









# আয়ুর্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক ।

সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ

„ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম,-এ এম,-বি ।

সহঃ সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন ।

প্রথম বর্ষ ।

( ১৩২৩ আশ্বিন হইতে ১৩২৪ ভাদ্র ) ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা মাসুল ৯/০ আনা ।

২৯ নং ফড়িয়া গুরুদ্বীপ, অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় হইতে.

শ্রীহারপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ।

# প্রথম বর্ষের সূচী ।

( বর্ণমালানুসারে )

বিষয় ।	লেখকের নাম ।	পৃষ্ঠা ।
অমি	... কবিরাজ শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত কবিত্ত্বষণ	৮৫১৬
অল্পকরণে আমাদের অবস্থা	... " শ্রীমত্যাচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৪২৮
অসিষ্ট প্রকরণ	... শ্রীতেজস্জ্ঞ বিজ্ঞানন্দ	২৭৩
অষ্টাদ আয়ুর্বেদ	... শ্রীগিরীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৭
অঙ্গরাগ ও অঙ্গরক্ষা	... ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস	৪৪৬
অষ্টাদ আয়ুর্বেদ ও		
অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়	... ..	২৯১৬৩
অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের		
উদ্দেশ্য কি ?	... কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ	২০৫
অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধে		
কয়েকটি কথা	... কবিরাজ শ্রীমত্যাচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৪২৩
অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়		
পরিদর্শকের মন্তব্য	... ..	১৩৩
আমাদের কথা	... কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ...	২২
আয়ুর্বেদে পরিণাপকক্রিয়া	... কবিরাজ শ্রীহরমোহন মজুমদার	৪২১০৬
আমরা অমায়ু হইতেছি কেন ?	... ..	১১৩
আবাহন	... শ্রীগিরীজনাথ কবিত্ত্বষণ	৭
আয়ুর্বেদ ( কবিতা )	... কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায়	৫
আয়ুর্বেদের কথা ( কবিতা )	... " শ্রীমত্যাচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৪৪৫
আয়ুর্বেদ অধ্যাপকের পত্র	... শ্রী ... ..	১৫০
আয়ুর্বেদ কি Empirical ?	... ..	১৫৮২১৩২৫৮
আম্র ( কবিতা )	... স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৬৭
আয়ুর্বেদে আয়ুতত্ত্ব	... শ্রীশ্রামাশ্রম সেনগুপ্ত	১৭৭১২৪৮
আমলকী	... কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ	২৬৭
আয়ুর্বেদে নিজাতত্ত্ব	... শ্রীমণীজনারায়ণ সেন	৪৫৫
আয়ুর্বেদে মাংস ব্যবহার বিধি	... ..	২২৭৩৩৭
আয়ুর্বেদের জর	... শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় বি-এ, বি-এল	৩১১
আয়ুর্বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা	... ..	৩৭৭
আয়ুর্বেদের কথার মাহাত্ম্য	... কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪০৬৫৫৬
আয়ুর্বেদে তক্ররহস্ত	... " শ্রীমত্যাচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৪১২
আয়ুর্বেদে নিজাতত্ত্ব	... " শ্রীমণীজনারায়ণ সেন	৪৫৫
আয়ুর্বেদের কথা ( কবিতা )	... " শ্রীমত্যাচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৪৪৫
আয়ুর্বেদের উন্নতি না অবনতি ?	... মহামহোপাধ্যায় শ্রী প্রমথনাথ তর্কভূষণ	৪৭৪
আয়ুর্বেদ চিকিৎসার স্থর	... কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরঞ্জন	৪৮৪৫৪৬
উন্নত কুতুরাদির বিবরণ ও চিকিৎসা	... ..	৩৬৮১
উদ্যোহন ( কবিতা )	... কবিরাজ শ্রীমত্যাচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৪৭৩

Acc. N.

Date.

66891

28, 10, 94

SL No. ৩৭১১৬৭

বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
কর্কট রহস্য	... শ্রীসতীশচন্দ্র দে, এম-এ	২০১
কুষ্ঠ ও বাতরক্লেব ভেদ নির্ণয়	... কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৩৯৩।৫১৩।৫৪৩
কাজের কথা	... ,, শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৪১৬।৪২৫।৫২১
খাণ্ডনির্কীচন ও সংস্কার	... ..	৩৫৬
খাত্তের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ	... শ্রীসারদাচরণ সেন	২২১
গোমাতা	... শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিজ্ঞাবিনোদ	৩১৬
গোলআলুর গর্ক	... কবিরাজ ৬দ্বন্দ্বরচন্দ্র গুপ্ত	৫৫৭
গ্রীষ্মচর্যা	... কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৪১৮
গ্রন্থপ্রাপ্তিধীকার ও এককালীন দান	... ..	১৮৪
চরকোক্ত ষড়ু পায়	... কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায়	১৮২।২৩২ ৪৬৪
চরকোক্তি স্বৈদ বিধান	... " " "	৫০৮
ছাত্রদিগের জ্ঞাত বিজ্ঞপ্তি	... ..	৪২৪।৪৭২
ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্যা	... শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ	৭৩
জর	... কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায়	২৫৪।৩০৬
তিল	... শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম-এ	৫৩৪
তামাকের ইতিবৃত্ত	... ডাক্তার শ্রীকান্তিকচন্দ্র দাস	৪২৫
তামাকের অপকারিতা	... " " "	৫৫১
থানকুনি বা থলকুড়ি	... ..	৩৬৫
তুইখানি পত্র	... ..	৪৭১
তুইট চিত্র ( কবিতা )	... শ্রীমণীন্দ্রপ্রসাদ সর্কাধিকারী	৪২০
বোহদের উপযোগিতা	... শ্রীহরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ	৭৪
দীর্ঘজীবির দিনচর্যা	... ..	১৬৫
ধূমপানবিধি	... কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন	৩৬২
নারী ও নারায়ণ তৈল	... শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়	৪২৮
নাভি কাঁহাকে বলে	... শ্রীমমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ,	৫০১
নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিকসম্মেলন-সভাপতির অভিভাবক—		
... কবিরাজ শ্রীধামিনীভূষণ রায়	১৭।৫২।১৬২।১৮৫।২৪৬	
পঞ্চায়র্বেদ	... শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ কাব্যবিশারদ	৫২৭
পঞ্চকর্ষ	... শ্রীশ্রীনাথ কবীন্দ্র	১
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোটকা ঔষধ	... কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৪২১।৪৫৩।৫৫০
পরীক্ষার ফল	... ..	৫৬৪
প্রাচীনকালের মুদ্রবিজ্ঞান	... শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ	১৪
প্রাচীন ভারতে পাউরুটি	... শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ	৪৭৭
পারিবারিক চিকিৎসা	... ..	৩২২
প্রতিসংকৃত রোগবিশিষ্ট	... কবিরাজ শ্রীমমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিকৃষ্ণ	৫১১
প্রাপ্তগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	... কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৪৬৮।৫১৭।৫৭৭
বকে ম্যালেরিয়া	... ,, শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৫১৭
বাল্যলীল স্বাস্থ্য	... ..	৩২২
বাল্যলীল স্বাস্থ্যের প্রতি সর্কায়ে কর্তব্য	... শ্রীমমরনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫০১

বিষয়।	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা।
বান্ধক রোগ চিকিৎসা	...	২২৪।২৩৮
বালাবিবাহ ( কবিতা )	... কবিরাজ চন্দ্রশ্রীচন্দ্র গুপ্ত	৩৬৮
ব্রণ-চিকিৎসা	... শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরাজ	২৫।৮২
বিবিধ প্রসঙ্গ	... কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন	৫৬২
বিবাহ-রজোদর্শন-গর্ভাধান	...	১৫৩
বিজ্ঞান-পরিদর্শকগণের নাম	...	১৮৩
বৈজ্ঞানিক	... কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ	৫৩২
বর্ষাচর্যা	... শ্রীমুখাংগুভূষণ সেন গুপ্ত	৪৬৭
ব্যাধির অস্বাভাব্য আয়ুর্কেন্দ্রের মূলমন্ত্র	... আয়ুর্কেন্দ্রাচার্য্য কবিরাজ গোস্বামী	৫৪২
মহুর জ্বর বা মোতাজ্বর	... শ্রীদারদাচরণ সেন কবিরঞ্জন	৫৩
মহুরিকা ( বসন্ত ) রোগ	...	২৭৭।২৮৫
মাসিক	... কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ বায় কাব্যতীর্থ	১
মাসিকের পঞ্চনিবান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য	... আয়ুর্কেন্দ্রাচার্য্য কবিরাজ গোস্বামী	৫৪৭
মাসিক ও এককালীন দান	...	৮৮
রোগ	... শ্রীশীতলচন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ	২৫১
রোগবিশিষ্ট—জ্বর	...	৩২১।৩৬২
শরচ্চর্চা	...	৪১
শিশুচিকিৎসা ( কবিতা )	... কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	২৬৩
শিশু-বক্তৃতা চিকিৎসা	...	৬৫।১২০
শিশুর সর্দি ও কাশ চিকিৎসা	...	১৪২
শিশুর উদরাময় চিকিৎসা	...	১২৩।২৪৩
শিশুর তড়কা চিকিৎসা	...	২৩৩
শিশুর প্রবাহিকা ও রক্তপ্রবাহিকা চিকিৎসা	...	৩৮৫
শিশুর ক্রিমি চিকিৎসা	...	৪৩৭
শারীর বায়ু	... কবিরাজ শ্রীহরমোহন মজুমদার	৩২২
শ্বেত প্রদর চিকিৎসা	...	৪২০
শাল্যধরোক্ত প্রলেপাবলী	... কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায়	৫০৮
সঙ্কট	... ,, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরাজ	৪৫৮
হৃৎনা	... শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ	২
হৃৎকাগার ও প্রহৃতিচর্চা	... শ্রীহরি প্রসন্ন রায় কবিরাজ	৫৫
স্নেহন ও স্নেহন বিধি ( কবিতা )	... কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায় কবিরঞ্জন	২৭০
সংক্রামক রোগ নিবারণে সদাচার...	...	২৮১
স্বাভাবিক	... শ্রীগিরীজনাথ কবিভূষণ	৭৮।১৩০
চৈতন্য চর্চা	... শ্রীমদ্রাজ কুমার দাস গুপ্ত	১৭২
চাউ ডিজিজ ও হৃদ্রোগ	... শ্রীরাজকুমার দাস গুপ্ত	৩৪৪।৪৪৭

# আয়ুর্বেদ ।

## মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

১ম বর্ষ । }

বঙ্গাব্দ ১৩২৩-আশ্বিন ।

{ ১ম সংখ্যা ।

### মাসিক ।

নমঃ শঙ্কর ! চন্দ্র-শেখর !  
ভবসিদ্ধুর কর্ণধার !  
ইহ সংসারে— বর্ণিতে পারে—  
মহিমা তোমার সাধা কার ?  
মৃত্যুঞ্জয় ! মঙ্গলময় !  
ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি ও লয় !  
মুক্তি ভিখারী— ব্রহ্মা মুগ্ধারি—  
ও চরণে ঢালে অর্ঘ্যভার !  
নমঃ শঙ্কর ! চন্দ্রশেখর !  
ভব সিদ্ধুর কর্ণধার !  
শিরেতে গজা— কল-তরঙ্গা,  
শিখ ডমরু শোভিত কর !  
কক্ষে উরসে— ভৈরব রসে—  
গর্ভে ভীষণ কুঞ্জবর !  
পিপাচ সন্ধে, অম্বৈ রবে,  
অকুটি-ভঙ্গী ভয়ঙ্কর !  
পিঙ্গল কেশ, সন্ন্যাসি-বেশ,  
পরেণ ! মহেশ ! দিগম্বর !  
নেত্র-অনলে- বিদ্যাং জলে,  
কোটি মন্ত্রণ ভয়ঙ্কার,  
চন্দ্র-মৌলি ! শক্তো ! জিহ্বা !  
বক্ষো-ভূষণ অস্থিহার,  
নিঃশেষ গতি ! বিশ্বের গতি !  
কর্ণে ধূতরা কর্ণিকার,  
নন্দী-শরণ ! বন্ধি-চরণ—  
লগ্নে দীপের নন্দকার !

## সূচনা।

\*~\*

জীবন ক্ষুদ্র, মৃত্যু বিরাট; জীবন মুহূর্ত, মৃত্যু অনন্তকাল, জীবন নিবস, মৃত্যু রক্তনী; জীবন চঞ্চল, মৃত্যু স্থির; জীবন স্থল, মৃত্যু ভয়ানক, জীবন সঙ্কীর্ণ, মৃত্যু প্রশস্ত; জীবন প্রাণক, মৃত্যু অদৃষ্ট, জীবন জীবের সেবা, মৃত্যু জীবকে গ্রাসক।

এই যে জীবন মৃত্যুর অজ্ঞে-বিশেষ—ইহারই নাম “আয়ুর্বেদ”। সংসারে ভ্রাম্যন্তর ঘনিষ্ট দৃষ্টান্ত বৃষ্টিবৎ জন্ম, মৃত্যুর এক মঙ্গল মুহূর্ত—ভরত “নগরীন্দর” সৃষ্টি হইয়াছিল। নিয়ম ভঙ্গ, সত্য ভঙ্গ, আদর্শের উপেক্ষিত বংশধর যখন ব্যসন-জাত রোগ-ভাড়াইয় দান-দগ্ধ কুল প্রবর্তিত হুটাহুটি করিতেছিল,—তখন এই “আয়ুর্বেদ”ই যেরূপে মজিন্দার আয় হতভাগ্য মানব সম্মানকে কোলে তুলিয়া ধইয়াছিল!

আমাদের বাহ্য কিছু আছে, সন্দেরই মৌ—মৃত্যু; মৃত্যু অনন্ত জীবনকে গাঙ্গু করে, অবিভক্ত্য মহাকাশকে ভগ্নাংশে বিভক্ত করে। মৃত্যুর নামে মাত্র ভয় পাব, মৃত্যুকে পরাভব করিতে না পাবিলে, মৃত্যুর উপ-ভোগমুগুর পারিব স্বথ চবিত্য্য হয় না। মৃত্যুকে সাধ্যমত দূরে রাখিব ব জ্ঞাত মাহুদ ধীর্গ জীবন কাম। করে। ভক্ত আরাধ্য দেবতার কাছে অমর বর চাহ—ইহার অধিক সে আর চাহিতে জান না। এই অমর্য বোভ বহু যুগব্যাপিনী উপাস্য কথায় আমাদের পুরাণের বহু অধ্যায়—হিরণ্য। ভারতের “আয়ুর্বেদ” সত্য ভাগ্য চবম দল।

মৃত্যু—বাঁচি-বিক্ষাভ চঞ্চল মহাদমুদ্র, তাহার বক্ষ জীবন-তরণী ভাসিতেছে, তরঙ্গ ছলিলে, বাহ্যসে হেনিতেছে, অবশেষে সেই মৃত্যুভেদে সলিল সমাধিতে মিশিতেছে। শত্ৰু উদ্ধৃতিতে স্বীকারে জীবনের বন্দনা গাঠিতেছে, সে শব্দ ডুবাই। গভীর নির্মোহ, সর্লকাল পরিপূর্ণিত ববিরা অনাকুর মুখে বিস্তার আসিতেছে—“মরণের জয়!” এই মর্লজয় মর্লগানী মরণের বিরুদ্ধে—ভবতেব “আয়ুর্বেদ” দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান! নিখিল স্বার্থক পবমার্গের মধ্যে মিন-ইয়া ক্ষয়িদমে যে আনন্দের হিজল জাগিয়াছিল “আয়ুর্বেদ” তাহারই দেবোদ্ভিষ্ট অপূর্ণ নৈবেদ্য। “আয়ুর্বেদ” শুধু চিকিৎসা শাস্ত্র নহে, জড় ও জীবের সামঞ্জস্য দেখাইয়া “অয়ুর্বেদ” বিবর্তিত “মহাবিজ্ঞান”। স্থল ভ্রমের পুলক—“আয়ুর্বেদ পূর্ণা সমুদ্রল “হৃদদর্শন”।

মৃগা: রত কত স্বথ, কত ভেদ, কত শৌক, কত উৎসব ব্যসনের স্বর্গ্যথ, অজীব বকে চির রাখিয়া গিয়াছে!

বিস্ত হায়! আর্ধ্য স্বয়ির অতুলনীয় মহাকাশি এমন যে অমূল্য আয়ুর্বেদ, আমরা তাহার মহত্ব ভূমিয়া গিয়াছি। আমাদের পাপের প্রাশস্তিত্ব আরম্ভ হইয়াছে। যে দেশে একদিন পূর্ণস্বথ, পূর্ণ স্বাস্থ্য, পূর্ণ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ছিল,—সেই দেশে এখন নিত্য নতুন উৎকট রোগের আনাধানি হইতেছে। আমাদের ‘সদাভূতের ভাণ্ডার’ হইতে মাংসমী কাদিয়া চণিয়া গিয়াছেন। “আয়ুর্বেদের”



আমাদের করিয়াজিলাম বলিয়া,— আমাদের দেশের প্রকৃতি বিকৃতিমণ্ডী, জল বায়ু অস্বাস্থ্য-বৎ, ভূমি সার-শক্তি-বিহীন, গাভী কৃষ্ণ-পয়স্বিনী, তরলতা দীন ফলবতী, নদ-নদী শুষ্ক মলিনা। আমাদের এখন বড় দুঃসময় ; আমরা দেশের সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ-পরিণামের অট্টোকা ছাড়া, শিল্প—স্বাধীনতা, আমাদের চতুর্দিকে কেবল অন্ধকার, অসুখ, অদর্শ, অন্নকষ্ট। বিপত্তি—কোটি মানবের আশ্রয়ভূমি— ভারত ভূমির কক্ষে কক্ষে, অন্ধকার ও বিদগ্ধতা— উভয় মিলিয়া, আজ বরণের ধ্যান করিতে বলিয়াছে।

“আয়ুর্কদের” অল্পশাসন মানি নাট বলিয়া, “আয়ুর্কদের” বিশ্বস্ত হইয়াছি বলিয়া আজ আমাদের দেশে অকালমৃত্যু কষ্ট তাগুণে নষ্ট করিতেছে। যে “আয়ুর্কদের” একদিন জগতের অভাব অন্যান্যের সহিত নিরন্তর দ্বন্দ্বযুদ্ধ পরিয়া লক্ষ লক্ষ জীবন রক্ষা করিয়াছিল, তাহার অধ্যাদা রাধি নাই বলিয়া, আজ আমাদের এত অধঃপতন।

আমাদের সমাজের এখন সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্ত অবস্থা, তাড়ী কুইনাইনের চেষ্টাজনায় আর তাহাতে বলাধান হইবে না। এখন তাহার উদ্ধোধনের জন্য আয়ুর্কদের ধাতু-দাতা মৃগনাতি প্রয়োগ বরিতে হইবে। আমাদের অক্ষয় গৌরবময় অতীত ইতিহাসে আয়ুর্কদের শাস্ত্র সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সেই সিংহাসনে আবার আমাদেরকে শিবস্থাপন করিতে হইবে। আয়ুর্কদের কথা—ভারতের “কৃষ্ণবধা”, আয়ুর্কদের ইতিহাস ভারতের উচ্চতা ও সত্যতার ইতিহাস। সেই অনবদ্য মঙ্গলমধুর ইতিহাসকে ভবিষ্যতের উদীয়মান গৌরবে দীক্ষিত করিতে হইবে।

আমরা বদল দেশে জন্মিয়াছি আমরা দেশের দীক্ষা—পরার্থ-পরতার মহামন্ত্রে। ছাত্তোয়া উপনিষদ পড়িয়া আমরা বুঝিয়াছি আমাদের জীবন—যজ্ঞ। আমরা ভারতবাসী—জীবন-যজ্ঞের যজমান। যজ্ঞার্থে স্বয়ম্ভু কর্ত্তব্য, এই জয়মুখের বেদ-গুপে আমরা স্টেট হইয়াছি। বেদভক্ত বলিয়া, বেদের উপাসক বলিয়া, আমরা বৈদ্য। পূণ্যপুত্র আয়ুর্কদের—আমাদের বরণ্য ‘বেদ’, দর্শন-সিঁটিকিয়া—আমাদের প্রাণের উপাসনা, মানবের স্বাস্থ্য—আমাদের যজ্ঞনিখালা।

বেদরক্ষা, জীবরক্ষা, বেদের রক্ষা হুজি—আমাদের সাধনার লক্ষ্য। আমাদের প্রথম কার্য—প্রকৃত “বৈজ্ঞ” গঠন করা। এদেশে “বিরাজ” অনেক আছেন, কিন্তু বৈজ্ঞের সংখ্যা বড়ই অল্প। বৈজ্ঞ না হইলে বৈদ্য যজ্ঞ কে করিবে? আমাদের দ্বিতীয় কার্য—আয়ুর্কদের জীর্ণ কথনে “নবজীবন” সকার আয়ুর্কদের এখন রক্ত-মালিনী রক্তপূরীভাব শেষ; প্রকৃত্যবিকের মত সেই ভয়তপ্ত সাদনে অল্পসঙ্কান, করিতে হইবে। অত্রভৌ বিরাট প্রাসাদ—বহুদিনের অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল, তাহার চুড়া ভাঙিয়াছে, কাগিশ খসিয়াছে, জমাট ধগিয়াছে,—কড়িবরগা জীর্ণ কী দষ্ট হইয়াছে নিপুণ হস্তের স্নেহ পরিচালনে—সে কলির সংস্কার করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে—যুরোপের জীবন বিজ্ঞানে সিমেন্ট দিয়া ও বিদ্রিষ্ট সন্ধি পূর্ণ করিতে হইবে দেশে দেশে ঘুরিয়া মানব জ্ঞানের চূর্ণবার সংগ্রহ করিতে হইবে। ধার করা জিনিষ-বস্তু লক্ষ্য করিলে চলিবে না। জ্ঞানবর্ধনে উপাদান যে কোনরকম হউক—তাঁহা কখনো অপব্যয় হয় না।

— আমাদের তৃতীয় কার্য—জীবনকার্য ঐশ্বর্য সংগ্রহ চিকিৎসা কার্যে—কুস্তিত জ্ঞান মহাপাপ। আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থী ছাত্র যাহাতে ঐশ্বরের বিশুদ্ধ উপাদান, গাছ গাছড়া, বিষ, উপবিষ, ধাতু উপধাতু, আনাগাদে চিনিয়া লইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই তিন প্রধান উদ্দেশ্য নইগা, আমরা কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম। আয়ুর্বেদের আটটা শাখার যোগাচরনপূর্বক অধ্যাপনার জন্য—“অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিভাগ্য” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাই আমাদের লক্ষ্যমণ্ডপ। নূতন উত্তম আমরা সজ্জা আরম্ভ করিলাম। যোগ্য বক্তৃতা—কেহ হোতা, কেহ উপপাতা, কেহ বা তত্ত্ববাদের কার্য্য ভার গ্রহন করিয়াছেন। ঋষি বংশধর ঋক্ময় সন্ধান করিতেছেন। এ যজ্ঞের ঋষিক স্মরণ স্মার আন্তর্য্যে মূগোপাধ্যায়। সার আন্তর্য্যে তাঁহার উদার কণ্ঠের কল্যাণ হস্ত, প্রতিভা দীপ্ত মহানুজ্জয়, এবং একনিষ্ট স্বাধীন প্রাণ-মহাসাধনায় নিবেদন করিয়াছেন। সন্তদয় বহুগণ, আমরা মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত এই মণি রত্ন-মালা লইয়া আপনাদের দ্বারে সমুপাগত, সযত্নে কণ্ঠে ধারণ করিলেই কৃতার্থ, উৎসাহিত ও ধন্য জ্ঞান করিব।

স্বার্থার্থীজন অপর আমরা—আমাদের ঋদ্ধি “আয়ুর্বেদ”, আমাদের প্রাণপত্নী

“আয়ুর্বেদ”, আমাদের ছন্দ—বার্তাপিতৃ-কণ্ঠের ত্রিষ্টমভরী “আয়ুর্বেদ”, আমাদের তীর্থ-মণি “আয়ুর্বেদ” আমাদের সর্ব্বধ—নিখিল বিধের মঙ্গল নি-কতন—“আয়ুর্বেদ” তাই “আয়ুর্বেদ” নামেই আমরা নাম করণ করিলাম। অপনারা আশীর্বাদ করণ—আমাদের যেন জ্ঞানকৃত কোনও ত্রুটি না হয়। সরস্বতী দৃশ্যতীর্থ পবিত্র-স্থলে—সাম বাক্যের সঙ্গে একদিন যে মহাসত্য উদ্ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। সেই বেদ-ধ্বনি-মুখরিত হইয়া, সেই হোম-ধ্বজ সন্মুখে বিহার ক্ষেত্র—সেই মুনিকল্পা-সেবিত লতা-বিতান, সেই নীবার কণা-কর্ণ উটজানন, আবার যেন আমরা ফিরিয়া পাই। রোদ-করোজ্জ্বল প্লকময় প্রভাতে, ময়ূষ সন্তপ্ত জ্যোতির্ময় মধ্যাহ্নে, দীপসমীর-সেবিত স্নিগ্ধ-গম্ভীর প্রদোশে, মুক্ত প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ধীরোদাত্ত ভাষায় আবার যেন আমরা বলিতে পারি—

পুনর্মমঃ পুনরাশ্রম্য আগম্,

পুনঃ প্রাণঃ পুনরাশ্রম্য ম আগম্,

পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগম্

আমাদের সেই মন সেই আত্ম, সেই প্রাণ সেই আত্মা, সেই চক্ষু, সেই কর্ণ—যাহা আমাদের নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সমস্তই আবার ফিরিয়া আসুক।

## আয়ুর্বেদ ।

•••••

অসীমে লগ্ন, সমাশ্রিত্য,  
বিরোট-নিষিকার,  
‘চতুর্ভুজের মুখ পঙ্কজ।  
হইতে ব্যক্তি যার,  
সৌম্য-রুচির মগ্ন মুক্তি  
জন্ম মরণ মাঝে,  
অনল-রুগে, বিলাস আহুতি  
যে দিল পরের কাজে,  
বিশ্বের বায়ু, নিশ্বাস বার,  
বিজ্ঞান যার প্রাণ,  
উদার-হৃদে, যে করে ভক্তে  
দীর্ঘ জীবন দান,  
ইন্দ্ৰিতে যার মগ্ন ভগ্ন  
শক্তি নহাকাল,  
কল্পনা বগে ভূতলে সৃষ্টি  
অমৃত ইন্দ্রজাল,  
সত্য-সহায় ‘কণাদ’ যাহার  
ক’রেছে নাড়ীচ্ছেদ,  
সিদ্ধ মথন-উত্থিত ধন,  
সে এই “আয়ুর্বেদ”।  
অশ্বি-যুগল, দ্ব্যলোকে বহিল  
যাহার স্বর্ণরথ,  
মন্ত্রে রচিল, ত্রীপুনর্কল্প  
অবতরণের পথ,  
তুলিল শব্দে, ওকার ধ্বনি,  
তাপস “ভরবাঙ্গ”  
বধিল “অজুর্কণের” কর,  
যহাযজ্ঞ লাজ ;

“স্বাগত” বলি, তৃত্য-নিগাদে  
ডাকিল “অগ্নিবৈশ্য”,  
সোম-উচ্চ, সে উঠিল কাপিয়া,  
আর্য্য উপনিবেশ ;  
“অত্রি” করিল অভিক্ষেপ যার  
শত তীর্থের নীরে,  
আপনি ইন্দ্র, রত্ন-কিরীট  
পরাইল যার শিরে ;  
পুণ্য পুণ্ড্র-স্পর্শে ঘুচাতে  
শিখিলের গ্লানি ক্রন্দ,  
দেবতার দেশে, দেবা দিল এসে,  
সে এই “আয়ুর্বেদ”।  
“ধম্বজরি” কনক কুন্ত  
স্থাপিল সিংহাসনে,  
“ভেল” সাজাইল কল্প তোরণ  
শলব-ফুলহারে,  
খেতচন্দন তিলক ললাটে,  
পরাইল “কার-পাণি”  
“চরক” “হারীত” হৃৎকণ্ঠ দিল,  
পূজা-সজ্জার আনি,  
“জৈমিণী” যার “শ্রীধর” মিলি;  
“বহুধারা” দিল ঢালি,  
“বৃক্ক রাগভট” করিল আরতি,  
‘পঞ্চপ্রদীপ’ জালি;  
হৃদি-মন্দিরে তাত্ত্বিক শিব  
পেতে দিল ‘বীরাসন’,  
শব-সাধনায়, পৃথিবীর অমু  
পরাধীন আহরণ।

“অমর” হেঁয়ান মন জগতের,  
 মিটল মনের খেদ  
 নানবের দেশে দিক অনিল,  
 সে এই “আয়ুর্বেদ”।  
 “অষ্টাদশের” লাবণ্য যা’র  
 কোটি সূর্যের দীপ্তি,  
 রোগীর মেঘের অতুলহর্ষ  
 অস্তুর ভরা তৃপ্তি,  
 আত্মার ভূমানন্দে ছুটায়  
 পবিত্র হামগন্ধ  
 রাতুল চরণ বন্দে বাহাব  
 শত ক্রীড়া-খীল ছন্দ,  
 দীক্ষা বাহার পর-হিত ত্রয়ে,  
 “অম্যান”-যা’র পর্ষ,  
 নির্মল মনে প্রতিবিম্বিত  
 চির নিকাম কণ্ঠ,  
 কীর্তি বাহার ত্রিতাপ তপ্ত  
 বিদ্র ও বাধি নাশ,  
 প্রার্থীর দেয় তিকা নিয়ত  
 করুণা—“অমৃত প্রাণ”  
 শাপনের নীতি “মারোগ্য যা’র  
 ‘নিরুহ’ বস্তি ‘স্বৈর’  
 নিঃশব্দে দেশে দেখ দিল এসে,  
 সে এই “আয়ুর্বেদ”।  
 যুগান্তরের প্রব প্রভাবে,  
 নিত্য নূতন বেশ,  
 ত্রিবিধ ছুঃখ নিবারণ তরে,  
 মুখে কত উপদেশ,  
 যুক্তিকা খুঁড়ি, বনে বনে চুড়ি,  
 অধ্যবসায় কত,  
 অশান শব্দ: “কুলশয্যায়”  
 হরে দেশ পরিণত ;

কুতল নর, ব্যসনের লাভে,  
 চিত্ত পথা গেল ভুলে,  
 দেখা দিল পাপ, অমর হ’রে,  
 অবগুষ্ঠন খুলে,  
 মোখার স্বাস্থ্য ভাঙিয় পড়িল,  
 তবু না হইল জ্ঞান,  
 “যড় দর্শন” শিখাইল শেগে,  
 মরণের মহাধ্যান,  
 তদ্রূপিত অলস নবনে,  
 রহিলনা ভেদাভেদ,  
 যত্ন অভাবে—শৃঙ্খলাগীন,  
 সে এই “আয়ুর্বেদ”।  
 কত বিপ্লব, কতই বঙ্গা,  
 প্রায় ডাকিল আনি,  
 মূর্ছিত তমু, কোল তুলে নিল,  
 কুলীন “চক্রপাণি”  
 “শঙ্কর” “শিবদাস” রোবিন্স  
 প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক  
 অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া করিল  
 চেতনা-সম্পাদন ;  
 “অঙ্গ-কল্প তরুর ময়,  
 শুনীল “সঙ্গাধর”  
 “কৈলাস” “রমানাথের” যত্নে,  
 কণ্ঠে ফুটিল স্বর,  
 ক্ষোম-বদন দিল পরাইয়া,  
 “সোপী ও “সারকানাথ,  
 দাঁড়াইল ধরি ‘তুর্গা’ “প্রসাদ”  
 “পঞ্চাননের” হাত ;  
 কঙ্কালে দিল বিজয় রত্ন  
 শোভিত—মাংস—মেদ  
 নূতন যুগেতে শ্রীহাদ  
 পাইল আয়ুর্বেদ।

শ্রীজবনত রায়।

## আবাহন।

বহু যুগযুগান্তর পূর্বে যখন ভূত-জননী  
বসন্তী অজ্ঞানীকৃত্যাক্ষর পশুপ্রতিম মানব  
সমূহে পূর্ণ ছিল, যখন জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে  
জ্ঞান-বর্ণ চিত্ত উদ্ভাসিত হয় নাই, যখন  
জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম মনুষ্যের উপাধি  
নিয়ম বিবেচিত হইত না, তখন এই পুণ্যভূমি  
ভারত, এই সুদীর্ঘ-সংস্কৃত, ভারতীর চরণ-  
স্পর্শে পুত্র ভবনে, এই জ্ঞান-ধর্ম বিদ্যা পুণ্য  
পরিষৎ-প্রবাহ সুশীতল দেশে করুণাবতার  
মহাদিগণ মানবদিগের রোগ-সমুদ্রা দর্শনে  
ক্লান্ত হইয় হে সনাতন আয়ুর্কেন্দ্র! একান্ত  
ভয়ের তোমার আবাহন করিগাহিলেন।  
সেই পাতঃস্মরণীয় পুণ্য প্রবণ-চিত্ত মহাত্মা-  
গোবিন্দ আবাহনে তুমি পুণ্যক্ষেত্র ভারতে  
সম্মিলিত হইয়াছিলে। হে চিরানন্দপ্রদ, তোমার  
পদস্পর্শে আশান স্বর্গে পরিণত হইল, মরুভূমি  
পলা উঠানে পরিবর্তিত হইল, রোগীর উৎকট  
দুঃখ-বিস্তার দূর হইল, ক্রোধের রোগক্রিষ্ট মুখে  
সুখানন্দ হাসি ফুটিয়া উঠিল, অবাগ-মরণোন্মুখ  
পশু-জীবন লাভ করিল, বন্ধা পুত্র লাভ করিল  
ব। পুরুষদলাভ করিল, মেধাহীন মেধা লাভ  
করিল, অজ্ঞান দীর্ঘ জীবন লাভ করিল। হে  
বদন্তক, তোমার প্রণামে ভারত আনন্দময়  
হইয়া উঠিল।

সে আজ কত দিনের কথা। তাহার পর  
বহুদিন, কত মাস, কত বৎসর, কত যুগ-  
যুগান্তর অগীত হইয়া গিয়াছে। ভূত ধাতীর  
বিশাল বক্ষো-নাট্যশালায় কত গুণ-রূপ পূর্ণ  
মহা-নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কত  
কল্পনাত, কত ভূমিকা, কত অমৃতোপাধ,  
বহুধা বহু বিধে কল্পিতা চলিয়া গিয়াছে,

কত রাষ্ট্র-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম-বিপ্লব  
বিভিন্ন জাতির জীবনে যুগান্তর ঘটাইয়াছে।  
কত উন্নত জাতি অবনত হইয়াছে, কত অব-  
নত জাতি উন্নত হইয়াছে, কত প্রাচীন বিজ্ঞা  
লোপ পাঠিয়াছে, কত নূতন বিজ্ঞা উদ্ভাবিত  
হইয়াছে।

অগণ পরিবর্তনশীল, জীব মরণশীল।  
উত্থান, পতন ভাগ্যচক্রনেমীর পরিবর্তন  
সমুদ্র। অগণ্য জাতি তাহা জানেন তাই তাঁহারা  
এই জাগতিক পরিবর্তনে বিশ্বস্ত নহেন। কিন্তু  
হে অমর্ত্য! আজ তোমার একরূপ পরিবর্তন  
দেখিগেছি কেন? হে অপৌকষেয়, হে অব্যয়  
ভূমিত এ জগতের নও তুমি যে স্বর্গের, ভূমিত  
বিনশ্বর নও, তুমি যে অবিনশ্বর, ভূমিত ক্ষয়-  
শীল নও, তুমি যে অক্ষয়। তবে তোমার এ  
পরিবর্তন কেন? কোথায় তোমার সে চতু-  
র্কর্ণ-কলপ্রাণ পরব-কল-সমুদ্র মষ্ট মহাশাখা?  
তাহাত আর লোকলোচনের বিষয়ীভূত নহে?  
কেবল একমাত্র নাতি-শুভ নাতি-কল পরব  
যুক্ত শাখা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। হে নিত্য,  
তোমার এ পরিবর্তনের হে হু কি? হে জ্ঞান-  
ময়, জ্ঞানের ত বিনাশ নাই। জ্ঞানের ত ক্ষয়  
নাই, তবে আজ তোমার একরূপ ক্ষয় দেখি-  
গেছি কেন?

‘না-না-অবিনশ্বর তুমি, অক্ষয় তুমি,  
তোমার কি বিনাশ হইতে পারে, তোমার  
কি ক্ষয় হইতে পারে। তোমাকে আরক্ত  
করিবার জন্য যেসকল কঠোর সাধনার আব-  
শ্যক, পূর্বতম মহাবিপণ বেক্রপ মহতী সাধনার  
বলে তোমাকে আরক্ত করিয়াছিলেন, সেসকল  
সাধনা আমাদের নাই। হে অমর্ত্য, তাই  
তুমি আমাদের নিকট অক্ষয়কালিত, অক্ষয়  
কৃত জ্ঞানের স্বতীত, আমাদের কৃত সাধনার

অন্যন্ত। স্বল্প-দৃষ্টি আমরা স্বল্প-দৃষ্টি-হীন হইয়াছি বলিয়া তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু হে শাশ্বত, তুমি ছিলে, তুমি আছ এবং তুমি থাকিবে। দেবতার আবাহন করিয়া, উপযুক্ত উপচার দ্বারা কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার পূজা করিতে হয়, তবে দেবতা প্রকট হইয়া থাকেন। কিন্তু হে দেবতা, আমরা উপযুক্ত দ্রব্যদ্বারা সম্যকরূপে তোমার পূজা করিতে পারি নাই, তাই তুমি আমাদের নিকট অপেক্ষা হইয়া আছ।

হে আরোগ্যপ্রদ, তোমাৎ এই প্রচ্ছন্ন অবস্থা বিপাক ভারত ভূমিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। সে দীর্ঘ আয়ু, সে মেধা, সে প্রতিভা, সে শৌর্য্য, সে বীৰ্য্য ভারতে আর নাই। রোগশীর্ণ ভারতবাসী আজ চৰ্ম্মাচ্ছাদিত কঙ্কাল মাত্র, আর সেই কঙ্কালের মধ্যে একটা শত-রোগ-শোক পীড়িত প্রাণ, বহির্গত হইবার জন্য ব্যকুল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঘরে ঘরে হাহাকার, পীড়িতের আর্তধ্বন, নিষ্ঠুর প্রিয়জনদের হা ততাশ, লুপ্ত-স্বাস্থ্যের করুণ বিলাপধ্বনি, আজ ভারত-ভূমিকে মুগ্ধিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রতি গৃহস্থের গৃহকোণে রোগ ও অকাল মৃত্যু লুকায়িত রহিয়াছে। তাই হে আয়ুর্বেদ, হে শর্কর, তোমার পুনরাবাহন করিতেছি—তুমি এস। আবার তোমার অষ্ট পাখা, অসংখ্য প্রশাখা—পত্র-পুষ্প-ফল সমৃদ্ধ হইয়া বিরাজ করুক। তোমার স্থশীতল ছায়া, সুগন্ধি ফুল, অমৃতময় ফল, ভারতবাসীর স্বাস্থ্যদ্বন্দ্ব সম্পাদন করুক। এস হে মহান, হে শাশ্বত, হে সনাতন, এস। এ শ্মশান সদৃশ ভারতকে আবার রম্য উপবনে পরিণত কর, তোমার প্রকট রোগ ও অকাল মৃত্যু দূরে পুলায়ন

করুক, ভারতবাসীর বোগমরণ-পঙ্কিত বিষম বধনে নির্ভীকতা ও হানি ছুটিয়া উঠুক। তোমাৎ ছাড়িয়া, স্থপথ ভুলিয়া ভারতবাসী ক্রমশঃ ভূবিতে বসিয়াছে। তুমি স্থপথ দেখাইয়া নিমগ্ন প্রায় ভারতবাসীকে উদ্ধার কর। হে শর্কর শাস্ত্রময়, তুমি আমাদেরকে স্বাস্থ্যনীতি, ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দাও। তোমার শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে ভারত আবার মধুময় হউক।

হে আরোগ্য, অল্প সাধনায় দেবতা প্রসন্ন হইবেন না। তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য অনেক মনস্বী মহর্ষির বক্ষশোণিতের প্রয়োজন হইয়াছিল। আজ তোমার পুনরাবাহনের দিনে, আমরা অসংখ্য ভ্রাতা তোমার মূলদেশে শোণিত সিদ্ধ করিবার জন্য বক্ষ উন্মুক্ত করিয়াছি। এস এস হে বহু সাধন-সাধ্য, তোমার যত অভিক্রি দোহদরূপে আমাদের বক্ষ শোণিত লইয়া তুমি আবার পূর্ণাঙ্গে আবির্ভূত হও। আর এই পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষে এই দ্বীচিশিবিকর্ণ পদরজ-পূতদেশে, এই পরিত্যক্ত ব্রত পুণ্যপুত্র ভবনে, কে কোথায় আছ আত্মত্যাগী মহাপুরুষ, নরসমাজের কল্যাণের জন্য, আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য বক্ষশোণিত প্রদানে অগ্রসর হও।

এস এস হে নিত্য, তুমি নিত্য হইলেও নিত্য্য মহামায়ার ন্যায় তোমার আরাধনা করিতেছি, লোকের মঙ্গলের জন্য জগন্মাতার ন্যায়, হে ভগতের পিতৃমাতৃ স্থানীয় আয়ুর্বেদ, তুমি পূর্ণ-মূর্তিতে আবির্ভূত হও। হে শর্কর-সিদ্ধি, তোমার পূর্ণ-মূর্তি না দেখিতে পাইয়া আজ আমরা ব্রূণিত, পদদলিত, মর্মান্বিত। জগতে আজিও এমন কোন ভাবার সৃষ্টি হয় নাই, যে ভাষা আমাদের জন্ম-নিহিত এই মর্ম্ম-ছেদী দুঃখ-কাহিনী প্রকাশ করিয়া বলিতে

পারে। হে বরণ্যে, হে নিখিল-চিকিৎসাশাস্ত্র-  
রত্নাকর সন্তঃ-অপগতবালা বিজ্ঞান-গর্ভ নবযৌবন-  
মরোক্ত বিবিধবৈদেশিক চিকিৎসাশাস্ত্র আজ  
আমাদিগকে নির্বাক নিনিমেষ ও নিবোধিতক  
করিয়া তুলিয়াছে। তাহার। যখন প্রত্যক্ষ-  
প্রমাণভাস-প্ররোগ দ্বারা আমাদিগকে ও জন-  
সাধারণকে মুগ্ধ করে, তখন হে বুদ্ধ-বিজ্ঞান-  
গর্ভ, ধীরোদাত আয়ুর্কোষ! আমরা নিঃসাহসে,  
নির্বাক বন্দনে, নিনিমেষ দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি  
চাহিয়া থাকি। আর একটা নিদারুণ হুঃখ,  
নিদারুণ শোক, নিদারুণ আত্মশ্রানি, আমাদের  
এই অস্থিগ্নর বেষ্টিত হৃদয়কে শতধা ছিন্ন করিয়া  
হাহাকার রবে দিযিমিকে ছুটিয়া বেড়াইতে  
চাহে। মনে হয় আমরা ঐষ্টান জাতির কথিত  
ঘোর নরকে পতিত হইয়াছি। আমাদের  
সম্মুখে শীতল জল, কিন্তু পান করিবার উপায়  
নাই। সম্মুখে স্বকোমল শয্যা, কিন্তু শয়ন  
করিবার উপায় নাই। আমাদের আছে  
সকলি, কিন্তু কিছুই নাই। তাই হে চতুর্কর্ণ-  
কণপ্রদ, হে পূর্ব-তোমার আবাহন করিতেছি।  
তুমি এস, এন হে সর্বাত্ম-সুন্দর, তোমার পূর্ণ  
মুর্ত্তিতে প্রকট হও। বল, একবার দৃষ্ট গভীর  
ঘরে বল—

“বদ ইহান্তি তদন্তত্র ঘরেহান্তি ন তং কচিং।”

এস, এস হে আমাদের সর্বত্র, আমরা প্রাণহীন,  
আমাদের প্রাণ দাও। আমরা বাক্যহীন আত্ম-  
দের বাক্য দাও, আমরা সাহসহীন আমাদের  
সাহস দাও। আমরা জ্ঞানহীন আমাদের জ্ঞান  
দাও।

## পঞ্চকর্ম।

শ্বেদ।

প্রায়শো বপুঃশুক্লিং কৃষ্ণা দেয়ং যদৌষধং।  
অতঃপূর্বং চিকিৎসায়াং শোধনং পরিকীর্তিতম্ ॥

প্রায় রোগ মাছেই শরীর প্রথমে পরি-  
শোধন করিয়া ঔষধ প্ররোগ করিলে, যথেষ্ট-  
পযুক্ত ফল লাভ হয়, নচেৎ তাদৃশ ফল হয়  
না। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলে  
যে রূপ সুন্দর শস্য হয়, অনাক্রষ্ট ভূমিতে তদন্ত-  
রূপ হয় না। অতএব অটল পুরাতন রোগে  
বিবিধবিহিত শোধন বিধেয়।

শোধন কাহাকে বলে?

যদুারা শরীরস্থ দোষাদি বহুপরিমাণে  
বিদূরিত হইয়া, শরীর প্রকৃতিস্থ অথবা  
চিকিৎসোপযোগী হয়, তাহাকে শোধন বলে।

শোধন পাঁচ প্রকার যথা—বমন, বিরেচন,  
হুই প্রকার বস্তি ও নস্য। বমনাদি পাঁচটিকে  
পঞ্চকর্ম বলে। এই পঞ্চ কর্মের পূর্বকর্ম বলিয়া  
প্রথমে শ্বেদ সম্বন্ধে কিকিৎ বিবৃত হইতেছে।  
ভাবমিশ্র বলেন—

“যেষাং নস্যং প্রোক্তব্যং বস্তিচাপি হি দেহিনাম্।  
শোধনীয়াস্ত যে কেচিৎ পূর্বং যেচ্চাস্ত তে মজাঃ

পঞ্চকর্মের মধ্যে যেটাই কর অগ্রে শ্বেদ  
মিতে হইবে।

শ্বেদ কাহাকে বলে?—“ষিধ্যতে অনে-  
নেতি শ্বেদঃ।” যদুারা ঘর্ম হয় তাহা শ্বেদ।  
শ্বেদ কাহার কার্য্য? শুণ কি? শ্বেদ অগ্নির  
কার্য্য। অগ্নি (তাপ) কারণ, শ্বেদ—কার্য্য।  
শ্বেদের গুণ—

অগ্নিবীজকমতত-নীত-বেগু-নাশনঃ।

অগ্নি-বীজ-কম-তত-নীত-বেগু-নাশনঃ।

অগ্নি, বাতককনিত অন্তঃস্থ হুই-  
শীত, কণ্ঠ, নিবারণ করে।

অতএব যে সময় আমাদের শরীরের সর্বদিকে বা যে কোন প্রদেশে তাপের অন্নতা হেতু শিরাস্থ রস, রক্ত স্তান অর্থাৎ গাঢ়, হইয়া, শুষ্ক, গৌরব, বেদনা জন্মাইয়া, অকর্ণস্থ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তৎকালে যেদ প্রয়োজ্য, স্তত্রাং যেখানে অবরোধ, প্রায়ই সেই স্থানে যেদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

অবরোধ কাহাকে বলে?—গতিজ্ঞান না হইলে অবরোধ জ্ঞান হয় না । এই জগৎ নিয়ত গতিশীল, “গচ্ছতীতি জগৎ ।” আমাদের অধিষ্ঠাত্রী পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য সকলই ভ্রমিতেছে । ইহাতেই দিবা, রাত্রি, ঋতু, পরিবর্তন হইতেছে । গতি না থাকিলে জগৎ কণমাত্র থাকিতে পারে না, গতিই জীবন । জগতে যে গুণ আছে জাগতিক পদার্থ পুঞ্জও সেই গুণ আছে । আমরা জগতের একাংশ । স্তত্রাং “ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে ।” বহির্জগতে চন্দ্র সূর্য্যের গতি দ্বারা যে রূপ পদার্থ নিত্যের স্থিতি পরিণতি, সানিত হইতেছে, সেইরূপ আমাদের দেহেও প্রাণ সঞ্চরণশীল, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া হইতেছে—য য বিষয়ে ইঞ্জিয়ার প্রবৃত্তি, আহার-পরিপাক, মলমূত্রাদি নিঃসরণ সকলই শারীরিক গতি-নিবন্ধন । গতিই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু, শরীরের গতিই জ্ঞান ।

অতএব যিনি যে পরিমাণে শারীরিক পদার্থ সকলের সংখ্যান, স্বভাব ও ক্রিয়া অবগত আছেন, তিনি সে পরিমাণে অবরোধ বুঝিতে পারেন । এই জ্ঞান যদি চিকিৎসক সেই গতি ও অবরোধের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তবে তাঁহাকে কর্তব্য নিরূপণে অধীর হইতে হইবে না ।

যে রূপ রোগপথ কি জলপথ পরিষ্কার না থাকিলে, যান অবরুদ্ধ হইয়া আরোহী বিপন্ন হয়, সেইরূপ আমাদের শরীরের স্রোতঃপথের অবরোধ হইলেও বিপদের সম্ভাবনা । অতএব কেনই বা অবরোধ হইয়া থাকে—কি রূপেই বা পরিষ্কার হয়, তাহা জানা আবশ্যক ।

সিরা সমূহের যথোপযুক্ত অবকাশ না থাকিলেই অবরোধ হয় না । অবকাশ আকাশের গুণ, যে রূপ মেঘ সঞ্চিত হইয়া আকাশ আবৃত করে, শরীরেও তদনুরূপ রক্তাদি স্তম্ভিত হইয়া অবরোধ করে । তাপের সঞ্চেতে যে রূপ মেঘ সংঘত হয়, শরীরেও তাপের অভাবে রসরক্তাদি সংঘত হয় । মেঘ যেমন তাপ সংযোগে প্রবীকৃত হইয়া বর্ষণ করে শরীরেও তদনুরূপ তাপ সংযোগে ঘর্ষাদিরূপে তাহা বিনির্গত হয় । অতএব অবরোধের বহিষ্কার—শীতবায়ুর স্পর্শ, শীতলজল, আভ্যন্তর কারণ—শ্লৈষ্মজনক ও অজীর্ণক আহার ইত্যাদি । এই জ্ঞান শাস্ত্রকারেরা প্রধানতঃ আমরসকেই স্রোতঃ অবরোধের প্রধান কারণ নির্দেশ করিয়াছেন ।

আহারস্য রসঃ শেষো যো ন পকেহ্মশ্লাঘবাৎ ।  
স মূল্যং সর্বরোগানামাম ইত্যভিধীয়তে ॥

পাচকাগ্নির বেশ বল না থাকিলে ভৃক্ষবস্ত হইতে যে অপরিপক রস জন্মিয়া থাকে তাহাকেই আমরস বলে । এই আমরস বহরোগের কারণ । দোষ ( বায়ু, পিত্ত, কফ ) নাম ও নিরাম ভেদে দ্বিবিধ ।

কি ভ্রণ, কি জর অভিসারাদি, আম, নিরাম বোধ ভিন্ন চিকিৎসা সূচাক্রমে হইতে পারে না ।

কিন্তু যে রূপে অবরোধে যেদ, তদনুরূপ বাতাতিক্যে আক্ষেপাদি রোগেও স্নিগ্ধ মালিস



শ্বেদ ভিন্ন উত্তম উপায় নাই। কিন্তু সকল অবরোধেই তাপ প্রয়োগ হয় না, কোন কোন অবরোধে উপনাহ (পুল্টিস) প্রলেপ এবং নিঃসরণ করাইতে হয়। এবং কোন কোন স্থানে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। যেমন কুষ্ঠাটিকাযুক্ত দিনে জাহাজ পুরুষকারে চালাইতে পারা না। সূর্য্য প্রকাশেব অপেক্ষা করে, তেমন এই সকল বিষয়ের কর্তব্যতা চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বিচার শক্তি উপর নির্ভর করে। তাঁহার জ্ঞানের পরিচালনার জন্ত রাজ্য কিঞ্চিৎ উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

যখন শরীরে কিছা শরীরের একদেগে তাপের অল্পতা হয়, তখন তাহাতে তাপের সঞ্চার করাই শ্বেদের উদ্যোগ। অগ্নিতাপ ভিন্নও এই উদ্যোগ-সিদ্ধি হইতে পারে। চরক সাগ্নি ও অনগ্নি এই দুই ভাগে শ্বেদের বিভাগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শঙ্করাদি সাগ্নিশ্বেদ। অনগ্নিশ্বেদের উল্লেখে বলিয়াছেন—

“বায়াম উষ্ণসদনং গুরুপ্রাবরণং ক্ষুধা।

বহুপানং ভয়ক্রোধাবুপনাহাবাতপাঃ।

শ্বেদরাস্তি দশৈতানি নরমগ্নিগুণাদৃতে।

সাতাং অগ্নি সঞ্চ না থাকিলেও, বায়াম উষ্ণগৃহ, গুরুবস্ত্রাবরণ, ক্ষুধা, বহুমদ্যপান, ভয়, ক্রোধ, উপনাহ (পুল্টিস) যুক্ত এবং রোজ দ্বারা শ্বেদের কার্য্য হইয়া থাকে।

চরক ত্রয়োদশ প্রকার শ্বেদভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহিব্যয়ে পরে কিঞ্চিৎ বলিব।

চরক বলেন—

বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা কফে বা শ্বেদ ইহ্যতে।

সিদ্ধকৃৎ স্তথা স্নিগ্ধা কৃষ্ণচাপা পক্কভিত্তঃ ॥

সাধারণতঃ শ্বেদের অব্যাহায়ে শ্বেদ ত্রিবিধ—কফ, স্নিগ্ধ এবং সিদ্ধকৃৎ। কফে কৃষ্ণ, বাতে

স্নিগ্ধ বাতকফে স্নিগ্ধকৃৎ শ্বেদ প্রণয়ন বিধেয়। কফে কৃষ্ণ শ্বেদ, যথা—বালুকা, শ্রবণ, চূর্ণাদি। বাতে স্নিগ্ধ-শ্বেদ—দুগ্ধ-সিদ্ধ মাষ, তিল, ঘব প্রভৃতি। বাতশ্লেষ্মা কৃষ্ণস্নিগ্ধ শ্বেদ—ভূষি, গোময় ইত্যাদি।

শ্বেদ দিবার পূর্বে পুৰাতন স্নাত দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া লইবে। কেবল কফ স্নিগ্ধ মালিষ আবশ্যক করে না।

সাধারণতঃ চিকিৎসকগণ সন্নিপাত অবৈ, বাত শ্লেষ্মাজরে বালুকা প্রভৃতির কফ শ্বেদ ব্যবহার করেন।

বালুকাশ্বেদ—প্রথমতঃ কটাহে বালুকা উত্তপ্ত করিয়া একখণ্ড বস্ত্রের উপর এরূপ পত্র স্থাপন করিয়া তাহার উপর বালু দিয়া পুটলী বান্ধিয়া, কাঁজি কি ততুলপিষ্ট জলে নিমগ্ন করিয়া, তদ্বারা শ্বেদ দিবে। সিক্ত না করিলে বস্ত্রাদি দগ্ধ হইয়া যায় এবং রোগী শ্বেদ সহ্য করিতে পারে না।

কিন্তু যতিক্ষেব উত্তেজনার রক্তাধিক্য হইয়া জানাবরোধ কি বেদনা হইলে বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া শ্বেদ দিবে না। রক্তাধিক্য শ্বেদ দিলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে, ইহাতে জল বা বরফ দিবে।

রক্তাধিক্যের লক্ষণ—রক্তাধিক্যে নাড়ী চঞ্চলা, বেগবতী, স্থূলা, চক্ষু আরক্তিম, জিহ্বা পরিকার রক্তবর্ণ, স্নৈমিক লক্ষণহীন যাতনা।

কফাধিক্যের লক্ষণ—কফাধিক্যে নাড়ী শীতল, ক্ষীণ, চক্ষু আবিণ (বোলাটে) জিহ্বা বেতলেপযুক্ত, মুখ শ্লেষ্মাবৃত, স্নৈমিক লক্ষণ যুক্ত যাতনাসীন। অনেক স্থানে কেরিমাছি ডাক্তারগণ এই পার্থক্য না দেখিয়া সকল

স্থানে রক্তাধিক্য নির্দেশ করেন। স্থলবিশেষে এইরূপ তেজ নিশ্চয় না করিয়াও জল প্রয়োগে মস্তকের সিরাসমূহের পরিণি সঙ্কুচিত হইয়া অবরোধ বারণ হয়। উপযুক্তরূপ প্রয়োগ করিতে না পারিলে অনিষ্টও হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তাধিক্যে তাপ পড়িলে রোগ ও যাতনা উভয়েরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যদি মস্তকের অভ্যন্তরে গাঢ়রূপে অবরোধ হয়, অথবা রক্তহীনতা হইয়া সম্মানসে উপ-ক্রম হয়, তবে কোন ফ্রিয়াটেই ফল হয় না। অতএব মস্তক-সংক্রীয় রোগে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন কাজ করিবে না। ইহাতে চিকিৎসকগণের বাদান্ত্রবাদে শেষে নিজেরাই অধ্যাত্ত ভাগী হন।

কতকাল শ্বেদ দিবে? চরক বলিয়াছেন—  
শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে।  
সজ্ঞাতে মার্দ্দবে শ্বেদে শ্বেদনাদিরতিমৰ্ভা॥  
যে পর্য্যন্ত শৈত্য, শুষ্কতা ও শুষ্কতা দূর হইয়া  
বর্ষ না হয়, বেদনা না যায় ও শরীর মুহু না হয়,  
সেই পর্য্যন্ত শ্বেদ দিবে।

কোন কোন স্থানে শ্বেদ দিবে না।—  
বৃষণো জায়ং দৃষ্টী শ্বেদেৎসু ছা ন বা।  
মধ্যমং বঙক্ষণৌ শেষমদ্ধাবয়বমিষ্টং॥  
জন্ম, অণ্ডকোষ ও নেত্রে শ্বেদ দিবে না,  
অথবা আবশ্যক হইলে মুহু শ্বেদ দিবে।

শ্বেদ অতিরিক্ত প্রযুক্ত হইলে দাহ শ্বেদ  
দুর্দলতা অন্ধাবসান এবং পিত্তপ্রকোপ হইয়া  
থাকে। চরক বলিয়াছেন—  
পিত্ত-প্রকোপো মুচ্ছিত শরীরদমনস্তথা।  
দাহবেদাদর্শদুর্দল্যমতিশ্মিয়ন্ত লক্ষণং॥  
ইহার প্রতিবিধান শেষ শীতল চিকিৎসা  
করিতে। চরক বলিয়াছেন—

অতি শ্মিয়ন্ত বর্ত্তবো মধুরঃ শিথ্বশীতলঃ।

কি কি রোগে শ্বেদ দিবে না—

চরক বলেন—

কষায়মতনিত্যানাং গৰ্ভিত্তা রক্তপিত্তিনাং।  
পিত্তিনাং সাত্তিসারাপাং কক্ষিণাং মধুমেহিনাং॥  
বিদগ্ধব্রণব্রণাং বিষমতাবিকারিণাং।  
ক্লান্তানাং নষ্টসংজ্ঞানাং স্থলানাং পিত্তমহিনাং॥  
তৃণতাং ক্ষুধিতানাঞ্চ ক্রুদ্ধানাং শোচিতামপি।  
কামলান্ননিগ্ধৈকৈব ক্ষতানামানারোগিণাং॥  
ছন্দগতিবিশুদ্ধানামুপক্ষীণৌজসাং তথা।  
ভিষক্ তিমিরিকাণাঞ্চ ন শ্বেদমবতারণেৎ॥

অর্থ—কষায় ঔষধপায়ী, নিত্য মত্ভগায়ী,  
গৰ্ভিণী, বক্তপিত্ত বোগী, অতিসার রোগী,  
কক্ষম্ভাবী, মধুমেহ রোগী, ব্রণরোগী, বিষ  
ও মতা বিকলগ্রস্ত, ক্রোধ, অতেন, স্থূল, পিত্ত-  
মেহ বোগগ্রস্ত, তৃণাক্ত, ক্ষুধিত, ক্রুদ্ধ, শোকা,  
কামলা ও উদর রোগী, ক্ষতরোগী, উরুস্তম্ভ  
রোগী, দুর্দল, অতিশয় শুষ্ক এবং যাহার  
ওজোহীন হয় হয় এরূপ রোগিগণকে শ্বেদ  
দিবে না।

কি কি রোগে শ্বেদ বিধের?—

চরক বলেন—

প্রতিগ্রায়ে চ কাশে চ হিক্সাদ্যাদেশলাঘবে।  
কর্ণমস্তাশিরঃশূলে স্বরভেদে গলগ্রহে॥  
অর্দ্ধিতৈকাদ্ব্যসর্কাদ্ব্যপক্ষাঘাতে বিনামকে।  
কোষ্ঠানাহাবক্লেবু শুক্রাঘাতে বিজৃম্বকে॥  
পার্শ্বপৃষ্ঠকটিকৃক্ষিসংগ্রহে গৃধ্রসীযু চ।  
মূলকৃচ্ছে মহক্লেচ মুক্লেবোরসমদ্যকঃ॥  
পাদৌজ্জ্বলদ্রব্যান্তিনংগ্রহে শ্ময়থাবপি।  
ঋষ্যমে চ শীতে চ বেগুথৌ বা তকণ্টকে॥  
সর্ষোচাশ্মাদশূলেষু স্তম্ভগৌরবস্থিযু।  
সর্বেষু বিকারেষু শ্বেদনং হিতমুচ্যতে॥

রোগের ভেদ অনুসারে শ্বেদের ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে বটে (যেমন বাত, শ্লিষ্ণু দ্রব্যাক্রান্ত শ্বেদ ; কফ, কক্ষ দ্রব্যাক্রান্ত শ্বেদ) কিন্তু শরীরের স্থানভেদে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়—শাস্ত্রকার বলেন—স্থানং জয়েন্ধি পূর্বে হি স্থানস্থতাবিরুদ্ধতঃ ।" এই জগৎ কফ, বাত-স্থানস্থিত হইলে শ্লিষ্ণুপূর্ক কক্ষশ্বেদ দিবে, বায়ু, কফ-স্থানস্থিত হইলে কক্ষপূর্ক শ্লিষ্ণু শ্বেদ দিবে । আমাশয়, কক্ষ স্থান, এই স্থানে বাত বিকার হইলেও অথবা কক্ষশ্বেদ পরে শ্লিষ্ণুশ্বেদ দিবে । চরক বলেন—

আমাশয়ে গতে বাতঃ কফে পক্ষাশয়াশ্রমে ।

কক্ষপূর্কো হিতঃ শ্বেদঃ স্নেহপূর্কস্তথৈব চ ॥

সচর্যচর চিকিৎসকেরা আমাশয়ে কক্ষ শ্বেদ দেন না । যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাহাদের মধ্যেও যাঁরা ইহার ফল না দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার সম্যক উপকারিতা অস্বত্ব করিতে পারেন না । আমি অনেক স্থানে দেখিয়াছি বায়ু আমাশয় গত হইয়া বেদনা ক্ষীণতা জন্মাইয়াছে, নানা শ্বেদ ঔষধে বারণ হইতেছে না, এখানে বালুকা শ্বেদ প্রদানে উপকার পাইয়াছি । অতএব আমাশয়িক শূল কি প্রত্যাহানে কক্ষ শ্বেদ ব্যবহার করিতে পাঁয়া যায় । এই প্রকার বস্তি বাতস্থান, এখানে কক্ষ প্রকোপে বেদনা হইলেও পূর্কে শ্লিষ্ণু দ্রব্য-

ক্রান্ত শ্বেদ দিয়া পরে কক্ষ শ্বেদ দিতে হইবে । কিন্তু কেবল বেদনা, ক্ষীতি দেখিয়াই শ্বেদ ব্যবস্থা করিবেন না । বেদনা ক্ষীতি আশ্রিক বিদগ্ধি যক্রুৎ-প্লীহাগত রক্তাপিক্য নিবন্ধনও হইতে পারে । অতএব প্রথমে রোগজ্ঞান আবশ্যক । এই সকল উপদেশ এইখানে আবশ্যক করে না তথাপি নবীন শিক্ষার্থিগণ অনবধানতা বশতঃ কর্তব্য পরিহার অকর্তব্য ব্যবহার না করেন, তজ্জগৎ সাবধান করা হইল ।

আম্মানে শ্লিষ্ণোক্ষ ঠৈল মালিষ করিয়া বাস্পশ্বেদ কি ঘটাবেদও প্রদত্ত হইয়া থাকে ।

জ্বরে অর্থাৎ জ্বর্যে শ্বেদ নিষেধ ; কিন্তু জ্বরোগপলক্ষিত বকোদেষে নিষেধ নহে, কান, শ্রীণ, বক্ষোবেদনায় পুরাতন স্তুত মালিষ করিয়া, পান অর্কপত্র দ্বারা বক্ষঃ পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে শ্বেদ দেওয়া হইয়া থাকে ।

সন্ধরঃ প্রস্রবো নাড়ী পরিষেকোহিবগাহনম্ ।

জৈন্তাকোহশ্রবনঃ কৰ্ণঃ কুটী ভুঃস্থিরেবচ ॥

কূপোহোলোক ইত্যেতে শ্বেদয়ন্তি ত্রয়োদশঃ ॥

চরকোক্ত উক্ত ত্রয়োদশ প্রকার শ্বেদের বিশেষ বিবরণ সূত্র স্থানের ১৫শ অধ্যায়ে লিখিত আছে । সাধারণতঃ সন্ধরশ্বেদ অধিক ব্যবহৃত হয় । সূত্র বিশেষে পরিষেক অবগাহশ্বেদ ও দেওয়া হয় । বাতব্যাধিতে বেশবার শ্বেদ এবং শাৰ্ধনশ্বেদ প্রসিদ্ধ ।

## প্রাচীনকালের মূত্রবিজ্ঞান :

সে অনেক দিনের কথা। মানবের ঋষি বুদ্ধি কামনায় আর্ধ্য ঋষি তখন ‘কুশ্বেত্রের’ মূত্রপ্রাদর্শে যজ্ঞ মণ্ডপ বাঁধিয়াছিলেন। সরস্বতী দৃষ্যতীর কুলে কুলে তখন “আপো-হিষ্টেতি” মন্ত্র ব্যক্ত হইয়া উঠিত। মুনি-সঙ্ক্লেষের মধ্যবর্তী আচার্য্য ভরদ্বাজ তখন জীব জগতের অভাব-অভাবের সহিত হৃদয়বুদ্ধি বরিতেন। দেশে পূর্ণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্ত—প্রয়োগ-কুশল ‘অত্রি’ ‘হারীত’ অপরিচিত বিষ ভক্ষণে ‘নীলবর্ণের’ গৌরব লাভ বরিতেন। এতদ্বারা এই প্রাণহীন মলিন ভারত তখন কত আনন্দময়—কত উদ্যম-ময়! শ্রামল বনশ্রীর মধ্যে, জীবনের বিচিত্র স্পন্দনে—এদেশে তখন অনাবিল শান্তি বিরাজ করিত।

সেই নামহীন, স্মৃতিহীন অতীতে,—জান-পরিচিৎ আচার্য্য গোষ্ঠী-ব্রহ্মণ্য প্রতিভায় যে সমুদ্র গম্বন করিয়াছিলেন—তাঁহাতে অনেক অমূল্য রত্ন উঠিয়াছিল। ভক্তিকর্ণের “মূত্র-বিজ্ঞান” সেই অনন্ত রত্নের অত্যন্তম। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই মূত্র-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

এখন লোকে কথায় কথায় মূত্র পীরক করে এবং তাহার জ্ঞান যুরোপের জীবন্ত বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে লোকের অপর্যব নাই। হিন্দুর উদার বিজ্ঞান এই বিংশ শতাব্দীর স্বর্ণ যুগে নিতান্ত শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। আয়ুর্বেদের যজ্ঞ এখন হবিঃহুত হইয়া উঠিয়াছে। বহুদিনের অনাদরে, অশ্রদ্ধা-সাধনময় অতুল্য আরোগ্য-ভাণ্ডার—কলা-

নিপুণা কল্যাণশ্রীর অভাব, এখন একান্ত নিশ্চল! জীবন সমস্যার মীমাংসা সূত্র-সাহায্যে হাতে ছিল, তাঁহাদের অযোগ্য সন্তান এখন সূত্র ও সূত্রার্থ হীন! জীবন তত্ত্বে এখন মহা নিকারের স্বপ্নচ্ছায়া! মন্ত্র—অসম্পূর্ণ, চন্দ্র যতিহীন, হোমার্ঘ্য—ভূতহীন—শীতল, ঋষিকের বংশধর ঋক-উচ্চারণ ভুলিয়া গিয়াছে!

এখন, বোণীর মূত্র-পরীক্ষার প্রয়োজন হইলে, কবিরাজগণ কেবল মূত্র তৈল বিন্দু প্রক্ষেপ করেন। কিন্তু কাচার্য্যযুগে, আমাদের দেশে, মূত্র পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগের কতকগুলি জীর্ণ ও কীটচুষ্ট পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল অপূর্ণ, অপ্রকাশিত বৈদ্যকগ্রন্থে চিকিৎসা তত্ত্বের অনেক অমূল্য উপদেশ নিহিত আছে। আমরা, একে একে তাহা পাঠকগণকে উপহার দিব। আজ কেবল প্রাচীনকালের মূত্র বিজ্ঞানের কথা বলিব।

বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগে, ভারতের “আয়ুর্বেদ”, গ্রীস, মিশর, আরব ও পারস্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম—জন্ম, কর্ম, জালা, যজ্ঞা নিভাইবার ধর্ম; সূত্রাং দৈহিক বাধা নিবারণ বৌদ্ধধর্মের প্রণব বা ঔদয়। এই যুগে শব্দের পা-পদবধ রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ হইয়া যায়। তাহা নই ফলে, বৌদ্ধযুগে বিজ্ঞানমূলক চিকিৎসার আবির্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম মাতৃবধে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল, মানবের সেই দেবত্ব ও ভ্রাতৃত্বের শুভসংবাদ লইয়া এখন

† মলিখিত “আয়ুর্বেদের ইতিহাস” এ সকল কথা বিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

ঔষধগণ দেশে দেশে ছুটিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে ভারতের আয়ুর্বেদ কামবোধির কুল হইতে গ্রীক বীপ-পুঞ্জ পঞ্চমুত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময় মূত্র বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়। রাজা অশোক “প্রব্রদর্শী” নাম গ্রন্থ করিয়া, পশু ও মানবের রক্ষা করিলে দেশে দেশে রুগ্নাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ২৪২ হইতে, খৃষ্টাব্দ ৭৫০ পর্য্যন্ত, আয়ুর্বেদের বৌদ্ধযুগ।

বৌদ্ধযুগের চিকিৎসকগণ আচার্য্য জতু-কর্ণের মূত্র-বিজ্ঞানকে পরিত্যক্ত করিয়া তুলিয়া-ছিলেন। আমাদের হর্ভাগ্য—আমরা সমগ্র পুস্তকখানি পাই নাই, কেবল ২১ খানি মাত্র পুথির পাতা পাইয়াছি। পণ্ডিত শশিভূষণ কাব্যগীর্থে কবিরাজ বিহার অঞ্চল হইতে পুথিখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এক সময় বিহার বৌদ্ধগণের লীলাক্ষেত্র ছিল।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে মূত্রকে আল দিয়া পরীক্ষা করা হয় বৌদ্ধযুগের বৈজ্ঞানিক এ প্রণালী জানিতেন। কেবল মাত্র মূত্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, রোগীর দেহের কোন দাড়া দূষিত হইয়াছে।

মূত্রে: পঞ্চল্যমিতং বিবিশ্রং

মূলস্ত চূর্ণং থলু পুঙ্করস্ত।

প্রক্ষিপ্য পক্তং মুহুনাগ্নিনা তৎ

যেদ: প্রুষ্টং যদি লোহিতং স্ত্রাৎ ॥

রোগীর মূত্র লইয়া তাহাতে তুল্যপরিমিত হুস্ত মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে পুঙ্কর মূলের চূর্ণ [ পুঙ্কর মূল—পশ্চিম প্রদেশে জাত রক্ত বিশেষের মূল, ইহা জলে জন্মে, ইহার পাতা কলারের পাতার মত, ফুল ত্রিক পদ্মের তায়। বঙ্গদেশের বৈজ্ঞানিক পুঙ্কর মূলের অভাবে হুস্ত নানক গন্ধ অথবা বাষ্পের করেন ] কিছু পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া, যদি দেখে ঐ মূত্র

লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিবে রোগীর দেহের মেদোদাহৃত বিকৃত হইয়াছে।

মূত্রে নবমুৎপাত্তস্থে নাগভক্ষ্যং বিনিষ্কিপেৎ।

তনুস্পর্শে ক্ষেদ্রিহ্যৎ শুক্রদোষং স্তনিশ্চিতং ॥

নূতন মূত্পাত্তে মূত্র রাখিয়া, তাহাতে সৌন্দর্য্য নিক্ষেপ করিলে, যদি মূত্র উষ্ণ স্পর্শ বোধ হয় তাহা হইলে ঐ রোগীর শুক্রের দোষ জন্মিয়াছে বুঝিবে।

মূত্রসিদ্ধং হি বসনং মূলস্ত পুঙ্করস্ত চ।

অর্দ্ধমিত্তা রসেনৈব শুক্রং তৎ বর্জিতাসমং ॥

কৃৎ তহজ্জলং নূনং তৈলাক্তসমং য়েবহি।

জলগীতি বিজ্ঞানীদামজ্জলদোষং ধ্রুবং সূচীঃ ॥

একখণ্ড বস্ত্র প্রথমে রোগীর মূত্রে দ্রুত করিবে, পরে ঐ বস্ত্রখণ্ড আবার পুঙ্কর মূলের রসে ভিজাইবে। শুষ্ক হইলে ঐ বস্ত্রখণ্ড গলিগার মত পাকাইয়া উহা জালিবে। যদি তৈলাক্ত বর্জিতার মত বেশ উজ্জলভাবে জলিতে থাকে, তাহা হইলে জানিবে রোগীর মজ্জা ক্ষয় হইতেছে।

দিনত্রয়ং স্ত্রিয়া মূত্রেসিদ্ধং গোধুমদানরাত্।

শুকীকৃতং ছায়ায়াক্ষেয়না ফুটতি ভজিতং।

ততো দুষ্টং বিজ্ঞানীরা দার্তব্যং থলু বাষিগাং ॥

কতকগুলি গোধুম লইয়া জী-মূত্রে বেশ করিয়া ৩ দিন ভিজাইবে। পরে তাহা ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই গম ভাজিলে যদি ফুটিয়া না উঠে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে ঐ রোগীর আর্তব্য দূষিত হইয়াছে।

মূত্রে কহুং নারীনাং নিকিপ্যোজ্জলহীরকং।

দিনত্রয়বাসনং তৎ দৃশ্যতে চেননির্ধলং।

সস্তানোৎপাদিকা শক্তিন্ধা জোয়া ততঃ স্ত্রিয়াঃ ॥

জীলোকের মূত্র জ্বলন্ত করিয়া তাহাতে ১৫০ উজ্জল হীরক ডুবাইয়া রাখিবে ৩ দিন

পরে যদি ঐ হীরকখণ্ড অনিশ্চল অবস্থায়  
রহিয়াছে দেখিতে পাও, তাহা হইলে জানিবে  
ঐ রমণীর আর গর্ভ হইবার আশা নাই।

স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়াছে কি না, তাহার  
মূত্র পরীক্ষা করিয়া সেকালের স্ত্রীকগণ  
বলিতে পারিতেন।

মূত্রে নারীয়াঃ ক্রিপেং শ্বেতশান্দালীপুষ্পচূর্ণকং।  
তত্রৈব স্নেহবদ্ ব্যং দৃশ্যতে চেৎ পরেহহনি।  
ততো গর্ভং বিজানীয়াৎ স্ত্রীরা ইখং বিশেষতঃ ॥

নারীমূত্রে শ্বেতশিমুলের ফুলের চূর্ণ নিক্ষেপ  
করিবে। পরদিন যদি দেখ ঐ মূত্রের উপরি-  
ভাগে তৈলের মত দ্রব্য ভাসিতেছে, তাহা  
হইলে জানিবে সে নারী গর্ভবতী হইয়াছে।

মূত্রেই বলিয়াঃ সিংহাসি চূর্ণং নিক্ষিপ্য পশ্যতি।  
যদিবদ্বন্দ-বস্ত্রস্মিন্ বিদ্যাৎ গর্ভবতীং হি তাং ॥

স্ত্রীলোকের মূত্র সিংহাসি চূর্ণ নিক্ষেপ  
করিয়া যদি দেখ—বুড়ুদের মত ভুড়ুভুড়ি  
কাটিতেছে তাহা হইলে বুঝিবেন সে নারীর  
গর্ভ সঞ্চীর হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগের বৈদ্যগণ মূত্র পরীক্ষা করিয়া  
বলিতে পারিতেন—ঐ মূত্র স্ত্রীলোকের কি  
পুরুষের।

মূত্রৈস্থল্যামিতে তৈলে মিশ্রয়েৎ মূলজং রসং  
করকস্ত ততো বিদ্যাৎ পীতাভং যদি তদ্রবেৎ।  
পুরুষস্তেতি তমূত্রং নীলাভং চেদ্ ধ্রুং স্ত্রীয়াঃ ॥

মূত্রের সহিত তুল্য পরিমাণে তৈল মিশ্রিত  
করিয়া তাহাতে করক মূলের রস দিবে। যদি  
মূত্রের বর্ণ পীতাভ হয়, তাহা হইলে সে মূত্র  
পুরুষের, আর নীলবর্ণ হইলে সে মূত্র রমণীর  
বলিয়া জানিবে।

স্ত্রী-জাতির মধ্যে যেমন বন্ধা নারী আছে  
পুরুষের মধ্যেও তেমনই বন্ধা-পুরুষ আছে।  
কিন্তু সাধারণ লোকে এ কথা জানেন না।  
তাই পুরুষ না হইলে এ দেশে পুরুষ আবার

একটা বিবাহ করিয়া বসেন। দ্বিতীয়া পত্নীর  
গর্ভ না হইলে পুরুষকে তৃতীয় পক্ষও অবলম্বন  
করিতে দেখা যায়। শেষ জীবনে এই তৃতীয়  
পক্ষের শাসন বিশ্বাসিত্রের জি-বিদ্যা। শাসনের  
চেয়েও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুত্রলাভে  
বঞ্চিত হইয়া বাহারা দ্বিতীয় দার-গ্রহণে উদ্যত  
হ'ন, তাহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত—কাহার  
দোষে সন্তান হইতেছে না? বৌদ্ধযুগের বৈদ্য  
বলেন,—পুরুষ বন্ধা, কি স্ত্রী বন্ধা, নিম্নলিখিত  
উপায়ে তাহা পরীক্ষা করিবে।

স্থানদ্বয়েহগাবুজং কৃতা চ প্রোথিতঃ পৃথক্  
একত্র পুরুষোহুগ্মস্মিন্ নারী মূত্রং পরিত্যজেৎ  
যস্ত নো জাযতেহকুরে। মূত্রাসক্তে তু বীজকে।  
তস্তা দেহং বিজানীয়াৎ শুক্রজং সত্যমেব হি।

পৃথক পৃথক হইটি স্থানে লাউ বাজ রোপণ  
করিলে, উহার একটি স্থানে পুরুষ, এবং অপর  
স্থানটিতে রমণী প্রস্রাব করিবে। বাহার মূত্র  
সিক্ত বাজ হইতে অকুরোগ্রহণ হইবে না,  
তাহারই শুক্রজ দোষে সন্তান হইতেছে না  
জানিবে। এখানে, কথা উঠিতে পারে  
স্ত্রীলোকের গো শুক্র নাই, তাহার আবার  
শুক্রজ দোষ কি? কিন্তু অস্পষ্ট প্রশ্নের আচার্য্য  
গণ প্রা জাতির শুক্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া  
গিয়াছেন।

মূত্র বাজকের কি যুবর, পুস্তর কি মাছবের,  
পূর্বাচাধ্যগণ তাহাও পরীক্ষা করিয়া বলিতে  
পারিতেন। অর, অতিসার, গ্রহণী, প্রমেহ,  
অর্ণ, অল্পপিত্ত প্রভৃতি যাবতীর রোগ—কেবল  
মাত্র মূত্র পরীক্ষা করিয়া তাহারা অনায়াসেই  
বলিয়া দিতেন। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া  
পড়িয়াছে, পাঠকের বৈদ্যচ্যুতির আশঙ্কায় অন্য  
এইখানেই “হতি” করিলাম।

ত্রৈজবল্লভ রায়।

ভূতপূর্ব “বহুদর্শী” সম্পাদক

\* পুস্তক মূলের পরিবর্তে কুড় বাঘবীর করিলে  
পরীক্ষা সিক্ত হইবে কিনা? সিংহাসি কি? করকের  
পরিচয়ের উপায় কি? যদি দেখে উল্লিখিত করকের  
তাহা হইলে অনেকই পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, পুস্তক  
ভেদ (আঃ সং)।

## নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞ-সম্মেলন ।

১৮৩৭ শকে, যাস্ত্রাজ নগরে, নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞ-সম্মেলনের সপ্তম

অধিবেশনে সভাপতি,—বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, কবিরাজ শ্রীযুক্ত

যামিনীভূষণ রায়, কবিরাজ, এম, এ ; এম, বি ;

সভাপতির অভিভাষণ—

যিনি লীলাঙ্কলে ব্রাহ্মাণ্ডরূপে ব্যক্ত হইয়া পুনরায় লীলা সংহার করিয়া অব্যক্ত-ভাবধারণ করেন, যিনি স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, যিনি হবিরূপে দাহ এবং অগ্নিরূপে দাহক, যিনি দ্রব্যরূপে দৃষ্ট এবং চক্ষুরূপে দ্রষ্টা, যিনি শব্দ-রূপে শ্রাব্য এবং কর্ণরূপে শ্রোতা, যিনি ধাতু-রূপে ভোজ্য এবং প্রাণিরূপে ভোক্তা, যিনি পথরূপে গম্য এবং চরণরূপে গতা, যিনি দ্রব্য-রূপে গ্রাহ্য এবং হস্তরূপে গ্রাহক, যিনি রজো-গুণে স্রষ্টা, সত্ত্বগুণে পালক এবং তমোগুণে অস্তক, যিনি নিত্য, সনাতন, শাশ্বত ও অব্যয়—সেই জগদেককারণ জগদ্রাধের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

বাহার রূপায় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মনরূপে জগতে অবতীর্ণ হইরাহি, যিনি ধর্ম, যিনি ধর্ম, যিনি পরমতপ, যিনি এই মর্ত্যধামে একমাত্র নররূপী প্রত্যক্ষ দেবতা, সেই স্বর্গগত জনকের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

বাহাদিরের রূপায় জ্ঞানলাভ করিয়া মহত্ব লাভের উপযুক্ত হইরাহি, বাহাদর জ্ঞান-জননলাকা দ্বারা আশ্রয় অজ্ঞানান্ধকারাঙ্কর নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, বাহাদিরের রূপায় ভগবতী তারতী দেবীর ভরণেরপুত্বে যতক পার্শ্ব করিতে সক্ষম হইরাহি বাহাদিরের রূপায় অশ্বত-বতলাকার চরিত্রবান্ধব

নাথের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে সর্ব্ব হইরাহি, সেই জ্ঞানদাতা ও নীক্ষাদাতা গুরুদেগের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশই বাহাদিরের জীব-নের একমাত্র ব্রত ছিল, ভগবানকে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত জানিয়া বাহাদর সর্ব্বভূতের সেবার জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, বাহাদিরের চেষ্টায় পুণ্যময় আয়ুর্কেন্দ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়া জগতের আশেব কল্যাণ সাধন করি তেছে, সেই পুণ্যমোক দয়াবতার মহাবিগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

বাহাদর স্নেহোপান্বিত আয়ুর্কেন্দ্র-শাস্ত্রকে উদ্ধার ও রক্ষা করিয়া ভারতের পৌরব অন্ধুর রাখিয়াছেন, বাহাদিরের সহায়তা না পাইলে আয়ুর্কেন্দ্র-শাস্ত্রে অধ্যয়ন অব্যাপন হইত। হইত মহাবিগণের পরবর্তী সেই আয়ুর্কেন্দ্র-বিশারদ স্নেহোপান্বিত চীতাকারগণের চরণে প্রণাম করি।

এই মহতী মহার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত যে সকল জননী স্বকিষ্টি-স্বকিষ্টি-স্বকিষ্টি বাহাদর সর্ব্বস্বার্থ ভঙ্গ্য করিয়া সর্ব্বভূতের পুনঃসংসার কল্যাণের হইয়াছেন, সেই মহা-ভক্ত-বিদ্যাকর্ষক মহাবোক্ত সজ্জীবন করিয়া সর্ব্বভূত সত্ত্ব-বাহাদরকে

করিয়াছেন আমি সেই পদের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। এই মহতী সভা পরিচালনজন্ত যে শক্তি—যে জ্ঞানের প্রয়োজন, আমাতে সে জ্ঞান—সে শক্তি কোথায়? কিন্তু আপনাদের নিয়োগ আমি অবশ্যই মন্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

একে শক্তি ও জ্ঞানের অভাব, তাহাতে বহু আতুরের সেবার নিযুক্ত থাকিতে হয় রঞ্জিতা, আহার অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার উপর আপনাদের নিয়োগপত্র অতি অল্পকাল পূর্বে প্রাপ্ত হওয়ার এই কার্যের জন্ত প্রস্তুত হইবারও অবকাশ পাই নাই। সুতরাং আমার যে কয়েকটী ক্রটি ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আশা করি আপনারা নিজস্বগে ক্রটি স্বীকার করিবেন।

এই মহতী সভার মহত্বদেয় সন্দেহ কোন কথা বলিবার পূর্বে প্রথমেই আমাদের পরম কারুণিক সম্রাটের কথা মনে পড়ে। রাজা প্রজার পক্ষে পিতৃহৃদয়, এবং আমাদের সম্রাট পক্ষের জরাজীর্ণ অসামান্যগে প্রজা-নির্কীর্ষেই পালন করিয়া আসিতেছেন। সাগরতীর ধরণীর প্রায় অর্দ্ধাংশ ইহার শাসনভাষীন, ইহার রাজ্যে স্বর্গ কখন অন্তর্মিত হয় না, ইহার রাজ্যে অসংখ্য বিভিন্ন জাতির বাস—সেই রাজ্যধিরাজকুমারী গতপূর্ব-বৎসর ভারতবর্ষে আসিয়া কি ভাবে বালক বালিকা-বিশেষ সহিত সমাগম করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদের সকলেই অবগত আছেন। মহাত্মা পঞ্চম অর্দ্ধকাল আমাদের বাহিরের সম্রাট নহেন, তিনি আমাদের হৃদয়ের সম্রাট। আমাদের এই সদাশয় সম্রাট আজ বলদ্রুপ দুর্বল-শক্তি সহিত যুদ্ধে বিপর। রাজা এখন কিংবা অল্পকালব্যতীতে বিপর তাহা আর

স্বতন্ত্র করিয়া বলিতে হইবে কি? যেখানে ধর্ম্য সেইখানেই জয়। সুতরাং আমাদের ধার্মিক রাজা যে জয় লাভ করিবেন ইহা সুনিশ্চিত। আমরা আমাদের সম্রাটের জয়-লাভ এবং তাঁহার স্বাস্থ্যলাভের জন্ত ভগবানের নিকট সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

সভা সহোদয়গণ! আজ এই মহাসম্মেলনে—এই আনন্দের দিনে মনে পড়ে তাঁহাদের কথা—ঐহাম্যগে গত সম্মিলনে দেখিয়াছি, কিন্তু বর্তমান সম্মেলনে আর দেখিতে পাই-তেছি না। তাঁহারা কোথায়? ঐহারা পূর্ব পূর্ব সম্মিলনে এই মহাসম্মেলনের সার্থকতার জন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন, অর্থ, সময় ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সভার কার্যোদ্ধারের নিমিত্ত অহোরাত্র চেষ্টা করিয়া ছেন—সেই সুপরিচিত মহাজনেরা কোথায়? হায়! কে উত্তর দিবে তাঁহারা কোথায়! জীবন-সমুদ্রের পরপারে কোন অজ্ঞাত দেশে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই মধুর-স্বভাব উদার মহাত্মারা আজিও তাঁহাদের চিরসেবিত আয়ুর্বেদের কথা ভুলিতে পারেন নাই—এখন ও বেন জীবন-সমুদ্রের পরপার হইতে তাঁহাদের বীর্ষবাস শুনা বাইতেছে।

ছাথের বিষয় যে, বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পরলোকিত ভাব্য তিব্ব-গণের বিষয় আমি অবগত নহি। কলিকাতার হুগ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ৬তম প্রায় ৬০০০ মহা-দয়ের অভাবই আমি বিশ্বাস করিতেছি। এই মহাসভায় অনেক রোগীকে বোধ হয় গত বৎসরের সম্মিলনের পরেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সে সময়ের সিন্ধি কলিকাতার সম্মিলনের জন্ত যোগ্য প্রস্তুত হইয়া ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা আপনাদের



অতীত। ভারতবর্ষের সেন এবং অজ্ঞাত স্বর্ণখত চিকিৎসকগণের নাম চিরস্মরণীয় হউক।

সভ্য মহোদয়গণ! আজ এই আনন্দজনক মহাসম্মেলনের দিনে বহু প্রাচীন যুগের এক পুরাতন কাহিনী মনে পড়ে। যে উদ্দেশ্যে এই মহাসভায় আমরা সমবেত হইরাছি, প্রায় সেই উদ্দেশ্যে দ্বাদশ জুই, বহু পুরাতন যুগে, আত্মিক, কাশ্মীর, তুগু, অগস্ত্য গৌতম, ভর-হাজ, মৈত্রেয় প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিগণ, জীবের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া, অস্ত্রিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে সমবেত হইতেন। স্বর্গের দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই মহর্ষিগণের তুলনা আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। কিন্তু আমরা যে সেই ভারতগৌরব—শুধু ভারত-গৌরব বলি কেন—অগস্ত্যগৌরব মহামহিমময় মহাপুরুষদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিতে উত্তম হইরাছি, ইহাও আমাদের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়।

বীণা বাদকগণ যেমন বীণার তন্ত্রী এক হুরে বাঁধিয়া লইয়া প্রতিমধুর ঐক্যতান বাজন করেন, হে সমাগত বিভিন্ন প্রদেশীয় ভিব্ধ-গণ, আমরাও সেইরূপ প্রাদেশিক-সাম্প্রদায়িক পার্থক্য তুলিয়া গিয়া, সেই মৈত্রীপরায়ণ আয়ুর্কেন্দ্রবস্তা মহর্ষিগণের চরণ-রেণু মস্তকে গ্রহণ পূর্বক আবারো হৃদয়বীণা একহুরে বাঁধিয়া লইয়া, সেই মহান আদর্শ সমুখে রাখিয়া, এই মহাসভার আয়ুর্কেন্দ্রের অভ্যন্তরস্থলক মহাপ্রতিষ্ঠান করি, নানা তন্ত্রিণী হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারত-বাসীর হৃদয়তন্ত্রী সম্মিলনে বাঁধিয়া উঠিবে। তখন এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ পরিপাক হইবে। তখন আমরা বুঝিতে পারিব

যে আমরা এখানে সমবেত হইরাছি—স্বাধীন-সিদ্ধির জন্ত নয়—স্বাধীনতার জন্ত, আত্ম-হিতের জন্ত নয়—পরহিতের জন্ত, আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্ত নয়—আত্মবিসর্জনের জন্ত। জগতের চতুর্থাংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—দেখিতে পাইবেন যে, যখন যে কোন জাতি যে কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার মূলে কতকগুলি মহাপুরুষের আত্মবিসর্জনের প্রমাণ জাজ্জল্যমান দৃষ্টিগোচর। সিদ্ধিলাভের জন্ত কঠোর সাধনা আবশ্যক, শুধু বাক্যের ছটায় সিদ্ধিলাভ হয় না। বেস উদ্ধারের জন্ত স্বয়ং ভগবানকে ও মীনরূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। যাবতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্মক, কিন্তু বিবিধশাখা অনুনা বিয়ল-প্রচার ও দিক-লাঙ্গ আয়ুর্কেন্দ্রের উদ্ধারের জন্ত এই বারিবি-বিবোধচরণা হিমালয়কিরিটিনী পুণ্যময়ী ভারত ভূমিতে কে কোথায় আছ—মাত্রালী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মালবী উৎকলী—কে যাহক আছ—মহাসাধনার জন্ত অগ্রসর হও, আত্মবিসর্জনের জন্ত প্রস্তুত হও। ভারতবর্ষী তোমার আত্মের কবচটির পরপ্রোক্ত বসাইয়া তত্ত্বপুস্তকগুলি অর্পণ করিবে।

যে পুরাকালের কথা স্মারি করিতেছি—যে সময়ে ভারতে মানববলকলমে-বেদ, ত্রেতাযুগে বর্নন, উপনিষদ, জ্যোতিষ, প্রকৃতিবিদ্যা, প্রাণসং-প্রচার জন্ত কল্মষবনজাত কলমুদ্রাণী মহর্ষিগণ কঠোর সাধনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এবং তাহার বহু পরমর্তীকায় পরাজয়জয়ের পরাজয় বশে বোরতর অজানাকারে সার্বভৌমিক সেই সকল দেশের অধিবাসিগণ যত খতর ভারত উপর হইয়া যেন যেন অগ্রসর করিত এবং সমস্ত সত্য-সুষ্ঠি-সৌন্দর্য্য এখানে প্রকাশিত

হতাহত করিত। সেই সকল অসভ্যজাতির সভ্যভাষান্তর সহিত ভারতবর্ষের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলমন্ত্র যে ভারতবর্ষেই প্রথমে উদ্ভাবিত হইছিল এবং অপরূপ জাতির বিজ্ঞানশাস্ত্র যে তজ্জন্ত ভারতবর্ষের নিকট গুলি, অধুনা জগতের বাবজীর বিশ্বব্যাপী তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। অজ্ঞাত বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের আলোচ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিলে জানা যায় যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলমন্ত্রগুলি প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে প্রচারিত হয়। আরবদেশে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক অধ্যাপক ছিলেন, এবং তথার চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ অদ্বিতীয় ও অমীত হইয়াছিল, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব হইতে মিশর, মিশর হইতে গ্রীস, গ্রীস হইতে রোম, রোম হইতে সমগ্র যুরোপ এবং পরে পৃথিবীর চতুর্দিকই আয়ুর্বেদের মূলমন্ত্রগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য যে, সেই মূলমন্ত্রগুলি অজ্ঞকোন দেশেই আর পূর্বাধিকারে নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির চেষ্টার রূপান্তরিত, পরিবর্তিত, পরিবর্তিত ও বিভিন্ন সংস্কার সংজ্ঞিত হইয়া সেই মূলমন্ত্রগুলি বিভিন্ন চিকিৎসা-শাস্ত্ররূপে জগতে প্রচারিত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক পাশ্চাত্য কোবিদ বহু বহু মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ দুই একটি উদ্ধৃত করা বাইতেছে।

এ, এফ, হারনেল, সি, আই, ই, পিএচ, ডি, এম, এ, মহোদয় তাঁহার গ্রন্থে (Studies in the Medicine of Ancient India) লিখিয়াছেন :—

“Probably it will come as a surprise to many as it did to myself, to discover the amount of anatomical knowledge which is disclosed in the works of earliest medical writers of India. Its extent and accuracy are surprising, when we allow for their early age—probably the sixth century before Christ—and their peculiar methods of definition. In these circumstances the interesting question of the relation of the medicines of the Indians to that of Greeks naturally suggests itself. The possibility, at least, of a dependence of either on the other cannot well be denied, when we know as on historical fact the two Greek physicians, Ktesits, about 400 B. C. and Megasthenes about 300 B. C., visited or resided in Northern India.”

ভাবার্থ:—ভারতবর্ষের প্রাচীন আয়ুর্বেদ-কারগণের লিখিত গ্রন্থে শারীরত্ব সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা শুনিয়া আমার জ্ঞান অনেকেরই আশ্চর্য্যবিত হইবেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীর জ্ঞান প্রাচীন সময়ে ঐ জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং বাধার্থ্য—বিশেষতঃ শারীরত্ব লিখিবার ক্ষমতা প্রাণী—প্রকৃতই বিস্ময়কর। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে গ্রীক ও হিন্দুদিগের এ বিষয়ে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদ্ভূত হয়। এক দেশের শারীরত্ব যে অন্য দেশের শারীরত্বের ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত সম্ভবপর। বিশেষতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে টেসিসাস এবং মেগাস্থেনিস

মেগাস্থিনিস্ নামক গ্রীসদেশীয় চিকিৎসক উক্ত ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন বা বাস করিয়াছিলেন—যখন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন ইহা আর অস্বীকার করা যায় না।

ঐশিক ডাক্তার ম্যাক্স নিউবার্গার তাঁহার গ্রন্থে (History of Medicine) লিখিয়াছেন:—

"That Greek medicine adopted Indian medicaments and methods is evident from the literature. The contact between the two civilisations first became intimate through the march of Alexander, and continued unbroken throughout the reign of Diaduchi and the Roman and Byzantine eras. Alexandria, Syria and Persia were the principal centres of intercourse. Indian physicians, means and methods of healing are frequently mentioned by Greco-Roman and Byzantine authors, as well as many diseases endemic in India, but previously unknown. During the rule of the Abbasides, the Indian physicians attained still greater reputę in Persia, whereby Indian medicines became engrafted upon the Arabic, an effect which was hardly increased by the Arabic dominion over India. Indian influence, in the guise of Arabic medicine, was felt anew in the west. The apparently spontaneous appearance in Sicily in the fifteenth century of rhino-plastic surgery bespeaks a long period of previous Indo-Arabian influence. The plastic

surgery of the nineteenth century was stimulated by the example of Indian methods. The first occasion being the news derived from India, that a man of the brickmaker's caste had, by means of a flap from the skin of the forehead, fashioned a substitute for the nose of a native."

ভাবার্থ:—“সাহিত্য পাঠ দ্বারা জানা যায় যে গ্রীকজাতি ভারতবর্ষীয়দিগের ঔষধ এবং চিকিৎসা-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিল। অ্যালেক-জান্ডারের দিখিলিয় কালে উক্ত জাতির মধ্যে সংস্পর্শ ঘটে এবং উহা ডিরাডোচির রাজত্ব-কালে এবং রোমান ও বাইজেন্টাইনদিগের যুগে চলিতে থাকে। এলেকজেন্দ্রিয়া, সিরিয়া এবং পারস্ত দেশই প্রধানতঃ যিগনের কেন্দ্র-স্থল ছিল। গ্রীকো-রোমান এবং বাইজেন্টাইন লেখকদিগের গ্রন্থে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসা প্রণালীর এবং বাহা গ্রীসদেশে ছিল না অথচ ভারতবর্ষে ছিল—এরূপ অনেকগুলি রোগের বহুল পরিমাণে উল্লেখ দেখা যায়। আক্বাসাইডের রাজত্বকালে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকগণ পারস্তদেশে অধিকতর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ঔষধ আরবদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। পরে উহা আরবদেশীয় ঔষধের সহাবে পাশ্চাত্য দেশে প্রবেশিত হইয়াছিল। কৃত্রিম নাসিকা নির্মাণের প্রণালী (Rhino plasty) ভারতবর্ষীয় ও আরব-দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে হইতে প্রকণন সভ্যতাবিভে সিনিমিলনে প্রচারিত হইয়াছিল। পর-চিকিৎসার চরম উন্নতির বিষয়ে পরিসর এক অবদান করি কটর, অপর দ্বারা রোগের কঠোর পদ্ধতি (Plastic operation)

ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা-প্রণালীর সহায়তায়ই উন্নতিলাভ করিয়াছিল। \* বহুপূর্বে একজন ভারতবাসী সিসিলিদেশীয় জনৈক লোকের কপালের চর্ম লইয়া নাসিকা নির্মাণ করিয়া-ছিল এই সংবাদ অবগত হইয়া পাশ্চাত্য জাতি উনবিংশ শতাব্দীতে এবাংলিশ শাস্ত্রোপচারে প্ররুত হইলেন।

এইখানে আমরা আয়ুর্বেদের প্রেষ্ঠ পণ্ডিত দেখিতে পাই। আয়ুর্বেদ সর্বাঙ্গিক প্রাচীনতম, এবং জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনক। অথবা জনক বলিলেও ঠিক হয় না, —প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, শস্ত্র-চিকিৎসারও ভারতবর্ষই শিক্ষাশ্রম। হুখের বিষয় অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষিত ভারতবাসী আয়ুর্বেদকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

আয়ুর্বেদ জ্ঞানের অভাব, পাশ্চাত্য চিকিৎসক এবং এবং চিকিৎসাগ্রহ লেখকগণকে অনেক সময় ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা বাইতেছে যে, ডাক্তার অস্লাম ও ম্যাকরে কর্তৃক সম্পাদিত চিকিৎসা-গ্রন্থে ( A system of medicine ) উইলিয়াম টি, কৌন্সিলম্যান এম, ডি, লিখিয়াছেন—

"The first description of the disease Small-pox, which leaves no doubt 'as to its nature, is given in the well known treatise by Rhazes in the tenth century."

ভাষার্থঃ—"মহরী ( বসন্ত ) রোগের নিসংশয়কর বর্ণনা রেজেস্ নামক আরব-

দেশীয় চিকিৎসকের গ্রন্থে দশম শতাব্দীতে প্রথমে লিখিত হইয়াছিল।"

কিন্তু উক্ত সময়ের বহুকাল পূর্বে লিখিত চরক এবং সুশ্রুত গ্রন্থে মহরিকার লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় লিখিত আছে। হুখের বিষয় উক্ত লেখক তাহা অবগত নহেন বলিয়া পূর্বোক্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং জগৎকে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী করিতেছেন। আয়ুর্বেদের সৌরব বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রমাণ সহ এইরূপ লেখকদিগের ভ্রম প্রদর্শন করা এই সভার কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে ঐ সকল গ্রন্থকার অবজ্ঞাই নহে এই লিখিত ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন।

হুখের বিষয় এই যে অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক আয়ুর্বেদের মহত্ত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক চার্লস্ সাহেব ছাত্রদিগকে বক্তৃতা দিবার সময় প্রায়ই বলিতেন—দুই হাজার বৎসর পূর্বে আর্য্যগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আজ আমি তোমাদের নিকট তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি রাজ। শিষ্যগণের কর্তব্য সম্বন্ধে চরকের বিধান স্থানের রোগভিষগ্জিহী অধ্যায়ের কিয়দংশ তিনিই কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সোপান—শ্রেণীর সমুদয় প্রাচীরে প্রথমে ফলকে খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমেরিকা দেশের কিলডেলিকিয়া নগরের ডাক্তার ক্লার্ক এম, ডি, মহোদয় চরকের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন—

"If the physicians of the present day would drop from the Pharmacopoeia all the modern drugs

chemicals, and treat patients according to the methods of Charaka, there will be less work for the undertakers and fewer chronic invalids in the world."

ভাবার্থ :—বস্ত্রপি চিকিৎসকগণ আধুনিক ঔষধাদি পরিত্যাগ করিয়া চরকের মতে চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে মৃত্যুর সংখ্যা কম হইবে এবং পৃথিবীতে চিররোগী খুব অল্পই দেখা যাইবে ।

ডাক্তার পল, বারথোলেম বলিয়াছেন —

"I have been exceedingly struck with the meaning of many passages which indeed go beyond anything that I have met before in medical literature."

ভাবার্থ :—অনেক স্থানের ভাবগাম্ভীর্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি । আমি এ পর্যন্ত যতগুলি চিকিৎসা-গ্রন্থ দেখিয়াছি, কোনটাতোই এরূপ গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাই নাই ।

আয়ুর্বেদের মহত্ব ও গৌরবের তুলনার উদ্ধৃত প্রশংসাবাদ নিতান্ত অল্প হইলেও, অনেক পাশ্চাত্য ভিত্তি যে আয়ুর্বেদের মহত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আমাদের আনন্দের বিষয় ।

সভাগণ, আমুন এক্ষণে আয়ুর্বেদ-মহাবৈ নিম্ন হইয়া তরহিত রত্নরাজির কথঞ্চিৎ মূল্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করি ।

প্রথমেই আয়ুর্বেদের যে বিস্তার দেখিতে পাই তাহা অতীব মনোহর । পল্য, শাল্যাক, কায়চিকিৎসা, ভূতবিজ্ঞা, সৌম্যরহস্য, অস্ত্র-রসায়ন ও বাক্যকরণ — এই অসংখ্য আয়ুর্বেদ বিস্তার । কেহ বলিতে পারেন কি—কোন

কালে—কোন দেশে—কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রে এরূপ উৎকৃষ্ট বিভাগ হইয়াছে, হইতে পারে, বা হইবে ।

আয়ুর্বেদের দ্বিতীয় অপরূপ — বায়ু, পিত্ত, কফ । এই মহাসভার সমবেত চিকিৎসক-মণ্ডলী সকলেই বায়ু, পিত্ত ও কফের বিষয় অবগত আছেন । বিশেষতঃ আমার পূর্ব-বর্তী সভাপতিগণ বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন । সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা আনাবত্বক । তবে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও যে বায়ু, পিত্ত, ও কফ পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই কথা বলি ।

বায়ু, পিত্ত কফ তিনটি শক্তি এবং এই তিনটি শক্তির বলে শরীর রক্ষিত, পীড়িত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে । শরীরের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে যে গতিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা বায়ুর সাহায্যেই হইয়া থাকে । পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত "নার্ভ" সকলের ক্রিয়া ঠিক বায়ুর ক্রিয়ার অনুরূপ । পাশ্চাত্যমতে শরীরের যে কোন কার্য নার্ভের শক্তিবলে বাহ্য-শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে । নার্ভ-সকল যে শক্তির বলে কার্য করে সেই শক্তিকে আমরা বায়ু বলিয়া থাকি । পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নার্ভের নার্ভ নারকরণ করিয়া সম্বল হইতে পারেন নাই ।

এই কেন্দ্রিক সাহেব এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার কিছুগুলি গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

The nerve may be regarded as conductor of a matter of energy, which for want of a better name is termed nerve-force."

যদি যে শক্তি বায়ু, পিত্ত, কফ

হয়, সেই শক্তি ভবিষ্যতে বায়ু বা তদ্রূপ কোন নামে অভিহিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

অপর দুইটি শক্তি পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বায়ুর ত্রায় এত স্পষ্ট নীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। এই রূপ দুইটি শক্তির অস্তিত্বের আভাস মাত্র তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন ডাঃ কষ্টার তাঁহর ফিজিওলজিতে লিখিয়াছেন—

“The animal body dies daily, in the sense that at every moment some part of its substance is suffering decay, and is undergoing combustion. Combustible, in the ordinary sense of the word an animal body is not, by reason of the large excess of water which enters into its composition, but an animal body thoroughly dried will in the presence of oxygen burn like fuel and like fuel give out energy and heat.”

ভাবার্থ : জীবের শরীর নিরন্তর মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। কারণ প্রতি মুহূর্ত্তে জীব-শরীরের অংশ বিশেষ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, শরীরস্থ অগ্নিসংযোগে জলিয়া বাইতেছে, প্রচুর জলীয় পদার্থ শরীরে আছে বলিয়া জীব-শরীর একবারে জলিয়া যায় না। যদি ঐ জলীয় অংশ শরীরে না থাকিত তাহা হইলে জীব শরীর ইন্ধনের ত্রায় শীঘ্রই জলিয়া বাইত।

আয়ুর্বেদের সেই পুরাতন কথা। “শীঘ্রাত ইতি শরীরম্”—শরীর অতিমুহূর্ত্তে শীর্ণ হইতেছে। তেজোরূপ পিত্ত শরীরকে দগ্ধ করিয়া দিতে উদ্ভত, আর সোম্য স্নেহা শরীরকে আলিঙ্গন করিয়া দহমান অগ্নির প্রকোপ

হইতে শরীরকে রক্ষা করিতেছে। শাস্ত্রে পিত্ত ও কফের সহিত সূর্য্য ও চন্দ্রের যে উপমা দেওয়া হইতেছে, এখানে সেই ভাব পরিস্ফুট দেখা যায় স্ততরাং প্রকারান্তরে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক তিনটি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহা অযুক্তি যুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

নাড়ীজ্ঞান আয়ুর্বেদের অন্যতম গৌরবের বিষয়।

জগতের আর কোন দেশে—আর কোন জাতির মধ্যে এরূপ নাড়ীজ্ঞান ছিল না—কখন যে হইবে এরূপ আশাও বর্তমান কাল পর্যন্ত নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু-বিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে যে রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ, আয়ুর্বেদীর চিকিৎসক অধিকাংশস্থলে একমাত্র নাড়ী পরীক্ষা, করিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারেন।

আজকাল অনেক শিক্ষিতাভিমাত্রী ব্যক্তি ভুক্তভব্যের সহিত যে নাড়ীর গতির মঞ্চ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আমি চিকিৎসকদিগকে বলিতেছি না, কিন্তু চিকিৎসক ব্যতীত এই মহাসভায় অন্য কোন সভ্য যদি এ সম্বন্ধে সন্দিহান হরেন, তাহা হইলে অনার্য্যসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। নিত্য শাকারভোজী ব্যক্তিকে একদিন মাংসাদি আহার করাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, যে নাড়ীর গতি আর পূর্বরূপ নাই—অভ্যুৎপন্ন হইয়াছে। বিদ্যা-জ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসক অনাচার্য্যসে দেখিয়া “পুষ্টিতৈলশূন্যত্বাহারে বাসেন” বলিয়া কুতিঃ এই তথ্য বুঝিতে পারেন।

কিন্তু আয়ুর্বেদোপদিষ্ট নাড়ীজ্ঞান এরূপ আশ্চর্যজনক ব্যাপার হইলেও উহা সহজ লভ্য নহে। মহর্ষি কণাদ “নাড়ীবিজ্ঞান” গ্রন্থের উপসংহারে বলিয়াছেন :-

“নাড়ীপরিচয়দ্বারং প্রায়শো নৈব দৃশ্যতে ।  
তেন ধাত্বা নিম্নোক্তং যং তৎ সমাধেয়মুত্তমৈঃ ॥  
জলে স্থলে চ্যুস্তরীক্ষে প্রসিক্তা যন্ত যা গতিঃ ।  
সৈবোপমানমত্র স্তাৎ প্রসিক্ত-গুণযোগতঃ ॥  
ন শাস্ত্রপঠনাবাপি শব্দদধ্যাপনাদপি ।  
স্পর্শনাদিভিরভ্যাসাদেব নাড়ীবিবেকভাক্ ॥  
নাড়ীগতিরিয়ং সমাগভ্যাসেনৈব গম্যতে ।  
নাড়ীপরিচয়ো লোকে প্রায়ঃ পুণ্যেন জায়তে ॥  
নাড়ীগতিরিয়ং সম্যগ্ যোগাভ্যাসবদেকতঃ ।  
নানুশাং শক্যতে জ্ঞাতুং বৃহস্পতিসমৈরপি ॥”

মহর্ষি কণাদের ছাত্র মহাপ্রকৃষের এই সত্যোক্তির উপর আর কিছু বলা যুটীয়া মাত্র ।

(ক্রমশঃ)

## ত্রণ-চিকিৎসা ।

কবিরাজ মহাশয়েরা ত্রণ-চিকিৎসা জানেন না। অধুনা, ছেদ-ভেদ-বন্ধন-সাধ্য বিজ্ঞানি ত্রণ-শোধ প্রভৃতির চিকিৎসায় এবং শোধন-রোপণাদি কর্মসাপেক্ষ ত্রণ-প্রতিকারে উদ্বাসীন রহিয়া, বৈদ্যক-শাস্ত্রমতাবলম্বি-চিকিৎসক-গণ এরূপ কলঙ্ক ভাজন হইয়াছেন। পরন্তু প্রচুর ক্ষতিগ্রস্তও হইতেছেন। অনেকের বিশ্বাস, কবিরাজ মহাশয়দিগের উপকীৰ্ত্তি চিকিৎসাগ্রহে অস্ত্রোপচারের এবং ক্ষতরোগের চিকিৎসা-পদ্ধতির উপদেশ মাই। এইরূপ অথবা বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ত্রণ-চিকিৎসা-বি-রোগিগণ কবিরাজের শরণ লয়েন না। উক্ত কবিরাজগণের মধ্যে বীহাঙ্গম ত্রণ-চিকিৎসায়

হুনিপুণ, তাঁহার। ত্রণ চিকিৎসায় কুশলতা দেখাইবার অবসর পান না।

মধ্যবিত্ত এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত লোকদিগের- হিতার্থে বৈদ্যকমতের ত্রণ-চিকিৎসা প্রচলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যদি অভূত। পরিহার করিয়া, বৈদ্যকমতাবলম্বি-চিকিৎসকগণ সচেষ্ট হইয়া, তাহা হইলে অত্যাশঙ্ক্যই দেশে দেশীয় ত্রণ-চিকিৎসা সুপ্রচলিত হইতে পারে।

অধুনা নর-নারী শরীরে যে সমস্ত রোগের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেক রোগ, সম্ভবতঃ অন্ধকেরও বেশী, ত্রণ, ত্রণপরিণামী এবং ত্রণ-সংস্ফট ব্যাধি। আয়ু-র্বেদোক্ত ত্রণ-চিকিৎসার ক্রম পরস্পরা অব-লম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে, সেই সকল রোগের মধ্যে অনেক ব্যাধি, অত্যন্ত ব্যয়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আরোপ্য করা যায়। আয়ু-র্বেদোক্ত ত্রণ চিকিৎসার পদ্ধতি অতি সুন্দর, ত্রণ প্রতীকারের ঔষধ সমস্ত আও সুকলগ্রহ এবং ঔষধের ব্যয়ও অকিঞ্চিৎকর।

আজিও দেশ হইতে আয়ুর্বেদোক্ত ত্রণ-চিকিৎসা সম্যক লোপ পায় নাই। অল্প চিকিৎসায় হতাশ হইয়া, কেহ বা অল্প চিকিৎসা করাইতে অসমর্থ হইয়া, দেশীয় ত্রণ চিকিৎসার আশ্রয় লইয়া থাকেন, তাই আমরা কতিং দেশীয় ঔষধের সুকলোপধারণতা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকি। দেশীয় ত্রণ-চিকিৎসার কল প্রত্যক্ষ করিবার আরও একটী সুযোগ আছে। দেশে টোটকা বা হুইরোগ নামে পরিচিত ত্রণ-শোধের ঔষধ আজিও কাহার কাহার জানা আছে। সম্ভবতঃ অনেকের জানা আছে যে, অতি কঠিন কত-রোগও টোটকা ঔষধে ভাল হইয়া থাকে। অল্পসময়ে জানা পিরাছে যে, এই সকল

টোটকা আয়ুর্বেদোপদিষ্ট ঔষধ। কৃত্রাপি  
পূর্ণাঙ্গে, কচিং কিঞ্চিৎ বিকৃত বা পরিবর্তিত  
হইয়া, লোক পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য যে দেশে দেশীয়  
চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে কবিরাজ  
মহাশয়দিগকেই পুরোবর্তী হইতে হইবে।  
কবিরাজ মহাশয়দিগের মধ্যে হাঁহারা বিজ্ঞতম  
বলিয়া অধুনা প্রসিদ্ধ তাঁহারা অধিকরণ,  
যোগ, হেতুর্থ, পদার্থ, প্রদেশ, উদ্দেশ, নির্দেশ  
অনুসারে, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ-ন্যাসের সাহায্যে  
এবং শব্দ ও দর্শন শাস্ত্রের কূটতর্ক দ্বারা  
শাস্ত্রভ্রমের দ্বারোদ্ঘাটনার্থ ব্যতিব্যস্ত রহিয়া-  
ছেন। কালক্রমে মনের কথা হইতেছেন না।  
কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দোপচায়ে এবং ব্রণ-  
চিকিৎসার মনোনিবেশ করিলে দেশের মঙ্গল  
হইতে পারে।

হাঁহারা চিকিৎসক নহেন, অথচ দেশের  
মঙ্গলার্থী, তাঁহাদের সহায়তারও বিশেষ  
প্রয়োজন। আর হাঁহারা ব্রণরোগগ্রস্ত, অন্ততঃ  
পরীক্ষার জন্য, দেশীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইলে  
তাঁহারা উপকৃত হইবেন এবং সাধারণে  
চিকিৎসার সাফল্য দর্শনে, আয়ুর্বেদোক্ত ব্রণ-  
চিকিৎসার ক্রমশঃ প্রচলিত হইয়া উঠিবেন।

আমরা আয়ুর্বেদে প্রবন্ধ লিখিতে  
প্রতিশ্রুত হইয়া, সর্বদা ব্রণ-বিষয়ক নানা  
কথা সংক্ষেপে লিখিতে প্রয়াস পাইব।  
অকিঞ্চনের অকিঞ্চিকর প্রবন্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য  
সাধনের সম্যক আশা করা যায় না। আশা  
করি কৃতবিদ্য কর্মকুশল চিকিৎসকগণ উদ্দেশ্য  
সাধনে যত্নপর হইবেন। অন্যান্য ভাল কাজের  
মত এ কাজেও বিঘ্নের আশঙ্কা আছে। কিন্তু  
সকলে যত্নপর হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাধা  
হইবে না।

### ব্রণ—ব্রণশোধ ।

বাঙ্গালা ভাষায় যে ব্যাধিকে বা বলে,  
সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম ব্রণ রোগ। অরুদ  
প্রভৃতি আরও কয়েকটা ব্রণ-বাচী শব্দ আছে,  
কিন্তু সে শব্দগুলি সুপ্রচলিত নহে।

চূবাঙ্গিণীয় ব্রণ ধাতুর অর্থ গাত্রবিচূর্ণন।  
প্রকুপিত দোষ শরীরের একদেশে বা স্থানে  
স্থানে সংশ্রিত হইয়া তদ্ বা তত্তদ দেশের ত্বক,  
মাংস, স্নিগ্ধ এবং স্নায়ু প্রভৃতি বিচূর্ণন অর্থাৎ  
বিধ্বংস করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে,  
তজ্জন্ম এই রোগের নাম ব্রণরোগ।

সুশ্রুতের মতে ব্রণশব্দ বৃ ধাতুমূলক।  
“বৃণোতি যস্যাদ রূঢ়েহপি ব্রণবস্ত্র ন নশ্রতি।  
আদেহধারণাৎ তস্মাদ ব্রণ ইভ্যচ্যতে বৃধেঃ।”  
এই শ্লোকের তাৎপর্যার্থ এইরূপ,—বা পুরিয়া  
তকাইয়া গেলেও ব্রণবস্ত্র অর্থাৎ ব্যয়ের দাগ  
দেহ ধারণকাল যাবৎ থাকিয়া যায় এইজন্য  
ইহার নাম ব্রণরোগ।

ব্রণরোগ দুইপ্রকার। একপ্রকারকে  
শারীর ব্রণ বলে; অপর প্রকারের নাম  
সদ্যোব্রণ। আহার বিহারের দোষে, অথবা  
শরীরে ব্রণারম্ভক দোষ-বীজের সংক্রমণ জন্য  
প্রকুপিত বায়ুপিত্ত কক, শরীরের স্থান বিশেষে  
সংশ্রিত হইলে, অস্বাভাবিক শোথ পুরঃসর যে  
ব্রণরোগ উৎপন্ন হয় তাহার নাম শারীর ব্রণ।  
অন্ন-শস্ত্রাদি দ্বারা স্থান বিশেষ ছিন্ন-ভিন্ন মণ্ডিত-  
পিচ্ছিত হইলে যে ব্রণরোগ অল্পে তাহাকে  
সদ্যোব্রণ বলে।

শারীর ব্রণ, শোধপূর্বক ব্যাধি। দেহের  
কোন বা কোন কোন স্থানে, প্রকুপিত দোষের  
সংঘাত জন্য শোথ উৎপন্ন হয়। সেই শোথ  
পাকিয়া স্বয়ং ভিন্ন হইলে, অথবা কোন ব্যক্তি  
দিলে ব্রণরোগের আবির্ভাব হয়।



শরীর-ত্রণ জন্মবার পূর্বে যে শোথ উপস্থিত হয়, তাহারই নাম ত্রণশোথ। ত্রণ-শোথ—রাগোগ্ন্যতোদক্ষীতি-লক্ষণ। অর্থাৎ শোথযুক্ত স্থানের ত্বগদেশের বর্ণ বিপর্যয় ঘটে; হয় লাল হয়, বা কাল হয় কিম্বা পীত অথবা শ্বেতবর্ণধারণ করে; স্থানটা অজ্ঞাত পরিমাণে গরম হইয়া উঠে, নানাপ্রকার তৌদ অর্থাৎ বেদনা উপস্থিত হয় এবং ফুলিয়া উঠে।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শোণিতজ, সন্নিপাতজ এবং আগন্তজ ভেদে ত্রণশোথ ছয় প্রকার। ত্রিদোষজ শোথও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

যে শোথের বর্ণ লাল বা কালো, শোথযুক্ত স্থানে হাত বুলাইলে পরষ অর্থাৎ থস্বসে বোধ হয়, শোথ টিপিলে বসিয়া যায় অর্থাৎ টোল ধায় এবং টাটানি, শূলানি, মপ্পানি প্রভৃতি যাতনা কখন বোধ হয় কখন বা হয় না, সেই শোথের নাম বাত-শোথ।

যে শোথ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, শোথ, যুক্ত স্থানটা পীত বা লোহিতচ্ছবি ধারণ করে, ব্যাধিত স্থানে জ্বালা অনুভূত হইতে থাকে, এবং শোথ টিপিলে কোমল বোধ হয় কিন্তু টোল ধায় না, তাহাকে পিত্তশোথ বলে।

কুপিত কফ স্থানসংশ্রয় করিলে কফজ-শোথ উৎপন্ন হয়। কফজ শোথ ধীরে ধীরে বাড়িয়া দীর্ঘকালে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শোথের বর্ণ পাত্ত বা শুষ্ক এবং চাকচিক্যযুক্ত। কফজশোথ কঠিন হয়, শোথে কণ্ডু প্রভৃতি যাতনা বিস্ত্রমান থাকে।

রক্তশোথ পিত্তশোথের লক্ষণযুক্ত পরন্তু অত্যন্ত ক্রমবর্ণ।

যে শোথে বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ শোথের লক্ষণ দেখা দেয়, সেই শোথকে সান্নিপাত বা ত্রিদোষজ শোথ বলে।

আহত স্থান ফুলিয়া উঠিলে তাহাকে আগন্ত শোথবলে। বোলতা, ভীমরুল এবং মোমাছি প্রভৃতি সবিষ প্রাণীর দংশনে এবং নির্দিষ্ট প্রাণীর নখদস্তপাতেও আগন্ত-শোথ জন্মে। শরীরের কোন স্থানে সবিষ প্রাণী চলিয়া গেলে কি মূত্রত্যাগ করিলে এবং অজ্ঞাত বাহু কারণে, আগন্ত শোথের আবির্ভাব হইয়া থাকে। চিকিৎসা প্রকরণে আগন্ত শোথের বিশেষ বিবরণ বলা যাইবে।

শোথ-সমুখান অনেক প্রকার রোগ মনুষ্য-শরীরে আবির্ভূত হইয়া থাকে। গ্রন্থি, অলসী এবং বিদ্রুহি প্রভৃতি শোথসমুখান ব্যাধি। ত্রণশোথও শোথসমুখান রোগ। কিন্তু ত্রণশোথ অপরাপর শোণ করণ ব্যাধি হইতে ভিন্ন লক্ষণ। ত্রণ-শোথ প্রায়শঃ ত্র্যাংসাশ্রয়ী দোষসংঘাত। বিদ্রুহি প্রভৃতি, ত্র্যাংস এবং অজ্ঞাত আভ্যন্তরীণ ষাৎকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। ছয় প্রকার ত্রণ-শোথের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা হইয়াছে; বিদ্রুহি প্রভৃতির লক্ষণ যথাবসরে বলিব।

বল্মীক নামক হৃক্ষর রোগ বিশেষও এক প্রকার শোথ-সমুখান ব্যাধি। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে, স্বকদেশে, পৃষ্ঠে, উদরে এবং মস্তকে প্রায়শঃ এই রোগ জন্মে। ক্রমাচ্ছিন্ন হাতে ও পায়ে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই রোগের চলিত নাম Curbuncle (কার্বীকল)। বল্মীক ত্রিদোষজ ব্যাধি।

ত্বগদেশে এবং ত্র্যাংস-ব্যবচ্ছেদক কলা (Subcutaneous tissue) ভাগে দোষসংঘাত হইয়া, কৃত্রিমকৃত বৃহত্তর ত্রণশোথের দ্বার শোথ উৎপাদন করে। উৎপন্ন শোথ ত্র্যাংসকোষ বিশিষ্ট (Ganglionic)। এইরূপ শোথ সমুখান ব্যাধির নাম বল্মীক কার্বীকল।

বন্দীকের উপরিতন দেশে একাধিক সমুচ্ছায় উদ্গত হইতেও দেখা যায়। ডাক্তারেরা এই ব্যাধিকে জীবাণু-প্রভব (Bacterial origin) বলেন। বন্দীকের উপরিতন বন্ধ অপস্থত হইলে একাধিক ছিদ্র (Opening) প্রকাশ পায়। সেই সকল ছিদ্র দিয়া আশ্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। এই রোগে তৌদ, শূল, জালা এবং অন্ত্রান্ত্র যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকে কখন কখন রোগের সঙ্গে জ্বরও প্রকাশ পায়।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকরণে, আমরা ব্রণ-শোধ এবং ব্রণরোগের সিদ্ধকল চিকিৎসা ক্রমে বলিব। দেশীয় ঔষধের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা উৎপাদন এবং বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ত, মধ্য-বিত্ত এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত লোকের উপকারের নিমিত্ত, ধনিজনেরও বহুদিনের ক্রেষভোগ নিবারণার্থ, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমরা এইস্থানে কার্বাকল রোগের একটা মহৌষধের প্রভুতি প্রণালী এবং প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ করিলাম। উপেক্ষা না করিয়া, অবৈজ্ঞানিক না ভাবিয়া, ষাহায়া এই ঔষধ ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা বহুবায়ের, ক্রোরেন্দ্রকরমে অভিতূত হইবার এবং বহুদিন শয্যাশায়ী থাকিয়া ভুগিবার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন।

### বন্দীকের (কার্বাকলের) মহৌষধ ।

অনন্তমূল, যষ্টিমধু এবং নালুকা যোগে এই ঔষধটী তৈয়ার করিতে হয়।

অনন্তমূল সকলেরই পরিচিত দ্রব্য। দ্রব্যটী চূর্ণভণ্ড নহে। অনেক স্থলে জঙ্গল হইতে সংগৃহীত হইতে পারে, সহস্রে, বন্দরেও কিস্মিতে পাওয়া যায় যে অনন্তমূল বেশ টাটকা আছে—গন্ধ-বর্ণ-রস বিকৃত হয় নাই, সেইরূপ অনন্তমূল কুট কুট করিয়া ওকাইয়া

গুঁড়া করিতে হইবে। সূচুর্ণিত অনন্তমূল পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া স্নান চূর্ণ গ্রহণকরতঃ স্বতন্ত্র রাখিয়া দিবে।

যষ্টিমধুও সুপরিচিত দ্রব্য। পশারির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। যে যষ্টিমধুর বর্ণ ও আশ্রাব ঠিক থাকে, পুরাতন হয় নাই, পোকায় ধরে নাই, সেইরূপ যষ্টিমধু গুঁড়া করিয়া পৃথক রাখিয়া দিবে।

নালুকাও পশারির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। পশারিরা ইহাকে নালুকা বলে; সংস্কৃত নাম নলিকা। কবিরাজ মহাশয়েরা এই দ্রব্য তৈলের মুচ্ছাপাকে ব্যবহার করেন। নালুকা দেখিতে দারুচিনির ছায়, তবে দারুচিনির চেয়ে নালুকা স্থল-বহুল। আশ্রাবও কতকটা দারুচিনির ছায়।

নালুকা গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া পৃথক রাখিবে। তারপর অনন্তমূলের গুঁড়া ১০ এক ছটাক, যষ্টিমধু চূর্ণ ১০ এক ছটাক এবং নালুকাচূর্ণ ১০ আধপোয়া এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া উপযুক্ত আবৃত পাণ্ড্রে রাখিয়া দিবে। আবৃত্তক হইলে উক্ত পরিমাণের বেশী গুঁড়াও করিয়া লইতে হয়।

প্রয়োজনানুসারে, ২ আঙ্গুল পুরু, ব্রণক্ষেত্র বুঁড়িয়া প্রলেপ লাগান যাইতে পারে, এরূপ পরিমাণের ঐ মিশ্রিত চূর্ণ গ্রহণ করিয়া শীতল জলে গুলিয়া প্রলেপ দিবার উপযোগী করিয়া কার্বাকলটী আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ বসাইবে। তদুপরি এক খণ্ড কচি কলার পাণ্ড দিয়া, যেখানে যেখানে ব্রণ-বন্ধন করিতে হয়, অর্থাৎ প্রলেপটী স্থান ভ্রষ্ট না হয়, সেইরূপকারে রাখিয়া রাখিবে। এইরূপে দিবসে পঁচটা প্রলেপ লাগাইতে হইবে। প্রলেপটী ওকাইতে আরম্ভ করিলেই বদলাইয়া দিবে। যদি

পাঁচটা প্রলেপ লাগাইলেই জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইবে। পরদিনেও এই প্রলেপ ঐ ভাবে যোজনা করিবে। প্রায়শঃ দ্বিতীয় দিনে কচিং তৃতীয় দিবসে, শোথ বসিয়া যায় এবং শোথের উপরিতম শীর্ণত্ব উঠিয়া গিয়া ব্রণছিদ্র প্রকাশ পায়। ব্রণছিদ্র প্রকটিত হইলেও তদুপরি প্রলেপ যোজনা করিবে। ক্রমশঃ শোথ লীন হইতে থাকিবে এবং ছিদ্র সকল দিয়া পূজ নিঃসৃত হইবে। এই সময় নিমের পাতা দিয়া

সিদ্ধ করা জল দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া প্রলেপ যোজনা করিবে। কত বিস্তৃত হইলে নিমের পাতা দিয়া গব্যঘৃত পাক করিয়া লগাইলে অচিরে যা শুকাইয়া যাইবে।

যে কোন ব্রণশোথে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
কবিরত্ন।

## অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ

ও

### অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ।

আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র—আয়ুর্বেদ, আট ভাগে বিভক্ত হইয়া অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গের নাম—শল্য, শালাকা, কারচিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কোমারভূতা, অগদ-ভঙ্গ, বসায়ন ও বাজীকরণ তন্ত্র।

প্রাচীনভারতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের

চর্চা ও উন্নতি ।

আয়ুর্বেদের এই অষ্টাঙ্গ বিভাগ কেবল পুথিগত নহে। আয়ুর্বেদে কৃতশ্রম মাত্রেই অবগত আছেন, প্রাচীন ভারতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের প্রত্যেক অঙ্গ লইয়া বহু আলোচনা, বিবিধ তথ্য-সংগ্রহ ও নানা পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। শল্যভঙ্গবিদগ্ধ, বঙ্গ, শস্ত্র, কার ও অগ্নিকর্ষ দ্বারা যে সকল উৎকট ব্যাধির প্রতীকার করিতেন, তাহার কিকিৎ মাত্রেই বিবরণ পাঠ করিয়া, আধুনিক সার্কেলসমূহ ও বিশিষ্ট

হইতেছেন। শালাকা তন্ত্রবিদগ্ধ, চক্ষুকর্ণাদি রোগ চিকিৎসায় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়া ছিলেন, সূত্রত সংহিতা পাঠে তাহার কিকিৎ মাত্র অভাস পাওয়া যায়। কোমার-ভূতা অর্থাৎ শিশুর পালন ও চিকিৎসা বিষয়ে এসেছে বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আমরা অজ্ঞাপি আয়ুর্গ্ৰন্থে পত্রক, জীবক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিশু চিকিৎসকের নামোন্মেষ দেখিতে পাই। অগদভঙ্গ অর্থাৎ বিষচিকিৎসার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। এতদ্বিবরক গ্রন্থ অধুনা নিতান্ত দুর্লভ হইলেও আমরা সূত্রত সংহিতার কল্পহান পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে সর্প, শৃগাল, মূষিক ও বিবিধ কীটাদির সংখ্যা, জাতি-বিভাগ, দৃষ্টলক্ষণ ও বিবেগ বিবরক বিবিধ সূত্র ভঙ্গের আলোচনা হইয়াছিল। সর্পবধে বিবের প্রকৃতি পরীকার জন্য, নিবধর ও নির্দিষ্ট সর্পের বর্গসমূহ উৎপাদন করা হইত। বর্গাদি বিবের সকল চিকিৎসা ও ব্যাধিভঙ্গ হইয়াছিল। বসায়ন ও বাজীকরণ চিকিৎসা

বিহার প্রভাবে ভারতবাসিগণ অকাল জরার আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিয়া, অমিত বল ও সুদীর্ঘ আয়ুলাভ করিয়া ছিলেন ।

### অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের অনালোচনা

ও

#### চিকিৎসক সম্প্রদায়ের অবনতি ।

গ্রন্থলোপ, সদগুরুর অভাব, অমুৎসাহ, পুনঃপুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব এবং অত্যাচার কারণে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের সম্যক আলোচনার বিষয় ঘটিলে, ক্রমশঃ যোগ্য চিকিৎসকের অভাব হইতে লাগিল। জীবের পরম হিতকারী, আচার্য্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ, অংশেবে শাস্ত্রানভিজ্ঞ জনগণের হস্তে লুপ্ত হইল। পরিতাপের বিষয়—কুশা-গ্রন্থী, জিতহস্ত, ধনুস্তরিশিষ্যগণ যে ব্রণটপাট-নাদি কৰ্ম্ম সম্বন্ধে নির্বাহ করিতেন, তাহা অনভিজ্ঞ ক্ষৌরকারগণের কুলাগুত কৰ্ম্ম হইল। শাস্ত্রদর্শী অশ্রুত-সদীপগণের বিশেষ যত্নানুষ্ঠিত মূঢ়গর্ভ-শল্যোদ্ধরণ অর্থাৎ গর্ভাশয়ে বিবিধ বিচিত্রভাবে স্থিত শিশুর বহিষ্করণ কার্য্য শাস্ত্র-বহিস্কৃত নীচ জাতীয় অবলাজনের অবলম্বনীয় হইল। আচার্য্য পরীতক, জীবকের সম্পাদিত শিশু চিকিৎসা মূর্থ “ছেলের বোজার” হস্তে সমর্পণ করা হইল। অগদতন্ত্রবিদ গণের অমুগ্ধিত বিষ চিকিৎসার ভার অজ্ঞানান্দ্র “মালবৈস্তর” হাতে গেল। ক্রমে এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ভারতে যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের এতাদৃশী উন্নতি হইয়াছিল, তাহা অধুনা যুক্তি তর্কস্বারাও সাধারণ লোককে বিশ্বাস করান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

### অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের পুনরালোচনার আকণ্ঠ্যতা ।

যে আয়ুর্বেদ কতকাল হইতে আমাদের কাছে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আমাদের দোষেই অজ্ঞলোকের হাতে পড়িয়া তাহা অধুনা বিকলাঙ্গ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। আয়ুর্বেদের এই দুর্দশা কখনই আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের আলোচনা না থাকায়, আয়ুর্বেদ চিকিৎসাগণ বিড়ম্বিত ও অবজ্ঞাত হইতেছেন। ইহাও কদাপি স্পৃহণীয় নহে। অতএব অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদেব পুনরালোচনা নিত্য প্রয়োজন হইয়াছে।

### আয়ুর্বেদের আধুনিক অব্যাপনা-প্রণালী ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের পুনরালোচনা নিত্য আশ্রয় হইলেও অধুনা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের অব্যাপনা হইতেছে না। এদেশীয় আয়ুর্বেদা-চার্য্যগণ কেবল মাত্র কার্যচিকিৎসার অব্যাপনা করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাও সম্যক উপদিষ্ট হয় না। যে দ্রব্য-পরিচয় চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য, তাহা দ্রব্য-প্রদর্শন পূর্বক যথাযথ ভাবে শিক্ষা না দেওয়ার, অজ্ঞ লোকের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। যে বৃত্তিকর্ম্ম কার্যচিকিৎসার অর্থেই বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, আধুনিক কবিরাজগণ তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভ না করায় তাহাদিগকে অস্ত্রের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। শিক্ষার অভাবেই ধনুস্তর-শিষ্যসত্ত্বিত শস্ত্রচিকিৎসার পরায়ুধ হইয়াছে। সদগুরুর অভাবে কবিরাজগণ ক্রমে সর্বাঙ্গীণ প্রাপ্ত হইতেছেন।

কায়চিকিৎসকেরও যোগ্যতা উৎকৃষ্ট হইতেছে ।

অষ্টাদশ আয়ুর্বেদে সম্যক আলোচনার জন্য বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা ।

আয়ুর্বেদ কাণ্যশাস্ত্র নহে—চিকিৎসা বিজ্ঞান । ইহার অধ্যাপনা প্রণালী প্রত্যক্ষ-দর্শনমূলক ও যোগ্যাকরণ পূর্বক হওয়া উচিত । পূর্বে এদেশে ঐ ভাবেই আয়ুর্বেদের অধ্যাপনা হইত । কি আত্রেয় সম্প্রদায়, কি ধনুস্তরীয় সম্প্রদায় উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থেই স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে যে, আয়ুর্বেদবিদ্যার্থী, শাস্ত্রোক্ত বিষয় যদি “হাতে হেতেড়ে” না করিয়া কেবলই পুঁথিগত বিজ্ঞান তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে সে চিকিৎসা করিবার যোগ্য নহে । কথ্যটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি—মনে করুন, ছাত্র দ্রব্য-গুণ পড়িতেছে । সে সেই দ্রব্যটির শাস্ত্রোক্ত রস, গুণ, বীৰ্য্য বিপাক, প্রভাব প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য বেশ আয়ত্ত করিল, কিন্তু দ্রব্যটি চক্ষে দেখিল না—চিনিলা না, বলুন দেখি এ জ্ঞান তাহার কি কাজে লাগিবে ? এইরূপ শারীরস্থানের শাস্ত্রীয় উপদেশ যদি নরশরীরে দর্শন না করা হয়, কেবল পুঁথিগত বিষয়ের মৌখিক শিক্ষা হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষা কি ছাত্রের জ্ঞানে মুদ্রিত হইবে ? না তাহার নিঃসংশয় জ্ঞান জন্মিবে ? আয়ুর্বেদ শিক্ষার এই কু-প্রণালীর জন্তই সুযোগ্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, সুতরাং সাম্প্রদায়িক অবনতি ঘটিতেছে । নচেৎ দেশে বুদ্ধিমান আয়ুর্বেদ বিদ্যার্থীর কিছু অভাব নাই । অধ্যাপনাগত এই সকল অনর্থপরম্পরা দূর করিবার জন্ত, বিগত ক্রোড় মাসে কলিকাতা স্ত্রামবাসীদের অন্তর্গত ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটের ২৯ সংখ্যক ভবনে “অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের বিভাগ ।

দেশের বেকরূপ অবস্থা তাত্কাতে বহু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের প্রয়োজন । আয়ুর্বেদ-বিদ্যার্থীর সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার থাকা আবশ্যক । কিন্তু হর্ভাগ্যক্রমে দেশে সংস্কৃত-ভাষার তাদৃশী চর্চা নাই ; সুতরাং অনেকে সামান্য সংস্কৃত জ্ঞানলাভ করিয়া বা সংস্কৃত না জানিয়াই, আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিতে আসেন । দেশের অবস্থাসূত্রে অল্পশিক্ষিত ও সংস্কৃত অনভিজ্ঞ আয়ুর্বেদবিদ্যার্থীগণকে প্রত্যাখ্যান করা ও এখন চলেনা ; সুতরাং অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ ও বাঙ্গালা বিভাগ পৃথক্ করিতে হইয়াছে । অধ্যাপনার বিষয় উভয় বিভাগেই এক, কেবল ভাষার পার্থক্য । সংস্কৃত বিভাগে ভাব ও বিষয় সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা বিভাগে যাবতীয় বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । ছাত্রেরা সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্বেদাচার্য্য হইলে ইহাই আমাদের অধিকৃষ্টর স্পৃহনীয়, এক্ষণ ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্ত একটা পৃথক্ বিভাগ খোলা হইয়াছে । ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ এই বিভাগের অধ্যাপনা করিবেন । ছাত্রগণ এই বিভাগ হইতে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া পশ্চাৎ অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে প্রবেশ করিতে পারেন ।

অষ্টাদশ আয়ুর্বেদের অধ্যাপনা বর্ষাবধি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্বাহ করিবার জন্ত বিদ্যালয়ে যে দ্রব্যরাশি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা যথেষ্ট বিবরণ —

(ক) স্ত্রামবাসীরা—উৎকৃষ্ট শিক্ষার বিবিধ সুপাঠ্যাদি ।

(খ) ভেষজ-পরিচয়-গারে—৫০০ শতাধিক বণিক্ দ্রব্য, বিবিধ ধাতুপদার্থ এবং ২০০ শতাধিক সজীব উদ্ভিদ।

(গ) ঋতুশাস্ত্রাগারে শস্ত-কর্মোপযোগী বিবিধ যন্ত্রশস্ত্র।

(ঘ) বিকৃত শারীর-দ্রব্য-সম্ভারে—পীড়া বিশেষে বিকৃতি প্রাপ্ত নর-শরীরের আশ্রয়াদি।

(ঙ) গবেষণা-মন্দিরে—চিকিৎসা-বিজ্ঞানোচিত বিবিধ বিষয়ের তত্ত্ব-সন্ধান ও পরীক্ষার জন্য নানা উপকরণ এবং যন্ত্রাদি।

(চ) শারীরপরিচয়াগারে—নরকঙ্কাল, মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুরঞ্জিত চিত্র ও মৃত্তিকা-রচিত, রঞ্জিত আশ্রয়াদি সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যাপকগণের নাম—  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত ত্রীনাথ কবীন্দ্র।

“ “ যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন,  
এম, এ, এম, বি।

“ “ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী,  
বি, এ, এল্, এম্, এম্।

“ “ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিত্বষণ।

“ “ সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

## বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী।

### প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

বনৌষধি বিজ্ঞান, দ্রব্যগুণ, রসশাস্ত্র, অঙ্গ-বিনিশ্চয়-বিজ্ঞা, শারীরবিজ্ঞান ও এই সকল অঙ্গীত অংশের বোধ্যাকরণ। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

### দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

পরিভাষা ও রসরত্নাদি-তত্ত্ব, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিজ্ঞা ( তত্ত্বসম্ভাষা [ পাঠ্য চাওয়া ] ও ব্যবচ্ছেদ পূর্বক মৃতকপরীক্ষাসহ ) শারীর-বিজ্ঞান, রোগবিনিশ্চয়। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

### তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

দ্রব্যগুণ, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, রোগবিনিশ্চয়, কায়চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র, প্রসূতিতন্ত্র, ( দাত্ত্রীবিজ্ঞা ), আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কোমারভূতা। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

### চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

কায়-চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র ( যন্ত্রশস্ত্রকর্ম্মাভ্যাসসহ ) শালাক্য-চিকিৎসা, উভয় তন্ত্রগত তত্ত্বসম্ভাষা, ত্রণবন্ধন শিক্ষা, নাড়ীবিজ্ঞান, বহু-তত্ত্ব, অগদতন্ত্র, আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস। সংস্কৃত বিভাগের ব্যুৎপত্তিলাভের সাধারণ প্রশংসাপত্র ও বাঙ্গালা বিভাগের চরম-পরীক্ষা।

### পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী।

নাড়ীবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা, দ্বাদশ মাস আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কায়-চিকিৎসা ও শল্যশালাক্য তন্ত্রের প্রত্যক্ষদর্শনমূলক বৃদ্ধ-বৈজ্ঞানিকপদেশ। চরম পরীক্ষান্তে উপাধিদান। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইল—

১। চরক-সংহিতা ২। সুশ্রুত-সংহিতা  
৩। অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ ৪। অষ্টাঙ্গহৃদয় ৫।  
মাধব-নিদান ৬। হারীত সংহিতা ৭। সিদ্ধ-  
যোগ ৮। চক্রদত্ত ৯। ভাবপ্রকাশ ১০।  
শাকদেব ১১। রসরত্ন-সমুচ্চয় ১২। রসেস-  
সার-সংগ্রহ ১৩। বঙ্গসেন ১৪। ধর্ম্মরত্ন-  
নিষণ্ট ১৫। রাজনিষণ্ট ১৬। বনৌষধি-  
দর্পণ ১৭। নাড়ীবিজ্ঞান ১৮। পরিভাষা-  
প্রদীপ ১৯। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়।

মুদ্রিত, অমুদ্রিত বৈয়াকরণ-

সংগ্রহ—গ্রন্থাগার ।

মহর্ষি আত্রেয়ের শিষ্যগণের প্রত্যেকেই এক একখানি গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক চরকসংহিতা ভিন্ন আত্রেয় সম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ভগবান্ ধনুস্তরির বারজন শিষ্য, বারখানি গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সুশ্রুতসংহিতা ভিন্ন ধনুস্তরিসম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা পাইতেছি না। তারপর এক সুশ্রুতসংহিতারই কত ভাষ্য, টিপ্পনী, টীকা রচিত হইয়াছিল। এগুলির কেবল নামমাত্র আমরা শ্রুত আছি। চরকসংহিতার দ্বাদশজন টীকাকারের নাম আমরা জানিতে পারিতেছি, কিন্তু অধুনা কেবল চক্রপাণির টীকা মাত্র পাওয়া যায়, তাহাও প্রায় খণ্ডিত। ইহা ভিন্ন গজ, অশ্ব, বৃক্ষ, প্রভৃতির পালন ও চিকিৎসা বিষয়ে কত গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। কত সিংহটু, “দ্রব্যচিক্ৰক” মত কত দ্রব্য পরিচায়ক, গ্রন্থ, কত প্রাণিবিষয়ক পুস্তক, কত সূদশাজ্ঞ, কত গন্ধশাস্ত্র, কত মনিষাসব প্রস্তুত বিষয়ক গ্রন্থ ও কত যে ঋতু-মণি-রত্নাদি পরীক্ষার পুস্তক রচিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। এই গ্রন্থরাশি কি বাস্তবিকই বিলোপ প্রাপ্ত হইরাছে? কি করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিব। অতাপি বৈয়াক গ্রন্থ অল্পসংখ্যক অল্প ভারতবর্ষব্যাপী, কোন আন্তরিক প্রয়ত্ন অমুষ্ঠিত হয় নাই। দেশের যে যে স্থানে প্রাচীন গ্রন্থরাশি অতাপি সঞ্চে রক্ষিত রহিয়াছে, সেই সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হয় নাই। সচিব্য পরিদর্শনের চেষ্টার পূর্বে কে বলিত বাস্তবিক আবার এক বিচির

গ্রন্থরাশি আছে? হুতরাং আমরা ইচ্ছা করিয়াছি যে, সংস্কৃতজ্ঞ ভ্রমণকারী পণ্ডিত নিয়োগ করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সংস্কৃত বৈয়াক গ্রন্থের অনুসন্ধান করা হইবে এবং প্রাপ্ত গ্রন্থ বা তৎপ্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে। একাধা নির্দোষার্থ বহু অর্থের ও প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন। আশা করি আয়ুর্বেদহিতৈষিগণ গ্রন্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদিগকে সাহায্য ও পরামর্শ দানে বাধিত করিবেন।

বৈয়াক বৃক্ষ-বাটিকা ।

যোদ্ধার যেনম অস্ত্র-প্রয়োগ কৌশল জানা আবশ্যক, চিকিৎসকেরও তদ্রূপ দ্রব্য-যোজনাকৌশল হওয়া প্রয়োজন। দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হইলে দ্রব্যের পরিচয় আবশ্যক। দ্রব্যের পরিচয় আবার, দ্রব্যের প্রত্যক্ষ-দর্শন-মূলক পরীক্ষা সাপেক্ষ। দ্রব্যের প্রত্যক্ষ দর্শন অল্প আবার দ্রব্যের একত্র সমাবেশ আবশ্যক, হুতরাং বৈয়াকবৃক্ষ-বাটিকা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইতেছে।

ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ, ইহারই তৈবজ্য-রসে পরিপূর্ণ। অল্প কোন দেশের চিকিৎসাশাস্ত্র এক্ষণে তৈবজ্য-রসের সঙ্গীত করিতে পারে না। কেবল বৈদ্য উভয়ের গুণে, কত অমূল্য নৈতিক কত হৃদয়বোধ্য কাহিনী প্রতীকার করিতেছে, ইহা অধিক স্মরণীয় করিতেছি। কিন্তু হৃদয়ের বিধি আমরা দিক-দিন কত অস্বাধিকারী প্রত্যাহারাইতেছি। চরক সুশ্রুতসংহিতা-সম্বন্ধে অসম্মতিসহকারে প্রত্যাহারাইতেছি।

প্রকাশ বা চক্রসংগ্রহোক্ত কত দ্রব্যই ক্রমশঃ আমাদের অপর্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। আমরা বলাভূমুরকে ত্রায়মাণা বলিয়া এবং কোন অজ্ঞাতনামা কাঠ বিশেষকে প্রপৌণ্ডরিক বলিয়া প্ররোগ করিতেছি। আজকাল কৃষি-কার্যের বিস্তার হেতু, বৃক্ষ গুল্যাদির বিলোপ সাধিত হইতেছে। দ্রব্যলোপের সহিত দ্রব্যের অপর্যাপ্ত অবশ্যস্বাভাবী। অতএব দ্রব্যের লোপাপত্তি নিরাসার্থ বৈষ্মক-বৃক্ষবাটিকা প্রতিষ্ঠার নিত্য প্রয়োজন। কেবল দ্রব্যের লোপাপত্তি নিবারণ নহে, দ্রব্যের গুণোৎকর্ষের জন্য ও উদ্যান-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা আছে। আমরা অধুনা যে সমস্ত বৃক্ষ লতা, গুল্মাদি ঔষধার্থ ব্যবহার করিতেছি দীর্ঘকাল আরণ্য উদ্ভিদের সহিত জীবনসংগ্রাসে তাহারা হীন-বীৰ্য্য হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল হীনবীৰ্য্য ঔষধি উদ্যানে সবল-পালিত হইলে, তাহারা আবার তাহাদের পূর্ববীৰ্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে উদ্ভিদ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত উদ্ভিদগুলিকে তত্তৎ দেশের ভূমি, বায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থাসারে রক্ষাপূর্বক তৈষজ্যোদ্যান প্রতিষ্ঠা, বহু ব্যয় ও অধ্যাস-সাধ্য। আশা করি আয়ুর্বেদ-হিতৈষী সমুদয়-গণ আয়ুর্বেদের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে আমাদের সহায় হইয়া আমাদের কৃতার্থ করিবেন।

### আয়ুর্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রের সজীবতা রক্ষা ও উন্নতি করণে যেমন হুচিকিৎসকের প্রয়োজন, লোকো-পকার স্থপিকা ও চিকিৎসার প্রসারের জন্য তদ্রূপ দাতব্য চিকিৎসালয় ও আত্মরায় (In-door Hospital) আবশ্যক। এই কলিকাতা মহানগরীতে কার্যোপলব্ধ কত দেশের লোক বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে

দরিদ্র লোকের সংখ্যাও অল্প নহে। যে কএকটি দাতব্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয় আছে, লোক সংখ্যার তুলনায় সে গুলি কোন মতেই প্রচুর নহে। বিশেষতঃ এই দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি সহরের দক্ষিণ ভাগেই প্রতিষ্ঠিত; অতএব সহরের উত্তরাংশের লোকের উপকারার্থ ২২ নং ফকিরা পুকুর ষ্ট্রীটের বাটীতে, বিগত ২৭ মাঘ হইতে একটা আয়ুর্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিদিন প্রাতঃ ৮—১০ পর্যন্ত দুই ঘণ্টাকাল, সমাগত রোগিগণের, যোগ্য চিকিৎসক কর্তৃক রোগ পরীক্ষা পূর্বক ঔষধ বিতরিত হইতেছে এবং আত্মরায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে।

আমরা অতীব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যোগ-দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সার আক্তোহা মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্র-বাচস্পতি।

„ ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্মাধিকারী।

„ মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)

„ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কানিমবাজার)

„ মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর।

„ মহারাজা রণজিৎ সিং (নসীপুর)।

„ রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়

সি, এস, আই,

„ অটীস নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

„ রাজা স্বরীকেশ লাহা।

„ রাজা বাহুদেব (কলকাতা, মাদারার)

„ গিরিজাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (গোবিন্দপুর)

„ বাবু প্রহলাদনাথ ঠাকুর।

„ পি, সি, লাল জমিদার (পুণ্ড্রা)

„ রাজা প্রজাতন্ত্র বক্রাঙ্গ দেবী



শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন (বহরমপুর)

- „ হেমেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল  
 „ মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি } জমিদার  
 „ জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি } (নিমতিতা)  
 „ রায়বাহাদুর চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ।  
 „ রায়বাহাদুর অমৃতলাল রাহা ।  
 „ অনুরেবল মহেন্দ্রনাথ রায় সি, আই, ই,  
 „ ষারকানাথ চক্রবর্তী এম, এ, বি, এল  
 „ মন্থনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল  
 „ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল  
 „ জ্যোতিষেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল  
 „ অনুরেবল নিশিকান্ত সেন রায়বাহাদুর  
 „ সি, আর, দাস বার-এট-ল  
 „ এন, সি, সেন বার-এট-ল  
 „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি এম, এ, বি, এল  
 „ এস্ কে, অগতি এম, এ, আর, পি, এস  
 „ রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরি এম, এ, বি এল  
 জমীদার ( টাকী )

নবাব সিরাজ উল্-ঈশলাম ।

- আমীন উল্ ঈশলাম খাঁ বাহাদুর  
 অনঃ ফজলুল্ হক এম, এ, বি, এল,  
 হুর উদ্দীন আহাম্মদ এম, এ, বি, এল ।  
 অধ্যাপক আবদুল হাকিম ।

শ্রীযুক্ত ডাঃ অমিরমাধব মল্লিক এম, বি,

- „ ডাঃ হুরেন্দ্রেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,  
 „ ডাঃ সার কৈলাসচন্দ্র বহু  
 ডাঃ ই. হেরল্ড ব্রাউন্ এম, ডি, এম,  
 আর, সি, পি, লেঃ কর্ণাল, আই, এম,  
 এস, ( রিঃ )  
 ডাঃ আর, এল, নল্ লেঃ কর্ণাল আই,  
 এম, এস, ( রিঃ )  
 ডব্লিউ, সি, গ্রোহাম বার-এট-ল ।  
 „ পণ্ডিত লালচন্দ্র বিহারী ।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ

- „ „ যাদবেশ্বর তর্করত্ন  
 „ কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন ।  
 „ কবিরাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্ন  
 „ „ শ্রীমান্দাস বাচস্পতি  
 „ „ নগেন্দ্রনাথ সেন  
 „ „ কালীশচন্দ্র সেন  
 „ „ অমৃতলাল গুপ্ত  
 „ „ হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ  
 „ „ অধ্যাপক লাহোর আঃ কালেজ  
 „ „ সারদাকান্ত সেন ( ভূতপূর্ব  
 নেপাল রাজবেত্ত )  
 „ „ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন  
 „ „ বিবেশ্বরপ্রসন্ন সেন  
 „ „ কালীভূষণ মেন  
 „ „ বহুনাথ গুপ্ত কবিরত্ন  
 „ „ অমৃতোব সেন কবিরত্ন  
 „ „ অধিনীকুমার সেন কবিরঞ্জন  
 „ „ নিশিভূষণ রায় কবিরঞ্জন  
 „ „ রাধাকিশোর সেন  
 „ „ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন  
 „ „ গিরীন্দ্রনাথ কবিভূষণ  
 „ „ তারাচরণ ব্যাকরণতীর্থ  
 „ „ শরচ্চন্দ্র সেন ব্যাকরণতীর্থ  
 „ „ সতীশরঞ্জন দাসগুপ্ত  
 „ „ করুণাকুমার সেন ভিৎকরত্ন  
 „ „ আদিত্য নারায়ণ সেন  
 „ „ শরচ্চন্দ্র সেন  
 „ „ ভটিংকুমার বিভাবিনোদ  
 শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ,  
 „ তপস্বতকুমার শাস্ত্রী এম, এ,  
 „ বদ্রিহর দিয়ারত্ন এম, এ,  
 „ কেশবলাল গুপ্ত সি, এম,  
 অধ্যাপক যুগেন্দ্রনাথ সিং এম, এ,  
 শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ মল্লী  
 „ ডাঃ বোমেন্দ্রনাথ বোম

শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়  
 ,, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র  
 ,, ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়  
 ,, ডাঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়  
 ,, ডাঃ নলিনীরঞ্জন গুপ্ত এম, ডি,  
 ,, ডাঃ শিবচন্দ্র মল্লিক  
 ,, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল,  
 ,, সত্যদাস বন্দ্যোপাধ্যায়  
 ,, ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়  
 ,, কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়  
 ,, সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়  
 ,, হিরণ্ময় রায়

শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল,  
 ,, গিরিজানাথ রায় চৌধুরি  
 ,, শৈলজানাথ রায় চৌধুরি  
 ,, যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি  
 ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি  
 ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি  
 ,, লক্ষণচন্দ্র রায়  
 ,, রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার  
 ,, রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,  
 ,, চন্দ্রোদয় বিজ্ঞাবিনোদ  
 ,, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( বহুমতী )  
 ,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ (ক্রমশঃ)

## উন্নত কুকুরাদির বিষ লক্ষণ ও চিকিৎসা ।

মাধবনিদান পাঠ করিয়া বাহারা মনে করেন আয়ুর্বেদে কেপা কুর শৃগালে কাম-ডানর লক্ষণ ও অরিষ্ট বর্ণিত হয় নাই তাহাদের অবগতির জ্ঞা প্রথমেই আমরা সুশ্রুত-সংহিতার করস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে নিম্ন-লিখিত কএক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—  
 “শৃগালখতরক্ষু ক-ব্যাভ্রাদীনাং যদানিলঃ ।  
 শ্লেষগ্রহণো মুফাতি সংজ্ঞাঃ সংজ্ঞাবহাশ্রিতঃ ।  
 তদা প্রসক্তলান্ লহুস্বকোহতিলালবান্ ।  
 অত্যর্থবিরোধে দৃষ্টম্ সোহস্তোত্তমমভিধাবতি ।  
 তেনোন্নতেন দষ্টম্ দংষ্ট্রিণা সবিবেগ তু ।  
 স্তম্ভতা জায়তে দংশে কক্ষকাতিস্রবতাস্ক ।  
 মিথ্যবিকৃত লিঙ্গে প্রায়শশোপলক্ষিতঃ ।  
 (১) যেন চাপি ভবেদ দষ্টম্ চেষ্টাং কৃতং নরঃ ।  
 বহুশঃ প্রতিকূর্ষণঃ ক্রিয়ালীনো বিনশতি ।  
 (২) দংষ্ট্রিণা যেন দষ্টম্ তজ্জপং যদি পশ্যতি ।  
 অশ্ল বা যদি বাদর্শে রিষ্টং তত্ত্ব বিনির্দ্দেশং ।

(৩) ত্রস্তাকম্মাদ যোহ ভীক্ষুং শ্রব্ধা দৃষ্টা পি বা জলম্  
 জলত্রাসস্ত বিস্তৃতং রিষ্টং তমপি কীর্তিতম্ ।  
 অদগ্ধো বা জলত্রাসী ন কথঞ্চন সিধ্যতি ।”  
 শৃগাল, কুকুর, নেকড়েবাঘ, ভালুক, ও  
 ব্যাঘ্রের শরীরস্থিত বায়ু, শ্লেষ্মার দ্বারা ঢেঁ  
 চইয়া, শরীরের জ্ঞানবহা নাড়ী আশ্রয় করিলে  
 উহার উন্নত হইয়া থাকে । ইহার উন্নত  
 হইলে, লাল্জল সোজা, মুখ লম্বা এবং ঘাড় বড়  
 দেখায় । মুখ হইতে অতিরিক্ত লাল-  
 শাব হয় । তখন ইহার কণ্ঠে তনিত ও  
 চকুতে দেখিতে পায় না । উন্নত হইলে  
 শৃগালাদি আর পরস্পর সম্প্রীতিপূর্বক বাস  
 করে না । তখন তাহার একে অন্যকে আক্রমণ  
 করে এবং মনুষ্যাদিকে দংশন করিতে উদ্যত  
 হয় । উন্নত শৃগালাদির শরীরে বিষ সঞ্চার  
 হয় । তখন ইহার বাহ্যকে দংশন করে  
 তাহার শরীরেও বিষ সঞ্চার হয় ।

স্পর্শজ্ঞান থাকে না এবং উহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নির্গত হইয়া থাকে । উন্নত শৃগাল বা কুকুরাদি যাহাকে দংশন করে সে যদি শৃগাল বা কুকুরাদির মত ডাকে, কিম্বা উহাদের স্বভাব অনুকরণ করে, তাহা, হইলে তাহার আর আরোগ্যের আশা নাই—সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । যে জন্তু কর্তৃক দষ্ট হয়, রোগী যদি জলে কিম্বা আর্শিতে সেই জন্তুর মূর্তি দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই রোগীর জীবনের আশা নাই জানিবে । রোগী কেবল জল দেখিয়া বা জলের নাম মাত্র শুনিয়াই যদি বিনা কারণে ভয় পায়, তাহা হইলে তাহার এই জলভ্রাস অরিষ্ট (মরণজ্ঞাপক লক্ষণ) বলিয়া বুঝিতে হইবে । অল্পমাত্র দংশন করিলেও যদি জল দেখিলে ভয় পায়, তাহা হইলে সেই বিষদোষও নিবৃত্তি পায় না ।

আমরা সূক্ষ্মতর উক্তির স্থল অর্থ করিলাম । এস্থলে বক্তব্য এই যে উপরি লিখিত দষ্টশব্দের অর্থ কেবল দন্তদ্বারা দংশন নহৈ নধাবাতও বুঝিতে হইবে । \* আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে ক্ষিপ্ত কুকুরের সামান্য নধাবাতেও কাহার কাহার জল ভ্রাস প্রকাশ পাইয়া, মৃত্যু হইয়াছে । আমাদের কোন চিকিৎসক বন্ধুর প্রত্যক্ষীকৃত একটি রোগীর বিবরণ তাঁহার নিজের কথায় বলিতেছি—

“রোগী দেখিতে গেলাম, রোগের ইতিহাস

\* কলহানের বট অধ্যায়ের শেষে প্রকৃতির কুকুরাদির নধাবাতকৃত কতের চিকিৎসার প্রকৃত বখন বলিয়াছেন—

“নধাবাতকৃতং বাটলং ধ্বং কৃতং তদ্বিরুদ্ধং ।

সিকেন তৈলেন কোকেণ তে হি বাতপ্রকোপজাঃ ।

তখন উন্নতের নধাবাতে যে বিষকারণ হইবে ইহা বলাই বাহুল্য ।

এই—রোগীর বয়স ২৩২৪ বৎসর, স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল, রীতিমত কাজ কর্তব্য করিতে ছিগেন । আজ হঠাৎ কয়েকবার মূর্ছা (ফিট) হইয়াছে । আমি রোগীর নিকট থাকিতে থাকিতেই মুখের খিচুনি ও ফিট হইল । শীতল জল প্রচুর পরিমাণে মাথায় দিতে দিতে মোহ ভাঙ্গিল । রোগী জ্ঞান পাইয়াই বলিল “জল দিবেন না জল দিবেন না” আমি বলিলাম “কেন শীত করে কি ? রোগী বলিল “না” “না” । তারপর আমি বলিলাম এতবার ফিট হওয়ায় ওতামার খুব ক্লান্তি হইয়াছে—জল খাবে কি ? রোগী কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে “না না” বলিল । ক্ষুধা পায় না ? কিছু খাবে না ? রোগী বলিল তা খেতে পারি । খাবার আসিল, রোগী খাইলও মন্দ নয়, কিন্তু জল খাইতে চায় না । জলের উপর মহাবিরক্ত । পানীয় জল আনিবা মাত্র মহাবিরক্তি সহকারে উত্তেজিত ভাবে বারবার বলিল —“জল চাহি না” “জল লইয়া যাও” । তখন আমার সন্দেহ হইল । আমি আরও নিশ্চয় বুঝিবার জন্ত গোপনে চাকরকে বলিলাম এক খালতি জল আনিয়া এই ঘরে রাখ । জল আনিলা—রোগী জল দেখিয়াই মহাতত্ত্ব ভাবে “জল লইয়া যাও” “জল লইয়া যাও” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল । তখন আমি রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম কোন দিন তোমাকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল কি ? বোগীর তখন বেশী জ্ঞান রহিয়াছে, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—আমার বাড়ীতে কয়েকটা কুকুর আছে । ২২২২ মাস পূর্বে আমি একদিন বাইসাইকেলে চড়িয়া বাহিরে বাইতেছি এমন সময় আমার বাড়ীর কুকুরগুলির মধ্যে একটি কুকুর আমার পিছু পিছু

আসিতে লাগিল এবং নিবেদন করিলেও বারম্বার লাফাইয়া লাফাইয়া আমার পা ধরিতেছিল—এরূপ তো কখন করে না। আমি বারম্বার তাড়া করায় শেষে ঘরে ফিরিয়া গেল, কিন্তু তার নথ আমার পায়ে মোজা ফুটিয়া একটুকু লাগিয়াছিল—অতি সামান্য আঁচড় গিয়াছিল, কিছুমাত্র রক্ত পড়ে নাই—অতি সামান্য আঁচড়। তাহা আমি গ্রাহ্যই করি নাই—কোন দিন এ কথা ভাবিও নাই। আজ আপনি জিজ্ঞাসা করায় মনে হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সেই কুকুরটি কোথায়? রোগী বলিল তাহার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল, কিছু না খাইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া আঁচড়ানর একমাসের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে। আবার সেই মুখমণ্ডলের আক্ষেপের সহিত ফিট্ হইল। আমি গৃহস্থকে বলিলাম রোগীর জল-ত্রাস (হাইড্রোফোরিয়া) হইয়াছে। রোগ কঠীন—আপনারা অন্ত কোন চিকিৎসককে দেখাইতে পারেন। পরে শুনিলাম অনেক সাহেব ডাক্তার আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেই রাত্রিতেই “রোগীর মৃত্যু হইয়াছিল।”

এই বাস্তব ব্যাপার হইতে আমরা প্রধানতঃ দুইটা তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি।

(১) উন্নত কুকুরের বিষ অতি গুপ্ত-ভাবে কিয়ৎকাল শরীরে অবস্থিতি করিয়া পশ্চাৎ সংজ্ঞানাশ জন্মাইয়া প্রাণবিনাশ করিতে পারে।

(২) অতি দীর্ঘ দষ্ট হইলেও জলত্রাস জন্মিতে পারে এবং জলত্রাস প্রকাশ পাইলে মরণ নিশ্চিত।

প্রথমোক্ত তত্ত্বটি অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশের কেবল চিকিৎসা-শাস্ত্রে কেন

কাব্যে পর্যায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। সুশ্রুতের টীকাকার ডব্বণ কোন আয়ুর্বেদ গ্রন্থ হইতে সারোক্তার করিয়া বলিতেছেন—

অত্রার্থে তন্ত্রান্তরম্—“ব্যাধিতেন শ্বাদিনা দষ্টম্ভ শ্লেষ্মা প্রকুপিতঃ সংজ্ঞাবাহিণীধমনী রম্-প্রবিশ্য সংজ্ঞানাশ মাণাময়তি সত্ত্বঃ কালাস্তরাদ্ বা ইতি বিশেষঃ। ততোনরঃ স্পষ্টাঃ দৃষ্টাঃ শ্বেতা জলাং ত্রস্ততি। তত্স্থাপি তদ্বিষ্টং জানীয়াৎ” (সুশ্রুত টীকা—কলহান ৬ অঃ ৯০২ পৃঃ জীবানন্দের সংস্করণ)।

ডব্বণোক্তির মর্ম্ম এই—রোগগ্রস্ত কুকুরাদি প্রাণিকর্তৃক দষ্ট ব্যক্তির শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া সংজ্ঞাবাহিণী ধমনীগণের ভিতর প্রবেশ করিয়া দষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞানাশ (মোহ বা মূর্ছা) জন্মাইয়া থাকে। এই সংজ্ঞানাশ, দংশন মাজেই কিম্বা কিছুকাল পরেও জন্মিতে পারে। কুকুরাদির বিষের এই বিশেষত্ব। ইহা বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত কথা। কাব্যোক্ত দেখি—সীতা রাবণের গৃহ-বাস করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র লঙ্কার সীতা চরিত্রের অগ্নিপরীক্ষা করিয়া তবে গ্রহণ করিয়া ছিলেন; কিন্তু তথাপি অযোধ্যার প্রজারা, সীতাচরিত্রের প্রতি পরগৃহবাস-দুষণোপলক্ষ্যে কটাক্ষ করিলে, মহাকবি ভবভূতি দীর্ঘকাল পরে পুনর্নবীভূত এই সীতাচরিত্রগত দৃশ্যকে উন্নত কুকুরের বিষের সহিত তুলনা করিয়াছেন \*।

দ্বিতীয় তত্ত্বের সম্বন্ধে বক্তব্য—যে রোগের যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর মরণ হইতে দেখা যায়, সেই লক্ষণকে

\* হাছা বিকরণগৃহবাসদৃশ্যং

বৈদ্যোঃ প্রশমিতমুদ্বৈতরূপায়ঃ

এতত্ত্বঃ পুনরপি সৈবদ্বিগাচ্চ-

মালকংবিষবিষ সর্বত্রঃ প্রসঙ্গম্ (উঃ ভঃ ১মঃ পৃঃ ১০২)

সেই রোগের অরিষ্ট লক্ষণ বলে । সুশ্রুত, উন্নত কুকুরাদি কতৃক দষ্ট ব্যক্তির যে তিনটা অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়াছেন আমরা উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে তাহাতে একাদিক্রমে অঙ্কপাত করিয়াছি । এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বলিতেছি । কুকুর শৃগালে কামড়াইলে প্রথম অরিষ্ট লক্ষণ—যে প্রাণি-কতৃক দষ্ট হইয়াছে, দষ্ট ব্যক্তি তাহার তুলা আচরণ ও শব্দ করিবে অর্থাৎ কুকুরে কামড়াইলে কুকুরের মত ডাকিবে, কুকুরের মত চলিবে, কুকুরের মত কামড়াইতে যাইবে, ক্রান্ত হইলে কুকুরের মত জিহ্বা বাহির করিয়া ঘন ঘন শ্বাস লইবে ইত্যাদি । দ্বিতীয় অরিষ্ট লক্ষণ—রোগী জলে বা আয়নাতে দংশন করী প্রাণীর মূর্ত্তি দেখিবে । তৃতীয় অরিষ্ট লক্ষণ—জল দেখিয়া কিম্বা জলের নাম শুনিয়াই ভয় পাইবে, ইহার নাম জলভ্রাস । এই তিনটা অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া, মহামতি সুশ্রুত বলিতেছেন—

“অদষ্টোহপি জলভ্রাসী ন কথঞ্চন সিধ্যতি ।”

এখানে জীবদর্শনে এক অর্থাৎ অদষ্ট পদের অর্থ অন্ন দষ্ট—ঈষৎ দষ্ট । ঈষৎ দংশন করিলেও যদি দষ্ট ব্যক্তি জল দেখিয়া ভয় পায় তাহা হইলে তাহার বিষদোষ কদাপি আরাম হইবে না—মরণ নিশ্চিত জানিবে । এখন সুশ্রুতোক্তির সহিত উপরি লিখিত বাস্তব ঘটনা মিলাইয়া দেখুন ।

### চিকিৎসা ।

“বিস্রাব্য দংশঃ তৈর্দষ্টঃ সর্পিরা পরিদাহিতম্ ।  
প্রতিহাদগদৈঃ সর্পিঃ পুরাণং বাপি পায়য়েৎ ।  
অর্ককীরযুক্তকান্ত দত্তাজীর্ষবিরেচনম্” ।

( সুশ্রুত কল্পস্থান ৬ অঃ )

উন্নত কুকুরাদি কামড়াইবার পরে যে স্থানে

দংশন করিয়াছে সেই স্থানের উপরিভাগ হইতে দংশন স্থান পর্য্যন্ত টিপিতে টিপিতে যত পারা যায় রক্তস্রাব করাইয়া পরে অত্যক্ষ গব্যদ্ব্যতে তুলা ভিজাইয়া দষ্ট স্থানের উপরি স্থাপন করিবে । ইহাতে ঐ স্থান দৃঢ় হইয়া বিধাবশেষ নষ্ট হইবে । অতঃপর সুশ্রুত সংহিতার কল্প স্থানের ৭ম অধ্যায়োক্ত “মহা স্রগন্ধি অগদ” রোগীর সর্বদা বিশেষতঃ যে অঙ্গে দংশন করিয়াছে তদঙ্গে লেপন করিবে । রোগীকে অন্ততঃ দশ বৎসরের পুরাণ গব্যদ্ব্যত ১ তোলা পান করাইবে । অপরাজিতার মূলের রসে আকন্দের আঠা ২।১ ফোঁটা মিশাইয়া নস্ত করাইবে । সেবন জন্ত, সুশ্রুত নিম্নলিখিত কয়েকটা বোগের উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) যেতাং পুনর্নবাকান্ত দত্তাকুতুরকায়ুতাম্ ।

(২) “পললং তিলতৈলঞ্চ রূপিকার্যঃ পয়োগুড়ঃ ।

নিহস্তি বিষমালকং মেঘবৃক্ষমিবানিলঃ ।”

(৩) “মূলস্ত শরপুষ্কার্যঃ কর্ণং ধুব্বকর্দ্বাক্কিকম্ ।

তণ্ডুলোদকমাদার পেথয়ে তণ্ডুলৈঃ সহ ।

উন্নতকস্ত পটৈস্ত্রস্ত সংবেষ্টাপ্পপং পচেৎ ।

খাদেদৌষধকালে অমলক-বিষদৃষিতঃ ।”

( সুশ্রুত কল্পস্থান ৬ অঃ )

(১) “কনকোড়ুশ্বর কলমিব

তণ্ডুলজলপিষ্টং পীতমপহরতি” ।

(২) “কনকদলত্রবদ্বত গুড়হুতুপলৈকঃ

শূন্যং গরলম্” ।

( চক্রসংগ্রহ—বিষ চিঃ )

সুশ্রুতে ও চক্রসংগ্রহে যাত্রার উল্লেখ নাই ; অতএব আমরা বৃহৎসং সন্মত পূর্ণবয়স্কের যাত্রার উল্লেখ করিতেছি ।

(১) কাঁচা বেঁটপুনর্নবাসুল, ১ তোলা, কুকুরার কাঁচা হুল এক তোলা লইয়া

গব্য ছদ্ম বা শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে হইবে।

(২) তিলবাটা ২ তোলা, তিল তৈল ২ তোলা, আকন্দের আঠা ৬ রতি, আকের গুড় ২ তোলা মিশাইয়া সেব্য।

(৩) শরপুষ্কার কাঁচা মূল ২ তোলা, ধুতুরার কাঁচা মূল এক তোলা, আতপ চাউল ২ তোলা, নূতন আতপ চাউলের চেলোনির সহিত পিষিয়া যতগুলি পত্র আবৃত করিবার জন্য প্রয়োজন ততগুলি ধুতুরার পত্রে পিঠা প্রস্তুত করিয়া সেব্য।

(১) যজ্ঞডুমুরের পুই ফল ২টা, কনক ধুতুরার পরিপুষ্ট বীজ ১৬টা একত্র পেষণ করিয়া সেবন করিবে।

(২) ধুতুরা পাতার রস ২ তোলা, উত্তম গব্যদুগ্ধ ২ তোলা, আকের গুড় ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ ২ তোলা—একত্র সেব্য।

আমরা আধুর্বেদ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া চিকিৎসা প্রণালী দেখাইলাম, অতঃপর চিকিৎসা প্রণালীর কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে।

সুশ্রুতোক্ত ঔষধ তিনটি এবং চক্রোক্ত ঔষধ ২ টিকে ভাগ করিলে দেখা যায় যে, সুশ্রুতোক্ত প্রথম ও তৃতীয় ঔষধে এবং চক্রোক্ত দুইটি ঔষধেই অধিক মাত্রায় ধুতুরা আছে। ধুতুরার একটা নাম “উন্নত” এবং দ্রব্যগুণ বৈত্তারা সকলেই একবাক্যে অধিক মাত্রায় সেবিত ধুতুরার মূল, পত্র ও বীজের মত্ততা, ভ্রম ও মূর্ছাকারিতা গুণ স্বীকার করিয়াছেন। আর সুশ্রুতোক্ত দ্বিতীয় ঔষধে যে সমস্ত দ্রব্য রহিয়াছে সকলই বিরোচক, কেবল আকন্দের আঠা বামক ও বিরোচক উভয়ই। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে সুশ্রুতোক্ত প্রথম ও

তৃতীয় যোগ এবং চক্রোক্ত ২টা যোগ সংজ্ঞা নাশ ও উন্নততা জন্মাইতে পারে। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে উন্নত কুকুরাদির বিষ, দষ্টব্যক্তির শরীরে থাকিয়া শীঘ্র বা কালান্তরে সংজ্ঞানাশ করিয়া থাকে। বাহ্য বিষের কার্য, ঔষধের দ্বারা তাহা উৎপাদন করিবার প্রয়োজন কি? একথা বুঝিতে গেলে সুশ্রুত-কথিত উন্নত কুকুরাদি বিষ—চিকিৎসার মূল-সূত্র বুঝিতে হইবে। সুশ্রুত উপদেশ দিয়াছেন—  
“কুপ্যেৎ স্বয়ং বিষং যন্ত ন স জীবতি মানবঃ।  
তন্মাং প্রকোপয়েদাশু স্বয়ং যাবদ কুপ্যন্তি।

( সুশ্রুত কল্প ৬ : )

ইহার অর্থ এই—কুকুরের বিষ দষ্ট-ব্যক্তির দেহে স্বয়ং প্রকুপিত হইবার পূর্বেই ঔষধ দ্বারা সেই গুপ্ত বিষের প্রকোপ জন্মাইবে। কেন না, বিষ স্বয়ং কুপিত হইলে রোগী বাঁচে না। অতএব শাস্ত্রকার অতিরিক্ত মাত্রায় ধুতুরা সেবন করাইয়া, বিষ স্বয়ং কুপিত হইয়া বাহ্য করিত, ঔষধ দ্বারা তাহাই করাইতে বলিলেন। ঔষধ দষ্ট হইলে, সাধারণতঃ জল-ত্রাসের লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের উল্লিখিত রোগীর মত, লোকে কোন চিকিৎসাই করায় না—উপেক্ষা করে। পরে বিষ যখন স্বয়ং কুপিত হইয়া মূর্ছা ও জলত্যাগ জন্মাইয়া থাকে তখনই চিকিৎসা করান হয়। সুতরাং আধুনিক চিকিৎসকগণ জলত্রাসের ( হাইড্রোকোমিয়া ) যে অসাধ্য বলিয়া জানেন তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু তাঁহার যদি সুশ্রুতের উপদেশানুসারে বিষ-প্রকোপের লক্ষণ মূর্ছাদি প্রকাশ পাইবার পূর্বেই, বিষ-প্রকোপকারী উপরি লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না।

( জ্ঞানদী )

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ।

{ বঙ্গাব্দ ১৩২৩-কার্তিক। }

২য় সংখ্যা।

## শরচ্চর্যা।

বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যের বেরূপ অবনতি ঘটয়াছে, তাহাতে সকলেরই বাস্তবিক সঙ্কল্পে যত্নবান হওয়া কর্তব্য। স্বাস্থ্যরক্ষা সঙ্কল্পে এতদেশের উপযোগী যাবতীয় নিয়ম ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। পাঠকদিগের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন স্বয়ং এই সকল নিয়ম পালন করেন এবং আত্মীয়-স্বজনগণকে পালন করিতে উপদেশ দেন। তাহা হইলে আশা করি, আবার দেশের লোক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।

আমাদের দেশে প্রধানতঃ শীতোক-বর্ষণ লক্ষণাক্রান্ত তিনটি ঋতু বর্তমান দেখা যায়। এই তিনটি ঋতুর তিনটি অন্তর্বিভাগ করিয়া ছয়টি ঋতু করণা করা হইয়াছে। তন্মধ্যেও শীতের অন্তর্ভুক্ত হেমন্ত, গ্রীষ্মের অন্তর্গত বসন্ত এবং বর্ষার শরৎ। আয়ুর্বেদে বহন বিরেচনাদি শোধনকার্য্যের জন্য আর এক-প্রকার ঋতুবিভাগ কল্পিত হইয়াছে। উপরোক্ত হলে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে লগতে এবং আমাদের

দেহে একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। গ্রীষ্মের তীক্ষ্ণ রবিকরে পৃথিবী উত্তপ্ত ও বর্ষার জল-ধারায় সিক্ত এবং শীতে তুষারপাতে শীতল হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের উত্তাপে গলদ্বন্দ্ব হইয়া আমরা হস্ত বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখিতেও কষ্ট বোধ করি, কিন্তু শীতে, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া স্থূল উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করিয়াও সুখী হইতে পারি না। শীতে আমরা পায়সপিষ্টকাদি যথেষ্ট পরিমাণে আহার করিতে পারি, কিন্তু গ্রীষ্মে অতিরিক্ত শীতল জলপান বশতঃ দুর্বল অগ্নি, গুরুপাক খাদ্য জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। বিবিধ পুষ্ণাতরণ ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে, নিম্ন-কিসলয় আমাদের রুচিজনক হয়, কিন্তু অল্প ঋতুতে তাহা রসনার তাদৃশ তৃপ্তিকর হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর এইরূপ পার্থক্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে আমাদের আহার-বিহারও পৃথক হওয়া উচিত। আয়ুর্বেদে ঋতুভেদে আহার বিহার সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রাপ্য,

তাহা ঋতুচর্য্যা নামে কথিত। সম্প্রতি শরৎ কাল উপস্থিত। তজ্জন্ম এই প্রবন্ধে আমরা শরৎকালে কিরূপ আহার বিহার করা উচিত, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুই মাসে শীতাদি ছয়টি ঋতু ধরা হইয়াছে—যথা, মাঘ ও ফাল্গুন শীত বা শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু। সাধারণ ঋতু বিভাগের সহিত আয়ুর্বেদের এই ঋতু-বিভাগের পার্থক্য পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন প্রকার আহার-বিহার ক্রিতে হয় বটে, কিন্তু ভাদ্র মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত বর্ষা ঋতুর নিয়ম পালন করিয়া যদি আশ্বিন মাসের প্রথম তারিখ হইতে শরৎ ঋতুর নিয়ম পালন করা যায়, তাহা হইলে সহসা আহার-বিহারের নিয়ম পরিবর্তন জন্ম শরীর অসুস্থ হইতে পারে। সেই জন্ত এক ঋতুর নিয়ম ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া অল্প ঋতুর নিয়ম পালন করা উচিত, শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এক ঋতুর শেষ সপ্তাহ এবং পরবর্তী ঋতুর প্রথম সপ্তাহকে ঋতুসন্ধি বলে। এই ঋতু-সন্ধির সময় ক্রমশঃ এক ঋতুর নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া অল্প ঋতুর নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়।

ছয়টি ঋতুসন্ধির মধ্যে শরৎ ও হেমন্তের মধ্যবর্তী ঋতুসন্ধির একটু অপবাদ আছে। বর্ষা—

কার্তিকশ্রু দিনাশ্রুষ্ঠৌ অষ্টাবগ্রহায়ণশ্রু চ।

যমদংষ্ট্রা সমাখ্যাতা বহ্বাহারো ন জীবতি ॥

অর্থাৎ—কার্তিকের শেষ আটদিন এবং অগ্রহায়ণের প্রথম আট দিন—এই সময়টুকু

যমদংষ্ট্রা (যমের দাড়া) বলিয়া সমাখ্যাত। এ সময়ে যে ব্যক্তি বহুভোজন করে, সে দীর্ঘ-জীবী হয় না। “বহ্বাহারো ন জীবতি” স্থলে “দ্ব্যাহারস্ত জীবতি” পাঠও দেখা যায়। ইহার অর্থ—যে ব্যক্তি লঘু আহার করে, সেই দীর্ঘজীবী হয়।

শরচ্চর্য্যার বিষয় বলিবার পূর্বে এইস্থলে আর একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। ঋতুচর্য্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

উপশেতে যদোচিত্যাদোকসাত্ম্যং তদুচ্যতে।

দেশানামায়মানাকং বিপরীতভুগং ভুগৈঃ ॥

সাত্ম্যমিচ্ছন্তি সাত্ম্যজ্ঞাশ্চেষ্টিতং চাত্ম্যমেব চ।

অর্থাৎ—এমন দেখা যায় যে কোন নির্দিষ্ট আহার বিহার, অপথ্য হইলেও নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে পীড়াকর না হইয়া বরং সুখজনক হইয়া থাকে। এইরূপ আহার বিহারকে ওকসাত্ম্য বলে। যে ব্যক্তি যেরূপ নির্দিষ্ট আহার বিহার দ্বারা ভাল থাকে, তাহার পক্ষে ঋতুচর্য্যার নিয়ম পালন তাহার ওকসাত্ম্যের বিরুদ্ধ না হয় দেখিতে হইবে। উদাহরণ দিতেছি—শরৎকালে দধি সেবন নিষেধ, কিন্তু নিরন্তর দধি সেবন করিয়া দধি বাহার ওকসাত্ম্য হইয়াছে, তাহার পক্ষে শরৎকালেও দধি সেবন বিশেষ অহিতকর হইবে না। বিহার সম্বন্ধে তেমনি—দ্বিবাশ্রিতা বাহার ওকসাত্ম্য শরৎকালে দ্বিবাশ্রিতা নিষিদ্ধ হইলেও তাহার পক্ষে উহা পীড়াকর হইবে না। রোগ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে—বদিকাহার শরীরে অত্যন্ত বাতুর প্রকোপ থাকে, শরচ্চর্য্যার কথিত শীতল ও তিক্ত দ্রব্য সেবন করিলে সেই বায়ু আরও কুপিত হইতে পারে। সেইজন্য ঋতুসাত্ম্য হইলেও শীতল ও তিক্ত



দ্রব্য তাহার পক্ষে সাত্ব্য ( হিতকর ) নহে ।  
অতঃপর ঐ ঋতুচর্য্যার নিয়ম পালন না  
করিয়া এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া  
ঋতুচর্য্যার নিয়ম পালন করিতে হইবে ।

ঋতুভেদে অন্নমধুরাদি রস সেবনের  
উপদেশ আছে । তথাপি শাস্ত্রকার  
লিখিয়াছেন:—

• নিত্যং সর্ব্বদেহাভ্যাসঃ স্বাধিক্যমুত্তরতঃ ।

অর্থাৎ ;—নিত্য সর্ব্ব প্রকার রস ( মধুর,  
অন্ন, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায় ) সেবন করা  
উচিত । তবে যে ঋতুতে যে রস সেবন করি-  
বার উপদেশ আছে, সেই ঋতুতে সেই রস  
বহল পরিমাণে সেবন করা কর্তব্য । অন্তরস  
অন্ন পরিমাণে সেবন করা উচিত ।

শরৎকালের লক্ষণ ।

বক্র কক্ষঃ শরৎকর্কঃ শ্বেতাভ্র-বিমলং নভঃ ।

তথা সরাস্তরুর্কঠৈর্ভাস্তি হংসাসঘট্টিতৈঃ ॥

পঙ্কতকক্ষমাকীর্ণ নিয়োগতসমেধু ভূঃ ।

• বাণগণ্ডালবন্ধক-কাশাপন-বিরাজিতা ॥

অর্থ—শরৎকালে মেঘযুক্ত স্বর্ঘ্য কপিল-  
পিন্মলবর্ণ ও উজ্জ্বল হয় । আকাশ নির্মল  
ও শ্বেতবর্ণ মেঘব্যাপ্ত হয়, সরোবরে পদ্ম  
প্রফুল্লিত হইয়া শোভা বিস্তার করে, হংস  
সকল সরোবর-জলে আনন্দে সন্মগ্ন করে,  
নিম্নভূমি কর্দমযুক্ত, উচ্চভূমি শুষ্ক, ও সমভূমি  
বৃক্ষ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া থাকে এবং ঝিটী,  
ছাতিম, বাধুলি কেশে ও শালবৃক্ষ পুষ্পিত  
হয় ।

প্রথমে বলা হইয়াছে, যে, আশ্বিন ও  
কার্ত্তিক মাস শরৎকাল । তবে শরৎ ঋতুর  
লক্ষণ লিখিবার সার্বকতা কি ? সার্বকতা  
অবশ্যই আছে । যে ঋতু বৈশিষ্ট্য লক্ষণাবিত  
হয়, সেই সমস্ত লক্ষণ সেই ঋতুতে বর্ণাবধানে

প্রকাশ পাইলেই তাহাকে অব্যাপন্ন (অবিকৃত)  
ঋতু বলা যায় । আর সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ  
না পাইলে তাহাকে ব্যাপন্ন ( বিকৃত ) ঋতু  
বলা যায় । ব্যাপন্ন ও অব্যাপন্ন ঋতুর বিষয়  
পরে লিখিত হইবে । এক্ষণে শরচ্চর্য্যার বিষয়  
বলা যাইতেছে ।

ঋতুভেদে দোষের সঞ্চয়, প্রকাশ ও  
প্রশম হয় । বর্ষাকালের কুপিত বায়ু, শরৎ-  
কালে প্রশমিত হইয়া থাকে, আর বর্ষাকালের  
সঞ্চিত পিত্ত, শরৎকালীন স্বর্ঘ্যাস্ত্রাপ হেতু  
কুপিত হয় । এইজন্য শরৎকালে মধুর, লবু,  
শীতল, কষায় এবং তিক্ত অন্ন পান-যাহা  
পিত্তনাশক তাহাই সেবন করা উচিত । তিক্ত  
দ্রব্যের মধ্যে এই সময়ে পলতা, উচ্ছে ও  
হিফে শাক পাওয়া যায় । ঐ সমস্ত তিক্তই  
শরৎকালে যথেষ্ট সেবন করা কর্তব্য । শিউলী-  
পাতা, পলতার জার ভাজিয়া বা দালের সহিত  
খাওয়ার রীতি স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে ।  
উহা শরৎকালে বিশেষ হিতকর সন্দেহ নাই ।  
যে দেশে এই প্রথা প্রচলিত নাই, সে দেশের  
অধিবাসিগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ।  
শরৎকালে লবু দ্রব্য লবু মাজার ( পেট  
ভরিয়া নহে ) সেবন করা উচিত । শালিতণ্ডু-  
লের অন্ন ( পুরাণ বৈমন্তিক ধাত্তের তণ্ডুল )  
এবং ঘব ও গোমুদ্রক লবুগাখ খাত্ত প্রশস্ত ।  
দালের মধ্যে মুগের দালই শ্রেষ্ঠ । ছোলা,  
মহুর মটর ও অড়হরের ঘুও ব্যবহার কর  
বাইতে পারে । কিন্তু ঐ সকল দাল, ঘুও  
ও বহু মসলা সংযুক্ত করিয়া আহার কর  
উচিত নহে । কারণ তাহাতে গুরুপাক  
হইয়া থাকে । পটোল, বেগুন, ডুহুর, ঘোটা,  
খোড়, চিচিলে ( ঘোপা ), ঘোঁসী কুমড়া প্রভৃতি  
তরকারী অন্ন মাজার সেবন করা উচিত ।

আলু, বিলাতী কুমড়া প্রভৃতি তরকারী ব্যবহার না করা, বা খুব অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা কর্তব্য। মংস্ত্র, অল্প জলজ প্রাণীর মাংস (কচ্ছপ, কঁকড়া, বিছুক প্রভৃতি), নানা প্রকার হংস, বক প্রভৃতি জলচর-প্রাণীর মাংস এবং মহিষ শূকরাদি আনুপ (জলাশয়সমীপ-চর প্রাণীর মাংস) প্রশস্ত নহে। বটের, চাতক প্রভৃতি পক্ষীর মাংস, হরিণের মাংস, মেঘ মাংস এবং শশকের মাংস, লঘুপাক করিয়া আহার করা উচিত। ইক্ষু, গুড়, চিনি, মিছরী দ্রব্য প্রভৃতি সুপথ্য। কাঁচা রুত সেবন করা প্রশস্ত নহে।

বেদানা, আপেল, মিষ্ট নাসপাতি, পেঁপে, মিষ্ট বাতাবী লেবু, আতা, খেজুর, কিসমিস, মনাকা, আঙ্গুর, আমলকী প্রভৃতি ফল শরৎকালে সুপথ্য।

বসা (চর্কি) তৈল, পূর্কোক্ত নিষিদ্ধ মাংস, দধি, ক্ষীর দ্রব্য এবং তীক্ষ্ণ মস্ত্র শরৎকালে সেবন করিবে না। শরতের রোদ্র এবং হিম অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিবে। এই ঋতুতে দিবা নিদ্রা সেবন করিবে না। শরতে পূর্ব-বায়ু বর্জ্জনীয়।

শরৎকালে িরেচন বিশেষ হিতকর। এই সময়ে সুস্থ শরীরে, সপ্তাহে বা পক্ষে একদিন

করিয়া জোলাপ লইলে, বহু রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং শরীর সুস্থ থাকে।

শরৎ কালে জল, দিবাতাগে মেঘযুক্ত-তীক্ষ্ণ সূর্য্যকিরণ দ্বারা সমস্ত ও রাত্রিকালে চন্দ্রকিরণে সৌম-গুণাধিত হয়, অপ্টিচ অগন্তোর উদয় হেতু উহার বিষদোষ নষ্ট হয়। সেই জন্ত শরৎ কালের জল নির্মল, পুষ্টি, এবং স্নান, পান ও অবগাহনে অমৃতের স্যায় হিতকর। ইহা রুক্ষ বা অভিজ্ঞানি নহে।

শরৎকালে শারদীয় পুষ্পের মাল্য ধারণ, নির্মল বস্ত্রপরিধান এবং সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকিরণ সেবন করা হিতকর। কিন্তু হিমের জন্ত অধিক্ত বাহিরে থাকা উচিত নহে। এই ঋতুতে তিন দিন অন্তর স্নান করিবার উপদেশ আছে।

শরৎকালে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হয়। পিত্ত প্রধান থাকে এবং কফ তাহার অনুবল হয়। কফ ও পিত্ত দ্রব্য ধাতু বলিয়া উক্তজ্বরে যথেষ্ট লক্ষণ সন্ধ্য হয়। সেই জন্ত সাধারণতঃ শরৎ কালের জ্বরে লক্ষণ দেওয়া উচিত। তবে প্রধানতঃ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর হইলেও, অল্প জ্বর যে একেবারে হয় না, তাহা নহে। অল্প জ্বর হইলে, অবস্থা বিবেচনায় লক্ষণ প্রযোজ্য।

## অফাঙ্গ আয়ুর্বেদ ।

আয়ুর্বেদ শব্দটা সকলের প্রতিগোচর হইয়া থাকিলেও, আয়ুর্বেদে কি আছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। সেই জন্য আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আয়ুর্বেদ শব্দের অর্থের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই দেখা উচিত যে, আয়ুর্বেদ শব্দে কি বুঝায়।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

আয়ুর্বিজ্ঞানং ব্যাধিনির্দানং শমনং তথা।

বিজ্ঞতে যত্র বিজ্ঞাতিঃ স আয়ুর্বেদ উচ্যতে ॥

অর্থাৎ বাহ্যতে কিসে আয়ুর হিত হয় এবং কিসে অহিত হয়, লিখিত আছে, বাহ্যতে রোগ জন্মবার কারণ ও তাহার প্রশমনের উপায় কথিত আছে, তাহাকেই বিঘবর্গ আয়ুর্বেদ বলিয়া থাকেন। সুশ্রুতে লিখিত আছে;

ইহ ধন্যায়ুর্বেদ-প্রয়োজনং ব্যাধ্যুপশ-  
টানং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বস্থস্ত রক্ষণঞ্চ।  
আয়ুর্ভাঙ্গান্ বিজ্ঞতে হনেন বা আয়ুর্কিন্দতীত্যা-  
য়ুর্বেদঃ ।

অর্থাৎ ব্যাধিত ব্যক্তিকে ব্যাধিমুক্ত করা এবং সুস্থ ব্যক্তিকে রক্ষা করাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বাহ্যতে আয়ু আছে, যবারা, আয়ুর বিষয় জানা যায়, বন্ধারা আয়ুর বিচার করা যায় অথবা বন্ধারা আয়ু লাভ করা যায়, তাহাকে আয়ুর্বেদ বলে।

সুশ্রুত-সংহিতায় লিখিত আছে—

ভগবন্! “শারীরস্থানসাগন্তাভাবিতৈক

ব্যাধিভিক্সিবিধবেদনাতিবাতো- পক্ষতান্  
সনাথানপ্যানাধবচ্চিচেষ্টমানান্ বিক্রোশতশ  
মানবানভিসমীক্য মনসি মঃ পীড়া ভবতি।

তেষাং স্থৈৰ্য্যবিধাং রোগোপশমনার্থমায়ুর্ভাঙ্গান্  
প্রাণযাত্রার্থঞ্চ প্রজাহিতহেতোরায়ুর্বেদং  
শ্রোতুমিচ্ছামি ইহোপদিষ্টমানস্। অত্রায়ত্ত-  
মৈহিকমায়ুর্ভাঙ্গশ্রেয়ঃ।”

ঔপধেনব প্রমুখ ঋষিগণ ধবস্তরিকে কহিলেন, হে ভগবন্! শারীরিক, মানসিক আগন্ত ও স্বাভাবিক ব্যাধি দ্বারা পীড়িত, বিবিধবেদনায় নিতান্ত কাতর, সনাথ হইলেও অনাথের ত্রায় বিপরীত ক্রিয়াকারী, কল্প-  
কন্দন-পরায়ণ মানবদিগকে দেখিয়া আমাদের  
অত্যন্ত মনঃপীড়া হইয়াছে। তাহাদের  
সুখের জন্য, রোগ নিবারণের জন্য, স্বীয়  
জীবন-যাত্রা সুখে নির্বাহের জন্য এবং প্রাণ-  
গণের হিতের জন্য, আমরা আয়ুর্বেদ শিক্ষা  
করিতে ইচ্ছা করি, যে সম্বন্ধে আমা-  
দিগকে উপদেশ প্রদান করুন। ইহলোক  
এবং পরলোকের শ্রেয়ঃ আয়ুর্বেদেরই  
আয়ত্ত।

এইখানে আমরা অত্র জাতির চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্বলনায় আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাই। রোগের নিদান ও প্রশমনোপায় এবং সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির বিষয় সকল জাতির চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু আয়ুর্বেদে ঐ সকলত আছেই, তদ্ব্যতীত ইহ ও পরলোকে শ্রেয়স্তর বাবতীর নীতি অর্থাৎ ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি সমস্ত নীতিই আয়ুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। একু কথায় বলিতে গেলে আয়ুর্বেদ সর্বশাস্ত্রময়।

সহজেই মনে হইতে পারে যে, আয়ু-  
বিজ্ঞান ( অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘ জীবন

লাভ সম্বন্ধে উপদেশ এবং রোগের কারণ নির্দেশ ও প্রশমনোপায়) যখন আয়ুর্বেদের আলোচ্য বিষয়, তখন অজ্ঞাত নীতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আয়ুর্বেদ কি অনধিকার চর্চা করেন নাই। এবিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু স্বাধীন ভাবে আলোচনা করা আবশ্যিক।

চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি? কিত ধাতু হইতে চিকিৎসা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কিত ধাতুর অর্থ রোগাপনয়ন। সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্যাধিতকে রোগমুক্ত করাই চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাহাই যদি হইল, তবে সুস্থবাস্তুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার এবং দীর্ঘ জীবন লাভের উপদেশ কেন? সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মানবগণ বাহ্যতে ব্যাধিমুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, তাহাই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সরল ভাষায় বলিতে গেলে, মানব জীবনের দুঃখ নিবৃত্তি এবং সুখ-সাঁধনই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, সুখের জন্ত মানবের কোন্ কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন। কেবল অব্যাহত স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন পাইলেই মনুষ্য সুখী হইতে পারে না। মানবের সুখ-দুঃখের সহিত ধর্ম, অর্থ, লোকাচার সকলেরই বিশেষ সম্বন্ধ। আর সেই জন্তই আয়ুর্বেদে ঐ সকল ব্যাপার সম্বন্ধীয় নীতি কথিত হইয়াছে। বিভিন্ন নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু উপদেশ আয়ুর্বেদকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। বাহ্যল্য ভয়ে দিগ্‌দর্শন স্বরূপ আমরা দুই একটা মাত্র প্রক্ষিপ্ত উদ্ধৃত করিব।

ধর্মনীতি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে :—

সুখার্থাঃ সর্বভূতানাং যতাঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।  
সুখং চ ন বিনা ধর্মাৎ তস্মাদ্ধর্মপরো ভবেৎ॥  
অর্থাৎ সুখের জন্তই সকলের চেষ্টা।  
কিন্তু ধর্ম ব্যতীত সুখলাভ হয় না। সুতরাং ধর্মপর হইবে।

তারপর অর্থ নীতি। ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের দিকেই আধ্যাত্মীয় অধিকতর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ইহজীবনের অতি প্রয়োজনীয় যে অর্থ—তাহার উপযুক্ত সমাদর করিতে আয়ুর্বেদকার বিমুখ হয়েন নাই। পরলোকত আছেই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহলোকটা কি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সে বুদ্ধি ত প্রশংসনীয় নহে। কারণ—“যা লোকদ্বন্দ্বসাধনী চতুরতা সা চাতুরী চাতুরী।”

অর্থাৎ যাহা ইহলোক এবং পরলোক—উভয় লোকেই প্রয়োজনীয় করাইতে পারে, সেই চতুরতাই চতুরতা।

সেইজন্ত ইহ জীবনের প্রত্যক্ষ-দেবতা অর্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

তিব্র এষণাঃ পর্যোষ্টব্য ভবন্তি। তদ্ যথা প্রাণৈষ্যদ্যদৈনয়ণা পরলোকৈকধংগতি।

অর্থাৎ মানুষের চেষ্টা তিন প্রকার। প্রথমেই প্রাণরক্ষার চেষ্টা। কেননা প্রাণ না থাকিলে ধন লইয়া কি করিবে। তারপর প্রাণ বাঁচাইয়া ধনলাভের চেষ্টা করিবে। কেননা ধন ব্যতীত ইহ লোকে প্রয়োজনীয় করিতে পারা যায় না, পরলোকেও কতকটা বটে। তারপর পরলোকোপকারক ধর্ম-জ্ঞানের চেষ্টা।

কুপমণ্ডুক জলের বিলুপ্তি কেবল কুপেই সীমাবদ্ধ দেখে। দুঃখের সহিত বলিতে

হইতেছে, যে অনেক আধুনিক তথাকথিত উন্নত, জাতির জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান, কৃপণতার তায় ইহলোকেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আয়ুর্বেদ জানেন যে, জীবন অনন্ত—ইহলোকের কয়েক দিন, জীবনের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। পরলোক লইয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অনেক বিচার আছে। কিন্তু প্রথমতঃ, তাহা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ভূত নহে এবং দ্বিতীকৃতঃ, উহা দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অত্যন্ত দুর্বোধ্য।

ইন্দ্রিয় লইয়া মানুষকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল অথ সদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিকে লইয়া কিরূপে চলা যায়, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। এই দুর্বৃত্ত অশুভলিট অনেক সময় মানবের অধঃপতনের মূল স্বরূপ হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে আয়ুর্বেদ বলেন ন পীড়য়েদ্বিঃস্রিয়ানি ন চৈত্যততি-লালয়েৎ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে পীড়িত করিবে না কিম্বা অতিরিক্ত লালিতও করিবে না। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের এই উপদেশ ইহ এবং পর—উভয় লোকের পক্ষেই শ্রেয়ঙ্কর। ইহলোকের পক্ষে উহা শ্রেয়ঙ্কর বলিয়া স্বীকার করিলেও, পরলোকের পক্ষে উহা শ্রেয়ঙ্কর কি না, সে সম্বন্ধে অনেকের সংশয় হইতে পারে। সেই সংশয় নিরাসার্থ ঠিক অরূপ না হইলেও এক উদ্দেশ্যবাক্য দুইটি প্রৌঢ় সর্বধর্মশাস্ত্রণার গীতা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

নাত্যমতস্তত্ত্বাণোহন্তি ন চৈকান্তমনস্ততঃ।

ন চান্তিস্বপ্নগীলস্ত জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥

যুক্তাহার বিহারস্ত যুক্তচেতস্ত কৰ্ম্মহ।

যুক্তস্বপ্নাবোধস্ত যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

অর্থাৎ—হে অর্জুন! যে ব্যক্তি অত্য-

ধিক আহার করে বা একেবারে আহার করে না, যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিদ্রা যায় অথবা একবারে নিদ্রা সেবন করে না, তাহার সমাধি হয় না। যিনি পরিমিতরূপ আহার বিহার করেন, কর্ম্ম সকলে পরিমিতরূপে চেষ্টা করেন যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রা সেবন করেন, এবং জাগরিত থাকেন, তাহার যোগ দুঃখনিবারক হইয়া থাকে।

সদাচার বিধি সম্বন্ধে উপদেশদিবার পর লিখিত হইয়াছে—

ইত্যাচারঃ সমাসেন যৎ প্রাপ্নোতি সমাচরন্।

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং যশো লোকান্চ শাস্তান্।

এই সকল আচার পালন করিলে দীর্ঘ আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য, যশ এবং নিত্য-লোক লাভ করা যায়। উপদেশগুলি ঘেঁরুপ সুন্দর, তাহাতে ইহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

সংসারে থাকিতে হইলে নানা প্রকৃতির নানা লোকের সহিত সংসর্গ ঘটে। এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির লোকগুলিকে সমুদ্র রাধিবার উপায় কি? সে সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ বলেন—

জনস্তাশয়মালক্ষ্য যো বথা পরিতুষ্টি।

তং তথৈবানুবর্তেত পরায়ামন-পশ্চিভঃ ॥

লোকের প্রকৃতি দেখিয়া যে যাহাতে সমুদ্র হয় তাহাকে সেইরূপ আচরণ দ্বারা সমুদ্র করিবে।

নাথীরো নাত্যচ্ছিত্তমথঃ স্তাৎ। নাত্ত-  
তুতোয়া বিবিস্রাজ্ঞানো নৈকঃ সুখী। ন-  
দুঃখগীলাচারোপকারো ন সর্ববিশ্রুতী ন  
সর্বাতিশকী। ন সর্বকাল-বিচারী। ন  
কার্যকালমতিপাতয়েৎ। নাপরীক্ষিতমতি-  
নিবিশেৎ। নৈজিরবশমঃ স্তাৎ।

অধীর কিসা উদ্ধত স্বভাব হইবে না।  
ভয়নীয় ব্যক্তিগণের ভয়ংগোষণ করিবে।  
আত্মীয়গণকে অবিখ্যাস করিবে না। একাকী  
সুখভোগ করিবে না। দুঃখপ্রদ চরিত্র বা  
আহার ব্যবহার পরায়ণ হইবে না। সকলকে  
অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না, বা সকলের প্রতি  
অত্যন্ত সন্দেহান হইবে না। দীর্ঘকাল  
ব্যাপিয়া বিচার করিয়া কার্য্যকাল নষ্ট  
করিবে না। অপরীক্ষিত বিষয়ে অতিনিবেশ  
করিবে না, ইঞ্জিরের বশতাপন্ন হইবে না।  
'সম্পদ্বিপদধ্বংসনা হেতাবীর্য্যে ফলে নতু।'

সম্পদ-বিপদে সমচিত হইবে। হেতুতে  
ঈর্ষা করিবে, কিন্তু ফলে ঈর্ষা করিবে না।  
অর্থাৎ অমুক বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট ধন ও  
বশঃ উপার্জন করিয়াছে, সুতরাং আমিও  
বিজ্ঞা শিক্ষা করিব—এইরূপ ভাবিবে। কিন্তু  
উহার এত ধন ও বশঃ কেন হইল, এরূপ  
ঈর্ষা করিবে না।

আয়ুর্বেদে এতই উদার যে, বিজ্ঞাকে নিজের  
মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব মনে করেন নাই।  
তাই সশাচার বিধির শেষে বলা হইয়াছে।  
যচ্চাত্তদপি কিকিং স্তাদমুক্তমিহ পুঞ্জিতম্।  
বৃত্তং তদপি চাত্রেয়ঃ সদৈবাত্মানুসৃততে ॥

অর্থাৎ—অন্ততঃ যে উত্তম সদাচার  
দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা এখানে উল্লি-  
খিত হয় নাই, তাহাও পালন করা আত্রেয়  
ঋষির অনুমোদিত।

বাহ্য ভয়ে আয়ুর্বেদান্তর্গত অস্ত্রা-  
শাস্ত্রের কথা না বলিয়া এক্ষণে আমরা চিকি-  
ৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে  
বলিতে হইতেছে যে—“বদ্বিহাস্তি তদন্ত্রা  
যন্তেহাস্তি ন তৎ কচিং” আয়ুর্বেদের এই  
গর্ভোক্তি সম্পূর্ণ সত্য। আয়ুর্বেদে নাই কি ?

আজ ঐ যে সুদূর যুরোপে বলদর্পিত মদোদ্ধত  
পাশ্চাত্যজাতিগণ ক্রুরভাবে পরস্পরকে আক্র-  
মণ করিয়া হতাহত করিতেছে, ঐ যে জলস্থল  
ব্যোমচারী নরহত্যার নিমিত্ত অসংখ্য রণ-  
সম্ভার সৃষ্টিসংহার করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে,  
ঐ যে বিবিধ নরঘাতন বস্ত্র ভীষণ গর্জন  
করিয়া পলকে পলকে সহস্র সহস্র নরের  
বিনাশসাধন করিতেছে, সে বিষয়ও আয়ু-  
র্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। যে যুদ্ধ পৃথিবীর  
চতুঃস্থিত সমুদ্রকে শব্দিত করিয়া তুলিয়াছে,  
যে যুদ্ধ কোটি কোটি মনুষ্যের অন্নভাবের  
কারণ স্বরূপ, যে যুদ্ধ পৃথিবীকে নরকে পরি-  
ণত করিয়াছে, সে যুদ্ধের বিষয়ও আয়ুর্বেদে  
উল্লিখিত হইয়াছে। যে যুদ্ধে আমাদের পরম  
কারুণিক মহাট, হুর্দলের রক্তের লগ্ন অনিচ্ছা-  
স্বৰ্গে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে যুদ্ধে  
বহুজাতি অজস্র বক্ষঃশোণিতপাত করিয়া  
পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে, যে  
যুদ্ধে নগরের পর নগর, দেশের পর দেশ,  
অশানে পরিণত হইতেছে, সে যুদ্ধ সম্বন্ধে  
ভবিষ্যদ্বাণী আয়ুর্বেদে দৃষ্ট হয়।

চরকে লিখিত হইয়াছে :—

“তথা শত্রুপ্রভবস্তাপি জনপদোদ্ধঃসস্তাধর্গ  
এব হেতুর্ভবতি। তে অতিগ্রন্থক রোষ-লোভ-  
ক্ৰোধমানাঃ হুর্দলানবমত্যাক্ষবলনপরোপ-  
যাতায় শস্ত্রেণ পরস্পরমভিক্রামন্তি, পরান্  
বাতিক্রামন্তি পটৈর্বাভিক্রাম্যন্তে রক্তগণা-  
ভিক্রী বিবিধৈর্ভূতসম্ভেদযন্ত্রমর্দনযাযাপ্য-  
চারাশ্রয়মুপলভ্যাত্তিহন্যন্তে।”

শত্রুপ্রভাব জনপদধ্বংসের ও কারণ অধর্ম।  
যাহাদের লোভ, ক্রোধ ও অভিমান অত্যন্ত  
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহারা হুর্দল ব্যক্তিবিশেষ  
অবমান করিয়া, আত্মীয়বন্ধন ও পৈতৃক উপ-  
যাতের জন্য পরস্পর শত্রু হারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়,  
অথবা অপর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। (ক্রমশঃ)

## আয়ুর্বেদে পরিপাক ক্রিয়া ।

পরিপাক ক্রিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে একটা প্রধান প্রতিপত্ত বিবয়। মানব দেহের ভ্রাস বৃদ্ধি—এমন কি উৎপত্তি-স্থিতি-লয় পর্যন্ত সমস্তই এই পরিপাক ক্রিয়ার অধীন। যদিও মানবদেহের উৎপত্তি, শুক্র-শোণিতের সংযোগেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি দেখা যায় যে, সেই শুক্র-শোণিতও পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যেই উৎপন্ন হইয়া এই দেহের সৃষ্টি করে। সুতরাং এই পরিপাক ক্রিয়া কি এবং কি ভাবেই বা এই দেহে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা বিশেষভাবে জানা আবশ্যিক। মানবদেহে প্রতিনিয়ত ক্ষয়-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষয় হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য ও শারীরিক পুষ্টি বিধানের জন্যই আহারের আবশ্যিক। যে ক্রিয়া দ্বারা ভুক্তদ্রব্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া রস-রক্তাদিরূপে পরিণত হয়, তাহাই পরিপাক ক্রিয়া। এই পরিপাক ক্রিয়া সর্বদেহব্যাপী, কারণ সর্বদেহেই এই পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। তথাপি প্রথমতঃ ও প্রধানরূপে আমাশয়েই এই কার্য সম্পন্ন হয় বলিয়া, আমাশয়ের ক্রিয়াকেই চিকিৎসা শাস্ত্রে পরিপাক ক্রিয়া বলা হইয়াছে। মানবদেহে যেমন ভূতময়, অর্থাৎ ক্রিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ এবং বোম এই পঞ্চ মহাভূতের পরমাণু দ্বারা নিৰ্ম্মিত, আহাৰ্য্য দ্রব্যও তজ্জপ। সুতরাং আহাৰ্য্য দ্রব্য, রস-রক্তাদিরূপে পরিণত হইয়া, নদান জাতীয় অংশ দ্বারা, রস-রক্তাদি দ্বাৰা সমূহের পুষ্টি বিধান করিতে পারে। আহাৰ্য্য দ্রব্যসকল পরমাণু ও প্রকৃতিভেদে অসংখ্য প্রকার এবং রসভেদে ঐ সমস্ত দ্রব্য ষড়বিধ।

কিন্তু ভক্ষণ ক্রিয়া ভেদে উহারা চতুর্বিধ—চৰ্কী, চূষা, লেহা এবং পেয়। মানবগণ মুখ দ্বারা আহাৰ্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে। শারীরিক পুষ্টি বিধানের জন্য বাতাতপাদি বায়ু দ্রব্য, ত্বক দ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শারীরিক পুষ্টি বিধান করিলেও তাহা আহার সংজ্ঞার অভিহিত হয় না। সুতরাং আহাৰ্য্য দ্রব্য চারি শ্রেণীর অতিরিক্ত নহে। যে সকল দ্রব্য মুখ-কুহরে পতিত হইলে দন্ত সাহায্যে চৰ্কিত হইয়া অধঃকৃত হয়, তাহারা চৰ্কী, যে সকল দ্রব্য জিহ্বা, কপোল ও ওষ্ঠ সাহায্যে আকর্ষণ করিয়া অধঃকৃত করা হয় তাহাদিগকে চূষা এবং যে সকল দ্রব্য জিহ্বা দ্বারা লেহণ করিয়া তালু, কপোল প্রভৃতির সাহায্যে অধঃকৃত করা হয়, তাহাদিগকে লেহা ও যে সকল দ্রব্য মুখে পতিত হইবা-মাত্র অধঃকৃত করা হয়, তাহাদিগকে পেয় বলে। এই চারিটা উপায় ভিন্ন মানবগণ অন্য কোন উপায়ে আহার গ্রহণ করে না। সুতরাং এই চারি প্রকার উপায় বা ক্রিয়া ভেদেই আহাৰ্য্য দ্রব্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

**মুখ্যগহ্বর**—ইহা ভুক্ত দ্রব্য মুখে ক্রিয়াকাল স্থাপন করিবার নিমিত্ত একটা বিবয় বিশেষ। ইহা বদন মণ্ডলের বক্রতাবস্থি ও হৃদাঙ্ক দ্বারা একটা পুটকের দ্বারা নিৰ্ম্মিত। ইহার অভ্যন্তরে একটা বড় জিহ্বা আছে, তাহার নাম গোজিহ্বা। গোশব্দের অর্থ রস, মধুরাদি রস আনিবার পক্ষে ইহাই এক মাত্র উপায় বলিয়া ইহার চরকোক্ত নাম গোজিহ্বা বা রসনেত্রিয় বলা হয়। এই জিহ্বার মূলভাগে আরও একটা ক্ষুদ্র জিহ্বা আছে

এবং ইহার উর্দ্ধদেশে তালু প্রাপ্তে অসুভাৱিত  
একটি মাংসখণ্ড দৃষ্ট হয়, এই উভয়কেই  
উপজিহ্বিকা বলে। এতদ্ভিন্ন মুখ গহ্বরের  
সমুখভাগে উর্দ্ধদেশে ও নিম্নদেশে দুই পুংক্তি  
দৃষ্ট আছে। চৰ্ভগোপযোগী দ্রব্য, মুখে প্রক্ষিপ্ত  
হইবামাত্র জিহ্বা সঙ্কুচিত, প্রসারিত ও  
সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং দন্ত পংক্তিদ্বয় চৰ্ভগ  
করিতে থাকে। এই সময় জিহ্বা, কপোল  
এবং দন্তমূল হইতে চুম্বাইয়া অজস্র রস নির্গত  
হইতে থাকে। এই রসের সহিত মিশ্রিত  
হইয়া, ভুক্তদ্রব্য কোমলতা এবং পিচ্ছিলতা  
প্রাপ্ত হয়, এবং তখনই উহা অধঃকরণোপ-  
যোগী হয়। বত্ৰক্ষণ উক্ত অবস্থাপন্ন না হইবে  
ততক্ষণ জিহ্বা ভুক্তদ্রব্যকে মুখবিবরে ধরিয়া  
রাখে। এইরূপে আহাৰ্য্য দ্রব্যসকল অধঃ-  
করণোপযোগী হইয়া জিহ্বা সাহায্যে কঠো-  
পরি নীত হয়। পূৰ্বোক্ত জিহ্বা, কপোল ও  
দন্ত নিঃসৃত রস, কেবল ভুক্তদ্রব্যের কোম-  
লতা সাধন করে— তাহা নহে, উহা পরিপাক  
ক্রিয়ারও বিশেষ সাহায্য করে। এই রস-নিঃস-  
রণ ক্রিয়া স্বাভাবিক। কারণ কোন দ্রব্য মুখে  
প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্রই এই রস প্রচুর পরিমাণে  
নির্গত হয়, ইচ্ছা করিয়া ইহার নিঃসরণ বন্ধ  
করা যায় না। উপবাস করিলে এই রসের  
পরিমাণ কমিয়া যায়। আবার অপ্রিয় দ্রব্য  
কিবা ক্রুত অথবা ভীত হইয়া আহার করিলেও  
অল্প পরিমাণে ইহার স্রাব হয়। কিন্তু শীতল,  
পিচ্ছিল, মধুর, অন্ন ও লবণ রসদ্রব্য সেবনে  
ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা কি পরিমাণ  
নির্গত হইতে পারে তাহা বলা যায় না। কিন্তু  
দেখা যায় যে, যে পরিমাণ দ্রব্যই মুখে ক্ষিপ্ত  
হউক না কেন এই রস সমস্তই সিক্ত করিবে।  
প্রথমদ্বয়ের ইহা স্বচ্ছ জলের ত্যায় এবং

ক্ষণকাল পরে ইহা কিঞ্চিৎ ঘন হইতে দেখা  
যায়। লোভনীর কোন দ্রব্য অথবা অন্নদ্রব্য  
দর্শন করিলেও এই রস আপনা আপনি  
নির্গত হইয়া থাকে। ভুক্তদ্রব্য মুখে না  
থাকিলে এই রস অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া  
মুখকে রসাল রাখে মাত্র। এই রসের নাম  
লালা। ইহা মধুররস, শীতল, পিচ্ছিল, শ্বেত-  
বর্ণ, স্বচ্ছ এবং অতিশয় পাতলা। ইহা শৌণ-  
্ডের শ্বেতাংশ হইতে উৎপন্ন মলভাগ দ্বারা পুষ্টি-  
লাভ করে। কণ্ঠপ্রদেশ, জিহ্বামূল, কণ্ঠমূল  
প্রভৃতি ইহার প্রধান স্থান। ঐ সকল স্থানের  
বিবিধ গ্রন্থি হইতে লাল নির্গত হইয়া মুখ গহ্বরে  
পতিত হয়। ইহা সৌম্য বাত বা শ্লেষ্মা। ইহার  
শ্লেষ্ম জাতীয় হইলেও ইহাদের স্বরূপ, গুণ ও  
কর্ম একরূপ নহে। অধিষ্ঠান ভেদে ইহার  
বিভিন্ন গুণ ও প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে।  
যেমন কণ্ঠগত গ্রন্থির স্রাব ঘন এবং কণ্ঠমূল-  
গত গ্রন্থির স্রাব তিক মেরূপ নহে। উহা  
তদুত্তর এবং অল্প পিচ্ছিল। পরিপাক কার্যে  
ইহার মিলিত হইয়াই কার্য্য করে। স্নাতরাং  
ইহাদের আর পৃথক আলোচনা নিশ্চয়োজন।  
পূৰ্বোক্তরূপে চর্চিত দ্রব্য এই লালার সহিত  
মিশ্রিত হইয়া পিচ্ছিল এবং কোমলতা প্রাপ্ত  
হইলে, জিহ্বা আহাৰ্য্য দ্রব্যকে কণ্ঠনাড়ীর  
উপরিভাগে জিহ্বামূলে স্থাপন করে। কণ্ঠ  
দেশের উপরিভাগ একটি মহাবিপজ্জনক  
স্থান। ইহার উক্ত দেশে নাসারস্ক এবং সমুখ-  
ভাগে শ্বাসনাড়ী। ভুক্ত দ্রব্যকে এই দুইটি  
মার্গ অতিক্রম করিয়া কণ্ঠনাড়ীতে উপস্থিত  
হইতে হইবে। কিন্তু ভগবানের এমনই  
কৌশল যে এই স্থানে ভুক্তদ্রব্য আসিবার  
যখনই জিহ্বা, কপোল এবং তালু একত্রিত  
হইয়া উহা কণ্ঠদেশে প্রেরণ করে তিক বোধ



মূহুর্তে কণ্ঠগত মাংসপেশী উপজিহ্বিকার সহিত কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া খাসনাড়ীর উপর পতিত হয় এবং সেই মূহুর্তেই উর্দ্ধভাগেও কোমল তালুর সহিত উর্দ্ধস্থিত উপজিহ্বিকা নাসারন্ধ্রের উপরে পতিত হয়। এবং ভুক্ত-দ্রব্য নিরাপদে কণ্ঠনাড়ীতে গড়াইয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর ক্রমে অন্তরহা-নাড়ী দ্বারা আমাশয়ে প্রবেশ করে। জিহ্বা-মূল, তালু ও কণ্ঠপেশীর সংকোচনকালে প্রাণ-বায়ুতে যে বেগ উপস্থিত হয় তাহাও ভুক্ত-দ্রব্যের আমাশয়ে গমনে সাহায্য করে। ভুক্ত-দ্রব্য বতকণ জিহ্বামূলে অবস্থিত করে ততকণ মানবের ইচ্ছাধীন থাকে। কিন্তু কণ্ঠনাড়ীতে উপস্থিত হইলে আর মানবের ইচ্ছাধীন থাকে না। ভুক্তদ্রব্যের প্রেরণ ক্রিয়া জিহ্বা-তালু ও কণ্ঠপেশীর ক্রিয়াবীন হইলেও ইহা অল্প কৌশলে সম্পাদিত হয়। ভুক্তদ্রব্য প্রবেশকালে রসনেন্দ্রিয় এই সংবাদ মনের নিকট উপস্থিত করে। অনন্তর উহা গ্রহণ করা উচিত কি না বিবেচনা করিবার জন্য মন উহা বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে। তৎপরে বুদ্ধি বিচারপূর্বক গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা চৈতন্তের নিকট বিজ্ঞাপিত করে, এবং চৈতন্তময়ের ইচ্ছা দ্বারা অর্থাৎ যখন প্রেরণ করিবার জন্য চৈতন্তময় পুরুষ আদেশ করেন, ত্তিক সেই সময় জিহ্বা, কণ্ঠপেশী ও তালু প্রভৃতির ক্রিয়া হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত কার্যগুলি নিবেশ অপেক্ষাও দ্রুত সম্পন্ন হয়। অনন্তর ভুক্ত-দ্রব্য কণ্ঠনাড়ীতে উপস্থিত হইলে প্রাণবায়ুর বেগে এবং কণ্ঠনাড়ী ও আমাশয়ের কূক্লে ক্রমে আমাশয়ে উপস্থিত হয়।

যাহাতে অপর ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের জন্য অবস্থিত করে তাহা নাম আমাশয়

পাকস্থলী। ইহার উর্দ্ধাধোভাগ নলকাকুতি এবং মধ্যভাগ একটা খলের মত। আমা-শয়ের তিনটা আবরণ আছে, বাহ্য, মধ্য ও অভ্যন্তর। মধ্য-আবরণ মাংসপেশী দ্বারা নির্মিত এবং কলাবাপ্ত। এই আবরণেই শিরা, স্নায়ু ধমনী এবং অসংখ্য গ্রন্থি স্রোত দৃষ্ট হয়। অভ্যন্তরভাগে শ্লৈষ্মিক আবরণ। ইহা জরায়ু নির্মিত। ইহাতে যে সমস্ত শ্লৈষ্মাবাহিস্রোত দৃষ্ট হয় তাহারা উরঃ কণ্ঠ প্রদেশ হইতে সমাগত। আমাশয়ের উর্দ্ধভাগে অর্থাৎ নলকাকার প্রদেশের মধ্য-আবরণে বহু শ্লৈষ্ম-গ্রন্থি দৃষ্ট হয়। ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে আসিবা-মাত্র এই সকল গ্রন্থি হইতেও লালার জার শ্লৈষ্মা করিত হয় এবং ক্রমে ভুক্তদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহার নাম ঔদক শ্লৈষ্মা। ঔদক শ্লৈষ্মা স্বচ্ছ জলের জার মধুর, রস, পিচ্ছিল এবং নীতগুণযুক্ত। ইহাতেও কার জাতীয় আঘেয়াংশ দৃষ্ট হয়। ইহার অনেকটা লাগা সূক্ষ্ম। পূর্বোক্ত লাল ও আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক রসের সহিত মিলিত হইয়া ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ইহাই আমাশয়ের প্রথম পরিপাক ক্রিয়া। এই প্রথম পরিপাককালে আমাশয়ের ভুক্তদ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা বাইবে, যে উহার অত্যন্ত পিচ্ছিল এবং কেন্দ্রস্থ হইয়াছে এবং আরও দেখা বাইবে যে মধুররস, লবণরস, নীতল, পিচ্ছিল দ্রব্য বা অংশগুলি সম্পূর্ণরূপে গলিয়া গিয়াছে এবং ঐ সকল দ্রব্য বা দ্রব্যের অংশ-গুলি মধুররসে (শর্করার) পরিণত হইয়াছে। এবং কটুতিক্ত প্রভৃতি রসপ্রধান দ্রব্যগুলিও সম্পূর্ণ না হইলেও কিঞ্চিৎ মধুররস প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ পরিপাককালে ভুক্তদ্রব্যগুলি আমাশয়ের দ্বারা সেচিয়া গেলি-পড়ি

করিতে থাকে। একবার গ্রহণীয় মুখ পর্যন্ত যায়, আবার ফিরিয়া আমাশয়ের মধ্যস্থলে আসে এবং আমাশয় আকৃষ্ট ও প্রসারিত হয়। ঠিক এই সময়েই আমাশয়ের নিম্ন গাত্র হইতে একপ্রকার রস ক্ষরিত হইয়া ভুক্ত-দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহা অন্নরস, এবং ঔদক স্লেষ্মা অপেক্ষা অধিকতর আশ্রয়। এই রস অত্যধিক অন্নযুক্ত হইলেও কিঞ্চিৎ লবণাক্ত বা লবণানুরস। এই রসের সহিত মিশ্রিত হইয়াই ভুক্তদ্রব্য কেনযুক্ত হয়। এবং দেখা যায় যে ভুক্তদ্রব্যগুলি ক্রমে অন্নরস হইয়াছে। এই রসের সহিত মিশ্রিত হইলে ভুক্তদ্রব্য অধিকাংশই গলিয়া যায়। কিন্তু অতিশয় রক্ষ ও কঠিন দ্রব্যগুলির এখানেও কোন পরিবর্তন হয় না। রেছজাতীয় পদার্থের উপর ইহার বিশেষ কিছু ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, তবে স্থলাংশগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতে দেখা যায়। এই সময় ভুক্তদ্রব্যগুলি অন্নরস হইলেও পূর্বোক্ত মধুররসকে ইহারা নষ্ট করে না অর্থাৎ মধুররসের উপর ইহাদের কোন ক্রিয়া হয় না। এই সর্বময় আমাশয়ের নিম্নমুখ—আমাশয় এবং গ্রহণী উভয়ের মধ্যস্থল সম্পূর্ণরূপে কুঞ্চিত থাকে, তৎক্ষণেই ভুক্তদ্রব্য সহসা গ্রহণীতে প্রবেশ করিতে পারে না। ভুক্তদ্রব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে গলিয়া গেলে গ্রহণীমুখ প্রসারিত হয়, তখন ক্রমে উহা গ্রহণীতে প্রবেশ করে।

গ্রহণী আমাশয়েরই একটি অংশ। আমাশয় যেমন একটি থলের মত, ইহা ঠিক সেরূপ নহে। ইহা দেখিতে কতকটা নলের আকৃতি। ইহা কিঞ্চিৎ বক্র হইয়া নাভিপার্শ্বে ক্ষুদ্রাঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার আভ্যন্তরভাগ পিত্তধরা কলাব্যাণ্ড। ইহা ভুক্তদ্রব্যের সমস্ত

অংশকে সমাক্রমে পরিপাক না করিয়া পরিত্যাগ করে না। এইজন্য আমাশয়ের এই অংশটির নাম গ্রহণী। এই গ্রহণী ও আমাশয়ের বাক্যে বক্রতের পিত্তকোষ হইতে একটি ধমনী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই ধমনী দ্বারা বক্রতের পিত্তকোষ হইতে পিত্ত-আসিয়া গ্রহণীতে পতিত হয়। ইহা দেখিতে ঈষৎ তাম্র ও পীত। ইহার ক্ষণিকাল অপনীত করিলে যে পীত তাম্রাভ অণু দৃষ্ট হয় তাহাই গ্রহণীস্থিত কলা গাত্রের সলগ্ন থাকে। এই অণুগুলি আশ্রয়। ইহাদের গাত্র হইতে অতি সূক্ষ্ম অম্লদ্রব্যরূপ উদ্ভা নির্গত হয়। সমান বায়ু এই উদ্ভাপ লইয়া গ্রহণী, আমাশয় ও পাকাশয়ে বিচরণ করে। বায়বীয় পরমাণু অরূপ বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। এই গ্রহণী গাত্রস্থিত পিত্তে অন্ন অথবা কটু রস প্রয়োগ করিলে পিত্ত উত্তেজিত হয় এবং তৎকালে বক্রকোষ হইতে প্রচুর পরিমাণ পিত্ত নির্গত হইতে থাকে। স্তবরাং অন্নরসযুক্ত ভুক্তদ্রব্য গ্রহণীতে প্রবেশ করিলে অধিকতর পিত্তস্রাব হইতে দেখা যায়, এবং এই পিত্তের সহিত ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত হইয়া পূর্বের ভাৱ পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ধবন্তুরি গ্রহণীকেই পিত্তের বা পাচকায়ির প্রধান স্থান বলিয়াছেন। মহর্ষি আর্যের বলেন—পিত্ত পাচকায়ি নহে, কাসোন্নাই পাচকায়ি। এই দুই মতই সত্য, কারণ পিত্তে দ্রবভাগ ও তেজোভাগ দুইই আছে। উদ্ভাপ পিত্তেরই ধর্ম। পিত্তাণু ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংশে উদ্ভাপ নাই। এই পিত্তাণু হইতে নির্গত তাপই সর্বদেহব্যাপী। মহর্ষি আর্যের এই তাপকেই উদ্ভা বলিয়াছেন। এবং ধবন্তুরি ইহাকেই পিত্ত বা পাচকায়ি বলিয়াছেন।

এই পিত্ত দেহে মানা স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া অগ্নিকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। প্রথমতঃ বন্ধিতে সঞ্চিত হইলেও তথায় ইহার কোন কার্য্য দেখা যায় না। বিশেষতঃ বন্ধিতে পিত্ত গ্রহণীস্থিত পিত্তের দ্বারা প্রবল আগ্নেয় নহে। উক্তিতে দ্রবভাগ অগ্নিক-পাকার অগ্নিগুণ হ্রাসল থাকে। ইহার দ্রব্যংশ মল-মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়, এবং আগ্নেয়াংশ গ্রহণী গাত্রে লিপ্ত দেখা যায়। সুতরাং গ্রহণীস্থিত পিত্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এই পিত্তাণ্ডুলি পীত-তাম্র হইলেও ইহা দ্বারা সবস্থা বিশেষে নানারূপ বর্ণ প্রস্তুত হইতে

দেখা যায়। নীল, হরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি বর্ণ এই পিত্ত হইতেই উদ্ভূত হয়। মানবপিত্তের সূক্ষ্ম অণুদকল অবিকৃত অবস্থায় কটুরস প্রধান। এই কটুরস পিত্তের সহিত মিলিত হইয়াই তুন্দ্ৰদ্রব্য অন্নরসের পরিবর্তে ক্রমে কটুরস হইয়া যায়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও দ্রব্য-গুলির স্বাভাবিক রসের কার্য্য নষ্ট হয় না। এই সময় গ্রহণীতে আর এক প্রকার রস আসিতে দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীহরমোহন মজুমদার ।

## মহুর-জ্বর বা মোতীজ্বর ।

মহুর-জ্বর সর্বপ্রথমে মাড়বার দেশে প্রাদুর্ভূত হয়। প্রাচীনকালে এই রোগ ভারত-বর্ষে দৃষ্ট হয় নাই; কারণ চরক-সূত্রাদি প্রাচীন গ্রন্থে এবং ভাবপ্রকাশ ও মাধব নিদানাদি সংগ্রহ পুস্তকেও এই ব্যাধির উল্লেখ নাই। মাড়বারীদিগের ভবনেই মহুর-জ্বরাক্রান্ত রোগী অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পীড়ার প্রকোপ প্রায়শঃ গ্রীষ্মকালেই হইয়া থাকে। আধুনিকগ্রন্থ “রোগ-সমুচ্চয়-দর্পণ” এবং “বোগরত্ন” প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। কথিত ব্যাধি সম্বন্ধে প্রোক্ত বৈজ্ঞানিকগ্রন্থের অভিমত এবং আমি বহুবর্ষ যাবৎ উক্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। এই মহুর-জ্বরের নাম—মোতীজ্বরী, মোতী-বাণা, মধুরিক জ্বর ইত্যাদি। ইহা সাধারণ জ্বর নহে, ইহার আক্রমণে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জ্বর রাজ-পুতানার প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমশঃ অজ্ঞাত দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। অনুমান হয় যে,

মহুর-জ্বর ৩০০ শত বর্ষের পূর্বে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয় নাই। অতথা—ভাবপ্রকাশে ইহার সন্নিবেশ দৃষ্ট হইত; কারণ ভাবপ্রকাশে পটুগীজদের আনীত ফিরঙ্গরোগের উল্লেখ আছে। এইরূপ জানিতে পারা গিয়াছে যে, কিছুদিন পূর্বে মাড়বার দেশে বহুকাল যাবৎ অনাবুটি হওয়ার গ্রীষ্মের আতিশয্য হয়; বিশেষতঃ রাজপুতানা অঞ্চলে জলের অল্পতা ও গ্রীষ্মের প্রাবল্য স্বাভাবিক; তাহার উপর আবার যদি অনাবুটি হয় তবে মরু সন্নিহিত দেশে বাস করা যে কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমের। এই অবস্থায় তদ্রূপবাসি-জনগণের শরীরের পিত্ত অতিমাত্র প্রকুপিত হইয়া, রক্ত-ধাতুকে দূষিত করিয়া, সর্ধপ-সন্নিভ বা তদ-পেক্ষাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা সমূহ উৎপাদন করে। এই ব্যাধির আর একটা কারণ এই যে, জলের অল্পতা নিবন্ধন মাড়বারীগণ নিজ দেশে স্বচ্ছন্দে অবগাহন ঘান ও শরীর মার্জন করিতে পারে না, তজ্জন্ত শরীরে দুগ্ধ ও ঘেদ

কর্দমের মত হইয়া রোমকূপ সমূহ বন্ধ করিয়া ফেলে, তজ্জন্ত যথারীতি ষ্ঠেনোপম না হওয়ায় শারীরিক উষ্ণা বহির্গত হইতে না পারিয়াও পিত্ত ও রক্তধাতুকে দূষিত করিয়া প্রোক পীড়ার উৎপাদক হয়।

### উক্ত জ্বরের পূর্বরূপ—

\* \* কাসারুচিন্তা প্রলাপো দাহবান্ জ্বরঃ  
অগ্নানাং গোরবং মানিরস্থিভেদো বিন্দ্রতা  
পূর্বলিঙ্গস্ত সর্বেষামিদং বৈঠেকদীরিতং ॥

কাস, অরুচি, পিপাসা, প্রলাপ, দাহযুক্ত জ্বর, শরীরে শুষ্কতা, মানি, অস্থিভেদ ও নিদ্রানাশ ঘটয়া থাকে।

### জ্বরের লক্ষণ;—

অরো দাহো ভ্রমো মোহো \* অতিসারো বমিস্তৃষা  
অনিদ্রা চ মুখং রক্তং তালু জিহ্বা চ শুষ্কতি  
গ্রীবামধ্যে চ দৃশ্যন্তে ফোটকাঃ সর্বপোপমাঃ  
এতচ্চিহ্নং ভবেদ যত্র স মধুরক উচ্যতে ॥

জ্বর, দাহ, ভ্রম, মোহ, অতিসার, বমি, অনিদ্রা, রক্তবর্ণতা এবং তালু ও জিহ্বার শুষ্কতা হইয়া থাকে; ইহা ভিন্ন গ্রীবামধ্যে সর্বপাকৃতি ফোটক সমূহ দেখা যায়। চর্ম্মের উপর বেরূপ পীড়কা উৎপন্ন হয়, মুখাভ্যন্তরে জিহ্বায় এবং কণ্ঠনালীতেও তজ্জপ ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে; তজ্জন্ত রোগী অন্ন বা রুটী প্রভৃতি পদার্থ চর্ব্বণ করিতে বা গিলিতে পারে না, দুগ্ধ ও মৃণালিমূর অক্ৰেশে পান করিতে পারে। ইহাতে জ্বর প্রায়শঃ ৩ হইতে ৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; অধিকন্তু কাস,

শরীর বেদনা এবং ওষ্ঠে ক্ষত উৎপন্ন হয়, অনেক সময় জ্বর বিচ্ছেদ হয় না, কখন কখন সকালে বা সন্ধ্যাকালে জ্বরের লঘুতা হয় নাত্র; রোগী অনেক সময় ক্রন্দন করিয়া থাকে। কোন কোন রোগী মধুরিকায় বহু দিবস যাবৎ অভিভূত থাকে; তখন এই মধুরিকা জীর্ণজ্বরে পরিণত হয়।

রক্তদৃষ্টি হইতে যেরূপ মধুরিকার উৎপত্তি হয় মধুরিকাও তজ্জপ শোণিত বিকার জন্ম; সুতরাং ইহাকে মধুরিকার অন্তর্গত মনে করিলেও অসঙ্গত হয় না। ইহাতে কোন কোন রোগীর জ্বরের প্রথমাবস্থায় দান্ত হয়, আবার কাহারও কাহারও জ্বরের শেষ সময়ে ভেদ হইয়া থাকে। রোগীর গলদেশ হইতে জন্মা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে মুকাসদৃশ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কাসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে কণ্ঠ বিচ্ছিন্ন থাকে।

মধুর-জ্বর-রোগীর চিকিৎসা মধুরিকার জ্ঞায়। ইহাতে অনেক বৈজ্ঞ ঔষধ প্রয়োগ করেন না। এই মধুরিকা সংক্রামক ব্যাধি।

এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত; আত্মরগ্ধ প্রবণবায়ু-বিরহিত অথচ আলোকদম্পন্ন ও অসঙ্কার্ণ হওয়াই সম্ভব। অতিশয় শীতোপ-তার বা অত্যন্ত উষ্ণক্রিয়া রোগীর পক্ষে হিতসাধনী হয় না। রক্তময়লা জীলোক বা অশুচি অবস্থায় কেহ যেন রোগীর গৃহে প্রবেশ না করে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ইহাতে পিত্তের প্রাবল্য থাকিলেও দোষের তারতম্য অনুসারে ইহাকে সামান্য পাতিক ব্যাধি বলিয়া নির্দেশ করিলে ভ্রান্ত হয় অসঙ্গত হইবে না। মধুরিকার তজ্জপ ফোটক

\* অর্কটীন গ্রন্থ বোপন্যাদিতে এই পাঠ আছে  
কিত “অরো দাহো ভ্রমো মোহো ভ্রমো বমিস্তৃষা  
পাঠে কোন দোষ হয় না।

গুলি মুক্তার জায় সমুজ্জল, পীড়কাসকল  
খেত, পীত-ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এজন্ত ইহাকে  
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা বাইতে পারে।

অনেক রোগী কেবল লজ্জনে থাকিয়া,  
একটু গরম জল পান করিয়াই আরোগ্য

লাভ করে ; ইহাতে ১৭ হইতে ৩৭ দিন মধ্যে  
দোষের পরিপাক হয়। দোষ-দূষ্টির তার-  
তম্যানুসারে প্রোক্ত সময়ের ইতর বিশেষও  
হইয়া থাকে।

শ্রীসারদাচরণ সেন কবিরত্ন ।

## স্মৃতিকাগার ও প্রসূতিচর্যা ।

সংসারক্ষেত্রে যে স্থানটিতে মানব-জীবন-  
যুগ উদ্ভিত হয়, পৃথিবীর মধ্যে যে গৃহ  
মানবের প্রথম পরিচিত, যে গৃহতল মানবকে  
প্রথম আশ্রয় দান করে, সেই আদি আশ্রয়ভূমি  
স্মৃতিকা-গৃহের স্বাস্থ্যকরত্বের প্রতি আমরা  
সম্পূর্ণ উদাসীন।

এতদেশের স্মৃতিকা-গৃহ বেরূপ স্থানে,  
বেরূপ উপাদানে বেরূপ সঙ্গীর্ণভাবে নির্মিত  
হয়, তাহা যে অতীত নিন্দনীয় ও অস্বাস্থ্যকর  
সেই কথা আজ আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে  
বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সহরের কথা ছাড়িয়া  
প্রথমতঃ পল্লীগ্রামের কথাই বলিতেছি।  
বাটীবা প্রাক্ষণের মধ্যে অতি অপ্রশস্তরূপে  
অবিকাংশ স্থলেই একখানি চালের দ্বারা অর্ধ  
গৃহ নির্মিত হয়। কোন স্থানে স্থপারিপত্র,  
তালপত্র, স্থলবিশেষে উলুখড় দ্বারা তাহার  
উপরের আবরণ (ছাউনী) দেওয়া হয়।  
বর্ষাকালে বর্ষণদেবের কৃপা হইলে সত্তোজাত  
শিশু-সন্তানটিকে বৃকে লইয়া স্বীয় মস্তক রক্ষা  
করিবার জন্য প্রসূতিককে ব্যভিব্যস্ত হইতে হয়।  
গৃহের চতুর্দিকে যে বেড়া দেওয়া হয় তাহাও  
অতি জব্বল। বাটীর যে সমস্ত চাটাই, মাছর,  
হাগলা অব্যবহার্য ও পরিত্যাজ্য তৎসমুদায়  
দ্বারা গৃহের চতুর্দিকে আবরণ দেওয়া হইয়া  
থাকে। উহা রোদ্র বায়ু ত্রিস নিবারক

পক্ষে যে কতদূর সাহায্য করে তাহা সহজেই  
অনুমেয়। গৃহভিত্তি প্রায়-উচ্চ করা হয় না,  
যদিও কোন কোন স্থানে করা হয় তাহাও  
৫ ইঞ্চি উর্দ্ধ নহে। ইহার ফল এই যে,  
বর্ষাকালে প্রাক্ষণের জল শোষণ করিয়া ভিত্তি  
নিরন্তর আর্দ্র অবস্থায় থাকে। এইরূপ আর্দ্র-  
ভূমিতে ১খানি চাটাই বা মাছরমাত্র শয্যাধার  
নির্দিষ্ট হয়, শয্যাটি আবার বাটীর অব্যবহার্য,  
ছিন্ন, মগ্ন। পরিত্যক্ত বসনাদি দ্বারা রচিত  
হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ স্মৃতিকা-গৃহের আয়তন এতদূর  
সংকীর্ণ হইয়া থাকে যে, তাহাতে পাদবিস্তার  
করিয়া শয়ন করা প্রসূতির পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়।  
এই প্রকার অস্বাস্থ্যকর স্মৃতিকাগারে প্রসূতি,  
সত্তোজাত শিশুটিকে জেগে করিয়া ১০ দিন  
বা এক মাস পর্যন্ত অতি কষ্টে কখন অর্ধশায়িত-  
ভাবে কখন বা উপবেশন করিয়া দিবা-রাত্ৰি  
অতিবাহিত করেন। এইরূপ গৃহে বাস করিয়া  
প্রসূতি ও সন্তান যে মর্দি, কানি, জর প্রভৃতি  
রোগে আক্রান্ত হইবে ইহা আর বিচির কি ?  
স্মৃতিকা-গৃহে সত্তোজাত শিশুর দেহে যে  
রোগের বীজ অঙ্কুরিত হয়, ঐ বীজ কালক্রমে  
পরিপুষ্ট হইয়া মহৎ অনিষ্টসারণ করে। কচিং  
টিরজীবনের জন্য শিশুকে অকর্মণ্য করিয়া  
ফেলে। প্রসূতি ও স্মৃতিকা-রোগগ্রস্ত হইয়া ক্র

শয্যা শায়িতা থাকেন, কোন কোন স্থলে বা ইহজীবনের লীলা শেষ করিয়া শিশুটার জীবনও সংশয়াপন্ন করেন।

ফল প্রত্যাশায় বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া যদি তাহাতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্তরূপ বারি সঞ্জন করা না হয়, যদি তাহাতে স্থায়ের কিরণ স্পর্শ না করে, তাহা হইলে সে বীজ যেমন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, কিম্বা অঙ্কুরিত হইলেও যেমন পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ হৃতিকা-গৃহে যখন সম্ভাব্য ভূমিষ্ট হয় তৎকালে তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে, সে সম্ভাব্য জীবনে কখনও স্বাস্থ্য-বান্ ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। যে হৃতিকা-গৃহ আমাদের তত্ত্বানুগ ও বর্তমান স্বাস্থ্যের নিদানভূত, সেই হৃতিকা-গৃহ সংস্কারের উপরই জাতীয় জীবনের উন্নতি যে সর্বথা নির্ভর করিতেছে একথা বোধ হয় পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

যে সময় আমরা পৃথিবীর সহিত প্রথম পরিচিত হই, সেই সময় আমাদের আশ্রয় শয্যা পরিত্যক্ত চাটাই, মাজুর হোগলা বা চাঁচ, আর যখন আমরা তবলীলা শেষ করিয়া লোকান্তরে আশ্রয় লইতে যাঁই, তৎকালে মৃতদেহের জন্ত পাট, পালঙ্গ, লেপ তোষকের ব্যবস্থা। ইহা অপেক্ষা পরিতাপ ও মূর্ত্তার বিষয় আর কি হইতে পারে। অবশ্য দরিদ্র-দিগের জন্ত ঐরূপ ব্যবস্থা হয় না বটে কিন্তু যাহাদিগের জন্ত ইহা করা থাকে, তাহাদিগের হৃতিকাগার বাটার তিতর যেখানি নিকট গৃহ তাহাই নির্বাচিত হইয়া থাকে।

আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে হৃতিকাগার নির্মাণ ও প্রস্থতির স্বথজনক দ্রব্যাদি রক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা আছে—

ঋষি সূত্রত বলিতেছেন—হৃতিকাগার ৮ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রস্থ, পূর্ব বা দক্ষিণ দ্বারবিশিষ্ট এবং গৃহভিত্তি স্থলিষ্ঠ হইবে। ইহাতে পর্য্যঙ্ক (বাট), রক্ষাকর ও মঙ্গলজনক দ্রব্য থাকিবে।

ঋষি চরক বলিতেছেন—নবম মাসের পূর্বেই হৃতিকা-গৃহ নির্মাণ করিবে। যেখানে হৃতিকাগার নির্মাণ করিবে সেই স্থানটি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। তাহাতে যেন অগ্নি, বায়ু, খোলার কুচি প্রভৃতি না থাকে, গৃহের ভূমি যেন প্রশস্ত রূপ, রস, গন্ধবিশিষ্ট হয়, অগ্নি রক্ষার্থে আশ্রয়, বিঘ, গাভ, ইন্দ্রবী, বরুণ বা খদির কাষ্ঠের প্রচুর আয়োজন রাখিবে। পর্য্যঙ্ক, বসন, আলোপন, আচ্ছাদন, শিখান, মল মুত্রাদি পরিভোগের স্থান, উন্নয়ন, ঘৃত, তৈল, মধু, সৈন্ধব, জল এবং প্রস্থতির পক্ষে যে সমস্ত দ্রব্য স্বথকর ও আবশ্যকীয় তৎসমুদয় রক্ষা করিবে। (চরকশারীর ৮ম)

হৃতিকাগার সর্বাঙ্গসুন্দর, সুপ্রশস্ত, স্বাস্থ্যপ্রদ ও প্রস্থতির আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমন্বিত হইবে ইহাই আচার্যগণের মত। কিন্তু আমাদের বর্তমান সময়ে হৃতিকা-গার নির্মাণ ও নির্মাচন যেন একটি বাজে কাজের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

জীবনের প্রথম আশ্রয় স্থান, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম সূত্রপাত যে গৃহে, তৎপ্রতি আমাদের পূর্ণ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যাহাদিগের পাকা বাড়ী ঘর আছে তাঁহারা যেন বাড়ীর মধ্যে একখানি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, খটখটে, উপযুক্ত দরজা জানালাবিশিষ্ট সুপ্রশস্ত গৃহ হৃতিকা-গাররূপে নির্মাচন করেন। দ্বিতল বা ত্রিতল হইলে তাহাতে পাটের আবশ্যক করিয়া কিন্তু নিম্নের ঘর হইলে তাহাতে পাটের ব্যবস্থা করা সম্ভব ও অভাব্যবহক।

খাহাদিগের কাঁচা-বাড়ী ঘর, তাঁহাদিগের স্বাসাধ্য, বহুশূর্যক স্মৃতিরা গৃহ নির্মাণ করা কর্তব্য । গৃহভিত্তি নান পক্ষে বিহস্ত পরিমিত উচ্চ এবং শুক হওয়া উচিত, সুবিধা হইলে উহাতে একখানি খাটের ব্যবস্থা রাখিবেন । পরিকৃত-পরিচ্ছন্ন-সুকোমল শয্যা, ঋতু অনুযায়ী আবশ্যকীয় গাঢ়াবরণ প্রদান করিবেন ।

স্মৃতিকা গৃহের চাল বেড়া, রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে শিশু ও প্রসূতিকে সুরক্ষিত করিবার উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক, অথচ আলো, বাতাস প্রবেশের পক্ষে বিঘ্ন না জন্মে তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । অগ্নি ব্রক্ষা স্মৃতিকা-গারের একটা প্রধান ও অত্যাবশ্যক কার্য । বর্তমান সময়ে অধিকাংশ নব্য শিক্ষিত বাবু ভায়াদিগের বাটীতে স্মৃতিকাগারে অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থা, শ্বেদ, তাপ প্রভৃতি প্রাচীন-প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে ।

প্রসবান্তে প্রসূতিকে শ্বেদ-তাপ দেওয়া যে তৎকালিক ও ভবিষ্যত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা বলাই বাহুল্য । প্রসবান্তে বহু হীনতা প্রযুক্ত কক্ষ ধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এই সময় উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা কক্ষের হ্রাস পায় এবং শরীর সুস্থ ও সবল হয় ।

আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি প্রসবান্তে যে সকল প্রসূতিকে উপযুক্ত শ্বেদ তাপ দেওয়া হয়না, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যতে সর্দি, কাসি, মস্তকে গুরুতর বোধ, হস্তপদে বেদনা প্রভৃতি নানাবিধ বাতশৈল্পিক পীড়ায় কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন । এমন কি কোন কোন স্থলে বাতরোগাক্রান্ত হইতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা আর একটা কথাও উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি, কোন কোন স্থলে

আমরা "হরিবোলার ব্যবস্থা দেখিতে পাই— এই প্রথা, প্রসবান্তে, প্রসবের পরবর্তী সমস্ত নিয়ম বর্জন করিয়া প্রসূতিকে ও সন্তো-জাত বালককে ইচ্ছানুসারে নান আহাৰাদি প্রদান করা হয় । কিন্তু এ নিয়ম আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কুরাপি দৃষ্ট হয় না । এ প্রথা পূর্বে এদেশে কখনও ছিল না । ইহা বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তিত হইবার সময় হইতেই হইয়াছে । স্থল বিশেষে কোন কোন স্থানে বিশেষ অনিষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । এই প্রথা যে প্রসূতি ও সন্তোজাত বালক উভয়েরই পক্ষে হিতকর নহে, ইহা আমরা অবশ্য বলিব ।

**অগ্নি ব্রক্ষা**—স্মৃতিকাগৃহে একটা অনতি-গভীর গর্ত করিবে, তন্মধ্যে শুক কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিবে, \* লতা পত্র সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা কখনও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে না, কারণ লতা-পত্রের সহিত কোন প্রকার বিবাক্ত দ্রব্য থাকিতে পারে ঐ বিবাক্ত দ্রব্যের ধূম নির্গত হইয়া প্রসূতি ও সন্তানের অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে । আম, তেঁতুল, গাব, সুন্দুর, বেল প্রভৃতি অতি শুক কাষ্ঠের অগ্নি জালিবে । কাষ্ঠবিশেষ শুক না হইলে অগ্নিকুণ্ড হইতে ধূম নির্গত হইয়া সন্তোজাত সন্তানের ও প্রসূতির শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার বিষ সম্পাদন করিতে পারে ।

দিবানিশি ঐ নিধূম অগ্নি স্মৃতিকাগারে সাবধানের সহিত রক্ষা করিবে । এবং তদ্বারা প্রসূতিকে সকাল ও সন্ধ্যায় শ্বেদ প্রদান করিবে ।

\* অধিষ্ঠানে চাষিঃ প্রজ্জ্বলয়েৎ ।

হৃতিকাগারে কখনও কেরোসিন তৈলের আশো রাখিবে না, উহার ধূম অতীব অনিষ্ট-কারী। নিদ্রিতাবস্থায় রক্ত গৃহ কেরোসিন তৈলের ধূম ব্যাপ্ত হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

অতঃপর আমরা প্রস্থতির পথসাধকে কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রসবের পর প্রস্থতিকে শীতল বস্তু— এমন কি শীতল জল পর্য্যন্ত পান করিতে দিবে না। ঈষৎঈষৎ জল পান করিতে দিবে। প্রথমে দুই একদিন চিড়াভাজা উত্তম গব্যস্থত ও গোলমরিচ চূর্ণ যোগে প্রস্থতি সেবন করিবে। অনেক প্রস্থতির প্রসবের পর দুই-রক্ত রীতিমত শ্রাব না হওয়ায়, উদরে অত্যন্ত বেদনা হয়, কিন্তু প্রসবের পর প্রস্থতিকে পিপুল, পিপুলমূল, চঞি, চিতামূল, ও গুঠ সমভাগে চূর্ণ করিয়া এই চূর্ণ সিকিভরি পরিমাণ লইয়া একছটাক গরম জলে মিশাইয়া উহার সহিত সিকিভরি আকের গুড় দিয়া প্রথমতঃ প্রসবের পর ৩৪ দিন সেবন করাইলে আর একপ্রসব বেদন জন্মিতে পারিবে না। এবং দুইরক্তও নিঃশেষিত রূপে নির্গত হইয়া যাইবে। ইহাকে “ঝাল খাওয়া” বলে। গল্পাগ্রামে এখনও ইহা প্রচলিত আছে। প্রসবের পর রক্তশ্রাব জন্ত কোন কোন প্রস্থতির অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে, এ-অবস্থায় ঈষৎজল অল্প অল্প পান করা উচিত। কয়েক দিনের পর প্রস্থতিকে পূরণ স্কচ চালের ভাত, ভাজা তরকারী উত্তম গব্যস্থত ও গোলমরিচ চূর্ণসহ সেবন করিতে দিবে। কুখা ও পরিপাকশক্তি প্রবল থাকিলে মোহনভোগ ও লুচি অপথ্য নহে। কিন্তু প্রস্থতি সর্বদা আহারের মাত্রার প্রতি লক্ষ্য

রাখিবেন—অপরিমিত ভোজন সর্বথা অহিত কর। প্রতিদিন প্রস্থতি ও শিশু রীতিমত তৈল মর্দন পূর্বক শ্বেদ গ্রহণ করিবে। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—

“প্রস্থতি হিতমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ ॥  
ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবাং বিবর্জয়েৎ ।  
সর্ষতঃ পরিত্যজ্য ত্রাণং বিগ্ধপথ্যার-ভোজনা ।  
শ্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেন্নাস-মতজ্জিতা ।

প্রস্থতি হিতকর আহার-বিহার পরিমিত-রূপ সেবন করিবে। উচ্চনীচ স্থানে গমন-গমন, সিঁড়িতে উঠানামা শ্রমজনক কার্য, স্বামিসহবাস, ক্রোধ, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগান, ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়া ত্যাগ করিবে। এই সকল নিষেধ না মানিলে হৃতিকা রোগ জন্মে। এক-মাস পর্য্যন্ত নিত্য তৈল মর্দন ও স্কচ লওয়া উচিত।

“প্রস্থতা সার্কামাস্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে  
হৃতিকানামহীনা শ্রাদ্ধিতি ধ্বংসরে মতম্ ।  
ব্যাপ্ত্রবাং বিগ্ধকাক বিজ্ঞায় বরবর্ণিনীম্ ।  
উর্দ্ধং চতুর্ভো। মাসেসো। নিয়মং পরিহারয়েৎ ।

প্রসবের পর দেড়মাস কিঞ্চা বতদিন পুনর্বার স্বতুদর্শন না হয় ততদিন প্রস্থতি হৃতিকানামে অভিহিত হয়। প্রস্থতি পূর্বোক্ত মৈথুন বর্জনাদি নিয়ম চারিমাস পালন করিয়া সম্পূর্ণ বিগ্ধক-দেহা হইলে, চারিমাসের পর তাহাকে নিয়ম বর্জন করিতে উপদেশ দিবে।

আমরা প্রবন্ধ শেষ করিলাম। যদি আমাদের দেশের নারিগণ প্রসবের পর, আয়ুর্বেদ বিহিত উপায় লিখিত নিয়মগুলি দৃঢ়তার সহিত পালন করেন, তাহা হইলে আধুনিক জী-রোগ-চিকিৎসকগণের কার্য অনেক লঘু হইয়া আসিবে এবং ভারত আবার সুস্থ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘায়ু, মেধাবী ও ধার্মিক সন্তানসমৃদ্ধি লাভ করিয়া অপূর্ণ জী-ধারণ করিবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরায় ।



# নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞ-সম্মেলনে

সভাপতির অভিভাষণ ।

( পূর্বানুষ্ঠিত )

একণে আমরা আয়ুর্বেদের ভিন্ন ভিন্ন  
জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে প্রয়াস  
পাইব।

শত্ৰুচিকিৎসার আয়ুর্বেদ যে চরম উন্নতি  
লাভ করিয়াছিল এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র  
যে এ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের নিকট বিশেষ শ্রী  
তাহা পাশ্চাত্য মনস্বীগণও স্পষ্টরূপে স্বীকার  
করিয়া থাকেন। অধুনা যে সকল তথ্য  
পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান নব্যবিজ্ঞান বলিয়া  
বিবেচনা করেন, তাহার অধিকাংশই আয়ুর্বেদ  
শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক শত্ৰু-  
চিকিৎসা বহু প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় শত্ৰু-চিকিৎসা  
অপেক্ষা কি পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে  
তাহা বিশেষ বিবেচ্য। এক্ষণে জনসাধারণের  
মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, পাশ্চাত্য শত্ৰু-  
প্রয়োগ বিজ্ঞান তদ্বৈদ্যগণই এদেশে আনিয়ন  
করিয়াছেন। অধুনা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ  
যখন আব শত্ৰুকর্ম-কুশল নহেন, তখন এই ধারণা  
নিতান্ত দোষাবহ নহে। কিন্তু শস্যতন্ত্র প্রধান  
অংশত গ্রন্থের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে :—

তত্র শল্যং নাম বিবিধ তৃণকাষ্ঠপাষাণ-  
পাংতুলোহলোষ্ট্রাঙ্ঘ্রি-বাল-নখ-পুষা, স্রাবাস্ত-শূল-  
শল্যোদ্ধারণার্থং যন্ত্রশস্ত্রকারাগ্নিশিখান-ব্রণ-  
বিনিস্চয়ার্থক।

সু, হৃত্র, ১ অঃ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের মধ্যে শল্য তন্ত্রকেই  
প্রথম বলা হইয়াছে। যথা—

অষ্টাঙ্গি চায়ুর্বেদতন্ত্রেষু তদেবাধিকমতি  
চমাত্তক্রিয়াকরণাত্তন্ত্রশস্ত্রকারাগ্নিশিখান-  
ব্রণকর্মাসামান্তাক।

সু, হৃত্র, ১ অঃ।

শত্ৰু কর্মের আশু ফলবত্তার ইহার প্রকৃষ্ট  
পরিচায়ক।

শত্ৰু কর্ম অষ্ট প্রকার বলিয়া কথিত  
আছে। যথা—

তচ্চ শত্ৰুকর্মোষ্টবিধং। তদ্ব্যং। ছেদং ভেদং-  
লেখ্যং বেদ্যমাহার্যং বিস্রাব্যং সৌম্যমিতি।

সু, হৃত্র, ৫ অঃ।

শত্ৰু বিংশতি প্রকার। যথা—

বিংশতি শত্ৰুণি। তদ্ব্যং। মণ্ডলাগ্রক-  
পত্রবৃদ্ধি-পত্রনবশস্ত্র-মুত্রিকোৎপলপত্রকাঙ্ক্ষার-  
হৃদী-কুশ-পত্রাটীমুখ-শরারিমুখাস্ত্র-মুখত্রিকূর্চক  
কুঠারিকা-ব্রীহি-মুখারাবেতস-পত্রকবড়িশ-দন্ত-  
শঙ্কে বণা ইতি।

সু, হৃত্র, ৮ অঃ।

এই সকল শত্ৰু স্বস্বধারযুক্ত এবং  
ইহাদিগের দ্বারা পূর্বকথিত আট প্রকার  
শত্ৰুকর্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা—

মণ্ডলাগ্রং ফলে তেবাং তচ্ছস্ত্রস্ত নথাকৃতি।

লেখনে ছেদনে যোজ্যং পোথকী শুভিকামিণ্ডু ॥

বৃদ্ধিপত্রং কুঠারিকং ছেদভেদনপাটনে।

শঙ্কগ্রন্থনতে পোথে গভীরে চ তদন্তথা ॥

ছেদে হৃদী করপত্রস্ত ধরবারং দশাঙ্গুলম্।

বিস্তারকে দ্যঙ্গুলং হস্তদন্তং স্তংসমুৎকটনম্ ॥

ইত্যাদয়ঃ অষ্টাঙ্গদ্বয়ে সুহৃদ্বানে বক্ত-

বিংশতিভিন্ন অথ্যয়ে ব্রহ্মব্যাপি।

শত্ৰু সম্পৎ সম্বন্ধে লিখিত আছে:—

তানি ইগ্রহাণি সুলোহাণি স্ত্রবারাণি

স্ত্রপাণি স্ত্রসমাহিত মুখাগ্রাণ্যকরাণি চেতি-

শত্ৰু-সম্পৎ। তত্র বক্তং কুঠং বক্তং ধরবার-

মতিস্থল মতান্বেষিতীর্ঘমতিস্থমতিষ্ঠৌ শব্দ-  
দোষাঃ। অতো বিপরীত গুণমাদনৌতাত্ত-  
করপত্রাৎ। তদ্ধি খরধারমস্থিচ্ছেদনার্থং। তত্র।  
ধারাত্তেদনানাং মাসুরী। লেখনানামর্ক-  
মাসুরী। বিস্তাবণানাক্ষ কৈশিকী। ছেদনা-  
নামর্ক কৈশিকীতি। তেবাং পায়না স্ত্রবিধাঃ  
ক্ষারোদক তৈলেষু। তত্র ক্ষারপায়িতং  
শরশল্যাশ্চিচ্ছেদনে। উদকপায়িতং মাংস-  
চ্ছেদনভেদনপাটনেষু। তৈলপায়িতং শিরা-  
ব্যধনস্নায়ুচ্ছেদনেবু। তেবাং নিশানার্থং প্লক্ষ-  
শিলা মাষবর্ণা। ধারাসংস্থাপনার্থং শাল্মলী-  
ফলকমিতি ॥

ভবতি চাত্র :-

যদা স্ত্রনিশিতং শব্দং রোমচ্ছেদি স্ত্রসংস্থিতং।  
সুগৃহীতং প্রমাণেন তদা কর্মসু যোজয়েৎ ॥  
সু, সূত্র, ৮ অঃ।

যন্ত্র সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :-

যন্ত্রশতমেকোত্তর মন্ত্রহস্তমেবপ্রধানতমং যন্ত্রা-  
গামবগচ্ছ। কিং কারণং। যন্ত্রাদ্ভ্যুদতে  
যন্ত্রাগামপ্রবৃত্তিরেব তদধীনস্তাদ্ যন্ত্রকর্মণাং।  
তত্রমনঃশরীরাবাধকরাণি শল্যাণি তেষামাহ-  
রণোপায়ো যন্ত্রাণি। তানি যট্ প্রকারাণি।  
তদ্ যথা স্বস্তিকযন্ত্রাণি, সন্দংশবস্ত্রাণি,  
তালযন্ত্রাণি, নাড়ীযন্ত্রাণি, শলাকা যন্ত্রাণি,  
উপযন্ত্রাণি চেতি ॥ তত্র চতুর্বিংশতিঃ স্বস্তিক-  
যন্ত্রাণি। দে সন্দংশ-যন্ত্রে। দে এব তালযন্ত্রে।  
বিংশতির্নাভাঃ। অষ্টাবিংশতিঃ শলাকাঃ।  
প্লক্ষবিংশতিরূপযন্ত্রাণি। তানি প্রায়শো লৌহানি  
ভবন্তি। তৎপ্রতিরূপকাণি বা তদলাভে।  
তত্র নানাপ্রকারাণাং ব্যালানামৃগপক্ষিণাং-  
মুখৈর্মুখানি যন্ত্রাণাং প্রায়শঃ সদৃশানি। তস্মা-  
ত্তৎসারগ্যাধাগমাহপদেদশাভ্যবদর্শনাত্তাত্ত-  
কারয়েৎ ॥ সু, সূত্র, ৭ অঃ।

শব্দ সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পর শাস্ত্রকার  
বাগমায়েন যে আবগ্ৰক মত যন্ত্র যুক্তিপূর্বক  
প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে স্থলবিশেষে নূতন  
যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইবার উপদেশ স্পষ্ট  
জানি যায়।

শব্দকর্ম শিক্ষা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে :-

অবিগত-সর্লশাস্ত্রার্থমপি। শিষ্যাম্ যোগ্যা-  
ক্ষারয়েৎ। ছেতাদিষু স্নেহাদিষু কর্মপথ-  
মুপদিশেৎ। সুবহুশ্রুতোহপ্যুক্তযোগ্যঃ কর্মস্ব-  
যোগ্যো ভবতি ॥

ইহার পর ছেতাদি ক্রিয়া কি করিয়া শিক্ষা  
করিতে হয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ  
দেওয়া হইয়াছে।

শব্দচিকিৎসকের গুণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে -  
শৌর্য মাণ্ড-ক্রিয়া শব্দতৈক্ষ্যামস্বৈদ-বেপথু।  
অসম্মোহশ্চ বৈত্তস্ত শব্দ-কর্মণি শত্বতে ॥

সু, সূত্র, ৫ অঃ।

শব্দ চিকিৎসকের দোষ সম্বন্ধে লিখিত  
হইয়াছে :-

হীনাভিরিক্তং তির্ভাক্ চ গাত্রচ্ছেদন মাখনঃ।  
এতান্চতস্রোহষ্টবিধে কর্মণি ব্যাপদঃ স্তুতাঃ।  
অজ্ঞানলোভহিতবাক্যযোগে

ভয়প্রমোহৈরপরৈশ্চভাবৈঃ।

যদা প্রযুক্তীত ভিক্ষু কুশস্তং তদা

সশেবান্ কুরুতে বিকারাদ্।

তৎক্ষার-শব্দাভিগতিরৌবধৈশ্চ

ভূয়োহভিযুজ্ঞানমযুক্তি-যুক্তং।

জিজ্ঞাবিষুদূরত এব বৈতং

বিবর্জ্যবেত্ত্বা-বিধারি-তুল্য।

রোগীর প্রতি চিকিৎসকের কর্তব্য সম্বন্ধে

লিখিত হইয়াছে :-

তস্মাপুত্রবদৈবৈনঃ পালয়েদাত্তরম্ ভিক্ষকী।

সু, সূত্র, ২ অঃ

প্রশস্তবাহাদির কার্য। প্রশস্তবাহানি গৃহে  
 ত্যাবশ্যবর্জিত। নিম্নোক্ত ল. রোগ্য জাঃ  
 শারীরগত বাল্যঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

দিবা নিদ্রা-বশগঃ স্রাং । \* \* \* \* \*  
 উখানসংবেদনপরিবর্তনচংক্রমণোচ্চৈর্ভাষণাদিষু  
 চান্নচেষ্টাশ্চপ্রমত্তং ব্রণং সংরক্ষেৎ । স্থানাসনং  
 চংক্রমণং যানযানান্তি-ভাষণং । ব্রণবায়-  
 নিষেবেত শক্তিমানপি মানবঃ । \* \* \* \* \*  
 গম্যানাঞ্চ ক্রীণাং সন্দর্শনসম্ভাষণসংস্পর্শনাদি  
 দূরতঃ পরিহরেৎ । \* \* \* \* \* মদাপশ্চ  
 মৈরেয়াহ্ন রিষ্টাসবনৌধুস্মরাবিকারান্ পরিহরেৎ ।  
 বাতাতপরজো-ধুমাবস্থায়ান্তি-সেবনান্তিভোজন-  
 নিষ্টপ্রবণদর্শনেষামর্থভয়কৌণ শোকধ্যান-রাজি-  
 জাগরণ-বিষমশূন্যোপবাস-বাখ্যায়ামস্থান-চংক্র-  
 মণশীত বাতবিরুদ্ধা শনাজীর্ণ মক্ষিকাদ্যা বাধাঃ  
 পরিহরেৎ ॥

এইরূপে ধূম, ধূলি, মক্ষিকা প্রভৃতি হইতে  
 ব্রণরোগীকে রক্ষা করার ফলে ক্ষত দূষিত  
 ( Septic ) হইতে পারে না ।

শল্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

শল শল্য আন্তগমনে ধাতুস্তত্র শল্যমিতি  
 রূপং । তদ্বিবিধং শারীর্য মগন্তকঞ্চ ॥ সর্ব-  
 শরীরাবাহকরং শল্যং তদিহোপদিষ্টত ইত্যতঃ  
 শল্যশাস্ত্রং । তত্র শারীরং রোমনখাদিধাতবো-  
 হ্নমলদোষাশ্চ দৃষ্টাঃ ॥ আগন্তুপি শারীরশল্য-  
 ব্যতিবেকেণ বাবস্তোভাবা হুঃখমুৎপাদয়ন্তি ।  
 অধিকারো হি লোহবেগুবৃক্ষতৃণশৃঙ্গাস্থিময়েব  
 তত্রাপি বিশেষতো লোহময়েষেব বিশসনার্থোপ-  
 পন্নস্তাল্লোহস্ত লোহানামপি দুর্জীরত্বাদগুণত্বাদ  
 দূরপ্রয়োজন-করত্বাচ্চ ।

শস্ত্র ও শস্ত্রসাধ্য ব্যাধি সম্বন্ধে যাহা উল্লি-  
 খিত হইল তাহাতে বুঝা যায় যে অধুনা প্রস-  
 রিত প্রায়-সর্বপ্রকার শস্ত্রচিকিৎসার উল্লেখ  
 আয়ুর্বেদে আছে । তন্মধ্যে কয়েকটা রোগের  
 চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে । চক্ষু চিকিৎ-  
 সার প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে :—

যটসপ্ততির্বেহ ত্রিহিতা ব্যাধয়ো ন্যামলক্ষণৈঃ ।  
 চিকিৎসিত মিদং তেবাং সমাসাধ্যাসতঃ শৃণু ।  
 ছেত্তান্তেষু দশৈকঞ্চ নব লেখ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।  
 ভেত্তাঃ পঞ্চবিকারাঃ স্বর্বেষাং পঞ্চদশৈবতু ।  
 দ্বাদশাঃ শস্ত্রকৃত্যাশ্চ বাপ্যাঃ সপ্ত ভবন্তি হি ।  
 রোগা বর্জয়িতবাশ্চ দশ পঞ্চ জানিত্বা ।  
 অসাধো বা ভবেত্তান্ত বাপোবাগন্ত সংজ্ঞিতৌ ।  
 শ্লেষ্মজ লিঙ্গনাশ রোগের ( cataract ) .

চিকিৎসার কথিত হইয়াছে :—  
 শ্লেষ্মিকে লিঙ্গনাশে তু কৰ্ম্ম বক্ষ্যামি সিদ্ধয়ে ।  
 সচেদেচ্ছৈবদ্ব্যাবিলম্বমুক্তাকৃতিঃ স্থিরঃ ।  
 নিষমো বা তদ্ব্যবধৌ রাজিমাধা বহু প্রভঃ ।  
 দৃষ্টিস্থো লক্ষ্যতে দোষঃ সৰুজো বা স্থলোহিতঃ ।  
 স্নিগ্ধশ্লিষ্মস্ত তস্তাথ কালে নাভ্যাক্ষণীতলে ॥  
 যন্ত্রিতস্তোপবিষ্টস্ত স্মারান্নাং পশ্যতঃ সমঃ ।  
 মতিমান্ শুক্লভাগো ধৌ কৃষ্ণামুক্তাহপাশতঃ ॥  
 উন্মীলা নয়নে সমাক্ সিরাজাল-বিবজ্জিতে ।  
 নাধো নোৰ্দ্ধঞ্চ পার্শ্বাভ্যাঃ ছিদ্ৰে দৈবকৃতে ততঃ ॥  
 শলাকয়া প্রযত্নেন বিশ্বতং যবকুয়া ।  
 মধ্য প্রদেশিতদৃষ্ট-স্থিরহস্ত-গৃহীতয়া ॥  
 দক্ষিণেন তিস্ক্ সযাং বিধেয়ং সর্বান চেতয়ং ॥  
 বারিবিন্দাগমঃ সম্যক্ ভবেচ্ছদ স্তথা ব্যধে ।  
 সংসিচ্য বিদ্ধ-মাত্রস্ত যোষিৎ-স্তম্ভেন কোবিদঃ ॥  
 স্থিরে দোষে চলে বাপি শ্বেদয়েদক্ষি বাহুতঃ ।  
 সম্যক্ শলাকাং সংস্থাপ্যাত্মৈরনিল নাশনৈঃ ॥  
 শলাকাগ্রেণ তু ততো নিলিখেদৃষ্টি-মণ্ডলম্ ।  
 বিধাতো যোহস্ত-পাশেইকস্তংক্রমা নাসিকাপুটম্ ॥  
 উচ্ছি জ্বনেন হর্ষব্যো দৃষ্টিমণ্ডলজঃ কক্ষঃ ।  
 নিরজ ইব ঘর্ষ্যাং শুৰ্ঘবা দৃষ্টিঃ প্রকাশ্যতে ॥  
 তদাসৌ লিখিতং সম্যক্ জ্ঞেয়া য়া চাপি নির্বাধা ।  
 ততো দৃষ্টেযু রূপেষু শলাকামাহরচ্ছনৈঃ ॥  
 স্থতেনাত্মজানয়নং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ ।  
 ততো গৃহে নিরাবাধে শরীতোস্থান এব চ ॥

উল্কারকাসক্ষবৃষ্টিবনোজ্জ্বলানি চ ।

তৎ-কাল-নাচরদুর্কং বিধিশ্চ স্নেহপীতবৎ ॥

ত্র্যাহা ত্র্যাহার্ত ধাবেত ক্বাশ্নৈরনিলাপহৈঃ ।

বারোভয়াত্র্যাহাদুর্কং শ্বেদয়েদক্ষি পূর্ববৎ ॥

দশাহমেবং স্রংঘমা হিতং দৃষ্টি প্রসাদনং ।

পশ্চাৎ কৰ্ম চ সৈবেত লঘুন্নকাপি মাত্রয়া ॥

বদ্ধগুদোদর (Intestinal obstruction) এবং রিঅসাব্যদর রোগে শস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

বদ্ধগুদে পরিপ্রাণি চ মিত্ত্বশ্লিষ্মস্তাভ্যক্ত-  
তাধো নাভের্ভ্রমিত শ্চতুরঙ্গুল মপহায় রোম-  
রাজ্য উদরং পাটরিয়া চতুরঙ্গুল-প্রকাণ্ডত্ৰাণি  
নিষ্কৃত্য নিরীক্য বদ্ধগুদস্তাত্ত্বপ্রতিরোধকরমশ্মা-  
নংবাংবাপোহ মলজাতং বা ততো মধুসপি-  
ভ্যামভ্যজ্যত্ৰাণি যথাস্থানং স্থাপয়িত্ব বাহুং  
ত্রণমুদরস্ত সীব্যেৎ । পরিপ্রাণিণ্যপ্যেবমেব  
শল্যমুক্ত ত্রাণশ্রালান্ সংশোধ্য তচ্ছিত্রমন্ত্রং  
সমাধায় কৃক্ষপিপীলিকাভির্দংশয়েৎ দষ্টেচ তাসা  
কায়ানপহরেন্ন শিরাসি-ততঃ পূর্ববৎ সীব্যেৎ  
সজ্ঞানঞ্চ যথোক্তং কারয়েৎ ।

জলোদর রোগে উদরস্থ জল নিঃসারণ  
(Paracentesis abdominis) সম্বন্ধে  
লিখিত হইয়াছে :—

উদকোদরিশ্লব্ধ বাতহরতৈলাভ্যক্তস্ত্রোক্ষোদ  
কশ্লিষ্মন্ত স্থিতস্ত্রাণ্টেঃ সুপরিগৃহীতস্তাকক্ষাৎ  
পরিবেষ্টিতস্তাধো নাভের্ভ্রমিতশ্চতুরঙ্গুলমপ-  
হায় রোমরাজ্য ত্রীহিমুণেনাভুট্টোদর-প্রমাণম  
বগাঢ়ং বিধেৎ । তত্র ত্রপ্ৰদৌনামভ্যক্তসস্ত  
নাভী-বিধারং পক্ষনাভীঃ বা সংযোজ্য দোষো-  
কমবসিদ্ধেত্ততো নাভীমপদ্ধত্য তৈললবণেনা-  
ভ্যজ্য ত্রণবন্ধেনোপচরেন্ন চৈকক্ষ্মিন্নেব দিবসে  
সর্বং দোষেদকমপহরেৎ সহগাহপদ্ধতে তৃক্ষা-  
জরাক্ষমর্দ্যতিসারখাসপাদবাহা উৎপত্তেরমা-

পূর্য্যতে বা ভূশতরমুদরমসজ্জাত-প্রাণস্ত তস্মা-  
তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠাষ্টদশম-দ্বাদশষোড়শত্র্য-  
ণামত্ৰতম্ মন্তরীকৃত্য দোষোদকমজ্জার মব-  
সিঞ্জেৎ । নিঃস্রুতে চ দোষে গাঢ়তরমাবিক-  
কৌশেয়চন্দ্রণামত্ৰতমেন পরিবেষ্টয়েহুদরং তথা  
নাগ্ধাপয়তি বায়ু । যথাসাংশ্চ পরমা ভোজয়ে  
জ্জাঙ্গলরসেন বা । তত্র ত্রীন্মাসানকৌদকেন  
ফলামেন জাঙ্গলরসেন বাবশিষ্টং মাসত্রয়মন্ত্রং  
লঘুহিতং বা সেবেতৈবং সংবৎসরেণাগ দী  
ভবতি । ভবতি চাত্র—আস্থাপনেচৈব বিরচনেচ  
পানে তথাহার-বিধিক্রিয়াহ । সর্বোদরিভাঃ  
কুশলৈঃ প্রযোজ্য ক্ষীরং শূতং জাঙ্গলজো  
রসো বা ॥

অশ্মরী রোগে শস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিত  
হইয়াছে :—

অথ রোগাঘিতমূপশ্লিষ্মমশকুট্টোদোষবীষৎ  
কশিত মভ্যক্তশ্লিষ্ম শরীরং ভুক্তবস্তং কৃতবলি-  
মঙ্গলশ্লিষ্মবাচনমগ্ৰোপহরণীযোক্তেন বিধানৈ-  
নোপকরিত-সস্তার মাশ্বাত্ত ততো বলবন্তমবিক্রব-  
মাজাহুসমে কলকে প্রাণপবেশ্ত পুষ্কবস্ত তস্তো-  
ৎসঙ্গে-নিবন্ধ-পূর্বকায় মুস্তানমুরতকটিকং সঙ্ক-  
চিত্তজাহু কুপ্পরমিতরেণ সহাববন্ধঃ সূত্রেণ শাট-  
কৈর্কী ততঃ স্বভ্যক্তনাভি-প্রদেশ্য বামপংখ  
বিমুস্ত মুষ্টিনাংবপীড়য়েদধো নাভে ক্যাবদক্ষ্যধঃ  
প্রপন্নেতি । ততঃ ঘোষাত্যক্তে কুণ্ঠনখে বাম-  
হস্ত প্রদেশিনী মধ্যমে পায়োপ্রশিধ্যামাসেবনীমা  
সাত্ত্র প্রবলবলাভ্যাং পায়ুমেত্রান্তরমানীয় নির্ব-  
লীক মনায়ত মবিষমঞ্চ বস্তিঃ সন্নিবেশ্ত ভূশমুৎ-  
পীড়য়েদুপলিভ্যাং বধা গ্রহির্বিবোরতং শল্যং  
ভবতি ।

সচেৎ গৃহীত শল্যকু বিবৃতাকো বিচেতনঃ ।

হতবলমশীর্ষশ্চ নির্ধিকারো যুক্তোপমঃ ॥

ন তস্ত নির্হরেজ্জলং নির্হরেৎকু ত্রিরতে সঃ ।

বিনাশ্বতেষু কপেযু নির্হরং সমুপাচরেৎ ॥

সবো পার্শ্বে সেবনীঃ যবমাত্রাণ মুক্তাব-  
চারেৎ শত্ৰুমক্ষয়ঃ প্রমাণং দক্ষিণতো বা  
ক্রিয়ামৌক্যাহতোরিত্যেকো। যথা চ ন  
ভিত্ততে চূর্ণ্যতে বা তথা প্রবতেত। চূর্ণমক্ষয়-  
বহ্নিতংহি পুনঃ পরিতৃষ্ণিমতি তন্মাং সমস্তা-  
মগ্রবলেনাদদীত। জীর্ণাস্তবস্তিপার্শ্বগতো  
গর্ভাশয়ঃ সন্নিবৃষ্টঃ তন্মাণাসামুৎসঙ্গবচ্ছত্রং  
পাতয়েদতোহন্তথা খবাসাং মূত্রস্রাবী ত্রণো  
ভবেৎ। পুরুষস্ত বা মূত্রপ্রসেকক্ষণনামূত্র  
ক্ষয়গৎ।

অর্শরোগে ক্ষার, অগ্নি এবং শস্ত্র প্রয়োগ  
সম্বন্ধে বাগ্‌ভট বলিয়াছেন :—  
উচিংকৃতস্তায়নং মুক্তবিস্মৃত্তমব্যথম্।  
শয়নে কলকে বাস্তনরোৎসঙ্গে ব্যাপাশ্রিতম্।  
পূর্বেন কার্যেনোত্তানং প্রত্যাদিত্য-গুদং সমম্।  
সমুন্নত-কটীদেশমথযজ্ঞগবাসসা।  
সক্‌থোঃ শিরোধারায়ান্চ পরিক্ষিপ্ত মূজুহিতম্।  
আলম্বিতং পরিচরৈঃ সর্পিষাভ্যক্ত-পায়বে।  
ততোহস্মৈ সর্পিষাভ্যক্তং নিদধ্যাদৃজুংস্বকম্।  
শনৈরহুগুণং পায়ৌ ততো দৃষ্টু। প্রবাহণাৎ।  
যন্ত্রে প্রবিষ্টং দুদাম প্লোত-শুস্তিতয়াহুচ।  
শলাকয়োৎপীড়্য ভিব্ধক্‌ বথোক্ত বিধিনামহেৎ।  
ক্ষারেনৈবার্জলিতরৎক্ষারেণ অলনেন বা।  
মহাবলিনিন্দিয়া বীতযজ্ঞমথাতুরম্।

ছিন্ন নাসিকার চিকিৎসা সম্বন্ধে লিখিত  
হইয়াছে :—

বিম্লেষিতায়ান্বথ নাসিকায় বক্ষ্যামি  
সন্ধানবিধিঃ যথাবৎ।  
• নাসাঃ প্রমাণং পৃথিবীকরণাং পত্রং  
গৃহীত্বা অবলম্বিতস্ত।  
তেন প্রমাণেন হি গণ্ডপার্শ্বস্থৎকৃত্যবন্ধঃ  
ত্বথনাসিকাগ্রং।  
বিলিখ্য চান্তু প্রতিলম্বীত  
তৎসাপু বন্ধৈর্ভিষগপ্রমত্তঃ।

সুসংহিতং সম্যগথো যথাবৎ  
নাকীদ্রয়েনাভিসমীক্ষ্য বন্ধা।  
প্রোন্নম্যচৈনা মচূর্ণয়েচ  
পত্তন্যষ্টমধুকাজ্জনৈশ্চ।  
সংছান্ত সলক্‌ পিচুনাগিতেন তৈলেন  
সিঞ্জেদসক্‌স্তিলানাম্।  
স্বতঞ্চপায়াঃ স নরঃ সুজীর্ণে শ্লিষ্টো কিরেচ্য  
স যথোপদেশং।  
কটক্ষসন্ধানমুপাগতং স্ত্রান্তদর্দক্‌শেষস্ত  
পুনর্নিবৃন্তেৎ।

হীনাং পুনর্নিবৃন্তেৎ যতেত  
সমাঞ্চ কুর্ধ্যাদতিবৃদ্ধমাংসং।  
সু, হস্তঃ, ১৬ অঃ।

এই চিকিৎসা পাশ্চাত্য দেশে রাইনো-  
প্লাষ্টিক শস্ত্র চিকিৎসা নামে প্রসিদ্ধ এবং  
পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে এই চিকিৎসা-  
প্রণালী ভারতবর্ষ হইতেই অল্পকাল পূর্বে  
পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে রোগীর  
অস্থি, সন্ধি প্রভৃতি ভগ্ন হইলে রোগীকে শয়ন  
করাইয়া ভগ্নস্থল এক্রপ ভাবে আবদ্ধ রাখা  
হয় যেন সেই অঙ্গ সঞ্চালিত না হয়।  
আয়ুর্বেদে এইরূপ প্রণালী কপাট-শয়ন নামে  
কথিত। প্রমাণ যথা—

অথ জজ্জ্বারু ভগ্নানাম্‌ কপাট-শয়নং হিতং।  
কীলক! বন্ধনার্থঞ্চ পঞ্চ কার্যা বিজ্ঞানত।  
যথা ন চলনং তস্ত ভগ্নস্ত ক্রিয়তে তথা।  
সন্ধেৰ্ভগ্নতো ঘৌ ঘৌ তলে চৈকশ্চ কীলকঃ।  
শ্রোণ্যাং বা পৃষ্ঠবংশে বা বন্ধস্তন্ধকমোত্তথা।  
ভগ্নসন্ধিবিমোক্ষেহু বিধিমেদং সমাচরয়েৎ।

সু, চিঃ, ৩য়ঃ  
(ক্রমশঃ)

## শিশু-যক্ষ-চিকিৎসা ।

মহিলাগণের বিশেষ পাঠ্য ।

ঠাকুরমা । এই যে—লীলা কখন এলি, ভাল আছি ত ?

লীলা । আমি ত ভাল আছি ঠাকুরমা, কিন্তু খোকার জন্তে মনে একটুও স্বস্তি পাইনে ।

ঠা । কেন, খোকার আবার কি হল ?

লী । তুমিত জান ঠাকুরমা, হু'হুটো ছেলেকে চেষ্টা ক'রেও রাখতে পারলেম না, মমের মুখে তুলে দিয়েছি । এখন এটার জন্তে প্রাণে আর একটুও স্বস্তি নেই । মধ্যে মধ্যে গা ছাঁক ছাঁক করে । ডাক্তার দেখে ব'লেছে, একটু নাকি লিভার বেরিয়েছে ।

ঠা । তোদের ঐ কেমন এক ধারা । ছেলে পেট থেকে প'ড়তে না প'ড়তেই নীবার—নীবার । নীবারত ছেলের পেটে জন্মায় না, ডাক্তার-বস্তির মাধ্যম জন্মায় ।

লী । সে কি ঠাকুরমা, হুটো ছেলেরই ত লিভার হয়েছিল । শেষে আমরাও হাত দিয়ে বুঝতে পারতাম ।

ঠা । তা' হবে না, ছেলে পেট থেকে প'ড়লেই আগুণের মত আরোক আর বড়ি গুলো দিন চার পাঁচ বার ঢুকুক করে গেলাবি, আর নীবার হবে না । আমরাও ছেলে পিলে মাস্তব্ব ক'রেছি, কথার কথায় অমন ডাক্তার-বস্তি ডাক্তার না । তোদের কাণ্ডই এক আলাদা । আজ ছেলের একটু গা গরম হয়েছে ডাক্তার, আজ একটু কাসি হয়েছে ডাক্তার, আজ একটু পেটের অস্বস্তি

হ'য়েছে ডাক্তার । পোড় ডাক্তার বস্তিও তেমনি । এসেই বগলে এক নল আর বৃকে এক চোঙ বসিয়ে, নয়ত নাড়ী টিপে এক গাদা ওষুধ লিখলেন, আর ব'ললেন তিন ঘণ্টা অন্তর, নয়ত প্রাতে, মধ্যাহ্নে বিকালে, রাত্রে ।

লী । তা' ছেলে-পিলের অস্বস্তি হ'লে ডাক্তার-বস্তি ডাকব না ?

ঠা । ঐ ত তাদের দোষ । ওত ডাক্তার বস্তি ডাকা নয়, রোগ ডেকে আনা । হুদিন ধরা-কাটা ক'রে দেখ, রোগ আপনি সারে কিনা, তারপর হুদিন টোটকা-টুটকী দিয়ে দেখ । তারপর দরকার হ'লেই ডাক্তার বস্তি ডাকবি । তা নয় হুটু বলতেই ডাক্তার বস্তি ।

( প্রফুল্লের প্রবেশ )

প্রা । এখন আর সে দিন নেই ঠাকুরমা, এখন সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার না ডাকলেই রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অকা ।

ঠা । তোদের মত বোকামির তাই জাবে । যে রোগে রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অকা পাবে সেত রোগ নয়—সে যে কাল । সেখানে ডাক্তার-বস্তি ডাকা কেন—ডাক্তার বস্তিকে গুলে খাওয়ালেও কিছু হবে না । লোকনাথ বদি বলত, যে অরে সকল উপসর্গ প্রথম থেকেই দেখা দেয়, সে অর নয় বড় মিথি ! অরকে আগে ক'রে কাল এসেছে বুঝতে হবে ।

প্র। কিন্তু কালের সঙ্গে যুদ্ধ করেও ডাক্তারকে জরী হ'তে দেখিছি ঠাকুমা। আমার একটা বন্ধুর মেয়েও অসুস্থ হ'য়েছিল। মেয়েটির হাত পা ঠাণ্ডা হল, ডাক্তার ওষুধ দিলে, অমনি হাত পা গরম হল। নাড়ী দ'মে গেল, ডাক্তার ওষুধ দিলে, অমনি নাড়ী তাজা হল। খুব ঘাম হ'তে লাগল, ডাক্তার ওষুধ দিলে, অমনি ঘাম বন্ধ হল।

ঠা। এ আর একটা নূতন কথা কি! লোকনাথ বস্তি বলত, বিকারের রোগীর চিকিৎসা করা সোজা নয় বড় গিন্ধি, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করা। উপসর্গ দেখে দণ্ডে দণ্ডে ওষুধ দিতে হয়। কিন্তু তা ব'লে কি ছেলে শিলের একটু অম্লত্ব হ'লেই গাদা গাদা ওষুধ গেলাতে হবে? কচি বেলা থেকে যদি গাদা গাদা ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে সে ছেলেকে কদিন বাঁচান বাবে।

প্র। কিন্তু তা ব'লে ডাক্তার যদি দেখাতে দোষ কি?

ঠা। দেখ, সে রকম বিজ্ঞ ডাক্তার ছিও কম, আর বেশী ভাগ ডাক্তার যদি বসাদার। একবার একটা ঘটনার কথা বলি শান্। তোর ঠাকুরদাদার একবার ভারি বসুধ হয়। আমার শাওড়ি ছিলেন পাকা গিন্ধি। তিনি প্রথমে ডাক্তার-বদ্বি ডাকতে দন্ নি। একটু অম্লত্ব বেশী হ'তেই ঠাকুর, গি়ের এক ছোকরা ডাক্তার ডেকে নিয়ে গেলেন। সে সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে। সে এসে বণ্টায় বণ্টায় ওষুধ আর পথিয়ার ব্যবস্থা করলে। কিন্তু আমার শাওড়ী ললেন, ও ডাক্তারের হাতে থাকলে আমার ছলে বাঁচবে না। তখন ঠাকুর আবার গুল্লী থেকে একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার

নিয়ে এলেন, সেও ছোকরা। সেও বণ্টায় বণ্টায় ওষুধ আর পথিয়ার ব্যবস্থা ক'রে গেল। আমার শাওড়ী তার হাতেও রোগী রাখতে রাজি হলেন না। ঠাকুরকে বলেন, ও সব ছেলে-ছোকরাব কাঙ্গ নয়, তুমি বিজ্ঞ ডাক্তার নিয়ে এস। ঠাকুর আবার হুগলী থেকে একজন আশুবড় ডাক্তার নিয়ে এলেন। তিনি এসে আগেকার ডাক্তারের চেয়ে কিছু কম ক'রে ওষুধ-পথিয়ার ব্যবস্থা ক'রে গেলেন। কিন্তু আমার শাওড়ী তার মতেও চিকিৎসা করাতে রাজী হলেন না, বলেন—ওর চুল পাকলে কি হয়—শুক্টিটে নেহাৎ কাঁটা।

লী। বাবা, তোমার শাওড়ী ত কম পাত্র ছিলেন না ঠাকুমা।

ঠা। আগে শোন সব। ঠাকুরগের কথার ঠাকুর রেগে গেলেন, বলেন—তুমি এ ডাক্তার নয়—ও ডাক্তার নয় ক'রে চিকিৎসা না করিয়ে কি ছেলে মেরে ফেলবে? এই নিয়ে দুজনে ঝগড়া। শেষে হির হল—হুগলী থেকে রামনারায়ণ বদ্বিকে আর কল্কাতা থেকে একজন বিজ্ঞ ডাক্তারকে আনা হবে। আর অল্প ডাক্তারেরা যে সব ওষুধ পথিয়ার বন্দোবস্ত করে গেছে, সব তাদের দেখান হবে। তাহা যদি বলে যে আমার শাওড়ির অস্তায় হয়েছে, তা হলে ঠাকুর যে শাস্তি দেবেন তাঁকে তাই নিতে হবে।

লী। বাবা, মেয়ে মানুষের এত সাহস!

ঠা। কেন মেয়ে মানুষ কি মানুষ নয়! শাওড়ির যে বুদ্ধি-বিবেচনা, আর যে সব কথা দেখেছি, আজ কাল অনেক লেখাপড়া জানি বাবুভায়াদের তা দেখতে পাইনে।

লী। যাক সে কথা। তার পর কি হবে বল।



ঠা। তার পর ডাক্তার-বন্দী এল, আর সব কথা আগাগোড়া শুনে শতযুখে আমার শাশুড়ির স্খপাত করতে লাগল। ডাক্তারটা ঠাকুরকে বলেন, যে আপনি বড় ভাগ্যবান তাই এমন দ্রুত পেয়েছেন। আপনার জ্বর বৃদ্ধিবলেই আপনার পুত্র এবার প্রাণ পেলে। আগে যে ডাক্তার বাবু এয়েছিল, তাঁদের মতে চিকিৎসা হ'লে বোধ হয় ছেলেটা রক্ষা পেত না। রোগ, প্রকৃতি ভাল করে, ওষুধে তার সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু আগে ঠাণ্ডা দেয়েছিলেন, তাঁরা প্রকৃতির উপর কিছু বেশী জোর করতে চেয়েছিলেন। তার ফল বোধ হয় ভাল হত না।

লী। তার পর কবিরাজ কি বলেন ?

ঠা। কবিরাজ বলেন, অতি সত্য কথা। বোগীর প্রবল জ্বর, অথচ অল্প অল্প মল বার-বার নির্গত হচ্ছে। আগেকার ডাক্তার বাবু দান্ত বন্ধ করবার ওষুধ দিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাতে ফল খারাপ হতো। জ্বর প্রবল হয়ে রোগী মারা যেতে পারত। রোগীর হিত করতে গিয়ে, কত চিকিৎসক যে এইরূপ ভ্রম করে, রোগীর অহিত করে; তার সংখ্যা নেই। আপনার বুদ্ধিমত্তী জ্বর ওগেই এক্ষেত্রে সেটা ঘটতে পারে নি।

লী। তার পর কি হ'ল।

ঠা। তার পর তাঁরা দুজনে বেশ বিনোদন হয়ে ওষুধ দিলেন। শেষে পথি দিয়ে দুজনে মহা তর্ক বাধলো।

লী। সে কি রকম ?

ঠা। ডাক্তার বলেন রোগী আজ এগার দিন প্রায় অনাহারে আছে, এখন থেকে বলকর পথ্য না দিলে ক্ষীণ হয়ে মারা পড়বে।

কবিরাজ বলেন, সে আশঙ্কা একেবারেই নেই। রোগী অনাহারে আছে বটে—কিন্তু অনাহারে থাকলে মুখ যেন শুকিয়ে যায় এর তা হয়নি, বরং মুখ রসা রসা রয়েছে, নাড়ী পুষ্ট রয়েছে, নাড়ী ক্ষীণ হয়নি। আর এর পরিপাক যন্ত্রের যেরূপ অবস্থা, তাতে খাদ্য দিলে খাদ্য পরিপাক হবে ব'লে মনে হয় না।

লী। তার পর কি হল ঠাকুমা, তর্কের কি শেষ হল ?

ঠা। তর্কের শেষ হল না। কবিরাজ মহাশয় বলেন, তবে অনাহারে রাখলে চৌদ্দ দিনে এর অব ছেড়ে যাবে। ডাক্তার বলেন, যে চৌদ্দ দিনে কখনই জ্বর ছাড়বে না, রোগী ৪১ দিন ভুগবে।

লী। তার পর ?

ঠা। তার পর দুজনে তর্ক করে যখন বনাবনি হ'লনা, তখন দুজনেই বলেন, যে যিনি এতদিন রোগী দেখেছেন—রোগীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁর যা মত—তাই করা হোক। ব'লে—আমার শাশুড়ীর মতের ওপর নির্ভর করলেন।

লী। তিনি কি বলেন ?

ঠা। তিনি বলেন কবিরাজ মহাশয় যা বলেন আমারও তাই মত। কাজেই রোগীকে আর কিছু পথ্য দেওয়া হল না। আগে যে ছানার জল আর খেঁকানার রস দেওয়া হচ্ছিল, তাই দেওয়া বন্ধে লাগল।

নীলা। তার পরে ?

ঠা। তার পর চৌদ্দদিনে জ্বর ছেড়ে গেল। ডাক্তার বাবুটা এমন ভাল লোক, যে তাঁর কথা খাটল না ব'লে তাঁর একটুও দুঃখ হল না। তিনি খুব আহ্লাদ ক'রে কবিরাজ মশায়কে বল্লেন, এখন থেকে আমি আপনাকে গুরু ব'লে মনে ক'রব। কেননা, পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে এই সং-শিক্ষা আপনার কাছে পেয়েছি। আমি যে রূপ পথ্য দিতে চেয়েছিলাম, তা দিলে হয়ত রোগী মারা পড়ত।

লী। বাঃ, ডাক্তার বাবুটা বড় চমৎকার লোক ত! কবিরাজ মশায় তুমি কি উত্তর করলেন?

ঠা। কবিরাজ মশায় বল্লেন, না আপনার জ্ঞায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে থাকলে রোগী মারা যেত না, তবে অনেক দিন ভুগত বটে। আর এই রকম রোগী যে বেশী দিন ভোগে, সে কেবল পথ্যের দোষে। সে যাহক, কিন্তু আজ আপনার গুণগ্রাহিতা, বিনয়, সৌজন্ম দেখে যে আনন্দ পেলাম, তেমন আনন্দ জীবনে কখন পাইনি। অনেক চিকিৎসকের অজ্ঞানতার সঙ্গে সঙ্গে দান্তিকতা এত প্রবল যে, আমাদের উপদেশ সত্য হলেও তাঁরা গ্রহণ করতে চান না, সত্য কিনা—তা পরীক্ষা করতেও চান না।

লী। হাক্—এখন তুমি বোকার অন্তরের কি করবে বল?

ঠা। এই কথাটা শেষ ক'রে তবে ব'লব। এ সব কথা শুনে তোদের উপকার হবে। ডাক্তার কবিরাজ দুজনেই সাত দিন বাড়ীতে ছিলেন, রোগীকে পথ্য দিয়ে তবে তাঁরা বাড়ী

থেকে যান। তাঁদের যাবার আগের দিন বাড়ীতে ৪৫ জন অতিথি এল। ঠাকুরকরোজ নিজে রেঁধে সকলকে খাওয়ালেন। কিন্তু সে দিন তাঁর আমোদ দেখে কে! একা একশ হয়ে রেঁধে বেড়ে সকলকে খাওয়ালেন। সে দিন খাওয়া-দাওয়ার পরে ডাক্তার বাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখুন, আপনার স্ত্রী কি স্কুলকলেজে পড়া উনো ক'রেছিলেন? ঠাকুর করলেন—না, কেন বলুন দেখি? ডাক্তার বাবু বল্লেন, দেখুন, আজ আমার একটা মন্ত ভুল ভেঙ্গে গেল। এত দিন আমার ধারণা ছিল, যে মেয়েদের শিক্ষা দিতে গেলে স্কুল কলেজে পড়ান আবশ্যক, কিন্তু এখন দেখছি সেটা মন্ত ভুল। আজ এক সপ্তাহ আমি আপদার স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে আসছি। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তাঁর কাজের বিরাম নেই। কিন্তু সর্বদা আনন্দময়ী, কখন মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখিনি। এত গুলি লোককে একলা রেঁধে খাওয়ান—আবার রান্না যেমন চমৎকার, তেমনি মার মত যত্ন ক'রে খাওয়ান—তা বি চাকর অবধি। আমি জন্মে এমন চমৎকার রান্না খাইনি—এত তৃপ্তির সহিত কোথাও আহার লয় নি। যেখানে যাই—বামুন ঠাকুর ঠক করে একখাল আধসিদ্ধ চাল আর কতকগুলো গাছ পালা সিদ্ধ দিয়ে যায়। এ দিকে আবার রোগীর সুশ্রুতি কি সুন্দর করেন। তার ওপর আপনার মা ঠাকুরকরোজ রান্নার পড়ে শোমান আছে। আপনার স্ত্রীকে দেখে মনে হয়, সংসারে থেকেই মেয়েদের শিক্ষা হওয়া উচিত, স্কুল-কলেজের শিক্ষা কোন কাজের নয়।

কবিরাজ মশায় বল্লেন, আপনি সুন্দর কথা বলেছেন। যে সংসারে পুরুষদের খেটে

খেতে হয়—আর তাই পনের আনা তিন পাই—তা হাকিমই হউন আর মুংহুদিই হউন, তাদের বাড়ীর মেয়েদেরও পরিশ্রম করা উচিত। সংসার কৰ্মক্ষেত্র। কাজ না ক'রে অলস হ'য়ে ওসে থাকলে শরীরে নানা রোগ আশ্রয় করে। আজকালকার বিলাসিতার যুগে অনেকেই মেয়েদের বিলাসিনী ক'রে তুলেছেন। তার বিষম ফলও তাঁরা ভোগ করছেন।

ঠাকুর হৈঁসে বলেন, কবিরাজ মহাশয় যে এক পাই বাদ রাখলেন তাদের উপায় কি?

কবিরাজ মহাশয় বলেন, যে এক পাই বা তারও কম লোক বাদ রেখেছি, তারা কম-লার বরপুত্র। তাদের শত শত দাস-দাসী আছে, তাদের মেয়ে পুরুষ কারও পরিশ্রম করবার আবশ্যক হয় না। ক'রলে যে পাপ হয় এমন কথা ব'লছি না, তবে প্রায়ই কেউ করে না। এই সব ধনবানদের মেয়েরা নানা বিজ্ঞ শিক্ষা করে। এদের জীবন যাত্রার উপায় দুই প্রকার। এক দেশের ও দেশের হিত করা, অপর নানা প্রকার বিলাসিতার স্রোতে ভেসে যাওয়া।

ডাক্তার বাবু বলেন, সে এক পাইয়ের কথা এই জন্তে বাদ দেওয়া ভাল। কিন্তু আজ কাল পনের আনা তিন পাইয়ের মধ্যে অনেক বরের মেয়েরা সংসারের কর্তব্য কৰ্ম ছেড়ে দিয়ে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রের নভেল কবিতা—কেউবা সেক্সপিয়র-মিলটন প'ড়ে—হারমোনিয়ম বাজিয়ে আর থিয়েটার দেখে দিন কাটায়। সেই জন্তে ব'লছিলাম যে আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষা গৃহস্থলীর মধ্যে হওয়াই ভাল।

ঠাকুর বলেন, আপনি সহরের স্কুল-কলেজে পড়া বিলাসিনীদের দেখে-দেখে বিরক্ত হয়ে গেছেন, তাই মূর্তিমতী কর্তব্য-রূপিনী আমার ত্রীকে দেখে তাদের উপর আর স্কুলের উপর চ'টে গেছেন। কিন্তু দেখুন—প্রকৃত পক্ষে স্কুলে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থলীর কর্তব্য শিক্ষা দিলে দুটিকই বজায় থাকে। আর মেয়েদের আমরাই বিলাসিনী ক'রে তুলছি।

আজও অনেক কথা হল—সে সব আর ব'লে কাজ নেই। শেষে ডাক্তার বাবু বলেন, দেখুন কলকাতায় আমার পসার বেশ, আর বড় ডাক্তার বলে খ্যাতিও আছে। কিন্তু পথ্যজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার ত্রীর কাছে পরাস্ত হয়েছি। নবীনারা যদি প্রাচীনাঙ্গদের কাছে এসব শিখে রাখেন, তা হ'লে দেশে রোগ ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অনেক হ্রাস পায়।

প্র। তোমার গল্পের ভেতর অনেক ভাল কথা আছে, বটে ঠাকুমা, কিন্তু তা ব'লে বেশীর ভাগ ডাক্তার-বন্দিষ্ট যে সূচিকিৎসক নয়, একথা আমি স্বীকার করিনে।

লীলা। দেখ, তুমি বাজে তর্ক করো না। ঠাকুমা মতেই খোকাকে রাখবো।

প্র। যে আজ্ঞে, তাই হোক। এত বড় বিলেত-ফেরত ডাক্তার বাড়ীতে থাকতে আর বাইরে যাওয়া কেন।

ঠা। অই বুদ্ধিতেই তোমারা গেলে গব-চন্দ্র! তোরা কি ভাবিস—যে ছরমাস বিলেত থেকে এলেই লোকে মায়াব হয় এদের? কি মায়াব হ'বার উপায় নেই। একেই কি

ভগবান কারুণ্য মানুষ হবার উপায় রাখেন নি ? নিজের দেশকে তোরা এত ছোট চোখে দেখিস্ !

প্র। তা সত্য কথা বলতে কি ঠাকুমা, এখন অনেক বিত্তে শিখতে আমাদের বিলেত যাওয়া দরকার।

ঠা। যেতে হয় যা'বি, বিত্তের কি পার আছে ! কিন্তু সব বিত্তে শিখতেই যে বিলেত যেতে হ'বে তা মনে করিসনে। দেশে অনেক রত্ন আছে; সেট তোরা খুঁজে দেখবিনে। হাতের কাছে রত্ন ফেলে রত্নের জন্তে বিলেতে ছুটবি।

প্র। তা একথাটা যা বলেছ তা সত্য ঠাকুমা।

ঠা। কেমন হার মান্ণিত।

প্র। পাঁচশোবার। তোমার নাত-নীর কাছেই হেরে আছি, তা তোমার কাছে।

ঠা। হ', তোর ঠাকুরদাদা বলতেন যে, সে কালের খবিরে সমস্ত জগতকে জ্ঞান দিয়ে গেছেন। আর তোরা তাঁদের বংশধর হ'য়ে ঘরের নিন্দে ক'রে পরের দোরে দাঁড়াচ্ছিস্।

প্র। সেটা তোমার মত ঋষিগণ্টীকে দেখলেই বোঝা যায়।

ঠা। তা'রা ঋষিই ছিল রে। হোদের মত টেড়িকাটা ক'তো বাবু ছিল না। তা'দের প্রাণ দেশের আর দেশের জন্তে কাঁদত।

প্র। আমাদের প্রাণ কি কাঁদে না ঠাকুমা ?

ঠা। একেবারে যে কারও কাঁদে না, সে কথা বলছিনে, তবে অনেকেরই কাঁদে—পেটের দায়ে।

লী। তুমি আর বাজে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট করো না। নিজের কাজ থাকেত করগে, নইলে আমি যতক্ষণ না যাই ততক্ষণ কড়ি গোন গে।

প্র। তা'র চেয়ে আমি এখানে মুখটা বুজে বসছি, তবু চাঁদ মুখ থানা দেখতে পাব। শুধু একটা কথা বলে নিই। দেখ ঠাকুমা, খোঁকা কে যদি ভাল করতে পার, যা চাইবে বক্শিস্ দেব।

ঠা। বেটা ছেলে হলে তোমার মাগটা চাইতাম, দেখতাম কি করতে। এখন আর কিছু চাইনে, চাই তোমার কান দুটা লাল ক'রে দিতে।

প্র। তা যদি খোঁকা কে ভাল করতে পার, একবার ছেড়ে পাঁচশোবার লাল ক'রে দিও। অহুবিধে হয়, কাণ দুটো কেটে রেখে যাব।

ঠা। সে আর কাটেত হবে না, হুকান কাটাই তোমরা। হুনিয়ার মধ্যে মাগটা-ভাতারটা আর ছেলে—এই নিয়েই মত্ত। বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবাসী—কারুর দিকে বড় ফিরে তাকান্না বাবুরা। অতিথ-ফকির এলে এক মুঠো ভিক্ষে পায় না। ক্রিসাক্ষরের মধ্যে পরিবারের গহনা গড়ান আর পশ্চিম বেড়ান।

প্র। কিন্তু আজকাল যে রকম অতিথ ফকির—

লী। আবার ?

প্র। বস্ চূপ।

লী। তার পর কি করবো বল ঠাকুমা

ঠা। শোন বলি। বাড়ীতে গর আছেত ?

লী। না, গরু নেই।

ঠা। ওমা সেকি! বড় মানবী কেবল গাড়ীঝোড়া আর দাসদাসী নিয়ে। বাড়ীতে গরু না থাকলে বাজারে হুধ খেয়ে কি ছেলে পিলে বাঁচে?

লী। তা' আমি গরু কেনাব।

ঠা। হাঁ তাই করিস্। আর গরুটী যেন মুড়ুধ না হয়। গরুটাকে বেশ ভাল ক'বে পালবি, যেন তার মনে হুধ-কষ্ট না হয়।

লীলা। সে কি ঠাকমা?

ঠা। তাকি আর কি! মাছের মনে হুধ-কষ্ট হলে শরীর খারাপ হয় তা জানিস্, গরুর মনে হুধ-কষ্ট হ'লে তা'দের শরীরও খারাপ হয়। আর তা হলে তাদের হুধও খারাপ হয়।

লী। বাবা, এতও জান ঠাকমা!

ঠা। গিল্পিপনা করা সোজা নয় দিদি-মণি—একটা সংসারের রাণীগিরি করা। সব জানতে হয়, নইলে ছেলে-পিলে কি আপনি মানুষ হয়।

প্র। এবার আর চুপ ক'রে থাকা চল্লে না। ঠাকমা গরু পালবার কথা বা বললেন, অনেক ডাক্তার বাবু তা'র চেয়ে অনেক বেশী কথা লিখে গিছেন। যথা, গরুকে খারাপ জিনিষ খেতে দিলে হুধ খারাপ হয়, গরুর থাকবার স্থান পরিষ্কার রাখা উচিত, নীরোগ ব্যক্তির ভাল ক'রে হাত ধুয়ে হুধ দোওয়া উচিত, হুধ দোওয়ার পাত্র পরিষ্কার রাখা উচিত, গোয়াল ঘরে বা'তে মশা-মাছি-পোকামাকড় যেতে না পারে—তা করা উচিত। তাঁরা আরও অনেক কথা ব'লে গেছেন। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় এতটা সমজদার ছিলেন না।

ঠা। সাথে বলি তোরা হাতের কাছে রত থাকতে রতের জন্মে বিদেশে ছুটিস্। ঋষিবা যে গরুকে দেবতা ব'লে গেছেন, যে-সে দেবতা নয়—সাক্ষাৎ ভগবতী। গাড়ী ত্রিলোকের মা, তাঁর শবাবে সকল দেবতা বাস করেন, হিন্দুবা তাই গাড়ীর পূজা করে—গোশালা দেবমন্দিরের মত পবিত্র দেখে। দেব-মন্দিরের মত গোশালা পরিষ্কার রাখতে হয়, কোন রকম অনাচার হ'তে দিতে নেই। যদি একবার ঋষির গোপালন সম্বন্ধে কি ব'লে গেছেন দেখিস্, তা হ'লে বুঝতে পারবি যে, তোমার ডাক্তার বাবুদের ততদূর পৌঁছতে এখনও অনেক দেবী।

লী। কেমন, মুখের মত জবাব পেয়েছ ত? আমি তারপর কি ক'রবো বল ঠাকুরমা।

ঠা। তারপর, সেই এক গাইয়ের হুধ দিবি। এবেলার ছুট ওবেলা দিস্নে, কি জানি যদি খারাপ হ'য়ে যার। আর হুধ খাও-যার কিছুক, বাটী, হুধ গরম করবার কড়া খুব পরিষ্কার রাখবি।

লী। তা' ঠ'রাবি।

ঠা। তা'রপর শুধু হুধ না দিয়ে হুধ সিদ্ধ ক'রে দিবি। এক পোয়া হুধ, এক পোয়া জল আর এক খানা খেঁতো করা “পিপুল” এক সঙ্গে জালে চড়িয়ে এক পোয়া থাকতে নামাবি। তা'রপর হেঁকে একটু একটু গরম থাকতে খাওয়াবি। পিপুলের সঙ্গে এই রকম হুধ সিদ্ধ ক'রে দিলে হুধ সহজে হজম হয়, হুধের দোষ কেটে যায়, আর সামান্য সর্দি কাসি থাকলে তাও ভাল হ'য়ে যার। যদি ঝাল বা বিষাদ ব'লে ছেলে খেতে না চায়, তা হলে একটু মিছরী দিয়ে দিস, তাহলে খাবে।

লী। ডাক্তার কিন্তু একেবারে দুধ বন্ধ ক'রে দিতে বলে।

ঠা। বলুক ডাক্তারে। লোকনাথ বন্ধি বলত, কচি ছেলেরা দুধজীবী, তাদের কখন দুধ বন্ধ করতে নেই—যেমন সর—অন্ন-বিস্তার দিতে হয়।

লী। আচ্ছা তাই করবো।

ঠা। ই্যা ভাল কথা, তোদের ওখানে গাধা আছে?

প্রা! গাধা কেন ঠাকুমা, চ'ড়ে রোগী দেখতে যাবে নাকি?

ঠা। চড়বার গাধা সামনেই আছে, খুঁজতে যেতে হবে না। দুধওলা গাধা চাই?

লী। ই্যা ই্যা, ঠাকুমা, বাড়ীর কাছে ক'র খোঁপা আছে, আর তারা গাধার দুধ বেচে দেখেচি।

ঠা। তা হ'লে ভালই হয়েছে। যতটুকু পার গাধার দুধ খোকাকে দেবে, বাকী গাইয়ের দুধ দেবে।

লী। গাধার দুধ কতটুকু দেব?

ঠা। গাধার দুধত বেশী পাওয়া যায় না, যতটুকু যোগাড় করতে পার। এই ধর, এক পোয়া পাঁচ ছটাক। আর দুধ খাওয়াবে ঠিক নিয়মমত—২১৩ বন্টা অন্তর আধ পোয়া আড়াই ছটাক ক'রে দেবে। যখন-তখন খাইও না। আর একবারে বেশী দুধ দিও না।

লী। অনেকে মাইয়ের দুধ দিতে বারণ ক'রে তার কি করণে বলত ঠাকুমা।

ঠা। আগে দেখতে হ'বে যে, মাইয়ের দুধ খাৰাপ হয়েছে কি না, তা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। একটা বাটীতে জল নিয়ে জলটা বেশ স্থির হ'লে তাতে একটু মাইয়ের দুধ

গেলে ফেলবে। যদি দেখ দুধ জলের সঙ্গে বেশ মিশে গেল আর রং বেশ শাদা থাকল, তা হলে বুঝবে—দুধেব দোষ নেই! আর যদি অল্প বকম হয়—দুধ জলের সঙ্গে বেশ না মিশে, ডুবে থাকে, কি ভেসে থাকে, কি প্রথমে ডুবে পরে ভেসে ওঠে, আর যদি শাদা ছাড়া অল্প রঙ দেখা যায়, তা হলে বুঝবে যে, মাইয়ের দুধ খারাপ হ'য়েছে। খারাপ হ'লে ছেলেকে মাই না দেওয়াই ভাল।

লী। কিন্তু ছেলে যদি মাই ছেড়ে না থাকে?

ঠা। না থাকে তাহলে অগত্যা মাই দিতে হ'বে। প্রথমে যত পার দুধ গেলে ফেলে দিয়ে তার পর মাই খেতে দেবে, তা হলে বেশী দুধ পেতে যাবে না। একটা কথা মনে রেখ। অনেক সময় পোয়াতীর মাইয়ে কুইনেন কুইনেন নানা রকম তেতো লাগিয়ে ছেলেকে মাই ছাড়াতে বাধ্য করে। তাতে ছেলে মাই ছাড়ে বটে, কিন্তু তাদের মনে বড় কষ্ট হয়। ছেলের মনে এমন কষ্ট দিয়ে মাই ছাড়ানর চেয়ে দুধ গেলে ফেলে মাই দেওয়া অনেক ভাল।

লী। ছেলের মনে কষ্ট হয় কিনা কি ক'রে বুঝব?

ঠা। ছেলে যেন মনমরা হ'য়ে থাকে, ভাল ক'রে হাঁসেনা, খেলা করেনা, কান্দে, ভাল ক'রে খায় না, আদর করলে তেমন প্রতিক্রিয়া হয় না—এই সব দেখলেই বুঝবে যে, ছেলের মনে খুব কষ্ট হ'য়েছে। ই্যা, ভাল কথা, ছেলেকে মাই বেশী দেওয়া হ'ক আর অল্পই দেওয়া হ'ক, তোনার কিন্তু খুব ধরা-কাটার থাকতে হবে।

(ক্রমশঃ)

## ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য ।

আমাদের হিতের জন্ত তাকী-আর্য্য-  
ঋষিগণ অতি গবেষণায় চতুরাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত  
করিয়া গিয়াছেন। কালের কঠোর নিয়মে  
ভারত অধুনা স্বধঃপতিত। সুতরাং সেই  
পূর্ব্ব বিধিনিষেধ পদদলিত হওয়ায়, আর্য্য-  
সন্তানগণ ক্রমশঃ হীন-তেজ, ক্ষীণ-বীৰ্য্য, অন্ন-  
শূদ্ধ ইইয়া পৃথিবীতে অজ্ঞাত জাতির নিকটে  
অসভ্য, ঘৃণ্যপদ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।  
ইহার মূল অশেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান  
হয়, চতুরাশ্রম-ধর্ম্ম-নষ্ট-জনিত পাগেই আজ  
আমরা এরূপ হীন-তেজ, ক্ষীণ-বীৰ্য্য, অন্নশূদ্ধ  
ও অন্ন-মেধাবী ইইয়া আর্ধ্যাকুল-কলঙ্ক নামে  
অভিহিত। সেই চতুরাশ্রম কি?—ব্রহ্মচর্য্য,  
গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু। মাহুষের  
ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের যত প্রকার পন্থা  
আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান। শাস্ত্রে  
কথিত আছে—“ব্রহ্মচর্য্য ময়নানাম”।

প্রথমে গোড়া না বাঁধিয়া কোন কার্য্য  
করিলে যেমন তাহা সুসম্পন্ন হয় না সেইরূপ  
ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা শরীর পুষ্ট না করিয়া  
গৃহস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশ করিলে তাহার গৃহস্থ্যশ্রম  
তত সুখকর হয় না। পূর্ব্ব—আর্য্য-ঋষিগণের  
সময় নিয়ম ছিল—চতুর্দশবর্ষ পৰ্য্যন্ত  
শুক্রগৃহে থাকিয়া সংযত চিত্তে জিতেন্দ্রিয় ইইয়া  
অধ্যয়নাদি দ্বারা জ্ঞানার্জন করিয়া, পঞ্চবিংশ-  
বর্ষ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া সংসার ধর্ম্ম  
প্রতিপালন করিতে হইত। সেই কারণে  
বুৎকালে এদেশে ষটপুষ্কর কর্ম্মনিপুণ জ্ঞানপ্রবীণ  
দীর্ঘায় লোক সচরাচর দেখা বাইত।

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—  
“পঞ্চবিংশে ভতো বর্ষে পুমান্ নারী তু বোদ্ধশে  
সমভাগতবীৰ্য্যো ভৌ কানবীৰ্য্যে কুশলো ভিবক্”।

কর্ম্মবিবৃৎ—৫

পুরুষের পচিশ বৎসর বয়স না হইলে  
বীৰ্য্য পরিপুষ্ট হয় না, স্ত্রীলোকেরও ষোল-  
বৎসর বয়স না হইলে সর্কীবয়ব পরিপুষ্ট হয়  
না; অতএব ইহার পূর্ব্ব সন্তানাদি হইলে  
তাহারা অপরিণত বীৰ্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া,  
চিরকাল ও অন্নায়ু হইবে এবিষয়ে সন্দেহ  
না। কুব্ধক যেমন কৃষি কার্য্যেই অপরিপক  
বীজ বপন করিয়া সুফল পায় না, সেইরূপ  
মানব-মানবীও ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা বীৰ্য্যাধান  
ও চিত্তসংযম না করিয়া অপভোক্ত্যপাদনে ত্রুতী  
হইলে, সুফলের পরিবর্তে কুফল ফলিবে  
ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? সঞ্চয়বিমুখ গৃহস্থ  
ব্যয়বাহুল্য দ্বারা যেরূপ ঋণী ইইয়া পড়ে, সেই  
রূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি-হীন মানব, অকালে গার্হস্থ্য  
ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া, অসংযত চিত্তে রিপূর  
তাড়নায়, অত্যধিক কন্ডজনিত-পাপে ব্যাধিরূপ  
ঋণ যাতনায় রাজি দিবা হুঃখ ভোগ করে।

যাবৎকাল পর্য্যন্ত শরীরের সর্কীবয়ব  
সুগঠিত না হয়, মনঃ চরম উৎকর্ষ লাভ না  
করে, ধী-বৃত্তি-বৃত্তি-স্বরূপা বুদ্ধি সম্যক পরি-  
পুষ্ট না হয়, তাবৎকাল ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যেতঃ-  
সংযম করিবে অর্থাৎ কোনও প্রকারে বীৰ্য্য  
নষ্ট করিবে না। এজন্য অনেক স্থলে যেতঃ-  
সংযম অর্থেই ব্রহ্মচর্য্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।  
অষ্টাঙ্গমৈথুন সর্কথা পরিভ্যাগ, করিয়া চিত্ত  
সুস্থির রাখিলেই ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা  
পায়। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনই সর্কবিধ মঙ্গ-  
লের সর্কপ্রথম সোপান।

অষ্টাঙ্গমৈথুন-ভ্যাগ না করিলে ব্রহ্মচর্য্য  
রক্ষা পায় না। অষ্টাঙ্গ-মৈথুন বধা—

“স্বয়ং কীর্তনঃ কেশিঃ প্রেক্ষণং ভ্রম্যভিযানং  
সকলোৎসাহবিসারজ্য ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সেরতঃ”

এতমৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মুনীবিগঃ ॥”  
অর্থাৎ অভিন্নবিত্ত কামিণীর রূপ, গুণ, বাক্য  
বিশ্রাস প্রভৃতি মনে মনে চিন্তা করা, তাহার  
রূপের কথা, গুণের কাহিনী বাক্যাতুরীর  
বিষয়াদি প্রিয়জনের নিমট বলা, একসঙ্গে  
ক্রীড়া করা, পরস্পর দেখা দেখি, সঙ্গোপনে  
কথা বলা, কি প্রকারে মিলন হইবে তাহার  
চেষ্টা করা প্রভৃতিকে অষ্টাঙ্গ-মৈথুন বলে।  
ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় ঐরূপ কার্য্য একান্ত নিষিদ্ধ।  
সেইজন্য মনুষ্যার্থই বন্ধিয়াছেন—

“অবিবাসমলং লোকে বিবাসমপি বা পুনঃ।

প্রমত্তা জুংপথং নেতুং কামক্ৰোধবশামুগম্ ॥”

কিশোর বয়সে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া,  
চতুর্বিংশতিবর্ষকাল পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গ-মৈথুন ত্যাগ  
করা মনুষ্য-প্রায়সী মনুষ্যমারেরই কটব্য

কর্ম্ম। বিশেষতঃ বিচার্য্যিগণের পক্ষে অষ্টাঙ্গ-  
মৈথুন বর্জন করা পরম হিতকর। শুক্র বা  
বীৰ্য্য পুরুষশরীরের সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান।  
স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি দর্শন, গৃহভাষণ, সঙ্কল্প  
ও অধ্যবসায় দ্বারা শুক্র চালিত হয় এবং ক্রিয়া-  
নিম্পত্তি দ্বারা ক্ষরিত হয়। শুক্রের অস্থিরতা  
অশেষ অনর্থের মূল। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন  
করিলে শুক্র স্থির হয়, সর্বাঙ্গের বিশেষতঃ  
মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয়, স্মৃতির, ধৃতি-স্মৃতি-শক্তি  
বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্রহ্মচর্য্য পুনরায় এদেশে  
প্রতিষ্ঠিত না হইলে, অল্প শত চেষ্টায়ও বোধ  
হয় জাতীয় গৌরব রক্ষিত হইবে না।

কবিরাজ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিজ্ঞাবিনোদ।

## দোহদের উপযোগিতা।

শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে গর্ত্তিণীর আন্তরিক  
অভিনাযের নামই দোহ। তজ্জানিতেও  
“গর্ত্তিণ্যাভিলাষে দোহম” বলিয়া উল্লেখ  
আছে। গর্ত্তিণীর এই দোহদের উপরি গর্ত্তস্থ  
সম্বন্ধের স্বপ্ন, স্বাস্থ্য, ধর্ম্মতাবাদি কি পরিমাণ  
নির্ভর করে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য  
বিষয়।

প্রথমতঃ গর্ত্তিণীর সহিত গর্ত্তের যে একটা  
অজ্ঞানাস্থাবের, অজ্ঞেয় স্বব্দ আছে, এ  
বিষয়ের প্রমাণ-প্রাপক পর্য্যালোচনার পূর্বেই  
গর্ত্তের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ক্রমিক গুণি ও সঙ্গীতবাহী যে  
প্রমাণ স্বরূপ সর্বসাধারণের জ্ঞানের বিষয়ী-  
ভূত হইবে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাপি  
আয়ুর্বেদবিদ্যাগণ গর্ত্তিণী ও জ্ঞানের স্বব্দ  
বিবর্ত্তে যে অভিন্ন প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বৎ

কিঞ্চিৎমাত্র লিখিত হইছে। সুশ্রুত  
বলেন—

“মাতুস্ত খণু রসবহায়াং নাড্যাং গর্ত্তনাডি-  
নাড়ী প্রতিবদ্ধা, সান্না মাতুরাহাররসবীৰ্য্য  
মাবহতি তেনোপমেহেনাস্তাভিবৃদ্ধিবতি।”

মাতার রসবাহিনী নাড়ীর সহিত গর্ত্তস্থ  
শিশুর নাড়ি-নাড়ী (অমরা) সংলগ্ন থাকে।  
সেই নাড়ী কর্ত্তক মাতার আহারজাত রসের  
সারভাগ ভ্রণশরীরে নীত হয়, এবং তদ্বারা  
উপবিস্ত হইয়া গর্ত্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে  
থাকে। চরক বলেন—

“গর্ত্তঃ পরতন্ত্রবৃত্তি মাতরমাত্রিত্য বৃদ্ধিঃ  
পরেহোপমেহাত্যাম্। স তন্ত রসং সর্ববিস্তার-  
করঃ সম্প্রত্যতে ॥”

গর্ত্ত সর্ববিষয়ে মাতার অধীন থাকিবে



উপস্বেহ এবং উপস্বেদের দ্বারা জীবিত থাকে ।  
মাতার আহারজাত রসে গর্ভের সমস্ত বল ও  
বর্ণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । উপস্বেহ ও উপস্বেদ  
সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও আমরা অপ্রা-  
সঙ্গিক বোধে এস্থলে উল্লেখ করিলাম না ।  
তত্ত্বকর্তা ভোক্তা বলেন—

যদ যদশ্রীতি স্নাতাত্ত্ব ভোজনং হি চতুর্বিধং ।  
তস্মাদ্ভ্রাতৃসীভূতং বীৰ্য্যং ত্রিধা প্রবর্ততে ॥  
ভাগঃ শরীরং পুষ্যতি স্তন্যং ভাগেন বর্ধতে ।  
গর্ভঃ পুষ্যতি ভাগেন বর্ধতে চ যথাক্রমম্ ॥

গর্ভের মাতা যে চর্যা চুষ্য প্রভৃতি চতুর্বিধ  
আহার্য ভোজন করেন, সেই আহার-জাতরস  
তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ গর্ভিণীর  
শরীর রক্ষা করে, দ্বিতীয় ভাগ স্তন্যরূপে পরি-  
ণত হইতে থাকে এবং তৃতীয় ভাগ গর্ভের  
পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধি সাধন করে ।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বোক্ত দোহদরূপ অভিলাষ  
গর্ভিণীর কি গর্ভের তাহাই বিবেচনা করিয়া  
দেখা যাউক । এই বিষয়ে উভয়বিধ মতের সম-  
র্থক উক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।  
স্বশ্রুত বলেন,—

“কর্মণা চোদিতং জন্তো ঔবিতব্যং পুনর্ভবেৎ ।  
যথা তথা দৈববোগাদোহদং জনম্ হৃদি” ॥

জীব পূর্বজন্মে যে প্রকার কর্মের দ্বারা  
জীবন অতিবাহিত করে, গর্ভাবস্থাতেও দৈব-  
যোগবশতঃ (পূর্বজন্ম কৃত কর্ম প্রযুক্ত) স্বদেহে  
সেই প্রকারই দোহদ (সাধ, অভিলাষ)  
জন্মিয়া থাকে । চরক বলেন—

“প্রার্থয়তে চ জন্মান্তরায়নুভূতং ইহ বৎ কিঞ্চিং”

গর্ভস্থিত জীব জন্মান্তরে অদৃষ্ট হৃৎসংস্থ  
মূলক প্রার্থনা সকল ইহজন্মে করিয়া থাকে ।  
পক্ষাণ্ডের চরকে দেখা যায়—

“মাতৃহৃদয়কান্ত হৃদয়ং, মাতৃহৃদয়াভিসম্বন্ধঃ  
রসবাহিনীভিঃ সংবাহিনীভি তস্মাদ্ভূতম্নোভক্তিঃ  
সম্পদ্যতে ॥”

গর্ভের হৃদয় মাতৃজ এবং মাতার হৃদয়ের  
সহিত রসবাহিনী নাড়ীসমূহ দ্বারা সম্বন্ধ  
থাকে, সেই নাড়ীসমূহ দ্বারা গর্ভের প্রার্থনা  
মাতৃহৃদয়ে এবং মাতার প্রার্থনা গর্ভের হৃদয়ে  
পরিচালিত হয় বলিয়া উভয়ের ইচ্ছা সমান  
হইয়া থাকে ।

এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে  
এক দিকে যেমন চতুর্থমাসে—যখন গর্ভের  
চৈতন্য সঞ্চার হয়, তৎকালে বহির্গত হইতে  
বিশেষ সম্বন্ধ বিহীন প্রশান্তচিত্ত-প্রায় জ্ঞানের  
জন্মান্তরায়নুভূত হৃৎসংস্থের বৃত্তিগুলির ক্ষুরণ  
অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না । অত্ৰ পক্ষেও  
সেইরূপ বাহ্যজগতের সহিত বিশেষ সম্পর্কশীল  
মাতৃহৃদয়ের অনবরত ক্ষুরিত অনন্ত আকাঙ্ক্ষা  
হৃদয়ে হৃদয়ে সম্পর্কযুক্ত গর্ভে, অলক্ষ্যভাবে  
অন্তঃ প্রবাহিত হওয়াও অমৌলিক বলিয়া  
মনে হয় না । যাহা হউক উক্ত প্রকার  
উভয়বিধ মতের উল্লেখ থাকিলেও পূর্বাগত  
বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে চতুর্থ মাসের  
পূর্ববর্তী অর্থাৎ গর্ভের চৈতন্য সঞ্চারের পূর্বের  
আকাঙ্ক্ষা, গর্ভিণীর অভিলাষ নামে অভিহিত  
হইতে পারে, কিন্তু চতুর্থ মাস হইতে গর্ভিণীর  
যে সকল আকাঙ্ক্ষা হয়, সে সকল যে প্রধানতঃ  
গর্ভস্থ জীবের আন্তরিক প্রবৃত্তিসমূহকে  
বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই ।

গর্ভিণীর চতুর্থ মাসের পূর্ববর্তী অভিলাষ,  
দোহদপরিচালক হইলেও উহা বর্তমান  
প্রকৃত্তির বিশেষ বিষয়ীভূত মতে, কারণ—  
চৈতন্যের আশ্রয় স্থল হৃদয়ের স্তন্যরস  
উৎপত্তি না হওয়ায়, গর্ভিণীকে তখন বিধি

বা দৌহদিনী বলা যায় না। বস্তুতঃ দৌহ-  
দিনীর অভিল্যবই দৌহদ পদবাচ্য অর্থাৎ  
দৌহদের লক্ষ্যভূত। মানব যখনই চিন্তে কোন  
বিষয়ে কোনরূপ অভাবের উপলব্ধি করে,  
তখনই তাহার ঐ বিষয়ক একটি আকাঙ্ক্ষার  
উদয় হয় এবং পরে উহা কার্যে পরিণতি  
লাভ করে। জগতের যাবতীয় কার্যের মূলেই  
ঐরূপ এক একটা ইচ্ছা এবং তাহার মূলে  
আন্তরিক অভাবের সত্তা বর্তমান রহিয়াছে।  
আবার এই অভাবের পূর্ণতার মানবের স্বপ্ন  
এবং তাহার অপূরণে ছুঃখানুভূতি স্বাভাবিক।  
পূর্কোক্ত নিয়মে গর্তিণীর আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ  
দৌহদ যখন গর্তস্থ জীবের প্রযুক্তিমূলক, তখন  
তাহার পূরণাপূরণের সহিত যে গর্তের স্বপ্ন  
ছুঃখানুভব হয় ইহা স্থির নিশ্চিত। ঐরূপ  
অনুভব করে বলিয়াই ঋষি ও পূর্কোক্তাধ্যায়  
“প্রিয়হিতাত্মাঃ গর্তিণীঃ বিশেষেনোপচরন্তি”  
বলিয়া গর্তিণীর স্বপ্নস্বাক্ষরের প্রতি বিশেষ-  
ভাবে লক্ষ্য করিতে উপদেশ করিয়াছেন।  
“\* গর্তিণ্যাঃ বেদোক্তো নৃপিকানিতা” বলিয়া  
তাহার পক্ষে ব্রত উপবাসাদি আপাতক্লেশকর  
বেদবিধি পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই  
খানেই আমাদের প্রস্তাবিত দৌহদের প্রভূত  
প্রয়োজনীয়তা এবং এইখানেই দৌহদাতাবের  
রোমাঞ্চকারিণী পরিণাম কল্পিত।

দৌহদ সম্বন্ধে সূত্রত বলেন ;—

“ইঞ্জিরার্থাংস্ত বান্ বান্ না

ভোক্তু মিচ্ছতি গর্তিণী।

গর্তবান্ধরাত্তান্তান্ ভিষগাজ্জতা দাপয়েৎ ॥”

নারীগণের গর্তবান্ধরায় যে সকল বিষয়  
ভোগ করিতে চক্ষুরাদি ইঞ্জিরগণের বাসনা  
হয়, গর্তের পীড়া নিবারণ করিবার জন্য সেই  
সকল সাধ পূর্ণ করা কর্তব্য। সূত্রতে লিখিত  
আছে।

“লব্ধদৌহদা হি বীৰ্য্যবস্তঃ চিরায়ুষঞ্চ পুংসঃ  
জনয়তি...” “সাপ্রাপ্তদৌহদা পুংসঃ জনয়েত  
গুণাং যতং।”

অন্তঃসত্তা নারীর অভিল্যব পূর্ণ হইলে  
বীৰ্য্যবান্ দীৰ্ঘায়ু ও গুণবান্ সন্তান জন্মিয়া  
থাকে। দৌহদ না দেওয়ার দৌষ বলিতে  
গিয়া সূত্রত বলিয়াছেন—

“অলব্ধদৌহদা গর্তে লভেত্যানি বা ভয়ং।

যেষু বেদিস্তিয়ার্থেষু দৌহদে বৈ বিমাননা।

প্রজায়েত স্ততস্তান্তি স্তম্মিস্তম্মিস্তথেষ্মিয়ে।”

“দৌহদ-বিমাননা কুঞ্জ কুণিং খণ্ডঃ জড়ঃ

বামনঃ বিকৃতাক্ষমনকঃ বা স্ততঃ জনয়তি”

যথোপযুক্ত সময়ে গর্তিণীর অভিল্যব  
পূর্ণ না করিলে গর্তবিষয়ে এবং আত্মবিষয়ে  
তাহার ভয় (আন্তরিক বিপর্যয়) হয়। গর্ত-  
বতী রমণীর যে যে ইঞ্জিরের কামনা পূর্ণ না  
হয়, সন্তানের সেই সেই ইঞ্জিরের পীড়া  
জন্মিয়া থাকে এবং তাহাতে সেই ভগ্নমনোরথা  
গর্তিণী কুঞ্জ (কুজো) কুণি (নখরোগাক্রান্ত)  
খণ্ড (খোঁড়া) জড় (বোকা, হাবা) বামন  
(খর্ব্ব) বিকৃতাক্ষ (টেরা) অথবা অনক  
(অন্ধ) সন্তান প্রসব করিয়া থাকে।

মহর্ষি চরকের “বিমাননে হস্ত দৃষ্টতে  
বিনাশো বিকৃতির্কী” দৌহদের অবমাননা  
করিলে গর্তের বিনাশ ও বিকৃতি দেখা যায়  
এই বচনের দ্বারা তিনি যেন স্বয়ং ঐরূপ  
ব্যাপদ্ যোগপ্রত্যক্ষ বা অন্ধি গোচর করিয়া-  
ছেন বলিয়াই মনে হয়। অতঃপর তিনি  
বলিয়াছেন—

“প্রার্থনাসদ্ধারগাচ্চি বায়ুঃ কুণ্ডিতোহস্তঃ

শরীর মনুচয়ন্ গর্তস্তাপজমানস্ত বিনাশঃ  
বৈরুপং বা কুণ্ডিয়াৎ”

গর্তিণীর প্রার্থনা ভঙ্গ করিলে তাহার বায়ু

কুপিত হইয়া গর্ভশরীরে বিচরণ পূর্বক গর্ভের বিকৃতি এমন কি বিনাশ পর্যন্ত সাধন করিয়া থাকে। এতদ্বারা মহর্ষি দোহদাতাব জনিত মহা অশুভের হৃদয় কারণও নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

বস্তুতঃ এস্থলে আমরা প্রথমতঃ সুলভাবে বিবেচনা করিলেও দেখিতে পাই যে, মানবের আন্তরিক বৃত্তিগুলি ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারাই প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ প্রকাশের সময় ইন্দ্রিয়গণের সঙ্কোচ বিকাশ প্রভৃতি নিজ নিজ ক্রিয়া (ব্যায়াম) হওয়াও স্বাভাবিক। যখন আমরা আমাদের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়গণের কোন একটিকে দিন কয়েক কোনরূপ কার্যের অবসর না দিয়া আবদ্ধ রাখিলে, তাহার অনিয়ত বৈকল্য এবং শক্তি হীনতা উপলব্ধি করি, তখন ক্রমের তথাকথিত বৃত্তির ক্ষরণের অভাবে যে তাহার অবয়ব-বৈকল্য হইবে কিম্বা তৎবিপরীতে পূর্ণতা লাভ করিবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? দ্বিতীয়তঃ আরও একটু অগ্রসর হইয়া হৃদয়ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, যে মানবের আকাঙ্ক্ষাগুলি যখন তাহার আন্তরিক অভাব মূলক এবং সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতায় যখন আন্তরিক পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তি ঘটে, তখন সেই পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণেরও যে পরিতৃপ্তি এবং পরিপূষ্টি সাধিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গর্ভজ জীবের শুভাশুভ যেখানে দোহদের উপর এতটা নির্ভর করে সেখানে বীর্ষবান্দ দীর্ঘায়ু ও বহুগুণাধিত সন্তান লাভে কোন ব্যক্তিরই পক্ষে দোহদ্বিনীর আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখা সম্ভব নহে। অধিক কি দোহদ্বিনীর আকাঙ্ক্ষা উল্লভনিত হৃৎখোংগামনের ভরে

চরক—“তীত্রায়াঃ খলু প্রার্থনায়াঃ কাম মহিত মঠৈ হিনোপসংহিতং দত্তাং” বলিয়া তীক্ষ্ণবীৰ্য্য অহিতকর দ্রব্যাদিও গর্ভিনীকে হিতকারী দ্রব্যের সংযোগে দিতে অনুমোদন করিয়াছেন। কেবল দোহদ্বিনীর প্রার্থনার (অর্থাৎ গর্ভবতী নারী চতুর্থ মাস হইতে যাহা প্রার্থনা করে তাহার) অপূরণ যে গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে অশুভকর তাহা নহে, পূর্বোক্ত প্রকারে গর্ভিনীর সহিত যখন গর্ভের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে যে, গর্ভাবস্থার যে কোন সময় গর্ভিনীর ইচ্ছা পূর্ণ না করিলে গর্ভস্থিত সন্তানের স্বাস্থ্য, বল, ইন্দ্রিয় ও আয়ুর বিষয় ঘটিবে এ বিষয়ে অশুভাভ সন্দেহ নাই। কেবল গর্ভাবস্থায় গর্ভিনীর হিতাহিত অনুষ্ঠানের সহিত গর্ভস্থিত শিশুর হিতাহিতের যে সম্বন্ধ আছে তাহা নহে, এমন কি গর্ভাবস্থানের পূর্বে, রজঃস্রাব নারীর কৃতকার্য্যের ফল পর্যন্ত তাহার পুত্রকে ভোগ করিতে হয়। আচার্য্য বলিয়াছেন—ঋতুবতী নারীর অশ্রুপাতে সন্তান বিকৃত চক্ষু, দিবানিত্রায় নিদ্রালু, অজ্ঞান প্ররোগে অন্ধ, স্নানমূলেপনে হঃখশীল এবং তৈলমর্দনে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব গর্ভাবস্থায় যে কোন সময়েই বিশেষতঃ দোহদ্বিনী বস্থার গর্ভিনীর অভিলাষ অপূর্ণ রাখিবে না। কে বলিতে পারে যে, কস্তা-গৃহ হইতে রাজর্ষি জনকের স্বপ্নে গমনের পরে পিতৃবিরোগ-বিধুয়া গর্ভিনী সোতার একমাত্র চিত্তবিনোদের অজস্র বৃদ্ধিমান লক্ষণ চিত্রদর্শনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন না?

বহুকাল হইতে এই দোহদ্বিনীর প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে বটে কিন্তু দেখিতে পাই, অধুনা ধনী-দরিদ্র প্রায় সকলেই

ইহার বিধি-নিষেধের বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়াছেন। অঙ্গুলী-সংখ্যায় ধনিগণ বিলাসের অধীন হইয়া ইচ্ছাপূর্বক যানারোহণ, দিব্য-দিক্কা, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি গর্ভিণীর কয়েকটা বর্জনীয় বিষয়ের অনুষ্ঠান করাইতেছেন, এজন্ত তাঁহাদিগের সন্তানগণের মধ্যে সংপ্রতি ভয়স্বাস্থ্যের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট লোক দারিদ্র্যের কঠোর নিপীড়নে ইচ্ছা সম্বন্ধে বিধিগুলির অধিকাংশ পালন করিতে পারিতেছে না। এই নিমিত্ত তাঁহাদের

সন্তানদিগের মধ্যে ক্রীণ, বিকৃত ও অপূর্ণাঙ্গের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক সমাজকে উন্নত করিতে হইলে ও সমাজের প্রধান অঙ্গীভূত সন্তানগণের দীর্ঘায়ু, বল ও গুণগ্রাম কামনা করিলে সকলেরই এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

করিরাজ :

শ্রীহরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

## হরীতকী।

হরীতকী সকলের নিকটেই সুপরিচিত। তবে আজকাল কেবল সুপরিচিত এই মাত্র। পূর্বে হরীতকী আর্ঘ্যজ্ঞাতির অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। আজিও বাগ, যজ্ঞ, ব্রতাদিতে হরীতকীর ব্যবহার তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। “এই স্বচ্ছন্দ-বনজাত অনার্যাদলভ্য ফলগুলির কি এত গুণ আছে, বাহাতে আর্ঘ্যজ্ঞাতি সে গুলিকে এতাদৃশ সমাদর করিতেন? গুণ না থাকিলে ত কাহার আদর হয় না! এই প্রবন্ধে আমরা হরীতকীর গুণ নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইব। তবে তাহার পূর্বে হরীতকী আর্ঘ্যজ্ঞাতির নিকট কত সমাদর লাভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই চারিটা প্রমাণ উদ্ধৃত করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

হরীতকীভুজ্ঞ রাজন্মাতো বহিতকারিণী।  
কন্দাচিং কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী ॥

অনুবাদ।—হে রাজন্ হরীতকী ভুজ্ঞ করুন, উহা মাতার শ্রায় হিতকারিণী। মাতাও কন্দাচিং কুপিতা হইয়া থাকেন, কিন্তু উদরস্থ হরীতকী কখন কুপিত হয় না। অপিচ,

পীষ্মং পিবতস্ত্রিবিটপপতের্থে বিন্দবো নির্গতা  
স্তেভ্যোহুভুভয়া দিবাকরকরশ্রেণীব দোষাপহা  
কালিন্দীব বলপ্রমোদজননা গৌরীব শূলি-প্রিয়া  
বহ্নিছাতকরী যুতাহতিরিব ক্ষৌণীব নানারসা ॥

অনুবাদ।—স্বর্গের পতি (ইন্দ্র) অমৃত পান করিবার সময় যে অমৃতবিন্দু পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে হরীতকী উৎপন্ন হয়। ইহা সূর্য্যালোকের শ্রায় দোষনাশক, বসুনার শ্রায় বল ও প্রমোদজনক, গৌরীর শ্রায় মহাদেবের প্রিয়, যুতাহতির শ্রায় অগ্নিবর্ধক এবং পৃথিবীর শ্রায় নানারসায়ক। অজ্ঞান,—  
হরন্ত ভবনে জাতা হরিতা চ স্বতাবতঃ।

হরতে সর্করোগাংস্ত তেন নামা হরীতকী ॥

অনুবাদ।—হরের (মহাদেবের) ভবনে জাত, স্বতাবতঃ হরিষণ এবং সর্করোগ হরণ করে বলিয়া হরীতকী নাম হইয়াছে।

হরীতকীর গুণ সম্বন্ধে বাগ্ভটে লিখিত হইয়াছে।—

কষায়া মধুরা পাকে কক্ষা বিলবণা লঘু।  
দীপনী পাচনী মেধ্যা বয়সঃ-স্থাপনী পরা ॥

উষ্ণবীৰ্য্য সরাযুষ্ণা বুদ্ধীজ্জিৱ বল প্রদা ।  
কুষ্ঠৈববর্ণাটবৈবৰ্ণ্যাপুরাণবিষমজ্ঞান ॥  
শিরোহন্ধি-পাণ্ডুদ্রোণকামলা-গ্রহণীগদান্ ।  
সশোষশোখাতিসারমেদমোহবমিক্রিমোন্ ॥  
খাসকাস প্রসেকার্শঃ শ্লীহ্নাহগরোদরম্ ।  
বিবন্ধঃ শ্রোত্ৰসাং গুণ্ময়ক্ কস্তমরোচকম্ ॥  
হরিতকী জয়েদ্বাধীং স্তাংস্তাং ১৫ কফবাতজান্ ।

অনুবাদ—হরিতকী কবার রস, পাকে  
মধুর, কঁক, লবণ রসবহীন (অথ পক্করস  
বিশিষ্ট) লবু, অগ্নিদীপক, পাচক, মেধাবর্দ্ধক,  
পরমায়ু বর্দ্ধক, পরম বয়ঃস্থাপক (যৌবনকে  
দীর্ঘস্থায়ী করে), উষ্ণবীৰ্য্য, সারক, বুদ্ধি ও  
ইঞ্জিরসমূহের বলপ্রদ এবং কুষ্ঠ, বিবর্ণতা,  
বিস্মরতা, পুরাতন অর, বিষম অর, শিরো-  
রোগ, চক্ষুরোগ, পাণ্ডু, দ্রোণ, কামলা,  
গ্রহণীরোগ, শোষ, শোথ, অতিসার, মেদ,  
মোহ, বমি, ক্রিমি, খাস, কাস, মুখ দিয়া জল  
উঠা, অর্শ, শ্লীহা, আনাহ, বিষদোষ, উদর-  
বোগ, শ্রোত সকলের বিবন্ধতা, গুণ্ম উরুগুণ্ড,  
অকর্টি ও কফবাতজ রোগ নাশক ।

অন্তঃ—

চর্কিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিঃ পেয়িতা মলশোধিনী ।

শিরা সংগ্রাহিণী পথ্যা ভূষ্টা প্রোক্তা

ত্রিদোষহুং ।

উন্মিলিনী বুদ্ধি-বলজ্জিৱাণাম্ ।

নিমূলিনী পিত্তককালিলানাম্ ।

বিসর্জিনী মূত্রশক্লমলানাম্ ।

হরিতকী স্তাং সহ ভোক্তনেন ।

অন্নপানকৃতান্দোষান্ বাতপিত্ত-

ককোত্তবান্ ।

\* পাক বা বিপাক, রস, বীৰ্য্য, এতাব অতুতি  
বিষম এবং আয়ুর্কোষাক অন্তত পারিতোষিক সংজ্ঞার  
অর্থ বর্ণনোপস্থি সন্দেহের বিচার-বশতঃ দেখুন ।

হরিতকী হরত্যাণ্ড ভূক্তান্তোপরিযোজিতা ।

লবণেন কফংহস্তি পিত্তঃহস্তি সশর্করাম্

স্বভেন বাতজান্ রোগান্ সর্করোগান্

গুড়াষিতা ।

অনুবাদ—হরিতকী চর্কণ করিয়া থাইলে  
অগ্নি বৃদ্ধি হয়, পেষণ করিয়া থাইলে কোষ্ঠ-  
গুচ্ছ হয়, সিদ্ধ করিয়া থাইলে মল সংগ্রহ  
(তরল মল গাঢ়) হয় এবং তাজিয়া থাইলে  
ত্রিদোষ নষ্ট হয়। খাত্তের সহিত হরিতকী  
সেবন করিলে বুদ্ধি, বল ও ইঞ্জিয়শক্তি বৃদ্ধি  
প্রাপ্ত হয়, পিত্ত, কফ ও বায়ু নষ্ট হয় এবং মল  
মূত্রাদি (শরীরের অন্ত্যস্ত মল—Excretion)  
নির্গত হয়। আহারের পর হরিতকী সেবন  
করিলে অন্নপানকৃত দোষ নষ্ট হয় (অর্থাৎ  
ভুক্ত অন্ন দ্বিত হইয়া কোন প্রকার গীড়া  
উৎপাদন করিতে পারে না) এবং বায়ু, পিত্ত  
ও কফের দোষ (বিকৃতি) নষ্ট হয়। হরিতকী  
লবণের সহিত সেবন করিলে কফরোগ,  
চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তক রোগ,  
স্বভের সহিত সেবন করিলে বাতজ রোগ  
এবং গুড়ের সহিত সেবন করিলে সমস্ত রোগ  
নষ্ট হইয়া থাকে ।

হরিতকী এবংবিধ গুণমূলক হইলেও স্থল

বিশেষে হরিতকী প্ররোগ নিবিদ্ধ । বধা—

তৃষ্ণারাম্ মুখশোষেচ হস্ততন্তে গলগ্রহে ।

নরজরে তথা কীণে গর্ভিণ্যাং ন প্রপত্ততে ॥

অনুবাদ :—তৃষ্ণা রোগে, মুখ শোষে,  
হস্ততন্তে (Lock jaw), গলগ্রহে (Wry-  
neck) ও নবজমে এবং কীণ ব্যক্তি ও  
গর্ভিণীর পক্ষে হরিতকী প্রপত্ত নহে ।

স্বায়ে সাত আকার হরিতকী এবং তাহা

কেষ জিন্ন : ভিন্ন কেবল ব্যবহারের উপেক্ষা  
করাইছে । বধা—

বিজয়া রোহিণী চৈব পুতনা চ মৃতভয়া ।  
 জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যারাঃ সপ্ত জাতয়ঃ ॥  
 অলাবুবুভা বিজয়া বৃভা সা রোহিণী স্মৃতা ।  
 পুতনাহিমতী হুমা কথিতা মাংসলামৃতা ॥  
 পঞ্চ-রেখাভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী ।  
 চেতকী চাসিতা ক্ষুদ্রা সপ্তানামিয়মাক্ততিঃ ॥  
 বিজয়া সর্সরোবেবু রোহিণী ব্রণরোহিণী ।  
 প্রলেপে পুতনা যোজ্যা শোধনার্থেহমৃতা হিতা ॥  
 অক্ষিরোগেহ ভয়া শস্তা জীবন্তী সর্সবোগদ্বয় ।  
 চুনার্থে চেতকী শস্তা যথাব্যুক্তং প্রমোজয়েৎ ॥  
 অনুবাদ ।—বিজয়া, রোহিণী, পুতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী ভেদে হরীতকী সপ্ত জাতীয়। তন্মধ্যে বিজয়া অলাবুবুং গোলাকার, রোহিণী গোলাকার, পুতনা হুম্ব এবং বৃহৎ অস্থি (আঁট) যুক্ত, অমৃতা মাংসল (প্রচুর শস্তযুক্ত), অভয়া পঞ্চ রেখাযুক্ত, জীবন্তী স্বর্ণের আয় বর্ণ-বিশিষ্ট এবং চেতকী ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ। সমস্ত রোগে বিজয়া, ব্রণ রোপণার্থ (যা শুকান) রোহিণী, প্রলেপ কার্যে, পুতনা শোধনার্থে, অমৃতা চক্ষুরোগে, অভয়া, সর্সরোগে জীবন্তী এবং চূর্ণ ঔষধে চেতকী ব্যবহার্য।

হরীতকীর সাত প্রকার ভেদের উল্লেখ থাকিলেও অধুনা কেহ সে বিষয়ে লক্ষ্য করেন না এবং তাহার ফলে এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও অক্ষিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। যখন এদেশে যজ্ঞে, ব্রতে, ঋত্বে, ঔষধে হরীতকী ব্যবহৃত হইত, তখন আমাদের দেশে হরীতকী বৃক্ষ যত্রপূর্বক পালিত হইত। যে কোন উদ্ভিদ যত্র সহকারে পালিত হইলে তাহার ফলের আকার ও গুণগত অনেক উন্নতি দৃষ্ট হয়—তিল, ক্ষুদ্র, বীজ বহুল নিত্য হীন-শস্ত যত্র পটোল, দীর্ঘকাল সঞ্চারিত হইয়া

স্বষাৎ উত্তম পটোলে পরিণত হইয়াছে। হরীতকী সম্বন্ধে এই কথা। অধুনা এদেশে হরীতকী বৃক্ষ সম্বন্ধে পালিত না হওয়ায়, দীর্ঘকালের অঘটনে, স্ববৃৎ, মাংসল হরীতকী এইরূপ ক্ষুদ্র, হীন-শস্ত হরীতকীতে পরিণত হইয়াছে। এবং ইহার অনেক জাতি বিলুপ্ত হইয়াছে। অধুনা বাজারে যে হরীতকী বিক্রীত হয়, তন্মধ্যে বিভিন্ন আকারের হরীতকীও দেখা যায়। বোধ হয় শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সত্যিত মিলাইয়া শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে সেইগুলিকে প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফল পাওয়া যাইতেও পারে। অধুনা যাহা জঙ্গী হরীতকী নামে প্রসিদ্ধ তাহা শাস্ত্রোক্ত চেতকী বলিয়া বোধ হয়।

হরীতকীর উৎকর্ষ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—  
 নবা শিখা ঘনা বৃভা শুক্লী কিপ্রা চ চাম্বসি ।  
 নিমজ্জ্যেং সা প্রশস্তা চ কথিতাতিগুণপ্রদা ॥  
 নবাদি-গুণযুক্তত্বং তত্রৈকত্ব দ্বিকর্ষতা ।  
 হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তৎ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥

অনুবাদ :—নূতন, শিখা, ঘন (শস্তবহুল) গোলাকার, শুক এবং বাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় এইরূপ হরীতকীই ফল প্রদ।

উপরোক্ত নূতন প্রভৃতি গুণযুক্ত হইলে অথবা একটা হরীতকী চারিতোলা হইলে এই দুই প্রকার হরীতকী শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

একণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রোগে আয়ুর্বেদোক্ত হরীতকী প্রয়োগের বিষয় উল্লেখ করিব।

হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে বিষম জ্বর নষ্ট হয় (চক্রদন্ত)। তিল তৈল, যত কিংবা মধুর সহিত হরীতকী সেবন করিলে রূপাহ নামক সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয় (ভাবপ্রকাশ)। অভিসার রোগের উদ্ভব যত্রণা থাকিলে এবং অন্ন অন্ন বিবর্তন যত্রণা

হইলে হরিতকী ও পিপুল চূর্ণ বাটিয়া উষ্ণজল সহ সেবন করাইয়া বিবেচন করাইবে (চক্রদত্ত) । উষ্ণজলের সহিত হরিতকী সেবন করিলে অতিসারের আমদোষ নষ্ট হয় (চরক) । মধু সহিত হরিতকী সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয় ও আম পরিপাক পায় । ইহা শূলযুক্ত অতিসারে প্রশস্ত (বঙ্গসেন) । রক্তার্শ রোগীকে ভোজনের পূর্বে গুড়ের সহিত হরিতকী সেবন করাইবে । গুড় ও হরিতকী সেবন করিলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা নষ্ট হয় এবং কঙ্ক, কণ্ড, বেদনা ও অর্শ নষ্ট হয় । ঘৃত ভক্ষিত হরিতকী গুড় ও পিপুলের সহিত কিংবা তেউড়ী ও দস্তী মূলের সহিত সেবন করিলে বায়ুর অতুলোম হইয়া অর্শ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত) । গোমুত্রে হরিতকী তিজাটয়া পরদিন সেই হরিতকী সেবন করিলে অর্শ নষ্ট হয় (বাগ্‌ভট) । হরিতকী বাটিয়া গুড়, শুঠ চূর্ণ বা সৈন্ধব লবণ সহ সেবন

করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয় । গুড়ের সহিত নিত্য হরিতকী সেবন করিলে আমাজীর্ণ অর্শ-রোগ এবং মলবদ্ধতা নষ্ট হয় (চক্রদত্ত) । হরিতকী গোমুত্রে সিদ্ধ করিয়া গোমূত্র সহ বাটিয়া থাকিলে, কফজ পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয় (চরক) । হরিতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেচন করিলে উহা পাচক ও অগ্নিদীপক হয় বলিয়া কফজ রক্তপিত্ত, শূল ও অতিসার নষ্ট হয় (চক্রদত্ত) । হরিতকী চূর্ণ বাসকের রসে সাত দিন ভাবনা দিয়া পিপুল ও মধু সহ সেবন করিলে প্রবল রক্তপিত্ত নষ্ট হয় (হারীত) । হরিতকীর সহিত সম পরিমাণ শুঠ পেষণ করিয়া উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে খাস ও হিকা নষ্ট হয় (চক্রদত্ত) । উষ্ণ জলের সহিত হরিতকী চূর্ণ সেবন করিলে হিকা নষ্ট হয় (সুশ্রুত) । হরিতকীর সহিত সম পরিমাণ শুঠ বা পিপুল মিশ্রিত করিয়া ঘূষে ধারণ করিলে শ্বরভেদ নষ্ট হয় (চক্রদত্ত) । (ক্রমশঃ)

## উন্নত কুক্রুরাদির বিধলক্ষণ ও চিকিৎসা ।

(পূর্বাভ্যুত্তি) ।

তারপর উন্নততা জনক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া সুশ্রুত বলিতেছেন—

“করোত্যন্তান্ বিকারাংশ্চ

তস্মিন্ জীৰ্য্যতি চৌষধে ।

বিকারাঃ শিশিরে বাপ্যা

গৃহে বারিবিবর্জিতে ॥

ততঃ শান্তবিকারস্ত দ্বাধা

চৈবাপরেহহনি ।

শালি খটিকরোক্তং

কীরেণোকেন ভোজয়েৎ ।

(সুশ্রুত ঐ)

কার্ত্তিক—৬

সেবিত ঔষধ পরিপাক পাইবার সময় হইতে রোগ-শরীরে অন্ত কতকগুলি বিকার প্রকাশ পাইবে । এ বিকারগুলি কি সুশ্রুত বলেন নাই । আমরা চক্রদত্ত কথিত শেবোক্ত ধুতুরাখটিত ঔষধ সেবন করাইয়া দেখিমাছি নষ্টযাজি ঠিক পাগলের মত আচরণ করে—সে লোককে মারিতে দার, হাসে, কাঁদে, গান করে, চক্ষু রক্তবর্ণ ও চাহনি ব্যাকুলের মত হয় । এইরূপ অবস্থার কি কর্তব্য ? সুশ্রুত বলিতেছেন—ঔষধ খাওয়াইয়া রোগীকে ঠাণ্ডা করে রাখিবে । সে ঘরে বেন জলের সম্পর্কও না

থাকে। পরদিন তাহাকে স্বান করাইয়া ভাল দাদখানি চাউলের ভাত এবং দুধ খাইতে দিবে। ঔষধ সেবনের দিন সূক্ষ্ম রোগীর স্বান আহারের কথা কিছু বলেন নাই; সুতরাং অস্বাস্ত রাখা ও উপবাস দেওয়াই বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রেত। উপবাস দিলে ঔষধের ক্রিয়াও তীব্রতরভাবে প্রকাশ পাইতে পারে— ইহা আরোগ্যের পক্ষেও অল্পকূল বটে, কিন্তু আঞ্জকাল লোকের আর সেরূপ বল নাই; সুতরাং ঔষধ সেবন-দিনেই ঠাণ্ডা হলে স্বান, পাস্তা ভাত, তেঁতুল গোলা জল, ডাব প্রভৃতি খাইতে দেওয়া হয়। ঔষধ সেবনের ২।৩ দিন পরে রোগীকে স্নান হইতে দেখা গিয়াছে এবং জীবনে তাহার আর কখনও বিষলক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

সূক্ষ্ম অতঃপর বলিতেছেন—

“দিনত্রয়ে পঞ্চমে বা বিধিরেবোহর্দ্ধমাত্রয়।  
কর্তব্যো ভিষজাব্র মলক-বিষনাশনঃ।”

তিন দিন কিম্বা পাঁচ দিনের দিন আবার অর্দ্ধমাত্রায় ঐ ঔষধ অবশ্য প্রয়োগ করিবে। আঞ্জকাল সাধারণতঃ একবার দিলেই যথেষ্ট, কিন্তু যদি রোগী সম্যক উন্নত না হয়, তাহা হইলে গুপ্ত বিধের সম্যক প্রাকোপ দ্বিতীয় বার ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হইতে পারে।

এখন সূক্ষ্মতোক দ্বিতীয় যোগটা যাহা বমনও বিরচেনকারী তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সূক্ষ্মত বলিয়াছেন—

“দহ্যং সংশোধনং তীক্ষ্ণমেবং সাত্ত্ব্য দেহিনঃ।  
“অন্তর্যন্ত সুরূঢ়েপি ব্রণে কুপ্যতি তদ্বিষম্॥

যাহার শরীর উত্তমরূপ শোধন করা হয় নাই, তাহার দংশনের কৃত সম্পূর্ণ আরাম হইলেও, বিষ কুপিত হইয়া থাকে, অতএব শোধন ঔষধ দিবে। বিরচন, বমন দ্বারা শরীরের শোধন হয়, অতএব সূক্ষ্মতের দ্বিতীয় যোগটা প্রয়োগের আবশ্যিকতা দৃষ্ট হইতেছে।

## ব্রণ-চিকিৎসা।

( পূর্বাভ্যুত্থিতি )

“বস্ম লোহষ্ট-পরিগ্রাহী পঞ্চ লক্ষণ-লক্ষিতঃ।  
ষষ্ঠা বিধানৈ নির্দিষ্টৈ শ্চতুর্ভিঃ সাধ্যতে ব্রণঃ॥”\*

সূক্ষ্মত—চিঃ ১মঃ অঃ

\* বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত, সন্নিপাত অর্থাৎ দুই বা তিন দোষের সমবায় এবং আগন্ত এই ছয়টি ব্রণের মূল অর্থাৎ কারণ, এই সাত ব্রণরোগ বস্মল। বস্ম, মাংস শিয়, মাংস, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ এবং মস্ত এই আটটি স্থান পরিগ্রহ অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া ব্রণ-রোগ উৎপন্ন হয় এই সাত ব্রণ রোগ এই পরিগ্রাহী। বাত, পিত্ত, কফ, দুই দোষের বা তিন দোষের সংঘাত এবং আগন্ত লক্ষণোল্লক্ষণ-লক্ষিত বলিয়া ব্রণ রোগকে পঞ্চলক্ষণ লক্ষিত বলে।

যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রণ-শোধ, ব্রণ এবং ব্রণ-বিকৃতি চিকিৎসা করিতে হয় তৎসমুদয়কে ব্রণোপকরণ বলে।

অপতর্পণ, আলোপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ, বেদ, বিস্মাগন, উপনাস, পাচন, বিস্রাবণ, মেহ, বমন, বিরচন, ছেদন, দারণ, লেখ্য, এবং, আহরণ, ব্যধন, সৌবন, সন্ধান, পীড়ন শোণিতাস্থাপন, নির্ম্মাপণ, উৎকারিকা, কষার বর্জি, কক, সর্পি, তৈল, রসজিহ্না, অক্ষুর্দন, ব্রণধূপন, উৎসাদন, অবসাদন, মুহুর্কর্ম, দক্ষণ কর্ম, কারকর্ম, অগ্নিকর্ম, কৃককর্ম, পানুকর্ম,



প্রতিসারণ, রোমসঞ্জনন, লোমোপহরণ, বস্ত্র-  
কর্ষ, উত্তর বস্ত্রকর্ষ, বন্ধ, পত্রদান, ক্রিমি, বৃহৎ, বিষয়, শিরোবিরেচন, নস্ত্র, কবলধারণ  
ধুম, মধু, সর্পি, যন্ত্র, আহার এবং রক্ষাবিধান  
ভেদে ত্রণোপক্রম ষাট প্রকার ।

সাত প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত  
চিকিৎসকেরা উক্ত ষষ্টি-সংখ্যক উপক্রম ব্যস্ত-  
সমস্ত ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন । তজ্জন্ত  
বোধ সৌকর্যার্থে তৎসমুদয়কে বিদ্বাপন,  
অবসেচন, উপনাহ, পাটন, শোধন, রোপণ  
এবং বৈকৃতাপহ এই সাতটি ক্রমে বিভাগ  
করিয়া লওয়া যাইতে পারে ।

উক্ত সাত প্রকার ক্রমের মধ্যে বিদ্বাপন,  
অবসেচন, উপনাহ এবং পাটন, আম, পাচ্য  
মান এবং পক্ষশোধ বিষয়ক । শোধন এবং  
রোপণ ত্রণ বিষয়ক । ত্রণ আরোগ্য হইলে,  
ত্রণ-পদে যদি কোন প্রকার বিকৃতি রহিয়া  
যায়, তাহা হইলে সেই বিকৃতি শাস্তির জন্য,  
বৈকৃতাপহ ক্রম অবলম্বন করিতে হয় ।

আদৌ ত্রণ-শোধ শাস্তির উপক্রম অবলম্বন  
করা উচিত । শোধের অবস্থা বিশেষে বিশিষ্ট-  
ক্রমে অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে হয় ।  
সেই কারণে ত্রণ শোধ এবং ত্রণ রোগের  
চিকিৎসা বলিবার পূর্বে ত্রণ শোধের আবশ্বিক  
ভেদ বলা যাইতেছে ।

পূর্বে বাতাদি ভেদে ছয় প্রকার শোধের  
লক্ষণ বলা গিয়াছে । আম, পচ্যমান এবং পক্ষ-  
ভেদে সেই সমস্ত শোধের অবস্থা ভিন্ন প্রকার ।

অপতর্পণাদি ষষ্টিসংখ্যক বিধান অবলম্বন করিয়া  
ত্রণ চিকিৎসা করিতে হয়, এই নিমিত্ত ত্রণকে ষষ্টি-  
বিধান নিমিষ্ট রোপ বলে । পরন্তু উপযুক্ত চিকিৎসক,  
ঔষধ এবং, কর্তৃকশল পরিচারক এবং আত্মবান্ধু যোগী  
না হইলে চিকিৎসা কার্য চলে না এই জন্য ত্রণরোপ  
এই ষাট প্রকারে বিভাজিত হইয়াছে ।

মনোমুগ্ধতা, ভ্রুক্‌সবর্ণতা, শীতশোফতা,  
হৈর্য্য অর্থাৎ কঠিনতা, মন্দবেদনতা এবং  
অন্নশোফতা আম ত্রণশোধের লক্ষণ ।

আম-শোধ উপেক্ষা করিলে, কিংবা দোষ-  
বাহুল্যহেতু, বিধিবিহিত চিকিৎসায় শোধ  
বিলীন না হইলে, শোধ পরিবর্দ্ধিত হইয়া  
জলপূর্ণ বা বাতপূর্ণ চর্ম্ম পুটকের আকার ধারণ  
করে । শোধযুক্ত স্থানের বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে—  
লাল বা কাল কিংবা পীতবর্ণে রঞ্জিত হয় ।  
ব্যাধিত স্থলে নানা প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত  
হইয়া রোগীকে অকুল করিয়া তুলে । সমস্ত  
শরীরেও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইতে থাকে এবং  
জ্বর, দাহ, পিপাসা এবং অকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ  
প্রকাশ পায় । এই সময় প্রচুট বায়ু, পিত্ত,  
কক যুগপৎ স্থান সংশ্রয় করিয়া পাক আরম্ভ  
করে । শোধের এইরূপ অবস্থার নাম পচ্য-  
মানাবস্থা ।

শোধের তৃতীয়াবস্থার নাম প্কাবস্থা ।  
এই অবস্থায় শোধের উৎসেধ কমিয়া যায় ।  
শোধযুক্ত স্থানটা পাণ্ডুরী ধারণ করে এবং  
কণ্ঠাগ্রস্ত হয় অর্থাৎ চুলকাইতে থাকে ।  
শোধের পার্শ্বে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া মার্কনা  
করিলে সোয়াস্তি বোধ হয় এবং পুয়নিঃসরণের  
ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে । শোধের একপ্রান্তে  
একটি অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করতঃ, অপর প্রান্তে  
অঙ্গুষ্ঠান্তর দ্বারা ধীরে ধীরে পীড়ন করিলে,  
জলপূর্ণ চর্ম্ম-পুটকে জলস্কারবৎ পুয়স্কার  
অনুভূত হইতে থাকে শোধের প্কাবস্থায়  
অন্যান্য উপক্রম প্রেরণিত হয় ।

অতঃপর বাতাদি দোষভেদে ত্রণ-লক্ষণ  
বলা যাইতেছে—

বাস্তুরক্তশ্চ বৃদ্ধ—তাববা অন্নপূর্ণা  
অগভীর উদরবিহীন ; পিজিল ; অন্নমায়ী

অমিষ্ণু; চট্টটারনশীল; ক্ষুরণ, আরাম, তোদ, ভেদ বেদনা বহল এবং মাংসোপচয় পরিহীন।

**পিত্তজত্রণ**—ক্ষিপ্রজ্ব অর্থাৎ অতি-শীঘ্র ত্রণের সন্ধার হয়। পিত্তজ ত্রণ নীলাভ বা পীতাত, দাহ পাকরাগ বিকারী এবং পীতবর্ণ গীড়কা জুই। পিত্তজত্রণ হইতে রক্তবর্ণ এবং উষ্ণ আশ্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে।

**কফজত্রণ**—ত্রণ নিরন্তর উগ্রকণ্ডু-বহল, স্থূল, ঘন, কঠিন, দিরা ও শ্বাসযজালাবৃত, পাণ্ডুবর্ণ এবং মন্দবেদন। কফজত্রণ হইতে শীতল, গাঢ় এবং পিচ্ছিল আশ্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে।

**রক্তজত্রণ**—প্রবালের স্থায় বর্ণ বিশিষ্ট, কৃষ্ণ-ফোট পীড়কাবৃত, তীক্ষ্ণকার গন্ধি, সবেদন, ধূমায়নশীল এবং রক্তস্রাবী। রক্তজত্রণে পিত্তজত্রণের লক্ষণ ও বিস্তারিত থাকে।

**বান্ধু-পিত্তজ**—ত্রণ তোদ-দাহ যুক্ত এবং ধূমনির্গমবৎ অগ্নুভূতি যুক্ত। এই ত্রণ হইতে পীত অক্ষণ বর্ণের আশ্রাব নিঃসৃত হয়।

**বাতশ্লেষ্মাজত্রণ**—কণ্ঠীতি অর্থাৎ চুলকান বাতশ্লেষ্মিক ত্রণের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। তোদ-বেদনা বিশেষ এবং কঠিনতা এই ত্রণের অপর দুইটা লক্ষণ। বাতশ্লেষ্মজ ত্রণ হইতে শীতল এবং পিচ্ছিল আশ্রাব নিঃসৃত হয়।

**পিত্তশ্লেষ্মাজত্রণ**—এই ত্রণ পাণ্ডু-বর্ণের আশ্রাব স্রাবী, উষ্ণস্রাব, দাহ যুক্ত এবং পীতাত। গুরুত্ব ইহার অন্ততম লক্ষণ।

**বাতরক্তজত্রণ**—রক্ত, অগভীর আভিশর বেদনা বিশিষ্ট, স্পর্শানুভূতি রহিত, অগ্নিপাত এবং অক্ষণ বর্ণের আশ্রাব স্রাবী।

**পিত্ত রক্তজত্রণ**—এই ত্রণ ঘৃতমণ্ডের স্থায় বর্ণ এবং দাহ ধোয়া জলের স্থায় গন্ধ বিশিষ্ট, কোমল এবং প্রসারণশীল। এই ত্রণ হইতে রক্তবর্ণ এবং উষ্ণ আশ্রাব নিঃসৃত হয়।

**শ্লেষ্মা-রক্তজ-ত্রণ**—রক্তবর্ণ, গুরু, পিচ্ছিল, কণ্ঠযুক্ত, স্থির এবং রক্তযুক্ত পাণ্ডু-বর্ণের আশ্রাব স্রাবী।

**বাতপিত্ত-শোণিতজ ত্রণ**—এই জাতীয় ত্রণ হইতে পীতবর্ণ তরল রক্ত স্রুত হয়। ক্ষুরণ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃশূলন (দগ্ধপ করা) তোদ, দাহ এবং ধূমনির্গমবৎ অগ্নুভূতি বাত-পিত্ত শোণিতজ ত্রণের অপরাপর লক্ষণ।

**বাত-শ্লেষ্মা শোণিতজ ত্রণ**—কণ্ঠযুক্ত, ক্ষুরণশীল, চুমচুময়মান অর্থাৎ চিম্-চিমি জাতীয় বেদনা বিশিষ্ট এবং পাণ্ডু ঘন রক্তস্রাবী।

**শ্লেষ্মা-পিত্ত শোণিতজ ত্রণ**—দাহ, পাক, রক্তমা এবং কণ্ঠযুক্ত শ্লেষ্মা-পিত্ত-শোণিতজ ত্রণ ও পাণ্ডু-ঘন রক্তস্রাবী।

**বাত-পিত্ত-কফজ**—অর্থাৎ সন্নি-পাতজ ত্রণে পৃথক্ দোষজ ত্রণের লক্ষণ, বেদনা এবং স্রাব বিস্তারিত থাকে।

**বাত-পিত্ত-কফ শোণিত**—ত্রণ অসহ্য দাহ বিস্তারিত থাকে। ক্ষত স্থানে মধনবৎ বেদনা অগ্নুভূত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ ক্ষুরিত হইয়া যন্ত্রণা প্রদান করে। পাক রাগ, অণু এবং স্থপ্তি অর্থাৎ স্পর্শ জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি এই ত্রণের অপরাপর লক্ষণ।

হয় প্রকার ত্রণশোধের লক্ষণ, পোথের আম, পচামান, পক্ষাবস্থা এবং চতুর্দশ প্রকার ত্রণের লক্ষণ বলা হইল। অতঃপর ত্রণশোধ এবং ত্রণের চিকিৎসা বলা হইতেছে।

### ত্রণ-শোধ চিকিৎসা ।

ত্রণ-শোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই চিকিৎসার বিধান করা উচিত, উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে । ত্রণ-শোধ চিকিৎসার প্রথম উপক্রম বিস্মাপন । যে সমস্ত উপক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিলে এক দেশোখিত শোধ বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ স্থান সংশ্লিষ্ট দোষ বা দোষ-সংঘাত তরল হইয়া রক্তশ্রোতে মিলিয়া, রোমকূপ পথে বা স্বাস পথে বা সর্ক-প্রকার মলায়ন দিয়া বাহির হইয়া যায় তাহার নাম বিস্মাপন । বিস্মাপন শব্দের একটি পারি-ভাষিক অর্থও আছে । সেই অর্থে শোধ বিলয়নের নিমিত্ত শোধ যুক্ত স্থান অসুষ্ঠ, পানি-তল বা বেগুন ( বাঁশের কঞ্চি ) দিয়া মর্দন করা বুঝায় । সেই পারিভাষিক বিস্মাপন অজ্ঞাতম বিস্মাপন । বস্তুতঃ “বিস্মাপ্যতে অনে-নেতি ব্যুৎপত্ত্যা বহিঃ-পরিমার্জন-রূপে শমনে, শোধ-বিলয়ন-কর-প্রলেপ-পরিবেকাত্মকদাবি বর্ততে” । ফলতঃ অচিরোখিত অবিনশ্

আমশোধ লয় করিবার জন্ত পারিভাষিক বিস্মাপন এবং আর যে যে উপায় অবলম্বন করা হয় তাহার নাম বিস্মাপন ।

ত্রণ-শোধ চিকিৎসায় দ্বিতীয় ক্রম—অব-সেচন । জলোকাদি দ্বারা রক্তবিস্রাবণের নাম অবসেচন । ত্রণ-শোধযুক্ত স্থানে দোষ-হর কাথ আদি সেচন করাও অবসেচনোপক্রম ।

তৃতীয় ক্রম—উপনাহ । শোধ পাকাইবার জন্ত যে যে উপক্রম অবলম্বন করা তৎসমু-দয়ের সাধারণ নাম উপনাহ ।

উক্ত তিনটি উপক্রম, আম-পচ্যমান এবং পকশোধ-বিষয়ক । অপতর্পণ, আলোপ, পরিবেক, অভ্যঙ্গ, শ্বেদ, বিস্মাপন ( পারি-ভাষিক ) উপনাহ, পাচন, বিস্রাবণ শ্বেদ, বমন এবং বিরচন এই কয়েকটি উপক্রম উক্ত ত্রিবিধ উপক্রমের অন্তর্ভুক্ত । (ক্রমশঃ)

কবিরাজ,

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কবিরত্ন ।

### অগ্নি ।

জীবজন্তুর জীবন ধারণোপযোগী অসংখ্য পদার্থের মধ্যে বায়ু, অগ্নি ও জল অতি প্রয়ো-জনীয় । আবার এই পদার্থত্রয়ের মধ্যে বায়ু সর্বপ্রধান, কারণ অগ্নি ও জল ব্যতীত তবু হই একদিন জীবন ধারণ করা যায়, বায়ু ব্যতীত এক মুহূর্তও জীবিত থাকি যায় না, কিন্তু তা বলিয়া অগ্নি এবং জলের প্রয়ো-জনীয়তাও বড় অল্প নহে, ধনীমুত নীতে দেহ আড়ষ্ট এবং প্রথর হব্যোক্তাপে তুচ্ছ উপস্থিত হইলে, অগ্নি ও জলাভাবে কিরূপ রোগ হয়,

তাহা সহজেই অনুমের । কেবল তাহাই নহে, অগ্নি ও জলাভাবে আমাদের নিত্য-ব্য-হার্য্য খাদ্য জীব্যের রন্ধনাদি পাকক্রিয়া সমাধা বা তদভাবে আমাদের জীবনধারণও অস-ম্ভব হয় । যেমন-বাহ্যহাণীই সঞ্চল-তণুল ও মাংস-বাহ্যনাদি অগ্নিপক হইয়া খাদ্যোপযোগী হয়, তদ্রূপ উন্নতির অগ্নি জলদ্বারা সেই খাদ্য আবার পরিপক হইয়া রসরসকারি সার পদার্থে পরিণত হয় এবং সেই সকল সার পদার্থই শরীরের ধারণ ও পোষণ ক্রিয়া নির্বাহ করে

অতএব কেবল বায়ু বলিয়া নহে বায়ুর জ্ঞায়  
অগ্নি এবং জলও আমাদের জীবন। দেহের  
যে অগ্নি পানাহারের পাচক, তাহাই ঔষধ  
পথ্যের পরিপাচক। যেমন পানাহারে শরীরে  
রসরক্তাদি সার পদার্থ উৎপন্ন ও বলবীৰ্য্যাদি  
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঔষধ পথ্য দ্বারাও শরীরে  
রসরক্তাদি পদার্থ উৎপন্ন ও বলবীৰ্য্যাদি বৃদ্ধি  
প্রাপ্ত হয়। সেই জন্তই আয়ুর্বেদে বলা হই-  
য়াছে—

সারমেতচিকিৎসারঃ পরমশেষঃ পালনম্।

তন্মানুষ্যজ্ঞেন কৰ্ত্তব্যং বহুস্ত প্রতিপালনম্॥

যত্নের সহিত কায়ায়ির রক্ষণ ও পালনই  
চিকিৎসার সার ও চিকিৎসকের শ্রেষ্ঠ কৰ্ম্ম।  
কারণ অগ্নি দুৰ্ব্বল বা নিস্তেজ হইলে, ঔষধ  
পথ্যই পরিপক হয় না, দেহ শীতল হইয়া নাড়ী  
ছাড়িয়া যায়। তজ্জন্ত আয়ুর্বেদে চিকিৎসক-  
গণকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—

অন্ত দোষশতং জুহুং সন্তি ব্যাধিশতানি চ।

কায়ায়ির্দেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্॥

শরীরে শত কুপিত দোষই থাকুক বা  
শত ব্যাধিই থাকুক, অগ্রে কায়ায়ির রক্ষণ ও  
পালন কৰ্ত্তব্য, কারণ অগ্নিই দেহের প্রদীপ  
স্বরূপ, অগ্নি অভাবে সেই জীবন-প্রদীপ  
নিবিয়া যায়। কায়ায়ির এক নাম পিত্ত,  
পিত্ত দেহের তাপ। যে তাপ কিতাদি অষ্ট-  
প্রকৃতি-বিশিষ্ট জগদবয়বের দেহে তেজ বা  
স্বৰ্ণ্যরূপে অধিষ্ঠিত, যে তাপ প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর  
মধ্যে অগ্নিরূপে অধিষ্ঠিত, যে তাপ প্রদীপে  
দীপালোক নামে অভিহিত, যে তাপ তড়িতা-  
লোক ও গ্যাসালোক রূপে অধিষ্ঠিত, সেই  
তাপই দেহে পিত্তরূপে অধিষ্ঠিত—

অগ্নিরেব শরীরে পিত্তাত্ত্বগতঃ কুপিতাকুপিতঃ

তত্তত্ততানি কৰোতি।

চরক।

অগ্নিই শরীরে পিত্তের অন্তর্গত থাকিয়া  
কুপিত হইয়া অগ্নিত ও অকুপিত থাকিয়া গুত  
বা অমঙ্গল ও মঙ্গল বিধান করে। তবে অগ্নি  
ও পিত্ত উভয়ের প্রভেদ আছে,—অগ্নিতে যে  
আলোক বিद्यমান, পিত্তে তাহার অভাব,  
কিন্তু অগ্নিতে যে তেজ, তাপ ও জ্যোতি বিদ্ভ-  
মান পিত্তে তাহার সত্তাব। সুতরাং তেজো-  
ধর্ম্মী পিত্তই দেহের অগ্নি বা স্বৰ্ণ্য। দেহ  
ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ-বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। “ব্রহ্মাণ্ডে  
যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে” ব্রহ্মাণ্ডে  
যে সকল গুণ বিদ্ভমান, দেহেও সেই সকল  
গুণ বিদ্ভমান। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মক্ষৎ ও  
ব্যোম এই পঞ্চভূতের যে গুণ তাহা জীবদেহেও  
বিদ্ভমান, তবে সেই সকল গুণের তারতম্য  
অবশ্যই আছে, আর সেই জন্তই জগতে অসংখ্য  
বৈচিত্রময় দ্রব্যের সৃষ্টি।

জাগতিক সকল দ্রব্যই পঞ্চভূতাত্মক, কিন্তু  
সকল দ্রব্যে তাহাদিগের গুণের পরিমাণ সমান  
নহে। তদ্রূপ পিত্ত দেহের অগ্নি বা স্বৰ্ণ্য  
হইলেও পিত্তে অগ্নি বা স্বৰ্ণ্যের সমস্ত গুণ সম-  
ভাবে নাই। আর সেইজন্তই পিত্ত স্বৰ্ণ্য এবং  
অগ্নির সমধর্ম্ম হইলেও অগ্নি এবং স্বৰ্ণ্যেরই  
অধীন। যেমন জ্যোতির্ম্ময় স্বৰ্ণ্যকান্তমণির  
সংস্পর্শে স্বৰ্ণ্যোত্তাপ ঘনীভূত হইয়া অগ্নিতে  
পরিণত হয়, তদ্রূপ স্বৰ্ণ্যোত্তাপ সংস্পর্শে জীব  
জন্তর দেহের তাপ ঘনীভূত হইয়া জুহুয় পিত্ত  
ও মর্শনাদি ক্রিয়া নির্বাহ করে। স্বৰ্ণ্যোত্তাপে  
যেমন জগতের প্রকাশ, তদ্রূপ জীবজন্তরও  
প্রকাশ (আগরণ) এবং ক্ষুণ্ণিপাসারও  
প্রকাশ অথবা স্বৰ্ণ্যোত্তাপে জীবজন্তরও উদয়  
এবং তৎসঙ্গে ক্ষুণ্ণিপাসারও উদয়। স্বৰ্ণ্যের  
প্রথরোত্তাপে উদয়গ্নি উদীপিত হইয়া  
পিপাসার উদ্রেক করে।

সূর্য্যে যে সকল গুণ বিদ্যমান, তাহাই  
নীভূত হইয়া অগ্নিতে পরিণত হয়, তজ্জন্ত  
সূর্য্যালোকের জ্বালা দীপালোক, গাসালোক ও  
চিহ্নিতাণেকে রজনীর অন্ধকার বিনাশ করে।  
পিত্ত শব্দে বাহ্য তাপিত হয় বা তাপ প্রদান  
করে, তাগাকে বুঝায়। এই পিত্ত, সূর্য্য বা  
অগ্নিরই তাপ এবং বায়ুর গতিশক্তি বা স্পন্দন  
ও কম্পন হইতে সেই তাপের উদ্ভব। বিকৃতি  
পারা, প্রকৃতি নির্মাতা হয়। জর দেহের  
স্বাভাবিক তাপের বিকৃতি। বিকৃতি শব্দে  
হাস, বৃদ্ধি। দেহের স্বাভাবিক তাপ ৯৮°  
ডিগ্রী, জরে সেই তাপের বৃদ্ধি এবং জর  
বিচ্ছেদে শরীর শীতল হইলে সেই তাপের  
হাস, এ উভয়ই দোষের—উভয়ই প্রকৃতির  
বিকৃতি। পরন্তু এই হাস ও বৃদ্ধির যে মধ্য-  
বর্তী অবস্থা, তাহাই সামান্যতা এবং এই  
অবস্থাই জরবিহীন অবস্থা। এই যে বিকৃতা-  
বস্থা ইহা হইতেই প্রকৃতিবস্থা জন্মগ্রহণ করে।  
বায়ু। নুলা বাহুল্য সে অবস্থার ও হাসবৃদ্ধি  
বিদ্যমান থাকে, তবে এত অল্পমাত্রায় থাকে  
যে তাহা সহজে জন্মগ্রহণ করে। বায়ু না। জর,  
দেহের স্বাভাবিক তাপেরই বিবৃদ্ধি এবং  
বায়ুর স্পন্দন বা কম্পন হইতেই উহার উদ্ভব,  
আর তাহার ফলে শ্বাস প্রশ্বাস ও নাড়ী  
ক্রমবেগে স্পন্দিত হয়। অতএব বায়ুর  
স্পন্দন বা কম্পন হইতেই তাপের উৎপত্তি  
এবং যেখানে বায়ু নাই, সেখানে গতিশক্তি  
বা কম্পন নাই, আর যেখানে গতিশক্তি বা  
কম্পন নাই, সেখানে তাপও নাই, সুতরাং  
তাপ সর্ব্বতোভাবে বায়ুর অধীন।

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, আকাশ  
হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে  
কলের এবং কল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।

ঋষির কথা যে সত্য, বায়ু হইতে তাপের  
উৎপত্তিই তাহার প্রমাণ। যেমন বায়ুর  
কম্পন হইতে তাপের উদ্ভব, তদ্রূপ আকাশ  
হইতে বায়ুর উদ্ভব এবং জাগতিক সকল বস্তুই  
আকাশ পদার্থের পরিণাম। আকাশই বায়ুর  
চলন গুণে ও চাপে সমুৎপন্ন হইয়া উঠে ও তাহা  
হইতে তেজস্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই তেজ-  
স্তত্ত্বও বিশ্বপরি-চালনী মহাশক্তির একটি  
প্রধানতম অঙ্গ। বেদান্তে বহুস্থানে এই  
তত্ত্বকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবার উপদেশ  
প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব  
সাধনার একটি প্রধানতম অবলম্বন। বৈদিক  
উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা গায়ত্রী, সেই  
উপাসনাও তেজস্তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া,  
তদ্ব্যতীত বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি সকল ক্রিয়া-  
কাণ্ডেই অগ্নি ব্যতীত উপাস্যস্তর নাই।  
অগ্নিই এই সকল সাধনার প্রধানতম অব-  
লম্বন। তত্ত্ব বলেন, আমাদিগের দেহস্থ  
অগ্ন্যাদার যে মণিগুণ পদ, তাহার ধারণা ও  
সাধনা মনঃসংগম ও ঈশ্বর তত্ত্ব উপনীত  
হইবার প্রধানতম উপায়। এইরূপ কি  
সাধন বিষয়ক, কি বিজ্ঞান বিষয়ক সকল  
শাস্ত্রেই সর্ব্বত্র তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব প্রধানতম  
স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

অগ্নির স্থান কেন এত উচ্চে অগ্নির ক্রিয়া  
ও গুণ আলোচনা করিলে, তাহা বুঝা যায়।  
বিশ্বপ্রকাশের প্রধানতম বিভাব, রূপের  
প্রকাশ। বিশ্বপ্রকাশ বর্ণিতে গেলেই আমরা  
সাধারণতঃ রূপের প্রকাশ বুঝি। জাগতিক  
বস্তু সকলকে রূপ প্রদান করা তেজের কার্য।  
জগতের উপাদানভূত মূলপদার্থ সকলকে  
তেজ উপযুক্ত পরিমাণে পাতিত করিয়া বিভিন্ন  
বস্তুর রাসায়নিক সংশ্লেষণ বিচ্ছেদে রাসায়নিক

একটি নূতন পদার্থ সংগঠন ও প্রকাশমান করে। এইরূপে বস্তু সকল প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত বা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া জগৎকে বহুরূপে প্রকাশমান করিতেছে। বস্তু সকলকে রূপান্তরিত বা পরিণামিত করা তেজের কার্য্য, আবার পরিণামিত রূপ সকলকে প্রকাশিত করাও তেজের কার্য্য। বায়ুর চলন গুণে তেজ ও চলগুণ-বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ ও প্রকাশ্য উভয়বিধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। শাস্ত্রকারগণ বলেন ;—

“তৈজসাস্ত রূপং রূপেন্দ্রিয়ং বর্ণঃ সন্তাপে  
ব্রাহ্মিযুতা প্তিরমর্থৈক্যঃ শৌৰ্য্যকঃ”।

হৃদ্য—তেজের আধার, রূপ, বর্ণ, তাপ, প্রকাশমানতা, পরিণাকশক্তি, অমৰ্ষ, তীক্ষ্ণতা ও শৌৰ্য্য ইহারা হৃদ্যতেজেরই বিকার বা অবস্থান্তর। রূপের ঘনীভূতাবস্থা আলোক বা অগ্নি। হৃদ্যোত্তাপে বস্তু দগ্ধ হয় না, কিন্তু হৃদ্যকাস্ত মণির সংযোগে হৃদ্যালোকে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া অগ্নি উৎপাদন ও বহ্নাদি দগ্ধ করে। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত, কবিত্ববর্ণ।

### অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিভাগলয়ের

জন্ম যে সকল মহাত্মা মাসিকদান, ও এককালীন দান করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন এবং আয়ুর্বেদের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত টাকার উল্লেখ করিতেছি—

### মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন  
অধ্যাপক, এম, সি, কলেজ শ্রীহট্ট ২৭  
,, অধ্যাপক এ, হাকিম ... ৪৭  
,, জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল,  
পূর্ণিয়া ২৫৭  
,, ডাঃ এস, সি, চক্রবর্তী আই, এম, এস  
শ্রীহট্ট ... ২৭  
,, ডাঃ ডি, এন, মুখোপাধ্যায়, কটক ১০৭  
,, এচ সান্যাল অমরাবতী-বেরার ... ৩৭  
,, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বল্লভোপাধ্যায়,  
হাবড়া ২৭  
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ  
বি, এল, উকীল হাইকোর্ট, তবানীপুর ২৫৭

শ্রীযুক্ত স্বধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

,, ডাঃ মদনমোহন দত্ত ১০৭

,, ডাঃ মনমথনাথ মুখোপাধ্যায়

এম, এ, বি-এল, উকীল হাইকোর্ট  
৪৪, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, মাসিক ২৫৭ হিঃ—১৫০৭

### এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত এন, সি, সেন স্কোয়ার, বার-এন্ট-ল,  
১ম দফায়—২০৭

,, যমুনাদাস গোয়েনকা ৩, বেরারাপাটা ১৬৭

ডবলিউ সি, গ্রেহাম ... ১০০৭

শ্রীযুক্ত হিরণ্যমোহনদাশগুপ্ত উকীল, বগুড়া ৫৭

,, প্রবোধচন্দ্র রায় ... ৫০৭

,, তারণকৃষ্ণ লস্কর ৬, উইলিয়মস স্ট্রীট

কলিকাতা.....১০০৭

,, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ৪ বলরাম বহর

ফার্ট লেন, ১ম দফা—২০৭

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় ১০০০

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চৌধুরি

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি

জমিদার নিমতিতা

(ক্রমশঃ)

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

১ম বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৩—অগ্রহায়ণ ।

৩য় সংখ্যা ।

বঙ্গালার স্বাস্থ্যানুতি সর্বাগ্রে কর্তব্য ।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মৰুৎ, ব্যোম—  
এই পাঁচটির পাঁচটিতেই আমরা সাধারণ  
ভারতবাসী—বিশেষতঃ বঙ্গবাসী, নানারূপে  
বিভূষিত। আমরা শুষ্ক মাটিতে বাস করিতে  
পাই না; হ্রান পানের জন্ত পরিষ্কার জল  
পাই না; পল্লীগাম জলি জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া  
উঠিতেছে—প্রচুর স্বর্ধ্যালোক আসে না।  
মাটি পচায়, গাছ পচায়, বায়ু অনেক স্থানে  
দূষিত হইয়াছে, আমরা বিস্তৃত বায়ু সেবন  
করিতে পাই না। রোগ-ক্রিষ্ট, শোক-দষ্ট,  
অনাভাবে শীর্ণ, অকালে জীর্ণ, কোটি কোটি  
নরনারীর অন্তরবে আকাশ পর্যন্ত বিদূষিত  
হইয়াছে, শূন্য প্রাণে শূন্য পানে চাহিয়াও  
আমরা ম্লাননা পাই না। হৃদশায় আমাদের  
শান্তি স্বস্তি অর্জিত হইতে বসিয়াছে। কি  
করিব, আমরা নির্দোষিত সদস্যপূর্ণ মঙ্গল সত্তা  
লইয়া? কি করিব, কমিটি, বোর্ড, কোমিশন  
লইয়া? কি করিব, উচ্চ, নীচ, মূল্য, হ্রাস, উন্নতি,  
শিক্ষা লইয়া? কি করিব, সভাগৃহ মধ্যে রাজ-  
কর্মচারীদিগকে অবোধে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা

লইয়া? আর কি করিব, 'রাজা' 'রায়'  
বাহাদুর' 'সায় হইয়া? আমরা তৃষ্ণার জল  
পাই না, শীতে রৌদ্র পাই না, বাস্তব মাটি  
পাই না, গ্রীষ্মে বিস্তৃত বাতাস পাই না;  
আমরা যে জরে উজাড় হইতে বসিয়াছি,  
আমরা যে পুষ্টিহীন প্রচুর আহার অভাবে দিন  
দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছি। ডেজাল খাওয়া  
খাইয়া আমাদের যে নিত্য দেহের বল  
কমিতেছে, হৃদয়ের সাহস টুটিতেছে, প্রাণের  
ক্ষুষ্টি ঘুচিতেছে।

রাস্তা, বাধ, জাঙ্গাল, সড়ক—সমগ্র  
ভারতে নিতাই বাড়িতেছে। গোলোক  
বাঁধার মত পথের অটলতার লক্ষ্য হির  
রাধিতে পারি না। স্থল পথের কিঞ্চিৎ  
জুসার হইয়াছে বটে কিন্তু জল নিকাশীর  
পথ প্রচুর না থাকায় বস্তার জল স্তব্ধ জল  
বাহির হইতে পারে না। মাটিতে ক্রমাগত  
জল বসিতে থাকে; কাজেই ভূমি হইয়াছে  
ম্যালেরিয়ার বিহার ক্ষেত্র। শুষ্ক ভূমিতে  
বাস করিতে চিকিৎসক উপদেশ দেন, কিন্তু

ভূমিতে জল বসিলে, ভূমি শুষ্ক থাকে কিরূপে ?  
সুতরাং বাস্তব ভূমি সকল বিকৃত হইয়া উঠি-  
রাছে। আবাব নদী গর্ভ ক্রমে ভরিয়া  
উঠিতেছে,—তবে বল দেখি, এ দেশের আর  
মঙ্গলের আশা কোথায় ?

পূর্বে ধনী মধ্যবিত্তের ধর্ম-প্রাণতা ছিল,  
পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও নব পুষ্ক-  
রিণীর প্রতিষ্ঠা প্রায়ই হইত; এখন আর  
সে ধর্ম-প্রাণতা নাই—কিন্তু প্রাণরক্ষা তা  
চাই; ভাল জলের সংস্থান না করিলে নদী  
বিহীন পরীগ্রাম টিকিতেই পারে না। এ  
বিষয়ে সকলের মনোযোগী হওয়া কর্তব্য।  
তাহার পর দেশে জঙ্গল বাড়িতেছে। কতক  
আমাদের উদাসীনতায়, কতক আমাদের  
আলস্যে, আর কতক আমাদের লোভে।  
বাগাত জমিতে গাছ পালা চিরকালই আছে  
ও থাকিবে; কিন্তু বাস্তব উদাস্ত—আমরা  
লোভ পরবশ হইয়া আমের কলমে লিচুর  
কলমে ভরিয়া ফেলিতেছি। যাহার জমি আছে  
সে বাগান ককক, কিন্তু বাস্তব উদাস্ত জঙ্গল  
করিও না। মাঠাল জমিও বাগাতে পরিবর্তন  
করিও না। জঙ্গলে ভূমি শুষ্ক হইতে পায়  
না, তাহাতে বাস্তব বিলক্ষণ কৃতি হয় এবং  
ক্ষেত্রে বাগান করিলে শস্য-সম্ভার কমিয়া  
যায়। আগাছা একটু বড় হইলেই পূর্বে  
লোক কাটিয়া ফেলিত; এখন পাথুরে কয়লা  
জালাগি হওয়ায়, আগাছার তত টান নাই,  
বড় বড় আগাছার নগরের ও গ্রামের উপকণ্ঠ  
একবারে ভরিয়া উঠিতেছে। আলস্যে  
ও উদাসীনতায়, আমরা সেগুলি কাটাইবার  
যত্নোবস্ত করি না। কিন্তু না করিলে আর  
চলে না। আপনার অবস্থা, আপনার  
গ্রামের অবস্থা, আপনার জেলার অবস্থা—

ধীরে স্নেহে বিবেচনা করিয়া দেখ; দেখিলে  
বেশ বুঝিতে পারিবে, আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট  
হওয়ায়—আমাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট  
হইতেছে। যাহাতে আপন গ্রামে, আপন  
ভিটায়, আমরা সুস্থ শরীরে বাস করিতে  
পারি, তাহার চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে।  
নদী গুলির বহতা বজায় রাখিতে হইবে,  
পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে, বাটীর  
আশেপাশের জঙ্গল কাটাইয়া ফেলিতে  
হইবে।

শরীর বহিলে, ধর্মসাধন হয়, লোক-যাত্রা  
সাধন হয়; শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন  
কিছুই হয় না। কোন কিছু ভালও লাগে  
না। যাহাতে সুস্থ শরীরে নিজের ভিটায়  
বাস করিতে পার, তাহার জন্ত প্রথমে নিজে  
চেষ্টা কর, জঙ্গল কাটাইবার পরমা না জুটে,  
প্রত্যহ স্বহস্তে নিজে কাটিতে থাক; তাহার  
পর প্রতিবাসীর জঙ্গল কাটাইবার জন্ত,  
জনের জনের বাড়ীতে গিয়া, হাতে পায়ে  
ধরিয়া তাঁহাদিগকে বন কাটাইতে লওয়াও।  
গ্রামের মাথাল মাথাল লোকদের বল,  
কাঁড়ীর জমাদারকে বল, থানার দারোগাকে  
বল, নদী বহতা করাইবার জন্ত জমিদার  
মহাশয়কে বল, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে  
বল, লাগিয়া পড়িয়া থাকিলে পাহাড় টলান  
যায়।

শিক্ষা বল, বিজ্ঞা বল, গুণপণা বল, ধন  
বল, যশ বল,—শরীর বহিলেই, সব।  
যাহাতে আমরা সেই শরীর সুস্থ রাখিয়া  
হুঁমিন বাঁচিতে পারি—তাহার জন্ত অগ্রে  
আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টাকে  
“আত্মজ্ঞান নীতি” বলিতে হয় বল, প্রজাতির  
বলিতে হয় বল,—এই জন্ত রাক্ষস পুত্রদের



নিকট যে ক্রন্দন আবেদন নিবেদন—তাহাকে ‘রাজনীতি’ বলিতে হয় বল—কিন্তু এই চেষ্টা এখন কিছু দিন করা চাই। সৰ্ব্বরূপ আন্দোলনে বিশ্রাম দিয়া এই কার্যে লাগিয়া যাও; উদাসীনতায়, আলস্যে, নির্বুদ্ধিতায়, আসল খোয়াইয়া নকলের জ্ঞান লালারিত হইওনা।

সমস্ত ব্যঞ্জে কথা ও কাজের কথা ফেলিয়া রাখিয়া আমাদের বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা অগ্রে ভাবিতে হইবে। বাহার বতটুকু সাধ্য স্বাস্থ্যোন্নতির জ্ঞান তাহাকে ততটুকু চেষ্টা করিতে হইবে। যে মহাপুরুষ—তিনি সন্ন্যাসী হউন, গৃহী হউন, হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, ব্রাহ্ম হউন খৃষ্টান হউন, বাঙ্গালী সাধারণের মন এ বিষয়ে লাগাইয়া দিতে পারিবেন,—তিনিই দেশের প্রকৃত বন্ধু। আমরা অস্বাস্থ্য-তরঙ্গে নিমজ্জমান হইতেছি, হাবু ডুবু থাইতেছি,—অগ্রে আমাদের উদ্ধার সাধন কর, তাহার পর আমরাদিগকে অল্প উপদেশ দিও। এই এত কাল ধরিয়া বাঙ্গালার মাসিক পত্র পথ্যালোচনা করিলাম, কই একথার গুরুত্বের উপলব্ধি ত কোথাও দেখিলাম না! সংবাদ পত্রেও এ সম্বন্ধে আলোচনা হয় না, কেবল “অমৃত বাজারে” কিছু থাকে, হ’এক খানা বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে ও একটু আধটু স্বাস্থ্যের কথা থাকে—কিন্তু প্রাণের কথা প্রাণ দিয়া লেখা ত দেখিতে পাইনা! অমৃত বাজার বলেন—“কলিকাতার লোকে জল-কষ্ট বা অন্ন-কষ্ট কিছুই বুঝে না, সেই জন্ত কিছুই লেখে না।” তবেই ত, কলিকাতা আমাদের মাথা—মাথার না লাগিলে মাথা ব্যথা হইবে কেন? কলিকাতার বড় লোকদের সাহায্য যদি না পাওয়া যায়, আমরা এই মধ্য ভ্রমণীর সম্মুখীন—

আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারি না কি? নাই বা হইলাম “রামমূর্ত্তির” মত জোয়ান, হরেন্দ্র বাবুর মত বক্তা, ডাক্তার বোধের মত আইনজ্ঞ, ঠাকুর কুমারের মত ধনশালী, আমরা সামান্য লোক—এই সামান্য বল, বিজ্ঞা, বুদ্ধি, বিত্ত লইয়া, প্রতিজ্ঞনে চেষ্টা করিয়া, আমাদের নষ্ট-স্বাস্থ্য কিরাইয়া আনিয়া, একটু আরামে দুইদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি না কি?

বঙ্গদর্শনের আমল হইতেই আমি এই স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু অলস বাঙ্গালী কথাটা শুনিয়া ও শুনে না। তাই আমাদের হেম, নবীন অকালে মরিয়াছে, রামেন্দ্র, প্রফুল্ল—যোবনেই বুড়া হইয়াছে, আমার কর্ম ক্ষেত্রের সঙ্গী আর কেহই বাঁচিয়া নাই। আছে—এক পাঁচকড়ি, বাঙ্গালীর হৃৎথ ব্যথা সে কতকটা বুঝিয়াছে, বাঙ্গালীর কথা সে শুছাইয়া বলিতে পারে, কিন্তু হৃৎথের বিষয়, যাদের জন্য সে কঁাদে, তারা তাকে চিনিতে পারিল না।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কলিকাতার কবিরাজ মহাশয় ত “আয়ুর্বেদ” বাহির করিলেন,—বুড়া হইয়াছি, মঙ্গলকামনা করিতে পারি—কামনা পূর্ণ হউক। আমি ত কয়েক বৎসর ধরিয়া একঘেয়ে কান্না কাঁদিয়া স্বাস্থ্যে ও সাহিত্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি, মানব-স্বাস্থ্য বাঁহাদের বেদ—আমার চেয়ে তাঁরা কথাটা ভাল করিয়া লোককে বুঝাইতে পারিবেন।

বাহারা “আয়ুর্বেদ” পরিচালনা করিবেন, আমি তাঁহাদের সকলকে চিনি না। তবে যে দুইজন কর্ণধার হইয়া ভাপকদের ন্যায়

নাম লিখাইয়াছেন—তাঁহাদের চিনি। যামিনী-  
ভূষণ—প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় চিকিৎসা-বিজ্ঞা-  
নেই কৃত-বিত্ত। বিরজা চরণ—কুচবিহারের  
রাজ-বৈদ্য,—আমার পরম প্রীতি-ভাজন প্রবীণ  
সাহিত্য-সেবী অধিকাচরণ গুপ্তের কনিষ্ঠ।  
আয়ুর্বেদের এই দুই কর্ণধার,—ইহাদের  
উত্তর-সাধক আমার প্রিয় ছাত্র—ছকণ কাটা  
ব্রজবল্লভের উজ্জল মস্তব্য, হৃদয় বিশ্লেষণ, অমূল্য  
ইঙ্গিতে স্বাস্থ্য যেমন হিতকারী, সাহিত্যে  
তেমনই মনোহারী। তাই প্রবন্ধ লিখিতে

বসিয়া আমি—এই ত্রিমূর্তিকে শাটফিকেট  
দিয়া ফেলিলাম।

বাস্তবিক, আয়ুর্বেদ পড়িয়া আমার বড়  
আনন্দ হইয়াছে। প্রাচীন মতের অমূর্তন—  
চিরদিনই আমাদের পক্ষে মঙ্গল জনক। বান্ধা-  
লীয় স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হইলে; কাবাব  
কাটলেটের মমতা ছাড়িয়া, আবার তাহাকে  
ঋবিহস্ত প্রসারিত পলতার ডালনার ভর্তু  
হইতে হইবে।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার।

## আমাদের কথা।

—\*—

সহদিন—বহুদিন পরে, মায়ের ছেলে  
আবার মায়ের ঘরে কিরিয়া আসিয়াছে!

তিমির-কুটীলা রজনীতে, কাহাকে ও না  
বলিয়া, সে যখন অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিয়া-  
ছিল, তখন তাহার কোতুক-তরল নেত্রে  
“নূতনের” মোহ! সে তখন ভাবে নাই—  
এই মোহই একদিন তাহার সোণার সংসার  
আশানে পরিণত করিবে! ঝঙ্কারুজ্জিত ধর-  
ণীর প্রলয়ান্বিতার মধ্যে—তাহার সেই গুপ্ত-  
পদক্ষেপ, তখন কেহ শুনিতেও পায় নাই।

অনেক দ্বারের লাক্ষনা সহিয়া,—আপনার  
সমস্ত সঞ্চয় শূন্য করিয়া, শ্রাস্তদেহে, মলিন  
মুখে, আজ সেই হৃদয়সর্বস্ব হতভাগ্য মাতৃ-  
মন্দিরের সিংহদ্বারে কিরিয়া আসিয়াছে!  
কিন্তু কে, তাহার অভ্যর্থনার জন্ত, পুরদ্বারে  
ত তুষ্পধ্বনি হইল না? মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া,  
জলের ঝারি দিয়া, লজ্জা-ললিত মুখের অব-  
জ্ঞান সরাইয়া, কুলবধূণ ত তাহাকে বরণ  
করিতে আসিল না? তাহাকে পথ দেখাই-

বার জন্ত চন্দ্রশালার চূড়ে দীপালোক জ্বলিয়া  
উঠিল না? হায়! সমস্ত আপনার জন কি  
আজ তাহার এত পর হইয়া গিয়াছে!

অনুতপ্তের স্পর্শে—কঙ্ক দ্বার সশব্দে খুলিয়া  
গেল। পলাতক পুত্র বড় ভয়ে ভয়ে সেই  
জনশূন্য বৃহৎ পুরীর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রবেশ  
করিল। দেখিল—পুষ্পিত গুল্মলতার শ্রাম্য-  
মান বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন—অতীত গৌরবের আশান  
ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে! সে বাটীর আর  
কেহই বাচিয়া নাই! যাহারা মরিয়াছে—  
তাহাদের চিতা চুল্লীর অর্দ্ধদগ্ধ চন্দন কাষ্ঠ  
হইতে তখন ও ধূম নির্গত হইতে ছিল। সেই  
নির্দোষিত-প্রায় অগ্নির প্রেতালোক “কঙ্ক-  
কীর” মত কুমারকে পথ দেখাইল। সে  
প্রতিকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতে লাগিল,  
অক্ষয় ভাণ্ডার এখনও অনন্ত রত্নে পূর্ণ।  
তাহার সমস্ত ঐশ্বর্যই অবিকৃত, কেবল অনেক  
দিনের অনাদরে বিশৃঙ্খল। এখন ও সেই  
পরিতাপ্ত ভ্রম্মাসনে—কতকগুলি দীর্ঘ

দষ্ট পুঁথি—“বকের” মত তাহার অমূল্য সম্পত্তি রক্ষা করিতেছে। যে, মার কোল ছাড়িয়া যুবক চলিয়া গিয়াছিল, উদাসীন সন্তানের মঙ্গল কামনায় সেই মা প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় দেবতার দ্বারে যে মাথা খুঁড়িয়াছিল, এখনও কক্ষমধ্যে তাহার চিহ্ন বর্তমান! চির-প্রতীক্ষা-মীল, ক্ষুধা, পিতৃস্নেহ—অসংখ্য দর্শন বিজ্ঞানের পুঁথিতে পরিণত হইয়া অজ্ঞানের অক্ষয় কবচের মত এখনও কক্ষমধ্যে তাহার মঙ্গল ধ্যান করিতেছে!

যুবক আরও দেখিল—তাহার জন্ত যে সকল অপূর্ণ খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, এখনও তাহা তেমনই ঢাকা রহিয়াছে—মাতৃস্নেহের মন্দার-মধু তাহাকে বিকৃত হইতে দেয় নাই। তাহার আবেগ্য কল্পে সযত্নে আবৃত “জড়ী বুটীর পুঁটলী” এখনও কক্ষ গাত্রে—টান্ধান’ রহিয়াছে!

যুবক আর এক কক্ষে প্রবেশ করিল। এই কক্ষে—তাহারই জন্ত একদিন শাস্তি স্বত্বায়ন হইয়াছিল। এখনও সহকার-পল্লব-পেলব মঙ্গল-কলস গৃহ মধ্যে শোভা পাইতেছে! যুবক আর থাকিতে পারিল না, অহুতাপে তাহার বুক ফাটিতে ছিল, উচ্চাঙ্গ-কুল বেদনাপ্রসূত হৃদয় দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, কম্পিত কণ্ঠে সে চীৎকার করিয়া একবার মা বলিয়া ডাকিল! মানব নয়নের কুহেলী আবরণ ভেদ করিয়া—তাহার সম্মুখে এক দেবীমূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! যুবক দেখিল—এই ত সেই মা! মৈত্রেয় মধ্যে ও তেমনি মহিমাধারা! আমার জন্ম জন্মাত্মের অক্ষুণ্ণ স্মৃতি—আমার ভবিষ্যতের চিরোজ্জ্বল আশা, কে বলে তুমি মরিয়া গিয়াছ? তোমার ত মৃত্যু নাই! আত্মহারা হইয়া আমি

তোমায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি আমার ইহকাল পরকালের মধ্যে—নাদের বন্ধনী। তুমি আমার কৰ্ম, ভক্তি জ্ঞান—“ত্রয়ী” তুমি আমার স্নেহ হৃৎথের অভিব্যঞ্জনা—ওঙ্কার; তুমি আমার জীবনে মরণে সর্বময়ী! তুমি আমার আমিহের অধ্যাস, কৰ্মের জিজ্ঞাসা, সমাধির নিদ্রা! আমার অনাচারে তুমি জীর্ণ জড়ের মত হইয়াছিলে, সেই মোহ প্রাপ্ত মাতৃদেহ আমি চিতা শব্দায় ভুলিয়া দিয়া ছিলাম! সে চিতায় জ্ঞান বিজ্ঞান পুড়িয়া আণ্ডণ ধরাইয়া ছিলাম,—অবোধ আমি, আলো দেখিয়া, তাপে মাতিয়া, পিশা-চের মত কঙ্কালের করতালি দিয়া, চিতা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম! এখন বুঝিতেছি—সে অগ্নি মাতৃঘাতী, তাহাতে আমার দেশ পুড়িয়াছে, বিজ্ঞান পুড়িয়াছে, সর্বস্ব পুড়িয়াছে! তাই নয়ন জলে—আজ চিতা নির্বাণ করিতে আসিয়াছি। এসো মা এসো—আয়ুর্কর্ষের জীবনীয় মেহে—তোমার অঙ্গের দাহক্ষোভ শীতল করিয়া দিই। তোমার কমলবরের সমস্ত কালিমা মুছিয়া দিয়া—তাহাতে হরিচন্দন লিপ্ত করি!

“ভেবেছিছ আমি বুঝি মীন মাতৃহারা? আজ দেখি—মা ত’ কভু নহে গৃহ ছাড়া! সর্বময়ী মা আমার সর্বঘটে আছে। দিন রাত আছি আমি মায়েরই যে কাছে! নিদাঘে মা “বগী” রূপা—বট বৃক্ষ মূলে, দেশের অনাথ শিশু কোলে লন তুলে, বরষাতে “দশহরা” বকর-বাহিনী। ভূষিতে ভূষিতে—বুকে মেহ বন্দাকিনী! শরতে সারনা মাতা—হুর্ণী দর্শভুজা, লক্ষী ভেবে পুর্ণিমা করি তাঁরি পূজা! আমার আধারে “কালী” তার মা আমার করে—“বরষার” “বুড়” “বরষার”

হেমন্তে মা “জগদ্ধাত্রী”—রাজরাজেশ্বরী,  
শস্ত্র পূর্ণা বহুধরা রূপে আলো করি।  
শিশিরে মা “বীণাপানি” শত-দল পরে,  
বসন্তেতে “অন্নপূর্ণা” দক্ষী পাত্র করে!  
মা আমার বিরাজিত বড়শুভ মাঝে!  
চারিদিকে দেখি আমি মা’র মহিমা যে!”

বলিতে হইবে কি, উপকথার পলাতক  
শুবক আর কেহই নহে—আমরাই। আমা-  
দের পরিত্যক্ত ভদ্রাসন—নিখিল বিজ্ঞানের  
স্মৃতিকা-গৃহ “আয়ুর্বেদে।” আমরা পত্র হৃচ-  
নার বলিয়াছি—দেশ রক্ষা করিতে হইলে  
প্রথমেই “আয়ুর্বেদকে” বাঁচাইতে হইবে।

আমরা যে মাহুষের বংশধর, আমরা যে  
জাতির বনিয়াদ,—মোহ মদিরার মুগ্ধ হইয়া  
তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ভুলিয়া  
কীট পতঙ্গের দলে মিশিয়াছিলাম! একদিন  
আমাদেরই পূর্ব পুরুষের প্রতিভা যে জগ-  
জ্যোতি রূপে সমগ্র আধ্যাত্মকে জ্যোতি-  
র্শ্বর করিয়া তুলিয়াছিল,—তাহা আমরা  
ভাবিবার অবকাশ পাই নাই। এখন সে  
মোহ নিজা ভাঙিয়াছে। সহস্র বর্ষব্যাপী ক্লম  
বিরহের জড়তা গুচিয়াছে। প্রিয় দর্শনের  
আশার আবার আমরা মিলনের প্রভাসক্ষেত্রে  
একত্র হইয়াছি। “আয়ুর্বেদের” কথাই আমা-  
দের ক্লমকথা। আমাদের পূর্ব পুরুষের ঐশ্বর্য্য  
একদিন অরুণ কিরণে শত ময়ূখ মালায় প্রাচী-  
গগনোপাশ সমুত্তাসিত করিয়াছিল।

তাঁহাদের মহত্বের মহাশ্মশানে আজ আমরা  
দণ্ডায়মান! ভুলিয়া যাও তাই! নিশার দ্রঃ-  
প্নের কথা; ভুলিয়া যাও সে প্রবল তৈরব  
কেকনাথ, ভুলিয়া যাও সে নর কপালের খট  
মই বিকট ধ্বনি; ভুলিয়া যাও—নিশাচরের  
করাল কণ্ঠের হলহলা রব; যে চিতা-ভস্মকে

তুমি আজ সামান্ত জ্ঞান করিয়া ভাসাইয়া  
দিতেছ, তাহা ভস্ম নহে—ভারতের বিভূতি।  
সেই বিভূতি-ভূষণকে অঙ্গরাগ করিতে  
পারিলে, তুমি শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ  
করিবে।

তোমরা হয় ত বলিবে,—আয়ুর্বেদের  
উন্নতি করিতে হইলে, আবার চরক, সুশ্রুত,  
হারীত, অশ্ববেশকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।  
এ কথায় আমাদের আপত্তি করিবার ক্ষমতা  
নাই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস—বিশ্ব-সত্যের  
চিরন্তন দিবা মানব চরক, সুশ্রুত—তাঁদের ত  
মৃত্যু হয় নাই। কালধর্ম্মে তাঁহারা তিরোহিত  
হইয়াছেন, তাঁহারা আবার আসিবেন। এসো  
আমরা তাঁহাদের আগমনী শব্দ উচ্চারণ করি!  
নিশ্চয়ই তাঁহারা উত্তর দিবেন।

আমরা মন্ত্র জানিনা, হৃত্যর্থ ভুলিয়াছি,  
বহি বিসর্জন দিয়া, মৃত্যুগন্ধি অন্ধকারে জড়ের  
মত বসিয়া রহিয়াছি। কিন্তু অতীতের মোহ  
ত ভুলিতে পারি নাই। যে দিন ভাবী আশার  
কল্পনা হই চ’খ ভরা অশ্রুর আড়ালে তাহার  
সোহাগের সপ্তবর্ণ লুকাইয়াছে, সেই দিন হই-  
তেই ত অহরহ কেবল অতীত স্মৃতির রোমন্থন  
করিতেছি! অধম অযোগ্য আমরা—কিন্তু  
“মাহুষ আমরা নহিত মেঘ”। তোমরা আশী-  
র্বাদ কর—জন্মজন্মের সর্পসর্পের জ্ঞার আমরা  
“ব্যাধিসত্র” করিব। বশিষ্ঠের “পুত্রোষ্ট্র”  
জ্ঞার আমরা এদেশে বেদোষ্ট্রের অমুষ্ঠান করিব।  
আমাদের দেশ হইতে “মড়ক মহামারী” চলিয়া  
বাইবে, প্রাচীন ঋষির আত্মা আবার এদেশে  
নবজন্মে নবদেহে পুনরাবিভূত হইবে।

তোমরা আমাদের সহায় হও। আমরা  
সুত্র, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ত সূত্র নয়।  
আজ কাল, তোমাদের কাছে

আমর বাড়িয়াছে, খাল, বিল, পুকুরিণী হইতে প্রস্তর, ফলক, ধাতুমূর্তি কুড়াইয়া আনিয়া সম্বন্ধে তাহা রক্ষা করিতেছে, নষ্ট লিপির পাঠোদ্ধারের ভার লইতেছে, কিন্তু যাহা হারা-ইয়াছে—একবার সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত কুড়াইয়া আনিয়া, একাগ্রভাবে তাহাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা—একবার করিবে না কি ? “আয়ুর্কোদ” তোমাদের পুরাতন সম্পত্তি,—তোমাদের স্পর্ধার সামগ্রী, গৌরবের জিনিষ,—সেই আয়ুর্কোদকে রক্ষা কর,—মাংস্র আবার দেবতা হইবে ।

বেদের যজ্ঞে—আমরা সকলকেই আহ্বান করিতেছি, সকলেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি । বেদের দেশে জন্মিয়া, শক্তি থাকিতে যিনি এযজ্ঞে যোগদান না করিবেন—তিনি মানবের বন্ধু নহেন ! তাঁহার দেশ-হিতৈষণা শুধু বিড়ম্বনা ! এদেশের প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে—কত অসংখ্য নর নারী—ব্যাধি শয্যায় শয়ন করিয়া, আরোগ্যের আশায় শীর্ণবাহু উর্দ্ধে উৎক্লিষ্ট করিয়া, ঈশ্বর-চরণে হৃদয়ের আকুল নিবেদন জানাইতেছে; কত স্নাতকের সংসারে কত ভয়ান্ত্রী অননী—কণ্ঠ শিশুর বরণাহত স্নকুমার মেহ কোলে করিয়া বলিয়া নয়ন জলে ধরণী সিক্ত করিতেছে ! জীবনের ক্লম বসন্তে কত প্রেমিক যুবকের শেষ নিশ্বাস পৃথিবীর বুকে মিশিতেছে; কত মিলন-সুখ-ক্লম নব দম্পতীর—সাধের কুঞ্জে মৃত্যুর ঘোর বিভীষিকা দেখা দিতেছে; বৃদ্ধা জননীর মেহের ক্রোড়ে—একমাত্র বংশধর মহা নিজ্ঞার নিজিত হইতেছে, জরাবীর্ণ বৃদ্ধের শেষ অবলম্বন কালের হুংকারে ভাঙিয়া পড়িতেছে,—কই কেহই ত তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না । এদেশে মৃত্যুর কক্ষ ধ্বনিকা

দিন দিন বিসর্পিত হইতেছে, মহাকাল নিত্য নিত্য নুতন ব্যাধির আমদানি করিতেছেন, অথচ এদেশের প্রতি গৃহের পার্শ্বে,—প্রত্যেক কুটারের অন্তরে, কত সহজ, কত অনায়াস-লভ্য মহৌষধী বত্ৰমান রহিয়াছে ! স্মৃচিকিৎসার অভাবে কত, সুখ-সাধ্য রোগ—প্রাণঘাতী-ভীষণ-মূর্তিতে আত্ম প্রকাশ করিতেছে ।

আমরা যে সকল কথা লিখিলাম ইহা ত সাধারণের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য ঘটনা । দেশের এরূপ অবস্থা দেখিয়া, যাহার প্রাণ কাঁদেনা—মানবাভিধানে বোধ হয় তাঁহার নাম স্থান পাইবে না ! আমাদের বিশ্বাস—এই ব্যাধি-ব্যাপন্ন দীন দেশে কেহই আয়ুর্কোদ প্রতিষ্ঠার বিরোধী হইবেন না । তাই সাহস করিয়া আজ আমরা সকলেরই সাহায্য চাহিতেছি । যাহার যে শক্তি আছে তাহা লইয়াই আমাদের সাহায্য করণ । আমরা সাধারণের পরিচারক, যথাসাধ্য সম্ভার সংগ্রহ করিয়া, কৃতজ্ঞদিগ কৃত করপুটে ভক্তির পাত্র অর্থা লইয়া, দেশের লোকের পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিলাম । যতদিন জগতে রোগ থাকিবে, অকাল মৃত্যু থাকিবে,—ততদিন আমরা যজ্ঞমণ্ডপ হইতে কোথায় বাইব না । যখন দেখিব—একখানি শোক-মলিন মুখ ও মানব বিজ্ঞানের অপূর্ণতার পরিচয় দিতেছে না—তখন বৃন্নিব আমাদের পূর্ণাহতির কাল নিকটে আসিয়াছে ।

রত্নমালিনী রাজপুত্রীর ভগ্নাবশেষের সহিত—আমরা আয়ুর্কোদের তুলনা দিরাছি । এই বৃহৎ অট্টালিকার অনেকখান ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কত ভূমিকম্প বাত্যা, বৃষ্টি, ইহার উপর হিলোল তুলিয়াছে, কাল-ভট্টপী কালিন্দী ইহার পাদমূলে ভরসাঘাত করিয়াছে, যুগ-

যুগান্ত ধরিয়া অধিকারীর অনাদরে ইহা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও স্নদূঢ় ভিত্তির উপর ইহার বিরাট বিপুল আয়তন দণ্ডায়মান। এই ঋষি-মনীষা-রচিত কল্যাণ-মন্দিরের পুনঃ সংস্কার করিতে হইবে, স্থানে স্থানে—নূতন হর্য্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। বহুকাল ধরিয়া বাহা ভাঙ্গিয়াছে—একদিনে তাহার সংস্কার বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্মার ও কার্য্য নহে। স্মৃতরাং আয়ুর্কোদের উন্নতি বহু সময় সাপেক্ষ। ইহা একজনের বা এক দলেরও সাধ্যাত্মক নহে। আমরা একজন্ম ধরিয়া যেটুকু পারি—করিব, ব্যক্তি মরে—সম্প্রদায় মরেনা,—স্মৃতরাং আমরা ভরসা করিতে পারি, আমাদের অবর্ত্তমানে নূতন সম্প্রদায় আসিয়া অপূর্ণ অংশের পূরণ করিয়া দিবেন। তাহার পর এক পুরুষ, তাহার পর আর এক পুরুষ, এই রূপ জন্ম জন্মান্তরের অশ্রান্ত সাধনায় যে মন্দির নির্মিত হইবে,—তাহার চূড়া বিমান ভেদ করিয়া দেবতার চরণ স্পর্শ করিবে।

আয়ুর্কোদের উন্নতিকল্পে সময় চাই, মাল্লুস চাই, কুবেরের ভাঙার চাই। উন্নতির প্রথম সোপান—আয়ুর্কোদীয় কলেজ ও রুগ্নাবাস প্রতিষ্ঠা করা। সেই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত—আজ আমরা সকলের কাছেই ভিক্ষার্থী। এক পয়সা হইতে এক লক্ষ মুদ্রা পর্য্যন্ত—আমাদের বেদ-

ভাণ্ডারে—আমাদের ভিক্ষার কুলিতে, সমান আদরের জিনিষ। বেদরক্ষার জন্ত, আপনাদের বাহা সাধ্য, ভিক্ষা দিন। এ ভিক্ষায় ভগবানকে ভিক্ষা দেওয়া হইবে। ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী ভগবান্ জে হাত পাতিয়া ভিক্ষা করেন না। অনাথ আতুরের হাত পা তাই তাঁহার হাত পা তা। জীবকে রোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্ত যিনি ভিক্ষা দেন, তিনি দেবতাকে ভিক্ষা দেন। ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জ্ঞান, গৌরবে—এদেশকে বাহারা জগতে শীর্ষ-স্থানীয় দেখিতে চাহেন, তাঁহারা আমাদের সহায় হউন। সপ্তর্ষির মত উচ্চে বসিয়াও বাহারা মরণহত পল্লীবাসীর মর্মব্যথা বুঝিতে পারেন, আমরা তাঁহাদিগকেই কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। এই অসীম বিরাট সম্ভার মধ্যে, আমাদের ‘হাসি কান্না’ জড়িত ক্ষুদ্র জীবন কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে; আমাদের আশা কামনা ভোগলিপ্সা—স্বর্ঘ্য্য-স্তোর বর্ণরেখার মত একদিন নীরবে মিলাইয়া যাইবে, আমাদের তুচ্ছ প্রাণবিন্দু গুল্মদল-চ্যুত শিশির কণার মত কবে ভাগীরথীর সাগরাভিমুখ জলতরঙ্গে নিঃশব্দে মিশিয়া যাইবে। আপনারা আশীর্বাদ করুন বেদ-রক্ষায় আমরা যেন সত্যযুগের ‘বিসর্জন’ দেখাইতে পারি।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

১৩২

অগ্নি।

(পূর্বাঙ্কুরভূতি)

বর্ণও পার্থিব বস্তু নহে,—স্বর্ঘ্যের তেজ, আকাশে নীল পীতাদি যে সকল বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা আকাশে স্বর্ঘ্য-কিরণ-সম্পাতের ফল।

ঠহাই আদিবর্ণ। এই সকল বর্ণের সম্মিশ্রণ নানাবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। রূপ সর্গ পদার্থের আকার বুঝায়। যে ইন্দ্রিয়

প্রভাবে পদার্থের সেই আকার দৃষ্ট হয়, তাহাই রূপেন্দ্রিয় বা চক্ষু। চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন হয়, সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়ও স্বর্ঘ্যের তেজ। যেমন নানিকাবারা বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরা বাহিরের বায়ুর সহিত সংযুক্ত আছি, তরূপ চক্ষের দ্বারা বাহিরের তেজ গ্রহণ করিয়া সেই তেজের সহিত আমরা সংযুক্ত রহিয়াছি। ব্রাহ্মিকৃত শব্দে প্রকাশমানতা, প্রকাশমানতা তেজের ধর্ম, তেজ ব্যতীত কোন পদার্থ প্রকাশমান হইতে পারে না। পক্তি শব্দে পরিপাক শক্তি, খাত্তের পরিপাক ক্রিয়াও তেজের প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। অমর্ষ শব্দে কোধ, কোধ তেজেরই প্রভাব। তীক্ষ্ণতা শোধ্য বা শূরত্ব তেজের অন্ততম ধর্ম। এক্ষণে দেখা গেল, রূপ, রূপেন্দ্রিয়, বর্ণ, তাপ, ব্রাহ্মিকৃত, পক্তি, অমর্ষ, তীক্ষ্ণতা ও শূরত্ব ইহার একমাত্র তেজেরই অবস্থান্তর বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এবং তেজ স্বর্ঘ্যেরই শক্তি। আমরা ক্ষুদ্র জীব, বাহিরের মহাশক্তির অধীনে সর্বদা কালযাপন করিতেছি। যেমন বাহিরের বায়ু ব্যতীত, আমরা এক মুহূর্ত্ত ও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, তরূপ বাহিরের তেজ ব্যতীত ও আমরা এক মুহূর্ত্ত ও জীবিত থাকিতে পারি না।

### পিত্ত ।

শরীরস্থ তেজের নাম পিত্ত। পিত্ত পাঁচ প্রকার—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভাজক। পাচক পিত্ত অগ্ন্যশরে, রঞ্জক পিত্ত বহুত ও গ্ৰীহাতে, সাধক পিত্ত কবরে, আলোচক পিত্ত নেত্রদ্বারে ও ভাজক পিত্ত সর্গ-শরীরে এবং চর্মে অবস্থিতি করে।

অগ্রহারণ—২

### পাচক পিত্ত ।

পাঁচ প্রকার পিত্তের মধ্যে পাচক পিত্তই সর্বশ্রেষ্ঠ। অল্প চতুর্বিধ পিত্ত পাচক পিত্তেরই অগ্রধান অংশ বা শাখা প্রশাখা। পাচক পিত্তের ক্ষয় বৃদ্ধি হইলে অন্ত্রান্ত্র পিত্তের ও ক্ষয় বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। পাচক পিত্ত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, অপরাপর অগ্নির বল বৃদ্ধি এবং রস, মূত্র ও মলকে পৃথক করে। এই অগ্নি অবিকৃত থাকিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সৌন্দর্য, মেধা, বুদ্ধি, শূরত্ব, মেহের কোমলতা, পরিপাক, তাপ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সুচারুরূপে নির্বাহ হয়। পাচক পিত্ত পীতবর্ণ এবং উহাতে উষা বা তাপাংশ অধিক। যেমন নীপের আলোক গৃহের একাংশে অবস্থান করিয়া অন্ত্রান্ত্র অংশকে আলোকিত করে, তেমন পাচক পিত্ত বীর আশরে অবস্থিত থাকিয়া সমগ্র দেহকে আলোকিত করে।

### রঞ্জক পিত্ত ।

রঞ্জক পিত্তের স্থান বহুত। ইহা ভুক্ত দ্রব্যের রসকে রঞ্জিত করিয়া রক্তে পরিণত করে। (“রঞ্জকং নাম বৎ পিত্তং জঙ্গমং শোণিতং নয়েৎ”)। রঞ্জক পিত্তে রক্তনগণ অধিক, ইহার সুখ বা প্রধান ক্রিয়া ভুক্ত দ্রব্যের রস-রক্তন এবং গোণ বা অগ্রধান ক্রিয়া ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক। রঞ্জক পিত্ত নীলবর্ণ, ইহা রসকে রঞ্জিত ও স্থপক করিয়া, মেহ ধারণোপযোগী শোণিতে পরিণত করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, স্বর্ঘ্যের নীলালোক দ্বারা পৃথিবীর পদার্থ সমূহের সংযোগ ও বিরোধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং নীলালোক দ্বারা প্রাণিজাত্য বৃদ্ধিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বায়ুজাত ও তাহাই বলেন। মেহে সুখ-মেহের ক্রিয়া

নীলবর্ণ রঞ্জক পিত্তের সংযোগে ভূক্ত দ্রব্যের সারভাগ-রসের বর্ণ-বিপর্যয় ঘটে অথবা ঐরস রঞ্জিত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করে, ইহাই রসের সহিত নীলবর্ণ পিত্ত সংযোগের রাসায়নিক ফল। যকৃৎ পিত্তাধার, যকৃৎের উপর পিত্তের ধনীতে এই পিত্ত নিহিত। রঞ্জক পিত্ত অপর বা নিস্তেজ পিত্ত, উহাতে উন্মাদ বা তাপ জ্বর, যেমন নীলাকাশ স্বর্ঘ্যেরই একাংশ ও তদ্বারা পৃথিবীর রাসায়নিক সংযোগ, বিরোগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, নীলবর্ণ রঞ্জকপিত্ত ও তদ্রূপ প্রধান পাচক পিত্তের একাংশ এবং তদ্বারা ভূক্তাঙ্গের পরিপাক ও ভূক্তাঙ্গজাত রসের রঞ্জনাধি রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রধান পাচক পিত্ত পক্ষ, পীতবর্ণ এবং সত্যিক আধেয়। তদ্বাস্তবে বলা হইয়াছে।

“তন্মাত্তজোদয়ঃ পিত্তং পিত্তোন্মাদ যঃ স

পাক্তিমান্।”

স কারায়িঃ স কারায়ো স পক্তা স চ জীবনম্।

স সক্ষরতি কৃষ্ণিবঃ সর্বতো ধমনীমুখৈঃ ॥

তৈজোদয় পিত্তের উন্মাদ বা তেজই পাক্তিমান্। উহাই কারায়ি, কারোন্মাদ, অন্নাদির পাচক এবং উহাই জীবনের জীবন। উহা কৃষ্ণিতে অবস্থিত করিয়া ধমনীমুখ দ্বারা সর্বদিকেরে সঞ্চরণ করে।

সাধক পিত্ত।

“বভু সাধকসংজ্ঞাং তং

কৃষ্যাদিঃ কৃতিঃ স্মৃতিঃ।”

বে পিত্তদ্বারা বৃদ্ধি, বেধা ও স্মৃতি জন্মে, তাহাই সাধক পিত্ত। সাধক পিত্তের কার্য্য মলদ্বারস্থ স্রবণের উৎকর্ষতা সাধন ও বৃদ্ধি, রেখা এবং স্মৃতি প্রভৃতিকে যথোপযুক্ত কার্য্য করিয়া তোলা ও সেই সকলকে যথা-বধিরূপে নির্বাহিত করা।

আলোচক পিত্ত।

“বদালোচক-সংজ্ঞাং তদ্রূপগ্রহণকারণম্।”

যে পিত্তদ্বারা রূপ দর্শন হয়, তাহার নাম আলোচক পিত্ত। আলোচক পিত্তের অবস্থিতি স্থান দর্শনেন্দ্রিয়। দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোচক পিত্ত আছে বলিয়াই আমাদেরিগের, দর্শনক্রিয়া নির্বাহ হয়। চক্ষের পীতবর্ণ রেখা সমূহের জ্যোতিতে পদার্থ নয়ন গোচর হয়। আর এই জ্যোতি দ্বারাই আমরা বাহিরের তেজের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছি। যেমন নাসিকা দ্বারা আমরা বহির্কায়ের আকর্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকি, তদ্রূপ চক্ষের দ্বারাও আমরা বাহিরের তেজ আহরণ করিয়া তেজের প্রকাশন ও পরিপাককরণ প্রভৃতি ক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকি। আমরা কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিয়া থাকিলে আমাদেরিগের নিজা আইসে, কারণ চক্ষু মুদ্রিয়া থাকিলে আমাদের সহিত বাহিরের তেজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সুতরাং বাহিরের তেজের প্রকাশন ও প্রাণ আমাদের মধ্যে আহৃত হইতে না পারায়, তমোভণের আবরণ শক্তি প্রবল হইয়া, আমাদের প্রকাশশক্তিকে বিলুপ্ত করিয়া, নিজাভিভূত করিয়া দেয়। অতি বলেন, চক্ষের অন্তর্গত তেজস্তবে সেই পরমায়া পরম পুরুষ বিরাজমান। গীতার রঙ্গা হইয়াছে—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাস্রিতঃ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যহং চতুর্লিঙ্গম্ ॥

আমি বৈশ্বানররূপে প্রাণীদিগের দেহাশ্রিত হইয়া প্রাণ ও অপানের বোনে চতুর্লিঙ্গ ভোজ্য পরিপাক করি।

সুশ্রুতে বলা হইয়াছে—

আঠরো ভগবানথিরাথরোহরস্ত পাচকঃ।

ওঁম্যজসনাদানো বিবেকঃ নৈব পাকতিঃ।



অন্নাদির পাককর্তা ভট্টরাগ্নি প্রভৃতি সকলই সেই ভগবান পরমেশ্বর ।

বস্তুতঃ যে শক্তি আমাদের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছে । যে শক্তি আমাদের ভুক্তাদি জীর্ণ করিয়া, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জা শুক্ক প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত করিয়া শরীর সংগঠন, পোষণ ও প্রকাশন প্রভৃতি যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি প্রভৃতি যাবতীয় মানসক্রিয়া, দর্শন, প্রকাশন ও উদ্বেজন প্রভৃতি যাবতীয় দ্বারবীয় ক্রিয়া ও যাবতীয় ইঞ্জিয়ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছে, তাহা মানববুদ্ধির অগম্য, সূতরাং তাহা একমাত্র পরম দয়াল পরমেশ্বরের শক্তি ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে ?

### ভাজক পিত্ত ।

ভাজকং কান্তিকারি শ্রাণ্নেপাত্তাদিপাচনম্ ।

যদ্বারা অগ্নে প্রলিপ্ত দ্রব্যাদি শোষিত ও পবিপাক হইয়া অগ্নের শোভা সম্পাদন বা রোগবিমোচন করে, তাহাই ভাজকপিত্ত ।

### মূহু ও তীব্র জ্বন ক্রিয়া ।

স্ব্যোক্তাপে পৃথিবীর রস শোষিত হয় । অগ্নির তাপে জল সহযোগে ডালভাত তরিতরকারি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের পাকক্রিয়া সমাধা হয় । ইহাকে মূহু নহন ক্রিয়া বলা যায় । তীব্র নহন ক্রিয়ার কাঠি করণ প্রভৃতি ভীষিত হয় ।

ডাল ভাত তরকারি প্রভৃতি আহার্য বস্তু অগ্নিতাপে শুষ্কপ নষ্ট হয় না, রূপান্তরিত এবং লঘু ও কোমল হইয়া খাদ্যোপযোগী হয়, অতি উত্তরে গিয়া উষ্ণতায় সহযোগে পুনর্বার রূপান্তরিত হইয়া রস, রক্ত ও মাংসাদি

পরিণত হয় । ইহাকেই ভুক্তাদির পরিপাক বা মূহু নহন-ক্রিয়া বলা যায় । স্ব্য, স্মি, ও পাচক পিত্তের ক্রিয়া অভিন্ন । স্ব্য, তেজ বা অগ্নিবস্তুই শরীরস্থ পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কুপিত হইলে অন্তত এবং অকুপিত থাকিলে শুভফল প্রদান করে, সেই শুভ ও অন্তত বা মঙ্গল ও অমঙ্গল এই—

পক্তিমপক্তিঃ দর্শনমদর্শনং মাত্রামাত্রমুদয়ঃ  
প্রকৃতিবিকৃতিরূপঃ শোষণং ভয়ং ক্রোধঃ হর্ষঃ  
মোহঃ প্রসাদমিত্যেবানীনি চাপরাণি বন্দ্যাদী-  
নীতি ।

পরিপাক ও অপাক, দর্শন ও অদর্শন, শারীরিক তাপের মাত্রার সমতা ও বিবমতা, প্রকৃতি ও বিকৃতি, বর্ণ ও অবর্ণ, শৌর্য ও অশৌর্য, ভয় ও অভয়, ক্রোধ ও অক্রোধ, হর্ষ ও অহর্ষ, মোহ ও অমোহ, প্রসাদ ও অপ্ৰসাদ ইত্যাদি এবং এইরূপ আরও অনেক লক্ষণ আছে ।

পরিপাক, দর্শন, শারীরিক তাপের মাত্রা, প্রকৃতি, বর্ণ, শৌর্য, অভয়, হর্ষ ও অপ্ৰসন্নতা এই সকল অকুপ্ত থাকি অকুপিত পিত্তের তথা বাহ্যের লক্ষণ এবং পরিপাকের পরিবর্তে অপাক, দর্শনের পরিবর্তে অদর্শন, শারীরিক তাপের বিবমতা, প্রকৃতির বিকৃতি, বর্ণের বিপর্যয়, সুরমের অভাব, ভয়, ক্রোধ, হর্ষের অভাব, মোহ ও অপ্ৰসন্নতা এই সকল কুপিত বিকৃতির তথা অবাহ্যের লক্ষণঃ পরিপাক হইতেই দর্শনাদি শুভফলপ্রসূতকাজি হইয়া থাকে । সুকৌশল্য হইয়াই অগ্নিই দেহস্থ পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সুফল ও সুকলের উৎপাদক করে, পরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়া সুফল এবং অপরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়া সুফল বস্তুতঃ ভুক্তাদি সম্যক পরিপাক হইলে, পরিপাক

শারীরিক সমস্ত ক্রিয়া এবং স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে, আর ভূক্তারের অপাক হইতেই বিবিধ বিকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আয়ুর্কেদে বলা হইয়াছে—

রোগস্ত দোষ-বৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।

দোষের বৈষম্য রোগ এবং দোষের সমতা অরোগ।

দোষ শব্দে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ইহা-দিগের বৈষম্যাবস্থায় দেহ অসুস্থ হয়। বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা সাম্যাবস্থায় থাকিলে দেহে প্রসাদভূত রক্তাদি সার পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং উহাদিগের বৈষম্যাবস্থায় রস-রক্তাদি সার পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সার পদার্থের বৃদ্ধির অবস্থা স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং ক্ষয়ের অবস্থা অস্বাস্থ্যের অবস্থা। যে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা সাম্যাবস্থায় দেহধারণক ও দেহ-পোষক, সেই বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাই বৈষম্যাবস্থায় দেহ গীড়ক ও প্রাণনাশক। দোষের এক নাম মল, দোষের বৈষম্যাবস্থায় মলাংশ এবং সাম্যাবস্থায় সারাংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঘর্ম, নাকের সিক্তী, মুখের থুথু, কাস ও বমনের পিত্ত প্রভৃতি মল পদার্থ বাচ্য এবং রসরক্তাদি প্রভৃতি সারপদার্থবাচ্য। সুশ্রুতে বলা হইয়াছে, বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মাই দেহোৎপত্তির হেতু এবং তাহার। অবিকৃত থাকিলেই দেহ সুস্থ থাকে, আর বিকৃত হইলেই দেহ অসুস্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চরকে বলা হইয়াছে—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতি বিবিধ। প্রাকৃতী গতি ও বৈকৃতী গতি।

পিত্তাদিবোধ্যং পক্তি নরাণামুপজায়তে।

ভুক্ত পিত্ত প্রকৃতিং বিকারান্ কুরুতে বহুন্।

প্রাকৃতভক্ত বলা শ্লেষ্মা বিকৃতো মল উচ্যতে।

যে পিত্তের উদ্ভা হইতে পরিপাক শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই পিত্ত প্রকৃতি হইলে আবার বহুবিধ বিকারের সৃষ্টি হয়। ভুক্তপ যে শ্লেষ্মা শরীরের বলকর, সেই শ্লেষ্মাই মলজনক। দেহের বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা কুরুপভাবে অবস্থান করিতেছে ও দেহ সুস্থ আছে কিনা, তাহা পাচকায়ির বলাবল ও ক্রিয়া দ্বারা জানা যায়। পাচকায়ি চতুর্কিধ—

মন্দাকীক্লেহণ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্কিধঃ।

মন্দায়ি, তীক্ষ্ণায়ি, বিষমায়ি ও সমায়ি। এই চতুর্কিধ অগ্নি—বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার বৈষম্য ও সাম্য অবস্থা হইতে উৎপন্ন।

কফ-পিত্তানিলাধিক্যাত্তৎসাম্যাক্কারোহনলঃ।

কফাধিক্যে মন্দায়ি, পিত্তাধিক্যে তীক্ষ্ণায়ি, বাতাধিক্যে বিষমায়ি এবং বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সাম্যাবস্থায় সমায়ি। এই চতুর্কিধ অগ্নির মধ্যে সমায়ি শ্রেষ্ঠ, অগ্নির সাম্যাবস্থায় কোন বিকারের সৃষ্টি হয় না। অল্প ত্রিবিধ অগ্নি হইতেই বিকারের সৃষ্টি হয়।

বিষমো বাতজান্ রোগাঃ তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্।

করোতাগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্॥

সমা সমাধেরশিতা মার্জী সমায়িপচ্যতে।

স্বরাপি নৈব মন্দাশ্চে বিষমাশ্চেস্ত দেহিনঃ॥

কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিৎ ন পচ্যতে।

মাত্রাতিমাত্রাপাশিতা গুণং যন্ত বিপচ্যতে॥

তীক্ষ্ণায়িরিতি তৎ বিভাৎ সমায়িঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।

আমং বিদম্ভং বিষ্টকং কফপিত্তানিশৈজ্জিতিঃ॥

বিষমায়ি হইতে বাতজরোগের, তীক্ষ্ণায়ি হইতে পিত্তজ রোগের এবং মন্দায়ি হইতে কফজ রোগের উৎপত্তি হয়। এই চতুর্কিধ

অগ্নির মধ্যে সমায়ি শ্রেষ্ঠ, অপর সমায়ি

সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করে এবং সাম্যাবস্থায়

সমভাবে পানাহার সম্যক্ পাক করে।

মন্দির অন্নমাত্রায়ও ভোজ্যবস্তু পাক করিতে সমর্থ নহে। বিষমায়ি কদাচিৎ সম্যক পরিপাকে সমর্থ হয়, আবার কখনও বা সম্যক পরিপাকে সমর্থ হয় না। অতি মাত্রায় আহার পানীয় পরিপাক করা তীক্ষ্ণায়ির কার্য। কক, গিঙ ও বাতের প্রকোপ হইতে যথাক্রমে আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও বিষ্টকাজীর্ণ উৎপন্ন হয়।

ত্রিবিধ অগ্নি হইতে ত্রিবিধ বিকারের সৃষ্টি হয় বলিয়া ত্রিবিধ অগ্নিই অপাকের মধ্যে পরিগণিত এবং এই অপাক হইতেই দর্শনাভাব বা অদর্শন, শারীরিক তাপের মাত্রার বিষমতা, প্রকৃতির বিপর্যয়, বর্ণবিপর্যয়, শূরত্বের অভাব, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ, মোহ বা অজ্ঞানতা ও অপ্রেমসত্তা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, কিন্তু ত্রিবিধ অগ্নির মধ্যে মন্দিয়ি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তীক্ষ্ণায়িতো দূরের কথা, এক্ষণে বিষমায়ির লোকও বঙ্গদেশে বিরল, পরন্তু মন্দিয়ির লোকই সর্বাপেক্ষা অধিক। বলা বাহুল্য ইহা বাঙ্গালীর শোচনীয় দুর্দশার চরম পরিণাম। তবে বেশী দিনের কথা নহে, বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এরূপ অবস্থা ছিল না, তখনকার লোকে মন্দিয়ি বা বদ্বহজম কাহাকে বলে, জানিত না, পাথর খাইরা হজম করিত। হই একজনকে নহে, প্রায় অধিকাংশ লোকেই তখন অগ্নি প্রবল ছিল। কলাহারের উপকরণ ছিল দই, চিড়ে ও গুড়, তাহাই তখনকার লোকে কত তৃপ্তির সহিত আহার করিত। এখন আর সে কালও নাই সে মাছও নাই বা সে বলবীৰ্য বা দেহের লাভ্যকাজি কিছুই নাই। প্রায় প্রত্যেকেই অবসাদগ্রস্ত, ককালসার, বিষর বদন, বেন আনন্দ চিরদিনের মত তাহাদিগের নিকট

হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলেন, আজ বদ্বহজম হইয়াছে, কেহ বা বলেন, চোঁরা ঢেকুর উঠিতেছে, কেহ বা বলেন, আজ পেটে বড় উইণ্ড জমিয়াছে, ইত্যাকার আক্ষেপোক্তি আজ কাল সচরাচর প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ উদরাময় বা বদ্বহজম আজ কাল যেন বঙ্গদেশে সংক্রামক রোগে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ লোক বিরল, যাহার পেটের অন্ত্র বা বদ্বহজম নাই। যিনি বার্ণির পরিবর্তে মাছের ঝোল ভাত আহার করেন, তিনিই এক্ষণে মহা ভাগ্যবান। বড় বেশী দিনের কথা নহে, দশ পনের বৎসর পূর্বেও এদেশে তীক্ষ্ণায়ির লোক ছিল, এরূপ এক ব্যক্তিকে আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাঁহার নাম আছমাণী কৈলাস, নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত মল্লিকপুর নামক গ্রামে। এই ব্রাহ্মণ প্রায় সর্বসম্মত কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার ব্যবসায় ছিল শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি কিরা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ ভোজন ও ভোজন দক্ষিণা আদায়। তাঁহার নামের পূর্বে যে বিশেষণ তাঁহাকে বিশেষিত করিয়াছে, তাহা তখনকার কলিকাতাবাসী অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহার অমিত-ভোজন দর্শনে সকলেই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইতেন, বিস্মিত হইবারই কথা, এককালে অদ্বৈত ভোজন বিষয়ক ব্যাপার নহে কি? তিনি চিকিৎসক শিরোমণি বর্গীর পদাশ্রয় সেন মহাশয়ের বাড়ীতে কিরা কর্ম উপলক্ষে প্রায়ই আহার করিতেন, কারণ সেন মহাশয় তাঁহাকে আহার করাইয়া সেন মহাশয়ের বাড়ীতে করিতেন, তিনিও সেখানে আহার করিয়া আসিতেন।

সস্তোষলাভ করিতেন। একদিন ৮কৈলাস শর্মা আবদার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, দেখ তুমি প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ভোজন দক্ষিণা বাহা দিতেছ, আমি যে কয়েক জনের ভোজ্য ভোজন করিব, আমাকে সেই কয়েকজনের ভোজন দক্ষিণা দিতে হইবে, সে দিন তিনি এই কথা বলিয়া লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি অর্দ্ধ মোণ আহার করিয়াছিলেন এবং ৬ সেন মহাশয়ও তাঁহার আবদার মত দশ টাকা ভোজন দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। কৈলাস শর্মা অল্পগ্রহ করিয়া একদিন আমার বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পেটের অম্লত্ব করিয়াছিল। আসিয়া বলিলেন, আমাকে অধিকুমাৰ দেও, আমি তাঁহার আদেশমত অধিকুমাৰ দিলাম, কিন্তু “একটি” দেখিয়া তিনি ক্রোধবাজক স্বরে বলিলেন, তুমি তো দেখিতেছি “মন্ত কবিরাজ” তোমার এমন বুদ্ধি! বাহার আধ মোণ খোরাক, তাহাকে দিয়াছ একটি অধিকুমাৰ। দশ বিশটা দিতে হয়!! একালের নব্য যুবক সম্প্রদায় বিশ্বাস করিবেন কি না বা এসকল উপজ্ঞাসের গল্প মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন কি না, জানি না, কিন্তু ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। হয় সেই একদিন, আর এই একদিন! তখন অতি বৃদ্ধ বাহারা, তাঁহাদিগের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই চন্দ্রা ব্যবহার করিতেন, আর এখন চন্দ্রাধারীর সংখ্যা করা যায় না, তাও আবার সবই নব্য যুবক ও বালক। হরি হরি এই তো দেশের অবস্থা! এই তো আমাদিগের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অবস্থা! এই তো তাঁহাদিগের দূরদর্শন! তাঁহারা চন্দ্রা ব্যতীত সমুখের মাসুখটি দেখিতে পান না। অগ্নীক্ষণ ব্যতীত অগ্নি দেখিতে পান

না, আর তাহাদিগের পূর্বপুরুষগণ চন্দ্রা-ব্যতীত বৃদ্ধাবস্থা পরম সুখে অতিক্রম করিয়া-ছেন এবং প্রাচীন ভারতের ঋষিরা দিব্যচক্ষে সেই “অণোরণীমান” মহতো মহীয়ানের” স্বরূপ দর্শন করিতেন। এই তো আমাদিগের তেজ! এই তেজের আবার গরুই কত। ইহারা মনে করে যেন ইহাদিগের পূর্বপুরুষ-গণ নির্দোষ এবং ঋষিরা অতিশয় অজ্ঞান ছিলেন। সমধর্মী সমধর্মীর আকর্ষণ, “গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নিঃশূন্যঃ।” বস্তুতঃ আমরা আমাদিগের পূর্বপুরুষগণের জ্ঞান ব্রহ্মচর্যপরায়াণ বা সংযমী না হইলে, কি করিয়া তাঁহাদিগের তেজ ও বীৰ্যের বা জ্ঞান-গৌর-বের মহিমা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিব? কোথায় সেই তেজ, কোথায় সেই বীৰ্য, আর কোথায়ই বা সেই রক্তমোহগুণ নির্মুক্ত নির্মল দিব্য জ্ঞান! আবার ভারতে—বাল্যলায় সেই ব্রহ্মচর্য, সংযম ও দিব্যজ্ঞান কবে ফিরিয়া আসিবে? কবে আমাদিগের জীবন ও সংসার মধুময় হইবে? সেই তেজ ব্রহ্মতেজ, সেই তেজ অগ্নির তেজ, যে তেজের প্রভাবে কপিলমুনি ষষ্টি সহস্র সগর সন্তানকে তপ্তীভূত করিয়াছিলেন। সেই তেজ, অগ্নির তেজ, যে তেজের বলে অর্দ্ধ মোণ খাদ্য পরিপক হয়। সেই অগ্নি সত্ত্ব ও রজোবহুল। সত্ত্ব গুণের ধর্ম প্রকাশ, সেই গুণ অগ্নি ও সূর্য্যে বিজ্ঞান, যে গুণে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেই গুণে আহার পরিপক ও দেহের অমোহগুণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেহের অগ্নি দেহের পাচক পিত্ত, সেই পাচক পিত্তেরই তেজ ও প্রকাশ ধর্ম বিদ্যাকমান, কিন্তু চর্য্য ও সংযমের অভাবে পিত্ত বিদ্যাকমান ও তাহার ফলে অগ্নি নিঃশূন্য ও দেহ-বিদ্যাকমান

হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন সে তেজের গুণ উপলব্ধি করা যায় না, অপচ—অপাক বা অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয় ও ক্রমশঃ তাহা হইতে অদর্শনাদি পিত্ত-বিকৃতির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ত্রিবিধ অগ্নি হইতে অপক্তি, এবং অপক্তি হইতে অদর্শন, উন্মাদ অমাত্র্য বা বিষমতা, প্রকৃতি ও বর্ণের বিপর্যয়, অশৌধ্য, ভয়, ক্রোধ, হর্ষাভাব বা বিবাদ এবং মোহ ও অপ্রসন্নতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কাঠ কয়লার যে শক্তিতে রেল ষ্টীমারের এঞ্জিন বা কল পরিচালিত হয়, সে শক্তি—স্থ্য-শক্তি। পাশ্চাত্য মনোবীদিগের এ কথা সত্য,—স্থ্য-তেজের আধার, সেই তেজ বাহাতে অধিক নিহিত, তাহাকেই তৈজস বস্তু বলা হয়, তৈজস দ্রব্যে অগ্নির সংস্পর্শ ঘটিলেই তাহা জলিয়া উঠে। গন্ধক, সোয়া প্রভৃতি এই শ্রেণীর দ্রব্য। কাঠ কয়লায়ও স্থ্যশক্তি নিহিত আছে বলিয়াই তাহা অগ্নিসংস্পর্শে জলে। কয়লার সংযোগে এঞ্জিনের যে শক্তি, খাত্তের সংযোগে দেহরূপী এঞ্জিনের সেই শক্তি, কিন্তু যদি দেহের পরিপাক শক্তি অত্যন্ত নিম্নেজ হয়, তাহা হইলে খাত্ত পরিপাকে সর্ব্ব হয় না। এঞ্জিনের অগ্নি নিম্নেজ হইলে কি কয়লা দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়? অতএব অগ্নিই যে তেজের আধার এবং সেই তেজ হইতেই যে পরিপাক শক্তি, বল, বর্ণ ও পৌর্য্য বীর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের বাঙ্গালী বর্ত্তমানে অগ্নিহীন, সুতরাং নিম্নেজ ও দুর্বল, কহালসার, কোটরপত্ত চকু, ক্ষুধাবিহীন মুখমণ্ডল, পাণ্ডুর বর্ণ, যেন দেশের দালক ও যুবকগণ অশীতিপর বৃদ্ধের ভাৱ অকস্মাৎ জরাক্রান্ত হইয়াছে। ত্রিবিধ অকীর্ণ ও

মন্দাগ্নি এই দুয়বছার মূল কারণ। অদর্শন শব্দে দর্শনাভাব, চক্ষের দ্বারা দর্শন ক্রিয়া নির্বাহ হয়, অঙ্গিগত রোগ উৎপন্ন হইলে দর্শনের ব্যাঘাত ঘটে। উন্মাদ শব্দে পিত্তের তাপ। পিত্ত স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিধা বিভক্ত। স্থূল পিত্ত দৃশ্যমান ও সূক্ষ্ম পিত্ত অদৃশ্য। অদৃশ্য পিত্তই উন্মাদ বা তাপ নামে অভিহিত। বিকৃতি দ্বারা প্রকৃতি নির্মীতা হয়। তেজের কি প্রকৃতি, কি শক্তি কি গুণ ও কি ক্রিয়া, চক্ষের ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহা হৃদয়দলন করা যায়। তজ্জন অগ্নির প্রকৃতি, তাহার বিকৃতি দ্বারা জানা যায়। মন্দাগ্নি বা অকীর্ণ উপস্থিত হইলে অগ্নি কি বস্তু, উপলব্ধি করা যায়। জরে সম্ভাপিত অবয়ব হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে, তাপ কি বস্তু হৃদয়দলন করা যায়। আবার ঐ তাপ যখন প্রবৃদ্ধ হইয়া ১০৬।১০৭ ডিগ্রীতে পরিণত হয়, তখন দেখে কি পরিমাণ উন্মাদ বা তাপ অবস্থিতি করিয়া কিরূপে খাত্ত পরিপাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু এই যে তাপ, এই তাপ অস্বাভাবিক, স্বাভাবিক তাপে শরীর সুস্থ থাকে এবং দুর্বলতার পরিবর্ত্তে শরীর সবল ও সতেজ করে, তজ্জন এই তাপ দূষিত পিত্তের ক্রিয়া বলিয়া গণ্য। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে—  
দর্শনঃ পলিক্রিয়া চ ক্ষুধা দেহমার্জবম্।

এতা প্রকাশো মেঘাচ পিত্তকর্ষাবিকারজম্ ॥

দৃষ্টিশক্তি, পরিপাকশক্তি, উন্মাদ বা তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের সুস্থতা, কান্তি, প্রকাশ বা সবলত্বের ধর্ম অপ্রসন্নতা ও মেঘা এই সকল অব্যাহত থাকে।

সূক্ষ্মইন্দ্রিয়া হইয়াছে, খাত্ত, পিত্ত দেহের গতি বিবিধ—প্রাকৃতি ও বৈকৃতি। প্রাকৃতি গতির দলন দেখে অসামান্য হয়।

শ্লেষ্মার প্রসাদগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও তাহার ফলে রস রক্তাদি সারবস্তুর পরিমাণ বাড়ে বলিয়া শরীর সুস্থ থাকে, আর বৈকৃতীগতির ফলে দেহের মলতৃত বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া বাতের অস্বাভাবিক শোষণ গুণে, পিত্তের অস্বাভাবিক দহনগুণে ও শ্লেষ্মার অস্বাভাবিক আর্দ্রতায় শরীরের রসরক্তাদি সার পদার্থসমূহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া দেহের ক্ষয়সাধন করে। যে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা দেহোৎপত্তি এবং দেহধারণ ও দেহ পোষণের হেতু। যে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা স্বভাবে অবস্থিতি করিলে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে, সেই বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাই অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্বাস্থ্য ও দেহ নাশ করে। কিন্তু এই অস্বাভাবিক ক্ষয় অপর কিছুই নহে, পদার্থের আশয় বা স্থানচ্যুতি। বাহার যে আশয়, সেই আশয়ে সে যথাযথভাবে অবস্থিতি করিলে, তাহার পরিমাণের তারতম্য ঘটে না। সুতরাং সে অবস্থার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। লোকালয়ে যেমন এতোক গৃহস্থের বাটীতেই রন্ধনালয় বা পাকশালা বিজ্ঞান, সেহেও তজ্জপ পকাশয় ও অগ্ন্যাশয় বিজ্ঞান। অপিচ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যেমন পাকশালার দিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়, তজ্জপ উদরের দিকেও দৃষ্টি নিপতিত হয়, বরং প্রথমেই উদরের দিকে দৃষ্টি পড়ে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শরীরের সকল অবয়বে তাপ থাকিলেও কেবলমাত্র পকাশয়েই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। সুতরাং পকাশয়েই অগ্ন্যাশয় বা অগ্নির স্থান। আবার কোন সজল তত্ত্ব পূর্ণ হাঁড়ী চুন্নীর উপর দ্বাগুন করিলে, তদ্রিম্ন অগ্নিসন্ধ্যাপে তত্ত্ব গরিপক হইয়া অগ্নে পরিণত হয়, তজ্জপ আমা-

শয় বা ষ্টমাকের নিম্নস্থ সমান বায়ুর ধমন ক্রিয়ার উদরায়ি প্রদীপ্ত হইয়া আমাশয়স্থ খাত্ত পাক করে। আয়ুর্বেদে বলা হইয়াছে—  
সঙ্কুচিতঃ সমানেন পচত্যাশয়স্থিতম্।

ঔদর্য্যোহগ্নির্থা বাহুস্থালীস্থং তোরতুলম্ ॥

এই সমান বায়ুর সমতায় ঔদরায়ি সাম্য-ভাব এবং বৈষম্যাবস্থায় বৈষম্যভাব অবলম্বন করে, আর এই সাম্যাবস্থার নামই সমায়ি এবং বৈষম্যাবস্থার নামই অগ্নি বৈষম্য। অগ্নি বৈষম্য ত্রিবিধ—মন্দায়ি, তীক্ষ্ণায়ি ও বিষমায়ি। মন্দায়ি—কফ-দ্রুট, তীক্ষ্ণায়ি—পিত্ত-দ্রুট এবং বিষমায়ি—বাত-দ্রুট। সমান বায়ু কুপিত হইলে অগ্নির সমতা বা সাম্যভাব বিনষ্ট হয় এবং তখন কফের সহিত সংযুক্ত হইলে কফের গুরুতাবশতঃ অগ্নি অধোগামী হয় এবং বাত পিত্ত দ্রুট হইলে বাত ও পিত্তের লঘুতাবশতঃ অগ্নি উর্দ্ধগামী হয়। যে গুণে বমন হয়, তাহাই অগ্নি ও বায়ুর গুণ এবং যে গুণে বিরোচন হয়, তাহাই পৃথিবী এবং জলের গুণ। দেহের বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা যথাক্রমে বায়ুর, অগ্নির এবং জল ও ক্রিতির পরিণাম বা রূপান্তর। পিত্ত অগ্নির এবং কফ জল ও পৃথিবীর। বমন ও বিরোচন উভয়েই বিকার। বিকৃতির দ্বারা প্রকৃতি নির্গীতা হয়। যে গুণে বমন ও বিরোচন হয়, সেই গুণে পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং রসরক্তাদি পদার্থ দেহের উর্দ্ধ ও অধোগামী হয়। অতএব বলা হইয়াছে—“বমনশ্লেষ্মায়ি অগ্নিবাহু-ভূমিটানি, অগ্নী বায়ু হি লঘু লঘুতাবশতঃ স্তুতিষ্ঠতি তদ্বায়বমনপার্শ্ব—গুণভূমিটানি” বমন এবং অগ্নি ও বায়ু গুণ বমন, অগ্নি ও বায়ু উভয়েই লঘু, লঘুত্ব দেহে তাহার লঘু গামী হয়। তজ্জপ—“বিরোচনপার্শ্বায়ি

বায়ুগুণভূমিষ্ঠানি পৃথিব্যাপো শুক্লো গুরুত্বা-  
ন্থো গচ্ছন্তি, তন্মাদ্বিরেচন মধোগুণভূমিষ্ঠ  
মুক্তং। বিরেচন এব্য পৃথিবী ও অম্লগুণভূমিষ্ঠ  
তজ্জল বিরেচন অধোগামী। পিত্ত স্বভাবতঃ  
লঘু এবং স্নেহা স্বভাবতঃ গুরু। যে গুণে  
আকাশ হইতে বৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহাই  
জলীয়গুণ, এই গুণ দেহের স্নেহায় বিভ্রমান,  
আর যে গুণে নদ নদী ও সমুদ্রের জল বাষ্প  
হইয়া উর্দ্ধগামী হয়, তাহাই সূর্য্যের দহন গুণ,  
এই গুণ দেহের পিত্তে বিভ্রমান। অথবা  
জলন গুণবিশিষ্ট প্রজলিত দীপালোকের  
উর্দ্ধগতি পিত্তে এবং তন্নিস্রহ তৈলের নিম্ন-  
গতি স্নেহায় বিভ্রমান, কিন্তু এই উর্দ্ধগতি ও  
নিম্নগতির কারণ সমান বায়ুর বৈষম্য, সমান  
বায়ু কুপিত হইলে, অগ্নি স্বকীয় আশয়-ভ্রষ্ট  
হইয়া উৎক্ষিপ্ত হয়, স্ততরাং ভুক্ত্যম যথারীতি  
পরিপক হয় না। চরকে ইহার একটি উত্তম  
দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে :—

যথা প্রজলিতো বহিঃ স্থাল্যামিদ্ধনবানপি ।  
ন পচন্ত্যাদনঃ সমাগনিলপ্রেরিতো বহিঃ ॥  
পক্তিস্থানান্তথা দোষৈ রুক্ষা ক্ষিপ্তো বহিনুগাম্  
ন পচত্যভ্যবহ্ত্যং কৃচ্ছ্রাং পচতি বা লঘু ॥

যেমন স্থালীস্থ বহি ইন্ধনযুক্ত হইলেও  
বায়ুধারা বহিঃ প্রেরিত হওয়ার সমক্ অন্নপাক  
করিতে পারে না, সেইরূপ দোষ সকলের  
ধারা মাত্ত্বয়ের উদ্ভা পকাশয় হইতে বহিনির্ক্ষিপ্ত  
হওয়ার আহার পাক করিতে সমর্থ হয় না  
অথবা কষ্টের সহিত লঘু অন্ন পাক করে।  
উদ্ভা কিরূপে স্থানচ্যুত হয়, অন্নই তাহার  
প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর যে খার্বদিক্রিয়ের পারদ  
উর্দ্ধগামী হয়, তাহা উর্দ্ধগতিশীল অগ্নি ও  
বায়ুগুণেরই ক্রিয়া এবং অগ্নিবিচ্ছেদে শরীর  
শীতল হইলে আবার যে এই প্রক্রিয়া পরিপূর্ণ

গামী হয়, তাহাই স্নেহায় সোম বা স্নৈতা-  
গুণের ক্রিয়া। চরকে অরোংপত্তির প্রসঙ্গে  
বলা হইয়াছে —

বিক্ষিপ্যামাশরোম্মাণং যন্মাদগত্বা রসং নৃণাং ।

অরং কুর্কন্তি দোবাস্ত হীরতেহগ্নিবলং ততঃ ॥

যেহেতু দোষ সকল আমরসকে প্রাপ্ত হইয়া  
আমাশয়স্থ উদ্ভাকে স্থানচ্যুত করিয়া অরোং-  
পাদন করে, সেইজন্য পাচকায়ি বলহীন হয়।  
যেমন অতি তপ্ত তৈল ও স্নতে জল নিপতিত  
হইলে সেই তৈল ও স্নতের উদ্ভা বা তাপ  
উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, তজ্জপ  
আমাশয়স্থ আমরস তন্নিস্রহ অগ্ন্যাশয়ে নিপ-  
তিত হইলে, সেই রসের চাপে অগ্ন্যাশয়ের  
উদ্ভা উৎক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বতঃ বিস্তৃত হয়, ইহাই  
অর নামে অভিহিত। তজ্জন্ত অগ্ন্যাশয়ের  
পাচকায়ি বলহীন হয়। কেবল অর বলিয়া  
নহে, পাচকায়ির দুর্বলতা হইতে অসম্মারোগের  
সৃষ্টি হয়। চরকে বলা হইয়াছে—

“যে রোগানীকে আশয়ভেদেন আমাশয়সমুখক  
পকাশয়সমুখক।”

আশয় ভেদে রোগ বিবিধ, আমাশয়জাত  
ও পকাশয়জাত। আমাদিগের পানাহার  
মুখবির হইতে নিপতিত হইয়া আমাশয় ও  
পকাশয় এই দুই স্থানেই পরিপক হয়, অত-  
এব পানাহারের দোষে যে সকল বিকার  
জন্মে সেই সকল বিকার আমাশয় ও পকাশয়  
হইতেই জন্মে এবং অগ্নি-বৈষম্যই তাহার  
কারণ, তবে সকল রোগে অগ্নি সমভাবে  
দুর্বল বা নিতেন্দ্র হয় না এবং সকল রোগের  
লক্ষণও একবিধ নহে। বন্ধ্যামি, উক্তায়ি  
ও বিষদায়ি এই ত্রিবিধ অগ্নি-বিকার হইতে  
যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহার  
অধিকাংশ ব্যাধিতেই অর পরিণতি হয়।

প্রকাশ করিলে অগ্নির দুর্বলতা প্রতীয়মান হয়। অন্ন-বিচ্ছেদে শরীর শীতল হইলে যেমন খাদ্যমিটারের পারদ ৯৪।৯৫ ডিগ্রীতে নামিয়া যায়, তদ্রূপ অনেক রোগেই পারদ নিয়ে নামিয়া যায়, ইহাই অগ্নিহীনতা তথা অগ্নি বা স্নেহের সোমগুণ বুদ্ধির লক্ষণ। অন্ন-বিচ্ছেদে শরীর-হাস, আহারে অনিচ্ছা বা অস্বাভাবিক আহারের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া অথবা অতিরিক্ত তাপ, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ প্রভৃতি লক্ষণ গুলি দুর্বলতারই লক্ষণ। তাপই হউক, ভয়ই হউক, ক্রোধই হউক বা বিষাদই হউক অথবা মোহ বা অপ্রসন্নতাই হউক, সকল শরীরেই আছে, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক বুদ্ধিই দোষের এবং তাহাই বিকার শব্দ বাচ্য।

ক্রোধ, ভয়, বিষাদ, অজ্ঞানতা ও অপ্রসন্নতা এ সকল স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক কিবা অগ্নিহীনতা হইতে উৎপন্ন, কি না, তাহা

জানাও কঠিন নহে। অগ্নিহীনতা হইতে জ্ঞাত ক্রোধ, বিষাদ ও অপ্রসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষণিক, তাহাদিগের স্থায়িত্ব বড় অল্প। যেমন ক্রোধের উদয়, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রশান্তি। অগ্নিহীন বা অগ্নি-এজিন কি অধিকক্ষণ বা অধিক বেগে দৌড়াইতে পারে? ইহকন বিহীন বা অল্প কয়লা বিশিষ্ট এজিন কি অধিক তেজ ছুটিতে পারে? সেইজন্মই আয়ুর্বেদে বলা হইয়াছে—

অন্ত দোষশঃ ক্রুদ্ধং সন্তি ব্যাধিশতানি চ।  
কায়ামিনেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতং ॥  
সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমশ্রেষ্ঠ পালনম্।  
তন্মাদ যত্নেন কর্তব্যং বহুস্ত প্রতিপালনম্ ॥  
তন্নি তেজোময়ং পিত্তং পিত্তোন্মাদা যঃ স পক্তিমাম্  
স কায়ামিঃ স কায়োন্মাদা স পক্তা স চ জীবনম্।  
স সঞ্চরতি কুক্ষিহঃ সর্বতো ধমনীমুখৈঃ ॥

কবিরাজ,

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

## আয়ুর্বেদে পরিপাক ক্রিয়া।

( পূর্বাঙ্গভূতি )

ইহা যেত, পিচ্ছিল, স্বচ্ছ, স্নায়ু ও অগ্নি-গুণযুক্ত। এই রসের গুণ ও কার্য্য কতকটা লালার তায়। কিন্তু আমাশয়িক অন্নরসের সহিত ইহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাশয়িক রস মূলতঃ মধুর রসকে (শর্করাকে) অন্নরূপে পরিণত করে এই রস আবার সেই অন্ন রসকে মধুর রসে আনয়ন করে। এবং দেখা যায় যে, ঘটনা ক্রমে গ্রহণী হইতে অতিরিক্ত পিত্ত চালিত হইয়া আমাশয়-গাত্র লিপ্ত করিলে পরিপাকের বিঘ্ন ঘটে। এইরূপ অবস্থায় যে কোন ভাষা আহার করিলে, পরি-

পাক প্রাপ্ত না হইয়া বরং তদ্বিপরীত অকীর্ণ (বিদগ্ধাকীর্ণ) রোগের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই রস সেরূপ নহে, এই রসের সহিত যত অগ্নির পরিমাণে পিত্ত সংযুক্ত হইবে ততই এই রসের কার্য্য প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। ঠিক এইরূপ অবস্থায় পুনঃ পুনঃ আহার করিয়াও মানব তৃপ্তি বোধ করে না, বরং আরও খাইবার ইচ্ছা হয়, ইহাকেই ভয়স্বাস্থ্য বলা হয়। গ্রহণীপ্রাপ্ত এই রসের নাম কোমলরস। কোমলরস নাভির উপরিভাগে সঞ্চিত হইয়া অবস্থিত। ইহা বহুতর স্নায়ু-এবং স্নায়ু-সংযুক্ত।



করিয়া প্রীহার সমন্বয়ে নাভির উপরিভাগে অবস্থিত করিতেছে। ইহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ দাগগুলি দেখিতে অনেকটা “তিলের মত” স্তূতরায় ইহার অপর নাম “তিল”। যকৃৎ এবং হৃৎকূলের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা জলবাহি-ধমনীর মূল। এখান হইতে একটা ধমনী উৎখিত হইয়া জলবাহি কৈশিকী সিরাজালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ক্রোময় হইতে একটা ধমনী গ্রহণীর বাকের কিঞ্চিৎ নিম্নে উপস্থিত হইয়াছে। এবং তদ্বারা ক্রোমরস গ্রহণীতে পতিত হইয়া পিত্তের সহিত একত্র হইয়াই কটুরস প্রধান ভূক্তদ্রব্যকে পরিপাক করে। এবং এই রসের সহিত মিলিত হইলে পুনরায় দ্রব্যগুলি মধুর রসে পরিণত হয়, ইহাই আমাশয়িক শেব পরিপাক। এই শেব পরিপাক কালে গ্রহণীগাত্র হইতে আরও বিবিধ প্রকার মধুর রস ঐষ্মিকধাতু লালার দ্বারা নির্গত হইয়া ভূক্ত দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়।

গ্রহণীর বিস্তৃত বিবরণ—গুরু বলা হইয়াছে যে, গ্রহণী আমাশয়েরই একটা অংশ এবং বর্ণনার সুবিধার জন্য, “গ্রহণী ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত মিলিত” এক গণাও বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রহণী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে বিশেষ কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। একটা ধমনীই আমাশয় হইতে নির্গত হইয়া পকাশর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই সমগ্র ধমনীর নাম ক্ষুদ্রান্ত্র। ইহার প্রথম অংশের নাম প্রধামতঃ গ্রহণী, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বাদশ আঙ্গুল। অপর অংশের নাম প্রধামতঃ ক্ষুদ্রান্ত্র কিং সাধারণতঃ এই বিস্তৃত সমগ্র ধমনীর নামই ক্ষুদ্রান্ত্র বা

গ্রহণী বলিয়া আয়ুর্বেদে উক্ত হইয়াছে। আমাশয়ের দ্বারা ইহারও তিনটা আবরণ, বাহ্য, মধ্য ও অভ্যন্তর। বাহ্য আবরণ—ইহা স্বকের দ্বারা আবৃত। এই আবরণটা আমাশয়ের ঐক গাত্র হইতেই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়—পেশীর আবরণ। ইহাতে কতকগুলি পেশীতন্তু দীর্ঘাঙ্কারে সমস্ত ক্ষুদ্রান্ত্রে বিস্তৃত হইতেছে, এবং কতকগুলি তন্তু বুড়াকারভাবে এই ধমনীর সমস্ত পরিধি বেঁটন করিয়া রহিয়াছে। এই পেশীর আবরণে মাংসধরা কলা দৃষ্ট হয়। এই কলাগাত্রে শোণিতবাহি-সিরা, ন্নায়ু সকল অবস্থিত করে। অভ্যন্তর আবরণ পিত্তধরা কলা। ইহার ঐকগাত্র পিত্তময় হইলেও স্নেহা লিপ্ত থাকে, এবং কৈশিকী সিরাজুলি এই স্থানে আসিয়া অবশেষে ছিদ্ররূপে পরিণত হইতেছে। এবং এই সকল স্থান পেলব (কোমল) পেশীতন্তু দ্বারা নির্মিত হওয়ার অভ্যন্তর প্রদেশটা অতিশয় কোমল প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষুদ্রান্ত্র পিত্তময় ও সমান রাসের চিহ্ন স্বান বলিয়া, এই স্থান হইতে পরিপাক প্রাপ্ত সারভাগ অল্পে শোষিত হইতে পারে এবং ইহাতে স্নেহা থাকায় এই অল্পে অল্পে গমন এবং পরিপাক ক্রিয়া সূচকরূপে সম্পন্ন হইতেছে। পেশীতন্তু বুড়াকারে ও দীর্ঘভাবে অবস্থিত করার ভূক্তদ্রব্যের স্তম্ভগতি শিথিল হইতেছে। স্তূতরায় এই ক্ষুদ্রান্ত্রে ভূক্তরস সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হইতেছে। এবং দেখা যায় যে এই অল্পের প্রথম অংশ অপেক্ষাকৃত স্থূল, স্থির, বন্ধ ও অধিক পিত্ত যুক্ত, তৎপর ক্রমে আর হইতে আরম্ভ হইতেছে। স্তূতরায় আদার বর্ণনার দ্বিবিধরূপে এই প্রথম অংশকে গ্রহণী ও সাধারণতঃ পরিপাক

এবং সমস্ত ধমনীকে ক্ষুদ্রায় বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

পূর্বোক্তরূপে গ্রহণীতে পরিপাককালে ভুক্তদ্রব্য হইতে যে সারভাগ উৎপন্ন হয় তাহার নাম রস। রস ষেতবর্ণ, অতিস্নায়ু, তন্ম, শীতল, মধুর রস, স্নিগ্ধ ও গতিশীল। এই রস পরিপাককালে পুনঃ পুনঃ নানা আকারে পরিবর্তিত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে অর্থাৎ বিকৃতি-বিবর্তন-সমবায় বশতঃ মদিরা প্রভৃতির জ্বায়, ভুক্তদ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রব্য হইয়া পড়ে। এই সময় গ্রহণীস্থিত ভুক্ত দ্রব্য পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে গ্রহণীতে পরিপাককালে প্রথম অবস্থায় যে পচ্যমান অন্ন কটুরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা পুনরায় ক্রোম-রস এবং গ্রহণীস্থিত নৈমিক ধাতুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মধুরতা লাভ করিতেছে। তৈল প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য আমাশয় কিম্বা গ্রহণীতে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু উহারা কৈশিকী সিরাজালে প্রবেশ করিয়া ক্রমে শোণিতবাহি সিরা দ্বারা সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তৈল, জল, স্রা, ভাস্ক, অহিফেন প্রভৃতি দ্রব্য, কতকগুলি আমাশয় হইতে এবং কতকগুলি গ্রহণী হইতে অপক্ক অবস্থায় শোণিত-সিরায় প্রবেশ করে। পক্কায়ের সারভাগ, গ্রহণীস্থিত হৃদয় হৃদয় ছিদ্র দ্বারা কৈশিকী সিরায় প্রবেশ করিয়া ক্রমে উর্দ্ধ-গামী রসবাহিনী ধমনীতে উপনীত হয়। রসবাহিনী ধমনী নাভিদেশ হইতে পশ্চাৎ-ভাগে পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া হৃদয় প্রদেশে উপস্থিত হইয়া নীল সিরায় সহিত মিলিত হইয়াছে। ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ ও এই ধমনী দ্বারা হৃদয় প্রদেশে শোণিত সিরায় পতিত হইয়া হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হইতেছে। ১৩৬।

গ্রহণী হইতে হৃদয়তম স্রোতঃ দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে রসের সহিত এবং অবশিষ্টাংশ শোণিত সিরায় প্রবেশ করিতেছে। এইরূপে সমস্ত ক্ষুদ্রায় হইতে ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ এবং জল শোষিত হয়। এবং এই স্থান হইতে পিত্তের কিয়দংশ শোষিত হইয়া নীল সিরায় পতিত হইতেছে। এইরূপে ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ, জল ও পিত্ত শোষিত হইলেও ভুক্তায় কঠিনতা প্রাপ্ত বা বিভক্ক হয় না, বরং পূর্ববৎ তরলই থাকিয়া যায়। কারণ সমস্ত জলীয় ভাগের শোষণ হয় না, যাহা আবশ্যক তাহাই শোষিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত জলীয় ভাগ এবং আমাশয় পরিষ্কৃত রস, এতদ্ব্যতিরিক্ত দ্বারা উহার তরলতা পূর্ববৎই থাকিয়া যায়। এই ভুক্তায় গ্রহণীর মূলভাগ হইতে যত অধিক অগ্রসর হইতে থাকে ততই মধুরতা লাভ করে। কারণ এই যে, গ্রহণী স্থিত কলা যত অধিক পিত্তযুক্ত, উপগ্রহণী সেক্ষপ নহে। উপগ্রহণীতেও লালার জ্বায় ধাতুস্রাব হইতে দেখা যায়।

ক্ষুদ্রায়ের নিম্ন প্রান্তে একটা কবাট দৃষ্ট হয়। যতক্ষণ ভুক্তদ্রব্য ক্ষুদ্রায়ে অপক্ক অবস্থায় অবস্থিত করে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ কবাট বন্ধ থাকে এবং পরিপাক প্রাপ্ত হইলেই ঐ দ্বার খুলিয়া যায় এবং সহজে পক্কায় পকাশরে উপস্থিত হইতে পারে। কবাটের নিকট এই সময় অন্ন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ সমস্তই শোষিত হইয়াছে এবং পক্কায় তরল অবস্থায় হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় মল পকাশরে প্রবেশ করে এবং তখন হইতেই মলে হৃগন্ধ জন্মে। হৃগন্ধের কারণ কি? এ সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত। কেহ

বলেন পকাশয় হইতে এক প্রকার রসের স্রাব হয় এবং তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া মলে হ্রগন্ধ জন্মে । বস্তুতঃ কোন একটি বিশিষ্ট রসের দ্বারাই যে হ্রগন্ধ জন্মে, ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না । কিন্তু দ্রব্য, পরিপাক ক্রিয়া, আশয় এবং ইহাদের সংযোগ এই সমস্তই একত্রে হ্রগন্ধের কারণ । ঐ কবাট, ক্ষুদ্রান্ত্র ও পকাশয়ের মধ্যে থাকিয়া ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রকে পৃথক করিতেছে । এই কবাট এমন কোশলে অবস্থিত যে, পকাশয় গত দ্রব্য পুনরায় কিরিয়া পশ্চাৎ ভাগে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিতে পারে না । কবাটের অংশদ্বয় অর্ধ চন্দ্রাকার ও পেশী নির্মিত । পেশীতন্তু কতকগুলি বৃত্তাকারে ও কতকগুলি সরলভাবে অবস্থিত থাকায় উহা আরও কঠিন হইয়াছে, উহা পিত্তধরা কলা দ্বারা আচ্ছাদিত । উণ্ডক যখন মলপূর্ণ থাকে তখন কবাটের অংশদ্বয় একত্রভাবে সংলগ্ন থাকে যে, উণ্ডক হইতে মল আর কিরিয়া উপগ্রহণীতে উপস্থিত হইতে পারে না ।

পকাশয়ের অপর নাম বৃহদন্ত্র । প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তির বৃহদন্ত্র প্রায় ৬৪ ইইতে ৯৬ অঙ্গুলী দীর্ঘ । বর্ণনার সুবিধায় অল্প ইহাকে চারিভাগে বিভক্ত করা বাইতে পারে । প্রথম উণ্ডক, দ্বিতীয় পকাশয়, তৃতীয় উত্তর গুদ, চতুর্থ অধরগুদ । উণ্ডকের অপর নাম পুরীষায়ক । ইহা একটা থলীর মত, ইহা আয়িক কবাটের দ্বারা ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত যোগ রক্ষা করে । পকাশয়—বৃহদন্ত্রের প্রায় সমস্ত অংশের নামই পকাশয় । উহা উণ্ডক হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধগামী হইয়া পরে সরলভাবে কিয়দূর অগ্রসর হইয়া নিম্নগত উত্তর গুদের সহিত মিলিত হইয়াছে । প্রধানতঃ

এই অংশটির নামই পকাশয় । উত্তর গুদ—ইহা অধরগুদেরই একটা অংশ, নলকাকার । অধরগুদ—ইহা নিম্নবেশে বিস্তৃত হইয়া আবার সর্পিণ হইয়া মলদ্বারে পরিণত হইয়াছে । ক্ষুদ্রান্ত্রের দ্বারা বৃহদন্ত্রের তিনটা আবরণ দেখা যায় । বাহ্য আবরণ, পেশীর আবরণ ও অভ্যন্তর আবরণ, বা মলধরা কলা । পেশীর আবরণের কতকগুলি পেশীহীন বহির্দেশে লক্ষ্যমানভাবে এবং কতকগুলি পেশীহীন অভ্যন্তরদিকে বৃত্তাকারভাবে অবস্থিত করিতেছে । এই পেশীর আবরণ অতিশয় স্থূল, ইহা উপর্যুপরি তিনস্তর পেশীহীন দ্বারা নির্মিত । এ স্থানের পেশীহীনগুলি কুঞ্চিত হইয়া থাকায়, অধিক মল প্রবেশ করিলেও ইহা বিস্তৃত হইতে পারে । উত্তর গুদ ও অধর গুদের পেশীর আবরণও ঐরূপ স্থূল এবং দ্বিবিধ অর্থাৎ দীর্ঘ ও গোলাকার এবং রক্ষ ও কুঞ্চিত পেশীহীন দ্বারা নির্মিত । গুদ-মার্গ বলয়াকার তিন খানি মাংসপেশী দ্বারা নির্মিত । বৃহদন্ত্রের তৃতীয় আবরণ মলধরা কলা । ক্ষুদ্রান্ত্রের দ্বারা ইহাতে আশয়ের সারকৃত পিত্তাণ্ডগুলি সংলগ্ন থাকে না । এই আবরণ ও তন্মু স্তক নির্মিত এবং স্নেহা, সিরাত ও রাস্তা দ্বারা ব্যাপ্ত । ইহাতেও কতকগুলি স্থূল স্থূল ছিদ্র আছে । এবং তাহারাও কৈশিকী সিরার সহিত যোগ রাখিয়া থাকে । এবং এই সকল কৈশিকী সিরাজাল বহুসংখ্য স্থূল অরুণ সিরার সহিত সংযোজিত । এই পোষিত-বাহি কৈশিকী সিরা হইতেই অপান বায়ু পকাশয়ে প্রবেশ করে এবং পেটের এক স্থানকে বেদনা উপস্থিত করিয়া কল-অধিক-করিয়-দেয় । এতদ্বির মলভাগ হইতে ও বায়ু উপস্থিত হয় । মল দ্বিধাশিন বাগানে বৃহদন্ত্রের

ক্রিয়াও সাহায্য করে। বৃহদন্ত্রের পরিপাক শক্তিও কিছু না আছে তাহা নহে, তবে আশায় কিবা কুদ্রাঘের সহিত তাহার তুলনা হয় না। কারণ পিত্তকারী দ্বারা কোন ঔষধ দ্রব্য, পকাশয়ে প্রবেশ করাইলেও তাহা পুরীষরূপে পরিণত না হইয়াই নির্গত হইয়া যায়। তবে উহার একটা শক্তি বা বীৰ্য্য শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা জানা যায় যে পকাশয়ের পরিপাক ক্রিয়াও আছে, কিন্তু তাহা ত্বকের দ্বারা। পকাশয়ের পরিপাক প্রাপ্ত দ্রব্যের বীৰ্য্য শোণিত মধ্যেই শোষিত হয়। কিন্তু দ্রবমল সিরাজাল দ্বারা শোষিত হইয়া বস্তিদেশে নীত হয়।

পূৰ্ণোক্তরূপে অপান বায়ুর বেগে ও বৃহদন্ত্রের কুঞ্জে মল সঞ্চালিত হইয়া উত্তর গুদে উপস্থিত হইলে একেবারে মলদ্বারে আসিয়া পড়ে না, কিন্তু উত্তর গুদে কিয়ৎকাল অবস্থিত করে। উত্তর গুদের উপরিভাগ বস্তি—গাত্রের সহিত সংলগ্ন। ইহার

উপরিভাগ হইতে মল আসিয়া উত্তর গুদে পতিত হইলে দেখা যায়, মল কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ উত্তর গুদে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র মধ্যে অসংখ্য দ্রব মলবাহি সূক্ষ্ম স্রোতঃ বিद्यমান থাকে। আবার ঐ সকল সিরাজালই বস্তিগাত্রে ব্যাপ্ত হইতে দেখা যায়।

অতঃপর অপান বায়ুর বেগে মল অধর গুদে উপস্থিত হইয়া নির্গত হইয়া যায়। কুঞ্জন ক্রিয়া দ্বারা অপান বায়ু উত্তেজিত হইতে পারে। অর্থাৎ নিঃশ্বাস টানিয়া উহা বাহির হইতে না দিয়া নিয়মিত চাপ দিলে অপান বায়ুর উপর যে ভার পতিত হয় তদ্বারা ঐ বায়ু প্রকুপিত হইয়া অল্প বেদনা উৎপাদন করতঃ মল নিঃসারণ করিয়া থাকে। এবং এই সময় অস্ত্রেরও কুঞ্জন ক্রিয়া হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ শুদ-মুখ কুঞ্চিত থাকে কিন্তু মল নির্গমন কালে উহা প্রশস্ত হইয়া মল পরিত্যাগ করে। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ—

শ্রীহরমোহন মজুমদার।

## দীর্ঘজীবীর দিনচর্যা।

### (১) শ্রীমুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

এম্.এ, বি, এল্. সি, এস, আই।

মহাশয় প্রকৃতি বাহারি ক্রিয়াক্ষত্র ও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহারা জানেন যে উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ মানুষের মনের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কেননা উপদেশ বাড় মন, উদাহরণ শরীরী, উপদেশ কর্তার, উদাহরণ কোমল, উপদেশ আত্মকারী প্রভৃ, উদাহরণ হিতকারী সুলভ। পিতার আদেশ পালন করিবে ইহা উপদেশ—রাষ্ট্রের ইহার অপূর্ণ জবদানস্বরূপ উদাহরণ। ধর্মের জর অবশ্যের পশ্চম উপদেশ দাতা—

মহাত্মারত ইহার সর্বাঙ্গস্বল্পক বিশদ উদাহরণ।

নীতি সম্বন্ধে যেমন স্বাভাবিক পক্ষ ও উক্তগ—আয়ুর্বেদের স্বহৃৎ উপদেশ, দীর্ঘজীবী—তাহার উদাহরণ। আয়ুর্বেদ হইতে কেবল আয়ুর্বেদ উপদেশ সংগ্রহ পূর্বক প্রচার করা অপেক্ষা এতদেশীয় দীর্ঘজীবীগণের অনুষ্ঠিত জীবন, ব্যায়াম ও আচারবিধি পাঠক পাঠিকগণের নিকট উপস্থিত করিলে, অধিক ফলপ্রসূত লভ্যবনা আছে এই সিদ্ধান্ত করিয়া, আয়ুর্বেদ

জীবগণের দিনচর্যা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 'অধুনা বাল্যলীল সাধারণ পর-  
মাযুর পরিমাণ সম্বন্ধে বাহারা অসুস্থকান  
করিয়াছেন তাঁহারা বলেন ৩০ হইতে ৪০ বৎসর  
আধুনিক বাল্যলীল গড় পরমাযু বলা যাইতে  
পারে। এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থায় বাহারা  
৭০ অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই  
আমরা দীর্ঘজীবী বলিব। শিশু পড়িয়া গেলে  
কি বিধম্ন খাইলে, 'মাতা "বাটু বাটু" বলেন।  
বাটু বৎসর বাঁচাই যেন এখন খুব বেশী।

উত্তর পাড়ার সুবিখ্যাত রাজা **শ্রীমুক্ত**  
**প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়**

এম, এ, বি, এল, সি, এস, আই মহোদয়  
১২৪৭ শালের ৩রা আশ্বিন জন্ম গ্রহণ করেন,  
মৃত্যুঃ এক্ষণে তাঁহার বয়স কিঞ্চিৎ অধিক  
৭৬ বৎসর। আমি রাজা বাহাদুরের  
অনুষ্ঠিত দিনচর্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য হইয়া  
তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন কবিয়াছিলাম রাজা  
বাহাদুর তত্বতরে আমাকে অল্পগ্রহ পূর্বক  
বাহা লিখিয়াছিলেন আমি তাহাই সুবিজ্ঞ  
করিয়া প্রকাশ করিতেছি। আশাকরি  
ইহাতে দীর্ঘ জীবনাভিলাষিগণের উপকার  
হইবে।

পিতা মাতার পবিত্র শরীর ও শাস্ত্র-  
সারে বিতর্ক আচার ব্যবহার, আমার দীর্ঘ-  
জীবনের প্রধান কারণ মনে করি।

**দস্তাবেজ—৪০ বৎসর বয়সের**  
পূর্বে কখনও **জল-ভাঁড়া** কখনও **খড়ি** মুখের  
ভাঁড়া দিয়া দস্তখতন করিতাম। জাহাজ  
পর এখন পর্য্যন্ত—**বাটা ভাঁড়া**, **সৈকব লবণ**,  
**ভট্ট**, **পিপুল**, **মরিচ**, **তেজ**, **পাতা**, **দোহ** ও  
ইহার ভাঁড়া সমান ভাণ্ডে রাখিয়াই এই ভাঁড়া

দিয়া দস্তখতন করি। এখন পর্য্যন্ত দাঁত  
ভালই আছে।

**তৈলমর্দন**—দ্বির নিয়ম কিছু  
নাই—তবে প্রতিদিন তৈল মাখি। বর্ষা ও  
হেমন্তকালে কুস্ত-প্রসারণী এবং অপর ঋতুতে  
কটু তৈলে প্রস্তুত সৈকবাস্ত তৈল মাখি।  
আমি কখনও সাবান ব্যবহার করি না।

**স্নান**—৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতি-  
দিন অবগাহন স্নান করিয়াছিলাম। এক্ষণে  
তোলাজলে স্নান করিয়া থাকি। শীতকালে  
—জলে স্নান করি।

**আহার**—৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত  
বেলা ১০ কি ১০½ টার সময় গৃহস্থ লোকের  
ভ্রায় সামান্যিথে অন্নাহার করিতাম। বেলা  
২½ টার সময় কচুরি সদশ জল খাবার খাই  
তাম। রাত্রি ৮টার মধ্যে পুরী খাইতাম।  
মাসের মধ্যে ৪৫ দিন ছাগ মাংস ভোজন  
করি। প্রতি মাসেই এই নিয়ম। যন্ত  
ভোজন প্রায় ত্যাগ করিয়াছি। মাসের  
মধ্যে কখনও এক দিন খাই। দ্বতবৎসর  
হইতে রাত্রিতে কেবল ২½ খানি কটী কি  
থৈ খাইতেছি। ফলের মধ্যে রস্তু, পেঁপে,  
আম্র, লিচু, শাকালু, কচিশসা, বাদাম,  
কিসমিস, ও পেস্তা সর্বদা খাইয়া থাকি।  
এসকল আহারের সঙ্গেই খাইয়া থাকি।

২০ বৎসর বয়স হইতে ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত  
বোধ হয় একদিনের জন্তও উপবাস করিতে  
হয় নাই। আমার বয়স মনের ভ্রমই ভাল  
লাগে, তবে ঝিই ভ্রম অধিক খাইতে পারি  
না। খাইলে ভ্রম হয়। প্রায় ১০৫ টার  
পূর্বে আমি কিছুই খাই না।

**পানীয়**—বয়সের প্রথম ভাগ পরিহার  
করিয়া পান করিতাম। কিন্তু বয়সের

টাক্স" হওয়ার পর আর গঙ্গা জল পান করি নাই, পুকুরের জল পান করিতেছি। আমি ১০।১২ বৎসর বয়সের পর কখনও বরফ ব্যবহার করি নাই। কখনও চা পান করি নাই।

**নিদ্রা**—পরীক্ষা দিব্যার ২।৩ মাস পূর্বে কেবল ৫ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতাম। মনে করিতাম যাহারা মনের সাথে নিদ্রা যাইতে পারে তাহারা কি সুখী। অপর সময় ৭।৮ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতাম। ৩০ বৎসর হইতে রাত্রি ৩ টার সময় শয্যাভ্যাগ করার নিয়ম করিয়াছি। ৫০ বৎসরের পর দিবানিদ্রা অভ্যাস হইয়াছে। কিন্তু আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টার অধিক নহে।

**শস্ত্রানুগৃহ ও শশ্য**—সমস্ত বৎসর আমার শয়ন গৃহের ১টা কি ২টা জানালা খোলা থাকে। গ্রীষ্মকালে সমস্ত জানালা খোলা থাকে। শীতকালে লেণ দিয়া মুখ কখনই ঢাকিতে পারি না। কখনও গদিকেশ্বরের বসি নাই। ৬।৭ বৎসর বয়সের পর কখনও গরিশব্যার শয়ন করি নাই। ৫০ বৎসরের পূর্বে কখনও মশারি ব্যবহার করি নাই।

**পরিচ্ছদ**—শীত, গ্রীষ্ম দুই কালেই আমি শীত ও গ্রীষ্ম সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী অনুভব করি। তজ্জন্ত শীতকালে গাঁয়ের উপরে ক্লানেল জামা অথবা উলের গেঞ্জী ২।৩ মাস পরিয়া থাকি। আমি সাধা-সিধা পরিচ্ছদের পক্ষপাতী। ৫০ বৎসরের পূর্বে কখনও ছাতি ব্যবহার করি নাই।

**ব্যায়াম**—৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতিদিন দুই বেলা অস্বারোহণ করিতাম। সংগ্রতি প্রাতে ও অপরাহ্নে আধ ঘণ্টা করিয়া পদাতিতে বেরাই।

### বিশ্বাস কৰ্ম্ম ও অধ্যয়ন—

মান আহারের সময় বাদে সকল সময় বিষয়-কৰ্ম্ম কিম্বা পুস্তক পাঠ করি। শরীর সুস্থ রাখিবার নিয়ম ১৬।১৭ বৎসর হইতে এখন পর্যন্ত সৰ্বদা পাঠ করি ও এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করি। মানসিক অথবা শারীরিক কার্যে সৰ্বদা ব্যাপৃত থাকি। সকল বিষয়েরই পুস্তক পড়িয়া থাকি, তবে গত ২।৩ বৎসর মধ্যে শরীর ও চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকই অধিক পড়িতেছি। ১৩।১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত পড়াপড়নার তাজিল্য করিতাম। তাহার পর স্কুল ও কলেজের পড়ার উপর ২।৩ ঘণ্টা মাত্র পড়িতাম। কিন্তু পরীক্ষা দিব্যার পূর্বে ২।৩ মাস ১২ হইতে ১৮ ঘণ্টা পড়িতাম। শেষ রাত্রিতে ৩টার সময় উঠিয়া প্রাতঃকাল পর্যন্ত লেখা পড়ার কার্য করিতাম। প্রায় ৫।৬ মাস হইতে দেহের আলোকে চক্ষুর দৃষ্টির হানি হইবার আশঙ্কায় বিছানায় শুইয়া থাকি। ৪টার পর উঠি—শেষ রাত্রিতে আমার ইংরাজি চিঠি পত্র ও অপর কাজ করি। অধিক কাজ না থাকিলে পুস্তক পাঠ করি।

**ঔষধ**—২০ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ও পরে আবশ্যক হইলে হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন করিতাম। গত ১০।১২ বৎসর হোমিওপ্যাথি ঔষধ ভিন্ন কবিরাজী ঔষধও খাইতেছি। প্রতি বৎসর ৩০।৪০ দিন ছাগলাভ দ্রুত ১ তোলা কি ১½ তোলা সেবন করি। পূর্বে বলিয়াছি প্রাতে ১৪০ টার পূর্বে কিছু খাই না, কিন্তু এখন ছাগলাভ দ্রুত সেবন করি তখন প্রাতে দ্রুতের সহিত অর্ধপোয়া গব্য দুগ্ধ পান করিয়া থাকি। বাল্যকাল হইতে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকি।

বয়সে তজ্জন্তু হৃৎকায়ের পিল ২১৩ বৎসর খাইয়াছিল। তারপর ৫৭ বৎসর কোন রেচক ঔষধ খাই নাই। এক্ষণে প্রায় ৪০ বৎসর হইল “শতুহরীতকী” খাইতেছি। চক্ষু-বোগাধিকারের যে ভূঙ্গরাজ তৈল আছে, ১০১২ বৎসর হইতে প্রতি সপ্তাহে ৩৪ দিন ঐ তৈলের নৃত্য লইয়া থাকি। অধিক লেখা পড়ার পর চক্ষু ব কষ্ট হইলে নির্মলী ফল মধুতে ঘসিয়া চক্ষুতে দিয়া থাকি। এমনও প্রায়ই চক্ষুতে দিয়া থাকি।

**বিশেষ অভ্যাস**—চুকট ছাড়িবার ভ্যন্ত সাজা তামাক ২১ দিন খাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু “তলব” নাই বলিয়া তাহা অভ্যস্ত হয় নাই। যতক্ষণ কাজে থাকি ততক্ষণ ঘরের ভিতর থাকি। বাকি সময় বারাণ্ডায় বা ফাঁকা জায়গায় থাকিতে ও বসিয়া পড়িতে ভালবাসি। প্রতিদিন প্রাতে ৪৫টার সময় উপস্থিতে জল দিয়া থাকি।

**শ্রম-বিনোদন**—ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লইয়া অবসর যাপন করি ও তাহাদিগকে সমবয়স্কের স্নায় দেখি।

**নীতি**—মন ভাল না রাখিলে শরীর ভাল থাকে না। পিতার উপদেশ ও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে সাংসারিক ঘটনায় অধিক আনন্দ বা দুঃখ করি না। কোন কার্য সম্পন্ন করিবার জন্ত সম্পূর্ণ চেষ্টা করি কিন্তু তাহা বিফল হইলে মনকে কষ্ট দিই না। সাংসারিক ঘটনা সকল আমাদের মঙ্গলের জন্ত বাটয়া থাকে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া মনকে সর্বদা সুখে রাখি। কাহারও সুখে হিংসা করি না এবং দুঃখে আনন্দ করি না।

**ঈর্ষ্যাচরিত্র**—জীবনের সমস্ত কার্যেই ধর্ম্মানুশীলন করিয়া থাকি—প্রকাশ আন্থিক কার্যে অতি সামান্য সময় ক্ষেপণ করি।

আমার বাতপৈত্তিকের ধাত। তবে প্রায় একবৎসর দেড় বৎসর হইতে দেখিতেছি পূর্বাপেক্ষা মধ্যে মধ্যে ক্রোধের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

**পীড়ার হেতু**—যে কোন শারীরিক কষ্ট পাইয়াছি আমার বিশ্বাস তাহার কারণ ২২ বৎসর বয়স হইতে এপর্যন্ত চুকট খাওয়া এবং ঔষধের প্রতি অধিক নির্ভর করিয়া মধ্যে মধ্যে অতি ভোজন।

## আমরা অল্পায়ু হইতেছি কেন ?

আমরা অল্পায়ু হইতেছি কেন ? বিচার করিয়া দেখিবার পূর্বে, আয়ু সন্ধকে সাধারণ লোকের যে একটা বিবম ভ্রম আছে তাহা অপনোদন করা উচিত। আয়ুঃশব্দের অর্থ জীবিতকাল অর্থাৎ যতদিন আমরা বাঁচিয়া থাকি সেই কালকে আয়ু বলে। আমাদের জীবিতকালের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই। মনে করিলে—স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিয়া

চলিলে, আমরা আমাদের জীবিতকাল সুদীর্ঘ করিতে পারি—আমরা দীর্ঘজীবী হইতে পারি। আবার অত্যাচার করিলে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মের অবমাননা করিলে, আমরা জীবিতকালকে অতিদ্রুত করিতে পারি—আমরা নিত্যন্ত ক্ষমায় হইতে পারি। লোকের কিন্তু ধারণা, মানুষ একটা নির্দিষ্ট আয়ু লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের বিশ্বাস অনুসারে প্রতিদিন ঐ নির্দিষ্ট

অর্থাৎ অমুকের আয়ু তাহার জন্মের সহিত ঠিক হইয়া গিয়াছে—তা সে হাজার নিধম পালন করুক বা সহস্র অনিয়ম করুক তাহাব জীবিতকাল তাহাতে বৃদ্ধিও হইবে না হ্রাসও পাইবে না—সে যত আয়ু লইয়া আসিয়াছে ততদিন তাহাকে কে মারে! জীবিতকাল সম্বন্ধে যাহাদের এইরূপ স্থির ধারণা আছে তাহারা যে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন উপেক্ষা করিবে ইহা আর বিচিত্র কি? ইহাদের নিকট যদি কেহ বলেন “অমুক ঘোন অজিতেশ্বিয়—নানা অত্যাচার করিয়া মারা গেল”—উহারা অমনি বলিবে “উহার আয়ু ছিল না তাই মারা গেল।” এই নিয়ত-আয়ুবাদিগণের ভ্রম নিরাশ জন্ত আমরা কিছু বলিব না। আয়ুর্বেদবক্তা ঋষি আয়ু সম্বন্ধে শিষ্যের সম্মুখে নিরাশ জন্ত যাহা বলিয়াছেন আমরা নিম্নে বঙ্গভাষায় তাহারই অনুবাদ প্রকাশ করিলাম—

“আয়ুর পরিমাণ যদি বিধাতাকর্তৃক নিরূপিতই থাকিত তাহা হইলে দীর্ঘায়ুলাভ করিবার জন্ত মন্ত্র, ওষধি, মণি, মঙ্গল, বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাতাদি কেন? উদ্ভাস্ত, চণ্ড, চপল, গো, গজ, উষ্ট্র, গর্দভ, অশ্ব, মহিষাদি এবং দুষ্ট ব্যাদি পরীহার করিয়া চলিবারই বা প্রয়োজন কি? পর্বত হইতে পতন, গিরি সঙ্কট, দুর্গমস্থান, জলশ্রোতঃ, প্রমত্ত, উন্মত্ত, মোহ-লোভাকুলমতি শত্রুগণ, প্রবল অগ্নি ও বিষধর সর্পাদি হইতে আত্মরক্ষারই বা আবশ্যক কি? আয়ুর পরিমাণ যদি নির্দিষ্টই থাকিত তাহা হইলে দৃশ্যহাস, রাজকোপ প্রভৃতি আনুশাসন করিতে পারিত না। আমরা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সহস্র পুরুষের

মাধ্যে যাহারা সর্বদা যুদ্ধ করে এবং যাহারা না করে, তাহাদের আয়ু সমান নহে। আমরা দেখিতেছি যে জন্মান্তর প্রতীকার ও অপ্রতিকাৰ হেতু মানুষের আয়ুর অতুল্যতা রহিয়াছে (যেমন, যদি কোন শিশুর নাড়ীচ্ছেদে ব্যতিক্রম ঘটে তবে তাহাব প্রতিকারে শিশুর জীবনরক্ষা ও অপ্রতিকারে মৃত্যু ঘটয়া থাকে)। যে বিষপান করে ও যে বিষগণন করে না এই দুই জনের আয়ুর অতুল্যতা দেখা যায়। জলপানের কলসী অপেক্ষা চিত্রখট অর্থাৎ চিত্রিত তোলা কলসী, অধিক কাল স্থায়ী হয়। যখন আমরা বুঝিতেছি বলিতেছি ও দেখিতেছি যে দেশ, কাল ও সাত্ত্ব্যের বিপরীত আহার বিহারে আয়ু হানি এবং শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিপূর্বক আহার বিহারে আয়ুবৃদ্ধি ঘটয়া থাকে, তখন সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, হিতাচার-মূল আয়ু। গুরুর এই কথা শুনিয়া শিষ্য বলিলেন—ভগবন্ যদি আয়ুর পরিমাণ বিধিনির্দিষ্ট না হইল তবে কালমৃত্যু অকালমৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয়? এতদন্তরে গুরু বলিতেছেন—একটি শকটের বিষয় চিন্তা কর—যদি শকটটা উত্তম সারবান কাঠে স্ননিপুণ কারিকর কর্তৃক সৃষ্টিত হয়, বলিষ্ঠ, শাস্ত্র অশ্বে শকট বহন করে, স্ননিপুণ সারথী শকট পরিচালন করে, সমতল রাজমার্গে বাহিত হয়, যথাকালে শকটচক্রে স্নেহাদি প্রদত্ত হয় এবং পরিমিত কার্য নির্বাহ করে, তথাপি চক্রমণ্ডলের স্বপ্রমাণ-ক্ষয়হেতু এক দিন উহা বিনষ্ট হইবে। এইরূপ মানুষের দেহরূপ যথাসাধ্য আহার বিহার অনুসারে পরিচালিত হইলেও একদিন উহা অচল হইবে। ইহাকেই কাল-মৃত্যু বলে। আর উক্ত শকটের উপাদান যদি অসার হয়, গঠন যদি স্ননিপুণ না



হয়, যদি তুষ্ট অথ কৰ্ত্তক উচ্চনীচ মার্গে, অনিপুণ সারথী দ্বারা অতি ভারযুক্ত হইয়া পরিচালিত হয়, যদি অভিঘাত হেতু চক্রাঙ্গের হানি হয়, তাহা হইলে শকটটী যেমন অকালে বিপন্ন হইয়া থাকে, মানুষের শরীরও সেইরূপ বলের অতিরিক্ত চেষ্টা, অধির অতিরিক্ত ভোজন, অতিনৈদ্রুণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বিষবহির উপতাপ, অভিঘাত ও উপবাসাদিহেতু মধ্য-কালেই 'অস্তিমদশায়' উপনীত হয়। ইহারই নাম অকালমৃত্যু"। (চরক-বিমান ২য় অধ্যায়)

উপবি উদ্ধৃত ঋষিবাক্যের সারমর্ম এই—মানুষের কোন নির্দিষ্ট আয়ু নাই—হিতাচার পালন কর, আয়ু রক্ষিত হইবে, অহিতাচার কর, আয়ু ক্ষয় হইবে। অতঃপরও যদি নিয়ত-আয়ুবাধিগণের ভ্রম নিরাশ না হয়, তাঁহারা যদি হিতাচারের—স্বাস্থ্যরক্ষাকর নিয়মের উপকারিতায় দৃঢ় প্রত্যয় না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এবং সমাজের দুর্দৃষ্ট বৃদ্ধিতে হইবে। ইহাও বৃদ্ধি যে, আর ঋষিবাক্যেও লোকের শ্রদ্ধা নাই।

স্ববুদ্ধি পাঠক এক্ষণে বৃদ্ধিতে পারিলেন যে, যা! বাড়ানর ও কমানর উপায় আমাদের হাতেই রহিয়াছে। কাহার ইচ্ছা নয় যে, আমি স্বস্থ শরীরে থাকি? কে ইচ্ছা করেন না যে, আমার আয়ু শতবর্ষ পরিমিত হউক? অব্যাহত স্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘ আয়ু যখন সকলেরই ঈশ্রিত এবং আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধির উপায় যখন আমাদেরই সম্পূর্ণ আয়ত্ত তখন আমাদের অগ্নায়ু হওয়ার কারণ কি?

প্রথম কারণ—শিক্ষাভাব—আচার-ভ্রংশ। অধুনা আমাদের দেশে পল্লীতে পল্লীতে পাঠ-শালায় স্বাস্থ্যরক্ষার পুস্তক বালকদিগকে পড়ান হইতেছে—তবে শিক্ষাভাব কেন

করিয়া বলা যায়? স্বাস্থ্যরক্ষার পুঁথি আবৃত্তি করাকে আমরা শিক্ষা বলিব না। যোগ্য-করণ (Experiment) যেমন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রাণ, আচার অনুষ্ঠান তেমনি স্বস্থ-বৃত্তের প্রাণ। আচারভ্রষ্ট হইয়া আমরা যদি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম আবৃত্তি করি, তাহা হইলে এই প্রাণহীন শিক্ষাকে শিক্ষাভাব বলায় দোষ কি? চারিদিকে কলেরা হইতেছে ও ক্রমহাশয় "সরলশরীরপালনের" নজির দিয়া উপদেশ দিলেন দেখ, তোমরা কেহ এখন কাঁচা ফল খাইও না। ছাত্র দেখিল গুরু-মহাশয় স্বয়ং বাড়ী গিয়া পেয়ারা ও শর্শা খাইতেছেন। ছেলে পাঠশালায় পড়িয়া আসিল "প্রাতঃকালে দস্তধাবনের পূর্বে কিছু ভক্ষণ করা উচিত নহে।" বাড়ীতে কিন্তু সে রোজ দেখে, বাবা বিছানা হইতে উঠিয়া কাছা দিতেও তরা সহে না, আগে চা খান। আপ-নারা বলুন দেখি এস্থলে বালক গুরুমহাশয় ও পিতার আচরণের অনুকরণ করিবে কি পুঁথির মতে চলিবে? পূর্বে এদেশের পাঠ-শালায় "শরীরপালন" পড়ান না হইলেও আচরণ করিয়া গৃহে গৃহে শরীরপালন শিক্ষা দেওয়া হইত। এই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। তোমরা আগে নিজে সদবৃত্ত, সদাচার অনুষ্ঠান কর, পরে শিক্ষা দাও, যে শিক্ষা ফলবতী হইবে। নচেৎ মত্তপায়ীর পানত্যাগের উপদেশ কেহ শুনিবে না। একটা গর মনে পড়িয়া গেল—একজনের ছেলে বড়ই মিষ্ট-প্রিয় ছিল। পিতা বিরক্ত হইয়া িস্তা করিত, কিসে ছেলের এ অভ্যাস ছাড়ান যায়। একদিন পিতা পুত্রকে এক সাধুর নিকট লইয়া গেল—সাধু বাবুসিদ্ধ পুত্রকে, বাহাকে ক্রপা করিয়া বাহা বলেন ঠিক ফলে। লোকটী সাধুকে বলিল, ক্রপা করিয়া

আমার ছেলেটির অতিরিক্ত মিষ্ট খাওয়ার অভ্যাসটা ছাড়াইয়া দেন। সাধু বলিলেন, সাত দিন পরে বালককে লইয়া আসিও। সাত দিন পরে লোকটা ছেলে লইয়া আবার সাধুর নিকট উপস্থিত হইল। সাধু কেবল ছেলেটির গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন “বেটা, মিঠা মং থানা” সেই হইতে বালক মিষ্ট খাওয়া পরিত্যাগ করিল। বালকের পিতা আবার সাধুর কাছে গিয়া বলিল “দেখুন আমার একটা সন্দেহ আছে, দয়া করিয়া ভঞ্জন করুন” সাধু বলিলেন, কি সন্দেহ বল। সে বলিল আজ্ঞা আমাকে সাতদিন পরে আসিতে বলিলেন কেন? আগনি ত সেই দিনই “বেটা মিঠা মং থানা” এই কথা বলিতে পারিতেন। সাধু বলিলেন “দেখ আমি নিজে তখন মিষ্ট খাইতাম, তাই তখন ঐ কথা বলি নাই, সাত দিন আমি মিষ্টভোজন পরিত্যাগ করিয়া তবে ঐ কথা বলিতে পারিয়াছি এবং তোমার ছেলেও আমার কথা শুনিয়াছে”। আমাদের দেশের উপদেষ্টারা কবে এই কথার গুরুত্ব জয়স্কর করিবেন? আজ কাল বিদেশ হইতে বিবিধ অশন বসনের আমদানী হইতেছে, লোকে শিক্ষার অভাবে, সে গুণি হিতকর কি অহিতকর বিবেচনা করিতে না পারিয়া, মূঢ়ের ভায় অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া বাহা পাইতেছে তাহাই গলাধঃকরণ করিতেছে। বাহা সম্মুখে দেখিতেছে তাহাতেই অঙ্গ ভূষিত করিতেছে। কত উদাহরণ দিব? ধরুন বিলাতী জমাট দুধ ও বিবিধ ফুড, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত কে না ব্যবহার করিতেছে? যে দেশ গোধন ও ধাত-ধনে ভরা ছিল সেই দেশের শিশুগণ আজ দেশান্তর হইতে আনীত পশু-বিশত দ্বন্দ্ব পালিত হইতেছে। অহো দশাবিপর্নয়!

এ সকল খাওয়া না বিষ? বিদেশীয় ব্যবসায়িগণ স্বার্থের জন্ত ঐ সকল দ্রব্যের গুণোদ্বেষণ করিতেছে শত্রু। যে দেশের বিলাসিণী রমণীগণ সৌন্দর্য্য হানির আশঙ্কায় সম্মানকে স্তম্ভদানে পরাশ্রয়ী হয়, সে দেশেই উহাদের প্রচার হউক, ভারতে এ সকল চালাইও না। পরিচ্ছদের কথা কিঞ্চিৎ বলি—বিদেশ হইতে রাশি রাশি পুরাণ জামা, কোট এদেশে আসিতেছে। এই সকল জামা কোথা হইতে আসিতেছে? এগুলি কাহাদের পরিধৃত? এ সকল তত্ত্ব না জানিয়া এদেশের লোকে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া আগ্রহের সহিত মূল্য দিয়া ঐ সকল পুরাণ, অস্ত্রের ব্যঞ্ছিত জামা ক্রয় করিয়া পরিতেছে। আর কত ছুরাণ্যোগ সংক্রামক ব্যাধি এতদ্দেশে বিস্তার করিতেছে। যে দেশের প্রথা, পিতার গামছা পুত্র ব্যবহার করিবে না, সে দেশের এই দূরবস্থা! এই সকল আয়ুঃক্ষয়কর অনর্থ-পরম্পরা হইতে দেশবাসিগণকে রক্ষা করিবার কি কেহ নাই?

দ্বিতীয় কারণ—প্রজ্ঞাপরাধ। প্রজ্ঞাপরাধ কি? প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান বাহা করিতে বলে তাহা না করিলে জ্ঞানের নিকট যে অপরাধ করা হয় তাহাই প্রজ্ঞাপরাধ। প্রজ্ঞাপরাধের তিনটি অবস্থা; প্রথম—“জ্ঞাতান্যং স্বধর্ম্মানামহিতানাম নিবেবদন”। অর্থাৎ নিজেই বেশ বুঝিতেছি যে, এইরূপ আহার বিহার শরীরের পক্ষে কদাপি হিতকর নহে। তথাপি জানিয়া শুনিয়া প্রজ্ঞার বখা ইচ্ছাপূর্ব্বক না মানিয়া সেই অহিত আহার বিহার করিতেছি। দ্বিতীয় অবস্থা—

“বুদ্ধ্যা বিবম-বিজ্ঞানং বিবমঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।

প্রজ্ঞাপরাধং জ্ঞানীয়ায়নসো গোচরং হি কথং।

প্রজ্ঞা, যথাযথ বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছে “ইহা করিও না, ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিত” কিন্তু আমি প্রজ্ঞার কথা না শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক উল্টা বুঝিয়া, অহিতকে হিতকর ও হিতকরকে অহিত ভাবিয়া আচরণ করিতেছি। ইহার পর এমন এক অবস্থা আসিয়া পড়ে যখন প্রজ্ঞার বাণী শুনিবার আর শক্তি থাকে না। এই অবস্থায় “দীর্ঘতিস্তিবিব্রট” ইহা অর্থাৎ হিতাহিত্য বিবেকশূন্য হইয়া লোক যে অন্তত্ব কর্মের অনুষ্ঠান করে ইহাই প্রজ্ঞাপরাদেশের তৃতীয় অবস্থা। প্রতি অবস্থার উদাহরণ দিতেছি। আমি বেশ জানি প্রাতঃস্থান স্বাস্থ্যের হিতকর, তথাপি জানিয়া শুনিয়াও আমি বেলা ৮টা পর্যন্ত বিছানায় পড়িয়া থাকি। আমি জানি, বায়ুপ্রবাহহীন বহু-জনাকীর্ণ স্থানে রাত্রিজাগরণ অধিক অহিতকর, জানিয়াও আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থিয়েটার দেখিতে ছাড়ি না। আমি জানি চা পান করিলে আমার শরীর বড়ই অস্থির হয় তথাপি লোকের দেখা দেখি স্নোতে গা ঢালিয়া দিয়া চা খাইতেছি। প্রজ্ঞাপরাদেশের এই এক অবস্থা। আমি জানি পাশ্চাত্য জাতির অভ্যস্ত খাদ্য আমার জাতিসাম্রাজ্য নহে বলিয়া কিম্বা দেশান্তর হইতে আগত টানবন্ধ বিবিধ বস্তু পর্যুষিত, বলিয়া আমার শরীর ও মনের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না, তথাপি আমি বিপরীত ভাবে চিন্তা করিয়া কোথাও বা কষ্টস্রষ্টা এক আধটা অল্পকূল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, যে ভক্ষ্য বস্তুতত্ত্ব অহিতকর তাহাকেই হিতকর ভাবিয়া স্বচ্ছন্দে সেবন করিতেছি। আমি দেখিতেছি বুঝিতেছি যে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে সাহেবদের মত আটাসাঁটা পোষাক আমাদের

স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, তথাপি আমি দশ জনের দেখাদেখি বিষম-জ্ঞানে অহিতকে হিতকর ভাবিয়া তদনুসারে আচরণ করিয়া আয়ুঃক্ষয় করিতেছি। প্রজ্ঞাপরাদেশের চরম অবস্থায় লোক মূঢ়ের ছায়, পর প্রেরিতের ছায়, সর্বথা হিতাহিত্য বিবেকশূন্য হইয়া, অন্তত্ব-অনুষ্ঠান করে, কাব্যে ও সমাজে ইহার ভূরিভূরি উদাহরণ আছে।

তৃতীয় কারণ—উপকরণাভাব—দারিদ্র্য। নির্মল পানীয়, বিত্তপূর্ণ গৃহজনক খাদ্য, স্বাস্থ্য উপযোগী বস্ত্রাদি, সুখকর বাসভবন, পরিমিত শ্রম, সেবাতৎপর ভৃত্য, রোগে চিকিৎসক, পথ্য, ঔষধ এইগুলি আয়ুরক্ষার সংক্ষিপ্ত উপকরণ। এই উপকরণগুলি অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিতে হইলেও আমরা অর্থাত্তাব শব্দ ব্যবহার না করিয়া উপকরণাভাব শব্দই প্রয়োগ করিলাম, কারণ সংসারে অনেকস্থলে অর্থের সন্ধান থাকিলেও উপকরণের অভাব দেখিতে পাই। যে ধনদ্বারা মানুষ আয়ুরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া আত্মবঞ্চনা করে, স্বাস্থ্যচিন্তকগণ সেই ধনরশ্মিকে, পাণ্ডুরাশির মধ্যে গণনা করেন। পক্ষান্তরে ধাহারা ধনাভাবে স্বাস্থ্য-রক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। আচার্য্য বলিয়াছেন, অগ্রে কিসে স্বস্থ শরীরে দীর্ঘকাল বাচিতে পার সেই চিন্তা করিবে। তারপর কিসে ধনার্জন করিতে পার সেই চিন্তা করিবে। উপকরণ বিহীন লোকের দীর্ঘ আয়ুর মত কষ্টকর আর কিছুই নাই। সে কাল অপেক্ষা একালে আয়ুরক্ষার উপকরণের সংখ্যা এবং মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং অল্পনা ঐসকল উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য লোককে অধিক শ্রম করিতে হইতেছে। দেশে স্বস্থ

ও বাণিজ্যের তাদৃশ প্রসার না থাকায় বহু-সংখ্যক লোকেই চাকুরীজীবী হইয়াছে। একে তাহাদিগকে অত্যধিক শ্রম করিতে হইতেছে, তাহাতে আবার পরের হুকুমে কাজ করিতে হইতেছে। এই হুকুমই তাহাদের আয়ুঃক্ষয়ের যথেষ্ট কারণ। আমাদের দেশের সরকারী আফিস আদালত, কারখানা, সপ্তদাগরী কার্যালয় সকলেরই কার্যকাল মধ্যাহ্ন সময়ে। এ দেশে এক প্রহরের মধ্যে আহাৰ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নহে, আবার দুই প্রহর অতীত হইলে আহাৰ করাও উচিতনহে। কিন্তু দেশের লোকের কার্যকালের এমনই ব্যবস্থা যে, যথাকালে কার্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইলে, লোককে বাধ্য হইয়া এক প্রহরের বহু পূর্বে, যাহারা দূরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া কার্য করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে সূর্যোদয়ের অল্প-পরেই আহাৰ করিতে হয়। তারপর গ্রীষ্ম প্রধানদেশে আহাৰের পর গুরুতর চিন্তা ও শ্রম স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর না হইলেও, দেশের জজ-দিগকে আহাৰান্তেই বিচার করিতে হইতেছে। দেশের কেরানীদিগকে আহাৰান্তেই লেখনী চালনা করিতে হইতেছে এবং দেশের হিসাব-রক্ষকগণ আহাৰান্তেই জমা খরচ লইয়া মাথা কুটিতেছেন। আহাৰান্তেই শিক্ষক পড়াইতে ছেন, ছাত্রও পড়িতেছে,—আর অগ্নিমান্দ্য বহুমূত্র, শিরোরোগ দল বীধিয়া আসিতেছে। আহাৰের পর মানসিক শ্রম করিবার ২৩খা আমাদের দেশে পূর্বে প্রচলিত ছিল না। এদেশের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা প্রাতেই হইত, এদেশের রাজদরবার প্রাতঃকালেই বসিত। স্ততরাং দেখা গেল আয়ুঃক্ষার জন্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া লোকে আয়ুঃ হাবাইতে বসিয়াছে। অহো কি বিধি বিড়ম্বনা! কেবল

কি আহাৰের পরই মানসিক শ্রম? আমি ত দেখিতেছি আজকাল দেশের অধিকাংশ লোকেই বাধ্য হইয়া অধ্যাশন ও বিষমাশন করিতেছে। অধ্যাশন ও বিষমাশন কি? যাহা ভোজন করা হইয়াছে তাহা সম্যক পরি-পাক পাইয়া ক্ষুধার উদ্ভেকের পূর্বেই পুনর্বার ভোজন করাকে অধ্যাশন বলে এবং অধিক মাত্রায় ভোজন, অল্পপরিমাণে ভোজন কিম্বা অকালে ভোজনকে বিষমাশন বলে। আজ-কাল জীবিকার জন্ত অনেকেই বেলা ৪।৬ দণ্ডেব মধ্যেই মধ্যাহ্নের ভোজন শেষ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় কি ক্ষুধা হয়? বহু-লোককে বলিতে শুনিয়াছি, ঘড়িই আমাদের আহাৰ করিতে বলে, ক্ষুধার তড়নায় খাওয়া কেমন তাহা অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছি। ইহা অধ্যাশন নয় ত কি? আহাৰের সময়েরও স্থিরতা নাই। একই লোক পার্শ্চাত্যবস্ত্র বিতালয়ের সময়ানুসারে, চাকুরে হইয়া চাকরীর অবস্থানুসারে এবং কর্ম হইতে অবসর লইয়া নূতন অভ্যাস অনুসারে আহাৰের সময় স্থির করিতে বাধ্য হয়—বহু ভোজন এবং অল্প ভোজন ত অকাল ভোজনেব সহচর, স্ততরাং বিষমাশনের আর বাকী রহিল কি? এই দেশব্যাপী অধ্যাশন ও বিষমাশনের ফলে অগ্নি-মান্দ্য, অজীর্ণ, গ্রহণী, শূল, যকৃৎদোষ, অনিদ্রা, বহুমূত্র, ক্ষয়, শিরোরোগ দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া আবালবৃদ্ধকে আক্রমণ করিতেছে। কথিত আছে “মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ” আহাৰ করিয়াই দ্রুত হাঁটিলে মৃত্যুও তাহার প্রতি দ্রুত ধাবিত হইবে। সমাজের অধিকাংশলোকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলুন দেখি আয়ুর্বা আহাৰান্তে কাহাকে না দ্রুত হাঁটিতে হইবে? এত হাঁটাইটি সমস্তই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া

সুতরাং উপকরণভাব প্রত্যাবে আমরা এ সকল কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

চতুর্থ কারণ - বিস্কন্ধ খাদ্য ও পান্যের অভাব। বণিক্গণের মধ্যে ধর্ম্মভীরুতা হ্রাস পাওয়ার বার্ণিজ্যে অধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে। বণিক্গণ ধনতৃষ্ণার বোর আবের্ভে পড়িয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং অর্থকেই সর্ব্বমুখ্য ভাবিয়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় বার্ণিজ্যক্ষেত্রে ঘোরতর প্রতারণার সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে বিস্কন্ধ খাদ্যদ্রব্য দ্রুত হইয়াছে। এখন মাখমে কলাবাটা; ঘূতে সর্পের চর্কি; সর্ষপ-তৈলে বিবিধ অপেয় স্নেহ; তুণ্ডে খড়ি মাটি, বাতাসা পচাপুতুরের জল; তামাকে চুণ, চট্টেঁড়া পচা কাঁটাল; চিনি ও ময়দায় পাথরের গুঁড়া; আরও কত বীভৎস ব্যাপার ঘটিতেছে আমরা সে সকলের সংবাদ জানি না। দেশে আছে সব কিন্তু ফলের পক্ষে ভূয়া। খাণ্ডে ভেজাল নিবারণের আইন আছে, কিন্তু লোকে আইনের কাটানও শিখিয়াছে। তোমার আমার যে দুঃখ সেই দুঃখ। কেবল কি খাদ্য? ঔষধ বিক্রেতার বিদেশী দ্রব্যকে দেশী নামে, অজ্ঞারিত কে সুজ্ঞারিত বলিয়া, রহিমকে রাম বলিয়া চালাইয়া, দেশের লোকের স্বাস্থ্যহরণ করিতেছে। সুগন্ধি দ্রব্যের বণিক্ অটোকে গুণক বলিয়া, ড্যাফোডিল্কে গন্ধরাজ বলিয়া চালাইতেছে। উগ্রবীৰ্য্য বিদেশীয় এসেল দেশীয় তৈলে মিলাইয়া বিবিধ বিচিত্র নামে বিক্রয় করিতেছে, আর অকালে খালিত্য পানিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। যেদিকে দেখি সেই দিকেই মেকির চলন ভেজালের প্রচার।

বিস্কন্ধ পানীয় জলের কথা আর কি বলিব, আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি যে বিস্কন্ধ জলের অভাবে পল্লীবাসার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে—ম্যালেরিয়া, কণেরা, অজীর্ণাদি বিবিধ দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় বর্ষে বর্ষে কত লোকের আয়ুক্ষয় হইতেছে।

অতঃপর আমরা সর্ব্বকারণ-সংগ্রাহক অধর্ম্ম ও অসংযমের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে, দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে হইলে, কেবল শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না—মনের বিষয়ও চিন্তা করিতে হইবে। মন সুস্থ না থাকিলে সুস্থ বলা যায় না। মন প্রকল্ল না থাকিলে, সর্ব্বদা চিন্তাকুল চিত্তে কালযাপন করিলে, মানুষ সুস্থ থাকিতে পারেনা, দীর্ঘায়ু লাভ ত দূরের কথা। সমাজে অধর্ম্ম এবং অসংযমের প্রাচুর্য্য হওয়ায় লোকের চিত্তের সুখ দ্রুত হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং চিত্তের অপ্রসন্নতা, চিন্তাকুলতার ভ্রান্ত যে সকল রোগ জন্মিয়া থাকে, দেশের লোকের সেই সকল রোগের আধিক্য দেখা যাইতেছে। দেশের লোকের স্বাস্থ্যের কথা, আয়ুর কথা চিন্তা করিলে আকুল হইতে হয়। আশা করি ভগবান আবার সেই সুখের দিন ফিরাইয়া আনিবেন যখন দেশের লোকের—

“নগরী নগরন্তেব রথন্তেব যথা রথী।

স্বশরীরন্ত মেধাবী কৃত্যেব বহিতোত্তবেৎ” ॥

এই শ্লোকি বাক্যানুসারে কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও শক্তি জন্মিবে।

## শিশু-যকৃৎ-চিকিৎসা।

মহিলাগণের বিশেষ পাঠ্য।

( পূর্বাহ্নরুত্তি )

লী। কি রকম ধরা কাটা ?

ঠা। হু বেলা ঝোল ভাত খাবে। ভাজা পোড়া, লঙ্কার ঝাল, দই, অম্বল, মাংস একে-বারে খাবে না। দাল, গরম মসলা ঘিয়ের জিনিষ না খাওয়াই ভাল। যাতে গরহজম না হয় এমনভাবে খাবে।

লী। আমাকেও তা হলে রোগী করে তুললে দেখুচি ঠাকুমা।

ঠা। তা দায়ে পড়েছ রোগী হতে হবে বৈ কি। রোগী হতে অসাধ থাকলে সেটা গোড়ায় ভাবতে হয়।

লী। বেশ রোগীই না হয় হলাম তার পর কি করতে হবে বল।

ঠা। মনে যখন দুঃখ কষ্ট হবে, কি রাগ হবে তখন ছেলেকে মাই দিবিনে। মন বেশ ভাল হলে তবে মাই দিবি।\*

লী। কেন তাতে কি হয় ?

ঠা। মনে দুঃখ কষ্ট রাগ হলে শরীর খারাপ হয়, মাইয়ের দুধও খারাপ হয়। আর সেই দুধ খেলে ছেলে পিলের অস্থখ হয়।

লী। বাবা, এতও ভুমি জান ঠাকুমা। তারপর কি বল।

ঠা। বলি শোন। শোক, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, উৎকর্ষ প্রভৃতি কারণে মন অভিতপ্ত হলে সে সময়ে মাইয়ের দুধ একটু বিকৃত হয়। সেই জন্তে সে সময়ে মাই দিতে নেই। মন সুস্থ হলে তবে দিতে হয়।

লী। যদি মনের অস্থখের সময় ছেলে মাই খাবার জন্তে কাঁদে।

ঠা। দেখ, যতক্ষণ মন খারাপ থাকে কখন ছেলেকে মাই দিস্নে। মনের দুঃখ ভুলে বেশ করে হাত পা ধুয়ে ভিজ্জে গামছা দিয়ে গা মুছে মন ঠাণ্ডা হলে ছেলেকে কোলে করে তার মুখ দেখুবি আর ভগবানের নাম করুবি। যখন ছেলের স্নেহে আপনি মাই করে দুধ পড়বে তখন মাই দিবি, বুঝলি।

লী। ই্যা বুঝেছি। এগুন দুধ ছাড়া আর কিছু পথ্য দেব কি না তা বল।

ঠা। ভাল কথা, খোকা কদিনের হলরে, দাঁত উঠেছে ?

লী। যেটের কোলে এই আট মাসে পড়েছে ঠাকুমা। ওপরে চারটা নীচে চারটা দাঁত উঠেছে।

ঠা। তা হলে খুব পুরান চালের ভাত সিদ্ধ করে চট্কে কাপড়ে ছেকেই হক কি খুব ফেনের মত করে চট্কেই হক দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিস্ন।

লী। ডাক্তারেরা বার্লি কি মেলিনস্ ফুড্ কি হরলিকস্ মলটেড্ মিড্ দিতে বলে ঠাকুমা।

ঠা। তা বার্লি দিতে হয় দিস্ন। সেত বিলাতী যব বই আর কিছু না। তবে তার এক রকম আন্ত পাওরা যায় তার কি একটা ইংরাজী নাম আছে বাপু—

প্র। পার্ল বার্লি ঠাকুমা।

ঠা। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই পারুল বালি সিদ্ধ করে দিস্। আর পারুল বালি না পেলে রামলক্ষণের গুড়ো বালি দিস্।

প্র। রাম লক্ষণ নয় ঠাকুমা রবিন্দ্রন।

ঠা। তা হবে ভাই, বুড়ো বয়সে মরবার সময় এখন ঠাকুর দেবতার নামই মনে আসে।

লী। আর ঐ ছরকম ফুডের কথা যে বললাম, তার কি বলে ঠাকুমা।

ঠা। ফুডের গুড়ের ধাতু দিদি আমরা ধারিনে। তাতে কি আছে না আছে তাও জানিনে। তবে আমার খণ্ডর বলতেন ওগুলো এদেশের ছেলের পক্ষে ভাল নয়। তিনিও না বুঝে বলবার লোক ছিলেন না। তাইতে মনে হয় ওগুলো ভাল নয়। আমার মনে হয় দেশী ভাতের মণ্ড, শটীর পালো, পানফলের পালো প্রভৃতি থাকতে, ও বিলাতী ফুড, ছাই ভস্ম গুলো ব্যবহার করবার দরকার কি। ভগবান কি আর এদেশের রোগীর পথি এদেশে হবার উপায় করেন নি।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা সাঙটা কি রকম ?

ঠা। সাঙটা খুব হালকা জিনিস বলেই বোধ হয়, ওটা রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। সাঙতে একটু দান্ত হয় আর বার্লিতে একটু দান্ত কমায় এই তফাত।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, দাঁত না উঠলে কি ভাত বার্লি কিছু দিতে নেই—তার মানে কি ?

ঠা। দাঁত উঠলে ছেলে পিলে ভাত বার্লি সাঙ এই সব হজম করতে পারে। সেই জন্তে আমাদের দেশে ছর মাসে অর্থাৎ দাঁত ওঠবার সময় অগ্রপ্রাশন দেবার নিয়ম আছে। সাধারণতঃ এই সময় থেকেই দুধের সঙ্গে ঐ সব জিনিষ কিছু দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু আবার এমন অনেক ছেলে

দেখা যায় যারা এক বৎসর পর্যন্ত দুধ ছাড়া কিছুই খায় না।

লী। দাঁত ওঠবার আগে সাঙ বার্লি দিলে কিছু দোষ হয় ঠাকুমা ? কিন্তু অনেক সময় ডাক্তারদের দিতে দেখেছি।

ঠা। দোষ যে হয় না এমন নয়। কেননা দাঁত ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সব জিনিষ দেওয়া উচিত। তবে ছেলে পিলের অস্থখ হলে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে সাঙ বার্লি অবস্থা বুঝে দেওয়া যেতে পারে।

লী। আর কিছু দেব না ?

না আর বড় কিছু নয় তবে একটু বেদানার রস কি আকুরের রস, কি মিষ্টি লেবুর রস দিতে পার।

লী। আচ্ছা পথিয়ার কথা ত হল এখন ওয়ুধের কি হবে বল।

ঠা। দান্ত কবার হয় আর কি রকম হয় বল দেখি।

লী। দান্ত প্রায়ই রোজ একবার মেটে রক্তের গুট্লে বাছে হয়, নৈবাৎ হুঁচার হয়—তখন মেটে মেটে কাঁদা কাঁদা মল হয়। কোন কোন দিন বাছে হয় না।

ঠা। আচ্ছা, এক কাজ কর। হস্তার কৈলে বাছুরের চোনা দুদিন করে দিবি, দুধ খাবার ঝিল্লকের এক ঝিল্লক করে দিলেই হবে।

লী। কৈলে বাছুর কি ?

ঠা। অবাঁক কন্নি তোরা, কৈলে বাছুর কি তা জানিস না। মাই খেগো কচি বাছুরকে কৈলে বাছুর বলে, সেই মেদী কৈলে বাছুরের চোনা, বুঝি।

লী। হ্যাঁ। আর কি করব ?

ঠা। আর হস্তার দুদিন করে আলুই দিবি।

লী। আলুই কি ?

ঠা। আলুই তয়ের করার কথাটা বলি শোন। বড় এলাচের খোসা ১টা, ছোট এলাচের খোসা ১টা, ধোয়া ঝাড়া পরিষ্কার জোয়ান দু'আনা ওজন আর টাটকা কালমেঘের পাতা পোকা ধরা না হয়, আধ ভরি ওজন, নিয়ে ঠাণ্ডা জলে বেশ পরিষ্কার শিল নোড়ায় খুব চন্দনের মতন করে বেটে, ছোট মটরের মত বড়ি তৈরির করবি। এই বড়িকেই আলুই বলে। নীবার হলে কোন ছেলের বাহে শক্ত হয় রোজ হয়ত হয় না। আবার কোন কোন ছেলের বার বার পাংলা বাহে হয়। বাদের পাংলা বাহে হয় তাদিকেও আলুই দেওয়া যায়—কেবল কালমেঘের পাতা কিছু কম করে দিয়ে আলুই তৈরির করতে হয়। বেশ করে মনে রাখিস, আলুই ছেলের অমৃত।

লী। আচ্ছা তাই করে দেব, আর কিছু দিতে হবে না ?

ঠা। মা এখন আর কিছু নয়। এই দিয়ে কিছু দিন দেখ, যদি ভগবানের দয়ায় ক্রমে ভাল হতে থাকে তবে আর কিছুর দরকার হবে না।

লী। ভাল মন্দ কি করে বুঝব ?

ঠা। ভাল হলে ক্যাকাশে ভাব থাকবে না, চোখের কোলে ক্রমশঃ বেশী রক্ত হতে থাকবে, ছেলে বেশ চন্দনে থাকবে, হাঁসি খেলা করবে, আর কাঁদবে। যদি বেশী হয় তাহলে আরও ক্যাকাশে হবে চোখের কোণ আরও শাদা হতে থাকবে, ছেলে নির্জীব পান হবে, খেঁতখেঁতে হবে আর বেশী কাঁদবে।

লী। হ্যাঁ, ভাল কথা ঠাকুমা, একটু গা হ্যাকু হ্যাকু করে বলেছিলাম তার কি হবে ?

ঠা। স্পষ্ট জর হয় বুঝতে পারিস ?

লী। না, তা হয় না, মধ্যে মধ্যে যে গাটা গরম গরম বোধ হয় !

ঠা। তা হলে এখন ছুচার দিন থাক। যদি জর হয় তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে।

লী। তা আমিত কাল চলে যাব, কবে আসব তার ঠিক নাই। জর হলে কি করব তাই শুনে রাখি।

ঠা। দেখ, নীবারের জর চপুকের সময় বা বিকালের দিকেই হয়। গা একটু একটু গরম হয়, সে সময় একটু নির্জীব আর খেঁত-খেঁতে হয়, যদি এরকম দেখিস, তা হলে সকালে হুপ্তায়-হুদিন করে চোনা আর আলুই যেমন দিতে বলিছি তাই দিবি আর রোজ বিকালে একটু করে ঘুষ্ড়ো রস দিবি।

লী। ঘুষ্ড়ো আবার কি ?

ঠা। ঘুষ্ড়ো অনেক রকম হয়, তবে একে যে ঘুষ্ড়ো দিতে হবে তা বলি শোন। ক্ষেত পাগড়া, শিউলী পাতা, গুলঞ্চ আর কাল-মেঘ টাটকা যোগাড় করতে হবে। পাড়াগারে যোগাড় করে নিতে হয় আর কলকাতার চাঁদনী, নতন বাজার, শোভাবাজার, বৌ-বাজার, মেছোবাজার আর মাধব বাবুর বাজারে যে বেদেরা বসে তাদের বলে রাখলে দরকারমত এনে দেয়। এগুলি যোগাড় হলে, সব সমান ভাগে নিয়ে বেশ করে ধুয়ে কুটে নিবি। একখানা কচি কলাপাতার জড়িরে কলার ছোটা দিয়ে বাঁধবি, আর তার ওপর দুই আঙ্গুল পুরু করে মাটির লেপ দিবি। তার পর ঘুটের আগুনে পোড়াবি। ওপরের মাটি লাল হলে, দিনে ঘরে আর বাজে গিগিরে রাখবি। রোজ বিকেলে তারি আধ কিলো আন্দাজ রস ১০।১৫ কোটা মধুর সঙ্গে মিশিবে।



থাইয়ে দিবি। একদিন ঘুড়ো তয়ের করিলে পরদিন তা থেকে রস নেওয়া চলে না। রোজ করতে হয়।

লী। এরকম তয়ের করাও শক্ত।

ঠা। শক্ত আর কি একটু কষ্ট করলেই হয়।

তবে নেহাত অস্থবিধে হলে কলাপাতা জড়িয়ে বেঁধে, আঙুণে তাওয়া চড়িয়ে, তাব ওপর বেধে এপিট ওপিট করে ভেজে নিবি। যখন কলাপাতা ঝলসা পোড়া হবে তখন নামিয়ে নিবি। এরকমে করলে খুব সহজে হয়।

লী। আর টাটকা গাছ গাছড়া সব যদি না পাওয়া যায়।

ঠা। পাওয়া বাবে না কেন, একটু চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। আজ কাল তৈয়ারী শিশি ভরা ডাক্তারী ওষুধ পাওয়া যায়, ঢেলে খেলেই হল, তাই লোকে একটু কষ্ট করতে নাবাজ। নইলে গাছ গাছড়ার অভাব কি? তবে ক্ষেত্ পাগড়াটা সব সময়ে না মিলতে পারে। তা হলে করবি কি জানিস্—পাচনের দোকান থেকে শুকনো অথচ বেশ টাটকা—যেন পচা না হয়, ক্ষেত্ পাগড়া আনিয়া, জলে ভিজিয়ে তাই কুটে দিবি। ভাল শুকনো ক্ষেত্ পাগড়া না পেলে ক্ষেত্ পাগড়া বাদ দিয়ে ঘুড়ো করবি।

লী। আচ্ছা—নাওয়া কি বন্ধ থাকবে?

ঠা। যদি জ্বর হয় তা হলে বন্ধ থাকবে।

আর তা না হলে শরীরের তাবগতিক দেখে যেমন সময় ২৩ দিন অন্তর কাঁচা পাকা জলে নাইয়ে দিবি। নাওয়ার সময় যেন ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে না লাগে। আর নাবার পরেই একটা মোটা কামা গায়ে দিয়ে দিবি।

লী। সব কথাই আমি জেনে নিয়েছি। এখন আশীর্বাদ কর ঠাকুমা খোকা আমার যেন নীরোগ হয়।

ঠা। আচ্ছা আমি আশীর্বাদ করছি তোমার খোকা ভাল হবে। কিন্তু একজন-ভাল ব্রাহ্মণ ডেকে একটু শাস্তি স্বস্তায়ন করিস্।

লী। আচ্ছা তা করবো। ই্যা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি বলেছ যে কচি বেলা থেকে আঙুণের মত আরো কগুলো চক্ চক্ গিলিয়ে ছেলে পিলের লিভার হয় সত্যিই কি তাই?

ঠা। না সব ছেলের যে সেই জন্তে নীবার হয় তা নয়, তবে কতক সে জন্তেও হয় বলে আমার মনে হয়।

লী। তবে আর কি জন্তে লিভার হয় ঠাকুমা?

ঠা। প্রায়ই বাপমার অঘলের দোষ থাকলেই ছেলে পিলের লিভার হয়। আজ কালকার দুধ, জিনিষ পত্র সব ভেজাল, তার ওপর নানা রকম অত্যাচার করে, আগে কার মত লোকে আর সংযমী নয়, এই সবের জন্তে বেশীর ভাগ লোকেরই গরহজর অঘলের বেয়ারাম। কাজেই তাদের ছেলের পিলের লিভার হয়। আর গাদা গাদা ডাক্তারী ওষুধ পড়ে, নীবার বেগড়ার বেশ স্থবিধে ঘটে।

আর একটা কথা, আগে কচি ছেলের চোনা ও আলুই খাওয়ান হত। তাতে নীবার ভাল থাকত আর নীবারের কোন অর্থ হত না। এখনত সে প্রথা আর নেই। আর এজন্তেও ছেলে পিলের নীবারের কোন বেশি হচ্ছে।

লী। তা এমন ভাল প্রথা আর কোথায় কেন?

ঠা। দেশের লোকের মতিভ্রম। ডাক্তারীর মোহে পড়ে লোকে এমন হিতকর প্রথা উঠিয়ে দিয়েচে। তার কুফলও ঘরে ঘরে দেখা যাচ্ছে।

লী। আবার কি সে প্রথা চালান যায় না?

ঠা। আজ কাল চেষ্টা করলে কতকটা হতে পারে বলে মনে হয়। বাঙ্গালী জাতির মোহ যেম কতকটা কেটে আসছে। এখন অনেকে বুঝেছে যে দেশে অনেক ভাল জিনিষ আছে। এখন যদি লোকে আবার কচি ছেলেদের চোনা আলুই খাওয়ায় তাহলে নীবারের রোগ অনেক কমে যাবে।

লী। চোনা আলুই কি রোজ দিতে হয়।

ঠা। না—দরকার বুঝে হুগুয় দুদিন, তিনদিন কি চার দিন দিলেই চলে।

লী। দরকার কি করে বোঝা যায়?

ঠা। কচি ছেলে পিলে রোজ ৩৪ বাব

হল্লে হল্লে বাহে করে। তা না হয়ে যদি কম, কি মেটে মেটে, কি গুটলে বাহে করে তবে বুঝতে হবে যে নীবারের দোষ হয়েছে। যার যত বেশী দোষ হয় তাকে তত বেশী দিন খাওয়াতে হয়।

প্র। ঠাকমা আমি তোমার নাতুনীর হুকুমে মুখটা বুজে চুপ্চুপ করে বসে আছি, বাহবা দিতে পারি নি। কিন্তু তোমার ব্যবস্থা বড় পাকা বলে বোধ হচ্ছে। আর ছেলে পিলের লিভার হবার যে কারণ বলেছ আমারও তাই মনে হয়। এখন বাড়ী ফেরবার সময় হল, পায়ের ধুলো দাও আর খোকাকে ভাল করে আশীর্বাদ কর।

ঠা। এস দাদা এস। খোকা তোমার ভাল হয়ে যাবে ভাই, আমি আশীর্বাদ করছি। মধ্যে মধ্যে লীলা সঙ্গে করে দেখা দিয়ে যাস। আর্ত বেশী দিন নয়। তাদের হাসি মুখ দেখে যেতে পারলেই হয়।

## অফাঙ্ক আয়ুর্বেদ।

( পূর্বাভাস )

এক্ষণে আমরা চিকিৎসা বিষয়ে আয়ুর্বেদের কৃতিত্ব নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইব। অজ্ঞাত চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে বিবিধ বিষয় উদ্ধৃত না করিলে আমাদের বক্তব্য বিষয় বিশেষ পরিষ্কৃত হইবে না। তজ্জন্ত আমরা ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আবশ্যিক মত বচনাদি উদ্ধৃত করিব। কিন্তু কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রের নিন্দাবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

চিকিৎসা-শাস্ত্র সৰ্ব্বদে কোন কথা বলিবার

পূর্বে চিকিৎসার কোন সার্থকতা আছে কি না সে সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করা কর্তব্য। কেননা এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত আজ কাল অনেক মনষী ব্যক্তি গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত। অপিচ, অনেক সুবিজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসক চিকিৎসা-শাস্ত্রের সার্থকতা সৰ্বদে বৈরপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিচারে নিরুৎসাহকর। প্রশ্নও স্বরূপ নিম্নে প্রকট করা যাইতেছে।

Said Sir John Forbes, M. D., F. R. S. "Some patients get well with the aid of medicine, more without it, and still more in spite of it."

2. Said the Dublin Medical Journal, "Assuredly the uncertain and most unsatisfactory art that we call medical science is no science at all, but a jumble of inconsistent opinions, of conclusions hastily and often incorrectly drawn, of facts misunderstood or perverted, of comparisons without analogy, of hypothesis without reason, and of theories not only useless but dangerous."

3. Said Dr. Bostwich, author of the "History of Medicine." "Every dose of medicine given is a blind experiment on the vitality of the patient."

4. Said James Johnson, M. D., F. R. S., editor of The Medico-chirurgical Review—"I declare as my conscientious conviction founded on long experience and reflection, that if there was not a single Physician, Surgeon, Man-midwife, Chemist, Apothecary, Druggist, nor drug on the face of the earth, there would be less sickness and less mortality than now prevail."

5. Prof. J. W. Carson, of the New York College of Physicians and Surgeons, says,—"We do not know whether our patients recover because we give them medicine or because nature cures them. perhaps bread-pills would cure as many as medicine."

6. The eminent Dr. Alonzo Clark, a professor in the same Medical College, states that, in their zeal to do good physicians have done much harm, they have hurried many to the grave who would have recovered if left to nature" and that "all of our curative agents are poisons and as a consequence, diminishes the patients vitality."

7. Prof. Martin Paine, of the New York University Medical College, asserts that "durg medicines do but cure one disease by producing another" a sentiment with which the late Prof. Liebig, the well known German chemist agreed.

১। শ্রবজন করবেস এম, ডি, এফ, আর, এন্স বলিয়াছেন—“কতক গুলি রোগী ঔষধের সাহায্যে আরোগ্যলাভ করে। তদপেক্ষা অধিক রোগী ঔষধ ব্যতীত ভাল হয়। তদপেক্ষা অধিক রোগী ঔষধকে তাচ্ছিল্য করিয়া ভাল হয়”।

২। ডব্লিন্ মেডিক্যাল জর্নাল্ বলিয়াছেন—“ইহা নিশ্চয় যে আমরা যে অনিশ্চিত এবং অসন্তোষকর বিতাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলি, তাহা একেবারেই বিজ্ঞান নয়। ইহা কেবল অনিশ্চিত মতের সমষ্টি, হঠকৃত এবং প্রায়শঃ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, ভ্রমাত্মক এবং বিপরীত তথ্য, অসদৃশ তুলনা এবং অহেতুকী ধারণা কেবল অনাবশ্যক নহে পরন্তু বিপজ্জনক মত মাত্র।”

৩। চিকিৎসার ইতিহাস নামক গ্রন্থ প্রণেতা ডাক্তার বস্ উইচ বলেন :—রোগীকে এক এক মাত্র ঔষধ দেওয়া কেবল রোগীর জীবনী শক্তির উপরি অন্ধ পরীক্ষা মাত্র।

৪। মেডিকো চিকিৎসাক্যাল পত্রের সম্পাদক ডাক্তার জেমস্ জনসন্ এম, ডি, এফ, আর, এন্স, বলেন : দীর্ঘ কালের বহু-দর্শিতা এবং চিন্তা দ্বারা আমার বিহিত ধারণা জন্মিয়াছে যে, যদি চিকিৎসক, শস্ত্র চিকিৎসক, খাদ্য-বিজ্ঞা-বিশারদ, রসায়ন-বিদ, ঔষধ-প্রস্তুত-কারক এবং ঔষধ বিক্রেতা না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে রোগ এবং মৃত্যুর সংখ্যা কম হইত।

৫। নিউইয়র্কের কলেজ অফ্ ফিজি সিয়ানস্ এবং সার্জেনের অধ্যাপক জে, ডবলু, কারপন্ বলেন :—আমরা জানি যে আমরা রোগীদিগকে ঔষধ দিই বলিয়া তাহারা ভাল হয় অথবা প্রকৃতি তাহাদিগকে আরোগ্য করে। আমার ঔষধে যেমন রোগ ভাল হয়, রুটীর বাড়ি করিয়া দিলেও সেটরূপ ভাল হয়।

৬। উক্ত বিজ্ঞানবীর অত্যন্ত অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ডাক্তার এলোনজো ক্লার্ক বলেন :—“চিকিৎসকগণ রোগীদের হিত করিবার উদ্দেশে অনেক অহিত করিয়া থাকে। যাহারা প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বাঁচিত, এরূপ অনেককে তাহারা শীঘ্র মৃত্যু মুখে পাত্তিত করে। তিনি আরও বলিয়াছেন—আমাদের রোগ ভাল করিবার ঔষধ গুলি বিষ এবং সেই জন্য উহারা রোগীর জীবনী শক্তি হ্রাস করে।

৭। নিউইয়র্ক ইউনিভারসিটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক মার্টিন পেইন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—“ঔষধগুলি এক রোগ নষ্ট করিয়া অল্প রোগ উৎপন্ন করে। আত্মাঙ্গীর প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ অধ্যাপক লেবিগ্ এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

একণে দেখা যাউক এ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ কি বলেন।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের সার্থকতা আছে কি না—এই প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা অধুনা অনেক সুধী ব্যক্তির মস্তিষ্ক পীড়ার কারণ হই-লেও, উহা বহু প্রাচীন যুগের আয়ুর্বেদাচার্য-গণের স্বল্প দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমরা নিজের ভাষায় না বলিয়া এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বাহা আছে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

চতুপাদং ষোড়শকলং ভেষজমিতি ভিষজো ভাষন্তে। যত্নং পূর্বাধ্যায়ৈ ষোড়শ-গুণমিতি তদ্বেষজম্ যুক্তিযুক্ত মলমারোগ্যা-য়েতি ভগবান্ পুনর্নবহুত্রৈঃ।

ভগবান্ পুনর্নবহুত্রৈঃ বলিয়াছেন :—ভিষকগণ বলেন যে ষোড়শকলাবিশিষ্ট চতু-পাদই ভেষজ\*। পূর্বাধ্যায়ের ঐ চারিপাদের যে ষোলটা গুণ বলা হইয়াছে তাহাই ভেষজ†। ঐগুলি যুক্তিযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

নেতি মৈত্রেয়ঃ। কিং কারণং ? দৃশ্যন্তে হ্যাহরাঃ কেচিৎপকরণবস্তৃশ্চ পরিচারক-সম্পদাশ্চ আয়ুর্বস্তৃশ্চ কুশলৈশ্চ ভিষগ্ভি-রহুষ্ঠিতাঃ সমুত্তিষ্ঠমানা স্তথাযুক্তা স্তাশ্চৈ-ম্মিয়মানা স্তস্মাদ্ভেষজ মকিকিৎকরং ভবতি।

\* চতুপাদ বলা, ভিষগ্ জ্বাণুপন্থাতা রোগী পারচতুষ্টয়ম্। (অম্ববাদ) ভিষক্, ত্রযা (ঔষধ), গুণবাক্যার এবং রোগী এই চারিটা পাদ।

† শাস্ত্রে নির্ণয় জ্ঞান, বহুদর্শিতা, চিকিৎসা-সার্থকতা এবং পথিব্রতা এই চারিটা চিকিৎসকের গুণ। প্রচুরতা, রোগবাপকতা, নানাপ্রকারে প্রযুক্ত হইবার উপযোগিতা এবং পূর্ণতা ও দোষরাহিত্য এই চারিটা ঔষধের গুণ। গুণব্রা করিতে জানা, দক্ষতা, রোগীর প্রতি অনুসরণ থাকা এবং পথিব্রতা এই চারিটা গুণবাক্যার গুণ। স্তাশ্চৈম্মিয়মানা হওয়া বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি মত চলা, অতীকৃষ এবং রোগের বিষয় ঠিক মত জানা চারিটা রোগীর গুণ।

মৈত্রেয় বলিলেন—ইহা ঠিক নহে। কেন না দেখা যাইতেছে যে কোন কোন রোগী উপযুক্ত উপকরণ (ঔষধ পথ্যাদি) যুক্ত, উপযুক্ত পরিচারকযুক্ত, আশ্রয়বস্ত (অর্থাৎ অত্যাচারী নহে) এবং সূচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিতেছে। আবার কোন রোগী ঐক্লপ হওরা সম্ভবও মরিয়া যাইতেছে। সুতরাং ভেদজ কোন কাজেরই নহে।

তদ্ যথা। স্বভ্বে সরসি চ প্রসিক্তমন্ন-মুদকম্। নত্যাং শুদ্ধমানায়াং পাণ্ডুধানে পাণ্ডু-মুষ্টিঃ প্রকীর্ত্ত ইতি। তথাপরে দৃশ্যস্তে অমুপ-করণা শ্চাপরিচারকা শ্চানান্ন-বস্ত শ্চাকুশ-লৈশ্চ ভিষগ্ভি বহুষ্টিতাঃ সমুষ্টিষ্ঠমানাঃ। তথা-যুক্তা ম্রিয়মাণা শ্চাপরে। যতশ্চ প্রতিকূর্নন্ সিধ্যতি, প্রতিকূর্নন্ ম্রিয়তে অপ্রতিকূর্নন্ সিধ্যতি, অপ্রতিকূর্নন্ ম্রিয়তে ততশ্চিন্ত্যতে ভেদজমভেদজেনাবিশিষ্ট মতি।

চিকিৎসা কেমন অকিঞ্চিৎকর ? না যেমন প্রকাণ্ড গম্বরে বা জলপূর্ণ সরোবরে অল্প জল নিক্ষেপ করা, প্রবহমান নদীতে কিংবা পাণ্ডুবাশিতে এক মুষ্টি পাণ্ডু (ধূলি) নিক্ষেপ করা। আবার দেখা যায় যে উপ-করণ (ঔষধ, পথ্য) নাই, পরিচারক নাই, রোগী অনাশ্রয়বস্ত (অত্যাচারী) চিকিৎসক ভাল নহে, অথচ ঐক্লপ স্থলেও রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছে। আবার ষোড়শকল ভেদজ-সম্পন্ন হইলেও রোগী মরিয়া যাইতেছে। অত-এবং যখন দেখা যাইতেছে যে চিকিৎসা করিলে ভাল হয় এবং মরিয়াও যায়, আবার চিকিৎসা না করিলে ভালও হয় এবং মরিয়াও যায়, তখন ভেদজ হইতে অভেদজ পৃথক নহে বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ চিকিৎসা করাও বা—আর না করাও তা।

মৈত্রেয় মিথ্যা চিন্ত্যত ইত্যাত্রেয়ঃ। কিং কারণং ? যে স্বাতুরাঃ ষোড়শগুণ-সমুদ্ভিতে-নানেন ভেদজেনোপপত্তমানা ম্রিয়ন্তে ইত্যুক্তম্ তদমুপপন্নম্। ন হি ভেদজ সাধ্যানাং ব্যাধীনাং ভেদজমকারণং ভবতি। যে পুন রাতুরাঃ কেবলান্তেষজাদৃতে সমুদ্ভিষ্ঠন্তে ন তেষাং সম্পূর্ণভেদজোপপাদনায় সমুখানবিশেষোহস্তি। যথাহি পতিতং পুরুষং সমর্থমুখানামোষাপয়ন্ পুরুষো বলমত্মোপাদযাৎ স ক্ষিপ্তরত মপরি-ক্লিষ্টে এবোত্তিষ্ঠেৎ তথং সম্পূর্ণ-ভেদজো-পলম্বাদাতুরাঃ। যে চাতুরাঃ কেবলান্তেষজা-দপি ম্রিয়ন্তে, ন চ সর্বের্ভবে তে ভেদজোপপন্নঃ সমুদ্ভিষ্ঠেয়ন্। ন হি সর্বের্ভব্যাধয়ো ভবন্ত্য-পায়সাধ্যাঃ ॥

আত্রেয় বলিলেন, মৈত্রেয় তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহা মিথ্যা। কেননা তুমি যে বলিলে যে ষোড়শগুণসম্বিত ভেদজ সংযুক্ত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়, তাহা অযুক্তিযুক্ত। কারণ ভেদজসাধ্য ব্যাধিতে ভেদজ প্রয়োগ অকারণ হয় না। আবার যে সকল রোগী ভেদজ ব্যতীত আরোগ্যলাভ করিতে পারে, তাহারা ভেদজযুক্ত হইলে আরও শীঘ্র এবং বিনা ক্লেশে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। যেমন গর্ভে পতিত পুরুষ স্বয়ং উঠিতে সক্ষম হইলেও, যদি কেহ তাহাকে উঠাইয়া দেয় তাহা হইলে সে আরও শীঘ্র এবং বিনাক্লেশে উঠিতে পারে, সেইরূপ রোগীও সম্পূর্ণ ভেদজযুক্ত হইলে শীঘ্র ভাল হয়। যে সকল রোগী ভেদজের অভাবে মরিয়া যাইতেছে তাহারা সকলেই যে ভেদজযুক্ত হইলে বাঁচিত, তাহা নহে। কারণ সকল রোগ চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয় না।

ন চোপায়সাধ্যানাং ব্যাধীনাং বহুপারৈদ

সিদ্ধিরন্তি, ন চাসাধ্যানাং ব্যাধীনাং ভেষজ-  
সমুদায়োহয়মন্তি, নহং জ্ঞানবান্ ভিষক্ মুমূর্ষু-  
মাতুরমুখাপন্নিতুং। পরীক্ষাকারিণো হি কুশলা  
ভবন্তি। যথা হি যোগজ্ঞোহভ্যাসনিত্য ইষালো  
ধনুর্বাদায়েষু মপাত্তন্ নাতিবিগ্রহে মহতি  
কায়ে নাপরাধো ভবতি সম্পাদয়তি চেষ্টে-  
কার্যাম্; তথা ভিষক্ স্বগুণ-সম্পন্ন উপকরণ-  
বান্ বীক্ষ্যকর্ণারভমাণঃ সাধ্যারোগমনপবাধঃ  
সম্পাদয়তোব্যাতুরমারোগ্যেণ। তস্মিন্ন ভেষজ-  
মভেষজেনাবিশিষ্টঃ ভবতি।

চিকিৎসা সাধ্য ব্যাধি চিকিৎসা ব্যতীত  
প্রশমিত হয় না। আবার অসাধ্য ব্যাধি  
চিকিৎসা দ্বারা ও ভাল হয় না। চিকিৎসক  
যতই জ্ঞানবান্ হউন্ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কখনই  
আরোগ্য করিতে পারেন না। যে চিকিৎসক  
রোগ সাধ্য কি অসাধ্য পরীক্ষা করিয়া  
চিকিৎসা করেন, তিনিই সাক্ষ্য লাভ করিয়া  
থাকেন। বৈরাগ্য অভ্যাসশীল কুশলী ধনু-  
র্দ্ধর ধনুতে শর যোজনা করিয়া অনতিদূরস্থ  
বৃহৎ পদার্থ অনায়াসে বিদ্ধ করিতে পারেন,  
সেইরূপ গুণবান্ ও উপকরণবান্ ভিষক্ পরীক্ষা  
করিয়া চিকিৎসা করিলে সাধ্যারোগগ্রস্ত  
রোগীকে অনায়াসে আরোগ্য করিতে পারেন।  
সেইজন্ত ভেষজ অভেষজ হইতে বিশিষ্ট নহে,  
ইহা বলা যাইতে পারেন। অর্থাৎ অবশ্যই  
চিকিৎসার সার্থকতা আছে।

ইদঞ্চোদকং নঃ প্রত্যক্ষং যদনাতুরেণ ভেষজে-  
নাতুরং চিকিৎসামঃ। কামমকামেণ ক্লেশক  
হর্ষলমাপ্যায়মামঃ স্থলং মেদস্বিনমপতর্পমামঃ।  
শীতেনোক্ষাভিত্ত মূপচরামঃ। শীতাভিত্ত-  
মূক্ষণ। নানান্ ধাতুন্ পুরমামঃ। ব্যতিরিক্তান্  
হ্রাসমামঃ। ব্যাধীন্ মূলাবিপর্যায়পোচরন্তঃ  
সম্যক্ প্রকৃতৌ স্থাপমামঃ। তেবাং নন্তথা  
কুরুতামঃ ভেষজসমুদায়ঃ কান্ততমো ভবতি।

ইহাও আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছি  
যে, ঔষধ প্রয়োগে রোগী আরোগ্য হইতেছে।  
ক্ষীণ, ক্লেশ ও হর্ষল, পুষ্টিকর ঔষধ দ্বারা ও  
সবল হইতেছে। স্থূল ও মেদস্বী ব্যক্তি অপ-  
তর্পণ ঔষধ প্রয়োগে ক্লেশ ও অন্নমেদ বিশিষ্ট  
হইতেছে। শীতল ঔষধ প্রয়োগে উষ্ণাভি-  
ত্ব ব্যক্তির এবং উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগে শীতা-  
ভিত্ত ব্যক্তির পীড়ার শান্তি হইতেছে। ঔষধ  
দ্বারা ক্ষীণ ধাতুর পুষ্টি হইতেছে এবং বৃদ্ধি  
প্রাপ্ত ধাতুর হ্রাস হইতেছে। কারণের  
বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ব্যাধির শান্তি  
হইতেছে। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে  
যে ব্যাধিতের পক্ষে ঔষধ নিত্য হিতকর।

জগতের ব্যবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেরই  
একটা মূলসূত্র আছে এবং সেই মূলসূত্রের  
উপরেই চিকিৎসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। য্যালো-  
প্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায়  
যে উহার মূল সূত্র :—

Contraria contrariis curantur.  
অর্থাৎ বিপরীত পদার্থ দ্বারা বিপরীত লক্ষণা-  
ক্রান্ত ব্যাধির উপশম হয়। পাশ্চাত্য দেশের  
অন্ততম চিকিৎসা শাস্ত্র হোমিওপ্যাথিক মতে  
Similia similibus curantur. অর্থাৎ  
সমগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা সমধর্ম্মারোগ প্রশ-  
মিত হইয়া থাকে। উভয়ের মূল সূত্র একে-  
বারে বিপরীত। এমন হয় কেন? উভয়ের  
মধ্যে একটা নিশ্চয় ভ্রমাত্মক। কেননা  
ইহা এবং না কখনই এক হইতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনটাই ভ্রমাত্মক  
নহে। তবে ঐ দুইটি বিভিন্ন মতকে এক  
দেশ-দর্শন-দৃষ্ট বলা যাইতে পারে। অতীত  
এই বিভিন্নমতবাদের সামঞ্জস্য দেখা যায়। সে  
কোথায়? জগতের প্রাচীনতম এবং ব্যবতীয়  
চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক আয়ুর্বেদে।

আয়ুর্বেদ বলেন—

হেতুব্যাধিবিপর্যন্তবিপর্যন্তার্থকারিণাম্ ।

ঔষধাঙ্গবিহারাণা মূপযোগঃ সূখাবহম্ ।

বিষাদ্রুপশরং ব্যাধেঃ স হিসাধ্যামিতি স্মৃতম্ ॥

হেতুর বিপরীত, ব্যাধির বিপরীত, হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত অথবা হেতুব্যাধি উভয়ের বিপরীত না হইলেও অর্থাৎ উহাদের সম্বন্ধী হইলেও, যে সকল ঔষধ, অন্ন এবং বিহার দ্বারা ব্যাধির উপশম হয় তাহাকে সাধ্য বলা যায়। ইহাই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মূল সূত্র। একটু বিশদভাবে সূত্রটী বুঝান যাইতেছে।

র্যালোপ্যাধি চিকিৎসা শাস্ত্রে বিপরীত দ্রব্য দ্বারা বিপরীত ব্যাধির শাস্তি হয়, কিসের বিপরীত? হেতুর না ব্যাধির, না উভয়ের? ইহার কোন সত্ত্বের ঐ তিনটি কথার মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু আয়ুর্বেদে উহা বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠকদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থ কতকগুলি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

হেতুর বিপরীত, যথা, কফজনিত শীত যুক্ত অরে উষ্ণবীৰ্য্য গুণী প্রভৃতি। অন্ন যথা,— শ্রম ও বায়ু জনিত অরে, শ্রম ও বায়ু নাশক মাংসের ঘূষ। বিহার যথা, দিবানিদ্রাজনিত কফে ক্লান্তাজনক রাত্রিভাগরণ। ব্যাধির বিপরীত ঔষধ যথা, অতিসারে সঙ্কোচক (Astringent) আকনাদি, বিবে বিযনাশক শিরীষ, কুঠে কুঠনাশক খদির প্রভৃতি। অন্ন যথা, অতিসারে মলতন্তক মসুরের ঘূষ। বিহার যথা, উদাবর্তে প্রবাহন। হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত ঔষধ যথা, বাতজন্যে বায়ু ও শোথ নাশক দশমূল। অন্ন

যথা—বাতকফ জনিত গ্রহণী রোগে বাত, কফ ও গ্রহণী নাশক তক্র।

বিহার যথা—শ্লিথ দিবা স্বপ্নজাত তন্দ্রার ক্লান্ত তন্দ্রা বিপরীত জাগরণ। এপর্ধ্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা Contraria Contrariis Curantur. এইবার Similia similibus Curantur. দেখুন।

হেতু বিপরীতার্থকারী ( অর্থাৎ হেতুর সম্বন্ধী হইলেও রোগ নাশক) ঔষধ যথা— পিত্ত প্রধান পচ্যমান ত্রণশোধে ( কোড়া ) পিত্তকর উষ্ণ উপনাহ ( পুলটাস )। অন্ন যথা, পিত্ত প্রধান পচ্যমান ত্রণশোধে পিত্তবর্জক বিদাহী অন্ন। বিহার যথা বায়ু জনিত উন্নাদ রোগে বায়ু বর্জক ত্রাসন। ব্যাধি বিপরীতার্থকারী ঔষধ যথা, বমন রোগে বমন কারক মদন কল। অন্ন যথা, অতিসারে বিরচন অন্ন বিরচক দ্রব্য-সিদ্ধ হৃদ্য। বিহার যথা, বমন রোগে প্রবাহন ( বেগ দান )। হেতু ব্যাধি বিপরীতার্থকারী ঔষধ যথা, অগ্নিদগ্ধ স্থানে উষ্ণ অগুরু প্রভৃতির প্রলেপ। অন্ন যথা, মত্তগান জন্মিত মদাতার রোগে ( Alcoholism ) মত্ততা জনক মত্ত। বিহার যথা, বায়ব জনিত সংমূচবাত নামক রোগে জল-সত্ত্বরূপ ব্যায়াম।

অবশ্য ঔষধের মাত্রা সৰ্বদে আয়ুর্বেদের সহিত হোমিওপ্যাথির মতের বিরোধ আছে। কিন্তু আমরা চিকিৎসার সূত্রের কথা বলিয়াছি।

এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে জগতের হইটী প্রধান চিকিৎসা শাস্ত্রের বিরোধী মূল সূত্রের সামঞ্জস্য প্রাচীনতম আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে।

## হরীতকী ।

( পূর্কানুভূতি )

হরীতকী গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্কাদোষজ বাতরক্ত নষ্ট হয় ( সুশ্রুত ) । তিনটা বা পাঁচটা হরীতকী সেবন করিয়া গুলঞ্চের কাথ পান করিলে উগ্র বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয় । হরীতকী চূর্ণ এরণ্ড তৈল সহ সেবন করিলে আম্বাত, গৃথসী (Scitica) ও বুদ্ধি রোগ নষ্ট হয় ( চক্রদত্ত ) । স্তূত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন পিত্ত শূলের পক্ষে হিতকর ( ভাব প্রকাশ ) । গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন গুল্মে হিতকর ( সুশ্রুত ) । হরীতকীর আঁটির সহিত সিদ্ধ দ্রুথ অশ্বরী ( পাথরী ) রোগে হিতকর ( বাভট্ট ) । রসায়ন-বিধি অনুসারে উদর রোগীকে ক্রমশঃ সহস্র হরীতকী সেবন করাইবে ( চরক ) । গুড়ের সহিত হরীতকী ক্রমবুদ্ধি নিয়মে এক মাস কাল সেবন করিলে শোথ, প্রেতিজ্বর, মুখরোগ, বাস, কাস, অরুচি, জীর্ণজ্বর, অর্শঃ, গ্রহণী এবং অন্ত্রান্ত কফবাতজি রোগ নষ্ট হয় ( চক্রদত্ত ) । হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ ও এরণ্ড তৈলে ভজিত করিয়া সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিলে দীর্ঘকালজ বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয় । হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, ঐ কাথের সহিত এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফবাতজনিত বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয় । হরীতকী চূর্ণ এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া পিষ্টল ও সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয় ( চক্রদত্ত ) । গো এবং ছাগাদির মূত্রের সহিত হরীতকী-চূর্ণ সেবন করিলে শ্লেষ্মজ স্নীপদ রোগ-

নষ্ট হয় ( সুশ্রুত ) । হরীতকীচূর্ণ সম পরিমাণ নিম্বপত্রচূর্ণ সহ সেবন করিলে এক বা দেড় মাসে কুষ্ঠ ভাল হয় । হরীতকী সম পরিমাণ কিস্মিসের সহিত পেয়ণ করিয়া পুরাতন গুড় ও মধু সহ সেবন করিলে অল্পপিত্ত রোগ নষ্ট হয় ( চক্রদত্ত ) । হরীতকী লৌহ পাত্রে হরিদ্রার রসে ঘর্ষণ করিয়া তদ্বারা চিপ্প ( আঙ্গুলহাড় ) পুনঃ পুনঃ লিপ্ত করিবে ( বঙ্গসেন ) । হরীতকীর কাথ মধু সহ সেবন করিলে কঠরোগে উপকার হয় ( বাভট্ট ) । হরীতকী স্তূতে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে লেপ দিলে নানা প্রকার নেত্র-রোগ নষ্ট হয় ( চক্রদত্ত ) । হরীতকী গব্য স্তূতে উত্তপ্ত করিয়া সেবন করিবে, এবং পরে দ্রুথ পান করিবে । ইহাতে বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

হরীতকী উৎকৃষ্ট রসায়ন । রসায়ন কাহাকে বলে ? ঔষধ বিবিধ । কতকগুলি অস্থবাক্তির ওজোবর্দ্ধক এবং কতকগুলি ব্যাধি-ভের রোগ নাশক । সুস্থের ওজবৃদ্ধি ঔষধ আবার বিবিধ, যথা, রসায়ন ও বাজীকরণ । তন্মধ্যে রসায়ন ঔষধ সেবন দ্বারা দীর্ঘ আয়ু, স্বাভি, মেধা, আরোগ্য, দীর্ঘহাঙ্গী যৌবন, প্রজা, বর্ণ, অম্বরজা, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল, বাক্‌সিদ্ধি, বিনয় এবং শান্তি লাভ করা যায় । প্রশস্ত রসাদি দ্বািত সমূহ লাভ করা যায় বলিয়া উহার নাম রসায়ন ।

সিদ্ধ শর্করা শুষ্কী কণা মধু গুড়ের ক্রমশঃ বর্ধাশিষ্যতা সেব্য রসায়ন গুণৈবিণী ॥

অনুবাদ :—সৈন্ধবলবণ, চিনি, ভজি



পিপুল, মধু ও গুড় এই ছয়টি দ্রব্যের সহিত বর্ষাদি ছয় ঋতুতে হরীতকী সেবন করিলে রসায়নের ফল লাভ করা যায়। এস্থলে বলা উচিত যে আয়ুর্ক্বেদে শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্তিক শরৎ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত, মার্গ ও কাশ্বিন শীত, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম এইরূপ সাধারণ ঋতু বিভাগ করা হইয়াছে।

রসায়ন ঔষধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে সিদ্ধদর্শন জ্ঞাত হই চারিটা বিষয় বলা বাইতেছে।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

পূর্বে বয়সি মধ্যো বা শুদ্ধদেহং সমাচরণং।

অবিশুদ্ধশরীরস্ত যুক্তো রসায়নো বিধি-  
ন ভাতি বাসসি স্নিগ্ধে রসযোগ ইবার্ণিতঃ।

অনুবাদঃ—যৌবনের প্রারম্ভে কিংবা প্রৌঢ় বয়সে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়। এতদ্বারা কথিত হইল যে বৃদ্ধ ব্যক্তি রসায়নের অধীকারী নহে। এবং (বয়স বিবেচনাদি দ্বারা) শরীর শোধন করিয়া রসায়ন সেবন করিতে হয়। কেননা—মলিন বস্ত্রে বস্ত্রপ ভাল রং ধরেনা, সেইরূপ অবিশুদ্ধ শরীরে রসায়ন ঔষধ কার্যকারী হয়না।

অপিচ,

যথায়লমনির্কীচ্ছ বোধানাশারীর মানসান্।

রসায়ন গুণৈর্জন্ত যুগ্মতে ন কদাচন ॥

বোগা হ্যায়ুঃপ্রকর্ষার্থা অরোগনিবর্হনা।

মনঃ শরীরশুদ্ধানাং সিধ্যন্তি এবতাস্তানাম্ ॥

অনুবাদ :—শারীরিক ও মানসিক বোগ রহিত না হইলে সে ব্যক্তি কখন রসায়ন ঔষধ সেবনের ফলপ্রাপ্ত হয়না। যে সকল ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক বোগ রহিত এবং সংয-

তাত্মা উহারাই আয়ুঃবর্দ্ধক ও অরোগপ্রতিষেধক রসায়ন ঔষধের ফল লাভ করিলা থাকেন।

রসায়নার্থ পূর্বকথিতরূপে হরীতকী প্রয়োগকে ঋতু হরীতকী বলে। ঋতু হরীতকীর মাত্রা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়।

বর্ষাকালে হরীতকী ছয় মাষা ও সৈন্ধব লবণ ছই মাষা, গিলিয়া খাইবে। শরৎ কালে হরীতকী পাঁচমাষা ও চিনি ৪ মাষা খাইয়া শীতল জল পান করিবে। হেমন্তে হরীতকী তিন মাষা ও শুষ্ক ছইমাষা খাইয়া তপ্তজল পান করিবে। শীতকালে হরীতকী তিনমাষা ও পিপুল ছই মাষা সেবন করিয়া তপ্তজল পান করিবে। একমাষা ১০ টী কুচের সমান।

এইরূপ সাধারণ মাত্রার উল্লেখ থাকিলেও অবস্থাভেদে মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করা বাইতে পারে।

এক্কে আমরা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ক্ষতরোগে—হরীতকীসিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত দ্বীত করিলে উপকার হয়। স্ফন্দ হরীতকী চূর্ণ গব্য দুগ্ধ সহ মলমের স্রাব করিয়া প্রয়োগ করিলে ক্ষত প্রশমিত হয়। হরীতকী অন্তর্ভুক্তি\* তত্ত্ব করিয়া ক্ষত স্থলে প্রয়োগ করিলে ক্ষত ভাল হয়।

নেত্র-রোগে—হরীতকীসিদ্ধ জল দ্বারা চক্ষু দ্বীত করিলে নেত্র রোগ জন্মিতে পারে

\* ক্ষত পাত্রেয় মধ্যো তত্ত্ব করিলে ভাহাকে অন্ত-  
র্ভুক্তি কহা বলে। উদাহরণ—হাঁড়ির মধ্যে হরী-  
তকী রাখিয়া হাঁড়ির মুখে সরিষা সন্নিবেশ হইলে হরীতকী  
দ্বারা ক্ষত এবং ততক্ষণ অত্যন্তদূর হরীতকী অকার্যকর  
বুদ্ধিবর্ধ এবং ততক্ষণ হাঁড়ির স্রাব  
অব্যাহত রাখা কর।

না এবং জন্মিয়া থাকিলে ভাল হয়। হরীতকী চূর্ণ অসমান সূত ও মধু সহ সেবন করিলে নেত্ররোগ জন্মিতে পারে না এবং দৃষ্টি শক্তি অব্যাহত থাকে।

মুখরাগে—হরীতকী চূর্ণ দিয়া নিত্য দন্ত ধাবন করিলে দন্ত ও দন্তবেষ্ট সুস্থ থাকে। দন্ত বেষ্টের ক্ষীতিতে ক্ষীতস্থলের উপর হরীতকী খণ্ড রাখিয়া দিলে ক্ষীতি ও যন্ত্রণা নষ্ট হয়। হরীতকী সিদ্ধ উষ্ণ জলের পুনঃ পুনঃ কবল করিলে দন্ত ও দন্তবেষ্টের শূল নষ্ট হয়। হরীতকী সিদ্ধ জল দ্বারা মুখ ধুইলে এবং মধু সহ হরীতকী চূর্ণ প্রয়োগ করিলে মুখ, জিহ্বা ও দন্তবেষ্টের ক্ষত নষ্ট হয়।

কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য হরীতকী প্রয়োগ—শাস্ত্রে হরীতকী অমুলোমক বলিয়া কথিত। যে জব্য অগ্নক দোষের পরিপাক এবং বায়ু বদ্ধ ভেদ করিয়া মলকে অধঃপাতিত করে তাহাকে অমুলোমক বলে।

মূহ বা মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে হরীতকী কার্যকারী। ক্রুরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিলে প্রায়শঃ স্ফুল পাণ্ডুয়া যায় না। তবে ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিশেষত্ব হেতু হয়ত কোন ক্রুরকোষ্ঠ ব্যক্তিরও বিরেচন হইতে পারে এবং হয়ত কোন মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির নাও হইতে পারে। অস্তান্ত হরীতকী অপেক্ষা জলী হরীতকী অধিকতর ভেদক।

রাগিতে শয়ন কালে কোষ্ঠ ভেদে আধ

তোলা হইতে দুই তোলা বা ততোধিক মাত্রায় বাটিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে প্রাতে বেশ কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়, অথচ কোনরূপ কষ্টকর উপসর্গ ঘটে না। কোষ্ঠভেদে—প্রাতে খালিপেটে, হরীতকী চূর্ণ বা বাটা এক দিকি হইতে এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে ৩৪ বার অন্ন অন্ন করিয়া তরল মল ভেদ হয়। আমি 'স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে এসম্বন্ধে হরীতকী Kntuow's Powder প্রভৃতি লবণঘটিত বিরেচকের ত্রায় ফলপ্রদ। সূত্রাং ঐ সকলের পরিবর্তে হরীতকী চূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। খুব প্রত্যুষে পূর্বে কথিত রাত্রের ত্রায় মাত্রায় হরীতকী সেবনে ৩৪ বার মল ভেদ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট নির্কীচন কালে মনে রাখিতে হইবে যে হরীতকী যত বড় ও ভারী হয় ততই ভাল। অধিকন্তু যে হরীতকী ভাঙ্গিলে শস্ত স্বর্ণের ন্যায় সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট এবং সারবান দেখা যায় তাহাই উৎকৃষ্ট।

অধিককাল হরীতকী সেবন করিলে পুষ্কবৎসের হানি হয় বলিয়া অনেকের ধারণা আছে কিন্তু শাস্ত্রে বা প্রচলিত ব্যবহারে হরীতকীর ঐরূপ কোন দোষের পরিচয় পাই নাই। সম্ভবতঃ সংযমী ব্যক্তিরাই হরীতকী ভক্ষণ করেন বলিয়াই এইরূপে অমূলক প্রবাদেব সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

## অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শকের মন্তব্য ।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্র-বাচস্পতি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ই. হেরল্ড ব্রাউন এম্ ডি, এম, আর, সি, পি, ( লণ্ডন ) লেপ্টেন্যান্ট কর্ণাল, আই. এম্, এন্স ( রিঃ ) অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বিদ্যালয়ের “পরিদর্শকগণের মন্তব্য পুস্তকে” যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন নিয়ে তাহার মূল ও অনুবাদ মুদ্রিত হইল—

I have visited with great pleasure the Ayurvedic College which owes its foundation to the energy and enthusiasm of Kabiraj Jamini Bhusan Roy. The object of the institution is the cultivation of the Science of Medicine as taught in Ancient India, with all the advantages and accessories derivable from Modern Science. The Professors will each be in charge of a special subject and will teach his own selected branch both theoretically and practically. Thus we shall have different instructors in Chemistry, Physics, Botany, Physiology, Anatomy, Medicine, Surgery and Midwifery. There will also be an out-door dispensary where professional aid will be available free of charge in Medical and Surgical cases. Arrangements have been commenced for a Museum for *Materia Medica* so as to facilitate the identification of Medicinal plants. It is also intended to collect manuscripts of rare Ayurvedic works with a view to their

publication in correct and reliable editions. I have mentioned a few only of the many striking features of the institution which make it worthy of liberal support from the public as also from the Government. A study of the indigenous system of medicine, which has successfully maintained its ground against formidable rivals, will convince any impartial critic that its basis was scientific and not empirical ; we cannot consequently afford to ignore a system which embodies the results of the observation and experience of the acutest intellects of India for ages. The right course to follow is, not to treat it as a dead system incapable of further development, but to foster its growth as a progressive science. To achieve this end, ample funds are needed, and one can only express the hope that the requisite funds for a building, a hospital, a library, a museum and a laboratory will not be slow to come.

Sd. ASUTOSH MUKERJEE.  
22nd July, 1916.

I had the pleasure of being conducted round the Ayurvedic college this morning, by my friend Kaviraj, Jamini Bhusan Roy, M. A., M. B.,

I was greatly interested at all I saw, there being indications on all sides of a serious and earnest ende-

avour to impart to the students the principles both of Ayurvédic and western medicine. This I consider a step in the right direction for, though many speak slightly of the empirical nature of the former, there is not the least doubt that we have much to learn from it. There are a great many indigenous drugs which are of extreme utility, but are little known to the students of western medicine, as they are not taught in the various medical schools; these are being largely employed here, and, among the many interesting and useful collections I saw, was one of growing plants, most of which were familiar to me as useful medicinally, and each one was labelled with the vernacular as well as the botanical name.

The anatomical room was well supplied with models and drawings, the Materia Medica room with a large and very varied collection of drugs organic and inorganic and there was also a fair collection of surgical instruments.

The staff is exceptionally strong and as all the members are imbued with a love of their work and a strong determination to overcome all obstacles, the success of the institution is assured.

I am in absolute sympathy with this college, for it meets a distinct want. The Materia Medica of the drugs indigenous to Bengal has been surprisingly neglected. Of late

the workers in the past, the last of whom was Dymock of revered memory, did a great deal in that direction.

The modern kabiraj with his wealth of empirical knowledge improved by being taught anatomy and physiology, medicine and surgery, will be amply equipped to practise the science and art of the profession; and I wish the infant institution every success, while heartily congratulating Kabiraj Jamini Bhusan and his keen and intelligent associates on the success they have already attained,

Sd. E. HAROLD BROWN, M, D

M.R.C.P. (London)

Lt. Col. I.M.S. (Retired).

The 7th Sept, 1916.

আমি আয়ুর্বেদ কলেজ পরিদর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। কবিরাজ যামিনী-ভূষণ রায়ের কর্মদক্ষতায় এবং উৎসাহে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আবিস্কৃত বিবিধতন্ত্র ও জরায়ু-সম্ভারের সাহায্যে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন করাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এক একজন অধ্যাপকের প্রতি বিষয় বিশেষের অধ্যাপনার ভার অর্পিত হইবে। এবং তিনি সেই বিষয়ের শাস্ত্রাংশ যোগ্যাকরণ পূর্বক অধ্যয়ন করাইবেন। রসশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, বন্যোষধি-বিজ্ঞান, শারীরক্রিয়াতত্ত্ব, অল-বিনিষ্টক-বিজ্ঞান, কায়চিকিৎসা, শল্য-শাল্য-চিকিৎসা ও প্রসূতিতত্ত্ব, চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই আটটি

শাখার জন্ত আটজন অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিবেন। একটা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে সমাগত রোগিগণের ঔষধসাধ্য এবং শস্ত্রসাধ্য উভয় রোগের চিকিৎসা বিনামূল্যে নির্বাহ করা হয়। চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত বৃক্ষ ওষধ লতাদির পরিচয়ের সুবিধার জন্ত ভেবজ পরিচয়গারের প্রতিষ্ঠা কার্য আরম্ভ হইয়াছে। দ্রুত আয়ুর্ষেন্দীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ পূর্বক ঐ সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য বিস্তৃত সংস্করণ মুদ্রিত কবাও উদ্‌যোক্তাদিগের অভিপ্রেত। এই বিদ্যালয়ের অস্থঠের বিবিধ চিকিৎসকর্ষক বিষয়ের মধ্যে আমি কতকটীর মাত্র উল্লেখ করিলাম। অস্থঠের বিষয়গুলি বিশেষ হিতকর স্তরায় এই বিদ্যালয় জনসাধারণের এবং রাজসরকারের নিকট হইতে বিশেষ আমূল্য লাভের যোগ্য। ভয়াবহ প্রতিবন্দী সত্ত্বেও এতদেশীয় চিকিৎসা প্রণালী স্বীয় যশঃপ্রভায় সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে কোন নিরপেক্ষ সমালোচক যদি দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা আলোচনা করেন তাহা হইলে তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিবে যে, এই শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরি প্রতিষ্ঠিত, ইহা কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ-জ্ঞান-মূলক নহে। ভারতীয় হুতীক-ধীসম্পন্ন মনীষিগণের যুগযুগান্তরের অর্জিত ভূয়োদর্শন এবং অভিজ্ঞতা যে চিকিৎসাশাস্ত্রে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহাকে আমরা কদাপি অবজ্ঞা করিতে পারি না। এক্ষণে যে পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে বলিতেছি—ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ষেন্দ, উত্তরোত্তর উন্নতির অযোগ্য—মৃত বলিয়া ভাবিও না কিন্তু উত্তরোত্তর উপচারণান বিজ্ঞান শাস্ত্রের নত বাহাতে ইহারও

পরিপূষ্টি সাধিত হয় যত্নের সহিত তদ্রূপ অনুষ্ঠান কর। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আশা করা যায়, কালেক্টর গৃহ, আতুর-নিবাস, গ্রন্থাগার, প্রদর্শনী ও কর্মশালা প্রতিষ্ঠার জন্ত যে অত্যাবশ্যক অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগৃহীত হইয়া যাইবে। (ইংরাজির অনুবাদ)।

স্বাঃ শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ।

২২শে জুলাই ১৯১৬।

অন্য প্রাতঃকালে আমার বন্ধু কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায় এম, এ, এম, বি, আমাকে আয়ুর্ষেন্দ কালেক্স দেখাইলেন।

যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার চিত্ত সর্ষধা আকৃষ্ট হইল। আয়ুর্ষেন্দ এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা উভয়ের মূলতত্ত্ব ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত যে সকল ব্যবসজ্জার ও অনুষ্ঠানের আবশ্যক তৎসমুদয় সংগ্রহের জন্ত আন্তরিক গুরুতর প্রযত্নের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। এই পদ্ধতিই সম্যক উদ্দেশ্য সাধিকা হইবে বলিয়া বিবেচনা করি। অনেকে আয়ুর্ষেন্দ শাস্ত্রকে কেবল ভূয়োদর্শন জ্ঞান-মূলক বলিয়া কটাক্ষ করিতে পারেন কিন্তু; এই আয়ুর্ষেন্দ শাস্ত্র হইতে আমাদের শিক্ষা করিবার যে অনেক বিষয় আছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চিকিৎসা কার্যে বিশেষ উপযোগী—কত দেশীয় গাছ গাছড়া আছে; কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়া, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যালয়িকারিগণের এই সকল উত্তম সবধে জ্ঞান অতি সামান্য। আয়ুর্ষেন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষার জন্ত অনেক গাছ গাছড়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই কৌতুকলোচীপক অভ্যাসক

সংগ্রহের মধ্যে আমি কতকগুলি জীবিত বৃক্ষ, গুল্ম, লতা দেখিলাম। ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই সকল উদ্ভিদের অধিকাংশই আমার পরিচিত। প্রত্যেক গাছের বৈজ্ঞানিক নাম এবং বাঙ্গালা নাম লিখিত রহিয়াছে দেখিলাম।

যে গৃহে অঙ্গবিশিষ্ট বিজ্ঞা শিক্ষার দ্রব্য-সম্ভার সংগৃহীত হইয়াছে, সেখানে বিবিধ চিত্র এবং আদর্শ (মডেল) সুরক্ষিত রহিয়াছে দেখিলাম। ভেষজ পরিচয়গারে ঔষধার্থ ব্যবহৃত বিবিধ জঙ্গম ও স্থাবর দ্রব্য এবং বস্ত্রশস্ত্রাগারে বিবিধ যন্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

অমুষ্ঠাতৃগণের বিশেষ যোগ্যতা আছে। অমুষ্ঠিত কার্যের প্রতি ইহাদের সকলেরই আন্তরিক অমুরাগ আছে এবং ইহাদের সকলেই সর্বপ্রকার বিষয় অতিক্রম করিবার জ্ঞান বদ্ধপরিবর; সুতরাং এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধি যে সুনিশ্চিত রূপক্ষে সন্দেহ নাই।

বহুপূর্বে কতিপয় কৰ্ম্মপুরুষ ভারতের দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্মরণীয় কীর্ত্তি ডাইমকের পর আর কেহই এদিকে শ্রমস্বীকার করেন নাই।

এক্ষণে বঙ্গদেশ সুলভ গাছগাছাড়ার গুণাদিতত্ত্বের আলোচনা এতাদৃশ অবজ্ঞাত হইয়াছে যে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই বিদ্যালয়ে সেই বহুদিনের অবজ্ঞাত দ্রব্যগুণ বিজ্ঞার পুনরাগোচনার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া এই বিদ্যালয়ের কার্যে আমার পূর্ণ সহায়ত্ব আছি।

ভূয়োদর্শন-জাত-অভিজ্ঞাতায় পরিপক্ব আধুনিক আয়ুর্বেদ-চিকিৎসক, অঙ্গবিশিষ্ট-বিজ্ঞা, শারীর-ক্রিয়াবিজ্ঞান, কায়-শল্যা-শালাকা চিকিৎসায় সুশিক্ষিত হইলে তাঁহারা ভিষক্বিজ্ঞায় সুনিপুণ এবং যুগোপযোগী সূচিকিৎসক বলিয়া আদৃত হইবেন। আমার আন্তরিক কামনা, এই অচিরপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধি হউক। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এবং তাঁহার কাৰ্য্যাভ্যুত্থান সুবুদ্ধি সহযোগিগণ এই শুভামুষ্ঠান কার্য্যতঃ নির্বাহের পক্ষে যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার জ্ঞান আমি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। (অমুবাদ)

স্বাঃ ই, হেরল্ড ব্রাউন, এম, ডি, এম, আর, সি পি. (লণ্ডন) লেপ্টে; কর্ণাল, আই, এম, এস (রিঃ)।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৬।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

১ম বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৩—পৌষ ।

৪র্থ সংখ্যা ।

## অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ ।

একগুণে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কি সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় প্রদান করিব। আয়ুর্বেদ আটটি অংশে বিভক্ত বলিয়া উহা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ নামে বিখ্যাত। আটটি অঙ্গ যথা, কায়তন্ত্র, শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, ভূতবিজ্ঞা, কৌমারভূত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র। প্রত্যেকের বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

১। কায়তন্ত্র—অর হইতে আরম্ভ করিয়া ঔষধ-সাধ্য যাবতীয় রোগের চিকিৎসা এই তন্ত্রমধ্যে নিবিষ্ট আছে। কায়তন্ত্র আজিও আয়ুর্বেদের প্রাবল্য অক্ষুর রাখিয়াছে বলিলে বোধ হয় অতুক্তি করা হইবে না। অবশ্য যাহারা কবিরাজীকে “হাতুড়ে” চিকিৎসা বলিয়া মনে করেন অথবা বিংশশতাব্দীর এই নিত্য নূতন উন্নতির যুগে সেই বহু প্রাচীন আয়ুর্বেদের আশ্রয় গ্রহণ করা দ্বীপ বিজ্ঞাবক্তার লাঘব বলিয়া বিবেচনা করেন তাঁহাদের কথা-স্বতন্ত্র। কেমনা—আয়ুর্বেদের কায়-চিকিৎসা কিরূপ কলপ্রদ তাহা জানিবার

অবকাশ তাঁহাদের কখন ঘটবে না। কিন্তু এইরূপ কতকগুলি লোক ব্যতীত ভারতের আপামর সাধারণ এবং অধুনা অনেক বৈদেশিক ব্যক্তি জীর্ণ জটিল রোগে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাই অধিকতর কলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কায়তন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের উৎকর্ষ সযত্নে “আয়ুর্বেদে” ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে বলিয়া বর্তমানে আমরা কেবল কায়তন্ত্রে কি কি বিষয় আছে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

রোগ সযত্নে—রোগোৎপত্তির কারণ, রোগনিগম, বিভিন্ন রোগের নিদান উপসর্গ ও অরিষ্ট, অজ্ঞাত রোগ জ্ঞানের উপায়, রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়, লঘু ও গুরু ব্যাধি নির্ণয়, সত্তর্পণ ও অপতর্পণকৃত রোগ, অনপদোদ্যম, রোগের শ্রান্ত্যাদি তেজ প্রভৃতি।

রোগী সযত্নে—রোগীর শুশ্রূষা, রোগি-শুশ্রূষা রোগি-পরীক্ষা, রোগীর প্রকৃতি, সখ, সাধ্যা, প্রভৃতি।

পথ্য সযত্নে—বিবিধ রোগের নান্য প্রকার

পথ্যের কল্পনা, হিতাহিহ্ন বিচার, মাত্রা, সংযোগবিরুদ্ধ ইত্যাদি।

ঔষধ সম্বন্ধে—ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ দ্রব্যের গুণ, উৎকর্ষ পরীক্ষা, নানা প্রকার ঔষধ কল্পনা ও তাহাদের প্রয়োগক্ষেত্র, ঔষধের মাত্রা, ঔষধপ্রয়োগের কাল প্রভৃতি।

চিকিৎসা—চিকিৎসার মূলমন্ত্র ও যোজনাবিধি, ভেষজ, ক্ষার ও অম্লি-প্রয়োগ, স্নেহ, স্বেদ, বমন, বিরেচন, নিরুহ, অস্থ্যবাসন, ধূম, নস্ত, কবল, আশ্চ্যোতন প্রভৃতির প্রয়োগ।

সুস্থব্যক্তি সম্বন্ধে—স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, রোগ প্রতিষেধের উপায়, দিনচর্যা, ঋতুচর্যা, সদাচারবিধি প্রভৃতি।

২। শল্যতত্ত্ব—( Surgery ) যন্ত্র শস্ত্র, অলোকা, ত্রণবন্ধন, শস্ত্রসাধ্য রোগ, শল্য-নির্ধারণ প্রভৃতি বহুবিধ তথ্যের আকর। ধাত্রী বিজ্ঞা ( Midwifery ) শল্যতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, শল্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর অভিভাষণে দ্রষ্টব্য।

শালাক্যতত্ত্ব—গ্রীবার উর্দ্ধদেশস্থ রোগ-সমূহের অর্থাৎ শ্রবণ, নয়ন, শ্বদন ও শিরোগত রোগের লক্ষণাদি এবং উহাদিগের চিকিৎসার উপদেশ শালাক্যতত্ত্বের বিষয়ীভূত।

ভূতবিজ্ঞা—ইহা মন্ত্রায়ুর্বেদ। কতকটা Spiritualismও বটে।

কোমার ভূতা—কুমারদিগের লালনপালন এবং তাহাদিগের রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ কোমারভূতা তত্ত্বের বিষয়ীভূত।

অগদতত্ত্ব—নানা প্রকার স্থাবর ও জঙ্গম বিষের পরিচয়, ভিন্ন ভিন্ন বিষ-পীড়িতের লক্ষণ এবং তাহাদের চিকিৎসা অগদতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

রসায়ন—দীর্ঘজীবন, দীর্ঘ যৌবন, বল,

বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি প্রভৃতি লাভ করিবার জন্ত সুস্থব্যক্তিকে যে ঔষধ সেবনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাই রসায়ন তত্ত্বের অভিধেয়।

বাজীকরণ তত্ত্ব—ভোগসুখকর, অপত্য-বর্জনকর ঔষধসমূহ বাজীকরণ তত্ত্বের বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের গোববের বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইল। পরে আমরা আয়ুর্বেদোক্ত প্রত্যেক বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

বর্তমানে আয়ুর্বেদের যে দুরবস্থা ঘটয়াছে সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গত নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া এবং তাঁহার সেই অভিভাষণ “আয়ুর্বেদে” ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া আমরা বাহ্যিক বিবেচনার তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম।

আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্ত চিন্তা ও চেষ্টা করা যে আমাদের একান্ত কর্তব্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি উপায়ে উহার পুনরুদ্ধার ঘটিতে পারে এ সম্বন্ধে আজ-কাল অনেকেই চিন্তা করিতেছেন—ইহা অতীব আনন্দ ও উৎসাহের কথা। আমরাও এ সম্বন্ধে আংশিকভাবে আলোচনা করিব।

এ বিষয়ে বিচার করিতে হইলে প্রথমেই দেখা উচিত যে তাদৃশ চেষ্টার উপযুক্ত কাল আসিয়াছে কি না? শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে “বরমেকাহতি: কালে নাকালে লক্ষ কোটয়ঃ” অর্থাৎ কালে একটা আহতি দিলে যে ফল হয়, অকালে লক্ষ কোটি আহতিতে সে ফল হয় না। কালে বীজ বপন করিলে শস্ত জন্মে, অকালে বপন করিলে তাহা সঠক হইয়া থাকে না।



নানা দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, কালে ক্ষুদ্র চেষ্টা বলবতী হইয়া মহাকল প্রসব করিয়াছে। আবার অকালে মহতী চেষ্টাও স্বল্পমাত্র ফল উৎপাদন করিতে পারে নাই। সেই জন্ত প্রথমেই দেখা উচিত যে আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধারকরে চেষ্টার কাল আসি-  
য়াছে কি না ?

পূর্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা অল্পকাল সমাধানের আভাস পাওয়া যায়। কারণ বহুকালের অবনতির পর অধুনা ভারতে একটা উন্নতির যুগ আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভারতে এক্ষণে নানা প্রকার কল কারখানা স্থাপনের জন্ত একটা বিরাট চেষ্টা চলিতেছে। টাটা আয়রণ ওয়ার্কস্ তাহারই একটা মধুময় ফল। সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন জন্ত আমাদের সদাশয় গবর্ণমেন্ট এবং অনেক দেশ হিতৈষী ব্যক্তি মুক্ত হস্ত হইয়াছেন এবং তাহার ফলে সংস্কৃত চর্চা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। কিছুকাল পূর্বে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যাহা ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শত্রু অজ্ঞ নরসুন্দরের হস্ত হইতে শিক্ষিত ডাক্তারের হস্তে স্থান পাই-  
য়াছে। অধিক কি, ভীক ও দুর্বল বলিয়া আখ্যাত বাঙ্গালী যুবক আজ যুরোপের মহা-  
সমরে যোগদান করিয়া বাঙ্গালীর দুর্নাম ঘুচা-  
ইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উন্নতির যুগে আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্ত চেষ্টা করা সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

এক্ষণে দেখা উচিত যে আয়ুর্বেদের পুন-  
রুদ্ধারের উপায় কি ? বর্তমানে আয়ুর্বেদের  
যতটুকু পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ বলিয়া মনে  
হয় না। অপিচ, বাহ্য পাওয়া যায় তাহাও  
সকলে বুঝেন বলিয়া মনে হয় না।

“বাহ্য পাওয়া যায় তাহা সকলে বুঝেন  
বলিয়া মনে হয় না” এই কথার অনেকে জুড়  
হইবেন। কিন্তু কথাটা যে অতি সত্য তাহার  
প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। চরকের শারীর  
স্থানে গর্তস্থিত জগ “উপস্বেহ” ও “উপস্বেদ”  
দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এইরূপ লিখিত আছে।  
এই উপস্বেহ ও উপস্বেদের স্পষ্টার্থ কি ?

শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে :—

ব্যপগতপিপাসাবুদ্ধকস্ত গর্ভঃ পরতস্ত বৃদ্ধি  
মাতরমাত্রিত্য বর্ধনতুপস্বেহোপস্বেদাত্যাম্।  
গর্ভস্ত সদসত্বতান্নাবয়ব স্তদন্তরঃ হ্যস্ত  
লোমকুপায়নৈরুপস্বেহঃ কশিরাভিনাদায়নৈঃ।  
নাভ্যাং হস্য নাড়ী প্রসক্তা নাভ্যাকামরামরা  
চাস্য মাতুঃ প্রসক্তা হৃদয়ে মাতৃহৃদয়ে হস্ত  
তামরামরামভিসংপ্রবতে সিরাসিঃ স্যন্দমানাভিঃ।  
স তস্য রসো বলবর্ণকরঃ সম্প্রসৃতে।

অনুবাদ :—জগ্ন কুংপিপাসা রহিত ও  
পরতস্ত হইয়া মাতাকে আশ্রয় করিয়া উপস্বেহ  
ও উপস্বেদ দ্বারা জীবিত থাকে। সদসত্বতান্না  
বয়ব ( কোন অঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে  
এবং কোন অঙ্গ প্রকাশ পায় নাই এরূপ )  
গর্ভ—লোমকুপের দ্বারা উপস্বেদ হয়, কখন বা  
নাভিনাড়ী দ্বারা পুষ্ট হয়। জগ্নের নাভির  
সহিত যে নাড়ী সংলগ্ন থাকে তাহাকে আমরা  
বলে, আমরা এক শ্রান্ত মাতার হৃদয়ের  
সহিত সংলগ্ন থাকে। মাতার হৃদয় সংলগ্ন  
সিরা রসদ্বারা আমরা নাড়ীকে আশ্রিত  
করে। সেই রস দ্বারা জগ্নের বল বর্ণ জন্মে।

এই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে মাতার নাভি-  
নাড়ী ও লোম-কুপ দ্বারা গর্ভ পুষ্ট হয়, তাহা  
বুঝা যায়। কিন্তু স্পষ্টার্থ ব্রহ্মতত্ত্বইহা-অঙ্গ-  
দ্বিপকে টীকাধরূপ যুরোপীয়-টিকিংসা শাস্ত্রে  
লিখিত হয়

বহু শোণিত স্থিত ডিম্ব ( ovum ) শুক্র-  
স্থিত স্পারমাটোজোয়া ( Spermatogoa )  
কর্ভক বিদ্ধ বা আহত হইয়া গর্ভরূপে পরিণত  
হইলে তখন উহা রস শোষণ করিয়া বৃদ্ধি  
প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহাকে উপস্বেহ (Subcu-  
taneous absorption) বলা যায়। কিন্তু  
গর্ভ চিরদিন এইরূপ ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়  
না। জরায়ুর মধ্যে অমরা ( Placenta )  
উৎপন্ন হইলে সেই অমরার ভিতর দিয়া মাতার  
রস জগ্ন শরীরে পোষণ করিয়া থাকে। এই  
রস কিরূপে মাতার শরীর হইতে গর্ভের  
শরীরে প্রবেশ করে? আমাদের হৃৎ হৃৎ  
যে রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত বায়ুস্থিত অক্সিজেন  
( Oxygen ) গ্রহণ করে এবং শরীর দূষিত  
অংশ বায়ুতে মিশাইয়া দেয় সেইরূপ প্রক্রিয়া  
দ্বারা একটা খুব পাতলা পর্দার ভিতর দিয়া  
এইরূপ বিনিময় ঘটে। ইংরাজীতে ইটাকে  
অসমসিস্ ( Osmosis ) বলে।

উপরি লিখিত বিষয়ের জ্ঞান আমরা শ্রদ্ধা-  
স্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমিয় নাথব মল্লিক এম্-  
বি, মহাশয়ের নিকট ধন্য। তিনি উপস্বে-  
হের অর্থ Absorption through the Skin  
এবং উপস্বেহের অর্থ Absorption by  
osmosis লিখিয়াছেন। কিন্তু মূলে “লোম  
কূপায়নৈকপদ্যেহঃ” পাঠ থাকায় আমরা উপ-  
স্বেহ শব্দের অনুবাদ Absorption Through  
the Skin করিতে বাধ্য হইয়াছি। উপস্বেহ  
অর্থে “Absorption by osmosis” কিনা  
— তাহা বিতর্ক্য।

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে যুরোপীয়  
চিকিৎসা শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিলে  
আমরা সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রাংশ অতি সহজে বুঝিতে  
পারি। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে বতবুর সম্ভব

সাহায্য গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য বলিয়া  
মনে হয়।

কিন্তু আয়ুর্কৌদে এমন অনেক বিষয়  
আছে যাহার সহিত যুরোপীয় চিকিৎসার  
সম্পূর্ণ বিরোধ দেখা যায়।। এরূপ স্থলে আমরা  
পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মত গ্রহণ না করিয়া  
আয়ুর্কৌদের মতকেই অভ্রান্ত মনে করিব।  
এবং সেই মত যে অভ্রান্ত তাহা প্রমাণ করি-  
বার জ্ঞান জীবনের পর জীবন উৎসর্গ করিব।  
শুণ্ড সত্য একদিন অবশ্যই প্রকাশিত হইয়া  
পড়িবে।

আয়ুর্কৌদের পুনরুদ্ধার করে আর একটি  
বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার—আয়ুর্কৌদীয় অপ্র-  
কাশিত গ্রন্থ সমূহের প্রচার। বিশাল ভারত-  
বর্ষে কত দেশে কত অসংখ্য গ্রন্থ শুণ্ডভাবে  
রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সমস্ত  
গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে পারিলে  
অনেক অজ্ঞাত বিষয় সহজেই আমরা জানিতে  
পারিব, আয়ুর্কৌদের অনেক রহস্য সহজেই  
বুঝিতে পারিব।

এছাড়া সন্ধান, গুঢ়শাস্ত্রার্থের সদব্যাখ্যা,  
উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে অধ্যাপনা, বৈদ্যকবুদ্ধ  
বাটিকা প্রতিষ্ঠা আয়ুর্কৌদের পূর্বগৌরব  
প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায় বটে কিন্তু যে রূপ  
ভাবেই উন্নতির চেষ্টা করা যাউক নিম্নলিখিত  
তিনটি বিষয় সফলতার পক্ষে একান্ত  
প্রয়োজনীয়।

১। রাজ্যসুগ্রহ।

২। চিকিৎসকগণের একতা।

৩। জন সাধারণের অর্থ সাহায্য।

রাজ্যসুগ্রহঃ—আমাদের সদাশয় সম্রাট  
এবং তাহার পূর্ব পুরুষগণ নানা প্রকারে  
ভারতের উন্নতি সাধন করিয়াছেন ও করিতে

ছেন। তাঁহাদের রূপায় কত লুপ্ত শির  
পুনর্জীবিত হইয়াছে; কত লুপ্ত-বিদ্ধা সু-প্র-  
চারিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু  
আয়ুর্বেদের ভাণ্ডে আজিও তাদৃশ-রাজ্যহুগ্রহ  
লাভ ঘটে নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস  
আমরা সমস্ত ভারতবাসী একযোগে যদি  
রাজার নিকট প্রার্থনা করি, তাহা হইলে  
কখনই সদাশয় সম্রাট আমাদের মনঃক্ষুব্ধ  
করিবেন না। এস ভাই, আমরা সকলে  
রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলি :—

হে রাজরাজেশ্বর, হে রাজহস্ত-মৌলিমণি-  
মণ্ডিত পাদ পীঠ, আজ আমরা কাতর হৃদয়ে  
আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি আয়ুর্কে-  
দের প্রতি রূপা-কটাকপাত করুন। ভারতের  
সকল শাস্ত্রই রাজ্যহুগ্রহ লাভ করিয়াছে, কিন্তু  
কোন অপরাধে আয়ুর্বেদ সে অহুগ্রহ লাভে  
বঞ্চিত রহিয়াছে প্রভু! আপনার রূপা-কটাক  
পাত হইলে আয়ুর্বেদ আবার সম্পূর্ণ হইয়া  
রোগার্শ্বজনগণের রোগোপশমন করিয়া ভারত-  
বাসীকে সুস্থ সৎল করিতে সক্ষম হইবে। এই  
সহৃদয়ে সহায়তার জন্য ভারতবাসী আপনার  
সুখ চাহিয়া আছে। যে রাজহস্তে রূপা-  
কটাকপাত করুন।

২। চিকিৎসক গণের একতা :—এক-  
তার অভাব বঙ্গদেশের অমূল্যতির একটি  
প্রধান কারণ। চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যেও  
একতার বিশেষ অভাব। কবিরাজে কবি-  
রাজে এবং ডাক্তার কবিরাজে একটা প্রতি-  
দ্বন্দ্বিতার ভাব পরিস্ফুট দেখা যায়। কিছু  
কাল পূর্বে ডাক্তারগণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে  
অবজার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু সুখের বিষয়  
আজ কাল অনেকের সে ভ্রম ঘুটিরাছে।  
অনেকে আজ কাল আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাকে,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধকে আদর করিতেছেন।  
ইম্পেরিকেল অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া আয়ু-  
র্বেদের যে কলঙ্ক ছিল তাহা এক্ষণে প্রায় লোপ  
পাইয়াছে। আমরা আমাদের পরম প্রীতি-  
ভাজন ডাক্তার ব্রাতাদিগকে আমাদের  
এই জাতীয় গৌরব আয়ুর্বেদের উন্নতি কল্পে  
সহযোগী হইবার জন্য সাদরে আহ্বান  
করিতেছি।

আর হে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ এখন  
আমরা ভাই ভাই ঠাই ঠাই। ব্যবসার ক্ষেত্রে  
তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, আমি তোমার প্রতি-  
দ্বন্দ্বী। সে ভাব তুমিও তাগ করিতে পারিবে  
না, আমিও পারিব না। কিন্তু এস আমরা  
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিভাগের রূপ গণ্ডী নির্মাণ  
করি। আমরা যখন সেই গণ্ডীর মধ্যে অব-  
স্থান করিব, তখন আমরা আর “ভাই ভাই  
ঠাই ঠাই নাই” তখন আমরা “বয়ঃ পঞ্চ শতানি  
চ।” সেই গণ্ডী ভেদ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা রূপ  
রাবণ, আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধারের ঐকান্তিকী  
একনিষ্ট ইচ্ছারূপিনী পতিব্রতা সীতাকে হরণ  
করিয়া লইয়া বাইতে পারিবে না। গণ্ডীর  
বাহিরে আসিয়া আবার তুমি আমার প্রতি-  
দ্বন্দ্বী হইবে, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।  
এস ভাই আর বিলম্ব করিও না। অনেক সময়  
অপব্যয় করিয়াছি; আর নয়, ঐ দেখ,  
আয়ুর্বেদের হৃদশা দর্শনে ব্যাধিত আত্মের  
ধনস্তরির স্বর্গগত আত্মা আমাদেরই সুখ পানে  
চাহিয়া আছে।

৩। আর হে ভারতীয় জনসাধারণ, আজ  
আমরা তোমাদের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া  
নগ্নায়মান হইয়াছি। আয়ুর্বেদ তোমাদের,  
আয়ুর্বেদ তোমাদের জীবন-স্বপ্ন, তোমাদের  
আয়ুর্বেদ, তোমাদের আয়ুর্বেদের জীবন

স্বরূপ। দাও ভাই ভিক্ষা দাও, ক্ষীণ প্রাণ  
কঙ্কাল সার আয়ুর্বেদকে পুনরুজ্জীবিত এবং  
পুষ্ট করিবার জন্ত ভিক্ষা দাও ভাই। ভিক্ষুক  
তোমার ভিক্ষালব্ধ তত্ত্ব হইতে একমুষ্টি দাও,  
কুবিজীবী তোমার ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য হইতে  
একসের শস্য দাও, গৃহস্থ তোমার বাজার  
ধরনের পয়সা হইতে একটা পয়সা দিয়া যাও,  
ধনী তোমার ধন ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য  
কর, বিলাসী তোমার বিলাসিতার জন্ত ব্যয়ের  
শতাংশ দাও, রাজা মহারাজা, নবাব, জমিদার  
তোমরা কৃপা-কটাক্ষপাত কর। আর মা  
বঙ্গকুললক্ষ্মীগণ, তোমাদের বস্ত্রভরণের সহ-  
স্রাংশ দান কর। মনে করিও না, এ দান

বৃথায় যাইবে। আয়ুর্বেদ শত সহস্রগুণ দিয়া  
তোমাদের এ ঋণ পরিশোধ করিবে। 'আয়ু-  
র্বেদ এমন একটা ফল, মূল বা পত্রের কথা  
তোমার বলিয়া দিবে যদ্বারা তুমি কঠিন ব্যাধি  
হইতে মুক্ত হইবে, তোমার ক্লমপত্নী সুস্থ  
হইবে, তোমার মৃতপ্রায় পুত্র পুনরুজ্জীবন লাভ  
করিবে। আর হে সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়ন্তা, সর্ব-  
দর্শী মঙ্গলালয় জগদীশ, তুমি একবার আয়ু-  
র্বেদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত কর। 'আয়ু-  
র্বেদ ধন্য হউক।

( ক্রমশঃ )

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## শিশুর সর্দি ও কাস চিকিৎসা।

( লীলা ও ছোট বো )।

ছোট বো। ঠাকুরঝি কখন এলে ?

লী। এই আসছি ভাই।

ছো। বাড়ীর সব খবর ভালত ?

লী। খবর ভাল হলে আর এই অসময়ে  
ছুটে আসি।

ছো। কেন কি হয়েছে ?

লী। এই ছেলে ছোটর অসুখ ভাই।

ঠাকুমা কোথায় আনিস ?

ছো। ঠাকুমা ঠাকুর ঘরে পূজো আহ্নিক  
করছেন এখনই আসবেন।

— লী। ( নিরীক্ষণ করিয়া ) ওমা একি ?

ছো। ( বিস্ময়ে ) কি ঠাকুরঝি ?

লী। তুই কি আজ কোন মজলিসে  
নাচতে যাবি নাকি ?

ছো। নাচতে যাব কি গো !

লী। পরনে ফিন্‌কিনে পাতলা কাগড়,  
পায়ে ঘুমুর দেওয়া মল, গায়ে পাতলা কিন-  
ফিনে বডিস—বুকের অর্ধেকটা খোলা, তার  
ওপর পাতলা বাহার দেওয়া ওড়না, মুখে  
পাউডার মেখেছিস্, ব্লুম অফ্‌ রোজ (Bloum  
of rose ) দিয়ে গাল রাঙা করেছিস্—এত  
নাচের পোষাক।

ছো। তবু ভাল।

লী। তবু ভাল কি ?

ছো। এতে আর কি দোষ হল ?

লী। এতে আর কি দোষ হল ! গের-  
ত্তর বউ, এই পোষাকে কোথায় যাবি তনি ?

ছো। চজ্ঞ ঠাকুরের খত্তর বাড়ী নেমন্তন্ন।

লী। বলি কিসের নেমন্তন্ন, নাচনার-  
খাবার ?ছো। নাচবার আবার কি ঠাকুরঝি  
খাবার।

লী। তবে এ নাচওয়ালীর পোষাক  
পরে কেন যাচ্ছি ?

ছো। ভাল পোষাক পরতে কি ইচ্ছা  
হয় না ?

লী। ভাল পোষাক পরতে কে তোকে  
বারণ করছে। কিন্তু তুই গেরস্তার বউ, চলতে  
ফিরতে তোর মল ঝুণ্ডু ঝুণ্ডু করে বলবে—  
“ওগো আমায় দেখ গো।” লোকের মন  
হরণ করবার জন্যে অসতী স্ত্রীলোকেরা পাউ-  
ডার, ব্রুম অফ্ রোজ য়েথের রূপ বাড়ায় আর  
লোককে মুগ্ধ করবার জন্যে অঙ্গের সৌন্দর্য্য  
দেখবে বলে পাতলা কাপড় গায়ে দেয়। তুই  
কার মন হরণ করতে চলেছিস্, কাকে মুগ্ধ  
করতে যাচ্ছিস্ ?

ছো। তা আজ কালই সবাই—

লী। য়েথের দে তোর সবাই। যদি কোন  
নির্কোষ স্ত্রীলোক নাচওয়ালীর মত পোষাক  
পরে বেরোয় তবে কি সবাই তাই করবে।

ছো। তা মেমেরাওত কত রকম সেজে  
গুজে বেরোয়।

লী। তুই কি মেমেরের দেশে জন্মেছিস্  
না মেমেরের সমাজে মিশেছিস্ যে মেমেরের  
মত চলবি। মেমেরা অখাত্ত খায়, তুই খেতে  
পারিস্ মেমেরের অনেকবার বিয়ে হয়, তোর  
হতে পারে ?

(ঠাকুয়ার প্রবেশ)

ঠা। এই যে লীলা এয়েছিস্। কিসের  
ঝগড়া হচ্ছে তাদের ?

লী। এই তোমার ছোট নাভবৌ নেম-  
স্তর খেতে বড়দার ঝগড় বাড়ী বাচ্ছে, তা  
পোষাকটা দেখ একবার।

ঠা। তাইত এই পোষাক পরে লোকের  
কাছে বেরবি কি করে ছোট ?

ছো। তা আজ না হয় বা—

লী। চোপরাও কালামুখী। জানিস্  
আমি তোর নন্দ, কখন যদি এমন পোষাকে  
বাড়ীর বার হতে দেখি—কি কোন গুরুজনের  
সুস্থখে বেকতে দেখি, এক কিল মেরে তোর  
দাঁত ছপাটি ভেঙে দেব। যদি একান্ত এ  
রকম সাজবার ইচ্ছা হয়, যার মনোরঞ্জন করা  
তোর দরকার—সেই স্বামীর কাছে এই রকম  
সেজে বসে থাকিস্। বা এখন এ কাপড়  
ছেড়ে ভাল মোটা কাপড় পরে আর, ও বুক  
খোলা বাড়ি রেখে বুক চাপা বাড়ি পরে আর,  
মোটা সাদাসিদে গুড়না গায়ে দিয়ে আর মল  
খুলে রেখে আর।

(ছোট বধূর প্রস্থান)

লী। এ রকম কেন হল ঠাকুমা ?

ঠা। যুগধর্ম—কালধর্ম, তা বৈ আর  
কি বলব। প্রাচীনকালের কথা ছেড়ে দাও।  
বাল্যকালে আমরা দেখেছি—একখানা মোটা  
কাপড় আর চাদরের মধ্যে একটা দেবতার  
মত ছন্দ ছিল, সে ছন্দ সংযম, আত্মত্যাগ,  
সর্বভূতে দয়া নিষ্ঠা, দেব দ্বিজে ভক্তি প্রভৃতি  
অশেষ সদগুণে পূর্ণ ছিল। একখানা মোটা  
লালপেড়ে সাড়ী আর হুগাছা শাঁখার মধ্যে  
একটা অশেষ সদগুণপূর্ণ মাতৃদুর্গা ছন্দ ছিল।  
আর এখন দেখি কি—জুতা, টকীন, মিহিখুতি,  
সাঁট, কোট, চেন বড়ির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র স্বার্থ-  
পর ছন্দ, জামা সেমিজ বডিস, মিহিসাড়ী ও  
অলঙ্কারের মধ্যে একটা স্বার্থপর অনন্ত লালসা-  
পূর্ণ নিষ্ঠুর ছন্দ। হায় হায় কি অধঃপতন !

লী। শুধু তাই নয় আদেবার লোক  
নাকি অসভ্য ছিল, আর এখনকার লোক  
নাকি সভ্য।

ঠা। তাই যদি হয় তবে গুণবানের নিকট

প্রার্থনা করি এই অমৃত অশান্তিপূর্ণ সভ্যতার পরিবর্তে দেশে আবার সেই সুখশান্তিপূর্ণ অসভ্যতা ফিরে আসুক। নারায়ণ, নারায়ণ পার কর প্রভু!

লী। সে জন্তে ভাবতে হবে না ঠাকুমা, প্রভু এপারে বড় কাউকে রাখেন না সকল-কেই দয়া করে ওপারে নিয়ে যান। এখন তুমি পার হবার আগে আমার পার করে দাও।

ঠা। কেন আবার কি হল তোর?

লী। এই ছোট খোকার কাসি আর বড় খোকার সর্দি।

ঠা। ছোট খোকার কি রকম কাসি?

লী। ওঃ! সে ভয়ানক কাসি। বখন হয় সহজে থামে না অনেকক্ষণ ধরে হয়। আর কাস্তে কাস্তে ছোটোটা নিঃস্রাব হয়ে পড়ে।

ঠা। কত দিন হয়েছে?

লী। স্ত্রপাত আট দশ দিন আগে থেকে। প্রথমে সর্দি হয়েছিল একটু একটু কাসিও ছিল। আজ তিন দিন এই রকম বেড়েছে।

ঠা। এর মধ্যে কিছু ওষুদ দিসনি?

লী। বেশী কিছু নয় কেবল ছুখের সঙ্গে পিপুল সিদ্ধ করে দিতাম। হাঁ ভাল কথা কাল আমার বড় নন্দাই এসেছিলেন। তিনি একজন ভাল ডাক্তার। তিনি বেশ করে দেখে শুনে বলেন যে একে হপিং কাসি বলে। এ রোগের ওষুদ বড় কিছু নেই। কিছুদিন - বাদে আপনিই সেরে যাবে।

ঠা। রোগ মাত্রেরই ওষুদ ভগবান সৃষ্টি করেছেন। ওষুদের অভাব নেই, অভাব জ্ঞানের। অর হয় না ত?

লী। বেশ স্পষ্ট অর হয় না তবে মাঝে মাঝে গা গরম বলে বোধ হয়।

ঠা। হঁ ঘুড়ি কাসি হয়েছে। বাহে কেমন হয়?

লী। বাহুগুব কঠিন। প্রায় একবার করেই হয়। একদিন কেবল হয় নি।

ঠা। খেতে দিচ্চিস্ কি?

লী। ভাত দিইনে, দুধ, রুটা, বালি, মিছরী, বেদানার রস এই সব দিই।

ঠা। কফ ওঠে কিছু?

লী। বেশ ওঠে না। কাস্তে কাস্তে একটু আধটু ওঠে। তা প্রায়ই গিলে ফেলে, কখন হক করে ফেলে দেয়—বেন জিওলের আটা।

ঠা। বলি শোন। এর কফ একটু বসে গিয়েছে, কাজেই কফ যাতে সরল হয়ে উঠে যায় এমন ধারা ওষুদ আর পথ্য দিতে হবে। দুধ আগেই বা কত খেত আর এখনই বা কতটুকু দিস?

লী। আগে একসের পাঁচ পোয়া খেত এখন আধসের আড়াই পোয়া দিই।

ঠা। হাঁ তাই দিস্, আর পিপুল দিয়ে সিদ্ধ করে মিছরী দিয়ে দিস। যদি পাওয়া যায় তাহলে গাইরের দুধ না দিয়ে ছাগল দুধ দিস্। সব না পেলেও যতটা পাওয়া যায় দিবি আর বাকী গাইরের দুধ দিবি। ছাগল দুধ শুকনো কাসি আর পেটের অন্ত্রের পক্ষে বড় ভাল।

লী। আচ্ছা তাই দেব। কিন্তু মিছরী কি সবই ছুখের সঙ্গে দেব?

ঠা। তা দিবি বৈ কি। মিছরীতে কফ বড় সরল করে। তবে আকের চিনির মিছরী যোগাড় করতে হবে। সেটা পাওয়া আট কাল দুর্ঘট হয়েছে।

লী। তবে বাজারে যে মিছরী পাওয়া যায় ও কি থেকে তৈরি?

ঠা। ও বিটের চিনির মিছরী। কাসির সময় দিশী চিনির মিছরী থাণ্ডে রাখলে স্বস্তি হয়, বিটের চিনির মিছরী রাখলে তেমন হয় না।

লী। তা সে আবার কোথায় পাব?

ঠা। কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা আমি জানিনে, তবে আমার প্রায় ভাট পাড়া থেকে আনি। সেখানে পাড়ার ভেতরকার ময়রার গুড় থেকে চিনি মিছরী তৈরির করে।

লী। তা আমি কালই চাকর পাঠিয়ে দিয়ে আনাব। আচ্ছা ভাল কথা তালের মিছরী দিলে হয় না?

ঠা। তালের মিছরী বেশে যে গুলো বিক্রী হয় ও গুলো তা এদেশে হয় না, চীন দেশ থেকে আসে। অনেক লোক, এমন কি ডাক্তার কবিরাজ ও গুলো ব্যবহার করেন, কিন্তু লোকনাথ যদি বলতেন যে ও গুলো কিসে থেকে হয় যখন জানিনা তখন ও ব্যবহার করবোনা। তিনি দিশী চিনির মিছরীই ব্যবহার করতেন।

লী। তা এদেশে এত ভাল গাছ তবু মিছরী হয় না কেন?

ঠা। দেশের লোকের কি সে চেষ্টা আছে। তা না হলে দেশে যে ভাল গাছ আছে তা থেকে গুড় মিছরী তৈরির করার ব্যবসা করলে লোকে বড় লোক হতে পারে, দেশেরও একটা অভাব দূর হয়।

লী। তালের গুড় কিন্তু তৈরির হয় ঠাকুমা।

ঠা। সে আরগার আরগার হয় বটে—খুব সামান্য।

লী। কাস্ সে কথা, আর কি দেব বল।

ঠা। বাছে যখন ভাল হয় না তখন গৈছ ধ দেওয়াই ভাল। গৈছ যেন টাটকা হয় আব লাল কাঁচুলি (‘গৈছ চড়া’) না থাকে।

লী। তা লাল লাল কাঁচুলিত সব গৈছে থাকে।

ঠা। না সব গৈছে থাকে না। ভাল ধানের গৈ বেশ সাদা ধপ ধপে হয়। যদিও বা থাকে সে এত কম যে ধর্তব্য নয়।

লী। রুটী দেবো না?

ঠা। দেখ কাসির পক্ষে লবু পথাই ভাল রুটী একটু গুরুপাক, সেই জন্তে না দেওয়াই ভাল। তবে যদি ছেলে না রাখতে পারিস তা খুব পাতলা হুজির রুটী ২১ খানা দিবি।

লী। হুজির রুটী কি করে করবো?

ঠা। চারটা ভাল হুজি নিয়ে গরম জলে চটকে শুক ডেলার মত করবি। তার পর ফুটন্ত জলে সেই হুজির ডেলাটা দশ মিনিট সিদ্ধ করবি। তারপর তুলে নিয়ে দরকার মত অল্প ছোট হুজি মিশিয়ে খুব পাতলা পাতলা রুটী করবি।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা পাউরুটী দেওয়া যায় না?

ঠা। পাউরুটীটা আমাদের দেশে চলে গেছে, আর ওটা যখন ময়দা থেকে তৈরির হয় তখন দিতে বাধা নেই। তবে অনেক সময় খারাপ ময়দার তৈরির হয়, ধুলো বালি মেশে সেইজন্তে খুব ভাল না পাওয়া গেলে দিতে নেই।

লী। আর যদি ভাল পাওয়া যায়।

ঠা। তা হলে আঙুরে সেকে দিতে হয়। পাউরুটী টুকরো টুকরো করে কেটে একটা খুজির আগার বিধে আঙুরের ওপর ধরতে হয় সে দিকটা কটা রঙের হয়ে গেলে আর এক পিট অনুলি করে সেকতে হয়। যদি একটু

আধটু পুড়ে ওঠে সেটুকু ছুরি দিয়ে কেটে ফেলতে হয়।

লী। তারপর বালি দিতে পারি ?

ঠা। ই। দরকার হলে বালি দিতে পার।

লী। জল খাবার কি দেব ?

ঠা। কিসমিস, খেজুর, মনকা, দাড়িম, কুমড়োর মেঠাই, হুঁচারটে এলাচ দানা একটু মিছরি।

লী। একটু দাল তরকারি কি মাছের ঝোল খেতে চায়, তার কিছু দিতে পারি কি ?

ঠা। এটা হলো বাতিক হাস, এতে বেতোশাক, কাকমাটী ( শুড় কামাই ) শাক, কচি মূলা, মাষ কলায়ের ঘূষ, মাছের ঝোল এ সব দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কচি ছেলে—এত না দিয়ে একটু থলশে, শিঙ্গি কি মাগুর মাছের ঝোল দিস।

লী। আচ্ছা তুমি ভিন্ন ভিন্ন কাস্ কি করে বোকা যায় ? আর কিসে কি রকম পথ্যি দিতে হয় একটু শিখিয়ে দাও।

ঠা। আচ্ছা মোটামুটি বলছি শোন। বাতিক কাসে মুখ, গলা, বুক শুকিয়ে উঠে, বুক, পাজর ও মাথার যন্ত্রণা হয়, খুব শুকনো কাসি হয়, কফ খুব কম ওঠে। বাতিক কাসের পথ্যির কথা আগে বলিছি তা ছাড়া মাংসের ঘূষ, টক ফল, দই, আক এ সব অবস্থা বুঝে দেওয়া যায়। পিত্তকাসে চোখ আর কক হলদে হয়, প্রায় একটু অর হয়, তৃষ্ণা হয়, বমি হয় আর গায়ের জ্বালা হয়। এতে যুগের—ঘূষ, বালি, বালির কটী তেতো শাক, কিসমিস, খেজুর, চিনি, ঐ এই সব পথ্যি দিতে হয়। কফকাসে বুক খুব ভার হয়, গলায় বেন কি শোঁপা রয়েছে বোধ হয়, অকচি হয়, বমি হয়, বন শাদা মেঘা ঘূষ বেরোর। এতে বালি,

যবের কটী, মধু, ঐ, কুলথি কলায়ের ঘূষ, কচি মূলা, কক, ঝাল, আর গরম জিনিষ পথ্যি দিতে হয়। পিত্ত ও কফ কাসে মাছটা দেওয়া ভাল নয়।

লী। এখন ওষুদ কি দেব বল ?

ঠা। আগে মালিষের কথা বলি। বৃকে পাজরে পুরান গাওয়া বি গরম করে বেশ করে মালিষ করবি।

লী। পুরান বি কোথায় পাব ?

ঠা। পুরান বি পাওয়া আজ কাল শক্ত, অনেক জায়গায় পুরান বি বলে যা বিক্রয় হয় সেটা ভেল। শুঁটের শুঁড়ো কি সাজি মাটির সঙ্গে নতুন বি মেড়ে পুরান বলে বিক্রি করে। আবার শুঁড় বাজারে বি বিক্রির পর টিনগুলি তাতিয়ে ও তাথেকে একটু আধটু ঘা বেরোর এক জায়গায় করে কোন কিছু মিশিরে কড়ো গন্ধ আর বদ রং করে পুরান বি বলে বেচে।

লী। ভাল পুরান কি করে চেনা যায় ঠাকুমা ?

ঠা। ভাল পুরান বির রং কটা হয়, খুব কড়ো গন্ধ হয় আর চাল ভাজার মত দানা বাঁধে। তা সেরকম বি বাজারেও পাবিনে আমাদের বাড়ীতে আছে একটু নিয়ে বাস। সেই বি বেশ করে মালিষ করে, আকন্দ পাতা গরম করে বৃকে সেক দিবি। আর সেক দেওয়া হয়ে গেলে গরম কাপড় দিয়ে বৃকটা বেঁধে রাখবি।

লী। সেক কবার দেব ?

ঠা। সকালে সন্ধ্যায় দু'বার দিবেই হবে।

লী। এখন খাবার ওষুদের কথা বল।

ঠা। আমি অনেক গুলো ওষুদের কথা বলছি এর মধ্যে দু'টো ওষুদ দিবি।



কাসির ওষুদ একেবারে না খাইয়ে ২।১ ঘণ্টা অন্তর চেষ্টে চেষ্টে খেতে দিবি। (১) কণ্টকারী-ফুলের ভেতর যে কেশর থাকে তাই এক আনা মধুতে মেড়ে খাওয়ালে কাসি ভাল হয়। (২) পিপুলের গুড়ো ২ রতি আর মধুর পুচ্ছ ভস্ম ছই রতি মধুর সঙ্গে মেড়ে খাওয়ালে ভাল হয়, মধুর পুচ্ছ কিন্তু অন্তর্ধূমে ভস্ম কবে নিতে হবে।

লী। অন্তর্ধূমে ভস্ম আবার কি ?

ঠা। শোন বলি। মধুর পাথার চাঁদ গুলো কেটে নিয়ে একটা ছোট হাঁড়ির ভেতর রাখবি। তার পর সেই হাঁড়ির মুখে একখানা ছোট সরা কি কটরা ঢাকা দিয়ে ঘোড়ের মুখ মাটি দিয়ে সেপে দিবি। লেপ শুকিয়ে গেলে সেই হাঁড়ি উল্লে চড়িয়ে তলায় আল দিলেই ভস্ম হয়ে যাবে।

লী। কতক্ষণ আল দিতে হবে ?

ঠা। কড়া আল হলে ১৫।২০ মিনিটেই ভস্ম হয়ে যাবে।

লী। তার পর আর কি ওষুদ বল ?

ঠা। (৩) কিসমিস ছ'আনা, হরীচকী ছ' আনা পিপুল তিন রতি বেশ চন্দনের মত করে বেটে ১টা ফোটা ঘি আর ২টা ফোটা মধু মিশিয়ে খাওয়ালে কাসি ভাল হয়। (৪) কুড়, আতাইচ, কাকড়াশূনী, পিপুল আর হরালভা এই কয়েক মসলার মিহি গুড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে ৩৪ রতি মাত্রার মধুর সঙ্গে খাওয়ালে কাসি ভাল হয়। (৫) কটুকিরির থৈ ১ রতি করে ছ'বার খেলে সারে।

লী। হাঁ ঠাকমা, শুনিছি বাসক কাসির খুব ভাল ওষুদ, তার কিছু দিলে হয় না ?

ঠা। বাসক দিলে এ রকম কাস-সময়ে

না বরং বেড়ে যায়। শিশু ও কফ কাসেই বাসক ভাল কাজ করে।

লী। আর কি ওষুদ বলবে বল ?

ঠা। যা বলিছি ওতেই সেরে যাবে, তবে আরও একটা শিখে রাখ। একটা বেশ বড় অথচ পোকা লাগা নয় এমনতর বয়ড়া ঘি মাখিয়ে গোবরের তুলির ভেতর পুরবি, তার পরে সেটা ঘুটের আগুনে পোড়াবি, পোড়াতে পোড়াতে গোবর শুকিয়ে বখন জলে উঠবে তখন আগুণ থেকে বের করে ভেঙ্গে সেই বয়ড়া নিবি। সেই বয়ড়ার বীচি ফেলে দিয়ে ৩৪ রতি গুড়ো মধুর সঙ্গে খাওয়াবি।

লী। আচ্ছা, ছোট খোকারত হল, এখন বড় খোকার কি করবো বল ?

ঠা। বড় খোকার অম্মখের কথা সব বল।

লী। বড় খোকার আজ চার দিন হল অম্মখ হয়েছে। হ'দিন কম ছিল কিন্তু পরশ থেকে সর্দিতে একেবারে হাস্ কাস্ করছে। মুখ খানা ভার ভার টুসো টুসো হয়েছে, মাথার ব্যথা, খিদে বড় নেই, দাত এক দিন হয় এক দিন হয় না, গাটাও ছাঁক্ ছাঁকে হয়েছে, আর নাক মুখ দিয়ে খুব সর্দি পড়ছে।

ঠা। কাসি আছে ?

লী। সে নেই বললেই হয়, এক আধ বার।

ঠা। নেই, এরপর হবে। গা বমি বমি করে ?

লী। হাঁ, গা বমি বমি খুব করে।

ঠা। এই হল কফ কাসের প্রথম অবস্থা, এ অবস্থার প্রথমেই বমি করতে হবে। মুক্ত-বর্ষীর (মুক্তাবুরি, বেড়াল কাঁছনী) গাভার রস চা চামচের এক চামচে আধ ছোটক আলের সঙ্গে খাইয়ে দিস। তা হইলে বমি হবে। মুক্ত বর্ষীর কাছ করে সেই কাছের সঙ্গে পিপুল,

ইন্দ্রযব, সৈন্ধব লবণ ও বচ এই গুলির গুঁড়ো সমান ভাবে মিশিয়ে এক সিকি মাত্রায় ঐ কাথে মিশিয়ে খাইয়ে দিবি। তা হলেও বমি হয়ে অনেক প্লেগ্মা উঠে যাবে।

লী। ষষ্টিমধুর কাথ কি করে করবো আর কত টুকু দেব ?

ঠা। এক ছটাক ষষ্টিমধু ১/২ সের জলে সিদ্ধ করে আধ সের থাকতে নামিয়ে ছেকে নিবি। তারই ছট ছটাক আন্দাজ দিলেই হবে। কিন্তু রোগী দুর্বল ছেলেকে বমি না করানই ভাল। আধ ছটাক ব্রাক্সীশাক ও এক সিকি আদা খেঁতো করে কলার পাতে বেধে বলসা পোড়া করে তার রস চা চামচের এক চামচে দেওয়া ভাল।

ঠা। সকালে বমি করাবি। তারপর কিছু খেতে দিস্নে। বেশ খিদে হলে বিকেলে খেতে দিবি।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, কফ কাসের সব অবস্থায় কি বমি করান চলে ?

ঠা। না, যেখানে খুব শব্দ উঠছে অথচ গা বমি বমি আছে সেইখানে বমি করান চলে। গা বমি বমি না থাকলে যদি বমি করান যায়, তা হলে রোগীর অনিষ্ট হয়।

লী। তারপর পথি কি দেব বল ?

ঠা। এক পোয়া ছাগলদুধ আর এক পোয়া জল সিদ্ধ করে, জল মরে গেলে সেই দুধে মিছরী আর ৩৪ রতি মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিবি। কফ কাসে দুধ না দেওয়াই ভাল, কিন্তু ছেলে মানুষ আর অনেকপানি করে দুধ খাওয়া অভ্যাস, তা এট একবার কর্তব্য দিবি এতে আহার ওষুধ দুই হবে।

‘লী।’ আর কি দেব ?

ঠা। জলবাণি, বাণির কুটা, ধৈ, এই সব দিবি।

লী। জল খাবার কি দেব ?

ঠা। বেশী খিদেতে নেই, জল খাবার আবার কি দিবি। খিদে হলে বেদানা, কিস্-মিস্, কুমড়োর মেঠাই দিস্।

লী। বড় খোকা বড় মুড়ি ভালবাসে ঠাকুমা, ছ’টি মুড়ি দিতে পারি ?

ঠা। তা গরম গরম টাটকা মুড়ি ছ’টি দিস্।

লী। এখন ওষুদ কি দেব বল ?

ঠা। অগ্র ওষুদের কথা বলবার আগে একটা কথা বলে রাখি, তোর দুই খোকােকেই গরম জল দিন ৩৪ বার যত টুকু করে খাওয়াতে পারিস দিবি। জল একটু গরম হলেই গরম জল হয় না। অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট টগবগ করে কোটা চাই। তার পর নামিয়ে সহ মত গরম খাওয়াবি। ঠাণ্ডাজল একেবারেই দিবি। আর সমস্ত খাবারই গরম গরম দিবি, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে দিস্নে।

লী। গরম জল কি এত উপকারী ?

ঠা। নবজর, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাসি, সর্দি এসব রোগে গরম জল একটা মন্ত ওষুদ।

লী। আর কি ওষুদ দেব বল ?

ঠা। আদার রস চা চামচের এক চামচ ২০।২৫ কোটা মধু মিশিয়ে সকালে বিকালে দু’বার করে দিস্ তা হইলে সেয়ে যাবে। ইচ্ছে হলে একবার আদার রস আর একবার গুঁঠ, পিপুল মরিচের গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে তার দুই রতি গরম জলের সঙ্গে দিতে পারিস্। আর কিছু দেবার দরকার হবে না। তবে জামা কাপড় দ্বারা সর্কাক ঢেকে রাখবি যেন বাতাস না লাগে। আর বুকের একটু গরম কাপড় বেধে রাখিস্।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, মাথার যন্ত্রণাটা বাতৈ শীঘ্র যায় এমন কোন উপায় নেই ?

ঠা। এক কাজ করিস্, খাটি সর্ব্বের তেল গরম করে পায়ের তলায় খানিক কণ মালিশ করে দিস্ তা হলে মাথার যন্ত্রণা কমে যাবে।

লী। 'আচ্ছা ঠাকুমা, হ' রকমত শিখলাম, পিত্ত'কাসের ওষুদও শিখিয়ে দাও না ?

ঠা। বলি শোন। পিত্ত কাসে কক পাতলা থাকলে এক সিকি তেউড়ীর গুঁড়ো চিনির সঙ্গে আর কক ঘন থাকলে এক সিকি তেউড়ীর গুঁড়ো সমান চিরতার গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দাত করাতে হয়। এবার যে মাত্রা বললাম এটা বড় লোকের মাত্রা। বয়স বুঝে মাত্রা কম কর্ত্ত হয়।

লী। কি রকম বয়সে কত মাত্রায় দিতে হয় ?

ঠা। ১২।১৩ বৎসর বয়স হলে হু' আনা, ৫৩ বছর বয়স হলে এক আনা, ২।৩ বছর হলে আধ আনা এই মোটা মুঠি বললাম।

লী। তার পর ওষুদ ?

ঠা। গোটা কতক ওষুদ বলছি শোন।

(১) কিস্‌মিস, আমলকী, খেজুর, পিপুল, মরিচ সমান ভাগে মিশিয়ে হু' তিন আনা মাত্রায়, গাওয়া বি এক আনা ও মধু হু' আনার সঙ্গে

খেলে পিত্তকাস ভাল হয়। (২) কিস্‌মিস, খেজুর, পিপুল, থৈ, চিনি সমান ভাগে মিশিয়ে তিন চার আনা মাত্রায়, গাওয়া বি ও মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তকাস ভাল হয়। (৩) পদ্ম-বীজের গুঁড়ো হু'তিন আনা মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তকাস ভাল হয়। (৪) বাসক পাতার রস ২ তোলা মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তকাস, কক কাস ও রক্তপিত্ত ভাল হয়। আর আগে যে বয়ড়া গোবরের ফুলিতে পোড়ানোর কথা বলেছি, তাতেও পিত্তকাস ভাল হয় পথিয়ার কথাত আগেই বলিছি।

লী। হাঁ, তা আগেও বলেছি। এখন আমার কাজ শেষ হল। ছোট বোকে বকিছি— ছোট বো কি করছে একবার দেখিগে।

ঠা। বেশ করেছিস্ বকেছিস্, আমি তোর বিবেচনা দেখে বড় খুসী হয়েছি। এরকম একজন গিন্নি সংসারে থাকা দরকার। বউমা আমার খেটে খেটে গতর জল করে কিন্তু অত শত বোধ নেই।

লী। তবু আমি একবার দেখে যাই ঠাকুমা, ছেলে মানুষ অত বেঝে না মনে কষ্ট হতে পারে।

ঠা। চল আমিও একবার গোকুলকে দেখে আসি তার বুঝি কি অস্থখ করেছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

## আয়ুর্বেদ অধ্যাপকের পত্র।

আমি “অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়” দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বহু বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রের নিকট বিদ্যালয়ের কথা বলিয়াছি। অন্তরের প্রিয়বস্ত্র ভাবিয়া বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু চিন্তা ও করিয়াছি। আপনারা যে এত অমুঠান করিয়াছেন চক্ষে দেখিবার পূর্বে তাহা বুঝি নাই, বা সোজা কথা বলিলে বিশ্বাস করি নাই বলাই ঠিক। অশিষ্টাস করায় বোধ হয় তেমন দোষও হয় নাই। কারণ ইতঃপূর্বে অনেক আলোচনা, অনেক সংবাদ প্রচার হইয়াছিল বটে কিন্তু ফলে ঐগুলি দম্পতিকলহে পরিণত হইয়াছিল। এবার যে এমন নিঃশব্দে কার্য্য হইতেছে কেমন করিয়া বুঝি বসুন। আমার মত আর বাঁহারা শব্দমাত্রে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সংবাদ জ্ঞানেন, বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মনের ভাবও হয়ত আমারই মত। এইজন্ত দেশের অবস্থা চিন্তা করিয়া, আমি বিদ্যালয় সম্বন্ধে বৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া পাঠাইতেছি। যদি সঙ্গত মনে করেন জনসাধারণের বিদিতার্থ পত্রখানি মুদ্রিত করিবেন।

### বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

—অনেকে মনে করিতে পারেন, এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণের গৃহে গৃহে আয়ুর্বেদ অধ্যাপনার ব্যবস্থা রহিয়াছে তবে আবার এই বিদ্যালয় কেন? প্রথমতঃ বলিয়া রাখি বিদ্যালয়ের কর্মপুঙ্খগণ গুরুগৃহে আয়ুর্বেদ অধ্যাপনার বিরোধী নহেন কিন্তু আমরা বেশ বুঝিয়াছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন, যে অধুনা দেশে বত আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের প্রয়োজন গুরুগৃহে অধ্যাপনা

প্রণালী প্রবর্তিত থাকায় তত চিকিৎসক পাওয়া যাইতেছে না। দেশের লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা মন্দ হওয়ায় রোগীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেশে বিবিধ চিকিৎসা প্রবর্তিত থাকিলেও এখনও আয়ুর্বেদ চিকিৎসাই বহুসংখ্যক প্রজাকে রক্ষা করিতেছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা দেশের লোকের অভিমত হইলেও পাঁচশত থানি পল্লীর মধ্যে হয়ত একজনও আয়ুর্বেদ চিকিৎসক নাই। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও দেশের লোক আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইতে পারিতেছেন না। পক্ষাঘ্নের আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণের মধ্যে বাঁহাদের চিকিৎসা নৈপুণ্যের প্রতিষ্ঠা আছে, বাঁহাদের আয়ুর্বেদ অধ্যাপনার যোগ্যতা আছে, তাঁহাদিগকে চিকিৎসা বৃত্তি লইয়া এতাদৃশ বিব্রত থাকিতে হয় যে, অধ্যাপনার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদের অধ্যাপনার অবসর বটে না, অথবা কাড়িয়া জোর করিয়া তাঁহারা বতটুকু সময় অধ্যাপনার্থে কেপণ করিতে পারেন, তাহাতে অত্যন্ত সংখ্যক ছাত্রেরও সঙ্গ আয়ুর্বেদের বিহিত অধ্যাপনা নির্বাহ হইতে পারে না। সংস্কৃত ভাষার বিশেষ ব্যুৎপন্ন, নানাশাস্ত্রে কৃতশ্রম, বিশিষ্ট বুদ্ধিমান বিদ্যার্থী এই সকল আয়ুর্বেদাধ্যাপকের নিকট ইন্দিমাত্র উপদেশ লাভ করিয়া, স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও চেষ্টা বলে বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের কেবল শাস্ত্র-দৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেন বটে কিন্তু উপকরণাতাব হেতু প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জ্ঞানলাভে প্রায়ই বঞ্চিত থাকিতে হয়। বাহা হউক সংস্কৃত চর্চ্চার অধুনা বিরল প্রচাৰ হওয়ায়, এবিধ বিদ্যার্থীর সংখ্যাও ক্রমশঃ অতি

অন্ন হইয়া পড়িতেছে। যে সকল অধ্যাপক ছাত্র, বৃদ্ধ গুরুর শিষ্য হইবার লোভে, এই সকল কর্ম্মভিত্তিক আয়ুর্বেদ অধ্যাপকগণের আশ্রয় লইতেছে, তাহাদিগকে আয়ুর্বেদ অধ্যাপনা করাইতে, অধম-বুদ্ধি শিষ্যের যোগোপযোগী করিয়া শাস্ত্র বাখ্যার জন্ত, স্বল্পপদার্থ-কালধীরতার সহিত পরিশ্রম ও উপকরণসংগ্রহ করা আবশ্যিক, গুরুর তাদৃশ সময়, সুবিধা ও স্মৃহান্না. থাকায়, তাহারা কেবল আয়ুর্বেদ অধ্যয়নের অভিনয় করিয়া, গুরু গৃহ হইতে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। এবং স্বীয় অল্পপশুতার জন্ত জনসমাজে আয়ুর্বেদের অগৌরব প্রচার করিতেছে মাত্র। অপরদিকে দেশের নিয়ম যে, কবিরাজ অন্নদান করিয়া ছাত্র পড়াইবেন। বিজ্ঞা থাকিলেই ধন থাকিবে এমন কোন নিয়ম নাই। যে সকল আয়ুর্বেদ চিকিৎসক আয়ুর্বেদে কৃতশ্রম অতীব অধ্যাপনার যোগ্য, কিন্তু বিধিবশত যাহাদের আর্থিক অবস্থা মন্দ, তাঁহাদের সময়, অবকাশ ও স্মৃহা থাকিলেও তাঁহারা ইচ্ছামত ছাত্র রাখিয়া দেশে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের অভাব দূর করিতে পারিতেছেন না। যে সকল কর্ম্মবাস্তব চিকিৎসকের সমগ্র আয়ুর্বেদ অধ্যাপনার অবকাশ নাই, তাঁহারা সুবিধামত কিস্কিমাত্র সময় ক্ষেপণ করিয়া এবং যাহাদের অবকাশ আছে তাঁহারা প্রচুর সময়ক্ষেপ করিয়া যদি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, তাহা হইলে দেশে আর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের অভাব থাকে না। কিন্তু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা ভিন্ন এবিধ সম্মেলন নির্বাহ হইতে পারে না। কলিকাতার একটীমাত্র অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা হারা ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের অভাব নিরাকৃত হইতে পারে না।

দেশে এইরূপ শত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা হইলে এবং প্রতি বিজ্ঞান হইতে বার্ষিক শতজন ছাত্র সুচিকিৎসক হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেখিলে তবে আমাদের তৃপ্তি হইবে।

### বিদ্যার্থি-গ্রহণের নিয়ম—

সং প্রতি দেশে বাহা নাই তাহার জন্ত হা হতাশ না করিয়া, দেশে বাহা আছে তাহা লইয়াই কাজ করিয়া যাও এবং ভবিষ্যতে তোমার অভিপ্রেত উচ্চ আদর্শের জিনিষ বাহাতে প্রস্তুত করিতে পার তাহার জন্ত আন্তরিক চেষ্টাকর। ইহাই প্রকৃত হিতৈষী কর্ম্মপুরুষের পন্থা। যখন কলিকাতার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন যদি প্রতিষ্ঠাতৃগণ ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র না পাইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান দান করিবেন না এই সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহা হইলে কি এ-দেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান এতদীঘল এতাদৃশ প্রচার হইত? দেশের অবস্থানুসারে তখন তাঁহারা বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এখন তাঁহারা এত অভিমত, যোগ্য, ব্যুৎপন্ন ছাত্র পাইতেছেন যে স্থান সম্বলান হইতেছে না। অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিভাগের ছাত্র গ্রহণ বিষয়েও আপনারা ঐরূপ কালোপযোগী উদার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমি আপনাদের দূরদর্শিতার প্রশংসা করিতেছি। আয়ুর্বেদ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত স্মৃত্তরং আয়ুর্বেদ-পাঠ্য সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক বটে, কিন্তু যদি আপনারা নিয়ম করিতেন যে কেবল সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র ভিন্ন অপরের বিজ্ঞান প্রবেশাধিকার নাই, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটত। অতএব বর্তমান দেশে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন বহুসংখ্যক ছাত্র না

পাওয়া হইতেছে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া পড়িতে লিখিতে পাবে এরূপ ছাত্র গ্রহণ করা হইবে এই নিয়ম প্রবর্তিত করা অতি উত্তম হইয়াছে। আশা কবি অদূর ভবিষ্যতে সহস্র সহস্র সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যার্ণী বিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ পাঠ করিতেছে দেখিতে পাইব। সংপ্রতি বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—বাস্তালা শ্রেণী ও সংস্কৃত শ্রেণী। সংস্কৃত পড়িতে বুঝিতে ও লিখিতে পারে এমন ছাত্রকে সংস্কৃত বিভাগে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইতেছে। সংস্কৃত বিভাগ ও বাঙ্গালা বিভাগের ভাষা মাত্র ভিন্ন, শিক্ষাগত বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিলাম না। বরং সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া, বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণের সুশিক্ষার জন্ত সুদক্ষ ও পরিপক্ব শিক্ষক অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করা হইয়াছে। যে সকল ছাত্র দেশান্তর হইতে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কেবল প্রত্যক্ষ-দর্শনমূলক জ্ঞানার্জন ও শল্য শালাকা ভদ্রে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্ত অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে প্রবেশিত হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিষয় বিশেষ (যেমন দ্রব্যগুণ কি চিকিৎসা) অধ্যয়নের অভিলାষ থাকিলে তাহারও সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হয় না। বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রকে মাসিক ৩ টাকা বেতন দিতে হয়। বিষয় বিশেষ অধ্যয়ন করিবার জন্ত বেতনের যে বিশেষ নিয়ম আছে তাহা অধ্যাক্ষের নিকট আবেদন করিয়া জানিতে হয়। বাঙ্গালা বিভাগের পাঠ ৪ বৎসরে এবং সংস্কৃত বিভাগের পাঠ ৫ বৎসরে সমাপ্ত হয়। চরমপরীক্ষাতে উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

**অধ্যাপনার প্রণালী—**আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপনা পূর্বে এদেশে যেমন যোগ্যাকরণ পূর্বক নিরীহ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেইভাবে অগত উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে শিক্ষা হইতেছে। দ্রব্যগুণের অধ্যাপক অগ্রে দ্রব্যটী ছাত্রদিগকে দেখাইয়া চিনাইয়া দিয়া, বজারে ঐ দ্রব্যের বত প্রকার নকল প্রচলিত সেগুলিও দেখাইয়া দিয়া, দেশ বিদেশে ঐ জিনিষটার ভ্রমে যে সকল নকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইতেছে তাহার বিবরণ শুনাইয়া, দ্রব্যগুণ শিক্ষা দিতেছেন। মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপাদান, সংস্থিতি ও সম্বন্ধ কঙ্কালে, প্রতিমূর্তিতে ও চিত্রে দেখাইয়া, বুঝাইয়া, অঙ্গবিন্দিচর বিদ্যার অধ্যাপক অঙ্গবিন্দিচর বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। বিচিত্র বনস্পতি, ফুল, লতা, পুষ্প, সমুদ্রে উপস্থিত রাখিয়া, দৃষ্টি-দীপক যন্ত্রের সাহায্যে সুযোগ্য অধ্যাপক বনোদধি-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন। দোষধাতু-মলান্দিবের অধ্যাপক বিবিধ সুরঞ্জিত চিত্র-সাহায্যে রক্ত-সম্বহনাদি ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিয়া প্রত্যক্ষবৎ বুঝাইতেছেন। রসোপরস ধাতুপদার্থ প্রভৃতি বিবিধ স্থাবর খনিজ বস্তু সংগ্রহ করিয়া, রসশাস্ত্রের অধ্যাপক রসশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। দ্রব্যগুণ শিক্ষা দিবার জন্ত বিদ্যালয়ে যে দ্রব্যবস্তুর সংগৃহীত ও সুসজ্জিত রহিয়াছে তাহা দেখিয়া, পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় সুশিক্ষিত কোন চিকিৎসক (ইনিও আমার মত এককণ্ঠ দর্শক) বলিলেন আমরা যদি পাঠ্যবস্তুর এরূপ সুবিজ্ঞত ভেদজ পরিচয়গায় পাইতাম তাহা হইলে কত উপকার হইত। আমাদের পাঠী কোন প্রতিভাশালী প্রবীণ কনিষ্ঠ শারীর পরিচয়গারে সংগৃহীত রসবস্তু

আশ্রয়াদির সুস্থর মূর্তি ও বিবিধ সুসজ্জিত চিত্র দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—“দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া আমার আবার শরীরের ছাত্র হইবার ইচ্ছা হয়।” অগ্রহায়ণের শেষভাগ হইতে ছাগ-শশকাদির মৃতদেহ ব্যকচ্ছেদ করিয়া দেখাইয়া

অঙ্গ বিনশ্চয় বিদ্যার অধ্যাপনা হইবে শুনিয়াছি। এখানে কেবল প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যাপনার প্রণালী বাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই লিখিত হইল।

শ্রী . . .

## বিবাহ-রজোদর্শন-গর্ভাধান ।

আমরা এই প্রবন্ধে বিবাহ, রজোদর্শন-গর্ভাধান সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উপদেশ ব্যাখ্যা করিব। সহজ ভাষায় সরলভাবে এই প্রবন্ধ লিখিত হইবে। লিখিত বিষয়ের প্রমাণার্থ বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ দৃষ্টান্ত করিব না।

**বিবাহ**—যে স্ত্রী বা পুরুষের এমন কোন রোগ আছে যে রোগ সঞ্চারী অর্থাৎ সন্তান সন্ততিতে সংক্রমিত হইতে পারে, তাহার বিবাহ করা উচিত নহে। স্ত্রী বা পুরুষ দীর্ঘ-রোগী হইলে কিম্বা স্ত্রীলোকের প্রদরাদি ঘোররোগ থাকিলে বিবাহ নিষেধ। যে স্ত্রী বা পুরুষ এমন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে বংশে সঞ্চারী রোগ আছে, তাহাদের কালপেক্ষা করিয়া, স্বয়ং স্বাস্থ্যের অবস্থা বিশেষ চিন্তা করিয়া বিবাহ করা বিধেয়। বিবাহ ইন্ড্রিয় চরিতার্থজ্ঞ নহে। আশ্রম ধর্মের উত্তর সাধক, সমাজের হিতকারী, বলিষ্ঠ, কুলপাবন সন্ততি দ্বারা বংশরক্ষা করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। দীর্ঘ রোগপীড়িত স্ত্রীপুরুষ বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিলে সমাজে কীণ, দুর্বল-শ্রিয়, অস্বাস্থ্য লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া সমাজের অকল্যাণ সাধিত হইবে তাহারা আয়ুর্বেদে তাহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ব্রূপা, স্থূলী, সর্বশূলী ও যে হীনালী,

বিকলাঙ্গী বা অধিকালী নহে এক্রপ পত্নী প্রশস্ত। যাহারা বিবাহ করিবার যোগ্য অর্থাৎ তাহাদের সুস্থ, বলিষ্ঠ সন্তানোৎপাদনের যোগ্যতা আছে তাহারা কত বয়সে বিবাহ করিবেন? সুশ্রুতের মতে পুরুষ ২৫ বৎসরে এবং নারী ১২ বৎসরে বিবাহ করিবেন। বৃদ্ধ বাগ্‌ডটের মতে পুরুষ ২১ বৎসরে এবং নারী ১২ বৎসরে বিবাহ করিবেন।

**রজোদর্শন**—এদেশে ১২ বৎসরের পর বালিকাদের প্রথম রজোদর্শন হইয়া থাকে। ৫০ বৎসরে স্ত্রীলোকদিগের রজোদর্শন নিবৃত্তি পায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। অবস্থা বিশেষে আর্ন্তর-রজের আবির্ভাব তিরোভাব কালের ন্যূনাধিক্য ঘটনা থাকে। অসং-বম, বিলাসিতা, কুগ্রহ পাঠ, অসংসংসর্গ, রজোদর্শনের পূর্বে পুরুষসংবাস ইত্যাদি কারণে উপরি লিখিত কালের পূর্বেও রজোদর্শন হইতে পারে। এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ শোকাঙ্গি কারণে ৫০ বৎসরের পূর্বেও রজোনিবৃত্তি ঘটতে পারে।

**আর্ন্তর শোণিতের আভাব ও ভেদ**—মাসে মাসে বহুকালে নারীদিগের গর্ভাশয়ে যে রক্ত সঞ্চিত হয় তাহার নাম আর্ন্তর শোণিত। এই আর্ন্তরশোণিত এবং শরীরের বাহ্য-শোণিত

উভয়ই আহার জাত সৌম্যগুণাবিত রস হইতে জন্মিয়া থাকে। একই রস হইতে উৎপন্ন হইলেও আর্তব শোণিত আশ্রয় অর্থাৎ অগ্নিগুণ বহুল এবং ধাতু-শোণিত সৌম্য ও আশ্রয়। এই আর্তব শোণিত দ্বিবিধ—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। যে আর্তব শোণিত দেখিতে শশকের রক্ত বা লাল্কা (“লা”) সিদ্ধ করা জলের মত, যাহা কাঁপড়ে লাগিলে সহজেই ধুইয়া উঠান যায় তাহাই অকৃত্রিম আর্তব শোণিত। আর যাহা কঁষৎ কৃষ্ণ, বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত এবং ঋতু কালে ৩৪ দিন যোনিদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায় তাহাই কৃত্রিম আর্তব শোণিত। গর্ভোৎপাদন ও সুসন্তান লাভের পক্ষে ইহা প্রশস্ত নহে বলিয়া ইহার নাম কৃত্রিম আর্তব শোণিত। অকৃত্রিম আর্তব শোণিত প্রশস্ত-গর্ভকৃত্ব। ইহার স্রাব হয় না—সুত্র বীজের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভোৎপাদন করে। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম আর্তব শোণিত এক সময়ে সঞ্চিত হয় না। কৃত্রিম আর্তব শোণিত স্রাব হইয়া গেলে গর্ভাশয়ে অকৃত্রিম আর্তব শোণিত সঞ্চিত হয়। কৃত্রিম আর্তব শোণিত সকল ক্ষেত্রে ৩ দিনেই নিঃশেষরূপে স্রাব হয় না। ইহার স্রাব স্বাস্থ্য, ধাতু, মাতৃপ্রকৃতি অনুসারে ৭৮ দিন পর্যন্ত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ইহা গর্ভাশয়ের পূর্ণ সুস্থতার পরিচায়ক নহে। কৃত্রিম আর্তব নিঃশেষরূপে স্রাব না হইলে অকৃত্রিম আর্তবের সঞ্চয় হয় না ইহাও নিশ্চিত।

**ঋতু-দৃষ্টাৰ্তব ও অদৃষ্টাৰ্তব**—ঋতু শব্দের অর্থ কাল, যেমন বর্ষা ঋতু শরৎ ঋতু। জী-ঋতু শব্দের অর্থ জী-লোকের গর্ভধারণ যোগ্য কাল। রজোদর্শন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশরাত্রি পর্যন্ত

বহু-সম্মত-ঋতু অর্থাৎ গর্ভধারণ অনুকূল কাল। কাহার মতে ঋতু ষোড়শ রাত্রি, যতান্তরে এক-মাস। দৃষ্টাৰ্তব এবং অদৃষ্টাৰ্তব ভেদে ঋতু দুই প্রকার। যেখানে কৃত্রিম আর্তব শোণিত যথারীতি স্রাব হইয়া থাকে তাহা দৃষ্টাৰ্তব ঋতু এবং যেখানে কৃত্রিম আর্তব শোণিতের স্রাব দেখা যায় না তাহা অদৃষ্টাৰ্তব ঋতু বলিয়া কথিত। কৃত্রিম আর্তব শোণিত স্রাব না হইলেও ঋতু হইয়াছে অর্থাৎ গর্ভধারণ যোগ্য কাল উপস্থিত হইয়াছে ইহা কি প্রকারে জানা যাইবে? অদৃষ্টাৰ্তব ঋতু হইলে নারীশরীরে যে সকল চিহ্ন প্রকাশ পায় আয়ুর্বেদে সেগুলির উল্লেখ আছে, ঐ সকল লক্ষণ দ্বারাই অদৃষ্টাৰ্তব ঋতুর জ্ঞান হইবে। এই অদৃষ্টাৰ্তব ঋতুতে কৃত্রিম আর্তব শোণিত অল্প থাকে বলিয়া স্রাব হয় না—ইহাতে কোন ক্ষতি নাই; কারণ অদৃষ্টাৰ্তব ঋতুতে, অকৃত্রিম আর্তব শোণিত, যাহা প্রশস্ত গর্ভোৎপাদনে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা যথোচিত পরিমাণেই বিদ্যমান থাকে। যে সময় অকৃত্রিম আর্তব শোণিত সঞ্চিত হয় (প্রায় ঋতুর চতুর্থ দিনের পূর্বে হয় না) তাহাই যথার্থ ঋতু অর্থাৎ গর্ভাধান যোগ্য কাল।

**গর্ভাধান**—পূর্বে বলিয়াছি ঋতু অর্থাৎ বহুসম্মত গর্ভধারণ যোগ্য কাল দ্বাদশরাত্রি। কিন্তু এই দ্বাদশ রাত্রিই গর্ভাধানের, অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনার্থ জীতে স্বামির উপগত হইবার প্রশস্ত কাল নহে; কারণ ঋতুর যে তিন দিন কৃত্রিম আর্তব স্রাব হইতে থাকে সেই তিন দিন পরিবর্জনের বিধি আছে। পরিবর্জনের হেতু এই—প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয়দিনে কৃত্রিম আর্তব স্রাব হইতে থাকে বলিয়া এই সময় যৌন প্রবিষ্ট হইয়া, গর্ভোৎপাদন করিতে



পারে না। যদি গর্ভোৎপত্তি হয় তাহা হইলে প্রথম দিনে গর্ভোৎপত্তি হইলে মৃত সন্তান প্রসব হয়, দ্বিতীয় দিনে স্ত্রীকাগারেই মরিয়া যায় এবং তৃতীয় দিনে অসম্পূর্ণজ ও অন্নাশু হয়। চতুর্থ হইতে দ্বাদশ রাত্রির মধ্যে (কঙ্কার মতে একাদশী রাত্রি ও গর্ভাধানের পক্ষে নিশ্চিত) স্ত্রীরাং অষ্টরাত্রি অবশিষ্ট রহিল। এই অষ্ট রাত্রির মধ্যে যদি পুত্রকামনা থাকে তাহা হইলে চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী, দ্বাদশী রাত্রিতে অর্থাৎ রজোদর্শন দিন হইতে ৪।৩।৮ ১।১২ দিনের দিন রাত্রিতে পত্নীতে উপগত হইবে। যদি কঙ্কাকামনা থাকে তাহা হইলে পঞ্চমী, সপ্তমী ও নবমী রাত্রিতে অর্থাৎ ৫।৭।৯ দিনের দিন রাত্রিতে গর্ভাধান করিবে। পর গর রাত্রিতে গর্ভাধান করিলে সন্তানের আয়ু আরোগ্য, ঐশ্বর্য ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং পূর্বে পূর্বে রাত্রিতে গর্ভাধানে সন্তানের আয়ু প্রভূতি হ্রাস পায়। কৃত্রিম আর্তব শোণিত তিন দিনে নিঃশেষরূপে স্রাব হয় মোটামুটি ইহা ধরিয়া লইয়াই গর্ভাধানের উপরি লিখিত রূপ কালনির্ণয় করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে ক্ষেত্রবিশেষে অধিক দিন পর্যন্তও উহার স্রাব হইতে দেখা যায়। কৃত্রিম আর্তব শোণিতের স্রাব বন্ধ না হইলে আবার অকৃত্রিম আর্তব গর্ভাশয়ে সঞ্চিত হয় না। এই অকৃত্রিম আর্তব সঞ্চয় না হইলে আবার প্রশস্ত গর্ভোৎপাদন সম্ভব নয়; স্ত্রীরাং দ্বাদশ রাত্রি অপেক্ষা গর্ভাধানের কাল বাড়িয়া যাইতেছে। এই জন্যই আচার্য্য উত্তর উত্তরকালে গর্ভাধানের প্রশস্ততা ও কেহ কেহ ১৬ দিন বা এক মাস পর্যন্ত ঋতু স্বীকার করিয়াছেন।

**গর্ভাধানের বসন্ত—বিবাহ**  
হইলেই জীসহবাস বা জীর রজোদর্শন হইলেই

গর্ভোৎপাদন করা আয়ুর্বেদের অভিন্ন নহে। আজকাল বিবাহের বয়স লইয়া অনেক বিচার বিতর্ক হইতেছে বটে কিন্তু গর্ভাধানের বয়সের কথা কয়জন ভাবিয়া থাকেন। এই সকল অপরিণামদর্শী সমাজ-হিত-চিন্তকের মতে বোধ হয় বিবাহ ও গর্ভাধানের কাল পৃথক রাখিবার প্রয়োজন নাই। অধুনা সমাজে এই পার্থক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সন্দেহ জ্ঞান না থাকায়, একদিকে অত্যন্ত বালার গর্ভাধান হওয়ায় সমাজে দুর্বলোন্মিয় অন্নাশু সন্ততির সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে; অপর দিকে অধিক বয়স্ক স্বতন্ত্রমতি যুবতীর সহিত উবাহবৃত্তে আবদ্ধ হওয়ায় গৃহস্থলীর চিরোপভূক্ত সুখশান্তি এবং সংসারের চিরাত্যস্ত “ধরণ ধারণ” অস্তহিত হইতেছে। এই সকল অনর্থ পরস্পরা চিন্তা করিয়া এদেশে পূর্বে বিবাহ ও গর্ভাধানের কাল পৃথক নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আয়ুর্বেদ পুরুষের বিবাহের বয়স ২৫ বা ২১ বৎসর এবং নারীর ১২ বৎসর নির্দেশ করিয়াছেন। নারীর ১২ বৎসরের উর্দ্ধে রজোদর্শন হইয়া থাকে ইহাও কথিত হইয়াছে। আয়ুর্বেদ বলিয়াছেন গর্ভাধানের সময় পুরুষের বয়স ২৫ বা ২৯ বৎসর এবং জীর বয়স ১৬ বৎসর হওয়া উচিত। দম্পতির বয়স ইহার কম হইলে সন্ততি পর্ভেই মরিয়া যায়। যদি গর্ভে না মরে তাহা হইলে অন্নাশু হইবে। যদি অন্নাশু না হয় তাহা হইলে দুর্বলোন্মিয় হইয়া ( অর্থাৎ অল্প বয়সে চক্ষুর দোষ, কর্ণের দোষাদি জন্মিয়া ) কোন রূপে বাঁচিয়া থাকিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আয়ুর্বেদের মতে বিবাহের তিন বৎসর পরে গর্ভাধানের কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। আয়ুর্বেদে রজোদর্শনের কাল স্পষ্ট লিখিত নাই—কেবল দ্বাদশ বর্ষের উর্দ্ধে বলা

হইয়াছে স্বাত্র, স্তত্রাং যদি রজোবর্শন ১৩ বৎসরে গণনা করা যায়, তাহা হইলে রজো-বর্শনের ২ বৎসর পরে গর্ভাধানের কাল নির্দিষ্ট হইতেছে। ইহা নিতান্ত সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। শিশুর দস্তোদগম হইলেই যেমন তাহার কঠিন খাত্ত চর্চণ করিয়া খাইবার শক্তি জন্মে না এবং চর্ক্য খাত্ত যেমন তাহাকে খাইতে দেওয়া হয় না, তদ্রূপ নারীগণের রজোবর্শন হইলেই তাহাদিগকে গর্ভাধানের যোগ্য বিবেচনা করা কোন মতেই সম্ভব নহে—কাল অপেক্ষা করিতে হয়। বিবাহের পরবর্তী তিনটা বৎসর নারীগণ ভর্তৃগৃহে বা শিতৃগৃহে থাকিয়া গৃহস্থলীর উপযোগী বিবিধ জ্ঞান লাভ করিবে এবং যেসকল গুণ থাকিলে রমণীগণ গৃহস্থলী হইতে পারেন কস্তার অভিতাবকগণ বহু পূর্বক তদ্রূপ শিক্ষা দিবেন। পুথক বাস করিলেও নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয়-জনের সহিত আমরা যেরূপ দেখাশুনা যাওয়া আসা করিয়া থাকি, বধু তিনটা বৎসর স্বামী ও স্বস্তর কুলের গুরুজনের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। স্বামী এবং অন্তান্ত গুরু-জনের প্রকৃতি এবং অভ্যাস বুঝিয়া তদনুসারে স্বীয় চরিত্র, আচার ব্যবহার গঠন করিবেন। ষাঁহার ষাটশব্দে কস্তার বিবাহ দিতে পারেন এবং ষাঁহাদের পুত্রেরা ২২ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে তিন বৎসর কাল কস্তা বা বধু সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে; কিন্তু আজকাল কস্তার বিবাহে পূর্বাপেক্ষা বহু প্রচুর অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ার, ত্রয়োদশ চতুর্দশ বর্ষের পূর্বে কস্তার বিবাহ দেওয়া অনেকের পক্ষেই হৃৎ হইয়া পড়িয়াছে। যদি ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বর্ষে বিবাহ হয়, আর

পূর্বের সেই প্রথা—“বিবাহের পর বছর না ফিরিলে স্বস্তর বাড়ী ঘাইতে নাই” দৃঢ়ভাবে বলবৎ রাখিয়া, “ধূলাপায়ে দিনের” কুত্রাপি প্রস্রাব না দেওয়া হয়, তাহা হইলেই অভি সহজে আয়ুর্কোমোক্ত প্রশস্ত গর্ভাধানের কাল সর্বথা অমুঘটিত হইতে পারে। আজকাল “ধূলাপায়ে দিন করার” প্রবল প্রচারের দিনে এসকল কথা লোকের কত কটিকর হইবে জানি না, কিন্তু যদি বীৰ্য্যবান দীর্ঘায়ু সন্ততি আমাদের প্রার্থনিতব্য হয়, যদি এদেশের সেই চির-মধুর গৃহস্থলীর সুখশান্তি আবার ফিরিয়া পাইতে চাও, যদি সমাজকে সুপটু শিল্পী, রসজ্ঞ কবি, ষথার্থ ধার্মিক ও দেশ-হিতব্রত মহাপ্রাণ মানুষে অলঙ্কৃত দেখিতে চাও, তাহা হইলে বিবাহ ও গর্ভাধানের বয়সের পার্থক্য অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে। দম্পতির প্রতি বক্তব্য এই—তোমরা সন্ততির মঙ্গলের অমুরোধে, সমাজের হিতের অমুরোধে, সকলের বড় ধর্মের অমুরোধে, মহুষ্যত্বের অমুরোধে সামান্ত ২১ বৎসর সংযম অবলম্বন করিয়া, জাতীয় সমুন্নতির মূল এই মহাব্রত পালন করিবে। যদি না করিতে পার, যদি অসংযমে আত্মবিসর্জন দাও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে অল্পের জন্ত বহু বিনষ্ট করিতে উদ্যত বিচারমুঢ় বলিব।

**ঋতুকৃত্য**—বলিষ্ঠ, দীর্ঘায়ু, সুসন্তান লাভ করিবার জন্ত ঋতুকালে জীকে যে সমস্ত নিয়ম পালন করিতে হয় তাহারই নাম ঋতুকৃত্য। আমরা ঋতুকৃত্যকে বিহারাচারগত ও আহারগত এই দুইভাবে বিভক্ত করিয়া লিখিব। প্রথমে বিহারাচারগত ঋতুকৃত্য লিখিত হইতেছে। ঋতুর প্রথম তিন দিন জী ব্রহ্মচারিণীর মত থাকিবেন। এই সময়ে জী দিবানিড্রায় পুত্র নিজাল, অল্পনে অল্প, সোপানে

বিকৃত-দৃষ্টি, স্নান ও অমুলেপনে দ্ব্যর্থশীল, তৈলমর্দনে কুঞ্জী, নখ কর্তনে কুনখী, দোড়িলে চঞ্চল, অধিক হাসিলে প্রলাপী, অধিক কথা কহিলে বা উচ্চ শব্দ করিলে বধির হয় স্তত্রাং রজঃস্রাব নারী এই সমস্ত বর্জন এবং কুশাসনে শয়ন করিবেন। রজঃস্রাবের আহার—বিশুদ্ধ গব্যদুগ্ধ মিশ্রিত সূক্ষ্ম পুরাণ তণ্ডুলের অন্ন বিশুদ্ধ গব্য দুগ্ধ যোগে প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিবেন। এ অবস্থায় স্বামিদর্শন পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

**গর্ভাধান কৃত্য**—গর্ভোৎপাদন কালে স্ত্রী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপরি সন্তানের শারীরিক ও মানসিক ভাব সম্পূর্ণ নির্ভর করে; অতএব সন্ততির মঙ্গল কামনায় দম্পতিকে কেবল রিপূরণতন্ত্র হইয়া গর্ভাধান করিতে আয়ুর্বেদ নিবেদ করিয়াছেন, এবং সুসন্ততি লাভ করিবার জন্ত যে সকল নিয়ম পালন করিবার উপদেশ দিয়াছেন সেইগুলিকেই আমরা গর্ভাধান কৃত্য নামে অভিহিত করিয়াছি। পূর্বে বলিয়াছি পুরাণ রজঃস্রাব বন্ধ না হইলে গর্ভাধানের প্রশস্ত কাল উপস্থিত হয় নাই জানিবে। সাধারণতঃ তৃতীয় দিনেই রজঃস্রাব বন্ধ হয় ধরিয়া লইলে চতুর্থ দিবস হইতেই গর্ভাধানের কাল বলা যাইতে পারে। চতুর্থ দিনে স্ত্রী স্নান করিয়া উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ পূর্বেক মঙ্গলাঙ্কুশান ও ব্যতিবাচন করিয়া বামীকে দর্শন করিবেন, কারণ ঋতুযাত্রা নারী প্রথমে বৈষ্ণব মনুষ্য দর্শন করেন উজ্জপ পুত্র প্রসব করেন। গর্ভাধান কালে স্ত্রী অতিভুক্তা হুখিতা, পিপাসিতা, ভীতা, বিমনা, শোকার্তা ক্রুড়া, অস্ত পুরুষকামা কিবা অতি বৈখ্যনা-ভিলাষিনী হইলে গর্ভোৎপত্তি হয় না—হইলেও সুসন্তান জন্মে না। মনোজ হিতকর বস্ত

ভোজন করিয়া, গর্ভাধান কালে দম্পতি শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবেন, সুগন্ধি পুষ্পমালা ধারণ করিবেন এবং প্রক্লম ও উদার ভাবে সুগন্ধি সুখকর শব্দায় শয়ন করিবেন। শুক্ল, আর্দ্র ও গর্ভাশয় সমাক্ষ বিশুদ্ধ থাকিলে গর্ভাধান নিশ্চয় সফল হইয়া থাকে এবং বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ু সুসন্ততি লাভ হয়।

যদি বিশিষ্ট অপত্যলাভের অভিলাষ থাকে তাহা হইলে দম্পতি একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। মৈথুনাতির চিন্তা ও করিবেন না। রজোদর্শন হইতে চতুর্থ দিবসে “পুত্ৰীয় বিধান” (যজ্ঞ বিশেষ) যোগ্য উপাধ্যায় দ্বারা নির্বাহ করাইবেন। রজোদর্শন দিবস হইতে বত বিলম্ব করিয়া পারেন গর্ভাধারণের রাজি নির্ধারণ করিবেন। ঐ দিন অপরাহ্নে পুরুষ, দুগ্ধ ও গব্যদুগ্ধ সহ শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবেন। স্ত্রী, যাহা ভোজন করিবেন তন্মধ্যে তিলতৈল এবং মাষ কলায় প্রধানভাবে থাকিবে। ইহাই সুশ্রুতের মত। চরকের মত এই—স্ত্রী যদি উন্নত কায়, গৌরবর্ণ, সিংহতুল্য তেজস্বী, শুচি ও সন্তবান পুত্র ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে চতুর্থ দিবসে শুদ্ধস্নানের পর পুরাণ যবের মিহি ছাতু মধু ও গব্যদুগ্ধ মিশ্রা ইয়া শ্বেতবৎসা শ্বেতবর্ণ গাভির দুগ্ধে তরল করিয়া কাংশ্র বা রজত পাত্রে সময়ে সময়ে সপ্তাহ পর্যন্ত পান করিবেন। প্রাতে প্রতিদিন একবার মাত্র শালিতণ্ডুলের অন্ন কিবা যবের অন্ন, দধি, মধু, দ্বত যোগে কিবা গব্যদুগ্ধ যোগে ভোজন করিবেন। পরিকৃত গৃহে পরিকৃত শব্দায় শয়ন করিবেন। উত্তম আসন, উত্তম বান, উত্তম বসন, উত্তম ভূষণ ও উত্তম বেশ ধারণ করিবেন প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বৃহৎ শ্বেতবর্ণ বৃষ ও গীতচন্দন-চর্চিত শ্রেষ্ঠ

জাতীয় অর্থ দর্শন করিবেন। স্ত্রীকে মনোহুকুল মধুব বাক্যে সন্তুষ্ট রাখিবে। যে স্ত্রী ও পুরুষের আকৃতি সৌন্দর্য, বচন সৌন্দর্য, আচার সৌন্দর্য এবং কর্ম সৌন্দর্য তাহাদিগকে এবং যে রূপ দর্শনে চক্ষু তৃপ্ত হয় যে শব্দ শ্রবণে কর্ণ সুখী হয় এমন দৃশ্য দর্শন ও শব্দ শ্রবণ করাইবে। সেবাহুকুল অম্বরক্ত সহচরীগণ সেবা করিবে। কিন্তু স্বামীর সহিত মিলিত হইবে না। রজোদর্শনের চতুর্থ রাত্রি হইতে সপ্ত রাত্রি পর্যন্ত উপরি লিখিত নিয়ম পালন করিয়া পুত্রাঙ্কাজিগী স্ত্রী যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক স্বামীর সহিত অগ্নিকে পশ্চিম দিকে ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া উপবেশন পূর্বক পুত্রকামনা করিবেন। ব্রাহ্মণ পুত্র-

কাম্য যজ্ঞ করিবেন, যজ্ঞান্তে হোমের অবশিষ্ট দ্রব্য প্রথমে স্বামী পরে স্ত্রী পান করিবেন। অনন্তর অষ্ট রাত্রি পূর্বকথিত পরিচ্ছাদি ধারণ পূর্বক স্ত্রীসহবাস করিলে অভিলষিত পুত্র লাভ হয়।

সন্ততির বর্ণ বৈকুণ্ঠ ইচ্ছা করিবেন দম্পতির পরিধেয় এবং বৃষের বর্ণ ও তজ্জপ হওয়া উচিত। অতঃপর সংক্ষেপতঃ উপদেশ এই যে,—স্ত্রী বৈকুণ্ঠ সন্ততি ইচ্ছা করিবেন, ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সেইরূপ আশীর্বাদ শ্রবণ করিবেন, সেই সেই জনপদের আহার ও পরিচ্ছদ চিন্তা করিবেন।

## আয়ুর্বেদ কি Empirical ?

প্রবন্ধের নামে ইংরাজি শব্দের ব্যবহার দেখিয়া পাঠক মহাশয় রাগ করিবেন না। ঐহাদিগের ভ্রম বিশেষতঃ এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে তাঁহারা ঐ ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করেন এবং ঐ শব্দের ঐক্যবাদ অপেক্ষা মূল ইংরাজি শব্দটাই ঐহাদিগের বুদ্ধিব্যবহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া আমরাও বাধ্য হইয়া ইংরাজি শব্দই ব্যবহার করিলাম। আয়ুর্বেদ কি Empirical বলিলে এই বুঝা যায় যে,—আয়ুর্বেদে রোগ কি ? কেন হয় ? কিরূপে হয় ? কিরূপেই চিনিতে পারা যায় ? ইত্যাদি রোগ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নাই। দ্রব্যের গুণ কি ? শরীরের উপরি দ্রব্যের ক্রিয়া কি ? দ্রব্য কিরূপেই রোগ প্রশমিত করে ? ইত্যাদি চিকিৎসা বিষয়ক তত্ত্বও আয়ুর্বেদে নাই। অর্থাৎ যাহারা আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করে তাহারা রোগও চিনে না ওষধের গুণও জানে না।

কেবল মুঢ়ের মত এইটুকু জানে যে এই ওষধে এই রোগ ভাল হয়। দীর্ঘকাল এইরূপ না জানিয়া শুনিয়া বুক চুকিয়া ওষধ দিতে দিতে যদৃচ্ছাক্রমে কতকগুলি রোগ আরাম করিয়া রোগ ও ওষধ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাই আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে কোন কোন লোকের বা কোন কোন সম্প্রদায়ের এই রূপ ধারণা শুনিয়া পাঠক বিস্মিত হইবেন না। এমনই যুগধর্ম যে, অধুনা অজ্ঞ বা অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই সুশিক্ষিত বলিয়া ঐহাদিগের খ্যাতি আছে তাঁহাদের অনেকের ও অভ্যাস এই যে, যে কোন বিষয়ে রায় প্রকাশ করিতে তাঁহাদের কিছু মাত্র কুপণতা নাই। যে বিষয়ে তাঁহারা কিছু মাত্র অধিকার নাই যে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই সে বিষয়েও পরের মুখে ঝাল খাইয়া তাঁহারা নিজ মত প্রকাশ করিতে কিছু মাত্র

দ্বিধা বোধ করেন না। এখন আর অধিকারী অনধিকারী বিচার নাই—সকলেই মনে করেন আমার সকল বিষয়েই অধিকার আছে। সাধারণ লোকও তেননি—কে বলিতেছে, যিনি বলিতেছেন তাঁহার এ বিষয়ের জ্ঞান কিরূপ, তাঁহার কথা বিশ্বাস যোগ্য কিনা, বিবেচনা না করিয়া, শুভ কথার তাৎপর্য সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া “গুরুসেন মরণ্য” গুনিয়াই কাঁদিয়া আঁকুল! গুরুসেন যে ধোবার গাধা—মানুষ নহে, ইহাও ক্রন্দনকারীদের জানা নাই। শ্রোতাঙ্গিরে ত এই অবস্থা। যাহারা আয়ুর্বেদ Empirical বলিয়া প্রচার করেন তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় মহাশয় আপনি কি আয়ুর্বেদ পড়িয়াছেন? তাহা হইলে নিশ্চয় শুনিতে পাইবেন যে তিনি স্বয়ং মূলগ্রন্থ পড়েন নাই কিন্তু কোন ইংরাজি পুস্তকে ইংরাজের লেখা আয়ুর্বেদ বিষয়ক কোন প্রবন্ধ পড়িয়া বা কোন একখানি আয়ুর্বেদীয় সংগ্রহ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আবৃত্তি করিয়া কিম্বা কোন কবিরাজের সহিত আলাপ করিয়াই নিজে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আয়ুর্বেদ Empirical. উপরি লিখিত প্রবন্ধ লেখক ইংরাজ, আয়ুর্বেদ সংগ্রহের বঙ্গানুবাদ কিম্বা কবিরাজ বিশেষের সহিত আলাপ, যদি তাঁহার নিকট আয়ুর্বেদের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা কি আয়ুর্বেদের দোষ? পেচক যে দিনে দেখিতে পায় না তার জন্য কি সূর্য দায়ী? বসন্তকালে বৃক্ষ বিশেষের পত্র না থাকিলে সেটা কি বসন্তকালের দোষ? একখাটা তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। যে সমাজে শিক্ষিতাভিনিগণেরও এই অবস্থা সে সমাজের যে নিত্যজ হৃদয়া উগ্ৰস্থিত হইয়াছে ইহা

বলাই বাহুল্য। যে চিকিৎসাশাস্ত্র—আয়ুর্বেদ এতদিন তাঁহাদের পূর্ব পুরুষগণকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে একটা অপবাদ রটাইবার পূর্বে—একবার সেই শাস্ত্রটা নিজে নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ছিল না কি? দেখিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সহিত নিজেদের বুদ্ধিমান বলিয়া আত্ম প্রকাশের দাবিটাও বাজায় থাকিত। আয়ুর্বেদ পরীক্ষা করিয়া দেখাও যে সোজা ব্যাপার নয়; আয়ুর্বেদ যে ভাষায় কথা বলেন অনেকের সেই ভাষাই জানা নাই; স্তরং ইচ্ছা থাকিলেও শিক্ষাদোষে তাঁহারা পরীক্ষা করিতে পারিছেন না। না পারিয়া নির্বাক থাকাই উচিত ছিল। না বুঝিয়া অপবাদ রটনা করিলে আয়ুর্বেদের কোনই ক্ষতি নাই। মণি যদি কর্দ্দমে পতিত থাকে তাহাতে মণির লজ্জা কি? সুগন্ধি পুষ্প যদি বনে ফুটিয়া বনেই মলিন হয় তাহাতে পুষ্পের ক্ষতি কি? তবে যাহারা আয়ুর্বেদ লইয়া ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের মনোবেদনা জন্মিতে পারে। যাহাদের আয়ুর্বেদের স্বরূপ বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা আছে অথচ শক্তি নাই, তাঁহাদিগের জন্তই আমরা এই শ্রমস্বীকার করিয়াছি। যাহারা চিরদিনই “পর-প্রত্যয়নেয় বুদ্ধি” বা যাহারা পরের জিনিষকে মন্দ ভাবে দেখিতেই চিরাত্য তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া নিবেদন করিয়াছি আমাদের এই শ্রমস্বীকার তাঁহাদের জন্ত নহে। সর্বোপায়ে একটা কথা বলিয়া রাখি। পৃথিবীর যাবতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক হইলেও উহাদের প্রস্থান ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণালীর মধ্যদা রক্ষা করিয়া সেই সেই চিকিৎসাশাস্ত্র বৃদ্ধিতে হইবে। আমি যে চিকিৎসা শাস্ত্রে জানি, যগন্তেয় যাবতীয়

চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থান যে ঠিক তাহার মতই হইবে এরূপ আশা করা বাতুলতা, কিম্বা চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষকে তুল্যদণ্ড করিয়া অজ্ঞাত চিকিৎসা শাস্ত্রের লব্ধ প্রমাণ করিতে যাওয়াও বিষম নির্লক্ষিতার পরিচয়। আমিই অথও সত্য আয়ত্ত করিয়াছি আর কাহারও নিকট সত্য প্রকাশ পাইতে পারে না এইরূপ সিদ্ধান্ত, মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। আয়ুর্বেদ বুঝিতে হইলে, আয়ুর্বেদের গ্রন্থান, আয়ুর্বেদের প্রাণালী অমুসরণ করিয়া বুঝিতে হইবে। নিজের নিজের মাপকাটা দিয়া মাপিলে সত্য নির্ণয় হইবে না।

রোগতত্ত্ব বিষয়ে আয়ুর্বেদ কি বলিয়াছেন অগ্রে তাহাই বলিব। রোগতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই কএকটি বিষয় জানিতে হয়—(১) রোগ কি? (২) রোগ কত প্রকার? (৩) রোগের কারণ কি ও কত প্রকার? (৪) কিরূপে রোগজন্মে অর্থাৎ রোগের সম্প্রাপ্তি কি? (৫) রোগ চিনিবার উপায় অর্থাৎ রোগের পরীক্ষা ও লক্ষণ (৬) রোগের উপসর্গ (৭) রোগের অসুখ্য লক্ষণ। একগুণে আমরা রোগতত্ত্বকে উপরি লিখিত ৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া আয়ুর্বেদের মত ব্যাখ্যা করিব।

রোগ কি? চরক বলিয়াছেন “বিকারো ধাতুবৈষম্যাম্ সাম্যাম্ প্রকৃতি রুচ্যাতে”—ধাতুর সমতা স্বাস্থ্য, ধাতুর বিষমতা রোগ। ধাতু কি? যাহারা শরীর-রক্ষণোচিত কর্ম করিয়া শরীর ধারণ করে তাহার ধাতু। উহারা কে? বায়ু, পিত্ত ও কফ। এই বায়ু পিত্ত, কফের কার্য অল্পপারে দুইটি নাম আছে—ধাতু ও দোষ। বায়ু, পিত্ত, কফ প্রকৃতিস্থ থাকিয়া অর্থাৎ নিজ পরিমাণে নিজ স্থানে এবং নিজ প্রকৃতিতে থাকিয়া শরীরের কার্য

নির্বাহ করিতে থাকিলে অর্থাৎ সমভাবে থাকিলে ইহাদিগকে ধাতু বলে। এই ধাতু সাম্যই স্বাস্থ্য। আর ইহার স্ব স্ব পরিমাণে বৃদ্ধি বা ক্ষয় প্রাপ্তি হইলে, নিজের স্থান হইতে বিচ্যুত হইলে এবং নিজ নিজ প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে ইহার দোষ নামে অভিহিত হয়, ইহাই ধাতু বৈষম্য বা রোগ। স্বাস্থ্য প্রকৃতি হইলে রোগ বিকৃতি, রোগ স্বাস্থ্যের বিকৃত অবস্থা সুতরাং রোগ বুঝিতে গেলে স্বাস্থ্য কি বুঝিতে হয়। এই ধাতু বৈষম্য-রূপ রোগের লক্ষণটি অতি সূক্ষ্ম। এই হিসারে বিচার করিতে গেলে সূক্ষ লোক প্রায় পাওয়া যায় না। ধাতু-বৈষম্য এই নাম ভিন্ন, রোগ বলিয়া এই অবস্থার শাস্ত্রে আর কোন নাম নাই। এই আত্ম ধাতুবৈষম্য অতি অল্প বলিয়া ইহার কোন চিকিৎসাও নাই। এই অবস্থাকে ব্যবহারিক রোগ বলিয়া গণনা করা হয় নাই, উপেক্ষা করা হইয়াছে। কেবল চরকে নহে সূশ্রুতে ও রোগের এই সূক্ষ্ম অবস্থার লক্ষণ দেখিতে পাই। সূশ্রুত বলিয়াছেন “তদ্ব্যংগসংযোগা ব্যাধয় ইত্যুচ্যন্তে” (সূত্রস্থান ১ম অধ্যায়) ইহার স্থূল অর্থ এই—পুরুষে (প্রাণীর) হৃৎ-সংযোগই রোগ। আরোগ্য সূত্র—রোগ হৃৎ-সংযোগ। আমরা উপরে যে ধাতু বৈষম্যের কথা বলিয়াছি, বখনই সেই ধাতু-বৈষম্য জন্মে তখন অবশ্যই হৃৎ-সংযোগাদান হইয়া থাকে, এই হৃৎ-সংযোগই রোগ। আত্ম ধাতু বৈষম্যের যেমন রোগ বলিয়া বিশেষ কোন নাম নাই—এই হৃৎ-সংযোগ রোগেরও শাস্ত্রে তজ্জপ কোন নাম নাই। রোগের সূক্ষ্ম অবস্থার কথা বলা হইল এক্ষণ শাস্ত্রে ব্যবহারতঃ যাহাকে রোগ বলা হইয়াছে—যেমন অন্ন, অতিসার প্রভৃতি তাহার লক্ষণ বলিতেছি। এই ব্যবহারিক

অর অতিসার প্রভৃতি রোগের অনেক প্রকার ভেদ আছে এবং এই সকল রোগ-ভেদের লক্ষণ রোগবিশিষ্টর গ্রন্থে (নিদানে) বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। আমরা এখানে কেবল ব্যাধিজাতির দুই একটি লক্ষণ বলি-তেছি। অরজাতীয় রোগের লক্ষণ,—শরীরের এবং মনের সন্তাপ—যে কোন অরই হউক না কেন উহা সন্তাপ-লক্ষণ হইবেই; এইরূপ মলমার্গ দ্বারা দ্রব বস্তু নিঃসরণ, অতিসার জাতীয় রোগের লক্ষণ, সমস্ত অতিসারেই এই লক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে। প্রকৃপিত বাতাদি যাবতীয় রোগের জনক।

(২) রোগ-কত প্রকার ?—দুঃখসংঘো-গই ব্যাধি একথা পূর্বে বলিয়াছি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ভেদে দুঃখ তিন প্রকার। আধ্যাত্মিক দুঃখ কি ? এখানে আত্মা শব্দে শরীর এবং দুঃখ শব্দে দুঃখের (রোগের) কারণ কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ অর্থাৎ দোষকৃত শারীর দুঃখ—অরাদি এবং মানস দুঃখ কামাদি বিকারই আধ্যাত্মিক দুঃখ। আধিভৌতিক দুঃখ কি ? এখানে ভূত শব্দে বায়ু, অগ্নি, জল, স্নিগ্ধ প্রভৃতি, ইহাদের দ্বারা যে দুঃখ জন্মে তাহাই আধিভৌতিক এবং দেবদেব কর্তৃক যে দুঃখ জন্মে তাহা আধিদৈবিক দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখ সাত প্রকার ব্যাধিরূপে প্রাণিদিগকে ক্লেশ দিয়া থাকে। সাত প্রকার ব্যাধি এই—(১) আদিবল-প্রবৃত্ত (২) জন্মবল-প্রবৃত্ত (৩) দোষ-বল-প্রবৃত্ত (৪) সন্তাপবল-প্রবৃত্ত (৫) কালবল-প্রবৃত্ত (৬) বৈবল-প্রবৃত্ত (৭) স্বভাববল-প্রবৃত্ত। আদিবল-প্রবৃত্ত রোগকে কহা-কে বলে ?—শিশুর দূষিত শুক্র এবং স্ত্রীর দুই আর্ন্তবশোণিত জন্তু সন্তানের বেকুষ্ঠ, অর

মধুমেহ ও ক্ষয়াদি রোগ জন্মে সেইগুলি আদি-বল-প্রবৃত্ত রোগ। আদিবল-প্রবৃত্ত রোগ দুই প্রকার—মাতৃজ ও পিতৃজ। যে রোগ কেবল দূষিত আর্ন্তবশোণিত জন্তু তাহা মাতৃজ এবং যাহা কেবল দুই শুক্র হইতে জন্মে তাহা পিতৃজ বলিয়া জানিবে। (২) জন্মবল-প্রবৃত্ত রোগ কি ? গর্ভাবস্থায় চতুর্থ মাস হইতে গর্ভবতী নারীর কোন বিশেষ বস্তু ভক্ষণে, কোন বিহারে বা কোন ভ্রবাদি দর্শনে যে আকাজ্ঞা জন্মে তাহার নাম দৌহ্য অর্থাৎ সাধ। গর্ভিণীর এই সাধ পূরণ করা উচিত। না করিলে দৌহ্যের অবমাননা হেতু গর্ভস্থিত শিশু বোবা, খোঁপা বা বামন হইতে পারে। এইগুলি জন্মবল-প্রবৃত্ত রোগ। তারপর গর্ভাবস্থায় প্রসূতির বেকুপ আহার, আচার পালন করিবার বিধি শাস্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে, প্রসূতি যদি সেইগুলি পালন না করে তাহা হইলে গর্ভস্থিত শিশুর যে অপরাধের রোগ জন্মিয়া থাকে সেগুলিও জন্মবল-প্রবৃত্ত ব্যাধির অন্তর্গত জানিবে। (৩) দোষবল-প্রবৃত্ত ব্যাধি কি ?—জন্ম প্রকৃতি ভূত দোষজাত অরাদি এবং রোগ হইতে জাত রোগকে (যেমন অরসন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে কাস ইত্যাদি) দোষবল-প্রবৃত্ত ব্যাধি বলে। ইহা দুই প্রকার—আমা-শয়-সমুখ ও গলাশয়-সমুখ। কুপিত-কফপিত্ত হইতে যে সকল রোগ নাতির উপরিভাগে জন্মিয়া থাকে তাহাদের নাম আমাশয়-সমুখ এবং কুপিত বায়ু জন্ত যে সকল রোগ নাতির অধোভাগে জন্মিয়া থাকে তাহাদিগকে গলা-শয়-সমুখ রোগ বলে। দোষবল-প্রবৃত্ত ব্যাধি আবার শারীর ও মানস দুই ভেদে বিবিধ। কুপিত বায়ু পিত্ত কফ রোগ সকল রোগের কারণ এবং বেগুলি শরীর আশ্রয় করিয়া

আমি সেইগুলি শারীর রোগ এবং যেগুলি  
জন্মে ও তন্ময় হইতে জন্মে এবং যে সকল রোগ  
প্রথমে মন আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় সেগুলি  
মন রোগ। আদিবল, জন্মবল ও দোষবল-  
প্রবৃত্ত এই তিন প্রকার ব্যাধি আধ্যাত্মিক ব্যাধি  
আমি জ্ঞাত। (৪) সজ্জাতবলপ্রবৃত্ত রোগ কি?—  
কর্তৃক ব্যক্তি বলশালী লোকের সহিত লড়িলে  
৥ পাজা দিয়া কোন কাজ করিলে, পর্ত্ত,  
জ্ঞানি হইতে পতিত হইলে যে সকল আগন্ত  
রোগ জন্মিয়া থাকে সেই সকল ব্যাধিকে সজ্জাত-  
বলপ্রবৃত্ত রোগ বলে। ইহা দুই প্রকার—শত্রু-  
কৃত ও ব্যাল অর্থাৎ হিংস্রজাত কৃত। সজ্জাত-  
বলপ্রবৃত্ত রোগের অপর নাম আধিভৌতিক  
জন্ম। (৫) কালবলপ্রবৃত্ত রোগ কি?—শীত,  
উষ্ণ, বায়ু, বর্ষাদি হইতে যে সকল রোগ জন্মে  
তাহাদিগকে কালবলপ্রবৃত্ত রোগ বলে। এই  
কালবলপ্রবৃত্ত রোগ দুই প্রকার—বাপন্ন ঋতু  
কৃত ও অব্যাপন্ন ঋতুকৃত। যে ঋতুতে বায়ু,  
জল, ভূমি প্রভৃতির বৈরুপভাব হওয়া উচিত  
তাহা না হইলে সেই ঋতুকে ব্যাপন্ন ঋতু বলে—  
যেমন বর্ষাকালে যদি উপযুক্ত বর্ষণ না হয়  
গ্রীষ্মকালে যদি শীত হয়, তাহা হইলে ব্যাপন্ন  
ঋতু বলিতে হইবে। এই ব্যাপন্ন ঋতু যে  
বিবিধ রোগ জন্মায় সেইগুলিকে ব্যাপন্ন ঋতু-  
কৃত কালবলপ্রবৃত্ত রোগ, আর যদি ঋতু ব্যাপন্ন  
না হয় তাহা হইলে কেবল কালধর্ম্মেও ঋতু  
বিশেষে এক একটা দোষ (বায়ু বা পিত্ত  
কিবা কফ) কুপিত হইয়া থাকে। মানুষ  
বেশ নিয়ম পালন করিয়া থাকিলেও কাল-  
ধর্ম্মেই বায়ু, পিত্ত বা কফের সঞ্চয় ও প্রকোপ  
হইয়া রোগ জন্মাইতে পারে, ইহাই অব্যাপন্ন  
ঋতুকৃত কালবলপ্রবৃত্ত রোগ। এখানে প্রসঙ্গ-  
ক্রমে আর একটা কথা বলিতে হইতেছে।

শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষায় কেবল কালধর্ম্মে কিরূপে  
রোগ জন্মে এবং তাহার প্রতীকার কি?  
আয়ুর্বেদে অতি বিশদভাবে এই তত্ত্ব আলো-  
চিত হইয়াছে। আমরা অতি সংক্ষেপে কেবল  
বিষয়টি মোটামুটি বুঝাইবার জন্য কিছু লিখি-  
তেছি। জিজ্ঞাস্য পাঠক মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে  
পূরঙ্কৃত ভিন্ন বঞ্চিত হইবেন না। এক ঋতুতে  
কিরূপে দোষের সঞ্চয় হয় এবং পরবর্ত্তী ঋতুতে  
কিরূপেই বা উহার প্রকোপ হইয়া ব্যাধি জন্মায়  
তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি—বর্ষাকালে দ্রব্যগুলি  
তরুণ এবং অন্ন বীৰ্য্যসম্পন্ন হয়, জল ঘোলা  
এবং বিবিধ মলিন বস্তু সংযুক্ত হইয়া পড়ে।  
এই সময় আকাশ সর্বদা মেঘাচ্ছন্ন ও ভূমি  
আর্দ্র এবং কর্দমপূর্ণ হইয়া থাকে। ঐরূপ  
দ্রব্য আহাৰ করিয়া, ঐরূপ ভূমিতে বাস করিয়া  
মানব শরীরও ক্রিয় ভাবাপন্ন হয়। বর্ষাকালীন  
শৈত্যে বায়ু কুপিত হইয়া অগ্নি মন্থ করে।  
একেই জল ও খাদ্য ঋতুধর্ম্মে দুই হয়, তাহার  
উপর আবার অগ্নির বল কম হওয়ার আহা-  
রের বিদাহপাক জন্মে। এই বিদাহপাক  
হেতু পিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে। বর্ষার পর  
শরৎকাল আসিলে আকাশ পরিষ্কার হয়—  
পথ শুষ্ক হয় এবং সূর্য্য মেঘ-নিমুক্ত হইয়া  
তীক্ষ্ণ কিরণ দান করেন। এই তীক্ষ্ণ সূর্য্য-  
কিরণে প্রাণিদেহে বর্ধা-সঞ্চিত পিত্ত দ্রবীভূত  
হইয়া কুপিত হয় এবং শরৎকালে পিত্ত জন্ম  
রোগ জন্মায়। শরতের পর হেমন্ত আসিলে  
বর্ষার অন্নবীৰ্য্য তরুণ দ্রব্য পরিণত বীৰ্য্য ও  
বলবান্ হয় বর্ষার ঘোলা জল পরিষ্কার হয়—  
এইরূপ খাদ্য এবং পানীয় জল সেবন করিয়া  
শরীরে স্নিগ্ধ, শীতল এবং উপলেশ ঋতুধর্ম্ম  
আধিক্য জন্মে। এদিকে শীতকালে সূর্য্য  
কিরণের তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসে এবং শীতল



বায়ুর সম্পর্কে শরীরে সঞ্চিত হইয়া পড়ে। সুতরাং শ্লেষ্মার সঞ্চয় হয়। হেমস্তের পর বসন্ত আসিলে আবার গরম পড়িতে আরম্ভ হয় এবং স্ব্যাকিরণ প্রথর হইতে থাকে। এই সময়ে হেমস্তের সঞ্চিত কফ বিগলিত হইয়া কুপিত হয় এবং কফ জন্ত রোগ জন্মাইয়া থাকে। বসন্তের পর গ্রীষ্ম আসিলে মানুষের ঋতু ও পানীয় জল নিঃসার, রুদ্ধ এবং অতিশয় লঘু-গুণাশ্রিত হইয়া থাকে। এইরূপ ঋতু ও পানীয় সেবন করিয়া শরীরের রুদ্ধতা, লঘুতা ও বৈশিষ্ট্য জন্মে। সুতরাং বায়ু সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং এই সঞ্চিত বায়ু বর্ষার শৈত্যে প্রকুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করে। যদি গ্রীষ্মের সঞ্চিত বায়ু বর্ষার, বর্ষার সঞ্চিত পিত্ত শরতে, হেমস্তের সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তে নির্ধরণ অর্থাৎ বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে উহার আর কালবল-প্রবৃত্ত রোগ জন্মাইতে পারে না। আয়ুর্বেদে যে “ঋতুচর্য্যা” কথিত হইয়াছে এই ঋতু-কৃত দোষের নির্ধরণই তাহার উদ্দেশ্য। যদি নির্ধরণ না করা যায় অর্থাৎ মানুষকে চেষ্টা যদি নাই হয় তাহা হইলেও প্রকৃতি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকেন না। কালধর্মের বর্ষা ঋতুতে সঞ্চিত পিত্ত যেমন শরৎকালে কুপিত হয় তেমনিই আবার ঐ কুপিত পিত্ত হেমন্ত ঋতুতে স্বয়ংই প্রদাহিত হয়। কালধর্মের হেমন্তে যে শ্লেষ্মার সঞ্চয় এবং বসন্তে যাহার প্রকোপ হয়, সেই কুপিত শ্লেষ্মা গ্রীষ্মকালে স্বয়ং প্রদাহিত হয়। নিরূপে কালধর্মের যে বায়ু সঞ্চিত এবং বর্ষার প্রকুপিত হয় সেই বায়ু আবার শরৎ ঋতুতে স্বয়ং প্রদাহিত হয়। বৎসরের ঋতুবিশেষে যেমন দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম ঘটতেছে দিবারাত্রির মধ্যে ও ঠিক সেইরূপ ঘটনা থাকে। দিব-

সের পূর্বাঙ্কে বসন্ত লক্ষণ অর্থাৎ কফ প্রকোপ, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম-লক্ষণ অর্থাৎ শ্লেষ্মাকর, অপরাহ্নে প্রাবৃট্-লক্ষণ অর্থাৎ বায়ু প্রকোপ জানিবে। এইরূপ রাত্রির প্রথম ভাগে অর্থাৎ সন্ধ্যার বর্ষা-লক্ষণ অর্থাৎ পিত্তসঞ্চয়, অন্ধারাত্রে শরৎ-লক্ষণ অর্থাৎ পিত্তকোপ এবং প্রভাত্রে হেমন্ত-লক্ষণ অর্থাৎ কফ সঞ্চয় জানিবে। সন্ধ্যাসরে এবং অহোরাত্রিে কিরূপে দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ এবং প্রশম হয় তাহা সংক্ষেপে কথিত হইল। এক্ষণে আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অমুসরণ করিব। (৬) দৈববল-প্রবৃত্ত রোগ কি?—যে সকল রোগ, অর্থর্ববেদ বিহিত মারণাদি-কারক মন্ত্র, বিদ্যা, বজ্র, পিশাচ ও ঔপসর্গিক রোগিসংসর্গ হেতু জন্মে সেইগুলি দৈববল-প্রবৃত্ত ব্যাধি। (৭) স্বভাববল-প্রবৃত্ত রোগ কি? ক্ষুৎ, পিশাশ, জরা, মৃত্যু, নিজা প্রভৃ-তিকে স্বভাববল-প্রবৃত্ত রোগ বলে। কালকৃত ও অকালকৃত ভেদে ইহার দ্বিবিধ। উচিত-কালে জরা, মৃত্যু ঘটলে কালকৃত এবং তৎ-পূর্বে ঘটলে অকালকৃত বলে। এক্ষণে সাত প্রকার রোগের ব্যাখ্যা করা হইল। অতঃ-পর আমরা রোগের কারণ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে কি আছে তাহাই অমুসন্ধান করিব।

রোগের কারণ কি ও কত প্রকার? চরক বলিয়াছেন—

“কালবৃদ্ধীজিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা নচাতি চ।  
দ্ব্যশ্রয়ানাং ব্যাধীনাং জিবিধো হেতুসংগ্রহঃ ॥”

(সুত্রস্থান ১ম অধ্যায়)

ইজিয়ার্থ শব্দের অর্থ ইজিরের বিষয় অর্থাৎ যে ইজির দ্বারা বাহ্য গৃহীত হয় তাহাই সেই ইজিরের বিষয়। চক্ষুর বিষয় রূপ, কণ্ঠের বিষয় শব্দ, জিহ্বার বিষয় রস, নাসিকার বিষয় গন্ধ এবং হৃদের বিষয় স্পর্শ। কাল, বৃদ্ধি

এবং ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাবোগ, অযোগ এবং অতিবোগ যাবতীয় শারীর ও মানস ব্যাধির কারণ। ইহাই উপরি উদ্ধৃত হেতু-স্বত্রের স্থলার্থ। এক্ষণে আমরা কাল, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাবোগ, অযোগ ও অতিবোগ কি তাহাই ব্যাখ্যা করিব।

কালের মিথ্যাবোগ অযোগ ও অতিবোগ—গ্রীষ্মকালে অতিগ্রীষ্ম, বর্ষাকালে অতিরুষ্টি ও শীতকালে অতিমাত্র শীত হইলে কালের অতিবোগ হয়। গ্রীষ্মকালে ভাল গ্রীষ্ম পড়িলনা, বর্ষাকালে ভালবৃষ্টি হইলনা বা শীতকালে বেশ শীত পড়িলনা, ইহাই কালের অযোগ। আর গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের পরিবর্তে যদি শীত হয়। বর্ষাকালে বর্ষার পরিবর্তে যদি গ্রীষ্ম হয় তাহা হইলে কালের মিথ্যাবোগ হইয়া থাকে।

মিথ্যাবোগ, অযোগ ও অতিবোগ স্বরূপ রোগের ত্রিবিধ কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া সর্বপ্রথমে কালের উল্লেখ করা হইল কেন? ছন্দোবিহীন বলিয়া অগ্রে কালের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রজ্ঞাপরাধ ও ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাবোগ, অযোগ, অতিবোগ আমি বহু লইলে পরিহার করিতে পারি কিন্তু কালের মিথ্যাবোগ, অযোগ অতিবোগ আমি বর্জন করিতে পারি না। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বর্ষাকালে যদি বৃষ্টি না হইয়া গ্রীষ্ম হয় তাহা হইলে এই আকালিক গ্রীষ্ম পরিহার করিবার কোন উপায় নাই। কালের পরই বুদ্ধির উল্লেখ করিবার হেতু এই যে, বুদ্ধির দোষ না হইলে আর লোকে ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাবোগাদির আচরণ করে না। এই বুদ্ধির দোষকে প্রজ্ঞাপরাধ বলে। প্রজ্ঞাপরাধ শব্দে এখানে শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক ক্রিয়ার অপভ্রাস্ত বৃত্তিতে বহির্ভূত। আমরা এক্ষণে কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টার অতিবোগ, অযোগ ও মিথ্যাবোগ কি তাহাই বলিব।

কায়িক চেষ্টার অতিবোগ, অযোগ, মিথ্যাবোগ কি?—কোন দৈনন্দিক পরিশ্রমের কাজ, ধারণ পথপার্থটন, ইহা কায়িক চেষ্টা। যদি অতিরিক্ত পথপার্থটন করা যায় তাহা হইলেই কায়িক চেষ্টার অতিবোগ হইল। ইহা পীড়ার কারণ। যদি একবারে পথপার্থটন না করি তাহা হইলে কায়িক চেষ্টার অযোগ হইল। ইহাও পীড়ার কারণ। মলমূত্রের বেগ উপহিত হইলে ধারণ করা, উপস্থিত না হইলে জোর করিয়া কোঁৎ পাড়িয়া ত্যাগের চেষ্টা করা, বিষমভাবে স্থানন, বিষম গমন, বিষম পতন, বিষমভাবে অঙ্গদ্রবিশেষ ও শয়ন, অঙ্গপ্রদূষণ অর্থাৎ এমন কোন কর্ম করা যাহাতে গাত্ৰ ক্ষত বা বিকৃত হয়—যেমন খুব জোরে চুলকান, অবিধি পুর্নক উকি পরা কি নাক কাণ বেঁধা, সংক্লেষণ অর্থাৎ শরীরের ক্লেশ জন্মে এমন আহার বিহার যথা—অতিরিক্ত মত্তপান, অধিকক্ষণ রোদ্রে কি জলে থাকা ইত্যাদি, প্রহার এবং মর্দন কায়িক মিথ্যাবোগ জানিবে।

বাচিক অতিবোগ, অযোগ, মিথ্যাবোগ কি? সঙ্কল্প অর্থাৎ চিন্তা মনের কার্য। এই চিন্তা অতিমাত্রায় করিলে মানস অতিবোগ, চিন্তা খুব কম করিয়া আনিলে মানস অযোগ এবং ভয়, শোক, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মান, দ্বন্দ্ব ও মিথ্যাদর্শন অর্থাৎ যেটা যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপ চিন্তা করা, মানস মিথ্যাবোগ। মানস অযোগ অর্থাৎ নিশ্চিন্ততাও রোগের কারণ। অর্শো নিদানে বলা হইয়াছে “প্রাথাত্ত-সেবা শীতো চ দেশকালাবচিহ্ননম্”। অতঃপর আমরা ইন্দ্রিয়ার্থের অতিবোগ, অযোগ, মিথ্যাবোগ ব্যাখ্যা করিব।

(ক্রমশঃ)

## দীর্ঘজীবীর দিনচর্যা ।

### (২) শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন ।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের জন্ম ১২৪৪ সালের শ্রাবণ মাসে স্মতরাং এক্ষণে ইহার বয়স কিঞ্চিৎ অধিক ৭০ বৎসর। ইনি কলিকতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ সেন মহাশয়, সেন মহাশয়ের দিনচর্যা সম্বন্ধে যাহা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এস্থলে প্রকাশিত হইল। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে যে চিকিৎসক সর্দাপেক্ষা স্বরাজীবী, তাহার নীচেই আইন ব্যবসায়ী। সেন মহাশয় আইন ব্যবসায়ী হইয়াও স্বরাজীবী ; স্মতরাং তাহার অবলম্বিত আহার বিহারাদি পাঠকগণের হিতকর হইতে পারে ভাবিয়া আমরা প্রকাশিত করিলাম। ইনি ১৮৬১ সালে আইন পাশ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হন।

#### ভ্রমণ, পরিচ্ছদ—বিশেষ অভ্যাস ।

বেড়ান অভ্যাসটা খুব কম ছিল, যখন বেড়াইতেন খুব আন্তে আন্তে চলিতেন। বাড়ীর পূজার দালানে অনেক বার পায়চারি করিতেন। পরিচ্ছদ মোটমুট ব্যবহার করিতেন, তাহাতে বিশেষ কোন পারিপাট্য ছিল না।

ইহার বরাবর খুব প্রত্যুষে উঠা অভ্যাস, প্রত্যুষে উঠিয়া কিছুক্ষণ ছাদে পায়চারি করিতেন, পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়া আদালতের কার্যে বনোনিবেশ করিতেন, বেলা ৮টা বাজিলে আদালত ছাড়া হইত। একটু লবণের সহিত খাইতেন ২২টা বাজিলে একটু ছোট বাটর এক বাটা ভাদ সন্নিহার তেল গায়ে ও মাথার মাখিতেন, খাদিগারে

হাটগা প্রত্যাহ গঙ্গান্নান করা অভ্যাস ছিল, কি শীত, কি গরম, কি বর্ষা, সকল সময়েই নিয়মিত সময়ে গঙ্গান্নান করিতেন, ন্নান করিয়া বাড়ী আসিয়া পূজা আত্মিক করিতে বসিতেন, ৫৬ ৫৭ বৎসর বয়সের পর পূজা আত্মিক ও জপে অধিক ক্ষণ সময় দিতেন।

ভোজন কার্য্য কখনও তাড়া তাড়ি সম্পন্ন করিতেন না, ধীরে ধীরে অধিকক্ষণ ধরিয়া আহার করিতেন, তাহার বরাবর নিয়ম ছিল এবং এখনও আছে যে আহার করিতে করিতে জল আদৌ খাইতেন না এবং এখনও খান না, আহাের পর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া পরে এক গেলাস জল খান।

অধিক ভোজন কখনও করিতেন না। তিনি সর্দাদ বলিতেন যে যখন খাইবে পেটের এক কোণ খালি রাখিয়া খাইবে, মাটির হাড়িতে সিদ্ধ করা খুব সুক দাদখানি চাউলের অন্ন আর ঘন অন্নহরের দাল এবং তাহাতে খুব ভাল ঘৃত ঢালিয়া তাই ভাতে মাখিয়া প্রায় সর্দাদই খাইতেন, হিঞ্জে শাক ইহার প্রিয় খাদ্য, সেই জন্ত হিঞ্জে শাক সিদ্ধ কিবা তাহার ডালনা সর্দাদ খাইতেন, পটল, উচ্ছে, করলা, খিঞ্জে এ সকল তরকারী খুব ভাল বাসেন। পলতার বড়া এবং পলতার ডালনা প্রায় আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকেন।

ঘোবন অবস্থার কাছারীতে ২টার পর জল খাবার খাইতেন, তৎপরে বাড়ী হইতে মুচি, তরকারী, ভাজা ও হালুয়া প্রস্তুত করিয়া প্রেরিত হইত। ১৫ বৎসর তাহার এ অভ্যাস ছিল, পরে কেবল ভাল হালুয়া খাই-

তেন, কিছুকাল পরে একটি সন্দেশ এবং একটি মাত্র রসগোল্লা খাইতেন, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার ও ক্রমে কমাইয়া ছিলেন। ইদানীং কাছারীতে কিছুই খাইতেন না, ৫টার পর বাড়ী আসিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া ১টি ডাবের জল, ১টি সন্দেশ, দুইখানি লুচি ও একটু তরকারী খাইতেন, রাত্রে ৫৬খানি কটা খাইতেন, রাত্রে খাওয়া প্রায় ৯টার সময় সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু ওকালতী হইতে অবসর লইয়া রাত্রে প্রায় ১০১১টার সময় খাইতেন। মৎস্ত কিম্বা মাংস যদিও যৌবনকালে খাইতেন, তবে খাইবার বিশেষ লোভ ছিলনা, পাঠার মাংস খাইতেন কিন্তু মাংস ছই খাইয়া পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। ৪৮ বৎসর বয়সে মৎস্ত মাংস একেবারে পরিত্যাগ করেন কিন্তু পেটের অন্ত্রের জ্ঞাত চিকিৎসকের পরামর্শে কখন কখন কেবল মোরলা মাছের ঝোল খাইতেন।

যখন কলেজে পড়েন তখন হইতেই নস্ত্র লওয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সকল সময়ে লইতেন না, এখনও সেই অভ্যাস আছে। আহারের পর ১টা মাত্র পান খাইতেন, ১০ বৎসর হইল পান আদৌ খান না। রাত্রে আহার করিয়া তখনই শয়ন করিতেন না, প্রায় এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা গল্প করিতেন। জীবনে কখনও তানাক চুকট কিম্বা অল্প কোন নেশার বশ ছিলেন না, চা কখনও পান করেন নাই।

একটি অষ্টধাতু নির্মিত আংটি এখনও অঙ্গুলীতে পরান আছে। উক্ত আংটি একব্যক্তি বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সামনে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতে ইহার শরীর বেশ

বলিষ্ঠ ছিল এবং তিনি কখনও পথশ্রমে ক্লান্ত হইতেন না। প্রয়োজন হইলে ২১৩ ক্রোশ অনায়াসে হাঁটিতে পারিতেন।

### গীড়া—ঔষধ।

একবার ম্যালেরিয়া অরে কিছুদিন ভুগিয়া ছিলেন। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করায় এক বার শিরোবর্ণন হইয়াছিল। তখন অনেক চিকিৎসকই মানসিক শ্রম ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু একজন বিচক্ষণ কবিরাজের ঔষধ এবং উপদেশে আরাম হইয়া ছিলেন। দৃষ্টিশক্তি সমতাবেই আছে। চশমার সাহায্যে দেখিতে হয় না, যদিও এক্ষণে ৭১ বৎসর বয়স তথাপি এখনও রাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখা বেশ পড়িতে পারেন, ৪৫৪৬ বৎসর বয়সের সময় চোখে অন্ন অন্ন ঝাপসা দেখিতেন এবং জল পড়িত। সেই সময় অনেকে চশমা লইতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তিনি চশমা গ্রহণ করেন নাই, ছই চারি মাস একটু কঠোর সহিত লিখিতেন ও পড়িতেন বটে কিন্তু তাহার পর সে ভাব কাটিয়া গিয়াছিল এবং চক্ষু পূর্বের জায় সতেজ হইয়াছিল। কখনও রাত্রে গ্যাসের আলো কিম্বা প্রবল কেরোসিনের আলোর লেখা পড়া করেন নাই। প্রত্যহ রাত্রে তাঁহার বসিবার ঘরে নারিকেল তৈলের সেজের আলো এবং শয়ন কক্ষে রেড়ীর তৈলের প্রদীপ জলিত, সারা রাত্রি অল্প কিম্বা সর্দি কাসি হইলে প্রথমে আদা ও বিষপত্রের রস খাইতেন এবং উপবাস দিতেন, যদি তাহাতে না কমিত তখন কবিরাজ কিম্বা ডাক্তারের ঔষধ খাইতেন, আদা ও বিষপত্রের উপর বড়ই শ্রদ্ধা ছিল, বাড়ীতে ছোট্ট ঘরের অন্তরঙ্গ হইলে আদা ও বিষপত্রের রস খাওয়াইতে বলিতেন।

রায়ে কখন কখন ছুঁয়ের সহিত মনেকা  
কিধা কিস্মিস মিশ্রিত করিয়া খাইতেন।

**ঐশ্বর্য্যভাব** হাইকেটেব উকীল মান-  
নায় শালিগ্রাম সিং মহাশয়ের কলিকাতার  
ভবনে প্রায় সন্ধ্যার পর রামায়ণ পাঠ হইত,  
ইনি প্রত্যহ শ্রুতিতে যাইতেন, এবং পূজার  
ছুটা হইলে উক্ত সিং মহাশয়েব কৈলোয়ারের  
উদ্যানভবনে যাইতেন, তথায় অনেকগুলি বিহারী  
ভদ্রলোক একত্র হইয়া সমস্তের রামায়ণ পাঠ  
করিতেন। পাঠ শুনিয়া ইহার ভাবের উদয় হইয়া  
চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রু পতিত হইত। এরূপ  
ভক্ত শ্রোতা পাইয়া তাঁহারি আনন্দের সহিত

রামায়ণ পাঠ করিতেন। কৈলোয়ারে অব-  
স্থিতিকালে অনেককণ শোণ নদীর সৈকতে  
বসিয়া তুলসী দাসের রামায়ণ গান করিতেন।

৭৫ বৎসর বয়সে ওকালতী হইতে একে-  
বারে অবসর গ্রহণ করেন, তখন সকল সময়ে  
বাসায় বসিয়া নিরন্তর জপ করিতেন, বেড়ান  
একবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে  
সঙ্গে আহার খুব কমাইয়াছিলেন।

একণ্ঠে ৭২ বৎসরে পড়িয়াছেন, শরীরে  
কোন ব্যাধি নাই তবে চলিবার শক্তি একে-  
বারে খুব কম, দৃষ্টি শক্তি সমান আছে,  
চশমার আবশ্যক হয় না।

## আত্ম । \*

### [ কবির ৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত ]

সকল কলের শ্রেষ্ঠ হয় আত্ম ফল।

ভক্ষণেতে সখ্য-ভাব, কলে মোক্ষ ফল ॥

সহকার সহ কার তুলনা বা দিব ?

অনন্ত মহিমা তাঁ'র ইঙ্গিতে কহিব।

শুন সবে রসালের জন্ম বিবরণ।

নিমেঘে ত্রিতাপ জালা হবে নিবারণ ॥

লক্ষ্যপূরে দশানন আপন বাগানে।

রেখে ছিল পুঁতে গাছ আতি সাবধানে ॥

\* ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর খেচ কবি। একজন রসিক লেখক “মাহেন্দ্র ফোনের” সঙ্গে গুপ্ত কবির  
কাব্যের তুলনা দিয়াছিলেন, “নবজীবনের” পাঠক বর্ণের তাহা অস্বিক্ষিত নাই। মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি—তাহার  
সংলগ্ন ধর্ম ছিল। বাহায়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন—তাহাদের মধ্যে অনেকই গুপ্ত কবির  
শিষ্য। এমন কি সাহিত্য সম্রাট, বঙ্গের চন্দ্র এবং নাট্যকার দীনবন্ধু গুপ্তকবির হাতের বঁটার করিয়াছিলেন।

কিন্তু ছুঁয়ের বিধর গুপ্তকবিকে বাঙ্গালী ভুলিতে বসিগাছে। উদীয়মান লেখক অমরেন্দ্রনাথ রায় ও হেমেন্দ্র  
হুদার—রথ্যে রথ্যে দীর্ঘর ভুঁয়ের এশঙ্ক লইয়া একটু নাড়া চাড়া করেন, গুপ্তকবির ৭৭ আর কেহই গোপন হয়,  
বীকার করেন না। বৈষ্ণব জাতির মধ্যে ও আর ঈশ্বর ভুঁয়ের আলোচনা দেখিতে পাইনা।

গুপ্তকবির বাটী ছিল—কাঁচড়াপাড়া গ্রামে। বাটীটা এখন ও বর্তমান আছে, কিন্তু এখন সেই নবরসের আধার  
বহিঃস্থ—একদম কুড়কাত আসিয়া “গাছ” হুয়াইতেছে। বৈষ্ণব ধর্মের কোনও ধন হুঁয়ের, জাতীর কবির স্তুতি  
রসার ভক্ত—বাটীটি কিসিতে পারেন নাই।

ঈশ্বর ভুঁয়ের কতকগুলি কবিতা আরোহের হৃদয়ত হইয়াছে। কাঁচড়াপাড়ার এসিষ্ট পণ্ডিত ৮ বাবুজি  
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কবিতাগুলি মৌল্য ভীষণত কবিতা—কোনোদ্রব্য লব-  
ধায় পতিত। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে এই—অধিগণকে কবিতাগুলি ধারি করিয়াছেন। একটু ভুঁয়কবি  
এতিনাসা সতীশ বাবুকে আরও আত্মরিক কুতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যে কবিতাগুলি—বাছ্য ভুঁয়ের উপযোগী হইবে, আর সে কবি কবিতা “আরোহেন্দ্র” প্রকাশিত করিব।

সীতা-অধিবর্ণে গেলে বীর হুয়মান।  
 জানকী জানান তা'রে আমারে সন্ধান।  
 শুনি রাম-দাস বড় পাইল আরাম।  
 জয়রাম বলে কপি ভাঙ্গিল আরাম।  
 শাস খেয়ে আঁটা বোর দিল ছড়াইয়া।  
 সে আঁটাতে হ'ল গাছ ব্রহ্মাণ্ড বাপিরা।  
 হনুর প্রসাদে তৃপ্ত মনুর সন্তান।  
 রামায়ণে এ কথার রয়েছে প্রমাণ।  
 যে বানর আমগাছ মর্ত্যে আনিয়াছে।  
 তা'র বংশধর যদি ওঠে তা'র গাছে।  
 লাঠী মারি, ঢিল ছুঁড়ি, গাল পাড়ি কত।  
 অকৃতজ্ঞ কেবা আছে আমাদের মত।  
 হনুর সে উপকার কেহ নাহি মানে।  
 গুণীর আদর কিন্তু ইংরাজেরা জানে।  
 ধন্ত দাদা! ডারুইন! তুমি বুদ্ধিমান।  
 “আদি” বলে বানরের বাড়িয়েছ মান।  
 তোমাদের বর্ণ সাদা, মনটাও সাদা।  
 সেইগুণে আমরা ত বুঝে মরি দাদা।  
 প্রথমে যে যে জিনিষ করে আবিষ্কার।  
 তোমরা তখন তা'রে দাও পুরস্কার।  
 মাথের প্রথমে ধরে বুদ্ধিতে মুকুল।  
 গন্ধ পেয়ে অন্ধ হ'য়ে, নারী ছাড়ে কুল।  
 শর ব'লে ফুল-শর ফুলে রাখে তুণে।  
 কে না হয় বিমোহিত রসালের গুণে।  
 কান্ডনেতে বাঁধে ‘গুটা’ চৈত্রে ধরে ধাঁচ।  
 বৈশাখে বাকড়া ভাব—বসন্তা কাঁচ।  
 জ্যৈষ্ঠ মাসে পেকে হয় অতি সুমধুর।  
 সেসে বিরস লাগে অধর বধুর।  
 মনোহর কলেবর মানস টলায়।  
 দেখা মাত্র জল সরে অমনি নোলায়।  
 কুঁড়ে বেঁধে ব'সে থাকি গাছের তলায়।  
 কেবল আহা করি গলায় গলায়।  
 বত পাই, তত খাই, আশা নাহি মেটে।  
 ইচ্ছা হয় সব শুদ্ধ পুরে কেলি পেটে।  
 হায় বিধি! এ ফলেতে কেন দিলে আঁটা।  
 আপনি আপন সৃষ্টি করিয়াছ-মাটা।  
 মধু চেনে মিষ্ট ব'লে “মধুকল” নাম।  
 লিখেছেন কত গুণ বৈজ্ঞানিক-ধাম।  
 যা'র ঘরে বিরাজিত গাছ পাকা আম।  
 তা'র করতলে—ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম।  
 বল বর্ণ রক্ত মাংস শুদ্ধ বুদ্ধি করে।

কিছু শ্লেষাকর, কিন্তু বায়ু পিত্ত হরে।  
 কচি আম কোল খেলে দেহ ঠাণ্ডা হয়।  
 সিদ্ধ আম, রিক্ত গুণে মেদ করে ক্ষয়।  
 কেশী চূর্ণ উপকারী বমি অতিসারে।  
 বোটার আঠার তেলে চুলকণা যারে।  
 পাতার রসেতে নাশে রক্ত—আমাশয়।  
 ছাল বেটে লেপ 'দলে বাখা ভাল হয়।  
 সুখসেবা “আম্র খণ্ড” ভেবজ প্রধান।  
 খেলে, বৃদ্ধ যুবা সম হয় বলবান।  
 নিত্য গৃহে অরাভাব—দীন দুঃখী যা'রা।  
 আম খেয়ে একমাস পেট পালে তা'রা।  
 গুড় সহ ‘আম্বীর’ মধুর অম্বল।  
 অকটিতে পোয়াতীর প্রধান সম্বল।  
 মসলা মাথিয়া আম তেলে রাখ ফেলে।  
 “আমতল” নাম তা'র প্রাণ ঠাণ্ডা খেলে।  
 কাঁচা আম ফালা দিয়ে আতপ শুখাবে।  
 অকালে আমের স্বাদ—“আমচুরে” পাবে।  
 খোসা ছাড়াইয়া আম ঢেঁকিতে কুটিয়া।  
 সরিষা হরিত্রা আর লুণ মাখাইয়া,  
 নুতন হাঁড়িতে ক'রে যত্নে রাখ তুলে।  
 মাঝে মাঝে রোদ্রে দিও সরা খানি তুলে।  
 “কাহ্নলীর” সঙ্গে রেঁধে ইলিশের-টক,  
 সেই কালে খেতে—যা'র প্রাণে আছে সধু,  
 কারও বাড়ী দেখে যদি আমের আচার,  
 লজ্জা খেয়ে পরনারী করেনা আচার।  
 ঘন ছুখে আশ্রয়—অমৃত সমান।  
 দৈবে পেলো, সুখা ফেলে, দেবরাজ খান।  
 কানিতে ছাঁকিয়া রস রোদ্রেতে শুখাও।  
 অসময়ে রসময় ‘আমসব’ খাও।  
 শিলা বৃষ্টি ঝড়, পানী, কুয়াসা, তন্দর,  
 আমের এ পঞ্চ শত্রু—ব্যাত চরাচর।  
 এড়ালে এদের হাত, ভয়ে ফল পাই।  
 আত্মীয় গণের ল'য়ে পেট ঠেসে খাই।  
 একাকী গোপনে আম খেওনাক' কেউ।  
 হস্তা হ'য়ে মরে বাবে ডেকে কেউ কেউ।  
 নিজে থাকে, বিলাইবে, পুরকে খাওয়ায়ে।  
 তা' হ'লেই, স-শরীরে স্বর্গে চ'লে যাবে।  
 বাহার কিছর হ'তে পেরেছ এ আম,  
 আম খেয়ে নাম তাঁর জপ অবিরাম।

## বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ ।

অনুবাদ :-—জ্ঞান বা উদ্দেশ্য ভগ্ন হইলে  
কপাট-শয়ন হিতকর । বন্ধন জন্ত পাঁচটি  
কীলক (খোঁটা) একরূপ ভাবে রাখিবে যেন  
ভগ্ন স্থান চালিত না হয় । সন্ধিস্থলের দুই  
দিকে দুইটা করিয়া, পদতলে একটা, শ্রেণী-  
দেশে, গুষ্ঠবংশে বা বক্ষে একটা এবং স্বল্পসন্ধির  
উপরভাগে একটা কীলক দিয়া ভগ্ন রোগীকে  
বন্ধন করাই বিধি ।

কিরূপে ভগ্নস্থান বন্ধন করিতে হয়, কোন  
ধাতুতে কত দিন অন্তর বন্ধন পরিবর্তন করিতে  
হয়, অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের উত্তরস্থানে সপ্তবিংশতি  
অধায়ে তাহা বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে ।

ইহাতে আয়ুর্বেদের মহিমা স্পষ্টই প্রতীত  
হইতেছে । পূর্বে অস্থি ছেদনার্থে যে করপত্র  
(করাত) নামক শস্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে  
তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে অঙ্গ-ছেদনের  
(Amputation) জন্ত করপত্র প্রাচীন  
কালে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ভগ্নরোগে অস্থি-  
ছেদনের নাম মাত্র উল্লেখ নাই কেন ?  
এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে  
অস্থিছেদনের বিষয় অবগত হইলেও চিকিৎসা-  
শাস্ত্রের কলঙ্ক স্বরূপ অস্থিছেদন কার্যে চিকিৎসা-  
সকদিগকে নিরুৎসাহিত করিবার জন্ত বোধ  
হয় ভগ্নরোগে অস্থিছেদনের স্পষ্ট উপদেশ দেন  
নাই । যদিও সময়ে সময়ে অঙ্গছেদন না করিলে  
রোগীর বিপত্তি ঘটিতে পারে বলিয়া অঙ্গছেদন  
আবশ্যক হইয়া থাকে তথাপি অঙ্গছেদনকে  
কখনই সুচিকিৎসা বলা হইতে পারে না । যদি  
প্রয়োজনীয় অঙ্গছেদন করিয়াই রোগীকে  
আরোগ্য করিতে হয় তবে চিকিৎসা শাস্ত্রের

ফলবত্তা কোথায় ? আর রোগীকে শমনভবনে  
প্রেরণ করিয়া রোগমুক্ত করিলে তাহাকেই বা  
কুচিকিৎসা বলিবনা কেন ? কিত ধাতু হইতে  
চিকিৎসা শস্ত্র নিষ্পন্ন হইয়াছে । কিত শস্ত্রের  
অর্থ রোগাপনয়ন, সুতরাং রোগ নাশ করা-  
কেই চিকিৎসা বলে । কিন্তু এখানেত রোগ  
নাশ করা হইল না । রোগীর অঙ্গনাশ করা  
হইল । সুতরাং ইহাকে চিকিৎসা কি করিয়া  
বলিব ? নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে  
যে অঙ্গছেদন ব্যতীত যে রোগ আরোগ্য হইতে  
পারিত, একরূপ অনেক স্থলে আধুনিক পাশ্চাত্য  
চিকিৎসকগণ অঙ্গছেদন করিয়া থাকেন ।

চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষতঃ শস্ত্র চিকিৎসা-  
সার ভিত্তি স্বরূপ শব-ব্যবচ্ছেদ (Dissection)  
সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :-

ত্বকৃপর্গ্যন্ত দেহস্ত বোহয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ ।

শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈব বর্ণ্যতে হস্তেষু ক্লেমুভিঃ ॥

তন্মাদ্রিসংশয়ং জ্ঞানং হস্তা শল্যস্ত বাস্তবতা ।

শোধয়িত্বা মৃতং সমাগ্ দ্রষ্টব্যোহঙ্গবিনিশ্চয়ঃ ॥

প্রত্যক্ষতো হি যদৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যতবেৎ ।

সমাসতত্ত্বভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনং ॥

তন্মাত্র সমস্ত-গাত্র মবিবোধহত মদীর্ঘ-  
ব্যাধিগীড়িত মবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টাঙ্গপুত্রীবাং  
পুরুষমপহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঙ্করহঃ  
মুক্তবলকুশলশাধীনা মন্ততমেনা বেটীভাল  
মপ্রকাশে মেষে কোথয়েৎ, সম্যক প্রকৃষিত-  
কোড়ত্য অতো দেহং সঙ্কল্প্যত্বাহশীরস্মানবেহ  
বকলকুটীনামন্ততমেন শনৈঃ শনৈরায়র্যং-  
দগাদীন সর্কানেন বাহ্যভ্যন্তরাদপ্রত্যক্ষবিশে-  
বানু বখোক্তানু লক্ষ্যেচ্চকুবেতি ।

অমুবাদ :—শরীরের স্বক্ প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্ষা করা হইল এই শল্যাতন্ত্র ভিন্ন অঙ্গ কোন তন্ত্রে তাহা বর্ণিত হয় নাই। শরীরে প্রবিষ্ট শল্য আহরণ করিতে হইলে শরীরের কোথা কি আছে তাহার নিঃসংশয় জ্ঞান থাকা উচিত। এই নিঃসংশয়জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মৃতদেহ শোধন করিয়া অঙ্গ-বিনিশ্চয় করা উচিত। কারণ প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্ররূপ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া শিক্ষা করিলে তবে সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সেইজন্ত সম্পূর্ণরূপ, বিবের দ্বারা মৃত নহে, অত্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাধি পীড়িত নহে এবং এক শত বৎসর অপেক্ষা কম বয়স্ক পুরুষের মৃতদেহ সংগ্রহ পূর্বক অস্ত্র ও পুরীষ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। অনন্তর মুগ্ধ (ভূণ বিশেষ) বহুল, কুশ বা শণ যে কোন একটা দ্রব্য দ্বারা উত্তম-রূপে বেটন করিয়া একটা পঞ্জরের (খাঁচা) মধ্যে রাখিয়া স্রোতোহীন নদীতে নির্জনে রাখিয়া পচাইবে। উত্তমরূপ পচিলে সাত দিন পরে উদ্ধৃত করিয়া বেণার মূল, কেশ, বা বাঁশের স্বক্, ইহাদের যে কোন একটীর কুটী প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা ধীরে ধীরে বর্ণপূর্বক বাহ্য এবং অভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল চক্ষু দ্বারা দেখিবে।

অধুনা পাশ্চাত্য দেশে লর্ড লিষ্টার উন-বিংশ শতাব্দীর প্রথমে এন্টিসেপটিক্ (anti-septic) নামক যে বিষ-প্রতিষেধক চিকিৎসার প্রচার করিয়াছেন তাহাও আয়ুর্বেদকার-গণের অবদিত ছিল না। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ধূনা ও মল্লিকা রোগজীবাণুবাহক বলিয়া ত্রণ রোগীকে এই সকল পরিহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, ঠিক এই কারণেই প্রাচীন সূত্রত গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে :—

ত্রণমভিমুখ প্রক্ষাল্য কথ্যেণ গোতেনোদ-  
কমাদায় তিল-কক-মধু-সর্পিঃ প্রাগাঢ়ামোবধ-  
যুকাং বর্জিঃ প্রণিধধ্যাৎ.....ততো গুণ-  
গুণগুরুসজ্জরসবচাগোরসর্বপচূর্ণৈল বণনিষপত্র-  
ব্যামিশ্রৈরাজ্যযুক্তৈ ধু ণৈধুপরেদিতি।

অমুবাদ :—ত্রণ পীড়ন ও কথার জল দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার শুক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। পরে তিলবাটা, মধু ও ঘৃত গাঢ়-রূপে মিশ্রিত বর্জিতে (Lint) মাখাইয়া ত্রণ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।.....অনন্তর গুণগুণলু ধূনা, অশুর, বচ, খেতসর্বপ চূর্ণ করিয়া লবণ, নিষপত্র ও ঘৃত সহ ধূপ প্রস্তুত করিবে এবং সেই ধূপের ধূম ত্রণে লাগাইবে।

মধু ও ঘৃত উৎকৃষ্ট বিষ প্রতিষেধক (anti-septic) এবং উক্ত ধূম প্রয়োগ দ্বারাও ত্রণ বিষাক্ত (Septic) হইবার ভয় নিরাকৃত হয়।

কল্পতরু সদৃশ আমাদের দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রে কেবল শস্ত্র প্রয়োগ নহে, পরন্তু ক্ষার ও অম্লি প্রয়োগ বিষয়েও সুন্দর উপদেশ আছে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ক্ষার ও অম্লি প্রয়োগের বিধি একরূপ উৎকৃষ্ট এবং অব্যর্থ, যে তাহার নিকট পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষার ও অম্লি প্রয়োগ বিধি নিতান্ত অকিঞ্চিংকর বলিয়া বোধ হয়।

মহামতি সূত্রত বলিয়াছেন :—

শস্ত্রামুশস্ত্রোভ্যঃ ক্ষারঃ প্রধানতম স্বেদ-  
ভেদ্যলৈখ্যকরণা ত্রিদোষদ্বাধিশেষ-ক্রিয়া-কর-  
ণাচ্চ। স বিবিধঃ প্রতিসারণীর পানীরশ্চ।  
তত্র প্রতিসারণীর-কুটীকটিম-মজ্জকিলাস-মণ্ডল  
ভগন্দর্যার্ক-মুঠেত্রণ-নাড়ী-চর্মকীল-তিলকালক-  
শুল্ক-ব্যঙ্গ-মশক-বাহ-বিদ্রমি-ক্রিমি-বিদার-মূপ-  
দিশ্রুতে; সপ্তম্ চ মুখরোগেব পূজিষ্যামি।



জিহ্বাপকুশ-দন্ত-বৈদর্ভে তিস্যুচ রোহিণী  
যেতেষু চৈবামৃতপ্রণিধানমুক্তং । পানীয়স্ত  
গরুড়মোদরাগ্নি-সঙ্গ-জীর্ণারোচকানাহ-শর্করা-  
মধ্যাতান্তরবিদ্রি-ক্রিমি-বিষাশঃসুপযুক্ত্যতে ।

অনুবাদ :—শত্রু এবং অন্ত্রশত্রু (অগ্নি  
জলোকা) অপেক্ষা ক্ষার শ্রেষ্ঠ । কারণ ছেদ্য  
ভেদ্য ও লেধ্য কারক, ত্রিদোষনাশক এবং  
বিশেষ ক্রিয়ারকারক । ক্ষার দুই প্রকার, যথা  
প্রতিসারণীয় এবং পানীয় । তন্মধ্যে প্রতি-  
সারণীয় ক্ষার কুষ্ঠ, কটিম, কিলাস, মদ্র,  
মণ্ডল, ভগন্দর, অর্জুন, দুষ্টব্রণ, নাড়ীক্ষত,  
চর্মকীল, তিলকালক, গুল্ল, বাঙ্গ, মশক, বাহু-  
বিদ্রি, ক্রিমি, বিষ, অর্শঃ, সাত প্রকার মুখ-  
রোগ এবং তিন প্রকার রোহিণী রোগে  
প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আর পানীয় ক্ষার দূরীষ,  
ঔষ, উদর, অগ্নিমান্য, অজীর্ণ, অকটি, আনাহ,  
শর্করা, অশ্মরী, অন্তর্বিদ্রি ক্রিমি, বিষদোষ ও  
দর্শঃ রোগে প্রয়োগ করা যায় ।

ক্ষারাদিগিরীয়াং ক্রিয়ারূপ ব্যাখ্যাতন্ত-  
দ্বন্দ্বানাং রোগাণামপুনর্ভাবান্তেবজ-শত্রুক্ষারৈ  
রসাধ্যানাং তৎসাধ্যত্বাচ্চ, অথেনানি দহনো-  
পকরণানি । তদ্যথা । পিঙ্গল্যজাশুকলোদন্ত-  
শর-শলাকা--জাঘবোষ্ঠেতর-লোহাকোদ্র--গুড়-  
সেহাশ্চ । তত্র পিঙ্গল্যজাশুকলোদন্তশরশলা-  
কাভগ্গতানাং । জাঘবোষ্ঠেতর-লোহানি মাংস  
গতানাম্ । কোদ্রগুড়সেহাঃ শিরাষাসুস্ফা-  
স্মিতগতানাম্ ।

অনুবাদ :—ক্ষার অপেক্ষা অগ্নি শ্রেষ্ঠ, ইহা  
অগ্নি প্রয়োগের ফল দেখিয়া বুঝা যায় ।  
অপিচ, অগ্নিদ্বারা ব্যাধির পুনরায় উৎপত্তি হয়  
না এবং ঔষধ, শত্রু ও ক্ষারের অসাধ্য  
ব্যাদিও অগ্নি প্রয়োগে প্রশমিত হইয়া থাকে ।  
পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর, শলাকা

জাঘবোষ্ঠ, লোহ, তাম্র, রোপ্যাদি, মধু, গুড়  
এবং ঘৃতাদি সেহ দ্রব্য দহন কার্যের উপকরণ ।  
তন্মধ্যে পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত শর ও  
শলাকা স্বকৃৎ রোগে, জাঘবোষ্ঠ, লোহ, তাম্র ও  
রজতাদি মাংসগত রোগে আর মধু ও ঘৃতাদি  
সেহ দ্রব্য সিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিগত ও অস্থি  
গত রোগে দহন কার্যে ব্যবহার্য ।

বিষর বাহুল্য এবং সময় সংক্ষেপ ভয়ে  
এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে পারিলাম না ।  
কিন্তু এতদ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে আয়ু-  
র্বেদে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগের সুন্দর ব্যবস্থা  
আছে ।

অনন্তর আমরা ধাত্রী বিত্তা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত  
আলোচনা করিয়া শল্য তন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য  
শেষ করিব । সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে  
চতুর্থ মাসে জন্মের স্তব্ধব্রতের ক্রিয়া আরম্ভ  
হয় । পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতেও অষ্টা-  
দশ সপ্তাহ কাল হইতে বিংশতি সপ্তাহের মধ্যে  
জন্মের স্তব্ধব্রত রক্ত সঞ্চালন (Fetal cir-  
culation) করিয়া থাকে । পাশ্চাত্য দিগের  
এই আধুনিক আবিষ্কার বহু পূর্বে হইতেই  
প্রাচীনগণ অবগত ছিলেন ।

মূঢ়গর্ভ (Difficult labour) চিকিৎসা  
সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

নাত্যকষ্টতমমতি যথা মূঢ়গর্ভল্যো-  
জ্ঞরূপে নত্ব হি বোনিষকং-দীর্ঘারবিররগর্ভাশ-  
নানাং মধ্যে কর্ম কর্তব্যং স্পর্শেন । উৎকর্ষণা-  
পকর্ষণহানাপবর্তনোদবর্তন ভেদনচ্ছেদনপীড়ন-  
জ্বকরণ দারণানি চৈকহস্তেন গর্ভং গর্তিনী  
বা হিংসতা, তন্মাদ্বিগতিশাস্ত্রা পক্ষক বহুশা-  
স্মারোপক্রমেণ ।

অনুবাদ :—মূঢ়গর্ভের শল্যোদ্ধারের জ্ঞান  
কষ্টতম আর কিছুই নাই । ইহাতে বোনি,  
দীর্ঘ, অরবির, রোগ, গর্ভাশ, নানা, মধ্যে কর্ম কর্তব্য  
স্পর্শ, উৎকর্ষণ, পকর্ষণ, হানি, পবর্তন, উদবর্তন, ভেদন,  
চ্ছেদন, পীড়ন, জ্বকরণ, দারণানি চৈকহস্তেন গর্ভং গর্তিনী  
বা হিংসতা, তন্মাদ্বিগতিশাস্ত্রা পক্ষক বহুশা-  
স্মারোপক্রমেণ ।

যজ্ঞং, প্রীহা, অন্নবিবর ও গর্ভাশয়ের মধ্যে স্পর্শ দ্বারা কার্য্য করিতে হয় এবং উৎকর্ষণ ( উপরের দিকে তোলা ), অপকর্ষণ ( নীচ দিকে নামান ), স্থানাপবর্তন জগকে পরি-বর্তিত করিয়া অধোমুখে আনয়ন ) উদ্বর্তন ( অধোমুখ জগকে উতান করা ), ছেদন ভেদন, গীড়ন, ঋজু করণ ও দারণাদি এক হস্ত দ্বারাই করিতে হয়। ইহাতে গর্ভ বা গর্ভিনীর হিংসা হইতে পারে বলিয়া গর্ভিণীর স্বামীকে ও রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক কার্য্য করিবে।

গর্ভের অবরোধ এবং তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

মৃত্তেচোতানার্য্য আভুগ্ধসক্ধ্যা বজ্রাধার-কোন্নমিতকট্যা ধ্বননগ-মুক্তিকা-শাঙ্গলীমুৎস-স্থতাভ্যাং ব্রক্মিষ্য হস্তং বোনো প্রাবিশ্ত গর্ভমুপহরেৎ। তত্র সন্ধিত্যামাগতমল্লোম-মেবাঞ্জে। এক-সক্ধ্যা প্রপন্ন-স্ততের সন্ধিৎ প্রসাধ্যাপহরেৎ। ক্ষিগ্দেশোনাগতস্ত ক্ষিগ্দেশং প্রপীড্যোক্ত মুৎক্ষিপ্তা সন্ধিপী প্রসাধ্যাপহরেৎ। ত্রিগ্যাগতস্ত পরিষত্বেষ তিরশ্চীনস্ত পশাদর্কমুর্দ্ধ মুৎক্ষিপ্য পূর্বাদ্ধিম-পত্যপথং প্রত্যার্জ্জব মানীয়াপহরেৎ। পার্শ্বাপ-বৃত্ত শিরসঃসং প্রপীড্যোক্তমুৎক্ষিপ্য শিরোহ-পত্যপথমানীয়াপহরেৎ। বাহুয় ত্রুতিপন্ন-জ্যোক্তমুৎপীড্যাংসো শিরোহল্লোমমানীয়া-পহরেৎ।

অনুবাদ :—গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে গর্ভিনীকে উতানভাবে শায়িত করিয়া উরুদ্বয় অন্ন বজ্র-ভাবে সংস্থাপন পূর্ব্বক কটির নিয়মে বজ্রা-ধার রাখিয়া কটি উন্নত করিবে। অনন্তর ধনুর্ধ্ব, গিরিমুক্তিকা, শাঙ্গলীনির্যাস ও যুত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা হস্তে মাখাইবে এবং সেই হস্ত যোনি পথে প্রবিষ্ট করিয়া

সন্তান বাহির করিবে। গর্ভস্থ সন্তানের উভয় সন্ধি বাহির হইয়া অল্লোম ভাবে ( নীচের দিকে ) টানিয়া বাহির করিবে। এক সন্ধি বাহির হইলে অপর সন্ধি প্রসা-রিত করিয়া টানিয়া বাহির করিবে। নিতম্ব-দেশ প্রসব পথে উপস্থিত হইলে নিতম্ব দেশ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সন্ধি দ্বয় প্রসারিত করিয়া বাহির করিবে। জগ পরিষের ( চড়কা ) দ্বায় ত্রিগ্য ভাবে থাকিলে পায়ের দিগ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মস্তক নিম্ন দিকে আনিয়া বাহির করিবে। জগের মস্তক পার্শ্ব-দেশে অপবর্তিত হইয়া অবস্থিত করিলে এবং স্বদ্ব অপর পথে আসিলে স্বদ্ব উর্দ্ধে ঠেলিয়া মস্তক অপর পথে আসিলে স্বদ্ব দেশ উর্দ্ধদিকে তুলিয়া মস্তক অপর পথে আনিয়া বাহির করিবে।

গর্ভস্থ মৃত সন্তান ছেদন এবং বহিকরণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

তত্র স্ত্রিয়মাখ্যাত মণ্ডলাগ্রোণাঙ্গুলীশস্ত্রেণ বা শিরো বিদার্য্য শিরঃ কপালাস্তাঙ্ঘ্রিত্য শঙ্কনা গৃহীত্বোরসি কক্ষায়াং বাপহরেৎ। অভিরে শিরসি চাক্ষিকুটে গণ্ডে বা অংসসক্তস্তাংসদেশে বাহুং ক্ষিত্বা দৃতি মিবাভ্যং বাতপূর্ণোদরং বা বিদার্য্য নিরস্ত্রাঙ্গাণি শিথিলীভূতমাহরেৎ। জঘনসক্তস্ত বা জঘনকপালানীতি।

যদ্বদঙ্গং হি গর্ভস্ত তস্ত সজ্জতি তত্ত্বিক। সমাধিনিহরেচ্ছিত্বা রক্ষোদারীঞ্চ যতঃ ॥  
গর্ভস্ত গতমস্ত্রিত্বা জায়ন্তেহ নিলকোপতঃ।  
তদ্রানন্নমতিবৈক্যে বর্তেত বিধিপূর্ব্বকম্ ॥  
নোপেক্ষেত মৃতঃগর্ভঃ মুহূর্ত্তমপি পণ্ডিতঃ।  
স হাঙ জননীংহস্তি নিকচ্ছুংসং পণ্ডং বধা ॥  
মণ্ডলাগ্রোণ কর্তব্যং ছেদমস্ত্রিক্রীড়নতঃ।  
বুদ্ধিপত্রং হি তীক্সাং নারীং হিংস্তাং কদাচিৎ।

অম্ববাদ : গর্ভাণীকে আশ্বাসিত করিয়া মণ্ডলাগ্র বা অম্বলীশস্ত্র দ্বারা প্রথমে গর্ভের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া শঙ্খ ( আকর্ষণী ) দ্বারা আকর্ষণ করিয়া খণ্ডীকৃত ধর্পর সকল নির্গত করিবে এবং বক্ষ ও কক্ষদেশ ধরিয়া টানিয়া নির্গত করিবে। মস্তক বিদীর্ণ করিতে না পারিলে অক্ষকূট বা গণ্ড দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বাহির করিবে। মৃত সন্তানের রক্ত দেশ দ্বারা অপত্য পথ সংরুদ্ধ হইলে বাহ ছিন্ন করিয়া বাহির করিবে। জ্রণের উদর দৃতির ( ভিত্তি, মশক ) জায় বায়ুপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিলে উদর বিদীর্ণ করিয়া অস্ত্র সকল নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে দেহ শিথিল হইয়া পড়িলে টানিয়া বাহির করিবে। জঘন দেশ দ্বারা অপত্য পথ রুদ্ধ হইলে জঘন দেশের অস্থি কাটিয়া বাহির করিবে।

গর্ভের যে অঙ্গ অপত্য পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে প্রথমে সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া গর্ভাণীকে যত্ন পূর্বক রক্ষা করিবে। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ জ্রণের নানা প্রকার গতি হইয়া থাকে। কিন্তু চিকিৎসক এরূপ অবস্থায় বিধি পূর্বক চিকিৎসা করিবেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি মৃত গর্ভকে মুহূর্তমাত্রও উপেক্ষা করিবেন না। কারণ উহা জননীকে রুদ্ধশ্বাস পশুর জায় সত্তর বিনষ্ট করিয়া থাকে। মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারাই মৃতগর্ভ ছেদন করা উচিত। বৃদ্ধিপত্র শস্ত্র অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলিয়া প্রস্থতিরও কখন কখন অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

হে মহাভাগগণ ! আমরা যে সকল শস্ত্র বচন উদ্ধৃত করিলাম তাহা শ্রবণ করিয়া কেহ কি বলিতে পারেন যে প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যাজ্ঞবল্ক্য ও শস্ত্র চিকিৎসা ছিল না বা সীমাস্ত্র ভাবে ছিল ? এরূপ স্পষ্ট প্রশ্ন থাকিতেও

বাহারা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে শস্ত্র চিকিৎসা-কৌশল বিহীন বলেন আমি তাঁহাদিগকেই এই কথা বলিতেছি যে হর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে জ্ঞান-হীনতা, নচেৎ আভিজ্ঞাত্যাভিমানিতা তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে বাধ্য করিয়া থাকে।

অধুনা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও যে আয়ুর্বেদীয় শস্ত্র চিকিৎসা পরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহা নিতান্ত আনন্দের বিষয়। মেডিকেল কালজের অধ্যাপক ডাক্তার চার্লস মহোদয়ের কৃত কার্যের বিষয় পূর্বেই বলিয়াছি। এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নামক প্রসিদ্ধ স্মৃহৎ অভিধানে এসম্বন্ধে কি লিখিত হইয়াছে শ্রবণ করুন :—

In both branches of the Aryan stock surgical practice ( as well as medical ) reached a high degree of perfection at a very early period. It is a matter of controversy whether the Greeks got their medicine ( or any of it from the Hindus ( through the medium of Egyptian priesthood ), or whether the Hindus owed that high degree of medical and surgical knowledge and skill which is reflected in Charaka and Susruta ( commentators of uncertain date on Yajurvede ) to their contact with western civilisation after the campaigns of Alexander. The evidence in favour of the former view is ably stated by wise in the introduction to his history of medicine among the Asiatics. The correspondence between the Susruta and Hippocratic collection is closet in the sections relating to

the ethics of medical practice ; the description also of lithotomy in the former agrees almost exactly with Alexandrian practice as given by Celsus. But there are certainly some dexterous operations described in Susruta (such as the rhinoplastic) which were of native invention, the elaborate and lofty ethical code appears to be of pure Brahmanical origin ; and the very copious materia medica (which included arsenic, mercury, zinc and many other substances of permanent value) does contain a single article of foreign source. There is evidence also (in Arian, strabo and other writers). That the east enjoyed a proverbial reputation for medical and surgical wisdom at the time of Alexander's invasion. We may give the first place, then, to the Eastern branch of Aryan race in a sketch of the rise of surgery.

অনুবাদ :—আর্যজাতির প্রাচ্য প্রাচীণ উভয় শাখাই বহুকাল পূর্বে শস্ত্র চিকিৎসার বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। গ্রীকেরা ইজিপ্ট দেশের পুরোহিত গণের সাহায্যে হিন্দুদিগের নিকট হইতে তাহাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞা অথবা তাহার কিয়দংশ শিক্ষা করিয়াছিল কিবা হিন্দুরা তাহাদের বহুপ্রাচীন যজুর্বেদমূলক চরক ও সুশ্রুত লিখিত উন্নত কায়চিকিৎসা ও শস্ত্র চিকিৎসা আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পর পাক্ষাত্য জাতির সংসর্গে আসিয়া শিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। প্রথমোক্ত ব্যাপারের সত্যতা ডাক্তার ওয়াইজ ভাহার “এশিয়াবাসির চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতি-

হাস” নামক পুস্তকের ভূমিকায় যুক্তিযুক্তরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। সুশ্রুত লিখিত চিকিৎসা-সূত্রের সহিত হিপোক্রেট কর্তৃক সংগৃহীত চিকিৎসা শাস্ত্রগুলির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। অশ্বরী রোগে শস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে সুশ্রুতে যেরূপ উপদেশ আছে, আলেকজান্ডা নগরের চিকিৎসক সেলসস কর্তৃক লিখিত চিকিৎসা তাহার অনুরূপ কিন্তু সুশ্রুতের লিখিত কতকগুলি সুন্দর শস্ত্রচিকিৎসা (যেমন ছিন্ননাসিকার চিকিৎসা) নিশ্চয়ই তদদেশীয় আবিষ্কার। চিকিৎসা নীতি সম্বন্ধে যে সুন্দর এবং উন্নত উপদেশ আছে তাহা বৈদিককালে লিখিত। বহু বিস্তৃত ভেষজ-সংগ্রহ, বাহাতে আর্সেনিক, পারদ, দস্তা এবং তদ্রূপ অনেক দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তাহাতে একটাও বিদেশীয় বস্তু দেখা যায় না। এরিয়ান দ্বাবো এবং অজ্ঞাত লেখক গণের লিখিত প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় যে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ কালে তত্রত্য কায়-চিকিৎসা ও শস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রবাদবাক্য রূপে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং আর্যজাতির প্রাচীণ শাখাকেই শস্ত্রচিকিৎসার উন্নতি সাধন বিষয়ে প্রথম স্থান দিতে পারি।

একণে কায়তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গের মধ্যে কায়তন্ত্রাভ্যাসী চিকিৎসাই একণে সমধিক প্রচলিত। কায়তন্ত্র প্রসঙ্গে চরকে লিখিত হইয়াছে :—

“যদিহাস্তি তদজ্ঞাত যদেহাস্তি ন তৎ কচিৎ।”

অনুবাদ :—যাহা ইহাতে আছে তাহা অজ্ঞাত দেখিতে পাইবে, যাহা ইহাতে নাই তাহা কোথায়ও নাই। মহাবীর এই মহাবাক্যের সার্বকথা একণেও আমরা স্পষ্টপ্রত্যক্ষ করিতেছি।

কায়ত্ত আলোচনা করিতে হইলে চরকই আমাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু আয়ুর্ষে-  
দের ইতিহাস দ্বারা আলোচনা করিয়াছেন  
তাঁহারা জানেন যে চরকসংহিতা কায়ত্তের  
মূলগ্রন্থ নহে। মহর্ষি আত্রের কায়ত্ত শিক্ষা  
করিয়া তাঁহার শিষ্য অগ্নিবেশকে সে সঙ্কে  
উপদেশ দেন। সেই উপদেশ লাভ করিয়া  
অগ্নিবেশ ঋষি কায়ত্ত-প্রধান যে গ্রন্থ সংকলন  
করেন তাহা অগ্নিবেশসংহিতা নামে খ্যাত  
হয়। কালে অগ্নিবেশ সংহিতার অঙ্গহানি  
ঘটিলে চরক ঋষি সেই সংহিতার প্রতি সংস্কার  
করেন এবং তখন হইতে অধুনা পর্যন্ত উক্ত  
গ্রন্থ চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ আছে। পর-  
বর্তী কালে চরকসংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে  
মহামতি দ্রুতবল তাহার পুনঃ সংস্কার করেন।  
এইরূপে পুনঃ পুনঃ অঙ্গহানি ঘটায় এবং পুনঃ  
পুনঃ সংস্কৃত হওয়ার কায়ত্তের কতদূর অপ-  
কর্ষ ঘটয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।  
কিন্তু বতই অপকর্ষ ঘটুক না কেন আমরা  
চরকসংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া  
সেখাইব যে জগতে কায়ত্ত-প্রধান বত চিকিৎসা-  
শাস্ত্র আছে, এখনও চরকসংহিতা তাহাদের  
শীর্ষস্থানীয়।

চরকসংহিতার জনপদধ্বংসনীর অধায়ে  
লিখিত আছে যে সময়ে সময়ে কোন দেশে  
মহামারী প্রাদুর্ভূত হইলে তদ্রূপ অসংখ্য লোক  
এই প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে  
পতিত হয়। পৃথিবীর বহুদেশে মধ্যে মধ্যে  
এইরূপ মহামারী প্রাদুর্ভূত হইয়া অনেক নগর  
এবং জনপদকে শূন্যে পরিণত করিয়াছে,  
ইহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত  
আছেন। বিদেশীয় অনেক চিকিৎসক য-  
এইরূপ মহামারীর বিষয় লিখিয়া গিয়া-

ছেন এবং তাহার কারণ নির্দেশ করিতে চেষ্টা  
পাইয়াছেন। স্মরণ্য যে সঙ্কে আমাদের  
বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু সস্ত্রুতি ঐ যে  
ইউরোপ দেশে বিভিন্ন বল দৃষ্ট আতি ভীষণ  
সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অসংখ্য বহুনাশী  
যন্ত্র দ্বারা মুহূর্ত্ত অসংখ্য অগ্নিময় লোহ গোলক  
নিক্ষেপ পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ সৈনিকের ও অসংখ্য  
ব্যক্তির প্রাণনাশ করিতেছে, ঐ যে নিহত  
সৈনিকদিগের বিধবা পত্নী, পিতা, ভ্রাতা,  
ভগ্নী ও শিশু পুত্রের হাহাকার রবে গগনমণ্ডল  
পরিপূরিত হইতেছে এই মহা সময়ের বিষয়ও  
হৃদয়দর্শী আয়ুর্ষেদকার দিগের দৃষ্টি অতিক্রম  
করে নাই, বহু প্রাচীন যুগে এইরূপ মহাসমর  
সঙ্কে শাস্ত্রকার কি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়া-  
ছেন, আপনারা তাহা অল্পগ্রন্থ পূর্ব্বক শ্রবণ  
করুন :—

তথাশস্ত্র প্রভবস্তাপি জনপদবিধ্বংসস্ত  
অধর্ম্মহেতু ভবতি যেহিতপ্রবুদ্ধলোভক্ৰোধ-  
মানা তে দুর্জলানামস্ত আত্ম-ব্রজন-পরোপ-  
দাতার শত্রেণ পরস্পরং অভিক্রামন্তি পরান্  
বা অভিক্রামন্তি পরৈকী অভিক্রামন্ত ইতি।

এই উক্তির দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে  
পারিতেছি যে আয়ুর্ষেদকারগণ কেবল শরীর  
সঙ্কে নহে, পরন্তু মনোবিজ্ঞান সঙ্কেও বর্ধে  
গবেষণা করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ কায়ত্তের পথ্য প্রয়োগ জানেন  
উৎকর্ষ দেখাইতে প্রয়াস পাইব। শাস্ত্রে  
কথিত হইয়াছে :—

বিনাপি ভৈবজ্যৈর্য্যযিঃ পথ্যানেব নিবর্ত্ততে।  
নহু পথ্যাবিহীনানাং ভৈবজ্যানাং শতৈরপি।

অর্থবাদ :—উৎকর্ষ ব্যতীত কেবল অথ্য  
সেবন দ্বারা রোগ নিবারিত হইতে পারে কিনা

সুপথ্য সেবী না হইলে শত ঔষধেও রোগ নিবারিত হয় না।

পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে একরূপ মূন্দর জ্ঞান বোধ হয় আজিও জগতের অল্প কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। আর রোগে পথ্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—স্বরাসৌ লজ্জনং পথ্যং। অর্থাৎ অরের প্রথমে উপবাসই পথ্য। চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন যে প্রবল অরে শরীরের যাবতীয় যন্ত্র, বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্র নিজস্বভাবে থাকে। যে ক্ষেত্রে পথ্য পরিপাক করিবার সামর্থ্য থাকে না, শরীরে প্রভূত আম্লরস সঞ্চিত থাকে, সেরূপ ক্ষেত্রে লজ্জনের দ্বারা মহোপকারী পথ্য আর কি হইতে পারে? বিজ্ঞান-গর্ভিত পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র-কোবিদগণ আজিও এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্যক উপগন্ধি করিতে পারেন নাই। রোগীর পরিপাক করিবার শক্তি না থাকিলে, খাদ্য দিলে অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। ইহা অতীত আনন্দের বিষয় যে অরে পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে আহুর্কেন্দ্রকারগণ যে উপদেশ দিয়াছেন, অনেক বিজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসক ক্রমে তাহার সারবত্তা বুঝিতে পারিতেছেন।

কিন্তু সাধারণতঃ অরে লজ্জন হিতকর হইলেও অরবিশেষে পাচকাগ্নি একেবারে দুর্বল হয় না; অপচি দুর্বল ব্যক্তি, বৃদ্ধ, বালক এবং গর্ভিণী স্ত্রীর লজ্জন দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে। এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

তত্ত্ব মারুতকৃত্বা-মুখ-শোষ-ভ্রমাধিতে।

কার্য্যঃ ন বালে বৃদ্ধে বা ন গর্ভিণ্যাং ন দুর্বলে ॥

অনুবাদ :—বায়ু প্রধান অরে, অররোগীর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখ শোষ বা ভ্রম থাকিলে, অর-

রোগী বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা দুর্বল হইলে একেবারে উপবাস দেওয়া উচিত নয়।

নবম্বরে লজ্জন অমৃতভূগা হিতকর ভাবিয়া চিকিৎসক পাছে অতিরিক্ত লজ্জন দিয়া রোগীকে মৃত্যু মুখে পাতিত করেন সেই আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লজ্জনেনোপপাদয়েৎ।  
বলাধিষ্ঠান মারোগাং যদর্থোহয়ং ক্রিয়াক্রমঃ ॥

অনুবাদ :—বলের বিরোধী বলিয়া রোগীকে অতিরিক্ত লজ্জন দিবে না; কারণ যে আরোগ্যের অল্প চিকিৎসা তাহা বলের উপরই নির্ভর করে।

পথ্য একরূপ ভাবে দিতে হইবে যেন অস্বাস্থ্য না হয় এবং অরুচি না জন্মায়। এসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

সাতত্যাং স্বাধুভাবাং পথ্যং স্বেচ্ছামাগতম্।  
কল্পনাবিধিভিত্তৈঃ স্তৈঃ প্রিয়ং গময়েৎ পুনঃ।

অনুবাদ :—সর্বদা একরূপ পথ্য সেবন বা অস্বাস্থ্য বলিয়া পথ্যের প্রতি রোগীর বিদ্বেষ হইলে নানা রূপ কল্পনা করিয়া পথ্যকে রোগীর প্রিয় করিবে।

এপর্যন্ত বলিয়া শাস্ত্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। বিবিধ কল্পিত পথ্য যদি রোগীর রুচিকর না হয়। তজ্জন্ত শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

অরিতোহহিতমন্নীণাং যত্পাত্যাকুর্চির্ভবেৎ।  
অন্নকালেহ্যভুজ্ঞানো দ্বীয়তে স্মিয়তেহপিবা ॥

অনুবাদ :—অরিত ব্যক্তির অরুচি হইলে তাহাকে অহিতকর দ্রব্যও ভোজন করিতে দিবে। কারণ অন্নকালে (আহারের সময়) আহার না করিলে রোগী ক্ষীণ হয়, অস্বাস্থ্য তাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

## আয়ুর্বেদে আয়ুস্তত্ত্ব।

—:~:~:~:—

মধ্যযুগে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদ অধুনা বহু কৃতবিশ্ব শোকের বহু ও চেষ্টায় ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা বাস্তবিকই আমাদের আশা ও সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। দেহীমাত্রেরই স্বস্থ দেহ ও স্বচ্ছন্দমনে জীবনের দীর্ঘতা চিরবাঞ্ছনীয়। অশীতি-পর বৃদ্ধেরও জীবিতাকামা বলবতীই রহিয়া যায়। সংসারের জিতাপ বাঁহাদের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত না করিয়াছে, তাঁহাদের জুহুমন ও জুহুদেহ যে চির স্পৃহণীয় তাহা স্বাভাবিক। এক্ষণে কি কি উপায়ে ধর্মার্থ কামমোক্ষ চতুর্কপের আধারত্ব এই পাকভৌতিক দেহ ও মন অব্যাহত ভাবে সংরক্ষিত হয় তাহার উপায় জীব মাত্রেরই অমুসঙ্কেত, তাহাতে অমুমাত্রও সন্দেহ নাই। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ মানব ও জগতের হিতকামনায় ইহ পরজন্ম সম্বলজননী উপদেশাবলী অনেক কাল পূর্বেই প্রচার ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দেশ বৈদেশিকশিক্ষার ও অমুচিকীর্ষার বিভ্রান্ত, তাই আমাদের নিজস্বরে অনন্ত রস থাকিতেও আমরা পরের ধারে মুষ্টিভিক্ষার জন্ত লালারিত, তবে স্বধের বিষয় এখন নিজের ঘরে কি আছে জানিবার জন্ত অনেক শিক্ষিত লোকের অন্তর্দৃষ্টি বেনীয় শাস্ত্রাদির উপর নিপতিত হইতেছে। সুতরাং এ আন্দোলন ও গবেষণায় যুগে সাধারণ্যে ঋষিদিগের অমূল্য উপদেশ প্রয়োগিত হইয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়া বলিয়া আশা করা যায়। আয়ুর্বেদে আয়ুস্তত্ত্বের প্রথম অধ্যায়

৩—আয়ুর্বেদ

কোন কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। মহামতি চরক বলিয়াছেন—

“হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তত্ত্ব হিতাহিতং।

মানুষ তচ্চব্রতোকৃত আয়ুর্কেনঃ স উচ্যতে।

হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ, দুঃখায়ুঃ আয়ুর হিত ও অহিত এবং পরমায়ুর পরিমাণ যাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়। তাহাই আয়ুর্কেন নামে অভিহিত।

মহর্ষিহর্যশ্রুত আয়ুর্কেন শব্দের দুটা অর্থ করেন, “আয়ুরস্মিন্ বিস্ততে হনেন বা আয়ুর্কিন্মতীত্যায়ুর্কেনঃ” যদ্বারা আয়ুর বিষয় জানা যায় কিদ্বা যদ্বারা আয়ুলাভ করা যায়, তাহাই আয়ুর্কেন, সুতরাং আয়ু চেষ্টা দ্বারা ও লভ্য বুঝিতে হইবে। ইহাছারা আয়ুর্কেন কি এবং আয়ুর্কেনের প্রতিপাত্ত বিষয় কি বুঝিলাম, কিন্তু আয়ুঃ শব্দে শাস্ত্রকারগণ কি ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য। প্রসিদ্ধ শব্দ-তত্ত্ববিদ অমরসিংহ বলিয়াছেন “আয়ুর্জীবিত কালো না জীবাতু জীবনৌষধঃ” এত্তি পরিমাণংগচ্ছতি ইত্যায়ুরিতি উনাদি উৎপত্তার দ্বারা আয়ুশব্দ সাধিত হইয়াছে। তবেই বুঝিতেছি জীবিত কালের নামই আয়ুঃ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে এই জীবিতকাল কি আমাদের নির্দিষ্ট? কি অনির্দিষ্ট? সাধারণতঃ কথার বলিয়া থাকে “ইহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে ইহার মৃত্যুনিশ্চয়, তবে কি আমাদের নিয়মিত বয়স ও নিয়মিত সময়ই জীবনকাল সম্বাপন হইয়া থাকে? বরি তাহাই ঠিক হয় তবে কেই বয়সপূর্ত, কেই সময়পূর্ত, কেই কেই সময়পূর্ত, কেই শতবর্ষ ইত্যাদি, কোন

করিতেছ কেন? যদি আয়ুর নির্দিষ্টকাল থাকিত, তবে সকলেরই আয়ুর একটা বাঁধা বাঁধি নিয়ম থাকিত, তাহা যখন দেখিতেছি না তখন আমাদের স্বীকার করিতে হইবে, আয়ুর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই এবিষয় মহর্ষি শাতাতপীয় ঋষিথাকে কি বলিতেছেন শুধুন—

“পথ্যশিনাঃ শীলবতাঃ সদ্বৃত্তাজাঃ বিজিতেক্রিয়াণাং এবধিধানামিদ মায়বজ চিন্ত্যঃ সনাবুদ্ধমুনিপ্রবাদঃ”

নিয়তস্বপথাভোজী এবং চরিত্রবান্ এবং শাস্ত্রনির্দিষ্টসদাচার পরারণ জিতেক্রিয়, ব্যক্তিগণ এই প্রকার শতবর্ষ পরিমিত পৰমায়ুর অধিকারী। এইরূক মুনিপ্রবচন সর্বথা চিন্তনীয়।

এবিষয় বুদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন “বত্যাধার মেহযোগাদ বথা প্রদীপস্ত সংহতিঃ। বিক্রিয়া-চৈব দুষ্টৈবমকালে প্রাপসংস্রয়ঃ ॥ বথাহবিকল বধ্যাদিসম্বে প্রবণবাতাদিনা দীপনাশস্তথা সঃ-প্যায়ুস্ত-ভুক্তকর্মবশাংমৌহর্গ-বয়ঃগমন-কুগণাশনা-দিভিঃ প্রাণনাশ ইতি।

যেদ্রুপ বস্তি দীপ ও তৈলাদি অগ্ন্যাহত থাকা সত্ত্বেও আকস্মিক বায়ু আসিয়া দীপনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমায়ুঃ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্ততকর্মহেতু নৌকাগমন, হর্গমপথ গমনে আকস্মিক বিষ আসিয়া পরমায়ুঃ ক্ষয় করিয়া থাকে, কুপথ্য ভোজনাদি দ্বারাও আয়ুর পরিমাণ অযথাক্রম হইয়া থাকে।

পূর্বে বলা হইয়াছে আয়ুর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই, এক্ষণে আবার আমরা বলিতেছি—“পরমায়ু থাকা সত্ত্বেও প্রাণ নাশ হইয়া থাকে, সুতরাং পূর্বাধার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে না। আয়ুর পরিমাণ স্থির নাই আয়ুর পরমায়ু থাকিতে বিনাশ হইতে পারে ইহা কিরূপ হয়?

ইহার স্থল স্ত্রীমাংসা এই আয়ুর পরিমাণ ঠিক নাই বটে তবে বর্তমান যুগে শতবর্ষ পর্যন্ত জীবিত কাল মোটামুটি ধরা হইয়া থাকে। এ নিম্ন বৈদিক কালে ঋষিদিগের প্রার্থনা বাক্য দ্বারাও দেখিতে পাই—“পশ্চমঃ শরদঃ শতং জীবেশরদঃ শতং” ইত্যাদি। মহর্ষি সূত্রত বলিয়াছেন—

অব্যাহতগতি যন্ত স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতো।

যায়ঃ স্রাৎ সৌধিকং জীবৌতরোগঃ সন্নঃ শতম্”

যাহার বায়ু অব্যাহতগতি অর্থাৎ কোন কারণে বাধা প্রাপ্ত হয় নাই, স্বস্থানে ও বদ্যাবে অবস্থিত, সে নিরোগী হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে। এ সমস্ত প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, আয়ুর একটা মোটামুটি হিসাব শতবর্ষ পর্যন্ত, যিনি সুনিয়ম ও সদাচার সম্পন্ন হইয়া থাকিবেন তিনি ঐ পরিমাণ পরমায়ুর অধিকারী হইবেন। পক্ষান্তরে যোগবলে যে পরমায়ুর পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ আমরা অনেক পাইয়াছি ও অনেক দূরদর্শী প্রাচীন মহায্যার মুখাৎ শ্রুত হইয়াছি।

কেবল ইহাই নহে আয়ুর্বেদ স্পষ্টাক্ষরে ওষধিসংলাপ স্থলে কি বলিতেছেন শুধুন—

“কিঞ্চিৎ খলু ভগবন্ নিয়তকাল-প্রমাণ মায়ঃ সর্বং নবেতি? ভগবান্ উবাচ।

ইহারিবেশঃ ভূতানামায়ুঃ ক্রিমপেক্ষতে।

নৈবে পুরুষকারেচ স্থিতঃ হস্ত বলাবলম্”

নৈবমায়ুঃকৃতং বিভাৎ কর্মম্ পুরুষৈহিকম্”

স্থিতঃ পুরুষকারস্ত ক্রিয়তে বহিঃপারম্”

বলাবলবিশেষো হস্তি তরোরপিচ কর্মণোঃশৌ

দৃষ্টংহি ত্রিবিধং কর্ম-ইদম্ বধ্যবৃত্তম্”

তরোরপারমায়ুঃকি-দীর্ঘস্য অল্পম্ভুতম্”

নিয়তকালম্বে যেদ্বিধাশীততঃ চেতরা ইত্যু-কৃতম্”





লিখিতে বলিয়া এই সকল কথা আলোচনার প্রয়োজন এই যে, ঋতুচর্যা কেবল কাল বিশেষের উপযোগী আহার বিহার বিষয়ক হিতকর শাস্ত্রীয় শাসন বাক্য মাত্র। পাঠক যদি ঋতু-চর্যায় উপদিষ্ট আহার বিহারের সহিত নিজ নিজ জিহ্বা ও মনের বিরোধ, অন্তঃকরন করেন, তাহা হইলে সেই বিরোধ, বিকার প্রভৃতির শীতল পানীয় প্রার্থনার ভ্রান্ত অহিতকর ভাবিয়া, শাস্ত্র-শাসন পালন পূর্বক নিজের এবং সমাজের হিত সাধন করিবেন।

শরচ্চর্যা প্রসঙ্গে ঋতু বিভাগের বিষয় বলা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে সম্প্রতি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের বিষয় বলা বাইতেছে।

অন্য বিভাগ কেবল আয়ুর্বেদের বিষয়ীভূত নহে পরন্তু ধর্মশাস্ত্রে ও উহার বহুল উল্লেখ আছে। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে স্বর্ষ্যদেব উত্তর পথে গমন করেন বলিয়া এই তিনটা ঋতু উত্তরায়ণ এবং এই জন্তই পৌষ সংক্রান্তি উত্তরায়ণ নামে খ্যাত। আর বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকালে স্বর্ষ্যদেব দক্ষিণ পথে গমন করেন বলিয়াই এই তিনটা ঋতুকে দক্ষিণায়ণ বলে।

উত্তরায়ণে স্বর্ষ্যকিরণ প্রথর হয় এবং বায়ু তীব্র ও রূক্ষ হয় বলিয়া পৃথিবীর মেহ ও রস শোষিত হইয়া থাকে, এই জন্ত শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পৃথিবীতে ক্রমশঃ রূক্ষতাবৃদ্ধি আধিক্য হয়, শীত বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যথাক্রমে তিক্ত, কষায় ও কটুরসের বৃদ্ধি হয় এবং মনুষ্যের শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে, উত্তরায়ণে স্বর্ষ্য পৃথিবীর রস গ্রহণ করেন বলিয়া উহা আদানকাল নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। আদান কাল আগের অর্থাৎ এই সময়ে উষ্ণতার আধিক্য হয়।

দক্ষিণায়ণে কালবত্যাব অনুসারে মেঘ, বায়ু

ও বর্ষার জন্ত স্বর্ষ্যের তেজ মন্বীভূত হয় এবং চক্ষুমা বলবান হইয়া স্বীয় শীত রশ্মি দ্বারা জগতকে স্নিগ্ধ করেন, এই জন্ত দক্ষিণায়ণ সৌম্যকাল অর্থাৎ এই সময় জগতে সৌম্য-গুণের (শৈত্যাদির) আধিক্য হয়, বর্ষার জলে জগতের সন্তাপ দূর হয়, অরুণ রস সকলের অর্থাৎ অন্ন, লবণ ও মধুর রসের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় এবং মানবগণ ক্রমশঃ বলবান হয়, এই কালে স্বর্ষ্য-তেজ-শোষিত পৃথিবীতে চক্ষু স্বীয় সৌম্য গুণ বিসর্জন করেন বলিয়া ইহা বিসর্গ-কাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আদান কালের শেষে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে এবং বিসর্গ কালের প্রথমে অর্থাৎ বর্ষাঋতুতে মনুষ্য সর্কোপেক্ষা হীনবল হয়। আদান কালের মধ্যে অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে এবং বিসর্গ কালের মধ্যে অর্থাৎ শরৎ ঋতুতে মনুষ্য মধ্যবল হয়। আর আদান কালের প্রথমে অর্থাৎ শীত ঋতুতে এবং বিসর্গ কালের শেষে অর্থাৎ হেমন্ত ঋতুতে মনুষ্য সর্কোপেক্ষা বলবান হয়।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস হেমন্ত-কাল, সম্প্রতি হেমন্তকাল চলিতেছে বলিয়া হেমন্ত চর্যার বিষয় লিখিত হইতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে শীত উষ্ণ ও বর্ষা লক্ষণাক্রান্ত তিনটা ঋতুই প্রধান এবং অপর তিনটা ঋতু উহারের অন্তর্ভুক্ত। এই হিসাবে হেমন্ত ঋতু শীতের অন্তর্ভুক্ত, এই সময়ে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শরীর হ্রাস উদ্ভা নির্গত হইতে পারে না বলিয়া অর্ধরাস্তা প্রবল হয় এবং গুরুপাক দ্রব্য অধিক নাস্তার জীর্ণ করিতে পারে যায়, সেই প্রবল অগ্নি উপযুক্ত আহার রূপ ইচ্ছা না পাইলে দেহদ্বিত্য রোগের কবর করিয়া থাকে এবং উপযুক্ত আহারের অভাবে বায়ু রূক্ষ ও তীব্রতাবৃদ্ধি পাইয়া

কুপিত হয়, এইজন্য হেমন্তকালে স্নিগ্ধ (স্বভা-  
বিস্কৃত) অন্ন, লবণ ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্য প্রচুর  
পরিমাণে আহার করা উচিত।

ঔষক মাংস (ছলজ মাংস মৎস্তাদি)  
আনুপমাংস (জলাশয় সমীপে বিচরণকারী  
প্রাণীর মাংস শূকর মহিষাদি), বিলেশয়  
মাংস (যে সকল প্রাণী গর্ভমধ্যে বাস করে  
তাহাদের মাংস—গোখা সন্ধ্যাক প্রভৃতি)  
এসহ মাংস গবাদি, প্রবমাংস, (মাহারা জলে  
ভাসিয়া বেড়ার হংসাদি) শলাকার বিদ্ধ করতঃ  
সিদ্ধ করিয়া (শুলামাংস, শিক কাবার) আহার  
করিবে, গোখর ও মাষ কলার দ্বারা প্রস্তুত  
খাদ্য, পিষ্টক, ডুড, চিনি, মিছরী, দুগ্ধ, ক্ষীর,  
ছানা, নুতন অন্ন, চর্কি, তৈল প্রভৃতি সেবন  
করিলে দেহের ক্রয় নিবারণিত হইয়া পুষ্টি  
সাধিত হয়।

হেমন্তকালে সর্গায়ে বিশেষরূপে বায়ু  
নাশক তৈল মর্দন, মস্তকে তৈল মর্দন ও ঈষ-  
দ্রব্য জলে দ্বান হিতকর, রেশমী ও পশমী  
কাপড়ের দ্বারা শরীর আবৃত রাখা এবং গরম  
কাপড়ের আসন ও শয্যা ব্যবহার করা  
উচিত। ঠুকাগৃহে বা গর্ভগৃহে (যুক্তিকাত্যব্রতের  
নির্মিত গৃহে) অবস্থান ও শয়ন হিতকর,  
এই সময়ে সর্পদা জুতা ও ঠকান প্রভৃতি পাদ-  
ত্রাণ ব্যবহার করা কর্তব্য। শৌচকর্মে ঈষ-  
দ্রব্য ও জল ব্যবহার করা উচিত এবং সূর্য্য-

রশ্মির অনুরতা প্রযুক্ত শীতল বায়ুর সংস্পর্শে  
জড়ীভূত মানব মণ্ডলীর যথোপযুক্ত অগ্নিবেদ  
ও রৌদ্র সেবন করা কর্তব্য ও প্রতিদিন কুন্তী  
করা কিম্বা বিবিধ ব্যায়াম করা আবশ্যক।

ছয় ঋতুর মধ্যে হেমন্ত ঋতুই সর্বাপেক্ষা  
প্রাণিগণের সমধিক বলপ্রদ, কারণ বর্ষা-  
কালে উৎপন্ন শস্তাদি ও যাবতীয় ওষধি  
দ্রব্য, কাল পরিণাম বশতঃ এই সময়েই  
অধিক বীৰ্যবান হয় ও পরিপুষ্টি লাভ করে।  
পৃথিবী পঙ্কহীন হওয়ার পানীয় জল স্নিগ্ধ  
ও নির্মল হয়, তৎসমস্ত ভক্ষণ ও পান করিয়া  
এবং ঋতুগতির প্রবলতায় স্নজীর্ণ করিতে  
পারায় জীবগণ দৃষ্ট পুষ্ট হয়, কাক, গণ্ডার,  
মহিষ, মেঘ ও হস্তী প্রভৃতি এই সময়ে বিশেষ  
বলশালী হইয়া থাকে সুতরাং বলসঞ্চয় করি-  
বার পক্ষে ইহাই উৎকৃষ্ট কাল।

এই কালে রাত্রি দীর্ঘ হয় বলিয়া প্রাতে  
শৌচাদি নিত্যকাৰ্য্য শেষ করিয়াই কিছু আহার  
করা উচিত। লঘু আহার অন্নাহার, বায়ু  
বর্ধক অন্ন পান এবং পূর্বদিকের প্রবাহিত  
বায়ু অনিষ্ট কর। এই ঋতুতে নিত্য জীসেবি  
ব্যক্তির পক্ষে প্রচুর মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ, স্বত  
প্রভৃতি বাজী-কারক দ্রব্য আহার করা  
কর্তব্য। এই কালে স্নিগ্ধতা, শৈত্য গুরুত্বাদির  
আধিক্য নিবন্ধন স্নেহের সঞ্চয় হইতে থাকে।

শ্রীহরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত ।

## চরকোক্ত ষড়ুপায় বিধি ।

লজ্জণ, বৃংহণ আর কক্ষণ, স্নেহন,  
 শ্বেদন, শুভ্রন কার্যো নিগূণ যে জন,  
 প্রয়োগ করিতে জানে বুদ্ধিগা সমর,  
 প্রকৃত ভিষক সেই জানিবে নিশ্চয় ।  
 সূর্য্য রোগে লজ্জনা দি চিকিৎসা সম্যক ।  
 ফলে, মাত্রা বিচারিয়া করিলে প্রয়োগ ।  
 সাধ্য-ভাণ্ডার সব রোগারোগ্য হয় ।  
 তেঁই ষড়ুপায় বিধি কহি সমুদয় ॥  
 যাহা দেহ লঘুকর তাহাই লজ্জন ।  
 পুষ্টিকর হয় যাহা সেসব বৃংহণ ॥  
 কক্‌শতা, বিষদতা, কক্ষতা জনক ।  
 সমস্ত দ্রব্যই হয় কক্ষণ-সংজ্ঞক ॥  
 ম্লিষ্ট, অভিজন্মি, মূহু, ক্লেশ যাতে হয় ।  
 স্নেহন তাদের নাক্স সুবীণ কয় ।  
 শুষ্কতা কক্ষতা শৈত্য নষ্ট যাতে হয় ।  
 শ্বেদ কর হয়, তাহা শ্বেদন নিশ্চয় ॥  
 গতিমান, সচঞ্চল, দ্রব পদার্থের ।  
 গতি রোধ করে, নাম শুভ্রন তাদের ॥  
 লঘু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, কক্ষ, বিশদ, কঠিন, \*  
 স্নান, খর, সরদ্রব্য লজ্জন প্রবীণ ।  
 গুরু, মূহু, ম্লিষ্ট, স্থূল, স্থির, মন্দ, ঘন,  
 শীতল, পিচ্ছিল, শ্লক্ক দ্রব্যাদি বৃংহণ ।  
 কক্ষ, লঘু, খর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, স্থির, স্থির,  
 অপিচ্ছিল, কঠিনাদি কক্ষণ সুবীণ ॥  
 দ্রব, ম্লিষ্ট, সর, স্থূল, পিচ্ছিল, শীতল,  
 গুরু, মন্দ, মূহুদ্রব্য স্নেহন সকল ।  
 উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সর, ম্লিষ্ট, কক্ষ, স্নান, দ্রব,  
 স্থির, গুরু দ্রব্য হয় শ্বেদন এসব ॥  
 শীতল, মন্দ ও মূহু, শ্লক্ক, কক্ষ, স্থির,  
 স্নান, লঘু, দ্রবদ্রব্য শুভ্রন সুবীণ ।

\* দ্রব্যখণ্ডে এই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে ।

## লজ্জন বিধি ।

বমি, বিরেচন ছই আর আত্মাশ্বাস,  
 শিবো বিরেচন, এই চারি সংশোধন ।  
 তৃষ্ণা, বায়ু, রৌদ্র আর ব্যায়াম, পানি,  
 উপবাস, এই সবে কহিবে লজ্জন ॥  
 স্নেহা, পিত্ত, রক্ত, মল, যাদের সঞ্চিত,  
 দীর্ঘ দেহ, বলবান, বায়ু সংযুক্ত;  
 তাহাদের বমনাদি চারি সংশোধন ।  
 প্রয়োগ করিয়া বৈদ্য করায় লজ্জন ॥  
 মধ্যবল-শালী রোগ, কক্ষ পিত্তোদিত,  
 অতিসার, হৃদরোগ, বিষটীকাঙ্কিত;  
 বমি, অর, অলসক, হ্রাস, উপার,  
 মল বন্ধ, গাত্রশূল, অরুচি বাহার;  
 তাহাদের প্রথমতঃ প্রোক্ষ বৈদ্যগণ,  
 প্রায়ই পাচন দ্বারা করে প্রশমন ॥  
 বমনাদি অল্প বল, কক্ষ পিত্তোদিত ।  
 তৃষ্ণারোধ, উপবাসে হয় দুরীভূত ॥  
 মধ্য-বল-শালী রোগ হয় যে সকল ।  
 হরে রৌদ্র, বায়ু সেবা, ব্যায়ামে কেবল ॥  
 বলবান ব্যক্তিদের অল্প বলান্বিত ।  
 রোগহলে এ উপায়ে আশু বিদূরিত ॥  
 মেহরোগাক্রান্ত, বার, অকু হুট হয় ।  
 অতিযোগে গুহ্মমার্গে স্নেহ বাহিরয় ॥  
 বাত ও বৃংহণ বৃদ্ধ হইলে বাহার ।  
 লজ্জনের উপযুক্ত শীতকালে তার ॥

## লজ্জনের ক্রিয়া ।

যে দ্রব্য বা কর্মে দেহ লঘুবোধ হয় ।  
 তাহাই লজ্জন, কিন্তু বৃংহণ তা নয় ॥  
 লজ্জনেতে গোব ক্ষয়, অগ্নি উদীপিত ।  
 দেহ লঘু, ক্ষুব্ধবোধ, অর বিরহিত ।  
 গোব অগ্নি স্থান চ্যুত, অলস বাহার ।  
 লজ্জনে গোবের পাক, অর নাশে তার ॥  
 (ক্রমশঃ)

শ্রীরাসবিহারী রায় ।

আমরা অতীব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত  
প্রকাশ করিতেছি যে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ  
অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে যোগ  
দান করিয়াছেন।

মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর মানিক্য  
বাহাদুর ( ত্রিপুরা ) ।

শ্রীযুক্ত সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,  
,, ডাঃ ব্রজেননাথ শীল, এম, এ,  
শ্রীযুক্ত অন্নদা কুমার রায় চৌধুরী  
জমীদার কীর্ত্তি পাশা, বরিশাল ।

,, জ্ঞানদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়,  
জমীদার গোবরডাঙ্গা ।

,, নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল,  
ঢাকা ।

,, রায় চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর,  
রিঃ ডেপুটি মাজিঃ ।

,, রায়সাহেব আণ্ডতোষ মুখার্জি বি, এল,  
,, কে, সেন, স্কোয়ার সিভিল সার্জন,  
( পাবনা ) ।

,, সারদা চরণ ঘোষ গভর্ণমেন্ট প্লীডার,  
ময়মনসিংহ ।

,, রাম রতন চট্টোপাধ্যায়,  
উকীল, ভবানী পুর ।

,, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যভূষণ বি, এ, এম,  
আর, এস ।

,, ডাঃ হরিধন দত্ত,  
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঢাকা ।

,, ,, স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার,  
এল, এম, এস ।

,, ,, জ্যোতির্নাথ বানার্জি এম, বি, এ

,, ,, ইউ বহু—( কলিকাতা )

,, ,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম, এস,

ডাঃ শ্রীযুক্ত জে, এন, সেন—বিলাস পুর ।

,, ,, অমূল্য চন্দ্র উকিল এম, বি ।

,, ,, টি, সি, ডাটাচার্য ।

,, ,, এস, সান্তাল এম, বি ।

,, ,, অমরেন্দ্রনাথ বানার্জি,  
এল, এম, এস, কলিকাতা ।

,, ,, বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায়,  
এল, এম, এস ।

,, ,, বি, এন. ঘোষ,  
আলবার্ট ভিঃ হাসপাতাল ।

,, ,, স্বরেন্দ্র কুমার মজুমদার,  
এল, এম, এস ।

,, ,, স্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,  
এল, এম, এস, বেনারস ।

,, ,, নলিনী রঞ্জন সেন গুপ্ত এম, ডি,  
শ্রীযুক্ত বি, ভি, মুখার্জি,

,, কেশবচন্দ্র গুপ্ত,

,, বরদাকান্ত সেন গুপ্ত,

,, নগেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত,

,, প্রিয় শঙ্কর মজুমদার, উকিল ।

,, কান্তীশভূষণ সেন, আই, এস, ও,

,, দ্বিজেন্দ্র কুমার মজুমদার,  
এম, এ, বি, এল ।

,, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত,

,, কামিনী কুমার সেন, উকিল ।

,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,

,, ভূতনাথ পাল ( কলিকাতা )

,, বতীন্দ্রমোহন সেন, উকিল, হাইকোর্ট ।

,, চন্দ্রশেখর সরকার, উকিল, ভাগলপুর ।

,, বিজুভিভূষণ দত্ত, এল, এম, সি

,, য়িকেন্দ্রনাথ বহু,

,, বতীন্দ্রনাথ বহু,

শ্রীযুক্ত এ, সি, রায়, সম্পাদক, "রিজেনারেশন।"

- , রাজকুমার রায়, করিমপুর।  
 ,, বসন্তকুমার আইচ, বশোহর।  
 ,, প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়, মুন্সেফ।  
 ,, রাখাল দাশ মুখোপাধ্যায়, বি, এল,  
 উকিল কাঁধি।  
 ,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।  
 ,, শীতলচন্দ্র ঘোষ।  
 ,, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।  
 ,, কিরণকুমার রায় চৌধুরী।  
 ,, বি, কে, সেন, হুগলী,।  
 ,, ক্ষেত্রমোহন বিহারত।  
 ,, সনৎকুমার ঘোষাল।  
 ,, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,  
 উকিল আলিপুর।  
 ,, বীরেশ্বর সেন গুপ্ত, উকিল করিমপুর।  
 ,, অভুলচন্দ্র গুপ্ত, এম এ, বি, এল,  
 উকিল হাইকোর্ট।  
 ,, মলিনচন্দ্র চক্রবর্তী এম, এ, বি, এল,  
 উকিল বগুড়া।  
 ,, নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী, ইঞ্জিনিয়ার।  
 ,, মনোমোহন পাণ্ডে।  
 ,, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ।  
 ,, প্রিয়দারজান রায় এম, এ,  
 ,, অমৃতলাল গুপ্ত, বি, এল,  
 সবডি: অফি: বাকীপুর।  
 ,, অধ্যাপক এন, এন, সেন গুপ্ত।  
 ,, বিজয়চন্দ্র সিংহ কলিকাতা।  
 ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জিওলজিষ্ট।  
 ,, নেপালচন্দ্র রায় এম, এ,  
 ,, ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, মংপুর।

- ,, বাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ, সাংসারত, বশোহর।  
 ,, দীনেশচন্দ্র চাট্টাঙ্গ, মুন্সেফ।  
 ,, কবিরাজ মধুসূদন সেন গুপ্ত, তিব্বত-রত্ন।  
 ,, ,, পূর্ণচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঢাকা।  
 ,, ,, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজ্ঞাবিনোদ।  
 ,, ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় কবিরজন,  
 মোরাদপুর।  
 ,, ,, কৃষ্ণকুমার সেন গুপ্ত।

(ক্রমঃ:)

### শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিস্বীকার।

আমারা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করি-  
 তেছি যে নিয় লিখিত মহোদয়গণ অষ্টাদশ  
 আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নিয়লিখিত  
 পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শর্মা কবিরূপণ—  
 চরকসংহিতা (সামুদ্রিক) এক খণ্ড।  
 শ্রীযুক্ত কবিরাজ রাসবিহারী রায় কবি-  
 কখন—(১) আয়ুর্বেদ তত্ত্ববিজ্ঞান পূর্ব ও  
 মধ্যখণ্ড (২) চণ্ডীচরিতামৃত (দেবীমাহাত্ম্য)।

### এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত রানতারণ চট্টোপাধ্যায় উকীল  
 ভবানীপুর—১০০।

মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত স্বতীন্দ্রনাথ সেন  
 মহাশয় তাঁহার স্বর্গগত ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ সেন  
 মহাশয়ের (ইনি বৃক্ষক্ষেত্র প্রাপ্ত্যাপ করিয়া-  
 ছেন) স্মৃতিরক্ষা কল্পে ৫০০ টাকা দান করিয়া-  
 ছেন। অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের বার্ষিক  
 পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্বোচ্চ স্থান অধিকার  
 করিবে ঐ টাকার অর্ধ হইতে তাহাকে পদক  
 দান করা হইবে।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

১ম বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৩—মাঘ ।

৫ম সংখ্যা ।

## বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ ।

এখানে অহিতকর দ্রব্য দেওয়াব উদ্দেশ্যে  
কিছির জ্ঞান । একটু কুপথ্য-সংযোগেও যদি  
রোগী সুপথ্য আহাৰ করিতে পারে—এই  
উদ্দেশ্য । নচেৎ কেবল কুপথ্য দেওয়া উদ্দেশ্য  
নহে । অনেকে “অরিতো হিতমশীয়াৎ” পাঠ  
করিয়া “অরিত ব্যক্তি হিতকর দ্রব্য ভোজন  
করিবে”—এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন । কিন্তু  
তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । অরিত ব্যক্তি  
হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে, ইহা সাধারণ  
নিয়ম । তবে অরুচি হইলে হিতকর দ্রব্য  
ভোজন করিবে বলার সার্থকতা কোথায় ?  
সুতরাং অহিতকর দ্রব্য বলাই শাস্ত্রকারের  
উদ্দেশ্য । অপিচ শাস্ত্রে না পাইলে আর  
একটা বচন আমরা অবগত আছি যে:—  
“কুপথ্যমপি দাতব্যং যদি পথ্যং ন রোচতে ।”  
অর্থাৎ পথ্য ক্রটিকর না হইলে কুপথ্যও দিবে ।

পথ্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর উপদেশ  
আর কোন দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রে আছে  
কি ?

সন্নিপাত অরে উপবাসসম্বন্ধে লিখিত  
হইয়াছে ;—

“ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা ।  
লজ্জনং সন্নিপাতেষু কুষ্ঠাদারোগ্যদর্শনাৎ ॥”

অনুবাদ ;—সন্নিপাত অরে তিন দিন,  
পাঁচ দিন, দশ দিন অথবা ষতদিন রোগ প্রশ-  
মিত না হয়, ততদিন উপবাস দিবে ।

সন্নিপাত অরে এইরূপ লজ্জন যে হিতকর  
তাহা পাশ্চাত্যদেশীয় চিকিৎসকগণ এক্ষণে  
বুঝিতে পারিতেছেন,—একথা পূর্বেই বলি-  
য়াছি । আমি আমার কোন সন্নিপাতঅর-  
রোগীকে একুশ দিন পর্যন্ত বাজিন (ছানার  
জল, Whey) পথ্য দিয়া ছিলাম । আর একটী  
পঞ্চমবর্ষীয় বালককে আট দিন কাল কেবল  
গরম জল পথ্য দিয়া ছিলাম । উভয় রোগীই  
কথিত সময়ে আর কিছুই খাইতে ইচ্ছা করে  
নাই এবং ঐ সময়ান্তে অত্যন্ত পথ্য আহাৰ  
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল । তখন  
অল্প পথ্য দেওয়া হয় । বলা বাহুল্য উভয়ই  
রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল । এরূপ  
অধিক লজ্জন সহ হওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রকার  
বলেন ;—

“দোষাণমেব সা শক্তিলজ্জনে বা সহিযুতা।

নহি দোষক্কে কশ্চিৎ সহতে লজ্জনা দিকম্ ॥”

অনুবাদ :—দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফের)

শক্তি বশতঃ এরূপ লজ্জন সহ হয়, দোষের ক্ষয় হইলে কেহই লজ্জন সহ করিতে পারে না।

আয়ুর্বেদের এই বচন যে সম্পূর্ণ সার্থক, তাহা আমরা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সমবেত সভা মহোদয়গণের মধ্যে বিস্তৃত চিকিৎসকগণও দেখিয়া থাকিবেন।

আয়ুর্বেদে প্রতিরোগে এরূপ বহুবিধ সারবান্ উপদেশ আছে। আমরা সমগ্রাভাব-বশতঃ এবং বাহ্যভায়ে সে সকলের উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

অনেকের বিশ্বাস যে আয়ুর্বেদে মাংস-পথ্যের প্রয়োগ নাই বা অত্যন্ত কম। কিন্তু এই বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আপনারা অবগত আছেন যে ভিন্ন ভিন্ন রোগে নানা প্রকার প্রাণীর মাংস পথ্যরূপে প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ক্ষীরমাণ যক্ষ্ম রোগীর বলপুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য প্রধানতঃ ছাগমাংস ব্যবহার করিবার বিধি আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাকোবিদগণ বিজ্ঞানবিহিত অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু অত্যন্ত পণ্ড পক্ষীর শরীরে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা রোগ উৎপাদন করিতে পারে ; কিন্তু ছাগ ও মেঘের শরীরে রোগ উৎপাদন করিতে পারে না। আয়ুর্বেদে ছাগমাংস, ছাগশোণিত এবং ছাগদুগ্ধ যক্ষ্মারোগীকে সেবন করাইবার উপদেশ দেওয়ায় স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে ঐ মহান্ বৈজ্ঞানিক সভ্য তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া পালা যায় না।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—

ছাগমাংসং পয়ঃশ্চাংগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।

ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে ত্ব যক্ষ্মহুৎ ॥

অনুবাদ :—ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ ও চিনি-মিশ্রিত ছাগদুগ্ধসেবন, ছাগসেবা এবং ছাগ-মধ্যে শয়ন করা যক্ষ্ম-রোগনাশক।

পথ্যাপথ্যজ্ঞানসম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র এক্ষণে আয়ুর্বেদের বহু পশ্চাতে রহিয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের দেশবাসীর ধাতু-প্রকৃতি-বিষয়ক জ্ঞানের অভাববশতঃ পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের উপদিষ্ট পথ্যাপথ্য যে বিপরীত ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি !

মাননীয় সভাসদ মহোদয়গণ ! এ পর্য্যন্ত আমি যে সকল কথা বলিয়াছি তাহা আয়ুর্বেদের পরম গৌরবে পরিচায়ক। এক্ষণে আয়ুর্বেদের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করিব। এ পর্য্যন্ত আয়ুর্বেদসম্বন্ধে যে সকল মধুময় কথা বলিয়াছি, তাহা শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া আপনাদের হর্ষ উৎপাদন করিয়াছে ; কিন্তু এক্ষণে বাহা বলিব, তাহা বিষময় বলিয়া আপনাদের হৃৎ উৎপাদন করিবে,—এইরূপ আশঙ্কা করিতেছি। কিন্তু যদি আমরা কেবল গুণের দিকেই দৃষ্টি রাখি এবং দোষকে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের সে সকল দোষ কখনই সংশোধিত হইবে না। অপিচ এরূপ করিলে আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে যে দায়িত্বপূর্ণ মহৎ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত সম্মান করা হইবে না, বরং অবমাননা করা হইবে। সুতরাং এক্ষণে আমি বাহা বলিব, তাহা অপূর্ণ হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে আয়ুর্বেদ জগতের বাবতীর চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূলভূত। অত্যাধিক চিকিৎসা শাস্ত্রকে এই মহান্ আয়ুর্বেদ-বুদ্ধের



শাখাজাত ক্ষুদ্র বৃক্ষস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ভারতের অতীত গৌরবের বিষয় আলোচনা করিলে আমাদের মনে যেরূপ স্মরণ আনন্দের উদয় হয়, আয়ুর্বেদের বর্তমান ছরবছার বিষয় আলোচনা করিলে সেইরূপ ক্ষোভে হৃৎথে ও লজ্জায় হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। আয়ুর্বেদ হইতে মূলমন্ত্র সংগ্রহ করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু কাল ধরিয়া কত কষ্ট স্বীকার করিয়া অজ্ঞত অর্থব্যয় করিয়া সূদৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে কতই না উন্নতি সাধিত করিয়াছেন! আর আমরা স্বার্থপরতা, অবহেলা ও অশ্রদ্ধায় অন্ধ হইয়া আমাদের সেই আত্মীয় গৌরব আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রকে কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া তুলিয়াছি। ভাষার এমন কথা নাই, কথার এমন শক্তি নাই, শক্তির এমন বিকাশ নাই যে—এই মর্য্যভেদী হৃৎকাহিনী প্রকাশ করিয়া বলা যাইতে পারে।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার জন্ত যেরূপ স্বার্থত্যাগ, বিপুল চেষ্টা এবং অপেক্ষণীয় ক্রম স্বীকার করিবার শক্তি আবশ্যিক, সে শক্তি এক্ষণে আমাদের নাই। শারীরতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শব্দব্যবচ্ছেদ যে নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহা আয়ুর্বেদে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ এক্ষণে শব্দব্যবচ্ছেদ করেন না বলিয়া শারীরতত্ত্বে তাঁহাদের ব্যুৎপত্তির অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের শারীর বিজ্ঞান বাহা পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং শল্যতত্ত্বে বাহা গ্রহণ আছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর। সকল ক্রিয়ায় শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ বস্তিপ্ৰয়োগে এক্ষণে আমরা অক্ষম। অধিক কি, এই সকল অবশ্যজাত্য বিষয় না জামিয়াও চিকিৎসা-কার্যে

উত্তম হইয়া আমরা বিজ্ঞান-জ্যোৎস্না-সমুদাসিত নানা চিকিৎসোপায়সমলঙ্কৃত যুগে বিশেষজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের এবং অজ্ঞাত বিবেচক ব্যক্তির নিকট উপহাস্যাম্পদ হইয়া পড়িয়াছি। ইহা কি আমাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জাকর নহে? আমরা আয়ুর্বেদশাস্ত্রসারী চিকিৎসক বলিয়া বৈদেশিক চিকিৎসকদিগের শারীর শল্যতত্ত্বাদি সরল ও সুলভ রীতিযুক্ত হইলেও তাহা আমাদের জাতব্য বলিয়া মনে করি না; অথচ আয়ুর্বেদশাস্ত্রোক্ত বহু বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের অভাব ঘটিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীর জীবনমরণের ভার লইয়া অবৈজ্ঞানিক পথ আশ্রয় করিয়া আমরা কি পূজনীয় মহর্ষিদিগের তপস্তার ফলভূত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অবমাননা করিতেছি না এবং পরমার্থতঃ অপরাধী হইতেছি না? শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে;—

শাস্ত্রং গুরুমুখোদগীর্ণমান্যোপাশ্রয় চাসক্তং।

যঃ কৰ্ম্ম কুরুতে বৈজ্ঞঃ স বৈজ্ঞোহস্তে তু তত্ত্বরাঃ ॥

অহুবাদঃ—গুরুর মুখ হইতে সমগ্র শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং তাহা বারংবার অমূলীন করিয়া যে বৈজ্ঞ চিকিৎসা-কার্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রকৃত বৈজ্ঞ; অন্যকে তত্ত্বর বলিয়া জানিবে।

শরীরাত্তত্ত্বস্বয়ং যজ্ঞসমূহের বিষয় অবগত না হইয়া, শস্ত্রচিকিৎসা ও বস্তিকৰ্ম্মাদিশিক্ষা না করিয়াও আমরা যে এখনও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হই, সে কেবল আয়ুর্বেদের তেজস্বিজ্ঞানের মহত্ববশতঃ। আয়ুর্বেদোক্ত ভেদবিজ্ঞান অগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, পরিবর্তনশীল নহে; এবং দেশ, কাল, পাত্রভেদে উপযোগী। অস্ত্র দেশের ভেদবিজ্ঞান আয়ুর্বেদোক্ত ভেদবিজ্ঞানকে বশনত

পরাকৃত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এই ভেষজবিজ্ঞান সংস্কারের পূর্বে, শবব্যব-  
চ্ছেদাদি দ্বারা শারীরতত্ত্ববিজ্ঞানের জ্ঞান আমা-  
দের যথেষ্ট অধ্যবসায়ের সহিত মহান্ আয়াস  
স্বীকার করা আবশ্যিক। পঞ্চকর্মের এক-  
মাত্র বিরচনই আমরা প্রয়োগ করিয়া থাকি,  
কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ ভাবে; আয়ুর্বেদোক্ত  
ছয় শত বিরচনের মধ্যে এক্ষণে পাঁচ ছয়টির  
অধিক ব্যবহৃত হয় না। অবশিষ্টগুলি কেবল  
গ্রন্থের শোভাবর্ধন করিয়া থাকে মাত্র—কদাপি  
প্রযুক্ত হয় না। বিরচন যে এক্ষণে যথাবিধি  
প্রয়োগ করা হয় না—তাহা নিম্নলিখিত  
বচনের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। যথা :—  
ঔষ্ধ্যয়, ঔষ্ধ্যবাস্ত্যয় দাতব্যস্ত বিরচনম্।

অত্রথা যোজিতং হোতন্ গ্রহীগদক্লম্বতম্ ॥

অমুবাদ :—রোগীকে স্নেহ প্রয়োগ করিয়া,  
পরে স্নেহ প্রয়োগ করিয়া, পরে বমি করাইয়া,  
তৎপরে বিরচন প্রয়োগ করিবে। অত্রথা  
করিলে গ্রহীগত রোগ জন্মিয়া থাকে।

আয়ুর্বেদের ভেষজবিজ্ঞান এতই উন্নতি লাভ  
করিয়াছিল যে সত্তোমারাস্বক ক্লম্বসর্পবিষও  
ঔষধের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সর্পবিষ  
উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও  
ও যে পুনরুজ্জীবিত করে, আমরা তাহা বহুব্যয়  
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা নিতান্ত পরিতাপের  
বিষয় যে বিষপ্রয়োগকুশল চিকিৎসক ক্রমেই  
বিয়ল হইতেছে।

শালাক্য, অগদ, কোমারভূত্য, রসায়ন ও  
বাজীকরণ তত্ত্বও অধুনা যথাবিধি অভ্যাস  
করা হয় না। ঐ সকল তত্ত্বের অপ্রচলন-  
হেতু আয়ুর্বেদবিজ্ঞান সাধারণের পক্ষে  
অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িতেছে, ইহা নিতান্তই  
আক্ষেপের বিষয়। এই সকল তত্ত্বের সুপ্র-  
চলনের জন্ত আমাদের যথেষ্ট যত্ন করা কর্তব্য।

পরিতাপকর হইলেও একটি অল্পপেক্ষীয়  
বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিগোচর হইতেছে। আমার  
পরিচিত জনৈক রাজবৈদ্য শিবিকারূঢ় এবং  
অল্পচরবেষ্টিত হইয়া কোন রোগীর চিকিৎসার্থ  
দূরদেশে যাইতে ছিলেন। পথে কোন গ্রামে  
কতকগুলি নিতান্ত উৎকণ্ঠিতচিত্ত গ্রাম-  
বাসীকে দেখিতে পাইলেন। এদিকে ঐ  
লোকগুলি কবিরাজ মহাশয়ের দেখা পাইয়া  
গ্রামস্থ কোন আসন্নপ্রসবী স্ত্রীলোক প্রসব  
বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে—এই কথা  
তঁাহাকে নিবেদন করিল এবং অত্যন্ত কাতর-  
ভাবে তঁাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।  
জনিষ্যমান বালকের এক হস্ত যোনিবিবর-  
পথে নির্গত হইয়াছিল, সুতরাং চিকিৎসকের  
সাহায্যব্যতীত প্রসবের কোন উপায় ছিল না।

এ দিকে দশ ক্রোশের মধ্যে কোন চিকিৎসক  
পাওয়া যায় না। এই বিষয় জানাইয়া তাহার  
বলিল,—আপনি রূপাপূর্বক গর্ভিণীকে প্রসব  
করাইয়া দুইটা প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করুন।  
কবিরাজ মহাশয় সেই করণ আহ্বান শুনিয়া ও  
এইরূপ ব্যাপারে নিজের শক্তিহীনতা স্মরণ  
করিয়া আন্তরিক কষ্ট অমুভব করিলেন এবং  
লজ্জা ত্যাগ করিয়া নিজের অসামর্থ্যের বিষয়  
গ্রামবাসীদিগকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। কিন্তু  
গ্রামবাসীগণ মনে করিল যে আমরা রাজ-  
বৈদ্যের উপযুক্ত অর্থদান করিতে অক্ষম বলিয়া  
কবিরাজ মহাশয় আমাদের বিপদ হইতে  
উদ্ধার করিতে অসম্মত হইতেছেন। সুতরাং  
তাহারা কবিরাজ মহাশয়ের কথায় বিশ্বাস না  
করিয়া গর্ভিণীকে দেখিবার জন্ত তঁাহাকে পুনঃ  
পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। অগত্যা  
কবিরাজ মহাশয় ভীতচিত্তে গ্রামবাসীদিগের  
সহিত বাইয়া সেই অভাগিনী গর্ভিণীকে দর্শন

করিলেন। কিন্তু দেখিয়া কি হইবে? কবিরাজ মহাশয় গভীর নীতি পরীক্ষা করিলেন, পরে নিতান্ত হুঃখিত চিত্তে গ্রামবাসীদের বলিলেন যে—আপনারা ইহাকে আমাদের রাজপুত্রের ডাক্তারখানায় লইয়া যান; সেখানকার ডাক্তারবাবু ইহাকে প্রসব করাইবেন। কি পরিতাপের বিষয়! সম্মুখে দুইটি প্রাণী মরণোন্মুখ, নিকটে চিকিৎসক; কিন্তু চিকিৎসক শক্তিহীন। যে বৃত্তান্ত আজ আপনাদের সমক্ষে বিবৃত করিলাম, তাহা বিবেচনা করিয়া আপনাদের বিচার করুন যে—এরূপ অবস্থায় পতিত শরণবিহীন দরিদ্রা রমণীকে আয়ুর্কেন্দ্রীয় চিকিৎসক স্বয়ং সাহায্য করিতে অক্ষম হইয়া যদি পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন, তবে আয়ুর্কেন্দ্রের গৌরব কোথায় রহিল? আর এরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞা শিক্ষাই বা সার্থকতা কি?

ঔষধ প্রস্তুতের জন্ত আবশ্যক নানাপ্রকার ধাতু ও উদ্ভিজ্জের নাম এক্ষণে গ্রন্থের মধ্যেই সামান্য রহিয়াছে। সে গুলির অধিকাংশই আমরা চিনি না এবং ব্যবহার করি না। সুতরাং যে সকল রোগ ঐ সকল অজ্ঞাত ধাতু বা ঔষধের দ্বারা সহজে নিরাকৃত হইতে পারিত, সে গুলির নিরাকরণ করা সংপ্রতি আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য, ক্ষেত্রবিশেষে অসাধ্যও হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের স্বরূপজ্ঞান এবং প্রাপ্তির উপায়ের জ্ঞান আমাদের যথোপযুক্ত চেষ্টা করা উচিত।

আরও দেখুন, অধুনা যে সকল মুদ্রিত আয়ুর্কেন্দ্রীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়, সে গুলি শব্দতঃ ও অর্থতঃ অত্যন্ত ভ্রমবহুল বলিয়া পাঠার্থীদের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং সে গুলিকে ভ্রমরহিত করিয়া মুদ্রিত করা নিতান্ত

আবশ্যক। অনতিপ্রাচীন টীকাকারগণের টীকায় প্রমাদ বা অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা চিকিৎসা-শাস্ত্রের অমুপযোগী হইলেও ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রাদিতে স্বকীয় ব্যুৎপত্তি দেখাইবার আগ্রহবশতঃ অনেক ভ্রুট রহিয়া গিয়াছে। ইহাতে পাঠার্থীদের বুঝবার সুবিধা না হইয়া অসুবিধাই হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল টীকাকারদিগের পরিশ্রম বার্থ হইয়াছে বলিতে হইবে।

চিকিৎসা-কার্যের উপযোগী আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে আমাদের প্রীতির চক্ষে দেখা কর্তব্য। যদি আমরা প্রাচীনদিগের প্রতি ভক্ত্যাতিশয়বশতঃ আধুনিক প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের প্রতি দৃষ্টিপাত না করি, তাহা হইলে আমরা অবনত ব্যতীত উন্নত হইতে পারিব না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রকে বিশেষ উন্নত করিয়াছে, তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমি ঐ সকল আবিষ্কারের মধ্যে কতগুলি অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের বিষয় এবং তাহাদের উপযোগিতার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। (১) এক্স রে যন্ত্র (X' Ray apparatus) ইহা এক প্রকার আলোক। এই আলোকের সাহায্যে শরীরের অন্তর্নিহিত শল্য (বন্টকের গুলি প্রভৃতি) দেখা যায় এবং অভ্যন্তরীণ তথ্য স্থান বা সন্ধিচ্যুতি সহজেই লক্ষ্য করা বাইতে পারে।

(২) অক্সিজেনের শ্বাসগ্রহণ (oxygen inhalation), বায়ুস্থিত অক্সিজেন আমরা নিয়ত গ্রহণ করিতেছি, তদভাবে এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারি না। নিউমোনিয়া, অতিমারি রক্তজ্বর, অত্যন্ত রক্তহীনতা প্রভৃতি

রোগে যখন শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটিয়া মৃত্যু হইবার আশঙ্কা হয়, তখন অক্সিজেনের খাঁস গ্রহণ দ্বারা জীবন রক্ষা হইয়া থাকে।

(৩) উপশিরা বা চর্মভেদ করিয়া লবণ জল প্রয়োগ (Saline injection intravenous and subcutaneous)—কলেরা-রোগে শরীরস্থ জলীয়াংশ এবং লবণ অতিরিক্ত পরিমাণে নির্গত হইয়া যায় বলিয়া সত্ত্বর মৃত্যু ঘটে। উপশিরা (Vein) কিম্বা চর্মভেদ করিয়া লবণজল প্রয়োগ করিলে অনেক সময় ঐ করাল রোগের কবল হইতে রোগীর প্রাণ-রক্ষা করা যাইতে পারে। সহসা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে ঐরূপে লবণজল প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(৪) 'এমিটিন' নামক ঔষধ :—এমিবা (Amoeba) নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু আছে এবং তাহারা মানব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া এক প্রকার প্রবাহিকা রোগ উৎপন্ন করে। উহাকে জীবাণুজাত প্রবাহিকা (Amoebic dysentery) বলা যায়। সূক্ষ্ম-মুখ পিচকারী দ্বারা চর্ম ভেদ করিয়া এমিটিন (Emetine) প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য উপকার হয়।

৫। ডিপথিরিয়া বিষনাশক ঔষধ (Diphtheria Antitoxin) :—ডিপথিরিয়া নামক এক প্রকার গলরোগ আছে, সম্ভবতঃ উহা আয়ুর্বেদোক্ত রোহিণী-রোগ। এই রোগ পূর্বে অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। আয়ুর্বেদেও এইরূপ উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ঔষধ আবিষ্কৃত হইবার পর ঐ রোগে শতকরা পাঁচজনের অধিক রোগীর মৃত্যু হয় না।

৬। কলি ভ্যাকসিন (Colli Vaccine) : হৃতিকা র এবং সেপটা সেমিয়া (Sceptic

æmia) নামক শোণিতবিষাক্তকারক রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা জীবাণু তত্ত্বসম্বন্ধে গবেষণার একটা মধুময় ফল।

রোগনির্ণয়ের জ্ঞান যে সকল যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুলিও যথাসম্ভব আমাদের ব্যবহার করা কর্তব্য। ঐ সকল যন্ত্রের মধ্যে স্টেথেস কোপ (Stethoscopes) নামক বক্ষঃপরীক্ষার যন্ত্র, রক্তসঞ্চালনের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র এবং অলুবাীক্ষণ যন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সকল ব্যাধি জীবাণুজাত সেই ব্যাধি নির্ণয়ের জ্ঞান অলুবাীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু এই প্রস্তাবটি আমাকে সতয়ে করিতে হইতেছে। কেন না বাঁহারা প্রাচীন মতরক্ষার পক্ষপাতী তাঁহারা হয়ত ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন।

বৈদেশিকদিগের উদ্ভাবিত আরও নানা প্রকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আছে; কিন্তু অবসরাভাবে এবং আপনাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট আমার সাগ্রহ নিবেদন এই—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের বিকল অঙ্গসমূহের পরিপোষণের জ্ঞান আমাদের বিগতমৎসর হইয়া ও কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানসম্মত সমুদায় সত্যগ্রহণপন্থী নির্ভয়ে অঙ্গসরগ করিয়া উদার মত অবলম্বনপূর্বক সর্বথা প্রযত্নপর হওয়া উচিত। পূর্বকালে আমাদের দেশবাসিগণ এইরূপ ক্ষেত্রে লজ্জামহোৎকর্ষ বৈদেশিকদিগের নিকট শিষ্যঅনোচিত সারল্যসহকারে শ্রদ্ধাপূর্বক মাৎসর্য ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা করিতেন। তাহাতে লজ্জাই কি, আর ভয়ই বা কি। মহাজন বলিয়াছেন :—‘সর্বতো জয়মিচ্ছৎ শিষ্টাদিচ্ছৎ পন্যজয়ম্।’ অর্থাৎ সর্বদা জয়

ইচ্ছা করিবে, কিন্তু শিষ্যের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করিবে।

এক্কে একটী গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সম্প্রতি ডাক্তার কৃষ্ণ স্বামী আমার মহোদয় মাস্ত্রাজ মেডিকেল কৌন্সিলের নিকট বেক্সপ ব্যবহাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত পরিতাপজনক। মাস্ত্রাজ প্রদেশবাসী জনৈক দয়ালু এবং সদাশয় মহাত্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দাতব্য আয়ুর্ষেদীর্ঘ ঔষধালয়ের ডাক্তার আমার মহোদয় একজন গভার্নর (Governor) ছিলেন। এই অপরাধে 'মাস্ত্রাজ মেডিকেল কৌন্সিল' তাঁহার নাম রেজিষ্টারীভুক্ত ডাক্তার দিগের নাম হইতে কাটিয়া দিয়াছেন। কলিকাতায় রায় ভগবানদাস বগলা বাহাদুরের স্থাপিত এইরূপ একটী ঔষধালয় আছে, এবং তাহাতে এলোপ্যাথিক ও আয়ুর্ষেদীর্ঘ দুইটি বিভাগ আছে। ডাক্তার শ্রীওসের ঞায় ব্যক্তি, এই ঔষধালয়ের অত্রতম গভার্নর ছিলেন এবং আয়ুর্ষেদীর্ঘ ও এলোপ্যাথিক উভয় বিভাগেরই পরিদর্শক-শস্ত্রচিকিৎসকের কার্য (Surgeon-superintendent) তিনিই করিতেন। এক্কে ডাক্তার ক্যাডি তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার ক্যাডি আয়ুর্ষেদীর্ঘ বিভাগের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কি কোন ব্যক্তি কোন কথা বলিতে পারে ?

উন্নতিশীল পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ষেদীর্ঘের এইরূপ নির্দোষ ব্যবস্থা করিয়া কখনই লাভবান হইতে পারেন না। প্রকৃত বিজ্ঞানামোদী ব্যক্তি উদারচিত্ত এবং অধিক জানিবার জন্য আগ্রহী হইয়া থাকেন। তাঁহার চিন্তা নূতন জ্ঞান-জ্যোতি লাভ করিবার

জন্য সর্বদা উৎসুক। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কি বলিতে পারেন যে—তাঁহার জীব-জগৎ ও উদ্ভিজ্জগৎ অল্পসন্ধান করিয়া তাঁহাদের ভেষজ-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন ? ইহার উত্তরে তাঁহারা নিশ্চয়ই 'না' বলিতে বাধ্য। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যে প্রত্যেক রোগ বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ প্রশমন করিতে পারেন না এই অভিজ্ঞতা তাঁহাদের নিত্যই লাভ হয়। অপর দিকে বায়ুরোগ, (Nervous disease), পক্ষাঘাত, উন্মাদ, চর্মরোগ, পুরাতন জ্বর, অতিসার, প্রবাহিকা, কুষ্ঠ, মূত্ররোগ প্রভৃতিতে তাঁহারা একেবারেই অকৃতকার্য হইয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল রোগের আশ্রয় শস্ত্রপ্রয়োগব্যাপারে তাঁহারা যে সিদ্ধহস্ত তাহা, মুক্ত কর্তে স্বীকার করিতে হয়। যদি প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্র এই সকল রোগ প্রতিকারে সমর্থ হইয়া মনুষ্য জাতিকে হুঃখভোগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারে, কাহারও সে সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে না। চিকিৎসার ঞায় মহৎ বিষয় বাহাদের জীবিকা সে সকল ব্যক্তিরত কথাই নাই। আমি আহলাদের সহিত জানাইতেছি যে—কলিকাতা-মহানগরীতে এমন অনেক সুপ্রসিদ্ধ এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন—বাহারা বিবিধ আয়ুর্ষেদীর্ঘ ঔষধ, যথা—পারদজাত সর্কোৎকৃষ্ট ঔষধ মকরদ্বন্দ্ব, গুলঞ্চ, কালমেঘ, কুড়চি, অশ্বগন্ধা প্রভৃতির সার (Extract) ব্যবহার করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত আমার ভক্তিবাজন শিক্ষক মেডিকেল কলেজের ভূত-পূর্ব প্রিন্সিপাল, অনারেবল সার্জেন জেনারেল স্যার পার্ভে লিউকীন্স মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বেঙ্গল মেডিকেল এণ্ড সার্জারি-সিউটিক্যাল ওয়ার্কস্' নামক কারখানার বেক্সপ

প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল দেশীয় ঔষধের সার প্রস্তুত করা হয়, তাহাতেই বুঝা যায় যে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এ সকল ঔষধ কত অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সং প্রতি 'কিং এডওয়ার্ড মেডিক্যাল স্কুলের' সংলগ্ন হুকুমচাঁদ লেবরেটরী এবং পাঠাগার উন্মোচন ব্যাপারে স্ত্রীর পার্শ্বে লিটকীস্ মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"I wish to impress upon you most stongly that you should not run away with the idea that every thing that is good in the way of medicine is contained within the ringfence of Allopathy or Western Medical science. The longer I remain in India and the more I see of the country and the people, the more convinced I am, that many of the empirical methods of treatment adopted by the Vaidas and Hakims are of the greatest value, and there is no doubt whatever that their ancestors knew, ages ago, many things which are now-a-days being brought forward as new discoveries; for instance during the last few years, that there has been a considerable amount of talk about what is known as 'dechlorination' that is to say, that depriving of the system of salt. This arose from certain experiments carried out by Wival and Javal, as a result of which it is recognised that in all cases of dropsy the greatest benefit can be obtained by restricting your pa-

tients to an entirely salt free dietary. This was known thousands of years ago in the East and Vaid or Hakin could have told you, long before Wival and Javal made their experiments, that 'salt is contraindicated in all dropsical affections.

অনুবাদ :- "আমি আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে ধারণা করিয়া দিতে চাই যে—ঔষধ সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাল, তাহা এ্যালোপ্যাথি বা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের গোম্পদের মধ্যে আছে,—আপনারা এরূপ মনে করিবেন না যতই অধিক দিন আমি ভারতবর্ষে থাকিতেছি এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও তত্রত্য অধিবাসিগণকে দেখিতেছি আমি ততই বুঝিতেছি যে বৈজ্ঞ ও হাকিমদিগের অভিজ্ঞতামূলক চিকিৎসা বিশেষ মূল্যবান। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ বহু পূর্বে যাহা জানিতেন, অধুনা সেরূপ অনেক বিষয় নূতন আবিষ্কার বলিয়া ঘোষিত হইতেছে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে—বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ রোগীকে লবণ বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করা সম্বন্ধে অনেক বাখিতগুা চলিতেছিল। ওয়াইভেল এবং জেভেল নামক চিকিৎসকদ্বয় পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে—লবণবিহীন পথ্য দ্বারা শোথরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে এবং তাহাই পূর্বোক্ত বাখিতগুার কারণস্বরূপ হইয়াছিল। ভিন্ন মহোদয়গণ, ইহাতে নূতন কিছুই নাই। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে এই তথ্য প্রতীচ্য দেশবাসিগণ অবগত ছিল এবং ওয়াইভেল ও জেভেলের পরীক্ষার বহুপূর্বে যেকোন বৈজ্ঞ বা হাকিম বলিতে পারিত যে—সর্বপ্রকার শোথরোগে লবণ অহিতকর।"

## শিশুর উদরাময় চিকিৎসা।

( ঠাকুরমা ও নাতনী )

—:—:—

লীলা। ঠাকুরমা, আমি এসেছি।

ঠাকুরমা। কে লীলা নাকি ?

লী। হাঁ ঠাকুরমা, চোখে দেখতে পাওনা নাকি ?

ঠা। চোখের আর দোষ কি দিদিমণি ? আজ প্রায় একশত বৎসর হতে চললো প্রভু-ভক্ত ভূত্যের মত খেটেছে। এখন ওর অবসরের সময় হয়েছে।

লী। সংসারের সব দেখে কি তোমার তৃপ্তি হয়েছে, ঠাকুরমা ?

ঠা। হয়েছে বৈকি ভাই। বাল্যকাল হতে আকাশের নীলিমা, বনস্থলীর শ্রামিকা পূর্ণচন্দ্রকরালোকিত রজনীর সৌন্দর্য্য দেখে আসছি ; তার পর কিশোর বয়সে যখন বিবাহ হ'ল তখন দেখলাম, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য স্বামীর চন্দ্রবদনে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তারপর পুত্র কন্যার আর তোমাদের চাঁদ মুখ দেখলাম। এখন বাহ্যদৃষ্টি আর ভাল লাগে না।

লী। ঠাকুর দামার জন্তে কি এখনও তোমার মন কেমন করে ঠাকুরমা ?

ঠা। কেন করবে দিদিমণি ? নখর দেহ ত্যাগ করেছেন বলে তিনি কি আমার ছেড়ে যেতে পেরেছেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্বদা তাঁকে অন্তরে দেখতে পাচ্ছি। তাই বলছিলাম যে বাহ্যদৃষ্টি আর ভাল লাগে না।

লীলা। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে স্বামীকে না পেলে কি তৃপ্তি হয় দিদিমা ?

ঠা। হয় বৈকি ভাই। যখন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় তখন হয়। জীবনে এমন এক

দিন গেছে, যখন স্বামীর একটা চুষন পাবার জন্তে ব্যাকুল ভাবে কত রাত জেগে প্রতীক্ষা করে বসে থাকতাম, কিন্তু এখন আর চুষন আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা নাই, বাহ্য প্রেম চলে গেছে। মরা সোণার খাদ কেটে গিয়েছে। এখন অন্তরে সর্বদা স্বামীকে দেখতে পাই, কিন্তু প্রেমের আকুলতা ব্যাকুলতা নাই—এবে বিরহ শূন্য, ধীর, শান্ত, স্থির প্রেম। এখন আর দৃষ্টি সামুদ্রাগে স্বামীর মুখ পড়ে বিহ্বল হয় না—কেবল তাঁর সর্বতীর্থময় চরণ দুখানির উপর পড়ে থাকে, আর চরণ দুখানি থেকে যে একটা সূক্ষ্ম জ্যোতি নির্গত হয়ে বিশ্বপিতার চরণ ধুলিতে সংযুক্ত হয়েছে, চক্ষু সেই দিকে লোলুপ ভাবে চেয়ে থাকে।

লী। ( পদধূলি লইয়া ) ঠাকুরমা, আশীর্বাদ কর—যেন তোমার মত পতিভক্তি পাই।

( প্রফুল্লের প্রবেশ )

প্রা। বেশ, পরকালের দিকেই খরদৃষ্টি দেখছি যে ইহকালের কাজটা বুঝি ভুলে গেলে ?

লী। ভয় নেই তোমার। এইবার ইহকালের কথা পাড়ি। দেখ ঠাকুরমা সেবারে তোমার দয়ার ছেলে ছোটো রকম পেলে। এবার আবার ছোটো পেটের অস্থখ নিয়ে ভুগছি। কিছুতেই ভাল হয় না।

ঠা। কি রকম হয় বল দেখি ?

লী। ছোট খোকার রোজই ৩৭ বার করে পাঁতলা দান্ত হয়, রাতেও ২১ বার হয়। আর বড়খোকার রোজ ৩৪ বার করে দাঁত,

কখন পাতলা, কখন ভসকা ভসকা, আবার  
কখন বাঁধা মলও দেখা যায়।

ঠা। বাহ্যের চেহারা কেমন ?

লী। ছোট খোকার হলদে রঙ্গের বাহ্যে  
হয়, আর বড় খোকার কখন হলদে, কখন  
মেটে, মেটে কখন শাদাটে, কখন বা, শাক-  
হেঁচানির মত বাহ্যে হয়।

ঠা। ওদের বয়স কত হয়েছে রে ?

লী। ছোট খোকা এই মোটে এক  
বছরের হল, আর বড় খোকার এই পোনে  
আড়াই বছর পুরবে।

ঠা। কি খেতে দিস্ ?

লী। ডাক্তারে যখন যা বলে, জল বার্লি,  
বেঞ্জারস্ ফুড্, হরলিকের মল্টেড্ মিক্—  
এই সব।

ঠা। দুধ দিস্ না ?

লী। না, ডাক্তারে দুধ একেবারে বন্ধ  
করে দিয়েছে। ছোট খোকাকে কখন কখন  
একটু আধটু দেয়।

ঠা। ছোট খোকা কি মাই খায় ?

লী। খেত ; ডাক্তারে মাই দিতে বারণ  
করেছে।

ঠা। কেন ?

লী। ( নিরন্তর )।

ঠা। পোয়াতি হয়েছিল বুঝি ?

লী। হাঁ।

ঠা। তা হলে মাই দিসনে।

লী। কিন্তু খোকা বড় কাঁদে, এক আধ-  
বার না দিলে চলে না।

ঠা। তা দিস্, দুধ খুব করে গেলে ফেলে  
তার পর মাই দিবি। তাও যত কম হয়  
ততই ভাল।

লী। কেউ কেউ বলে—মাইতে তেতো  
মাথিয়ে রাখলে আর মাই খাবে না।

ঠা। না তা করিস্ নে। যাদের মাই  
খাবার বড় ঝোক, তাদের ঐ রকম জোর  
জরবদস্তি করে মাই ছাড়ালে ছেলে একে-  
বারে মনমরা হয়ে থাকে। আর তাতে করে  
খুব অসুখও হতে পারে। তা না করে যে  
রকম বল্লাম অম্নি করে মাই দিস্।

লী। তার পর কি পথি দেব বল ?

ঠা। ছোট খোকার দাঁত উঠেছে কয়টা ?

লী। উপরে চারটে নিচে চারটে।

ঠা। ভাত হবার পর থেকে ভাত খেতে  
দিস্ ?

লী। না ভাতত দিইনে।

ঠা। অন্ডায় করেছিস্। শায়ে যে ভাত  
দেয়ার বিধি আছে, তার মানে যে সেই সময়  
থেকে শিশুকে ভাত খেতে দেওয়া উচিত।

লী। ডাক্তার বলে বার্লি দিলেই হবে।

ঠা। তা বটে, চাল, যব, গম একই  
জাতের ; তবে আমাদের দেশে বহুকাল থেকে  
যা চলে আসছে, সেটা সরও ভাল আর খরচ  
ও কম হয়, পরমাণুলোও দেশে থাকে।

লী। তুমি যা বলবে আমি তাই দেব।

ঠা। তা ভাতই দিস্। তবে বার্লি  
দিলেও ক্ষতি নাই, ওটা দেশে চলে গেছে।  
তবে বার্লি দিতে হলে ভাল বার্লি দিতে হয়।  
বাজারে অনেক বার্লিতে চালের গুড়ো  
মিশায়।

লী। আজ্ঞা ঠাকুমা, তুমিত বলছ—ভাত  
দিতে ; তবে চালের গুড়ো মিশালে ক্ষতি কি ?

ঠা। কচি ছেলেদের একটু ভাল পুখার  
চালের ভাত দিতে হয়। ওরা যে চাল দেয়  
সেটা একেবারে জবজ। ভাল চাল দিলে  
ক্ষতি ছিল না।

লী। কিন্তু দেখ ঠাকুমা, তুমিত বলছ



ভাল চাল দিতে, কিন্তু আমাদের বাড়ীর পাশে আমাদের এক জন পাইক থাকে তারা জাতে পোদ। তার একটা এক বছরের ছেলেকে খুব মোটা রাঙা চালের ভাত দেয়, ছেলেটাও কোঁত কোঁত করে গেলে।

ঠা। তাতো হবেই দিদি! মাহুঘের যার যেমন অবস্থা, ভগবান তাকে তেমনি সয়বার শক্তি দিয়েছেন। শুধু খাওয়া কেন শীতের সময় তোমার খোকাটাকে গরম জামা কাপড়ে সাজিয়েও তোমাদের ভয় হয়—পাছে ঠাণ্ডা লাগে, কিন্তু পোদের সেই ছেলেটা এখন পাতলা স্ততোর কাপড় গায়ে দিয়ে অনায়াসে শীত কাটিয়ে দেয়। ভগবানের এ দয়া না থাকলে কি সৃষ্টি থাকত ?

লী। ঠিক কথা ঠাকুমা। এখন ভাত কি করে দেব বল ?

ঠা। বলছি, আগে বার্লির কথা বলি। বার্লি দিতে হলে খুব ভাল বার্লি দিতে হবে। এক রকম আস্ত বার্লি পাওয়া যায়, তাকে ‘পার্ল বার্লি’ বলে। সেই বার্লি সিদ্ধ করে দিলে খুব ভাল হয়।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, বিলিভী বার্লির মত কোন জিনিষ কি আমাদের দেশে নেই ?

ঠা। আছে বৈকি ভাই! আমাদের সোণার দেশে নেই কি ? দেশে জিনিষ আছে, কিন্তু মাহুঘ নেই। ঐ শটী বলে যে একরকম গাছ আছে; কতকটা হলুদ গাছের মত আর হলুদের মত জিনিষ তার গোড়ায় হয়, সেই গুলি শুকিয়ে গুড়ো করে বার্লির মত পাক করে খেতে দিলে ছেলেদের পেটের অস্থখ খুব উপকার হয়। তা ছাড়া পান-ফলের পালো আছে একরকম কাঁচকলার গুড়ো আছে, আরও কতকি আছে, কে তাঁর

সন্ধান করে! যদি কোন জ্ঞানী বড়লোক এই সব জিনিষ থেকে ছেলেদের স্তন্তে বার্লির মত একটা খাবার তৈরির করে, তা হলে অনেক লোক প্রতিপালন হয়, দেশের অনেক পয়সা বেঁচে যায়, আর যে করে তারও অনেক পয়সা হয়।

লী। হাঁ, ভাল কথা ঠাকুমা। এরাকট কেমন জিনিষ ?

ঠা। এরাকটও ছেলেদের পেটের অস্থখ খুব উপকারী। বাঁছে খুব কমিয়ে দেয়।

লী। তা যাক, সবত শুনে রাখলাম এখন ভাত কি করে দেব বল।

ঠা। বশি শোন ঠা—বছরের পুরাণ সন্ধ্যা চাল যোগাড় করে বড় খোকাকে পোরের ভাত করে দিবি।

লী। পোরের ভাত আবার কি ঠাকুমা ?

ঠা। পোরের ভাত কি তাও জানিসনে তোরা এমনই মেম্ব বনে গেছিল—শোন বলি। যাতে দরকার মত ভাতধরে এমন একটা ছোট ভাঁড় নিবি, আর চালগুলি বেশ করে বেছে ধুয়ে সেই ভাঁড়ে রাখবি, তাতে এমন জল দিবি যেন ফেন না থাকে, অথচ ভাত যেন বেশ সিদ্ধ হয়। তারপর কতকগুলি ঘুঁটে থাকে থাকে সাজিয়ে তাতে আস্ত গরিয়ে দিবি, আর ভাঁড়টা তার উপর রাখবি। আর কিছুই করতে হবে না। শেষে বেশ সিদ্ধ হয়ে গেলে ভাতগুলি নামিয়ে নিবি।

লী। যদি নিত্য একরকম যোগাড় না হয় ঠাকুমা ?

ঠা। যোগাড় হবে না কেন, চেষ্টা থাকলে যোগাড় হয়। নিত্য না হলে মাটির হাড়িতে কাঠের আলো ভাত সিদ্ধ করে দিলে।

লী। হাছ উপকারী কি দেখে ?

ঠা। কচি কাঁচকলা আর ছোট কৈ, মাগুর, শিঙ্গি মাছের ঝোল ; এছাড়া আর কিছু দিবিনে। তরকারী লক্ষ্য কি ঘি দেওয়া হবে না। তাছাড়া যত কম তেলে রাঁধা যায়, ততই ভাল।

লী। তা শুধু এই তরকারী দিয়ে কি খাবে ?

ঠা। অস্থখ বিস্থখ হলে আর উপায় কি। ঐ তরকারী দিয়েই তুলিয়ে রাখতে হয়।

লী। এতে যদি অরুচি হয় ?

ঠা। ছেলেপিলের প্রায়ই অরুচি হয় না। তবে নিত্যন্ত অরুচি হ'লে এটা সেটা দিতে হবে বৈকি। কিন্তু অস্ত্র জিনিষের কথা বলছি ব'লে যেন গোড়া থেকেই দিসনে। নেহাৎ দরকার বুঝলে তবে দিবি। অরুচি হ'লে একটু আখটু কুপথ্য দিয়েও রুচি করতে হয়।

লী। না তা দেব কেন। যদি নেহাৎ রাখতে না পারি, কি অরুচি হয়, দেখি তাহলেই দেব।

ঠা। হাঁ তাই করিষ মস্থর কি অড়হর দালের যুগ একটু দেওয়া চলে। কিন্তু কেবল যুগ একটা দাল যেন না থাকে। আর দালে মসলা যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল। কেবল একটু নুন, হলুদ আর ধনে বাটা। তাই দিয়ে সিদ্ধ করে কাপড়ে ছেঁকে দিবি। তেল ঘির নামও নয়।

লী। আর তরকারী কি দেব ?

ঠা। তরকারী আর কিছু না দেওয়াই ভাল, দিলে কুপথ্য দেওয়াই হ'ল। তবে নেহাৎ দরকার হ'লে কোন দিন দুটো পলতা বেগুন সিদ্ধ করে দিলি। কোন দিন বা বেগুন, কাঁচকলা আর কচি পটোলের তরকারী করে,

কি ঐ সব তরকারী দিয়ে একটু গাঁদালের ঝোল ক'রে দিবি।

লী। গাঁদালের ঝোল কি ঠাকুমা ?

ঠা। তাদের আলায় আলাতন বাপু। গাঁদালের ঝোল কি তাও জানিসনে ! গাঁদাল এক রকম লতানে গাছ। কোন কোন দেশে গন্ধভাজলেও বলে। তারি পাতার সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে ঝোল করলেই গাঁদালের ঝোল হ'ল।

লী। তরকারী আর কিছু নয় ত ?

ঠা। না, তরকারী আর কিছু নয়। আর ঐ সব তরকারী যদি না খেয়ে চুষে ফেলে দেয়, তা হলে খুব ভাল হয়। হাঁ একটা কথা। ছাখ, -ভাতের সঙ্গে পাতি কি কাগজি লেবুর রস দিতে পারিস্। তাতে অরুচিও যায়, আর পেট ঠাণ্ডাও হয়।

লী। আচ্ছা, তরকারী ত হ'ল; এখন জলখাবার কি দেব বল ?

ঠা। দাড়িম, বেদানা, পানফল, কেশুর সিঙ্গাপুরে কেশুর, কচি বেলপোড়া, পাকা গাব, বিলীতি গাব—যে ঙুলোকে 'ম্যাসোষ্টিন' বলে,—এই সব জিনিষ জলখাবার দিবি। তবে কেশুর টেশুরগুলো চিবিয়ে রস খেয়ে ছিব্ড়ে ফেলে দেওয়াই ভাল।

লী। অনেকে বেলের মোরব্বা দিতে বলে ঠাকুমা।

ঠা। আরে ওগুলো কিছুই নয়। বেলের মোরব্বা তৈয়ের কতে হ'লে বেল খণ্ড খণ্ড করে কেটে সিদ্ধ করে, তাতে আসল জিনিষটে বেরিয়ে যায়, থাকে কেবল ছিব্ড়েগুলো আর তার মধ্যে চিনির রস ভরে রাখে, ওর চেয়ে বেলপোড়া অনেক ভাল; আহাৰ গুয়ু দুই হয়। তবে বেলপোড়ার সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে দিলে ছেলেরা বেশ আনন্দে

খায়। আর একটা মনে রাখিস্ যে বেল বত  
কচি হয় ততই উপকারী ।

লী। আচ্ছা, জলখাবার ত হ'ল। এইবার  
হুধের কথা বল ।

ঠা। বাড়ীতে গরু করেছিস্ ত ?

লী। হাঁ, সে আর বলতে। শুধু তাই  
নয় ঠাকুমা, গরু করে খগুর বাড়ী আমার  
কত সুখ্যাৎ হয়েছে।

ঠা। কিরকম বল দেখি ।

লী। আমার খগুরেরা বড় গৃহস্থ, তাত  
জান ঠাকুমা। কোন তরকারীর খোলা,  
পাতের ভাত, এসব আগে ফেলা যেত। এখন  
সে সব গরুতে খায়, একটু কিছু ফেলা যায় না।  
বাগান থেকে রোজ হুজন মালি আসে, আমি  
তাদের ঘাস আনতে বলে দিয়েছি। তারা  
রোজ হুবোঝা করে ঘাস নিয়ে আসে। আর  
কিছু খড়, খোল ও দানা কিনতে হয় ।

ঠা। কতগুলি গরু হয়েছে ?

লী। গরু মোট ছ'টা। তিন তিনটির  
হুধ এক একবারে পাওয়া যায়। কাজেই  
বারমাস রোজ প্রায় ২০২৫ সের করে হুধ  
হয়।

ঠা। তা হ'লে সংসারে একটা কাজ  
করেছিস্ বল ।

লী। শোন না ঠাকুমা, আগে হুধের  
জন্মে মাসে প্রায় হুশো টাকার কাছাকাছি  
খরচ হ'ত। এখন একশ টাকার বেশী হয় না।

ঠা। শুনে বড় আশ্চর্য হল লীলা।  
এই রকম গিনিপনাই ত চাই।

লী। আগে সব শোন। অনেক হুধ  
হুটে দেখে যে হুধ খরচ হয়, তা বাদে যা থাকে,  
তাই নিয়ে আমি নানা রকম খাবার তৈয়ের  
করি। ছানা, কীর, সন্দেশ, কীরের পান্ডুরা,

রাবড়ি, মাখন, ঘি,—এই সব। খগুর,  
শাকুড়ী, ভান্সুর, দেওর—এঁরা সেই সব খেয়ে  
বলেন—আর আমরা বাজারের খাবার খাবনা,  
বৌমার হাতের খাবার খাব। তা অত বড়  
সংসার ঠাকুমা, থাকে একদিন কিছু না দিতে  
পারি, তিনি সেই দিন রাগ করেন। খগুর  
বলেন, বৌমাকে বল—আরও ছ'টা গরু  
পুষতে। কিন্তু বড় খাটতে হয় ঠাকুমা।

ঠা। এইত চাই দিদিমণি। সংসার কর্ম-  
ক্ষেত্র। এ সংসারে যিনি না খেটে জীবন কাটিয়ে  
দিতে চান, তিনি ত জেতেন না,—হায়েরন,  
সংসারে আত্মীয়-স্বজনদের—ছেলে, নাতি,  
জামাই, গুরুজনদের—স্বামী, খগুর, ভান্সুরদের  
যদি সুখী করতে না পারলাম, তবে এ মেয়ে-  
মাছুষজন্ম বুথায় গেল। তবে একটা কথা বলি  
দিদিমণি,—সংসারের ঝি চাকরদেরও একটু  
যত্ন করিস্। আমি যখন এবাড়ীতে আসি,  
তখন এদের এত বোল বলা ছিল না। রাম-  
প্রসাদ ব'লে একটা চাকর ছিল। তখন আমার  
দিদিমা বেঁচে। কোন ভাল খাবার এলে  
যখন তাঁরে দেওয়া হত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা  
করতেন—“রামপ্রসাদকে দেওয়া হয়েছে ?”  
রামপ্রসাদকে না দিলে তিনি খেতেন না।

লী। ঠাকুমা, সে কথা বলতে হবে না।  
আমি কার নাতনী, সে কথা জান। সপ্তায়  
একদিন আমি খাবার হুভাগ করি। এক  
ভাগ বাবুদের জন্মে, আর একভাগ চাকরদের  
জন্মে। আর চাকর চাকরাণী কবে সেই দিন  
আসবে বলে হাঁ করে থাকে।

ঠা। শুনে বড় সুখী হলাম্ লীলা।  
আশীর্বাদ করি—তুই সকলকে এমন সুখী  
ক'রে নিজে চিরসুখী হয়ে পাকা মাথার সিঁদুর  
পরিস্।

প্র। ঠাকুমা, এতক্ষণ মুখটা বুজে বসে আছি, কিন্তু এবার আর পাল্লেন না। তোমার নাত্নী সকলকে সুখী করেছেন বটে, কিন্তু আমাকে যে নিতান্ত অসুখী ক'রে তুলেছেন। সে দিকে কি তোমার একটু কৃপাদৃষ্টি পড়বে না ঠাকুমা ?

ঠা। কেন ভাই, লীলা তোমায় কি অসুখী করেছে ?

প্র। অসুখী নয় ঠাকুমা। সকালে ঘুম ভেঙ্গে লীলাকে খুঁজি, কোথায় লীলা! হৃদিকে কেবল ছটো বালিশ। লীলা তখন গোয়ালঘর তদারক করছে। একটু বেলা হ'লে ভাবি—লীলা আসচে, কোথায় লীলা। সে সংসারের একাজ সে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। খাওয়ার সময় শুধু একবার তাকে দেখতে পাই। তার পর আর নয়। গভীর রাত্রে যখন সংসারের সকলে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন লীলা খাবার নিয়ে আমার কাছে আসে। যাকে সর্বদা দেখতে চাই, তাকে এত কম দেখতে পাওয়া কি একটা বিষম কষ্ট নয় ঠাকুমা ?

ঠা। এতে কি তোর কষ্ট হয় প্রফুল্ল! সাফাৎ কর্তব্যরূপিণী এমন স্ত্রী পেয়েছিস এত ভাগ্যের কথা, এতে হুখ কেন ভাই? আজকাল যে রকম দিন কাল পড়েছে, তাতে লোকে তাই চায়। সংসারের কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে, পাড়া প্রতিবাসীর খোঁজ খবর না নিয়ে স্ত্রী শুধু সর্বদা আমার কাছে থাকে,—এই এখন লোকে চায়। কিন্তু সেটাও আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম নয়, অধর্ম বলেই কথিত হয়েছে। স্ত্রী আমার সংসারের সকলকে সুখী করছে, স্ত্রী আমার সংসার মাথায় করে রেখেছে, স্ত্রী আমার পরমপ্রিয় পতি-পুত্রের সুখস্বচ্ছন্দ্য বজায় রেখে সংসারের

সকলের সুখের জন্তে খাটছে; এতে কি তোমার হুখ হয় ভাই ?

প্র। ঠাকুমা, আজ তোমার পা ছুঁয়ে প্রাণের একটা সত্য কথা বলছি। যখন প্রথম এম, এ, পাস ক'রে জগতটাকে দেখেছিলাম, তখন তাই মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম যে—আমি আর স্ত্রী পুত্র এই নিম্নেই সংসার, কিন্তু তোমার আর তোমার চেলা নাত্নীর ব্যবহার দেখে সে মত বদলে, গিয়েছে। সকালে উঠে যখন লীলাকে কাছে পাইনে, তখন চুপি চুপি গোয়ালে গিয়ে দেখি—লীলা আমার গরুর শুশ্রূষা করছে। যখন দুপুর বেলা লীলাকে পাইনে তখন লুকিয়ে গিয়ে দেখি লীলা আমার পিতামাতার শুশ্রূষা করছে। যখন বিকালে লীলাকে পাইনে, তখন চুরি করে লুকিয়ে গিয়ে দেখি—লীলা আমার দাস দাসী অতিথি অভ্যাগতদের অভিযোগ শুনছে। দেখে আমার কি মনে হয় ঠাকুমা,—তা আমি প্রকাশ ক'রে বলতে পারিনে। আর মনে হয় লীলা নিজের লীলা হয়নি, লীলাকে লীলা করেছেন তাঁর ঠাকুমা। তখন তোমার ঐ চরণস্থানির উদ্দেশে আমার মস্তক স্বতই অবনত হয়ে পড়ে ঠাকুমা। প্রার্থনা করি—যেন জন্ম জন্মান্তরে লীলার মত কর্তব্যরূপিণী স্ত্রী পাই।

লী। মাও, আর বক্তৃতা করতে হবে না। তোমার শ্রীচরণের দাসী লীলা, তাকে অত বড় করা কেন? ওচরণে যে কত অপরাধ করি, তার কি লীমা আছে?

প্র। অপরাধ—অপরাধ অসংখ্য। প্রথম অপরাধ যে—আমার সুখী করেছ। দ্বিতীয় অপরাধ যে আমার বাপমাকে সুখী করেছ। তৃতীয় অপরাধ যে আমার ভাইদের সুখী করেছ। চতুর্থ অপরাধে যে সংসারের দাস

দাসী অতিথি অভ্যাগতদের সুখী করেছে ।  
এ অপরাধের শাস্তি কি লীলা ?

লী। থাক এখন । অপরাধের শাস্তি  
বথাসময়ে দিও । এখন আমার কাজের কথা  
বলতে দাও ।

ঠা। কি মিটলো তোদের ?

লী। হাঁ ঠাকুমা মিটেছে, এখন দুধ  
দেবার কি বল ?

ঠা। বড় খোকার কতটুকু করে দুধ  
খাওয়া অভ্যাস ?

লী। যখন ভাল ছিল, তখন পাঁচ পোয়া  
দেড় সের দুধ খেত ।

ঠা। তা হলে এখন দেড়পো কি আধ-  
সের দুধ দিবি । যত দুধ তত জল, আর ৮১০  
টা মুখে থেঁতো করে একসঙ্গে সিদ্ধ করবি ।  
যখন জল মরে যাবে কেবল দুধ থাকবে, তখন  
নামিয়ে নিবি ।

লী। দুধ কি শুধু চুমুক দিয়ে খেতে  
দেব ?

ঠা। পেটের অন্তর্থে শুধু দুধ প্রায় সহ্য  
হয় না, তবে সহ্য হ'লে দেওয়া যেতে পারে ।

লী। সহ্য হচ্ছে কিনা কি করে বুঝব ?

ঠা। ছেলের মলের দিকে নজর রাখলেই  
তা বোঝা যায় । যদি মলে শাদা শাদা  
ছানার মত জমাট দুধ দেখা যায়, তা হলে  
বুঝতে হবে যে দুধ হজম হচ্ছে না ।

লী। তা হলে কি করব ?

ঠা। তা হলে শুধু দুধ না দিয়ে একটু  
তাড়ের সঙ্গে, একটু বাল্লির সঙ্গে দিবি ।  
আর মলের দিকে নজর রাখবি ।

লী। তাতেও যদি মলের সঙ্গে ছানো  
ছানো দুধ দেখা যায় ?

ঠা। তা হলে ঐ রকম সিদ্ধ করা দুধ

আর দুধের সিকি আন্দাজ চূনের জল এক  
সঙ্গে মিশিয়ে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু করে  
খেতে দিবি ।

লী। তাতেও যদি হজম না হয় ?

ঠা। তা হলে দুধ কমাতে হবে । আর  
গরুর দুধ বন্ধ করে ছাগলের দুধ দিতে হবে ।

লী। ছাগল দুধ কি করে দেব ?

ঠা। যেমন করে গরুর দুধ দিতে বললাম,  
তেমনি করে দিবি । ছাগলদুধ পেটের অস্থ-  
খের পক্ষে বড় উপকারী । যদি পাওয়া যায়  
তাহলে গরুর দুধ না দিয়ে এখন থেকেই দিস ।

লী। তাতেও যদি মলের সঙ্গে সেই রকম  
জমাট দুধ দেখা যায় ?

ঠা। তা হ'বে মৃত্যুর সঙ্গে সিদ্ধ করা  
ছাগল দুধই হজম করতে পারবে । তবে যদিই  
হজম না হয়, তা হলে দুধ কমিয়ে যতটুকু হজম  
হয়, ততটুকু দিতে হবে ।

প্র। আমি একটা কথা বলে নিই ঠাকুমা ।  
ডাক্তারেরা একটা জিনিষ বার করেছে, তার  
নাম হচ্ছে পেপটোনাইজিং পাউডার । এক-  
রকম গুড়ো । তার সঙ্গে দুধ তৈয়ার করে  
দিলে খুব সহজে হজম হয় । দরকার বুঝলে  
সেটা দিতে কি আপত্তি আছে ?

ঠা। না তাতে আপত্তি কি । জিনিষটে  
যদি সত্যি উপকারী হয়, কেন ব্যবহার করব  
না ? তবে কথা হচ্ছে এই যে—দেখতে হবে—  
জিনিষটে প্রকৃত উপকারী কিনা । আবার  
এক দিকে উপকার করে অন্য বিষয়ে অপকার  
করে কি না সেটাও দেখা দরকার ।

প্র। না ঠাকুমা, জিনিষটা খুব উপকারী  
তবে পরিণামে কোন অপকার করে কি না  
তা জানি না ।

ঠা। তবেই ত কেমন করে দিতে বলি ।  
ওগুলো না হলে কি চলে না ?

প্র। আর একটা কথা বলছিলাম ঠাকুমা—  
ডাক্তারেরা কতকগুলি ছেলেদের খাবার  
তৈয়ার করেছেন, সেগুলি পেটের খাবার  
যেমন হজম হয় সেই রকম উপায়ে আগেই কত-  
কটা হজম করা হয়। সেগুলি ছেলেরা খুব  
সহজে হজম করতে পারে। আর তার মধ্যে  
বেনজারস ফুড্ ( Benger's food ) বলে যে  
একটা খাবার আছে, সেটা ছেলেদের পেটের  
অসুখে খুব উপকারী।

ঠা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটার কথা জানি বটে।  
ঐ যে কলকাতার কুমারটুলীতে একজন খুব  
বড় আর খুব ভাল কবিরাজ ছিলেন, তাঁর  
নামটা কি ?

প্র। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন।

ঠা। হ্যাঁ, ঐ নামই বটে। তিনিই এক  
বার আমাদের বাড়ী এসে ঐ খাবার আর  
ছাগলদুধ পথি দিয়েছিলেন। তাতে খুব  
উপকারও হয়েছিল। তবে উহাতে ক্ষেত্রবিশেষে  
উপকার হলেও দেশের পক্ষে খাণ্ড বলে  
ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে না।

লী। সেই ছোট বোয়ের খোকার  
পেটের অসুখের সময় ঠাকুমা, আমারও  
মনে আছে। অমন কবিরাজ কিন্তু আর  
দেখিনি ঠাকুমা। তিনি মানুষ নন, দেবতা  
ছিলেন।

ঠা। দেখ, বিলাতি ফুড বা দুধ এদেশের  
ছেলেদের খাণ্ড হয় এটা আমার ভাল বোধ  
হয় না—এদেশে কত উপকারী খাবার আছে।  
খুব দরকার হলে ওষুদ বলে দিতে হয়, খাবার  
করে নিওনা। দেশের জিনিষে চললে আর  
বিদেশের জিনিষ ব্যবহার করা কেন ?

প্র। হ্যাঁ, সেত বটেই। আর কবিরাজ-  
মহাশয়ও তাই করতেন।

লী। ভাল কথা ঠাকুমা। আদ্যকাল  
বিস্কুটের খুব চলন হয়েছে। এরাকুটের বিস্কু-  
টের এক আধখানা দেওয়া যায় ?

ঠা। পারত পক্ষে নয়। তবে যেখানে  
নেহাৎ অল্প জিনিষ পাওয়া যায় না, সেখানে  
ছেলে ভোলাবার জন্তে খুব ভাল বিস্কুট এক  
আধ খানা দেওয়া যায়। তবে আবার বিলিভী  
টানের বিস্কুটের চেয়ে শাদা বাতাসার মত  
হালকা যে একরকম দেশী বিস্কুট পাওয়া যায়,  
সেগুলো টাটকা হ'লে শীঘ্র হজম হয়।

লী। ছুধের কথাত হল। এখন আর  
কি করবো বল ?

ঠা। ছুধের কথা হয়েছে, এখনও ঘোল  
আর ছানার জলের কথা বাকী আছে। যখন  
দুধ কোন মতেই হজম হয় না, কি খুব সামান্য  
একটু হজম হয়, তখন টাটকা দইয়ের সত্তো  
ঘোল দিলে আহাৰ ওষুদ দুই হয়। ঘোল  
নানা রকম আছে। তার মধ্যে বত খানি দই  
তার সিকি জল মিশিয়ে মইলে যে ঘোল হয়  
সেইটেই দেওয়া ভাল। যে দইয়ে ঘোল হবে,  
সেই দই যেন খুব টক না হয়, কি একেবারে  
টক নয়, এমন না হয়। আর ঘোল থেকে বেশ  
ক'রে মাখন তুলে ছেকে তবে দিতে হয়।

লী। ঘোল কি সইবে ঠাকুমা, সর্দি হবে  
না ?

ঠা। অনেকের সইতে পারে, আবার  
অনেকের নয় না। না সইলে কি একটু আধটু  
সর্দি কাসি থাকলেও যদি ঘোল দেবার দর-  
কার হয়, তা হ'লে একটা মাটির হাঁড়িতে  
গোটা কতক জীরে ভেজে তার ওপর ঘোল  
ঢেলে দিবি, আর একটু ফুটে উঠলে নামিয়ে  
ছেকে কুসুম কুসুম গরম থাকতে পাওয়াবি।

## কর্কট-রহস্য ।

—:—

‘মর্কটেতে কি জানিবে কর্কটের রস ।

ভাগ্য যার ভাল, সেই খেয়ে গায় যশ ॥

কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।

বাস্তালার ও বাঙ্গালীর মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজ কাব্য-মধ্যে স্থান দিয়া যে কাকড়াকে ‘অমরত্ব’ দান করিয়াছেন, আজ আমি সেই কাকড়ার গুণ কীর্তন করিব। মাঘের হরন্ত হিমে, অলাবু-সুন্দর কর্কটের প্রসঙ্গ বাহার ভাল লাগিবে না, কাক্সালের কর্কট রাশি ভাবিয়া তিনি আমায় ক্ষমা করিলে কৃতার্থ হইব।

কাকড়া সকলেই দেখিয়াছেন, স্ততরাং কাকড়া যে কি পদার্থ, বোধ হয় তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু কাকড়া সম্বন্ধে অনেক কথা পাঠকের জানিবার আছে। কাকড়া অনেক রোগে উপকারী, এবং রোগ-উৎপাদনের শক্তিও কাকড়ার আছে। সেই সকল কথার আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কাকড়া পচিশ প্রকার। ইহার মধ্যে কতক-গুলি স্থলচর, কতকগুলি জলচর, আবার কতক গুলি বা উভচর। প্রাণিজগতে এগণ্য একদল জলকর্কট আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা জলে বাস করে বটে, কিন্তু হিমসমুদ্রে থাকিতে ভাল বাসেনা। উক্ত কটিবন্ধনের দিকেই প্রচুর কাকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র ব্যতীত খাল বিল নদীতেও কাকড়ার দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; কখন কখন নদীতীরের সিকতাময় শুষ্ক চরে ইহারা বাসস্থান নির্মাণ করে। স্থল-কর্কট শুষ্কভূমিতে থাকে, ইহাদিগকে জলে ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। এইজাতীয় কর্কট সমস্ত দিন

গর্তের ভিতর লুকাইয়া থাকে, সন্ধ্যা হইলেই বিষয়কর্মে অর্থাৎ আহার-অশ্বেষণে বহির্গত হয়।

কাকড়ার শ্বাসযন্ত্র শরীরের মধ্যস্থলে স্থাপিত, দেখিতে ঠিক ছেঁড়া শ্বাকড়ার পুঁটিলির মত। এই শ্বাসযন্ত্রটিকে সর্সদাই ইহারা সিক্ত করিয়া রাখে, শ্বাসযন্ত্র শুকাইলে কাকড়া বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কাকড়ার ভ্রমণশক্তি অতি অল্প, ধাত-সংগ্রহের জন্ত ইহারা প্রত্যহ ৩-৪ মাইল পর্যন্ত অনায়াসে বেড়াইতে পারে। যাত্রা করিবার পূর্বে ইহারা শ্বাসযন্ত্রটা ভাল করিয়া ভিজাইয়া লয়, ইহাতে রৌদ্রের প্রখর তাপে পথ চলিবার সময়, ইহাদের কোনই কষ্ট হয় না।

এক শ্রেণীর কাকড়া আছে, তাহাদের একটা মাত্র দাঁড়া, দাঁড়াটি শরীরের চতুর্গুণ বৃহৎ। এই শ্রেণীর কাকড়া যখন পথে ভ্রমণ করে, তখন দাঁড়াটি সোজা করিয়া রাখে। ইহারা যখন গর্তের মধ্যে থাকে, তখন ঐ দাঁড়াটি গর্তের দ্বারদেশে আগড়ের মত করিয়া রাখে। এইরূপ অবরুদ্ধ গহবরে, আর কোনও জীব সহসা প্রবেশ করিতে পারে না।

আর এক শ্রেণীর কাকড়া আছে, তাহার কেবল নারিকেলের শস্ত খাইয়া জীবনধারণ করে। নারিকেলের গোতে ইহারা বড় বড় গাছে উঠে। দাঁড়া দিয়া নারিকেলের স্ক্রুটিন বহিরাবরণ ভেদ করিয়া কলমধ্যস্থিত শস্য বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করে। ইহাদের দাঁড়া ঠিক সাঁড়াশির মত। এই দাঁড়া দিয়া ইহারা প্রথমে নারিকেলের ছোঁড়া ছাড়ার,

তাহার পর যেখানে নারিকেলের তিনটি চোখ আছে, সেইখানে সজোরে আঘাত করে। এইরূপে ঐ স্থানে ছিদ্র করিয়া শাঁসটুকু নিঃশেষে ভক্ষণ করে। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ আদর করিয়া ইহাদের নাম রাখিলেন “ভোজন-বিলাসী।” ইহারা শুধু “ভোজনবিলাসী” নয়, শয্যা-বিলাসীও বটে! কেননা ইহারা যে গর্তে বাস করে, নারিকেলের ছোবড়া দিয়া তাহারই মধ্যে বিশ্রামের জন্য সুখ-শয্যা রচনা করিয়া থাকে। নারিকেলভোজী কঁাকড়া খাইতে বড় সুখাহ। এই জাতীয় কঁাকড়ার গাত্র হইতে প্রায় এক কোয়ার্ট তৈল বাহির হইয়া থাকে। একজন জাহাজের অধ্যক্ষ এই কঁাকড়া স্বদেশে আনিবার জন্য একটা ডবল টিনের পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া দিলেন, অধিকন্তু উক্ত পেটিকাটা লৌহনির্মিত তার দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রির মধ্যেই কঁাকড়াগুলি টিনের বাহ্যের গাত্রে ছিদ্র করিয়া কারামুক্ত হইয়াছিল। পাঠক মহাশয়! ইহাতেই বুঝুন—ইহাদের দাঁড়া কতদূর শক্তিশালী!

কঁাকড়া অত্যন্ত কলহপ্রিয়। ইহাদের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটয়া থাকে। যুদ্ধে যিনি জয়ী হন, তিনি পরাজিত শত্রুর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। ইহারই নাম—“শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।” ইহারা চাণক্যের কোটিল্য-নীতির পরম ভক্ত।

আর এক শ্রেণীর কঁাকড়া আছে,—ইহাদের সম্মুখভাগ কঠিন আবরণে আবৃত, কিন্তু পশ্চাৎদিকে একেবারেই অনাবৃত। ইহাদের একটা লাল্লু আছে। ইহারা অকর্মণ্য জীব—না পারে জলে নামিতে, না পারে মাটিতে দোড়াইতে; কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বুদ্ধি-

মান। সমুদ্রতীরে অনেক শব্দকের খোলা পড়িয়া থাকে, সেই খোলার সাহায্যে পশ্চাৎদিক আবৃত করিয়া ইহারা আশ্রয়স্থান সজে সজে লজ্জা নিবারণও করিয়া থাকে। মৃত শব্দক না পাইলে, অনেক সময় ইহারা জীবিত শব্দকে আক্রমণ করিয়া মরিয়া ফেলে। ইহাতে ‘অন্ন বস্ত্র’ উভয়ই সংগৃহীত হয়। জীব-জগতে এই জাতীয় কঁাকড়ার নাম “তপস্বী কঁাকড়া”; “তপস্বী” বটে, কিন্তু “ভণ্ড-তপস্বী”! কারণ শব্দকুলসংহার—ইহাদের জীবনের মহাব্রত!

উড়িয়া অঞ্চলের সমুদ্রকূলে পাঁচ ছয় রকম কঁাকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজাতীয় কঁাকড়ার বর্ণ উজ্জল লোহিত, যেন—টকটকে জবা-ফুল! মানব-হস্তের কঠিন স্পর্শে ইহারা মরিয়া যায়, তখন আর দেহের বর্ণ রান্না থাকে না, কালীর মত কালো হইয়া যায়। তদনন্তর ধীরগণ—সদৌ কাশি হইলে, এই কঁাকড়া ছেঁচিয়া রস খায়। তাহাদের বিশ্বাস—কাশির এমন চমৎকার ঔষধ জগতে নাই। ‘চাঁদীপুরে’ কঁাকড়ার রস থাইয়া এক ধীরগুত্রকে আমি কঠিন কাস-রোগ হইতে মুক্তি লাভ করাইয়াছি। দুর্গন্ধি ‘কডলিভার’, খাইতে ঐহাদের আপত্তি নাই, তাঁহারা একবার লাল কঁাকড়ার রস থাইয়া দেখুন, আমার বিশ্বাস—যথেষ্ট উপকার পাইবেন। বালেশ্বর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে ‘চাঁদীপুরের’ সমুদ্রতীরে আমি এই শ্রেণী কঁাকড়া অসংখ্য দেখিয়াছি। সামান্য প্রয়াসেই ইহারা মানুষের হাতে ধরা পড়ে।

মালোবার উপকূলে এক রকম কঁাকড়া আছে, ইহাদের আকার তেঁতুলে বিচার ঝড়। ইহারা মাহুষ কি কোনও জীবজন্তু দেখিবে



পাইলে ছুটিয়া গিয়া কামড়ায়। এই জাতীয় স্ত্রী কঁাকড়াগুলি সন্তোষগন্তে স্বামী হত্যা করিয়া থাকে। তাহার পর নিজের সঙ্গিনীগণকে ডাকিয়া পরম ভূষিপূর্বক মৃত স্বামীর দেহ ভক্ষণ করে। ইহারা কেবল বংশ-রক্ষার জন্তই স্বামীর জীবিত থাকা প্রয়োজন মনে করে। বলা বাহুল্য—এইজাতীয় কঁাকড়ার পুরুষগণ—স্ত্রী জাতির অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্বল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণয়িণীর মন ভুলাইবার জন্ত বিধাতা ইহাদিগকে স্ত্রী জাতির চেয়ে রূপবান করিয়াছেন। ইহাদের তাগ্যে প্রাণের পরি-বর্তে—প্রেমলাভ হইয়া থাকে।

জীবপ্রবাহরক্ষার জন্ত স্ত্রীপুরুষের মিলন—ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কিন্তু কর্কট-জাতির যৌন সম্মিলন, জননপ্রক্রিয়াতেই পর্যাবসিত হইয়া থাকে। কর্কট পিতা বা কর্কট মাতা কেহই অগত্যলালনের ভার গ্রহণ করে না। জননপ্রক্রিয়ায় পিতার এবং প্রসবপ্রক্রিয়ায় মাতার করণীয়ের অবসান হয়। কর্কট শিশু দৈবাধীন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, দৈবাধীন রক্ষা পায়। কর্কটদম্পতির প্রেমের স্বাদ্বিচ্ছ, ইহাদের জাতীয় প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। অনেক কঁাকড়াই কিছুতেই প্রণয়িণীর মন পায় না। প্রণয় নিবেদন করিতে গেলে ইহাদের মধ্যে প্রায়ই হাতাহাতি হয়। অনেকে আবার প্রেয়সীর অনুরাগ বিরাগ বৃত্তিতে না পারিয়া, সাধ্য সাধনা করিতে গিয়া প্রাণ হারায়। প্রেম-চূষনের ছলে প্রেয়সী, প্রেমিকের মাংস ভক্ষণ করে।

যে জাতীয় কঁাকড়া বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার নাম “বায়লেট”। কঁাকড়ার মধ্যে ইহারাই কুলীন। ইহাদের এক এক জনের তাগ্যে বহু স্ত্রীলাভ ঘটিয়া থাকে। ইহাদের

পুরুষেরা বলবান, তাহারা স্ত্রীকে ভালও বাসে, স্ত্রীও স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে ভালবাসায় ‘জেলসি’ বৃত্তিতে পারা যায়;—একে অস্ত্রের স্ত্রীর সহিত প্রেম সম্ভাষণ করিতে সাহস করে না।

বায়লেটের বংশ অভাবনীর রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গর্ভবতী কর্কটী প্রসব করিবার জন্ত সমুদ্রাভিমুখে বা নদী-তীরে গমন করে, প্রসবান্তে আর ফিরিয়া আসে না। অধিকাংশ কঁাকড়াই প্রসবের পর মরিয়া যায়। কর্কট শিশু “মাতৃহস্তারক” বলিয়া অনেক হিন্দু কঁাকড়া খায় না।

এক একটা কর্কটী অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি দেবিতে কিছুত কিম্বাকার, মাথাটা শিরজ্ঞাণের ত্রায়, - সেই মাথায়—একখানি কুঠার;—তাহারই নিম্নে একজোড়া উজ্জল চক্ষু। এই অন্নাবস্থাতেই ইহারা জলে সাঁতার দিতে থাকে। অন্নদিন পরেই এই সকল ডিম্ব অতি ক্ষুদ্র কঁাকড়ার আকার ধারণ করে। তখন আর জলে থাকেনা, সমুদ্রের তীরে উঠিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। একটু বড় হইলে, পিতৃ-মাতৃ-উদ্দেশে যাত্রা করে। এই সময়ই ইহাদের বিপদ,—পক্ষীরদল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া কর্কটশিশুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাহারা পক্ষিকূলের লুপ্ত দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে, তাহারাই ফিরিয়া গিয়া বাপ-মাকে দেখিতে পায়।

এহলে অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন, যে কর্কটশিশুরা ত জন্মিয়া পিতামাতাকে দেখিতে পায় না, তা বলিয়া শোহাগ যত্নও লাগিত হয় না, তবে তাহারা কেমন করিয়া জন্মদাতা ও গর্ভধারণিকাকে চিনিতে পারে, তাহাদের বাস-স্থানেরই বা কি করিয়া লক্ষ্য

পায়? প্রাণিতত্ত্ববিদগণ ইহার উত্তরে বলেন—স্বাভাবিক সংস্কারই কর্কটশিশুর পথ প্রদর্শক, স্বাভাবিক সংস্কার বলেই তাহার পিতা মাতাকে চিনিতে পারে।

কাঁকড়ার দলবদ্ধ হইয়া যখন সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হয়, তখন একরকম শব্দ করিতে থাকে। সেশব্দ দুই মাইল দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। দূর হইতে এই কর্কট-অভিধান দেখিলে মনে হয়, যেন এক বিরাট বীরবাহিনী রণযাত্রায় বহির্গত হইয়াছে। অভিধান প্রায় রাত্রিকালেই হইয়া থাকে। বলবান কর্কটগণ—পথ প্রদর্শকের কার্য করে! ইহাদের পশ্চাতেই—মহুরগামিনী গর্ভবতীর দল। বৃদ্ধ শিশু ও দুর্বল কর্কটগণ সকলের শেষে স্থান পায়। পথ চলিবার সময়—কর্কট-বাহিনী কোন বাধাই গ্রাহ্য করে না। সম্মুখে কোন মাছুষ বা পশু দেখিলে দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া ভয় দেখায়, কখন কখন সকলে মিলিয়া শত্রুকে আক্রমণও করিয়া থাকে। কর্কট-বাহিনী ঠিক লম্বাভাবে অগ্রসর হয়, বামে বা দক্ষিণে হেলে না। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া ইহার প্রথমেই একবার অবগাহন স্থান করিয়া লয়। তাহার পর গর্ভিণীগণ অণ্ড প্রসব করে, পুংজাতীয় কর্কটগণ—স্থানান্তরে গিয়া খোলস ছাড়ে। এই সময় ইহার অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, প্রায় পক্ষ কাল পরে, নূতন খোলস জন্মিলে তবে আবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। এই সময়েই ইহার মনুষ্যকর্তৃক ধৃত হয়।

এই বার কাঁকড়ার রোগনাশিনী শক্তির সংকীর্ণ পরিচয় দিয়া, এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বাহাদের রূপিণী দুর্বল কাঁকড়া তাহা-

দের পক্ষে বড়ই উপকারী। বস্মা রোগে—কর্কট একটা সুপথ কিন্তু উদরাময়, শোথ, মেহ, উপদংশ, অজীর্ণ (ডিসপেপসিয়া) উদরী, গুল্ম, যকৃৎ, দ্রীহা, অর্শ, কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ, প্রদর, বহুমূত্র, মুচ্ছা এবং বাতরোগে কাঁকড়া-ভক্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ।

শিশু (১০ বৎসর বয়সপৰ্য্যন্ত) এবং গর্ভিণীর পক্ষে কাঁকড়া অত্যন্ত অহিতকারী।

মস্তিষ্ক-রোগে বধিরতায় এবং শুক্র-তারল্যে কাঁকড়া ঔষধির কার্য করিয়া থাকে।

যেসকল পুষ্করের সন্তান হয় না এবং যেসকল রমণী পুনঃ পুনঃ কষ্ট প্রসব করেন, কর্কট-ভোজনে তাঁহাদের উপকার হইতে পারে।

কর্কটের অস্থির ক্ষুদ্র চূর্ণ মাখন সহ চাটিয়া খাইলে, রক্তপিত্তজনিত রক্ত-বমন তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

কাঁকড়ার দাড়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া চরণতলে প্রলেপ দিলে, ছেলেদের শয্যামূত্র-রোগ ও দাঁত-কড়-মড়ানি ভাল হয়। নিজ দেহেই ইহা আমি পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

যে দিন কাঁকড়া ভক্ষণ করিবেন, সে দিন মূলা, হৃৎ, ডিম্ব এবং কোনও প্রকার দাল খাইবেন না। শাস্ত্র-মতে এগুলি কাঁকড়ার পক্ষে সংযোগবিরুদ্ধ।

অলাবুযুক্ত কর্কট যে কেবল যুথপ্রিয় তাহা নহে, উপকারীও বটে, কাঁকড়া পেট গরম করে—অলাবু কাঁকড়ার এই গুরুতর দোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

কাঁকড়া ভোজনের পর—তরল দ্রব্য পান করিবেন।

দুগ্ধদোহনের সময় যে গাভী অস্থিরতা প্রকাশ করে, তাহার গলদেশে কাঁকড়ার কাণকুয়া বাঁধিয়া দিলে গাভী শান্তমুখি ধারণ করিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম্, এ।

## অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি ?

—:—

পৌষের হিমালীমণ্ডিত প্রভাত। গাঢ় ধূসর কুহেলিকার অন্তরালে তপনের আর্দ্রমূর্তি—তেজোহীন, মলিন। মুক্ত জনতার মুখের কণ্ঠ তখনও পক্ষিকুলের ভোরের ভৈরবী থামাইতে পারে নাই। পল্লী-পথ দু'একটা পথিকের চরণ-চিহ্ন বক্ষে লইয়া, উদয়পুরীর কনকপ্রভার প্রতীক্ষা করিতেছিল। আকাশ তখনও কুস্মাটিকায় আচ্ছন্ন। দেহ-মনের বিপুল অবসাদ লইয়া, রুদ্ধ কক্ষে, দুই বন্ধুতে বসিয়াছিলাম। ওষ্ঠাধরচুষিত ফুরসীর নল অনুরীগন্ধী প্রচুর ধূম উদগীরণ করিয়া, ঘরের মধ্যেও কুস্মাটিকার সৃষ্টি করিতেছিল। আমরা শ্বুতিসর্বস্ব অতীতের রোমন্থন করিতেছিলাম।

সপ্তাহ পূর্বে, বন্ধু এক সংখ্যা “আয়ুর্বেদ” পড়িবার জন্ত লইয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে সেই আয়ুর্বেদেরই প্রসঙ্গ চলিতেছিল।

বন্ধু বলিলেন—“বড় বড় কবিরাজের বাড়ীতে ত ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সে শিক্ষার ফলে, অনেক ছাত্রই দেশমাত্র কবিরাজ হইয়াছেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তবে আর তোমারা বেশী কাজ কি করিবে? অনেক কবিরাজই ত ডাক্তারী পাশ করিয়া, তবে বৈজ্ঞানিক পাঠ করিতেছেন; সুতরাং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, ডাক্তারী ও কবিরাজী একত্র মিলাইয়া, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়-স্থাপনের উদ্দেশ্য কি ?

বন্ধুর প্রশ্নের বাহা উত্তর দিয়াছিলাম, সেই কথাই আজ সকলকে ভুলাইব। আমার বিশ্বাস—আমার এই তত্ত্বজিজ্ঞাসু বন্ধুটির

মত—অনেকেই অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়ের মহান উদ্দেশ্য এখনও বুঝিতে পারেন নাই।

কবিরাজ মহাশয়দের বাটীতে ছাত্র পড়ান হইয়া থাকে। সে সকল ছাত্রের মধ্যে দুই একজন খুব নামজাদা চিকিৎসকও হন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হয়—আয়ুর্বেদ যতটুকু কবিরাজি ব্যবহারে লাগে, কবিরাজগণ ছাত্রদের কেবল সেইটুকুই শিক্ষা দেন। ইহাতে বিপুলায়তন সমগ্র আয়ুর্বেদের ধারণাই হয় না। যাহারা আয়ুর্বেদকে কেবল কবিরাজী শাস্ত্র বলিয়া জানেন, তাঁহারা আয়ুর্বেদের মহিমা অবগত নহেন। আয়ুর্বেদ জগতের একমাত্র আয়ুর্বেদ, আয়ুর্বেদ—অতলস্পর্শ অনন্ত মহাসাগর; ‘এলোপ্যাথি’ ‘হোমিওপ্যাথি’, টিসুইরেমিডি, ‘ইউনানি’ প্রভৃতি নিখিল চিকিৎসা-বিজ্ঞান—সে মহা-সমুদ্রের এক একটা তরঙ্গ মাত্র। সাহস করিয়া বলিতে পারি—সমগ্র পৃথিবীর চিকিৎসার মৌলিক তত্ত্বগুলি আয়ুর্বেদের স্বত্রের উপর স্থাপিত,। আপনারা আয়ুর্বেদের চিকিৎসা, শারীর, বিমান, কল্প, সূত্র, সূত্রান্ত, সকল মিলাইয়া দেখুন, এমন স্বল্প, এমন বিরাট, এমন সরল, এমন সম্পূর্ণ, এমন সুলভ, এমন উদার বিজ্ঞান জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

তাই অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, পৃথিবীসীকে আমরা আয়ুর্বেদের—“বিশ্বরূপ” দেখাইতে চাই। আমাদের “অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়”—আয়ুর্বেদের ‘বিশ্ব-বিদ্যালয়’ হইবে। কিন্তু আমাদের কাজ বড় কঠিন; তাহার গুরুত্ব একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অল্প কথার!

প্রকাশ করা অসম্ভব। আমাদের কার্যনির্দেশ পঞ্চভাগে বিভক্ত হইবে। কেননা—বৈদিক, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগভেদে—আমাদের আয়ুর্কর্মেদেরও পাঁচটি অবস্থা। আমাদের কার্যের তালিকা অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

১ম। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন।

২। শল্যতন্ত্র ও শবচ্ছেদ।

৩। ভৈষজ্যের রাসায়নিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

৪। রূপাবাস ও ভৈষজ্য উদ্ভাৱন স্থাপন।

৫। নৃপ্ত গ্রন্থের পুনঃপ্রচার।

আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিতে হইলে, শারীর বিজ্ঞা [ Anatomy ] শারীর তত্ত্ব [ Physiology ] নিদান ও রোগ তত্ত্ব [ Pathology and Etiology ] দ্রব্যগুণ [ Materia-Medica ] চিকিৎসা ( Therapeutics ) কল্প [ Toxicology ] জ্বররোগ ও কোমার ভূতা [ Gynecology, Child manage ] শল্যতন্ত্র [ Surgery ] ধাত্রী-বিদ্যা ও গর্ভিণী ব্যাকরণ [ Midwifery ] আমরিক শারীর [ Morbid Anatomy ] এবং প্রত্যঙ্গ ও প্রতিরোগ চিকিৎসা প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে। এজন্ত পুস্তক প্রণয়নের আবশ্যিকতা আছে। আয়ুর্কর্মেদের বিভিন্ন সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শনের সহিত মিলাইয়া, আয়ুর্কর্মেদের যে যে অংশ লোপ পাইয়াছে, সেই সেই অংশ নূতন সংযোগ করিয়া সন্নিধ স্থানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে। কিন্তু কাজটা বড় সহজ নহে, জীর্ণ সংস্কার হইলেও ইহার জন্ত বিরাট পুঙ্খকাৱের প্রয়োজন। “সুশ্রুত” ও “বাগ্ভটের” শারীর স্থানের

সহিত, পাশ্চাত্য এনাটমি বা কিজিওলজির—বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সুশ্রুতের মর্ম্ম শারীর পড়িলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—আয়ুর্কর্মেদের শারীর ও পাশ্চাত্য এনাটমি উভয়ই এক। ইহার জন্ত বড় বেশী পরিশ্রম করিতে হইবেনা। পরিশ্রম করিতে হইবে—সুশ্রুতের অম্লত্ব অংশ পূর্ণ করিবার জন্ত। যাহারা মন দিয়া সুশ্রুত সংহিতা পড়িয়াছেন, তাহারা অবশ্যই জানেন—যুগধর্ম্মে কালধর্ম্মে—সংস্কারকগণের হাতে পড়িয়া সুশ্রুতের বহু অধ্যায় সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, অনেক স্থল পরিত্যক্ত ও হইয়াছে। এই সকল অংশ প্রত্যক্ষ দর্শন-লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে পরিপুষ্ট করিতে হইবে, শাস্ত্রদৃষ্ট বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষ দৃষ্টের যদি কোন অনৈক্য থাকে, নিপুণ হস্তে তাহারও নীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। এ কার্য একের সাধ্যাত্মক নহে। একজন বা একদল লোক—এক মহা প্রদে-শের বিশাল দিগন্তব্যাপী মহাক্ষেত্র কর্ষণ করিতে পারে না। তাহাতে সকল ভূমি সমতল হয় না, সর্ব্বত্র সার পড়ে না, অনেক বন্দীক-বজুর স্থান হয় ত তেমনি উত্তর থাকিয়া যায়। আমরা এক জন্ম ধরিয়া আয়ুর্কর্মেদ ক্ষেত্র কর্ষণ করিব। আমাদের উত্তরাধিকারি-গণ—সেই কর্ষিত ক্ষেত্রের বহু দোষ বহু ব্যাণ-মতা দূর করিয়া দিবেন। তাহার পরে আর এক সম্প্রদায় বীজ বপন করিবেন। সমগ্র আয়ুর্কর্মেদের আশ্র-মহিমায়—সেই বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া দিব্যফলপূর্ণ-শোভিত কল্পপাদপে পরিণত হইবে।

আমরা মৈত্রী স্বাধীনতার অবতার উদার ইংরাজের প্রজা। উদারতা, অমূল্যদান ও অগ্রগামিত্ব—আমাদের মূল মন্ত্র হউক। যুগ

যুগে মনুষ্যজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইতেছে। একযুগ, একজাতি, একদেশ সাকল্য বেদের [ সম্পূর্ণ জ্ঞানের ] অধিকারী হইতে পারে না। এ রহস্য, শ্রীকৃষ্ণের ঐজ্ঞাতিক স্পর্শে, ভগ-বদ্বাক্যের স্বর্ণমুকুরে একদিন প্রতিকলিত হইয়াছিল, পণ্ডিতবর শবর স্বামী—দূর প্রসা-রিতী দিব্যদৃষ্টিতে বেদের ভিতর “পিক” প্রভৃতি যাবনিক শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। আয়ুর্বেদের স্বাধীন শেষ গ্রন্থকার ভাবমিশ্র—অনেক বিদেশী ঔষধের গুণ বর্ণনা করিয়া বিজ্ঞজনেচিত উদারতা দেখাইয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশীয় বৈজ্ঞানিক সেরূপ অসম্বন্ধিত দেখাইতে পারেন নাই বলিয়াই—আয়ুর্বেদের চরম অধঃপতন ঘটয়া-ছিল। অতএব, প্রাচ্য বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রকট মুক্তি দেখিতে হইলে, পাশ্চাত্য আলোকের জীবন্ত রশ্মির সাহায্য লইতে হইবে। স্বশ্রুতের শারীর স্থানের অনেক স্থলে পাঠের বিশৃঙ্খলতা বৃদ্ধিতে পারা যায়। উন্নয়ন ও চক্রদন্ত প্রমুখ টীাকারগণ—সে সকল স্থানে সংযতবাক্। পাশ্চাত্য ফিজিওলজির বিনা সহায়তায় সে সকল স্থানের মর্মগ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। অথচ, এই শারীর তত্ত্বই—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একমাত্র মূল ভিত্তি।

আয়ুর্বেদের শারীর তত্ত্ব—বাত পিত্ত কফ—এই ত্রিধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত। বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকৃতি বুলিলে—দেহের পরিপাক, রস পাক, ইন্দ্রিয়ার্থ, ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু এই ত্রিধাতুর বিচিত্র রহস্য সহজবোধ্য নহে। “বায়ু” বলিলে যিনি বাতাস বুঝিবেন, “পিত্ত” অর্থে যিনি যক্কনিঃসৃত রস মনে করিবেন, এবং “কফ” বলিলে যিনি স্লেম্মাস্রাব বুঝিবেন,

তিনি মহাত্মদে পতিত হইবেন। এই বায়ু, পিত্ত কফকে লক্ষ্য করিয়া ঋষিগণ এমন অনেক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—বাহার অর্থ আমরা সহসা বুঝিতে পারি না। আমাদের টীাকার-গণও অনেক স্থলে তাহার রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে সকল অমূল্য ইঙ্গিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পরিশুদ্ধ হইয়াছে। আয়ু-র্বেদ-সংহিতার অনেক তথ্য পুরাকালে কেবল উপদেশগম্য ছিল, সেই জন্ত তাহা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। এখন আমাদের দেশে মর্মজ্ঞ উপদেষ্টার একান্ত অভাব। তন্ত্রান্তর হইতে তদভাব পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। বীজরূপী ঋষিযুগের গূঢ় মর্মকে সুব্যাখ্যাত করিয়া মহান মহীকূহে পরিণত করিতে হইবে। কথটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। “বায়ু” “পিত্ত” “কফ”—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহার স্বরূপ যে কত হৃদয়—তাহা দেখিতে গেলে—ঋষিযুগের সৃষ্টি-কুশলী প্রতিভা চাই। এই এই বায়ু, পিত্ত, কফের ক্রিয়া যে কত নিগূঢ় শারীরতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত—অনেকে বৈজ্ঞানিক তাহা বুঝিতে পারেন না। অনেকে “বায়ু-পিত্ত-কফ” বলিলে কতকগুলি বিশিষ্টলক্ষণ-সমষ্টি মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যে ভাষায় আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল,—সে ভাষা দেবতার ভাষা; সে ভাষায় একশব্দ বহু অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে। “পিত্ত” অর্থে পিত্তরস, কফ অর্থে কফস্রাব বুঝিলেও কফ আর কফস্রাব, পিত্ত বা পিত্তরস সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ব্যতীত—ইহার মর্মভেদ করা কঠিন। আয়ুর্বেদের ঐশ্বর্যগুণতত্ত্বে এমন অনেক শব্দ আছে, বাহার মূল অর্থ বোধগম্য হইলেও, হৃদয় অর্থ বুঝা যায় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই সকল শব্দের প্রভেদ

অতি সহজে ধরা যায়। “বাতহর” “বাতঘ্ন” “বাতমুং”—ইহাদের স্থূল অর্থ এক, কিন্তু ক্ষুদ্র অর্থ ভয়ঙ্কররূপে পৃথক্। এ সকল কথা পৃথক্ প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ষোগ্যাকরণপূর্বক অধ্যাপনার প্রতিষ্ঠা করিয়া আয়ুর্বেদকে জীবন্ত করিতে হইবে। আমরা জানি—মানবের ক্ষুদ্র জ্ঞান, মহাপাপ। সুতরাং আয়ুর্বেদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত, নূতন করিয়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে।

২। শল্যতন্ত্র ও শবচ্ছেদ। মহর্ষি সূশ্রুত একজন অদ্বিতীয় সার্জন ছিলেন। সূশ্রুতের প্রত্যেক অধ্যায়ে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায়—সংশয়-প্রশ্নের অতীত অপার্থিব সত্য আগ্রত। বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এমন কোন বিষয় নাই, যাহার বীজভাব সূশ্রুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সূশ্রুত শব-ব্যবচ্ছেদে—সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি মৃত্যুশয় হইতে অশ্বরী কাটিয়া বাহির করিতেন। যক্ষুং প্রীহায় বিদ্রুপি হইলে তাহা ভেদ করিয়া দিতেন। যন্ত্র-সাহায্যে মূঢ়গর্ভ আহরণ করিতেন। উদরে আবাত লাগিয়া ছিন্ন অস্ত্র বহির্গত হইয়া পড়িলে তাহা যথাস্থাপিত করিয়া সেলাই করিয়া দিতেন। নেত্ররোগে—তাহার মত অস্ত্র-প্রয়োগ-কুশল চিকিৎসক—দ্বিতীয় কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। আবর্তন-বিবর্তন-ক্রমে গর্তীগীর সূত্র প্রসবের ব্যবস্থায়, জর-পরীক্ষায়, ধাত্রীবিদ্যায়, তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা পড়িলে বিশ্বাসে আবাক হইতে হয়। প্লেফেক্সারের মিডিকোরির সঙ্গে আপনারা তাহা মিলাইয়া দেখিবেন।

সূশ্রুত ‘বেসৌলি থিওরী’ জানিতেন। রাজ যক্ষা, কতকগুলি অর, পাপজ ব্যাধি—ইহার। সংক্রামক। কুষ্ঠের ক্রিমি আছে। পাণুরোগে

গর্ভাবস্থায়—রক্তের লাল কণিকা কমিয়া যায়। যক্ষা রোগে হৃৎপিণ্ডে কোটর (ক্যাভিটি) উৎপন্ন হয়। বিসপ্‌রোগে—রক্ত বিযাক্ত হইয়া পড়ে। বিযাক্ত সর্প দংশন করিলে হৃদয়ে রক্ত শল্য জন্মায়—তাহার ফলে খাসকৃচ্ছ্র তার মামুষের মৃত্যু ঘটে। বিষটীকা রোগে, হৃদয়ে রক্তের চাপ বাধিতে থাকে। রক্তাতিসার ও উরঃক্ষতে আভ্যন্তরিক ক্ষতের চিকিৎসা করা উচিত। রক্তার্কুদ পাকিলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী। ইত্যাদি বহুবিষয় সূশ্রুত অমামুষিক দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। সূশ্রুতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা—বিরাট বিশাল বিক্ষেপে এখনও অপরাঞ্জের।

আমাদের কার্য এই সূশ্রুতকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে বাঁচাইয়া তোলা! সূশ্রুত যে সকল শস্ত্রের ও যন্ত্রের নাম করিয়াছিলেন, কয়জন কবিরাজ তাহা চেনেন? আমরা তাহার যথার্থ আকৃতি ও গঠনপ্রণালী জানি না। আমাদের অনূদিত গ্রন্থে—যন্ত্রের নামার্থ, ব্যবহার ও প্রয়োগ ভাবিয়া আমরা কেবল কাল্পনিক চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছি। সুতরাং সূশ্রুতের এই অংশ ভাল করিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। আয়ুর্বেদের প্রাধান্ত বজায় রাখিয়া—বৈদেশিক বিজ্ঞানের সহিত মালীর মত কলম বাধিতে হইবে।

আয়ুর্বেদের উদ্ভিদ-বিত্তা অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু ইহাকেও সরল ও শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া লইতে হইবে। ভেদ্য দ্রব্যের, পথ্যাপথ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দেখাইতে হইবে। আয়ুর্বেদের মত সম্পূর্ণ চিকিৎসা কোথাও নাই। আয়ুর্বেদের চিকিৎসা-তত্ত্ব—যুগযুগান্তরের সাধনার সফল সিদ্ধি। এখনও বৈজ্ঞানিকের স্পৃহা শুনিতে পাই—“চরকের চিকিৎসা প্রাপ্তি

থাকিলে, পৃথিবীতে অকালমৃত্যু থাকিত না।" চরকের পরিচয় ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভবে না। চরক ৬০০ ছয় শত প্রকার জ্বোলাপ জানিতেন। এমন প্রজ্ঞা-মহিম-দীপ্ত পেলব-সংহিতা—জগতের কোন ভাষাতেই অতাপি সঙ্কলিত হয় নাই। এই চরক-সংহিতাতে এমন অনেক জিনিষ আছে—তাহা এমন স্বল্প ইঙ্গিত উপদেশ পূর্ণ—যে দেশকল ইঙ্গিত ও উপদেশ বুঝিতে হইলে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সাহায্য চাই।

অতএব প্রয়োজন মত আমাদেরকে কিছু কিছু খণ করিতে হইবে। এই খণের নামে কেহ কেহ হয় ত শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি এ অধমের নিবেদন—হরি: বেধানকারই হটক—যজ্ঞ আয়ুর্বেদ মস্ত্রে। ধরুণ—সুশ্রুতের শারীর-তত্ত্ব, বহুতথ্যে পূর্ণ, তাহাতে আমরা জীবদেহের সকল রহস্যই বুঝিতে পারি। শারীর-বিজ্ঞা—দেহের “ভূগোল” বিজ্ঞা। সুশ্রুতে তাহার সাধারণ মানচিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায় কোন নদী কল্লোল মুখরা, কোথায় কোন্ পর্বত গগনস্পর্শী, কোথায় কোন্ বন, কোথায় কোন্ নগর অবস্থিত—মানচিত্রে তাহার ইঙ্গিত থাকে মাত্র; কোন পর্বত কত উচ্চ,—তাহার শৃঙ্গের সংখ্যা কত, কোন্ নদী কত গভীর, কোন্ বন কতদূর বিস্তৃত, কোন্ নগরে কোন্ জাতীয় লোকের বাস—তাহাদের আচার ব্যবহার কিরূপ, এসকল বিষয় সম্পূর্ণ জানিতে হইলে, যে আই নদী স্বয়ং দেখিয়াছে, পর্বতে আরোহণ করিয়াছে, বনে উত্তরণ করিয়া নিসর্গ সুন্দরীর শ্রামল শোভায় মুগ্ধ হইয়াছে, তাহার কাছে গিয়া সমস্তই জানিতে হইবে আয়ুর্বেদের শল্য তন্ত্র—অব্যবহার্য্য হইয়া অনেক দিন পড়িয়া আছে, বাহারা এক্ষণে শল্যতন্ত্র লইয়া নাড়া-

চাড়া করিতেছেন—তাঁহাদের নিকটে গিয়াই আমাদেরকে সেই শল্য তন্ত্র শিখিতে হইবে। তবে আমাদের মূল সূত্র হইবে, অভ্রান্ত ঋষি বাক্য, আর তাহার ভাষ্য, বার্তিক বা টীকা হইবে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য। এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে না পারিলে, আমরা আয়ুর্বেদের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না।

রোগ নিরূপণে আমাদের অমুকুল সহায়—একমাত্র মাধব-নিদান। কিন্তু মাধবকর নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহার গ্রন্থ বহু তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ। যাহারা অল্প বুদ্ধি শ্রমকাতর, তাহাদের জন্যই মাধবকর তাঁহার “রুখ্মিনিচয়” রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে—মাধবকরের প্রশাস—আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে দৈন্তের মধ্যে সুখের ক্ষীণ আভাষ মাত্র। সুতরাং মাধব-নিদান ছাড়া প্রকৃত বৈদ্যকে আরও বহুতন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যে দোষদৃষ্টি লইয়া বৈদ্যাগণ প্রকৃতির অন্তরঙ্গ আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছেন, সে দোষদৃষ্টি যে কি জিনিষ—মাধব-নিদানে তাহার উল্লেখ নাই। ধাতু বিশেষে, প্রত্যঙ্গ বিশেষে—শারীর যন্ত্র বিশেষে বায়ুপিত্ত কফ যে কি, মাধব তাহার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। এক বিকৃত পিত্ত হইতে অতিসার ও প্রমেহ দুইই হইতে পারে, কিন্তু অতিসার বা প্রমেহ বিশেষে—সে পিত্তের স্বরূপ কেমন, অবস্থিতিই বা কোথায়, মাধব তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। অথচ এ সকল তত্ত্ব—মিশ্রকেশের নিদানে আছে, সুশ্রুত ও বাগভটের নিদানেও আছে। এই সকল নিদান একত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে আমাদের এই শাক্তভূমি চিরন্তনী কল্যাণী মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবেন।

কাহিনী ও মানব-কাহিনীর সংমিশ্রণে আমরাও “মৃত্যুঞ্জয়” হইব।

আয়ুর্বেদের একই ঔষধে—অর, অতি-সার, অর্শ, গুল্ম, প্রেমহ প্রভৃতি বিবিধ রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ অর, অতিসার, অর্শাদি যে কোন জাতীয়, কি বিকৃত শারীরতত্ত্বে যে তাহাদের উৎপত্তি—জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা সহসা তাহার উত্তর দিতে পারি না। ইহার কারণ—আমাদের আয়ুর্গিক শারীর বা দ্রব্যগুণ-তত্ত্ব—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল। অথচ আমাদের সংহিতায়—কত ধাতু, কত বিধ, উপবিধ, কত রস, কত বনৌষধি, কত জীবজন্তু,—ঔষধের উপাধানরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। এই সকল জিনিষ—আমরা যদি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের প্রণালীতে সাজাইয়া লই তাহা হইলে আমাদের আয়ুর্বেদের সমুদ্রে—কোনও প্যাথলজি, কোন মর্বিড্ এনাটমি—অথবা কোনও মেটরিয়াল-মেডিকা—নগোরবে আশ্রয় প্রকাশ করিতে পারে না। হা ভাগ্য! কেবল পরিশ্রমের ভয়ে, আর অর্থের অভাবে, আমাদের সকল শক্তিই আজ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। অল্পতপ্ত বস্তুর বক্ষঃবেদনা—বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে আমাদেরকে আজ মেঘদূতের মন্দাক্রান্তার মত, কেবল অশ্রু সজল করিয়া তুলিয়াছে!

প্রত্যেক চিকিৎসকের পদার্থ-বিজ্ঞান, এবং রসায়ন-শাস্ত্রে অধিকার থাকা চাই। মহর্ষি সুশ্রুত শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিয়াছেন—“শুধু আয়ুর্বেদ পড়িয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না। এক গ্রন্থে সকল তত্ত্ব থাকিতে পারে না, এক জন অধ্যাপকও সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিতে অক্ষম। সুতরাং তোমাদিগকে বহুবিধ শাস্ত্র

বিভিন্ন আচার্যের নিকটে অধ্যয়ন করিতে হইবে। বাস্তবিক জড়াত্মকই হউক আর আধ্যাত্মিকই হউক, সকল দর্শনের সহিত আয়ুর্বেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বৈজ্ঞ হইতে গেলে, সকল শাস্ত্রের অমূল্য শীলন করিতে হইবে। যেমন, ইন্দ্রিয়ার্থ বোধ কিরূপে হয়, কি জ্ঞান মাহুস চক্ষু দেখিতে বা কর্ণে শুনিতে পায়, এ তত্ত্ব বুঝিতে গেলে—প্রাকৃতিক দর্শনের সাহায্য চাই। দৃষ্টিগত ও কর্ণগত এমন অনেক রোগ আছে, যাহাদের চিকিৎসা করিতে হইলে রূপ ও শব্দ রহস্তের জ্ঞান অনিবার্যরূপে আবশ্যক। ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহামুনি কণাদ—একথা বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। ঘাগুক, ত্রাগুক, অদৃষ্ট ও শব্দতত্ত্ব বুঝিবার লোক বর্তমান যুগে কেহ আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বৈশেষিক দর্শনে রসায়ন শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব আছে,—আমাদের মধ্যে কয়জন তাহা পড়িয়াছেন? আমাদের শাস্ত্রে কথায় কথায়—জারণ, মারণ, শোধন, অথচ ঐ সকল ক্রিয়ার রাসায়নিক-তত্ত্ব আমরা জানিতে চাহি না।

পূর্বে—অনেক বৈজ্ঞ, অনেক বণিক ব্যবসায়ী, এমন কি অনেক গৃহস্থ পর্য্যন্ত গাছ-গাছড়া চিনিতে ন। এখন অনেক সময় ভেষজ উপাদানের জ্ঞান, বাজারের বেদে পসারীর সততার উপর বৈজ্ঞগণকে নির্ভর করিতে হয়। ইহার যে কি বিষময় ফল—বৈজ্ঞ ভিন্ন সাধারণে তাহা বুঝিবেন না। প্রত্যেক বৈজ্ঞকে উদ্ভিদবিজ্ঞা শিখিতে হইবে, প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইতে হইবে; বৈজ্ঞকে স্মরণ রাখিতে হইবে—বহু শতাব্দী পূর্বে তাহারই বংশে একদা মনীষা ও প্রতিভার সমন্বয় হইয়াছিল। তাহার পূর্ব পুরুষের প্রতিভা ছিল নিঃসংশয়



মুদুর—জগৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত।

আমরা চরক, সূত্র পড়ি,—রসৌষধি প্রস্তুত করি; কিন্তু যে দর্শনশাস্ত্র অনভিজ্ঞ, শস্ত্র-প্রয়োগের কৌশল জানে না, রসায়ন-তত্ত্বের মর্ম বুঝে না,—তাহার চরক-সূত্র ও রসগ্রন্থ পাঠি বিড়ম্বনা নহে কি ? শুধু ব্যাকরণ ও কাব্যের কৌশলে, বগ্নী, সপ্তমী, সমাস, কারকের যুক্তি অবতারণায়, অম্বয় বা ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই “আয়ুর্বেদ” শাস্ত্র পড়া হয় কি ? কবিরাজের বাটীর ভৃত্য পরিচারকগণও ত অনেক সময় ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিয়া থাকে,—তাহাদিগকে কেহ “বৈজ্ঞ”—সম্ভাষণ করেন কি !

অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে আমরা প্রাকৃতিক দর্শন ও উদ্ভিদবিজ্ঞা আলোচনার পথ চির উন্মুক্ত রাখিব। আমাদের দেশে—আর একটি অভাব বৌদ্ধযুগের পর হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। বৈজ্ঞ চিকিৎসার রুগণাবাস বা হাসপাতাল নাই! বিপর্যস্ত প্রকৃতির করুণ আর্ন্তর্য—যে দেশের মানুষ পক্ষ-তন্মাত্র-স্পৃষ্টা প্রকৃতিকে দ্রোপদীর মত বিবসনা করিয়াছিল, যে দেশের জীবন্ত সোম বিন্দু—সাগরাস্বরা ব্রহ্মরার বক্ষে সঞ্জীবনী মহাশক্তি আনিয়া দিয়াছিল,—সে দেশের বৈজ্ঞগণ—ব্যাধি-ত্রাণ রুগণাবাসের মহিমা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহা কি লজ্জার কথা নহে ? আমরা দেখিতে পাই, যে রোগ ডাক্তারে ভাল করিতে পারেন নাই, একজন বৈজ্ঞ সামান্য বনৌষধির প্রয়োগে—সে রোগ আরাম করিয়াছেন,—আমাদের রুগণাবাস নাই বলিয়া এ শুভসংবাদ গগন পবনে ঝঙ্কত হইতে পারে না। রুগণাবাসেই—বৈজ্ঞের প্রকৃত কর্মভাষ্য। হাসপাতাল আছে বলিয়াই—ডাক্তারী চিকিৎসার এত

কারুণ্য প্রসার! কারুণ্যে—যে আয়ুর্বেদের জন্ম,—রুগণাবাস প্রতিষ্ঠিত না হইলে, সে আয়ুর্বেদ কখনই উন্নীত হইতে পারিবে না। আমরা কবিরাজী রুগণাবাস স্থাপন করিতে চাই।

আমাদের আর একটি কাজ—লুপ্তগ্রন্থের পুনঃ প্রচার। এখনও আমাদের এমন অনেক পুঁথি আছে—যাহা অদ্যাবধি মুদ্রাযন্ত্রে কবলিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই। ক্রমশঃ সেইগুলি ছাপাইতে হইবে—নতুবা কীটদষ্ট জীর্ণ পাণ্ডুলিপি ধ্বংসের হস্ত হইতে আর বড় বেশী দিন রক্ষা পাইবে না। এই বিভাগের কার্যে যেসকল মহাত্মা আত্ম নিয়োগ করিবেন, তাহাদিগকে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। ভারতের সর্বত্র, সর্বকালেই আয়ুর্বেদ বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছিল। সূত্রাং আয়ুর্বেদীয় সংহিতা সংগ্রহের জন্ত দেশে দেশে শ্রমণধর্মী সন্ন্যাসীর মত ভ্রমণ করিতে হইবে। যেখানে যাহা পাওয়া যাইবে—তাহা সম্পূর্ণ হউক, অসম্পূর্ণ হউক, অতি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই হউক—সাদরে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—প্রাচীন বৈজ্ঞ-পরিবার এজন্ত আমাদের প্রতি অবাচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। যাহার ঘরে প্রাচীন পুঁথি আছে, দেশের উপকারের জন্ত তিনি তাহা দিয়া আমাদের সাহায্য করিবেন। ইহা ভিন্ন বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে, দর্শনে, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা আমরা সংগ্রহ করিব। অতীত সম্বল সংগ্রহ না করিলে, ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

এইরূপ ভাবে কার্য করিয়া আমরা যে নির্দোষ-নিরুদ্ভয় নির্মাণ করিব, তাহার চুকা

একদিন হিমাদ্রির মত আকাশ স্পর্শ করিবে।  
আয়ুর্বেদকে জীবন্ত করিবার জন্তই—“অষ্টাঙ্গ  
আয়ুর্বেদ কলেজের” প্রতিষ্ঠা। ইহা ব্যক্তি-  
বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের সখের সামগ্রী  
নহে।

আমি অকপটচিত্তে মৃতকণ্ঠে—আমার  
দেশবাসিগণের সম্মুখে—আমাদের অভাব  
অপূর্ণতার কথা নিবেদন করিলাম। আমার  
দৃঢ় বিশ্বাস—দেশ-হিতৈষীমাত্রেই আমাদের  
সহায় ও সহচর হইবেন। মেঘ-ছদ্দিন আঘাতে  
জগবন্ধুর রথ যেমন অনেক বন্ধু মিলিয়া টানিয়া  
তাহা গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দেন, তেমনি  
আমাদেরও আশা—দেশের লোক, আমাদের  
মনোরথের গতিতে রূপান্তরের অবলম্বন  
দিবেন। তাঁহাদেরই অমুগ্রহে—শারীর-নিদান  
শল্যাত্ত্ব, গর্তীব্যাকরণ সকল তত্ত্বে সুপুষ্টি-  
বয়ব বিরাট-দর্শন আয়ুর্বেদ দেশের দৈত্যাতুর-  
তাকে আবার কোলে তুলিয়া লইবে।

এদেশে একবার একজন জাগিয়াছিলেন,  
—তিনি কপিলবাস্তুর রাজকুমার বুদ্ধদেব,  
তাহাতেই জগৎ জাগিয়াছিল। আর একবার  
একজন জাগিয়াছিলেন—তিনি ভগবান্ শঙ্ক-  
রাচার্য, তিনি ব্রাহ্মণ্যকে পুনর্জীবন দান

করিয়াছিলেন। তাহার পর আর একজন  
জাগিয়াছিলেন—তিনি মহাপ্রভু ত্রীচৈতন্য,  
তাঁহার প্রেম প্রাবনে—দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল,  
মানুষ দেবতা হইয়াছিল, সমাজ ভ্রাতৃত্বের  
আশ্বাদ পাইয়াছিল। সেই একজনের প্রভাব  
—এখনও লোকে ভুলিতে পারে নাই, আর  
আমরা এত জন, এত ভাই—আমরা জাগিলে  
—আয়ুর্বেদের উন্নতি হইবে না? জীবের  
জীবনরক্ষার জন্ত আমরা কি মর্ত্যে ভগবানের  
সিংহাসন নামাইয়া আনিতে পারিব না?  
এসো ভাই—দলাদলি তুলিয়া, সকলে এসো,  
—তোমাদের বিজ্ঞান ভূমি অনেক দিন হইতে  
নিষ্ক্রিয় পড়িয়া আছে, তোমরাই তাহা  
ফেলিয়া রাখিয়াছিলে; শুনিয়াছি—ভূমিকে  
কিছুদিন ফেলিয়া রাখিলে, তাহার উর্বরতা  
বৃদ্ধি পায়। তোমাদের বিজ্ঞান ভূমিরও উৎ-  
পাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, এখন সকলে  
মিলিয়া, তাহাতে হাত লাগাও—হেমন্তের  
দিগন্তচুম্বি প্রান্তরে নিশ্চয়ই সোণা ফলিবে।  
এক স্বরে যন্ত্র না বাঁধিলে তারের ঝঙ্কারে তার  
কাঁপিবে কেন?

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

## আয়ুর্বেদ কি Empirical ?

—:—

( পৌষ সংখ্যার ১৬৪ পৃষ্ঠার পর । )

রূপের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ কি ?—অত্যন্ত উজ্জ্বল বস্তুর নিরন্তর দর্শন যেমন প্রাতঃসূর্য্য, কোন উজ্জ্বল ধাতুতে কিম্বা দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য কিরণ, বিদ্যুৎ, কিম্বা অতিতীব্র বিদ্যুদ্যালোক দর্শন করিলে রূপের অতিযোগ, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোন বস্তু একবারে না দেখা, রূপের অযোগ এবং অতি হৃদয় বস্তু, অতি নিকট বা অতিদূরস্থিত বস্তু, উগ্র, ভয়ঙ্কর, অদূত, স্বর্ণাজনক অপ্রিয় ও বিকৃতরূপ নিরন্তর দর্শন করিলে রূপের মিথ্যাযোগ হইয়া থাকে ।

শব্দের অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ কি ?—বজ্রধ্বনি, কামান বন্দুকের কঠোর শব্দ, কল কারখানার কর্ণ পীড়াকর ঝনঝনি, সিংহ ব্যাঘ্রাদির বিকট শব্দ নিরন্তর শ্রবণ করিলে শব্দের অতিযোগ, কর্ণচ্ছিন্ন বন্ধ করিয়া একবারেকোন শব্দ শ্রবণ না করা, শব্দের অযোগ এবং কঠোর বাক্য, প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদ, বাহাতে চিন্তা-ক্ষেপ ও ভীতি জন্মে এরূপ শব্দ শ্রবণ করাকে শব্দের মিথ্যাযোগ বলিয়া জানিবে ।

গন্ধের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ কি ?—অতি তীক্ষ্ণ, অতি উগ্র ও তুর্গন্ধি বস্তুর নিরন্তর ঘ্রাণ লইলে গন্ধের অতিযোগ, নাসিকা পথ রোধ করিয়া একবারে কোন দ্রব্যের গন্ধ না লওয়া, গন্ধের অযোগ এবং পচা, স্থগিত, ক্রিম, অপবিত্র, বিষাক্ত ও শব প্রভৃতির গন্ধ ঘ্রাণ করিলে গন্ধের মিথ্যাযোগ ঘটিয়া থাকে ।

রসের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ কি ?—রস একাকী থাকিতে পারেনা, রস শব্দে

রসাত্মকী দ্রব্য বুঝাইবে। মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, ঝাল, কষায় এই ছয়টা রসাত্মক বস্তুর অতিভোজনকে রসের অতিযোগ, একবারে কোন রসাত্মক বস্তু ভোজন না করাকে রসের অযোগ এবং শাক্তোক্ত বিধি পূর্ব্বক আহার না করাকে রসের মিথ্যাযোগ বলে ।

আহারের শাস্ত্রোক্ত বিধি কি ? আয়ুর্বেদ বলিয়াছেন আহারের হিতাহিতভাব আটটা বিষয়ের উপরি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই আটটা বিষয় যথা—প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, ভোজনের নিয়ম এবং ভোজনের কর্ত্তা। খাদ্য দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ, লঘু প্রভৃতি গুণকে প্রকৃতি বলে যেমন মাষ গুণ, মুগ লঘু। এই প্রকৃতির উপরি আহারের হিতাহিত নির্ভর করে। স্বাভাবিক দ্রব্যের সংস্কারের নাম করণ। সংস্কার শব্দের অর্থ গুণান্তরের সংযোগ। জল, অগ্নি, শোধান, মন্থন, দেশ, বাসন, কালপ্রকর্ষ, ভাবনা ও পাত্রযোগে কিরূপে দ্রব্যের গুণান্তরাদান ঘটিয়া থাকে বলিতেছি। জল, অগ্নি ও শোধান যোগে গুরুগুণ তণ্ডুল ইহতে লঘুগুণ অন্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। এস্থলে অগ্নি, জল ও শোধান যোগে তণ্ডুলে গুণান্তরাদান হইল। মন্থনযোগেও গুণান্তর জন্মিয়া থাকে যথা—শোধকারি দধিকে যদি মন্থন করা যায় তাহা হইলে সেই মধিত দধি যেরূপ যুক্ত হইলেও শোধ নাশক হইয়া থাকে। স্থানের গুণে দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে যথা—ঔষধ বিশেষকে ধাতু রাশির ভিতর রাখিলে গুণান্তর সংযোগ হয়। বাসন অর্থাৎ

অধিবাসনের দ্বারা গুণাস্তর হয়—যেমন তিলকে ফুলের সহিত অধিবাসিত করিয়া পীড়ন করিলে ফুলে তৈল প্রস্তুত হয়। কাল প্রকর্ষে দ্রব্যের গুণাস্তর হয় যেমন অরিষ্ট আসবাদিকে নির্দিষ্ট কাল গাঁজাইতে হয় তবে গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। পাত্র বিশেষে গুণাস্তর হইয়া থাকে, যেমন—ত্রিকত্রাদি লৌহ, লৌহ পাত্রে লৌহ দণ্ডে মর্দন করিবার উপদেশ আছে। ভাবনা দ্বারাও গুণাস্তর হয় যেমন—আমলকীকে যদি কোন দ্রব্যের রসে রোদ্রে শুষ্ক করা যায় তাহা হইলে আমলকীর গুণাস্তর হইয়া থাকে। করণের কথা বলা হইল এক্ষণে সংযোগ সম্বন্ধে, বলিব। সংযোগ হেতু আহারের হিতাহিত সাধিত হইয়া থাকে। মধু ও ঘৃত কোনটাই মারক নহে কিন্তু মিলিত হইলে মারক হইয়া থাকে। দুগ্ধ ও মংস্ত্র পথ্য, কিন্তু সংযোগে কুষ্ঠাদিরোগের জনক হইয়া থাকে। ভাবনা ও সংযোগ এক নহে পার্থক্য আছে। রাশি অর্থাৎ প্রমাণের উপরি আহা-  
রের হিতাহিত নির্ভর করে। রাশি দুই প্রকার সর্কগ্রহ রাশি ও \*পরিগ্রহ রাশি। ভাত, দাল, ব্যঞ্জন, দুগ্ধ মিলিত হইয়া যে প্রমাণ হয় তাহাকে সর্কগ্রহ রাশি এবং ভাত এত, দাল এত, ব্যঞ্জন এত, দুগ্ধ এত, এই প্রত্যেকের প্রমাণকে পরিগ্রহ রাশি বলে। এই দ্বিবিধ রাশির উপরি আহারের গুণাগুণ নির্ভর করিয়া থাকে। দেশ অর্থাৎ দ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচার এবং ভোক্তার স্থান অনুসারে দ্রব্যে গুণাস্তরাদান হইয়া থাকে, বথা—  
হিমালয়ে উৎপন্ন দ্রব্য গুরু এবং মরুদেশে জাত দ্রব্য লঘু হয়। যে সকল প্রাণী মরুদেশে বিচরণ করে এবং যহ জিহ্বাকারী তাহাদের মাংস লঘু, ইন্টার বিপরীতকারী প্রাণীর মাংস

গুরু। ভোক্তা যদি মরুদেশে বাসী হয়েন তাহা হইলে শীতল ও স্নিগ্ধ দ্রব্য এবং যদি অনুপদেশবাসী হয়েন তাহা হইলে উষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য হিতকর হইবে। রসের অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ ব্যাখ্যাত হইল।

স্পর্শের অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ কি?—তৈলাদি তরল বস্তু প্রচুর পরিমাণে মাখাকে “অভ্যঙ্গ” এবং কোন দ্রব্যকে শুঁড়া করিয়া কিম্বা পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দন করাকে “উৎসাদন” বলে। অতি শীতল কিম্বা অতি উষ্ণ জলে স্নান, অতি শীত বা অতি উষ্ণ বাতাস (“লুব্ধ” মত) গায়ে লাগান, অতি উষ্ণ বা অতি শীতল দ্রব্যের অভ্যঙ্গ বা উৎসাদন করিলে স্পর্শের অতিযোগ ও সর্কগ্রহ অনুপসেবন, স্পর্শের অযোগ বলিয়া জানিবে। স্নান, অভ্যঙ্গ ও উৎসাদন যদি শাস্ত্রবিহিত বিধি অতিক্রমপূর্বক করা হয়—যেমন স্নানের পর উৎসাদন কিম্বা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া হঠাৎ শীতল জলে অবগাহন, অপ্রীতিকর স্পর্শ যেমন শীতকালে শীতল শয্যা বা গ্রীষ্মকালে উষ্ণ শয্যা, কণ্টক কঙ্করাদির উপরি শয়ন বা উপবেশন, স্পর্শের মিথ্যাযোগ বলিয়া অভিহিত হয়।

আমরা যে হেতু সূত্রের ব্যাখ্যা করিলাম তাহার শেষে বলা হইয়াছে—“ত্রিবিধো হেতু-  
সংগ্রহঃ” অর্থাৎ অযোগ, অতিযোগ, মিথ্যা-  
যোগরূপ রোগের এই তিনটি সংকীর্ণ হেতু। বস্তুতঃ হেতু তিনপ্রকার নহে অনেক। সকল রোগই প্রকৃপিত বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মার কার্য্য সূত্রায় যে যে আহার বিহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকৃপিত হয় তৎসমুদায়ই রোগের হেতু। কি কি আহার বিহারে বায়ু পিত্ত কফের বৈষম্য জন্মে আয়ুর্বেদে সে কথা অতি বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। জিজ্ঞাস্ত মূলগ্রন্থ পাঠ করিবেন।

রোগের কারণ কি বলা হইল। এক্ষেপে প্রতিজ্ঞানুসারে কারণ কত প্রকার বলিতে হইবে, রোগের প্রভেদ হেতুর বচ সংখ্যক হইলেও এস্থলে প্রসিদ্ধ দশপ্রকার হেতুভেদ লিখিত হইতেছে—(১) সন্নিবৃত্ত (২) বিপ্রকৃত্ত (৩) ব্যভিচারী (৪) প্রেরক (৫) উৎপাদক (৬) অসাম্যোচ্ছিন্নার্থ সংযোগ। (৭) প্রজ্ঞাপরাধ (৮) পরিণাম (৯, বাহ্য (১০) আভ্যন্তর। (১) সন্নিবৃত্ত হেতু—সন্নিবৃত্ত শব্দের অর্থ নিকটবর্তী। আজ রাজিতে গুরুভোজন করিলাম কল্যাণপ্রাপ্তে আমার অজীর্ণ হইল, এস্থলে গুরুভোজন অজীর্ণের সন্নিবৃত্ত হেতু। (২) বিপ্রকৃত্ত হেতু—গ্রীষ্মকালে সমুদ্র তীরবর্তী কোন স্থানে গিয়া সমুদ্রের প্রীতিপ্রদ শীতল বায়ু নিরন্তর সেবন করিয়াছিলাম, গ্রীষ্মাবসানে আমার সেই শৈত্য সেবন জন্ম ঘোরতর শ্লেষ্ম-বিকার উপস্থিত হইল এই শৈত্য সেবন শ্লেষ্মরোগের বিপ্রকৃত্ত কারণ। (৩) ব্যভিচারী হেতু—যে দুর্বল কারণ রোগ উৎপাদন করিতে পারে না তাহাকে ব্যভিচারী হেতু বলে। দধি সেবন তরুণ কফ রোগ জন্মাইতে পারে। আমি দধি সেবন করিলাম কিন্তু কফরোগ হইল না। এস্থলে দধি সেবন ব্যভিচারী হেতু হইল। স্বাস্থ্য বত উত্তম থাকে রোগের নিদানকে ততই ব্যভিচারী করিতে পারা যায়। স্বাস্থ্য বত মন্দ হয় ততই নিদান আর ব্যভিচারী হয় না—সামান্য হেতুতেই রোগ জন্মে। (৪) প্রেরক হেতু শরীরে রোগের কারণ সঞ্চিত আছে কিন্তু যে একটি কারণকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই সঞ্চিত কারণ রোগ জন্মাইয়া থাকে সেই উপলক্ষ্যীভূত কারণকেই প্রেরক হেতু বলে। যেমন হেমন্ত কালে আমার শ্লেষ্ম সঞ্চয় হইয়াছে, সেই সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্ত কালের স্বর্ষ্য সঙ্কোচে কুণ্ডিত হইয়া আমার

কফরোগ উৎপাদন করিল—এখানে স্বর্ষ্যসম্প্রাপ্ত কফরোগের প্রেরক হেতু। (৫) উৎপাদক হেতু—আর হেমন্তকালজ যে মধুর রস শ্লেষ্ম-সঞ্চয়ের কারণ তাহাকেই উৎপাদক হেতু বলে। (৬-৮)—অসাম্যোচ্ছিন্নার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম এই তিনটি হেতু পূর্বেই অতি যোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৯-১০) বাহ্য হেতু ও আভ্যন্তর হেতু—আহার, আচার ও কাল প্রভৃতি রোগের বাহ্য হেতু আর বায়ু পিত্ত, কফ এবং রক্ত মাংসাদি সপ্তধাতু রোগের আভ্যন্তর হেতু। দৌষভেদে ব্যাধিভেদে এবং দৌষব্যাধি উভয়ভেদে যে তিনপ্রকার হেতু স্বীকৃত হইয়াছে তাহা আমরা পরে বলিব।

রোগের হেতু কত প্রকার বলা হইল, অতঃপর আমরা, রোগ কিরূপে জন্মে অর্থাৎ রোগের সম্প্রাপ্তি কি? তাহাই ব্যাখ্যা করিব। অহিত আহার বিহার—যেমন বিকৃত মাংসভোজন কিম্বা রাত্রিজাগরণ রোগের কারণ। এই অহিত আহার বিহার সেবন করিলে কিরূপে রোগোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে তাহা বুঝিতে হইলে নিদান-সেবন ও ব্যাধি-দর্শনের মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম অবস্থা ভেদ আছে সেগুলি যথাক্রমে অল্পসরণ করিতে হইবে। নিদান সেবনের অর্থাৎ যাহা রোগের হেতু তাহা আচরণ করার পর, প্রথম অবস্থা—সঞ্চয়, দ্বিতীয় অবস্থা—প্রকোপ, তৃতীয় অবস্থা—প্রসার, চতুর্থ অবস্থা—স্থানসংশ্রয়, পঞ্চম অবস্থা—ব্যাধিদর্শন। নিদান সেবন করিলে যে রোগ জন্মিবেই এরূপ কোন নিশ্চয় নাই। নিদান সেবনে কিম্বা কালধর্ম্যে দৌষের সঞ্চয় হইয়া থাকে মাত্র। সেই সঞ্চিত দৌষ যদি রোগোৎপাদনের অধুলা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে

প্রকোপাদি উপরি লিখিত ৪টি অবস্থার পরি-  
ণত হইতে পারে, তবেই রোগ জন্মিয়া থাকে।  
নচেৎ উহা ব্যভিচারী নিদান মধ্যে পরিগণিত  
হইয়া যায়। সঞ্চয়, উত্তরোত্তর প্রকোপাদি  
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিম্বা বাধি আনয়ন  
করে তাহাই আমাদের বক্তব্য। সঞ্চিত দোষ  
অমুকুল অবস্থা লাভ করিয়া প্রকুপিত হয় অর্থাৎ  
যোগ্য বল লাভ করে। প্রকুপিত দোষ (বায়ু,  
পিত্ত, কফ) পরে প্রসার লাভ করে অর্থাৎ স্তম্ভ  
শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফ যে যে স্থানে অবস্থিত  
করে, সেই সেই স্থান হইতে ছড়াইয়া পড়ে।  
যেমন সুরা প্রভৃতি সঞ্চিত হইলে (fermented)  
যেমন উগলিয়া উঠে, সেইরূপ দোষও শরীরে  
প্রসারলাভ করিয়া থাকে। বায়ু এই গতিশক্তি  
দানের কর্তা। বায়ু অচেতন হইলেও রজোগুণ-  
ভূয়িষ্ঠ বলিয়া কফ, পিত্ত, শোণিতের প্রবর্তক  
হইয়া থাকে। দোষ ছড়াইয়া পড়িয়া শাবীরের  
যে স্থানে রোগ জন্মাইবে সেই সেই অঙ্গে,  
যেমন—হস্ত, পদ, উদর, মুখ, চক্ষু কি কণ্ঠ কিম্বা  
হৃদয়, বক্ষঃ, আমাশয়, বৃক্ক বা বন্তি আশ্রয়  
করিয়া থাকে, ইহারই নাম স্থান-সংশ্রয়। দোষ  
স্থান সংশ্রয় করিলে মোটামুটি এই জানা যায়  
যে, অমুক অঙ্গের বা অথক আশ্রয়ের রোগ  
জন্মিবে কিন্তু সেই অঙ্গে বা আমাশয়ে অনেক  
প্রকার রোগ জন্মিতে পারে, তন্মধ্যে ঠিক  
কোন রোগটি জন্মিবে তখনও নিশ্চয় করা  
যায় না। পরে আরও একটু অনুকুল অবস্থা-  
প্রাপ্ত হইলে, স্থান-সংশ্রিত দোষ কি রোগ  
উৎপন্ন করিবে জানা যায় অর্থাৎ রোগের পূর্ব-  
রূপ প্রকাশ পায়। যেমন মেঘদর্শনে বৃষ্টি, পুষ্প  
দর্শনে ফল অমুখিত হইয়া থাকে তদ্রূপ পূর্ব-  
রূপ দর্শনে ভাবী ব্যাধির জ্ঞান হইয়া থাকে।  
কোন রোগের কি পূর্বরূপ তাহা রোগবিনি-

শ্চয় গ্রাহ্যে, বলা হইয়াছে। রোগের পূর্বরূপ  
আর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইলে তাহাকে রূপ  
অর্থাৎ রোগের লক্ষণ বলা হয়। যখন রোগের  
লক্ষণ প্রকাশ পায় তখনই ব্যাধি-দর্শন অর্থাৎ  
এই জর, এই অতিসার হইল বলিয়া থাকি।  
অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই ব্যাধি-দর্শনের  
পর চিকিৎসার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু  
আয়ুর্বেদ বলেন ইহা চিকিৎসার পঞ্চম কাল।  
প্রথম যখন দোষের “সঞ্চয়” হইয়াছিল সেই  
চিকিৎসার প্রথম কাল। তখন সঞ্চিত দোষ  
বাহিব করিয়া দিলে আর দোষের প্রকোপ হইতে  
পারিত না। দোষের সঞ্চিচ্চাবস্থায় প্রতীকার  
না করিলে দ্বিতীয় অবস্থা—“প্রকোপ” প্রাপ্ত  
হয়, ইহা চিকিৎসার দ্বিতীয় কাল। প্রকোপ-  
কালে প্রতীকার করিলে আব তৃতীয় অবস্থা—  
“প্রসার” লাভ করিতে পাবে না। দোষ  
“প্রসারের” অবস্থায় উপনীত হইলে চিকিৎসার  
তৃতীয় কাল। প্রসার প্রাপ্ত দোষ পরে স্থান  
সংশ্রয় করে, এই অবস্থা চিকিৎসার চতুর্থকাল।  
স্থান সংশ্রয়ের পর ব্যাধিদর্শন ইহা চিকিৎসার  
পঞ্চমকাল। যে চিকিৎসকগণ ব্যাধিদর্শন অর্থাৎ  
রোগোৎপত্তির পর চিকিৎসা আরম্ভ করেন।  
আয়ুর্বেদ বলেন তাঁহারা চিকিৎসা করিবার  
চারিটি অবসর হারাইয়া চিকিৎসা আরম্ভ  
করিয়া থাকেন। আয়ুর্বেদের এই অপূর্ণ  
এবং অনন্ত-সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থা স্বেবল  
উপদেশ মাত্র নহে—প্রতিরোগে এইরূপ  
চিকিৎসা প্রদর্শিত হইয়াছে। সঞ্চয়েই চিকিৎসা  
করিলে দোষ আর উত্তরগতি লাভ করিতে  
পারে না; অতএব বর্ষাকালে সঞ্চিত পিত্ত  
শরৎকালে প্রকুপিত হইয়া বাহাতে পিত্ত জ্বর  
ব্যাধি উৎপাদন করিতে না পারে তজ্জন্ত আয়ু-  
র্বেদ শরৎকালে পিত্তনির্ধারণে ব্যবস্থা দিরা-

ছেন। আবার শরৎকালে সঞ্চিত কফ বাহাতে বসন্তকালে কুপিত হইয়া কফরোগ জন্মাইতে না পারে তজ্জ্ঞ আয়ুর্বেদে বসন্তে কফনির্হরণের উপদেশ দিয়াছেন। মাংস্বক ঋতুকৃত দোষের সঞ্চয় ও প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্মই প্রধানতঃ আয়ুর্বেদে “ঋতুচর্যা” উপদিষ্ট হইয়াছে। সঞ্চয়েই যদি দোষ নষ্ট হইয়া গেল তবে তাহার প্রকোপ প্রসারাদি আর কোথা হইতে হইবে? তারপরে রোগের পূর্বরূপ প্রকাশ পাইলেও যদি প্রতিকার করা যায় তাহা হইলে আর রূপ অর্থাৎ ব্যাধি জন্মিতে পারে না; অতএব আয়ুর্বেদে রোগের পূর্বরূপ প্রকাশ পাইলেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন জরের পূর্বরূপ প্রকাশ পাইলে অতি লঘু ভোজন কিম্বা উপবাস করিবার উপদেশ আছে। পূর্বরূপে এই লঘু ভোজন বা উপবাস রূপ চিকিৎসা অবলম্বন করিলে আর জ্বর হইতে পারিবে না। নিদান সেবন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাধিদর্শন পর্যন্ত আমরা ব্যাখ্যা করিলাম বটে কিন্তু একটা কথা বলিতে বাকী আছে। আমরা বলিয়াছি দোষের সঞ্চয় হইতে প্রসার পর্যন্ত দোষ কি ব্যাধি জন্মাইবে জানা যায় না, পরে স্থান সংশ্রয় করিয়া পূর্বরূপ প্রকাশ পাইলে তবে কি রোগ জন্মিবে জানা যায়। এ বিষয়ে কএকটা সূক্ষ্ম কথা আছে এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব। দোষ স্থান-সংশ্রয় করিয়া পূর্বরূপ প্রকাশের পূর্বে কি রোগ উৎপাদন করিবে যদি জানিতে না পারা যায় তাহা হইলে রোগের নিদান কিরূপে স্থির হয়? অর্থাৎ এইরূপ অহিত আহার বিহার করিলে অমুক রোগ জন্মিবে, ইহা কিরূপে বলা যায়? কারণ প্রথম, অহিত আহার বিহার দ্বারা দোষ সঞ্চিত ও কুপিত হইবে পরে প্রসার

লাভ করিবে, তারপর স্থানসংশ্রয় করিবে সূত্র-রাং যাহা চতুর্থ অবস্থায় জ্ঞেয় তাহা প্রথমাবস্থা-তেই কিরূপে জানিব? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে যদি এই কথা বলিতে পারা যাইত যে, অমুক আহার বিহার করিলে শরীরের অমুক অঙ্গ বা অমুক আশ্রয় আশ্রয় করিয়া দোষ অমুক রোগ উৎপন্ন করিবেই অর্থাৎ রোগের নিদানের সহিত রোগের জন্মের একটা নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে চতুর্থ অবস্থার কথা প্রথম অবস্থায় বলা আর কঠিন কি? কিন্তু বস্তুতঃ নিদানের সহিত রোগের জন্মের ঐক্য কোন নিয়ত সম্বন্ধ নাই। নাই বলিয়াই আয়ুর্বেদে নিদান অর্থাৎ রোগের হেতুকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা (১) দোষ হেতু (২) ব্যাধি হেতু (৩) দোষ ব্যাধি উভয় হেতু। (১) দোষ-হেতু—মধুর রস কফের, তিজরস বায়ুর এবং কটুরস পিত্তের সঞ্চয় ও প্রকোপের হেতু। আয়ুর্বেদে ২০ প্রকার শ্লেষ্মরোগ, ৪০ প্রকার পিত্তরোগ এবং ৮০ প্রকার বায়ুরোগ স্বীকৃত হইয়াছে। মধুরস দোষ-হেতু অর্থাৎ কফের সঞ্চয় ও প্রকোপ করে মাত্র কিন্তু ঐ প্রকুপিত কফ উপরি কথিত ২০ প্রকার কফরোগের মধ্যে কি রোগের উৎপাদন করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সূত্ররাং ইহা কেবল দোষের হেতু হইল। (২) ব্যাধি-হেতু—মৃত্তিকা ভক্ষণ পাণ্ডুরোগের হেতু। এই হেতুকে আমরা ব্যাধি-হেতু বলিব। মৃত্তিকা ভক্ষণ পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করিবার পূর্বে যদিও বায়ু বা পিত্ত বা কফের প্রকোপ জন্মাইয়া তবে পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে তথাপি মৃত্তিকা ভক্ষণ জন্ম কুপিত সেই বাতাদি কেবল পাণ্ডুরোগেই জন্মাইয়া থাকে অল্প কোম রোগ জন্মাইতে পারে না। সূত্ররাং এই হেতুকে আমরা

ব্যাধি-হেতু বলিবা। ব্যাধি-হেতু হইলেই যখন দোষ-হেতু হইবেই, কারণ দোষ বিনা ব্যাধি জন্মিতেই পারে না, তখন পৃথক-দোষ ব্যাধি উভয় হেতু স্বীকারের প্রয়োজন কি? কেবল চিকিৎসার সুবিধার জন্ত এই হেতু ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, যে বস্তু দোষ-হর তাহা সর্বত্র ব্যাধিহর নহে—এখানে আপত্তি হইতে পারে যে দোষ কারণ, ব্যাধি কার্য কারণভূত দোষের নিবৃত্তি হইলে কার্যভূত ব্যাধির নিবৃত্তি হইবে না কেন? দ্রব্য শক্তির উপরি প্রস্থ চলেনা। আমরা দেখিতে পাই যে, কোন দ্রব্য দোষ হরণ করে কিন্তু ব্যাধি হরণ করিতে পারে না। এক্ষণে বৃষ্টিতে পারা গেল যে কতকগুলি হেতু কেবল দোষ কুপিত করে কতকগুলি হেতু, বিশেষ ব্যাধি উৎপাদন করে। রোগবিনিশ্চয় গ্রন্থে প্রতি রোগের যে হেতু লিখিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে কতকগুলি দোষ-হেতু কতকগুলি ব্যাধি-হেতু কতকগুলি বা দোষ ব্যাধি উভয় হেতু। প্রসঙ্গক্রমে হেতু সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া আমরা এই বিষয়ের উপসংহার করিব। অনেক রোগ এক হেতু হইতে জন্মে আবার এক হেতু হইতে একটা রোগও জন্মে। বহু হেতু হইতে বহু রোগ জন্মে আবার বহু হেতু হইতে একটা রোগও জন্মে।

(৫) এক্ষণে আমরা রোগের লক্ষণও রোগপরীক্ষা সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের উক্তি ব্যাখ্যা করিব। রোগের লক্ষণ এবং রোগের রূপের একই অর্থ অর্থাৎ যাহা রূপ তাহা লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। “রোগে লক্ষণ” বলিলে রোগ এবং লক্ষণ পৃথক্ ব্রূয় কিন্তু লক্ষণ সমষ্টিই ত রোগ, লক্ষণ সমষ্টি ভিন্ন রোগের আর পৃথক্

অস্তিত্ব কোথায়? ঘর্মরোধ সস্তাপ এবং সর্কাদ-গ্রহণ ভিন্ন আর আর কি? এইগুলির সমষ্টিই ত জ্বর, কাহার কাহার এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু এরূপ সন্দেহ সঙ্গত নহে। ঘর্ম-রোধ প্রভৃতিই জ্বর নহে। দোষ এবং দৃশ্য (রস, রক্ত, মাংসাদি) সংমূর্ছিত হইয়া যে অবস্থা বিশেষ জন্মায় তাহাই জ্বরাদিরূপ ব্যাধি, ঘর্মাবরোধ প্রভৃতি তাহার কার্য। অথবা ঘর্মরোধ প্রভৃতি প্রত্যেকে রূপ অর্থাৎ লক্ষণ ইহাদের সমষ্টির নাম ব্যাধি। সমুদায় সমুদয় হইতে পৃথক। পলাশ বৃক্ষের সমষ্টিই পলাশ বন বটে কিন্তু তাহা বলিয়া পলাশবৃক্ষ ও বন এক নহে। লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় হয় বটে কিন্তু অনেক ব্যাধির একই লক্ষণ দেখা যায়, আবার একই ব্যাধির বহু লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং নিঃসংশয় জ্ঞান লাভের জন্ত আয়ুর্বেদে রোগের ইতর-ব্যবচ্ছেদক (অন্ত হইতে পৃথক করিবার) লক্ষণ এবং প্রারম্ভ: দৃষ্ট লক্ষণ উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক চিকিৎসকের জ্ঞান উচিত যে রোগ-পরীক্ষা ও রোগি-পরীক্ষা দুইটা পৃথক বিষয়। অনেক সময় দেখা যায় চিকিৎসকেরা রোগ পরীক্ষা লইয়াই তন্ময়, রোগি-পরীক্ষা—যাহার চিকিৎসা হইতেছে তাহার পরীক্ষা যে চিকিৎসা কার্যে নিতান্ত প্রয়োজন ইহা অনেক ক্ষেত্রেই বিস্মৃত হইতে দেখা যায়। রোগীকে ভুলিয়া রোগের চিকিৎসা করিলে যে কি বিষম অনর্থোৎপত্তি ঘটিলে থাকে তাহা আল কাল প্রত্যক্ষ করিবার অবসর বোধ হয় অনেকেরই ঘটনাছে। আয়ুর্বেদে রোগ-পরীক্ষার সহিত রোগি-পরীক্ষার উপদেশ দিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই, বরং রোগ-পরীক্ষা অপেক্ষা রোগি-পরীক্ষা অধিকতর বিস্তৃত তাহা এখানে



স্বল্পরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব আমরা অগ্রে রোগি-পরীক্ষা পরে রোগ-পরীক্ষা আলোচনা করিব।

আয়ুর্বেদ বলিতেছেন রোগি-পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিবে রোগীর জন্ম ও বসতি স্থান কোথা; কোথা অবস্থিতিকালে রোগটা উৎপন্ন হইয়াছে, রোগী যেদেশের লোক সেই দেশের লোকের আহার কিরূপ, বল কিরূপ, এবং অভ্যাস কি? এই সকল তত্ত্ব জানিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। শীতবহল ইংলণ্ড-বাসী ইংরাজ ও গ্রীষ্মবহল ভারতবাসী বাঙ্গালীর আহার, বল, অভ্যাস একরূপ নহে। একজন আবার মাংসভোজী আর একজন প্রধানতঃ অন্নফলমূলভোজী কচিং মংস্ত্র মাংস ভোজন করে। ইহাদের বলও সমান নহে। সবলের গন্ধে ঔষধের যে মাত্রা হিতকর, দুর্বলের গন্ধে সে মাত্রা মহা অনর্থের হেতু। অভ্যাসও ভিন্ন, একজন ভ্রমেও তিক্তরস সেবন করে না, মধুর ও অন্ন রস নাম মাত্র ভোজন করে। অপর প্রচুর মধুরান্নভোজী এবং ইচ্ছা করিয়া তিক্তবস্তু সেবন করে। চিকিৎসকের এই সকল পার্থক্য চিন্তা করা উচিত। এত হইল রোগীর দেশগত পার্থক্য, অতঃপর রোগীর আয়ুগত বিষয় চিন্তা করা যাইতেছে। চিকিৎসক রোগীর প্রকৃতি, সার, সংহনন, সত্ত্ব, সাত্ব্য, আহার-শক্তি, ব্যায়াম-শক্তি ও বয়স পরীক্ষা করিবেন।

**প্রকৃতি—প্রকৃতি কি?** যাহাকে আমরা “ধাত” বলি তাহাই প্রকৃতি—যেমন অমৃকের বায়ুর ধাত, অমৃকের পিত্তের ধাত ইত্যাদি। এই “ধাত” বা প্রকৃতি কিরূপে জন্মে? গর্ভাধানকালে পিতার শুক্র এবং মাতার অরুজিম আর্দ্রব শোণিত, যে ঋতুতে গর্ভাধান হয় সেই ঋতু, গর্ভাশয়ের অবস্থা, মাতার তৎকালীন আহার

বিহার এবং মহাত্মত বিকার অমৃসারে গর্ভস্থিত শিশুর শরীর নির্মিত হইয়া থাকে। ঐ শুক্রশোণিত, ঐ গর্ভাশয়, মাতার ঐ আহার বিহার যে যে দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) দ্বারা অমৃবিদ্ধ হয় গর্ভস্থিত শিশুর সেই সেই প্রকৃতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত ভাব বায়ু দূষিত হইলে বায়ুপ্রকৃতি, পিত্তদুষ্ট হইলে পিত্তপ্রকৃতি; কফ দূষিত হইলে কফপ্রকৃতি হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি জন্মের সহিত জন্মিয়া থাকে। এই বাতাদি প্রকৃতি জানিবার জন্ত আয়ুর্বেদ বাতাদি প্রকৃতি মনুষ্যের যে লক্ষণ বলিয়াছেন পাঠকের অবগতির জন্ত আমরা সংক্ষেপে তাহা লিখিতেছি। কারণের গুণ কার্যে প্রকাশ পায়। স্নেহপ্রকৃতির কারণ স্নেহা স্ততরাং স্নেহ-প্রকৃতির শরীর স্নেহ গুণযুক্ত হইয়া থাকে। স্নেহ স্নান ও স্নিগ্ধ বলিয়া স্নেহপ্রকৃতি মনুষ্যের শরীর স্নিগ্ধ, দৃষ্টি সুখকর ও সুকুমার হইয়া থাকে। স্নেহা মধুরগুণ অতএব স্নেহপ্রকৃতি লোকের শুক্রধাতু প্রচুর, মেধুনশক্তি অধিক এবং সন্তান বহু জন্মিয়া থাকে। স্নেহা সারু ও সাজ্জ বলিয়া স্নেহপ্রকৃতি মনুষ্যের শরীর দৃঢ়, অঙ্গ সমুদায় পূর্ণ ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। স্নেহা মন্দ, ত্রিষিত, গুরু ও শীত গুণযুক্ত অতএব স্নেহপ্রকৃতি মাহুষেরা অন্ন উদযোগী ও অন্ন আহার বিহার করিয়া থাকে। ইহারা সহজে ক্রুদ্ধ বা হুঃখিত হয় না। ইহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মেহের উত্তাপ ও বর্ষা অন্ন হইয়া থাকে। পিত্ত—উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, বিজ্ঞ, অন্ন ও কটু গুণযুক্ত অতএব পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্যগণের উষ্ণ সঙ্ঘ করিবার ক্ষমতা থাকে না। গাত্র কোমল হয়, শরীরে তিল, মেহেতা ও চুলকানি প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহাদের ক্ষুধা ও পিপাসা অধিক দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত শীত ইহাদের

চর্ম লোল হয়, চুল পাকিরা যায় এবং টাক পড়ে, দাড়ি গোঁপ ঘন হয় না, চুল কটা হয়, ইহার পরাক্রমশালী হয়, ইহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রবল, ক্লেশ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে, প্রায়ই পেটুক হয়, শরীরের সন্ধি ও মাংসের তেমন বাধুনি থাকে না, ঘর্ম, মূত্র ও মল প্রচুর নির্গত হয়, শরীরে হর্গন্ধ হয়, শুক্র অল্প এবং সন্তানও অল্প জন্মিয়া থাকে। পিত্ত-প্রকৃতির আয়ু ও বল মধ্যম। বায়ু রুদ্ধ, লঘু, চল, বহু, শীত, পুরুষ ও বিশদ গুণযুক্ত অতএব বাতপ্রকৃতি পুরুষের শরীর রুদ্ধ, অপুষ্ট ও খর্ব্ব হইয়া থাকে। ইহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, ক্ষীণ ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া থাকে, গাঢ় নিদ্রা হয় না, কখন স্থির থাকিতে পারে না, প্রায়ই হাত পা নাড়ে, অধিক কথা বলে, শরীর শিরাব্যাপ্ত, সহজেই চিন্তের বিকার জন্মিয়া থাকে, ভয়, ক্রোধ অধিক হয়, শীঘ্র ধারণা করিতে পারে কিন্তু মনে রাখিতে পারে না, শীতবোধ অপেক্ষাকৃত অধিক ও গা কাটিয়া থাকে। ইহার অন্নায়, অন্নবল, অন্নসত্ত্বান ও নিধন হইয়া থাকে। দ্বন্দ্বপ্রকৃতি হইলে ছইটীর লক্ষণ দেখা যায়। বাতপ্রকৃতির বায়ুজন্ম রোগ, পিত্তপ্রকৃতির পিত্তজন্ম এবং কফপ্রকৃতির কফজন্ম রোগ শীঘ্রই বর্ধিত হইয়া থাকে। বাহার যে প্রকৃতি অহিত আহার বিহারে সেই প্রকৃতিত্বত দোষ বত শীঘ্র প্রকৃপিত হয় অল্প দোষ তত শীঘ্র প্রকৃপিত হয় না—যেমন কোন বাতপ্রকৃতির লোক অহিত আহার বিহার করিলে বায়ু বত শীঘ্র কৃপিত হইবে কফপিত্ত তত শীঘ্র

কৃপিত হয় না। এইরূপ কফপিত্ত প্রকৃতির পক্ষেও জানিতে হইবে।

সান্ন—প্রকৃতির পর আমরা সারের কথা বলিব। সার কি? বৃক্ষের সার বলিলে যেমন স্থিরাংশকে বুঝায় মনুষ্যের সার বলিলেও সেই-রূপ মাংসাদি ষাতুর বিশেষ বল বুঝাইয়া থাকে। এই সার সাত প্রকার যথা—ত্বকসার রক্তসার, মাংসসার, মেদসার, অস্থিসার, মজ্জাসার, ও শুক্রসার। হৃষ্টপুষ্ট হইলেই বলবান্ এবং ক্লশ হইলেই দুর্বল কিম্বা বৃহৎ শরীর হইলেই বলবান্ অল্পকায় হইলেই হীনবল একরূপ কল্পনা করিয়া চিকিৎসক বাহাতে ভ্রমে পতিত না হয়েন তজ্জন্ত শরীর ও মনের বিশেষ বলরূপী এই সারতত্ত্ব তাঁহার আলোচনা করা উচিত। পিপীলিকা ক্ষুদ্রকায় হইলেও যেমন অনেক বড় জিনিষ বহিয়া লইয়া যাইতে পারে, মানুষের মধ্যেও সেইরূপ অনেক মানুষ দেখা যায় বাহারি স্বল্পকায় হইলেও বেশ বলশালী। সারই এই বিশেষ বলশালিত্বের কারণ। সারের দ্বারা যেরূপ শরীরের বল অধুমিত হয় তজ্জপ মনের বলও জানা যায়। মানুষ যে মহোৎসাহ, বীর, ত্যক্তবিবাদ, গম্ভীরবুদ্ধি, কল্যাণাভিনিবেশী ও ক্লেশসহ হয় সেও সারের গুণেই হইয়া থাকে। পূর্বে আমরা ত্বক্ হইতে শুক্র পর্য্যন্ত যে সপ্ত প্রকার সারের উল্লেখ করিয়াছি আয়ুর্বেদে উহাদের বিশেষ লক্ষণ লিখিত আছে—বাহ্য-ভয়ে সেইগুলি লিখিত হইল না।

(ক্রমশঃ)

## খাত্তের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ ।

যাহারা পাশ্চাত্য ভাষায় সুশিক্ষিত, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিমল প্রভাৱ যাহাদের প্রাচীন কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে, যাহারা সর্বতোভাবে সর্বাস্তঃকরণে ইংরাজী রীতি, নীতি ও মতিগতির অনুকরণে অভ্যস্ত, তাহারা ই বর্তমান কালে “শিক্ষিত জন-সমাজ” শব্দের অভিধেয়। প্রোক্ত ভারত-সম্ভোগিণের অধিকাংশ লোকেরই ধারণা এই যে ধর্মের সহিত আহাৱাদির বিধি-নিষেধ বাহ্যভূত মাত্র। ঈশ্বরে ভক্তি, জীবৎ দয়া, ও সত্যভাষণাদি সদগুণ থাকিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। দান, গোচাচার, ললাটতটে চন্দন বা তিলকধারণ এবং দীর্ঘশিখা বন্ধন ব্যাপার নিরর্থক। সর্বশক্তিমান্ ভগবানের উপাসনায় এই সকল ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন নাই। যে সকল আহাৱীয় দ্রব্য রসনার তৃপ্তিসাধন করে, যাহা শ্রবণের আনন্দ বর্দ্ধন করে ইত্যাদি বিষয়ভোগ ধর্ম্মের হানি করে না। এই মতে অনেক ব্যক্তি চলিয়া থাকেন। বর্তমানকালে রেল, ষ্টীমারে চলিবার সময় শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত স্নানমণ্ডল আর জাতি-বিচার করেন না, যে কোন ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্নপানাদি অন্নান বদনে গ্রহণ করিয়া পথ-শান্তি দূর করেন। একটু প্রগিধানপূর্বক চিন্তা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে দানাদি সদাচার এবং আহাৱীয় দ্রব্যের গ্রহণ ও পরিবর্জন সর্বথা ঈশ্বরোপাসনার অনুকূল। দান, চন্দনলিপন, গুল্লবসন পরিধান এবং সাম্বিক ভোজন প্রভৃতি সকল বিষয়ই সর্বথা কর্তব্য, তথাপি আচরণে মনের পবিত্রতা সাধিত হয়, চিত্ত পবিত্র হইলে আরাধ্য বস্তু লাভ করিতে কোন বিষ উপস্থিত হয় না, আর

মনঃ যদি চঞ্চল, কুংসিত বিষয়ে বিলীন, থাকে তবে আরাধ্য বস্তু কখনই লাভ হয় না। সাধনার অমুরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, এজন্য সর্বপ্রায়ে ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের বিগুহ্মি সম্পাদন জন্ত পুতচরিত আর্ঘ্যগণ আহাৱাদির সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ স্থাপন করিয়াছেন এবং যে বিষয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুকূল তাহার গ্রহণ এবং প্রতিকূল বিষয়ের পরিবর্জন করিতে বলিয়াছেন—তাহারই নাম শাস্ত্র—“শান্তি ত্রায়তে যেন তচ্ছাস্ত্রং” সেইজন্য শাস্ত্রের বিধি নিষেধ অবনত মস্তকে মাথ্য করা কর্তব্য। স্ববিগণ জগতের কল্যাণ কামনায় যে সকল সুনিয়মের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার পরিবর্জন করার ভারতবাসিগণ দিন দিন ক্ষীণ দুর্বল হইয়া অকালে কাল-কবলে পতিত হইতেছেন। মনু বলেন—

আচারান্নভতে হাযুরাচারাদীপ্জিতাঃ প্রজাঃ ।  
আচারান্ননক্ষম্য মাচারো হনন্ত্যলক্ষণম্ ॥  
অর্থাৎ আচারানুষ্ঠান করিলে দীর্ঘ আয়ু, অভিলষিত সম্ভোগ ও ধন ধাত্ত প্রভৃতির লাভ হইয়া থাকে, আচার অন্তলক্ষণ ॥ -  
কোন কারণে আর্ঘ্যগণ খাত্তাদির গ্রহণ ও বর্জন করিয়াছেন এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার কারণ নিশ্চয় করা যাইতেছে; কারণ প্রদর্শনের হেতু এই যে আধুনিক নব্য সভ্যগণ কারণ না শুনিয়া কেবল অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কোন কার্যেই প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। দান না করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করার দোষ কি ?

\* সাংঘ্যমতে মনঃ মস্তকের অভ্যন্তরস্থ মূতের দ্বারা পদার্থ দ্বারা তপ্ত হইতেছে। সহস্রাব্দে আজ্ঞাচক্রে মনের বসতি স্থান, দান করিলে মস্তক শীতল হয়, হৃদয়ঃ মনঃ হির থাকে এজন্য সহজেই ঘোর বস্ত্র ধারণ করা যায়।

এই কথার সহজতর না পাইলে শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে হইবেন না; তজ্জন্মই জগতের আদি কারণের কথা বিবৃত হইতেছে;—

এই নিখিল জগতের কারণ “প্রকৃতি”। সৰ্ব, রজঃ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি-প্রসূত-জগতের বৈচিত্র্যও প্রকৃতির গুণ-ভেদে সম্পন্ন হইয়া থাকে, অত্যাধিক সৰ্বল মাহুষের বর্ণগঠন ও চরিত্র প্রভৃতিও একরূপই হইত। একটা ছাগী একই দিনে কখনই গুরু কৃষ্ণ ও কর্করূ বর্ণের শাবক প্রসব করিত না।

এই জগৎ ত্রিগুণাত্মক সূতরাং আমরা যে সকল বস্তু আহাৰ করি, যে যে বিষয়ের উপভোগ করি তাহার কোনটাতে সৰ্বগুণের উদ্রেক হয়, কোনটাতে রজোগুণের আবির্ভাব এবং কোনটাতে তমোগুণের বিকাশ হইয়া থাকে।

শরীর অন্ন রস হইতে উৎপন্ন; সূতরাং ঘেরূপ গুণ-বিশিষ্ট অন্ন ভুক্ত হয়, শরীরেও সেই সেই ভুক্তদ্রব্যের গুণাবলী সংক্রমিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—“সন্ধাৎ সজ্জায়তে জ্ঞানং, রজসো লোভ এব চ। প্রমাদ-মোহৌ জায়েতে তমসোহজ্ঞান মেব চ”। সৰ্ব-গুণের বাহুল্যে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, রজঃ ও তমোগুণাধিক্যে লোভ, প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানতা উপস্থিত হইয়া থাকে। মত্তঃ মাংস

\* সঙ্গত মাত্রায় মত্ত পীত হইলে তাহা হৃৎপ্রদ, স্মৃতি ও বলবর্দ্ধক হইয়া থাকে। মত্তের এই সকল গুণ থাকিলেও বিষয়ী লোকে স্থায়ী মাতা ও কাল প্রয়োগ ঠিক রাখিতে পারে না; যদিয়ার উদ্ভাসিনী শক্তির বশীভূত হইয়া পড়ে এই জন্ত ‘মদ্য মদ্যে মেষের মগ্রাহম্’ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ও পলাণ্ডু প্রভৃতির নিয়ত সেবনে শরীর উষ্ণ এবং চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে; এই সকল কারণে তপশ্চক্ষুঃ শ্রমিগণ আহারীয় দ্রব্যের সহিত ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অবলোকন করিয়াছেন; তজ্জন্মই খাতাদির বিধি নিষেধের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এই বিধি নিষেধের ফলে আর্ধ্যসন্তানগণ দুগ্ধ, ঘৃত, কন্দ, মূল, ফল প্রভৃতি সাম্বিক দ্রব্য ভোজন করিয়া রজঃ ও তমোগুণের অন্নতা সান্নিধ্য করিতে সমর্থ হইতেন; এবং সুদীর্ঘকাল সুস্থ শরীরে থাকিয়া তীব্র তপস্তা করিতে পারিতেন, তাহার ফলে অমৃতত্ব লাভ করিতেন। চরক বলেন—“হিতাশীতান্নিতাশী-স্তাং কাগভোজী জিতেন্দ্রিয়ঃ” হিত দ্রব্যের আহাৰ করিবে, পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিবে, যথাকালে ভোজন করিবে, এবং জিতেন্দ্রিয় হইবে, অর্থাৎ লোভের বশবর্তী হইয়া অতি মাত্রায় ভোজন করিবে না।

হিন্দু সন্তানদিগকে খাতাখাদ্য বিষয়ে আর নূতন কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই; তাঁহাদের আচার-পুত পূর্ব পুরুষগণ যে সকল আহাৰাচার গ্রহণ ও বর্জন করিয়াছেন, সেই চিরচরিত পদ্ধতির অনুসরণে ধর্মোপার্জনের পথ সুগম হইবে।

আহারীয় দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিতে গেলে প্রবন্ধ কলেবর নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; এবং পাঠক মহাশয়দিগেরও বৈধীচ্যুতি হইতে পারে এজন্য এ বিষয়ের সূক্ষ্মে উপ-সংহার করিতে হইল।

ঋতু-বিশেষে এবং তিথি-ভেদে নানাবিধ পদার্থ উপকারী বা অপকারী হইয়া থাকে। সেজন্য শ্রমিগণ অষ্টমীতে নারিকেল, ত্রয়ো-

দশীতে বেগুন ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। মানুষমাজেই অমুসন্ধান করিলে প্রত্যক্ষকরিতে পারেন যে পূর্ণিমা \* তিথিতে বিষণ্ণ হইতে সহজেই রস নিঃসৃত হইয়া থাকে ; অত্র তিথিতে তত সহজে হয় না ; ইহার কারণ এই যে পূর্ণিমায় চন্দ্রমার বলের বৃদ্ধি হয়, চন্দ্রে জলের অংশ অধিক পরিমাণে বর্তমান আছে বলিয়া শব্দধর-কিরণে পৃথিবী রসবতী এবং শীতল হইয়া থাকে। পৌর্ণমাসীতে সাগর সলিল সম্যক পরিবর্তিত লইয়া নদনদীর জলেরও বৃদ্ধিসাধন করে, ধরিত্রী জলক্রিয় হয় বলিয়া জগতের সকল পদার্থ রসযুক্ত হয় ; সুতরাং পৃথিবীস্থ লতাপাতা হইতে ঐকালে স্বরাসে রস গ্রহণ করা যায়। পক্ষান্তে পৃথিবী রসবতী হয় সেজন্ত কক্ষপ্রকৃতি-মানব এবং খাস কাস ও বৃদ্ধি রোগাক্রান্ত জনের পীড়া সকল বৃদ্ধি পায়, কক্ষ ক্ষয় ও রোগের শাস্তির জন্য শাস্ত্রকার বলেন ;—“কাকজন্ম সহস্রাণি গৃধ্রজন্ম শতানি চ খাপদং লক্ষজন্মানি পক্ষান্তে নিশিতোজনে” সুতরাং প্রত্যেক তিথিতে নিম্ন বস্তুই আমাদের শরীরের অল্পপযোগী ; ইহা এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে হইবে।

আমরা স্থলদর্শী অল্পবুদ্ধি মানব, সকল বিধি নিষেধের সুযুক্তি সর্বদা প্রদর্শনে অসমর্থ ; কিন্তু ঋষিগণ যোগবলে সকল বিষয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

কেবল আহারের নিয়ম পালনেই অতি-লঘিত লাভ হইবে না ; শাস্ত্রের অন্ত্যস্ত বিধানেরও যথাসম্ভব পালন করিতে হইবে।

বসন ভূষণের বিশেষত্বেও মনের গতির

\* অসাব্যততেও পৃথিবী অধিকতর শীতল হয়।

বিভিন্নতা হয়। আমার একজন সৈনিক বহু এক দিন বলিয়াছিলেন ;—

“আমি যখন সৈনিকের পরিচ্ছদ পরিধান করি তখন আমার বল বিগুণ বাড়িয়া যায় ; রণোৎসাহে রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠে, মনে হয় এই দণ্ডেই অরাতিকে ছিন্ন ভিন্ন ও উন্মথিত করিয়া ফেলি”। আরও একটা প্রাচীন আখ্যায়িকা শুভ্র—

এক সময়ে কোন মূনি ইন্দ্র লাভ করিবার মানসে উগ্র তপস্তায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মূনি-পুঙ্গবের অভিশ্রায় জানিতে পারিয়া পুরন্দর এক দিন ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তপস্বীকে যথোচিত প্রণাম করিয়া অনেক বিষয়ে আলাপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ; সেই পুণ্যাশ্রম হইতে বিদায় হইবার সময় মুনিকে অমুনয়ের সহিত বলিলেন ;—মুনে কৃপা করিয়া আমার এই ধৃঞ্জা খানি আশ্রমে রাখিয়া দিও। কয়েক দিন পরে আমি স্বর্গে যাইবার সময় লইয়া যাইব, আমি এখন মূনিগণের পুণ্যাশ্রমভিমুখে যাইতে ইচ্ছা করি, তথায় বিনীতবেশে বাওয়াই উচিত, অমুমতি করুন। তাপস বাসবের বিনয়বচনে সন্ততি জ্ঞাপন করিয়া ইন্দ্রের ধৃঞ্জা খানি কুটীরের কোণে রাখিয়া দিলেন ; ইন্দ্রও মনে করিলেন যে এইবার তপস্তায় বিয় হইবার আর বড় বিলম্ব নাই। অত্র হইতে মূনির স্বদয়ে শত্রুর জ্ঞাসম্বরূপ অসিখানির চিন্তাই সর্বদা জাগরুক হইল, ইন্দ্র কবে আসিবেন, এই অসিখানি যদি কেহ চুরি করে এই মনে করিয়া স্নান ও পুষ্প চয়ন কালেও অসিখানিকে সঙ্গে রাখাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। ক্রমশঃ বন শ্রেণীর অন্তরালে কখন শুক তৃণ ছেদন করিয়া ইন্দ্রের দ্বারা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন কখন

বা হিংস্র জন্তুর বধ করিতে আরম্ভ করিলেন ;  
কিয়দিবস এই ভাবে অতীত হইলে মুনি ঠাকুর  
এক দম্ভরূপে পরিণত হইলেন, তাঁহার  
তপোবন-স্থলভ শাস্ত্র-স্বভাব দূরে গেল।  
সুতরাং এই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত হইল  
যে ক্ষমা-সার ঋষিরাও দম্ভা দক্ষিণ্য প্রভৃতি  
গুণাবলী অলঙ্কিত ভাবে বিসর্জন করিতে  
বাধ্য হন ; অতএব মানবের পরমাতীষ্ট লাভেচ্ছ  
পুরুষগণ স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করিয়া সদা-  
চার সম্পন্ন হউন। নানা জাতির স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্ট  
ভক্ষণ করিয়া শারীরিক মানসিক ও নৈতিক  
অবনতি লাভ করিবেন না।

ধর্মের সহিত আহার আচারাদির নিকট  
সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, “যঃ শাস্ত্র বিধি মূং-  
স্বজা বর্জ্যেতে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাশ্নোতি  
ন সুখং ন পরাং গতিম্। যে ব্যক্তি শাস্ত্রের  
বিধান অমান্য করিয়া করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়  
সে সিদ্ধি, সুখ এবং উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে  
পারে না। অলমতি-বিস্তরণে।

শ্রীসারদাচরণ সেন, কবিরত্ন।

(দারভাঙ্গা)

## বাধক রোগ চিকিৎসা।

লীলা ও সরমা।

—:—

লী। এই ঘরেই ঠাকুমা থাকেন, এখনই  
আসবেন।

স। আমার ভাই কিন্তু বড় লজ্জা করে,  
আমি ঠাকুমার স্মৃকে সব কথা বলতে  
পারবো না।

লী। জ্ঞাকি আর কি! রোগের কথা  
বল্‌বি তাঁর আবার লজ্জা কিসের।

স। তা হক ভাই, আমি পারবো না।  
তোমায়ত সব বলিছি তুমিই বলো।

লী। আচ্ছা, তা আমিই বলবো। কিন্তু  
তুই আমার কাছে বসে থাকিস, যেখানটা  
আমার ভুল হবে কি আমার মনে না হবে  
আমার গা টিপে চুপি চুপি বলিস।

স। আচ্ছা তা বলবো।

( ঠাকুমা ও ছোট বৌয়ের প্রবেশ )।

ছো। ( লীলাকে প্রণাম করিয়া ) ঠাকুর-  
ঝি কখন এয়েছ, বাড়ীর সব ভালত ?

লী। এই আসছি ভাই, বাড়ীর সব  
ভাল। কিন্তু তুই যে একেবারে প্রণাম করে  
ফেলি, তোকত কখন কারো কাছে মাথা  
নোয়াতে দেখিনি।

ছো। ঠাকুরঝি, সে দোষ কি আমার ?  
ছেলে বেলা থেকে যেমন শিক্ষা পেয়েছিলাম,  
সেই রকম ব্যবহার করতে শিখেছিলাম।

ঠা। ছোট ঠিক কথা বলেছে। কখন  
বউগুলিকে তাদের স্বভাবের অন্তে খুঁজ  
বাড়ীতে অনেক সময় গল্পনা সইতে হয়। কিন্তু  
বাস্তবিক তাদের দোষ কি। তারা যে রকম  
শিক্ষা পায় সেই রকম হয়। তা লোকে যদি

নিজ্জন্দের সমান যাদের আচার ব্যবহার তাদের ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে আসে তা হলে ভাল হয়।

লী। আমি বলি কি ঠাকুমা যে বিবিয়ানা শিক্ষা দেশ থেকে উঠে যাওয়া দরকার।

ছো। সে যে হয় তাত বোধ হয় না ঠাকুর-ঝি। আমি ছেলে মানুষ হলেও অনেক বাড়ীতে গিয়েছি, সব জায়গায় সাহেবিয়ানা আর বিবিয়ানা। হিদ্দানী বড় দেখতে পাইনে। বাপ মাকে ছবেলা প্রণাম করা ঠাকুরদের প্রণাম করে বাড়ী থেকে বেরোনা কেবল এই বাড়ী-তেই দেখছি।

লী। ছোটবউ ঠিক কথা বলেছে ঠাকুমা। এ স্রোত আর কি ফিরবে।

ঠা। ফিরবে বই কি দিদি, সনাতন আর্ধ্য-ধর্মের কি বিনাশ আছে। যখন দেশের লোকে নিজ্জন্দের ভুল বুঝতে পারবে, যখন আর্ধ্যধর্মের মহত্ত্ব বুঝতে পারবে, তখন আবার তারা হিদ্দ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের স্রোত ত ফিরবেই, শুনতে পাই আজ কাল কয়েক জন জীটানও নাকি হিদ্দর মত চাল চালন আরম্ভ করেছে।

লী। যাক্, এখন আমাদের ছোটবৌ যে ফিরেছে সেই ভাল।

ঠা। হাঁ ছোট খুব ফিরেছে। এখন ঠাকুর, দেবতা, ব্রাহ্মণে ভক্তি হয়েছে, গুরু-জনের সেবা করতে শিখেছে, আমার সেবাত খুঁই করে। এখন আর ছোট সে বাবু নেই।

ছো। এর মূল কিন্তু ঠাকুরঝি তুমি। সে পোষাকে বড় ঠাকুরের খণ্ডর বাড়ী নেম-তন্ন খেতে যাবার সময় বকুনি খাই, এখন মনে হয় কি করে গেরস্তর বউ ঝি সে রকম পোষাক পরে বেরোয়। সে দিন না বকে

যদি আমার প্রস্তর দিতে তা হলে আমার চাল কখনই শোধরাত না।

লী। তাইত হয়। যে বাড়ীর গিন্নিরা বা কর্তারা বউ ঝিদের বেয়াড়া চাল দেখে শাসন করে না, সে বাড়ীর বউ ঝির চাল কখনই শোধরায় না।

ঠা। তা লীলা বোস দাঁড়িয়ে রইল কেন। ছোট এখন এখানে থাকবি নাকি ?

ছো। না, আমার ঠাকুরের পূজোর যোগাড় করে দিতে হবে আমি যাই।

(ছোট-বোয়ের প্রস্থান)

লী। (সরমাকে দেখাইয়া) ঠাকুমা, একে চিন্তে পার।

ঠা। (নিরীক্ষণ করিয়া) তোর ছোট নন্দ সরমা যে। ভাল আছিস ত সরমা।

স। (পদধূলি লইয়া) হাঁ ঠাকুমা।

ঠা। জন্ম এইন্নি হও দিদি, পাকা মাথায় সিঁহর পর।

লী। সরমা কিন্তু ভাল নেই ঠাকুমা। ওর একটা অস্থখ হয়েছে।

ঠা। কি অস্থখ?

লী। বাধক। তা অনেক ডাক্তারী ওষুদ খেয়েছে কিছুতে কিছু হয় না। শেষে আমার মুখে শুনে তোমার কাছে এসেছে।

ঠা। আ। বাধক আর হিষ্টিরিয়া এয়েন আজ কাল মেয়েদের হওয়া চাই। আমাদের আমলেত এসব বিদ্যুটে রোগের এত আম-দানী ছিল না।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা এসব রোগ আজ কাল এত হচ্ছে কেন ?

ঠা। তার কারণ অনেক, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব। এই ধর ছেলেবেলা থেকে আজ কালকার মেয়েরা এখন নাটক

নভেল পড়ে, যাতে তাদের উত্তেজনা হয় অনেক সময় গরম জ্বিনিষ খায় যাতে সেই উত্তেজনাকে বাড়িয়ে তোলে। থিয়েটার দেখা তার কম সাহায্য করে না। আগে ঘরে সব ঠাকুর দেবতার ছবি থাকত, এখন ঘরে যে সব ছবি টাঙ্গান থাকে সে গুলিও বড় কম সহায়তা করে না। এই সব কারণে ছোট ছোট মেয়েদের মন আর শরীর এঁচোড়ে পাকতে থাকে। তার পর প্রথম পুষ্প দর্শনের সময় থেকে জীর্ধর্ষের সময় যে রকম স্তন্যমিমে থাকা উচিত সে রকম কেউ থাকে না।

লী। কি রকম ধরা কাটায় থাকতে হয় ঠাকুমা।

ঠা। সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে থাকতে হয়। দিনে ঘুমুতে নেই, গায়ে স্নগন্ধ বা অল্প কিছু মাখতে নেই, স্নান করতে নেই, নখ কাটতে নেই, তাড়াতাড়ি হাঁটতে কি দৌড়াতে নেই, চেষ্টিয়ে কথা কইতে নেই, বেশীকণ কথা কইতে নেই, উচ্চ শব্দ শুনিতে নেই, চুল আঁচড়াতে নেই, গায়ে বাতাস লাগতে নেই, পরিশ্রম করতে নেই, মনের কোন রকম উদ্বেগ হওয়া ভাল নয়, হাঁসতে কঁাদতে নেই। আজ কাল এসব নিয়ম কি কেউ মানে। ঐ অবস্থায় গাড়ী করে বেটা-ছেলের সঙ্গে বেড়ায়, থিয়েটার দেখে আমোদ আহ্লাদ করে। তা এতে আর রোগ হবে না।

লী। আচ্ছা আর কিছু নিয়ম আছে ঠাকুমা?

ঠা। তিন দিন হবিষ্য করতে হয়, হাতে, সরায় কি কলাপাতে খেতে হয়, আর মাটীতে কি কুশ পেতে শুতে হয়।

লী। তা শীত কালে কুশ পেতে শুখু গায়ে কি মানুষে শুতে পারে।

ঠা। পাগল আর কি! শাস্ত্র কারেরা দিগদর্শন মাত্র করিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝে অবস্থা মত ব্যবস্থা করতে হয়। এই সময়ে জীলোকের শরীরেব একটা পরি-বর্তন ঘটে, ডিম্বাধার (ovary) আর জরায়ুতে (uterus) একটা কার্য্য প্রবাহ চলে। এসময়ে শরীর বা মনের কোন রকম উদ্বেগ হলে সেই কার্য্যে বাধা বা বিপর্য্যয় ঘটে থাকে। সেই জন্তে এই সময় কোন রকম স্নহ হুখ ভোগ না করে প্রশান্ত ভাবে থাকতে হয়। শীতকালে মাটীতে কি কুশ না শুয়ে একটা কি কব্বলের উপর একটা কব্বল গায়ে দিয়ে শুলেই চলে।

লী। আচ্ছা আর কি কারণ আছে বল?

ঠা। আর একটা কারণ অসংযম। আজ কাল মেয়ে পুরুষ দুই অসংযত হয়ে পড়েছে। অমাবস্তা পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র কিছুই বিচার করে না। তার পর সর্ব্বদা জী পুরুষে এক জায়গায় থাকাটাও ভাল নয়।

লী। আরও কিছু কারণ আছে নাকি।

ঠা। খুঁজলে অনেক মেলে তবে মোটা-মুটি এই। তবে আর একটা কারণের কথা বলা হাইতে পারে। পূর্বে বাপ মা যারে হাতে দিত সে কাপা খোঁড়া নিগুণ যেমনই হক জীলোকে তাকে দেবতার মত ভক্তি করত। এখন নভেল পড়ে সকলে যুখে না বললেও স্বামীকে বেশ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারে না। এর সঙ্গে এই সব অসুখের কিছু সম্বন্ধ আছে বোধ হয়।

লী। আচ্ছা এখন ছোট ঠাকুরঝির কি হবে বল?

ঠা। কি হয়েছে বল।

লী। কেন বললাম ত বাধক



ঠা। বাধক বলয়ে কি কিছু বোঝা যায়, না বাধক একটা রোগের নাম।

লী। সে কি ঠাকুমা বাধক রোগের নাম নয়।

ঠা। লোকনাথ যদি বলতেন যে এদানীর করিয়ারে বাধক রোগের নাম দিয়েছে বটে, কিন্তু স্ত্রীরোগ হয়ে সম্ভাব্য জন্মাতো বাধা ঘটলে তাকে বাধক বলে। সরমা তোমার কি হয় বলত।

স। (লীলার প্রতি চুপে চুপে) আমি বলতে পারব না বৌ তুমি বল।

লী। আমি বলছি শোন ঠাকুমা। ওর ঠিক মাসে মাসে হয় না একটু দেরী করে হয়, দৈবাৎ ঠিক একমাস পরে হয়। দৈবাৎ পরিকার লাল রক্তের হয় নৈলে প্রায়ই কালচে হুর্গন্ধ, হু একটা ডেলার মত ও দেখা যায়, আর সন্তানের চেয়ে প্রায়ই কম হয়। সকল বার যন্ত্রণা হয়, কিন্তু কোন কোন বার বড় যন্ত্রণা হয়। যতক্ষণ রক্তটা না ভাঙ্গে ততক্ষণ যন্ত্রণা থাকে ভেঙ্গে গেলে যন্ত্রণা কমে যায়।

ঠা। এদিকে খিদে, ঘুম, বাচ্ছে প্রস্রাব কেমন হয়?

লী। তা প্রায় স্বাভাবিক তবে বাচ্ছে বেশ পরিকার হয় না, ২১ মাস অন্তর এক দিন ২৪ বার পাতলা দান্ত।

ঠা। বয়স কত হয়েছে?

লী। এই আঠার বছরে পড়েছে।

ঠা। এর মধ্যে পোয়াতি টোয়াতি হয় নি?

লী। না, যখন চৌদ্দবছর বয়স তখন থেকে এই রোগে ভুগছে।

স। (লীলার প্রতি চুপে চুপে) এদানী ২১ বার জলের মত ভেঙ্গেছে।

লী। কিছুদিন হল ২১ বার জলের মত শাদা শাদা ভেঙ্গেছে ঠাকুমা।

ঠা। হাঁ এই থেকে ক্রমে শ্বেত প্রদরে দাঁড়ায়।

লী। তা যাতে না দাঁড়ায় তাই কর। বলি ভাল হবেত ঠাকুমা?

ঠা। ভাল হতে পারে। কিন্তু চিকিৎসা করান বড় কঠিন।

লী। তা যত কঠিনই হক আর যত খরচ পত্র হক তা করতেই হবে, তুমি ভাল করে দাও।

ঠা। খরচ পত্র বড় বেশী কিছু হবে না। স্থানিয়মে থাকাই কঠিন।

লী। তা সে যেমন কঠিনই হক, কি করতে হবে তুমি বল।

ঠা। প্রথম কথা এই যে যতদিন অমুখ ভাল না হয় ততদিন স্বামী-স্ত্রীতে পৃথক ভাবে থাকতে হবে।

লী। সে কত দিন।

ঠা। তা প্রায় এক বৎসর।

লী। সে কি এত দিন।

ঠা। হাঁ এত দিন বরং বেশী। দেখ একটা যান্ত্রিক রোগ হলে ভাল হওয়াইত শক্ত, তার পর যদি ভাল হয় তবে বেশী দিনে। এই সব রোগে অনেকে এই নিয়ম গালন করতে পারে না বলে প্রায়ই রোগ ভাল হয় না সন্তানের সাধী হয়।

লী। তা এত দিন স্বামী-স্ত্রীতে আলাদা থাকতে হবে।

ঠা। তা হবে বৈকি। দেখ শরীর অমুখ হলে যেমন তার বিশ্রাম দরকার, নইলে কি রোগ সারে।

লী। তা এর চেয়ে কম দিন থাকলে হবে না, ওষুদ না হয় থাকবে।

ঠা। তাতে কাজ হবে না। কতকটা ভাল হয়ে আবার রোগ প্রবল হবে।

লী। (চুপে চুপে সরমার প্রতি) কেমন লা পারবি?

স। (চুপে চুপে) তা-সে তা-না হয় তা আমি কি করে বলবো, সে তোমার ঠাকুর জামায়ের হাত।

লী। তাই চেষ্টা করতে হবে ঠাকুমা এখন এর পথি আর ওষুদ কি বল।

ঠা। পথির বিশেষ ধরা কাটা করতে হবে না, তবে মাছ, কুণ্ডলি কলায়, মাষ কলায়, তিল, দই, মাংস, কাঁজি এই সব জিনিষ বেশী করে থাকবে।

লী। আর যেমন নাওয়া পাওয়া করে, সব সেই রকম করবে।

ঠা। হাঁ তাই করবে, তবে ছোটো কথা মনে রাখতে হবে যাতে মনে কোন রকম উত্তেজনা না হয় এরকম ভাবে থাকতে হবে। জ্বালা নেভল না পড়ে, রামায়ণ, মহাভারত পড়বে। থিয়েটার কি ঐ রকমের নাচ তামাসা দেখা বন্ধ করতে হবে। স্বামীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল।

লী। তা হলে একেবারে সন্ন্যাসিনী হতে হবে বল।

ঠা। সেই রকমই বটে। রোগ হয় নিজের পাশে, তার প্রায়শ্চিত্ত চাইত। বাস্তবিকই এসব রোগ হলে যদি ঠাকুর দেবতা সেবা করে আর পূজা করে দিন কাটায় তা হলে রোগ ভাল হয়ে যায়।

লী। আর একটা কথা কি?

ঠা। আর এটা কথা এই যে তলপেটে

যেন কোন রকম আঘাত কি চাড়া না লাগে। ভারি জিনিষ তোলা, বেশী সিঁড়ি ভাঙ্গা এসব করা হবে না।

লী। আচ্ছা এসব ব্যবস্থাত হল এখন ওষুদের কথা কি বল?

ঠা। ওলট কষলের ছাল কাঁচা যোগাড় করতে হবে। সেই কাঁচা ছাল ১০ তোলা আর মরিচ দু আনা এক সঙ্গে বেটে সকালে একবার করে থাকবে।

লী। রোজ যদি কাঁচা ছাল না পাওয়া যায় শুকনো নিলে হবে না?

ঠা। কাঁচা ছাল তাই বেশী উপকারী। শুকনো ছাল কি আরকে কাঁচা ছালের মত কাজ করে না তবে মধ্যে মধ্যে যদি না পাওয়া যায় তা হলে শুকনো ছালই এক সিকি বেটে থাকবে। ছাল শুকনো হলেও যেন বেশীদিনের না হয়।

লী। না একেবারে একটানা খাবার দরকার সাত দিন খেয়ে ছুচার দিন বন্ধ দেওয়া ভাল। তবে জী-ধর্ম হবার আগে তিন দিন ওষুদ পড়া চাই। জী-ধর্মের তিন দিন ওষুদ খাওয়া চাই।

লী। এর কি আর কোন ভাল ওষুদ নেই ঠাকুমা?

ঠা। এইটেই খুব ভাল ওষুদ। তবে আরও দুই একটা বলি শিখে রাখ। জ্বালাল কাঁজির সঙ্গে বেটে খেলে উপকার হয়। লতা কটুকীর পাত ঘিয়ে ভেজে খেলে উপকার হয়। আর একটা পাচন বলি শোন। আক-নাড়ি, শুঠ, পিপুল মরিচ ও কুড়চি (জীবক) ছাল প্রত্যেকটা সাড়ে ছয় আনা ওজনে নিয়ে খেতে করে আমলের জলে নুতন হাঁড়িতে কাঠের মন্দ মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করবি। বধন

আধপোয়া আলাজ্জ জল থাকবে তখন নামিয়ে  
ছেঁকে ঠাণ্ডা হলে খাওয়াবি ।

লী। পাচন কি রোজ তৈয়ের করে  
খেতে হবে ?

ঠা। হাঁ, রোজ তৈয়ের করতে হবে  
বৈকি। তবে এক লাগাড়ে ওষুধ খেয়ে কাজ  
নেই, সাত দিন খেয়ে ছুদিন বন্ধ দেওয়া ভাল।  
আব জ্বী-ধর্মের সময় কোন ওষুদই খেতে নেই।

লী। জবাকুল আর লতাকটকীর পাতা  
কতটা করে খেতে হয়।

ঠা। জবাকুল আধ তোলা থেকে এক  
তোলা আর লতাকটকীর পাতা এক তোলা  
থেকে দু তোলা পর্য্যন্ত।

লী। তা মাত্রা কম বেশী কি হিসাবে  
করতে হয় ?

ঠা। সকলের শরীর, রোগও সমান নয়,  
কাজেই একরকম মাত্রা সকলের পক্ষে ঠিক  
হয় না, তবে প্রথম থেকে কম মাত্রার আরম্ভ  
করাই ভাল। তার পর সে মাত্রা যদি বেশ  
সহ্য হয় তা হলে ২৩ দিন পরে এক আনা  
বাড়িয়ে দিলে আবার ২৩ দিন পরে এক  
আনা বাড়িয়ে দিলে। এমন করে ক্রমে  
বাড়াতে হয়।

লী। তা মাত্রা বেশী হলে কি করে  
বোঝা যাবে ?

ঠা। তা হলে খিদে কম হবে, সমস্ত দিন  
ওষুদের ঢেকুর উঠবে, আর হয় বমি ভাব, নয়  
শরীরের গ্রাসি একটা না একটা উপসর্গ দেখা  
দেবে। এই রকম হলেই মাত্রা বেশী হয়েছে  
বুঝতে হবে আর মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে।

(মনোরমার প্রবেশ)

লী। একি মন্থ বে! তোরা পশ্চিম থেকে  
কবে এলি।

ঠা। কে মন্থ এয়েছিস আয় দিদি বেশ।  
সকলে ভাল আছে ত ?

ম। (ঠাকুমা ও লীলাকে প্রণাম করিয়া)  
পশ্চিম থেকে আজ চার দিন এয়েছি দিদি।  
আর সকলে ভাল আছে, কিন্তু আমি ভাল  
নই।

ঠা। কেন কি হয়েছে তোর ? তাইত  
বড় রোগা আর ফেকাশে হয়ে গেছিস যে।

ম। রোগে ভুগে শরীর একেবারে  
খারাপ হয়ে গেছে ঠাকুমা। আর তার ব্যব-  
স্থার জন্মেই তোমার কাছে এসেছি। এখন  
আগে তোমাদের আর লীলা দিদির খবর বল।

ঠা। ভগবানের আশীর্বাদে এবাড়ীর  
সকলে ভাল আছে। লীলার বাড়ীর ও  
খবর ভাল। তবে সংসারে পাঁচটা থাকলে  
একটা না একটা রোগে ভোগে।

ম। তোমার সঙ্গে ইনি কে বড়দি ?

লী। চিনিমনে ? এ আমার ছোট ননদ  
সরমা। আয় তাদের আলাপ করে দি।  
এ আমার পিশতুতো বোন মনোরমা, বুঝলে  
ঠাকুরঝি।

স। (মনোরমার প্রতি) আপনি আমার  
বড় আমি দিদি বলে ডাকবো।

ম। তা ডেকো কিন্তু আপনিটে বাধ  
দিয়ে আর তুমি যখন দিদির ঠাকুর ঝি তখন  
আমি ঠাকুর ঝি বলে ডাকবো। আর হুজনে  
এসে ঠাকুমার সঙ্গে কি সলা পরামর্শ হচ্ছে  
বল দেখি।

লী। ঠাকুর জামাই হড়কো হয়েছে তাই  
বশ করবার মন্তর শিখতে এয়েছ।

স। না দিদি না। তুমি বোয়ের কথা  
শুনো না।

ম। তবে ব্যাপার কি ?

লী। সত্যি কথা বলবো, দিদিরও যে দশা বোনেরও সেই দশা।

ম। কেন ঠাকুরঝি কি হয়েছে?

লী। ওর বাধক হয়েছে, সেই ব্যবস্থা ঠাকুরঝি কাছে এতক্ষণ নেওয়া হচ্ছিল। তুমিও যখন চুপি চুপি ঠাকুরঝি কাছে এসেছ তখন তোমারও এ রকম একটা কিছু বলে মনে হচ্ছে।

ম। হাঁ দিদি আমি প্রদরের ব্যোমারামে বড় ভুগছি। ডাক্তারী হোমিওপ্যাথি ওষুদ অনেক খেয়েছি কিন্তু কিছুতে কিছু হয় নি।

লী। তা বেশ হয়েছে, ঠাকুরঝি কাছে ব্যবস্থা নাও, এই সুযোগে আমারও ঐ রোগের চিকিৎসাটা শেখা হয়ে থাক।

ম। তুমি বুঝি ঠাকুরঝি বিচ্ছেদে সেরে নেবার চেষ্টায় আছ।

ঠা। ওঃ লীলা আমার একজন সঙ্গীর পোড়ো। তার তোর অন্তরের কথা আগাগোড়া বল।

ম। এ রোগের সূত্রপাত আমার অনেক দিন থেকে হয়েছে তখন আমার ১৪।১৫ বৎসর বয়স। কিন্তু তখন রোগ তত প্রবল হয় নি বলেও বটে আর লজ্জারও বটে কাউকে কিছু বলিনি।

ঠা। এইগুলো মেয়েদের একটা মস্ত ভুল অন্তরের কথা কখনও গোপন করতে নেই, আর যত সামান্য রোগই হক, কখন অবহেলা করতে নেই। ঘরে আগুণ লাগবা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে না নিবিয়ে দিলে যেমন শেষে আর নেবার উপায় থাকে না, রোগও তেমনি গোড়ায় চিকিৎসা না করলে শেষে ভাল হবার উপায় থাকে না।

ম। তা বউ মানুষ এসব রোগের কথা কি করে গুরুজনদের কাছে বলা যায়।

ঠা। হ, রোগের সৃষ্টি করতে তোমরা বেশ পার কিন্তু রোগের কথা বলতেই যত লজ্জা। আরে গুরু জনদের নাই বললি, লঘুজন স্বামীকেও বলতে পারিস।

লী। কিন্তু তুমি ঠাকুরা নিজে আমাদের দিকে নজর রেখেছিলে।

ঠা। সংসারে পাকা গিন্নি থাকলে তাইত করা উচিত। ছেলেবয়সে লজ্জাও করে বটে আর কোন রকম দোষ ঘটলে তারা বুঝতেও পারে না যে ভবিষ্যতে এক পরিণাম এত ভয়ানক হবে।

মা। ঠিক বলেছ ঠাকুরা, এমন হবে তা যদি তখন বুঝতে পারতাম তা হলে আমি নিশ্চয়ই সে সময়ে বলতাম।

ঠা। এই জন্মে গিন্নি বাম্বির বোঝির উপর এবং স্বামীর জীর ওপর নজর রাখা দরকার। আর এগুলোর সূত্রপাত প্রায় বার বছর থেকে বোল বছরের মধ্যেই হয়। তা বাক এখন তোর রোগের কথা বল।

ম। আগেই বলিছি যে প্রথম থেকেই একটু বেশী রক্ত ভাঙ্গত তার পর বোল বছরের সময় বড় খুঁকী হয়। বড় খুঁকী হবার পর এক বৎসর এক রকম ভালই ছিলাম। তার পর আবার আরম্ভ হল। আবার এক বছর পরে ছোট খুঁকী পেটে আসে। সেবার অন্তঃসত্তা অবস্থায়ও একটু আধটু রক্ত ভাঙতে লাগল। কান্নাই ডাক্তার দেখান হল। ডাক্তার দেখিয়ে সে ব্যতায় এক রকম ভাল হলাম। কিন্তু খালাস হবার ছমাস পরেই আবার রোগ দেখা দিল।

ঠা। রোগ কি একভাবে ছিল না ক্রমশঃ বাড়তে লাগল?

ম। ক্রমশঃ বাড়তে লাগল বৈকি। এই সময় ডাক্তারী চিকিৎসা হয়েছিল তাতে একটু ভাল ছিলাম, কিন্তু দিন কতক ওষুদ বন্ধ করবার পরে যে কে সেই। আবার ওষুদ খাই একটু ভাল থাকি। এমনি করে ছবৎসর 'ভালয়' মন্ডয় কাটল তার পর বড় খোকা পেটে হল। বড় খোকা যখন পেটে তখনও একটু একটু রক্ত ভাস্কত। আবার ডাক্তারী ওষুদ খেয়ে বন্দ করতে হল। বড় খোকা হবার পর ছমাস যেতেই আবার অসুখ দেখা দিলে তখন প্রথমে ডাক্তারী, তার পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হল, তার পর একজন হিন্দুস্থানী কবিরাজকেও দেখান হল। ওষুদ খেলে একটু আধটু ভাল থাকতাম, কিন্তু রোগ একেবারে গেল না। তার পর ছোট খোকা হল। ছোট খোকা হবার চার মাস পরে থেকে আজ এক বৎসর অসুখে ভুগছি।

ঠা। এখনকার অবস্থা কিরকম বল দেখি ?

লী। এখন এক মাসের চেয়েও শীর্ণগীর হয়, কখন বা মাসে দুবার হয়। রক্ত খুব বেশী ভাঙে। এতে শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। মাথা ঘোরা, বুক ধড় ফড় করা, গা বেদনা, এই সব উপসর্গ জুটেছে। ভাল খিদে হয় না ঘুমও ভাল হয় না।

ঠা। ভয় নেই ভাল হয়ে যাবি। এখন থেকে সুপথ্যে থাকলে আর ওষুদ খেলে শীঘ্র ভাল হয়ে যাবি। তবে আর অত্যাচার না হয়।

ম। আমিও আর কচি খুকি নই, বড়ো মাগী কি আর অত্যাচার করবো ?

ঠা। আমি যে অত্যাচারের কথা বলছি তা কচি খুকিরা করে না তোমার মত বড়ো

মাগীরাই করে থাকে। মোট কথা বাতে আর ছেলে পিলে না হয় সেটা করতে হবে।

ম। সে পরামর্শ আগেই হয়ে আছে ঠাকুমা। এখন ২১ বৎসর আমি এখানে থাকবো আর তোমার নাতজামাই পশ্চিমে থাকবে।

স। তা মাঝে মাঝে আসবেন ত ?

ম। সেও আলাদা ঘরে শোবার বন্দোবস্ত।

ঠা। ভাল বন্দোবস্ত করেছে। তা এ মতলব হল কার ?

ম। তাঁর কে একজন ডাক্তার বন্ধু আছেন সেখানে তার পরামর্শে।

ঠা। তা ডাক্তার ভাল পরামর্শই দিয়েছে। এব ওপর আর ছেলে পিলে হলে আর তোকে বাঁচান যেত না। আজ আমাদের দেশে এইটে বড় বাড়াবাড়ি। অন্ন বরসে অনেক গুলি ছেলে পিলে হয়ে শরীর খোলা হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামী, স্ত্রী, বাপ মা, স্বস্তর শান্ত্তী কাকুর চৈতন্ত নেই। শেষে শেষে পোয়াতি হয় কতকগুলি কচি কাঁচা রেখে মারা যায়, নয়ত একেবারে রুগ ও অকর্মণ্য হয়ে কিছুদিন বেঁচে থাকে।

লী। থাক্ সে কথা, তুমি এখন মম্বর ব্যবস্থা কর ঠাকুমা।

ঠা। শোন বলি মম্বর তোর শরীর এখন যে রকম হয়েছে তাতে কিছু দিন তোর পরিশ্রম না করে একেবারে স্তরে থাকা দরকার।

ম। তা কি করে হবে ঠাকুমা, ছেলে মেরে গুলোকে এক একবার দেখতে হবে ত।

(ক্রমশঃ)

## চরকোক্ত ষড়ুপায় বিধি।

অগ্নিদীপ্তি, আহারেতে অভিলাষ হয়,  
দেহের লঘুতা জন্মে, রুচির উদয় ॥  
আহার্য্য অভাবে অগ্নি দোষ নাশ করে,  
জরুত ও জ্বর নাশে, বাসনা আহারে ;  
সামদোষ, আমাশয়ে অগ্নিমান্দ্য করি,  
শ্রোতরোধে, জরে তেঁই লজ্বন আচরি ।  
ত্রিরাত্র, কি এক রাত্র, কিসা রাত্রদিবা,  
দোষ, বলাবল ক্রমে লজ্বন করিবা ॥

সম্যকৃ কৃত লজ্বনের ফল ।

দেহ লঘু, মল মুত্র-বায়ু নিঃসরণ,  
উদগার, হৃদয় কণ্ঠ-মুখ বিশোধন ;  
তজ্জা, ক্রান্তি দূর আর রুচি, বর্ধ হয়,  
সম্যকৃ তে ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রসন্ন হৃদয় ॥

অলজ্বনের দোষ ।

কফ, বমি, বিবমিষা, সর্দা নিষ্টীবণে ।  
অশুদ্ধ হৃদয় কণ্ঠ তজ্জা অলজ্বনে ॥

অতিরিক্ত লজ্বনে দোষ ।

অতিরিক্ত উপবাসে সন্ধিভয়প্রায়,  
শরীর বেদনা, কাস, মুখশোষ তায় ।  
ক্ষুধা-রুচি হীন, তৃষ্ণা, দেখা শুনা হ্রাস,  
ভ্রান্তি, উর্দ্ধবাত, মোহ, কায় অগ্নি নাশ ;  
মানি বোধ, বলহ্রাস, উপদ্রব হয় ।

আরোগ্যের জন্ত বল প্রধান আশ্রয় ।

বাত বৃদ্ধি, মুখশোষ, ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর,  
গর্ভিণী, বালক, বৃদ্ধ, ভ্রান্ত ভয়াতুর,  
হ্রস্বল, পথিক, শ্রান্ত, কাম ক্রোধাধিত,  
ক্ষয়, শোষ, চিরজ্বরে, লজ্বন অহিত ।

সামবাতে আমশাক নিমিত্ত লজ্বন ।

কফ জ্বর বিধি ক্রমে তদন্তে বারণ ॥  
কফ পিত্ত দ্রব হেতু সহিবে লজ্বন ।

আমশাক হ'লে বায়ু না সহে কখন ॥

বৃংহণ বিধি ।

পশু, পক্ষী, মৎস্য যদি নহে রোগাধিত,  
বিষাক্ত, বাণাদি দ্বারা অথবা পীড়িত ;  
প্রকৃতির অন্তর্কূল আহার, বিহার ।  
বয়স্থা হইলে, মাংস বৃংহণ তাহার ॥  
ক্ষীণ, ক্ষত, বৃদ্ধ, কৃশা, হ্রস্বল যোজন,  
নিত্য করে যেই ব্যক্তি পথ পর্য্যটন ;  
প্রতিদিন মত্তপান নারী সেবা হয় ।  
গ্রীষ্মকালে বৃংহণীয় তাহার নিশ্চয় ॥  
যেই ব্যক্তি শোষ, অর্শ, গ্রহণী পীড়িত,  
তারপক্ষে মাংস ভোজী পশুমাংসহিত ;  
ম্নান, নিদ্রা, চিনি, দ্রব, স্নাত, উৎসাদন ।  
হুমধুব স্নেহবস্তি সবার বৃংহণ ॥

রুক্ষণ-বিধি ।

কটু, তিক্ত, কষায়াদি দ্রব্য নিসেবন,  
দ্রীসদ্র ; সর্ষপ-তিল-খইল ভক্ষণ ;  
তক্র, মধুপানে হয় রুক্ষতা সাধিত ।  
কহিব রুক্ষণ কার্য্য যে যে রোগে হিত ॥  
যেই সব রোগে পুয়ঃ, রক্তাদি ক্ষরণ,  
বায়ু, পিত্ত আদি দোষ বৃদ্ধি বিলক্ষণ ;  
উরুস্তম্ভ, মর্দঙ্গত রোগ সমুদয় ॥  
রুক্ষণ কার্য্যেতে হিত হইবে নিশ্চয় ॥

স্তম্ভন-বিধি ।

দ্রব, তম্ব, সর, বাছ, তিক্ত ও শীতল,  
কষায় দ্রব্যাদি হয় স্তম্ভন সকল ।  
পিত্ত ক্ষার অগ্নিদ্বারা দগ্ধ যেই জন,  
বমি, অতিসার আর বিষাক্ত যে জন ;  
ষেদ অভিযোগ হেতু পীড়িত বাহারি,  
রক্তপিত্ত রোগাদিতে স্তম্ভনীয় তারি ।  
স্তম্ভনীয় যে যে রোগ হইল কথিত ।  
স্তম্ভন ক্রিয়ায় তাহা হ'বে প্রশসিত ॥

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

১ম বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৩—ফাল্গুন ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

## শিশুর তড়কা চিকিৎসা ।

ঠাকুরমা ও বড় বো ।

বড় বো । ঠাকুরগত এখানে নেই, ঠাকুরমা, এদিকে অশ্বতী এসে পড়েছে । তা এ সময় কি খাবার দাবার যোগাড় করতে হবে—ব'লে দাও । একটু ক্রটি হলে তোমার নাতি আমার বনবাসে দেবে ।

ঠা । সে সত্য ত্রেতা যুগের চোলে গেছে বড়, তোর ভয় নেই । এটা কলি, বনবাসে দেবার যুগ নয়—‘দেহি পদপল্লবযুগ্মদারমে’র যুগ ।

ব । না ঠাকুরমা, অস্ত্র বাড়ীতে যা হয় হোক, কিন্তু এ বাড়ীতে কলি বোধ হয় এখনও ঢুকতে পারেনি । যে বাড়ীতে নিত্য দেবসেবা অতিথি সেবা হয়, ঞ্জুক ভিক্ষে না পেয়ে ক্ষেপে না, ছেলেপিলে বউষি, গুরুজন আর দেবতা বামুনের ভক্তি শ্রদ্ধা, বাপমাকে ছবেলা প্রণাম ক'রে সদাচারে থাকে, যে বাড়ীতে, অথাত্ত কুখ্যাত্ত প্রবেশ করতে পারে না, একজন আর একজনের হিংসে করেনা, সেখানে বোধ হয় কলির প্রবেশের অধিকার নেই ।

ঠা । কথাটা বড় মিথ্যে বলিসনি বউ ।

ব । শুধু মিথ্যে বলিনি তা নয় ঠাকুরমা, সম্পূর্ণ সত্যি বলিছি । কলির প্রাচীর্ভাব হ'লে লোকে অন্নায়ু হয়, অধার্মিক হয়, রোগ ও অকালমৃত্যু ঘটে, পুরুষে স্ত্রীর অমুরক্ত হ'য়ে গুরুজনদের তাচ্ছল্য করে, স্ত্রীলোকে কলহ-প্রিয় হয়,—স্বামী ও গুরুজনদের ভয় ভক্তি করে না—এই সব হয়ত ঠাকুরমা ।

ঠা । হাঁ, তাই হয় বৈ কি ।

ব । কিন্তু দেখ ঠাকুরমা, এ বাড়ীতে নেহাৎ অন্নদিন আসিনি । যা দেখেছি আর শুনেছি তাতে স্পষ্ট বুঝেছি যে—এ বাড়ীতে সকলে দীর্ঘায়ু, রোগ ও অকালমৃত্যু নেই, অধর্ম প্রবেশ করে না, ছেলেপিলে বৌষি পরস্পর হিংসা, ঘেব বা ঝগড়া করে না, গুরুজনদের ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তবে কেন বলব না যে এ বাড়ীতে কলি প্রবেশ করতে পারে নি ?

ঠা । তোমরা আমার এক একটা

গার চাঁদ। এত চাঁদ যেখানে, সেখানে  
অন্ধকার আসতে পারে ?

ব। সে কথা বলে ভোলালে শুনছিনে  
কমা। আমরা এখন চাঁদ হয়েছি বটে,  
কিন্তু সে কোন্ স্বর্গের আলো পেয়ে —  
গমার। আমরা অমায়ুষ ছিলাম—এখন  
মায়ুষ হয়েছি, সে কার শিক্ষায় ?—তোমার।  
হংস পক্ষ যেমন তপোবনে গেলে হিংসা ভুলে  
গিয়ে শান্ত শিষ্ট নিরীহ হয়, আমরা তেমনি  
তোমার তপস্তার স্থলে এই বাড়ীতে এসে  
শান্ত শিষ্ট হয়েছি।

ঠা। আমার করবার কি সাধি, কর-  
বার কর্ত্তা সেই ভগবান।

ব। তাত বটেই, কিন্তু একটা উপলক্ষ  
চাই। তা তুমিই হলে সেই উপলক্ষ। আমা-  
দের বাড়ীত আগাগোড়া সমান টানে চলছে,  
কিন্তু ঠাকুরবন্দিদের বাড়ীর কি পরিবর্তনই না  
ঘটেছে !

ঠা। হাঁ, ওদের বাড়ীর সকলেই সাহেবী  
খানা ছেড়ে এখন পুরো হিঁদু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ব। আচ্ছা ঠাকুমা, এমন হয় কেন ?  
লোকে যখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে  
যে—প্রকৃত হিঁদুমানী-চালে চললে রোগ,  
শোক, অকাল মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পাওয়া  
যায়, আর স্বস্থ শান্তি আসে, তখন সাহেবী-  
মানা চালে চলে কেন ?

ঠা। কালের ধর্ম বৈ আর কি বলবো ?  
কালের ধর্মে লোকের বিপরীত বুদ্ধি আসে।  
বিপদ হবার সময় হলেই এই রকম ঘটে।  
সোণার হরিণ কখন হয় না, কিন্তু তবু সোণার  
হরিণ দেখে রামচন্দ্র লোভ করেছিলেন।  
বিপদ আসন্ন হলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিও  
লোপ পায়। আমাদের দেশের এখন তাই

ঘটেছে। তবে সাহেবীমানাকে মন্দ বলে  
ভাবা তোমার একটা মন্ত ভুল। সাহেবদের  
পক্ষে সাহেবীমানাই ভাল। বিলেতের মত  
শীতের দেশে পাতলা কাপড় গায়ে দিয়ে,  
আর আলোচাল কাঁচকলা ডাব খেয়ে তারা  
বেশী দিন বাঁচতে পারে না। তাদের গরম  
কাপড়, চা, মদ, মাংসই দরকার। তবে আমা-  
দের দেশের লোক বিলিগী চালে চললে ভাল  
থাকে না। আর বরং পুরো সাহেবী ভাল,  
কিন্তু অনেকেই হু নোকায় পা দেয়, আধা  
সাহেব, আধা হিঁদু।

ব। আচ্ছা ঠাকুমা, সাহেবরা ত এদেশে  
সাহেবী চালে চলে, তবে তাদের শরীর  
খারাপ হয় না কেন ?

ব। খারাপ হয় না কে বলবে ? ওরা  
এই গরম দেশে এসে জ্যাস্তে মরা হয়ে  
থাকে। কিন্তু কি করবে—পেটের দায়। তবে  
মনেক সাহেবই তাজা হবার জন্তে মধ্যে মধ্যে  
বিলেত যায়, আর অমুখ হলেত যায়ই।

( ছোট বোয়ের প্রবেশ )

ছো। কি বড়দি, তুমি এখনও এইখানে  
বসে আছ ?

ব। ঐ দেখ ভাই, ঠাকুমার কাছে এলে  
আর কাজ কর্ত্ত কিছুই মনে থাকে না। হাঁ  
ঠাকুমা, অশ্বত্থের ( অম্বুবাটী ) কি বোগাড়  
করবো বগ ?

ঠা। যা হয় করগে না, আমার খাবার  
দিন জুরিয়ে গেছে।

ব। আমি বলি—যে বেশ করে মরান  
দিয়ে লুচি ভেজে রাখি, কিছু তরকারী আর  
সন্দেশ তৈরির করে রাখি।

ঠা। অশ্বত্থীতে কি পাক করা জিনিষ  
খেতে আছে ?



ব। অষবতীর সময় পাক করবো কেন, আগে তৈয়ের করে রাখবো। অনেকেই ত তাই করে—মেখেছি।

টা। তারা শান্তরকে ফাঁকি দেয়। অষবতীর সময় পাক করা জিনিষই খেতে নাই। কিছু ফল মূল কাঁচা হুখ—এই সব হলেই চলবে।

ব। চিনি, মিছরি কি গুড়—কিছু মিষ্টি চাইনে?

টা। ও সব যে পাক করা জিনিষ। তবে ভাল মধু পাওয়া যায়ত দেখিস্।

(লীলার প্রবেশ)

টা। এই যে লীলা এয়েছি। আয়—বোস্।

লী। বস্বো কি ঠাকুমা, আমি বড় বিপদে পড়ছি।

টা। কেন আবার তোর কি হল?

লী। আমার সেই ছোট মেয়েটার খুব জ্বর, কাশত বার বার হয়েছিল। হাত মুঠো বেঁধে, হাত পা শক্ত করে, চক্ষু কপালে তুলে কেমন কোরতে লাগল।

টা। ও, তড়কা হয়েছিল। তা ভয় নেই, একটু বেশী জ্বর হলেই কচি ছেলে পিলের ও রকম হয়ে থাকে। ও রকম ভাব ভাল হয়ে বাবার পর বেশ চাঙ্গা হয়েছিল ত?

লী। হাঁ, ২১৩ বটা বাদে জ্বর কমে গেলে বেশ খেলা করতে লাগল,—হাসতে লাগল।

টা। তা হলে তাবনা নেই, ভাল হয়ে যাবে।

লী। আমার কিন্তু বালকের ব্যাপার দেখে বড় ভয় হয়েছে ঠাকুমা। যাতে ও রকম আর না হয়, তার উপায় করে দাও। আর হলেই বা কি

টা। জ্বর বেশী হ'লেই ওরকম হয়। কাজেই জ্বর কমাতে না পারলে তড়কা হবার ভয় ঘুচবে না। জ্বর কমানোর কথা পরে বলছি, আগে তড়কা যাতে মা হয় আর হলেই বা কি করা উচিত সে কথা বলি, তা বোস্ না তুই।

লী। তা বস্ছি। আমার আর বসা দাঁড়ান মনে নেই ঠাকুমা, তুমি বল এখন।

টা। একটু বেশী জ্বর হলেই দেখবি, ছেলে মুঠো বাঁধছে কিনা আর চোখ কপালের দিকে তুলেছে কি না। যদি সে রকম করছে দেখতে পাস্ তা হ'লে তখনি একটু অডি কলমে জল মিশিয়ে হুখের মত তাতে নেকড়া ভিজিয়ে কপালে পটা দিবি, পটা যেন শুকিয়ে না যায়—একটু একটু অডিকলম দিয়ে ভিজ়ে রাখবি, আর মাথায় পাখার বাতাস করবি।

লী। তা অডিকলম ও অনেক রকম আছে—যে কোন অডিকলম দিলে চলবে?

টা। এক রকম সফ লম্বা শিশি ক'রে যে অডিকলম বিক্রী হয়, তাকে পাইভারের অডিকলম বলে। সেই গুলো খুব ভালো। তা যদি না পাও—তা হলে অল্প ভাল অডিকলমও দেওয়া যেতে পারে।

লী। আচ্ছা, অডিকলম যদি না পাওয়া যায়?

টা। তা হলে সোরা আর নিশাদল জলে দিলে জল বেশ ঠাণ্ডা হয়। সেই জন্দের পটা দিলে চলে।

লী। নিশাদল কোথায় পাওয়া যায়?

টা। ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়, বেণের লোকানে পাওয়া যায়, আর শেকরাদের কাজে নিশাদল লাগে বলে তাদের কাছেও থাকে।

লী। আর কিছু দেওয়া চলে না?

টা। শাকি কি লাগ চন্দন হবে কপালে

লেপে দিলেও চলে। শুকিয়ে গেলে তুলে ফেলে আবার টাটকা চন্দন লেপে দিতে হয়। ঘাই দাঁও মাথায় কিন্তু পাখার বাতাস দেওয়া চাই।

লী। আর যদি হয় তা হলে কি করতে হবে ?

ঠা। হবার মুখে এ রকম করলে আর তড়কা হতে পায় না। হলেও এ রকম করলে ভাল হয়ে যায়।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, তড়কা কি একবার হয়েই ভাল হয়ে যায় ?

ঠা। তার মানে নেই। যদি আর বেশী জ্বর না হয়, তা হলে একবার হয়েই ভাল হয়ে যেতে পারে। যদি আবার বেশী জ্বর হয়—আবার হতে পারে। একবারকার জ্বরেই বাস বাস হতে পারে, আর এইটেই ধারাপ বেশী।

লী। তা যে সব উপায় বললে, তাতে যদি ভাল না হয়, তা হলে কি করবো ?

ঠা। প্রায়ই এই সব নুপায়ে ভাল হয়ে যায়। তবে যদি কিছুতেই ভাল না হয়ে অনেকক্ষণ থাকে, তা হলে বরণের আঙুটি পুড়িয়ে কপালে ছেঁকা দিতে হয়।

লী। বরণের আঙুটি ভিন্ন আর কিছুতেই হয় না ?

ঠা। হবে না কেন ছেঁকা দেওয়া যখন উদ্দেশ্য তখন একটা চাবির গোল মুখটা বা অস্ত্র কিছু ঐ রকম ছোট জিনিষ গরম করে ছেঁকা দেওয়া যেতে পারে। কচি ছেলের কপালে ছেঁকা দিতে হবে, তাই পাছে কেউ কোন বড় জিনিষ দিয়ে ছেঁকা দেয়, এজ্ঞ বরণের আঙুটি দিয়ে দেবার নিয়ম হয়েছে।

লী। এতেও যদি ভাল না হয় ?

ঠা। এতে ভাল না হ'লে জীবনের আশা কম। তবে আজ কাল আর একটা উপায় হয়েছে, আব সেটা ডাক্তারী কবিরাজী উভয় মত সম্মত চিকিৎসাও বটে। তবে আগে যখন তখন বরফ পাওয়া যেত না বলে দেওয়া হত না। ডাক্তারের একরকম রবারের খলের ভেতর ররফ রেখে মাথার দেয়। তা খলে না পাওয়া গেলে কচু পাতা কি কলা পাতায় বরফ বেখেও মাথায় দেওয়া চলে। এতে জল শোষে না অথচ মাথায় ঠাণ্ডা লাগে।

লী। তা একে কচি ছেলে—তাতে এত ঠাণ্ডা লাগলে অস্থখ বেড়ে যেতে পারে ত ?

ঠা। বেথানে শ্লেয়ার দোষ প্রবল সেই খানে ঠাণ্ডা লাগার ভয় বেশী। কিন্তু শ্লেয়া শরীরে বেশী থাকলে জ্বরের উত্তাপ খুব বেশী হয় না। পৈত্তিক কি বাত পৈত্তিক জ্বরেই গায়ের উত্তাপ খুব বেশী হয়। এতে ঠাণ্ডা লাগলে ক্ষতি হয় না। আর এক কথা—ঠাণ্ডা না লাগালে যখন প্রাণরক্ষা হয় না, তখন সে সময় তাই করেই প্রাণ রক্ষা করা উচিত।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, কবিরাজীতে জ্বরে ঠাণ্ডা করিবার নিয়ম আছে বললে, কিন্তু কোন কবিরাজকে তা করতে দেখিনি।

ঠা। লোকনাথ বদ্বি বনুতেন—দেখ বড় গিন্নি, নূতন পিত্ত জ্বরে ঠাণ্ডা করবার কথা স্পষ্ট লেখা আছে\* কিন্তু টাকাকার অজ্ঞ জায়গায় একটা বচন তুলে দেখিয়েছেন যে—নবজরে ঠাণ্ডা করতে নেই, আর সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে তবে এটা নূতন পিত্তজ্বরে নয়—পুরাতন পিত্তজ্বরে। এমনি করে আমাদের দেশ থেকে এ সব বিষয় গোপন হ'য়ে পড়েছে।

লী । ডাক্তারেরা কি অরে ঠাণ্ডা করে ?

ঠা । হাঁ খুব করে, যেখানে অরের উপর ভয়ঙ্কর হ'য়ে রোগী মারা যাবার উপক্রম হয়, সেখানে ঠাণ্ডা করা ছাড়া আর উপায় নেই । দু' এক রকম ডাক্তারী ওষুধ আছে, যা খাওয়ালে অর কমে যায়, কিন্তু একটু পরে যে কেঁ সেই । তাই এখন অরের তাত খুব বেশী হ'লে ডাক্তারেরা রোগীর সর্বাস্থে আর মাথায় মোটা কাপড় জড়ায়, কেবল মুখটি বাদ রাখে । আর বরফ জল কি খুব ঠাণ্ডা পাতকোর জল দিয়ে সেই কাপড়খানি ভিজিয়ে রাখে । এই রকম ভাবে ১৫২০ মিনিট রেখে অরের তাত কমে গেলে রোগীর সর্বাস্থ বেষণ করে মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখে ।

ঠা । অর কেন হ'ল—বলতে পারিস ?

লী । তাত বলতে পারিনে ঠাকুমা, তবে অব হবার দু দিন পূর্বে আমি নিজে তাকে খাওয়াইনি । আমার ঝিই তাকে খেতে দিত ।

ঠা । তা হলে খাওয়ার দোষেই হয়েছে । কচি ছেলে পিলের প্রায় খাওয়ার দোষেই অর হয় । এ দুদিন বাছে কেন্দন হচ্ছে ?

লী । রোজ ২৩ বার পরিষ্কার বাছে হয়, কিন্তু এ দিন একবার করে সামান্য একটু বাছে করেছে ।

ঠা । পেটটা দেখেছিস্ ?

লী । হাঁ, দেখেছি । পেটটা একটু ফাঁপা আর পেটের ভেতর গড় গড় করে শব্দ হচ্ছে ।

ঠা । তা হলে ঠিক হয়েছে । খাওয়ার দোষেই বটে । খেতে কেমন চায় ?

লী । এখন খেতে বড় চায় না ।

ঠা । তা হ'লে খেতে খুব কম দিস্ । পিপুলের সঙ্গে দুধ সিদ্ধ ক'রে সেই দুধে জল মিশিয়ে সাগু সিদ্ধ ক'রে গরম গরম খাওয়াবি ।

যেন ২ ভাগ দুধ আর এক ভাগ জল থাকে । বার্লি কাপড়ে ছেকে দিস্ । আর মিছরী না দিয়ে মুগ নেবুর রস দিয়ে দিলেই ভাল হয় । পেটটা ভাল হলেই অর সেরে যাবে ।

লী । কতটুকু দুধ দেব ?

ঠা । যখন খিদে নেই বলচিস্ তখন এক পোঁ পাঁচ ছটাকের বেশী দিসনে ।

লী । আর কিছু খেতে দেব না ?

ঠা । কচি মেয়ে আর কি দিবি, একটু বেদানার রস দিস । আর মধ্যে ২৩ ঝিহুক গরম জল দিস ।

লী । ওষুদ কি দেব ?

ঠা । খাঁড়ি হুন বলে এক রকম হুন বেনের দোকানে কিন্তে পাওয়া যায় । সেই হুন গুড়িয়ে এক আনাভর সকালে আর এক আনা ভর বিকালে দিস্ ।

লী । আর কিছু দেব না ?

ঠা । যদি আর দেবার দরকার হয়, তবে শিউলী পাণ কি বেলপাতার রস একবার চা চামচের এক চামচে—এই ৬৬ ফোটা আন্দাজ দিস্ ।

লী । আর কিছু করতে হবে না ?

ঠা । না, আর কিছু করতে হবে না । তবে তোমায় খুব ধরা কাটায় থাকতে হচ্ছে, পুরান চালের ভাত আর মাছের ঝোণ ছাড়া আর কিছু খোয়ো না ।

লী । আমি খুব ধরা কাটায় থাকবো, আমার কিছু বলতে হবে না । দরকার হ'লে আবার আসব । এখন আসি ঠাকুমা, মনটা ছেলেটার ওপর পড়ে রয়েছে ।

ঠা । তা থাকবে বৈকি ভাই, ছেলের অস্থির হলে মার প্রাণ যে কি করে—তা মাই জানে । তার নেই, ভাল হয়ে যাবে ।

( লীলার প্রস্থান )

## বাধক রোগ চিকিৎসা ।

( পূর্বাংশপ্রকাশিত ২২৪ পৃষ্ঠার পর । )

ঠা। ছেলে ময়েদের ভার বহন পারিস্  
ঝি-চাকরের হাতে দিস্ তার পর তোমার  
শান্তী ননদেরাও কতক দেখতে পারবেন,  
নেহাৎ যেটুকু নইনে নয়, ততটুকু করবি।

ম। আচ্ছা, তাই করবো।

ঠা। হা তাই করিস্। ছোট খোকা কি  
মাই খায় ?

ম। মাইয়েতে দুধ বড় নেই, এক আধ-  
বার টানে।

ঠা। তোর গায়ে যে রকম রক্ত নেই,  
তাতে ছেলেকে মাই না দেওয়াই ভাল।  
মাইয়ের দুধও গায়ের রক্ত কিনা, তবে নেহাৎ  
না রাখতে পারিস্ ত এক একবার দিস্।

ম। আচ্ছা—স্নান কি রকম করবো  
ঠাকমা ?

ঠা। এ রোগে অবগাহন-স্নানই ভাল,  
আর রোজ স্নান করাও চলে। কিন্তু একে  
তোর শরীর কাহিল, তাতে পশ্চিমের জল  
ছেড়ে এদেশের জলে নাইতে হবে; কাজেই  
শরীরের অবস্থা বুঝে কলের জল ধরে খানিক  
ক্ষণ রৌদ্রে রেখে তার পর স্নান করবি।  
স্নান ধরার মধ্যে, আর অল্পক্ষণ ধরে করিস্।  
কি জানি ঠাণ্ডা লেগে আবার জ্বর ফর হয়ে  
পড়বে! স্নান করতে ইচ্ছে না হ'লে, শরীর  
মাজ্জা মাজ্জা কি ভার ভার হলে স্নান না  
করাই ভাল।

ম। আচ্ছা, যে রকম বলে, সেই রকম  
করবো। এখন ওবুদ পথিয়ার ব্যবস্থা কি হবে  
বল ?

ঠা। আগে পথিয়ার কথা বলি। বেশ  
খিদে হলে দু বেলাই পুরান চালের ভাত  
খাবি, আর দুবেলা ভাত সহ না হলে এক  
বেলা ভাত আর রাত্রে খেই দুধ কি দুধ বালি  
খাবি।

ম। আমার কিন্তু পশ্চিমে থেকে রাত্রে  
কটা খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে ঠাকমা !

ঠা। তা এদেশে তেমন ময়দা কি আটাও  
পাওয়া যায় না, আর কটা তুমি হজম করতেও  
পারবে বলে বোধ হয় না। খিদে কেমন হয়  
বল দেখি ?

ম। সকালে তবু একটু হয়,—রাত্রে দে না  
হওয়ার মধ্যে।

ঠা। তা হ'লে যদি ইচ্ছে হয়, আর  
সহ হয়, তা হলে ভাত খাবি, নয়ত খেই দুধ কি  
দুধ বালি খাবি। আর নেহাৎ যদি খোঁটানি  
হয়ে থাকিস, তা হ'লে ঘরের কটা, বালির কটা  
কি সূজির কটা খাবি।

ম। তরকারী টরকারী কি খাব ?

ঠা। হা দেখ—যদি খেই দুধ খাস্, তা হলে  
যে রকম বলছি এই রকম করে খেলে আহা  
ওবুদ দুই হবে। এক ছটাক কিসমিস দুধের  
জলে সিদ্ধ করে দেড়গো আধসের থাকতে  
নামাবি। নামিয়ে ছেকে তাইতে বৈয়ের  
গুড়ো তোলা চারেক, একটু চিনি আর একটু  
মধু মিশিয়ে খাবি।

ম। ওর সঙ্গে দুধ খাওয়া যায় না ?

ঠা। যাবে না কেন ? তা হ'লে দুধ দেড়গো  
কি আধ সের—আর বাকী জল দিয়ে দুধের

ক'র তার সঙ্গে কিস্মিস্ সিদ্ধ করে নিবি।  
তবে হুধ দিলে সেটা গরম গরম খেতে হবে,  
আর তার সঙ্গে মধু দেওয়া চলবে না।

লী। কেন ঠাকুমা, গরম জিনিষের সঙ্গে  
কি মধু খেতে নেই ?

ঠা। গরম জিনিষের সঙ্গে -কি গরম করে—  
মধু ত খেতেই নেই ; তা ছাড়া শরীরে গরম  
সেক তাপ দেওয়ার পরেও মধু খেতে নেই।  
গরম জিনিষের সংসর্গে এলে মধু বিষ হয়।

ম। তার পর তরকারীর কথা বল।

ঠা। তরকারীর মধ্যে ন:টশাক, কাঁচড়া  
শাক, মোচা, কচি কাঁচকলা, মান, খোড়,  
পটোল, পাকা দেশী কুমড়া, ডুম্ব, শাউ,  
কাঁচা পেঁপে—এই সব খেতে পার। আলুটা ন  
খাওয়াই ভাল, কিন্তু আলুটা এত চল্টি হয়েছে  
যে—আলু বাদ দিয়ে তরকারী রাগাই হয়  
না, সেই জন্তে একটু আধটু আলু খেতে  
বলতেই হয়।

ম। দালের মধ্যে কি খাওয়া যায় ?

ঠা। দালের মধ্যে মুগ, মসুর, অড়হর ও  
ছোলার দালের যুব। মনে রেখ—দাল নয়  
দালের যুব। দাল এখন হজম হবে না। তবে  
যুব আলাদা করে করতে হবে না, গেরোস্তোর  
যে দাল রাগা হবে, তাই থেকে দাল গুলো  
নিংড়ে ফেলে দিলেই হবে। কিন্তু দালে, শুধু  
দালে নয় তুমি যে তরকারী থাকে তাতে, লক্ষ্য  
কি সরষে বাটা দেওয়া না হয়। গুড়ের বদলে  
চিনি আর সরষের তেলের বদলে ঘি দিয়ে  
রাঁধা উচিত। অল্প হুণ ব্যবহার না করে  
সব্বদ হুণ ব্যবহার করা দরকার।

ম। মাছ মাংস কিছু খাওয়া যায় না ?

ঠা। মাছ এরোগে বড় ভাল নয়, কেবল  
'চিড়ি' আর 'বান মাছ' খাওয়ার নিয়ম আছে।

তবে বাংলা দেশের লোকের মাছ একটা  
প্রধান আহার—তা না হয়, খল্লে, কৈ, কি  
মাগুর মাছের ঝোল খাস, কিন্তু একটা কথা  
বলে রাখি—মাছ হুধ এক বেলায় খাসনে। যে  
বেলায় মাছ খাবি—সে বেলায় হুধ খাবিনে, যে  
বেলায় হুধ খাবি—সে বেলায় মাছ খাবিনে।  
আর খুব কম খাবি, বরং মাছের ঝোলট খাস।

ম। মাংস খাওয়া যায়।

ঠা। শশক, ঘুঘু, হরিণ, পায়রা, ভেড়া  
—এই সকলের মাংস খাওয়ার নিয়ম আছে।  
কিন্তু তুমি এখন মাংস হজম করতে পারবে  
না। তবে শরীর যে রকম তাতে মাংসের  
যুগ ক'রে খেতে পারলে ভাল হয়।

ম। ঘি খেতে পারব ?

ঠা। একটু একটু ঘি খেতে পার। তবে  
এখন কাঁচা ঘি না খেয়ে তরকারীতে দিয়ে কি  
হু একখানা ফুলকো লুচি খেতে পার। তার  
পর কচি তালশাঁস, ডাব নারকেলের শাঁস,  
দাড়িম, পেজুর, কেশুর, পানফল, কিস্মিস্,  
মিছরী, আক—এই সব জিনিষ জল খাবার  
খেতে পার। তবে একটা কথা বলে রাখি—  
তোমার শরীর দুর্বল বলে যেমন কিছু গুটিকর  
জিনিষ খাওয়া দরকার, তেমনি খাবার যাতে  
হজম হয়—সে দিকে লক্ষ্য রাখাও দরকার।  
হজম হলে থৈ খেয়েও বল হয়, আর হজম না  
হলে কালিয়া পোলাও খেয়েও বল হয় না।  
বরং জর, পেটের অসুখ, অঙ্গীর্ণ প্রভৃতি রোগ  
জন্মাবার সম্ভাবনা।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, এ রোগে পথিয়ার  
কথাত বললে, কুপথি কি তা বলনা—শিখে  
রাখি :

ঠা। বলছি শোন। পরিভ্রম, পথচলা,  
রোজ লাগান, শরীর মাড়াচাড়া করা, গাড়ী-

চড়া, বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ এলে বাহ্যে প্রস্রাব না করা—এই সব ভাল নয়। তার পর শুভ্র, কুলথি, বেগুন, তিল, মাষকলায়, সরষে, দৈ, পান, শিম, রসুন, টক জিনিষ, ঝাল জিনিষ, হুণ, ভাঙ্গাপোড়া, ক্ষার জিনিষ পাতকো'র জল—এসব খেতে নেই।

ম। আচ্ছা ঠাকমা, এখন ওষুদের কথা বল।

ঠা। তোমাকে বড় ওষুদ না দিলে হবে না। তবে লীলা শিখবে বলেছি—তাই কতক শুকো ছোট ছোট মুষ্টিযোগ বলছি। রোগের প্রথম অবস্থায় কি সামান্য রোগে এই ওষুদ দিলে কাজ হয়।

(১) কুণের মূল আধতোলা চেলেনী জলের সঙ্গে বেটে তিন দিন খেলে বোগ ভাল হয়।

(২) খেত বেড়েলার মূল আধতোলা দুধে বেটে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে একটু মধু দিয়ে খেলে রক্তপ্রদর ভাল হয়।

(৩) মোচার তেতর যে কলা থাকে—সেই কলা শুকিয়ে গুঁড়িয়ে এক সিকি থেকে আধ তোলা মাত্রায় দুধের সঙ্গে খেলে ভাল হয়।

(৪) ডুমুরের রস আধ তোলা থেকে এক তোলা মাত্রায় মধু মিশিয়ে খেয়ে চিনি আর দুধের সঙ্গে ভাত খেলে রক্তপ্রদর ভাল হয়।

ম। এখন আমাকে কি বড় ওষুদ দেবে বল ?

ঠা। বড় ওষুদ অশোক ছাল। অশোক ছালের মত রক্ত প্রদরের একটা ভাল ওষুদ নেই বললেই হয়।

ম। অশোক ছাল কি করে খেতে হবে ?

ঠা। প্রথমে একটা পাচন ব্যবহার কর। অশোকছাল, বাসকছাল, রক্ত কমলের মূল আর দারুহরিদ্রা প্রত্যেক আধ তোলা হিসাবে ছ তোলা নিয়ে খেঁতো করে আধসের জল দিয়ে সিদ্ধ করবি। তার পর আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ছেকে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে খাবি। এটা ৩৪ দিন ব্যবহার করলে যত প্রবল রক্ত-স্রাবই হ'ক, কমে যায়। কিন্তু এসব রোগে দোষ হয় এই যে—রক্ত একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে রোগীর বড় যন্ত্রণা হয়। আবার যতক্ষণ রক্ত না ভাঙ্গে, ততক্ষণ শরীর সুস্থ হয় না।

লী। রক্ত প্রদর—রোগ মাত্রেই কি এরকম হয় ?

ঠা। না, তা হয় না। নূতন রোগেও হয় না, মাঝামাঝি রোগেও অনেক সময় হয় না, তবে পুরাণ রোগে অনেক সময় এ রকম হতে দেখা যায়।

ম। তা এরকম হলে কি করবো ?

ঠা। ৩৪ দিন ঐ রকম পাচন খাবার পর যদি দেখিস্ যে রক্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে, তা হ'লে পাচন বন্ধ করে দিবি। আর আগে যে মুষ্টিযোগ বলেছি তার কোন মুষ্টিযোগ কি কেবল অশোকছাল দুধের সঙ্গে সিদ্ধ করে খাবি।

ম। অশোকছাল দুধের সঙ্গে কি ক'রে সিদ্ধ করবো ?

ঠা। ছ তোলা অশোক ছাল খেঁতো, ষোল তোলা দুধ আর ৬৪ তোলা জল ক'রে একসঙ্গে সিদ্ধ করবি। জল মরে গেলে, যখন কেবল দুধ ১৬ তোলা থাকবে, তখন নামিয়ে ছেকে নিয়ে খাবি। ফল কথা—এটা যেন মনে থাকে যে—এই ওষুদগুলো রক্তস্রাব বন্ধ করার ওষুদ। কোনটা বেশী রক্ত রোধক, কোনটা

কম। কিন্তু আমাদের এমন ওষুদ এমন মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে যে—রক্তস্রাব যেন একেবারে বন্ধ না হয়, অথচ বেশী স্রাব না হয়। এই মনে কর—অশোক ছাল দু তোলা দিলে যদি রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা হয়, তা হলে অশোক ছাল ২ তোলা না নিয়ে এক তোলা নির্ব।

লী। তাতে জল দুধ কি আগেকার মতন নিতে হবে?

ঠা। না, বলি শোন।—দুধের সঙ্গে ওষুদ পাক ক'রে খাওয়ার কবিরাজীতে 'ক্ষীর পাক' বলে। এব নিয়ম হচ্ছে এই—ওষুদ যতটা হবে, দুধ তার আটগুণ, আর জল দুধের চার-গুণ দিয়ে পাক ক'রে দুধ শেষ থাকতে নামিয়ে নিতে হয়। তা এক তোলা অশোক ছাল নিলে দুধ ৮ তোলা আর জল ৩২ তোলা একত্র পাক ক'রে ৮ তোলা থাকতে নামিয়ে নিতে হবে।

ম। তার পর?

ঠা। তার পর আর কিছু নেই, এতেই অম্লখ সেরে যাবে। রক্তস্রাব বেশী হলেই ঐ পাচনটী ব্যবহার করবি। আর খুব ক'মে গেলে অশোক ছাল দুধের সঙ্গে সিদ্ধ করে কিম্বা একটা মুষ্টি বোগ ব্যবহার করবি। পাচনটী অর্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করলেও চলে।

ম। পাচন অর্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করতে হ'লে কি করে তৈয়ার করবো?

ঠা। তৈয়ার পূরে মাত্রায় করতে হবে। তার পর অর্ধেক খেতে হবে, আর অর্ধেক ফেলে দিতে হবে।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, দারুহরিজাত আনি—এক রকম হলদে কাঠ,—বেনের দোকানে পাওয়া যায়। কিন্তু রক্ত কমলের মূলটী কি?

ঠা। রাস্তা পদ্ম ফুলের গোড়ার কাদার ভেতর যে গেঁড় থাকে, তাকেই রক্তকমলের মূল বলে।

লী। ঠাকুমা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। আচ্ছা—মুষ্টি মানেত কি—আর বোগ মানে লাগান। তা মুষ্টিবোগ দিলে ওষুদ খাইয়ে রোগীকে খুব কিলুতে হয় নাকি?

ম। যদি তা হয় ঠাকুমা, তা হলে তোমার মুষ্টিবোগ আমার পক্ষে মারাত্মক হবে। এ শরীরে বেশী কিল সহাবে না।

ঠা। কিল খাবার এত ডর! কাঁটাল খেতে গেলেই মুখে আঠা লাগে—সেটা আগে ভাবতে হয়। যাক্ তোর ভয় নেই। মুষ্টি মানে মুটো, এক মুটো ওষুদ নেবার নিয়ম ছিল ব'লে মুষ্টিবোগ নাম হয়েছে।

লী। তা তুমিত একমুটো নিতে বলেনা?

ঠা। এখনকার ক্ষীণপ্রাণ লোক কি আর অত বেশী মাত্রা সহ করতে পারে।

ম। আচ্ছা ঠাকুমা, সবত হ'ল। এখন এই মাথা ঘোরু, আর বুক ধড়কড়ানিতে যাতে কমে, তার একটা উপায় কর।

ঠা। একটু শরীরে বল হ'লে ওগুলো আপনি যাবে। তবে এখন মাথার তিলের তেল দিস্—কি একটু বড়বিলু তেল কিনে এনে মালিশ করিস। আর ১ তোলা শালপানি—ক্ষীরপাকের নিয়মে দুধের সঙ্গে পাক ক'রে খাস্, তা হ'লে বুক ধড়কড়ানি কমে যাবে। তবে শরীরে একটু রক্ত না হ'লে একেবারে যাবে না।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি ত বল যে সব রোগেই বায়ু, পিত্ত, ককের দূষণ অবস্থা আলাদা হয়? আচ্ছা এ রোগে কি সে রকম হয় না?

ঠা। হয় বৈকি। তবে শোন বলি—  
বাতিক প্রদরে রক্ত, ফেনা ফেনা, অরুণবর্ণ, অরু  
অরু রক্ত যন্ত্রণার সহিত নির্গত হয়। পৈত্তিক  
প্রদরে পীত নীল কি কৃষ্ণবর্ণ গরম রক্ত খুব  
বেগে নির্গত হয়, আর পিত্তের উপসর্গ হাতপা  
গা জ্বালা থাকে। কফ প্রদরে আটার মত  
পিঙ্গল পাণ্ডুবর্ণ বা মাংস ধোয়া জলের স্রাব  
আব হয়।

লী। তা ওষুধ ত আলাদা আলাদা  
বল নি ?

ঠা। সব রোগে ওষুধ সম্বন্ধে সেটা  
আবশ্যক হয় না। এই মনে কর—থয়ের  
কুষ্ঠ রোগ নষ্ট করে। তা বায়ু, পিত্ত, কফ  
যে দোষই বেশী থাকে না কেন, সকল অবস্থা-  
তেই থয়ের প্রয়োগ করা চলে। এই রোগের  
যে সব ওষুধ বলেছি, সেগুলোও তেমনি সব  
অবস্থায় প্রয়োগ করা চলে।

লী। তা তুমি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ছ  
একটা মুষ্টিযোগ বল,—শিখে রাখি।

ঠা। আচ্ছা তবে বলি শোন। (১)  
সচলবর্ণ, খালজীরে, যষ্টিমধু, নীল সুদী—  
এতোক ভিনিষ এক আনা বেশ করে বেটে  
কি গুঁড়ো করে আধ ছটাক আলাদা দই বা  
এক সিকি ভরি মধুর সঙ্গে খেলে বাতিক  
প্রদর ভাল হয়। (২) বাসক কি গুলকের রস  
২ তোলা, আধ তোলা চিনি আর এক সিকি  
মধু মিশিয়ে খেলে পৈত্তিক প্রদর ভাল হয়।  
(৩) রোহিতক রসনা বা রেডা গাছের মূলের  
কাঁচা ছাল ১ তোলা, কি আমলকীর বীচির  
শাস এক সিকি বেটে, চিনি আর মধু মিশিয়ে  
খেলে ককজ প্রদর ভাল হয়। (৪) কাপাসের  
মূল আধ তোলা চেলুনী জলের সঙ্গে বেটে  
খেলে ভাল হয়।

লী। যাক্, এ বিহেটা এক রকম শেখা  
হল।

ম। (চুপে চুপে লীলার প্রতি) বাধ-  
কের বেদনার সময় বেদনা কমবার কোন  
উপায় আছে কিনা—জিজ্ঞাসা কর না বৌদি ?

লী। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুল  
হয়েছে ঠাকনা, ঠাকুর ঝির যখন বাধকের  
বেদনা ধরে, তখন কি করে সেটা কমান  
যায় ?

ঠা। রক্তটা যতক্ষণ না ভাঙ্গে, ততক্ষণ  
যাতনা হয়; ভেঙ্গে গেলে যাতনা কম হয়।  
তলপেটে সেক দিলে রক্তটা বেরিয়ে যায়।  
তা এক কাজ করিস,—একটা বোতলে গরম  
জল পূরে মুখে বেশ করে ছিপি বন্ধ করে  
তাই দিয়ে তলপেটে নাইয়ের একটু নীচে  
সেক দিস্।

লী। তা এত গরম সহিবে কেন ?

ঠা। না সয়, বোতলের উপর দু এক  
পুরু কি যতটা আবশ্যক কাপড় জড়িয়ে নিস্।

লী। আর কোন উপায়ে তাত দেওয়া  
যায় না ?

ঠা। গমের ভূবির পুলটাস্ দিলেও চলে।  
ভূষ বেশ করে বেটে গরম করে একটা  
নেকড়ার আধখানার মাথিয়ে আর আধখানা  
দিয়ে ঢেকে দিবি। আর সেই পুলটাস্ তল-  
পেটে বসিয়ে দিবি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সেটা  
বদলে আবার নতুন করে দিবি।

ম। আমার আর কিছু বলবার নেই  
ঠাকনা।

ঠা। না আর কিছু বলবার নেই। এই  
রকম করগে যা, তাইতে অল্প ভাল হয়ে  
যাবে। এখন তোরা আমার ছুটি বে।  
আমার পুণ্ডো আলিক করবার সময় হয়েছে।



নী। তবে তুমি এস ঠাকুমা।

(সকলের প্রণাম ও ঠাকুমার প্রস্থান)।

ম। ঠাকুমা আমাদের দেখি ডাক্তার কবিরাজের উপর।

নী। যে উপকার ঠাকুমার দ্বারা পেয়েছি তা আর কি বলবো। ঠাকুমা না থাকলে বোধ হয়—ছেলেপিণ্ডলকে বাঁচাতে পারতাম না। কত লোকের কত কঠিন বেরারাম যে ঠাকুমা 'সামান্য' ওষুদে ভাল করেছেন, তার আর সংখ্যা নেই; এখন যেকদিন বাঁচেন—আমাদেরই লাভ।

ম। তুমিও ত ক্রমশঃ ঠাকুমা হয়ে উঠছ বোদি।

নী। অনেক শিখেছি বটে, কিন্তু অমন পাকা হতে পারি না।

ম। দিদি কি এখন এখানে থাকবে?

নী। না আমার এখন যেতে হবে।

ম। আমিও যাব। কিন্তু বাড়ীর কারো সঙ্গে দেখা হয় নি। একবার সকলের সঙ্গে দেখা করে আসি।

নী। চল, আমরা যাই।

(সকলের প্রস্থান)।

## শিশুর উদরাময় চিকিৎসা।

(মাঘ সংখ্যার :... পৃষ্ঠার পর)

লা। আর ছানার জল?

ঠা। এই আমাশা রক্তামাশা, অতিসার যখন বাড়াবাড়ি হয়, তখন ছানার জল খুব ভাল পথ্য। দুধ কি ঘোল না সইলে কি বেশী না সইলেও একটু একটু ছানার জল দেওয়া ভাল।

নী। সে কি করে করব?

ঠা। দুধ গরম করে তাইতে পাতি কি কাগজি লেবুর রস দিবি। তা হইলেই—ছানা কেটে যাবে। তারপর সেইটে হেঁকে যে নীল জল বেরাবে, সেইটে খাওয়াবি। কিন্তু হাঁকবার সময় যেন ছানাটা টিপিস না। তা হ'লে ছানার কতক অংশ (পাতলা শাদা শাদা রঙ্গের) ছানার জলের সঙ্গে মিশিয়ে যাবে। যখন ঐ সব মেলগে খুব প্রবল—তা কি বড় লোকের কি ছোটছেলে, তখন এই ছানার জল, খুব পাতলা ভাতের মাড় কি রাস্তিতে

লেবুর রস আর মিছরী দিয়ে কাপড়ে হেঁকে পথ্যি দিলে আর বড় ওষুদ দেবার দরকার হয় না। একটু বেদানার রস আর চীনে কেহুরও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেহুর চিবিয়ে ছিবড়ে ফেঁলে দিতে হয়। তবে আগেই বলেছি যে—ছোট ছেলেদের একেবারে দুধ বন্ধ করতে নেই।

নী। আচ্ছা ঠাকুমা, বড় খোকাকে পোরের ভাত কি একবেলা না দুবেলা দেব?

ঠা। যেমন খিদে আর যেমন সর দেখে একবেলা কি দুবেলা দেওয়া যেতে পারে, তবে খুব পেট ভরে খেতে দিসনে, একটু খালি রেখে দিস।

নী। আর ছোট খোকাকে কি দেব?

ঠা। দুধ দেওয়ার কথাত বলিছি। তা ছাড়া বড় খোকার যে পোরের ভাত হবে তাই খুব চটকে চটকে একটু কাঁচকলা চটকানির

সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবি। যদি তা না খায়, তাহ'লে মাড় করে ছধের সঙ্গে খাওয়াবি। আর আগে যে বার্লি বা শটীর পালোর কথা বলছি, তাও দিতে পারিস্। মিহি পুরাণ চাল গুড়িয়ে খুব মিহি করে ছেকে বার্লির মত সিদ্ধ করে দিলেও চলে।

লী। আর কি দেব?

ঠা। আবার কি দিবি? ভোলাবার জন্যে একটু বেদানার রস কি একটু মিষ্টি কমলা লেবুর রস দিতে পারিস। বেশী দিলে পেট কামড়ানি বাড়বে।

লী। দেখ ঠাকুমা, কেউ কেউ বলে যে আমাকেও পেটের অস্থখের রোগীর মত পথ্য করিতে হবে।

ঠা। ছেলে মাই খেলে তাই করিতে হয় বৈকি? খুব কচি ছেলের অস্থখ হলে দেখেছি, কবিরাজে মাকে ওষুদ খাওয়ায় আর সেই ওষুদ মাইয়ের ছধে মিশে ছেলের উপকার করে। তা তুইত আর মাই দিস্না। আর তোর পেটেও একটা রয়েছে। তবে খোঁকা যখন এক আধ-বার টানে তখন একটু ধরা বাঁধায় থাকিস।

লী। আর কি নিয়মে থাকতে হবে বল?

ঠা। আর নিয়ম কিছু নয়। তবে দুধ যেন নষ্ট না হয়, ছধের বাটী, যিহুক যেন পরিষ্কার থাকে, সে দিকে খুব নজর রাখিস। বাটী যিহুকের দোষে, আর খারাপ দুধ খেলে, অনেক সময় ছেলেপিলের অস্থখ হয়; আর ছেলেদের খাওয়ান সম্বন্ধে খুব সূনিয়ম দরকার। অনেক পোয়াতী নিয়ম-মত না থাইয়ে, যখন সময় পায়, তখন খানিক দুধ জোরজবরদস্তী করে গিলিয়ে দেয়। বড় খোকাকে চার ঘণ্টা অন্তর আর ছোট

খোকাকে তিন ঘণ্টা অন্তর খেতে দিবি। এটা হল সাধারণ নিয়ম। তাত খাওয়ার চার ঘণ্টা পরে খেতে দিবি, কিন্তু যদি এক-বার অন্ন একটু বার্লি দিস্, তবে তার তিন ঘণ্টা পরে কিছু দিস্। আর খাওয়াতে হলে প্রধান দেখা উচিত ছেলের থিদে। ছোট ছোট ছেলেরা থিদে থাকলেই খায়, আর থিদে না থাকলেই খেতে চায় না। খেতে না চাইলে জোর ক'রে খাওয়ান উচিত নয়। তা অনেক ছেলে আবার থিদে পেলেও খেতে চায় না, বুকে হাঁটু দিয়ে দুধ খাওয়াতে হয়। তাদের ঐ রকম নিয়মে খাওয়ান উচিত। আবার বড় ছেলে থিদে না থাকলেও খাবার দেখলে “খাব খাব” করে। তাদেরও ঐ রকম নিয়মে খাওয়াতে হয়। আর মলের দিকে লক্ষ্য রেখে, খাবার হজম হচ্ছে কিনা দেখে, খাবার কমাতে বা বাড়াতে হয়।

লী। পথ্যাত হল। এখন ওষুদ কি বল?

ঠা। তিন চার দিন সূনিয়মে পথ্য দিয়ে যদি অস্থখ কমে যায়, তা হলে ওষুদ দেবার দরকার হবে না। নইলে এক কাজ করিস, বটগাছের যে সুরি নামে জানিস্ত?

লী। হাঁ, জানি।

ঠা। সেই সুরির আগা থেকে এক আনা (ছয় রতি) আন্ডাজ নিয়ে চেলুনি তলের সঙ্গে বেটে ছোট খোকাকে আর দু'আনা আন্ডাজ বড় খোকাকে থাইয়ে দিবি। কচি বাবলা পাতা ও ওকড়ার কচি মূলও এই নিয়মে বেটে দিলে উপকার হয়।

লী। চেলুনি জল কি?

ঠা। গোটাকতক আতপ চাল খানিক কণ জলে ভিজিয়ে রেখে, পাথরের ওপর চাল

গুলি জলের সঙ্গে ঘষতে হয়। জলটা একটু শাদা শাদা হলেই চেলুনী জল হল।

লী। এতে যদি ভাল না হয়?

ঠা। এতেই ভাল হবে। যদি না হয়, তাহলে বেণের দোকান থেকে মুত্তো, পিপুল আভইচ আর কাকড়াশুঙ্গী—এই চারটে জিনিষ কিনিয়ে আনবি। জিনিষগুলি পুরান, পোকা লাগা বা পচা না হয়। তারপর ঐ গুলি বেশ পরিকার করে ঝেড়ে বেছে নিয়ে হামানদিস্তেয় গুঁড়ো করবি। তারপর কাপড়ে খুব মিহি করে ছেঁকে নিবি। তারপর চারটে জিনিষের মিহি গুঁড়ো সমান ভাগে একসঙ্গে মিসাবি। সেই গুড়োর রত্নি ছোট থোকাকে আর চার রত্নি বড় থোকাকে মধুতে মিশিয়ে খাওয়াবি।

লী। এত বড় হাঙ্গমা ঠাকমা?

ঠা। মনে করলেই তাই, নইলে কিছুই নয়। চারটে মসলা গুড়ো করা আর কি হাঙ্গমা?

লী। যদি হামানদিস্তে না থাকে?

ঠা। শীল পরিকার করে ধুয়ে তাইতে গুঁড়িয়ে নিবি।

লী। আর একটা সহজ কিছু বল না?

ঠা। সহজ এর চেয়ে আর কি হবে? তবু একটা বলছি শোন—এক তোলা বেল গুঁঠ আর এক তোলা আমগাছের ছাল গেঁতো করে আধসের জলে সিদ্ধ করে আদ পোয়া থাকতে নামাবি। মাটির হাঁড়িতে মন্দ মন্দ কাঠের জালে সিদ্ধ করতে হবে। তার পর ছেকে নিয়ে ঠাণ্ডা হলে, তার এক তোলা কি দেড় তোলা বড় থোকাকে আর আধ তোলা কি পৌনে একতোলা ছোট থোকাকে খাওয়াবি। খাওয়ার আরও

সঙ্গে ১১:০ ফোটা মধু আর এক টিপ গৈয়ের গুঁড়ো মিশিয়ে নিস।

লী। রোজ সিদ্ধ করতে হবে?

ঠা। হ্যাঁ, রোজ সিদ্ধ করতে হবে। আর বাকীটা ফেলে দিবি।

লী। ওষুধ কি একবার করে দেব?

ঠা। হ্যাঁ, সকালে একবার করে দিবি। তবে রোগের বেশী বাড় থাকলে বিকেলেও সকালের মত নিয়মে দেওয়া যায়। আর পাচন হলে, সকালের পাচনটা না ফেলে দিয়ে তাই থেকে বিকেলে দেওয়া চলে।

লী। আচ্ছা, ঠাকমা, এখন এই রকম করেই দেখি। তার পর না হয় আবার শ্রীচরণে হাজির হব।

ঠা। তার আর দরকার হবে না। ওতেই ভাল হয়ে যাবে।

লী। (পদধূলি বইয়া) সেই আলীর্বাদ কর ঠাকমা।

ঠা। আলীর্বাদত নিতাই করি তাই। রাজমাতা হও, রাজরাণী হও।

প্র। ঠাকমা, তোমার শেষের আলীর্বাদটা যে আমার পক্ষে বড় বিপজ্জনক। উনি যদি কোন রাজার রাণী হয়ে বসেন, তাহলে আমার উপায় কি হবে?

ঠা। কেন ভূমিও রাজা হতে পার।

প্র। সেটা এজন্মে সম্ভব বলে মনে হয় না।

ঠা। পুরুষের ভাগ্যের কথা কে বলতে পারে?

লী। ভূমি ঐ কর বসে, আমি চম্লাম।

(প্রস্থান)

প্র। বলি শোননা ওগো, আমার ফেলে রেখেই চলে যে দেখছি? (প্রস্থান)

ঠা। এই ছুটি প্রাণী কে জানে কোন অজ্ঞাত লোকে ছিল, তার পর সংসারে এল। এদের জন্মাতে দেখেছি, হামা দিতে দেখেছি, ছুটো ছুটী করে খেলা করতে দেখেছি। তার পর বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়ে পরস্পর অপরিচিত ছুটি প্রাণী এত আপনাদর হয় গেছে যে—এক দণ্ড পরস্পরকে না দেখলে পৃথিবী শূন্য বোধ করে। অল্প দিন পূর্বে যারা শিশু ছিল, তারা

এখন শিশুর জনকজননী হয়েছে। একদিন আমিও সংসারে এ খেলা খেলেছিলাম, এ অভিনয় করেছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার খেলা ফুরিয়ে এসেছে। কোন অজ্ঞাত লোক-থেকে যে আমার পাঠিয়ে ছিল, সে আবার ফিরে যাবার জন্ত আহ্বান করছে। নারায়ণ! নারায়ণ! মুক্তকর জগদীশ!

(প্রস্থান)

## বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

( মাঘ সংখ্যার ১২২ পৃষ্ঠার পর )

মাস্ত্রাজের “মেডিকেল কৌন্সিল,” সভ্য-গণের নাম তালিকা হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-স্বামী আয়ারের নাম বাণ দিয়া আয়ুর্বেদের ঘোরতর অবমাননা করিয়াছেন। এই অবমানায় “মেডিকেল কৌন্সিলেরই” অজ্ঞতা, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিতা ও নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। যে আয়ুর্বেদ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে সত্তেজে দণ্ডায়মান থাকিয়া যুগযুগান্তর হইতে স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছে, সেই আয়ুর্বেদের বিমল যশোভাতি ইহাতে কিছুমাত্র ম্লান হইবে না। সপারিষদ শ্রীযুক্ত মহামায়া বড়লাট বাহাদুরের সভায় ডাঃ কৃষ্ণস্বামী ঘটতি বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে ভারত-গভর্নমেন্ট কদাপি মাস্ত্রাজ মেডিকেল কৌন্সিলের অধীনত সমর্থন করিবেন না এবং আয়ুর্বেদের হিতার্থে যে ডাঃ কৃষ্ণস্বামী এতদৃশ স্পষ্টবাদিতা সত্যপ্রিয়তা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন, তিনি আমাদের সমাধায় গবর্ণরের নিকট নিশ্চয়ই সুবিচার প্রাপ্ত হইয়া

জয় লাভ করিবেন। আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বলিতেছি যে—মাস্ত্রাজ মেডিকেল কৌন্সিলের এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক, এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ। ‘বম্বে মেডিকেল কৌন্সিল’ ডাক্তার পোপাত প্রভুরাম বৈজ্ঞ, তাঁহার মৃত পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়ের অধ্যাক্ষতা করার জন্ত তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সমগ্ররে তাহারও প্রতিবাদ করিতেছি।

আমার জ্ঞায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতিবাদ যতপি আমাদের উদারচেতা রাজরাজেশ্বর সম্রাটের উক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে উহা বিশেষ বলবান হইবে—সন্দেহ নাই, এই আশায় আমাদের মহামায়া সম্রাট ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতগমনকালে ‘কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের’ প্রদত্ত অভিবাদনের প্রেক্ষাপটে বাহা বলিয়াছিলেন—তাহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

You are to conserve the ancient

learning and simultaneously to push forward Western science.

অনুবাদ :—“প্রাচীন বিজ্ঞানকে রক্ষা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসার সাধন করা আপনাদের কর্তব্য”। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-মতঃসূত্রবাহী ব্যক্তিগণ, ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী এবং ডাক্তার পোপাত প্রভুরাম বৈজ্ঞানিক মতঃসূত্রকে অযোগ্য নির্দেশ করিয়া কি সম্রাটের এই মহৎ বাক্যের অস্তিত্ব করেন নাই? ভারত-সাম্রাজ্য স্বরূপে পরিচাগন করিতে হইলে পরম্পরের সহায়ত্ব ইতি এবং একতা যে তাহার মূলসূত্র,—আমাদের সুবিবেচক সম্রাট তাহা স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞান যদি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া এক যোগে কার্য করে, তাহা হইলে সমধিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব। এক জন দুই এবং অপরে তিন জানিলে যদি উভয়ে মিলিত হয়, তবে উভয়েই পাঁচ জানিতে পারে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে একের সেই দুই এবং অপরের সেই তিনই রহিয়া যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি আমরা পৃথক্ না থাকিয়া একত্র মিলিত হই, যদি পরস্পরের সহায়তায় উচ্চ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হই, যদি প্রতিবাসীদিগকে সহায়ত্বের চক্ষে দেখিতে পারি, যদি এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদবিদ এবং ইউনানীচিকিৎসক,—সকলে মিলিত হইয়া এক মহান উদ্দেশ্যসাধনে যত্নবান পাইতে পারি, তাহা হইলে মানবজাতির রোগ যন্ত্রণা এবং অকাল মৃত্যু বহুল পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদপেক্ষা উচ্চতর এবং মহত্তর উদ্দেশ্য জগতে আর কিছুই নাই, এবং পরস্পরের সহায়ত্বই সেই উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায়। আমাদের সদাশর

সম্রাট সেই সহায়ত্বেরই সূচনা করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের উদ্যমের তাৎক্ষণিক প্রতিফলিত হইয়া আমাদের রাজপ্রতিনিধির নিকট এই উন্নয়ন প্রকার চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে পৃথক্ করিবার নীচ এবং স্বার্থপর চেষ্টার বিরুদ্ধে আবেদন করি।

যে সকল চিকিৎসক দেশীয় ঔষধ ব্যবহার করেন, গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া তাঁহাদিগকে মিউনিসিপালিটির চিকিৎসালয়ে এবং অন্যান্য সাধারণ চিকিৎসাগারে চিকিৎসা-কার্য করিবার অধিকার দিয়া যে উদ্যমের প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্ত ‘বর্ষে গবর্ণমেন্ট’ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্থী।

অবশেষে, ‘বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি’ আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রকে প্রাচীন বিজ্ঞান-শিক্ষা-বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছেন বলিয়া আমরা আহ্লাদের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশা করি—তাঁহার আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা এবং আয়ুর্বেদের আটটি লুপ্ত প্রায় অঙ্গের উন্নতি-মূলক গবেষণার নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে উৎসাহ প্রদান করিবেন। ডাক্তার পি সিরায় হিন্দু রসশাস্ত্রসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশ প্রসাদ সর্কাদিকারী হিন্দু শস্ত্র-চিকিৎসাসম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধের জন্ত, এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীজনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত হিন্দুদিগের শস্ত্রসম্বন্ধীয় পুস্তকের জন্ত আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্থী। চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর পক্ষে আয়ুর্বেদ একটা স্বয়ংগত গবেষণা-মন্দির। প্রাচীন ঋষিদিগের যে সকল অমূল্য আবিষ্কার বহু শতাব্দী ব্যাপী অবহেলার কলে বিস্মৃতিগুণ্ডে বিলীন

হইয়া গিয়াছে, সে শুল্লির যখন পুনরুদ্ধার হইবে, তখন তদ্বারা রোগপীড়িত মানব-জাতির পরম মঙ্গল সাধিত হইবে—সন্দেহ নাই। অপিচ সেই সকলের সাহায্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে এবং আয়ুর্বেদের চিকিৎসকগণও আপনাদের অজ্ঞ-তার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সভা মহোদয়গণ, উপবেশন করিবার

পূর্বে আপনারা আমার বক্তব্য বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্ত বহু ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সর্ব-শক্তিমান্ বিধাতাঃ নিকট প্রার্থনা করি যে—মহত্বদেয়সাধনে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। তাগা হৃদয় হউক।

“সিদ্ধিঃ সাধ্যো সত্যমজ্ঞ”।

( সম্পূর্ণ )

## আয়ুস্তত্ব।

( পূর্বাশ্বয়তি )

বিপরীত হইলে অদীর্ঘ, অসুখকর ও অনিয়ত হয়। যদি দৈব ও পুরুষকার মধ্যম হয় নিয়তি ও সুখ মধ্যম হইয়া থাকে। দৈব ও পুরুষকার হীনবল হইলে আয়ুও হীন হইয়া থাকে। প্রবল পুরুষকার দ্রুতল দৈব কর্মকে পরাভূত করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে প্রবলদৈবও দ্রুতল পুরুষকারকে বাধা দেয়। সাধারণতঃ আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই, একজন প্রতিভাসম্পন্ন, উন্নতমনাঃ, উদযোগী ব্যক্তি বহুচেষ্টায়ও একটি কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন না, অপর ব্যক্তি তাদৃশী শক্তি লাভ না করিয়াও অনায়াসে কার্য উদ্ধার করিতেছে, এ স্থলে বলিতে হইবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি পুরুষকার সম্পন্ন হইয়াও প্রতিকূল দৈববশাৎ বা দ্রুতল দৈববশতঃ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রবল দৈববলে অনায়াসে সে কার্য উদ্ধার করিতেছে। জগতের যাবতীয় কার্যই দৈব পুরুষকার ও কাল সাপেক্ষ, এই তিনটির একত্র সমাবেশ না হইলে কোন কার্যই হয় না।

যেমন কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ, বীজ বপন ইত্যাদি পুরুষকার সাপেক্ষ কর্ম করিয়াছে, তখন দৈব বর্ষণ না করিলে বা বৃষ্টি না হইলে কেবল বীজবপনে তাহার অকুরোদগম হইবে না, আবাব বর্ষণ হইলেও নির্দিষ্ট সময় না হইলে শস্য অকুরিত হইবে না, হইলেও সীমাবদ্ধ কাল না পাইলে উহা ফলপ্রসূ হইবে না। তদ্রূপ পরমাত্মব্যাপার ও জাগতিক সমস্ত কার্যই, দৈব, পুরুষকার এবং কালের অধীন। এরূপ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে পরমাত্মর পরিমাণ বিবাতা কর্তৃক ব্যক্তিভেদ ও অবস্থাভেদ নির্দিষ্ট আছে।

বস্তুতঃ আয়ুর কাল বিধাতৃ-নির্দিষ্ট নহে, কোন মহাকল কর্তৃক দীর্ঘায়ুরূপে পরিণত হয়। এস্থলে মহাকলকর্ম শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে,—কোন ব্যক্তি নানা প্রকার সুপথ্যাদি সেবন করিয়াও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতেছে দেখা যায়, কিন্তু সে অলক্ষিতভাবে এরূপ কোন মহাকলজনক কার্য করিতেছে বাহ্যিক তাহার দীর্ঘজীবিতার কারণ স্বাক্ষর হইতেছে

হয়তো সে তাহা নিজেও লক্ষ্য করে নাই, কিম্বা অপরেও তাহা লক্ষ্য করে নাই । আবার কোন ব্যক্তি হয়তো সহস্র সুপথ্যসেনী হইয়াও অকালে সংসার হইতে বিদায় লইতেছে,—একপাশে বৃষ্টিতে হইবে কোন অলক্ষিত মহাপ্রাণ কৰ্ম্মই একপ অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে । আবার কোন মহাফল কৰ্ম্মই অনিরতায়ুর হেতু হইতেছে, যখন উভয় প্রকারই দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে তখন আয়ুর নিত্য স্বীকার করা যুক্তি-সঙ্গত নহে ।

আমাদের পরমাযু যে অনিয়ত তাহাটি মহাবিদ্যাস্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন ।

“যদি হি নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃসৰ্ব্বঃ জাদায়ুঃস্বামানাং ন মজ্জৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপ-  
হারহোমনিয়ম-প্রায়শ্চিত্তোপবাস-স্বত্যয়নপ্রতি-  
পাতগমনাতাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রযোজ্যোরণ-  
নৌদ্রাস্তচণ্ডচপলগোগজোষ্ট্রখর তুরগমহিষাদয়ঃ  
\* \* \* নসাহসং ন দেশকালচর্যা ন নরেন্দ্র-  
প্রকোপ ইত্যেবমাদয়ো ভাবা নাভাবকরাঃ  
স্বাবায়ুঃ সৰ্ব্বত্র নিয়তকালপ্রমাণত্বাৎ  
“নাভ্যন্তাকালমরণভয়নিবারকানা মকাল  
ভয়মাগচ্ছেৎ প্রাণিনাং ব্যর্থান্চারজ্ঞকথা-  
প্রয়োগবুদ্ধয়ঃ স্তম্ভহর্ষণাং রসায়নাধিকারে :  
নাপীক্সো নিয়তায়ুঃ শত্রুং বজ্রেনাভিহত্যাং,  
নাধিনা বার্ত্তং ভেষজেনোপপাদয়েতাং নৰ্ধনো  
যথেষ্টমায়ুস্তপসা প্রাপ্নুয়ন্ট বিদিতবেদিতব্য  
নহর্ষয়ঃ সমুদ্রেশাঃ সমাক্ পশ্চৈয়ুকপদিশেষ  
যাচরেয়ুর্কী ।

যদি আয়ুর পরিমাণ বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইত, তবে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া কেন মন্ত্র, ঔষধি, মণি, হোম, প্রায়-  
শ্চিত্ত, স্বত্যয়ন, বিনীতাচরণ প্রভৃতি স্বীকার

করা হয় ? যদি আয়ু নিয়তই হইত, তবে উদ্-  
ভ্রান্ত, প্রচণ্ড, চঞ্চল, গো, মহিষ, উষ্ট্র প্রভৃতি  
হৃদমণীয় জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার  
চেষ্ঠা ও প্রবল বায়ু ও ঘূর্ণীবায়ু হইতে নিজকে  
সাবধান করিবার আবশ্যক হইত না, অপিচ  
নগপ্রপাত, গিরিসংকট, দুর্গমস্থান, প্রবল  
জলশ্রোতঃ, প্রমত্ত, নৃশংস, ঈর্ষ্যা ও লোভপরতন্ত্র  
শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্ঠা বা তাহা-  
দিগকে পরাভূত করিবার বাসনা কিম্বা  
প্রবল্যায়ি বিবিধ বিষধর সর্প ও সর্পীক্ষপ  
প্রভৃতি হইতে দূরে পলায়নের চেষ্ঠার আবশ্যক  
থাকিত না । যদি আয়ুর পরিমাণ নির্দিষ্টই  
থাকিত, তবে দুঃসাহস, দেশ ও কালের  
বিরুদ্ধাচরণ রাজবোম ইত্যাদি ও আয়ুনাশ  
করিতে সমর্থ হইত না । যদি অকাল  
মরণের নিয়ম না থাকিত, তবে অকালমরণ  
ভীতি প্রাণিদিগের হৃদয়ে সমুদিত হইত না ।  
রসায়ন-প্রয়োগে দীর্ঘ জীবন লাভ ও জরাব্যাধি  
বিদূরিত হয় ইত্যাদি ঋষিবাক্য বৃথা  
বাক্যাদ্বয়ের বলিয়া বোধ হইত, আর যদি  
শত্রুর আয়ু নিয়তই হইত, তবে এক তাহাকে  
অস্ত্র প্রয়োগে হত্যা করার ছেষ্ঠা করিত না,  
এবং চিকিৎসকগণ বিবিধ প্রকার ঔষধ  
প্রয়োগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন না,  
কিংবা ঋষিগণ কঠোর তপস্চর্যা দ্বারা অচূর  
আয়ুর অধিকারী হইতেন না । সৰ্ব্বজ্ঞ  
মহর্ষিগণ সুস্থদেহে দীর্ঘজীবন লাভের উপদেশ  
দান ও তদনুরূপ বিবিধ আচরণ করিতেন না ।

“তন্মাদ্বিতোপচারমূলং জীবিতং । অতো-  
বিপর্যায়ান্মৃত্যুঃ, অপিচ দেশকালান্মরণ-  
বিপরীতানাং কৰ্ম্মণাং আহারবিকারান্যক  
ক্রিয়োগযোগঃ সমাক্ সৰ্ব্বাতিযোগসম্ভারণ  
মসম্ভারণমুদীর্ণানাঞ্চ গতিমতাং সাহসানাং

বর্জনঃ আরোগ্যমুত্তো উপালভামহে হেতু-  
মুপদিশামঃ সম্যক্ পশ্যামশ্চেতি।

অতএব স্থির হইতেছে দীর্ঘজীবন লাভের  
মূল উপায় হিতজনক আহার আচার সেবা।  
একদিপরীত মৃত্যুর কারণ, পরন্তু দেশকাল ও  
স্বভাবের বিপরীতাচরণ বা আহাব বিহারাদির  
বিপরীতাচরণও অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়া  
থাকে। বিশেষতঃ আমরা সর্বদা বুঝিতেছি  
বলিতেছি ও দেখিতেছি যে সর্বপ্রকার অত্যা-  
চার পরিহার, মলমুত্রাদির বেগধারণ না করা  
এবং গতিশীল জন্তু ও হুঃসাহসিক কর্ম সমু-  
হের পরিহার আবোগ্যের কারণ। যদি  
পরমায়ুর পরিমাণ এক্রপ অনিশ্চিতই রহিল,  
তবে কাল ও অকাল মৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয়?  
তাহাও সরল দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত  
হইতেছে।

“যথা বানসমায়ুক্তোহক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষ-  
জ্ঞৈরুপেতঃ সর্বগুণোপপদ্যোবাহ্যমানো যথা-  
কালং স্বপ্রমাণকরাদেবাবসানং গচ্ছেৎ তথায়ুঃ  
শরীরোপগত্তং বলবতঃ প্রকৃত্য যথাবহুপচর্যা-  
মাণং স্বপ্রমাণকরাদেবাবসানং গচ্ছতি, স মৃত্যু-  
কালে তথা স এবাক্ষো অতিভারাদিগ্ধিত্ত্বাৎ  
বিষমপথাদপথাদক্ষচক্রভঙ্গাদবাহ্যবাহক-দোষাদ-  
মির্মোক্ষাৎ পর্য্যাসনাদহুপান্ধাচ্ছান্তরা ব্যাসন-  
মাপত্ততে, তথায়ুরপি অযথাবলমারস্তা-  
দযথান্যভাবহরণাদিষমশরীরস্ত্যাপাৎ অতি-  
মৈথুনাদসংস্রায়াৎ উদৌগবেগবিনিগ্রহাৎ  
বিধার্যবেগাবিধারণাৎ ভূতবিষায়্যপতাপাৎ  
অতিষাভাৎ আহারবিবর্জন্য চাণুর্য্যাসন-  
মাপত্ততে স মৃত্যুরকালে, তথাক্ষরাদীনপাত্তক-  
নিধোপচরিতানকালমৃত্যুপশ্যাম ইতি।

যেমনশকটের চক্রমণ্ডল প্রকৃত চক্রগুণ  
সম্পন্ন ও সর্বগুণসম্পন্ন হইলেও ব্যাহমাণ

হইতেই যথাকালে নিজ প্রমাণের ক্ষয় বশতঃ  
অবসান বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ শরীরের  
আয়ু ও বলবানের প্রকৃতি গুণে যথাবৎ উপ-  
চর্যমাণ হইয়াও নিজপ্রমাণের স্বাভাবিক  
ক্ষয় বশতঃ যথাকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহা  
কেই আমরা কালমৃত্যু বলিয়া থাকি, আবার  
সেই চক্রমণ্ডল বা গাড়ীর চাকা অতিভার  
বশতঃ বিষমপথ বা উচ্চনীচপথ অথবা অপর  
বশতঃ চক্রভঙ্গবশতঃ বাহ্যবাহকদোষ বশতঃ  
বা পরিচালক ও আরোহীর পরিচালন আরো-  
হণ দোষে, অথবা চক্রগুলির অনির্মোক্ষণ  
বা খুলিয়া পরিষ্কার না করার জন্তু বিপর্য্যস্ত  
হয় বা অসময়ে ক্ষয় অর্থাৎ বিপর্য্য হয়, তদ্রূপ  
দেহীরও অযথারূপেও দেহের পরিচালন এবং  
অনিয়মে আহার বিহারাদি দ্বারা অসময়ে  
দেহের পতন ঘটিয়া থাকে তাহাকেই আমরা  
দেহের অকালমৃত্যু বলিয়া থাকি।

পূর্বে আমরা আয়ুর্বেদের লক্ষণে বলিয়াছি  
হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ, দুঃখায়ুঃ, আয়ুর  
হিত অহিত, পরমায়ুর পরিমাণ, বাহ্য পাঠে  
অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম আয়ুর্বেদ,  
এপর্যন্ত আমরা, পরমায়ু কি ও তাহা নিয়মিত  
কি অনিয়মিত তাহার বিচার করিলাম, এক্ষণে  
হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ, দুঃখায়ু কি, তাহার  
শাস্ত্রনির্দিষ্ট লক্ষণ কি, তাহাই আমাদের  
বক্তব্য। জীবমাত্রেরই স্বকীয় প্রাক্তন সূক্ষ্মতা বা  
দৃঢ়তাবশে ইহজীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ  
দারিদ্র্যের অধিকারী হইয়া থাকে, কর্মফল  
ভোগ দেহী মাত্রেরই অনিবার্য্য সূতরাং বাহার  
যেদ্রুপ কর্ম তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ  
করিতেই হইবে। শুভ কর্মের ফলে হিতায়ু ও  
সুখায়ুর ভোক্তা ও অন্তত কর্মফলে অহিতায়ু  
ও দুঃখায়ুর ভোক্তা জীবকে হইতে হইবে।



নিম্ন লক্ষণবিশিষ্ট জীবিতকালকে স্থায়্য বলে ।

“তত্র শরীরমানসাভ্যাং রোগাভ্যাংমনভিভ্র-  
তস্ত বিশেষেণ যৌবনবতঃ সমর্থাহুগতবলবীৰ্য্য  
পৌরুষপরাক্রমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানেন্দ্রিয়ার্থবল-  
সমুদায়স্ত পরমর্জিরুচিরবিবিধোপভোগস্ত সমৃদ্ধ-  
সর্কারস্ত যথেষ্টবিচারিণঃ স্থখমায়ুকচ্যতে  
অস্থখমতো বিপর্য্যয়েণ ।”

যে ব্যক্তিশরীর ও মানসরোগে অভিভূত  
নহে, যে ব্যক্তি বিশেষরূপে স্থির যৌবনের অধি-  
কারী হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি বলবীৰ্য্য পৌরুষ  
পরাক্রম সম্পন্ন, যাহার জ্ঞান ( শাস্ত্র জ্ঞান )  
বিজ্ঞান ( তদর্থনিশ্চয়শাস্ত্রাহুযায়িনী নিশ্চয়া  
দ্বিকাবুদ্ধিঃ ) ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ ও বল সম্পূর্ণ  
অবিকৃত থাকে, যে ব্যক্তি পরম ত্রীসম্পন্ন  
রুচিকর বিবিধ উপভোগসমর্থ এবং যাহার  
সমস্ত চেষ্টাই সুসম্পন্ন এবং যে ব্যক্তি স্বাধীন  
তাহার আয়ুকে স্থায়্য বলে । ইহার বিপরীত  
হইলে অস্থায়্য বশিয়া থাকে ।

নিম্নোক্ত লক্ষণটি হিতায়ু বলিয়া কথিত ।

হিতৈবিণঃ পুনরুত্থানাং পরস্বাদুপরতস্ত  
সত্যাদিনিঃ শমনপরস্ত পরীক্ষাকারিণোঃ প্রম-

দস্ত ত্রিবর্গং পরম্পরেণাহুপহতমুপসেবমানস্ত  
পূজ্যহিসম্পূজকস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানোপশমশীলস্ত  
বৃদ্ধোপসেবিনঃ স্থনিয়তরাগেষ্ঠ্যামদমানবেগস্ত  
সততঃ বিবিধপ্রদানপরস্ত তপোজ্ঞানপ্রশম-  
নিভ্যাত্মাধ্যাত্মবিদস্তংপরস্ত লোকমিমকামুকা-  
পেক্ষমানস্ত স্মৃতিমতোহিতমায়ুকচ্যতে অহিত-  
মতোবিপর্য্যয়েণ ।

যিনি প্রাণিগণের হিতাকাঙ্ক্ষী পরধনে বীত-  
স্পৃহ, সত্যবাদী, শান্তিপ্রিয় সদীক্ষাকারী  
( পূৰ্ব্বাপরদৃষ্টি রাখিয়া কাজকরা ) অপ্রমত্ত  
( স্থখদুঃখে সমভাব ) ধর্মার্থকামের পরস্পর  
অবিরোধে ভোগকারী, পূজ্যজনের পূজক,  
জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন, বৃদ্ধের সম্মানকারী  
রাগ বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা মদ ও মানের বেগধারণ-  
কারী, সতত বিবিধ দানপরায়ণ, তপোজ্ঞান  
শান্তিপরায়ণ অধ্যাত্মবিদ ও তৎপর ( অধ্যাত্ম-  
পর ) ইহা ও পরলোকের হিতলাভেচ্ছ এবং  
স্মৃতিমান্ ঐদৃশজীবিতকালের নাম হিতায়ুঃ  
ইহার বিপরীত অহিতায়ুঃ ।

ক্রমশঃ ।

কবিরাজ শ্রীশ্যামা প্রসন্ন সেন ।

## রোগ ।

জীবশরীর - রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি,  
মজ্জা, শক্ৰ, ললীকা, বসা, ওজঃ, ত্বক্, শরুৎ,  
মূত্র, বেদ, বায়ু, পিত্ত, কফ, জ্বদয়, বক্রং, কুস্  
কুস্, ক্রোম, বৃক্ক, নায়ু, ধমনী, সির', রসায়নী  
প্রভৃতি স্থল ও হৃদয় ভেদে নানাবিধ শরীরোপ  
কারক দ্রব্যদ্বারা গঠিত হইয়াছে । এই  
সকল দ্রব্যের গুণ যথা—গোরব, লাঘব,  
শৈত্য, উষ্ণ্য, দ্রবতা, কার্কশ্য, বৈশস্ত,  
পৈচ্ছিল্য, সাস্ত্র, দ্রব, কাঠিন্য, লব্ধ, স্পর্শ, স্পন্দ,

রস, গন্ধ প্রভৃতি; এবং এই সকল দ্রব্যের কর্ম  
যথা—উৎক্ষেপন, অবক্ষেপন, আকৃশ্ণন, প্রসারণ,  
নিমেঘ, উন্মেষাদি দ্বারা শরীর গুত, বর্ধিত ও  
যাপিত হয় । যদি কোন কারণে এই সকল  
দ্রব্য, দ্রব্যের গুণ বা কর্ম অথবা বৃদ্ধ, ক্ষীণ বা  
বিকৃত হয়, তাহা হইলে শরীর পীড়িত হইয়াছে  
বলা যায় । মহর্ষি চরকও ব্যাখ্যার এই  
প্রকার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ।

যেযামেব হি ভাবানাং সম্পৎ সঞ্জয়য়ন্নয়ম্।

তেষামেব বিপদ্যাদীন বিবিধান্ সমুদীরয়েৎ ॥

অর্থাৎ যে সকল ভাবের সম্পৎ হইতে মনুষ্যদেহ গঠিত হইয়াছে, তাহাদেরই বিপদ হইতে বিবিধ রোগের উদ্ভব হয়।

নিজ ও আগন্তুভেদে রোগ দুই প্রকার। দোষপ্রকোপজন্ম যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নিজরোগ। ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি, সম্প্রহারাদিসমুৎ রোগকে আগন্তু রোগ কহে। শরীর-দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, ও কফের প্রকোপজন্ম যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শরীর রোগ এবং মানস দোষের অর্থাৎ রজঃ এবং তমঃর প্রকোপ জন্ম যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মানসরোগ। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে রোগের আশ্রয় শরীর এবং মন। কিন্তু একের পীড়ায় অপর অবশ্যই পীড়িত হয়। আধার ভূত শরীর পীড়িত হইলে আধেয় মন পীড়িত হয়, আবার আধেয় মন পীড়িত হইলে আধারভূত শরীর পীড়িত হয়। যেমন উত্তপ্ত কটাছে কোন দ্রব্য রাখিলে সেই দ্রব্য কিংবা উত্তপ্ত দ্রব্য কোন কটাছে রাখিলে সেই কটাছ উত্তপ্ত হয়, সেই-রূপ শরীর ও মনের বিষয় বুঝিতে হইবে, আত্মায় কোন প্রকার রোগ আশ্রয় করে না, কারণ আত্মা নির্বিকার। তবে ইন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত আত্মাই পীড়া অনুভব করেন।

আগন্তু রোগের পূর্বে যদিও দোষ প্রকোপ হয় না, তথাপি রোগ উৎপন্ন হওয়া মাত্রই দ্রব্যের সোৎপত্তির স্থায় দোষ-সংক্রমণ অনিবার্য।

• রোগসবল নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত হইতে পারে (১) পিতার শুক্র কিংবা মাতার আর্ন্তব ছুটিজন্ম ক্রণশরীরে কুষ্ঠার্শমেহাদি যে রোগ সংক্রমিত হয়, তাহার নাম সহজ রোগ।

(২) গর্ভকালে জননীর অপচার-হেতু কিংবা দোহদের (গর্ভকালে যে জিনিষে গর্ভিনীর লোভ হয়, তাহার নাম দোহন) অভাব-হেতু ক্রণের কুষ্ঠ, পৈঙ্গল্য কিলাসাদি যে রোগ হয়, তাহার নাম গর্ভজ রোগ। (৩) অত্যধিক অপতর্পণ বা সন্তর্পণরূপ শিখাহারবিহারাদি-জন্ম উৎপন্ন রোগকে স্বাপচারজ রোগ কহে। (৪) ক্ষত, ভঙ্গ, প্রহারাদি এবং ক্রোধ শোক ভয় প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন যে শরীর ও মানস রোগ, তাহার নাম পীড়াজন্ম বা আগন্তু ব্যাধি। (৫) শীতোষ্ণবর্ষ লক্ষণ কাল ত্রয়ের বিকৃতি-জন্ম কিংবা যে কালে যে বিধি পালনীয়, তাহার অনুষ্ঠানজন্ম যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কালজ রোগ। (৬) দেবগুরুর অপ-মাননা; অথর্ববেদবিহিত শ্যেণযাগাদি অথবা ভূতাভিব্যঙ্গপ্রভৃতি কারণজন্ম যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রভাবজ রোগ। (৭) কালেই হউক কিংবা অকালেই হউক, ক্ষুধা, পিপাসা এবং জরাদি যে সফল রোগ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম স্বাভাবিক রোগ। সর্বপ্রকার রোগই এই সাত প্রকারের কোন না কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। রক্ত সামান্য হেতু অর্থাৎ পীড়া দেওয়া সকল প্রকার রোগের সাধর্ম্য বলিয়া সকলকেই রোগ নামে অভিহিত করা হয়। নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, সম্প্রাপ্তি এবং চিকিৎসার ভেদে রোগের অসংখ্য ভেদ কল্পিত হয়। সর্বপ্রকার রোগে দোষ প্রকোপ থাকিতে হইবে। প্রথমতঃ নিদান-সেবনজন্ম দোষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; পরে সেই বৃদ্ধ দোষ প্রকৃপিত হইয়া উঠে; প্রকোপের পর প্রসর হয় অর্থাৎ স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে আরম্ভ করে, পরে একটা স্থান সংশ্রয় করিলে রোগের প্রকাশ হয়।

দোষের বৃদ্ধি-হেতু যেমন পীড়া জন্মে, সেই-  
রূপ দোষের ক্ষয়-হেতুও পীড়া জন্মে। যেমন  
শ্লেষ্মার ক্ষয়বশতঃ বায়ু প্রকৃতিস্থ পিত্তকে  
স্থানান্তরিত করিয়া যেখানে যেখানে বিচরণ  
করে, গাত্রের সেই সেই স্থানে ভেদনবৎ পীড়া,  
দাহ শ্রম ও ফৌর্বল্য উপস্থিত হয়, সেইরূপ  
পিত্তের ক্ষয় উপস্থিত হইলে বায়ু শ্লেষ্মাকে  
স্থানান্তরিত করিয়া শরীরের বেদনা, শৈত্য,  
তৃষ্ণ ও গুরুতা উৎপাদন করে। এইরূপে  
দেহের ক্ষয়-হেতু নানা প্রকার রোগ উপস্থিত  
হইতে পারে। রোগ সকলের মধ্যে কতকগুলি  
রোগ সামান্যজ অর্থাৎ সর্বদোষপ্রকোপজ্ঞ  
উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন জ্বর একটি  
সামান্যজ রোগ; ইহা বায়ু, পিত্ত কিংবা কফ  
যে কোন দোষের প্রকোপহইতে উৎপন্ন  
হয়। সেইরূপ রক্তপিত্ত, অতীসার, গ্রহণী  
প্রভৃতি রোগও সামান্যজ। আর কতক-  
গুলি রোগ আছে, তাহার নিয়ত একদোষের  
প্রকোপজ্ঞ উৎপন্ন হয়। যথা গৃধ্রসী, খঞ্জত্ব,  
কুজত্ব প্রভৃতি অশীতি প্রকার বাতবিকার।  
দাহ, দবধু, ধূবক, অম্লক প্রভৃতি চত্বারিংশৎ  
পিত্তবিকার। তৃষ্ণা, তৈমিত্য, আলস্ত প্রভৃতি  
বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মবিকার। গৃধ্রসী  
প্রভৃতি বাতবিকার নিয়ত বায়ুপ্রকোপ  
ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না, পৈত্তিক কিংবা  
শ্লেষ্মিক গৃধ্রসী রোগ কখনই উৎপন্ন হয় না।  
সেই প্রকার দাহ প্রভৃতি পৈত্তিক রোগ  
কখন পিত্তভিন্ন বায়ু কিংবা শ্লেষ্মজ্ঞ উৎপন্ন  
হয় না, এবং তৃষ্ণা প্রভৃতি শ্লেষ্মিক রোগ,  
বায়ু বা পিত্তজ্ঞ কখনও উৎপন্ন হয় না।  
এই সকল রোগকে নামান্বজ ব্যাধি বলা হয়।

রোগসকল কোথাও একদোষপ্রকোপ-  
জ্ঞ, কোথাও বা যুগপৎ ত্রিদোষ প্রকোপজ্ঞ

এবং কোথাও বা যুগপৎ ত্রিদোষ প্রকোপ-  
জ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রিদোষ বা ত্রিদোষ  
প্রকোপজ্ঞ যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা দুই  
প্রকারের দেখা যায়। এক প্রকারের নাম  
প্রকৃতি সম সমবায় এবং অপর প্রকারের নাম  
বিকৃতিবিষম সমবায়। বাতিক পৈত্তিক ও  
শ্লেষ্মিক রোগ যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, যদি  
বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লেষ্মিক, বাতশ্লেষ্মিক কিংবা  
সান্নিপাতিক রোগে সেই সেই লক্ষণেরই  
প্রকাশ থাকে, তবে তাহা প্রকৃতিসম-  
সমবায়, আর যদি সেই সেই লক্ষণভিন্ন  
অন্য লক্ষণ ও প্রকাশ পায়, যেমন—যক্ষ্মাগম  
বায়ুর ধর্ম্য নহে, শ্লেষ্মার ধর্ম্যও নহে, অথচ  
বাতশ্লেষ্মিক জরে যক্ষ্মাগম একটা লক্ষণ,  
ইহা বিকৃতিবিষম-সমবায়। সাধারণতঃ দোষ  
ও দৃঢ়ের সংযোগে রোগ উৎপন্ন হয়।  
যেখানে সংযোগে উভয়ের বিক্রিয়া উৎপন্ন না  
হয়, সেই স্থানে প্রকৃতিসম-সমবায় দেখায়।  
কিন্তু যেখানে সংযোগে উভয়ের বিক্রিয়া উৎ-  
পন্ন হয়, সেই স্থানে বিকৃতিবিষম-সমবায়। দৃঢ়  
এবং সান্নিপাতিক রোগস্থলে সর্বত্র যে এক  
প্রকার লক্ষণ দেখা যাইবে, এমন হইতে পারে  
না। কারণ ভারতম্যভেদে দোষের ৬৩  
প্রকার ভেদ আছে। সেই ভেদজ্ঞ রোগ-  
লক্ষণেরও ভেদ হয়। বাতশ্লেষ্মিক রোগে  
যদি বায়ু ও শ্লেষ্মা তুল্যবলশালী হয়, তবে যে  
প্রকার লক্ষণ দেখা যাইবে, যেখানে বায়ু বা  
শ্লেষ্মা অধিক বলশালী কিংবা শ্লেষ্মা হীনবল  
হইবে, সেরূপ স্থলে আর সে প্রকার লক্ষণ  
দেখা যাইবে না। দোষের এই প্রকার যে ভেদ  
হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ সূত্রভেদে দোষ-  
ভেদীরাধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।  
এখানে তাহার উল্লেখ নিম্নরোক্তন।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাবূষণ ।

## জ্বর।

আমি তখন দশমবর্ষীয় বালক, পিতা-মাতার স্নেহের উষ্মার আমার প্রভাব-জীবন তখন স্বধাময়। পৃথিবীর সন্ধীর্ণ উপভোগ হৃদয়ে তখনও অভাব অভিযোগ আনিতে পারে নাই। স্বনামধন্য পিতৃদেব তখন ছুঁচুড়ার একজন বড় কবিরাজ। নানা দিগ্-দেশাগত রোগিগণ জীর্ণ পাণ্ডুর দেহে তাঁহার আরোগ্যাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতির “মণিকর্ণিকায়”, কত মণি-ময় মুকুট-মণ্ডিত মস্তক লুপ্ত হইত।

মুনিদহশ্রের মধ্যবর্তী আশ্রয়ে ঋষির বৃত্ত, বহু শিষ্যের ত্রীতি-পরিবেষ্টনের মধ্যে বসিয়া পিতা আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র পড়াইতেছিলেন, স্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাহার কণ্ঠের সজল গম্ভীর মেঘ-স্তনিভের স্রাব শুনাইতেছিল। ডাক্তার কৈলাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম বি, মহাশয়ের তখন খুঁ প্রসার প্রতিপত্তি; উত্তরের নামের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া পিতৃদেবের সহিত কৈলাশ বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। স্নানোৎসব ও সুবিধা পাউলে, কৈলাশ বাবু প্রায়ই আমাদের বাটীতে বেড়াইতে আসিতেন, সে দিনও আসিয়াছিলেন। পিতা পড়াইতেছিলেন—

“অরুণিপাদজি-শিরাঃ বড় ভূজো নবলোচনঃ।

ভঙ্গপ্রহরণে রৌদ্রঃ কালান্তকবমোপমঃ॥

কিছু না বুঝিতে পারিলেও, শৈশব-চপল-কৌতুহলের বশে—আমি সেখানে বসিয়া-ছিলাম। পিতার মুখে অরের এই অপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া সহসা কৈলাশ বাবু বলিয়া উঠিলেন—

“কবিরাজ মহাশয়! আজ আপনার কাছে একটা নূতন কথা শিখিলাম। অরের মাথা আছে, হাত পা আছে, চক্ষুঃ কর্ণ আছে—

ইহা ত এতদিন জানিতাম না। অর কি জীব জন্তব তার ইন্দ্রিয়বান? এই শুলাই আপ-নাদের শাস্ত্রের পাগলামী।”

বাল্যকালের স্মৃতিশক্তি যদি এই শেষ যৌবনে আমাকে প্রতারণা না করিয়া থাকে তাহা হইলে সাহস করিয়া বলিতে পারি—অন্তগমনোন্মুখ রবি-সদৃশ ‘প্রশান্ত-মূর্তি পিতা সে সময় কৈলাস বাবুর কথার কোনও উত্তর দেন নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন ব্যস্ত ভাবে কৈলাস বাবু আমাদের বাটীতে আসি-লেন—পিতাকে বলিলেন “সেদিন আপনার মুখে অরের হাত পা আছে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, উপহাসও করিয়াছিলাম; কিন্তু আজ আমার ভ্রম বুঝিয়াছে। অনেক চুঃখেই ঋষিগণ অরের মূর্তি করিয়াছিলেন!” পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—“ব্যাপার কি কৈলাস বাবু? হঠাৎ এত ঋষি ভক্তি জন্মিল কিসে?” কৈলাস বাবু বলিতে লাগিলেন—

“\* \* \* পুত্রের আজ ২৬/২৭ দিন অর; কিছুতেই অর বন্ধ হইতেছে না। অনেক চেষ্টার পর আজ ৩ দিন অরের বিরাম হইয়াছে বটে, কিন্তু বিরাম-কাল অল্পকণস্থায়ী। গৃহস্থের ব্যগ্রতাতিশয়-অমুরোধে, গত কল্যা ডাক্তার সাহেবকে \* আহ্বান করিয়া ছিলাম, প্রত্যহ বেলা ১১ টার সময় অর আসিতেছিল, সে অর সমস্ত দিন ভোগ হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ৬ টার সময় ছাড়িতে-ছিল। তাই আমরা উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলাম—আজ ঐ ৬ টার সময় হইতেই রোগীকে কুইনাইন প্রয়োগ করিব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—অন্তদিন অর বেলা

১১ টার সময় আসিত, আজ একেবারে রাত্ৰি ৩ টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতেই আমার বিশ্বাস হইয়াছে—জ্বর নিশ্চয়ই জীব জন্তুর মত ইন্দ্রিয়বান্, তাহার কাণ আছে; রোগীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া আমরা চুইজন ডাক্তারে যে পরামর্শ করিয়াছিলাম, জ্বর সে কথা শুনিতে পাইয়াছে, এবং আজ সকাল সকাল আসিয়া, আমাদের সকল চেষ্টা বার্থ করিয়া দিয়াছে!”

কৈলাস বাবুর রহস্য-চটুল ব্যঙ্গ শুনিয়া আমাদের গৈঠকখানা গৃহে, উৎস উজ্জ্বাসের জ্ঞায় হস্তাকাকলি উখিত হইল। পিতাও হাসিলেন, কিন্তু সে হাসি নিদাঘ সন্ধ্যার চক্র-বাল দীপ্তির মত চকিতে চমকাইয়া অধর প্রান্তেই মিশিয়া গেল। পিতা গভীরভাবে বলিলেন—“কৈলাস বাবু! আমাদের শাস্ত্র বৃত্তিতে হইলে মনে হিন্দুত্বের অভিমান থাকা চাই। মূলে বাহা ‘অতীন্দ্রিয়’—তাহাকে নানা ইঙ্গিতে, নানা সম্বন্ধে, উপমায়া রূপকে সাজাইয়া, ঋষিগণ—ইন্দ্রিয়ানুভূতির অধিকারে উপস্থিত করিয়া দিতেন আজ তুমি জ্বরের ‘হাত পা’র কথা শুনিয়া উপহাস করিতেছ, কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যে দিন উপহাস উপাসনায় পরিণত হইবে।”

কিশোর অহুত্বের মধ্য দিয়া, পিতার সেই উদার উপদেশ, ভবিষ্যৎ জীবনে পূর্ণাবয়ব ধারণ করিয়া নিত্য সহচরের মত, আমার হৃৎকণ্ঠে, আনন্দে অবগাদে,—আজিও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। অতীত জীবনের কুহেলিকাচ্ছন্ন অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এই ঘটনাটি আতিশয়ের পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের জায়গানও আমার প্রাণে আগিয়া রহিয়াছে। সে আজ কত দিনের কথা—সত্যোদ্ভূত স্বপ্ন-

স্বপ্নের মত এখনও তাহা আমার স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল!

বাস্তবিক আমাদের তত্ত্ব, পুরাণ, কাব্য, সমস্তই রূপক রহস্যে পূর্ণ। আপনারা তান্ত্রিকের হরগৌরী মূর্তি নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। শিবরূপী মহাকাল [মৃত্যু] বৃষভের উপর আরুঢ়, তাঁহার অঙ্গে বিশ্বজননী গেরী। পুরাণে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের নাম ‘বৃষ’। হরগৌরী চিত্রের উপাখ্যান ভাগ—মরণের কোলে জীবন অধিষ্ঠিত। এ তত্ত্ব বৃষরূপী, অটল বিশ্বজনীন মহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। মরণের রাজ্যেই জীবনের নেপথ্য-বিধান, অর্থাৎ মরণের ভিতর দিয়াই জীবনের পথ; মাতৃ-অংশ যখন আংশিক মরিয়া গিয়াছে, মাতার জীবনী-শক্তিতে শক্তিতে যখন শেষ তাঁটা পড়িতেছে,—যখন তাহা মহাকালের কোলে অধিষ্ঠিত,—তখনই গর্ভের উৎপত্তি। এই গভীর দার্শনিক তত্ত্বকে, সরল সহজ ছবির মত আঁকিয়া, তান্ত্রিক দেয়ালে দেয়ালে, হৃদয়ে হৃদয়ে, টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। আপনারা এই রূপক রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করেন কি? আর্ধ্য ঋষির রূপক অসার গল্প নহে; তাহাতে প্রাকৃতিক সত্য, নৈতিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনার আভাষ থাকে। স্বাধা উঠিলে কেতুরূপ অঙ্ককার-সর্পের নাশ হয়, পুণ্য পাপকে বিধ্বস্ত করে, ত্রিকুল কোন একটা ভীষণ সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন—এই ত্রিতত্ত্বের সংযোগে ‘কালীরদমন’ রূপকের সৃষ্টি। এ চিত্র অনেক দিন হইতেই ত আমাদের কঙ্ক-প্রাণীরে লব্ধিত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা চিত্র-কল্পের উদ্দেশ্য বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি কি? আমরা ল্যাকারাস্ মটের চশমা চখে দিয়া হিন্দুর দিবা দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাই

আমরা তুলিয়া গিয়াছি—আমাদের পূর্ব-  
পুরুষের নেত্রসমক্ষে বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান,  
একদিন অভিন্ন হইয়া ধরা দিয়াছিল। \*

আমাদের আবুর্বেদেও এক সময়ে অনেক  
রূপক প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। সেই সকল  
রূপকে যে শারীর তথ্য নিহিত আছে—  
আমরা পাঠকগণকে একে একে তাহা বুঝাই-  
বার চেষ্টা করিব। জর সমস্ত বোগের রাজা,  
এইজ্ঞ জ্বর সর্বপ্রথমে জ্বরের কথাই আলোচনা  
করিতেছি। তবে গোড়াতেই বলিয়া রাখি  
তেছি—বেদরহস্য প্রচার করিতে যেটুকু  
সাহিত্যশক্তির প্রয়োজন, আমি তাহাতে  
একেবারেই নিঃসম্মল।

জ্বর—এখন সর্বজনবিদিত মহারোগ।  
বৈয়াকরণিক জ্বরের সংক্ষিপ্ত ধাতু নিরূপণ  
করিতে পারেন নাই। জ্বর সকল রোগের  
প্রধান, তাত্ত্বিক পূজার সম্ভার সাজাইয়া পাণ্ড  
অর্ঘ্য দিয়া জ্বরের পূজা করিয়াছেন। পূর্বা-  
কার জ্বরচরিত-অবলম্বনে লাবণ্যভূষণা দিব্য-  
ভাষায় জ্বরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন।  
বঙ্গালী কবির রসময়ী লেখনী-মুখে জ্বরের  
যে বন্দনা-গুঞ্জন বাহির হইয়াছে—তাহা আরও  
অপূর্ব! ঋষিগণ যে জ্বরকে রুদ্ররসের অবতার  
বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই জ্বর  
বঙ্গালী কবির হাতে পড়িয়া নধুবোবনা  
শ্রেমিকা সাজিয়াছে! কবি জ্বরকে সষোদন  
করিয়া বলিতেছেন—

\* রত্নিন ভাঁহার ‘কুইন অব্‌ দি এয়ার’ নামক  
গ্রন্থে রূপক সম্বন্ধে সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন।

‘নিত্য নিয়মিত ভাবে তুমি তো আসিবে যাবে  
আকিসের যেমন কোরাণী।

কি করিবে কুইনাইন্, আর্শেনিক, পলতা, নিম,  
‘ডিঃ গুপ্ত’ ‘ভাইব্রোণা’ ব্রাণ্ডী পানি?

ইংরাজের মত তুমি, পাংচুয়েল, প্রেমময়ী!  
ফরাসীর মত Positive.

ফুধা ও তৃষ্ণার মত তুমি যে লো! স্বাভাবিক,  
সমন্বয়ের মত সাময়িক!

তুমি যবে দাঁও দরশন—  
পিরীতি-পরশরসে— ধৈর্যব বন্ধন খসে—  
হাড়ে হাড়ে পেয়ে আলিঙ্গন’

কি কম্পন রক্কে রক্কে, দেখা দেয় প্রেমানন্দে  
আপাদ মস্তক লোমে লোমে!

অস্থিচূর্ণ সার বেহ রসের আবেশে গো!  
বিছানায় টলে পড়ে ক্রমে!

কট কট কটায়িত, তল্লুকটি সিহরিত,  
ঠিক্ যেন, কুসুম কদম্ব!

বন বন শীতকার— মুমধুর তীব্রকার,  
ক্ষণে দাহ, ক্ষণে গাত্ত তন্তু!

জ্বরের মূব বিগ্রহকে নিখাস ও ভাষা  
দিয়া, কবি যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন!

জ্বরের কথা বলিবার পূর্বে—আমি  
সংক্ষেপে—এই মহারোগের ইতিকাহিণীর  
আলোচনা করিব।

পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ ‘ঋগ্বেদ’। ঋগ্বেদে  
‘জ্বরোগ’ ‘হরিমাণ রোগ’ ‘শ্বেতি রোগ’ ‘রাজ  
যক্ষ্মা’ প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়;  
কিন্তু ‘জ্বরের’ নাম ঋগ্বেদে লিপিবদ্ধ হয় নাই।  
এইজ্ঞ জ্বর এক জন ঐতিহাসিক বলেন—  
বৈদিক যুগে এদেশে জ্বর রোগ দেখা দেয় নাই,  
বৈদিক যুগের পর ব্রাহ্মণ যুগ। তখন ‘আর্য্য-  
দহ্ম্যর’ বিরোধ বিগ্রহ শাস্ত্যভাব ধারণ করি-  
য়াছে, ঐশ্বৰ্য্যের কোলে বসিয়া আর্য্যগণ

বিলাসী হইয়াছেন। দেশে অজীর্ণ প্রভৃতি ব্যসন-জাত ব্যাধি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। “শল্য বৈদ্যের” চেয়ে ‘ত্রিধরা অর্থর্কণের’ আদর বাড়িয়াছে। এ হেন আলস্য-মধুর ব্রাহ্মণ যুগে আমরা জ্বরের নাম খুঁজিয়া পাই না।

ব্রাহ্মণ যুগের শেষ ভাগ অর্থর্কবেদের যুগে তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরে যে অর্থর্ক বেদ রচিত হইয়াছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং ‘অর্থর্ক বেদকেও আমরা ব্রাহ্মণ যুগের ভিতরে ধরিব। ব্রাহ্মণ যুগে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায়—‘দকোদর’ ‘প্লীহোদর’ ‘পাণ্ডু’ ‘মেহ’ ‘বৃক্ষা’, ‘অকাল বার্ষিক’ প্রভৃতি রোগের কথা আমরা প্রথম জানিতে পারি। এ সকল রোগ বিলাসিতার সহচর। কিন্তু যে জ্বর রোগের রাজা বলিয়া চিকিৎসকগণ অভিনন্দন করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ যুগে সে জ্বরের নামও পাওয়া যায় না।

পূর্বেই বলিয়াছি অর্থর্কবেদ অনেকগুলি ‘ব্রাহ্মণের’ পরে রচিত হইয়াছিল, ইহার সকল অংশও আবার এক সময়ে রচিত নহে। এই অর্থর্কবেদে একটা নূতন রোগের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম “তক্ষণ”। এ রোগের লক্ষণ ঠিক জ্বররোগের মত।—তক্ষণ যে কতকটা ম্যালেরিয়ার লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধি, পরে তাহা দেখাইব।

ব্রাহ্মণ যুগের পর ‘আচার্য্য যুগ’—আর্য্য ভূমি তখন আর্য্য সভ্যতার গৌরবান্বিত। ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াছেন, দেশের শান্তি রক্ষা করিতেছেন, বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্যে দেশের ধন ধাতু বৃদ্ধি করিতেছেন, কলৌল-মুখরা দৃষ্যভী ও সম্ভ্রতীর পূর্বভীরে পর্ণকুটির রচিত হইয়াছে। স্থানী চুল্লী লইয়া ঋষিগণ সংসারী

সাজিয়াছেন, মূনি-পত্নীগণ স্বামী-সেবায় ও সন্তান পালনে নারী জীবনের আদর্শ গঠন করিতেছেন। ঋষিবাণকের মুক্তকণ্ঠের বেদ গাথায়, ঋষি কুমারীর হোমধেয়-দোহনকালীন কলহান্তে কুণ্ঠিত তখন মুখের হইয়া উঠিয়াছে ভারতে তখন ঋষিযুগ, ধর্ম্মের তখন উপনিষদ যুগ, আয়ুর্বেদের আচার্য্য-যুগ।

আয়ুর্বেদের তখন উত্তময় যৌবনকাল। আশ্রমে আশ্রমে আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়,—মৌলিক অমুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আয়ুর্বেদের তখন সকল বিভাগ সম্পূর্ণ। এই আচার্য্য যুগের প্রধান প্রতিনিধি এখন ‘চরক’ ও ‘সুশ্রুত’ সংহিতা। চরকের চেয়ে সুশ্রুত আরও প্রাচীন গ্রন্থ। কেননা চরক সংহিতায় ইঙ্গিতে সুশ্রুতের উল্লেখ আছে—‘বায়ব্রত সস্ত্রদায়ের’ উপর কটাক্ষপাত আছে, কিন্তু সুশ্রুত সংহিতায় চরকের নাম গন্ধও নাই।

এমন যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ‘সুশ্রুত-সংহিতা’—তাহার নিদান স্থানে ও চিকিৎসা স্থানে জ্বরের কোন উল্লেখ নাই। জ্বরের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা প্রভৃতি বাহা কিছু সমস্তই, সুশ্রুতের উত্তর তত্ত্বে সন্নিবিষ্ট। টীকাকার ডল্লন মিশ্রেরমতে—উত্তর তত্ত্ব বৌদ্ধ নাগার্জুন কর্তৃক বিরচিত। জ্বর ও জ্বর চিকিৎসা উত্তর তত্ত্বের প্রসঙ্গীভূত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস—সুশ্রুতের আমলে এদেশে জ্বর ছিল না। আমরা কিন্তু এ মতের পোষকতা করি না। আমাদের ধারণা—সুশ্রুত “শল্য বৈদ্যের সংহিতা” তাই সুশ্রুতের প্রথমমাংশে কেবল শল্য শালাক্যের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর তত্ত্ব সুশ্রুত কায় চিকিৎসার একটা স্বতন্ত্র বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, হয়ত সেই জন্তই ‘জ্বরতত্ত্ব’ উত্তর তত্ত্ব হান পাইয়াছে।

শলা বৈজ্ঞ ছিলেন বলিয়া, মহর্ষি যে কায় চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই, আমাদের ইহা বিশ্বাস হয় না। অমন পারগ সার্জন যে নিজের গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রাখিবেন, এ কথা কি সাহস করিয়া বলা যায়? আমাদের অনুমান—সংহিতার অন্ত্য অংশের গ্রন্থ নাগার্জুন এ অংশেরও প্রতি সংস্কার করিয়াছিলেন। অতএব অর ও অর চিকিৎসা উত্তর তন্ত্রের প্রসঙ্গীভূত বলিয়া, স্ত্রুতের সময়ে এ দেশে অর ছিল না এ কথা বলা চলে না।

চরক সংহিতার নিদান স্থানের প্রথমেই কিন্তু অর নিদান অধ্যায় এবং চিকিৎসা স্থানের 'রসায়ন' ও 'বাজীকরণ' শীর্ষক অধ্যায় দুইটির পরই অরের চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস বৈদিক যুগে যে রোগ "রাজ যক্ষ্মা" নামে পরিচিত ছিল, ব্রাহ্মণ যুগে তাহাই "তক্ষণ" নামে পরিচিত হয়। আচার্য্য যুগে সেই "তক্ষণ" রোগেরই "অর" নামে নামকরণ হইয়াছিল, এ সকল কথা আমরা অরেরনিদান তত্ত্বে বিস্তারিত ভাবে বলিব। "তক্ষণ" যে কিরূপে অর আখ্যায় পরিবর্তিত হইল, তাহার ও একটু আভাস দিব।

### জরের পৌরাণিক ইতিহাস।

এক সময়ে প্রজাপতি দক্ষ রুদ্রকে অপমানিত করিয়াছিলেন। সেই অপমানে রুদ্রের ললাটস্থিত শশিনেত্র হইতে রক্তনাগিনীর গ্রন্থ বহিঃ জালা বিকীরণ হইয়াছিল। রুদ্র রোষান্বিত জাত বাণ প্রলয়-সংহর মহাকাশের মূর্তি ধারণ করিয়া অম্বর গণকে সংহার এবং দেবগণকে সমুপ্ত করিতে লাগিল ধ্বংসলীলার এই উন্মাদা হুষ্ঠানে—সপ্তভুবন কাঁপিয়া উঠিল। দেবগণ প্রমাদ গণিয়া প্রমথ নাথকে স্তবে তুষ্ট করিলেন। শিব শাস্তমূর্তি ধারণ করিলে—নেত্র-সমুত ক্রোধান্বিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"অহং কিং করবাণি তে"

"হে দেব! আমি এখন কি করিব?"

শিব উত্তর দিলেন—

"\* \* \* \* অরো লোকে ভবিষ্যতি।

জন্মান্দো নিধনে চ স্বমপি চাবান্তরেষু চ।"

"তুমি জীবগণের জন্মকালে, মৃত্যুকালে, এবং জন্ম মৃত্যুর মধ্যকালে, "অর"রূপে অবস্থান কর।"

[ ক্রমশঃ ]

শ্রীভজবল্লভ রায়।

## আয়ুর্বেদ কি Empirical ?

(মাধ্যসংখ্যার ২২০ পৃষ্ঠার পর)

—:~:—

সংহনন—সংহনন শব্দের অর্থ শরীরের বাধুনি, শরীরের বাধুনি দেখিয়াও চিকিৎসক অনেক বিষয় অনুমান করিতে পারেন। যাহার শরীরের অস্থিগুলি সম, সুবিকৃত, সন্ধিসকল সুবদ্ধ এবং শরীরের পেশী-

গুলি সুসন্নিবিষ্ট, তাহার শরীরের বেশ বাধুনি আছে বুঝিতে পারা যায়। যাহাদের শরীরের সংহনন আছে তাহারা প্রায়শঃ দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

সংহনন—মনের বলকে সম্ব বলা হয়। শরীর



বৃহৎ ও স্থূল হইলেই মনের বল অধিক হয় না । মানুষটা দেখিতে হয়ত খর্বাকৃতি শরীরও কোনমতেই স্থূল বলা যায় না অথচ মনের বল যথেষ্ট আছে, ঘোরতর মানসিক কি শারীরিক ক্রেশ অক্রেশে সহ্য করিতে পারি । কোন কোন কঠিন পীড়ায় বা কোন অঙ্গচ্ছেদ হইলেও এইসকল লোক কিছু মাত্র কাতর হয়েন না যে বৃহৎ ব্রণে শাস্ত্রোপচার কালে রোগীকে অজ্ঞান করা চিকিৎসকেরা আবশ্যক মনে করেন এই সকল লোক কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত না হইয়া সেই শাস্ত্রোপচার ক্রেশ সহ্য করিতে পারেন—“ক্রোরোকরম” করার কোনই প্রয়োজন হয় না । এই শ্রেণীর লোককে “প্রবর সত্ত্ব” বলিয়া জানিবে । বাহারা অস্ত্রের দেখা দেখি অমুক অনেক করিতেছে আমি পারিব না কেন এইরূপ সাহসে কি অস্ত্রের সাহায্যে উপরি লিখিত “প্রবরসত্ত্ব” লোকের অতীত মনের বল দেখাইতে পারে তাহারা মধ্যম সত্ত্বের লোক । আর বাহারা নিজে ত পারেই না অস্ত্রের দেখাদেখি কিবা অস্ত্রের সাহায্যেও মনের বল প্রদর্শন করিতে পারেনা, শরীর বৃহৎ ও স্থূল কিন্তু কিছুমাত্র বেদনা সহ্য করার শক্তি নাই, অগ্নেই ভীত, অগ্নেই শোকে ত্রিয়মান, সামান্য বিষয়েই অভিমানে কাতর, এমন কি উৎকট শব্দে, অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে কিবা ভয়াবহ দৃশ্য ও শোণিত শ্রাব দর্শনে অতিমাত্র ত্রস্ত, বিষণ্ণ ও বিকল চিত্ত হইয়া পড়ে তাহাদিগকে “হীন সত্ত্ব” বলিয়া জানিবে । “হীনসত্ত্ব” লোকের সামান্য শারীর কিবা মানস পীড়া হইলে সেই পীড়া সত্ত্বর আরাম হয় না—আর প্রবরসত্ত্ব লোকে কঠিন-পীড়াতে ও কাতর হয় না । সহজপে প্রবল বস্তুগণকেও সামান্য বোধে অবিকলিত থাকে—

সুতরাং পীড়া সত্ত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে । শরীরের উপরি মনের এতই প্রভাব ।

সাম্রাজ্য—যে আহার বিহার সতত সেবা করিলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর হয় না তাহার নাম সাম্রাজ্য । সাম্রাজ্য বস্ত্র শীত্র বলদান করে এবং বহুমাত্রায় সেবন করিলেও বিশেষ অহিত কর “হয় না । এই সাম্রাজ্য প্রধানতঃ চারিপ্রকার জাতি-সাম্রাজ্য, দেশ-সাম্রাজ্য, ঋতু-সাম্রাজ্য ও ওকসাম্রাজ্য । যে জাতির যে বস্ত্র সতত ও প্রচুর ভোজনেও বিশেষ কোনও অহিত হয় না সেই বস্ত্র সেই জাতির জাতি-সাম্রাজ্য যেমন ইংরাজের পক্ষে মাংস এদেশ বাসীর পক্ষে দুগ্ধ, ঘৃত, বাঙ্গালীর পক্ষে মৎস্য । চরকের চিকিৎসা স্থানের ৩০ অধ্যায়ের শেষে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও দেশবাসীর সাম্রাজ্য লিখিত হইয়াছে । বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর প্রভাবে যে বিশেষ দ্রব্য হিতকর হইয়া থাকে তাহার নাম দেশসাম্রাজ্য । হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশে মধু ও মাংস হিতকর কিন্তু রাজপুতনার তুল্য মরু-প্রধান দেশে মধু ও মাংস হিতকর নহে । সাম্রাজ্য ও সিংহল বাসীর পক্ষে অতিরিক্ত লব্ধা সেবন প্রয়োজন বটে কিন্তু উড়িষ্যার পক্ষে অহিত কর । ঋতু বিশেষের হিতকর বস্ত্রকে ঋতুসাম্রাজ্য বলে । শীতল পানীয় বরফ প্রভৃতি নিদাঘে হিতকর হইলেও হেমন্তের পথা নহে । যাহা অপথা হইলেও কেবল অভ্যাসের গুণে পীড়াজনক হয় না তাহাকে ওকসাম্রাজ্য বলে । যেমন দিবানিত্রা অহিত কর বলিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু যে ব্যক্তির দীর্ঘকাল হইতে দিবায় নিত্রা-বাওরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে দিবানিত্রা রোগকারী হইতে দেখা যায় না এখানে । দিবানিত্রা ওকসাম্রাজ্য বলিতে হইবে । ইহা ওক-

সাত্ব্য বিহার। ওকসাত্ব্য আহারের কথা বলিতেছি। মনে করুন দীর্ঘকাল হইতে অভ্যাস করিয়া একজন মনুষ্য প্রতিদিন সিকিভরি অহিফেন সেবন করিয়া বেশ সুস্থ আছেন। অগ্নের পক্ষে এতাদৃশ অহিফেন সেবন প্রাণ হাণির অথবা সংজ্ঞাহীনতা মলরোধ, উদরাদ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার কারণ হইয়া থাকে। বাস্তবিক অভ্যাসেব শক্তি অতি আশ্চর্য। অভ্যাসের প্রভাব এতই বিস্ময়কর যে ইহার বিষয় চিন্তা করিলে নিয়ম, অনিয়ম, হিতকর, অহিতকর প্রভৃতির পার্থক্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ২ ঘণ্টা কোন পুতিগন্ধি স্থানে থাকিলে কি কিয়ৎ কালের অন্ত ও মলমূত্র স্পর্শ করিলে তোমার আমার শিরঃপীড়া, বিবমিষা ও অরুচি জন্মিয়া যায়। আবার ইহাও দেখিতেছি যে মেথরেরা সতত পুতি বস্ত্র ও মল মুত্রেব সম্পর্কে থাকিয়াও কিঞ্চিৎ মাত্র ও অসুস্থতা অনুভব করে না। যে আর্দ্র, রুদ্ধ, অন্ধকার গৃহে একরাত্রি বাস করিলে তুমি আমি পীড়িত হইয়া পড়ি, কতক্বেক সেইরূপ গৃহে সুখে সুস্থ ভাবে বাস করিতেছে। অভ্যাসের এই বিস্ময়কর প্রভাব দর্শন করিয়া আয়ুর্বেদ-কার ওকসাত্ব্যকে সাত্ব্য মধ্যে গণনা করিয়াছেন। চিকিৎসক রোগীর সাত্ব্য বিবেচনা না করিয়া যদি কেবল যথাক্রমে ভাবে চিকিৎসা করেন তাহা হইলে তিনি অপরাধী হইয়া থাকেন। চিকিৎসক রোগীর আহার-শক্তি দ্বারা পরিপাকের বল এবং ব্যায়াম-শক্তি দ্বারা কর্মবল পরীক্ষা করিবেন।

**বাক্যসংক্ষেপ—**অতঃপর আমরা বয়সের কথা বলিব। বয়স প্রধানতঃ তিন প্রকার—বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধ। ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক। বালক তিন প্রকার কীরণ, কীরামাদ ও

অগ্রাদ। একবৎসর বয়স পর্যন্ত কেবল দুগ্ধ পান করিয়া থাকে বলিয়া একবৎসর বয়স পর্যন্ত বালককে “কীরণ” বলে। তার পর একবৎসর অর্থাৎ ২ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকে দুগ্ধ ও কিছু কিছু স্নান ভোজন করে বলিয়া “অগ্রাদ” বলে। ষোলবৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত মধ্যবয়স। এই মধ্যবয়সকাল চারি ভাগে বিভক্ত—বৃদ্ধি, যৌবন, সম্পূর্ণতা ও হানি। ২০ সংসর পর্যন্ত বৃদ্ধি, ২০ হইতে ৩০ পর্যন্ত যৌবন, ৩০ হইতে ৪০ পর্যন্ত সম্পূর্ণতা অর্থাৎ এই সময় পর্যন্ত ধাতু, ইন্দ্রিয় শক্তি, বল ও বীৰ্য্য পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪০ হইতে ১০ পর্যন্ত হানি—অর্থাৎ এই সময় বলবীৰ্য্য ক্ষয় হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়। ১০ বৎসরের পর ইন্দ্রিয় শক্তি, বল, বীৰ্য্য উৎসাহ দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে। গাত্রের চর্ম্ম লোল হয় চুল পাকে, খাস কাশাদি ব্যাধি কর্তৃক পীড়িত হইয়া উৎসাহযোগ্য কর্মে অসমর্থ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে বৃদ্ধ বলে। আজ কালকার লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যৌবনবিভাগ করিতে গেলে বলিতে, হয় সূক্ষ্মত ১০ বৎসরের পরে যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন অধুনা তাহা ৫০ বৎসর ঋতু বিশেষে বলিতে গেলে বলিতে হয় তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে ও দেখা গিয়া থাকে। রোগীর বয়স চিকিৎসকের একটা অবশ্য চিন্তনীয় বিষয়। রোগীর বয়সের উপর ঔষধ নির্বাচন, মাত্রা, পথ্য প্রভৃতি অনেক চিকিৎসা সোপযোগী তত্ত্ব নির্ভর করে। রোগীর শরীরের প্রমাণ ও চিকিৎসকের অবস্থা লক্ষ্যণীয় বিষয়। বাহ্যদের দীর্ঘ আয়ু লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ চরকের বিমান হাঙ্গের ৮ম অধ্যায়ে

সুশ্রুতের সূত্র স্থানের ৩৫ অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। আজকাল যুদ্ধ ও পুলিশ বিভাগে লোক নির্বাচন কালে দেহের উচ্চতা, ছাতির মাপ লওয়া হইয়া থাকে। কুতূহলী পাঠক চরক সূত্রতোক্ত প্রত্যঙ্গাদির পরিমাণের সহিত আধুনিক চিকিৎসকগণের সম্মত পরিমাণ মিলাইয়া দেখিতে পারেন। চরকের মতে মানুষের দেহের উচ্চতা নিজের আঙ্গুরের ৮৪ আঙ্গুল, সুশ্রুতের মতে ১২০ আঙ্গুল। এই ১২০ আঙ্গুল নিজের কি অস্ত্রের তাহার টলৈব নাই।

রোগীর পরীক্ষা সম্বন্ধে আনুর্বেদ বাহা বলিয়াছেন আমরা স্থলতঃ তাহা ব্যাখ্যা করিলাম। অতঃপর রোগ পরীক্ষার কথা লিখিত হইতেছে। সুশ্রুত বলিয়াছেন রোগ বিজ্ঞানের উপায় ছয়টি—দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, স্নানগ্রহণ ও শ্রবণ। চিকিৎসক দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যে পরীক্ষা করেন তাহাই দর্শনগত-পরীক্ষা। চিকিৎসক রোগীর মল, মুত্র, জিহ্বা, চক্ষু ও গাত্রের বর্ণ, রোগীর প্রত্যঙ্গগত অস্ত্রাঙ্গ দর্শনযোগ্য বিকৃতি-দর্শন দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। চিকিৎসক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া যে পরীক্ষা করেন তাহাই স্পর্শনগত-পরীক্ষা। চিকিৎসক রোগীর ব্রণাদির পঙ্ক বা অগুরু অবস্থা, গ্ৰীহা, বক্কা, অগ্রমাংস প্রভৃতির বিবৃদ্ধি বা হ্রাস, শরীরের উত্তাপ বা শীতলতা ও বেদনা। শোণাদি স্পর্শদ্বারা পরীক্ষা করিবেন। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে পরীক্ষা করা হয় তাহা শ্রবণ-গত পরীক্ষা। চিকিৎসক কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়া উরঃকণ্ঠে উরোবিচারী বায়ুর গতি-শব্দ, কাণ ও শ্রবণভেদ রোগের কণ্ঠশ্বর, অন্ন ও কণ্ঠব কুজন, প্রভৃতি পরীক্ষা করিবেন। রসনেন্দ্রিয় দ্বারা চিকিৎসক যে পরীক্ষা

করেন তাহাই রাসন-পরীক্ষা। চিকিৎসক যে কেবল নিজের জিহ্বা দ্বারা এই পরীক্ষা নির্বাহ করিবেন আচার্য্যগণের এরূপ অভিপ্রায় ছিলনা, এতদর্থে প্রাণি বিশেষের জিহ্বা দ্বারাও যে পরীক্ষা সিদ্ধ হইতে পারে তাহার উদাহরণ আমরা শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বিবৃত আছে দেখিতে পাই। রক্তপিত্ত রোগে ক্রমত রক্ত কেবল জীবরক্ত কি পিত্তমিশ্রিত জীবরক্ত, কি কেবল অম্ল-রঞ্জিত পিত্তমাত্র ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য আচার্য্যগণ উপরি লিপিত স্তব্ধবস্ত্র অঙ্গের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুকুরকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। উহা যদি কেবল জীব-রক্ত হয়, তাহা হইলে কুকুর সামনে তাবৎ অন্ন ভোজন করিবে। যদি পিত্ত মিশ্রিত জীবরক্ত হয় তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়াই পিত্তের তিক্ততা হেতু নিবৃত্ত হইবে এবং যদি নিরবজ্জির পিত্ত হয় তাহা হইলে পিত্তের তিক্ততার দ্বাণ মাত্রই নিবৃত্ত হইবে। এইরূপ প্রমেহ রোগীর মূত্রাদি পিপীলিকায় পান করে তাহা হইলে উহাতে শর্করা আছে বুঝিতে হইবে। এস্থলে কুকুর ও পিপীলিকার জিহ্বাই পরীক্ষার সাধন হইল। কেবল রাসন পরীক্ষার কথা কেন চক্ষু-কর্ণ-গত পরীক্ষা স্থলেও চিকিৎসক স্বীয় চক্ষু কর্ণের সাহায্য বা শক্তি বর্দ্ধনার্থ অল্প কোন যন্ত্রাদিও ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা আচার্য্যগণের অনভিপ্রের নহে। চিকিৎসক গন্ধগ্রহণ পূর্বক যে পরীক্ষা করেন তাকে স্রাবগত পরীক্ষা বলে। চিকিৎসক রোগীর গাত্র, মল, মুত্র, পুষ্, ঘ্রেষ, নিঃশ্বাস, ব্রণ প্রভৃতির গন্ধ স্রাবগত পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইয়া থাকেন। শ্রবণ করিয়া চিকিৎসক

রোগীর বসতি স্থান, আতি, রোগোৎপত্তি স্থান, সাত্মা, দেশ, বল, ক্ষুধা; বায়ু, মূত্র, মলের বিসর্গ নিরোধ স্ত্রীলোকের রজঃ প্রযুক্তি বা রোধ অবগত হইবেন।

রোগের পরীক্ষার কথা বলাহইল এক্ষণে আমরা রোগের উপদ্রব ও অসাধ্য লক্ষণের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি। রোগারম্ভক দোষের প্রকাশ জন্ম যে রোগ জন্মে তাহার নাম উপদ্রব—যেমন হিকা, তৃষ্ণা, অরুচি, শোথ প্রভৃতি জরের উপদ্রব। চিকিৎসকগণ সতত রোগিশরীরে এইগুলি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। উপদ্রবের পর এক্ষণে আমরা রোগের অসাধ্য লক্ষণের বিষয় সংক্ষেপে বলিব। যে রোগে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ আরামের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না সেই লক্ষণকে সেই রোগের অসাধ্য লক্ষণ বলে। ইহার অন্ম নাম অরিষ্ট। আয়ুর্বেদে প্রতিরোগের অসাধ্য লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল অসাধ্য লক্ষণের অব্যভিচারিত্ব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতে হয় এবং দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে ইহা সুদীর্ঘকালের সুশ্রীপক অভিজ্ঞতার ফল। যাহারা রোগের বিচিত্র গতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও বিচার করিয়াছেন তাঁহারা এই সকল কথা বলিতে পারেন, অন্তের বলা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

আমরা আয়ুর্বেদের রোগতত্ত্ব অতি স্থল ভাবে ব্যাখ্যা করিলাম। যাহারা আয়ুর্বেদকে Empirical বলেন তাঁহারা যদি প্রমস্বীকার পূর্বক এই কথাগুলি নিরপেক্ষভাবে পাঠ-

করেন তাহা হইলে আশাকরি তাঁহাদের মত পরিবর্তন হইবে। কোনও চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগ ও রোগী সম্বন্ধে ঐতদতিরিক্ত কিছু আছে কি? এখানে যাহা স্থূলভাবে আছে অন্মত হয়ত তাহাই বিশদীকৃত হইয়াছে মাত্র। পক্ষান্তরে এখানে এমন অনেক তত্ত্ব আছে যাহা পাঠ করিলে অন্মাত্ম সম্প্রদায়ের চিকিৎসকের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইবে। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা বর্তমান চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অচিন্তিত। যে বায়ু পিত্তকফ আয়ুর্বেদে রূপ বিরাট মন্দিরের ভিত্তি স্বরূপ এস্থলে আমরা সেই বায়ু পিত্ত কফের বিষয় কিছুই বলিলাম না কেন? কেহ যদি আমাদিগকে এই প্রশ্ন করেন তাহা হইলে আমরা তত্ত্বতরে এই মাত্র বলিতে পারি যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধকগণ যে রূপ অক্লান্ত শ্রম সহকারে রোগতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছেন আর কিছুকাল এইরূপ গবেষণা-বৃত্তি জাগ্রত থাকিলে তাঁহারা স্বয়ংই বায়ুপিত্ত কফের তত্ত্ব জগতে প্রচার করিবেন। আমাদিগকে আর বুঝাইবার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। যতদিন না সেই শুভদিন আসি-তেছে ততদিন কেবল আমাদের এই সতর্ক অমরোপ যে বায়ু পিত্তকফ-তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করিবেন না, ধীরভাবে যথার্থ বৈজ্ঞানিকের স্বভাব-স্থূলত তত্ত্বাবেষণ-স্পৃহা হৃদয়ে লইয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন। প্রকৃতি একদিন অবশ্যই তাঁহার রহস্য মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিবেন।

(ক্রমশঃ)

## শিশু চিকিৎসা ।

(বালিকা ও মহিলাগণের জন্ত ছড়ায় লিখিত )

শ্লেষ্মা প্রধান বাল্যকালে,  
পিত্ত বাড়ে যৌবন হ'লে ;  
বার্দ্ধক্যে বায়ু প্রবল হয়,  
সকলশাস্ত্রে ইহা কয় ।  
(অতএব)—শ্লেষ্মা প্রধান রেখে মনে,  
যত্নে রাখ শিশুগণে ।  
ঠাণ্ডা যা'তে নাহি লাগে,  
দৃষ্টি রেখ তা'তে আগে ।  
গা' সদা তা'র ঢেকে রাখ ;  
প্রহতিগণ নিয়মে থাক ।  
প্রহতিগণের স্বেচ্ছাচারে,  
কোমল মতির শ্লেষ্মা বাড়ে ;  
সেই শ্লেষ্মা হ'লে প্রবল  
শিশু শরীরে রোগ সকল ।  
শ্লেষ্মা কভু ভাল নয়,  
হঠাৎ এতে মৃত্যু হয় ।

বাগক হয় তিনপ্রকার,  
'হৃৎকোজী' যা'র হৃৎক আহার ।  
অন্ন যা'রা ভোজন করে,  
'অন্নভোজী' নাম তা'রা ধরে ।  
হৃৎক অন্ন ভোজী হ'লে,  
'হৃৎকোজী' নাম তা'রে বলে ।  
হৃৎক পায়ীর হ'লে পীড়া,  
প্রহতিকে লাও বড়ী শুঁড়া ।  
হৃৎকোজী পীড়া বধন,  
ঔষধ লাও উত্তরকে তখন ।

পীড়া যদিঅন্ন ভোজীর  
শিশুকে ঔষধ খাওয়াও ধীর ।

হৃৎক পায়ীর পীড়া দেখে  
উপবাসী রাখ প্রহতিকে ।  
শিশুর উপবাস উচিত নয়,  
স্তন্যদুহ্য ব্যবস্থা হয় ।

বড় ঔষধ দিওনা শিশুকে কখন,  
মহাজ্বরের এটি বচন ।  
পাচন টোটিকার রোগ সারাও,  
যদি সুস্থ রাখতে চাও ।

আমলকী অন্ন হতকীর শুঁড়  
যি মধুতে মিশাল কর ।  
জন্মেই যে শিশু টানে না মাই,  
তার জিবে এ লাগাও সদাই ।

স্তন হৃৎকের অভাব যখন,  
ছাগ হৃৎক কর ব্যবস্থা তখন ।

গব্য হৃৎকে শালপানি নিয়ে,  
সিদ্ধ কর চিনি দিয়ে,  
ছাগহৃৎক যদি না পাও,  
এযোগ তখন খাওয়ারে লাও ।

ছাগ হুথের আর গুণ ইহার,  
ব্যবস্থা ইহা মুনি জনার।

এক খণ্ড মাটি আগুনে পোড়াও,  
হুথে ভিজিয়ে 'নাই'তে দাও,  
'নাই' এর শোথের যত কষ্ট,  
বালকগণের হয় নষ্ট।

হলুদ, শোধ, যষ্টিমধু,  
আর প্রিয়ঙ্গু নাওগে শুধু  
তৈল দিয়ে পাক ক'রে  
ঘসে দাও গে 'নাই' উপরে।  
(কিষা)—ঐ জিনিস কটি'র শুঁড় নিয়ে,  
বেশ করে দাও 'নাই'তে দিয়ে,  
'নাই' পাক দেওয়া ভাল হয়,  
বিজ্ঞ বৈদ্য এ যোগ কর।

বচ, হরিত্রা, শুঠ, পিপুল,  
মরিচ, হস্তকী—নাও গে তুল।  
শুভ্র হুথে এদের কঁক দিয়ে,  
সেবনে স্নেহা যায় উঠিয়ে।  
শিশুর শরীর হয় দৃঢ়,  
জেনে রেখ এ যোগ গুঢ়।

'এঁড়ে' লেগেছে যদি যায় জানা,  
ছাতিয় ফুল, মরিচ, গোরোচনা  
পিষে নিয়ে সেবন করাও,  
যদি উপকার পেতে চাও।  
সিদ্ধ অন্ন বেটে নিয়ে  
কলার পাত্রে দাও রাখিয়ে;  
কুশের দ্বারা উহা বেঁধে  
আগুনে রেখে নাও দগ্ধে;

সেবন করাও এই যোগ  
সেয়ে যা'বে এঁড়ে লাগা রোগ।

তুলসীর রস মধু দিয়ে  
সর্দি-কাসিতে দাও খাওয়াইয়ে,  
বেশী সর্দি মনে কর,  
মিসিয়ে নিও কর্পূরের শুঁড়।

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম মধু সহ  
সর্দি ব'সলে খেতে দেহ।

আদার রস আর পুরাণ বিরে  
কিষা পুরাণ বি শুধু নিয়ে  
বুকে গলায় মাশিশ কর  
সর্দি যদি বসে বড়।  
হু' আনা পিপুল আর তুলসী মঞ্জরী,  
যষ্টিমধু, মিছরি, কণ্টকারি,  
বড় এলাচ আর হরিতকী  
ওজন কর একটি সিকি রাখি,  
সিদ্ধ কর দেড় পোয়া জলে,  
নামিয়ে নাও এক ঝিহুক র'লে,  
খাওয়াইয়ে দাও হু'তিন বাবে  
সর্দি কাশি শিগ্গির সারে।  
জিনিসগুলি পৃষ্ঠ রাতে  
ভিড়িয়ে রেখ পাথর পাতে।

মরিচ, পিপুল, শুঠের শুঁড়  
বচ, হস্তকী মিশাল কর;  
আর হরিত্রা সমান নাও,  
হুথের সঙ্গে খেতে দাও,  
স্নেহা এতে হয় সরল  
শরীর এতে হয় সবল।  
বরষা একমাস হ'য়েছে যা'র  
মাত্র এক কুঁচ ব্যবস্থা তা'র।

বয়স বাড়ার পরিমাণে,  
ব্যবস্থা ক'র মাত্রা জানে।

সরষের তৈল বৃকে মালিস কর,  
শ্লেষ্মা বসলে ফল বড় \*।

নাগর মুতা, হস্তুকী, নতি,  
যষ্টিমধু, নির্মছাল—সাড়ে আটত্রিশ রতি,  
আধসের তুলে রেখে আধ পোয়া  
এক ঝিহুক খাওয়াও চুমুক দিয়া,  
বাঁকীটুকু দাও গে' ফেলে,  
শিশুর অর বা'বে চলে।  
“মুতাদি” নাম এর হয়,  
কাথ যেন একটু নরম রয়।

নতি, নিমছাল, হরীতকী,  
বয়ড়া, হলুদ, আমলকী,  
বত্রিশ কুঁচ এক একটি নিয়ে  
আধসের জলে দাও চাপাইয়ে।  
এক ঝিহুক মাত্র—আধ পোয়া র'লে  
খাইয়ে দাও অর বা'বে চ'লে।  
“পটোলাদি” নাম হয় ইহার,  
বিস্ফোট রোগেও হয় প্রতীকার।

হলুদ, দারু-হরিদ্রা, যষ্টিমধু  
চাকুলে, ইন্দ্র-বব নাও সে শুধু,

\* কেহ কেহ সরষের তৈল উহার সমপরিমাণ  
ভূর্জপত্রের তৈল ও ৭:৬ কোঁটা তাম্বিন তৈল একত্র  
মিশাইয়া মালিস করিতে বলেন। ইহাতে আরও শীত  
উপকার দর্শে, কারণ কয়েকটি ঔষধের মিলিত শক্তির  
পরস্পর সাহায্য দ্বারা রোগ প্রতীকারের পক্ষে সম্ভব  
হয়ল প্রসব করিঃ থাকে। ভূর্জপত্রের তৈল “ক্যাক্স  
পটা অয়েল” নামে যেনের দোকানে চাহিলে পাওয়া  
যায়।

আটত্রিশ কুঁচে কর ওজন  
আধসের জল রাখ আধ পোয়া বখন,  
সবটুকু ফেলে একটু খানি।  
খাওয়ায়ে দাও অর অতিসার জানি।  
অতি কচি শিশু হ'লে  
শিশুর মা'কে খেতে শাস্ত্রে বলে।  
“হরিদ্রাদি” ইহার নাম করণ,  
ক'রে গেছেন মুনি জন।

শুঠ, আতইচ, কুড়চির ফল,  
আটত্রিশ রতি নাও সকল।  
মুতা, বালা তা'তে দিয়ে  
আধসের জলে আধপোয়া নিরে,  
শিশুর অতিসারে খেতে দাও,  
দেখবে কেমন ফল পাও।  
“নাগরাদি” নাম হয় এর  
এর গুণ জেন চের।

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল,  
লোধ আল নাও অনস্তালে,  
এক একটি ওজন আধ আধ ভরি,  
আধসের জলে সিদ্ধ করি।  
আধপোয়া থাক্তে নামিয়ে নাও  
মধু সহ খানিক খাওয়াও,  
শিশুর অতীসার বা'বে সেরে,  
“সমবাদি” নাম বলে এরে।

বেলগুঠ, বালা, লোধ, ধাইফুল,  
আর নাওগে গজপিনুল,  
আটত্রিশ রতি কর ওজন  
আধসের জল, রাখ আধপোয়া বখন।  
খেতে দাও এই কাথ অতীসারে  
কিবা—এ সকলে শুদ্ধ ক'রে

মধুর সহ করাও লেহন ;  
“বিষাদি” এর নাম করণ।

আমের আঁটির মজ্জা আধ্ভরি  
আধ্ভরি বেলগুঁঠ ওজন করি।  
আধ্ভের জলের আধ্ভপোয়া রাণ,  
ভাল ক’রে তা’র পর ছাঁক।  
‘খই’ আর চিনি মিশাও তা’তে,  
বমন অতিসারে দাওগে খেতে।  
“বিষ্যতা” নাম ইহার,  
এ যোগ জেন মুনি জনার।

সরল কাঠ, দেবদারু, কণ্টকারি  
বৃহতী, গজপিপুল নাও মিশাল করি।  
হলুদ, শুল্কা নাও চাকুলে,  
বেশ্ ক’রে নাও পিষে শিলে,  
খেতে দাও বি মধু দিয়ে,  
জ্বর অতীসার যায় সারিয়ে।  
বাত, কামলা, পাণ্ডুরোগ,  
গ্রহণী সারে—এমনি যোগ।

আতইচ এর গুঁড় মধু সহ  
জ্বর কাশি বমিতে খেতে দেহ।  
কিষা—ইহার সঙ্গে সুতার গুঁড়  
আর কাঁকড়া শূঙ্গী মিশাল কর।  
“শূঙ্গাদি” নাম ইহার হয়  
বাল রোগ যায় সমুদর।

ভিল, বটীমধু পিষে নিয়ে  
মধু আর চিনি দিয়ে,  
রক্তাশায় হ’লে ছেলের  
লেহন করাও—ফল ঢের।

খই, বটীমধু, চিনি মধু  
চেলুনি জলে মিশাও গুঁড়,  
আমাশয়ে গেতে ব্যবস্থা কর,  
শিশুরোগে উপকার বড়।

কাঁকড়াশূঙ্গী, মুতা, পিপ্পল,  
আর আতইচ সমান তুল।  
গুঁড় করে মধু সহ,  
অতীসার বমিতে খেতে দেহ।  
খাস কাসের যত কষ্ট,  
এ যোগেতে হয় নষ্ট।  
“বালচাতুর্ভঙ্গিকা” নাম ইহার  
গুণ জানা আছে বিজ্ঞজন্যর।

বেলগুঁঠ, বালা, লোধ, ধনে  
ধাইফুল, ইন্দ্রযব—সম ওজনে,  
গুঁড় ক’রে মধুর সহ  
জ্বরাতিসারে খেতে দেহ।  
“ধাতক্যাদি” এর কয়  
বমি উপদ্রবও ভাল হয়।

মোরি, পিপ্পল, রসাজন  
কাঁকড়াশূঙ্গী, মরিচ, খই চূরণ  
সমান ভাগে মধুর সহ  
জ্বর কাশি বমিতে খেতে দেহ।

কণ্টকারি ফলের রস বৃহতী নিয়ে  
মধু আর মিশাও দিয়ে।  
স্তন-তৃণ পানে হয় বমন  
সেবন করাও হ’বে নিবারণ।

আম আঁটির শাঁস, সৈন্ধব, খই  
খাওয়া’লে বমি থাকে কই।



• মধু একটু মিশিয়ে নিও  
যখন তখন এর ব্যবস্থা দিও ।

পিপুল মরিচ, চিনি, মধু  
ছোলঙ্গ লেবুর রসে মাড় শুধু ।  
হিক্কা বমিতে দাও এ বোগ—  
আর থাকবে না কোন রোগ ।

ঝাপী টুপরী, আকলাদি মূল,  
জাম, আমের ছাল সমতুল,  
জনন, নাই, তালুতে বেটে  
বমি অতীসারে দাও—যা'বে কেটে ।

কদবেল কাকমাচী, কুল, আমরুল,  
সমান ভাগে কর তুল ।  
বেটে মাখার লেপন কর,  
বমি, অতীসারে—ফল বড় ।

মাসকলাইয়ের ঘূ, পিঁপুল চূর  
মায়ে খেলে ছেলের আম দূর ।

আম, আমড়া জামের ছাল  
অতীসারে দেয় ফল ।

মধু একটু মিশিয়ে নিও,  
জিনিষ ক'টির শুঁড় দিও ।

জীরে, সাদা ধনার শুঁড়  
আমাতিসারে ফল বড় ।

বেল-মূলের কাথ, খই, চিনি  
বমি, অতীসার বার গো জানি ।

ছাগ হুত্ব আর আম ছালের রস,  
শিশুর অতীসার হয় বশ ।

মলবার যদি পাকে ছেলের,  
খাওয়াও শুঁড়া রসাজনের ।

পিপুল, মরিচ, ছোট এলাচ চূরণ  
চিনি, মধু আর সৈন্ধব লবণ,  
ক'রে নিরে এই অবলেহ  
শিশুর মূত্ররোগে খেতে দেহ ।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত ।

## আমলকী ।

আমলকী সুপ্রসিদ্ধি ফল । যখন আম-  
লকী আমাদের গৃহে গৃহে খাদ্য ও ঔষধরূপে  
ব্যবহৃত হইত, তখন আমরা আমলকী বৃক্ষকে  
বহু পালন করিতাম । প্রতাপালিত হওয়ার  
আমলকী বৃক্ষ পুষ্ট বীৰ্য্যবান্ বৃহত্তর ফল প্রদান  
করিত । এখন আমরা না থাকার বনদেশে  
তাহাকে কোড়ে লইয়াছেন । আর আমরা  
আমোপাঙ্গে অবহুসকৃত আমলকী বৃক্ষের হীন-

বীৰ্য্য ক্ষীণ ফল কুড়াইয়া লইয়া তাহার নিকট  
হইতে শাস্ত্রোক্ত গুণাবলীর দাবি করিয়া  
আয়ুর্বেদকে উপহাস করিতেছি । বাঙ্গালা  
দেশের আমলকীকে ম্যাংলেরিয়া ধরিলেও  
এখনও দেশান্তরে সুপুষ্ট বীৰ্য্যবান্ আমলকী  
প্রকৃতিদেবীর কল্যাণে আমাদের পক্ষে দৃষ্টাণ্য  
নহে । আমরা, দেশের চিরোপকারী আমলকী  
বৃক্ষের প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়া এবং

পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমলকীর উপকারিতা প্রচার কামনায় হরীতকীর পর (অগ্রহায়ণ সংখ্যার ১৩০পৃঃ) আজ আমলকীর প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলাম।

আমলকী ঋতুক্রমেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকেই আমলকীর মোরবা, আমলকীর চাটনী ও আচারের আবাদ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ঔষধের জন্ত কাঁচা ও শুষ্ক দুই প্রকার আমলকীই ব্যবহৃত হয়। কাঁচা আমলকী শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে প্রচুর পাওয়া যায়। শুষ্ক আমলকী বেণের দোকানে পাওয়া যায়। চরকের “রসায়ন” পাদ আমলকীর বশোগানে পূর্ণ। “চ্যবনপ্রাশের” নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। এই চ্যবনপ্রাশের প্রধান উপাদান আমলকী। চরকে কথিত হইয়াছে—একদা ঋষিগণ লোকহিতার্থে গ্রাম্যবাস বীকার করিয়াছিলেন। গ্রাম্যবাসে তাঁহাদের বৃদ্ধি মলিন, শরীর অলস ও কান্তি ম্লান হওয়ার তাঁহারা “আমলক রসায়ন” সেবন করিয়া উপশ্চর্য্যার শক্তি ও অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আমলকী, আর কি তুমি সেই পুরাকালের মত ব্রহ্মামৃত পুত হইয়া এই অকাল অরামৃত্যুগ্রস্ত ভারতে দেখা দিবে না?

আমলকী—কষায়, কটু, তিক্ত, মধুর ও অগ্নয়সবিশিষ্ট, রুক্ষ এবং শীতবীৰ্য্য, ইহা অগ্নয়সমুজ্জ্বল বলিয়া প্রকৃপিত বায়ুর প্রশমক, মধুর রসযুক্ত ও শীতবীৰ্য্য বলিয়া পিত্তের এবং কষায় রস বিশিষ্ট ও রুক্ষবীৰ্য্য বলিয়া কুপিত কক্ষের শান্তিকারক, স্তম্ভরাং ইহা মানব-জীবনকে উক্ত ত্রিবিধ মহান্ অন্তরায় হইতে রক্ষা করিয়া সমভাবে পরিচালিত করে, ঔষধার্থে ইহার ফল ও বীজ এবং স্থলনিশেবে পত্র ও

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধ প্রয়োগে ইহার মাত্রা স্বরস (জলভিন্ন রস) ২ তোলা, চূর্ণের পরিমাণ পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। আয়ুর্বেদোক্ত ত্রিফলার অন্তর্গত থাকিয়া এই মহৌষধ গোপভাবে বহুরোগে উপকারী হইলেও কয়েকটা রোগে মুখ্যতঃ ইহার উপকারিতা নিম্নে নির্দেশ করা যাইতেছে।

**জ্বরে**—আমলকী গুলঞ্চ ও ধনের সহিত সমানভাগে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে বাতিক অর নষ্ট হয়, পিপাসায়ুক্ত পিত্তজ্বরে পাচনের মত ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবনে আশু উপকার হয়। দাহযুক্ত প্রবল জ্বরে, মস্তকে রক্ত সঞ্চরণ (congestion) হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও মস্তকে দাহ উপস্থিত হইলে আজকাল বরফ জল কিম্বা ঠাণ্ডা জলের অবধি পটা ও “আইস্ ব্যাগই” তাহার একমাত্র শান্তিকারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ঐরূপ অতিরিক্ত শৈত্য ক্রিয়া অনেক স্থলে নিউমোনিয়া প্রভৃতি উৎকট প্লেগজ ব্যাধির কারণ হইয়া থাকে, ঐরূপ ক্ষেত্রে আমলকী ঘূতে ভাজিয়া কাঁজি কিম্বা তদভাবে আমলকীর রস দিয়া পেষণ করিয়া ভালুতে রগে ও কপালে প্রলেপ দিলে বরফের স্থায় শীতক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে, অথচ অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না, হরিতকী, পিপুল ও চিতার মূলের সহিত আমলকী সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কফ-জ্বর নিবারিত হয়, গুলঞ্চ ও মুখার সহিত আমলকী সিদ্ধ করিয়া পান করিলে চতুর্থক (দুই দিন ছাড়া) জ্বর নিবারিত হয়, বিসর্প জ্বরে আমলকীর রস গব্য ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জ্বরের শান্তি হয়, এক ভাগ আমলকী ও চারি

ভাগ মুগের, ডাইল আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া দুই ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে, সেই মুগের বৃষ বাতিকের, পৈত্তিক জ্বর ও বাত-পৈত্তিকজ্বরের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ ও পথ্য হইবে।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুজনিত মলবদ্ধতায় ও পেট ফাঁপায় কিঞ্চিৎ তেউড়ী চূর্ণের সহিত আমলকীর রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।  
**অশ্বরোগে**—আমলকী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মৃত্তিকা নির্মিত কোন পাত্রে অত্যন্ত লেপন করিবে, তৎপর সেই পাত্রে ঘোল বাখিরা পান করিলে উপকার হয়, অতি-সারে আমলকী আঙ্গুর ও মধুর সহিত উত্তম-রূপে পেষণ পূর্বক সরবত্ প্রস্তুত করিয়া পানীয়রূপে ব্যবহার করার উপকারিতা দর্শনে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও মুগ্ধ হইয়াছেন।

**পিত্তশূলে**—আমলকীর রস চিনির সহিত পান করিবে।

**বকাশে**—আমলকীচূর্ণ দুগ্ধ সহ পাক করিয়া ঘূতের সহিত সেবন হিতকর, (২) দুই তোলা আমলকী চূর্ণ, দেড় পোয়া জল ও আধ পোয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করতঃ আধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে সহ মত আধ তোলা কিষা ১ তোলা গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উপকার হয়।

**হিক্কাহ**—আমলকী এবং কয়েক বেগের রস পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনে উপকার দর্শে।

**বাতিক বমন**—আমলকীর রসে খেচন্দন বসিমা গাঢ় হইলে কুল প্রমাণ তাহার বটা প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত সেবন অমোঘ প্রতিকারক।

**রক্তশিশি**—নাসিকা হইতে রক্ত পতন নিবারণের জন্য শুষ্ক আমলকী ঘূতে

ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্বক মস্তকে প্রলেপ দিবে।

**বাতরক্ত**—আমলকীর রসের সহিত পুরাতন ঘৃত পান করিবে। (২) খদির কাঠ (খয়ের কাঠ, বেনে দোকানে পাওয়া যায়) ১ তোলা ও শুষ্ক আমলকী ১ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিবে।

**প্রমেহ**—হবিষ্যার ভোজন পূর্বক আমলকী অধিক মাত্রায় ভোজন করিবে, (২) প্রস্রাবের বন্ধনায় অধিক পরিমাণ আমলকীর রস সেবনে আশু উপকারক (৩) ইক্ষুরসের সহিত আমলকীর রস সমভাগে সামান্য মধুর সহিত পান করিবে। ইহাতে অতিশয় বন্ধ দায়ক সরল মূত্র নির্গমন ও মূত্ররোধ নিবারিত হয়। প্রস্রাব অল্প অল্প হইলে কিষা বদ্ধ হইলে আমলকী বাটা তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়। (৪) মধুর সহিত আমলকীর রস সেবন প্রমেহে উপকারী।

**মূত্ররোধ**—আমলকী জলে পেষণ পূর্বক নাভির নিম্নদেশে প্রলেপ দিবে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন।

**শোথ**—আমলকীর রস তেউড়ী চূর্ণের সহিত পান করিবে।

**শীতপিত্ত রোগে**—চর্ম্মের উপর বোলতা দংশনে যেক্রপ ঢাকা ঢাকা কোলা হয়, সেক্রপ হইলে) আমলকী চূর্ণ পুরাতন ইক্ষু-গুড়ের সহিত সেবন করিবে। পুরাতন গুড়ের অভাব হইলে নুতন ইক্ষুগুড় ১০১২ খণ্ডী মোড়ে ওকাইয়া লইবে। ইহা বীণ্যবর্জক এবং চক্ষুরোগের উপকারক, রক্তপিত্ত দাহশূল ও মূত্ররুদ্ধ রোগেও উপকার করিয়া থাকে।

**শ্বেত প্রদর**—আমলকীর চূর্ণ  
কিষা রস মধুর সহিত সেবন করিবে। (২)  
আমলকীর বীজ উত্তমরূপে পেঘণ পূর্ষক চিনি  
ও মধুর সহিত সেবন করিবে।

**ষোনিদাহ**—আমলকীর রস চিনি  
সহ পান করিবে।

**শিরঃক্ষতে**—আমলকী চিনি ও  
স্বতের সহিত পেঘণ করিয়া মস্তকে লেপন  
করিবে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ  
আমলকী, কুড়ুন ও নীলোৎপল (নীল হুদি)  
গোলাপ জলের সহিত উত্তমরূপে পেঘণ  
করিয়া শিরঃপীড়ায় দিতে বলেন।

**চোখ উঠায়**—অপক আমলকীর  
রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিলে যন্ত্রণা ও লোহিত্য  
নিবৃত্তি হয়।

**চুল উঠায়**—আমলকীর রসের  
সহিত তিলতৈল পাক করিয়া, শীতল হইলে  
কেশে মাখিবে। ইহাতে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও  
চিকণ হয়।

**বমনে**—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন  
বর্ষণ করিয়া গাঢ় করিবে, আমলকীর মত এক  
একটা বাটকা করিয়া, মধু সহ লেহন করিলে  
বায়ু জন্ম বমন আরাম হয়।

**শিশুর চর্মরোগে**—শিশুর  
“বিখাজ” “কাউর” হইলে শুক আমলকী গুঁড়া  
করিয়া গোমুত্রে ৭ বার “ভাবনা” দিবে, পরে  
উহা বড়ির মত করিয়া শুকাইয়া রাখিবে—  
এই ঔষধ গোমুত্রে বসিয়া লাগাইবে—ইহাতে  
কোন জালা যন্ত্রণা নাই—অথচ ফলপ্রসূ।

**শিরঃপীড়ায়**—শুক আমলকী,  
গোলাপের কুড়ি, জাকরাণ গোলাপ জলে  
বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে বায়ু জন্ম মাথা-  
ধরা আরাম হয়। আমলকী বৃক্ষের শাখা  
বোলাজলে ডুবাইয়া রাখিলে জল নিষ্কল হয়।

কবিরাজ—

শ্রীহরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

## স্নেহন ও স্নেদন বিধি।

দ্রুত।

দ্রুত—বায়ুপিত্ত হয়; রস শুক্র আর,  
ওজ পদার্থের হয় হিতৈষী আবার;  
অগ্নিদাহ গাত্র জালা শাস্তি প্রদায়ক।  
কোমলভরকর, স্বর-বর্ণ প্রসাদক ॥  
বাতপিত্ত রোগ, সেই প্রকৃতি বাহার,  
দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করা অতিপ্রায় যার;  
ক্ষত-ক্ষীণ রোগী, বৃদ্ধ, বালক, দুর্বল,  
সুখর-দীর্ঘায়ু যেরূপ চাহে বর্ণ, বল;  
পুষ্টি, সৌকুমার্য, ওজ যাচে যে সন্তান,  
অতি, মেধা, বুদ্ধীশ্রিয়, অগ্নি বলবান;  
যারা দাহ, শত্রু, বিষ, অনলে পীড়িত।  
তাহাদের পক্ষে হয় দ্রুত পান হিত ॥

তৈল।

তৈল বায়ু হয়; শ্লেষ্ম-বল-বিবর্জক,  
দ্রব হিত, উষ্ণশক্তি, বোনি বিশোধক;  
বিশেষত শরীরের দৈর্ঘ্যতা কারক ॥  
যাহাদের কফ আর মেদাধিক্য হয়,  
গলা ও উদর স্থল, চক্কাতিশয়;  
বাত ব্যাধিগ্রস্ত, বায়ু প্রকৃতি বাহার,  
শরীরের বল তহু লঘু দুঢ় আর,  
হির গাত্র করিবারে আকাঙ্ক্ষা বাহার;  
চর্মে সাদ স্নিগ্ধ, তরু, মন্থণ্য যার;  
ক্রিমি, ক্রুর কোষ্ঠ, নালীকতে যে পীড়িত।  
তৈলাভ্যস্ত শীতকালে তৈল-পান হিত ॥

বসা ।

বাতাউপদহ, রুদ্ধ দেহ-খাতু বার,  
রুদ্ধ হয় তার বহি পথপ্রমে আর ;  
রেতঃ, রক্ত, কফ, মেদ শুষ্ক দ্বার হয়,  
অস্থি, সন্ধি, শিরা, ঋয়ু, মর্মে শূল রয় ;  
যাদের ইঞ্জির-স্রোতমহাবাতাবৃত,  
অগ্নিবল-অভ্যন্তরে বসাপান হিত ॥

মজ্জা ।

দীপ্তাগ্নি বিশিষ্ট, ক্রেশ সন্ধি আবার,  
বহভোজী, মেহাভ্যস্ত, বাতব্যাদি বার ;  
কুর কোষ্ঠ বাহাদের ; মেহ যোগ্য যদি ।  
তাহাদের পক্ষে হয় মজ্জা পান বিধি ॥

শ্বেদন বিধি ।

তাপ, উষ্ণ, উপনাহ, দ্রব চতুষ্টয় !  
শ্বেদের প্রকার ভেদ, বায়ুনাসী হয় ॥  
বিশেষত তাপ উষ্ণ শ্বেদে কফ নাশ ।  
উপনাহে বায়ু, দ্রবে পিত্তের বিনাশ ॥  
বনবান, উৎকট ব্যাধি প্রণীড়িত ;  
শীতকালে মহাশ্বেদ হইবে বিহিত ॥  
দুর্দল ব্যক্তির পক্ষে স্বল্প শ্বেদ দিবে ।  
মধ্যমাবস্থায় মধ্য শ্বেদ আচরিবে ॥  
কক্ষ কোপে রুদ্ধ শ্বেদ, বাত শ্লেষ্ম রোগে  
রুদ্ধ স্নিগ্ধ দুইরূপ শ্বেদই প্রয়োগে ॥  
কক্ষ-মেদ কৃত বাত অবরুদ্ধ হ'লে,  
উষ্ণগৃহ, রৌদ্রসেবা, যুদ্ধোৎসাহ বলে ;  
পপ পর্যটন, গুরু আবরণ গায়,  
চিন্তা ও ব্যায়াম তার বহিবেক তায় ;  
নস্ত, বস্তি, শোথনাদি হ'লে প্রয়োজন,  
অগ্রে শ্বেদ বিধি তাহা রাখিবে স্মরণ ॥  
ভগন্দর, অগ্নরী ও অর্শরোগ জরে,  
শস্ত্রকর্ম পরে শ্বেদ প্রয়োগ অতরে ॥  
শুভ গর্ভ শল্যোদ্ধারে, কালে বা অকালে,  
প্রসবান্তে শ্বেদ বিধি সকলেই পালে ॥

ভুক্ত পরিপাক অস্তে, বায়ুশূন্য স্থান ।  
সর্ববিধ শ্বেদ বিধি জানিবে সন্ধান ॥  
মেহ সিক্ত জলে শ্বেদ প্রদান করিলে,  
ঋতুগত দোষ তার দ্রবীভূত হ'লে,  
কোষ্ঠ অভ্যন্তরে তাহা করিয়া প্রবেশ,  
বিনেচিত হ'য়ে থাকে জানিবে বিশেষ ॥  
শরীরেতে শ্লেহ নাথি, আর্দ্রবস্ত্র দিয়া,  
আবরিয়া চক্ষুদ্বয়, শ্বেদ প্রদানিয়া,  
রোগীর হৃদয়ে পরে শীতল স্পর্শন ।  
করাইবে, ইহা বেন নহে বিস্মরণ ॥  
অজীর্ণ, দুর্দল, মেহ, ক্ষতক্ষণ রোগে ;  
গর্ভিণী, তৃষ্ণার্জ জনে শ্বেদ না প্রয়োগে ।  
অতিদার, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু ও উদর,  
মেদ রোগে শ্বেদ নাহি হয় হিতকর ।  
ইহাদের শ্বেদে রোগ অসাধ্য হইবে ।  
নতুনা শরীর ক্রমে বিনাশ পাইবে ॥  
যদিও একান্ত শ্বেদ হয় বিবেচিত ।  
মৃদু শ্বেদ দান তারে করিবে নিশ্চিত ॥  
হৃদয়, নয়ন, মূত্র, শ্বেদ দিতে হ'লে ।  
মৃদু শ্বেদ বিধি তার জানিবে সকলে ॥  
অতিরিক্ত শ্বেদ দিলে সন্ধি পীড়া হয় ।  
দাহ, তৃষ্ণা, ক্রান্তি, ভ্রান্তি, রক্তপিত্তাময়,  
পীড়কাদি উপদ্রব হ'লে উপস্থিত ।  
করিবেক শীতল ক্রিয়া তাহাতে নিশ্চিত ॥

তাপশ্বেদ ।

অলভক দ্বারা দেহ করিয়া বেটন,  
অগ্নিসিক্ত বায়ু, বস্ত্র, হস্তে বা কখন ।  
উষ্ণ করি সেই শ্বেদ করিবে প্রদান ।  
তাপ-শ্বেদ নামে তাহা হয় অভিধান ॥

উষ্ণশ্বেদ ।

বাতনাসী দ্রব-কাথ-রসাদি পুরিয়া,  
উষ্ণকটে একপার্শ্বে ছিত্রেক রাখিয়া,

ধাতু কিম্বা কাঠনল হাতেতে পুরিবে ।  
 ষড়ঙ্গুলী মুখ, দীর্ঘ দ্বিহস্ত করিবে ॥  
 ক্রমশ গোপুচ্ছাকৃতি যুদ্ধ অগ্রভাগ,  
 শ্বেদ সৌকার্যার্থে নল হবে তিন ভাগ ।  
 বাত রোগাক্রান্ত জলে তৈলাদি মর্দিয়া,  
 আসনে বসাবে গুরু বস্ত্রে আবরিয়া ॥  
 হস্তিগুণ্ডিকাখ্য নল করিয়া ধারণ ।  
 শ্বেদ প্রদানিবে পরে হ'য়ে একমন ॥  
 দেহ পরিমাণ ভূমি করিয়া মার্জন ।  
 তৎপরে খঁদির কাঠ করিয়া দাহন ॥  
 দ্রব কঁজি দ্বারা তাহা কলি অভ্যক্ষণ,  
 করিবে বাতয় পত্রে ভূমি আচ্ছাদন ।  
 করাইয়া তত্পরি রোগীকে শয়ন ।  
 মাষাদি দ্বারায় শ্বেদ করিবে তখন ॥

### উপনাহ শ্বেদ ।

কঁজি দ্বারা বাত হর ঔষধ পিষিয়া,  
 মুন, স্নেহ, ছত্ৰ, মাংসরস মিশাইয়া ;  
 বাত-রোগী অঙ্গে উষ্ণ করিয়া লেপন,  
 উপনাহ শ্বেদ তায় করিবে তখন ।  
 অথবা আত্মপ-গ্রাম্য মাংসরস আর,  
 জীবনীয়গণ, দধি, সৌবীৰ্য আবার,  
 দ্রব, বীরতরু আদিগণ সম্মিলনে,  
 পূর্কোক্ত বিধানে শ্বেদ দেয় কোনজনে ॥  
 গোধূম, সর্ষপ, তিল, কুলথকলায়,  
 দেবদারু, সেকালিকা, তিসি, মাষকলায়,  
 শলুফা, স্থলজীরক, ভেরেণ্ডার মূল,  
 জীরা, বায়া, মোরী, মূলা, শজিনা, শিপুল  
 বাবুইতুলসী, কঁজি, গাঁদাল, দৈন্দব,  
 অশ্বগন্ধা, দশমূল, বেড়োলা এসব,  
 গুড়চুটী, বানরীবীজ, যত পাওয়া যায় ।  
 কুটিত করিয়া সিদ্ধ করিয়া তাহার ;

অতঃপর বস্ত্রখণ্ডে বান্ধিয়া লইবে ।  
 ঈষদ্বষ্ণ অবস্থায় শ্বেদ প্রদানিবে ॥  
 এ মহাশায়ন শ্বেদ নামে অভিহিত ।  
 সর্গবিধ বাত এতে হয় অন্তর্হিত ॥  
 কঁজিতে পেষণ করি উষ্ণ অবস্থায়,  
 কিম্বা সিদ্ধ, বস্ত্রে বান্ধি শ্বেদ দিবে তায় ॥

### দ্রব শ্বেদ ।

বাতহর দ্রব্য-কাথে, কটাহ বা দ্রোণী  
 পূর্ণকরি বসাইবে তাতে রোগী আনি ।  
 আকর্ষ মগন করি রাখিবে তাহার ।  
 দ্রব শ্বেদ কচে তাহে কহিহু তোমায় ॥  
 দ্রোণটী স্রবণ, রোপ্য, তাম্র, লৌহ, কিরা,  
 কাঠ দ্বারা চতুষ্কোণ প্রস্তুত করিয়া ।  
 ছাব্বিশ অঙ্গুলী দীর্ঘ, প্রস্থ, উর্দ্ধে হবে ।  
 অথচ মক্ষণ তাহা অবশ্যই হবে ॥

### পক্ষান্তরে ।

নাভি উর্দ্ধে ষড়ঙ্গুলী নিমগ্ন করিয়া,  
 বসাইবে, উষ্ণ কাথ ধারায় ঢালিয়া,  
 স্বকদেশে যতক্ষণ দ্রোণী পূর্ণ নয়,  
 ততক্ষণ ধারাপাত করিবে নিশ্চয় ।  
 অবগাহনের বিধি মুহূর্ত চতুষ্ঠয়,  
 অথবা আরোগ্য চিহ্ন যবে দৃষ্ট হয় ।  
 তৈল, ছত্ৰ কিম্বা ঘূতে শ্বেদ প্রদানিবে ।  
 দুই একদিন পরে স্নেহ আচরিবে ॥  
 লোমকূপ, শিরামুখ, ধমনী দ্বারায়,  
 স্নেহ পশি দেহ মধ্যে বল, তৃপ্তি পায় !  
 জল সিক্তে বীজাকুর বন্ধিত যেমন ।  
 স্নেহ সিক্তে ধাতু বৃদ্ধি হইবে তেমন ॥  
 দ্রব শ্বেদ তুল্য হেন বাত বিনাশক ।  
 উপায় কিছুই নাই জানিবে ভিষক ॥  
 শীত, শূল, শুষ্ক, দেহ গুরুত্ব হরিলে,  
 শ্বেদ সঞ্চারিবে মুদ্র অগ্নি উত্তেজিলে ॥

## অরিষ্ট প্রকরণ ।

অরিষ্ট কাহাকে বলে, যে সকল লক্ষণ দেখিয়া মনুষ্যের ভাবী মরণ নিশ্চয় করা যায়, তাহাদিগকে অরিষ্ট লক্ষণ বলে । কি স্তম্ভ শরীরে, কি রুগ্নাবস্থায় সকল সময়েই মৃত্যুর পূর্বে এই সকল লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে । এমন কি, মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বেও এই সকল লক্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে । রুগ্নাবস্থায় এই সকল অরিষ্টদ্বারা রোগের অসাধ্যতা বোধ হইয়া থাকে । এই সকল অরিষ্ট লক্ষণ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মানসিক বৃত্তিনিচয়ে, চক্ষুর্গাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, হস্তপদাদি কর্ষেন্দ্রিয়ে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে, স্বপ্নযোগে, শরীরের মর্শস্থানে নিমিত্তসকলের প্রাতিভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে । শরীরের কোন স্থানে কিরূপ ব্রণ, ব্যঙ্গ, তিলকালক বা পীড়কাদির আবির্ভাব হইলে স্তম্ভশরীরীর মৃত্যু অনিবার্য, কিরূপ স্বপ্ন দেখিলে স্বপ্নদর্শনকারীর আয়ুর্কাল নিশ্চেষিত হয়, অথবা গুল্ম বা উৎকট রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে গুল্মরোগী কিরূপ স্বপ্ন দেখে; চক্ষুর্গাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও হস্তপদাদি কর্ষেন্দ্রিয়ের কিরূপ বিকৃতিতে আয়ুর্কিঁষাতক চিহ্ন উপস্থিত হয়, জ্বরাদি রোগে মস্তকের সীমস্তে, দস্তে বা নাসিকাদি প্রদেশে কি কি লক্ষণ উপস্থিত হইলে জ্বরাদিরোগ অসাধ্য হইয়া ভাবী মরণের স্থচনা করিয়া থাকে, আসন্ন মৃত্যুকালে বা মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে শব্দস্পর্শাদিতে বা ভাঙীর কিরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে, এই সকল বিবরণ বিস্তৃত ভাবে আয়ুর্কর্মীর গ্রন্থসকলে বর্ণিত আছে । মহামতি চরক ইন্দ্রিয়স্থানে এই অরিষ্ট প্রকরণ সম্বন্ধে বর্ণিত করিয়াছেন ।

ইন্দ্রিয়ের (ভূষালাবৎ) যুগপৎ উদ্ভিত বৃত্তিকে জীবন বা আয়ু বলে । সুতরাং ইন্দ্রিয়স্থানই যথার্থ আয়ুর্বিজ্ঞান বা আয়ুর্কর্মদ । এই ইন্দ্রিয়স্থানে বা অরিষ্টসকলে জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে বৈজ্ঞ কখনই বৈজ্ঞপদবাচ্য হইতে পারেন না । পৃথিবীর অপর কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে এই অরিষ্টজ্ঞান অথচ রোগসকলের এইরূপ সাধ্যাসাধ্য যাগ্যাদি নির্ণীত হয় নাই । সুতরাং এইটাই আয়ুর্কর্মের বিশিষ্টতা, শাস্ত্রকারকগণ এই সকল মরণজ্ঞাপক চিহ্নগুলির অব্যর্থতার উপর এতটা আস্থা বান্ধে, তাহারা বলেন যে, স্থলবিশেষে ধূম দেখিলে বহ্নির অহুমান বৃথা হইতে পারে, অথবা স্থলবিশেষে পুষ্প দেখিয়া ফলের অহুমানও বৃথা হইতে পারে, কিন্তু অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়াছে, অথচ মৃত্যু ঘটে নাই, এরূপ স্থল কুত্রাপিও দেখা যায় না । অরিষ্টচিহ্ন দেখা দিলে মৃত্যু অনিবার্য, বিশিষ্ট-সুপ্রযুক্ত চিকিৎসাও সে মৃত্যু নিবারণে সক্ষম নয় । গুল্মবান্ধু ভিষক অথবা উপহ্বাতা কেহই তখন কার্যক্ষম হয় না । একমাত্র দৈব বা তপস্তা ব্যতীত আর কাহারও সে মৃত্যু নিবারণে ক্ষমতা নাই ।

অরিষ্ট উত্তামের প্রস্তোতন । এই অরিষ্টের বিষয় জানা থাকিলে যোগী আপনাদি মৃত্যু নিকটবর্তী জানিয়া যোগকার্যে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন । ভোগী বা বিষয়ী তাহার মৃত্যুর পূর্বে আপনাদি বিষয় কার্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন । চিকিৎসক রোগ অসাধ্য জানিয়া চিকিৎসাকার্য হইতে বিরত থাকিয়া রোগের শান্তিব্যতীর্ণনের পরামর্শ দিতে পারেন; গৃহস্থকে চিকিৎসার ভয় দেন

প্রাণে মজিতে হয় না। এবং রোগীও তীব্র ঔষধাদি সেবনের যত্নগা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শান্তমনে ধ্যানধারণার অথবা তীর্থক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। হিন্দুর পক্ষে মরণ দিনের জ্ঞায় পুণ্যজনক, মহাফলপ্রসূ দিন আর নাই। সেই মহাপ্রস্থান দিনে হিন্দু দান ধ্যান করিতে পারিলে আপনাকে সফল-জন্মা ও কৃতকৃত্য বোধ করিয়া থাকেন। এবং যে বৈজ্ঞ তাহা পারেন, তিনি তাঁহাকে আচার্য্যবৎ পরমোপকারী বক্তৃতা জান করিয়া থাকেন। হিন্দুর জগতপ সকলই সদৃশতির জন্ত, সজ্ঞান মৃত্যুর জন্ত; এই সজ্ঞান মৃত্যুর জন্তই ঋষিগণ তপোবলে অরিষ্ট বিজ্ঞানের আবিষ্কার করিয়াছেন। পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে এ জ্ঞান নাই। কোন জাতির জন্মজন্মান্তরে বিশ্বাস নাই।

যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে জীব অন্তকালে কলেবর ত্যাগ করে, সেই ভাবানুসারেই পরকালে তাহার গতি হয়; হিন্দুশাস্ত্রের প্রেরণা এইরূপ। সুতরাং এই অরিষ্টবিজ্ঞান হিন্দুর পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় পদার্থ। এই অরিষ্ট জ্ঞানের আলোচনায় এই শব্দবিজ্ঞান বা স্বপ্নবিজ্ঞানের আলোচনায় আপামর সাধারণেরও ঔষধ ও চিকিৎসার প্রতি একান্ত নির্ভরতা কমিয়া গিয়া জীবনীশক্তি বা আয়ুর স্বতন্ত্রতা ও জন্ম-জন্মান্তরে বা দৈবের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। কোথাও কিছু নাই, কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধে একটা লোক যেমন আহারবিহারাদি স্বাস্থ্য বৃদ্ধির-অমূল্যলব্ধ করে, নিতাই সেইরূপ স্বাস্থ্যচর্যা করিতেছে, শরীরের কোন গ্লানি নাই, অথচ তাহার নাসাদও হঠাৎ

একটা গৃধ্র আসিয়া বসিল এবং এই ঘটনার ২৪ দিন পরে কোন উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইয়া তাহাকে মৃত্যুমুখে নীত করিল, ইহা দেবিতা সাধারণ লোকে কে না বিচার করিতে পারে যে, আয়ু বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, যাহা ঐহিক আহারবিহার, চিকিৎসাদি কোন কর্ম্মের অধীন নয়। যাহার অন্তঃস্থলে দৈবই বলবৎ কারণ। যাহার অন্নপানীয়ে ঘৃণ, কেশ, কীট, নখ, লোম প্রভৃতি নিয়তই পরিশুদ্ধ হয়, সে ব্যক্তি অসাধ্য রাজস্বাস্থ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কে না স্থির করিতে পারে যে, ঐ সকল ঘৃণাদি জীবাণু দৈব কর্তৃকই রাজস্বাস্থ্য রোগীর অন্নপানীয় দূষিত করিবার জন্ত প্রেরিত হইয়াছে।

রাজস্বাস্থ্য উৎপত্তির পূর্বে জীবাণু কর্তৃক অন্নপান দূষিত হইয়া থাকে, ছাগদ্বারা আক্রান্ত হইলে যক্ষ্মাবীজাণু কর্তৃক আক্রান্ত স্থানের শুদ্ধি হয়, যে অরে মস্তকে সীমন্ত (সিঁধি) বা বক্ররেখা দেখা যায়, সে অর অসাধ্য, অল্পে স্বর্ঘ্য দর্শন হইলে যে অতি গুরুতর রোগও আরোগ্য হয়, ছায়া বা কাস্তি দেবিতা যে রোগীর শুভাশুভ বলা যাইতে পারে, ইত্যাকার জ্ঞানসকল আলোচনা করিলে মন বিশ্বাস-রসে পরিপ্লুত হয় এবং এই সকল জ্ঞানের আবিষ্কারক ঋষিগণের চরণতলে আশ্রয়লি দিলেও মহাশয়সমাজ তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এ বিষয় প্রতীতি হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদের আলোচনায় বিশেষতঃ অরিষ্টজ্ঞানের আলোচনায় স্পষ্টই অমূল্য হয় যে, আদিজ্ঞান বা বেদ কি অনন্ত কি মহা-মহিম-শক্তিশালী এবং ঐ বেদভ্রষ্টা ঋষিগণের কি বেদোচ্ছল বুদ্ধি। বহু বলিয়াছেন, বহু-



মূল্যী সংযতাত্মা ঋষিগণ তপোবলে সচরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পান, তাঁহারা তপোবলেই ঔষধশাস্ত্রে বিষচিকিৎসা প্রভৃতি জ্ঞানসকল আবিষ্কার করিয়াছেন। হেতু শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া ঋষির্বােক্যের প্রতি সন্দিহান হইতে নাই। বাস্তবিকও আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রসকল যে অলৌকিক জ্ঞানপ্রসূত, উহা যে পরীক্ষালব্ধ হইতে পারে না, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। ভাবিয়া দেখ, আমরা এই যে প্রতিদিন অন্নব্রাহ্মণাদি উপভোগ করিতেছি, আমাদের এই ভোজনবিধি কি সামান্য জ্ঞানমূলক? আজও পাশ্চাত্যজগৎ শিশু-খাত্ত করুণ হওয়া উচিত, তাহার গবেষণা করিতেছে, কিন্তু আমাদের অন্নপ্রাশন সংস্কার সেই বৈদিক যুগের। তণ্ডুল, তিল, যবের আবিষ্কার অথবা হরিজ্ঞা যে পচন নিবারক, এই সকল আবিষ্কারকি অদ্ভুত বিজ্ঞানমূলক নয়? পৃথিবীতে কোটি কোটি বৃক্ষ লতা ও ওষধি আছে, তন্মধ্যে ধাত্তের স্তায় এমন একটা শস্ত্রের আবিষ্কার বাহা প্রতিদিন খাইলে অরুচি ও বাস্ত্য নষ্ট হইবে না, অথচ দেখে বলা-ধান ও জীবন রক্ষা হইবে, ইহা কি যুগযুগান্তরের পরীক্ষাবলে নিষ্পন্ন হইতে পারে? আমাদের আহারের বিধি, শয়নবিধি, গর্ভাধানাদি সংস্কারবিধি, আমাদের আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসা প্রভৃতি সমুদয়ই বেদমূলক ও অতীন্দ্রিয়, একথা আমরা অপর প্রসঙ্গে নিরূপণ করিব। পরন্তু এই নাড়ীজ্ঞান বা অরিত্তজ্ঞান যে তপস্তাপ্রসূত, ইহা আমরা এই প্রসঙ্গে ক্রমশঃ দেখাইতে চেষ্টা করিব। নাড়ীজ্ঞান সত্বকে মহর্ষি কণাদ নিজেই বলিয়াছেন যে, অন্ন গুণ্যে লোকে নাড়ী পরিচর লাভ করিতে পারে না। যোগাত্ম্যাসের

তায় একাগ্রচিত্তে ইহার জ্ঞাত তপস্তা করিতে হয়।

পবন্য দুঃখের বিষয় এই যে, অরিত্ত-জ্ঞান বা নাড়ীজ্ঞানের চর্চা বৈষ্ণবসমাজ হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে চলিল। আয়ুর্বেদে আছে যে, শাস্ত্রদ্বারা হিতায়, অহিতায়, স্থপায়, ও দুঃখায় এবং আয়ুর মান প্রভৃতি জানা যায়, তাহাকে আয়ুর্বেদ বলে। রক্তসার, শুক্রসার, মেদঃসার প্রভৃতি সার অথবা ব্রাহ্মসত্ত্ব, পিণ্ডসত্ত্ব, গন্ধর্ব্বসত্ত্ব ও সাত্ব্যাদি নানা বিবেচনায় আয়ুর পরিমাণ বা জীবনী-শক্তির উৎকর্ষাপকর্ষের কথা আয়ুর্বেদে লিখিত হইয়াছে, তথাপি এই অরিত্তজ্ঞান আয়ুর মান জানিবার বিশেষ উপায়। অগ্রে আয়ু বা জীবনীশক্তির পরীক্ষা না করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলে ঔষধ-ব্যাপত্তি ঘটে বলিয়া আয়ুর মান জানাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। অরিত্তলক্ষণদ্বারা, নাড়ী দেখিয়া রোগের সাধাসাধ্য নির্ণয় করিয়া তবে চিকিৎসাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ঔষধ বল, চিকিৎসা বল, রোগীর জীবনী-শক্তি না থাকিলে কিছুতেই কিছু হয় না। বরঞ্চ জীবনীশক্তির হাসাবস্থায় ঔষধাদির প্রয়োগ বিপরীত ফলজনক হইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল কল্পজন কবিরাজ আয়ু পরীক্ষা করিয়া তবে ঔষধাদি প্রয়োগ করেন, আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার আজও এই সংস্কার আছে যে, অরিত্তজ্ঞান বা নাড়ী-জ্ঞানশূন্য কবিরাজ কবিরাজই নহেন। কিন্তু আজকাল কল্পজন কবিরাজ অরিত্ত দেখিয়া বা নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসা করেন। অথবা নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্মীলন করিতে পারেন? বড় বেশী দিনের কথা নয় যে

পূর্বে এদেশে এমন সব শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়গণ বিস্তারিত ছিলেন; বাঁহারা নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতেন, বাঁহারা অরিষ্ট দেখিয়া মৃত্যুর একমাস পূর্বে রোগীকে তীর্থধামে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বাটীর প্রাচীনা গৃহিণীগণেরও নাড়ীজ্ঞান বা অরিষ্টজ্ঞান বোধ ছিল। কিন্তু হায়! এক্ষণে সে বৈজ্ঞানিক নাই, সে রোগীও নাই। রোগী কতকদণ্ডের মধ্যে মরিয়া যাইবে—রোগী শয্যাকণ্টক অবস্থায় বাতনার ছটকট করিতেছে, অথবা রোগীর নাভিখাস উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়েও বাতনার উপর বাতনা—অরিষ্টজ্ঞান অভাবে ডাক্তার বা কবিরাজ মহাশয় হয়তো রোগীর গুহুঘর দিয়া পিচকারী দিতে বসিয়াছেন, অথবা রোগীর মৃত্যুখাস বুঝিতে না পারিয়া তাহার বুকের বড় বড়ানির জন্য মালিস দিতে বলিতেছেন। ডাক্তারি চিকিৎসার এ জ্ঞান না থাকিতে পারে, ডাক্তারি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার আকাশপাতাল প্রভেদ। কিন্তু ডাক্তারি চিকিৎসাকে পরম সত্যবোধে নাড়ীজ্ঞান বা অরিষ্টজ্ঞানকে মিথ্যাবোধ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকমহাশয়েরা থার্মোমিটার ও টেম্পেরোমিটার ব্যবহারে আপনাদিগকে মহাগৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, এইটা বিবম ছঃখের কথা; ডাক্তারেরা তো পূর্বজন্ম, পরজন্ম, আত্মা এসব কিছুই মানেন না। তাঁহারা আয়ু কি আজও তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই বলিয়া অত্যাধি তাঁহাদের চিকিৎসাশাস্ত্রকে তাঁহারা ভৈষজ্য-বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আজও রোগের সাধ্যসাধ্য বা বাধ্যত্ব স্বীকার করেন না। রোগ আরোগ্যের পক্ষে কাল যে একটা বলবত্তর কারণ, একথাও তাঁহারা

ততটা মানেন না। সকল রোগকেই সাধ্য মনে করিয়া ভৈষজ্যবিজ্ঞান বলে তাঁহারা পুরুষ-কার প্রদর্শন করিতে যান। “জাত্যায়ুঃ ভোগবিপাকাঃ” পূর্বপূর্বজন্মের কর্মফলে যে জন্মভোগ ও জীবনৌশক্তি বিধৃত থাকে—প্রজ্ঞাপ্রদায় যে সকল রোগের কারণ, অথবা আধ্যাত্মিক নিয়ম বলে যে রোগ সকল সারিতে পারে, একথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের চিকিৎসা হেতুশাস্ত্রমূলক। সুতরাং নিম্নতর পরিবর্তনশীল। অন্ধকারে হস্তোপচারে গমনশীল হাতুড়িয়ার তায় তাহারা এযাবৎ পরীক্ষারাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসার ভিতর অরিষ্টের কথা নাই, নাড়ীবিজ্ঞান নাই, দৈবব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা নাই বলিয়া উহা-দিগকে অনাবশ্যকীয় বোধে আমরা যদি উহাদের অহুশীলন না করি, তাহা হইলে আমরা কি প্রকারে বেদবিদ্যাসী বলিয়া পরিচয় দিব, এই যে কণিকাতা সহরে আজ-কাল অনেক মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিরাজ করিতেছেন, কৈ, বল দেখি নাড়ী দেখিয়া সময় বুঝিয়া তাঁহাদের মধ্যে কয়জন রোগীর গল্গাঘাতের কাল নিরূপণ করিতে পারেন? কয়জন কবিরাজই বা লক্ষণদৃষ্টে রোগ অসাধ্য বুঝিয়া রোগীর আত্মীয়স্বজনকে শাস্তি-সন্তান হোমাদি দৈবব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন? আয়ুর্বেদের নিদান স্থান, আয়ুর্বেদের বিমানস্থান, আয়ুর্বেদের শারীরস্থান, আয়ুর্বেদের বায়ু, পিত্ত, কফ এবং উহাদের প্রকোপ প্রভৃতি অহুশীলন করিলে বুঝা যায় যে, আমাদের এই অল্প কিছু নূতন আরম্ভ হয় নাই এবং আমাদের রোগ ও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতির উপায় এই কালে

আরম্ভ হয় নাই, কত জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি  
দ্রুতি অনুসারে এই শরীর ধারণ ও এই  
শরীরের ব্যাধি বিমোচন উপায়সকল সৃষ্টির  
জ্ঞানাদিই প্রযুক্ত নিত্য। বায়ু পিত্ত, কফরূপী  
দেবত্রয় এই দেহে অবস্থান করিয়া জীবের  
সুখ, দুঃখ বিধান করিতেছেন, পূর্ণরূপের  
কণ্ঠবিপাকে মহাপাতক, অতিপাতকাদি  
পাপের জন্ত ইহজন্মে রাজঘন্টা, কুষ্ঠ, অর্শঃ,  
ভগন্দরাদি রোগ হয় এবং কৰ্মজ রোগ প্রায়-  
শ্চিত্ত দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে। কিন্তু কৈ  
কোথায় দেখিয়াছ কি যে, কবিরাজ মহাশয়  
রোগের জন্মকথন প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে-  
ছেন? ভিক্ষু, দ্রব্য, উপস্থাতা প্রভৃতি পাদচতুষ্টয়  
সাধকতম হইলেও তথাপি দৈব চিকিৎসা  
ব্যতীত অরিষ্টোপশম হইতে পারে না বলিয়া  
আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ অথর্কবেদে অধিক ভক্তি  
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেননা, অথর্ক-  
বেদেই দৈবব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা বর্ণিত আছে।  
চিকিৎসাদ্বারা সাধারণ রোগ সুশাধ্য হয়;  
যাপ্যরোগ যাপ্য থাকে, কিন্তু অসামান্য  
প্রতিবিধান আয়ুর্বেদে নাই বলিয়াই অথর্ক-

বেদের এত সম্মান। কিন্তু হায়, যে জন্ম  
জন্মান্তর, আয়ুর্বেদের প্রতি বিষয়ে ওতপ্রোত  
সেই জন্মজন্মান্তরে দেবব্রাহ্মণে বেদবেদান্তে  
আধুনিক কবিরাজ মহাশয়গণের বিশ্বাস  
নাই, তা সাধারণ লোকের কোথা হইতে  
থাকিবে? ভগবান্ পাতঞ্জলি আয়ুর্বেদে ও  
জ্যোতিষশাস্ত্রে বেদের প্রত্যক্ষতার কথা  
বলিয়াছেন। কিন্তু হায়, যাহারা আয়ুর্বেদের  
প্রচারক, তাহারা বেদবিশ্বাসী নন।  
তাহারা "কামোপভোগপরমা" এই সত্যেরই  
বিশ্বাসী। সেই জন্তই পুরাকালে বেদবিষ্মদেব  
ব্রাহ্মণভক্ত ব্রতধারী পুরুষ ব্যতীত আয়ুর্বেদের  
অপর কেহ অধিকারী ছিল না। কিন্তু  
এক্ষণে কেহ কেহ অর্থলোভে আয়ুর্বেদচর্চা  
করাতে আয়ুর্বেদের এই দ্রুতি ঘটিতেছে।  
আয়ুর্বেদবাদিগণের মধ্যে যদি ঋগ্বেদমিটার  
বা ষ্টেগিঙ্কোপ প্রচলিত হইল—তবে কে আর  
নাড়ীবিজ্ঞানের বা অরিষ্টজ্ঞানের চেষ্টা  
করিতে? ক্রমেই উহা মিথ্যার মধ্যে  
পরিগণিত হইবে।

শ্রীতেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ।

## মসুরিকা (বসন্ত) রোগ ।

দুঃখের অনুবন্ধ ব্যতীত সুখ থাকিতে  
পারে না। ইহা বুঝাইবার জন্তই বোধ হয়  
বিধাতা বসন্ত রোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।  
নচেৎ যখন দুরন্ত শীতের অবসানে মলয়  
মাক্ত শবীরকে স্পর্শসুখ অনুভব করায়, যখন  
কোকিলের কাকলি এবং ব্রহ্মরের গুঞ্জন  
মানবের শ্রুতিসুখ সম্পাদন করে, যখন চ্যুত

মুকুল পরিমল শত শত পুষ্পরাশির সৌরভের  
সহিত মিশিয়া মানবের ভ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ  
করে, এমন সুখময় সময়ে এমন অসুখের  
সৃষ্টি কেন? মর কবির কাব্য পারিপার্শ্বিক  
অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রচিত হয়।  
কিন্তু অমর কবির কাব্যে আমরা তাহার  
বিপরীত দেখিতে পাই। সে কাব্য বলে

যেখানে হুঃখ, সেখানে সুখ, যেখানে সুখ সেখানে হুঃখ। সুখ হুঃখ অভেদায়া হরি-হরের দ্বায় পরস্পর জড়িত।

বসন্ত রোগের শাস্ত্রীয় নাম মহুরিকা। মহুরীর (মহুর কলারের) দ্বায় ব্রণ উৎপন্ন হয় বলিয়া এই রোগের নাম মহুরিকা রাখা হইয়াছে। ইহা যে কি জন্ম সাধারণে বসন্ত রোগ নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। প্রকৃততত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ের তথ্যনির্ণয়ে চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের স্বভাবতঃ মনে হয় যে, বসন্ত কালে এই রোগের প্রাবল্য ঘটে বলিয়া ইহার “বসন্ত” রূপেই নামকরণ হইয়াছে।

বসন্তরোগ জগতে অনেক কাল হইতে আছে এবং অনেক সময় অনেক দেশ আশানে পরিণত করিয়াছে। মানবের প্রাণপণ চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া এই রোগ যে আরও কতদিন জগতে বিস্তারিত থাকিবে, যিনি বসন্ত রোগের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহা বলিতে পারেন, আমরা বসন্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু নহি। সুতরাং তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি না। কিন্তু আমাদের কাম্য না হইলেই যে সে স্বল্পজীবী হইবে, এরূপ আশা করিবার কোন কারণ নাই।

বসন্তরোগ অনেক দিন হইতে পৃথিবীতে আছে এবং আশা করি থাকিবে। আর এ রোগের অস্তিত্বের পরিচয় সত্ত্বতঃ আয়ুর্বেদেই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক এ সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নিয়ে তাহার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

ডাক্তার ওসলার এবং ম্যাকরে প্রণীত চিকিৎসাশাস্ত্রে ডাক্তার উইলিয়ম, টি, কাউ-

স্কিল ন্যাক, এম,ডি, লিখিয়াছেন যে, মহুরিক রোগের প্রকৃত পরিচয়জ্ঞাপক বিবরণ দশম শতাব্দীতে বেজেন নামক জনৈক মুসলমান চিকিৎসক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বহুপূর্বের চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থে মহুরিকার লক্ষণ ও চিকিৎসা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে বসন্তরোগীকে যেদ্রুপ স্বতন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়, পূর্বে এরূপ ছিল কি না? বসন্ত রোগী সম্বন্ধে যেদ্রুপ দেশাচার এখনও দেখা যায়, তাহাতে ইহার অমূল্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও বাঁহারা প্রাচীন মতের পক্ষপাতী তাঁহারা বসন্ত রোগীর গৃহে কাহাকেও বাইতে দেন না, রোগীর কাপড় রজকালরে প্রেরণ করেন না, এবং রোগীর গৃহ পরম পবিত্র রাখিয়া থাকেন।

কেবল দেশাচার বলিয়া নহে, শাস্ত্রেও বসন্ত রোগীকে নির্জনেও পবিত্র স্থানে রাখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

“ন চ তস্যাস্তিকং ব্রজেৎ॥”

অর্থাৎ বসন্ত রোগীর নিকটে কেহ বাইবে না। ইহাতে বসন্ত রোগীকে স্বতন্ত্র ভাবে রাখিবার নিয়ম সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

বসন্তরোগ যে সংক্রামক, তাহা রোগীকে এইরূপ স্বতন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থাব্যবাহী প্রতীত হয়। সংক্রামক না হইলে এরূপ সাবধানতার আবশ্যক কি? আবার সংক্রমণ নিবারণের বিধিও অতীব সুন্দর। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন যে, মহুরী রোগ পাকিবার পরে বিশেষতঃ শুষ্ক হইবার সময়ে উহা হইতে অসংখ্য কণা নির্গত হয় এবং সেই কণা

কণাধারা রোগ সংক্রমিত হয়। এই তথ্য লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকার উপদেশ দিয়াছেন :—

“পক্ষে ... ধূপো মৃদুযুক্তিতঃ।

শব্দগোময়ভস্মগুণ্ডলুমথো শুক্রে

শিলাপিষ্ঠয়োরাশেপঃ পিচুমদ্পত্রনিশয়োঃ

শেষে ব্রণোক্তাঃ ক্রিয়াঃ)।”

অর্থাৎ বসন্তের গুটি পাকিয়া উঠিলে যুক্তিপূর্বক ধূম প্রয়োগ করিবে; এবং সর্বদা গোময় ভস্ম (ঘুটের ছাই) গায়ে মাখাইবে। শুক হইলে নিমপাতা ও হরিদ্রা শিলায় বাটয়া প্রলেপ দিবে এবং ব্রণোক্ত ক্রিয়া করিবে।

মসুরিকা পাকিয়া উঠিলেই বাহাতে মক্ষিকাদি ক্ষতে উপবিষ্ট হইয়া রোগ সংক্রমণ করিতে না পারে, সেই জন্য ধূম প্রয়োগের ব্যবস্থা। গ্রন্থান্তরে ইহা ব্যতীত স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

“সপত্রনিষশাখাভিমক্ষিকামপসারয়েৎ।”

অর্থাৎ সপত্র নিষশাখাধারা মক্ষিকা তাড়াইয়া দিবে। অপিচ, গোময়ভস্ম লেপন করিবার যে বিধি আছে, তদ্বারা যে কেবল মক্ষিকা নিবারণ হয়, এমত নহে, বোগবীজ বায়ুগুণ্ডে ব্যাপ্ত হইতে পারে না অপিচ, গোময়ভস্ম বিষনাশক। বিষ ফোঁড়া হইলে গোময়ভস্ম ব্যবহারে বিষ নষ্ট হয়। সুতরাং গোময়ভস্ম সংযোগে বসন্তের বিষও নষ্ট বা হীনবীৰ্য্য হয়; মিশিতে পার না। শুক হইলে নিমপাতা ও হরিদ্রা শিলায় বাটয়া প্রলেপ দিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে রোগবীজ কোন উপায়েই সংক্রমিত হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বসন্ত রোগ সংক্রামক বলিয়া জানা ছিল এবং সংক্রমণ

নিবারণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে, কিন্তু রোগ সংক্রামক বলিয়া ত কোথাও উল্লেখ নাই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আয়ুর্বেদ-কারগণ সংক্ষিপ্ত ভাবে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা সুস্ববুদ্ধি পুরুষের জন্য। অনেক স্থলে তাঁহারা দিগ্‌দর্শনমাত্র করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে পুনরুক্তি বা অত্যাুক্তি বড় কোথাও দেখা যায় না। রোগের সংক্রমণ সম্বন্ধে আমরা একটা মাত্র আভাস পাই :—

‘প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ

সহভোজনাতঃ।’

“একশয্যাসনানীচৈব বস্ত্রমালামুলেপনাতঃ ॥

অরঃ কুষ্ঠশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিঘ্নাদ্ এব চ।

ওপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরানরম্ ॥”

অর্থাৎ—একত্র থাকা, গাত্রসংস্পর্শ,

নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যা ও আসনে শয়ন ও উপবেশন এবং এক বস্ত্র, মালা ও অমুলেপন ব্যবহার বশতঃ অর, কুষ্ঠ, শোষ, চক্ষুউঠা এবং ওপসর্গিক রোগসকল একব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রমিত হয়, এই বচনটার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বুদ্ধিমান চিকিৎসক, বসন্ত রোগীকে নির্জনে রাখিবার, তাহার কাছে কাহারও না যাইবার প্রভৃতি যে সকল উপদেশ, শাস্ত্রে আছে তদ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, রোগটা সংক্রামক।

শাস্ত্রে বসন্ত রোগের বিষয় বেরূপ লিখিত হইয়াছে, বিশেষতঃ বসন্তের ঢাকার বিষয় উল্লিখিত না থাকায় সহজেই মনে হয়, সে সময়ে বসন্তরোগের প্রাবল্য কম ছিল। যে কারণেই হউক পরবর্তী কালে উহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের ঢাকা লইবার প্রথার স্রষ্টা ও প্রচলন, কতকাল পূর্বে কোন মনস্বী ব্যক্তি কর্তৃক যে উদ্ভাবিত

প্রচলিত হয়, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। তবে প্রাচীনদিগের মুখে যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে এই প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, বোধ হয়। বর্তমান টীকা দিবার প্রণালী উহার বহুকাল পরে আবিষ্কৃত এবং প্রচলিত হইয়াছে। ইহার পোষক স্বরূপ আর একটি অবস্থার বিষয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। উহাকে “গুলসান” বলে। কোন দক্ষ পদার্থদ্বারা মণিবস্ত্রের সন্মুখ ভাগে বা পদের অঙ্গাদেশে ক্ষত উৎপাদন করা এবং সেই ক্ষতকে রক্ষা করার নাম “গুলসান”। এই প্রথা এখনও সুদূর পল্লিগ্রামের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে এবং তদ্বারা অনেক কঠিন রোগের উপশম হইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রথা আয়ুর্বেদে গ্ৰীহা যকৃৎ রোগে যে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবার উপদেশ আছে, তাহারই রূপান্তরমাত্র।

বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত কি উপায় অবলম্বন করা সম্ভব, এক্ষণে আমরা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উপায়গুলি দুই জাতীয়, কতকগুলি বসন্ত রোগীর পক্ষে প্রযুক্ত্য এবং কতকগুলি সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রযুক্ত্য। রোগীর পক্ষে প্রযুক্ত্য উপায়গুলির বিষয় পূর্বেই অনেকটা বলা হইয়াছে, যথা—রোগীকে নির্জনে রাখা, রোগীর নিকট কাহারও না যাওয়া, রোগীর বস্ত্রাদি রজ্জ্বকালয়ে না দেওয়া, রোগীর গৃহে বাহাতে নাছি প্রবেশ না করিতে পারে, তজ্জন্ত ধূম দেওয়া, কিন্তু রোগীর নিকটে শুশ্রূষাকারী না বাইলে চলিতে পারে না। শুশ্রূষাকারীকে যখন বাইতে হইল, তখন তাহাকেও রোগীর দ্বার দেখিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার নিকটে

কেহ যাইবে না এবং তাহার বস্ত্রাদি রজ্জ্বকালয়ে দেওয়া হইবে না। রজ্জ্বকালয়ে বস্ত্র না দিয়া বস্ত্র গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া কর্তব্য, রোগীর ঘরে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিবে, তাহার বস্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম পালন করা আবশ্যিক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পকাদস্থায় গোময় ভস্ম এবং সংক্রান্ত অবস্থায় নিমপাতা ও হরিদ্রা লেপন করিলে রোগ সংক্রামিত হইতে পারে না। অপিচ ঐ সকল পদার্থ বীজনাশক বলিয়া রোগবীজের রোগোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া বা কমিয়া যায়। কিন্তু তথ্য সাবধানের বিনাশ নাই। রোগীর শরীর-সংলগ্ন গোময়ভস্ম ও নিমপাতা হরিদ্রার প্রলেপ সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়া ফেলা বা দূরে পুতিয়া ফেলা কর্তব্য। রোগী সম্বন্ধে এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে রোগ আর সংক্রামিত হইতে পারে না।

এক্ষণে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে যে সকল উপায় অবলম্বনীয় তাহা কথিত হইতেছে। সংসারে নরের যম সকলেই—রোগ ও বাধ যান না। জীবনীশক্তি কমিয়া গেলে রোগ সহজেই মানব শরীরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সেই জন্ত জীবনী শক্তি বাহাতে বর্ধিত হয় অর্থাৎ শরীর বাহাতে সুস্থ এবং সবল থাকে, তাহা করা কর্তব্য। এক্ষণে সুনিয়মে স্নানাহার করা, পবিত্র ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহার করা, পচা, দূষিত ও বাসি খাদ্য আহার না করা, অতিরিক্ত আহার না করা, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। বাহাতে বেশ কোষ্ঠ শুদ্ধ হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

(ক্রমশঃ)

# আয়ুর্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক ।

১ম বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৩—চৈত্র ।

৭ম সংখ্যা ।

## সংক্রামক রোগ নিবারণে সদাচার ।

আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই সংক্রামক  
বোগের প্রাদুর্ভাব। কলেরা, ডেঙ্গু, যক্ষা,  
চুই, বিউবনিক প্রেগ, ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতি  
সংক্রামক রোগসকল ভীষণ মূর্তিতে পৃথিবীর  
সর্বত্রই বিচরণ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্য  
জগতে এই সকল সংক্রামক রোগ নিবারণ  
জ্ঞান কুর্ভাশ্রম, যক্ষাশ্রম, আহুবাশ্রম, কোরা-  
রাণ্ টাইন্ ও সিগ্রিগেসন্ প্রভৃতি নানাবিধ  
আশ্রম ও আইন জারি হইতেছে। এই  
সংক্রামক বোগের তথ্য নির্ণয় করিতে গিয়া  
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই যৌমানুসার উপনীত  
হইয়াছেন যে, পৃথিবীতে বহু প্রকার রোগ  
আছে, তাহার অধিকাংশই সংক্রামক। এক  
দেহ হইতে অন্তদেহে যার বলিয়া সংক্রামক  
রোগ কখন নূতন হইতে পারে না। ঐ  
সকল রোগবীজাণু অনাদি কাল হইতে দেহ  
হইতে দেহান্তরে সঞ্চারিত হইতেছে; কেবল  
যে রূপ ব্যক্তির দেহে ঐ সকল বীজাণু  
দেহিতে পাওয়া যায়, এমন নহে। সুস্থ  
শরীরেও ঐ সকল বীজাণু প্রকটভাবে বাস

করে। একারণ কি সুস্থ, কি রূগ সকল  
ব্যক্তির সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকাই সংক্রামক  
রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়।

পূর্বে পূর্বে সংক্রামক রোগ সকলের  
সংক্রমণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে  
ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয়  
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অমুবীক্ষণ  
যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়াতে এক্ষণে ইহা পরীক্ষা  
দ্বারা স্থিরীকৃত ও সর্ববাদিসম্মত হইয়াছে  
যে, বীজাণু দ্বারা রোগ এক দেহ হইতে অন্য  
দেহে সংক্রামিত হয় এবং অধিকাংশ রোগই  
সংক্রামক। এই সকল বীজাণু বায়ু বোগে,  
নিখাস প্রদান সহকারে, বিষ্ঠা, মূত্র, কক,  
বমন, নথ, লোম, নিস্ত্রবন, জল, জল,  
হৃৎ, পরিধের বস্ত্র বা ধূলিকণা অথবা মশা  
মাছি প্রভৃতি জীবগণ দ্বারা আর এক  
দেহে প্রবেশ করে। জল, স্থল, বায়ু, আকাশ  
প্রভৃতি সমুদ্রই এই বীজাণু দ্বারা পরিপূর্ণ  
রহিয়াছে। এই সকল বীজাণু যে কেবল  
রোগ উৎপাদন করে, তাহা নহে, পরস্পর

সৃষ্টিকার্যই এই সকল বীজাণুদ্বারা সৃষ্ট।  
ও সুকোশলে সম্পাদিত হইতেছে। আমাদের  
অন্ত্রমধ্যে এই সকল বীজাণু অবস্থান করিয়া  
পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করিতেছে, রক্ত  
মধ্যে অবস্থান করিয়া রক্তকণিকা সকল  
শোষণ করিতেছে। মূত্রনালীতে অথবা কোষ্ঠ-  
স্থানে থাকিয়া বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ কার্যের সহায়তা  
করিতেছে। আবার শরীরের বহিঃপদার্থ  
সকলেও সর্বত্র ইহাদের ক্রিয়া লক্ষিত হই-  
তেছে। দধি-বীজাণু হৃৎককে দধিতে পরিণত  
করিতেছে, মত্তবীজাণু শর্করাকে মত্তে পরিণত  
করিতেছে। যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তি বিষ্ঠা,  
মূত্র, নিষ্ঠীবন, শ্লেষ্মা, কর্ণমল বা গাত্রমল  
ত্যাগ করে, অথবা যদি কোন ব্যক্তি নিঃশ্বাস  
প্রশ্বাস ত্যাগ বা বমন করে, নথ লোমাদি  
ছেদন করে, তখন তাহার সেই বিষ্ঠামূত্র,  
নিষ্ঠীবন প্রভৃতি পদার্থের সহিত এই সকল  
বীজাণু দেহ হইতে নিকাশিত হইয়া আশ্রয়ের  
জন্ত দেহান্তর অবশ্যন করে। সূর্যালোক বা  
পরিষ্কার বায়ুতে ইহারা অধিকক্ষণ থাকিলে  
মরিল্প যায়। আগাছা যেমন অস্ত্র বৃক্ষের  
আশ্রয় ব্যতীত বাঁচিতে পারে না, রোগোৎ-  
পাদনকারী বীজাণুগণও তজপ দেহের আশ্রয়  
ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। মহুশ্য বা জীবদেহে  
প্রবেশ করিয়া ইহারা রক্তবীজের দ্বায় বংশ-  
বৃদ্ধি করিতে থাকে। মহুশ্যদেহের বিভিন্ন  
ধাতু হইতে রস শোষণ করিয়া এই সকল  
বীজাণু জীবন ধারণ করে। বীজাণুগণের  
দেহনিঃসৃত রস অতি বিষাক্ত। ইংরাজীতে  
ঐ রসকে টক্সিন বলে এবং আমাদের  
অর্থর্ববেদের ভাষায় উহাকে তক্শন্ বলে।  
এই বিষ হইতেই রোগের কষ্টদায়ক উপসর্গ-  
সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নানা প্রকার

রোগের নানা প্রকার বীজাণু আছে। যক্ষা,  
ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, কলেরা প্রভৃতি রোগের  
বীজাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন। দেহের মধ্যে  
আবার এমন অসংখ্য অসংখ্য বীজাণু বাস  
করিতেছে, যাহারা রোগ বীজাণু সকল নাশ  
করিতেছে। এই সকল বীজাণু রোগ প্রতি-  
ষেধক।

এই বীজাণুতত্ত্ব আবিষ্কারের পর হইতে  
ডাক্তারি চিকিৎসার গতি অল্প দিকে ফিরি-  
য়াছে। প্রাচীনকালের ডাক্তারি পুস্তকসকল  
আলোচনা কর দেখিবে—চিকিৎসা বা ঔষধের  
কথায় সেই সকল গ্রন্থ পরিপূর্ণ রহিয়াছে।  
আর আজকালকার ডাক্তারি গ্রন্থসকল দেখ,  
দেখিবে যে ঔষধ ও চিকিৎসাকে অকিঞ্চিৎকর  
বোধে ডাক্তারগণ যাহাতে ঔষধ সেবন ও  
চিকিৎসা না করাইতে হয়, সেই পথে দিন  
দিন অগ্রসর হইতেছেন। তাহার কারণে  
বুঝিয়াছেন যে, রোগ হইলে ঔষধ বা চিকিৎসা  
দ্বারা তাহার আরাম করিবার জন্ত চেষ্টা করা  
অপেক্ষা যাহাতে দেহে রোগ প্রবেশ করিতে  
না পারে, সেইরূপ আচরণ অবলম্বন করাই  
পরম শ্রেয়ঃ। রোগী বা সুস্থের ব্যবহৃত  
বস্ত্রাদি পরিধান করা অথবা কাহারও নথ,  
লোম, কক্ষ, নিষ্ঠীবন না মাড়ান, কাহারও  
উচ্ছিষ্ট ভোজন না করা বা কাহারও আহার্য  
পাত্রসকল বিশেষরূপে শোধন না করিয়া  
তাঁহাতে ভোজন করা অথবা গৃহে আবর্জনা  
না রাখা, কাহারও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গায়ে না  
লাগান, উত্তমরূপ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকা  
ইত্যাদি নানা প্রকারের সনাতনের প্রবর্তন ও  
প্রচলন করাই এক্ষণকার ডাক্তারি পুস্তক  
সকলের চেষ্টা, এমন কি বিজ্ঞানগোচর রোগ-  
প্রণের মধ্যে পরস্পর সংক্রমণ, হস্ত, আশ্রয়



আমেরিকাতে মুক্তবাঘু বিভাগয়েরও প্রবর্তন হইতেছে।

**ভারতবর্ষের কথা।** আমরা এই আর্ধ্যক্ষেত্রে পুরাকালে টাইফয়েড, জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, ডেঙ্গু, বিউবনিক্, প্রেগ, কলেরা, রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি মহামারী সংক্রামক রোগ সকলের প্রাদুর্ভাব এত ছিল না, এমন কি আমাদের পূর্বপুরুষগণ আধুনিক অনেক রোগের নামগন্ধও যে জানিতেন না, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদিপাঠে জানা যায়। আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকাত, আমরা সন্ধানচারা পরিত্যাগ করায়, রোগাভিসর ভিষক-গণের হস্তে এক্ষণে অধিকাংশ ভারতবাসীর চিকিৎসার ভার শুভ্র থাকায়, ভারত এক্ষণে দিন দিন রোগে শোকে ভুগ্ন দারিদ্র্যে মুহুমান হইতেছে। এমন কি রোগের জালায় ভারতবাসীর জাতীয় অস্তিত্ব পর্যন্তও লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এক বঙ্গদেশে বৎসর বৎসর ম্যালেরিয়া জ্বরেই দশ বার লক্ষ লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ভারতবর্ষ এক্ষণে পৃথিবীর নানা জাতির কৰ্মক্ষেত্রে হওয়াতে নানা জাতির সমাগমে ও সম্বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন রোগের আবাসস্থল হইয়াছে। ভারতবাসীর বর্ণাশ্রম ধর্ম এক্ষণে ছিন্নমূল হইয়াছে, যে ভারতবাসী আর্ধ্য পূর্বে দান, পান, ভোজন, শয়ন, ক্রীড়ন, জীবিকার্জন প্রভৃতি সর্ববিধেই সন্ধানচারা মানিয়া চলিত, স্পর্শক্রমের ভয় করিত, আপনার আশ্রয় বা বর্ণগণের বাহিরে বাজারের কোম দ্রব্য বা কোন লোকের সংস্পর্শ রাখিত না, এক্ষণে সমাজ-বিপর্যাস হওয়াতে সেই আর্ধ্যকে প্রতিদিন পেটের দায়ে যে কত প্রকারে কত লোকের সংগ্রহ করিতে হইতেছে, তাহা বলা যায় না।

এক্ষণে আমাদের পান ভোজন শয়ন সকলই বাজারের উপর নির্ভর করিতেছে, এমন কি আমাদের মলমূত্র, ত্যাগ তাহাও দশ জনের সঙ্গে একত্র হইয়া না করিলে চলে না, সুতরাং এই গুরুতর সংক্রামক কালে সংক্রামক রোগ নিবারণ জন্ত একমাত্র সন্ধানচারাই অবলম্বনীয়।

আমাদের বেদ, শ্রুতি, পুরাণ, তন্ত্র সমুদয় শাস্ত্রই সন্ধানচারের কথায় পরিপূর্ণ, চরকাদি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থসকলেও ঔষধ চিকিৎসার আলোচনা অপেক্ষা রোগ প্রতিষেধক সন্ধানচারেরই অধিক আলোচনা এইরূপই হওয়া উচিত। কেন না, সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা সন্ধানচারের উপরেই নির্ভর করে। বাহাতে আয়ুলাভ করা যায়, তাহাকেই যদি আয়ুর্বেদ বলে, তাহা হইলে সন্ধানচারা প্রতিপালনই আয়ুর্বেদের স্বয়ং তাৎপর্য। “আচার্য্যভক্তে হ্যায়ুঃ” সন্ধানচারা হইতে আয়ু লাভ করা যায়, এটা সকল শাস্ত্রেরই কথা। আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও সংক্রামক রোগ নিবারণ জন্ত রাজ্যমধ্যে হাইজিন বা সন্ধানচারা প্রবর্তনের উদ্দেশে রাজাকে আইন জারী করিতে বলিতেছেন, কিন্তু আমাদের এই বিশ কোটি লোকসমষ্টি আর্ধ্যক্ষেত্রে বহুপূর্বে হইতে শাস্ত্রের অমুশাসনেই প্রতিদিন প্রতিকার্যে সন্ধানচারের বশবর্তী হইয়া চলিতেছে। আমাদের সমাজকে সন্ধানচারা প্রধান দেখিয়া পূর্বে যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের বিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহাদেরই বংশধরেরা আজ হিন্দু সন্ধানচারের ভুলসী প্রশংসা করিতেছেন। বিহু প্রভৃতি পাশ্চাত্য ইতিহাসলেখকগণ আমাদের সন্ধানচারের অধীন দেখিয়া একদিক লিখিয়াছিলেন, যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণের কি নোন্সাহাব্য জাতকতরঙ্গী

কি পরাধীন! খাওয়া শোওয়া সম্বন্ধেও ভারতবাসীকে পরাধীন হইয়া চলিতে হয়। কোন্ দিন কি খাইতে আছে বা নাই, অথবা শোচক্রিয়ার কতবার হস্তমৃত্তিকা ব্যবহার করিতে হইবে, এসকল ভুজ্য বিষয়েও হিন্দুকে ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। পরন্তু এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, সদাচারের অভাব হেতুই আমাদের এত রোগ শোক।

**ঋষিগণের বীজাণুভাণ্ডার**  
ছিল। আবার এই যে বীজাণু কর্তৃক রোগের সৃষ্টি প্রমাণ করিয়া লোকে ইহাকে নূতন আবিষ্কার বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু স্মরণ-  
তীত কাল হইতে ঋষিগণ এ তত্ত্ব জানিতেন বলিয়াই আমাদের দেশে শোচাচারের এত বন্ধন। প্রাতঃকালে উঠিয়াই গৃহিণীগণকে গৃহ-  
সার্জন করিতে হইবে, গৃহের আবর্জনা সকল দূর করিতে হইবে, গৃহসকল গোময়দ্বারা উপলেপন করিতে হইবে, বাসন সকল ধৌত করিতে হইবে, কোন বাসনকে বা ভয় দিয়া মাজিতে হইবে, তামার বাসনকে যে অন্ন দিয়া মাজিতে হইবে, শোচাচারের সময় পায়ুদেশ ও হস্তপদ মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শোধন করিতে হইবে, স্নানীয় জল যে মাড়াইতে নাই। কক্ষ, মল সূত্রাক্ত দ্রব্য যে স্পর্শ করিতে নাই, পরের পরিহিত বস্ত্রাদি যে পরিধান করিতে নাই, অস্থিসকল যে মাড়াইতে নাই, রোদ্রে দিলে যে বিছানা মাড়র শুদ্ধ হয়, ইত্যাকার আর্ধ্য-  
সমাজের সমুদয় আচরণের মূলেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে। আর্ধ্যগণের দেহ শুদ্ধি, দ্রব্য শুদ্ধি, আহার শুদ্ধি, পানীয় শুদ্ধি, ভূমিশুদ্ধি, বস্ত্র শুদ্ধি, স্তবিকাশোচ, আবাসশোচ, জননাশোচ, মরণাশোচ প্রভৃতি সমুদয় শুদ্ধি ও অশোচের মূলে মাল প্রকারের

বৈজ্ঞানিক তথ্যসকল নিহিত। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমুদয় শাস্ত্র আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, তাঁহারা জীবাণুতত্ত্ব বিশেষ-  
রূপে অবগত ছিলেন। আমরা যে দেবকার্য্য করিবার পূর্বে “অপসর্গন্ত তে ভূতাঃ” বলিয়া ভূতাপসরণ করি, হোমের পূর্বে অক্ষুণ্ণবাদি অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবার সময় “নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ” অর্থাৎ অরাতীগণকে দগ্ধ করিলাম বলি, শ্রাদ্ধের সময় যে “নিহ্মি সর্বং যদমেধ্য-  
বদভবেৎ” অর্থাৎ সমুদয় অপবিত্রতাজনক অন্নর দানবাদি নষ্ট করিবার জন্ত পিপুপাতিবার স্থান সার্জন করিতেছি বলি, অথবা কুশণ্ডি-  
কার সময় যে “ইদং ভূমের্ভজামহং” অর্থাৎ হে ভূমি অত্রস্থ শত্রুসকল নাশ কর, আমি তোমার শরণাগত ইত্যাদি বলি, অথবা প্রতিদিন যে সূর্য্যদেবকে “বিস্বদৃষ্টং অদৃষ্টহা” অর্থাৎ অদৃষ্ট আয়ুরাদিনাশক বলিয়া স্তুত করি, অথবা ভোজন করিবার পূর্বে পক্ষার্জ হইয়া ভোজন করি, কেশ ও নখলোমের ভিতর পাপ প্রচ্ছন্ন থাকে বলি যে দ্রব্য স্বাভাবিক মিষ্ট, কিন্তু কালসহকারে অম্লতা প্রাপ্ত হয়, সেই শুক্ল দ্রব্য খাই না, অথবা যাত্যাম বা বাসী জিনিষ খাই না ইত্যাকার আমাদের সমুদয় সদাচারের মূলে বীজাণুতত্ত্ব নিহিত আছে। অথচ আধুনিক জড়বাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিত-  
গণের স্তায় তাঁহারা জীবাণুকেই রোগসৃষ্টির একমাত্র সর্বস্বকর্ক কারণ বলেন নাই। তাঁহারা জীবাণুতত্ত্ব অবগত থাকিলেও প্রজাপ্রাণ বা অধর্ম্মকেই রোগোৎপত্তির মূল কারণ বলিয়াছেন।

আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, কলেরার বা প্লেগের বীজাণু দেখে থাকিলেই যে কলেরা বা প্লেগ হইবে, তাহা নহে। পরন্তু বীজাণু

দেখে না থাকিলে যে কলোরা বা মেন্গ হ্রস্ব না, এইটা স্থানিষ্ঠিত। স্মৃতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের বচনানুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, বীজাণুর প্রেরণাও অদৃষ্ট বা দৈবাধীন। আমরাও বীজাণুকে সর্বোপরি প্রাধান্য না দিয়া আমরা রোগস্থিতির পক্ষে অধর্মকেই প্রধান কারণ বলি। এবং ধর্মার্থের নিয়ন্তা রুদ্রদেবের কোপকেই রোগোৎপত্তির মূল কারণ বলি। যিনি আমাদের পক্ষে রোদন করান বা হুঃখ দেন, তাঁহাকে আমরা রুদ্র বলি। আমাদের শাস্ত্রে রুদ্রকেই সংহার-কর্তা বলে। যখন জনপদ অধর্মবহুল হয়, তখন রুদ্রদেবই সংহারমূর্তি ধারণ করিয়া বায়ু, মেঘ, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতির বিকৃতি উৎপাদন করিয়া জনপদ ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই রুদ্রের ছই মূর্তি, শিবময় ও অশিবময়। বজ্রকর্ষেদের রুদ্রাধ্যায়প্রকরণে

জানান যায় যে, মহারুদ্রের অমৃতেরবাই স্বস্ব রুদ্রগণ। তাঁহারাই মহারুদ্রের আদেশে লোকসকলকে ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই সকল চর্মচক্ষুর অগোচর স্বস্ব স্বস্ব রুদ্রগণের বৈরূপ বর্ণনা আছে, যদিও আধুনিকগণের জীবাণুর সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই, তথাপি বোধ হয় যেন কতকটা সাদৃশ্য আছে। কোথায় অমৃতবীক্ষণের দৃষ্টি, আর কোথায় বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি।

যাহা হউক, আমরা শাস্ত্রীয় মতে প্রত্যেক বিষয়ের শোচাশোচ এবং শুদ্ধিশুদ্ধির ক্রমশঃ বিচার করিয়া এই রোগের শেষ করিব এবং সন্ধানের যে কেবল স্ত্রের স্বাভা-বিকার উপায়, এমন নহে, পরন্তু রোগীর রোগোপশমের পক্ষেও যে ইহা প্রধান সহায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীতেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ ।

## মসুরিকা ।

যে কোন জমিতে বীজ বপন করিলেই ফসল হয় না। জমী রীতিমত কর্ণ করিয়া বীজ বপন করিলে তবে ফসল হয়। আবার বালিতে বা পাথরের উপর বীজ বপন করিলে তাহা কখনই অঙ্কুরিত হয় না, কালে নষ্ট হইয়া যায়। রোগ সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম। রোগের বীজ সকল শরীরে সমান ভাবে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে না। কবিত জমির ভায় শরীর যদি দূষিত হইয়া থাকে এবং রোগ প্রতিবেধক শক্তি যদি কমিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে রোগবীজ সহজেই রোগ উৎপন্ন করিতে পারে, কিন্তু শরীর সুস্থ; লবল ও নির্মল হইলে এবং

রোগ প্রতিবেধক শক্তি প্রবল থাকিলে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে না বা সামান্য ভাবে পারে। প্রকৃতির পাগলী শক্তি যদি এইরূপে প্রাণিদিগকে রক্ষা না করিত, তাহা হইলে এতদিন রোগাক্রান্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইত।

পূর্বে যেখান হইয়াছে যে, বসন্ত রোগের সংক্রামকতা আয়ুর্বেদাচার্যগণের সুবিদিত ছিল। তথাপি বসন্ত রোগের নিদান (কারণ) সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, রুটু, অন্ন, লবণ ও ক্ষার পদার্থ অতিরিক্ত ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন যেমন রক্ত ও দুগ্ধ একত্রে ভোজন, পূর্নাহার অসীর্ণ সম্বন্ধে ভোজন, হই পড়া স্বাদু,

দূষিত খাদ্য ভোজন, অতিরিক্ত শাক-সিম প্রভৃতি ভোজন, ছুটে জল পান, ছুটে বায়ু সেবন প্রভৃতি কারণে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিদান কি? ক্রমিক পক্ষে বাহ্যিক র্শণ, শরীরে রোগোৎপত্তির পক্ষে এই নিদান তাহাই। ঐ সকল দ্রব্য অতিরিক্ত দেবনে শরীরস্থ রক্ত, পিত্ত এবং কফ দূষিত হয়। সেই দূষিত শরীরে রোগবীজ প্রবিষ্ট হইয়া সহজেই রোগ উৎপন্ন করিতে পারে। আয়ুর্বেদ মতে ইহাকে বাতিক নিদান বলে। বোধ হয় ডাক্তারেরা ইহাকে exciting cause বলিয়া থাকেন।

এই স্থলে নিদানোক্ত আর একটা বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নিদানে লিখিত হইয়াছে যে “প্রদুঃ পবন” বসন্ত রোগের নিদান। ছুটে শব্দ প্রয়োগ না করিয়া প্রদুঃ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংস্কৃত-নভিজ পাঠকের বোধার্থ বলিতে হইতেছে যে, সংস্কৃত ভাষায় বৃথা কোন শব্দের প্রয়োগ করা হয় না। “প্র” উপসর্গের অনেকগুলি অর্থ আছে, সম্ভবত এখানে “অত্যন্ত” অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, কিসের দ্বারা অত্যন্ত দুঃ পবন বসন্ত রোগ উৎপন্ন

করিয়া থাকে? অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প দ্বারা হইলে সর্দি কাস হয়, বসন্ত রোগ হয় না। অত্যন্ত ধূম দ্বারা দূষিত হইলে, কাস কাস হইতে পারে। তবে কিসের দ্বারা দূষিত? বসন্ত রোগের বীজের দ্বারা—এইরূপ মীমাংসাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মতেও বসন্ত রোগের বীজ বায়ু দ্বারা বাহিত হয়। এই তথ্য যে বহু পূর্বে আয়ুর্বেদাচার্যগণ অবগত ছিলেন, এতদ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

কেহ বলিতে পারেন যে, এক প্রকার হইল বাট, কিন্তু বহু কষ্টে আর বড় অস্পষ্ট। তাহার একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে, আর্গা ঋষিগণ প্রাণীত যাবতীয় শাস্ত্রের কি চুরবহা। শাস্ত্রব বিমল জ্ঞান এক্ষণে আমাদের অজ্ঞানতার সমাধার। জানি না কতদিনে আবার আমরা সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইব। শাস্ত্রের সকল তথ্যই এক্ষণে আমাদের নিকট অস্পষ্ট, জানি না কবে আবার তাহা পটভূমিতে আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে।

কোন রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে পূর্বরূপ বলে। বসন্ত হইবার পূর্বে প্রাণ জর, অত্যন্ত গাত্রবেদনা ও কখন কখন মাথার ব্যথা হয় এবং শরীর বিশেষতঃ মুখ রক্তাক্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এইগুলিই বোঝা যায়। আয়ুর্বেদে লিখিত হইয়াছে যে, জ্বর, কণ্ঠ, গাত্রভঙ্গ, কার্ণো অপ্রস্থিতি, ভ্রূর (যেন চাকার উপর চড়িয়া আছি বোধ হওয়া), যকের শোথ, শরীরের বিবর্ণতা এবং স্বেদরোগ হয়। এ স্থলে জানা উচিত যে, পূর্বরূপের সমস্ত লক্ষণই সর্বত্র প্রকাশ পাইবে, এমন কোন সন্দেহ নাই। কতকগুলি প্রকাশ

\* আয়ুর্বেদের শাক অর্থে “৩২কারী” বুঝায়। শাক পাঁচ প্রকার, ১। পত্রশাক—মটর, পালক, প্রভৃতি। ২। পুষ্পশাক—সজিরা ফুল, কুমড়া ফুল, প্রভৃতি। ৩। ফল শাক—লাউ, কুমড়া, বেগুন প্রভৃতি। ৪। মালশাক—কচু ডাঁটা, লাউ ডাঁটা, পুইডাঁটা প্রভৃতি। ৫। কন্দশাক—গুল, কচু, আলু প্রভৃতি। আয়ুর্বেদ মতে শাক স্থানান্ত্র মতে।

শাকেবু সর্বেষু নিবসন্তি রোগাঃ। তে হেতবো দেহ বিদ্যাকঃ অর্থাৎ শাকে দেহনাশের হতুভূত রোগ সকল বাস করে। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে।

পাইয়া থাকে। অপিচ, পূর্বরূপের লক্ষণ-গুলি যত অধিক আর যত প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, রোগ ততই কঠিন হয়। আর যত অল্প ও সামান্যভাবে প্রকাশ পায়, রোগ তত মৃদু হয়। কিন্তু পূর্বরূপ-সামান্য ভাবে প্রকাশ পাইবার পর যদি অপর কোন উত্তেজক কারণের সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে রোগ প্রবল হইতে পারে।

চিকিৎসাকার্যের সৌকর্য্যার্থ বসন্ত রোগের চারিটা অবস্থা নির্দেশ করা বাইতে পারে।

(১) অর্যাবস্থা—এই সময় প্রবল জ্বর হয়, কিন্তু গুটি নির্গত হয় না।

(২) নির্গমনাবস্থা—গুটি বাহির হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত বাহির হওয়া পর্য্যন্ত।

(৩) পক্ষাবস্থা—পাকিতে আরম্ভ হইয়া পাকা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত।

(৪) শুষ্কাবস্থা—শুকাইতে আরম্ভ হইয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত।

ক্রমশঃ প্রত্যেক অবস্থার বিষয় আলোচনা করা বাইতেছে।

(১) যে সময়ে দেশে বসন্তের প্রকোপ হয়, সেই সময়ে কাহারও জ্বর, গাত্রবেদনা, মস্তকের যন্ত্রণা হইলে এবং মুখ রক্তাক্ত হইলে বসন্ত হওয়ার সম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে নিবাত স্থানে রাখিবে, জল স্পর্শ করিতে দিবে না এবং উপবাস করাইবে। ক্ষুধা, পিপাসা ও মুখ শোঁষ থাকিলে এবং বৃদ্ধ ও বালক-দিগকে জলসাপ্ত বা জল বার্নি পথ্য দিবে। খদির কাঠ ১ তোলা ও গীতশাল (অভাবে অনন্তমূল) ১ তোলা ৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১/২ ছই সের থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে হাকিয়া পান করিতে দিবে।

খদিরকাঠ, হরিজ্রা ও বহুবীর (অভাবে হরিজ্রা) এরূপ নিয়মে সিদ্ধ করিয়া শৌচকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। বসন্ত রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পান ও শৌচকার্য্যে এইরূপ জল ব্যবহার করা কর্তব্য।

পূর্বে যে বমন বিরচনের কথা বলিয়াছি এই অবস্থায় তাহা প্রয়োগ করিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে সন্ধ্যাত অল্প মাত্রায় বমন বিরচন করাইবে। বমন বিবেচন আদৌ সহ না হইলে করোলাপাতায় রস দুই তোলা ও হরিজ্রাচূর্ণ এক সিকি একত্র মিশ্রিত করিয়া নিত্য একবার করিয়া সেবন করাইবে। প্রথমে এই সকল নিয়ম পালন করিলে বসন্ত রোগ প্রবল হইতে পারে না। পুষ ও বেদনা অল্প হয় এবং উপসর্গ উপস্থিত হয় না।

(২) এই অবস্থায় পথ্য প্রয়োগ রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে। জরের প্রাবল্য যতদিন থাকে, ততদিন অন্নাহার নিষিদ্ধ। জলসাপ্ত, থৈ, জলবার্নি, কিসমিস, খেজুর, মিষ্ট দাড়িম ও মুগের ঘূষ পথ্য। জ্বর কমিয়া গেলে বা ছাড়িয়া গেলে অবস্থা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধিয়া পুরাতন চাউলের অন্ন, ছোলা, মুগ বা মসুর দালের ঘূষ, পলতা, কঁরলা, কাঁকরোল, কাঁচকলা প্রভৃতি পথ্য দেওয়া বাইতে পারে।

এই অবস্থায় প্রথমেই নিম্নলিখিত ঔষধের দুই একটা ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। (১) কুমুদ্রিয়া লতা দুই তোলা ও তৈলা জলে সিদ্ধ করিয়া আট তোলা থাকিতে নামাইবে। অপর, হিং অল্প স্বত সংযোগে লৌহপাত্রেরে অন্ন ভাজিয়া লইবে। পূর্ব্বোক্ত কাণ্ড এই হিংচূর্ণ এক আনা বা দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। (২) অর্যবস্থা এক সিকি বাসি জলে খাটরা এক সিকি স্বত, জল

প্রয়োগ করিবে। (৩) সুশারীর মূল এক সিকি পঁচিশটি মরিচের সহিত বাটিয়া বাসি জলের সহিত খাওয়াইবে। (৪) এক সিকি ময়না মূল ২৫টি মরিচের সহিত বাসি জলের সহিত খাওয়াইবে। (৫) এক সিকি নাটা করঞ্জের মূল ২৫টি মরিচের সহিত বাটিয়া বাসি জলের সহিত খাওয়াইবে।

তিন চারি দিন এইরূপ ঔষধ প্রয়োগের পর দোষ ও অবস্থাতেদে চিকিৎসা করিবে। লোমভেদে কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা লিখিত হইতেছে।

বাতন্ত্র বসন্ত রোগে—স্ফোট অরূপ বা শ্যাম বর্ণ, তীব্রবেদনায়ুক্ত ও কঠিন হয় এবং বিলম্বে থাকে। পিত্তজ বসন্ত রোগে—স্ফোট রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, উহাতে দাহ ও তীব্র বেদনা থাকে, শীঘ্র থাকে, সন্ধি, অস্থি ও পর্কসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা হয়, তালু, গুঠ ও জিহ্বা শুকাইয়া যায়, এবং তৃষ্ণা, অরুচি, কাস, কম্প, অস্থিরতা ও অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হয়।

রক্তজ বসন্ত রোগে—মলভেদ, গাভীকা দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি ও তীব্র জ্বর হয়, চক্ষু লাল হয়, মুখে ক্ষত হয় এবং স্ফোটসকল পিত্তজ বসন্তের জ্বর লক্ষণযুক্ত হয়।

কফজ বসন্ত রোগে—স্ফোট সকল শ্বেত বর্ণ, স্নিগ্ধ, মৃদু, কণ্ডুযুক্ত ও অল্প বেদনায়ুক্ত হয়, বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, বিলম্বে থাকে, এবং কক্ষ প্রসেক, শরীর আর্দ্র বদ্ব্যবৃত্তবৎ বোধ হওয়া, মস্তক বেদনা, শরীরের শুষ্কতা, বমনাতার, অরুচি তন্দ্রা ও আলস্ত উপসর্গ ঘটে।

সন্নিপাতজ (ত্রিদোষজ) বসন্ত রোগে—স্ফোট সকল প্রবালের জ্বর, পাকা জ্বরের জ্বর, মসিনার জ্বর হইতে পারে। সাধা-

রণতঃ চিড়ের জ্বাশ আকৃতি বিশিষ্ট, বিস্তীর্ণ, নীলবর্ণ, মধ্যস্থলে নীচু ও অত্যন্ত ঘনাবিশিষ্ট হয়, বিলম্বে থাকে, চূর্ণক্ক শ্রাব হয় এবং বহু পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা অসাধ্য। চন্দ্রদল নামক বসন্ত রোগ অরুচি, প্রলাপ, তন্দ্রা এবং কঠরোধ উপসর্গ ঘটে।

রসরক্তাদি ভিন্ন ভিন্ন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বসন্ত রোগের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে জলবৃদ্ধের জ্বর স্ফোট উৎপন্ন হয় এবং উহা বিদৌর্ণ হইলে জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহা অল্প দোষযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণে ইহা জল বসন্ত বা পানিবসন্ত নামে খ্যাত।

বসন্ত রোগের যে চারিটি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম অবস্থা ৩৪ দিন থাকে, তাহার পর প্রথমে কপালে পরে হাতের কজির ভিতর দিকে বসন্ত বাহির হয়। ইহার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মূগে, হাতে পায়ে এবং শরীরের অন্তস্ত স্থানে শূন্য গুটি বাহির হয়। গুটি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং রোগী সুস্থতা বোধ করে। দ্বিতীয় অবস্থা ৩৪ দিন, ইহার পর তৃতীয় অবস্থা। গুটিগুলি প্রথমে উজ্জল রক্তবর্ণ থাকে। জন্মিবার ২১ দিন মধ্যে একটু চাপা গোলাকার কোষ্কার জ্বর হয়। ইহার দুই একদিন পরেই পাকিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয়, গুটির ভিতর পূর্ব জমে বলিয়া শ্বেতভঙ্গ হরিজাবর্ণ দেখায়। তৃতীয় অবস্থা ৩৪ দিন থাকে। ইহার পর রসজ হইবার একাদশ বা দ্বাদশ দিনে গুটি শুকাইতে আরম্ভ হয় এবং জ্বর চলিয়া যায়। ইহাই চতুর্থ অবস্থা। এই অবস্থা ৩৪ দিন থাকে। সাধারণতঃ বসন্ত রোগ এইরূপ ভাবেই প্রকাশ

পাইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিম্নে একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

একজন ধনবানের গৃহে চিকিৎসার্থ আহুত হই। রোগী দেখিবার পর সেই বাটার জনৈক কৰ্মচারীর ২৪২৫ বৎসরবয়স্ক পুত্র আসিয়া বলে, দেখুন দেখি, গায়ে এগুলি কি বাহির হইয়াছে? দেখিয়া বসন্ত বলিয়া বোধ হইল এবং তাহাই বলিলাম। সে সময়ে আমি বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিতাম না। সেই জন্ত বলিলাম যে, এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা কম, আব কাহাকেও দেখাও। তাহারা একজন বসন্ত চিকিৎসককে দেখাইল। সে ব্যক্তি বসন্ত বলিয়া স্থির করিল এবং ঔষধ দিল। ঔষধ লইয়া রোগী দেশে চলিয়া গেল। সেখানে কোনও কিছু হইল না। ৮১০ দিন দেশে থাকায় অনেকে রহস্ত করিয়া বলিল, তোমার চুলকাণী হইয়াছে, অথচ বসন্তের দোহাই দিয়া বাড়িতে বসিয়া আছ। ইহার ২১১ দিন পরেই বোগী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, আসিবার ২১৩ দিন পরে ভয়ঙ্কর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইল। এই রোগেই তাহার মৃত্যু হয়।

বসন্ত রোগের দ্বিতীয়াবস্থার প্রথমে যে সকল ঔষধ প্রযোজ্য তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়াবস্থার শেষের দিকে নিম্ন লিখিত ঔষধসমূহের মধ্যে যেরূপ কোন একটা ঔষধ অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

(১) ক্রডাকচূর্ণ এক আনা ও মরিচ চূর্ণ এক আনা বাসি জল সহ সেবন করিলে বসন্ত ভাল হয়।

(২) হরিদ্রাপত্র ও তেতুলপত্র পেষণ করিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে বসন্ত বোগ নষ্ট হয়।

(৩) নিষাদি—নিমছাল, ক্ষেপাপড়া, আকনাদি, পলতা, কটুকী, বাসকছাল, দ্রাবলতা, আমলকী, বেণারমূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথে তিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ত্রিদোষ বসন্ত রোগ নষ্ট হয় এবং যে সকল বসন্ত উষ্ণিয়ার বসিয়া যায়, তাহার পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(৩) তৃতীয় অর্থাৎ পক্ষাবস্থা—বসন্ত পাকিতে আরম্ভ হইলে শোষক পথ্য ও ঔষধ না দিয়া পুষ্টিকারক ঔষধ ও পথ্য দিবে। এই সময় কিসমিস, দাড়িম, মাষকলায়ের যুগ্ম, ঘৃত, তিনি প্রভৃতি পথ্য দিতে হয়। শোষক ঔষধ দিলে পাকোন্মুখ দোষ গুরু ও অন্তঃপ্রবীর্ণ হইলে রোগ কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্ত পুষ্টিকর, রস-বর্দ্ধক, পবিত্র ও লঘুপাক পথ্য দেওয়া উচিত। জ্বর না থাকিলে অন্নপথ্য দেওয়া যাইতে পারে। দ্রুত এই সময়ে স্থপথ্য।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলির যে কোন একটা অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

(১) গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিসমিস ও ইক্ষুমূল সমান ভাগে মোট দুই তোলা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা পাকিতে নামাইবে। অনন্তর ছাঁকিয়া উহার সহিত দাড়িমের রস ও ইক্ষু শুদ্ধ দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে বসন্ত শীঘ্র পাকে এবং বায়ুশুদ্ধি হইতে পারে না।

(২) কুলের আঁটির শাঁস চূর্ণ এক সিকি দুই তোলা ইক্ষু শুদ্ধ সহ সেবন করিলে বসন্ত শীঘ্র পাকে।

(৩) গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাসা, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কটুকারী, গোন্ধুর, রক্তচন্দন, গাঙ্গারীকণ, বেড়েলার মূল ও বৈচি ইহাদের

কাথ করিয়া বাতজ বসন্ত রোগের পাক কালে প্রয়োগ করিবে।

(৪) কিসমিস, গান্তারীফল, খেজুর, পলতা, নিমছাল, বাসকছাল, আমলকী ও হুবালাভ ইহাদের কাথে খৈ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিত্তজ বসন্তেও ইহা প্রযোজ্য।

বসন্ত পাকিতে আরম্ভ করিলেই গোময় ভস্ম গায়ে মাখাইবে। স্ফোটে অত্যন্ত রুদ্র হইলে পঞ্চবঙ্গল চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই সময়ে নানা প্রকার উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। সেই সকল উপসর্গের চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে।

রোগীর পেটফোলা ও পেটে যন্ত্রণা থাকিলে এবং বায়ু কর্তৃক কম্পমান হইলে জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের যুষ সৈন্ধব লবণ সংযোগে প্রয়োগ করিবে। অরুচি হইলে দাল বা মাংসের যুষ অন্ন দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

মুখ ও কণ্ঠের মধ্যে বৃশস্ত হইলে জাতী-পাতা, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, স্রপারী, শাঁই-গাছের ছাল, আমলকী ও যষ্টিমধুর কাথ করিয়া গণ্ডূষ (আকর্ষ মুখে ধারণ) করিতে দিবে। পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ মধু সহ সেবন করিলেও কণ্ঠ বিগুহ্ব হয়। খদিরাষ্টক-পাচনে শোধিত গুগ্গুলু এক সিকি প্রক্ষেপ দিয়া সেচন করিলেও উপকার হয়।

চক্ষুতে বসন্ত হইলে গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু সম-ভাগে বাটিয়া একটা পরিষ্কার কাগড়ে বাঁধিবে এবং উহা নিংড়াইয়া চক্ষু মধ্যে রস দিবে। যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মূর্খা, দারুহরিদ্রার ছাল, নীলোৎপল, বেনার মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা বাটিয়া উপরোক্ত প্রকারে

তাহার রস চক্ষু মধ্যে দিলে এবং চক্ষুর পাতার উপর বাটিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নষ্ট হয়।

শিরীষ, যজ্ঞভূমুর, অণখ, শেলু ও বট ইহাদের ছাল সমভাগে বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারিত হয়। তেলাকুচার পাতার রস কাঁচা হলুদ একর ছেঁচিয়া তাহার রস লাগাইবে; এই ঔষধটী বিশেষ পরীক্ষিত। ডাক্তারী লোশন বোতল বোতল ব্যবহার করিয়া যেখানে ফল হয় না, সেখানে এই সামান্য ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল হয়। জ্বালা নিবারিত হয়। তুণ্ডলোদক দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভিজাইলে পদের জ্বালা নিবারণ হয়।

বসন্ত পাকিবার সময় হইতে শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ধূম প্রয়োগ কর্তব্য। বচ, ঘৃত, বাশের নীল, বাকসমূল, কাপাস বীজ, ব্রাহ্মী শাক, তুলসী, আপাং ও লাক্ষা সমভাগে লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া রোগীর শরীরে ধূম লাগাইবে। সরল কাষ্ঠ, অগুরু ও গুগ্গুগুলু দগ্ধ করিয়া সেই ধূম রোগীর গাত্রে লাগাইলে ক্ষত বিগুহ্ব হয়, যন্ত্রণা কমিয়া যায় এবং ক্ষতে ক্রিমি হইতে পারে না।

নিম্নলিখিত কয়েকটা পাচন বসন্ত রোগের দ্বিতীয় অবস্থা হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেবন করা যাইতে পারে। কোন কোনটা দ্বিতীয় অবস্থার প্রয়োগ করা চলে। খদিরাষ্টক—খদির কাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমপাতা, পলতা, গুলঞ্চ ও বাসক ছাল; ইহাদের কাথ বসন্তরোগ নাশক।

অমৃতাদি—গুলঞ্চ, বাসকছাল, পলতা, মূতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, অনন্তমূল, নিম-পাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের কাথ। পটোলাদি—পলতা, গুলঞ্চ, মূতা, বাসক



ছাল, ছুরালভা, চিরভা, নিমছাল, কটকী ও ক্ষেতপাপড়া ; ইহাদের কাথ পান করিলে অপক বসন্ত প্রশমিত হয় এবং পক বসন্ত শুষ্ক হইয়া যায় ।

রক্তাশ্রয়ী বসন্ত রোগে নাসিকা, চক্ষু, মল দ্বার, ফুসফুস প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে । দাড়িম ফুলের রস, দুর্কীষাসের রস, আমের কোশীর রস এবং জল বা দুগ্ধ সহ মিশ্রিত চিনি ইহাদের যে কোন একটি দ্রব্যের নাস লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয় । কর্ণ বা চক্ষু দিয়া রক্তস্রাব হইলেও ঐ সকল দ্রব্যের কোন একটি প্রয়োগ উচিত । মুখ দিয়া রক্তনির্গত হইলে বাসক পাতার রস মধু ও চিনির সহিত, ষণ্ডডুঘরের রস মধুর সহিত, রক্তকাঞ্চন ফুল মধুর সহিত, শিমুলফুল চূর্ণ মধুর সহিত ; ইহাদের যে কোন একটি যোগ প্রয়োগ করিবে । মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে খোসাহীন কুড়তিল বাটা আধ তোলা ও চিনি আধ তোলা ছাগহুখে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে । কাঁটানটের মূল বাটিয়া চেলুনী জলের সহিত সেবন করিলেও রক্তস্রাব নিবারিত হয় । মূত্র দ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হইলে কুশ, কাশ, শর, উলু ও ইক্ষু ; ইহাদের মূলের কাথ প্রয়োগ করিবে ।

যে স্থান দিয়াই রক্ত নির্গত হইতক নিম্ন-লিখিত পথ্য হিতকর । কিসমিস, খেজুর, মউয়াফুল, ও ফলুসাফল মোট সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইবে । অনন্তর ছাকিয়া লইয়া সেই কাথে থৈচূর্ণ ওতোলা এবং কিঞ্চিৎ স্নাত, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে দিবে । অস্ত্র দ্রব্য না পাইলে কেবল কিসমিস সিদ্ধ করিয়া ঐরূপ দেওয়া

যাইতে পারে । প্রবল অরৈ বা পেটের দোষ থাকিলে স্নাত দেওয়া উচিত নহে ।

প্রবল বসন্ত রোগে অনেক সময়ে বিকার উপস্থিত হয় । এই অবস্থায় সূচিকিংসকের দ্বারা চিকিৎসা করান কর্তব্য । এই অবস্থায় অর-বিকারের চিকিৎসা করিতে হয় । রোগীর খাস, কাস, পার্শ্ববেদনা, তন্দ্রাহীনা থাকিলে দশমূল, চতুর্দশাঙ্গ বা অষ্টাদশাঙ্গ পাচন এবং কস্তুরীভূষণ, কস্তুরীভৈরব, পঞ্চানন রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । বৃকে শ্লেষ্মা বসিয়া খাসকষ্ট বা বাক্রোধ হইলে বকঃস্থলে ও পার্শ্বে ক্রমাগত গমের ভূষির পুলটিস দিবে । চরম অবস্থায় প্রতাপলঙ্ঘন, সূচিকাতরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে । নাড়ী ক্ষীণ এবং দেহ শীতল হইলে প্রথমে মকরধ্বজ ১ রতি, মৃগনাভি ১ রতি এবং কর্পূর ১ রতি মধু সহ মাড়িয়া ১ঘণ্টা বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ৩৪ বার খাওয়াইবে । তাহাতে কাজ না হইলে পূর্বোক্ত সর্পবিষঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

(৪) কত শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে রোগীর অবস্থা বুঝিয়া শোষক পথ্য দিবে । অর না থাকিলে এবং ক্ষুধা হইলে পুরাতন চাউলের অন্ন, ময়ূর, অড়হর ও বুটের দালের ঘুস, নিমপাতা, সজিনা ডাঁটা, পটোল, পলতা, উচ্ছে, কাঁচকলা, কাঁকরোল প্রভৃতি পথ্য । দুগ্ধ, মিষ্টদ্রব্য, কলায়ের দাল প্রভৃতি নিষিদ্ধ । প্রায়ই বসন্ত রোগের শেষে সর্দি কাসি হয় । সর্দি কিবা কাসি থাকিলে ছই বেলা অন্ন না দিয়া এক বেলা রুটি দিবে । রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িলে এবং অত্যন্ত বায়ু একোপ থাকিলে পায়সা ও ডাক পাখীর মাংস বা জাঙ্গল মাংসের ঘুস সৈন্ধব লবণ সংযোগে পথ্য দিবে ।

এই সময়েও রোগীর গৃহে ধূপ দেওয়া চলিবে এবং নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ শিলায় বাটিয়া রোগীর শরীরে প্রলেপ দিবে। যত দিন খোলস উঠিয়া না যায় ততদিন প্রলেপ দেওয়া উচিত। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেনার মূল, শিরীষ ছাল, মুতা, লোধছাল, খেতচন্দন ও নাগকেশর জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বসন্তরোগের শেষে অনেক সময় কাস হয়। কাসের জন্ত নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগের যে কোন একটা প্রয়োগ করিবে।

(১) একটি বহেড়া ঘৃতভাজ্য করিয়া গোবরের তুলিতে পুরিয়া ঘূঁটের আঙুণে পোড়াইবে। অনন্তর উহা উদ্ধৃত ও বীজ-রহিত করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কাস ভাল হয়।

(২) হরীতকী, শুঠ ও মুতা সমভাগে চূর্ণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের সমান ইক্ষুগুড়ের সহিত মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা মুখে রাখিয়া চুমিয়া খাইলে কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়।

(৩) পিপুল, শুঠ, খেজুর, ঠেং, কিসমিস ও চিনি সমপরিমাণে একত্রে বাটিয়া এক সিকি মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুসহ সেবন করিলে কাস নষ্ট হয়।

(৪) পিপুল, রক্তকাষ্ঠ, লাক্ষা ও বৃহতী ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া দুই আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ স্বত ও মধুসহ সেবন করিলে কাস নষ্ট হয়।

বসন্তরোগের শেষে মুখে, মণিবন্ধে, কহু-ইয়ে এবং স্বন্ধের নিম্নে শোথ হইলে প্রথমে তাহাতে জৌক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে।

পরে নিম্নলিখিত যোগের কোন একটা প্রয়োগ করিবে।

(১) তিল তৈলে বিছা ভাজিয়া প্রলেপ দিলে ঐ শোথ ভাল হয়।

(২) শেওড়া গাছের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া স্বতসংযোগে প্রলেপ দিলে শোথ নষ্ট হয়।

(৩) বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুম্বর, পাকুড় ও বেতসের ছাল বাটিয়া স্বতসংযোগে প্রলেপ দিলে শোথ নষ্ট হয়।

(৪) পুনর্নবা, সজিনা ছাল, দেবদারু ছাল, গাম্ভারী ছাল, বেল ছাল, শোণাছাল, পাকুল ছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও শুঠ বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে শোথ ভাল হয়।

বসন্ত রোগ ভাল হইবার পর রোগীর বল জননার্থ লঘুপাক ও পুষ্টিকর স্বপথ্য দিবে। বেশ সবল না হওয়া পর্য্যন্ত সাবধানে রাখিবে। বসন্তের দাগ ও গঠ মিলাইবার জন্ত শম্ভভঙ্গ ডাবের জলে মাখিয়া ঘর্ষণ করিবে। কানীয় কাঠ, প্রিয়ঙ্গু, আমের আঁটির শাঁস, নাগকেশর ও মঞ্জিষ্ঠা গোমর রসে বাটিয়া স্বতসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে ত্রণস্থান ত্বকের সমান বর্ণবিশিষ্ট হয়।\*

কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিলে বা ভালরূপ কোষ্ঠ শুদ্ধি না হইলে হরীতকী এক তোলা ও সৈন্ধব এক সিকি সেবন করিলে অথবা তেউড়ীমূলচূর্ণ তিন চার আনা ও চিনি দুই আনা মিলাইয়া গরম জল সহ পান করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রবল গা বমি বমি থাকিলে ব্রাহ্মী শাকের রস এক ছটাক অথবা হেলেঞ্চার রস এক ছটাক কিঞ্চিৎ মধুসহ সেবন করিয়া বমন করিবে।

\* অন্তঃপর যাহা নিখিত হইয়াছে তাহা প্রবর্তের প্রথমে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল মুতাকর অমানবর্ণাধি-  
বিশদায় বাটনাছে।

লবণ মিশ্রিত গরম জল বা এক সিকি সর্বপ চূর্ণ গরম জল সহ সেবন করিলেও বমন হয়। বমন বা বিরেচনের পরে সেইদিন কোনরূপ গুরুপাক খাদ্য আহার না করিয়া জলসাপ্ত বা জলবারি খাইয়া থাকা ভাল। পরদিন শরীরের অবস্থা বুঝিয়া লঘুপাক আহার করা কর্তব্য। শরীর ভারি বা মাজম্যাজে হইলে অমৃতাভাব দূর হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্যন্ত লজ্জন দেওয়া কর্তব্য। অরুচি হইলে উপবাস করা উচিত। উভয় অবস্থাতেই মান বন্ধ রাখা উচিত। এই সকল নিয়ম পালন করিলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় খুব কম।

চতুর্দিকে বসন্ত রোগের বা যে কোন সংক্রামক রোগের প্রাবল্য ঘটিলে এবং মহামারীর সময় সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্ত্র বা ওষা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ।

বসন্তের প্রাবল্যের সময় অরুচি হইলে প্রথম হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। নিবাত স্থানে অবস্থান ও উপবাস নিত্য প্রয়োজনীয়।

বমির ভাব থাকিলে পুরোক্ত উপায়ে বমন করা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বিরেচক ঔষধ সেবন করা উচিত। ইহাতে রোগীর জ্বর হইলেও কখনই মারাত্মক হইতে পারে না।

শাস্ত্রোক্ত বসন্ত রোগের প্রতিষেধক কয়েকটি ঔষধ নিম্নে লিখিত হইয়াছে।

(১) নিমের বীজের শাঁস দুই আনা, বহেড়া বীজের শাঁস দুই আনা ও হরিদ্রা দুই আনা পেষণ করিয়া শীতল জলসহ সেবন করিলে বসন্ত রোগ হয় না। (২) মোচার রস খেতচন্দন বাটার সহিত, (৩) বাসকের রস বট্টমধু চূর্ণের সহিত, (৪) জাতি ফুলের পাতার রস বট্টমধু চূর্ণের সহিত সেবন করিলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত করিতে পারে না।

বসন্ত রোগ যে সময় হয়, সেই সময় নিমপাতা এবং সজিনার ডাঁটা নিত্য আহার করা কর্তব্য। বসন্ত রোগ পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ হয়। আর নিমপাতা ও সজিনার ডাঁটা পিত্তশ্লেষ্মানাশক। সুতরাং বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। ইহা পরীক্ষিত।

## আয়ুর্বেদে মাংস ব্যবহার বিধি ।

কবিরাজমহাশয় রোগীকে মাংস যুগ ব্যবস্থা করিলেন। রোগী বিম্বিত হইয়া বলিলেন, সে কি কবিরাজমহাশয়, ডাক্তারেই ত মাংসের যুগ পথ্য দেয়! আপনারা ডাক্তার-যেব নকল করিতেছেন দেখিতেছি! কি বিভ্রম! আয়ুর্বেদে যত মাংসের ব্যবহার আছে এত আর কোথায়ও নাই, অথচ লোকের এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা! এই ভ্রম সংশোধন করিবার আশায় আমরা আজ

পাঠকগণকে আয়ুর্বেদোক্ত মাংস ব্যবহার বিধি উপহার দিতেছি।

জলচর, আনুপ (জল সমীপে বিচরণকারী), গ্রাম্য, মাংসাশী, একশক (জোড়াকার) ও জাকলভেদ মাংস ছয়প্রকার। এই সকল মাংস উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা আনুপ, আনুপ অপেক্ষা গ্রাম্য, গ্রাম্য অপেক্ষা মাংসাশী, মাংসাশী অপেক্ষা একশক এবং একশক অপেক্ষা জাকল মাংস শ্রেষ্ঠ।

ইহার আবার জাঙ্গল ও আনুপ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে জাঙ্গল মাংস আট প্রকার, যথা, জজ্বাল, বিক্রি, প্রতুদ, গুহাশর, প্রমহ, বর্ণমৃগ, বিলেণ ও গ্রাম্য। ক্রমশঃ প্রত্যেকের বিষয় কথিত হইতেছে।

জজ্বাল—এণ (কৃষ্ণহরিণ), হরিণ (গৌর হরিণ), ঋষ্য (শ্বেতবর্ণপদযুক্ত হরিণ), কুরঙ্গ (ঈষৎ তাব্রবর্ণ বৃহৎ হরিণ), করাল (কস্তুরী মৃগ, ইহাদিগের নাভিতে কস্তুরী বা মৃগনাভি হয়), কৃতমাল এক প্রকার হরিণ (ইহার দলে দলে বিচরণ করে) প্রভৃতিকে জজ্বাল বলে। ইহার বৃহৎ জজ্বাশিষ্টে বলিয়া ঐ নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ যথা,—কষায়রসবিশিষ্ট মধুর রস, লঘুপাক, বাতপিত্তনাশক, তীক্ষ্ণবীৰ্য, তুষ্ণিকারক এবং মূত্রাশয়শোধক। অনাবগ্ৰক বিবেচনায় প্রত্যেকের পৃথক্ গুণ লিখিত হইল না। মূত্রাশয়শোধক বলিয়া ইহাদের মাংস অশ্মরী (পাথরী), শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাখাত প্রভৃতি রোগে হিতকর।

বিক্রি—তিস্তির, বটের, চকোর, ময়ূব, কুক্কু প্রভৃতি পক্ষী চরণ ও চক্ষু দ্বারা ছড়াইয়া আহার করে বলিয়া উহাদিগকে বিক্রি বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—কষায়-রসসংযুক্ত মধুর রস, লঘুপাক, শীতবীৰ্য এবং ত্রিদোষনাশক। কুক্কুটের মাংস নিধ, উষ্ণবীৰ্য, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, ঘর্মজনক, স্বরপরিষ্কারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, গুরুপাক এবং বায়ুরোগ, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বর-নাশক।

প্রতুদ—পারাবত, বহু পারাবত, কোকিল, গ্রাম্য চটক, কাদাখোঁচা, খজন, ডাকপাখী প্রভৃতি আছড়াইয়া আহার করে বলিয়া উহা-

দের নাম প্রতুদ। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—কষায় রসযুক্ত, মধুর রস, কক্ষ, বায়ু-বর্দ্ধক, পিত্তশ্লৈশ্মনাশক, মূত্ররোধক এবং মলের অন্নতাকারক। ইহাদের মধ্যে পারা-বতের মাংস রক্তপিত্তনাশক, কষায় রস, মধুর বিপাক এবং গুরু। রাজনিঘণ্টের মতে পারাবতের মাংস বলবীৰ্যবর্দ্ধক, কক্ষ, পিত্ত ও রক্ত দোষনাশক। রাজবল্লভের মতে উহা বাতপিত্তনাশক। পারাবতমাংস সৰ্বদে বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, শাস্ত্রের একাংশ দেখিয়া কোন বিষয়ের বিচার করা চলে না। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, পারাবতের মাংস সমস্ত মাংসের তুল্যাগুণ-বিশিষ্ট। অত্ৰ কোন বাস্তব না থাকিলে যেমন এক সর্ববাস্তব ঘটনা দ্বারা পূজা নির্বাহ হয়, সেইরূপ অত্ৰ কোন মাংসের অভাব ঘটিলে পারাবতের মাংস দ্বারা তাহার কাজ চলে। কিছুকাল পূর্বে কবিরাজেরা তুর্কল রোগীর জন্য পায়রার পিলের ঘূষ (শাবকের) ঘূষ ব্যবস্থা করিতেন। এক্ষণে মুরগীর পিলে পায়রার পিলের স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে মুরগীর মাংস এখনও সমাজে সুপ্রচলিত হয় নাই। সুতরাং কুক্কুট-মাংস-রসে বঞ্চিত রোগীকে পায়রার পিলের ঘূষ দেওয়া যাইতে পারে। প্রতুদ মাংসের স্বর-বর্দ্ধক শক্তি নাই। সুতরাং সুস্বরকামী ব্যক্তির কোকিল পোড়াইয়া খাওয়া বৃথা চেষ্টা মাত্র। প্রতুদ মাংসের মধ্যে চটকের মাংস এবং ডিম্ব অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক সুতরাং অন্ন ও কণীভুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে পরম হিতকারী।

গুহাশর—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল প্রভৃতি যে সকল জন্তু গুহার বাস করে তাহাদিগকে গুহাশর বলে।

ইহাদিগের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা—মধুর রস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকর, বায়ুনাশক, উষ্ণ-বীৰ্য্য এবং চক্ষু ও শুষ্কবোগে বিশেষ হিতকর ।

প্রসহ—কাক, বাজ্র, পেঁচা, চিল, শিক্রে, শকুন প্রভৃতি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে প্রসহ বলে । ইহাদের মাংস শুষ্কশয় প্রাণীর মাংসের ত্রায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ক্ষয়রোগীর পক্ষে পরম হিতকর ।\*

পৰ্ণমৃগ—মলয় সর্প, গেছো ইন্দুর, কাঠ-বিড়ালী, বানর প্রভৃতি বৃক্ষে বাস করে বলিয়া ইহাদিগকে পৰ্ণমৃগ বলে । ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—মধুর রস, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, ক্ষয়রোগীর হিতকর, কাস-শ্বাস-অর্শঃ-নাশক এবং মলমূত্র-নিঃসারক ।

বিলেশয়—শজারু, গোসাপ, বনবিড়াল-শশক (খরগোস), সর্প, ইন্দুর, বেজী (নেউল) প্রভৃতি বিলে অর্থাৎ গর্ত্তে বাস করে বলিয়া উহাদিগকে বিলেশয় বলে । ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—মলমূত্রের ঘনত্বসম্পাদক, উষ্ণবীৰ্য্য, মধুর বিপাক, বায়ুনাশক, শ্লেষ্ম-পিত্তবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ এবং কাস, শ্বাস, ও ক্লান্তি-নাশক । ফণায়ুক্ত সর্পের মাংস চক্ষুর পরম হিতকর । আশা করি, চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি-গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ।

গ্রাম্য—অশ্ব, অশ্বতর (খচর), গো, উষ্ট্র, ছাগ, মেঘ এবং মেদ, পুচ্ছক (দুধা) প্রভৃতি গ্রামে বাস করে বলিয়া উহাদিগকে গ্রাম্য বলে । ইহাদিগের মাংসের সাধারণ গুণ যথা,—বায়ুনাশক পুষ্টিকারক, ককপিত্ত-বর্দ্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, অগ্নিদীপক এবং বলবর্দ্ধক । তন্মধ্যে ছাগমাংস মাতি-

শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, অন্ন, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, অনভিয্যন্দি এবং পীনসনাশক । বাগভটের টীকাকার অরুণদত্ত বলিয়াছেন—ছাগমাংস মানুষের শরীরধাতুর সমান বলায় এই ভঙ্গীতে মনুষ্যমাংসের গুণ বাখ্যা করা হইল । এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আর্ঘ্য জাতি নরখাদক ছিলেন বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন ।

মেঘমাংস—পুষ্টিকর, পিত্তশ্লেষ্মাবর্দ্ধক, এবং গুরু । একক্ষুরবিশিষ্ট প্রাণীর মাংস মেঘমাংসের সমান গুণবিশিষ্ট ও ঈষৎ-লবণ-রসায়ক ।

এই সমস্ত জঙ্গল মাংস অন্ন অভিয্যন্দি ।\* যে সকল পশুপক্ষী লোকালয় এবং জলাশয় ইহিতে দূরে বিচরণ করে তাহাদের মাংস অন্ন অভিয্যন্দি । আর যে সকল পশুপক্ষী লোকা-লয় বা জলাশয়ের নিকটে বাস করে তাহা-দিগের মাংস অত্যন্ত অভিয্যন্দি ইহা ধাকে ।

আট প্রকার জঙ্গল মাংসের বিষয় বলা হইল । এক্ষণে আনুপ মাংসের বিষয় কথিত হইতেছে ।

আনুপমাংস পাঁচ প্রকার । যথা, কুলচর, প্রব, কোশস্থ, পাদি এবং মংস্ত । ক্রমশঃ ইহাদিগের বিষয় লিখিত হইতেছে ।

কুলচর—হস্তী, মহিষ, শূকর, গণ্ডার, গুন্দ (ভোঁদড়) প্রভৃতি পশু জলাশয়তীরে বিচরণ করে বলিয়া উহাদিগকে কুলচর বলে । ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা, বাত-পিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীৰ্য্য, বলকারক, মূত্রকারক এবং কফ-

\* যে সকল ঐষ্য গুরু ও শিথিল বলিয়া যেদবাহী নিরাশকলকে ব্রহ্ম করিয়া শরীরের গুরুত্ব জন্মায় তাহাদিগকে অভিয্যন্দি বলে । যেমন ঘণি ।

বর্দ্ধক। বরাহমাংস—ঘর্ষকারক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীৰ্য্য, ধাতুবর্দ্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক এবং বলকারক। প্লব—হংস, সারস, কলহংস, বক, পানকোড়ী প্রভৃতি পক্ষী জলে ভাসিয়া থাকে বলিয়া উহাদিগকে প্লব বলে। এই সকল পক্ষী প্রায় দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদিগের মাংসের সাধারণ গুণ যথা, রক্তপিত্তনাশক, শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, মলমূত্রনিঃসারক, মধুর রস ও মধুর বিপাক\*। তন্মধ্যে হংসের মাংস গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, মধুর রস, স্নায়ুপরিষ্কারক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক, বল ও পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

কোশস্থ—শঙ্খ, ঝিষুক, শযুক ও গুগলি কড়ি প্রভৃতি যে প্রাণীর শরীর কোশের (কঠিন আবরণ) মধ্যে থাকে তাহাদিগকে কোশস্থ বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ যথা, মধুর রস, মধুর বিপাক, বায়ুনাশক, শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, পিত্তের হিতকারক, মলনিঃসারক এবং স্নেহবর্দ্ধক।

পাদী—কচ্ছপ, কুম্ভীর, কাকড়া, কুম্ভবর্ণ কাকড়া, শুভ্রক প্রভৃতির পদ আছে বলিয়া উহাদিগকে পাদী বলে। ইহাদিগের মাংস কোশস্থ প্রাণীর মাংসের ত্রায় গুণবিশিষ্ট।

মংস্ত্র—মংস্ত্র নানা প্রকার এবং তাহাদিগের মাংসের গুণও নানা প্রকার। সাধারণতঃ নাদের মংস্ত্রে মাংসের গুণ, যথা, মধুর রস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তজনক, উষ্ণবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ এবং মলের অন্নতাকারক। পুষ্করিণী ও দীঘিজাত মংস্ত্র মধুর রস ও স্নিগ্ধ; মহাহ্রদজাত মংস্ত্রসকল অত্যন্ত

বলকারক এবং অন্নজলজাত মংস্ত্র তত বলকর নহে।

হিমি, তিমিস্রিল, গাগরা, চাঁদা প্রভৃতি সমুদ্রজাত মংস্ত্রের মাংস গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মধুর রস; অন্নপিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মলনিঃসারক এবং কফবর্দ্ধক। ইহারা মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া অত্যন্ত বলকারক। সমুদ্রজাত মংস্ত্র অপেক্ষা চুটী (ডোব) ও কূপজাত মংস্ত্র অধিকতর বায়ুনাশক বলিয়া উৎকৃষ্ট। বাণী (ক্ষুদ্র পুষ্করিণী) জাত মংস্ত্র সকল স্নিগ্ধ এবং মধুর রস বলিয়া পুষ্কোক্ত ছই প্রকার মংস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নদীজাত মংস্ত্র মুখ ও পুচ্ছদ্বারা বিচরণ করে বলিয়া উহাদের মধ্যদেশ গুরুপাক। সরোবর ও তড়াগ (বৃহৎ পুষ্করিণী) জাত মংস্ত্রের মস্তক (মুড়া) লঘুপাক। বক্ষঃস্থল দ্বারা বিচরণ করে বলিয়া সরোবরজাত মংস্ত্রেব পূৰ্ব্ভাগ লঘু এবং অধোভাগ গুরু। পূৰ্ব্ভেদের ঝরণার মংস্ত্র অত্যন্ত অন্নপরিপাকী\* বলিয়া উহাদিগের মস্তকের কিয়দংশ ব্যতীত সমস্তই গুরুপাক।

আম্রপ জাতীর মাংস অত্যন্ত অভিযান্দি।

চতুষ্পদ পশুর জীজাতির মাংস এবং পক্ষাদিগের পুরুষজাতির মাংস উৎকৃষ্ট। বৃহৎ কায় প্রাণীর মধ্যে বাহাদের শরীর ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রকায় প্রাণীর মধ্যে বাহাদের শরীর বৃহৎ তাহাদের মাংস উৎকৃষ্ট।

রক্ত হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত ধাতু উত্তরোত্তর গুরু, অর্থাৎ রক্ত অপেক্ষা মাংস, মাংস অপেক্ষা মেদ, মেদ অপেক্ষা অস্থি† এবং অস্থি অপেক্ষা মজ্জা গুরুপাক। সন্ধি (উরুদেশ), হৃদয়, ক্রোড়

† অস্থি অর্থে সমস্ত হাড় চিহ্নাইয়া থাকিতে বলা হয়। তরুণাঘ্রি (Cartilage) কথাই বলা হইয়াছে বোধ হয়।

\* জঠরানলসংযোগে ভুক্ত ভ্রব্যের যে রসাত্তর ঘটে তাহাকে বিপাক বলা যায়।

মস্তক, পদ, হস্ত (সম্মুখের পদ), কটী, পৃষ্ঠ, বৃক্ক (Kidney), যকৃৎ (মেটে) এবং অন্ত্র উত্তরোত্তর গুরুপাক। (সক্টি অপেক্ষা স্বক্ক, স্বক্ক অপেক্ষা ক্রোড় ইত্যাদি। স্বক্ক অপেক্ষা মস্তক; পৃষ্ঠ অপেক্ষা কটীদেশ এবং পশ্চাতের সক্টি (বায়) অপেক্ষা সম্মুখের সক্টি গুরুতর।

সকল প্রাণীরই দেহের মধ্যভাগ গুরুপাক। পূর্ব জাতির দেহের সম্মুখ ভাগ এবং স্ত্রী জাতির দেহের পশ্চাত ভাগ গুরু। বিশেষতঃ পক্ষ্যদিগের উরু ও গ্রীবা গুরু, এবং পক্ষ উৎক্ষেপণ হেতু উহাদের শরীরের মধ্যভাগ মধ্যম অর্থাৎ লঘু ও নয় গুরু ও নয়। ফলভক্ষক পক্ষ্যদিগের মাংস অত্যন্ত রক্ষ, মৎস্য ভক্ষক পক্ষ্যদিগের মাংস অত্যন্ত পিত্তকর, এবং ধাতু ভক্ষক পক্ষ্যদিগের মাংস অত্যন্ত বায়ুনাশক।

জলচর, উভচর, গ্রামবাসী, মাংসাশী, একশক, প্রসহ, বিশেষায়, প্রতুদ ও বিক্রির ইত্যাদিগের মাংস উত্তরোত্তর লঘু এবং অল্প অভিজ্ঞান্দা। স্ব স্ব জাতির মধ্যে যে প্রাণী বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট তাহার মাংস গুরুপাক, এবং অল্পস্বরবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। সমুদায় প্রাণীরই যকৃতের নিকটবর্তী স্থানের মাংস প্রধানতম। তদভাবে মধ্যবরক্ষ, অক্লিষ্ট (যে পশু কোন ক্রেশ সহ্য করে নাই, কলিকাভায় যে সকল ছাগ চালান আইসে তাহারা খাতাভাবে এবং পথশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে) উপায়ে এবং সতোহত পশুর মাংস গ্রহণ করিবে।

নিষিদ্ধ মাংস—শুক বা পচা মাংস, পীড়িত বা বিব ও সর্প দ্বারা হত পশুরমাংস, বিষাদিলিপ্ত, শত্রাদিবিদ্ধ, বৃদ্ধ দুর্বল, অল্পবয়স্ক এবং জঘন্যখাত আহারকারী পশুর মাংস ভক্ষণ

করিবে না। শুষ্কমাংস অকৃতি জনক, প্রতিক্রিয়ায় কারক ও গুরুপাক। বিষাক্ত ও ব্যাধি হত মাংস মূহাজনক। অত্যন্ত কচিমাংস বমি উৎপাদক। বৃদ্ধ পশুরমাংস কাস ও শ্বাস উৎপাদক। ক্লিন্ন (পচা) মাংস উৎক্লেস (গা বমি বমি) জনক। কুশপশুরমাংস বায়ু প্রকোপক।

এইরূপে প্রাণীর বয়স শরীরের অবয়ব, স্বভাব, ধাতু, ক্রিয়া, লক্ষণ, সংস্কার ও মাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মাংস সংগ্রহ ও আহার করিতে হয়। প্রত্যেকের বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে।

বয়স যেমন মধ্য বয়স্ক প্রাণীর মাংস গ্রহণ করিবে। শরীরের অবয়ব—যেমন পক্ষীর উরুদেশ এবং গ্রীবা গুরু। স্বভাব—যেমন স্বভাবতঃ লাবমাংস লঘু। ধাতু—যেমন মাংস অপেক্ষা মেদ গুরুপাক। ক্রিয়া যেমন—বক্ষ্যস্থল দ্বারা বিচরণ করে বলিয়া সরোবরজাত মৎস্যের পূর্বার্দ্ধ লঘু, অল্প পরিশ্রমী বলিয়া পর্কতের বরণার মৎস্য গুরু, বাহারা জলাশয়-তীরে থাকে তাহাদের মাংস অভিজ্ঞান্দা এবং গুরু, বাহারা জঘন্য খাত আহার করে তাহাদের মাংস অগ্রাহ্য, শল্য শৈবাল ভোজন করে বলিয়া রোহিত মৎস্য কষায় রস, বায়ু নাশক এবং অল্প পিত্তবর্ধক প্রভৃতি। লিঙ্গ—যেমন চতুষ্পদ প্রাণীর স্ত্রী জাতির মাংস উৎকৃষ্ট। প্রমাণ যেমন মহাশরীর প্রাণীদিগের মধ্যে অল্প

\* এই লক্ষ সাহেবেরাও হোণা থেকে (Grain fed) মাংস গ্ৰহণ করেন।

\* দেবতার না হটক দেবতার প্রদাদ পাইয়া পীছে ভক্তদিগের বমন রোগ জন্মায় সেই ভয়ে শূদ্র বাহির না হইলে ছাগশিত্ত দেবতার নিকট বলি দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শরীর বিশিষ্ট প্রাণীরমাংস লবু। সংস্কার—  
যেমন ঘূত, দধি, ধাতায়, কলায় ইত্যাদির  
সহিত পাক করিলে মাংস লঘুপাক হয়।  
পাকের ব্যাপার পরে হইবে, পাঠক ধৈর্যধারণ  
করুন। মাত্রা—যেমন গুণকদ্রব্য আশ পেটা  
এবং লঘুদ্রব্য পেট ভরিয়া থাইবে।

মাংসের সাধারণ গুণ আলোচনা করা  
হইয়াছে। এক্ষণে মাংসের সংস্কার সম্বন্ধে  
আলোচনা করিব।

মাংস তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা মূহ  
মাংস, (যেমন শশকাদির মাংস,) কঠিন মাংস  
(যেমন হরিণাদির মাংস) এবং ঘন মাংস  
(যেমন অশ্বাদির মাংস) ভিন্ন ভিন্ন মাংসের  
পাক প্রণালীও ভিন্ন।

মাংসার্ক (মাংসের আরক)। মূহমাংসের  
অর্ক প্রস্তুত করিতে হইলে মাংসগুলিকে বড়  
বড় করিয়া কাটিয়া তাহাতে মাংসের চল্লিশ  
ভাগের একভাগ (চল্লিশ তোলা বা আধ  
সের মাংসে এক তোলা) সৈন্ধব লবণ  
মাখাইয়া এরূপ সাবধানে ঘোত করিয়া লইবে  
যেন মাংসগুলি অধিক সঞ্চালিত না হয়।  
অনন্তর জায়ফল, তেজপাত, লবঙ্গ, দারচিনি,  
এলাচ, নাগকেশররেশু, মরিচ ও মৃগনাভি  
এই সকল দ্রব্য মিলিত ভাবে মাংসের ষাট  
ভাগের একভাগ, ইক্ষুরস অভাবে দুগ্ধ মাংসের  
আট ভাগের এক ভাগ, মাংসের সহিত মিশ্রিত  
করিয়া মাংসের চারিগুণ জলসহ বকযন্ত্রে  
স্থাপিত করিবে এবং জাতী প্রভৃতি সুরভি  
পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মূহ অগ্নি সম্ভাপে  
চুয়াইয়া লইবে।

কঠিন মাংসের অর্ক প্রস্তুত করিতে  
হইলে, মাংস ছোট ছোট করিয়া কাটিবে।  
অনন্তর মিলিত সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও সৈন্ধবলবণ

মাংসের চল্লিশ ভাগের একভাগ মাংস  
মিশ্রিত করিয়া তিনবার কাঁজিয়াবা এবং  
সাতবার ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা ধৌত দ্বারা  
ঘোত করিবে, পবে পূর্ব নিয়মে জায়ফল  
প্রভৃতি দিয়া এবং জাতী পুষ্পাদি দ্বারা আচ্ছা-  
দিত করিয়া চুয়াইয়া লইবে।

ঘন মাংসের অর্ক প্রস্তুত করিতে হইলে  
প্রথমে মাংস খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া  
লইবে, পরে পূর্কোক্ত পরিমাণে সৈন্ধবলবণ  
দিয়া এবং তৎপবে শঙ্খ দ্রাবক মিশ্রিত করিয়া  
দুগ্ধ দ্বারা সাতবার ঘোত করিবে। অনন্তর  
জায়ফল প্রভৃতি পূর্কোক্ত দ্রব্য সংযোগে  
চুয়াইয়া লইবে।

মাংসরস—মাংসরস তিন প্রকার—যথা  
ঘন, অচ্ছ এবং অচ্ছতর। তন্মধ্যে ঘন মাংস  
রস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে  
দেড়সের মাংস দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট  
থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অচ্ছ  
মাংস রস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের  
জলে তিনপোয়া মাংস দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট  
থাকিতে নামাইয়া লইবে। অচ্ছতর মাংসরস  
প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে অর্ধ-  
পোয়া মাংস দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে  
নামাইয়া লইবে। এস্থলে জানা আবশ্যক যে  
মাংস রস প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে মাংস  
বাটিয়া বটকাকার করিবে। পরে তাহা অগ্নি  
যুতে ভাজিয়া সিদ্ধ করিবে।

মাংস ঘূষ—মাংস একপোয়া দুইসের  
জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামা-  
ইয়া ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে।

মাংস রসের গুণ যথা, সর্ষপাতুর পুষ্টিকর  
প্রাণ (Vitality) জনক, শুক্রবর্দ্ধক,  
ওজোবর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক, বাস কাস ও শ্বাস নাশক,



বাপ্পিত ও শ্রমনাশক, তৃপ্তি জনক, স্মৃতি, ওজঃ ও স্বরহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর, জ্ববক্ষণ এবং উরঃকৃত রোগীর হিতকর, বাহ্যদেব সন্ধি ভগ্ন বা বিল্লিষ্ট হইয়াছে তাহা-  
দেব পক্ষে উপকারী, কৃশ এবং অল্পশুক্ল  
ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টি ও শুক্রজনক। দাড়িমরসের  
সহিত প্রস্তুত মাংস রস বীৰ্য্যবর্দ্ধক এবং  
ত্রিদোষ নাশক। উক্ত তসার মাংসের গুণ—যে  
মাংস হইতে স্নায়ু বাহির করিয়া লওয়া  
হইয়াছে তাহা দ্রুপাচ্য বিষ্টম্ভী, রুক্ষ বিরস,  
বাসবর্দ্ধক এবং বল বা পুষ্টিকর নহে।

আয়ুর্বেদে রোগীর পথ্যরূপে মাংস  
সংসার সম্বন্ধে এবং সুস্থ ব্যক্তির জন্ত মাংস  
সংসার সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ দেওয়া হই-  
রাছে। অনেক স্থলে হৃদ শাস্ত্রের উপর  
ববাত দেওয়া হইয়াছে। হৃদশাস্ত্র রন্ধন  
কৌশল শিথিলতার শাস্ত্র। হৃৎথের বিষয় হৃদ-  
শাস্ত্র এ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।  
হৃদ শাস্ত্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কত প্রকার  
স্বাভাব্য হইতে যে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি তাহা  
মনে করিলে রসনা লালস্রাব করিয়া কাদিতে  
পাকে। এক্ষণে বাহা সামান্য কিছু পাওয়া  
যায় পাঠক তাহা উপভোগ করুন।

ললিত মাংস—ঘৃত, দধি, কঁাজি, ফলান্ন  
(দাড়িমের রস প্রভৃতি) এবং মরিচ প্রভৃতির  
সহিত সিন্ধুমাংস ললিতমাংসনামে পরিচিত।  
ইহা হিতকর, বলকর, রুচিকর, পুষ্টিকর  
এবং গুরুপাক।

প্রলেহ মাংস—ললিতমাংসে বেশী করিয়া  
ঘৃত দিয়া এবং হিঙ্গু, মরিচ, জীরা, এলাচ,  
দাবচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা সুরভি করিয়া  
পাক করিলে তাহা প্রলেহমাংসনামে খ্যাত

হয়। ইহা পিত্ত ও কফবর্দ্ধক এবং বল মাংস  
ও অগ্নিবর্দ্ধক।

পরিপুষ্ট মাংস—মাংস ধুইয়া প্রচুর ঘৃতে  
ভাজিবে এবং তাহাতে মুহমূহ উষ্ণ জল  
একটু একটু দিতে থাকিবে। জীরা, মরিচ,  
প্রভৃতি মসলা সংযোগে ঘন করিয়া এইরূপে  
মাংস পাক করিলে তাহাকে পরিপুষ্ট মাংস  
বলে। এই মাংস, স্নিগ্ধ, হর্ষজনক (রসনার  
এবং দেহের), ধাতু পুষ্টিকর, রুচিকর, বল,  
মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজঃ ও শুক্রবর্দ্ধক এবং  
গুরুপাক।

প্রদীপ্ত মাংস—পরিপুষ্টমাংস প্রচুর দধি  
সংযোগে পাক করিলে তাহাকে প্রদীপ্তমাংস  
বলে।

উল্লপ্ত মাংস—খণ্ড খণ্ড মাংস পেষণ  
করিয়া ঘৃতাতির সহিত পাক করিলে তাহাকে  
উল্লপ্ত মাংস বলা যায়। ইহা পরিপুষ্টমাংসের  
তায় গুণবিশিষ্ট, ইহা অঙ্গারায়িতে পাক  
করিতে হয় এবং সেই জন্ত লঘু হইয়া থাকে।

ভর্জিত মাংস—মাংস বাটিয়া মসলা মিশা-  
ইয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তাহাকে ভর্জিত  
মাংস বলে।

প্রতপ্ত মাংস—দধি, দাড়িমের রস, ঘৃত,  
জীরা, লবণ ও মরিচ প্রভৃতির সহিত মাংস  
বাটিয়া অঙ্গারায়িতে পাক করিয়া লইলে  
তাহাকে প্রতপ্ত মাংস বলে।

কন্দু পাচিত—মাংস, এলাচ, লবঙ্গ, হিং  
প্রভৃতি দ্রব্য বাটা দ্বারা লিপ্ত করিয়া কন্দুতে  
(over) পাক করিবে। পরে রাই সরিষা  
বাটা দ্বারা লিপ্ত করিবে। ইহাকে কন্দু  
পাচিত বলে। আজ কাল মাংস দ্বারা প্রস্তুত  
খাদ্য বিশেষ সরিষা বাটা (Mustard) মাখা-  
ইয়া থাইবার নিয়ম দেখা যায়। কিন্তু আয়ু-

র্ষেদের পাকা বন্দোবস্ত, একেবারে মাখাইয়া দেওয়া। ইহাতে সরিষা বাটা মাখাইবার বিলম্ব হইতে পরিত্রান পাওয়া যায়।

শূল্য মাংস—হিঙ্গ মিশ্রিত জল এবং এলাচি, স্নগন্ধ দ্রব্য বাটা মাখাইয়া মাংস শূলে বিদ্ধ করিবে এবং নিধূর্ম অঙ্গারায়িত পাক করিবে। পাক কালে একটু একটু জল বা দাড়িমাদি ফলের রস দিতে হয়। ইহাকে শূল্য মাংস বলে।

এই সকল মাংস গুরুপাক। তৈলপক মাংস উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তজনক এবং লঘু। ঘৃত পক মাংস উষ্ণবীৰ্য্য নহে, মনোজ্ঞ এবং পিত্ত নাশক।

বেশবার—সুসিদ্ধ মাংসকে অস্থিবিহীন করিয়া শিলায় পিষিয়া লইবে। পরে পিপুল শুঠ, মরিচ, গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ইহাকে বেশবার বলে। বেশবার গুরু, স্নিগ্ধ, বলকর, ও বাতজ্বরোগ নাশক। শশাঙ্ক কিরণ—মাংসের বড়া ভাজিয়া পুনরায় চূর্ণ করিবে এবং কপূর ও চিনি মিশ্রিত করিয়া বটকা (লাড়ু) প্রস্তুত করিবে। ইহাকে শশাঙ্ক কিরণ বলে। ইহা অত্যন্ত কঠিন জনক।

এক্ষণে সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় মাংসাহার সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ আছে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমে সুস্থাবস্থার কথা ধরা যাক।

হিতকর ও অহিতকর দ্রব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদে লিখিত হইয়াছে যে শালি তুলের অন্ন, যব ও গোধূমকৃতখাদ্য, ঘৃত, জাঙ্গল মাংস প্রভৃতি নিত্য আহাৰ করিবে। হৃৎথের বিষয় যে ইচ্ছা সবে ও এই ষোরতর জীবন সংগ্রামের দিনে ঋষিদিগের অমূল্য উপ-

দেশ আমরা পেট ভরিয়া পালন করিতে পারি না।

সুস্থাবস্থাকারে বায়ু প্রধান ব্যক্তিকে গভীর শূকর, মহিষ প্রভৃতি আনুপ মাংস এবং গো, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র, গর্ভত, ছাগ প্রভৃতি গ্রাম্য মাংস আহাৰ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পিত্ত প্রকৃতি এবং শ্লেষ্ম প্রকৃতি ব্যক্তিকে ধনদেশ জাত শ্রাণীর মাংস আহাৰ করিতে বলা হইয়াছে।

ঋতু চর্যা প্রসঙ্গে সুস্থব্যক্তিকে গ্রীষ্মকালে জঙ্গলদেশজ যুগ পক্ষীর মাংস যুগ, বর্ষাকালে ধনদেশজ মাংসের যুগ, শরৎকালে মরুভূমি জাত যুগপক্ষীর স্বচ্ছ মাংস যুগ, হেমন্ত ও শীত কালে আনুপ, বিলেশয়, প্রসহ গ্রাম্য এবং জলজ মাংস গরম গরম খাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বসন্তকালে জাঙ্গল মাংসই ব্যবহা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সকল প্রকৃতির ব্যক্তির পক্ষে এবং সকল ঋতুতেই মাংসাহারের ব্যবহা আছে।

পূর্বকালে মাংসের যে বহুল প্রচলন ছিল, তাহা পুরাণ কাব্য আলোচনা করিলেও বুঝা যায়। রামচন্দ্র সীতার বিরহে কাতর হইয়া চতুর্দিকে খুজিতে ছিলেন, কিন্তু স্বর্ণ গোধাটী দেখিবারাত্র বিরহ বেদনা চাপিয়া রাখিয়া গোধাটীকে সংগ্রহ করিলেন। প্রেমের দায় অপেক্ষা পেটের দায় অনেক বড়। বনবাসিনী দ্রৌপদী জয়দ্রথের অত্যাচার হইতে নিবৃত্তি পাইবার জন্ত তাহাকে বিবিধ মাংসের লোভ দেখাইয়াছিলেন। অগত্য মুনি মেধরূপী বাতাপিকে সমগ্র উদরস্থ করিয়াও কিছুমাত্র অজীর্ণ বোধ করেন নাই। সীতা লোকে কাতর জনক বৎসতরীর লোভ

সংবরণ করিলেও বশিষ্ঠপ্রাপ্ত উপহারের সন্ধ্যাবহার করিয়াছিলেন ।

মাংসের ব্যাপার লইয়া অনেক সময় বিমম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল । পুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । কোন ব্রাহ্মণ হয়ত কোন রাজার নিকট গিয়া তৎক্ষণাৎ মাংস খাইবার আবদার করিলেন, না দিতে পারিলেই বিপদ । কল্যাণপাদ গুরুকে মাংস খাওয়াইয়া নরকস্থ হইলেন ; এরূপ বহু ঘটনার পবিচয় পাওয়া যায় ।

পূর্বে মাংসপ্রীতি ইহলোকেই শেষ হইত না । মনুষ্যের আত্মা পবলোকেও মাংস কামনা করিত । পরলোকস্থ পিতৃপুরুষের মাংসাকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির জন্ত মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ প্রচলিত ছিল । হায় হুভার্গা ! এখন ইহ লোকেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, পরলোকত দূরেব কথা ।

এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্বে মাংস খাওয়া হইত । রামচন্দ্রের স্বর্ণ গোধা আহরণের বিষয় পূর্বে বলিয়াছি । এক্ষণে দ্রৌপদী জয়দ্রথকে কোন কোন মাংসের লোভ দেখাইয়াছিলেন পাঠক তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন ।

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে সৌবীর ! তোমার রাজ্য, রাষ্ট্র, কোষ ও বলের কুশলত ?.....। তে নৃপনন্দন ! এক্ষণে পাণ্ড ও আসন এবং প্রাতরাশস্বরূপ পঞ্চশত মৃগ প্রদান করি তেছি, গ্রহণ কর । আর রাজ্য যুধিষ্ঠির স্বয়ং তোমাকে ঐশ্বেয়, পৃথত, তুষ্ণু, হরিণ, শরভ, শশ, রুক্ম, রুক্ম, বঘ্ন, গবয় প্রভৃতি বহু সংখ্যক মৃগ এবং বরাহ, মহিষ ও অন্ত্রাজ্য মৃগ প্রদান করিবেন ।”

হৃৎখের বিষয় যে মাংসাহার সম্বন্ধে আমা-

দের উদারতা এক্ষণে বিমম হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া কেবল ছাগশিঙিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল । তবে হৃৎখের বিষয় যে পূর্বসন্ধীর্ণতা ঘূচিয়া আবার উদারতা বৃদ্ধি পাইতেছে । হোটেলের কুকুট মাংসের এবং চায়ের দোকানে কুকু-টাণ্ডের অবাধ প্রচলন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ।

মাংসাহার সম্বন্ধে এত সন্ধীর্ণতা ঘটিয়াছিল কেন এবং মাংসের প্রচলন এত কম হইয়াছিল কেন সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব । এক্ষণে আয়ুর্বেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগে মাংসব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ আছে দেখা যাউক ।

জ্বরে মাংস । শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, জ্বর হইবার দশ দিন পরে রোগীর শরীরে যদি কফাধিক্য থাকে এবং সম্যক উপবাসের লক্ষণ প্রকাশ না পায় তাহা হইলে স্নাত প্রয়োগ না করিয়া মাংসরস পথ্য দিবে । ঐশ ( হরিণ ) লাভ প্রভৃতির মাংস রসজ্বরে সুপথ্য । কুকুট, ময়ূর, তিতির ও কৌচবক গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক জ্বরে ঐ সকল মাংসের যুগ প্রয়োগ করার প্রশংসা করেন না ।

অপিচ, উপবাস হেতু জ্বররোগীর শরীরে অতিরিক্ত বায়ুপ্রকোপ ঘটিলে মাত্রা ও বিকল্পজ্ঞ চিকিৎসক কুকুটাদির মাংস রসও পথ্য দিবেন ।

মাত্রা শব্দে পরিমাণ । কতটুকু পরিমাণে দিতে হইবে তাহার বিচার করা আবশ্যক । আর বিকল্প শব্দে বিশিষ্ট করনা বা সংস্কার । কিরূপ উপায়ে এবং কি উপকরণসহ পাক করিয়া দিলে তাহা সহজে জীর্ণ হইবে এবং রোগীর পক্ষে হিতকর হইবে তাহাও বিচার করিতে হইবে । (ক্রমশঃ)

## বাস্তালীর স্বাস্থ্য।

বর্তমান সময়ে বাস্তালীর স্বাস্থ্য যে একে-  
বারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে, ইহা স্থানিচিত।  
অনেকের হৃদয়ে বল নাই, মনে শ্রুতি নাই,  
কার্যে উৎসাহ নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই।  
কর্মজগতে সর্বপ্রকার উন্নতির প্রয়াস-বিরহিত  
জীবনে অনেককেই যেন একটা অজানা স্রোতে  
গা ঢালিয়া দিয়া বিধিনির্নূপিত আয়ুষ্কালের  
কয়টা দিন কোনরূপে কাটাইতে পারিলেই  
কর্তব্য পালিত হইল বলিয়া মনে করিয়া  
থাকেন। আগেকার বাস্তালী কিন্তু এরূপ  
ছিল না। খুব বেশী দিনের কথায় কাজ  
নাই, আমাদের এক পুঙ্খ পূর্বেও বাস্তালীর  
অবস্থা অল্প রূপ ছিল। তখনকার বাস্তালী  
এখনকার মত সভ্যতার চরম সোপানে  
অধিরোহণ করে নাই সত্য; শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ  
বসন্ত—সকল ঋতুতেই আবরণ-সম্ভারে  
সর্বত্র আচ্ছাদনপূর্বক ভদ্রতার পরাকাষ্ঠী  
দেখাইতেন না সত্য; এক পোয়া পথ যাতা-  
য়াতের জ্ঞাত তখনকার বাস্তালীরা টাম  
অখ্যান মোটর প্রভৃতির বন্দোবস্ত ছিল না  
সত্য; কিন্তু তখন তাঁহাদিগের ধর্মণীর ভিতর,  
তাঁহাদিগের শিরায় শিরায়, তাঁহাদিগের  
অস্থিতে অস্থিতে নিয়ত কালের জ্ঞাত কি যেন  
একটা অপূর্ব শক্তি সঞ্চারিত হইত। বিধি-  
প্রদত্ত সেই অচিন্ত্যনীয় শক্তির সাহায্যে সে  
কালের বাস্তালী নীষোগ দেহে কালের পরমায়ু  
শতবর্ষ পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ আশী নব্বই  
পঁচানব্বই বৎসর পর্যন্ত জীবন ধারণে সক্ষম  
হইতেন। এখন বাস্তালীহৃদয়ে সে শক্তি  
ভিরোহিত হইয়াছে; সেই জ্ঞাত এখনকার  
বাস্তালীর স্বাস্থ্যেরও এত দুর্গতি ঘটয়াছে।

দুর্গতি বলিব না তো কি! আগেকার  
অপেক্ষা এখনকার বাস্তালীর মৃত্যুর হিসাব  
মিলাইলে একালে যে মৃত্যুর সংখ্যা বহুল  
পরিমাণে বৃদ্ধিত হইয়াছে, তাহা সরকারি  
হিসাব দেখিলেই অবগত হইতে পারা যায়।  
কলিকাতা সহরে শিশুদিগের মৃত্যুর পরিমাণ  
প্রতিবৎসরই কিছু কিছু বৃদ্ধিত হইতেছে।  
শৈশব মরণের এতদূশ বাহুল্যের জ্ঞাত  
তাহাদের স্বাস্থ্যহীন পিতামাতাকেই কি  
কারণ নির্দেশ করিলে অজ্ঞান হইবে?  
আমার তো মনে হয়, ইহা সত্যসত্যই তাহা-  
দিগের নষ্ট স্বাস্থ্য পিতামাতার প্রায়শ্চিত্ত  
ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রকৃত পক্ষে আমরা শক্তিহীন হইয়াছি  
কি না, আমাদের সামর্থ্য কমিয়াছে কিনা,  
অকালবার্দ্ধক্য আমাদের শরীরে প্রবেশ  
করিয়াছে কি না,—ইহার জ্ঞাত অত্যাচারকেও  
জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না,—শরীর ধারণের  
সর্বপ্রধান বিষয় আমাদের আহারের কথা  
আলোচনা করিলেই ইহার মীমাংসা  
হইয়া যাইবে। দুগ্ধ যত প্রভূতি যে সকল  
আহার্য্যে আমাদের দেহ পুষ্ট হইবে, সে  
সকল দ্রব্য দেশ হইতে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে।  
আয়ুর্বেদে দুগ্ধের নাম যতগুলি লিখিত  
হইয়াছে, তাহার মধ্যে পয়ঃ, স্তন্য এবং বাল-  
জীবন—এ কয়টা নাম যে কেন প্রদান করা  
হইয়াছে, তাহা বিশেষজ্ঞের নিকট ব্যক্ত না  
করিলেও চলিবে। ইহার গুণব্যাখ্যায়  
অনেকরূপ গুণের মধ্যে ইহাকেও জীবনীশক্তি-  
প্রদ প্রাণিগণের আত্মা, আয়ুষ্কাল এবং দেহস্থ  
পদার্থসকলের সংলগ্নকারক বলিয়া অভি-

হিত করা হইয়াছে। স্মৃতি কালের পর হইতে এই পয়ঃ বা দুগ্ধ জীবনীশক্তির পোষণ কার্য্য সমাধা করিবে বলিয়া সে কালে দেশে গোপালকের ব্যবস্থা যথেষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। সকল গৃহস্থই সেকালে নিজে গো সেবা করিতেন। ফলে গৃহপালিত গাভী-জাত দুগ্ধ বাস্কালী গণের নিকট সহজ প্রাপ্য-ছিল বলিয়াই বাস্কালী শক্তি সামর্থ্য বলবীৰ্য্য কান্তি পুষ্ট—তাবৎ প্রাণীময় বিষয়লাভেই সমর্থ হইতেন। প্রকৃত পক্ষে সেকালে বাস্কালী মাত্রই শরীররক্ষার জন্য দুগ্ধ পানে যেরূপ সন্তোষ লাভ করিত, সহস্র সহস্র স্তন্যদার বিনিময়ও তাহার সমকক্ষ হইত না। মহাকবি ভারতচন্দ্র এইজন্যই পাটনীর মুখ দিয়া দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন,—

“আমার সম্ভান যেন থাকে দুধে ভাতে।”

যে দেশে নীচকুলসম্ভূত সঙ্গতিহীন পাটনিও ‘দুধে ভাতে’ থাকিলেই তাহার অপত্যগণের যথেষ্ট কল্যাণ কামনা করা হইল বলিয়া মনে করিত, সে দেশে এক সময় দুগ্ধ-পানের ব্যবস্থা যে অত্যধিক প্রচলিত ছিল এবং সেই দুগ্ধ পানের ফলে পয়ঃ বা অমৃত পানের মত সুস্থ এবং সবলদেহে দীর্ঘজীবন লাভ ঘটত তাহা তো বলিতে হইবে না। এক্ষণ দেশ হইতে সে ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়াছে। বিলাতী জমাট দুগ্ধে এখন শিশুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শিশুদিগের জননী—আমাদের দেশের অঙ্গনাগণ অঙ্গরক্ষার জন্য শিশুদিগকে শুভ্রদুগ্ধ প্রদানেও কাৰ্পণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় দেশে শিশুর মৃত্যুর যে যথেষ্ট কারণ নিহিত রহিয়াছে, শৈশবে মৃত্যু না ঘটিলেও স্বভাবতঃ রোগ-প্রবণ দেহ লইয়া

জীবন কাটাইবার যে যথেষ্ট কারণ ঘটয়াছে, বিবিনির্দিষ্ট আয়ু্যকালের বিপর্য্যয় ঘটয়া অম্লায়ু হইবার যে প্রভূত কারণ দাঁড়াইয়াছে, ইহা নিভাজ সত্য কথা, একথার প্রতিকূলে বলিবার কেন কথাই নাই।

তাহার পর কতকটা সভ্যতার অঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া এবং কতকটা অক্ষমতানিবন্ধন বাস্কালীর আহার করিবার শক্তি সে কালের অপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভোজ্য নিমন্ত্রণে সে কালের মত আহার করিবার সামর্থ্য একালে বাস্কালীর তো লুপ্ত হইয়াছেই, যদি কাহারও সামর্থ্য থাকে তিনিও দেশ কাল বিবেচনায় লজ্জার খাতিরে সে সামর্থ্যের প্রয়োগে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সেকালে কিন্তু এমনটা ছিল না। সেকালে আহারপটু ব্যক্তির আদর সম্বন্ধ সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত। যিনি সৰ্ব্বাপেক্ষা বেশী আহার করিতে পারিতেন, তাঁহাকে পরিতোষপূৰ্ব্বক খাওয়াইবার জন্য আয়োজনকারী ব্যস্ততায় সন্তুষ্ট লাভ করিত। এই আহার বিষয়ে পটু ব্যক্তিদিগের মধ্যে শাস্তিপুর অঞ্চলের ‘মুনকে রঘুনাথের’ নাম অত্যাধি স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিম্বদন্তী আছে, এই ‘মুনকে রঘুনাথের’ স্নানান্তে জলযোগের ব্যবস্থাই নাকি দশ পনের সের সন্দেশ বিধি-বদ্ধ ছিল।

এই আহারপটুতার ফলে শারীরিক সামর্থ্যে ঐ শাস্তিপুরেরই ‘আশানন্দ চৌকি’ যেরূপ অমিত শক্তি লইয়া একু সময়ে দম্ভ উপদ্রব হইতে স্বদেশ রক্ষা করিয়াছেন, তাহারই জন্য তাঁহার নামের জোরে ‘চৌকি’ উপাধি চলিত হইয়া আসিতেছে। প্রবাদ, সে সময়ে তাঁহার এক ধনী প্রতিবেশীর গৃহে

দম্বা অপতিত হইলে এই আশানন্দ একটি চেকির সাহায্যে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার চেকি অখ্যা তাঁহাকে সেই সময় হইতে প্রদান করা হয়।

এ সকল ভৌ এখন গল্পকথায় পরিণত হইয়াছে। এই গল্প কথায় পরিণতি ছাড়িয়া দিলেও আমাদের বালাজীবনে আমাদের পল্লী ভূমির ব্যসনবিরহিত ক্রিয়াপব্যয়ণ গৃহস্থেব আঙ্গিনায় বসিয়া যখন আমরা ভোজ-নিমন্ত্রণে ভূষিত করিয়াছি, তখনও আমাদের মধ্যে ছ'চারিজন ভোক্তার আহাৰপট্টায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি নাই। সহরের সভ্যতার মত পল্লীপ্রান্তে পোলাও কালিয়ার ব্যবস্থা কোনকালেই ছিল না। সাদা ভাত, বিশ পঁচিশ রকম ব্যঞ্জন, প্রচুর মংসা, ছন্ধের রূপান্তরে পায়স দধি ক্ষীর সন্দেশ রসগোল্লাই পল্লীগ্রামের ভোজপ্রদানে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। ফলাহারের ব্যবস্থা পূর্বে চিঁড়া দধি-ক্ষীর-সন্দেশে নির্বাহিত হইত। অধুনা লুচি তরকারি মিষ্টানে পরিণত হইয়াছে। ঘাউক সে কথা, ভোজের নিমন্ত্রণে আমাদের বালা জীবনে ছ'চারিজন খুই উদরপূতি করিয়া আহাৰ করিয়াছেন। আচমন করিয়া উঠিলেই হয়, এমন সময় তাঁহার নিকট সন্দেশ রসগোল্লা আনিয়া আরও কিছু খাই-বার জন্ত অমরোধ করা হইল, তিনি আর কিছু আহাৰ করিলে কর্মকর্তার সমস্ত আয়োজন সার্থক হইবে একপভাব দেখান হইল, কর্মকর্তার সেই প্রস্তাবে সমবেত ব্যক্তিগণেরও সইমুভূতি প্রকাশ পাইল। কাজেই অমরুদ্ধ ব্যক্তি অমরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; এক গণ্ডা, দুই গণ্ডা করিতে করিতে পূর্ণ আহাৰের পর দশ বার গণ্ডা মোঙা এবং

রসগোল্লা উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। এখনকার দিনেও পল্লীপ্রান্তে অম্বষণ করিলে একরূপ আহাৰ পরায়ণ ব্যক্তি ছ'দশ খানি গ্রান ভাড়াইয়া দু'এক জন না মিলিতে পাবে এমন নয়।

যাহা হউক, সেকালে বাঙ্গালীর আহাৰ এইরূপ ছিল। জীবনধারণের জন্ত, শক্তি সংগ্ৰহের জন্ত, কর্ম্ম হইবার জন্ত, আহাৰেব ব্যবস্থা যে সর্বাগ্রে কর্তব্য, ইহা সেকালেব বাঙ্গালী বিলক্ষণই বুঝিত। একালে পুষ্টিকর আহাৰ্য্য পাইবারও যো নাই, পাইলেও লোক-লজ্জায় উদরস্থ করিবার উপায় নাই। এক কথায় আহাৰের প্রথা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। এখন প্রাতে উঠিয়া খালি পেটে খানিকটা 'চা' না খাইলে চলে না। আমি এমন অনেককে দেখিয়াছি, তিনি হয়তো দিনের মধ্যে ৬৭ বারও চা পান করিয়া আয়ুতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ফলে এই অত্যধিক চা পান হইতে বাঙ্গালীর যকৃতের ক্রিয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া বাঙ্গালীশরীরে অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য অক্ষুধা প্রভৃতি নানারূপ রোগ উপস্থিত হইতেছে। কণাটা উড়াইয়া দিবার নহে; সত্য সত্য এখনকার বাঙ্গালীর বোধ হয় বার আনা আন্দাজ লোক শুধু এই কারণেই অজীর্ণপ্রবণ দেহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

শুধু "চা" পান নহে, বাঙ্গালী সন্তানের দেহক্ষয়ের আরও কতকগুলি কারণ আছে। সিগারেটের ধূমপান এবং তাবুল বা পান চর্বনের মাত্রা একালে বাঙ্গালী সন্তান যেরূপ বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাহারই ফলে দেশে থাইসিস বা বম্বা রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ গুঠ হইয়া উঠিতেছে। সরকারি হিসাবে শিশু

মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধির মত বর্তমান সময়ে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই অতিরিক্ত সিগারেটের ধূমপান তাহার মধ্যে যে একটি প্রধান কারণ ইহা অবিসংবাদিত।

ইহা ভিন্ন আর একটি বিশেষ কারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। সে কারণটির কথা অনেকে গোপন করিতেছেন, কিন্তু গোপনেই সর্বনাশ ঘটতেছে। বর্তমান সময় আমরা ধর্ম্মকর্ম্মের বাহিরে গিয়াছি। আমাদের দেখাদেখি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ধর্ম্মবিগর্হিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। সংসর্গ দোষেই হউক বা আবহাওয়ার বশেই হউক তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই তাহার অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয় চালনার অভ্যস্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির ইহাই সর্ব্বপ্রধান কারণ। এ কথাটা কেহ ভাবিতেও চেষ্টা করেন না, ইহাই দুঃখ।

রক্তের সারভাগই শুক্ররূপে পরিণত হয়। ইহা সকল দেশের সকল শাস্ত্রবিদেরাই বলিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে শুক্র ১২।১৩ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জলবৎ তরল থাকে তাহার পর গাঢ়ভাব ধারণ করিতে আরম্ভ হয়। আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐ শুক্র অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের কমে কখনই পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ১২।১৩ বৎসর বয়সের সময় হইতে আমাদের দেশের বালকগণ অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিণত শুক্ররূপে অত্যন্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ অভ্যাস অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহারই ফলে যুগ ধরা বংশধরের ছায় বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ তরলা হইল বালকবৃন্দের দেহ অন্তঃসারশূন্য হইয়া

পড়িতেছে। দুঃখের বিষয় আমরা এদিকে আদৌ দৃকপাত করিতেছি না। শরীরক্ষয়ের বিত্তা তাহার কতদূর শিক্ষা করিতেছে, তাহা আমরা একবারও ভাবিবার অবসর পাইতেছি না। কি করিয়া তাহার কলেজের উচ্চডিগ্রি পাইয়া অর্থাগমের সুবিধা করিবে— ইহাই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্যহল দাঁড়াইয়াছে। অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিণত শুক্রের ক্ষয় যেরূপ দোষাবহ, স্বাভাবিক উপায়েও তদপেক্ষা কম দোষাবহ নহে। এক কথায় শুক্রের পূর্ণ পরিণতি না হইলে, তাহা আদৌ ক্ষয় করা কর্তব্য নহে। এইজন্ত আগে বিজ্ঞাদায়ন সমাপ্ত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা ছিল। এখন অর্থলোভে সে ব্যবস্থা দেশের প্রায় সকল অভিভাবকই উল্টাইয়া দিয়াছেন। এখনকার বিবাহ, সাধারণতঃ পুরুষদিগের ১৮।২০ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই ১৮।২০ বৎসরের পুরুষদিগের পত্নীগুলি আবার বয়সে তাহাদিগের ছ'এক বৎসরের কমমাত্র। কাজেই ১৮।২০ বৎসরের পুরুষ পঞ্চদশী বা ষোড়শী রমণীর মিলন স্থখে আপাততঃ মধুর তৃপ্তিলাভ পূর্ব্বক ভবিষ্যতে যে নিতান্ত দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অকালজরাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? কপি কি সাধ করিয়া বলিয়াছেন,—

“যৌবনে অধিক ব্যয় বয়সে কাল।”

অধুনা বাঙ্গালার অন্ন, অজীর্ণ, খাইদিস্ এবং ধাতুদৌর্ব্বল্যাগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা যে এত বাড়িয়া গিয়াছে,—ঐ সকল রোগ নিবারণের জন্ত প্রায় অধিকাংশ সংবার পত্রের বিজ্ঞাপন শুভ্রগুলি নিত্য নূতন ঔষধে যে রোগ আরোগ্যের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ করিতেছে, তাহার কারণ ভাবিয়াছেন কি?

সেকালে লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালনই শরীর ধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অবশ্য কর্তব্য মনে করিত, উপযুক্ত সময়ে বিবাহ হইলেও তিথিনক্ষত্র বাছিয়া স্বামী স্ত্রীর মিলনের ব্যবস্থা করিত। রজঃস্রাবা স্ত্রী সেকালে অশুচি জ্ঞানে গৃহস্থলীর কোন কার্য্যেই স্থান পাইত না। সেকালে এ অবস্থায় স্বামীকে এক গ্রাস জল আনিয়া দিবারও স্ত্রীর পক্ষে ক্ষমতা ছিল না। একদিকে এইরূপ ভাবে শুক্ররক্ষার যেমন ব্যবস্থা করা হইত, অপরদিকে সেইরূপ সাত্বিক ও পুষ্টিকর আহাৰ্য্যে শরীর বক্ষায় সকলেই মনোযোগ প্রদান করিতেন। কাজেই একালের অপেক্ষা সেকালের পুরুষগণ বলবীৰ্য্য শক্তি সমর্থ্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সকল প্রকার সম্পদ

লাভেই অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ বলিয়া গিয়াছেন,—

“ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণামারোগ্যং মুগমুত্তমম্।”

যদি মানব দেহে আরোগ্যই না থাকিল, তবে তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এ সকল সম্পদ লাভ কেমন করিয়া ঘটিবে? দেশের প্রত্যেক পিতা, প্রত্যেক অভিভাবক এ সকল কথা চিন্তা করুন। চিন্তা করিয়া আগে বালক রক্ষায় যত্নবান্ হউন। তবে আবার এট অধঃপতিত বাঙ্গালী জীবনে উন্নতি হইবে। নতুবা কীটদষ্ট কুহুমের মত বাঙ্গালী জাতি যে ক্রমশঃ অধঃপতনের অধস্তন দেশে পতিত হইবে, তাহা স্থানিচিত।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

## জ্বর।

### [ পূর্ব্বানুভূতি । ]

পুরাণে জরোৎপত্তির আর একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তাহার উল্লেখ না করিলে বর্তমান প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে

বাণ নামক অশ্বরের নাম পাঠকগণ অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন। বাণ শিব-বরে বলীমান ছিল, দেবগণ পর্য্যন্ত তাহাকে ভয় করিতেন। এই বাণের ‘উষা’ নাম্নী এক রূপসী কন্যা ছিল। সত্যঃপ্রবুল মধুগর্ভ কুহুম কলিকায় জন্ম, উষা পিতৃ গৃহে বর্দ্ধিত হইতে ছিল; একদিন তাহাতে প্রেমের অঙ্গুর্য্য প্রবেশ করিল। স্বপ্নে এক মহাপুরুষের ছায়া-মূর্ত্তি দেখিয়া, বালিকা মনে মনে

তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিল। উষা আশ্ব-হারা হইল, পিতৃগৃহে অতুল ঐশ্বর্য্যার কোলে বসিয়াও তাহার মনে হইতে লাগিল “অতৃপ্ত-বাসনাময় নবযৌবন প্রকৃতিরই তীব্র বিক্রম”। কিন্তু তাহার এই ভাব বিশ্বকাবের অপূর্ণ ভাষা রমণীর চক্ষে শীঘ্রই ধরা পড়িল। উষার সঙ্গিনী উষার বিরহ বেদনা বৃদ্ধিতে পারিল। বৃদ্ধিতে পারিল—শূন্য নয়নে জ্যোৎস্না-মূল আকাশের পানে উষার আকুল চাহনি দেখিয়া বৃদ্ধিতে পারিল—অতর্কিত আধ্বানে তরুণীর কোমল অঙ্গের অকস্মাৎ শিহরণ দেখিয়া, বৃদ্ধিতে পারিল—অনুভূত উষার আহাৰ্য্যে অনিচ্ছা, ভ্রমণে অচ্যুতম, হাসিতে বিষমতা।



ও লাগাণো কালিমার ছায়া দেখিয়া, তখন অনেক কৌশলে, সঙ্গিনী উবার মনোচোরের সন্ধান করিল। শেষে, উবার যুগযুগান্তরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা একটা ত্রিযামা যামিনীর মনোহা সাকল্য লাভ করিল। যুবতীর অনন্তা-সকল ক্ষুদ্র জদয়, লতার মত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, প্রেম পুলকিত দৃঢ় আলিঙ্গনে দাহিত ধনকে বাঁধিয়া ফেলিল। যখনাথ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত উবার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু যুবক যুবতীর এই গুপ্ত মিলন বড় বেশীদিন চাপা রহিল না। উবার শয্যাগৃহে অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া, দৈত্য-প্রহরীগণ বাণ রাজাকে সংবাদ দিল। বাণের বিশালা-য়ত লোচনে প্রলয়গ্নি জলিয়া উঠিল। পৌত্রের জীবন রক্ষার জন্ত, শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্তে বাণরাজ্য শোধিতপুবে উপস্থিত হইলেন। দানব যাদবে, মহাযুদ্ধ বাধিল। ভক্তের আস্থানে—স্বয়ং শঙ্কর রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। দানব কুল, যাদব-তেজ সহিতে পারিল না, দেব-বিজয়ী বাণ মুর্ছিত হইল। ভক্তের পরাজয়ে শঙ্কর ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। তখন, শিবের দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব তেজঃ বহির্গত হইল। সেই তেজঃ অরুণে যাদব চমুকে একেবারেই অভিভূত করিয়া ফেলিল। জর শ্রীকৃষ্ণের দেহেও প্রবেশ করিল। অরাবিশে ভগবানের বারম্বার পদাঙ্কন হইতে লাগিল, শাসককুল-হৃত্তা বিকাশ, রোমাঞ্চ, তন্ত্রা, প্রভৃতি উপদর্শে দাবকানাথ বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন রুদ্র-জরকে সংহার করিবার জন্ত, শ্রীকৃষ্ণ ও দ্বিতীয় জরের সৃষ্টি করিলেন। রুদ্রজ্বর ও বিষ্ণুজ্বর প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। রুদ্রজ্বর পরাভব স্বীকার করিয়া

বিষ্ণুর স্তব জুড়িয়া দিল। বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন “বৎস জর! তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।” জর কহিল—“দয়াময়! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আমার ভিক্ষা—জগতে আমি ভিন্ন যেন আর অন্য জর না থাকে।” শ্রীকৃষ্ণ জরের কামনা পূর্ণ করিলেন। বৈষ্ণব-জর বিষ্ণু শরীরেই বিলীন হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ রুদ্র জরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—“হে জর! তুমি যেক্ষণে স্থাবর জঙ্গমাঙ্কুর পদার্থ মধ্যে বিচরণ করিবে, আমি বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগে চতুস্পদ পশু মধ্যে, দ্বিতীয় ভাগে স্থাবর মধ্যে এবং অপর অংশে মহুঘ মধ্যে বিচরণ কর। তন্মধ্যে তোমার তৃতীয় ভাগের চতুর্থাংশ পক্ষি-মধ্যে নির্দিষ্ট রহিল; অপর অংশ দ্বারা মহুঘ মধ্যে ঐকান্তিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক ও চাতুর্থাহিক নামে বিচরণ করিবে। অবশিষ্ট জাতি মধ্যে যেক্ষণে অবস্থান করিবে, তাহাও বলিয়া দিতেছি। তুমি বৃক্ষ মধ্যে কোট, পত্র মধ্যে পাণ্ডুতাও সঙ্কেত, ফল মধ্যে আতুর্ধ্য, পদ্মিনী মধ্যে হিম, মৃত্তিকা মধ্যে উবর, জল মধ্যে নীলিকা, ময়ূর দিগের মধ্যে শিথোত্তেদ, পর্কত মধ্যে গৈরিক, এবং রোগ মধ্যে অপস্মারক ও ঘোরক নামে বিচরণ করিবে। তুমি ভূতলে, এই মত বিবিধরূপী হইবে, তোমার দৃষ্টি ও স্পর্শ মাত্র প্রাণিগণের বিনাশ ঘটবে। দেবতা ও মহুঘ ভিন্ন অন্য কেহ তোমার প্রজ্ঞা-সম্মত করিতে সমর্থ হইবে না।”

হরিবংশ—একাদশাধ্যায়িক শততম অধ্যায়।

[ কালীপ্রসন্ন বিহারী কট্টক অনুদিত ]  
ইহাই অরোণপত্তির পৌরাণিক ইতিহাস।

এই উপাখ্যানের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে, ক্রমশঃ আমরা তাহা ব ব্যাখ্যা করিব।

পুরাণে অরোহণের উপাখ্যানে মতান্তর থাকিলেও, অব যে ব্রহ্ম সন্তা, সফল পুণ্য-কারই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শিব যে অরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, একথা, বিংশ শতাব্দীর সুভাষার স্বর্ণযুগে সহসা কেহ বিশ্বাস করিবেন না। এখন, প্রকৃতদেব অনুসন্ধানে বাবুরা কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ফলে অনেক দেবতাই 'দেবত্ব' হারা-ইয়া স্বাধিকার বিচ্যুত হইতেছেন। বাবুরা প্রমাণ করিতেছেন—'শিব' একজন মানুষ, তাঁহার বাড়ি ছিল তিব্বত দেশে। তিনি 'চামরীষণ্ডে' আরোহণ করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী বলিয়া গজিকার ধূম পান করিতেন। শিব বর্ষরের দেবতা বর্ষরের সঙ্গে বাস করিতেন বলিয়া, 'দিগধর' সাজিতেন, কখনও বা কটদেশে বাঘছাল আঁটিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন। শিব যখন, মাংসাশী, উলঙ্গ, ভিগারী, অশানবাসী, তখন নিশ্চয়ই অনার্থ্য। হিন্দুবা জোর করিয়া শিবকে দেবতা করিয়া ঘরে তুলিয়াছেন।

অমৃতিকীর্ত্তির দল এই ভাবে শিবের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন। এ যেন পাদরীর মুখের কুৎসার প্রতিধ্বনি! এই সকল উৎকট মতের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে অরের কথা লিখিতে গেলে শিবকে ছাড়া চলেনা। অরের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে শিবকে চিনিতে হইবে, শিব-সর্ব্ব তত্ত্বের গূঢ় রহস্য জানিতে হইবে। সেই অতী শিবের কথার উল্লেখ করিলাম।

হিন্দুর দেব দেবীর ধ্যান, মূর্ত্তিকল্পনা, রূপের আরোপ, বর্ণের ছোঁতনা—সমস্তই তাবের সাবয়ব বিকাশ মাত্র। হিন্দু জাতি-তেন তাঁহার চিন্ময়ী দেবতা, মূর্ত্তয়ী হইলেও মূর্ত্তিকা-নির্ম্মিত প্রতিমা দেবতা নহেন, তাই পূজাস্ত্রে হিন্দু মাটির ঠাকুরকে বিশুদ্ধ দিয়া থাকেন।

শিব-সৃষ্টির পুংশক্তি। এ শক্তি আদি ও অন্তে স্থায়ী, ইহার বিশেষণ—নরক্যাপী, সর্বভূতান্তরায়, মহাকাল; শিব, সংহার মূর্ত্তি, নিখিল শক্তি তাহাতেই সংস্কৃত হইয়া থাকে। সৃষ্টির সংহরণ—শিবেরই অভিব্যক্তা, তাই শিবের নাম মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুর অজ্ঞেয়তার তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ; বিনাশ-শক্তি বিধবর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যে অংশে জীবের পরিসমাপ্তি, শিব সেই স্থানে বাস করেন। ব্রহ্মাণ্ডের পরিণতি—ভস্ম শিবের অঙ্গরাগ। মনুষ্য-জীবন শিবত্ব-দুরণের মহা-মুহূর্ত্ত, শারীর বিচ্যার মেরুদণ্ড—বিষবৃক্ষ। আমাদের দেহতত্ত্বের অনেক রহস্যই গল্পাকারে রচিত, সেই সকল গল্প, অর্থবাদ ও রূপক রোচকের ভিতর দিয়া, তত্ত্ব বেদে, পুরাণে—ত্রিষ্টুভ, অমৃষ্টুভ, জগতী মহতীর মধুহন্দে কাল সাগরে প্রবাহিত।

পৌরানিক তত্ত্বের অর্থ—শারীর ক্ষেত্রে—শিব পিতৃ অংশ [Katabolism] বা দৈহিক বৈশ্লেষিক শক্তি। অর চিকিৎসার রস প্রয়োগের সময় বিস্তারিত ভাবে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তত্ত্ব শ্লেষার নাম 'শিব'—শ্লেষা বা শারীরনিষ্কাশ [ধর্ম, মল, মূত্রাদি]—এই বৈশ্লেষিক শক্তির ফল। মর্ষি অন্বেষণ অরকে দেহ ও মনের সম্ভাব বলিয়াছেন। দেহ ও মনের যে সমবায় তাহারই

নাম পুরুষ, স্ত্রীরাং জর পুরুষের [ভিতরকার মাছুষের] এক প্রকার সন্তাপ। দক্ষ—দেবী-পিতা, মাতৃ অংশের [Anabolism বসপাক] প্রসবিতা। অতএব দক্ষ, বা শরীরে বসপাক প্রবর্তক কারণ, যদি তাঁহার কণ্ঠাব [রসপাকের] সহায়তা না করেন; যদি তিনি শিব বা শরীরের বৈশ্লেষিক অর্থাৎ প্রাদেহিক ক্রিয়ার আঘা প্রাপ্য উপহারাদি না দিয়া তাহার অপমান করেন, তাহা হইলে শিব [দৈহিক শ্রাব ক্রিয়া—মলমূত্র বর্জ্যাদি] কুপিত হইয়া যে উত্তাপ উৎপাদন করেন, তাহারই নাম জর। আপনাদি জরের নিদানেনব সহিত এ সকল তত্ত্ব মিলাইয়া লউন; দেখিবেন জরের নিদান ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শরীরের শ্রাব সংরোধ বা রসপাকের ব্যাপন অবস্থাই জরের মূল শক্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি—অথর্ব বেদে এক বকম রোগের উল্লেখ আছে, তাহার নাম “তক্ষণ”। এই ‘তক্ষণ’ রোগই বৌদ্ধযুগে ‘জর’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই স্থলে আমরা বৌদ্ধযুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কীর্তন করিব।

দিনকরের যেমন উদয়াস্ত আছে, তেমনি যুগধর্মের ও উদয়াস্ত আছে। কালক্রমে, তীক্ষ্ণায়কের মত উজ্জল ব্রাহ্মণ্য প্রতিভাও নিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যজ্ঞের ছল করিয়া ভারতে তখন রক্তের স্রোতঃ প্রবাহিত, যজ্ঞ-ভূমি যুদ্ধ-ভূমির আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। বক্ত-দিগ্ধ নৈদিক ধর্ম, ক্রমে সংকীর্ণ সংহিতায় পবিত্র হইয়াছিল। সোম-পানের পরিবর্তে ভারতের আবাগ বৃদ্ধ বনিতা সীধু-পান আরম্ভ করিয়াছিল। উপনিষদের সূক্ষ্ম হেতুবাদ বিশ্ববার লোক বিরল হইয়া আসিতেছিল। অধিরা সেই সকল ভবে রক্ত মাংসের সংযোগ

করিয়া পুরাণ রচনায় মন দিয়াছিলেন। এই রূপ সময়েই, ভারতের এক মঙ্গল মুহূর্ত্তে—কপিলবাস্তুর রত্নপ্রাসাদে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ প্রসারিত ধর্ম সন্ধীর্ণ ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে রীতি-মত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। নূতন ধর্ম, জগতে ও জীবনে নূতন প্রাণ ঢালিয়া দেয়। বৌদ্ধধর্মও ভারতকে নূতন ভাবে গঠন করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগে একদিকে আয়ুর্বেদের অবঃপতন ঘটিয়াছিল। রাজাজ্ঞাস পশুবলি, শবচ্ছদ প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, শরীর তত্ত্বের বর্থেষ্ট কতি হইয়াছিল; অন্ত দিকে আবার চিকিৎসা বিজ্ঞান কর্ম্মভ্যাসের মহিমায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। “প্রিয়দর্শী” রাজা অশোক, মানুষ ও পশু উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই ‘রুগ্ণাবাস’ ও ‘চিকিৎসালয়’ স্থাপন করিয়াছিলেন। বেদে দেবতা—মানুষ; বৌদ্ধ ধর্মে মানুষ—দেবতা; এই ‘দেবত্ব’ ও ভ্রাতৃত্বের মিলন সংবাদ লইয়া, শ্রাবকেরা দেশে দেশে ছুটিয়া ছিলেন। অনাম কামবোধির কুল হইতে গ্রীক বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত নির্ধাণ মন্ত্রের ঐক্যতানে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম জালা বহুগা নিভাইবার ধর্ম। কারুণ্যে—আয়ুর্বেদের জন্ম, প্রসার ও পরিপুষ্টি বলিয়া বৌদ্ধগণ আয়ুর্বেদকে আদরে বরণ করিয়া ছিলেন। বৌদ্ধ নৃপতি ভিক্ষু শ্রাবকের সহিত বৈথকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদের অনেক সংহিতায় বৌদ্ধ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের হস্তে ‘সুশ্রুত’ প্রতি সংস্কৃত হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস এই বৌদ্ধ যুগেই “জর” নামে, নৈদিক “তক্ষণের” নাম-করণ হয়।

এ অধ্যায়ের কারণ—বেদে ‘জরের’

নাম নাই, আচার্য্যযুগের সর্গাপেকা প্রাচীন গ্রন্থ সূক্ষ্মতের স্বরূপ বা নিদান স্থানে আরের উল্লেখ নাই। সূক্ষ্মতের উত্তর তন্ত্র (যাহা নাগার্জুনব রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ) সেই উত্তর তন্ত্রেই অর প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে। সূক্ষ্মতাবিভাবের বহুকাল পবে এই উত্তর তন্ত্র মূল সংহিতাব সহিত সংযোজিত হইয়াছে।\*

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ রাজা অশোক ব্রাহ্মণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে তিনি যে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা নষ্ট করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার প্রচুর প্রমাণ সাহিত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ রচিত ‘আয়ুর্বেদেরও’ অনেক পরিবর্তন করিয়াছিল। কেবল দৈহিক ব্যাধি বিনাশ বৌদ্ধধর্মের ‘প্রণব’ বলিয়া বৌদ্ধগণ ‘আয়ুর্বেদকে’ নষ্ট করিতে পারেন নাই। বরং তাহারা ‘আয়ুর্বেদকে’ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নতুন করিয়া গড়িয়া আপনাদের প্রয়োজন সিদ্ধিক অতুল্য কবিয়া লইয়াছিলেন।

তাহার পর বৌদ্ধযুগের অবসান, তান্ত্রিক যুগের আবির্ভাব। সংঘ সত্যলষ্ট হইয়া

রায় মহাপ্রভুর অবগতির জন্ত নিবেদন করিতেছি। যে, সূক্ষ্মতের স্বরূপের ৩য় অধ্যায়ের সূচিতে আরের উল্লেখ আছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে জনপদ সংস্কারী আরের, ১০ম অধ্যায়ে স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা আরের উদ্ভাপ পরীক্ষা, ১১ অধ্যায়ে পানীয় আরের আরে অহিতকারিতা, ১১ অধ্যায়ে সর্বাঙ্গগত রোগের উদাহরণ অর এবং ৩৩ অধ্যায়ের ১৩—১৬ লোকের অসাধ্য লক্ষণ আছে। আরও আছে। সূক্ষ্মতের উত্তরতন্ত্র যে নাগার্জুনব রচিত বা পরে সংযোজিত নহে একথা বর্ণোবধিরূপের কুমিকায় “বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণে” বলা হইয়াছে।

আঃ সাঃ।

টলিতেছিল, নির্মাণের দার্শনিকতা ভুলিয়া, অপাত্র হস্ত ব্রহ্মচর্যা উচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। মঠ চৈত্যা বাড়িচার আসিয়া অনার্থ উৎসবে যোগদান করিতেছিল। শঙ্কর, রামানুজ ও উদয়নেক প্রতিভা উদয় তোরণে উকি মারিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণ্য আবার স্ব-প্রতিষ্ঠার অবসর খুঁজিতেছিল।

ভারতে আবার ধর্ম-বিপ্লব আরম্ভ হইল। বৌদ্ধ ধর্ম বলিয়াছিল—“রমণী ত্যাগ কর,” তন্ত্র বোধগা করিলেন—রমণীয় জননীয়ে পরিণত কর। তাহা হইলেই তোমার প্রাকৃতিক পিপাসার শান্তি হইবে।”

এই সময় সামবেদী শুদ্ধ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-গণ সগোরবে মাথা তুলিলেন। পাটলিপুত্র নগরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের উপর প্রতিশোধ লইলেন। বজ্র-দীর্ঘ গিরিশঙ্করের ত্রায় অশোকের বিশাল রাজ্য চূর্ণ বেগু হইয়া মহাশূন্তে মিশিয়া গেল। এ ঘটনা খৃঃ পূঃ ২৪৯ হইতে খৃঃ ৭৫০ পর্যন্ত এমিয়ায় ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে অঙ্কিত আছে, অল্প সন্ধিস্থ পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। স্বল্পাবসরে মাসিকের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বলিবার নহে।

ব্রাহ্মণ পুণ্যমিত্র রাজা হইলেন; অশোক ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও বেদ-বিদ্বেষ্টা ছিলেন, অশোকের দলের উপরই পুণ্যমিত্রের প্রদীপ্ত রোষা-নল বজ্রের ত্রায় পতিত হইল। ‘স্ববিরবানী’ “মহাসাংগিক” প্রত্যেক বৌদ্ধই পুণ্যমিত্রের নির্ঘাতন সহিতে লাগিল। আয়ুর্বেদের উপর দিয়াও এই বিপ্লবে বড় বহিয়া গেল। কৃষি-নিশ্চয় তন্ত্রে, আবার বৈদিক যুগের ‘তন্ত্র’ রোগ বিপথ্য প্রকৃতির আর্ন্তর্যর ভণা-ইয়া দিল। বাগ্‌ডটের শিষ্য মিশ্রকেশ ‘তন্ত্র-গো’র লক্ষণ আবার লিপিবদ্ধ করিলেন,—

কম্পঃ কঠোষ্ঠবিটশোষাক্ষবো মুর্দ্ধোদরাস্রকৃ।  
বেদম্যাস্থগসস্তাপজ্জস্তাশ্চ তক্ষণাকৃতিঃ ॥

কম্প, কঠ ও ওষ্ঠ শোষ, মলশোষ [মল-  
বদ্ধতা] হাঁচী বন্ধ, উদরের উর্দ্ধদিকে এবং  
মস্তকে যন্ত্রণা, বিষমবেগ, অনিদ্রা এবং শরীরের  
সস্তাপ ওজ্জ্বল—তক্ষণ রোগের এই গুলি  
লক্ষণ। আবার তক্ষণের পূর্বরূপ দেখুন ;—

“জ্জস্তাপমর্দাবরতি দৃগদাহো গোরবারুচী।  
তক্ষণানাং প্রাগ্গুপং হি দ্বিত্রিজে দ্বিজিলক্ষণম্।

তক্ষণই যে জ্বর, ইহাতে আর সন্দেহ  
থাকে কি ? তাত্ত্বিক যুগের প্রথমপাদে পুণ্য-  
মিএব শাসনকালে যে সকল আয়ুর্বেদ তত্ত্ব  
বচিত হইয়াছিল, মিশ্রকেশের ‘আমর্যাবলোক’

তাহাদের অন্ততম। আমাদের বিশ্বাস বৈদিক  
যুগে যে রোগ তক্ষণ নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ  
যুগের বৈজ্ঞান্য তাহাকেই “জ্বর” আখ্যা প্রদান  
করিয়াছিলেন। আবার বৌদ্ধ বিদ্বেষের ফলে  
তাত্ত্বিক যুগে সেই জ্বর “তক্ষণ” নামে পুনরুদ্ভি-  
হিত হইয়াছিল। তাহার পর, বৌদ্ধ ধর্মের  
উপচার যখন তাত্ত্বিকতায় মিশিয়া গেল, লোকে  
যখন অসাম্প্রদায়িক ভাবে মতের আদর  
করিতে শিখিল, তখন তক্ষণ ও জ্বর হরিহরের  
মত এক হইয়া গেল। জ্বর নামেই তাহা  
আয়ুর্বেদ সংহিতায় স্থান লাভ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভ্রজবল্লভ রায়।

## আয়ুর্বেদের জয়।

তখন কাটোয়ার থাকিতাম।

কাটোয়া বর্তমান জেলার মধ্যে একটি  
খ্যাত প্রাচীন স্থান। ইহার পৌরাণিক নাম  
—‘কণ্টকদ্বীপ’, ঐতিহাসিক এরিয়ান সাহেব  
‘কণ্টকদ্বীপের’ অপভ্রংশে Katadupa নামে  
ইহার নামকরণ করেন। সেই ‘কাটাদুপা’  
এই কাটোয়ায় দাঁড়াইয়াছে। সেন-রাজের  
সময়ে, মুসলমানের আমলে, কাটোয়া বাগিচা  
বন্দবস্তে পরিণত হইয়াছিল। বিশেষতঃ  
“নদীয়া বিজয়ের” পর ইহার ঐশ্বর্য ও সৌন্দ-  
র্য্যেব সীমা ছিল না। গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গদে  
অবস্থিত বলিয়া মুসলমানগণ এই কাটোয়ায়  
কেদ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

কাটোয়ার পূর্ব সমৃদ্ধি এখন আর কিছুই  
নাষ্ট। কালের ইজিতে সমস্তই সলিল-সমাধি  
লাভ করিয়াছে। তবে জেলার মহকুমা  
থাকার সহর এখনও একেবারে জীহীন হইয়া

পড়ে নাই। চাউলের গজ, এবং গ্রানুপারায়ণ  
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কাছারী, এখনও সহরকে  
জীবন্ত রাখিয়াছে।

আমি থাকিতাম নগরের বাহিরে।  
বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটি স্থল্লর বাংলায়  
আমি বাস করিতাম। সংসারে আমার স্ত্রী  
ও আমি, আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। এই  
দুইটা প্রাণীর পরিচর্য্যার জন্য দুইজন ভূতা,  
দুইজন দাসী এবং এক অলকাতিলাক শোভী  
উৎকল ব্রাহ্মণ, পাচকরূপে আমাদের ঘর  
আলো করিয়াছিলেন।

আহারের পর আমি কর্মক্ষেত্রে যাত্রা  
করিতাম। আমার স্ত্রী তখন একা। সময়  
কাটাইবার জন্য আমাদের অবস্থান স্থানের  
গোষ্ঠবর্ষকমে তিনি কিছু অতিরিক্ত মনঃসংযোগ  
করিয়াছিলেন। চাকর চাকরাণীদের তিনি  
বসিয়া থাকিতে দিতেন না, নিজের মন্তল

পাঠে অবসর স্তূথ ভোগ করিতেন না। বাড়ী  
ঘর সাজানো বাংগোটিকে তিনি বেশ সাহেবী  
ধরণে সাজাইয়া ছিলেন। শিক্ষিতা মহিলা  
কলা-নিপুণ হস্তে, আমার বাংলা এক অপূর্ণ  
শ্রীধারণ করিয়াছিল। বন্ধু বান্ধব যিনিই  
বেড়াইতে আসিতেন, তিনিই আমাদের  
বাংলো দেখিয়া, আমার স্ত্রীর রুচির প্রশংসা  
করিতেন। মেদী পাতার বেড়ার মাঝখানে  
একটি ক্ষুদ্র গেট, গেটের পরেই রক্ত কঙ্করাবৃত্ত  
সন্ধ্যার পথ বাংলোর সোপান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।  
সেই পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি ফ্রোন্টন  
গাছ, ফ্রোন্টন সারির পশ্চাতে সমতল ভূমি-  
খণ্ডের উপর নানাবিধ ফুলের গাছ। গাছ-  
গুলিতে বারমাসই ফুলফুটিত। আর এই  
বাগান ঘেরা বাংলা খানির সরল সজ্জা  
কোশল, দর্শকগণকে দুইখানি বলয়-মণ্ডিত  
কল্যাণ ভরা কোমল হস্তের সন্ধান বলিয়া  
দিত।

একদিন অপরাহ্নে কক্ষ ক্রান্ত দেহে বাসায়  
ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—শিশুর চপলহাস্তে  
ক্রীড়া কোলাহলে নির্জন বাংলা বেন আনন্দ-  
মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই দৃষ্টি-  
লাম—আমার এক শ্রালিকাপতি সপুত্র স-  
কলত্র আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।  
বাসায় একটা ধূম লাগিয়া গিয়াছে, দাঁশ  
দাসীরা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, আমার  
শ্রালিকাটা কিছুদিন আমার বাংলোর অতিথি  
রূপে কাটোয়ার বাস করিবেন। তিনি  
ম্যালেরিয়া জরে অনেক দিন ভুগিতেছেন,  
ডাক্তার স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়াছেন।  
বিদেশে পরিচিত বা আত্মীয় লোক না থাকায়,  
আমার শ্রালিকাপতি তাঁহার পত্নীকে কিছুদিন

আমাদের আশ্রয়েই রাখিবার সঙ্কল্প করিয়া-  
ছেন।

আমার শ্রালিকা-পতি—চৌকীদারের  
সদ্বার, অর্থাৎ ডেপুটি বাবু—দ্বিতীয় শ্রেণীর  
ক্ষমতা প্রাপ্ত হাকিম। স্ত্রীরাং তাঁহার  
প্রস্তাব আমি সাগ্রহেই অমমোদন করিলাম।  
২৩ দিন পরেই ডেপুটি বাবু কর্মস্থলে চলিয়া  
গেলেন। শ্রালিকা আমাদের কাছেই  
রহিলেন।

এস্থলে আমার শ্রালিকার একটু সংক্ষিপ্ত  
পরিচয় দিব। আমার শ্রালিকা আমার  
স্ত্রীর দুই বৎসরের অগ্রজ। প্রথমা কন্যা  
বলিয়া তিনি পিতামাতার মেহের পাত্রী  
ছিলেন; স্ত্রীরাং জনকালয়ে গৃহস্থলীর কাজ  
শিম্বিবার তাঁহার অবসরই হয় নাই। তাহার  
পর, বিবাহের পরই তিনি ডেপুটিগৃহিণী।  
ইহা জীবনে এই ডেপুটিগৃহিণীর যে কয়টা  
বিশেষ কর্ম ছিল, তাহার মধ্যে—

- ১। বেলা ৯টার সময় শয্যাভ্যাগ।
- ২। শয্যাভ্যাগ করিয়া চা পান
- ৩। বেলা ১১ টার মধ্যে আহাৰ।
- ৪। আহাৰান্তে ছয় ঘণ্টা ব্যাপী স্নানার্থ  
নিদ্রা।
- ৫। সন্ধ্যায় সিন্ধু-জ্যাকেট, বড়ি  
প্রভৃতি আঁটিয়া বসিয়া থাকা।

- ৬। দাঁশ দাসীর প্রতি কারণে অকারণে  
তিরস্কার। এইগুলিই প্রধান।

তাঁহার দেহ ভাল ছিল না। হিষ্টিরিয়া  
ও ডিসপেন্সিয়া তাঁহার চিরসঙ্গিনী ছিল।  
ইহার উপর প্রায় বর্ষাকাল ধরিয়া তিনি  
ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন। শ্রম-বিমুক্ত শরীর  
যে ব্যাধির মন্দির, এই ডেপুটি গৃহিণী

তাঁহার একমাত্র উদাহরণ। ডেপুটী বাবু পত্নীকে চাগচলনে বিবি বানাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধিতে পারেন নাট,—ইংরাজ মহিলা-বাও আবশ্যক মত ব্যায়াম করিয়া থাকেন। অথারোহে টেনিস ক্রীড়ায় তাঁহাদের যে অঙ্গ সঞ্চালন কার্য সম্পন্ন হয়, তাহাতেই তাঁহাদের কুম্ভ-কোমল কলেবর স্বাস্থ্যের অরুণিমায় ঝলমল করিতে থাকে। বাঙ্গালী বাবুরা ইহা বৃদ্ধিতে পারেন না; তাঁহারা পত্নীকে বিবি সাজাইয়া কেবল গৃহ শোভার উপাদানে পরিত্রা করেন। তাই এখনকার বঙ্গনারী—  
“নামটী অবলা কিন্তু ছলনায় ছাঁহুনী।  
অগ্নি তাপে গলে তহু ভাত রাখে রাধুনী ॥  
গৃহকার্যে শক্তি নাই লোকে বলে গৃহিণী।  
ধাত্রী পালে শিশু ছেলে, তবু হয় ‘জননী’ ॥  
সৃষ্টি ছাড়া দৃষ্টি পোড়া হিষ্টিয়া সঙ্গিনী।  
দাস দাসীদের প্রতি মুহুঃ চোখ রাঙ্গানী ॥  
ইত্যাদি কবি কাহিনীর লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িতেছেন। বিলাসিতায় আমাদের “সদর হন্দর” কলুষিত হইতে বসিয়াছে।

ডেপুটী বাবু যে কেবল পত্নীকেই বিবি বানাইয়া সম্বষ্ট ছিলেন, তাহা নহে। পুত্র কন্যাকে নীতি শিক্ষা দিবার সময় ও তিনি হিন্দু আদর্শ ভুলিয়া যাইতেন। আত্মত্যাগের মহিমা বুঝাইবার জন্ত তিনি জনহাওয়াডের দৃষ্টান্ত দিতেন। সম্ভানকে হিতাহিত জ্ঞান বুঝাইবার জন্ত পিওডোর পার্কারের উপাখ্যান কীর্তন করিতেন, নেপোলিয়নের উদাহরণ দিয়া তাহাদের বীরত্ব বুঝাইতেন। অথচ তাঁহারই দেশে বীরত্ব ধীরত্ব উদারতা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ স্বরূপ, কত ভীষ, কর্ণ, রাম ও কৃষ্ণ—প্রভৃতির চরিত্র কাহিনীর কথনও অপ্রভুল ছিল না। কিন্তু বার্ষ শাসন বালা পঙ্কিলতা

হইতে তাঁহার পুত্রেরা কখনও পরিভ্রাণ পাইত না। তাহারা নিরাকার সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে যতটা না বিশ্বাস করিত, তাহাব চেয়েও বিশ্বাস করিত, পিতামহী মুখশ্রুত বিকট-নেত্রা জটাই বড়ীকে নেলসনের দৃষ্টান্ত খাড়া করিয়া, সন্ধ্যাকালে তিনি যে পুত্রকে নির্ভীকতার মাহাত্ম্য শিখাইতেন, পরদিন প্রভাতে একটা নিরীহ গঙ্গা ফড়িং দেখিয়া তাহার সেই পুত্রই ভয়ে মূর্ছিত হইত।

যাহা হইক, ডেপুটী গৃহিণী আমাদের কাছে দুই মাস থাকিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেলনা। এমন ছায়ালোক উদ্ভাসিত মধুরানিল-বীজিত সুন্দর স্থানে বাস করিয়াও তাঁহার রোগের উপশম হইল না। তখন সকলেই বলিলেন—একবার কলিকাতায় গিয়া ভাল ডাক্তার দেখান উচিত। ৫৬ দিনের মধ্যেই সেই ব্যবস্থা করা হইল। ডেপুটী বাবু ছুটি লইলেন। কলিকাতায় একটা বাসা স্থির করা গেল। একজন ভাল ডাক্তার ডাকা হইল—তাঁহার ফিঃ ষোড়শ মুদ্রা। তিনি মোটরে চড়িয়া আসিলেন, রোগিণীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন, শেষে অতুল গাভীর্থের সহিত মস্তব্য প্রকাশ করিলেন—“রোগিণীর থাইসিস হইয়াছে, তবে প্রথম অবস্থা, ভাল হইতে পারে।”

রোগের নাম শুনিয়াই আমরা ভীত হইলাম। যাহা হউক, ডাক্তারের ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবন চলিতে লাগিল। একমাস কাটিল কোনও উপকার হইল না অধিকন্তু কাসির সঙ্গে রক্ত উঠিতে লাগিল। আর একজন ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি আসিয়া রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। রীতিমত

চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সেবন, মর্দন, সস্তাপন, ইনহেলন, আচ্ছাদন, প্রক্ষালন, একে একে সমস্তই আচরিত হইল। এ যেন তান্ত্রিকের স্তম্ভন, বিদেহণ, উচ্চাটনাদি ষট্কার্ম সাধন! গৃহস্থের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। অবশেষে ডাক্তার বাবু বলিলেন—“ভাল জায়গায় ‘চেঞ্জ’ দিন, ‘চেঞ্জ’ অর্থে ডাক্তারী মতে ‘গঙ্গাযাত্রা’ আমরা তাহা বুঝিলাম। বহু বান্ধবেরা বলিলেন—“এ সকল রোগে—পুরীর জল হাওয়াই ভাল।” অগত্যা ডেপুটী বাবু পুরুষোত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমাকে সঙ্গে লইতে ছাড়িলেন না। আমার ভয় হইল—পাছে বন্ধা রোগীর সংস্পর্শে থাকিয়া আমাদের ও বন্ধা হয়। জীকে সাবধান করিয়া দিলাম। তিনি কিন্তু আমার কথা গ্রাহ্য ও করিলেন না। বিদেশের নির্দোষ পুরে, তিনি যখন সেই মরণাহত নারীর শয্যালুপ্তিত মস্তক, মায়ের মত নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন, তখন আমার মনে হইল, এক স্বর্গের দেবী তাঁহার মেহময় করস্পর্শে সজীবনী মুখ সেচনে বুঝি রোগিণীকে রোগ-মুক্ত করিয়া, নবজীবন দান করিতে মৃত্যুমলিন রোগ শয্যার পার্শ্বে আবিভূত হইয়াছেন। এই সেবাপরায়ণা সুন্দরীকে, আমি যে রোগিণীর স্নেহা করিতে বারণ করিয়া ছিলাম, সেজন্য অমূল্য হইলাম।

পুরীতে আসিয়া প্রথমে রোগিণীর অবস্থা একটু ভাল বোধ হইয়াছিল। কিন্তু সে ভাব বেশী দিন থাকিল না। আবার অর বাড়িল, কাসির সঙ্গে রক্ত উঠিতে লাগিল, উদরাময় দেখা দিল। সেই সময় একজন সাহেব ডাক্তার পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তিনি

বেস্থানে সিভিল সার্জন ছিলেন, সেই স্থানে আমিও কিছুদিন সরকারী কার্য করিয়া ছিলাম। সেই স্ত্রেই তাঁহার কাছে পরিচিত হইয়াছিলাম। সাহেবকে আমাদের বিপদের কথা জানাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ রোগিণীকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বলিলেন “এখন রোগ চিকিৎসার অতীত হইয়া গিয়াছে, ঔষধ সেবনে কোনও ফল হইবে না। ইনি কখনও পরিশ্রম করিতেন না, সেই জন্য অল্প-বোগ ও অজীর্ণ রোগে ইহার স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই অজীর্ণ হইতেই ‘টিউবারকুলিসিস’ জন্মিয়াছে। এখন আর কোনও উপায় নাই। আমি আর কি করিব?”

বাস্তবিক তিনি আর কি করিবেন? তবে তিনি যে অসামান্য উদারতা দেখাইলেন, এজীবনে তাহা ভুলিব না। আমরা টাকা দিতে গেলাম, তিনি লইলেন না।

রোগিণী আর পুরীতে থাকিতে চাহিল না। বলিলেন—“আমায় সেই কাঁটোয়ার লইয়া চল। শান্তিময় স্থানে শান্তিতে মরিতে দাও।” অনেক কষ্টে আবার তাঁহাকে কাঁটোয়ার ফিরাইয়া আনিলাম। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। কলিকাতার থাকিবার সময় রোগিণীকে কিছুদিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল। কাঁটোয়ার আসিলে প্রতিবেশী বন্ধুগণ বলিলেন—“এইবার কবিরাজী চিকিৎসা হউক। কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হইল। কিন্তু ডেপুটীবাবু একেবারেই অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি পষ্টই বলিলেন চিকিৎসায় অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ দেখাইতে গেলে, আবার কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইবে। এখন তাহা



একবারেই অসম্ভব । এ অবস্থায় রোগিণীকে নাড়া চাড়া করা বিপদ জনক । কলিকাতা হইতে কবিরাজ আনিতে গেলেও—পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে হইবে । অতএব ও সঙ্কল্প ত্যাগ করণ ।” আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার স্ত্রী কোন কথা শুনিলেন না । তিনি কাটোয়া হইতেই একজন বৈথকে আহ্বান করিলেন । বৈথটীর বয়স হইয়াছিল ; শ্রীখণ্ড গ্রামে তাঁহার বাড়ী । গো-যানে চড়িয়া, এক পা’ ধূলা মাখিয়া, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বৈথরাজ উপস্থিত হইলেন ! রোগিণীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন, প্রায় আধঘণ্টা নাড়ী টিপিয়া বসিয়া রহিলেন ! তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মনে হইল—ভগবানের আদালতে ইহাই বুঝি সাক্ষীর বোঝা !” বৈথ গভীর ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন “রোগ কঠিনবটে ! দেখি, কি করিতে পারি !” হায় বৃদ্ধ ! এখনও আশা দিতেছ ? দেখিতেছি, তোমার “বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধির” উদয় হইতেছে !

বোধ হয় কবিরাজ মহাশয় আমাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তাই ঈষৎ হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমার ঔষধ সেবন করাইতে সম্ভবতঃ আপনার আপত্তি করিবেন না । কেননা,—কোনও ডাক্তারই আর এ রোগিণীর চিকিৎসায় অগ্রসর হইবেন না । স্মৃতরাং দায়ে পড়িয়া—আমার বা আমার সখ্যী কাহারও ঔষধ খাওয়াইতে হইবে । কিন্তু, আমিও রোগিণীকে কোনও পাকা ঔষধ দিব না । একটা পাচন লিখিয়া দিয়া যাইতেছি, ১৫ দিন তাহা খাওয়ান, তার পর

আর একবার দেখিয়া সময়োচিত ব্যবস্থা করিব ।

পাচনের ফর্দ লিখিয়া দিয়া, দুইটা টাকা দর্শনী লইয়া, গো-যানে চড়িয়া কবিরাজ চলিয়া গেলেন । আমার স্ত্রী জোর করিয়া পাচন আনাইলেন । আমরা কেবল কোতুহলী হইয়া তাহার ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম ।

চারিদিন পরে ব্যাংগেল—ঔষধ ধরিয়াছে । রোগিণীর কাসি বেশ কমিয়া গিয়াছে, ক্ষুধাও বাড়িয়াছে । ১২দিন পরে দেখিলাম—রোগিণী বালিসে ঠেস্ দিয়া বসিতে পারিয়াছেন । ১৫ দিনের দিন কবিরাজ আবার আসিলেন, রোগিণীকে দেখিয়া বলিলেন—“আর ভয় নাই, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, আর আমার আসিবার আবশ্যক হইবে না । ঐ পাচন—এখনও ১মাস খাওয়াইবেন ।”

তাহাই হইল । রোগিণী দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন । এক মাসের মধ্যে অর বন্ধ হইয়া গেল । আমরা বিষয়ে অবাক হইলাম । সভ্যতার অহঙ্কারে স্বীত ডেপুটী বাবুর প্রাণে—আবার ঋষিদের অভিমাম আসিল । এ কি ইজ্জতাল ? যে রোগ বড় বড় ডাক্তারে আরাম করিতে পারিল না, সে রোগ একজন পাড়ার্গে কবিরাজ ভাল করিল ? সাহিত্যিক বন্ধু—ব্রজবল্লভের আত্ম-প্রাসিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—‘কত কোটকেনা, কত কক্কিওর, কেপ্লারের কর্ভলিডার, কিছুতেই যে কাসি কমে নাই’—সেই কাসি কিনা সামান্ত জড়িটীর কাখে, ভৌতিক ব্যাপারের মত অকস্মাৎ অন্তর্ধান করিল ? ইহাই কি মন্ত্র শক্তি ?

বহুদিন পূর্বে আচার্য্য অক্ষর চন্দ্রের এক প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম—‘ভারত বাসী জাতির

কাহাকে বলে তাহা জানেনা ; বোঝেনা, ভাবেনা। ভারতবর্ষ—ভগবানের অপূর্ণ সৃষ্টি। দেখিবার বস্তু বটে! কিন্তু আমরা ভারত সন্তান, এহেন ভারত আমরা দেখিনাই দেখিব না। \* \* \* \* \* দেখিবার সামগ্রী বটে—কিন্তু আমরা দেখিলাম না।’ তখন সাহিত্য ধুরন্ধরের এই মর্মবাণী সহসা মনে পড়িয়া গেল। বাস্তবিক ভারতের ত কিছুই আমরা জানিলাম না। ভারতের ‘আয়ুর্বেদ’ অবহ্ন মলিন ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা ত তাহার আদর বুঝিলাম না! লাগো-চড়া, মোটর-রোজ, জীবন্ত বিজ্ঞানের প্রতিনিধি, যে রোগ অসাধ্য বলিয়া ছিলেন, গোয়াল বিহারী বৈষ্ণব সে রোগ যে অনায়াসে জয় করিলেন,—সে ত কেবল আয়ুর্বেদেরই অপূর্ণ মহিমায় হতভাগ্য আমরা ভারতের কিছুই দেখিলাম না, কিছুই বুঝিলাম ন, তাই সার্ববর্ষিক বিজ্ঞা চর্চাতেও আজিও আমাদের হুঃখ ঘুচিল না।

যে পাচন খাইয়া আমার শ্রাণিক মূত্ৰামুখ

হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন,—নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

- ১। কটিকারী, ২। হরালভা, ৩। কুড়
- ৪। বাসক ছাল, ৫। কাঁকড়া শুল্কি,
- ৬। পলতা, ৭। মুখা, ৮। কটুকী
- ৯। চিরতা, ১০। লবঙ্গ, ১১। গুলঞ্চ,
- ১২। চট, ১২। পিপুল মূল, ১৪। পিপুল,
- ১৫। শুষ্ঠ ১৬। গজ পিপুল, ১৭। জায়ফল
- ১৮। বামন হাঁটী, ১৯। গন্ধ ভাজুলে,
- ২০। দারু হরিদ্রা।

এই কুড়িখানি মসলা, প্রত্যেকটি চকুচকু ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ইহাই দুই বেলা খাওয়ান হইয়াছিল। পুরাতন জ্বরও কাস রোগে—সাধারণে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

পাচনের ফর্দখানি—ডেপুটী বাবু এখনও ইষ্টকবচের মত সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। \*

শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায়  
(বিএ, বিএল)

## গোমাতা।

ভারতবর্ষে আবহমানকাল হইতে গো-সেবা মাতৃ সেবার ভ্রায় পুণ্য কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু বর্তমানে আমরা বিদেশীয় শিক্ষা নীতায় অধুপ্রাণিত হুওয়ায় আচার-ভ্রষ্ট অনাথ্যের ভ্রায় গো সেবা পরাজুখ হইয়া, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল হারায়া হুঃখকে স্মৃৎ বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি। গো মাতা বলিয়া আর্ধ্যদের গো সেবা নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে

ছিল। এমন কি গো-সেবা না করিয়া কোন ও কার্য আরম্ভ হইত না। বস্তুতঃ মানুষের

\* বাহাদের বাটতে ক্ষুধিকবস্ত্র রোগ—কবিগায়ী ওষধে আরোগ্য হইয়াছে, বাহারা আয়ুর্বেদীয় ঔষধের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সেই সবার লিখিবার জন্ত আমরা অহুরোধ করিতেছি। “বায়ু-র্বেদের জয়” শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিব।

আর. ক।

জীবন গরুর নিকট সর্বতো ভাবে ঋণী ।  
জন্মাবচ্ছিন্নে সকল কাজেই গাভীর উপকারিতা  
বর্তমান ।

ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মাতৃস্তন্য কয়েক মাস  
মাত্র পান করিয়া জীবিত থাকি ; কিন্তু মাতৃ-  
রূপিনী গাভীর পায়ুষ পান করিয়া চিরকাল  
জীবিত থাকিতে পারি । ভূমিষ্ঠ কাল হইতে  
আজীবন আমরা গো দুগ্ধ পান করিয়া জীবিত  
থাকিতে পারি বলিয়াই, গাভীকে আর্ধ্যশ্রম  
কারেরা সপ্ত মাতার মধ্যে স্থান দিয়াছেন ।  
সপ্ত মাতা যথা—“আদৌ মাতা গুরোঃ পত্নী  
ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা । গাভী দ্বাত্রীতথা পৃথু-  
সপ্তৈস্তা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥” জীবন ধারণ ও  
পোষণের পক্ষে মানবের যত কিছু প্রয়োজন  
তাঁহার অধিকাংশই গোমাতা হইতে সংগৃহীত  
হইয়া থাকে । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে  
বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান  
হয়—গোমাতা আমাদের সকল কার্যেরই  
সহায়তাকারিণী । এইজন্তই বিষ্ণুপুরাণে  
উক্ত হইয়াছে—

“গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পি দধিচ রোচণী ।  
যড়ঙ্গ মেতমঙ্গল্যং পবিত্রং সৰ্বদা গবাম্” ॥  
ইতি শুদ্ধিতত্ত্বম্ । গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ,  
ঘৃত, দধি ও গোরোচনা এই ছয়টি মঙ্গল্য ও  
পবিত্রকর দ্রব্য ।

যাত শতের জন্ত কৃষি কার্যে গরুর প্রয়ো-  
জনীয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক । যখনই ঋষিগণ  
মানবের আহারার্থে পঞ্চ শত আবিষ্কার  
করিয়া সমাজে চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন  
তখনই গোমেষ যজ্ঞ নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত  
হইল । সেই সময়ে ভারতে গোরক্ষার বিষয়ে  
বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছিল, বোধ হয় সেজন্তই  
বিধিবদ্ধ শাস্ত্র দ্বারা উদ্বারগামী মানবদিগের

কল্যাণ কামনার গোবধ জনিত প্রায়শ্চিত্ত-  
দির বাধ্যতা মূলক শাস্ত্র প্রণয়ন হয় । যে  
কেহ জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত অপপ্রতিপালন  
জন্ত বা গোবধে লিপ্ত থাকিলে, প্রায়শ্চিত্ত  
হইতে হইবে ।

কৃষিকার্য্য আমাদের দেশে বলীবর্দ ব্যতীত  
হয় না । চাষ করিতে গরুর প্রয়োজন, ক্ষেত্রে  
সার দিতে গোময় প্রধান উপাদান, গোমূত্র  
ক্ষেত্রের কীটনাশক সূত্রাং এদেশে চাষ কার্য্য  
গরুর সাহায্য ব্যতীত হয় না । পঞ্চগব্য  
জরায়ুর কীট নাশক বলিয়া গর্ভাধানের সময়  
যোষিং বর্গের সেবিত । তব্দর্শী ঋষিগণ  
অতি গবেষণায় স্থির করিয়াছিলেন দূষিত  
বায়ু নাশ করিতে গোময়ের তুল্য সহজ  
লভ্য দ্রব্য ভারতে আর নাই । সেই জন্তই  
অতাপি ও হিন্দুর গৃহ প্রাঙ্গনে প্রাণাতিক  
গোময় ছড়া প্রচলিত । আমাদের যাগ যজ্ঞ,  
ব্রত, নিয়ম সকলই গো-সেবায় পরিপুষ্ট ।  
পূর্বকালে পুণ্যতপা ঋষিগণ বিদ্রুত ঘৃতদ্বারা  
যজ্ঞ সম্পাদন ক্রমিতেন বলিয়াই সূকালে  
সুস্বাদি দ্বারা বহুদ্বারা শতপূর্ণ হইতেন ।

সর্ব-লোকাদর্শ পুণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণ বাল্য জীবন  
গো সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তাঁহার  
উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, গো সেবা না হইলে  
চিত্ত সংতুষ্টি হয় না, এবং চিত্ততুষ্টি না হইলে  
দেশের উন্নতিকার্য্যে আত্মনিয়োগ হয় না ।  
বিশ্রুত-কীর্্ত্তি-বিরাট রাজ গোধন প্রতিপালন  
করিয়া ভারতে অক্ষয় কীর্্ত্তি স্থাপন করিয়া  
গিয়াছেন । কন্দর্বীর বিশ্বাসিত গোধনের  
মহীরসী ক্ষমতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গোধন  
আকাজ্ঞারই ক্ষত্র জীবনের উন্নতি সাধন  
করিয়া মহর্ষি হইয়া ছিলেন । দিলীপ প্রভৃতি  
রাজত্ব বর্গ গো সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া

ধৃত হইয়া ছিলেন। ভারতে গো সেবায় পুণ্য আছে বলিয়া আত্মাঙ্গণ সকলেই এই পবিত্র কার্যে আত্মনিয়োগ করিত। প্রাকালে পর-মুখাপেক্ষী হওয়া পাপ মনে করা হইত। সেই জন্তই শাস্ত্রে কথিত আছে “গাবঃ পবিত্রা মঙ্গল্যা দেবানামপি দেবতাঃ। যন্তাঃ শুশ্রূষতে ভক্ত্য স পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে॥” হিন্দুর গো সেবায় পুণ্য আছে পাপ নাই। এপ্রকার পবিত্র কার্যেও সময়ের দোষে এদেশে শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। বড়ই দুঃখের কথা। ভারতের আর সে দিন নাই, এখন গোরক্ষার উচ্চশিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণের দৃষ্টি নাই। তাঁহারা গো-সেবা বা প্রতিপালনের ভার গোপজাতির উপর বিস্তৃত করিয়া প্রগল্ভ স্বাস্থ্যের জন্ত দেশের জল বায়ুর দোষ দিতে ছেন। অনেকেই মুখরোচক, সুখাত, পুষ্টি

কারক ও শরীরের উপযোগী বলিয়া দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীতে বিশেষ প্রীতি রাখেন বটে কিন্তু তাঁহারা একবার ও ভাবিয়া দেখেন না যে, ঐ সকল দ্রব্য অধুনা কি প্রণালীতে সংগৃহীত হইতেছে। যতদিন না আৰ্য্য সন্তানগণ তাহাদের পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিবেন ততদিন কিছুতেই নিশ্চয় দুগ্ধ, দধি, ঘৃতাদি মিলিবেনা। আমাদের গো-সেবা নিত্য কার্যের মধ্যে নির্দিষ্ট করিতে হইবে; তাহা না হইলে দিন দিন আৰ্য্য সন্তানগণ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ ঘৃতাদির অভাবেই ক্ষয়মান হইবে। যে দীনতা ও মলিনতার চ্ছায়ায় আজ ভারত সন্তানগণের মুখপঙ্কজ মলিন, তাহা স্বীয় আচার ভংগ জনিত পাণেই হইয়াছে।

কবিরাজ—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিজ্ঞাবিনোদ।

## চরকোক্ত।

### ত্রয়োদশ প্রকার শ্বেদের বিধান।

সঙ্কর, প্রস্তর, নাড়ী, শ্বেদাবগাহন।  
পরিবেক শ্বেদ আর তথা অখণ্ডন॥  
কষু, কুটী, ভূমি, কুষ্ঠী কৃপ ও হোলাক।  
ত্রয়োদশ বিধ শ্বেদ সহিত জৈন্তাক॥

১

শ্বেত দ্রব্য বস্ত্রেপূরি পুঁচু লী করিয়া।  
উষ্ণকরি, পিণ্ডাকারে অথবা পেয়িয়া॥  
যে সকল শ্বেদ কার্য্য হয় সম্পাদন।  
তাহাকে সঙ্কর শ্বেদ কহে সুধীগণ॥

২

শুক, শালী, প্লাস্কাদি ধাতু সিদ্ধ করি।  
উৎকারিকা, বেশধার, পায়স, থিচরি॥

ঐচ্ছিত প্রস্তুত করি, গরম থাকিতে।  
দেহের প্রমাণ পাত্রে হইবে লেপিতে॥  
তত্পরি পটুবস্ত্র, কঞ্চল পাতিয়া।  
এরও, আকন্দ পত্র কিম্বা বিছাইয়া॥  
তৈলাভ্যক্ত করি রোগী তাতে পোয়াইবে।  
এরূপে প্রস্তর শ্বেদ সমাধা হইবে॥

৩

শ্বেতদ্রব্য-ফল, মূল, পত্র, শুদ্ধা কিবা।  
উষ্ণবীৰ্য্য পঞ্চাদির মাংস শির মিবা॥  
বথায়ুক্ত অন্ন-গুন-ঘৃতাদি সংযোগে।  
কিঞ্চা মুত্র ক্ষীর আদি বিহিত যে রোগে।

হাঁড়ীর মধ্যেতে রাখি মুখ বান্ধি তার ।  
 জ্বলদিবে বাষ্প যেন না সরে তাহার ॥  
 মুখবন্ধ শরাটীর ছিদ্র করি নিবে ।  
 নল বসাইয়া তাতে বাষ্প শ্বেদ দিবে ॥  
 করঞ্জ, আকন্দ, শর, বংশ পত্রে কিবা ।  
 হস্তি শুণ্ড সমস্থল নলটা করিবা ॥  
 এক ব্যাম-চতুর্ভাগ মূলের পরিধি ।  
 অগ্রভাগ অষ্টমাংশ দীর্ঘ তার বিধি ॥  
 নল ছিদ্র বায়ুনাশি-পত্রের দ্বারা হবে ।  
 দুই তিন স্থান তার বন্ধ হয়ে রবে ॥  
 বাতহর দ্রব্য সিদ্ধ তৈল ঘৃত দিয়া ।  
 রোগীর সর্বাঙ্গ নিবে পূর্বেই মাখিয়া ॥  
 নল, বন্ধ হলে বেগ প্রচণ্ড না হবে ।  
 শ্বেদ স্থতকর তায় প্রদাহ না রবে ॥  
 এইরূপ শ্বেদ যাতে হয় সম্পাদন ।  
 নাড়ী শ্বেদ বলি তাকে কহে সুধীগণ ॥

৪

বায়ুনাশি-দ্রব্য-কাথ, ক্ষীর তৈল, ঘৃত ।  
 মাংস রস কিম্বা উষ্ণ জল পরিবৃত্ত ॥  
 টবেতে অবগাহন শ্বেদার্থ করিবে ।  
 অবগাহন শ্বেদ নাম তাহার জানিবে ॥

৫

বায়ুনাশি-উদ্ভিদের ফল মূল দিয়া ।  
 কাথকরি, সুখ উষ্ণ, কলসো পুরিয়া ॥  
 ঘটা বা নলবিশিষ্ট কোন পাত্রে পুরি ।  
 বোগীর শরীরে ধীরে সেচিবে সে বারি ॥  
 সেচনের পূর্বে তার দোষ বিচারিয়া ।  
 উপযুক্ত সিদ্ধ তৈল ঘৃত মাখাইয়া ॥  
 বস্ত্র দ্বারা করিবেক বেহ আচ্ছাদন ।  
 পরিষেক শ্বেদ একে কহে সুধীগণ ॥

৬

যেথ রোগী-শয্যাসম প্রান্তরের ঘণ ।  
 শিলা তাপি কাষ্ঠানলে বায়ু বিনাশন ॥

উত্তপ্ত হইলে তাহা করি নিষ্কাশিত ।  
 উষ্ণ জলে শিলাখানি ধুইয়া স্থরিত ॥  
 তদুপরি কোষের বা মেঘ রোম জাত ।  
 কিম্বা কষলাদি শয্যা করিবে প্রস্তুত ॥  
 ঘৃতাদি অভ্যক্ত করি শোয়াবে তথায় ।  
 ঘনবস্ত্র আবরণ করি তাঁর গায় ॥  
 এরূপ শ্বেদের নাম হয় অশ্বঘন ।  
 অতঃপর কষু শ্বেদ করিব বর্ণন ॥

৭

অভ্যস্তর সুবিস্তীর্ণ সক্ষীর্ণ বদন ।  
 এরূপ গর্ভকে কষু কহে বৃধগণ ॥  
 স্থানের যোগ্যতা বুঝি করে বৈতগণ ।  
 রোগীর শয্যার নিম্নে গর্ভের খনন ॥  
 গর্ভ পুরি ধূম শূন্য অলস্ত অঙ্গারে ।  
 তদুপরি খট্টা দিতে শোয়াইবে তারে ॥  
 এরূপে যে সব শ্বেদ করিবে গ্রহণ ।  
 কষু শ্বেদ নাম তার কহে বৈতগণ ॥

৮

অনতি উচ্চ বিস্তার, গোলাকার হবে ।  
 কুটীরের ঘন ভিত্তি, জানালা না রবে ॥  
 কুড়াদি স্ফগন্ধি দ্রব্য প্রলিপ্ত করিয়া ।  
 তাহাতে বিস্তীর্ণ শয্যা লইবে পাড়িয়া ॥  
 প্রাচার অজিন, কুথ, কোষের, কষল ।  
 শয্যার উপকরণ হবে এ সকল ॥  
 অঙ্গারাদি পূর্ণ হাঁড়ী চতুর্দিকে রবে ।  
 তৈল কিম্বা ঘৃত মাখি রোগী শয্যা লবে ॥  
 শুইগা হুখেতে শ্বেদ করিবে গ্রহণ ।  
 ইহাকেই কুটী শ্বেদ কহে বৃধগণ ॥

৯

অশ্বঘন ভূমি শ্বেদ একই প্রকার ।  
 প্রস্থরের স্থানে ভূমি শুধু ভিন্নতার ॥

১০

বাত্তর দ্রব্যের কাথে কুন্ত পূর্ণ করি ।  
 তদর্ক, ত্রিভাগ কিম্বা ভূমি-মধ্যে তরি ॥

কলদী উপরে, অতি স্থল স্থল নয়।  
 একুণ আসন, শয্যা স্থাপিবে নিশ্চয় ॥  
 পরে লৌহ শিলা খণ্ড উত্তপ্ত করিয়া।  
 লটবে সে কুষ্ঠী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ॥  
 বায়ুনাশি স্নেহা ভাক্ত; বস্ত্র পরাইয়া।  
 কুষ্ঠ বাষ্প স্নেদ দিবে আসনে বসিয়া ॥  
 যেরূপে এ স্নেহে স্নেদ হয় সম্পাদন।  
 কুষ্ঠীবেদ নাম তার কহে সুধীগণ ॥

১১

রোগীর শয্যার সম কূপের বিস্তার।  
 দ্বিগুণ প্রাণাণ হবে গভীর তাহার ॥  
 বায়ু শূন্য স্থান, তার মধ্য স্তম্ভার্জিত।  
 গজাস্ব গন্ধিত উষ্ট্র গোঘূটে পূর্ণিত ॥  
 অগ্নি প্রক্ষালিত করি নিধুম হইলে।  
 অঙ্গার তুলিয়া তথা শয্যা বিস্তারিবে ॥  
 বায়ুনাশি স্নেহ মাখি, বস্ত্র আচ্ছাদিয়া।  
 স্নেহে স্নেদ দিবে রোগী শয্যায় শুইয়া ॥  
 যাহাতে একুণ স্নেদ হয় সম্পাদন।  
 তাহাকেই কূপ-স্নেদ কহে বুধগণ ॥

১২

বৃহৎ পিত্তল পাত্রে রোগী শয্যা সম।  
 গবাদি ঘূটায় দগ্ধ করিয়া উত্তম ॥  
 উত্তপ্ত হইলে উহা, অগ্নি উঠাইয়া।  
 তদুপর শয্যা নিবে রচনা করিয়া ॥  
 স্নেহা ভাক্ত করি রোগী করিবে শয়ন।  
 অবশ্য থাকিবে তার গাত্র আবরণ ॥  
 অক্লেশে এস্নেদ রোগী গ্রহণ করিবে।  
 ইহাকে হোলাক-স্নেদ সকলে কহিবে ॥

১৩

জ্যেষ্ঠাক-স্নেদেতে স্থান পরীক্ষা উচিত।  
 রোগী গৃহ পূর্বোক্তরে হবে তা নিশ্চিত ॥  
 ফল স্থল স্নেহোভিত, তুষাঙ্গার হীন।  
 কৃষ্ণ বা সুবর্ণ বর্ণ মাটি তদধীন ॥  
 নদী দীঘি পুষ্করিণী জলাশয় কূলে।  
 ঘাটের সমীপে স্থান হবে সমতলে ॥  
 সাত্ত্বিক আট হাত দূরেতে তাহার।  
 পূর্ব বা উত্তর দ্বারী হবে কূটাগার ॥  
 উচ্চতা বিস্তার তার ষোল হাত হবে।  
 মুক্তিকায় লিপ্ত গৃহ গোলাকার হবে ॥  
 উহাতে অনেকগুলি জানালা রাখিবে।  
 অভ্যন্তরে চারিদিকে পিত্তিকা গড়িবে ॥

এক হস্ত পরিসর উচ্চতা তাহার।  
 কপাটের ধারে শুধু বাদ রবে তার ॥  
 মধ্যস্থলে চারিচক্র প্রশস্ত অপর।  
 সাতচক্র; স্তম্ভাঙ্কিত রবে বহুতর ॥  
 কন্দুর সদৃশ এক উন্নত করিবে।  
 হৃদয় চাকিতে এক চাকনা গড়িবে ॥  
 উন্নত পদির কাষ্ঠ, অশ্বকর্ণ কিবা।  
 পবিত্র কাষ্ঠাদি পূরি অগ্নিমালা দিবা ॥  
 যখন দেখিবে তাহা ধূমহীন আর,  
 অগ্ন্যুত্তপ্ত স্নেদ যোগ্য উত্তাপ তাহার ॥  
 তখন বায়ু বিনাশি-স্নেহ মাখি গায়।  
 বস্ত্র আঁবরিয়া রোগী পাঠাবে তথায় ॥  
 প্রবেশের কালে তারে উপদেশ দিবে।  
 “কল্যান আরোগ্য জন্ম এগৃহে পশিবে ॥  
 গৃহেব বেদীর পরে করি আরোহণ।  
 যে পার্শ্বে লভিবে স্থখ করিবে শয়ন ॥  
 ঘর্ষ হয়, মুর্ছাহয় জীবন্ত কখন।  
 বেদীছাড়ি ধারে নাহি কর আগমন ॥  
 তথায় আসিলে ঘর্ষ মুর্ছাদি হইয়া।  
 সত্ত্বঃপ্রাণ হারাইবে রাখিও জানিয়া ॥  
 যখন বুঝিবে কক্ষ বিগত তোমার।  
 ঘর্ষশ্রাবকৃদ্ধ-শ্রোত বিমুক্ত আবার; ॥  
 দেহলবু; বিরুদ্ধতা, জড়তা, স্তম্ভিতাব।  
 বেদনা ও ভারবোধ হবে তিরোভাব।  
 তখন করিবা তুমি বেত্তমুদ্রণ।  
 দ্বারদেশে করিবেক শুভ আগমন ॥  
 বেদীছাড়ি দ্বারদেশে যখন আসিবে।  
 সহসা শীতল জল নেহে নাহি দিবে ॥  
 মুহূর্ত্ত বিশ্রাম পরে সন্তাপ জনিত।  
 শ্রম অপগত বোধ হলে স্নানচিত্ত ॥  
 স্নেহোষ্য জলেতে স্নান; আহার করিবে।  
 ইহাকে জ্যেষ্ঠাক-স্নেদ সকলে কহিবে ॥

কবিরাজ

শ্রীরাসবিহারি রায় কবিকঙ্কণ।

# রোগবিনিশ্চয়।

জ্বর

জ্বরোৎপত্তির কারণ।

নিম্নলিখিত কারণে মনুষ্যের জ্বর রোগ উৎপন্ন হয়—

মিথ্যা আহার, মিথ্যা বিহার, মিথ্যা প্রযুক্ত রসায়ণ, মিথ্যায়ুক্ত বা অতিযুক্ত স্নেহাদি কৰ্ম অর্থাৎ স্নেহ—স্বৈদ—বমন—বিরেচনের ও বস্তির অভিযোগ বা মিথ্যায়োগ, বিবিধ অভিঘাত, রোগ বিপর্যয়, ত্রণাদির পাক, অতিশ্রম, ক্ষয়, অজীর্ণদৌষ, বিষভোজন, সান্ধ্যবিপর্যয়, ঋতু-বিপর্যয়, বিষবৃক্ষের পুষ্পগন্ধাচ্ছাণ, শোক, নক্ষত্র ও জ্বর গ্রহপীড়া, অভিতার, অভিষাপ, কামাদি অভিসঙ্গ, ভূতাদিসঙ্গ; (দ্বীপক্ষে)—প্রসবের অনিয়ম, প্রসবান্তে অহিত সেবা, স্তন্যবিতরণ, স্তনজ্বরের দৌষ (শিশু পক্ষে)।

মিথ্যা আহার।

আহার আবার মিথ্যা সত্য কি? আহারের উদ্দেশ্য শরীররক্ষা, কেবল চর্কণ ও গলাধঃকরণ করিলেই আহারের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। ভুক্ত বস্তু যদি পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শরীর ধারণ ও পোষণের অক্ষুণ্ণ হয় তবেই তাহাকে যথার্থ আহার বলিব। যে আহার দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না তাহাকে মিথ্যা আহার বলে। আটটি বিষয় বিবেচনা না করিয়া আহার করিলে আহার মিথ্যা হইয়া থাকে। সেই আটটি বিষয় যথা—(১) প্রকৃতি (২) করণ (৩) সংযোগ (৪) রাশি (৫) দেশ (৬) কাল (৭) উপযোগ-সংস্থা (৮) উপযুক্ত।

(১) প্রকৃতি শব্দের অর্থ স্বভাব। খাদ্যের স্বাভাবিক গুণকে প্রকৃতি বলে। মাষকলায়ের গুরুত্ব মুগকলায়ের লঘুত্ব, মাষ ও মুগের প্রকৃতি। এইরূপ সকল খাদ্য দ্রব্যেরই এক বা বহু স্বাভাবিক গুণ আছে। শরীরের অবস্থানুসারে এই সকল গুণ বিবেচনা করিয়া আহার কথিত হয়—না করিলে আহারের মিথ্যায়োগ অর্থাৎ সে আহার শরীরের পক্ষে হিতকর হয় না। সুতরাং রোগের কারণ হইয়া থাকে।

৬—আয়ুর্বেদ, চৈত্র।

(২) করণ—ঔষধিক দ্রব্যের সংস্কারের নাম করণ। সংস্কার দ্বারা দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে। এই সংস্কার আটপ্রকারে সাধিত হইয়া থাকে যথা—জল, অগ্নি, শোথন, মন্থন, দেশ, বাসন, ভাবনা ও পাত্র \*।

(৩) সংযোগ—দুই বা বহু বস্তুর মিশ্রীভাবকে সংযোগ বলে। সংযোগের পূর্বে সেই সেই বস্তুতে যে গুণ ছিল না সংযোগের পর তাহাতে এমন অনেক অপূর্ণগুণেরও আবির্ভাব হয়। মধু ও ঘূতের মধ্যে কোনটাই মারক নহে কিন্তু মধু ঘূত তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত হইলে মারক হয়। মধু, মাংস, হৃৎ তিনটির কোনটাই কুষ্ঠকারি নহে কিন্তু হৃৎ, মধু মংস্তের মিলন কুষ্ঠকারি।

(৪) রাশি—দ্রব্যের মাত্রাকে রাশি বলে। রাশি দুইপ্রকার সর্বগ্রহ রাশি ও পরিগ্রহ রাশি। ভাত, দাল, ব্যঞ্জন, হৃৎ মিলিত হইয়া যে পরিমাণ হয় তাহাতে সর্বগ্রহ রাশি এবং এত ভাত, এত দাল, এত ব্যঞ্জন. এত হৃৎ প্রভৃতি প্রত্যেকের প্রমাণকে পরিগ্রহ রাশি বলে। এই দ্বিবিধ রাশি অর্থাৎ আহার পরিমাণের উপরি আহারের মিথ্যাত্ব অমিথ্যাত্ব নির্ভর করে।

(৫) দেশ—দেশ শব্দে খাদ্য দ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচার স্থান এবং ভোজন কর্তার অবস্থিতি স্থান বৃত্তিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যের উৎপত্তি স্থানভেদে গুণান্তরের উদাহরণ—শীতপ্রদেশে জাত দ্রব্য শুষ্ক এবং মরুদেশ জাত দ্রব্য লঘু হইয়া থাকে। দ্রব্যের প্রচার স্থান বিশেষেও

\* জলদ্বারা সংস্কারে দ্রব্যের গুণান্তর হয় যথা—শুষ্ক কলায় ও ভিজান কলায়, চিনি ও চিনির সরবৎ। অগ্নিদ্বারা সংস্কারে গুণান্তর যথা—কাঁচা ও ভাজা কলায়। অগ্নির স্বরূপ ভেদেও গুণান্তর হয় যেমন কংলায়, কাঠের, ঘুঁটের ও তেলের আলো পাক করা হইলে একই বস্তুর গুণান্তর হয়। পোখন দ্বারা গুণান্তরের উদাহরণ আমরা সকলেই জানি। তুলুসি শোথন অর্থাৎ খোঁচ করিয়া ব্যবহার না করিলে বিবিধ উৎকট রোগ জন্মিয়া থাকে। মন্থন মওয়া একটি সংস্কার। ইহার দ্বারাও দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে। দধি শোধনকারি কিন্তু মথিত দধির মদী না তুলিলেও ইহা শোধনাপন্ন হইয়া থাকে। দেশ অর্থাৎ স্থানভেদে দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে একজন্ম দেশকেও সংস্কারের অন্তর্গত করা হইয়াছে। উষ্ণজল, বায়ু-প্রবাহ-বর্জিত স্থানে রাখিয়া শীতল করিলে যে গুণ হয়, প্রাতঃস্থানে রাখিয়া শীতল করিলে তাদৃশ গুণ হয় না। গাছপাকা ফলের যে গুণ, ফল পাড়িয়া পাত্রাবদ্ধ করিয়া পাকাটলে, এত জাঁকান পাকা ফলের গুণ তাদৃশ হইবে না। অনেক গুণের ভস্মরাশি বা ধাতুরাশিতে রাখিবার উপদেশ আছে। বাসন—সংস্কার দ্বারা দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে বাসন শব্দের অর্থ গন্ধাদিবাসন অর্থাৎ কোন হৃগন্ধি বস্তুর সংসর্গে কোন দ্রব্যকে হৃগন্ধি করা। আমরা যে ভরকারিতে মসলা কি গরম মসলা দিয়া থাকি তাহাও একপ্রকার বাসন সংস্কার মাত্র। জল, গোলাপ ফুলের সহিত বাসন-সংস্কারে গোলাপ জলে পরিণত হইয়া থাকে। তিল, পুশ্প সহ অধিগমিত হইলে সেই তিলজ তৈল ফুলে তৈল হয়। বলা বাহুল্য জল ও গোলাপ জলের তিল তৈল ও ফুলে তৈলের গুণ কবাপি এক নহে। ভাবনা সংস্কারের অর্থ এই যে, কোন বস্তুকে কোন রস বা কাণ দ্বারা আকর্ষিত করিয়া রোজে শুষ্ক করা। আমলকী কোন বস্তুর রসে আকর্ষিত করিয়া রোজে শুষ্ক করিলে অবশ্যই আমলকীর গুণান্তর হইবে। কালপ্রকর্ষ আর এক সংস্কার—কালপ্রকর্ষ অর্থাৎ পূরণ হইলে অনেক দ্রব্যেরই গুণান্তর হইয়া থাকে। আমরা সকলেই জানি মৃতন ও পূরণ চাল, ঘৃত, ভট প্রভৃতির গুণে অনেক তফাৎ। পাত্র বিশেষেও দ্রব্যের গুণান্তর হয়। শাখে রোপ্য, বর্ণ, ভাস্কর্যাদি পাত্র ভোজননের গুণ পৃথক পৃথক লিখিত হইয়াছে। কুম্মাওপণ্ডে ভাস্কর্য পাত্র এবং ত্রিকত্রয়দি-লৌহ লৌহপাত্রে পাক ও সূর্দন করিবার উপদেশ আছে।



ওগাস্তর হয় যথা যে প্রাণী জলাশয় ভূমিতে বিচরণ করে কিম্বা গুরু শ্রম্য ভোজন করে তাহার মাংস গুরু এবং যে প্রাণী মরুদেশে বাস করে এবং লঘু বস্তু ভোজন করে তাহার মাংস লঘু হইয়া থাকে। আমরা সকলেই জানি কোন কোন ফল শস্য স্থান বিশেষে যেমন উপাদেয় হয় অল্প তেমন হয় না। দেশ সংস্কার প্রকৃতিতে দেশ সাত্ব্যও বিচার করিতে হইবে। রাজপুতনার মরুপ্রায় দেশে শীত পানীয় ও মেহ বহুল বস্তু ভোজন হিতকর কিন্তু হিমগিরি এক্ষত্রে প্রদেশে ঐ সকল দ্রব্য কদাপি হিতকর হইতে পারেনা;—কিন্তু রুক্ষ ও উষ্ণ বস্তু হিতকর হইবে।

(৬) কাল—কালানুসারে বিবেচনা করিয়া ভোজন না করিলে আহার হিতকর হয় না। যাহা বালকের পক্ষে হিতকর, যুবকের পক্ষে তাহা হিতকর না হইতে পারে; যুবকের পক্ষে যাহা হিতকর বৃদ্ধের পক্ষে তাহাই যে হিতকর হইবে বলা যায় না। তারপর সুস্থ বালকের পক্ষে যাহা হিতকর, কিংবা শ্লেষ্ম প্রকৃতির বালকের পক্ষে যাহা হিতকর, রুগ্ন বা পিত্তপ্রকৃতির পক্ষে তাহা হিতকর হইবেনা। গ্রীষ্মে যাহা হিতকর, শীতে তাহা হিতকর নহে। অসময়ে ভোজন বিবিধ পীড়ার কারণ, অতএব কালবিবেচনা পূর্বক আহার গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক, অন্তথা আহারের মিথ্যাযোগ ঘটয়া থাকে।

(৭) উপযোগসংস্থা—ভোজনের বিধিকে উপযোগসংস্থা বলে। যেমন—ভুক্ত খাদ্য জীর্ণ হইলে পুনর্বার ভোজন করিবে, পবিত্র স্থানে হস্ত, পদ, মুখ প্রক্ষালন করিয়া ভোজন করিবে, নিবিষ্ট চিন্তে ভোজন করিবে ইত্যাদি।

(৮) উপবোক্তা—ভোজন কর্ত্তা স্বীয় প্রকৃতি ও অভ্যাসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিবে। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে মিথ্যা আহার জন্ম পীড়া জন্মিতে পারে। আমি নিরামিষ ভোজন করিতে অভ্যস্ত, কি আমি একবার আহার করিতে অভ্যস্ত, আমি যদি মাংস ভোজন বা দুইবার আহার করি তাহা হইলে আমার পীড়া জন্মিতে পারে। দিবানিত্রা নিবিদ্ধ কিন্তু বাহার দিবানিত্রা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে দিবানিত্রা হঠাৎ পরিত্যাগ বিধেয় নহে। যে আহার বিহার অহিতকর হইলেও অভ্যাস গুণে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে হিতকর হইয়া পড়িয়াছে সেই আহার বিহারকে ওকসাত্ব্য বলে।

### মিথ্যা বিহার ।

শ্রান, নিদ্রা, জাগরণ, ভ্রমণ, ক্রীড়া, মৈথুন প্রভৃতিকে বিহার বলে। এই শ্রান, নিদ্রাদি ক্রিপণ ভাবে আচরণ করিলে স্বাস্থ্যের বা রোগারোগ্যের পক্ষে হিতকর হয় শাস্ত্রকার তাহা বলিয়া দিয়াছেন, কিম্বা ব্যক্তিবিশেষের এসকল বিষয়ে বিশেষ বিশেষ অভ্যাস আছে। শাস্ত্র নিষিদ্ধসময়ে কিম্বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও যাহা ব্যক্তিবিশেষের অভ্যাস গুণে সঙ্গ পাইয়াছে উপলক্ষ্যে, স্বামাদির অহুষ্ঠান না করিলেই মিথ্যা বিহার বলিয়া কথিত হয়। যখন হিতকর বটে কিন্তু দীর্ঘকাল জলে থাকিয়া শ্রান কিম্বা শ্রুতুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া শ্রান (যেমন শীত কালে অতিশীতল জলে শ্রান কিম্বা গ্রীষ্মে অত্যুষ্ণ জলে শ্রান) রোগের কারণ। বিধিত নিদ্রা

স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে হিতকর কিন্তু অতিনিদ্রা—বা অনিদ্রা মিথ্যা বিহার, ইহা বিবিধ রোগের কারণ। জাগরণ—ব্রাহ্মমূর্ত্ত্তে শয্যা ত্যাগের উপদেশ আছে—ইহার বিপরীত আচরণ করিলে মিথ্যাবিহার হয়। পরিমিত ব্যায়াম শরীর রক্ষার জন্ত নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু অতিব্যায়াম মিথ্যাবিহার। দুঃসাহস পূর্ব্বক কোন আয়াস জনক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়াকেও মিথ্যাবিহার বলে। যে ২০ সের বস্ত্র তুলিতে পারে না সে যদি আড়াই মৌণ ভার উঠাইতে চেষ্টা করে কিম্বা যদি কেহ ধাবমান অথ মহিষাদির বেগরোধ করিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে তাহার মিথ্যা বিহারের অনুষ্ঠান করা হয়—এইরূপ মিথ্যা বিহারকে “অযথা বলারস্ত” বলে। \*

### মিথ্যাপ্রযুক্ত রসায়ন।

যে ঔষধ শরীরের মালিখ দূর করিয়া, আরোগ্য, বীৰ্য্য, কান্তি মেধা ও সুদীর্ঘ আয়ু দান করে। বাহ্য অকাল জরা হইলে দূরে রাখে সেই ঔষধকে রসায়ন বলে। রসায়ন, যাহাকে তাহাকে যখন তখন প্রয়োগ করা যায় না—শাস্ত্রে রসায়ন প্রয়োগের কতকগুলি বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। চরক সংহিতার চিকিৎসা স্থানের প্রথম অধ্যায়ে রসায়ন বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। এই নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া রসায়ন যোগ সেবন করিলে মিথ্যা প্রযুক্ত রসায়ন জন্ত অন্ন হয়। \*

### মিথ্যায়ুক্ত বা অতিযুক্ত স্নেহাদিকৰ্ম্ম।

স্নেহাদি কৰ্ম্ম শব্দে স্নেহপান, স্নেহ, বমন, বিরেচন ও বস্তি এই পঞ্চকৰ্ম্ম বুঝিতে হইবে। মিথ্যায়ুক্ত শব্দের অর্থ অযোগযুক্ত, কেননা স্নেহপানাদির মিথ্যাযোগ সম্ভব নহে। স্নেহপান প্রভৃতি উপরি লিখিত পঞ্চকৰ্ম্মের সম্যক্‌যোগ, অতিযোগ এবং অযোগ, শাস্ত্রকারেরা এই ত্রিবিধ যোগের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চকৰ্ম্ম ঠিক প্রযুক্ত হইয়া কার্যকারী হইলে সম্যক্‌যোগ, বমনাদির অত্যন্ত প্রবৃত্তি হইলে অতিযোগ এবং যদি প্রতিলোমভাবে ও অল্পমাত্রায় প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ যদি বমন করাইতে গিয়া বিরেচন কিংবা অল্পবমন কিম্বা বিরেচন করাইতে গিয়া বমন বা অল্পবিরেচন হয় তাহা হইলে অযোগ বলে। পঞ্চকৰ্ম্মের মধ্যে স্নেহপান ও বস্তির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আবশ্যক। বিশেষ ফল লাভের জন্ত ব্যক্তিবিশেষকে ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা বিধি-পূর্ব্বক পান করান হইয়া থাকে ইহারই নাম স্নেহপান। কোন কালে, কোন লোককে, কত মাত্রায় কতদিন ঐ ঘৃতাদি পান করাইতে হইবে ইহার বিশেষ বিবরণ আয়ুর্বেদের স্নেহাদি-কারে বিবৃত হইয়াছে। বস্তি শব্দের অর্থ পিচকারী দ্বারা গুদমার্গ দিয়া কাথ বা স্নেহযুক্ত কাথ প্রবেশ করান। কেবল কাথ দ্বারা প্রদত্ত বস্তির নাম “নিরুহ বস্তি” এবং স্নেহাশ্রিত কাথাদি দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে “অমুহাসন বস্তি” বলে।

শস্ত্র, গোষ্ঠ, কশা (চাবুক), কাষ্ঠ, মুষ্টি, নখ, দন্ত ও পতনাদি হইতে প্রাপ্ত আঘাতকে অভিঘাত বলে।

\* কোন সংগ্রহ পুস্তকে দেখাছিল আমলকীচূর্ণ আমলকীর রসে ৭টা ভাবনা দিয়া সেবন করিলে রসায়নের কার্য করে। এই দেখিয়া একজন মহলোক উহা প্রস্তুত করিয়া সেবন করে এবং সেবনের প্রথম দিনেই যোৱন্ত অন্নরোগে পীড়িত হয়। আমি চিকিৎসার্থ আহুত হইয়া রোগের বিবরণ শুনিয়া উপবাস ব্যবস্থা করিলে—যদি নিমুষ্টি পাইয়াছিল। এইরূপ বহু উদাহরণ আছে।

### সান্ন্যাসবিপর্যয়—ঋতুবিপর্যয় ।

সান্ন্যাস শব্দের অর্থ বাহা অভ্যস্ত স্তবরাং অপথ্য হইলেও বা অধিক মাত্রায় সেবন করিলেও অহিতকারী হয় না। সান্ন্যাস ছয় প্রকার জাতি সান্ন্যাস, প্রকৃতি-সান্ন্যাস, ঋতুসান্ন্যাস, ওকসান্ন্যাস দেশসান্ন্যাস, আময়-সান্ন্যাস। যে জাতির লোকের যে বস্তু সান্ন্যাস তাহাকে জাতিসান্ন্যাস বলে যেমন ইংরাজের মাংস, বাঙ্গালীর অন্ন ও দুগ্ধ। চরকের চিকিৎসাস্থানের ৩০ অধ্যায়ের শেষে ভারতীয় কোন কোন জাতির কিকি সান্ন্যাস ছিল তাহার উল্লেখ আছে। প্রকৃতি-সান্ন্যাস—লোকে চলিতকথায় বাহাকে “ধাতু” বলে (যেমন বায়ুর ধাতু পিত্তের ধাতু কফের ধাতু) তাহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি অনুসারে বাহার বাহা সান্ন্যাস তাহাকে প্রকৃতি সান্ন্যাস বলে যেমন বায়ু প্রকৃতির স্বাদু, অন্ন ও লবণরস সান্ন্যাস, কফ প্রকৃতির কটু, তিক্ত, কষায় রস সান্ন্যাস। এই সান্ন্যাসের বিপর্যয় হইলে অর্থাৎ কফপ্রকৃতির লোক যদি হঠাৎ অধিক পরিমাণে স্বাদু ও অম্লরস কিম্বা বাত প্রকৃতি কটু, তিক্তরস ভোজন করে তাহা হইলে সান্ন্যাসবিপর্যয়-হেতু উহাদের জ্বর বা অতিসার হইতে পারে। ঋতুসান্ন্যাস—যে ঋতুতে যে দ্রব্য ভোজন বা যেরূপ আচার বিহার হিতকর ঋতুচর্যাধায়ে তৎসমুদায়ের উল্লেখ আছে। যদি এই ঋতু-সান্ন্যাসের বিপর্যয় ঘটে তাহা হইলে জ্বর বা অতিসার হইতে পারে। যেমন গ্রীষ্মঋতুতে স্বাদু, শীতল নিষ্ক বস্তু হিতকর ইহার পরিবর্তে যদি কেহ কটু তিক্ত রসক বস্তু ভোজন করে তাহা হইলে ঋতুসান্ন্যাস-বিপর্যয়হেতু তাহার জ্বরাদি রোগ হইতে পারে। এইরূপ অন্যান্য ঋতুতেও ব্যাখ্যা করিবে। দেশসান্ন্যাস—দেশ তিন প্রকার জঙ্গল, আনুপ ও সাধারণ। এই তিন প্রকার দেশের জল, বায়ু ভূমি বিভিন্ন গুণাক্রান্ত হওয়ায়, দেশ ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত হইয়া থাকে। দেশ যে গুণাক্রান্ত হইবে তাহার বিপরীত গুণ সেই দেশের পক্ষে সান্ন্যাস হইবে। মেঘ ও গৌবব আনুপদেশের গুণ স্তবরাং ইহার বিপরীত রোক্ষ ও লাঞ্চ আনুপদেশ সান্ন্যাস বৃষ্টিতে হইবে। মোগোপশনকারী আহার বিহারকে আময় সান্ন্যাস বলে। স্তব্রাবতরণ শব্দের অর্থে প্রসবের পর স্তনে প্রথম “দুধনামা” ইহার জন্ত যে জ্বর হয় লোকে সেই জ্বরকে “দুধনামাজ্বর” বলে। জ্বর নির্দানের অপর দুই শব্দের অর্থ যথাস্থানে কথিত হইবে।

উগরি লিখিত কারণে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কৃক পৃথক্ ভাবে, সংসৃষ্ট ভাবে অর্থাৎ দুইটি দুইটি মিলিয়া ( বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা ) কিম্বা সম্মিশ্রিত হইয়া অর্থাৎ তিনটি একত্র মিলিয়া রসাম্লগত হইয়া থাকে। অনন্তর রসাম্লগত দোষ আশ্রয় হইতে জাঠরান্নিকে ( তেজোরাপ পাচক পিত্ত ) বহির্নিষ্কিপ্ত করিয়া এই জাঠরান্নির উদ্বার সহিত দোষের মিজের উদ্বার মিলিত হইয়া, দেহের উদ্বার বলবৃদ্ধি করিয়া, প্রকুপিত দোষ সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং বর্ষবাহি স্রোতঃ সকল রুদ্ধ করে। ইহার ফলে দেহে অধিক সম্ভ্রাপ জন্মিয়া থাকে সর্বাঙ্গ অভ্যস্ত উষ্ণ হয় তখন জ্বর হইয়াছে বলি। তৎকাল জ্বরে আমি নিজস্থান হইতে প্রস্থত এবং স্রোতঃসকল রুদ্ধ হয় বলিয়া সব জ্বরে প্রায় বর্ষ হয় না।

### জ্বরের বিভাগ ।

সমস্ত জ্বরেই সম্ভ্রাপ থাকে স্তবরাং সম্ভ্রাপ লক্ষণ লইয়া বিচার করিলে জ্বর এক প্রকার

বলিতে হয়। নিজ ও আগন্তু ভেদে জ্বর দুই প্রকার। কারণ ভেদে নিজ জ্বর সাত প্রকার যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতশ্লেষজ, বাতপিত্তজ পিত্তশ্লেষজ ও ত্রিদোষজ। আগন্তুজ্বর এক প্রকার সকল আগন্তু জ্বরই ব্যাথাপূর্বক হইয়া থাকে অর্থাৎ কোন না কোন রূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে হয়। এই আগন্তুজ্বর আবার কারণ ভেদে চারি প্রকার যথা—অভিঘাতজ, অভিশ্লজ, অভিচারজ ও অভিণাপজ। দোষের বলবত্ত্ব এবং দুর্বলত্ব কালের বলবত্ত্ব এবং দুর্বলত্বহেতু জ্বর আবার পাঁচ প্রকার যথা সমস্ত, সতত অন্তেদ্রাঃক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক। আশ্রয়ীভূত ধাতু ভেদে জ্বর সাত প্রকার যথা রসগতজ্বর, রক্তগতজ্বর, মাংসগত জ্বর, মেদোগত-জ্বর, অস্থিগতজ্বর, মজ্জাগতজ্বর ও শুক্রগতজ্বর। অন্তর্বেগ ও বহির্বেগভেদে জ্বর দুই প্রকার। ইহা ভিন্ন প্রাকৃত, বৈকৃত, সাধ্যা, অসাধ্যা, সাম, নিষাম, শারীর, মানস সৌম্য, আগ্নেয়ভেদে জ্বরের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল জ্বরের বিবরণ যথা স্থানে কথিত হইবে।

জ্বরের প্রধান লক্ষণ—দেহ ও মনের সস্তাপ। দেহের সস্তাপ বলিলে কেবল শরীরের উত্তাপ বুঝায় না উহার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের বিকলতাও বুঝায়। ইন্দ্রিয়ের বিকলতা অর্থে যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য তদ্বিষয়ে তাহার অথুখাচার বুঝায়। মনের সস্তাপার্থে চিত্তের বিকলতা—‘কিছু ভাল লাগেনা’ ভাব এবং মানি বুঝায়।

### সর্বজ্বরের সামান্য পূর্বরূপ।

জ্বর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইবার পূর্বে, রোগীর গাত্র সম্পূর্ণরূপ উষ্ণ হইবার পূর্বে সর্ব-জ্বরেই যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় সেইগুলিকে জ্বরের সাধারণ পূর্বরূপ বলে। নিম্ন লিখিত সমস্ত পূর্বরূপ লক্ষণ প্রায় কাহারও প্রকাশ পায় না দুই চারিটা দেখা যায় মাত্র। যদি কাহারও নিম্নোক্ত সমস্ত পূর্বরূপ প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহার সেই জ্বর অসাধ্য বলিয়া জানিবে। সর্বজ্বরের সাধারণ পূর্বরূপ যথা—পরিশ্রম না করিলেও শ্রান্তি বোধ করা, “কিছুই ভাল লাগেনা” মনের এইরূপ ভাব, বিবর্ণতা, মুখের বিকৃত স্বাদ, চোখ ছলছল করা, চোখে জল আসা, কখন ছায়া কখন বা রৌদ্র ভাল লাগে, কখন বাতাস ভাল লাগে, কখন বা নির্বাত স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হয়, হাই উঠা, গা ভাঙ্গা, দেহভার, বোমাঞ্চ, আহারে অনিচ্ছা, অন্ধ-কার দেখা, বিষন্নতা ও শীতবোধ অধিক নিদ্রা বা জাগরণ, কম্প, ভ্রম, দাঁত শিড় শিড় করা কোন শব্দ এমন কি গান পর্যন্ত ভাল লাগে না, অঙ্গের অবিপাক, দুর্বলতা, অধিক পিপাসা, পিণ্ডিকোষেটন (পায়ের ডিমে কামড়ান) আলস্য (শক্তি থাকিতে কার্য্যে অমুৎসাহ) দীর্ঘসূত্রতা, কাজে স্মৃতি না থাকা।

### জ্বরের বিশেষ পূর্বরূপ।

উপরি লিখিত লক্ষণের কতকগুলি বা কোনটা প্রকাশ পাইলে আমরা বুঝিতে পারি যে জ্বর হইবে, কিন্তু কি জ্বর হইবে জানিতে পারি না এইজন্য ঐ লক্ষণগুলিকে জ্বরের সামান্য পূর্বরূপ বলে। কিন্তু এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে যেগুলি প্রকাশ পাইলে কি জ্বর অর্থাৎ বাতিক পৈত্তিক কি শ্লেষিক জ্বর হইবে তাহা বলা যায়। এই বিশেষ লক্ষণগুলিকে জ্বরের বিশেষ পূর্বরূপ বলে। সামান্য পূর্বরূপের কোনটা বা কতকগুলির সহিত

যদি অধিক হাই উঠিতে থাকে তাহা হইলে বাতজ্বর, যদি অধিক চক্ষুজ্বালা করে তাহা হইলে পিত্তজ্বর, যদি আহারের প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ পায় তাহা হইলে কফজ্বর হইবে জানা যায়। যদি হাই উঠাও চক্ষুজ্বালা থাকে তাহা হইলে বাতপিত্তজ্বর, যদি আহারে বিশেষ অনিচ্ছা ও চক্ষুজ্বালা থাকে তাহা হইলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং যদি হাই উঠা ও আহারে অনিচ্ছা থাকে তাহা হইলে বাতশ্লেষ্মজ্বর হইবে। আর যদি তিনটাই থাকে তাহা হইলে ত্রিদোষজ্বর হইবে।

### বাতজ্বরের নিদান ও লক্ষণ ।

অতিরিক্ত শ্রম, মূলমূত্রের বেগ ধারণ, অতিশয় শ্রম, মানসিক উত্তেজ, শোক, রক্ত-শ্রাব, আগবণ, বিষমশরীরজ্ঞান অর্থাৎ উচ্চনীচস্থানে শয়ন কিম্বা পা উচ্চ ও মাথা নীচ ভাবে, রাখিয়া শয়ন, বাতজ্বরের কারণ ।

কম্প, জ্বরের বেগ কখন অল্প কখনও বেশী, গলা ও ঠোঁট শুষ্ক হওয়া, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, রক্ত চোখা, মাথা বুক ও গায়ে বেদনা, মুখের বিকৃতাঙ্গাদ, মলের কাঠিষ্ঠ, পেটে বেদনা পায়ে স্নিগ্ধতা লাগা, পিণ্ডিকোবেটন, সন্ধির ঘোড় যেন খুলিয়া গিয়াছে বোধ করা, উরু-দেশের অবসন্নতা, চুয়াল চাপিয়া ধর, কাণে শব্দ, কপাল বেদনা, মুখের কষায় আঙ্গাদ, পিপাসা কাঠিউকি, শুষ্ক কাশি, ঢেঁকুর না উঠা, অবিপাক, ভ্রম, প্রলাপ, রোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, পেটফাঁপা হাইউঠা ও উষ্ণাভিপ্রায়তা অর্থাৎ গরম ভাল লাগা, বাতজ্বরের লক্ষণ। বাতজ্বর আদিবার ও বাড়িবার সময়—ভুক্তবস্ত্র জীর্ণ হইবার পর, দিনের শেষ ও বর্ষাকাল ।

### পিত্তজ্বরের নিদান ও লক্ষণ ।

কষ্ট, লবণ, অন্ন, ক্ষার অতিভোজন, অজীর্ণে ভোজন, তীব্র রোদ্র তাপ, অগ্নি সন্তাপ, অতিমাত্রায়, অন্নমাত্রায় কিম্বা অসময়ে ভোজন ও অতিশ্রম পিত্তজ্বরের বিশেষ কারণ। জ্বরের বেগ প্রবল, তরল দান্ত, অন্ন নিদ্রা, বমন, কোন অঙ্গে ফোড়া হইবার সময় যেমন বেদনা হয় রোগীর কঠে, ওঠে, নাকে ও মুখে সেইরূপ বেদনা, ঘর্ষ নির্গম, অসম্বন্ধ বাক্য, মুখ তিস্ত, মুর্ছা, গাত্রদাহ, মদ ( অন্নভাবে মুর্ছা ) তৃষ্ণা, ভ্রম ( গা বোরা ), মল, মুত্র ও চক্ষুর বর্ণ শীত হইয়া থাকে। অপিচ রোগী শীতল আহার আচরণ ভালবাসে, খুঁখু সহিত বস্ত্র বাহির হয়, গায়ে লালবর্ণ বোলতা কাষড়ানর দাগের মত চিহ্ন প্রকাশ পায়, নিঃখাসের বিকৃতি গন্ধ ও ভুক্ত বস্ত্র অন্নপাক—পিত্তজ্বরের লক্ষণ।

### কফজ্বরের নিদান ও লক্ষণ ।

অধিক পরিমাণে ঘৃত, তৈলাদিযুক্ত বস্ত্র কিংবা গুড়, মধুর পিচ্ছিল, শীত ( ঠাণ্ডা ) অন্ন ও লবণ রস সেবন ও পরিশ্রম না করা কফজ্বরের বিশেষ কারণ।

রোগী মনে করে গায়ে যেন ভিজা কাপড় জড়ান আছে, জ্বরের মৃদুবেগ, কাজ করিবার শক্তি আছে কিন্তু উৎসাহ নাই, মুখের মিষ্ট আঙ্গাদ, প্রস্রাব জলের মত শাদা, মল শাদা রঙের, গায়ের জড়তা, কিছু না খাইলেও রোগী মনে করে যেন কত খাইয়াছি, সর্বাঙ্গ বিশেষতঃ শাখ

ও কোমল ভাব, শীত বোধ, বমি বমিভাব, রোমাঞ্চ ( গা কাঁটা দেওয়া )। ঘুম খুব বেশী, নাক হইতে জলের মত স্লেয়া-স্রাব, কাসি, মুখে জল উঠা, আহাবে অনিচ্ছা, চক্ষুব রক্ত-শাদা, এট গুলি কফজ্বরের লক্ষণ।

### দ্বন্দ্ব জ্বর।

দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ দুই—দুইটা দোষ কর্তৃক ( যেমন বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্ম, বাতশ্লেষ্ম ) আরক্ত জ্বরকে দ্বন্দ্ব জ্বর বলে। এখন সন্দেহ হইতে পারে যে, বাত, পিত্ত ও কফ জ্বরের লক্ষণ বলিয়া আবার দ্বন্দ্ব বাতপিত্তাদি জ্বরের লক্ষণ পৃথক বলিবার প্রয়োজন কি? কারণ বাতজ্বরের ও পিত্তজ্বরের লক্ষণ একত্র করিলেই ত বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ হইবে। সর্বত্র এইরূপ হয় না। কেবল জ্বর বলিয়া নহে সমস্ত দ্বন্দ্বজ্বর রোগেবই লক্ষণ দুই প্রকারের দেখা যায়—প্রকৃতি-সম-সমবায়ারক ও বিকৃতি-বিষম-সমবায়ারক। জ্বর রোগকে উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝাইতেছি—বাতজ্বরের যে যে লক্ষণ ও পিত্তজ্বরের যে যে লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে বাতপিত্তজ্বরে কেবল সেইগুলিই প্রকাশ পায়—অতিরিক্ত কোন লক্ষণই দেখা যায় না, সেই বাতপিত্ত জ্বরকে প্রকৃতিসমসমবায়ারক বলে, কেননা এখানে কারণের ( বাতপিত্তের ) অনুরূপ অর্থাৎ সমান কার্য্য ( লক্ষণ ) হইল। শাস্ত্রকারগণ প্রায়ই এই প্রকৃতিসমসমবায়ারক দ্বন্দ্বজ্বর রোগের লক্ষণ বলেন না। কেননা—প্রত্যেকের লক্ষণ জানা থাকিলে এইরূপ দ্বন্দ্বজ্বর রোগের লক্ষণ না বলিলেও বুঝা যায়। কচিং অতিদেশে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যেমন চরক বলিয়াছেন—

নিদানে ত্রিবিধা প্রেক্ষণা যা বা পৃথগ্জ্বরাকৃতিঃ।

সংসর্গসন্নিপাতানাং তথা চোক্তং স্বলক্ষণম্।

নিদানে বাতজ্বর পিত্তজ্বর কফজ্বর যে যে লক্ষণ বলিয়াছি সেই সমস্ত লক্ষণের সমাবেশেই দ্বন্দ্বজ্বর ও সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ বুঝিবে। সমস্ত দ্বন্দ্বজ্বর রোগের এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় যাহাদের কতকগুলি, ঐ দ্বন্দ্বজ্বর রোগটি যে দুইটা দোষ দ্বারা আরক্ত উহাদের লক্ষণ এবং কোনটা বা কতকগুলি উহাদের কাহারও লক্ষণ নহে। এই প্রকার দ্বন্দ্বজ্বর রোগকে বিকৃতিবিষম-সমবায়ারক বলে। উদাহরণ দিতেছি। আমরা পরে যে বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ বলিব তাহাতে অগ্নাজ্বর লক্ষণের সহিত অরুচি ও রোমাঞ্চ এই দুইটা লক্ষণ আছে। কিন্তু এই অরুচি বা রোমাঞ্চ বাতজ্বর বা পিত্তজ্বর কাহারই লক্ষণ নহে। বাতশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণের মধ্যে 'সন্তাপ' আছে কিন্তু এই সন্তাপ বাতজ্বর বা শ্লেষ্মজ্বর কোনটিরই লক্ষণ নহে। বিকৃতিবিষমসমবায়ারক শব্দের অর্থ কারণের অনুরূপ কার্য্য। এতলে বাতপিত্ত জ্বরে, কারণের ( বাতপিত্তের ) অনুরূপ অর্থাৎ অসমান কার্য্য ( অরুচি, রোমাঞ্চ ) হইল। পরে যে সকল দ্বন্দ্বজ্বর ও সন্নিপাত জ্বরের উল্লেখ করা হইবে সে সমস্তই বিকৃতি-বিষমসমবায়ারক জানিবে।

**বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ**—পিপাসা, অজ্ঞান হওয়া, গা ঘোরা, গা জালা, নিদ্রানাশ, মাথায বেদনা, গলা মুখ শুকাইয়া যায়, রোমাঞ্চ, আহারে অনিচ্ছা, চক্ষুতে অন্ধকার দর্শন, হাতের পায়ের হাড় হুচ কোঁটার মত বেদনা, অধিক কথা বলা, ও হাইউঠা।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

১ম বর্ষ । } বঙ্গাব্দ ১৩২৪—বৈশাখ । } ৮ম সংখ্যা ।

পারিগার্ভিক ( এঁড়ে লাগা ) চিকিৎসা ।

( ঠাকুরমা ও লীলা । )

লী । ঠাকুরমা, আজ তোমার এমন দেখছি কেন ?

ঠা । মনটা বড় ভাল নয় লীলা ! গোবিন্দ অনেক দিন গেছে, আজও দিবে এল না, তাব জন্ত ভাবনা হচ্ছে ।

লী । ঠাকুরমা ! বাবা কি কচিছেলে, তাই তোমার এত ভাবনা হচ্ছে ?

ঠা । ছেলের কচি বুড়ো নেই ভাই, বরং ছেলে যত বড় হয় তার প্রতি তত মায়া বেশী হয় । যতদিন যায় মেহের বন্ধন ততই কঠিন হয়ে পড়ে ।

লী । কিন্তু ছোট ছেলেমেয়ের জন্তেইত আনন্দের ভয় ভাবনা বেশী ।

ঠা । সেটা খুব স্বাভাবিক । ছেলে যত ছোট, তত নিঃসহায়, সেই জন্তে তাকে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে সাবধানে রাখতে হয় । ছেলে বড় হলে সে নিজের ভার নিজে নিতে পারে, সেই জন্তে তার মা অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে

পারে । কিন্তু তা বলে মাতৃস্নেহ কমে না, বরং বাড়ে ।

লী । তা হলে আমার ছেলে পিলের ওপর আমার ঘেমন মায়া, বাবার ওপর তোমারও তেমনি মায়া ?

ঠা । তারচেয়ে অনেক বেশী । তোমার মেহের ইতিহাস খুব ছোট, কিন্তু আমার যে সাতকাণ্ড, রামায়ণ, শৈশব থেকে তাকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি । তাকে সুখে রাখবার জন্তে স্নান, আহার, নিদ্রা ভুলে যেতাম । তার কত মলমূত্র পেটে গিরাছে । অসুখ বিষুখে কত দীর্ঘ রাত্রি উৎকণ্ঠিত চিন্তে জেগে কাটিয়ে দিয়েছি । দিনে সাতবার তাকে হারিয়েছি, কত আকুল হয়ে ভেবেছি । রাত্রে বুকের কাছে থেকে সরে গেলে চমকে উঠেছি । এমনি করে ক্রমে তাকে মানুষ করে তুলেছি ।

লী । আমরাও তাই করেছি ঠাকুরমা ?

ঠা। হাঁ; কিন্তু তোমাদের আপাততঃ এইখানেই শেষ, আমার এইখানে সব প্রথম কাণ্ড শেষ। আরও ছয় কাণ্ড বাকী। তার পরে সেই ছেলে বিতালিকা করতে গেছে, তখন কত ভেবেছি, দেবতার কাছে মানত করেছি, কিসে সে ভাল লেখা পড়া শিখবে। কোন ক্রটি হলে নিজের মাথায় পেতে নিয়ে তাকে স্বামীর ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছি। তার পর তার বিয়ে দিয়েছি। তার ছেলে পিলে মানুষ করেছি। সে যখন সংসারের ভার নিয়েছে, তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন সকলকে সে সুখে রাখিতে পারে কেউ যেন তার নিন্দা না করে। কত আর বলব, এই এখনও দেখছিস্ত তার জন্তে ভাবছি।

লী। আহা! মাতুলের এমনই বটে। এমন মার প্রতি যে পুত্র কত্যা অসৎ ব্যবহার করে নরকেও তাদের স্থান নেই।

(ছোট বোয়ের প্রবেশ)

ছোট। ঠাকুমা, এঁরা সব কিরে আসছেন।

ঠা। আঃ ঝাটালি ছোট! আশীর্বাদ করি জন্ম এইদ্বি হও।

লী। কখন বাড়ী এসে পৌঁছবেন?

ছোট। এক ঘণ্টার মধ্যে। আমি সকলকে খবর দিগে যাই।

লী। যা, আমাদের বাড়ীতে আর অল্প অল্প বাড়ীতে খবর দে, যেন সবাই আসে।

ছোট। তোমার সবাইত বৈঠকখানায় এসে বসে আছেন।

(ছোট বোয়ের প্রস্থান)

লী। এইত ঠাকুমা! তোমার ভাবনা গেল এখন আমার দরকার মিটিয়ে দাও।

আমি মা, বাবা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো।

ঠা। তোর আবার কি দরকার?

লী। আমি যে পাঠ নিতে এসেছি।

ঠা। কিসের পাঠ নিতে চাস, তা বল।

লী। এই এঁড়েলাগার। আমাদের বাড়ীর আশে পাশে তিন চার ঘর গেরোস্তের ছেলে হয় আর প্রায়ই এঁড়ে লাগে। তাবা এসে আমাদের ঘরে বসেছে। তোমার আশীর্বাদে অনেক ডাক্তার কবিরাজের চাইতে আমার রোগী বেশী। এখন এঁড়ে লাগে কেন, আর তার ওষুদ পথি কি তা বল।

ঠা। এঁড়ে লাগে পোয়াতী মায়ের মাইয়ের দুধ খেয়ে।

লী। মাইয়ের দুধ খেয়ে কি এমন হয়? আমি দেখেছি—হাত, পা সুরু, পেট মোটা, রোগা কঁকলাসের মত হয়ে যায়। যা খায় তা হজম হয় না, ভস্কা ভস্কা বাছে হয়।

\* ঠা। হাঁ মাইয়ের দুধ খেয়েই এরকম হয়। মাইয়ের দুধ সকল সময়ে সমান থাকে না। গাই প্রসব করলে প্রথম দিন কতক তার দুধ লোকে খায় না, দুধ জাল দিতে গেলে ছান্না হয়ে যায়। নূতন বাছুরের পক্ষে সে দুধটা উপকারী কেননা তাতে কতকটা জ্বোলা-পের মত কাজ করে। মানুষের পক্ষে সেটা অপকারী। মাইয়ের দুধের সন্ধেও এই নিয়ম। ছেলে হবার পর দিন কতক দুধ যে রকম থাকে, ছেলে একটু বড় হলে সে রকম থাকে না।

লী। তা পোয়াতি হলে কি হয়?

ঠা। পোয়াতি হবার দিন কতক পরেই ভবিষ্য শিশুর অল্প দুধ প্রস্তুত রাখবার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। পোয়াতীর শরীরে যে দুধ জন্ম



হবার কারখানা আছে, সেখানে ভবিষ্য শিশুর উপযোগী দুধ প্রস্তুতের আয়োজন চলে, কাজেই সে দুধ আর পূর্বের শিশুর উপযোগী থাকে না। সেই জন্য পোয়াতী মায়ের মাইয়ের দুধ খেলেই ছেলের অসুখ হয়।

লী। তা এর কি কোন প্রতিকারের উপায় নেই ?

ঠা। উপায় বাপ-মার হাতে। দেখ প্রকৃতিতে যত জীব জন্তু আছে, তাদের মধ্যে যে গুলি শাবক প্রতিপালন করে, তাদের পূর্ব-শাবক যতদিন না নিজের ভার নিজে নিতে পারে তত দিন অল্প শাবক উপর করে না। তেমনি মানুষ শিশু আত্মনির্ভর হতে না পারলে অল্প সন্তান উপর করা উচিত নয়।

লী। কিন্তু মানুষ শিশুর আত্মনির্ভর হতে ত অনেক সময় লাগবে ঠাকুমা !

ঠা। আমি সে আত্মনির্ভরের কথা বলছি, কেবল শিশুর আহাৰ সধক্কে বলছি, শিশু যতদিন আহাৰ সধক্কে মায়ের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ যতদিন মাতৃস্তন পান করে, ততদিন আর সন্তান হওয়া উচিত নয়।

লী। তা হলে এঁড়ে লাগা রোগ বন্ধ হয়ে যাবে ?

ঠা। বন্ধ হয়ে যাবেই, অনেক শিশু ও প্রসূতি অকালমৃত্যু থেকে অব্যাহতি পাবে। এঁড়ে লাগার পরিণাম ফলে কতকগুলি শিশুর মৃত্যু হয়, তারা বেঁচে যাবে। আর অল্প বয়সে অনেকগুলি সন্তান প্রসব করে প্রসূতি জীর্ণা শীর্ণা চিরকুলা হয়ে পড়ে, কিছু কাল পরে কতকগুলি কচি কাঁচা রেখে অকালে মারা যায়। মা মরা ছেলের কতক বাঁচে কতক বাঁচে না। যে সংসারে উপযুক্ত স্ত্রীলোক না থাকে সে সংসারের অতি শোচনীয় অবস্থা হয়ে পড়ে।

এর জন্তে কত সংসারে যে হাহাকার উঠে তা বলা যায় না। স্বামী স্ত্রী একটু বুঝে চললে, একটু সংযমী হলে আর এ রকম ঘটে না।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা ! যখন যখন ছেলে হলে পোয়াতীর এমন হয় কেন ?

ঠা। তা হবেনা ? প্রথমেই ধর গর্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পোয়াতীর শরীরের রক্তে গর্ভ পুষ্ট হয়। কাজেই পোয়াতির রক্তের ক্ষয় আরম্ভ হয়। তার পর শরীরের কত পরিবর্তন ঘটে, জরায়ু বড় হয়, খিদে হজম কম হয়। কাজেই আরও দুর্বল হয়। তার পর প্রসবের সময় ঘণ্টে রক্তপাত হয়, আর ছেলেও স্তন্য পান করিতে আরম্ভ করে। এই সকল কারণে পোয়াতির শরীরের যে ক্ষয় হয়, তা পূরণ হইতে দীর্ঘ কাল লাগে। সেটা পূরণ হতে না হতে আবার গর্ভ হইলে ক্ষয়ের ওপর পুনরায় ক্ষয় হয়। বার বার এই রকম হলে সে পোয়াতি আর কতদিন বেঁচে থাকে।

লী। তা অনেক ছেলের মা হয়েও ছেলে জনকে বেশ সুস্থ থাকতে দেখেছি ঠাকুমা।

ঠা। সে খুব কম, দৈবাৎ এমন ছেলে এক জন মহাপ্রাণ স্ত্রীলোক দেখা যায়। আবার যাদের ওপরে দেখতে বেশ, অনেক সময় তাদের ভেতরে কিছু থাকে না। এক রোগের থাকতেই শেষ হয়ে যেতে পারে। তবে একটা কথা, পোয়াতি হলে আর প্রসবের পর ভাল রকম যদি আহাৰ পায় তা হলে প্রসূতির শরীর ততটা খারাপ হয় না। কিন্তু দেশের যে রকম অবস্থা, তাতে অধিকাংশ প্রসূতির ভাগ্যে তা জোটা কঠিন ব্যাপার। একে ত লোকের অর্থ নাই; তারপর জিনিষ দুর্লভ। তার ওপর বাজারে ভেল জিনিষই পূনর আনা। আগে প্রসবের পর প্রসূতিকে অনেক ঘি

খাওয়ান হত। এখন তত বি অনেকের ভাগ্যে জ্বোটে না, বা জ্বোটে তাও ভেল। ময়দায় নাকি সাদা পাথর গুড়িয়ে মিশিয়ে দিচ্ছে শুন্ছি। তা সেই পাথরের লুচি করে খেলে কি আর প্রহতির বল হবে, বরং রোগ হওয়ারই সম্ভাবনা।

লী। যা বলেছ ঠাকুমা! আজ কাল খুব বড় লোক না হলে আর ভাল খাবার পেটভরে খেতে পায় না। তা এঁড়ে যাতে না লাগে তার উপায়ত শুন্লাম, এখন এঁড়ে লাগলে তার প্রতিকার কি বল।

ঠা। প্রথম উপায় মাই বন্ধ করা।

লী। কিন্তু ছেলে যদি মাই খাবার জন্তে হেদোয়?

ঠা। সে কথা আগে একদিন বলেছি। যদি না হাসে ভাল করে খেলা না করে, মন-মরা হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে ছেলের মমে বড় কষ্ট হয়েছে। একরূপ অবস্থায় মাই খেতে না দিলে কঠিন রোগ হতে পারে। সেই জন্তে মাইয়ের দুধ বেশ করে গুলে ফেলে, যত কম সম্ভব মাই দিতে হয়।

লী। পোয়াতীর খাবার কি কোম রকম ধরাকাট করতে হয়?

ঠা। তা হয় বৈকি। ছেলে পিলের অম্লত্ব হলে সেই রোগের যে রকম পথ্য, পোয়াতীর সেই রকম পথ্য করা উচিত। তবে এঁড়েলাগার এ নিয়মটা বড় বেশী খাটে না। কেননা আগেই বলেছি যে, মাইয়ের দুধ ভবিষ্য শিশুর উপযোগী করে তৈরির হতে থাকে। সুপথ্য থাকলে সেটাত বন্ধ হবার নয়। তবে কিছু না কিছু উপকার হয়ই।

লী। তা, কি রকম পথ্য করতে হয় ঠাকুমা!

ঠা। এঁড়ে লেগে ছেলের সাধারণতঃ অজীর্ণ রোগই হয়ে থাকে। সেই অজীর্ণ রোগের মত পথ্য করতে হয়। এই ছুবেলা সরু চালের ভাত আর নাছের ঝোল। বড় মাছ, ইলিসমাছ, এসব ভাল নয়। ছোট কৈ, মাগুর, শিম্ভি, খলসে, মোরলা এই সব মাছই ভাল। তরকারী খুব কম, কচি বেগুন, পটোল, কচি কাঁচকলা সহজে হজম হয়। গোল আলু ভাল নয়, তবে ও না হলে আজ কাল চলেনা বলে দুএক থানা দেওয়া যেতে পারে। দাল ভাল নয়, তবে পোয়াতী মাগুর, তার দিকে আর তার পেটের ছেলেটার দিকে ত নজর রাখতে হবে, সেই জন্তে ইচ্ছা হলে একটু মুগ কি মন্থর দালের ঘু দিতে হয়।

লী। পেটের ছেলের দিকে নজর রেখে খেতে দিতে হয় কেন ঠাকুমা?

ঠা। তা বুঝি জানিসনে! এই জন্তে আমাদের দেশে সাধ দেবার নিয়ম আছে। আচ্ছা এসময় আর একদিন বুঝিয়ে বলবো। তার আগে আয়ুর্বেদ পত্রিকার স্বরেন কবি-রাজ 'দোহদ' বলে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটা একবার পড়ে দেখিস।

লী। হাঁ, সেই মাসের আয়ুর্বেদে বেরিয়েছিল; আচ্ছা সেটা আমি আর একবার ভাল করে পড়ে দেখব। এখন তুমি পথ্যের কথা আর কি বলবে বল।

ঠা। হাঁ বলছি। শাক খেতে ইচ্ছে হলে গুলতা কি বেতো শাক দেওয়া যেতে পারে। অম্বলের মধ্যে পাতি কি কাগজীলোবু আর পুরাতন তেঁতুল।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা! পুরান তেঁতুল কি রকম হলে ভাল হয়? একবার একজন

পুরাণ তেঁতুল আনলে, সে যে কত বছরের  
পুরাণ তা বলতে পারি না। শত কাঠের  
মত কোন আশ্বাদন নেই। সেই কি ভাল ?

ঠা। না, সে অতি পুরাতন ব'লে বোধ  
হয়। অতি শব্দটা কোন কাজেই ভাল নয়।  
যে তেঁতুল বেশ কাল হয়ে গেছে, দেখলে  
তেঁতুল ব'লে বোধ হয় অল্প অতি অল্প থাকে,  
সেই তেঁতুলই ভাল। তার চেয়ে পুরাণ  
তেতুল খাওয়াও বা আর কাঠ ভিজিয়ে খাও-  
য়াও তাই।

লী। আমিও তাই ভেবেছিলাম ঠাকুমা !  
এখন তুমি পখির কথা বল।

ঠা। ভাজা, পোড়া, শাক, অম্বল, পিঠে  
নাটা এসব না খাওয়াই ভাল।

লী। জল খাবার কি খাওয়া যায় ?

ঠা। জলখাবারের মধ্যে দাড়িম, বেদানা,  
চীনেকেশুর, পাকা গাব, বিলাতী গাব (ম্যান্ডো-  
ষ্টন) মিছরী, এই সব ভাল। ছই চার টুকরো  
আকু-কি দু একটা ভাল সন্দেশও পোয়াতীর  
ইচ্ছা হলে দিতে পারা যায়।

লী। আর কিছু দেওয়া চলে না ?

ঠা। না, আর কিছু নয়। অম্বল হলে  
কি আর সব জিনিষ খেতে আছে ? তাহলে  
অম্বল আর সুস্থ লোকের পখির তরুণ কি  
বৈগ।

লী। থাকছে পিলের বাপ মা হওয়া  
কি কষ্টের ঠাকুমা !

ঠা। কষ্ট বৈকি দিদি ! কষ্ট পেতেই  
সংসারে আসা, সংসারে কষ্ট বই কেউ সুখে  
নেই। কিন্তু এই কষ্টের মধ্যে এই অম্বলের  
মধ্যে আমাদের মহাপরীক্ষা হয়ে থাকে। এ  
পরীক্ষায় যে জয়ী হতে পারে সেই মানুষই  
উন্নতি লাভ করে। আর যে পরাজিত হয়,

সে অমানুষ, তার অবনতি হয়ে থাকে। সে  
অবনতি পুরুষে পুরুষে সংক্রমিত হয়। পুত্র-  
কন্যার শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন পিতা  
মাতার উপর নির্ভর করে। এই মহাকর্তব্য  
পালন করিতে পিতামাতার সংযমী ও ত্যাগী  
হওয়া আবশ্যক। তা হলে সং পুত্রকন্যা উৎ-  
পন্ন হয়ে সংসারের সুখ শান্তি বৃদ্ধি করতে  
পারে। আর এর বিপরীত হলে, রুগ্ন ভুগ্ন,  
অস্বাস্থ্য, বিকৃত, চরিত্রহীন পুত্র-কন্যা উৎপন্ন  
হয়ে সংসারে অসুখ ও অশান্তির সৃষ্টি করে।

লী। বা বলেছ ঠাকুমা ! সংযম আর  
ত্যাগশীলতার অভাবেই আমাদের দেশে  
এমন খারাপ ছেলে পিলে জন্মাচ্ছে। এখন  
তুমি এঁড়ে লাগার কথা বল।

ঠা। আগেই বলেছি যে, পোয়াতী মায়ের  
মাইয়ের দুধ খেয়ে এইরোগ হয়। তা ছাড়া  
মা যদি রোগ ভোগ করে, তার মাইয়ের দুধ  
খেলেও এরকম রোগ হয়। আবার একে  
বারে মার মাইয়ের দুধ না খেতে পেলেও  
এরকম হতে পারে।

লী। সবগুলোকেই কি এঁড়ে লাগা বলে ?

ঠা। পোয়াতী-মায়ের মাইয়ের দুধ খেয়ে  
যেটা হয় সেটাকে শাস্ত্রে পারিগার্ভক বলে।  
তারই বাঙ্গালা হয়েছে এঁড়েলাগা। তবে  
অল্প যে ছটো কারণে হতে পারে বললাম,  
তাতেও এই রকম লক্ষণ প্রকাশ পায়,  
চিকিৎসাও এক রকমের।

লী। লক্ষণ কি, কেবল ওকি দিয়ে যায়  
আর পেটের মোষ হয় ?

ঠা। কেবল তাই নয়, কাস, বমি, অক-  
চিও হয়। কারও কারও দাঁত ভাল হয় না।  
সময়ে জ্বরও হতে পারে। ফল কথা অকর্ষই

এর মূল, আর তা থেকে এসব উপসর্গ ঘটে থাকে।

লী। তা হলে সব জায়গায় এক রকম ওষুধ পথিা চলে না।

ঠা। তা চলবে কি কবে? তবে সাধা রণতঃ হজম হয় না, আর ভস্কা ভস্কা বাহ্যে করে এই অবস্থার চিকিৎসা জানা দরকার।

লী। কি পথ্য দিতে হয়?

ঠা। পূর্বে ছেলেদের পেটের অম্লধ হলে যে রকম পথ্য দেবার কথা বোঝি, সেই রকম। মুত্রে দিয়ে সিন্ধু ছাগল দুধ, দুধবার্লি, দুধ এরাকট। ভাত খেতে শিখে থাকলে কচি কাঁচকলা, আর ছোট মাছের ঝোল ও পোরের ভাত।

লী। দুধ কতটুকু করে দেওয়া যায়?

ঠা। অবস্থা বুঝে, যে যেমন সহ্য করতে পারে।

লী। সহ্য হচ্ছে কিনা কি করে বুঝবো?

ঠা। মল দেখিলেই বোঝা যায়। মলের সঙ্গে যদি ছ্যাক্কা ছ্যাক্কা, সাদা সাদা ছানার মত থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে দুধ হজম হচ্ছে না। তা হলে দুধ কমিয়ে দিতে হবে, আর দুধের সঙ্গে সিকি আন্দাজ চুণের জল মিশিয়ে দিলে ভাল হয়।

লী। আর কি লক্ষণ দেখে দুধ বাড়াতে হয়?

ঠা। যখন বেশ আঁট আঁট তামাটে বাহ্যে হবে, বাহ্যে কম হবে, তখন একটু একটু করে দুধ বাড়িয়ে দিতে হয়।

লী। কবার করে খেতে দেব?

ঠা। বয়স বুঝে আর কি রকম হজম হয় দেখে, তিন ঘণ্টা কি চার ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়।

লী। জলখাবার কি দেওয়া যেতে পারে?

ঠা। দাড়িম, বেদানা, মিছরী, কৈশুর, পানফল, কচি বেলপোড়া এই সব।

লী। আচ্ছা, এখন এ অবস্থায় কি ওষুধ দেওয়া যায় বল।

ঠা। যোয়ান, শুঁঠ, আতইচ, আর পিপুল মূল, সমান ভাগে নিয়ে গুঁড়ো করে বয়স বুঝে ৩৪ রতি মাত্রায় গরম জলের সঙ্গে দিনে, দুবার করে দিলে ভাল হয়। সৈন্ধবমূল, পিপুল, মরিচ, রক্ত চিতার মূল আর মুত্রে বেশ করে গুঁড়ো করে সমান ভাগে মিশিয়ে ৩৩ রতি মাত্রায় দিনে দুবার গরম-জলের সঙ্গে খাওয়ালে ভাল হয়। সোহাগার থৈ, লবঙ্গ, যোয়ান, সৈন্ধবমূল আর আতইচ সমান ভাগে গুঁড়ো করে ৩৪ রতি মাত্রায় গরম জলের সঙ্গে খাওয়ালে ভাল হয়।

লী। সোহাগার থৈ কাকে বলে ঠাকুমা?

ঠা। বেনের দোকানে সোহাগা কিনতে পাওয়া যায়। সেকরার সোহাগা দিয়ে সোণা গালায়। সেই সোহাগা গুঁড়ো করে কড়ায় কি চাটুতে করে আগুনের ওপর চড়াতে হয়। খানিক ক্ষণ থাকলেই সোহাগার গুঁড়ো গুলো থৈয়ের মতন হয়ে যায়। একেই সোহাগার থৈ বলে।

লী। আচ্ছা, এখন যাদের দাঁস্ত ভাল হয় না, তাহাদের ব্যবস্থা কি রকম বল।

ঠা। প্রায় একই রকম, তবে যাতে দাঁস্ত পরিকার হয়। এমন ধারা লঘুপাক পথ্য দিতে হবে। যাদের দাঁস্ত বেশী হয় তাদের পক্ষে ছাগল দুধ, ঘোল ভাল, কিন্তু যাদের পরিকার হয় না তাদের পক্ষে গাইয়ের দুধই ভাল। আর দুধ পিপুলের সঙ্গে সিদ্ধ করে দিতে হয়। আর দুধ হজম না হলে সোহাগার মূল কি গুড়ো-সোড়া এক আনা, আতইচ

জলে গুলে হুধের সিকি আন্দাজ মিশিয়ে দেওয়া ভাল। অর্দ্ধেক বার্লি সিদ্ধ জলের সঙ্গে হুধ মিশিয়ে সবাইকেই দেওয়া যেতে পারে।

লী। জল খাবার কি দেওয়া যায় ?

ঠা। আঙ্গুর, কিসমিস, মনাকা, খেজুর মিছরী, পানফল এই সব দেওয়া যেতে পারে।

লী! আচ্ছা, এখন এদের ওষুধ কি তা বল।

ঠা। আগে যে সব ওষুধ বলেছি তার মধ্যে যে গুলো বাহ্যে কথা করে, যেমন মূতা আতট্ট, সেখানে এই গুলো বাদ দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সন্ধব হুণ হরীতকী ও রক্ত চিতার মূল গুঁড়িয়ে সমান ভাগে মিশিয়ে ৩৪ রতি মাত্রায় দিনে দুবার গরম জলের সঙ্গে দিলে ভাল হয়। সন্ধব হুণ হরীতকী, পিপুল ও রক্ত চিতার মূল \* গুঁড়ো করে সমান ভাগে মিশিয়ে ৩৪ রতি মাত্রায় গরম জলের সঙ্গে দিনে দুবার খাওয়ালে ভাল হয়। হরীতকী, পিপুল ও সচল লবণ, বেশ গুঁড়ো করে সমান ভাগে মিশিয়ে ৩৪ রতি মাত্রায় দিনে দুবার গরম জলের-সঙ্গে দিলে ভাল হয়।

লী। আচ্ছা এসবত হলো ঠাকুমা! এখন বমি, কাস, অর এসব হলে কি করতে হবে?

ঠা। আগে শিশুর কাসের যে চিকিৎসা বলেছি, তারই দু একটা ওষুদ দিবি। আর যে ওষুদের কথা বললাম সেই ওষুদ দুবার কি একবার দিবি, আর কাসের ওষুদ একবার দিবি। কাসি হলে যে রকম পথ্য দিতে

\* রাগিতা ( বাহার বেড়া দেয় তাই নহে ) যে চিতার মূল রক্তবর্ণ।

বলেছি সেই রকম পথ্য দিবি যেন গুরুপাক না হয়।

লী। অর হলে কি রকম করতে হবে?

ঠা। অর হলে ভাতটানা দেওয়াই ভাল। অবস্থা বুঝে থৈ হুধ, হুধ সাণ্ড, হুধ বার্লি, খেজুর, কিসমিস, বেদানা, মিছরী এই সব পথ্য দিতে হয়।

লী। ওষুদ কি দেব?

ঠা। আগে যে এঁড়ে লাগার ওষুদ বলেছি তাই দুবার কি একবার দিবি। আর একবার সিউলী পাতার রস মধু, কি তুলসী পাতার রস মধু মিশিয়ে দিবি। ঘূষড়োর রস দিতে পারলে ভালই হয়।

লী। কিসের ঘূষড়ো?

ঠা। ক্ষেৎপাণ্ডা, শিউলীপাতা আর গুলঞ্চ, কাঁচা নিয়ে ধুয়ে কুটে কচি কলাপাতা জড়িয়ে এপিট ওপিট করে চাটুতে ভাজতে হয়, কলা পাতা ঝলসা পোড়া হলে নামিয়ে দিনে দুবার ভেতর আর বাহ্যে বাইরে রাখতে হয়। এক দিন করলে ২৩ দিন চলবে না—রোজ করতে হবে।

লী। আচ্ছা রস কতটুকু করে দিতে হয়?

ঠা। বয়স বুঝে ২৩ বছরের ছেলেকে আধ কিলোক রস ১০।১২ ফোটা মধু মিশিয়ে দিলেই হবে। বয়স কম বেশী হলে মাত্রাও কম বেশী করতে হয়।

লী। আচ্ছা বমি হলে কি ওষুদ দেব ঠাকুমা?

ঠা। আমের আঁটির শাঁস, থৈ, আর সন্ধব হুণ সমান ভাগে গুড়ো করে কি বেটে ৪৫ রতি মাত্রায় একটু মধুর সঙ্গে দিলে ভাল হয়। থৈয়ের চূর্ণ জল ও মধুর সঙ্গে দিলে বমি ভাল হয়। অথথ গাছের শুক ছাল

পুড়িয়ে জলে ফেলতে হয়। সেই জল ছেকে খেলে বমি ভাল হয়।

লী। আর এঁড়েলাগার ওষুদ কিছু দেব না?

ঠা। তা দিতে হবে বৈকি। দিনে দুবার কি একবার করে দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ওষুদ দিলে বমি বাড়ে কিনা, যদি বাড়ে মনে হয় তাহলে দু এক দিন সে ওষুদ বন্ধ রেখে, আগে কেবল বমির ওষুদ দিবি। বমি ভাল হলে একটু একটু করে সহ্যে সহ্যে সেই ওষুদ দিবি।

লী। আর পথি কি রকম চলবে?

ঠা। পথি ঐ রকমই চলবে। পুরান চালের ভাত, থৈয়ের মণ্ড, বালি, ছুপ, লেবু, দাড়িম, আঙ্গুর, কিসমিস, চিনি মিছরী এই সব। ছুপ যদি সহ্য না হয়, বালি সিদ্ধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিবি। তাতেও সহ্য না হলে দুই এক দিন বন্ধ রাখা দরকার। বরং টাটকা ঘোল ছেকে, কি গরম ছুধে লেবুর রস দিয়ে ছানা কেটে গেলে সেই ছানার জল ছেকে দেওয়া ভাল।

লী। দরজায় গাড়ীর শব্দ হলো। এঁরা সব এলেন বুঝি?

ঠা। দেখ দেখি।

লী। হাঁ এসেছেন, তোমার কাছে আসছেন। (অগ্রে কর্তা ও গৃহিণী পশ্চাতে দুই পুত্র, তিন পুত্রবধূ, দুই কন্যা ও তিন জামাতার প্রবেশ।) সকলের বৃত্তাকে প্রণাম এবং অপর সকলের কর্তা ও গৃহিণীকে প্রণাম।

কর্তা। সকলকে দেখচি, কিন্তু নন্দলালকে দেখচিনে কেন?

(নন্দলাল ও প্রভাসের দ্বারদেশে আগমন)

নন্দ। এই দেখ প্রভাস। এই আমাদের 'হোম'। বাঙ্গালীর সংসারের স্ত্রী পুরুষ পিতা, মাতা, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ বিপদে আর উৎসবে একত্র হয়। নিত্য একরূপ একত্র হলে তার মাধুর্য থাকে না, নিত্যন্ত পুত্র-তন হয়ে পড়ে। গুরুজনের সম্মুখে যুবক যুব-তীর আলিঙ্গন চুষন বা রহস্তালাপ, আর বহু পুরুষের সম্মুখে বিকট দশন বিস্তার করে আহ্বার করা, যদি তোমরা সভ্যতা বলে মনে কর তা হলে ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন তেমন সভ্যতা কখন ভারতে আসে না আসে না। আর আমাদের এই সম্মিলনের মাধুর্য দেখ দেখি, স্ত্রীলোকের বিনয় ও লজ্জা দেখ দেখি। আমার মার অনেক গুলি নাতি পুতি হয়েছে, তথাপি ঠাকুনার সম্মুখে বাবার কাছে একটু ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে ঘোমটা বলছে, দেবী! আমি তোমার হাতে মাঘ্য করা সেই পুত্রবধূ। তাই আমার অস্তিত্ব—কিন্তু যে মাতৃস্বের মহিমায় আজ এতগুলি প্রাণী তোমার চরণে প্রণত হতে এসেছে, সেই মহিমা তোমাদেরই নিদেশক্রমে আমার অন্ন পরিসর হতে বাধা করেছে। তারপর ঐ দেখ আমার স্ত্রী, মধ্যম ভ্রাতৃবধূ, তিন ভগ্নী আধু ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ঘোমটা বলছে—মাতৃস্বের মহিমা আমাদের পরিসর কমিয়ে এনেছে কিন্তু আমরা তোমাদের সেই লজ্জাশীলা চরণের দাসী। আর ঐদেখ আমার ছোট ভ্রাতৃবধূ কত সঙ্কোচে জড়-সড় হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাতৃস্বের মহিমা ওকে এখনও তাগ স্বীকার করতে শেখায়নি, তাই ওর স্থান সংসারের সর্বা-পেক্ষা নিয়ে। নিয়ে বলে মনে করো না ও করে

আছে। বাড়ীর সকলের চেয়ে বেশ ভূষার পারিপাট্য খুব বেশী, অলঙ্কার খুব বেশী, আহাৰের ব্যবস্থা প্রায়ই সৰ্বাপেক্ষা ভাল। কিন্তু সংসারের পাঁচজন সখন একত্র হয়, তখন

ভ্যাগের কাছে ভোগ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের দেশের পারিবারিক সম্মিলন যেন চিরদিন এইরূপ থাকে।

## আয়ুর্বেদে মাংস ।

( চৈত্র সংখ্যার ৩০১ পৃষ্ঠার পর )

পূর্বে যে মাংসার্ক, মাংসবস ও মাংস যুগের কথা বলা হইয়াছে সেগুলি অতি লঘু-পাক। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিবিধ দ্রব্যের সংযোগে যুগাদি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। রোগীর সর্দিকাশ থাকিলে আদা, শুঠ, পিপুল, মরিচ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে পারে। অগ্নিবল অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে হিং ও আদা বা শুঠের সহিত সংস্কৃত করিয়া দিলে সহজে জীর্ণ হয়। অরুচি থাকিলে—দাড়িমের রস এবং সুগন্ধি দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। এইরূপ নানা-প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে।

অতিসার রোগে—শশক, এন, লাভ, হরিণ কপিঞ্জল, গোরবর্ণ তিত্তির পক্ষী, এই সকল প্রাণীর রস এবং সৰ্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্ত, সিঙ্গী ও মোরলা অতিসার রোগে পথ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতিসারের সকল অবস্থাই যে মাংস যুগ পথ্য দিতে হইবে তাহা নহে, কেননা অতিসারে প্রথমে লজ্জণই পথ্য। অতিসারের প্রধান অবস্থা ( Acute stage ) দূর হইলে এ সকল মাংসের যুগ লঘুপাক করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে মাংস মলরোধক এবং বায়নাশক বলিয়া অতিসার রোগে আহাৰ ও ঔষধ হইয়েরই কাজ করে।

গ্রহণীরোগে—মাংসান্ধী-জন্তু, লাভ পক্ষী, এণ, তিত্তির পক্ষী প্রভৃতির মাংস, ক্ষুদ্র মৎস্ত মোরলা ও থলিসা মৎস্ত গ্রহণী রোগে পথ্য। মাংসান্ধী জন্তুর মাংস অত্যন্ত পুষ্টিকর বলিয়া ক্ষয় সংযুক্ত গ্রহণী রোগে বিশেষ ফলপ্রদ অতিসার রোগের জ্বাঘ লঘুপাক করিয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য।

অর্শরোগে—মেঘ, উষ্ট্র, কচ্ছপ সজার, ফিঙ্গা পাখী, ছাগ, নেকড়ে বাঘ, স্বর্ণঘাতক, অশ্ব, শৃগাল, ও অন্তান্ত প্রকার জন্তুর মাংস হিতকর অর্শরোগীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কেননা বিবিধ মাংস আশ্বাদন করিবার সৌভাগ্য ঘটে। মাংস মলরোধক বলিয়া অর্শরোগীর কোষ্ঠ-বদ্ধতা থাকিতে মাংস পথ্য দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অথবা লবণ, আদা, হিং, জীরা, মরিচ প্রভৃতি সারক দ্রব্য সংযোগে সংস্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। উদরাময়যুক্ত অর্শরোগীর পক্ষেই মাংস সুপথ্য। রক্তার্শ রোগে রক্তপিত্ত রোগের নিয়ম অনুসারে মাংস প্রয়োগ করা কর্তব্য। অর্শরোগে আনুপ মাংস ও মৎস্ত অপথ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ভারতের অন্তান্ত অংশে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিলেও বঙ্গ তাত্ত্বিক দিগের প্রভাব ছিল। ছাগ, মেঘ শশক, শজার, কচ্ছপ এবং নানাপ্রকার

পক্ষীর মাংস লোকে আহাৰ করিত। মহিষ বলি দেওয়া হইত বটে, কিন্তু কত দিন হইতে যে মহিষ মাংস আহাৰ কবিবার প্রথা লোপ পাইয়াছে তাহা বলানায় না! এখনও স্থানে স্থানে বঙ্গের মুসলমানগণকে মহিষ মাংস আহাৰ করিতে দেখা যায়। এই সকল মুসলমান পূৰ্বে হিন্দু ছিল, মুসলমান জাতি, বঙ্গদেশ জয় করিবার পর মুসলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহিষ মাংস আহাৰের প্রথা উহারা মুসলমানদিগের নিকট শিক্ষা করে নাই। প্রাচীন প্রথা বজায় রাখিয়াছে মাত্র।

চৈতন্ত দেবের ধৰ্ম্ম প্রচারের অল্পকাল পরে বঙ্গে তান্ত্রিক যুগের অবসান হয়। গোরাঙ্গের মহতী প্রতিভা বলে পরাজিত হইয়া বহু পণ্ডিত চৈতন্তদেবের মতের অনুসরণ করে। ফলে অসংখ্য বঙ্গবাসী বৈষ্ণবধৰ্ম্ম গ্রহণ করে এবং মাংসের প্রচলন অনেক কমিয়া যায়। এইরূপে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কাল হইতে চৈতন্তদেবের সময় পর্য্যন্ত ধৰ্ম্মবিপ্লবের ফলে প্রাচীনকালের মাংসের বহু প্রচলন অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালী মন্থকে একবারে ভুলিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর মন্থ প্রিয়তার নিকট ধৰ্ম্ম পরাভূত। বঙ্গের সকল ধৰ্ম্মাবলম্বী অধিকাংশ লোকই মন্থ ভক্ষণ করিয়া থাকে। বাহারা প্রকৃষ্টভাবে মন্থ ভক্ষণ করিতে, কুষ্ঠা বোধ করেন, তাঁহাদিগকেও গৃহপালিত বিড়ালের জন্ত মন্থা ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গাল ব্যতীত ভারতের অন্যান্য দেশে মন্থের এ সৌভাগ্য বা হুৰ্ভাগ্য ঘটে নাই।

মাংসসম্বন্ধে আরও দুই একটা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মাংসাহারের প্রচলন কমিয়া যাওয়ায় দেশের ভাল কি মন্দ হইয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া

কঠিন। তবে এই মাত্র দেখা যায় যে, যখন মাংসাহার যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, তখনই ভারত শৌৰ্য্যে, বীৰ্য্যে, জ্ঞানে, ঐশ্বৰ্য্যে জগতের শ্রেষ্ঠ ছিল। বৰ্ত্তমান উভয় বিষয়েই বিপরীত। আশা কবি কোন যোগ্যতর ব্যক্তি ইহাব মীমাংসা করিবেন।

মাংসাহার হিতকর কি অহিঁকর? এই প্রশ্ন লইয়া আমিষাহারী এবং নিরাмиষাহারী উভয় সম্প্রদায়ের বহুদিন তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। উভয় পক্ষেরই অনেক অনুকূল যুক্তি আছে। কিন্তু বিশেষ মীমাংসা কিছুই হয় নাই। ভবিষ্যতে আমরা মাংসাহার সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের মনষীদিগের মতামত পাঠকগণকে অবগত করিতে প্রয়াস পাইব।

তক্রমাংস—পাকপাত্র দ্বত দিয়া হিং ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে খণ্ড খণ্ড মাংস উপযুক্ত জল দ্বারা পাক করিবে এবং পাক শেষে জীরকাদি সংযুক্ত মাংস, তক্রে নিক্ষেপ করিবে।

শুদ্ধ মাংস—পাক পাত্রে দ্বত দিয়া হিং ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে অস্থিহীন মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাজিয়া লইবে এবং উপযুক্ত লবণ ও জলসহ পাক করিবে। পাক শেষ হইলে বাটিয়া পানের রস, তণ্ডুল, লবঙ্গ ও মরিচ সংযুক্ত করিবে।

সহদ্রক—ছাগাদির উরু প্রভৃতির মাংসল স্থানের খণ্ড খণ্ড মাংস, শুদ্ধ মাংসের জ্বার পাক করিবে।

আস—বৃহৎ মাংসখণ্ড পাক পাত্রে রাখিয়া উপযুক্ত জল, হিং, হরিদ্রা, আদা, শুঁঠ, লবঙ্গ, মরিচ, তণ্ডুল, গোধূম ও গোড়া লেবুর রস সহ পাক করিবে।



তলিত—তুচ্ছ মাংস দ্বতে ভাজিয়া লইলে তাহাকে তলিত বলে ।

শূন্য—যকুৎ প্রভৃতি স্থানের মাংস দ্বত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া শূল বিদ্ধ করিয়া ঘূ-  
তীন অঙ্গরাগ্নিতে, পাক করিয়া লইবে ।

মাংস শৃঙ্গাটক—ছোট টুকরা টুকরা মাংস  
সিদ্ধ করিয়া লবঙ্গ, হিং, মরিচ, এলাচ,  
জীবা, ধনে ও লেবুর রস মিশ্রিত দ্বতে ভাজিবে  
পবে বাটিয়া ময়দার তুলির ভিতর পুরিয়া  
ভাজিয়া লইবে ।

অগ্নিমান্দ্য-অজীর্ণ রোগে এন, ময়ূব, শশক  
লাব, সারস এবং সর্ষপ প্রকার ক্ষুদ্র মংস্ত  
এই রোগে পথ্য । ক্ষুদ্র মংস্ত এক্ষণে পথ্য  
স্বরূপে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু শাকামভোজী  
বান্দালী অজীর্ণ রোগ গ্রস্ত হইলে মাংসের ঘূষ  
জীর্ণ করিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না । পূর্বে  
লোকে যে মাংসে অভ্যস্ত ছিল ইহা তাহার  
অত্যন্ত প্রমাণ । মাংস বায়ুনাশক । স্ততরাং  
যে সমস্ত অজীর্ণ রোগীর উদরে বায়ুসঞ্চয় হয়,  
সেই সকল রোগীকে হিং আদা, মরিচ প্রভৃতি  
পাচক এবং বায়ুনাশক দ্রব্য সাংযোগে সংস্কৃত  
লবুশাক মাংসরস পথ্য দিলে বিশেষ উপকার  
হইতে পারে ।

পাণ্ডুরোগে—জাঙ্গল মাংসের ঘূষ এবং  
শিজিমাছ এই রোগে সুপথ্য । পিঁয়াজ রক্তন  
চলিতে পারে, কিন্তু হিং দিয়া সংস্কৃত করা  
চলেনা ।

রক্তপিত্ত রোগ—শশক, কপোত ( পায়রা  
ওষ ), হরিণ, এন, লাব, পায়রা, বটের,  
বক, মেঘ, কপিঞ্জল প্রভৃতির মাংস এবং চিংড়ি  
ও বাইম মাছ এই রোগে সুপথ্য । কিন্তু দধি  
রক্তন, সর্ষপ, অন্ন দ্রব্য বা অধিক লবণ সহ  
সংস্কৃত করা উচিত নহে । রোগীর অগ্নিবল

থাকিলে কেবল মাংসের ঘূষ না খাইয়া মাংসও  
স্বচ্ছন্দে আহার করিতে পারেন ।

রাজবক্ষা, ক্ষত ক্ষীণ রোগে—জাঙ্গল মাংস,  
ছাগমাংস, মাংসাশী জন্তুর মাংস প্রভৃতি  
রোগীর অগ্নিবল বিবেচনায় সংস্কৃত করিয়া  
যথেষ্ট প্রয়োগ করা যাইতে পারে । কিন্তু  
হিং, রক্তন বা অন্নদ্রব্য সহ সংস্কৃত করা উচিত  
নহে । ক্ষীয়মান বক্ষারোগীর ক্ষয় নিবারণ  
করিতে মাংসের বিশেষতঃ মাংসাশী জন্তুর  
মাংসের গ্ৰায় খাদ্য আর দ্বিতীয় নাই । অগ্নি  
প্রবল থাকিলে বেশবার ও শশাক করণ  
দেওয়া যাইতে পারে । প্রচণ্ড রৌদ্রে মাংস  
তুচ্ছ করিয়া চূর্ণ করিবে । পরে সেই চূর্ণিত  
মাংস পাক করিয়া লেছ বা ভোজ্যরূপে  
প্রয়োগ করিবে ।

কাসরোগে—গ্রাম্য, আনুপ ও ধষদেশ  
জাত পশু পক্ষীর মাংস কাসরোগে সুপথ্য ।  
রক্তন, ছোটএলাচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ  
প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে পারে  
কিন্তু সর্ষপ নিষিদ্ধ, মাংস বা মাংস ঘূষ  
গরম গরম লঘুপাক করিয়া, খাওয়া উচিত ।  
মংস্ত নিষিদ্ধ ।

শ্বাসরোগে—শশক, ময়ূব, তিতির, লাব,  
কুকুট এবং, বহুদেশজাত পশু পক্ষীর মাংস  
সুপথ্য । এলাচ, শুঠ পিপুল, মরিচ প্রভৃতি  
চলিতে পারে, কিন্তু সর্ষপ নিষিদ্ধ । আনুপ  
মাংস ও মংস্ত অপথ্য ।

হিকারোগে—এন, তিতির, লাব, এবং  
জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংস সুপথ্য । রক্তন,  
মরিচ, আদা প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে  
পারে, কিন্তু অন্নদ্রব্য ও সর্ষপ অব্যবহার্য ।  
আনুপ মাংস অপথ্য ।

স্বরভেদরোগে হংস, বহুকুকুট, ও ময়ূব

মাংস আদা, রশুন, মরিচ প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত করিয়া গরম গরম আহার করা উচিত।

অরুচিরোগে—শুকর, ছাগ, শশক ও কুম্ভ হরিণের মাংস, চেন্ন, মোকলা, ইলিশ, পুটী, খলিশা; কই ও রোহিত মংস্ত্র এবং মংস্ত্রের ডিম্ব সুপথ্য। দধি, ঘৃত, রসোন, দাড়িমের রস, মরিচ, হিং, আদা প্রভৃতি সংযোগে সংস্কৃত করা যাইতে পারে।

বমনরোগে—শশক, ময়ূর, তিত্তির, লাভ এবং জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংস সুপথ্য। দধি, জীরা, মরিচ, আদা প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু, ছোট এলাচ ও সর্ষপ নিষিদ্ধ। মাংসের ঘৃষ ছাঁকিয়া দাড়িমের রসাদি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

তৃষ্ণারোগে—ধনুদেশজাত জন্তুর মাংস রস ও লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। এলাচ, ধনে, কর্পূর, জায়-ফল, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা মাংসরস সংস্কৃত করা কর্তব্য। লবণ, মরিচ, হিং প্রভৃতি নিষিদ্ধ। মূর্ছারোগে বহুদেশজাত মৃগপক্ষীর মাংসের ঘৃষ সুপথ্য। চিনি, দাড়িমের রস, কর্পূর, এলাচ, তেজপাতা ধনে প্রভৃতি দ্বারা মাংসরস সংস্কৃত করা যাইতে পারে। মরিচ প্রভৃতি কটুদ্রব্য এবং তক্র নিষিদ্ধ।

মদাত্ম্য রোগে—এন, তিত্তিব, লাভ, ছাগ, কুকুট, ময়ূর ও শশকের মাংস সুপথ্য। দাড়িমের রস, কর্পূর, চিনি, ধনে, তেজপাতা, হরিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা মাংস সংস্কৃত করা উচিত। হিং প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য এবং মরিচ প্রভৃতি কটু দ্রব্য ও তক্র বর্জ্যীয়।

দাহরোগে—ধনুদেশজ প্রাণীর মাংসরস এই রোগে সুপথ্য। মদাত্ম্য রোগের লিখিত নিয়মে সংস্কৃত করা উচিত।

উন্মাদরোগে—কচ্ছপের মাংস এবং ধনু-দেশজাত জন্তুর মাংস ব্যবহার্য। ঘৃত, চিনি, তেজপাতা, ছোট এলাচ, হরিদ্রা ধনে প্রভৃতি মসলা দ্বারা সংস্কৃত করা উচিত।

অপস্মারোগে—কচ্ছপের মাংস এবং ধনু-দেশজ মৃগপক্ষীর মাংস উন্মাদ রোগের নিয়মে সংস্কৃত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। মংস্ত্র অপথ্য।

বাতব্যাধিতে (Nervous disease) পথ্য—গো, অশ্বতর, উষ্ট্র, গর্দভ, ছাগ, শূকর, মহিষ, হস্তী, হংস, কাদম্ব (শ্রামপক্ষ কলহংস), বক, ভেক, বেজী, শজারু, চড়াই, কুকুট, ময়ূর, তিত্তির, কুস্তীর, কচ্ছপ, শুক, প্রভৃতির মাংস এবং শিল্পি, পাবনা, গাগরা, কই, ইলিশ, তিমিঙ্গিল, রোহিত, মদম্বর, শিক্তী; বাইম ও ক্ষুদ্র মংস্ত্র সকল এই রোগে প্রযোজ্য। দধি, ঘৃত, তৈল, অন্নদ্রব্য, লবণ, রশুন দাড়িম প্রভৃতি দ্বারা মাংস সংস্কৃত করা যাইতে পারে।

বাতব্যাধি অসংখ্য প্রকার। বাতব্যাধির এক রোগে বাহ্য পথ্য অপর রোগে তাহা অপথ্য। সুতরাং মাংস প্রয়োগ ও সংস্কার অবস্থার উপর নির্ভর করে।

বাতরক্ত রোগে—লাভ, তিত্তির, ময়ূর, কুকুট, শুক, ভাব, কপোত এবং চড়াই পান্থীর মাংস বাতরক্ত রোগে পথ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ধনে, হরিদ্রা, তেজপাতা, ঘৃত চিনি প্রভৃতির দ্বারা মাংস সংস্কৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু হিং, মরিচ, দধি, সর্ষপ প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

আসবাত রোগে—জাঙ্গল দেশজাত পশু-পক্ষীর মাংস রস এই রোগে প্রযোজ্য। রশুন, আদা হিং মরিচ, শুঠ, পিপ্পল, ছোট এলাচ,

তেজপাতা, লবঙ্গ, ধনে, হরিদ্রা জীরা প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। মংস্ত্র ও দধি বর্জনীয়।

শূলরোগে—এই রোগে জাঙ্গল মাংসের যুগ প্রশস্ত। সংস্কারের জন্ত আমবাতের জায় মসলা ব্যবহার করা উচিত। উদাবর্ত (মলমূত্রাদির বেগধারণ জনিত বিবিধ বোগে) ও আনাহ (এ মল মূত্রের বিবদ্ধতা) বোগে—গ্রামা, ঔদক ও আনুপ মাংসের যুগ পথ্য। শুঠ, হিং, লবণ, মরিচ, তেজপাতা, মসলা ব্যবহার্য। উদাবর্ত ও আনাহ রোগ নানা প্রকার, অবস্থা ভেদে মাংস প্রয়োগ ও সংস্কার করা আবশ্যিক।

গুহ্ম রোগে—ধষদেশ জাত প্রাণীর মাংস হিতকর। রশুন, তক্র, হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আদা, জীরা, তেজপাতা, ধনে, হরিদ্রা, প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

হৃদ্রোগে—মংস্ত্র অপথ্য জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংস রস স্থপথ্য। শুঠ, রশুন, ধনে, মরিচ, আদা, এলাচ, তেজপাতা, তক্র, দাড়িম, সৈন্ধব-লবণ, প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত করা উচিত।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে—ধষদেশ জাত পশু পক্ষীর মাংস গব্য, দধি, তক্র, ছোট এলাচ, কর্পূর, হরিদ্রা, ধনে, প্রভৃতি মসলার সহিত পাক করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। মাংস অপেক্ষা মাংসের যুগই হিতকর। হিং, সর্ষপ, আদা, তৈল, লবণ এবং মরিচাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য বর্জনীয়, মংস্ত্র অপথ্য।

মূত্রাবাত (প্রস্রাব বন্ধ হওয়া) রোগে—ধষদেশ জাত মাংস পথ্য। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের জায় মসলা ব্যবহার্য।

অশ্মরী (পাথরী) রোগে—ধষদেশ

জাত এবং অণ্ডজ প্রাণীর মাংস হিতকর। হিং, মরিচ, শুঠ, আদা, ধনে, হলুদ, তেজপাতা প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য।

প্রমেহ রোগে—চড়াই, কপোত, শশক, তিতির, লাব, ময়ূর, এণ, বটের শুক প্রভৃতি জাঙ্গল মাংস প্রমেহ রোগে প্রশস্ত। মাংস অপেক্ষা মাংসের যুগই প্রশস্ত। মাংসের মেদ (fat) বাদ দিয়া তন্ন ও ঘৃত না দিয়া সংস্কৃত করিয়া লইবে। রশুন, আদা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, হরিদ্রা, তেজপাতা, জীরা, প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। দধি, তৈল, চিনি ও অন্ন দ্রব্য বর্জনীয়। আনুপ মাংস, গ্রামা মাংস এবং মংস্ত্র অপথ্য।

মেদো রোগে (obesity)—এই রোগে পুষ্টিকর দ্রব্য মাত্রই অপথ্য। সূতরায় মাংস ও মংস্ত্র পরিত্যজ্য। তথাপি মেদোরোগী-গণ একেবারে বঞ্চিত হয়েন নাই, চিংড়ি মংস্ত্র সর্ষপ তৈল, মরিচ, আদা, শুঠ, হিং, এলাচ, প্রভৃতি মসলার সহিত পাক করিয়া আহার করিতে পারেন, ঘৃত ও চিনি পরিত্যজ্য।

কার্ষ্য রোগে—বিবিধ মাংস স্তন্যাদি সংযোগে উত্তমরূপে পাক করিয়া আহার করা হিতকর। তবে মাংস জীর্ণ হওয়া আবশ্যিক। শুঠ, মরিচ প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করা ভাল নয়।

উদর রোগে—জাঙ্গল মাংস পথ্য। রশুন, আদা, এলাচ, শুঠ, মরিচ, তেজপাতা প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য মাংসের যুগ করিয়া খাওয়াই ভাল, কেননা এই রোগে অগ্নি দুর্বল থাকে। ঔদক ও আনুপ মাংস অপথ্য। লবণ বর্জনীয়।

শোথরোগে—ময়ূর, তিতির, কুঙ্কট, লাব ও কচ্ছপের মাংস পথ্য। হরিদ্রা, শুঠ,

মরিচ, এলাচ, ধনে প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য। চিনি, দধি, লবণ ও অন্ন দ্রব্য বর্জনীয়। গ্রাম্যমাংস ওঁদক মাংস, আনুপ মাংস ও শুক মাংস অপথ্য।

ত্রণ (বাঁধী) ও কোষ বৃদ্ধি রোগে—বহু দেশ জাত যুগপক্ষীর মাংস প্রশস্ত। রক্তন, হিং, আদা, মরিচ, প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য। আনুপ মাংস ও দধি অপথ্য।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্কুদ (আব), স্লীপদ (গোদ) প্রভৃতি রোগে মাংস পথ্য বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু অপথ্য প্রসঙ্গে আনুপ মাংসের উল্লেখ আছে মাত্র। এত দ্বারা বুঝায় যে আবগুরু মত জাঙ্গল মাংস চকিতে পারে।

বিদ্রুধি (বড় ফোড়া) রোগে—পক্ষা-বহ্য বহু দেশজ মাংসের যুগের ব্যবস্থা আছে।

ত্রণশোথ (ফোড়া), ত্রণ (বা), সন্তোত্রণ (আবাতাদি জনিত ক্ষত) ও নাড়ীত্রণ (নাড়ী বা) রোগে—জাঙ্গল মাংসের যুগ পথ্য। জাঙ্গল ভিন্ন অজ্ঞাত মাংস অপথ্য। ঘৃত, সর্ষপ তৈল, হরিদ্রা, ধনে, দাড়িমের রস প্রভৃতি দ্বারা মাংস সংস্কৃত করা যাইতে পারে। চিনি দধি, অন্ন দ্রব্য নিষিদ্ধ।

ভগন্দর রোগে—জাঙ্গল মাংসের যুগ পথ্য।

উপদংশ রোগে—বহু দেশজ প্রাণীর মাংস পথ্য। অন্ন দ্রব্য, তক্র ও গুড় সংযোগ করিবে না।

কুষ্ঠরোগে—জাঙ্গল যুগপক্ষীর মাংস হিত-কর। ঘৃত, রক্তন, হরিদ্রা ধনে, এলাচ প্রভৃতি মসলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। দধি, অন্নদ্রব্য ও গুড় নিষিদ্ধ।

শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোষ্ঠ (চলতি কথায় আমবাত)—রোগে জাঙ্গল মাংসের যুগ পথ্য। সর্ষপ তৈল, মরিচ, আদা, হরিদ্রা, ধনে প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য। দধি, অন্ন দ্রব্য, চিনি ও গুড় বর্জনীয়। আনুপ মাংস ও মংস্ত নিষিদ্ধ।

অল্পপিত্ত রোগে—জাঙ্গল মাংসের রস পথ্য। ধনে, হরিদ্রা, তেজপাতা প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য। দধি, মরিচ, হিং প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

বিসর্প রোগে—জাঙ্গল মাংসের রস পথ্য। ঘৃত, হরিদ্রা, ধনে দাড়িমের রস, কর্পূর প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে পারে। রক্তন, লবণ, মরিচ প্রভৃতি কটু দ্রব্য ও অন্ন দ্রব্য নিষিদ্ধ, অজ্ঞাত মাংস অপথ্য।

বিষ্ফোট (বিষফোড়া) রোগে—ধ্বংসজ মাংস পথ্য।

মহুরী (বসন্ত) রোগে—পায়রা, চড়াই, ডাক, বক, চকোর এবং শুক পক্ষীর মাংস অবস্থা বিবেচনায় প্রযোজ্য। লবণ, কটু দ্রব্য ও অন্ন দ্রব্য দ্বারা সংস্কৃত করিবে না।

মুখরোগে—জাঙ্গল মাংস রস এবং পুঁটি মাছ পথ্য। ঘৃত, হরিদ্রা, ধনে, জীরা, মরিচ, এলাচ প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য। দধি, অন্ন দ্রব্য ও গুড় নিষিদ্ধ। আনুপ মাংস এবং মংস্ত অপথ্য।

কর্ণরোগে—লাব, ময়ূর, হরিণ, তিত্তির ও বহু কুক্কটের মাংস পথ্য।

নাসারোগে—গ্রাম্য ও জাঙ্গল মাংস রক্তন, দধি, ঘৃত, লবণ, মরিচ, শুঁঠ, আদা হরিদ্রা, ধনে প্রভৃতি মসলা সহ পাক করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মেত্ররোগে—লাব, ময়ূর, বহু কুক্কট,

কচ্ছপ, ফিঙ্গা ও গোরবর্ণ তিত্তিরের মাংস পথ্য। স্নাত, ধনে, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, এলাচ রসুন, কর্পূর প্রভৃতি মসলা ব্যবহার্য। নহে। অত্যাশ্র মাংস ও মংস্র অপথ্য।

শিরোরোগে—ধ্বদেদশজ মাংস, এলাচ, কর্পূর, হরিদ্রা, ধনে, দাড়িমের রস প্রভৃতি মসলা দ্বারা সংস্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বিষরোগে—ময়ূষ, তিত্তির, লাব, এণ, ইন্দুৰ ও সজার মাংস পথ্য। রসুন, সৈন্ধব লবণ, হরিদ্রা, ধনে, চিনি, তক্র প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত করা যাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত বাহা লিখিত হইল তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মাংস এদেশে স্নাত ও অস্নাত অবস্থায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। বাতরক্ত ও কুষ্ঠ রোগে এক্ষণে মাংসের ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ। কদাপি কোন কবিরাজ ঐ দুই রোগে মাংস ব্যবহার কবেন না। কিন্তু শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে মাংস পথ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

কেবল মাংস বলিয়া নহে বসা, মজ্জা এবং বক্ত ও ব্যবহৃত হইত। বসা (চর্কি) আশা-বেব উপদেশ, হেমন্ত ও শীত চর্চায় দেখা যায়। মজ্জা ( Bone marrow ) স্নেহ পানার্থ প্রযুক্ত হইত। প্রদর রোগের চিকিৎসায় লিপিত হইয়াছে যে এণ নামক হরিণের রক্ত চিনি ও মধু সহযোগে পান করিলে প্রবল বক্ত প্রদর ভাল হয়।

বহু প্রাণীর মাংস পূর্বে বহুলরূপে ব্যবহৃত হইত তাহা নিশ্চয়, কিন্তু বর্তমান সময় মাংসের

প্রচলন কমিয়া গিয়াছে। কেবল বঙ্গদেশে বলিয়া নহে ভারতের সর্বত্রই মাংসেব প্রচলন অত্যন্ত কম হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে মহা-ভারতের সময়েও বিবিধ জন্তুর মাংস যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-ধর্মের অভ্যুদয়েই ভারতে মাংস প্রচলনের এরূপ অল্পতা ঘটাইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বহু রাজা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া জীব হিংসা রহিত করিয়া দেন। এই জন্ত বৌদ্ধাচার্য্য দ্বিগকে এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত রাজগণকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের পর জৈন ধর্মও জীব হত্যার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অবশ্য সকল হিন্দুই বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মে দীক্ষিত হয় নাই, কিন্তু বৌদ্ধ রাজার আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অপিচ, বৌদ্ধদিগের সংসর্গে গুণেও অনেক হিন্দু মাংস আহার পরিত্যাগ করিয়াছিল। যে সকল মহাপ্রাণ বৌদ্ধাচার্য্য পশুগণের প্রাণরক্ষার জন্ত নিজের জীবন বিপন্ন করিতে কণামাত্র কুষ্ঠিত হয়েন নাই, সাধারণে যে তাহাদের অনুকরণ করিবে তাহা আর বিচিত্র কি।

ইহার পর শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি অনেক সন্ন্যাসী ও যোগী জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের বহুসংখ্যক হিন্দু সন্তান ঐ সকল শিষ্য বা অশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাদিগের শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবেও মাংসের প্রচলন অনেক হ্রাস পাইয়াছিল।

মাননীয়।

### শ্রীযুক্ত আয়ুর্বেদ পত্র সম্পাদক মহাশয়গণ

সমীপেষু —

মহাশয়গণ! আপনাদের বিখ্যাত মাসিক পত্র আয়ুর্বেদের এক পার্শ্বে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটির জন্য একটু স্থান দিলে বারপাশ নাই সুখী এবং একান্ত বাঞ্ছিত হইবে।

ভাষার চাতুর্য, ভাবের মাধুর্য এবং শব্দ বিভ্রাসের পারিপাট্য প্রভৃতি ভাষার যে সমস্ত গুণ থাকিলে প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকগণ সাদরে গ্রহণ করেন এবং পাঠক মহাশয়গণও আগ্রহের সহিত পাঠ করেন, আমাদের লেখায় তাহার কোনও একটা গুণও নাই; তবুও যে কেন আমরা, সুবোধ্য সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদিত সমস্ত দেশে প্রসারিত আপনাদের এই বিখ্যাত পত্রে আমাদের প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে সমুৎসুক হইলাম; তাহার কয়েকটা বিশিষ্ট হেতু আছে।

বক্ষ্যমান বিষয়টির নিজ গুরুত্ব বিবেচনায়ই উহা সমস্ত মানবজাতির জীবন মরণ ও সুখ দুঃখের সহিত, বিশেষতঃ কি বোগী কি তাত্ত্বিক কি আয়ুর্বেদী কি ভিন্ন মতের চিকিৎসক কি গুরুতা, পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমস্ত হিন্দু সন্তানগণের ধর্ম কর্মের সহিত বনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ।

এই পত্র দেশব্যাপী বলিয়া সকল স্থানের সকল বিভাগের পণ্ডিত মণ্ডলীরই ইহা আলোচনার সুযোগ হইবে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আমরা বিষয়টা উল্লিখিত মহাত্মাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব মাত্র। এবং আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি টুকুও বথাসাধ্য তাহাদের সেবায় নিযুক্ত করিব। দ্বিতীয় হেতু এই যে বিষয়টা সকল সম্প্রদায়ের আর্থ

জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তর্কটী আয়ুর্বেদ মূলক; সুতরাং আয়ুর্বেদ পত্রেই প্রচারিত হওয়া সম্ভব। আয়ুর্বেদ মূলক হইলেও উহা অনেকটা প্রাচ্য চিকিৎসা ভাবাপন্ন। আর কয়েক বৎসর পূর্বে হইলে এই বিষয়ের জন্য আমাদেরকে অনেক বেগ পাইতে হইত; কিন্তু দোষাগা ক্রমে এখন কবিরাজ মহাশয়দের মধ্যে ডাক্তারী বিভাগ্য পারদর্শী চিকিৎসক একেবারে বিরল নহে। তন্মধ্যে এই আয়ুর্বেদ পত্রের অন্ততর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরাজ এম, এ, এম্‌ব, মহাশয় এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম, এ, এল, এম, এস, বিভ্রানিধি কবিভূষণ এই ব্যক্তিদ্বয় আমাদের বিশেষ পরিচিত। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ মহাশয় উভয় চিকিৎসা বিভাগ্য পারদর্শী এবং ইহারা সকলেই কলিকাতাবাসী সুতরাং মীমাংসার জন্য এক্ষণ আর আমাদেরকে অপর কোন ডাক্তারের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। আজকাল আমাদের মাহেত্রক্ষণ! অল্পদিন মধ্যেই যে আমাদের লিখিত বিষয়ের একটা সুমীমাংসা হইবে, তৎসম্বন্ধে অহুমাত্রও সন্দেহ নাই; কাজেই আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণায় আর বিলম্ব করিব না।

কতিপয় বৎসরাবধি অনেক আয়ুর্বেদ পারদর্শী খ্যাতনামা কবিরাজ মহাশয়দ্বিগেরও এই বন্ধমূল ধারণা এবং দৃঢ় বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে, ডাক্তারী পুস্তকে লিখিত হার্ট ডিজিজ (Heart disease) এবং আয়ুর্বেদ

দের হৃদ্রোগ এই উভয় একই বোগ। এবং হার্ট (আয়ুর্বেদের ভাবায় রক্তাশয় বা রক্ত কোষ্ঠ) ও আয়ুর্বেদোক্ত হৃদর একই বস্তু (অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ)।

এই বিখ্যাস ও ধারণার স্রোতঃ পূর্বে অমর্যসলিলা ফল্গুনদীপ প্রবাহের মত লোক-দোচনের অন্তবালেই প্রবাহিত হইতেছিল; কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই স্রোতঃ এখন স্বীয়-গাত পবিপূর্ণ করতঃ ঢলের ছায় দেশের পর দেশ প্রাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্বে ইহা উক্ত মতাবলম্বী কবিবাক্ত মহাশয়দিগের ব্যবস্থা পদের এবং চিকিৎসিত বোগীর অমূল্যদান বাতীত জানার আর কোন উপায় ছিলনা। এখন কিন্তু অমূল্যদান বাতীতই উহা দৃষ্টি গোচর হইতেছে, এবং উক্ত মতাবলম্বী কবিবাক্ত মহাশয় দিগের সহিত আলোচনায় ও উক্তমতের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আমরা কিন্তু এপর্যন্ত ছোটখাট যে দুই চারিখানা, আয়ুর্বেদ সম্মত শারীর গ্রন্থ ও বোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা গ্রন্থ এবং বোগ ও তত্ত্ব শাস্ত্র আলোচনার সুবোগ পাইয়াছি, তাহার কোন ও একখানা গ্রন্থে ও উপরোক্ত মত সমর্থনোপযোগী কোন একটা প্রমাণ ও পাই নাই, পক্ষান্তরে ভূরি ভূরি বিরুদ্ধ প্রমাণই আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। আমাদের বিখ্যাস আয়ুর্বেদোক্ত হৃদ রোগ, ও ডাক্তারী গ্রন্থোক্ত হার্ট ডিজিজ এক নয়, দুইটা, ভিন্ন বোগ, সমর্থন জ্ঞাত আয়ুর্বেদ গ্রন্থ হইতে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। তজ্জন্ত কেহ যেন মনে না করেন যে, আমাদের মত দাস্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে ও আমরা সেই দাস্ত মতেরই পোষণ করিব। এই শুভ সুযোগে উপরোক্ত বিষয়ের একটা চূড়ান্ত

মীমাংসা অবশ্যই হইবে, এই মনে করিয়া প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণ বলে যে সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা অগ্রাহ্য করা কাঙ্ক্ষণ ও সাধারণ নয়। যাহা চউক আয়ুর্বেদোক্ত হৃদ্রোগ, এবং ডাক্তারী গ্রন্থোক্ত হার্টডিজিজ (Heart Disease) অর্থাৎ (প্রতি পক্ষের ভাবায় কথিত হৃদ্রোগ) এক কিনা, এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত অতি সম্বর হওয়া আবশ্যক। এই সিদ্ধান্তে উপ-নীত হইতে হইলে আমাদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিতে হইবে—

(ক) হৃদয় অর্থাৎ হৃদয়, ও হার্ট অর্থাৎ রক্তাশয় বা রক্ত-কোষ, এই উভয়ই এক না ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দুইটা পদার্থ?

(খ) এক জাতীয় পদার্থ হইলে ও উভয়ে একই পদার্থ (অঙ্গ) কিনা?

(গ) বিভিন্ন জাতীয় হইলে, কোনটা কোন জাতীয়, এবং কোনটার স্থান কোথায়, এবং আকৃতি গত, ক্রিয়া গত (Functional) ও গুণ গত উহাদের কোন নাম্য আছে কিনা, অথবা সর্বাংশে বৈষম্য?

(ঘ) হার্ট ডিজিজ (Heart disease) ও আয়ুর্বেদোক্ত হৃদ রোগ, এই উভয়ের সংগ্রাণ্ডি, রূপ (রোগলক্ষণ) নিদান (রোগের কারণ) ও চিকিৎসা প্রণালীর ঐক্য আছে কিনা। যদি ডাক্তারী পুস্তকে লিখিত ঐ সব বিষয়ের সহিত, কবিবাক্ত পুস্তকে লিখিত ঐ সব বিষয়ের মধ্যে এক কি-ততোধিক বিষয়ের কিছু ঐক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কোন কোন বিষয়ে কি পরিমাণে ঐক্য এবং ঐ ঐক্যবলে হার্ট ডিজিজকে হৃদ্রোগ বলা যায় কিনা? এবং আয়ুর্বেদোক্ত হৃদ্রোগের ঐক্য

দ্বারা তাহার (হার্ট ডিজিজের) চিকিৎসা চলিতে পাবে কি না ?

উপরে যে যে বিষয় আলোচনা করার কথা উল্লেখ করা হইল, তদ্বিষয়ে সম্যক আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থই (শাস্ত্র) প্রধান অবলম্বন; সুতরাং তাহা হইতেই প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল, এবং নর্রসাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে শোকগুলির বাস্তবতার অর্থ করিয়া দেওয়া হইল।

(খ) (গ) হৃদয় ও রক্তকোষ (Hcart) এই উভয়ের আকৃতি, এবং কার্যগত সাম্য ও বৈষম্য সম্বন্ধেই প্রথম আলোচনা করা যাইবে।

ভাবমিশ্র সঙ্কলিত ভাবপ্রকাশ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর সেন কবিরত্ন মহাশয় দ্বারা অমুদ্রিত ও সংশোধিত, বৈদ্যমাধব দে এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত পূর্বখণ্ড ৪২ পৃষ্ঠা।

১। “হৃদয়ং পুণ্ডরীকেশ সদৃশং শ্রাদধো মুখং।

জাগ্রত স্তব্ধ বিকশতি স্বপ্নস্তব্ধ নিবীণতি।

আশয়ন্তত্, জীবন্ত চেতনাস্থান মুক্তমম্।

অর্থ—হৃদয় আকারে পদ্মপুষ্প সদৃশ অধোমুখ; ইহা জাগ্রদবস্থায় বিকশিত এবং নিদ্রাবস্থায় মুদ্রিত থাকে, এবং উহা জীবের উত্তম চেতনাস্থান।

এখানে দেখা গেল, হৃদয় পদ্ম সদৃশ অধো-মুখ, আর হার্ট অর্থাৎ রক্তাধার উর্দ্ধে ন্যূন, এবং অধোদিকে কুঞ্জ; একটা খলিয়ার আকার ও উর্দ্ধমুখ। হৃদয় নিদ্রিতাবস্থায় মুদ্রিত থাকে, হার্ট জীবের চিরনিদ্রাবস্থায় পূর্বে মুদ্রিত হয় না। উহার মুখ উর্দ্ধদিকে, তৎসংলগ্ন হৃৎটী শিরার একটী দ্বারা নিদ্রিত কি জাগ্রত সকল অবস্থায়ই বিস্তৃত রক্ত, আর একটী সিরী দ্বারা অগুচ্ছ রক্ত, সর্বদাই প্রবা-

হিত হইতেছে। হৃদয় চেতনাস্থান, জীবের চৈতন্য সম্পাদন ইহার কার্য, আর হার্ট বা রক্তাশয়—রক্তস্থান (আয়ুর্বেদ মতে যকৃত ও প্লীহা রক্তস্থান) সর্বশব্দে রক্ত সঞ্চালন ইহার একমাত্র কার্য। পাঠক দেখিলেন হৃদয়ের সহিত হার্টের (Heart) ত্রিবিধগত, আকৃতিগত কোন সাদৃশ্যই নাই।

ঐ ভাবপ্রকাশ উক্ত খণ্ড ৪৩ পৃষ্ঠা—

২। “শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ রক্তবাহিসিরাণাং স মূলংখ্যাতে মহর্ষিভিঃ ॥

\* \* \* \*

অধো দক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াদ্ যকৃতঃ স্থিতিঃ ॥১১

অর্থাৎ হৃদয়ের বামাদ্যোদিকে প্লীহা—ইহাকে মহর্ষিগণ রক্তবাহি সিরী সকলের মূল বলিয়াছেন আর হৃদয়ের দক্ষিণাধোদিকে যকৃত অবস্থিত। এই শ্লোকোক্ত হইতে আমরা এই দেখিতে পাইলাম যে প্লীহা ও যকৃত এই দুইটী যথাক্রমে হৃদয়ের বাম ও দক্ষিণ অধোদিকে। সুতরাং হৃদয় এই দুই মন্ত্রেরই কিয়দূর উপরে এবং ঠিক মধ্যভাগে। আর হার্ট যে বক্ষের বামোর্দ্ধপার্শ্বে তাহা সর্বসম্মত।

হার্টের (রক্তাশয়) উর্দ্ধভাগের অতি সামান্যভাংশ মাত্র বক্ষের ঠিক মধ্য রেখার উপর থাকিলেও উহা যকৃত প্লীহার এত উর্দ্ধে যে ওদলম্বনে যকৃত প্লীহার স্থান নির্দেশ কোন-রূপেই পণ্ডিতাগ্রগণা আয়ুর্বেদ-লেখকের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। হার্টকে হৃদয় ধরিলে আর প্লীহার বেলায় (বামতো হৃদয়াদধঃ) বলিতে হইত না। শুধু হৃদয়াদধো বলিলেই চলিত। আর যকৃতের নির্দেশও এই শ্লোক দ্বারা কোনও মতেই হইতে পারে না। সুতরাং এই শ্লোকস্থ হৃদয় শব্দ দ্বারা হার্টকে বুঝাইবার আশা হ্রাস্য।



আমাদের সুবিধার মধ্যে আমরা এই শ্লোক দ্বাৰা ইহাই মাত্র নিশ্চয় করিতে পারিলাম যে স্নায়ুটা কিঞ্চিৎ উৰ্দ্ধে হইলেও গ্নীহাযুক্ততের সমদূরবর্তী। অর্থাৎ বক্ষের ঠিক মধ্যে কোন স্থলে অবশ্যই হইবে।

হৃদয়-স্বন্ধে মীমাংসার প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিতে হইলে, শারীর স্থান এবং চিকিৎসা স্থান এবং অস্ত্রাঙ্ক স্থান হইতেও আমাদিগকে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। হয়ত অস্ত্রাঙ্ক গ্রন্থের আশ্রয়ও লইতে হইতে পারে, কাজেই প্রবন্ধ কিছু দীর্ঘ হইয়া উঠা অসম্ভব নয়। আশা করি পাঠক মহাশয়গণ তজ্জ্ঞ ক্ষমা করিবেন।

প্রতিপক্ষ বলেন, হার্টে (রক্তাশয়ে) যাও-রাব পর রস, রক্তবর্ণ ও রক্ত নাম প্রাপ্ত হয়। এই উক্তির সন্ধে ও আমাদিগকে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে হইবে। এবং তাঁহাদের অপরাপর আপত্তিগুলি ও খণ্ডন করিতে হইবে। এবং আমাদের স্বমত স্থাপন জ্ঞাতও চেষ্টা করিতে হইবে। এখন হইতে আমরা ঐ দুই বিষয় মনে রাখিয়াই চলিতে চেষ্টা করিব। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি বাধ্য হইয়াই করিতে হইবে। তবে চেষ্টা করিয়া যতদূর সংক্ষেপ করা যায় তৎসন্ধে চেষ্টার ক্রটি করিব না। পূর্বেই বলিয়াছি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিব। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত আমরা চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের প্রমাণ উপস্থিত করিব না।

নিম্নে তাহারই চেষ্টা করা গেল।

বায়ু পিত্ত কফ এই তিন লইয়াই আয়ুর্বেদে নতৈ বাহ্য ও রোগ; স্তত্রাং ঐ গুলি সন্ধে কিছু আলোচনা না করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি উপায়াস্তর নাই। উক্ত দোষত্রয় মধ্যে আবার

বায়ুই সর্কপ্রধান; কাজেই বায়ুর বিষয়ই প্রথম উল্লেখ করা গেল।

ভাবপ্রকাশ উক্ত খণ্ড ৪৮ পৃঃ—

বায়ুর স্থান ও নাম—

৩। উদান স্তদন্থ প্রাণঃ সমানোহপান এবচ।

৫। ব্যানশ্চৈতানি নামানি বায়োঃ স্থান প্রভেদতঃ  
স্থানভেদে ১ উদান, ২ প্রাণ, ৩ সমান, ৪ অপান, ৫ ব্যান, বায়ুর এই পাঁচ নাম।

উহাদের স্থান —

১ ২ ৩ ৪  
৪। কঠে হৃদি তথাধস্তাৎ কোষ্ঠবল্লেম্শাশয়ে।

৫। সকলেহপি শরীরেহসৌ ক্রমেণ পবনোবসেৎ ॥

অর্থাৎ ১ উদান, ২ প্রাণ, ৩ সমান, ৪ অপান, ৫ ব্যান, উহাদের স্থান যথাক্রমে—  
১ কঠ, ২ হৃদয়, ৩ অন্নায়, ৪ মলায় এবং ৫ সর্কশরীর।

৫। যো বায়ুঃ প্রাণ নামীহসৌ মুখং গচ্ছতি দেহবৃক্ষ সোহন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে।  
প্রায়শঃ কুরুতে হৃষ্টো হিষ্কাখাসাদিকান্গদান্ ॥

অর্থ—প্রাণ নামক বায়ু মুখে গমন করতঃ  
অন্নাদি ভিতরে (আম্নাশয়ে) প্রবেশ করায়।  
ঐ বায়ু হইতে হিকা খাসাদি রোগ জন্মায়।  
ইহা দ্বারাও বুঝা যায় যে, রক্তাশয় (Heart) হৃদয় হইলে, এবং তাহা প্রাণ বায়ুর স্থান হইলে, রক্তাশয়ই বায়ু ভুক্তদ্রব্য আম্নাশয়ে (Stomach) না লইয়া (Heart) রক্তাশয়েই লইয়া বাইত। আর Heart হিকাও উৎপত্তি স্থান হইত; এবং রক্ত বমন হিকা রোগে একটা সাধারণ লক্ষণ থাকিত। কার্যতঃ তজ্জপ বটে কিনা তাহার উল্লেখ নিম্নরোজন।

অতঃপর পিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

পিত্ত সকলের নাম :—

৬। পাচকং রঞ্জকঞ্চাপি সাধকালোচকে তথা।

৫। ভ্রাজকঞ্চৈতি পিত্তস্তানামানি স্থানভেদতঃ।

পাচকাদি পিত্তের স্থান :—

৭। অন্যাশয়ে যকৃৎপ্রীহ্নোঃ হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে।

৫। ষ্টি সর্বশরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ।

অর্থাৎ ১ পাচক পিত্ত অন্যাশয়ে ২ রঞ্জক যকৃৎ প্রীহায়, ৩ সাধক হৃদয়ে, ৪ আলোচক লোচনদ্বয়ে ৫ এবং ভ্রাজক পিত্ত সর্ব শরীরের স্বকে যথাক্রমে অবস্থান করে।

ভাবপ্রকাশ ঐ খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা—

৮। রঞ্জকং নাম যং পিত্তং তদসং শোণিতং নয়ং যন্তু সাধকং সংজ্ঞা তৎকুর্যাদ্ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিম্।

ভাবার্থ—রঞ্জক নামক যে পিত্ত ঐ পিত্তই রসকে রক্তরূপে পরিণত করে; আর সাধক নামক পিত্ত বুদ্ধি, ধৃতি ও স্মৃতি উৎপাদন করে। উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না যে, রঞ্জক পিত্ত দ্বারাই রস রঞ্জিত (রক্তবর্ণ প্রাপ্ত) হইয়া রক্ত নামে খ্যাত হয়। না—এখনও বলিতে চান রক্ত-কোষে যাইয়া রস রক্তবর্ণ হইয়া রক্ত নাম প্রাপ্ত হয়। উক্ত মতাবলম্বী কবিরাজমহোদয়গণ নাকি শব্দচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন, রক্তাধারে অর্থাৎ হার্টের চারিটা গর্ভের দুইটায় নাকি রস থাকে!

এই দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া এবং শারীর স্থানের “রসস্ত হৃদয়স্থানং—শ্লোক ধরিয়া তাহারা বলেন; “যেহেতু Heart

অর্থাৎ রক্তাণয়ের একদিকের দুই কোঠে রস থাকে, তখন এটা ত প্রত্যক্ষ প্রমাণেই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, হার্ট আর হৃদয় একই?”

এরূপ দেখিয়া থাকিলে কেমন করিয়া কোন মুখে বলিব Heart আর হৃদয় এক নয়, ডাক্তারবাবুদের কাছেও নাকি তাহারা হার্টের এক দেশে রস থাকার কথা শুনিয়াছেন। একেত প্রত্যক্ষ তত্পার আবার আপ্তবাক্য, এর চেয়ে অধিক প্রমাণের আর প্রয়োজন কি?

কিন্তু আমরা কোনও ভাল ডাক্তারকে ঐরূপ বলিতে শুনি নাই। আর নিজে, নরদেহ ব্যবচ্ছেদ করা দূরে থাকুক, অপর কাহাকেও নরশব ব্যবচ্ছেদ করিতে দেখি নাই। আমরা পাঠা কাটিয়া কিন্তু পাঠার রক্তকোষে রস দেখি নাই। উক্ত কবিরাজ মহোদয়েরা স্বয়ং দেখিয়াছেন এবং কোন কোন ডাক্তার বলিয়াছেন, তা বলিয়া ঐ কথাই ঠিক বা উহা মানিয়া লইতেই হইবে এমন কথা স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ ডাক্তার মহোদয়গণই মত প্রকাশের মুখ্য অধিকারী। তাহারা (Heart) হার্টে রস দেখিয়া থাকিলে অমুগ্রহপূর্বক জানাইলে বাধিত হইব।

আমরা কিন্তু শাস্ত্রের দাস, শাস্ত্রানুশাসনেই চলিব। তা যাহা হউক, পূর্বোক্ত শ্লোক পাঠে আমরা ইহাও পাইলাম যে, হৃদয় স্থিতি ও ধৃতির স্থান। উক্ত শ্লোকের, “তদসং শোণিতং নয়ং” ইত্যাদি উল্লেখ দ্বারাও যদি পিত্ত সংযোগে রসের রক্তরূপ প্রাপ্তি স্বীকার না করেন, তবে আর কিয়দূর অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইব—

ভাব প্রকাশ ৩০ পৃষ্ঠা—

৯। “বদা রসো যক্লং যতি তত্র রঞ্জক-পিত্ততঃ ।  
রাগং পাকঞ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্রক্তসংজ্ঞকঃ ॥”

অর্থ—রস যক্লং প্রাপ্ত হইয়া, তথায় রঞ্জক  
পিত্তদ্বারা (রঞ্জক পিত্ত হইতে) বর্ণ ও পাক  
প্রাপ্ত হইয়া রক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ।

অন্তঃপর শ্লেক্ষা সৃষ্টিকে লিখিত হইল :—

ভাবপ্রকাশ ঐ খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা—

১০। “কফশৈত্যানি নানানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ ।

৩ ৪ ৫  
বসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষণঃ স্থানভেদতঃ ।”  
স্থানাত্মা—

১ ২ ৩ ৪ ৫  
১১। “আমাশয়েহ্থ হৃদয়ে কঠে শিরসি সন্ধিষু  
নাম যথা—

১ ২ ৩ ৪ ৫  
ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন, ও শ্লেষণ ।  
ইহার যথাক্রমে,—

১ ২ ৩ ৪ ৫  
আমাশয়ে, হৃদয়ে, কঠে, শিরে এবং সন্ধি  
সমূহে বাস করে ।

এস্থলে আমরা রস সঞ্চকে কয়েকটি বিষয়ের  
খালোচনা না করিলে; মহাপণ্ডিত হইলে ও  
আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী বাতীত অন্তান্ত  
শাস্ত্রে কৃতবিদ্য বা কৃতশ্রম ব্যক্তিদিগকে  
আমাদের কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝাইতে  
পারিব না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই রস সঞ্চকে  
এক্ষণে কোন কোন বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা  
না করিয়া পারিলাম না। রস কথাটা, পাঠ  
করিয়া স্বভাবতঃই নানা ব্যক্তি নানা রকম  
বুঝিতে পারেন, তাহাদের জন্য বিশেষতঃ  
আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় হৃদয়ের প্রমাণ ও  
আমরা উপযুক্তরূপে করিয়া উঠিতে পারিব না।

অতএব রস কি তাহার বর্ণ ও আকার কি,  
এবং কার্য কি এবং রসের স্থানই বা কোথায়  
যথা সম্ভব সংক্ষেপে এক্ষণে তাহার আলোচনা  
করিব।

প্রথমতঃ রস পদার্থটা কি ? ও তাহার  
গুণই বা কি তাহা বলিতেছি।

১২। সম্যক পক্কস্ত ভুক্তস্ত সারো নিগদিতোরসঃ  
সতু দ্রবঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদুঃ মিথুনশ্চলো ভবেৎ ॥

অর্থ—ভুক্ত দ্রব্য জাঠরাগ্নি দ্বারা সম্যক  
প্রকারে পরিপাক পাইয়া, তাহা হইতে যে সার  
উৎপন্ন হয়, তাহাকেই রস বলা যায়। এই  
রস—দ্রব (তরল), স্বেতবর্ণ, শীতল, মধুর মিথুন  
ও গতিশীল।

রসস্ত স্থানমাহ ।—

১৩। সর্ব-দেহ-চরস্তাপি রসস্ত হৃদয়ং স্থলম্ ।  
সমানমরুতা পূর্ব্বং যদয়ং হৃদয়ে ধৃতঃ ॥

রস সর্ব শরীর সঞ্চারী হইলেও হৃদয়কেই  
ইহার স্থান বলা যায়। কেন না—পূর্ব্ব  
হৃদয়ে যায়, এবং ইহার স্বকীয়্যাংশ সর্বদাই  
হৃদয়েই থাকে। প্রমাণ—যথা—রসস্ত  
সমান বায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেন শরীর-  
রন্তকস্ত রসস্ত স্থানং হৃদয়ং গত্বা তেন সহ  
মিশ্রিতো ভবতি। এখানেও রসস্ত হৃদয়ঃ স্থানং  
বলা হইয়াছে; কিন্তু ‘রন্তকস্ত’ ত বলা হয় নাই।  
‘রন্তকস্ত বেতি’ এমন ও ত বলা হয় নাই। তবু  
ও কি বুঝিতে হইবে যে রস এবং রন্তাধার  
একই।

টীকা যথা—“মর্ষৈক দেশে—হৃদয়ৈক  
দেশে” উক্ত ত্যাংশের সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ এই—

“ত্রিদোষজ হৃদ রোগে যে হৃদ্রোগা তিল,  
ক্ষীরাদি (হৃদ্রাদি) সেবন করে তাহার আহার-  
জাত রস ক্লিন্নতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিগত হইতে  
পারে না। ক্লিন্ন (অস্বচ্ছ) রস হৃদয়ে বাইরা

সম্যক্ ক্রিয়া প্রাপ্ত (পুষ্ট) হয়। ঐ পুষ্ট রস হইতে ক্রিমি জন্মে, ক্রিমির কণ্ডুয়ন জন্ত হৃদয়ে গ্রন্থি জন্মে। অর্থাৎ ফুলিয়া উঠে। এস্থলে আমাদের অনুকূলে অনেক কথা ছিল; কিন্তু আপাততঃ পাঠক মহাশয়দের বিরক্তি আশঙ্কায় ঐ সব বলিতে বিরত রহিলাম। আমাদের উক্তির প্রতিবাদ দেখিলে বারান্তরে ঐ সব বিবৃত করা যাইবে।

সুশ্রুতের ক্রিমিরাগপ্রতিষেধাধ্যায় সূত্র-  
স্থান ৪৩অঃ উক্ত হইয়াছে—

“শ্লাগ্নিমাল্যাপাধুঃ বিষ্টম্বলসংক্ষয়াঃ  
প্রসেকারচিহ্নদ্রোগবিভ্রভেনাস্ত পুৰীষজে”  
ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক।

ডাক্তারী গ্রন্থে হাট্টিজিজের নানা প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু ক্রিমি জন্ত হৃদ রোগ আছে কিনা তাহা বিতণ্ডাবাদিগণ বলিতে পারেন।

নিরপেক্ষ সূর্যী পাঠক গণের অবগতির জন্ত এখানে সুশ্রুতোক্ত হৃদ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতির একটুকু উল্লেখ করিতেছি।

“বাতোপস্থষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধ মাতুরম্  
দ্বিপঞ্চ মূলকাথেন সম্বেহলবণেন তু”

“ত্রিপর্ণীমধুকফোদ্রসিতোৎপলজলৈর্বনেৎ  
পিত্তোপস্থষ্টে হৃদয়ে সেবেত মধুরৈঃ শৃতম্”

“বচানিষকষায়াভ্যাম্ বাস্তং হৃদি কফাশ্মকে”

“হৃদয়গত পতন্ত্যেব মধস্তাৎ ক্রিময়ো নৃণাম্”

উপরোক্ত স্থলে কাশিরাজ ধ্বস্তরি স্বীয় শিষ্যকে উপদেশ করিতেছেন—

পূর্বের রসের স্বকীয়াংশ বলিয়া যে বলা হইল, তৎসম্বন্ধে একটুকু না বলিলে কথাটা সর্বসাধারণের বোধগম্য হইবে না। তাই কথাটা একটু প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক।

১৪। রসস্ত হৃদয়ং যাতি সমান মারুতেরিতঃ  
সহু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্বান ধাতুন্ বিবর্কয়েৎ।  
রসস্ত তত্র তত্র ত্রিধা বিভজ্যতে ॥

অর্থঃ—রস সমান বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া রসবাহিনী ধমনী পথ দ্বারা শরীর-রম্ভব স্থায়ী রসস্থানে হৃদয়ে নীত হইয়া তত্রস্থ স্থায়ী রসেব সহিত মিশ্রিত হয়। তৎপরে ব্যান বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া রসাদি গুরুত্ব সমস্ত ধাতুর পোষণ করে। চরকে উক্ত হইয়াছে :—

১৫। “স্থূলঃ সূক্ষ্মতন্মলশ্চ তত্রতত্র ত্রিধা রসঃ  
স্বয়ং স্থুলোহংশঃ পরং সূক্ষ্মতন্মলং যাতিতন্মলঃ।

অর্থ—রস তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও তন্মল ভাগ (ধাতুর মলাংশ), স্থূল ভাগ (স্বকীয়াংশ) পূর্বোক্ত রূপে হৃদয়ে নীত হইয়া ধাতু অর্থাৎ রক্ত হইতে গুরু ধাতু পর্দান্ত প্রত্যেক ধাতুর পোষণ করে এবং তন্মল ভাগ ধাতু সমূহের মলক প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ রস পরিপাক পাইয়া তাহার স্থূলভাগ রসই থাকে, সূক্ষ্মভাগ প্রথমতঃ পরধাতু রক্তের পোষণ করে ও তন্মল ভাগ কফরূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ রস ধাতুর মল কফ, রক্ত ধাতুর মল পিত্ত, মাংস ধাতুর মল কর্ণ ও নাসিকাদির মল, এবং মেদের মল, ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

কেন রস সম্বন্ধে এত কথা লেখা হইল, আয়ুর্বেদের পাঠক মহাশয়গণ নিজেরাই তাহা বুঝিবেন। অজ্ঞাত লোকের বুঝিবার জন্ত নিম্নে তাহার কারণ উল্লেখ করিতেছি।

প্রতি পক্ষের প্রথম আপত্তি এই যে তাঁহার Heart অর্থাৎ রক্তাশয়ের দুইটা প্রকোষ্ঠে রস দেখিয়াছেন, আমরা রস সম্বন্ধে যে কতিপয় শ্লোক (১২—১৫) উদ্ধৃত

করিয়াছি, পাঠক মহাশয় তদ্বারা দেখিতে পাইবেন যে রস (আহারীয় বস্তুর সারাংশ) প্রথমে তাহা হৃদয়ে যায়, তৎপরে অপরপর ধাতু (রক্তাদি ধাতুর) সহিত মিশ্রিত হওয়ায় পুর্বেই রক্তক পিত্তসহযোগে রক্তরূপে পরিণত হয়। সূক্ষ্মাংশ বাহ্যে রস নামেই পরিচিত, তাহা স্বকীয় স্থান হৃদয়েই থাকে—আর তাহাব বর্ণ শ্বেত। হার্টের এক প্রদেশে যাহাব রস দেখাইয়াছেন সেই রসের বর্ণটা শ্বেত, পীত কি লোহিত তাহা তাহার অবস্থাই বলিতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রোক্ত হৃদয়েব কোন স্থানেও রক্ত নাই, সূত্রবাং হাটেব চারিটা প্রকোষ্ঠের ছইটার যদি কেহ বস দেখিয়াও থাকেন, তবু তদনুসারে তাহাকে হৃদয় বলা ত শাস্ত্র কর্তাদের অভিপ্রেত বলিয়া কোন প্রমাণ নাই!

বাস্তবিক অর্দ্ধাংশে রসের স্থান, অর্দ্ধাংশে বক্তব্য স্থান, এমন একটা কিছুত কিমাকার যথেষ্ট নামও আমরা কাহারও মুখে কোন কালে শুনি নাই।

হৃদয়ে সাধক নামক পিত্ত আছে, হৃদয়ে অবলম্বন নামক শ্লেষ্মাও রহিয়াছে এবং প্রাণ নামক বায়ুও রহিয়াছে। হৃদয়ে থাকিয়া প্রাণবায়ু যে কার্য করিতেছে তাহা আমরা পক্ষম শ্লোকে দেখাইয়াছি। হাটে বায়ু ঐ ঐরূপ কার্য কিছু নাই। সাধক নামক পিত্তেব গুণ ৮ম শ্লোকে আছে অর্থাৎ হৃদয়ের বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতিরূপ কার্যের কারণ ঐ সাধক পিত্ত। বিতণ্ডাবাদিগণের ইহাও দেখা কর্তব্য যে হাট (রক্ত-কোষ্ঠে) বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি শক্তি আছে কি না! অর্থাৎ হাট হৃদয়ের মত বুদ্ধি স্থান কিনা, হৃদয়স্থ শ্লেষ্মার

নাম অবলম্বন। এখন অবলম্বন শ্লেষ্মার কার্য কি তাহাও দৃষ্টব্য।

১৬। রসযুক্তান্নবর্ষণে হৃদয়স্থাবলম্বনঃ

ত্রিকসন্ধারণকাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ।

অর্থ—হৃদয়স্থ অবলম্বন শ্লেষ্মা বস (হৃদয়স্থ) সহযোগে আয়তশক্তি দ্বারা হৃদয় অবলম্বন এবং ত্রিকের সন্ধারণ করে। ত্রিক অর্থে এখানে শিরোবাহুদ্বয় সন্ধি।

উপরোক্ত স্থলে পাঠক মহাশয়গণ দেখিতে পাইলেন যে (গ) হৃদয়ের ক্রিয়া ও গুণ কি, এখন হাটে আমরা উহার কোন একটা গুণ বা ক্রিয়া দেখিতে পাই না। সূত্রবাং হৃদয়ের সহিত হাট (রক্তাশয়ের) ক্রিয়াগত বা গুণগত কোন সাম্যই নাই। তবে আমরা কি করিয়া বুঝিব যে, হৃদয় আর হাট একই পদার্থ (অঙ্গ)?

এখন আমরা হাট (রক্তাশয় বা রক্তকোষ্ঠ) এবং হৃদয় এতদ্বয়ের জাতি ও স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব, এবং উভয়ের মধ্যে এই ছই বিষয়ের কি পার্থক্য বা ঐক্য আছে তাহার অনুসন্ধান করিব।

অনেকেই অবগত আছেন হাট (রক্তাশয়টা) বক্ষঃ প্রাচীরের অনেকটা ভিতরের দিকে, এবং কণ্ঠ হইতে ক্রমে নিম্নদিকের পঞ্জরাস্থির মধ্যে। বাম দিকের পঞ্জরাস্থি অর্থাৎ দ্বিতীয় পাঞ্জরার নিম্ন হইতে প্রায় ৬ষ্ঠ পঞ্জরাস্থি পর্যন্ত লম্বা; এবং এটাবে মাংস নির্মিত তাহাও বোধ হয় অধিকাংশ লোকই জানেন, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় আর বেশী কথা লেখার প্রয়োজন নাই।

তবে হৃদয়টা কোন্ জাতীয় কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত অঙ্গ তাহাই আমাদের এখানে আলোচ্য।

ভাব প্রকাশ আশ্রয়পক্রমে বলিতেছেন।  
৭০ পৃষ্ঠা ঐ খণ্ড।

১৭। নাভে বিত্তিস্তমাত্রক কণ্ঠদেশাৎ  
ষড়ঙ্গুলম্। উরস স্তদ বিজানীয়াৎ শেষেতু হৃদয়ঃ  
মতম্। উরো রক্তাশয় স্তম্বাদধঃ শ্লেয়াশয়ঃ স্তম্বতঃ  
আমাশয়ঃ স্তম্ব তদধঃ দগনাশয়ঃ ইতি ॥

উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ কিছু জটিল।  
আমরা পৃথক পৃথক এডিসনের ২১৩ খানা  
বহি দেখিয়া ও তুণ্ডি লাভ করিতে পারি-  
লাম না।

আমরা উহার অর্থ ও অর্থ যেক্রপ হওয়া  
সঙ্গত মনে করিয়াছি তাহা পরে দেওয়া হইল।  
আমরা যে দুইখানা বহির অনুবাদ পাঠ করি-  
য়াছি তাহার এক খানার অনুবাদ এস্থলে  
উদ্ধৃত করিলাম।

“নাভি হইতে ১২ অঙ্গুলি উর্দ্ধে ও কণ্ঠ  
দেশ হইতে ৬ অঙ্গুলি নিম্নে এই দুইয়ের মধ্যে  
যে স্থান টুকু অবশিষ্ট থাকে তাহাকে উরঃ স্থল  
বলে, এই উরঃস্থলই রক্তাশয়। উরঃস্থল ও  
কণ্ঠ দেশের মধ্যগত স্থানকে হৃদয় বলে।  
রক্তাশয়ের নিম্নে (সুতরাং উরঃস্থলের নিম্নে)  
শ্লেয়াশয়, শ্লেয়াশয়ের নিম্নে আমাশয়, এবং  
আমাশয়ের নিম্নে অগ্ন্যাশয়।

কিন্তু শ্লোকের অর্থ গ্রহে নাই, সুতরাং  
আমরা এই অর্থের সঙ্গতি বুঝিতে পারি নাই।  
আপনাদের পাঠকের মধ্যে আয়ুর্বেদের ও  
অত্রাণ্ড সংস্কৃত গ্রন্থের বহু পণ্ডিত আছেন,  
আপনারাও প্রধান পণ্ডিত। ঐ অর্থ সম্বন্ধে  
আমরা কোন কথা বলিতে অক্ষম।

আমাদের কৃত অন্তর, অনুবাদ ও অর্থ  
নিম্নে দেওয়া গেল।

অন্তর—“নার্ভেবিত্তিস্তি মাত্রঃ (পরিত্যজ্য)  
কণ্ঠদেশাচ্চ ষড়ঙ্গুলং (পরিত্যজ্য) উরসঃ

শেষে তু যৎ (স্থলং) তৎ হৃদয়ঃ বিজানীয়া-  
দিতি মতম্”

তন্নিম্নে “উরোরক্তাশয়” বলিয়া যে শ্লোক,  
ঐ শ্লোকের “উরোরক্তাশয়ঃ” এই টুকুর সহিত  
আমরা ঐক্য হইতে পারি নাই, ঐ স্থলে ‘উরঃ  
ই রক্তাশয়’ অনুবাদ কবিয়াছেন। কিন্তু আমা-  
দের মতে উরসি (উরঃদেশে=বক্ষঃস্থলে)  
রক্তাশয়ঃ, তন্নিম্নে, শ্লেয়াশয়, তন্নিম্নে আমাশয়,  
এবং আমাশয়ের নিম্নে অগ্ন্যাশয় বা গ্রহণী।

বিবরণটা এই—প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতা  
বা দৈর্ঘ্য যেমন তাহার আপন হাতেব আ.  
সার্কি তিন হাত পরিমিত, তেমনই প্রত্যেক  
ব্যক্তির নাভি হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত স্থানের  
পরিমাণ ও ২২ দ্বাবিংশ অঙ্গুলি।

পূর্বোক্ত শ্লোকের অর্থ আমরা যেক্রপ  
বুঝিয়াছি তাহা নিম্নে লেখা গেল। আমাদের  
কৃত অর্থ সমীচীন কিনা বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়-  
গণ বলিতে পারেন।

অর্থ—নাভি হইতে (সোজাভাবে) উর্দ্ধে  
বিত্তিস্তি (১২ অঙ্গুল) এবং কণ্ঠদেশ হইতে  
(সোজাভাবে) ৬ অঙ্গুলী মোট আঠার ১৮  
অঙ্গুলির শেষ (অবশিষ্ট) অর্থাৎ বাদ  
যাইয়া উরঃদেশের (বক্ষের) যতটুকু বাকি  
থাকে তাহাই হৃদয় (হৃদয়ের পরিমাণ)  
আমরা এইমাত্র বলিলাম নাভি হইতে কণ্ঠ  
পর্য্যন্ত স্থানের পরিমাণ ২২শ অঙ্গুলি, তাহা  
হইতে উপরোক্ত ১৮ অঙ্গুলি বাদ দিলে ২২  
অঙ্গুলির বাকী থাকে ৪ অঙ্গুলি এখন যদি  
আয়ুর্বেদোক্ত হৃদয়টার পরিমাণ ও চারি  
অঙ্গুলি হয় তবে বোধ হয় আমাদের কৃত অর্থে  
কাহারও আপত্তি হইবে না।

উপরোক্ত শ্লোকে “উরোরক্তাশয়ঃ স্তম্বাদধঃ  
শ্লেয়াশয়ঃ স্তম্বতঃ। আমাশয়ঃ স্তম্ব তদধঃ” বলিয়া

পক্ষ বলেন যে—শ্লেষ্মাণয়ের নিয়ে আমাশয় বলায় উহাদের উভয়ের মধ্যে হৃদয় নামক একটা অবয়ব থাকা সাব্যস্ত হইতেছে না, বরং না থাকাই সাব্যস্ত হইতেছে।

এতদন্তরে বক্তব্য এই যে—

গ্রন্থকার গ্রন্থের অংশাংশে বক্ষাহুরোধেই হৃদয়েব নাম উল্লেখ করেন নাই। আশ্রয়প-ক্রমে এখানে আশ্রয়েব কথাই বলিয়াছেন। হৃদয়কে আশ্রয় মধ্যে পরিগণিত করিয়া এখানে তাহাব অনুলেখে অবশ্যই কিছু দোষও ঘটিত এবং উক্তরূপ সন্দেহের ও কিছু কাবণ হইত।

শারীর স্থানে প্রত্যেক অঙ্গের জাতি বিভাগ ক্রমে এক জাতীয় অঙ্গের পর আর এক জাতীয় অঙ্গের বিষয় লিখিত হইয়াছে। হৃদয় মধ্য জাতীয়, তাহা একটুকু পরেই বিবৃত হইবে।

হৃদয়েব জাতি ও স্থান নির্ণয় করার পূর্বে মধ্য কাহাকে বলে তাহাই অগ্রে নির্দেশ করা কর্তব্য।

মর্ম্মের সংজ্ঞা :—

“দগ্নিপাতঃ শিরাম্নায়ুসন্ধিমাংসাস্বিসম্ভবঃ”

‘মর্ম্মাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ’

অর্থাৎ শিরাম্নায়ু মাংস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদার্থের একাধিক বস্তুর একত্র সম্মিলন স্থানকেই মর্ম্ম বলে। যথা দুই বা তিনটা দেবাব মিলন স্থানকে সিরামর্ম্ম; দুই তিন অঙ্গের মিলন স্থান মাংস মর্ম্ম ইত্যাদি।

বিভিন্ন জাতীয় মর্ম্ম সমষ্টির সংখ্যা একশত ত (১০৭) নির্দেশ করতঃ পুনঃ সত্ত্ব মারক প্রভৃতি পাখা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। দ্বয় এই সত্ত্ব মারক ১২টী মর্ম্মের প্রধান। এবার ১০৭টী মর্ম্মের মধ্যে যে তিনটীকে প্রধান বলিয়াছেন তন্মধ্যে ও হৃদয় প্রধান।

সুতরাং মানব দেহে হৃদয় প্রধান মর্ম্ম তাহাব আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হৃদয়ের (হৃদয়ের) স্থান ও জাতি।  
ভাবপ্রকাশ ঐ খণ্ড। ৯৬ পৃষ্ঠা।

“স্তনমোর্যধা মাশ্রয়দ্বার মেকং সিরামর্ম্ম  
চতুরঙ্গুলং সন্তোমারকং হৃদয়ং”

অর্থ—স্তনদ্বয়ের মধ্যে (বক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে) আমাশয়দ্বার পর্যন্ত চারি অঙ্গুলি প্রমাণ যে একটি সিরামর্ম্ম আছে তাহাই হৃদয় হ্রৎ বা হৃদমর্ম্ম।

এই শ্লোকে হৃদয়ের স্থান, জাতি ও পরিমাণ নির্ণীত হইল। আর পূর্বোক্ত শ্লোকে হৃদয়ের অনুলেখ জগ্গ, আপত্তি ও নিরস্ত হইল। এবং স্পষ্টই বুঝা গেল যে ক্রমভঙ্গ দোষে দোষী না হইতে হয় এই মনে করিয়াই ঐ স্থলে হৃদয়ের নামোল্লেখ ও করা হয় নাই।

এই শ্লোকের দ্বারা ইহাও দেখা গেল যে রক্তাশয়ের (Heart) সহিত, হৃদয়ের জাতি গত বা স্থান গতও কোন সম্বন্ধ নাই, গুণগত ক্রিয়াগত অনৈক্য দ্বিষয়ে পূর্বেই বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। এখন আমাদের ১২ সংখ্যক শ্লোক হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম, যে হৃদয় সিরামর্ম্ম এবং ইহার পরিমাণ চারি অঙ্গুলী এবং নাভের্বিত্তি মাত্র শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে দেখিমাছি উরঃ বক্ষস্থলের ১৮ অঙ্গুলীর পর চারি অঙ্গুলী বাকী ছিল, হৃদয়ের পরিমাণও চারি অঙ্গুলী স্থির হইল। সুতরাং আমরা যে যে বিষয়ের আলোচনা দ্বারা হার্ট ও হৃদয়ের তর্ক মীমাংসা কর্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলাম, তাহার আলোচনায় আমরা কিছুতেই “হার্ট” ও হৃদয় একই বস্তু এরূপ সিদ্ধান্তে আত্মস্থাপনের কোন কারণ পাইলাম না।

বাতব্যাধি নিদানে কোষ্ঠ নিরূপণে  
লিখিত হইয়াছে :—

“স্থানাত্মাশ্মিপকানাম্ মূত্রস্ত কধিরস্তচ ।

হৃদযুক্তঃ কৃপকৃসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিবীজতে ॥”

অর্থ :—আমস্থান (আমাশয়) অগ্ন্যাশয় (গ্রহণী) পক্যশয়, মূত্রাশয়, কধিরাশয় (Heart) হৃদয় (অর্থাৎ হৃদয়, উৎক ; যকৃতের অধোদেশস্থ বর) কৃপকৃস” ইহাদিগকে কোষ্ঠ বলে ।

এই শ্লোকে কধির কোষ্ঠ রক্তাশয় লিখিয়া পরে হৃদয় লিখিয়াছেন, ইহাতেও কি বুঝিতে বাকি থাকিল যে, রক্তাশয় ও হৃদয় এই দুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ। কেহ কেহ বা এই স্থলে একরূপ তর্ক ও উপস্থিত করেন যে এস্থলে কধিরাশয় শব্দটা যকৃত প্রাচীরই বোধক। আমরাও যকৃত প্রাচীরকে রক্ত স্থান বলিতে আপত্তি করি না। কিন্তু স্থান, ও আশয় বা কোষ বা কোষ্ঠ এক বস্তু নয়। যেমন রস সর্বস্থানে থাকিলেও হৃদয়ই রসের মুখ্য স্থান বা আশয়, তেমন রক্ত স্থান অনেক থাকিলেও সকল স্থানই রক্ত কোষ্ঠ বা রক্তাধার বলিয়া কোন গ্রন্থে ও উল্লিখিত নাট। এই রক্তাধার বা রক্তাশয়কে কোষ্ঠ বা আশয় শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। প্রাচীর যকৃতকে রক্ত স্থান মাত্র বলিয়াছেন। এই স্থানে যে গুলি কোষ্ঠ শ্রেণীতে পরিগণিত তাহাদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

অপিচ রক্তাশয়ের স্থান বন্ধেই (১৭শ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। আর প্রাচীর যকৃত উভয়ই বন্ধ প্রাচীরের নিয়ে অবস্থিত হুতরাং এই আপত্তি আমার সঙ্গত বলিয়া মনে করিনা এখন সহৃদয় পাঠক মহাশয়গণের উপর বিচার ভার রহিল।

আর ও একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন, উক্ত বাতব্যাধি প্রকরণে, অত্যাশ্র আশয় (কোষ্ঠ) গত ব্যাধিব উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু যকৃত প্রাচীর নাম ও উল্লেখ করা হয় নাট। এট স্থলেব কধিব স্থান শব্দ যকৃত বা প্রাচীর বোধক হইলে বাতব্যাধি রোগ মধ্যে ঐ দুই রোগের ও নিদানাদি লেখা হইত। এবং “রক্ত-শীতাল-লব্ধ” বলিয়া বাতব্যাধিব যে নিদান লিখিত হইয়াছে, তাহারই কোন না কোনটা যকৃত প্রাচীর নিদান হইত, কিন্তু কোন ও নিদানেই তাহা দেখা যায় না। যকৃত প্রাচীর নিদান ও চিকিৎসা স্বতন্ত্র হুতবাং এখানে কধিব স্থান শব্দে যকৃত বা প্রাচীরকে কিছুতেই বুঝাইতে পারেনা এখানে রক্ত কোষ্ঠ শব্দ যে রক্তাশয়ের হাটেরই বোধক এবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ করা যায় না।

“বাতিক হৃদরোগে হৃদরোগীকে সিদ্ধ কবতঃ দ্বিপঞ্চমূলী কাথ ও লবণ দ্বারা বমন করাইবে। এইরূপে পিত্তজ্ঞে গাষ্ট্রার যষ্টমধুকাথ দ্বারা, এবং কফজ্ঞে বচ ও নিষাদির কাথ দ্বারা বমন করাইয়া হৃদয় শোধন করাইবে। আব ক্রিমিজ হৃদবোগে ক্রিমিগুলিকে উৎক্লেশিত করতঃ ক্রিমি নাশক যোগ ব্যবহারে ক্রিমি নিঃসারিত করিবে।”

উপরোক্ত চিকিৎসা প্রণালী পাঠে অনায়াসেই বুঝা যায় যে “হৃদরোগে বমন দ্বারা হৃদি শোধন করা সর্বদা আবশ্যক”।

হৃদরোগটা যদি রক্তাশয় গত গীড়া (Heart Disease) হইত তাহা হইলে অত্যাশ্র ও যে ধ্বংসের নামে আর্ধ্যগণ ঔষধের জীবন্ত্যাস করেন, রোগী বাহার নাম স্মরণ করিয়া ঔষধ সেবন করেন, এবং বাহার স্মরণে ও রোগ দূর হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন,



সেই ধনুত্তরি কি ভ্রান্তি বশে রক্তাশয় গত রোগে বমন দ্বারা রক্তাশয় পরিষ্কার করার ব্যবস্থা দিতেন। বাস্তবিক হৃদয়টাকে রক্তাশয় বগার এবং রক্তাশয়িক পীড়ায় হৃদ-রোগোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করার কারণ আমরা কিছুই খুজিয়া পাই না।

হৃদরোগ যে হৃদ্মর্ষেরই বোগ, তাহার নামেই প্রকাশিত আছে। তবু যে রক্তাশয় টাকে হৃদয় বলিতে যাইয়া আয়ুর্ষেদের হৃদয়ে কুঠারাবাত করিতে অনেক শিক্ষিত লোক ও অত্যন্ত উৎসাহী কেন বৃদ্ধিতেছিল। রক্তাশয়টাকে হৃদয় নাম দিলে আয়ুর্ষেদটার যেন একটা গৌরব বৃদ্ধি পায়, আয়ুর্ষেদের দেহটা যেন সুসংস্কৃত হয়।

আয়ুর্ষেদ শাস্ত্রের যে স্থানেই এই হৃদয় শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থানেই সাংস্কৃত বা গোণ ভাবে এই হৃদ্মর্ষের সহিতই সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। দিগ্ দর্শন স্বরূপ আমরা দুই একটা রোগেব বিষয় উল্লেখ করিয়া আমাদের উক্তির সমর্থন করি। বাহ্যিক বলিয়া আর বৈশিষ্ট্য স্থলের উল্লেখ করিলাম না।

নাথব নিদান উন্মাদ রোগের নিরুক্তি : ৩১ পৃষ্ঠা:—

“মদন্ত্যাদ্গতা দোষা যম্মাহুর্মাগ মাগতা।  
মানসোয়মত ব্যাধি রুন্মাদ ইতি কীর্ণিত: ॥

“উদগতা:—উর্দ্ধঃ হৃদয়ং গত। ( ব্যাধ্যা মধুকোষ )।

অর্থ:—যে রোগে প্রবৃদ্ধ, বিমার্গগত দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) মনোবহাধমনীতে ( অশ্রুত মতে সংখ্যা ২৪ ) প্রবেশ করত: মনের মোহ ( ভ্রান্তি ) জন্মায় সেই মানস ব্যাধির নাম

“উন্মাদ”। উন্মাদের সামান্য সম্প্রাপ্তি। ১৩২ পৃষ্ঠা।

“তৈরন্নসত্ত্ব মলা: প্রহৃষ্টা বুদ্ধে নির্বাসং হৃদয়ং প্রদ্য্য শ্রোতাংশুখিষ্ঠায় মনোবহানি প্রমোহয়ন্ত্যাক্ত নরশ্চ চেত:”।

টীকা:—বুদ্ধে নির্বাসং হৃদয়ং ইত্যনেন হৃদয়শ্রয়শ্চ হৃষ্টা তদাশ্রিতশ্চ জ্ঞানশ্রাপি হৃষ্ট ভবতি।

অর্থ:—পুষ্কোক্ত কারণে অন্ন সব গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির দোষ সমূহ মনোবহা ধমনী সমূহে ( সংখ্যা ২৪ ) প্রবেশ করত: মনুষ্যের চিত্ত বিকৃতি উৎপাদন করে। ইত্যাদি। হৃদয় অধিকার করিয়া উন্মাদ রোগ জন্মে; হৃদয় মন ও বুদ্ধির স্থান। জ্ঞানবহা নাজী (ধমনী) ইহাকেই অবলম্বন করিয়া শরীরের সর্বত্র জ্ঞানের প্রভাব ( কার্য ) বিস্তার করে। এতগুলি বিষয় উপেক্ষা করিয়া ও হৃদয়কে রক্তাশয় ( হার্ট ) বলা শোভা পায় কি না স্থধী পাঠকবৃন্দ বিচার করিয়া দেখিবেন।

কোনও কোনও বিতণ্ডাবাদী বলেন হৃদ্ময় নামে কোনও একটা অবয়ব বিশেষ থাকিলে ও থাকিতে পারে কিন্তু আয়ুর্ষেদে যে হৃদরোগের নিদান ও চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে তাহা ঐ মর্ষের পীড়া এবং চিকিৎসা নহে, তাহাদের কথিত হৃদয়ের অর্থাৎ হার্টেরই চিকিৎসা। তাহাদের এই উক্তি কত দূর সঙ্গত এখানে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

নিদানে হৃদরোগের সম্প্রাপ্তি:—

“দুষ্মিত্তা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গত:।  
হৃদি বাধাং প্রকূর্ষন্তি হৃদরোগং তং প্রচক্ষতে”

অর্থ:—বিগুণ দোষ ( বায়ু, পিত্ত, কফ ) হৃদয়ে গমন করত: রসকে দূষিত করিয়া হৃদ-

পীড়া জন্মায়। কিন্তু রক্তকে ত দূষিত করে না! হৃদয়টা রস ও রক্ত উভয়ের স্থান হইলে রক্তের সহিত দোষের কি কুটুষ্ণিতা যে তাহাকে দূষিত করে না। তাহার যত আক্রোশ কি কেবল রস বেচারীরই উপর।

ক্রিমি জন্ম হৃদরোগে লিখিত হইয়াছে:—

“.....গ্রস্থি শুশ্রূপ জায়তে

মর্শ্বক-দেশে সংক্লেদং রসশ্চাপ্য গচ্ছতি  
সংক্লেদাৎ ক্রিময়শ্চাস্ত পতন্ত্যাপহতাস্থনঃ”

উপরোক্ত ক্রিমি জন্ম হৃদরোগে স্পষ্টাক্ষরে “মর্শ্বক-দেশে” পদ দেখিয়া যাহারা বলিতে পারেন হৃদমর্শ্ব নামে কোন মর্শ্ব থাকিলেও আয়ুর্বেদোক্ত হৃদরোগ ঐ মর্শ্বের পীড়া নয়,

হাটেরই পীড়া তাহাদিগকে কোন কথা বলার অধিকার ত আমাদের নাই। এই মাত্র বলিতে পারি যে আয়ুর্বেদোক্ত হৃদরোগ যে এই মর্শ্বেরই রোগ তৎবিষয়ে অনুমাত্র ও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ টীকাকার পরিকারই বলেন যে মর্শ্বশব্দ এস্থলে হৃদমর্শ্বেরই বোধক। তবে টীকাকারের ভাষা যদি তাহারা না মানেন, তাহাদিগকে মানাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

নিবেদন এই সম ভাবে প্রবন্ধে সমস্তটি দিতে পারিলাম না। যে পর্যন্ত দেওয়া হইল, তাহা প্রকাশিত হইলে অবশিষ্টাংশ পাবে পাঠাইব ইতি।

শ্রীরাজকুমার দাশ গুপ্ত।

## খাদ্য নির্বাচন ও সংস্কার।

কলিতে অন্নই জীবের প্রাণ। অন্ন ব্যতীত কোন জীব স্বল্পকালও জীবিত থাকিতে পারে না। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা অন্নের জন্ম মুখ ব্যাদান করি, আর অন্তর্জ্বলির শেষ মুখব্যাদনে সে অন্নাকাজ্জার নিবৃত্তি হয়।

কলির জীব অন্নগত প্রাণ, অন্নের অভাব ঘটিলেই আমরা পৃথিবী অন্ধকারময় দেখি। এটা প্রাকৃতিক সত্য। কিন্তু অন্নের সত্ত্বাবেও অনেক সময় আমাদের অন্ধকার দেখিতে হয়। ইহা একেবারেই প্রাকৃতিক নহে, সম্পূর্ণরূপে আমাদের চেষ্টায়ত্ত সেই কথা বলিব বলিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

খাদ্যের সত্ত্বাবেও আমরা পৃথিবী অন্ধকার ময় দেখি কেন? খাদ্য নির্বাচন এবং খাদ্য সংস্কারে জ্ঞানের অভাব বা অমনোযোগিতাই

ইহার কারণ। পূর্বে সুখাদ্য স্বল্পমূল্য এবং অনায়াস লভ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে সুখাদ্য নিতান্ত দুর্লভ এবং বহুবায় সাপেক্ষ। বাজারে খাদ্য বলিয়া বাহা বিক্রীত হয়, তাহা অনেক সময় অখাদ্য অথচ দুর্শ্বল্য। এই ঘোরতর জীবন সংগ্রামের দিনে অনেকেরই আর অপেক্ষা ব্যয় অধিক। মাতৃদায়, পিতৃদায়, কস্তাদায়, পুত্র কস্তার শিক্ষার ব্যয় এসকল ত আছেই, তাহার উপর কতকগুলি অনাবশ্যক দায় আমরা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি। চা, চুফট, উত্তম সাজসজ্জা প্রভৃতি এই দায়ের মধ্যে পরিগণিত। কলিকাতা সহরে ভাড়া গাড়ীর সহিস কোচম্যানও দিনের মধ্যে পাঁচ ছয় বা ততোধিক পয়সার পান বিড়ি চা কিম্বা খায়, কিন্তু দুই পয়সায় দুখ দি তাহাদের পেটে

পড়ে না। অনেক দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরও এই অবস্থা। বাজ্রে খরচ চালাইবার জন্য বাজার খরচ কমাইতে হয়। কাজেই খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার সময় দ্রব্যের উৎকর্ষ অপেক্ষা পরিমাণের উৎকর্ষের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখিতে হয়। ফলে হয় এই যে, তাঁহারা খাদ্য মনে করিয়া অখাদ্য আহার করনে এবং রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। বঙ্গ দেশে যে অকালমৃত্যু হয় তাহার বিবিধ কারণ আছে। তন্মধ্যে খাদ্য নির্বাচনে অমনোযোগ একটা প্রধান কারণ। আমাদের বিশ্বাস জনসাধারণ খাদ্য নির্বাচনে সন্মুখে যদি একটু সতর্কতা অবলম্বন করেন তাহা হইলে বঙ্গে রোগ ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়, এবং ভবিষ্যতে ডাক্তার কবিরাজ এবং ঔষধ পথ্যের ব্যয়ের জন্য ঋণভার গ্রস্ত হইতে হয় না।

এক্ষণে খাদ্য নির্বাচন সম্বন্ধে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু খাদ্য বহুবিধ এবং ভেজাল দেওয়া এমন চাতুর্য্যের সহিত চলিতেছে যে সে সবগুলি নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে, ইহা পাঠক স্মরণ রাখিবেন।

স্বত—স্বতের জায় পবিত্র উৎকৃষ্ট এবং পুষ্টিকর দ্রব্য আর নাই। নৈবেদ্যে স্বতের ছিটা না দিলে দেবতার তাহা গ্রহণ করেন না চাগকানীতিতে আছে যে, স্বতহীন ভোজন কিছুই নয়। চার্ব্বাক ঋণ করিয়াও স্বত খাইতে উপদেশ দিয়াছেন। এখনও বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক বেশী না হউক অন্ততঃ তরকারীর সহিত এক আধ ফোটা স্বত উদরস্থ করিয়া থাকেন।

স্বত পূর্বে স্থলত এবং অকৃত্রিম ছিল।

এক্ষণে দুর্শ্বল্য ও কৃত্রিম। বিস্তৃত স্বত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। প্রায়শঃ বাদাম তৈল প্রভৃতি ভেজাল দেওয়া হয়। কিন্তু তজ্জাত বাজারে নানাপ্রকার দরে স্বত পাওয়া যায়। বাহা যত স্বল্প মূল্য তাহা ততই নিকৃষ্ট এবং ভেজালে পূর্ণ। এরূপ ক্ষেত্রে বাহা সর্বোৎকৃষ্ট তাহাই ব্যবহার করা কর্তব্য। সস্তার স্বত দুই পয়সার কিনিয়া কতকটা বাদাম তৈল খাইয়া রোগগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা এক পয়সার উত্তম স্বত খাইয়া সুস্থ এবং নীরোগ থাকাই ভাল।

তৈল—তৈল দুই প্রকার পাওয়া যায়। এক প্রকার কলের, আর এক প্রকার ঘানির। ঘানির তৈলে সামান্য ভেজাল থাকিতে পারে কিন্তু কলের তৈলে মারাত্মক ভাবে ভেজাল দেওয়া হয়। পাঠক দুইটা কাচ পাত্রে কলের তৈল এবং ঘানির তৈল রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উহা মনুষ্যের আহারের পক্ষে সম্পূর্ণ অমুপযোগী। এরূপ ক্ষেত্রে তিন পয়সার কলের তৈল ব্যবহার করা অপেক্ষা দুই পয়সার ঘানির তৈল ব্যবহার করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

মংসা—বাহার। কখন কলিকাতার বাজারে গিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে বাজারে নানা প্রকার মংসা বিক্রয় হয়। কতক জীবিত, কতক মৃত, কতক টাটকা, কতক রস, কতক পচা। চিংড়ি মাছ পড়িয়া লাল হইয়া গিয়াছে অথচ তাহাই অনেক ভদ্র লোককে কিনিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। তাঁহারা সজ্ঞা ভাবিয়া কিনিয়া লইয়া ঘান বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের টাটকা মাছ অপেক্ষাও অনেক বেশী পড়ে। কেননা পচা মাছ খাইয়া যে রোগ হয় তাহার খরচও মাছের দামের

সঙ্গে ধরা উচিত। এরূপ ক্ষেত্রে শেষে অনেক বেশী দাম দেওয়া এবং রোগ ভোগ করা অপেক্ষা প্রথমে কিছু বেশী মূল্য দিয়া মংস্ত্র ক্রয় করা লাভ জনক। অপিচ, হই থানি সস্তার পচা মাছের গোভ সংবরণ করিয়া একথানি টাটকা মাছ খাইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং রোগাক্রান্ত হইবার ভয় কম হয়।

তরকারী—টাটকা এবং বাসি শাকসবজী ষাঁহার পৃথক ভাবে আহার করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে উভয়ের আবাদনের প্রভেদ ও যেমন, শরীরের পক্ষে উপযোগিতার প্রভেদ ও সেইরূপ। শাক এবং লাউ বেগুন প্রভৃতি তরকারী বত টাটকা পাওয়া যায়, দেখিয়া ক্রয় করা উচিত। একেত কলিকাতায় কিছুই টাটকা পাওয়া যায় না, তাহার উপর সস্তার লোভে যদি বহুদিনের বাসী তরকারী কিনিয়া খাওয়া যায়, তবে তাহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অন্তরায় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। পশ্চিম দেশ হইতে এক প্রকার ফুলকপি এই সময়ে কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা এমন শুক ও বিবর্ণ যে কপি বলিয়া চিনিয়া লওয়া হুঙ্কর। এরূপ দ্রব্য আহার করা যে রোগোৎপত্তির কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। শাক সবজী এবং তরি তরকারী কচি, টাটকা কোমল এবং পোকা লাগা নহে, এরূপ দেখিয়া ক্রয় করা উচিত। কেবল কন্দশাক—যেমন আলু এবং কুমড়া প্রভৃতি কচি ভাল নহে পাকাই ভাল।

দুগ্ধ—শাস্ত্রে দুগ্ধ বিবিধ রোগ নাশক, আয়ুর্বেদিক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক প্রভৃতি বিবিধ গুণ সম্পন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা মহানগরের প্রভাব বশতঃ দুগ্ধের

বা দুগ্ধবৎ পদার্থের গুণ ঠিক ইহার বিপরীত দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ দুগ্ধ বিবিধ রোগ উৎপাদক পরমায়ু হ্রাস কারক, জীবনীশক্তি নাশক ইত্যাদি। কেবল সহর বলিয়া নহে, পল্লিগ্রামেও দুগ্ধের অভাব এবং গো জাতির অপকর্ষ বশতঃ দুগ্ধেরও অপকর্ষ ঘটয়াছে। অস্থিহার জীর্ণশীর্ণ রুগ্না গাভীর শরীর হইতে উত্তম পুষ্টিকর দুগ্ধ পাওয়া সম্ভব পর নহে। কলিকাতায় আবার অধিকাংশ গাভীর বৎস মরিয়া যায়, বা কষাই দিগের নিকট বিক্রীত হয়। এ সম্বন্ধে প্রতিকারের উপায় রাজপুরুষদিগের হস্তে। পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে বর্তমান অবস্থায় উত্তম দুগ্ধ সংগ্রহের জন্ত আমাদের কর্তব্য কি? প্রথম কর্তব্য বাহাদিগের পক্ষে সম্ভব গো পালন করা। দ্বিতীয় কর্তব্য চেষ্টা পূর্বক সুবৎসা এবং সুপালিতা গাভীর দুগ্ধ সংগ্রহ করা। অন্ততঃ শিশুদিগের জন্ত এই উপায় অবলম্বন করা সর্বোত্তোভাবে কর্তব্য। তৃতীয় কর্তব্য স্থলভে টাকায় ছয় সের বা আট সের দবে জল বহুল দুগ্ধ ক্রয় না করিয়া উচিত মূল্যে খাটি দুগ্ধ ক্রয় করা।

দোকানে প্রস্তুত খাণ্ড—দোকানদারেরা লাভ করিবার জন্ত ব্যবসা করিয়া থাকে। সুতরাং খাণ্ড প্রস্তুতের উপকরণ দ্রুত ময়লা, চিনি প্রভৃতি তাহারা যে স্থলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া আনে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একেত স্থলভ মূল্যের ঐ সকল দ্রব্যো যথেষ্ট তেজাল থাকে, তাহার উপর দোকানে প্রস্তুতের সময় ও প্রস্তুত হইবার পর আরও কিছু অনিষ্টকর দ্রব্য তাহার সহিত সংযুক্ত হয়—যথা, পথের ধূলা, দোকানীর হাতের ময়লা, কদাচিত্তি দেহের ঘর্ষ, কদাচিত্তি কুশাস্থিত, আর

মাছি, আরসোলা প্রভৃতি জীববাহিত রোগ-বীজ। এহেন উপাদেয় খাদ্য আমরা ক্রয় করিয়া আহার করিয়া থাকি, সুতরাং রোগ না হইবে কেন ?

অনেকে বলিতে পারেন যে কলিকাতায় এবং অন্যান্য সহরে সহস্র সহস্র খাবারের দোকান আছে, এবং লক্ষ লক্ষ লোক সেই সকল দোকান হইতে খাবার কিনিয়া খাইতেছে। যদি দোকানের খাবার কিনিয়া খাইলে রোগ হইতে তবে দেশে আর নীরোগ লোক থাকিত না। প্রকৃত কথাও তাই। যে সকল লোক বাজারের খাবার কিনিয়া খায় তাহাদের মধ্যে নীরোগ নাই বলিলেই চলে। অজীর্ণ, অম্পিত্ত, শূল, উদরাময় ইহার একটা না একটা আছেই আছে। ১০০।১৫০ শত বৎসর পূর্বে দেশে এত খাবারের দোকান ছিলনা, লোকে প্রচুর মংগ ও ভাল দ্রব্য দ্রুত খাইতে পাইত। সেই সময়ের লোকের স্বাস্থ্য জীবনীশক্তি ও পরমায়ু যেকদম ছিল এখনকার লোকের তাহা অপেক্ষা অনেক নূনতম ঘটিয়াছে। অকাল মৃত্যু ও রোগ গৃহে গৃহে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, আমাদের ক্ষমতা থাকিতেও আমরা প্রতিকার করি না।

মাংসের হোটেল আজকাল প্রতি গলিতে বহু সংখ্যায় বিস্তারিত, আর অনেক লোক বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায় সেই সকল হোটেলের প্রস্তুত মাংস উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকেন। দোকানের খাবার অপেক্ষা এই সকল হোটেলের প্রস্তুত মাংস এবং মাংসজাত খাদ্য আরও জঘন্য। পূর্বেদিনের পচা বাসী মাংস যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, সেগুলিকে হোটেল ওয়ালারা নূতন প্রস্তুত মাংসাদির

সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেয়। যথেষ্ট নাল মসলার সংযোগ থাকে বলিয়া আশ্বাদন দ্বারা ধারা যায় না। বাসী লুচি, কচুরি অপেক্ষা বাসী মাংস অধিকতর অনিষ্টকর। অবশ্য যেদিন হোটেলের মাংস খাওয়া যায় তাহার পরদিনই রোগ জন্মে না। আজ বীজ বপন করিলে কাল কি তাহাতে ফল ফলে? কিন্তু ঐ সকল খাদ্য আহারের পরিণামে ভবিষ্যতে শরীর রোগগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য।

পূর্বেই বলিয়াছি যে ক্ষমতা থাকিতেও আমরা তাহার প্রতিকার করিব না। যদি আমরা দোকানের খাবার খাওয়া পরিত্যাগ করি, বালক বালিকাদিগকে খাইতে না দিই তাগ হইলে অনায়াসেই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। কথাটা শুনিতে শক্ত, কিন্তু কাজে অত্যন্ত সহজ। ছেলেরা যাহা দেখে তাহাই শিখে, আমরা যদি দোকানের খাবার না খাই এবং দোকানের খাবারের অনিষ্ট কারিতা তাহাদের বুঝাইয়া দিই, তাহা হইলে ১০০।১৫০ বৎসরের মধ্যে যেমন অসংখ্য খাবারের দোকানের স্রষ্টা হইয়াছে, ১০০।১৫০ বৎসর পরে আবার তাহারা বিলুপ্ত হইবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু বলিতেন যেদিন স্কুলের ছেলেরা দোকানের খাবার ছাড়িয়া মুড়ি নারিকেল খাইতে শিখিলে সেইদিন বুঝিবে যে বাঙ্গালার উন্নতির দিন আসিয়াছে। অতি মূল্যবান উপদেশ, কিন্তু দেশের লোকে তাহা বুঝিল কৈ, উপদেশ গ্রহণ করিল কৈ? কিন্তু তাহা বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না, দেশবাসীকে বুঝাইতে হইবে। ভূমি পিতা, পুত্র কন্ডার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের চেষ্টা করা তোমার কর্তব্য। তবে

তুমি জানিয়া শুনিয়া কি বলিয়া ভবিষ্যতে  
রোগোৎপাদক এই সকল খাণ্ড তাহাদের  
হাতে তুলিয়া দিতেছ? তুমি যে খাণ্ড বলিয়া  
খাণ্ডরূপী বিষ তুলিয়া দিতেছ তাহা তোমার  
জ্ঞান নাই? ইহাতে কি তোমাব কর্তব্য পাল-  
নের ক্রটি হইতেছে না?

যাহাদের অবস্থায় কুলায় তাহাদের পক্ষে  
খাণ্ডাদি ঘরে প্রস্তুত করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ।  
যাহাদের পক্ষে সেরূপ সুবিধা ঘটবে না তাঁহা-  
দের পক্ষে দোকানেব পাবার না খাইয়া মুড়ি,  
নারিকেল, গুড়, ফল ইত্যাদি অবস্থানুসারে  
ক্রয় করিয়া খাওয়া ভাল। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল  
থাকিবে এবং রোগ ভোগ হইতে অনেকটা  
অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে খাণ্ড সম্বন্ধে  
প্রতিকারের উপায় রাজপুরুষদিগের হস্তে।  
এক্ষণে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রাজা প্রজার রক্ষক, প্রজার পিতামাতা-  
স্বরূপ, রাজার অনুরূপ ব্যতীত প্রজাব যে  
কোন অভাব যে কোন দুঃখ দূর হয় না।  
সুতরাং রাজার সাহায্য ব্যতীত আমাদের  
এই জীবন মরণ সমস্তা অন্তঃকণ্ঠের প্রতি-  
কারের উপায় কোথায়? পিতা মাতার সকল  
পুত্র সমান হয় না, কেহ কেহ দ্রুত হয়, জোর  
করিয়া কাড়িয়া থায়। আবার কেহ কেহ  
শিষ্ট শাস্ত্র হয়, না খাইতে পাঠিলেও জোর  
করিয়া কাড়িয়া খাইতে জানে না। কিন্তু তাই  
বলিয়া পিতা মাতা কি তাহাকে খাইতে না  
দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমরাও  
রাজার শিষ্ট শাস্ত্র পুত্র বা প্রজা। তাঁহার  
দ্রুত পুত্র ইংরাজ বা আইরিসদিগের গ্রাম  
জোর করিয়া কিছু চাহিতে জানি না। কিন্তু  
তাই বলিয়া আমাদের দয়াল রাজা আমাদের

প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না, আমাদের দুঃখ  
দূর করিবেন না।

হে রাজ রাজেশ্বর! হে অখণ্ড মহিম-  
মণ্ডিত প্রজাবৎসল সম্রাট পঞ্চম জর্জ! এই  
সুন্দর সাগরপারস্থিত ভারতভূমি হইতে আপ-  
নার ত্রিশকোটি প্রজা আপনার রূপা ভিক্ষা  
করিতেছে। দুষ্ট ব্যবসায়ীরা অর্থলোভে কৃত্রিম  
খাণ্ড প্রস্তুত করিয়া আপনার এই বিশাল  
রাজ্যের প্রজাদিগের জীবন বিপন্ন করিয়া  
তুলিয়াছে। ঐ সকল দুষ্ট ব্যবসায়ীদিগকে  
দণ্ডিত করিয়া আপনার পুত্র তুল্য প্রজা-  
দিগকে রোগ ও অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা  
করুন।

স্থানীয় রাজপুরুষদিগের নিকট আমাদের  
প্রার্থনা যে তাহারা যেন এ সম্বন্ধে উদাসীন  
না থাকেন। যাহারা কৃত্রিম খাণ্ড প্রস্তুত  
করিয়া লোকের রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণ  
স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহারা প্রত্যক্ষভাবে না  
হউক পরোক্ষভাবে নরহত্যা। সেইরূপ কঠিন  
দণ্ডই তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করা উচিত।  
আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের সদাশয় রাজ-  
প্রতিনিধি এবং প্রজাবৎসল গবর্নর লর্ড  
কারমাইকেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এ সম্বন্ধে আমাদের আরও একটু বক্তব্য  
আছে। লোকের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয়,  
দূষিত খাদ্য বাহাতে বিক্রীত হইতে না পারে  
তজ্জন্ত রাজকর্মচারী নিযুক্ত আছে। সময়ে  
সময়ে সংবাদ পত্রে দেখিতে পাই দূষিত দ্রুত  
বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতার অর্থদণ্ড হইয়াছে।  
এইরূপ নিয়মই যদি থাকে আর দেশের  
লোকের অর্থে এইরূপ কর্মচারীই যদি নিযুক্ত  
থাকে তবে এই ভেজাল খাদ্য পূর্ণ কলিকাতায়  
দুই চারিটি দোষীর দণ্ড হয় কেন? এরহতের

বিষয় কেহ আমাদেরকে বুঝাইয়া দিবেন কি ?  
কোন কোন দোকানে বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই  
‘এখানে জল মিশ্রিত দুগ্ধ বিক্রয় হয়’ ‘এখানে  
ভেজাল ঘূতে প্রস্তুত খাদ্য বিক্রয় হয়’ ‘এখানে  
বাজার চলন মিশ্রিত ঘূত ও তৈল বিক্রয় হয়’।  
প্রকৃষ্টভাবে এইরূপে ভেজাল খাদ্য ও খাদ্যের  
উপকরণ বিক্রয় করা শাসকদিগের কলঙ্কের  
পরিচায়ক নহে কি ?

একণে আমরা দ্রব্য সংস্কার সম্বন্ধে আলো-  
চনা করিব। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে সংস্কার  
দ্বারা লঘু দ্রব্যের গুরুত্ব এবং গুরু দ্রব্যের  
লঘুত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। খাদ্য হইতে  
খৈ এবং চিড়া প্রস্তুত হয়। খৈ কত লঘুপাক  
আর চিড়া কত গুরুপাক। আবার লঘুপাক  
খৈ ঘূতাদি সংযুক্ত খৈচুররূপে পরিণত হইলে  
তাহা গুরুপাক হয়, আর চিড়ার মণ্ড  
প্রস্তুত করিলে তাহা লঘুপাক হইয়া থাকে।  
ফলতঃ সংস্কার দ্বারা খাদ্য দ্রব্যকে আমরা  
ইচ্ছামত লঘুপাক বা গুরুপাক করিয়া লইতে  
পারি।

চিকিৎসা কার্যে অভিজ্ঞতার ফলে আমরা  
জানিয়াছি যে, অধুনা বঙ্গদেশে বিশেষতঃ সহরে  
অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। কোন  
কোন রোগীকে কুকারে রন্ধন করিয়া না  
খাওয়াইলে খাদ্য, জীর্ণ করিতে পারেন না।  
কালে কুকারে রাখিয়া খাওয়া রোগ যদি  
দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে বড়ই  
বিড়ম্বনার বিষয়। সেই অনিষ্ট নিবারণের

উদ্দেশ্যে আমরা খাদ্য সংস্কার সম্বন্ধে আলো-  
চনা করিতেছি।

দ্রব্যের সংস্কার নিম্নলিখিত কয়েকটি  
প্রকারে করা যাইতে পারে।

- ১। রন্ধন দ্বারা।
- ২। দ্রব্যান্তর সংযোগের দ্বারা
- ৩। ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা

প্রত্যেকের বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা  
করা যাইতেছে।

১। রন্ধন—অগ্নি ও জল সংযোগে পাক  
করিলে সকল দ্রব্যই লঘুপাক হইয়া থাকে।  
কিন্তু রন্ধন কৌশলে ইহার বিশেষ তারতম্য  
ঘটে। বেগুন পোড়াইয়া থাকিলে লঘুপাক।  
হয় কিন্তু ভাজিয়া থাকিলে অপেক্ষাকৃত গুরুপাক  
হয়। দাল গুরুপাক কিন্তু দালের যুষ লঘুপাক  
সচরাচর লোকে বেকর দাল রন্ধন করিয়া খায়  
তাহা যুষ অপেক্ষা গুরুপাক। রন্ধনের তার-  
তম্যে এক অন্নই নানা প্রকার গুণযুক্ত হয়।  
পোরের ভাত মুহু আশুণে পাক করা হয়  
বলিয়া বেশ সুসিদ্ধ হয়, সুতরাং খুব লঘুপাক।  
হইয়া থাকে। কাঠের জালে ভাত রাঁধিলে  
পোরের ভাতের তায় সুসিদ্ধ না হইলেও বেশ  
সিদ্ধ হয়। কিন্তু কয়লার প্রচণ্ড জালে ভাত  
বেশ সুসিদ্ধ হয় না।

প্রসঙ্গ ক্রমে এই স্থানে বলা যাইতে পারে  
যে পোরের ভাতের কেন ফেলিয়া দিবার  
নিয়ম নাই, অথচ উহা লঘুপাক ও রোগীর পথ্য  
কিন্তু সাধারণতঃ ভাতের কেন ফেলিয়া দেওয়া

হয়। ইহা খাদ্যের অপচয় মাত্র। আয়ুর্বেদে কথিত হইয়াছে যে অন্ন, চাউলের পাঁচগুণ জল দ্বারা পাক করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে পাক করিলে ভাত বেণু সুসিক্ত হয় অথচ ফেন থাকে না। কিন্তু তখন কয়লার প্রচলন ছিল না। কাঠের মূহু জ্বলে সিদ্ধ হইলে যত জল লাগে, কয়লার প্রচণ্ডজ্বলে সিদ্ধ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক জল লাগে। কেননা প্রচণ্ড তাপে জল অধিক বাতায় জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। কয়লার জ্বলে রাঁধিতে হইলে সাতগুণ জল দিলেই চলিতে পারে।

পূর্বে বলিয়াছি কেন ফেলিয়া দেওয়া খাদ্যের অপচয় মাত্র। ফেন জল এবং চাউলের কাথ মাত্র। ফেন ফেলিয়া না দিয়া সমান জলে ভাত রাঁধিয়া খাইলে যাহার আধসের চাউল লাগিত তাহার দেড় পোড়া চাউলে চলিতে পারে। এই হিসাবে এক জন লোকের মাসে পনের পোয়া বৎসরে এক মনের উপর চাউল বাঁচিয়া যায়। ভারতের গ্রাম দরিদ্র দেশে ইহা কম লাভের কথা নহে।

আমাদের দেশে দাল, ভাজা, ঘণ্ট, দালনা, চচ্চড়ি, অন্ন, ঝোল এই কয় প্রকার তরকারী ব্যবহৃত হয়, দালের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ভাজা দ্রব্য গুরুপাক, সুতরাং মন্থাশি সম্পন্ন ব্যক্তির না খাওয়াই ভাল। অল্প তরকারী বেশ সিদ্ধ হইলেই লঘু পাক হইয়া থাকে।

দ্রব্যান্তর সংযোগে উহাদের কিরূপ গুণান্তর ঘটে তাহা পরে বলা যাইতেছে।

রন্ধনের উৎকর্ষাপকর্ষ সধন্ধে তাপেরই প্রাধান্ত বেশী। তীব্র জ্বলে সিদ্ধ করা অপেক্ষা মৃদু জ্বলে সিদ্ধ করা তরকারী সুসিদ্ধ এবং লঘু পাক হয়। অগ্নি বাহাতে রন্ধন পাত্রের চতুর্দিকে সমান ভাবে লাগে তাহা প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। নচেৎ কতক সিদ্ধ এবং কতক অর্দ্ধ সিদ্ধ হইতে পারে।

রন্ধন কোশল দ্বারা একই মাংস হইতে কালিয়া সুরম্যা এবং ‘জগ’ স্নপ, প্রস্তুত হইয়া থাকে। কালিয়া কত গুরুপাক এবং সুরম্যা ও ‘জগ’ স্নপ কত লঘু পাক।

২। দ্রব্যান্তর সংযোগের দ্বারা—জল সাগু লেবুর রস ও লবণ সংযোগে আহাতি অতি সহজে জীর্ণ। ছধ সাগু উহা অপেক্ষ গুরুপাক। আবার দালের সহিত সাগু খিচুড়ি প্রস্তুত করিলে আরও গুরুপাক হইয়া থাকে।

তরকারী সহ ছোলা ভিজান, বড়ি নারিকেলকোরা বা নারিকেল কুচি দিও উহা অপেক্ষাকৃত গুরুপাক হইয়া থাকে। তরকারীতে বা মাংসে যত অধিক তৈল যুত সংযোগ করা যায় তাহা ততই গুরুপাক হইয়া থাকে। পায়ের সহিত পেঁপে বা দাম প্রভৃতির সংযোগ করিলে তাহা অপেক্ষ কৃত গুরুপাক হয়। আবার একবি



চলুদ, লঙ্কা, তেজপাতা, সর্ষপ অপর দিকে আদা বাটা, হিং, জীরা, মরিচ, প্রভৃতি মসলাব সংযোগে খাদ্য পাক করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাক হয়। আমাদের দেশে বন্ধনের জন্য যে সকল মসলা ব্যবহার করা হয় তাহার সব গুলিই উপকারী। তবে শরীরেব অবস্থা বুঝিয়া তাহার কিছু তারতম্য করা উচিত। পিত্ত প্রধান ধাতুতে হরিদ্রা, ধনে, মৌরী যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু লঙ্কা, সর্ষপ, জীরা, মরিচ, হিং, আদা প্রভৃতি কম ব্যবহার করা উচিত। কফ প্রধান ধাতুতে শেমোক দ্রব্য গুলি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঐ সকল মসলা খাদ্যের স্বাদ্বৃতা সম্পাদন করে এবং অধিকে উত্তেজিত করিয়া পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে। কিন্তু মসলা উত্তমরূপে বাটিয়া দেওয়া কর্তব্য। বাটিয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া দিলে আরও ভাল হয়। উত্তমরূপে বাটিয়া না দিলে মসলায় অধিকাংশ দানা দানা থাকে এবং যাহাদের অল্প দুর্বল, তাহাদের অস্ত্রের উত্তেজনা ঘটাইতে পারে।

দ্রব্যান্তর সংযোগে ব্যঞ্জনকে ক্রিয়ালব্ধ এবং রোগ নাশক করা যাইতে পারে নিয়ে তাহার একটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

একটি অজীর্ণ রোগীর তালরূপ কোষ্ঠ শুষ্ক হইত না বেশ ক্ষুধা হইত না, ভুক্ত দ্রব্য হজারূপে জীর্ণ হইত না এবং মধ্যে মধ্যে পেটের অসুখ হইত। একবার প্রবাহিকা (আমায়) রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই রোগী আমার চিকিৎসাধীনে থাকেন। চিকিৎসা দ্বারা প্রবাহিকা রোগের উপশম হইল, কিন্তু অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, মলের আমদোষ (পিচ্ছিল মল) রহিয়া গেল এবং কোষ্ঠ-

শুক্ল ও ভাল হইত না। কোমরে বাতের জ্বাশ সামান্য বেদনা ও হইল। রোগী হেঁট হইয়া অল্পক্ষণ থাকিলেই যথেষ্ট বেদনা অনুভব করেন। এদিকে বোগী ঔষধ খাইতে চাহেন না। আমি তাঁহার জন্য নিম্নলিখিত পথ্য ব্যবস্থা করিলাম।

পূর্বাঙ্কে পুরাতন দাদখানি চাউলের অন্ন এবং কৈ, মাগুর বা ছোট পোনা মাছের ঝোল। মাছের ঝোলে বেগুন ও ছই এক খানা আলা এবং আদা বাটা ১ তোলা, রসুন ৫১৬ কোরা ও হিং ২ রতি। হিং অল্প গব্য ঘূতে লৌহপাত্রের জ্বাশ ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম। রাত্রিতেও এইরূপ মাছের ঝোল ও ভাত খাইবার ব্যবস্থা দিই। কিন্তু রাত্রে ভাত খাওয়া অভ্যাস না থাকায় শেষে পাঁউরুটি টোট্ট করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মে পাক্ত মাছের ঝোলের সহিতে খাইতে দিই। টোট্ট করিবার নিয়ম এইরূপ :—পাঁউরুটি খণ্ড খণ্ড করিয়া বড় বড় বরকীর মত আকারে কাটিতে হয়। পরে ছুরি বা খুঁটির আগায় বিধিয়া আগুনের উপর ধরিতে হয়। সে দিক সিদ্ধ হইয়া জ্বাশ রক্তবর্ণ হইলে অপর দিক আবার ঐরূপে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

এইরূপ নিয়মে পনের দিন পথ্য করিয়া রোগীর বিশেষ উপকার হইয়াছিল। ছই বেলা পরিষ্কার দান্ত হইতে লাগিল, মলের আমদোষ দূর হইল, ক্ষুধা হঠাৎ লাগিল, অজীর্ণ ও কোমরের বেদনা ভাল হইয়া গেল। তাহার অজীর্ণ এবং তদানুযায়িক আমবাত (চলতি কথায় বাত) প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেছেন তাহার হিং, আদা, মরিচ, পিপুল, রসুন প্রভৃতি আম পাক্য এবং অগ্নিদীপক মশলার সহিত খাদ্য পাক করিয়া সেবন করিলে

যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। চরক সংহিতা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অন্নপানের সহিত ঔষধ সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগের বিধি বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে পূর্বোক্ত অজীর্ণ-রোগীকে আরও একটা ব্যবস্থা দিয়াছিলাম। সেটা দুইবেলা যথেষ্ট ভ্রমণ করা।

৩। ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা—দধি গুরুপাক কিন্তু মছন করিয়া মাখন উদ্ধৃত করিয়া লইলে যে ঘোল হয় তাহা লঘুপাক। চিড়া গুরুপাক কিন্তু উত্তমরূপে ধুইয়া ভিজাইয়া খাইলে অপেক্ষাকৃত লঘুপাক হয়। গুড় ছোলা লঘুপাক। মটর গুটির বীজের খোসা ফেলিয়া দিলে অপেক্ষা কৃত লঘুপাক হয়। সাধারণ দ্রুত অপেক্ষা মাখন তোলা বা সর তোলা দ্রুত লঘুপাক। তরকারী ও ফলের ছাল বা খোসা ফেলিয়া খাইলে লঘুপাক হয়। আঁসবুট আমের রস করিয়া খাইলে সহজে জীর্ণ হয়। যে সকল তরকারী বা ফলে ছিব্‌ড়া থাকে তাহার ছিব্‌ড়া ফেলিয়া খাইলে লঘুপাক হয়। কিন্তু সুস্থ-শরীর লোকের এই স্থলে জানা উচিত যে ফল ও শাক সবজীতে যে ছিব্‌ড়া (Fibre) থাকে, তাহারা অল্পের ক্রিমিগতি (Peristaltic movement) বর্দ্ধক বলিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধির সহায়তা করে।

একই দ্রব্য অবস্থা ভেদে লঘু পাক বা গুরু পাক হইয়া থাকে। যেমন মটর গুঁটি

কচি অবস্থায় লঘুপাক থাকে পাকিলে গুরু পাক হয়। কচি মূলা লঘু পাক কিন্তু পাকা মূলা গুরু পাক। গুড় অপেক্ষা চিনি বা মিছরী লঘু পাক। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যাহারা সুকুমার দেহ, সুখী, অন্ন পরিশ্রমী, অন্নান্নি এবং সর্বদা সুস্থ থাকে না তাহাদের পক্ষেই খাদ্য সম্বন্ধে পদে পদে বিশেষ চিন্তা করা প্রয়োজন। কিন্তু যাহারা বলবান, প্রবল অগ্নি সম্পন্ন, পরিশ্রমী এবং ভোজনপটু তাহাদের পক্ষে খাদ্য সম্বন্ধে তত বিচার করিবার আবশ্যক নাই। অধুনা বঙ্গদেশ প্রথম শ্রেণীর লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া আমরা খাদ্য নির্বাচন ও খাদ্য সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এক্ষণে শাস্ত্রে স্বভাবতঃ যে সকল খাদ্য হিতকর এবং যে সকল খাদ্য অহিতকর বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

মাষকলাই, শিম, পিষ্টক, অঙ্কুরিত শস্য, গুরু শাক, পাতলা ইক্ষু গুড়, ক্ষার দ্রব্য, কাঁচা মূলা, নষ্ট দ্রবের ক্ষীর বা ছানা, চিড়া প্রভৃতি নিরস্তর এবং প্রচুর পরিমাণে খাইবে না। যাহাদের অগ্নিবল অত্যন্ত অন্ন, তাহাদের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য আহাৰ করা অনুচিত। উত্তম চাউলের অন্ন, গোধূম ও যব কৃত খাদ্য জাঙ্গল প্রাণীর মাংস, মুগ, চিনি, কিস্মিস্ মধু, দাড়িম, সৈন্ধব লবণ, পটোল প্রভৃতি দ্রব্য শরীরের হিতকর বলিয়া নিত্য সেবন করিবে।

## ধূমপানের সময় ।

ধূমপানে আট কাল আছে যে নির্দেশ ।  
বাতপ্লেগ সেই কালে হয় সমুৎক্রেম ।  
স্নানাহার, বমনাস্তে, হাঁচির অন্তর,  
দস্ত ধাবনাস্তে, নস্ত-অঙ্গনের পর ;

এইকালে উৰ্দ্ধ জক্ৰ-বাত কক্ষাশ্বক,  
রোগ নহে আশ্রয়ানে কহিলা চরক ॥  
অন্ন বিশ্রামের পর তিন তিন বার ।  
ত্রিগুণ নবম সংখ্যা বারে ব্যবহার ॥

প্রায়োগিক ধূমপান যে কালে কথিত ।  
 ছইবার মাত্র পান জ্ঞানীর বিহিত ॥  
 বারেক মৈত্রিক ধূম এককালে হয় ।  
 বিরেচক ধূম পান দিনে বার ত্রয় ॥  
 বিগুহ্ব হৃদয়, কঠ, ইন্দ্রিয় নিচয় ।  
 কুণ্ডদোষ প্রশমিত, শিরলঘু হয় ॥  
 যথামাত্রা, ধূমপানে এসব লক্ষণ ।  
 অতিমাত্রা, অকালে বা মন্তক ঘূর্ণন ॥  
 অন্ধতা ও বধিরতা, মুকত্ব উদয় ।  
 রক্ত পিত্ত ছুষ্টি আদি উপদ্রব হয় ॥  
 বাত পিত্তে উপদ্রব হ'লে সংঘটন ।  
 ঘৃতপান, স্নেহে নশ্র অঞ্জন-তর্পণ ॥  
 রক্তপিত্তে স্নানীতল দ্রব্য সংঘটিত ।  
 অঞ্জন, তর্পণ, নশ্র হবে ব্যবস্থিত ॥  
 স্নেহ পিত্ত প্রকোপেতে রক্ষতাকারক ।  
 অঞ্জন, তর্পণ নশ্র হিতসম্পাদক ॥

### ধূমপান বিধি ।

ধূমপান ছয়রূপ-শমন বৃংহণ,  
 রেচন, কাসয়, ত্রণধূপন বামন ।  
 শাস্ত, ভয়যুক্ত কিম্বা যে জন হুংখিত,  
 বস্তি বিরেচন ক্রিয়া হ'লে প্রয়োজিত ;  
 রাত্রি আগরিত, তৃষ্ণা, দাহযুক্ত আর,  
 তালুশোষ অভিযুক্ত উদররোগ যার ;  
 তিমির, আত্মান বমি, শিরোরোগাধিত,  
 উরঃক্ষত, পাণ্ডুরোগ, প্রমেহ পীড়িত ;  
 গর্ভিণী, রক্ষ ও ক্ষীণ ; হৃৎ, মধু আর  
 আয়ুর্বাণ, দধি, মংস্ত, করিলে আহার ;  
 বাল, বৃদ্ধ, ক্রশবাক্তি, অকালে অধিক,  
 ধূমপানে উপদ্রব হবে বহু ঠিক ॥  
 ঘৃতপান, নশ্র আর অঞ্জন, তর্পণ,  
 ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, হৃৎ নিষেবন ;  
 চিনি পান্য, মধুমাংস রসসহ যোগে ॥

শ্রেষ্ঠ বৈতগণ এতে বমন প্রয়োগে ॥  
 দ্বাদশ বৎসর নিম্নে অশীতে উপর,  
 শিশু, বৃদ্ধ ধূমপানে না হবে তৎপর ।  
 সম্যক প্রকারে ধূম হ'লে প্রয়োজিত,  
 কাস, শ্বাস, প্রতিশ্রায় হ'বে বিদূরিত ;  
 মন্ত্রাগ্রহ, হনুগ্রহ, শিরোরোগ আর ।  
 বাতশ্লেষ কৃত ব্যাধি হইবে সংহার ॥  
 বাড়িবে-ইন্দ্রিয় বাক্য, মনঃ প্রসন্নতা ।  
 কেশ-দন্ত-শৃঙ্গদৃঢ় ; মুখ সৌগন্ধতা ॥

### ধূমপ্রয়োগের নলাকৃতি ।

ধূম নল তিন খণ্ড, তিন পর্ক তাই,  
 স্থলতা কনিষ্ঠাঙ্গুলি (ছিদ্র) রাজমাথায়া ।  
 চক্ৰিশ, বক্রিশাঙ্গুলি, চক্ৰিশ, ষোড়শ,  
 দশ, দশাঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে ক্রমশঃ ।  
 মটর কলার ছায় স্থলতা তাহার ।  
 কুলখ কলার পশে ছিদ্র তদাকার ॥

### ধূমগ্রহণ বিধি ।

দ্বাদশ অঙ্গুলী, শ্লক্ষ, শরকাণ্ড এক,  
 অষ্টাঙ্গুলী ধূমকঙ্কে লেপ করিবেক ;  
 কঙ্কমাত্রা দুইভরি, শুকাবে ছায়ায়,  
 শুক হলে শরকাণ্ড ত্যাগ করি তায় ;  
 কঙ্কবর্জিত-স্নেহসিক্ত করি এক ভাগ,  
 জালাবে অঙ্গারাগুণে ; মুখে অন্তভাগ ;  
 ধূমপান করি মুখে, মুখেই তাজিবে ।  
 পরে নাসা পান করি মুখে বিবর্জবে ॥

### ত্রণধূপবিধি ।

করিয়া অঙ্গারানলে সরাব স্থাপন ;  
 কঙ্কোষধ তত্পরি করিবে ক্ষেপন ;  
 সহিষ্ণু সরাব অন্ত করি আচ্ছাদিত,  
 ছিদ্রমুখে নলমুখ করিবে যোজিত ;  
 ছিদ্রমুখ দিয়া ধূম যখন আসিবে,  
 অগ্ন মুখে ক্ষত স্থানে ধূম প্রয়োগিবে ।

শমনে তদাদি কক্ক ; স্নিগ্ধ সর্জ্বরস  
বৃহৎ ধূম প্রয়োগে হইবে সরস ;  
তীক্ষ্ণদ্রব্য-কক্ক ধূম রেচনে হইবে,  
কাসয়ে মরিচ, কণ্টকারী ধূম নিবে ;  
স্নায়ু চর্ম্মাদির ধূম বামনে প্রয়োগ,  
নিষ, বচাদির কক্ক ত্রণ ধূমযোগ ।

### অপরাজিতা ধূপ ।

শিথিপুচ্ছ, নিষপত্র, বৃহতীর ফল,  
মরিচ ও জটামানৌ, হিঙ্গু এসকল,  
ছাগলোম, সর্পখোস বীজ কাণ্ডাসের,  
গজদন্ত, এবসহ বিভাঁ নিড়ালেব ;  
এইসব চূর্ণকরি স্নাত্ত বিমিশ্রিত,  
গুচমধ্যে ধূম যদি হয় প্রয়োজিত,  
পিশাচ, রাক্ষসভয় বিদূরিত হয় ।  
সর্ব্বজ্বর, বাল-বোগ নাশিবে নিশ্চয় ॥  
রক্তঃ, ক্রোধ, মনস্তাপ, ধূমপানে তাগে ।  
বংশ, স্বর্ণাদি ধাতু ধূমনলে লাগে ॥

### গণ্ডুষবিধি ।

স্নেহ, তৃক্ষ, কষায়াদি সম্পূর্ণ মাত্রায় ।  
মুখেতে ধরিলে বলে গণ্ডুষ তাহায় ॥  
মতক্ষণ কক্ষ পূর্ণ না হয় বদন,  
দোষের বিনাশ আর উদ্রেক বমন ;  
জলশ্রাব নাহি হয় মুখ নাশিকায় ।  
গণ্ডুষ ধারণ বিধি ততক্ষণ ভায় ॥  
স্বস্থির রাখিয়া রোগী, গণ্ডুষের বিধি ।  
ভাল-গল-গণ্ডদেশে ঘর্ম্মোপমাধি ॥  
নাশনাহি হ'লে দোষ দুই এক বারে ।  
তিন, পাঁচ, সাতবার গণ্ডুষ আচারে ॥

### গণ্ডুষের প্রকার ভেদ ।

চতুর্দশ হয় সেই গণ্ডুষ ধারণ ।  
স্নেহন, শমন আর শোধন যোগে ॥

বাত্তাধিক্য-স্নিগ্ধ উষ্ণদ্রব্যেতে স্নেহন ।  
মধুর, শীতল দ্রব্যে পিত্তেতে শমন ॥  
কফাধিক্য-কটু, অন্ন, লবণ সংযোগ,  
উষ্ণদ্রব্যে হইবেক শোধন প্রয়োগ ।  
কষায়, তিক্ত মধুর কটুরস যোগে,  
উষ্ণ দ্রব্যদ্বারা ত্রণ রোপন প্রয়োগে ॥  
গণ্ডুষ দ্রবেতে চূর্ণ এক তোলা দিবে ।  
কবলে দ্বিভরি কক্ক দ্রবে মিশাইবে ॥  
পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তখন,  
গণ্ডুষ কবল আদি করিবে ধারণ ।  
গণ্ডুষে বিনাশে ব্যাধি, অগ্নি ও বিষাদ ।  
হৃদ মুখ সন্তলয় ; ইঞ্জির প্রসাদ ॥

### গণ্ডুষ ।

মৈহিক গণ্ডুষে তিলকক্ক বিমিশ্রিত ।  
জল, তৃক্ষ কিম্বা তৈল স্নেহে হয় হিত ॥  
তিল, নীলোৎপল, স্নাত, তৃক্ষ, মধু চিনি,  
এসব গণ্ডুষ মুখে ধরিবেন যিনি ।  
উঁহার মুখ-বিষাদ, দাঁহ নাশ হয় ।  
পুরিয়া মুখের ক্ষত উঠিবে নিশ্চয় ॥  
মধুর গণ্ডুষমুখে করিলে ধারণ ।  
দাঁহ তৃক্ষা আদি তাতে হয় প্রশমন ॥  
নিষ-ক্ষারদগ্ধ কিম্বা অগ্নিদগ্ধ হ'লে,  
স্নাত বা তৃক্ষ গণ্ডুষে নাশিবে সকলে ॥  
তৈল ও সৈন্ধবে তথা দস্তচাল নাশে ।  
মুখশোষ বিরসতা কাঁজিতে বিনাশে ॥  
আদার রসে মিশ্রিত সৈন্ধব লবণ,  
ত্রিকটু, সর্ষপ চূর্ণে কক্ষ প্রশমন ॥  
ত্রিফলার চূর্ণে মধু করিয়া মিলিত ।  
গণ্ডুষে কক্ষ ও রক্ত, পিত্ত প্রশমিত ।  
গুলঞ্চ, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, জাতীপাতা আর ।  
দারু হরিদ্রা, দুর্লাভা, কাথ করি তার  
তাহাতে ষষ্ঠাংশমধু করিয়া মিলিত ।  
ত্রিদোষজ মুখপাক হবে বিদূরিত ॥

## থানকুনি বা থুলকুড়ি ।

ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র শাকজাতীয় ভুলুপ্তিত উদ্ভিদ। ইহার পাতাগুলি প্রায় গোলাকৃতি কিন্তু বোটার দিকে কিঞ্চিৎ কাটা ও পাতার ধাবগুলি করাতের দাঁতের স্থায় কাটা কাটা। ইহা বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র সকল সময় জন্মিয়া থাকে এবং বাঙ্গালার স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাকে থানকুনি বা থুলকুড়ি বলে—কলকাতার অঞ্চলে ইহাকে ইন্দুকানি বলে এবং কোন কোন অঞ্চলে এ ইহাকে “ক্ষুদে মাগুদ” বলে। ইহার সংস্কৃত নাম মণ্ডুকপর্ণী।

**থুলকুড়ির পরিচয়**—মণ্ডুকী, ভেকী, ব্রাক্সা, ব্রক্ষমণ্ডুকী। যদিও ব্রাক্সা শাক ও থুলকুড়ি গুণে প্রায়ই সমান—তথাপি উভয়েই আকৃতি গত কিছু ভেদ আছে। ব্রাক্সার পত্রের বৃত্ত নাই। ব্রাক্সার শ্বেতবর্ণ পুষ্প হয় কিন্তু থুলকুড়ির পুষ্প লোহিতবর্ণ। শিবদাস ও ঐকর্ষ থুলকুড়ীকে থানকুনীত-নোকে—মণিমাণাতি লোকে” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রদেশে মণ্ডুকপর্ণী বা থুলকুড়ী ব্রাক্সা নামে পরিচিত। ইহার মূল, শিকড়, পাতা প্রভৃতি সকলই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্বেদের এই সকলে ইহার বিবিধ গুণের উল্লেখ আছে। ভাবপ্রকাশকার বলেন “ব্রাক্সা হিমা সরা তিক্তা লঘী মধ্যা চ শীতলা। কষায়া মধুরাস্বাদুপাকায়ুজ্যায়নী বর্ষা স্মৃতিপ্রদা কৃষ্টপাতুমহাজ্বকাসজিৎ। বিষশোথশরহরী তবৎমণ্ডুকপর্ণী ॥” নিঘণ্ট রত্নাকর বলেন, “ব্রাক্সা শীতা কষায়া চ তিক্তা হৃতিপ্রদা মতা। মেধ্যাশুরগ্নিজননী সারকা

স্বাহুনা লঘুঃ। কণ্ঠতৃদিকরী হৃতা স্মৃতিদাচ রসায়নী। হৃতানাহং বিষং কুষ্ঠং পাণ্ডুকাশং জরং জয়েৎ ॥ শোথকণ্ঠগ্রীহবাতরক্তপিত্তা কণী জয়েৎ। স্বাসং শোথং সর্কদোষং কফ-বাতাময়জয়েৎ। সর্কে পোতে গুণা ব্রাক্ষমণ্ডুক্যামপি সংস্থতাঃ ॥ অর্থ এই যে ব্রাক্সা ও থুলকুড়ি শীতল, কষায়, তিক্ত, বুদ্ধিপ্রদ, আশু ও অগ্নিবর্দ্ধক, পবিত্রতাকারক, সারক, লঘু, কণ্ঠতৃদিকরী হৃদ্য স্মৃতিবর্দ্ধক ও রসায়ন। ইহা ঘরা মেহ, বিবদোষ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, কাস, জ্বর, শোথ, চুল্কনা, গ্রীহা, বাত, রক্তপিত্ত, অক্লান্ত, শ্বাস, শোথ ও কফবাত সমুৎপত্ত সর্কদোষ নষ্ট হয়। যে যে গুণ ব্রাক্সাশাকে আছে সেই সমুদয় গুণই থুলকুড়ী মণ্ডুকপর্ণীতে আছে। চরক বলেন “মণ্ডুকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রবোজ্যঃ” ইত্যাদি (চিঃ ১ অধ্যায়) স্মৃতি (চিঃ ২৮ অধ্যায়) অর্থ এই যে রসায়নাধী মণ্ডুকপর্ণীর স্বরস হৃৎকের সহিত পান করিবে। কিম্বা স্বরস পানান্তর দুগ্ধ পান করিবে।

### উদররোগে থুলকুড়ি—

উদররোগী মণ্ডুকপর্ণী শাক মণ্ডুকপর্ণী রসে। কষা জলে সুসিক্ত বা অর্দ্ধসিক্ত করিয়া অন্ন, লবণ ও মেহ বিনা ভোজন করিবে। অন্নাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৃষিত হইলে জলপান না করিয়া মণ্ডুকপর্ণীর স্বরস পান করিবে। এই বিধি একমাস কাল গালনীয়। (চরক—চিঃ ১৮ অধ্যায়)

### ক্ষতক্ষীণ রোগে থুলকুড়ি—

—চরক বলেন ক্ষতক্ষীণ রোগে থুলকুড়ীর মূল চূর্ণ ক্রমশঃ খাদ্য বর্দ্ধিত করিয়া হৃৎকের সহিত পান করিবে। ঔষধ সেবনকালে অন্নাহার পরিত্যাগ পূর্বক কেবল দুগ্ধপান করিতে হইবে

ক্ষতক্ষীণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ইহা সেবন করিলে বল, আরোগ্য ও পুষ্টিশক্তি করিবে। ( চিঃ ১৮ অঃ )।\*

**পালাজ্বরে থূলকুড়ীর উপকারিতা**—পালাজ্বরে ইহার মূল ও শিকড় পানের সহিত দিবসে তিনবার করিয়া খাইলে দুইতিন দিনের মধ্যে ঐজ্বর আরোগ্য হইয়া যায়। পালাজ্বর যে দিবসে আইসে সেই দিবস প্রাতঃকাল হইতে জ্বরের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনবার খাইতে হইবে। এইরূপে দুইতিন পালার দিন ঔষধ খাইলে জ্বর আর আসিবে না। ইহা দ্বারা একদিন অন্তর দুই দিন অন্তর প্রভৃতি পালাজ্বর আরোগ্য হইবে ইহা দ্বারা নাড়ী পুষ্ট ও বেগবতী হয় এবং কিছুদিন সেবন করিলে অত্যন্ত ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। এই হেতু পুরাতন আমাশয়, উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। স্ত্রীগণের স্তন্যতিকা ঘটতি উদরাময় ও বালকদিগের উদাময় রোগে ইহা দ্বারা বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে।

**কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে ইহার উপকারিতা**—কুষ্ঠ ব্যাধিতে ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা উপকার হয়। যে প্রকার কুষ্ঠব্যাধিতে শরীরের স্থানে স্থানে স্পর্শ শক্তির লোপ হয়, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী। যে স্থানে স্পর্শ শক্তির লোপ হইয়াছে, সেখানে ইহার পাতা বাটিয়া পুন্টিশের ভায়া প্রয়োগ করিতে হয়। পুরাতন উপদংশ ( গরমর ) পীড়াম্ব, নানাপ্রকার চর্মরোগে ও ক্ষতে ইহা উপকারী। জিহ্বা-

মূলের ভিতর বা হইলে ইহা পাপড়ি খয়েরের ও পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে উক্ত বা আরাম হয়। ইহার বোটা সমেত পত্র ছায়াতে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিতে হয় এবং ঐ চূর্ণ ৪।৫ রতি পরিমাণে দিবসে তিনবার করিয়া সেবন করিতে হয়। কিম্বা ঐ পরিমাণ পত্র এক ছটাক গরম জলে ভিজাইয়া পরে পাতাগুলি ছাঁকিয়া ঐ জল পান করিতে হয়। শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে বা মহ্কাইয়া গেলে সেই স্থানে ইহার পাতা পুন্টিশরূপে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে শীঘ্র বেদনা নিবারণ হয়।

**থূলকুড়ি সম্বন্ধে নব্য বা ডাক্তারি মত**—মণ্ডুকপর্ণী বা থূলকুড়ি—রসায়ণ, বল্য, মূত্রকর ও ইহার প্রলেপ উষ্ণ। মূত্রশ্লিষ্য ও জননেশ্লিষ্যের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। মণ্ডুকপর্ণী অত্যধিক মাত্রায় সেবিত সেবিত হইলে মূত্রশ্রোত ও অণ্ডাধারের ( ovary ) উত্তেজনা এমন কি সমস্ত শরীরে চুলকনা জন্মায়। যষ্টিমধুসহ থূলকুড়ির মূল উষ্ণ ও রসায়ন বলিয়া পাচড়া প্রভৃতি বিবিধ চর্মরোগ, কিরঙ্গকতে বা কণ্ডুয়নে ( Second syphilitic sores or skin eruptions ), কুষ্ঠ স্নীপদ এবং গলগণ্ড, গণ্ডমালাদিরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পীনস রোগে থূলকুড়ীর মূল চূর্ণের নস্ত হিতকর। ইহার পুন্টিশ বা প্রলেপ কিরঙ্গকতে বা অন্তবিধ ক্ষতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চূর্ণদ্বারা ও ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার সমগ্ররূপ। মাত্রা মণ্ডুকপর্ণী বা থূলকুড়ীর স্বরস ১ হইতে দুই তোলা। মূলচূর্ণ ২ আনা হইতে দুই আনা।

**ইতিহাস ও দেশবিশেষে**

\* আয়ুর্বেদোক্ত অপরাপর গুণ রাজবৈজ্ঞানিক ব্রিজাচরণ গুপ্ত কবিত্বরণ মহাশয়ের রচিত “বনৌষধি দর্পণ” নাম দ্রব্যাক্তঃ ১১ পৃষ্ঠকে দ্রষ্টব্য।

ব্যবহার—সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা ব্রাহ্মী ও মধুকর্ণী এই দুই নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। চরুদত্ত বলেন ইহার টাটকা রস দুগ্ধ ও যষ্টিমধু সহ খাইলে উত্তম রসায়ন ও বৃষ্য যোগ হয়। নিষণ্টুগ্রন্থ সকলে ইহার পর্যায় বাচক নানাশব্দ আছে। এবং ইহা শীতল, লণু, স্বাছ ও বলকারক বলিয়া উল্লেখ আছে। শাস্ত্রে আছে যে ব্রাহ্মী বা থুলকুড়ী শাক সেবনে স্মৃতি ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয় এবং কুষ্ঠ, মেহ ও জ্বর নষ্ট হয়। এনলি সাহেব বলেন কেরামগুল তীরবাসীরা কোন বায়গায় আঘাত লাগিলে কি আঘাত জনিত ক্ষত হইলে ঐ স্থানে থুলকুড়ীর রস প্রয়োগ করে। ইহাতে ঐ সকল আঘাত বা ক্ষতে প্রদাহ জন্মিতে পারে না। হুসৈফি সাহেব বলেন যাতা ঘাঁপের লোকেরা সূত্র-সিদ্ধির জন্ত ইহার রস ব্যবহার করে। মালাবার উপকূলের লোকেরা ইহার রসকে কুষ্ঠ নাশক বলে। ১৮ ৫২ সালে ইহা কুষ্ঠ রোগের Specific বা নিশ্চয় উপশমকারী কিনা সম্বন্ধে ডাক্তার বইলোর মনো-যোগ আকর্ষণ করে। এবং পরে ডাক্তার এ, হাটার মদ্রাজ কুষ্ঠ হাসপাতালে ইহার পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে ইহা কুষ্ঠ রোগের Specific বা নিশ্চয় উপশমকারী হউক বা না হউক পরন্তু ইহা কুষ্ঠরোগ নাশপক্ষে যে বিশেষ সহায়তা করে তাহা নিশ্চিত। ইণ্ডিয়া ফার্মাকোপিয়াতে তাহার পরে এই থুলকুড়ীর কথা গেজেট হয় এবং ইহাকে বলকারক, রসা-য়ন ও স্থানীয় উত্তেজক, বিশেষতঃ গর্ভি এবং উপদংশ জনিত চর্মরোগে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ বিশেষ হিতকর বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ইহার পাউডার ও পুন্টস্ কি করিয়া করিতে

হয় তাহা ফার্মাকোপিয়াতে লেখা আছে। ১৮১৮ সালে ইউরোপ হইতে এতৎ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট আইসে তাহাতেও ঐ সকল গুণাবলীর কথা দৃষ্টীকৃত হয়। বোম্বাই প্রদেশে ছেলেদের অন্নস্বর পেষ্টের গোলমালে থুলকুড়ীর ৭৫ টা পাতার রস চিনি ও কামিন অর্থাৎ জীরা দিয়া খাইতে দেয় কঙ্গন প্রদেশে তোতলা তোতলামি (Stammer) আরাম করিবার জন্ত লোকে ইহার ২টা কি ১টা পাতা প্রতাহ খাইতে দেয়। এবং রক্তের উচ্চতা জন্ত যে সকল চর্মরোগ হয় তাহাতে ইহার রস প্রয়োগ করে।

ডাক্তার প্রাণ্ডিপ্রি বলেন যে মরিশাস্ দ্বীপে এই থুলকুড়ী শাক এত প্রচুর পরিমাণে জন্মে যে সকল লোকে ইহা পশুদিগকে দেয়। ইহা খাইলে পশুর দুগ্ধের পরিমাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়।

ডাক্টার্স সাহেব বলেন কুষ্ঠরোগীকে থুলকুড়ীর রস সেবন করিতে দিলে প্রথমতঃ তাহাদের গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের গাত্রচর্মে বিশেষতঃ হস্তে ও পদে কাঁটা ফুটানের মত যাতনা হয়। কিছুদিন বাদে গাত্রোত্তাপ এতবৃদ্ধি হয় যে সহ্য করা যায় না। তারপর এক সপ্তাহ বাদে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় ও চর্মগুলি নরম হইতে থাকে। থুলকুড়ী মুজনালাী ও জঠরক্রিয়ার উত্তেজনা করে। প্রতিদিন ১০ গ্রেণ করিয়া ইহার এক ডোজ তিনবার করিয়া খাইলে ইহা উত্তেজক (টিমুলেণ্ট) ঔষধের কাজ করে এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্মরোগের পক্ষে উপকারী হয়। কিন্তু অধিক স্নাত্ত্বা খাইলে ইহাতে ঘোর বম্বনা, মাথাব্যথা, আচ্ছন্ন ভাব ইত্যাদি অনিষ্ট জনক উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়।

## বাল্য-বিবাহ ।

[ কবির ৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত ]

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় মহাশয় প্রেরিত

বার বছরেব কড়া, নিশব্দ বর ।  
 বিবাহের পরিণাম—অতি শুভ কর ॥  
 মন দিয়া শুন সবে মম্বর এ উক্তি ।  
 বাল্য বিয়া পুরুষের কড় নহে যুক্তি ॥  
 বিবাহ উচিত, দেহে ধাতু পুষ্ট হ'লে ।  
 চব্বক স্তম্ভত ইচ্ছা গিয়াছেন ব'লে ॥  
 \* \* \* \* \*  
 পনের অথবা ষোল বছর বয়সে ।  
 পুরুষ, বয়স্কা ভাৰ্গ্য লভে বঙ্গদেশে ॥  
 যে বয়সে পুস্তকেতে দিবে যুবা মন,  
 সে বয়সে দেখে যদি নারী'র বদন,  
 লেখা পড়া আর তা'ব ভাল নাহি লাগে ।  
 চাঁদমুখ খানি শুধু আশ্রবেতে জাগে ॥  
 \* \* \* \* \*  
 পোত্র মুখ দরশনে স্বর্গে হয় বাস ।  
 বাপ মারি মনে এই আছয়ে বিশ্বাস ॥  
 ছ'বেলায় অন্ত যুটে, এ সঙ্গতি নাই ।  
 পরের মেরেকে তবু ঘরে আনা চাই ॥  
 'নিজে শুতে ঠাই নাই, শঙ্করাকে ডাকে ।'  
 বাঙ্গালীর এইরূপ বিয়ে হ'য়ে থাকে ।  
 মধুর কি আছে বল বধূ'র মতন ।  
 "রাঙ্গাবধূ" নামে, গামে শিশু'র ক্রন্দন ॥  
 "স্বা ভাগ্যেতে ধন হয়" শাস্ত্রের বচন ।  
 বউ না আনিলে ঘর চলে কি কখন ?  
 \* \* \* \* \*  
 হ'ক ছেলে কাণা খোঁড়া, জ্ঞানহীন গাধা ।  
 সে ছেলের বিবাহে নাহিক কিন্তু বাধা !  
 কঠোর পিতার পক্ষে মুখ্য উপদেশ—  
 "গৌরীদানে" মহাপুণ্য, মঙ্গল অশেষ ।  
 চারা-গাছে, চারালতা জড়ায় উত্তম ।  
 \* \* \* \* \*

অন্ন বয়সেতে করি নারী সহণাম ।  
 জড়বুদ্ধি যুগাদের ঘটে সর্বনাশ ॥  
 হীনবীৰ্য্য অশয় হইয়া পড়ে ক্রমে ।  
 চক্ষু হয় জ্যোতিঃশূন্য, স্মৃতি শক্তি কমে ॥  
 লাগেতে চল চল সুন্দর চেঁচাৱা ।  
 শিরাজালে পরিপূর্ণ, যেন টেসো মারা !  
 পেঁমারাদ্য প্রিয়তমা পত্নী দরশনে ।  
 স্বামীর উল্লাস আব নাহি থাকে মনে ॥  
 নেসা বোর হয় শেবে বল বাড়াইতে ।  
 কেহ যান বৈজগৃহে "মোদক" খুজিতে ॥  
 কিশোরীর শরীর কি ভাল থাকে এতে ?  
 কচি ছুঁ'ড়ী, সাজে বুড়ী, ভরা যৌবনেতে ॥  
 কলিতে ছুটিতে হয় অলির ভাঙনে ।  
 স্বকায় পেমেব মধু, প্রথম জীবনে ॥  
 \* \* \* \* \*  
 করিলে অপক বীজ ভূমিতে বপন,  
 সে বাজ হইতে গাছ জন্মে কি কখন ?  
 জন্মী-শুণে যদি হয় অল্পব বাহির,  
 তরু কিন্তু তেজোহীন হবে জেনো স্থির ।  
 প্রায়ই মরিয়া যায়, হ' একটা বাঁচে ।  
 তরু সম নরজাতি, বুঝ সবে আছে ॥  
 অপক বীজের ফল দেখ কলিযুগে ।  
 ক্ষীণাঙ্গ অল্পায়ু শিশু রোগে মরে ভুগে !  
 যে বিবাহে, জলাঞ্জলি দিয়া ভোগ স্নেহে,  
 পতি পত্নী উভয়ের দিন কাটে ছুঃখে ;  
 হেন বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী বারা,  
 সমাজের শুভাশুভে দারী ন'ন তাঁরা ।  
 চাও যদি দেশ-হিত, ওহে স্মৃধীগণ !  
 বাল্য বিবাহের প্রথা কর নিবারণ ॥  
 যদি বিয়ে দিতে প্রাণে থাকে খুব সখ ।  
 দম্পতিরে একছু কাল রাখিও পৃথক ॥ ‡

‡ তারা চিহ্নিত স্থানের পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। কাগজের জীর্ণতা বশতঃ অনেক অক্ষর লুপ্ত ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।



**বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ**—রোগী মনে করে যেন তাহার গায়ে ভিজা কাপড় জড়ান আছে, হাত পায়েব হাড়ে যত কোঁটার মত বেদনা, ঘুম বেশী, সমস্ত দেহ ভারী, মাথা ধবা, নাক হইতে জলেব মত শ্লেষ্মা আঁা, কাসি, সন্তাপ, জ্বরের বেগ মধ্যম—অতি তীক্ষ্ণ নহে মুহুও নহে ।

**পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ**—মুখ বিবর শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত, মুখের স্বাদ তিক্ত, তন্দ্রা (যেন ঘুমাইয়া আছে), অজ্ঞানতা, কাসি, অকচি, পিপাসা, কখন শুক্ণভাব কখন ঘর্ষ, শ্লেষ্মা পিত্ত মিশ্রিত বমন বা দাস্ত, কখন দাহ, কখন শীত ।

### সন্নিপাত জ্বর ।

সন্নিপাত শব্দের অর্থ মিলন—মিলন ছই বা বহু বস্তুর হইতে পারে । সন্নিপাত জ্বর বলিলে বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনটি দোষ বিকৃত হইয়া যে জ্বর উৎপাদন করে সেই জ্বর বুঝাইয়া থাকে । এই জন্ত সন্নিপাত জ্বরের নামান্তর ত্রিদোষজ জ্বর । তিনটি দোষের—বায়ু, পিত্ত, কফের প্রত্যেক সমানভাবে কুপিত হইয়া জ্বর জন্মাইতে পারে, আবার তিনটির মধ্যে কোন একটি বা কোন দুইটি “উৎপন্ন” অর্থাৎ অত্যন্ত কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করিতে পারে । আবার তিনটির মধ্যে কোনটি হীনভাবে কোনটি বা মধ্যমভাবে কোনটি বা অধিকভাবে কুপিত হইয়াও জ্বর জন্মাইতে পারে । এইরূপে গণনা করিলে সন্নিপাত জ্বর ১৩প্রকার হয় । চরক বলিয়াছেন—

দ্ব্যুৎপন্নকোষটৈঃ ষট্ স্থায়ীনমধ্যাধিকৈশ্চ ষট্ ।

সমৈশ্চৈকো বিকারান্তে সন্নিপাতাস্ত্রয়োদশঃ ।

ছইটি দোষ ‘উৎপন্ন’ অর্থাৎ অত্যন্ত কুপিত এবং একটি দোষ মন্দভাবে কুপিত এইরূপ গণনায় সন্নিপাতজ্বর তিনপ্রকার যথা—(১) বাতপিত্ত উৎপন্ন কফ মন্দ (২) বাতশ্লেষ্মা উৎপন্ন পিত্ত মন্দ (৩) পিত্তশ্লেষ্মা উৎপন্ন বায়ু মন্দ । একটি দোষ উৎপন্ন, অপর দোষদ্বয় মন্দ এই হিসাবে সন্নিপাত তিনপ্রকার যথা—(১) বায়ু উৎপন্ন পিত্তশ্লেষ্মা মন্দ (২) পিত্ত উৎপন্ন বায়ু কফ মন্দ (৩) শ্লেষ্মা উৎপন্ন বায়ুপিত্ত মন্দ । একটি দোষ হীন, একটি মধ্যম, অপরটি অধিক এইরূপ গণনায় সন্নিপাত জ্বর ছয় প্রকার যথা—(১) হীনবাত, পিত্ত মধ্যম শ্লেষ্মা অধিক (২) হীনবাত, কফমধ্য, পিত্ত অধিক (৩) হীন পিত্ত, কফ মধ্যম, বায়ু অধিক (৪) হীন পিত্ত, মধ্যম বাত, শ্লেষ্মা অধিক (৫) হীন কফ, বাত মধ্যম, পিত্ত অধিক (৬) হীন কফ, পিত্ত মধ্যম, বায়ু অধিক । এই ১২ প্রকার আর তিনটি সমানভাবে কুপিত সন্নিপাত এক প্রকার—এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বর ।

জ্বরের সাধারণ কারণ পূর্বে লিখিত হইয়াছে । বন্দজ ও সন্নিপাত জ্বরের যে কৃতকগুলি বিশেষ কারণ আছে সেগুলি নিয়ে লিখিত হইতেছে—

অধিক ভোজন, অল্প ভোজন, অসময়ে ভোজন, উপবাস, ঋতু পরিবর্তন, ঋতু-ব্যাপত্তি অর্থাৎ যে ঋতুতে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষণ যে প্রকার হওয়া উচিত তাহা না হওয়া বা তাহার বিপরীত

ভাব—যেমন শীতে শীত ভাল না হওয়া কিম্বা শীতে গ্রীষ্ম হওয়া, যে গন্ধ গ্রহণ করা অভ্যাস নাই বা যাহা অহিতকর এরূপ গন্ধ আশ্রয় করা, যেমন—চামড়ার গুদামে কি এসিডের কারখানায় যাহার থাকে অভ্যাস নাই, তাহাকে যদি সেই স্থানে বাস করিতে হয় তাহা হইলে তাহার অস্বাস্থ্য-গন্ধভ্রাণ ঘটিবে। সুতরাং বা জঙ্গম বিষ দ্বারা দুষ্ট জলপান, বরণার জলপান, শুষ্ক শাক বা শুষ্ক মাংস ভোজন, অনুচিত ভেবজ-গন্ধভ্রাণ অর্থাৎ উৎকট তীব্র ঔষধের গন্ধ আশ্রয় করা, মেঘাচ্ছন্ন শীতল দিনে পূর্নদিকের বায়ু সেবন, অন্ন পরিবর্তন অর্থাৎ যাহার যাহা ভোজন করা অভ্যাস কোন কারণে তাহার পরিবর্তন।

উক্ত ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বরের যে সকল লক্ষণ প্রায় দেখা গিয়া থাকে সেইগুলি নিম্নে লিখিত হইতেছে। নিম্নোক্ত ত্রয়োদশবিধ সন্নিপাত জ্বর বিকৃতি-বিষম-সমবায়াবদ্ধ।

(১) বাতপিত্ত উজ্জ্বল কফমন্দ—ভ্রম, পিপাসা, দাহ সর্দাগ্ভ ভারি ও মাথায অত্যন্ত বেদনা।

(২) বাতশ্লেষ্ম উজ্জ্বল পিত্তমন্দ—শীতবোধ, কাস, অরুচি, সর্দাদা নিদ্রাভিত্তের মত ভাব, পিপাসা, দাহ রক্ত ও ব্যথা।

(৩) পিত্তশ্লেষ্মা উজ্জ্বল বায়ুমন্দ—বমন, কখন শীতবোধ, কখন দাহ, তৃষ্ণা, অজ্ঞান ভাবে অবস্থিতি, হাড়ে বেদনা।

(৪) বায়ু উজ্জ্বল পিত্তশ্লেষ্মা মন্দ—অস্থিসন্ধি, অস্থি এবং মস্তকে বেদনা, অস্বপ্ন বাক্য, সর্দাগ্ভ ভারি, ভ্রম, গলা ও মুখের শুষ্কতা ও তৃষ্ণা।

(৫) পিত্তউজ্জ্বল বায়ুকফমন্দ—মল ও মূত্রের সহিত রক্তনির্গম, দাহ, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, বলহানি ও মূর্ছা।

(৬) শ্লেষ্মাউজ্জ্বল বায়ু পিত্তমন্দ—উখান উপবেশনাদি কার্যেও অজুৎসাহ, অরুচি, গাবমি, দাহ, বমন, কিছু ভাল লাগে না ভাব, ও গাঘোর সর্দাদা তজ্জাভাব, ও কাসি।

(৭) হীনবাত পিত্তমধ্যম শ্লেষ্মা অধিক—ভ্রমণ শ্লেষ্মজ্বাব, বমন, আলস্য, তন্দ্রা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য।

(৮) হীনবাত মধ্যকফ পিত্ত অধিক—চক্ষু ও মূত্র হরিদ্রা বর্ণ, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম, অরুচি।

(৯) হীনপিত্ত মধ্যকফ বাত অধিক—মাথায বেদনা, কল্প, খাঁস, প্রলাপ বমন, অরুচি।

(১০) হীনপিত্ত মধ্যকফ বায়ু অধিক—শীতবোধ, দেহভার, সর্দাদা তজ্জাভাব, প্রলাপ অস্থি ও মস্তকে অতীব বেদনা।

(১১) কফহীন বাতমধ্য পিত্ত অধিক—পাংলা দাক্ত, অগ্নি দুর্বল, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি, ভ্রম।

(১২) কফহীন পিত্তমধ্য বায়ু অধিক—কাস, খাস, তরুণ সর্দি, মুখ শুষ্কতা, পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা।

(১৩) সমানভাবে কুপিত বাতপিত্ত কফ—কখন দাহ, কখন শীত, অগ্নির সন্ধি ও মস্তকে বেদনা, চক্ষু হইতে জল পড়ে, চক্ষুর রঙ ঘোলাটে, বা রক্তবর্ণ, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট, কর্ণে বেদনা ও চম্ চম্ রম্ রম্ শব্দ, গলার ভিতর যেন কি লাগিয়া আছে, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাস, খাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা কাল পোড়ার মত এবং খরখরে, অত্যন্ত শ্রুত-দ্রুত অর্থাৎ অতিশ্রম করিলে অঙ্গ যেরূপ ক্লান্ত হইয়া থাকে সেইভাবে, রোগীর যে স্নেহা উঠে তাহার সহিত রক্তমিশ্রিত থাকে, মাথা চালা, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, বৃকে বেদনা, ঘর্ম্ম, মূত্র মল অতি বিলম্বে অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, রোগী বেশী রোগী হয় না, সর্বদা গলায় বৃকে স্নেহার শব্দ, গায়ে বোলতা কামড়ানর মত দাগ দেখা যায়—এই দাগগুলি গোলাপী রঙের এবং গোল গোল, রোগী অল্প কথা বলে, নাড়ী ভূঁড়িতে ও সিরায় সিরায় বেদনা, পেট ভার, বিলম্বে দোষের পরিপাক। কোন কোন ক্ষেত্রে—রোগী দিবাভাগে নিদ্রাচ্ছিন্নের মত ও রাত্রিতে জাগ্রত থাকে, কোন সময় অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হয় কখন বা নাই। কখন হাঁসে কখন নাচে, কখন গান করে, কখন কটমট করিয়া চাহিয়া থাকে, কখন বিছানা আঁচড়ায়, কামড়াইতে যায়, কখন একপাশে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে যেন কিছু গুণিতেছে; পায়ের ডিম্বতে, পার্শ্বে, মাথায় ও হাড়ে বেদনা, মূত্র ও মল কখন অল্প কখন বা অধিক, রোগীর মুখ তৈল মাখিলে যেরূপ চক্‌চকে হয় সেইরূপ দেখায় এবং স্বরভঙ্গ দৃষ্ট হয়।

### সন্নিপাত জ্বরের কষ্টসাধ্যত্ব ও অসাধ্যত্ব।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা ঠিক যেন মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করা। সন্নিপাত জ্বর যেমনই হউক না কেন উহা কদাপি সুখসাধ্য নহে। সন্নিপাত জ্বরে যদি মলবদ্ধ থাকে, পাচক অগ্নির দুর্বলতা হেতু পথ্য যদি পরিপাক না পায় এবং যদি উপরিকথিত লক্ষণের সমস্ত গুলিই প্রকাশ পায় তাহা হইলে সন্নিপাতজ্বরের অসাধ্য হইয়া থাকে। আর যদি রোগীর মলবদ্ধ না থাকে, অগ্নির যদি তাদৃশ দুর্বলতা ন্য থাকে, সমস্ত লক্ষণ যদি প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে কষ্টে আরাম হইয়া থাকে। সন্নিপাত জ্বর প্রায়ই পিত্তবৃদ্ধি, কফবৃদ্ধি বা বায়ুবৃদ্ধি হেতু যথাক্রমে ১০ দিনের দিন, ১২ দিনের কিম্বা ৭ দিনের দিন অত্যন্ত বাড়িয়া থাকে। কাহার বা এই সঙ্কট অবস্থা হইতেই মৃত্যু হয় কাহারও বা এই সঙ্কট অবস্থার পর ক্রমশঃ আরোগ্যের দিকে গতি দেখা যায়। কেন এইরূপ হয়? সন্নিপাতজ্বরের দোষের কার্য্যকে দুইভাগ করা হইয়াছে—ধাতুপাক আর মলপাক। যদি ধাতুপাক হয় তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হয়; আর যদি মলপাক হয় তাহা হইলে রোগী রক্ষা পায়। কি করিয়া ধাতুপাক, মলপাক বুঝা যায়? লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে হয়। ধাতুপাকের লক্ষণ—উত্তরোত্তর রোগের বৃদ্ধি, বলের হানি, গয়েরের সহিত রক্ত, মূত্রের সহিত শুক্রস্রাব ইত্যাদিরূপে ধাতুনির্গম এবং নিদ্রাশূন্যতা, বৃকের তরুণতা,

মলমূত্রাদি রোধ, গাত্রশীত, মাথা বেণীভার, আহারের প্রতি নিতাস্ত অনিচ্ছা, সর্বদা ছট্‌ফট করা, এইগুলি ধাতুপাকের লক্ষণ। মলপাকের লক্ষণ—দোষ প্রকৃতিবৈচিত্র্য, জ্বর ও দোষের লঘুতা, ইন্দ্রিয়ের বিমলতা এইগুলি মলপাকের লক্ষণ। সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসায় তাড়াতাড়ি করা চলে না—সময় অপেক্ষা করিতে হয়। সাধারণতঃ সন্নিপাত রোগীর ২২ দিন পর্যন্ত বিশেষ আশঙ্কা থাকে। যে সকল সন্নিপাত জ্বর কষ্টসাধ্য এই সময়ের মধ্যে সেই সকল জ্বরে মলপাকের লক্ষণ ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। পরে আরাম হইতে হয়ত ৪২।৪৪ দিন বা আরও অধিক কাল সময় লাগে। আর সন্নিপাতজ্বর অসাধ্য হইলে ঐ সময়ের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে এই জ্ঞাত এই ২২ দিন সন্নিপাত জ্বরের মর্যাদা বলিয়া অভিহিত হয়।

### সন্নিপাতজ্বরের উপদ্রব।

যে সন্নিপাত জ্বরের যেকোন মর্যাদা কথিত হইয়াছে সেই মর্যাদা কালের শেষভাগে যদি রোগীর কর্ণমূল ফুলিয়া উঠে তাহা হইলে সেই রোগীর জীবন সংশয় জানিবে। অতি অল্প রোগীই এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করে।

### অভিভ্রাস জ্বর।

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ বক্ষোদেশের স্রোতঃসমূহ আশ্রয় করে। আম রসের বৃদ্ধিতে দোষত্রয় আরও কুপিত হইয়া পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষ্ঠান অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং হৃদয় আশ্রয় করিয়া মহাঘোর প্রবল অভিভ্রাস জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরে—রোগী চক্ষুতে দেখিতে পায় না, কর্ণে শুনিতে পায় না, গাত্রস্পর্শ করিলে জানিতে পারে না, গন্ধগ্রহণের শক্তি থাকে না বারম্বার মাথা চালে, বিড়বিড় করিয়া কি বলে বুঝা যায় না, এমনভাবে প্রকাশ করে যেন ভিতরে কোন অব্যক্ত যন্ত্রণা হইতেছে, একপাশে থাকিতে চায় না এবং অতি অল্প কথা বলে। \*

বাগ্‌ভট বলেন—সন্নিপাত, অভিভ্রাস ও হতৌজাজ্বর একই জ্বরের নামান্তর মাত্র। সূক্ষ্মত অভিভ্রাস ও হতৌজাজ্বরের লক্ষণ পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন। রোগীর গাত্র অধিক উষ্ণ বা শীত হয় না, জ্ঞানের অন্নতা, বিস্মিতের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ গলার আওয়াজ ভাঙ্গা ভাঙ্গা, বা বাকরোধ, জিহ্বা, কর্কশ, কণ্ঠত্বক, ঘর্ম্ম ও মূত্ররোধ, চক্ষু হইতে জলস্রাব, বিভ্রান্ত দৃষ্টি, আহারে ঘেব, শরীরের প্রভাহানি, ঘন ঘন শ্বাস পতন, বিহানা হইতে উঠিয়া যায় কখন বা স্থির থাকে এবং অসবধ কথা বলে। এইগুলি অভিভ্রাস জ্বরের লক্ষণ। পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া ওজো ধাতুক্কর করিলে রোগীর গাত্র শীতল ও জড়ভাবাপন্ন, অচেতনের মত শয্যা পড়িয়া থাকা, সর্বদা তন্দ্রার ভাব—জাগিয়া আছে কি ঘুমাইয়া আছে

\* মাধব নির্দোষ অভিভ্রাস জ্বরের এইরূপ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। অভিভ্রাস জ্বরের এই লক্ষণ—চরক, সূক্ষ্মত, বাগ্‌ভট বা অধুনা যে গ্রন্থ হারীত নামে প্রচলিত তাহাতে ও নাই। বিজয় রকিতের টীকার এই অভিভ্রাস জ্বরের ব্যাখ্যা নাই।

হইলে বুঝা যায় না, অসম্বন্ধ কথা বলে, রোমাঞ্চ হয়, সর্কাস অবসর এবং উত্তাপ ও বেদনা জ্বর ও যোনিরোধ জ্বর হইয়াছে জানিবে। এই অভিজ্ঞাস জ্বর প্রায়ই অসাধ্য, কচিং কোন রোগী আরাম হয়।

### আগন্তুজ্বর ।

আগন্তুজ্বর চারি প্রকার—অভিঘাৎজ, অভিষঙ্গজ, অভিচারজ ও অভিশাপজ। শব্দ, লোভ, চাবুক, কাষ্ঠ, মুষ্টি, করতল, পদতল, দণ্ডাদি, পশুদিগের নখাদি, পতন কিম্বা অত্যাচারে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে জ্বর হয় তাহাকে অভিঘাতজ আগন্তুজ্বর বলে। অভিঘাত জ্বর বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত দূষিত করে। আহত অঙ্গে ব্যথা, ফুলা এবং বিবর্ণতা দেখা যায়। অভিলষিত স্ত্রী বা ধনাদির কামনা, পুত্র ধনাদি বিনাশ জ্বর শোক, ভয় এবং ক্রোধদ্বারা মানুষের মন অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলে কিম্বা ভূতাবেশ জ্বর যে জ্বর হয় তাহাকে অভিঘাতজ আগন্তুজ্বর বলে। অরণ্যস্থিত বিষবৃক্ষে পুষ্প একটুটি হইলে, সেই পুষ্পপরাগবাহী বায়ু সেবন, কিম্বা অত্যাচারে বিষ সংগ্রহ ঘটিলে যে জ্বর হয় কাহার মতে সেই জ্বরকেও অভিষঙ্গ জ্বর বলে। অনিষ্ট ইচ্ছা করিয়া বিপরীত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক রক্ত, সর্পাদি দ্বারা যে ব্যাধি করা হয় তাহার নাম অভিচার। ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, গুরু বা সিদ্ধপুরুষ অনিষ্ট অভিপ্রায় করিয়া যে বাক্য উচ্চারণ করেন তাহার নাম অভিশাপ। এই অভিচার ও অভিশাপ জ্বর যে জ্বর হয় তাহাকে অভিচারজ অভিশাপজ আগন্তুজ্বর বলে।

এবং আমরা সে সকল জ্বরের উল্লেখ করিলাম সে গুলিকে—নিজ “জ্বর” বলে। অতঃপর আগন্তু জ্বরের হেতু লক্ষণ কথিত হইবে। নিজ শব্দের অর্থ আপনার, আগন্তু শব্দের অর্থ অতিথি বা “উট্টকো”। জ্বর আবার “আপনার” বা “উট্টকো” কি? বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইয়া যে জ্বর উৎপাদন করে তাহার নাম নিজজ্বর। এই জ্বর নিজ অর্থাৎ আপনার কেন না জ্বরের কারণ বায়ু, পিত্ত, কফ আমাদের শরীরের ভিতরের দ্রব্য বাহিরের কিছু নহে। আগন্তুজ্বরের কারণ কিন্তু এরূপ নহে—উহা সম্পূর্ণ বাহিরের বস্তু। আগন্তুজ্বরের কারণ নানা প্রকার আঘাত, অভিচার ও অভিশাপ। লণ্ডুদ্বারা আঘাত হইলে কিরূপে জ্বর জন্মিয়া থাকে? আঘাত জ্বর বায়ু কুপিত হইয়া সর্কাসে বিশেষতঃ আহতস্থানে ব্যথা, ফুলা ও বিবর্ণতার সহিত জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব দেখাইতে যে আগন্তুজ্বরে লণ্ডুদ্বারা আঘাত স্বাধীন ভাবে কিছু করিতে পারে না—এখানেও দোষসম্বন্ধ হইয়া তবে অরোংপত্তি হইয়া থাকে। যাহাকে আমরা নিজজ্বর বলিয়াছি তাহারও কারণ ত লণ্ডুদ্বারা আঘাতের মতই বাহিরের বস্তু। মনে কর আমার দধি ভোজন জ্বর প্রায় কুপিত হইয়া প্রেম-জ্ব হইল—এ স্থলে বাহিরের বস্তু দধিও লণ্ডুদ্বারা মত স্বাধীন ভাবে কিছু করিতে পারিল না, কিন্তু প্রেমকে কুপিত করিয়া অরোংপাদন করিল। তবে আগন্তুজ্বরে আর নিজ জ্বরে প্রভেদ হইল কি? উভয় জ্বরের এই মাত্র প্রভেদ যে আগন্তু জ্বরে প্রথমে ব্যথা, পরে দোষ

সম্বন্ধ ঘটে, আর নিজজ্বরে প্রথম হইতেই দোষ-সম্বন্ধ, ব্যাথাপূর্বকত্ব নাই। এই উত্তর অভিধাতজ আগন্তুজ্বরের পক্ষ গ্রহণ করা যাইতে পারে কিন্তু আর তিন প্রকার (অভিবঙ্গ, অভিচাব, অভিশাপ) আগন্তুজ্বরে আবাত নাই, সুধু আবাত কেন, বিশেষ কোন শারীর সম্পর্কই নাই—মনে কর তুমি কলিকাতায় আছ,—প্রয়াগে একজন তোমার প্রতি অভিচার কি অভিশাপ প্রদান করিল—আর তোমার অভিচার বা অভিশাপজ আগন্তু জ্বর হইল। আবার অভিবঙ্গ জ্বরে প্রথমে কামাদি কর্তৃক মন দূষিত হয় পশ্চাৎ দোষ সম্বন্ধ ঘটয়া জ্বর হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে আগন্তুজ্বরের হেতুর বিশিষ্টত্ব আছে কেবল হেতুর কেন চিকিৎসারও বিশেষত্ব আছে। চরক বলিয়াছেন—

হেতৌষধিবিশিষ্টাশ্চ ভবন্ত্যাগন্তবোজ্বরাঃ।

আগন্তুজ্বরের চিকিৎসায় লঙ্ঘন উপদিষ্ট হয় নাই। আশ্বাস বাক্য, হর্ষণ, ঈপ্সিত বস্ত্র দান, হোম, সন্তান ও দানাদি দ্বারা আগন্তু জ্বরের চিকিৎসা করিতে হয়।

এক্ষণে উপরিউক্ত বিবিধ আগন্তুজ্বরের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

**অভিচার ও অভিশাপ** জন্ম আগন্তুজ্বরে সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যাহার নাম করিয়া অভিচারিক মন্তোচ্চারণ করা হয়, প্রথমে তাহার মন অতি সমস্ত হয় পরে দেহের সন্তাপ জন্মে, গায়ে ক্ষোড়া হয়। তৃষ্ণা, ভ্রম, দাহ, মূর্ছার সহিত প্রত্যহ জ্বর বাড়িতে থাকে।

**কামজ জ্বরে** মনের ঠিক থাকে না, সর্বদা নিদ্রার ভাব, সর্বকার্যে অহুৎসাহ এবং আহারে অনিচ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। **শোকজ জ্বরে**—রোগী নিরন্তর অশ্রুমোচন করে। **ভয়জ্বরে**—রোগীর বাক্য ও আচরণে ভীতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। **ক্রোধজ জ্বরে**—রোগী হস্ত বিক্ষেপ পূর্বক ক্রোধ লক্ষণ প্রকাশ করে। **ভূতাবেশ** জন্ম জ্বরে—রোগী মানুষের পক্ষে অমুচিত বাক্য ও আচরণের অমুষ্ঠান করে। **বিশভোজন** জন্ম জ্বরে—মুখ সাদা হইয়া যায় এবং অতিদার, অরুচি, পিপাসা, সর্কাজে বেদনা ও মূর্ছা লক্ষিত হয়। কামাদি জ্বরের যে লক্ষণ কথিত হইল, এই লক্ষণগুলি যে কেবল কামাদি অরোগেই প্রকাশ পায় তাহা নহে কিন্তু কামাদি জন্ম অন্নাত্ত রোগেও দেখা গিয়া থাকে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে আগন্তু জ্বরে প্রথমে মন বা শরীর ব্যাথা প্রাপ্ত হয় পরে বাতাদির অশ্রুতম দোষ প্রকুপিত হইয়া জ্বর জন্মাইয়া থাকে। এক্ষণে আগন্তুজ্বরের সেই দোষ সম্বন্ধ কথিত হইতেছে। কাম ও শোক হেতু বায়ু, ক্রোধহেতু পিত্ত, এবং ভূতাবিশেষ হেতু ত্রিদোষ কুপিত হয়।

**শারীর ও মানসজ্বর।**

বাতাদি প্রথমে শরীর দূষিত করিয়া যে জ্বর উৎপাদন করে তাহাকে **শারীর** জ্বর বলে। কামাদি প্রথমে মন দূষিত করিয়া যে জ্বর জন্মায় তাহার নাম **মানস**

# আয়ুর্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক ।

১ম বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৪—জ্যৈষ্ঠ ।

৯ম সংখ্যা ।

## আয়ুর্বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ।

(ঢাকা নগরীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে পঠিত ।)

পূর্ণ-সং-চিত্র—আনন্দময়, বেদবক্তা দেবদেবেণ জগদীশ্বরের সর্বসিদ্ধিপ্রদ চরণোদ্দেশে  
কোটি কোটি প্রণাম করিয়া, গুরুজনের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া, সমবেত সভ্য মহোদয়  
গণকে যথাযোগ্য প্রণাম, অভিবাদন ও অভিনন্দন করিয়া, আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিবেদন  
করিতেছি ।

সমবেত সভ্য মহোদয়গণ, বহুদিনের সুপ্ত ভারত আজ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে । স্বপ্নে জীব  
যেমন বাস্তব পদার্থকে অবাস্তব এবং অবাস্তব পদার্থকে বাস্তব দেখে, ভারত স্বপ্নযোগে এতদিন  
তাহাই দেখিতেছিল । স্বকীয় ভাণ্ডারের কাঞ্চনকে কাচ মনে করিয়া ভারত এতদিন পরকীয়  
ভাণ্ডারের কাচকে কাঞ্চন জ্ঞান করিতেছিল । এতদিনে সে স্বপ্ন টুটিয়াছে—সে ভ্রম  
শূন্য হইয়াছে । কিন্তু এই এতদিনের সুপ্ততা—এতদিনের ভ্রম, আয়ুর্বেদের যে কি অনিষ্ট  
করিয়াছে, তাহা কেনন করিয়া বুঝাইব । বুঝাইবার ভাষা জগতে আজিও সৃষ্টি হয় নাই ।  
জগতের বাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্রাট্ আয়ুর্বেদ, আজ সর্ববাস্তব দীনহীন ভিখারী ।  
কোটি কোটি প্রাণীর দেহ যাহার অমুগ্রহে রক্ষিত হইত, সে আজ স্বীয় দেহ রক্ষার  
জন্ত পবের দ্বারস্থ । বাহ্যর জ্ঞানালোকে একদিন জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সে আজ  
ঘোবতর অজ্ঞান তমসাজ্জম । এ হুঃখ প্রকাশের কি ভাষা আছে ।

একথা কেন বলিতেছি ? আজ এই সুখের দিনে—বঙ্গের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের এই প্রান্ত  
সম্মিলনের দিনে, জগৎ সুখে পরিপ্লুত না হইয়া হুঃখে অভিভূত হয় কেন ? হয়—স্বামরা  
পুণ্যময়, অনাদি, জগতের বাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক আয়ুর্বেদকে ত্যাগিয়া করিয়াছি  
বলিয়া, লোভে স্বার্থপরতার অন্ধ হইয়া আমাদের সর্বভূতহিতে রত আয়ুর্বেদকে নষ্ট প্রায়  
করিয়াছি বলিয়া, অবহেলায় আমরা এই জীবের জীবন শাস্ত্রকে কলসাসার করিয়া তুলিয়াছি  
বলিয়া ।

যে আয়ুর্বেদের অষ্ট মহাশাখা, অসংখ্য প্রশাখা ফলপল্লবকুসুম সমৃদ্ধ হইয়া ভারতে কল্লতরু রূপে অবিস্তৃত ছিল, বাহ্যব আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাচীন ভাবতবাসী জ্ঞান, বিজ্ঞা, বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা ও শৌর্য্যবীর্য্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে আয়ুর্বেদের অমৃতময় ফলপাতার আকাজক্ষায় দেশদেশান্তর হইতে বিবিধ জাতি ভিক্ষুকরূপে ভারতে আসিয়াছিল, সেই মহামহিমমণ্ডিত আয়ুর্বেদের অবস্থা এক্ষণে কিরূপ? বলিতে কণ্ঠ বদ্ধ হইয়া যায়, অশ্রু দৃষ্টরোধ করে, প্রদর শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে চায়—সে আয়ুর্বেদ আর নাই, আছে কেবল তাহার অঙ্গহীন কঙ্কাল মাত্র। আয়ুর্বেদ মহাতরু অঙ্গ বহ্নাহতবৎ বিশীর্ণ। সে অষ্টমহাশাখা নাই, প্রশাখা নাই, ফলপল্লব কুসুম নাই—কেবল দুই একটি শীর্ণশাখা কোনও রূপে জীবিত রহিয়াছে মাত্র।

একটি অপ্রিয় সত্যকথা বলিতেছি। দেখুন আমাদের আয়ুর্বেদে চিকিৎসকেবল যে আদর্শ অঙ্কিত দেখিতে পাই সেই আদর্শের শল্যচিকিৎসক এমন কি কায়-চিকিৎসকও এক্ষণে আমরা ভারতে দেখিতে পাইতেছি না। আদর্শ চিকিৎসক ত দূরের কথা তাঁহাদের যোগ্য শিষ্য বলিয়া গণ্য হইবার অধিকারীই বা কয়জন আছেন? এই অবনতি কেন হইল ভাবিয়াছেন কি? এত সিজ্ঞাসার অনেক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমার বোধ হয়

### প্রধান ও প্রথম কারণ—শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অধ্যাপনা প্রণালী।

দেশে এখন যে প্রণালীতে আয়ুর্বেদের অধ্যাপনা হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ আধর্মিক বিরুদ্ধ। আয়ুর্বেদ বিদ্যার্থীর শিক্ষিতব্য বিষয় অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনটি—রোগীর জ্ঞান, রোগের জ্ঞান এবং ঔষধের জ্ঞান। রোগীর শরীবে রোগ, আমাকে তাহাব চিকিৎসা করিতে হইবে, সুতরাং রোগীর শরীরটি আমার ভাগ করিয়া জানা আবশ্যক। এই জ্ঞান লাভের জন্ত যে নরশরীরের রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে সেই নরদেহচ্ছেদ করিয়া বাত্ম আশ্রয়াদির নিঃসংশয় জ্ঞান লাভ করিতে হইবে—ইহাই আয়ুর্বেদ বক্তা ঋষির উপদেশ। কিন্তু আমরা আয়ুর্বেদ বিদ্যার্থীগণকে শারীরতত্ত্ব এইরূপে শিক্ষা না দিয়া কাব্যের মত আবৃত্তি করাইতেছি। তারপর রোগের জ্ঞান—রোগের জ্ঞানলাভ বিষয়ক পূর্ণ উপদেশ দিতে হইলে শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ দর্শন দুইই প্রয়োজন। রোগজ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে আমরা অল্পমেধা ভিষগের জন্ত অতি স্থূলভাবে সংগৃহীত সেই মাধবনিদান ভিন্ন আর কিছুই পড়াই না। মাধবনিদানে উল্লিখিত হয় নাই এমন অনেক সূত্র-ভিত্তি আকরগ্রন্থে বিস্তারিত রহিয়াছে, যাহা বিদ্যার্থীগণের অবগত পাঠ্য। কিন্তু পরিচালকের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত ঐ সকল অমূল্য সূত্রভিত্তি সংগ্রহ ও উপদেশের আকাজক্ষা কোন আয়ুর্বেদ অধ্যাপকেরই হৃদয়ে জাগ্রত হইল না। বিজ্ঞর রক্ষিত বুদ্ধিয়াছিলেন যে, মাধবে উপযুক্ত বিষয় অমূল্য হইয়াছে, কিন্তু তিনি সেই অমূল্যের উল্লেখ কেবল গ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন মাত্র—প্রপুর্তির অতিপ্রায়ে বলেন নাই। ইহা ত হইল গ্রন্থের কথা—প্রত্যক্ষ দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা কিছুই নাই। রোগের লক্ষণ শাস্ত্রে পড়িলেই যথেষ্ট হইল না, রোগীর শরীরে ঐ রোগ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিবার উপদেশ আছে। কিন্তু দেশে “আতুরাশ্রম” (In door Hospital) না থাকায় বিদ্যার্থীগণের সে শিক্ষা হইতেছে না। অধ্যাপকের গৃহে সমাগত রোগী দেখিয়া বিদ্যার্থীগণের



এই জ্ঞান সম্যক্ লাভ করা কেন সম্ভব নহে তাহা ভুক্তভোগী জানেন। অতঃপর ঔষধের জ্ঞানের কথা—ঔষধ শব্দে ঔষধের উপাদানের পরিচয়, গুণ, যোজনা ও ঔষধ নির্মাণের জ্ঞান বুঝিতে হইবে। কিন্তু আমাদের আয়ুর্বেদাধ্যাপকগণের গৃহে বিবিধ ভেষজ দ্রব্য সংগৃহীত না থাকায় এবং দেশে বৈদ্যক বৃক্ষ-বাটিকার অভাব তেজ, দ্রব্যদর্শন করাইয়া দ্রব্যগুণের অধ্যাপনার পরি-বর্তে কাব্যের মত দ্রব্যগুণের শ্লোক ছাত্রেরা আবৃত্তি করিতেছে। ইহার ফলে অনেক মহাই দ্রব্য একবারে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, অনেকের পরিচয়ে ঘোরতর সন্দেহ জন্মিয়াছে, কতগুলি দ্রব্যকে নমনালোকে নানানামে ব্যবহার করিতেছে। অধ্যাপনার দোষে ঔষধ নির্মাণের জ্ঞানও ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। দেশে রীতিমত “রসশালা” প্রতিষ্ঠিত না থাকায় পাকযন্ত্র ও রসৌষধ নির্মাণের পটুতা প্রায় লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা কোন বন্ধু কবিরাজ সেদিন বলিতেছিলেন তাঁহার নিকট এক বৎসর থাকিয়া কোন ছাত্র দেশে গিয়া তাঁহাকে কঙ্কণীর জায় চাহিয়াছিল—অবস্থা ত এই। আয়ুঃশাস্ত্র-বক্তা স্বয়ংগণের উপদেশ মতে যদি আমরা, নবশরীরে প্রত্যক্ষ দর্শন পূর্বক শারীর জ্ঞান, রোগি-শরীরে প্রত্যক্ষদর্শন পূর্বক রোগবিনিশ্চয় এবং দ্রব্য-প্রদর্শন পূর্বক দ্রব্যগুণের অধ্যাপনা করাইতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের এই ব্রীড়াজনক ছরবস্থা উপস্থিত হইত না।

### অবনতির দ্বিতীয় কারণ—গ্রন্থলোপ ।

নহর্ষি আত্রেয়ের শিষ্যগণেব প্রত্যেকেই এক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক চরকসংহিতা ভিন্ন আত্রেয় সম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ভগবান্ ধনন্তরির বারজন শিষ্য, বারখানি গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সূত্রতসংহিতা ভিন্ন ধনন্তরিসম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা পাইতেছি না। তারপরে এক সূত্রত-সংহিতাবই কত ভাষ্য, টিপ্পনী, টীকা রচিত হইয়াছিল। এগুলির কেবল নাম মাত্র আমরা প্রত্যাখ্যি। চরকসংহিতার দ্বাদশজন টীকাকারের নাম আমরা জানিতে পারিতেছি, কিন্তু অধুনা কেবল চক্রপাণির টীকা মাত্র পাওয়া যায়, তাহাও প্রায় খণ্ডিত। ইহা ভিন্ন গজ, অথ, বৃক্ষ প্রভৃতির পালন ও চিকিৎসা বিষয়ে কত গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। কত নিঘণ্ট, “দ্রব্যচিহ্নের” মত কত দ্রব্য পরিচায়ক গ্রন্থ, কত প্রাণিবিষয়ক পুস্তক, কত সুরশাস্ত্র, কত গন্ধশাস্ত্র, কত মদ্যরাসব প্রস্তুত বিষয়ক গ্রন্থ ও কত ঘেধাতু-মণি-রত্নাদি পরীক্ষার পুস্তক রচিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। গ্রন্থ জ্ঞানের ভাণ্ডার—গ্রন্থলোপে অজ্ঞানতার প্রসার অবগুস্তাবী।

### তৃতীয় কারণ—অযোগ্য-বিদ্যার্থী ।

অধ্যাপক অযোগ্য হইলে এবং অধ্যাপনার প্রণালী উৎকৃষ্টতর হইলেও যোগ্য পাত্র যদি উপদেশ প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং কেবল অধ্যাপক বা অধ্যাপনা প্রণালীর দোষের প্রত্যকার করিলেই উদ্বেগ সিক্ত হইবে না, ছাত্রের যোগ্যতার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রীতিমত সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র না হইলে আয়ুর্বেদ সম্যক্

রূপে আয়ত্ত করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এক্ষণে যে সকল ছাত্র আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন কবে তাহাদের মধ্যে শতকরা একটা ছাত্র ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কি না সন্দেহ।

পূর্বে ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদপ নিয়মে বিদ্যাশিক্ষা করিবার রীতি ছিল, এখন আর সেরূপ প্রথা নাই। ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে না এবং বিজ্ঞা-গ্রহণান্ত কাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস কবে না। যে ছাত্র বৎসরে তিন মাস গুরুগৃহে বাস করে, সে নয় মাস কাল স্বগৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। এক্ষণ অবস্থানও বন্ধকালের জন্ত। ভগবান্ মনু ছত্রিশ বৎসর, অষ্টাদশ বৎসর, নয় বৎসর বা গ্রহগাণ্ডিক কাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহ বাসের সময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ছত্রিশ বৎসর স্থলে ছত্রিশ মাস, অষ্টাদশ বৎসর স্থলে অষ্টাদশ মাস, নয় বৎসর স্থলে নয় মাসও গুরুগৃহে অবস্থান করা হয় কিনা সন্দেহ! এইরূপ প্রথা বশতঃ ছাত্রদিগের আয়ুর্বেদ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ব্রহ্মচর্য্য পালন ব্যতীত বুদ্ধি মেধাব প্রার্থ্য সাধিত হইতে পাবে না এবং বুদ্ধি ও মেধার প্রখরতা ব্যতীত শাস্ত্রার্থে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায় না। এই জন্ত আমাদেরকে ব্রহ্মচর্য্যশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমাদের বাল্য সিংহের দেশে অল্প বয়সে বিবাহ অনেক সময় অনিবার্য্য হইলেও বিবাহের পব গুরুগৃহে নিয়ত অবস্থান করিলে ব্রহ্মচর্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃত পক্ষে আয়ুর্বেদের উন্নতি করিতে হইলে আমাদের কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত—এক্ষণে সেই বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

### ১। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

দেখিতেছি সংপ্রতি অনেক সুযোগ্য অধ্যাপক অন্নদান করিয়া ছাত্র রাখিতে অক্ষম, আবার অনেক অধ্যাপক কন্মাতিগত বলিয়া ছাত্রদিগের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন না। যোগ্যাকরণপূর্ব্বক অধ্যাপনার উপকরণ রাশি কাহারই গৃহে সমাক্ষ সংগৃহীত নাই। যে সকল কন্মাতিব্যস্ত চিকিৎসকের সমগ্র আয়ুর্বেদ অধ্যাপনার অবকাশ নাই, তাঁহারা সুবিধানত কিঞ্চিৎ মাত্র সময়ক্ষেপ করিয়া এবং বাঁহাদের অবকাশ আছে তাঁহারা প্রচুর সময়ক্ষেপ করিয়া যদি যোগ্যাকরণ সহকারে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, তাহা হইলে দেশে আর বিজ্ঞ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের অভাব থাকে না। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ভিন্ন এবিধ সম্মেলন নির্বাহ হইতে পারে না। সুতরাং এক্ষণে দেশে আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

### ২। ছাত্র নির্বাচন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে-সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র যথেষ্ট পাওয়া যায় না। তবে উপায় কি? আমাদের মতে সংপ্রতি দেশে বাহা আছে তাহা লইয়াই কাজ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে অতিপ্রেত উচ্চ আদর্শের চিকিৎসক প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার জন্ত আন্তরিক চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত হিতৈষী কর্ত্ত্বী পুরুষের পন্থা। যখন কপিতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন যদি প্রতিষ্ঠাতৃগণ ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র না হইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করাইবেন না—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহা হইলে কি এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় এতদীজ এতদুশ প্রচার

হইত। দেশের অবস্থাভূসাবে তখন তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়াই এখন তাঁহারা এত অভিমত, যোগ্য, ব্যুৎপন্ন ছাত্র পাইতেছেন যে স্থান, সঙ্কলান হয় না। আমাদিগকেও বর্তমানে এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যতদিন দেশে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন বহুসংখ্যক ছাত্র না পাওয়া যাইতেছে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া পড়িতে দিহিতে পারে এরূপ ছাত্র লইয়া তাহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে।

### ৩। যোগ্যাকরণ—শব ব্যবচ্ছেদাদি ।

প্রত্যক্ষদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন এই দুইয়ের মিলনেই জ্ঞানবদ্ধিত হয়। এই উপদেশটি স্মরণ রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। শবব্যবচ্ছেদ চিকিৎসক মাত্রেই বিশেষতঃ শল্য চিকিৎসকগণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শনমূলক জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে চিকিৎসায় বিশেষতঃ শল্য চিকিৎসায় নিপুণতা লাভ করিবার অল্প উপায় নাই। সেই জন্ত বিদ্যালয়ে শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য এ সম্বন্ধে প্রাচীন মতের অনুবর্তন না করিয়া বর্তমান প্রণালীর অনুসরণ করা কর্তব্য।

### ৪। গ্রন্থাগার ।

পূর্বে বিবিধ আয়ুর্বেদ গ্রন্থের প্রচার ছিল। এই গ্রন্থরাশি কি বাস্তবিকই বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে? কি করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিব। অতাপি বৈথক গ্রন্থ অনুসন্ধানের জন্য ভারত-বর্ষব্যাপী কোন আন্তরিক প্রযত্ন অমুষ্ঠিত হয় নাই। দেশের যে যে স্থানে প্রাচীন গ্রন্থরাশি অদ্যাপি সমগ্ৰ রক্ষিত রহিয়াছে, সেই সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের চেম্বার পূর্বে কে জানিত বাঙ্গালা ভাষায় এত বিচিত্র গ্রন্থরাশি আছে? সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ ভ্রমণকারী পণ্ডিত নিয়োগ করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সংস্কৃত বৈথক গ্রন্থের অনুসন্ধান করা এবং প্রাপ্তগ্রন্থ বা তৎপ্রতি-লিপি সংগ্রহ ও মুদ্রিত করিয়া প্রচার করা আবশ্যক।

### ৫। বৈথক বৃক্ষ-বাটিকা ।

যোদ্ধার যেমন অস্ত্র প্রয়োগ কৌশল জানা আবশ্যক, চিকিৎসকেরও তজ্জপ দ্রব্য-যোগ্যতা-বিশেষ হওয়া প্রয়োজন। দ্রব্য প্রয়োগ করতে হইলে দ্রব্যের পরিচয় আবশ্যক। দ্রব্যের পরিচয় আবার দ্রব্যের প্রত্যক্ষ-দর্শন-মূলক, প্রত্যক্ষদর্শন জন্ত আবার দ্রব্যের একত্র সমাবেশ আবশ্যক। সুতরাং বৈথকবৃক্ষ-বাটিকা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইতেছে।

ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্বেদ মহার্হ ভৈষজ্য-রত্নে পরিপূর্ণ। অল্প কোন দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্র এরূপ ভৈষজ্য-সম্পদের স্পর্শা করিতে পারে না। কেবল দেশীয় ঔষধের গুণে কত অনভিজ্ঞ লোকও কত হুরারোগ্য ব্যাধির প্রতীকার করিতেছে, ইহা আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দিন দিন কত মহোপকারী দ্রব্য হারাইতেছি। চরক, সুশ্রুত, কৃষ্ণসংহিত বা অপরিচিত দ্রব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ভাব-প্রকাশ বা চক্রসংগ্রহোক্ত কত দ্রব্যই ক্রমশঃ আমাদের অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে। আমরা বলাভূমরকে ত্রায়মার্গা বলিয়া এবং কোন অজ্ঞাতনামা কাষ্ঠ বিশেষকে প্রপৌণ্ডরিক বলিয়া প্রয়োগ করিতেছি। আজকাল কৃষিকার্যের বিস্তার হেতু বৃক্ষ ওষুধাদির বিলোপ সাধিত হইতেছে। দ্রব্যলোপের সহিত দ্রব্যের অপরিচয় অবশ্যভাবী। অতএব দ্রব্যের

লোপাপত্তি নিরাসার্থ বৈদ্যক-বৃক্ষবাটিকা প্রতিষ্ঠার নিত্য প্রয়োজন। কেবল দ্রব্যের লোপাপত্তি নিবারণ নহে, দ্রব্যের গুণোৎকর্ষের জন্তও উদ্যান-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা আছে। আমরা অধুনা যে সমস্ত বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি ঔষধার্থ ব্যবহার করিতেছি দীর্ঘকাল আরণ্য উদ্ভিদের দ্বিতীয়া জীবনসংগ্রামে তাহারা হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল হীনবীৰ্য্য ঔষধি উদ্যানে সবল-পালিত হইলে, তাহারা আবার তাহাদের পূর্ববীৰ্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে উদ্ভিদ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত উদ্ভিদগুলিকে তত্ত্ব দেশের ভূমি, বায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থানসমূহে বক্ষাপূর্বক ভৈষজ্যোদ্যান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

### ৬। দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস স্থাপন।

চিকিৎসা শাস্ত্রের সজীবতা রক্ষা ও উন্নতি কল্পে যেমন সূচিকিৎসকের প্রয়োজন, দরিদ্রদিগের উপকার, ছাত্রদিগের সুশিক্ষা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রসারের জন্ত সেইরূপ দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস ( Out-door and In-door Hospital ) আবশ্যক। দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস প্রতিষ্ঠা না করিলে ছাত্রদিগের কার্যতঃ চিকিৎসা কোশল শিক্ষার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এইজন্ত বহুব্যয় করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস স্থাপন করা হইয়াছে। এখন বলিতে কেমন সম্ভোতি বোধ হয়, কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে মেডিকেল কলেজের জায় আমাদের ও দাত্তাবিদ্যা, চক্ষুঃ চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষাদিবার জন্ত স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবার আবশ্যক হইবে।

অধ্যাপনাগত অনর্থ পরস্পরার প্রতিকারের জন্ত প্রায় একবৎসর হইল কলিকাতায় অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়, রসশালা, ভেষজ পরিচয়াগার বস্ত্র শস্তাগার, গ্রন্থাগার, গবেষণা মন্দির এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বাটিকা ইতি মধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। বহু সংখ্যক ছাত্র সুযোগ্য অব্যাপকদিগের নিকট সুশিক্ষা লাভ করিতেছে। আমরা সর্বাঙ্গতঃ প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে বিশেষতঃ প্রত্যেক চিকিৎসককে এই স্তম্ভহংস মঙ্গলকর অনুষ্ঠানে যোগ দান করিতে অনুবোধ করি। সকলে একত্র মিলিয়া কার্য ক্ষেত্র অগ্রসর হইলে আমাদের একের ক্রটি অপরের দ্বাৰা শোধিত হইবে, একের অজ্ঞাত বিষয়ে অপরের নিকট উপদেশ পাওয়া যাইবে, একের পরিশ্রমের ফল অপরে লাভ করিবে, সকলের জ্ঞান মিলিত হইয়া সকলের স্বপ্ন আলোকিত করিবে। নব প্রতিষ্ঠিত এই শিশু বিদ্যালয়টিকে সম্পূর্ণ করিয়া আমরা ক্রমে দেশের দেশে দেশে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আয়ুর্বেদের লুপ্ত গৌরব পুনঃস্থাপন করিব।

বর্তমান যুগে আবার ভারতবাসী লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদের উদ্ধার কল্পে বহুবান্ হইয়াছে। ভারতের মোহ নিদ্রা ভাঙিয়াছে বলিয়া, বহুবৃগের নিদ্রিত ভারতকে আবার জাগরিত দেখিয়া প্রাণে অশ্রীর সঞ্চাৰ হয়, জনর আনন্দে উৎফুল্ল হয়। আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে এই যে ভারত ব্যাপী চেষ্টা—ইহার ফল একদিন অবশ্যই কলিবে। কিন্তু এই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন্ত ভারতীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর এক প্রাণতা চাই, প্রাণপণ চেষ্টা চাই, সাধারণের

সহায়তা চাই, ভারত সম্রাট ও ভারতীয় রাজস্ববর্গের সহায়তা চাই। এই সকল প্রার্থনার বিষয়ের সংযোগ ঘটলে আবার জীবীর্ণা আয়ুর্বেদ অষ্ট-শাখা-সমন্বিত মণ্ডিতরূপে পরিণত হইয়া ছায়া ও ফল দানে ভারতবাসীকে ধাতু করিয়া তুলিবে। আবার আমরা দিগন্ত যুগের বিজ্ঞা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শৌর্য, বীৰ্য্য ফিরিয়া পাইব।

কিন্তু সাধনা চাই, একাগ্রতা চাই, শত শত জীবন উৎসর্গ করা চাই—তবে এই মহা সাধনাক্রীড়ার সিদ্ধি লাভ হইবে। প্রাচীন কালে মহর্ষিগণ বহু সাধনার ফলে আয়ুর্বেদকে মর্ত্যে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন জাতি কোন কালে কঠোর সাধনা ভিন্ন কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের স্বার্থকে শব্দরূপে পরিণত করিয়া শব্দসাধনা করিতে হইবে। ধৈর্য, হিংসা, বিদ্বেষ কত মায়াময়ী বিভীষিকা দেখাইবে, তাহাতে সন্দেহ করিলে চলিবে না।

হে সমবেত সুধীবৃন্দ, উপসংহারে বিনীত নিবেদন এই যে, আর কথাই নয় কাজে দেওয়াই হইবে। আয়ুর্বেদ সম্মেলন নানা স্থানে অনেক হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল সভার উদ্দেশ্য, সিদ্ধির পক্ষে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? চিরদিন কি আমরা এইরূপ বাক্যচ্ছটায় আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধার করিব? সভাই কি চিরদিন আমাদের কর্মক্ষেত্রে পরিণত হইবে? বাক্যের সময় আর নাই এখন কাণ্ডের সময় আসিয়াছে। আহুন আমরা একযোগে কার্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হই—অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হইবে।

## অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়

২৯নং ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের অধ্যাপনা যথাযথ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্বাহ করিবার জন্ত বিভাগে যে দ্রব্যরাশি সংগৃহীত হইয়াছে তদ্বিবরণ স্থল বিবরণ—

(ক) **ব্রহ্মসামান্য**—ঔষধ নির্মাণের বিবিধ যন্ত্রপাতিাদি।

(খ) **ভেষজ পরিচয়গান্ধারী**—৫০০ শতাধিক বর্ণিত দ্রব্য, বিবিধ ধাতুপদার্থ এবং ২০০ শতাধিক সজীব উদ্ভিদ।

(গ) **ব্রহ্মসামান্যগান্ধারী**—শতকর্ষোপযোগী বিবিধ যন্ত্রপাতি।

(ঘ) **বিকৃত শাস্ত্রীয় দ্রব্যসম্ভার**—গীড়া বিশেষে বিকৃতি প্রাপ্ত নব-শরীরের আশ্রয়াদি।

(ঙ) **গবেষণামন্দির**—চিকিৎসা-বিজ্ঞানোচিত বিবিধ বিষয়ের তত্ত্বাস্থান ও পরীক্ষার জন্ত নানা উপকরণ এবং যন্ত্রাদি।

(চ) **শাস্ত্রীয় পরিচয়গান্ধারী**—নরকঙ্কাল, মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুরক্ষিত চিত্র ও মৃত্তিকা-রচিত রঞ্জিত আশ্রয়াদি সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যাপকগণের নাম—  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ কবীন্দ্র।

- “ “ বামিনীভূষণ রায় কবিরাজ, এম, এ, এম, বি।  
“ “ শ্রীযুক্ত অমিয় নাথব মল্লিক এম, বি,  
“ “ সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস।  
“ “ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিতৃষণ।  
“ “ সুবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।  
“ “ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।  
“ “ দ্বিজেন্দ্রকুমার মজুমদার এম, এ।  
“ “ ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

## বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী।

### প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

বনৌষধি-বিজ্ঞান, দ্রব্যগুণ, বসশাস্ত্র, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা, শারীর-বিজ্ঞান ও এই সকল  
অদ্বীত অংশের যোগ্যাকরণ। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

### দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

পরিভাষা ও রসরসাদি-তত্ত্ব, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা (তদ্বিহীনস্তাষা [ পাঠ  
চাওয়া ] ও ব্যবচ্ছেদ পূর্বক মৃতকপবীক্ষাসহ) শারীর-বিজ্ঞান, রোগবিনিশ্চয়। তৃতীয় বার্ষিক  
শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

### তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

দ্রব্যগুণ, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, রোগবিনিশ্চয়, কায়-চিকিৎসা, শল্যতত্ত্ব প্রস্তুততত্ত্ব,  
(ধাত্রীবিদ্যা), আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কোমারভূত্যা। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত-  
করণের পরীক্ষা।

### চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

কায়-চিকিৎসা, শল্যতত্ত্ব, (যন্ত্রশস্ত্রকর্ম্মাভ্যাসসহ) শালাক্য-চিকিৎসা, উভয় তত্ত্বগত  
তদ্বিহীনস্তাষা, ব্রণবন্ধন শিক্ষা, নাড়ীবিজ্ঞান, স্বস্থ-তত্ত্ব, অগদতত্ত্ব, আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস।  
সংস্কৃত বিভাগের বৃৎপতিলাভের সাধারণ প্রশংসাপত্র ও বাঙ্গালা বিভাগের চরম পরীক্ষা।

### পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী।

নাড়ীবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা, দ্বাদশমাস আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কায়-চিকিৎসা ও  
শল্যশালাক্য তত্ত্বের প্রত্যক্ষদর্শনমূলক বৃত্তবৈজ্ঞান্যপদেশ। চরম পরীক্ষাস্ত্রে উপাধিধান।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইল—

- ১। চরক-সংহিতা ২। সুশ্রুত-সংহিতা ৩। অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ ৪। অষ্টাঙ্গহৃদয় ৫।  
মাধব-নিদান ৬। হারীত সংহিতা ৭। সিদ্ধযোগ ৮। চক্রদত্ত ৯। ভাবপ্রকাশ  
১০। শাঙ্গধর ১১। রসরস-সমুচ্চর ১২। রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ ১৩। বঙ্গসেন ১৪।  
ধ্বজ্ঞরীয়নিবট্ট ১৫। রাজনিবট্ট ১৬। বনৌষধিদর্পণ ১৭। নাড়ীবিজ্ঞান ১৮।  
পরিভাষাপ্রদীপ ১৯। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়।

## শিশুর প্রবাহিকা (আমাশয়) ও রক্ত প্রবাহিকা চিকিৎসা।

—••••—  
(ঠাকুর মা জপে নিযুক্তা)

ঠা। নারায়ণ, নারায়ণ, দয়া কর দয়াল  
ঠাকুর আমাব। জীবনের সাধ আমার পূর্ণ  
হয়েছে, এখন রাঙা পায়ে স্থান দাও।

(লীলার প্রবেশ)

লী। ঠাকুমা, কি করছ?

ঠা। জগন্নাথ, জগদীশ, জগদবল্লভ,  
সকলই নিয়েছ, আর প্রাণ টুকু কেন বাকী  
বাখ ঠাকুব।

লী। (উচ্চবাক্যে) ও ঠাকুমা, আমি  
এয়েছি।

ঠা। কে লীলা, আর, দিদি আর।

লী। ঠাকুবকে বলছিলে কি ঠাকুমা?

ঠা। এই বলছিলাম, সংসার থেকে  
কাছে ডেকে নিতে ভাই।

লী। কেন ঠাকুমা, তোমার কি কষ্ট  
হয়?

ঠা। কষ্ট কেন হবে দিদি। রোগ ত  
গিছের ফল নয় যে, পথে চলতে চলতে টুপ  
পড়ে মাথার প'ড়বে। মানুষ নিজের পাপে  
রাগে ভোগে, আমি ভেতন পাপও করিনি,  
বাগও শরীরে নেই। তারপর, সোণার চাদ  
তামরা আমার বেঁচে থাক,—আমার কষ্ট  
কেন?

লী। তবে যেতে চাইছ কেন ঠাকুমা?

ঠা। যমরাজা যে শমনের পর শমন দিচ্ছে

গই। রাজার হুকুম অমান্য করা কি ভাল?

লী। শমন কি ঠাকুমা?

ঠা। • প্রথম শমন, চুল পেকে শোণের  
হুড়ি হয়েছে, তারপর, বস্ত্রি দাঁতের একটাও  
খুঁজে মেলে না, তারপর, চোখেও যেন একটু  
কম দেখি। কাণেও যেন খাট হয়েছে।

লী। যাই হ'ক দিদিমা, তুমি আছ,—যেন  
পাহাড়ের আড়ালে আছি। তুমি না থাকলে  
ছেলে পিলেগুলো কি বাঁচাতে পারতাম?  
তুমি না থাকলে যে ছেলে পিলে কি ক'রে  
বাঁচাব—সেই ভয়ে অস্থির হই।

ঠা। (হাসিয়া) আঃ পাগলী, বাঁচাবার  
কর্ত্তা কি আমি!—সবই সেই ভগবানের হাত।

লী। সে তুমি যাই বল ঠাকুমা, দেখে-  
শুনে আমার বিশ্বাস হয়েছে,—চিকিৎসার  
দোষে পরমাণু থাকতেও রোগী মরে।  
ভগবান কর্ত্তা সেটা ঠিক, তবে মরা-বাঁচার  
মানুষের হাতও কিছু আছে।

ঠা। তা এটা মিথ্যে বলিস্নি লীলা।  
সকল জিনিষের মত যত্ন করে রাখলেই  
শরীর বেশী দিন টেকে, আর অত্যাচার  
করলে শীঘ্র নষ্ট হয়।

লী। সেই জন্তেই ত বলছি, তুমি যত দিন  
আছ,—পাহাড়ের আড়ালে আছি।

ঠা। ত', আমি আর কতদিন থাকব  
দিদি। আর তুমিও ত এখন পাঁজা-গিলি  
হয়ে দাঁড়িয়েছ। ঠাকুমা'র পুঁজিপাটা শেষ  
যা' আছে,—তা' শিখে নাও।

লী। আমার হয়েছে ঠেকে-শেখা  
আবার ঠেকিছি বলে শিখতে এয়েছি।

ঠা। কেন আবার কি ঠেকলি?

লী। তা বেশ। ছোট খোকার রক্তা-  
মাশা, আর বড় খোকার শাদা আমাশা।

ঠা। তাইত—তোর ছেলে পিলের নিতি  
অস্থখ দেখতে পাই। কেন এমন হয়, বল  
দেখি?

লী। তা কি ক'রে বলব ঠাকুমা।

ঠা। তবে এতদিন আমার কাছে শিখলি  
কি? সব কি ভয়ে ঘি ঢালা হ'ল। এই একটু  
আগে বললাম, যে, রোগ গাছের ফল নয়,  
নিজের দোষে রোগ হয়।

লী। তা কি জানি ঠাকুমা, আমি ত  
কিছু বুঝতে পারি নে।

ঠা। আচ্ছা ওরা সকাল থেকে রাত  
পর্যন্ত যা খায়,—যা করে,—সব বল।

লী। সকালে উঠে প্রথমেই তোমার  
নাতজামায়ের সঙ্গে চা, মাখন, বিস্কুট আর  
কোন কোন দিন ডিম সিদ্ধ খায়। তারপর—

ঠা। ধাম্। একে ত চা আমাদের  
দেশের উপযোগী নয়। তারপর, শীতকালে  
বেশী বয়সের মানুষে বরং খেতে পারে,  
কিন্তু ছেলেদের পক্ষে ওটা বড় অনিষ্টকর।  
চা খাওয়াটা, আগে বন্ধ কর।

লী। আচ্ছা তাই করব।

ঠা। তারপর, মাখন ছেলেদের পক্ষে  
খুব উপকারী বটে, কিন্তু সে টাটকা মাখন।  
লোকনাথ বন্দি বলত, যে, বাসি-মাখন বড়  
অপকারী। সেটা বি করে খাওয়াই ভাল।

লী। আচ্ছা, আমি বাসি কখন খেতে  
দেবো না। পারি ত রোজ টাটকা মাখন  
ক'রে দেবো, ঘরেত ১০।১২ সের ছধ হয়।  
কিন্তু একটা কথা ঠাকুমা, বাসি মাখনত সাহেব-

হবে আব বাবু খায়, তবে তাদের রোগ  
হয় না কেন?

ঠা। রোগ হয় না,—তোমায় কে বলে?  
কিন্তু আজ কুপথ্য করলে কালইত রোগ হয়  
না। আগেকাব লোকে যেমন বলগান আব  
দীর্ঘজীবী হ'ত, আজ-কালকার লোকে বে  
এত অন্নজীবী হয় আর'রোগে ভোগে, অস্ত্রা  
দোবের মধ্যে খাবার দোষ তার একটা  
প্রধান কারণ। যাক্ তারপর, তারা আর  
কি খায় বল।

লী। তারপর দুজনকেই একটু কবে  
দুধ দিই।

ঠা। কত ক্ষণ পরে?

লী। চা খাবার আধ ঘণ্টা পরে। বড়  
খোকা সেই সঙ্গে বাজারের হু' একখানা কচুবি  
সিঙ্গাড়া, কি জিলিপি খায়।

ঠা। না, তা' করোনা। ছেলেদের খাণ্ড  
দেবার একটা নিয়ম ক'রো। বয়স বুকে তিন  
চার ঘণ্টা অন্তর খেতে দিবে। তার চেয়ে  
শীঘ্র শীঘ্র খেলে অস্থখ হয়। তারপর কি  
খায় বল।

লী। তারপর, বেলা নয়টার সময় দুজন-  
কেই পোরের ভাত দিই। ছোট খোকাকে  
ছধের সঙ্গে চটুকে, আর বড় খোকাকে মাছের  
ঝোল দিয়ে ঐ ভাত দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

ঠা। তা' বেশ। কিন্তু তা'র আগে  
হু'জনকেই অল্প কিছু না দিয়ে সকালে একবার  
একটু ক'রে দুধই দিও, অল্প কিছু দিও না।

লী। কিন্তু তারা যে তাতে ভোলে না।

ঠা। না ভোলে একটু বেদানা, দুটো  
আমুর, দুটো খেজুর, দুখানা বাতাসা, কি  
এমনই কিছু তার সঙ্গে দিও।

লী। বাজারের খাবার কিছু দেব না?



ঠা। একেবারেই না। তোর ঠাকুর-দাদার এক বন্ধু—তঁার বাড়ী ভাটপাড়ায়, তিনি বাজারের খাবার খাওয়াকে বজ্রাঘাত বলতেন। বাস্তবিকই তাই। অব্যক্ত বি-ময়দায় প্রস্তুত ধুলো-বালি-মিশান, বা হয়ত হালুই-কারের কোন ছোঁয়াচে রোগ আছে—তার হাতে প্রস্তুত। সে 'গুলো বিষ বৈকি। কাজেই তিনি যে বজ্রাঘাত বলতেন, সেটা মিথ্যা নয়।

লী। কিন্তু ঠাকুমা, এই খাবার খেয়ে শত শত লোকও ত বেঁচে রয়েছে।

ঠা। আফিন-সেঁকোর মত বিষ খেয়েও ত কত লোকে বেঁচে থাকে ভাই। তা' ব'লে কি বুঝতে হবে, যে আফিন-সেঁকো আমাদের উপকারী!

লী। না, তা নয়।

ঠা। তাতো নয়ই। বেশীর ভাগ বুঝতে হবে যে, ঐ সব জিনিষ খায় ব'লে, তাদের পনমায়ু ক'মে যায় আর রোগ হয়। ভগবান্ নাহুয়ের শরীরকে অতি আশ্চর্যভাবে নির্যাস ক'রেছেন ব'লে, তাদের সদ্যোমৃত্যু হয় না। যাক্ সে কথা, তার পর ওরা কি খায় বল।

লী। তার পর দশটার সময় তোমার নাতজামাই খেতে বসেন—দুজনেই তাঁর পাশে গিয়ে বসে। আর এটা-সেটা তরকারী, মাছ, মাংস—যেদিন যা হয়, একটু একটু খায়।

ঠা। খবরদার আর এমন কাজ না হয়। কচি-শিশু ছধ ছেড়ে সবে ভাত-তরকারী খেতে শিখেছে। তা'র কি খুব মসলা দেওয়া নানা রকম তরকারী-মাছ-মাংস হজম করতে পারে? তাদের পেট এখনও ততটা পোক্ত হয় নি। সেই জন্তে বড় বড় মাছবে যা হজম ক'রতে পারে, তা ছেলেরা কখন পারে না এবং

সেই জন্তে ও সকল জিনিষ তাদের দেওয়া উচিত নয়।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা আমি তাই করব। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে ব'লে ছেলেদের আটকে রাখা একটু দায় হবে।

ঠা। তা হোক লীলা। প্রাণ যাওয়ার চেয়ে, এমন আটকে রাখা ঢের ভাল। তার পর কি হয় বল।

লী। তার পর আমার শ্বশুর খেতে বসেন প্রায় ১১টা ১২ টার সময়। সে সময়েও খোকারা তাঁর কাছে গিয়ে বসে আর তাঁর সঙ্গে কিছু কিছু খায়।

ঠা। উটও বন্ধ ক'রে দিতে হবে লীলা। বড় মানুষ আর ছোট মানুষ—দুয়ের যেমন বয়স আলাদা, ভাবনা আলাদা, কার্য্য-ক্ষেত্র আলাদা, তেমনি তাদের খাবার ও আলাদা। আমরা ভালবাসায় ভুলে যদি বুড়োর বা যুবোর খাবার ছেলেকে দিই, সেটা ছেলের অপকার করা বই উপকার করা হয় না।

লী। তা' ঠাকুমা, তুমি যা ব'লছ এখন আমি তাই করবো।

ঠা। তা হ'লে এখন বুঝতে পারুলি ত কেন তোর ছেলেদের রোগ হয়।

লী। হ্যাঁ বুঝছি ঠাকুমা,—রোগ কেবল খাওয়ার দোষে, এখন থেকে সেটা আমি সব শুধরে নেব। বাজারের খাবার দেবোনা, ওঁদের সঙ্গে খেতে দেব না, চা খেতে দেব না, আর ৩৪ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াব। এখন এ ছটোর আমাশা আর রক্তামাশা কি করে ভাল হয় বল।

ঠা। তোর ছেলেদের পেটের অন্ত্রের সময় যে সব বলেছিলাম, তা মনে আছে?

লী। খুব মনে আছে ঠাকুমা। তোমার

সেই পথি আর টোটকা ওষুধ যে কত  
যোগী ভাল ক'রেছি তার ঠিক নেই।

ঠা। যাক্ সে কথা, এখন তোর ছেলের  
দেহ অস্থির কথা বল।

লী। ছোট খোকার আজ ৪৫ দিন  
হল অস্থির ক'রেছে। প্রথমে সাদা আমাশয়  
হয়েছিল, দুইদিন পরে রক্ত দেখা দিলে।  
প্রথম দু'দিন ২৫১০ বার ক'বে বাছে হ'ত—  
মল আর আম মিশান। তারপর থেকে  
১৫১৬ বার ক'বে বাছে কবে—মল, আম  
আর রক্ত। কোন কোন বার শুধু আম  
আর রক্ত।

ঠা। বাছে অনেক হ'য়ে গেছে ত?

লী। হাঁ বোধ হয় ২।৩ মালসা।

ঠা। শোন, ছোট খোকাকে ছানার  
জল, ছাগল দুধ, মূতোর সঙ্গে জল দিয়ে সিদ্ধ  
ক'রে তার সঙ্গে বার্লি রেঁধে দিবি।

লী। কি রকম করে সিদ্ধ করব?

ঠা। এক পোয়া ছাগল দুধ, এক পোয়া  
জল আর ৮১০টা মূতো খেঁতো করে এক সঙ্গে  
সিদ্ধ কর'ব, জল ম'রে গেলে নামিয়ে ছেকে  
নিবি। তার পর তার সঙ্গে জল মিশিয়ে বার্লি  
সিদ্ধ করবি। রাঁধা শেষ হলে বেন তাতে  
দুধের সিকি আন্দাজ জল থাকে।

লী। সব কি একবারে খাওয়াব?

ঠা। না ছ'বারে দিবি। দেখিস্ বেন  
খারাপ না হয়ে যায়।

লী। খারাপ হ'ল কিনা কি করে বুঝব?

ঠা। খারাপ হলে বদ রং হবে, বদ গন্ধ  
হবে। ছ্যাকড়া-ছ্যাকড়াও হতে পারে।

লী। দুধ কতটুকু দেব?

ঠা। সহজ বেলায় যা' খায়, তার অর্ধেক  
দিবি। সঙ্গে সঙ্গে দেখ'বি যে দুধ, হজম হচ্ছে

কি না। মল দেখে দুধ হজম হচ্ছে কিনা, কি  
করে বুঝতে হয় তা মনে আছে?

লী। হাঁ মনে আছে। (পোষ সংখ্যা  
১৪৫ পৃষ্ঠা)

ঠা। দুধ হজম হচ্ছে না মনে হলে আরও  
কমাতে হবে।

লী। আর বাড়াব কখন?

ঠা। যেমন অস্থির কমতে থাকবে, ছেলের  
ফিদে বাড়বে—অমনি একটু একটু করে  
বাড়াবি।

লী। আর কি দেব?

ঠা। বার্লির বদলে শঠীর পালো, কি  
একটু এরাকটও দিতে পার। আর অচ  
জিনিবের মধ্যে দাড়িমের রস, মিষ্টি কমলা-  
লেবুর রস, কচি বেলপাতার রস চিনি মিশা'য়ে,  
কাপড়ে ছেকে কাদার মত ক'রে দিতে পার।

লী। বেলের মোরব্বা দিতে পারি?

ঠা। ও না দেওয়াই ভাল। এক ত  
ওতে উপকার নেই, বেলের যেটা উপকারী,  
সেই কাখটা সিদ্ধ ক'রে ফেলে দেয়। থাকে  
বেলেব' ছিবড়ে আর চিনি। তারপর বড়  
বড় বেলের মোরব্বা করে। কিন্তু বেলের  
কচিই উপকারী।

লী। তারপর, আর কি বল?

ঠা। রক্তামাশয়ে নাড়ীতে যা হয়। সেই  
জন্তে খাবার এমন দিতে হয়, যা'তে মল খুব  
কম জন্মায়। যে সব জিনিষ শক্ত, যা'তে  
ছিবড়ে আছে—এমন জিনিষ দিতে নাই,  
এটা খুব মনে রাখা চাই।

লী। তা' খুব রাখব। এখন ওষুধ কি  
দেব বল?

ঠা। পাঁড়া,—পথির কথা আগে শেষ  
করি, তারপর বলব। সকল রোগের

সুপাথার দরকার, কিন্তু রক্তমাশয়ে খুব বেশী । একটু কুপাথ্য হ'লেই রোগ তিল থেকে তাল হ'য়ে উঠে । তারপর ভাল হ'বায় মুখে খুব সাবধান হওয়া চাই । একটু এদিক-ওদিক হ'লেই রোগ পাল্টে আসে ।

লী । ভাল হ'বায় মুখে কি রকম করবো ?

ঠা । বস দিন রক্ত বন্ধ না হয়, তত দিন না 'বলেছি তা ছাড়া আর কিছু নয় । রক্ত বন্ধ হওয়ার পরেও ৩ঃ দিন ঐ প্যাঁচ, তবে মাত্রাটা একটু বেশী দিবি এই মাত্র । এই সময়ে কিন্তু ছেলে সামলান দায় হবে, খুব ক্ষিপে হবে কিনা । কেবল থাই-খাই করবে, ভাত আব খাবারের জন্তো জুলুন করবে, সুবিধে পেলে চুরি ক'রে খাবে । কাজেই খুব চোখে-চোখে রাখবে, আর বোজাই "কাল ভাত দেব" বলে ভুলিয়ে ৩ঃ দিন কাটিয়ে দিবি । এই সময় নল শক্ত হবে, হয়ত কোন কোন দিন দান্ত বন্ধও যেতে পারে । তখন খুব পুরাণ মিহি চালের ভাত আর ছোট কৈ, মাগুর, শিশি মাছ ও কচি কাঁচকলার ঝোল দিবি । সমস্ত কাদার মত ক'রে চটকে খাওয়াবি । ভাত একবারে বেশী নয়,—২ঃখম দিন ১ তোলা চালের, তার পর দিন দেড় তোলা চালেব,—এমনি করে বাড়াবি । রক্ত বন্ধ হ'বার পনের দিন পরে তবে পেট ভ'রে ভাত দিবি ।

লী । তাই ক'রবো । এখন ওষুদ কি দেব বল ?

ঠা । ছোট খোঁকার বয়স হল কত ?

লী । এই মাসে ষেটের চার বছরে পা দেবে ।

ঠা । সকালে ১০ঃ১২টা কচি দাড়িম পাতা বেশ ক'রে বেটে চেলুনী জল মধু মিশিয়ে

কাপড়ে ছেঁকে খাইয়ে দিবি । আর হ'পরে ও বিকালে দু'বার কম-কম আধ ঝিলুক ক'বে মুতোর বস দিবি । চেলুনী জল কি মনে আছে ত ?

লী । হাঁ আছে । (পোষ সংখ্যা)

ঠা । হুদিন ওষুদ দিয়ে যদি রক্ত ও বাহ্যে কমে, তবে আর কিছু দিতে হবে না, ওতেই সেরে যাবে । আর হুদিনে যদি উপকার না হয়, তা হলে সকালে দাড়িম পাতা বাটা, দু'পরে মুতোর রস এক বার, বিকালে দুই আনা বটের ঝুরি বাটা চেলুনী জলের সঙ্গে, আর সন্ধ্যায় কৃষ্ণ জীরা ও ধূনের পুন মিহি গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে দুই রতি ৩ঃ৪০ ফোটা বেল পাতাব রসের সঙ্গে খাইয়ে দিবি । এতেই ভাল হ'য়ে যাবে ।

লী । এতে যদি ভাল না হয় ?

ঠা । এতেই ভাল হ'য়ে যাবে, ভয় নেই । তবে শিখে রাখ, যে, রক্তমাশয়, বিশেষ পুরাণ রক্তমাশয়ে কুড়্‌চির মত ওষুদ আর নাই । টাটকা কুড়্‌চি ছালের কাথ সিদ্ধ ক'রে যখন ক্ষীরের মত ঘন হবে, তখন আগুণ থেকে নামিয়ে সেই ঘন কাথের সিকি আন্দাজ নিয়ে তাতে আতাইচের গুঁড়ো বেশ করে মেশাবে । সেই ওষুদ এক রতি কি দু'রতি চেলুনী জলে গুলে খাওয়াতে হয় । এ ওষুদটা রক্তমাশয়ে ধ্বস্তরি ।

লী । আতাইচ কি ঠাকমা ?

ঠা । বেণের দোকানে কিন্তে পাওয়া যায়,—ময়লা রঙ্গের মাথারি শিকড়ের মত লম্বা লম্বা ; ডাল্‌লে ভেতর বেশ সাদা ।

লী । ওষুদ কি রোজ ত'য়ের ক'রতে হয় ?

ঠা । না, একদিন করলে ১ঃ১৫ দিম, কি এক মাস দেড় মাসও ভাল থাকে ।

লী। বড় লোকের কি মাত্রায় দিতে হয় ?

ঠা। এক আনা থেকে ছ'আনা মাত্রায় দেওয়া চলে।

লী। আচ্ছা এখন বড় খোকার কি ক'রব বল ?

ঠা। অম্লথের খবর সব বল ?

লী। তা'র আজ তিন দিন হল সাদা আমাশা হয়েছে। ১৫২০ বার বাছে যায়। একটু-একটু বাছে যায়, আর তা'র সঙ্গে থোলো-থোলো আম। বাছের সময় খুব কৌতায়, আর পেটের কামড়ানিও খুব।

ঠা। এ তিন দিনে কি খুব বেশী বাছে হয়েছে ?

লী। না বাছে বেশী কৈ হয়েছে ? অনেক বার বাছে যায়, আর খুব কৌতায় বটে কিন্তু বাছে খুব কম হয়। ছেলেটা তিন দিনে খুব কাবু হয়ে পাড়ছে। যা'তে শীঘ্র ভাল হয়, তাই কর ঠাকমা।

ঠা। শোন বলি, প্রথমে একটা জোলাপ দিয়ো।

লী। সে কি ঠাকমা, এই ১৫২০ বার বাছে, তার ওপর আবার জোলাপ।

ঠা। হাঁ তাই। এ রকম অবস্থায় জোলাপ দিলে রোগী যন্ত্রণা পেয়ে পঞ্চাশ বারে যে বাছে ক'রত, সেটা ২১৩ বারে বেরিয়ে যায়, রোগীর যন্ত্রণা কমে, আর রোগও শীঘ্র ভাল হয়ে যায়।

লী। সব আমাশয়ে কি জোলাপ দিতে হয় ?

ঠা। না তা কেন ? যেখানে আপনা হতে খুব বাছে হয়, সেখানে জোলাপ দিতে নেই। কিন্তু যেখানে একটু-একটু মল যন্ত্রণার

সঙ্গে বারংবার বেয়োর, সেখানে জোলাপ দেওয়া খুব দরকার।

লী। তা'—কি জোলাপ দেব বল ?

ঠা। বড় খোকার বয়স কত হয় ?

লী। এই ষেটের সাত বছরে প'ড়েছে।

ঠা। তা'হলে এক কাঙ্গ ক'র, হন্তুকী এক সিকি আর পিপুল' আধ আনা বেটে ছটাক খানেক গরম জলের সঙ্গে থাইয়ে দিও।

লী। তারপর কি করব ?

ঠা। ৪।৫ বার বাছে হ'য়ে অনেকটা মল আর আম বেরিয়ে গেলে, ছেলে একটু স্বস্তি পাবে, যন্ত্রণা অনেক কম হ'য়ে যাবে। সে দিন আর কোন ওষুদ দিসনে। তার পর দিন থেকে সকালে কাঁচা বেল পোড়া আধ তোলা, আঁকের গুড় এক সিকি, পিপুলের গুঁড়ো ২ রতি, আর গুঠের গুঁড়ো ২ রতি এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবি। এক পোয়া ছাগল হুধ, তিন পোয়া জল আর ৮।১০ টা থেঁতো করা মূতো এক সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে জল মরে গেলে নামা'বি। সেই হুধ এক এক ছটাক ক'রে হু'রতি মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে ছ'বার দিবি। আর বিকালে একবার কচি বেল পোড়া আধ তোলা, খোসাহীন কৃষ্ণ তিল বাটা এক সিকি আর দৈয়ের সর এক সিকি, এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবি। এতেই ভগবানের ইচ্ছায় সেরে যাবে।

লী। আর ছই একটা ওষুদ বল না ঠাকমা ?

ঠা। (১) খোসাহীন কৃষ্ণ তিল বাটা ছই আনা, ষষ্টিমধুর গুঁড়ো এক আনা, চিনি' ছ'আনা, মধু ১৫।১৬ ফোঁটা আর তিলের তেল ৩৪ ফোঁটা এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে আমাশা নষ্ট হয়। বাছের সঙ্গে রক্ত থাক-

লেও বন্ধ হয়ে যায়। (২) ঠৈয়ের গুঁড়ো এক আনা, ষষ্ঠমধুর গুঁড়ো এক আনা, চিনি এক আনা, মধু ১৫:১৬ ফোঁটা—এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে আশাশী ভাল হয়। মুত্রে, পিঁপুল, আতাইচ আর কঁাকড়াশুঙ্গী সমান ভাগে গুঁড়ো করে ৩ রতি মাত্রায় মধুর সঙ্গে খাওয়ালে আশাশী ভাল হয়। সামান্য জ্বর, কি সর্দি-কাশি থাকলে,—তাও যায়।

লী। কঁাকড়াশুঙ্গী আবার কি?

ঠা। কঁাকড়ার দাড়ার মত এক রকম ফল; বেণের দোকানে পাওয়া যায়। যে গুলো বেশ লাল থাকে সেই গুলোই ভাল।

লী। সবাইকে কি এক মাত্রায় দিতে হয়?

ঠা। এত দিন শিখে বুঝি এই নিজে হল? আমি সাত বছরের ছেলের পক্ষে যা' মাত্রা, তাই বলেছি। বয়স বুঝে কম-বেশী করে নিতে হয়।

লী। ক'বার ক'রে ওষুদ দেওয়া ভাল?

ঠা। হ'বার, জোর তিনবার। তবে বেলপোড়াটা আহার-ওষুদ দুই। বেলপোড়া ওষুদ ছাড়াও ২:১ বার দেওয়া যেতে পারে। বেলগুঁঠ জলে সিদ্ধ করে নিয়ে, সেই জল দিয়ে বার্লি পাক করে দিলেও চলে।

লী। তারপর পথি কি দেব বল?

ঠা। ছোট খোকাকে যা-যা দিতে ব'লেছি, তাই দিবি। তা'ছাড়া একটু টাটকা ঘোল কাপড়ে ছেঁকে দিতে পারিস, কিন্তু এটা যদি জ্বর ভাব না থাকে, তবেই দিস। ই! ভাল কথা, ছোট খোকার বেলাও যেমন কাপড়ে ছেঁকে নিতে ব'লেছি এর বেলাও সেই রকম করবি,—ওষুদ পথি সব। যেন শক্ত কি করকরে কোন জিনিষ পেটে না যায়।

লী। কেন ঠাকুমা এতে ত নাড়ীতে যা' হয় না।

ঠা। যা না হোক, নাড়ী ফোলে, ব্যথা হয়। কাজেই মল বত কম হয় আর মলব সঙ্গে শক্ত ভাবটা না থাকে। সেটা দরকার। ব্যথার উপর সামান্য কিছু লাগলে কষ্ট হয় আর ব্যথা বেড়ে যায়, তা জানত। তা' এ মনে কর নাড়ীর ভিতর কত নরম জায়গা।

লী। অচ্ছা তাই ক'রবো কিন্তু আর কিছু খেত দেব না?

ঠা। ছোট খোকার মত একে অত ধরা-কাটায় রাখতে হবে না। আম পাক পেলে একটু ময়ূর দালের ঘূষ আর মাছের ঝোল কাপড়ে ছেঁকে দিস। কঁচকলা আর মাছ, ঝোলে চ'টকে তার পর ছেঁকে দিবি।

লী। তা, আম পাক পাওয়া বুঝবো কি করে?

ঠা। আম বেশী থাকলে মলে হুর্গন্ধ হয়, পেটে গুড় গুড় শব্দ হয়, পেটের শুলুনী হয়, অন্ন অন্ন মল নির্গত হয়। আর বত আম পাক পায়, তত ঐ সকল উপসর্গ ক'মে আসে। আম পাক পেলে মলে হুর্গন্ধ থাকে না, পেটে গুড় গুড় শব্দ থাকে না, শুলুনী কম হয় আর দান্ত সহজে হয়।

লী। একেও কি ভাল হবার যুখে ছোট খোকার মত ধরা-কাটায় রাখতে হবে।

ঠা। ত'হটা না হোক, দিন কতক বেশ ধরা-কাটায় রাখতে হ'বে বৈকি। একেবারে খুব পেট ভ'রে খেতে দেবো না। দিন কতক যে সব পথি ব'লেছি, তা ছাড়া আর কিছু দেবে না।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

লী। তুমি আবার এসে হাজির কেন

ঠা। (হাসিয়া) আজ কালকার বাবুরা যে বেজায় মাগমুখো। এতক্ষণ ছিল—সেই বাহাজুরী।

প্রা। ঠাকমা, সত্যি বলছি, আগে মাগ-মুখোই ছিলাম বটে, কিন্তু এখন লীলা যেমন কাজ করে, আমিও তেমনি কাজ করি। হয় না—হয় জিজ্ঞাসা কর।

লী। সত্যি ঠাকমা, এখন সংসারের সকলে কিসে সুখে থাকে তার জ্ঞান চেষ্ঠা দেখতে পাই। পাড়া-প্রতিবাসী গরীবজীবীর উপকারও করেন শুনতে পাই।

ঠা। বেশ, বেশ, শুনে বড় সুখী হলাম। এতেইত নাগধের মন্থ্য।

প্রা। তবেই বোঝ ঠাকমা, এখানে মাগ-মুখো হ'য়ে আসিনি। তবে মাগের ঠাকমা-মুখো হয়ে এসেছি।

ঠা। হঠাৎ ঠাকমার উপর বাবুর এত স্নানজর পড়লো কেন বল দেখি।

প্রা। সেটা সত্যি বলতে কি, ঠাকমা, তোমার জন্তেও নয়, আমার জন্তেও নয়—বড় ছেলেটার জন্তে।

ঠা কেন তার ব্যবস্থাত করে দিলাম।

প্রা। সে পেটের কামড়ানিতে এত অস্থির হ'য়েছে যে, সে বলে বন্ধাবার নয়। আমি ছুটে ডাক্তারের কাছে গেলাম, ডাক্তার বলে—হয়—মর্ফিয়া মিক্চার দিয়ে গুম পাড়াবে, নয়—মর্ফিয়ার পিচকারী দেবে। তা তোমার জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু ক'লে লীলা ভারী রাগ করবে। তাই ছুটে তোমার মত জানতে এসেছি। ছেলেটার কষ্ট আর চক্ষু দেখা যায় না।

লী। তুমি কি বল ঠাকমা?

ঠা। আচ্ছা বাছারে, বড় কষ্ট পাচ্ছে। তা'ও গুম পাড়ান, কি পিচকারি দিয়ে দরকার নাহি। এট প্রলেপটা দিলে যন্ত্রণা ক'মে যাবে এখন, - পুলকুড়ি পাতা, ঘোয়ান, আদা আর দৌরী, সমান ভাগে বিন্দু নাভির ঠিক জ্বলবে

দিবি। তার পর একখানা লোহার হাতা গরম ক'রে—সয়—এমন ভাবে প্রলেপেব ওপর চেপে ধরবি। যখন যন্ত্রণা বেশী হবে, তখন এই রকম ক'রলেই যন্ত্রণা ক'মে যাবে।

লী। তা পুলকুড়ি পাতা এখন কোথায় পাব?

ঠা। বাজারের পাওয়া যায়, বেদেদের কাছে পাওয়া যায়, পাচন ওয়ালার কাছে পাওয়া যায়। অনেক কবিবাজের বাড়ীতেও থাকে। আজ নেহাৎ কাঁচা না পাওয়া গেলে টাটকা শুকনো নিলেও চরবে। কাগ থেকে কাঁচা যোগাড় করে নিও।

প্রা। দেখ লীলা, আমি তবে মসলাগুলো নিয়ে যাচ্ছি, তুমি আর দৌরী ক'রে না।

( প্রফুল্লের প্রস্থান )

লী। আমি তবে আসি ঠাকমা। ছেলে-টান কষ্টের কথা শুনে মনটা বড় খাবাপ হ'ল।

ঠা। আচ্ছা তা হ'বে না, মার প্রাণ। তা, এস দিদি। আমারও বড় ভাবনা রইল। ত'বেলা খবর দিতে ভুলো না।

লী। সে তোমার বলতে হবে না, এখন আসি।

( লীলার প্রস্থান )

ঠা। ষষ্ঠ মহামায়ার মায়া! মায়া-রজ্জুতে বদ্ধ ক'রে ক্ষণবিন্দুও বস্তুতে আপনার বলে ভ্রম জন্মিয়ে কি খেলা খেলাচ্ছ মা মরণের পথে এক পা দিয়েছি, আজ বাদে কাল সকল আপনার-জনকে ছেড়ে যেতে হ'বে, এখন একটা নান্দনীয় ছেলের রোগ-যন্ত্রণার ক'য় শুনে মনটা কাতর হয়ে উঠলো। মা! মা! মায়ার বাধন কেটে দে মা! এ অস্তিম সময়ে ঐ রাজা চরণ হুথানি ছাড়া প্রাণে আর যেন কখন ভাবনা না আসে

## কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয় ।



(আয়ুর্বেদ সভায় পঠিত ।)

চিকিৎসকগণের নিকট রোগ সমূহ নানা  
মুদ্রিতে স্থপরিচিত । কতকগুলি মারাত্মক,  
কতকগুলি দাক্ষণ-যন্ত্রণাদায়ক, কতকগুলি  
পৈতৃক, কতকগুলি ষোপার্জিত; আবার  
কতকগুলি একাধারে সর্বগুণ সম্পন্ন । এই  
শেষোক্ত ব্যাধি সমূহের মধ্যে কুষ্ঠ রোগকে  
সর্বপ্রধান বলিলে, বোধ হয় কোন দোষ হয়  
না । নান্ন মাংসে ভীতি-উৎপাদক, বন্ধু-আত্মীয়-  
স্বজনাদির সঞ্চরচ্ছদক, সাক্ষাৎ জীবন-ত্যা-  
নিন্দাদক,—এমন রোগ অতি অল্পই আছে ।  
তাই কুষ্ঠ-চিকিৎসা-প্রশংসায় উক্ত হইয়াছে,—

“কথ্যাকোটি প্রদানেন গঙ্গায়ান্ পিতৃতপণে ।  
বিধেধরপুবাবাসে তৎফলং কুষ্ঠনাশনে ।  
গবাং কোটি প্রদানেন চাঞ্চমেধশতেন চ ।  
ব্রহ্মোৎসর্গে চ বৎ পুণ্যং তৎপুণ্যং কুষ্ঠনাশনে ॥”

[ রাসেন্দ্র,—কুষ্ঠ চিকিৎসা ]

কোটি কথ্যাসম্পাদন ও গঙ্গাতে পিতৃ  
পুত্রগণের তপণ এবং কাশীধামে বাস করিলে  
যে ফল,—গো-কোটিদান, শত অশ্বমেধ যজ্ঞ  
এবং ব্রহ্মোৎসর্গ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়,  
—কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিলে, সেইরূপ পুণ্য  
ও সেই ফল হইয়া থাকে । এমন উক্ত প্রশংসা  
আর কোন রোগ-চিকিৎসাতেই দেখা যায়  
না । প্রশংসাও অজ্ঞাভ্য নহে ।

চিকিৎসা করিতে হইলে সর্বাগ্রে রোগ-  
নির্ণয় আবশ্যিক । বহুবিধ আত্রেয়ের এই মহতী  
উক্তি কেবল আয়ুর্বেদের নহে, সর্বদেশীয়  
চিকিৎসা-শাস্ত্রেরই মেরুদণ্ড স্বরূপ ।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোহনন্তরমৌষধম্ ।

ততঃ কৰ্ম ভিষক্ পশ্চাদ্ জ্ঞান পূৰ্ব্বং

সমাচরেৎ ।

যন্ত রোগমবজায় কৰ্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্ ।

অপোষধ বিধানজ্ঞ স্তস্য সিদ্ধিৰ্যদৃচ্ছয়া ॥

( চরকসূত্র—মহারোগাধ্যায় । )

অর্থাৎ চিকিৎসক সর্বাগ্রে রোগ-পরীক্ষা

বা রোগ-নির্ণয় করিবেন । তাহার পর ঔষধ

নির্ধাচন করিবেন । তাহার পর জ্ঞান পূর্বক

অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন ।

যিনি রোগ-নির্ণয় না করিয়া, চিকিৎসায় প্রবৃত্ত

হন, ঔষধ-প্রয়োগ-বেত্তা হইলেও সেই চিকিৎসা

সকলের সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ রোগ-আরোগ্য

সম্পাদন কদাচিত্ বা দৈবক্রমেই ঘটয়া থাকে ।

রোগ নির্ণয় দ্বিবিধ । (১) রোগের স্বরূপ

নির্ণয় (২) তৎসদৃশ বা তৎসজাতীয় অন্তরোগ-

সমূহ হইতে পার্থক্য নির্ধাচন । দার্শনিকের

ভাষায় বলিতে হইলে রোগের লক্ষণ দ্বিবিধ \*

(১) স্বরূপ প্রতিপাদক (২) ইতরব্যবর্তক ।

আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে রোগসমূহের যে লক্ষণাবলী

বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যুগপৎ এই

দ্বিবিধ লক্ষণ সন্নিবিষ্ট । ভেদক বা ইতর-

ব্যবর্তক লক্ষণ স্বতন্ত্রভাবে প্রায়ই উপদিষ্ট হয়

নাই । কিন্তু ব্যাধিসমূহের পরস্পরের সহিত

সংশয় উপস্থিত হইলে, ভেদক লক্ষণের সাহায্য

\* অব্যাপ্তি ও অতি ব্যাপ্তি লক্ষণের এই দ্বিবিধ  
দোষ । তাহা নিবারণের জন্যই দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ  
করা আবশ্যিক ।

ব্যতীত রোগনির্ণয় সম্ভব নহে। সেইগুলি বিশ্লেষণ পূর্বক উপদেশ করা টীকাকারগণের কর্তব্য। বিজয় রক্ষিত, শ্রীকৃষ্ণ, ভাবপ্রকাশকার ভাবমিশ্র প্রভৃতি, অতিসার ও গ্রহণী, মুচ্ছা ও অপস্মার, মূত্রাবাত ও মূত্রকৃচ্ছ ইত্যাদি অনেক রোগেরই ভেদক লক্ষণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি রোগ সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ নীরব রহিয়া গিয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে কুষ্ঠ ও বাতরক্তের নাম করা বাইতে পারে, এবং সেই সম্বন্ধে আলোচনা করাই অদ্যকার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সংশয় ভঞ্নের পূর্বে, সংশয় আছে কিনা, তাহার মীমাংসা প্রয়োজন। ভেদ-নির্ণয়ের পূর্বে কুষ্ঠ ও বাতরক্তের মধ্যে কিরূপ সাদৃশ্য আছে তাহা দেখা কর্তব্য। এই জন্ত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থাবলী হইতে বচন সমূহ উদ্ধৃত করা আবশ্যক। কিন্তু এই সমস্ত অংশই চিকিৎসক মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত বলিয়া অতি সংক্ষেপে একান্ত প্রয়োজনীয় স্থল মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

কুষ্ঠের পূর্বরূপ—

স্পর্শাত্ত্বমতিষেদো ন বা বৈবর্ণ্যমুন্নতিঃ।

কোঠানাং লোমহর্ষণে কণ্ডুস্তোদঃ ...

ব্রণানামধিকং শূলম্ ...

সুপ্তাঙ্গঠা চেতি কুষ্ঠ লক্ষণমগ্রজম্।

অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানের অগ্রথাতাব, অতি ষেদ, ষেদাভাব, বিবর্ণতা, কোষ্ঠ সমূহের (মণ্ডল বিশেষ) উৎপত্তি; রোমাঞ্চ, কণ্ডু, স্থতীবিক্রবৎ বেদনা, ক্ষত সমূহে অত্যন্ত যন্ত্রণা, অঙ্গের সুপ্ততা অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানাতাব ইত্যাদি কুষ্ঠের পূর্বরূপ।

[ চরক চিকিৎসা স্থান, কুষ্ঠ চিঃ অঃ ]।

অঙ্গপ্রদেশানাং বাপ অস্থিঃ কৃষ্ণতা চ...

যত্র যত্র দোষো বিক্ষিপ্তো নিঃসরতি তত্র তত্র মণ্ডলানি প্রাধুর্ভবন্তি।

[ সুশ্রুত নিদাঃ স্থাঃ—কুষ্ঠ নিদান ]

অর্থাৎ দেহের স্থান সমূহে সুপ্তি, রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা . সে সমস্ত স্থানে দোষ বিস্তৃত হইয়া বহিঃস্থ হয় সেই সমস্ত স্থানে মণ্ডল সমূহ উদ্ভূত হইয়া থাকে।

এস্থলে বক্তব্য অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগভট কুষ্ঠপূর্বরূপে চরক ও সুশ্রুতোক্ত লক্ষণগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। নাথবকর বাগভটের বচনগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাতরক্তের পূর্বরূপ—

ষেদোহ তার্থং নবা কাম্যং স্পর্শজ্ঞানং

ক্ষতেহ ত্তিকৃ

নিঃস্তোদঃ...কণ্ডুঃ...

বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তিবাতাস্থক-পূর্বলক্ষণম্।

[ চরক-বাং শোং চিকিৎসিতাধ্যায় ]।

অর্থাৎ অত্যন্ত ষেদ, ষেদাভাব, কৃষ্ণবর্ণতা, স্পর্শজ্ঞানাতাব, ক্ষতে অত্যন্ত যন্ত্রণা, জাহ্নু, জজ্বা, উরু, কটা, স্কন্ধ ও শরীরের সন্ধি সমূহে স্থতীবিক্রবৎ বেদনা, চুলকানি ..বিবর্ণতা, মণ্ডলোৎপত্তি—এইগুলি বাতরক্তরোগের পূর্বরূপ। বাগভট পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, বাতরক্তের পূর্বরূপ—কুষ্ঠপূর্বরূপের সদৃশ। “তন্ত্র লক্ষণং ভবিষ্যতঃ কুষ্ঠসদম্”

কুষ্ঠের রূপ—

রৌক্ষ্যং শোষস্তোদঃ শূলং সঙ্কোচনং তথায়াসঃ।

পারুধ্যং থরতাবো হর্ষঃ শ্রাবাক্রণদ্বয়ঃ—

কুষ্ঠেষ্ণ বাতলিঙ্গম্—

অর্থাৎ রুক্ষতা, শুষ্কতা, স্থতীবিক্রবৎ যন্ত্রণা, শূল, সঙ্কোচ, শ্রমবোধ অর্থাৎ অবসাদ, পক্ষতা ককশতা, রোমাঞ্চ, শুক্রাশ্রুবিক্রকৃষ্ণবর্ণ ই রক্তবর্ণ ই, এইগুলি কুষ্ঠের বাতকৃত লক্ষণ।



—দাহো রাগঃ পরিশ্রবঃ পাকঃ। বিষগন্ধঃ

ক্লেদ স্তথাঙ্গপতনঞ্চ পিত্তকৃতম্ \* \* \*

অর্থাৎ দাহ, রক্তবর্ণতা, অত্যন্ত শ্রাব, পকৃতা, পুতিগন্ধ, ক্লেদ ও অঙ্গপতন,—এইগুলি কুষ্ঠের পিত্তকৃত লক্ষণ।

ঐত্যাং শৈত্যাং কণ্ডুঃ শৈত্যাং

দোষোপাধগৌরবশ্চৈত্যাং।

কুষ্ঠম্ তু কফলিঙ্গম্—

অর্থাৎ গুরুবর্ণতা, শীতবোধ, চুলফানি, কাঠিগ্র, উচ্চতা (শোথের) গুরুত্ব ও স্নিগ্ধতা কুষ্ঠের কফকৃত লক্ষণ।

[ চরক-কুষ্ঠ চিকিৎসা অধ্যায় ]  
বাতবক্তের রূপ -

নিশেষতঃ শিবায়ামতোদগ্ধবর্ণ ভেদনম্।

গোপস্য কাষ্যাক্ষকৃৎ-গ্রাবতা-বুদ্ধিহানয়ঃ ..

অনিলোত্তরে—

অর্থাৎ, নিশেষতঃ শিবাসমূহের আকর্ষণ (টান দরা), স্তম্ভবিক্রমং যন্ত্রণা, স্পন্দন, বিদীর্ণবৎ বেদনা, শোথের কৃষ্ণতা, রক্ষতা, শ্বেতরক্ষবর্ণতা, বুদ্ধি ও হ্রাস ইত্যাদি বাতরক্তে বাগধিক্যের লক্ষণ।

বিদাহো বেদনা মুচ্ছা শ্বেদ শৃঙ্গা মদোদ্রমঃ।

রাগঃ পাকশচ ভেদশচ শোষশ্চাক্তানি

পৈত্তিকে ॥”

বিশিষ্টরূপ দাহ, বেদনা, মুচ্ছা, শ্বেদ, তৃষ্ণা, মত্ততা, ভ্রম, লোহিতা, পকৃবৎ ভাব, বিদারণবৎ যন্ত্রণা,—এইগুলি বাতরক্তে পিত্তাধিক্যের লক্ষণ।

তৈমিত্যাং গৌরবং রেহঃ স্তম্ভিমল্লাচ কৃকৃককে।

অর্জিতাবোধ, গুরুত্ব, স্নিগ্ধতা, স্তম্ভি ও বেদনার অন্তরা—এইগুলি বাতরক্তের কফাধিক্যের লক্ষণ।

[ চরক-চিঃস্বাঃ বাঃ শোঃ চিঃ অঃ ]।

কুষ্ঠবহ্তানং ভূত্বা কালান্তরেণ অবগাঢ়ী ভবতি। অর্থাৎ বাতরক্ত প্রথমে কুষ্ঠের মত ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করে, পরে, কালক্রমে গভীর ধাতুগত হয়।

[ সুশ্রুত চিঃ স্বাঃ মহাবাহতব্যা চিঃ অঃ ]

এস্থলে একটু বক্তব্য আছে। চরকে কুষ্ঠ চিকিৎসিতাধায়ে যে গুলি কুষ্ঠের দোষভেদে লক্ষণ বলা হইয়াছে, নিদানস্থানে কুষ্ঠ নিদানে প্রায় সেইগুলিকেই সম্ভ্রাত ক্রিমি-কুষ্ঠের দোষকৃত উপদ্রব রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতের কুষ্ঠ-নিদানে সামান্যতঃ দোষজলিঙ্গ বলিয়াই এই গুলির নির্দেশ আছে। চরকের চিকিৎসিত স্থানে শ্বেদের উল্লেখ নাই, নিদানস্থানে উল্লেখ আছে। সুশ্রুতের নিদানস্থানে, বাতজগ্র বলিয়া শ্বেদের পাঠ আছে। এই সম্বন্ধে বথা স্থানে বিচার করিব।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, কুষ্ঠ সপ্ত-ধাতুগত ও ত্রিদোষায়ক, বাতরক্ত প্রধানতঃ বাত ও রক্তদ্বিসম্ভূত। উভয়ের কারণ সমূহেরও পার্থক্য আছে। সুতরাং ভেদ-নির্ণয় হুঙ্ক নহে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে রোগ পরীক্ষার কালে এই সংপ্রাপ্তি ও কারণের পার্থক্য নিরূপণ অসম্ভব বলিলেও অতুক্তি হয় না। নিদান ও সংপ্রাপ্তি প্রায়ই গরোক। প্রত্যক্ষ পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় অল্পশয় এই তিনটাই আমাদের রোগ-নির্ণয়ের প্রধান সম্বল। তন্মধ্যে গুঢ় লিঙ্গ ব্যাধিম্ উপশয়াল্পশাভ্যাং পরীক্ষেত” অর্থাৎ চিকিৎসার কলাকলের দ্বারা রোগ নিরূপণ,—অন্ততঃ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত সম্বন্ধে সুসাধ্য নহে। কারণ অধিকার ও ঔষধাবলী স্বতন্ত্ররূপে উপদিষ্ট হইলেও, প্রকৃত পক্ষে আমরা অন্ততঃ সাধারণতঃ চিকিৎসার কোন পার্থক্য করি না। ঔষধ সমূহের কল-

প্রতিতেও প্রায়ই একই ঔষধের বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নাশকত উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে একটা তর্ক উঠিতে পারে, যদি চিকিৎসারই পার্থক্য না থাকে, তবে ভেদ-নির্ণয়ের কি প্রয়োজন? চিকিৎসার ভেদের জন্তই ত রোগের পার্থক্য নির্ণয় আবশ্যক। কিন্তু এ তর্ক সঙ্গত নহে। চিকিৎসার পার্থক্য করা না হইলেও, প্রকৃতি ও পরিণামের পার্থক্য আছে। কুষ্ঠরোগ দারুণ সংক্রামক এবং পাশ্চাত্য মতে সম্পূর্ণ স্বীকৃত \* না হইলেও

\* Certain Physiopathological qualities, predisposing to leprosy, may be inherited \* \* Physiological peculiarities and susceptibilities may, but parasites cannot be inherited. It is true the ovum may be infected by a germ as in Syphilis, but infection is not heridity \* \* \* Without absolutely denying the possibility of ovum infection, the probability is that such an event is very rare. \* \* Another powerful argument against the doctrine of heridity is, the circumstance, that lepers become sterile early in the disease.

Sir Patirick Manson

Tropical Diseases,

New edition. (1914)

কুষ্ঠরোগোৎপত্তির অসুক্ল কতকগুলি প্রকৃতি ও লেগ সংক্রমিত হইতে পারে \* \* শরীরপ্রকৃতি ও রোগ-প্রবণতা সংক্রমিত হইতে পারে বটে, কিন্তু রোগ বীজ সংক্রমিত হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য উপদংশের মত রোগে স্ত্রীবীজ (অর্ধব) রোগ বীজগু দুই হইতে পারে, কিন্তু রোগ সংক্রমণ এবং পুরুষাভুজ এক কথা নহে \* \* আর্ন্তববীজ ব্যাধি দুই হইবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিতে পারিলেও তাহা অত্যন্ত বিরল একথা বলা যায়। (কুষ্ঠরোগের) বংশানুক্রমের বিরুদ্ধে আর একটা গুরুতর তর্ক এই যে, কুষ্ঠরোগীগণের রোগাক্রমণের অধিকাল মধ্যেই অপত্যোৎপাদন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

সুতরাং এ তত্ত্ব পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মতেরও বিরুদ্ধ হইতেছে না।

আয়ুর্বেদ মতে বংশানুক্রমিক। সুশ্রুত বলিয়াছেন—

স্ত্রীপুংসয়োঃ কুষ্ঠদোষাদ্ তষ্ঠ শোণিতস্তক্ৰমাঃ  
যদপত্যং যয়োজাতং জ্ঞেয়ং তদপি

কুষ্ঠিতম্—(কুষ্ঠ নিঃ)

অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের কুষ্ঠ রোগে শুক্র ও শোণিত দূষিত হইলে তাহাদের যে সন্তান জন্মে, সেও কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত হয়। টীকাকার উল্লেখে মতে কুষ্ঠবোগগ্রস্ত স্ত্রী-পুরুষের বীজ শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের অপত্য জন্মে না, এই মত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু বীজ সম্পূর্ণ নষ্ট না হইলে কুষ্ঠবোগগ্রস্ত সন্তান উৎপন্ন হয়। অতএব সমাজের ও জাতির মঙ্গলের জন্ত কুষ্ঠবোগীকে তদনুযায়ী নিয়মিত ও পৃথগভূত রাখা একান্ত প্রয়োজন। ভেদ-নির্ণয় ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। আর চিকিৎসার প্রকৃতিই পার্থক্য না থাকিলে বসন্ত চিকিৎসকদের মত স্বতন্ত্র কুষ্ঠ চিকিৎসক গণের (অন্ততঃ সেই নামে পরিচিত) আবর্তিত হইতে না। শাস্ত্রে যখন অধিকার-ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। রোগের ভেদ-নির্ণয় ব্যতীত তাহার চিকিৎসার ভেদ নির্ণয় করাও অসম্ভব, সন্দেহ নাই।

এক্ষেণে কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয় সম্বন্ধে প্রচলিত ও বহুসম্মত মত সমূহ অগ্রে আলোচনা করা যাউক।

তত্ত্ব স্থানং কয়ো পাদাবজুলঃ সর্বসঙ্গরঃ।

কুহাদৌ হস্তপাদেভ্য মূলং দেহে বিধাবতি।

[ চরক—চিঃ স্থাঃ, বাঃ শোঃ চিঃ অঃ ]

অর্থাৎ হস্ত ও পদদ্বয়, অঙ্গুলী ও সন্ধি সমূহ বাত রক্তের স্থান। ইহা হস্ত ও পদে আরম্ভ হইয়া দেহে বিস্তৃত হয়।

পাদগোমূলমাস্থায় কদাচিৎসত্ত্বোরপি ।

অথোবিষমিতা ক্রুরাঃ তদেহমুপসর্পতি

( সূত্রত—বাতব্যাং নিং ) ।

অর্থ্যং বাতরক্ত হস্ত ও পদদ্বয়েব মূলে  
অধিষ্ঠান করিয়া প্রকুপিত মূষিক বিধের মত  
দেহে বিস্তৃত হয় ।

বাগ্ভট বলিয়াছেন “তচ্চপূর্বে পাদৌ  
প্রধাবতি” অর্থ্যং বাতরক্ত প্রথমে পদদ্বয়  
আক্রমণ করে । মাধবনিদানের টীকাকার  
বিভিন্ন রক্ষিত রক্তগত বাতের সহিত বাত-  
বক্তেব পার্থক্য নির্দেশ করিতে যাওয়া বলিয়া-  
ছেন,—“বাতরক্তে তু স্বকাষণা দ্ভাবপি  
হস্তাদিগমনকুপিতৌ বিশিষ্টং সংপ্রাপ্তা হস্ত-  
পাদগতাবেব বাতরক্তাখ্যাং বিকারং জনয়তঃ” ।  
অর্থ্যং স্ব স্ব প্রকোপক কারণ বশতঃ, হস্তী  
প্রভৃতিতে গমন দ্বারা কুপিত বায়ু ও রক্ত,  
বিশিষ্ট সংপ্রাপ্তি বশতঃ হস্তপদে অবস্থিত  
হইয়াই বাতরক্ত নামক রোগ উৎপাদন করে ।

এই সকল বচন ও নির্দেশ অনুসারে, পদ  
মূল ও হস্তমূল হইতে প্রকাশ ও প্রসারই  
বাতবক্তের ভেদক লক্ষণ বলিয়া অনেক  
চিকিৎসকের ধারণা । কিন্তু এই লক্ষণ সমাক  
অবিসম্বাদী বা সংশয় নিবারণক নহে । মুখাদি  
অন্তস্থানে (কুষ্ঠ) রোগ আরম্ভ হইলে, এই  
লক্ষণের দ্বারা বরং বাতরক্তের ব্যাবৃতি বা রোগ  
নির্ণয় করা গেল, কিন্তু যে স্থলে পদমূলে বা হস্ত  
মূলে কুষ্ঠ আরম্ভ হয়, সে ক্ষেত্রে এই লক্ষণ  
অকিঞ্চিকর হইয়া পড়ে । কুষ্ঠ যে পাদমূল  
বা হস্ত মূলে হইবে না, এক্রপ নিবেদ্য ত  
কুত্রাপি নাই । বাতরক্তের মত কুষ্ঠের  
সংপ্রাপ্তি ও স্থান, কোন বিশেষ সীমাবদ্ধ নহে ।  
সুশ্রুতই কুষ্ঠের পিত্ত লিঙ্গের মধ্যে অনুলী

পতন ও করভঙ্গ উক্ত হইয়াছে । ইহা প্রত্যক্ষ  
সিদ্ধও বটে ।

কাহাব কাহাবও বিশ্বাস, বাতবক্ত বাত ও  
রক্তহৃষ্ট মাত্র । ইহাতে কুষ্ঠের মত মাংস পচা,  
অস্থি ভঙ্গ প্রভৃতি গুরুতর লক্ষণ প্রকাশ পায়না  
কিন্তু ত হা স্তিক সম্ভব নহে । মাংসক্ষয় ও  
মাংস কোথ বাতবক্তের বিশেষ উপদ্রব ।

“...মাংসকোথশিরাগ্ৰহাঃ...

এতরূপদ্রবতং বজ্জাম্”

( চরঃ বাঃ শাঃ চিঃ )

অর্থ্যং মাংস পচা, শিরাসঙ্কোচ ইত্যাদি  
উপদ্রব-পীড়িতকে ত্যাগ করিবে । “আজানু-  
ক্ষুটিতং বজ্জ প্রতিগ্নং প্রস্রুতঞ্চ বৎ, উপদ্রবৈ শচ  
বজ্জুষ্ঠং প্রাণমাংসক্ষয়াদিভিঃ, শোণিতং তং  
অসাধ্যং স্ত্যং...অর্থ্যং সূত্রত বলিয়াছেন যে,  
যে বাতরক্তে জালুপর্ঘ্যস্ত ( ডক্ ) ফাটয়া বা  
(মাংসাদি, বিন্দীর্ণ হইয়া বায়ু, শ্রাব হইতে থাকে  
এবং বলও মাংসক্ষয় প্রভৃতি উপদ্রব হইয় থাকে,  
সেই বাতবক্ত অসাধ্য । [সূত্রত বাং ব্যাং নিং]  
অতএব বাতরক্তেও গুরুতর লক্ষণের অসম্ভাব  
নাই । অস্থি-ভঙ্গাদি কুষ্ঠের প্রায় চরম লক্ষণ  
কিন্তু রোগ নির্ণয়ের জন্ত ততদিন অপেক্ষা  
করিলে চিকিৎসকের পূর্বে স্বয়ং রোগীরই  
চৈতন্য-সঞ্চারের অধিক সম্ভাবনা ।

অতএব কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয়  
করিতে হইলে, উভয়েরই ( অন্ততঃ কুষ্ঠের )  
এমন ভেদক লক্ষণ বাহির করিতে হইবে,  
যদ্বারা নিঃসংশয়রূপে সর্বস্থলে অচিরকালেই  
উভয়েরই স্পষ্ট পার্থক্য নিরূপিত হয় এবং সেই  
লক্ষণ বলিবার উদ্দেশ্যেই অস্ত্র এই প্রবন্ধের  
অবতারণা । কিন্তু সেই লক্ষণগুলি বলিবার  
পূর্বে ইহা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক যে,  
সেই লক্ষণ যথার্থই বিশিষ্ট ভেদক লক্ষণ ।

আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে সামান্যতঃ কথিত লক্ষণ সমষ্টির মধ্য হইতে একটী বা দুইটী লক্ষণকে ইতরব্যবর্তক বলিয়া নির্দেশ মাত্রই বিনা প্রমাণে সে কথা কেহই স্বীকার করিবেন না।

প্রমাণের কথা বলিতে চাইলে, আগে দেখা যাউক, এস্থলে কিরূপ প্রমাণ সম্ভব। চরক মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি ও আশ্রু—এই চতুর্বিধ প্রমাণ। যুক্তি অর্থাৎ অর্থাপত্তি, নৈয়ায়িকগণ স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িক ও সুশ্রুত সম্মত উপমানও সেইরূপ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া বাইতে পারে। অতএব স্থলতঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আশ্রু এই ত্রিবিধ প্রমাণ বলা যায়। রোগ বিশেষ বিজ্ঞানীয় বিমানাধ্যয়ে মহর্ষি আত্রেয় ও বলিয়াছেন—“ত্রিবিধং খলু রোগ বিশেষ বিজ্ঞানং ভবতি তদ্বাচ্য উপদেশঃ প্রত্যক্ষমন্তু-মানঞ্চ।” এস্থলে আশ্রু প্রমাণ সম্ভব নহে, কেননা আশ্রু বা ঋষিকৃত লক্ষণবলীর মধ্যে গৌণমুখ্যভাব নির্ধারণই এই বিচারের উদ্দেশ্য। তজ্জন্ত স্বতন্ত্র বিশদ আশ্রু প্রমাণ থাকিলে, এত সংশয় ও গোলযোগ ঘটিত না। অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক হওয়া আবশ্যক। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষফলকশাস্ত্র প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত।

“চিকিৎসিতজ্যোতিষতত্ত্ববাদাঃ

পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি”

কিন্তু এক্ষেত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া অতি দুষ্কর। বিশেষতঃ শাস্ত্র বচন

মাত্রাব্যবসী প্রত্যক্ষবিজ্ঞানক্রিয়াশূন্য আমাব পক্ষে তাহা একেবারে অসম্ভব। অতএব অস্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, কিন্তু কাহার ক্রমাণ প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে? আমরা নিশ্চয়ই ঋষি ব্যতীত অন্যকে আশ্রু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। \*

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র লৌকিক প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতি-  
ষ্ঠিত। অবশ্য তাহাও সমস্ত সিদ্ধান্তই অভ্যাস বা পরীক্ষক ও প্রত্যক্ষদর্শীর ভ্রম প্রমাদ দূষিত নহে,—একথা বলিতেছি না, কিন্তু মোটেও উপব সেগুলির অধিকাংশই প্রত্যক্ষ মূলক—  
ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্বদ্বন্দ্বী সম্মত যদি এমন কোন ভেদক লক্ষণ পাওয়া যায়, যাহা ঋষি বচনেও সুস্পষ্ট উল্লিখিত চইয়াছে, তবে সেই লক্ষণ গুলিকে প্রকৃত ভেদক বা ইতর ব্যবর্তক বলিয়া স্বীকার করিতে বোধহয় কাহারও অপত্তি হইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ষাণ্ডগুপ্ত,

কাব্যাতীর্থ, কবিরহ।

\* কিন্তু জ্ঞানবর্ধনের ভাষ্যকার বাৎস্তারনমুনি স্বীকার করিতেন। “আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ” এই জ্ঞান-  
বর্ধনের ভাষ্যে বাৎস্তারন বলিয়াছেন “ঋগ্বেদে খলু সাক্ষাৎ  
কৃতবাক্যম্। যদাদুদৈত্ব অর্থন্ত চিহ্ন্যাপরিমিতাঃ প্রযুক্ত  
উপদেষ্টাঃ। সাক্ষাৎকরণমর্থস্তাপ্তিঃ স্তয়া এবর্ততে  
ইত্যাপ্তঃ।” অর্থাৎ যিনি পদার্থের স্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি  
করিয়াছেন তিনি আশ্রু। ঋষি অর্থাৎ যজ্ঞে সাক্ষর  
পক্ষেই ইহা সমান লক্ষণ।

## শারীর বায়ু ।

—::—

• ( আয়ুর্বেদ সভার পঠিত । )

আয়ুর্বেদে বায়ু কি, তাহা অবগত হওয়া প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্তব্য। কারণ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব। এই দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি এবং বিনাশ—সমস্তই বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার কার্য। সুতরাং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার স্বরূপ বিজ্ঞান এবং এই দেহে তাহাদের অবস্থিতি ও কার্য এবং তাহাদের প্রকৃতি-বিকৃতি, হ্রাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি বিশেষরূপে জানিতে না পারিলে তিনি যোগ নির্ণয় অথবা রোগোপশমের প্রকৃত ঔষু নির্দেশ করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। এমন কি, তিনি একজন প্রকৃত চিকিৎসক নামে অভিহিত হইবারও যোগ্য নহেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদী, বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা স্বীকার করেন না। কিন্তু পুরাণ-তত্ত্বের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে, অতি প্রাচীনকালে ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মাই চিকিৎসার মূলতত্ত্বরূপে নির্দিষ্ট ছিল, এবং তাহা এই আয়ুর্বেদ হইতেই গৃহীত। কিন্তু আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য দেশবাসী তাহা স্বীকার করিতে গড়া বোধ করেন। তাঁহারা বলেন গ্রীকদেশ হইতেই ভারতবাসিগণ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-তত্ত্ব সংগ্রহ করেন গ্রীকগণ ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করে নাই। ইহা অতীব হাস্যজনক। আয়ুর্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞান। যাহার অত্যাঙ্কল কিরণমালা ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে নানা দিক্‌দেশে বোরতর অমানিশার অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন মানবজাতির তমোরশি বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণাগ্রস্ত মানবকুল ব্যাধিযুক্ত

হইয়া, সর্বণ ও সৃষ্টি দেহে দীর্ঘজীবন লাভ পূর্বক পরম সুখে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,—এই সেই আয়ুর্বেদই পৃথিবীস্থ অস্তিত্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মভূমি! উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা অবগত আছেন, যে, ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের বিস্তৃত জ্ঞান-প্রসূত এই আয়ুর্বেদ কি ভাবে পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, সুতরাং সেই সকল পূর্বাবস্থার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব না। বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা তাহারই মূল তত্ত্বরূপে থাকিয়া আয়ুর্বেদকে বিবিধ ঘূর্ণি-বায়ু, উষ্ণাপাত প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। একথা অবশ্যই বলা আবশ্যক, যে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-শাস্ত্র বলিয়া গর্ব করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা নিতান্তই অবিজ্ঞান যে, অতাপি তাঁহারা তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা ত্রিধাতুকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই।

শারীর বায়ু কি? ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বায়ু কি, জানিতে হইলে, জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে তুই একটা কথায় আলোচনা করা আবশ্যক। তাহা হইলে বুঝাইবার এবং বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইবে। আমি এক্ষণে প্রমাণ করিব, যে, কারণভূত জল, বায়ু, অগ্নিই মানবদেহে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা নামে অভিহিত হয়।

ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, এই পরিপূর্ণমান বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পাকভৌতিক। ক্রিতি, অপ-  
ভেদ্য; মরুৎ, ব্যোম, এই কয়েকটা পঞ্চ মহাত্মতের

সনষ্টি মাত্র। পরম সূক্ষ্ম পরমাণু সকল বিভিন্নরূপে পরিণতি প্রাপ্ত-হইয়াই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি করিতেছে। মানব-দেহ তাহারই একটা অংশমাত্র। সূত্রাং ইহাও পার্শ্বভৌতিক, কিন্তু অপর্যাপ্ত ভৌতিক দ্রব্যের সহিত বিসদৃশ। পঞ্চমহাভূত হইতে কিরূপে এই জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার আলোচনা করিলে, দেখা যাইবে, যে, পার্থিব পরমাণুই সমস্ত কার্য্য-দ্রব্যের আধার। অর্থাৎ কার্য্য-দ্রব্যগুলি পার্থিব পরমাণুতে প্রতিষ্ঠিত। জল দ্রব ও স্নিগ্ধ বলিয়া জলীয় পরমাণু ঐ সকল পার্থিব পরমাণুর সংযোজক। অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যান্তরেই পূর্ব্বোক্ত পরমাণুতে সমবেত থাকিয়া কার্য্য দ্রব্যের সৃষ্টি করে। কার্য্য-দ্রব্যের ভেদ এই, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ঘট, পট নয়, অপবা ঘট হইতে পট ভিন্ন, এইরূপ প্রতীতি অগ্নি, বায়ু ও আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ ও পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়াই এই পঞ্চ মহাভূত ইতর ভেদ বিশিষ্ট কার্য্য দ্রব্যে পৃথক্ স্বরূপ এবং সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। যেমন একই অগ্নি, বাড়বানল, বিদ্যুৎ, অশনি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ও স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ দৈহিক সেই অগ্নির নামই পিত্ত, জলের নাম শ্লেষ্মা এবং বায়ুর নাম বায়ু। দৈহিক বায়ুর নাম ও বায়ু এবং কারণভূত বায়ুর নাম ও বায়ু, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে, তাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাই দেহের মূল। পূর্ব্ব

দেখান হইয়াছে যে, পঞ্চ মহাভূতই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ এবং মানবগণ সেই জগতেবই একটা অংশ, সূত্রাং মানব-গণের মূলও পঞ্চমহাভূতই হইতেছে, কিন্তু এখানে বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাকে মূল বলায় বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। নীমাংসা এই যে, ভৌতিক জল বায়ু ও অগ্নিই বিভিন্ন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, দেহে বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা নামে অভিহিত হয় এবং তাহারাই শুক্রশোণিতে অবস্থিতি করিতেছে, এবং এই শুক্রশোণিত হইতেই মানবের উৎপত্তি হয় বলিয়া, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা-কেই দেহের মূল করা হইয়াছে। ফলকথা, এই যে, পরমাণু ভেদে দেখিতে গেলে, পঞ্চ মহাভূতকেই দেহের মূল বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভিন্ন পরিণাম বশতঃ দেহের মূল শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া শুক্রশোণিতকেই দেহের মূল বলা হইয়াছে। এবং ভৌতিক জল-বায়ু-অগ্নিই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া এই দেহের বৃদ্ধিসাধন করিতেছে। সূত্রাং বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাই দেহ বৃদ্ধির মূল এবং এই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাই বিকৃত হইলে শরীর ধ্বংসমুখে পতিত হয়। সূত্রাং বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাই দেহ-বিনাশের কারণ। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে, বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা কেবল দেহোৎপত্তির কারণ নহে, কিন্তু স্থিতি এবং বিনাশের কারণ।

বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মার নাম দোষ। কারণ বায়ু স্বাভাবিক গতি শক্তি দ্বারা তাপ ও শৈত্যকে সঞ্চালিত করিয়া, পার্থিব পরমাণুকে দূষিত করে এবং স্রবণ ও দূষিত হয়। পার্থিব অথবা আকাশীয় পরমাণুর সেরূপ কোন শক্তি না থাকায় তাহার অপেক্ষে দূষিত করিতে

পাবেনা, এজন্যই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মার নাম দোষ, অপব ভূতদ্বয়ের নাম দোষ নহে। পিত্ত, শ্লেষ্মা জড়, ইহাদের গতি-শক্তি নাই, স্বয়ং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারেনা। বায়ু সেরূপ নহে, তাহার গতি-শক্তি আছে, সুতরাং অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে এক স্থান হইতে অত্র স্থানে যাইতে পারে এবং অপর-কেও চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সুতরাং **বায়ুই অন্যান্য ভূতের নিয়ন্তা বা চালক।** বায়ুর এই-রূপ গতি-শক্তি কোথা হইতে আসিল? মনুষ্যদান করিলে দেখা যাইবে, যে, বায়ু রজোগুণ বহুল এবং রজোগুণের স্বভাব এই যে, তাহা অত্যন্ত চঞ্চল। এক স্থানে কখনই স্থিৰ থাকিতে পারে না। সুতরাং বায়ুও এক স্থানে স্থিৰ থাকিতে পারে না এবং ইহাই তাহার গতি শক্তি।

জীবদেহের স্বল্পভাবে আলোচনা করিলে, একটা অতিশয় আশ্চর্য্য কৌশল দেখা যাইবে, যে, প্রাণীগণের জীবনীশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নাই, কিন্তু প্রাণী-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, অণুতে এবং পরমাণুতেও তাহার উপলব্ধি হয়। ধাতুবাহি এই বায়ুর কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলেও তাহা প্রমাণিত হইবে। দেখা যায় যে, মানবদেহের যেখানে যে পরিমাণ রস-বস্তাদির আবশ্যক, অসংখ্য বায়বীয় পরমাণু তাহা ইতস্ততঃ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আবার যেখানে রোগোৎপাদন করিতে হইবে, এত বায়বীয় পরমাণুই বিপথগামী না হইয়া, ঠিক সেই স্থানে ধাতুসকল বহন করিয়া, উপনীত হইতেছে। এই ধাতু-বহন-ক্রিয়া অতি স্বল্প পরমাণু ভেদে বিভাগ করিয়া দেখিলে মনে হইবে, যেন উহারা প্রত্যেকে এক একটা প্রাণী।

বায়ু সৰ্ব্বদেহ ব্যাপী। যদিও এই দেহের অভ্যন্তরে বায়ুর কতকগুলি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা সৰ্ব্বদেহ ব্যাপী অর্থাৎ বায়ু অহরহ জীবের সৰ্ব্ব দেহেই বিচরণ করিতেছে। শুক্রশোণিতাস্তর্গত সামান্য পরিমাণ বায়ু এই দেহে কিরূপে ব্যাপ্ত হইতে পারে?—এইরূপ প্রশ্ন হইলে দেখিতে হইবে, বায়ুর ভ্রাস বৃদ্ধি কিরূপে হইয়া থাকে। দেখা যায় যে, বায়ু, শুক্রশোণিতের অতি ক্ষুদ্রতম বাজভাগে শক্তিরূপে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মানবের এই স্থূলদেহ যেমন অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত থাকিয়াই প্রাতি নিয়ত ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে,—সেইরূপ শুক্রশোণিতাস্তর্গত স্বল্প-তম শক্তিরূপী বায়ুও দেহের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াই ক্ষয় বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এই বীজরূপী বায়ু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম হইলেও ইহার শক্তি অচিহ্নানীয়। ইহাই প্রাণীগণের প্রাণ, আবার ইহাই প্রথম কালে বিশ্বসংহারী মহাকাল। এই বায়ু বিকৃত হইলেই বিকৃতাস্ত সন্তান প্রসূত হয়, আবার ইহারই সামান্যবাহ্য অবিকৃত সন্তান প্রসব হইয়া থাকে। যিনি প্রবল শ্বাস রোগে আক্রান্ত হইয়া দিব্যরাত্রি অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, যিনি বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছেন, যে বীরপুরুষ এক মন, দেড় মন ভার অবলীলাক্রমে হস্তধারা উত্তোলন পূর্ব্বক শিরে স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন, আবার যখন তিনিই তাঁহার স্বীয় হস্তও উঠাইতে অক্ষম হন এবং যিনি অগহনীয় বেদনার দিন রাত্রি “হাররে গেলাম্বে” বলিয়া কাতর-ক্রন্দনে গৃহবাসী—এমন কি প্রতি-বাসীকে পর্য্যন্ত অস্থির করিয়া তুলেন, তিনিই

কিয়ৎপরিমাণে এই বায়ুর শক্তি অনুভব করিতে পারেন পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ু ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সূতরাং দেখা উচিত যে, বায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি কিরূপে হয়। আহাৰ বিহার ইহাতে যেমন অত্যাশ্রিত—রস রক্তাদিৰ উপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ আহাৰ-বিহার ইহাতেই বায়ুর ও উপত্তি হয়। কষায় রস, কটুরস ও তিক্তরস দ্রব্য ইহাতেই সাধারণতঃ বায়ুর উপত্তি হয়। আবাব বাহু-বায়ু ইহাতেও শরীর বহু পুষ্টিলাভ করে। গুণের আলোচনা করিয়া বাহু বায়ু ইহাতে শারীর-বায়ুর বৃদ্ধি প্রতিপন্ন করা যায় না। কারণ, শারীর-বায়ু ও বাহুবায়ু সমান গুণ বিশিষ্ট নহে। বাহুবায়ু অশীতোষ্ণ এবং শারীর বায়ু বহু শীত-যুক্ত। সমান গুণ দ্রব্য দ্বারা ই সমান গুণ দ্রব্যের বৃদ্ধিসাধন হয়, অসমান গুণ দ্রব্যদ্বারা হয় না। সূতরাং বহির্বাযু দ্বারা শারীর-বায়ুর বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বায়ুর উপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিলে, তাহা সপ্রমাণ ইহাতে পারে। উপত্তির আলোচনায় দেখা যায় যে, কারণ ভূত বায়ুর অংশ ইহাতেই শারীর বায়ু নিৰ্মিত। সূতরাং বাহুবায়ু ইহাতে শারীর-বায়ুর বৃদ্ধি বা পুষ্টি অবশ্যস্বাভাবী। শ্বাস-ক্রিয়ার আলোচনায় ইহার সুস্পষ্ট সীমাংসা ইহাৰে।

শারীর বায়ুর স্বরূপ কি? শারীর-বায়ুর কোন প্রকার বর্ণ বা রূপ নাই। এবং নাই বলিয়াই উহা চক্ষুর অগোচর,—যেমন বাহুবায়ু। বাহুবায়ুরও কোন প্রকার রূপ না থাকায় উহা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে। ইন্দ্রিয়-গণের স্বভাব এই যে, স্বজাতীয় দ্বারা অভি-ব্যক্ত হইয়া বিষয়ের গ্রাহক হয়; যেমন মধু-রাদি রস, লালা দ্বারা অভিব্যক্ত ইহাৰেই রস নেন্দ্রিয় তাহার গ্রাহক হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত

লালার সহিত সংমিশ্রিত না হইবে, ততক্ষণ কি রস,—তাহা বসনেন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না। সেই প্রকার রূপ বা বর্ণ আলোকের দ্বারা অভিব্যক্ত ইহাৰেই চক্ষুরিন্দ্রিয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বায়ু কোন প্রকার রূপ না থাকায়, উহা আলোকের দ্বারা অনভিব্যক্ত, সূতরাং চক্ষুর অগোচর। কিন্তু গতি-ক্রিয়া দ্বারা উহার সরোপলক্ষি সুনিশ্চিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বায়ুর জোড়গুনময় এবং সূক্ষ্ম, সূতরাং গতিমান। এতদ্বিত্ত পিত্ত, শ্লেষ্মার কোন গতি নাই। বায়ুই ইহাদিগকে চালিত করিয়া সর্বদেহে আনয়ন করে। ঠিক যেমন বহির্জগতে একমাত্র বায়ুই জলীয় পরমাণু এবং আগ্নেয় পরমাণু বহন করিয়া এই বিশাল-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচরণ করিতেছে।

কিরূপ দ্রব্য-সেবনে শারীর-বায়ুর বৃদ্ধি হয়? এবং কেন হয়?—ইহার সীমাংসা করিতে হইলে, বায়ুর উপত্তি এবং তাহার গুণ বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সমান গুণ দ্রব্য দ্বারা ই সমান গুণ দ্রব্যের বৃদ্ধিসাধন স্বাভাবিক। যেমন রসের দ্বারা রসের, রক্তদ্বারা রক্তের, এবং মাংসদ্বারা মাংসের বৃদ্ধি হয়,—সূতরাং বায়ুর তৎসমান গুণ দ্রব্য কি, তাহাই অগ্রে দেখা আবশ্যক। শারীর-বায়ুর উপত্তি সম্বন্ধে ঋষি-গণ বলেন যে, “বায়ুকাশাত্যাং বায়ুঃ”। অর্থাৎ শারীর বায়ু=কারণভূত—বায়ু এবং আকাশাত্মক ইহাতে উপত্তি। সূতরাং এই শারীর বায়ু ও কারণভূত বায়ু যে ঠিক একজিনিষ নহে, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। এবং এই ভূতই শারীর বায়ু শীত এবং কারণ-বায়ু অশীতোষ্ণ। বিশিষ্ট পরিণতিই ইহার কারণ। শারীর



বায়ু পরমাণুগুলি অসংখ্য অর্থাৎ একে অস্ত্রের সহিত মিলিত হয় না। পিত্ত, শ্লেষ্মার অবয়বগুলি স্ফেদ্রপ নহে, সংখ্যাত। সুতরাং বায়ু স্পন্দন হইতেও সূক্ষ্মতম অবস্থায় অবস্থিতি করে। বায়ু স্পন্দিত পান্যগণকে ভেদ করিয়া, চলিয়া যাইতে পারে। ইহা দেহের অস্থি মাংস, নখ ও কেশাদিতে প্রবেশ পূর্বক তাহা-দেব বিকৃতি উৎপাদন করিতেছে।

**বায়ুর গুণ**—এই বায়বীয় পরমাণু-গুলি কক্ষ, লঘু, চল, বহু, শীঘ্র, শীত, পুরুষ এবং বিশদ। এতদগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য সেবনে বায়ুর বৃদ্ধি এবং বিপরীত গুণ দ্রব্যদ্বারা বায়ুর উপশম হইয়া থাকে।

একথা মনে করা উচিত নয় যে, কক্ষ এবং উষ্ণ কটুরসের দ্বারা বায়ুর যখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং শীত ও মিষ্ক-মধুর রস দ্বারা যখন বায়ুর প্রশমন দেখা যায়, তখন বায়ু যে শীত, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সত্য বটে, শীত দ্রব্য দ্বারাও বায়ুর উপশম এবং উষ্ণ দ্রব্য দ্বারাও বায়ুর বৃদ্ধি দেখা যায়, কিন্তু উচ্ছ্র বায়ু শীত নয় এরূপ বলা যায় না। কারণ বায়ু শীত হইলেও শীতরূপ প্রদান নয়, কক্ষতাই প্রধান। কটুরস উষ্ণ হইলেও অতি-শয় কক্ষ, তত্ত্বিন্ন লঘুতা, বৈশম্য প্রভৃতি আরও কতকগুলি বায়ুর সমান জাতীয়গুণ বিস্তারিত থাকায় উষ্ণতার প্রভাবকে অভিভূত করিয়া বায়ু বৃদ্ধির হেতু হয়। কারণ ইহাতে বায়ু প্রশমক গুণ অপেক্ষা বাত বর্ধক গুণই অধিক বিস্তারিত থাকে। আবার শীত-মধুর রসে, মিষ্কতা, মধুরতা, গুরুতা এবং পিচ্ছিলতা প্রভৃতি বাত বিরুদ্ধগুণ অধিক থাকায় শৈত্যকে অভিভূত করিয়া বাত প্রশমনে সমর্থ হয়। সুতরাং বায়ুর শীতত্ব কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

বায়ুর কার্য কি? শুক্র, শোণিত, মল, মূত্র এবং গর্ভের নিষ্কাশন প্রভৃতি বায়ুর কার্য। এতদ্বিন্ন ধাতাদির বহন করা ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতিও বায়ুর কার্য। এই যে, গর্ভাশয়ে শুক্র, শোণিতের মিলন, ইহাও বায়ুর কার্য। স্ত্রী পুরুষের সহবাসে বায়ু উত্তেজিত হইয়া, শুক্র-শোণিতে যে বেগ উৎপাদন করে, তদ্বারা শুক্র-শোণিত স্বস্থানচ্যুত হইয়া, উভয়ে গর্ভাশয়ে মিলিত হয়। শুক্র-শোণিতের এই বেগের প্রতি অগ্র কোন কারণ নাই। জীবিত শক্তি ও অদৃষ্ট প্রভৃতি অন্তর হেতু হইলেও তাহারা অবগত-ব্যবহৃত গতি শক্তি প্রদান করিতে পারে না। পারিলে পিত্ত, শ্লেষ্মা প্রভৃতিও গতিমান হইত।

ইহা যেমন শুক্র-শোণিতকে মিলিত করে তেমনি শুক্র শোণিতে শক্তিরূপে অবস্থিত থাকিয়া, উহাদিগকে নানা আকৃতিতে বিভক্ত করে এবং উহাদের গঠন নির্মাণ করে। ইহাদের কার্যগুলি আলোচনা করিলে, ইহাদিগকে কোনরূপ বুদ্ধিজীবী প্রাণী না বলিয়া থাকা যায় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাহা “সেন্” বলিয়া উচ্চ হইয়াছে, তাহা কি এই বায়ু মিশ্রিত ধাতব অণু? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদীগণ বলেন যে “সেন্” গুলি বহুরূপী, ক্ষণে ক্ষণে “উহার” আকৃতির পরিবর্তন করে। “আয়ুর্বেদে” ঠিক তদ্রূপ কথা না থাকিলেও ইহার অনুরূপ তত্ত্ব আছে। আয়ুর্বেদে বলা হইয়াছে, যে, শুক্র শোণিতে বীজরূপ সঞ্চিত থাকেই বিলম্বমান আছে। এবং বায়ুই তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন আকারে পরিণত করে। আমার বোধ হয়, এই উভয় তত্ত্বেরই বিলম্ব সামঞ্জস্য আছে। যাহা হউক এ বিষয়ের অধিক আলোচনা করা অত্যধিক প্রবেশের উদ্দেশ্য নহে।

বায়ুর প্রধান স্থান শ্রোণী প্রদেশ অর্থাৎ বায়ু সর্কশরীর ব্যাপী হইলেও ইহাদিগকে শ্রোণী প্রদেশেই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গন্ধাশয়গত কতকগুলি শোণিত-স্রোতে ইহারা বিশেষ ভাবে বিচরণ করে। তন্মিন্ন সমস্ত দেহেই ইহাদের গতি আছে। শিরা, ধমনী, স্রোত প্রভৃতি ইহাদের গমনমার্গ। ইহারা বিশেষ ভাবে অস্থিকে অবলম্বন করিয়া বাস করে। ব্যায়ামাদি দ্বারা বায়ুর বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা স্থানচ্যুতিরূপ বৃদ্ধি মাত্র। অর্থাৎ ব্যায়ামাদি দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া, অস্থি হইতে বহির্গত হইয়া সর্কদেহে একটা প্রবল ঝটিকা উৎপাদন করে, আবার পরক্ষণেই তাহার শাস্তি হয়। শ্রোণী প্রদেশ বায়ুর সর্ক প্রধান স্থান হইলেও নাভি ছন্দস, কণ্ঠ ও সমস্ত সন্ধিতেই ইহারা বিশেষ ভাবে অবস্থিতি করে।

কি পরিমাণ বায়ু দেহে অবস্থিতি করে, তাহা বলা যায় না। রস-রক্তাদি ধাতু কি পরিমাণ থাকে, তাহা নিরূপিত আছে, কিন্তু বায়ু সম্বন্ধে সেরূপ কিছু নাই, হইতেও পারে না। কারণ-বায়ু অসংঘাত অর্থাৎ মিলিতা-বয়ব নহে; এবং অসংঘাত বলিয়াই ইহাকে ধরাও যায় না। কিন্তু ঔষধ দ্বারা ইহার উপশম করা যায়। প্রকুপিত বায়ু, শরীরের যে অংশে থাকে, সেবিত ঔষধের বীৰ্য তথায় প্রবেশ করিলেই বায়ুর সহিত মিলিত হয়, এবং মিলিত হইলেই বিপরীত গুণদ্রব্য দ্বারা তাহার উপশম হয়। দৈহিক অস্ত্রান্ত রস-রক্তাদি ধাতুর গতি যেমন নিয়মিত অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্রোতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, বায়ুর গতির সেরূপ কোন বিশেষ নিয়ম নাই। যদিও কতকগুলি বায়ু-স্রোত ও দেখিতে

পাওয়া যায়, তথাপি তাহারা দেহের সকল স্রোতেই গমন করে এবং কখন বা রস-রক্তাদি স্রোতের অন্তরালে, কখন বা প্রতি-কূলে গমন করিতে পারে।

বায়ুর দ্বারা দেহের ক্ষয় হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ুর রক্ষণতাই প্রধান, এবং বায়ু রক্ষণ বলিয়াই অত্যন্ত শোষণক। এই বায়ুই রসরক্তাদি ধাতু ও উপধাতু এবং তাহাদের মলাংশ শোষণ করিয়া বহির্মার্গে লইয়া যায়। লজ্জিত ব্যক্তির বাতৃক্ষয় এই প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্বাস-ক্রিয়া দ্বারাও প্রতি নিয়ত দেহের ক্ষয় হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পীড়িতাবস্থায় যে বহির্গত-স্রোতঃ দ্বারা অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় হইতে দেখা যায়, তাহাও বায়ুর কার্য। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, দোষ-ধাতু-মল প্রভৃতির বহন করা এবং শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিচালনা করা প্রভৃতিই বায়ুর প্রধান কার্য।

বস্তুর বায়ুর কোন ভেদ নাই, একই বায়ু সর্কদেহে বিচরণ পূর্বক পূর্বোক্ত কার্য সকল নির্বাহ করিতেছে। কিন্তু কার্য ভেদে ঐ বায়ুকে প্রাণাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া, পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যেমন প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ইহাদের মধ্যে অপান, ব্যান ও সমান বায়ু দোষ-ধাতু-মল প্রভৃতির বহন করে। এবং প্রাণ ও উদান—ইহারা শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ায় বিশেষ ভাবে নিযুক্ত। বায়ু প্রধান রূপে এই শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া দ্বারা ইতিপূর্বে প্রাণীগণকে জীবিত রাখে। ইতিপূর্বে দোষ-ধাতু-মলাদির সঞ্চালন ক্রিয়া বলা হইয়াছে, অধুনা শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা কি ভাবে বায়ু প্রাণীগণকে সজীবিত রাখে, তাহা

সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া, এই বায়ু প্রবন্ধের শেষ করিব।

শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রধান স্থান ফুসফুস। যদিও ফুসফুসের বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি ফুসফুস সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে বিষয়টি অস্পষ্ট প্রতীত হইবে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

মানবজাতির ফুসফুসের আকৃতি কোবিদ্য (কাচনার) পত্র সদৃশ দুই ভাগে বিভক্ত। কণ্ঠ দেশ হইতে শ্বাস নাড়ী নির্গত হইয়া, দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, ফুসফুসের বান-দক্ষিণ—দুই অংশে প্রবেশ করিয়াছে। এবং অবশেষে ইহা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া, সর্বশেষে প্রত্যেকটি শাখা এক একটি ক্ষুদ্র কোটরে পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে ফুসফুসকে একটি স্পঞ্জের তায় বলা হইয়াছে। আমার বোধ হয়, স্পঞ্জের তায় বলিলে উহার বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। ফুসফুসকে সমুদ্রক্লেণের সহিতও কেহ কেহ তুলনা করিয়াছেন। সমুদ্র ক্লেণের বর্ণ ও ফুসফুসের বর্ণে সোসাদৃশ্য আছে, এবং সমুদ্রক্লেণের উপরিভাগ যেমন নিম্ন ও অভ্যন্তর ভাগ সচ্ছিন্ন, ফুসফুসও তিক্ত তদ্রূপ। স্পঞ্জ সচ্ছিন্নতায় ফুসফুস তুল্য হইলেও অস্ত্রাস্ত্র বিষয়ে সামঞ্জস্য নাই। যাহা হউক বুঝিতে হইবে, যে, ফুসফুস কোবিদ্য পত্র সদৃশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াও তিক্ত সমুদ্রক্লেণের তায়। এই সকল ছিন্ন মধ্যে সমল-শোণিতের সহিত উদান বায়ু বাস করে। উৎকণ্ঠনশীল বায়ুর নামই উদান-বায়ু। প্রাণবায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া শোণিত মধ্যে আকাশীয় অংশ এবং

কিয়ৎ পরিমাণ বিস্তৃত বায়বীয় অংশ প্রদান করে। উদান বায়ু তৎক্ষণাৎ শোণিতের মলভাগ লইয়া বহির্গত হয়। এইরূপ আদান-প্রদানের নামই শ্বাস-প্রশ্বাস। বায়ু স্বয়ং অরূপ, তাহার কোন বর্ণই নাই। কিন্তু ইহার সংযোগে এক প্রকার লাল বর্ণ হইতে দেখা যায়। তবে ইহার সংযোগে রস রঞ্জিত হইয়া শোণিত রূপে পরিণত হয় কি না, তাহার আলোচনা করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা বলা হইল না।

উদান বায়ুর প্রধান স্থান ফুসফুস। উদান-বায়ু এই স্থান হইতে নির্গত হইয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয় না। দেখা যায় যে, উদান বায়ু উপযুক্তরূপে বহির্গত হওয়ার পরও আমরা ইচ্ছা করিয়া আরও কতকটা নিঃসরণ করিতে পারি।

প্রাণ বায়ুর প্রধান স্থান মস্তক। কারণ প্রাণবায়ুর কতকংশ মস্তকে থাকিয়া যায়। অথবা উভয়েরই প্রধান স্থান উরঃ। প্রাণ বায়ুর গতি ফুসফুস পর্যন্ত; ইহার অধিক নয়। প্রাণবায়ু ফুসফুস হইতে শোণিতে প্রবেশ পূর্বক সমস্ত দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। এই প্রাণ-বায়ুকে আমরা চেষ্টা করিয়া কিছুকণ বন্ধ রাখিতে পারি সত্য, কিন্তু চিরদিনের জন্ত বা কিছুদিনের জন্তও বন্ধ রাখিতে পারি না। সেরূপ বন্ধ রাখিবার জন্ত চেষ্টা করিলে ইহা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কেহ যদি সৈন্ধ-রাশ (উচ্চৈশ্বাস) কে বাধিয়া রাখে, তবে সে যেমন খুঁটি উঠাইয়া, বুকাদি উত্তুলিত করিয়া, প্রস্থান করে, এই প্রাণ-বায়ু ও সেইরূপ বাধা পড়িলে আর রক্ষা নাই, একেবারে

প্রায়শ্চর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত বায়ু সঙ্গে করিয়া এই দেহ-বাহু ভেদ করিবেই করিবে। তখন তাহার সেই গতিরোধ করিতে পারে, এখন ভগবানও নাই। বলিতে কি,—সেই মুহূর্ত্তেই মানব সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখদুঃখ, কলহ, বিচার এবং শক্রতা-মিত্রতা—সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবনীলা সংবরণ করে।

বায়ুর প্রকৃতি-বিকৃতি ও তাহার বিস্তৃত

কার্য্যের আলোচনা করিয়া আর আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। \*

কবিরাজ শ্রীহরমোহন মজুমদার ।

\* এই প্রবন্ধ গত ১৩২৩ সালের ২১শে চৈত্র “আয়ুর্বেদ সভা”র ১ম সাধারণ অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত গ্রামদাস বাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত হইয়াছিল।

## “আয়ুর্বেদে”র কষায় মাহাত্ম্য ।

—:~:—

গত চৈত্রমাসের ৭ম সংখ্যক “আয়ুর্বেদে” শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, বি, এল, মহাশয়ের লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাকে লিপি-কোশল বলে, সুরেন্দ্রবাবুর লেখায় তাহা বহুল পরিমাণে বিত্তমান রহিয়াছে। একবার পড়িলে, আর একবার পড়িতে ইচ্ছা করে; এরূপ লেখা কতিং-কদাচিং প্রকাশিত হয়। রায় মহাশয়ের লেখা সুখোত, অকুর, নিষ্পষ্টার্থ এবং মনোহর। তজ্জন্ম বার বার পড়িতে প্রবৃত্তি জন্মে, পড়িয়া বন্ধুজনকে শুনাইতেও ইচ্ছা করে।

লেখকের শ্রালিকা দুরারোগ্য কাস-জ্বর-রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তারি চিকিৎসার আশ্রয় লইয়া এবং ডাক্তারদিগের উপদেশ অনুসারে স্থানে-স্থানে ঘুরাইয়া-দুরাইয়া, তাঁহাকে আরোগ্য-দান করিতে সমর্থ হন নাই। তারপর সুরেন্দ্র বাবুর প্রতিবেশ-বাসি বন্ধু জনের কথানুসারে (বোধ হয় তাঁহার Uneducated) এবং তাঁহার স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে অগত্যা কবি-

রাজি চিকিৎসা করাইলে, রোগিণী আরোগ্য লাভ করেন।

সুরেন্দ্র বাবু লোক-হিতৈষণার বণবর্তী হইয়া, পীড়ার অহেতুক-সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এবং যে কষায় পান করিয়া রোগিণী রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তাহা জন-সাধারণকে জানাইবার জন্ত সরল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ সাধরে “আয়ুর্বেদে” মুদ্রিত এবং প্রচারিত হইয়াছে। যে কেহ পাচনের পত্রী দেখিয়া প্রশস্ত দ্রব্য যোগে পাচনটা তৈয়ার করিয়া, তথা কথিত রোগে ব্যবহার করিবেন, তিনিই পরমোপকার লাভ করিবেন,—ইহাই প্রবন্ধ রচনার মুখোদ্দেশ্য। আর একটা গোপ উদ্দেশ্যও আছে। রায় মহাশয় কোশলে অনাগত রোগ প্রতিষেধেরও যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমরা সে কথাটা একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি।

বাদৃশ শিক্ষার শুণে নয়-নারীগণ আশ্ব-হিতে রত রহিয়া, পরহিত পরায়ণ হইয়া, হৃৎ-শরীরে এবং প্রসন্নমনে সংসার বাজা দিল্লী

কবিতে পারেন এবং পরকালে তাঁহারা সঙ্গতি লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা ঐহিকামুখিক চিত্তকাবী শিক্ষার নাম সুশিক্ষা। কেবল পড়িলে-শুনিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি এবং অধীত সহপদেশমুসারে চলিতে শিখিলে শিক্ষার সাক্ষ্য ঘটে। বর্তমানকালে বিদ্যার্থী-শালকবাগিকারা নানা সহপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন এবং শিক্ষকের মুখে, ও অল্পস্বত্রে বহু সহপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। কিন্তু অধীত এবং শ্রুতি উপদেশ অনুসারে কর্মে অভ্যস্ত হইতে অনেকে বাধ্য নহেন। ব্রাহ্মযজ্ঞে শয্যা ত্যাগের স্বকল (Advantage of early rising) বহুজনের জানা-শুনা আছে; কিন্তু কেহ ৭টার, কেহ বা ৮টার, কেহ কেহ তাব চেয়েও বেশী বেলায় শয্যা ত্যাগ করেন। এ একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। পুষ্টিজনক, তুষ্টিবদ্ধক, আয়ুধ্য এবং বশ্য্য বহু সর্ব্বত জ্ঞানিয়া শুনিয়াও লজ্জন করিতে অনেকে ইতস্ততঃ করেন না। কারণ অধুনা সদাচরণে বাধ্য করিবার কেহই নাই। শিক্ষকেরা উপদেশ দিয়াই কর্তব্য কর্ম শেষ করেন, গুরুজনেরা অগত্যা সে কাজে এতদন্ত উদাসীন; সমাজের হাত হইতে শাসনদণ্ড স্থলিত-প্রায়। লোক মাদ্রেই দগুজিত; স্বভাব গুণি মনুষ্য একান্ত দুর্ব্বল। দণ্ড-ভয়-ভীত নর-নারীগণ নিয়মিত বহিরা ঐহিক ভোগ-সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হন। দণ্ডের ভয় নাই; বার যেমন ইচ্ছা সে সেই ভাবেই চলে। বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে অনেকই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে অনেক সর্ব্বত লজ্জন করিতে হয়। হিতায়ুর প্রতিকূল অসু-চিৎ আহার, বিহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম, শয়ন, উত্থান প্রভৃতিতে আশঙ্ক হইয়া শারীর-মানস-

স্বাস্থ্য হারাতিয়া তাঁহাদিগকে আয়ুষ্কাল কাটা-ইতে হয়। এই সকল কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা-বার জন্ত সুরেন্দ্র বাবু একখানি সজীব চিত্রপট অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রব-বিমুখতা, অকাল নিদ্রা, অতিনিদ্রা, দেশ কালের অনুপযোগী পরিচ্ছদ ধারণ এবং অপ্রসন্ন-চিত্ততা প্রভৃতি ভাবগুলি সে পট খানিতে বেশ প্রক্ষুটিত হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবু আর একখানি চিত্রে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আঁকিয়া দিয়াছেন। সে চিত্র খানির ভাব গ্রহণ করিতে হইলে, অতীতের এবং বর্তমানের সুসমাবেশ স্বয়ংগত করা আবশ্যক। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

কিছুকাল পূর্বে এদেশের স্ত্রীলোকেরা বিজ্ঞানগণে লেখা পড়া শিখিতেন না। কিন্তু তখন স্বতন্ত্র প্রকার স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে সময়ে পুবাণ ও ইতিহাস শুনিবার নানা প্রকার উপায় ছিল। পুবাণে উক্ত, সংহিতায় কথিত বিবিধ পালন এবং নিষেধ পরিবর্জন করাইবার জন্ত ব্রাহ্মণ-শাসন দণ্ড পরিচালিত হইত। গুরুজনেরাও স্ব স্ব পরিজনবর্গকে সদাচারে নিয়মিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। তদ্বিষয়ে সামাজিক শাসনও দৃঢ়তর ছিল। এই সকল কারণে স্ত্রীজনেরা লেখাপড়া না শিখিয়াও সহপদিষ্ট হইতেন এবং অনেকে সদাচার পালন করিতে বাধ্য থাকিতেন। যদিচ বর্তমানে হিন্দুসমাজের বন্ধন ছেদ করিবার জন্ত নানা দিক দিয়া প্রবল আঘাত, বাধন রাখিবার জন্ত দুর্ব্বল-প্রতিঘাত চলিতেছে; তথাপি বহুকালের অভ্যস্ত অনেক গুলি সর্ব্বত আজিও সযাক্ লোপ পায় নাই। তজ্জন্ত এখনও আমারা পতি-ব্রতা, ব্রত-নিয়ম পরায়ণা, গুরুজনে ভক্তিমতী, গৃহ কর্ম নিপুণা, আলস্য রহিতা, আশ্রিত জনে দয়াবতী, প্রিয়-

বাদিনী এবং সর্বমঙ্গল মঙ্গলা আর্ঘ্য-ললনায়  
কচিং সাফাং পাই। তাঁহার সন্তান-পালনে  
আপনাদের অঙ্গবিশেষের সৌষ্টব হানি করিতে  
কুণ্ঠিত নহেন; আর্জুনব দেবার হাতে বাখা  
পাইবারও ভয় কবেন না।

অধুনা কদাচিৎ মণি-কাঞ্চনের বোণ  
হইতেও দেখা যায়। পুণ্ড্র পরম্পরাগত  
সদ্বৃত্তে নিবত্তা পরন্তু আধুনিক কুচির শিল্প-  
কলায় সিদ্ধ হস্তা হিন্দু রমণী আজিও সমাজে  
বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের বলয়মণ্ডিত  
কোমল হস্তের প্রবন্ধে পতিদেবতার গৃহখানি  
লক্ষ্মীর আবাস ক্ষেত্র হইয়া উঠে, গৃহ লাঙ্গল  
নন্দনকাননের ত্রী ধারণ করে। সুরেন্দ্র  
বাবুর অঙ্কিত দ্বিতীয় চিত্রপটে তথাবিধ  
স্ত্রী-মূর্ত্তি প্রতিকৃতি প্রকটিত হইয়াছে।  
বলা বাহুল্য সেখানি তাঁহার অঙ্কশিল্পী  
পত্নীর প্রতিকৃতি।

প্রতিকৃতি দেখিয়া প্রাকৃতের ভাব অনু-  
ভব করা যাইতে পারে। ষাঁহার সুরেন্দ্র বাবুর  
কবিকৌশলেব প্রতি মনঃসংযোগ করিবেন,  
তাঁহার বুঝিতে পরিবেন যে, তাঁহার মনো-  
বৃত্তান্তসারিনী মনোরমা-গৃহলক্ষ্মীর জ্বয়ে  
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্যকক্ষুর্ভূতি লাভ করিয়াছে,  
পরোপচিকীর্ষা বৃত্তিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।  
তিনি আলস্ত পরিহীন। এ সকল গুণ  
ষাঁহার থাকে, তাঁহার আত্মা, মনঃ এবং  
ইন্দ্রিয়গণ সুপ্রসন্ন। প্রেমোজ্জ্বল মনস্তা  
স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ভরসা করি, তিনি নিশ্চয়ই  
স্বাস্থ্যব্রতী নহেন। তাঁহার কঃশ্মজি, বৃত্তির  
অমরূপ সাধনা করিতে আলস্ত পরিহীন  
এবং সুনিপুণ। বাধা না মানিয়া, আপনার  
অনিষ্টাশঙ্কায় শঙ্কিত না হইয়া, তিনি রোগিণীর  
মস্তক আপনার অঙ্কে ধারণ করেন, তাঁহার

হস্ত রোগি-পরিচর্যায় নিরালস্ত্রে সঞ্চালিত  
হইতে থাকে।

সুরেন্দ্র বাবুর লিখিত প্রবন্ধ-বিশ্লেষণ  
করিয়া আরও অনেক কথা লেখা যাইতে  
পারে। কিন্তু কাগজের দাম অসঙ্গত চড়িয়া  
গিয়াছে, ছাপার এবং কালীর মূল্যও বাড়িয়া  
গিয়াছে। তজ্জয় আর অধিক লিখিলাম না।  
“আয়ুর্কোদ”র পাঠিকাগণ ছইখানি চিত্রপটের  
প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া, ভালমন্দ বিচার  
করতঃ আপনারা সদ্বৃত্ত-পরায়ণা হইবেন।  
আর পাঠকগণ আপন আপন গৃহীণীগণকে  
ভুক্তিবিধি শিখাইবার প্রয়াস পাইবেন,  
ইহাই অকিঞ্চনের সনিনয় প্রার্থনা।

অতঃপর আমবা প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ  
কবিব। বলাবাহুল্য যে, আয়ুর্কোদের কষায়-  
মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তনই এই প্রবন্ধের প্রস্তুত  
বিষয়।

যে পানীয় ঔষধ এ দেশে পাচন নায়ে  
পরিচিত, আয়ুর্কোদ শাস্ত্রে তাহাকে কষায়  
বলে। শূত, কাথ এবং নির্ঘূহ,—কষায়ের  
অপর তিনটী নাম। কষায়ের আর একটা  
ব্যাপক অর্থ আছে, সে কথা পরে বলিব।  
আয়ুর্কোদাচাৰ্য্যগণ জরাদি বিবিধ রোগে,  
নানা প্রকার কষায় করণা করিয়া, প্রতি  
রোগের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ  
কষায় প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন।  
সে সকল কষায় বহুসংখ্যক,—কেহ গণিয়া  
দেখেন নাই কত? প্রতি রোগে বর্ণিত  
সমস্ত কষায় প্রয়োগ করিয়া, তৎক্ষণাতঃ  
কলোপধায়কতা অবধারণ করা কোন  
চিকিৎসকেরই সাধ্যায়ত্ত নহে। অভিজ্ঞ  
চিকিৎসকগণের মধ্যে যিনি যে যে রোগে যে  
যে কষায় প্রয়োগ করিয়া, বহুস্থলে সুকল সাধিত

কবিয়া আসিতেছেন, তাহা যদি লোক-হিতার্থে “আয়ুর্বেদে” প্রকাশ করেন, তাহাইহলে, কালে “আয়ুর্বেদের কথায় মাহাত্ম্য” প্রকরণটী পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইতে পারে। চূর্ণাঙ্গি বৎসবেব অভিজ্ঞভায়, বহুস্থানে বহুবার প্রয়োগ কবিয়া, আমি যে যে কথায়ের স্কলতা উল্লিখ করিয়াছি, তাহা ক্রমশঃ এই প্রকরণে প্রকাশ করিব। প্রকরণটী বাহাতে সর্বাস্থ মূন্দর হয়, তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞতর চিকিৎসকগণ মনঃসংযোগ করিলে, “আয়ুর্বেদে”ব কথায় “মাহাত্ম্য” বহু জনের বোধ-গম্য হইতে পারে।

### সহচরাদি কথায়।\*

আয়ুর্বেদ-ভাণ্ডারের ঔষধ-রত্ন বহু সংখ্যক। সেই অনন্তকর রত্ন সমুচ্চয় গণিয়া শেব করা অনায়াস সাধ্য-নহে। কেহ বলিতে পারে না—আয়ুর্বেদের ভৈষজ্য-রত্ন সংখ্যায় কত, প্রকার-ভেদেই বা কত প্রকার। উপযুক্ত জহরির অভাবে অধুনা সকল রত্ন চিনিবার উপায় নাই। সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিবার লোকাভাবে রত্ন সমুচ্চয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কতক বা হারাইয়া গিয়াছে। কোন কোন রত্ন কাহার-কাহার গৃহে লুকান রহিয়াছে; হয় ত তাঁহারা নিজস্ব করিয়া লইয়া ব্যবহার করেন, পরকে দেন না। দিবার উপযোগী উদারতা তাঁহাদের নাই।

এক সময়ে একজন বড় রকমের জহরি

\* সংগ্রহকার কথায়ের কোন নাম দেন নাই। প্রাণক: আন্তর্যবাস নামানুসারে কথায়ের এবং অন্ত অনেক যোগের নামকরণ করা হয়। সহচর, আন্ত্র্য বলিয়া যোগটীর নাম দেওয়া হইল, “সহচরোদি কথায়।”

অনেকগুলি ভৈষজ্যরত্ন নানা স্থান চইতে আহরণ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে অনেক দিনের কথা। জহরির নাম চক্রপাণিদত্ত; যে কোষে তাঁহার সংগৃহীত রত্ন স্তম্ভ রহিয়াছে, তাহার চলিত নাম “চক্রদত্ত ংগ্রহ।”

অলঙ্কার ভাগ করিয়া, কথাগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি।

চক্রপাণিদত্ত নানা আয়ুর্বেদে বিখ্যাত বহু সদ্যোগ আহরণ পূর্বক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া-ছেন। সমস্ত সদ্যোগই স্কলপ্রদ। তজ্জন্ত চক্রপাণিদত্ত কৃত সংগ্রহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতাবলম্বি-চিকিৎসকগণের শ্রেষ্ঠ উপজীব্য গ্রন্থ। গ্রন্থ-প্রারম্ভে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,— গৃঢ়-বাক্য-বোধক বাক্যবান্ গ্রন্থ নিবন্ধন করিব। কিন্তু তিনি সর্বত্র প্রতিশ্রুতির অনু-রূপ কাজ করেন নাই। অনেক কথাই গৃঢ়ার্থক রহিয়া গিয়াছে। সেব্যমান ঔষধ স্বকীয় গুণ-বীৰ্য্য-প্রভাবানুসারে শরীরের কোন দোষের, কোন ভাবের বৈগুণ্য কিরূপে দূর করিয়া, আরোগ্য বিধান করে, গ্রন্থকার কুহাপি তাহা স্পষ্টতঃ বলেন নাই। টীকাকারেরাও তত্ত-দ্বিষয়ে একান্ত উদাসীন রহিয়াছেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্মৃতিকা রোগা-ধিকারে “সহচরাদি কথায়ের” কলপ্রতি— “সন্তো জর-স্মতিকারোগহরম্”। কথাটা বিস্ম-প্ঠার্থক নহে। বুরিলাম, “সহচরাদি কথায়” জরর এবং স্মতিকারোগ নাশক। স্মৃতিকা রোগাধিকারে কথায়টী লিখিত হইয়াছে, তজ্জন্ত কথায়টী যে স্মৃতিকা জরে হিতকর, তাহাও বুঝা গেল। কিন্তু স্মৃতিকার সর্বপ্রকার জরে হিতকর অথবা জর-বিশেষে হিতকর

তাহা বুঝা গেল না। হৃতিকা-রোগ-হর বলিলেই বা কি বুঝিব? প্রসবাস্ত্রে-হৃতিকার শব্দে অর, অজীর্ণ, অতীসার, গ্রহণী, আক্ষেপক এবং উন্মাদ প্রভৃতি নানা রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। নবপ্রস্থতার শরীরে যে রোগের আবির্ভাব হয়, তাহার পূর্বে হৃতিকাশব্দ বসাইয়া রোগের নাম করণের প্রথা পূর্বাণের প্রচলিত আছে, যেমন হৃতিকাক্ষব, হৃতিকা-গ্রহণী ইত্যাদি। এখানে "হৃতিকারোগ হর"—ইহার অর্থ কি বুঝিতে হইবে? যাবতীয় হৃতিকা-রোগের বুঝিব? অথবা বিশেষ-বিশেষ হৃতিকা-রোগ নাশক বুঝিতে হইবে? হৃতিকা-রোগ হৃতিগীর সর্বরোগবাচী হইলে, অর কথাটা পৃথক করিয়া বলা হইল কেন?

এইরূপ সন্দিকারের মীমাংসা আবশ্যক। হৃতিকা রোগ বলিলে, অধুনা প্রস্থতির অজীর্ণ, অতীসার এবং গ্রহণী রোগের অন্ততম রোগ,—সকলে বুঝিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ চক্রদত্তের সময়ও হৃতিকারোগের তাদৃশ ব্যাপ্য অর্থও প্রচলিত ছিল। তাহা হইলে শ্লোকাংশের অর্থ করা যায়—হৃতিগীর অর এবং অজীর্ণাদি রোগ নাশক অথবা অর সংযুক্ত হৃতিকারোগ নিবারক।

বস্তুতঃ নবপ্রস্থতার অর সংযুক্ত উদরামর রোগে "সহচরাতি কষায়" প্রয়োগ করিলে অক্ষল লাভ করা যায়।

সহচরাতি কষায়,—যথা,—

"সহচর পুষ্কর বেতসমূলং,

বিকঙ্কতং দারু কুলথ সমম্।

জলমত্র সৈন্ধব হিঙ্গুযুতং

সস্তো অর হৃতিকা রোগ হরম্"।

কষায়ের পত্রী ;—

সহচরমূল ... ২৭ রতি।

পুষ্করমূল ... ২৭ রতি।

বেতসমূল ... ২৭ রতি।

বিকঙ্কতমূল ... ২৭ রতি।

দেবদারু ... ২৭ রতি।

কুলথ কলায় ... ২৭ রতি।

ছয়খানি দ্রব্যযোগে উক্ত যোগ পরিকল্পিত হইয়াছে। সমবেত দ্রব্য ছয়খানির পরিমাণ ২ ভরি অর্থাৎ ১৬০ রতি গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ  $\frac{1}{3}$  রতি। ১৬০ রতিকে ৬ ভাগ করিলে, প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ হয়—২৬  $\frac{2}{3}$  রতি।  $\frac{1}{3}$  রতি ভগ্নাংশ অধিক লইয়া উক্তযোগে প্রত্যেক দ্রব্য ২৭ রতি মাত্রায় দেওয়া হইয়া থাকে।

কষায় পরিকল্পনা কালে সহচরাতি প্রত্যেক দ্রব্য একে একে ওজন করিয়া লইয়া, একদিকে উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে। তারপর মেটে পাত্রে কাঠের আলো আধ সের জল সহ পাক করিবে। আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, তাহাতে ৩ রতি শোধন-করা হিং এবং ১০ হুই আনা সৈন্ধব চূর্ণ—গুলিয়া পান করিতে দিবে।

সহচরাতি কষায়ের দ্রব্য পরিচয়,—

সহচর—চলিত নাম ঝিটী, বাঁটা,

ঝিটী এবং ঝিটুকী প্রভৃতি। ইহা এক প্রকার কণ্টকাকীর্ণ ক্ষুদ্রাঙ্গার উদ্ভিদ। সহচর মূল দেশ হইতে একটা দণ্ড বাহির হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বিস্তার করিয়া, বাড়িয়া উঠে। কুত্রাপি মূল হইতে একাধিক দণ্ড বাহির হইয়া বাড় বাধিয়া জন্মে। উর্বর ভূমি জাত ঝিটীর গাছ ৩৪ হাত উচ্চ হয়। ইহার কাঁপে কাঁপে পত্র-গ্রাহি। পত্রগ্রাহি



বেড়িয়া তীক্ষ্ণাগ্র কাঁটা বাহির হয়। ঝিণ্টীর মূল ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য। অভাবে মূল কাণ্ড-দণ্ড-শাখা-পল্লব-সমেত ঝিণ্টীর গাছ অনেকে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহা প্রশস্ত নহে। ঝিণ্টী শুকাইলে গুণ-বীৰ্য্য-প্রভাবহীন হইয়া যায়। তজ্জন্ত ঔষধের কাজে কাঁটা ঝিণ্টী ব্যবহার করিতে হয়।

**পুষ্করমূল**—অধুনা পুষ্কর মূল পাওয়া যায় না। অভাবে কুড় ব্যবহৃত হয়। গন্ধ-বর্ণ-রসযুক্ত কুড় ব্যবহার করিতে হয়।

**বেতসমূল**—হই প্রকার উদ্ভিদ বেতস নামে পরিচিত। এক প্রকার ক্ষীরবৃক্ষ, অন্নবেতস নামে প্রসিদ্ধ। আর এক প্রকার বহু কণ্টকাকীর্ণ লতা-বিশেষ বেত নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মূল “সহচরাদি” কষায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**বিকঙ্কত**—বৈথর, বৈচি, বৈচী, বুঁজ এবং ডুম্বুর প্রভৃতি নামে পরিচিত। বিকঙ্কত মূল-তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকাকীর্ণ উদ্ভিদ। ইহার কাঁচা ফল সবুজ বর্ণ, পচ্যমান ফলের বর্ণ লাল। ফল পাকিলে মিষ্ট-কৃষ্ণ-ঐ ধারণ করে। ক্ষুদ্র গোলাকার ফলের মধ্যে পেয়ারা বীজের আয় বহু বীজ নিহিত থাকে। বালকেরা সাদরে ইহার পাকা ফল খাইয়া থাকে। পক্ষ-ফলের আবাদ কষায়-মধুর। পাকা ফল মালা গাথিয়া অঙ্গারগুণ্ড করে। এই গাছের মূল বা মূল শিকড়ের ছাল অথবা স্থল স্থল শিকড় বসায়-কল্পনার জন্ত ব্যবহার করিতে হয়।

**দেবদারু**—পার্বত্যীয় বৃক্ষ বিশেষ। ইহার সুমিষ্ট পীত-লোহিতাভ কাষ্ঠ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলা দেশে দেবদারু জাতীয় এক প্রকার গাছ জন্ম, তাহা ঔষধের জন্ত ব্যবহৃত হয় না।

**কুমস্থ**—পাণ্ডুবর্ণ, চেপ্টা কলায় বিশেষ। বিবর্ণ হইলে ঔষধের কাজে ব্যবহার করা অশুচিত।

### বিকঙ্কত কষায় ।

স্বতিকা রোগের অর্থাৎ প্রসূতির অজীর্ণ ভেদ সংগ্রহ যোগ্য অতীতার এবং গ্রহণী রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

আমাদের দেশে মুষ্টিযোগ বা টোটকা ঔষধ নামে অনেক ঔষধ অনেকের জানা আছে। যাহারা চিকিৎসক নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ মুষ্টিযোগ-বিশেষ প্রয়োগ করিয়া, অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখাইয়া থাকেন। চিকিৎসকের অসাধ্য অনেক উৎকৃষ্ট ব্যাধি টোটকা ঔষধে আরাম হইতে দেখিয়া আমরা বহুবার বিস্মিত হইয়াছি। সুদীর্ঘ কালে আমরা যতগুলি টোটকা নানা লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, বিশেষ অমূল্যদানে জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে কৃতকগুলি ঔষধ প্রচলিত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। হয় ত অল্পগুলি কোন-না-কোন অপ্রচলিত শাস্ত্রে উক্ত রহিয়াছে। নূতন উদ্ভাবিত মুষ্টিযোগের প্রয়োগও অসম্ভবপর নহে।

আমরা “বিকঙ্কত কষায়” নাম দিয়া যে কষায়ের গুণ-প্রভাবের কথা বলিতেছি, তাহা একটা টোটকা ঔষধের প্রয়োগ দেখিয়া, কিছু রূপান্তর করিয়া আমরা ব্যবহার করতঃ বড়ই ফল লাভ করিয়া আসিতেছি। কি উপায়ে এই মহৌষধ জানা গেল এবং প্রয়োগ-সৌকর্য্যার্থে তাহার কিরূপ রূপান্তর করা হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

আমাদের গায়ে একজন ব্রাহ্মণ সত্তা

পাঁচ আনার পয়সা লইয়া হৃতিকার ঔষধ দিতেন। এক গোছা সরু সরু শিকড় দিয়া বলিয়া দিতেন,—“এই শিকড়গুলি সাতভাগ করিয়া, তাহার এক ভাগ আর ৭টা কৈ মাছ এবং আবক্ষাকারুণ্য তরকারি ও লণ, হলুদ প্রভৃতি মসলা দিয়া ঝোল রাঁধিবে। সেই ঝোলের সঙ্গে উচিত পরিমিত অন্ন মধ্যাহ্নে ভোজন করিবে। মাছ-তরকারি—সমস্তই খাইবে। ভাতের সঙ্গে আর কিছুই খাইবে না। রাত্রিকালে লবু-পথ্য করিবে। প্রতি-দিন এইরূপ করিলে, ৩ হইতে ৭ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিবে”। তাঁহার ঔষধে অনেক হৃৎনি আরোগ্য লাভ করিতেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, উহা বিকল্পত অর্থাৎ বৈছির শিকড়। আমি বৈছির সুস্ন শিকড় এবং স্থল শিকড় বা মূলেব ছাল লইয়া, কষায় প্রস্তুত পূর্বক প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করি। তাহাতেই সুফল ফলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, বিকল্পতের মূলের ছাল এবং সুস্ন শিকড়ের পরিমাণ ২ তোলা পেষণ করিয়া, আধসের জল সহ পাক করতঃ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া পান করিবে। সাতদিনের মধ্যে ক্রমে হৃৎনি রোগ আরোগ্য হয়। আমাদের “আয়ুর্বেদের” পাঠিকাগণের মধ্যে যিনি এই কষায় ব্যবহার করিয়া সুফল দর্শন করিবেন। তিনি রূপা পূর্বক তাহা জানাইলে, আমরা অমুগ্ধীত হইব।

### পিপ্পল্যাদিগণের কষায়।

তিন বা তদধিক ভৈষজ্য সমবায়ে কল্পিত যোগসমূহের মধ্যে কতকগুলি যোগ ‘গণ’-সংজ্ঞক। যে সকল দ্রব্যযোগে যে গণ পরি-

কল্পিত, প্রায়শঃ সেই সকলের আদি দ্রব্যের নামানুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ‘গণেব’ নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন বিদারিগন্ধাদিগণ, সারসালাদিগণ ইত্যাদি। মহর্ষি সুশ্রুত যে কয়েকটা গণ কল্পনা করিয়াছেন তন্মধ্যে পিপ্পল্যাদিগণ অন্যতম। সুশ্রুতোক্ত পিপ্পল্যাদিগণের দ্রব্য সংখ্যা ষাটবিংশতি। চক্র-পানিদত্ত সেই বাইশখানি দ্রব্যের মধ্য হইতে দুইখানি দ্রব্য—বচ আর গজপিপূল বাদ দিয়া, কুড়িখানি লইয়া গণকল্পনা করিয়াছেন। “ভাবপ্রকাশে” লিখিত উক্তগণের দ্রব্য-সংখ্যা একবিংশতি। দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা কোন স্থলে বাইশখানি দ্রব্য লইয়া, কচিং একুশখানি দ্রব্যযোগে, কুগ্রাপি বা চক্রদত্তের নির্দেশানুসারে কুড়িখানি দ্রব্য-সমবায়ে পিপ্পল্যাদিগণ কল্পনা কবতঃ প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি, সুফলের ভারতম্য অবধারণ করিতে পারি নাই। তজ্জন্ত অগ্রাবধি চক্রদত্তের মতানুসরণ করিয়া আসিতেছি। সুশ্রুত বলেন—

“পিপ্পল্যাদি কফহরঃ প্রতিশ্রুত্যানিলাকৃচীঃ।

নিহতাদ্দোপনো গুণ্য শূলশ্লশ্চাম পাচনঃ।”

অর্থাৎ পিপ্পল্যাদিগণ কফরোগ নাশক, প্রতিশ্রুত নিবারক, বায়ুনাশক এবং অকৃচিৎ। দোপন, গুণ্য, শূল-প্রশমন এবং আমপাচন—ইহার অপয় চারিটা গুণ।

চক্রদত্ত বলেন—

পিপ্পল্যাদি কফহরঃ প্রতিশ্রুত্যাচক-জরান্

নিহতাদ্দোপনো গুণ্য শূলশ্লশ্চাম পাচনঃ।”

চক্রপানিদত্ত পিপ্পল্যাদিগণের বায়ুপ্রশমনী শক্তি স্বীকার করিলেননা। সুশ্রুতোক্ত অপরাপর গুণগুলি গাঁথিয়া দ্রৌক-রচনা করিলেন। অধিকন্তু বলিলেন,—পিপ্পল্যাদি-গণ জরয়। জরয় বলিতে, অষ্টবিধ জরনাশক-

দ্বার। সেই ব্যাপক অর্থ—তিনি সঙ্কোচ করিয়াছেন। যে হেতু ককজ্বর-চিকিৎসা প্রকরণেই পিণ্ডালাদি কষায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু হৃতিকারোগাধিকারে, মকল বা মকল শূল-প্রশমনের জন্ত পিণ্ডালাদিগণের কষায় সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পরবর্ত্তি কালে ভাবমিশ্রও এই গণের মকলশূল-প্রশমনী-শক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন। দীর্ঘকাল বাবৎ বহু বহু স্থলে পিণ্ডালাদিগণের কষায় এবং কচিং পিণ্ডালাদি গণোক্ত সমুদয় দ্রব্যের সমবেত চূর্ণ প্রয়োগ করিয়া, যেরূপ স্ফুল জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল।

বদি প্রহৃতির শরীরে অপানবায়ু স্বস্থানে, স্বভাবে এবং স্বমানে রহিয়া, স্বকীয় কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকে, তাহা হইলে, প্রসবাস্তে গর্ভ ক্ষেত্রে সঞ্চিত ক্রোধ এবং চ্যুতকৃধির নিঃশেষে বাহিব হইয়া যায়। গর্ভক্ষেত্রে প্রকৃতিস্থ হয়। প্রহৃতিও অবিলম্বে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। বিগুণ অপান বায়ু কুক্ষিগত অপগদার্থ নিঃসরণের বাধা দেয়। অনিঃসৃত ক্রোধ প্রভৃতি সঞ্চিত রহিলে শোষিত হইয়া রক্তগত হয়, তজ্জন্ত প্রহৃতির শরীরে নানা রোগ দেখা যায়।

প্রসবের পর কুক্ষিদেহ পরিষ্কার করিবার জন্ত যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং যে যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে কোন ঔষধই পিণ্ডালাদিগণের কষায় বা চূর্ণ সেবনেব স্থায় স্ফুল্পপ্রদ নহে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গণোক্তাবিশিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য একে একে ওজন করিয়া লইয়া, একসঙ্গে কুটিয়া, মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে পাক করিবে। পাকসিদ্ধ হইলে পরিষ্কার কাপড়ে

ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। অথবা গণোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য একে একে স্বল্পতম চূর্ণ করিয়া, পৃথক পৃথক রাখিয়া দিবে। পরে তুল্য-পরিমাণে সমস্ত দ্রব্য ওজন করিয়া লইয়া, একসঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১০ রতি। অবস্থানুসারে উষ্ণজল, কঁাঁজ, দইয়ের মাত বা সুরার সঙ্গে সেবন করিতে দিবে।

প্রসবাস্তে চ্যুতকৃধির, প্রহৃতির কুক্ষিদেহে আবদ্ধ রহিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া হৃদয়ে, মস্তকে,—বিশেষতঃ বস্তিদেহে হুঃসহ শূল উৎপাদন করে। সেই শূলের নাম মকলশূল। মকলশূল প্রায়শঃ তিনদিন স্থায়ী হয়। কখন-কখন এই শূল দীর্ঘকাল স্থায়ী রহিয়া, হৃতি-গীকে হুঃসহ যন্ত্রণা দিতে থাকে। এই রোগে জ্বর, অরুচি, মুখদৌগন্ধ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। পিণ্ডালাদি কষায় পান করাইলে সোপদ্রব মকলশূল অচিরে প্রশমিত হয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে কষায় পান করিতে দেওয়া উচিত।

প্রসবাস্তে গাত্র-বেদনা থাকিলে উক্ত কষায় ব্যবস্থা করিলে, বিশেষ স্ফুল্প পাওয়া যায়।

প্রহৃতির অঙ্গে আমরস সঞ্চিত রহিলে, আমাপচনার্থ উক্ত পাচন ব্যবস্থায়। তত্ত্বিন্ন মন্দানল রোগে এবং হৃতিকা-গ্রহণী রোগেও পিণ্ডালাদি কষায় হিতকর।

পিণ্ডালাদিগণের পত্রী—

- (১) পিণ্ডুল, (২) পিণ্ডুলের মূল, (৩) চই  
(৪) চিতা, (৫) শুঠ, (৬) মরিচ, (৭) এলাচ,  
(৮) ঘোয়ান, (৯) ইন্দ্রধব, (১০) আকনাদি,  
(১১) রেণুকা, (১২) জীরা, (১৩) বামন হাটী,  
(১৪) মহানিমের ফল, (১৫) হিং, (১৬) কটুকী,

(১৭) সর্ষপ, (১৮) বিড়ঙ্গ, (১৯) আতাইচ, (২০) মূর্ধা।

প্রতিদ্রব্য ৮ রতি ( আটটা কুঁচের ওজন ) গ্রহণ করিবে। প্রস্তুত-প্রণালী বলা হইয়াছে।

দ্রব্য গ্রহণের নিয়ম—

(১) পিপ্পল—সুপরিচিত ভৈষজ্য। সংস্কৃত নাম পিপ্পলী, কণা প্রভৃতি। পাটনাই পিপ্পলের চেয়ে দেশী পিপ্পল সমধিক গুণশালী। অভিনব পিপ্পল ঔষধার্থ প্রশস্ত নহে। সুপরিপক পিপ্পল সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয়। এক বৎসবকাল অতিক্রম করিলে, ঔষধের কাজে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু গন্ধ-বর্ণ-রসভ্রষ্ট হইলে পিপ্পল এবং অপর সমস্ত ভৈষজ্য নিষেধ হইয়া যায়। পিপ্পলের মঞ্জরী ভ্যাগ করিয়া দানাগুলি গ্রহণ করিতে হয়। (২) পিপ্পলের মূল—পিপ্পলের গাছ লতাজাতীয়। লতিকার মূলদেশে যে সকল গ্রন্থি ( গাঁইট ) জন্মে, তাহাই ঔষধ কক্ষে প্রশস্ত। ইহার সংস্কৃত নাম গ্রন্থিক। চলিত নাম গাঁঠেলা। গ্রন্থির অভাবে মূল বা শিকড় গ্রহণ করা যাইতে পারে। (৩) চই—ইহার সংস্কৃত নাম চবিকা। চই লতা জাতীয় উদ্ভিদ। বৃক্ষমূলে চইর লতা রোপণ করিলে, কাপে কাপে যে গুচ্ছাকার শিকড় জন্মে, তাহা গাছের গায়ে লাগিয়া, গাছ বাহিয়া উঠিতে থাকে। ইহার পাতার আকৃতি পানের জায়। পূর্ক-উত্তর-বঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে চইর চাষ হয়। ইহার মূল, শিকড় এবং কাণ্ড ব্যঞ্জন কটুরসাধানের জন্ত ব্যবহৃত হয়। ঔষধার্থ মূল বা শিকড় ব্যবহার্য। কলিকাতার পশারির দোকানে চই চাহিলে এক প্রকার কাষ্ঠ দেয়। তাহার আশ্বাদও চইয়ের জ্ঞান বাল। কিন্তু উহা প্রকৃত চই

নহে। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্ত্র চই জন্মে না। তজ্জন্ত অন্ত্র দেশের লোকে চই চিনেন না। তাই প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য চইর অর্থ লিখিয়াছেন—গজপিপ্পলের মূল। (৪) চিতা—ইহার সংস্কৃত নাম চিত্রক, বহি প্রভৃতি। শ্বেত ও রক্ত ভেদে চিত্রক দুই প্রকার। শ্বেত চিতার ফুল শুক্লবর্ণ, রক্তচিতার পুষ্পত্বক উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। সাদা চিতার শিকড় কাষ্ঠগর্ভ; লাল চিতার শিকড় কলার শিকড়ের জায়। শিকড়ভ্যন্তবে একটা আঁশ থাকে। ঔষধার্থে লাল চিতার শিকড় ব্যবহার করিতে হয়। মাত্র যেখানে শ্বেত চিতার শিকড় দিবার উপদেশ থাকে, সেইখানেই তাহা দিতে হয়। শরীরের বহিঃপ্রদেশে রক্তচিহ্ন লাগাইলে বিধক্রিয়া করে। অনেকে জ্বীশরীরে রক্তচিহ্ন প্রয়োগ করিতে আপত্তি করেন। বাহ্য প্রয়োগে গর্ভপাতের কথা শুনিয়া, এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়া থাকিবে। কিন্তু উপযুক্ত মাত্রায় রক্ত চিতা সেবন করিলে, গর্ভ শয্যায় ইহার কোন মন্দ ফল প্রকাশ পায় না। নির্ভয়ে গর্ভিনী রোগে, হৃৎক পীড়ায় এবং অন্ত্রাশ্রয় রোগে জ্বীশরীরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (৫) শুঁঠ—সংস্কৃত নাম শুষ্ঠা প্রভৃতি। শুঁঠ প্রসিদ্ধ ভৈষজ্য। টাটকা শুক শুঁঠ উত্তমরূপে ধুইয়া, শুকাইয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিবে। (৬) মরিচ—প্রসিদ্ধ দ্রব্য। গোল মরিচ নামে বিখ্যাত। মরিচ জলে ফেলিলে যে গুলি ভাসিয়া যায়, সেগুলি ভ্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট মরিচ শুকাইয়া লইবে। (৭) এলাচ—ছোট এলাচের খোসা ভ্যাগ করিয়া দানা গ্রহণ করিবে। (৮) যোয়ান—পিপ্পলগাণি কষায়ে অজমোদা দিবার উপদেশ আছে। অজমোদার অর্থ বন যোয়ান। আভ্যন্তর

প্রযোগে অজমোদা অর্থাৎ বনযোয়ান না দিয়া, প্রসিক্ টাকাকার শিবদাস, যোয়ান দিতে বলেন। বাহ প্রযোগে অজমোদা অর্থে বন যোয়ান বুঝিতে হইবে। (৯) ইন্দ্রব—কুটজ অর্থাৎ কুড়চি ফলের বীজ; ক্রীত বীজ জলে ফেলিলে যে গুলি ভাসিয়া উঠে, তাহা ত্যাগ করিয়া, নিমজ্জিত বীজগুলি শুকাইয়া লইবে। (১০) আকনাদি—সংস্কৃত নাম পাঠা। ইহা লতা জাতীয় উদ্ভিদ। আকাসি, আকনাদি, আকনিধি, এবং নিমুখী প্রভৃতি নামে স্থানে স্থানে পরিচিত। লতিকাব মূল এবং শিকড় ঔষধার্থ গ্রহণ করিতে হয়। অভাবে লতা-পাতা দিলেও কষায়ের গুণেব তারতম্য উপলব্ধি করা যায় না। (১১) বেণুক—অসম গাত্র, গোলাকার, ঈষলোহিত পাণ্ডুর্ণ, মরিচের আকারের ত্রায় বীজ-বিশেষ। পশারির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। এই বীজ অন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করিলে গর্ভাশয়ের জরায়ু বললাভ করে এবং সঙ্কচিত প্রসারিত হইতে থাকে। তজ্জন্ম গর্ভাশয়ে সঞ্চিত ক্লেদ প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া যায়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে গর্ভাশয় আক্শিপ্ত হইতে থাকে। গর্ভিনীর পক্ষে বেণুকের প্রয়োগ অনিষ্টকর। (১২) জীরা প্রসিক্ বণিক্ দ্রব্য। ক্রীত-জীরক ঝাড়িয়া গাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। কায়ণ জীবার সহিত অগ্নাত্ত বীজ প্রভৃতি মিশান

থাকে। (১৩) বামনহাটা—সংস্কৃত নাম ব্রহ্মবটি, ভার্গী প্রভৃতি। বা'ন'বটি, ভামট প্রভৃতি নামে স্থানে স্থানে পরিচিত। ইহার মূলক বা শিকড়ের ছাল গ্রহণ করিবে। (১৪) মহানিমের ফল—ফলের আবরণ ত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরের শাঁস গ্রহণ করিবে। ইহার গাছ অমূল্য নহে। গাছ হইতে ফল আচরণ করা বাইতে পারে। বেণের দোকানেও পাওয়া যায়। (১৫) হিং—মূলতানি হিং গ্রহণ করিবে। পাচনে প্রক্ষেপ দিবে না। অগ্নাত্ত দ্রব্যের ত্রায় ৮ রতি পরিমিত হিং লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া লইবে। মাত্রাধিকার আশঙ্কা নাই। (১৬) কটুকী—প্রসিক্ বণিক্ দ্রব্য। টাটকা কটুকী গ্রহণ করিবে। (১৭) সরিষা—সদাসর্বপ গ্রহণ করিবে। (১৮) বিড়ঙ্গ—বিড়ঙ্গ কিঞ্চিকালের পুরাতন প্রশস্ত। ইহার খোসা ছাড়াইয়া অভ্যন্তর ভাগে যে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা থাকে, তাহা ঝাড়িয়া বাছিয়া গ্রহণ করিবে। (১৯) আতইচ—প্রসিক্ বণিক্ দ্রব্য। ক্রীত আতইচ উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। (২০) সূচমুখী—সংস্কৃত নাম মুর্খী। বোড়াচক্র নামেও পরিচিত। গাছের পাতা ত্যাগ করিয়া মূল ও কাণ্ড গ্রহণ করিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবিরত্ন।

## কাজের কথা ।

—:~:—

'চা'য়ে অনিষ্ট :—দেশে 'চা' পায়ীর সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, সেই পরিমাণে সহরের অলিতে-গলিতে 'চা' বিক্রয়ের দোকানও দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এক পয়সায় এক পেয়ালা চা,—একটু ছুপ্প বেগা দিয়া বক-মারি 'কাকো' দিলে না হয়—উহা ব মূল্য ডুই পয়সা। ফলে এই এক পয়সা বা দুই পয়সার নেশার কলিকাতা সহর মাতিয়া উঠিয়াছে। শুধু কলিকাতার কথা কেন, মফঃস্বলের সহর বেসা স্থানগুলিতেও এইরূপ 'চা'য়ের দোকান অনেক গুলি স্থাপিত হইয়াছে। এই 'চা'-পানে অজীর্ণ-অক্ষুধা প্রভৃতি অশ্রু অনিষ্ট ঘা হইয়া—তাহা ত হইতেছেই,—তাহা ভিন্ন ইহার দ্বারা আর একটি যে বিশেষ অনিষ্ট উপস্থিত হইতেছে, তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখিতেছেন না। 'চা'য়ের দোকানের প্রায় সকল গুলিতেই এক-একটা বাল্টি পূর্ণ যে জল থাকে, উচ্ছিষ্ট বাটি বা কাফ গুলি সেই বাল্টির জলে ডুবাইয়া পবিত্র করা হয়। ফলে ঐ একই বাল্টিতে এইরূপ ভাবে 'কাফ' পরিষ্কারে, উহা দ্বারা শুধু ব্যক্তি-বিশেষেরই উচ্ছিষ্ট যে পান করা হইতেছে, তাহা নহে,—ঐ জলপূর্ণ বাল্টিতে বহু-সংখ্যক ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট মিশ্রিত হওয়ায় বহু-সংখ্যক ব্যক্তিরই উচ্ছিষ্ট উহা দ্বারা গ্রহণ করা হইতেছে। ইহা হইতে দোকানের 'চা'পানে জাতি-ধর্ম্ম ত রসাতলে যাইতেছেই,—তা ছাড়া অনেক সংক্রামক-ব্যাধিও ইহার ফলে বহুগোলের শরীরে প্রবেশ লাভ করিতেছে। দোকানদার ব্যবসায় করিতে বসিয়াছে, কাহার ঈপ আছে, কাহার কাস

আছে, কে স্নহ, কে অস্নহ,—এসকল ত তাহার বিচার করিবার আবশ্যক নাই, তাহার ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি হইলেই যথেষ্ট হইল। ফলে বাঙ্গালী সম্ভান এই 'চা' পানেও যে স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে, তাহা স্তম্ভনীয়।

\* \* \* \*

আমোদে আনুক্ষয়।—প্রভাতের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করিতে হয় এবং রাত্রি এক প্রহরের পর শয্যা-গ্রহণ করিতে হয়,—ইহাই সকালে শাস্ত্রীয়-ব্যবস্থা ছিল। এখন সহরের বাবু আমোদে উন্নত হইয়া,—সমস্ত রাত্রি জাগরণপূর্বক, রঙ্গমঞ্চগুলির অভিনয় দেখিয়া থাকেন। এই দর্শকগুলির মধ্যে আবার বালক এবং যুবকের সংখ্যাই অধিক। ছাত্র বা Student হিসাবে যাহারা অভিভাবক-শ্রু হইয়া, সহরে অবস্থিত করিতেছেন, বালক এবং যুবকদলের মধ্যে হিসাব-গণনায় তাঁহা-দিগেরই সংখ্যা অধিক। শাস্ত্রবাক্য অনুসারে বালক এবং যুবকের শ্রেণী-বিভাগে আমরা ষোড়শ বর্ষীয়গণকে বালক এবং তাহার পর হইতে যুবক বলিয়া স্থির করিয়া লইতেছি। যাহা হউক, উহার পঠদশায় ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-অভিনেত্রীর হাবভাবদর্শনে, রাত্রি-জাগরণের স্বাস্থ্যক্ষয়ের কারণ অপেক্ষাও অধিকতর স্বাস্থ্য ক্ষয়ের যে কারণ উপস্থিত করিতেছে, তাহা অবিসংবাদিত। ইহা হইতে রমণী-সুখ-মিগনের চিন্তা অলক্ষিতভাবে স্কুন্মার কৈশোর জীবনে প্রবেশলাভ পূর্বক তাহদিগের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য-সুখ একেবারে নষ্ট

কবিতা তুলিতেছে, ইহা আমবা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। হায়! বাঙ্গালী অভিভাবক কবে এ সকল কথা বলিবে?

\* \* \* \*

বাসনে স্বাস্থ্যহানি।—আগে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত বাঙ্গালী, তৈলের অভ্যাস করিত। এখন অনেকস্থলে দেশ হইতে সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এখন একটু স্বগন্ধি তৈল—মাসা মাথায় না দিলে নহে, অনেকে তাহাই দিয়া থাকেন, তাহা ভিন্ন দেহের সকল স্থানে ‘সাবান’-মর্দনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শাস্ত্রে তৈল-মর্দনের উপকারিতা গাণ লিখিত আছে, সাবান-মর্দনে কখনই তাহা সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—তৈল মর্দনে স্নতপানেরও অষ্ট গুণ ফল লাভ ঘটয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত পায় সকলপ্রকার তৈলকেই শাস্ত্রকারগণ বর্জ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তৈল মর্দনে বায়ু-পিত্ত এবং কফ—তিনটি ধাতুর সাম্য-ক্রিয়া সংস্খিত হয়। বাঙ্গালী যুবকের নিকট কিন্তু এ কথা বুঝাইবে কে? ফলে এই তৈলভাগী হওয়াব জন্তও বাঙ্গালী ব্যায়ামের অন্তর্ভুক্তি করিয়া তুলিতেছে।

\* \* \* \*

ক্রিয়ার বিপত্তি।—হেঁড়ে ডুডু, হাড়ুগুডু, লুকাচুরি, কপাট—সকালে বাঙ্গালী বালকের জন্ত এই সকল খেলার প্রথা নির্দিষ্ট ছিল। তাহাব পর, সে সকল উঠিয়া গিয়া, ব্যাটবলে বাঙ্গালী-বালকের খেলার কার্য সিদ্ধ হইতে লাগিল। এখন একেবারে তাহাও উঠিয়া ‘ফুটবল’ বাঙ্গালী-বালকের খেলার কার্য সম্পাদিত হইতেছে। ফুটবল খেলিতে হইলে, যেকোন আহার্যের প্রয়োজন, বাঙ্গালী বালকের

জন্ত সেরূপ আহার্যের ব্যবস্থা কিন্তু নির্দিষ্ট নাই। যে সমাজ হইতে ‘ফুটবল’ খেলাব সৃষ্টি হইয়াছে, সে সমাজে মাংস-ভক্ষণের ব্যবস্থা নিত্য প্রচলিত আছে। এদেশে সেরূপ নিত্য মাংস ভক্ষণ ত দূরের কথা,—অনেকের ভাগ্যে এক সপ্তাহ অন্তরও তাহা জুটয়া উঠে কি না সন্দেহ। ইহা ভিন্ন দুগ্ধ-দধি-ক্ষীর-ছানা-ভক্ষণের উপায় ত দেশ হইতে লোপ-ই পাইয়াছে। এ অবস্থায় ‘ফুটবল’ খেলিতে হইলে নেরূপ সামর্থ্যের প্রয়োজন, বাঙ্গালী-বালকের শরীরে সে সামর্থ্য নাই। কাজেই ওরূপ খেলায় মানসিক তৃপ্তি যথেষ্ট ক্ষুরিত হইলেও উহাদ্বারা বাঙ্গালী-বালকের শক্তির ক্ষয় ঘটতেছে। বাঙ্গালী বালকগণের কর্তৃপক্ষ-মণ্ডলী এ সকল কথা চিন্তা করিবেন কি।

\* \* \* \*

উপচক্ষুর অপকারিতা।—দৌন্দর্য্য-বুদ্ধির জন্ত আজকাল অনেকেই চন্দ্রা বা উপচক্ষু ব্যবহার করিয়া থাকেন দেখিতে পাই। বালক এবং যুবক-মহলেই ইহার প্রচলন অত্যধিক। দৃষ্টিশক্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তথাপি দৌন্দর্য্য বুদ্ধির জন্ত Power হীন চন্দ্রা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অনেকেরই একটা রোগে দাঁড়াইয়াছে। ফলে, অসময়ে এবং অকারণে উপচক্ষু গ্রহণ করায় সত্য সত্যই অনেকের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যাইতেছে। তৈল-মর্দনে চক্ষুর জ্যোতি বর্ধিত হয়, বাঙ্গালী সে তৈল মর্দন ভুলিয়াছে, স্নত-দুগ্ধ-মৎস্য ভক্ষণে দৃষ্টিশক্তির প্রথরতা অটুট থাকে, বাঙ্গালীর তাহা পাইবার উপায় কমিয়াছে,—ব্রহ্মচর্য্য-পালনে মানব তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকে, বাঙ্গালী-বালক সে ব্রহ্মচর্য্য-পালনে অনভ্যস্ত হইয়াছে, ইহার উপ উপচক্ষু-ধারণে বাঙ্গালী-

বালকের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবার কারণ, তাহার নিজেবাই করিয়া তুলিতেছে। এটও বাঙ্গালী অভিভাবকেব চিন্তা করিবাব বিষয়।

\* \* \* \*

সিগারেটে সর্বনাশ।—সিগারেটে বাঙ্গালীর বিলক্ষণ সর্বনাশ সাধিত হইতেছে। ইহার প্রচলন-বিষয়েও বাঙ্গালীর আশা-ভরসা-হল—যুবকমণ্ডলীই অগ্রণী। আমাদের দেশে তামাকের ধূমপানের প্রচলন আছে, তাহা শিরোরোগনাশক, ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক এবং বমনকারক বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—“তামাক স্বয়ং বিষ হইয়াও উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে সকলপ্রকার বিষের নাশক হইয়া থাকে।” সিগারেট কিন্তু আমাদের দেশীয় তাম্রকূট নহে। উহাকে নীতপ্রধান দেশের উত্তমজক মাদক বলা যাইতে

পারে। উহার অতিরিক্ত ব্যবহারে মস্তিষ্ক বিকাব, বক্ষঃস্থলেব পীড়া,—অনেকপ্রকার ব্যাধিই শবীব মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে। তামাকের মত সিগারেট কলিকায় সান্নিধ্য হুঁ দিয়া পরাইবাব প্রয়োজন হয়না বলিয়া, ইহার ব্যবহাৰটাও অনেকের নিকট ঘন ঘন দাঁড়াইয়াছে। ফলে অপরিণতবয়স্ক বাঙ্গালী-বালকগণ এই সিগারেটের ধূমেও স্বাস্থ্যক্ষাব অপচয় করিয়া তুলিতেছে। দেশে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যক্ষেব কাৰণ চতুর্দিকে এতই বিস্তৃত হইয়াছে, যে, তাহা হইতে বাঙ্গালীর নিকৃতি পাইবাব উপায় সূব্বপর্যাহত। এই সিগারেটের হস্ত হইতে বাঙ্গালী সম্ভান যে কিরূপে নিকৃতি পাইবে, তাহার উপায় তৎক্ষণাৎ দেখিতেছি না।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

## গ্রীষ্ম-চর্যা।

স্বাস্থ্যক্ষায় বয়স্কীল ব্যক্তিদ্বিগের জন্ত বর্তমান-গ্রীষ্ম-সমাগমে “গ্রীষ্ম-চর্যা”র বিষয় লিখিত হইতেছে। স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণ এই সময় এই প্রবন্ধের লিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে, স্বাস্থ্য-সুখলাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

এই সময় হৃদয়ের তেজ অতিশয় খরতর হয়, এজন্ত কক্ষের ক্ষয় এবং বায়ুর বৃদ্ধি ভাব হইয়া থাকে। এই কারণে এসময় লবণ, কটু ও অম্ল-রসযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার বিধেয় নহে। শাস্ত্রকার এই ঋতুর পথ্য-নির্দিষ্টানে বলিয়া গিয়াছেন,—

“ভজ্যেদধুৰ্ণং যে বায়ং লঘুস্বিধুঃ হিমং দ্রবম্।

হৃশীত ভোরসিক্তাকৌ লিহাৎ সক্তনু সশর্করান্॥”

অর্থাৎ এ সময় মধুর, লঘু, স্নিগ্ধ, শীতল ও দ্রব অন্ন এবং শর্করা মিশ্রিত সজল শক্ত ভোজন ও প্রত্যহ স্নানীতল জলে স্নান করা কর্তব্য।

জল মাংসের সহিত শুভ্র-শালি খাওয়ার অন্ন ভোজন এ সময় প্রশস্ত। পানীয় জল কপূর সংযোগে স্নেহদ্রবীকৃত করিয়া কুঁজা, কলসী প্রভৃতি যন্ত্রপাত্রে রক্ষিত করিবে। ব্যায়াম এবং রোদ্র সেবন এই ঋতুতে বিষৎ পরিত্যজ্য। দিবানিদ্ৰা দ্বারা কক্ষ বৃদ্ধিশ্রান্ত হয়—এজন্ত ইহা অধিকাংশ স্থলে অহিতকর হইলেও গ্রীষ্মকালে কক্ষের ক্ষয় নিবন্ধন ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।



এই ঋতুতে মধ্যাহ্ন সময়ে বিশ্রাম করা একান্ত আবশ্যিক । শাস্ত্রকার এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—

অত্রুৎষ মহাশাল তালরুৎক্ষোষ রশ্মিবু ।  
বনেষু মাধবী শ্লিষ্ট দ্রাক্ষাস্তবক শালিনু ॥  
কদলীদল-কঙ্কর মৃণাল-কমলোৎপলৈঃ ।  
কোমলৈঃ কলিতে তলে হসৎকুসুমপল্লবে ॥  
মধ্যাহ্নেনৈর্ক তাপাভঃ সুপ্যাকারা গৃহেষুখম্ ।  
নিশাকরকরাকীর্ণে সৌধপৃষ্ঠে নিশাসু চ ॥  
আসনা স্বস্থ চিত্তস্ত চন্দনার্জুণ মালিনঃ ।  
নিবৃত্ত কাম তন্ত্ৰস্ত সুস্থস্য তনু বাসবঃ ॥

অর্থাৎ অত্যুচ্চ শাল ও ভাল বৃক্ষাকর্ণ, বোদ্রহীন-মাধবী-জড়িত-দ্রাক্ষাস্তবক শোভিত বনমধ্যে ধারা-গৃহে কোমল-কদলীপত্র, কঙ্করা, মৃণাল, পদ্ম ও কুমুদ নির্মিত পুষ্প-রাগ-তীর্ণ-শয্যার শয়ন করিয়া গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন যাপন কারবে । রাত্রিতে চন্দন-চর্চিত দেহ, মালাধারী, সুস্থির চিত্ত, সুস্থ বস্ত্র পরিধারী ও কাম কর্ম বিরহিত হইয়া, চন্দ্র-কিরণ প্রদীপ্ত-সৌধোপরি অবস্থিতি করিবে ।

এ সময় জলযুক্ত তালবৃন্তে ব্যজন গ্রহণ করিবে,—ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত পদ্মিনী পত্র ও জলসিক্ত চামর বীজন দ্বারা গ্রীষ্ম জনিত ক্রান্তি নিবারণ করিবে

মত্তপান এ ঋতুতে অতিশয় অহিতকর । নিত্যন্ত অভ্যাস পরায়ণ বক্তৃগণের পক্ষে মত্তপান করিতে হইলে, সুরার সহিত অত্যধিক পরিমাণে জল মিশাইয়া পান করা কর্তব্য । ইহার অন্তথায় শোথ, দেহের শৈথিল্য, দাহ ও মূর্ছা রোগ ইহবার সম্ভাবনা ।

শাস্ত্রকার গ্রীষ্মঋতুর বর্ণনায় সকল কথা বলিয়া শেষ কথা বলিয়াছেন,—

মৃণাল বলয়াঃ কাস্তা প্রোৎফুল্ল কমলোজ্জ্বলাঃ ।  
জঙ্গমা ইব পদ্মিণো হরন্তি দয়িতাঃ ক্লেশম্ ॥

অর্থাৎ এ সময় মৃণাল-বলয়ধারিনী, বিকসিত কমলোজ্জ্বলশালিনী, সুন্দরী রমণী-দিগের সহিত প্রণয়লাপ দ্বারা নিদাঘ জনিত সকল কষ্ট দূরিত হইয়া থাকে ।

## আয়ুর্বেদে তন্ত্র-রহস্য ।

এখনকার দিনে পাশ্চাত্য চিকিৎসক সমাজের পক্ষ হইতে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, তদর্শনে আমরা বিমোহিত হইয়া থাকি, কিন্তু সেই সকল তথ্য ইতিপূর্বে আমাদের দেশীয় শাস্ত্রবিশারদগণ বলিয়া গিয়াছেন কিনা—সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি না, ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা বলিতে হইবে । ডাক্তারি মতে আধুনিক অনেক রোগের পথ্যে ঘোল বা ডাক্তার-পান নির্ণীত

হইয়াছে । সে সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারগণ ইতিপূর্বে কিছু বলিয়াছেন কিনা, তাহা লইয়া একটু আলোচনা করিব ।

আমাদের বেদ পারগ আৰ্য্যঋষিগণ সর্বত্র বিষয়েরই আলোচনা করিবার সময় শুধু দ্রব্য মাত্রের নাম এবং সেই সকল দ্রব্য যে সকল রোগের পথ্য—মাত্র তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সেই সকল দ্রব্য কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, কিরূপ সময়ে—কিরূপ অবস্থায়—কিরূপ ঋতুতে তাহা ব্যবহার করিতে হয়—

এ সকল কথার সকল প্রকার আলোচনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করিয়া গিয়াছেন। ঘোলের অবস্থা বা তক্র সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

তক্রের নামকরণে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, ঘোলন্তু মথিতং তক্রমুদম্বিচ্ছচ্ছিকাপিচ স সরং নির্জলং ঘোলং মথিতং অসরোদকম্। অর্থাৎ—ঘোল, মথিত, তক্র, উদম্বিৎ ও ছচ্ছিকা এইগুলি ইহার পর্যায়। তাহার পর কোন সময়ে কোন অবস্থায় ঐ কয়টি দ্রব্যের কি আখ্যা প্রদান করা হইবে, তাহা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

“তক্রং পাদজলং প্রোক্তমুদম্বিন বর্জং বারিকম্ ছচ্ছিকা সারহীন্য শ্রাং স্বচ্ছা প্রচুর বারিকা”

অর্থাৎ সরসংযুক্ত নির্জল দধির নাম—ঘোল, সরবিহীন নির্জল দধির নাম মথিত, চতুর্থাংশ জলযুক্ত দধির নাম তক্র, অর্ধেক জল সংযুক্ত দধির নাম উদম্বিৎ, সারহীন দধির নাম ছচ্ছিকা এবং প্রচুর জল সংযুক্ত দধির নাম স্বচ্ছা।

ইহারের গুণ ব্যাখ্যার শাস্ত্রীয় উক্তি এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে—

ঘোলন্তু শর্করা যুক্তং শুণৈশ্চৈয়ং রসালবৎ।

বাতপিত্তহরং ক্লাদি মথিতং কফ পিণ্ডমুৎ।

তক্রং গ্রাহী কষায়ান্নং স্বাদুপাক রসং লঘুঃ।

বীৰ্য্যোঞ্চঃ দীপনং বুধ্যং ঐশ্বৰ্য্যং বাতনাশনম্।

অর্থাৎ শর্করা মিশাইয়া ঘোল সেবনে রসালবৎ উপকার হইয়া থাকে, ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক ও অক্লাদজনক। মথিত পানে কফ এবং পিত্ত নাশ হইয়া থাকে। তক্র গ্রাহী, কষায় ও অন্নরস। ইহা জীর্ণ

হইয়া স্বাদু রস প্রাপ্ত হয়। ইহা লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, দীপন, বুধ্য, প্রীতিজনক, বায়ুনাশক।

রোগের পথ্য নির্ণয়ে শাস্ত্রবিদগণ ইহাকে গ্রহণী রোগের উৎকৃষ্ট পথ্য বলিয়া, তাহাব পর অনেক রোগেই ইহা সেবনের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। যথা—

শীতকালেহিমাশ্মদ্যো চ তথা বাতায়েষু চ অকৃচো শ্রোতাসং রোধে তক্রং স্বাদমৃতোপমম্।  
তত্ত্ব হস্তি গরচ্ছর্দি প্রপক বিষম জরান্।  
পাণ্ডুমেদো গ্রহণার্শো মূত্রগ্রহ ভগন্দরান্॥  
মেহং শুষ্কমতীসারং শূল প্লীহোদরাকরী।  
শিত্র কোষ্ঠ গত ব্যাধিন্ কঠ শোথ ত্বষাক্রিমৌন॥

অর্থাৎ শীতকালে, মন্দাম্বিতে, বাতরোগে, অকৃচিতে ও শ্রোতাসংকলের রুদ্ধতা জন্মিলে, তত্র সেবনে অমৃতপানের ফললাভ ঘটয়া থাকে। বিষ, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদো, রোগ, গ্রহণী, অর্শ, মূত্রগ্রহ, ভগন্দর, মেহ, শুষ্ক, অতিসার, শূল, প্লীহা, উদররোগ অকৃচি, শিত্র, কোষ্ঠগত ব্যাধি, কঠ, শোথ, ত্বষা ও ক্রিমিরোগ—তক্র সেবনে নিবারিত হইয়া থাকে।

উষ্ণকালে এবং কৃত, দৌর্বল্য, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত বিকৃতি হইলে তক্র সেবনের নিষেধ করিয়া সূক্ষ্মশরীরে তক্র সেবনের ফল-প্রতি শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—

“ন তক্র সেবী ব্যথতে কদাচিত্

ন তক্র দন্ধা প্রভবন্তি রোগাঃ

যথা সুরানাম্ অমৃতং সুরায়

তথা নরাণাম্ ভুবি তক্র মাছঃ।”

অর্থাৎ—নিয়মিত তক্রসেবনে করিলে রোগ সকলের প্রাবল্য জন্মিতে পারে না। অমৃত পানে দেবতাদিগের যেরূপ সুখোৎপাদন

হইয়া থাকে, পৃথিবীতে মনুষ্যশরীরে তক্র সেই-রূপ উপকারী জানিবে।

মনুষ্য-শরীরের এহেন উপকারী তক্র বায়ু, বুদ্ধি উপলব্ধি হইলে শুষ্ক ও সৈন্ধব লবণের সহিত, পিত্ত প্রকৃপিত হইলে চিনির সহিত এবং কফ-প্রাবল্যে শুঁঠ পিপুল ও মরিচের গুঁড়া মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

চিং, জীরার গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত

কবিতা তক্র সেবনে অকুচি অবস্থায় রুচি জন্মিয়া থাকে। একরূপভাবে সেবন করিলে অর্শ ও অতিসার রোগেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পাঠক, এখন দেখিলেন ত, তক্র সেবনের ব্যবস্থা এখনকার নূতন উদ্ভাবনা নহে,—মানব জাতির কল্যাণেচ্ছা আৰ্য্য ঋষিমণ্ডলী বহু-কাল পূর্বে ইহার গুণ-পরিচয় লোকসমাজে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

## পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ এবং টোটকা ঔষধ।

ছ'দিন অন্তর পান্য জরের ঔষধ। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, ছ'দিন অন্তর পান্যজরে অনেক সময় অনেক ঔষধের প্রয়োগ দরকার হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা প্রথম অবস্থায় পান্যের পূর্বে দিন হইতে যথেষ্টরূপে পটেনাইন-প্রয়োগেব ব্যস্থা করেন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাহাও কার্যকরী হয় না। এ অবস্থায় নিম্নলিখিত ষোণটিতে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়, (১) 'বক'-পুষ্প বৃক্ষের ছাল, অনন্তমূল, গোক্ষুর বীজ, (আট বাদ দিয়া) হরিতকীর শাঁস,—প্রত্যেক দ্রব্য আধ তোলা ওজন লইয়া হামান দিষ্টায় কুটিয়া লইবে। তাহার পব পাচন প্রণালীর নিয়মানুসারে আদ্যের জল দিয়া জালে চড়াইয়া এক ছটাক অশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লও। প্রতিদিন প্রাতে উছা একেবারে পান করিয়া ফেল। এক সপ্তাহকাল এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই জ্বরের আক্রমণ বন্ধ হইবে।

সর্দি-কাশীর ষোণ।—'বক' পুষ্প বৃক্ষের মূলেব ছাল অর্দ্ধভরি এবং বচ অর্দ্ধভরি একত্র কুটিয়া লইয়া এক পোয়া জলে সিদ্ধ করতঃ

এক ছটাক অশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লও। ২৩ বারে ২৩ দিন সেবন কর, সর্দি-কাশী সারিয়া যাইবে।

মলবদ্ধতার সহজ ব্যবস্থা।—ধল আঁকোর বা ধল আঁকড়া বৃক্ষের শিকড় তুলিয়া লইয়া, অল্প কুটিয়া পাচন-প্রণালীর নিয়মানুসারে অর্দ্ধ সেব জলে জাল দিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশেষে নামাইয়া লইবে। উহার সহিত একটু মধু মিশাইয়া প্রাতে ও বৈকালে ছই বারে পান করিয়া ফেল। ষাঁহার মলবদ্ধতার জন্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ইহা দ্বারা নিয়মিত দান্ত পরীক্ষার হইবে।

কোষ্ঠ-কাটিয়া আর একটি ব্যবস্থা।—শুপক হরিতকীর আট বাদ দিয়া, চারি আনা পরিমিত গুঁড়া এবং চারি আনা পরিমিত মিছরির গুঁড়া বা চিনি এক ছটাক গরম জলে মিশাইয়া রাত্রিতে শয়নের পূর্বে পান করিবে। প্রাতে ইহা দ্বারা উত্তমরূপে দান্ত পরীক্ষার হইয়া যাইবে। ষাঁহাদিগের ধাতু অতিশয় রুদ্ধ, তাঁহাদিগের জন্ত চারি আনা গুঁড়ার পরিবর্তে ছয় আনা বা অর্দ্ধ তোলা সেবন করাও চলিতে

পারে। গুঁড়া করিতে অস্ববিধা হইলে হরিতকী বাটিয়া পুর্বোক্ত প্রণালীতেও সেবন করিতে পারা যায়।

প্রস্রাবের জন্ত পাথরকুচি।—কলেরা এবং অতিরিক্ত উদরামরে যেখানে প্রস্রাব হইতেছে না, সেস্থলে কতকগুলি পাথরকুচি, খানিকটা, সোরার সহিত মিশাইয়া তল পেটে প্রলেপ দাও। সহজে মূত্র নিঃসৃত হইবে।

রক্তমাশয়ের একটি ব্যবস্থা—কাঁটান'টের মূল সিকিভরি লইয়া চালুনি জল এবং ২১০টী গোলমরিচ সহ বাটয়া, একবার কি দুইবারে খাইয়া ফেল। এইরূপ ২১০ দিন করিলেই রক্তমাশয় সারিয়া যাইবে।

প্রমেহে সোরা।—প্রমেহের অসহ্য যন্ত্রণার নিবৃত্তি করিবার জন্ত সোরা একটি অব্যর্থ ঔষধ। অর্দ্ধ আনা পরিমিত সোরা এক ছটাক জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে প্রমেহ রোগের আলা যন্ত্রণা উপশমিত হইয়া থাকে।

প্রদরের ঔষধ।—প্রদর রোগে স্ত্রী জাতির অত্যধিক শ্রাব হইতে থাকিলে, কতকগুলি গাঁদা ফুলের পাতা তুলিয়া ছেঁচিয়া রস বাহির কর। উহার রস ১ তোলা এবং চাউল ধোয়া জল একত্র মিশাইয়া দুইবেলা সেবন করাও। এইরূপ ৩৪ দিন করাইলে শ্রাব নিঃসরণের নিবৃত্তি হইবে। (২) এইরূপ অবস্থায় হৃৎকের সহিত চারি আনা পরিমিত খেত বেড়েলার মূল বাটয়া সেবন করিলেও উপকার হইয়া থাকে। (৩) যক্ষীমধু দুই তোলা এবং দুই তোলা চিনি চাউল ধোয়া জল সহ বাটয়া অর্ধেক করিয়া ২ বেলা সেবনে প্রদর রোগের শাস্তি হইয়া থাকে।

শিরঃপীড়ায় ব্যবস্থা।—(১) অপরাঞ্জিতা ফুলের যে লতিকা, তাহার মূল্যগ্র লইয়া, নস্ত

গ্রহণ করিলে শিরঃপীড়ায় উপকার হইয়া থাকে (২) অপরাঞ্জিতার মূল কর্ণদেশে বন্ধ করিলে শিরঃপীড়ার শাস্তি হইয়া থাকে।

(৩) গোলমরিচ ২১০টী গুঁড়া করিয়া, এক তোলা ভৃঙ্গরাজ বা ভীমরাজের রসে গুলিয়া বারংবার নস্তগ্রহণ করিলে শিরঃপীড়ায় শাস্তি হইয়া থাকে। (৪) চুল্লী বা উননের পোড়া মাটি চারি আনা ও গোলমরিচের গুঁড়া চারি আনা একত্র মিশাইয়া নস্ত গ্রহণ করিলে শিরঃপীড়ায় শাস্তি হইয়া থাকে। (৫) হৃৎকের সহিত গুঁঠোব গুঁড়া বাটয়া প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়ায় উপকার হইয়া থাকে।

বহুমূত্রে ব্যবস্থা।—(১) আমলকী বস ১ তোলা অন্ন মধুর সহিত মিশাইয়া দুই বেলা সেবনে বহুমূত্রের উপশন হইয়া থাকে। (২) কচি তালের মূল চারি আনা, কচি খেজুরের মূল চারি আনা, পাকা কলা একটি, হৃৎক সহ মিশাইয়া কয়েকদিন সেবন কর, বহুমূত্রের উপশম হইবে। (৩) চাউল ভাজার গুঁড়া মধুর সহিত মিশাইয়া খাইলে বহুমূত্রের উপশম হইয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগে ব্যবস্থা।—(১) খানিকটা পাতি বা কাগজি লেবুর রস জলে গুলিয়া, অন্ন চিনি মিশাইয়া, দুই তোলা পান কর, অপাক-অজীর্ণে বিশেষ উপকারী হইবে। (২) দিবসে এবং রাত্রিকালে আহারান্তে দুই আনা করিয়া বিটলবর্ণের গুঁড়া জলের সহিত মিশাইয়া সেবন কর, বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইবে। (৩) দুই তোলা মুখা কুটিয়া লইয়া আধ সের জলে আলে চড়াইয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশেষে নামাইয়া লও। উহার সহিত একটু চিনি মিশাইয়া অর্ধেক করিয়া দুই বেলা সেবন কর, অজীর্ণ নষ্ট হইয়া অগ্নি বর্ধিত হইবে। এই কয়টি ব্যবস্থা অন্নপিণ্ডেও উপকার হইয়া থাকে।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

## অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শন  
ব্যাপদেশে বিদ্যালয়-ভবনে অনেক গণ্যমাণ্য  
ব্যক্তিবৃন্দ মধ্যো মধ্যো শুভাগমন ঘটতেছে।  
এ পর্য্যন্ত অনেক মহাত্মা ভব ব্যক্তি এবং মহা-  
মাত্র গণ্যমেষ্ট সংশ্লিষ্ট বাঙ্গালপুস্তকগণ বিদ্যালয়-  
ভবনে আগমন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের সকল  
অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক, ইহার উত্তোগ-  
কর্তৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। সংপ্রতি  
গত শুভক্রাইডের দিন বেলা ১১ ঘটিকার  
সময় অনারেবল এম, বিটসনবেল সি, এস,  
ম্রাব, সি, আই, ই, সি, এফ, এস,  
আই, আই, সি, এস, এবং বেঙ্গল  
মিডিল হস্পিটালের ইনস্পেক্টর জেনারেল  
অনারেবল কর্ণেল ডব্লিউ, আর এডওয়ার্ড  
সি, ডি. এ, এম, এফ, আই, সি, এস  
মহোদয় বিদ্যালয়ের সকল প্রকার অবস্থা  
পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী গণ্যমেষ্টের অত্যন্ত মদ্য অনারেবল  
নবাব দামুল হুদা মহোদয় তাহার কিছু পূর্ব্বকই  
বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই সকল উচ্চ  
বাঙ্গালপুস্তকগণের শুভাগমনে আমাদের আশা-  
ভবনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অষ্টাঙ্গ  
আয়ুর্বেদের সপ্ত অঙ্গ লুপ্ত দেখিয়া, শ্রী  
ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক, তাহার উদ্ধার-  
সাধন মাত্র লক্ষ্য করিয়া, একদা একটি অসাধা-  
সাধন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। দেশের  
গণ্যমাত্র ব্যক্তিদিগের সন্মত-দৃষ্টি পতিত  
হইলে, আমাদের আশা ফলবতী হইতে কয়দিন  
লাগিবে!

কোচবিহারের সুযোগ্য দেওয়ান বাহাদুর  
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন বি, এল, বার-এট-ল,  
মহোদয় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয় অগ্রগ-  
পূর্ব্বক পরিদর্শন করিয়া, বিদ্যালয়ের সাহায্য-  
কল্পে মাসিক ১০ টাকা দানের অতিপ্রায়  
প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেকে স্বচ্ছ প্রণোদিত হইয়া এখন

বিদ্যালয় পরিদর্শনে আগমন করিতেছেন।  
আলিগড়ের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা উকিল শ্রীযুক্ত বাবু  
কিশোরীলাল মহোদয় অগ্রগ-পূর্ব্বক বিদ্যা-  
লয়ে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি  
বিদ্যালয় পরিদর্শনান্তর নগদ ৫০০ বিদ্যালয়ের  
উন্নতি কল্পে সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক উত্তোগ-  
কর্তৃগণকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন।

লুপ্ত প্রায় আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্ত  
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তাব  
বিষয় বর্তমান সময়ে হিন্দুমহিলাগণও উপ-  
লব্ধি করিতেছেন। শুধু যে উপলব্ধি করিতে-  
ছেন, তাহাই নহে, একটি হিন্দু মহিলা এই  
প্রয়োজনীয়তার বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিয়া  
গত ২২ বৈশাখ আমাদিগের নিকট নগদ  
একশত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই  
দানশীলা রমণীর নাম—শ্রীমতী রাধাসুন্দরী  
দেবী। ইনি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন  
মহাশয়ের মাতৃদেবী। আমরা তাঁহার পুত্রের  
মারফৎ এই দান প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে আর কয়েকজন  
বিত্তোৎসাহী ব্যক্তি গত বৈশাখ মাসে নগদ  
অর্থ এবং কতকগুলি বিশেষ মূল্যবান পুস্তক  
বাহা দান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করাও  
আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। নগদ  
অর্থ সম্বন্ধে চন্দ্রনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণ-  
চন্দ্র দে মহাশয় ২৫ টাকা এবং পুস্তক সম্বন্ধে  
খড়দহের স্বর্গীয় বাবদ কিশোর গোস্বামী  
মহাশয়ের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত পুলিন কিশোর  
গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত কিশোরী কিশোর  
গোস্বামী প্রভৃতি ভ্রাতৃবৃন্দ মিলিত হইয়া, স্বর্গীয়  
বাবদকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের লাইব্রেরীটি

এই বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীকে দান করিয়াছেন। এই দান প্রাপ্তি হইতে অনেকগুলি বহুমূল্য এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারা বিদ্যালয় লাইব্রেরীর সম্পদ-সম্ভাব সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

\* \* \* \*

দেশের ছোট-বড় সকল প্রকার জমীদার-দিগের দৃষ্টি ইহার উপর অল্পে অল্পে পতিত হইতেছে; ইহা নিশ্চয়ই আশার কথা বলিতে হইবে। গত ৩রা বৈশাখ মেহেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত ভূষণ-চন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মল্লিক এবং সোমড়া-আবুলপুরের ভূমালিকারী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মজুমদার বিদ্যালয়পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে অনেক প্রকার কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া, আমাদিগকে আশা প্রদান করিয়াছেন। ফল কথা, এ সকলই যে বিদ্যালয়ের পক্ষে আশার বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

\* \* \* \*

একপ একটি মহান কার্য্য সিদ্ধ করা একার কার্য্য নহে। ইহার জন্ত প্রথমতঃ যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ-সংগ্রহের

জন্ত চেষ্টাশীল, উদ্যোগী এবং উৎসাহী-পুরুষের আবশ্যক। দেশের ধনকুবেরদিগকে মুক্তকণ্ঠে করিবার জন্ত সে উৎসাহ প্রয়োগ করিতে, হইবে। ষাঁহাদিগের ইচ্ছা আছে, শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, দেশের কাজ করিতে, দেশের হিত করিতে,—জগতের মঙ্গলসাধন করিতে ষাঁহাদিগের প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা এমনই নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া, এই মহান কার্য্যে যোগদান করুন। আরোগ্য এবং দীর্ঘায়ু লাভ,—ঋণ-অর্থ-কাম-মোক্ষ—সকল কর্ম্মের মূলমন্ত্র। যখন আয়ুর্বেদের সন্ধান অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন মানবজাতি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—সকল প্রকার সম্পদ লাভেরই যে অধিকারী হইত—এ কথা বিশেষজ্ঞের অবদিত নাই। তাহাও অভাবে বর্ত্তমান সময়ে ভারতভূমি জরামবণের লালানিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। দেশ-রক্ষার মনোযোগ প্রদান করিতে চাইলে, আগে দেশের লোককে স্বাস্থ্যবান ও দারিদ্র্যলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয় এই উদ্দেশ্যে বহিরাষ্ট্র পাতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের প্রত্যেক চিত্তাঙ্গীন ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করুন—ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

## অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী ছাত্রদিগের প্রতি বিজ্ঞাপ্ত।

আগামী আষাঢ় মাসের শেষভাগ হইতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রদিগের নূতন সেসন বা নব-বর্ষের অধ্যয়ন আরম্ভ হইবে। সংস্কৃত ভাষায় ষাঁহাদিগের জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারা ই সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়নের অধিকারী হইবেন। বাঙ্গালা-বিভাগে, বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক এবং কিছু ইংরাজী শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রবেশ করিতে হইবে। মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন,—বাঙ্গালা বিভাগের

জন্ত একপ ছাত্রদিগের আবেদনই গ্রহণ করা হইবে। এখন হইতে আবেদন করুন, নতুবা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গেলে আর কাহারও আবেদন গৃহীত হইবে না।

আবেদনে জাতি ও বয়সের কথা উল্লেখ করিবেন। অস্ত্রাস্ত্র বিষয় জানিবার জন্ত অর্ধ আনার টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায়

কবিরত্ন এম্, এ, এম্, বি  
অধ্যক্ষ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়।

# আয়ুর্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক ।

১ম বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৪—আষাঢ় ।

১০ম সংখ্যা ।

## কাজের কথা ।

—:—

আহারে অনিষ্ট।—আহারই প্রাণধারণের মূল। আহার্যের অভাব হইলে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম—এমন কি, অড়পদার্থ—উদ্ভিদ পর্যন্ত জীবনধারণে সক্ষম হয় না। সেই আহার্য কিন্তু পরিমিত এবং বিত্ত্ব হওয়া আবশ্যক। বর্তমান সময়ে অন্ন-অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য—এক কথায় ইংরাজী মতে ডিসপেপসিয়া নামক ভীষণ ব্যাধি—যাহা বাঙ্গালা জুড়িয়া একাধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে, আহার বিষয়ের অস্মিত আচরণই তাহার একটা বিশেষ কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। হিন্দু বাঙ্গালী-সাম্বিক আহারে সেকালে বল-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিত, এখন সে সাম্বিক-আহারের ব্যবস্থা দেশ হইতে একরূপ লুপ্ত হইয়াছে। হিন্দুজাতিতে ঋতু-বিচারের ব্যবস্থা একালে অনেক হিন্দুসন্তানই যে ভুলিয়াছে, ইহা নির্ভাল সত্য কথা। দ্রব-স্থত-মাখন দধি—যে সকল দ্রব্য আহার করিলে, শরীর পুষ্ট হইবে; কাস্তি-ধতি বর্দ্ধিত হইবে, জ্বর-ভ্রী পবিত্রতা পূর্ণ

হইবে, বাঙ্গালীর নিকট সে সকল দ্রব্য এখন সহজ-সুলভও নাই,—সেই সঙ্গে সেই সকল দ্রব্যের আবাদ লাভে বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাও যেন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের রূপান্তরে প্রস্তুত বাজারের খাবারে অনেক বাঙ্গালী এখন রসনার পরিতৃপ্তি-সাধন করিয়া থাকেন। বাজারের শিকার্ডা-কচুরি, বাজারের চপ-কাটলেট—ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া বাঙ্গালী এখন উদরস্থ করিতে শিখিয়াছে! ধর্ম্মের কথাটা না হর ছাড়িয়াই দিলাম,—কেহ হিন্দুমানি মাহুন আর না মাহুন, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের মোটেই আসিয়া বাইতেছে না, কিন্তু একথাটি আমরা জোর করিয়া বলিব,—এই বাজারের খাবার হইতে দেশে অন্ন-অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য বা ডিসপেপসিয়া রোগ বাঙ্গালীর সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে। সকল বিষয়ের মত খাওয়া এখন ভেজালের চসন বখেট চলিয়াছে। দ্রুত এবং ময়দার বিরূপ ভেজাল-চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংবাদপত্র-পাঠকগণের

অবিদিত নাই। দোকানদার লাভ করিতে বসিয়া, খুব দেখিয়া শুনিয়া, বিশেষ বিবেচনাসহ উৎকৃষ্ট দ্রব্য এবং মগ্নদার আমদানি পূর্বক যে খাদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবে—এমন কথা ত তাহাকে মাথার দিয়া দিয়া দেওয়া নাই; সুতরাং তাহার দোকানের খাদ্যে বাঙ্গালা দেশ অজীর্ণ-প্রবণ হইবে কি না; তাহা তাহার চিন্তা করিবার ও আবশ্যক নাই। দেশের লোকে এ কথা বুঝেন না—ইহাই ছুঃখ। আমাদের মনে হয়, সেকালে পল্লীগ্রামে যে মুড়ি-চালভাজা, আদা-ছোলা, গুড়-চিনির ব্যবস্থা ছিল;—এখনকার বাজারের কচুরি-শিঙাড়া তুলিয়া দিয়া, সকলে যদি জলযোগের সময় সেইরূপ ব্যবস্থা পুনঃ প্রচলিত করেন, তাহা হইলে, দেশ হইতে অম্ন-অজীর্ণ-রোগীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইতে পারে। দেশের লোকে এ সকল বুঝবেন কি?

\* \* \* \*

পানীয়ে প্রমাদ—আহারের মত অযথা পানীয়-ব্যবহারে ও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-ক্ষয় হইতেছে। প্রাণধারণের জন্য আহার্যের মত পানীয়েরও প্রয়োজন; কিন্তু সে পানীয়ের ব্যবহার উপযুক্ত হওয়া কর্তব্য। চাঁয়ের দোকানের মত কলিকাতায় এখন সোডা-লেমনেডের দোকানও অসংখ্য। সকালে-সন্ধ্যায় চা-পান এবং দ্বিপ্রহরে সোডা-লেমনেডের আশ্বাসন অনেক বাঙ্গালীই এখন করিয়া থাকেন। ডিসপেন্সিয়া বা অম্ন-অজীর্ণ-অগ্নিমান্দ্যের রোগীদিগের নিকট ইহার ব্যবহার ত খুব বেশীরূপই। ফলে সোডা-লেমনেডের প্রধান উপাদান ফার দ্রব্যের ব্যবহারে তাঁহাদিগের আন্ত কষ্ট দূরীভূত হইলেও, উহারই ফলে, তাঁহাদিগের ব্যাধি

কিন্তু শরীর-মধ্যে বেশ পাকিয়া দাঁড়াইতেছে। ফার-দ্রব্য-ব্যবহারে অম্ন-রোগের আশু-ময়না, নিবারিত হয়, কিন্তু অম্নরোগীর গক্ষে অধিক পরিমাণে ফার মিশ্রিত দ্রব্য ব্যবহার অবিদেয়—ইহা অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের অভিমত। তা' ছাড়া, অধিক জলপানে অম্ন-অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যের সৃষ্টি ইচ্ছা পূর্বক আনয়ন করা হয়। ফলে, স্নেহ-শরীরে গ্রীষ্ম-সন্তাপ-নিবারণের জন্য ঐ সকল দ্রব্যের অত্যধিক ব্যবহারে অনেকে অজীর্ণ-প্রবণ হইয়া পড়িতে-ছেন। সেকালে গ্রীষ্ম-সন্তাপ অপোদনার্থ ডাব-বেলের, সরবৎ-মিছুরির পান্য প্রভৃতি যে সকল পান্যের ব্যবস্থা ছিল, তদ্বারা বায়ু-পিত্ত-কফের সকল দোষ নষ্ট হইয়া, শারীরিক দৃষ্টতা লাভ ঘটত। এখনকার সোডা-লেমনেড-পানীয় যদি এ সকল কথা বুঝেন, তাহা হইলে একদিকে অর্থের অযথা ব্যয়ের হস্ত হইতে তাঁহারা ত নিষ্কতিলাভ করিবেনই, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের ও উন্নতি লাভে যে যথেষ্ট সমর্থ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

\* \* \* \*

আলোকে অপকার।—এখনকার আলো-কের কথা তুলিলে, সাধারণতঃ কেরোসিন তৈলের আলোক বুঝিয়া থাকে। বাহ্য-দিগের মর্থ আছে, সঙ্গতি আছে, ইচ্ছা আছে, প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক-আলোকের ব্যবস্থাপূর্বক নৈশ-অন্ধকার অপনোদন করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণতঃ গৃহস্থ-সংসারে কেরোসিন তৈলের আলোকেই নিশার আধার দূরীভূত করা হয়। এই কেরোসিন তৈলের যে গ্যাস বহির্গত হয়, তাহা কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। শ্বাসকক্ষ, বৈঠকখানা এবং অন্যান্য ঘরগুলিতে এই



কেরোসিনের আলোক চিম্নির দ্বারা যে প্রণালীতে ব্যবহার করা হয়, তাহারা বড় বেশী অনিষ্ট না হইলেও রন্ধন ঘরে চিম্নিবিহীন তরু 'ডিবা' বা 'কুপি'র আলোকে যে স্বাস্থ্য-হানি অবশ্যসম্ভাবী, তাহা আদৌ অস্বীকার করিবাব্যো নাই। আমাদের মনে হয়, যে সকল কারণে আমাদের অন্তঃপুষ্টিচারিণী মহিলাদিগের স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিতেছে, ইহাও তাহার মধ্যে একটি বিশেষ কারণ। পূর্বে বেড়ি বা সর্ষপ তৈলে আমাদের আলোকের কার্য সিক্ত হইত, এখন সে ব্যবস্থা দেশ হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে। ইহার উপর, এখনকার দিনে সবস্ত রাত্রি আলো-জালিয়া অনেকের নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস আছে। দরজা-জানালাগুলিও অনেকে শয্যা গ্রহণের পূর্বে বন্ধ করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় কন্ধ-গৃহে কেরোসিন তৈলের আলোকে যে বিববৎ অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যদি কেরোসিনের আলোকেই সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ রন্ধন-গৃহে 'কুপি' বা 'ডিবা'র ব্যবহার বন্ধ করাত কর্তব্যই, নিদ্রাব পূর্বেও ওরূপ আলো জালিয়া রাখা কর্তব্য নহে। অধ্যয়নশীল ছাত্রগণও যদি অধ্যয়ন-কালে কেরোসিনের আলোক পরি-তাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রভূত মঙ্গল-সঞ্চিত হইবে।

\* \* \* \*

আবরণে অমঙ্গল।—সেকালে দৈহিক আবরণ বা জামার ব্যবহারটা অনেকে বেরূপ স্নেহ পরিমাণে করিতেন, এখন সেইরূপ তাহার সর্বদা প্রচলন চলিয়াছে। ভূমিষ্ট-কালের পর হইতে বার্কক্য পর্যন্ত—সকল

অবস্থাতেই সকল সময়ে জামার ব্যবহার না করিলে ক'হারও যেন অঙ্গরক্ষা—তথা ভদ্র-গ-রক্ষা হয় না,—ইহা এখন দেশের আপামব সাধারণের বন্ধমূল-ধারণা জন্মিয়াছে। স্নেহ-প্রধান শিশু-পর্যায়ের এই জামার ব্যবহার সর্বদা কপিল, তাহাদিগের স্বাস্থ্যহানির ততটা কারণ না ঘটিলেও ইহা দ্বারা বয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটনা থাকে, ইহা অনিশ্চিত। সর্বদা জামা গায়ে দিয়া, দেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, দেহ মধ্যে বায়ু-চলাচলের অন্তরায় ঘটিল থাকে। আমাদের পরিত্যক্ত-পল্লাভূমির অনাচ্ছাদিত-দেহ কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য এই-জন্মই আমবা অনেক সময় সমুন্নত দেখিতে পাই। আমবা স্বাস্থ্যসুখ-প্রিয়াদী দেশবাসী-দিগকে এ কথাটিও চিন্তা করিতে পরামর্শ প্রদান করিতেছি। কৰ্ম্ম-কাল হইতে অবসর লইয়া অন্ততঃ স্বয়ং গৃহে অবস্থিত কালেও অনাচ্ছাদিত-দেহে সেকালের সভ্যতাবিহীন ব্যক্তিদিগের পন্থা অনুসরণ করিলেও যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতে পারিবে।

\* \* \* \*

যানারোহনের অপকারিতা-দেশে যখন রেল-ষ্ট্রিমারের চলন হয় নাই,—তখন লোকে পঞ্চাশ মাইলেরও দূরবর্তী স্থান হইলে পদব্রজে যাতায়াত করিত। এখন রেল-ষ্ট্রিমারের প্রবর্তনে বালি-মদনমা হইতেও ত কেহ পদব্রজে যাতায়াত করিবে না,—কলিকাতার মধ্যেও টাম-লাইনে এক পল্লী হইতে অল্প পল্লীতে যাতায়াত করিতে হইলে, টাম ভিন্ন কাহারও গমনাগমনের উপায় নাই। শরীর রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া, বন্ধ লইয়া, ব্যায়ামকার্য ত লোকে তুলিয়াই গিয়াছে, গমনাগমনের

প্রয়োজনে—হেলান-প্রকার পদব্রজে যে ব্যায়াম-টুকু হইতে পারে, ক্রমশঃ লোক তাহাতেও অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুখ-সুবিধার জ্ঞান মোটর-ট্রাম-অথবা প্রভৃতি যানারোহণেও প্রয়োজন হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব হইতে হেতু্যাব মোড় পর্য্যন্ত বাইতে অবশ্য ট্রামের প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে। ইহাতে একদিকে যেরূপ বিলাসিতার প্রশংসা দেওয়া হইতেছে, অপর দিকে সেইরূপ এই অকর্মণ্যতার ফলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যেও অপচয় ঘটতেছে। পাঁচ পরমা, ছয় পরমা করিয়া, মাসের শেষে অনেকগুলি পরমাও একজ্ঞ ব্যয়িত

হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক, দেশের আবহাওয়া যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ-জীবন প্রকৃতই অন্ধকারময়। শুধু কলেজের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়া, রাশি রাশি অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিলে চলিবে না, স্বাস্থ্য-সুখলাভের জ্ঞান সর্বোপায়ে চেষ্টাশীল হইতে হইবে। আমাদের আশা-ভরসা হইলেও প্রত্যেক বাঙ্গালী-সন্তান এ সকল কথা বুঝুন,—বুঝিয়া স্বাস্থ্যসুখ লাভের জ্ঞান সর্ব প্রথম চেষ্টা করুন—ইহাই আমবা দেখিতে ইচ্ছা করি।

কবিরাজ—শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত।

## অনুকরণে আমাদের অবস্থা।

—:—

আমবা এখন ছুঁয়ের বাঁর হইয়াছি। সে কালের যে সকল পদ্ধতি আমাদের সর্ব বিবয়ের উপযোগী বলিয়া বিধিবদ্ধ ছিল, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যেরূপ নিয়মে সংসার-যাত্রার সকল প্রকার কর্ম অবহিত চিত্তে নির্বাহ করিতেন, বৃন্দারকালের অবতার-কল্প, লোকহিতবৎসল, স্বার্থত্যাগী, ধর্ম্মিগুণী, বহুল-গবেষণাব ফলে যে সকল বিষয় আমাদের করণীয় বলিয়া শাস্ত্র নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, কাল-মাহাত্ম্যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রণোদিত হইয়া, সে সমস্তই এখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা হিন্দু নামে অভিহিত, কিন্তু হিন্দুজ্ঞানচিহ্ন সকল প্রকার করণীয়ই আমরা করিতে জানি না, বাঙ্গালী বলিয়া আমরা পরিচয় দিয়া থাকি, কিন্তু বাঙ্গালীর অনেকগুলি আচরণই মানিয়া

চলিতে এখন আমাদের লজ্জাবোধ হয়, আমাদের পূর্ব পুরুষগণের প্রাচীন-পন্থা অনুকরণ করিতে এখন আমরা যেন সর্বতোভাবে কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায়, পাশ্চাত্য-সমাজের অনুকরণ-প্রয়াস এখন আমাদের সর্বতোভাবে প্রাথমিক হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে অনুকরণেও আমরা সাকল্য-লাভ করিতে পারিতেছি না।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য-সমাজে প্রাথমিক পান 'চা' পানের ব্যবস্থা আছে, আমাদের সে অনুকরণটা করিতেই হইবে, কিন্তু পাশ্চাত্য-সমাজে কিছু আহার না করিয়া 'চা' পানের ব্যবস্থা নাই, আমরা কিন্তু তাহার অনুকরণ করিতে শিখি না, শুধু চা পানের

ব্যবস্থা করিলেই সভ্য সমাজের অনুকরণ সুসিদ্ধ হইল ! ইহাই হইয়াছে আমাদের অবস্থা ! কিন্তু এবস্থি অবস্থার ফলে হিন্দু — তথা বাঙ্গালী-সমাজের যে বিলক্ষণ কতি হইতেছে, আমরা তাহা চিন্তা করিবারও অবসর পর্য্যন্ত পাইতেছি না, ইহা পেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? শুধু এ মটা চায়ের কথা মাত্র উল্লেখ করিলাম ; বলিলে একপ দুবি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । আমরা অগ্ৰাণু কথার আলোচনা না করিয়া, অত শুধু ব্যায়ামের কথা অবলম্বনে অনুকরণে আমাদের অবস্থা বা আমাদের কতি-বৃদ্ধির কথা বুঝাইব ।

কলির পরমায়ু একশত কুড়ি বৎসর শাস্ত্র নির্দিষ্ট, কিন্তু এখন অনেকের আয়ু-স্বর্ষ্য পঞ্চাশং বৎসরের পূর্বেই অন্তমিত হইয়া থাকে । ইহা ভিন্ন জীবিত-কালের অধিকাংশ সময়ই স্থপ-বাচ্ছন্দ্য বা আরোগ্য অবলম্বনে অতি-বাহিত করিতেছেন, অথবা একপ ভাগ্যান বাস্তবিক ও দর্শন অত্যন্ত ঘটিয়া থাকে । সে কালের লোকে সভ্য কি অসভ্য ছিলেন, তদ্ব্যতীত অর্থাৎ এ কালের মার্জিত-ভদ্রতা বা 'etiquette' দোরস্তে তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন, কি না, ছিলেন, সে কথা লইয়া আমরা কোন আলোচনা করিতে চাহিনা, কিন্তু ইহা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গতি দোষ ঘটিবে না, যে, সে কালের লোকে ঋষি-প্রবর্তিত-পন্থাসূত্রে জীবনের সমস্ত ভাগই যেরূপ নিরোগ-দেহে অতিবাহন করিতে সমর্থ হইতেন, আমরা সেই মহাজন পন্থা বা ঋষি-প্রদর্শিত সন্ন্যাসী-শ্রুতি হইয়া, সমস্ত জীবন অতিবাহিত করা ত দুঃখের কথা, বৎসরের দশমাংশ সময়ও ক্ষেপণ করিতে সমর্থ হইতেছি না । ইহা ভিন্ন সে

কালের হিসাব-গণনার দীর্ঘজীবী ব্যক্তির সংখ্যা যেরূপ ভুরি ভুরি পাওয়া যাইত, এ কালে অল্প জীবির সংখ্যাই সেইরূপ উত্ত-রোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে । এ অবস্থার সে কালের আদর্শ অবলম্বনই আমাদের পক্ষে হিতজনক ছিল, কি অনুকরণে আমাদের শ্রেয়ঃ লাভ ঘটিতেছে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই ইহা চিন্তা করা উচিত ।

সে কালের লোকে অতি প্রত্যায়েই পাত্ৰোখান করিতেন । গাত্ৰোখান করিয়া, মলতাগ ও দন্ত-ধাবনাদি কার্য্য সমাপনান্তর দৈনন্দিন অগ্ৰাণু কণ্ঠের মত দৈহিক লবুতা-সম্পাদনার্থ, কর্ষ-সামর্থ্য-পরিবর্দ্ধনার্থ, অঙ্গ সৌষ্টব দৃঢ়ীকরণার্থ, বায়ু পিত্ত-কফ—ত্রি ধাতুর দোষ নিবারণার্থ—যাহাতে অগ্নি-বৃদ্ধি হয়, দেহ-শিথিল্য নিবারিত হয়, জরা ও নানা প্রকার জটিল-ব্যাধি যাহাতে অকালে আক্র-মণ করিতে না পারে—তাহার উপায় বিধান করিবার জ্ঞান—নিয়ম পূর্বক কিছুকণ ব্যায়াম কার্য্য সম্পন্ন করিতেন । সে ব্যায়াম-কার্য্য কাহার কুস্তির দ্বারা সম্পন্ন হইত, কাহার বা ভ্রমণে সুসিদ্ধ হইত । কল কথা, দৈনন্দিন স্নান এবং পান-ভোজনের মত নিয়ম পূর্বক ব্যায়াম করিতে হইবে,—ইহা সে কালে অনেকেই মনে করিতেন ।

এত গেল, সাধারণ কথা । সাধারণ লোকে এইরূপ ভাবে সে কালে ব্যায়াম-কার্য্য সুসিদ্ধ করিত । কিন্তু ধর্ম্মবৎসল, নিষ্ঠাবান হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ জাতি—বিজয়গুপ্তীর ব্যায়াম-কার্য্য কুস্তি এবং ভ্রমণাদি ব্যক্তিরেকও যেরূপ ভাবে নির্বাহিত হইত, তাহার আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, সংযম-নিয়মপরায়ণ, উদ্ভূত-পরিপূর্ণ, তপোবীৰ্য্য-বৈরাগ্য-অজ্ঞান

পুঞ্জের হিতাকাজী আমাদের আৰ্য্য ঋষি মণ্ডলী আমাদের জগৎপ, আক্ষিক-পূজার নিয়ম প্রবর্তনে, তাহার ভিতর দিয়াও সু-কৌশলে এবং অলঙ্কিত ভাবে ব্যায়াম-কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য কি এক অপূৰ্ণ ব্যবহারই না বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি বিজ্ঞাতির কুস্তি বা মল্ল-ক্রীড়ায় সময় ক্ষেপণ করিলে চলিবে না; দেশ-রক্ষার জন্য, সমাজ-বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, কুশল-কল্যাণ-চিন্তা-প্রসূত-উপদেশ-বর্ষণে সমগ্র মানবজাতির শুভাশুভ বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণৱ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতিব লোক-দিগকে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইবে এই জন্য,—সমগ্র মানব জাতিব কল্যাণেচ্ছ আৰ্য্য-ঋষিগণ তাঁহাদিগেব ধর্ম্ম-কর্ম্মের ভিতর দিয়াও যাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে, যাহাতে তাঁহারা নীরোগ দেহে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে সমর্থ হন, ধর্ম্মেব সহিত ব্যায়ামের কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় জরা-বৃদ্ধিক্য যাহাতে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে,—ইহার জন্য,—তাঁহাদিগের পূজা-আক্ষিকে, তাঁহাদের ভগবদ্রূপাসনায়, তাঁহাদের পার-লৌকিক ইষ্ট চিন্তার মধ্যে “প্রাণায়াম”র ব্যবস্থা করিয়া কি অলৌকিক শক্তিরই না পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! মানবজাতির দেহরক্ষার জন্য তাঁহাদের সেই অপূৰ্ণ উদ্ভাবনী-শক্তি স্মরণ করিলে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।

প্রকৃত পক্ষে ব্যায়াম কার্য্যের মহত্বদেখ্য প্রাণায়াম দ্বারা যে রূপ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, সে রূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

ব্যায়াম দৃঢ় গাত্রস্ত ব্যাধিনর্হস্তি কদাচন।

বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তংশীঘ্রং বিপচ্যতে ॥

অর্থাৎ ব্যায়ামের দ্বারা গাত্রের দৃঢ়তা লাভ হইয়া থাকেই, কোন ব্যাধিও ব্যায়ামশীলের শরীরে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। বিরুদ্ধ বা বিদগ্ধ দ্রব্য সকলও ব্যায়ামশীল ব্যক্তি ভোজন করিলে অনায়াসেই জীর্ণ করিতে সমর্থ হন।

এখন কথা হইতেছে; এতগুলি কার্য্য ব্যায়ামেব দ্বারা কেমন করিয়া সিদ্ধ হয় এবং সে কালের প্রাণায়াম-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কেমন করিয়া সেই সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতেন, এখন আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

শরীর রক্ষার জন্য দেহীগণের শ্বাস-প্রশ্বাসেব গতি অব্যাহত রাখা যে একান্ত প্রয়োজন, একথা লইয়া বোধ হয় কোনও বাদানুবাদই উঠিবার সম্ভাবনা নাই। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য আমাদের হৃৎকোষ্ঠ সংস্থষ্ট হৃদয় হইতে সম্পাদিত হইতেছে। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—শরীর মধ্যে কেরোটি, বক্ষঃ ও উদর—এই তিনটি গুহা বা গহ্বর বর্তমান আছে। ইহার মধ্যে কেরোটিতে মস্তিষ্ক, বক্ষঃপ্রদেশে উণ্ডুক, হৃদয় ও হৃৎকোষ্ঠ এবং উদর প্রদেশে পিত্তাশয়, আমাশয়, ক্রোম, ধমনী, স্বক্ক, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহান্ত্র, প্লীহা, বৃক্ক, মূত্রনাড়ী, বন্তি ও মূলাস্ত্রের নিম্নস্ত বর্তমান থাকে। আমরা এই তিনটি গুহার শ্রেণী-বিভাগ করিয়া, ইহাদিগকে উর্দ্ধ, মধ্য এবং নিম্ন-গুহা অধিধানে অভিহিত করিয়া লইতেছি। উর্দ্ধ এবং নিম্ন গুহার বিষয় এস্থলে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। শ্বাস-প্রশ্বাসের বিষয় বুঝিবার জন্য মধ্যগুহা বা বক্ষের বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

এই গুণের সমুদভাগে উরোহিষ্ণি, পত্ৰকো-  
নাশি ও পত্ৰকাগণ অবস্থিত করিতেছে ।  
পার্শ্বদ্বয়েও পত্ৰকাগণ ও পশ্চাদভাগে কশে-  
রুকা সকল, উপরিভাগে প্রথম-পত্ৰকা ও  
উর্দ্ধপট এবং নিম্নভাগে বক্ষঃস্থল পেশী বর্তমান ।  
এই গুহাতেই হৃৎকোষ্ঠ, উণ্ডুক ও ফুস্ফুসের  
স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে ।

হৃৎকোষ্ঠ বক্ষ প্রদেশের মধ্যস্থলে ত্রিভা-  
ভাবে একটি আবরণী দ্বারা আবৃত রহি-  
য়াছে । ইহার উপরিভাগেই ফুস্ফুসের স্থান ।  
হৃৎকোষ্ঠই বিশুদ্ধ রক্তের আধার এবং ইহা  
হৃৎকোষ্ঠেই ধমনী উৎপত্তি হইয়াছে । ইহারই উর্দ্ধ  
ও নিম্নপ্রদেশে দুই দুইটি করিয়া চারিটি গর্ভ-  
প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান । শারীর-যন্ত্রের যাবতীয়  
শিবা একত্রীভূত হইয়া, দুইটি মহাশিরা রূপে  
পরিণত হইয়াছে এবং ঐ শিরাদ্বয় উর্দ্ধস্থ দক্ষিণ  
হৃৎগর্ভে সমাগত হইয়া শরীরের সর্বপ্রকার  
দূষিত রক্তকে তথায় অর্পণ করিতেছে । অধঃস্থ  
বামগর্ভ হইতে মূল ধমনী উৎপত্তি হইয়াছে ।  
দূষিত রক্ত এই গর্ভ চতুর্দিকে উপস্থিত হইয়া,  
বিশুদ্ধতা লাভ পূর্বক প্রাণীগণকে জীবিত  
রাখিতেছে । জীবের ভূমিষ্ঠকাল হইতে মরণ-  
কাল পর্যন্ত হৃৎকোষ্ঠ একবার ক্ষতি ও এক-  
বার সঙ্কুচিত হইতেছে,—এমনইভাবে দেহী-  
গণের দেহ-রক্ষার জন্ত বিধাতা সৃষ্টি-নৈপুণ্যের  
অপূর্ণ ব্যবস্থা করিয়াছেন । হৃৎপিণ্ডের  
আকুঞ্জন-প্রসারণ ক্ষণমাত্র নিবৃত্ত হইলেই  
যুতাসংঘটিত হইবে—ইহাও বিধাতার অপূর্ণ  
নিয়ম বন্ধনী ।

যাহা হউক, যেরূপ মধুচক্র বা মোটাক  
কোষ থাকে সুসৈরী ফুস্ফুসের মধ্যে যে  
অসংখ্য কোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, উহারই  
ভিতর খাসাকৃষ্ট বায়ু রক্তনালীর মধ্যে

খাসক্রিয়া সম্পাদনান্তর সঞ্জীবনী শক্তি  
আনয়ন পূর্বক আমাদের জীবনী শক্তি বহন  
করিতেছে ।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলা যাউক ।  
খাস-ক্রিয়া দ্বারা বায়ু বায়ু নাসিকা ও মুখরন্ধ্র  
দ্বারা খাস নাড়ীতে প্রবেশ পূর্বক ফুস্ফুসের  
অসংখ্য কোষমধ্যে উপস্থিত হইতেছে । যে  
দুইটি মহাশিরা যাবতীয় শিরা-সম্মিলনে উদ্ভূত  
হইয়া, দেহ মধ্যস্থ দূষিত রক্ত সকলকে হৃৎ-  
গর্ভে সমাগত করিতেছে, তাহাদেরই দ্বারা  
আনীত রক্ত হৃৎগর্ভ হইতে ফুস্ফুসে উপস্থিত  
হইতেছে । খাসাকৃষ্ট বায়ুর সাহায্যে এই  
রক্তই বিশুদ্ধ, সুখোদ্য ও লোহিতবর্ণ হইয়া  
হৃৎকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং তথা হইতে  
ধমনীমার্গে অতি প্রবলভাবে সমুদয় দেহ পরি-  
ভ্রমণ করিতেছে ।

যাহা হউক বুঝা গেল, দেহ রক্ষার জন্ত,  
বল-সঞ্চয়ের জন্ত, খাসক্রিয়া দেহী-মাত্রেয়ই  
একান্ত প্রয়োজন । কথা বলিতে, পথ চলিতে,  
বা নাসা ও মুখবিবর হইতে খাস-প্রশ্বাস  
ত্যাগ করিতে, যে পরিমাণ খাস-ক্রিয়া দেহী-  
শরীরে সম্পন্ন হয়, শরীর ধারণের জন্ত তাহা  
যথেষ্ট নহে । এই জন্তই ব্যায়ামের প্রয়োজন ।  
প্রাণায়ামে এই খাস-ক্রিয়ার কার্য যেরূপ  
সুসিদ্ধ হয়, তাহা কুস্তি, মুণ্ডর-ভাঁজা বা জিম্-  
নাস্টিক অপেক্ষা পরিমাণে অল্প নহেই, পরন্তু  
সে ব্যায়ামে খাস-ক্রিয়ার কার্য আরও অধিক  
পরিমাণে সিদ্ধ হইয়া থাকে । সনাতন আধ্য-  
আতির প্রাচীন ইতিহাস অপুণীলন করিলে,  
এই জন্তই সেকালের তপঃ নিষ্ঠ ঋষিদিগের  
পরমায়ু সহস্র সহস্র বৎসর নির্দিষ্ট ছিল দেখিতে  
পাইয়া থাকি । মহাভারতের ভীষ্মদেব এই  
জন্তই ইজা যুত্বার অধিকারী হইয়াছিলেন ।

অমিত্তেজা দ্রোণাচার্য্যের বীরত্ব এই জন্তই বৃদ্ধি অনুলনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্য-অর্থখামার অব্যাহত শক্তিও এইজন্ত বৃদ্ধি অতাপি অমানুষিক বলিয়া ঘোষিত হইয়া আসিতেছে।

যাক্ সে কথা,—এখন আমরা শুব-বীর হইতে চাহি না, অমিত্তেজা-যোদ্ধৃবৃন্দেরও আসন-পরিগ্রহে আমাদের আশঙ্কি নাই। আমরা চাহি, এখনকার দিনে মোটা-ভাত, মোটা-কাপড়ের সংস্থান করিয়া, মোটামুটি চালে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিয়া, আরোগ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ পূর্ব্বক, জীবিতকালের সকল সময় টুকু সাচ্ছন্দ্য লইয়া কাটাইতে পারি,—মাত্র ইহাই এখনকার দিনে আমাদের লক্ষ্যস্থল,—সেই লক্ষ্যস্থল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই ব্যাঘ্রামের কথা—তথা সেকালের প্রাণায়ামের কথা স্মৃতিপথে যেন কেমনই জাগরিত হইয়া পড়িতেছে। এই জন্তই এত কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

শুধু ‘প্রাণায়ামের’ কথা কেন, সেকালে আমরা সংসার যাত্রা নির্বাহ করিবার জন্ত যে সকল কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিতাম, সে সকলের মধ্যেই প্রচুরভাবে ব্যাঘ্রাম-কার্য্যের কতকটা যেন নিহিত থাকিত। বেদপারগ-ব্রাহ্মণগণ, প্রভাতে গাত্রোপান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর “গঙ্গাগঙ্গতি যো ব্রহ্মাং যোজনানাং শট্‌গরিপি” বলিতে বলিতে যে গঙ্গাস্নান ( বা যে দেশ ভাগীরথি-স্থলভ নহে—সেখানে গ্রাম-সান্নিধ্য নদী বা দীর্ঘিকা-সলিলে ) প্রাতঃ বগাহন মানসে গমন করিতেন, তদ্বারা পথ-ভ্রমণে তাঁহাদের ব্যাঘ্রামের কার্য্য কতকটা সিদ্ধ হইত। তাহার পর, পূজোপচার-সংগ্রহের জন্ত প্রভাতানিল-প্রবাহিত, পুষ্প-বাটিকার

প্রাকুট-পুষ্পওচ্চয়নে তাঁহাদের যে ভ্রমণ টুকু করিতে হইত, তাহারও ফলে কতকটা ব্যাঘ্রামের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া যাইত। তাহার পর, আস্থিক-কালে প্রাণায়ামের কথা ত বলিয়াছি-ই। কেবল ব্রাহ্মণের কথা কেন, সকল জাতির মধ্যেই সেকালে সংসার যাত্রা পরিচালন-কার্য্য-ব্যাপদেশে, সকলেরই হেলায়-শ্রদ্ধায় ব্যাঘ্রামের কার্য্য কতকটা সম্পন্ন হইত। এখনকার মত সেকালে সার্ট-কোর্ট গায়ে দিয়া, লম্বা কোচা খুলাইয়া, কেশ-শুষ্কের পারিপাট্য সাধন করিয়া, অপরিণত বয়সে এবং নিশ্চয়ো-জনে উপচক্ষু দ্বারা চক্ষুর সম্পদ বর্দ্ধন করিয়া, ‘বাবুগিরি’র জন্ত কেহ ব্যস্ত হইত না। দরিদ্র-মহৎ, ইতর-ভদ্র, শুদ্র-ব্রাহ্মণ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ‘স্বাবলম্বন’ বলিয়া সেকালে একটা জিনিষ সকলেই মানিয়া চলিত। তাহারই ফলে, মান-কার্য্য সমাপনান্তর বস্ত্র প্রক্ষালনের জন্ত এ কালের মত সেকালের লোকে দাস-দাসীর অপেক্ষা করিতেন না, উদরপূর্ব্বির উপায়-বিধানের জন্ত বিপণি-স্থানে ঘাইতে লক্ষ্য বোধ করিতেননা, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সুখদর্শন-মানসে এখনকার মত সামান্য মাত্র পথটুকু চলিবার জন্তও তাঁহাদের ট্রাম অর্থধান বা মোটর প্রভৃতির প্রয়োজন হইত না।

ইহা ভিন্ন, সেকালে যে জাতীয়-বৃত্তির ব্যবস্থা দেশমধ্যে অল্প ছিল, তাহার ভিতর দিয়াও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাঘ্রামের ব্যবস্থা কেমন অলঙ্কিতভাবে নিষ্পন্ন হইত। বিদ্যাভিগণের কথা জো বলিয়াছি-ই, বিদ্যাভি-দিগের মধ্যে ‘বৈত’ চিকিৎসা-ব্যবস্থার ভিন্ন অজবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন না। মৌরী দেবিবার জন্ত সেই চিকিৎসা-ব্যবস্থা

বৈতগণ স্বগ্রামে পনরজে রোগি-সন্দর্শনে গমন করিতেন। ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থাও একালেব মত সেকালে লোকজন দিয়া কবাইবার বন্দোবস্ত ছিল না, সে কালের বৈতগণ নিজেরাই সে সকল সম্পন্ন করিতেন। কাজেই তাঁহাদিগের জীবিকা-নির্বাহের বৃত্তির মধ্যেই ব্যায়াম-কাৰ্য্য সিদ্ধ হইত।

কেবল ব্রাহ্মণ-বৈত কেন, সকল জাতির মধ্যেই সেকালে এইরূপে হেলায়-শ্রদ্ধায় কতকটা ব্যায়াম কাৰ্য্য হইয়া যাইত। কর্ণ-কাব, কুম্ভকার, মৌদক, নরসুন্দর, গোপ, মালি, তিলি, তাষুলী এবং অজ্ঞাত জাতির সকলেই যে সকল নির্দিষ্ট বৃত্তি লইয়া, সেকালে জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা করিতেন, তাহারই ফলে, তাহারই মধ্য দিয়া, তাঁহাদের ব্যায়াম-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। আমাদের আৰ্য্য-ঋষিগণ গবেষণার ফলে সকল বিষয় চিন্তাপূৰ্ব্বক এই জন্তই আমাদের ধর্ম্মপালন এবং করণীয় সম্পন্নের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক জাতির আশ্রমধর্ম্ম যে সকল কারণে তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছিলেন, একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে, আমাদের স্বাস্থ্য যাহাতে অব্যাহত থাকে, আমরা নীরোগ ও সুস্থদেহে যাহাতে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে পারি,—আমাদের উদারদের সংস্থানের সহিত, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালন ক্রিয়ার যাহাতে অন্তরায় উপস্থিত হইতে না পারে,—সকল কারণ অপেক্ষা আমাদের করণীয়-নির্ধারণের ইহাই তাঁহাদের মুখ্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অধুনা আমরা সে উদ্দেশ্য ভুলিয়াছি, উদ্দেশ্য বুলিতে না পারিয়া, সমাজ-রক্ষার একমাত্র নিমিত্ত—ব্রাহ্মণজাতিকে একদেশদর্শী বলিতে অভিযুক্ত

হইয়াছি, কলেজের সর্বোচ্চ ডিগ্রীলাভের জন্ত জীবিতকালের প্রায় অর্দ্ধাংশ অতি-বাহিত পূৰ্ব্বক চিরকালিত-চাকরিগত-প্রাণ সকল জাতির মধ্যেই একাকারের সৃষ্টি আনিয়া ফেলিয়াছি,—সুতরাং কে কাহার কথা ভাবিবে? ব্রাহ্মণ-শূদ্র,—সকলেই এক পন্থার পথিক হইয়াছে, কেহ কাহাকে বুঝাইবার নাই। এখন আমরা এমনই কর্তব্যদ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি যে, সহস্র-উপদেশ-বর্ষণেও বুদ্ধি আমাদের আর উদ্ধারের উপায় নাই, এই পতিত জাতির নিকট কেহ সুপথ দেখাইয়া দিলেও বুদ্ধি সে আর তাহা অবলম্বন করিতে সমর্থ নহে।

দেশের পুরুষগুলির ত দুর্গতি এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিম-রমণী-জাতির দুর্গতিও ইহাপেক্ষা কম হয় নাই। পুরুষের মত তাঁহাদিগেরও ব্যায়াম বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালন-ক্রিয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন। সে কালে তাঁহাদিগের জন্ত গৃহস্থলীর কর্ম সকল বাহা বিধিবদ্ধ ছিল, তাহাতেই তাঁহাদের সেই ব্যায়ামের কাৰ্য্য সম্পন্ন হইত। ইদানীন্তন কালে একটু অবস্থাপন্ন-সংসার মাত্রেই দাস-দাসী এবং পাচক নিয়োগের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। দাস-দাসীতে সম্বাস্ত্রজ্ঞান পরিচালন ক্রিয়া হইতে তাৎপূল রচনা, শয্যা-সংস্কার,—সকল কাৰ্য্য সম্পন্ন করিবে। পাচক, পাক কাৰ্য্যে নিযুক্ত রহিবে—ইহাই অনেক সংসারে আধুনিক ব্যবস্থা! সুন্দরী-সমাজে অনেকে এখন সৌন্দর্য্য নষ্টের আশঙ্কা করিয়া, অপর্যায়গণকেও সজ্জন দান করিতে চাহেন না! লজ্জাজড়িত-বিনয়-বধু পাছে শয্যাভ্যাগের পর লোক-সন্দর্শনে সমুজ্জ্বল হইতে, হয়,—এই ভয়ে স্ত্রী

প্রত্যয়ে শয্যা-ত্যাগ করিয়া গৃহস্থলীর বিবিধ কার্যে ব্যাহত হইতেন, সে প্রথাও এখন তিরোহিত হইয়াছে। সকল বিষয়ের মত তরুণী-বধু বা যুবতী-কছাও সেকালের জায় স্বামি স্মৃখ-মিলনে এখন আর সমমজ্জিত নহেন! ইহার জন্ত অবশ্য আমি স্মন্দরীদিগকে দোষী করিতেছিলাম, দোষী ইহার জন্ত দেশের 'স্মন্দর'গণ। 'স্মন্দর'গণ, স্মন্দরীদিগকে স্বকীয় শ্রোতে ভাসমানা করিয়া, তাঁহাদিগের এবম্বিধ অবস্থা উপস্থিত করিয়াছেন। সে ছড়া-কাঁট দেওয়া,—সে আলিপনা দেওয়া,—সে দেবগৃহ পরিকার কার্য,—সে রন্ধন, সে পরিবেশন, সে খণ্ড-খণ্ড, স্বামী, দেবর, পুত্র, কছা, অনাহত-ববাহত, অতিথি-অভ্যাগত,—সকলকে পরিতোষণার্থক ভোজন করাইয়া, সর্বশেষে অবশিষ্ট মাত্র ভোজনে পরিভূষ্ট হওয়া,—তাঁহার পর, খালা-বাসন পরিকার, ছিন্ন-বস্ত্র কষ্টা-সেলাই, বৈকালে আবার কক্ষ-পরিকার, শয্যা-পরিকার, পুনরায় নৈশ-রন্ধন—প্রভৃতি কোন কার্যেই অধুনা আর বস্ত্রমণী অভ্যস্তা নহেন। এখন তাঁহাদের বেলা ৯টার সময় শয্যা-ত্যাগ করিতে হইবে, শয্যা হইতে উঠিয়াই পুরুষদিগের মত চা পান করিতে হইবে, তাঁহার পর শুধু উদরপূর্তির ব্যবস্থা, আর নভেল-পাঠের ব্যবস্থা! একালের এই আলস্তপরতন্ত্রতার ফলেই স্মন্দরীগণ যে হিষ্টিরিয়া এবং ডিম্পেপ্সিয়া জর্জরিতা, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। প্রসব কালেও এই জন্তই অনেকে প্রসব-বাধা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। দেশে বলিষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যবান শিশুরও এইজন্ত অভাব হইতেছে। এককথায়, কি পুরুষ, কি রমণী,—সকলেই সাবেক-পদ্ধতি ভুলিয়া,

অমুকরণে অবস্থার দূর্গতি করিয়া তুলিয়াছেন। ফল কথা, একালে স্মৃখ-সুবিধায়েবী পুরুষ এবং রমণীমণ্ডলী আলস্ত-পরতন্ত্র হইয়া, অল্প চালনায় যে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে সম্যক প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, তাহাতে আর বিধা করিবার কিছুই নাই।

এই স্থলে আমাদের প্রাচীনতরঙ্গীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয়সংস্থষ্ট একটা কাহিনীর উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কিঞ্চিদন্তী,—একদা বিজ্ঞানাগর মহাশয় কোন একটা স্টেশন-মারিখে বিচরণ করিতেছিলেন। ছাট-কোট পরিধৃত, সাহেবি পোষাকে মণ্ডিত একটা বাবু একটা ব্যাগ হস্তে সেই সময় ব্যাগটি গইয়া যাইবার জন্ত একটা বাহক অন্বেষণ করিতেছিলেন। অদূরে অনাচ্ছাদিত-দেহ-শিখাধারী বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে মুষ্টিয়া বা বাহক-জ্ঞানে তাঁহাকে ব্যাগগ্রহণে আদেশ প্রদান করিলেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ও বিনাবাক্যব্যয়ে ব্যাগটি গ্রহণান্তর স্বন্ধ দেশে সংস্থাপন পূর্বক গন্তব্যস্থানে পৌছাইয়া দিলেন। ব্যাগের অধিকারী তদীয় শ্রমের বিনিময়ে অর্থদানে উত্তোগী হইয়াছেন,—এমন সময় ব্যাগের অধিকারীর পরিচিত একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“সর্বনাশ, আপনি করিয়াছেন কি? ইনি যে দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর!” ব্যাগের অধিকারী এইকথা শুনিয়া মরমে মরিয়া গিয়া, বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমার ভিখারী হইলেন। দয়াপ্রবণ মহাত্মা বিজ্ঞানাগর ইতিপূর্বেই ত তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার ব্যাগবহন করিবেন কেমন?



তিনি বলিলেন, “আমি তোমার ব্যাণ্ণ হইয়া আসিয়াছি বলিয়া, কমা প্রার্থনার কোন কারণ নাই, কিন্তু তুমি যে এই সামান্য মাত্র ব্যাণ্ণটি আনিবার জন্য অথবা অর্থের অপব্যয় এবং আগন্তু-পরতন্ত্রতার পরিচয় দিয়াছ, ইহার জন্য ভগবদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা কবা উচিত। বাপু, তোমাদের এবিধ অকর্ম্মণ্যতার কারণেই দেশের গণত আরম্ভ হইয়াছে।”

বাস্তবিক বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের সেই উক্তি আজি ভবিষ্যৎকালের মত সমগ্র বাঙ্গালা দেশে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার অমূল্য প্রাণিত-বাস্তবী এখন আর কোন কর্ম্মেই নিজের পায়ে ভর দিয়া চলিতে সক্ষম নহে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-জড়িত কি সনাতন ধর্ম্ম—কি করণীর বিষয়—সে কালের তাবৎ কর্ম্মেই বাঙ্গালী এখন বিপথ-গামী হইয়া, দুর্গতির একমুখী সর্ব্ব নিরস্তরে পতিত হইয়াছে, যে, তাহার পুনরুদ্ধার সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হয়। সেই ত সব আছে,—বাঙ্গালা দেশে সেই মার্ত্তও-মুখমালা বাঙ্গালী সকল স্থান টুকু অধিকার পূর্ব্বক বাঙ্গালী জাতিকে কর্ণ-কুশল করিতে চেষ্টা করিতেছে,—সেই হিমকুল-মৃণালভ-শান্তকরণ-স্নিগ্ধোজ্জল ফলসোমাদী হিমাংগ-কিরণ-সম্ভারে বাঙ্গালা দেশ আজিও ত স্বর্গীয় সুখ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে,—সেই মধুর মলয়-অভিযুক্ত প্রাণোন্মত্ত বিমল আনন্দ-বহু স্নিগ্ধ-অনিল-বায়নে বঙ্গবাসীর হৃদয় তন্ময় তাজিও মাতিয়া উঠিতেছে,—আমাদের পরিতুষ্টির জন্য—আমাদের আনন্দ-বিধানের জন্য—কর্ম্ম-বিজড়িত বাঙ্গালীর দেহ স্বয়ং প্রাণে কণকালের জন্যও বিভোর রাখিবার জন্য, অলিঙ্গনমূলক-কুহম বাটিকায় আজিও ত অসংখ্য পুষ্পস্তবক

প্রফুটিত হইতেছে,—সেই বসন্ত বহিতেছে,—সেই গ্রীষ্ম ছুটিতেছে,—সেই বরষার প্লাবনে পৃথিবী প্লাবিত হইতেছে, সেই সুখদ-শরতে জগজ্জননী-শারদ-প্রতিমার অর্চনা হইতেছে,—হিম প্রবণ হেমন্ত ঋতুতে সেই ত বিশ্বসংসার হিমাক্ত বিকম্পিত হইয়া পড়িতেছে। সবই হইতেছে, সবই চলিতেছে—সেকালে যেমনটি, ছিল, প্রকৃতিরানী সেকালে যেদূর সম্ভ্রা-সম্ভারে সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে দিগ্ধধূগণের আনন্দ উৎপাদন করিতেন,—এখন ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম বটে নাই? তবে আমাদের অবস্থা এরূপ হইল কেন? আমরা সেকালের স্বাস্থ্য বিজড়িত ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভুলিয়া আজি এরূপ অধঃপতিত হইয়া পড়িলাম কেন! ইহার বিষয় চিন্তা করিলে, বুক ফাটিয়া উঠে। হে সর্ব্বশক্তি-মান্ ভগবন্, তুমি এই কর্ম্মফলে-পতিত-অধঃপতিত সমাজকে উদ্ধার কর। তুমি ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। হে অনাথের নাথ, হে বিপদ ভঞ্জন, দরিদ্রের সঞ্চল, মধুসূদন, এ অবস্থার শোচনীয় সময়ে তুমিই আমাদের একমাত্র তরসাথল।

আমার আর একটি কথা বলিবার আছে। এই কথাটি বলিলেই অন্য আমার বক্তব্যের পরিণামান্তি হইবে। ব্যাঘ্র, স্বাস্থ্যরক্ষার মূল,—ব্যাঘ্র বিহীন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনার অভাব হইলে, তাহার জীবনো-শক্তি-বর্ধনের উপায় থাকিবে না,—ইহা যেমন সেকালের সমাজ-তত্ত্ব-ঋষিগণের চিন্তা করিতেন, একালেও দেশের শিক্ত সম্প্রদায় সে চিন্তার বিরত নহেন। এই জন্যই অধুনা সমস্ত সুগ-কলেজে ‘ড্রিল’ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগেই ড্রিল শিক্ষা দিবার জন্য একজন করিয়া ড্রিল-পক্ষক

নিযুক্ত আছেন। কিন্তু সে শিক্ষার মূলে এমন একটা গলদ রহিয়াছে, যে, সে শিক্ষায় আমাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইতেছে। কারণ, আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান-দেশবাসীর ব্যায়ামের ব্যবস্থা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়াই সেকালে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতির নির্দিষ্ট ব্যায়ামকালে আমাদের ব্যায়ামকাল নির্দেশ করিলে, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা নাই। স্কুল-কলেজে এই ব্যায়ামের সময় কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহরের পর তৃতীয় প্রহরেই নির্দিষ্ট। এ সময় ব্যায়াম করিলে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি ত হইতেই পারে না, স্বাস্থ্যের পক্ষে এ সময় বথেষ্ট অপকারী বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কানী-খানী কৃশক্ষয়ী ।  
রক্তপিত্তী-ক্ষতী-শেযী ন তঃ কুর্ধ্যাৎ কদাচন ॥

অর্থাৎ—আহাবের পর, দৈন্যনের পর, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং কাস, খাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতুগোষ—এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

এই অবাস্থ্য স্কুল-কলেজের অধ্যয়নশীল ছাত্রদিগের জন্ত যে ব্যায়ামকাল নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা শাস্ত্র বিগর্হিত। আমাদের বাঙ্গালী শিশুর পক্ষে ঐ সময় ব্যায়াম-নির্দিষ্টকাল হইতে পারে না। শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ গণ এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন—এজন্ত আমরা তাঁহাদিগের করণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ফল কথা,—দেশ বাসীর মতিগতি যদি আবার পরিবর্তিত হয়, সর্ববিষয়ে অনুকরণের প্রথা যদি আবার আমরা ছাড়িয়া দিয়া, সাবেক পন্থায় চলিতে চেষ্টা করি, আমাদের ধর্ম—আমাদের করণীয় বিষয়,—গর্হ্যভয়ে—মর্মে

মর্মে—আবার যদি আমরা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি,—দেশ রক্ষার জন্ত, সমাজ বন্ধনীয় অক্ষুন্ন রাখিবার জন্ত, আমাদের আয়ুষ্কালের সমস্তটুকু অপ্রতিহতভাবে অব্যাহত রাখিবার জন্ত,—আমাদের কুশল-কল্যাণেচ্ছ-ত্রিকালদর্শী আধ্যাত্মিক প্রবর্তিত—সরলী-অশেষণে আবার যদি আমরা প্রয়াস-পরায়ণ হইতে পারি, তাহা হইলে পৃথক ব্যায়ামকাল নির্দেশ করিয়া, শরীর-রক্ষার জন্ত আমাদের কোন প্রয়োজনই হইবে না,—স্বাস্থ্য-বিজড়িত ধর্ম-কর্ম করিলেই আমাদের কার্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। দেশের পুরুষমণ্ডলী দাসদাসীর এতাদৃশ মুখ্য-পেশ্য না হইয়া কর্মণ্য হউন,—সুকুমারমতি শিশুজীবনের প্রবৃত্তির অক্ষুর-কালেই তাহা-দিগকে কর্মণ্য করিবার চেষ্টা করুন,—যৌবনে সেই কর্মস্রোত অপ্রতিহতগতি লইয়া বাহ্যতে সমস্ত জীবনব্যাপী হইতে পারে,—তাহার জন্ত চেষ্টাপর হউন,—স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আর কোন অন্তরায়ই থাকিবে না। দেশের রমণীগুলিকেও আবার কর্মকুশল করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে আলস্য-অবসন্নতা হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহাদিগের হস্ত হইতে নাটক-নভেল কাড়িয়া লইয়া, বিলাস-ব্যসনে তলপত প্রাণা—তাঁহাদিগের চিত্ত বৃত্তির গতির বৈপরীত্য সাধন করিয়া, তাঁহাদিগের কুসুম-কোমল-প্রাণে অরুদ্রতী-কুতী-দ্রোপদী বা বন্ধিন চরিত্রের অপূর্ব চিত্র—শ্রী-সূর্যমুখী-ভ্রমর, অথবা রাজপুতমহিলা-সংযুক্ত-কর্মদেবীর কর্মণ্য বিষয়ের জ্ঞাতব্য কথাগুলি অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। স্বভাবস্বলভ বিলাস-বাহ্য,—প্রকৃতিরূপীণী সর্বসৌন্দর্যের অধিকারিণী,—ইহসংসারে প্রকৃতির একমাত্র সাহায্যকারিণী—দেশের রমণীদিগকে বলিতে হইবে,—“মা লক্ষ্মীস্বয়ং, আদর্শরূপে এই

অধঃপতিত জাতির পুনরুদ্ধারের জন্ত তোমরা আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য-পরায়ণ হও। —তোমরা ত চিরদিনই স্বার্থভাগ করিতে জান, আমাদের ছাড়িয়া, তোমাদের স্বাভাব্য ত কোনকালেই নাই।—আমরাই তোমাদিগকে একদা কৰ্মকুশলা ভাবে গঠন করিয়া, সমাজ রক্ষার সুব্যবস্থা করিমাছিলাম, আবার আমরাই এখন তোমাদিগের রুচি-বিপর্যয় ঘটাইয়া, তোমাদিগকে নিজ্জীব-অচেতন পদার্থের মত সজ্জিত করিয়া—সমাজ শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে বসিয়াছি। বাহা হউক, বাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর আমরা বিপথগামী হইব না—লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, কর্তব্যচ্যুত হইয়া, আমাদের স্বাস্থ্যের দুর্গতি যতদূর হইতে পারে, তাহা ত হইয়াছেই, কাণের ভিতর দিয়া মরমে মরমে কে যেন এখন আমাদিগকে আবার সেই কথা বলিয়া দিতেছে—

শ্রোয়ান স্বধৰ্ম্ম বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাৎ স্বহুষ্টিত্যাং  
স্বধৰ্ম্মে নিধনঃ শ্রেয়ো পরোধৰ্ম্মে ভয়াবহঃ।

সে ধ্বনি শুনিয়া; আরোগ্যলাভের জন্ত, স্বাস্থ্যসুখ অব্যাহত রাখিবার জন্ত, দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্ত, ঐকান্তিকমনে আবার আমরা স্ব স্ব ধৰ্ম্ম মানিয়া চলিব ইচ্ছা করিয়াছি।—স্ব স্ব ধৰ্ম্ম মানিয়া ঋষিপ্রবর্তিত কৰ্ম পরায়ণ হইব স্থির করিয়াছি,—জপতপ-পূজা আত্মিক—সৰ্বাপেক্ষা প্রাণায়ামের ব্যবস্থা নিয়মপূৰ্ব্বক পালন করিব, অভীষ্টা করিয়াছি, —তোমরা ত আমাদের সকল কৰ্ম্মের চির সাহায্য-কারিণী। তোমাদের দয়া—তোমাদের স্নেহ, তোমাদের অমুরাগস্পৃহা স্মরণ করিয়াই ত কবি তোমাদের কত গুণ-গান গাহিয়াছেন। সেইজন্ত তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি,— তোমরা আমাদের যেমন ছিলে, তেমনি হও— আমাদের জীবনাধিষ্ঠাত্রী-তোমরা, এস তোমাদের লইয়া আমরা সাবেক পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রেয়ো-লাভের চেষ্টা করি।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

## শিশুর ক্রিমি চকিৎসা।

—:—

( মহিলাগণের বিশেষ পাঠ্য। )

( ঠাকুর মা ও লীলা )।

লী। ছেলেগুলো ক্রিমিতে বড় কষ্ট পাচ্ছে ঠাকুমা, তাই এলাম।

ঠা। কা'র কা'র ক্রিমি হয়েছে ?

লী। বড় খুকি, ছোট খোকা আর বড়

খোকা—তিন জনেরই হয়েছে, ঠাকুমা।

ঠা। কি ক'রে বুঝলি যে ক্রিমি হয়েছে ?

লী। মলের সঙ্গে প'ড়েছিল যে। বড়

খোকা ও ছোট খোকাকার পেট থেকে ছদ্মি হু'টো কঁচোর মত বেরিয়েছে। আর বড় খুকির মলের সঙ্গে হুতোর মত শাদা-শাদা ছোট ছোট ক্রিমি আর মোজাই পড়ে।

ঠা। বাঃ, একেবারে মাথব-মিলাল দেখছি।

লী। মাথব মিলাল কি ঠাকুমা ?

ঠা। তা'র মানে, যত রকম ক্রিমি  
নিদানে লেখা আছে,—সব রকমই হ'য়েছে।

লী। কেন, এই দুইরকম ছাড়া আর  
ক্রিমি নেই ?

ঠা। আছে বৈ কি। আমি কথার  
কথা বর্ণনাছি। তবে আমাদের দেশে  
সাধারণতঃ পেটের ক্রিমি এই দুই রকমই  
দেখা যায়।

লী। পেটে ছাড়া অন্য কোন জায়গায়  
ক্রিমি হয় নাকি, ঠাকমা ?

ঠা। হয় বৈকি। ছোট ছোট পোকা  
শরীরে আশ্রয় করে, দেখিস্নি ! তারাও ক্রিমি  
জা'নবি। নিকি-উকুন—এরাও একরকম  
ক্রিমি। ক্রিমি, রক্তের মধ্যে ঢুকে কুষ্ঠরোগ  
পর্যন্ত জন্মাবার কারণ হয়। মাথায় যে  
টাক হয়, তারও মূল ক্রিমি জেন। তা সে  
সব কথা যাক, এখন আজ এই দুই রকম  
ক্রিমির কথাই বলবো। কিন্তু আমি ভাবছি  
যে, তুমি এত সাবধানী মেয়ে, তোর ছেলেদের  
ক্রিমি হ'ল কি ক'রে।

লী। ভাল কথা ঠাকমা, ক্রিমি কেন হয়  
বলত ?

ঠা। ওই যে কৈঁচোর মত ক্রিমি, ওগুলো  
যা'র পেটে হয়, তা'র পেট থেকে অসংখ্য  
ক্রিমির ডিম মলের সঙ্গে বেরোয়। সেই মল  
কোন রকমে জলে মিশে গেলে, সেই জলে  
অনেক ক্রিমির ডিম থাকে। আর সেই  
জল যে খায়, তা'র পেটে সেই ডিম যায়।  
জল না খেয়ে, সেই জলে শাক-সব্জী, কি ফল  
যা' কাঁচা খাওয়া যায়,—সেই সব ধূয়ে থেলেও  
তার সঙ্গে ক্রিমির ডিম পেটে যায়। আর  
১ পেটে গিয়ে সেই সব ডিম ফুটে ক্রিমি হয়।  
তারাত আবার অনেক ডিম পাড়ে।

লী। আর স্নাতো-ক্রিমি কি রকম ক'রে  
অন্ত্রের শরীরে যায়, ঠাকমা ?

ঠা। স্নাতো-ক্রিমিও প্রায় এই রকম  
ক'রেই যায়। তবে স্নাতো-ক্রিমির ডিম জলে  
ডুবে থাকলে বেশীক্ষণ বাঁচে না। ফল-ফুলুরি  
আর শাক-সব্জীর সঙ্গেই এই ক্রিমির ডিম  
পেটে যায়। এই ক্রিমি-রোগীর মলমিশান  
ধোয়াটে জল শাক-সব্জীতে লাগলে, তা'তে ও  
ক্রিমির ডিম লেগে যেতে পারে। তা'  
ছাড়া এই রোগে মল-দ্বারের চুলকানি হয়।  
রোগী মলদ্বার চুলকালে তার নখের ভিতর  
কি আঙ্গুলে ডিম লেগে যায়। আর সে সেই  
হাতে যদি কোন খাবার জিনিষ দেয়, তা'  
হ'লে তা'র সঙ্গে ক্রিমির ডিম মিশে যেতে  
পারে।

লী। আচ্ছা ঠাকমা, এই ক্রিমিগুলো  
থাকে কোথায় ?

ঠা। কৈঁচোর মত ক্রিমিগুলো প্রায়  
নাড়ীতেই (অন্ত্র বা Intestine) থাকে। তবে  
অনেক যায়গায় এমন কি গলা পর্যন্ত যেতে  
পারে। আর স্নাতোর মত ক্রিমি গুলোর আড়া  
মলভাগ, (Rectum)। তবে মুখ দিয়ে  
এসে তাদের ডিম ফোটে ব'লে নাড়ীর মধ্যেও  
তা'দের দেখা যায়। ক্রিমির বিকার জন্মে  
অনেক উৎকট রোগ হ'তে পারে লীলা।

লী। আচ্ছা ঠাকমা, এক সঙ্গে কত গুলো  
ক্রিমি থাকে আর তাদের ডিমই বা কত  
হয় ঠাকমা।

ঠা। কৈঁচো-ক্রিমি গুলো একসঙ্গে প্রায়  
২৫০০ টে ক'রে থাকে। আর স্নাতো ক্রিমি  
২০০০০—এরও বেশী থাকে। ডিম হয়  
এদের মেলা—তা'সংখ্যা করা যায় না।

লী। দেখ ঠাকমা, এইবার তোমার ছুরি

ধরা পড়েছে। আমি নিদানের বাজালা প'ড়ে দেখছি, তা'তে এসব কথা কিছু নেই। এ সব তোমার কবিরাজী নয়, চুরি করা ডাক্তারী বিদ্যে।

ঠা। লীলা, সত্যিই এসব ডাক্তারী কথা। কিন্তু কবিরাজীতে যে এ সব নেই, তা' নয়। আছে বড় গোপন ভাবে, সকলে বুঝতে পারে না। এই বিষয় নিয়ে লোকনাথ বন্ধির সঙ্গে কল্কাতার সেই বিজ্ঞ ডাক্তার বাবুটির যে সব কথা হয়েছিল, তা' শুনে, আমি অনেক শিখেছি, সে সব শাস্ত্রের কথা।

লী। ধন্তি তুমি ঠাকমা, মেয়ে মানুষ হয়ে, কি ক'রে এত শাস্ত্রের কথা শিখলে?

ঠা। তোকে কতবার মনে ক'রে দেব, যে, মেয়েমানুষও মানুষ, তা'রা জন্তু জানোয়ার কি গাছ-পালা কিছু নয়। এ সব কথার বেটা-ছেলের যতটা দরকার, মেয়ে-মানুষের ততটা বা তারও বেশী দরকার জান্‌বি। প্রাচীনকালে অনেক লেখাপড়া জানা (বিদ্বান বা পণ্ডিত) মেয়েমানুষ ছিল, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এখন অনেক মেয়েমানুষ ডাক্তারী ক'রছে, বই লিখছে, রাণীগিরি ক'রে রাজ্য চালাচ্ছে,—এওত দেখতে পাই। মেয়েমানুষ কম কিসে?

লী। ঠিক ব'লেছি ঠাকমা, আমি অতটা ভাবিনি। আর এখন আমাদের দেশের মেয়েমানুষের যে অবস্থা হ'য়েচে, তা'তে তাঁদের আত্মত্ব আর রাস্তারের বিষয় শেখা ছাড়া অন্য কিছু শেখবার দরকার আছে ব'লে বেন মনেই হয় না।

ঠা। লীলা কথাটা ঠিক বলেছিস্। সংসারে থাকতে হ'লে, পুরুষকে আর মেয়ে-মানুষকে নির্দিষ্ট কর্তব্য ক'রতে হ'বে। সেই

হিসাবেই মেয়েমানুষ আত্মত্বের, রাস্তার আর গৃহস্থালী নিয়ে থাকে। কিন্তু মেয়ে মানুষের যদি সকল দিকে হিসাব জ্ঞান না থাকে, তা'হলে সংসারের সুবন্দোবস্ত হ'তেই পারে না। পুরুষ মানুষ,—এনেই খালাস্। সেই আনা-জিনিষ ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে দেওয়া আরও শক্ত, এই জন্তেই মেয়ে মানুষের সব বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার।

লী। তা' ঠাকমা, আমরা কিন্তু এত শক্ত কাজ করি, তবু আমাদের দেশের পুরুষেরা আমাদের পারের তলার ফেলে রেখেছে। কিন্তু সাহেবেরা মেয়েদের কত মাস্ত্র করে।

ঠা। আঃ পাগলী, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা যখন পুরুষের মা, তখন তা'রা বলে, জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়। আমরা যখন তাদের স্ত্রী, তা'রা আমাদের ছেড়ে কোন কাজ ক'রতে পারে না। তাই রামচন্দ্র যজ্ঞ করবার সময় সোণার সীতা তৈরি ক'রে যজ্ঞ ক'রেছিলেন। পুরুষ মানুষ বলে, যে,—স্ত্রী আর লক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ নাই, এটা কি শোননি? আবার দেখ, আমরা যখন মেয়ে বা কন্যা হই, তখন আমরা পিতার রেহ মমতা বা' পাই, তা আর কোন দেশে আছে ব'লে আমার মনে হয় না।

লীলা। আজ আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে দিলে ঠাকমা। আমি ভাবতাম, সাহেবদের দেশে মেয়েমানুষের বেশী মান; কিন্তু এখন বুঝছি, সেটা মস্ত ভুল। ওদের ভালবাশা বা সম্মান করা অন্তঃসার শূন্য, তবে বাইরে বড় চক্‌চকে। আর আমাদের বাইরে চাকচিক্য না থাকলেও ভিতরে বড় সার আছে।

ঠা। বুঝেছি—সেও ভাল। নইলে হয়ত নাভজানাইকে কোন দিন এসোপা (Divorce) করতিন্। তা' সে কথা যাক্, এখন যে জ্ঞেত্রে এয়েচিন্, সে কথা বল্।

লালা তোমাব পায়ে পড়ি ঠাকুমা, লৌকনাথ বন্দি আর সেই ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কি কথা হ'য়েছিল—বল।

ঠা। সে অনেক কথা, তবে মোটামুটি বলি শোন। ডাক্তারে আর কবিরাজে ক্রিমি নিয়ে কথা হয়। তার পর ডাক্তার বাবু, আমি আগে যে সব কথা বলিছি, সেই সব কথা ব'লে, বললেন, “দেখুন কবিরাজ মশায়, এ সব কথা যখন আপনাদের শাস্ত্রে নেই, তখন এগুলো আপনাদের শাস্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া উচিত।”

লা। কবিরাজ মশায় কি বললেন?

ঠা। কবিরাজ মশায় বললেন,—তার জ্ঞেত্রে আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না,—রাজার জাতের অনেক জিনিষ বিলিভ জাতির মধ্যে প্রবেশ করে—তা' কি ভাষায়, কি-পরিচ্ছদে, কি খাঞ্চে আর কি ঔষধে। মুসলমান রাজার আমলে আমরা জমি-জমার বন্দোবস্ত করতাম, গায়ে মেরজাই পরতাম, মাংসের কাবাব খেতাম, মোরকা ব'লে ওষুদুও তৈয়ের করতে শিখেছিলাম। ইংরেজের আমলে আমরা গোলদে জল খাই, গায়ে কোট পরি, বিস্কুট-পাউরুটি, চপ-কটলেট খেতে শিখেছি, আর কুইনাইন সালসার ত ছড়াছড়ি! সুতরাং ডাক্তারীর অনেক জিনিষ কবিরাজীর মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে এবং করবে। তবে ক্রিমির বিষয় যা' আপনি বললেন, যেটা আমাদের শাস্ত্রে একেবারে নেই, তা' মনে করবেন না।

লা। ডাক্তার বাবু কি বললেন?

ঠা। ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন,—“বলেন কি! এসব আপনাদের শাস্ত্রে আছে?” তখন কবিরাজ মশায় থুলে বললেন, দেখুন, আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি। আপনি জানেন, যে, ফর্মী পূরণ ক'রবার জ্ঞেত্রে আপনাদের অনেক পুস্তক লেখা, আয়ুর্কেদে কিন্তু সে বিষয় ছ একটা কথায় বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। এই দেখুন, ক্রিমির উৎপত্তিব কারণ “মলিনাশন” একটা। মলিনাশন কিনা—ময়লামিশ্রিত জল আর খাদ্য। আরও দেখুন, আমাশয় আর পকাশয়ের মধ্যে ক্রিমির “প্রসব” হয় লেখা আছে। প্রসব মানে উৎপত্তি হ'তে পারে, কিন্তু কেবল উৎপত্তি বোঝা-বার জ্ঞেত্রে প্রসব শব্দ আয়ুর্কেদের কোথায়ও প্রয়োগ করা হয়নি। সুতরাং এ শব্দ প্রয়োগে শাস্ত্রকারের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—ক্রিমির প্রসব করে এটা বোঝান। আর ক্রিমির বাচ্ছা হয় না,—ডিমই হয়—এটা জীব-জগতের দিকে লক্ষ্য ক'রলে, আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি। তা' হ'লে ক্রিমির ডিমও পাওয়া গেল, আর সেই ডিম সংযুক্ত জল বা খাঞ্চই মলিনাশন।

লা। ডাক্তার বাবু কি বললেন?

ঠা। তিনি বললেন, তা' অসঙ্গত নয়, তবে বড় অস্পষ্ট,—কষ্ট ক'রে বুঝতে হয়। আর ক্রিমির অন্ত্রান্ত কারণ ত লেখা রয়েছে। তখন কবিরাজ মশায় বললেন, কারণ এক রকম নয়, অনেক রকম। ষট ত'য়ের করবার কারণ—মাটি আর কুমারের চাক, কিন্তু কুমার সবই। ঐ সব খাঞ্চে থেলে ক্রিমিরা খুব বাচ্ছতে পারি। সে জ্ঞেত্রে ওগুলোও কারণের মধ্যে।

লী। ডাক্তার বাবু তা'র কি উত্তর করলেন?

ঠা। ডাক্তার বাবু বললেন, তা' যেন হল, কিন্তু ক্রিমি রোগ যা'তে না জন্মাতে পারে, তা'র জন্মেওত সবকথা গুলো খুলে বলা উচিত ছিল। কবিরাজ ম'শায় বললেন,—অনাবশ্যক কথা বলা শাস্ত্রকারদের স্বভাব নয়। একেত জল আর খাদ্য সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ যেরূপ পরিকার-পরিচ্ছন্নতার উপদেশ দিয়েছেন, তা'তেই কার্যাসিদ্ধ হ'য়েছে,—তা'র উপর ধর্মশাস্ত্র ব'লেছেন,—জল নারায়ণ, জলে কোন রকম মল মিশ্রিত করা নিষিদ্ধ। আর খাদ্য ও জল সম্বন্ধে পরিকার-পরিচ্ছন্নতার কথাও ধর্মশাস্ত্রে অনেক ব'য়েছে। তবুও আবার আয়ুর্বেদ সাবধান কবে দিয়েছেন যে, ক্রিমি ও অণু দূষিত জল খাবে না।

লী। ডাক্তার বাবু তা' শুনে কি ব'লেন?

ঠা। ডাক্তার বাবু বললেন,—হাঁ একরকম বুঝলাম, তবে স্পষ্ট নয়। তখন কবিরাজ ম'শায় একটু হেসে বললেন,—এখন আমাদের সমস্তই অস্পষ্ট ম'শায়। জানিনে ভগবান আবার কবে স্পষ্ট করবেন। যাই হ'ক এ সুযোগে একটা বিষয় আপনাকে দেখাই। এই দেখুন কতপ্রকার অদৃশ্য ক্রিমির কথা ব'য়েছে। অদৃশ্য জিনিষ যখন তাঁরা দেখতে পোতেন, তখন হয় অস্বীকার যত্ন ছিল, নয় তাঁদের অতীজির বিষয়ের জ্ঞান ছিল। আব আজকাল যে জীবাণু নিয়ে আপনারা কেপে উঠেছেন, সেটাও তাঁদের জানা ছিল।

লী। আর কিছু কথা হ'ল?

ঠা। বলবার মত আর কোক কথা হয় নি। এখন ভোর কথা ক'ল।

লী। বলছি ত,—খোকা ছ'টির কেঁচো ক্রিমি, আর বড় খুকির ছোট ক্রিমি হ'য়েছে।

ঠা। বড় ক্রিমির প্রধান লক্ষণ নাক খোঁটা আর ঘুমিরে দাঁত কিড়মিড় করা। তা' কিছু করে?

লী। দাঁত কিড়মিড় খুব করে, আর নাকও খোঁটে।

ঠা। আর কি উপসর্গ আছে?

লী। কেমন ফাফাশে চেহারা হ'য়েছে। ভাল খেতে পারে না, মুখ দিয়ে কেবল খুঁখু ওঠে, আর কেমন নিজ্জীব হ'য়ে পড়েছে।

ঠা। বাহে কেমন হয়?

লী। বাহে ভাল হয় না। একবার ক'রে শক্ত বাহে হয়।

ঠা। এখন থেকে এ রোগ ভাল না হ'লে এর পর পেটের অস্থখ দাঁড়া'বে।

লী। তা'তেই ব'লছি, তোমার শীগগির ভাল ক'রে দিতে হবে।

ঠা। আচ্ছা তা' হবে, এখন ওষুদের কথা বলি শোন। কমলাগুড়ি ব'লে এক রকম ইটের রঙ্গের ভারি গুড়ো বেনের দোকানে পাওয়া যায়। তাই কিনে এনে জলে ফেলতে হবে। যে গুলো ভেসে থাকবে, তাই নিয়ে শুকিয়ে রাখবি।

লী। আচ্ছা জলে ফেলতে হয় কেন ঠাকুমা?

ঠা। ওর সঙ্গে অনেক গুলো-বালি মিশান থাকে কিনা। জলে ফেললে গুলো-বালি গুলো নীচে পড়ে যায়, আর ওষুদ গুলো ওপরে ভাসে।

লী। আচ্ছা আমি এককম ক'রেই দেখি।

ঠা। এই কমলাগুড়ি তিন রতি সাজান। টাইকা বোলের সঙ্গে সকালে খাদ্য পেটে খেতে

দিবি। আর শুধু কমলাগুঁড়ি না দিয়ে  
বিড়ঙ্গ, নৈক্ষব, সাচিকাব, হরীতকী আর  
কমলাগুঁড়ি সমান ভাবে নিয়ে গুঁড়ো ক'রে  
এক আনা কি দেড় আনা মাত্রায় হয় বোল,  
নয় ত গরম জলের সঙ্গে দিলে আবও  
ভাল হয়।

লী। সাচিকাব জিনিসটা কি আর  
পাবই বা কোথায়?

ঠা। সাচিকাব আর কিছুই নয়, সাজি-  
মাটি। বেণের দোকানে পাওয়া যায়।

লী। আচ্ছা আর কি ওষুদ দেব বল?

ঠা। সকালে ঐ ওষুদ দিস, আর বিকালে  
পলাশ বীজ তিন রতি আর বিড়ঙ্গ তিন রতি  
হয় বোলের সঙ্গে, নয়ত জলের সঙ্গে বেটে  
দিস। ক্রিমির পক্ষে বিড়ঙ্গ খুব ভাল জিনিস  
জানবি। শুধু বিড়ঙ্গের গুঁড়া তিন রতি মাত্রায়  
হ'বেলা খাইয়েও ক্রিমি ভাল করা যায়।

লী। আর কি দেব?

ঠা। আর কিছু দিতে হবে না, যে  
সকল বললাম, ঐ সব দিলেই ভাল হ'য়ে  
যাবে। এর উপর একটু-একটু চুণের জল  
দিতে পার।

লী। আচ্ছা তবে খুকীকে কি ওষুদ দেব  
বল?

ঠা। সকালে খালিপেটে সোমরাজী-  
বীজের গুঁড়ো তিন রতি, গরম জলের সঙ্গে  
দিস। আর বিকালে কেঁউ গাছের মূলের  
রস আধ তোলা মধুর সঙ্গে দিস।

লী। যদি কেঁউ মূল না পাই?

ঠা। তা' হ'লে পাল্তেমাদারের ছালের  
রস কি ডালিমের শিকড়সিকড় জল দিস।

লী। এর চেয়ে সহজ কিছু নেই?

ঠা। আছে বৈ কি,—কচি আনারস

পাতার রস, বেঁটুপাতার রস, শাঞ্জে শাকের  
রস—এ সমস্তই ক্রিমির ভাল ওষুদ। আর  
বিড়ঙ্গ যে খুব চমৎকার ওষুদ তা'ত আগেই  
ব'লেছি।

লী। তা'র পর পথিয়ার কথা বল?

ঠা। পথিয়ার কথাও ব'লছি। কিন্তু দেখ,  
এই যে, স্নাতোর মত ছোট ক্রিমি এগুলো বড়  
বিশী। ওষুদে সহজে যেতে চায় না।

লী। ওষুদে না গেলে তবে কিসে যাবে?

ঠা। পিচকারী ক'রে ওষুদ দিলে খুব  
শীগ্গিবে যায়।

লী। সে কি ঠাকুমা, কবিরাজীতে  
আবার পিচকারি ক'রে ওষুদ দেওয়া কি!  
সে ত ডাক্তারেরাই দেয়!

ঠা। তুই জানিসনে, তাই ব'লছি।  
পিচকারী দেওয়াকে কবিরাজীতে 'বস্তি'  
বলে। বস্তিকে শাস্ত্রে অর্ধেক চিকিৎসা  
ব'লেছে। ডাক্তারদের পিচকারী দেওয়া,  
কবিরাজী বস্তির কাছে কিছুই নয়। বস্তি যে  
কত রকম আছে, তা'র ঠিক নেই।

লী। কিন্তু এখন ত কোন কবিরাজকে  
বস্তি দিতে দেখিনি?

ঠা। তোকে কতবার বলবো, যে, শাস্ত্রে  
যে সব চিকিৎসার কথা আছে, তা'র সিকির  
সিকিও এখন কবিরাজেরা ক'রতে জানে না।  
কবিরাজী মতে ক্রিমির চিকিৎসা ক'রতে  
হ'লে, প্রথমে রোগীকে, যি কি অন্য কোন  
মেহ পান করা'তে হয়। তা'র পর বমি  
করিয়ে, পরে জোলাপ দিতে হয়। তা'র পর  
বস্তি দিয়ে পরে ওষুদ দিতে হয়। এখন এসব  
আর কেউ করে না, কেবল খাণ্ডার ওষুদ দেয়।

আম তাইতে যোগও সহজে ভাল হয় না।

লী। কি ওষুদের বস্তি দিতে হয়?



ঠা। বস্ত্রের কথা আর সে সব ওষুদের কথা এখন ছেড়ে দাও, এখন দরকার হ'লে, ডাক্তারের সাহায্যে পিচকারি দিতে হ'বে। সাবান-ঘসা জল, কি ছোট পেরাজের রস এই ছুটার একটা কিছু নিয়ে পিচকারী দিলেই হয়।

নী। সে পিচকারী দেওয়ার হাঙ্গামায় এখন কাজ নেই ঠাকুমা। ওষুদে ভাল হ'বে না ?

ঠা। ভাল হ'বে না এমন কোন কথা নেই। বরং সুপথ্য আর ওষুদ প'ড়লে ভাল হ'বাই কথা। তবে তা'তে ভাল না হ'লে, পিচকারী দিতে হ'বে তাই বলে রাখলাম।

নী। আচ্ছা তুমি এখন পথ্যের কথা বল।

ঠা। প্রথমে এ রোগে কি কি খেতে নেই তাই বলি। ঘি, দুধ, দই, মাষকলায়, শাক নাংস, মিষ্টি, টক, পিটে, ঠাণ্ডা জিনিষ, বেগী পাতলা জিনিষ—এ সব খেতে নেই জেনে বেখ।

নী। তা' কচিছেলে দুধ না দিলে কি ক'রে চলবে ?

ঠা। না,—দুধ দিতে হবে বৈকি, তবে যা' থায় তা'র অর্দ্ধেক আন্দাজ দিবি। আর ১৫২০টে বিড়ঙ্গ খেঁতো ক'রে, জল এক পোয়া আর দুধ এক পোয়ার সঙ্গে সিদ্ধ ক'রবি। জল ম'রে গেলে, ছেকে নিয়ে সেই দুধ দিবি। যদি বিশ্বাস ব'লে খেতে না চায়, তবে একটু মিছরী মিশিয়ে দিয়ে দিস্।

নী। আর কোন রকম ক'রে দুধ দেওয়া চলে না ?

ঠা। কুলখি কলায়ের কাথ ক'রে তা'র সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারিস্। ঝুটটা দুধ তা'র সিকি আন্দাজ কাথ মিশিয়ে দিতে হয়।

লা। কাথ কি নিয়মে ক'রতে হয় ?

ঠা। এই মনে কর আধ ছটাক আন্দাজ কুলখিকলায়ের দাল নিয়ে, একসের জলে সিদ্ধ করে একপোয়া থাকতে ছেকে নিবি।

নী। আর কোন রকমে দুধ দেওয়া যায় না ?

ঠা। যত দুধ তা'র সিকি আন্দাজ চুণের জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও চলে। তবে চুণের জলে একটু বাছে কথা করে ব'লে, যা'দের পাতলা বাছে হয়, কি বেশী বাছে হয়, তা'দের গন্ধেই ভাল।

নী। আচ্ছা ঠাকুমা, কবিরাজীতে ত নানা রকম দুধের ব্যবস্থা আছে; তা' ক্রিমি রোগে কি কোন দুধ ভাল নয় ?

ঠা। কেবল উটের দুধ ভাল। তা' সে পশ্চিমে যে দেশে উট আছে, সে দেশের লোকেই কেবল পেতে পারে। তোমরা তা' আর পাবে না।

নী। আচ্ছা দুধের কথা ত হল, কিন্তু মিষ্টি একটু না দিলে ত চলবে না।

ঠা। মিষ্টির মধ্যে মিছরী, তাও যত কম হয়, ততই ভাল।

নী। আচ্ছা আর কি কি দিতে পারি বল।

ঠা। পুরাণ দাদখানি চালের ভাত, মোচা, কাঁচকলা, উচ্ছে, করলা, পলতাশাক, পটোল, বেতোশাক, নিমপাতা—ভরকারীর মধ্যে এই সব সুপথ্য। তবে হ' একখানা আলু, বেগুন মধ্যে মধ্যে না দিলে চলবে না। কটা, লুচি, পাঁড়কটা, বিস্কুট—এ সব এ রোগে মোটেই চলবে না।

নী। দাল কিছু দেওয়া যেতে পারে ?

ঠা। দাল এ রোগে সুপথ্য নয়, বোল-

ভাতই খেতে দিস। তবে নেহাৎ কোন দিন  
কারে পড়লে, একটু অঁড়হর,—কি কুলখি  
কলায়ের দালের ঘুস দিস।

লী। মাছ-মাংস কিছু দেওয়া যেতে পারে ?

ঠা। মাংস এ রোগে একবারেই কু-  
পথ্য। মাছও স্থপথ্য নয়।

লী। কেন ঠাকুমা, তুমি বলতে, যে, কবি-  
রাজীতে সব রোগেই মাংসের ব্যবস্থা আছে।

ঠা। তা' আছে, কিন্তু সে মাংস কি দিতে  
পারবি ? এ রোগে ইহরের মাংস স্থপথ্য।

লী। সে কি ঠাকুমা, ইন্দুরের মাংস কি  
মানুষে খায় ?

ঠা। কেন থা'বেনা ? মানুষের অখাদ্য  
কি আছে ! এক দেশের লোকে না খায়,—  
অন্য দেশের লোকে খায়।

লী। তা থাক্, কিন্তু মাছ একটু-আধটু  
না হ'লেত ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হ'বে।

ঠা। তা' একটু আধটু মাছ দিস।  
খলশে, কৈ, মাগুর, শিজি,—কি মোরলা  
মাছ,—যত কম দিয়ে রাখতে পারিস্,  
তা'রই চেষ্টা করবি।

লী। রাত্রে কি খেতে দেব ?

ঠা। রাত্রে সন্ধ্যা হলে, ছা'ট ভাত দেওয়াই  
ভাল। তবে নেহাৎ যদি ভাত সন্ধ্যা না হয়,  
দুধ-বাঁলি, কি, খৈ-দুধ দিস্। কিন্তু দুধ যেমন  
ক'রে ব'লেছি, তেমন ক'রে সিক্ত ক'রে দিবি।

লী। জলখাবার—কি দিতে পারি ?

ঠা। এ বিদ্যুটে রোগে পথ্যের বড়  
ক'টুকেনা। তা' দাড়িম, পানকল, হু' চারটে,  
কিসমিস, আনারস আর একটু মিছরী,—এই  
দিস্। আনারসটা এ রোগে স্থপথ্য।

লী। ছা'ট মুড়ি দিতে পারিনে ?

ঠা। মুড়ি কি অল্প ভাজা-পোড়ার নাম

একবারেই ক'রনা। এ রোগে ও গুলিকে  
বিষ ব'লে জানবে।

লী। আর কি দেওয়া যেতে পারে ?

ঠা। আর কিছু নয়, যা' বললাম, তাই  
দিবি। আর ঠাণ্ডা জল না দিয়ে, আগে যেমন  
গরম জল কি গরম জল ঠাণ্ডা ক'রে দিতে  
ব'লিছি তাই দিবি।

( মেজ বোয়ের প্রবেশ )

মে। এই যে ঠাকুরঝি কখন এলে ?

লী। অনেকক্ষণ এয়েছি। এখন তোর  
রান্না কেমন চলছে বল দেখি ?

মে। এখন আর রাঁধতে কষ্ট বোধ হয়  
না, অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

লী। দেখলি ত ?—পারিনে—ব'ললে  
কোন কাজই পারা যায় না, আর পারি  
ব'ললে,—সব কাজই পারা যায়।

ঠা। শুধু তাই নয় লীলা, মেজ রাঁধতে  
শিখেছেও বেশ। বড় বোয়ের চেয়ে ভাল রাঁধে।

লী। সাধ্লেই সিক্তি, শিথলে সব কাজই  
ভাল ক'রে ক'রতে পারা যায়।

মে। তা'তে আমার বাহাদুরী কিছু  
নেই। ঠাকুমা হাতে ধ'রে সব শিখিয়েছেন।

লী। সে ত বটেই, সংসারে পাকা-গিরি  
না থাকলে সে সংসারের বোঝা কি রাগাই  
বল, বা কি ছেলে-পিলে মানুষ করাই বল—  
কোন কাজই ভাল ক'রে শিখতে পারে না।

( ছোট-বোয়ের প্রবেশ )

ছো। ঠাকুর শীগুগীর আসবেন, তাঁর  
চিঠি এসেছে ঠাকুমা।

ঠা। কি সুখের আজ দিলি ছোট।  
কা'র কাছে চিঠি এয়েছে ?

ছো। বড় ঠাকুরের কাছে, তিনি ওপক্কেই  
আছেন।

ঠা। চল্ সবাই, কি খবর শুনিগে।

( সকলের প্রস্থান )

## আয়ুর্বেদের কথা ।

—:~:—

( ১ )

- ( আজি ) সৃষ্টভারত উঠেছে জাগিয়া  
লুপ্ত রতন আশে,  
( তাই ) দীপ্ত-বাগনা জেগেছে এখন  
ক্ষিপ্ত-পরাণ পাশে ।  
ব্যর্থ করিতে বন্ধ-ধারণা,  
মর্শ-মার্বারে কি যেন গাহনা  
( ওগো ) স্তব্ধ করিছে কে যেন গাহিয়া—  
স্বিধ-মধুর ভাবে ।  
গর্জ করিয়া কে যেন কহিছে,  
মর্শ ভিতরে সে কথা পশিছে,  
“সেই আয়ুর্বেদ, জ্ঞানের গরিমা  
( দেখ ) উদেছে ভারতাকাশে ।”

( ২ )

- দেখিলা স্রষ্টা সৃষ্টি লোপ হয়,  
পাপের ফলেতে ধরা রোগময়,  
আয়ুসকালের অগ্র-সময়ে—  
ব্যাধি যে বিশ্বনাশে ।  
( তাই ) ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক-কারণে  
জীবের কুশল আরোগ্য স্থাপনে  
লক্ষ শ্লোক পূর্ণ রচিলা সংহিতা,  
—যা‘তী’র মনেতে আসে ।  
দক্ষ প্রজাপতি শিখিগা সে বাণী,  
অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ে নিলা মানি,  
ঠাণ্ডাও রচিলা স্বকীয় সংহিতা  
কহিলা ইজের পাশে ।  
ইজ হইতে আর্ঘ্য ঋষিগণ,  
আত্রেয়, অঙ্গিরা, শিখিলা চ্যবন,  
আর আর ঋষি সকলে শিখিলা—  
বসিয়া আত্রেয়বাসে ।

( ৩ )

- যখন কেশব বেদের উদ্ধার  
করিতে হইলা মন্ত্র অবতার,  
এই ‘আয়ুর্বেদ’ দেব অনন্ত  
লভিলা পরমোন্মাদে ।  
তিনিই ‘চরক,’—মুনিপুত্র হ’য়ে  
করিলা সংস্কার পূর্ব শ্লোকচয়ে,  
‘চরকসংহিতা’ রচনা তাঁহারি,  
( বাহে ) বিশ্ব চমকে ভাসে ।  
দেব ‘ধন্বন্তরি,’ ‘দিবোদাস’ হ’য়ে  
জন্মিলা কালীতে নরদেহ ল’য়ে,  
মহাবি ‘স্বশ্রুত’ তাঁহারি শিষ্য,—  
রোগেরা কঁপিল ভ্রাসে ।  
শল্য-চিকিৎসা সৃষ্ট তাঁহারি  
রোগ ক্লিষ্ট দেখি যত নরনারী,—  
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে সে সব,  
( শুধু ) স্বতিটি সমুখে আসে ।

( ৪ )

- এই ‘আয়ুর্বেদ’ ভারতে প্রথম,  
ভারত হইতে আরবীয়গণ,  
আরব হইতে গ্রীসবাসিগণ  
লভিল মধুরোন্মাদে ।  
গ্রীস দেশ হ’তে সমগ্র মেদিনী  
শিখিল চিকিৎসা,—ভুলিল এ ধ্বনি  
শিহরিল সব যুক্তি দেখিয়া ;—  
এ শক্তি কেমনে আসে !

( ৫ )

- সব দেশে গেল,—সবাই শিখিল,  
ভারত সন্ধান কিন্তু গো ভুলিল,  
আপনার ধন অগরে প্রেমারি,  
রহিল দীর্ঘ বাসে ।

এমনি করিয়া জগত চলিছে,  
এমনি করিয়া উঠিছে পড়িছে,  
দিবসে মার্ভণ্ড, নিশায় চন্দ্রমা  
(বুঝি) এমনি করিয়া হাসে।

(৬)

সেদিন বিগত হ'য়েছে এখন,  
সেই সুখ-স্বর্গ্য উড়েছে তেমন,  
আবার ভারতবাসীর প্রাণে  
অতীত আশঙ্কি আসে।

আবার 'বাসক' 'গুলঞ্চ' 'অশোক'  
সেই 'কালমেঘ' দিতেছে পুলক,  
(এখন) সকলে বুঝেছে, সবই ত র'য়েছে  
—ছড়ান বাড়ীর পাশে।

সেই 'পুনর্গণা' সেই কণ্টকারী'  
সেই সে র'য়েছে 'তুলসী-মঞ্জরী',  
আতপতাপিত সেই 'আয়াপান'।  
সেই ত ইন্দ্রীতে হাসে।

সেই 'অখগন্ধা' শ্রেষ্ঠ রসায়ন,  
আর কোথা পাবে এ হেন রতন।  
সেই 'হরীতকী' সেই 'আমলকী'  
সেই ত পাতার পাশে।

(৭)

যা' ছিল আবার লভিতে হইলে  
শিথিতে হইবে গিয়াছি যা' জ্বলে,  
তা'রই আয়োজন হ'তেছে আবার,  
তা'তেই মনেতে আসে,

(আজি) সুপ্তভারত উঠিল জাগিয়া  
লুপ্তরতন আশে,

(তাই) দীপ্ত-বাসনা জেগেছে এখন  
ক্ষিপ্ত-পর্যাণ পাশে।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ মেনগুপ্ত।

## অঙ্গরাগ ও অঙ্গরক্ষা।

—:—

অধুনা স্বাস্থ্যরক্ষার ত্রায় সৌন্দর্য্য রক্ষাও  
সভ্যজগতে আদরের সামগ্রী হইয়াছে। এমন  
কি, স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াও অনেককে সৌন্দর্য্য  
রক্ষার জন্ত যত্নবান হইতে দেখা যায়। সাধা-  
রণতঃ অধিকাংশ লোকেই সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির  
জন্ত দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া  
থাকেন। একটা পরিচ্ছন্ন ও অপরিষ্কার অঙ্গ-  
রাগ। এ দুইটা লাভ্য বৃদ্ধির পক্ষে যে  
সহায়তা করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।  
কিন্তু অনেক স্থলেই ইহাদের একরূপ অসুপযুক্ত  
প্রয়োগ হইয়া থাকে, যে এতদ্বারা কেবল  
বাহ্যসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয় মাত্র, ইহাতে

স্বাস্থ্যরক্ষার কোন সহায়তা ত করা হয়ই না,—  
বরং ইহার ফলে স্বাস্থ্য বিশেষরূপে বিয় প্রাপ্ত  
হইয়া পড়ে। এখনকার দিনে যে সকল  
মূল্যবান পরিচ্ছন্ন দ্বারা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা  
করা হয়, মূল্যান্তিণ্য বস্তুতঃ সেগুলি প্রায়  
যৌত করা হয় না, বা যদি করাই হয়, তাহা  
হইলেও বহুকাল অন্তর তাহার ব্যবহা হইয়া  
থাকে। আবার হয়ত যৌত করিলে পরি-  
চ্ছদের সৌন্দর্য্যের লাভ হইবে বলিয়া, চির-  
কাল অব্যোত অবস্থাতেও উহা রক্ষা করা হয়।  
এইরূপ আচরণে পরিচ্ছদের বাহ্য সৌন্দর্য্য অক্ষত  
থাকে বটে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত

সিদ্ধ হইয়া স্বাস্থ্যহানি ও রোগোৎপাদনের কারণ উপস্থিত করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময় অঙ্গাবরণ দ্বারা শারীরিক গঠনবিকাশ বন্ধিত হইবে বিবেচনা করিয়া প্রাকৃতিক গঠনের নৈলক্ষ্যতা উৎপাদন করতঃ সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি চেষ্টা করা হয়। ইয়ুরোপাদি পাশ্চাত্য সভ্যদেশে রুমণীগণের মধ্যে কসে'ট ব্যবহার ইহার একটা উদাহরণ। চীনদেশীয়া স্ত্রীলোকগণের চরণের ক্ষুদ্রতা সাধনও ঐরূপ। মঙ্গলপন দ্বারা যে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করা হয়, তাগ প্রায় মুখলাবণ্য-বৃদ্ধির জন্ত বা অনাবৃত স্থানের লাবণ্যবৃদ্ধির জন্ত। যদি স্বাস্থ্যই ভাঙ্গিতে থাকিল, এইরূপ উপায়ে লাবণ্য কতদিন থাকিবে? ইহাতে স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যহানিও হইতে থাকিবে।

লাবণ্যবৃদ্ধির প্রধান উপায়—পরিকার-পরিচ্ছন্নতার জন্ত স্নান ও অঙ্গধাবন অতিশয় প্রয়োজনীয়। যেমন মল, মূত্র, খাসপ্রবাস দ্বারা দেহাভ্যন্তর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ শ্বেননির্গমনের সঙ্গেও নানা প্রকার দূষিত পদার্থ বাহির হয়। শ্বেনের জন্য অংশ শুধাইয়া যাইলে, ঐ সকল পদার্থ স্বকের উপর প্রলেপবৎ জমিয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরে এইরূপ প্রতিদিন যে ক্রেন সঞ্চিত হয়, উহার ওজন প্রায় ১/১ সের। যদি এতগুলি পরিকার না করা হয়, তাহা হইলে উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া শ্বেনগ্রন্থি-সমূহের মুখ বন্ধ হইয়া শ্বেননির্গমনের পথ বন্ধ করিয়া ফেলে। উহার ফলে নানাবিধ চর্মরোগ ও অন্যান্য রোগও উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং উহা পরিকার করা প্রয়োজন। এইজন্য স্নান ও গাত্রধাবন আবশ্যিক। স্নান ও গাত্র-ধাবনকালে এই জন্তই গাত্রমল উঠাইয়া

ফেলিতে হয়। কেবল জলধৌত করিলেই যে গাত্র পরিকার হয় তাহা নয়। গাত্রমল উঠাইবার জন্ত গাত্র বর্ষণ আবশ্যিক। এই গাত্র-বর্ষণের সহায়তার জন্ত আমাদের দেশে তৈলাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে অনেকে সাবান ব্যবহারও করিতেছেন। সাবানে গাত্র পরিকার অতি সহজে এবং অল্প সময় মধ্যে সম্পন্ন হয় সত্য, কিন্তু উহাতে চূর্ণ ও ক্ষার থাকায় উহা দ্বারা কেবল যে ক্রেন উঠিয়া যায়, তাহা নহে, উহাতে স্বকেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। তৈল-মর্দনে অধিক সময় আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু উহাতে স্বকের কোন হানি হয় না, বরং মন্থনতা বৃদ্ধি করে। তবে অধিক পরিমাণ তৈল যদি গাত্রে লাগিয়া থাকে এবং ভাল করিয়া বর্ষণ বা মর্দন দ্বারা উঠাইয়া ফেলা না হয়, তাহা হইলে তদ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে। ধূলি প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ এবং শ্বেনদূষিত পদার্থ তৈল সংযুক্ত হইয়া, অর্নৈসর্গিক গাত্রমলে পরিণত হয়, উহা দ্বারা শ্বেননালীসমূহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তৈল উত্তমরূপে মর্দন করিলে, কিয়ৎ-পরিমাণে শরীর মধ্যে শোষিত হয় ও কিয়ৎ-পরিমাণে গাত্রমলের সহিত সন্মিলিত হইয়া, উহাকে কোমলাকারে পরিণত করে। তখন উহা উঠাইবার সুবিধা হয়। মর্দন দ্বারা মাংসপেশীর ও স্নায়ুসংশ্লিষ্ট অনেক সময় আভ্যন্তরিক যন্ত্রেরও হিত সাধন হয়। গাত্রমল উঠাইবার জন্ত কেবল রিক্তহস্ত-বর্ষণ কষ্টকর হইয়া পড়ে, তৈলাক্ত হস্তে গাত্র মর্দন করিলে বর্ষণ সুস্বাধ্য হয়। পরন্তু তৈল দ্বারা গাত্রের কোমলতা, মন্থনতা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া যেমন তৈলরূপে নিষেধ হইয়া থাকিবে না। কোন বিষয়েই স্বেচ্ছাচার্য্য

ভাল নয়। হিতকর বস্তুর ও আতিশয্যে হিতের পরিবর্তে অহিত সাধনই হইয়া থাকে। ঝাঁহারা সাবান ব্যবহারে অভ্যস্ত তাঁহারা অত্যন্ন পরিমাণে সাবান মাখিয়া অঙ্গ ধোত করিয়া, পরে অল্প পরিমাণে তৈলমর্দন করিতে পারেন।

বেশম ব্যবহার দ্বারাও গাত্রমল পরিষ্কার হয় এবং ইহা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিরও সঙ্গায়তা করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা চর্মরোগও নিবারিত হয়। ইহা ব্যবহারে ত্রণাদি চর্মবোগ হইতে পারে না। মস্তুরের বেশম সর্বাঙ্গপেক্ষা উপকারী। ছোঁলার বেশমও মন্দ নহে।

ছুধের সর মাখার প্রথা আমাদের দেশে পূর্বে খুবই প্রচলিত ছিল। এখনও পরীগ্রামে স্থানে স্থানে উহার প্রচলন আছে। অধুনা ক্রিম, ভ্যাসেলিন, পোমেড প্রভৃতি বিলাতী দ্রব্য উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ সকল বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারে অর্থাব্যয় অধিক হয়। কিন্তু ইহাদেব অপেক্ষা ছুধেব সবেব বে লাভা-বর্দ্ধিনী শক্তি অধিক, তাহা আমাদের পরীক্ষিত। ছুধের সর ও বাদাম একত্রে শিলাপিষ্ট করিয়া মুখমণ্ডলে বা অন্ত্রাঙ্গ অঙ্গে প্রতিদিন লেপন করিলে, তত্ত্ব্য ত্বকের বর্ণের উৎকর্ষ সাধিত হয় অর্থাৎ গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

পূর্বে আমাদের দেশে হরিত্রালেপনের প্রথা ছিল। এখনও উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, ও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে হরিত্রা লেপনের প্রথা আছে। উহাও বোধ হয় সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জ্ঞ। এইজন্তই পূর্বে বোধ হয় পীতবর্ণকেই লোকে গৌরবর্ণ বলিতেন। এখনকার বিবিয়ানা গৌরবর্ণ বোধ হয় তাঁহারা ভাল বাসিতেননা বা তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। পীতবর্ণ যে গৌরবর্ণ বলিয়া অভিহিত হইত,

তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'সোণার বরণ,' 'কাঁচা সোণার রং,' 'তপ্ত কাঞ্চনেব ভায় বর্ণ' ইত্যাদি কথা প্রাচীন কালের অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। আধুনিক গ্রন্থকারেরাও এই সকল কথা বহুল ব্যবহার করেন। আমরাও কথায় কথায় বা গল্প করিতে করিতে এই সকল কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং সোণার ভায় পীতবর্ণ যে এ দেশেব গৌরবর্ণ ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। বিবাহেব পূর্বে গাত্র-হরিদ্রা নামক যে মাস্তুলিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, উহাও বোধ হয় বর-কস্তার সৌন্দর্য্য-সাধনের জ্ঞ। আজকাল অনেক সৌখীন বাড়ীতে পার্শ্বী দেখাইবার সময় পেণ্ট করিয়া দেখান হয়। এ পেণ্ট অবশ্য কাঁচা সোণার রং নহে, উহা বিবিয়ানা রং। পেণ্টের রং ধোত কবিরামাত্র উঠিয়া যায়, হরিত্রার রং ধোত করিলেও সহজে যায় না। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার কাঁচা সোণার রং রুচি-বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং হরিত্রা-লেপনও রহিত হইয়াছে। এমন কি, বিবাহের সময় মাস্তুলিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ অনেক হলে কেবল লগাটে ফোঁটা দেওয়া হয় মাত্র। হরিত্রা-লেপনে নানারূপ চর্মরোগ নিবারিত হয়। গাত্রে হরিত্রা লেপন করিলে কাঁট-মশকাদির দংশন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বাহ্য হউক রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই।

এইবার পরিষেব সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া, আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিব। তাপ ও শৈত্যের আক্রমণ হইতে স্বাস্থ্যরক্ষা করা ও লজ্জা নিবারণ—এই উভয় উদ্দেশ্যে গাত্রাবরণ প্রয়োজন। তাপ ও শৈত্য হইতে শরীর-রক্ষার জ্ঞ পক্ষ পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর রৈস্মিক

আবরণ আছে। পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা আমরা আমাদের গাত্র আবৃত করিয়া থাকি। দেশ-কাল বিশেষে পরিধেয়ের বিভিন্নতা হইতে পাবে। আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশে পরিধেয় পাংলা, লণ্ড ও ঞ্বেতবর্ণ হওয়া আবশ্যক। শীত-কালে পরিধেয় অপেক্ষাকৃত মোটা হওয়া উচিত। কার্পাস নির্মিত ঞ্বেতবস্ত্র মন্দ পরিধেয় নয়। গরম বা তপ্তবায়ু কাপড় সর্কোপেক্ষা ভাল। ইহা প্রথমতঃ ব্যয়সাধ্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে কার্পাস-বস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এফ জেডা তপ্ত কাপড় ৫১৬ বৎসর খুব টেকে। প্রতিদিন জলধোত কাপড় ও আট দশ দিন অন্তর একবার করিয়া,

রিটা দ্বারা ধোত করিলে বেশ পরিকার থাকে। বেশম তাপ, শৈত্য-বোধক। স্নাত্তাং তপ্ত বা গরম কাপড় দ্বারা শরীরের উত্তাপ রক্ষিত হয় এবং বায়ু তাপ-শৈত্যের আক্রমণ হইতে শরীর অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের পরিধেয় চিলা হওয়া আবশ্যক। আঁট বা টাইট পরি-চ্ছদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি-সাধনের বিষয় ঘটায়। শুভ্র ও পরিকার-পরিচ্ছদই স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেই সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পোষাক পরিচ্ছদের চাকচিক্যে সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করা,— ছেঁড়া-চুলের গোঁপা বাঁধার জায় অস্বাস্থ্য।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

## হার্ট ডিজিজ্ ও হৃদরোগ ।

::

মাননীয়

শ্রীযুক্ত আয়ুর্বেদপত্র সম্পাদক মহোদয়গণ

সমীপেষু।

( পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর। )

পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে হার্টডিজিজ্ ও হৃদরোগ নামক প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পাঠাই-তেছি। আশাকরি, পূর্ববারের জায় অনুগ্রহ পূর্বক এবারেও আপনাদের বিখ্যাত পত্রের এক পার্শ্বে ইহার জন্ত কিঞ্চিৎ স্থান দানে যথিত করিবেন।

পরিশেষে প্রতিপক্ষ যে একটা সাংখ্যাত্তিক আপত্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহা শুনা নাত্র ধর্ম্মপ্রাপ্ত হিন্দুর মর্মে যে নির্দারুণ শূল বিদ্ধ হইবে এবং আত্মজ্ঞাতীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, তাঁহারা যে শোক-হৃৎখে মুহমান হইয়া

পড়িবেন, তাহার আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তাঁহারা বলেন,—“তাঁহারা, ডাক্তার বাবু-দের কাছে শুনিয়াছেন, এবং নিজেরাও শব-চ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন যে, আমাদের কথিত হৃদয়ের স্থানে (আমাশয় মুখে) হৃদয়ের আকারের কিছুই দেখিতে পান নাই।” হৃদয় সমস্ত তর্কের মূল হৃদয়গীতি “আকাশ-কুসুমবৎ দ্রব্যাহীন নাম মাত্র।”

এই আপত্তির কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমরা আপত্তিকারী কবিরাজ মহাশয়

দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, যে, যেখানে ডাক্তার বাবু কিছু দেখেন নাই, আপনারাও কিছু দেখিতে পান নাই, সেই সেই স্থানে কি কিছুই থাকিতে পারে না? শত শত ব্যক্তি যে স্থানে কোনও এক বস্তুর ভ্রাণাত্মক করিতেও পারে না, ছই এক ব্যক্তি সেখানে তীব্র গন্ধ পায়। এইরূপে দৃষ্টিশক্তির প্রখরতার তারতম্য বশতঃ দর্শন শক্তিরও ন্যূনাতিরেক হইতে পারে। হইতে পারে, আপনাদের পরিচিত ডাক্তার বাবু বা আপনারা হৃদয়ের স্থলে কিছুই দেখিতে পান নাই। তা' বলিয়া আয়ুর্বেদ,—কেবল আয়ুর্বেদ কেন, যোগ, তন্ত্র, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রের প্রাণ স্বরূপ এবং আর্ধ্য চিকিৎসা গ্রন্থের, প্রায় অধিকাংশ প্রধান প্রধান রোগের মূল স্বরূপ এই জন্মশ্রুতির অস্তিত্ব স্বীকার করা সমাচীন কি? আমরা যাহা দেখিতে পাই না, তাহারই অস্তিত্বে অবিশ্বাস করাটা ত শুভ লক্ষণ নহে।

এই যে আমাদের বাস গৃহে প্রকাণ্ড কাঠের কপাট রহিয়াছে এবং তাহাতে যে অগণিত ছিদ্র রহিয়াছে, তাহার একটাও কি আমরা দেখিতে পাই? না পাইলেও কি উহা সচ্ছিন্ন বলিয়া আমরা সকলেই স্বীকার ও বিশ্বাস করি না। যদি তাহাই করা যায়, তবে যোগবলে অপ্রমেয় শক্তি সম্পন্ন মহর্ষিদিগের উপর আপনাদের এত অরূপা কেন? একি কাল মাহাত্ম্য!

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রটা কিছু “নরু হরু”র লেখা বা উন্নত প্রলাপ কিবা অজ্ঞ জনের কপোল কল্পিত করনা বাক্য নয়। যে মহর্ষিগণ ভূতলে প্রকৃত ও লক্ষ লক্ষ যোজন দূরস্থ গ্রহাদির

আকার প্রকার, গতি বিধি ও গম্যপথ নখ-দর্পণের মত দেখিয়া, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, যে জ্যোতিষের বার, তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহণাদি ব্যাপার অতাপিও ঐ শাস্ত্রের অনুসৃত্যর জাজ্ঞল্যমান প্রমাণ দিতেছে, এবং অবোগী সাধারণ মনুষ্যের স্থূল দৃষ্টি এবং বস্ত্রাদির অগোচর হৃদ্যাদি পি হৃদ্য বস্ত্রও বাহারা সহজ দৃষ্টিতে “করামলকবৎ” প্রত্যক্ষ করণে সমর্থ ছিলেন, সেই স্মৃতীক্স জ্ঞানেন্দ্রিয় শালী সত্যতঃ লোকহিতরত নিঃস্বার্থপব মহর্ষিগণই এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেরও প্রণেতা। তাঁহারা যে না জানিয়া, না শুনিয়া, না দেখিয়া স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে এই জন্মশ্রুতির কথা মিথ্যা করিয়া রচিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, যে সাহসে আপনারা এই কথা বলেন, সেই সাহসকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যোগবলে ইন্দ্রিয় শক্তির যে কতদূর উন্নতি জন্মিতে পারে, তাহা আমাদের মত অবোগী পুরুষের বুদ্ধি ও ধারণারও অতীত।

আর্য্যজাতির এই চরম অধঃপতনের কালেও যোগবলে যেরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতেছে এবং যোগীদিগের ইন্দ্রিয় শক্তির বিশেষতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে, তাহাতে বর্তমান যোগিগণের গুরুস্থানীয় আয়ুর্বেদ প্রণেতা মহর্ষিগণের দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির একটা ধারণা ও আমাদের আসিতে পারে না।

আয়ুর্বেদানুশীলনকারী ব্যক্তি যাত্রেরই জানা আছে যে, বৈশ্যায়ন বেদব্যাসেরও সমস্ত বৎসর পূর্বে, তাঁহার গুরুকন্ম মহর্ষিগণ হৃ-লোকে আয়ুর্বেদ প্রচার উদ্দেশ্যে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।



এই বেদব্যাসই যখন অপর এক ব্যক্তিকে গবে বসিয়া হৃদর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার এবং সমুদ্র কল্লোলবৎ কোলাহলপূর্ণ যুদ্ধস্থলস্থ লোকের পবম্পর কথোপকথন স্পষ্টাক্ষরে শুনিবার শক্তি প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্ম বেদব্যাসের দর্শন ও শ্রবণ শক্তির একটা ইয়ত্তা করাও আমাদের সাধ্যাতীত। এখন এট বেদব্যাসের গুরু স্থানীয় আত্রেয়, বশিষ্ঠ, পরাশর প্রভৃতি আয়ুর্বেদ প্রণেতা মহর্ষিগণের দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রখরতা যে আমাদের ধারণা এবং কল্পনারও অতীত ছিল, তৎসম্বন্ধে অধিক বলা নিশ্চয়োজ্ঞান।

যোগবলে দর্শন শক্তির একটা বিষয়কর দৃষ্টান্ত আমরা অত্যন্ত কাল পূর্বের ঘটনা অবলম্বনে দেখাইতেছি। ( ঘটনার সম- সাময়িক বহু লোক এখনও জীবিত আছেন )। ঘটনাটি এইরূপ—ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদী গ্রামে ৮লোকনাথ ব্রহ্মচারী নামে এক মহা- পুরুষের আশ্রম ছিল। উক্ত মহাপুরুষকে কোনও এক বিচারালয়ে সাক্ষী স্বরূপে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে যতদূর হইতে ঘটনা দেখার কথা, ব্রহ্ম- চারী মহাশয় বলিয়াছিলেন, ততদূর হইতে ঐ রূপে ঘটনা দেখা সাধারণ মানুষের পক্ষে একবারেই অসম্ভব। তাই বিপদের মোক্তার বাবু, ব্রহ্মচারী মহোদয়ের উক্তি মিথ্যা প্রতি- পন্ন করার অভিপ্রায়ে ব্যঙ্গধরে বলিয়াছিলেন, —মহাশয় এতদূর হইতে এইরূপে ঘটনা দেখা কি সম্ভব? তদুত্তরে ব্রহ্মচারী মহাত্মা বলিয়া- ছিলেন, “দেখ, মোক্তার বাবু! ঐ বে ( অমূল্য নির্দেশে দেখাইয়া ) দূরে একটা গাছ দেখিতেছেন, ওটা কি গাছ বলিতে

পারেন?” উত্তরে মোক্তারবাবু গাছের বিখ- মানতা মাত্র স্বীকার করিলে ব্রহ্মচারী বলিলেন, “দেখ বাবু! আমি ঐ গাছের পাতাগুলি স্পষ্ট দেখিতেছি। বলিতেছি ওটা কাঁঠাল গাছ; আর ঐ গাছের মূল দেশ হইতে এক বাঁক লাল পিপড়া উহার কাণ্ড পর্যন্ত উঠিতেছে; আমি উহার এক একটা পিপড়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র- রূপে দেখিতেছি।” এই কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন এবং কোতূহল পরবশ হইয়া সেই গাছের তলায় যাইয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

অতঃপরও যদি প্রতিপক্ষ বলেন, মহর্ষিগণ সহজ দৃষ্টি প্রভাবে সৌর জগতের বিষয় অব- গত হইতে পারেন নাই, যন্ত্র বলেই তাঁহারা সৌর জগতের বিবরণ অবগত হইয়া জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে, যন্ত্রবলেই মহর্ষিগণ, মানব দেহের অস্থি, মাংস, শিরা, ধমনী এবং মর্মাদি অবগত হইয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাসত করা উচিত, কিন্তু হৃৎকেন্দ্র বিষয় তাহাতেও প্রতিপক্ষের অল্পমাত্রও বিশ্বাস নাই।

শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেই জানেন, যে, ভারতের চরম উন্নতির সময়ে পূর্ণাবয়ব আয়ু- র্বেদীয় চিকিৎসা-প্রভাবেরই ছিন্ন-শিরক্ক ব্যক্তি যুক্তশির হইয়া পুনর্জীবিত হইতেন। এই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-প্রভাবেরই পূর্বদিনের ক্ষত বিক্ষত দেহ যোদ্ধৃবৃন্দ তৎপরদিনই অক্ষত দেহে পূর্ণ বলবীৰ্য্যে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন— এরূপ ঘটনাও অনেক বাটরাছে। সেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে, মহাশয়ের বীজ, চেতনার আধার স্বরূপ, বহু রোগের আশ্রয় স্থল এই জ্ঞানখণ্ডটা ( শুধু জ্ঞানার্ণব নয় উদাহিত চতুর্বিংশ ধমনী, তাহাদের নাম, স্থান ও

কার্যাদি) মিথ্যা করিয়া লেখা সম্ভবপর কি?

আমরা স্পর্ধা সহকারে বলিয়া থাকি, “আর্য চিকিৎসা শাস্ত্র পৃথিবীর বাবস্তীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ” এই কথার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে, না ইহা অপরিণত বয়স্ক ও অপরিণত মস্তিষ্ক ব্যক্তির স্বভাব-মূলত চপলতা সম্ভূত?

একটুকু সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, যে, এই উক্তি একেবারে অসঙ্গত নহে। আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে প্রচলিত অপরাপর সমস্ত চিকিৎসাই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে, নানা-বিক পরিমাণে এই আর্য চিকিৎসার নিকটে ঋণী। এইটী আমাদের স্বথ ও সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্তু এতদ্বারা আয়ুর্বেদের সর্ব-প্রাধান্য নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইতে পারে না। কালে গুরু হইতেও শিষ্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান জন্মিতে পারে। আয়ুর্বেদের প্রাধান্য প্রতীপাদক বহু বিষয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট একটা বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপরোক্ত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দিন দিন উন্নতি অভিযুগে ধাবিত রাজ-শক্তি পৃষ্ঠপোষিত ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান যে সমস্ত স্বাস্থ্য শারীর তত্ত্বের আবিষ্কারে অক্লান্ত কার্য রহিয়াছেন, আর্য ঋষিগণ অতুলনীয় শক্তিবলে, বিভিন্ন দেশে চিকিৎসার হ্রতপাতের ও সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে, সেই সমস্ত গূঢ় শারীরতত্ত্ব ও তত্ত্ব-বস্তুর ব্যাধি ও চিকিৎসা আবিষ্কার পূর্বক স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, ঐ সমস্ত শারীর যন্ত্র মধ্যে মর্শ্বগুলি

এক শ্রেণীর যন্ত্র। সর্বদেহে তাঁহারা ১০৭টা মর্শ্ব নির্দেশ পূর্বক উহাদিগকে বিভিন্ন শাখা শ্রেণীতে বিভক্ত করতঃ তৎসমস্তের অবস্থিতি স্থান ও ক্রিয়াদি এবং কোনটী আহত হইলে দেহীর কিরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয় তাহাও বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই অংশে আয়ুর্বেদ অতুলনীয়, এই অংশে আয়ুর্বেদের প্রাতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসা শাস্ত্র অগতে নাই। এই অংশেই আয়ুর্বেদের অবিসম্বাদী প্রাধান্য, এই শ্রেণীর মধ্যে শিরামর্শ্ব শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার হৃদমর্শ্ব সর্বশ্রেষ্ঠ। এই হৃদমর্শ্ব অবলম্বনেই বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত।

আমাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কবিরাজ মহাশয়েরা প্রায় সকলেই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, খাঁটি কবিরাজ, শুধু ডাক্তারী কৃহকে মজিয়াই তাঁহাদের এই শৌচনীয় পরিবর্তন। ঋষিবাক্যে এই ঘোরতর অবিশ্বাস। জানিনা, তাঁহাদের এই শুভাশুভ্যায়ী ডাক্তার বন্ধগণ কোন শ্রেণীর ডাক্তার। খৃষ্টধর্ম্মালম্বী খাঁটি বিলাতী পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান—পারদর্শী সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার ওয়াইজ প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সাহেব মহোদয়গণও এই মর্শ্বগুলির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন নাই। এমন কি তাঁহারা এই বিষয়ে একটুকু সন্দেহানও হন নাই। তাঁহারা যে এই গুলির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় ত ইহাই বুঝা যায়। তাঁহারা বলিয়াছেন, হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ-পণ্ডিতগণ, কোন ও অপ্রাকৃত শক্তি (Supernatural power) প্রভাবে এই তত্ত্বের (মর্শ্বের) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিজাতীয় চিকিৎসা-তত্ত্ববিদ এই সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের স্বপক্ষে

আয়ুর্বেদের প্রাধান্য হৃৎক এই প্রকার কথা শুনিলে, কোন্ আর্ধ্য বংশধরের অন্তঃকরণ আনন্দে না উৎফুল্ল হইয়া উঠে ! কিন্তু আমরা অধঃপতনের এমন চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি যে, অতি উপাদেয় হইলেও নিঃস্বপন উপর আমরা একান্ত বীতশ্রদ্ধ। উহা দেখিলেও যেন আমাদের অশ্রদ্ধার উদয় হয়। হে ভগবন্, কবে আমাদের এই কুহক ভঙ্গ হইবে ?

আমাদের করতলে মধ্যাহ্নলী মূলে তল মর্ষ নামে একটি মর্ষ আছে। তাহাতে হৃৎক বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। অথচ হাতের কজাটা সমস্ত কাটিয়া ফেলিলেও মানুষ জীবিত থাকে। এই গূঢ় রহস্য আর্ধ্য চিকিৎসা গ্রন্থ ব্যতীত আর কোথাও আছে কি ? বৃদ্ধা-শূষ্ঠ ও তর্জ্ঞীর মধ্যেও একটি স্নায়ুমর্ষ আছে। এই মর্ষে শস্ত্রাঘাতে কালান্তরে আক্ষেপ (ধমুষ্ঠকারাদি) জন্মিয়া মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ কোনও হাসপাতালে বাতরোগযুক্ত এক রোগী উপস্থিত হইলে, সিবিলাসার্জন উহাকে অস্ত্র দ্বারা আরোগ্য করিতে হইবে, ঠিক করিলেন। কিন্তু ভারতবাসী হিন্দু আসিষ্ট্যান্ট বাবু, সাহেবকে বলিলেন, হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রমতে

এই স্থানে “ক্ষিপ্ৰমর্ষ নামে” একটি মর্ষ আছে, তাহাতে অস্ত্রাঘাত লাগিলে কালান্তরে টিটেনাস হইয়া রোগীর প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা। সুতরাং অস্ত্র প্রয়োগে নিরস্ত থাকাই আমার মত। একেত সাহেবের কেতাবে একথা নাই, ভাষাতে অবীনস্থ নেটিবের কথামুযায়ী কার্য্য করিলে সাহেবের প্রেস্টিজ থাকে না ; কাজেই সাহেব নেটিবের কথা অগ্রাহ্য করিয়া, শস্ত্রপাত অর্থাৎ “সক্সেসফুল অপারেশন্” করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া, শত মুখে হিন্দু চিকিৎসার অসারতা প্রমাণ এবং ত্রিরাত্রি পর্য্যন্ত আসিষ্ট্যান্টের শ্রদ্ধা করিলেন। চতুর্থ দিনে রোগীর টিটেনাস উপস্থিত হইল। তখন হইতেই সাহেবের মস্তক নত হইল ও বাকশক্তি বিরহিত হইল। (চিকিৎসা সম্মিলনী পত্রিকা দেখুন) অতএব সাহুনের অনুরোধ, কোনও ডাক্তারের কথা শুনিয়া কিম্বা ডাক্তারী পুস্তক পাঠ করিয়া, পরম কারুণিক ঋষিবাক্যে অশ্রদ্ধাপর না হইয়া, আহুন আমরা সকলে মিলিয়া আর্ধ্য চিকিৎসার বিজয় বৈজয়ন্তী স্বরূপ এই মর্ষ গুলি, যত তত্ত্ব মস্তকে লইয়া বেড়াই।

বিনয়াবনত—

শ্রীরাজকুমার দাশগুপ্ত ।

## পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোটকা ঔষধ ।

::

অজীর্ণে ব্যবস্থা—অজীর্ণ বশতঃ আপক দান্ত হইলে, লবণ দুই আনা এবং যমানি (যোয়ান) দুই আনা না চিষাইয়া একটু জলের সহিত গিলিয়া ফেল, বিশেষ উপকার পাইবে।

অগ্নিমান্দ্যের ষোণা।—(১) আঁটি বাদ দিয়া হরীতকীর গুঁড়া দুই আনা, গুঁঠের গুঁড়া দুই আনা, পুরাতন গুড় দুই আনা এবং সৈন্ধব লবণ দুই আনা এই চারিটা দ্রব্য একত্র মিলাইয়া প্রত্যহ সেবন কর,

অগ্নির দীপ্তি হইবে। (২) প্রত্যহ শুষ্ঠের শুঁড়া ছই আনা একটু গব্যঘূতের সহিত মিশাইয়া অর্দ্ধ ছটাক গরম জলসহ পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। (৩) অন্ন পরিমাণে আদার কুচি এবং সৈন্ধব লবণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন কর, অগ্নির দীপ্তি হইবে। (৪) পিপুলের শুঁড়া চারি আনা ও পুরাতন শুড় চারি আনা প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে মলবদ্ধতা নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

#### স্বরভঙ্গে সুব্যবস্থা।—(১)

কতকগুলি কচি কুলপাতা তুলিয়া একটু সৈন্ধব লবণের সহিত মিশাইয়া গব্যঘূতে ভাজিয়া কয়েক দিন সেবন কর,—স্বরভঙ্গ সারিয়া যাইবে। (২) সমান ভাগে হরিতকী ও পিপুলের শুঁড়া একটু সরিষার তৈলে মাখাইয়া মুখে ধারণ কর, স্বরভঙ্গে উপকার হইবে। (৩) পীপড়িখয়ের শুঁড়াও ঐরূপ তৈলাক্ত করিয়া মুখে রাখিলে স্বরভঙ্গের উপশম হয়।

#### দন্তরোগের ব্যবস্থা।—যে

কোন কারণে দাঁতের বেদনা হইলে অর্দ্ধআনা সৈন্ধব লবণ অর্দ্ধ গ্লাস জলে ভিজাইয়া রাখ। প্রত্যহ রাত্রে শয়নের পূর্বে ঐ জলে কুলকুচা কর, যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইবে। বেদনার সহিত দাঁত নড়িতে থাকিলেও এই যোগে আশু উপশম হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে রাত্রির মত দিবসেও ইহার ব্যবহার করিতে পারা যায়।

#### শূলবেদনার মর্হোষ্ম।—

(১) শায়কের খোলা ভষ্ম করিয়া, সেই ভষ্ম ছই আনা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক ছটাক গরম জলের সহিত পান কর,—শূল

বেদনা সারিয়া যাইবে। এই ঔষধ সেবনের পূর্বে একটু গব্য ঘূত মুখবিবরে মাখাইয়া লইও। (২) প্রত্যহ প্রাতঃকালে আঁটিবাদ দিয়া আমলকীর শুঁড়া চারি আনা লইয়া মধু ও গরম জলের সহিত সেবন করিলে শূল রোগের শান্তি হইয়া থাকে। (৩) প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে শূলরোগের উপশম হয়। (৪) বিব (বেল) বৃক্ষের মূলের ছাল, এরণ্ড (বাগ্ ভেরেণ্ডা) মূল, চিতামূল, শুষ্ঠ, হিং ও সৈন্ধব লবণ—সবগুলি সমানভাগে লইয়া, একত্র করিয়া, জল দিয়া বাটিয়া লও। শূল রোগীর বেদনাব সময় উহা তাহার উদরে বেশ করিয়া প্রলেপ দাও, যন্ত্রণার আশু শান্তি হইবে।

#### কণ্ঠিতস্থানের রক্তবন্ধের

উপায়।—(১) কতকগুলি আপাং বা অপামার্গের পাতা তুলিয়া রস কর। কণ্ঠিত স্থানে উহা লাগাইয়া দাও, সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হইবে। (২) কতকগুলি ছুরীঘাস তুলিয়া রস বাহির করিয়া কণ্ঠিত স্থানে লাগাইয়া দাও, তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইবে। (৩) কয়লার শুঁড়া লাগাইলেও সন্তোঃ রক্তবন্ধ হইয়া থাকে।

#### পতনের বেদনানাশের

ব্যবস্থা—হঠাৎ পড়িয়া গিয়া স্থান-বিশেষে আঘাত লাগিলে, ধানিকটা টাটকা গোবর অনেকখানি জলে গুলিয়া ফুটাইয়া লও। তাহার পর, আহত স্থানে সেই জল অগ্নে অগ্নে ঢালিতে থাক, সঙ্গে সঙ্গে একজন হাত দিয়া মর্দন করিতে থাক। যে কয় দিন না আহত স্থান ভালরূপে সারিবে, সে কয় দিন প্রত্যহ সকালে-সন্ধ্যায় এই ব্যবস্থা করিও।

## বৃত্তিক দংশনে ব্যবস্থা—

(১) হুঁকার জল দ্বারা ধৌত করিলে বৃত্তিক দংশনের আলা নিবৃত্তি হয়। (২) তুণসীর মূল

বাটিয়া একটা গুটিকা কর। সেই গুটিকা বৃত্তিক দংশন স্থানে লাগাইতে থাক,—বিষ নষ্ট হইবে।

কবিরাজ শ্রীসত্যসরণ সেনগুপ্ত।

## আয়ুর্বেদে নিদ্রাতত্ত্ব।

—:—

আহার, স্নিদ্ধা ও ইন্দ্রিয়-দমন (যম ও দম) এই তিনটি শরীরের উপস্তম্ভ বা ধারক। এই তিনটি উপস্তম্ভ বৃত্তি পূরক ব্যবহৃত হইলে আয়ুঃ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে বল ও বর্ণের উপচয় হয়। আয়ুর্বেদে নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু প্রভৃতিকে স্বাভাবিক ব্যাধি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আহার ব্যতীত যেমন আমাদের শরীরধারণ অসম্ভব, নিদ্রা ব্যতীতও তদ্রূপ জীবনধারণ করা যায়না। সুখদুঃখ, বলাবল, পুষ্টিক্রশতা, স্ত্রীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞান এবং জীবন, মরণ, নিদ্রা আয়ত্ত্ব। অকালে বা অধিক পরিমাণে নিদ্রা সেবন করিলে অথবা নিদ্রা একেবারে সেবন না করিলে, মনুষ্যের স্বাস্থ্য ও আয়ুঃ শেষ হইয়া থাকে। অপিত নিদ্রা যুক্তিপূরক সেবন করিলে, দেহের সুখ ও দীর্ঘায়ুলাভ হইয়া থাকে। অনাহারের জায় অনিদ্রাও জীবের মৃত্যুর কারণ হয়। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে চীনদেশীয় জৈনিক বণিক হত্যাকারার অপরাধে নিদ্রা-বিহীন মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন, প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। আহার বিহারাদি সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি কোনরূপ কঠোরতার ব্যবস্থা করা হইল না। কিন্তু নবম দিনে তাঁহার বরণা এত অসহ্য হইয়াছিল যে, তিনি প্রহরীদিগকে তাঁহাকে

হত্যা করিবার জন্ত কাকুতিমিনতি করিতে-লাগিলেন। এই অবস্থায় অষ্টাদশ দিবসে তাঁহার প্রাণবিরোগ ঘটিল।

যেমন ভুক্তদ্রব্যের সম্যক পরিণত রস অদৃষ্ট কর্ম ও হেতুর দ্বারা আমাদের দেহকে তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ যাপন করিয়া জীবিত রাখে, তদ্রূপ অদৃষ্ট হেতু ও কর্মের দ্বারা নিদ্রা আমাদের দেহকে তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ, যাপন করিয়া জীবিত রাখিতেছে। দৈনিক পরিশ্রমে আমাদের শরীরের যে ক্ষয় উৎপন্ন হয়, নিদ্রা-কালে তাহা পূরণ হইয়া থাকে। নিদ্রা বৈষ্ণবী, শাক্তিনায়িনী, ভৃংখনাশিনী, ভূতধাত্রী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

নিদ্রা আর কিছু নয়,—বোধের অভাব নিদ্রা এবং নিদ্রায় অভাব জাগরণ-বোধ। জীবের বোধ বা বুদ্ধি কি? দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ, রস ও স্পর্শ—এই পঞ্চবুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপকরণ দ্রব্য যথাক্রমে জ্যোতি, আকাশ, ক্রিতি, জল, ও বায়ু। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান স্থান যথাক্রমে অক্ষিষ্ণু, কর্ণধ্ব, নাসিকাধ্ব, জিহ্বা, ও স্বক। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় বোধ যথাক্রমে দর্শন-বোধ, শ্রাবণ-বোধ, স্পর্শবোধ, স্বাদবোধ ও স্পর্শবোধ, এবং

ইহারা বুদ্ধি নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও আত্মা এক যোগ হইলেই বোধের উদয় হয়। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ ও আত্মা ইহাদের সংযোগ হইলেও মনোযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা বোধ হয় না।

মনেব অস্তিত্ব, জ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব দ্বারা জানা যায়। মনঃ একাদশ ইন্দ্রিয়ের অত্যন্তম—অতএব মন একটি স্বতন্ত্র বস্তু। মনকে অঙ্গ্যকরণ, সত্ত্ব, অতীন্দ্রিয় এবং অন্তরীন্দ্রিয় কহে। যাহা চিন্তা, বিচার, তর্ক, ধ্যান, বা সংস্কল্প করা যায় এবং যাহা জ্ঞেয়—তৎসমস্তই মনের বিষয়। তর্ক ও বিচার মন হইতে উৎপন্ন হয় এবং তৎপরে বুদ্ধির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ যে ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করে, তাহা মনের সাহায্যেই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের পর মনের কার্য্য হয়, তাহা স্বপুণ হইতে পারে, সন্দোষও হইতে পারে। পরে বুদ্ধির প্রবৃত্তি হয়। মনের যে নিশ্চয়তা তাহাকে বুদ্ধি কহে। মনের বিষয় ও আত্মা একত্র হইলে, মনের চেষ্টা নির্বাহিত হয়। মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়াত্মক, মনের অধীনে ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে মনটী আত্মা-সংযুক্ত, নচেৎ মন অচেতন। বোধের অভাব নিদ্রা, নিদ্রায় যে বোধের অভাব হয়, সে সমস্তই বাহ্যেন্দ্রিয়গণের বোধের অভাব। নিরিন্দ্রিয় প্রদেশের মনের অধিষ্ঠানকে নিদ্রা বলে। অন্তরীন্দ্রিয়-মনের বোধের অভাব হয় না। কারণ নিদ্রিতাবস্থায় আত্মা মনের সাহায্যে বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া অপরিচিতের জ্ঞায় ধৃতি, স্মৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি যুক্ত হইয়া স্মৃৎ হৃৎ ভোগ করিয়া থাকে। বাহ্যেন্দ্রিয় গণের অন্তরীন্দ্রিয় মনের

সহিত অযোগ্যই নিদ্রা। এই অযোগ্যের কারণ তমো বা অজ্ঞ নৈসর্গিক কারণ। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে হৃদয়ই নিদ্রার স্থান ;

“পৃণুরীকেন সদৃশং হৃদয়ং শ্রাদধো মুখং।

জাগ্রত শুদ্ধিকগতি স্বজতশ্চ নিদ্রীমতি ॥”

হৃদয়ের আকার পদ্মমুকুলের জায়, উচ্চ অধোমুখে থাকে, উচ্চ জাগ্রত অবস্থায় প্রস্তুত এবং নিদ্রিতাবস্থায় নিম্নলিখিত থাকে। সেই হৃদয়ই চেতনার স্থান, তাহা তমোগুণে আবৃত হইলে সর্বপ্রাণী নিদ্রিত হয়।

মহর্ষি সূত্রত বলিয়াছেন :—

“হৃদয়ং চেতনা স্থান মূলং সূত্রত দেহিনাম্।

তমো'ভিত্তে তস্মিংশু নিদ্রা বিশতি দেহিনাম্ ॥

নিদ্রাহেতুত্তমঃ সত্ত্বঃ বোধনে হেতুকচ্যতে।

স্বভাব এব বা হেতুর্গরীয়ান্ পরিকীর্ত্যতে ॥”

যে সূত্রত সংহিতায় হৃদয়ই চেতনার স্থান উক্ত হইয়াছে, সেই হৃদয়ে তমোগুণ অভিভূত হইলে নিদ্রা প্রাণীদিগের শরীরে আবিষ্ট হয়। তমোগুণ নিদ্রার হেতু (তমো মোহ বা আবরক গুণ, তমো চেতনাকে বা সত্ত্বগুণকে মুগ্ধ বা আবৃত করে) এবং সত্ত্বগুণ জাগরণের হেতু (সত্ত্বগুণই চেতনা) অথবা নিদ্রা বা জাগরণের মুখ্য কারণ স্বভাবই বলা যাইতে পারে।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন :—

বড়ঙ্গমদ বিজ্ঞান মিস্রিয়াত্বর্থ পঞ্চকং।

আত্মাচ মণ্ডলশ্চেতি চিন্ত্যঞ্চ হৃদসংশ্রিতম্ ॥

হৃই হস্ত, হৃই পাদ, মধ্যদেহ ও মস্তক এই ছয়টি লইয়া মানব দেহ। চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চবুদ্ধী-  
ন্দ্রিয় রূপরসমাদি পঞ্চইন্দ্রিয়ার্থ, স্বপুণ আত্মা ও চেতঃ হৃদয় ইহাদের আশ্রয় স্থান। যেমন ঘরের চাল প্রভৃতির আশ্রয় আড়া, সেইরূপ হৃদয় উক্ত দ্রব্য সমূহের আশ্রয় স্থান। বস্তুনি

স্পর্শজন্য জন্মিয়া থাকে, তাহা হৃদয়ে আশ্রিত। হৃদয়েই ওজঃধাতু বা বলের প্রশস্ত স্থান। হৃদয়েই চৈতন্তের আশ্রয়। এষ্ট চেতনা-স্থান হৃদয় যখন স্লেষ্মার দ্বারা অভিভূত হয়, তখন প্রাণিগণ নিদ্রা যায়। এই স্লেষ্মা বুদ্ধির অবরোধ জন্মাইয়া প্রাণিগণের নিদ্রা উৎপন্ন করে। নিদ্রা বা জাগরণ হ্রস্বের বাত-প্রতি-ঘাত ব্যতীত অস্ত্র কিছুই নয়।

তমোগুণবশে ইন্দ্রিয়গণ বিকলতা প্রাপ্ত হইলে, অনিদ্রিত যে ভূতাত্মা তাহাকে নিদ্রিতের চার উপলব্ধি হয়। জীব, নিদ্রা গেলে কক্ষীপুরুষ তাহার উপব কর্তৃত্ব করে। এক কথায় ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্নতাই নিদ্রা।

যখন জীব নিদ্রা যায়, তখন কক্ষীপুরুষ শুধু যে তাহাব উপর কর্তৃত্ব করেন তাহাই নহে, বজ্রোয়ুক্ত মনের দ্বারা পূর্ষদেহে অধুভূত বা শুভাশুভ বিষয় সকলও গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যেমন সব জাগরণের কারণ, এবং সব-বিচ্ছিন্ন তমো নিদ্রার কারণ, তদ্রূপ সব-বিচ্ছিন্ন বজ্রোয়ুক্ত মনঃই স্বপ্নের কারণ। জাগরিত অবস্থা ব্যতীত অস্ত্র কোন সময় মনের সহিত সর্বের সংযোগ হয় না। জাগরণের অবস্থায় মনঃ যদি বজ্রোয়ুক্ত হয়,—তবে কাম, ক্রোধ, মান, দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতি জীব-দেহে সঞ্চার করে, এবং যদি তমোয়ুক্ত হয়, তবে বুদ্ধিভ্রংশ অজ্ঞানতা আসিয়া জীবদেহে প্রকটিত হয়।

মানবজীবন—জাগরণ, নিদ্রা ও স্বপ্নময়।

এইবার আমরা স্বপ্ন সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বাতিক প্রকৃতির লোকে স্বপ্নে আকাশে গমন করে, যেন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইতেছে মনে করে। কারণ বায়ু চলুগুণ বিশিষ্ট।

পৈতিক প্রকৃতির ব্যক্তি স্বপ্নে স্বর্ণ বা নাগ-

কেশব, পলাশ, কর্ণিকায়, অগ্নি, বিহাং, উদ্ধা প্রভৃতি আশ্রয় গুণবিশিষ্ট বিষয় দর্শন করিয়া থাকে। কারণ পিত্ত তৈজস পদার্থ।

মৈত্রিক প্রকৃতির লোকে স্বপ্নে পদ্ম, হংস, চক্রবাক যুক্ত মনোজ্ঞ জলাশয়াদি দর্শন করিয়া থাকে। কারণ স্লেষ্মা সোম্য বস্তু। বাহা ইউক উল্লিখিত প্রাকৃতিক স্বপ্ন সকল কোনরূপ ইষ্টানিষ্টের কারণ হয় না।

ইহা ভিন্ন, কতগুলি শুভাশুভের ভবিষ্যৎ জ্ঞাপক স্বপ্ন আছে। সুস্বংগণ বা স্বরং সেই স্বপ্ন দেখিলে, শুভ বা মরণ হয়। যেমন দেবতা ব্রাহ্মণ, গো, বৃষভ, জীবিত সুহৃৎ, নৃপ, অগ্নি, মাংস, মৎস্ত, শ্বেতবর্ণ মালা, শ্বেতবস্ত্র, ফল, নির্ঘল জল, প্রাসাদ, বৃক্ষ, হস্তী, পর্কতে আরোহণ প্রভৃতি স্বপ্নে দেখিলে, কল্যাণ লাভ এবং ব্যাধির উপশম হয়, এবং কার্পাস, তৈল, তিল লবণ ও ধাতুলাভ, মৎস্তে গ্রাস করা, পর্কতাগ্র হইতে পতিত—কাঁক, চিতায় আরোহণ প্ররীপ নির্মাণ, দেবতা নাশ, স্রোতে বাহিত হওয়া, শ্রেতের সহিত বাক্য-কথন, পক্ষ অন্ন ভক্ষণ বা সুরা, মধু ও তৈল পান, পক্ষে নিমগ্ন হওয়া, মালা বা তারকাধির পতন, ঋণদগণ কর্তৃক মস্তকে রক্ত আঘাণ, মুণ্ডিত মস্তক হওয়া প্রভৃতি স্বপ্নে দেখিলে সুস্থের ব্যাধি ও ব্যাধিতের মৃত্যু হয়। ইহা আমরা অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বাহা পূর্ষদৃষ্টকৃত বা চিন্তিতপূর্ষ নয়, বাহা ইষ্টানিষ্ট স্মৃক নয় এবং বাহা স্বভাবানুযায়ী নয়—এইরূপ উত্তম অচিন্ত্যপূর্ষ স্বপ্ন সকলই পূর্ষদেহানুভূত স্বপ্ন।

শুভাশুভ স্বপ্ন দেখিলেই যে ইষ্ট বা অনিষ্টের কারণ হয়, তাহা নহে, শাস্ত্রে উক্ত আছে :—

“যথাং প্রকৃতি-স্বপ্নো বিশ্বতো বিহতচ যঃ।

চিস্তাকৃতো দিবাদৃষ্টো ভবন্ত্যকলদাস্ততে ॥”

যদি স্বপ্ন আপনাব স্বভাবানুসারী হয় অথবা যদি স্বপ্ন দৃষ্ট হইবার পথ তাহা বিস্মৃত হওয়া যায় অথবা অশুভ স্বপ্ন দৃষ্ট হইবার পর পুনরায় শুভ স্বপ্ন দৃষ্ট হয় কিম্বা যদি স্বপ্ন চিস্তাকৃত বা দিব্য দৃষ্ট হয়, তবে নিশ্চল হইয়া থাকে।

রাত্রির প্রথম প্রহরে হুঃস্বপ্ন দেখিলে শুভচিস্তা করিতে করিতে পুনরায় নিদ্রা যাওয়া উচিত। অশুভ স্বপ্ন দেখিলে কাহাকেও প্রকাশ করিবে না, দেবতা গৃহে ত্রিরাত্র বাস করিবে। আর বিপ্রদিগের পূজা করিলেও হুঃস্বপ্ন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হুঃস্বপ্ন দৃষ্ট হইলে প্রভাতে উঠিয়া বিপ্রদিগকে মাষ, তিল, ধাতু ও স্বর্ণদান করিবে এবং শুভমন্ত্রসমূহ ও গায়ত্রী জপ করিবে।

নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখা যায় বলিয়া স্বপ্নকে নিদ্রার রূপান্তর বলা যাইতে পারে। স্বপ্নে আমাদের যথার্থ বোধ বা জাগরণ হয় না—অথচ হেতু ও কর্ম দ্বারা শুভাশুভ স্বপ্নের ইষ্টানিষ্ট ফল সকল আমরা ভোগ করিয়া থাকি। ইহাই কর্মীপুরুষের জীব-দেহের

উপর কর্তৃত্ব। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়, আত্মা নিদ্রার আগন্ত নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ মনো-যোগের অভাবে ক্রিমা হীন হইয়া ও বিষয় সকল গ্রহণ কর না,—ইহা দ্বারা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অচেতনত্ব প্রমাণ হয়। ভূতাত্মাকে চেতন আত্মার সাহচর্য্যে হেতু মনের চেতনতা বলা যাইতে পারে।

মহর্ষি চরক নিদ্রালক্ষণে বলিয়াছেন:—

“বদা তু মনসি ক্লাস্তে কর্ম্মাশ্রানঃ ক্লমাবিহাঃ।  
বিষমেষভা নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপতি মানবঃ ॥”

যখন মানগণের মনঃ, কর্ম্মে ক্রিয় ও জ্ঞানে-  
ক্রিয় (একাদশ ইন্দ্রিয়) বিভ্রান্তভাবে অব-  
লম্বন করে এবং সমস্ত বিষয়-কর্ম্মে নিবৃত্ত  
হয়, তখন তাহাকে নিদ্রাভিভূত জানিবে।

স্বপ্ন ও ভ্রম উভয়েই রঞ্জোত্তপ্ত হইতে  
উৎপন্ন হয়। স্বপ্ন সুনিদ্রার ব্যাঘাত করে।  
অতএব স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নশীল ব্যক্তিগণ বাহাতে  
অশুভ বা চিস্ত-প্রসূত স্বপ্ন সকল উপহিত  
হইয়া সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে না পাবে,  
তত্তত্ত্ব যত্নপর হইবেন।

কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ সেন।

## সদরস্ত।

### উপক্রমণীয়াধ্যায়।

যাহার শরীরে বায়ু-পিত্ত-কফ, কায়াদি  
এবং জঠরানল স্বস্থানে, স্বমানে, স্বভাবে  
রহিয়া স্বস্বকার্য্য নির্বাহ করিতে থাকে, রস-  
রক্তাদি ধাতুবৃহ স্বভাব-ভ্রষ্ট ও দোষ-দৃষ্ট না

হইয়া শরীরের পুষ্টি এবং মনের তৃপ্তি বিধান  
করে, আহার পরিপাকান্তে অসার পার্শ্ববাণ  
মলরূপে এবং জলীয়ংশ মূত্ররূপে পরিণত হই-  
বার বাধা না ঘটে; সজ্জাত মলমূত্র, শরীরের



বিশীর্ণ বিধবস্ত তন্তুকী প্রভৃতি অবাধে মলায়ন পথদিয়া বাহির হইয়া যায়, রক্ত-সঞ্চলন-খাস প্রধাস প্রভৃতি শারীর-ক্রিয়া অবাধে চলিতে থাকে, পরন্তু আত্মা মনঃ এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাম সুপ্রসন্ন রহিয়া পরম মঙ্গল বিধান করে, তাহাকে স্বস্থ বলে। স্বস্থ-ব্যক্তি ভাবের নাম স্বাস্থ্য বা আরোগ্যের অপর নাম সুখ।

স্ব্থের কামনা স্বাভাবিকী, সকলেই স্ব্থের কামনা করে; দুঃখ-ভোগ কাহারও অভীষিত নহে। স্ব্থের জন্ম প্রাণি সকল প্রাণ-পণ করিয়া মনঃ, বুদ্ধি এবং শরীর পরিচালনা কবত নানা প্রকার কাজ করে। তথাপি কেহই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। ত্রিবিধ দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—বাহু প্রসারণ করিয়া প্রাণিগণকে আলিঙ্গন করি-বাহু জন্ত সতত উদ্ধাত্ত রহিয়াছে। দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি? ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা মুক্তির কথা বলিতেছি না। মুক্তি যোগি জনের ভাগ্যে ঘটিতে পারে, সাধারণের অদৃষ্টে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কি করিলে দুঃখের অন্নতা ঘটে অর্থাৎ কিরূপ কাজ করিলে সকলে অব্যবশ্য শরীরে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সুখাশুঃ উপভোগ করিতে সমর্থ হন তাহারই কথা হইতেছে।

মন্তব্যটো—

“স্বখার্থাঃ সর্বভূতানাং নতাঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।  
কিন্তু—

স্বখং ন বিনা ধর্ম্যং তস্মাদ্ ধর্ম-পরো ভবেৎ॥”

ধর্মভিন্ন স্বখ হয় না, সুখী হইতে হইলে ধর্মচরণ করিতে হয়।

ধর্ম না ক্রিয়িলে, ধর্মচরণ সম্ভবপর নহে।

ধর্মচরণ না করিলে সুখাবাপ্তি এবং দুঃখ হানির সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্ত ধর্ম কি, তাহা বিশেষরূপে জনস্বয় করিয়া ধর্ম-পথাবলম্বন করত সুখাশুঃ উপভোগ করিবার চেষ্টা করা মনুষ্যমাত্রেরই সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য কর্ম।

ধর্ম কাহাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া যায় না। বহু কথা বলিয়াও ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। মহাপ্রাজ্ঞ মহাতারতকার যুধিষ্ঠিরের মুখদিয়া বক্ররূপী ধর্মের নিকট বলাইয়াছেন—“ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহ্যম্”। যখন দেবকর ব্যাসদেবের বিবেচনায় ধর্মতত্ত্ব দুরধিগম্য, তখন ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ করা সম্ভবপর কি না তাহা বলা যায় না।

তবে উচ্চাখ্যমান শব্দ মাত্রেই প্রকৃতি-মূলক। ধর্ম শব্দের মূলও একটা প্রকৃতি রহিয়াছে। সে প্রকৃতি ‘ধৃ’ ধাতুর। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। তদুত্তর কর্তৃ-বাচ্যে ‘ম’ প্রত্যয় বিধান করিলে ধর্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়। “ধরতীতি ধর্ম।” অর্থাৎ যে ধারণ করে, তাহার নাম ধর্ম। নিরুক্তিও লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত। উক্ত নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তি অমু-সারে বুঝিলাম—যে ধারণ করে সেই ধর্ম। এটা ধর্মের ব্যাপক লক্ষণ, কুত্ৰাপি ইহার ব্যতি-চার নাই। সমস্ত জগৎ এবং জগৎের চেতনা-চেতন পদার্থ সমূহ ধারণাত্মক ধর্মধীন। সেই ধর্ম বলে সমস্তই বিধৃত হইয়া স্থস্থিত রহিয়াছে। ধর্ম-হীন হইলেই সমস্তই বিধবস্ত হইয়া যায়। সৃষ্টি কালে বিধাতৃ-বিধাতৃসারে স্বজ্যমান পদার্থের উপাদান সকল যেমন-যেমন ভাবে সমবেত হইতে থাকে, ধারণাত্মক ধর্ম সেই স্তুলি সেই-সেইরূপ ভাবে ধারণ করিয়া

রাখিতে থাকে। ধর্মই স্থিতি কালের স্থি-  
রতা বিধান করে। বিনাশ কালে বিশিষ্ট  
উপাদান লইয়া, যাহা যাহার নিকট হইতে  
আসিয়াছিল, তাহা তাহার অঙ্গে মিশাইয়া  
ধরিয়া রাখিতে থাকে; কিছুই নষ্ট হইতে দেয়  
না। ধর্ম সর্বত্র সর্বকালে বিद्यমান রহিয়া  
জগৎ ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

ধর্মের আরও অনেক ব্যাপ্যার্থ আছে,  
তুই একটীর উল্লেখ করিতেছি। অতি অল্প  
সংখ্যক লোক ছাড়া পৃথিবীর সকল মনুষ্যই  
জানেন যে, এ জগতের একজন স্রষ্টা এবং  
বিধাতা আছেন। অনেকে পরলোকও স্বীকার  
করেন। যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার  
করেন এবং পরলোক মানিয়া চলেন, তাহা-  
দিগকে আন্তিক বলে। আন্তিকেরা ইহ-  
কালের মঙ্গলের জন্য এবং পরকালের  
কল্যাণের নিমিত্ত স্রষ্টার অর্চনা করেন  
এবং বিধাতৃ-বিধান জ্ঞান করিয়া শাস্ত্র বিশেষ  
মানিয়া চলেন। দেবারাধনা এবং-শাস্ত্র  
বিশেষের মত অনুসরণ করিয়া চলার নামও  
ধর্ম। পৃথিবীতে বহু ধর্মমত প্রচলিত আছে।  
যেমন হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম এবং খৃষ্টধর্ম  
প্রভৃতি।

ভগবান্ মনু বলেন,—বেদ-স্থিতি সদাচার  
আপনার আশ্রয় প্রিয় ধর্মের লক্ষণ। অত্ৰত্ৰ  
বলিয়াছেন—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শোচ,  
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিজ্ঞা, সত্য এবং অক্রোধ  
—এই দশটা ধর্মের লক্ষণ।

ধর্মের আরও অনেক প্রকার অর্থ প্রে-  
লিত আছে। যেমন চোরের ধর্ম চুরি করা,  
আগুণের ধর্ম দাহ করা, চুপকের ধর্ম লোহ  
আকর্ষণ করা—ইত্যাদি। তত কথার আমাদের  
প্রয়োজন নাই। যাহা পালন করিলে পৃথি-

বীর নর-নারীগণ হিতায়ুঃ এবং সুখায়ুঃ  
উপভোগ করিতে পারেন, তাহাই আমাদের  
প্রস্তুত বিষয়। সেই ধর্মের নাম সদ্ভূত।

কোন কোন সদ্ভূত পালন করিলে সুখ  
বা আরোগ্য লাভ করা যায়, তাহা জানা  
দুর্ঘট নহে। এখনও আমাদের দেশে প্রাচীন  
কালের বেদ, স্থিতি, তত্ত্ব, পুরাণ, ইতিহাস,  
নীতিশাস্ত্র, কাব্য, কথাগ্রন্থ এবং চিকিৎসা  
শাস্ত্র প্রভৃতি রাশি রাশি গ্রন্থ বিद्यমান রহি-  
য়াছে। সেই সকল গ্রন্থে সে কালের ঋষি  
এবং ঋষিকল্প মনীষীগণ নানাছলে অনুষ্ঠেয়  
সদ্ভূত সমস্তের উপদেশ দিতে রূপণতা করেন  
নাই। তার পর বর্তমান সময়ে আমরা নানা  
দিগদেশ হইতে আনীত ধর্মগ্রন্থ, নীতিগ্রন্থ  
এবং নানাবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের বহুগ্রন্থ পড়ি-  
বার সুযোগ পাইয়াছি। মনোনিবেশ পূর্বক  
সেই সকল গ্রন্থ পড়িলে বা তাহার মর্মার্থ  
শ্রবণ করিলে সমস্ত সদবৃত্ত জানা যাইতে  
পারে। তাই বলিতেছিলাম, যে সকল সদ্ভূত  
পালন করিলে শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য লাভ  
করা যায়, তাহা অবগত হওয়া অসম্ভব পর  
নহে, নানা কারণে বর্তমান সময়ে সদ্ভূত পালন  
করাই দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে।

যে সকল কারণে আমরা সদ্ভূত পালনে  
অনভ্যস্ত হইয়া অসদাচার-পরায়ণ হইয়া উঠি-  
য়াছি, সেই সকল কারণের মধ্যে শিক্ষা-  
বিপর্ধায়ই মুখ্য কারণ। পূর্বে আমাদের  
দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন ছিল।  
হয়ত শূদ্রবর্ণের শিক্ষা সঙ্ঘে তাদৃশ কঠোর  
নিয়ম না থাকিতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মবর্ণের—  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির সন্তানগণকে  
বাধ্য করিয়া বিজ্ঞাশিক্ষা দেওয়া হইত। উপ-  
নয়ন সংস্কারের অপরিহার্য্যতাই তাহার প্রকৃষ্ট

প্রমাণ। এখন যেমন প্রাবেশিক গুরু বা এড্-মিশন্ ফি দিলেই বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়, তখন বিদ্যালয়দ্বিধে প্রবেশের পথ সেরূপ সুগম ছিল না। সে সময়ে উপনীত হইয়া কতকগুলি সদাচার পরিপালনে রত রহিয়া, গুরুগৃহে দীর্ঘকাল বাস করত বিজ্ঞাভ্যাস করিতে হইত।

বালকের নির্দিষ্ট শিক্ষাকাল উপস্থিত হইলেই তাহাকে আচার্য্য-গুরুর নিকট অর্পণ করা হইত। আচার্য্য মানবকের সংস্কার বিধান করিয়া, শিষ্যকে বহু নিয়মে বাধ্য রাখিয়া শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইতেন। উপনীত মানবক গুরুর অনুশাসনে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন কবতঃ কাম, ক্রোধ, মান, অহঙ্কার, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, পাক্ষ্য, অনৃত এবং আলস্য প্রভৃতি পরিহার পূর্ব্বক গুরুগৃহে রহিয়া বিজ্ঞাভ্যাস করিতেন। দীর্ঘকাল-ব্যাপি-যম-নিয়মে নিয়মিত ব্রহ্মচারিগণের শরীর যথোচিত উপচিত এবং বলিষ্ঠ হইত। অল্পশীলনে মনো-বৃত্তি ক্ষুধি লাভ করিত এবং বিজ্ঞাভ্যাসে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হইত। তাহার পর তাহারা সদাচারে অভ্যস্ত হইয়া এবং মনুষ্যত্বলাভ করিয়া গৃহ-ধর্ম্ম আচরণের জ্ঞাত গৃহে ফিরিয়া আসিতেন।

সে সময়ে গৃহস্থ্যশ্রম প্রেম-ধর্ম্ম উপার্জনের আশ্রম ছিল। গৃহস্থ হইয়া গৃহিণী ধর্ম্মাচরণেব জ্ঞাত ধর্ম্ম-পত্নী গ্রহণ করিতেন তাঁহারা গুরুজনে ভক্তি, বন্ধুজনে সৌখ্য, সন্তানকরুণে বাৎসল্য, আর্ন্তজনে দয়া, প্রভুজনে দাস্ত, তাগ্যায় মাধবীকতা এবং গৃহাগত জনে পরম ঐতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রেম-ধর্ম্মের সাধনা করিতেন। মনঃ যখন বিধ্বংসনীয় প্রেমপূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন গৃহস্থগণ গৃহস্থ্যশ্রম পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমান্তর আশ্রম করিতেন।

বহুকাল হইল ব্রহ্মচর্য্যশ্রম উঠিয়া গিয়াছে। শিক্ষার গতিও ফিরিয়াছে। বলবদ দেশাচার এবং লোকাচারের খাতিরে উপনয়ন সংস্কারটা আজিও সম্যক্ লোপ পায় নাই। ব্রাহ্মণ সন্তানকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেই হয়, অত্যাশ্রয় দ্বিজবর্ণের মধ্যে উপনয়ন সংস্কারের গোলাঘোষণা ঘটয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অধুনা বিজ্ঞাশিক্ষার অবিকারের আশায় কাহাকেও উপনাত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হয় না। এখন প্রাবেশিক গুরু বা এড্-মিশন্ ফি দিলেই যে কেহ কোন বিজ্ঞা-লয়ে ভর্তি হইতে পারেন।

ব্রহ্মচর্য্যশ্রম-ভ্রংশের এবং সম্বৃত্তের অননুষ্ঠানের দ্বিতীয় কারণ যুগ-বিপর্য্যয়। কথিত আছে—

“সত্যং ত্রেতা যুগৈশ্চৈব দ্বাপরং কলিরেব চ।

রাজ্ঞোরুত্তানি সর্বাণি রাজ্যাহি যুগমুচ্যতে ॥”

বস্তুতঃ রাজাই যুগের প্রবর্তক। দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষে নানা জাতীয় অহিন্দু-রাজগণ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। যখন যিনি রাজা হইয়াছেন, তখন তিনি প্রকৃতি-পুঞ্জকে স্বকীয় ধর্ম্ম এবং স্বজাতীয় আচরণ শিক্ষা দিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। সত্য বটে, কোন রাজাই সম্যক্ প্রকারে সমাজবিজয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু রাজপ্রভাব একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। যুগে যুগে ভারতবাসীরা বিদেশী ভাব অনুকরণ করিয়া আসিতেছেন এবং ক্রমশঃ দেশকালোপযোগী সদাচার-ভ্রষ্ট হইতেছেন।

যুগ-চক্রে গুরিয়া-কিরিয়া ভারতের হিন্দুগণ এক অতিভীষণ যুগান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময়ের জ্ঞান দুঃসময় এদেশে আর কখন উপস্থিত হয় নাই। যে সময়ে

মুসলমান রাজার হাত হইতে রাজদণ্ড স্থলিত-  
প্রায় অখচ ইংরেজ রাজ্য পতন হয় নাই,  
—সেই সময়ের কথা বলিতেছি। সত্য বটে,  
সে সময়েও ভারতবর্ষে অধ্যয়ন এবং অধ্যা-  
পনার প্রথা সম্যক্ লোপ পায় নাই। স্থানে  
স্থানে প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপিত ছিল,  
স্থান-বিশেষে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনার জ্ঞাত  
চতুষ্পাঠীও প্রতিষ্ঠিত ছিল; কোন কোন স্থানে  
মৌলবীরা পাঠশালা স্থাপন করিয়া আরবী,  
পার্সী এবং উর্দু ভাষা শিক্ষা দিতেন। কিন্তু  
সে সময়ে মনুষ্যত্ব লাভের জ্ঞাত কেহ কিছু  
শিখিতেননা; উপার্জনক্ষম হইবার জ্ঞাতই  
লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন হইত। আর  
এক কথা, সে সময়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত জনের সংখ্যা  
দেশের তদানীন্তন জনসংখ্যার তুলনায় অল্পই  
ছিল,—হাজার ভাগের এক ভাগ ছিল কিনা,  
তাহাও সন্দেহহীন। তখন দেশ অজ্ঞানান-  
তমসচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।  
ত্রিকালদর্শী-মহর্ষিগণ, দূর ভবিষ্যতে দেশের  
যে একরূপ উদ্ভাষণ উপস্থিত হইবে, তাহা বুঝিয়া,  
বেদ-বিহীন-জনসাধারণের শিক্ষার জ্ঞাত পুরাণ,  
ইতিহাস, এবং তত্ত্ব প্রভৃতি নানাশাস্ত্র প্রণয়ন  
করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেদার্থের অবিপ-  
রীত তত্ত্ব শাস্ত্রের উপদেশ বাহাতে এ দেশের  
নরনারী সকলের হৃদয়ে স্থায়ী আত্মদ লাভ  
করে, পরবর্ত্তি-মনীষীগণ তজ্জ্ঞাত যথেষ্ট প্রয়াস  
পাইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে স্মার্ত্ত-শিরোমণি  
রঘুনন্দন হিন্দু সমাজটাকে কর্ম্মপাশে বাঁধিয়া  
রাখিবার জ্ঞাত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বাত্মক নব্য-স্বত্ব  
প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের  
যত্ন একাধিক নিফল হয় নাই; তবে যুগপ্রভাবে  
সম্যক্ সাফল্য-লাভও করিতে পারে নাই।  
শাস্ত্রাভ্যাসন ছিল বলিয়া হিন্দুসমাজ কোরাণ,

কৃপাণপাণি মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকের বশবর্ত্তী না  
হইয়া এবং অন্ধকার হইতে আলোকে বাইবার  
লোভ সম্বরণ করিয়া স্বাভাবিক রক্ষা করত  
আপনার বিরাট দেহ বজায় রাখিতে সমর্থ  
হইয়াছিল। শাস্ত্রাভ্যাসন-ভীতি না থাকিলে  
এতদিন হিন্দু নর-নারী অজ্ঞাত সম্প্রদায়ের  
অজ্ঞাত হইয়া বাইত, হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ  
পাইত। সত্য বটে, শাস্ত্রাভ্যাসন ভয়েই  
হিন্দুর দেশে বর্ণ-বিচার ছিল এবং দশবিধ  
সংস্কারের মধ্যে কোন কোন সংস্কার, শৌচা-  
চার, সন্ধ্যাবন্দনা, দেবার্চনা, শ্রাদ্ধ-তর্পণ,  
অতিথি-পোষণ প্রভৃতি শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্মগুলি  
অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু কিছুই নির্দোষ ছিল না।

বর্ণ-বিচার ছিল—ভালই ছিল। তবে বর্ণ-  
বিচারের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। তজ্জ্ঞাত  
নীচজাতীয় অনেক লোক, মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ  
করিয়া, উচ্চজাতীয় লোকের অত্যাচারের হাত  
হইতে নিরুত্তী লাভ করিয়াছিল। শুধু নিরুত্তী  
লাভ করিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত রহে নাই;  
সময়ে সময়ে হিন্দু জাতির উপর অত্যাচারও  
করিত। তজ্জ্ঞাত এ দেশে বিষম মুসলমান-ভীতি  
উপস্থিত হইয়াছিল। সে সকল কথা এবং  
সংস্কার প্রভৃতির দোষের কথা সকলেরই জানা  
আছে, লিপি-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ফল  
কথা এই যে, মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে  
হিন্দুর সমাজ ছিল বটে কিন্তু হিন্দুত্ব কলুষিত  
হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার পর, যে সময়ে মুসলমানের রাজত্ব  
যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে ইংরেজ,  
বণিক সম্প্রদায় এ দেশে স্থাপিত রহিয়া,  
বাণিজ্য বাণদেয়ে বহুধন উপার্জন এবং সঞ্চয়  
করিতেছিলেন টাকার সঙ্গে সঙ্গে বণ-সঞ্চয়ও  
হইতেছিল। ধনে-জনে এবং বুদ্ধি-বলে বণীয়া

ইংরেজ জ্বয়ে রাজ্যনাভের আশার সঞ্চার  
হটল। ভাগলক্ষীর রূপায় মুসলমান রাজার  
হাত হইতে স্থলিতপ্রায় রাজদণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া  
কোম্পানি হস্তগত করিলেন। তখন ভারত-  
বর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আর এক নূতন যুগ  
প্রবর্তিত হইল। এ যুগের প্রথম ভাগটা  
ভারতবাসীর পক্ষে ভাল গেলনা। কিছুকাল  
পরে, ভারতের সৌভাগ্যলক্ষীর রূপায় ইংরেজ  
বাদ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজপুরুষেরা নানা  
দুর্ভিক্ষ-নরমে ব্যাপ্ত রহিলেন এবং প্রকৃতি-  
পুঞ্জকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখাইবার সুবন্দোবস্ত  
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বাঙ্গালদেশে  
অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ-বালক এবং তদপেক্ষা  
আরও অল্পসংখ্যক বৈষ্ণববালক চতুষ্পাঠীতে  
ব্যাকরণ এবং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন।  
অগ্ৰাণ্য বর্গের উচ্চশিক্ষার উপায় ছিল না।  
অতি অকিঞ্চিৎকর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া  
বা না করিয়া তাহাদিগকে সংসারের কাজে  
ব্যাপ্ত হইতে হইত। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞা-  
মন্দিরের দ্বার সাধারণের জন্ত উন্মুক্ত রহিল  
অর্থাত্ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বিজ্ঞানদানের ব্যবস্থা  
হটল। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে তদানীন্তন  
ভারতের অজ্ঞানান্ধকার ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া  
আসিতে লাগিল।

সদাশয় ইংরেজের রূপায় এদেশে বহু-  
জ্ঞানের আকর ইংরেজী বিজ্ঞা শিক্ষাদানের  
ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু শিক্ষাঙ্গী-বালকগণকে  
ব্রহ্মচর্যাগাদি সদ্বৃত্ত পালনে বাধ্য রাখিয়া শিক্ষা-  
দানের ব্যবস্থা হইল না। এ ক্রটি অবশ্য  
ইংরেজের নহে। ঠাঁহার বিদেশাগত।  
সদ্বৃত্ত ভ্রষ্ট হইয়া এদেশের লোক কতদূর  
অধঃপতনের সোপানে নামিয়া পড়িয়াছে  
হয় ত তাহা ঠাঁহার জানিতেন না।

আর পূর্বকালের আচার্য্যেরা শিষ্যদিগকে  
কিরূপ নিয়মে আবদ্ধ রাখিয়া বিজ্ঞানদান  
করত মাহুব করিয়া দিতেন, সে তত্ত্বও  
জানিবার সুযোগ তখন ঠাঁহাদের হয়  
নাই। যে সময়ে ইংরেজেরা এদেশে শিক্ষা  
বিস্তারের স্বত্রপাত করেন, সে সময়ে এদেশে  
বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান্‌ এবং ক্ষমতাশালী লোকও  
ছিলেন। ইংরেজের সহিত ঠাঁহাদের বনিষ্ট-  
তাও ছিল। ঠাঁহার যদি ব্রহ্মচর্যাগাদি সদাচারে  
বাধ্য রাখিয়া বালকদিগকে শিক্ষাদানের  
ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিতেন, তাহা হইলে  
দেশজনের সদাশয় ইংরেজ সম্ভবতঃ সে  
পরামর্শ গ্ৰহণিতেন এবং পরামর্শানুরূপ কাজও  
করিতেন।

বর্তমান সময়ে সদ্বৃত্তভ্রষ্ট অথচ কঠোর  
অধ্যয়নেরত কিশোর এবং যুবকগণের  
শারীরিক এবং মানসিক দুর্দশা দেখিলে মনে  
হয়, শিক্ষার সুফল কে ভোগ করিবে?  
আর মনে হয় কি করিলে যেমন ছিল তেমন  
হয়? কিন্তু সুতীর্থ কালের পর একরূপ চিন্তা  
সুফলপ্রসূ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

যে সময়ে ভারতবর্ষ কাস্তারভূমিতে প্রান্তর-  
বহুল, বিমলজলপূর্ণ-সরিংসরোবরভুল এবং  
বিরল-জনপদ ছিল; যখন গোসর্গে প্রচুর হৃদয়  
দান করিয়া কাস্তারে প্রান্তরে চরিয়া-ফিরিয়া  
গোধূলিসময়ে ভুক্ত-পীত-হৃষ্টপুষ্ট ঘটোয়া  
গাভীর পাল স্ব স্ব অধিপতির গৃহে ফিরিয়া  
আসিত; যখন পরিচ্ছদের পারিপাট্য লোকে  
বুঝিত না; অতি অকিঞ্চিৎকর-বসনে লজ্জা  
নিবারণ এবং শীতত্রাণ করিতে কেহ লজ্জা  
বোধ করিতনা বা নিম্নাভাজন হইত না,  
সংক্ষেপতঃ যে দেশে অন্নবস্ত্রের দায় এবং  
বিলাসপ্রিয়তা ছিল না, সেই দেশে সেই

সময়ে সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ছিল। তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিন্তমনে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং প্রণয়ন করিতেন এবং সমাগত শিষ্যদিগকে অন্নদানাদি দ্বারা পোষণ করিয়া কুলপতি উপাধি লাভ করত ধন্যমান হইতেন।

সে দেশ নাই, সে কালও গত হইয়াছে। এখন আর উল্লেখ্য এবং সংপ্রতিগ্রহ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া সংসারবাত্সল্য নির্বাহ করা যায় না। পেট-কাঁকালের দায়ে এবং অল্প বহুবিশ দায়ে পড়িয়া ব্রাহ্মণগণ স্বতন্ত্র পথে চলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ব্রহ্ম-

চর্যাশ্রম উঠিয়া গিয়াছে। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিয়া সম্প্রতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; যৎকিঞ্চিৎ প্রচলিত আছে তাহা নগণ্যের মধ্যে।

এদেশে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পুনরার প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গৃহে বাস করিয়াও সদ্ভক্ত পালন করা যাইতে পারে। সেই আশায় আমবা নানা শাস্ত্র হইতে সদ্ভক্ত সঙ্কলন করিয়া আয়ুর্বেদের পাঠকদিগকে ক্রমশঃ উপহার প্রদান করিব স্থির করিয়াছি। কবিরাজ শ্রীশীতল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

## চরকোক্ত ষড়ুপায় বিধি ।

—:—

### কবল বিধি ।

বায়ু, পিত্ত, কফনাশী দ্রব্য মুখে দিয়া ।  
কবলে অর্দ্ধাংশ ত্যাগে চর্ষণ করিয়া ॥  
কবলে আহার্য্য দ্রব্যে অভিকৃতি হয় ।  
নাশে-কফ, তৃষ্ণা, শোষ, বৈরস্ত নিচয় ॥

### প্রতিসারণ বিধি ।

চূর্ণ বা কক্কাবলেহ, অঙ্গুলি দ্বারায় ।  
ঘর্ষিলে 'প্রতিসারণ' দস্তান্ত জিহ্বায় ॥  
তা'তে-মুখ-বিরসতা, হৃগন্ধ তাহার ।  
মুখশোষ, তৃষ্ণাক্রুতি, দস্তাঢ্য সংহার ॥  
অসম্যক কৃতে হয় মুখের জড়তা ।  
কফোৎক্লেষ, রসান্বাদে শক্তির হ্রাসতা ।  
অতিরিক্তে-মুখপাক, মুখশোষ আর,  
তৃষ্ণা, বমি, ক্লান্তি ভাব, হইবে তাহার ॥

### মূর্দ্ধতৈল বিধি ।

অভ্যঙ্গ ও পরিষেক, পিচু, বস্তি আর ।  
যথাক্রমে বলবান মূর্দ্ধতৈল চার ॥  
অভ্যঙ্গাদি আদি ত্রয় প্রসিদ্ধ সকল ।  
শিরোবস্তি বিধি তেঁই কহিব কেবল ॥  
দ্বিমুখ দ্বাদশাঙ্গুলি, চন্দ্র বিনির্মিত,  
শিরোবস্তি রোগী-শিরে করিয়া ঘোষিত ;  
সন্ধিস্থান পিষ্ট মাষকলায়ে কথিবে ।  
বস্তি, রোগী-মস্তকের প্রমাণ হইবে ॥  
ঈষদৃষ্ট স্নেহে তাহা করিয়া পূরণ,  
নাশী, কর্ণ, মুখস্তাব নহে যতক্ষণ,  
কিঞ্চিৎ শূল উপশম না হয় বাবৎ,  
অথবা সহস্র মাত্রা কাল, এতাবৎ,  
রাখিবে ধারণ করি ; রাখি অনাহারে,  
শিরোবস্তি-দান বৈজ্ঞ করিবে তাহারে ॥

পাত কিষা সাতদিন মস্তকে ধারণ ।  
করিবে এ শিরোবস্তি কর্তব্য-ধারণ ॥  
মস্তক হইতে বস্তি করিয়া মোচন ।  
সেই স্নেহ সর্ষ অঙ্গে করিবে মর্দন ॥  
ঈষৎ জলে তা'কে ধান কবাইবে ।  
ঈর্জ বা ঠাণ্ড বোগ এতে পলাইবে ॥  
শিবঃকম্প আদি রোগ নাশিবে নিশ্চয় ।  
সর্ষকালে শিরোবস্তি প্রয়োজিত হয় ॥

### কর্ণপূরণ বিধি ।

কর্ণে স্নেহ দিবে, রোগা পার্শ্বাঘ্নী করি,  
দিবে উষ্ণ মূত্র, স্নেহ, মাংস রস পুরি ।  
কর্ণ-কঠ-শিরোগত বোগে পাঁচগত,  
গুরু উচ্চারণ কাল রাখিবে সেমত ॥  
মূত্রাদি কর্ণপূরণে আহারের আগে ।  
স্থূধ্যস্তের পরে, কর্ণে তৈলাদি প্রয়োগে ॥  
কর্ণ-শূলে-ঈষৎক্ষণ ছাগমূত্র সহ,  
সৈন্ধব মিলিত করি দেয় যদি কেহ,  
কর্ণশূল, কর্ণপাক প্রভৃতি যে রোগ ।  
নিশ্চয় বিনাশ হ'বে করিলে প্রয়োগ ॥  
আদা, বৈষ্ণবধু, তৈল, সৈন্ধব—এসব ।  
ঈষৎক্ষণ কর্ণে দিলে বেদনা লাঘব ॥  
পীতাকন্দ পত্রে ঘৃত করিয়া ব্রক্ষণ ।  
তপ্ত নিম্পীড়িত রস শূলয় তেমন ॥

### কর্ণপূরণ ঔষধ ।

আমলকী, তিলগণী পাতিলেবুর রস,  
সোহাগার ষৈ কিষা কাগজির রস,  
ঈষৎক্ষণ, বারি কর্ণে করিলে প্রদান,  
কর্ণের বেদনা তা'তে হবে অন্তর্দান ॥  
কদবেল টাবালেবু-আদা-রস কাঁজী ।  
উষ্ণবারি কর্ণশূলে দিতে হবে রাজী ॥

কাঁজীতে আকন্দাঙ্কুর পেষণ করিয়া,  
তৈল ও লবণ তা'তে ল'বে মিশাইয়া ;  
মনস-ডালের মধ্য কুরিয়া তৎপরে,  
আবারি মনসা পত্রে রাখি তদন্তরে ;  
পুট পাক করি তার ঈষৎক্ষণ রসে ।  
সুনারণ কর্ণপীড়া পূরণে বিনাশে ।  
মহাপঞ্চ মূল-কাঠ অষ্টাঙ্গুলমান,  
বেষ্টিয়া রেশমী বস্ত্রে তৈলেতে সন্ধান ;  
অগ্নি আলাইয়া নিম্নে পাতটি রাখিবে,  
তাহাতে বিচ্যুত তৈলে দীপিকা জালিবে ॥

ঈষৎক্ষণ কর্ণে ইহা করিলে প্রদান ।  
কর্ণেব বেদনা সত্তা হয় অন্তর্দান ॥  
এইরূপ দেবদারু, কুড়কাঠ দিয়া ।  
দীপিকা প্রস্তুত হয় রাখিবে আনিয়া ॥  
শোণামূল-কঙ্কসহ বিহিত বিধানে ।  
পাকতৈলে ত্রিদোষজ কর্ণশূল হানে ।  
যষ্টিমধু, অখণ্ডকা, ধনে, মাষকলায়ে,  
ইহাদের কঙ্ক কাথ ; শূকর-বসয়ে,  
পাক করি কর্ণে তাহা করিলে পূরণ ।  
কর্ণনাদ রোগ এতে হয় প্রশমন ॥

সাচিকার, শুষ্ক মূলা, শুলকা, পিপ্পল,  
হিন্দুকক, তৈলএর চতুর্গুণ তুল ।  
তৈল-চতুর্গুণ শুদ্ধ করিয়া মিলন ।  
পাক করি কর্ণে তাহা করিলে পূরণ ।  
কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বাধিধ্য অপর ।  
কর্ণজীব প্রশমিত হইবে সত্বর ॥

আপালের ক্ষার অল, কঙ্ক ও তাহার,  
সেই তৈলে কর্ণ রোগ হয় প্রতিকার ।  
শব্বকের মাংস, কচু তৈলে পাক করি,  
কর্ণে দিলে শীঘ্র যায় কর্ণ-নালা সারি,  
পঞ্চকষায়ের চূর্ণ করেতবেল রস,  
মধুযোগে কর্ণে দিলে কর্ণজীব রস ।

গাব, হরীতকী, লোধ, আমলকী আর,  
মঞ্জিষ্ঠা পঞ্চকষায় নামটী ইহার ।  
সজ্জিষ্কার চূর্ণ দিলে টাবালেবু যোগে,  
কর্ণশ্রাব-দাহ-শূল রোগে নাহি ভোগে ।  
আম-জাম-মোল-বট-পত্র কঙ্ক সহ,  
যথাবিধি ঠৈল পাক করি যদি কেহ,  
পুতিকর্ণ রোগে তাহা করিয়ে প্রদান ।  
অচিরে সে রোগ তবে হয় অন্তর্ধান ॥  
গোমূত্র ও হরিতাল করিয়া মিলন,  
কিঞ্চা কটুঠৈলে কর্ণ কীট-প্রশমন ।  
সজিনা ও হুড় হুড়ে, আলকুশী রসে,  
ত্রিকটুর-চূর্ণে তথা কর্ণ কীট নাশে ।  
মস্ত আর-হিন্দু কর্ণে করিলে প্রদান ।  
আন্ত কর্ণ কীট তাতে হবে অন্তর্ধান ॥

### লেপ বিধি ।

লেপন, লিপ্তক, লেপ, একর্থজ্ঞাপন ।  
দোষয়. বিষয়, বর্ণ্য, ত্রিবিধ লেপন ॥  
চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ, অর্দ্ধাঙ্গুলীমান ।  
পুরু লেপ আলেপনে ত্রিবিধ প্রদান ॥  
আদ্র লেপ ব্যবহার্য্য, ব্যাধি বিনাশক ।  
বিস্তৃক প্রলেপ-দেহ-কান্তিসংহারক ॥

### দোষয় লেপ ।

পুনর্গবা, দেবদারু, সরিষা ধবল,  
শুষ্টি, সজিনার ছাল মিলিত সকল ;  
কাজিতে পেষণ করি, করিলে লেপন ।  
সর্ব্ববিধ শোথ এতে হইবে নিধন ॥  
শিরিষ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, ওলা,  
তগর পাছকা, অটামাংসী, কুড়, বালা ;  
হরিজ্ঞা যুগল,—সব চূর্ণ করি নিবে ।  
পঞ্চমাংস তাতে মিলিত করিবে ॥  
জল সহযোগে ইহা করিলে লেপন ।  
বিসর্প, বিকোট, ব্রণ, শোথ বিনাশন ॥

### বিষয় লেপ ।

ছাগদুগ্ধ, তিলসহ করিয়া মিলিত ;  
অথবা কৃষ্ণমৃত্তিকা, তিল নবনৌত,  
পেষণ করিয়া ছই করিলে লেপন ।  
ভগ্নাতকজাত শোথ হইবে নিধন ॥

### বর্ণ লেপ ।

লোহিত চন্দন, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা ও কুড়,  
প্রিয়ঙ্গু বটের ঝুড়ি, সহিত ময়ূর ;  
একত্র পেষণ করি, করিলে লেপন ।  
ব্যান্ধনাশী মুখকান্তি করিবে বর্দ্ধন ॥

### লেপের বিধান ।

প্রলেপ প্রভেদ ভেদে দ্বিবিধ কথিত,  
লেপের বিধান ক্রমে হইবে বর্ণিত ॥  
মহিষ চর্ম্মের ছায় উন্নত উভয় ।  
আদ্র ব্যবহৃত লেপ আনিবে নিশ্চয় ॥  
শীতল, পাতলা, শোষী, পিত্তবিনাশক ।  
তাহাকে প্রলেপ বলি কহিবে ভিষক ॥  
আদ্র, গাঢ়, শুষ্ক লেপ প্রদেহ সংজ্ঞক ।  
প্রদেহ বাত ও কফ প্রশান্তি কারক ॥  
নিশিতে ও শুষ্ক লেপ ব্যবহৃত নয় ।  
ব্রণাদি পীড়ন হেতু শুষ্কতেও হয় ॥  
তমোতে আবৃত উন্মাদ রোমকূপস্থিত ।  
রাত্রিকালে স্বভাবতঃ হয় বিনিহৃত ॥  
প্রলেপ থাকিলে উন্মাদ বাহিরিতে নাহে ।  
রাত্রিতে প্রলেপ তেঁই কভু না আচরে ॥  
অপাকী, প্রবল রক্ত শ্লেষ্ম সমুদ্ভব ।  
ব্রণে লেপ রাত্রি যোগে অবশ্য সম্ভব ॥  
যষ্টিমধু, স্থচিমুখী, লোহিত চন্দন,  
বালা, পদ্ম, চিতামূল, পর্পট, বিরনু,  
সমভাগে জলদ্বারা পেষণ করিয়া ।  
লেপ দিলে পিত্ত-শোথ বাইবে সারিয়া ॥



প্রদেহ ।

ছোলঙ্গ লেবুর মূল, জটামাংসী আর,  
দেবদারু, রান্না, শুক্লী, গণিয়ারীচার ,

তুল্যা পিষ্ট; উষ্ণ করি করিলে প্রদেহ ।

বাত শোথ নিবারিত হয় নিঃসন্দেহ ॥

কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায়  
কবিকঙ্কণ ।

বর্ষাচর্যা ।

—:—:—

এই সময়ে আকাশ সর্বদা মেঘে আচ্ছন্ন থাকে এবং সর্বদা প্রচুর বারি বর্ষণে ভূমি আর্দ্র হয়। ফলে বর্ষাকালে প্রাণিগণের শরীরও আর্দ্রতা-প্রবণ হইয়া থাকে। মানব-শরীরে গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত বায়ু প্রকুপিত হওয়ার যাহাতে বায়ু প্রশমিত হয়, বর্ষা-ঋতুতে তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই সময়ে আহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। আহারের ব্যতিক্রমে অগ্নিমাত্রার সৃষ্টি ত সকল ঋতুতেই হইয়া থাকে, এই সময় আহা-রের ব্যতিক্রমে তাহার সম্ভাবনা আরও অধিক। গুরুভোজন করিলে এ সময় সহজে পরিপাক হয় না, এজন্ত লঘুদ্রব্য আহার করা কর্তব্য। এই ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জন্ত কখন শীতকালের মত বোধ, কখন অনা-বৃষ্টি জন্ত সূর্য্যের তেজে গ্রীষ্মকালের গ্রাস বোধ হইয়া থাকে। এই জন্ত এই সময়ে অজ্ঞাত ঋতুর গ্রাস শয়ন, আহার, শয্যা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া পরিবর্তন করিবে। বৃষ্টির সময়ে জলে ভিজিবেনা। গাত্র সর্দা ঢাকিয়া রাখিবে। কারণ এই সময়ে ভূমি হইতে একরূপ দূষিত বাষ্প উৎখিত হইয়া থাকে। উহা অত্যন্ত অনিষ্ট জনক। সমস্ত পানীয় দ্রব্যের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত

করিয়া পান করিলে এ সময় স্বকলদায়ক হইয়া থাকে। বৃষ্টির জল, কৃপ, সরোবর, নদী ও পুকুরিগীর জল উষ্ণ করিয়া, শীতল হইলে, সেই জলে স্নান করা এ সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হইয়া থাকে। পানীয় জল সঞ্চকেও এইরূপ রীতি অবলম্বন করা মন্দ নহে। এই ঋতুতে জাকল মাংস, পুরাতন চাউলের অন্ন, অন্ন, লবণ ও রিদ্ধ দ্রব্য আহার করিবে।

এই সময় নির্মূল কাপাস বস্ত্র পরিধান করা হিতজনক। এই ঋতুতে নদীর জল পান করিতে নাই এবং ভূমিতে শয়ন বিশেষ অহিতকর।

ব্যায়াম সকল ঋতুতেই হিতকর; এ সময়ও সহ মত ব্যায়াম করা কর্তব্য। এই ঋতুর উৎপন্ন ওষধি সকল অন্নবীৰ্য্য হইয়া থাকে। এই সময়ে চন্দ্র কিরণ দ্বারা পৃথিবী সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করে। তাহার স্রজ অন্ন, লবণ ও মধুর রস বর্দ্ধিত হয়। বর্ষা বিসর্গ ঋতু বলিয়া প্রাণিগণের বণ ও বর্ণ এই সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, একালে মধুর রস সেবন করিলে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়, এবং উদ্ভিদা দৃষ্টি শক্তির প্রেরণতা জন্মে এবং বলা ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় অন্ন রস-সেবনে

বায়ুর অমূল্য সাধিত হয়, কারণ অন্নরস আরক ও পাচক।

লবণ রস দ্বারা পাচক ও সংশোধক শক্তি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় কোন দ্রব্য সেবনই কর্তব্য নহে।

সকল দ্রব্যের অপরিমিত সেবনেই অনিষ্ট হইয়া থাকে। অমৃতের ভ্রায় উপকারী এমন যে ছুট, বাহা আমাদের ভূমিষ্ট কাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জীবনী-শক্তির

পরিবর্দ্ধক বলিয়া শাস্ত্র-নির্দিষ্ট, তাহাও যদি অত্যধিক পরিমাণে পান করা যায়, তাহা হইলেও তদ্বারা অজীর্ণাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফল কথা হিতকর বস্তুরও অধিক মাত্রায় সেবা করিলে রোগের কারণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার বলেন—

“প্রাণাং প্রাণভূতামন্নং তদযুক্ত্যাহিতন্ত্যয়ন।  
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্”।

শ্রীমুখাংশু ভূষণ সেন গুপ্ত।

## প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।



**টাইফয়েড চিকিৎসা।**—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দাস প্রণীত ও “কাজের লোক” সম্পাদক শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত। মূল্য এক টাকামাত্র। সাম্প্রতিক বা টাইফয়েড জর কি এবং তাহার লক্ষণাবলী দেখিয়া হোমিওপ্যাথিক মতে কিরূপ চিকিৎসা করা উচিত—ইহা লইয়া পুস্তক ধানি লিখিত হইয়াছে। এই রোগে নাড়ীর গতি কিরূপ হয়, কিরূপ নাড়ীর অবস্থা হইলে এ রোগে মৃত্যু হইতে পারে, এ সকল কথার আলোচনা করিবার অজ্ঞ ও গ্রন্থকার যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে। তিনি নাড়ীর কথা বলিতে গিয়া একস্থলে বলিয়াছেন, “নাড়ী যদি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত দ্রুত হয়, তাহা হইলে ভয়ানক দৌর্য্যালোর পরিচায়ক, টাইফয়েড বা সাম্প্রতিক জরের শেষ অবস্থায় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।” আমাদের আয়ুর্বেদ বলিয়াছেন,—“দ্বীণে বল-বতী নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণ বাতিকা”। কাজেই

গ্রন্থকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইলেও আয়ুর্বেদের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা আছে বুঝা গেল। কিরূপ ভাবে রোগের বীজাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, এই রোগের আক্রমণে কিরূপ নিয়ম পালন করা উচিত,—এ সকল কথারও বেশ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইজন্য পুস্তকখানি শুধু চিকিৎসক দিগের পাঠ্য নহে, সাধারণ লোকের পক্ষেও বিলক্ষণ উপকারী হইয়াছে বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্য লইয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকের প্রচারে দেশের উপকার হইবে।

**আয়ুর্বেদ তত্ত্ব-বিজ্ঞান।**—পূর্বখণ্ড।—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকল্প কর্তৃক ও প্রণীত প্রকাশিত। এই পূর্বখণ্ড দুইটি ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ২য় ভাগে স্বাস্থ্যতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। চরক, সূত্রক, ভাব প্রকাশ

ও মাধবনিদান প্রভৃতির সরল পদ্ধতিবাদ কবিতা গ্রন্থখানি রচিত। রচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। নীরস ও জটিল আয়ুর্কৌদীয় শ্লোকের ভাব-সমষ্টি ঠিক বজায় রাখিয়া, সরল পদ্ধতি একরূপ ধবণের গ্রন্থ প্রণয়ন করা বড়ই কঠিন। প্রকৃত কবি এবং ভাবুক ভিন্ন সে সকল শ্লোকের অনুবাদ একরূপ সহজ ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। সংস্কৃত ভাষায় জনভিজ্ঞগণ যদি যত্নপূর্বক এই গ্রন্থ খানি পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্মৃতিতত্ত্ব, এবং খাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা শিক্ষা করিয়া, আপনাপন স্বাস্থ্যোন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন। দেশের অঙ্গনাগণ বাজে নাটক-নবলের পাঠ্যস্পৃহা কয়েক দিনের জন্ত বন্ধ রাখিয়া যদি এ গ্রন্থ খানি পাঠ করেন, তাহা হইলেও নিজ নিজ সংসারের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। মূল্য কত—তাহার উল্লেখ কিন্তু গ্রন্থের কোন স্থানেও পাওয়া গেল না।

**আয়ুর্কৌদীয় বিজ্ঞান।**—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায় কবি কল্পণ প্রণীত। এখানি মাধবকর কৃত নিদান-বৈদ্য পদ্ধতিবাদ। অনুবাদ বেশ সহজ ও প্রাজ্ঞ হইয়াছে। আয়ুর্কৌদীয় গ্রন্থগুলিকে একরূপ ভাবে সাধারণের বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিলে, দেশবাসীর প্রভূত উপকারের দত্তাবনা। আমরা একরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

**ষোগবঙ্গ।**—ধর্মতত্ত্ব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্কৌদীয় মাসিক পত্র। সম্পাদক কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিত্ববর্ণ। প্রকাশক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিরাজ, ৩নং কালীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট কলিকাতা। প্রতিম বার্ষিক মূল্য দ্বাদশহ ১০/০ আনা।

২য় বর্ষ। তিন খণ্ডে দুই দুই সংখ্যা করিয়া ১ম হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা। সবগুলির প্রত্যেক খণ্ডেই দুই সংখ্যা করিয়া বাহির হইয়াছে, একত্র এখানিকে ইহার পরিচালকগণ “মাসিক পত্র” অভিধান প্রদান করিলেও, ইহা ঠিক মাসিক কি না বুঝা গেল না, দুইমাস অন্তর ইহা বাহির হইয়াই উপলব্ধি হইল। তাহার পর “ধর্মতত্ত্ব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্কৌদীয় মাসিক পত্র” নাম কেন যে ইহার পরিচালকগণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও বুঝিলামনা, শুধু “আয়ুর্কৌদীয় মাসিক পত্র” বলিলে, “আয়ুর্কৌদ” কথাটির মধ্যে কি ধর্মতত্ত্ব বুঝাইতনা? তবে “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্কৌদীয় মাসিক পত্র”—এ কথাটি বলায় অবশ্যই বাহ্যিক হইয়াছে। এতদিন “আয়ুর্কৌদ” বলিলে উহা প্রাচ্য বলিয়াই সকলে জানিত, এখন কিন্তু “যোগবঙ্গ” প্রচারে লোকে বুঝিবে, আয়ুর্কৌদ শুধু প্রাচ্য নহে,—ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে উদ্ভূত হইয়াছে। অবশ্য স্বীকার করি, বর্তমান সময়ে আয়ুর্কৌদীয় চিকিৎসার শ্রোত অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। সেকালের মত রোগ আরোগ্য করিবার জন্ত সকলেই ধর্মতত্ত্বিকর চিকিৎসক হইতে ইচ্ছা করেননা, এখনকার দিনে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-ব্যবসায়ের পেটেন্ট ঔষধাদির অধিকরণে মফস্বলে ক্যাটালাগ-প্রচারেই অনেকের চিকিৎসা-বৃত্তি সিদ্ধ করা হয়। বাস্তবতায় অনেক গোড়া কবিরাজ ম্যালেরিয়া দ্বারা তাড়াইবার জন্ত নানারূপ চেষ্টা করিয়াও যখন অকৃতকার্য হইলেন, তখন-অতিসম্পর্পনে মসিন্দ্রাদির সহিত গোপনে কুইনাইন বিশাইয়া “ম্যালেরিয়ার সিদ্ধ বটিকা” আরোগ্যে

রোগ আযোগ্য করিয়া থাকেন। যোগবলের সম্পাদক কি এই অর্থে “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্বেদীয়” কথা ব্যবহার করিয়াছেন? কল, কথা, আমরা এ কথাটার অর্থ বুঝিলাম না। কাগজের বাহিরে ত এই, এইবার ভিতরের প্রবন্ধ প্রকাশের কথা। ১ম ও ২য় সংখ্যা নাম যুক্ত ১ম বহিখানিতে প্রথমেই প্রকৃতি ও বিকৃতির কথা। এই প্রবন্ধে ধান ভানিতে শিবের গীত অনেক গাথা হইয়াছে। সর্কোপেক্ষা এই প্রবন্ধের লেখক বর্দ্ধমানবাসিনী রমণী সমাজের “বাজখাই আওয়াজ” শ্রবণে প্রথমতঃ “কাগের ভিতর দিয়া মরমে পশায় প্লীহা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম” ভয়ে যে ভীত হইয়াছেন, তাহাই আমাদের দুঃখের কারণ। বলি, নাম জাহির করিবার জন্ত, কাগজ পুরাইবার জন্ত প্রবন্ধ লিখিতেছ, লেখ, তাহাতে কাহারও আসিয়া-বাইতেছে না, কিন্তু তাহাতে রমণী সমাজে বিদ্রূপ-বর্ষণ কি শিষ্টাচারের পরিচায়ক? বাসন-বিক্রেত্রী হইলেও রমণী, রমণী। যদি হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান কর, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মান বজায় রাখিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। তাহার ব্যতিক্রমে সৌজন্যহানি অবশ্যস্বাভাবী, ইহা প্রত্যেক হিন্দুই স্বীকার করিবেন। ঐ

পুস্তকে ইহার পর “নাড়ীজ্ঞান রহস্য”। ইহাতেও রহস্যজনক বাপার-সমাবেশের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। লেখক একস্থলে বলিয়াছেন,—“অনেকের ধারণা যে, নাড়ীজ্ঞানটা কিছুই নহে, উহা লোক ভুলান একটা ছলনা বা চাতুরী মাত্র।” কিন্তু এই “অনেকের ধারণা” শব্দে কাহাদিগকে “অনেক” অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কিন্তু লেখক খুলিয়া বলেন নাই। শুধু “কোড” প্রকাশই করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সেই কোড-প্রকাশ ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা খুব জোর-করিয়া বলিতে পারি, “নাড়ী জ্ঞানটা কিছুই নহে, উহা লোক ভুলান ছল বা চাতুরী” এরূপ কথা বাঙ্গালা দেশের কোন স্থলে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরই মুখে এপর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং ইহা এই প্রবন্ধ লেখকের প্রাক-রচনার চাতুর্য্য ভিন্ন কিছুই নহে। তাহার পর মাসিক পত্র নাম দিয়া কাগজ বাহির করিতে হইলে, এইরূপ একটি বা দুইটি প্রবন্ধ লইয়া সংখ্যা-সমাপ্তিও কর্তব্য নহে। তবে আয়ুর্বেদীয় মাসিক পত্রের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ততই দেশের মঙ্গলের কথা। সেই হিসাবে ইহার পরিচালকগণ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

ক বিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন ও  
কবিরঞ্জন।

## দুইখানি পত্র।

—::—

১ম পত্র।

“ভারতবর্ষের” অশিষ্টাচার।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের “ভারতবর্ষে” কবিরাজ

সম্পাদ্যকে বিদ্রূপ করিয়া একটি অদ্ভুত চিত্র প্রকাশ করা হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। রোগী ও কবিরাজ, অকল্যাণ

১ চিত্র ফলিত। বোগী, কবিরাজের নিকট  
 গিড়েছেন,—“মহাশয় প্রস্রাব সরল হই-  
 তছেন”—অমনি কবিরাজ বলিতেছেন,—  
 ‘হাতখানি দেখি’—ইহাই চিত্র-কথায়  
 প্রকাশ। প্রস্রাব সরল হইতেহে না বলায়,  
 ‘হাত দেখা’টা “ভারতবর্ষের” চিত্রকর্তার নিকট  
 দ্বন্দ্বার্থ বোধ হইলেও ইহা আয়ুর্বেদীয়  
 চিকিৎসার বহির্ভূত বিষয় নহে। বায়ু, পিত্ত ও  
 কফ লইয়াই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার কৃতিত্ব।  
 যে কোন রোগেরই চিকিৎসা করা হউক,  
 ঐ বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটিকে  
 অবলম্বন কবিরাজ চিকিৎসা করিতে হইবে—  
 ইহাও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষত্ব।  
 প্রস্রাব সরল না হইলে, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-  
 শাস্ত্রে তাহাকে মূত্রকছু, মূত্রাধাত বা প্রমেহের  
 অঙ্গীভূত রোগ নামে অভিহিত করা হয়।  
 সেট সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ধাতু বায়ু  
 প্রধান, কি পিত্ত-প্রধান, কি কফ-প্রধান,  
 কি কোন্ ছুইটির সমন্বয়ে দ্বন্দ্বজভাবে  
 উপস্থিত হইয়াছে, সর্বাগ্রে ইহা জ্ঞাত হইয়া  
 তবে চিকিৎসাকার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।  
 “ভারতবর্ষের” চিত্রকর্তা ‘এম-বি’ উপাধি-  
 যুক্ত ডাক্তার, তিনি এ রহস্য কেমন করিয়া  
 অবগত হইবেন? তিনি ত পাশ্চাত্য  
 চিকিৎসা-বিজ্ঞান স্থপতি; “আয়ুর্বেদ”  
 লইয়া ত বাঁটাবাঁটি করেন নাই, সুতরাং  
 আমরা “ভারতবর্ষের” প্রকাশিত এই অদ্ভুত  
 ধবণের চিত্র দেখিয়া চিত্রকর্তা ডাক্তার বাবুর  
 চিত্র-কোশলে আদৌ বিশ্বাস হই নাই, “তবে  
 “ভারতবর্ষের” মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রের  
 সম্পাদক মহাশয় যে এরূপ চিত্র পত্রস্থ করিয়া  
 পত্রের গৌরব-মর্যাদা নষ্ট করিতে পারেন,  
 ইহার জ্ঞান-জ্ঞপিত হইয়াছি।

## ২য় পত্র।\*

## ঢাকার বৈদ্য-সম্মেলন।

বৈদ্য বা আয়ুর্বেদ-সম্মেলনের অধিবেশন  
 হইবার কথা শুনিলেই—আমাদের প্রাণে  
 আশা জাগিয়া উঠে। আমাদের মনে হয়,  
 স্থানে স্থানে এরূপ অধিবেশনের ব্যবস্থা হইলে,  
 ইহা হইতে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদের মহিমা-  
 কীর্ত্তনে ভারতাকাশে বৈদ্য-চিকিৎসার গরিমা  
 বৃদ্ধি আবার ফুটিয়া উঠবে,—সে গরিমা-ক্ষয়-  
 দেশের লোকে আবার আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার  
 প্রতি যথোচিত সমাদরে অভ্যস্ত হইবে। ইহা  
 ভিন্ন সকল সম্মেলনেই যে একতা বৃদ্ধির উপায়  
 হইয়া থাকে, আমাদের বৈদ্য বা আয়ুর্বেদ  
 সম্মেলনেও বৃদ্ধি আমাদের মধ্যে সে একতা-  
 বৃদ্ধি বিশেষরূপে হইতেছে দেখিতে পাইব।  
 পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ সহর—শুধু পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ  
 সহর কেন,—একদা বাঙ্গালার সর্বপ্রধান  
 রাজধানী—ঢাকানগরীতে বৈদ্যসম্মেলনের  
 ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া এই জ্ঞানই আমরা  
 অত্যন্ত আশাবিত্ত হইয়াছিলাম। আমরা  
 ভাবিয়াছিলাম, এই অধিবেশনে বাঙ্গালার  
 বাঙ্গালী চিকিৎসকগণের সকলেই বৃদ্ধি ইহাতে  
 সম্মিলিত হইবেন, সে সম্মিলনে আয়ুর্বেদের  
 উন্নতিকল্পে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে,—  
 বাঙ্গালা দেশের কবিরাজগণের মধ্যেও বৃদ্ধি  
 এই উপলক্ষে একতা-বৃদ্ধির ব্যবস্থার একটা  
 উপায়-বিধান করা হইবে। কিন্তু সে সব  
 কিছুই হইল না দেখিয়া ঢাকার বৈদ্যসম্মেলনের  
 অধিবেশনের ফলে আমাদের মনে নিরাশই  
 হইতে হইয়াছে। কলিকাতা হইতে সভাপতি

\* এই পত্রখানি বহুপূর্বে হস্তাক্ষরিত হইয়াছে,  
 যদ্যপ্যবে প্রকাশিত হয় নাই। (অঃ সঃ)

মহাশয় ভিন্ন আর কোন কবিরাজই ঐ অধিবেশন উপলক্ষে গমন করেন নাই,—ইহা নিশ্চয়ই সম্মেলনের সার্থকতার অন্তরায় বলিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন,—সংখ্যে থিয়েটারে ঐহারা main part লইয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিনয়েব কৃতিত্ব দেখাইবার জন্তই তাঁহারা অভিনয়ের পুস্তক নির্বাচন করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রেও নাকি সেই ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সেইজন্তই নাকি দেশের নামজাদা কবিরাজদের কেহ সে সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। তাহার পর সম্মেলনে অনেকরূপ কলেঙ্কারীও হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। অনেকে বলিতেছেন,—সমাগত ব্যক্তিদিগকে যথোপযুক্ত আদর ও যত্ন করা হয় নাই। ময়মনসিংহের “চাকমিহির” এবং কলিকাতার “হিতবাদী” পত্রে সে সকল

কলেঙ্কারীর অনেক কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। সভাপতির অভিভাষণেও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-সকলিগেব নামোল্লেখের সময় প্রায় অধিকাংশ প্রাচীনতামা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের নাম বাদ পড়িয়াছিল, এ সকল লইয়াও নানা জনে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা পূর্বক ঢাকা সম্মেলনেব দোর বাহির করিতেছে। ফলকথা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণের ব্যবস্থার ত্রুটিতে যে সকল দোর হইয়াছে, সভাপতি মহাশয়েব অভিভাষণে উল্লেখযোগ্য কবিরাজ মহাশয়-দিগের নাম বাদ পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইয়াছি। এই জন্তই বলিতে হয়, ঢাকার এই বৈতনসম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন,—এ সম্মেলনের আয়োজন এরূপ ভাবে করা ভাল হয় নাই।

শ্রী —

## অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিভাগে প্রবেশার্থী ছাত্রদিগের প্রতি বিজ্ঞপ্তি।

—:—

বর্তমান আর্ষাট মাসের শেষভাগ হইতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিভাগেব সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রদিগের নতুন সেসন বা নব বর্ষের অধ্যয়ন আরম্ভ হইবে। সংস্কৃত ভাষায় ঐহাদিগের জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারা ইহা সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়নের অবিকারী হইবেন। বাঙ্গালা-বিভাগে, বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যাপ্তি থাকা আবশ্যক এবং কিছু ইংরাজী শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রবেশ করিতে হইবে। মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছেন,—বাঙ্গালা বিভাগের

জন্ত এরূপ ছাত্রদিগের আবেদনই গ্রহণ করা হইবে। এখন হইতে আবেদন করুন, নতুবা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গেলে আর কাহারও আবেদন গৃহীত হইবে না।

আবেদনে জাতি ও বয়সের কথা উল্লেখ করিবেন। অগ্রজ বিষয় জানিবার জন্ত অর্থ আনার টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায়

কবিরত্ন এম, এ, এম, বি

অধ্যক্ষ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিভাগ

# আয়ুর্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক ।

১ম বর্ষ ।

}

বঙ্গাব্দ ১৩২৪—শ্রাবণ ।

}

১০ম সংখ্যা ।

উদ্বোধন ।

—:—

( ১ )

( ৩গো ) নিখিল বেদের শ্রেষ্ঠ যে টুকু,  
—সে টুকু সকলি তুমি,  
চতুর্দর্গ লভি, তোমা'বি গর্বে  
ধন্য গো ভারত ভূমি ।  
প্রথম চিকিৎসা তোমাতে প্রকাশ,  
প্রথম বিজ্ঞান তোমাতে বিকাশ,  
প্রথম রাগিণী কণ্ঠে তোমারি  
উঠিল দিগন্ত চুমি' ।

( ২ )

প্রথমে তুমিই শিখা'লে রিখে  
জ্ঞানেরি গরিমা-গান,  
পরপমে তুমিই তুলিলে বিখে  
শ্লোকেরি অপূর্ণ তান ।  
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লইয়া,  
বায়ু-পিত্ত-কফ মুখ্য করিয়া,  
সে শ্লোক সমষ্টি করিলে রচনা  
—রাখিতে অগত প্রাণ ।

( ৩ )

প্রথমে তুমিই এসেছিলে যে গো  
'শল্য-শালাক্য' বেশে,  
প্রথমে তুমিই দিয়েছিলে ঢেলে  
' যা' কিছু সকলি দেশে ।  
তোমারি প্রথম সকল 'হস্ত'  
তোমারি প্রথম 'অগদ তন্ত্র'  
'কৌমার ভূতা' 'কায়' 'রসায়ন'—  
শেখা'লে সকলি এসে ।

( ৪ )

তোমার সেবার ত্রুটি লইয়া  
মুখর হইল নিশি,  
তোমার সেবক হইবে বলিয়া—  
দেবতা আসিল নিশি ।  
অবতার বেশে এল দেবগণ'  
করিল তোমার মহিমা কীর্তন,  
উদিল তারতে সূতের তপন,  
ঘুটিল তামসী—নিশি ।

একদা তোমার উপদেশ-বাণী

মুগ্ধ করিল দেশ,

দীর্ঘ জীবন লভিল সকলে

ধরিয়া মোহন বেশ।

তোমারি নিয়মে জগত চলিল,

তোমারি নিয়মে সমাজ গঠিল,

(তুমি) বিধে চালিলে শক্তি অপূর্ণ,

—ছিলনা বাহার শেষ।

( ৬ )

আরোগ্য-সম্পদ লভিল তাহাতে

দেশেরি যতেক লোক,

(তুমি) আশীষ করিলে অন্তর হইতে

“ধরণী স্মৃতে রোক্ত।”

কি পাপে জানি না গেল সেই দিন,

তাহারি ফলেতে এবে আয়ুঃক্ষীণ,

আবার এস গো তুমি ‘আয়ুর্বেদ’—

‘ভারত’ তেমনি হোক্ত।

( ৭ )

আবার তোমার সেবাটি করিয়া

ঘুচুক রুগ-জরা,

আবার তোমার আদেশ-পালনে

মত্ত হউক ধরা।

আবার তোমার শক্তি দেখিয়া,

আবার তোমারে ভক্তি করিয়া—

মত্ত হইয়া তোমারি ভাবেতে

রহুক বিশ্ব গড়া,

(ওগো) এস ‘আয়ুর্বেদ’ অষ্টাঙ্গ লইয়া—

তেমনি স্মৃতে ভরা।

## আয়ুর্বেদের উন্নতি না অবনতি ?

—\*—

আজ কাল অনেকেরই মুখে শুনিতে পাই যে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সর্বপ্রকারে উন্নতির দিন আসিয়াছে। প্রমাণ স্বরূপে অনেকেই দেখাইয়া থাকেন যে, কলিকাতা এবং মফঃস্বলে—সর্বত্রই আয়ুর্বেদ-ব্যবসায়ীর ও ঔষধালয়ের সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি,—লোকের যদি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা না বাড়িত, তাহা হইলে, কলিকাতার প্রত্যেক গলিতে এত অধিক সংখ্যক আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ বিক্রয়ের দোকান খুলি কখনই টিকিতে পারিত না। তাহার

পর আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসার যে সকল কবি-রাজ মহাশয় আজকাল বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রণামীর গোরব, মোটরকার ও জুড়ীগাড়ীর ‘স্বচ্ছতা’, প্রকাণ্ড প্রাসাদ প্রভৃতি বাহুসম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, এখন কলিকাতার এলোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক খ্যাতনামা বড় বড় চিকিৎসকগণ অপেক্ষা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের পদ-প্রতিপত্তি অধিক না হউক কিন্তু কোন প্রকারে ন্যূন ত নহেই। তাহার পর নিখিল



ভাবতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিক মহাসম্মেলন প্রভৃতি ভারত-  
বাসী আন্দোলন-প্রণালী দিন দিন যেপ্রকার  
প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা দেখিলে কাহার  
না মনে হয় যে, ভারতে অচিরকালের মধ্যেই  
আবার আয়ুর্বেদের সমধিক উন্নতি হইবে,—  
দেশের স্বাস্থ্য, সুখ ও সম্পদ আবার ফিরিয়া  
আসিবে,—মোটী-ভাত মোটীকাপড়ের দেশে  
সবল ও মূল্যবান আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রভাব  
আবার সার্বজনীন হইবে। কথাগুলি আপা-  
ত্যতঃ বেশ ঐতিহাসিক ও মুখবোচক বটে  
তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভিতরে তলাইয়া  
দেখিলে, অতীতপন্থী প্রতীত হয়। এই বাহ্য-  
সৌন্দর্যের আবরণের ভিতরে যে কি ভীষণ ও  
বীভৎস প্রকৃতি খেলা করিতেছে, তাহা এক-  
বার সকলেরই দেখা উচিত। আয়ুর্বেদ  
প্রেমিক প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি যাহাতে এই  
বিষয়ে পতিত হয় এবং ইহার প্রতীকার কি  
ও তাহার উপায় কি, তাহা বুঝিয়া জনসাধারণ  
মিলিয়া শীঘ্র যাহাতে অমূল্য ভাবে মিলিত  
হইয়া বিহিত কার্য করিতে অগ্রসর হন,  
তাহারই জন্ত গুটিকয়েক কথা অনেকেরই  
ঐতিহাসিক না হইলেও আজ বলিব।  
আর না বলিয়া থাকা চলেনা,—  
কারণ একবার আলোচনা স্থগিত থাকিলে,  
আয়ুর্বেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া  
উঠিবে।

সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, আয়ুর্বেদ  
শোকানদারীর জিনিষ নহে, আয়ুর্বেদবিজ্ঞা  
ধনাজ্ঞানের জন্ত নহে,—অর্থাৎ আয়ুর্বেদবিজ্ঞা  
অর্থকরী বিজ্ঞা নহে, কোন প্রকার অর্থার্জন  
করিয়া সমাজে গণ্যমান্য হইয়া বিয়-ভোগ-  
লালসার চরিতার্থতা সম্পাদন করাই বাহার  
লক্ষ্য, সেই ব্যক্তি আয়ুর্বেদশাস্ত্রানুসারে

চিকিৎসকের পবিত্র পদে অধিষ্ঠিত হইবার  
যোগ্য নহে।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"বরমাশী বিষবিষং কথিতং তাম্রমেববা ।  
পীত মতগ্নি সন্তপ্তা ভক্ষিতাবাপ্যয়োগুড়াঃ ॥  
নতু শ্রুতবতাং বেশং বিজ্ঞতা শরণাগতাং ।  
গৃহীতমন্নং পানং বা বিত্তং বা রোগপীড়িতাং ॥  
ভিষগবুভূমুঃ তিস্মান্ অতঃ স্বগুণ সম্পদি ।  
পরং প্রযত্নমতিষ্ঠেৎ প্রাণদঃ শ্রাদ্ যথা নৃণাম্ ॥"

তাৎপর্য এই যে, সর্প বিষ ভক্ষণ করাও  
বরং ভাল, কথিত তাম্র পান করিয়া প্রাণ-  
ত্যাগ করাও বরং শ্রেয়ঃ, সন্তপ্ত লোহগুড়িকা  
ভক্ষণ করাও বরং প্রশস্ত, তথাপি আয়ু-  
র্বেদজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বেশ ধারণ পূর্বক রোগপীড়িত  
শরণাগত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ন, পান বা  
কোনরূপ বিত্ত গ্রহণ করা উচিত নহে।  
অতএব<sup>১</sup> যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসক  
হইতে চাহেন, তাঁহাকে প্রাণপণে সেই গুণ-  
সম্পত্তিকে অর্জন করিবার জন্ত সর্বদা প্রযত্ন  
করিতে হইবে,—বাহার প্রভাবে তিনি  
লোকের প্রাণপ্রদ হইতে পারেন<sup>২</sup>।

আমাদের দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য এই যে,  
আজকাল এইরূপ প্রাণদ অথচ নিঃস্বার্থ  
আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল  
হইয়া পড়িতেছে,—সরণাতীত কাল হইতে  
পুরুষ-পরম্পরায় চিকিৎসা করা বাহাদের  
ব্যবসায় ছিল, একটা অসাধ্য রোগের চিকিৎসা  
করিয়া আসন্নমৃত্যুর করাল কবল হইতে  
রোগীকে রক্ষা করিয়া একজোড়া কাপড়,  
একটা পিঠলের ঘড় এবং একটা রক্ততৃপ্ত  
লক্ষ্মী পাইলেই বাহারা যোগ্য পারিশ্রমিক  
লাভ হইল বলিয়া সন্তোষ অমূল্য করিতেন,  
পুরুষ-পরম্পরায় লক্ষ্মী-নৈশুণ্য ও অতি

জ্ঞতার প্রভাবে ষাঁহারা ঔষধ নির্মাণে চিকিৎসা-ব্যাপাবে দিব্য হস্ত ছিলেন, সেই সকল কবিরাজের ববণীয় আসনে আজ ষাঁহারা উপবেশন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পেটেব দায়ে চিকিৎসক—একথা কয়জন অতিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? কোন প্রকারে ৩০।৪০ নং গ্রেসের প্রসাদে (কাব্যার্থী) উপাদিত হস্তগত করিতে পারিলেই হইল, আর পায় কে? দিন কয়েক কোন খাতনামা কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে অন্নধ্বংসসহকায়ে ‘মাদবনদান’ থানা চোখ কান বুজিয়া গলাধঃকরণ করিতে পারিলেই বাজোমাং! তাহার পরই কলিকাতার কোন একটা জনসংকুল পথের ধারে ‘গভর্নমেন্ট ডিপো’ প্রাপ্ত” “ভূতপূর্ব মহারাজ বিশেষের ভূতপূর্ব গৃহচিকিৎসক” ইত্যাদি আড়ম্বরপূর্ণ বাজে কথাপূর্ণ সাইন-বোর্ড লিখাইয়া দোকান বরে—দ্বাবের উপর লটকান আর সঙ্গে সঙ্গে ‘বৃহদঙ্গার চূর্ণ’ ‘বৃহদিশ্ঠকচূর্ণ’ ও ‘বৃহদটোলিকাচূর্ণ’ এই জাতীয় নানাবর্ণ ঔষধপূর্ণ ছোট বড় শিশি-বোতলমণ্ডিত একটা বা দুইটা আলমারী স্থাপন ইহাই যথেষ্ট!—ইহারই প্রসাদে “শত মারীলবেদবৈথ” হইবার জন্ম একটা অদম্য উৎসাহ থাকিলেই হইল! ইহাই হইল—বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক হইবার সর্বজনবিদিত সূত্র-পন্থা।

এই জাতীয় চিকিৎসকগণ কিসে অজ্ঞ, আতুরদিগকে বঞ্চনা করিয়া দুই পয়সা হাতাইতে পারিবেন, তাহারই জন্ম কায়মনো-বাক্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন। স্কুল-পণ্ডিতী জ্যোটেলা,—বাটীতে চাববাসের ও কোন সুবিধা নাই,—কেয়ালীগিনি করিবারও সামর্থ্য

নাই, অথচ ভদ্রবংশোদ্ভব বলিয়া মুটেকিবি করিবারও যো নাই, সামর্থ্যও নাই; স্ত্রতবা কবিরাজী করাই প্রাপ্ত! এই ব্যবসায়িক-বুদ্ধির দ্বাৰা ষাঁহারা পরিচালিত, অধিকাংশহলে তাঁহাবাটীত আজ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকেব কার্য্যে ব্যাপৃত। এইরূপ ধনগোভে বিবেক-হীন অশাস্ত্রজ চিকিৎসানিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যদি আয়ুর্বেদের দোহাই দিয়া সাধাবণের চক্ষে ধূলিনিঃক্ষেপপূর্বক অর্থার্জন করিতে সন্মত হয়, তাহাদিগের এই লোক ঠকাইবার কুশলতা দেখিয়া কি বলিব যে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের উন্নতির দিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে? চিকিৎসকেব স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে (চরকসংহিতা) কি বলিতেছে?

“শীলবান্ মতিমান্বুক্তো বিজ্ঞাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।  
প্রাণিভিঃ ঙ্গবৎপূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ সহিস্বতঃ॥”

সংস্ভাব, মতিমান্, যুক্তিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞাতিই প্রাণাচার্য্য বা চিকিৎসক হইয়া থাকেন, এই প্রাণাচার্য্যকে প্রাণীগণ গুরুরূপে পূজা করিবে।

কাহাকে বৈথ বলে,—ইহারই উত্তর দিতে যাইয়া চরকসংহিতাকার বলিতেছেন।

“বিজ্ঞানমাপ্তৌ ভিষজ্জুতীয়া জাতিকচ্যতে।

অশ্রুতে বৈথশব্দং হি ন বৈথঃ পূর্বজন্মানা॥”

“অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে লাভ করিলে চিকিৎসক তৃতীয়া জাতি লাভ করিয়া থাকেন, এই বিজ্ঞালাভ করিবার পূর্বে কেহই বৈথকুলে জন্ম হইয়াছে বলিয়া বৈথ হয় না।”

“বিজ্ঞানমাপ্তৌ ব্রাহ্মাণ্য বা সত্কার্য্য মথাপি বা।  
ঐবমাবিশতি জ্ঞানং তস্মাদ্বেথ ব্লিজঃ স্তুতঃ॥”

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পারগত হইলে চিকিৎসক সেই জ্ঞানের প্রভাবে ব্রাহ্ম বা সত্কার্য্য

গান্ধী কবিরা থাকেন, এই ব্রাহ্ম বা আৰ্য সব  
পাতি করিলেই তাঁহার তৃতীয় জন্ম সিদ্ধ হয়  
এবং তখনই তিনি বৈষ্ণব নামে অভিহিত  
হইবার যোগ্য হইয়া থাকেন ।

নান্যার্থং নাপিকামার্থং অথ ভূত দয়াং প্রতি ।  
বভূবে নৃশিচ্চিংসয়াং স সর্পমতিবর্ততে ॥

নিজে আরোগ্যের জন্ত বা নিজের কামনা  
চর্চা করিবার জন্ত চিকিৎসার প্রবৃত্ত না  
হইয়া, যে কেবল ব্যাধিপ্রদীত প্রাণীগণের  
রূপনোচনার্থ দয়াপবন হইয়া চিকিৎসা কার্যে  
ব্যাপ্ত হয়, সে এই জগতে সৰ্বাপেক্ষা মহান  
অর্থ। সেট প্রকৃত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক-  
শ্রেষ্ঠ। ইহাই হইল—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎ-  
সকের উন্নত আদর্শ। এই আদর্শেব প্রতিষ্ঠা  
হইবার এদেশে যতদিন স্থাপিত না হইতেছে,  
ততদিন আয়ুর্বেদের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর  
কি না, তাহা শিষ্টগণই বিচার করুন ।

এই জাতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে-অনভিজ্ঞ  
ব্যক্তিগণ লোক বঞ্চনা দ্বাৰা আয়ুর্বেদের  
দোহাই দিয়া বাহাতে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের উন্নতি-  
পথকে কণ্টকাকূট না করিতে পারে, তাহার  
জন্ত আমাদের দেশে আয়ুর্বেদহিঁসেব্য ব্যক্তি  
মাত্রেরই চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য হইয়া  
পড়িয়াছে । আজকাল দেশের সর্বত্রই  
ভেজালেব আধিক্য। এট ভেজালেব বিড়ম্বনার  
পড়িয়া ঘৃত হৃদ-তৈল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক  
আহার্য দ্রব্যগুলি অব্যবহার্য হইয়া পড়িতেছে  
বা ব্যবহৃত হইলে স্বাস্থ্যহানিকর হইতেছে ;  
তদ্রূপ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের মধ্যে এই  
(ভেজাল চিকিৎসকের) অত্যাধিক্যে দেশে  
আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মূলোচ্ছেদ হইতেছে  
বলিলেও বোধ হয় অতুক্তি হয় না । ইহার  
প্রতিকার সম্বন্ধ আবশ্যক—ইহা কে না  
বলিবে ?

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ ।

## প্রাচীন ভারতে পাঁউরুটী ।

তখনও ট্রেণ ছাড়িবার একটু বিলম্ব ছিল।  
গৌড়-পাতি-মধ্যাহ্নে, মধ্যম শ্রেণীর এক  
কামরায়, সুখোমুখী হইয়া দুই বন্ধুতে বসিয়া-  
ছিল। বেল-কোম্পানী ট্রেনের সংখ্যা  
কমাইয়া দেওয়ায়, প্রত্যেক কামরায় অসংখ্য  
অবোলাব ভিড় হইয়াছিল। বিশেষতঃ  
ট্রেন ও মধ্যম শ্রেণীর অবস্থা দেখিয়া, “অন্ধ-  
দুঃপ্ৰত্যাং” অধিনায়ক “সিরাজকে”ও অনেকটা  
দুঃখ দলিয়া মনে হইতেছিল। নিদাঘের  
উগ্রতাপস মুক্তি দেখিয়া, হাওড়া ষ্টেশনের অমল  
কোলাহল-মুখর-বিপুল-বিস্তার-“প্ল্যাটফর্ম”

স্তম্ভিতভাবে পড়িয়াছিল। যাত্রীদের ভৃষ্ণা-  
কাতর-জিহ্বার সমুখ দিয়া, “বরফ সরবতের”  
ঠেলা গাড়া খানি পুনঃ পুনঃ আনাগোনা  
করিতেছিল।

সহসা আমাদের কামরার দ্বারে এক  
জীবিত ককাল-রক্ত ব্রাহ্মণ উপস্থিত। তাঁহার  
শিরা-বহুল-জীর্ণ-হস্তে এক বিরাট “পুঁটলী”  
ঝুলিতেছিল। একে দারুণ গুমোট—তাহাতে  
গাড়ীর মধ্যে “তিল-ধারণের”ও স্থান ছিল না,—  
আয়োজীদের মধ্যে ৫৭জন উঠিয়া গাড়ীর  
দ্বার চাপিয়া ধরিয়া ব্রাহ্মণের প্রবেশে বাধা

দিনে লাগিল। কিন্তু দেখিলাম—সেই বৃক্ষের শরীরে তখনও অন্ধ রক্তবাহকের মত অযুত হস্তীর বল! সকলকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া, দ্বার ঠেলিয়া, ব্রাহ্মণ গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। আমরা চাহিয়া দেখিলাম,—ব্রাহ্মণের পিছনে-পিছনে ধীরে অথচ অচল মহিমাভরে—এক শুভ্র-বসনা-বিধবাও প্রবেশ করিল। তাহার কোলে গোধূলের প্রথম তারাতীর মত—রূপে উজ্জ্বল ও রোগে ম্লান—একটা ৫ বৎসরের কন্যা!

বিধবা—যুবতী। তাহার 'লজ্জা-ললিত-মলিন মুখ হইতে অবশ্যস্ত সরিয়া গিয়াছিল, অর্ক-ময়ূখ-তাপে-অবসন্ন-ললাট-দেশ হইতে স্থূল ঘর্ষবিন্দু মুকুটফলের মত গণ্ডযুগলে গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে কোনও কথা না কহিলেও, তাহার নিরাশা-কাতর-মুখখানি—অব্যক্ত মধুর চ'ক্ষের ভাষায়, একটু স্থান পাইবার জন্ত যেন সকলের কাছেই মিনতি করিল। সে আর্ন্ত নীরব-নিবেদন যেন নিয়তির অলঙ্ঘ্য আদেশের মতই কঠোর মনে হইতে লাগিল। মুহূর্তের প্রমাদে—যাহারা ব্রাহ্মণকে বসিবার স্থান দিনে স্বীকৃত হয় নাই, যুবতীর নির্বাক মুখের কমনীয়তার তাহাদের স্তম্ভ হৃদয় লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্বের তীব্র-কশাঘাতে সহসা সচেতন হইয়া উঠিল। দুই চারি জন যাত্রী আপনা হইতেই গাড়ীয়া উঠিয়া, ব্রাহ্মণ ও যুবতীকে বসিবার স্থান করিয়া দিল। বৃক্ষের এক পার্শ্বে, বহু অপরিচিতের ব্যগ্র-কোতুহলী সেই দৃষ্টির সম্মুখে—দেহমনে একান্ত লঙ্ঘিত হইয়া, শ্রান্ত-রমণী বসিয়া পড়িল, তাহার পর, অন্তরের কোষবন্ধ মাতৃস্বটুকু বর্ণে গন্ধে ফুটাইয়া তুলিয়া, নিজের অঙ্কেই বালিকার জন্ত নিরাপদ নীড় রচনা করিল।

শেষ, রোগ-পাণ্ডুর মুখের পানে পলকহীন নতনেত্রে চাহিয়া বালিকার জীর্ণ বক্ষ পঙ্কবে সেবা-নিপুণ শীতল হাত খানি বুলাইয়া দিতে লাগিল।

এইবার ব্রাহ্মণের সঙ্গে কেহ কেহ আলাপ আরম্ভ করিলেন।

মায়ের কোলে শুইয়া, প্রতিপদের কাঁণ চক্কেলধার ছায়া, মেয়েটা, অলঙ্কণের জন্ত বুলাইয়া পড়িয়াছিল, সহসা জাগিয়া উঠিয়া কাদিতে লাগিল। তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত ভাবিয়া, ব্রাহ্মণ সেই স্রবৎ পুঁটলিটা খুলিয়া ফেলিলেন এবং এক খানি পাউরুটী বাহির করিয়া তাহারই কিয়দংশ বালিকার হাতে দিলেন, কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সে তাহা চিবাইতে লাগিল।

এই দুঃসহ গ্রীষ্মেও শাটের উপর 'কোট-ওয়েস্ট কোট' আঁটিয়া 'লব্ধসাত পটাবৃত' এক ভদ্র লোক ব্রাহ্মণের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মেয়েটার কি অসুখ?” উত্তর হইল,—“পেটের ব্যারাম”। আবার প্রশ্ন হইল,—“পেটের অসুখে পাউরুটী খাইতে দিতেছেন কেন?” উত্তর—“কি করিব?—কবিরাজ মহাশয় খাইতে বলিয়াছেন।” প্রশ্ন—“তিনি কি রকম কবিরাজ?” উত্তর—“ভাল বলিয়াই বোধ হয়। কলিকাতায় নাম ডাক যথেষ্ট। এই দেখুন না, আমার এই দৌহিত্রীটি প্রায় সাত মাস ভুগিতেছিল, আমাদের দেশের সমস্ত ডাক্তারকে দেখান হইয়াছিল, কেহই স্বাস্থ্য উপকার দেখাইতে পারেন নাই। শেষে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, একটু জল বালিও হজম করিতে পারিত না। তখন কবিরাজ দেখাইবার ব্যবস্থা হইল। সেই অবস্থায় ইহাকে কপি-

কাতায় আনিলাম। কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইলাম। তাঁহার ঔষধ এক মাস খাইতেছে, পেটেব অসুখ ভাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন এই এক দোষ দাঁড়াইয়াছে—মেয়েটাব ভাত সহ হইতেছে না! উপযুপরি দুই তিন দিন ভাত দিলেই সন্দাঁ হইয়া অব কুটে। সেই জগা আজ সকালে ইহাকে কলিকাতায় আনিয়া ছিলাম। কবিরাজ মহাশয় দেখিয়া বলিলেন, —“১০।১৫ দিন ভাত না দিয়া পাঁউরুটী খাইতে দিবেন।” আমাদের দেশে প্রত্যহ “রুটওয়লা” আসেনা, তাই ২।৪ থানা ভাল কটী কলিকাতা হইতে কিনিয়া লইয়াছি।” ব্রাহ্ম নিস্তরু হইলেন। প্রশ্নকর্তা-ভদ্রলোকটী দ্বৈব হাসিয়া, আমাদের দিকে চাহিয়া, জনান্তিকে বলিলেন,—“ব্যাপার বুঝুন মহাশয়। আজকাল কবিরাজরাও পাঁউরুটী পথ্য দেন।” আমার বন্ধু বলিলেন—“তাহাতে আর দোষ কি? ডাক্তাররাও ত মাছের ঝোল, পলতার ডালনা পথ্য দেন, কবিরাজ না হয় পাঁউরুটীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।” ভদ্রলোক আবার বলিলেন—“ইহাতে দোষ আছে বৈকি! যিনি শাস্ত্র-কবিরাজ, তিনি বিদেশী পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন কেন? পাঁউরুটী মুসলমানের আম-দানি, এদেশের খাদ্য নহে। পাঁউরুটীর দোষ-গুণ কবিরাজ কি বুঝিবেন? তবে আজ কাল দেশে অনেক পেটেট ঔষধ-বিক্রেতা-কবিরাজ বলিয়া পরিচিত, তাহারা “অরাস্তকচূর্ণ” নাম দিয়া গোপনে রং মিশ্রিত কুইনাইন্ চালায়, তাহারাই প্রকাণ্ডে পাঁউরুটীর ব্যবস্থা করিতে পাবে।”

মর্শাস্তিক শ্লেষ! কিন্তু সহজ সারল্যে অকুণ্ঠিত!! এ কথার আর কি প্রতিবাদ করিব? এষে সাংঘাতিক সত্য! বাস্তবিক,

বিদেশীকে স্বদেশী করিয়া লইবার উদ্যোগ— বৈজ্ঞানিক সমাজে ত দেখিতে পাউ না! সে উদ্যোগ-বতা ছিল—ভাব মিশ্রণ; সেই আত্ম-সমাহিত মনস্বী চিকিৎসক, জন-হিতৈষণায় অল্পপ্রাণিত হইয়া ‘কফি’ ‘তোপচিনি’কেও স্ব-গ্রন্থে সগো-রবে স্থান দিয়াছিলেন! সে ত্রিকালের কাক-ণিক গুণগ্রাণী-বৈজ্ঞানিক এখন আব দেখিতে পাওয়া যায় কি? আয়ুর্বেদের অভাব অপূর্ণ-তার কথা, ত্যাগশীল-তপস্বীর মত কেহ ভাবিয়া দেখেন কি?

গাড়ী ছাড়িবার বণ্টা বাজিয়া উঠিল। “অগ্নিময় রক্তচক্ষু” মেলিয়া, বাশ্পময় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, বিরাট দেহ “লৌহ সরীসৃপ” ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমি সেই ভদ্রলোকের কথাই ভাবিতে লাগিলাম।

ভাবিতে লাগিলাম—সত্যই কি পাঁউরুটী এদেশের খাদ্য নহে? যে দেশের ভগবান ভোগের জন্তই, “এক” হইয়াও “বহু” হইয়া-ছেন—সে দেশে কি ভোগের জিনিষের কখনও অপ্রতুল ছিল?

সেই দিন হইতেই—অতীতকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি। সেই দিন হইতেই, প্রকৃত্ত্বের আলোচনা আমার হীন-জীবনের ক্ষুদ্র-ইতিহাসে একটা যুগ সৃষ্টিকারী অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে! সেই দিন হইতেই—আশানের অঙ্গার ঘাঁটিয়া, চিত্তভঙ্গ অঙ্গে মাখিয়া, শব-চুম্বীর অর্দ্ধদণ্ড বংশ খণ্ড বাছিয়া ভবিষ্যতেক জন্ত সঞ্চয় সংগ্রহ করিতেছি। একটা অনাগত আনন্দের নবীন আলোক রশ্মি, আমার বিগ্রহ-বিহীন-অন্ধকার-মর্শ-মন্দিরে আরতির “পঞ্চ-প্রদীপ” জাליয়া দিয়াছে। সেই পুলাকের উদ্গাদনায় মনোবী-চিস্তরঞ্জনের মধুর ধ্বনির প্রতিধ্বনি কুলিয়া, স্বর্ণবস্ত্রিত অতীতের পানে

চাচ্চি, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—“এদেশে নাট কি? ছিল না কি?”

এদেশে পাঁচকটাও ছিল। আয়ুর্বেদের পাঠকগণের কাছে আজ আমি তাহাবই একটু পরিচয় দিব।

ভাবতেব প্রাচীন সাহিত্যে “কন্দুপক” নামক এক প্রকাব খাণ্ড দ্রব্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। “কন্দুপক” শব্দটী যোগিক,—অর্থাৎ দুইটী শব্দে যোগে নিষ্পন্ন,—উহাব অর্থ কন্দুত বাগ পক। কিন্তু ণাদে নানা জনে ‘কন্দু’ নানা অর্থ কবিয়াছেন, ফলে “কন্দু” চেনা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অতএব প্রথমতে আয়ুর্বিদগকে “কন্দু” প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে, কেননা ‘কন্দু’ না বুঝিলে “কন্দুপক” ও বুঝা যাইবে না।

প্রসিদ্ধ অভিধান কৰ্ত্তা—নব রত্নের অত্যন্তম রত্ন অমর সিংহ—“কন্দু” পর্ষায়ে ৪টা শব্দ সন্নিবেশিত কবিয়াছেন। যথা—

কৌবেইধরীষঃ দ্রাষ্টোনা কন্দুব।

স্বৈদনী দ্রিষাং।

অমরোক্ত শ্লোকান্দ পাঠ করিলে আমবা বুঝিতে পারি, “অধরীষ” “দ্রাষ্ট” “কন্দু” ও “স্বৈদনী”—এই চারিটী শব্দ সমানার্থক। কিন্তু কারিকার টীকাকার ভাষ্করী দীপ্তিত “অধরীষ” ও “দ্রাষ্ট” শব্দকে ভজ্জন পাত্রে সংজ্ঞা রূপে ব্যবহার করিয়া, “কন্দু” ও “স্বৈদনী” এই উভয় শব্দকে অজ্ঞ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্করী সূত্র—

স্বৈদ ‘স’ লোপশ্চ উঃ। ১। ১৫ অর্থাৎ শৌণ্ডার্থ ‘স্বৈদ’ ধাতুর উত্তর ণাদিক ‘উ’ প্রত্যয় করিয়া কন্দু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আবার ‘স্বৈদ’ ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে লুট প্রত্যয় করিয়া “স্বৈদন” শব্দ, এবং তাহাই

স্থালিঙ্গে “স্বৈদনী” রূপে সিদ্ধ হইয়াছে। “স্বৈদনী”ব অর্থ স্বৈদ করা হয় যাতাতে, ‘কন্দু’ব অর্থ ও শৌণ্ড করা হয় যাতাতে, অর্থাৎ ভাষ্করী মতে “কন্দু” ও “স্বৈদনী” অভিন্ন। উভয়েই এক অর্থ। ভাষ্করী ‘কন্দু’ ও “স্বৈদনী”কে মত নির্মাণোপযোগী পাত্র বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এদিকে আচার্য্য হেমচন্দ্র “ভক্ষ্যাব” ও “কান্দবিক” এই দুইটী নামকে এক পর্যায়াভূত করিয়া, ‘কন্দু’ ও ‘স্বৈদনিকা’কে এক অর্থেই প্রয়োগ কবিয়াছেন। \* অমর সিংহ “ভক্ষ্যাব” ও “কান্দবিকের” আর একটী নাম দিয়াছেন—“অপূপিক”। এত সকল শব্দ-যোজন ও সংজ্ঞা-বহুতা দেখিলে মনে হয়, সেকালে “ভক্ষ্য” বলিলে “কন্দুপক” ও “অপূপ” [ পিষ্টক ] প্রভৃতি বুঝাইক।

এইবার আমরা “কান্দবিক” শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ বুঝিব চেষ্টা করিব। ‘কন্দুতে সংস্কৃত’ ( সংস্কৃতং ভক্ষ্যাঃ। ১৪। ২। ৬ ), এই অর্থে “কন্দু” শব্দের উত্তর “অনু” প্রত্যয় হইয়া ‘কান্দব’—এই রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। পরে ‘কান্দব’ যাহার ‘পণ্য’ [ বিক্রয় ] এই অর্থে “কান্দব” শব্দের উত্তর ঠক প্রত্যয় করিয়া “কান্দবিক” শব্দের উৎপত্তি। অমরসিংহ ‘কান্দব’ ও ‘অপূপ’কে এক পর্যায়াভূত করিলেও ‘কান্দব’ ও ‘অপূপ’ এক দ্রব্য নহে। ‘অপূপ’ শব্দ সাধারণ পিষ্টক বুঝায়, ‘কান্দব’ পিষ্টক জাতীয় হইলেও স্বতন্ত্র পদার্থ। বোধ হয় অমরসিংহ ইহা জানিতেন, নহিলে ‘ঋতীষ্য পিষ্টপবনম’ লিখিয়া তিনি পিষ্টক পাক পাত্রে

\* ভক্ষ্যাকার: কান্দবিষা: কন্দু স্বৈদনিকে সুপে।  
মতী কাণ্ড।

নামকরণ করিতেন না। “অপুপ” [পিষ্টক] ও “কান্দবের” পাকপাত্র ও পাকপ্রণালী-সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। “পিষ্টক”—সাক্ষাৎ অগ্নির সাহায্যে পাক করিতে হয়, ‘কান্দব’ পাকে সাক্ষাৎ অগ্নির আবশ্যক নাই—কেবল পাক করিবার পূর্বে—অগ্নির সাহায্যে “কন্দুটী” গরম করিয়া লইতে হয়। “কন্দু” উত্তপ্ত হইয়া ‘ষেদের’ উপযোগী হইলে—ভন্নধ্যে ‘কান্দব’ পূর্ণ করিয়া পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। কন্দু—শোষকযন্ত্র বিশেষ, স্তরাং কন্দুতে যে দ্রব্য সংস্কৃত হইবে, সে দ্রব্য যে সাধারণ পিষ্টক হইতে স্বতন্ত্র—ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। অমরসিংহ—উভয়ের এই ভেদটুকু অগ্রাহ্য করিয়াছেন, পাক-বিশারদ হেমচন্দ্র এ ভেদ ভাল রকমেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি “কান্দবিক” শব্দের পর্যায় হইতে অপূপিক শব্দটী ছাটিয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস—এই “কন্দু”-পক দ্রব্যই—পাঁউরুটী। “মালবিকাগ্নি মিত্র” নামক কালিদাস কৃত নাটক পড়িয়া আমাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। সকলেই দেখিয়া থাকিবেন—পাঁউরুটী প্রস্তুতের শেষদয় “কন্দু”—দোকানের মধ্যেই অবস্থিত হইয়া থাকে। “মালবিকাগ্নি মিত্রের রাজা বিদূষককে অহরোধ করিতেছেন—“কিং বহনা সখ! চিন্তয়িতব্যোহস্মিতে।” সখা! আর অধিক বলিতে চাহিন, আমার সখকে তুমি কিছু চিন্তা করিয়া দেখিও।” উত্তরে বিদূষক বলিতেছেন—ভবদাবি অহং দিচ্ বিপণে কন্দু বিতমে উদরভ্যন্তরং দজ্জবই।” “আপনার কেও আমার বিবর তাবিত হইবে, কেননা,

বিপণিস্থ “কন্দু” ভায় আমার উদরেব অভ্যন্তরং দজ্জবইতেছে।” ২য় অঙ্ক। এই উক্তি প্রত্যুক্তিতে বেশ বুঝা যায়,—সেকালেও দোকানের মধ্যে ‘কন্দু’-বয় প্রতিষ্ঠিত হইত। কান্দবিক অল্পস্ত অঙ্গার পূর্ণ করিয়া কন্দু অভ্যন্তর ভাগ উষ্ণ করিয়া লইতেন।

বর্তমান কালে এক শ্রেণীর লোক রুটী বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে আমরা “রুটীওয়াল” নামে অভিহিত করি। পুরাকালেও কান্দব বিক্রয়কারীকে লোকে “কান্দবিক” বলিত। সচরাচর বৈষ্ণু জাতিই—কান্দব-বিক্রয়ের ব্যবসা করিতেন, বৈষ্ণববর্ণ—দ্বিজাতি, স্তরাং তাহাদের প্রস্তুত ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে কাহারও আপত্তি ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্র পড়িলে আমরা বুঝিতে পারি,—বৈষ্ণবগণের দেখাদেখি শূদ্রগণও একদা কান্দব বিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। শূদ্রস্পৃষ্ট “কান্দব” ভক্ষণেও ব্রাহ্মণের কোন বাধা ছিল না। প্রমাণ—

কন্দুপক্কানি তৈলেন পায়সং দধিশক্তবঃ।

দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রেগেহকৃতাতপি ॥

এ প্রমাণ তিথিতত্ত্বের। “কুর্ম পুরাণেও” এ প্রমাণ সমর্থিত হইয়াছে। প্রধান স্মার্ত হারীত ও ব্যবস্থা দিয়াছেন—

“কন্দুপক্কং মেহপক্কং পায়সং দধিশক্তবঃ।

এতানি শূদ্রাং ভুজ্যে ভোজ্যানি মদ্রব্রবীং ॥”

একে কন্দুপক্ক, তাহাতে আবার মদ্রব্রবীং মোহাই, এ মোহত সঞ্চরণ করা—দেবতারও অসাদ্য! ব্যবস্থাপক সূর্য এবং প্রায়শ্চিত্তকার শূলপাণিও শূদ্রগৃহজাত “কন্দুপক্ক”কে উপেক্ষা করিতে সাহসী হ’ন নাই।

এ যুগে রুটীর কারখানাতে শৌচাশৌ

রক্ষিত হয় না। সেকালেও হইত না। শুদ্ধি-  
তত্ত্বে মহর্ষি শাতাতপ ও বলিয়াছেন—

গোকুলে “কন্দুশালায়াঃ” তৈলযন্ত্রেক্ষু যজ্ঞায়াঃ ।

অমী মাংস্তানি শৌচানি জীষু বালাতুরেষু চ ॥

মহর্ষি চরক জেস্টাক বেদ-প্রসঙ্গে কন্দুর  
উল্লেখ করিয়াছেন।

“দ্বি-পুরুষ প্রমাণঃ স্তম্ভঃ কন্দু সংস্থানম্”

সূত্র। ১৪ অঃ

এই সকল শাস্ত্র-বচনের মহিমায় আমরা  
“কন্দুপক”কে পাউরুটী ও বিস্কুট বলিয়া গ্রহণ  
করিতে বাধ্য হইতেছি। আর্ঘ্যযুগে যে পাউ-  
রুটীর প্রচলন ছিল, পাউরুটী প্রস্তুতের জন্ত  
যে স্বতন্ত্র শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে কালের  
লোকে যে বহুল পরিমাণে পাউরুটী ব্যবহার  
করিতেন, উগাদিত্য, স্মৃতি শাস্ত্র, পুরাণ তন্ত্র  
প্রভৃতি আর্ঘ্যগ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ  
দেখিতে পাওয়া যায়। কালের অনতিক্রমণীয়  
বিধান বলে—প্রাচীন “কন্দু” “তন্দু” নামে  
অপভ্রংশ ও পরিচিতি হইয়া উঠিয়াছে। আমা-  
দের দেশের জিনিষই আজ আমাদের কাছে  
বিদেশী আগন্তুকরূপে, দেখা দিয়াছে, আর্ঘ্য-  
যুগের “কান্দব” আজ “পাউরুটী” “বিস্কুট”  
নামে অনাৰ্য্য জুষ্ট অভিধান গ্রহণ করিয়াছে !

“তত্ত্ববোধিনীর টীকাকার হইতে স্বাক্ষর  
রঘুনন্দন পর্য্যন্ত—সকলেই “কন্দু” ও “কন্দুপক”  
লইয়া আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ  
কন্দুকে “ভর্জুন পাত্র” কেহ “মত্ত-পাক ঘস্ম”,  
কেহ “ভোগস্থান” কেহবা “করাহী” নামে  
ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু কন্দুপক যে  
পাউরুটী—“বৃন্দ সংহিতা”র কৃতারবর্গ হইতে  
আমরা তাহা সপ্রমাণ করিতেছি।

“বৃন্দ” একজন প্রবীন বৈজ্ঞ ছিলেন, তিনি  
চক্রপাণি ও ভাবমিশ্রের পূর্ববর্তী। “চক্র

দত্ত” ও “ভাব প্রকাশে”—“বৃন্দ-স্বত বহুবোণ  
উদ্ধৃত হইয়াছে। সূত্রাং “বৃন্দকে” অর্ক-  
টীন বলা চলেন। “বৃন্দ”র সময়ে “কন্দুপক”  
একটা উৎকৃষ্ট পথ্য বলিয়া পরিচিত ছিল।  
যথা—

বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং লবণান্বিতাং ।

বিনীয় সন্ধানং কিঞ্চিং স্থাপয়েত্তাজনেন নবে ।

চণ্ডাতপে তাবজ্জক্ষেৎ যাবদগ্নম্ মাধুয়াং ।

উদ্ধৃত্য চ পুনঃ পশ্চাৎ সন্নায়ং দৃঢ় পাণি না ॥

ততোহপূর্ণা কৃতি কুর্ঘ্যাৎ খজমুচ্ছিতয়া তয়া ।

ভূষাদ্ভার প্রতপ্তেভু কন্দুগর্ভে নিবেশ্য চ ॥

পঙ্কজেন রক্তমালিন্যে স্বেদায়ত্তাং যথাবিধি ।

অনেন বিধিনা সিদ্ধং কান্দবং কথিতং বৃধৈঃ ॥

কান্দবং মলকুব্ধাং ত্রিষু দোষেষু পূজিতং ।

সত্তোরুচি করং হৃন্তং শীঘ্র মিত্রিয় তপর্ণং ॥

ছষ্টৈ, মাংসরসৈঃ বাপি কান্দবং ভক্ষয়েন্নরঃ ।

শ্বাস-কাস-জরচ্ছর্দি মেহ কুষ্ঠ ক্ষয়াপহং ॥

“বৃন্দ”। কৃতারবর্গ। (১)

দ্রব্য বিজ্ঞানীয়-কাণ্ড ।

ইহার অর্থ—

ময়দার সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া, জল  
দিয়া বেশ নরম ভাবে মাখিবে এবং তাহাতে  
কিঞ্চিং সন্ধান [ মত্ত জাতীয় অন্ন রসায়ন দ্রব্য  
বিশেষ ] নিক্ষেপ করিয়া নূতন স্তম্ভর-পাত্রে  
রাখিয়া দিবে। ঐ পাত্র যোদ্ধে থাকিবে,  
যখন দেখিবে, পাত্রস্থ ময়দা অন্নরসযুক্ত  
হইয়াছে, তখন ভাঁড় হটতে তাহাকে বাহির  
করিয়া খুব দৃঢ় হস্তে মর্দন করিতে থাকিবে।  
উত্তমরূপে ছানিত হইলে, তাহার দ্বারা পিষ্টক  
প্রস্তুত করিবে। পরে “কন্দু” নামক পাক

(১) “বৃন্দ”র অনুকরণ করিয়া ভাবমিশ্র রসগ্রন্থে  
“কৃতারবর্গ” বলিবেশিত করিয়াছেন।



যন্ত্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রজ্বলিত অঙ্গার পূর্ণ করিয়া তাহা উত্তপ্ত করিয়া লইবে। সেই উষ্ণ কন্দুর মধ্যে পিষ্টকগুলি রাখিয়া, কন্দুর ছিদ্র পথ পক্ষদ্বারা লেপন করিয়া দিবে। এই রূপ উপায়ে সিদ্ধ পিষ্টকের নাম “কান্দব”। চুখ অথবা মাংস রসের সহিত ইহা ভক্ষণ করিতে হয়।

কান্দবের গুণ—মল-বৃদ্ধিকারক, শুক্র জনক, ত্রিদোষ-নাশক, স্তোত্রচিহ্নক, হৃদ-য়ের তৃপ্তিসাধক, ইন্দ্রিয় তপণ [ ইন্দ্রিয়ের প্রশ্রুতি সম্পাদক ] এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয় রোগ নাশক।

এই কান্দবই যে পাঁউরুটী—এখন বোধ হয় কেহই আর তাহা অস্বীকার করিবেননা। বর্তমানকালে যেরূপ ভাবে পাঁউরুটী প্রস্তুত হইয়া থাকে, পুরাকালে “কান্দব” ও সেইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইত।

এখন আমরা “কন্দু” ও “কান্দব” চিনিতে পারিলাম। ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি, পুৰাণ, যে “কন্দুর” স্বরূপ বুঝাইতে পারে নাই, আয়ুর্বেদের মহিমায় আমরা সেই ‘কন্দুর’ প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইলাম। আয়ুর্বেদের প্রমাদে—আমাদের মনের সন্দেহ সংশয় প্রশ্নের অতীত হইয়া গিয়াছে। এই জন্তই পত্র-“হুনোর” বলিয়াছিলাম, আমাদের এমন কোনও শিল্প-বিজ্ঞান, শাস্ত্র-নীতি নাই, আয়ুর্বেদের সঙ্গে সঙ্গে হাহার না উন্নতি হইবে। আয়ুর্বেদকে অপূর্ণতা হইতে রক্ষা করিতে পারিলে—আমরা দেব-প্রতিষ্ঠার ফল তাগী হইব। কিন্তু চুৎখের বিষয়,—আমার

ক্ষীণ কণ্ঠের আর্জ নিবেদন অরণ্যের “রোদ-নের মত নিফল হইয়াছে। নহিলে, অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদবিদ্যালয়ের পবিত্র-প্রাঙ্গণে—এতদিন “গণনাথ” যোগীন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রনাথকে আমাদের সহযোগী-সাধক বেশে দেখিতে পাইতাম।

আমাদের শ্লাবার, স্পর্ধার, গর্বের—যাহা কিছু আছে, তাহা যে স্বর্গ্যস্তের বর্ণ-রেখার মত ধীরে ধীরে দিক্ চক্রবালে মিলাইয়া যাইতেছে! কীর্তি-গরীয়ান-ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া, সে দিকে কি তোমরা ফিরিয়াও চাহিবে না?

আমার আয়ুর্বেদ! আমার বিরাট অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি! আমার পার্থিব নন্দনের হরিচন্দন! আমার জাতীয় জীবনের দীপালি-উৎসব! আমার সারা সৃষ্টির কঠোর সাধন! আমার চরম সত্যের দিব্য জ্যোতিঃ! তুমিই বলিয়া দাও—কেমন করিয়া তোমার রক্ষা করিব? সৃষ্টি-নেপথ্যের ছিন্নমস্তা সাজিয়া—আমরা যে দলাদলির মোহে আপনার রক্ত আপনাই পান করিতেছি! \*

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

\* \* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, “গাহিত্য” “মর্দবাগী” “ভারতবর্ষ” প্রভৃতি সাময়িক পত্রের লেখক, প্রস্তুতকৃত বিশারদ অসাধারণ শক্তিত, শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ বেনারসী তীর্থ মহাশয়ের “পাকবিদ্যা” হইতে এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য অমাপত্তি সংগ্রহ করিয়াছি। “কন্দুগক”ই যে পাঁউরুটী—একথা তিনিই সর্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। তিনিই আমার বখেট সাহায্য করিয়াছেন।

—লেখক।

## আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সূত্র ।

—:—

পদার্থবিদ পণ্ডিতগণের অভিমতে যতগুলি পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলই কার্য-কারণ সমষ্টি। অর্থাৎ-মহৎ-প্রকৃতি হইতে কোটাধর হ্রদপিণ্ডজাত শোণিত পুঞ্জের স্বল্প পবমানু পর্য্যন্ত যত কিছু পদার্থ জ্ঞানের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে, সে সমুদয়ই পরস্পর কারণ-মুখাপেক্ষী।

কোন কোন বিজ্ঞানবিদ বলেন,—গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রমালা শোণিত গগনমণ্ডল অসংখ্য জাতীয় অসংখ্য জীবগণের আধার বায়ুমণ্ডলের সহিত দেদীপ্যমান বসুন্ধরা ঐন্দ্র জালিকের বৈচিত্রের স্রায় বিচিত্রতা দেখাইয়া অহর্নিশি প্রাণগণের ইন্দ্রিয়গণকে যথোচিত তৃপ্ত করিতেছে।

এই বিচিত্রতা কেবল কার্য-কারণ ভাবের বিকাশ মাত্র। প্রোক্ত মত পোষক বৈজ্ঞানিক আচার্য্যবৃন্দ এই সীমান্ত জগৎকে দুই ভাবে বিভক্ত করিয়া, একটা কারণ অপরটি কার্য এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি এরূপ আছে—যাহা এক সময়ে কার্য, তাহাই অপর সময়ে কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়? যেমন পিতা, পুত্র, পোত্র ইত্যাদি।

এই কার্য-কারণ যেমন স্বপ্ন, তেমনি মহৎ ও বিবিধ রাগে রঞ্জিত, জগৎব্যাপক; অতএব মহৎ; অনেক স্থানে অতি নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত, —অতএব স্বপ্ন। নানা বিচিত্র ভাবে প্রকটিত —সুতরাং বিবিধরাগে রঞ্জিত।

কত সহস্র সহস্র শতাব্দী অতীত হইয়াছে

এ অদ্ভুত কার্য-কারণ ভাবের ইয়ত্তা হইতে পারে নাই,—পারিবেও না।

সভ্য জগতে যত প্রকার চিকিৎসা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার সকলেরই কতকগুলি মূল নিয়মের নাম সূত্র বা Principle। উক্ত সূত্রের ভেদানুসারে চিকিৎসা এবং উহার নামের ভেদ হইয়া থাকে।

সূত্রই শাস্ত্রের জীবন এবং সূত্রই শাস্ত্রের সোপান। যে কোন বিজ্ঞান হউক,—যতদিন সৌত্রিক আকারে উপস্থিত না হয়, সৌত্রিক পন্থায় সম্প্রসারিত না হয়, অথবা সৌত্রিক নিয়মের অধীন হইয়া না চলে, ততদিন উহার প্রকৃতশাস্ত্রে সংজ্ঞা বা (Science) নাম দেওয়া সমীচীন নহে। সূত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারে শাস্ত্রের উন্নতি বা অবনতি সর্বতোভাবে বিচার্য্য।

শাস্ত্রের সূত্র অতি দুর্বোধ্য ও জটিল বলিয়া সহসা উহার মর্মোদ্ঘাটন হয় না। এই হেতু বাদ বশতই বিবাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞানের যথার্থ উন্মেষ ও যথার্থ অনুশীলন না জন্মিলে সূত্রের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না।

অথর্ব বেদে সূত্রের একটি সূক্তের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে—,

“যোবিজ্ঞাং সূত্র বিততং”

যন্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।

সূত্রং সূত্রস্ত যো বিজ্ঞাং

সবিজ্ঞা ব্রাহ্মণং মহৎ ॥

যদি ও এই সূত্রটি ব্রহ্ম বিধায়ক; ব্রহ্মপ্রতি

পাদনই এই সূত্রের উদ্দেশ্য, তথাপি ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বাহ্য মূল—বাহ্য হইতে সমুদয়ের সূচনা হইয়াছে—বাহ্য সর্বত্র বিস্তীর্ণ—তাহাতে সমুদয়ই প্রথিত, তাহা জ্ঞাত হওয়াই কর্তব্য ।

আমাদের দেশে অনেকেই ব্যাকরণ-সাহিত্যাদি পাঠ করিয়াই ঐক্যকশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন । সাধারণতঃ বৈজ্ঞ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই সংগ্রহক বা তালিকা গ্রন্থপাঠী । শাস্ত্রে যে রোগে যে ঔষধ-তৈল-ঘৃতাদি নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহারা তাহার অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন । আবার বাহ্য মূল (আৰ্ধ) গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন । তাঁহাদেরও শাস্ত্রের সূত্রাদির প্রতি দৃষ্টি নাই বলিলেই হয় ।

বৈজ্ঞ শাস্ত্রের আলোচনা করিতে গিয়া ইহারা ব্যাকরণের কারক-সমাস প্রভৃতি এবং জায়ের দুই চারিটা অবচ্ছদাবচ্ছিন্ন লইয়াই প্রায়শঃ বৃথা কাল হরণ করেন । বৈজ্ঞ শাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতির পক্ষে ইহাও একটি অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে । কাজেই চিকিৎসা বিষয়ক নূতন সংকলন বা আবিষ্কার ও যথার্থ গভীর গবেষণা আর নাই । রোগী, রোগের প্রকৃতি, রোগ প্রতি কারক ঔষধ ও তত্তাৎতের অংশাংশ কল্পনা,—দেশ-কাল ইত্যাদির চিন্তা ও অমুখাবনের সহিত অল্প ব্যক্তিরই সংশ্লিষ্ট দৃষ্টি-গোচর হয় । সুতরাং এহিক্ষণ অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের আবার সূত্র কি ! ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, যে, যুক্তির উপর শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, বিস্তীর্ণ বিষয় বাহ্য দ্বারা সুস্বচ্ছ এবং বাহ্যে প্রোথিত থাকে এবং অমুক্ত বিষয়ের ও বাহ্য দ্বারা উপলব্ধি হয় তাহাই সূত্র ।

যেমন—দেব+আদি=দেবাদি । দয়া+অৰ্ণব=দয়ার্ণব । এইরূপ নির্দিষ্ট সংহিত পদ বাহার জানা আছে, তিনি সেই কয়েকটি নির্দিষ্ট পদেরই সন্ধি করিতে পারিবেন । কিন্তু ঐরূপ উদাহরণ সমূহের সন্ধি যে নিয়মে নিষ্পন্ন হয়, বাহার সেই নিয়মের পরিগ্রহ হইয়াছে, তিনি ঐরূপ অনন্ত পদের সন্ধি নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম সমর্থ ।

ঐরূপ নিয়মের নামই সূত্র । সূক্ষ্মদর্শী চক্রপাণি বলিয়াছেন ।—

“সূত্রানাং সূচনাচ্চার্য সত্ততে: সূত্রম্ ।”

বাহ্যর সূত্র যত ব্যাপক অব্যভিচারী ; তাহার সূত্র তত পরিপক ও প্রশংসনীয় । দৌত্রিক লাক্ষণিক প্রথার সন্ধান না পাইলে মনুষ্য কোন বিষয়ই আয়ত্ত করিতে পারিত না ।

সেই জন্তই সিদ্ধ পুরুষ বলিয়াছেন ।—

ঋষ্যোহপি পদার্থানাং

নাস্তং যান্তি পৃথক্ তশঃ ।

লক্ষ্যনেন তু সিদ্ধানামন্তঃযান্তি বিপশ্চিতঃ ॥

কোনরূপ নিদর্শন ব্যতিরেকে শাস্ত্র মাত্রেরই সূত্র পরিষ্কৃত ভাবে লক্ষ্যভূত হয়না । সুতরাং চিকিৎসা শাস্ত্রের ও সূত্র একেবারে বিনা নিদর্শনে নির্মিত হইয়াছে—ইহা সম্ভবপর নহে । কোন স্থানে কোন ঘটনা অগ্রে প্রত্যক্ষ হওয়া চাই । সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসারে অমুমান, অমুভব, যুক্তি—ইত্যাদির বলে সূত্র সকল উদ্ভাবিত হয় ।

১। অন্নরন্ধন-স্থানীয় উপরিস্থিত সরাবের উত্থান ও পতন অবলোকন করিয়া (জন্মস্ ওয়াই) জলীয় বাষ্পের যে কার্য সাধিকা শক্তি অবধারণ করেন, তাহা হইতেই

এহিষ্ণু বৃহৎ অণবয়ান, সূদীর্ঘশকটশ্রেণী, শত শত যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে ।

২। উদ্যানস্থিত য়াপেল ফলের পতন দেখিয়া সার আইযাক্ নিউটন পৃথিবীর যে আকর্ষণ অসুমান করেন, তাহা জগৎব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের মূল সূত্র ।

৩। দানার্থ জলাধারে অবগাহন কালে শরীরের লঘুতা অনুভব করিয়া, আর্ক মিডিশ্ জলাদিতে ভাসমান দ্রব্যের ভারাপচয়ের যে কারণ নিরূপণ করেন, তাহা হইতেই আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়ক নিয়মের সূত্রপাত হয় ।

৪। একদা ঝটিকা কালে ফ্রান্সলিন্ ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ যে বিদ্যাতের অংশ ইহা অবগত হন। পরে বিদ্যুৎ ও তড়িৎ আবিষ্কৃত করেন । তাহাই বর্তমান টেলিগ্রাফ যন্ত্রের মূল ভিত্তি ।

৫। কোন সময় গ্যালেলিউ এক ধর্ম সভায় উপবিষ্ট ছিলেন ; এমন সময় দেখিলেন, সেই গৃহের উপরিভাগে একটি ঘণ্টা ছলিতেছে, এবং দোলন-ক্রিয়ার ক্রমিক-ভাবেয় হ্রাস হইতেছে,—ইহা হইতেই তিনি প্রমাণ করিলেন, এক নির্দিষ্ট বিন্দু সংলগ্ন গোলক সমভাবে ছলিতে থাকিবে, এই ঘটনা হইতেই জগতের ঘটিকা-যন্ত্রের সূত্র পাত হয় ।

৬। কোন সময়ে গ্যালেলিউ গুনিতে পাইলেন, জনসন নামে এক ওলন্দাজ পণ্ডিত এমন এক সেন্দূর সৃষ্টি করিয়াছেন, বাহা দ্বারা বস্তু সকলকে বিপরীত দেখা যায় । ইহা শুনিবামাত্র তিনি সেই খেলনা ক্রয় করিয়া এবং এই খেলনা অবলম্বন করিয়া পরিশেষে জ্যোতিষ সমূহের তত্ত্বাবধানের মূল স্বরূপ দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্রের সৃষ্টি করেন ।

৭। কথিত আছে, অধিক মাত্রায় কুই-

নাইন্ সেবন করিয়া জরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইতেই হানিমন্ স্বপ্রবর্তিত চিকিৎসার সূত্রাংশ নিদর্শন করেন । সেই সূত্র হইতেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের আর একটি ভিন্ন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া আজ বিশ্ব ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে । পাশ্চাত্য ভূমিতে সূত্র বিষয়ক এবস্থত বহুল ইতিহাসের অভাব নাই । যৎকালে সূত্র দৃঢ় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, কোনস্থানেই আর উহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না,—তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উহার আয়ত্ত হইয়া পড়ে । সহস্র যোজনান্তরের কার্য্য সকল সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের বা পরের ব্যাপার সমূহ তখন আর দূরস্থ বলিয়া মনে হয় না, হস্তামলকের স্রায়া সমিহিত বলিয়া নিরূপিত হয় ।

অনুধ্যান করিলে সমস্ত জগৎ বুদ্ধি-দর্পণে সংক্রামিত হয় । এই সূত্র সংকলনে যিনি যে পরিমাণে পটু, তিনি সেই পরিমানে যোগী ।

আয়ুর্বেদীয় সূত্র সমূহ প্রথমনাতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—কারণ-সূত্র, লক্ষণ-সূত্র ও ক্রিয়া-সূত্র ।

চরকে কথিত আছে—

“হেতুলোকোবধ জ্ঞানং

স্বস্থাতুর পরায়ণম্ ।

ত্রিসূত্রং শাস্তং পুণ্যং

ব্রুধে যং পিতামহঃ ।

কারণ-সূত্রের দ্বারা রোগের ভূত-তবিদ্যৎ-বর্তমান-হেতু সকল সঙ্কলন করা যায় । লক্ষণ-সূত্রের দ্বারা রোগের ভূত-তবিদ্যৎ-বর্তমান চিহ্ন ও পীড়ার ওভাস্তত কল দ্বিমীকৃত হয় । ক্রিয়া-সূত্রের দ্বারা রোগের ওষধ-বা-রোগ-প্রতিকারের উপায় নিরূপিত হইয়া থাকে । এই সূত্রের দ্বারা প্রতিক্রিয়ায় যে সকল

প্রয়োজ্য, সেই সকল ঔষধে কিরূপ বীৰ্য্য—  
কিরূপ ধর্ম হওয়া চাই,—কিরূপ বীৰ্য্য বিপাক  
প্রয়োজন, কোন্ প্রকার দেশে বা কোন্ প্রকার  
কালে, কোন্ প্রকার প্রকৃতিতে কিরূপ দ্রব্য  
আবশ্যক, কোন্ ব্যক্তির প্রতি বা কোন্  
রোগের প্রতি কিরূপ আহার-আচরণ, পথ্য বা  
অপথ্য কোন্ কোন্ দ্রব্যের সহিত মানবের  
কিরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি—অত্যাৱশ্যক তত্ত্ব সকল  
সম্বলিত হইয়া থাকে ।

রোগের যেমন বিচিত্র অবস্থা অর্থাৎ  
কোন রোগে মলভেদ জন্মায়, কোন রোগে  
মল কঠিন করে, কোন রোগে শৈত্য আনিয়া  
থাকে, কোন রোগে উত্তাপ দান করে,—  
ঔষধের ও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, কোন ঔষধ  
ভেদক, কোন ঔষধ ধারক বা গ্রাহক কোন  
ঔষধ শৈত্যদায়ক, কোন ঔষধ উষ্ণ-তাগাদি  
জনক ইত্যাদি ।

ঈদৃশ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বা লক্ষণ যুক্ত রোগে  
কিরূপ ধর্ম বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়—  
ইহা বুঝাইবার জন্ত ঋষিদিগের অনেক সূত্রের  
সম্বলন করিতে হইয়াছে । আমরা তন্মধ্যে  
প্রথমে সামান্য সূত্রের আলোচনা করিব ।  
বিশেষ জ্ঞানের পূর্বে সামান্য জ্ঞান হওয়াই  
উচিত ।

চরকের বিমান স্থানে লিখিত আছে—  
যথায় সর্কেষাং বিকারানামপি চ নিগ্রহে ।  
হেতু ব্যাধি বিপরীত মোষণ মিচ্ছন্তি

কুশলা স্তদধর্ষকারিণঃ ॥”

ইহার মর্মার্থ :—সমুদয় রোগের প্রতি  
কাবার্থে হেতু বিপরীত অথবা হেতু বিপরি-  
তার্থকারী, ব্যাধিবিপরীতার্থকারী এবং উভয়  
বিপরিতার্থকারী ঔষধ যথায় স্থান বিবেচনা  
পূর্বক প্রয়োগ করিবে । এইটিকে সাধারণ

সূত্র বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা সমুদয়  
রোগের চিকিৎসাতেই ব্যাপক । রোগ যেরূপ  
প্রকৃতির বা যে প্রকার ধর্ম লইয়া হউক না  
কেন, সমুদয় রোগেরই ঔষধ ইহা দ্বারা নির্ধা-  
চিত, হইতে পারে । প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ও যুক্তিবলে  
স্থির হইয়াছে যে, বিরোধী পদার্থ বা ক্রিয়ায়  
সম্পর্কে পদার্থ নাত্রেরই হ্রাস বা বিনাশ হইয়া  
থাকে ।

শীত ক্রিয়ায় উষ্ণ নিবারণ, উষ্ণযোগে শীত  
প্রতিকার—ইত্যাদি ব্যাপার স্বতঃসিদ্ধ । এই  
নৈসর্গিক কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন  
প্রণালীতে সংসাধিত হয় । প্রণালীতে বিভিন্নতা  
থাকিলেও বৈপরিত্য বা বিরোধিতা হ্রাস বা  
বিনাশের হেতু ।

ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ।  
এই সিদ্ধান্ত-প্রভাবে ঋষিগণ স্থির করিয়াছেন  
যে, যে রোগ যে কারণে উৎপন্ন অথবা যেরূপ  
ধর্মযুক্ত, উহার বিরোধী ধর্ম বা ক্রিয়াই সেই  
রোগের ঔষধ বা প্রশমক । উক্ত বিরোধিতা  
বহু প্রকার, প্রথমতঃ আমরা উহাকে তিন  
ভাগে বিভক্ত করিতেছি, যথা,—সাক্ষাৎ বিরো-  
ধিতা ও পরম্পরিত বিরোধিতা, প্রভাবকৃত  
বিরোধিতা ।

১। সাক্ষাৎ বিরোধিতা । ঔষধ শরী-  
রের সহিত সম্পর্কিত হইবা মাত্র সাক্ষাৎ  
সম্বন্ধে অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই যে বিরুদ্ধ বা  
বিপরীত ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা সাক্ষাৎবিরো-  
ধিতা, যথা অগ্নিতাপে শীত নিবারণ, জল-  
সেচনে দাহ বা তাপ প্রশমন ।

২। পরম্পরিত বিবোধিতা,—ঔষধ  
শরীরে সংযুক্ত হইবামাত্র প্রথমতঃ এক প্রকার  
ক্রিয়া প্রকাশ করে । পরে সেই ক্রিয়ায়  
আহুসদিক বা সেই ক্রিয়ায় বিরুদ্ধ ক্রিয়া

আবির্ভাব হয় তাহাই পরম্পরিত বিবেচিত।

যথা—

সিদ্ধার্থকবচালোঃ-সৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনং  
বমনঞ্চনিহত্যাত্ত-পীড়াকান্ধোবনোদ্ববান্ ॥

ভাবপ্রকাশ।

স্বেত সর্ষপ, বচ, লোধ, সৈন্ধবের প্রলেপে  
বমন প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

এমন স্থান আছে, যে স্থানে কারণের নাশ  
বা বিলোপ সাধন হইলে কার্যেরও বিনাশ  
ঘটে। আবার এমনও উদাহরণ পাওয়া যায়,—  
যে স্থলে কার্যের বিনাশ ঘটিলে তাহার কারণ  
আপনা হইতেই লয় পায়। কোন কোন  
স্থলে একরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যে স্থলে কার্য ও  
কারণ উভয়ের যুগপৎ আক্রমণ না ঘটিলে  
উভাদের বিনাশের সুযোগ ঘটে না। ইহা  
পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়মের  
অধীন বলিয়া ঋষিগণ ঔষধ ত্রিবিধ গণনা  
করিয়াছেন। তৎ যথা—

হেতু বিপরীত—(নামাস্তর হেতু বিরোধী  
বা হেতু নাশক)।

ব্যাধি বিপরীত—(নামাস্তর ব্যাধি  
বিরোধী বা ব্যাধি নাশক)।

উভয় বিপরীত—(নামাস্তর হেতু-ব্যাধি—  
উভয় বিপরীত বা হেতু-ব্যাধি—উভয় নাশক

১। হেতু বিপরীত ঔষধ—যে সকল  
ঔষধ হেতু অর্থাৎ উৎপাদক-কারণের বিপরীত  
ধর্মযুক্ত অথবা উৎপাদক কারণের বিনাশ  
ঘটিলে যাহা দ্বারা পীড়ার উপশম হয়—সেই  
সমস্ত ঔষধকে হেতু বিপরীত ঔষধ বলা যায়।  
যেমন কফজ্বরে শুঁঠু অথবা ক্রিমিজনিত বমন  
বা শূল রোগে ক্রিমি নাশক ঔষধ।

২। ব্যাধি বিপরীত ঔষধ—। যে সকল  
ঔষধে রোগীর, শক্তিকে ধ্বংস করে (যে

কারণে রোগোৎপন্ন হইয়াছে, তৎপ্রতি  
চিকিৎসকের বিশেষ মনোনিবেশ না থাকি-  
লেও চলিতে পাবে), সেই সকল ঔষধে  
নাম ব্যাধি বিপরীত। যথা—খদির কুষ্ঠ নাশক,  
হরিদ্রা মেহ নাশক, অহিফেন অতিদার  
নাশক ইত্যাদি।

৩। উভয় বিপরীত ঔষধ—যে সকল  
ঔষধ রোগের কারণ এবং রোগ—উভয়-  
কেই এক সময়ে প্রশমিত করিতে সমর্থ,  
সেই সকল ঔষধকেই উভয়-বিপরীত  
ঔষধ বলা যায়। যথা বাত জনিত শোথরোগে  
দশমূল।

৪। হেতু বিপরীতার্থকারী ঔষধ—  
নামাস্তর হেতু সদৃশ। ব্যাধি বিপরীতার্থকারী  
ঔষধ—নামাস্তর ব্যাধি সদৃশ ঔষধ। উভয়  
বিপরীতার্থকারী ঔষধ, নামাস্তর হেতু ব্যাধি  
উভয় সদৃশ ঔষধ।

হেতু বিপরীতার্থকারী ঔষধ,—যে সমস্ত  
ঔষধ—হেতুর সমান ধর্ম অর্থাৎ যে কারণে  
রোগোৎপন্ন হয়—তাহার যেরূপ ধর্ম বা ক্রিয়া  
তদ্রূপ ধর্ম বা ক্রিয়া যুক্ত হইয়াও রোগ  
প্রতিকারে সমর্থ—সেই সমস্ত ঔষধকে  
হেতু-বিপরীতার্থকারী ঔষধ বলা যায়।  
যেমন মত্ত পান জনিত রোগে মত্ত।

ব্যাধি বিপরীতার্থকারী ঔষধ,—রোগের  
যেরূপ ধর্ম, সেইরূপ ধর্ম বা ক্রিয়াযুক্ত  
ঔষধকে ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ বলা যায়, যথা—  
উন্মাদ রোগে ধুস্তর, অল্পপিত্ত রোগে  
জ্বরী রস, বমন রোগে মদন ফল ইত্যাদি।

উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ। যে সমস্ত  
ঔষধ রোগের কারণ এবং রোগ সমধর্মাক্রান্ত  
হইয়াও রোগ প্রতিকারে সমর্থ তাহাকে  
উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ বলা যায়।

যথা,—অগ্নিদগ্ধ স্থানে অগ্নি সস্তাপ, তথা  
উষ্ণবীৰ্য্য বস্ত্র প্রলেপ ইত্যাদি ।

তিন প্রকার সদৃশ ঔষধের মোটামুটি  
লক্ষণ মাত্র বলা হইল । উহাদের পরস্পরের  
পার্থক্য প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক ।

হেতুসদৃশ ও ব্যাধি-সদৃশ—এতদ্বয়ের  
প্রভেদ এই যে, হেতু-সদৃশ কেবল হেতুরই।  
(যে কাৰণে রোগ উৎপন্ন হয়) সদৃশ । যে  
ব্যাধির যে প্রকার লক্ষণ হউক না কেন,  
তাঁহাব সহিত সাদৃশ্যের কোন আবশ্যকতা  
নাই । মনে কর, পান-দোষে অজীর্ণ,  
পিপাসা, দাহ—অনেক প্রকার রোগ হইয়া  
থাকে । ইহার যে কোন রোগ যেরূপ  
লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উপস্থিত হউক না কেন,  
সমস্ত বোগেই মত্ত প্রয়োগ করা যায় ।

ব্যাধি-সদৃশ ঔষধ ওরূপ নহে,—অর্থাৎ  
যে কোন কারণে রোগ উপস্থিত হউক না  
কেন, ঔষধ কারণের সদৃশ না হইয়া রোগের  
সদৃশ হওয়া চাই । মনে কর, ধূতুর সেবনে  
উন্মাদ রোগ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু  
ধূতুর ভিন্ন অন্য কোন কারণে যদি উন্মত্ততা  
উপস্থিত হয়, সে স্থলে ধূতুর প্রয়োগ করাই  
যথার্থ ব্যাধি-সদৃশ ঔষধ ।

উত্তর সদৃশ ঔষধ,—উত্তরের মিশ্রণ লক্ষণ  
যুক্ত । পাবদ জনিত ক্ষত রোগে পারদ  
প্রয়োগ অথবা অগ্নি দগ্ধ স্থানে অগ্নিরই সস্তাপ  
প্রদান করা—ইহাই উত্তর সদৃশ ঔষধ ।

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার বিপরিতার্থকারী  
বা সদৃশ ঔষধের উল্লেখ দেখিয়া কেহ যেন মনে  
না করেন যে, ঐ সকল ঔষধ বর্তমান—  
হোনিওপ্যাথি চিকিৎসার মতামুযায়ী । কেননা,  
হোনিওপ্যাথের মতের সহিত অংশ-বিশেষে  
একতা থাকিলেও সর্ব্বাংশে তৎতুল্য নহে ।

ঐ সমস্ত ঔষধের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া ও  
মাত্রাদি বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিলে  
স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে, ঐ সমস্ত ঔষধ বিপরীত  
ঔষধেরই অর্থাৎ এলোপ্যাথিকেরই অন্ত  
নিবিষ্ট । কেবল ধর্ম্ম গত বৈলক্ষণ্য বশতঃ  
নাম মাত্র পৃথক শ্রেণীভুক্ত । বমন রোগে  
মদন ফল প্রয়োগ করিবার বিধান  
থাকিলেও ইহা যাবতীয় বমন রোগে প্রয়োজ্য  
নহে । যে স্থানে উদরে অথবা হৃদয়ে বহু  
পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে এবং ঐ সঞ্চিত  
শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ রোগীর বমন বা  
বিবমিষা উপস্থিত হয়,—এমন স্থানে উক্ত  
শ্লেষ্মা নিষ্কারণের জন্য বমন কারক ঔষধ  
প্রয়োগ করাই আত্ম উপকারক । কেননা,  
যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা নির্গত  
না হইলে বমন নিষ্কারণের সুযোগ নাই । এই  
বিবেচনায় রোগের কারণীভূত কক্ষের নিষ্কারণ  
জন্ম ঐরূপ ক্ষেত্রে মদন ফল প্রয়োগের বিধান  
হইয়া থাকে । সুতরাং উহা হেতু বিপরীত  
ঔষধ বলিয়াই গণ্য ।

কবিরাজ

শ্রীদীননাথ কবিরাজ শাস্ত্রী ।

## দুইটা চিত্র ।

—:—

### অভিব্যক্তি ।

অব্যক্ত চৈতন্য, ক্রিতি, তেজ, বায়ু বোম্  
ইহাতেই প্রকটিত জগৎ যেমন ;  
অপরূপ অভিনব সৃষ্টির পৌরব  
নরদেহে একাধারে বর্তমান তাহা ।  
মানবের পুণ্য মূর্তি পৃথিবী স্বরূপ,  
রস, রক্ত—অপ্ ; তেজঃ—শারীরিক তাপ্ ;  
প্রাণাদি বায়ুর রূপ, ছিদ্রাদি আকাশ,  
নিত্যগুরু অন্তরাশ্রয় ব্রহ্মের সদৃশ ।  
ব্রহ্মার উদ্ভব বশা ঐশ্বর্য প্রভাবে,  
অন্তরাশ্রয় বিকৃতিতে তথা নর-মন ;  
ইন্দ্র যিনি নরদেহে অহঙ্কার তিনি,  
উজ্জল আদিত্য মাত্র পুরুষে আদান ।  
এ জগতে অভিহিত বাহা রক্ত নামে,  
তাপ্নিনাম যৌবন ক্রোধ নর দেহধামে ।

### পূর্ণতা ।

জগতের চক্ষু বাহা, পুরুষে প্রসাদ,  
জগতের বসু বাহা, দেহে তাহা সূত্র ;  
দেহ কান্তি—পৌরাণিক অশ্বিনী কুমার  
বায়ুর প্রবাহ নরে উৎসাহ অসীম ।  
ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ দেবতা স্বরূপ,  
জগতের অন্ধকার পুরুষের মোহ ;  
বিশ্বমাঝে জ্যোতিঃ বাহা, নরে তাহা জ্ঞান,  
পুরুষের সৃষ্টি ক্রিয়া রঙ্গ ছালোকের ।  
সত্যযুগ প্রকাশিত নরের শৈশবে,  
জ্যেষ্ঠাযুগ দৃশ্যমান যৌবনাবস্থায় ;  
কল্পতা ও স্থবিরতা ষাণ্ময় ও কলি,  
যুগান্ত প্রলয় বাহা মৃত্যু তাহা নরে ।  
অব্যক্ত অচিন্ত্য শক্তি এই নরদেহে,  
বিরাজেন চিদানন্দ এই পুণ্য দেহে ।

শ্রীমণীন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী ।

## শ্বেত প্রদর চিকিৎসা ।

—:—

### ঠাকুমা ও ছোট বো ।

ছোট বো । তোমার দু'টি পা'য়ে পড়ি  
ঠাকুমা, তুমি ঠাকুরকে বল—আমার সঙ্গে নিয়ে  
যেতে । তুমি ব'ল্লে, আর কেউ রদ্ ক'রতে  
পারবে না ।  
ঠা । তা' আমার পায়ে না হয় পড়'লি,  
আমি না হয় ব'ল্লাম, কেউ না হয় রদ্ করতে  
পারলে না, কিন্তু একটা কাজ করতে গেলে  
—বিবেচনা ক'রতে হ'বেত—যে কাজটা ভাল  
কি মন্দ ।

ছো । তা' তীর্থ ক'রতে যা'ব,—এ আর  
কি মন্দ ?

ঠা । দেখ, সব কাজেরই একটা সময়  
অসময় আছে । যে বয়সের যা'—সেই বয়সে  
সেটা মানায় ভাল । তোর কি এখন তীর্থ  
ক'রতে যাবার বয়স ?

ছো । তা' ধর্মের কাজে আবার বয়স  
কি ঠাকুমা ?

ঠা । সব কাজেরই বয়স আছে । এখন



সংসারের কর্তব্য করাই তোমার ধর্ম। সংসার কর, ছেলে-পিলে নাতি-নাতনী হোক, তাঁর পর তীর্থ করতে যেরো।

ছো। আমার যে যা'বার জন্তে বড় মন কেমন করছে ঠাকুমা।

ঠা। মন এমনই চঞ্চল যে, অনেক সময় অনেক অজ্ঞায় কাজের জন্তে 'কেমন'ই করে—বাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে প্রবৃত্তিকে দমন করাই মানুষের কর্তব্য। যে দমন না করিতে পারে, তার নিশ্চয় অধঃপতন ঘটে।

ছো। কিন্তু এতে ত পুণ্য হয় ঠাকুমা।

ঠা। না, এবরসে সংসার ছেড়ে—নিজের কর্তব্য ছেড়ে কোথায়ও গেলে তা'তে পুণ্য হয় না, পাপ হয়। সংসারে থেকে পুণ্য করাই এখন তোমার উচিত।

ছো। সংসারে থেকে আর কি পুণ্য করবো? তীর্থের মত পুণ্য কি এখানে হয়?

ঠা। বটে? এ বরসে সংসারই যে মহা-তীর্থ। স্বামী সেবা কর, গুরুজনের সেবা কর, বাড়ীর জীব-জন্তু, চাকর-বাকর, লোক-জন যা'তে সুখে থাকে, কষ্ট না পায়—তা' কর, অতিথি-ককিরকে আহার দাও, ভিক্ষা দাও,—এতে এখানে থেকে যে পুণ্য হবে, শত তীর্থে গেলেও সে পুণ্য হবে না। বরং এসব না করার জন্ত তা'তে পাপ হবে।

ছো। পাপ কিসে হবে?

ঠা। তোমার গুরুজন, তোমার স্বামী, তোমার সংসারের চাকর বাকর গরু-বাছুর—সকলের প্রতি তোমার একটা কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য না কর',—তুমি অজ্ঞ যত ভাল কাজই করনা, তাতে পাপ বই পুণ্য হবে না।

( লীলা ও রমার প্রবেশ )

লী। কিসে পুণ্য হবে না ঠাকুমা?

ঠা। এই দেখনা—গোবিন্দ আর বউমা তীর্থ করতে যাচ্ছে, ছোট বলে, আমার ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।

লী। তা'তে বাড়ীর সকলের মত কি?

ঠা। কারুরই মত নেই। ওর স্বামীর নেই, ওর শশুর-শাশুড়ীর নেই, গিন্নি,—এমন কি, যি অবধি মানা করছে। ও এখন আমার এসে ধরেছে, যে, আমি বলে দিলেই ওর যাওয়া হয়।

লী। হাঁ ছোট বো, গুরুজনের মনে কষ্ট দিয়ে তীর্থ করতে গেলে কি পুণ্য হয়? তুই ত এখন মানুষের মত হয়েছিস, এটা আর বুঝতে পারিনি।

ছো। বুঝতে একেবারে পারিনি,—তা'নয়, তবে মনে বড় ইচ্ছে হ'চ্ছিল। কত কি দেখতে পেতাম।

লী। তা' ওর বড় দোষ নেই ঠাকুমা, অনেক নিকোঁদ জীলোকেরা স্বামীর মনে কষ্ট দিয়ে অনেক সময় লুকিয়ে তীর্থ করতে চলে যায়, তা'রা বোঝে না যে, এতে তাদের পুণ্য হয় না, পাপ হয়। এই রকম করে আমাদের দেশে ধর্মের নামে যে কত অধর্ম হ'চ্ছে তা'র ঠিক নেই।

ঠা। তা'ত ভুলেই। বিশেষ আমাদের দেশে আগে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণপাঠ, কথকথা প্রভৃতি খুব চলিত ছিল বলে ধর্মীধর্ম সবকিছু লোকের অনেক জ্ঞান হ'ত। এখন সে ভালো প্রার লোপ গেরে আসছে, মহাভারতে ধর্ম-ব্যাখ্যের যে একটা গল্প আছে—তা'তেই এই রকম ব্যাপারে ধর্ম আর অধর্ম কি, বেশ বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

লী। ছোট বোনের কি এখনও বেগে ইচ্ছে আছে নাকি?

হো। একে ঠাকুমা,—তা'তে তুমি, আর ইচ্ছে কি থাকে ঠাকুরঝি। যাই—আমি সব শুছি যে-গাছিয়ে দিই গে।

ঠা। লীলা কখন এলি? বাড়ীর সব খবর ভালত?

লী। এই আসছি ঠাকুমা। বাড়ীর সব খবর তোমার আশীর্বাদে ভালই। বাবা-মা তীর্থ করতে যা'বেন শুনে, একবার দেখতে এসেছি। আর তোমার একটা রোগী সঙ্গে ক'রে এনেছি। এ আমার সই রমা, তুমিত চেন। তুমি রোগীর ব্যবস্থা কর, আমি সকলের সঙ্গে দেখা করিগে।

(লীলার প্রস্থান)

ঠা। আর রমা, বোস্। তাইত বড় রোগী হ'রে গেছিল যে!

রমা। (প্রণাম করিয়া) অনেক দিন থেকে অস্থখ ভুগছি ঠাকুমা। কত চিকিৎসা করলাম, কিছুতেই কিছু হলোনা। শেষে সইএর পরামর্শে তোমার কাছে এসেছি।

ঠা। তা' কি অস্থখ হয়েছে তোর?

র। কবিরাজের! বলে খেত প্রদর।

ঠা। কত দিন হ'য়েচে?

র। হয়েছে আজ ২০ বছর। প্রথমে রক্ত ভাঙ্গা রোগ ছিল, ক্রমে খেত প্রদরে পাড়িয়েছে।

ঠা। ছেলে-পিলে কিছু হয়েছে?

র। ছ'টি ছেলে,—একটা আঠার বছর বয়সের সময় হয়েছে, তার তিন বছর আগে থেকে রক্ত ভাঙ্গা রোগ হয়। বড় ধোকার হ'বার পরে থেকেই এই রোগের সূত্রপাত। ছ'বৎসর পরে ছোট ধোকা হয়। তা'র পর পাঁচ বৎসর হ'ল আর ছেলে পিলে কিছু হয় নি।

ঠা। এখন রোগের অবস্থা কি রকম বল দেখি?

র। এখন দিন-রাত জলের মত ভাসে,—ভুগ্নি। মাসিক বেশ পরিষ্কার হয়না। ক্ষিদে নেই, মাথা ঘোরে, বুক ধড়-ধড় করে, মনে কেমন ভয়-ভয় হয়, সংসারের, কিছুই ভাল লাগেনা।

ঠা। তাইত—এ রোগ বড় বিক্রী, সহজে সারতে চায় না। অনেকদিন ধরা-কাটা করলে—তবে যদি সারে।

র। তা' তুমি আমায় যা' করতে বলবে, আমি তাই ক'রবো ঠাকুমা।

ঠা। প্রথম কথা এই, স্বামীর কাছ থেকে তাকে থাকতে হবে।

র। আজ ছমাস থেকে তা'ই আছি ঠাকুমা।

ঠা। তা'র পর—এখন কিছু দিন এক-বারে শুয়ে থাকতে হবে, কোন কিছু ক'রতে পাবে না। তা'র পর, যত দিন অস্থখ না সারে, ততদিন কোন পরিশ্রমের কাজ মোটেই করবে না, সিঁড়ি-ভাঙ্গা হ'বে না, কোন ভারী জিনিষ তুলতে পাবেনা, ফল কথা, যা'তে তলপেটে চাড় লাগে—এমন কোন কাজ করতে পা'বে না।

র। আচ্ছা ঠাকুমা, আমি তাই ক'রবো। তুমি ওষুদ-পথ্যির কথা বল।

ঠা। আগে পথ্যির কথা বলি, শোন। দুধ-ভাত, গাওয়া-বি, ফুলকো লুচি—এসব খেতে পার। রাত্রে যদি বেশ ক্ষিদে না হয়—তা হ'লে ঠৈ-দুধ—কি দুধ-বারি—মিছরী দিয়ে খাবে। তরকারীর মধ্যে পটোল উচ্ছে, পলতা, কাঁচকলা, ন'টেলাক, পাকা দেশী কুমড়া—এইসব খেতে পার, কিন্তু জরুরী

যত কম খাও—ততই ভাল। বেশী তরকারী খাওয়া ভাল নয়।

র। তা' তরকারী আমি বেশী খাইওনে।

দাল খাওয়া চলবে না ?

ঠা। মুগ, মসুর, ছোলা আর অড়হর দাল খেতে পার। কিন্তু দাল হেঁকে ফেলে দিয়ে কেবল ঘষ টুকু খাবে।

র। মাছ মাংস কিছু খাওয়া যায় না ?

ঠা। না এখন মাছ-মাংস কিছুই খেয়ে কাজ নেই, একটু ভাল হ'লে তখন দেখা যাবে।

র। জলখাবার কি খাওয়া যেতে পারে ?

ঠা। দাড়িম, বেদানা, কেশুর কিসমিস পানকল, মিছরী—জল খাবারে এই সব খেতে পার।

র। খাবার সম্বন্ধে আর কোন নিয়ম আছে ?

ঠা। অল্প মুগ না খেয়ে সন্ধ্যা মুগ খাবে, আর তরকারীতে যেন লঙ্কার ঝাল দেওয়া না হয়। শাক, অম্বল, কলায়ের দাল, দই—এসব একেবারে ছোঁবে না।

ব। আচ্ছা, এখন ওষুদ কি খাব বল ঠাকুমা ?

ঠা। খাবার ওষুদ পরে বলছি, জল ভাঙ্গাটা কি খুব বেশী ?

র। হাঁ, আজ মাসখানেক থেকে বড্ড বেড়েছে।

ঠা। তা' হলে প্রথমে দিন কতক ডুস নিতে হবে।

র। সে আমি পারবোনা ঠাকুমা, তা'তে মবি আর ঝাঁচি।

ঠা। কেন পারবিনে ? নিজে নিজে নিবি অল্প কায়র সাহায্য দরকার হ'বে না।

র। তা' যদি হয় তা'হলে পারবো।

আচ্ছা হাঁ ঠাকুমা, ভূমিত কবিরাজী মতে ব্যবস্থা দাও, কবিরাজীতে ত ডুসের ব্যবস্থা ছিল না !

ঠা। কেন থাকবে না ?—বরং ডাক্তারীতে যা' আছে, কবিরাজীতে তা'র চেয়ে খুব বেশী রকমই ছিল, তবে ডুস নাম ছিলনা, ডুস ইংরাজী নাম, আর ওর কবিরাজী নাম বস্তি।

র। আচ্ছা কি ক'রে ডুস নিতে হ'বে বল ?

ঠা। শোন বলি। এক ছটাক বাবলা ছাল আর অধতোলা জনকপুরী খয়ের—ডুসের জলে সিদ্ধ ক'রে, এক সের থাকতে নামা'বি। তা'র পর হেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে, ডুসের যে পাত্র থাকে—তা'ইতে রাখবি। সেই পাত্রটা দেয়ালের গায়ে টাঙ্গিয়ে রাখতে হয়। তা'র সঙ্গে একটা লম্বা নল থাকে আর সেই নলের গোড়ায় একটা কল থাকে। সেই কল ঘুরিয়ে দিলেই নলের মুখের ভেতর দিয়ে বেগে কাথ বেরিয়ে আসে। ডুস এমন ভাবে নিতে হয়—যেন নাড়ীর (জরায়ু uterus) ভেতর পর্যন্ত জল যায়।

র। ডুস কি রোগ নিতে হবে ?

ঠা। প্রথমে উপরি উপরি ৩০ দিন, কি যে কয় দিন নিলে জল ভাঙ্গা খুব ক'মে যায়—কি বন্ধ হ'য়ে যায়—তত দিন নিতে হবে। তা'রপর সপ্তায় ছ' দিন করে নিলেই হবে।

র। এরকম কত দিন নিতে হবে ?

ঠা। এ রোগের নিয়ম হ'লে যে, ডুস নিলেই জল ভাঙ্গা বন্ধ হয়, আর ডুস বন্ধ করলেই আরম্ভ হয়। প্রথমে তিন মাস যে রকম বললাম, সেই রকম নিবি। তা'র পর কিছু দিন—সপ্তায় এক দিন—এমনি ক'রে যত দিন না রোগ ভাল হ'য়ে যায়, তত দিন নিবি।

র। আচ্ছা এখন খাবার ওষুদ বল।

ঠা। খেত ধুনা, রসসিন্দুর আর বঙ্গ ভস্ম সমান ভাগে মিশিয়ে ছ'রতি মাত্রায় মধু দিয়ে মেড়ে, খেত চন্দনের কাথ—কি রক্ত চন্দনের কাথ মিশিয়ে নিয়ে খা'বি।

র। আর এতে যদি উপকার না হয় ঠাকুমা ?

ঠা। উপকার হ'বে বৈকি। তা' না হয় আরও একটা ওষুদের কথা বলছি শোন,— খেত কুঁচের শিকড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্ত-চন্দন, অনন্তমূল, অর্জুন ছাল, খয়ের কাঠ আর অশোক ছাল—প্রত্যেক জিনিষ এক সিকি ক'রে নিয়ে, খেঁতো ক'রে, নূতন হাঁড়িতে—কাঠের জালে আধ সের জল দিয়ে সিদ্ধ করবি। আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে, হেঁকে নিয়ে কুসুম-কুসুম গরম থাকতে থেয়ে নিবি।

র। আচ্ছা ঠাকুমা, রস সিন্দুর আর বঙ্গ পাব কোথায় ?

ঠা। কোন কবিরাজের কাছে থেকে কিনে নিবি। রসসিন্দুর ছ'রকম পাওয়া যায়, এক রকম মোটা আর এক রকম চটি ; চটি রস-সিন্দুরই ভাল।

র। আর কোন ওষুদ খেতে হবেনা ?

ঠা। এই ওষুদ খেয়ে জল ভাঙ্গা বন্ধ হলে, কি খুব কমে গেলে, ওলট কব্বলের কাঁচা ছাল আধ তোলা আর মরিচ এক সিকি—এক সঙ্গে বেটে খাবি।

র। তখন কি আগেকার ওষুদ ছেড়ে দেব ?

ঠা। না, সকালে আগেকার ওষুদ খাবি, আর বিকালে ওলট কব্বলের ছাল খাবি। ৫৭ দিন ওষুদ খেয়ে ছ' এক দিন বন্ধ দিবি। ঋতুর তিন দিন কোন ওষুদই খাবিনে।

আর সকালের ওষুদ না হ'ক, ওলট কব্বলটা ঋতু হ'বার আগে তিন দিন—আর ঋতুর পরে তিন দিন খাওয়া চাই।

র। আচ্ছা ঠাকুমা, যে রকম ব'ললে, সবই ঠিক সেই রকম করবো। আশীর্বাদ কর—যেন ভাল হ'তে পারি।

ঠা। ভাল হবে বৈকি, তবে সময় একটু লাগবে। দেখ্ আর একটা কথা ব'লে দিই,—যে সব ওষুদের কথা বললাম, সে সব খেলেই সেরে যা'বে, তবে যদি এক সপ্তা' খেয়ে না সারে, তা'হলে ও সব ওষুদ ত খা'বিই, তা' ছাড়া কাঁচা অশোকছাল হ' ভরি, আধ পোয়া হুথ ও দেড় পোয়া জল—এক সঙ্গে কাঠের আগুনের জালে সিদ্ধ ক'রে, হুথটুকু মাত্র থাকতে নামিয়ে নিয়ে, ঠাণ্ডা হলে সেটাও রোজ একবার ক'রে খা'বি। এটাও খুব ভাল ব্যবস্থা,—এ ব্যবস্থায় খেত প্রদর কি রক্ত প্রদর—সব রকম প্রদরেই উপকার পাওয়া যায়। সব কথাই তোকে ব'লে দিলাম, যা' হোক এই সব ক'রে যেমন থাকিস্, মাঝে মাঝে খবর দিস্।

র। খবর দেওয়া কি—আমি নিজেই আসব।

( লীলার প্রবেশ )

লী। কি লো সই, তোর সব কাজ হ'য়েছে ?

র। হাঁ, যা' জানবার—সব জেনে নিয়েছি।

লী। তবে এখন আসি ঠাকুমা, বাবা-মা চ'লে যা'বেন, বড় মন কেমন ক'রছে।

ঠা। কা'কে বলছ, দিদিমণি। তোর বাবা যে আমার নাড়ী-হেঁড়াবন। আর জীবনে কখন কাছ ছাড়া হয় নি। তা' আমি আশীর্বাদ ক'রছি—ওর পারে কাঁটাটি হুটবে না। চল্ আমিও একবার দেখে আসি।

( সকলের প্রস্থান )

## তামাকের ইতিহাস ।

বর্তমানকালে সমুদায় সভ্যজাতির মধ্যে তামাকের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও ইহার প্রচলন খুব বাড়িয়াছে। এখন তামাক না দিলে অভ্যাগত ব্যক্তির সন্মতনার ক্রটি হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে তামাক খান না, তাঁহাকেও অভ্যাগত ব্যক্তি-দিগের ভদ্রোচিত সমাদরের জন্ত তামাকের বন্দোবস্ত করিতে হয়। উৎসবাদি ক্রিয়াকর্মে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনার জন্ত তামাকের বন্দোবস্ত সর্বোপায় আবশ্যক। কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্বে সভ্য জগত ইহার অস্তিত্ব অবিদিত ছিল। কেবল আমেরিকার ভাংকালীন অনাবিস্কৃত দেশবাসী কতিপয় জসভ্যজাতির মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন কলম্বাস কিউবা দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তখন তিনি দুইজন নাবিককে উক্ত দ্বীপ পরিদর্শনেব জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া নবাবিস্কৃত স্থানের বৈরূপ অভিনব বর্ণনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটা বিবরণ এই যে, তথাকার অধিবাসীরা প্রস্তুত হইয়া খণ্ড সঙ্গে করিয়া বেড়ায় এবং মুখ ও নাসিকা হইতে ধূম নির্গত করে। এই ঘটনাটিতে নাবিকদ্বয়ের মনে প্রথমে ধারণা হইয়াছিল যে, আদিমবাসীরা তাহাদের দেহ সজ্জিকরণের জন্ত বোধ হয় এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, ঐ নথ অসত্যেরা বড় বড় পত্রশুষ্ক একত্র বহুতর মত পাকাইয়া অগ্নিসংযোগে উহার ধূমপান করিয়া থাকে।

তামাক সেবন-রীতি সভ্যজাতির দৃষ্টি পথে এই প্রথম পতিত হইল। ক্রমে এই জঘন্য রীতি সভ্যজগতে এত প্রচলিত হইল যে, প্রত্যেক নগর, উপনগর, গ্রাম ও পল্লী এই বিস্ময়কর পত্রের ধূমে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। যাহা হউক এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যে সভ্যজাতির মধ্যে তামাক সেবন প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নহে, প্রথমতঃ ইহা অতি স্থণিত পদ্ধতি বলিয়াই তখন তামাকের উপর সকলের ধারণা ছিল। এমন কি, ইউরোপের কোন সাম্রাজ্য তামাক সেবন অপরাধে দণ্ডিত হইবে—তখন একরূপ ব্যবস্থাও হইয়াছিল। রুসরাজ্যে তামাক সেবন করার প্রথম অপরাধের জন্ত বেত্রাঘাত, দ্বিতীয় বার অপরাধের জন্ত নাসাচ্ছেদ ও তৃতীয় অপরাধের জন্ত প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হইয়া ছিল। দ্বিতীয় অপরাধের জন্ত সর্বসমকে কয়েক জনের নাসাচ্ছেদ করাও হইয়াছিল। খৃষ্টীয়-ধর্ম সমাজের প্রধান গুরু রোমের পোপ বাদশ ইনসেণ্ট এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়া-ছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি উপাসনা-মন্দিরে তামাক চর্কন বা ধূমপান বা অন্য কোন উপায়ে উহা ব্যবহার করিবেন, তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে। ইহার বহুকাল পরে পোপ বেনি-ডিক্ট নিজে ধূমপানী হইলেন, এবং তিনি এই দণ্ডবিধি মুহিত করিলেন। সুইজারল্যান্ড, ইংলণ্ড ও পার্শ্ব দেশেও তামাক সেবন অপরাধের জন্ত রাজসংগেয়ে নির্দেশ হইয়াছিল। ইংল্যান্ডাধিপতি প্রথম জেমসের অজ্ঞকরণে আমেরিকার উপনিবেশ সমস্তেই

কর্তারাও এই অপরাধের জন্ত দণ্ডবিধি আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই সকল দেশের রাজপুরুষেরাও তামাক ভক্ত হইয়া পড়িলেন, ক্রমে ক্রমে দণ্ডবিধি আইন শিথিল হইয়া অবশেষে একেবারেই লোপ পাইল ।

ভারতবর্ষেও পুরাকালে তামাকের প্রচলন ছিল না। কোন সময় হইতে ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কোন ঐতিহাসিক পাওয়া যায় না। অভিধানে যে তামাকুট কণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোন্ সময় কিরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে ভাঙ্গ, ধূতুর, সুরা প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তামাকুটের উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তামাকুটের ব্যবহার পূর্বে ভারতবর্ষেও ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। কি কারণে তামাকুট নাম হইয়াছে, তাহাও কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া অর্থ করিলে, তাম্র শব্দে কুষ্ঠ-রোগ বিশেষ ও কুট শব্দে বৃক্ষ, তাম্ররোগোৎপাদক বৃক্ষ বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ধূমপান দ্বারা স্মোকার্স ক্যান্সার (Smokers cancer) নামক যে রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাম্র-রোগ বোধ হয় তাহারই অনুরূপ। কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, ঘনরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি বাঙ্গালার কবিগণের গ্রন্থে,—এমন কি প্রাচীন কবিদের শেষ কবি ভারত চন্দ্রের গ্রন্থেও তামাকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল গ্রন্থে ভোজনান্তে মুখগুহ্বির জন্ত তাম্বুলের উল্লেখ আছে, কিন্তু তামাকের

উল্লেখ নাই। বর্তমান কবিদের আদিকবি ৮ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থে তামাকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল আলোচনা করিলে বোধ হয়, মুসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে এদেশে তামাকের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে বাঙ্গালাদেশে ইহার বহুল প্রচলন হইলেও ইহা যে অবৈধ প্রথা, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এখনও গুরুজন ও মাননীয় ব্যক্তিগণের সমক্ষে তামাক সেবন ভদ্রতা বিরুদ্ধ।

তামাকের পাতা হইতে যে তৈলাক্ত নির্ঘাস প্রস্তুত হয়, তাহাকে নিকোটিন্ বলে। প্রতি পাউণ্ড তামাকের পাতায় ৩৮০ গ্রেণ নিকোটিন্ পাওয়া যায়। ১½ গ্রেণ নিকোটিন্ দ্বারা ৩ মিনিট কাল মধ্যে একটী কবুরের মৃত্যু হইতে পারে। এই বিষ দ্বারা অর্ধ মিনিট মধ্যে মনুষ্য জীবন নষ্ট হইতে শুনা গিয়াছে। নিকোটিন্ সময়ে সময়ে নরহত্যা বা আত্মহত্যার জন্ত ব্যবহৃত হইতে শুনা গিয়াছে। নিকোটিনের মত প্রসিদ্ধ এমিড্ ভিন্ন অন্য কোন বিষে এত শীঘ্র মৃত্যু হইতে শুনা যায় নাই।

হোটেন্টটেরা সর্পাদি বিনাশের জন্ত তামাকের তৈল ব্যবহার করে। উগান রক্ষকেরা ইহা প্রচুর ব্যবহার করে। শিশুদের মতক বা মুখমণ্ডলের ক্ষততে সামান্য মাত্র এই তৈল প্রয়োগে মূহূর্তকাল মধ্যেই মৃত্যু সংঘটনের দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়। একটী চুপটের পাক খুলিয়া উহাতে বতগুলি পাতা থাকে, সেই গুলি উদরের উপর স্থাপন করিলে অত্যন্তকাল মধ্যেই বমনোদ্রেক হয়। এক সময়ে ইউরোপ খণ্ডের ভীষণ সৈনিকেরা

বগলেক্রে অল্পশস্থিত থাকিবার জন্য বগলের মধ্যে তামাকের পাতা রাখিয়া দিয়া অত্যন্ত বমন করিত।

ডাক্তার বিচার্ডসন্ সম্প্রতি মনুষ্য দেখে তামাকেব কি॥ সম্বন্ধে যে সকল তথ্যস্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঁহারা প্রথম তামাক খাইতে শিখিতেছেন, তাঁহাদের জীবনী শক্তি সম্ভাবক যন্ত্র সমূহের নিম্নলিখিত পরি-বর্তন বর্ণনা করিয়াছেন,—“মস্তিষ্ক মলিন ও বক্ত হীনহব, আমাশয়ে গোলাকার উচ্চ লাল লাল দাগ হয়; বক্ত অস্বাভাবিক তরল হয়; ফ্লুকুস দয় মলিন হয়; হৃৎপিণ্ডে প্রচুর রক্ত জমিয়া থাকে, এবং উহার সঙ্কোচনো শক্তি নষ্ট হয়। কেবলমাত্র ধীর প্রকল্পন পরিগণিত হয়।”

একপে একপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, তামাক যদি এতই বিধাক্ত, তবে বাবতীয় ধূমপায়ী-গণেবই তামাকের বিষে মৃত্যু হইয়া কেন ? ইহাব উত্তর এই যে, আমাদের শরীর ও শরীরাতন্ত্রর যন্ত্র সমূহ এতই অভ্যাসের বশবর্তী যে, অভ্যস্ত হইলে অস্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, আচার-ব্যবহার, আহাৰ্য্য-পানীয়—সবই সহ্য হইয়া থাকে। অনেককে মক্ষিয়া, ষ্টীকনিয়া প্রভৃতি মারাত্মক বিষ মাদকরূপে সেবন করিতে দেখা যায়। ডাক্তার কিলগ প্রভৃতি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তাঁহাদের মতে অধিকাংশ তামাকসেবনকারী তামাকের বিবেই জীবন ত্যাগ করে। বিষ খাইবা মাত্র মৃত্যু হইলেই যে বিষে মৃত্যু হইল এবং বহু বৎসর পরে মৃত্যু হইলে যে তাহার কারণ পূৰ্বেকার বিষ-ভক্ষণ নহে—এরূপ বলিতে পারা যায় না। তাঁহারা বলেন, যদি তামাক সেবন জন্য পাঁচ বৎসরও আয়ুঃ হ্রাস হয়, তাহাকেও বিষ ক্রিয়ার ফল বলিয়া স্বীকার

করিতে হইবে এবং এই অকাল-মৃত্যুকে বিষ ভক্ষণে মৃত্যু বলিতে হইবে।

জীবন রক্ষার জন্য রক্তই আমাদের শরীরের শ্রেষ্ঠ উপাদান। নৈসর্গিক ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা অনবরত আমাদের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যে ক্ষয় হইতেছে, রক্তই সেই সমুদায় ক্ষতিপূরণ করে। রক্ত আবার আমাশয় ফুসফুস ও চর্মেব মধ্য দিয়া প্রয়োজনীয় উপাদান সকল প্রাপ্ত হয়। যে সকল দ্রব্য দ্বারা রক্ত দূষিত হয়, তাহা সমুদায় শরীরেরই বিনাশ সাধন করে। তামাক সেবন দ্বারা রক্তের যে পরিবর্তন ঘটে, তদ্বারা যে কেবল জীবনীশক্তির হ্রাসতা হয়, তাহা নহে, দেহের রোগপরিবৰ্জনী শক্তিও উহার দ্বারা লুপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তামাক সেবনকারীর সংক্রামক অসংক্রামক—সকল প্রকার রোগ দ্বারাই আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

তামাক সেবনে গলক্কত, বম্বা, হৃদপিণ্ডে নানাপ্রকার পীড়া সমূহ, অজীর্ণ, কুধামান্দ্য, অধর ও জিহবার কৰ্কশতা, পক্ষাবাত, দৃষ্টি-হীনতা, বর্ণাক্ততা, ( Colorblindnes ), ও নানাপ্রকার স্নায়বীয় রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।\*

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস ।

এবর্তমান সময়ে বাজারে যে তামাক বিক্রীত হয়, উহা সেবনে আমাদের অনিষ্ট আরও বর্দ্ধিত হইতেছে, কারণ উহা শুধু তামাক নহে, সম্ভার বিক্রয় করিবার জন্য উহার সহিত চট্‌ছেঁড়া, পাটির কুচি পেপের পাতা এবং ই জাতীয় আরও অনেক পদার্থ মিশ্রিত করা হয়। ইহা ভিন্ন স্থগতিকরণের জন্য এবং মিষ্টতা সাধনার্থ কাঁটালের রস, শিলাশয় প্রভৃতিও উহার সহিত মিশান হইয়া থাকে। ফলে তামাকের সহিত অজ্ঞাত দ্রব্য মিশ্রিত করার তামাক সেবনের অপকারিতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। দেশে যে বম্বা রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, আমাদের মনে হয়, ইহাই তাহার অন্ততম কারণ। তামাকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবহারের ফলে শরীর যন্ত্রের নানাপ্রকার বিকলতা উপস্থিত হয়। এই প্রবন্ধের লেখক সেই সকল চিত্র “বায়ুর্বেদে” প্রকাশ করিলে দেখের উপকার করিতে পারিবেন।

আগ পঃ।

## নারী ও নারায়ণ তৈল ।

—:~:—

১৫ বৎসর পূর্বের ঘটনা। আমার এক মাত্র কন্যা “সরযু” সাংঘাতিক রোগ হইয়াছিল। বাঁচিবার কোনও আশাই ছিলনা। একদিকে ভীষণ যমদূত, অপর দিকে আমরা দুই স্ত্রী-পুরুষ—রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছিল। এইরূপে চল্লিশ দিন, দিবা-রাত্রি, যুদ্ধ করিয়া যমদূত গুলার পরাজয় ঘটিল। সরযু বাঁচিয়া উঠিল। কিন্তু শমন দূতগণ সমরাস্তানের যে চিহ্ন রাখিয়া গেল,—তাহাতেই আমরা অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

কথাটা এই—“সরযু” দেখিতে সুন্দরী ছিল না। তাহার উপর এই রোগে তাহার মাংস চুলগুলি একেবারেই উঠিয়া গেল। প্রথমে এদিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না, শেষে সরযুর বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, ততই আমাদের চিন্তার কারণ হইয়া উঠিল। আমরা হিন্দু,—কন্যাকে চির কুমারী করিয়া রাখিতে পারিনা। কাজেই সরযুর বিবাহের জন্য আমি বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। যিনিই কন্যা দেখিতে আসেন, তিনিই তাহার কেশ-বিরল-মস্তক দেখিয়া গিছাইয়া পড়েন। পাড়ায় ছষ্ট মেরেঙলা, আমাদের সাক্ষাতেই মেরেটাকে কেপাইতে আরম্ভ করিল—

“ও সরযু! নেড়ী,

মেড়ার পালের মেড়ী”

এই অপূর্ব কবিতার অমির রস, আমাদের “শ্রবণ ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো! আকুল করিল বড় প্রাণ।” কন্যার মলিন মুখ ধানি, দুঃখের স্থতির মত সর্পিদাই অন্তরে আগিতে

লাগিল। আমার ধৈর্য্য টুটিল। আমি বড়ই বিচলিত হইলাম।

বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন, “ডাক্তার দেখাও।” শেষে বালিকার অমূল্য-মস্তকে “ক্যাহারাইডিলের” রীতিমত আবাদ আরম্ভ হইয়া গেল। মানে, কিন্তু “লাভ পরং গোবধঃ”, চুল গজান দূরে থাক্, কন্যার মাথাটা—ব্রণ-সম্বুল হইয়া উঠিল। ঔষধ দেওয়া বন্ধ করিলাম। কিছু দিন পরে অবশ্য ক্ষত শুকাইল। একজন বড় ডাক্তারকে মেরেটাকে আবার দেখান হইল, তিনি বলিলেন—“যে যে স্থানে ক্ষত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আর কেশ-দগমের আশা নাই।” তিনি অনেক ঔষধ দিলেন, কোন ফলই হইল না।

আমাদের পরীগ্রামে অনেক প্রবীণ স্ত্রী-লোক থাকেন,—যাহারা অনেক টোটকা জানেন; কিছু দিন তাঁহাদের কথাও শোনা গেল। কেহ নির্জলা আদার রস মাখাইতে বলিলেন, কেহবা জায়ফল বাটিয়া প্রলেপের ব্যবস্থা করিলেন, আবার কেহবা কণ্টকময় ওকুড়া ফল ঘষিবার পরামর্শ দিলেন। নানা চিকিৎসায়-মেরেটাও বিরক্ত হইয়া উঠিল।

এই বার কেশ-তৈলের পালা! সেটেড-ক্যাষ্টরঅয়েল হইতে আরম্ভ করিয়া “জাতি কুসুম” “অপরাজিতা কুসুম” পর্য্যন্ত সমস্ত তৈলই আমার ক্ষুদ্র গৃহে সমবেত হইলেন! হায়! আমি অতি দুর্ভাগ্য! নহিলে যে সকল তৈল মাখিয়া কত নিরক্ষর মূর্খ কবি হইয়াছে, কত ঐশ্বর্য্যশালী-প্রেমিক-পুরুষের কর্ম্ম পট-



টাকে চমকী লাঙ্গুলের মত চুল গজাইয়াছে,—  
কত বিরহিনীর মুখে হারাণ-হাসি দেখা  
দিয়াছে, একে একে সেই সকল ঢকা-নিমাদী  
অপূর্ণ কেশ-তৈল আমার কন্ঠার মন্তকে  
বহুধারার মত সপ্তধারায় ঢালিয়াও কোন ফল  
পাইলাম না কেন? অথচ এই সকল তৈল-  
ব্যবসায়ীরা তৈল বেচিয়া ‘ক্ৰহামে’ চড়িয়া  
বেড়াইতেছে !!

বিজ্ঞাপনের উপর অশ্রদ্ধা জন্মিল। কেশ  
তৈলের বাকী শিশিগুলো বণ্ড-বাহিত-মিউনি-  
সিপ্যালিটির ক্যাবেজারের গাড়ীতে তুলিয়া  
দিলাম। আবিষ্কারকদের ইহাই যোগ  
প্রকার।

এই সময় একদিন আমার এক সাহিত্যিক  
বন্ধু \* আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসি-  
লেন। কথা প্রসঙ্গে বন্ধুকে মেয়েটার অবস্থা  
নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন—“কোন  
ও কবিরাজী তৈল ব্যবহার করিয়াছে কি?”  
আমি উত্তর দিলাম—মাপ করিবেন, আর  
তৈলে আমার ভক্তি নাই। তৈল মাথায়  
মেয়েটার মাথা আরও তেলা হইয়া গিয়াছে।

বন্ধু চলিয়া গেলেন। ৬৭ দিন পরে  
আমার নামে একটা পার্শেল আসিল, তাহার  
ভিতরে একটা শিশি ও একখানি পত্র। পত্র  
খানি পাঠ করিলাম। বন্ধু লিখিতেছেন—

“আমার বাসার পার্শে একজন প্রবীন  
কবিরাজ আছেন, তাঁহাকে তোমার কন্ঠার  
কথা জানাইয়াছিলাম। তিনি এই তৈলটুকু  
দিয়াছেন। ইহার নাম—‘নারায়ণ তৈল’।  
তোমার কন্ঠার জন্ত পাঠাইলাম। একবার  
পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কি?”

বন্ধুর পত্র খানি পড়িয়া ভাবিলাম,—বন্ধুর

\* শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস।

একটু ভুল হইয়াছে। এ ‘নারায়ণ’ তৈল  
আমার কন্ঠার জন্ত নহে; আমারই জন্ত;  
কেন না, কন্ঠার জন্ত ভাবিমা-ভাবিমা আমারই  
উৎকট উন্মাদ রোগের সম্ভাবনা,—কবিরাজ  
মহাশয় হয়ত আমারই জন্ত ‘নারায়ণ তৈল’  
ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি তৈলের শিশিটি  
সেতের উপর তুলিয়া রাখিলাম।

বোধ হয় একমাস পরে—একদিন দেখি-  
লাম—আমার কন্ঠার মাথার স্থানে স্থানে  
নূতন কেশোৎপাদন হইয়াছে। দেখিয়া আমার  
বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এমন সময়  
গৃহিণী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে কন্ঠার  
কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিতে-  
হাসিতে বলিলেন—তোমার বন্ধুর পত্র খানি  
আমি পড়িয়াছিলাম। তিনি যে তৈল  
পাঠাইয়াছেন—তাঁহাও জানিয়াছিলাম।  
তোমার অজ্ঞাতসারে আমিই মেয়েটাকে  
জোর করিয়া তৈল মাখাইতে আরম্ভ করি।  
আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। দেখ—  
মেয়ের মাথার কেশম চুল উঠিতেছে। আর  
বেশী তৈল নাই। তোমার বন্ধুকে আর  
এক শিশি পাঠাইতে বলিও।”

এ কি স্বপ্ন না সত্য! যে ‘নারায়ণ তৈল’  
বাহু রোগের ঔষধ বলিয়া জানিতাম, তাহাতে  
কি কেশ-পাতও ভাল হয়? আশ্চর্যের  
তবে অসাধ্য সাধন করিতে পারে! তৎক্ষণাৎ  
কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বন্ধুকে একখানি পত্র  
লিখিলাম। আর এক শিশি তৈল আসিল।  
বন্ধুর ভক্তিরসে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

১০১ ১২ দিনের মধ্যেই মেয়ের মাথার  
অনেক চুল গজাইল, তাহার মুখে ক্রীড়িত  
আসিল। আমি আশ্চর্যের  
প্রণাম করিলাম।

‘নারায়ণ তৈল’ যে ইগুলুগু রোগের ঔষধ,—  
হয়ত অনেক কবিরাজই একথা জানেননা।  
অনেক বিলাসী ও বিলাসিনী—চুলের পাট  
করিয়া থাকেন, চুলের জন্ত—ছাই-ভস্ম  
কিনিয়া অনেক বাজে খরচ করেন; আমি  
তাঁহাদিগকে একবার “নারায়ণ তৈল”  
মাথিতে অমুরোধ করি।

প্রাচীনকালে নারী-সমাজে ‘নারায়ণ  
তৈলের’ যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। প্রাচীন  
কাব্যে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।  
সপ্তদশর ধনপতি যখন সিংহল হইতে দেশে  
ফিরিয়াছিলেন, তখন লহনা ও থুলনা—ছাই  
সপত্নীর মধ্যে প্রসাধনের ধুম পড়িয়া গিয়া-  
ছিল। তখন রমণীদ্বয়কে সাজাইবার জন্ত—

“ডানি করে নিল রামা রজতের ঝারি।

বাম করে নারায়ণ তৈল বাটা পুরি ॥”

পরিচারিকা নিপুণহস্তে—বিরহিনীর  
মাথায় নারায়ণ তৈল ঢালিয়া দিয়া খোঁপা  
বাঁধিয়া দিয়াছিল।

“রুদ্রকেশে নারায়ণ তৈল এক বাটা।

কবরী বাক্সিল রাখা নাম শুভামুটি ॥”

কবিকঙ্কণের অনেক স্থানেই “নারায়ণ  
তৈল”র উল্লেখ আছে, ইহাতেই মনে হয়,  
‘নারায়ণ তৈল’ তখন নারীদের প্রসাধনের  
এক প্রধান সহায় ছিল। তাঁহারা নারায়ণ  
তৈলের গুণ জানিতেন। “মনসার ভাসানে”ও  
নারায়ণ তৈলের প্রভাব দেখিতে পাওয়া  
যায়।

“হরিত্রা বাটরা দিল মাথাইয়া গায়।

নারায়ণ তৈল দিল বেহলার মাথায় ॥”

বৈষ্ণব কবিও লিখিয়াছেন—

‘নারায়ণ তৈল দিয়ে যত সহচরী।

বাঁকি দিল ক্রীমতীর মোহন কবরী ॥”

পাঠক! বলিতে পারেন, সেকালের  
নারীগণ কেন নারায়ণ তৈলের এত আদর  
করিতেন? নারায়ণ তৈল যে শুধু কেশ  
পোষক, তাহা নহে। বে হিন্দু রমণী মাতৃ-  
লাভকে জীবনের চরম সার্থকতা মনে করেন,  
যাঁহাদের প্রাণের উদ্দেশ্য—

“কাণা খোঁড়া পুত্র হ’ক তবু হুংখ বোঁচে।”

‘নারায়ণ তৈল’ই তাঁহাদের নিঃসঙ্গ জীব-  
নের অবলম্বন। সেকালের হিন্দু সতী-  
সোভাগ্যবতী হইবার কামনায় মাথায় নারায়ণ  
তৈল মাখিতেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে যখন নারায়ণ  
তৈলের ফলশ্রুতি পড়ি—

“বন্দ্যা চ নারী লভতে চ পুত্রং বীরোপমং  
সর্বগুণোপ পন্নম্।” তখনই বুঝিতে পারি—  
নারীর সহিত নারায়ণ তৈলের কি পবিত্র  
সম্বন্ধ! যখন দেখি,—শাস্ত্রকার জোর করিয়া  
বলিতেছেন,

গর্ভমম্বতরী বিন্দ্যাং কিং পুনর্মামুহুতী তথা।

অন্ন প্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।

এততৈল বরং তেবাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতং’

তখনই বুঝিতে পারি—সেকালের পতি-  
ব্রতা স্ত্রীরাগণ কেন নারায়ণ তৈল মাখিয়া  
স্বামী-সোহাগিনী হইতে চাহিতেন।

এখন আমরা কান্ধন ফেলিয়া কাচের  
আদর শিখিয়াছি। বিলাসের মোহে—  
সুগন্ধের প্রলোভনে—বাজে তৈল কিনিয়া  
গৃহিণীর হাতে তুলিয়া দিতেছি। আমরা  
ভাবিবার অবকাশ পাই না—ইহাতে আমা-  
দের কি সর্বনাশ হইতেছে! আমরা বুঝিয়াও  
বুঝি না,—যে গৃহে “নারায়ণের” মহিমা নষ্ট  
হইয়া গিয়াছে, সে গৃহে লক্ষ্মীর পূজা নিতান্তই  
দুরাশা! আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি—  
নারায়ণ তৈলের প্রসাদেই আমার কণ্ঠা  
স্বকেশী হইয়া স্বামী সোভাগ্য লাভ করি-  
য়াছে। হৃদয়ের আবগে কণাটা আজ সর্ব-  
সমক্ষে প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

## নাভি কাহাকে বলে ?

—:~:~:~:—

ঘটনা—চারিবেংসর পূর্বের। আমরাই পাড়ার এক ভদ্রলোকের উদরভাস্তরে অঙ্গ-চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছিল, একজন বড় ডাক্তারের সহকারী রূপে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। স্থির হয়—ক্রোরোফর্ম করিয়া রোগির নাভির পার্শ্বে অঙ্গ প্রয়োগ করিতে হইবে। আমরা সেই ভাবেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলাম।

কিন্তু প্রথমই এক বিড়ম্বনা—বাটার গৃহিণী সেকলে লোক, তিনি একজন কবি-বাজকে ডাকিয়া আনাইয়া ছিলেন। কবি-বাজ যখন স্তনিলেন—রোগির নাভি ছেদন করা হইবে, তখন তিনি ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহার কথায় ডাক্তার বাবু যখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কবিরাজ তখন বাটা গিয়া একখানি পুঁথি লইয়া আসিলেন। পুঁথি খানির নাম—“সুশ্রুত সংহিতা”, বৈজ্ঞানের অঙ্গচিকিৎসার স্মৃতি! সেই পুস্তক খানির “মর্শ্ব-নির্দেশ” নামক অধ্যায়টি খুলিয়া, কবিরাজ মহাশয় আমাদের দেখাইলেন—

“পকামাশয়োর্মধ্যে শিরা-প্রভবা নাভির্নাম;  
তত্রাপি সত্ত্ব এব মরণম্।”

তাঁহার কথায় আমরা ইহার মোটা মুঠি অর্থ এই বুঝিলাম, যে—পকাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে সমস্ত শিরাজালের উৎপত্তিস্থান নাভি নামক মর্শ্ব আছে, সেই নাভি আহত হইলে নাশক সংঘর্ষই মরিয়া যায়।

ডাক্তার বাবু একটু স্নেহের হাসি হাসিলেন। দক্ষ হস্তে রোগীর নাভি ছেদন করি-

লেন। বেগতিক বুঝিয়া বৈজ্ঞবর গা’ ঢাকা দিলেন। প্রায় ১ মাস শয্যাগত থাকিয়া রোগী বাঁচিয়া উঠিল। কবিরাজ মহাশয় ত অবাক? “নাভি কাটিলে কি মানুষ বাঁচিয়া থাকে?” বোধ হয় এই প্রশ্নই অতঃপর তাঁহার জপমালা হইল। ইহার উপর,—ডাক্তার বাবু একদিন আর একটু ‘রসান’ চড়াইলেন—“কৈ, কবিরাজ মহাশয়! আপনার সুশ্রুতের কথা খাটিলনা! ‘নাভি-মর্শ্ব’ আহত হইয়াও রোগী যে বাঁচিয়া রহিল! আপনার শাস্ত্র ভুল!” কবিরাজ মহাশয় নতশিরে নিরুত্তর! তাঁহার এ মর্শ্ব-স্তিক লাঞ্ছনা—আমার কিন্তু ভাল লাগিল না। আমি হিন্দু—ব্রাহ্মণের সন্তান—আমার সম্মুখে ঋষি রচিত শাস্ত্রের নিন্দা, এ অপমান নিতান্তই অসহ্য। কিন্তু “ঋষি বংশধর” বলিয়া আভি-জাত্যের গৌরব মনে মনে থাকিলেও, সে সময় শাস্ত্র-সমর্থনের কোন যুক্তিই আমার জানা ছিলনা। আমিও নীরবে বাটা ফিরিলাম। এই ঘটনার পর হইতেই আমার “আয়ুর্কৌদ” শাস্ত্র আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। এখন আমি যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি,—ঋষি বাক্য নিভুল; আমরা কুলদ্বার—শাস্ত্রের প্রকৃত মর্শ্ব না বুঝিয়াই শাস্ত্রের নিন্দা করি। সে দিন কবিরাজ মহাশয় যে নাভি-ছেদনে বাধা দিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন,—ইহার কারণ তিনি শাস্ত্র বাক্যের নিগূঢ় অর্থ বুঝেন নাই বলিয়া। কবিরাজ মহাশয়েরা যত বড় বিদ্বান হউন, শারীর বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতাই তাঁহাদের শিক্ষা-গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। যে শরীর,—চিকিৎসার ক্ষেত্র,

সেই শরীরের সকল রহস্য না জানিলে কি কৰ্মক্ষেত্রে কৃতকার্য হওয়া যায় ?

বাজে কথা ছাড়িয়া এইবার কাজের কথা বলি। নাতি অর্থে ঋষিরা কি বুঝিতেন ? তন্ত্র-শাস্ত্রে এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—নাতি হইতে সমস্ত নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে, ঋষিরা ইহা নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব নাতি—নাড়ী চক্র। এ নাতি—চৰ্ম্ম নির্মিত নাতি হইতে পারেনা। ‘নাতি’ কি এবং তাহার অবস্থান কোথায় ?—ইহা বুঝিতে গেলে, প্রথমে তন্ত্রশাস্ত্রের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, তন্ত্রে যাহা “মূলধার চক্র”, আয়ুর্বেদে তাহারই নাম “নাতি”। এক্ষণে বুঝা যাক, “মূলধার” কি ?

তন্ত্র বলেন—গুহ্যধারের দুই অঙ্গুলি উর্দে এবং মেঢ় স্থানের দুই অঙ্গুলি নিম্নে মূলধার পদ্ম বিরাজিত, উহার বিস্তৃতি চতুরংঙ্গুলি পরিমাণ। এই মূলধারপদ্মের কর্ণিকা মধ্যে একটা ত্রিকোণ মণ্ডল আছে—যোগিগণ তাহাকে যোনি-মণ্ডল বলেন। এই যোনি-মণ্ডলের মধ্যপ্রদেশে—বিছিন্নতার ভায় আকার সম্পন্ন সার্ক ত্রিবলয়া কায়া কুটীলা “কুল-কুণ্ডলিনী” ব্রহ্মপথ বোধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সেই ত্রিকোণ-যোনি হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামী নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। মূলধার পদ্ম হইতে অল্প যে সকল নাড়ী উৎখিত হইয়াছে, সেই সকল নাড়ী জিহ্বা মেঢ়, বৃষণ, পাদাস্থি, নাসিকা, চক্ষু, অঙ্গুষ্ঠ, কর্ণ, পায়ু, কুঁকি প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গমন করিয়া, স্বকর্ষ সাধন পূর্বক আবার নিজনিজ উদ্ভবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে।

অত্যা বাতপরা নাড্যঃ মূলধারাং সমুখিতাঃ।

রসনা মেঢ় বৃষণ পাদাস্থিঃ নাসিকাং।

কক্ষা নেত্রাস্থি কর্ণঃ সর্বাঙ্গং পায়ু কুঁকিকং।

লজ্জা তা বৈ নিবর্ততে যথাদেশ সমুদ্ভবা।

[ শিব সংহিতা ]

ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে—মানব দেহ-স্থিত ইড়া-পিঙ্গলাদি সমস্ত নাড়ী মূলধার পদ্মস্থিত “কুল কুণ্ডলিনী” হইতে উৎপন্ন। এই সকল নাড়ী—উপর প্রাচীরস্থ চৰ্ম্ম নির্মিত নাতি হইতে কখনই উৎপন্ন নহে।

সংস্কৃত ভাষায় চৰ্ম্মনির্মিত নাতির নাম “নাতি” হইলেও, নাতি শব্দে—দ্রব্যের মধ্যস্থলকেও বুঝায়। যেমন “চক্রনাতি” বলিলে চক্রের মধ্যস্থল এইরূপ অর্থই প্রকাশ পায়। সূর্য্য সৌর জগতের মধ্যে বিরাজমান,—তাই তিনি জগতের নাতি, অর্থাৎ Centre. পাঠকগণের মধ্যে বাহারী বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন—একখানা লৌহকর্ষকের সংস্পর্শে আর একখণ্ড লৌহ “চুম্বকত্ব” প্রাপ্ত হয়। এইরূপ চুম্বকত্ব লৌহখণ্ড, আর একখণ্ড লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে। সকল লৌহেই চুম্বকের ধর্ম আছে, কিন্তু সে শক্তি নিম্নিত। এই নিম্নার নাম “যোগিনিদ্রা”। পরমাত্মরূপ চুম্বকের সংস্পর্শে প্রকৃতিরূপ লৌহখণ্ডে তিনটা শক্তি জাগ্রত হয়। তাই যোগবিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে—

নিরুদ্ধে সংস্থিতে বাস্তবখা লৌহঃ প্রবর্ততে।

সব্বামাত্রো দেবেন তথৈবেরং জগজ্জনী।

অক্ষাতিত অবস্থায় এই তিন শক্তি যোগ নিম্নার নিম্নিত থাকে। পরমাত্মার চৈতন্তে চৈতন্তবতী হইয়া প্রকৃতি জীবদেহে তিনভাবে ক্রিয়া করেন। চুম্বকের দুই সীমার লৌহ

কর্ষণ শক্তি বিস্তারিত, কিন্তু উহার ঠিক মধ্যস্থলে সে শক্তির সত্তা নাই। এইরূপ লোহা-কর্ষণ-শক্তিবাহিন-মধ্যস্থল না থাকিলে, চুম্বকের উভয় প্রান্ত কখনও লোহকে আকর্ষণ করিতে পারিত না।

জগতের অগ্রাশ্রয় শক্তিগুলিও একটি স্থির মধ্যস্থল না পাইলে, কার্য্য করিতে পারেনা। মানব-দেহে যে জীবনী-শক্তি ক্রিয়া করে—সেও চুম্বকের মত মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়া। এই স্থির মধ্যস্থল না থাকিলে, মানব-শরীরে কোন জীবনী শক্তিরই বিকাশ ঘটিত না।

একণে দেখা যাউক মানব-দেহের এই স্থির মধ্যস্থল কোথায় ?

তত্ত্ব বলেন—

মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নাভী স্থানিধিরূপিনী।  
ততোদশোর্দ্ধগা নাভ্যো দশশ্চাধো গতা শুভা।  
তির্ধ্যগ্ গতে জ্যেষ্ঠা নাভ্যো চতুর্ধ্বংশতি সংখ্যায়া।  
অহি স্বরূপিনী মহাশক্তি কুণ্ডলিনী হইতে ২৪ টি প্রধান নাভী উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০টি উর্দ্ধগ ১০টি অধোগ এবং বামে ও দক্ষিণে দুইটি দুইটি করিয়া চারিটি নাভী তির্ধ্যগ্ গামী।

মহর্ষি সূত্রত বলিয়াছেন ;—

চতুর্ধ্বংশতি ধমন্তো নাভি প্রভবা অভ্য-  
হিতাঃ। তাসান্ত নাভি প্রভবানাং ধমনীনা  
মূর্দ্ধগা দশ দশশ্চাধোপামিত্তঃ চতস্র তির্ধ্যগ্ গাঃ

[ শা, ১ম অঃ ]

আবার “শিব-স্বরোদয়” নামক তন্ত্রে দেখা যায়—নাভিকুণ্ডল হইতে অম্বুরের স্থার ৭২০০০ গহ্বর ধমনী নির্গত হইয়াছে। নাভিস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে ১০টি উর্দ্ধগ, ১০টি অধোগ, এবং ৪টি তির্ধ্যগগত, এই ২৪টি নাভী প্রধান।

তাত্ত্বিক মূল্যবাহু ত্রিকোণের আর একটি নাম দিয়াছেন—“কূর্ম্ম”। দস্তাবেজ বলেন—  
তির্ধ্যাক কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে  
বামে বল্লঃ তন্ত্র পুচ্ছঞ্চ যামো।

উর্দ্ধ ভাগে হস্ত পাদৌ চ যামৌ

তত্ৰাবিত্তাং সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ ॥

বল্লভে নাভীদ্বয়ঃ তস্য পুচ্ছে নাভীদ্বয়ঃ তথা  
পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণ ভাগয়োঃ।

শব্দর সেন তাঁহার “নাভী প্রকাশে”—  
এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বৈজ্ঞানিক এক  
“গোলোকধাধারণ” কেলিয়া দিয়াছেন।  
দেহিদিগের নাভিদেশে তির্ধ্যগ্ভাবে একটি  
কূর্ম্ম আছে, তাহার মুখ নাভিদেশের বাম  
ভাগে, পুচ্ছ দক্ষিণভাগে, উর্দ্ধভাগে তাহার  
বাম হস্ত ও বাম পদ এবং অধোভাগে দক্ষিণ  
হস্ত ও দক্ষিণ পদ। ঐ কূর্ম্মের মুখে দুইটি  
নাভী পুচ্ছদেশে ২টি নাভী এবং পদদ্বয় ও  
হস্তদ্বয়ে ৫টি ৫টি করিয়া ২০টি—সর্বসমেত  
২৪টি নাভী আছে।

এই শ্লোকে রূপকভাবে যে ত্রিকোণখানি  
হইতে ২৪টি ধমনীর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে—  
শব্দর সেন ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই।  
সুতরাং কেবলমাত্র “নাভী-প্রকাশ” পাঠে—  
কূর্ম্মের প্রকৃত অর্থ নিরূপিত হয়না।  
মানবদেহে বস্তু ও লিঙ্গমূল সমুখদিকে এবং  
ত্রিকাহি ( Sacrum ) পশ্চাদিকে এই অংশই  
দেহের মধ্যস্থল বা নাভি। সুতরাং সূত্রত  
বর্ণিত নাভিমর্শ—চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি হইতেই  
পারে না। চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি আহত হইলে  
কাহারও সত্তা মরণ হয় না। উদর মধ্যস্থিত  
আমাশয় ও পাকায়ন—যে স্থান হইতে, স্বল্প  
স্বল্প রস বহা শিরা উৎপন্ন হইয়াছে—  
সেই স্থানই সূত্রতোক্ত “নাভিরূপ”। এই

নাভিমর্মে আঘাত লাগিলে—মাতৃঘের সত্তাই প্রাণবিয়োগ ঘটে। এই নাভিই প্রাণের আশ্রয় স্থল। ক্রণের দেহ প্রস্তুত হইবার পূর্বে মাতৃগর্ভস্থ অণুর (Ovum) মধ্যস্থল হইতে জীবনীক্রিয়া প্রথম বিকাশ পায়, মস্তিষ্ক হস্ত পদাদি ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হয়। দেহের নাভি বা মধ্যস্থল জীবনীশক্তির প্রধান স্থান। মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জা (Spinal cord) এই নাভিস্থ প্রাণ ধারাই সৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন বটবৃক্ষের অতি স্থল বীজে বটবৃক্ষ সৃজন করিবার শক্তি থাকে, তেমনি মাতৃগর্ভস্থ অণুে মানব-দেহ সৃজন করিবার শক্তি স্থল ভাবেই নিহিত থাকে। বটগাছ যেমন কাণ্ড-শাখা ও পত্র-পল্লবে ক্রমশঃ ভূষিত হইয়া থাকে, —জীবনীশক্তি ও ক্রমশঃ সমগ্র বৃক্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; মাতৃগর্ভস্থ অণুও তেমনি ক্রণ দেহের জীবনীশক্তি অণুর অণু ভাবে লুক্কায়িত থাকে। এই শক্তিই শ্রুতির সেই—

“অণোরণীয়ান্ মহতে মহীয়ান্।”

সর্বজ্ঞ ঋষি তাই নাভিমর্মকে প্রাণের আশ্রয়স্থল বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা ঋষি বাক্যের প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়াই তাঁহাদের নিন্দা করি।

যেমন পখের কন্দ পক্ষ মধ্যে থাকে এবং প্রক্ষুটিত পক্ষ জলের উপর ভাসে তজ্জপ অর্ধা-শাস্ত্র মতে সমস্ত ধমনী নাভিকন্দ অর্থাৎ কটদেশস্থ ত্রিকোণস্থির (Sacrum) সমুদ্বন্ধ (Pelvicplexus) হইতে উৎপন্ন হইয়া উদরাত্তরস্থ (Solar Plexus) হইতে বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে। যোগী যাজ্ঞ বক্য বলিয়াছেন—

“কন্দস্থানং মহাঘানাং দেহমধ্যায়বাস্থলং”

মূলধার হইতে ৯ অঙ্গুলি উর্দ্ধস্থিত স্থান

অবধি সমস্ত নাড়ীর উৎপত্তি স্থান। যখন মানব দেহ প্রথম মাতৃগর্ভে গঠিত হয়, তখন জীবনী-শক্তির প্রথম বিকাশ নাভি প্রদেশে [ অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগে ] দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞতা বশতঃ অনেকে উদর-প্রাচীর স্থিত চর্ম নিশ্চিত নাভিকে সমস্ত শিরার মূল বলিয়া থাকেন,—ইহা কিন্তু একেবারেই অসম্ভব। তবে চর্ম নিশ্চিত নাভির তিতর দিয়া ক্রণের নাভি রজ্জু (Umbilical cord) গমন করে বটে, কিন্তু ইহা কেবল মাতৃ-হৃদয়ের সহিত ক্রণের হৃদয় সংযোগের জন্ত। বাগ্‌ভট এ কথাটা সন্দেহ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন—গর্ভস্থ নাভো মাতৃশুদ্ধি নাভি নির্বধাতে। যথা স পুষ্টি মাপ্রোতি কেদার ইব কুলায়া।

প্রকৃত পক্ষে নাভি—কেবল রক্ত চলাচলের জন্ত নাভিরজ্জু যাইবার পথ মাত্র।

গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণের পর শিশুর কোন শিরাই চর্ম নিশ্চিত নাভির সহিত সংযুক্ত থাকে না। শবব্যবচ্ছেদের দ্বারা বেশ বুঝা যায়—সমস্ত শিরাই উদর মধ্যস্থিত Solar Plexus এর সহিত নিবদ্ধ। এই Solar Plexus হইতে শাখা-প্রশাখা অন্ত্যান্ত Plexus এর সহিত সংযুক্ত হইয়া শরীরের সমস্ত শিরাজালের প্রাচীর ব্যাপিয়া আছে। Solar শব্দের অর্থ সূর্য্য সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ ঋষিগণও নাভিকে সূর্য্যস্থান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তত্ত্ব—এ সকল কথা ভাল রকমই বুঝাইয়াছেন। আমাদের দুইটা কেন্দ্র,—উর্ধ্বকেন্দ্র অর্থাৎ মস্তক চক্রের স্থান, অধোকেন্দ্র অর্থাৎ নাভিদেশ সূর্য্যের স্থান।

“তালুমূলে স্থিতচক্রঃ নাভিমূলে বিদ্যকিরঃ”  
নাভি যেমন সমস্ত ধমনীর উৎপত্তি স্থান, তেমনি সমস্ত শিরারও উৎপত্তি স্থান।

যে শক্তি Solar Plexus প্রক্রিয়া করে— তাহাই আয়ুর্বেদের সমান বায়ু। এই বায়ু অন্ত্রপরিপাকের সাহায্য করে, এবং পরিপাক প্রাপ্ত অন্নের সারাংশ ( রস ) আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে প্রেরণ করে। বৃক্ষ যেমন হৃদয় হৃদয় মূল দ্বারা বস আকর্ষণ করিয়া, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ জীবনী শক্তির প্রভাবে মানব দেহে আমাশয় ও পাকায়ন হইতে রস দুইটি মার্গ দিয়া হৃদয়ে প্রেরিত হইয়া শরীরকে পোষণ করে। যে রস দুইটি বর্ণ—সেই রস Lactial নামক অসংখ্য হৃদয় রস বহা শিরার দ্বারা শরীরের বাম ভাগস্থিত Tharacic cluct নামক শিরা দিয়া বক্ষের ভিতরে বক্তের সহিত হৃদয়ে উপস্থিত হয়। এবং আহারের সারাংশ রসের কিয়ৎ পরিমাণ আমাশয় ও পাকায়ন হইতে হৃদয় হৃদয় রসবহা শিরা দিয়া Portal vein শিরায় প্রবেশ করে। ইহাই হইতেছে—রস প্রবাহের দক্ষিণ মার্গ। Portal vein হইতে এই রস যকৃততে যায়। তাহার পর যকৃতের মধ্যে সংশোধিত হইয়া হৃদয়ে গমন করে। ইহার দ্বারা আয়ুর্বেদ নতের আমাশয় ও পাকায়ন হইতে রসের হৃদয় পর্যন্ত গমন—অনারাসেই প্রতিপন্ন হইল। এই আমাশয় ও পাকায়নের প্রাচীরে যে হৃদয় Lactial ও Portal vein এর হৃদয় অগ্রভাগ আছে, তাহাই রস ও রক্তবহা শিরা সমূহের উৎপত্তি স্থান। এই জন্তই অসাধারণ মনোবী সূত্রত বলিয়াছেন—“তাসাং নাভিসূলং ততশ্চ প্রসরন্তু সূক্ষ্মমস্তিষ্ঠ্যক্ চ।” নাভিই শিরা সমূহের মূল, শিরাগণ তথা হইতেই উৎপন্ন; এবং তিষ্ঠ্যক্ ভাবে প্রসারিত হইয়াছে। হৃদয় আরও বলিয়াছেন—

প্রাণ—৫

যাবতান্ত শিরাঃকায়ে সম্ভবন্তি শরীরিণাং  
নাভিহাঃ প্রাণিণাং প্রাণাঃ

প্রাণান্নাভিতু'পাশ্রিতাঃ

শিরাভিরাত্তা নাভিশ্চক্রনাভি রিবারকৈঃ ॥

দেহীগণের দেহে যতগুলি শিরা উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই নাভির সহিত নিবদ্ধ, নাভি হইতেই তাহারা সর্বশরীরে প্রসারিত হইয়াছে। প্রাণীগণের প্রাণ নাভিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, আবার নাভিও প্রাণকে অবলম্বন করিয়া আছে। যেমন চক্রনাভি, চক্র সমূহ দ্বারা বেষ্টিত। চন্দ্র নির্মিত নাভির সহিত কোন শিরাই নিবদ্ধ থাকেনা। সুতরাং প্রাণীর প্রাণ ও চন্দ্র নির্মিত নাভিকে আশ্রয় করিয়া থাকেনা। অতএব নাভি অর্থে দেহের মধ্যস্থল—ঋষি উক্তির ইহাই অভিপ্রায়। দেহের মধ্যস্থল কটদেশে, এই কটি দেশেই মূলধার চক্র অবস্থিত; সেই চক্রের মধ্যে মহাশক্তি কুণ্ডলিনী বিরাজিত। ইহাই নাভিকন্দ। এই কুণ্ডলিনীর প্রভাবেই Solar Plexus হইতে স্বাস-প্রবাসের কার্য চলিতেছে।

শাঙ্গ'ধরও বলিয়াছেন,—

নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ সৃষ্টঃ। হৃৎকমলাস্তরং।

কণ্ঠাধিহি বিনির্বাতি পাতুং বিজ্ঞ পদামৃতং।

পিচ্ছাচাশ্বর পীযুষং পুণরায়ান্তি বেগতঃ।

প্রীণয়নু দেহ মথিলং জীবয়নু জঠরানলম্ ॥

অর্থাৎ নাভিস্থ প্রাণবায়ু হৃদয়ভ্যন্তর [ Chest ] দিয়া গমন করিয়া বিজ্ঞপদামৃত ( বুদ্ধিবায়ু ) পান করিবার আশায় কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয় এবং আকাশ পীযুষ পান করিয়া সমস্ত শরীরকে তপিত ও জঠরানলকে বর্দ্ধিত করিয়া নাসিকায় রক্তপথে স্বহানে ফিরিয়া আসে।

আয়ুর্বেদ-রচয়িতৃগণ কাহাকে নাভি বলিয়াছেন, এতক্ষণে পাঠকগণ তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। অতএব নাভি যে কেন সমস্ত ধমনীর উৎপত্তিস্থান—নিম্নলিখিত যুক্তির বলে আমরা সেই স্বমিবাক্য সমর্থন করিতেছি।

(ক) জীবনী শক্তির প্রথম বিকাশ হয়—দেহের মধ্যস্থল হইতে। জননীর জরায়ুস্থ শিরার সহিত ক্রণের নাভি রজ্জুর যে সংযোগ—তাহাই জীবনী শক্তির প্রথম ক্রিয়া।

(খ) Solar Plexus হইতে vasomodor ধমনী সমূহ সকল শরীরে বিস্তৃত হইয়া থাকে। পোষণ অভাবে কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। শরীরের বিস্তৃতির সহিত রসবহা শিরাগুলিও বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই সকল শিরায় প্রাচীরে Varomodor ধমনী জাল আকুঞ্জন ও প্রসারণের কার্য করে। এই ধমনীগুলি উদরাত্মকত্বের Solar Plexus এর সহিত সংযুক্ত বলিয়া, শিরা ও ধমনী সমূহকে নাভি নিবন্ধ বলা যায়।

(গ) সূত্রতোক্ত নাভি-মর্শ্ব কখনই চর্ম নির্মিত নাভি হইতে পারেনা। কেননা চর্ম নির্মিত নাভি ছেদন করিলে মাহু্য কখনই মরে না।

(ঘ) উদরের অভ্যন্তরে আমাশয় ও পাক-শয়ের মধ্যে যে শিরাজাল আছে,—সেই শিরাজাল বেষ্টিত স্থানের নামই নাভিমর্শ্ব। এই স্থানে সামান্য মুঠ্যাঘাত করিলেও মৃত্যুর সম্ভাবনা।

(ঙ) পৌরাণিক উপাখ্যানে আমরা জানিতে পারি,—বিষ্ণুর নাভি হইতে হংস-বাহন ব্রহ্মার উৎপত্তি। ক্রণের মধ্যদেশ হইতে সমস্ত দেহই সৃজিত হয়। হংস অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস (হং—নিশ্বাস, স—উচ্ছ্বাস) অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ক্রণের দেহের মধ্যস্থলেই শ্বাস-প্রশ্বাস বা প্রাণের বিকাশ স্থান।

ডাক্তার—

শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, বি।

## আয়ুর্বেদের কষায়-মাহাত্ম্য।

—:—

### দুর্ভালতা-কষায়।

“পিবদ্ দুর্ভালতা-কাথং সমুতং ভ্রম-শান্তয়ে।” দুর্ভালতার কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্নাত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ভ্রম-রোগের শান্তি হয়।

ভ্রম-রোগটা কি, তাহা আগে বুঝা যাউক, পরে কষায়ের প্রস্তুতি-বিধি প্রভৃতি বলা যাইবে।

প্রচলিত আয়ুর্বেদে আছে অভ্যন্তর রোগের

ভ্রায়, ভ্রম-রোগের নিদানাদি তত্ত্ব সবিত্তারে বর্ণিত নাই। “নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ।” কিন্তু মাধব করণ স্বকীর রোগবিদিশ্র সংগ্রহে, “রজঃপিত্তানিলাদভ্রমঃ” সূত্রতোক্ত এই বাক্যটি উদ্ধার করিয়া নিরন্তর রহিয়াছেন,—লক্ষণ বলেন নাই। নিদানের প্রসিদ্ধ উপা-কার বিজয় রক্ষিত, মাধব নিদানে ভ্রম-রোগের



লক্ষণ না বলার সপক্ষে একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, “নিজা ভ্রমরোগে লক্ষণ নোক্ত মিহাতি প্রসিদ্ধান্তঃ।” অর্থাৎ অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া, নিজার লক্ষণ এবং ভ্রমরোগের লক্ষণ এখানে উক্ত হয় নাই। কিন্তু টীকার, “ভ্রমলক্ষণস্ত চক্রস্থিতস্যেব ভ্রমবদবস্ত দর্শনম্” অর্থাৎ ভ্রমমান-চক্রস্থিত বস্তু দর্শনের ছায় বস্তু দর্শনই ভ্রমরোগের লক্ষণ, এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ বলিয়া রোগের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বোগ-চিকিৎসার পক্ষে একরূপ সংক্ষিপ্ত লক্ষণ পর্যাপ্ত নহে। রোগের নিদানাদি তত্ত্ব না জানিলে, সূচাকরূপে রোগ চিকিৎসা করা চলেনা। তজ্জন্তু সংক্ষেপে ভ্রম রোগের নিদান, পূর্বিকা, সম্প্রাপ্তি এবং লক্ষণ বলা যাইতেছে।

অনবস্থান বা ভ্রমনার্থক ভ্রম ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অল্প বিধান করিলে ‘ভ্রম’ শব্দ সিদ্ধ হয়। করণায়তন বা মনোভূমি (Brain) অনবস্থিত হইলে অর্থাৎ স্থিত না রহিয়া বিচলিত হইতে থাকিলে ভ্রমরোগ উৎপন্ন হয়।

ঘৃত, তৈল, বঙ্গা এবং মজ্জা—এই চারি দ্রব্যের সাধারণ নাম স্নেহ। যে দ্রব্যে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে, ন্যূনাতিরিক্ত মাত্রায় স্নেহ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে স্নিগ্ধ দ্রব্য বলে। অস্নিগ্ধ দ্রব্যের নাম কৃষ্ণ দ্রব্য।

কৃষ্ণ ভোজন, মাদক সেবন, ধাতুকর বিশেষতঃ মজ্জা-ধাতুর ক্ষীণতা, উৎকট চিন্তা, রাত্ৰিজাগরণ, মত্তকে ভারবহন, অতি মাত্রায় রোহিণির সম্ভাপ গ্রহণ, এবং অতি-ব্যায়াম প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত এবং রক্ত-সংজ্ঞক মানস দোষ-প্রকৃপিত হইয়া যদি উত্তমাজ আশ্রয় করে, তাহা হইলে দোষ ত্রয়ের কক্ষোক্ষ-

চাক্ষুশ্য গুণে মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা এবং স্থিরতা হ্রাস পাইতে থাকে। তজ্জন্তু মনঃ অপ্রসন্ন ও ও চঞ্চল হইয়া উঠে, মুখমণ্ডল স্নান-ত্রী ধারণ করে, ভালরূপ নিদ্রা হয় না, অথবা আদৌ ঘুম আসে না এবং শরীর খুব গরম বোধ হইতে থাকে। এই সময়ে নিদান পরিবর্তন পূর্বক সাবধান না হইলে ভ্রম রোগ উপস্থিত হয়।

মাথাধোরা এবং গা-টলা ভ্রমরোগের প্রতিনিয়ত লক্ষণ। হৃৎস্পন্দন, বিবমিষা, বমন, চিত্তের অস্থিরতা, মুখশোথ এবং অকৃতি প্রভৃতি এই রোগের অপরাপর লক্ষণ।

সর্বত্র সর্বকণ ভ্রমরোগের লক্ষণ বিদ্যমান থাকেনা। কিন্তু ভ্রম-রোগগ্রস্থ ব্যক্তির শরীর কোন সময়েই স্বচ্ছন্দ লাভ করেনা। কাল বা অপর হেতু বশতঃ দোষ-লক্ষ-বল পীড়া প্রকাশ পায়। দোষের প্রকোপ প্রশমিত হইলে, রোগী কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করে। কাহারও বা ন্যূনাতিরিক্ত পরিমাণে সর্বকণই পীড়া বিদ্যমান থাকে। বসিয়া স্থির থাকিলে কিংবা স্থিরভাবে শুইয়া রহিলে, রোগী কিছু স্বস্তি বোধ করে; হঠাৎ আসন-শয়ন ত্যাগ করিলে মাথা ঘুরিয়া আইসে। যখন পীড়া প্রবল হয়, তখন যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে। বোঁধ হয় যেন, ব্রহ্মাণ্ড প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। এই সময়ে উপযুক্ত উপাধানে মাথা রাখিয়া, চোক বুজিয়া শয়ন করিলে এবং মাথা চাপিয়া রাখিলে কিছু ভাল বোধ হয়। চোক মেলিয়া চাহিলে এবং মাথা ঘুরাইলে-ফিরাইলে পীড়া বৃদ্ধি পায়।

ভ্রমরোগ, কখন-কখন অন্তরোগের লক্ষণ-রূপে আবিস্কৃত হইয়া থাকে। বিদগ্ধাঙ্গীর্ণ, বাতপিত্তজ্বর এবং শ্রবণ ও নয়ন রোগ বিশেষ

ভ্রম উপস্থিত হয়। এরূপ ভ্রমকে লাক্ষণিক ভ্রম বলা যাইতে পারে। ভ্রমরোগ কখন-কখন অল্প রোগের উপদ্রবরূপেও আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। ভ্রম বিষ্টকাজীর্ণ রোগের অন্ততম উপদ্রব।

হুরালভা,—হুরালভা বহুকণ্টকাকীর্ণ ক্ষুণ্ণ জাতীয় উদ্ভিদ। উত্তর-পশ্চিম-বঙ্গের এবং ভারতের অন্যান্য উচ্চপ্রদেশের প্রান্তরে বহু পরিমাণে হুরালভা জন্মিয়া থাকে। নিম্ন বঙ্গে জন্মে না। কিন্তু কুত্ৰাপি হুরালভা অমূলভ নহে। সর্বত্রই পশারির দোকানে আবশ্য-কামুরূপ হুরালভা কিনিতে পাওয়া যায়। হিন্দি ভাষায় এই গাছের নাম জবাসা ও হুরালা।

অথয়ে রক্ষিত, চিরকালোষিত, ব্রষ্টবর্ণ, গতরস এবং হতবীৰ্য্য কোন ওষধিই ওষধার্থে ব্যবহার করা উচিত নহে। টাটকা অথচ শুক হুরালভা সংগ্রহ করিয়া, ধুইয়া ধূলি-বালি ছাড়াইয়া শুকাইয়া লইবে। তার পর কুটি-কুটি করিয়া কাটিয়া, উদ্‌ধূলে বা হাবানদিস্তায় উত্তম রূপে কুটিয়া লইবে। কুটিত হুরালভা

২ ভরি ওজন করিয়া লইয়া মেটে পাত্রে কাঠের জালে, আধসের জল সহ ধীরে ধীরে পাক করিবে। আধপোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া পরিকার পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে অর্দ্ধ তোলা পুরাতন গব্যদুত প্রক্ষেপ দিয়া রাখিবে। দ্ব্যত গলিয়া গেলে এবং কষায় শীতল হইলে এক মাত্রায় পান করিবে। পুরাতন দ্ব্যতের অভাব হইলে টাটকা গব্য দ্ব্যত অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

তরুণ এবং অবুদ্ধ ভ্রম-রোগে, উক্ত নিয়মে হুরালভার কাথ তৈয়ার করিয়া ৭৭ দিন ব্যবহার করিলে ভ্রম রোগের হাত চইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। পুরাতন ভ্রম রোগে ইহা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে মূল পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, যে কারণে ভ্রম রোগ জন্মে, যত্নপূর্বক সেই সেই কারণ পরিবর্তন করিয়া কষায় সেবন করা উচিত।

কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,  
কবিরত্ন।

## শাঙ্গধরোক্ত প্রলেপাবলী।

### বিষম্মলেপ।

ঈশলাঙ্গলা, আতাইচ, তিতলাউ বীজ,  
কাজীতে পেষণ করি বিঙ্গা মূল্যবীজ।  
প্রলেপন দিলে কোঠ আর বিস্কোটিক।  
বিনাশ হইবে ইহা জানিবে তিব্বক ॥

### বম্মলেপ।

টাবালেবুমুল, দ্বত, মনহাল আর,  
গোময়ের রসে লেপ করিবে যাহার।

নীলিকা, পিড়কা, ব্যঙ্গ তার নাশ হবে,  
বিশেষ মুখের কান্তি সদা তার রবে।

### বয়োব্রণে লেপত্রয়।

( ১ )

লোথ, ধনে, বচ দ্বারা করিলে প্রলেপ;  
তথা গোরোচনা আর মরিচের লেপ,  
সর্ষপ, বচ ও লোথ, সৈন্ধব লবণ  
যৌবন পিড়কানাশে করিলে লেপন।

(২)

অজ্জ্বনের ছাল কিম্বা মস্তিষ্ঠা পেষিত,  
সংযুক্ত করিয়া তাতে মধু, নবনীত ।  
অথবা শ্বেতাশ্বথুর ভঙ্গ তথা করি ।  
প্রলেপ করিলে ব্যঙ্গরোগ যায় সরি ॥

(৩)

আকন্দর আঠা আর হরিত্রা মর্দিত,  
প্রলেপনে মুখকাষ্য হয় প্রশমিত ॥  
বটের কোমল পত্র, মালতী, চন্দন,  
কুড়ু ও দারু হরিত্রা, লোধ বিলেপন  
করিলে নীলিকা, ব্যঙ্গ, বয়োত্রণ নাশ ।  
শার্ঙ্গধর গ্রন্থে ইহা হইল প্রকাশ ॥  
তিলের খইল আর কুকুটের মল,  
গোমুত্রে পেষিয়া লেপ অরুণি কাঁজল ।  
খদির, নিম ও জাম ইহাদের ছাল,  
গোমুত্রে পেষণ করি লেপ দিলে ভাল,  
কিঞ্চিৎ কুড়চীর ছাল সৈন্ধবে তেমন  
প্রলেপনে আরুণিকা হয় প্রশমন ॥  
সৈন্ধব, পিয়ালবীজ, কুড়, যষ্টিমধু,  
বাটিয়া মাষকলাই, যুক্ত করি মধু,  
মস্তকে প্রলেপ দিলে নাশে দারুণক ।  
তথা পোস্তদানা দ্রুখে হয় বিনাশক ॥  
আম্রবীজ হরীতকী করিয়া চূর্ণিত,  
দ্রুক্ষেতে পেষিয়া লেপে উহা প্রশমিত ।  
তিক্ত পটোলের পত্র রসের লেপন,  
তিন দিনে ইন্দ্র লুপ্ত হয় প্রশমন ।  
বৃহত্তীর রসে মধু সংযোগ করিয়া  
লেপ দিলে টাকপড়া বাইবে সরিরা ।  
গুজার মূল বা ফল, ভেলায়স কিবা  
গোক্ষুর ও তিলমূল, সম অংশে নিবা  
বৃত্ত মধু মস্তকেতে করিলে লেপন ।  
কেশ বৃদ্ধি হয় তার কহে বৃষগণ ॥

ছাগদুগ্ধে হস্তিদন্ত ভঙ্গ, রসায়ন,  
পেষণ করিয়া যদি করে বিলেপন ;  
হাতের তলে ও তাতে রোমোৎপন্ন হয় ।  
ঢাক বিনাশিবে তার কি আছে সংশয় ।  
যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দ্রাক্ষা, তৈল, ঘৃত  
দ্রুগ্ধপেষি লেপ দিলে ঢাক প্রশমিত ।  
বিশেষত কেশ সব ঘন দৃঢ় হয় ।  
অপর রোমসকল শ্রেষ্ঠ অতিশয়  
চতুষ্পাদজন্তুদের রোম, নখ, ডক,  
শৃঙ্গ, অস্থিভঙ্গ, তৈলে মর্দিয়া ভিষক  
তদ্বারা প্রলেপ দিলে রোমোৎপন্ন হয় ।  
রোমসজনক ইহা শ্রেষ্ঠ অতিশয় ॥  
রাখাল শশার বীজ তৈলে বিমর্দিয়া  
মাখিলে হইবে কেশ ভ্রমর নিদিয়া ॥  
লোহচূর্ণ, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও মাটি,  
একমাস ইক্ষুরসে, রাখিবেক খাটি ;  
তদ্বারা প্রলেপ দিলে জানিবে নিশ্চয় ।  
অকাল পলিত কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥  
আমলকী, হরীতকী, বহেড়া এ তিন,  
ক্রমে সংখ্যা তিন, দুই, একটি প্রবীন ।  
আমের আটার মজ্জা পাঁচটি লইবে ।  
লোহচূর্ণ দুই তোলা একত্র পেষিবে ।  
লোহপাত্রে এক রাত্রি করিয়া স্থাপন  
লেপে কৃষ্ণ পক কেশ কৃষ্ণ-ভ্রমর বরণ ॥  
ত্রিফলা ও নীলপত্র, লোহচূর্ণ আর,  
ভীমরাজ সমভাগে পেষিয়া আবার  
ছাগদুগ্ধে, তাহা দ্বারা করিলে লেপন  
কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় শ্রেষ্ঠ একারণ ॥  
ত্রিফলা, দাড়িমম্বক, পদ্মের মৃণালে ।  
লৌহ প্রত্যেকের চূর্ণ পাঁচশল তলে ।  
চারিসের ভীমরাজ রসে নিমজ্জিয়া ।  
একমাস লৌহপাত্রে রাখিবে পুষ্টিয়া ॥

পরে ছাগহুন্ধে তাহা করিয়া মিলন ।  
 রাত্রিকালে কুষ্ঠে, শিরে করিয়া মর্দন ॥  
 এরণ্ড পত্রের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া  
 নিদ্রা যাবে, শ্রান্তে স্নান করিবে উষ্ণিয়া  
 এইরূপ তিন দিন করিলে লেপন ।  
 নিশ্চয় পলিত কেশ হবে প্রশমন ॥

### নেত্র ।

হরীতকী, গেরিমাটী, সৈন্ধব, রসাজন,  
 এই সব দ্রব্য জলে করিয়া পেষণ ।  
 নেত্রে বহির্লেপ ইহা করিলে প্রদান ।  
 সর্ব নেত্ররোগ প্রব হবে অন্তর্ধান ॥  
 ত্রিকটু ও রসাজন সলিলে পেষিয়া ।  
 বটিকা প্রস্তুতকরি, জলে তা বসিয়া,  
 নেত্রে লেপে, কণ্ডূপাক অধিত অঞ্জন ।  
 নেত্ররোগ ইহা হ'তে হয় প্রশমন ॥  
 সোমরাজী-চাকুলের বীজ, তিল, কুড়,  
 সর্ষপ, হরিদ্রাদ্বয়, মুতা করি চূর,  
 তক্রিতে পেষণ করি লেপ দিলে তার ।  
 কণ্ডূ, দ্রুণ, বিচর্চিকা হইবে সংহার ॥  
 বিড়ঙ্গ, হিঙ্গুল, হেমক্ষীরী ও গন্ধক ;  
 চাকুলের বীজ, কুড়, সিল্পুর ভিষক,  
 পৃথক্ পৃথক্ নিম্ন ধুতরাপাতার,  
 পানের রসেতে মর্দি লেপ দিলে তার ॥  
 পামা, দ্রুণ, বিচর্চিকা, কণ্ডূ, কুষ্ঠরোগ ।  
 (রকসা) বিনাশে আশু—নাহি হয় ভোগ !  
 হরীতকী, হরীতকী আর চাকুলে সৈন্ধব,  
 অরণ্যভুলসী, তক্রি পেষি এই সব ;  
 তক্তারা প্রলেপ দিলে কণ্ডূ, দ্রুণ হয় ।  
 বিনাশ হইবে তাতে নাহিক সংশয় ॥  
 শঙ্খচূর্ণ হই ভাগ, এক হরিভাল ।  
 সর্জিকার তথা, অর্দ্ধভাগ মনছাল ।  
 এই সব দ্রব্য জলে করিবে পেষণ ।  
 কেশ কামাইয়া উহা করিবে লেপন ।

সাত লেপে এইরূপ ক্ষণের ছায় ।  
 নির্মূলিত কেশ-শির দেখিবেক ভায় ॥  
 হরিভাল, পলাশের ক্ষার দুইখণ ।  
 শঙ্খচূর্ণ ছয়মাণ, ( ত্রিভরি প্রমাণ ) ।  
 কলার খোড়ের রসে, আকন্দপাতার  
 রসে মর্দি কিবা, লেপ দিলে সাতবার  
 রোম সব উঠে যায়, শ্রেষ্ঠ অতিশয়  
 রোম কেশ উৎপাদনে ইহাই নিশ্চয় ।  
 পীতবর্ণ হীরাকস, সুরণ গৈরিক,  
 বিড়ঙ্গ ও মনছাল, গোরচনা ঠিক,  
 সৈন্ধব, এসব দ্বারা করিলে লেপন ।  
 শিথ্র কুষ্ঠ রোগ আশু হবে প্রশমন ।  
 কাকটুতা, চাকুলের বীজ আর কুড় ।  
 পিপুল, গোমূত্র লেপে শিথ্র হবে দূর ॥  
 সোমরাজী বীজ, লাক্ষা, বায়সভুমুর,  
 পিপুল, অন্নবেতস, তিল, লৌহচূর,  
 রসাজন এই সব গোপিত্তে পেষিয়া ।  
 গুটাকরি লেপে শিথ্র যাইবে সরিয়া ।  
 আমলকী, যবক্ষার, ধূনাচূর্ণ করি ।  
 সৌবীরের সহ লেপে সিদ্ধরোগ হরি ॥  
 দারু হরিদ্রা, মূলাবীজ, হরিভাল, পান ।  
 দেবদারু অতি চূর্ণ হই তোলা মান ;  
 শঙ্খচূর্ণ অর্দ্ধ তোপা সলিলে পেষণ  
 করিয়া প্রলেপ দিলে সিদ্ধপ্রশমন ।  
 বেণামূল, যষ্টিমধু বেড়োলা, চন্দন,  
 নদী, নীলোৎপল হুন্ধে করিয়া পেষণ,  
 রক্তপিত্ত, শিরোরোগে লেপ দিলে তার,  
 আশু সেই রোগ হ'তে লভে প্রতিকার ।  
 হরিদ্রা, খেতসর্ষপ, চাকুলে ও কুড় ।  
 তিল, কটু তৈল লেপে উদদাক দূর ।  
 দেবদারু, নীলোৎপল, রাশা ও চন্দন,  
 বেড়োলা ও যষ্টিমধু সহুন্ধে পেষণ,

দ্রুতযুক্ত করি লেপ করিলে তাহার ।  
 বাত বীসর্প নাশ হয় কহিলাম সার ।  
 গন্ধের মৃণাল, লোধ, চন্দন, কমল,  
 অনন্ত-বেণার মূল আর নীলোৎপল,  
 আমলকী, হরীতকী করিয়া মিলন ।  
 প্রলেপে পিত্ত বীসর্প হয় প্রশমন ॥  
 ত্রিফলা ও পদ্মকাষ্ঠ, বরাক্রান্ত আর ।  
 করবী, অনন্ত, বেণা, নলমূল চার,  
 ইহাদের প্রলেপন করিলে প্রদান ।  
 শ্লেষ্মজ বীসর্প রোগ হয় অন্তর্দান ॥  
 জটামাংসী, ধুনা, লোধ, মূর্ধা, নীলোৎপল  
 বেণু ও যষ্টিমধু, শিরীষ, কমল,  
 পিষে শত-ধৌত ঘূতে করিলে লেপন ।  
 পিত্তজাত বাত রক্ত হয় প্রশমন ॥  
 আমলকী ঘূতে ভাজি, কাঁজীতে পেথিয়া  
 শিরোগেলেপে নাসাস্রাব যাইবে সারিয়া  
 কাঁজীতে পেথন করি মুচুকুন্দ ফুল,  
 এরণ্ডের তৈলে কিষা পেথিত থাকুড়,  
 তদ্বারা প্রলেপ দিলে অনিলজনিত ।  
 মস্তক বেদনা আশু হয় প্রশমিত ॥  
 তগরপাছকা কুড়, দেবদারু আর,  
 বেণামূল, শুঠ ; পিষি কাঁজীতে ইহার

লেপ দিলে তৈল আদি স্নেহযুক্ত করি  
 বাতজ মস্তক পীড়া শীঘ্র যায় সারি ।  
 আমলকী, বাত, পদ্ম, কেশর, চন্দন,  
 পদ্মকাষ্ঠ, দুর্ধা-বেণা-নলমূলগণ ;  
 এদের প্রলেপে পিত্তশিরঃ পীড়া হরে ।  
 বিশেষত রক্তপিত্ত রোগও দূর করে ॥  
 রেণুক, তগর পাছকা শৈলজ, অম্বক,  
 মুতা, এলা, জটামাংসী, রান্না, দেবদারু,  
 এরও মূলের লেপ স্তম্ভ উষ্ণ করি ।  
 দানিলে বাতজ রোগ যাইবেক সারি ॥  
 দেবদারু, গন্ধতণ্ড, শুঠ, কুড়, আর  
 চাকুন্দ ; গোমূত্রে পেথি দ্বৈষদ্রব্য তার ।  
 প্রলেপ প্রদানে আশু কহে বৃধগণ ।  
 শ্লেষ্মজাত শিরঃপীড়া হয় প্রশমন ।  
 যষ্টিমধু, নীলোৎপল, বট ও পিপুল,  
 কাঁজীতে পেথন করি কুড়ানন্তমূল,  
 স্নেহাভ্যক্ত করি তাহা করিলে লেপন ।  
 আশুকপালে, স্রৃধ্যাবর্ত্ত হয় প্রশমন ॥  
 শতমূলী, নীলোৎপল, দুর্ধা, পুনর্নবা !  
 কৃষ্ণতিল ; শতানন্ত বাতে লেপ দিবা ॥  
 কবিরাজ—শ্রীরাঙ্গবিহারি রায় ।  
 কবিকঙ্কণ ।

## প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয় ।

—::—

চিকিৎসকের বাবতীর জ্ঞাতব্যকে আমরা  
 দুইটা বিষয়ে অবরোধ করিতে পারি। প্রথম  
 রোগ-পরিচয়, দ্বিতীয় ঔষধ ষোজনা বা  
 চিকিৎসা। যে রোগপরিচয় চিকিৎসকের  
 পক্ষে এত আবশ্যক, সেই রোগ পরিচয়ের  
 ক্ষমতা মাধবের রোগবিনিশ্চয় অর্থাৎ নিদান ভিন্ন

আর কোন গ্রন্থ নাই। রোগবিনিশ্চয়  
 করিবার জন্য বাহা জ্ঞাতব্য সমস্তই মাধব-  
 নিদানে আছে,—আর কিছুই বক্তব্য নাই এই  
 জন্যই কি মাধবনিদানের পর রোগবিনিশ্চয়ের  
 জন্য আর কোন পুস্তক রচিত হয় নাই ?  
 একথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়।

মাধবনিদানের চীকাকার বিজয়রক্ষিত স্বীকার করিয়াছেন যে, উপযুক্ত অথচ মাধবনিদানে অমুক্ত এমন অনেক বিষয় আছে। আর বলিয়াছেন,—আমি গ্রন্থব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই অমুক্ত বিষয়গুলি লিখিব। বিজয়রক্ষিত স্বরচিত চীকাকার গ্রন্থব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাধবের কোন কোন অমুক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু মাধবনিদানের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করিবার জন্য প্রপুষ্টি রচনা করেন নাই। ইহা প্রতिसংস্কর্তার কার্য, চীকাকারের কর্তব্য নহে। বোধ হয় এই ভাবিয়াই বিজয়রক্ষিত প্রপুষ্টি লেখেন নাই। প্রতिसংস্কর্তার কাজ কি ?

“বিস্তারয়তি লেশোক্তং সংক্ষিপ্তাতিবিস্তরম্।  
সংস্কর্তা কুরুতে তত্ত্বং পুরাণঞ্চ পুনর্নবম্।”  
দৃঢ়বলঃ।

প্রতিসংস্কর্তা সংক্ষিপ্ত বিষয় বিস্তৃত করেন, বিস্তীর্ণ বিষয়কে সংক্ষেপ করেন—মোটের উপর বলিতে গেলে তিনি পুরাণ গ্রন্থকে প্রতिसংস্কৃত করিয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করেন। মাধবনিদানের কি এইরূপ প্রতিসংস্কর্তার প্রয়োজন নাই ? অধুনা স্থলভ আকর গ্রন্থ চরক-সুশ্রুতের নিদানস্থানে যে সকল বিষয় আছে, মাধব কি সকল বিষয়েরই যথাযথ সংগ্রহ করিয়াছেন ? বাগ্‌ডট কেবল চরকাদির মতের পিষ্টপেষণ নহে, ইহাতেও অনেক অভিনব তত্ত্ব আছে—এ সকলও কি মাধবের নিদানে সঙ্গৃহীত হইয়াছে ? বাহারা আয়ুর্বেদে কৃতপ্রম, তাঁহারা স্বয়ংই বলিবেন না যে, মাধবনিদানে এ সকল বিষয় সংগ্রহীত হয় নাই। সাধারণের বৃদ্ধিবার জন্য আমরা কএকটি উদাহরণ দিতেছি—

মাধবনিদানের নিম্নলিখিত স্থলে সংক্ষেপের বিস্তার আবশ্যক।

(১) বাতাদি অতিসারের নিদানসংপ্রাপ্তি পৃথক্ নাই। চরক হইতে লইয়া বিস্তার করিতে হইবে। (২) নাসাসুখাদিগত অর্শের (অধি-মাংস) লক্ষণ মাধবে নাই, সুশ্রুত হইতে লইয়া লিখিতে হইবে। (৩) পাণ্ডুরোগের পূর্বরূপ, সংপ্রাপ্তি, বাতাদি ভেদে নিদান, লক্ষণ মাধবে সংক্ষিপ্তভাবে আছে, চরক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বিস্তার করিতে হইবে। (৪) বেগবোধ, ক্ষয়, সাহস ও বিষমাশন এই চারিটি হেতুজন্য যক্ষ্মা রোগের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ মাধবে নাই, আকর হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইতে হইবে এবং যক্ষ্মার সংক্ষিপ্ত পূর্বরূপকে বিস্তার করিতে হইবে। (৫) যক্ষ্মা ত্রিদোষজ ব্যাধি—ত্রিদোষের প্রত্যেকে কেমন করিয়া একাদশ লক্ষণ উৎপাদন করে, তাহার ব্যাখ্যা মাধবের নিদানে নাই, ইহা পূরণ করিতে হইবে। (৬) বাতাদি ভেদে প্রত্যেক কাসের নিদান মাধবে নাই, লিখিতে হইবে। (৭) ২০টা প্রমেহের মধ্যে কোন্ দশটি কফজ, কোন্ ছয়টি পিত্তজ এবং কোন্ ৪টা বাতজ তাহার নামোল্লেখ মাধবে নাই, আকর হইতে পূর্ণ করিতে হইবে। আর উদাহরণ বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই।

মাধবনিদানের বিস্তারের সংক্ষিপ্তকরণ সম্বন্ধে প্রতিসংস্কর্তার সামান্যই কর্তব্য আছে—কারণ মাধবে বিস্তার নাই, সংক্ষেপার্থই মাধবের উদ্ভব। তবে শূকদোষের তুল্য যে সকল রোগের উল্লেখ আছে এবং বাহা অধুনা জনসমাজে প্রায় কাহারই হয়না, তাহাই বিস্তারের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তৎ পরিবর্তন করিতে হইবে।

বিজয়রক্ষিত টীকারস্তে —

উপযুক্তবিহাঙ্গুঃ নিন্দানং মাধবেন যৎ ।  
গ্রহবাখ্যা প্রদর্শনেন ময়া তদপি লিখ্যতে ।

বলিমা প্রতিষ্ঠা করিলেও মাধবেন বাবতীয় উপযুক্ত অথচ অল্প ক্রম বিষয়ের উল্লেখ তাঁহার টীকায় অমবা দেখিতে পাইনা। ক একটি উদাহরণ দিতেছি। (১) অবের সৌম্যগ্নের ভেদ এবং হারিদ্ৰক ও ঔপত্যকস্বর মূল বা টীকা কোথাও নাই। (২) অতিসারের পূর্বোৎপত্তি কথা অতিসার ও গ্রহণীর ভেদ এবং ধৌষরাখ্যা গ্রহণী মূলে নাই, টীকাতেও নাই। (৩) মত্তগুণে কি প্রকারে ওজোগুণের বিঘাত হইয়া মদাত্ম্য রোগ জন্মে তাহা মূলে বা টীকায় কোথাও নাই। (৪) আবরণভেদে কুপিত বায়ুর লক্ষণ মূলে নাই, টীকাতেও নাই। ব্রণারাম নামক বাতব্যাধি মূলে নাই, টীকাতেও নাই। (৫) শূল্যধিকারে পার্শ্বশূল, কুক্ষিশূল, গর্ভশূল, বস্তিশূল, মূত্রশূল, বিটশূল নাই, টীকারও উহাদের লক্ষণ উদ্ধৃত করেন নাই। (৬) অশ্মরীরোগে—বস্তির আকার, অবস্থিতি ও মূত্রসঞ্চয়-প্রকার সম্বন্ধে আকারে বাহা পাওয়া যায়, তাহা লেখা উচিত ছিল, কিন্তু মাধব বা বিজয় কেহই কিছু বলেন নাই। (৭) মহুরিকার শীতলাদি ভেদের উল্লেখ নাই। আর উদাহরণ দিবার প্রয়োজন কি? ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র উপযুক্ত অথচ অল্প ক্রম বিষয়ের ত উল্লেখই করিলাম না।

মাধবনিদান ও বিজয় রক্ষিতের ব্যাখ্যা-মধুকোষ লইয়া এই সকল কথা বলিবার আবশ্যকতা এই যে, আমি “প্রতিসংস্কৃত রোগ-বিনিশ্চয়” নামক একখানি পুস্তক পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। বাহার “আয়ুর্ষেদ” মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়া দেশে আয়ুর্ষেদ প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই এই গ্রন্থ সম্বলন করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থে পূর্বপ্রদর্শিত সমস্ত ক্রটির সংশোধন জন্ত কতিংগ পাঠটীকা “প্রপুষ্টি” যোজিত হইয়াছে এবং বহু বিষয় মূলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্বিধ উপক্রমণিকাধ্যায়ে প্রকৃতিভূত ও বিকৃতিপ্রাপ্ত বায়ুপিত্ত কফের কৰ্ম, পঞ্চনিদান, ব্যাধিপরীক্ষা, প্রকৃতি, সাত্ব্য, বয়স এবং অঙ্গোপাঙ্গনিরূপণ নামক একটি অধ্যায় লিখিত হওয়ায় গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয় হইয়াছে। মাধবে বাহা আছে ইহাতে তাহা ত আছেই, অধিকন্তু অল্প অনেক সুভাষিত সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আশাকরি জিজ্ঞাসু বিদ্বান্বী এবং গুণগ্রাহি-অধ্যাপকগণ এই গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপন দ্বারা চিকিৎসক সম্প্রদায়ের জ্ঞান বিবর্দ্ধনে সহায়তা করিবেন।

• কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত  
কাব্যতীর্থ কবিভূষণ ।

## কুষ্ঠ ও বাতবৃক্কের ভেদ-নির্ণয় ।

( পূর্বোক্তভিত্তি )

এইবার প্রথমতঃ কুষ্ঠের কথা বলিব।  
প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রাহুসারে কুষ্ঠের  
ভেদক লক্ষণ প্রধানতঃ দুইটি ১। স্পর্শ শক্তি  
প্রাণ—৬

হীনতা ২। স্বেদাতাব (কচিং মাত্র হইলে)  
স্পর্শজ্ঞানহীনতাই কুষ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ ভেদক  
লক্ষণ—Sir Malcom Morris K. C. V.

O. F. R. C. S. &c. ইংলণ্ডের সর্গশ্রেষ্ঠ কুষ্ঠাদি রোগ বিশেষজ্ঞ, তাহার উক্তি প্রামাণিক বলিয়া গণ্য। “Index of differential Diagnosis” গ্রন্থ হইতে তাহার উক্তির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি।

\* \* \* After a time the macules and the neighbouring areas of apparently normal skin become more or less anæsthetic. As soon as anæsthesia arises the diagnosis is settled. This is indeed the crucial test in all cases of doubt as between leprosy and any other affections, for in leprosy it is almost invariably present, if not in the lesions themselves, then in the neighbouring area of the skin.

অর্থ—কিছু কাল পরে (কুষ্ঠের) মণ্ডল-সমূহ এবং তৎসংলগ্ন স্থানের ত্বক্ (আক্রান্ত বলিয়া বোধ না হইলেও) অন্ত-বিস্তার পরিমাণে স্পর্শশক্তি শূন্য হইয়া পড়ে। যে মুহূর্ত্তে স্পর্শ-শক্তিহীনতা প্রকাশ পায় তন্মুহূর্ত্তেই রোগ-নির্ণয় স্থিরীকৃত হয়। কুষ্ঠ ও তৎসদৃশ অত্র রোগের সহিত সংশয় স্থলে ইহাই সর্গশ্রেষ্ঠ নির্ণয়ের উপায় বা ভেদক লক্ষণ, কারণ কুষ্ঠ-রোগে ক্ষতে অথবা একান্তই ক্ষতে অমৃত না হইলেও তৎসংলগ্ন স্থানে (ত্বকে), স্পর্শ-শক্তিহীনতা প্রায় অব্যতিচারিতরূপেই বর্তমান থাকে।

Sir Patrick Manson কৃত Tropical diseases নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কুষ্ঠ-রোগের নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে “The touchstone in all doubtful cases is

the presence or absence of anæsthesia. Anæsthesia is early absent in leprosy. In no other skin diseases is definite anæsthesia a symptom”

অর্থ—সমস্ত সন্দিগ্ধ স্থলেই স্পর্শ-শক্তির অস্তিত্ব বা অভাবই রোগ-নির্ণয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়। কুষ্ঠ রোগে স্পর্শশক্তি কদাচিৎ অক্ষুণ্ণ থাকে। কুষ্ঠ ভিন্ন আর কোন চর্ম-রোগেই সুস্পষ্ট স্পর্শজ্ঞানভাব লক্ষিত হয় না।\* আর অধিক উদ্ধৃত করা নিম্নয়োজন, কায় চিকিৎসার সর্গশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চরকসংহিতায় ঠিক এই কথাটা এমন সুস্পষ্ট ও অসন্দিগ্ধরূপে কথিত হইয়াছে যে, পড়িলে চমৎকৃত ও উৎফুল্ল হইতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগ নির্ণয়ের প্রমাণ খুঁজিতে হয়। চরকসংহিতায় চিকিৎসিত স্থানের কুষ্ঠ চিকিৎসিতাধ্যায়ের সর্ব প্রথম প্লোকেই উক্ত হইয়াছে

হেতুং দ্রব্যং লিপং কুষ্ঠানাম্ আশ্রয়প্রশমনঞ্চ  
শৃণুয়িবেশ সমাগ্ বিশেষতঃ স্পর্শজ্ঞানানাম্

হে অয়িবেশ! বিশেষতঃ স্পর্শ জ্ঞান নাশক

\* কুষ্ঠ রোগের কারণ, উপাদান, লক্ষণ, আশ্রয় ও প্রতীকার সম্যকরূপে প্রবণ কর।

এমন অবিস্বাদিতরূপে এমন লক্ষণ আর কোন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। সাধে কি “চরকস্ত চিকিৎসিতে” বলিয়া চরকের এত প্রশংসা!

\* Tabetic ulcer (একজাতীয় বাতব্যাদির ক্ষত) রোগেও স্পর্শশক্তির অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে গাঢ় লক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা রোগ নির্ণয় হইয়া পড়ে, অতএব কুষ্ঠ সংশয় থাকিতে পারে না।



কোন কোন কুষ্ঠে বেদনা লক্ষণ আছে, যেনন কপাল ও ঔষধ কুষ্ঠ “কপাং তোদ বহলম্”। “কৃগদাহরাগকণ্ডুভিঃ পরীতম্” ইত্যাদি সে স্থলে বেদনা প্রথমাবস্থার লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ” বিশেষতঃ স্পর্শ নয়ানাম্—এই বাক্য-বিরোধ পরিহার হয়না। Sir Malcom Morris ও তাহাই বলিয়াছেন। “They, i. e. the nodules in leprosy, are at first sometimes hyperæsthetic, but later very frequently become temporarily or permanently anæsthetic.” অর্থাৎ কুষ্ঠরোগের মণ্ডলসমূহ সময়ে সময়ে প্রথমতঃ স্পর্শোদ্বিগ্ন অর্থাৎ বেদনায়ুক্ত থাকে কিন্তু কিছু কাল পরে প্রায়ই স্থায়ী বা অস্থায়ী রূপে স্পর্শ শক্তি শূন্য হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় ভেদক লক্ষণ স্বেদাভাব—\*

Sir Malcom Morrisএর উক্তিটুকু এই—“Another distinctive feature of leprosy is, that they rarely perspire.”

Sir Patrick Manson প্রভৃতিরও এই মত।

অর্থাৎ—কুষ্ঠাক্রান্ত স্থানের আর একটা বিশিষ্ট লক্ষণ সেই স্থানে কচিং ঘর্ম্ম হয়। এই দ্বিতীয় লক্ষণটা প্রথমোক্ত লক্ষণের মত সুস্পষ্টরূপে কোথায়ও উল্লিখিত

\* দার্শনিকের ভাষায় বলিতে হইলে “ব (=কুষ্ঠ)-সংগ্রহযোগ্যত্বে সতি স্পর্শহানিবৎ কুষ্ঠবৎ” কুষ্ঠের ইতর ব্যবর্তক লক্ষণ এইরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে।  
‘ব-হেতুত্বব্যা-বটিকালিঙ্গব্যাপ্যতাবচ্ছিন্ন স্পর্শনিবৎ কুষ্ঠবৎ,  
‘কুষ্ঠের লক্ষণ এইভাবেও নির্দেশ করা যায়।

হয় নাই, বরং ইহার বিপরীত লক্ষণই স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় তথাপি আয়ুর্বেদের গ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিয়া এই লক্ষণটাও আয়ুর্বেদা-চাৰ্য্যগণের অনুমোদিত বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। কিরূপ বিচার-প্রণালীতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

প্রথমতঃ—কুষ্ঠ রোগের পূর্বরূপ সমূহের মধ্যে “স্বেদবাহুলা মস্বেদনং বা” (স্ব-নি-কু-নি) “অতিস্বেদো ন বা” (চ-চি-কু-চি) এই দুইটা লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কুষ্ঠের পূর্বরূপের মধ্যে অতি-স্বেদ পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রমতেও স্বীকৃত। এখন তর্ক “অস্বেদন” লইয়া। পূর্বরূপ দ্বিবিধ, সামান্য ও বিশিষ্ট, তন্মধ্যে বিশিষ্ট পূর্বরূপই রূপাবস্থায় বর্তমান থাকে এবং তাহাই ব্যক্তাবস্থার নামরূপ। অতিস্বেদও সামান্য পূর্বরূপ এবং স্বেদাভাব বিশিষ্ট পূর্ব এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে গোড়ায় কোন দোষই হয় না, অথচ প্রত্যক্ষমূলক অল্প শাস্ত্রসম্বাদীও হইতে পারে। পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটা লক্ষণকে সামান্য পূর্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি নাই, অথচ সেরূপ ব্যাখ্যায় স্থানভেদ ও কালভেদ অর্থাৎ কোন স্থানে অতিস্বেদ, কোনস্থানে স্বেদাভাব এবং কখনও অতিস্বেদ, কখনও স্বেদাভাব স্বীকার করিতে হয়, এরূপ ব্যাখ্যায় কল্পনামগোরব দোষ ঘটে। প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলে এ ব্যাখ্যা অসঙ্গত। অতিস্বেদন ও অস্বেদন—এই লক্ষণ দুয়ের পৌরোপরি নির্দেশও অনুধাবন যোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ—পূর্বেই বলিয়াছি চরক সংহিতার কুষ্ঠ-চিকিৎসাব্যাহারে কুষ্ঠ লক্ষণে কুণ্ডোপি স্বেদের কথা নাই, নিদান স্থানে

সঞ্জাতক্রিমি কুষ্ঠের পিত্তকৃত উপদ্রবের মধ্যে  
শ্বেদের কথা আছে, সূত্রাং ঐ বিশিষ্ট ক্ষেত্র  
অতীত চরকের মতে কুষ্ঠলক্ষণে শ্বেদাভাব  
অর্থাপত্তিস্বয়ুক্তি বলে অন্তর্ভুক্ত করিয়া  
লওয়া বাইতে পারে। সূত্রতে নিদান স্থানে  
মহাকুষ্ঠ সপ্তকের সামান্য লক্ষণের মধ্যেও  
শ্বেদের কথা লিখিত নাই। সূত্রাং চরক  
সূত্রত উভয় মতেই মহাকুষ্ঠের সামান্য লক্ষণ  
মধ্যে শ্বেদ লক্ষণ নাই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

তৃতীয়তঃ—সূত্রতসংহিতার কুষ্ঠনিদানা-  
ধ্যায়ের “কুষ্ঠেষু রক্তস্ফোটচাপশ্বেদভেদ-  
কোণ্যস্বরোপঘাতা বাতেন” (অর্থাৎ বেদনা,  
ত্বক্ স্ফোট, স্পর্শজ্ঞানাভাব, ঘর্ম, বিদারণ,  
করভঙ্গ এবং স্বরভেদ এই গুলি কুষ্ঠের  
বাতকৃত লক্ষণ) এই বচনে শ্বেদ লক্ষণ  
বিশেষ বিচার্য। এস্থলের ডল্লনকৃত টীকা  
পড়িলে মনে হয়, বিশেষ পাঠপ্রমাদ ঘটিয়াছে।  
টীকা উদ্ধৃত করিতেছি। স্বধীগণদেখিবেন,—  
ডল্লনের কথা গুলি অতি গুরুতর।

“কুষ্ঠেষু রুগিত। বাতকার্যেষু শ্বেদ-  
শ্চিস্তা স্বাপভেদাবিত্যপি পঠন্তি। তত্র  
অশ্বেদপ্রতিষেধার্থঃ। ব্যাধিস্বভাবাৎ শ্বেদঃ  
স্বাদিত্যপরে”। অর্থাৎ—কুষ্ঠে বেদনা  
ইত্যাদি বাতজনিত লক্ষণ সমূহের মধ্যে  
ঘর্ম চিন্তা সৃষ্টি বিদারণ এইরূপ পাঠ আছে।  
সেক্ষেত্রে শ্বেদাভাবলক্ষণের নিষেধ ঘটিবে না।  
রোগ স্বভাব বশতঃ শ্বেদ হইতে পারে—কেহ  
কেহ একথা বলেন। অধুনা প্রচলিত সূত্রত  
সংহিতায় চিন্তা ব্যতীত পূর্কোক্ত তিনটা লক্ষ-  
ণেরই পাঠ দেখা যায়। ডল্লনের উপজীব্য  
গ্রন্থে কিরূপ পাঠ ছিল? আর যে পাঠই  
থাকুক, শ্বেদ শব্দের পাঠ ছিল না,—কেমনা  
ডল্লন শ্বেদ লক্ষণের পাঠ লইয়াই বিশেষ

বিচার করিয়াছেন। এস্থলে সর্বাপেক্ষা  
প্রণিধানযোগ্য “তত্রন অশ্বেদ প্রতিষেধার্থঃ”  
এই কথা। অশ্বেদ লক্ষণ যদি অন্ততঃস্বীকৃত  
বা পূর্ববর্তী টীকাকারগণ সম্মত মাত্র হইত,  
তাহা হইলে নবক্সংগ্রহকার ডল্লনের পক্ষে  
তাহা উল্লেখ না করার কোন কারণ দেখা  
বাইত না। অপ্রামাণিক এবং পূর্বাচার্য অনুরূপ  
লক্ষণ দ্বারা মূল গ্রন্থের পাঠান্তরের অর্থ স্ফোট  
সঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না। সূত্রাং  
ডল্লন ব্যাখ্যাত গ্রন্থে অশ্বেদ লক্ষণের পাঠ  
নিশ্চয়ই ছিল—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত  
নহে। ডল্লনের রচনা-ভঙ্গীতে স্পষ্টই প্রতীত  
হয়, অশ্বেদ কুষ্ঠের অতি গুরুতর লক্ষণ।  
শ্বেদের কথা স্বীকার করিলেও তদ্বারা অশ্বেদ  
লক্ষণের নিষেধ ঘটিবে না। যদি অশ্বেদ  
কুষ্ঠের নিয়ত লক্ষণ না হইত, বা বৈকল্পিক বা  
ব্যতিচারী লক্ষণ হইত, তাহা হইলে এই আশঙ্কা  
পরিহার্য নিরর্থক হইয়া পরে। সূত্রতে  
ত্বগাশ্রিত ও রক্তাশ্রিত কুষ্ঠ লক্ষণে শ্বেদের  
কথা আছে। ডল্লন শ্বেদ লক্ষণের কথা কিছুই  
বলেন নাই। বাগ্ভট কেবল রক্তাশ্রিত ও  
মাধবকর কেবল ত্বগাশ্রিত কুষ্ঠে শ্বেদ পাঠ  
করিয়াছেন, কিন্তু বিজয় রক্ষিত শ্বেদ ও অশ্বেদ  
উভয় লক্ষণ প্রতাপাদক স্বতন্ত্র বচন উদ্ধৃত  
করিয়াছেন। প্রতীচ্য মতেও কচিং শ্বেদ দৃষ্ট  
হয় স্বীকৃত হইয়াছে। অধিক আলোচনা  
অনাবশ্যক। ত্বক্ স্ফোট অঙ্গুলী পতন করভঙ্গ,  
কর্ণভঙ্গ, নাসাভঙ্গ, অক্ষিরাগ, স্বরভেদ এই লক্ষণ  
গুলি আয়ুর্বেদ ও প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্র উভয়  
মতেই কুষ্ঠের বিশেষ লক্ষণ। আমাদের প্রতি-  
পাদ্য ভেদনির্ণয়, সূত্রাং রোগের সম্পূর্ণ  
আলোচনার অবকাশ ও অধিকার নাই, তথাপি

আর একটা কথা বলিয়াই কুষ্ঠরোগ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

আয়ুর্বেদ মতে কুষ্ঠ সপ্তধাতুগত, রাজ যক্ষ্মাও সপ্তধাতুক্ষয়কর। উভয়ের এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া Sir Patrick Manson বলিয়াছেন,—রোগ লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকিলেও কুষ্ঠ ও যক্ষ্মার মত সর্বদেহগত ব্যাধি এবং এইজন্ত কুষ্ঠ রোগে সর্বদেহ গত অবসাদ দৌর্বল্য ক্ষয় \* প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

কুষ্ঠ নির্ণয়ের পর বাতরক্তনির্ণয় আমাদের প্রতিপত্ত। বাতরক্তের নির্ণয় সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রমের একটা উদাহরণ দিব। প্রচলিত মুদ্রিত যে কয় খানি মাধব নিদানে আয়ুর্বেদীয় নামের অনুরূপ ডাক্তারী নাম নিবেশিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিতেই কুষ্ঠ ও বাত রক্তের ডাক্তারী নাম Leprosy লিখিত হইয়াছে। এমন কি, স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহোদয়ও তাঁহার মাধব নিদানের অনুবাদে এই ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। আমার ধারণা হইয়াছে, হস্তমূল গত বাতরক্ত ও পাদমূল গত বাতরক্তের সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা

\* কুষ্ঠ রোগও মারাত্মক অথবা রোগক্ষান্ত হইতে পারে। "It may even prove fatal as a sort of galloping leprosy within a year. \* \* one must be careful to exclude the possibility of contamination with Bacillus Tuberculosis with which the lepers are often infected". \* \* অর্থাৎ এই জাতীয় কুষ্ঠ আন্তকারী কুষ্ঠরূপে একবৎসরের মধ্যেই জীবনান্ত করিতে পারে। \* \* কুষ্ঠরোগী অনেক সময় যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত হয়, অতএব কুষ্ঠবীজাণু পরীক্ষাকালে যক্ষ্মাবীজাণু মিশ্রিত না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যিক। Tropical diseases.

শাস্ত্রানুসারে (ষথাক্রমে) Erythema Nodosum ও Erythema Induratum Scrofulosorum এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রতীচ্য চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে এই দ্বিবিধ রোগের বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করিতে গেলে প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এবং আমাদের তাহা উদ্দেশ্যও নহে।

সর্বদোষ সম্বন্ধ থাকিলেও প্রধানতঃ বাত-রক্তে বায়ু হুষ্টিই প্রাধান্য। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—"তৎপ্রাবল্যাচ্চ্যতে বাতরক্তম্" তৎ প্রাবল্যাৎ তস্য বাতস্য দোষেহেন প্রাধান্যাৎ (বাতরক্তাধিকার) অর্থাৎ বায়ুর প্রাধান্য বশতই বাতরক্ত নাম হইয়াছে। যন্ত্রণা এবং স্পর্শশক্তিহীনতা—উভয়ই বায়ুবিকার। এক্ষণে বিচার্য এই বাত রক্তে কিরূপ বিকার উৎপন্ন হয়? তদন্তরে আমরা বলিব বেদনা এবং এই বেদনাই বাতরক্তের প্রথম ও প্রধান ভেদক লক্ষণ \*

স্থিতং পিত্তাদি সংসৃষ্টং তান্তাঃ সৃজতি বেদনাঃ।  
কণ্ডুহ রুগায়ামতোদ ফুরণ কুঞ্চণৈঃ।

অধিতা শ্রাবরক্তাঙ্ক..... ॥

গভীরে শ্বয়শ্চ স্তবকঃ কঠিনোহথ ভৃশার্তিমান্।  
কৃথিদাহাষিতোযু তীক্ষ্ণং বায়ুঃ সন্ধ্যাহিমজ্জহু।  
হিন্দ্রিবে চয়ত্যন্তঃ বক্রীকুর্কংচ বেগবান্ ॥

\* দার্শনিকের ভাবায় বলিতে হইলে "ব (বাতরক্ত) সংশয়গ্যাণ্যাবচ্ছিন্ন-বিশিষ্টবেদনাবৎ বাতরক্তম্" বাতরক্তের ইতর ব্যবর্তক লক্ষণ এইরূপ সিদ্ধি করা যায়। "কুপিত বাতশোণিতজন্তবিশিষ্ট সংশ্রাণ্যাবচ্ছিন্ন সন্ধ্যাহির্বোপশ্বয়স্পর্শকরগ্যাণ্যাবচ্ছিন্নবেদনাবচ্ছিন্ন শিথলং বাতরক্তম্" বাতরক্তের লক্ষণ এইরূপ ও বলা যায়।

রক্তমার্গঃ নিহন্ত্যাত্ত শাখা সন্ধিসু মারুতঃ  
নিবেশ্যাত্তোত্তমা বাধ্য বেদনাভিহেরদহন।

( চরক বা শোঃ চিঃ অঃ )

অর্থাৎ (বাতরক্ত) পিত্তাদির সহিত সংযুক্ত সেই সমস্ত ( পিত্তাদিক্রান্ত ) বেদনা উৎপাদন করে। উত্তাপ বাতরক্তে ত্বক্ চুলকানি, দাহন বেদনা, প্রসারণ, হৃচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, স্পন্দন ও কুঞ্জন যুক্ত এবং গুরুকৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবর্ণ হয়। গস্ত্রীর বাতরক্তে শোথ শুষ্ক, কঠিন ও অত্যন্ত বেদনা যুক্ত হয়। বেদনা ও বিদাহ যুক্ত বায়ু সন্ধি, অস্থি ও মজ্জাতে প্রকাশিত হইয়া ছেদনবৎ পীড়া উৎপন্ন করে এবং ( হস্ত পদাদি ) বক্র করিয়া ফেলে। হস্ত পদাদির সন্ধি স্থানে বায়ু প্রবেশ করিয়া রক্তের পথ রুদ্ধ করে এবং পরস্পরকে দূষিত করিয়া বেদনায় প্রাণান্ত করে।

বাতরক্তের সংপ্রাপ্তি এবং সামান্য লক্ষণ সমূহের মধ্যে চরক কুত্ৰাপি স্থপ্তি বা স্পর্শ শক্তি হীনতার কথা বলেন নাই। স্থপ্তত্বের নিদান স্থানে—“স্পর্শোষ্মিহৌ তৌদভেদ প্রশো-  
ষষাপো পৈতৌ বাতরক্তেন পাদৌ”—এই বচনে

বাতরক্ত লক্ষণের মধ্যে স্পর্শোষ্মিহ অর্থাৎ স্পর্শসহজ এবং স্থপ্তি এই দুইটি লক্ষণই উক্ত হইয়াছে। চরকে বাতরক্ত লক্ষণে স্থপ্তির প্রসঙ্গও পাই বরং—

“বিশেষতঃ শিরায়াম তৌদ ক্ষুরণ ভেদনম্ ..অঙ্গগ্রহোহতিকৃ” এই বচনে বিশেষরূপে তৌদ অর্থাৎ ‘হৃচী বেধবৎ যন্ত্রণা ও অতিকৃ ( বাতশোণিত চিকিৎসিতাধার ) লক্ষণই পাওয়া যায়। অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্ভট গোলযোগ দেখিয়া উভয়েরই মর্যাদা রাখিয়াছেন। তিনি বাতাধিক্যের লক্ষণ বলিতে যাইয়া “...অধিকং তত্রশূলং...অতিকৃ” এই দুই লক্ষণের সঙ্গে ২ “স্তম্ভ বেপথু স্থপ্তয়ঃ...” বলিয়া স্থপ্তির কথাও বলিয়াছেন। চরক সংহিতার কেবল স্নেহ লক্ষণের মধ্যে স্থপ্তির কথা আছে। মাধবকর বাগ্ভটেরই অনুবর্তী হইয়াছেন।

( ক্রমঃ )

কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত  
কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন।

## প্রাপ্তগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—::—

স্বাস্থ্য ও শক্তি।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম, এ, বি, এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়, বীণাপাণি বুকস্টোর, ২১ নং বেচু চাটার্জির স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। শারীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয়ের জ্ঞান কিরূপ ভাবে দিন চর্যা করা কর্তব্য—এ পুস্তকে

তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যায়ামের দ্বারা মানুষ কতটা উন্নত হইতে পারে—এই-  
কার তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া অনেকগুলি ব্যায়ামশীলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ব্যায়ামের প্রথমে গ্রন্থকার সে কালের ‘প্রাণায়ামের’

কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন। ‘প্রাণায়ামের’ ‘পূবক’ ‘কুস্তক’ ও ‘রেচক’ প্রক্রিয়ায় ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে ক্রিয়াকর্ম সিন্ধু হই, তাহা গত মাসে “অনু-করণে আমাদের অবস্থা” প্রবন্ধের লেখক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাবেক ‘কপাটা’ ‘হাড়গুড়ু’ খেলাই যে আমাদের দেশের বালক-গণের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম,—গ্রন্থ মধ্যে এ পবিচয় পাইয়াও আমরা সুখী হইলাম। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ এবং বাধাই অতি উৎকৃষ্ট,—বিষয় গুলি তদপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এরূপ গ্রন্থ গৃহ-পঞ্জিকায় জায় প্রত্যেক গৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ এ গ্রন্থ খামিকে ছাত্রদিগের অধ্যয়নের জন্য মনোনীত করিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

চণ্ডী-চরিতামৃত।—শ্রী রাসবিহারী রায় বিবকল্পন কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিসস্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত। মূল্য ১/০ আনা। মার্কেণ্ডের চণ্ডীর পদ্ম অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এ ধরণের গ্রন্থের অনুবাদ করা অতি-শয় কঠিন। কিন্তু গ্রন্থকারের কবিত্ব নৈপুণ্যে তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পদ্ম গুলি বেশ সরল, সংস্কৃতভাষানভিজ ব্যক্তিগণ সহজে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিবেন। নানারূপ ছন্দো-বিভাগে গ্রন্থখানি বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমাদের দেশের রমণী রমণী এই পদ্ম অনুবাদ আবৃত্তি করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠের পুণ্যাভ্যাস করিতে পারবেন।

পরিচারিকা।—মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা রাণী নিরুপমা দেবী। শ্রীমানকী বল্লভ

বিশ্বাস কাথ্যাদ্যক, কাথ্যালয়—কোচবিহাৰ।  
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাণ্ডুল সহ ২৫০  
আনা। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। প্রথমেই সম্পাদিকার  
ঠ (কবিতা)। ভাষার স্বাক্ষরে এবং ভাবের  
মাধুর্য্যে বড়ই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে, লেখিকার  
কবিত্ব যেন কবিতার প্রত্যেক কথায় ফুটিয়া  
উঠিয়াছে। “জীবরাজ্যে মানুষের যথার্থ স্থান”  
মানুষের সহিত অপরাধের ইতর জীবের যে  
একটি রক্তের সম্পর্ক আছে—কয়েকটি যুক্তি  
দ্বারা তাহা বেশ ব্যাখ্যা হইয়াছে। “শ্রামা”  
কবিতাটি খুব স্বাক্ষর পূর্ণ, তবে ‘চুলাও আঁধি  
তব নিবিড় চূমে’ চূমের এই নিবিড়ত্ব পাঠকের  
ভাল লাগিলেই ভাল। ‘মঙ্গল ঘট’ ক্রমশঃ গল্প।  
নিঃস্বের অধিকার’ একটি চলন সহী কবিতা।  
‘বাঙ্গলার ছন্দ ও তাল’ প্রবন্ধটি গবেষণা পূর্ণ।  
‘কল্পনা’ কবিতাটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।  
‘অম্পৃথ’ গল্পটি মনোরম। ‘গৃহের প্রতি’  
কবিতাটি মন্দ হয় নাই। ‘পাঠান দিল্লীর প্রতি-  
বাদে’ অনেক গুলি নূতন কথা অবগত হওয়া  
যায়। ‘বিশ্বত দেশে’ একটি উৎকৃষ্ট কবিতা।  
‘ঐশ্বর্য্য’, একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপভাস। ‘প্রণয়  
আমার’ আদর্শেরই অনুরূপ হইয়াছে। ‘দিল্লীর  
ভীমপাদ তীর্থের আবিষ্কর্তা’ প্রবন্ধে শিখিবীর  
বিষয় আছে। ‘পরিচারিকা’র সম্পাদন কাণ্ড খুব  
ভালরূপেই হইতেছে, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।  
মূল্যও যথেষ্ট সুলভ। প্রত্যেক সাহিত্যাহু-  
রাণী ব্যক্তিরই ‘পরিচারিকা’ পাঠ করা উচিত।

নারায়ণ।—মাসিক পত্র। তৃতীয় বর্ষ  
২য়খণ্ড—১ম সংখ্যা,—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪। সম্পা-  
দক শ্রীচিন্তরঞ্জন দাশ। কাথ্যালয় ১৬৬ নং  
বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য  
৩০ টাকা। এবারের প্রথমেই কবিতা “পর  
আহারী বাবা”। ঠাকুর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

মহাপ্রভুর রূপা ভাজন শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্ম-চারী প্রণীত শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্ম মঙ্গল পুস্তকে কথিত একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কবি-তাটি বেশ হইয়াছে। ২য় প্রবন্ধ “বাল্যলার কথা।” অপূর্ব—উপাদেয়—অত্যন্ত কষ্ট প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে ভাবিবার—জানিবার—বুঝিবার এবং শিখিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। এ প্রবন্ধের তুলনা নাই, সকলেরই যত্ন পূর্বক এটি পাঠ করা উচিত। ইহার পর “তিহুর মা”—একটি গল্প। এ গল্পে প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ-মিলন নাই, চাঁদের কিরণ—মলয় মারুত—হা-হতাশ—লইয়াও এ গল্প রচিত হয় নাই, সেজন্ত ইহা নব্য-পাঠকের ভাল লাগিবে কিনা জানিনা, কিন্তু এ গল্পে দরিদ্রা—নীচ জাতীয়া—চণ্ডাল বিধবার স্বার্থ-বলির দৃষ্টান্তে পল্লীচিত্রের একটি বিশেষ অঙ্ক অতি অল্পের ভিতর বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে—গল্প লিখিতে হইলে এইকপই ত লেখা উচিত। অনেক পল্লীগ্রামেই এই গল্পের অশ্রুতর নায়ক ‘রায় মহাশয়ের’ চিত্র খুঁজিলে বাহির হইতে পারে। “সাহিত্যে স্বাভাব্য” প্রবন্ধে সেরূপ বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। “বিরহে পাগল” প্রবন্ধে “বিক্রমার্জুনী”র বেশ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

কাজের লোক।—মাসিক পত্র। ১১শ বর্ষ, ১ম হইতে ৫ম সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীসারদা-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—, কার্যালয় ৭নং অকুর দস্তের লেন। বার্ষিক মূল্য ২৫। কৃষি শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য—অনেক বিষয়েরই আলোচনা ইহাতে হইয়া থাকে দেখা গেল। ইহার অধিকাংশ লেখাই কাজের কথার পূর্ণ। সহযোগী গার্হস্থ্য

শিল্প লইয়া যে সকল আলোচনা করেন, তাহা হইতে অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়। হোমিওপ্যাথিক তথ্য এবং মুষ্টিযোগ সংগ্রহ পড়িলে অনেক সময় উপকার হইতে পারে। “কৃষি তথ্য”ও অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। গল্প ও কবিতাগুলি মুখ-রোচক হইলেও কিন্তু সহযোগীর উদ্দেশ্যেব সহায়তা করিতেছে বলিয়া মনে হইলনা, প্রবন্ধ নির্বাচন কালে এ ধরণের লেখা একটু বাছিয়া-গুছিয়া মানানীত করিলে ভাল হয়।

স্বাস্থ্য সমাচার।—মাসিক পত্র। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ। সম্পাদক ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম, বি। কার্যালয় ৪নং আমহাট্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ১ টাকা। ‘আলোচনা’ প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। ‘মানব দেহে শিল্প সৌন্দর্য্য’ মন্তব্য প্রবন্ধ। ‘রঙের কথা’র লেখক অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন, “কোন লোককে লাল ঘরে পুরিয়া ২১ দিন রাখিলে সে পাগল হইয়া যাইবে”—এ বিষয় কিন্তু পরীক্ষা না করিলে গ্রহণ করা যায় না। ঘরের মধ্যেই যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে লাল বর্ণের পোষাকেও ত কতকটা ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু কাহাকেও সেরূপ হইতে ত শুনিতে পাই নাই, তবে লালবর্ণের চেলি পরিধানের ফলে বিবাহের পর অনেক বর-কণ্ঠে প্রেমে পাগল হইয়াছে—দেখা গিয়াছে! “চন্দন” প্রবন্ধ পাঠে পাঠকের উপকার হইবে। “অহিন্দেন ব্যবহার” উদ্ধৃত প্রবন্ধ, ইহার সমস্ত কথার আমরা একমত হইতে পারিলাম না। “ধাতুপাত্র” বিশেষ গবেষণা পূর্ণ।

# আয়ুর্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক ।

১ম বর্ষ । } বঙ্গাব্দ ১৩২৪—ভাদ্র । } ১১শ সংখ্যা ।

## কাজের কথা ।

স্বাস্থ্য ও সদাচার ।—স্বাস্থ্য  
রক্ষার জন্য সদাচারের অমুষ্ঠান একান্ত কর্তব্য ।  
ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ আমাদেরকে সমস্ত পরায়ণ  
হইবার জন্য তাঁহাদিগের রচিত নানাবিধ  
শাস্ত্রে যে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,  
স্বাস্থ্য রক্ষাই তাহার মূল কারণ । পাপ এবং  
পুণ্য কেহ মানুন বা না মানুন, পাপ এবং  
পুণ্যের ফলে স্বর্গ ও নরক-ভোগের চিত্র  
কল্পনা-প্রস্তুত বা অতিরঞ্জিত বলিয়া বাহ্যিক  
মনে করিতে হয় করুন, তাহাতে কাহারও  
আসিয়া-বাইতেছে না ; কিন্তু সদাচার-দ্রষ্ট হও-  
য়ার ফলে নানারূপ ব্যাধি-বিজড়িত-দেহে  
অনেকে পার্থিব-জীবন বহনই বিড়ম্বনাময় এবং  
শেষে অকাল-মৃত্যুর পথ পরিস্কৃত করিয়া  
ভুলিতেছেন, ইহাও চক্ষের সম্মুখে প্রতি-  
ন্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায় । শাস্ত্রকার  
ইহাকেই পাপ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন ।  
ইহারই ফল রোগ । ধর্ম-প্রাণ-হিন্দু যে দিন  
হইতে এই ভুল ভুলিয়াছে, সেই দিন হইতেই

তাহার সংসার নানারূপ ব্যাধির আকর ভূমি  
হইয়া পড়িয়াছে ।

\* \* \*

অভক্ষ্য ভক্ষণ ।—অভক্ষ্য-ভোজন  
বলিলে শুধু যে হিন্দু জাতির নিষিদ্ধ মাংস প্রভৃতি  
আহারই বুঝাইয়া থাকে,—এমন নহে ।  
হিন্দুর অণুটি সমন্বিত আহাৰ্য্য মাত্রই হিন্দুর  
নিকট অভক্ষ্য পদবাচ্য । হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল  
মাংস-ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে, ছাগমাংস  
তাহার মধ্যে অন্তর্গত, কিন্তু এই ছাগ মাংস  
স্বাইবার পূর্বে দেবতার উদ্দেশে বলি-প্রদানের  
ব্যবস্থা না করিয়া, উহা ভক্ষণ করা যে অপকর্ম  
—ইহাও শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন ।  
এখনকার কালে কিন্তু সকল স্থলে সে শাস্ত্র-  
বাক্য প্রতিপালিত হয় না । সহরে কসাই-  
দিগের দোকান গুলিই ইহার প্রকৃত প্রমাণ ।  
ছাগীর মাংস ভক্ষণে আমাদের স্বাস্থ্যহানি  
হইয়া থাকে, এমত উহা ভক্ষণ করা আমাদের  
শাস্ত্র নিষিদ্ধ । বৃদ্ধ, জরা এবং রোগ প্রকৃতি

ছাগ মাংসও আমাদের ভক্ষণের বিধিবহিত। দোকানে কিন্তু ছাগী ও ছাগ—জবা ও রুগ—সকল প্রকার মাংসই বিক্রয় করা হইয়া থাকে। ‘বাবু’রা তাহাই সাগ্রহে ক্রয় পূরক ভক্ষণ করিয়া থাকেন! এই সকল মাংস-ভক্ষণে কিন্তু অনেক সময় অপকারই হইয়া থাকে। অজীর্ণ এবং যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা দেশে যে সকল কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাও তাহার একটি কারণ। সকলেরই এ সকল কথা চিন্তা করা উচিত।

\* \* \*

#### দোকানের রাঁধা মাংস।—

দোকানের রাঁধা মাংস, চপ-কাটলেটের প্রচলনও এখন সকল গৃহেই যথেষ্ট বাড়িয়াছে। কসাইয়ের দোকান হইতে ঐ সকল মাংস যে আমদানি করা হয়, তাহা বোধ হয়—না বলিলেও চলিবে। একে মাংসের অবস্থা ঐরূপ, তাহার উপর অপকৃষ্ট ঘৃত-মসলা-সংযোগে ঐ সকল মাংস রন্ধন করা হয়। ধর্ম্য হানির কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু স্বাস্থ্য হানি ত ইহার ফলে অবশ্যস্বাবী। তাহার পর চেয়ারে বসিয়া, টেবিলে রাখিয়া, যে সকল ‘ডিসে’ ঐ সকল খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহার ফলেও উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণের জন্ত স্বাস্থ্য হানির কারণ যথেষ্ট ঘটয়া থাকে। পিতল এবং কাঁসার পাত্র মাজিয়া-বসিয়া লইলে শুদ্ধ হইয়া থাকে কিন্তু কাঁচ এবং এনায়েলের পাত্র যেরূপ ভাবে মাজিয়া-বসিয়া লওয়া হটকনা কেন, উহা শুদ্ধ হইতেই পারেনা। দৃষ্টান্ত স্বলে আমরা মাটির প্লাসের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তা’ ছাড়া, চায়ের দোকানের মত এখানেও ‘ডিস’ এবং জল পাত্র বা প্লাসগুলি কখন মুক্তিকা-সংযোগে পরিষ্কার করা হয়না, শুধু

জলে ধোত করিয়া লওয়া হয় মাত্র। এজন্য দোকানের এই মাংস এবং চপ-কাটলেট ভক্ষণে একের উচ্ছিষ্ট অপরের ভক্ষণ করার ফলে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটতেছে, ইহা নিতান্ত সত্য কথা। দেশে সংক্রামক রোগ-বাহুল্যের ইহাও কারণ।

\* \* \*

#### মুখপ্রক্ষালনে বিরক্তি

ভাব।—ভোজনান্তে যে মুখ-প্রক্ষালনের রীতি প্রচলিত আছে; এখনকার দিনে অনেকে তাহাও মানিয়া চলেননা। রাঁধা মাংস বা চপ-কাটলেটের দোকানে যাহারা রসনার তৃপ্তি লাভ করিয়া পবিত্র (!) হইয়া থাকেন, তাঁহারা ত এ রীতি মানিতেই পারেননা,—দোকানে ত আর তাঁহা-দিগের জন্ত সেরূপ ভাবে জল-সরবরাহের আবশ্যকতা দোকানদার মনে করিতে পারেনা,—‘বাবু ভায়াদের’ও তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, কাজেই তাঁহাদিগের পক্ষে উচ্ছিষ্ট প্লাসের জলে হস্ত ডুবাইয়া এবং ঐ হস্ত একবার মুখ-মণ্ডলে ঘুলাইয়া—ক্রমাগৎ দ্বারা মুছিয়া ফেলিলেই মুখ-প্রক্ষালনের কার্য সিদ্ধ হইয়া গেল,—ইহাই হইল—দোকানে বসিয়া আহারাতে মুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা! ইহা ভিন্ন ভোজন-নিময়ণেও অনেককে ঐরূপ ভাবে মুখ-প্রক্ষালনের বিরত দেখিতে পাই। ফলে ভোজনকালীন চর্কিত দ্রব্য গুলি উত্তমরূপে মুখ-প্রক্ষালনের অভাবে দন্ত-সংশ্লিষ্ট হওয়ার অনেককেই অসময়ে দাঁত বাঁধাইবার দায়ে পড়িতে হয়। আজকাল যে এত যে dentist বা দন্ত চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, মুখ প্রক্ষালনে বিরক্তি পূর্ণ ‘বাবু ভায়ারা’ই সেই সকল চিকিৎসকের ব্যবসায়-বৃদ্ধির কারণ। বিশ-চলিশ বছর



বয়সে যৌবনের বল বীৰ্য্য অটুট না থাকুক, একেবারে নষ্ট হইবার ত কথা নহে, কিন্তু দস্ত-চিকিৎসকদিগের দোকানে গিয়া অহুসন্ধান করুন, তাঁহাদিগের খরিদদারদিগের মধ্যে ঐ বয়সের লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে । ফল কথা, আমরাদিগের রুচি-বিপর্য্যয়ে অনেক প্রকারেই আমাদের স্বাস্থ্য হানি ঘটিতেছে ।

\* \* \*

**তাম্বুলে মুখ শুদ্ধি ।**—তাম্বুলে মুখ শুদ্ধির ব্যবস্থা বরাবরই প্রচলিত আছে । ইহার গুণ-বাখ্যায় আয়ুর্বেদ বলিয়াছেন,— “ইহা বিশদ, রোচক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কষায়, সর, বস্ত্র, তিক্ত, কটুকার, রক্তপিত্ত জনক, লঘু, বলকারক, শ্লেষ্মা নাশক, মূত্রের দুর্গন্ধ নিবারক, মলাপহারক, বায়ু নিবারক ও শ্রম শাস্তি কৰ ।” কিন্তু মুখ শুদ্ধি করা ভিন্ন অনেকে যখন-তখন যে ইহার অত্যধিক ব্যবহার করেন, তাহাব ফলে দস্তরোগ উপস্থিত হয় ।

অকালে দাঁত বাঁধাইবার কারণও এই অতিরিক্ত তাম্বুল বা পান চর্ষনের ফলে ঘটিয়া থাকে । তা' ছাড়া, ইহা রক্ত-পিত্তজনক বলিয়া ইহার অধিক ব্যবহারে রক্তপিত্ত রোগ জন্মিাব আশঙ্কা করা যায় । ইহা তীক্ষ্ণ এবং কটুকার বলিয়া ইহার অধিক ব্যবহারে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে । কলিকাতায় আজ-কাল পানের খিলির দোকানও অলিতে-গলিতে, অজীর্ণ রোগে ও অনেক পল্লী জরুরীত প্রায় । ফল কথা, উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে, বিষও অমৃতের তায় উপকারী হইয়া থাকে এবং ব্যবহার-বাহুল্যে অমৃতও জীর্ণ করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া থাকে,—ইহা চির প্রচলিত সত্য কথা । ইহা ভিন্ন পানে যে শুপারি ব্যবহার করা হয়, তাহারও অধিক ব্যবহারে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয় । তাম্বুলের অতিরিক্ত ভক্ত ব্যক্তিগণ এসকল চিন্তা করেন,—ইহাই আমাদের বন্ধব্য ।

## বঙ্গ ম্যালেরিয়া ।

ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালা দেশ ছারখার হইতে বসিয়াছে । প্রতিবৎসরই এই সময় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ইহার তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া বাঙ্গালার পল্লীগ్రাম গুলি কিরূপ ভীতি-বিহবল চিন্তে ত্র্যস্তভাবে কালাতিপাত করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই । প্রথমতঃ যশোহর জেলার গদখালি গ্রামে ইহার উৎপত্তি আরম্ভ হয়, তাহার পর ঐ জেলারই ব্রীনগর গ্রামটী ধ্বংস করিয়া, নদী-য়ার উলা বা বীরনগর গ্রামে ইহার একটী লীলা পরিলক্ষিত হয়, সে লীলা বড় সহজ হয়

নাই, নদীয়া জেলার শাস্তিপুরের পর উলা বা বীরনগরের মত পল্লী আর একটিও ছিল না, সেই সুবৃহৎ পল্লীর প্রায় তাবৎ অধিবাসীই এই দুঃস্বপ্ন রাক্ষসীর করাল গ্রাসে পতিত হওয়ার আজি সেই সুবৃহৎ পল্লীখানি কয়েকটি মুষ্টিমের অধিবাসী লইয়া পূৰ্ণ স্মৃতি রক্ষা করিতেছে দেখিতে পাই । সুবৃহৎ মৌদ-গুলির পতিত ইষ্টকল্প বনাকীর্ণ-পল্লীর মধ্যে অটোহাট করিয়া এক্ষণে সেই একলা-জনবহুল-পল্লী-স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে মাত্র ।

তাহার পর উলা বা বীরনগর ধ্বংস

কবিয়া, ম্যালেরিয়া সমগ্র নদীয়ার বিস্তৃত হইয়া পড়িল,—অনেকগুলি গ্রাম ইহার করাল-গ্রাসে উৎসন্ন-প্রায় হইল। তাহার পর, মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়া, রাজদাহি, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের প্রায় সকল জেলাই অধিকার-পূর্বক ইহার স্বভাব সিদ্ধ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। এদিকে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশপরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর বীরভূম প্রভৃতিও ইহার প্রভাবে অক্ষুণ্ণ রহিল না,—এক কথায় একে একে সমগ্র বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি হইয়া পড়িল। উলা এবং বীরনগরের পর রংপুর, দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ির অবস্থা ইহার আক্রমণে যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে, এরূপ আর বাঙ্গালার কোন জেলা হয় নাই। এখন কিন্তু সে কয়েকটি জেলা অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, যশোর, খুলনা, হুগলি, বর্ধমান এবং ২৪ পরগণা প্রভৃতির অবস্থাই অধিক শোচনীয়। সর্বাপেক্ষা গঙ্গার তীরবর্তী স্থানগুলির উপর ইহার অত্যাচার যেন অধিক বলিয়া মনে হয়। গঙ্গা-তীরবর্তী নদীয়ার শান্তিপুর এবং গঙ্গার শাখা চূর্ণী, নদীর তীরবর্তী রাণাঘাটের কথা আমরা ভালরূপই বলিতে পারি,—গত কয়েক বৎসরে শান্তিপুর এবং রাণাঘাটের মত ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ এতদ্দেশীয় অনেক পল্লীই সহ করিয়াছে কি না সন্দেহ।

বঙ্গে ম্যালেরিয়া ছিল না, কি করিয়া যে ইহার আবির্ভাব হইল, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। ফলে দেশের জল বায়ু দূষিত হওয়াই ইহার আবির্ভাবের যে কারণ, সে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালার পল্লীগুলির অধিকাংশ স্থানই এখন পঞ্চিল-খাল-ডোবার পূর্ব হইয়াছে। সে

কালের মত ধনীর অর্থ এখন আর পুষ্করিণা-দীর্ঘিকা-প্রতিষ্ঠা বা নষ্টপ্রায়-জলাশয়গুলির সংস্কার-কার্যে ব্যয়িত হয় না। ফলে দূষিত জল ব্যবহারই যে অনেক পল্লীর ম্যালেরিয়া ভোগের কারণ, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। আমরা এমন অনেক পল্লীর কথা অবগত আছি, যে সকল পল্লীতে আদৌ কোনরূপ জলাশয় নাই, বৃষ্টিব ধারা-পূর্ণ ডোবা বা গর্তেব জলেই বর্ষা কালে সেই সকল পল্লীর অধিবাসীগণের স্নান-পানাদি সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, অল্প সময় অর্দ্ধ ফ্রোশ—কোন কোন স্থলে তাহারও অধিক দূরবর্তী স্থান হইতে জল আনয়ন পূর্বক সেই সকল পল্লীর আবাস্ত্রীকীয় কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। এই জলকষ্ট বাঙ্গালার শুধু ম্যালেরিয়া-বিস্মৃতির কারণ নহে, দেশে ওলাউড়া-উদারাময় প্রভৃতি রোগ-বৃদ্ধিও এই জল কষ্টের হেতুভূত। মাগদহ জেলায় প্রতি বৎসর ওলাউঠায় অনেক লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে, সে জেলার জলকষ্টই ইহার কারণ বলিয়া আমরা নির্দেশ করিতে পারি।

শুধু জল কষ্ট নহে, বাঙ্গালার পল্লী গুলি এখন বন-বহলও হইয়া পড়িয়াছে। ফলে এই বন-বিটপী সকল হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকৃষ্ট বীজ মশকের উৎপত্তির আধিক্য হইয়া থাকে। 'সেকালে পল্লীবাসীর কেহ পাথুরিয়া কয়লার জালে রন্ধন-কার্য্য করিতেন', পাথুরিয়া কয়লার আমদানি তখন হয় নাই—বন-বিটপী সকলই তখনকার দিনে পল্লীবাসীর ইন্ধনের কার্য্য সিদ্ধ করিত। কাজেই হেলায়-প্রকার তখন পল্লীগ্রামের জঙ্গল গুলি নষ্ট হইয়া পড়িত। এ ছাড়া—সে কালের পল্লী-মাতার অসন্তানপিতৃপুরুষের কর্ম্মণ্য সকল বজায় রাখিবার জন্য স্রমতি পরায়ণ ছিলেন, তাহারা

বাঙ্গালার পল্লী গুলিতে বার মাসে তের পার্কিন হইত, বিশেষতঃ শারদীয় পূজার সময়ে পল্লী মাতার সজ্জা-সম্ভার দেখিয়া দিগ্‌ধৃগণ হাসিয়া উঠিত। সে সজ্জা-সম্ভার বলিতে শুধু দৌধ-প্রাসাদেব শোভা-বুদ্ধি বৃথাইতনা,—অভিনব পরিচ্ছদে পরিবার-পরিজনদের সম্পদ-বর্দ্ধনের ক্ষুদ্রতান বৃথাইত না,—সে সকল ব্যবস্থা যে, সেকালে ছিল না—এমন নহে, সে সকল ব্যবস্থা ত ছিলই, কিন্তু তাহা ভিন্ন পূজা অস্ত্রে—প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে—প্রতিমা লইয়া যে পল্লী-পরিদ্রবণেব ব্যবস্থা ছিল,—তাহারই ক্ষুদ্র পল্লীর বন-জঙ্গল গুলি বাধ্য হইয়া পরিত্যক্ত করান হইত—প্রতিমা লইয়া পরিভ্রমণ কালে বন-জঙ্গল থাকিলে প্রতিমা ভাঙ্গিয়া যাইবে,—এই ঘাশঙ্কা করিয়াই পল্লী-পথগুলির বন কাটানর ব্যবস্থা করা হইত। ফলে যে কারণেই হউক, এ কালের মত সে কালে বাঙ্গালার পল্লীগুলি বন-বহুল ছিল না। এই সকল ব্যবস্থা যে সময় হইতে দেশে লুপ্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়া-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছে।

পর্যঃপ্রণালীর অভাব বাঙ্গালার পল্লী পর্য্যবেক্ষণ আর একটি কারণ। পল্লী-ভূমির যে সকল বড় বড় স্থানে পর্যঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে; সে সকল স্থানের অধিকাংশ স্থলে জন-নিকাশেব ব্যবস্থা নাই, কাজেই সে সকল স্থানে শুষ্ক বৃক্ষপত্র প্রভৃতি পচিয়া তথ্যরা স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায় ঘটাইতেছে। যে সকল পল্লী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্নিহিত নহে, সে সকল পল্লীতে ত পর্যঃপ্রণালীর কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, কিন্তু বিস্তৃত জন-সংস্থান এবং বন-জঙ্গল পরিত্যক্তের মত এটিরও ব্যবস্থা না করিলে চলিবেনা।

গঙ্গার তীরবর্তী পল্লীগুলির উপর ম্যালেরিয়ার আক্রমণ যে সর্বাধিক অধিক বলিয়াছি, তাহার প্রধান কারণ—বাঙ্গালার রেল-বিস্তার। এই রেল-বিস্তারের ফলে যে সকল স্থলে গঙ্গা বা তাহার শাখা নদীগুলির উপর রেলকোম্পানী সেতু-বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সকল স্থলেই ইহার প্রভাবাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্থলে আমরা হাওড়া, হুগলি এবং সারা ঘাট অঞ্চলের কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই রেল-বিস্তারের ফলে নদী সকল যে স্বল্পতোয়া হইয়া পড়িতেছে,—নদীজলে ‘পলি’ পড়িয়া জলের অবিভক্ত শ্রোতঃ সকল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, তাহারই ফলে ম্যালেরিয়া-বিষের উৎপত্তি আরম্ভ হইয়া, নদী পার্শ্বস্থ পল্লীগুলি ম্যালেরিয়া-প্রবণ হইতেছে। ইহার প্রতিকারের উপায় আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। পতিত ‘পলি’গুলি তুলিয়া ফেলিয়া, স্বল্পতোয়া নদীগুলির শ্রোতঃ-বাহুল্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে, বঙ্গায় সেনেটারি বিভাগকে সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাঁহা-দিগের সত্বকরণ দৃষ্টি পতিত না হইলে ইহার প্রতিকারের উপায় নাই।

আমাদের মহামান্য গবর্ণমেন্ট বাহ্যিক অবস্থা আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার চিন্তায় উদাসীন নহেন। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, লোকাল-বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা এই ক্ষুদ্রই গবর্ণমেন্ট প্রবর্তন করিয়াছেন। প্রতি গ্রামের রাশি রাশি অর্থও একত্র ব্যয়িত করার ব্যবস্থা আছে। সংপ্রতি গত ১৯১৬ সালের ভারত গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের কার্য-বিবরণী বাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালা দেশে মোট ১১১টি মিউনিসিপ্যালিটির ৮৮, ৬৮, ৬৯২

টাকা আয়ের শত করা ৩৭, ১৮ ভাগ স্বাস্থ্যোন্নতি কার্যে ব্যয়িত করা হইয়াছিল। ১৯১৫।

১৬ খঃ অক্রে রিজার্ভ সেনেটারি কার্যে ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়; এবং ২,৯৯,৫৬৮ টাকা ব্যয়িত করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি দ্বারা সংগৃহীত ২২, ৯২, ৪২৯ টাকা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়। এই রিপোর্টে প্রকাশ, পল্লী গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, পুরাতন জলাশয়ের সংস্কার-সাধন, ডেঞ্জ-পরিষ্কার প্রভৃতি কার্যের জন্য আলোচ্য বর্ষে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল।

যাহাউক আমাদের সদাশয় গবর্ণমেন্ট বাহাদুর যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে বিশেষ রূপ মনোযোগী সে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে উত্তরোত্তর যেরূপ ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট যে টাকা ব্যয় করিতেছেন, তাহাপেক্ষা আরও অধিক ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। আমাদের নিজেদেরও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাশীল হইতে হইবে। সে চেষ্টাশীল হইতে হইলে, কিন্তু কিছু অর্থব্যয়ের আবশ্যক। পল্লী-সংস্কারের জন্য জেলাবোর্ড বা লোকাল-বোর্ড গুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শুধু বসিয়া থাকিলে চলিবেনা, যাহা পার, সাধ্যমত গ্রামা চাঁদা তুলিয়া, তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান পূর্বক পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করাইবার জন্য,—জঙ্গল-পরিষ্কার করাইবার জন্য,—রাস্তা গুলি সুসংস্কৃত করিবার জন্য তাঁহাদিগের করণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে, তবেই দেশ হইতে ম্যালেরিয়া হ্রাস পাইতে পারিবে।

গবর্ণমেন্ট বাহাদুর ম্যালেরিয়ার হস্ত

হইতে পল্লীবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জলাশয়ের সংস্কার,—বন পরিষ্কার প্রভৃতি প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াই শুধু নিশ্চিন্ত নহেন, প্রতি বৎসর নানা পল্লীতে চিকিৎসক প্রেরণপূর্বক যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন-বিতরণেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এজন্য গবর্ণমেন্ট বাহাদুর আমাদেরিগের নিকট নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্থ এবং তাহার জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ সন্দেহ নাই;—কিন্তু আমাদের মনে হয়,—আমরা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যদি এ সময় আয়ুর্বেদীয় ব্যবস্থার অনুসরণ করি, তাহা হইলে তাহা আমাদের পক্ষে অধিকতর শুভজনক হইতে পারে। প্রত্যহ একটু-একটু তুলসীর রস বা সিউলির পাতার রস সেবন করা—এ সময় মন্দ ব্যবস্থা নহে। অবস্থায় কুলাইলে সপ্তাহে ২।৩ দিন একটু-একটু “মকরমুদ্রাব” সহিত ঐ দুইটি দ্রব্যের যে কোনটি ব্যবহার করিলে আরও উপকারের সম্ভাবনা। কুইনাইন-ব্যবহারে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে আপাততঃ রক্ষা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহার অপব্যবহারে পরিণামে দেহ-মন্দির নানারূপ ব্যাধির আক্রমণ ভুগি হইয়া থাকে; কিন্তু আয়ুর্বেদীয় ঔষধে সে আশঙ্কা একেবারেই নাই, বিশেষতঃ তুলসীর রস—বায়ু এবং কফ ধাতুকে নষ্ট করিয়া থাকে বলিয়া ইহা সেবনে অত্যন্ত অনেক রোগের আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়। সিউলি বা সেকালিকা পত্রের রস কটু ও তিক্ত এবং উষ্ণবীৰ্য্য, এজন্য ইহা জরনাশক বলিয়া আয়ুর্বেদে কথিত। ম্যালেরিয়া-প্রবণ-দেশের অধিবাসীগণকে এ দুইটি দ্রব্যের যে কোনটি বা ঐ দুইটি দ্রব্যের এক বেলা একটু

অপর বেলা আর একটি সেবন করিবার জন্ত আমরা পরামর্শ প্রদান করিতেছি ।

ম্যালেরিয়া আরম্ভের সময় বর্ষার অন্ত কাল। বর্ষা ঋতুতে দেহে শীতাতিক্রিয়া ও পিত্ত সঞ্চিত হয়। এই ঋতুর অন্তকালে ঐ সঞ্চিত পিত্ত সহসা প্রথর-মার্ত্তণ্ড-কিরণ পাইয়া প্রকুপিত হইয়া থাকে। এজন্ত এ সময় তিক্ত-দ্রব্য আহার করিলে এবং যাহাতে নিত্য কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, তাহার জন্ত রাত্রে শয়ন-কালে সপ্তাহে ২৩ দিন অর্দ্ধ তোলা হরিতকী চূর্ণ, অর্দ্ধ তোলা চিনি এবং এক ছটাক গরম জল একত্র মিশাইয়া পান পূর্বক কোষ্ঠ-পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

পল্লীর অনেক ব্যক্তিকে দেখিতে পাই, ইহারা ক্রমাগত ভূগিয়া-ভূগিয়া একরূপই সহনশীল হইয়া পড়িয়াছেন যে, অনেক সময় তাহাদের নিকট ম্যালেরিয়া রোগটি যেন উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়ে। জ্বর হইল—পড়িয়া থাকিলেন, জ্বর ছাড়িল—কুইনাইন সেবন করিলেন,—অনেক ক্ষেত্রে ইহাই হই-

য়াছে—উঁহাদিগের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা হইতেই ত দেশের সর্বনাশ হইতেছে। এইরূপ ভাবে ভূগিয়া-ভূগিয়া ক্রমশঃ জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া পড়িতেছে। ম্যালেরিয়া কখনই উপেক্ষণীয় নহে, যাহাতে ম্যালেরিয়া-বিষে শরীর আক্রান্ত হইতে না পারে—প্রথমতঃ তাহাই করা কর্তব্য, সেরূপ চেষ্টা করিয়াও যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া-বিষ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র স্ট্রিচিকিংসা দ্বারা নিরাময় হইবার চেষ্টা করা উচিত। রোগ মাত্রই উপেক্ষণীয় নহে। শাস্ত্রকার এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—  
“জাতমাত্রশ্চিকিৎস্তুঃ স্ত্রাম্রোপেক্ষ্যোহন্নতয়া গব ।  
বহুশস্ত্র বিবৈজ্ঞান্য স্ত্রাম্রোহপি বিকরোত্যাসৌ ॥”

অর্থাৎ—রোগ উৎপত্তি হইবামাত্র চিকিৎসা করাইবে, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবেনা, কারণ সামান্য ব্যাধিও অগ্নি, শত্রু ও বিষের স্তায় অন্ন পরিমিত হইয়াও বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে।

আমরা সমসামুদ্রে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল।

## পশ্চাৎসুর্বেদ ।

### রক্ষাসুর্বেদ ও গবাসুর্বেদ ।

সকালে কেবল মানুষের জন্তই “আয়ুর্বেদ শাস্ত্র” উদ্ভাবিত হয় নাই। আর্ঘ্যশিগণ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির জন্তও “আয়ুর্বেদ” রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে

যে পুরা বিজ্ঞা ও অপরা বিজ্ঞার যুগপৎ সাধনা চলিয়াছিল, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাহা জানেন না।

বিশ্ব বিজ্ঞত কীর্ত্তি—মহাত্মা জগদীশ চন্দ্র

বহু \* উদ্ভিদের প্রাণ-সত্তা সপ্রমাণ করিয়া, বিজ্ঞান-বাহন রূরোপকেও আজ যে বিস্তৃত করিয়াছেন, বহুগুণ পূর্বে আর্ধ্যাধ্যায়গণও এ উদ্ভিদ-রহস্য অবগত ছিলেন। মনু বলিয়াছেন—

“অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে স্মৃৎ হুংথ সমন্বিতাঃ”

অর্থাৎ বৃক্ষাদিরও অন্তঃসংজ্ঞা আছে, তাহারও স্মৃৎ-হুংথ-অনু ভব করিতে পারে। এইজন্যই আর্ধ্য-শাস্ত্রে বৃক্ষাদির শ্রাক-তর্পণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি বৃক্ষকেই ঋষিগণ দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া গিয়াছেন। উদ্ভিদের পালন, বর্দ্ধন, রোগনির্ণয় ও তাহার প্রতিকারের জন্য, “বৃক্ষায়ুর্বেদ” রচিত হইয়াছিল। “শাক-ধর পদ্ধতি” “কেদারকল্প” “কুবি পরাশর” প্রভৃতি গ্রন্থে আপনারা—“বৃক্ষায়ুর্বেদের” আভাস পাইবেন। বর্তমান প্রবন্ধে আপনাদের কাছে আমি “পঞ্চায়ুর্বেদের” পরিচয় প্রদান করিব।

গো, অশ্ব ও হস্তী—মানবের কর্মক্ষেত্রে এই তিনটি পশুর উপযোগিতা বড় বেশী। প্রাচীন ভারতে এই তিন শ্রেণীর পশুর যথেষ্ট সমাদর ছিল। ঋষিগণ—এই তিন শ্রেণীর

\* ডাক্তার সায় জগদীশ চন্দ্র বহু মহাশয় তাঁহার রচিত “প্ল্যাণ্টরেন্ডপুল” নামক পুস্তকের ভূমিকার মধ্য-ভাগে এবং উপসংহারে বলিয়াছেন, “বৃক্ষের নানাবিধ গতিবিধি, পরিপাক বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্য ঘাত-প্রতিঘাত-জনিত শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়, ঐ সমস্ত কার্য জীবনী-শক্তির দ্বারা পরিচালিত নহে,—ইহার জন্য একটা অতীন্দ্রিয় জীবনীশক্তির প্রয়োজন হয় না।” বাহ্য হউক এই প্রবন্ধের লেখকের সহিত আমাদের মতানৈক্য নাই।

আং সং

পশুর জন্য “চিকিৎসা-বিধি” প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। কিন্তু হুংথের বিষয় প্রাচীনকালের গো-চিকিৎসা বিষয়ক কোনও গ্রন্থই আমরা এ পর্যন্ত সন্ধান করিতে পারি নাই। কেবল “অগ্নিপুরাণ” প্রভৃতি পুরাণে—গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে দুই চারিটি উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। মহাত্মারত পড়িলে আমরা জানিতে পারি,—পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব একজন প্রসিদ্ধ “গো-বৈজ্ঞ” ছিলেন। সহদেব যে গো-চিকিৎসা বিষয়ক কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের ধারণা, পুরাকালে গো-চিকিৎসার জন্য “গব্যায়ুর্বেদও” রচিত হইয়াছিল, অবহেলার তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গো-জাতির উন্নতি ও অবনতির সহিত ভারতের উন্নতি-অবনতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। “গো-পালন” একদিন আর্ধ্যজাতির প্রধান ধর্ম ছিল। গো-বৃষ,—ঋষি রচিত-পুণ্য-সংসারে-গার্হায্য ধর্মের অনেক সাহায্য করিত, তাই ভারতবাসী একদিন গো-জাতিকে দেবতার বজ্রভাগ সমর্পণ করিয়াছিলেন। এখনও পিতৃকার্যে “ব্রহ্মোৎসর্গ” আভিজাত্য-প্রকাশে “গোত্রের” উল্লেখ, দুর্গা-চন্দনে “হোমধেহুর” আমন্ত্রণ—ভারতে গো-জাতির প্রতি শ্রদ্ধারই পরিচয় দিয়া আসিতেছে! জানি না, কোন মহাপাণ্ডে—“গো-বুলোক প্রতিষ্ঠিতঃ” এই মহতীবাণীর মর্যাদা এদেশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে! বাহ্য-দেহ পূর্ব পুরুষ একদিন গো-চিকিৎসার অন্য়নিয়োগ করিয়া, ধার্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই বংশের ঋশধর আজ গো-বৈজ্ঞকে স্বপা করিতে দিখিয়াছে। গো-চিকিৎসা এখন হেরতর নাট্য-কার্য। পূর্বে অনেক ব্রাহ্মণ—গো-চিকিৎসা

করিতেন। চিকিৎসা করিতে গিয়া—গো-বধ করিয়া ফেলিলেও চিকিৎসাকারী প্রায়-শিষ্টাই হইতেন না। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

দাহক্ষেদং শিরাবেধং প্রবন্ধৈরুপকূর্ষতাং।

বিজ্ঞানং গো হিতার্থায় প্রায়শ্চিত্তং ন বিত্ততে।

যত্নেণ গো-চিকিৎসায়াম্ মৃতগর্ভ বিদারণে।

যদি কার্যো বিপত্তিঃ স্যাম্ প্রায়শ্চিত্তং ন বিত্ততে॥

পূর্বোক্ত শ্লোক দুইটা পাঠ করিলে ইহাও বুঝিতে পারা যায়—প্রাচীন আর্ধ্যগণ গাভীর হিতের জন্য অতি যত্নের সহিত গো-শরীরে অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিতেন।

### অশ্বায়ুর্বেদ ।

প্রাচীন কালে “শালিহোত্র” নামে এক জন ঋষি ছিলেন। ইনি একজন অদ্বিতীয় “অথবৈজ্ঞ” বলিয়া তৎকালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। “শালিহোত্র” প্রণীত অশ্ব-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ এখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই। প্রয়োজন মত কেহ কেহ এই বিশাল গ্রন্থের দুই একটি অধ্যায় মুদ্রিত করিয়াছেন। শীঘ্রই ইহার পূর্ণাবয়বে প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

বৈজ্ঞ-কুলতিলক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিজ্ঞারত্ন, “বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি” হইতে দুই খানি দ্বুপ্রাপ্য অশ্বচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহার একখানি চতুর্থ পাণ্ডব শ্রীমৎ নকুল রচিত, অপর খানির নাম—“অথ বৈজ্ঞক।” এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম—সরদত্ত। নকুল যে একজন অশ্ব চিকিৎসক ছিলেন, একথা বোধ হয় প্রত্যেক হিন্দুই শুনিয়া থাকিবেন। সূত্রায় নকুল রচিত অশ্ব-শাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি

ভাষ্য—২

প্রচার করিয়া বিজ্ঞারত্ন মহাশয় এদেশের যুথোজ্জ্বল করিয়াছেন। এজন্য ভারতবাসী মাঝেই উমেশ বাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থে বিজ্ঞারত্ন মহাশয় একটা বিস্তৃত সূচী সংযোজিত করিয়াছেন। এই সূচী—তাঁহার অপরাধু অল্পসন্ধানের অবিনশ্বর উদাহরণ। সহনশক্তি, অন্তদৃষ্টি, বহু-অধ্যয়ন, উদারতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও শিপি-কুশলতা—সাহিত্য জগতে উমেশচন্দ্র এই সকল গুণের অধিকারী। তাঁহার এই সর্বাঙ্গ সুন্দর অল্পশীলন জাত সূচী পত্রে আমরা অনেক জটিল-দুর্য্যোগ্য গুরুতর সমস্যার সীমাংসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার সাধনা, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার অতীতের প্রতি অহুঁরাগ, তাঁহার মৌলিক গবেষণা শক্তি—সমগ্র বাঙ্গালীর আদর্শ। হৃৎকের বিষয়—এরূপ অক্লান্ত শ্রম ও অটুট অধ্যবসায়ের যথার্থ মূল্য—এদেশ এখনও বুঝিতে পারে নাই।

প্রাচীন ভারতে অশ্ব-চিকিৎসার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। অশ্ব চিকিৎসা বিষয়ক অনেক গুলি গ্রন্থের আমরা নামোন্মেষ দেখিতে পাই। ভবিষ্যতে পৃথক্ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

বিদর্ভাধিপতি নল—অশ্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন। অশ্বের প্রতিপালন সম্বন্ধে তিনি অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে অশ্ব-চিকিৎসার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য আমরা পাঠক গণকে উমেশ বাবু কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক দুই খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইতঃপূর্বে, “অশ্বভূমি” পত্রে—বৌদ্ধযুগের অশ্ব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একটা প্রবন্ধ বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। তাহাতে

অমরোগেব অনেকগুলি মুষ্টিযোগও উদ্ধৃত  
হইয়াছিল ।

### গজায়ুর্বেদ ।

ভারতে “গজায়ুর্বেদের”ও প্রভূত উন্নতি  
সাপিত হইয়াছিল । হস্তা-চিকিৎসার অনেক  
গুলি পুস্তকও রচিত হইয়াছিল । “অগ্নি-  
পুরাণে”—একটা শ্লোক দেখিতে পাই—

পালকাপ্যোইজ রাজায় গজায়ুর্বেদ মন্ত্রবীং ।

শালিহোত্রঃ সূশ্রুতায় হরায়ুর্বেদ মন্ত্রবান্ ॥

ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি, “পালকাপ্য”  
নামক ঋষি অঙ্গাধিপতি লোমপাদকে গজায়ু-  
র্বেদ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আর মহর্ষি  
শালিহোত্র সূশ্রুতের নিকট “হরায়ুর্বেদ”  
কর্তন করিয়াছিলেন । শালিহোত্রের কথা  
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । ইনিই “অথায়ুর্বে-  
দের” প্রথম প্রচারক, কিন্তু ইহার উপদেশ-  
শ্রোতা ‘সূশ্রুত’ আর—সংহিতাকার “সূশ্রুত”  
—একই ব্যক্তি কিনা, তাহা বলা যায়না ।  
আপাততঃ এ সকল তর্কে প্রয়োজনও নাই ।  
এখন “গজায়ুর্বেদের” কথাই বসি ।

“পালকাপ্য”—প্রাচীন ঋষি।—বামায়ণ  
পাঠে আমরা জানিতে পারি “অঙ্গাধিপতি”  
—লোমপাদ, রাজা দশরথের পরমাত্মার ও  
বন্ধু ছিলেন। অবোধানাত দশরথ নিজ কন্যা  
“শান্তা”কে লোমপাদের হস্তে “দাত্রিমা” রূপে  
সমর্পণ করেন । রাজা লোমপাদ—বিভাগুক  
মুনির পুত্র ঋগ্বেদের সহিত শান্তার বিবাহ  
দেন । দশরথ—চতুর্বিংশ ব্রতায়ুগে ধরনীতে  
আবির্ভূত হন । এ সম্বন্ধে মন্তব্য পুরাণের  
প্রমাণ,—

“চতুর্বিংশে যুগে রামো বশিষ্ঠেন পুরোধসা ।

সপ্তমো রাবণস্তার্থে জজ্ঞে দশরথাত্মজঃ ॥”

এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে  
হয়—“পালকাপ্য” দশরথের সমসাময়িক ।  
কেননা দশরথ-সুশ্রুত অঙ্গাধিপ লোমপাদকেই  
তিনি গজায়ুর্বেদ শুনাইয়া ছিলেন । এতদ্বারা  
আমরা পালকাপ্য প্রণীত “গজায়ুর্বেদের”  
প্রাচীনত্বের নির্দেশ করিতেছি ।

প্রভুতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মহেন্দ্র নাথ রায়  
বিজ্ঞানিধি যখন “অমুল্লীলন” নামক সাময়িক  
পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন, তখন  
সময়ে সময়ে আমি তাহাতে দুই একটা কবিতা  
লিখিতাম । সেই হস্ত্রে পণ্ডিত মহাশয়  
আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, কলিকাতার  
যাইলে আমিও তাঁহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে  
সাক্ষাৎ করিতাম । ক্রমে তাঁহার উদারতায়  
আমাদের মুখের আলাপ বহিষ্টতায় পরিণত  
হয় । বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের মধ্যস্থতায়—স্বর্গীয়  
মহাত্মা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে—  
“সাহিত্যসভার” এক বিশেষ অধিবেশনে, আমি  
এক মহাপুরুষের কাছে পরিচিত হই । তিনি  
সুন্দরের অধিপতি । আজ তিনি স্বর্গে—এ  
মর্ত্যের মাটির কথা বোধ হয় তাঁহার মনে  
নাই, আমি কিন্তু এখনও সেই চরিত্র-মাধুর্যের  
অপব্যাজিত বারকে অন্তবে অন্তরে পূজা করি ।  
সুন্দরাধিপতি একদিন আমার নিমন্ত্রণ করিয়া-  
ছিলেন । তাঁহার প্রাসাদ তুল্য ভবনে—  
আমি সর্ব প্রথম পালকাপ্যের “গজায়ুর্বেদ”  
চক্ষে দেখিয়া জীবন ধন্য করিয়াছিলাম ।  
পুস্তকখানি মুদ্রিত ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে—পুণার  
“আনন্দাশ্রম” হইতে শ্রীযুক্ত মহাদেব চন্দনজী  
আপ্তে মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত । মহারাজ  
যজ্ঞের সহিত পুস্তকখানি আমার দেখাইয়া-  
ছিলেন এবং আমাকে তাহার বঙ্গানুবাদ  
করিবার জন্য অমুমতি দিয়াছিলেন ।



অনুবাদ আরম্ভ ও হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীরা দুর্ভাগ্য—আরক্ত কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই কালের ঈর্ষিতে মহারাজ পৃথিবীর পাছশালা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ পণ্ড-চিকিৎসা বিষয়ক অনেকগুলি দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—একে একে সেগুলি মুদ্রাব্যয়ের সাহায্যে সাধারণ্যে প্রচার করিবেন। হায়! তাঁহার সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, রাবণের স্বর্ণ-সোপান-নির্মাণের কল্পনার মত চিরদিন ব্যর্থ হইয়াই রহিল !!

দেবানাং প্রিয়দর্শী রাজা অশোক পশুর জ্ঞা হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার আমলে—ভারতে পণ্ড-চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এখনও ভগ্ন প্রস্তর-স্তম্ভে, শিলাপট্রে, তাম্রশাসনে,—ইতর জীবের প্রতি অশোকের অসীম করুণার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ অসুস্থ—সেই বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের মতই—“অহিংসা পবন ধর্ম্মের” মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল—ভারতে আবার পঞ্চায়তবর্ষদের প্রবর্তন করা। মহারাজের পিতৃব্য ৮রাজা কমলকুমার সিংহ “গো-পালন” ও “অষ্টতরু” নামক দুইখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। এই পুস্তকদ্বয়ের রচনা-কৌশলের মধ্যে মহারাজেরও দুইখানি মূল্যবান হস্তের সন্ধান পাওয়া যায়। কলিকাতার উদ্দেশ্য-হীন কোলাহল, নিরানন্দ ধর্ম্মের আকাশ এবং জনর শূন্য সমাজের মধ্যে থাকিয়াও মহারাজ পণ্ড-রক্ষার কথা ভুলেন নাই।

মহারাজের গ্রন্থাগারে—আর একখানি হস্তি-চিকিৎসার পুস্তক দেখিয়াছিলাম।

সেখানি মাদ্রাজের ত্রিবেঙ্গুন্ন নগর হইতে প্রকাশিত। তাহাতে হস্তী চিকিৎসা বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—“করি-কৌতুকসার” “মাতঙ্গদর্পণ” “মাতঙ্গলীলা” “হস্তি-বিলাস” “গজেন্দ্র-চিন্তামণি”—ইত্যাদি। এই সকল পুস্তকের মধ্যে দুই একখানি মহারাজ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি। আশা করি মহারাজের কোনও বোধ্য বংশধর তাহা মুদ্রিত করিয়া মহারাজের স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা করিবেন। \*

“বারাহী-সংহিতা” “গর্গসংহিতা” “শার্ঙ্গ-ধর পদ্ধতি” “বসন্তরাজ” “রাজবল্লভ” “জ্যোতির্নিবন্ধ” “ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ” “অগ্নিপুরাণ” “গরুড়পুরাণ” প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে হস্তি-চিকিৎসার বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অমুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা ঐ সকল গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন। যুরোপে হস্তী জন্মেনা, সুতরাং পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত হস্তি-চিকিৎসা বিষয়ক কোন গ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত যে দুই একখানি গ্রন্থ আছে—তাহাও ভারতপ্রবাসী সাহেব কর্তৃক লিখিত। তন্মধ্যে Gilchrist &c. Major Evans কৃত গ্রন্থই উল্লেখ বোধ্য। আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত কতকগুলি হস্তি চিকিৎসার গ্রন্থ আছে, এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত সংহিতার অনেকটা অনুকরণেই লিখিত।

এইবার পালকাণ্য রচিত গজায়ত্নবর্ষদ

\* মহারাজের বোধ্য বংশধর প্রিয়দর্শন ভূপেন্দ্র চন্দ্র এবার আই এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আবার তরুণা আছে—শ্রীমান্দ নাম শেখ পিতৃদেবের রাজবংশের গৌরব অক্ষর রাখিবেন।

নামক বিরাট গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বর্তমান প্রবন্ধেব উপসংহার করিব।

এই গ্রন্থ ১৬০টী অধ্যায় যুক্ত এবং “মহা-রোগ স্থান” “ক্ষুদ্র রোগ স্থান” “শল্যস্থান” ও “উত্তর স্থান”—এই চারিভাগে বিভক্ত। ইহার “মহারোগ স্থানে” ১৮টী, “ক্ষুদ্র রোগ স্থানে” ৭২টী, “শল্যস্থানে” ৫৪টী, এবং উত্তর স্থানে ৩৬টী অধ্যায় আছে। ইহার ভাষাও “চরক স্মৃতি” “আয়ুর্বেদ-সংহিতার” ভাষার মত—গুজ-পদ্মময়ী। সমগ্র গ্রন্থে দুই হাজারেরও বেশী শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে। পালকাপোর মতে—হস্তীদেহে ৩১৫ প্রকার ব্যাধির আক্রমণে সম্ভাবনা। মহর্ষি—ধীর-গম্ভীরভাবে ৩১৫ প্রকার ব্যাধির নিদান ও চিকিৎসাবিধি বুঝাইয়া দিয়াছেন। “শল্য-স্থানে” পালকাপা, হস্তীদেহে প্রযোজ্য যে সকল শস্ত্র-যন্ত্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহা প্রায় “স্মৃতি-সংহিতায়” বর্ণিত শস্ত্র-যন্ত্রাদির অমূ-রূপ। ত্রিংশৎ অধ্যায়ে হস্তীর অবয়বাদির পার্থক্য এবং ছেদ, ভেদ, লেখা, বিশ্রাবণীয়, বিদারণীয় এষা ও সীবনীয়াদি শস্ত্রোপচার লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবাধ হইতে হয়। মহর্ষির রচনার নমুনা স্বরূপ—আমরা “গজায়ুর্বেদের” একটি মাত্র অধ্যায় নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম,—

অথোবাচ ভগবান্ পালকাপাঃ ইহ খলু ভো হস্তিনামাগন্তবো দোষসমুৎপাদ ত্রণ-বিধয়ো বহুবিধা ভবন্তি। তেষাং দোষ-প্রশমনার্থঃ শস্ত্রবিধানঃ সংস্থানপ্রমাণস্তচ বক্ষ্যামঃ।

তত্র কুঠং থরধারং বক্রং হৃষ্মনতিস্থলং দীর্ঘমানতং খণ্ডং বর্জকং। গুণবহিপরাং ন চাতিনিশিতং শস্ত্রমবচারয়েৎ।

তত্র তীক্ষ্ণগায়সা বিধিবিম্পিন্নেন কুশল-কর্ম্মারঃ শস্ত্রাণি কুর্যাৎ। তদন্তমেন হি দ্রব্যো-গোন্তমেন চাচার্য্যেণ ক্রিয়য়া চোত্তময়া কৃতঃ শস্ত্রং কার্য্যং সাধয়েদিতি। তস্মাৎ প্রযুক্তঃ কার্য্যঃ শস্ত্রাণামুত্তমানাং করণে।

তত্র শস্ত্রাণি দশ নাম সংস্থানানি ভবন্তি। তন্মথ,—বৃদ্ধি পত্রং, কুশপত্রম্, ত্রীহিমুখম্, মণ্ডলাগ্রম্, কুঠারাকৃতি, বৎসদন্তম্, উৎপল পত্রম্, শলাকা, সূতী, রম্পকশ্চতি ফালজাঘবতাপিকা দর্ব্বাকৃতিয়শ্চতি। এতাত্ময়িকশ্রমবিধানে চত্বারি চাত্তানি শল্যোদ্ধরণানি। যথাযোগং সিংহ-দন্তং গোধামুখং কঙ্কমুখং কুলিশমুখশ্চেতি। তিস্রএবিণ্যাঃ। একবিংশতিরেব বা অয়ো ময়ানি সাধনানি ভবন্তি। তেষাং সংস্থানং প্রমাণং কর্ম্মাণি বক্ষ্যামঃ—তত্র দশানুল প্রমাণং বৃদ্ধিপত্রং ষড়ঙ্গুল প্রমাণং বৃত্তং। চতুরঙ্গুল-প্রমাণং পত্রম্। ত্র্যঙ্গুল-বিত্তীর্ণং পাটনার্থং ছেদনার্থশ্চেতি। ষড়ঙ্গুলবৃত্তমঙ্কা-ঙ্গুলং সর্ব্বতঃ। তৎ পূর্ণচক্রাকৃতিরগ্রে মণ্ডলা-গ্রম্। লেখনার্থমঙ্কো ত্রীহিমুখং। উৎপল পত্র-মষ্টাঙ্গুলম্বেবৈকম্। তচ্চাত্তাঙ্গুলপ্রমাণং। অধ্য-ঙ্কাঙ্গুলবিস্তৃতমুভয়তো ধারম্ (ত্রীহিমুখা-কৃতি ত্রীহিমুখং মুগ্ধভেদনার্থং ছেদনভেদনার্থ-শ্চেতি। নবাঙ্গুলং কুশপত্রং। পকাঙ্গুলং বৃত্তম্। চতুরঙ্গুলং পত্রং, অধ্যঙ্কাঙ্গুলবিস্তৃত-মুভয়তো ধারম্।) কুশপত্রাকৃতিগম্ভীর-পাকভেদনার্থং ষড়ঙ্গুলবৃত্তম্। অধ্যঙ্কাঙ্গুলং পত্রম্। পূর্ণচক্রাকৃত্যগ্রমণ্ডলাগ্রম্। লেখনার্থ-মঙ্কো ত্রীহিমুখমুৎপলপত্রং ভেদনার্থ-কুঠারাকৃতি কুর্যাৎ। কুঠারপত্রং প্রজ্জেন-নার্থম্। বৎসদন্তাকৃতি বৎসদন্তং দশাঙ্গুলম্। একৈকমধ্যাঙ্কাঙ্গুলমুখম্। এধমেতানি চ ত্রীণ্যপি যথাযোগং প্রজ্জনার্থং, সূতী পেক্ষাকারী।

অষ্টাঙ্গুল, নাগদন্তাকৃতি ত্রাশ্র চতুরশ্র বা দৃঢ়া সমাহিতা সমা বা শলাকা বনে বস্তু বিধৃত্য-  
র্থম্ । বস্পক স্ত্র্যঙ্গুল মুখো দশাঙ্গুল বৃত্তঃ পাদ  
শোধনার্থং নথচ্ছেদনার্থকেতি । এষণী দশাঙ্গুলা ।  
বিশতাঙ্গুলা ত্রিশদঙ্গুলা যথাযোগ মজ্জন শলা-  
কাকৃতিঃ শল্মা সমাটৈবমেতা ত্রিশ্র এষণঃ  
প্রমাণতঃ কার্ধ্যাঃ । কোরটকপুশ্পাকৃতি মুখ-  
নেত্র তাম্রায়সং বোড়শাঙ্গুল মনুপূর্ণং ত্রণানাং  
প্রফালনং কুর্ধ্যাদ্ভিসং চক্রাগ্রমষ্টাঙ্গুল-  
প্রমাণমঙ্কোঃ পটলোদ্ধরণার্থকেতি ।

তত্র শ্লোকঃ—

যথাক্রান্তেবমেতানি শস্ত্রাণি বিধিবদ্ ভিষক্ ।  
কারয়িত্বা যথাযোগং কুর্ধ্যাদ্ভ্রণবিদারণম্ ।

ইতি শ্রীপালকাপ্যে হস্তায়াুর্বেদ মহা প্রব-  
চনে তৃতীয়ে শল্যস্থানে ত্রিশঃ শস্ত্র বিধিরধ্যায় ।

পালকাপ্যের “গজায়ুর্বেদ যে বিরাট আয়ু-  
র্বেদেরই এক অবিচ্ছিন্ন অংশ—ইহা আমরা  
সাহস করিয়া বলিতে পারি। তিনি—  
সহায়ত্বিত পূর্ণ করুণ-স্বদয়ে—হস্তীর প্রত্যেক  
অঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন, অস্ত্র-সাধ্য  
বোগে—শস্ত্র-প্রয়োগের কৌশলও লিপিবদ্ধ  
করিয়াছেন। অস্ত্রচিকিৎসার জন্ত হস্তীর  
নানাবিধ বন্ধন-ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন,  
দন্তোৎপাতন, মূঢ়গর্ভ বিদারণ, কবল প্রদান,  
বেদকর্ষ, বস্তিকর্ষ, অগ্নিকর্ষ, কারকর্ষ, নস্ত্র,  
ধূপ, অজ্ঞন প্রভৃতি বিষয়েও বিদগ্ধ উপদেশ  
দিয়াছেন। হস্তিশালা নির্মাণ, হস্তি পালন,  
অতি দক্ষতার সহিত বৃদ্ধাইয়াছেন। হস্তি-তত্ত্ব  
বিষয়ে এমন কোনও তথ্য নাই,—যাহা এই  
বিপুল কলেবর পুস্তকে পাওয়া যায় না। যুক্তি-  
পূর্ণ মন্তব্যে ইহার এক একটা অধ্যায় বেন  
সঙ্গীত হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকগণ পূণা হইতে

আনাইয়া,—এই “গজায়ুর্বেদ” একবার পাঠ  
করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ ।

### গারুড় বিদ্যা ।

“রারাতী সংহিতা”তে গৃহপালিত ছাগ-  
মেঘাদি পশুর প্রকৃতি ও রোগ প্রতিকারার্থ  
সংক্ষেপে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ।

দয়াময় ঋষিগণ—কোনও জীবকেই উপেক্ষা  
করেন নাই। যে সকল পশু—রোগযন্ত্রণায়  
অস্থির হইয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ পড়িয়া মৌন ভাবায়  
মৃত্যুকে আহ্বান করিত, আর্ঘ্যঋষি তাহা-  
দিগকেও ক্রোড়ে তুলিয়া স্নানসেচনে সজীবিত  
করিতেন। আকাশের বৃষ্টিধারার মত—সে  
করুণা স্থান-পাত্রের বিচার করিত না।

প্রাচীন ভারতে গারুড়-বিজ্ঞানও প্রচুর  
উন্নতি হইয়াছিল। সম্প্রতি ত্রীযুক্ত হর-  
প্রসাদ শাস্ত্রী—এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থা-  
গার হইতে একখানি অভিনব সংস্কৃত পুস্তক  
প্রচারিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রেনপক্ষী-  
প্রতিপালন ও তহার যুগ্ম-শিক্ষা প্রভৃতি  
আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে শ্রেন  
পক্ষীর রোগ ও তৎ প্রতিকারের উপায় বর্ণিত  
হইয়াছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা—কমলানা-  
থিপতি শ্রীমদ্ রাজা কৃষ্ণদেব। শাস্ত্রী মহাশয়  
গ্রন্থের ভূমিকায় রুদ্র দেবের কাল নিরূপণের  
জন্ত—অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

আয়ুর্বেদের অমূল্যলন—বাহাদুরের জীবন  
ব্রত, পশ্চাৎযুর্বেদের প্রতি আমি তাঁহাদের দৃষ্টি  
আকর্ষণ করিতেছি। পশু-চিকিৎসা সম্বন্ধীয়  
প্রাচীন পুস্তকগুলির প্রচার ও তাহার  
বক্তব্যবাদ সংগন, আয়ুর্বেদের উন্নতির এক  
অপরিহার্য্য অঙ্গ। অতএব, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ  
বিজ্ঞানবের শক্তিশালী পরিচালকগণ—যদি  
আয়ুর্বেদের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎযুর্বেদের ও অধ্য-

য়ন, অধ্যাপনা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ অকস্মাতঃ স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

আমার মত নগণ্য ব্যক্তির লিখিত—এই অক্লিষ্টকর প্রবন্ধ—যাঁচারা এতদূর পর্য্যন্ত দয়া করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অতি ধৈর্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, অতঃপর এইখানেই ইতি করিলাম। \*

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায়  
কাব্যতীর্থ, কাব্যকণ্ঠ যোগবিশারদ।

\* যদিও আমাদের দেশে এখন গো-চিকিৎসার কোনও ধারাবাহিক নিবন্ধ সংগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি পুরাণে যাহা পাওয়া যায়—বর্তমান

ক্ষেত্রে—তাঁহাই যথেষ্ট। সেটুকু রক্ষা করাও কর্তব্য। অথচ এই আমাদের অনেক অমূল্য রত্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আয়ুর্বেদকে সর্বদা স্মরণ করিতে হইলে পণ্ডিত-বেদকেও রক্ষা করিতে হইবে। সুপন্দের মহারাজের মুখেই শুনিয়াছি—Colonel L. A. Waddel নামক একজন বিজ্ঞানসাহী সমন্বয় ইংরাজ ভিক্টোর নামা নগরী হইতে সহস্রাধিক হস্তলিখিত (Mss) পুস্তক সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সেগুলি লণ্ডনের ইতিহাস অফিসের পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে। প্রকাশ—এই সকল পুথির অধিকাংশই আয়ুর্বেদ সংহিতা। ইহার মধ্যে পণ্ড চিকিৎসার কোনও গ্রন্থ আছে কিনা জানি না। কালে এই সকল গ্রন্থ হইতে আয়ুর্বেদের সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য প্রসারিত হইবে, কিন্তু আমরা সে গৌরবের ফলভাগী হইব কি না বলিতে পারি না।

## তিল।

—++—

নামটী ঠিক মনে পড়িতেছেন—সেদিন একখানি মাসিক পত্রে দেখিলাম, একজন লেখক তিল বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের সূচনাতেই লেখক বলিয়াছেন, —“তিল ভারতবর্ষের জিনিষ নহে।” স্বীয় মত সমর্থনের জন্ত লেখক হ’ একটি প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন কোন যুরোপীয় উদ্ভিদ বেত্তার মত—তিল আফ্রিকা দেশ জাত। শত্ৰু,—আরবীয়গণ ভারতবর্ষে তিলের আমদানি করিয়াছিলেন।

বিদেশীরা যাহাই বলুন—কিন্তু আমাদের হিন্দু লেখক কোন্ প্রাণে বলিলেন—“তিল এদেশের জিনিষ নহে” ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র

গ্রন্থে তিল শব্দের ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তিল না হইলে আৰ্য্য ঋষির দৈব কার্য্য, পিতৃ-কার্য্য—কোন কার্য্যই হইত না। আমরা যে “তৈল” ব্যবহার করি—সেই ‘তৈল’ শব্দই তিল হইতে উৎপন্ন। সর্বপ, এরও, নারিকেল প্রভৃতি ফলের শত জাত স্নেহ মাত্রকেই আমরা ‘তৈল’ নামে অভিহিত করিয়া থাকি, পূর্বে কিন্তু তিল জাত স্নেহকেই “তৈল” বলা হইত। পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ, সেই আয়ুর্বেদে তিলের এবং তিল জাত তৈলের আনয়িক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মাহুঘের চর্ম্মোপরি তিলাকৃতি এক প্রকার চর্ম্মরোগ দেখিতে পাওয়া যায়—কর্ম্ম

বাজেরা তাহাকে “তিল কালক” বলেন! তিল কাষ্ঠব ক্ষার ঐ চর্ম রোগের একমাত্র ঔষধ। তিলের প্রলেপে শূল রোগ ভাল হয়। তিলের করু ছাগীদুগ্ধ সহ সেবনে—রক্তাতিসারের রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। তিল বাটা নবনীত সহ শ্বেদ দিলে অর্শরোগে বিশেষ উপকারী। আয়ুর্কোদে এইরূপ অনেক রোগেই তিলের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাওয়া যায়। তিল-তৈলের ত কথাই নাই। “গুড়ুচ্যা দি তৈল” “মধ্যম নাভায়ণ তৈল” “বিষ্ণু তৈল” প্রভৃতি সকল তৈলেই তিল তৈল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে ও তিল কাষ্ঠের জাল দিয়া কবিরাজ মহাশয়েরা “অভয়ালবণ” নামক প্লীহারোগের একটা মহৌষধ প্রস্তুত করেন। আর কত নাম কবিব? তিল যে ভারত জাত শস্ত—এ কথাই প্রমাণ আপনারা হিন্দুর বেদ, পুরাণ, কাব্য, স্মৃতি, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্র এহেই দেখিতে পাইবেন। তথাপি যদি কেহ বলেন,—তিল আফ্রিকার শস্ত, তাহা হইলে আমি বলিব—আগে ঋষিরা সমস্ত এসিয়াটিকেই ভাবতবর্ষ বলিয়া ধরিতেন। তখনকার ভারত বিবট-বিশাল-স্থান ছিল,—এখন ত্রিকোণাকৃতি ভারতের নাম “ইণ্ডিয়া”।

ভারতের ঋষিগণ বলেন,—তিল তিন প্রকার,—শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত। এই ত্রিবিধ তিলের মধ্যে কৃষ্ণ তিলই সর্বোৎকৃষ্ট।

স্থানের অন্নতা বুঝাইতে হইলে হিন্দুরা বলেন,—“তিল স্থানং।” প্রাচীন হিন্দুদের পাক রাজ্যের প্রভৃতি পুথকে তিল হইতে উৎপন্ন অনেক প্রকার শস্ত ও মিষ্টাঙ্গের বর্ণনা আছে। “তিল পিষ্টক” “তিল ভূট” “তিলান্ন” “তিলহোম” “তিলধেয়” “তিল-কাঞ্চন” তিলগড়ক প্রভৃতি শব্দ—কোন

ভারতবাসী না অবগত আছেন? গ্রীক-পর্যটকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া তিলের অস্তিত্ব দেখিয়া গিয়াছেন। সে আজ দুই সহস্র বৎসর পূর্বের কথা। প্লিনি (Plini) বলেন,—সিন্ধ দেশ হইতে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া ভারত জাত তিল যুরোপে চালান যাইত।

পূর্বে গুজরাট প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে তিল-তৈল উৎপন্ন হইত, এবং ঐ তৈল বিদেশে প্রেরিত হইত—খাস ইংরাজ একথা স্বীকার করিয়াছেন।

“আইন-ই-আকবরী” গ্রন্থে শ্বেত ও কৃষ্ণ—এই দুই জাতীয় তিলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান শাসনকালে দিল্লী, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে—প্রচুর পরিমাণে তিলের চাষ আবাদ হইত। বাহ্য ভয়ে আমি অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিবনা। তবে তিল যে ভারতেরই সম্পত্তি, ধাত্তাদি শস্তের সঙ্গে সঙ্গে আর্ধ্যগণ যে তিলের ও চাষ করিতেন,—ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

তিল শিশির-শস্ত অর্থাৎ শীতকালেই ইহা জন্মিয়া থাকে। বেলে মাটিতে তিল রোপণ করিতে হয়। কিন্তু কৃষিতত্ত্ববিদগণ তিল রোপণ সম্বন্ধে সর্বত্র একমত নহেন। মাদ্রাজের লোক ফাক্তনের শেষে তিল রোপণ করে। রোপণের নিয়ম—প্রথমে জমিতে ২৩ বার লাঙ্গল দিয়া কেলিয়া রাখিতে হয়। তাহার পর সেই জমি বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেলে—তাহাতে তিল রোপণ করিতে হয়। এক বিঘা জমির পক্ষে—পাঁচ গোয়া বীজ যথেষ্ট। বপনের ৮১০ দিন পরে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া থাকে। অঙ্কুর বাহির হইলে, চারা

একটু বড় হইলে, মাঝে মাঝে জমি নিড়াইয়া দিতে হয়। গাছ বড় হইলে, তাহাতে ফুল ধরে। সেই ফুল কবিকুশ কৰ্কুক সুল্লরীর নাসিকার সহিত উপমিত হইয়া থাকে।

ফুল হইতে ক্রমে গুটী জন্মে। এই গুটীর ভিতর তিল থাকে। গুটী পাকিলে গাছ শুকাইতে আরম্ভ করে। এই সময় গাছ কাটিয়া এক স্থানে গাদা দিতে হয়। গাছ গুলি বেশ শুকাইয়া গেলে, আছড়াইয়া তিল বাহির করিয়া লইতে হয়।

বঙ্গদেশে মাঘ মাসের প্রথমেই ইহার আবাদ হইয়া থাকে। ঢাকা জেলার লক্ষ্মীয়া নদীর ধারে বহুল পরিমাণে ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে এক বিঘা জমিতে দেড়সের তিল ও দশ সের আমন ধান এক সঙ্গে রোপণ করা হয়। এই উপায়ে প্রতি বিঘা হইতে ৩ মণ তিল পাওয়া যায়। সেখানকার লোকের বিশ্বাস, ধানের সঙ্গে চাষ করিলে তিল নাকি ভাল রকম জন্মায়।

সিন্ধু দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ বিঘা জমিতে তিলের চাষ হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিম দেশে—তুলার সহিত তিলের আবাদ হয়, সেখানে তিলের তৈল খাওয়ার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এদেশের লোক আধিনের শেষে তিল রোপণ করে।

‘বানোগাছের সাহায্যে’ তিল হইতে তৈল বাহির করা হয়। কাঁচা তিলের তৈল কিছু অপরিষ্কার হয় বলিয়া তৈল ব্যবসায়ীগণ প্রথমে তিলকে জলে সিদ্ধ করিয়া লয়। সিদ্ধ করিলে বোসার রং আর কালো থাকে না। তা’র পর তিলকে রৌদ্রে শুকাইয়া তৈল বাহির করিলে, সেই নিকাষিত তৈলের বর্ণ বেশ উজ্জ্বল হইয়া থাকে। বোঝাই এদেশে তিলের

সহিত মসিনা প্রভৃতি ভেজাল দিয়া তৈল বাহির করে।

আসল তিল-তৈলের বর্ণ হরিদ্রাভ, ইহার গন্ধ কখনও বিকৃত হয় না। তিলে olein পদার্থ শতকরা ৭৫ ভাগ বর্তমান থাকে। যদি কোনও তৈলে দণ্ডাগ তিল-তৈল মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে ১ ড্রাম তৈল লইয়া, ঐ তৈলে ১ ড্রাম সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড মিশাইলে মিশ্রিত দ্রব্য হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে।

এদেশে পাক কার্যে, ঔষধে, সাবান প্রস্তুত করিতে, মাখিবার জন্ত ও প্রদীপে জ্বলাইবার জন্ত তিল-তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিলাতে অনেক সময় অলিভ অয়েলের পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধার্থে—কৃষ্ণ তিলের তৈলই উত্তম। কোন কোন ছুট ব্যবসায়ী ঘূতের সহিত তিল-তৈল ভেজাল দেয়। এদেশে বে অলিভ অয়েলের আমদানী হইয়া থাকে, তাহার অর্ধেক প্রায় বিলাতে প্রস্তুত তিল-তৈল। তিল-তৈল—এদেশের বহু গন্ধ দ্রব্যের মূল উপাদান। একগুণ ফুল, তিনগুণ তৈল একত্রে বোতলে পুরিয়া ৪০ দিন পচিলে, ঐ ফুলের গন্ধ তিল-তৈলে মিশ্রিত হয়। এই উপায়ে আমি ফুলের তৈল প্রস্তুত করিয়াছি। আতর প্রস্তুত করিতেও তিল তৈলের আবশ্যক হয়। ফুলের তৈল প্রস্তুত কারীরা তিল ও ফুল স্তরে স্তরে সাজাইয়া, তিল পুষ্পগন্ধ অল্পপ্রতিষ্ট হইলে, সেই তিল হইতে তৈল বাহির করিয়া লয়, ইহার মূল্য কিন্তু বড় বেশী। সচরাচর তিল তৈলে ফুলের আতর মিলাইয়া ফুলের তৈল প্রস্তুত হয়।

সিন্ধু দেশে তিলের তৈল কে দাড়রলী

এই খৈল গো-মেঘ-মহিষাদির পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। তৈলের খৈলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। পঞ্জাবে অনেক গরীব লোক আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া তৈলের খৈল ভক্ষণ করিয়া থাকে।

তৈলেব কক্ক অত্যন্ত বলকারক এবং স্তম্ভ বর্দ্ধক। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়—এই জন্য অর্শরোগীর পক্ষে ইহা অমৃতের ছায়া উপকারী। তিল আমাশয় বোগীর পক্ষেও মনোষধ। পঞ্জাবের চিকিৎসকগণ বাত রোগে এবং ফোটকে তিল তৈল ব্যবহার করেন। তিল তৈল বিরেচক গুণ বিশিষ্ট। ইহার মাটিমে বৃক্ক কোমল হয়, গায়ের আলা কমে, যেদ জনিত দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, শরীর বেশ বিন্ধ হয়।

বড় গামলার এক গামলা গরম জলে, আধপোয়া তিল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, সেই জলে কাট পর্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া থাকিলে, স্ত্রীলোকের বাধক-বজ্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। তৈলের কাথ চিনি সহ সেবনে সর্দি ভাল হয়। মীরটিবাসীরা চক্ষুরোগে তিল তুলের শিশির প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

তৈলের পাতার এক রকম চটচটে পদার্থ থাকে। এই চটচটে জিনিষ যুক্ত-প্রদেশে কলেরা ও আমাশয়ের ঔষধ। পাতা জলে ভিজাইয়া রগড়াইলে চটচটে জিনিষ জলে মিশ্রিত হয়, সেই জল পান করিতে হয়।

তিল পত্রের কাথ কেশ-বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম-এ ।

## গোল-আলুর গৰ্ব ।

[ কবিবর ৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত ] ।

ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ হ'তে ।  
উড়ে এসে জুড়ে আমি ব'সেছি ভারতে ॥  
'পটটিস্' নাম ছিল সাহেবের দেশে ।  
'গোল-আলু' নাম হ'ল বাদ্দালায় এসে ॥  
আনাজের রাজা আমি, মণ্ডল আকার ।  
ভোগীর ভোগের নিধি, সুখের আহার ॥  
স্বভাবতঃ নপুংসক, নাহি মোর বীজ ।  
নিজ রক্তে জন্ম লই বেন 'রক্ত-বীজ' ॥  
শোধিতে প্রেমের ধার মানিনী রাখার ।  
আলু-রূপে কলিতে গোরাঙ্গ অবতার ॥

শিশিরে উদ্ভব মোর কৃষির কুপাতে ।  
পিরীতে প'ড়েছি ধরা, রাখালের হাতে ॥  
সব গুণ সুপ্রকাশ বিষ্ণু আংশ ব'লে ।  
প্রেম-ভরে আ-চণ্ডালে তুলে লই কোলে ॥  
কিবা হিন্দু, কিবা মুসল্লি, বত আতি আছে ।  
আলুর আদর দেখ, সকলের কাছে ॥  
'আরিস্' \* গণের আমি প্রধান সম্বল ।  
অন্নের সমান গুণ ধরি অবিকল ॥

\* আইরিস্ ।

মাংস কটী কোথা পা'বে দীন হৌল যা'রা।  
 পেট ভ'রে আলু খেদে বেঁচে থাকে তা'রা।  
 আমাদের 'বয়েল' ক'রে বিক্ রোষ্ট দিয়া।  
 ছেলে বুড়া আদি সব খায় চিবাইয়া ॥  
 বাঙ্গালীর মত কেউ রাঁধিতে নাহি জানে।  
 মৌলিক মোরসী তাই আমার এখানে ॥  
 আনাড়ী 'কুকের' হাতে মসলা না মিলে।  
 'হাজিরার' কালে, করে হাজির টেবিলে ॥  
 অঙ্গ করে আলিঙ্গন রসবতী রাই +।  
 আধসিদ্ধ হ'য়ে তবু স্নত কিছু পাই ॥  
 ব'সে হোটেলের 'সপে' সঙ্গে ল'য়ে মিস্।  
 মুখে দেয় বুক কাঁটা, মুখে কিস্ত পিস্ ॥  
 নিজে ব্যথা পেয়ে, তুবি অপরের মন।  
 মহৎ কে আছে বল আমার মতন ॥  
 যাতে দাও তা'তে আছি, কটী লুচী ভাতে।  
 "একমেবাবিতীয়ম্" ব্যঞ্জন মজা'তে ॥  
 ঝোলে-ঝালে-অধলেতে করি বিচরণ ॥  
 চকুড়ীতে শুক তন্ন 'সুতার' কেমন ॥  
 আলু-ভাতে মেখে কেহ কাঁচা লঙ্কা দিয়া।  
 হ' রেক ‡ চালের অন্ন দেয় উড়াইয়া।  
 চাকা চাকা ক'রে যদি ছাঁকা তেলে ভাজে।  
 জিলাপী পলায় দূরে হেরে মোরে লাজে ॥  
 রুপণ-গৃহিণীগণ যে গেছে বিরাজে।  
 সিদ্ধ ক'রে অন্ন তেল দিয়ে তারা ভাজে ॥  
 কাজেই সোণার অঙ্গ জ'লে গুড়ে যায়।  
 নিজ দোষে, পোড়া-মুখে, পোড়া আলু খায় ॥

+ মাষ্টার্ড।

‡ কাঠা বা পালি।

উড়েনীর মত গায়ে হসুদ মাখিয়া।  
 মদের দোকান পাশে ব'সে থাকি গিয়া ॥  
 "আলু দম" বলে তা'রে রসিক সৃজন।  
 মুখে দিলে খুসী বড় মাতালের মন ॥  
 কচুরীর সঙ্গে প্রেম খোঁড়াব দোকানে।  
 বৃথা জন্ম তা'র, তা'র 'তার' যে না জানে ॥  
 সুবর্ণ বণিকগণ নহে মাংসাহারী।  
 আমিই তা'দের ঘরে শ্রেষ্ঠ তরকারি ॥  
 বর্ষাকালে ভর্সা আমি—অধম-তারণ ॥  
 অনেকেরই হয় তাই জীবন ধারণ ॥  
 পরম গোসাই যিনি পাঠা নাহি খান।  
 অজা-রসে ভিজা আলু খেয়ে মজা পান।  
 সধবা—বিধবা ভেদ নাহি রাখি মনে।  
 সমভাবে সদালাপ সকলেরই মনে ॥  
 পাঞ্জ দিয়া রাঁধে মোরে প্রেমিক-যবনে।  
 গোপনে সে রসে মজি হিন্দুর ভবনে ॥  
 কোন স্থান পুড়ে গেলে, আলু বেটে দিবে।  
 ফোন্স কত্ব হবেনাক, জালা জুড়াইবে ॥  
 শুচি-বেয়ে-মাগী গুলা জল ঘেঁটে মরে।  
 হাত পা'র আঙ্গুলে তা'দের হাজা ধরে।  
 আলু পোড়া সে রোগের পরম ঔষধি ॥  
 হ'বেলা প্রলেপ তা'র দিতে পার যদি ॥  
 যে ভজে আমার তা'র বুদ্ধি হয় বল।  
 মহিমা না জানে শুধু পেট-রোগী দল ॥  
 বহুশ্রুত মোগী যা'রা—অতি অভাজন।  
 আমাদের ডরায় তা'রা যমের মতন ॥



## বৈজ্ঞানিক-স্মৃতি ।

—\*—

অনেক দিন ধরিয়া, প্রায় সমস্ত সভ্য-জগতে,—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ক্রম-বিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে ; আমাদের এই বঙ্গদেশকেই উক্ত বিকাশের কেন্দ্রস্থল বলিলে বোধ হয় অতুক্তি দোষ হয় না। যতদূর অনুধাবন করিতে পারা যায়, তাহাতে আমার মনে হয়, মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে তাহার ক্রমোন্নতি সহ অশেষ কল্যাণময় সনাতন চিরারাদ্য আয়ুর্বেদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রায় বিলোপ-দশায় উপনীত হয়। তৎকালে, যেরূপ দ্রুতগতিতে ইহার অবনতি হইতেছিল, দেশের তদূহ অবস্থা বর্তমান থাকিলে, এতদিনে ইহার অস্তিত্ব থাকিত কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয় হইত।

‘আয়ুর্বেদ’ শত সহস্র বাস্তব-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও, এখন আত্মনির্ভরক্ষম এবং প্রায় সার্বজনীন সভ্য স্বরূপে প্রতীত হইয়াছে। যুরোপ ইউরোপ আদি বিজ্ঞানময় রাজ্যের অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও এক্ষণে আয়ুর্বেদকে একটা দর্শন ও আলোচনার বিষয় মনে করিয়া, ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

ইহাতে আমাদেরই সমধিক গৌরব। যাহা হেতু “আয়ুর্বেদ” আমাদেরই পুরুষাত্মক সঞ্চিত সম্পত্তি, রক্ষণাবেক্ষণের দোষে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছিল, কিন্তু অনুকূল-কাল-প্রবাহে তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত হওয়া আমাদেরই পক্ষে কৃতজ্ঞতা বলিতে হইবে। গোপ আয়ুর্বেদ-সিদ্ধ বর্তমানে যেভাবে মন

করা হইতেছে, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে সাফল্য-রত্নের আশা করা যায় কি না,—সম্প্রতি এতদ্বিষয়ের পর্যালোচনা ও তদনুসারে কর্তব্য নির্ধারণ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। সেইজন্য আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নিজ নিজ স্বার্থ-সাধন জন্ত এসময়ে এই জাতীয় মহা গৌরবের প্রতিকূলে যাহাতে আমরা আমাদের শক্তির লেশমাত্রও অপব্যবহার না করি, তৎপ্রতি বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। অনেক সময় অনেকে নিজের দোষ নিজে দেখিতে পায় না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং কোনও সংপ্রদর্শক যদি তাহা দেখাইয়া দেন, তাহাতে তৎপ্রতি বিরক্ত না হইয়া কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আমরা ভ্রম বা অনবধানতা বশতঃ অথবা স্বার্থপরতা-মোহে যুক্ত হইয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মর্যাদা যথেষ্ট লঙ্ঘন করিতেছি, কেহ জানেন অতাবে, কেহ কর্ম্ম-ভ্রাস অতাবে, কেহ উক্ত উভয়বিধ অতাবে, কেহ বা লোভের বশবর্ত্তিতার, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে এমন বিকৃতাবস্থায় পরিণত করিতেছে যে, তাহা চিন্তা করিলে কোন লবণবান্ই স্থির থাকিতে পারেন না। আয়ুর্বেদের মোহাই দিয়া, যেচ্ছাচার-কুঠারা-বাতে, আয়ুর্বেদকেই ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। এই প্রকার যথেষ্টাচারী হিতাহিত-বোধ-বর্জিত-কুবেত্তাগণ ধেরূপ অপ্রতিহত গতিতে আয়ুর্বেদকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে, জানি না, কোন্ অপার্থিবশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা কোন্ মহাপ্রভাববলে ইহা উদ্ধার পাইতে

সমর্থ হইবে। আয়ুর্বেদ কি ? তদ্বিধিবিহিত কর্তব্যই বা কি ? বৈজ্ঞ কাহাকে বলে ? বৈজ্ঞের বিধের ও দায়িত্ব কি ? অধিকাংশ কবিরাজই ইহার খবর রাখেন না। অথবা এতদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাবে কোনরূপ কার্যেরও অঙ্গুবিধা মনে করেন না, ইহা অপেক্ষা আয়ুর্বেদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আর কি করনা করা যাইতে পারে ? যে শাস্ত্রের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই, বৈজ্ঞকে স্বীয় কর্তব্য-সাধন বিষয়ে ভূয়ো ভূয়ো সতর্ক করিয়া দিতেছে, গুরুতর দায়িত্ব বিষ্মত হইয়া বৈজ্ঞ অগণ্যে স্থলিত পদ না হন, সেইজন্য পুনঃ পুনঃ সহপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতেছে, আমরা কিন্তু সেই জগদারাদ্যা, দেবতুল্য ঋষি-দের সংশ্লিষ্ট ও অনুশাসন বাক্য অসংকোচে লক্ষ্যন করিয়া, অশাস্ত্রীয় যথেষ্টাচার-বিহিত রূপে বিচরণ করতঃ মানব জীবনকে একটা অকিঞ্চিৎকর জীড়া-পুতলিকা মনে করিয়া, উহার ভবের খেলা সাজ করাইয়া দিতেছি,— ইহাপেক্ষা দেশের অধোগতি আর কি হইতে পারে ?

মহর্ষি মুশ্রুত বলিয়াছেন,—

শাস্ত্রং গুরুমুখোদগীর্ণমাদারোপাত্ত চাসকৃৎ ।

যঃ কৰ্ম্ম কুরুতে বৈজ্ঞঃ স বৈজ্ঞোহস্ত্রোতু তস্করাঃ ॥

অর্থাৎ—আচার্যের মুখ হইতে উপদিষ্ট শাস্ত্র যথার্থ ভাবে গ্রহণ করতঃ পুনঃ পুনঃ তদনুষ্ঠিত বিধির অঙ্গুশীলন করিবে এবং পরিণামে তদ্বিষয়ে অন্তঃকরণ সংশয় বর্জিত হইলে, বৈজ্ঞ চিকিৎসা-ব্যাপারে অধিকার লাভ করিতে পারিবেন, উল্লিখিত বিধির বহির্ভূত বৈজ্ঞ, কেবল বৈজ্ঞান্যের অযোগ্য নহে, পরন্তু শাস্ত্রকার তাহাকে তস্কর নামে অভিহিত করিয়াছেন। শাস্ত্রকার যদিও

এতাদৃশ বৈজ্ঞকে তস্কর মাত্র বলিয়াই ক্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু বাস্তব পক্ষে উক্ত ব্যক্তি সামান্য তস্কর নহে। সাধারণতঃ তস্কর মানবের পার্থিব সম্পত্তি মাত্রই অপহরণ করে, কিন্তু ঈদৃশ তস্কর-বৃত্তি-বৈদ্যা অর্থসহ অমূল্য জীবন রত্নেব অপহরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কি ভয়ানক হিংস্র তস্কর ! বাস্তবিক বৈদ্যবৃত্তি সহজ সাধ্য নয়। কেবল আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নকারী চিকিৎসক নিজবৃত্তি পরিশীলনে অধিকার লাভ করিতে পারেন। আয়ুর্বেদে সম্যক অধিকার অর্জন করিতে হইলে, ব্যাকরণ, সাংখ্য ও বৈশেষিকাদি দর্শন-শাস্ত্রে ও ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে। নতুবা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অধিকার জন্মিতেই পারে না। চরকাদি বৈদ্যকসংহিতার ভাষা সরল নহে; শব্দশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা ব্যতীত কেহই উহা জদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ সাংখ্য ও বৈশেষিকাদি দর্শন-শাস্ত্রের সহিত আয়ুর্বেদের সম্বন্ধ অলঙ্ঘনীয়। ফলতঃ দর্শন-শাস্ত্রকে আয়ুর্বেদের প্রাণ বলিলেও অতুক্তি হয় না। এই নিমিত্তই মুশ্রুত সংহিতাকার বলিয়াছেন—

একং শাস্ত্রমধীরাণো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্রনিশ্চয়ং ।

তস্মাদ্ বহুশ্রুতঃশাস্ত্রং বিজানীয়াচ্চিকিৎসকঃ ॥

অর্থাৎ—কেবল আয়ুর্বেদ অধ্যয়নে শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। প্রয়োজনানুসারে ব্যাকরণ-দর্শনাদি অপরাপর যে যে শাস্ত্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে, সেই সেই শাস্ত্রেও ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যিক। অতএব বহু শাস্ত্রার্থ বেত্তা ব্যক্তিই প্রকৃত চিকিৎসক হইতে সমর্থ। ইহাই যথেষ্ট নহে, বৈজ্ঞকে প্রাতি পদ-বিজ্ঞানে সতর্ক করিয়া দিবার নিমিত্ত ও সাধারণ জনগণকে বৈদ্য-নির্বাক্সন সর্বদা

অভিজ্ঞান-প্রদানের অল্প বৈদ্যক-শাস্ত্রে ভূরি ভূবি প্রমাণ-প্রয়োগ আছে ।

সুশ্রুত সংহিতা—সুত্রস্থান—৩য় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এইরূপ—

যে বৈদ্য চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, কিন্তু চিকিৎসা কর্মে ( ঔষধাদির উপযুক্ত বিধানানুসারে প্রস্তুত করণে ও স্বর্ণাদি ধাতু বা উপধাতু সমূহের জারণ, মারণ, শোধনার্থ কর্মে এবং তৈল, ঘৃত, মোদক, গুড়, আসব, অরিষ্ট, চূর্ণ ও বটিকাদির যথা নিয়মে প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধানে ) অবহেলা করতঃ অনভ্যস্ত হইয়াছে, তাদৃশ বৈদ্য কদাপি চিকিৎসক নামের যোগ্য নহে ।

যুদ্ধ-নীতি-বিশারদ—অথচ কোন দিন স্বয়ং রণস্থল দর্শন করেন নাই—এরূপ ব্যক্তি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া তত্রতা ভয়াবহ ব্যাপার-সন্দর্শনে যেমন ভয়বিষ্ট ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়, চিকিৎসা-কর্মে অনভ্যস্ত কেবল শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যরও রোগি-সমনীপে তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয় । পক্ষান্তরে যে বৈদ্য যথারীতি চিকিৎসা কর্মে অভ্যস্ত, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান পরাশ্রুত,—তাহারও চিকিৎসাকার্যে অধিকার নাই । আর্ধ্যযুগে, উক্ত উভয়বিধ বৈদ্যই রাজ-শাসনে, প্রাণদণ্ড পর্যন্ত প্রাপ্ত হইত । ইহাদিগকে অর্দ্ধ শিক্ষিত ও এক পক্ষহীন পক্ষীর জ্ঞান, অকর্মণ্য বলিয়া শাস্ত্রকার প্রমাণ করিয়াছেন । অমৃতোপম জীবনপ্রদ ঔষধ ও কালান্তক বম-সদৃশ মূর্খবৈদ্য প্রযুক্ত হইয়া, বজ্র ও বিষবৎ, মানবের প্রাণ বিনাশের হেতু হয় । অতএব এতাদৃশ বৈদ্য দ্বারা কদাপি চিকিৎসা করান কর্তব্য নহে ।

সেহাদি কর্মে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত

স্নেহন, স্বেদন, বমন, বিরচন ও অগ্নুবাসনা-দির প্রয়োগ বিষয়ে অপারদর্শী অথবা তৈল-ঘৃতাদির পাক কর্মে অনিপুণ, ও শস্ত্রাবচরণে অনভিজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে, উহা তদদেশীয় রাজারই অপরাধ স্বরূপে গণ্য হইত । কারণ রাজার অনবধানতা দোষেই তাদৃশ অনধিকারী বৈদ্য রাষ্ট্রমণ্ডলে রাজ্যবিধি বহি-ভূত হইয়াও অনধিকার চর্চার অধিকারী হইতে সমর্থ হইত ।

বৈদ্যের দায়িত্বের গৌরব বিষয়ে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

“মাতরং পিতরং পুত্রান্ বান্ধবানপিচাতুরঃ ।

অথৈতান্ পরিশঙ্কেত বৈদ্যে বিশ্বাসমেতি চ ॥”

মহুঘ, ব্যাধিক্রিষ্ট হইলে, যজ্ঞাণ্য লাঘব-বিষয়ে মাতা, পিতা, পুত্র ও বান্ধবদিগের প্রতিও বিশ্বস্ত হৃদয়ে নির্ভর করিতে শক্তি হয় । শরীর-তত্ত্বাভিজ্ঞতা এবং রোগোপনয়ন-শক্তি-ব্যতীত কেবল স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি, বাৎসল্য বা আত্মীয়তা-প্রদর্শনে রোগার্থের যাতনা নাশের সম্ভাবনা নাই । ইহা নিশ্চয় জ্ঞান করিয়াই রোগী নিঃসন্দেহ অন্তঃকরণে, বৈজ্ঞের হস্তে আত্ম সমর্পণ করে । অনেক স্থলে এই রূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস বশতঃ অভীষ্ট-চিকিৎসকের দর্শন-স্পর্শনেও রোগী রোগ-যজ্ঞাণ্য উপশম বোধ করে ।

এখন একবার চিন্তা করুন, পাঠক ! বৈজ্ঞের দায়িত্ব কি ? বৈদ্যের বৈজ্ঞত্ব কোথায় ? যাহার নাম শ্রবণে, রোগপীড়িত ব্যক্তি পুলকিত হয়, যাহার দর্শনমাত্রে ব্যাধি-যাতনার উপশম অস্বভূত হয়, তাদৃশ বৈদ্যের মহত্ব ও পারদর্শিতার পরিমাণ একবার স্মরণ করিয়া, এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের আলোচনা করুন,—ইহাই একান্ত প্রার্থনা ।

এতৎ প্রসঙ্গে বৈদ্যকশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় চরক-সংহিতার অভিপ্রায় সম্বন্ধে ২১১টা কথা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলামনা। চরকসংহিতাকার বলিতেছেন,—

“দেশ কালামুসারে ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রকৃতির বিশেষত্ব অনুধাবন পূর্বক যিনি ঔষধ প্রয়োগে সমর্থ,—তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক। পাত্ৰাপাত্ৰ অথবা প্রয়োজ্য ঔষধের গুণাদির পরিচয় না জানিয়া, ঔষধ প্রযুক্ত হইলে, উহা শত্রু, বিষ, অগ্নি ও বজ্রের স্থায় রোগীর প্রাণ-নাশক হয়; অথচ সুবিজ্ঞাত হইয়া, ব্যাধি ও প্রকৃতির অনুকূলে ব্যবহৃত হইলে, পীড়ানাশক, জীবনবর্দ্ধক অমৃতরূপে পরিণত হয়। নাম, রূপ বা গুণাদির দ্বারা অজ্ঞাত, কিম্বা বিজ্ঞাত হইয়াও অবধাবস্থায় দ্রুতযুক্ত ঔষধ কোন উপকার সম্পাদন করেনা, প্রত্যুত উহা অনর্থেরই কারণভূত হয়। সুতীত্ৰ-সর্পাদির বিষও প্রয়োগনৈপুণ্যে রোগহারী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হয়, আবার সুধোপম ভৈষজ্যও অবধা-প্রয়োগে বিষত্ব প্রাপ্ত হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করে। অতএব প্রয়োগ-জ্ঞানহীন-মূর্থ বৈদ্য প্রযুক্ত ঔষধ প্রাণান্তে ও সেবন করা বিধেয় নয়। দীর্ঘজীবন ও সুস্থতাভিলাষী, বিশেষ পরীক্ষিত বৈদ্যকেই চিকিৎসা কর্ষে বরণ করিবেন। ইন্দ্রের

বজ্র মস্তকে পতিত হইলেও কদাচিৎ কেহ ত্রাণ পাইতে পারে, কিন্তু অনভিজ্ঞ কুবৈদ্য-চিকিৎসা-ক্রান্ত ব্যক্তি কখনই জীবন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার আশা করিতে পারেনা। ব্যাধি-যন্ত্রণাক্রিষ্ট-অকর্মণ্য দশায় শয্যাশায়ী, বিযুক্ত-হৃদয় রোগীর প্রতি, যে যথেষ্টাচারী, মূঢ় বৈদ্য প্রাজ্ঞাভিমানী হইয়া নিজের অপরিজ্ঞাত ঔষধ প্রয়োগ করে, ধর্মহীন, হুবাচার সংসারের মৃত্যুরূপধারী তাদৃশ বৈদ্যের সহিত সম্ভাষণ করিলেও নিরয়গামী হইতে হয়। যথার্থ চিকিৎসক পদলাভেছু বৈদ্য উক্ত দোষ সমূহ পরিহারকরতঃ, বৈদ্যবিহিত গুণ সম্পন্ন হইবেন, যাহাতে মানবগণ জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার সমর্থ হইতে পারেন, তাহাই একমাত্র তাঁহার জীবনব্রত। এই পবিত্র ব্রতপরায়ণতা গুণে তিনি ঐহিক ও পারত্রিক সুখের অধিকারী হইবেন। ফলতঃ বাহা হইতে ব্যাধির যাতনা প্রকৃতরূপে উপশমিত হয়, তাহাই যথার্থ ঔষধ, আর যিনি তাদৃশ ঔষধ-প্রয়োগে রোগীগণকে রোগ যাতনা হইতে মুক্তিদান করেন,—তিনিই যথার্থ বৈদ্য।”

কবিরাজ শ্রীঅমৃত লাল গুপ্ত

কাব্যতীর্থ, কবিভূষণ।

# কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয় ।

( পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর )

আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, চরক মতে সংপ্রাপ্তি ও সামান্য লক্ষণে সর্বত্রই বেদনার প্রাবল্য বরং বাতলিপ্তের মধ্যে বিশেষতঃ ও ত্তিককৃ শব্দে “অতি” এই বিশেষণ সন্নিবেশানুসারে অন্ততঃ বাতরক্তের বাতলিপ্তে স্থপ্তি লক্ষণ চরকের অল্পমত নহে—ইহা অনায়াসেই বলা যায়। বিশেষতঃ চরকোক্ত কুষ্ঠের ইতর ব্যাবর্তক লক্ষণ—“বিশেষতঃ” স্পর্শনম্নাগাম্—এই বাক্যের সহিত বিরোধ-ভঞ্জন এবং “বিশেষতঃ” এই বিশেষণের সার্থকতা ও গৌরব বক্ষা করিতে হইলে বলিতেই হইবে, বাতরক্তের স্থপ্তি লক্ষণটী সাময়িক \* এবং ঈষদাত্র হইয়া থাকে। চরকোক্ত কক্ষ লক্ষণে যে স্থপ্তির কথা আছে, সে সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা অপরিহার্য। “স্থপ্তির্মন্দা চ কক্ষ” —এই বচন সন্নিবেশ-প্রণালীতেও তাহাই প্রত্যত হয়। মন্দা এই বিশেষণটীর স্থপ্তি ও কক্ষ এই দুইটী বিশেষ্য বা লক্ষণের মধ্যবর্তিত্ব এবং ‘মন্দা’ এই বিশেষণের পরই সমুচ্চর হৃচক চকাব নিবেশ দ্বারা “মন্দা স্থপ্তির্মন্দা চ কক্ষ” এই অর্থই প্রতিপাদিত হয়। মন্দা শব্দটী কেবল কক্ষের বিশেষণ—চরকের একরূপ অতিপ্রায় থাকিলে ‘স্থপ্তিচ্চ মন্দকক্ষ কক্ষ’ এইরূপ বচন সন্নিবেশ হইত। বাগ্‌ডট বোধ হয় এই তর্ক পরিহারের জন্য কক্ষ লক্ষণে “স্থপ্তি-মিত্ত্বশীততাঃ কণ্ডূর্মন্দা চ কক্ষ” এই পাঠ বচনা করিয়াছেন। নিদানকার মাধবকর ও

\* অর্থাৎ বাতরক্তে পদব্রম স্পর্শসহ হয় এবং স্থগীভবন ব্রমণ, বিদীর্ঘবৎ বেদনা, শুষ্কতা ও স্থপ্তিযুক্ত হয়।

বাগ্‌ডট-বচনই অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর্শনতরৈধ বিচারে সংগ্রহকারের মত বিচার অনাবশ্যক, কেননা সংগ্রহকারের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই।

বাতরক্তের দ্বিতীয় ভেদক লক্ষণ—ইহা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সন্ধিসমূহকে আক্রমণ করে।

তত্ত্ব স্থানং করৌ পাদাবল্ল্যঃ সর্বসন্ধয়ঃ ।

বাতরক্তের আক্রমণ স্থান হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, অঙ্গুলীসমূহ ও সমস্ত সন্ধিস্থল।

তদ্‌দ্রবত্বাৎ সরস্বাত্য দেহং গচ্ছন্ত শিরায়ণৈঃ পর্কস্বভিত্তং ক্রুদ্ধং বক্রত্বাদবতিষ্ঠতে—

রক্তের দ্রবত্ব ও প্রবহন-শীলতাবশতঃ সেই বাতরক্ত শিরাপথে গমন করিয়া পর্ক স্থানের বক্রত্বহেতু রুদ্ধ ও দৃষিত হইয়া অবস্থান করে। “করোতি দ্বঃখঃ তেষেব তন্মাত্ প্রায়েণ সন্ধিস্থ”

সেই কারণে প্রায়ই সেই সমস্ত সন্ধিস্থানে বেদনা উৎপাদন করে।

ধমন্তুলীসন্ধীনাং সন্ধোচঃ :.....

ধমনী অঙ্গুলী ও সন্ধিস্থানের সন্ধোচ হয়। রক্তমার্গে নিহন্ত্যন্ত শাখাসন্ধিস্থ মাক্তঃ নিবেশঃ.....

হস্ত-পদাদির সন্ধিস্থানে বায়ু অবস্থান করিয়া রক্তের পথ রুদ্ধ করে।

[ চরক বাতশোধ চিঃ অঃ ]

এবং বাতরক্তের পূর্বরূপে —

সন্ধি শৈথিল্যমালস্তং সদনং পিড়কাক্ষয়ঃ  
সন্ধিস্থানের শিথিলতা, অলসতা, অবসাদ  
পিড়কা প্রাক্ত্যব হয়।

আয়ুজ্ঞজ্ঞোক্তাংস হস্তপাদাঙ্গসন্ধিস্থ

নিস্তোদঃ ক্ষুব্ধং ভেদঃ.....

জাম্বু জলদা, উরু, কটি, স্বক্ক, হস্ত, পদ ও শরীরের সন্ধিসমূহে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্পন্দন, বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়।

তৃতীয় ভেদক লক্ষণ :—

কণ্ডুঃ সন্ধিস্থ কণ্ডুভূত্বা নশ্রুতি চা সত্ত্বং  
বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তিবাতাস্ক পূর্বলক্ষণম্

[ চরক বাতশোথ চিকিৎসা অধ্যায় ]

এই শ্লেষাক্ত বচনটীষ বাখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য আছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা এই— চুলকানি হয়, সন্ধিস্থান সমূহে পুনঃ পুনঃ বেদনা হইয়া প্রশমিত হয় এবং বিবর্ণতা ও মণ্ডলোৎপত্তি হয়। কিন্তু কুষ্ঠরোগের পূর্ব-রূপের মধ্যে “অন্নানামপি ব্রণানাম্ হৃষ্টিরসং-রোহণঞ্চৈতি” অর্থাৎ অতি সামান্য ব্রণেরও হৃষ্টি এবং অন্তঃকতা (চরঃ কুষ্ঠনিঃ) এই লক্ষণ আছে। বস্তুতঃ কুষ্ঠরোগের মণ্ডল বা ব্রণ একবার উৎপন্ন হইলে আর শীঘ্র সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না—ইহা কুষ্ঠরোগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অশ্রুত কুষ্ঠ পূর্বরূপে বলিয়াছেন,—“যত্র যত্র চ দোষো বিকিপ্তো নিঃসরতি তত্র তত্র মণ্ডলানি প্রোহ্তবন্তি এবমুৎপন্ন স্তি দোষস্তত্র চ পরি-বুদ্ধিঃ প্রাপ্য অপ্রতিক্রিয়মাণোহভ্যন্তরং প্রপি-পদ্যতে ধাতুন্ দুষয়ন” (কুষ্ঠনিঃ) অর্থাৎ যে সমস্ত স্থানে দোষ প্রস্রুত হইয়া বহির্গত হয় সেই সমস্ত স্থানে মণ্ডলসমূহ উৎপন্ন হয় এবং এই ভাবে তাকে দোষ উৎপন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং প্রতীকার করিতে না পারিলে দেহের ধাতু-সমূহ দূষিত করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাই চরক বলিয়াছেন ‘কুষ্ঠং দীর্ঘরোগানাম্’ (চরক সূত্রং যজ্ঞঃ পুরুষাধ্যায়) দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগনিচয়ের মধ্যে কুষ্ঠ সর্ব প্রধান।

কুষ্ঠের সহিত বাতরক্তের পার্থক্য রাখিতে হইলে ঐ বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। “কণ্ডুঃ সন্ধিস্থ কণ্ডু বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তিচ্চ অসক্কদ ভূত্বা ভূত্বা নশ্রুতি অর্থাৎ এই সমুদয় লক্ষণই বারংবার প্রকাশিত হয় ও নিবর্ত্তিত হয়। এই ব্যাখ্যায় ‘নশ্রুতি’ এই শব্দের অর্থ্য পূর্ববর্তী লক্ষণাবলী এবং পরবর্তী হই-লক্ষণের মধ্যে সমুচ্চয়সূচক ‘চ’কার সন্নিবেশের সার্থকতা লক্ষিত হয়, গুরুত্বপূর্ণের বচনের সহিতও এক বাক্যতা রক্ষিত হয় \* সূত্ররায় পুনঃ পুনঃ প্রকাশ ও উপশম এই পূর্বরূপটি ও বাতরক্তের বিশিষ্ট ভেদক লক্ষণ।

এক্ষণে আমরা কুষ্ঠ ও বাতরক্তের পরস্পর ভেদ-নিদর্শক লক্ষণসূচীবিজ্ঞাস করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

## কুষ্ঠ।

- ১। স্পর্শ শক্তির অভাব হয়।
- ২। একবার আরম্ভ হইলে শীঘ্র (প্রতি-কার না করিলে) উপশমিত হয় না।
- ৩। ত্বক্-সঙ্কোচ, করতঙ্গ ও অঙ্গু-পতন হয়।
- ৪। নাসা, কর্ণ, হস্ত প্রভৃতি অঙ্গের পতন হয়।
- ৫। আক্রমণের কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। মুখমণ্ডলে অনেক সময় দেখা যায়।

## বাতরক্ত।

- ১। অত্যন্ত বেদনা হয়।
- ২। পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত ও উপশমিত হয়।

\* গুরুত্বপূর্ণাণাম্ পূর্ববৎ ১১১ অধ্যায়ঃ।

৩। ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিস্থানেব বক্ষতা  
সঙ্কেত হয় ।

৪। অঙ্গপতন কখন হয় না ।

৫। প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সন্ধিস্থল  
আক্রান্ত হা। হস্ত পদ ও অঙ্গুলি বিশিষ্ট  
অধিষ্টান। বাতবস্ত্র কখনও যুগে হয় না ।

### কূঠ ।

৬। অক্ষিবোগ ( চক্ষুর লোহিতা )  
হইয়া থাকে ।

৭। আক্রান্ত স্থলে বেদ হয় না ( কচিং  
হয় )

৮। আরম্ভেব নির্দিষ্ট স্থান নাই ।

৯। ক্রিমি জন্মে ।

### বাতরন্ত ।

৬। অক্ষিবোগ হয় না ।

৭। বেদ হইয়া থাকে ।

৮। পাদমূল বা হস্তমূল হইতে আরম্ভ হয় ।

৯। ক্রিমি দৃষ্ট হয় না ।

অনেকে বলিতে পারেন “পাশ্চাত্য চিকিৎসা-  
পারামর্শেব আয়ুর্বেদের ব্যাখ্যা অতি  
অত্যাধ। একপ বিজ্ঞাতীয় সংমিশ্রণ সঙ্গত  
নহে। ঋষিবাক্য ও কি শেষে পাশ্চাত্য  
বিজ্ঞানের কণ্ঠিপ্রস্তরে পরীক্ষা করিয়া লইতে  
হইবে ?” তাঁহাদের নিকট আমার বক্তব্য এই,  
আমি আর্থ বাক্য অপেক্ষা প্রত্যক্ষ চিকিৎসা-  
পারামর্শের সিদ্ধান্ত সমূহ বলবত্তার প্রমাণ বলিয়া  
স্বীকার করিতেছি না। কিন্তু মূল আর্থ  
আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ অধিকাংশই লুপ্তপ্রায়, বাহা  
আছে,—তাহাও সর্বত্র সহজ-বোধ্য নহে এবং  
তজ্জাত চক্রপাণি, ডল্লগ, বিজয়রক্ষিত, অরুণদত্ত,  
শ্রীকৃষ্ণ এবং বাগ্ভট, মাধব ও ভাবপ্রকাশকার

ভাবমিশ্র প্রভৃতি টীাকার ও সংগ্রহকার-  
গণের শরণাপন্ন হইতে হয়, কিন্তু টীাকার ও  
সংগ্রহকারগণও সর্বত্র বিশদ মীমাংসা ও  
ব্যাখ্যা করেন নাই, অনেক স্থানে “দুর্কৌধঃ  
গদগীভ বদ্বিজগতি স্পষ্টার্থমিত্যুক্তিভিঃ” দুর্কৌধঃ  
স্থলসমূহ স্পষ্টার্থ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন।  
আর্থমত বৈধক্ষেত্রে “স্মৃতিবৈধবৎ সর্বং প্রমাণং”  
বলিয়া ( অর্থাৎ দুই স্মৃতিকারের ভেদ চটলে  
উভয়েবই মতের জায় আয়ুর্বেদে আর্থ মত  
বৈধ স্থলে উভয় ঋষির মতই প্রমাণ অর্থাৎ  
গ্রাহ্য ) তর্ক পরিহার করিয়াছেন \*। আমি  
সেস্থলে প্রত্যক্ষ চিকিৎসা-পারামর্শেব আয়ুর্বেদের  
অভিনব টীাকারূপ ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছি,

\* অগত প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিশাস্ত্রের মীমাংসকগণ  
প্রায়ই একের প্রাধান্য অস্ত্রের গোণ্ড স্বীকার করিয়া-  
ছেন। মহাসংহিতার প্রাধান্য দেখাইবার জন্য কুল্লুক ও  
বৃহস্পতি প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বোদার্পোপ-  
নিবন্ধদ্বাং প্রাচ্যাম্ হিমবোঃ স্মৃতমবধি বিপরীতায়  
সা স্মৃতির্ন প্রণতঃ ইত্যাদি। অস্ত্রদিকে বঙ্গীয়  
স্মার্তপ্রধান রত্নবন্দন এক স্মৃতির অনুসরণে অস্ত্র স্মৃতির  
সঙ্কেত ও অর্থবাদ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, যাহা বচনও  
তিনি অর্থবাদ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। কেবল  
আয়ুর্বেদেই সেই তর্ক ও মীমাংসা স্থাপনের চেষ্টা বিশেষ  
লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ আর্থবৈধ ও ইতর বিশেষ আছে।  
সকলেই ভুল্য বল প্রমাণ নহেন। নচেৎ ভগবান্  
পুনর্ব্বহ বিবদমান ঋষিদত্তের সম্ব্যবহা বা মীমাংসকের  
পদলাভ করিতে পারিতেন না। চরকপাণীর তাহা  
অজ্ঞাত নহে। মহর্ষি আত্রেয়ের ষট্ শিষ্য-ঋষিগণের  
মধ্যে “বুদ্ধেবিশেষে তত্ত্বানীং” বলিয়া মহর্ষি অগ্নিবিশেষের  
প্রশংসা বচনও এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে।  
ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের শারীরিকভাবে এইরূপ  
বিচার প্রণালীতেই সাক্ষ্য ও পাতঞ্জলাদির মত খণ্ডন  
করিয়াছেন। সে সকল কথা বলিবার স্থান ও সময়  
এখন নাই।

এবং তাহা করা অসম্ভব ও মনে করি না। “গ্রন্থস্ত গ্রন্থান্তরং টীকা”—ইহা আমাদেরই শাস্ত্রের কথা। চক্রপাণি, ডল্লন, বিজয়রক্ষিত, ত্রীকৰ্ণ, অরুণদত্ত, এবং বাগভট, মাধবকর, ভাবমিশ্র প্রভৃতির তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রকারগণকে সৰ্বাংশেই নিকৃষ্ট বিবেচনা করার কোন কারণ নাই। আর একটা কথা বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না যে, পারলৌকিক পরোক্ষফলক ও ধৰ্ম বিষয়ক শাস্ত্র এবং ইহলৌকিক প্রত্যক্ষফলক শাস্ত্রের বিচার ও অনুশীলনের প্রণালী একরূপ হইতে পাবে না—যে শাস্ত্র লৌকিক প্রত্যক্ষফলক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে তাহা যদি স্থানে স্থানেও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত কর, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রের তৎ তৎ স্থলের সংস্কার আবশ্যক; নচেৎ ঐকান্তিক নিয়মে তাহা লুপ্ত হইবে। শাস্ত্র বাক্য অৰ্থাৎ ঋষি প্রভাব শাসিত এই ভারতবর্ষেও তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অধিক দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই,—এই আয়ুৰ্বেদের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, ভেল, জতুকৰ্ণ, ক্ষারপাণি এবং ঔপধেনব প্রভৃতি কৃত এমন কি মূল অগ্নিবেশ ও সূক্ষ্মত কৃত তত্ত্ব বিলুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়। প্রতি সংস্কৃত চরক ও সূক্ষ্মতসংহিতা অত্ৰাপি বৰ্ত্তমান। শাক্য-সংহিতার এই বচনটা মণিবিগণের অমুকরণ যোগ্য।

কিং তেনাপি সুরবর্ণে কৰ্ণধাতং কৰোতি যং তথাপিং তেন শাস্ত্রেণ যন্ন প্রত্যাক্ততঃ স্মৃটম্ ?

যাহাতে কেবল কৰ্ণ পীড়া উৎপন্ন হয় এমন কুণ্ডলে কি প্রয়োজন? যাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে, সে শাস্ত্রে কি লাভ হয়?

উপসংহারে আমাৰ বিনীত নিবেদন, আমাৰ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা সম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই যে যথার্থ বা প্রামাণিক, আমি এমন স্পষ্টতা বা দাবী রাখি না। কিন্তু আপনাদের মত আয়ুৰ্বেদ প্রবীন সুবীৰ্ণগণের সম্মুখে আমাৰ এই সামান্য প্রবন্ধ পাঠের অধিকার-গৌরব বখন লাভ করিয়াছি, তখন আপনাদের নিকট এ বিষয়ের সমালোচনা ও বিচারের দাবী করিয়া এবং এই বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত স্থাপন—অন্ততঃ রীতিমত আলোচনার সূত্রপাত করিয়া আপনাদিগকে আমাৰ মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই সামান্য প্রবন্ধের ও সাধকতা সম্পাদন করিবেন—এমন স্পষ্টতাও করিব এবং আপনাদের উপর এই দাবী ও এই স্পষ্টতা করিবার অধিকারে বঞ্চিত হইব না—এই আশা লইয়া অত্ৰ এই স্থানেই অবসর গ্রহণ করিতেছি। \*

শ্রীহরেন্দ্ৰনাথ দাশগুপ্ত,  
কাব্যতীর্থ কবিরত্ন।

\* ভ্রম সংশোধন।

মৈত্রী সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে দুইটা গুরুতর মুদ্রাকর অমাদ ঘটিয়াছে। (১) ৩৯৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামের চতুর্থ এবং পঞ্চম পংক্তিতে “...প্রমাণ প্রত্যক্ষ...” এইরূপ বিপর্যাস্তভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে “প্রত্যক্ষ প্রমাণ” হইবে। (২) ঐ পৃষ্ঠার টিপ্সনীতে উদ্ধৃত স্মারসূত্রের বাৎস্তায়ণ ভাষ্যের “ইত্যাপ্তঃ” (টীপ্সনীর ষষ্ঠ পংক্তি) এই অংশের পর “কথ্যার্থেচ্ছায়াঃ সমানঃ লক্ষণম্” এই কথাগুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাই। তজ্জন্ত আমি পাঠকগণের নিকট লক্ষিত আছি।

—লেখক



## মাধবের পঞ্চনিদান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য ।

—:—

মাধবকৃত রুগিনিশ্চয় গ্রন্থের যে অংশ সাধারণের নিকট পঞ্চ নিদান নামে সুপরিচিত, তাহা মহামতি বাগ্ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গ রূদয়ের নিদান স্থানের প্রথম অধ্যায় হইতে সংগৃহীত । কেবল মঙ্গলাচরণ ছাড়া অবশিষ্ট শ্লোক গুলি মাধব অবিকল যেমন বাগ্ভট হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, বাগ্ভট ভেদে ৫৬ক সংহিতাকে মূল করিয়া চরকের গতাংশ পড়ে—শ্লোকাকারে অনুবাদ করিয়াছেন । ৫৬ক সংহিতায় এই অংশের কোন বিশেষ নাম নাই;—বাগ্ভট কিন্তু ইহার নামকরণ করিয়াছেন—“সর্বরোগনিদানম্” । জানি না মূল গ্রন্থে—“সর্বরোগ নিদান” এই শব্দটি ব্যবহৃত হইলেও নাধবনিদানে কেন ইহা পঞ্চ নিদান নামে সমাখ্যাত ? যদিও আত্রেয় সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিজ্ঞানের উপায় সংখ্যায় পাঁচটি মাত্র এইরূপ অবধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধর্মস্তুরি সম্প্রদায়ের মতে, কেবল পাঁচটিই যে রোগ বিজ্ঞানের উপায়, তাহা নহে—আত্রেয়াদি মুনিগণের মতে—

নিদানং পূর্বরূপাণি রূপাণ্যাপশ্য লুপা ।

সম্প্রাপ্তিচেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং

পঞ্চদ্ব্যন্তম্ ॥

কিন্তু ধর্মস্তুরি সম্প্রদায় বলেন—

সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রসরং স্থানসংশ্রয়ম্ ।

ব্যক্তি ভেদঞ্চ যো বেত্তি রোগাণাং

সদবেত্তিষক্ ॥

অর্থাৎ নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয়,

সম্প্রাপ্তি—যেমন একদিকে রোগ-বিজ্ঞানের উপায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেইরূপ অত্র দিকে আমরা দেখিতে পাই—

সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থানসংশ্রয়, ব্যক্তি ভেদ—এই ছয়টিও রোগ বিজ্ঞানের উপায় ।

সুশ্রুত সংহিতায় ত্রণ প্রশ্নাধ্যায়ে এই শ্লোকটি পঠিত হইয়াছে । সুশ্রুত শল্যতন্ত্র, সূত্ররাং ত্রণের বিজ্ঞান ইহার লক্ষ্যবস্ত; সেইজন্ত ভেদ শব্দ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে । ত্রণের সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থান সংশ্রয়, ব্যক্তি ভেদ—ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও আমরা যখন এই ত্রণ প্রশ্নাধ্যায় মনোযোগের সহিত পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই, ত্রণ বিজ্ঞান ইহার লক্ষ্য হইলেও সর্বরোগ নিদানই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে । সূত্ররাং স্বীকার করিতে হইবে, আত্রেয় সম্প্রদায়ের রোগ-বিজ্ঞানের তালিকা এবং ধর্মস্তুরি সম্প্রদায়ের তালিকা সংখ্যায় এক নহে । সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর ইহাতে অতিরিক্ত । প্রতীচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে যাহাকে Pathogenesis বলে—সঞ্চয় প্রকোপ প্রসর তাহাই—Generation and development of diseases । যদিও ইহা সত্য কথা যে, চিকিৎসক যে সময়ে রোগীর চিকিৎসার্থ আহুত হইবেন, সে সময়ে রোগ সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসরের সীমা বা ক্রিয়াকাল অতিক্রম করিয়া স্থানসংশ্রয়ে পর্যাবসিত হয় এবং এই সময় বা এই অবস্থা হইতে চিকিৎসক রোগ বিনিশ্চয়ার্য নিদানাদি বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, সূত্ররাং তাহাকে

নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, সম্প্রাপ্তি ও উপশয় এই—পঞ্চা উপায় অবলম্বন করিয়া রোগ বিনির্গর করিতে হয়, কিন্তু তা' বলিয়া রোগের সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর—এই আত্ম অবস্থাত্রয় শল্যতন্ত্রের ত্রণ বিজ্ঞানেই হউক, আর কায়-চিকিৎসাধিকৃত জ্বরাদি রোগ বিজ্ঞানেই হউক, বিশেষতঃ ত্রণবিজ্ঞানে একবারেই উপেক্ষণীয় নহে—সর্বরোগ নিদানাদিকারে ত্রণ ও যেমন বিচার্য্য বস্তু জ্বর ও তেমনি ।

সুশ্রুত সংহিতার ত্রণ প্রশ্নাধ্যায় চিকিৎসা ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন,—ভগবান্ ধনন্তরির অক্ষয় কীর্ত্তি । যদি ভগবান্ ধনন্তরির এই অধ্যায়স্থত অমূল্য উপদেশ সকল সুশ্রুত সংহিতায় লিপিবদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে আয়ুর্বেদে গ্রন্থের সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করিয়া আমরা সম্যকরূপে জানিতে পারিতাম না, বাতপিত্তশ্লেষ্মার প্রকৃত অর্থ কি?—কি করিয়া ত্রিধাতু অব্যাপন্ন হইয়া শরীর রক্ষা করে এবং ব্যাপন্ন হইয়া শরীরের পতন সংঘটন ও ব্যাধির সমুৎপত্তি ঘটায় ।

প্রতীচ্য বিজ্ঞানের Pathology বর্তমান সময়ে যে প্রশ্নালীর অনুসরণ করিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান—একটু অনুসন্ধিৎসু হইয়া কেহ যদি চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, ভগবান্ ধনন্তরির প্রোক্ত মহত্বপূর্ণ উপদেশ ইহার প্রতি স্তরে অনুপ্রবিষ্ট,—প্রাচ্যের স্মিথালোকে প্রতীচ্য বিজ্ঞান কিরূপ মহিমাযিত !

পূর্বে বলিয়াছি মাধবে বাহা “পঞ্চনিদান” এই আখ্যায় আখ্যায়িত, মূল গ্রন্থ বাগ্ভট্টে তাহার নাম সর্বরোগনিদান । চরক সংহিতায় কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—এই

অংশ জ্বর নিদানে পরিপঠিত । বাগ্ভট্টে সর্বরোগ নিদান আগে, পরে জ্বর নিদান । সুতরাং স্বীকার্য্য “সর্বরোগ নিদান” বাগ্ভট্টের স্বকৃত সংজ্ঞা । জ্বর নিদানে নিদানাদি-পঞ্চ রোগবিজ্ঞানে প্রকৃষ্ট উপায় এবং ইহাতে সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসরের উল্লেখ না থাকিলেও তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু সর্বরোগ নিদান বলিতে গিয়া ত্রিধাতু বা ত্রিদোষের কথা উল্লেখ না করা এবং সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসরের কথা একেবারেই না বলা—সকলই স্বীকার করিবেন—বিড়ম্বনা মাত্র । বাগ্ভট্ট চরকসংহিতার অনুসরণ বা অনুকরণে তাঁহার পঞ্চ নিদানের শ্লোক সকল পরিগঠন করিয়া শেষভাগে ত্রিদোষের পৃথক দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাতের বিভাগ ও কারণ বর্ণনা করিয়া, শেষ একছত্রে মোটামুটি সঞ্চয় ও প্রসরের উল্লেখ করিয়া সর্বরোগ নিদান শব্দের সার্থকতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন । কিন্তু মাধব না এরিক না ওদিক—বাগ্ভট্টের শেষ ১১টি শ্লোক তিনি যেমন তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই, তেমনি সুশ্রুতের ত্রণ প্রশ্নাধ্যায় তাঁহার গ্রন্থে কিংবা টীকাকার গণের টীকায় কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না । সর্বরোগনিদানে সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি জানা উচিত—পঞ্চনিদান বাহার একান্ত উপশর তাহা General Pathologyর অন্তর্ভুক্ত হইতেই পারে না । তাই বলিতেছি—পঞ্চনিদান নামের পরিবর্তন আবশ্যক কি না এবিষয়ে সকলের পরামর্শ গ্রহণীয় ।

লেখক—

আয়ুর্বেদাচার্য্য কবিরাজ গোস্বামী ।

## ব্যাধির অস্বাভাব্য আয়ুর্বেদের মূলমন্ত্র ।

—:—

স্থান ভেদে বিভিন্ন হইলেও কারণের দিক  
হুটে দেখিলে ব্যাধি মাত্রেরই এক । ইংরা-  
জীতে যাহাকে oneness of diseases  
বলে এক অর্থ তাহাই—অস্বতন্ত্র । ভগবান  
ধর্মন্তরির উপদেশ ও এইরূপ । তিনি বলিয়া-  
ছেন,—একই দোষ, স্থানসংশ্রয়ভেদে বিভিন্ন  
আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন ব্যাধির রূপ  
প্রদর্শন করে । এই মতে পদাশ্রিত হইলে  
দোষ রূপের আকার ধারণ করে । সর্বদেহ  
আশ্রয় করিলে জ্বরাদি জন্মায় । আয়ুর্বেদের  
চিকিৎসা তাই দোষের চিকিৎসা—ব্যাধির  
চিকিৎসা নহে । দোষের বলাবলের উপর  
তাই আমাদের সম্ভ্রান্তিবিজ্ঞান । জ্বর যেমন  
বাতাদিরূপে পৃথক্, বৃন্দ, সান্নিপাতিক, অতি-  
সাবও সেইরূপ । কাস, ঘন্সা, হ্রস্বোগ—সমস্তই  
বাতাদিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত নহে ।  
দশমূল পাচনে বায়ুর শাস্তি হয় ; দশমূল সেই  
জ্ঞাত বাতজ্বরে, দশমূল সেইজ্ঞাত বাতব্যাধিতে,  
দশমূল সেইজ্ঞাত আমবাতে ব্যবহার্য্য । যেখানে  
বায়ব প্রকোপ,—সেইখানেই বাতর দশমূল—  
ঔষধ । জ্বরের চিকিৎসায়, ঘন্সার চিকিৎসায়,  
বাতের চিকিৎসায় ধাতু সব গুলিই আছে ;  
শীসা হইতে স্বর্ণ পর্য্যন্ত—তবে—কম বেশী ।  
Oneness of Disease আয়ুর্বেদের Prin-  
ciple । ঔষধও তাই সর্বত্রই একরূপ ।  
তাই ভগবান ধর্মন্তরি তাহার ব্রণ প্রমাণ্যে  
বলিয়াছেন—“তে যদোদর সন্নিবেশঃ কুর্কন্তি  
তদা গুল্ম বিজ্রমি উদরাধিসন্ধানাহ বিহচিকা-  
তিসার প্রতীতীন জনয়ন্তি ।—

বস্তিগতাঃ প্রমেহাশ্মরী মূতাবাতী মূত্রদোষ  
প্রতীতীন \* \* \* \*  
বৃষণাগতা বৃদ্ধীঃ \* \* \* \*  
সর্কাসগতা জ্বর সর্কাসরোগ প্রতীতীন ।

ভবতি চাত্র—

কুপিতানাং হিদোবাণাং শরীরে পরিধাবতাং ।  
যত্র সঙ্গং স্ববৈগুণ্যং ব্যাধি স্তত্রোপ জায়তে ॥

( তত্র বর্ষস্তি মেঘবৎ )

যদি এই কথা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে  
বলিতে হইবে, ব্যাধির বিভিন্নতা নাই । ব্যাধি  
কতকগুলি রূপের ও লক্ষণের সমষ্টিমাত্র ।  
জ্বরাদির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই । বৈষম্যই  
ব্যাধি । সাম্য ও বৈষম্য তাই আয়ুর্বেদের মূল-  
মন্ত্র । ত্রিধাতুর সাম্য এবং তজ্জনিত ক্রিয়া  
আয়ুর্বেদের Physiology । ত্রিধাতুর বৈষম্য  
এবং তজ্জনিত ক্রিয়া ইহার Pathological  
Physiology বা Pathology । সঞ্চয়,  
প্রকোপ, প্রসার ইহার Pathogenesis । স্থান,  
সংশ্রয় ইহার Morbid Anatomy ; পূর্বরূপ  
রূপ ইহার Symptoms । ডাক্তারেরা  
Symptomsকে কোম শ্রেণী বিশেষে  
বিভাগ করেন না, বা করিতে জানেন না ।  
এবিষয়ে একমাত্র আয়ুর্বেদই জগতে আদর্শ-  
স্থানীয় । ধর্ম ছুঁদি হয় কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর  
কেবল আয়ুর্বেদই তাঁহায় ত্রিধাতুর প্রতি  
লক্ষ্য করিয়া দিতে সমর্থ । দোষের অশাংশ  
কল্পনা ও বলাবল আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় সিদ্ধি  
আনিয়া দেয় । “যে চিকিৎসক এই বলাবল ও

অংশাংশ করনায় সিদ্ধহস্ত তিনি চিকিৎসা-  
সংগ্রামে বিজয়ী।

আয়ুর্বেদ বলিয়াছেন, ব্যাধির নাম নির্দেশ  
করিতে না পারিলেও চিকিৎসকের লঙ্ঘিত  
হইবার কারণ নাই। ত্রিদোষের প্রকোপ  
বুঝিলেই যথেষ্ট, এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। হাড়  
কোথায় উচু নীচু, কোথায় কোন্ শির কি

ভাবে গিয়াছে, ইহা শল্যতন্ত্রের আলোচনা-  
বিষয়। কায়-চিকিৎসক কেবল ত্রিধাতুর সাম্য  
বৈষম্য মনশ্চক্রে পরিদর্শন করিয়া, ইহার  
সঞ্চয়-প্রকোপ-প্রসরাদি জানিয়া, সংগ্রামজয়ী  
হইতে পারেন। পারেন যে—তাহার মূলমন্ত্র  
এই *Oneness of Diseases*.

লেখক—

আয়ুর্বেদাচার্য্য কবিরাজ গোস্বামী।

## পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোটকা ঔষধ। \*

—:—

**‘টাকে’র ঔষধ।**—(১) কুঁচের  
মূল বা কুঁচ ফল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত  
মিশাইয়া ‘টাকে’ প্রলেপ দিলে চুল গজাইয়া  
থাকে। (২) হাতীর দাঁত পুড়াইয়া, রসাজ-  
নের সহিত মিশাইয়া মধুসহ ‘টাকে’ প্রলেপ  
দিলে মস্তকের চুল গজাইয়া থাকে।

**মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিবার  
উপায়।**—(১) শিমূল কাঁটা বাটিয়া মুখে  
লাগাইলে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া থাকে।  
(২) মস্তুর দাল ঘুতে ভাজিয়া এবং ছুঁড়ের সহ  
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল  
হয়।

**মেচেতা রোগের ঔষধ।**

(১) কুল আঁটির শাঁস, নবনী, মধু ও গুড়  
একত্র লেপন করিলে মেচেতা রোগ ভাল

হইয়া থাকে। (২) জাম্বল বাটিয়া প্রলেপ  
দিলে মেচেতা রোগ আরোগ্য হয়।

**দন্তশুলে সুব্যবস্থা।**—অধিকতর  
পিপুলের গুঁড়া, এক ভরি গব্যঘৃত এবং দুই  
ভরি মধু একত্র মিশাইয়া মুখে ধারণ করিলে  
দন্তশুলের উপশম হয়।

**কর্ণশুলে ব্যবস্থা।**—(১) কয়েক  
বেলের শাঁস গরম করিয়া কর্ণবিবরে প্রদান  
করিলে কর্ণশুলের শান্তি হইয়া থাকে।  
(২) ছোলঙ্গ লেবুর রস গরম করিয়া কর্ণবিবরে  
প্রদান করিলে কর্ণশুলের যন্ত্রণা নিবারিত হয়।  
(৩) আদার রস গরম করিয়া কর্ণমধ্যে কিয়ৎ-  
কাল রাখিলে কর্ণশুলের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়।  
(৪) রসুন কিম্বা সজিনাছালের রস গরম  
করিয়া কর্ণমধ্যে রাখিলে কর্ণশুলের যন্ত্রণা দূর

\* কোন চিকিৎসক পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ এবং টোটকা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠাইলে, তাহা আদ্য  
সাধারণ পত্র করিব, তবে সেই লক্ষ মুষ্টিযোগ এবং টোটকা তাহার নিজের পরীক্ষিত হওয়া চাই।

হইয়া থাকে । (৫) কলার মাজের রস গরম করিয়া কর্ণবিগ্ৰহে রাখিলে কর্ণশূলের যন্ত্রণার শাস্তি হইয়া থাকে ।

**পাথুরির ঔষধ।**—(১) গোক্ষুর দ্বায়ে গুঁড়া, মধু এবং ছাগ হৃৎ একত্র পান করিলে পাথুরি বোগে উপকার হয় । (২) বাবলশাব মূল ও তালমূল একত্র বাসি জলেব সহিত বাটিয়া সেবন করিলে পাথুরী বোগে উপকার হয় । (৩) নারিকেলের মূল এবং যবক্ষাব একত্র জল দ্বারা বাটিয়া সেবন করিলে পাথুরিবোগে উপকার পাওয়া যায় ।

**প্রমেহে টোটকা।**—(১) পলাশ দুল এক ভবি এবং অর্দ্ধতরি চিনি শীতল জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে প্রমেহরোগে উপকার পাওয়া যায় । (২) জলপূর্ণ একটি নারিকেলের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফটকির চূর্ণ গুলিয়া মুখ বন্ধ করিয়া এক রাত্রি কাদার মধ্যে পুতিয়া রাখিবে । প্রাতঃকালে সেই

জল বারম্বার পান করিলে বহু দিনের মেহ রোগের কষ্ট নিবারিত হয় । (৩) ছুৎ এবং শতমূলীর রস একত্র সেবন করিলে প্রমেহেব শাস্তি হইয়া থাকে । (৪) কণ্টকারির শিকড় বাটিয়া মিছরির সরবতের সহিত পান করিলে প্রমেহের শাস্তি হইয়া থাকে ।

**আগুনে পুড়িয়া যা হইলে ব্যবস্থা।**—(১) তিল এবং যব ভস্ম সমান ভাগে লইয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ স্থানের ক্ষত আরোগ্য হয় । (২) তিলের তৈল আর যব ভস্ম একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে এতদ্রূপ ক্ষতের উপশম হয় । (৩) যব এবং যবচূর্ণ একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে জ্বালায় নিবৃত্তি হইয়া থাকে । (৪) পাকা তেঁতুল গুলিয়া লেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের উপশম হইয়া থাকে । (৫) গোল আলু বাটিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে প্রদান করিলে যন্ত্রণায় আগু নিবৃত্তি হইয়া থাকে ।

## তামাকের অপকারিতা ।

পূর্ণ সংখ্যায় “তামাকের ইতিবৃত্ত” নামক প্রবন্ধে উহার অনিষ্টকারিতার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে । এক্ষণে ইহা বিগত বিবরণ জল্প ডাঃ কিলগের মন্তব্য হইতে নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয় উদ্ধৃত করিতেছি,—

**রক্তের উপর তামাকের প্রভাৱ।**—যে কোন প্রকারে তামাক সেবন করা হউক না কেন, অর্থাৎ কলিকায় সাজিয়া,

হুঁকা-গড়গড়া দ্বারা, বিড়ি-চুরুট ও সিগারেট আকারে বা পাইপ দ্বারা গুঁড়া তামাক সাজিয়া ধূমপান বা নস্ত গ্রহণ বা দোস্তা ভক্ষণ—সকল প্রকারেই এই তামাকের বিষ সত্ত্বর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় । ইহা দ্বারা রক্তের যে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, ডাঃ রিচার্ডসন তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—  
“রক্তকাল তামাকের জ্বাণ লইলে রক্তের যে পরিবর্তন হয়, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া

যায়। ইহা স্বাভাবিক অপেক্ষা তরল হয় এবং কঠিন স্থলে ইহার রক্তিমাত হ্রাস হয়। কোন কোন স্থলে রক্তের এই প্রকার বর্ণ-ভারলা সর্কশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বহিস্কৃত পীতাদ-শ্বেতবর্ণ ও ক্ষীত হয়। রক্তের তারলা বশতঃ ইহার স্রাব অতি সহজেই হয় এবং কর্তিত স্থান প্রভৃতি হইতে বহুক্ষণ রক্ত নির্গত হয়, ঔষধ সেবনেও সহজে বন্ধ হয় না। মলুষা-শোণিতে অসংখ্য রক্তকণিকা থাকে, উহাদের আকৃতি গোলাকার, উভয় দিক খাল, ধারগুলি পরিষ্কার। তামাকের ধূম রক্তে শোষিত হইয়া সত্ত্ব এই সকল রক্ত-কণিকাগুলির গঠনের পরিবর্তন হয়। গোলাকারের পরিবর্তে ডিম্বাকৃতি ও ধারগুলি অপরিষ্কার হইয়া থাকে এবং সুস্থাবস্থার ত্যায় রক্ত-কণিকাগুলি ঘনীভূত না থাকিয়া ইত্যন্তঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে এবং দেহিলেই বৃষ্টিতে পারা যায় যে, এই রক্ত দুর্বল শরীর হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।”

তামাক যে কেবল রক্তের হীনতা ও বিবক্রিয়া সাধন করে এবং তাহার ফলে রক্ত-কণিকাগুলির দুর্বলতা উপস্থিত হয়,—এমন নহে। ইহা হইতে স্নায়ুগুলোর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ারও যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটয়া থাকে।

এইরূপে তামাকের দ্বারা রক্তের হীনতা সাধিত হইয়া, শরীরের রোগ-প্রতিরোধী-শক্তি কমিয়া যায়; সুতরাং সেই অবস্থায় সহজেই রোগ জন্মিতে পারে।

তামাক ব্যবহারের অপকারিতা সকল বয়সেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ববয়সের পূর্বে বা বাল্যাবস্থায় ইহার অপকারিতা আরও বেশী। ইহা দ্বারা শরীরের বর্দ্ধন-শক্তির হ্রাস, অকাল-বার্দ্ধক্য ও দৈহিক-দৌর্বল্য উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের জনৈক ইংরাজ কণ্ঠস্রাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন অভিযাত্রায় ১১ জন কণ্ঠস্রাবী প্রেবিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১ জন মাত্র সুস্থ শরীরে ফিবিয়া আসে। সেই ২ জন তামাক সেবন করিতেন না।

**ধূমপানীদের গলক্ষত**  
(Smoke's Sorethroat)—ধূমপানীদের মুখগহ্বর ও গলাভাগস্থ ব্রন্থিক ঝিল্লি সমূহের যে অবিক্রম ও শুষ্কতা সচরাচর দৃষ্ট গোচর হয়, উহা বিষধম্মা-তাম্রকূট পত্রের উত্তপ্ত ধূম জ্বলিত উত্তেজনার ফল। ধূমপান পুণাতন গলক্ষতের একটা সাধারণ কারণ; সেই জন্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে Smokers Sore throat বা ধূমপানীদের গলক্ষত বলিয়া একটা স্বতন্ত্র রোগের নাম কবণ হইয়াছে। কোন কোন ধূমপানী গলরোগ শাস্তির ভাগ করিয়া, তামাকের ধূমপান করেন; কিন্তু ইহা তাঁহা-দিগেব কেবল ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ তামাকে গলক্ষত রোগ আরোগ্যের না, ইহা দ্বারা কখন কখন স্থানীয় উত্তেজনার উপশম হয় মাত্র, কিন্তু ফলে ইহা হইতে বোগ প্রায়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায়।

**তামাক ও ক্ষয়রোগ।**—অবিশুদ্ধ বায়ু ফুসফুসের পাড়া সমূহের একটা কারণ। শ্বাস দ্বারা অবিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করণ কাশের একটা প্রধান কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। রক্ত ও ফুসফুসের উপর বায়ু মধ্যস্থ বিষধম্মা পদার্থ সমূহের বিবক্রিয়া দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। এমন কি, রক্তের যে সকল দূষিত পদার্থ আমাদের শ্বাস-বায়ু দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, উহা শ্বাস দ্বারা পুনঃগ্রহণও নিরাপদ নহে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে

যে, নিকোটিন্ মিশ্রিত উষ্ণ ধূম দ্বারা ফুসফুস  
দ্বারা প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়া পূর্ণ করাও  
ক্ষয়রোগের একটি প্রধানতম কারণ—পরি-  
দর্শন দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। লগুনের  
মেট্রোপলিটান ফ্রি হাসপাতালের প্রধান  
চিকিৎসক ডাক্তার সি আর, ডাইস্‌ডেল  
পাবলিক 'হেলথ' নামক পত্রে একটি প্রবন্ধে  
বর্ণনা করিয়াছেন যে,—বালাবস্থায় বা পূর্ণ-  
বয়স পূর্বে ধূমপান-অভ্যাস ক্ষয় বোগের  
একটি কারণ।

**তামাক হৃদরোগেরও  
একটি কারণ।**—নাড়ী হৃৎপিণ্ডের  
ক্রিয়ার পরিচায়ক। হৃৎপিণ্ডের উপর তামা-  
কের বিধিক্রিয়া নাড়ী-পরীক্ষা দ্বারা উপলব্ধি  
করিতে পারা যায়। তামাক সেবন করার  
অব্যবহিতকাল পরেই কাহারও নাড়ী-পরীক্ষা  
করিলে স্পষ্ট বৃদ্ধিতে পারা যায় যে,  
হৃৎপিণ্ড কিয়ৎ পরিমাণে অবশ হইয়াছে এবং  
উহার বেগ ও ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। পুরা-  
তন ধূমপায়ীদের মধ্যে হৃৎকম্পন বা বুক ধড়-  
ফড়নি, সবিচ্ছেদ নাড়ী, হৃদয়ের স্নায়ুশূল ব্যথা  
ও হৃদবোগের অন্যান্য লক্ষণ সমূহ প্রায়ই  
দেখিতে পাওয়া যায়।

বাহার কেবল বৎসর কয়েক মাত্র এই  
অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে  
কতক লোকের এই সব লক্ষণ দেখা যায়না,  
কিন্তু ক্রমশঃ বহুকাল সেবন করিতে করিতে  
একে একে উপরোক্ত লক্ষণাবলী প্রকাশ  
পাইতে থাকে। তালিকা দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে  
যে, ধূমপায়ীদের প্রত্যেক চতুর্থ ব্যক্তির এই  
সব লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ  
চারজন ধূমপায়ীর মধ্যে অন্ততঃ একজনের

এই সব লক্ষণ দেখা যায়। ইহাও প্রমাণিত  
হইয়াছে যে, তামাক ব্যবহারে যে কেবল হৃৎ-  
পিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যত্যয় হয় তাহা নহে, ইহার  
ফলে বার্ষিক পীড়াও উৎপন্ন হইতে পারে।

**তামাক ও অজীর্ণ রোগ।**—

কেহ কেহ তামাককে অজীর্ণ রোগের মনোবধ  
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু শত শত  
স্থলে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ইহা  
দ্বারা অজীর্ণরোগ আদৌ আরোগ্য হয়না,  
বরং অনেক স্থলেই ইহা অজীর্ণের কারণ  
হইয়া থাকে। তামাক একটি অবসাদক  
মাদক। এই শ্রেণীস্থ মাদক সাধারণতঃ পাক-  
শয়ের ক্রিয়ার কার্যকরী-শক্তি নষ্ট করিয়া  
আমশয়িক রসের আবাল্লাত ঘটায়। তামাকের  
এই গুণ অত্যন্ত প্রবল। তামাক সেবনকারী  
তামাক বা অন্ত কোন মাদক সেবনে কুস্মিত  
সাধন করিতে পারে। ইহা দ্বারা আহাৰেচ্ছা  
দমন হয় বটে, কিন্তু খাদ্য দ্বারা দেহস্থ যে  
অভাব পরিপূরণ হইত, সে অভাব মোচন  
হয় না। তামাকের এই অবসাদক-শক্তিদ্বারা  
পরিপাক-ক্রিয়ার বিয় ঘটয়া থাকে। নষ্ট  
গ্রহণেও কুখ্যামান্য হয়। ইহা দ্বারা  
নাসাতান্তরস্থ শৈল্পিক বিলিসমূহ উত্তেজিত  
হয় এবং সহানুভূতিজনক স্নায়ু ক্রিয়ার পরে  
অপমাশয় ও আক্রান্ত হয়।

যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ধূমপান, নষ্ট গ্রহণ  
বা দোস্তা চর্চা করেন,—তাঁহার কুখ্যামান্য  
বা অজীর্ণরোগ হইতেই হইবে। এইরূপে পরি-  
পাকশক্তির হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ ও  
মাংসহীন হইয়া যায়। অতি মূল্যবান ব্যক্তিকে  
দোস্তা খাইয়া অল্পকাল মধ্যে শীর্ণ হইতে  
দেখা গিয়াছে। বাহার অত্যধিক তামাক  
সেবন করেন, তাঁহার অজীর্ণরোগে আক্রান্ত

হইলে, তাঁহাদিগকে তামাক তাগ না করাইয়া কেবল ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা হুঃসাধ।

**তামাক ও ক্যান্সার বা কৰ্কট বা।**—তামাক সেবন এই ভয়াবহ রোগের একটি নিঃসন্দেহ কারণ। খ্যাতনামা অন্ত-চিকিৎসক সকলেই বলেন যে, অধর ও জিহ্বার ধূমপানজনিত কৰ্কট বা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ( Smoker's Cancer ) স্মোকাস' ক্যান্সার নামে অভিহিত হইয়াছে। লণ্ডন নগরের ক্যান্সার হাস-পাতালের রোগী-সংখ্যার তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও তথ্য জীরোগীর সংখ্যা পুরুষের পাঁচগুণ, তথাপি অধর ও জিহ্বার ক্যান্সার পুরুষদের মধ্যে অধিক অর্থাৎ জীলোকের তিনগুণ। ইহার কারণ পুরুষদের মধ্যে ধূমপান অধিক প্রচলিত।

**তামাকজনিত পক্ষাঘাত।**—এক প্রকার পক্ষাঘাত বা অবশতা রোগ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে ক্রমে ক্রমে মাংস-পেশীর ক্ষমতা হ্রাস ও ক্ষয় হয়। গত ৪০।৪৫ বৎসর ধরিয়া এই রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তামাক ব্যবহারের বৃদ্ধি এই রোগ-বৃদ্ধির কারণবলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কারণ এই রোগ অধিকাংশ স্থলে তামাক সেবনকারীদের ভিতর দেখা যায়।

তামাক সেবনে অক্ষিষ্মার এক প্রকার ক্রমিক অবশতা হয়। উহাতে দৃষ্টি হ্রাস হইয়া ক্রমে ক্রমে একেবারে দৃষ্টিহীন হয়। চক্ষু-চিকিৎসকেরা এই রোগকে টোব্যাকো এমোরসিস্ বা টোব্যাকো ব্লাইণ্ডনেস্ অর্থাৎ তামাক জনিত অন্ধত্ব বলেন। এই রোগ তামাক ত্যাগ করিলে সারিয়া যায়, কিন্তু তামাক না ছাড়িলে আরোগ্য

হয় না। আয়র্লণ্ডে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক, কারণ তথাকার অধিবাসীরা অতি উগ্র তামাক ব্যবহার করেন। ধূমপান এবং দোস্তা চর্ষণ—উভয় কারণেই এই রোগ হয়।

বর্ণাক্ততা নামক এক প্রকার রোগ আছে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে কোন পদার্থের প্রকৃত বর্ণ রোগীর বোধগম্য হয় না। বেল-জিয়ম ও জর্মনিতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার তত্ত্ব-সন্ধানের জন্ত বেলজিয়াম্ বর্ণগণকর্তৃক কর্তৃক নিযুক্ত জনৈক খ্যাতনামা বেলজিয়াম্-চিকিৎসক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তামাকের বহুল প্রচলনই ইহার কারণ। পরে অত্যান্ত চিকিৎসকেরাও তাঁহার এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন।

**তামাক স্নায়ুদৌর্বল্যের কারণ।**—তামাক সেবনকারীর মধ্যে স্নায়ুদৌর্বল্য নানা প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ সহজেই চমকিয়া উঠে; কেহ অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতি, কোপনস্বভাব ও কটু-ভাবী; কাহারও বা রাজ্যে নিদ্রা হয় না; আবার কাহারও লিখিবার সময় হাত কাঁপিতে থাকে। আবার অনেক স্থলে তামাক ত্যাগ করিয়া এই সকল দোষাবলী অপসারিত হইতেও দেখা গিয়াছে। তামাক সেবনে প্রথমতঃ স্নায়ু সমূহের সাময়িক বলা-ধান বা শক্তিসাধন হয় বলিয়া অনুমান হয় বটে; কিন্তু এই অনুমান ভ্রমোৎপাদক মাত্র; শেষে দৌর্বল্য পূর্ণাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হয়।

জী ও শিশুগণের মধ্যে প্রায়ই নামাকরূপ সাময়িক বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাহাদের কৈশোর-শরীরে ধূমপানী বা পিতৃদেহ হইতে প্রাপ্ত তামাকের নিবেদন।



ডাক্তার এল, জি; আলেকজান্ডার এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, মায়ু-দুর্জল ব্যক্তি, মায়ুর ব্যাধি, মায়ুশূল ও নানাপ্রকার মায়ুপীড়ার সংখ্যা অধুনা এত সম্ভব বৃদ্ধি হইতেছে যে, এ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের মনসংযোগ আবশ্যিক। তিনি বলেন যে, তামাক, সুরা ও অহি-ফেনের বহুল ব্যবহারই এই মায়ুরোগের প্রধানতম কারণ।

কলভ: ইহা নানাপ্রকারে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, পুরুষত্বহীনতা ও অজ্ঞাত মায়ুপীড়ার একটা প্রবান কারণ তামাক সেবন।

**তামাক সেবনের কুল-ক্রমাগত পরিণাম।**—যে সকল কু-অভ্যাসের কু-পরিণাম বংশানুক্রমে ভোগ হইয়া থাকে, তামাক সেবন তাহাদের কোনটা অপেক্ষা নান নহে। কোন প্রবল বলশালী ব্যক্তি আজীবন নির্ভয়ে তামাক সেবন করিয়া মনে করিতে পারেন, তাহার কোন অনিষ্টই হইলনা; কিন্তু হৃৎথের বিষয় যে, তাঁহার পুত্রের অমূল্য বল ও নীরোগ স্বাস্থ্য বহুরূপ পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়া রোগপ্রবণ ও অকালজবাসমুল দেহ লইয়া অশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। বাহারা অতি-মাত্রায় তামাক সেবন করেন, তাঁহারা সবল হইলে, তাঁহার পুত্রেরা পিতার জায় সবল দেহ হন না; এবং ঐ পুত্রেরাও যদি তামাক অতি মাত্রায় ব্যবহাৰ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পুত্রেরা নিশ্চয়ই মায়ুদুর্জল, ক্ষীণ ও রুগ্ন-দেহ হয়,—পাল্শাত্য চিকিৎসকগণ বহু পর্যা-লোচনা দ্বারা এই বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

**তামাক সেবনে মনো-বৃত্তির ব্যত্যয়।**—তামাক চরিত্রবল নষ্ট করে, চিত্তের দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া চঞ্চল

উৎপাদন করে, বিবেককে একেবারে হীনবল করিয়া ফেলে এবং চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির সক্ষমতা ধ্বংস করিয়া হুলতা সম্পাদন করে। বাহারা যৌবনের প্রারম্ভে তামাক সেবন অভ্যাস করেন অর্থাৎ যে সময় মানসিক বৃত্তি সকলের প্রথম বিকাশ আরম্ভ হয়—সেই সময় তামাক সেবন আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লিখিত দোষগুলি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

**নস্যাগ্রহণের অপকারিতা।**

—নস্যাগ্রহণে অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্য রোগ জন্মিতে পারে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নাসাত্যন্তরস্থ মৈথ্রিক ঝিল্লি ক্ষয় হয়, এবং তদুপাত্তয় গন্ধবহা মায়ু-সমূহ অরশ হইয়া পড়ে। এইরূপে ভ্রাণশক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হয়। বহুদিন নস্যা ব্যৱহারে অমুনাসিক বর্ণ সমূহের স্পষ্ট উচ্চারণ হ্রাস হইয়া পড়ে। প্রায়ই অমুনাসিক বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারা যায় না। ‘গঙ্গা’র পরিবর্তে ‘গগ্গা’ ‘কোমগর’ এর পরিবর্তে ‘কোমগর’ ইত্যাদি প্রকার উচ্চারণ হয়। নস্তের সহিত চুণ থাকায় নাসারন্ধ্রে ক্ষতও হয়।

তামাকের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা হইল। তামাকের সপক্ষেও ছই এক কথা কেহ কেহ বলেন, এক্ষণে সেই গুলির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, সুরার জায় তামাকও শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে। স্তম্ভাং খাত্তের প্রয়োজনীয়তা কম হয়। কিন্তু একত পক্ষে তাহা নহে। ইহা দ্বারা স্বাভাবিক জীব সমূহ কমিয়া যায় বলিয়া খাত্তের প্রয়োজনীয়তাও কমিয়া যায়। সে কারণ ইহাকে খাত্ত হানীর করা যাইতে পারে না। নাইটিক এসিড, পারদ প্রভৃতি জব্য ব্যবহারে যেরূপ শরীর

ভ্যস্তরস্থ শ্রাব কমিয়া থাকে, অলসতার সহচর হইলে যেরূপ ঐ শ্রাব কমিয়া থাকে,—ম্যালেরিয়া বিবে শরীর আক্রান্ত হইলেও ঐ শ্রাব যেরূপ কমিয়া থাকে, তামাক সেবনের ফলেও দেহাভ্যস্তরস্থ শ্রাবান্নতা সেইরূপ । কিন্তু শ্রাব কম হওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর ভিন্ন হিতকারী নহে । বক্তৃতির ক্রিয়াহীনতা, অর্থাৎ পিত্তনিসরণের স্বল্পতা, চর্ম্মের ক্রিয়াহীনতা অর্থাৎ শ্বেদনিসরণের হ্রাসতা, মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়া-ব্যত্যয়, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি দ্বারা যে স্বাভাবিক শ্রাব কমিয়া যায়, তাহাতে মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের ব্যাবাতই ঘটয়া থাকে এবং এই সকল ব্যাধি তামাকসেবনের ফল ।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, অতিরিক্ত সাময়িক শ্রমের পর যখন মস্তিষ্ক ও রায়ু-মণ্ডলী উত্তেজিত হয়, তখন তামাক সেবনে মস্তিষ্ক শীতল হয় ও সুনিদ্রা হয় । কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক । তামাক দ্বারা ইহার বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যে তামাক সভ্যজগতে বহু প্রচলিত হইয়াছে, যে তামাক সভ্যজাতীর আদরের সামগ্রী হইয়াছে, যে তামাক বৈঠকী-মজলিসে উদ্ভতা ও সম্ভব রক্ষা করিতেছে, যে তামাক অভ্যাগতের যথোচিত সম্ভাষণ প্রকাশ করিতেছে, যে তামাককে আমরা বিশ্রামের সহচর ও সম্ভাপের শাস্তি দায়ক মনে করিয়া সমাদর করি ও বাহ্যিক চিরসঙ্গী করিয়া রাখিয়াছি, সেই তামাক যে আমাদের গুপ্তশত্রু, আমাদের প্রাণহন্তা, আমাদের স্বাস্থ্যহানীর মূল, আমাদের রোগ-ভোগের কারণ, এবং সুখ-শান্তির প্রধান প্রতিবন্ধক, তাহা যদি এই প্রবন্ধ পাঠে পাঠকগণের উপলব্ধি হয়, এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনও যদি এই গুপ্তশত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে প্রবন্ধ লেখকের শ্রম সফল হইবে ।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস ।

## আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূল সূত্র ।

( ২ )

— :: —

অগ্নিদগ্ধ স্থানে অগ্নির উত্তাপ ।—

আপাত-বুদ্ধিতে বোধ হয় শৈত্য, সংযোগে অগ্নি দাহের উপশম হইতে পারে, অতএব দগ্ধ স্থানে শীতল জল সেচন করাই উচিত । বস্তুর ঐরূপ শীত-প্রক্রিয়ার উপকার না হইয়া অপকারই ঘটে । কারণ শীতল জল স্বাভাবিক-সঙ্কোচন-শক্তি বশতঃ দগ্ধ স্থানে রক্ত জমাট করিয়া থাকে, পরে বনীভূত রক্ত

পাক প্রবল হইয়া পড়ে, কিন্তু দগ্ধস্থানে অগ্নির তাপ লাগাইলে তাপের সঞ্চালন শক্তি বশতঃ রক্ত চতুর্দিকে সঞ্চালিত হয়, জমাট বাধিতে পারে না । সুতরাং পাকিবারও আশঙ্কা থাকে না । অধিকন্তু আভ্যন্তরিক-প্রক্রিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ তাপও হেতু বিপরীত ঔষধ বলিয়াই গিষ্ঠাঙ্কিত হইবে ।

**বিস্মে বিষ ক্ষম্য ।**—ইহা হইবার তাৎপৰ্য্য এই যে, পূৰ্ব্বোক্ত বিষের নাশক যেমন স্থাবর মৌল জঙ্গম বিষের ঔষধ; তেমনি জঙ্গম বিষ স্থাবর মৌল বিষের ঔষধ, কেন না উভয় প্রকার বিষ, বিষগত বিষয়ে এক হইলেও বস্তুগত্যা পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়াশীল। জঙ্গম বিষ উর্দ্ধগামী, এবং স্থাবর বিষ অধোগামী, ঈদৃশ বিপরীত ক্রিয়াকারী বলিয়া হেতু বিপরীত ঔষধের মধ্যে বলিয়া ধৰ্ত্তব্য।

**মদ্যপান জনিত মদ্যাত্ম্য রোগে মদ্যপান ।**—টীকাকারগণ এই উদাহরণে দুইটা উপপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন; প্রথম উপপত্তি—মদ্য মাত্রই সদৃশ গুণযুক্ত এমন কথা হইতে পারে না, কোন মদ্য রক্ষ, কোন মদ্য বা স্নিগ্ধ ইত্যাদি, সুতরাং কোন মদ্যের সহিত কোন মদ্যের বিরোধিতাও অবশ্যই আছে। অতএব রক্ষ মদ্যপান করিয়া যাহার পীড়া হইয়াছে তাহাকে স্নিগ্ধ মদ্য পান করাইবে। এইরূপ স্নিগ্ধ মদ্য পানে যাহার পীড়া হইয়াছে, তাহাকে রক্ষ মদ্য পান করিতে দিবে। কাজেই এবাধিধ ব্যবহার-কার্য্যও হেতু বিরোধী হইল। দ্বিতীয় উপপত্তি এই যে, যে স্থলে কোনরূপ অব্যাস্তরের সহিত ঐ মদ্যের বিপরীত ক্রিয়া আনয়ন করিয়া হেতু-বিরোধী করিয়াই গইতেছে, সুতরাং উহা হেতু-বিপরীত ঔষধের মধ্যেই গণ্য হইল।

**ব্যাক্সাম জনিত বাত রোগীয় জল সস্তরস্বরূপ ব্যাক্সাম ।**—যে রূপ কুস্তকালের পরোনন্ত অগ্নি, উপস্থিত বৃত্তিকালেপের আবরণে সংবৃত থাকার, অভ্যন্তরে পিত্তীকৃত হইয়া সমধিক প্রজলিত হয়, সেইরূপ সস্তরগকারী

ব্যক্তির আভ্যন্তরিক তাপ-জ্বলের শৈত্য ক্রিয়া বশতঃ লোমকূপ পথে বহির্গত হইতে না পারিয়া অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেই তাপের সহায়তায় মেদ ও শ্লেষ্মা গণিত হয়, তৎসহকারে সস্তরগ প্রমোৎপন্ন বায়ু পূৰ্ব্ব সঞ্চিত বাতকে স্বস্থানে আনয়ন করে, সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও হেতু-বিপরীত ঔষধের মধ্যেই পরিগণিত হইল। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এই বিপরীতার্থকারী ঔষধ আভ্যন্তরিক-ক্রিয়া প্রভৃতির কারণ বশতঃ বিপরীত ঔষধ বলিয়াই গণ্য হইল, তাহা হইলেই উহাকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিবার তাৎপৰ্য্য কি? এবং (সদৃশ ঔষধ) নাম করণ করিবারই বা সার্থকতা কোথায়? আমরা এ স্থলে টীকাকারগণের ব্যাখ্যা বিবৃত মৰ্ম্মাহ্বাদ করিয়া দিতেছি। যদিও বিপরীতার্থকারী ঔষধ প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত ঔষধেরই অন্তর্নিবিষ্ট, তথাপি উক্ত ঔষধে ধর্ম্মগত আংশিক বৈলক্ষণ্য দেখাইবার জন্ত পৃথক্ শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। যদি বল, বৈলক্ষণ্য কি? আপাততঃ সমধম্মী বা সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াই বৈলক্ষণ্য।

পূৰ্ব্বে যে হেতু-বিরোধী, ব্যাধি বিরোধীও উভয় বিরোধী ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সমস্ত ঔষধ যথেষ্টভাবে অর্থাৎ যে স্থানে যেমন ইচ্ছা হইল—তদনুসারে প্রয়োগ করিলেই চিকিৎসার ফল হইতে পারে না। ইহাতে অনেক বিচার ও বিতর্ক করা চাই। ইহাদের প্রয়োগের স্থল সকলও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সেই সকল বিষয় ও ক্ষেত্র প্রাণিধান পূৰ্ব্বক পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করাই সচ-চিকিৎসকের কর্তব্য। আজ কাল আমাদের

দেশে যে ভাবে বৈদ্য-চিকিৎসা চলিতেছে, অধিকাংশ বৈদ্য যে হিসাবে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার আভ্যন্তরীণ বিবরণ অনুসন্ধান করিলে হতশ্রদ্ধ হইতে হয়। শাস্ত্রের প্রকৃত আলোচনার অভাবে উহার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য লুপ্ত হওয়ায় “ডোলামারা চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পূর্ণ-বিজ্ঞানময় হইয়াও ব্যবহার-দোষে প্রায় অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহা দেখিয়া প্রতিযোগী চিকিৎসকগণ অসার ও অপদার্থ বলিয়া উপহাস করিতেছেন। সুতরাং ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? যতদিন দেশীয় চিকিৎসকগণ শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সম্মাননা না করিতেছেন, প্রকৃত ভাবে ঋষির আদেশ কার্যে পরিণত না করিতেছেন, ততদিন উক্ত কলঙ্ক অপনোদনের পন্থা নাই।

**১ম। হেতু বিরোধী ঔষ-  
ধের প্রয়োগস্থল।** রোগের হেতু অনেক প্রকার। সংক্ষেপে উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—বাহ্য হেতু ও আভ্যন্তর হেতু। আহার, আচরণ, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতিকে বাহ্য হেতু এবং কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, মল মূত্র প্রভৃতিকে আভ্যন্তর হেতু বলা যায়। কোনও রোগই হেতু বিনা উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং হেতু সংঘটন হইবা মাত্রই আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-বিশেষ ব্যতীত কোনও রোগই জন্মিতে পারে না। বীচি ভরঙ্গ শ্রায় অনেকগুলি ক্রিয়া অপেক্ষা করে। একটীর পর আর একটা ক্রিয়া; তৎপরে অপর একটা ক্রিয়া—এইরূপ পরস্পরিত ও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া জন্মাইয়া পরিণামে যে ক্রিয়া বা ফল প্রকাশ করে, তাহারই নাম রোগ।

যে সমস্ত রোগ অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়, তাহাতেও প্রায় ইহার ব্যতিচার নাই। তবে শত পত্র বেধের শ্রায় অতি অল্প সময়েই উৎপন্ন হয় বলিয়া সর্বদা অমূড়ত হয় না। এই সমস্ত ক্রিয়ার যথা ক্রমিক নাম,—(২) সঞ্চয় (২) প্রকোপ (৩) প্রসর (৪) স্থান সংশ্রয় (৫) অভিব্যক্তি এবং (৬) ভেদ। এই ক্রিয়াগুলিকে শরীরের এক একটা অবস্থা বলা যাইতে পারে; এবং ঐ সকল অবস্থার বৃদ্ধির নাম সঞ্চয়, এবং ঐ সঞ্চিত বায়ু প্রভৃতি যৎকালে প্রবল ভাব ধারণ করে, সেই অবস্থাকে প্রকোপ বলা যায়। প্রকুপিত বায়ু প্রভৃতির স্বস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমনের নাম প্রসর; এবং স্থানান্তর আশ্রয় করিলে সেই অবস্থাকে স্থান-সংশ্রয় বলে। স্থান-সংশ্রিত বাত বা পিত্ত প্রভৃতি যৎকালে কোন রোগের ধর্ম প্রকাশ করে, সেই অবস্থাকে অভিব্যক্তি এবং বায়ু পিত্ত প্রভৃতি স্পষ্ট ধর্ম বাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকে ভেদ করে। অগাধ মতি স্মৃদ্রদর্শী আৰ্য্য ঋষিগণ ঐ সকল লক্ষণ অবগতির জন্য যেরূপ গভীর চিন্তা-গবেষণা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহা ভাবিলে জ্ঞদয় বিশ্বাস রসে প্রাপ্তি ও তজ্জি-ভাবে বিগলিত হয়। তাঁহাদের চেষ্টা কেবল লক্ষণানুসন্ধান করিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই, প্রত্যেক অবস্থায় চিকিৎসারও বিধান করিয়াছেন। এক এক অবস্থায় চিকিৎসার সময়কে এক এক চিকিৎসা-কাল বলে, তদনুসারে প্রথম চিকিৎসাকাল, দ্বিতীয় চিকিৎসা কাল ইত্যাদি সংজ্ঞা বৈদ্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরোক্ত দোষের সঞ্চয় হইতে স্থান-সংশ্রয় পর্যন্ত এই চারিটা অবস্থার অর্থাৎ বহুদিন রোগ অভিব্যক্ত না হয়,—পূর্ণরূপে অবস্থার

থাকে, কিম্বা প্রবলাকার ধারণ না করে, ততদিন হেতু বিরোধী ঔষধ যুক্তিসঙ্গত, অপিচ যে স্থলে কারণের সহিত রোগের অধীনাভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ কারণের ধ্বংস হইলে রোগেরও বিনাশ হইতে পারে, পক্ষা-  
হরে কারণের অবস্থিতি বশতঃ রোগের স্থায়ীত্ব অসুভূত হয়, সেই স্থলে হেতু-বিরোধী ঔষধ প্রয়োগ করা কৰ্ত্তব্য। এই কথাগুলি উদাহরণ দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে,—১ম মনে কর—হিমসম্পর্কক; দধি সেবন এবং এইরূপ কোন কারণ বশতঃ কোন ব্যক্তির শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়াছে, এবং ঐ সঞ্চিত শ্লেষ্মা প্রকোপ প্রভৃতি ক্রমাগত অবস্থান্তর সকল প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে কোন প্রকার রোগ উৎপাদন করিতে পারে, অথবা কোন প্রকার রোগের সূচনা করিয়াছে—এমন স্থলে বমন, লক্ষণ বা এইরূপ কফ নাশক উপায় দ্বারা শ্লেষ্মা-নিঃস্রবণ বা শোধন করা। এইরূপ প্রতীকার দ্বারা রোগের হেতু বা মূল কারণ বিনষ্ট করা। সুতরাং রোগের ভবিষ্যদাক্র-  
মনেব আশঙ্কা থাকে না। মহর্ষি সুশ্রুত এইরূপ প্রতীকারের বিশেষরূপ প্রশংসা করেন।

সঞ্চয়ক প্রকোপাক প্রসরং স্থান সংশ্রয়ন্

ব্যক্তিং ভেদক যো বোক্তি দোষাণাং

সভবেদ ভিষক্ ।

সঞ্চয়ক হতাদোষা লভন্তে নোত্তরাগতীঃ

তাহতবাসু গতিষু ভবন্তি বলবন্তরাঃ

সুজ্ঞান ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বায়ু পিত্ত প্রভৃতির সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থান, সংশ্রয়, ব্যক্তি ও ভেদের ধরণ ও লক্ষণ সুন্দররূপে অবগত আছেন, এবং তৎ-সাময়িক প্রতিকারে সক্ষম, তিনি

সুচিকিৎসক। যৎকালে শরীরে দোষের সঞ্চয় হয়, সেই সময়ে উহা সমূলে বিনষ্ট হইলে, আর উত্তরোত্তর গতি অর্থাৎ প্রকোপ, প্রসর প্রভৃতি প্রশস্ত হইতে পারে না। দোষ যত উত্তর গতি ( Degree ) লাভ করে, ততই তাহার প্রবলতা হয়।

ফলতঃ দোষের সঞ্চয় হওয়া মাত্র তাহার প্রতি বিধান করাই উত্তম কাজ। এইরূপ ক্রিয়ায় অনায়াসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভাবী রোগের হস্ত হইতে পরিচাপ পাওয়া যায়।

২য়। রোগের অপ্রবল অবস্থায় অর্থাৎ যতদিন সামান্যাকার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, বৈজ্ঞানিক সেই অবস্থাকে বিশিষ্ট পূর্ক-  
রূপ বলে। সে অবস্থায়ও হেতু বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু এই মত সর্ক-  
বাদী সম্মত নহে।

৩য়। যে স্থলে হেতুর সহিত রোগের অধীনাভাব সম্বন্ধ, সে স্থলে হেতু-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক। মনে কর, যেমন ক্রিমি বা মল সঞ্চয় বশতঃ উদরে বেদনা জন্মিয়াছে—এমন স্থলে বেদনা নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ কোন উপকার লাভের প্রত্যাশা নাই, সে অবস্থায় যাহাতে বেদনার কারণ ভূত ক্রিমি বা মল নিঃসারিত হয় তদনু-  
রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

( ৪ ) কেহ কেহ রোগের হেতু ত্যাগ-  
কেও হেতু-বিরোধী-চিকিৎসা বা ঔষধের মাত্রা গণনা করিয়া থাকেন। কেননা নৈম-  
রিকেরা বলেন যে, আহার ও আচরণাদি রোগের নিদান, তৎসমুদয়ের নিরম পালন না করিলে রোগের উপশম হয় না, কারণ ঐরূপ আহার-বিহারাদি দ্বারা দোষের বল বৃদ্ধি হয়,

দোষ বদীভূত হইয়া রোগের বল বৃদ্ধি করে অথবা আরোগ্যের প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। এমন স্থলে ঔষধ দেওয়া না দেওয়া তুল্য। এছাড়া অনেক রোগী সুবিজ্ঞ বৈজ্ঞ কৰ্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়াও একমাত্র নিদান সেবনের দোষে আরোগ্য লাভে বঞ্চিত হয়েন। অতএব আহার, আচার প্রভৃতি যে প্রকার নিদানই কেন হউকনা—প্রথমতঃ তৎসমুদয় পরিত্যাগ করা আবোগ্যার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। অনেক সময়ে কেবল নিদান পরিত্যাগ করিয়াও অনেক ব্যক্তিকে রোগ হইতে মুক্তি পাইতে দেখা যায়। নিদান-পরিত্যাগের সংক্ষিপ্ত নাম নিদান পরিবর্জন। আয়ুর্বেদা-চাৰ্য্যগণ বলিয়া থাকেন, “সংক্ষেপতঃ ক্রিয়া যোগা নিদান পরিবর্জনম্” পরন্তু এই মতটা হেতু-বিপরীত বলিয়া কেহ কেহ স্মরণ করেন না।

**ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগের স্থল.**—রোগের অভি-ব্যক্ত বা পরিস্ফুট অবস্থায় ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এমন অনেক-গুলি ঔষধ দ্রব্য আছে, রোগ যে কারণেই হউক না কেন, সেই সমস্ত ঔষধ-প্রভাব-শক্তি বশতঃ কারণ-নির্বিশেষে রোগ প্রতী-কারে সমর্থ, অর্থাৎ রোগ বায়ু, পিত্ত বা যে কোন হেতুতেই উৎপন্ন হউক না কেন, তৎপ্রতি ঔষধের লক্ষ্য থাকে না, কেবল রোগ প্রশমনের প্রতিই ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইংরাজী ভাষায় ঐ সমস্ত পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট শক্তি সম্পন্ন ঔষধকে স্পেসিফিক্ মেডিসিন্ (specific medicine) বলা যাইতে পারে। একরূপ ঔষধের সংখ্যা অতি অল্প। পরন্তু এক-প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে চিকিৎসকের

চিন্তা এবং শ্রমের লাভব হইবে বলিয়া লোক-হিতৈষী ঋষিগণ উহাদের অমুসন্ধান সমধিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং ভূবি পরি-মাণে ক্লতকার্য্যও হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ তাঁহাদের কামা-কোফিয়া গ্রন্থে যেমন ক্রিয়াভূমিতে অল্টার নেটিব্ পার্গেটিব ইত্যাদি শ্রেণীভেদে ঔষধ সমূহের বিভাগ করিয়া থাকেন, আয়ুর্বেদীয় পণ্ডিতগণ তেমন দাহ নাশক, ইত্যাদি ভেদে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

(ক) অনেকের একরূপ বিশ্বাস যে, বৈদ্য-শাস্ত্রের ঔষধ নিত্যন্ত অন্ধকাবে ঢেলামারার তায়। বৈদ্যগণ শবচ্ছন্দন করেন না, সুতরাং শারীরিক যন্ত্র বা তাহাদের ক্রিয়ার বিষয় ইহার কিছুই জানেন না। ইহাদের শাস্ত্রও কেবল অমুমানের উপরে লিখিত, শারীরিক যন্ত্রাদির প্রত্যক্ষের সহিত ইহার কোন সংশ্লিষ্ট নাই; অতএব উহাদের চিকিৎসা নিত্যন্ত অকর্ম্মণ্য।

যাহারা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন বা স্পর্শ করেন নাই, তাহাদের একরূপ সংস্কার হওয়া বিচিত্র নহে। যে সকল জাতি এইক্ষেপে সভ্যতম বলিয়া গণ্য, এক সময়ে দেশের অবস্থা একরূপ ছিল যে, এই চিকিৎসা-শাস্ত্র কি? অথবা চিকিৎসার উদ্দেশ্য কি?—ইহা তখন ইহাদের কল্পনায় ও উপস্থিত হয় নাই। তৎকালে হিন্দুগণ শারীরিক চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। নরদেহ কল্পণে ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়, যন্ত্রাদির আকারপ্রকার গতিবিধি কল্পণ, এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অমুসন্ধান করিতে ক্রটি করেন নাই। যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ইংলণ্ডে অল্পদিন মাত্র জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা হিন্দুগণ অনেক

সহস্র বৎসর পূর্বে পরিজ্ঞাত ছিলেন। হিন্দু-গণের শাস্ত্র বাঁহারা কাল্পনিক বলেন, ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তি ভিন্ন কিছুই নহে।

আজিকালি কতকগুলি ব্যক্তির এইরূপ সংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে, বৈজ্ঞ-চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক নহে। উহা যৎপরোনাস্তি ভ্রম-সম্মূল। বাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা বৈজ্ঞশাস্ত্র কখন স্পর্শও করেন নাই, কেবল হজুগের কল ব্যবহী চলিত।

(খ) দৈহিক উপকরণের অথবা হ্রাস-বৃদ্ধি অথবা ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদিগের মতে দৈহিক তাড়িতের (পঞ্চোদ্রাণ: সমাভয়া:) অসামঞ্জস্ত (Disturbance of the Equilibrium of the Animal Magnetism) যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা আর্ধ্য ঋষিগণ সহস্র বৎসর পূর্বে উপলব্ধি করিয়া সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। কালে বিস্তার জ্যোতি: যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, উক্ত জ্ঞান-গর্ভ-বাক্যের মহিমা ততই প্রতিপাদন করিতেছে। রোগ মাত্রেই উহা অসমতার পরিণাম মাত্র। শোণিতে জলীয় ভাগ অধিক হইলে উহা রোগ; লৌহের অংশ অল্প হইলে রোগ। পাকস্থলীতে অগ্নির আধিক্য হইলে রোগ, অগ্নির অল্পতাও রোগ। মস্তিকে শোণিত-প্রভাব অধিক হইলে রোগ, অল্প হইলেও রোগ, অধিক শিথলতাও রোগ, অধিক রুদ্ধতাও রোগ।

হ্রাসের বৃদ্ধি, বৃদ্ধির হ্রাস, সমতার বিধান,

যে চিকিৎসার মূলভিত্তি; তাহা বিজ্ঞান সম্মত নয় কেন? কোন অশিক্ষিত লোকের মুখে জ্বরাদি কোন রোগের উৎপত্তি বিষয়ক রূপকে লিখিত শ্লোক-বিশেষের ব্যাখ্যা শুনিয়া ইহাকে অবৈজ্ঞানিক বলা খুঁটতার কৰ্ম্ম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বৈজ্ঞ-চিকিৎসার সাষ্টাঙ্গ অনুসন্ধান কর, দেখিবে—শিক্ষা প্রাণ-নের প্রকৃষ্ট পদ্ধতির অভাবেই ইহা অন্ধকার ও অজ্ঞানোচ্ছন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতিতেই কতকগুলি কুসংস্কারাগম লোক আছেন। যে ইংরাজ জাতি আজ বিজ্ঞান লইয়া এত গরীয়ান হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ে কতদূর কুসংস্কার আছে, তাহা শুনিলে হাস্য সন্নিবেশ করা যায় না। একজন ইংরাজ সমাজ-লেখক বলেন—শিরোবেদনা রোগ সম্বন্ধে ইংরাজ দিগের এই কুসংস্কার আছে যে, মাথার চুল কাটিয়া যদি কেহ পথে ফেলিয়া দেয়, এবং একটা পাখী যদি সেই চুলের কয়েকটা মুখে করিয়া উড়িয়া যায়, তাহা হইলে ভয়ানক শিরোবেদনা হয়।

সসেক্স জিলার ইংরাজ কৃষকদিগের মধ্যে এই কুসংস্কারের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। এই কুসংস্কারে বিখ্যাত ইংরাজগণ মাথার চুল কাটিয়া তাহা অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া দিতে দেয় না।

কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরাম শাস্ত্রী ।

## বিবিধ প্রশঙ্গ ।

**আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির অন্তরীক্ষা।**—পরশ্রীকাত-  
রতাই যে জাতীয় উন্নতির অন্তরায় জন্মাইয়া  
থাকে, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ সত্য কথা।  
মিরজাফরের পরশ্রী-কাতরতার জন্তই সির-  
াজের সিংহাসন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, জয়-  
চাঁদের পরশ্রী-কাতরতার ফলেই পৃথিব্রাজ্যের  
সিংহাসন মুসলমান করতলগত হয়,—দুর্য্যো-  
ধনের পরশ্রীকাতরতার জন্তই কুরুক্ষেত্রের  
যুদ্ধের স্মৃতিঃ লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধার-  
শাখনের জন্ত দেশে নানারূপ আয়োজনের  
চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু সে আয়োজনের ভিতরও  
পরশ্রীকাতরতার শ্রোত পূর্ণভাবে প্রবাহিত।  
আমরা ধরাধরই বলিয়া আসিতেছি, আয়ুর্বে-  
দীয় চিকিৎসার উন্নতি করিতে হইলে, আয়ু-  
র্বেদের যে অঙ্গগুলি লুপ্ত হইয়াছে, সর্বত্র  
সেই অঙ্গগুলির পুনরুদ্ধার করিতে  
হইবে। শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ক্ষু-  
ত্রিকা, কোমারভূতা, অগদত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব,  
বাকীকরণতত্ত্ব—এই অঙ্গগুলি লইয়া আয়ু-  
র্বেদীয় চিকিৎসা। কিন্তু ইহার মধ্যে কেবল  
শল্য কায় চিকিৎসার কতকাংশ ভিন্ন আর  
সমস্ত অংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ  
কায় চিকিৎসার যতটুকু লইয়া বর্তমান সময়ে  
আমরা চিকিৎসা কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া  
থাকি, তাহাও পূর্ণাঙ্গবস্তু নহে। এমনতা-  
বছার দেশে পূর্ববং আয়ুর্বেদীয় গৌরব প্রতি-  
ষ্ঠিত করিতে হইলে শল্য চিকিৎসার জন্ত  
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট শিক্ষালাভ  
করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের  
প্রতিষ্ঠায় সেই চেষ্টাই করা হইতেছে। কিন্তু  
ইহার ভিতরও পরশ্রীকাতরতার বিষেবহি  
ক্রুটি-ভঙ্গিমার বিরোধপাদনের চেষ্টা করি-

তেছে দেখিয়া হুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না।  
ইদ্রীতে আমরা সামান্য আভাস দিলাম মাত্র,  
ইহা হইতে যিনি যাহা বুঝিতে পারেন, বুঝিয়া  
লউন।

## ডাক্তারি ও কবিরাজি।

চরক বর্ণিয়াছেন,—“তদেব যুক্তং তৈষক্যাং  
যদা রোগ্যায় কর্ততে। স চৈব তিব্বক্যাং শ্রেষ্ঠ  
রোগেভ্যঃ যঃ প্রশ্রয়ং।” অর্থাৎ তাহাই  
উৎকৃষ্ট ঔষধ—যাহাতে রোগ প্রশমিত হয় এবং  
তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক,—যিনি রোগ আরোগ  
করিতে পারেন। কিন্তু এখনকার দিনে অনেক  
চিকিৎসকই এ কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা  
না ভুলিলে বর্তমান সময়ে ডাক্তার এবং কবি-  
রাজের মধ্যে বিপ্লব-বহি উপস্থাপিত হইবে  
কেন? আমরা যখন শল্য চিকিৎসা এখন  
নিজেরা ভুলিয়া নিরক্ষর নাপিতের হাতে অর্পণ  
করিয়াছি, তখন শিক্ষিত ডাক্তার সম্প্রদায়কে  
অশ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিয়া, তাঁহাদের নিকট  
হইতে শল্যচিকিৎসা শিক্ষাপূর্বক আয়ুর্বেদের  
লুপ্ত অঙ্গ পূরণ করিতে চেষ্টা করা সমধিক  
সঙ্গত নহে কি? আমাদের গুরুত্ব সহ্যিতার  
সকলই আছে স্বীকার করি; কিন্তু আয়ুর্বেদত  
মাথার দিব্য দিগ্বাণীয়াছেন,—ভুৎ ঐহ অধ্যয়ন  
করিলে চলিবে না, দৃষ্টকর্ম্ম মা হইলে চিকিৎ-  
সক পদবাচ্য হইতেই পারিবে না। স্তুরাং  
আমাদের লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্ত,—আমাদেরই  
শল্য-চিকিৎসা বাহা আমরা নিজেরা ভুলিয়া  
অপরকে প্রদান করিয়াছি,—স্বকার্য উদ্ধারের  
জন্ত—তাঁহাদিগের নিকট তাহা গ্রহণাত্তর আমা-  
দের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পূর্বভাবে আদরনের  
চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে লক্ষ্য  
এ রহস্য বোধননা,—বা অন্তরে উপলব্ধি  
করিলেও মুখে কুটিতে পারেন না,—বা কুটিতে



স্বকীয় জ্ঞেদ বজায় রাখার জন্য অন্তরূপ বুলি  
বিধিগা থাকেন, সেই জ্ঞেদ এই কথা বলিলাম।

**অষ্টাদশ আশুর্বেদ বিদ্যা-  
লয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রের  
ভবিষ্যৎ।**—অষ্টাদশ আশুর্বেদ বিদ্যালয়ে  
যে পাঁচ বৎসর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা  
হইয়াছে,—সেই পাঁচ বৎসর শিক্ষা-সমাপ্তির  
পরে, উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এক একজন যে ধর্মকর্ম  
কর চিকিৎসক হইয়া দেশবাসীর সর্বপ্রকার  
মঙ্গল করণে সমর্থ হইবে,—ইহা আমরা মুক্ত-  
কণ্ঠে বলিতে পারি। এই উত্তীর্ণ ছাত্রগণই তখন  
একদিকে কায়চিকিৎসার কৃতিত্ব দেখাইবে,  
অপর দিকে শস্ত্র-চিকিৎসার সিদ্ধিলাভে সমর্থ  
হইবে। তখন শস্ত্রকরণ-উদ্দেশ্যে বাহারা ডাক্তার  
দেখাইতে অভিলাষী—এই উত্তীর্ণ ছাত্র-  
গণের নিকট তাঁহারা নির্ভয়ে সে ভার প্রদানে  
নিশ্চিত হইতে পারিবেন। কায়চিকিৎসার  
জ্ঞান বাহারা সুশিক্ষিত কবিরাজ চাহেন, এই  
উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে আহ্বান পূর্বক তাঁহারা সে  
উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ করিতে পারিবেন। এক্ষণ  
ব্যবস্থায় যুগপৎ মণিকাকনের সংযোগ সাধিত  
হইবে। বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরত অতিবাহিতই  
হইল, আর চারি বৎসর পরে এই বিদ্যালয়  
কিরূপ সফল প্রদান করিবে, তাহা দর্শন  
করিয়া চক্ষুর তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইবেন।

**খানো ভেজাল।**—টেল, ঘৃত,  
হুখ প্রভৃতি বিস্তৃত পাওয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া  
পড়িতেছে, সকল প্রকার দ্রব্যেই এমন ‘ভেজা-  
ল’ের পূর্ণ প্রচলন। এই ‘ভেজাল’ নিবারণের  
জন্য অল্প গবর্ণমেন্ট বাহাদুর আইনের বাধন  
আটগি রাখিয়াছেন,—কিন্তু সে বাধন এত  
অলপ যে, তাহাতে ব্যবসায়ীরা ‘ভেজাল’  
চালাইবার আরও সুবিধা পাইতেছে।  
‘ভেজাল টেল’ ‘ভেজাল ঘৃত’ ‘ভেজাল হুখ’  
প্রভৃতি কথা সাইন্স বোর্ডে লিখিয়া রাখিলে  
আর সে ব্যবসায়ীকে আইনের দায়ে পড়িতে  
হয় না; কাজেই বাধনটা শূন্য হয় মাই বুঝিতে  
হইবে। মন্ত্রাজ গবর্ণমেন্ট এই ‘ভেজাল’  
নিবারণের জন্য একটা আইন নিষিদ্ধ করিয়া  
ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া  
লইয়াছেন। সংপ্রতি মধ্য প্রদেশেরও গবর্ণ-

মেন্ট উহার নিবারণ করে একটা পাণ্ডুলিপি  
প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য ভারতগবর্ণ-  
মেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।  
কলিকাতাভ্রমত সহরে এ আইনটার কিন্তু  
আব ও একটু কড়া কড়ি হওয়া কর্তব্য।  
‘ভেজাল টেল’ ‘ভেজাল ঘৃত’ ‘ভেজাল হুখ’  
প্রভৃতি দোকানের সাইনবোর্ডগুলি হইতে  
তুলিয়া দিয়া একেবারেই ঘাহাতে কোন  
ব্যবসায়ী ভেজাল দ্রব্য চালাইতে না পারে,  
তাহার চেষ্টা করা উচিত। দেশবাসীর স্বাস্থ্য  
রক্ষার জন্য আমরা বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট বাহাদুরকে  
এজন্য অনুরোধ করিতেছি।

**ধূমপান নিষেধ।**—আমরা দেখিয়া  
সুখা হইলাম, বঙ্গদেশে শিক্ষা বিভাগের সহ-  
কারী ডিবেকটার মিঃ এফ, সি, টার্নার মহোদয়  
বাক্সালা প্রেসিডেন্সি স্কুল ও কলেজ সমূহের  
ছাত্রগণ ঘাহাতে ধূমপান করিতে না পার—  
তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য সমস্ত  
স্কুল কলেজে এক একটি মারকুলার জারি  
করিয়াছেন। তিনি স্কুল-কলেজের শিক্ষক  
মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা  
বিদ্যালয় সামগ্রি স্বাস্থ্য সকল হইতে সিগারেট  
বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন। ছাত্র  
দিগকে শিক্ষা-মন্দিরে বা বাহিরেও ধূমপান  
করিতে দিবেন না, তাঁহারা নিজেরা নিজেরাও  
বিদ্যা-মন্দিরে—অন্ততঃ পক্ষে ছাত্রদিগের সম্মুখে  
ও ধূমপান করিবেননা। তাঁহার আরও  
আদেশ—কোন ছাত্র প্রথম বার ধূমপানের  
অপরোধ করিলে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া  
হইবে, কিন্তু ২য় বারে তাহার দণ্ডবিধান করা  
হইবে। সকল প্রকার ধূমপানেই ছাত্র জীবনে  
‘অনিষ্ট’ হইয়া থাকে,—সিগারেটে ত সর্বশাস  
হইবে। বর্তমানে সিগারেটের অত্যধিক প্রচ-  
লনের জন্য দেশে প্রচলিত এবং বঙ্গ-রোগীর  
সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায়  
শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিবেকটার মহোদয়  
দেশের সকল মন্ডলীকে রক্ষা করিবার জন্য  
এইরূপ এক অনুরোধ প্রদান করিয়াছেন,  
তাহার জন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান  
করিতেছি।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আয়ুর্কেন্দীয় ধাত্রী বিজ্ঞা।—শ্রী প্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয় কবিবাজ কর্তৃক সংকলিত। কলিকাতা ৮০নং হাবিসন বোডে শ্রীযুক্ত দীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্নের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১১০ টাকা। রমণীগণের গর্ভধারণের প্রথম হইতে প্রসবকাল পর্যন্ত যে সকল নিয়ম থাকা কর্তব্য, ঐ সময়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যাধি উপস্থিত হইলে যে রূপ ব্যবস্থায় তাহার প্রতি-বিধান করা যাইতে পারে, যে রূপ ব্যবস্থায় পাশকরা ধাত্রী বা ডাক্তার দিগের সাহায্য না লইয়া প্রসব-বাধা দূর করা যাইতে পারে, —এই পুস্তকে হর-পার্কীতীর কথোপকথন-চ্ছলে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। স্মৃতিকা রোগের ব্যাঘ্র এবং শিশু-চিকিৎসা সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ খানি পাঠ কবিলে সকলেরই উপকার হইতে পারিবে।

হিন্দু পত্রিকা।—মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যত্ননাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল। সহঃ সম্পাদক স্মৃতি-সাংখ্য-মৌমাংসা-তীর্থ শ্রীযুক্ত কেন্দার নাথ ভারতী। যশোহর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ধর্ম সাহিত্য এবং বিজ্ঞানাদি বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্ত এ পত্রিকা-খানি ২৪ বর্ষ কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। এবারে অনেকগুলি প্রবন্ধই গবেষণাপূর্ণ।

নব্য ভারত।—মাসিকপত্র ও সমালোচনা। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। সম্পাদক শ্রী দেবপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—২১০৪ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। “নব্যভারত” আজ পর্যন্ত বঙ্গের কাল পরিচালিত হইতেছে,— ইহাই ইহার যোগ্যতার পরিচয়। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই ধর্ম কথার পূর্ণ,— বাজে অসার বিষয়ের আলোচনা ইহাতে নাই। এবারের সকল প্রবন্ধগুলিই মনোজ্ঞ হইয়াছে।

কৃষ্ণ ও বাতরত্নের ভেদনির্ণয় প্রবন্ধে  
মুদ্রাকর প্রমাদ।

কৃষ্ণ ও বাতরত্ন প্রবন্ধের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় ২৪ কলামে ১০মলাটনে যে ফুটনোট দেওয়া হইয়াছে, তাহার পব এই কথাগুলি বসিবে।

“আম্বুজ্যোক্ত কংসঃ হস্তপাদাঙ্গসঙ্কি-  
কণ্ড ক্ষুরণ নিস্তোদ ভেদ গৌরব সূচ্যতাঃ  
তুহা তুহা প্রশাস্তি কদাচারিভবন্তি চ।”  
গুরুপুত্রাণাম্ পূর্বখণ্ডম্—১৭১ অধ্যায়।

অর্থাৎ আম্ব, জঙ্গা, উল্ল, কটী, স্কন্ধ, হস্ত, পদ এবং শরীর সমূহে চুলকানি, স্পন্দন, স্ফটিকবৎ বস্রণ, বিন্যাস, গুরুতাগোধ ও স্পর্শ শক্তির অভাব (এই সকল লক্ষণ) পুনঃ পুনঃ হইয়া প্রশমিত হয়, আবার কখনও আবির্ভূত হয়।

মূলের শব্দার্থ অনুসারে ইহা বাতরত্নের পূর্বলক্ষণ, কিন্তু বর্ণায় রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শিশুতত্ত্বের পক্ষানন তর্করত্ন সম্পাদিত দুইখানি গ্রন্থের অনুসারে ইহা বাতরত্নের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই অর্থ টীকাকার সম্মত কিনা বলিতে পারি না তবে বাত-প্রধান রোগে লক্ষণসমূহের অন্তরিত্ব যুক্তিসঙ্গত বটে।

গুরুপুত্রাণের এই সুপ্তি নির্দেশ দৃষ্টে অনুমান হয়, লিপিকর প্রমাণ চরকসংহিতায় “নগ্ধতি” স্থলে “নগ্ধতি” পাঠও সঙ্গিবিহীন হইতে পারে।

ঐ প্রবন্ধে কৃষ্ণভেদক লক্ষণ সূচীতে “অঙ্গ পতন হয়” এ কথাটো দেওয়া হয় নাই। অঙ্গ পতন হয় ইহার প্রমাণার্থ বাগ্‌ভট বলিয়াছেন, “আম্বাং কৃষ্ণাতি তবুঃ” অর্থাৎ অঙ্গপতন কারক বলিয়াই কৃষ্ণ নাম হইয়াছে।

বার্ষিক পরীক্ষার ফল।

এবার অষ্টাদশ আয়ুর্কেন্দ বিদ্যালয় হইতে বার্ষিক পরীক্ষার শারীরবিজ্ঞান, অঙ্গবিন্যাস বিজ্ঞা বা অ্যানাটমী পদার্থবিজ্ঞা ও রসশাস্ত্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞা, জ্যোতিষ—এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। মোট ত্রিশটি ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই উত্তীর্ণ হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় উত্তীর্ণ ছাত্র-গণের নাম প্রকাশিত হইবে।

# আয়ুর্বেদ

---

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ ।

„ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম. এ. এম. বি ।

সহ-সম্পাদক— „ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ।

—:~:—

দ্বিতীয় বর্ষ ।

( ১৩২৪ আশ্বিন হইতে ১৩২৫ ভাদ্র )

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, মাণ্ডল ১০/০

—

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় হইতে

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত ও ৩১ নং

দলহুয়ার চৌধুরীর সেক্রেটারী সেন, সংস্কৃত প্রেস হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত ।

—



## দ্বিতীয় বর্ষের প্রবন্ধ সূচী।

( বর্ণমালা অনুসারে )

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অতিসার রোগ— শ্রী—	...	৩৬৭, ৪১৭
অপত্য তত্ত্বের উপসংহার—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্যকণ্ঠ,	যোগ বিশারদ	২৯০
অপত্য বিজ্ঞান—প্রফেসার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ	...	১৯৫
আজকাল কাসরোগের এত আধিক্য কেন ?—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সেন গুপ্ত	...	১৬৯
আমাদের নববর্ষ ( প্রবন্ধ )—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ, কাব্যকণ্ঠ,	যোগ বিশারদ	৩
” ” ( কবিতা )	”	৩৬০
আয়ুর্বেদে ক্ষার কল্পনা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত স্মৃধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত	...	৪৫৬
আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ	সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	১২১
আয়ুর্বেদে বায়ু—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত	...	১৬৪, ২০০
আয়ুর্বেদীয় ভারত বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমর নাথ	চট্টোপাধ্যায় এম লি	৩৩৪
আয়ুর্বেদ সমস্যা—শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী ক্রেবর্তী	...	১৭১, ২০৮
আর্য্যাবি জীবগুত্ব জানিতেন কি না ?—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম সহায় কাব্যতীর্থ,	বেদান্ত শাস্ত্রী	২৮১
আহার ও স্বাস্থ্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	...	২৩
উচ্ছেদ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ কবিভূষণ	...	৪৬৬
এস যা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	...	৪৯
কাজের কথা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	...	৫৩, ১৯৩, ২৪১, ৪৪১, ৪৮১
কালাজর—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ	...	৩৭৩
ক্ষয়রোগ—শ্রী	...	৩৯৫, ৪৩২, ৪৬৫, ৪৯৯
গর্ভিণীর সাধ ভক্ষণ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণিনি নাথ মজুমদার	...	৪৬৯
গ্রহণী কাহাকে বলে ?—ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-বি	...	৭৫
রক্ত—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কান্তিকচন্দ্র রায়	...	১৪৮
স্বপ্নাপির জাতিনাশ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদেব কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী, ডাক্তার	...	৪৯৮

চরকোক্ত পঞ্চ কণ্ঠসাধন ( কবিতা )—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন	৩১৫
চিকিৎসকের কর্তব্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর লোহ—	৪২২
চিকিৎসকের দুঃখ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কাব্যতীর্থ	৩৩৬
“চিকিৎসকের দুঃখ” প্রবন্ধের প্রতিবাদ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় গুপ্ত ধ্বন্তরি	৩৩৩
চিকিৎসা তত্ত্ব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত জীবনকালী রায় বৈষ্ণবরত্ন	৫৬, ১১৫
চূড়ান্ত সন্তায় চাবনপ্রাশ—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায়	১৩০
ছাত্রজীবনে স্বাস্থ্যরক্ষা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ	৪৪৯
জাতীয় সঙ্গীত ( কবিতা )—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৩৬১
টোটকা ও মুষ্টিযোগ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত স্বধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত	৩১৬
তৈল মর্দন—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ, কবিভূষণ	৩০
দিনচর্যা শ্রী ... ..	৩০৭, ৩৪২, ৩৮১
দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে	২৯৭
ধল্ আঁকোড় বা ধল্ আঁকড়া! ( ছড়া )—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত	কবিরঞ্জন ৩৯০
নববর্ষে প্রার্থনা ( কবিতা )—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৩২১
“ন বেগান্ ধারণীয়”—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন	২৩
নাগার্জুন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় কাব্যতীর্থ	২৯
নূতন জ্বর—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৪৭৮
পরিপাক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত উমাচরণ ভারতীভূষণ	৮৯
পরিবর্তিত প্রণালীতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত উচিত কিনা?—প্রফেসর শ্রীযুক্ত	সতীশচন্দ্র রায় এম-এ ২৪৩, ২৮৬
পরিবর্তনের প্রতিবাদ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এল-এম-এস	৩৫১
পল্লীক্ষার ফল ... ..	৪৮
পরীক্ষিত ছইটি ঔষধ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত মৈত্র	৩৯১
প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়	এল, এম, এস ১৭৫
প্রার্থনা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বারাগনী নাথ গুপ্ত বৈষ্ণবরত্ন তিথগাচার্য	৮৩
ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু রায়	১৪২, ১৯০
‘বকে’র গুণ ( ছড়া )—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৩৬৭
বঙ্গে অজীর্ণরোগের এত প্রাচুর্য্য কেন?—শ্রী—	২৪৬, ২৯০
ব্রণলেপ বিধি ( কবিতা )—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন	৩৭৭
বঙ্কায় পুত্রলাভ ( গল্প )—শ্রীমতী কমলাবালা দেবী	৩৭৭
বর্ষাবন্দন ( কবিতা )—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ	৩৪৭
বহুমুত্র ও বাঙ্গালী—ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস	৩৪৭

বাণাবিবাহের বৈজ্ঞানিক যুক্তি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ, বেদান্তশাস্ত্রী	৭৭,২৪৯
বায়ু সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—শ্রী— ... ..	২৬৭
বিজ্ঞান সম্মিলন—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্যকণ্ঠ, যোগ	
বিশারদ	২৭
বিবিধ প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ... ৪৩,১২১,২৩৯, ১৭৮, ৩১২, ৩৫৮, ৪০০, ৪৩৯, ৪৮০	
বিশ্বেশ্বর ও কলেরা—শ্রী— ... ..	২২৪
বৈদিক কৃষ্ণাবনী—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী	৩৩১
ব্যায়াম—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কান্তিকচন্দ্র দাস ... ..	২১
একচর্যা ও বিবাহ—শ্রী— ... ..	১৫০, ২১৮
মকরধ্বজের প্রস্তুত প্রণালী—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সদানন্দ সেন গুপ্ত	৩৬২, ৪৩৫
মজলাচরণ ( কবিতা )—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ, কাব্যকণ্ঠ, যোগবিশারদ	১
মহুয়া রক্তে লোহিত কণিকার আকার—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৫৫
মহিলাগণের চিকিৎসা শিক্ষা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৬৮, ১২৪, ১৮৫, ২৩৩
মানব জন্ম রহস্য—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগিনীনাথ মজুমদার	৪৯৬
মুষ্টিযোগ ও টোটকা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিত্বভূষণ	২৭৫, ৩৫৭, ৩৯৯
মুষ্টিযোগ ও টোটকা ঔষধ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ভিষগাচার্য্য	৪১
ম্যালেরিয়া ও পল্লীগ্রাম—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	২৮
ম্যালেরিয়া ও বিষম জ্বর—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	১৩৯
ম্যালেরিয়া তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত রামরতন চট্টোপাধ্যায়	৫০৪
ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৮৭
ম্যালেরিয়ার দেশীয় মহৌষধ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস	৪১২
রক্তপিত্ত—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিত্বভূষণ	১৩৫
রসায়ন ও বাজীকরণ— শ্রী ... ..	৩৮৬, ৪২৯, ৪৪৬
রোগ পরীক্ষা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাবূষণ	১০৭
শর্করা তত্ত্ব—প্রফেসর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে এম-এ	১০২
শর্ষ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে এম-এ ... ..	১৯
শরতে—শায়দা ( কবিতা )—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ	৫১
শাক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মত ... ..	১৮০
শিক্ষায় স্বাস্থ্যহানি—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বল্লভোপাধ্যায় বি, এ	৪৮৩
শিশুজীবন—ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-বি	২৭২
শিশুর কণ্ঠরোগ চিকিৎসা ( গল্প )— শ্রী ... ..	৩২
শিশুর ক্রিমি চিকিৎসা ( ছড়া )—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৪৬৮
শব্দ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীতলা চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরঞ্জন	৬১

প্লাসীর হাতে সোণা প্রস্তুত—প্রফেসর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ	...	৩৪৫
পতাতায় আয়ুক্ষর—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দাস	...	২১৪
বর্ণ সিন্দূর ও মকরধ্বজ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত — মৈত্র	...	৪৭৫
মালোচনা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	...	৪৭, ২৫, ১৯১, ২৭৭,
		৩১৮, ৩৫৭, ৪৭৭
পরম্বতী স্তোত্র—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ	...	২৭৭
Surgeon সুরশ্রুত—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ, কাব্যকণ্ঠ, যোগ		
	বিশায়দ	৩২২, ৪০৬
গাধনা ও সিদ্ধি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৪
গালসার মসলা—মুন্সী আসরাফ আলী হাকিম	...	১২৯
ইটিকাতরণ ও Injection—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীমাচরণ মৈত্র কবিরত্ন	...	৪৬৪
সকালের চিকিৎসা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দাস	...	৪৭২
স্বাস্থ্যকর স্থান—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার দে	...	১৪৫
স্বাস্থ্যরক্ষায় ভোজন বিধি—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন	...	২৬২
স্বাস্থ্যরক্ষায় সমুদ্রতীর—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র তর্করত্ন	...	৪০১
স্বোদ্য ও কার্য ( গল্প )—	...	৬
ধাম জরে কবিরাজী চিকিৎসা—শ্রীযুক্ত রাখাল দাস সেন গুপ্ত	...	১৬১
হামিওপ্যাথি—আয়ুর্বেদ সমুদ্রের একটি তরঙ্গ - কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়		
	কাব্যতীর্থ, কাব্যকণ্ঠ, যোগবিশারদ	৪৪৩



# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

২য় বর্ষ । } বঙ্গাব্দ ১৩২৪—আশ্বিন । } ১ম সংখ্যা ।

মঙ্গলাচরণ ।

—:~:—

১

শাশ্বত যশঃ সৌরভে য়ার সফল আশ্রদান !  
কণ্ঠ য়াহার গাহিল প্রথম “তৎসবিতুর্” গান !  
ভীত কল্পিত আর্ন্ত-নিদাদ বাজিল কোমল প্রাণে,  
মৃতের জগতে ভ্রমিলেন যিনি অমৃতের সন্ধানে ;  
মহৎ হঠাতে মহীয়ান্ যিনি অগোরগীয়ান্ ধ্রুব ;  
সেই আত্মেয় এ নববর্ষে—করণ মোদের শুভ ।

২

অতুল গুহ-শুচি-গরিমায়-ধন্য গুরু শিষ্য ।  
নয়নে য়াহার উঠিল ফুটিয়া কল্প শেষের দৃশ্য ।  
গায়ত্রী য়ার অথর্ক বেদ, সংঘম য়ার শিক্ষা ।  
সত্য য়াহার জীবনের ব্রত, বড়-দর্শন দীক্ষা ।  
ছত্র চামর হেলায় ফেলিয়া ধরিলেন দীন-বেশ ।  
ককন্ মোদের মঙ্গল সেই ভিষক্ অগ্নি বেশ ।

৩

ত্রীভগবানের “চর”রূপে য়ার অবনীতে আগমন,  
দৃষ্ট প্রতিভা প্রসবিল য়ার “হয় শত বিরচন”  
যজ্ঞ য়াহার “জীব কল্যাণ”, “আরোগ্য” য়ার জপ,  
কন্দী, কন্দ, জগৎ, এ তিন—বায়ু পিত্ত ও কফ,

ভুলোক, গোলক, ত্রিলোক, যাহার ছিলনাক অগোচর,  
সেই চরকের আদর্শ পথে হইহু অগ্রসর !

৪

বিন্দুতে করি' সিদ্ধ স্বজন, কোটি তরঙ্গ দলি'—  
সহসা ভাঙিল মূর্তি যাহার স্বর্ণ শিখায় অলি।  
শিরে অপূর্ব অমৃত কুণ্ড, দুই করে বরাভয়,  
ইঙ্গিতে যার ঘুচিল নরের অকাল মৃত্যু ভয়।  
মুক্ত উদার অন্তর যার—দেব ধম্বন্তরি  
তাঁহার চরণে, সবে মিলে আজ, বিনয়-প্রণাম করি।

৫

“শারীর বিজ্ঞা” যাহার নিকটে একক-বিজ্ঞা সম,  
অনাথ আত্মের নিজ কোলে তুলে। এত যে নরোত্তম।  
পূর্ণ-কুটির ধারে এসে যার—কত রাজা কত রাণী,  
রত্ন খচিত মুকুট নামা'য়ে হইল যুক্ত-পাণি।  
করিলেন যিনি প্রথম প্রচার—শস্ত্রের উপচার,  
সে স্মৃতিচৈতন্য চরণে মৌদের অমৃত নমস্কার।

৬

বুদ্ধ যুগের বৈষ্ণ-প্রবর, আচার্য্য চূড়ামণি।  
কর্ম-ক্ষেত্রে বিভূতি যাহার, বোগীর রোদন-ধ্বনি,  
আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গে সদা সচেতন দৃষ্টি,  
শত আগ্রহে জুড়ের মাঝে গড়িলা বিরাট সৃষ্টি,  
জুড়া'তে জীবের যত্নগা জালা বাগ্‌ভট যার নাম,  
তাঁহার প্রসাদে হউক মৌদের পূর্ণ মনস্কাম !!

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ যোগবিশারদ।

## আমাদের নববর্ষ ।

আনন্দময় আশ্বিনে আমাদের আদরের  
ধন "আয়ুর্কেদ" দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল।  
আজ আমাদের আনন্দের দিন।

তোমরা হয় ত বলিবে—"বিশ্বের আয়ু-  
র্কেদের উপব দিয়া কত যুগ যুগান্তর বহিয়া  
গিয়াছে; তোমাদের আয়ুর্কেদের উপর দিয়া  
কেবল একটা মাত্র বৎসর চলিয়া গেল; অথও  
দণ্ডায়মান মহাকালের একটা ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত—  
আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অতীতে গা'  
ঢালিয়া দিল;—ইহার জন্ত আবার গৌরব  
কিসেব? আনন্দই বা কেন?" বাস্তবিক  
এই "কেন"র উত্তর দিতে আমরা অক্ষম।  
আমরা জানি, আমাদের এই ক্ষুদ্র "আয়ুর্কেদ"  
সেই বিশ্বের আয়ুর্কেদের প্রতিনিধি,—তোমরা  
এই আয়ুর্কেদের মহিমা ভুলিয়া গিয়াছ,  
গঠি ভাবত ব্যাপিয়া আজ আন্তের  
স্বকণ্ঠন রোদন ধ্বনি! দেশে দেশে বিলাসীর  
শান-শয্যা বিস্তীর্ণ! অনন্ত আবার অনন্ত  
চিত্র সমুখে রাখিয়া—শোকময়ী স্মৃতির সহস্র  
উৎপীড়ন বেজ্যায় সহিয়া, তাই আমরা  
প্রাণের শূন্য সিংহাসনে আয়ুর্কেদের পুনঃ-  
প্রতিষ্ঠার জন্ত বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছি।  
আমাদের কত যত্নের, কত সাধের, কত  
গৌরবের আয়ুর্কেদ; আমাদের ইহ-পর-  
কালের সর্বস্ব; মানব জীবনের অবলম্বন,  
পৃথিবীর দর্প-দস্ত "আয়ুর্কেদ",—আজ এই  
নূতন বর্ষে নূতন বর্ষে,—কেন তাহাকে অভি-  
নন্দন করিব না? অজ্ঞেয়-বাহিরে, হুগে,  
হুগে, সামঞ্জস্যের আকাঙ্ক্ষা এতদিন যে বহা

মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিয়াছিলাম, এই ত  
সেই শুভ অবসর! আজ আয়ুর্কেদের "নব-  
বর্ষ", আজ 'পুরাতন'কে ভুলিয়া 'নূতন'কে  
আহ্বান করিতে হইবে। অতীতের সাজ  
পাষণ-দ্বার খুলিয়া যুগ যুগান্তের কত আনন্দ,  
কত বিবাদ, কত অভ্যাদয়, কত বিলয়, কত  
গঠন, কত ধ্বংস, কত উৎসব-বাসনের ইতি  
কাহিনী মাথায় বহিয়া, হতাশের নেত্রে অক-  
ণোজ্ঞ আশার আলোক তরঙ্গিত করিয়া,  
জরাজীর্ণ জগতে ব্যাধিশীর্ণ-জীবের শ্রবণ-পথে  
উৎসাহের অমৃত ধারা ঢালিতে, আয়ুর্কেদের  
এই আশ্ব প্রকাশ—এ ত বিধাতারই মঙ্গলা-  
শিখ! ধর ধর বাঙ্গালী! এই মঙ্গলাশিখ  
মাথায় তুলিয়া ধর। তোমার জীবন কৃতার্থ  
হইবে! শরীরে—স্বাস্থ্যের অমলিন মণি-দীপ-  
দীপ্তি বরিয়া পড়িবে! উজ্জ্বল সংসারে—  
বিষ লক্ষীর চরণশায়ী পদ শতদলে ফুটিয়া  
উঠিবে!

এক বৎসর পূর্বে—ঠিক এমন দিনে—  
কত আকুল আগ্রহে বাহাকে আদর করিয়া  
অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম—আজ সে "পুরাতন".  
হইয়া কাল-সাগরে বহুবৃদের মত মিশিয়া  
গেল! তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া যে  
আসিয়াছে—সে নিশ্চয়ই "নূতন"। আয়ু-  
র্কেদের আজ "নূতন বর্ষ"; কিন্তু আয়ুর্কেদ  
যে চির পুরাতন, তাহার আবার "নূতন বর্ষ"  
কি? আমরা হতাশাগ্রস্ত—তার ভাবসী—  
আমাদের জীবনে বৈচিত্র্য নাই, প্রাণে-শাশ্বতী  
ভুগুণি নাই, স্বপ্নে পাবনী শক্তি নাই, আমাদের

আবার “নববর্ষ” কোথায়? আমরা ত একই ভাবে—চিরকাল বর্ষ ভোগ করিয়া আসিতেছি! আমাদের চতুর্দিকে প্রকৃতি—বিকৃতিময়ী, জল-বায়ু অস্বাস্থ্য কর, ভূমি-সার শস্ত-বিরলা, গাভী—ক্ষীণ পয়শ্বিনী, তরুলতা—দীন ফলবতী; নদ নদী—শূণ্ড সলিলা,—আমাদের সবই যে পুরাতন! আমাদের ঋষি-রচিত সূত্রে সংসার—অনৈক্য-ভ্রষ্টে, শির—স্বপ্না-বশিষ্ট; যে দিকে চাহি—সর্বত্র কেবল অভাব, অধর্ম, অকাল মৃত্যু, অশান্তি আর অন্নকষ্ট! আমরা আবার নূতন কোথায় পাইব? আমাদের জীবনে নববর্ষের সার্থকতা কি? বর্ষ যায়, বর্ষ আসে; বর্তমান—অতীতে রূপান্তরিত হয়, আমরা কেবল তাহারই পদক্ষেপ গণনা করি! অগ্রসিত্ত নয়নে, আমরা কেবল চাহিয়া দেখি—কলিত সূত্রে সহস্র স্মৃতি, স্মৃষ্ট কামনার অমৃত স্বপ্নজাল, আর আশা আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য অবশেষ!!

কিন্তু তবুও নূতনের মোহ অপরিহার্য! মানুষ নূতনকেই ভাল বাসে। নূতনের পিপাসা—ভাতের পিপাসা। নায়কের লেখক এবং লেখকের নায়ক একটা বড় পাকা কথা বলিয়াছেন—“প্রথম পুরাতন হইবার উপক্রম হইলে, উহা পুত্র-বাৎসল্যে নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠে। পুত্র-কন্ডার নবীনতা ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, উহা পৌত্রে-দৌহিত্রে প্রবল ভাবে নবীন হইয়া দাঁড়ায়।” সুতরাং নবীনতার আদান-প্রদানেই মানুষের জীবন। মানুষের কর্ম-কোলাহল পূর্ণ প্রাণ-গতি নবীনতার বাদ গ্রহণের জন্যই অজান-পথে অগ্রসর। তাই সে শোকে অশোকে, দুঃখে সুখে, জরে পরাজয়ে, অবসাদে উদ্বাহনায়,—পুরাতনকে নুতন করিয়া একটু জিরাইবার অবসর খুঁজিয়া

লয়। মানব-ইতিহাসে—এই অবসরের নাম “নববর্ষ”।

আমাদের আয়ুর্বেদ ও সেই জীবন-মরণের, অপচয় উপচয়ের, তাপ-শান্তির, গতা-গতির অভিব্যক্তি। আয়ুর্বেদ আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের, পিতৃ পিতামহের পুরুষ পরম্পরাবক্ষয় কর্মক্ষেত্র। আয়ুর্বেদের প্রসাদে—এখনও আমরা গোরবের—মহুয়াঘের—বীর-ঘের—জগজ্জয়ের শ্লাঘা করিতে পারি! আমাদের অনন্ত অতীতের স্পর্শ আয়ুর্বেদ—আজ পুরাতন হইয়াও “নূতন”, আয়ুর্বেদের “নববর্ষ” আমাদের ক্রীত সংশোধনের অবসর, পশ্চাদবলোকনের অবকাশ, হৃদয়ের শান্তির ঘাস, উত্তমের ক্ষণ-বিশ্রাম, জীবনের আদ্যে পরিচ্ছেদ।

পল্লবে-পল্লবে সুখমা ছড়াইয়া, মুকুলে-মুকুলে হাসি ফুটাইয়া, বাতাসে-বাতাসে গন্ধ বিলাইয়া শরৎ আসিয়াছে। আকাশ—নীল-স্বচ্ছ-অহুধেল, জলে—কুমুদ কল্লার কমলদল, মাঠে—দূর বিসর্পি হরিৎ শোভা, আলোক বায়ুর অক্ষরস্ত হিলোলে মেদিনী মোদিনী; কোটি উদার অরুণ রাগ মাখিয়া, কাশ হৃষ্মের আন্তরগের উপর দিয়া, দশহাতে শেকালীর লাজ বর্ষণ করিতে করিতে—স্থল পথের সঙ্গে রাঙা হাসি হাসিতে হাসিতে,—আনন্দময়ী মা আসিতেছেন! সারা বঙ্গে মহামহোৎসবের সাড়া পড়িয়াছে। এইত আয়ুর্বেদের বিকাশের শুভদিন। আমাদের নানবতার হিমগিরি, জগজ্জননীর লীলাক্ষেত্র। আমাদের দেহ পর্কে-পর্কে উৎপন্ন, মেরুদণ্ড পর্কে-পর্কে সৃসজ্জিত,—তাই এ দেহের একটা নাম পর্কত, সেই দেহের কন্ডা রূপিনী—রা আমার “পার্কতী”। এই শুভ মুহূর্তে—সাধক পার্শ-

গীর যোগনিদ্রা ভাঙ্গাইবার আয়োজন করি-  
ছেন। তবে আমরাই বা নীরব থাকিব  
কেন? আমাদের কার্যও ত উৎকৃষ্ট শক্তিতে  
—ঘট্টক ভেদ করা। তবে এসো ভাই।  
এসো—আজ মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া, জলের  
ঝাঝি দিয়া, এই ফুল্ল শরতে আমরা “নববর্ষের”  
সাধনা করি। সত্যে, সত্যাবে, প্রেমে—হৃদয়  
পূর্ণ করিয়া, বার্থ আশার বেদনা চাপিয়া,  
সনাতন ও পুৰাতনকে আজ নূতন করিয়া  
ডাকিয়া লই। ঐ গুন কবি বলিতেছেন,—

“গত আয়ু প্রায় গত বর্ষ যায়,  
যাক, দেও গত হ’তে।

হৃদয়-মন্দিরে অসত্য নিবারি  
শিখ’হ পুজিতে সতে।

ঐ বাজে হোরা দিয়া অশ্রুধারা  
প্রাচীনে বিদায় দাও।

বাজে হুখ হোরা, আনি আশ্রয়ার  
নূতনে ডাকিয়া লও।”

পুৰাতন ও নূতনে মিলিয়া আমরা আয়ুর্কে-  
দের সাধনা করিব। নববর্ষে নব-উদ্যমে,  
সিংহবাহিনীর সত্তাপ-হারিণী মূর্তি দেখিতে  
দেখিতে কক্ষক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। হয় ত  
এই সাধনার ফলে, সত্য সত্যই একদিন  
আমাদের চির পুরাতন “আয়ুর্কেদে” দিবা  
জ্যোতির্ষ্য “নববর্ষ” আসিবে। আমাদের  
সাধনা কবির হাতে কবিতা হইয়া ফুটিবে।  
গায়কের কণ্ঠে সঙ্গীত হইয়া ঝরিবে, বাদকের  
বীণায় ঝঙ্কার হইয়া ক্ষরিবে, মানবের শ্রোণে  
বর্ষ হইয়া জাগিবে।

এসো ভূমি—এসো হে নবীন অতিথি—  
নববর্ষ! যে ভাবেই আসিয়া থাক’—এসো।  
তোমার চরণে—আজ আমাদের ভিক্ষা,—এই  
মহা যুদ্ধে আমাদের সম্রাটকে বিজয় লক্ষী দান

কর। তোমার প্রদানে—আমাদের দেশ  
ধন-দায়ে সমৃদ্ধ হউক। আমাদের “আয়ু-  
র্কেদে” পূর্ণ সত্ত্ব ও পূর্ণ তত্ত্ব বিরাজ করুক।  
আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা তান্ত্রিকের যন্ত্র  
লিপির মত বিশ্বজনীন হউক।

গতবর্ষে আমাদের অনেক ভুল-ভ্রান্তি  
হইয়া গিয়াছে। কত সুবর্ণ সুযোগ আমরা  
হেলার হারাইয়াছি। কত আত্মীয়ের মনে  
নিদারুণ ব্যথা দিয়াছি। নিষ্ফল-কামনার  
কত অকুন্তল যন্ত্রণা প্রাণের ভিতর পোষণ  
করিয়াছি! আমাদের সে প্রমাদ-অবসাদ,  
অপ্রেম-অসম্ভাব, অপূর্ণ অভাব—এ বৎসর  
যেন আমরা সংশোধন করিয়া লইতে পারি।

অধিকার দোহাই দিয়া,—নবোদ্যমে  
আবার আমরা কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম।  
আমাদের ভরসা—গ্রাহকগণের উদার অনুগ্রহ।  
উদ্বেগ—রোগ-বিজয়। মূলমন্ত্র—বিজ্ঞানের  
উন্নতি। লক্ষ্য—আয়ুর্কেদের মহিমা প্রচার।  
সহায়—সর্ব-বিপদহারী নারায়ণ। আমরা  
জানি, আয়ুর্কেদের উন্নতি সাধন—অসাধ্য  
ব্যাপার। ইহাতে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠি-  
রের সত্যবাদিতা, কর্ণের উদারতা, ভীষ্মের  
বল, লক্ষ্মণের উৎসর্গ, বিদুরের তেজ এবং  
কুবেরের ঐশ্বর্য্য চাই। দীন-দরিদ্র-ভিক্ষুক  
আমরা,—আমাদের তো কিছুই নাই। কিন্তু  
নিজের দেশের—নিজের জাতির সব ভুলিয়া,  
যে পাপাচার করিয়াছি, তাহাতে মহাবীর পুণ্যা-  
শ্রম কলুষিত হইয়াছে। সেই পাপাচারের  
প্রায়শ্চিত্ত—আয়ুর্কেদকে রক্ষা করা। এক  
আয়ুর্কেদের উন্নতিই আমাদের একমাত্র নিরায়  
হইতে রক্ষা করিতে পারে। আমাদের এই  
ক্ষুদ্র পত্রিকা—আমাদেরই “কলকতকনের”  
প্রথম হেমকুস্ত। কালহরিভা কালিন্দীর কাল

লে ঘট পূর্ণ করিয়া, আমরা ত সরম-সঙ্কুচিতা  
ধীর মত ভয়ে ভয়ে শত কোতুহলী ব্যাঘ্র-  
টির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি—ইহাতে সহস্র ছিদ্ৰ  
কুক,—এ যে তোমাদের গর্জ-গৌরব-

শ্রাব্য জিনিষ। উৎসাহের হলুধনি দিয়া,  
তোমার একবার ইহাকে রক্তবেদীর উপর  
বসাইয়া দাও। এ জলে তোমারি গৃহে—  
বিষ্ণুর মঙ্গলস্নান নিষ্পন্ন হইবে।

## শৈল্য ও কার্শ্য।

স্থূল—রাম ও কৃশ—শ্যাম।

—\*:—

শ্রা। কি হে ভায়া, এ যে ক্রমশঃ বেজায় রকম  
জাচ্ছ দেখছি! শেষে দরজা কাটাতে হবে।

রা। তবে কি তোমার মত রোগা হ'তে  
ল নাকি। কোন্ দিন হাওয়ার সঙ্গে  
মিশিয়ে যাবে দেখছি।

শ্রা। হাওয়ার মিশি আর না মিশি—  
গ'তে বড় এসে-যাবে না। কিন্তু দেশের  
লাকের সবাই যদি তোমারই মত হইয়া পড়ে,  
গ'হ'লে বহুমতী উদ্ধার করবার জন্তে ভগ-  
নিকে আবার বরাহরূপ ধারণ ক'রতে হ'বে  
বাধ হয়।

রা। ভগবান্ বরাহ বা কূর্ম হ'লে তা'তে  
কি ক্ষতি হবেনা, বরং অবতারের সংখ্যা বেড়ে  
গাওয়ায় পুণ্য করবার আর একটা পথ পরি-  
চায় হবে। কিন্তু যাই বল ভাই, আমি  
তোমার মতন রোগা হতে নারাজ। রোগা  
হ'ব,—বলকি—রোগা খেতে পায় না।

শ্রা। খাওয়ার পরিণাম যদি এই রকম  
হয় ভায়া, তা' হলে আমি না খেয়ে থাকাই  
ভাল মনে করি। একে জীবন নানা ভাবে  
কাতর, তা'র ওপর হ'চার মেন 'মেদ' চাপিয়ে  
দীর্ঘনটাকে হুঁকিষহ ক'রতে আদৌ ইচ্ছে নেই।

রা। তবে মুখ্য, একটু ভার থাকা ভাল,  
হালকা হওয়া কিছু নয়। শাস্ত্রকারও বলিয়া-  
ছেন,—শূত্র হ'লে সবই লঘু হয়, আর পূর্ণ  
হলেই গুরু হয়।

শ্রা। এত পূর্ণ নয় দাদা, পূর্ণতর—পূর্ণ-  
ভরও তোমার কাছে এগুতে সাহস করে না!  
এযে ভায়া আবার নূতন ক'রে হিমালয়ের  
স্রষ্টি হ'চ্ছে দেখছি।

রা। তা হ'লেই বোঝ—ভারটা কি রকম!  
একবার যদি তোমার ওপর চেপে প'ড়তে  
পারি—তা হলেই ফর্দ।

শ্রা। সেটা ঠিক, তুমি একটা জ্যান্ত টিম্-  
রোলার। কিন্তু চেপে প'ড়বে কি ক'রে?  
তোমার ভার তোমার জড় গদার্থ ক'রে  
তুলেছে, আমরা কিপ্র গতিতে স'রে যেতে  
পারি। এস দেখি ভায়া, একবার হুঁজনে  
একটু দৌড়ে দেখি, বুঝি—তুমি কতটা স্থাবর  
আর কতটা জঙ্গম!

শ্রা। বলিস্ কি! মাহুঘ—বিশেষতঃ উদ্ভ-  
লোকে দৌড়বে! শাস্ত্রে বলে,—অশ্বো ধার্ব্যত  
অর্থাৎ অশ্ব দৌড়িতেছে। তা বোড়া দৌড়ুক,  
হরিণ দৌড়ুক, বাঘ-ভালুক-গরু-বাহুর

দৌড়ুক। আর মানুষের মধ্যে ডাক হরকরা  
কি—বেহারা-কুলি দৌড়ুক। তদ্রলোকে  
দৌড়বে কি! তদ্রলোকে এই রকম গজেন্দ্র  
গমনে চলবে।

বা। হাঁ গড়নে এবং আকৃতিতে গজেন্দ্রের  
সাদৃশ্য আছে বটে! পাশা পাশি দু'টো  
দাঁড়ালে,—কোনটা হাতী—ঠিক করা কঠিন  
হ'য়ে পড়ে।

( কবিরাজ মহাশয়ের প্রবেশ )

ক। কি হে তোমাদের দুজনের বিতণ্ডা  
হ'চ্ছে কিদের ?

শ্রী। ভাল হ'য়েছে, কবিরাজ মহাশয়কে  
মধ্যস্থ মানা যাক—যে মোটা হওয়া ভাল, কি  
বোগা হওয়া ভাল ?

বা। বেশ কবিরাজ মহাশয়ই মীমাংসা  
করুন।

ক। এর মীমাংসা ত প'ড়েই র'য়েছে,  
অর্থাৎ যে স্থলদেহ—শ্রাম চন্দ্র, কৃশ দেহ—রাম  
চন্দ্র। তোমাদের উভয়ের দেহই নিন্দনীয়।

রাম ও শ্রাম। কি রকম কি রকম ?

ক। শাস্ত্রে বলে,—

অত্যন্তগর্হিতাবেতাবতিস্থলকৃশৌ নরৌ।

শ্রেষ্ঠো মধ্যশরীরস্ত কাশ্যঃ স্বোলাভ্যন্তু পুঞ্জিতম্ ॥

অর্থাৎ অতি স্থল এবং অতি কৃশ নয়  
অত্যন্ত গর্হিত। মধ্য শরীর ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।  
আবার মোটা হওয়ার চেয়ে বরং বোগা  
হওয়া ভাল।

বা। শুনুচো শ্রাম ভায়া ?

শ্রী। আরে গর্হিত ত দুজনেই, তা' না  
হয় এপিট আর ওপিট। তা'মোটা হওয়ার চেয়ে  
বোগা হওয়া ভাল কেন কবিরাজ মহাশয় ?

ক। বোগা লোককে চিকিৎসা ক'রলে  
তা'র কৃশতা সহজেই দূর করা যায়। কিন্তু

মোটা লোককে চিকিৎসা ক'রে তা'র স্বোলা  
কমান অত্যন্ত কঠিন। শাস্ত্রে স্বোলার  
চিকিৎসা নাই ব'লেই এক রকম লেখা আছে।

শ্রী। আচ্ছা কবিরাজ মহাশয়, মোটা  
হওয়ার দোষটা কি বলুন ?

ক। মোটা হ'লে ক্ষুদ্র খাস হয়—হাঁপাতে  
হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা ও ঘাম অধিক  
হয়, গাত্রে দুর্গন্ধ হয়, ঘুমুলে গলা বড়-বড় করে,  
শরীর অবসন্ন হয়, কথা অস্পষ্ট হয় কোন  
শ্রম জনক কার্য করা যায় না, মেন ধাতু  
অত্যন্ত বর্ধিত হয় ব'লে, তার পরবর্তী ধাতু  
অর্থাৎ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র পুষ্ট হয় না, আর  
সেই জন্তে দ্বীসহবাসের ক্ষমতা খুব ক'মে যায়,  
প্রাণশক্তি ( Vitality ) অল্প হয়, এবং  
গ্রামেহ, পিড়কা, জ্বর, ভগন্দর, বড় কোড়া  
কিছু বায়ু জনিত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে  
প্রাণ ত্যাগ করে।

শ্রী। বলেন কি ম'শায় প্রাণত্যাগ ?

ক। হাঁ বাপু! ওটা সকলকেই সময়ে  
ত্যাগ ক'রতে হয়। তবে মোটা ম'শায়রা  
কিছু সকালে—সকালে করেন, আর যে রোগ  
গুলে! বললাম, ওর মধ্যে একটা না-একটা  
রোগে ভুগে থাকেন।

• রা। আর বোগা লোকেরা নীরোগ-  
শরীরে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, কি বলেন  
কবিরাজ মহাশয় ?

ক। না বাপু, ততটা সুবিধে ভগবান  
বোগা লোকদের দেন নি।

রা। তবে বোগা হওয়ার দোষটা কি বলুন ?

ক। অত্যন্ত কৃশ ব্যক্তি ক্ষুধা, পিপাসা,  
শীত, গরম, প্রবল বায়ু ও বর্ষা সহ ক'রতে  
পারে না, প্রায়ই বায়ু-রোগে আক্রান্ত হয়,  
অল্প-প্রাণ হয়, কোন শ্রমজনক কাজ ক'রতে

পারে না এবং শ্বাস, কাস, শেষে প্লীহা, উদর, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, ও রক্তপিত্ত রোগে প্রাণ-তাগ করে। কৃশ ব্যক্তির যে কোন রোগ জন্মায়, সেটা প্রবল হ'য়েই থাকে।

শ্রী। আচ্ছা কবিরাজ ম'শায়, মোটা হ'বার কাবণটা কি বলুন দেখি ?

ক। অত্যন্ত পুষ্টিকর দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে খাওয়া, পরিশ্রম না করা, পূর্ব আহার জীর্ণ না হ'তে খাওয়া, দিব্যভাগে নিদ্রা যাওয়া, অতিরিক্ত শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দ্রব্য খাওয়া প্রভৃতি কারণে মেদের বৃদ্ধি হ'লেই লোকে মোটা হ'য়ে পড়ে।

রা। আর লোকে রোগী হয় কেন কবিরাজ ম'শায় ?

ক। অত্যন্ত বায়ু বর্দ্ধক রুক্ষ খাদ্য খাওয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন অধিক অধ্যয়ন, ভয়, শোক, চিন্তা, রাত্রি-জাগরণ, পিপাসা ও ক্ষুধা সহ্য করা, কষা জিনিষ খাওয়া, অল্প পরিমাণে খাওয়া প্রভৃতি কারণে শরীরের রস-ধাতু ক্ষীণ হয় এবং অজ্ঞাত ধাতুকে ভাল রকম পোষণ করতে পারে না, কাজেই শরীর কৃশ হ'য়ে পড়ে।

শ্রী। আচ্ছা কবিরাজ ম'শায়, আপনি ত ব'লেন যে, হৌল্য রোগের চিকিৎসাই নেই। তবে কি আমরা শরীর কমা'বার কোন উপায় নেই ?

রা। কেন হে ভায়া, কমা'তে চাও কেন ? এই যে ব'ল'ছিলে—ভার থাকা ভাল।

শ্রী। আরে রক্ষা কর ভায়া, হু'পা চলতে পারিনে, একটু নড়তে-চড়তে হাঁস-ফাঁস ক'রতে হয়, আর এই গরমে যে কি কষ্ট হয়—তা' ব'লে বোঝাবার নয়।

ক। হৌল্য রোগের চিকিৎসা ক'রতে হ'লে—প্রথমেই যে সকল কারণে বোগ জন্মেছে, সে গুলি পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে।

শ্রী। কারণ কি—তা' জানবো কি কবে ?

ক। এই যে আগে ব'লেছি—প্রচুর পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়া, দিনে ঘুমান, পরিশ্রম না করা ইত্যাদি।

শ্রী। হাঁ বুঝেছি, বলুন।

ক। তা'র পর পথোর কথা বলছি। উড়ী ধান বা কান্দুনী ধানের চালের ভাত, যবের ভাত, যবের রুটী, কুলখি কলায়, মসুর, মুগ বা বুটের দাল, শাক, বেগুন পোড়া, খই, মধু, বোল, তেঁতো, কষা ও ঝাল জিনিষ, সর্ষপ তৈল, এলা'চ, রুক্ষ খাদ্য, গরম জল—এই সব এ রোগে পথ্য। এ রোগে আহারের পূর্বেই জলপান করা উপকারী। আর চিন্তা, পরিশ্রম, রাত্রি-জাগরণ, মৈথুন, উপবাস, রোজসেবন, পথভ্রমণ, মধ্যে মধ্যে বমি করা ও জোলাপ লওয়া, হাতী-ঘোড়া চ'ড়ে বেড়ান—এই সব উপকারী।

শ্রী। আচ্ছা ভাবনা যদি আপনি হ'তে না আসে, তবে ভাবনা আনবো কি করে ?

ক। ভাবনার মত শরীর রোগী কন্নার জিনিষ আর কিছু নেই। কথায় বলে—ভেবে-ভেবে রোগী হয়ে যা'চ্ছে। তা' যে লোকটার রোগ,—তা'র আত্মীয়-স্বজন কোন রকম যোগাড়-বন্দ ক'রে তাকে অল্প সখকে বা কোন বিষয় সখকে ভাবনায় ফেলবে। তা'রপর শরীর রোগী হ'য়ে গেলে তাকে বুঝিয়ে ব'লবে যে, এই জন্তে তোমায় এই রকম ক'রে ভাবনায় ফেলেছিলাম।

শ্রী। আচ্ছা এখন এ রোগের কি কি অপথোর কথা বলুন ?



ক। ভাল চালের ভাত, গম থেকে প্রস্তুত পাবাব জিনিষ, হুঙ্ক বা হুঙ্ক থেকে প্রস্তুত খাত্ত, গুড়, চিনি, মিছরী, মাষ কলায়, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি স্নেহ-বহুল ফল, আম, কাঁটাল প্রভৃতি মধুৰ ও পুষ্টিকর ফল, মৎস্য, মাংস, মধুৰ দ্রব্য, আহারের পর জলপান, মিষ্ট দ্রব্য, প্রভৃতি এ রোগে অপথ্য।

শ্রী। আচ্ছা মাছ কি কিছুটা খাবার যো নেই?

ক। মাছের মধ্যে একমাত্র চিংড়ি মাছ খাওয়া যায়। স্নেহে খাওয়া ও স্নান করা—হোলা রোগে যতদূর পারা যায় ত্যাগ করা উচিত।

শ্রী। তা' হ'লে পথ্য ত বড় বিপজ্জনক?

ক। রোগ বিপজ্জনক হ'লেই পথ্যও বিপজ্জনক হয়। একজন কলিকাতার গণ্য মান্ন ব্যক্তি এই রোগের প্রতিকারের জন্ত কিছু দিন কেবল মুড়ি খেয়ে ছিলেন। তা'তেই তাঁব বোগ ভাল হ'য়ে গিয়েছিল।

শ্রী। আচ্ছা কবিরাজ ম'শায়, এখন এর স্রেদ কি আছে বলুন?

রা। দাঁড়াও ভায়া—এক যাত্রায় পৃথক ফল! আমি রোগা, আমার কি পথ্য আগে ত জেনে নেই, তা'রপর তোমার কথা।

শ্রী। কেন হে, এই যে বল্ছিলে রোগা থাকাই ভাল।

রা। ভাল বটে, তবে এতটা নয়, একটু শাস-জলে হওয়া চাই বৈ কি! জ্বত কি গরম সহ হয় না, কষ্ট সহ হয় না, একটা বলবান লোক পাশ দিয়ে গেলে মনে হয়—পাকা লেগে প'ড়ে যাই, আর রোজই একটা-না-একটা বায়ুর উপসর্গ আছেই।

ক। আচ্ছা শোন বলছি। যে সকল

কারণে কুশতা জ'য়েছে—যেমন অন্ন আহার, উপবাস, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পথ-পর্ধ্যটন, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি—সে সমস্ত ত্যাগ ক'রতে হ'বে। তা'র পর পুষ্টিকর জিনিষ, ঘৃত হুঙ্ক, লুচি, মৎস্য, মাংস, ক্ষীর, ছানা, মাখন, পেস্তা, বাদাম, আম, কলা প্রভৃতি মিষ্ট ফল, চিনি, মিছরী উত্তম চালের ভাত,—এই সব স্পথ্য। কটু, তেতো ও কষা দ্রব্য, শাক, সর্ষপ তৈল, মধু—এ সব দ্রব্য পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে। আহারের পূর্বে জলপান না ক'রে—পরে করা উচিত। পরিশ্রম না করা, স্নেহে থাকা, দিনে নিদ্রা যাওয়া, প্রচুর আহার করা, স্নান—এই সমস্ত কুশতা রোগে হিতকর।

রা। এ দেখছি শ্রাম ভায়া'র যা' পথ্য' আমার তাই অপথ্য। আর শ্রাম ভায়া'র যা' অপথ্য—আমার তাই পথ্য।

ক। হাঁ ঠিক তাই। কাশ্য রোগে হোলা রোগের বিপরীত এবং হোলা রোগের বিপরীত ক্রিয়া কাশ্যরোগে ক'রতে হয়।

শ্য। ভায়া, এখন রোগা হওয়াই ভাল মনে হ'চ্ছে। কেননা তোমার পথ্যের বন্দো-বস্তটা বড় লোভনীয়।

রা। আর তোমার পথ্যটা তেমনি শোচনীয়। কোন জয়ে কখন যেন মোটা না হই।

শ্য। দেখুন কবিরাজ ম'শায়, শ্যামকে ভালভাল জিনিষ খেতে বললেন, আর আমাকে ভাল জিনিষ কিছুই খেতে বললেন না। এটা আপনার অবিচার হ'ল।

ক। আমার বিচার ক'রবার ত অপেক্ষা রাখনি বাপু, আগে থেকেই মোটা হ'য়ে ব'সে আছি। যদি রোগা হ'তে পারতে,—তা' হ'লে ঐ রকম পথ্যই ঘটতো। তবে একদিকে তোমার জিত আছে, নামের হাতী মোটা চড়া

নিষেধ, কিন্তু তুমি যত খুসী—হাতী ঘোড়া চড়, পরিশ্রম কর, চিন্তা কর, রাত্রে গিয়েটার দেখ।

৯ রা। আচ্ছা। কবিবাজ মশায়, শ্যামকে দাল খেতে ব'লেছেন, তা' দাল কি আমার পক্ষে নিষেধ?

ক। দাল বায়ু-বর্দ্ধক ব'লে কৃশব্যক্তি ব'লে পক্ষে অহিতকর, কিন্তু এব' মধ্য যুক্তি আছে;—প্রথমতঃ তোমার যদি নিত্য দাল খাওয়া অভ্যাস থাকে এবং দাল নইলে ভাল রূপ আহার ক'রতে না পার—তা' হলে দাল সুপথ্য না হ'লেও অন্ন-বহ্ন খেতে হ'বে। তা'রপর দাল রক্ষ ব'লে বায়ু বর্দ্ধক, সুতরাং তুমি যদি দালে যথেষ্ট ঘৃত দিয়ে খাও—তা' হলে আর বায়ু-বর্দ্ধক হ'তে পারে না ব'লে কুপথ্য হয় না, বরং সুপথ্য হয়। আবার দেখ, শ্যামকে দাল খেতে বলা হ'য়েছে কিন্তু শ্যাম যদি দালে যথেষ্ট ঘৃত মিশ্রিত ক'রে খায়,—তা' হলে সেটা শ্যামের পক্ষে কুপথ্য হবে।

শ্যা। পথ্য সম্বন্ধে আমার সকল দিকেই সুবিধা দেখছি। যাক্ এখন ঔষধের কথা বলুন।

ক। ঔষধের কথা ব'লছি—কিন্তু কারণ পরিত্যাগ, পথ্য সেবন, অপথ্য ত্যাগ—এইগুলি আগে চাই। বরং ঔষধ না খেলে এতেই ফল হয়, কিন্তু এগুলি না ক'রলে ঔষধে কিছু হয় না। শাস্ত্রে বলেছে,—পরিশ্রম, চিন্তা, ক্রী-সহবাস, পথভ্রমণ, মধু খাওয়া, রাত্রি জাগরণ, যব ও শ্যামা ঘাসের বীজের চালের ভাত আহার করা—এই সকলের দ্বারা হোলা রোগ অবশ্যই নষ্ট হ'য়ে থাকে। নিজা না খাওয়া, বৈথুন, ব্যায়াম এবং চিন্তা—এগুলি দ্বারা হোলা ত্যাগ ক'রতে

ইচ্ছা করেন—তাঁদের ক্রমশঃ বাড়ান উচিত।

শ্যা। তা' একেবারে না ঘুমিয়ে কি থাকতে পারা যাবে?

ক। আবে তাও কি হয়? না ঘুমিয়ে মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে? তবে এতে ঘুম বত কমান যায়, ততই ভাল।

শ্যা। এইবার ঔষধের কথা বলুন।

ক। প্রাতে পুরাণ মধু মিশ্রিত কৃপ জল পান ক'রলে হোলা নষ্ট হয়।

শ্যা। কৃপ জল যদি না পাওয়া যায়, তা' হ'লে কি হ'বে? আর মধু ও জলের পরিমাণই বা কি? কতদিনের পূরণ মধু?

ক। কৃপ জল না পাওয়া গেলে—পুকুরের জল, তা'ও না হ'লে—নদীর জল, তাও না হ'লে—কলের জল। কৃপের জলে ক্ষার থাকে ব'লে বেশী উপকারী। আর মধু সহমত মাত্রায় আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ বাড়াত হ'বে। প্রথমে এক তোলা আন্দাজ মধু পাঁচ সাত তোলা জলে মিশিয়ে খেতে হয়, সহমত এক ছটাক পর্যন্ত মধু প্রত্যহ খাওয়া যেতে পারে। জলের পরিমাণও ঐ পরিমাণে বাড়তে হবে। গা' জ্বালা হ'লে মধু বাড়াবে না ছই বৎসরের সযত্ন রক্ষিত মধু চাই।

শ্যা। আচ্ছা তা'র পর বলুন।

৯ রা। প্রাতে উষ্ণ অন্নমণ্ড আহার করলে শরীর রোগী হয়।

শ্যা। অন্নমণ্ড মানে কি? ভাল ভাল খেতে বারণ ক'রেছেন।

ক। শ্যামা শানের চাল, কান্দিনী বানের চাল—এই সব জিনিষের মণ্ড ক'রে খেলেই ভাল হয়। তা' না ঘটলে—যে কোন

পুণ্য চালের মণ্ড ক'রে খাওয়া যেতে পারে।

শ্রী। মণ্ড কি রকম ক'রে তৈরি ক'রতে হয়, কতটা খাওয়া যায়, আর ক'বারই বা খাওয়া যায় বলুন।

ক। চাল গুঁড়ো ক'রে,—যতটা চালের গুঁড়ো—তা'ব চৌদ্দ গুণ জলে পাক ক'রতে হয়। তা'রপর চালের গুঁড়ো জলের সঙ্গে ঘোলের মত হ'য়ে গেলে, অথবা খুব তরল থাকতে নামা'তে হয়। মণ্ড একটু গরম থাকতে থাকতে খাওয়া উচিত। একবার পেয়ে থাকতে পা'রলে ভালই, নয়ত দু'বার খেতে হয়। আর একটা কথা—যতটা খেলে পেট বেশী না ভরে—অথবা যতটুকু খেলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়—ততটা খাওয়া যেতে পারে।

শ্রী। আচ্ছা আর কি ওষুদ আছে বলুন?

ক। খই; জীরা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিং, সচল লবণ ও চিতার মূল—সমান ভাগে চূর্ণ ক'রে একত্র ক'রবে। আর চূর্ণ যত—তা'র ঘোল গুণ যবের ছাতুর সঙ্গে মেশা'বে। দধির মতের সঙ্গে এই ঔষধ মিশ্রিত ছাতু সহ্য মত খেতে পার;—এইরূপ ভাবে ৩৪ তোলা থেকে ৭৮ তোলা পর্যন্ত মাত্রায় দিন কতক সেবন ক'রলে স্থূলতা ক'মে যায়।

শ্রী। খালি এই ছাতু খেয়েই কি থাকতে হ'বে?

ক। না, অল্প যে সব পথ্যের কথা ব'লেছি, সে সবও খা'বে, আর একবার এই ওষুদ মিশ্রিত ছাতু খা'বে। তবে এটা যেন মনে থাকে যে,—বেশী খাওয়া আর পরিশ্রম না করার ফলেই স্বোচ্য রোগ হয়। সুতরাং এ রোগে যত কম ক'রে খাওয়া যায় এবং যত অধিক পরিশ্রম করা যায়—ততই ভাল। কিন্তু

কম খাওয়া ব'ললাম ব'লে একবারে কম ব'সতে হ'বে না। কেন না,—শরীর ধারণের উপযোগী আহা'র চাই ত! আর পরিশ্রমও অধিক বলায় শক্তির অতীত—এমনটা বুঝতে হ'বে না, কেননা হঠাৎ অধিক পরিশ্রম ক'রলে অনিষ্ট ঘটতে পারে। আবার পূর্বে যে ক্রমশঃ ব'লেছি—সেটা, এই আহা'র কমান এবং পরিশ্রম বাড়ানোর প্রতি বিশেষ প্রয়োজ্য। ক্রমশঃ আহা'র কমা'লে এবং পরিশ্রম বাড়া'লে কোন অনিষ্ট হয় না।

শ্রী। আচ্ছা আর কি ওষুদ আছে বলুন?

ক। ওষুদ অনেক আছে। কিন্তু সব ত তোমার ঘরে তৈয়ের ক'রে নিতে পা'রবে না। তবু দু'চারটির কথা বলছি শোন (১) মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, সজিনা বীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনা'দি, আতাইচ, শালপানি, হিং, কেয়াফুলের গাছের মূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা ও হবুয়া (অভাবে ধনে) সমান ভাগে চূর্ণ ক'রে একত্র মিশ্রিত ক'রে নেবে, আর চূর্ণ যত নেওয়া হ'বে—যত, মধু ও তিল তৈল প্রত্যেক জিনিষ তত পরিমাণ নিয়ে একত্র মিশ্রিত ক'রবে। তা'রপর সমস্ত মিলিত দ্রব্যের পরিমাণের ঘোলগুণ যবের ছাতু নিয়ে সমস্ত একত্র ক'রবে। এই ঔষধ মিশ্রিত ছাতু সহ্য মত মাত্রায় জলের সঙ্গে গুলে খেলে—স্বোচ্য, মেহ, উদর, শোথ, ভগন্দর, পাণুরোগ প্রভৃতি ভাল হয়। ঔষধ খা'বার সময় কলা, আলু প্রভৃতি কল, কাঁজি, কুমড়া, বাঁশের কোড়, আর করোলা উচ্ছে খেতে নেই। এ ওষুদ ৩০ তোলা থেকে ১১১২ তোলা পর্যন্ত মাত্রায় খাওয়া যেতে পারে।

(২) কুলের পাতা আট তোলা বেটে কাঁজির সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে খেলে হোঁচা ভাল হয়। কাঁজি এক সেরের সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে বথন বন হয়, তখন নামিয়ে নিতে হয়।

শ্রী। অতটা খাওয়া যাবে কেন ?

ক। না পার বতটা পার—ততটা খেও।

রা। আচ্ছা কবিরাজ মহাশয়, ভায়াকে ডাল শুদ্ধ কুলপাতা খাওয়ালে হয় না ?

ক। সেটা তুমি তোমার ভায়ার সঙ্গে বোঝ। কিন্তু ছাগলে কুলপাতা খায় ব'লে মনে ক'রনা যে, ইহার আর কোন রোগ-নাশকতা শক্তি নেই। পৃথিবীর অতি তুচ্ছ দ্রব্য দ্বারাও সময়ে মহান উপকার পাওয়া যায়।

শ্রী। আপনি তা'রপর বলুন কবিরাজ মহাশয়। ও পাগলের কথা ছেড়ে দিন।

ক। (৩) বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, আমলকী ও যব চূর্ণ প্রত্যেকে এক তোলা, আর লৌহভঙ্গ ৪ তোলা একত্র মিশ্রিত ক'রে প্রথমে ছইরতি মাত্রায় আরম্ভ ক'রে তারপর দু' আনা বা তা'রও বেশী প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্রী। লৌহ ভঙ্গ পা'ব কোথায় ?

ক। লৌহভঙ্গ তৈয়ের করা ত সোজা নয়, কাজেই কোন কবিরাজের কাছ থেকে এক আধ তোলা খরিদ ক'রে লওয়া ভাল।

(৪) গুলঞ্চ চূর্ণ এক তোলা, ছোট এলাচ চূর্ণ চার তোলা, ইক্ষয়ব চূর্ণ পাঁচ তোলা, হরীতকী ছয় তোলা, আমলকী চূর্ণ সাত তোলা এবং গুগ্গলু আট তোলা—একত্র মিশ্রিত ক'রে আবশ্যক মত মধুর সঙ্গে বেশ ক'রে মেড়ে নেবে। এই ওষুদ্ব এক সিকি হইতে এক তোলা পর্যন্ত মাত্রায় মধুর সঙ্গে মেড়ে খেলে হোঁচা ও ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়।

শ্রী। আবশ্যক মত মধু কি বলুন ? আর

গুগ্গলু কি ? এই যে ধনে-গুগ্গলু পোড়ান হয়—সেই গুগ্গলু ?

ক। আবশ্যক মত মধু মানে হ'চ্ছে—যে পরিমাণ মধু দিয়ে মাড়লে পাতলা হয় না, বা খুব শক্ত থাকেনা এবং বড়ির মত করা যায়। আর গুগ্গলু মানে যা ব'লছি, তাই বটে, তবে, ওরই মধ্যে যে গুগ্গলু মহিষের চোখের মত লাল আভা দেখতে—সেইগুলি শোধন ক'রে নিতে হয়।

শ্রী। শোধন আবার কি ক'রে ক'রতে হয় ?

ক। শায়ে বলে গুলঞ্চের কাথ; ত্রি-ফলার কাথ কিবা দ্রবের সঙ্গে গুগ্গলু সিদ্ধ ক'রতে হয়। সিদ্ধ ক'রবার সময় শ্রাকড়ার গুগ্গলু নিয়ে হাঁড়ির মুখে একটা কাঠি রেখে—শ্রাকড়া সেই কাঠির সঙ্গে বেঁধে হাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হয়, যেন হাড়ির তলায় না লাগে। তা'রপর সিদ্ধ ক'রতে-ক'রতে গুগ্গলু বেশ নরম হ'লে তুলে নিয়ে মলামাটা বাদ দিয়ে উত্তম গব্য ঘৃত দিয়ে উত্তমরূপে শিলে বাটিয়া লইতে হয়।

শ্রী। আর কি ওষুদ্ব বলবেন বলুন ?

ক। গুগ্গলু বাটিত আর একটা ওষুদ্ব ব'লছি,—মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা আর শোধিত গুগ্গলু নয় তোলা একত্রে আবশ্যক মত মধুর সঙ্গে মেড়ে রা'খতে হয়। এই ওষুদ্ব এক সিকি থেকে এক তোলা মাত্রায় মধুর সঙ্গে মেড়ে খেলে—হোঁচা, মেহ, শুষ্ক ও আমবাতি রোগ ভাল হয়।

শ্রী। আর কোন ওষুদ্ব বলবেন না ?

ক। আর ব'লে লাভ কি, ভোমারী ও

গায়ের ক'রে নিতে পা'রবে না। আর যে সব ওষুদ ব'ললাম—এর দুই একটা তোয়ের ক'রে খেলে আর সুপথ্যে থা'কলে ভাল হ'য়ে যা'বে।

শ্রী। আচ্ছা, তাই ক'রব আমি। আমার একজন বন্ধু এই রোগের জন্তে আমেরিকা থেকে ওষুদ আনিয়েছিল, হু'মাস খেয়েও কিছু হ'ল না। আমি বিদেশী-ওষুদ ছেড়ে দিয়ে একবার দেশী-ওষুদই চেষ্টা ক'রে দেখি।

ক। শুধু তাই নয়, তোমার সেই বন্ধুটিকেও যে সব নিয়ম ব'ললাম সেই সব নিয়ম পালন ক'রে ওষুদ খাইও। তা' হলে তিনি দ্রুত পাবেন যে, হাতের কাছে প্রতিকারের উপায় থাকতে, তিনি প্রলোভনে প'ড়ে বিদেশে ওষুদ আনিয়ে প্রতারণিত হ'য়েছেন। এদেখে অনেকের চোখও ফুটতে পারে।

শ্রী। আচ্ছা কবিরাজ মশায়, আমার শরীরে বড় হুর্গন্ধ হয়,—এব. কি কোন প্রতি-কাব নেই ?

ক। তা' আছে বই কি। কিন্তু সে সব ব'লে লাভ নেই, কেননা তোমরা ত'য়ের ক'রে নিতে পা'রবে না। সহজ কতকগুলো মুষ্টিযোগ বলছি। (১) তেজপাতা, কলা, অগুরু, হরীতকী ও রক্তচন্দন সমভাগে বেটে প্রলেপ দিলে গায়ের হুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

শ্রী। অগুরুটা কি ? অনেক স্থানে অগুরু নাম শুনেতে পাই, আর ব'য়েও দেখতে পাই, কিন্তু জিনিষটে কি—তা' জানিনে।

ক। চন্দনের মত এক রকম কাঠ। আসাম অঞ্চলে জন্মায়, খুব সাদা,—দামও খুব বেশী। তা তুমি অগুরু না পেলে খেত চন্দন দিও।

শ্রী। সে ভাল কথা। এখন আরও মুষ্টিযোগ বলুন।

ক। (২) শাঁক—কি শাঁক যা'রা তৈয়ের করে,—তা'দের দোকানে শাঁকের এক রকম গোড়া পাওয়া যায়। তাই চূর্ণ ক'রে—বাসক পাতার রস—কি বেগপাতার রসের সঙ্গে বেটে গায়ে মা'খলে হুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

(৩) তেঁতুল পাতার রস মালিস ক'রে—তা'র পর হলুদ পোড়া—তেঁতুল পাতার রসে বেটে মর্দন ক'রলে বগলের এবং গায়ের হুর্গন্ধ নষ্ট হয়। (৪) তেজপাতা, কলা, অগুরু, খেত-চন্দন ও বেগারমূল জলের সঙ্গে বেটে মর্দন করলে হুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

শ্রী। এখানে অগুরু ও খেতচন্দন দুই ব'য়েছে, তবে অগুরু না পেলে তা'র বদলে কি নেব ?

ক। হু'ভাগ খেতচন্দন নেবে, কি অগুরুর বদলে রক্তচন্দন নেবে। কিন্তু বেশ সাদা-যুক্ত রক্তচন্দন হওয়া চাই। এক রকম গন্ধহীন লালচন্দন কাঠ বাজারে বিক্রী হয়, সেগুলো রক্তচন্দন নয়।

শ্রী। আচ্ছা তা'রপর বলুন।

ক। (৫) শিরীষছাল, বেগারমূল, নাগকেশর ও লোধ ছালচূর্ণ—জলের সঙ্গে বেটে প্রলেপ দিলে ত্বকের দোষ ও ঘাম হওয়া ভাল হয়।

শ্রী। আর কি ?

রা। থাম ভায়া। উনি হোল্য নষ্ট ক'রবেন, শরীরের হুর্গন্ধ নষ্ট ক'রবেন,—আর আমি যেন কেউ নই! আমি কি ক'রে মোটা হই—বলুন ত কবিরাজ মশায়।

ক। তোমার পথ অতি সোজা। খুব ঘুমোও, ব'সে ব'সে ক্ষুধা কর, পরিশ্রম ক'রো না, রান্ধা হেঁট না, গাড়ী বোড়া চড়া বন্ধ কর, চিন্তা ক'রো না, শোক বা ভয় ক'রো না, রা

সহবাস ক'রো না, আর পোলাও, কালিয়া, মাছ, মাংস, খাও, ঘি যত পার খাও। কিন্তু পেট বুঝে খা'বে, শেষে যেন অজীর্ণ কি অতিসার রোগ ক'রে ব'স না।

রা। তা' একেবারে চিন্তা না ক'রে আর একেবারে পখ'না হেটে চ'লবে কি ক'রে মশায়?

বা। চলা ত উচিত, তবে যদি নিতান্ত না চলে, তবে যতটা কম ক'রবে তত ভাল। আর যত বেশী ক'রবে ততই মন্দ।

রা। আর ওষুদের কথা বলুন।

ক। ঔষধ তোমার বড় দরকার হ'বে না, পুষ্টিকর জিনিষ প্রচুর খেয়ে ঐ সব নিয়ম পালন করলেই হ'বে। আর আহারের পূর্বে জল না খেয়ে আহারের পরে খা'বে। ঔষধ যদি খেতে চাও—কবিরাজী বৃহৎ ছাগলাচ্ছত, অশ্বগন্ধা স্মৃত, চ্যবন প্রাশ, মাখন, মিছরী দিয়ে মকরধ্বজ—এই সব খেতে পার।

রা। বেশ কবিরাজ মশায়?—শ্রামের বেলায় এত মুষ্টিযোগ প্রদান করলেন, আর আমার বেলায় কি আপনার মুষ্টি শিখিল হ'য়ে গেল?

ক। মুষ্টি শিখিল হয় নি, কিন্তু কীর্ণ দেহে যোগ করা বিপজ্জনক। তবে নেহাৎ যখন

তুমি ছাড়বে না,—তখন ছই একটা শোন,—  
(১) ক্ষীর কাঁকলা, অশ্বগন্ধা, ভূঁইকুমড়া, ভূঁই আমলা, শতমূলী, শ্বেত বেড়েলা, পীতবেড়েলা, ও গোরক্ষচাকুলে—সমান ভাগে চূর্ণ ক'রে ছই আনা থেকে এক সিকি মাত্রায় জ্ববে সঙ্গে খেতে পার। (২) অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ বা ভূঁইকুমড়া চূর্ণ—জ্ববে সঙ্গে একসিকি মাত্রায় খেলে শরীর মোটা হয়। এ ছাড়া রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধগুলি সমস্তই ক্রুশতা নাশক।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ মশায়, এই কি আয়ুর্বেদের স্থৌল্য বা কাশ্য—চিকিৎসা শেষ?

ক। না, কত ঔষধ আছে। কিন্তু সে সমস্ত এখন কেবল পু'থিগত, ব্যবহার নাই।

রা। তা' কবিরাজ মশায়, আপনিও ব'লছেন যে, শ্রামের চেয়ে আমি শীঘ্র ভাল হ'ব?

ক। সেটা নিজের উপর নির্ভর করে। ডাক্তার-কবিরাজে ব্যবস্থা করে, কিন্তু নিয়ম পালন করে—রোগী। যে যেমন নিয়ম পালন করে, সুপথ্য থাকে, সে তেমন ফল পায়।

রাম ও শ্রাম। আচ্ছা এখন আমি কবিরাজ মশায়, ভাল হ'লে খুসী ক'রব।

## সাধনা ও সিদ্ধি।

—:—

যে লোক-হিতৈষণা প্রবৃত্তিরশে একদিন ভারতের আধ্যাত্মবিগণ স্বার্থ-পরার্থ সমান ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, যে চিন্তার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প প্রভৃতি মানুষের

ইহ-পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলির ঐকান্তিকী উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, আজি আর ভারতের সে দিন নাই; সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই! সে স্বধের দিন—

সে গৌরবের দিন আর নাই ; সে মনস্ত্রিবিদ্যুৎ  
প্রবৃত্ত—সে ব্যাস-বশিষ্ঠ-শুক-পরশর—সে  
মনক-মনাতন-মনন্দ আব নাই,—সে ধনস্ত্রি-  
বিক-সুশ্রুত-বাগ্‌ভট আর নাই ;—আছে  
ঋতাদের অমূল্য উপদেশ—মল্লধোব সর্ববিধ  
রূপে নিবৃত্তি ব্যাপদেশে তাঁহাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধি  
নবলোক-জগৎ অত্যন্ত অলৌকিক উপদেশ  
মালা। যে উপদেশ নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া  
ভাবতবাসীরা ভাণ্ডার ধনধাত্তোপূর্ণ ছিল, আয়-  
বল-আবোগ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, সমাজে শৃঙ্খলা  
ছিল, ধর্ম্মে আস্থা ছিল, মেহ-প্রীতি-বিশ্বাস-  
তত্ত্বিতে হৃদয় পূর্ণ ছিল, পরার্থে স্বার্থ উপে-  
ক্ষিত হইয়াছিল, সে দিন আর নাই। সে  
দিন নাই—সে কিছুই নাই। একটা তন্ত্রীতে  
আঘাত মাত্রে যেমন বীণার প্রত্যেক  
তন্ত্রী বহুত হইয়া উঠে, একদিন তেমনি  
পৃথিবীতে একটা অঙ্গুলি হেলনে—একটা  
ইঙ্গিতে সমগ্র সমাজ পরিচলিত হইত, সে দিন  
আব নাই। সে একতা নাই, সে নিষ্ঠা নাই,  
সে সহায়ত্ব নাই, সে কৃতজ্ঞতা নাই, সে  
উপদেশানুবর্তিতা নাই। কেন এমন হইল,  
কে বলিয়া দিবে—কেন এমন হইল ?

ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীগণ  
আজিও ত সেইরূপ সমাজের উচ্চস্তরে  
দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু সে জ্ঞান, সে  
তপশ্চরণ, সে শিক্ষা কই ? সে স্বার্থ-  
ত্যাগ—সে স্বাবলম্বন—সে সমাজহিতৈষিতা—  
সে পরস্পরে আত্মবোধ কই ? মহর্ষিগণের  
বংশধর বলিয়া—আর্য্যসন্তান বলিয়া অনেকের  
ভিতর একটা অভিমানও আছে দেখিতে  
পাই, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান ইহাদের কোন-  
ও বর্তমান আছে ? তাঁহাদের অন্তর্জ্ঞানের  
পরে ইহারা তাঁহাদের অমূরূপ কোন কীর্ত্তি

স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ? নূতন একটা  
কীর্ত্তি স্থাপন দূরে থাক, তাঁহারা বাহা রাখিয়া  
গিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতেই বা তাঁহাদের  
বংশধরগণের যত্ন-চেষ্টা কই ?—আগ্রহ-আকুলতা  
কই ? তাঁহাদের যদি সে স্মৃতি—সে আত্ম-  
রক্ষার যত্নপরতা দেখা বাইত, তবে কি দেশের  
এ দুর্গতি হয়—এ অধঃপতন হয় ! নিদর্শন  
থাকিলে স্মৃতি একেবারে অন্তর্হিত হয় না,  
কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশে ভারতের সে স্মৃতি  
নাই, স্মৃতির সে নিদর্শনও নাই ; সুতরাং  
স্মৃতির সে পূর্বস্মৃতি টুকু পর্য্যন্ত মুছিয়া  
গিয়াছে। যদি হৃদয়ে পূর্বে গৌরবের সে  
স্মৃতি বর্তমান থাকিত, তবে কি দেশের  
এ দারুণ দুর্গতি ঘটে ? স্মৃতি গিয়াছে বলিয়াই  
ত এই অধঃপতন—এই পরমুখাপেক্ষিতা !  
আজি বৈদেশিক উন্নতি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ,—  
বিজ্ঞান-দর্শন দেখিয়া,—শিল্প-সাহিত্য দেখিয়া,  
—কাব্য-অলঙ্কার দেখিয়া মুগ্ধ ! বাহা বস্তুতঃ  
ভাল, তাহা দেখিয়া সর্বদেশে—সর্বকালেই  
লোকে স্মৃত্যতি করে,—মুগ্ধ হয়, কিন্তু বিদেশ  
হইতে যাঁহা কিছু আমদানী হইবে, তাহা  
দেখিয়াই মুগ্ধ হইতে হইবে—এ বড় আশ্চর্য্য  
কথা ! দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে,—দুর্গতি  
আর কাহাকে বলে,—অবনতি আর কাহাকে  
বলে ! আমাদের যাঁহা ছিল, তাহা দেখিব না—  
বুঝিব না—বুঝিবার চেষ্টাও করিব না,—তাহা  
ভাল কি মন্দ ছিল, তাহার বিচার করিব  
না, একটা স্বেচ্ছা-আলপিন্ দেখিয়াই পরের  
গৌরব করিব,—এ বুদ্ধির বালাই লইয়া মরিতে  
ইচ্ছা হয় ! বৈদেশিকেরা আমাদের বেদ-  
উপনিষদ, স্মৃতি-দর্শন, পুরাণ-ইতিহাসের  
অর্থ কহিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের বুদ্ধির মাপ-  
কাঠিতে বাপিয়া-জুখিয়া বাহা সিদ্ধান্ত করিয়া

দিতেছেন, তাহাই আমরা মাথা-পাতিয়া  
 লইতেছি। তাঁহারা যাহার অর্থ বুঝিয়া বলিতে  
 ছেন—“ইহার অর্থ নাই,—ইহা আধুনিক,—  
 ইহা প্রক্ষিপ্ত,—এটা কল্পিত,—এটা ভ্রম-  
 প্রমাদ,—এটা কুসংস্কার,—শ্রম-বিনোদনে ইহা  
 চাষার গান,”—আব অমনি আমরা তাহাই  
 বুঝিতেছি;—ভাগ্য! যাহা আমাদের নিতান্ত  
 নিজস্ব—নিতান্ত ঘরের কথা,—নিত্য-নৈমিত্তিক  
 ক্রিয়া-কাণ্ডের কথা, যে কথা আমাদের জীবন-  
 মরণের সহিত জড়িত, যাহা আমাদের অতি  
 প্রয়োজনীয় কথা—যে কথা আমাদের পূর্ব  
 পুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন—বুঝাইয়া গিয়াছেন,  
 সে কথার অর্থ আজি আমরা নিজের বুঝিতে  
 পারি না—বুঝিবার চেষ্টাও করি না, এ ছুঃখের  
 কথা বলিই বা কাহাকে—ভুলেই বা কে? যে  
 কথা শুনিবার জ্ঞাত—বুঝিবার জ্ঞাত—এক দিন  
 সহস্র সহস্র লোকের আগ্রহ-আকুলতা ছিল,  
 সহস্র সহস্র লোক সেই-তপোনিষ্ঠ আচার্য্য-  
 সন্নিধানে সমবেত হইয়া তত্ত্বার্থ জিজ্ঞাসু হইত,  
 সেই কথা শুনিবার জ্ঞাত এখন আমরা বিদেশীর  
 মুখপানে চাহিয়া আছি! দ্রুতগ্য কি  
 আমাদের অঙ্গ! এক্ষণে যদি কেহ আমাদের  
 সেই কথা শুনাইবার—বুঝাইবার জ্ঞাত অগ্রসর  
 হয়, চেষ্টা-যত্ন করে, তবে সে সহজেই উপ-  
 হাস্যম্পদ হয়,—মতিচ্ছন্ন আর কাহাকে বলে?  
 আজি আর অত্ন কথা বলিব না—তুলিব না;  
 বর্তমানে যাহা আমাদের বড় প্রয়োজনীয় কথা,  
 আমাদের মরণ-জীবনের কথা, সেই আয়ুর্বেদ  
 সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের  
 উপসংহার করিব, পরে আমার যাহা বক্তব্য,  
 তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

যদি সুস্থ-শরীরে বাঁচিয়া থাকি, তবেই  
 অত্ন বিষয়ের প্রয়োজন হয়, নচেৎ কিছুই

প্রয়োজন নাই। আমি বাঁচিলে তবে  
 দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য,  
 রাজনীতি-সমাজ-নীতি-অর্থনীতির প্রয়োজন;  
 এমন কি, যে ধর্ম আমাদের ইহ-পরকালে  
 সহচর, শরীর সুস্থ-সবল-কর্মক্ষম না থাকিলে  
 সে ধর্ম-সাধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। জন্ম  
 হইতে মরণ পর্য্যন্ত কখনও বোগাক্রান্ত হয়  
 নাই,—মৃত্যু সময়ে সহসা একদিন রোগ  
 আক্রমণ করিল—আর মৃত্যুমুখে পতিত হইল,  
 এমন দেহধারী জীব জগতে নাই; সকলকেই  
 জীবিতকাল মধ্যে বহুব্যবহারে রোগ-কবলে  
 পতিত হইতে হয়। রোগ যখন আক্রমণ  
 করিবেই, তখন যে সত্ৰপায় দ্বারা সেই রোগেব  
 আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই  
 অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। যে জ্ঞান দ্বারা  
 সেই সত্ৰপায় নির্দিষ্ট হয়, তাহাই চিকিৎসা।  
 এই চিকিৎসা যে শাস্ত্র নির্দেশ করে, তাহাকে  
 আয়ুর্বিজ্ঞান বা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলে। এই  
 আয়ুর্বেদের রক্ষা কল্পে,—শিক্ষা কল্পে,—প্রণাব  
 কল্পে এই ভারতবর্ষে অনাদি কাল হইতে  
 চেষ্টা চলিতেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু-রুদ্র-ঋষিরা  
 কুমারদ্বয়-ধনুস্তরি প্রভৃতি দেবগণ; দক্ষ  
 প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, অজৈয়, অঙ্গিরা, চাবন,  
 চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ এই পবিত্র  
 লোকহিতকর আয়ুর্বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার  
 করিয়া জীবকুলকে রোগমুক্ত ও দীর্ঘায়ু হু  
 করিতে যত্নপর হইলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা—  
 সে যত্ন—সে সাধনা সার্থক হইল; আয়ুর্বেদ  
 জীব-জগতে বরনীয় হইল; আয়ুর্বেদের  
 উপকারিতা লোকে হৃদয়ঙ্গম করিল; আয়ু-  
 র্বেদ জীবনধাত্রা নির্বাহের অত্ন দ্বিতীয়  
 দেহরক্ষাপঞ্জীরূপে পরিগৃহীত হইল। যে  
 মহাপুরুষগণ আপনাদের দ্বারা উপেক্ষা পূর্বক



লোকহিতার্থে সেই আয়ুর্কোষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, জীবকুলকে বোগমুক্ত করিতে আত্ম-নিয়োগ করিলেন, প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের এই স্বার্থত্যাগ, পবোপকারিতা, অধ্যবসায় দর্শনে প্রীত হইয়া পরম পবিত্র অমূল্য সমগ্র আয়ুর্কোষ শাস্ত্র তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদের আয়ুর্কোষ বিজ্ঞায় বংশানুক্রমিক উন্নতি-কামনায়—আয়ুর্কোষ বিদ্য কবিবার অভিপ্রায়ে “বৈদ্য” এই বিজ্ঞান-বিদ্য অভিধান প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিলেন। তদবধি প্রধানতঃ বৈদ্যাগণই এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা দ্বারা এবং স্বয়ং শাস্ত্র সম্বন্ধে চিকিৎসাবিধান করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের সাতিশয় যত্নে এই এই চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতিও হইয়াছিল। উন্নতি হইবারই কথা। ইহা আমাদের দেশের লোকের ধাতুর সম্পূর্ণ উপযোগী, বিশেষতঃ আমাদেরই গৃহ পার্শ্বে, পল্লী-প্রান্তরে, পর্বতে-কাননে দেশের যত্র-তত্র ঔষধের উপাদান সকল ছড়ান রহিয়াছে, অনাগ্রাসেই এই সকল উপাদান চিকিৎসক-গণ সংগ্রহ করিতে পারেন। আমরা যেমন চিরদরিদ্র, আমাদের চিকিৎসার ব্যয়ও সেইরূপ অল্প হইল। কেবল ইহাই নহে, এক পক্ষে এই বৈদ্য বা আয়ুর্কোষীয় চিকিৎসকগণ যেমন অভিজ্ঞ ও বিলাস-বিহীন থাকিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, অত্ৰপক্ষে ঔষধাদির ব্যয়ও তেমনি বরন হইল, সুতরাং মণিকাঞ্চন বোগের হ্রাস হওয়াতে এই চিকিৎসা-প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল, কিন্তু কেমন যে বিধাতার অভিপাত, উন্নতি হইতে না হইতে যোর অবনতি আরম্ভ হইল। যেমন ভারতের জ্ঞান-ধর্ম দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহি-

ত্বের অবনতি হইল, তেমনি আয়ুর্কোষেরও অবনতি হইল! প্রদীপ্ত প্রাণঃস্বর্গ উদয় মাত্রেই চির মেঘাবৃত হইল! সত্যবটে কাল-ধর্ম্মে উন্নতির পথে অবনতি অবশ্যস্বাবী, আবার অবনতির পথে উন্নতিও অবশ্যস্বাবী; কিন্তু ভারতের যে অবনতি ঘটিল, তাহার আবার পরিবর্তন হইল না। তাই বলিতে ছিলাম, ভারতের উন্নতিতে বৃদ্ধি দেবকুলেরও ক্ষীর্ণ হইয়াছিল, সেইজন্য দেবশ্রেষ্ঠ বিধাতার অভিসম্পাতে আজ আমাদের এ দারুণ দুর্গতি,—এ অপ্রতিবিধেয় অবনতি।

অনেকে বলেন যে, আজ কাল আবার আমরা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু হায়, কোথায় সে উন্নতি! যদি উন্নতিই হইতেছে, তবে সে একতা কৈ—সে এক প্রাণতা কৈ,—সে বিশ্বজনীন হিতৈষণা কৈ,—সে জ্ঞান কৈ? ধর্ম্মে সে আস্থা কৈ,—আপত্তাকো সে বিশ্বাস কৈ,—সে ত্যাগ কৈ,—সে তিতিক্ষা কৈ,—সে ব্রহ্মচর্যা কৈ?—কৈ সে স্বজাতি-প্রীতি? কৈ সে স্বদেশ-প্রীতি? মুখের কথায় যদি উন্নতি সম্ভব হয়, তবে সেটা আমাদের যথেষ্টই হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। কথায় আমরা কি করিতে না পারি? কথায় চটকে আমরা লোকের মন ভুলাইতে পারি,—লোক মজাইতে পারি,—কথায় আমরা দিগ্বিজয় করিতে পারি;—আকাশের চাঁদ পাড়িয়া হাতে দিতে পারি,—কথায় উন্নতি আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে! কিন্তু কার্য্যতঃ আয়োজনপরায়ণতা ব্যতীত আর আমাদের কিছুই শিক্ষা হয় নাই; আয়োজনপূরণে এতটুকু বিয় ঘটিলে আমরা অস্থির হই। আমরা আপনায় কাহিনী আপনি দিখি,

আপনার ধ্বংস আপনি কাঁধে করি, আপনি আপনার ঢাক বাজাই, আপনার কথাই “পাঁচ কাহন” করি! ইহাট আমদের জ্ঞান, ইহাট আমাদের শিক্ষা, ইহাই আমাদের বুদ্ধি, আর ইহাই আমাদের বর্তমান উন্নতি!

যাক্, বলিতেছিলাম—আয়ুর্বেদের অবনতির কথা। আয়ুর্বেদের অবনতিতে আমাদের মতটা ক্ষতি হইয়াছে, অল্প কিছুতে বোধ হয় এত ক্ষতি হয় নাই। বলিয়াছি ত, যদি আমাদের আয়ু-বল-আরোগ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তবেই আমাদের অল্প বিষয় আলোচনার অবসর হয়—প্রয়োজন হয়; সুতরাং ধর্মার্থ কাম-মোক্ষের নিদান স্বরূপ আয়ু-বল-আরোগ্যহীন হইয়া আমরা সকল হারা হইতে বসিয়াছি। যাহাদের পূর্ব পুরুষগণ সর্বলোকরক্ষাকর এই আয়ুর্বিজ্ঞানের বিজয়-বৈজয়ন্তী মালা গলদেশে ধারণ করিয়া সগৌরবে জীবরক্ষাত্রে আত্মশক্তির সম্পূর্ণ নিয়োগ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্বগৌরব সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত। সেই প্রাণাচার্য্যগণের স্মৃতি আজি আর প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষায় যত্নশীল নহেন।

এ দেশে একটা প্রবাদ আছে,—“বৈজয়ন্তী বড় স্বভাতিপ্রিয়।” বর্তমানে কৈ, তাহার ও ত সার্থকতা দেখিতে পাই না। যদি পরম্পরে সে সহায়ত্ব হুতি থাকিত, তবে আজি সমুদয় বৈজয়-চিকিৎসক-সমাজকে “অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়ের” প্রাঙ্গনে সমবেত দেখিতাম। এই আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া ইহার উদ্বোধন যেরূপে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার যে গুরুত্ব কত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আজ আমাদের দেশে হাকিমি,

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি নানা প্রকার চিকিৎসার ছড়াছড়ি;—এই সময়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠা! ব্যাপার বড়ই গুরুতর! কোথায় পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানসম্মত, রাজাধিরাজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত পরিস্ফুট চিকিৎসাগার—পরীক্ষাগার—শিক্ষাগার—যেখানে বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতমণ্ডলী—তাঁহাদের জীবনব্যাপী শিক্ষা-উত্তম-অধ্যবসায় লইয়া শিক্ষা-পরীক্ষা-চিকিৎসা-ব্যাপদেশে নিযুক্ত, আর কোথায় সহায়-সহায়ত্বহুতি বিহীন আয়ুর্বেদ-কলেজ! অবস্থা বুঝিয়া অনেকেই বলিবে—“আয়ুর্বেদ-কলেজের প্রতিষ্ঠা—পাগলামীর পরিচয়।” আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমরা বলি, ঠিক উপযুক্ত সময়েই ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে জিনিষের ভাল মন্দ বুঝা যায় না, প্রতিযোগি-পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে জিনিষের আদর হয় না। এই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে যাহারা অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীর নিকট বরণ্য হইবেন—দেব-ঋষিগণের আশীর্বাদ-ভাজন হইবেন।

আমার আয়ুর্বেদ বলিয়া আমি গৌরব করিতে পারি, কিন্তু অপরের নিকট তাহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে না পারিলে তাহার গৌরব রক্ষা হইবে কেনন করিয়া? প্রতিযোগিতার তুলনার দেখাইতে হইবে যে, আমার আয়ুর্বেদই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-শাস্ত্র, আমার আয়ুর্বেদই সকল প্রকার চিকিৎসার নিদান—অস্ত্রাঙ্গ দেশের চিকিৎসা-প্রণালী আমার আয়ুর্বেদ হইতেই সমুদ্ভূত।

কেবল বক্তৃতায়ুধে—প্রবন্ধে-নিবন্ধে একথা বলিলে চলিবে না,—এ বিজ্ঞানের যুগে—এ পরীক্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে—মুখের বৃথা আফালন কেহ শুনিবে না—মানিবে না। তাই বলিতেছিলাম, আজি ঠিক উপযুক্ত সময়েই “অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদ কলেজের” প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠাকে যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে এক পক্ষে যেমন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, অন্যপক্ষে তেমনি প্রত্যেক আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের ঐকান্তিক সাহায্যেরও প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমরা বলি, যিনি শাস্ত্র মানেন, দেবতা মানেন, ঋষি মানেন, ঋষিদিগের বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদানে কুণ্ঠিত নহেন, তিনিই আহুন,—এই দেব-ঋষি রচিত আয়ুর্বেদের মহিমা রক্ষা করিতে অগ্রসর হউন। এই আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়ের সর্ববিধ কার্য সুচারুরূপে সম্পাদনার্থ যত্ন-প্রকাশে—আশ্রয় স্বীকারে—সাধ্য সাধনভূমিতে পুরস্কার নাই—অথচ না করিলে

প্রতাবায় আছে—এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া যিনি এ ক্ষেত্রে কার্য করিবেন, তিনি যথার্থ ত্যাগশীল-ঋষি-সন্তান, তিনি দেশের সুসন্তান, তিনি ধন্ত।

ইহার উদ্বোধনগণের কার্যকলাপে—বিধি-ব্যবস্থায় ভ্রম-প্রমাদ আছে, তোমরা আসিরা সে ভ্রম-সংশোধন করিয়া দাও, “অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়কে” আপনাদের নিজ প্রতিষ্ঠিত কার্য বলিয়া গ্রহণ কর, দেশে-দেশে ভারতের বৈদ্য-কুলের যশঃ বিবোধিত হউক, দেশে দেশে আয়ুর্বেদের মহিমা প্রচারিত হউক, দেশে-বিদেশে আয়ুর্বেদের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক; স্বর্গ হইতে দেশের সুসন্তানগণের মন্তকে—অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদ প্রচারের অনুরোধ-গণের মন্তকে পুষ্পাশিস্ বর্ষিত হউক। সাধনায় সিদ্ধি আছে, কে তাহা অস্বীকার করিবে? অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধনায় যদি সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়, তবে অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদের সাধনাও ব্যর্থ হইবে না।—সাধনা কর, সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত।

ডাঃ শ্রীকালীকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

## শঙ্ক।

—:—

হিন্দুর গৃহে শঙ্ক বড় পবিত্র জিনিষ। শঙ্কের ধ্বনিতে হিন্দুর দেবতা তুষ্ট। হিন্দুর সকল মঙ্গল কার্যোই শঙ্ক-ধ্বনির প্রয়োজন। শাঁখা-সাড়ী ও সিন্দূরের প্রসাদে, হিন্দু রমণী দেবীর মহিমা মহিমাষিতা। যে কিছু হিন্দুর সর্বপ্রধান দেবতা, পুরাণে তিনি শঙ্ক-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপে বর্ণিত।

এক সময় এ দেশে শঙ্কের আদর যথেষ্ট

ছিল। এ দেশের রথি-মহারথিগণ শঙ্কনাদে সন্মত বোধনা করিতেন। এক জোড়া শাঁখা জন্ত মা জুগা শিবের সঙ্গে কতই না বগড়া করিয়াছিলেন! শাঁখা পরিবার জন্ত—দেবী বানবী সাজিতেন! শঙ্ক নির্মিত অলঙ্কার হাতে না থাকিলে, মেয়ে-মহিলার হাতের জল শুষ্ক হইত না। যে নারীর হাতে শঙ্ক শোভা পাইত না, তাহার হস্ত হইতে

ভিত্তারী ভিক্ষা লইত না। শঙ্খ মধ্যস্থিত জলকে হিন্দুগণ তীর্থ-সলিলের মত অতি পবিত্র ভাবিয়া থাকেন। “মহাতারতে” শঙ্খের অনেকগুলি নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ, “পাঞ্চজন্তু” শঙ্খ বাজাইতেন, অর্জুনের হস্তে “দেবদত্ত” নামক শঙ্খ শোভা পাইত। বীর-হস্তের শঙ্খ—“পোণ্ডু” “মনদ্ৰ” “বিজয়” “সুবোধ” “মণিপুষ্পক” প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইত।

প্রাচীন কালে বঙ্গরমণীগণও শাঁখা পরিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের এই শঙ্খ-প্রীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া ইতালী দেশের পরিব্রাজক “গার্সিয়া” তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন—“শঙ্খ উপটোকন পাইলে বাঙ্গালীর মেয়ে উপহার-প্রদাতার হস্তে অনায়াসেই নিজের সত্য অর্পণ করিতে পারে।” এ কথা সাহেব কোতুক করিয়া লিখিয়াছেন কি না জানি না, এখন কিন্তু এ দেশে শঙ্খ নির্মিত অলঙ্কারের তত আদর নাই। “বেলোয়ারী চুড়ী” এখন শঙ্খের স্থলে অভিষিক্ত হইয়াছে। যদিও কোন কোন ভক্ত-মহিলার হাতে ঢাকার শাঁখার বালা—এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা বাদলার দিনে বড়গোঁকের মুড়ী খাওয়ার মত—কেবল সখের খাতিরে। কিছু দিন পরে হয় ত শাঁখার আদর একবারেই উঠিয়া যাইবে।

শাঁখার আদর এখনও আসাম প্রদেশের বঙ্গ জাতিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কুকি, মিকির, মালা, প্রভৃতি বর্বর জাতিরা—জী-পুরুষে মিলিয়া এখনও নানাবিধ শাঁখার গহনা পরিয়া থাকে। এখনও তাহারা সভ্য হয় নাই।

পুরাণে শঙ্খধ্বনির অনন্ত মহিমা উক্ত হইয়াছে। “শঙ্খাঙ্কো ভবেৎ যত্র তত্র লক্ষ্মীঃ সুস্থিরা”—যে স্থানে শঙ্খধ্বনি হয়, লক্ষ্মী সেখানে সুস্থিরা হইয়া থাকেন, এইজন্তই আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ সন্ধ্যাকালে শাঁখ বাজাইয়া মা কমলার অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারগণ—মেয়ে মানুষকে শাঁখ বাজাইতে বারণ করিয়াছেন যথা,—

জ্ঞীণাঞ্চ শঙ্খধ্বনিভিঃ শূদ্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ।

ভীতা রুষ্টা য়াতি লক্ষ্মীঃ স্থলমনাং স্থলান্ততঃ।

অর্থাৎ জ্ঞীজাতি ও শূদ্রজাতি যদি শাঁখ বাজায়, তাহা হইলে লক্ষ্মী ভয় পাইয়া ও রাগ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন। পূর্বে বোধ হয়—পুরুষেরাই শাঁখ বাজাইতেন, কাল ক্রমে ত্রুত নিয়মাহুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনির ভারটাও পুরুষদের হাত হইতে মেয়েদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে শঙ্খবাজের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহা কখনই কুসংস্কার নহে। নিশ্চয়ই পুরাকালের আৰ্য্য ঋষিগণ শঙ্খধ্বনির কোন অলৌকিক শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে বঙ্গের দিগ্বিজয়ী বৈজ্ঞানিক আচার্য্য ত্রিযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শঙ্খধ্বনির অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিয়া দেশবাসিগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন। এস্থলে সে ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—

কীট পতঙ্গ ধরিয়া জীবিত রাখিবার জন্ত এক রকম কাচপাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কাচপাত্র একরূপ ভাবে নির্মিত, যে ইহার মধ্যে বায়ু অনায়াসে চলাচল করিতে পারে, অথচ ইহার ভিতরে রক্ষিত কীট বা জীবাণু কোনরূপে বাহিরে বাহির হইয়া পলাইতে

পাবে না। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে শত শত ছাত্রের সম্মুখে, এইরূপ একটা কাচপাত্র বহু সংখ্যক জীবাণু দ্বারা পূর্ণ করিয়া, আচার্য্য ভগদীশচন্দ্র তন্মধ্যে শঙ্খের শব্দ প্রবেশ করাইয়াছিলেন। শঙ্খধ্বনি প্রবিষ্ট হইবার অন্তর্ক্ষণ পবেই দর্শকবৃন্দ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন—পাত্রস্থিত অসংখ্য জীবিত জীবাণু পক্ষান্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র শঙ্খধ্বনিই যে জীবাণুগুলির মৃত্যুর কারণ—পরীক্ষায় ইহা স্থিবিধৃত হয়। শঙ্খধ্বনির এই অপূর্ব শক্তির কথা সার্থ্য্য শ্রুতিদের অজ্ঞাত ছিলনা। শঙ্খ-দ্রুতি স্থলে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন—  
গর্ভা দেবারিনারীণাং বিনশ্চন্তি সহস্রধা।  
তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্তু নমোহস্ততে॥

পাঠকগণের স্বরণ থাকিতে পারে, এদেশে যখন জনপদ-বিধ্বংসী মহামারীরূপে বিউবনিক প্রেণ রোগ দেখা দিয়াছিল, তখন জনৈক সাধু দেশবাসিগণকে শঙ্খধ্বনি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

শঙ্খের যে রোগনাশিকা শক্তি আছে, আমাদের জীবন্ত বিজ্ঞান “আয়ুর্বেদ”ই তাহার একমাত্র সাক্ষী। অনেক রোগেই কবিরাজ মহাশয়েরা শঙ্খভঙ্গ ব্যবহার করিয়া থাকেন। শঙ্খ—এছাড়া ঔষধেরই উপাদান। নিম্নে দুই চারিটির উল্লেখ করিতেছি।

### জ্বরের শঙ্খ প্রয়োগ—

দগ্ধশঙ্খং ত্রিকটুকং টঙ্গরং সমভাগিকং।  
বিষঞ্চ পঞ্চভিস্তল্য মার্কতোয়েন মর্দয়েৎ।  
গাবত্রয়ং রক্তিকাভাং বটাং কুর্ধ্যাৎ বিচক্ষণঃ।  
কককেতুঃ কণ্ঠরোগে, শিরোরোগেগঞ্চ নাশয়েৎ॥

শঙ্খভঙ্গ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খে, প্রত্যেক এক ভাগ, শোধিত কাঠবিষ ৫

ভাগ, আদার রসে মাড়িয়া ১ রতি বটা করিবে। ইহার নাম “কককেতু”। ইহাতে শ্লেষ্মঘটত জ্বর, কণ্ঠরোগ ও শিরোরোগ নষ্ট হয়।

### জ্বরাতিসারে শঙ্খ প্রয়োগ—

শঙ্খং মোচরসং লোহং ধাতকী বটশুষ্ককং।  
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন শুড়িকাক্ষাস্মিতাঃ।  
ছায়া শুষ্কাঃ পিবেৎ ক্ষিপ্ৰং জ্বরাতিসারশাস্তয়ে।  
শঙ্খভঙ্গ, মোচরস, লোধকাঠ, ধাতকীফুল এবং বটের রুরি, সমভাগে তণ্ডুল জলে বাটিয়া অক্ষতুল্য শুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইবে। এই শুড়িকা সেবনে জ্বরাতিসার ভাল হয়।

### শূলরোগে—শঙ্খ প্রয়োগ—

শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিস্রব্যোবসংযুতং।  
উষ্ণোদকেন তংপীতং শূলং হস্তি ত্রিদোষজং।  
শঙ্খভঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, ভাজা হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইয়া মিশাইয়া রাখিবে। এই চূর্ণ গরম জল সহ সেবনে তৎক্ষণাৎ শূল রোগের যন্ত্রণা দূর হয়।

### চর্মরোগে—শঙ্খ প্রয়োগ—

দগ্ধশঙ্খং মনঃশিলা প্রপুন্নাডশ্চ লাম্বলী।  
গৌমুত্রৈ রারণালৈর্বা পিষ্ট্বা লেপঞ্চ কারয়েৎ।  
দক্ষমণ্ডল-কণ্ডূঞ্চ বিচর্চ্যঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

শঙ্খভঙ্গ, মনছাল, চাকুলের বীজ ও জৈলাঙ্গলার মূল গোমুত্র অথবা কাকিচ দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে, দক্ষমণ্ডল, কণ্ডূ এবং বিচর্চী রোগ নষ্ট হয়।

### জ্বরীরোগে—শঙ্খ প্রয়োগ—

শঙ্খং ত্রিকত্রয়ুতং ধাতীরসবিভাবিতং।  
হস্তি ঋতুশূলং পীতং ত্র্যাহং তণ্ডুলবারিণা॥

শঙ্খ ভস্ম ও ত্রিকত্রয় ( শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, চিতা, মুখা, বিড়ঙ্গ—এই নয়টা দ্রব্য ত্রিকত্রয় নামে বৈদ্যক শাস্ত্রে অভিহিত ) আমলকীর রসে ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ—তণ্ডুল জল সহ তিন দিন সেবনে ঋতুশূল নষ্ট হয়।

### লোমশাতনে—শঙ্খ প্রয়োগ

দগ্ধশঙ্খং ক্ষিপেদ্রস্তাস্বরসে তপ্ত পেষিতং ।

\* \* \* লেপতো হস্তি লোম গুহাদিসম্ভবম্ ॥

এইরূপে—আয়ুর্বেদের বহু রোগাধায়ে—শঙ্খ ভস্ম ঔষধ রূপে কল্পিত হইয়াছে। বাহ্যিক ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। অমুসন্ধিস্থ পাঠক, “ভৈষজ্য রত্নাবলী,” “সার কোমুদী” “সার কণিকা” প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থ দেখিয়া লইবেন।

“শঙ্খ-দ্রাবক” প্রীহা যক্ষ্ম-গুণ্মাদি রোগের একটা প্রসিদ্ধ ঔষধ। শঙ্খভস্ম—বস্মা, কাস, ক্রিমি, পাণ্ডু, ও অজ্ঞান রোগে—বিশেষ ফল-প্রদ। “শঙ্খ বটা” “মহাশঙ্খ বটা” “শঙ্খ রস গুড়িকা” প্রভৃতি—নামজাদা ঔষধ—কবিরাজ মহাশয়গণ সর্বদাই ব্যবহার করেন। অল্প রোগে—শঙ্খভস্ম ঠিক Sodi Bi Carb এর মত উপকারী।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে—শঙ্খ শোধন করিয়া পরে ভস্ম করিয়া লইতে হয়। শঙ্খকে গোড়ালেবুর রসে সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ জল দিয়া ধৌত করিয়া লইলেই শঙ্খ শোধিত হইল। এইরূপ শোধিত শঙ্খ—শরীর মধ্যে পুরিয়া উপরে আর এক-খানি শরা চাপা দিয়া উত্তর শরীর সন্ধিস্থানে কর্দ্দমের লেপ দিয়া, ঘুঁটের আওণে পোড়াই-লেই উত্তর শঙ্খভস্ম প্রস্তুত হয়। ঔষধার্থে এইরূপ শঙ্খভস্মই ব্যবহার করা উচিত।

শঙ্খের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে অনেক

আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু সে সকল গল্প—এ যুগের লোক বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। সংহার-কর্ত্তা শঙ্কর “শঙ্খচূড়” নামক অমুরের প্রাণ বধ করিলে সেই অমুরের অস্থিখণ্ড হইতে শঙ্খের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণের মতে ক্ষীরোদ সমুদ্রের নীবেই শঙ্খের জন্মস্থান। পূর্বে সৌর্য্যদ্বী [ সুরাট ] দেশে প্রচুর পরিমাণে শঙ্খ পাওয়া যাইত। এখন সেতুবন্ধের সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রতিবৎসর অসংখ্য শঙ্খ উত্তোলিত হইয়া থাকে। টুটিকোরিণ ও সিংহলের সমুদ্র ভাগেও বৎসে শঙ্খ পাওয়া যায়। সমুদ্র গর্ভে—প্রায় ৪০ হাত গভীর জলে—শঙ্খ বাসক রে, ইহার বালির মধ্যে লুকাইয়া থাকে। শঙ্খ দলবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসেনা,—ইহার “খেতান্ন” কিনা!—বোধ হয় তাই একান্নবর্ত্তী প্রথার বিরোধী।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ডুবুরীগণ শঙ্খ উত্তোলন কার্যে নিযুক্ত থাকে। এক হাজার শাঁখ তুলিলে, তাহার ২০ টাকা পারিশ্রমিক পায়।

সমুদ্রতীরের খানিকটা স্থান প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া রাখা হয়,—ইহার নাম “কোটু”। শাঁখ তোলা শেষ হইলে, শাঁখগুলিকে আগে বাছাই করিয়া পরে এই “কোটুতে” রাখা হয়! বড়, মাঝারী, ছোট—সকল শাঁখের জন্ত পৃথক পৃথক “কোটু” নির্দিষ্ট আছে। যে শাঁখ গুলি খুব ছোট, সেগুলিকে আবার জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য—সেগুলি আবার বড় হইবে। কিন্তু নর-করম্পর্শে—জলে পড়িয়াও তাহার পুনর্জীবিত হয় কিনা সন্দেহ। কিছুদিন কোটুতে থাকিলে, শঙ্খের মধ্যস্থিত মাংস বা শাঁস পচিতে আরম্ভ করে। সে সময় সেস্থান হইতে

ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। মাংস পচিয়া গেলে শাখগুলিকে জল দ্বারা ধোত করিয়া পবিত্র করার হয়। তাহার পর সেই সকল পরিশুদ্ধ শাখ নীলামের ডাকে বিক্রীত হইয়া থাকে।

শাখের অনেক রকম জাতি আছে। সকল জাতীয় শাখেরই ঝাঁটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়—“বামাবর্ত্ত” ও “দক্ষিণাবর্ত্ত”। য. শাখের চক্র বাম দিকে হেলিয়াছে—তাহার নাম “বামাবর্ত্ত”, আর বাহ্যার চক্র দক্ষিণাভিমুখী, তাহার নাম “দক্ষিণাবর্ত্ত”। “দক্ষিণা-

বর্ত্ত” শাখ—দুস্ত্রাপ্য। শ্রীহরির পাণ্ডজ্ঞত “দক্ষিণাবর্ত্ত” ছিল। এই শাখ গৃহে থাকিলে, গৃহের অমঙ্গল দূর হয়—অনেক গৃহস্থের মনে এইরূপ ধারণা আছে। শুনিয়াছি—হু’একটি “দক্ষিণাবর্ত্ত” শাখ নাকি লক্ষাধিক মুদ্রায় বিক্রীত হইয়াছে। সিংহলের জাফনা নামক স্থানে—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে একটি গোক একটি “দক্ষিণাবর্ত্ত” শাখ পাইয়াছিল,—সেটি মাত্র ৭০০ সাত শত টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে, এম্ এ।

[প্রফেসর]

## আহার ও স্বাস্থ্য।

আহারই প্রাণ রক্ষার মূল। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া দেহী দিগের দেহ রক্ষা করিতেছে। জীব-জগতে বিশ্বনিয়ন্তার ইহাই অপূর্ণ বিধান। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন, যেরূপ যশা সময়ে দহনীয় পদার্থ প্রাপ্ত না হইলে বাহ্যায় মন্দবল হইয়া থাকে, সেইরূপ, ক্ষুধার সময় আহার না করিলে দৈহিক পাচকায়িও হীনশক্তি হইয়া থাকে। অগ্নি প্রথমে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কদাচিৎ দোষ সকলকে, তদভাবে রসাদি ধাতু সবলত্বকে এবং তৎপরে জীবন পর্যায় পরিপাক করিয়া থাকে। আহার দ্বারা শ্রীতি, সত্ত্ববল-রক্ষা, দেহ-রক্ষা এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া যখন ধান বা তা’ দ্রব্য মাড়ান করিলে চলবে না। নিয়ম পূর্বক উপযুক্তকালে এবং বিত্ত্ব দ্রব্য আহার করা কর্তব্য। যে কাল পর্যায় আমাদের দেশের

লোক এ সকল কথা বুঝিয়াছিল, সে কাল পর্যায় নানারূপ আধিব্যাধি এবং অকালমৃত্যু আমাদের দেশে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

মহুয প্রকৃতি ত্রিবিধ—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—মিশ্র প্রকৃতিযুক্তও মানুষ দেখা যায়। শাস্ত্রে ত্রিবিধ প্রকৃতি ও লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

সুস্থ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সাধু স্বভাব এবং ধর্ম, মোক্ষ ও পরলোকে শ্রদ্ধাবান হন। ইহারা অক্রেমি ও সত্যবাদী। মেধা, বুদ্ধি, ধৃতি, ক্ষমা এবং দয়া—এইগুলিকে স্বয়ং রক্ষা করিয়া ইহারা আত্ম-তত্ত্বাধেবী হইয়া থাকেন। রোগোত্তর সম্পন্ন ব্যক্তিরা অত্যন্ত সুখাধেবী হওয়ার ক্রোধ, দুঃখ, অধীরতা, দম, অতিমান এবং ঐশ্বর্যের দাস। মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ ইহা দিগের অনেক ভ্রূষণ, কামুকতায় ইহারা দিগ্ভিতিক জ্ঞানশূন্য। তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিরা

নিতান্তই দৃষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন। নির্দিষ্ট-কর্মজনিত স্মৃতিই ইহাদিগের তৃপ্তি। ইহাদিগের মূর্ততা এবং কোথাও সর্বদা প্রকাশমান হইয়া থাকে।

খাদ্যবিচার সম্বন্ধেও ঐ ত্রিধাতুব ব্যক্তিদিগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

সম্বন্ধ প্রকৃতির যে মহাপুরুষগণ দেশ রক্ষা ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাবা ধর্ম্মেব প্রতিষ্ঠা ও সমাজের হিতের জন্ত বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাবা সকলেই সাংঘিক ও পরিমিতভোজী ছিলেন—কেহই মৎস্য-মাংস-পলাশে উদরপূর্ত্তি করিতেন না। যে সকল দেশের লোকের আচার ব্যবহার দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা আহার করার জন্তই বাঁচিয়া আছে, সেই জাতির মধ্যেও যাহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচারে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাও “উচ্চ জ্ঞানচর্চা ও সাদাসিধে আহারের” পক্ষপাতী। দেশ, প্রকৃতি ও কর্ম্মভেদে লোকের আহারের পার্থক্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যিনি বাহ্যি আহার করুন, খাদ্য বস্তুর বিশুদ্ধতা সর্বদেশে ও সর্বকালে যে নিতান্ত আবশ্যিক, এ বিষয়ে মতভেদ নাই! আয়ুর্বেদাচার্য্য বলিয়াছেন—“শরীরাস্ত্র অনপানমূলা” সমস্ত শারীর রোগ অনপান দোষে জন্মিয়া থাকে। ‘সুতবাং’ এই অনপানের বিশুদ্ধতা ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবার কবচ স্বরূপ।

সম্বন্ধবর্দ্ধক দ্রব্য-স্বত আমাদের দেশেব লোকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকে কিন্তু সংপ্রতি এই সকল বস্তু আর বিশুদ্ধ পাওয়া যাইতেছে না—অধুনা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যগুলির সংগ্রহ-প্রণালীর ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেকালে ভজ-ইতর, দরিদ্র-মহৎ—সকল সংসারেই

গাভী-পালনের ব্যবস্থা ছিল। সেই গাভী পালনের ফলে সকল গৃহেই বিস্তৃত দুগ্ধ এবং স্নাত যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত; গৃহজাত দ্রব্য অবাস্তাকর হইবার কোন কারণই ছিল না। আটাই মঙ্গল! এমন কি চাউল পর্য্যন্ত এখনকার মত সে কাশে বিপণীস্থান হইতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা ছিলনা,—গম কিনিয়া জাঁতার পিষিয়া ইতর ভদ্র—সকল গৃহের রমণীরাই আপনাপন সংসারে আটা প্রস্তুত করিতেন। টেকি গৃহস্থমাজেরই গৃহস্থলীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। নিজ তত্ত্বাবধানে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করা হইত। সেই বিস্তৃত তণ্ডুলের অন্ন ও আটার কুটি বা লুচি গৃহললনাগণ হৃদয়ে প্রস্তুত করিয়া স্বামী-পুত্র-আত্মীয় বর্গকে আহার করিতে দিতেন। সে ব্যবস্থা ক্রমশঃ হ্রাস পাইলেও এখনও অনেক পল্লীগৃহস্থ এইরূপেই অন্ন সংগ্রহ করিতেছে। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী-পরিবারের বাটী স্বীকৃতেরাই গম পিষিয়া আটা প্রস্তুত করেন, ইহাতে ব্যায়াম ও বিস্তৃত ভোজ্য সংগ্রহ হইই নির্বাহ হয়। সর্বপ তৈলও এখনকার মত তখন বাজার হইতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা ছিল না, সর্বপ কিনিয়া, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া, কলুদিগের নিকট হইতে সকলে ঘানিতে ভান্ধাইয়া লইতেন। ইক্ষু চাষ সেকালে অধিকাংশ গৃহস্থেরই ছিল, ধর্ম্ম বৃক্ষের চাষের জন্ত সেকরূপ কেহ মনঃসংযোগ না করিলেও গৃহ সন্নিহিত বৃক্ষ-বাটিকার প্রায় সকল গৃহস্থেরই অস্বাভাবিক পরিমাণে অবদ্র সম্ভূত খজুর বৃক্ষ বিস্তারিত থাকিত। ফলে ইক্ষু শুড় এবং খজুর শুড় ক্রয় করিবার জন্ত সেকালে প্রায় কাহাকেও পণ্য-বিক্রেতার



আলয়ে গমন করিতে হইত না। মাঠে চাষ হইত, বাগানে তরকারি হইত, হয় তো অনেক গৃহ-প্রান্ত্রনেই শাক সজ্জি উৎপন্ন হইত। ইহা ভিন্ন এখনকার মত তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে জল-কষ্ট উপস্থিত হয় নাই, অনেক গৃহস্থই দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠায় যত্নপর ছিলেন। তদ্বারা উৎকৃষ্ট পানীয়ের ব্যবস্থা তো হইতই, অধিকন্তু ঐ জলাশয়গুলি হইতে গৃহস্থের মৎস্তের ব্যবস্থা হইত। ফলে এইরূপ ব্যবস্থায় সেকালে এক দিকে অর্থ-ব্যয়ের হ্রাস হইত, অপর দিকে শবীর রক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর দ্রব্য সকল আহাব করিতে পাইয়া আমরা নীরোগ ও সুস্থ শরীবে দীর্ঘায়ু লাভে সমর্থ হইতাম। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—এ ব্যবস্থা তো পল্লীগ্রামেই সম্ভব ছিল,—সহরে তখনকার দিনে এ ব্যবস্থা কিরূপ ভাবে চলিত? ইহার উত্তর অতি সহজ। সে কালের সহর গুলি এরূপ অন্তঃসারশূন্য গাছিক-সম্পদে বিভূষিত ছিল না, পল্লীগ্রামের এই আব্বাওয়া সেকালে সহরেও বহমান ছিল।

বাহ্য হউক ক্রমশঃ এ সকল ব্যবস্থা দেশ হইতে লুপ্ত হইল। ক্রমশঃ পরিবর্তিত-দেশে আমবা সভ্যতার শিক্ষা পাইয়া স্বাস্থ্য-হিতকর দীক্ষা বিস্তৃত হইলাম। কাঞ্চনের পরিবর্তে কাচের আদর করিতে শিখিলাম। কি কবিলে,—কিরূপ নিয়মে থাকিলে—কিরূপ দ্রব্য আমাদের শরীরপুষ্টির উপযোগী—এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা একটু আলস্ত-পশতস্ত হইয়া পড়িলাম। জীবিকা-নির্বাহের জন্ত য য ব্যবসায়-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার স্ফূর্তি অনেক-

রই বলবতী হইল। ফলে নগদ অর্থের মুখ আমরা বেশী করিয়া দেখিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে অর্থক্লান্ততা বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন কিরূপে করিতে হয়,—হিন্দুর দেশে—হিন্দু-সন্তানের কিরূপ আহার করা কর্তব্য—এ সকল কথা তো ক্রমশঃ ভুলিতেই ছিলাম, অর্থ ক্লান্ততার জন্ত সেট বিস্মৃতিটা আরও অধিক হইয়া পড়িল। চাকরিগত-প্রাণ ভারতবাসীর ক্রটি তো পরিবর্তিতই হইয়াছিল, এক্ষণে সং-প্রবৃত্তিও লোপ পাইল। এমনই করিয়া দেশের অধঃপতন আরম্ভ হইল।

ক্রমশঃ সে অধঃপতনটা অল্প দূর গড়াইল না। করণীয় বিষয় তো ভারতবাসী ইতঃ-পূর্বেই ভুলিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে ধর্ম ও ভুলিল। যে গোপ জাতি গো-মাতার সেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং নন্দবংশ সমুৎত বলিয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই গোপ-নন্দনগণ স্রোযোগ বৃদ্ধি—ধর্ম ভুলিয়া—তাহা-দিগের বিক্রয় হুখে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইতে আরম্ভ করিল, ঘূতে নানাক্রপ ভেজাল মিশাইতে লাগিল, অজ্ঞাত ব্যবসায়ী-রাও ইহাদিগের অহুকরণে আটা এবং ময়দার জীর্ণশক্তির অপকারী পাথর এবং কত কি মিশাইতে লাগিল। দেশের দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী মজিয়া আসিল, কাজেই দেশের লোক পচা জল পানে অভ্যস্ত হইল। আমরা শুধু সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া—চাকরি করিয়া অর্থ আনিতে শিখিরাছি; ঐ অর্থ ব্যাথা কিরূপভাবে দেহ রক্ষা করিতে হয়, তাহা আমরা আদৌ শিক্ষা করি নাই, কাজেই আমাদের দুর্গতি হইবে না তো দুর্গতি হইবে

কাহাদের? আজ যে পণের আনা বাঙ্গালী-সন্তান অন্ন, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দো জর্জরিত হইয়া অস্বস্তি-হৃদয়ে কালাতিপাত করিতেছে, ইহা তো তাহাদেরই—কৃত কর্মের ফল! কবি কি সাধ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

“কারো দোষ নয় গো মা,

আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্রামা।”

বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটে নাই, কিন্তু এ দুর্দিনে একটা আশার অলোক দেখা দিয়াছে। মারওয়ারি সম্প্রদায় ভেজাল ঘূতের ব্যবসায়ী-দিগকে শাস্তি দিবার জন্ত ভাগীবন্দী-তীরে যে উপবাস ব্রত করিয়াছিলেন, দ্বারবঙ্গের মাহারাজা প্রমুখ দেশের ধর্ম প্রাণ হিন্দুগণ সে ব্রতের উদযাপন করিয়া ঐ দুর্ভিক্ষ ব্যবসায়ী-দিগকে অর্থ এবং সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মারওয়ারি-সমাজে এখনও সামাজিক দণ্ডের ভয়ে সকলে ভীত হইয়া থাকেন, সেইজন্ত এ দণ্ড অপরাধীগণ বাড় পাতিয়া মানিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালীর এ দণ্ড-ভয় নাই, বাঙ্গালী এ দণ্ড-ভয় রাখেও না, বাঙ্গালীসমাজ যে উৎসর্গ গিয়াছে, সূত্রাং বাঙ্গালী দণ্ড-ভয় রাধিবে কেন? মারওয়ারি সমাজে তো এত কাণ্ড হইল, কিন্তু কলিকাতার খাবারওয়ালার দোকান গুলিতে বাঙ্গালী গ্রাহকের দ্রব্য ক্রয় কি কম হইয়াছে? সে কালের বাঙ্গালী কচুরি-জিনিপিতে জলযোগ করিত না। সে কালে ঐ ধরণের দোকানও ছিল না,—সমাজভয়ে বাঙ্গালীর ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া রসনার পরিকৃষ্টি সাধনের প্রবৃত্তিও হইত না। সেকালের বাঙ্গালীর জলখাবার ছিল—আদা-ছোলা, গুড়-মুড়ি, চালভাজা-মুড়কি বা নানারূপ ফল। এখনকার দিনে ফল খাইবার

প্রবৃত্তি কাহারও কাহারও থাকিতে পারে, কিন্তু আদা-ছোলা বা মুড়ি-মুড়কি, কি গুড়-চালভাজা খাইলে তো তোমাকে ভদ্র-সমাজে স্থানই দেওয়া হইবেনা।

এই দুর্দিনে সেকালের আহারের বিস্তৃতি স্মরণ করিয়া ভাবি, কি করিলে দেশের লোকে আবার সেইরূপ বিস্তৃক খাদ্য পাইতে পারে? অবশ্য পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, আমরা আবার সেকালের মত সকল গৃহস্থ-কেই ধান ভানিয়া, কলায় ভাজিয়া খাইবার ব্যবস্থা দিতেছি,—কারণ দেশকালভেদে এখন হয় ত তাহা কার্যকর হইবে না, কিন্তু তাহা না হইলেও খাদ্যের বিস্তৃতির জন্ত তখন যে যথেষ্ট শ্রম করা হইত, সে কমা আমবা চিরকালই মনে করিব। গৃহস্থ আর জাঁতায় ভাজিয়া দাল করেনা, ফলে দালের কারবার, দালের দোকান অনেক হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার যে কোনো দালের আড়তে গিয়া দেখুন—কি বিভীৎস ব্যাপার, অতি কর্ধ্য-স্থানে পর্ত্তপ্রমাণ ভাল মন্দ মিশ্রিত ভাঙ্গা কলায় রহিয়াছে, বহুসংখ্যক জীপুর্কবে কলায় ভাজিতেছে, আর সেই দালের সূপের উপর কত থু থু পড়িতেছে, পিষণওয়ালীর শিশু সন্তান মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে, ইহা ভিন্ন তাহাদের শ্রমজাত ধর্ম-মিশ্রণের ত কথাই নাই। এরূপ ত হইবেই, তাহাদের ত কোন কদর নাই, ইহা তাহাদের ব্যবসা। এই দাল আমরা আনিয়া বাছিবার ও খুইবারও অবসর পাই না—হাড়িতে দিয়া তাহাই আহার করিতেছি।

চাউলের ও ঘূতের আড়তে, তৈলের ও ময়নার কলে, সন্দেশের-খাবারের দোকানে—বাহা যাহা থাকে, তাহাতে ঐ সকল দ্রব্যের পবি,

ত্রতা ও বিস্কৃততা কিছুমাত্র রক্ষিত হইতেছে না। এখন চর্কিও তৈল-স্বত বলিয়া বিক্রীত হইতেছে। বিভিন্ন তৈল-ঘোনি-বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইয়া সার্ষপ তৈল নামে চলিয়া গাইতেছে,—তেলেব কলের ট্যাঙ্ক ও এক নবক বিশেষ—ময়লার কথা ছাড়িয়া দাও, ইহাতে ২৫ টা পচা ইন্দুব ও না পাওয়া যায় এমন নহে। বণিকগণের অর্থলোভ অতিরিক্ত-বর্দ্ধিত হওয়ায় এই সকল অনর্গ-পরম্পবা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাব উপর খাণ্ডেব বিস্কৃততা ও পবিত্রতা রক্ষার প্রতি আমাদের উদাসীনতা মিলিত হওয়ায় স্বাস্থ্য-নাশেব পক্ষে মণিকাক্ষণ যোগ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পশ্চিমে খোঁটা-চাপরাসী সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনিব পরেও আপনার খাবার—চাল-দাল-গুলি এক একটা করিয়া খুঁটিয়া-বাছিয়া তবে পাক করে, সমস্ত পাকপাত্র রোজ মাজিয়া-বসিয়া পরিষ্কার কবে, কারণ পবিত্রতা রক্ষা ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ। প্রকৃতই পবিত্রতা রক্ষায় অনেক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের আজকালকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্বীলোকগণ (বড় মামুষদের ত কথাই নাই) খাতের পরিব্রতা রক্ষার দিকে তত নজর দেন ন', শরীরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি কিন্তু বেশ দৃষ্টি আছে, ছেলেকে সাবান মাখান, পোষাক-পরাণর জুতা যত যত্ন লওয়া হয়, তাহাদের আহারের পবিত্রতা রক্ষার জন্ত তাহার চতুর্থাংশের একাংশও যত্ন নাই! খাবার জিনিষ দোকান হইতে আসিতেছে, নিযুক্ত ভৃত্যে পাক করিতেছে!

দেহটা ফিটকাট রাখা এবং আহারের পবিত্রতার প্রতি এতাদৃশ উদাসীন হওয়া—এই ভাবটা ইংরাজি অম্লকরণের বিষময় ফল। উহাদের রান্নাঘরটা নবক বিশেষ হটক তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু বাবুর্চি উত্তম শুভ্রবস্ত্রধারী হইয়া খাবার সরবরাহ করিলেই হইল—পাচক হয়ত সপ্তাহাধিক কাল নানাই কবে নাই—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু পাণিতল ও অম্লি মাত্র সাবান-বিধৌত হইলেই হইল।

এদেশে এই যে অজীর্ণ ও ক্ষয় রোগের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, আহারের অবিস্কৃততাই যে ইহার অন্ততম কারণ—একথা বিজ্ঞ লোক মাত্রই স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু প্রতীকারের উপায় কি? অনেকেই ধারণা, কঠোর-রাজশাসন প্রবর্তিত না হইলে খাণ্ডে ভেজালের এই সর্বনাশকর প্রথা রহিত, হইতে পারেনা। কিন্তু, আমরা যদি অবিস্কৃত স্বত-তৈলাদি সর্বাঙ্কঃকরণে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলেই ত ভেজালের প্রতিকার হইতে পারে। এবং প্রজা যাহা আন্তরিকতার সহিত প্রার্থনা করে, তদ্বিবরক রাজশাসন প্রবর্তিত হইতেও বিলম্ব হয়না, সংশ্রুতি সেইজন্যই আইনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। যাহা হটক কলিকাতার মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অনশনপূর্বক অন্তঃস্থত বর্জনের প্রতিজ্ঞা আমাদের চিরস্মরণীয় হটক এবং ইহার সুফল স্থায়ী হইয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হউক—ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

## ম্যালেরিয়া ও পল্লীগ্রাম ।

কি কক্ষে জিনিয়া,—ম্যালেরিয়া বিব বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে প্রাণ কবিতা ছিল! এই বিষের জ্বালায় বাঙ্গালার কত পল্লীরই যে সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে ও বুক ফাটিয়া যায়। কত ধনৌষ কত অর্থ এট বিধ ঝাড়াইতে গিয়া নষ্ট হইয়াছে, কত গৃহস্থ অর্থাভাবে বিধ ঝাড়াইবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, ফলে সর্বস্বান্ত হইয়া ইহার দংশনে কালকবলিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কথায় স্বজাতি-সুফলা-শস্ত্র-শ্রামলা আমাদের পল্লী-মাতার দুর্গতি যে ম্যালেরিয়া হইতেই আবৃত্ত হইয়াছে, ইহা নির্ভাঙ্ক সত্য কথা। যখন পল্লীবাসিগণ দেখিল, ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী বিকট-বদন-ব্যাধানপূর্বক গ্রামের পর গ্রাম—পল্লীর পর পল্লী—এক ঘর গৃহস্থের পর আর এক ঘর গৃহস্থ গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তখন উপায়ান্তর রহিত হইয়া, জননী-জন্মভূমি-পল্লীমাতাকে চিরদিনের মত প্রণাম করিয়া, পল্লী-সন্তানগণ সহরের সম্পদ-বৃদ্ধি করিতে লাগিল। শুধু কলিকাতার কথা নহে, এমনই করিয়া দেশের জেলা এবং মহকুমাগুলিও আজি জনবহুল হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলের জেলা এবং মহকুমাগুলির বর্তমান বাসিন্দা দিগের নিকট পূর্ব নিবাসের তথ্য সংগ্রহ করিলে আমাদের কথিত বিষয়ের প্রমাণ সহজেই নির্ণীত হইতে পারিবে। ফলে বাঙ্গালার সহরগুলিও জনবহুল হওয়ায় সহরেও রোগ-বাহ্যল্য ঘটতেছে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে ম্যালেরিয়ার প্রাক্রমণ কম হইলেও

অল্প বোগের আধিক্য—জন-বাহ্যল্য-নিবন্ধন অনেক বেশী। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া-বৃদ্ধিই সহরের জন-বাহ্যল্যের কারণ। এ অবস্থায় ম্যালেরিয়াই যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সর্বপ্রধান অন্তরায় ঘটাইতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

নানা কারণে এখন অনেকের আবার পল্লীবাস-স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে শুনিতে পাঠ। কিন্তু উহা জাগিলে কি হইবে? পাছে আবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণে সর্বস্বান্ত হইতে হয়—এই ভয়ে সে স্পৃহা অনেকের মনে মনেই বিগল্যপ্রাপ্ত হইতেছে। ম্যালেরিয়ার বিষ তো যেমন-তেমন নহে,—এ বিষে আক্রান্ত হইলে সন্তঃস্রবের আশঙ্কা সকল স্থলে থাকুক বা না থাকুক, ইহার দ্বারা যে শনৈঃ-শনৈঃ পরমায়ুর হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা অবি-সংবাদিত। একটা প্রবাদ আছে—“কাচা লম্বা কোঁচা টান, বাড়ী জেন বর্জমান” সেইরূপ পেট জোড়া-প্লীহা, উদর-জোড়া-যকৃৎ এবং বকঃস্থলের নিম্নদেশ জোড়া কড়া বা অগ্রমাস দেখিলেই বুঝিতে হইবে, ইহার পরমায়ুর কতকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্ন, অজীর্ণ, অক্ষুধা বা ইংরাজী মতে ডিসপেপ্সিয়া নামক যে ব্যাধি আজি বাঙ্গালার চিরসহচর হইয়া পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অনেকস্থলে ইহার মূণীভূত কারণও ম্যালেরিয়া। কোন কোন স্থলে থাইসিসের হুচনাও এই ম্যালেরিয়া হইতে আরম্ভ হয় দেখা গিয়াছে।

অনেক বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিতের মতে অনেক-গুলি কারণের মধ্যে প্রধানতঃ বাঙ্গালার

মশক বংশেব অধিকাই ম্যালেরিয়া-বিস্তৃতিব  
কাৰণ। কথাটা অসঙ্গত বলিয়া উড়াইয়া  
দেওয়া যায়না। বর্ষার ধারাসিক্ত-কর্দমাক্ত  
পল্লী-পথ,—বন-বহল-পল্লীপার্শ্বস্থ অটবী সকল—  
বৃচক্লাবধি অসংস্কৃত পঙ্কিল-ডোবা-পুষ্করিণীর  
পার্শ্বস্থ অবিক্রান্ত জঙ্গলগুলি যে মশক উৎপন্নের  
বৃভাষ-মূলভ-স্থলদ স্থান এবং তাহা হইতে  
যে বাস্তুলাব পল্লীগুলির ম্যালেরিয়া বর্দ্ধিত  
হইয়া থাকে, ইহা তো সুনিশ্চয়। কিন্তু  
তাহার জন্ত আমবা কবিতেছি কি?

পল্লী ছাড়িয়া সহরে বাস করিলে তো  
দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ-সাধন করা  
হইবে না। দেশ ছাড়িয়া আমবা আশ্রয়ক্ষার  
উপায় করিতে পারি বটে, কিন্তু পল্লী-জননীর  
সমগ্র সন্তানবহই তো পল্লী ছাড়িয়া সহর-  
বাসেব উপায় নাই। আর সকলেই যদি  
সহবে বাস করিতে থাকে, তাহা হইলেই বা  
চলিবে কেমন করিয়া! সহরের অনায়াস-  
লভ্য কলেব জল পাইয়া বা মফঃস্বলের যে  
সকল সহবে জলের কলের প্রতিষ্ঠা হয় নাই—  
সে সকল সহরে ইন্কারা হইতে জল তুলিয়া  
গটগা আমরা পিপাসার শান্তি করিতে পারি  
বটে, কিন্তু সকলেই যদি সহরবাসী হয়, তাহা  
হইলে আমাদের আহারীয় সংগ্রহ হওয়া যে  
ভাব হইয়া পড়িবে। আমাদের অন্ন-সংস্থানের  
জন্ত—আমাদের জীবনব্যাপী চিরন্তন স্নেহদ—  
আমাদের কৃষিজীবী—পল্লী-সন্তানদিগকেও  
তো অন্ততঃপক্ষে অধঃপতিত—হৃদশাগ্রস্ত পল্লী-  
প্রান্তরে পড়িয়া থাকিয়া আমাদের আহাৰ্য্য-  
সংস্থানে সচেষ্ট থাকিতে হইবে! বুদ্ধি দান  
করিয়া—উপদেশ প্রদান করিয়া—নানারূপ  
প্রলোভন দেখাইয়া আমরা তো তাহাদিগকে  
আমাদের মত সহরবাসী হইবার দলপুঠি

করিতে পারিব না! কাজেই ম্যালেবিয়ার  
জন্তই হটক, বা যে কারণেই হটক, আমরা  
পল্লীভূমি পরিত্যাগ কবিলেও পল্লী-মায়া  
পরিত্যাগ কবিতো পারিবনা,—পল্লী চিন্তায়  
আমাদিগকে ব্যাপৃত থাকিতেই হইবে।  
আমরা নিকাশধর্মী হইতে পারি বা না পারি,  
—অন্ততঃপক্ষে আমাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত ও  
পল্লী-চিন্তা আবশ্যক। সেজন্ত সর্বোপায়ে  
আমাদের চিরতান্ত্র পল্লীগুলিকে ম্যালেরিয়ার  
হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পল্লী-  
মাতাকে রক্ষা করিতে পারিলে তবে আমরা  
নিজেরা রক্ষা পাইতে পারিব।

পল্লীগামগুলি ম্যালেরিয়ার লীলা-নিকেতন  
হইয়াছে বলিয়া পল্লী পরিত্যাগ করিলে  
চলিবেনা, পল্লী-রক্ষার জন্ত চেষ্টাশীল হইতে  
হইলে দেশ-মাতার সুসন্তানগণকে আবার  
পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মাতৃ-  
সন্নিধানে ফিরিয়া গিয়া, অর্থে পার,—সামর্থ্যে,  
পার—যত্ন লইয়া—চেষ্টা করিয়া,—কতক  
নিজেরা চান্দা তুলিয়া—কতক বা লোকাল-  
বোর্ড-ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া,  
যাহাতে গ্রামের বন-জঙ্গলগুলি বিদূরিত হয়—  
রাস্তাঘাটগুলির সংস্কার-সাধন করা হয়—  
সুপেয় জল-সংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে,—  
তাহার জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রমপূর্বক চেষ্টা  
করিতে হইবে, তবেই পল্লী-রক্ষা হইবে, এবং  
সে রক্ষায় আমরা নিজেরা রক্ষা পাইব।  
দেশ রক্ষা করিতে হইলে—সমাজ রক্ষা করিতে  
হইলে—বাস্তবলীলাটির অন্তিম রক্ষা করিতে  
হইলে, একদা ব্যবস্থা ভিন্ন আমাদের গতান্তর  
নাই।

ম্যালেরিয়া বড় সহজ ব্যাধি নহে, কেবল  
যে শুধু মশক হইতেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি

হয়—এমনও নহে,—ম্যালেরিয়াগ্রস্থ ব্যক্তির শরীর হইতেও ম্যালেরিয়া-বিষ অল্প দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। সংপ্রতি আমেরিকার একজন বিচক্ষণ ডাক্তার স্পষ্টতঃই এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে মশক হইতে ম্যালেরিয়া উৎপত্তি কোন কারণই নাই, ম্যালেরিয়া-বিষ মানবের শরীর হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া-ভুগিয়া যাহাবা জীর্ণতন্মু হইয়াছেন, তাহাবা যে বাজারের ‘আসেনিক’, ‘কুইনাইন’ প্রচুরভাবে মিশ্রিত কতকগুলি উগ্রবীৰ্য্য পেটেন্ট ঔষধ সেবন করিয়া আরও স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছেন, তাহা সত্য কথা। আমরা ইহার পূর্বে বলিয়াছি, কুইনাইনের অপব্যবহার কোনক্রমেই কর্তব্য

নহে। ম্যালেরিয়া জর পুরাতন হইলে তো আর একজরি থাকে না, অনেক সময় প্রান্তঃ-কালে সে জর আপনা আপনাই ছাড়িয়া যায়। সেই সময় অনেকে কোন একটা পেটেন্ট ঔষধ বা যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বর বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে দুই চারিদিন জর চাপা থাকে, কিন্তু দুই চারিদিন পরেই পূর্ববৎ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য ওরূপ ভাবে জ্বর চাপা দিবার চেষ্টা করায় কুইনাইনের অপব্যবহারেও দৌর্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে। ওরূপ অবস্থায় নিজের মতে কার্য্য না করিয়া সূচিকিংসকের পরামর্শ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য।

## তৈল-মর্দন।

শরীরে তৈল-মর্দন পদ্ধতি ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ, ইতিবৃত্ত ও প্রাচীন কাব্যদির পর্যালোচনায় ইহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। আর্ষাষিগণ তৈল-মর্দনের বিশেষ গুণপাতী ছিলেন, স্তত্রাং তৎপ্রয়োগ বিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তৈল-ব্যবহার বহু প্রকারে বিধিবদ্ধ আছে, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে শরীরে তৈল মর্দনের উপকারিতা ও তদাঙ্গসঙ্গিক বিধি-ব্যবস্থাই আলোচিত হইবে।

তিল হইতে জাত এই অর্থে তৈল শব্দটি

ব্যুৎপাদিত হইলেও সাধারণতঃ যে কোন বস্তুর স্নেহভাগই তৈল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ অস্ত্রান্ত স্নেহ অপেক্ষা তিল-নিষ্পন্ন স্নেহে শ্লিষ্টতা এবং ব্যবহারোপযোগিতা অধিকভাবে থাকার জন্তই তিল জাত স্নেহই মুখ্যভাবে তৈল নামে কথিত হইয়াছে। সে যাহা হউক শব্দ ব্যুৎপত্তি-বিচারে দ্রব্যগুণের কোন তারতম্যের শঙ্কা নাই, স্তত্রাং উপস্থিত প্রস্তাবে উহা নিষ্প্রয়োজন।

শরীরে তৈল-মর্দনের আবশ্যকতা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের শাস্ত্র নির্ধারিত যুক্তি-প্রমাণ অনুসন্ধানের পূর্বে বাহু জগতে তৈলের

সাধারণ প্রয়োগ ও উপকারিতার প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই বোধ হয় এতদ্বিষয়ে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারে।

যে সমস্ত যন্ত্র বা শস্ত্রাদি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত করিতে হয়, তাহাকেই কার্যক্ষম রাখিবার জন্য তৈলসিক্ত করা হইয়া থাকে। ইঞ্জিনের স্কানভাগে মাঝে মাঝে তৈল-নিষেক ব্যতীত উহা পূর্ণবেগে চলিতে সমর্থ হয় না এবং বহুকাল কার্যোপযোগীও থাকেনা। স্নেহাভ্র না থাকিলে শকট-চক্র বেগে ঘূরিতে পারে না। ফলতঃ যেখানেই আকুঞ্চন-প্রদাবণ ক্রিয়ার আবশ্যক, সেখানেই মাঝে মাঝে তৈল-সেক প্রয়োজনীয়।

আমাদের দৈহিক-যন্ত্রগুলির পরিচালনার জন্যও উক্ত কারণে ঠিক ঐ ভাবেই তৈলের আবশ্যক করে। তৈলসিক্ত না থাকিলে শারীরিক যন্ত্র সর্বল ও কার্যক্ষম থাকিতে পারেনা। অধিকাংশ দৈহিক যন্ত্রই আকুঞ্চন-প্রদাবণ ব্যাপার দ্বারাই স্ব স্ব প্রয়োজন সম্পাদন করে।

তৈল ষাতিবিক প্রসারণ শক্তির আধিক্যে গুণে অল্পকাল মধ্যেই সর্কশরীর গত শিরা সমূহ দ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে এবং স্নিগ্ধতা গুণে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দৃঢ়, কার্যক্ষম ও কষ্ট-সহিষ্ণু করিয়া থাকে। ইহা সম্পর্কে চর্মের প্রসন্নতা, সর্কোজিয়ের পরিপুষ্টি ও বাতাদি দোষের আতুল্য সাধিত হয়। স্নায়ুগুণী দোষযুক্ত ও পরিকৃত থাকার জন্য রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া স্থচাক্রমে সম্পন্ন হয়।

প্রথমে পদদ্বয়ে পরে অন্তঃস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তৈলমর্দনের ব্যবস্থা আয়ুর্বেদে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পদদ্বয়ের স্নিগ্ধতাগুণে

সর্কশরীরই স্নিগ্ধ হইতে পারে বলিয়া এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পৃথক পৃথক অবয়বে তৈলমর্দনে যে সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সাধারণ ভাবে কিছু বলা যাইতেছে। মস্তকে তৈল মর্দন করিলে শিরঃশূল, খালিত্য (টাক), অকালে কেশ-পকতা প্রভৃতি রোগ প্রায়ই জন্মিতে পারেনা এবং ইহাতে কেশ সকল দৃঢ়মূল, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, মস্তিষ্ক সর্বল থাকে, উদ্বিগত জরুইন্দ্রিয় সকল স্নিগ্ধতা সম্পন্ন হওয়ায় নিজ নিজ বিষয়-গ্রহণে অধিক সামর্থ্য লাভ করে, স্মৃতিভ্রা হয়, এবং তদ্বিবন্ধন দৈহিক সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়াই অব্যাহত ভাবে কার্য করিতে পারে। ঋতি-বিবরে তৈল-প্রয়োগে বায়ুর প্রকোপজনিত কর্ণনাদ প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে না এবং মস্তান্তস্ত, হনুগ্রহ প্রভৃতি বাতব্যাদিরও আশঙ্কা দূরীভূত হয়, কর্ণশ্রোত বিস্তৃত ও সর্বল থাকায় বধিরতা অথবা শ্রোত্রাদি জনিত শ্রবণ সঞ্চয় হইতে পারেনা। পদতলে তৈল-মর্দনে পাদ-যুগ্ম (স্পর্শানভিজ্ঞতা) পাদশোষ প্রভৃতি ব্যাধি নষ্ট হয় এবং সৌন্দর্য ও কার্য ক্ষমতাগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু পদগত স্নায়ুগুণী সঙ্কুচিত হয়না বলিয়া পাদফুটন, গৃহসী প্রভৃতি অতি কষ্টদায়ক বাতব্যাদি জন্মিতে পারেনা। পাদাঙ্গুষ্ঠের কণ্ডার সহিত চকুর সম্বন্ধ থাকায় ঐ কণ্ডার স্নিগ্ধতাগুণে দৃষ্টি শক্তিও প্রবল থাকে। নাভি মণ্ডলে তৈল-মর্দনে কোষ্ঠগত বায়ুর আতুল্য হয়, তাহাতে আত্মানাদি রোগ জন্মিতে পারে না এবং সহজে ও স্থচাক্রমে ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গত তৈল মর্দনে পৃথক পৃথক উপকার আদর।

প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তৈল ব্যবহার সম্বন্ধে একটি প্রাচীন উপদেশ আছে, যথা—“স্বতাদষ্টে গুণং তৈলং মর্দনাৎ নতু ভোজনাৎ” তৈল-মর্দনে স্বত-ভোজনের অপেক্ষা আটগুণ উপকার হইয়া থাকে। বাস্তবিক আমাদের দেশে আহারার্থ তৈলের এরূপ ব্যবহার প্রাচীন সময়ে কখন ছিলনা। পূর্বে তৈল মর্দনের জ্ঞানই প্রায় ব্যবহৃত হইত। কালক্রমে আহারের রুচি-পরিবর্তন সহ তৈল-সংস্কৃত ও ভজিত দ্রব্যাদির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বাহ্যিক রূপে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাতে আমাদের স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট হানি হইতেছে, তাবিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ান্তরে তাবিষয়ক আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

আমরা সাধারণতঃ তিল, সর্ষপ ও নারিকেল জাত তৈলই অভ্যাসের জ্ঞান ব্যবহার করি, সুতরাং এস্থলে উক্ত ত্রিবিধ তৈলের গুণাগুণ প্রকাশ করা আবশ্যিক। ইহাতে ব্যবহারকারীগণ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে তৈলের উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন।

প্রায় সর্ববিধ তৈলই স্বীয় উপাদান

দ্রব্যের গুণানুবর্তী হয়। তন্মধ্যে তিল তৈল গুণে অত্যন্ত তৈলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা তীক্ষ্ণ, শীঘ্র প্রসারণশীল, চর্মদোষ নাশক (কিন্তু ভোজনে বিপরীত) ক্ষুদ্র শ্রোত প্রবেশক্ষম, নেত্র রোগীর অহিতকর, দ্বিগুণ অথচ শ্লেষ্মাব অপ্রকোপক, স্থূলতানশক অথচ কৃশতা হারক, মলস্তুভক, ক্রিমি-বিনাশক। ইহার আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, যে দ্রব্যের সহিত পাকাদি দ্বারা ইহা সংস্কৃত হয়—তাহারই গুণ গ্রহণ করিতে পারে। এই জ্ঞানই আয়ুর্বেদোক্ত অবিকাংশ তৈল ইহার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

**নারিকেল তৈল**—অতি দ্বিগুণ, ধাত্বাদির পোষক, মালিছ হারক, শ্লেষ্মবর্ধক, কেশের সৌন্দর্য্যকারী, কফপ্রকৃতি ও কফ-প্রধান রোগীর অহিতকর।

**সর্ষপ তৈল**—কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, রক্তপিত্তকারী, কফ, শুক্র, বায়ু, কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ ও ক্রিমি নাশক।

কবিরাজ শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত

কাব্যতীর্থ-কবিভূষণ।

## শিশুর কণ্ঠরোগ চিকিৎসা।

—:~:—

(ঠাকুরমা ও বড়বো।)

বড়বো। আমি ত আর পেরে উঠিনে ঠাকুরমা।

ঠা। নতুন নতুন একটু কষ্ট হ'বে, দিন কতক পরে অভ্যাস হ'য়ে গেলে আর কষ্ট হ'বে না।

ব। আমার বেরকর কষ্ট হয় ঠাকুরমা, তা'তে সে অভ্যাস হ'তে চ'তে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তুমি একটা বামন কি বামনী ঠিক ক'রতে বল।

ঠা। দেখ বড় বউ, আমি বেঁচে থাকতে



এ বাড়ীর ভেতর বামুন ঢুকবে, তা' মনেও করিস্নে। কল্‌কাতায় বা'রা বামুন-বামুনী ব'লে পরিচয় দেয়,—তা'র পনের আনা তিন পাই অল্প জাত। চাকর থাকার চেয়ে বেশী বোজগার হ'বে ব'লে বামুন সাজে। তা'দের চাতে খেয়ে কি জাতের মাথা—ধর্মের মাথা খাবি ?

ব। কেন ?—দেশেও জানা-জনা ত কত গরীব-দুঃখী-বামুন-বামুনী আছে !

ঠা। আছে বটে, কিন্তু তা'রা না খেতে-পেয়ে ম'রবে সেও স্বীকার,—তবু লোকের বাড়ী মাইনে নিয়ে রাঁধতে আসবেনা, তা'দের মধ্যে দৈবাৎ কেউ কখন এ কাজ করে।

ব। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি ব'লছ যে, অচেনা-বামুনের হাতে খেলে জাত যায়, কিন্তু এই ক'লকাতা সহরে কাজ কর্তব্য উপলক্ষে ত বামুনেরাই রাঁধে !

ঠা। দেখ, জগন্নাথের মহিমায় ত্রীক্ষেত্রে যেমন জাত-বিচার নেই, কলির মহিমায় কল্‌কাতায়ও তেমন জাত-বিচার নেই। এখনকার যেমন ব্রাহ্মণ—তেমন ব্রাহ্মণ-ভোজন !

ব। তা'র মানে কি ঠাকুমা ।

ঠা। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের মত সম্মানের সহিত খায় না,—কান্দালীর মত খায়। আমরা আগে দেখেছি—ব্রাহ্মণ-ভোজন করা'তে হ'লে ব্রাহ্মণদের কত সম্মান ক'রতে হ'ত, বাড়ীর কর্তা সর্বদা তটস্থ—পাছে কোন ক্রটি হয়, আর যতক্ষণ না ব্রাহ্মণ-ভোজন শেষ হয়,—ততক্ষণ কর্তার আহার করা হ'ত না।

ব। আর এখন কি হয় ঠাকুমা ?

ঠা। এখন কোথায় কর্তা—আর কোথায়

সম্মান ! কর্তা খেয়ে-দেয়ে নিজা দিচ্ছেন, ব্রাহ্মণেরা কান্দালীর মত খেতে বসে। যে কর্তার ব্রাহ্মণদের ওপর বড় দয়া, তিনি এক-বার দেখা দিয়ে যান, দৈবাৎ ছুটো-একটা মিষ্টি কথা বলেন। তা' ছাড়া—সব একাকার, পরস্পর চেনা নেই—ব্রাহ্মণ-শূদ্র এক সঙ্গে থাকে ! আগে শূদ্রদের দিয়ে, পরে সেই পাত্র থেকে ব্রাহ্মণদের দেওয়া হ'ছে। ঐ সেদিন পাশের বাড়ীর বাবুটী ব'লছিলেন যে, সকালে ব্রাহ্মণ-ভোজন হ'বে, আর রাতে 'ভদ্রলোকদের' খাওয়ান হবে। এতেই বোঝনা—যে ব্রাহ্মণে কত ভক্তি।

ব। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি যে বললে,—কলির মহিমায় জাত-বিচার নেই, কিন্তু পাড়ারগায়েও ত জাত-বিচারের এখনো ব্যতিক্রম হয়নি !

ঠা। তা' হয়নি বটে, কিন্তু তা'ও আর থাকে না। প্রথমে কল্‌কাতায় আড্ডা গেড়ে কলি এখন পাড়ারগায়ের দিকে হাত বাড়ী-চ্ছেন। পাড়ারগায়েও এখন বামুন ঢুকছে।

ব। আচ্ছা ঠাকুমা, পাড়ারগায়ে আগে কাজকর্ম হ'লে কা'রা রাঁধত ?

ঠা। রাঁধত—গ্রামের ভদ্রবরের ঘেরেরা,—যারা ভাল রাঁধতে পারত। তা' আবার কেমন কড়াকড়ি। রায় চড়া'বার আগে গ্রামের কোন প্রবীন লোক কি বাড়ীর কর্তা গিয়ে জিজ্ঞেসা ক'রতেন—হেঁসেলে কে কে আছে ? তা'র পর দরকার বুঝে নাম জেনে একজনকে ডেকে বলতেন, কে কীরো, তুমি এখানে কেন ? সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ইসারা করতেন, পালা পালা। কীরোদা লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে পালা'ত। কেন জানি ?

কীরোদার কোন দোষের কথা শোনা যেত  
ব'লেই এমনটা ক'রতে হ'ত ।

ব। আর পরিবেশন ক'রা করত ?

ঠা। পুরুষদের পরিবেশন ক'রত—

গ্রামের কিশোর আর যুবকের দল। আর  
মেয়েদের পরিবেশন মেয়েরাই করত ।

ব। আচ্ছা লুচিও কি মেয়েরা ভাজত ?

ঠা। না, লুচি হ'লে গ্রামের মধ্যে যুবক  
বা প্রৌঢ়—যা'দের লুচি ভাজার ভাল শিক্ষা  
ছিল, তা'রাই ভাজত, শূদ্রেরা ময়দা মেখে—  
বেলে দিত ।

ব। কিন্তু খাজা, গজা, পাস্তুরা—এ সব ত  
আর হালুইকর-বামুন ভিন্ন হ'বার যো নেই ।

ঠা। ও সকলের আগে বড় চলতি ছিল  
না। পরমান হ'ত, গোয়াল দই-কীর দিত,  
আর ময়রা সন্দেশ দিত। আমাদের সময়ে  
পাস্তুরা-বৌদেও আরম্ভ হ'তে দেখেছি, আর  
সে শুলি হালুইকর বামুনেই ক'রত বটে,  
কিন্তু কলি তখন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের আচার  
পরিত্যাগ ক'রতে আর অল্প নীচ জাতকে  
বামুন সাজতে শিথিয়ে উঠতে পারেননি ।

( লীলার প্রবেশ )

ব। এই যে ঠাকুরঝি এয়েছে, এখুনি  
তোমাদের শাস্তালাপ হ'বে। আমার কি  
ক'রবে বল ?

ঠা। তুই মেজ বৌ আর ছোট বোকে  
ডেকে নিয়ে আর, আমি বন্দোবস্ত ক'রে  
দিচ্ছি ।

ব। আচ্ছা তোমাদের কথা শেষ হোক,  
আমি একটু পরে ডেকে নিয়ে আসছি ।

ঠা। আর লীলা, ব'স। সব খবর ভালত ?

লী। খবর আর ভাল কই ঠাকুমা,  
খুকির আলজিব ফোলা রোগ হয়েছে, বং-বং

ক'রে কাশে, গা-টাও একটু ছাঁক-ছাঁক  
ক'রে। আর ছোট খোকার গলার ভেতর  
ফুলেছে, কাশি আছে, আর গলায় ব্যথা  
হ'য়েছে ।

ঠা। তাই ত তোর ছেলে-পিলের যে  
নিতাই অস্থখ দেখতে পাই। তা', ওষুদ  
কিছু দিয়েছিস ?

লী। হাঁ, আজ চার পাঁচ দিন হ'ল  
হোমিওপ্যাথিক ওষুদ দেওয়া হ'চ্ছে, তা'তে  
কিছুই হ'ল না। সেই জন্তে তোমার কাছে  
এসেছি ।

ঠা। এ বড় বিস্তী রোগ, অনেক সময়  
ওষুদে ভাল হয়না। অস্ত্র ক'রতে হয়। তা',  
প্রথমে ওষুদ দিয়েই দেখ ।

লী। সে কি ঠাকুমা, তুমি যে ব'লতে—  
কবিরাজী ওষুদেই সব রোগ ভাল হয় ।

ঠা। তা' কবিরাজীতেই ত এ রোগে  
অস্ত্র ক'রবার নিয়ম আছে ।

লী। তা, কই কবিরাজেরা ত অস্ত্র করে  
না ?

ঠা। কবিরাজীতে অস্ত্র-চিকিৎসা খুব  
ভালই ছিল, এখন সেটা লোপ পেয়ে গেছে।  
কাজেই এখন অস্ত্র করতে হ'লে ডাক্তারের  
কাছেই যেতে হ'বে ।

লী। কচি ছেলে—অস্ত্র করবার নাম  
শুনেই যে ভয় করে ঠাকুমা ।

ঠা। না ভয় কিছু নেই। আর অস্ত্র  
ক'রতেই হবে—তা'রও মানে নেই ; ওষুদেও  
সারতে পারে ।

লী। আচ্ছা ওষুদ আর পথ্য কি সেব  
তা' বল ।

ঠা। আগে পথ্যের কথা বলি, হ'লনকে  
প্রায় একই রকম পথ্য দিতে হ'বে। জর—

কি জরভাব আর খুব সর্দি-কাশ থা'কলে ও সব রোগে দিন কতক ভাত বন্ধ ক'রে যব কি বালির রুটী দেওয়াই ভাল ।

লী। আর যদি জর না থাকে ?

ঠা। জর না থা'কলে—কি খুব সর্দি-কাশি না থা'কলে,—এক বেলা ছুটি পুরাণ চা'লের ভাত দেওয়া চলে । সাধারণ চা'লের বদলে কান্ননি ধানের চা'লের ভাত দিতে পা'রলে ভাল হয় ।

লী। কান্ননি ধানের চা'ল আবার কি, সে কোথায় পাওয়া যায় ।

ঠা। গ্রামা ঘাসের বীচির চেয়ে একটু বড় দে'খতে । বড় বড় পাচনওয়ালা-বেনের দোকানে পাওয়া যায় ।

লী। দাল-তরকারী কি দেওয়া যেতে পাবে ?

ঠা। দালের মধ্যে মুগের দালের যুথ । উচ্ছে করলা, কচিমুলো আর পটোল এই কয় রকম তরকারী ।

লী! মাছ কি দেওয়া যায় ?

ঠা। এ রোগে মাছ কুপথ্য, তবে কচি ছেলে—বদি কান্না-কাটি করে, কুপথ্য হ'লেও একটু-আধটু থলসে, শিজি, কি মাগুর মাছ দিতে হবে । অমনি ভুগুতে পারিস্ ত ভালই ।

লী। হুধ কি রকম দেব ?

ঠা। যা খায়, তার অর্দ্ধেক, আগে যেমন পি'ছি—পি'খল দিয়ে সিদ্ধ ক'রে দিবি । মিছরী ও মরিচের গুড়ো দিয়ে হুধ দিলেও হয় ।

লী। জলখাবার কি দেব ?

ঠা। একটু দেশী চিনির মিছরী, বেদানা । কিসমিস, ছ' একটা খেজুর—এই দিস্ ।

লী। আর কি দেওয়া যেতে পারে ?

ঠা। খাবার কি দিবি ? তবে গরম

জল একটু-একটু ক'রে দিন—তিন চা'র বারে খাওয়াতে পারলে ভাল হয় । আর যখন জল খেতে চা'বে, তখন ঠাণ্ডা জল না দিয়ে গরম জল দেওয়াই ভাল । তবে যদি গরম জল না খাওয়াতে পারিস, তা' হ'লে গরম জল ঠাণ্ডা ক'রে দিস্ । কিন্তু দিনমানের গরম করা জল রাখে, কি রাত্রে গরম করা জল দিনে দেওয়া হ'বে না আর গরম জল ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে, সে জল আর গরম ক'রে দেওয়া হ'বে না ।

লী। খাবার সত্বে আর কোন নিয়ম আছে ?

ঠা। সব খাবারই গরম-গরম খেতে দিবি, ঠাণ্ডা জিনিষ কিছুই দিস্‌নে, আর বেশী ক'রে না খাইয়ে বরং কম ক'রে খাওয়াবি ।

লী। আচ্ছা, এখন শুধু কি দেবে বল ?

ঠা। ছোট খুঁকির আলজিব্ ফুলেছে বলছি'স্ ? তা' বাছে কেমন হয় ?

লী। বাছে ভাল হয়না । প্রায় এক-বার ক'রেই কঠিন মল বাছে ক'রে', এক আধ দিন মোটেই বাছে হয় না ।

ঠা। হু', দেখ্, বাছেটা যা'তে রোজ ছ'বারের কম আর তিন বারের বেশী না হয়—তা' ক'রতে হ'বে । এক কাজ করিস্ ; সোঁদালের পাকা ফলের ভেতর যে আকিনের মত আটা থাকে—তাই ছ' আনা ভ'র নিয়ে গরম হুধে গুলে একবার সকালে খাইয়ে দিস । যদি তা'তে বাছে হয়—ভালই, নরত ছ' আনার জায়গায় তিন আনা—কি এক সিকি সোঁদালের আটা দিতে হ'বে ।

লী। আচ্ছা খাবার শুধু কি দেব বল ।

ঠা। আগে লাগাবার ওষুধের কথা বলি । রান্নাঘরের ঘোঁরা'র বে' খুল হ'ব—

সেই ঝুল, সৈন্ধব আর মধু এক সঙ্গে বেশ ক'রে মেড়ে তাই, আলজিবের ওপরে আর চার পাশে লাগিয়ে দিবি, আর মুখ হাঁ ক'রে হেঁট হ'য়ে ব'সে লাগা'বি। খানিকক্ষণ পরে অনেক লালা কেটে প'ড়বে।

লী। ক'বার ক'রে দেব ?

ঠা। সকালে বিকালে ছ'বার দিলেই হ'বে।

লী। আর কোন লালা কাটার ওষুদ নেই ?

ঠা। আছে, কিন্তু এইটে খুব সহজ। আর একটা বলি শোন,—মরিচ, বচ, আতইচ, আকনাদি, কুড়, সোণাছাল আর সন্ধব—সমান ভাগে নিয়ে, মধু মিশিয়ে—আগে যেমন ব'লেছি তেমনি ক'রে লাগালেও হয়, নয় ত ঐ সব দিয়ে বাতির মত ক'রে—সেই বাতি আলজিবের উপর আর তার চারদিকে ব'সে দিলেও হয়। বাতি কিন্তু খুব গরম হওয়া দরকার।

লী। আচ্ছা হাত দিয়ে যদি লাগা'বার অসুবিধা হয় ?

ঠা। তা' হ'লে পাতলা কানার মত ক'রে তুলোর তুলিতে মাথিয়ে লাগা'লেও চলে।

লী। আর লাগাবার ওষুদ কিছু আছে ?

ঠা। আছে অনেক, তবে এখন এইটাই দিগে যা'। আর একটা কুলকুচো ক'রবার ওষুদ আছে, তা' বড় ছেলেমানুষ,—পা'রুবে কি ?

লী। তুমি বল, আমি চেষ্টা ক'রে দেখবো।

ঠা। তবে শোন। বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটকী আর নিমছাল—এইগুলো সমানভাগে নিয়ে কাথ তৈয়ের ক'রে, একটু একটু গরম থাকতে কুলকুচো ক'রতে হয়। যেমন তেমন কুলকুচো নয়—খুব এক

মুখ নিয়ে খানিকক্ষণ রেখে তারপর ফেলে দিতে হয়। আবার নিয়ে ঐ রকম ক'রতে হয়। এই রকম ৪৫বার ক'রতে হয়।

লী। আচ্ছা ঠাকমা, লাগা'বার ওষুদ—কি কুলকুচো ক'রবার ওষুদ একটু-আধটু পেটে গেলে কি কিছু দোষ হয় ?

ঠা। বিশেষ দোষ কিছু হয়না, তবে যে সব ওষুদ গলায় লাগাবা'র নিয়ম থাকে, সে সব ওষুদ পেটে যত না যায়, ততই ভাল। কেননা, ওগুলো পেটে যাবার জন্তে ত দেওয়া হয়না।

লী। আচ্ছা এখন খা'বার ওষুদ কি দেব তা' বল।

ঠা। খুকের বয়স কত হ'ল।

লী। এই যেটের কোলে চার বছরে পা দিয়েছে।

ঠা। তিনবার ক'রে ওষুদ দিতে হ'বে। ওষুদ ক'টাও এমন কিছু নয়—হরীতকী, গুঁঠ আর দেবদারু গুঁড়ো সমান ভাগে মিলিয়ে তার তিন রতি ক'রে নিয়ে সকালে, বিকালে আর সন্ধ্যায়—তিনবার ক'রে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে চেষ্টে খেতে দিবি।

লী। দেবদারু কি এই দেবদারু ?

ঠা। না এ দেবদারু নয়। এর কাঠ হালকা আর গন্ধ নেই। সে দেবদারু সঙ্গর যুক্ত। বেণের দোকানে কিন্তে পাওয়া যায়।

লী। আচ্ছা খুকের ব্যবস্থা ত হল, এখন খোকার কি করবো বল।

ঠা। খোকার কি হ'য়েছে ভাল ক'রে বল দেখি।

লী। তার গলার ভেতর—জীবের নীচে ফুলে উঠেছে, বড় ব্যথা আর কানি আছে।

ঠা। সর্দি আছে খুব ?

লী। না সর্দি বেশী নেই। নাকে ত নেইই, কাসির সঙ্গে একটু-আধটু গয়ের ওঠে।

ঠা। বাহো কেমন হয় ?

লী। বাহো ভাল হয়না। কোন দিন একবার হয়—কোন দিন বা হয় না।

ঠা। বাহোটা যাঁতে পরিষ্কার হয়—তা' ক'বতে হ'বে।

লী। তুমি আগে পথিয়ার কথা বল।

ঠা। খুকিকে যেমন পথিা দিতে বলিছি, একেও সেই রকম দিতে হ'বে। তবে এর যখন সর্দি কি জ্বর নেই, তখন এক বেলা ছুটি পুবাণ চালের ভাত, আর একবেলা বালি কি যবের রুটী দিস্।

লী। আচ্ছা ঠাকমা বালি কি যবের রুটী যদি কোন দিন না যোগাড় হয়, তা' হ'লে হুজির রুটী কি পাউরুটী দেওয়া চলেনা।

ঠা। যবের রুটীই উপকারী। তবে যদি কোন দিন নেহাত না যোগাড় ক'রতে পারিস্, তা'হলে হুজির রুটী দিস্। পাউরুটীতে আর দরকার কি ?

লী। আচ্ছা ঠাকমা বিস্কুট হ' একখানা দেওয়া চলে না ?

ঠা। ওগুলো বড় ভাল জিনিস নয়, ওগুলো না দেওয়াই আমাদের উচিত। লোকনাথ যদি হুংখ ক'রে বলতেন, বড় গিগি, সময়ের গতি বোঝ করবার সাধ্য কা'রও নেই।

আমাদের চৌদ্দ পুরুষ—চৌদ্দই বা বলি কেন, হাজার হাজার পুরুষ এই দেশের পথিা আর অন্ন খেয়ে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হ'য়ে কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু আমাদের ছেলে-পিলেকে আমাদের দেশের খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা আর আমাদের জননী জন্মভূমির নেই ; বিলেতের যব-গম

আর সুইজারলণ্ডের গাইয়ের দ্বধ পেটে না প'ড়'লে এরা যেন এখন মানুষই হয় না।

লী। সে কথা ঠিক ঠাকমা, আবশ্যক হ'লেও অপকারী জেনেও আমরা দেশের উপকারী জিনিষ ছেড়ে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করি ! আমার কিন্তু সেটা একে-বারেই ইচ্ছে নয় ঠাকমা, কিন্তু কি করবো ছোট থোকা অন্ন বাড়ীর ছেলেদের বিস্কুট খেতে দেখে এমন আবদার করে যে, হ' এক খানা না দিয়ে থাকা যায় না। তা' তুমি কি বল ?

ঠা। আমি আর বলবো কি ? না দিলে যদি নেহাৎ না চলে, তা' হ'লে হ' এক খানা দিস্, আর ত উপায় নেই। তবে পৈতে হ'বার পর থেকে এ রকম অনাচার যাঁতে না হয়, তা' করিস্।

লী। সে আর তোমায় ব'লতে হ'বেনা ঠাকমা। পৈতে হ'বার পর থেকে আমি আর কোন রকম অনাচার ক'রতে দেবনা। তা' ছেলে বাঁচুক আর মরুক।

ঠা। ছেলেপিলের মন কাদার মত নরম, যেমন গ'ড়বে, তেমনি হ'বে। ওদের যা' শেখাবে তাই শিখ'বে। তা' হ' একখানা বিস্কুট দিস্। অনেক বায়ুন-বিস্কুট-ওয়ালায় দোকানে বাতাসার মত ছোট ছোট খুব হালকা এক রকম এরাকটের বিস্কুট পাওয়া যায়, সে গুলো খুব সহজে হজম হয়। আর তা' না হয়তো—এক রকম এরাকটের পাতলা বিলিভী বিস্কুট পাওয়া যায়, তাকে কি বলে—দুর ছাই—ও সব বিলিভী নাম মনেও আসেনা, পাকা পরাণের বিস্কুট বলে বুঝি।

লী। (হাসিয়া) পাকা পরাণ নয় ঠাকমা ; পিক্ত্রিমাণ।

ঠা। হাঁ তাই হ'বে, সেই পাতলা এরা-  
রুটের বিকট গুলো যা'দের পেট নরম—  
তা'দের পক্ষেই ভাল, ওতে একটু বাহ্যে কম  
করে। তবে হু' এক থানা দিলে দোষ নেই।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, হু' এক থানায় দোষ  
কিছু নেই ব'লছ, কিন্তু একে এদের বাহ্যে  
কম, তা'তে যদি আবার কম পথ্য দেওয়া যায়  
তা' হ'লেত আরও বাহ্যে কমে যা'বে।

ঠা। এত দিনে তোর একটু জ্ঞান হ'য়েছে  
দেখছি। তবে একটা উপলক্ষ্য ক'রে বুঝিয়ে  
দিই শোন। দেখ এই গুরুপাক জিনিষ  
হু' রকম; এক স্বভাব গুরু আর মাত্রা গুরু।  
স্বভাব গুরু বলি কাকে? - না যে জিনিষ  
স্বভাবত: গুরুপাক, যেমন কাপিয়া, গোলাও,  
ক্ষীর চিড়ে, দাল—এই সব জিনিষ খাওয়া;  
আর মাত্রা গুরু বলি কাকে—না যে সব জিনিষ  
লঘুপাক,—যেমন সাগু, ধৈ, ভাত প্রভৃতি  
জিনিষ বেশী ক'রে খাওয়া। তা' দেখ্ মাত্রা  
গুরু জিনিষ যদি বোগী খুব কম খায়—যেমন  
অজীর্ণ বোগী যদি একটা ছোলা খায়, তা'  
হ'লে তা'র অপকার করেনা, আবার লঘু  
পাক জিনিষ যদি মাত্রা গুরু হয়, যেমন ধর—  
একটা সুস্থ লোক যদি পাঁচ সের ধৈ কি  
সাগু খায়, তা' হ'লেও তা'র অপকার হয়।  
সেই অজ্ঞে বলছি—যে হু' এক থানা বিকটে  
ওদের কিছু অনিষ্ট হবে না।

লী। ঠিক বলছ ঠাকুমা, আমি এতটা  
ভাবিনি। তা' দেখ ঠাকুমা, তুমি আগে  
ব'লেছিলে যে, মেলিঙ্গফুডে বাহ্যে পরিষ্কার  
হয়। মেলিঙ্গ ফুডের এক রকম বিকট হয়—  
তা' এক আধ থানা দিতে পারি?

ঠা। মেলিঙ্গ ফুড মিষ্টি। এ সব রোগে  
মিষ্টি, নোমতা আর টক জিনিষ কুপথ্য।

মিষ্টির মধ্যে মিছরী আর ভুগের মধ্যে সন্ধব—  
তা'ও কম ক'রে দিতে হয়। কাজেই মেলিঙ্গ-  
ফুড না দেওয়াই ভাল।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, পথ্যের কথা ত হ'ল  
নাওয়ার ব্যবস্থা কি রকম করবো?

ঠা। নাওয়া এখন বন্ধ থাক কিছু দিন।  
তবে মধ্যে মধ্যে গরম জলে গামছা ভিজিয়ে,  
নিংড়ে—সেই গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিস।  
একটা ঘরের মধ্যে গা মুছিয়ে দিবি, সে সময়  
কি তা'র পরে যেন ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগে।  
আর গা মোছানোর পরেই একটা মোটা জামা  
গা'য়ে দিয়ে দিস।

লী। কতদিন অন্তর গা মুছিয়ে দেব।

ঠা। সেটা বিবেচনা ক'রে দিতে হ'বে।  
মোটামুটি ৩৪ দিন অন্তর দিলেই হ'বে।  
শরীরের অবস্থা বুঝে এর চেয়ে দেরী করেও  
দেওয়া যেতে পারে।

লী। আচ্ছা আর কোন নিয়ম ক'রতে  
হ'বে।

ঠা। দিনমানে ঘুমানটা এ রোগে বড়  
ভাল নয়। আর গলায় একটা গরম কাপড়  
জড়িয়ে রাখা ভাল। আর গরম জল যে ঠাণ্ডা  
ক'রে দিবি, তা'তে একটু কর্পূর দিয়ে দিস।

লী। পথ্য ত হ'ল, এখন ওষুদের কথা  
বল।

ঠা। বাহ্যে ভাল হয়না ব'লছি। তা'  
বাহ্যেটা যা'তে হু'বার ক'রে হয়, তা' ক'রতে  
হ'বে। তা' রাত্রি শোবার সময় তেউড়ীর  
শিকড়ের গুড়ো এক আনা আর কাশীর  
চিনি এক আনা এক সঙ্গে মিশিয়ে জলের  
সঙ্গে খেতে দিস।

লী। তেউড়ী কি ঠাকুমা?

ঠা। তেউড়ী এক রকম লতানে গাছ

বেদেদেব কাছে পাওয়া যায়। সেই তেউড়ীর শিকড়ের ভিতরকার কাঠটা ফেলে দিয়ে, ছাল শুকিয়ে গুড়ো ক'রে নিতে হয়। আর এ ছাড়া বেণেব দোকানে পশ্চিম-তেউড়ী এক রকম পাওয়া যায়, টুকরো টুকরো ছাল। তা'তে যে কাঠ থাকে, তা' ফেলে দিয়ে গুড়ো ক'রে নিতে হয়।

লী। কোন তেউড়ী ভাল ঠাকুমা ?

ঠা। পশ্চিম-তেউড়ীর চেয়ে দেশী তেউড়ীতেই কাজ হয় বেশী।

লী। আর তেউরী যদি না পাই।

ঠা। তা' হলে জাঙ্গীহরীতকী ছ' আনা আর পিপুল তিন রতি বেটে গরম জলের সঙ্গে খাইয়ে দিস।

লী। এখন ওষুধ কি দেব বল।

ঠা। দেখ, খুকিকে যে ওষুধ দিতে ব'লেছি থোকাকে তা'র একটু বেশী মাত্রায় দেওয়া চাই। শুঠ, পিপুল, মরিচ, উননের পোড়া মাটি—এক ক'রে বেটে জাল দিয়ে গরম কোবে সেই গরম জল—আগে যেমন কুলকুচো ক'রতে বলিছি, একেও সেই রকম রোজ কুলকুচো ক'রতে দিবি। কুলকুচো এমন ভাবে করা চাই—যেন গলায় তাব'টা লাগে, —বুঝলি।

লী। হাঁ তা ত বুঝলাম। খুকীর আর থোকাব ওষুদের তফাৎ কি ব'লবে বলেছিলে ?

ঠা। হাঁ ব'লছি! এই থোকার জন্তে কুলকুচো করবার যে ওষুধ ব'ললাম এটার শুঠ পিপুল, মরিচ আছে ব'লে বড্ড ঝাল হ'বে। খুকি বড্ড কচি ব'লে অত ঝাল সহ্য ক'রতে পারবেনা। সেই জন্ত তাকে এটা দিতে নেই। আর থোকাও ত ছেলে নাহয়,

তা'কেও এমন করে দিবি—যেন খুব ঝাল না হয়।

লী। তাই দেব, আমি নিজে আগে মুখে ক'রে দেখব। যদি বেশী ঝাল বোধ হয় আরও খানিক গরম জল মিশিয়ে নেব। তা' তুমি কুলকুচো করবার এমন আর একটা ওষুধ বল—যেটা ঝাল না হয়।

ঠা। বচ, আতইচ আকনাদি, রান্না, কটকী আর নিমপাতা সিদ্ধ ক'রে কুলকুচো ক'রলে হয়।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা; ডাক্তারে একবার একজনের এই অস্থিতে একটা যন্ত্রের মধ্যে কি রেখে তার ধোঁয়া গলায় লাগা'তে দিয়েছিল। কবিরাজীতে কি তা' নেই।

ঠা। আছে, ধোঁয়া লাগান আর তাপ নেওয়া এরোগে উপকারী, কিন্তু খুকি কচি ব'লে তা'কেত দেওয়া চলবেনা। তবে থোকাকে দিতে পার। মরিচের গুড়ো, দারচিনির গুড়ো আর কর্পূর—জলে গুলে একটা ঘটা কি হাঁড়িতে রেখে জালে চড়া'তে হয়। আর তা' থেকে যে ধোঁয়া ওঠে, হাঁ করে সেটা গলার ভেতর লাগা'তে হয়।

লী। সে কি স্থবিধে হ'বে ঠাকুমা ?

ঠা। না হয় একটা গাড়ুর মুখ ঢাকা দিয়ে তাইতে সিদ্ধ ক'রবি, আর নল দিয়ে যে ধোঁয়া বেরাবে—সেইটে ঝা'তে গলায় লাগে—তাই ক'রবি।

লী। আর কোন ভাল উপায় নেই ?

ঠা। আছে বৈকি,—ওষুধ মিশান জল একটা হাঁড়ির মধ্যে রেখে তা'র মুখে এক-খানা সরি ঢাকা দিয়ে ঘোড়ের মুখ—মাটি কি ময়দা দিয়ে লেপে দিবি। সরার মাঝখানে আগেই একটা ফুটো ক'রে রাখতে হয়। তা'র

পর পাতার একটা লম্বা নল ক'রে তা'র এক মুখ সেই ফুটোয় বসিয়ে দিতে হয়, আর অল্প মুখ দিয়ে গলায় ধোঁয়া লাগাতে হয়।

লী। আর কি কোন রকম ক'রে ধোঁয়া লাগান যায়না ?

ঠা। আর এক রকম উপায়ে যাচ, বলি শোন; ইক্ষুদী, লতাফটকী, দম্বী, তেউড়ী আর দেবদাক সমান ভাগে নিয়ে অল্প তেজপাতা আর দাবচিনি মিশিয়ে ছোট ছোট বাতির মত ক'রতে হয়। তা'র পর শুকিয়ে সেই বাতি একটা নলের একমুখে রাখতে হয়, আর তা'তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নলের অল্প মুখ দিয়ে চুরুটের মত ধোঁয়া টানতে হয়। আর তা' না হ'লে একটা শুকনো আট আঙ্গুল ছাকড়া জড়িয়ে, তা'র ওপর ওষুদ লাগা'তে হয়, তা'র পরে শুকিয়ে চুরুট খাওয়ার মত খেতে হয়।

লী। বাবা, কবিরাজীতে এত আছে ঠাকুমা ?

ঠা। এ আর কি শুনিলি ? আমি লোক-নাথ-বদ্বির মুখে শুনিছি যে, বৃকের, গলার, মুখের, মাথার, কাণের আর চোখের অনেক রোগে ধূমপান খুব উপকারী, আর অনেক রকম ধূমপানের ব্যবস্থা আছে। আর আগে ঐ সকল রোগ যা'তে না জন্মায়—তা'র জন্মেও ধূমপানের ব্যবস্থা ছিল।

লী। ঠিক কথা ঠাকুমা, কাদম্বরী ব'লে একখানা সংস্কৃত বই আছে, তা'র বাঙ্গালা প'ড়ে দেখিছি ধূমপানের কথা আছে। আমি ভেবেছিলাম—বুঝি তামাক, তা' নয় এই ওষুদের ধোঁয়া। এ সব উঠে গেল কেন ঠাকুমা ?

ঠা। কালের গতিতে ওলট-পালট হওয়াটা

সংসারের নিয়ম। আর একটা কথা, সব ওষুদই যেমন ঠিক ব'লে দিতে না পা'রলে অনিষ্ট হয়, ধূমপানও ঠিক মত না হ'লে অপ-কারী হয়, সে জন্মেও কতকটা উঠ' গেছে বটে। তা' তুই জিজ্ঞাসা করলি, তাই বললাম, কচি-ছেলে-পিলেকে চুরটের মত ধোঁয়া না খাইয়ে আগে যা' গলায় লা'গাবার কথা বলেছি তাই দেওয়াই ভাল।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, আগে যে নাসের কথা ব'লেছিলে—সে কিসের নাস বলনা ?

ঠা। নাস এ যোগে খুব উপকারী বটে, তবে ছেলে মানুষ। তা' সপ্তায় ছ' তিন দিন ক'রে দিস না হয়। পিপুল, সজ্জনের বীচি, মরিচ, শুঠ, বচ—এর যে কোন একটা জিনিষের গুঁড়ো অল্প ক'রে দিস, যাতে ২।৪ টা ইঁচি হয়।

লী। আচ্ছা এখন খাবার আর গলায় লাগাবার কি ওষুদ দেব বল ?

ঠা। খুঁকির অস্থত্থের জন্ত যা' ব'লেছি, তা' দিতে পারিস। তা' ছাড়া আরও দুটো একটা বলছি শোন। হরীতকী বেশ মিহি ক'রে বেটে গলার ভিতর লাগা'তে পারিস। আদার রস, মরিচের গুঁড়ু আর সন্ধব—এক সঙ্গে মিশিয়ে লা'গাতে পারিস। আর গলার চা'রদিকে টুটার উপর একটা প্রলেপ দিস।

লী। কিসের প্রলেপ দেব ?

ঠা। উননের পোড়া মাটি, সমুদ্রফেনা আর গোল মরিচ—আদার রস কি মুক্তরো-পাতার রসে বেটে গরম ক'রে প্রলেপ দিস।

লী। ক'বার প্রলেপ দেব ? আর সমুদ্র ফেনা কি ?

ঠা। দিনে ৩।৪ বার দিলেই হবে।



সমুদ্রফেনা এক রকম হালকা শাদা জিনিষ,  
বেগের দোকানে পাওয়া যায় ।

লী। সমুদ্রফেনা যদি না পাওয়া যায় ?

ঠা। তা' হলে সমুদ্রফেনার বদলে কাল-  
কান্তনের পাতা দিলে চলবে ।

লী। আচ্ছা এখন খাবার ও খুব কি দেব  
বল ?

ঠা। আগেই ব'লেছি যে, খুকিকে যে  
ওষুদ্ব দিতে ব'লেছি তা' একটু বেশী মাত্রায়  
থোকাকেও দিতে পারিস, তা' ছাড়া আরও  
ছ' একটা বলি শোন্। দারচিনি, লবঙ্গ,  
গুঁঠ, পিপুল, মরিচ আর কুড় সমান ভাগে  
মিশিয়ে, গুঁড়ো ক'রে, তা'র ৪৫ রতি মধু  
দিয়ে মেড়ে চেটে চেটে খেতে দিবি।  
আর একবার বচ, খই, গুঁঠ আর পিপুল এই  
চারটে জিনিষের গুঁড়ো সমান ভাগে  
মিশিয়ে ৩৪ রতি মাত্রার মধুর সঙ্গে  
মেড়ে চেটে খেতে দিবি। আর এক  
টুকরো বচ আর দেলী চিনির মিহরি মুখে  
বেখে দিতে বলবি।

লী। আর কোন কিছু ক'রতে হ'বে  
ঠাকুমা ?

ঠা। পারিস ত থোকাকে ভাত খাবার  
শেষে ছ'আনি ভ'র পুরাণ ঘি অল্প একটু গরম  
হুখে গুলে খেতে দিস। আর ভাত খেয়ে  
উঠেই বাতে জল না খায়, আর জল কি হুখ  
খেয়েই না শোয়—তা'র ব্যবস্থা করিস।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি অনেক রোগেই  
পূবাণ ঘি—খাবার—নয় মালিষ ক'রবার  
ব্যবস্থা কর, পুরাণ ঘি কি এমন ভাল জিনিষ ?

ঠা। এমন ভাল জিনিষ কি আছে ?  
লোকনাথ বলতেন, শাস্ত্রে আছে যে, পুরাণ  
ঘিয়ে না সারে—এমন রোগ নেই।

( বড় বো, মেজ বো ও ছোট বোয়ের প্রবেশ )

বড় বো। এই বড়দি-মেজদিকে ডেকে  
এনেছি ঠাকুমা ।

ঠা। ই্যাবে, বোমা নেই ব'লে হোঁরা কি  
ক'টা দিন তিন জায়ে রান্না ক'রতে পার'বিনে ?

লী। পারবেনা কি ঠাকুমা, পারতেই হ'বে।

ছোট বো। তা' তোমাদের হু'জনকে  
এক জায়গায় দেখেই বুঝেছি।

লী। তা' বুঝেছিস যদি তো তিন জায়ে  
গিয়ে রাঁধ গে।

মেজ বো। আমার যে আশুন-তাতে  
গেলে মাথা ঘোরে ঠাকুরঝি।

লী। মাথাটা খুব ক'রে দড়ি-দড়া দিয়ে  
বঁধে আশুন তাতে যাস, তাহ'লে আর ঘুরবে  
না। আর তাতেও যদি ঘোরে,—মাথাটা  
কেটে রেখে যাস।

মেজ বো। তুমি এমনি মাথা-কাটা-  
ঠাকুরঝিই বটে।

লী। আর তোমরা এমন গুণের ভাজ  
যে, রাঁধতে পারবেনা, একটা অজ্ঞাতের হাতে  
খাইয়ে সকলের জাত মারবে। রেঁধে পাঁচ  
জনকে খাওয়াবে—এও যে ভাগির কথা।

ঠা। শোন্ বলছি। বড় বো তিন দিন,—  
মেজ বো ছদিন—আর ছোট বো এক দিন,—  
খালটা-পালটা ক'রে রাঁধবি। যদি এর মধ্যে  
কারও অস্থখ করে, কি কোথাও যাওয়া হয়,  
তা' হ'লে তা'র পর যা'র পালা, সেই রাঁধবে।  
কিন্তু তা'কে আবার পরে সেই ক'দিন পুখিরে  
দিতে হবে।

মেজ বো। তা' আমরা যে রান্নার কিছু  
জানি নে, হ'এক দিন দেখিয়ে না দিলে কি  
ক'রে হবে।

ঠা। চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

লী। আমিও বাই চল ঠাকুমা।

( সকলের প্রস্থান )

## মুক্তিযোগ ও টোটকা ঔষধ ।

—:~:—

### বমন রোগের ঔষোগ ।—(১)

খেতচন্দন ঘসা ২ তোলা ও আমলকীর রস ২ তোলা একত্র করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন নিবারণ হয় । (২) ভাজামুগ ৪ তোলা, পার্কার্থ জল এক সের আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐষচূর্ণ ৪ তোলা ছ' তিন ফোঁটা মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে বমন, তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ হয় ।

(৩) অশ্বখবৃক্ষের শুষ্কছাল দ্রব্ধ করিয়া কোন মাটির পরিষ্কার জলে রাখিয়া দিবে । শীতল হইলে উপরিভূত স্বচ্ছজল পান করিলে সর্ব-প্রকার বমন প্রশমিত হয় । (৪) আমলকী ২ তোলা ও কিস্মিস্ ২ তোলা আধপোয়া শীতল জলের মধ্যে রগড়াইয়া ছাঁকিয়া ২ তোলা পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া অল্প অল্প পান করিলে বমন রোগের শান্তি হয় ।

### ক্রিমি নিবারণের উপায় ।

—(১) কটকো ।০ সিকি তোলা, দাড়িম মূলের ছাল ১০ তোলা, বিড়ঙ্গ ১০ আধ তোলা আপাঙ্গের পাতা ১০ আধ তোলা ও দারুচিনি ১০ সিকি তোলা । আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ৪½ ফোঁটা তাম্বিন তৈলের সহিত পান করিলে কোষ্ঠে আবদ্ধ সমস্ত ক্রিমি নিশ্চিত সমূলে নষ্ট হয় । (২) বিড়ঙ্গ ১০ আনা, পলাশ পাপড়া ১০ আনা একত্রে জলের সহিত বাটীয়া প্রতিদিন প্রাতঃ-কালে সেবন করিলে ক্রিমি নাশ হয় । (৩)

ভাঁট পাতা ও আনারসের পাতা এক সঙ্গে মিশাইয়া সেই রস দুই তোলা লইয়া ৩৪ রতি বিটলবণের সহিত সেবন করিলে নানা প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয় । (৪) পালিধামাদারের ছাল পরিষ্কার চূর্ণের জলে ছেঁচিয়া তাহার রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয় । (৫) পালিধামাদারের পাতার রস মধু সহ সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শে ।

### কর্ণশূলে ব্যবস্থা ।—(১)

হড়ে পাতার রস গরম করিয়া কর্ণের ভিতর দিলে প্রবল কর্ণশূল আরোগ্য হয় । (২) অন্ন উষ্ণ নারিকেল তৈলের মধ্যে ১ রতি আফিং ঘসিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণশূলের নিবারণ হয় । (৩) পাকা আকন্দ পাতায় ঘৃত মাখাইয়া আঙুণে সেকিয়া তাহা হইতে রস বাহির করিয়া সেই ঈষৎক্ষর রস পুনঃ পুনঃ কর্ণে পূরণ করিলে শীঘ্র শীঘ্র বেদনার শান্তি হয় । (৪) ছাগমূত্রের সহিত সৈন্ধবলবণ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূলের শান্তি হইয়া থাকে, (৫) সরিষার তৈল, মধু ও আদার রস একত্রে অগ্নিতে পাক করিয়া গরম গরম ২৪ বিন্দু কর্ণ বিবরে প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হইয়া থাকে ।

### শূলবেদনান্ন মর্হৌষধ ।—

(১) শামুকের খোলা ত্বক ১ তোলা, সৈন্ধব-লবণ ২ তোলা, বিটলবণ ৩ তোলা ও মোহর

১ তোলা,—গাছ পাকা খুনা নারিকেল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে উক্ত চারি দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া নারিকেলের ছিদ্রযুগ্মে, সেই নারিকেলের মালা ভাঙ্গার টুকুরা বসাইয়া কাদা মাখা বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া কাদা দ্বারা গোলাকার করিয়া শুষ্ক হইলে, বহিঃ সংযুক্ত ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া লইবে। শীতল হইলে ঘরটা বাহির করিয়া সেই নারিকেলের দণ্ড শস্ত ও ঔষধ বাহির করিয়া একত্রে পেষণ পূর্বক কাঁচ পাত্রে রাখিবে। এই ঔষধ দুই আনা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় গরম জলসহ সেবন করিলে শূল বেদনা সারিয়া যাইবে। (২) কর্পূর, বড় এলাচের দানা ও মিশ্রী এক টুকরা মুখের মধ্যে রাখিয়া চুষিলে শূল বেদনার উপশম হয়। (৩) শুঁঠ চূর্ণ ৬ তোলা, জাঙ্গীহরীতকী চূর্ণ ৬ তোলা, বিটলবর্ণ চূর্ণ ৯ তোলা, সোহাগার থৈ চূর্ণ ৬ তোলা, যোগান চূর্ণ ৬ তোলা, মোরীচূর্ণ ৩ তোলা, জীরাচূর্ণ ৩ তোলা, হরিদ্রা চূর্ণ ৩

তোলা—এই সমস্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার দুই আনা, তিন আনা বা চারি আনা মাত্রায়—শীতল জলের সহিত দুইবার আহারান্তে সেবন করিলে শূল বেদনা অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে।

**দন্তশূলে ব্যবস্থা।**—কাঁচ পাথুরিয়া কয়লায় অগ্নি সংযোগ করিয়া হুদধ হইলে যে কোমল সাদা ভস্ম হয়, সেই ছাই গাবভেরেণ্ডার পাকা গাফা গাছের আঠা সংগ্রহ করিয়া সিক্ত করতঃ রোড়ে শুকাইবে। তাঁরপর উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া দিয়া প্রত্যহ ২১৩ বার দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইলে দাঁতবেদনা, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁতের গোড়া হইতে রক্তস্রাব ও পুয়স্রাব আরোগ্য হইয়া দন্তমূল দিন দিন দৃঢ় হইতে থাকে।

কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী  
ভিষগাচার্য্য।

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

**গ্রাহকদিগের প্রতি কৃত-জ্ঞতা।**—গ্রাহক বৃন্দের অহুকম্পাই সাময়িক পত্রের জীবন। নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের আয়ুর্বেদ ২য় বর্ষে পদার্পণ করিল। আমাদের গ্রাহক মণ্ডলীর নিকট এই শুভ সন্ধ্যাপে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের কৃপা-দৃষ্টি না থাকিলে আমরা ইহার পরিচালন কার্যে কখনই সক্ষম হইতামনা। অজ্ঞা আয়ুর্বেদের এই ঘোর

হাঙ্গিনে আমাদের এই ক্ষুদ্র “আয়ুর্বেদে”র প্রতি তাঁহাদিগের করুণদৃষ্টি যেন পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই আমরা এই নববর্ষের আরম্ভকালে তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

**মৃত্যুর হিসাব।**—সরকারি বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, গত ১৯১৬ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে মৃত্যুর হার অনেক কম হইয়াছিল। ঐ বৎসর সমগ্র বঙ্গদেশের মৃত্যুর সংখ্যা ১২, ৪১, ২, ৪১, উহার পূর্ববৎসর

মরিয়াছিল ১৪, ৮৮, ৫, ৬৭। ইহার মধ্যে আলোচ্য বর্ষে জ্বর এবং ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে, ২,২,৮৮ জন। তৎপূর্ব বৎসর জ্বর এবং ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছিল—১০,৬৪,১,৫২ জন। আলোচ্য বর্ষে কলেরায় মরিয়াছে ৭০,৮,৩৬ এবং তৎপূর্ব বৎসর মরিয়াছিল—১৩০,৬,৭২। বসন্তে মৃত্যু ১৯১৫ খৃঃাব্দে ৩২,৭,৮৫ এবং ১৯১৬ খৃঃাব্দে ঐ রোগের মৃত্যুর সংখ্যা ১৩,৮,২০। ১৯১৫ সালে প্লেগে মরিয়াছিল ১৯২ জন। ১৯১৬ সালে ১১০। হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, গত বৎসর বঙ্গে শিশু-মৃত্যুও কিছু কম হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন—মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা গত বৎসর অনেক বেশী হইয়াছিল। ১৯১৫ সালে জন্ম-সংখ্যা ১৪,৪১,৩,২৮ এবং ১৯১৬ সালে জন্ম-সংখ্যা ১৪,৪৫,৫,২২। উভয় বৎসরের তুলনায় জন্ম-সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও গত বৎসর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম-সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আশার কথা সন্দেহ নাই।

**স্বাস্থ্যরক্ষায় সার্ব আশু-তোষ।**—বাল্যকালে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত পিতা-মাতার চেষ্টা থাকিলে ভবিষ্যৎ সন্তানের অকালে যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারেনা— আমাদের দেশপুত্র্য সার্ব আশুতোষ মুখো-পাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। নানারূপ কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও ভগবৎ রূপায় ইহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রধান কারণ, শিশুকালে ইনি যখন বিজ্ঞানলে পাঠ করিতেন, ইহার স্বর্গীয় পিতৃদেব সেই সময় হইতেই নিয়ম করিয়াছিলেন,—‘টিকিন’র সময় ইহাকে বাজারের খাবারের জন্ত পরমা

দেওয়া হইবেন। উহার পরিবর্তে ১ গ্লাস দুগ্ধ এবং হু’ একটি সন্দেশ দিয়া বিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা ভিন্ন ইহার পিতৃদেব ব্যায়ামের জন্ত ইহাকে নিয়মিত প্রাতঃকালীন ভ্রমণে অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন, সার্ব আশুতোষ অতাপি সে অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। বাহা হউক সার্ব আশুতোষ অতাপি কশ্মীর হইয়া দেশের—দেশের—সমাজের সর্ববিধ কর্ম্মেই অগ্রণীর আসন অধিকারে সমর্থ হইতে ছেন; আর তাঁহার সম-সাময়িক দেশের ভবিষ্যৎ ভবনস্থল কত ছাত্র অকালে কাল-কবলিত হইয়াছে। বালকাল হইতে বাজারের খাবার খাওয়া এবং ব্যায়াম অভ্যাস না করার জন্ত আমাদের যে স্বাস্থ্যরক্ষার অন্তরায় ঘটিতেছে, তাহারই ফলে বয়োবৃদ্ধি ব সঙ্গ সঙ্গ আমরা নানারূপ আধিব্যাধি লইয়া এক এক জন অকর্ম্মণ্যের অবতার হইয়া পড়িতেছি। প্রত্যেক অভিভাবকই সার্ব আশুতোষের পিতৃদেবের পথ। অহুসরণ করিলে তাঁহাদিগের বংশধরদিগের সর্ববিধ কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে।

**ম্যালেরিয়ার নূতন ঔষধ।**—ডাক্তার হেরেস্ উইলিশ নামক ব্রহ্মদেশের এক পুলিশ ডাক্তার পুরাতন উর্দু-চিকিৎসা পুস্তকগুলি হইতে এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এক প্রকার লেবু হইতে ক্যালশিয়াম নামক ধাতুর তিনপ্রকার লবণ মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর পুরাতন হইলে কুইনাইনে ফল হয়না, কিন্তু উক্ত ডাক্তার সাহেব যে সকল ম্যালেরিয়া গ্রন্থ রোগীকে তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার সকল গুলিই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

ডাক্তারের মতে কুইনাইন সেবনে রক্তকণা নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার আবিষ্কৃত এই নূতন ঔষধে উহা তো নষ্ট হই না, বরং রক্ত-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উক্ত ডাক্তার এখনও এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিবার জন্ত আমরা উৎসুক বহিলাম।

**বিবাহের বয়স।**—বিবাহের বয়ঃনির্দ্ধারণ লইয়া সংপ্রতি একটা আন্দোলন চলিতেছে। এক পক্ষ বলেন, কন্যা এবং পুত্র উভয়েই বয়স্ক হইলে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য, অপর পক্ষের মতে কন্যা-পুত্র—সকলের পক্ষেই বিবাহটা অল্প বয়সেই প্রশস্ত। ১ম পক্ষের মত লইয়াই ছাত্র-মহলে ঘোড়শী-বিবাহের হুজুগ আরম্ভ হয়। বর্তমান সময়ে সহযোগী “বেঙ্গলী”তে বালা-বিবাহ কল্যাণকর বলিয়া একটা মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক এ সকল আন্দোলন শুভজনক বলিয়া আমরা মনে করি। ত্রোতা-দ্বাপরে যে সময় স্বয়ম্বরা হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল, সে সময় অধিক বয়সে বিবাহ হইত আমরা এতাদৃশে দেখিতে পাই, কিন্তু বর্তমানযুগের প্রারম্ভ কাল হইতে বরাবরই বাঙ্গালী-সন্তান অষ্টম বর্ষে কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া গৌরী-দানের ফললাভ করিত। সে ফললাভে দেশের—দেশের—সমাজের অমঙ্গল ত হইত না। অষ্টম বা নবম বর্ষের কন্যা এবং অষ্টাদশ কি বিংশ বর্ষীয় পুরুষের বিবাহ-ক্রিয়া সে কালে সমাজে চলিত। ইহার ফলে বালক মণ্ডলী রূপখগানী হইবার স্বযোগ না পাওয়ায় এখনকার মত নানারূপ কুৎসিত ব্যাধিও তাহা-দিগের শরীরে প্রবেশ করিতনা। স্ত্রী লোকেরাও এখনকার মহিলা কুলের মত নানা

রূপ রোগে আক্রান্ত হইতেননা। কি স্ত্রী, কি পুরুষ—সকলেই তখন সংযম-ধর্ম্য পালন করিয়া নীরোগ ও দীর্ঘায়ু লাভে সক্ষম হইতেন। কাজেই বালা-বিবাহের দোষ দিব কেমন করিয়া। বালা-বিবাহের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াই শাস্ত্রকারগণ ‘গৌরীদানের’ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

**ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা।**—বঙ্গের বিখ্যাত স্বাস্থ্য-কমিশনার ডাক্তার বেণ্টনী মুর্শিবাদ জেলার জঙ্গী-পুর-রঘুনাথগঞ্জের অধিবাসীদিগকে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কতক গুলি উপায় প্রবর্তন করিয়াছেন। ঐ স্থানের ডোবা এবং নিম্নভূমি গুলি জলপূর্ণ করিয়া রাখিবার জন্ত পয়ঃ প্রণালী নির্মাণ করা হইয়াছে। গঙ্গার জল এই পয়ঃ প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ ডোবা ও নিম্নভূমি গুলি সর্বদা জল পূর্ণ করিয়া রাখিবে—এই রূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বর্ষাকাল গত হইলে আবার সমস্ত জল ঐ প্রণালীর দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে, সুতরাং এই সকল স্থান হইতে মশকের উৎপত্তি হইতে পারিবেনা। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, বর্তমান বর্ষেই ইহার ফল জানিতে পারা যাইবে। দেখা যাউক, ফল কি হয়।

**ভেজালমুক্ত।**—ব্যবসায়ীগণ স্বতে চর্কি এবং নানারূপ ভেজাল মিশ্রিত করিয়া জনসাধারণের ধর্ম্য এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া আসিতেছিল বলিয়া কলিকাতা ভাগীরথীতীরে মারওয়ারি-ব্রাহ্মণগণ কয়েকদিন অনশনে থাকিয়া যজ্ঞ কার্যের বৃহৎসংস্থান করিয়া ছিলেন। ষাটবঙ্গের মহারাজা প্রমুখ—ধর্ম্ম-প্রবণ মহাঋগণের উদ্বুদ্ধে আসন্ন টকিল,

ঠাহার। সকলকে আহ্বান করিয়া, সভা করিয়া ব্যবসায়ী দিগকে অর্থ এবং সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। বর্তমান যুগে ইহা এক অভূত পূর্ব ঘটনা। যাহা হউক সংপ্রতি বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রমুখ কয়েক জন হিন্দু-সন্তান আইনের বাধনে ইহার প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া বঙ্গেশ্বর বোনাল্ডসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর প্রধান পক্ষ দুর্গোৎসবের আর বিলম্ব নাই—ইহারই মধ্যে আইনটা বাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়—তাহার জ্ঞাত ও সাক্ষাৎকারীরা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর এ কথায় কর্ণপাত করিয়া আইনের প্রবর্তন দেশাসীবি আশা পূর্ণ করিয়াছেন।

**স্মৃতিকিৎসকের পদ-লোক।**—গত ৫ই আষাঢ় বহরমপুরের স্বনামধন্য চিকিৎসক হরচরণ সেন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ভারতের শেষ ঋষি গঙ্গাধরের শিষ্য ছিলেন। ইহার পরলোক গমনে বহরমপুর হইতে গঙ্গাধরের শিষ্য লোপ পাইল। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিদগাঁ নামক গ্রামে ১২৫১ সালের ৩রা ভাদ্র ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম ৬ অভয়চন্দ্র সেন। ১৪ বৎসর বয়সে বিক্রমপুর—ভরাকর নিবাসী ৬ বিংশেশ্বর দাশ গুপ্তের দশম বর্ষীয়া কন্যা নিত্যতারার দেবীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। এক্ষণে তাঁহার পাঁচটি পুত্র ও দুইটি কন্যা বর্তমান। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

**অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যা-লক্ষ ও ধ্বংসস্তরী।**—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে গত শ্রাবণ মাসের “ধ্বংসস্তরী” লিখিয়াছেন,—

“আজ কাল ইংরাজীভাষা সমগ্র সভ্য জগতের প্রচলিত ভাষা। ইংরেজী ভাষায় কথা বার্তা বলিতে—বুঝিতে অসমর্থ, সমগ্র সভ্য জগতে এরূপ স্থান নাই বলিলেই হয়। অতএব যদি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর ক্ষেত্রের বিস্তৃতি সাধন করিতে হয়, এবং এই চিকিৎসা-প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র প্রতিপন্ন করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজী ভাষায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ ব্যবস্থায় এই বিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীর অভাব হইবে না।” আমরা ইহার উত্তরে ধ্বংসস্তরী-সম্পাদক মহাশয়কে জানাইতেছি যে,—আমরাও এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি—সমগ্র জগতে পূর্ববৎ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে, ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দান ভিন্ন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমাদের ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্ত আমরা যথেষ্ট আয়োজনও করিতেছি, সাধারণের সহায়ত্ব পাইলে অচিরেই ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিব। ধ্বংসস্তরী-সম্পাদক যে বিদ্যালয়ের ত্রীমুখিক্রমে চিন্তা করিয়াছেন, সেজন্ত আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

**পদক ও ছাত্রস্বত্তি দান।**—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত ভবানীপুর নিবাসী এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বশাচর উকীল শ্রীযুক্ত মেহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি যোগ্য পদক ও মাসিক ছাত্র টীকা করিয়া একবৎসরের জন্ত হুজি বা স্বাক্ষর

দান করিয়াছেন । ১ম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের মধ্যে যে ছাত্র সর্বোচ্চ জ্ঞান অধিকার করিবে, তাহার জ্ঞান বৃত্তি এবং অঙ্গবিনিস্তর বা অ্যানাটমী বিভাগে উত্তীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বোধ্য পদক পুরস্কার পাইবে । এই পদক ও বৃত্তি মোহিনীবাবুর বর্গীয়া জননী বিক্রবাসিনী দেবীর স্মৃতি করে “বিক্রবাসিনী পদক” এবং “বিক্রবাসিনী বৃত্তি” নামে অভি

হিত হইবে । মোহিনী বাবু ইহা ভিন্ন মাসিক পচিশ টাকা হিসাবে এই বিভাগের উন্নতি করে সাহায্য করিয়া থাকেন । আমরা এক্ষণে যে মোহিনী বাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা বলাই বাহুল্য । দেশের দানশীল ব্যক্তিগণ মোহিনী বাবুর দানের অনুসরণ করুন—ইহাই আমরা তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি ।

## সমালোচনা ।

—\*—

ম্যালেরিয়া ।—শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এল-এম-এস প্রণীত । শ্রীকিরণচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত, মুদ্রের ১০ টাকা মাত্র । ম্যালেরিয়ার বাঙ্গালা দেশ ছাড়া খারে যাইতে বসিয়াছে । এ দুর্দিনে এরূপ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী । ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, কিরূপ ব্যবস্থায় দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার নিবৃত্তি হইতে পারে, গ্রন্থকাব সে সম্বন্ধে অনেক কথাই ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন । শুধু ম্যালেরিয়ার কথা নহে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধেও এ গ্রন্থে অনেক কথার উল্লেখ করা হইয়াছে । ছ’এক স্থল উদ্ধৃত কবিত্তেছি,—

‘আমাদের দেশে এত রোগ কেন ?  
বাদশী জয়দশীর পরই আমাদের দেশে  
যুবগীরা কেন অমাত্যার চলিয়া পড়ে ? পুরুষের  
‘বয়স না হ’তে কুড়ি আগে পাকে কেন  
কেন ? ‘ইহার কারণ কি ! স্বাস্থ্য প্রকৃতির  
দান । মাতার দান বলিয়া কখনই আমরা  
প্রকার সহিত গ্রহণ করি নাই, ধর্মভ্রষ্ট—আচার  
ভ্রষ্ট আমরা বয়ঃ পদে পদে প্রকৃতির নিয়ম

লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছি । তাঁহার নির্মল বায়ু  
রুদ্ধতার ও জানালায় আবদ্ধ করিয়াছি, সর্ব-  
শক্তি দাতা ও সর্বপাবন স্বর্ঘ্যালোক আমা-  
দের কুটীরের রুদ্ধতার দেখিয়া চলিয়া যান,  
গৃহের কলুষ গৃহেই রহিয়া যায় । বিজ্ঞানাপত্র,  
আসবাব প্রভৃতি প্রত্যহ বোদে দেওয়ার  
আবশ্যক মনে করিনা ।”

“তা’র পর জল ; জলের একটি নাম  
জীবন, আর একটি নাম নারায়ন । ইহা  
হইতেই ইহার উপকারিতা ও পবিত্রতা স্মৃতি  
হইতেছে । পুষ্করিণী হাজিরা মজিয়া উঠিতেছে,  
কেহ পক্ষোদ্ধার করেনা, পাড়ে বসিয়া  
অনেকে মলমূত্র ত্যাগ করে, বর্ষার জলে তাহা  
ধুইয়া আবার পুষ্করিণীতেই পড়ে । পান ও  
আগাছায় ভরা সেই এক পুষ্করিণী, বেখানে  
দত্তধাবন, বোতিকাখা, গাভ মার্জনা ও সর্ববিধ  
রোগের মল মুত্রাদিময় কাপড় কাচা হয়,  
অথচ তাহা স্বরঞ্জনা, এবং কবিনকালে  
তাহার পক্ষোদ্ধার হয় না ; সেই জল উত্তম  
মাত্র না করিয়া আমরা পান করি, পরিণাম,  
উদরাময়, অতিসার, জ্বরাতিসার, বিষচিকা  
এবং অজস্র লোকের মৃত্যু ।”

“জমিদারেরা গোচারণ ভূমি জমা বিলি করিয়া দিয়া ভোগ-বিলাসের আয় যথারীতি বর্দ্ধিত করিতেছেন। এদিকে গ্রামের গাভী কুল কঙ্কাল সার হইতেছে, দুধ কম দেয়, বৎসরা দুর্বল হয়, নয় অকালে মারা পড়ে। দুধের ঘোগান কম, কিন্তু চাহিদা বেশী, গয়লারা কাজেই প্রাণপণে যেখান-সেখান-কার জল মিশায়। দুধের মাখন তুলিয়া লয়। মহিষ দুধে ও গরুর দুধে মিশায়। সেই দুধ খাইয়া আমাদের ছেলেরা মায়ুষ হয়। সকলে আবার দুধের দুর্মূল্যতার জন্ত তাহাও পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারে না, ভাত হজম করিবার শক্তি না হইতে-হইতেই তাহারা ভাত ও অন্ত্রান্ত্র ছল্লাচা ড্রবাদি খাইতে শুরু করে, পরিণাম—যকুৎ রোগ, উদরাময় ও অকাল মৃত্যু।”

এই রোগ-প্রবণ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি-রই এ গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক উপকার হইবে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

আয়ুর্বেদ বিকাশ। মাসিক পত্র। শ্রীমুখ্যঃ ভূষণ সেন কাব্যতীর্থ বাচস্পতি সম্পাদিত। মূল্য ২৮ টাকা। ৫ম বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। বসন্ত-চিকিৎসার যে মুষ্টিযোগগুলি প্রকাশিত হইতেছে তদ্বারা পাঠকের উপকার হইতে পারিবে। “আয়ুর্বেদ বিষয়ক প্রস্তাব” চিত্রা প্রস্তুত। “আয়ুর্বেদ” শীর্ষক প্রবন্ধটিও মননীয় নাই। ছাপা ও কাগজ কিন্তু আর একটু ভাল হওয়া উচিত। এবারের ২ সংখ্যার কাগজ যাহা দেখিলাম, তাহাতে আকারও বৃদ্ধি করা উচিত। “অম্বিনীকুমার সংহিতা”র অসম্পূর্ণ বাক্যে যে সংখ্যা শেষ করা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়।

## পরীক্ষার ফল।

—:—:—

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিভাগয় হইতে ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে।

শ্রীমুরেল্লনাথ দাশগুপ্ত

” বিশ্বনাথ সেন গুপ্ত

” যতীন্দ্রকুমার মজুমদার

” রজনীকান্ত গুপ্ত

” মণীদাস রাজপক্ষ

” সতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত

” প্রফুল্লচন্দ্র রায়

” জ্ঞানচন্দ্র গুপ্ত

” সারদাকান্ত দাশ গুপ্ত

” ধনঞ্জয় সেন গুপ্ত

” বিমলা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

” রাজেন্দ্রচন্দ্র দাশ গুপ্ত

” যোগেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

” কিরণরায় দাশ গুপ্ত

” মোহিত কুমার সেন গুপ্ত

” ভোলানাথ রায়

” দেবনাথ মজুমদার

” বিশ্বনাথ তালুকদার

” বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

” হেমচন্দ্র চক্রবর্তী

” প্রমথনাথ দত্ত গুপ্ত

” নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

” গৌরদাস অধিকারী

” পি, এম, অভয় সিংহ

” ফণিভূষণ সেন গুপ্ত



# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

২য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৪—কার্তিক ।

২য় সংখ্যা ।

এস মা ।

—:—

এস মা জগজ্জননি,—তোমার আগমনের  
সাড়া পাইয়া আমার বঙ্গভূমি আবার মাতিয়া  
উঠিয়াছে। বর্ষব্যাপি দারিদ্র-দুঃখ আমার  
বঙ্গজননী আজি সকলি তুলিয়া গিয়া, তোমার  
দর্শন আকাজক্ষায় হর্ষ-সুখ অনুভব করিতেছে।  
তুমি আসিতেছ—এই গর্বে দিখুগুণ শারদ-  
শুভ-জ্যোৎস্না-কিরণ অঙ্গোপরি তুলিয়া লইয়া  
সেই কিরণ রাশি যেন সমগ্র বঙ্গদেশ থানিতে  
ছড়াইয়া দিয়াছে। দিখুগুণের এবোধি গর্বে  
দর্শনে রাগালস-লোচনে রক্তজবা ফুটিয়া  
উঠিয়াছে। রক্তজবার দেখা দেখি জর্ঘাতরে  
পদ্মগুচ্ছও তোমার ত্রীপদযুগলে লুটাইয়া  
রক্তকটার্ণ হইবার জন্ত প্রাণভরা হাসির  
উৎস ঢালিয়া দিয়াছে। এস মা, বাকালীর  
শোকোত্তপ্ত প্রাণের ভিতরও আজি বড়  
আনন্দের দিন। বাকালীর মা—বাকালীর  
পূজা লইতে আসিতেছেন, বাকালীর এ আন-  
ন্দের বৃষ্টি আর তুলনা নাই।

‘মা’কে দেখিলে সকলের

ফুটিয়া উঠে। সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকল  
অশান্তির কাহিনী ‘মা’র নিকট বলিয়া যে  
কত সুখ—কত তৃপ্তি, তাহা মাতৃবৎসল-সন্তান  
ভিন্ন আর তো কাহারও বৃষ্টিবার শক্তি নাই।  
নৈরাশ্রের ঘোরঘনাক্রকার যখন হৃদয় আকাশ  
আচ্ছন্ন করিয়া তুলে, দৈত্য-দুঃখের দীন  
চাহনিটির ভিতর শুক ক্রকৃটির ভঙ্গিমাটুকু  
যখন বিছাৎ-প্রভার মত নিমেষ কালের জন্ত  
নেত্রপথে পতিত হয়, রোগে-শোকে-জীর্ণতায়  
হইয়া, জাগতিক সকল আশার জলাঞ্জলি দিয়া,  
নিষ্ফলকাম-মানব যখন সংসারের অসারতা  
সর্বপ্রকারে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখন  
প্রাণের আবেগে আকুল হইয়া মর্ষগ্রস্থির  
ভিতর হইতে ক্রীণ কর্তে ‘মা’ ‘মা’ বুলি উচ্চা-  
রণ করিয়া থাকে। তোমার অক্লান্ত সন্ধান  
আমাদেরও তো মা এখন সেই অবস্থা। সেই  
অবস্থার পতিত হইয়াছি কবিরায়ী কালি  
আমাদের কাতর কণ্ঠ হইতে স্রবিত হইতে

—এস মা।

সেই অবস্থার পতিত হই নাই তো কি ?

অবস্থার দীনতার আমাদের বাকী তো আর কিছুই নাই মা ! ম্যালেরিয়া-রাফনী বা জ্বালার পল্লীগুণের সকল টুকু গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জ্বালার অনেকে পল্লী-মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে মা, কিন্তু পল্লী ছাড়িয়াও স্থখ নাই,—সহরে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং যক্ষ্মারোগীর হিসাব প্রতি নিয়তই বর্দ্ধিত। ফলে সেকালের মত তোমার সন্তানগণের আর সে বলবীৰ্য্য নাই, সে কাস্তি-বৃদ্ধি নাই, সে প্রভা-প্রতিভা নাই,—নানারূপ আধিব্যাধি-পরিপূর্ণ দেহে প্রতি পলে তাহাদের আয়ু ক্ষয় হইতেছে। ধর্ম তো দেশ হইতে লোপই পাই-রাছে, সমাজের নিয়মও এখন কেহ আর মানিতে চাহেনা। পুরুষ স্বেচ্ছাচারী,—রমণী কর্তব্যচ্যুতা,—বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ বালক মণ্ডলীর কর্তব্য-পথ প্রদর্শনে অক্ষম, যুবকগণ স্বাধীন পন্থা চিনিয়া কাহারও অহুজা পাইবার অপেক্ষা রাখে না। ফলে কি করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়—তাহা বুদ্ধগণও চিন্তা করেন না, বালকগণও শিখিতে চাহে না, যুবক-যুবতীগণ ও সে সংঘম হারাইয়া আত্মোন্নতির পথ রুদ্ধ করিতেছেন। ধর্ম বল, অর্থ বল, কামনা বল, মোক্ষ বল,—স্বাস্থ্যই তো মা সকল সুখের মূল। সে স্বাস্থ্য-সুখই যখন তোমার সন্তান-দের নাই মা, তখন তাহাদের আর অধঃপতনের বাকী কি ! তাই তোমায় এই হৃদ্বিনে তোমার এই বাঙ্গালী সন্তানের জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে তোমার অমোঘ আলীকর্ষণে ক্রীণ-সেহে সঞ্জীবনী-শক্তি আনিবার উদ্দেশ্যে ডাকিতেছি—এস মা !

অধঃপতনটা কি কম হইয়াছে মা !

ধর্মবিগলিতপ্রাণ-আর্য্য-অবিমণ্ডলী আমাদের

ভবিষ্যৎ শুভেচ্ছা পরবশ হইয়া রাশি রাশি গ্রাহ্যে যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দৈহিক উন্নতি বা স্বাস্থ্য রক্ষাই তো সে সকল গ্রাহ্যে মূলীভূত বিষয়। সমাজ-বন্ধনের জন্ত, স্বদেশ রক্ষার জন্ত তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফল প্রসূত যে পুস্তকাবলী,—তাহারও তো উদ্দেশ্য মা এই স্বাস্থ্যরক্ষা। তিথি-বিশেষে দ্রব্য-বিশেষের নিষিদ্ধ-ভক্ষণের ব্যবস্থায় যে স্বাস্থ্য-রক্ষার কল্যাণকর বিধিটুকু অলক্ষিতভাবে লঙ্ঘনিত রহিয়াছে, তাহা অনুসন্ধিৎসু-ব্যক্তিগণ ভিন্ন কেহ তো মা বুঝিতে পারিবেননা। সম্প্রদায় বিশেষের লোলুপ-লালসায় তৃপ্তিপ্রদ হইলেও নিষ্ঠাবান আর্য্য-সন্তানের পক্ষে এই জন্তই অনেক দ্রব্য আহারই নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রবিধি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-শূদ্র,—তদ-ইত্যন্তের শ্রেণী-বিশ্রাসে এই জন্তই আর্য্য জাতির সমাজ ভিত্তি গঠিত। সে ভিত্তি-গঠনে গঠন-কর্তার কৃতিত্বের পারদর্শীতা পূর্ণ ভাবে ছিল বলিয়াই সমাজস্থ আচার ভট্ট ব্যক্তিগণের সকল ব্রহ্মবাৎসল্য করিয়াও অত্যাধি ইহা বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই, নতুবা অনেক কাল পূর্বেই ইহার অস্তিত্বের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যাইত।

বাক্য,—এক কথায় তোমার সন্তানগণের অবস্থা বড়ই ভীষণ হইয়াছে মা ! স্বধর্ম হারাইয়া অধুনা আমরা সমাজমধ্যে একাকারের শ্রোত পূর্ণভাবে প্রবাহিত করিয়াছি। সে শিক্ষালাভের প্রযুক্তিও আমাদের নাই, সে দীক্ষা-দানের যোগ্য ব্যক্তিরও সমাজমধ্যে অভাব হইয়াছে। সে সামর্থ্য ও আমাদের ঘুচিয়া গিয়াছে, সে সামর্থ্য আনয়নের চেষ্টাও আমাদের লুপ্ত হইয়াছে। ফলে অধঃপতনটা ক্রমেই যে ভীষণ হইতে

মা! তুমি বর্ষে বর্ষে যেমন আসিয়া থাক,—  
এবাবও তো তেমন করিয়া আসিতেছ মা!  
তুমিই আমাদের বলদাও, বুদ্ধি দাও, আমাদের  
অজ্ঞান-তমঃ অপনয়ন করিয়া আমাদের  
বাস্তবান্ ও দীর্ঘজীবী হইবার জন্ত একটা অদমা  
পৃষ্ঠা আবার আমাদের হৃদয় মধ্যে জাগরিত  
করিয়া তুল মা। অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত

করিয়া লোক-হিতবৎসল-ঋষি-প্রদর্শিত শাস্ত্ররূপ  
সরণী অবেষণে আবার যেন আমরা অবহিত  
চিত্ত হই, ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ—ত্রিলোকের সৃষ্টি-  
স্থিতি পালনকর্তা—জননী আমার,—তোমার  
চরণে ইহা ভিন্ন এই দুদ্দিনে আর আমাদের  
অন্ত প্রার্থনা নাই।

## শরতে—শারদা ।

( ১ )

নিবাণ-কাতব প্রাণে চেয়ে শুধু উর্দ্ধ পানে,  
কতদিন আছি যে গো! ছঃপ জালা স'রে  
একে একে “শুভক্ষণ” গেল কত ব'য়ে!  
গম্মী সবস্বতী গুহ গজ্ঞাননে ন'য়ে—  
অসময়ে, আজ কেন এলি মা! অভয়ে?  
রূপেব ভাগুরী ঘা'র—সন্তান—ভিখারী তা'র  
বিধ—এ ভীষণ দৃষ্ট—দেখে সবিস্ময়ে!  
তাই কি এলি মা! আজ ‘দশভূজা’ হ'য়ে?

( ২ )

এ দীন-দবিত্র-দেশে—আরো কতবার এসে—  
দেখে গেছ তনয়ের বোর অমঙ্গল,  
তোমার চরণ পূজে, কে পেয়েছে ফল?  
কা'রে বা স্মৃতি দিলে, কা'রে দিলে বল?  
কোন ভাগবান্—পেলে আশার সম্বল?  
সেই মুঃ অশপাত, সেই বিয় বজ্রাবাত,  
সেই হিংসা লোভে পাপে ম্লান মহীতল!  
গাছেতে ফলেনা ফল—সেবে নাই জল!

( ৩ )

তাই—মাবে বৃকে ছুরি, বন্ধ করে নারী চুরী  
বিধবা—করেনা ব্রহ্মচর্যের পালন,

নিত্য নিত্য আত্মহত্যা অকাল মরণ।

অন্নকষ্ট—চিরস্থায়ী—হৃর্ভিক্ষ-তাড়ন—

সৃষ্ট ছাড়া সৃষ্টি—এ কি তোমারি সৃজন?

কোথা তোর পুত্র সব? এরা তো নির্জীব-শব

কা'র গৃহে পূজা খেতে কর আগমন?

ধনী, দীন—সবাই ত বিলাসে মগন!

( ৪ )

তোর এ সাধের ধরা—দারুণ অশান্তি ভরা,

মরীচির অভিশপ্ত মরুভূমি প্রায়!

বল্মা! দাঁড়াবিকোথা? বসিবি কোথায়?

ডেকে এনে, পথ থেকে কিরাব কি হায়!

মাটির আসনে—বাথা বাজিবে যে পায়!

চিত্ত-বহ্নি জলে বৃকে, ‘দেহি দেহি’ শব্দ মুখে,

মৃত্যু-ছায়া অন্ধকারে ব'সে আছি ঠায়!

তা'র মাঝে, মা তোমারে বসানো কি যায়?

( ৫ )

“রাস্তা রাজধরী” বেশে—

কেন দেখা দিলি এসে?

‘মা’ বলে ডাকিতে যে মা! বড় ক্ষয় করে,

হাতে ধ'রে আনিতে কি পারি ভাঙা ঘরে?

মাতা-পুত্র—কান্দা কাঁদি কতদিন পরে—

বল্মা ! একটা কথা—সুধাই কাতরে —  
 অমৃতানে পরিপূর্ণা—মা ঘাঁদের “অন্নপূর্ণা”—  
 কোন্ মহাপাপে তা’রা অন্নভাবে মরে ?  
 বস্নাভাবে—কেন তা’রা ছিন্ন-বাস পরে ?  
 ( ৬ )

ছি ছি মা ! হৃদয় তোর

কি পাষণ ! কি কঠোর !  
 কত্না অন্তরীপ হ’তে হিমাদ্রি শিখর—  
 ঘরে ঘরে মহামারী ম্যালেরিয়া জর !  
 মরণে আহ্বান করে কোটি নারী-নর,  
 এরাই কি—হা জননি—আর্য্য বংশধর ?  
 বিধাতার বজ্র বোম্বে,

মুষ্টি ভিক্ষা, গোষ্ঠী পোষে—  
 শোণিতে শোণিমা নাট, শুক ওষ্ঠাধর !  
 রোগে অস্থি চর্ম্মসার—কন্ম-কলেবর !  
 ( ৭ )

কি দিয়ে গো দশভুজা ! করিব ও পদ পূজা ?  
 দেবতার যোগ্য আছে কি উপকরণ ?  
 পুষ্পে কীট, গন্ধে স্ত্রীট, দূষিত পবন,  
 ভুজঙ্গের সহবাসে, বিবাক্ত চন্দন,  
 শশাঙ্কের অঙ্গে মাখা রাহুর বমন ;  
 নিজ হস্তে বস্ত্র বোনা—ভুলে গেছি ত্রিনয়ন !  
 তীক্ষ্ণ কাঁটা বিষদলে, কে করে চয়ন ?  
 গঙ্গাজলে “সেপ্টিক্টিয়াং” ব্যাধি-নিকেতন !  
 ( ৮ )

হুগ্ধে সে মাধুরী নাই, স্নেহে ঘৃণ্য-চর্কি পাই,  
 গোহাড়ে শর্করা-শুল—উজ্জ্বল প্রভায় !  
 রবিকরে কৃষি-জাত জলে পুড়ে যায় !

ধনরত্ন সবই গেছে—বিলাসের দার !  
 জননী কি উপচারে তুবিব তোমাং ?  
 দেহ ? সে ত রোগে ক্ষীণ, হৃদয় কলুষে লীন,  
 মন ?—সেও অপবিত্র—স্বার্থের চিত্তাশ্রম ;  
 ভক্তি—কুকার্য্যের প্রতি, আসক্তি নেশার  
 ( ৯ )

যুগান্তের চিন্তা রাজি, একত্র করিয়া আজি,  
 চিনেছি তোমাং ওমা ! এতক্ষণ পবে,  
 তুমিই বে “আয়ুর্বেদ” বিশ্ব চরাচরে !  
 অষ্টাদশ কোটি ব্যাধি বিনাশের তরে—  
 দশ হাতে “দশমূল” ধ’রেছ সাদরে ।  
 কাম-ক্রোধ শন্ত-বলে—দলিয়া চরণ-তলে—  
 রোগক্রপী অস্ত্রবের স্বক্কের উপবে,  
 “স্বাস্থ্য”রূপে “মহাশক্তি” আনন্দে বিহরে !  
 ( ১০ )

এতদিন—মোহ বোরে—

চাহিয়া দেখিনি তোবে,  
 সকল সংশয় মাগো ! ঘুটিল এখন—  
 তুমি “আয়ুর্বেদ” নিত্য সত্য-সনাতন !  
 “যুক্তি” “দৈব” ব্যাপাশ্রয় বন্ধে ছুটি স্তন,  
 “বায়ু পিত্ত কফ” তিন, তোরই ত্রিনয়ন !  
 অষ্ট-অঙ্গ পূর্ণ করি—এসো তুমি হে শঙ্করি !  
 “বৈদিক” “তান্ত্রিক” তোর দু’খানি চরণ,  
 বিপন্ন-জগৎ-শিরে করুক ধারণ ।

শ্রী ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ,  
 কাব্যকণ্ঠ বিশারদ ।

## কাজের কথা ।

স্রীসমাজে স্বাস্থ্য-হানি।—

অধুনা নানা কারণে দেশের পুরুষ মণ্ডলীর মত-বাস্তালীর মণীগণেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটতেছে। অন্ন এবং অজীর্ণ রোগে বাঙ্গালী পুরুষ দিগের মত অনেক মহিলাই ভুগিতেছেন। ইহা ভিন্ন ‘হিষ্টিরিয়া’ বা মূর্ছা রোগটি অনেকের তো ভীষন ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। ‘ফ্লেব ঘায়ে মূর্ছা বাওয়া’র কথা এখন আর কাব্য পুস্তকে পড়িয়া অনুমান করিবার দরকাব হয়না,—আমাদের মহিলা সমাজে লক্ষ্য করিলেই উহার বাথার্থ্য প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। একটু সামান্য অভিমান হইলেই,—একটু সামান্য দুঃখ পাইলেই,—একটু সামান্য কথাস্তব হইলেই—এখন আমাদের মেয়েরা ‘মূর্ছা’ গিয়া থাকেন। শারীরিক সামর্থ্য এবং মানসিক দৃঢ়তার অভাবই ইহার মূল প্রধান কারণ। সেকালে স্রীসমাজে এই দুইটি বিষয়েরই অভাব ছিলনা। ভোরে উঠিয়া ছড়া কাঁট দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, রন্ধন-পরিবেশন প্রভৃতি সাংসারিক সকল কার্যই সেকালে আমরা স্রীজাতির উপর নির্ভর করিতাম,—ইহাতে তাঁহাদিগের গৃহস্থলীর সহিত ব্যায়ামকাৰ্য্যও সিদ্ধ হইয়া যাইত। অবকাশ-কালে বৃদ্ধ মহিলা দিগের নিকট বসিয়া গুণিতার বামায়াণ-মহাভারত পাঠ করিতেন, কখন বা ঠানদিদির নিকট উপকথা বা গল্প শুনিতেন। মনোবৃত্তির দাঢ়্য সেই বামায়াণ-মহাভারত পাঠ বা গল্প শ্রবণে সিদ্ধ হইত। আদর্শ বৈরাগ্য, অম্লকরণও সেইরূপ হইত। এখন ছড়া কাঁট দেওয়া, থালা বাসন পরিষ্কার

করা, রন্ধন-পরিবেশন করা—এ সকল তো অনেক সংসাধ হইতে উঠিয়াই গিয়াছে, বাধুনি-চাকরাণীতে অনেক সংসারে এখন সে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে! নূতন নূতন নাটক-নভেল এখন বামায়াণ-মহাভারতের স্থল অধিকার করিয়াছে। ঠাকুমার নিকট গল্প শোনা—সে প্রথা তো দেশ হইতে একেবারেই বিলুপ্ত। সে ঠাকুমাও এখন নাট, সে গল্প শুনিবার জন্ত যুবতীগণেরও ইচ্ছা নাই। ফলে শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতার অভাবে অধুনা আমাদের রমণী-সমাজের যেরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

\* \* \*

ভবিষ্যৎ চিন্তা।—আমাদের

স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর দিগের স্বাস্থ্য যে উন্নত হইতে পারিবে, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সহিত মতবৈধ ঘটিবার কারণ নাই। বীজ বৈরাগ্য, চারাও সেইরূপ হইবে,—ইহা তো চলতি কথা। অস্বাস্থ্যকর পিতামাতার শুক্র-শোণিত মিশিত হইয়া কখন ‘ভীম অর্জুনের’ মত সম্ভান উৎপন্ন করিতে পারেনা। প্রত্যেক পিতার—প্রত্যেক মাতার ইহার অন্ত ও স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী হইতে চেষ্টা করা কর্তব্য। পিতার রক্তছটি এবং পারদ-বিকৃতির ফলভোগ—সন্তানকে যে করিতে হয়, ইহা তো সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই জন্তই আমাদের সবার চার ও স্বাস্থ্য-পরিচর্যা হইবার জন্ত আমাদের শাস্ত্রকারগণ রাশি রাশি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেকালে আমাদের গৃহস্থলীর সকল

কার্য যেরূপ ভাবে নির্ধারিত হইত, তাহার সহিত সে উপদেশের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। আমাদের করণীয় সকল বিষয়েই স্কুলশেলে শাস্ত্র বা শাসন-প্রণালী বিজড়িত। আমরা সে সকল এখন ভুলিয়া গিয়াছি এবং তাহাবই ফলে সে আমাদের স্বাস্থ্যের দুর্গতি ঘটাইয়াছে—একথা গ্রহণ্য সত্য।

\* \* \*

### আমাদের কর্তব্য।—স্বাস্থ্য-

রক্ষার জন্ত আমাদের সদাচার পালন যেরূপ কর্তব্য, বংশধরদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত ও আমাদের সেইরূপ সর্বত্র-পব্যয়ন চণ্ডা উচিত। তাহাবা তো যেরূপ দেখিবে, সেই-রূপই শিখিবে। কিন্তু সেই শিক্ষার সহিত তাহাদের যে জীবন-মরণের সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে। এখানে একটা গণ্যেব উল্লেখ করিলে অগ্রাসঙ্গিক হইবেনা। কতকগুলি মুনিকুমার এক পিটপিত্ত কুলায়ে দুইটা পক্ষী-শাবকদেখিয়া একটিকে কুটীরে লইয়া গেলেন। ঐ শাবকটী ঋষিকুমারদিগের ব্যবহাব-দর্শনে ঋষি-স্বভাব প্রাপ্ত হইল। অতিথি অভ্যাগত কুটীরে আগমন করিলে পক্ষী—ঋষিদিগের মত মিষ্ট বচনে অভ্যর্থনা কবিতো শিখিল। মুনিকুমারগণ তদর্শনে চিন্তা করিলেন,—কুলায় মধ্যে যে আর একটা পক্ষী আছে, তাহাকেও লইয়া আসা যাউক। ফলে তাহাবা কুলায় মধ্যে পক্ষীটি না পাইয়া পথিমধ্যে আসিতে আসিতে এক চর্ম্মকার-গৃহের নিকটবর্তী হইবা-  
মাত্র শুনিতে পাইলেন, কে তাহাদের উদ্দেশে গালি-বর্ষণ করিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, একটি শুকপক্ষী। তাহাব পর কুটীরে ফিরিয়া গিয়া নিজদের পালিত শুকপক্ষীর নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাস্য হইলে, পক্ষী বলিল,—

“মাতাপোকঃ পিতাপোকো মম তন্তু চ পক্ষিণঃ।  
অহং মুনিভিরানীতঃ সচানীতো গবাসনৈঃ।

অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি  
গবাসনানাং বচনং শৃণোতি সঃ,  
ন তন্তু দোষোঃ ন চ মে গুণো বা  
সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি ॥”

অর্থঃ—“আমাদের পিতা এবং মাতা একই, কিন্তু আমি মুনিদিগের দ্বাৰা আনীত এবং সে চর্ম্মকাবের দ্বারা নীত। আমি মুনিদিগের বাক্য শিক্ষা কবিয়াছি, আব সে চর্ম্মকাবদিগের বাক্য শিখিয়াছে। অতএব তাহাবও কোন দোষ নাই, আমারও কোন গুণ নাই, সংসর্গই এই দোষ এবং গুণের কারণ-ভূত।”

আমাদের সংসর্গে আমাদের বংশধরগণ যাহাতে মুনিবৃত্তি প্রাপ্ত হইতে পাবে, তাহা কি আমাদের করা কর্তব্য নহে। সেই মুনিবৃত্তিলাভ করিলেই তো তাহাই তাহাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষাব কারণ জন্মাইতে পারিবে।

\* \* \*

### সংযম শিক্ষা।—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত

আমাদের চেষ্টা করিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদিগকে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। সংযম শিক্ষা কবিতো পারিলেই মনোবৃত্তির আবির্ভাব আমাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে। সাংখ্য বল, পাতঞ্জল বল, বৈশেষিক দর্শনের কথাই উত্থাপন কর—এই সংযম শিক্ষা-দানই তো দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। দর্শনশাস্ত্র যোগ কি বুঝাইতে গিয়া প্রথমেই তো বলিয়াছেন,—“যোগশ্চিন্তাবৃত্তিনিরোধঃ”—অর্থঃ “চিন্তেব বৃত্তির নিরোধ করার নামই যোগ।” এই একটি মাত্র উপদেশ যদি আমরা মানিয়া চলি,—তাহা হইলে আর

মোম বিষয়েরই বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকেনা, তৎকালে কথার গুরুত্বের মত মানিতে পাবিলে তাহাবই ফলে আমাদের দেশবন্ধা,— দেশবন্ধা, — স্বাস্থ্যবন্ধা—সকলই রক্ষা হইতে পাবিবে ।

\* \* \*

**প্রশাসকের অভাব ।**—আমরা প্রথম ভুলিয়াছি, সদাচারব্রত হইয়া অপকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি । আমাদের কুদৃষ্টান্তে আমাদের বংশবধন কুপথগামী হইতেছে । ফলে বহুচক্ষু বলিয়া দেশে যে সর্ববোধেব হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিবার একটা উৎকৃষ্ট বিষয় ছিল, তাহার নাম দেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে । চৌদ্দ-পনের বৎসরের বালকদিগের মধ্যে একে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহাদের গণ্ডনে ব্রণ সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, চক্ষুগণের নিম্নভাগে—কালিমা-বেখা দেখা দিয়াছে । এই অবস্থা হইলেই বালজীবনের প্রথম ভ্রম আরম্ভ হইয়াছে, সুস্পষ্ট বুদ্ধিতে পরিণত হয় । পিতামাতার এদিকে লক্ষ্য নাই,—বিষয়বস্তুর জ্ঞান ভাঙনা কবিলেই তাহাদিগের কর্তব্য পালিত হইল বলিয়া তাহারা মনে করেন । ফলে এমনই করিয়া বাঙ্গালী জাতিব অন্তিম ক্রমে লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ।

\* \* \*

**বংশরক্ষার চিন্তা ।**—বালকবৃন্দকে এই ব্রহ্মচর্য্যার পদাঙ্কান হইতে রক্ষা করিবার জ্ঞান আমাদের উপায়-

চিন্তন কর্তব্য । বালকবৃন্দকে বক্ষা কবিত পাবিলে তবে বাঙ্গালীর বংশরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে । “শৈশব-যৌবন দুই মিলি গেল”—বালকদিগের যখন এই অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তাহাদিগের কুসুম-কোমল-প্রাণে কাল-কৌট দংশনের সূচনা আরম্ভ হয় । এই সময়ই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত কাল । এ সময় যদি উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সারাজীবন চেষ্টা কবিয়াও আব তাহাদিগকে বক্ষা করিতে পারা যায়না । কিশোর কাল অতিক্রম কবিয়া যৌবনের সমস্ত বৃত্তি ক্ষয়িত হইলে, তখন তো নাটকীয় নাটিকা লাভের ইচ্ছা তাহাদিগের যে বলবতী হইবে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধকথা । সে অবস্থা উপস্থিত হইলে, তখন আব গুণের রোগ সারাইবাব চেষ্টা না কবিল বিবাহ দিলে কতকটা সুফল ফলিতে পাবে । কিন্তু যুগ ধরা বাঁশের সহন-ক্ষমতা বেরূপ অল্প, কীটদষ্ট-যুবকমণ্ডলীর অবস্থাও তদ্রূপ । সেই জন্ত ছেলে বিগড়াইতেছে জানিবা মাত্র পিতা মাতা যদি তাহাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন, সেই সময় হইতে কাছে কাছে রাখিয়া বাহাতে তাহারা ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় না ঘটাইতে পারে, সর্ব কর্ম্ম ফেলিয়া তাহার জ্ঞান চেষ্টাশীল হইতে পারেন, তাহা হইলে বালক রক্ষা—তথা বংশ-রক্ষার ব্যবস্থা সুগম হইতে পারে । দেশের বালকবৃন্দের পিতা-মাতাগণ এ সকল কথা চিন্তা করিবেন কি !

## চিকিৎসা-তত্ত্ব ।

( ভূমিকা অংশ )

বাড়ীর কোন ব্যক্তি পীড়াক্রান্ত হইলে রোগীর আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়েন। হয়ত একমাত্র উপার্জন-ক্ষম কর্তা, কি লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণী, মেহেব সহোদর, প্রাণাধিক পুত্রকন্যা যে কেহই হউক না,—রোগযন্ত্রণার কাতব হইলে বাড়ীর সকলেবই বিচলিত হইবার কথা। ইহার ফলে অনেক সময় চিকিৎসা-বিদ্রাট ঘটয়া পীড়িতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি ও বুণা অর্থব্যয় হইয়া থাকে; এমন কি অনেক সময় রোগীর জীবন-সংশয়ও হইয়া পড়ে। সুতরাং যাচাতে চিকিৎসা-বিদ্রাট না ঘটে, তাহার জন্ত পূর্ক হইতে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

কলিকাতার শ্রায় চিকিৎসক-বহুল-নগ-রীতে এইরূপ চিকিৎসা বিদ্রাট-ফলে যে বিষময় ফল আমার শ্রুতি গোচর হইয়াছিল, তাহা আমার মানস-পটে চিরান্বিত রহিয়াছে। ঘটনাট,—কলিকাতাব কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র পুত্র বিমূঢ়িকা বোগে আক্রান্ত হন; রোগ প্রকাশ হইবা মাত্র বালকের পিতা, অতিমাত্র কাতব হইয়া তাঁহাব পারিবারিক চিকিৎসকের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, এদিকে তাঁহার বাড়ী অপেক্ষাকৃত দূর বলিয়া নিকটস্থ অপর একজন চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। নবাগত চিকিৎসক রোগ-পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন, ঔষধ আনা হইল, কিন্তু উহা সেবন করাইবার পূর্বেই তাঁহার পারিবারিক ডাক্তার আসিলেন, তিনি ব্যাধি-পরীক্ষা

করিয়া পূর্কপ্রদত্ত ঔষধেব পবিবর্তন আবশ্যক বোধে নূতন ব্যবস্থা করিলেন। পুনবাণ ঔষধ আনাইবার ব্যবস্থা হইল। এদিকে রোগীর পিতা ডাক্তার বাবু নিকট পীড়ার জটিলতাব বিষয় অবগত হইয়া, অপর একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার আনাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। পারিবারিক চিকিৎসকের ব্যবস্থামত ঔষধ সেবনেব পূর্ক পুনরীার নূতন ডাক্তার ও নূতন ব্যবস্থায় বোগীর ঔষধ সেবনেব বিষ উপস্থিত হইল।

বোগীর মাতামহও কলিকাতাব অপর একজন ধনবান ব্যক্তি। তিনি দৌহিত্রেব কঠিন পীড়ার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার বিষাদী একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তৃতীয় বারের অনীত ঔষধ ব্যবহার না করাইয়া কোন্ মতে চিকিৎসা চলিবে পরামর্শ করিতে কিয়ৎক্ষণ অগীত হইল। এইরূপে চাষিজন চিকিৎসক আসিলেন, অজ্ঞপ্র টাকা ব্যয় হইল, অথচ অচিকিৎসায় রোগ উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া যখন রোগীর অবস্থা নিতান্তই শঙ্কা জনক হইল, তখন যৎকিঞ্চিৎ হোমিওপ্যাথী ঔষধ রোগীর ভোগে আসিল। রোগীর উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বাবু সেখানে অবস্থান করা সমিচীন বোধ করিলেননা। তিনি করেক মাত্রা ঔষধ ও সেবনের নিয়মাদি বলিয়া দিয়া যেমন থাকে—সংবাদ দিবার জন্ত উপদেশ দিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন; কিয়ৎক্ষণ পরেই ক্রন্দনের শোল উঠিল।



এই ঘটনায় বাহিরের লোকে হুঃখ প্রকাশ করিয়াছে,—“যা'র আয়ু নাই তা'কে কে বাঁচাবে বল। এত ডাক্তার এল, পরসাতাই কি কম খরচ হ'ল, চিকিৎসার জন্য কিছুই হয়নি, দিন ফুরাইয়াছে, চলে গেল” ইত্যাদি। সত্য,—ডাক্তার বা ব্যবস্থা-পত্রের জন্য কিছু না থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের কাতরতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় পিতামাতার বৃদ্ধি দোষে এক প্রকার বিনা প্রয়োগেই বালকেব মৃত্যু হইল। ইহা অপেক্ষা মর্শ্মাতিক ঘটনা আর কি হইতে পারে? অনেক সময় মেহ, উপদংশ প্রভৃতি লক্ষ্যাকর কুণ্ডলিত পীড়াক্রান্ত হইয়া অনেকে আত্মীয়-স্বজনের নিকট গোপন কবিত্তে গিয়া চিকিৎসা-বিদ্যাটো নিজে চিরদিন জীবন হইয়া থাকেন, এবং ভবিষ্যৎ সন্তানাদিরও জীবন হারিসহ এবং বিসময় করিয়া বাথেন।

এই সমুদয় বিপত্তি হইতে উদ্ধারের উপায় পূর্বে হইতে সাধাবশ্যকে বুঝাইয়া দেওয়া চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। যখন প্রিয় পরিজন রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বাড়ীর সকলকেই কাতর করিয়াছেন,—মানবের সেই সর্বাপেক্ষা বিপত্তির কালে ও সকল তত্ত্ব অবগতি থাকিলে সৰ্ব্বদুঃখ ও অচিকিৎসকের উপদেশ পাইবেন।

ব্যাধি প্রতিকারের সময়।—চরকাদি আয়ুর্বেদ তত্ত্ব ঋষি প্রণীত। প্রাচীন ঋষিগণ নির্ভেদ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপ্রিয় ও পরোপকার-পরায়ণ ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের বাক্যে কোন প্রকার স্বার্থপরতার বিষয় নিহিত আছে, ইহা কাহারও মনে উদয় হওয়া সম্ভবপর

আয়ুর্বেদ—২

নহে। আমার এ প্রবন্ধ তাঁহাদেরই আদর্শ উপদেশের মর্ম্ম লইয়া লিখিত।

চরকসংহিতায় একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে,—বৃদ্ধিমান ব্যক্তি বাহ্য অথবা অভ্যন্তরস্থ রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার প্রতিকারে যত্নশীল হইবেন। নির্দোষ ব্যক্তিরাই অজ্ঞানতা অথবা অনবধানতা বশতঃ রোগের প্রথমোৎপত্তিকালে তাহাকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারেনা। ব্যাধি সমূহ প্রথমে অল্পভাবে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও জাতমূল হইয়া নির্দোষ ব্যক্তির বল ও আয়ুনাশ করে। মূঢ় ব্যক্তিগণ অতি-পীড়িত না হইলে তাহার প্রতিকারে যত্নশীল হয়না, আর অতি পীড়িত হইলে তখন ব্যাধি নিগ্রহে যত্নশীল হইয়া,—

“অথ পুত্রাংশ্চ দারাদংশ্চ জাতীশ্চাহু ভাষতে সর্বস্বেনাপি মে কশ্চিদ্ ভিন্নগানীযতামিতি ॥”

অর্থাৎ পুত্র, পরিবার, আত্মীয়বর্গকে ডাকিয়া বলে,—“আমার সর্বস্ব দিনও কোন একজন চিকিৎসক আনিয়া দাও।” কিন্তু ঐ প্রকার ব্যাধি-পীড়িত, দুর্বল, ক্লান্ত, ক্ষীণেন্দ্রিয়, ক্রান্তচিত্ত-মুগ্ধকে কোন্ চিকিৎসক রোগ মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন! এই কারণে জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী মহর্ষিগণ। বলিয়াছেন—

তন্মাৎ প্রাগেব রোগেভ্যো রোগেষু তরুণেষু বা ভেষজৈঃ প্রতিকুরীত য ইচ্ছেৎ সুখমায়নঃ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার সুখ অর্থাৎ স্বাস্থ্য লাভে ইচ্ছুক, তিনি রোগের পূর্নাবস্থায় অথবা তরুণাবস্থায় ঔষধের সাহায্যে প্রতিকার-পরায়ণ হইবেন।

তরুণাবস্থায় চিকিৎসিত হইলে যে সহজে আরোগ্যলাভ ঘটয়া থাকে তাহা নহে, তরুণাবস্থায়

অন্নতা এবং অথের শাস্ত্রণও ইহার ফলে হইয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি—ব্যাধি অন্ন হইলেও অবহেলা না করিয়া সরব প্রতিকারে যত্নশীল হইবেন।

**ঔষধ।**—যে সমুদয় ঔষধ আমাদের উপস্থিত ব্যাধি নষ্ট করিতে পারে, অথচ ভবিষ্যৎ ব্যাধির কারণ হয় না, সেই ঔষধই আমাদের হিতকর।

বয়স, প্রকৃতি, ঋতু, দেশ, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি ভেদে আমাদের বৈকল্প্য অন্ন-বস্তাদির পার্থক্য রক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে, ঔষধ সম্বন্ধেও সেই প্রকার পার্থক্য-রক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে। এইজন্তই শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, যুবক ভেদে, শীতোষ্ণাদি কালভেদে, আঙ্গ-শুদ্ধাদি দেশভেদে, ঔষধেব পৃথক পৃথক প্রয়োগ-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এদেশবাসীর সম্পূর্ণ অল্পযোগী নীত প্রধান দেশীয় ঔষধ সকল বিনা বিচারে সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এই জাতীয় ঔষধ কোন কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত কার্য্যকরী হইলেও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের উপযোগী কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা সকলেরই কর্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল-বায়ু প্রভৃতি হইতে ঋতুাদির গুণান্তর হইয়া মানবের বল, বর্ণ, আকৃতি, প্রকৃতির কত তারতম্য হইয়া থাকে, ইহা আমরা সর্বদা দেখিবার সুযোগ পাই। এক ভারতবর্ষের মধ্যেই জল-বায়ুর বিভিন্নতা বশতঃ বহু বিভিন্ন প্রকৃতি, বল, বর্ণাদি যুক্ত মানব দেখিতে পাওয়া যায়।

পাথ হইতে যখন এইপ্রকার বিচিত্র পার্থক্য সম্পাদিত হয়, তখন শক্তিশালী ঔষধ হইতে যে আরও অধিক পরিমাণে ভিন্ন

ফল ফলিবার সম্ভাবনা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই ফল বিভিন্নতা জন্তই আয়ুর্বেদের ঔষধগুলি ভাবতের সর্বত্র সমান ফলদায়ক হয় না। যে ঔষধ এক প্রদেশে অত্যন্ত হিতকর, তাহাষ্ট আবার অন্য প্রদেশে পক্ষে সেরূপ কার্য্যকর হয় না। এইজন্তই আয়ুর্বেদের অগণ্য শক্তিশালী ঔষধের মধ্যে স্থান-বিশেষের হিতকর ঔষধ-গুলি বিশেষ ভাবে সেই সেই প্রদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক ভারতবর্ষের মধ্যেই যখন এই প্রকার বিভিন্ন ভাব উপস্থিত হয়, তখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন জল-বায়ু সম্পন্ন বিদেশীয় ঔষধগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের কিরূপ বিবোধী, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহা যে শুধু আমাদেরই অনুমানের কথা তাহা নহে, ইহা সত্যানুসন্ধি ঋষিগণের পবীকৃত সত্য; তাই তাঁহারা বলিয়াছেন,—

“যন্ত দেশস্ত যো জন্ত তজ্জন্তোষধং হিতং।”

অর্থাৎ যে দেশেব যে প্রাণী, তাহাব পক্ষে সেই দেশের ঔষধই হিতকর।

**পথ্য।**—বিদেশীয় চিকিৎসায় যে কেবল ঔষধই বিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে পথ্যও বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অথচ এই পথ্য অর্থাৎ হিতকর আহার-বিহার সুস্থ-রোগী কাহারও উপেক্ষার বস্তু নহে। প্রথম যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ পথ্য অর্থাৎ অহিত আহার-বিহার উপভোগ জন্ত। যদি পীড়িত অবস্থাতেও পুনরায় বিরুদ্ধ আহার-বিহার হয়, তবে তাহা আরও বিষময় হইবে। অন্ন ব্যাধি অনেক সময় পথ্য বা হিতকর আহার-বিহার সাহায্যে দূরীভূত হয়, কিন্তু বিরুদ্ধ পথ্যেবী শত শত ঔষধও আনোণ্য লাভ করিলে

পাবেনা। তাই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ দেশ, কাল, রোগ, বয়স প্রভৃতি ভেদে পাক্তিতের আহাৰ-বিহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদেশীয় চিকিৎসায় উক্ত প্রধান দেশেব একান্ত উপযোগী ডাবের জলের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'সোডা' পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্য ও দেশোপযোগী খবমণ্ড পথ্য হয় না, কোটার ভরা বিলম্বিতা বালি (যব চূর্ণ) পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ সন্তঃপ্রাপ্ত দুগ্ধের পরিবর্তে দেশোৎপাদিত হইতে আনীত সমধিক বায়ু সাপেক্ষে মদ্য উত্ত পথ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চিরদিনেব অভ্যস্ত দেশ-হিতকর পথ্যেব পরিবর্তে আনাদেব অনভ্যস্ত ও অল্পপযোগী খাদ্যগুলি কি সমধিক ফলপ্রসূ হইতে পারে? দুগ্ধের বিধয় স্তন্য—পাক্তিত—সকলেই এক্ষণে বিদেশীয় আচার আচারেব অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাতে দেশের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইতেছে কোথায়? এই প্রকার অল্পপযোগী আহাৰ আচারে আনাদেব উপকাৰ ত হইতেই পারে না, বরং অনিষ্টই হইতেছে। পথ্য সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে কখনই উচিত নহে। কারণ,—

"বিনাপি ভৈরবৈজ্যোষিঃ পথ্যাদেব নিবর্ততে।

নহু পথ্য বিহীনস্ত ভেষজানাং শতৈরপি ॥"

**ঔষধ-পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য।**—বিদেশীয় ঔষধ ও পথ্যের অপ-কাৰিতা সম্বন্ধে বাহা বলা হইল, তাহাতে বিদেশী-ঔষধ-প্রিয় ব্যক্তিবর্গ মনে করিতে পারেন—যে, আমি সাধারণের হিতের পরিবর্তে এ ক্ষেত্রে দেশীয় ঔষধ প্রচারের

চেষ্টাই করিতেছি। সে জন্ত এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অনেক বলেন, তরুণক্ষেত্রে ডাক্তারী ঔষধে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায় এবং পুরাতন ও জটিল রোগেই কবিরাজী ঔষধ বেশী কার্যকরী হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিলে একথার কোনও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতিসার, পাণ্ডু, গুল্ম, মূত্রাশয়পীড়া, মেহ, কাস, হৃদরোগ, আমবাতি, বাতরক্ত, অগ্নিপিত্ত, বাধক, মূতবৎসা প্রভৃতি কোন পীড়াতেই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার জ্বায় জগতের কোন চিকিৎসায় সম্ভব ও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের শক্তি নাই। হইতে পারে, একটি পুরাতন গ্রহণী, বাধক বা কাসের পীড়ার চিকিৎসা করাইতে হইলে একমাস বা ততোধিক কাল কবিরাজী ঔষধ সেবন করিতে হয়, কিন্তু জন্ত যে কোন মতের চিকিৎসায় উক্ত কালের মধ্যে আরোগ্য করিবার ক্ষমতা দূরে থাক, বিশেষ উপকার পথ্য হইবেনা—ইহা সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। এক মাত্র নবজন্মের চিকিৎসায় কুইনাইন গ্রহণে ডাক্তারি মতে শীঘ্র জর বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত আরোগ্য সম্পাদন হয় না। কুইনাইন অপেক্ষা তীব্র ও অল্প সময়ে জররোধকারক ঔষধ আয়ুর্বেদে অভাব নাই, কিন্তু দোষ পরিশাক না করিয়া আয়ুর্বেদ মতে জর-রোধের চেষ্টা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেশীয় চিকিৎসায় জর বন্ধের চেষ্টা না করিয়া প্রথম হইতে দোষ হানিরই চেষ্টা করা হয়, ডাক্তারি মতে প্রথম হইতে জর বন্ধের চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টার ফলেই দেশে লোকের প্রধান ব্যাধি

এখন ডাড়াইয়াছে—একমাত্র জ্বর। যদি ডাক্তারি চিকিৎসা আমাদের উপযোগী হইত, কুইনাইনের প্রকৃত জ্বররোগ্য শক্তি থাকিত, তবে পুনঃ পুনঃ একই ব্যক্তির জ্বর হইবার কারণ ছিল না। যাহারা ৭৮ দিন বৈধায়াধিয়া দেশীয় ঔষধে দোষের পরিপাকের পর আরোগ্যলাভ করেন, তাঁহাদের এইপ্রকার পুনঃ পুনঃ জ্বর হইতে দেখা যায়না। আয়ুর্বেদে বিশেষভাবে উল্লেখ হইয়াছে যে, লালাত্রাব বমনভাব, হৃদয়ে অগুন্ধি, অকচি, তন্দ্রা, আলস্ত, অপরিপাক, মুখেব বিরসতা, গাত্রের গুরুতা, ক্ষুধার অভাব, মূত্রের আধিক্য গুরুতা এবং জ্বরের প্রাবল্য—এইগুলি আম-জ্বরের চিহ্ন। এই চিহ্ন যে কাল পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেকাল পর্যন্ত বুঝিতে হইবে—জ্বরারম্ভক দোষের পরিপাক হয় নাই এই সমস্ত লক্ষণ বিद्यমান থাকিতে জ্বররোধক ঔষধ প্রয়োগ আয়ুর্বেদ মতে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এসময়ে মুখ্য অর্থাৎ জ্বর শাস্তিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে, পুনর্বার জ্বর বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ডাক্তারি চিকিৎসায় এই সমস্ত লক্ষণ বিद्यমান সত্ত্বেও জ্বর কম দেখিলেই কুইনাইন-সাহায্যে রোধ করিতে দেখা যায়। আয়ুর্বেদ মতে অনলিপ্সা জ্বর মুক্তির একটি বিশেষ লক্ষণ। যাহারা আয়ুর্বেদ মতে দোষের হানি করিয়া আরোগ্যলাভ করেন, তাঁহাদের জ্বরমুক্তির পর ক্ষুধা এবং খাইবার ইচ্ছা বেশ প্রবল হয়, কিন্তু কুইনাইনে যাহাদের জ্বররোধ হয়, তাঁহারা বহুদিন পর্যন্ত অকচি ও অক্ষুধার কথা বলিয়া থাকেন। সুতরাং এপ্রকার আরোগ্যে আমাদের পার্থক্য কি থাকিতে পারে? কুইনাইন

সাহায্যে জ্বর রোধ করা ভিন্ন যখন কোন ব্যাধিতেই দেশীয় চিকিৎসার জ্ঞান নির্দোষ ও সম্ভব আরোগ্য অথবা কোন চিকিৎসায় দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং একমাত্র এই চিকিৎসাব্যবলম্বনেই যখন প্রাচীন ভারতবাসিগণ বর্তমানকাল অপেক্ষা নির্দোষ আবেগ্য ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যলাভ কবিয়া দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন কোন্ গুণে আমরা যবের অর্থ বিদেশে পাঠাইয়া সম্পূর্ণ বিজাতীয় চিকিৎসাব্যবশ্রয় গ্রহণ করি, তাহা ভাবিবার সময় আসে নাই কি? আর যে কুইনাইনের জন্ত আজ বিদেশীয় চিকিৎসাব্যব আদর, তাহা আমাদের কিরূপ উপযোগী তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমার এসম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিব। ইহা আমাদের কথা নহে, বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য বিবরণীতেই প্রকাশ,—

“The Governor in council is also disappointed to find that despitae the employment of Sub-Assistant Surgeons in the distribution of quinine in the District of Nadia and Murshidabad there has been no diminution in fever mortality but the reverse.”

The Government Resolution on the Sanitary Reports for the year 1912.

ইহার মর্ম্ম,—নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় কুইনাইন বিতরণের জন্ত ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই, উপরন্তু মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীজীবনকালী রায়

বৈদ্যরত্ন।

## সদ্বৃত্ত ।

### প্রথমাধ্যায় ।

“এবীরেন্দ্রিয়সংক্রিয়াসংযোগবৎ-পুরুষ” অর্থাৎ জীৱন্ত নান্নয় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পাবেনা,— হয় কিছু করে, নয় কিছু বলে অথবা কিছু ভাবে। সকলকেই কায়বায়ানস-ব্যাপারে ব্যাপ্ত রহিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। কায়বায়ানসী চেষ্টা সাধু হইলে, নিয়মিত কাল সুখায়ুঃ উপভোগ করিয়া অক্লেশে জার্ণ-শবীর পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক সদগতি লাভ করা যায়; অসাধু হইলে দুঃখায়ুঃ উপভোগ করিতে হয়, অকাল মৃত্যুব পরও দুঃখ ভোগেব হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না। সুখে সুদীর্ঘকাল সুখায়ুঃ উপভোগ করিতে হইলে পরম সাবধানে অসদাচরণ পরিত্যাগ করিয়া পরম যত্নে সদ্বৃত্তি পরায়ণ হওয়া উচিত। সদ্বৃত্তি পরায়ণ হইতে হইলে আদৌ সুশিক্ষা লাভ করিয়া, শিক্ষানুরূপ কৰ্ম্মভ্যাস করিতে হয়। যে শিক্ষার গুণে ইচ্ছাকালে আত্ম-হিতে রত রহিয়া পরহিত পরায়ণ হইয়া এবং জীবন-যাত্রার উপযোগী উপকরণ উপার্জনে সামর্থ্য লাভ করিয়া, যজ্ঞে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা যায়, পরন্তু পরকালে সদগতি লাভ ঘটে,—তাহার নাম সুশিক্ষা। সুশিক্ষিত, সংকর্মে অভ্যস্ত এবং অরিষ্ট পুরুষেরা বেরূপ আচরণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন, তাহার নাম সদ্বৃত্ত ।\*

\* সতিরিশ্রিয়-পুরুষের সনসা বাচ্য করেন  
১৭৩৫-৩৬ খ্রিঃ বর্ষনীতি তৎ সম ভবঃ । জন্মকলত্তরঃ ।

এই প্রবন্ধে আমরা নানা শাস্ত্র হইতে কায়বায়ানস সদ্বৃত্ত সঙ্কলন করিয়া, সেই সমস্তের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইব। প্রথমতঃ শারীর সদ্বৃত্ত বলা যাইতেছে।

**শারীর সদ্বৃত্ত**।—বিধি বিহিত আহার, ব্যায়াম, ব্যবায়, নিদ্রা নানাদি, শৌচকর্ম্ম এবং অপরাপর বিধি বিহিত শারীরিক কর্ম্মকে শারীর-সদ্বৃত্ত বলে। শরীর পরিচালন করিয়া, এই সকল সদাচার সম্পাদন করিতে হয়, এইজন্ত এই সমস্ত সদ্বৃত্তের সাধারণ নাম শারীর-সদ্বৃত্ত। তন্মধ্যে আহাব শবীৰ ধারণের মূল। তজ্জন্ত শারীর-সদ্বৃত্ত-নিচয়ের মধ্যে আহার অগ্রগণ্য। এই নিমিত্ত অগ্রে আহার বিধি বলা যাইতেছে।

**আহার-আহার প্রবিচার**।—ঋষি বলিয়াছেন—“ইষ্টবর্ণ রস-গন্ধ-স্পর্শ বিধি বিহিতমন্ন পানং প্রাণিণাং প্রাণসংক্র-কানাং প্রাণ মাচক্ষতে কুশলাঃ। প্রত্যক্ষফলদর্শনাং। তদিক্সনাং হস্তরথঃ স্থিতিঃ। তৎসদ্ব্যমুজ্জয়তি, তচ্ছরীর ধাতুব্যুহ বল বর্ণেন্দ্রিয় প্রসাদ করং যথোক্ত মুপমেতামানঃ।”

ইহার ভাবার্থ এইরূপ;—যে সমস্ত বিধি বিহিত-অন্ন-পানের বর্ণ মনোজ্ঞ, গন্ধ মনোরম, রস অভিপ্সিত এবং স্পর্শ প্রীতিকর, চিকিৎসা-কুশল পণ্ডিতগণ বলেন, প্রত্যক্ষ ফল-দর্শন হেতু, সেই সকল অন্ন পান, মনুষ্যের এবং অপর প্রাণিগণের প্রাণ স্বরূপ। তথাবিধি অন্নপান ইহকন (আল দিবার কাঠ) স্বরূপ। সেই

ইন্ধন-যোগে অন্তরগ্নি স্থিতি থাকে। বাবতীয় অন্ন পান যথা বিধানে নিষেধিত হইলে, জীবের স্বাস্থ্যক্ষতি হয় এবং শরীরে রসাদি ধাতু সমূহ, বল, বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল স্ত্রপ্রসন্ন হইয়া উঠে।

“প্রাণাঃ প্রাণভূতামন্নং তদযুক্ত্যা হিন-  
স্তাহন।” অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত অন্ন প্রাণিগণের  
প্রাণ স্বরূপ। বিধি গ্রাহ্য না করিয়া, যথেষ্ট  
আহারে প্রবৃত্ত বহিলে, নানা বোগ-ভোগ  
করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত চইতে হয়।  
তজ্জন্ত সকলকেই সর্বাগ্রে আহাব-নির্ধাচনে  
মনোনিবেশ করিয়া, আহার-বিধি-পালন  
করা উচিত। নিম্নে প্রয়োজনীয় আহার-  
বিধি সকল উদ্ধৃত হইল।

১। হিতাশী স্যাৎ। যদাহাব জাত  
মগ্নিবেশ। সমাংশৈশ্চ শরীর ধাতুন্ প্রকৃতৌ  
স্থাপয়তি, বিষমাংশে সমীকরোতি তদ্বিতং  
বিক্টিং তদ্বিপরীতম্ভিতং।

হিতাহাব পরায়ণ হইবে। ছে অগ্নিবেশ !  
যে সমস্ত আহার, রস-রক্তাদি ধাতুগণের  
সমতা রক্ষা করে অর্থাৎ স্বস্থানস্বমনে এবং  
স্বভাবে রাখে, কোন ধাতুর বৈষম্য ঘটিলে  
সমতা বিধান কবে, তাহাকে হিতাহার বলিয়া  
জানিও।

সকল নর-নারীর প্রকৃতি একরূপ হয়  
না। কেহ বাত প্রকৃতি, কেহ পিত্ত প্রকৃতি,  
কেহ শ্লেষ প্রকৃতি, কেহ কেহ বা মিশ্র  
প্রকৃতি। তজ্জন্ত সকলের পক্ষে একই প্রকার  
আহার হিতকর হয়না। বাহার যেক্রপ  
প্রকৃতি, তদ্বিপরীত গুণসম্পন্ন আহারই  
তাহার পক্ষে হিতাহার। যেমন পিত্ত প্রকৃতি  
পুরুষের পক্ষে পিত্তজন্য আহারই হিতাহার।

সকল ঋতুতে একই প্রকার আহার

হিতকর হয় না। ঋতু-গুণ-বিপরীত-গুণ  
বিশিষ্ট আহারই হিত সাধন কবে। যেমন  
বসন্ত ঋতুতে কফরূপ আহার, শরৎকালে  
পিত্তনাশক খাদ্য, বর্ষা ঋতুতে বায়ু-প্রশমন  
অন্ন-পানীয় ঋতুজন্ত দোষ প্রশমন করিয়া  
স্বচ্ছন্দে শরীরে পুষ্টি সাধন কবে।

দেশভেদে আহার্য দ্রব্য হিত সাধন  
কবে। যে খাদ্য একদেশীয় লোকের পক্ষে  
হিতকর, হয় ত সেই দ্রব্য অন্য দেশীয় লোকে  
আহার করিলে বিসদৃশ ফল লাভ কবে।

বয়ঃক্রম ভেদেও আহার্য দ্রব্য ভেদ এবং  
পরিমাণ কল্পনা করিতে হয়। এই সকল  
বিবেচনা করিয়া প্রকৃতিসাম্য, ঋতুসাম্য,  
দেশসাম্য, বয়ঃসাম্য এবং অভ্যাসসাম্য  
আহার করা উচিত। এই অনুরূপ কার্যে  
উদাসীন হইলে আহার-দোষ জন্ত রোগ  
করিতে হয়।

২। মাত্রাশী স্যাৎ। পরিমিত আহার  
গ্রহণ করিবে।

কথিত আছে—“আহার মাত্রা পুনরগ্নি-  
বলাপেক্ষিণী। বাবদ্যশ্চাশনমশিতমহুপহতা  
প্রকৃতিং যথা কালং জরাং গচ্ছতি তাবদন্ত  
মাত্রা প্রমাণং বেদিতব্যম্ভবতি।”

ইহাব তাৎপর্য এইরূপ—সকলের পরি-  
পাক শক্তি একরূপ নহে। কেহ বা সমাগ্নি,  
তজ্জন্ত উপযুক্ত পরিমিতাহার স্নেহে জীর্ণ  
করিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি মলাগ্নি,  
তজ্জন্ত তাহার পরিপাক শক্তিও দুর্বল।  
কেহ বা তীক্ষ্ণাগ্নি, যা খায় তাহা সহজ জীর্ণ  
করিয়া ফেলে অথচ পুষ্টি তুষ্টি লাভ করে না।  
কেহ কেহ বিষমাগ্নি, কখন তাহার জঠর  
খাদ্য দ্রব্য অনায়াসে পরিপাক পায়, কখনও  
বা সম্যক পরিপাক পায় না। তজ্জন্ত

হিন্দুধর্ম—“আহার মাত্রাশিবলাপেক্ষী ।”  
দৃষ্ট্যে যে পরিমিত আহারে শারীর ভাবের  
কোন ব্যতিক্রম ঘটনা, অথচ যথাকালে  
দুর্গা হইয়া যায়, সেই পরিমিত আহারই  
দৃষ্ট্যে পক্ষে উচিত মাত্রাচার । আপ-  
নাব পরিপাক শক্তির বলাবল বিবেচনা  
করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় হিতাহার সেবন করা  
উচিত ।

অতিমাত্রাহার অতিক্রম । হীনমাত্র  
দাহারও অনিষ্ট সাধন কবে । অল্পাহারে  
শরীরে শক্তি সঞ্চিত হয় । অল্পাহারে  
পাশে । তরিতরুন শবীর দুর্বল হইতে  
থাকে । দুর্বল শরীরে ক্রমশঃ নানা প্রকার  
রোগ দেখা দিতে থাকে । তজ্জন্ত—“মাত্রাশী-  
ল্যং” এই বিদ্যি সর্বতোভাবে পরিপালন  
করা উচিত ।

৩। কাগভোজীভাষ্য । যথাকালে ভোজন  
করিলে, কদাচ অসময়ে আহার করিলে না ।

কথিত আছে—“বাসমধ্যে ন ভোক্তব্যং  
বাসমধ্যং ন লজ্জয়েৎ ।” অর্থাৎ এক প্রহর  
বেলা না হইলে আহার করিলে না ; দুই  
প্রহর মধ্যেই ভোজন করা কর্তব্য ।  
বাএকালেও এক প্রহরের পর দুই প্রহরের  
পূর্বেই আহার করা উচিত । অধুনা নানা  
কারণে এই উচিত কাজের বিস্মৃতিতেছে ।  
বাধ্য হইয়া বহু লোককে অসময়ে আহার  
করিতে হয় । পূর্বে এদেশে প্রাতঃকালে  
ও বৈকালে কাজের সময় নির্দিষ্ট ছিল ।  
শেষ উপযোগী প্রথাই ছিল । শিক্ষার্থী  
পূর্নাঙ্কে এবং অপরাহ্নে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন  
করিতেন ; রাজকাৰ্যালয়েও দুইবেলা কাজ  
করিবার সময় নির্দিষ্ট ছিল ; শ্রমজীবীরাও  
প্রত্যেক কাজ করিত । অধুনা অধ্যয়ন ও

অধ্যাপনা এবং আর আর কাজের সময়  
পরিবর্তিত হইয়াছে । অনেক স্থলে শ্রম-  
জীবীরাও দুইবেলা কাজ না করিয়া, পূর্নাঙ্ক  
১০টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা পর্যন্ত কাজ  
করে । এই নিয়মে বাধ্য হইয়া কাজের  
লোকদিগকে অসময়ে আহার করিতে হয় ।  
বিশেষতঃ রেল-ষ্টেশনারযোগে প্রতিদিন আবাস  
ক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে যাইয়া যাহাদিগকে  
কাজ করিতে হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ  
কেহ অতি প্রত্যুষে কেহ কেহ বা ৭টা  
৮টার মধ্যে আহার করেন । আহার-বিধি-  
লজ্জনের কলও হাতে হাতে চলিতেছে ।  
অজীর্ণ, অম্বাজীর্ণ এবং গ্রহণী প্রভৃতি  
রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুলোক  
যৌবনে অরোগ হইতেছেন, অনেকে অকালে  
কালকবলে পতিত হইতেছেন । নিদান পরি-  
বর্তন না করিলে আরোগ্যের আশা করা  
যাইতে পারে না ; কাজের দায়ে সকলে  
তাহা পারেননা । তজ্জন্ত বিশিষ্ট চিকিৎ-  
সাও তত্তদ্ব রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ  
করা দুর্ঘট হইয়া উঠে ।

৪র্থ । জীর্ণে হিতং মিতং চাদ্যং । অর্থাৎ  
পূর্নভুক্ত অন্ন-পানীয় স্নজীর্ণ হইলে হিত এবং  
পরিমিত আহার করিলে ।

“অজীর্ণে ভোজনং বিষং ।” কথাটা অতি  
প্রসিদ্ধ । প্রায় সকলেই জানেন, অজীর্ণে  
ভোজন করা বিষপানের তুল্য অনর্থকর ।  
বিধি জানিয়া পালন না করা অনর্থের হেতু ।  
অনেকেই অজীর্ণে ভোজন করিয়া বিপদগ্রস্ত  
হইয়া থাকেন দেখিতে পাই । অজীর্ণে  
ভোজন বহুরোগের কারণ । তজ্জন্ত আহার  
জীর্ণের লক্ষণ উপলব্ধি না করিয়া কদাচ  
ভোজন করিলে না ।

উদগার শুদ্ধিকংসাহো বেগোৎসর্গ যথো-  
চিতঃ। লবুতা ক্ষুৎ পিপাসেচ জীর্ণাহারস্ত  
লক্ষণং।” যে সময়ে উদগত উদগারের গুরুত্ব  
থাকেনা, নির্গত উদগারে কোন প্রকার গন্ধ  
অমুভূত না হয়, সঞ্চিত মল-মূত্র নিঃশেষে  
আপন পথে নিঃসৃত হইয়া যায়, শরীর বেশ  
হালকা বোধ হয় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত  
হয়; তখন বুঝিবে যে, আহার সুজীর্ণ হইয়াছে।  
জীর্ণাহারের লক্ষণ বুঝিলে, ভোজন করা  
উচিত।

আমবা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেব কোন কোন  
স্থানে, অজীর্ণে ভোজন এবং অধ্যাশন এই দুইটি  
কথার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই অধ্যাশন  
শব্দের অর্থ পূর্কদিনের আহারাজীর্ণে ভোজন।  
৪ সংখ্যক নিষেধ বিধির অর্থ অধ্যাশন করিবে  
না। যে স্থানে দুইটি কথার একত্র সমাবেশ  
থাকে, সেখানে অজীর্ণে ভোজনের অর্থ  
স্বতন্ত্র। তথায় অজীর্ণ শব্দের অর্থ পরিপাক  
যন্ত্রের কোন না কোন নিদ্রাণ বা ক্রিয়া  
বিকার ঘটত ব্যাধি বিশেষ। তাদৃশ অজীর্ণে  
চিকিৎসকের উপদেশ লইয়া আহার গ্রহণ  
করিতে হয়।

৫ম। উষ্ণমন্নীয়ান্। সুখোষ অন্ন  
ভোজন করিবে।

শুকধাতু এবং শমীধাতু জাত চাল, ডাল  
এবং নানা প্রকার কন্দ, মূল ফল, শাক, মাছ,  
মাংস প্রভৃতি আহরণ করিয়া আমরা খাজো-  
পোযোগী অন্ন-ব্যাঞ্জন প্রস্তুত করি। জল ও  
অনল যোগে অন্ন এবং উপযুক্ত পরিমিত তৈল,  
দুগ্ধ, লবণ আর নানা প্রকার মসলা মিশাইয়া  
ব্যাঞ্জন সংস্কার করিতে হয়। অন্ন-ব্যাঞ্জনার্থ  
গৃহীত দ্রব্যে যে কোন প্রকার শরীরের  
অনিষ্টকর জীবাণু অথবা অস্ত্র কোন প্রকার

অপদার্থের যোগ থাকে, বিধি বিহিত সংস্কার  
দ্বারা তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যতক্ষণ উষ্ণ  
থাকে, ততক্ষণ তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে আহার  
করা বাইতে পারে। জুড়াইয়া গেলে মক্ষিকা-  
সর্পগাদি দোষ-দুষ্ট হইতে পারে, পবন  
দুর্জ্বর হইয়া উঠে। তজ্জন্তই সুখোষ অন্ন-  
ব্যাঞ্জন ভোজন করা উচিত। পবনদুষ্টি  
অন্ন তৃপ্তিকর, অগ্নিবলবর্দ্ধক, সুখপাচ্য, বায়ুর  
অমূলোমন এবং কফনাশক। কিন্তু অত্যুষ্ণ অন্ন-  
ভোজন করা উচিত নহে। কথিত আছে;—  
অত্যাষ্ণানং বলংহস্তি নীতশুদ্ধকং দুর্জবং। অতি  
ক্রিয়মানি করং যুক্তিযুক্তং হি ভোজনং।

৬। স্নিগ্ধমন্নীয়ান্। স্নিগ্ধ অন্ন-পানীয়  
নিষেবন করিবে।

দুগ্ধ, তৈল, বসা এবং মজ্জা—এই চারি  
দ্রব্যের সাধারণ নাম স্নেহ। স্নেহযুক্ত ভক্ষ্যের  
নাম স্নিগ্ধাহার। শীতগুণযুক্ত দ্রব্যকেও  
স্নিগ্ধদ্রব্য বলে। মৎস্ত, মাংস, বাদাম, পেস্তা  
এবং নারিকেল প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য  
স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ। দধি, দুগ্ধ ও স্নেহদ্রব্য।  
সুশীতল পানীয় প্রভৃতিও স্নিগ্ধ দ্রব্যের মধ্যে  
পরিগণিত। যে সকল আহাৰ্য্য দ্রব্য গুণবৎ  
অথচ পরিপাকের উপযোগী স্নেহ বিজ্ঞমান  
থাকে, সেই সকল আহাৰ্য্য গ্রহণ করা উচিত।  
আবশ্যক হইলে দুগ্ধ, তৈল এবং মাখন যোগে  
রক্ষাকরকে স্নিগ্ধ করিয়া লইয়া খাইতে হয়।  
সমস্ত পুরুষই স্নেহসায়ী। তজ্জন্ত স্নিগ্ধাহার  
সকলের পক্ষে হিতকর।

স্নিগ্ধাহার সুস্বাদু; স্নিগ্ধাহার উপযুক্ত  
মাত্রায় ভক্ষণ করিলে ঔদর্য্যগ্নি সজ্জ্বলিত হয়,  
মেদোমাংস মজ্জাদাতু পরিপুষ্ট হয়, শরীরের  
বর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং মস্তিষ্ক পুষ্ট হয় ও স্বস্থির  
থাকে।



৭। বীর্ষ্যাবিকল্প মন্যায়। অবিকল্প  
বীর্ষ্য আহাৰ করিবে।

বীর্ষ্য দ্রব্যনিষ্ঠ ধর্ম বিশেষ। “যেন কুর্ক্ৰান্তি  
তংবীর্ষ্যং।” অর্থাৎ বাহার প্রভাবে কর্ম  
সমাপ্য হয়, তাহার নাম বীর্ষ্য। বীর্ষ্য দুই  
প্রকার এক শীতবীর্ষ্য অপর উষ্ণবীর্ষ্য।  
কাহারও পক্ষে উষ্ণবীর্ষ্য অন্ন-পানীয় হিতকর,  
কাহারও শরীবে অহিতকর। শীতবীর্ষ্য  
দ্রব্যও শরীরে ভেদে হিতাহিত সাধন করে।  
যেদ্রব্য বীর্ষ্যবদ্দ্রব্য দেহের অনিষ্ট সাধন করে,  
তাহারই নাম বিকল্প বীর্ষ্যদ্রব্য। কোন কোন  
দ্রব্য স্বভাবতঃ বিকল্পবীর্ষ্য, যেমন গোমাস  
প্রভৃতি। এই বা তদধিক দ্রব্য মিলিত হইলে  
কখন কখন সংযোগ-বিকল্প হয়। যেমন লবণ  
যোগে উষ্ণ তৃষ্ণ, মৎস্য যোগে তৃষ্ণ ইত্যাদি।  
বীর্ষ্য-বিকল্প দ্রব্য ভক্ষণ করিবেনা। কবিলে  
কুষ্ঠ, বিসর্প এবং অকৃত প্রভৃতি বোগগস্ত  
হইতে হয়।

৮। নাতিদ্রুত মন্যায়। অতিদ্রুত  
ভোজন করিবেনা।

চর্ম্ম, চুষ্ম, লেহ্ম এবং পেয় ভেদে আহাৰ্য্য  
দ্রব্য চাৰি প্রকার। চতুর্বিধ খাওয়ার কোন  
খাওয়াই অতিদ্রুত গলাধঃকরণ করিবেনা।  
বিশেষতঃ চর্ম্ম বস্ত্র ধীরে ধীরে চর্ম্মণ করিয়া  
খাইতে হয়। নতুবা খাওয়া পাচক রসে সহসা  
দ্রবীভূত হয় না, কোন খাওয়া আদৌ দ্রবীভূত  
হয় না। তজ্জন্ত প্রথমতঃ দস্তদ্বারা ছেদ-ভেদ  
এবং পেষণ করিয়া, লালাসংজ্ঞক রসযোগে  
ক্লিন্ন করত গলাধঃকরণ করিলে কোষ্ঠস্থ পাচক  
রসে অনায়াসে পরিপাক পাইতে পারে।  
ভাত এবং কটি প্রভৃতি খেতসারযুক্ত খাওয়া  
উদররূপে চর্ম্মিত এবং লাল্য সংযোগে মধুরী-  
ভূত হইলে খাওয়া উচিত। তাহা না হইলে

দায়ক—

ঐ সকল দ্রব্য ভালরূপে পরিপাক পায় না।  
অন্ন জল অতি দ্রুত নিষেবন করিলে বিমার্গগত  
হইয়া বিষম পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।  
ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে স্থস্থিত হয়না, তজ্জন্ত  
পরিপাক কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ইত্যাদি  
কারণে অতিদ্রুত আহাৰ করিবেনা।

৯। নাতি বিলম্বিত মন্যায়। অনাবশ্যক  
বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবেনা।

দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিলে আহাৰ গুরুতর  
হয়। আহাৰ-সামগ্রী জুড়াইয়া যায়, তজ্জন্ত  
হৃজ্বর হইয়া উঠে।

১০। অজররহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত। কথা  
বলিতে বলিতে, হাসিতে হাসিতে ভোজন  
করিবে না। তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে।

“উচ্চাবে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দস্তধাবনে।  
স্নানে ভোজন কালে চ ষট্শ্চ মৌনং সমা-  
চরেৎ।” অর্থাৎ মলত্যাগ কালে, মৈথুন  
সময়ে, প্রস্রাব ত্যাগ কালে, দাঁত মালিবার  
সময়, স্নান করিবার সময় এবং ভোজন  
কালে মৌনাবলম্বন করিবে। মৌনাবলম্বন  
করত মনোযোগ পূর্বক উক্ত কার্য্যগুলি  
করিলে, কাজগুলি সুসম্পাদিত হয়। হাসিতে  
হাসিতে, কথা বলিতে বলিতে বা অন্যমনে  
থাকিলে চর্ম্মণের ব্যাঘাত ঘটে, অন্ন-পানীয়ের  
স্বাদ-গ্রহণে সুপ্রীতি হওয়া যায় না, ভক্ষ্যদ্রব্যের  
সহিত যদি অন্য কোন দ্রব্যের মিশ্রণ থাকে,  
তাহা বুঝা যায় না, অন্নপানীয় বিপথগামী  
হইতে পারে এবং অপরিমিত অন্ন উদরস্থ  
হইবারও সম্ভাবনা।

১১। ইষ্টেদেশে মন্যায়। মনোজ্ঞহানে  
ভোজন করিবে।

অনাবৃত, অপরিষ্কৃত এবং তৃষ্ণযুক্ত কদম্ব  
হানে বসিয়া আহাৰ করা অতিগর্হিত।

তাদৃশ স্থানে দৃশ্য এবং চক্ষুৰ আগোচর বহুতর কীট-পতঙ্গ সঞ্চরণ কবে। তৎসম্পর্কে অন্ন-জল দূষিত হয়। হয় ত চক্ষুৰ আগোচর নানা রোগের হেতু বিবিধ প্রকার দোষবীজ-জীবাণু অন্নের সহিত মিশিয়া উদরস্থ হয়। অনিষ্ট দেশে বসিয়া আহার করিলে মনও অপ্রসন্ন হইয়া উঠে, পরস্তু ঘুণাব উদব হয়। মনো-বিবাদ বহুবোগেব কারণ। তজ্জন্ত স্থপবিকৃত এবং মনোজ্ঞ গন্ধ বিশিষ্ট স্থানে আহার করা উচিত। স্নগ্ধত বলেন—ভোক্তারং বিজনে রম্যে নিঃসম্পাতে শুভে শুচৌ। স্নগন্ধ পুষ্প রচিত্তে সমে দেশেহং ভোজয়েৎ।”

১২। তথেষ্ট সর্লোপকরণঞ্চান্মীয়াং। ভোজনেব সমস্ত উপকরণই মনোজ্ঞ হওয়া উচিত।

১৩। নান্মীয়াং সন্ধিবেলায়াং। রাত্রি-দিবার সন্ধিক্ষণে ভোজন করিবেনা।

অপরাক্তে সমস্ত নরনারীর শরীরে স্বভাবতঃ বায়ু প্রকুপিত হয়, রাত্রিকালের প্রথম প্রহর শ্লেষ্মা প্রকোপের প্রাকৃত সময়। সন্ধ্যাকালে কালের স্বভাবানুসারে বায়ু প্রশমিত হয়, শ্লেষ্মা-ধাতু প্রকুপিত হইতে থাকে। রাত্রিকালের শেষ যাম বায়ু প্রকোপের সময়। প্রত্যুষে বায়ু প্রশমিত হয় এবং শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইতে আরম্ভ হয়। উভয় সন্ধি কালে, উভয় দোষের প্রকোপ-প্রশমন সন্ধিক্ষণে পরিপাক যন্ত্র—আমাশয়াদি সম্যক সক্রিয় থাকে না, শরীর কক্ষিৎ অবসন্ন এবং চিত্ত নৃনাতিরেক পরিমাণে অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। তজ্জন্ত সেই সেই সময়ে আহার করা অমুচিত। যখন কফ প্রশমিত হয়, শরীর এবং মনঃ স্থস্থির হয়, ক্ষুধা-ভুক্ষা উপস্থিত হয়, তখনই আহার করিবে।

১৪। উদ্ধৃত-স্নেহং ন ভুঞ্জীত। স্নেহবত্ৰ দ্রব্যেব, স্নেহ মছন করিয়া উঠাইয়া ফেলাইয়া অথবা স্নেহ নিস্পীড়ন করিয়া সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিবেনা। যেমন মাখন তোলা দুধ, তিলেব খইল প্রভৃতি।

অধুনা তিলেব খইল, কেহ আচার্য্য-রূপে ব্যবহার করেননা। পূর্বে নিস্পীড়িত স্নেহ তিলকক খাত্ত রূপে ব্যবহৃত হইত। মাখন তোলা দুধ নিঃসাব পানীয়, তজ্জন্ত শরীরেব পুষ্টি এবং মনের তুষ্টি বিধান কবে না। তবে বোগের কোন কোন অবস্থায় মাখন তুলিয়া দুধ পথ্য দিতে হয়। গোল এবং তরু উদ্ধৃত স্নেহ হইলেও অনেক স্থলে এবং অনেক রোগে উত্তম পথ্য।

১৫। নাতি দৌহিত্যমাচরেৎ। দিব্য ভাগে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে অতি তৃপ্তি পূর্বক ভোজন করিবে না।

“জঠরঃ পূরয়েদধ্মনৈর্ভাগং জলেন চ।

বায়োঃসঞ্চলনার্থঞ্চ চতুর্থমবশেষয়েৎ।”

ভোজনকালে উদরের অর্দ্ধভাগ অগ্নে, এক চতুর্থাংশ জলীয় দ্রব্যে পূরণ করিয়া অবশিষ্ট পাদাংশ বায়ুব চলাচলের জন্ত খালি রাখিবে। এই নিয়ম অতিক্রম করিয়া ভোজন করিলে তাহাকে দৌহিত্য বলে।

দিবাভাগে গুরু ভোজন করিলে, রাত্রিকালে অনশনে থাকা উচিত। সকলেরই অরুণ রাখা উচিত যে, “একাহারঃ স্নগ্ধ-জরানাং” অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন অনায়াসে স্থজীর্ণ করাইবার যতগুলি উপায় আছে, তন্মধ্যে একাহারই শ্রেষ্ঠ উপায়।

১৬। শয়নস্থো ন ভুঞ্জীত। শুইয়া আহার করিবে না।

একই ভাবে শরীরের অবয়ব বিজ্ঞান

করিয়া সকল কাজ করা চলেনা, করাও উচিত নহে। কার্য-বিশেষে অঙ্গের স্থিতি-বিশেষেব প্রয়োজন। আহারে, ব্যায়ামে, মৈথুনে, গমনে, উপবেশনে এবং শয়নে বিশেষ বিশেষ ভাগে অঙ্গ-বিভাগের আবশ্যক। যে কাজেব জন্ত যেকোন অঙ্গবিভাগ করা উচিত, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া কাজ করিলে শরীরেব বাধা উপস্থিত হয়। বাধামাত্রই পাড়াপাক। তজ্জন্ত বাধা-প্রয়োজন সুস্থিত না হইয়া কাজ করিবেনা। কাজে বাধা না গাওয়া এবং কষ্টানুভূতি না হওয়াও সুস্থিতির লক্ষণ। সুস্থিতিতে সুস্থিত হইয়া আহার করিলে আহার্য দ্রব্যও আনন্দে সুস্থিত হয় এবং আহার্য পরিপাক্য পাক রস নিঃসরণেরও কোন বাধা হয়না।

১৭। আয়ানমতিসদীক্ষা ভুক্তীত সম্যক। এত পরিচিত এবং এই প্রকার আহার্যপানীয় আহার্য শরীরেব দ্রিত সাধন করে; এতদতি-বিক্রম দ্বারা আহার্য আমার পক্ষে অনিষ্ট-দ্রব্য, পণ্ড এবং আহার্য আমার শরীরের অক্ষত নহে। ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া আহার্য কবা উচিত।

“ব্যক্তি নিয়তঃ” সম্ভবতঃ অনেকই প্রগাঢ় করিয়াছেন। এমন লোক আছেন, উহা পাঠিলে তাহার বমন হয়। অথচ অনেক লোক উহা খাইয়া অনায়াসে পরিপাক করিতে পারেন এবং উহা ভক্ষণ জন্ত ফলও লাভ করেন। ডিমের ছায়া আরও অনেক খাদ্য ব্যক্তি-বিশেষের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু শরীরেব পক্ষে অহিতকর হয়না। ত্রি-প্রভৃতি ভোজন জন্ত বমনাদি “ব্যক্তি নিয়তঃ” “ব্যক্তি নিয়তঃ” অপর নাম “প্রতি পুষ্কবহ” বিশেষ বিবেচনা করিয়া,

প্রতিপুষ্কবহ অবধারণ করিয়া আহার্য নির্বাচন পূর্বক আহার করা উচিত।

‘ব্যক্তি নিয়তঃ’ ছায়া ‘জাতি-নিয়তঃ’ প্রমাণসিদ্ধ। একজাতিব সমস্ত আহার্য অপর জাতির পক্ষে হিতকর হয়না। যাহারা উভয় নিয়তঃ অগ্রাহ্য করিয়া অল্প পুষ্কবহ বা অপর জাতির অনুকরণে আহার করেন, তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। তজ্জন্ত আহার্য-সামান্য এবং জাতিসামান্য অন্ন জল গ্রহণ করা উচিত।

১৮। নামীয়াং ভাষ্যয়া সাক্ষং। ভাষ্যায় সঙ্গে ভোজন করিবেনা। স্ত্রী-পুষ্কবে এক সঙ্গে আহার্য করিতে থাকিলে—“অজ্ঞানরহস্ তন্মনা ভুক্তীত।” এই বিধি নিশ্চয়ই লঙ্ঘন করিতে হয়। আবও দোষ ঘটে। চরক বলেন—

“কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহেষ্ণী-শোক-মনোদেগ ভয়াপতন্তেন মনসা বা যদরপান মুপযুক্ত্যেত তদপ্যামমেব প্রদুষ্যতি।” অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, লজ্জা, শোক, অজ্ঞান মনোদেগ এবং ভয়যুক্ত হইয়া যে সকল অন্ন-পান সেবন করা যায়, তাহা পরিপাক পায় না, আমাশয় রহিয়া শরীরকে দূষিত করে। স্ত্রীর সহিত একাসনে এক ভোজনে বসিয়া আহার্য করিবার সময় অনেকের মনঃ কামমোহিত হইতে পারে। তজ্জন্ত অষ্টাদশ সংখ্যক বিধি পালন করা উচিত।

১৯। না প্রক্ষালিত পানি-পান বদনোহম মাদদীত। হাত, পা, এবং মুখ ভালরূপে না ধুইয়া আহার্য করিবেনা।

উক্ত বিধির যুক্তিবাধ অনাবশ্যক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া আহার্য করিয়া

মৌক্তিকতা সকলেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ ভোজনের অব্যবহিত পূর্বে হাত-মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। নখের মধ্যে কত জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, অমু-বীক্ষণ দ্বারা দেখিলে তাহা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। তজ্জন্ম আহারের পূর্বে হস্ত-নখ-মল ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। মূখমধ্যে যে সকল মল সঞ্চিত থাকে, তাহা অন্নপানের সহিত উদরস্থ হইলে, নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

২০। আর্দ্রপাদন্ত ভূজীত। ভিজা-পায়ে ভোজন করিবে।

ভগবান্ মম্ব বলেন—আর্দ্রপাদন্ত ভূজানঃ শতং বর্ষণি জীবতি।”

আরও কথিত আছে—“আর্দ্রপাদন্ত ভূজানো দীর্ঘমায়ুরপাপ্ণুয়াৎ।”

কি জন্ম ভিজা পায়ে ভোজন করিলে আয়ুর্বদ্ধিত হয়, তাহা আমরা অত্যাশি অবগত হইতে পারি নাই। তবে আন্তোপদেশেব তাৎপর্য বুঝিতে না পারিলেও প্রতিপালন করা উচিত।

শ্রীশ্রীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

## মহিলাগণের চিকিৎসা শিক্ষা ।

( অগ্নিদগ্ধে ব্যবস্থা )

সে অনেকদিনের কথা। আমার স্বামী তখন মুর্শিদাবাদে নবাব-সরকারে চাকরি করিতেন। এখনকার মত পরিবার গইয়া বিদেশবাসী হইবার ব্যবস্থা তখন ‘চাকুরে পুরুষ’দের মধ্যে বড় প্রচলিত হয় নাই। স্বামীও আমার সেই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে চাকরি করিতেন, মাসটি গত হইলে বাহা পারিতেন, পাঠাইয়া দিতেন, আমি একটি ছেলে, একটি মেয়ে এবং এক বিধবা পিসীমাকে লইয়া স্নেহ-দ্রুখে দিন অতি-বাহিত করিতাম। আমার বয়স হইয়াছিল তখন আঠার’ বৎসর। ছেলেটি ঘেটের কোলে তিন বছরে পা দিয়াছিল, মেয়েটি এক বছর উত্তীর্ণ হইয়াছিল মাত্র,—হামাগুড়ির সহিত তখন কখন কখন দাঁড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা

করিত। আর পিসীমা,—তাঁহার বয়সটা যে কত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিবার শক্তি আমার ছিলনা, তিনি বলিতেন, তিন কুড়ি পার হইয়া আর তিন বৎসর হইয়াছে, কিন্তু সাত বৎসর আমি পিতৃগৃহ হইতে আমার এই নূতন সংসারে আসিয়াছি। আমি ইহার মধ্যে তাঁহার বয়সের পরিবর্তন কখন বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার সঙ্গিনীরা তাঁহাকে পরিহাস করিয়া এই জন্মই বোধ হয় বলিত—“তারা। তুই চিরকালই কুমারী থাকিলি।” পিসীমার নাম ছিল তারাহন্দরী। এখনকার মত নামের ভিতর রূপ-মায়ুরী বুধাইবার চেষ্টা তখন হয় নাই। বার্ষিক পিসীমা তারাহন্দরীর রূপ-রাশির ভিতর হইতে তেরটি বৎসর বয়সের বৈশিষ্ট্য

দিবা-জ্যোতিঃ বাহির হইত, তাহার নিকট কণ-গর্দ-মোহিতা অনেক সুন্দরী যুবতীও তখন হারি মানিতেন ।

সন্ধ্যার রাগোদ্গিষ্ট-স্বর্ধাকিরণ বধন পশ্চিম গগনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত দিনের কন্দের নিরন্ত-শ্রান্ত-হৃদয়ে তাবৎ প্রাণীই যখন আনন্দের আবিলতাটুকু সঞ্চল করিয়া স্ব স্ব কক্ষ প্রান্তে ধাবমান হইয়াছে, এক কথায় কায়া-কুশলা-প্রকৃতিরাজী যে সময় বিশ্রাম-সুখ-লালসায় স্তব্ধ ভাব অবলম্বনের প্রয়াস করিতেছেন, ঠিক সেই সময় একদিন আমি বন্ধনগৃহে বসিয়া ছেলে মেয়ে এবং নিজের জন্ত উননের জ্বলে কুঁ পাড়িতেছিলাম। পিসীমা দাওয়ায় বসিয়া হরিনামের মালা লইয়া জপ করিতেছিলেন। আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—“বউমা, এ বড় অস্তায় কথা, এই ভন্ন সন্ধ্যাবেলা রান্না-বাগ্নার কাণ্ডে কখন ব্যস্ত থেকনা মা—এ তোমায় কত দিন ব'লেছি। এ সময়ট, ‘রান্ধসী বেলা’। এ সময় রান্না-বাগ্না কি খাওয়া-দাওয়ার কাণ্ডটা ভুলে যেতে হয়। তোমায় এত ক'রে বলি, তুমি কিছুতেই শিখলেনা !”

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম,—আমি একালের শিক্ষা ভো পাই নাই, স্বতরাং কেহ তিরস্কার করিলে অপ্রতিভ হইতে হয়—ইহা আমার আবাল্য অভ্যাস ছিল। অপ্রতিভ হইয়া আমি বলিলাম,—“এমন কর্ম্ম আর ক'রবনা পিসীমা,—আজ যা' হ'ল তা' হ'ল। যাই এখন ঘর-দুয়ারে সন্ধ্যা দিই গে।” এই বলিয়া আমি রন্ধন-গৃহ হইতে নিজস্ব হইলাম।

সন্ধ্যা জালিয়া সকল ঘর গুলিতে প্রদীপ লইয়া দেখাইলাম। দাঁখ বাজাইলাম, ঘরে

নারায়ণ শিলার অধিষ্ঠান ছিল, গললগ্নী কৃত-বাসে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বামীর মঙ্গল কামনা করিতেছি, এমন সময় শব্দ পাইলাম,—খুকীটি আমার বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু চীৎকার করিয়াই সে থামিয়া গেল, আর কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না। নারায়ণ শিলাকে প্রণাম করিয়া তুলসী তলায় প্রণাম করিতে যাইতেছি এমন সময় তাড়াতাড়ি পিসীমা ডাকিলেন,—“বউমা, শিগগির এস, খুকী পুড়িয়া গিয়াছে।”

রান্নাঘরে যখন উননে কুঁ পাড়িতেছিলাম, তখন খুকীটি মাই খাইতে-পাইতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে সেই ঘুমন্ত অবস্থায় এক পার্শ্বে শোয়াইয়া প্রদীপ জালিতে আসিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে খুকী উঠিয়া হামাগুড়ি দিয়া উননের পাশে গিয়া আগুনের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে, তাহাতেই এই বিভ্রাট। আমি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলাম।

গিয়া দেখিলাম,—ডান হাতখানির আঙ্গুল গুলি এবং তলদেশের সকলটুকু পুড়িয়া গিয়াছে, ফোঁকা হয় নাই, কিন্তু যন্ত্রণা এতই বেশী হইয়াছে যে, সেই যন্ত্রণার ঘোরে তাহার অজ্ঞানতা আসিয়া পড়িয়াছে। ভাবিলাম, কি সর্বনাশই হইল। অধীর হইয়া পিসী-মাকে বলিলাম,—“পিসীমা উপায় কি হইবে ?” আমার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

পিসীমা বকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—“মিছামিছি চীৎকার ক'রে সব ঘুলিয়ে দিসনে। তুই কোলে তুলে মাই মুখে দিতে চেষ্টা কর দেখি। তা'র পর আমি উপায় ক'রে দিচ্ছি।”

আমি খুকীকে কোড়োপরি তুলিয়া লইলাম। কিন্তু কীদিতে কীদিতে আমার হৃদয় লাল,—“মাই কা'কে ঘেবে পিসীমা। মাই

খা'বার শক্তি কি আর আছে ?" পিসীমা বলিলেন,—“শক্তি এখনি হ'বে, তুই মাই মুখে দেবার চেষ্টা কর্তো। আর এই পাখা খানা নে, পাখা খানা নিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস কর্।” আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। পিসীমা ইত্যবসবে করিলেন কি,—রান্নাঘরের একপার্শ্বে কতক গুলি আলু ছিল, শিলের হুড়িটি লইয়া তাহাব কতক গুলি ছেঁচিয়া আনিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইয়া তাহার উপর এক টুকরা পরিষ্কার ধপ্পে নেকড়া আনিয়া এক ফন্দা করিয়া আস্তে আস্তে জড়াইয়া দিলেন। আমি বলিলাম,—পিসীমা, একি হইতেছে, ডাক্তার-বড়্ঠাকুরকে ডাক্লে ভাল হ'তনা।” পিসীমা বলিলেন,—“ডাক্তার এসে কি মন্তরে ভাল ক'রে দেবে নাকি! ডাক্তার-বদ্বিরাও তো এই সবই ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই ক'রতে পা'রবেনা। আর তোমার ডাক্তারবড়্ঠাকুরের বাড়ীও তো এ পাড়ায় নয়। তাঁকে খবর দিলে তাঁ'র আস্তে যে সময় লাগবে,—সে সময়টা চুপ ক'রে ব'সে থেকে তোমার মত কারাকাটি না ক'রে—বা' ছ' একটা টোটকা-মুষ্টিযোগ জানি, তা'র ব্যবস্থা ক'রলে লাভ ভিন্ন তো ক্ষতি নাই। দেখ'না এতে কি হয়।

বাস্তবিক পিসীমার ব্যবস্থা ব্যর্থ হইল না; মাই মুখে দিতে-দিতে, বাতাস করিতে করিতে থুকীর অজ্ঞানের ভাব অগনোদিত হইল। নেকড়া খুলিয়া হাতের পাতা এবং আঙ্গুল কয়টির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—একটিও ফোন্সাইয়া নাই। আমি থুকীকে চুষন করিয়া পিসীমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

থুকী যখন মাই খাইতে খাইতে শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন আমি বলিলাম,

“পিসীমা, এ আলু পোড়া লাগাইলে মাগুণে পোড়ার যন্ত্রণার শাস্তি হয়—এ কথা ভুনি কোথায় শিখিয়াছিলে,—এ যে অপূর্ব ঔষধ।”

পিসীমা একটু হাসিয়া বলিলেন,—এখন এ সকল ব্যবস্থা লোপ পাইতেছে বউমা। এ সকল ব্যবস্থা আগে শুধু আমিই শিখিতাম না,—আমার বয়সের অনেক স্ত্রীলোকই আমার মত এ সকল টোটকা-ঔষুদ বুদ্ধা স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে মন দিয়ে শিক্ষা ক'রত। সে শিক্ষায় সময় অসময়ে বড়ই সুন্দর ফল ফ'লত।

আমি বলিলাম,—“আচ্ছা পিসীমা, তা' যেন হ'ল, কিন্তু আলু তো আমাদের দেশে জিনিস নয়; আমাদের দেশে আগে বাঙ্গা আলু ছিল, আলু বা গোল আলু তো আমাদের দেশে ইংরাজ জাতির আসার পর লোকে দেখতে পেয়েছে। তা' হ'লে আমাদের দেশে যখন আলু ছিলনা, তখন এ রকম পুড়িয়া গেলে কি দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ত পিসীমা।”

পিসীমা আবার হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—কি দেওয়া হ'ত? এক আলু দেখেই ভাব্লে বুকি বউমা—এর মতন ঔষুদ আর নেই! এ রকম ঔষুদ আমাদের আনাচে-কানাচে যে কত প'ড়ে র'য়েছে, তা'র সংখ্যা করা যায় না।”

রান্নাঘরের দাওয়ার নীচে এক পার্শ্বে কতকগুলি পাথরকুটির গাছ ছিল। পিসীমা কথা শেষ করিয়া আমাকে বলিলেন,—ওরই ছ'চারটে পাতা তুলিয়া আনগে দেখি।” আমি তুলিয়া আনিলাম। পিসীমা বলিলেন,—“ঈশ্বর না করুন, এরূপ ঘটনা যদি আর কখন হয়,— তা' হ'লে এই হিমসাগর বা পাথরকুটির পাতা খেঁতো ক'রে লাগিয়ে দিলে তখনি যন্ত্রণার

নির্দিষ্ট হ'বে জেনে রেখে দাও । এও একটা ভাল ওষুদ ।”

আমি চূপ করিয়া থাকিলাম । পিসীমা আবার বলিতে লাগিলেন,—“ডিমের যে সাদা অংশ সে জিনিসটাও পোড়া ঘাঙের মহোষদ । পুঁড়িয়া বাইবা মাত্র ঐ সাদা অংশটা লাগাইলে তখন যন্ত্রণাব শাস্তি হইয়া থাকে ।”

আমি বলিলাম,—“ডিম সব সময় কোথায় পাওয়া যাবে ? ডিম তো আর সকল সংসারে সব সময় থাকে না ! আর একটা কথা, তুমি যে হিমসাগরের কথা বল্লে, সে হিমসাগর বা পাথরকুটিও যদি সব সময় পাওয়া না যায় ? তা'বা সম্ভবে থাকে, তা'দেব পক্ষে তো এটিও যখন-তখন পা'বাব উপায় নেই ! তা'বপর যদি আবুও দবে না থাকে ? আসল কথা, তুমি, যে তিনটি ছিনিয়ের কথা বল্লে, এই তিনটেব কোন একটাও যদি তখন না পাওয়া যায়, তা'হ'লে কি ব্যবস্থা করা উচিত ?”

পিসীমা বলিলেন,—“তা'হ'লে খানিকটা মধু নিয়ে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিলে যন্ত্রণার নির্দিষ্ট হ'বে । ছেলে পিলে নিয়ে যা'রা ঘর-সংসার ক'রে, হঠাৎ দরকার হ'লে ওষুধ পাওয়াবাব জন্ত তা'দের সকলের ঘরেই একটু আধটু মধু থাকে । আর যদি বল,—তাও যদি না পাওয়া যায়, তা'হ'লে খানিকটা মাই-য়েব ধর গেলে নিয়ে লাগিয়ে দিও—উপকার হ'বে । আরও যদি বল, স্তনের দুধও যদি সে সময় শুকিয়ে যায়,—তা'হ'লে মুখের খুঁতু তা'র শুকাই না, সেই খুঁতু খানিকটা

লাগিয়ে দিও, তা'তেই উপশম বৃত্তে পাব'বে ।”

পিসীমা আবার বলিলেন,—“পুঁইশাকের পাতার বস, ঘরের চাঁলের পচা খড়, ইংরাজী কালী, ছাগল ছুগ্ধ—এ সকলের যেটি পাওয়া যায়, মাখাইয়া দিলেও যন্ত্রণাব উপশম হয় । আর ফোকা হয় না । এগুলিও ভাল ক'রে মনে রেখ ।”

আমি পিসীমাব বিচক্ষণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম । বলিলাম,—“গৃহস্থলীর সকল বিষয়ের শিক্ষাতেই তো তুমি আমাকে শিখা করিতেছ পিসীমা । এটো টোটকা-শিক্ষাব শিখা করিবে ?”

পিসীমা বলিলেন,—“করিব । কিন্তু তুমি তা'হার বিনিময়ে আমাকে কি দিবে বল ।”

আমি বলিলাম,—“আমি আর কি দিব,—আমি রোজ রোজ তোমার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিব । দিনের বেলায় পাকা চুল তুলিয়া দিব, আর রাত্রে যখন শুইবে, তখন পায়ের তলায় তেল মালিস করিয়া দিব, গ্রীষ্ম বোধ হইলে পাখা লইয়া বাতাস করিব । আমি এই করিতে পারি, এ ছাড়া আমার আর কিছু তো ক্ষমতা নাই পিসীমা ।”

চিরসুন্দরী-পিসীমা আমার কথার উক্তিমা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন । হাসিয়া বলিলেন,—“আচ্ছা শিখাইব । আমি আবৃত্তা হইলাম ।

## বহুমূত্র ও বাঙ্গালী ।

—:—

ম্যালেরিয়ার চেয়েও “বহুমূত্র” বাঙ্গালীর পরম শত্রু। ম্যালেরিয়ার ছোট, বড়, ভদ্র, অভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সকল রকম লোক মরে, কিন্তু বহুমূত্র রোগে যাহারা মরেন, তাঁহারা এ দেশের গণ্যমান্ত সম্ভ্রান্ত বাছা বাছা লোক। যে সকল মহাত্মা দীর্ঘজীবী হইলে বাঙ্গালীরা মুখ উজ্জ্বল হইত, বাঙ্গালার সমাজ, ক্রীসম্পন্ন হইত,—এই কালোপম কঠোর রোগ দেশের সেই অমূল্য রত্নগুলি একে একে আত্মসাৎ করিতেছে! বহুমূত্রের আক্রমণে বঙ্গ জননীর ক্রোড় শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে, সমাজের অস্থিগুহ্মর খসিয়া যাঁতেছে, ঘরে ঘরে আর্জিনাদ ও মর্শ্বেভদী হাহাকার উঠিতেছে! বাঁচাদেব লইয়া দেশের গোরব,—যাঁহাদের ভরসা যি বিদেশীকে আমরা প্রতিদ্বন্দিতার আহ্বান করি, বহুমূত্র রোগে তাঁহাদের শোচনীয় অকাল মৃত্যু ঘটতেছে। বহুমূত্র রোগ শুধু আমাদের দেশেরই যে ক্ষতি করিতেছে এমন নহে, বহুমূত্রের প্রভাবে আমাদের ভাষা-জননী ও সাহিত্যেরও সর্বনাশ হইতেছে। আমাদের বড় বড় কবি, বড় বড় দার্শনিক, বড় বড় সাহিত্যিক—বহুমূত্র রোগেই প্রাণ হারাইতেছেন। দুঃখের বিষয়—জানিয়া শুনিয়াও এ বিষয়ের জ্ঞান কাহাকেও চিন্তিত দেখিতেছি না! কেহই এ মহা অনিষ্টের প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না।

বহুদিন হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি—সাহিত্যদেবী, হাকিম, উকীল, চিকিৎসক—অর্থাৎ যাহাদিগকে অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, তাঁহারা এই রোগে আক্রান্ত হ'ন। ইহার কারণ,—তাঁহারা

শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেননা। দেশ-হিতকর কার্যে লিপ্ত হইতে হইলে, দীর্ঘ-জীবনের আবশ্যকতা আছে। দীর্ঘজীবী না হইলে ব্রত-ধারণ সার্থক হয়না। এই জ্ঞান দেশের বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ—তাঁহারা যেমন মানসিক পরিশ্রম করিবেন, সেই সঙ্গে কিছু কিছু শারীরিক-পরিশ্রমও অভ্যাস করিবেন। তাহা হইলে আর বহুমূত্র রোগ হইবার ততটা আশঙ্কা থাকিবেনা।

বহুমূত্র—প্রতিষেধ যোগ্য রোগ। যিনি মানসিক পরিশ্রমের সহিত কায়িক-পরিশ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, এবং স্বাস্থ্যকর নিয়মগুলি প্রতিপালন করেন, এ রোগ কখনই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

বিশেষতঃ যে রোগ একবার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, দেহ অন্তঃসার-শূন্য ও মৃত্যু-ভঙ্গুর হইয়া পড়ে, সে রোগ যাহাতে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে—তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য নহে কি?

ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্যের সুব্যবহার বহুমূত্র রোগের উপশম হইয়া থাকে। আমি স্বয়ং বহুমূত্রের আক্রমণে বহুকষ্ট পাইয়াছি, শেষে বৈজ্ঞানিক মতের প্রভাবে প্রাণে-প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছি। সুতরাং বহুমূত্র-রোগ সম্বন্ধে আমার মত লোকের মতামত নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্বে—বহুমূত্র রোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই। কেননা রোগের প্রকৃতি



পারিলে তাহাকে উন্মূলিত করা কঠিন সমস্তাব কথা !

কেবল বেশী মাত্রায় বা বেশী বার প্রস্রাব হইলেই তাহাকে বহুমূত্র রোগ ভাবিয়া ভীত হওয়া অনুচিত । অথবা প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া তাহাতে চিনি দেখিতে পাইলে, তাহাতেও আশঙ্ক্য কারণ নাই । যাহারা অতি-বিলম্বিত ভোজন করেন, তাঁহাদের মূত্র পরীক্ষা করিলে প্রায়ই শর্করার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায় । আবাব “মূত্রাতিসার” নামক রোগে—বারম্বার মূত্র পরিত্যাগ কবিত্তে হয়, একপ রোগীর মূত্রে চিনির নাম-গন্ধও থাকে না । তবে বহুমূত্র রোগ ধরিবার উপায় কি ? উপায় অতি সহজ । যথা—

১। প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী হইবে ।

২। তাহাতে শর্করা থাকিবে ।

৩। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বলক্ষয় এবং মাংস ক্ষয় হইবে ।

৪। প্রবল গাত্রদাহ থাকিবে ।

৫। অত্যন্ত পিপাসা হইবে ।

এই পাঁচটা লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হইলেই, তাহাকে মারাত্মক বহুমূত্র বা Diabetes বলিয়া স্থির করিবেন । এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত-ব্যক্তি যদি রোগের প্রতিকার করিতে অব-হেলা করেন, তাহা হইলে পরিণামে ক্ষয়, ত্রণবোগ, [ পৃষ্ঠত্রণ, উরুস্তম্ভাদি ] বিসর্প [ ইনসিপিয়াস ], মূত্রগ্রস্থির পীড়া, প্রভৃতি সাংঘাতিক আত্মসম্বন্ধিক রোগে—তাঁহার মৃত্যু অশঙ্ক্যাবী ।

আমাদের দেহে যকৃৎ নামক যে যন্ত্রটা আছে, কেবল পিত্ত নিঃসরণ বা ভূক্তদ্রব্যের পরিপাকই তাহার এক মাত্র কার্য্য মহে । এই যকৃৎকে মানব-দেহের ভাণ্ডারী বলিতে

পারা যায় । আমরা ভাত, রুটি, আলু প্রভৃতি খেতসারময় যে সকল খাদ্য আহার করি, তাহাদের সারাংশ শর্করায় পবিণত হইয়া যকৃতের কাছে সঞ্চিত থাকে । রক্তাদিতে—যখন শর্করার প্রয়োজন হয়, যকৃৎ তাহা নিজের ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া দেয় । কোন কারণে যকৃৎ বিকৃত হইলে, সে আর আবশ্যক মত শর্করা যোগাইতে পারেনা, কেননা সে শর্করা স্ব-ভাণ্ডারে সঞ্চিতই রাখিতে পারেনা । সুতরাং আহার জাত শর্করা সমস্তই রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয় । শর্করার গুণ—মূত্রকারক, এই জন্তই মূত্রের ভাগ বৃদ্ধি হয়,—তাহার সঙ্গে শরীরস্থ শর্করাও বাহির হইতে থাকে । সেই সময় পিপাসা, গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয় । খাদ্য দ্রব্যের যে যে অংশ শরীর-পোষণের সাহায্য করে, যদি প্রস্রাব-দ্বার দিয়া তাহা বহির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে বল ও মাংস ক্ষয় অনিবার্য্য ।

কেহ কেহ বলেন—এ রোগের বলবৎ কারণ—মানসিক আঘাত । সর্বশরীর ব্যাপি ন্নায়ু মণ্ডলের আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তিতে, Depression এবং শোক-মোহাদি মনো-বিকারে, বহুমূত্র রোগ জন্মিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । যে কোন প্রকারে হউক, ন্নায়ু মণ্ডল আহত হইলেই এ রোগ মানব-দেহে প্রবেশলাভ করে । বাহারী অনাদি খেতসার-ময় দ্রব্য আহার করে, অথচ কায়িক-পরিশ্রম একেবারে করিতে চাহেনা, যদি কোন কারণে তাহাদের ন্নায়ু মণ্ডল সহসা আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার বহুমূত্র কর্তৃক আক্রান্ত হইবে ।

পূর্বেই বলিরাছি—বহুমূত্র রোগ ঐক্য

চেয়ে পথ্যের ব্যবস্থাতেই শমতা প্রাপ্ত হয়।  
এ রোগে প্রস্রাবে চিনি বাহির হয়।  
সুতরাং যে সকল খাদ্য-ভক্ষণে শরীরে চিনি  
উৎপন্ন হইয়া থাকে—সেরূপ খাদ্য বহুমাত্র  
রোগীর বর্জন করা উচিত। চাউল, চিনী ও  
শ্বেতস্বারময় দ্রব্য—এ রোগে এই সকল  
জিনিষ সর্বাগ্রে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।  
আপনারা হয়ত বলিবেন, অন্নগত প্রাণ-বাস্তালী  
অন্ন না খাইয়া কয়দিন থাকিবে? কিন্তু  
ইহা ঐক্য, সত্য, নিশ্চিত—যে বহুমাত্র-রোগী  
যদি অন্নের মায়া না ছাড়িতে পারেন, তাহা  
হইলে অচিরেই তাঁহাকে প্রাণের মায়া  
পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহারা বহুমাত্র  
রোগের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে চাহেন,  
তাঁহারা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গুলি যথাসাধ্য  
পালন করিবেন।

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিতে  
হইবে। যিনি অন্তরূপ ব্যায়াম করিতে  
পারিবেননা, তাঁহাকে অন্ততঃ ৪ মাইল  
পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হইবে।

মেদোন্নয় ও যবক্ষারজানময় দ্রব্য—  
মাংস, মংশ, নিষ, বৃত, মাখন, শাক সব্জি,  
পটোল, ডুমুর, কুমড়া (দেশী) শশা, মোচা,  
খোড় প্রভৃতি—ভোজন করিবেন।

ফলের মধ্যে—ঈষৎ অল্পরসযুক্ত ফল  
ব্যবহার করা চলে। কিন্তু মিষ্টফল একে-  
বারেই নিষিদ্ধ। ফলসা, আমড়া, আনারস,  
কালো জাম, পিয়াল, করমন্দি, আমপিচ—  
এই সকল ফলই এ রোগে খাইতে পারা যায়।

কেহ কেহ এ রোগে দুগ্ধ খাইবার  
উপদেশ দেন। কিন্তু ডাক্তার জগবন্ধ বসু  
ঘোষণা করিয়াছেন যে, দুগ্ধ ব্যবহারে আপত্তি করিতেন।  
তাঁহার আপত্তির কারণ—দুগ্ধে শর্করার

অংশ আছে। তবে যিনি অত্যন্ত শ্রমশীল,  
তিনি অল্প পরিমাণে দুগ্ধ ব্যবহার করিতে  
পারেন, আর এ রোগে যাহারা অস্থির-  
সেবী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারাও দুগ্ধ পান  
করিতে পারেন। বহুমাত্র রোগে, কেবল  
মাত্র দুগ্ধ পথ্য দিয়া এক প্রকার চিকিৎসা-  
প্রণালী প্রচলিত আছে। এই চিকিৎসা-  
পদ্ধতির নাম—Skimmed milk treat-  
ment. এই মতে রোগীকে নবনোত-শূদ্ধ-দুগ্ধ  
পান করিতে দেওয়া হয়। দুগ্ধ হইতে মাখন  
তুলিতে গেলে তাহার শর্করাংশ Lactic  
Acid এ পরিণত হয়, এই এসিড বহুমাত্র  
রোগে উপকারী।

ছোলাকে জাঁতায় পিষিয়া আটা প্রস্তুত  
করিবেন। ইহার নাম “বেশম্”। এই  
বেশমের রুটি কিম্বা লুচি ভক্ষণ করিবেন।  
এমন উপকারী পথ্য আমি আর দেখি নাই।  
১ দিন খাইলেই প্রস্রাব কমিয়া যায়।

প্রত্যহ প্রাতে ৪ আউন্স আন্দাজ জলে,  
১০।১৫ ফোঁটা লেবুর রস (কাগজী বা পাতি)  
দিয়া পান করিবেন। ইহাতে প্রস্রাবের  
চিনী কমিয়া যায়।

প্রত্যহ ১ বার মেরুদণ্ডের উপর শীতল  
জল মাখাইবেন।

যে দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়, অথচ পুষ্টি-  
কর, তাহাই ভক্ষণ করা উচিত। যাহাতে  
পরিপাক-শক্তির ব্যাঘাত না হয়, সে বিষয়ে  
দৃষ্টি রাখিবেন।

• লবণ সংযুক্ত বোল পান করিলে অনেক  
সময় বিশেষ উপকার হয়।

চিন্তার কাণ্ড বাড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে কারিক  
পরিশ্রম অবশ্য বাড়াইতে হইবে।

এই নিয়ম গুলি পালন করিলে, রোগী

এ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকটা ভাল থাকিবেন, যাঁহারা আক্রান্ত হ'ন নাই—ভবিষ্যতে তাঁহাদের আক্রান্ত হই-  
বার ভয় থাকিবেনা।

এ রোগে—সকল চিকিৎসার চেয়ে কবি-

রাজী-চিকিৎসাই উৎকৃষ্ট। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে  
বহুমূত্র রোগের অব্যর্থ ঔষধ আছে। বার-  
স্তরে আমি তাহার উল্লেখ করিব।

শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়,

এল, এম, এম্।

## গ্রহণী কাহাকে বলে ?

যে নাড়ী অন্নকে গ্রহণ করে, আয়ুর্বেদ  
মতে তাহার নাম—“গ্রহণী”। স্তত্রবাং  
গ্রহণী অগ্নিরও অধিষ্ঠাত্রী। সংক্ষেপে—ইহাই  
গ্রহণীব সংজ্ঞা, কিন্তু গ্রহণীর অবস্থান বুঝাইতে  
গেলে—আবও দুই চারিটা কথা বলিতে  
হইবে।

সাধারণতঃ আমাশয় ও পকাশয়ের মধ্য-  
স্থিত পিত্তধরা-কলাকে গ্রহণী নামে নির্দেশ  
করা হয়। আমবা যে আহার করি, তাহা  
পরিপাক হয় আমাশয়ে ও পকাশয়ে।  
আমাশয়ে অন্ন আম বা অপকাবস্থায় থাকে  
বলিয়া ইহার নাম “আমাশয়”। পকাশয়ের  
অনেক স্থলেই অন্ন পরিপাক হয়—স্তত্রবাং  
ইহার “পকাশয়” নাম সার্থক এবং সঙ্গত।  
কবিবাজেবা বাহাকে আমাশয় বলেন, ডাক্তারী  
মতে তাহার নাম Stomach এবং কবিরাজী  
মতে পকাশয়কে ডাক্তারেরা—Small  
Intestine বলিয়া থাকেন। এই আমাশয়  
ও পকাশয়ের মধ্যই পিত্তধরা-কলা বর্তমান।  
আমাশয় ও পকাশয় উভয়ের ভিতর হইতেই  
রস গৃহীত হইয়া থাকে।

দৈ দিন একখানি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক  
পড়িতেছিলাম। ঐ গ্রন্থে Deodenum কে

গ্রহণী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমার  
কিন্তু এ আখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হইলনা।  
গ্রহণী অর্থে আমি বাহা বুঝিয়াছি, বর্তমান  
প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব। আমার ভ্রম-  
প্রমাদ—যোগ্যতার হস্তে সংশোধিত হইবে,—  
এই টুকুই আমার আশা।

Deodenum নামক নাড়ীর অংশ  
প্রত্যেক লোকেরই স্ব-হস্তের দ্বাদশাঙ্গুলি  
পরিমিত। ঐ দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত স্থান,  
আমাশয়ের (Stomach) শেষ প্রান্ত হইতে  
আরম্ভ হইয়া Jejunum এ গিয়া শেষ হই-  
য়াছে। Deodenum এর ভিতর পিত্তনিঃস-  
রণের মার্গ অবস্থিত, যত্ন হইতে পিত্ত নিঃসৃত  
হইয়া সেই স্থানে গিয়া পতিত হয়। আবার  
Pancrrens হইতেও ঐ যন্ত্রের রস Deode-  
num এ আসিয়া সম্মিলিত হইয়া থাকে।  
ভাবমিশ্র বলেন—নাভিমণ্ডলস্থিত সমান ব্য-  
ধার রস প্রেরিত হইয়া গ্রহণীতে উপনীত হয়।  
আমাশয় ও পকাশয়ের মধ্যবর্তী পাচক নামক  
পিত্তের দ্বারা আহাৰ্য্য দ্রব্য পরিপাক পাইয়া  
থাকে। পাচক পিত্তই—অগ্নির অধিষ্ঠান,—  
গ্রহণী সেই পিত্তকে ধারণ করে বলিয়াই  
তাহার আর একটা নাম—“পিত্তধরকলা”।

ডাক্তারী মতে Gastric juice. Pancreatic juice. Bile ( পিত্ত ) এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের রস—এই কয়টা পদার্থ হইতে অগ্নের পরিপাক-ক্রিয়া সাধিত হয়। যে যে স্থান হইতে এই সকল রস নিঃসৃত হইয়া থাকে, বৈজ্ঞানিকেরা সেই সেই স্থানের নামই পিত্তধরাকলা বা গ্রহণী।

শারীর-বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত মহর্ষি সূত্রত—মানবদেহে সাতপ্রকার কলার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে পিত্তধরাকলার নামই গ্রহণী। ইহা আমাশয় ও পকাশয়ের মধ্যস্থিত শৈল্পিক-ঝিল্লী। গ্রহণীতে যে শক্তি পরিপাক করে, সেই শক্তির নাম ও গ্রহণী। সূত্রত বলেন—

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীৰ্ত্তিতা ।

পকাশয় মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

গ্রহণী বলমগ্নির্হি সা বাপি গ্রহণী মতা ।

তন্মাদয়ো প্রভৃষ্টেতু গ্রহণ্যপি প্রভৃষ্যতি ।

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা চতুর্বিধং অন্নপান মুণ্যুক্তং আমাশয়াৎ প্রচ্যুতং পকাশয়োপস্থিতং ধারয়তি। অর্থাৎ এই পিত্তধরা কলা, চতুর্বিধ [ চর্কা, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ] আহাৰ্য্য পদার্থ যখন আমাশয় হইতে বাহির হইয়া পকাশয়ে উপস্থিত হয়—তখন সেই সকল খাদ্য সম্যক পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত পিত্তধরা কলাই ধারণ করিয়া থাকে, পরে পরিপাক আহাৰের সারভাগ স্বরূপ যে রস, তাহা সমান-বায়ু কর্তৃক হৃদয়ে প্রেরিত হয় এবং গ্রহণীস্থিত অবশিষ্টাংশ মলজব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মলজবের জলীয় ভাগ বস্তিদেহে নীত হইয়া মূত্ররূপে পরিণত হয়। অবশিষ্ট কীটপুৰীষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই পুরীষ সমান বায়ুকর্তৃক মলাশয়ে (Large intestine) উপস্থিত হয়।

চরকও বলিয়াছেন—

অগ্নাধিষ্ঠান মনস্ত গ্রহণাদ্ গ্রহণী মতা ।

নাভেরুপরি সা হৃদয়ি বলোপস্তম্ব বৃংহিতা ।

অপকং ধারয়তান্নং পকং ত্যজতি চাপাধ্যঃ ॥

গ্রহণী অগ্নিব অধিষ্ঠান অন্নকে গ্রহণ করে বলিয়াই ইহার নাম “গ্রহণী”। ইহা নাভির উপরে অবস্থিত। অধিকন্তু ইহা পাচকাগ্নি ও বলের আশ্রয় স্বরূপ, ইহার কার্য্য অপক অন্নকে গ্রহণ করা এবং পক অন্নকে অধঃপ্রেরণ করা।

সুতরাং দেখা যাউতেছে—সমগ্র আয়ুর্বেদের প্রতিনিধি সূত্রত এবং চরক—উভয়েরই মতে—গ্রহণী পিত্তধরা-কলা অর্থাৎ পাচকাগ্নির স্থান। এই কলাকে আশ্রয় করিয়াই জীবের পরিপাক শক্তি “বৈজ্ঞানিকেরা”রূপে উদ্ভাসিত।

অন্ন গ্রহণ—গ্রহণীর প্রধান কার্য্য। এই কার্য্য আমাশয় ও পকাশয়ের অভ্যন্তরস্থিত শৈল্পিক-ঝিল্লির দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। এই শৈল্পিক ঝিল্লীতে Lacteals [ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রস বাহিনী শিরা ] এবং Portal vein এর সহযোগিতায় দ্বারা গৃহীত রস সমান-বায়ুর সাহায্যে হৃদয়ে নীত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিজ্ঞানেরই ইহাই অভিমত। কিন্তু ১২শ অঙ্গুলি পরিমিত Deodenumকে গ্রহণী বলিলে, চরক সূত্রতের কথার তাৎপৰ্য্যই থাকে না। কেননা, আমাশয় এবং পকাশয় এই উভয় স্থলেই ত অগ্নের পরিপাক এবং উভয় স্থল হইতেই ত অন্নরস গৃহীত হইয়া থাকে। যদি Deodenumএ পরিপাকের সমস্ত কার্য্যই হইত, এবং ইহা আহা-রের অসাধারণকৈ মল-মূত্ররূপে অধঃপ্রেরণ

কবিতা পারিত, তাহা হইলেও Deodenum  
কেননা হয় গ্রহণী বলিতে পারিতাম। অত-  
এব এতলে অনায়াসেই বলিতে পারি—  
Deodenum কখনই গ্রহণী নহে।

কেহ কেহ আমাশয়ের Pyoric প্রাপ্তকে  
গ্রহণী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ইহাও  
একটা গুরুতর প্রমাদ! কেননা, Pyloric  
প্রাপ্ত-পাচক পিত্তের আধার হইতে পারে  
না। চবক বলিয়াছেন—গ্রহণী অন্তরঙ্গ গ্রহণ  
করে। কেবল মাত্র Pyloric প্রাপ্ত হইতে  
একাংশ হয় না—সমস্ত আমাশয় এবং পকাশয়  
দ্বারা একাংশ হয়। থাকে। “গ্রহণী অপক  
অন্ন গ্রহণ করে এবং পক অন্নকে অধঃপ্রেরণ  
করে” —চবকের এই নির্দেশে আমরা বুঝিতে  
পারি—যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ন সম্যক পরিপাক

না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অন্নকে আমাশয়  
ও পকাশয়ের ঝিল্লীর সংস্পর্শে গ্রহণী ধারণ  
করিয়া রাখে। ইহাতে অন্ন গ্রহণীস্থ পাচ-  
কাগ্নির প্রভাবে পরিপাক পায় এবং পরি-  
পাকের পর সারাংশ গৃহীত ও অসারাংশ  
অধঃপ্রেরিত হইয়া থাকে। অতএব গ্রহণীর  
তিনটা কার্য—১। অপক অন্ন পরিপাক,  
২। সারাংশ গ্রহণ, ৩। অসাব ভাগকে  
অধঃপ্রেরণ। গ্রহণীতে যে বায়ু কার্য করে,  
তাহার নাম সমান বায়ু। যে ধমনী-মণ্ডলে  
সমান বায়ব কার্য প্রকাশ পায়—তাহার  
ইংরাজী নাম Solarplexus, — এই  
সোলার প্লেক্সসই গ্রহণীর অবস্থিতি স্থান।

ডাঃ শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

এম্, বি।

## বাল্য-বিবাহের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ।

—:~:—

বৈদিক যুগেব আশা সমাজে—নাবীগণ  
যৌবনাবস্থায় পরিণীতা হইতেন। তখন  
ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত—রমণীদের যুবতী সংজ্ঞা  
দেওয়া হইত।

বামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের যুগেও  
সমাজে যৌব-বিবাহ প্রচলিত ছিল। সাবিত্রী,  
দময়ন্তী, কণ্বিনী, শকুন্তলা প্রভৃতি প্রাচীন-  
অবলোকে—মহিলাগণ—পূর্ণ যৌবনে স্বামী-সঙ্গে  
সংগীত হইয়াছিলেন।

প্রথম দ্ব্যুত্তরযুগেও—যৌবন কালেই স্ত্রীলোক  
দের বিবাহ হইত। তবে তখন ধর্মশাস্ত্রকার-  
গণ—বয়সের একটা বাধাবোধ নিয়ম  
করিয়া রাখিয়াছিলেন। যথা,—

“ত্রিশবর্ষঃ ষোড়শাং ভাৰ্য্যাং বিন্দেত  
নয়িকাম্” ইহার অর্থ—ত্রিশ বৎসরের বর  
ষোড়শী কন্যাকে বিবাহ করিবে।

মহুর আমলে—কন্যার বিবাহের বয়স  
আরও কমিয়া গিয়াছিল। ষোল বৎসর,—  
বার বৎসরে নামিয়াছিল। মহুর উপদেশ—  
“ত্রিশবর্ষো বহেদ ভাৰ্য্যাং হুতাং ষাদশ  
বার্ষিকীং।” তখন ত্রিশ বৎসরের বর, বার  
বছরের কন্যাকে বিবাহ করিত।

ইহার পরবর্তী যুগে—শাস্ত্রকারগণের মত  
পরিবর্তিত হইয়াছিল। সমাজে বাল্য-বিবা-  
হের আদর বাড়িয়াছিল। এ সময় শাস্ত্র-  
কারগণও ব্যবস্থা দিয়াছিলেন—

“দশ-বর্ষাষ্ট বর্ষাবা ধর্ম্যে সীদতি সত্ত্বরঃ।

অতোহি প্রবৃত্তে রজসি কৃত্যং দত্ত্বাৎ পিতা সত্ত্বং।”

অর্থাৎ কৃত্যার দশবর্ষ কিম্বা আটবর্ষ বয়সে বিবাহ হইলে, সে গার্হস্থ্যধর্মের বিশেষ সহায় হইয়া থাকে। অতএব রজস্বলা হটবার পূর্বেই পিতা একবার মাত্র কৃত্যাদান করিবেন।

যৌবন-বিবাহ কিরূপে বালাবিবাহে পবিত্র হইয়াছিল, প্রবন্ধের সূচনাতে অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বিবাহ সম্বন্ধে—ঋষিগণের একরূপ মত-পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কি? হিন্দু বিবাহ-বন্ধন বড় কঠোর, অতি কঠিন; দম্পতিব মধ্যে একের মরণেও তাহা শিথিল হইবাব নহে। এ বন্ধন পরলোকেও অবিকল থাকে। এমন স্থলে কৃত্যার পক্ষে স্বয়ং পাত্র নির্বাচন করিয়া লওয়াই ত স্বাভাবিক, অভিভাবকের কথায় নির্ভর করিয়া একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির হস্তে চিরদিনের জন্য আশ্র-সমর্পণ—কখনই যুক্তি সম্মত হইতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় সেকালে স্বয়ম্বর বা গার্কর্য-বিবাহ সমাজে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কৃত্য-যুবতী না হইলে কেমন করিয়া এর পছন্দ করিবে! সুতরাং যৌবনাবস্থায় বিবাহ, দম্পতির জীবনে ভাবী সুখের হিসাবে—বৈধ। আট দশ বৎসরের কৃত্য—বর নির্বাচনের ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। অতএব বালা-বিবাহ প্রথা—সমাজে শুভকরী হইতে পারে না। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ধরিলেও—বালা-বিবাহ প্রণীর সমর্থন করা চলেনা। পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞান “আয়ুর্বেদে”ও বালা বিবাহের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেননা বালা বিবাহের বিষয় ফলে—সন্তান-সন্ততি অন্নায়ু হয়,

দম্পতির সংসার-সুখ ও অকাল-বার্দ্ধাক্যে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

তবে ত্রিকালদর্শী, সর্বজ্ঞ ঋষিগণ বালা-বিবাহের এত পক্ষপাতী হইলেন কেন? হিন্দু সমাজে, ক্রমশঃ বালা-বিবাহই বা প্রচলিত হইল কেন? ইহার কি কোনও উৎকৃষ্ট নাই? ইহার কি কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব—নিশ্চয়ই আছে। আর্ষ ঋষিগণ যে আট নয় দশ বৎসর বয়সে কৃত্যার বিবাহ দিবার দ্রষ্টব্য ব্যবস্থা দিয়াছেন,—শুধু ব্যবস্থা নহে—একরূপ বয়সে কৃত্যকে পাঠদ্বারা কবিত্তে না পারিলে, কৃত্যার পিতৃপুরুষের নরক-সম্ভাবনারও ভর দেখাইয়াছেন, শাস্ত্রের অমুশাসনকে কঠিন শপথ-গর্ভ করিয়া তুলিয়াছেন, নিশ্চয়ই ইহা কারণ আছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি সেই কাব্য-নির্ণয়েরই প্রয়াস পাইব। ইহাতে পাঠক-গণও বুঝিতে পারিবেন—নিশ্চয়োজনে ঋষিগণ কিছুই করেন নাই। তাঁহাদের সকল মতই “বৈজ্ঞানিক” যুক্তির উপর একলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—ভ্রান্ত, অন্ধ, মোহমুগ্ধ আমরা—সে কথা ভাবিয়া দেখিবারও চেষ্টা করি না।

যুক্তি তর্কের দ্বারা—ঋষি-বাক্যের ব্যাখ্যা করা উচিত কিনা?

আমি ত ঋষি-বাক্যের বৈজ্ঞানিক অর্থ আবিষ্কার করিতে বসিতেছি, কিন্তু আমার এ স্পর্ধা নিতান্তই অজ্ঞানোচিত। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যোগ-বলে বাঁধা বুঝিয়াছেন, যোগের অণুবীক্ষণে যে সকল স্বপ্ন তত্ত্ব দেখিয়াছেন, আমাদের মত ক্ষুদ্র কীটাপুঁক্ত তারা সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারে? এই কথাই মনে

ঋষি-সিদ্ধান্ত অবনত শিরে বরাবরই মানিয়া আসিতেছে । ঋষি-বাক্যে হিন্দুর কখনই সংশয় হইত না, ঋষিরা বাহা মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, হিন্দুব যুগান্তরের বিশ্বাস—সে মীমাংসা অনাপত্ত, অতর্কনীয়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা, তাহা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করা—প্রকৃত হিন্দুব পক্ষে মহাপাপ । যোগ বলে বলীয়ান-ঋষি—এমন অনেক অনুশাসন লিখিয়া গিয়াছেন, লৌকিক বিজ্ঞান বা যুক্তিতে তাহা বরহস্ত বৃষ্টিতে যাওয়া, কেবল মানবের ঝুঁটী মাত্র । তাই মানবধর্ম-শাস্ত্র প্রণেতা মনু বলিয়াছেন—

“হৈতুকান বক্রবৃত্তিঃশচ বাৎ মাত্রোগাপি

নার্কয়েৎ ।”

তাহা বা ঋষি-নির্গীত তত্ত্বের হেতু অনুসন্ধান করিলে, তাহা বা নাস্তিক ; তাহাদের সহিত কখনও কথা কহিও না । বাচস্পতি মিশ্র ইহা বৃষ্টিও দেখাইয়াছেন—“আর্থন্ত যোগিনাং বিজ্ঞানাং লোকাবুৎপাদনায়নালাং” যেমন অণুবীক্ষণের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যও বৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, চক্ষুচক্ষুতে তাহা দেখা যায় না, সেইরূপ ঋষিগণের যোগ-নেত্র-বৃষ্টি পদার্থ, মানবের দর্শনযোগ্য হইতে পারে না ।

তবে আশাব ঋষিবাক্যের বিজ্ঞান তত্ত্ব বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছি কেন ? ইহার উত্তর—এখন আর সেকাল নাই । এখন আমরা সভ্যতাগর্ভী হইয়া, আমাদের চিরচ-রিত ধর্ম-কর্মেরও বৈজ্ঞানিক যুক্তি জানিতে চাই । এখন যুগ ফিরিয়াছে, “কেন”র যুগ আসিয়াছে । অতএব বাল্য বিবাহের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আমি যে মপরাধা হইতেছি, পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিবেন ।

দেহে—বিষ প্রবাহ ।—তন্ত্র-শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে—“ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেববে” অর্থাৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে বাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের শরীরেও তাহা বর্তমান আছে । বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গিরি, নদী, বন, পর্ব্বত, উদ্ভিদ, জীব, বিষ, অমৃত, স্বর্গ, নরক, প্রভৃতি স্থূলরূপে বিরাজিত, আমাদের দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ গ্রহ-নক্ষত্রাদি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত । কথাটা আবার একটু স্পষ্ট করিয়া বলি । আমাদের চক্ষু ছাড়া, দেহ ব্রহ্মাণ্ডের চন্দ্র-সূর্য্য । জিহ্বা—জলময়ী নদী, জঠরানল—অগ্নি, কেশশাখ-লোম—উদ্ভিদ, অরণ্য মৃগাদির বিহার ক্ষেত্র, আমাদের কেশ ভূমিও উৎকুনাতির বিচরণ স্থান ;—এইরূপ সমস্ত বিষয়েই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহের সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন । বহির্জগতে যেমন অমৃত ও বিষ আছে, মানব দেহেও সেইরূপ অমৃত ও বিষের অস্তিত্ব আছে । মানবের নখাগ্রে ও দশনাগ্রে বিষের প্রভাব উত্তমরূপেই উপলব্ধি হইয়া থাকে । ইহা ভিন্ন—শরীরের রক্ত, মজ্জা, বসা, শুক্র, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, অশ্রু, ঘর্ম্ম—সমস্তই বিষ ।

“বিষস্ত বিষমৌষধং”—বিষের ঔষধ বিষ—একথা বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্তের কথা । পূর্ব্ববঙ্গের অনেক দেশে দেখা গিয়াছে—কেহ বিষ পান করিলে বিষ-বৈষ্য তাহাকে বিষ্ঠা খাওয়াইয়া দেন । আমাদের দেশেও দেখি-রাছি—কাহারও মুখমণ্ডলে ‘যুবানু পীড়কা’ বা ত্রণ হইলে, তাহাতে নাসিকার স্লেষ্মার প্রলেপ দেওয়া হয় । ইহাতে ২১ দিনের মধ্যেই পীড়কার ক্ষতি ও বেদনা কমিয়া যায় । দেখিলে বিষ না খাটিলে,—একপ উপকার কখনই হইত না ।

সেই বিষ বিশেষ অসাধু ব্যক্তির শরীরে “পাপ” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অসাধু শরীরের সেট পাপ আবার আলাপ, গাত্রস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন, ইত্যাদি কাৰণে অগরের দেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। এইরূপে অসাধু-শরীরের পাপসংসর্গ-কাৰীকে অসাধু কবিতা তোলে ; কমে সংসর্গ-কাৰী বিকৃত স্বভাব ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

সাধু শরীরেও একপ বিষ আছে, কিন্তু পুণ্যকর্মেব অমৃত সেচনে তাহা স্নিগ্ধ ও মৃদু-বীৰ্য হইয়া পড়ে, তাহা আবার অপর দেহে প্রবেশ কবিতা বিবক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারেনা।

অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কোন কোন ব্যক্তি কাহারও কাহারও সংসর্গে যেন জীর্ণ জীর্ণ হইয়া পড়ে। ইহাব কাৰণ আর কিছুই নহে—যাহার শরীরে বিব-প্রবাহ বেশী, তাহার সংস্পর্শে থাকিলে সংসর্গকারী ক্ষীণ-পুণ্য ও হৃত বল হইয়া যায়। কাহার শরীরে বিব-প্রবাহের আধিক্য আছে, আৰ্য্য ঋষিগণ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লক্ষণাদি দেখিয়া ইহা বুঝিতে পারিতেন। কাহার সংসর্গ কাহার সহ্য হইবে, কাহার বা সহ্য হইবে না, দেহের চিহ্ন দেখিয়াই তাঁহারা ইহাব নির্দেশ করিয়া দিতেন। বিবাহের পূর্বে—বর কন্ডার রাশি-বিচার, গণ-বিচার, লক্ষণালক্ষণ-বিচার প্রভৃতি বিষয় যিনি মনোযোগের সহিত আলোচনা করিবেন, তিনিই আৰ্য্যঋষির অভিজ্ঞতার প্রশংসা করিবেন।

এখন লোকে বর কন্ডার লক্ষণালক্ষণ কতকটা দেখে, বর-সদ্যকে কোনও বিচার করেনা। পূর্বে একরূপ ছিল না। তখন

কন্ডাপক্ষ বরের লক্ষণালক্ষণ দেখিতেন, বর পক্ষও কন্ডাকে যাচাই করিয়া লইতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র, সামুদ্রিকশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র—এই পরীক্ষা কার্যেব সহায়ক হইত।

এখন বরপক্ষ দেখেন—কন্ডাব দপ ও কন্ডার পিতার ঐশ্বর্য্যসম্পদ, আবার কন্ডাপক্ষ দেখেন—বরের পাশ বা ডিগ্রীব গোবদ। ইহাতে যে দেশেব শোচনীয় সর্বনাশ হইতেছে, বড় বড় বংশ ধ্বংসমুখে অগ্রসব হইতেছে, পুত্রকন্ডাব দাম্পত্য-জীবন বিষ-সম্বল হইয়া উঠিতেছে—স্বার্থমুখেবা তাহা ভাবিয়াও দেখিতেছে না।

বালিকা বিবাহের গুণ ও যুবতী বিবাহের দোষ।—যে সকল বমণীব দেহে বিষের প্রবাহ বেশী থাকিত, সেকালে তাহার “বিষকন্ডা” নামে অভিহিত হইত। বিষকন্ডাব সংসর্গে—পুরুষ জীর্ণশীর্ণ হইয়া প্রাণ হাবাইত। এ কথা পৃথক প্রকারে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এক্ষণে আবার বক্তব্য শেষ করিয়া যাই।

বিষকন্ডার দৌন্দৰ্য্যে আত্মহাবা হইয়া, অনেকেই তাহাদিগকে বিবাহ করিবার জন্ত লাগানিত হইত। ফলে এইরূপ বিবাহের বিষময় ফলে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইত। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্তই—আৰ্য্য ঋষিগণ বাণ্যবিবাহ-প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। যুবতীর দেহে বিষপ্রবাহের আধিক্য লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারা বালিকা অবস্থায় কন্ডার বিবাহ দিতে সমাজকে বারংবার উপদেশ দিয়া ছিলেন। সংক্রামক বিষ-দোষ হইতে পুরুষকে রক্ষা করিবার জন্তই—বালিকা-বিবাহের ব্যবস্থা। ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন—বালিকা অবস্থায় কন্ডাকে বিবাহ করিলে বিবাহের



ততটা সম্ভাবনা থাকিবে না । যেমন আধপক্ক  
মজার-সাব বিষতরুর বিষভক্ষণে, কথঞ্চিৎ  
ক্লেব হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে মৃত্যুর  
ভয় থাকে না । ক্রমশঃ অল্পপরিমাণ হইতে  
আবদ্ধ কবিতা পরে অধিক পরিমাণ আফিম  
অভ্যাস ও প্রযুক্ত ভক্ষণকারিকে মারিতে  
পারে না, সেই প্রকার যে বালিকার শরীরে  
দিয়েব অকুবোদগম হইয়াছে মাত্র,—সেই নব  
বিবাহিতা বালিকা-বধূব সংসর্গে তাহাব স্বামী  
বিষদোষ আক্রান্ত হয় না । যুবতী-বিবাহে  
এ সুবিধা নাই । যুবতী প্রবল বিষময়ী, পতি  
গৃহে আসিয়াই সে পতিকৈ আয়ত্ত করিয়া  
নেলে, বিবাহের কষ্টা হইলেও—সে ততটা  
লক্ষ্যশীল হয় না, সকলকে অতিক্রম করিয়া  
সে একেবারেই স্বামীর সহচরী হইয়া পড়ে ।  
কিন্তু বালিকা-বধূব এতটা স্বাধীনতা থাকেনা,  
লক্ষ্য জড়সর হইয়া—পতিগৃহে আসিয়া সে  
কিছু দিন কাহারও সঙ্গে তত কথাবার্তা  
কহে না, কষ্টাব মত স্নেহের পাত্রী ও আদ-  
বিশা হইয়া শান্তভীর কাছে কাছে থাকে,  
তাঁহাব কাছেই রাত্রে শোয়, দিবাভাগে ক্ষুদ্র  
ক্ষুদ্র গৃহকক্ষে রত থাকে । ক্রমে যত শব্দ  
বাড়িতে তাহার কক্ষক্ষেত্র বিস্তৃত হয় । সে  
শান্তভীকে রন্ধনকালে সাহায্য করে, স্বামীর  
ছাড়া-কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দেয়,—পাদ-  
প্রক্ষালনের জল রাখে, স্বামীর ভোজনান্তে  
উচ্ছিন্ন ভোজন করে । এইরূপে সেই বালি-  
কার শারীরিক উন্নতি অল্পে অল্পে তাহার  
স্বামীর সহ হইয়া যায় । প্রথম বিষের বেগ  
শব্দ-শান্তভী-নন্দী ও দেবর প্রভৃতি পরি-  
জনব সম্পর্কে অনেকটা সাধ্য লাভ করে,  
পতির দেহে প্রবেশ করিয়া আর ততটা  
বিকৃতি জন্মাইতে পারে না । প্রথম, অল্পে  
আবুদ্ধ—

অল্পে সহিয়া সহিয়া অভ্যস্ত হইয়া গেলে, শেষে  
শুক্রতর সংসর্গেও ততটা অনিষ্ট হয় না । বরং  
অহিফেনের মতই অভ্যস্ত ব্যক্তির দেহের  
উপকারই করিয়া থাকে ।

মানুষের শরীরগত উন্নতি বা তাড়িত শক্তি  
স্বভাবতঃ ইত্যন্তঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ।  
কিন্তু আলাপ-গাত্রস্পর্শাদি সংসর্গে পাপ  
নামক দৈহিক বিষ উক্ত তাড়িত-প্রবাহের  
সঙ্গে—এক দেহ হইতে অল্প দেহে প্রবিষ্ট  
হয় । এই জন্তই “প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে”র  
পতিত সংসর্গ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে—

আলাপাদ গাত্র সংস্পর্শানি স্বাসাং

সহ ভোজনাং ।

সহশয্যাসনাধ্যায়াং পাপং সংক্রমতে নুনাং ॥

পরস্পর আলাপ, গাত্র-স্পর্শ, নিঃশ্বাস,  
একত্র ভোজন, শয়ন, উপবেশন ও অধ্যয়ন—  
এই সকল কারণে এক দেহের পাপবৃত্তি অল্প  
দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে । দেবল ও পরা-  
শরের মতে—যাজন, অধ্যাপন, যৌন-সংসর্গ,  
যানারোহণ—ইত্যাদি কারণেও এক দেহ  
হইতে অল্প দেহে দোষ বা পাপ অল্প শরীরে  
সংক্রমিত হইয়া থাকে ।

জীলোকের রজঃনিঃস্রাবের সঙ্গে তাহার  
শরীর গতবিষ চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন হইতে  
থাকে, তখন তাহার সহিত অল্পমাত্র সংস্রবও  
ভয়ানক অনর্থের সৃষ্টি করে । এই জন্তই—  
ধর্ম-শাস্ত্রে রজঃস্রাব জীকে স্পর্শ করা মহাপাপ  
বলিয়া বর্ণিত । চরক সূত্রত প্রভৃতি বিজ্ঞান-  
চার্যগণও—রজঃস্রাব নারীর সংসর্গ হইতে  
পুরুষকে দূরে থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন ।

এই জন্তই রজঃপ্রবৃত্তির পূর্বে বালিকাকে  
বিবাহ করিবার ব্যবস্থা । শাস্ত্রের অনুশাসন  
—“যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহে পরিণত

ভাবে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়া থাকে, অতএব যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখ-শান্তিতে থাকিতে ইচ্ছা করে, সে কখনও বয়োধিকা-কন্ধ্যাব পানিপীড়ন করিবে না” \* “বর্ষা, মৃত, আর্ন্তবাদি দুখিকা বা বিষে কবাল কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্ত, নাবী-দেহস্থ বিষ প্রচলন ভাবে অক্লীবস্থায় থাকিতে থাকিতে বালিকা কন্ধ্যাকেই বিবাহ কবা উচিত।”

অনেক দেবীয়া-শুনিয়াই—লোক চরিত্রজ্ঞ, ধর্মতত্ত্বজ্ঞ, এবং শরীর তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এক-বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন—“অষ্টম, নবম ও দশম বর্ষ বয়স্ক বালিকাট বিবাহযোগ্য।”

এদিকে সামাজিক ব্যাপারের হিসাবে দেখিতে গেলেও—বালিকা বিবাহই প্রশস্ত মনে হয়। কেন না, পুষ্পবতী প্রমদার মানসিক চাঞ্চল্য অনিবার্য। স্নতবাং সে অবস্থায় তাহার। পঞ্চশরের পাড়নে উৎপথবর্তিনী হইয়া, পিতৃকুল কলুষিত করিতে পারে। অতএব রজঃপ্রবৃত্তির পূর্বেই বালিকাকে পাত্রসাং কবিলে, পিতামাতা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

যদি নিতান্ত ভদ্র কুলের কন্ধ্যা—লোক লজ্জায় এবং অশ্রান্ত কারণে, পুষ্পিতা হইয়াও উৎপথবর্তিনী না হয়, কিন্তু মানসিক কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় অস্বাভাবিক উপায়ে নিজের

আর্ন্তব জরায়ু মধ্যে নিহিত করিয়া, সংসেব অসংযোগে হংসীর অসার ডিম্ব প্রসবেব মত—সর্প-বৃশ্চিক-কুম্মাণ্ডাকৃতি বিকৃত-প্রসব জন্মাইতে পারে। একুপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব ও নহে। শারীর তত্ত্ববিদ অসাধারণ গণ্ডিত ভগবান সুশ্রুত অপ্রাকৃত গর্ভের যে আভাষ দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব জ্ঞান-গবেষনার বড়ই উজ্জল দৃষ্টান্ত। শাবীর স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আচার্য্য যে উপদেশ দিয়াছেন, পাঠকগণেব অবগতিব জন্ত নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

রজঃস্রাবা যা নারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে।  
পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুরুষমীহতে ॥  
যদানার্য্যাকুপেয়াতাং বৃষস্ত স্তো কথঞ্চন।  
মুক্সস্তো স্তুত্র মন্ত্রোহ্য মনস্বি স্তত্র জায়তে ॥  
ঋতুমানাতু যা নারী স্বপ্নে মৈথনমাচবেৎ।  
আর্ন্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং কবোতি হি ॥  
মাসি মাসি বিবর্দ্ধেত গর্ভিষ্ঠা গর্ভ লক্ষণং।  
কললং জায়তে তস্তা বর্জিতং পৈত্রিকৈ ওগৈঃ ॥  
সর্প-বৃশ্চিক কুম্মাণ্ড বিকৃতাকৃতম্শচ যে।  
গর্ভাশ্বেতে স্নিয়াদৈশ্চ জেয়াঃ পাপকৃতা ভূষণং ॥

অধিকন্তু, বালিকা অবস্থায় বিবাহ হইলে বধূকে শিক্ষাদ্বারা সুগঠিত করিয়া পতিকুলের অবস্থানুরূপ স্বভাবা করিয়া লইতে পারা যায়। অতএব যে দিক দিয়াই বিচার করুন না কেন, বালিকা বিবাহই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইবে।

শ্রীরাম সহায় কাব্যতীর্থ  
বেদান্ত শাস্ত্রী।

\* পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণের “বৈবাহিক বিজ্ঞান” পড়ুন।

## প্রার্থনা ।

সমুদ্র মন্থনকালে বিশ্বসংসারের হিতের  
জ্ঞেয় দেব, অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে বপুস্মান  
পদন্তর্য্য মূর্তিতে প্রাহুভূত হইয়াছিলেন, যিনি  
বিশ্বসংসারবেব অমঙ্গলময় বিষপান করিয়া  
শিবনাম ধাবণ করিয়াছেন সেই সর্বস্বত্ব দাতা  
সকলরোগ নিবাবক শিশুস্বরূপ আদিদেব  
পদন্তর্য্যকে নমস্কাব । হে দেব ! “ভেষজমসি”  
তুমিই ভবসংসারবেব ভেষজ স্বরূপ,—“ভেষজম্  
গণেশায়, পুষ্ণায় ভেষজম্” তুমি গো অশ্বাদি  
প্রাণীসকল এবং ষলুযাগণেব ভেষজ স্বরূপ,  
গোমাকে নমস্কার করি । “অধ্যাবোচদধি-  
বতা প্রথমো বৈদেগ ভিষক” তুমিই অধিবক্তা  
সম্পাদো তুমিই আয়ুর্ক্বেদ শাস্ত্রের উপদেশ  
দিয়াছিলে, অতএব আয়ুর্ক্বেদ গুরো !  
তোমাকে নমস্কার করি ।

দেব, বর্তমান বিপদে তুমিই আমাদের  
একমাত্র শরণ্য, তাই আমাদের হৃদয় তোমার  
জন্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে । আমরা  
বারম্বার তোমাকে অহ্বান করিতেছি, তুমি  
আমাদের পুত্র ও পৌত্র যুবা ও বৃদ্ধ, গো ও  
অশ্ব প্রভৃতি—আমাদিগকে রক্ষা কর ।

দেব ! “কালশচায়ং আয়ুর্ক্বেদোপ  
দেশ্যত” এষ্ট সেই আয়ুর্ক্বেদের উন্নতির যথার্থ  
কাল উপস্থিত হইয়াছে, এই ভারতবর্ষের  
বিশেষোটা প্রজার মধ্যে এমন একজনও  
নাই যে, তাহার দেহ কোন না কোন রোগে  
আক্রান্ত নয়, অন্ন, অজীর্ণ জ্বর যক্ষ্মা, ধাতু-  
দৌর্ব্বল্য, মেহ, মহামারী বিসৃচিকা প্রভৃতি  
কত প্রকারের ভীষণ রোগ সমূহ যে এই  
ভারতবর্ষে আবিভূত হইয়া ভারতবাসীর দেহ,

প্রাণ অকালে হরণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা  
করা যায় না ! একা এই বঙ্গদেশেই কেবল-  
মাত্র জ্বর রোগে বৎসর বৎসর অসংখ্য লোক  
মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে । উদরে অন্ন নাই  
পরিধানে বস্ত্র নাই, তার উপর এই সকল  
সাক্ষাৎ কৃতান্তেব অন্ত্রচর রূপ রোগের  
দৌবাঘ্যে লোক সমূহ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে,  
সম্বাদপত্রের বিজ্ঞাপন শুন্তুগুলিতে দেখিতে  
পাওয়া যায়, কেবল মাত্র ঔষধের বিজ্ঞাপনেই  
সম্বাদপত্র পরিপূর্ণ । যেন এদেশের লোক  
আর কোন কিছু চায় না, কেবল ঔষধ ঔষধ  
করিয়াই চারিদিকে চাঁৎকার করিতেছে । হে  
অমরাময়-নিমুদন, ভগবান, ধনন্তরি ! কি  
পাপে ভারতবাসীর একরূপ হুর্দ্দিন উপস্থিত  
হইল ! ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর পক্ষে একরূপ  
হুর্দ্দিন বুঝি আর কোন কালে হয় নাই ।  
এলাহাবাদ, পঞ্জাব, নর্ম্মদাতীর, দার্ক্জিলিং  
প্রভৃতি যে সকল পৃথিবীর সর্বোত্তম স্বাস্থ্যকর  
স্থান ছিল, যে সকল স্থানের মনুষ্যেরা  
পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দেহ ধারণ করিয়া  
যাবতীয় জাতির মধ্যে প্রধানতম বীর  
জাতীয় বলিয়া খ্যাত ছিল । সে সকল স্থান  
এক্ষণে সর্বপ্রকার ব্যাধির আবাসভূত হইয়া  
উঠিয়াছে । এবং সেই সকল স্থানের লোকেরা  
এক্ষণে নিজ নিজ দেহ ও প্রাণ লইয়া  
ব্যতিব্যস্ত । হে কাশিরাজ ! হে আদিদেব !  
ভারতবর্ষে প্রতিদিন যেরূপ লোকক্ষয় হই-  
তেছে, তাহাতে এক্ষণে ষণ্ড গ্রন্থ উপস্থিত  
হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । অতএব  
তুমি আবার জাগ্রত হও, জাগ্রত হইয়া

আবার ভারতবাসীকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগ-  
তত্ত্বের উপদেশ প্রদান কর।

করুণাময় ইংরেজরাজ ভারতবাসীর এই  
শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া সর্বতোভাবে  
ঘাহাতে ভারতবর্ষের রোগনিকর নিবারণ হয়  
এবং ভারতবাসী সুস্থ থাকে বিধিমত প্রকারে  
তাহার চেষ্টা করিতেছেন। রাজনৈতির  
চর্চা, শিক্ষা বিস্তারের চর্চা, শাসন-ব্যবস্থা  
প্রভৃতি রাজ্যের অপরাপর বিষয় চিন্তা করা  
অপেক্ষা প্রজার স্বাস্থ্যচিন্তা করা যে সর্বাগ্রে  
কর্তব্য, রাজা এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছেন, এই  
কারণে ম্যালেরিয়া-কমিশন প্লেগ-কমিশন,  
পালখনন, হেল্থ আফিসার নিয়োগ,  
প্রভৃতিতে প্রতিবৎসর অসংখ্য অসংখ্য মুদ্রা  
ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কোন উপায়  
উদ্ভাবন বা রোগাদি নিবারিত হইতেছে না।  
লক্ষ লক্ষ টাকা জলের স্থায় ব্যয় করিয়া রাজা  
কখনও স্থির করিতেছেন,—মূষিকের বাহুল্য  
প্লেগের কারণ,—মশকের দোরায়ে ম্যালেরিয়া  
রোগের বীজ সংক্রামিত হইতেছে বা গোময়ের  
ব্যবহারে রোগের উৎপত্তি হইতেছে, ইত্যাদি  
ইত্যাদি। এইরূপ বহুল পরিমাণে রোগ  
নিবারণের চর্চা হইতেছে, কিন্তু হৃৎকের বিষয়  
এপার্থ্যন্ত কিছু নিশ্চিত বা স্থির হইল না, বা  
হইতেছে না। মনুষ্যসাধ্য যতটা যত্ন ও চেষ্টা  
হইতে পারে রাজা তাহা করিতে পশ্চাৎপদ  
হইতেছেন না। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয়  
হইতেছে না, পরন্তু এত যত্ন, এত চেষ্টা, কিজন্ত  
ব্যর্থ হইতেছে,—কেন ফলোদয় হইতেছে না,  
এ প্রশ্নের উত্তর ভারতবাসী তুমি কি আজ  
দিতে পার? পার না ভারতবাসী,—তুমি যে  
এক্ষণে স্বাবলম্বন ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া,  
পুষ্টি বিনষ্ট করিয়াছ, সেই অর্থ সঞ্চরেই

আজি ব্যাধি ও বিপত্তি প্রাচুর্য্যবেব  
একমাত্র কারণ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসী  
আজি ইহা ভুলিয়া গিয়াছে।

অতএব হে ধনুস্তরি! তুমি আবার  
জাগ্রত হও, আবার তুমি “অহংহি ধনুস্তরি  
বাদিদেবো জরাকৃজোমৃতাহরোহমরাণাং”  
বলিয়া অনাথ-ভারতবাসীর হৃদয়কে আশ্বস্ত  
করিয়া তাহাদিগকে দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব,  
আয়ুতত্ত্ব ও আহারতত্ত্ব, ভেষজতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব  
ইত্যাদির উপদেশ দান কর। তুমি আবার  
বুঝাইয়া দাও যে, ধর্ম সহায় ব্যতীত কেবল  
মনুষ্যসাধ্য যত্নে দেহতত্ত্ব বা স্বাস্থ্যতত্ত্ব জ্ঞান-  
বার উপায় নাই। পরন্তু যাহারা “রজস্ত-  
মোভ্যাং নিমুক্তা স্তপোজ্ঞানস্তবলেন বে।  
যেবাং ত্রৈকাল মননং জ্ঞানমব্যাহতং সপা।  
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধান্তে তেবাং বাক্যমসংশয়ং।  
সতাং বক্ষ্যন্তি ত্বে কথবান্ নাসতাং নীরজ  
স্তমাঃ ॥ যাহারা জ্ঞান ও তপোবলে রজঃ ও  
তনোপ্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাহারা ভূত-  
ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ, সেই আশু  
পুরুষগণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা  
বলিয়াছেন, তাহাই সত্য। হে দেব! তুমি  
আবার দেশবাসিবর্গকে বুঝাইয়া দাও যে,  
বাহু জল বায়ু, বা বলকর আহার বিহারাদির  
দ্বারা কেবল নীরোগ হইতে পারা যায় না।  
পরন্তু সমুদয় স্বাস্থ্যের মূল কারণ ধর্ম ও সমুদয়  
রোগের মূল কারণ প্রজ্ঞাপরাধ বা অর্থ।  
এখনকার উচ্চ শিক্ষিতগণ বর্ণাশ্রমধর্ম, শৌচা-  
চার বা সদাচার প্রভৃতি রোগ নিবারণের  
কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু হে  
ধনুস্তরি, তুমি আবার বুঝাইয়া দাও যে, বর্ণজ-  
প্রথাই সংক্রামক রোগনিবৃত্তির প্রকৃত উপায়।  
সেই হইতেই সংক্রামক ব্যাধি নিবৃত্তি হয়।

শোচাশোচ ও সদাচার সেবনই দীর্ঘায়ুর মূল-  
কারণ ।

হে দেব ! তুমি আবার লোক সকলকে  
দুর্ভাগ্য দাও যে, "উৎপত্তিতে ব্যবস্তে চ যাত্ত-  
নানি কানিচিৎ । তাত্তবর্বাৎ কানিকতয়া  
নিষকনাত্ত নৃতানি চ" বেদ বহিষ্কৃত শাস্ত্র সকল  
নিষ্ফল ও তমোনিষ্ঠ । প্রাচীন কাল হইতে  
এ পর্যন্ত কি গ্রীক, কি রোম, কি মিসর কত  
দেশে কত প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্ভাবন  
ও লয় হইয়া গেল তাহা বলা যায় না । এক্ষণে  
সেই সকল শাস্ত্রের কার্যকারিতা আর নাই,  
তাহা বা সকলেই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে । পরন্তু  
আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অপরিবর্তিত ও  
নিত্যরূপে থাকিয়া তাহার কার্যকারিতা  
আজও সমানভাবে দেখাইয়া বেদের অপৌ-  
রুষেয়ত্ব প্রমাণ ও ঘোষণা করিতেছে । প্রাচীন  
কেন, বর্তমান কালের ও অন্ত্রাশ্র দেশের  
চিকিৎসা পুস্তক সকল ও তাহাদের অনুমোদিত  
ঔষধাদির বিচার কর, দেখিবে যে, আজ  
যাহাকে কার্যকর বলিয়া পুস্তক প্রণেতাগণ  
যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিতেছেন—কল্যা-  
ণ আবার তাহাদেরই স্বতন্ত্র যুক্তি বলেই তাহাই  
আবার নিষ্ফল ও অকিঞ্চিংকর বলিয়া নির্ণীত  
হইতেছে । কখনও বা যুক্তি বলে প্রমাণীকৃত  
হইতেছে—স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে শয্যা হইতে  
গাত্রোথান করা ভাল, প্রাতঃস্থান করা ভাল,  
শব্দাহ প্রথা ভাল, ক্যালামেল প্রয়োগ, রক্ত-  
মোক্ষণ ক্রিয়া, বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ  
ইত্যাদি ভাল, আবার হয়ত পরদিনেই যুক্তি  
বলে বুঝান হইতেছে যে, স্বর্ঘ্যোদয়ের পর  
গাত্রোথান করা ভাল । শব্দাহ অপেক্ষা  
সমাধি প্রথা ভাল । ক্যালামেল প্রয়োগ  
রক্তমোক্ষণ ক্রিয়ায়, দেহের অনিষ্ট করে অথবা

কুইনাইন অপেক্ষা ফেনাসিট-প্রয়োগে অর-  
আপ্ত নিবারণিত হয় । এইরূপ যুক্তিমূলক  
শাস্ত্রের অকিঞ্চিংকরতা দেখাইয়া হে দেব !  
তুমি লোক-সমাজকে দেখাইয়া দাও যে,  
আয়ুর্বেদ প্রতিপাত্ত-স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগতত্ত্বই  
যথার্থ সত্য । কিন্তু একালে আর সে ব্রহ্মচর্যা  
নাই, সে তপস্তা নাই প্রকৃত সে বর্ণাশ্রমধর্ম  
নাই, বাহাতে লোকে বেদ-বাণীর বাথার্থ্য  
উপলব্ধি করিয়া তন্মতানুবর্তী হইবে, এক্ষণে  
তমোগুণের আতিশয্য হেতু জনপদোদ্ধবংশীয়  
কারণ সমূহের অনুশীলনে সমাজ দিন দিন  
অগ্রসর হইতেছে, পূজাপূজা-ব্যতিক্রম সমাজের  
এক্ষণে যশ ও গৌরবের কারণ হইয়াছে, জীবন্ত  
দেবতা মাতা-পিতাকে বা স্নেহাস্পদ ভ্রাতা-  
ভগ্নিকে অন্ন বা আশ্রয় দেওয়া কর্তব্য বলিয়া  
লোক আর মনে করেনা । সত্বগুণের আধার  
দেবতা, ব্রাহ্মণ সমাজে আর পূজা পায়না,  
নিতান্ত আত্মরিক ভাবে উন্নত হইয়া সমাজ  
এক্ষণে সত্বগুণের দ্বারা কিছু বিপরীত, জন-  
পদোদ্ধবংশের যত কিছু কারণ,—সেই সকলের  
অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছে । শাঠ্য ও কাপট্য,  
লালচ্য প্রভৃতি এখন সমাজের ভূষণ স্বরূপ  
ব্যাপৃত রহিয়াছে ! পবিত্র চন্দনের পরিবর্তে  
অপবিত্র দ্রব্যসকল অঙ্গে লেপন করিয়া সমাজ  
এক্ষণে নিজেকে পবিত্র মনে করিতেছে । বিধ-  
পত্র বা তুলসী পত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া  
সমাজ এক্ষণে ক্রোটন রোপিত করিয়া ভ্রাতা-  
শনের শোভা বাড়াইতেছে । হৃদ ও স্বতন্ত্র  
উপর তাহার দিন দিন অশ্রদ্ধা বাড়িতেছে ।  
এমন এক তরঙ্গ আসিয়াছে যে, তাহার  
প্রভাবে কে প্রকৃত আত্মীয়, কে প্রকৃত পুত্র,  
এক্ষণে সে তাহা চিনিতে পারিতেছে না । সমাজ  
এক্ষণে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তে বাধ্যতামূলক

সমুঃ গাভী হৃৎ অপেক্ষা বৈদেশিক পর্য্যবিত  
জমাট ফুগে তাহার বড়ই আদর, নারিকেল  
জলের পরিবর্তে সোড়াওয়াটার তাহার অধিক-  
তর প্রিয় বস্তু হইয়াছে। হস্ত যুক্তিকা ও তৈল  
মর্দনের পরিবর্তে সে সাবানের উপকারিতা  
বুঝিয়াছে, পিতল বা কাঁসার বাসনের পরি-  
বর্তে সে কাঁচের বা লোহার (এনামেলের)  
বাসনের আদর করে, গোময়ের পরিবর্তে সে  
ফেনাইনকে ভাল বলে। ফলতঃ যাঁহা কিছু  
সাস্থিক বা পবিত্র—সকলই তাহার চক্ষে এক্ষণে  
বিষবৎ প্রতীত হইতেছে। সুতরাং জনপদ  
ধ্বংসীয় কারণ সমূহের একত্র সমাবেশেব  
আর বাকী কি রহিয়াছে, সকলই পূর্ণ মাত্রায়  
প্রকাশ পাইয়াছে।

অতএব হে দেব! হে সর্কাময় নিয়দন!  
তুমি আবার জাগ্রত হও, আবির্ভূত হও, তুমি  
আবার ভারত বানীর কর্ণকূহেবে বেদমন্ত্রের  
অমৃতময় ধারা ঢালিয়া দিয়া তাহাদেব অন্ধ-  
কারময় অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের উজ্জল  
আলোক জালিয়া দাও শান্তিময় গন্তব্য পথ  
দেখাইয়া দাও, এবং বুঝাইয়া দাও যে, সত্ত্ব,  
রজঃ, তম যেমন তিনই আত্মার গুণ, তদ্রূপ  
বায়ু, পিত্ত, কফ—এই তিনই আয়ুষ্করের মূল,  
এই তিনেরই বিষমাবস্থায় সমুদয় রোগের  
উৎপত্তি, অতএব এই তিনেরই প্রতি লক্ষ্য  
রাখিয়া আমাদের আহাৰ্য্য-বিচার ও ঔষধ-  
বিচার করিতে হইবে, কিন্তু এক্ষণকার সমাজে  
এই সকল সূক্ষ্মতম তত্ত্ব ধারণা করিবার  
সামর্থ্যই বা কোথায়? কাল, বুদ্ধি ও ইচ্ছা-  
র্থের যোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ যে সমুদয়  
রোগোৎপত্তির হেতু, মানব সমাজের অধর্মেই  
যে, হৃদা, চক্ষু, জল, বায়ু, ওষধি বনস্পতি  
প্রভৃতি সমুদয় বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, এই লক্ষণ

যে মনোময়, রোগের যে সাধ্যাত্ম অসাধ্যাত্ম ও  
যাপ্যাত্ম আছে, কতকগুলি রোগ যে, পূর্নজন্ম  
কৃত কর্মজ, কতকগুলি যে ইহজন্মজ বা অতি-  
শাপাদি জনিত, কাল যে রোগ আরোগ্য বা  
রোগ প্রবর্তনের প্রধান কারণ,—সকলে  
বাহাতে আমরা বিশদ রূপে উক্ত সূক্ষ্মতম তত্ত্ব  
সকল বুঝিতে পারি, হে ভগবন! তুমি আমা-  
দিগকে প্রতি সেই শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর।  
যে দেশের জল বায়ুতে যে বোগ জন্মে,  
সেই দেশের ওষধি-বনস্পতিতে সেই বোগ  
আরোগ্য হয়, বেদান্তমোদিত পথো বাহাদেব  
আহার বিহার স্নান, পান ও আচার-ব্যবহা-  
রাদি সম্পন্ন হয়, মান পান আহার বিহারাদির  
সময় নিশ্চিত করিয়া আমরা যে আয়ুর্বেদেব  
রূপায় জীবন যাত্রা নির্বাহ করি, সেই আয়ু-  
র্বেদ উপর নির্ভর করিয়া আমাদের রোগযাত্রা  
নির্বাহ করাও উচিত, এই তথ্য হে দেব!  
আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, হে দেব! এই  
সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে—বাহাতে তোমার  
উপদিষ্ট স্বাস্থ্যের তত্ত্ব, আহাৰ তত্ত্ব, দ্রব্য তত্ত্ব,  
কোমাব তত্ত্ব, শল্য শাস্ত্র, অগ্ন্যতত্ত্ব প্রভৃতি  
অষ্টাঙ্গের বিচার হয়। অতএব তুমি আবার  
জাগ্রত হও, ভারতবাসী তোমাকে নতশিরে  
বারম্বার নমস্কার করিতেছে, তুমিই ভারতের  
আদিগুরু, ভারতবাসী তোমার শরণাপন্ন  
হইতেছে, দেশরক্ষকগণ দেশের হিতার্থে যত্ন-  
বান হইয়া, স্বাস্থ্যতত্ত্বদেবী হইয়া রোগ নিবা-  
রণোপায় সকল আবিষ্কারে যত্নবান হইয়াছেন,  
এ সময়ে হে ধর্মসুত্রি! তুমি আমাদের বুদ্ধিগত  
করিয়া তোমার বেদবানী সকল প্রচার পূর্বক  
আমাদিগকে রোগ শোক, পাপ-তাপ হইতে  
পরিত্রাণ কর,—এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীবারাণসীনাথ গুপ্ত

বৈষ্ণবতন্ত্র, ভিষগাচার্য্য।

ভূতপূর্ব "বৈষ্ণব সঙ্গীত" সম্পাদক।

## ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় ।

—:—

ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে ছিলনা, ইহা  
কিরূপভাবে আমাদের কাছে আক্রমণ করিল,  
তাঁহাও তথ্যও কেহ বলিতে পারেন। ১৮০৪  
খৃঃাব্দে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে এই  
রোগের প্রথম আবির্ভাব হয়। তাহার ২০  
বৎসর পবে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম  
বায় প্রতিষ্ঠিত যশোহর জেলার মহম্মদপুর  
ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত প্রায় হইয়াছিল  
—ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্তে জানিতে পারা যায়।  
ঐ আক্রমণে মহম্মদপুরের পাঁচ হাজার লোক  
কাল-কবলিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই  
বাঙ্গলাদেশে লোক ম্যালেরিয়ার নাম ভাল  
করিয়া জানিতে পারে। মহম্মদপুর ধ্বংসপ্রায়  
করিয়া নলডাঙ্গা, গদখালি প্রভৃতি যশোহরের  
চিরা নদীর উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির লোক  
ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী নদীয়ায়  
প্রবেশ করিল। এই সময় উলা বা বীরনগরের  
১০০০ লোক ইহাও ভাগ্যমানে একই সঙ্গে  
মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

তাঁহা পর ২৪ পরগণায় ইহার প্রভাব—  
বিস্তারও বড় কম হইল না। কাচড়াপাড়ার  
লোক সংখ্যা ৩০০০ এর মধ্যে ১৩৫৫ জন  
ইহাও আক্রমণে কাল-কবলিত হইল। ১৮৫৭  
সালে নৈহাট ও হালিসহর গ্রাম দুইখানি  
ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল।  
১৮৬১ সালে হুগলি নিবাসীগণ ইহার প্রকট  
মূর্তি নিরীক্ষণ করিল। হুগলি জেলার  
ত্রিবেণীতে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়া দার-  
বাসিনী আক্রমণ পূর্বক বারাসত অধিকার  
করিল।

ইহার কয়েক বৎসর পবে ১৮৬৫ খৃঃাব্দে  
কাঁটোয়া, মেহেরপুর এবং গোবরডাঙ্গার  
লোকে ইহার তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া  
ম্যালেরিয়া কি—জানিতে পারিল। ক্রমে  
সমগ্র বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া—সকল রোগকে  
ছাড়াইয়া উঠিয়া স্বীয় আধিপত্য প্রবলভাবে  
বিস্তার করিতে সমর্থ হইল।

এই ম্যালেরিয়া কি এবং কি কারণে  
বাঙ্গলাদেশে অবাধ আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ  
হইল, এইবার সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা  
করা যাউক।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন,  
“ম্যালেরিয়া জীবাণু পরকর উদ্ভিদ শ্রেণীর  
অন্তর্গত।” ১৮৮০ খৃঃাব্দে ফরাসী দেশীয়  
ডাক্তার ল্যাভেরণ অম্বুবীক্ষণ দ্বারা ম্যালেরিয়া-  
ক্রান্ত রোগীর শোণিতে এই জীবাণু সকল  
অবলোকন করেন। তাহার পর ১৮৯৭ খৃঃ-  
াব্দে ডাক্তার ম্যানসন মশক হইতে এ জীবাণু  
সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে—এ কথা দেশ  
মধ্যে প্রচার করেন। ১৮৯৯ খৃঃাব্দে  
ডাক্তার ‘রস’ও এই মতের পোষকতা  
করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন যে,  
মশক—নর শোণিত হইতে জীবাণু গ্রহণ উদ্-  
বৃত্ত করিয়া জীবাণু সকল নরদেহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত  
করিয়া জীবকোরক রূপে মশকের ছেলের  
গোড়ায় বংশ বিস্তার করিতেছে।

ইটালীতে যখন ম্যালেরিয়া বিস্তৃত হইয়া  
পড়িল, তখন ‘লো’ এবং ‘সামবিল’ নামক দুই-  
জন ডাক্তার মশকের আক্রমণ হইতে অব্যাহত  
থাকিবার জন্য লোহ-জলের জল প্রস্তুত

বাড়ীতে অবস্থিত পূর্বক ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। করমোসা দ্বীপে ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতিকালে জাপান গবর্ণ-মেন্ট মশক-দংশনেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয় কিনা—ইহা নির্ণয় করিবার জন্ত ঐ দ্বীপে দুই দল সৈন্ত প্রেরণ করেন। একদল ইটালিতে ডাক্তার 'লো'য়ের মত—ঘেরা-যায়গায় বাস করিয়াছিল, আর একদলের লোকের মশক হইতে অব্যাহতি পাঠিবার জন্ত কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। উভয় সৈন্তই ১৬ দিন কাল ঐরূপভাবে অবস্থান কবে। ফলে যাহারা জালদার ঘেরা স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহাদের কাহারও ম্যালেরিয়াজর হয় নাই, অন্যদলের ২৫৯ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল।

আমাদের বাঙালা দেশে ম্যালেরিয়ার আধিক্যের কারণ যে আমরাই উপস্থিত করিয়াছি, ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। যে মশক হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, সে মশক-ধ্বংসের জন্ত আমাদেরই কোনরূপই চেষ্টা নাই। আগে আমাদের দেশে প্রকৃতির বিকৃতি ভাব পরিলক্ষিত হইতনা, সময়ে বৃষ্টি হইত, সে বৃষ্টিরফলে পল্লী-পথের আবর্জনা সকল উত্তমরূপে ধৌত হইয়া পল্লীভূমির লোকসকল স্থানগুলি হইতে প্রাস্তর ভূমিতে চলিয়া যাইত, ফলে সময়ের সুবৃষ্টি হইতেই পল্লীগ্রামের জল-নিকাশের কার্য সম্পন্ন হইত। এখন সময়ে ও সুবৃষ্টি হয় না, জল-নিকাশের সুবন্দোবস্ত করিবারও আমাদের মতিগতি নাই। দেশে মশক বংশের বৃদ্ধি এই জন্তই হইতেছে, এবং ম্যালেরিয়ারও প্রাদুর্ভাব বিলক্ষণ বাড়িয়াছে। ইসম্যাগিয়া এবং সুইটহেম বন্দরে এই জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়াই ম্যালেরিয়ার

আক্রমণ হইতে সে অঞ্চলের লোক রক্ষা পাইয়াছিল। ১৯০২ সালে ইসম্যাগিয়াতে ১৫৫১ জন ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হয়। জলনিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া ১৯০৫ সালে ৩৭ জনেব বেনী ম্যালেরিয়াক্রান্ত বোগী সেখানে দেখা যায় নাই। ক্র্যাং এবং সুইটেন হামে ১৯০১ সালে ৩১০ জন ম্যালেরিয়া বোগী দেখা যায়, ১৯০৫ সালে ঐরূপ চেষ্টায় ২৩ জনের অধিক ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয় নাই। হংকংয়ে ১৯০১ সালে ১২৯৪ জন ম্যালেরিয়া বোগী ছিল, ১৯০৫ সালে জলনিকাশের বন্দোবস্ত ফলে ৪১৯ জন মাত্র ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়াছিল জানিতে পারা যায়। জল-নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া ইটালি, হল্যান্ড, আল-জিরিয়া এবং আমেরিকার অনেক স্থানই স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। আমাদের সে চেষ্টা নাই, আমরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী ছাড়িয়া সহরে আবাসস্থান নির্ণয় করিলেই কর্তব্য সাধিত হইল বলিয়া মনে করি, সুতরাং আমাদের দেশ হইতে ম্যালেরিয়া নষ্ট হইবে কি করিয়া? ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিতে হইলে জল-নিকাশের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কোন পল্লীই যাহাতে বনবহল হইয়া মশক বৃদ্ধির কারণ উপস্থিত করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাড়ীর নিকটে যে সকল ডোবা বা গর্ত আছে, তাহা বুজাইয়া ফেলিতে হইবে, জলাশয় গুলি যাহাতে কলুষিত না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা তিন মশক ধ্বংস হইতে অব্যাহত থাকিবার জন্ত সন্ধ্যার পর নগ্নপায়ে থাকা হইবে না, জামা বা কাপড় পরে নিয়া এবং শয়ন কালে মশারি পাটাইয়া দেহকে ব্যবস্থা করিতে হইবে।



হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘরের জানালাগুলি  
ভাব দ্বারা ঘিরিয়া লইলে ভাল হয় ।

ইহা ভিন্ন সন্ধ্যাকালে গৃহমধ্যে ধূপ-ধূনা  
দিবার ব্যবস্থা যাহা আমাদের বরাবর চলিয়া  
আসিত, এখন অনেক গৃহস্থ তাহা তুলিয়া যাই-  
লেও নতুন করিয়া আবার তাহার প্রবর্তন  
কবিত্তে হইবে । ধূপ-ধূনার গন্ধ মশকগণ  
সহ্য করিতে পারেনা । ইহা বোধ হয় সক-  
লেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ।

হিন্দু সংসারে আগে তুলসী এবং কৃষ্ণচূড়া  
ফুলের গাছ যতপূর্ব্বক পুঁতিয়া রাখা হইত ।  
ইহা বা রস টানিয়া স্ত্রী-পুংসেতে জমি শুক করে  
বলিয়া ইহাদিগকে পুঁতিয়া রাখায় হিন্দুসন্তান  
ধর্ম্ম ভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষার স্বথও অনুভব করিতে  
সক্ষম হইত । এখন এ প্রথাও দেশ হইতে  
বিলুপ্ত । কিন্তু ম্যালেরিয়া হইতে নিষ্কৃতি  
পাইতে হইলে আবার সে প্রথা প্রচলিত  
কবিত্তে হইবে ।

ম্যালেরিয়ায় আক্রমণ হইতে রক্ষা পাই-  
বার জন্য আরও কতকগুলি নিয়ম পালন

করিবার প্রয়োজন । শরন-ঘরে খাট-পালঙ্ক  
তক্তাপোষ ভিন্ন আর কিছুই রাখা হইবে না ।  
আলনা-বাল্ম-সিন্দুক, এ সকল অস্ত্র ঘরে  
রাখাই প্রশস্ত । তরকারি, গুড় এবং স্নাত-  
তৈলাদির ভাণ্ডও শয়ন-গৃহ হইতে তক্ষাৎ  
করিতে হইবে । সাবান মর্দনে অঙ্গ পরি-  
ষ্কারের ব্যবস্থাটি ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালী-  
সন্তানকে আবার তৈল মর্দনে অভ্যস্ত হইবে ।  
দেহের লঘুতা সম্পাদক, স্বকের স্বাস্থ্যরক্ষক,  
বাতশ্লেষ্মকনাশক—তৈলের মত একরূপ আর  
একটি দ্রব্যও নাই আমরা এই তৈলের ব্যবহার  
এখন যে তুলিয়াছি, ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে  
রক্ষা পাইবার জন্য আবার তাহার প্রচলন  
করিতে হইবে । বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও স্থির  
করিয়াছেন, উত্তমরূপে তৈল মর্দনকারী  
ব্যক্তিদিগের ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অনেক  
কম হইয়া থাকে । কিন্তু দেশের বেকরুপ কৃষি-  
বিপণীয় ঘটনাছে, তাহাতে এ সকল যুক্তি  
কেহ শুনিবেন কি !

## পরিপাক ।

অগ্নি আহার পরিপাক করে, আহার না  
পাইলে দোষ পরিপাক করে, খাত্তর অভাবে  
প্রাণ পরিপাক করে । ১ম আহার পরিপাক,  
২য় দোষ পরিপাক, ৩য় খাত্ত পরিপাক,  
৪র্থ প্রাণ পরিপাক ।

আহার পরিপাক অর্থাৎ আমরা যে ভাত,  
দাল, শাক, মাছ প্রভৃতি খাত্ত গ্রহণ করিয়া  
খাকি, তাহার আমাদের পাচক অগ্নির  
সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া রসে পরিণত হয় ।

তখন ঐ খাত্ত সকলের ভাব, রস, অঙ্গ,  
প্রভৃতি বর্ণ, লব্ধা, গোল, চ্যাপ্টা প্রভৃতি  
আকৃতি, কটু তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি রস সমস্তই  
পরিবর্তিত হইয়া যায় । কারণ রস প্রভৃতি  
ভিন্ন গতিশীল মধুর ভূমিষ্ট দ্রব্য ।

ঐ রস আহার পরিপাকতা ভাঙে কঠিন  
রস, মাংস, বেদ, অস্থি, হৃদয় ও ত্তক মাংস  
প্রভৃতি পরিবর্তিত পরীক্ষায় রস অম্ল প্রভৃতি  
পরিণত হইয়া যায় । রস, মাংস, বেদ, অস্থি

প্রভৃতি ধাতু সকল রস হইতে পৃথক পদার্থ ও তাহাদের একটা অপরটার সহিত সমজাতীয় নহে। তবেই দেখা যাইতেছে যে ভোমা, আপ্য, বায়বা, তৈজস ও নাভস এই পঞ্চ অগ্নির সাহায্যে, ভোম, আপ্য, তৈজস প্রভৃতি পঞ্চবিধ আহাৰ্য্য পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া রসে ও ধাতুতে পরিণত হয়, সেই যে প্রক্রিয়া-বলে আহাৰ্য্যের এই পরিণতি সুসম্পন্ন হয়, তাহাকে আহাৰ্য্য পরিপাক কহে।

আহাৰ্য্য পদার্থ পরিপাক হইলে, তাহা আর শরীরে বাহ্য পদার্থ রূপে বর্তমান থাকে না, তখন তাহারা শারীর-পদার্থের সহিত সম্পূর্ণভাবে এক হইয়া যায়। আহাৰ্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে শরীরে যে লক্ষণ উৎপন্ন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। যথা—

উদগার শুদ্ধিঃ সাহোবেগোৎসর্গ যথোচিত।

লঘুতা ক্ষুৎপিপাসা চ জীর্ণাহারণ্য লক্ষণম্॥

( ইতি ভাব )

উদগার শুদ্ধি ( ধূমোদগার বা আহাৰ্য্য জ্বয়ের গন্ধোন্মাদ বিবৰ্জিত উদগার ) শরীরের প্রশস্ততা অর্থাৎ চক্ষু ও মুখের বর্ণ ও স্বরের স্বাভাবিক ভাব। মনের প্রশস্ত ভাব বা সুখীভাব, মলমূত্রাদির যথোচিত প্রবর্তন, দেহের লঘুতা ক্ষুধা ও পিপাসা রোধ হইলে ভুক্তাহার জীর্ণ হইয়াছে বুঝা যায়।

**দোষ পরিপাক।**—দোষ অর্থে বায়ু পিত্ত কফ। নানারূপ অহিতকর দ্রব্য যথা, অতি গুরু অর্থে অজীর্ণকর দ্রব্য, অতি মৃদু বাহাতে বেশী পরিমাণ দ্রুত তৈল আছে—এমন পদার্থ, অতি শীতল, অতি উষ্ণ দ্রব্য। পচা দ্রব্য অপরিষ্কার দ্রব্য। ধূলা, ধূস, বিষ বাস্প, হাস, বসন্ত, কলেরা, মেলেরিয়া প্রভৃতি

জীবাণু, পান-ভোজন-খাস গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা বাহ্যজগত হইতে শরীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্রূপ দোষ সকলকে অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত ও বিকৃত করে। ঐ সমস্ত দূষিত পদার্থসমূহ-সংশ্লিষ্ট দোষই অশেদ প্রকার পীড়ার কারণ। এখন আমাদের শারীর-প্রকৃতি যে প্রক্রিয়া দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ হইতে ঐ সমস্ত দূষিত পদার্থকে পৃথক করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় বাহ্যজগতে নিক্ষেপ করে, সেই প্রক্রিয়াকে দোষ-পরিপাক-ক্রিয়া কহে। এই বিক্ষেপ কার্য্য ফুসফুস, যেননাভী, মূত্রগ্রন্থি, মলভাণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে সেইজন্ত ঐ যন্ত্র সকলকে সংশোধন যন্ত্র ও বলা যাইতে পারে।

দোষ পরিপাকের লক্ষণ-যথা—

দোষ প্রকৃতি বৈকল্যং লঘুতা দেহয়োঃ।

ইন্দ্রিয়নাথ বৈমল্যঃ মলানাং পাক লক্ষণম্।  
দূষিত বায়ুপিত্ত কফের যে প্রকৃতি, তাহার বিপরীত ভাব হইলে অর্থাৎ বায়ু দূষিত হইলে যেমন কম্প, মুখশোষ গাত্র-বেদনা উপস্থিত হয়, পিত্ত দূষিত হইলে যেমন শরীর উষ্ণ হয়, দাহ, পিপাসা, বম্ব, দেহে ক্ষত—প্রভৃতির উৎপত্তি হয়; দূষিত কফের প্রকৃতি যেমন শরীর ভার হওয়া ক্ষুধাহারিত্য, অরুচি, বাস, সর্দি প্রভৃতি দেখা দেওয়া—এই সমস্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অরের প্রশস্ত হইলে ইন্দ্রিয়সমূহের বিমলতা হইলে, অর্থাৎ চক্ষের লালবর্ণতা, পীতবর্ণতা ও গুরুবর্ণতা না থাকিলে চক্ষের দৃষ্টি পরিষ্কার হইলে, কর্ণে কোন অস্বাভাবিক শব্দ প্রভৃতি না থাকিলে বা শব্দবোধ্য পরিষ্কার না হইলে—শ্রবণে কোন মলনা ন

হইলে, তাকে ওড় ওড় শিড় শিড় অল্পভূতি না হইলে, স্পর্শশক্তি অব্যাহত থাকিলে, দোষ পরিপাক হইয়াছে জানিবে ।

ধাতু পরিপাক । জীবগণের নিমেষ, উন্মেষ, ধাবন, কুর্দন, হাসন, ভাষন উত্থান, পতন, চিস্তন, প্রভৃতি কার্য্যে পক্কভূত সব যোগ্যপন্ন বস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি ধাতুগণ অনবরত ক্ষয় হইতেছে । অর্থাৎ ঐ সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা তাহারা পুনরায় ক্ষিপাত্তেজ, মরুদেশ রূপে পরিণত হইয়া বায়ু জগতস্থ বজ্রাতীয়া গণের সহিত মিলিয়া যাইতেছে । যে প্রক্রিয়া বলে ঐকপ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহাকে ধাতুপাক ক্রিয়া কহে । ধাতু পরিপাক ক্রিয়া যে সকল সময়েই শরীর প্রকৃতির প্রতিকূলতা কবে, তাহা নহে, বরং অনেক সময় ইহার অল্পকালতাই করিয়া থাকে । এইরূপ পরিপাক ক্রিয়া-বলে শরীর হইতে ধাতুগণ অনবরত বহির্গমন করিতেছে বলিয়াই আহাব পরিপাক ক্রিয়া বলে তাহারা পুনরায় সৃষ্ট হইয়া দেহ ধারণ করিতেছে । এইরূপ ক্ষয় কার্য্য না হইলে পূরণ কার্য্য হয় না । ক্ষয় ও পূরণ এই দুই প্রক্রিয়ার উপরই প্রাণ শক্তিব ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে । ইহা-দেব একের ক্রিয়ার উপরেই অন্নের ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে, একের অভাবে অন্নের বিকাশ

অসম্ভব । কিন্তু যখন এই দুই ক্রিয়ার সাম-  
গ্র্য লোপ পায়, অর্থাৎ পূরণ অপেক্ষা ক্ষয়  
বেশী হয়, অথবা ক্ষয় অপেক্ষা পূরণ বেশী হয়,  
তখনই শরীর অস্থস্থ হইয়া উঠে । এইরূপ  
ধাতু পাককে লক্ষ্য করিয়া এখানে ধাতু  
পাকশব্দ লিখিত হইয়াছে । নিম্নে ইহার  
লক্ষণ লেখা যাইতেছে, যথা—

“নিদ্রা নাশঃ হৃদিতস্তো বিষ্টস্ত গোরবারুচি ।

অরতির্কল হানিচ্চ ধাতুনাম পাক লক্ষণম” ॥

নিদ্রা নাশ হয়, হৃদয় স্তম্ভিত হয় অর্থাৎ হৃৎ-  
পিণ্ডের স্পন্দন অল্প হইয়া যায়, উদরের বিষ্টস্ত  
হয় । বল হ্রাস বশতঃ পরিপাক অল্প হইয়া  
যায়, তাহাতে পেট ফাঁপিয়া থাকে এবং  
পেটের ভিতরকার বায়ু নিঃসরণ হয়না ।  
শরীর ভার হয় অর্থাৎ বলক্ষয় জন্ম বোগী  
নিজ শরীরকে সফলিত করিতে কষ্ট বোধ  
করে বলিয়াই তাহাকে ভারী বলিয়া বোধ  
করে । বস্তুতঃ তাহার শরীর ক্ষয় জন্ম লঘুই  
হয় । তাহার অরতি হয় অর্থাৎ কোন বিষয়েই  
তাহার ভাল ইচ্ছা বোধ হয় না ও বলক্ষয় হয়  
এবং দৃষ্টিশক্তি, আবাদশক্তি, ভ্রাণশক্তি  
অন্নপাকশক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তির ক্ষয়বশতঃ  
তাহার দৈহিক কোন কার্য্যই সুচারুরূপে  
সম্পন্ন হয় না ।

কবিরাজ শ্রীউমাচরণ ভারতী ভূষণ

## ব্যায়াম ।

— • —

স্বাস্থ্যকর্ষ যে শারীরিক পরিশ্রম আব-  
শ্যক, তাহাকেই সাধারণতঃ ব্যায়াম বলা যায় ।  
ব্যায়াম নানাবিধ—যথা পথভ্রমণ, অর্ধারোহণ,  
মৌচাপন, সস্তরণ, মুণ্ডর বা ডবল জাম্প,

কুস্তি, ডনফেলা, দৌড়াদৌড়ি, হাফুজু,  
কপাটি, ফুটবল, ক্রিকেট, বকি, ব্যাডমিন্টন,  
রগবি, টেনিস ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে  
কতকগুলি আধুনিক । ফুটবল, ক্রিকেট

কি প্রভৃতি কতকগুলি ইউরোপীয়গণ কর্তৃক দেশে প্রচলিত হইয়াছে সুতরাং এগুলি ঋণানুসার। ব্যায়াম সমূহকে দুইটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা সাধারণ বা অবিমিশ্র ব্যায়াম এবং ক্রীড়া-যুক্ত ব্যায়াম বা ব্যায়াম ক্রীড়া। ব্যায়াম যার মাংসপেশী সমূহের পুষ্টিসাধন হয়। ব্যায়াম যার মাংসপেশী সমূহের নিয়মিত পরিচালনা হয়, তজ্জন্ত ঐ সকল স্থানে রক্তসঞ্চালনের বোধিত হয়, সুতরাং মাংসপেশী সমূহ সমধিক পরিপুষ্ট ও সবল হয়। জগতে সকল পদার্থের নৈজস্রিক নিষ্কৃতি ক্রিয়া আছে। জীবদেহস্থ জল ও উপাদান সমূহেরও তদ্রূপ স্ব স্ব ক্রিয়া আছে। যদি কাহাকেও তাহার ক্রিয়া-সম্পাদনে ব্যাঘাত দেওয়া হয় অর্থাৎ তাহাকে কোন ক্রিয়া করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। মাংসপেশী সমূহেরও ঠিক এই নিয়ম। যদি কোন মাংসপেশীকে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়, তাহা হইলে উহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও অকর্মণ্য হয়। উর্ব্বাহু সন্ন্যাসিগণের উর্ব্বোদ্ধিত বাহু ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। উহা ক্ষীণ ও অকর্মণ্য হইয়া যায়, নাড়িতে চাড়িতে পারা যায় না তজ্জন্ত অপর দিকে ক্রিয়া দ্বারা উহারা পুষ্ট, সবল ও কর্মণ্য হয়। শ্রমজীবীদের মধ্যে উপ-জীবীকার ক্রিয়ামুখ্যিক মাংসপেশী-বিশেষের পুষ্টির আধিক্য ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। এইজন্ত তার বাহকেদের গ্রীবার মাংসপেশী, যান-স্রাহকদের স্বন্ধের মাংসপেশী, নর্তক-নর্তকীদের উরুগের মাংসপেশী, দাঁড়ি-মাজিদের বাহুর মাংসপেশী, অপর সাধারণ অপেক্ষা অধিকতর পুষ্ট, স্থূল ও সবল।

একপে কেহ বলিতে পারেন যে, আমার

ধনের অভাব নাই, আমাকে খাটরা খাইতে হইবে না, পদব্রজে পথভ্রমণও করিতে হইবে না, সুতরাং আমার মাংসপেশীর পরিপুষ্টির বা কি আবশ্যক এবং ব্যায়ামেরই বা কি আবশ্যক ?

ইহার উত্তর এই যে ব্যায়ামের দ্বারা যে কেবল হস্তপদাদির মাংসপেশীর পরিপুষ্টি সাধন হয়—তাহা নহে। হৃৎপিণ্ড, ফুফুস, পাকায়, অন্ত্র, যকৃৎ মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহের মাংসপেশীর ও পুষ্টিসাধন হয়। ব্যায়ামকালে হস্তপদাদির দ্বারা আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের ও পরিচালনা হয়। দেহজন্ত ঐ সকল যন্ত্রের ক্রিয়ার ও উৎকর্ষসাধন হয়। ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণরোগে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় ঔষধ দ্বারা কোনও উপকার উপলব্ধি হওয়া না কিন্তু কেবল ব্যায়াম দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর বটে, কিন্তু ব্যায়ামের আতিশয্য বা ক্রেশকর ব্যায়াম দ্বারা আবার স্বাস্থ্যহানি হয়। যদি স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় শারীরিক শ্রমকে ব্যায়াম নামে অভিহিত করা হয়, তাহা হইলে ক্রেশ শুল্ক শ্রমই প্রকৃত ব্যায়াম। অধুনা ছাত্রবৃন্দ মধ্যে ব্যায়ামের বিশেষ প্রচলন হইয়াছে। যুবক কর্মচারিগণও অনেকে ব্যায়ামপ্রিয়। পিতামাতা প্রভৃতি কর্তৃপক্ষেরা বালকদের ব্যায়াম শিক্ষার জন্য উৎসাহ দিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও শুদ্ধাব্যায়িকগণও ব্যায়ামের বিশেষ পক্ষপাতী। আবার সকল বিদ্যালয়েই ব্যায়ামের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ব্যায়ামের পরিমাণের বিচার করা কাহারও লক্ষ্য নাই।

যে ব্যায়াম দুই প্রকার, সাধারণ বা অবিমিশ্র ব্যায়াম এবং ক্রীড়াসংযুক্ত ব্যায়াম বা ব্যায়াম ক্রিয়া। অধুনা শেষোক্ত ব্যায়ামই সচরাচর লোকে শিক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু ক্রীড়াসংযুক্ত হওয়ার উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর না হইয়া বরং অহিতকর হইয়া থাকে। কিসে খেলায় জিতিব, কিসে আমার খেলা সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় হইবে—এই আশায় শ্রমোতিশয়া ঘটনা থাকে। শুধু তাহা নহে, আবার ছাত্রদেব মধ্যে কেহ কেহ জল খাবারের পরমা জমাইয়া বা খোঁরাঙ্কির ব্যায়াম সংকোচ করিয়া খেলাব সবজ্ঞান ও ক্লাবের চাঁদা ভোগাড় করিয়া থাকে। ইহাদের পক্ষে ব্যায়ামক্রীড়া অত্যন্ত অনিষ্টদায়ক। একদিকে শ্রমোতিশয়া ও অপরদিকে খাত্তর অনাটন। হুতরা উপযুক্ত পরিপোষণের অভাবে শরীর সহ্য দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি যে সকল ব্যায়াম

পাশ্চাত্য অধিকরণে এদেশের সহর ও পল্লীগাম সকল স্থানেই বহু প্রচলিত হইয়াছে, সেগুলি কেবল বিলাসিতা মিশ্রিত, স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর বলিয়া বোধ হয় ন', কাজেই অর্থনাশক ও বিলাসিতাবর্দ্ধক। দেশকালঅবস্থা—ভেদে ব্যায়ামের প্রকারভেদ হওয়া আবশ্যক। যে ব্যায়ামে অর্থক্ষয় না হইয়া বরং অভাব আরম্ভ হয় সেদ্রুপ ব্যায়াম অভ্যাস কি যুক্তি-সম্মত! পল্লীগামবাসী বালক ও যুবক-বৃন্দ ফুটবলক্ষেত্রে নৃত্য করিয়া হাত পা ভাঙ্গার পরিবর্তে যদি কৃষিক্ষেত্রে একটু একটু নিয়মিত পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও তৎফলাধিক্য—এককালে উভয় কার্যই সমাধা হয়। সহরবাসীরাও ইচ্ছা করিলে সময়ে সময়ে নিকটবর্তী পল্লীগামে গিয়া এইরূপ -হল চালনাদি ব্যায়াম অভ্যাস করিতে পারেন।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস ।

## “নবেগান্ ধারণীয়” ।

স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই বোগোৎপাদন হইয়া থাকে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমরা বহু সময় স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য এষ্ট হইয়া বহুবিধ উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকি, স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি নিয়ম সাধারণ রূপে সকলেই জ্ঞাত হওয়া উচিত।

আমাদিগের বর্তমান বিষয়ের আলোচ্য বিষয়—“নবেগান্ ধারণীয়” অর্থাৎ মল-মূত্রা-দির বেগ ধারণ করিবেনা। এ সম্বন্ধে আম-রোঁদাচার্য মহর্ষি চরক বাহ্য উপদেশ দিয়াছেন—এখানে ঐ মূলাবানীর লোক উক্ত করিয়াছেন—

“নবেগান্ ধারণে জীমান জাতান্ মূত্রপূরীষয়োঃ

ন রেতসো নবাতস্ত নবম্যাঃ ক্ষবর্থোনচ ॥

নৌকারস্ত ন জন্তানা ন বেগান্ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ ।

ন বাম্পস্ত ন নিদ্রায়া নিখাস্ত শ্রমেনচ ।

এতান্ ধারণতো জাতান্ বেগান্ রোগা

ভবন্তি ॥

( চরক )

অন্তর্থাৎ—জীমান ব্যক্তি মূত্র, পুরীষ (মল)

অধোবাহু, বমি, ক্ষুব্ধ ( হাঁচি ) উল্কার,

জন্টা (হাইজলা) ক্ষুধা, পিপাসা, অন্ত্র (চোবের)

জল ) নিদ্রা কিংবা শ্রমজন্য নিদ্রাহীনতায় বেগ

ারণ করিবে না । ঐ সমস্ত ধারণ করিলে  
বগরোধ জন্ম ব্যাধি জন্মে ।

বেগরোধ জনিত যে সকল ব্যাধি জন্মে,  
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাহাকে “উদাবর্ত” বলে,—  
উদাবর্তে বায়ুর প্রাধান্য অধিক থাকে ।

ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—

।।তবিনমুত্র জিহ্বাশ্চ ক্ষবোকার বমীক্রিয়ঃ ।  
হৃৎক্ষোভাস নিদ্রানাগ্নি বৃত্তোদাবর্তসম্ভবঃ ॥

( ভাবপ্রকাশঃ )

উল্লিখিত শ্লোকের অর্থও চবোক্ত শ্লোকের  
মুদ্ররূপ ।

একণ কোন কোন বেগধারণ করিলে  
কোন কোন ব্যাধি জন্মিতে পারে ক্রমশঃ  
তাহার উল্লেখ করা যাইবে এবং ঐ সমস্ত  
কারণ জাত ব্যাধির চিকিৎসা-তত্ত্বও পরে  
বলা হইবে ।

চরক-ঋষি বলিয়াছেন বেগধারণ জন্ম যক্ষ্মা  
রোগ জন্মিয় থাকে ।

অধোবাস্তুর বেগধারণে—

মূত্র ও মলের রুদ্ধতা, উদরাগ্নান (পেট ফাঁপা)  
ক্লান্তি বোধ, উদরে বেদনা ও হুঁচ ফুটার  
ছায় যাতনা, এবং গুল্মাদি দুঃসাধ্য ব্যাধি  
সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

পূরীষ (মল) বেগধারণে—

পেটে বেদনার সহিত গুড়গুড় শব্দ, পকাশয়ে  
(শাক্ত্বলীতে) শূলবৎ বেদনা, গুল্মদ্বারে  
কর্তন বঃ পীড়া অমৃতব, মল রুদ্ধতা, উল্কার,  
এবং কখনও কখনও মুখের দ্বারা মল নির্গত  
হইয়া থাকে ।

মূত্রবেগ ধারণে—বন্তি ও

(তল পেটের নিম্নভাগ) শিশ্নে বেদনা, মূত্র-  
ক্লম্ব, মস্তকে বেদনাপ্রযুক্ত দেহ বক্র, এবং  
বস্ত্রঙ্গদেশে (কুচকি) বেদনা হইয়া থাকে ।

জৃম্মা (হাই) বেগধারণে—

মজ্জা (গ্রীবীর পশ্চাৎ ভাগের শিরা) ও গল-  
দেশের স্তম্ভতা, বায়ু প্রধান তীব্র শিরোরোগ,  
চক্ষুরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, ও কর্ণরোগ  
জন্মিয়া থাকে ।

অশ্রু (নেত্রজল) বেগ-

ধারণে—আনন্দাশ্রু অথবা শোকাশ্রু  
রোধে মস্তক ভারবোধ, তীব্র চক্ষুরোগ ও  
সর্দি উৎপন্ন হয় ।

হাঁচি বেগধারণে—মজ্জাব-

(ঘাড়) স্তম্ভতা, শিবঃশূল, অর্দিত (মুখ  
বাকিয়া যাওয়া) অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে  
মাথা ধরা) ও ইন্দ্রিয় সকলের হ্রাসলতা হইয়া ।

উদগার বেগধারণে—কঠ ও

মুখের পূর্ণতা, হৃদয় ও আমাশয়ের হুঁচী বিক-  
বৎ অত্যন্ত বেদনা, কঠে অব্যক্ত শব্দ, উজ্জ্বা-  
সাদিরোধ, হিকা, প্রভৃতি বায়ুজনিত ব্যাধি  
জন্মে ।

বমি বেগধারণে—শরীরে কণ্ঠ

(চুল্কা) ফোট (বোলতা দংশনের ছায়  
ফুলিয়া উঠা) অরুচি, মুখ-বিকৃতি, শোথ,  
পাণ্ডু, জ্বর, কুষ্ঠ, জ্বরাস ও বিসর্প (কুষ্ঠের  
প্রকার ভেদ রক্ত দূষিত ব্যাধি) রোগ উৎ-  
পন্ন হইয়া থাকে ।

শুক্র বেগধারণে—মূত্রাশয়ে

মলদ্বারে ও অণুকোষে শোথ, বেদনা জন্মে,  
মূত্র রোধ হয়, শুক্রাশ্রয়ী (পাথরী) বৃথা  
শুক্র শ্রাব ও বাত কুণ্ডলিকা, বাধিয়া বাধিয়া  
মূত্র নির্গত) প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগ উৎ-  
পন্ন হইয়া থাকে ।

ক্ষুধা বেগধারণে—ভ্রম,

শারীর-বেদনা, অরুচি, শ্রান্তি বোধ এবং চক্ষুর  
দীপ্তি হ্রাস হইয়া থাকে, ইহাতে শিবঃ  
বিকৃতি হইয়া ক্ষুধাশাল্য হয় ।

**তৃষ্ণা বেগধারণে**—কঠশোষ, মুখশোষ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, হৃদয়ে বেদনা, জিহ্বার জড়তা হইয়া থাকে ।

**শ্বাস বেগধারণে**—( পবিশ্রান্ত ব্যক্তির দীর্ঘ শ্বাস ধারণে ) হৃদরোগ, মোহ এবং গুণ্য প্রভৃতি কঠিন রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

**নিদ্রা বেগধারণে**—জৃম্বা ( হাঁহি তোলা ) শরীর বেদনা, তন্দ্রা এবং দেহ, চক্ষু ও মস্তকে অত্যন্ত জড়তা হইয়া থাকে ।

উল্লিখিত কারণ সমূহ ব্যতীত কক্ষ অগ্নাদি ভোজন জন্ত বায়ু বৃদ্ধি হেতু উদাবর্ত্ত বেগ জন্মিয়া থাকে ।

এখন পাঠক পাঠিকাগণ ব্রূয়িয়া দেখুন যে সমস্ত নিয়ম রক্ষা আমবা সামান্য জ্ঞানে অব্যাহত করি, ঐ সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘনের কুফল কত দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে । সামান্য কাবণে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্বাস্থ্য হারাইতে হয় ।

বর্ত্তমান কালে সভ্যতার অন্তর্ভালে, সভ্যতার খাতিরের আমরা যে কত প্রকারে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই, দেখা যায় কোন সভ্য সমিতিতে উপস্থিত হইলে হাঁচি, কাসি, অধোবায়ু নিবোধ পূর্ব্বক ৪৫ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিতে হয়, সময় সময় মল-মূত্রের বেগ ধারণ কবিতো ও হইয়া থাকে । ইহাতে কি স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে না !

চাকরী বুদ্ধি বাহাদিগের অভ্যাস, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি অনেক সময় মল মূত্রের বেগ বোধ করতঃ কত দূর শারীরিক অনিষ্ট সাধিত করিয়া থাকেন, তাহা আমরা বলিলাম, আশাকরি আমাদের “আয়ুর্বেদ” পাঠক পাঠিকাগণ বেগ ধারণের কুফল ব্রূয়িয়া বিশেষ সতর্ক থাকিবেন । অতঃপর আমরা বেগ ধারণ জন্ত ব্যাধি সমূহের চিকিৎসা তত্ত্ব আলোচনা করিব ।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন ।

## সমালোচনা ।

কলিত চিকিৎসা বিধান। কবিরাজ শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। শ্রীশশীভূষণ দত্ত কবিরাজ কর্তৃক প্রকাশিত। পোঃ সাভার, কবিরাজবাটি, ঢাকা। মূল্য ৩ টাক। এই গ্রন্থে প্রত্যেক রোগের নিদান এবং রোগ প্রশমনের জন্ত ঔষধগুলি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বিশাল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চিকিৎসা পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সকল গুলির সারসঙ্কলন পূর্ব্বক যদি কোন গ্রন্থ প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে এখনকার দিনে অল্প শিক্ষিত চিকিৎসক মণ্ডলীর তাহা বিশেষ উপকারে আসিতে পারে। আমাদের দেশে এখনকার সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ চিকিৎসক যথেষ্ট, পর লোকগত ডাক্তার বহুনাথ যথোপাধায় এই

জন্তই অশিক্ষিত ডাক্তারগণের শিক্ষা-উদ্দেশ্যে “সরল অর চিকিৎসা” প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে গ্রন্থের প্রচারে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধও হইয়াছিল, অনেক হাতুরে চিকিৎসক সে পুস্তকের রূপায় অনেক স্থলে চিকিৎসার কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থও হইয়াছিল। হাতুরে চিকিৎসকদিগের জন্ত এক দিকে সমাজের ক্ষতি হইতেছে সভ্য, অপর দিকে কিন্তু দেশে যে পর্য্যন্ত অচিকিৎসকের সংখ্যা পূরণ যথেষ্ট ভাবে না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের আবশ্যকতাও আছে। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা এবং অশিক্ষিত চিকিৎসকের তুলনার এখনও আট চল্লিশ হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন। সেই আটচল্লিশ হাজারের সংখ্যা পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত হাতুরে চিকিৎসকদিগকে সমাজে

না দিলে আশাততঃ উপায় নাই। আর এক কথা, যে সময় দেব ভাষা বা সংস্কৃত ভাষা দেশ মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেই সময় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও সে সময় সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন চলিত, সেজন্য আয়ুর্বেদ-শিক্ষার্থীর পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় আয়ুর্বেদ শিক্ষায় কাহারও অসুবিধা হইত না। এখন দেশ-কালোপযোগী আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে; শুধু বাঙ্গালায় কেন, আয়ুর্বেদের উন্নতি করিতে হইলে—ইংরাজীতেও আয়ুর্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু সে অনুবাদ গ্রন্থ মূলের সহিত ঠিক থাকা কর্তব্য। “কলিত চিকিৎসাবিধান”—প্রণতার উদ্দেশ্য মন্দ নহে, তিনি শাস্ত্র অবলম্বনে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেকের উপকারে আসিবে, কিন্তু যে সকল স্থলে নিজের মত ঢালাইয়াছেন, সেগুলি সাহস করিয়া সকলে মানিতে পারিবে কিনা—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এক এক স্থলে শাস্ত্রীয় মত ছাড়িয়া এরূপই নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা কোন ক্রমে গ্রহণযোগ্য নহে। ৩য় পৃষ্ঠায় সততক জরের চিকিৎসায় “হরীতকী বটা” ব্যবহারের পর প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় “প্রবাহিকারি লেহ” প্রস্তুতে পিরিট মিশাইতে উপদেশ দিয়াছেন—এ সকল মত কেমন করিয়া গ্রহণ করা যাইবে? ৫০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—যে জ্বর উৎপত্তি মাত্রই বিষম পরিণত হয় তাহা অসাধ্য। আমাদের মতে উহা হুঃসাধ্য।” এ স্থলে শাস্ত্রীয় মত ছাড়িয়া তাঁহাদের মত গ্রহণ সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। এক এক স্থলে নিজেদের ঔষধ প্রচারের বিজ্ঞাপনের মত “এইরূপ বেদনায় আমাদের বাতকুলান্তক বৃত্তমালিস করিলে সদ্য সদ্য ফল দর্শন্য থাকে।”—প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহার না করিলেই ভাল হইত। বাহা হটক গ্রন্থ-প্রচারের উদ্দেশ্য যে সাধু, তাহাতে সন্দেহ নাই।

**ব্রহ্মচর্য সাধন।**—শ্রীযোগেশ-চন্দ্র সেন, এল, এম, এস এবং শ্রীহেমচন্দ্র সেন এল, এম, এস প্রণীত। কলিকাতা ৭৮ নং রসায়ন-ভাণ্ডার (মধ্য) হইতে প্রকাশিত।

কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১১ টাকা। ব্রহ্মচর্য পালনে শারীরিক সামর্থ্য যেক্রমে বর্ধিত হয়, ইহা দ্বারা সেইরূপ মানসিক পবিত্রতাও সাধিত হইয়া থাকে। বালাকাল হইতেই ইহাতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। সেখানে এক গৃহে অধ্যয়ন নিরত বালকমণ্ডলা ইহাতে অভ্যস্তও থাকিত লোকে মুগ্ধকায় এবং দীর্ঘজীবীও হইত, এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। ফলে অপরিণত বয়স হইতেই অসুখাশুক্রকয়ে বাঙ্গালার যে ভাবন সন্ধান হইতেছে, তাহা ভাবিলেও শিহরিতে হয়। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—“মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ”। অর্থাৎ শুক্রকয়ের ফল মৃত্যু এবং শুক্র ধারণের ফল দীর্ঘজীবন। এই দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্ত সকল সময়ে প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে কোন স্থানেই নাই। এ গ্রন্থে এ সকল কথাই আলোচনা অতি উত্তমরূপে করা হইয়াছে। আমরা এ সকল বিষয়ের আলোচনা খুব বেশী পরিমাণেই করিয়া থাকি। ব্রহ্মচর্য্যাব অভাবে মহিলামণ্ডলেও যে ক্ষতি হইতেছে, তাহাও কথাও গ্রন্থ মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহা বড় সংক্ষিপ্ত। শুক্রমেহ এবং পুরুষ হানির কারণই যে অপরিণতঃ বয়সে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব সে বিষয়ে আর কথা কি? প্রত্যেক অধিভাবকের এ সকল কথা যত্নপূর্ব্বক মনে রাখিয়া এই গ্রন্থের উপদেশ পালন করা উচিত। ব্রহ্মচর্য্যের ফল-কীর্তন বাগদেশে গ্রন্থমধ্যে অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ, সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রথমে মহাভারতের দেবব্রত বা ভীষ্মের নাম উল্লেখ করিলে কিন্তু আরও বেশী সুখী হইতাম। ওরূপ আদর্শ ব্রহ্মচারী চিত্র আর যে একটিও পাওয়া যায় না। আমরা এই ব্রহ্মচর্য্য পালনই তাঁহার ইচ্ছা মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করি, তাহা হইলেই যোবকি। বাহা হটক এই হৃদয়ে এর একখানি সর্ব প্রথম প্রবোধকীয় গ্রন্থ প্রচারে সমাজের যত্ন হইবার আশা করা যায়। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই যত্ন হইবে। প্রত্যেক বুদ্ধ ব্যক্তিরই যত্ন হইবে।



# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

২য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৪—অগ্রহায়ণ ।

৩য় সংখ্যা ।

## বিজয়া-সম্মিলন ।

আমাদের গ্রাহক, অন্তর্গ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠ  
পোষক এবং অভিব্যক্তিগণকে আমরা বিজয়ার  
আয়োজন প্রণাম, নমস্কার, আশীর্বাদ ও সম্ভাষণ  
জ্ঞাপিত করি।

বিজয়ানন্দমা চুকিয়া গিয়াছে—সে ত  
অনেক দিন; অজ্ঞ তবে “বিজয়ার সম্ভাষণ”  
কেন? কিছু সত্য করিয়া বল দেখি ভাই!  
এই কর্মটা দিনের ব্যবধানে কি “বিজয়ার”  
মঙ্গল করায়? আমাদের বিজয়াই যে চিরদিন!  
আমাদের শত সাধের মহিমাময়ী মহাসপ্তমী  
দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়; অষ্টমী—চ’ফের  
পলকে কালের কোলে চলিয়া পড়ে, নবমী—  
বিদ্যো নিঃশ্বাসে কাঁপিয়া উঠে; যষ্টী আলোক-  
পলকের উদ্বোধন—“আগমনীর” আকাজকময়ী  
কাশানার, বেতাগের বিরহ ঢালিয়া মুহূর্তেই  
নিষ্পন্দ হব; থাকে কেবল—বেদনা-বিদ্ধ—  
“বিজয়ানন্দমা” আমাদের উৎসব ছুঁদিনের জন্ত,  
আমাদের উল্লাস প্রকৃতির তীব্র বিজ্ঞপ;

আমাদের হৃৎথ দৈন্তের মধ্যে জাগিয়া থাকে—  
কেবল সেই শুভবসনা উদাসিনী “বিজয়া  
দশমী!”

মা আসিয়াছিলেন—তিনটা দিনের জন্ত।  
মা আসিয়াছিলেন—সন্তানকে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষা  
দিতে। সে শিক্ষা বুঝিয়াছ কি ভাই? অসি-  
পাশ-মেথলা রক্তোজ্জল-কিরীটিনী আনন্দময়ী  
মা—সাক্ষাৎ “দেব শক্তি,” পাশব বলের প্রতি-  
কৃতি পশুরাজ সিংহের পৃষ্ঠদেশে—মা’র পূর্ণ  
ক্ষুরণ রাতুল চরণ! কাম ক্রোধাদি পশু  
শক্তিকে সংযম বলে পদ-দলিত করিতে  
পারিলে,—তোমার হৃদ-কমলে দেবশক্তি  
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সে মহাশক্তি তোমারই  
স্বাস্থ্যরূপে—তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান  
জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিবে। জগজ্জননীর  
ইহাই ত শিক্ষা!

মা’র দক্ষিণে রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মী, বামে—  
বিজ্ঞান-বিজ্ঞা-রূপিনী সর্বগুরা সরস্বতী। ইহা

কি বুঝিলে ভাই? শুধু শক্তিতে কাজ হয় না।  
 বিপুল-বিদার কর্মক্ষেত্রে—শক্তির সঙ্গে ধনও  
 বিত্তা থাকা চাই। শক্তি, ধন ও বিত্তা এই  
 তিনটি থাকিলেই জগতে কার্য সিদ্ধি হয়।  
 তাই মার সঙ্গে—সিদ্ধিদাতা গণ-নায়ক। কিন্তু,  
 তুমি ক্ষণ-পূণ্য দীনবুদ্ধি মর্ত্যের মানব—যদি  
 শক্তি ধন ও বিত্তার গর্বে—উচ্ছ্রাবল হও—  
 তোমার শাসনের জন্ত পুঞ্জিত শর দেবসেনাপতি  
 কান্তিকের। তোমার দেশ—ঋষির দেশ,—  
 শাস্তির নিকুঞ্জবন, এখানে রক্তমাংসের ছনিবার  
 ক্ষুধা—ভোগের ইন্ধনে অলিয়া উঠে না। এখানে  
 লালসার তাড়নায় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ  
 ব্যাকুল হইয়া ছোটে না, এখানে অসংখ্যের  
 দীপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাস্তব খাদকে বিরোধ ফোটে  
 না। এখানে ভগবতীর চরণ প্রান্তে, মুখিক,  
 সর্প, ময়ূর একসঙ্গে বিহার করে। হায় রে!  
 মাতৃদত্ত এমন শিক্ষাও আমরা বুঝিতে পারি  
 না! মার বিশ্বব্যাপিনী বিরাট প্রতিমা—  
 আমরা ত চাহিয়া দেখি না! আমরা শুধু দেখি  
 —চিগ্নায়ী মৃন্ময়ী ঠাট, শুনি অর্থশূন্য অসার  
 মন্ত্র পাঠ।

তোমার সকল শাস্ত্রের একমাত্র কেন্দ্র  
 “আয়ুর্বেদ”—তোমার শূন্য “চণ্ডী-মণ্ডপ”,—  
 তোমার মুহূর্তের প্রমাদ—উৎসব ব্যাসনের ক্ষণিক  
 লোভে—তোমার স্বাস্থ্য সমুজ্জল, “শক্তির”  
 প্রতিষ্ঠাকে বিশ্বস্তির জলে বিসর্জন দিয়াছে।  
 তোমার সকল ঐশ্বর্য্য সকল সুখ—স্বপ্নেরই  
 মত শেষ হইয়া গিয়াছে! তোমার বুকের  
 ভিতর “বিজয়া” আসিয়াছে। তবে, বিজয়ায়  
 ব্যথা পাও কেন? বিজয়ার দীর্ঘশ্বাসে—  
 মিলনের আনন্দ ভুলিয়া যাও কেন? কে বলে  
 তোমার বিজয়া দশমী বিবাদময়ী? তুমি হিন্দু  
 সন্তান, ঋষি বংশধর,—“বিজয়া দশমী” তোমার

মহাপর্ক, তোমার মিলনের পর্ক, সিদ্ধির পর্ক,  
 আনন্দের পর্ক। বিজয়ায় তোমার নবজীবনের  
 আরম্ভ, সাধনার নব সূচনা; বিজয়ার পবিত্র  
 স্মৃতি বুকে করিয়া আজ তোমার অগ্রসব হইতে  
 হইবে। আজ তোমায় সকল জীবিতা পরিত্যাগ  
 করিয়া পুরাতন হিংসা ঘেঁষ ভুলিতে হইবে।  
 সিদ্ধিবর্ষ ধারার মনের মালিন্য মুছিয়া ফেলিয়া,  
 শাস্তিজল গ্রহণ করিতে হইবে। আজ তুমি  
 —বাধা বিমুক্ত, —চাপলা-বিক্ষিত মাদক;  
 তোমার বোধনের উল্লাস থামিয়া গিয়াছে,  
 আত্মবিকার বাস্তব-ভাণ্ড নীরব হইয়াছে, সপ্তমীর  
 স্বপ্ন টুটিয়াছে, অষ্টমার জ্যোতিষ্মতী দীপমালা  
 নিবিয়াছে, নবমীর উৎসবানন্দ অতীতে  
 নিশিয়াছে;—আজ তোমার সম্মুখে—মাধুর্য্যময়ী  
 “বিজয়া”। দালানে মার প্রতিমা নাই, উৎসবে  
 কোলাহল নাই,—“বিসর্জন আসিয়া আজ  
 হর্ষ প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গিয়াছে।” আজ আর  
 তোমার কিছু নাই। কিন্তু আজ যাহা তুমি লাভ  
 করিয়াছ, তাহা অতি অপূর্ব্ব; সে জিনিষ—  
 সপ্তমী অষ্টমী নবমীর উৎসব-কোলাহলের মধ্যে  
 তুমি ত খুঁজিয়া পাও নাই।

“নব পত্রিকা”—তোমার পল্লী-প্রীতির  
 শেষ স্মৃতি, ছুঁয়া প্রতিমা তোমার স্বাস্থ্যরূপা  
 মহাশক্তি। আজ তোমার মণ্ডপ শূন্য, কিন্তু  
 তোমার নাই কি? আকাশে এখনও সেই  
 কৌতুকতরল জ্যোৎস্নালোক, বাতাসে  
 বিকশিত পদ্মের মৃদু সুরভি, জলে—কান্নার  
 বাঁচি-চাঞ্চল্য, স্থলে স্রপক শস্তের স্বর্ণ সর্কার।  
 তোমার কিসের অভাব? আজ তোমার  
 “বিজয়া দশমী,”—শূন্য মণ্ডপে দাঁড়াইয়া, শব্দ-  
 মিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, আজ তোমাকে  
 বিজয়া মহামন্ত্র পাঠ করিতে হইবে—

পুনরাগমনীয়

হে আমার আয়ুর্কেদ ! হে আমার স্বাস্থ্য-  
রূপা মহাশক্তি ! হে আমার “আমিষের”  
অপায় ! স্বাবলম্বনের বিকাশ ! তুমি আবার  
অসিও । আমি তোমায় বৃষি আর না বৃষি,  
তোমার সেবা করি আর না করি - তুমি আবার  
অসিও । যে মূর্তিতে—সরস্বতী-দৃশ্যতীর কূলে

ঋষি-পরিষদের অরাস্ত্র সাধনায়—তুমি স্বর্গ  
হইতে মর্ত্যে নামিয়াছিলে, —আবার তুমি সেই  
মূর্তিতে প্রকট হইও । আমরা তোমায় প্রণাম  
করিব —

“য ওষধীষু যো বনস্পতিষু  
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ।”

## নাগার্জুন ।

ভাবতীর চিকিৎসা-ক্ষেত্রে—“নাগার্জুনের”  
নাম সুবিদিত, তাঁহার জীবন-কাহিনী তাদৃশ  
সুপরিচিত নহে । বর্তমান প্রবন্ধে আমি  
সংক্ষেপে নাগার্জুনের পরিচয় নিপিবদ্ধ করিব ।

“নিবন্ধ-সংগ্রহ” নামক টীকা-কার ডল্লনা-  
চার্য্যের মুখেই আমরা নাগার্জুনের নাম প্রথম  
শ্রুতিতে পাই । “প্রতিসংস্কর্তাপি ইহ নাগার্জুন  
এব” —অর্থাৎ নাগার্জুন স্মৃতিত সংহিতার প্রতি-  
সংস্কার কবিয়াছিলেন । আয়ুর্কেদ-তত্ত্বকর্তা  
বাগ্‌ভট্টও নাগার্জুনের নামোল্লেখ করিয়াছেন ।  
চক্রপাণি দত্তের “চক্র-দত্ত” নামক প্রসিদ্ধ  
সংগ্রহ পুস্তকে “নাগার্জুনাজ্ঞান” এবং “নাগার্জুন  
যোগ” নামক দুইটী ঔষধ উদ্ধৃত হইয়াছে ।  
ঐ দুইটী ঔষধ নাকি—পাটলীপুত্র নগরে  
তত্ত্ব নাগার্জুন স্বয়ং উৎকর্ষণ করাইয়াছিলেন ।

“কক্ষপুট” নামক একখানি চিকিৎসাগ্রন্থ  
—নাগার্জুন কর্তৃক বিরচিত বলিয়া বিখ্যাত ।  
নাগার্জুন যেখানে বাহিতেন, গ্রন্থখানি সঙ্গে লই-  
তেন । কক্ষপুটে-ধারণ করিতেন বলিয়াই “কক্ষ-  
পুট” নামে উক্ত গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে ।

অতএব দেখা যাইতেছে নাগার্জুন এক-  
জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন । চিকিৎসাবিজ্ঞানে  
গভীর অসাধারণ অধিকার ছিল ।

একণে দেখা যাউক নাগার্জুন কোন  
শতাব্দির লোক ? কাশ্মীরের ইতিহাস “রাজ  
তরঙ্গিনী” একখানি প্রাচীন গ্রন্থ । এই রাজ  
তরঙ্গিনীর মতে—কাশ্মীর দেশ নাগার্জুনের জন্ম-  
ভূমি । যথা—

“ততঃ ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পুর-নিবৃত্তে ॥  
অগ্নিন্‌ সহলোক ধাতো দার্বং বর্ষশতং হুগাং  
বোধিসত্ত্বশ্চ দেশেহগ্নিন্‌ একভূমীষরোহভবৎ ।  
স তু নাগার্জুনঃ ত্রিমান্‌ ষড়্‌ই বনসংশ্রয়ী ॥”

ভগবান বুদ্ধদেবের পরি নিক্সীগের দেড়শত  
বৎসরের পর, কাশ্মীর দেশে নাগার্জুন প্রাচুর্ভূত  
হইয়াছিলেন ।

প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় গ্রন্থ “জান—পাল—চ—  
গু’ই” প্রামাণিক বলিয়া বিখ্যাত । এই গ্রন্থে  
একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় ।

দে—সিন্‌ শেগ—প-গু-দেঙ্গ—নেম্  
লো—নি—বি—গু’ লোন্—প ন ।  
গে—লোঙ—লু-যিস্‌ দো—বোদ্‌ জুঙ  
তন্—প—ল—দদ্‌ চিঙ, কন্ ॥

ইহার অর্থ বুদ্ধদেব ইহ জগৎ হইতে মহা-  
প্রস্থান করিবার চারিশত বৎসর পরে তিব্ব-  
নাগার্জুন জন্মগ্রহণ করিয়া “বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের”  
অনেক উপকার করিয়াছিলেন । এই তিব্বতীয়

গ্রন্থের মতে—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিদর্ভ দেশ—নাগার্জুনের জন্মভূমি। তিনি ব্রাহ্মণকূলে আবির্ভূত হইয়া, প্রথম যৌবনেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া—বহু সহস্র নর নারী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। নাগার্জুন রাজার মত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, বৈদিক ধর্মের উপর বৌদ্ধ-প্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন, পর্যটকের ব্রতগ্রহণ করিয়া সমগ্র এশিয়ার ভারতের গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন। কত দেশের কত পণ্ডিত তাঁহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। কত রত্ন-কিরীটী রাজমন্তক তাঁহার পদতলে বিলুপ্তি হইয়াছিল। তাঁহার কর স্পর্শে—কত জীর্ণ মেহে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল, কত অনাথ আতুর ব্যাধি-যন্ত্রণা ভুলিয়াছিল, কত তাপিত তৃষিত ব্যথিত হৃদয়ের আকুল বেদনা জন্মের মত ঘুচিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এমন যে নামজাদা নরনারায়ণ নিত্য-নিরন্ত-কীর্তি নির্বেদ মুক্ত নাগার্জুন—এদেশে তাঁহার পবিত্র জীবনের ধারাবাহিক কোনও ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিরাজ মহাশয়েরা তাঁহার কোনও খবর রাখেন না। নাগার্জুনের জীবন কাহিনী জানিতে হইলে, আমাদিগকে তিব্বত চীন বা জাপানে গিয়া তথাকার মনীষিগণের শরণাগত হইতে হয়। ইহার চেয়ে বিষয়-কর ব্যাপার আর আছে কি? বৌদ্ধযুগে—ভারতবর্ষে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন—তাঁহার নাম “ভোজ ভজ্ঞা” ইনি অত্যন্ত “বৌদ্ধ বিদ্বৎ” এবং ভক্ত-স্বভাব শাসন কর্তা ছিলেন। চিকিৎসক রূপে নাগার্জুন—এই ভোজভজ্ঞের রাজধানীতে আহূত হন। প্রথমে—নাগার্জুনের চিকিৎসা-কৌশলে—ভোজভজ্ঞের শ্রদ্ধা জন্মিলে, নাগার্জুন

ধর্মোপদেশ দানে রাজার মতের পরিবর্তন করেন। রাজা—বৌদ্ধধর্মী, নাগার্জুনের শিষ্য হন। এই ব্যাপারে—রাজ সংসারে নাগার্জুনের এতদূর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল যে অনেক নাগার্জুনকেই প্রকৃত রাজা বলিয়া জানিত। ক্রমাগত ৭ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া, নাগার্জুন ভোজভজ্ঞকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

নাগার্জুন—বৌদ্ধাচার্য্য শরৎকবে শিষ্য ছিলেন। নাগন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাগার্জুন বিদ্যাশিক্ষা করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া—পরোপকার-বৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ও পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা-বলে—আয়ুর্বেদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি রাসায়নী বিজ্ঞায় বহু রহস্যই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই ভজ্ঞ “রসরত্ন সমুচ্চয়” নামক রসগ্রন্থেব রচয়িতা—নাগার্জুনের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছেন।

অতিথানে নাগার্জুনের অনেকগুলি নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা;—

নাগার্জুনঃ সুরানন্দো

নাগবোধির্ধাশোথনঃ।

খণ্ড কাপালিকো ব্রহ্মা

গোবিন্দো লপকো হরিঃ॥

তিব্বতীয় গ্রন্থে \* নাগার্জুন সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু—নাগার্জুনের ঠিক আবির্ভাব কাল স্থির করা দুষ্কর ব্যাপার। এখন কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চাহেন—সুশ্রুত সংহিতা খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় কিবা চতুর্থ শতাব্দিতে রচিত হইয়াছিল। নাগার্জুন এই সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার এবং উত্তর-উন্নয়ন করেন। আবার কেহ কেহ বলেন—নাগার্জুন খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম শতাব্দীতে তিনি

Manuscript" হইতে জানা যায়—পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই সুশ্রুত একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল ।

বাগ্‌ভট রচিত গ্রন্থে নাগার্জুনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং নাগার্জুন বাগ্‌ভটের পূর্ববর্তী । বাগ্‌ভট তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক—ইহাই অনেকের অনুমান । নাগার্জুন ইহার বহু পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন ।

রসায়ন শাস্ত্রের তির্থাগপাতন-প্রণালী—নাগার্জুন কর্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল । তির্থাগপাতনের ইংরাজী নাম—Distillation. নাগার্জুন বৌদ্ধধর্ম্মালবষী হইলেও তাহার অমণে এদেশে উন্নত প্রণালীর অল্প চিকিৎসা ও সাস্থ্যহিনী ( Anæsthetic ) বিচার প্রভূত প্রচলন ছিল । তিনি “আরোগ্য শালা” (Hospital) ও “ভেষজাগার” (Dispensary) স্থাপন করিয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দিতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিযাংসা তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন—“যে চারিটা স্রোতের উদয়ে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে—“নাগার্জুন” তাহাদের একটা ।” চীন ভাষায় নাগার্জুনের একখানি জীবন চরিত রচিত হইয়াছিল । একজন কাপানী পণ্ডিত বলেন—ঐ-জীবন চরিত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাগার্জুন কাহিনীর অনুবাদ । পৃঃ ৪০০ অঙ্গ বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত-কুমার-জীৱ ঐ গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন ।

শতক-শাস্ত্র প্রণেতা আর্যদেব নাগার্জুনের অতিপ্রিয় ছাত্র ছিলেন ।

নাগার্জুন বহু গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিই সর্বত্র সমাদৃত হইয়া আসিতেছে ।

১। নাগার্জুন কক্ষপুট । ২। সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার ও উত্তর তত্ত্ব । ৩। প্রজ্ঞা পার-মিতা টীকা । ৪। দ্বাদশ নিকায় শাস্ত্র । ৫। ধর্ম্ম সংগ্রহ । ৬। প্রজ্ঞাদণ্ড । ৭। প্রজ্ঞাপ্রতীক । ৮। মাধ্যমিক সূত্র ।

শেনোক মাধ্যমিক সূত্রের—টীকাকার—নাগার্জুনকে প্রণিপাত করিয়াছেন—

নাগার্জুনায় প্রণিপত্য তস্মৈ

তৎ কারিকাগাং বিবৃতিং করিষ্যে ।

‘চক্রকীর্তি রচিত মাধ্যমিক বৃত্তি । সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাগার্জুনের যে জীবন চরিত কীট-দষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহার অনুবাদ এই প্রবন্ধ লেখক কর্তৃক আরম্ভ হইয়াছে । এই অনুবাদ মুদ্রিত হইলে—অনেকে নাগার্জুনের অনেক কথা জানিতে পারিবেন ।

তন্মৈ নাগার্জুনকে “মুনি” নামে অভিহিত করা হইয়াছে । শৈবসিদ্ধান্ততন্ত্রে বাধক রোগের একটি যোগ দেখিতে পাওয়া যায় । সেই যোগটি নাগার্জুন-পরিকল্পিত । তন্ত্রকার নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা স্বীকার করিয়াছেন—  
যথা শিব পার্শ্বতী সংবাদে শিব বসিতেছেন—

“ইতুচে রুচিরালোপে ! নাগার্জুনোমুনিঃ  
স্বর্য ।

ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—তারিখ যুগেও বৌদ্ধ নাগার্জুনের প্রভাব অক্ষুণ্ণ হইয়া শাবর-তন্ত্রে দ্বাদশ শিবের মধ্যে নাগার্জুনকে নামও উল্লিখিত হইয়াছে । এইজন্য কেহ কেহ বলেন—নাগার্জুন দুইজন ছিলেন, একজন বৌদ্ধ নাগার্জুন, অপর নাগার্জুন—নাগার্জুন নামে তন্ত্রশাস্ত্রে বিখ্যাত ।

সামান্যের আমরা ইহার বীমান্ত্য করিয়া চোরা করিব ।

গতি—অসিদ্ধাবস্থা ।

## শর্করা-তত্ত্ব ।

— :: —

“রাজা অশোকের ক’টা ছিল হাতী,  
টোডর মল্লের ক’ছেলে, ক’ নাতি ?  
যুধিষ্ঠিরের বাবা কোন্ জাতি ?

এ সব করিয়া বাহির,  
ক’রেছি বিদ্যা জাহির !”

কবি এ সকল কথা কৌতুক করিয়াই  
লিখিয়াছেন : আমরা কিন্তু পদে পদে তাঁহার  
অম্লর বাক্যের সার্থকতা অনুভব করিতেছি।  
দেশে যেন একটা আবিষ্কারের যুগ আসিয়াছে।  
নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রকৃত্ত্ব বাহির করিয়া  
সকলোই বাহ্যিকরী দেখাটোতে চাছেন। কেহ  
হিন্দু ধর্মকর্ম আচার ব্যবহার রীতি নীতির  
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করিতেছেন, কেহ  
বিক্রমপুরের বল্লালসেনকে বর্তমানের ভূমিষ্ঠ  
হইতে দেখিতেছেন,—কেহবা রাম রাবণের  
ব্যক্তিগত ভুলিয়া রামায়ণকে কৃত্তিকর্ম বলিয়া  
বক্তৃত্ব দিতেছেন ; কালিদাসকে বাঙ্গালী  
করিয়া তুলিতে পারিলে, রামপ্রসাদের জাতি  
মারিলে, আশ্ব গৌরব খ্যাপনের সুবিধা হয়।  
বাহারা একরূপ কার্য করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য  
আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। কিন্তু  
বাহারা এ দেশের যুগযুগান্তরের আপনার ধনকে  
নিজের ক্ষুদ্র অহুমানের সাহায্যেই অপরিচিত  
ও পর করিয়া দিতে চাছেন—তাঁহাদের মহৎ  
উদ্দেশ্য তো আনার মোটা বুঝিতে বুঝিতে  
পারি না। তাই, “ভারতবর্ষে পূর্বে চিনি  
ছিল না”—নামজাদা লোকের মুখে একরূপ কথা  
শুনিলে আমরা বিশ্বাসে অবাক হইয়া পড়ি।

আসল কথাটা হইতেছে এই—একখানা  
বড় কাগজে একজন বড় লেখক লিখিয়াছেন

— “ভারতবাসীরা পূর্বে চিনি প্রস্তুত করিতে  
জানিত না, ভারতে চিনি ছিল না ; চিনি চীন  
দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে—সেইজন্ম ইহাব  
নাম “চিনি”। সেইরূপ মিসর দেশ হইতে  
ভারতে যে মিষ্ট দ্রব্য আসিয়াছে তাহার নাম  
“মিস্ত্রী” ।”

চিনি ও মিছরীর ব্যুৎপত্তিবাদ এইরূপ।  
অতএব আমাদেরকে বুঝিতে হইবে—আমাদের  
পূর্ব পুরুষগণ চিনি কিম্বা মিছরী প্রস্তুত করিতে  
জানিতেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—ঋষি  
যুগে এ দেশে চিনি ও মিছরীর অত্যন্ত ব্যবহার  
ছিল। ভারতের আয়ুর্বেদে চিনি মিছরীর  
গুণ বর্ণিত হইয়াছে। সে কালের বৈজ্ঞানিক -  
কথায় কথায় “সিতা” ও “শর্করার” ব্যবস্থা  
করিতেন। “সিতাপল” ও মৎস্তগুণিকা—  
তাঁহাদের আদরের জিনিষ ছিল। আমাদের  
বিশ্বাস সেই সুদূর অতীতের আচার্য্য যুগে—  
ভিন্ন দেশ-জাত, কোনও পদার্থই আয়ুর্বেদে  
গৃহীত হয় নাই। চিনি ও মিছরী যখন বহু  
ঔষধের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসি-  
তেছে, তখন নিশ্চয়ই ঋষিগণ চিনি ও মিছরী  
প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি “চিনির” গুণ কিছু  
সবিস্তারে প্রকাশ করিব। আমাদের ষাট  
দ্রব্যের ভিতর এমন অল্প জিনিসই আছে, বাহা  
উপকারিতায় চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে  
পারে। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় জিনিষ শক্তি  
বড় বেশী। মানব জাতির জীবন ধারণে  
চিনি একটা অহুকূল সহচর। চিনি সর্বত্র  
খাণ্ডের শ্রেষ্ঠ।

চিনির সংস্কৃত নাম—“সিতা” ও “শর্করা।” অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে চিনির আদর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বের মধু হইতে শর্করা প্রস্তুত হইত তাহার নাম ছিল—মধু-সিকতা অর্থাৎ মধু জাত বালুকা। চিনি বালির মতই স্বরসের জিনিষ, তাই মধু-জাত চিনির “মধু সিকতা” নাম সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

ইহার পর, ইক্ষুরস হইতে চিনি প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু কোন রাসায়নিক ইহা প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন তাহা বলিতে পারা যায় না।

ইতিহাস পড়িলে জানা যায় মহাবীর আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সর্ব প্রথম সেনাপতি “নিগাকাস”—তারতবর্ষ হইতে গ্রীক দেশে ইক্ষু-বৃক্ষ লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই যুগোপের কৃষিক্ষেত্রে—মধুর রসের অবতার ইক্ষু আবাদ আরম্ভ হয়।

এদিকে—ইক্ষু ভিন্ন, খজুর তাল ও নারিকেল বৃক্ষের রস এবং বিটপালম্ প্রভৃতি কন্দ হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ম্যাকগ্রাফ্ নামক একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিটপালম্ হইতে প্রথম চিনি বাহির করেন। নেপোলিয়নের আনলে-ফ্রান্স দেশে—বিট্ চিনির অত্যন্ত আদর বাড়িতে থাকে। এখন—বিটের চিনি সর্বত্র ছাইয়া ফেলিয়াছে। এখন ঔষধের অল্পপান স্বরূপ চিনির আবশ্যক হইলে কবিরাজ মহাশয়কে “ইক্ষু চিনি” এইরূপ নির্দেশ করিয়া দিতে হয়। এদিকে খাঁটা ইক্ষুজাত চিনি খুঁজিয়া বাহির করা—একদিকে বড় সহজ সাধ্য ব্যাপার মনে হয় না।

পাশ্চাত্যমতে চিনির উপকারিতা।

পাশ্চাত্য রাসায়নিকের পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে চিনি কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—এই তিন মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। চিনি ভক্ষণ করিবামাত্র—উষ্ণ আমাদের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহার পর হৃৎ-ভাবে দগ্ধ হইয়া, কার্বনিক এসিড, বাষ্প ও জলে পরিণত হয়। এই দগ্ধ হইবার সময়ই, চিনি কর্তৃক যে তাপের উদ্ভব হইয়া থাকে—সেই তাপের ক্রিয়াদংশই শরীরের শক্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং শর্করাজাত তাপ হইতে আমাদের শারীরিক তাপ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। সেই তাপজাত শক্তির সাহায্যেই আমরা কক্ষক্ষেত্রে সকলই কার্যই করিতে পারি।

ভক্ষিত চিনি পাকস্থলীতে উপস্থিত হইলে, তাহার ক্রিয়াদংশ পাকস্থলীর রসের সঙ্গে মিলিয়া Grape Sugarএ রূপান্তরিত হয়, তাহার পর অস্ত্রের মধ্যে উপস্থিত হইলে, অজ্বলিত রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া অবশিষ্টাংশও Grape Sugarএ পরিণত হয়। ঐ গ্রেপ সুগার রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রক্তবাহিনী শিরায় সাহায্যে যুক্ত নামক বস্ত্রে গমন করিয়া Glycogenএর রূপ ধরিয়া, বস্তুতের মধ্যেই বাস করে। আবশ্যক হইলে এই গ্লাইকোজেন শারীরিক তাপ ও শক্তির সাহায্য করিয়া থাকে। সংক্ষেপে, ইহাই চিনির উপকারিতা।

চিনির বিশেষ গুণ।

১। অতি সহজে পরিপাক হয়। ২। শরীর মধ্যে অতি সঘন শোষিত হয়। ৩। তাপ ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া শরীরের পোষণ করিয়া থাকে। চিনির আরও গুণ—

প্রথমতঃ। আমরা ডাল ভাত, আলু, গম প্রভৃতি যাহা কিছু খেতসারনয় দ্রব্য আহার করি,—ঐ সকল পদার্থ মুখের লাল ও অঙ্গের খাচক রসের সাহায্যে চিনিতে পরিণত হইয়া শরীরে শোষিত হয়। কিন্তু চিনি খাইলে—উহা একেবারেই শরীরে শোষিত হইয়া থাকে, ছতরাং শারীর যন্ত্রগুলিকে অকারণে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। আমরা ডাল ভাত—ফল মূল যাহা কিছু ভক্ষণ করি, সে সকল জিনিষের সমস্ত টুকু হজম হয় না, তাহার অপরিপাচ্য অংশ, মলমূত্রের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। চিনি খাইলে, চিনির সমস্ত অংশই জীর্ণ হইয়া দেহ মধ্যে অবস্থিতি করে। এজন্য শারীরযন্ত্রগুলিকে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না।

তৃতীয়তঃ। চিনি হইতে মেদ [ চর্কি—Fat ] উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই মেদ দেহের ভিতর সঞ্চিত থাকিয়া আবশ্যক মত তাপ ও শক্তির উৎপাদন করে। একজন বিচক্ষণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিনির গুণ পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ;—

(ক) চিনি খাইলে মাংস পেশীর ক্ষমতা বাড়ে। (খ) শরীর যন্ত্রের অবত্যা ক্ষয় নিবারিত হয়। (গ) মুখরোচক বলিয়া স্বাস্থ্য পরিপাক হয়। (ঘ) চিনি—বহুদিন সঞ্চিত থাকে। (ঙ) চিনি মিশ্রিত খাদ্য পচিয়া নষ্ট হয় না।

চিনির এই সকল গুণের একে একে বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

(ক) চিনি খাইলে মাংসপেশীর ক্ষমতা বাড়ে। সেই জন্য চিনি ভক্ষণকারী খুব পরিশ্রম করিতে পারে; কষ্ট সহ্য করিতে

পারে, উত্তমশীল হয়। আরব দেশের নান্দব এবং আরব দেশের পশু উষ্ট্র—অত্যন্ত খর্বুর ভক্ষণ করে। খর্বুরে শত করা ৫০ ভাগ চিনি বর্তমান। এই জন্য আরব দেশের লোক কষ্ট সহিষ্ণু, উষ্ট্রও অত্যন্ত পরিশ্রমী। সুমাত্রার নাবিকেরা যথেষ্ট ইক্ষুরস পান করে, তাই তাহারা দাঁড় টানিতে ক্লান্তি বোধ করে না। ইংরাজ জাতি খুব চিনি খায়, তাই তাহারা উত্তম শীলতার আদর্শ।

(খ) গুরুতর পরিশ্রমে মাংস পেশীর দৌর্বল্য জন্মে। চিনি খাইবামাত্র সে দৌর্বল্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যুরোপের বিখ্যাত ভ্রমণ কারিগণ—চিনির ডেলা মুখে কবিতা চুষিতে চুষিতে দীর্ঘ পথ এবং উচ্চ পর্বত অতিক্রম করিতে কোনও কষ্ট বোধ করেন না।

(গ) শিশুরা চিনি খাইতে ভাল বাসে, —এই জন্য শিশুর পাকস্থলীতে গীষ্মই খাদ্যদি পরিপাক হইয়া থাকে। মূলমূত্রঃ তাহাদের ক্ষুধারও উদ্রেক হয়।

(ঘ) মিছরী, বাতাসা, ওলা প্রভৃতি জিনিষ—চিনিরই রূপান্তর। এসব দ্রব্য অনেক দিন পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না।

(ঙ) মোরব্বা, জেলী, জ্যাম প্রভৃতি খাদ্য গুলিতে অতিরিক্ত চিনি মিশ্রিত থাকার নষ্ট হয় না। দিল্লীর হালুয়াসান্ নামক উপাদেয় মিষ্টান্ন, ৩ মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার যোগ্য থাকে। তাহার স্বাদ গন্ধ সমস্তই টাইকা প্রস্তুতের মত মনে হয়।

### প্রাচ্যমতে চিনির গুণ।

আর্য্য ঋষিগণ—চিনির অনেক গুণ জানিতেন। “আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে” ইহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।





খাণ্ড ( অন্ন, অ নু প্রভৃতি খেতসারময় দ্রব্য )  
—প্রাণঘাতী কালকূটের মত অনিষ্টকারী।

যাঁহারা অধিক চিনি বা চিনি জাতীয় খাণ্ড ব্যবহার করেন,—তাঁহারা রীতিমত পরিশ্রম করিলে, চিনির উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন। চিনি খাওয়া খুব ভাল, কিন্তু চিনির অন্ন ব্যবহার কখনই ভাল নহে। আমাদের দেশের চিনির অপব্যবহারই ঘটয়া থাকে।

উপবাসের পর—প্রথমই চিনির পান খাওয়া ভাল। ইহাতে পিত্ত প্রকৃতিস্থ হয়, মুখ-শোণ, শরীরের ক্রান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হয়। ঈষৎক্ষণ হৃৎকের সহিত চিনি ভক্ষণ করিলে—হৃৎপিণ্ডের বলবৃদ্ধি ও শরীরে রক্তস্রোতের বেগ বৃদ্ধি হয়।

স্বতের সহিত চিনি খাইলে গুরু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নবনীতের সহিত চিনি ভক্ষণে নার্ভের বল বাড়ে স্মরণ শক্তি প্রথর হয়।

দধির সহিত চিনি খাইলে কানও উপকার হয় না। অধিকন্তু—দধি সেবনের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। বাঙ্গালী বাবুদের মুখে কিন্তু চিনি পাতা দধি ভিন্ন রোচে না। দধির সহিত চিনি—চিনির অপব্যবহার মাত্র।

যাঁহাদের দেহে রক্তের বিকৃতি [থোস পাচড়া, কণ্ডু, ক্ষত, কুষ্ঠ প্রভৃতি] আছে, যাঁহারা জোলাপ লইয়াছেন, যাঁহাদের অস্ত্রে ক্রমি সঞ্চিত আছে, যাঁহারা প্রায়ই যকৃতের পীড়ায় আক্রান্ত হন—তাঁহারা চিনি খাইবেন না। নবপ্রসূতা নারীর পক্ষেও চিনি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

চিনি প্রস্তুতের সহজ প্রণালী।

এক ক দী ইক্ষুগুড় লইয়া কুলসীর তল-বেশে ছিদ্র করিয়া উহা একখানি গাম্ভার

উপর ২৪ ঘণ্টা বসাইয়া রাখিবেন। ইহাতে ঐ গুড়ের সমস্ত তরলাংশ (মাত) করিয়া পড়িবে। তাহার পর কলসীর সারগুড় বাহির করিয়া—ঝুড়ীতে কিম্বা ডালায় রাখিয়া—তাহার উপর জলজাত শৈবাল চাপা দিবেন। এইভাবে একদিন একরাত্রি থাকিলে, শৈবাল তুলিয়া দেখিবেন উপরের গুড় বেশ শুষ্কবর্ণ হইয়াছে। উহাই চিনি। যতটা গুড় শুষ্কবর্ণ হইয়াছে—ততটুকু গুড় চাঁচিয়া অল্পপাত্রে রাখিবেন। বাকী গুড়ের উপর আবার নূতন শৈবাল চাপা দিবেন। এইরূপ ভাবে পূর্বে—আমাদের দেশে চিনি প্রস্তুত হইত। এখনও ‘দলুই’ উপাধিধারী একশ্রেণীর হিন্দুরা—এইরূপ প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে। সেই চিনিকে লোকে দলুই বা দোলো বলে। এইরূপে চিনিকে কাঠের পাটার উপর রাখিয়া—দলিয়া লইতে হয় বলিয়াও ইহার নাম “দোলো” হইতে পারে।

গুড়কে শুষ্ক করিবার জন্ত—পাঁচ প্রকার জলজ শৈবাল ব্যবহৃত হয়। তাহাদের নাম—“দাম”—(পাটা সেওলা), “শিমাল লাঙলী”—(দেখিতে শূগাল লাঙলের মত) “হাঁজি” (অতি সূক্ষ্ম—অথচ লম্বা) পাতাড়ী (এই জাতের শেওলায় ছোট ছোট গোলাকার পাতা হইয়া থাকে) “কোতোকুয়া” (জলা জমীতে জন্মে—দেখিতে কলমীলতার মত—অত্যন্ত কোমল) —এই সকল শেওলার সাহায্যে গুড় হইতে অনায়াসেই চিনি করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই ইহা সহজ সাধ্য কার্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে সে “স্বাবলম্বন” কোথায়? আমরা—১০/০ ছয় আন সূলা দিয়া—দলুইয়ের দ্বারা অপবিত্র চিনি অনায়াসেই কিরিয়া লইয়া তথাপি নিজে চিনি প্রস্তুত করিয়া

পারিব না। আমাদের এক সাধক গাহিয়া  
গিয়াছেন—

“চিনি হ’তে চাইনেকো মা!

আমি চিনি খেতে ভালবাসি”

এই গানটা—সারা বঙ্গের প্রতিধ্বনি।  
আমরা চিনি খাই—কিন্তু সে চিনি যোগাইবার  
তার চিন্তামণির উপর।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম্ এ।

## রোগ-পরীক্ষা।

চিকিৎসা করিবার পূর্বে চিকিৎসক রোগীর  
রোগ পরীক্ষা করা উচিত। পরীক্ষা দ্বারা রোগ  
নিশ্চিত হইলে তাহার চিকিৎসা সম্ভব;  
নতুবা রোগ স্থির করিতে না পারিলে তাহার  
চিকিৎসা অসম্ভব। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে  
“রোগানানো পরীক্ষেত” অর্থাৎ সর্ব প্রথমে  
রোগ পরীক্ষা করিবে। বিশেষভাবে পরীক্ষা  
করিয়া রোগ নির্ধারণপূর্বক চিকিৎসাকর্মে  
প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

রোগ পরীক্ষা সম্বন্ধে মহর্ষি সুশ্রুত বলেন  
“আতুর গৃহমতিগমা উপবিশু আতুরমতিপশ্চেৎ  
স্পৃশ্যং পৃচ্ছেচ্চ। ত্রিভিরেতৈ বিজ্ঞানোপায়ৈ  
রোগাঃ প্রায়শো বেদিতব্যা ইত্যেকৈ। তন্তু ন  
সম্যক্, ষড়বিধোহি রোগানাং জ্ঞানোপায়ঃ।  
তদুপায়া পঞ্চভিঃ শ্রোত্রাদিভিঃ প্রশ্নেন চেতি”।  
অর্থাৎ আতুর গৃহে গমন করিয়া উপবেশনান্তর  
আতুরকে দেখিবে, স্পর্শ করিবে এবং প্রশ্ন  
করিবে। কেহ কেহ বলেন এই তিন প্রকার  
পরীক্ষা দ্বারা প্রায়ই রোগ জ্ঞান হয়; কিন্তু  
তাহা সম্যক্ নহে। রোগ জ্ঞানের উপায় ছয়  
প্রকার; শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং প্রশ্ন।

১। তত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া বিশেষা  
নোপায়া বর্ণাশ্রাববিজ্ঞানীয়াদিষু বক্ষ্যন্তে সফেনং  
রক্তনীরয়মনিলঃ সশকো নির্গচ্ছতি ইত্যেব-  
মানয়ঃ।

অর্থাৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয় বিশেষজ্ঞানযোগ্য, যেমন  
বর্ণবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে বর্ণজ্ঞাব সম্বন্ধে বলা  
হইয়াছে ‘সফেন রক্তের সহিত শব্দযুক্ত বায়ু  
নির্গত হয়’। এখানে এই শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়  
গ্রাহ্য। এইরূপ উষ্ণার অধোবায়ু, কাস,  
হিকা প্রভৃতির শব্দও শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য।

২। স্পর্শেন্দ্রিয় বিজ্ঞেয়া নীতোষ্ণ-  
শীত-কর্কশ মৃদু-কঠিনহৃদয়ঃ স্পর্শবিশেষা জর-  
শোথাদিষু।

অর্থাৎ জ্বর, শোথ প্রভৃতি রোগে শৈত্য  
ঔষ্ণ্য শ্লক্ষতা, কার্কশ, মৃদুতা এবং কঠিনত্ব  
প্রভৃতি স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। নাড়ী পরীক্ষাও  
এই স্পর্শেন্দ্রিয় জ্ঞানদ্বারা সম্পাদিত হয়।

৩। চক্ষুরেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া শরীরোপচয়া-  
পচয়ায়ুর্লক্ষণবলবর্ণ বিকারাদয়ঃ।

অর্থাৎ শরীরের স্থৌল্য, কৃশতা, আয়ুর্লক্ষণ,  
বল (উৎসাহ), বর্ণবিকৃতি প্রভৃতি চক্ষুরেন্দ্রিয়  
গ্রাহ্য। নেত্রপরীক্ষা, জিহ্বা পরীক্ষা, মূত্রের  
বর্ণ পরীক্ষা প্রভৃতিও চক্ষুরেন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

৪। রসেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ প্রমেহাদিষু রস-  
বিশেষাঃ।

অর্থাৎ প্রমেহাদি রোগে মূত্র প্রভৃতির রস-  
বিশেষ রসেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। যদিও সুত্রোক্ত  
চিকিৎসক স্বয়ং বুঝে লইয়া রস গ্রহণ করিতে  
পারেন না কিন্তু মূত্রে বহুরূপ রস থাকিলে তাহাও

পিপীলিকাদির সঞ্চরণ দেখিয়া মূত্রে মধুর রসের অবধারণ করিতে পারেন। এখানে চিকিৎসকের রসনেন্দ্রিয়জ্ঞান না হইলেও পিপীলিকাদির রসজ্ঞান হইতেছে বলিয়া রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয় বলায় কোন দোষ হয় না।

৫। ত্রাণেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া অরিষ্টলিঙ্গাদিষু ব্রণানামব্রণানঞ্চ গন্ধবিশেষাঃ।

অর্থাৎ ব্রণ কিম্বা ব্রণের রোগের অরিষ্টাদি লক্ষণে (নিয়ত মরণাধ্যাপক লক্ষণকে অরিষ্ট কহে অর্থাৎ যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে জীব নিশ্চয়ই মরিবে বুঝা যায় তাহার নাম অরিষ্ট) যে সকল বিশেষ গন্ধ উপস্থিত হয় তাহা ত্রাণেন্দ্রিয় বিজ্ঞেয়।

৬। প্রয়েন চ জানীয়াং দেশং কালং জ্যতিং সান্ধ্যমাতঙ্কসমুৎপত্তিং বেদনাং সমুচ্ছ্রায়ং বলমন্তরয়িং বাতমূত্রপূরীবাণাং প্রবৃত্তাপ্রবৃত্তী কালপ্রকর্ষাদীংশ্চ বিশেষান্। আয়ুসদৃশেষু বিজ্ঞানভূতপায়েষু তৎস্থানীয়ে জ্ঞানীয়াং।

অর্থাৎ ১ প্রকার নিম্নলিখিত বিষয় জানিতে হইবে।

(ক) আহুপ, জ্ঞাপ্লব এবং সাধারণভেদে যে ত্রিবিধ দেশ আছে ইহার কোন দেশে রোগের উৎপত্তি এবং শরীরের কোন দেশের পীড়া। দেশ বলিতে শরীর ও ভূমি উভয়ই বুঝায়।

“ভূমিদেহপ্রভেদেন দেশমাহরিহ বিধা।”

বাগ্ভট।

(খ) ক্ষণাদিরূপ কালের কোন সময়ের পীড়া; বায়ু, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য ইহার কোন কালের পীড়া এবং ব্যাধির অবস্থা—যেমন কম্পের সময়, দাহের সময় পিপাসার সময় ইত্যাদি। “ক্ষণাদিব্যাবহাচ কালঃ” বাগ্ভট।

(গ) জী, পুরুষ অথবা স্ত্রী ইহার কোন ক্রান্তীর রোগীর রোগ এবং ব্রাহ্মণাদি কোন ক্রান্তীর রোগীর রোগ।

(ঘ) আহার এবং আচার যথা সেবিত হইলে সুস্থ থাকা যায় তাহার নাম সান্ধ্য।

(ঙ) আতঙ্কসমুৎপত্তি অর্থে যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয় সেই কারণ।

(চ) বেদনাসমুচ্ছ্রায় অর্থাৎ পীড়ার উদগতি। যে প্রকারে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা।

(ছ) বল অর্থাৎ কার্য্য করিবর শক্তি এবং উৎসাহ।

(জ) সম, বিষম কিংবা মন্দভেদে পাচকায়িকে অন্তর্গত কহে।

(ঝ) বাত মূত্র পুরীষের যথাকালে প্রবৃত্তি হওয়া না হওয়া। এস্থলে পুরীষের পর লুপ্ত আদিশক উদ্ধার করিয়া বেদ, আর্ন্তব, রক্তপিত্ত প্রভৃতি বৃদ্ধিতে হইবে।

(ঞ) কতদিনের রোগ ইত্যাদিকে কাল প্রকর্ষাদি বলা হয়।

(ট) যে স্থানের পীড়া সেইস্থান কোন দোষের আশ্রয় এবং পূর্বোক্ত ছয় প্রকার পরীক্ষা দ্বারা দোষেরও পরীক্ষা।

মহর্ষি চরক বলেন “ত্রিবিধং রোগবিশেষ-বিজ্ঞানং ভবতি। আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষমহু-মানঞ্জেতি।” রোগের বিশেষ জ্ঞানোপায় তিন প্রকার যথা—আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ এবং অহুমান। “ত্রিবিধেন খবনেন জ্ঞানসমুদয়েন পূর্বং পরীক্ষা রোগং সর্কথা সর্কমেবোত্তরকাল মধ্যাবসানমদোষং ভবতি। নহি জ্ঞানাবয়বৈ কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমুৎপত্ততে। ত্রিবিধেষুবিদ জ্ঞানসমুদয়ে পূর্বমাপ্তোপদেশাদ জ্ঞানং ততঃ প্রত্যক্ষাহুমানাভ্যাং পরীক্ষোপপত্ততে। কিং হমুপদিষ্টং পূর্বং যৎ তৎ প্রত্যক্ষাহুমানজ্ঞ পরীক্ষ্যমানো বিজ্ঞাং।”

অর্থাৎ এই তিন প্রকার জ্ঞান—আপ্তোপদেশ দ্বারা পূর্বক সর্ক প্রত্যক্ষ এবং অহুমান

উভয় কালে রোগ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা সর্বপ্রকারে অদোষ। জ্ঞানাবয়ব দ্বারা সকল জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞান লাভ অসম্ভব। এই তিন প্রকার পরীক্ষার মধ্যে পূর্বে আপোপদেশ দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাই প্রত্যক্ষ এবং অমুমান দ্বারা পরীক্ষা করা চলে। অমুপদিষ্ট বিষয়কে প্রত্যক্ষ ও অমুমান দ্বারা পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা অসম্ভব।

রোগ বলিলে যাহা বুঝায় তাহার দুইটি অবস্থা; প্রকৃতি ভূত ব্যাধাবস্থা এবং বিকৃতি ভূত ব্যাধাবস্থা। নিদান সেবন জন্ত স্বস্থানে দোষের সন্ধান হয়; পরে দোষ-প্রকোপক নিদান সেবন জন্ত সেই সঞ্চিত দোষের প্রকোপ হয়। প্রকোপের পর প্রসর, অর্থাৎ দোষ তখন স্বস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে যাইতে থাকে। এই অবস্থা পর্য্যন্ত যে শারীরিক পীড়া অনুভূত হয় তাহার নাম প্রকৃতিভূত বিকার। প্রসরের পর দোষ কোন স্থান সংশ্রয় করিয়া কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ করে যাহাদ্বারা ভবিষ্যতে কোন বিশিষ্ট রোগ হইবে ইহা বুঝা যায়। ইহাকে রোগের পূর্বরূপ কহে। পরে পূর্বরূপাবস্থা দূর হইয়া কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয় যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে কোন বিশিষ্ট রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পর আর একটি অবস্থা আইসে যখন ব্রণশোথ ফাটয়া গিয়া ব্রণ ভাব প্রাপ্ত হয় কিংবা অরতিসারাদি রোগ দীর্ঘ কালানুববন্ধী হয়। এই দুই অবস্থার নাম ব্যাধির রূপাবস্থা। পূর্বরূপ ও রূপাবস্থায় যে পীড়া অনুভূত হয় তাহার নাম বিকৃতিভূত ব্যাধি। যখন প্রকৃতিভূত দোষ হইতে কোন রোগ উৎপন্ন হয় তখন সেই প্রকৃতিভূত দোষকে নিদানার্থ-কর বলা হয়। অর্থাৎ নিদান যেমন দোষ প্রকোপরূপ প্রকৃতিভূত ব্যাধির উপাদানক।

সেইরূপ প্রকৃতিভূত দোষ বিকৃতিভূত ব্যাধি-উৎপাদক। বিকৃতিভূত ব্যাধি আবার অপর বিকৃতিভূত ব্যাধি উৎপাদনে সমর্থ, যেমন জ্বর সন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে অর, উভয় হইতে বক্ষা এবং ম্রীহা বৃদ্ধি হইতে জঠর রোগ ইত্যাদি।

নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি দ্বারা রোগের উপলব্ধি হয়।

নিদান;—যে কারণে রোগের উৎপত্তি হয় সেই কারণকে নিদান কহে।

কালবুদ্ধীক্ষিপ্তার্থানাং যোগো মিথ্যা নচাতি চ।  
দ্ব্যাদিশ্রয়ানাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতু সংগ্রহঃ।

চরক

অর্থাৎ কাল বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ার্থের অযোগ্য, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ সর্ব প্রকার শারীর ও মানস রোগের হেতু অর্থাৎ নিদান। হেতু বা নিদান সাধারণতঃ তিন প্রকারের দৃষ্ট হয় যথা দোষ হেতু, ব্যাধি হেতু এবং দোষ ব্যাধি উভয় হেতু। ১ যেখানে নিদান দোষবৈষম্য উৎপাদন করে কিন্তু তজ্জন্ত কি রোগ হইবে তাহা বুঝা যায় না তাহাকে দোষহেতু বলা হয়। যেমন মধুর রসাদি ( ২ ) যেখানে নিদান আদৌ ব্যাধি উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ দোষানুববন্ধী হয় তাহাকে ব্যাধিহেতু কহে। যথা ভূতাভিষেক অভিঘাত প্রভৃতি। ( ৩ ) যেখানে নিদান পূর্বে দোষবৈষম্য উৎপাদন করিয়া বিশিষ্ট রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে উভয় হেতু বলা হয় যেমন মক্ষিকা ভক্ষণ ছদ্রিরোগের, বা ভক্ষণ পাণুরোগের এবং হস্তি, অশ্ব বা উরু গমন বাতন্ত্রক রোগের নিদান। এখানে নিদান সেবন জন্ত পূর্বে দোষবৈষম্য হইলেও অতঃপর দোষবৈষম্যাকারক দ্বিধারের জায় না বরং ইহার দোষবৈষম্যের নিদান হইয়াছে বলা হয়।

তজ্জন্ত বিশিষ্ট রোগেরও কারণ হইতেছে বলিয়া ইহাদিগকে উভয়হেতু বলা হয়। কোন টীকা-কার মক্ষিকা ভক্ষণ ছদ্মবোগের এবং মৃদু ভক্ষণ পাণ্ডু রোগের নিদান বলিয়া ইহাদিগকে ব্যাধিহেতু বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে; কারণ ছর্দি ও পাণ্ডুরোগ আগন্তু ব্যাধি নহে নিজব্যাধি। নিজ ব্যাধি উৎপন্ন হইবার পূর্বে দোষ বৈষমা থাকা অনিবার্য। সুতরাং মৃদুভক্ষণ ও মক্ষিকাভক্ষণ যেমন নির্দিষ্ট ব্যাধির হেতু সেই প্রকার দোষবৈষম্যেরও হেতু সুতরাং ইহাদিগকে উভয় হেতু বলাই সঙ্গত।

পূর্বরূপ;—যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ভবিষ্যতে কোন বিশিষ্ট রোগ হইবে বুঝা যায় তাহার নাম ব্যাধির পূর্বরূপ। এই পূর্বরূপ দুই ভাগে বিভক্ত। একের নাম সামান্য পূর্বরূপ এবং অপরের নাম বিশিষ্ট পূর্বরূপ। সামান্য শব্দের অর্থ জ্ঞাতি। যে যে লক্ষণ দ্বারা মাত্র কোন জাতীয় রোগ হইবে ইহার উপলক্ষি হয় তাহার নাম সামান্য পূর্বরূপ। আর যে যে লক্ষণ দ্বারা ভবিষ্যৎ রোগের বিশেষ অবধারণ হয় তাহার নাম বিশিষ্ট পূর্বরূপ। সামান্য পূর্বরূপের দ্বারা ভবিষ্যতে অমুক ব্যাধি হইবে ইহা জানা যায়; কিন্তু ইহা কোন দোষজ হইবে তাহার উপলক্ষি হয় না। বিশিষ্ট পূর্বরূপের দ্বারা তাহার অবধারণ করা যায়।

রূপ;—যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে বুঝা যায় তাহার নাম ব্যাধির রূপ বা লক্ষণ। রূপ দ্বারা বর্তমান ব্যাধি নির্দেশ করা যায়। পূর্বরূপের দ্বারা রূপও দুই ভাগে বিভক্ত। যে যে লক্ষণের দ্বারা অমুক জাতীয় রোগ হইয়াছে ইহা নির্দেশ করা যায় তাহাকে সামান্যরূপ এবং যে যে লক্ষণের দ্বারা

বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, ক্షমজ বা সান্নিপাতিক ইহার কোন বিশিষ্টাবস্থা—এরূপ নিদ্বারিত হয় তাহাকে বিশিষ্টরূপ কহে। যেমন শ্বেদাবরোধ, সন্তাপ এবং সর্বাঙ্গ গ্রহণ জরের সামান্যরূপ; সেইরূপ অংস-পার্শ্বাভিতাপ, হস্ত ও পদের সন্তাপ এবং সর্বাঙ্গ জ্বর যক্ষার সামান্যরূপ। যে দোষ হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন জ্বর এবং যক্ষ্মারোগে এ লক্ষণগুলি থাকিবেই থাকিবে। অপর যে লক্ষণ আছে দোষ ভেদে তাহার ভেদ হয় এবং সেই লক্ষণ দ্বারা ব্যাধির দোষাবধারণ হয় বলিয়া ইহাদিগকে বিশিষ্টরূপ বলা হয়।

উপশয়;—হেতু বিপরীত, ব্যাধি বিপরীত এবং হেতুব্যাধি উভয় বিপরীত অথবা হেতু বিপরীতার্থকারী, ব্যাধি বিপরীতার্থকারী, অথবা হেতুব্যাধি উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ, অন্ন এবং বিহারের যে সুখানুভব তাহাকে উপশয় বলে। অর্থাৎ যে প্রকার ঔষধ, অন্ন কিংবা বিহারের উপযোগ তাহা যদি হেতুর বিপরীত ধর্মী, ব্যাধির বিপরীত ধর্মী কিংবা হেতু ব্যাধি উভয়ের, বিপরীত ধর্মী অথবা হেতুর সমান ধর্মী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী, ব্যাধির সমান ধর্মী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী কিংবা উভয়ের সমান ধর্মী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী, তাহা দ্বারা যদি আরোগ্যলাভ হয় তবে তাহাকে উপশয় বলা যায়। যে রোগে কতকগুলি লক্ষণ একত্রে মিলিয়াছে বলিয়া কিংবা লক্ষণগুলি গূঢ় আছে বলিয়া রোগের সম্যক উপলক্ষি হয় না, সেখানে উপশয় দ্বারা রোগজ্ঞান হয়। উপশয় দ্বারা ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ব্যাধির বোধ হয়। পূর্বরূপাবস্থা প্রযুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ব্যাধির বোধ হইলে বর্তমান ব্যাধিবোধক।

সম্প্রাপ্তি ;—ব্যাধির উৎপত্তিকে সম্প্রাপ্তি কহে । সম্প্রাপ্তি, সংখ্যা, প্রাধাত্য, বিধি, বিকল্প এবং বলকাল বিশেষে ভেদ হয় ।

(১) সংখ্যা যেমন আটটি জ্বর এবং অষ্টাদশটি কুষ্ঠ ইত্যাদি ।

(২) প্রাধাত্য—দ্বন্দ্বজ এবং সান্নিপাতিক দ্বন্দ্ব দোষের তর এবং তম দ্বারা প্রাধাত্য নির্দিষ্ট হয় অর্থাৎ দুই দোষের মধ্যে প্রধানকে তং এবং তিন দোষের মধ্যে প্রধানকে তম কহে ; দোষের এই তর কিংবা তমভাব দ্বারা প্রাধান্য নির্ণীত হয় । অথবা যে দোষ স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিজেই প্রধান তাহারই প্রাধাত্য এতদ্ভিন্ন যাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ যাহা অপর দোষের অধীনে থাকে তাহার অপ্রাধান্য ।

(৩) বিধি অর্থে প্রকার । রোগ নিজ ও আগন্তুক ভেদে দুই প্রকার, ত্রিদোষ ভেদে তিন প্রকার ; অথবা সাধ্য, অসাধ্য, মৃদু এবং দাক্ষণ ভেদে চারি প্রকার ।

(৪) বিকল্প—মিলিত দোষের অংশাংশ নিকারণকে বিকল্প কহে । যেমন রুদ্ধ, স্থল, নম্র, শীত চল, বিশদ ও খর এইগুলি বায়ুর ধর্ম । ঈষৎ স্নেহ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দ্রব, অন্ন, সর ও কটু এইগুলি পিত্তের ধর্ম । গুরু, শীত, মৃদু, মিষ্ট, মধুর, স্থির ও পিচ্ছল এইগুলি স্নেহের ধর্ম । দ্বন্দ্বজ এবং সান্নিপাতিক দোষে কোন দোষের কোন ধর্মের প্রকোপ তাহার নিকারণকে বিকল্প কহে ।

(৫) বলকাল বিশেষ—ঋতু, দিন, রাত্রি ও আহার—কালভেদে ব্যাধির বলভেদ হয় । যেমন শরৎ ঋতু পিত্তজ ব্যাধির বলকাল । প্রাতঃকাল কফজ ব্যাধির, মধ্যাহ্ন পিত্তজ ব্যাধির এবং অপরাহ্ন বাতজ ব্যাধির ; রাত্রির প্রথমভাগ কফজ ব্যাধির, মধ্যভাগ পিত্তজ

ব্যাধির এবং শেষভাগ বাতজ ব্যাধির ; আহা-  
রের প্রথমভাগ কফজ ব্যাধির, মধ্যভাগ পিত্তজ  
ব্যাধির বলকাল বিশেষ ।

সম্প্রাপ্তি না জানিলে সংখ্যাাদি এবং দোষের  
অংশাংশাদি জ্ঞান ভিন্ন রোগের বিশেষ জ্ঞান  
লাভ অসম্ভব । সংপ্রাপ্তি বর্তমান ব্যাবিবোধক ।  
নিদানাদি যে পাঁচ প্রকার রোগ জ্ঞানের উপায়  
কথিত হইল, রোগ জ্ঞানের জন্য এই পাঁচটিরই  
আবশ্যকতা আছে । নিদানের দ্বারা ভবিষ্যতে  
রোগ হইবে বুঝা যায় । বহু রোগের নিদান  
এক প্রকার বলিয়া সর্বত্র কোন রোগ হইবে  
তাহার নিশ্চয়াবধারণ করা যায় না ; এইজন্য  
পূর্বরূপাদিরও আবশ্যকতা আছে । পূর্বরূপ  
দ্বারা কোন রোগ হইবে ইহা জানিতে পারিলেও  
দোষের বিশেষ অবধারণ হয় না বলিয়া রূপ  
জানা আবশ্যক । রূপ দ্বারা রোগ জ্ঞান হইলেও  
সর্বত্র চলে না ; যেখানে তুলা লক্ষণ দৃষ্ট হয়  
সেখানে পূর্বরূপ স্মরণের আবশ্যকতা আছে ।  
যেমন রক্তপিত্ত এবং রক্ত প্রমেহ সন্দেহস্থল ।

হারিদ্রবর্ণং রুধিরঞ্চমূত্রং

বিনা প্রমেহস্ত হি পূর্বরূপৈঃ ।

যো মূত্রয়েৎ তং ন বদেৎ প্রমেহং ।

রক্তস্ত পিত্তস্ত হি স প্রকোপঃ ॥

ব্যাধির সাধ্যাসাধ্যাত্তও জ্ঞাত হওক  
যায় না ।

পূর্বরূপাণি সর্বাণি অরোক্তান্ততিমাত্রায়া  
বংবিশস্তি বিশতোনং মৃত্যুর্জরপূরঃসরঃ ॥

অন্ততাপি চ রোগস্ত পূর্বরূপাণি বংসরঃ  
বিশতেনেন কচেন তন্তাপি মরণং জবম্ ॥

পূর্বরূপ এবং রূপ দ্বারা রোগজ্ঞান হইলেও

গূঢ়লিঙ্গ ব্যাধি জ্ঞান হয় না এইজন্য উপায়  
অবশ্য জ্ঞাতব্য । “গূঢ়লিঙ্গং ব্যাধিযুগপদ্বারা  
পরিণামভাগে পরীক্ষিতঃ” পূর্বরূপ, রূপ, রোগ

শয় দ্বারা পরীক্ষিত হইলে ও সংখ্যাদি এবং  
দেহের অংশাংশাদির কোপ অবধারণ করা  
যায় না। বলিয়া সম্প্রাপ্তি জ্ঞান ও আবশ্যক।

পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি দ্বারা  
রোগ জ্ঞান হইলে নিদান জানা না থাকিলে  
চিকিৎসা অসম্ভব; “সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগো  
নিদানপরিবর্জনম্।” নিদানত্যাগই সংক্ষেপ  
চিকিৎসা। যেমন সন্তর্পণোথে বাধিতে অপ-  
তর্পণ প্রয়োজন এবং অপতর্পণোথে সন্তর্পণ  
প্রয়োজন। এই সকল নিদান পরিবর্জন।  
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, রোগ জ্ঞানের  
পক্ষে নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি  
এই পাঁচটিরই কারণতা বিদ্যমান। বুদ্ধিমান  
বৈজ্ঞ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগমের সাহায্যে  
এই পাঁচটি উপায় দ্বারা রোগ পরীক্ষা করিলে  
রোগ সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে তাহা অভ্রান্তই  
হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে বহু প্রকার রোগের বিবরণ আছে  
এবং সেই সকল রোগের নিদান, পূর্বরূপ, রূপ,  
উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু  
বেদনা, বর্ণ, নিদান, স্থান, লক্ষণ এবং নান-  
ভেদে বাধির অসংখ্য ভেদ হয়; সেইজন্ত  
সকল রোগের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। সেরূপ  
স্থলে যে প্রকারে রোগ নির্দেশ সম্ভব হয়  
সংক্ষেপে নিম্নলিখিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

প্রত্যয়প্রসংগে সা ভিত্তমানা ভবন্তি হি।

কল্পাবর্ণ-সমুখান-স্থান সংস্থান-নামভিঃ।

ব্যবহারকরণং তেবাং যথাস্থলেষু সংগ্রহঃ।

তথা প্রকৃতিসামান্যং বিকারেবুপদিষ্টতে।

বিকারনামাকুলো ন জিহ্বীয়াৎ কদাচন।

স্বাহি সর্ববিকারানাং নামভেদন্তি ক্রমা স্থিতিঃ।

সংগ্রহ কুপিতো দোষঃ সমুখানবিশেষতঃ।

স্থানান্তরগতশ্চৈব সর্ববিকারানাম বহুনা।

তস্মাদ্বিকারপ্রকৃতি রথিষ্ঠানান্তরাণিচ।

সমুখানবিশেষাংশচ বুদ্ধা কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ॥

যে হেতুং দ্রিতয়ং জ্ঞাত্বা কৰ্ম্মাণ্যারভতে তিবকু।

জ্ঞানপূৰ্ণং যথাভ্যায়ং স কৰ্ম্মস্ব ন মুহতি ॥

অর্থাৎ বেদনা, বর্ণ, নিদান, স্থান, লক্ষণ ও

নাম ভেদে ব্যাধির অসংখ্য ভেদ হয়।

মোটামুটি নির্দেশ করিয়া তাহাদের সংগ্রহ করা

গেল। অমূল্যস্থলে প্রকৃতি-সাদৃশ্য দেখিয়া অর্থাৎ

যে ব্যাধির প্রকৃতি বায়ু তাহাকে বাতিক,

যাহার প্রকৃতি পিত্ত তাহাকে পৈতিক এবং

যাহার প্রকৃতি শ্লেষ্মা তাহাকে শৈথিল্য ইত্যাদি

নির্দেশ করিতে হইবে। অর, রক্তপিণ্ডাদিবৎ

সকল রোগের নাম করণে অসমর্থ হইলেও

লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই; যেহেতু

সর্ব প্রকার রোগের নাম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট নাই।

একই দোষ, বিশেষ বিশেষ কারণে কুপিত ও

বিশেষ বিশেষ স্থান প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ রোগ

উৎপাদন করিতে পারে। অতএব রোগের

প্রকৃতি, অধিষ্ঠান (যে স্থানে রোগ উৎপন্ন হয়)

ও নিদান লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

যে চিকিৎসক এই তিনটি অর্থাৎ রোগের

প্রকৃতি, অধিষ্ঠান ও নিদান লক্ষ্য করিয়া

চিকিৎসা করেন; তিনি চিকিৎসা কার্যে কখন

দোহগ্রস্ত হয়েন না।

এ বিষয়ে একটি উদাহরণ লইলে বিষয়টি

বেশ স্পষ্ট হইবে। আজকাল একটি রোগ

দেখা যায় তাহার কোন উল্লেখ আয়ুর্বেদে শাস্ত্রে

দৃষ্ট হয় না। আধ্বজাতির প্রকোপ ছিল না।

পার্শ্বগিজ নাবিকগণের সহিত উহা একে

আমদানি হয় এই রোগকে ডাঙ্কারগণ

Gonorrhoea কহেন। দুই বোলি-সিকি

জন্ত দূষিত বিব এক শরীর হইতে পুরুষের

সংক্রমিত হইয়া এই রোগে প্রকোপ



সক্রামিত বিষই এরোগের নিদান। পুরুষের মূত্রনালী এবং স্ত্রীলোকের যোনিমার্গ এ রোগের স্থান। বিষ সংক্রমণের তিন কিংবা চারাদনের দিন, সাধারণতঃ রোগের সূত্রপাত হয়। দুই দিনের পর দশ দিনের মধ্যেও কখন কখন রোগের সূত্রপাত দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ লিঙ্গক্ষীতি, প্রদাহ, বেদনা, মূত্রাব-রোধ, মূত্রত্যাগকালে অসহ্য যন্ত্রণা এবং জরভাব বা প্রকৃত জ্বর হয়। কখন কখন রক্তাগম দেখা যায়। তৎপরে রূপাবস্থা দৃষ্ট হয়। এই সময় আপনা হইতে পূয়ের স্রাব প্রাৰ, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও বেদনা উপস্থিত হয় এবং অতিক্রমে মূত্রত্যাগ করিতে হয়। এ অবস্থায় যদি রোগের প্রতীকার করা না হয় তবে রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; তখন জ্বালা যন্ত্রণা আর বড় থাকে না, একপ্রকার ঘৃচ্ছস্রাব (glairy discharge) হয় এবং মূত্রমার্গের অবরোধ (stricture) উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতা, বাত (Gonorrhoel Rheumatism) (অভিযান্দ Gonorrhoel opthalmia) প্রভৃতি উপদ্রব আইসে। স্ত্রী শরীরে অধিকন্তু জনেনেত্রির প্রদাহ উপস্থিত হয়।

আয়ুর্বেদমতে এই রোগ নির্দেশ করিতে হইলে বাহ্য করা উচিত তাহা দেখা বাউক।

- ১। লিঙ্গক্ষীতি—স্নেহায় লক্ষণ।
- ২। প্রদাহ—পিত্ত ও স্নেহায় লক্ষণ।
- ৩। বেদনা—বায়ুর লক্ষণ।
- ৪। মূত্রাবরোধ—বায়ুর লক্ষণ।
- ৫। জরজরভাব বা জ্বর—ত্রিদোষের লক্ষণ।
- ৬। মূত্রত্যাগকালে অসহ্যযন্ত্রণা—বায়ু ও পিত্তের লক্ষণ।

অগ্রহারণ

৭। রক্তাগম—পিত্তের লক্ষণ।

এই সকল লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে শরীরে বিষ সংক্রমণজন্য বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকৃপিত হইয়া লিঙ্গাভ্যন্তরে স্থান সংশ্রয় পূর্বক যে রোগ উৎপাদনের চেষ্টা পাইতেছে তাহা ভবিষ্যতে একটী ত্রিদোষজ ব্যাধিরূপে প্রকাশ পাইবে। উক্ত লক্ষণগুলি ইহার পূর্বরূপ।

ইহার পর যে যে লক্ষণ দেখা যায় তাহা দ্বারা নিম্নলিখিতভাবে অবধারিত হয়।

১। পূষ—কফের লক্ষণ।

২। পাক—পিত্তের লক্ষণ।

৩। স্বভাবতঃ পূয়ের স্রাব—বায়ুর লক্ষণ।

৪। মূত্রত্যাগকালে জ্বালা—পিত্তের লক্ষণ।

এই সকল লক্ষণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে যে স্নেহ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ত্রিদোষজ। ইহার পরের অবস্থা—

১। জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়া যাওয়া—ক্ষীণপিত্তের লক্ষণ।

২। ঘৃচ্ছস্রাব—বায়ু ও স্নেহায় লক্ষণ।

৩। মূত্রমার্গের অবরোধ—বায়ু ও স্নেহায় লক্ষণ।

এই দুই অবস্থার লক্ষণগুলি ইহার রূপ। তাহা হইলে এই সকল পরীক্ষার দ্বারা জরুরি যাইতেছে যে (১) দুই যৌন সন্ধিগন—জর বিষ সংক্রমণ এই রোগের হেতু অর্থাৎ নিদান।

(২) পুরুষের মূত্রনালী এবং স্ত্রীলোকের যোনিমার্গ এই রোগের অধিষ্ঠান অর্থাৎ বিষ সংক্রমণজন্য দোষ প্রকৃপিত হইয়া এই রোগ আদিষ্ট করিয়া রোগ উৎপাদন করে।

(৩) লিঙ্গের ক্ষতি, লিঙ্গের প্রদাহ, লিঙ্গের বেদনা, মূত্রাবরোধ, মূত্রত্যাগকালে অসহ্য যন্ত্রণা, লিঙ্গপথে রক্তাণ্ডম এবং জ্বরভাব বা জ্বর এইগুলি ইহার পূর্বরূপ।

(৪) (ক) আপনা হইতে পুষের শ্রাব, মূত্রত্যাগ কালে জ্বালা ও বেদনা এবং অতি কষ্টে মূত্রত্যাগ। (খ) রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়া যাওয়া, স্বচ্ছ শ্রাব (Glairy discharge) এবং মূত্রমার্গের অবরোধ (stricture) এইগুলি ইহার রূপ। দুর্বলতা, বাত (Gonorrhoeal Rheumatism), অভিস্রাব (Gonorrhoeal ophthalmia) এবং স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ (Inflammation of the productive organs) এইগুলি এই রোগের উপদ্রব।

এক্ষণে এই রোগকে যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। এইরূপে সকল প্রকার অজ্ঞাত রোগের—যেমন প্রেগ, বেরিবেরি, সিকিলিস ইত্যাদির নির্দেশ করা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব নহে। এক্ষণে পাঠক বিচার করিয়া দেখুন আয়ুর্বেদ মতে রোগপরীক্ষার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাঁহাদের অনুচিকীর্ষ অনেকের নিকট শুনিতে পাই যে কবিরাজগণ রোগ নির্ধারণে একেবারে অসমর্থ। কারণ শরীর জ্ঞান লাভের জন্ত শব-ব্যবচ্ছেদ তাঁহারা করেন না সুতরাং শরীরের ভিতর কোণায় কোন রোগ হইয়াছে তাঁহারা নির্দেশ করিতে পারেন না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অণালীতে রক্ত, মল, মূত্র, খুঁ প্রভৃতির রাসায়নিক এবং আণু-

বীক্ষণিক পরীক্ষা তাঁহাদের নাই। শরীর পরীক্ষার জন্ত থার্মমিটার, টেম্পিস্কোপ, স্পেকিউলাম প্রভৃতি যন্ত্র তাঁহাদের নাই এবং রনজেন্স লাইট যাহার সাহায্যে ভিতরের যান্ত্রিক বিকৃতির জ্ঞান হয়, তাহা নাই সুতরাং কিসের বলে তাঁহারা রোগ নির্ণয়ে সমর্থ? এতদ্বারা আমাদের বক্তব্য এই যে প্রাচ্য-বিজ্ঞান চিরকালই প্রাচ্যবিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চিরকালই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। রোগ সম্বন্ধে প্রাচ্য মনীষিগণ এক প্রকার স্থির করিয়াছেন; পাশ্চাত্য মনীষিগণ অপর প্রকার স্থির করিতেছেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মতে রোগ কোনানিষ্ট স্থানে আবদ্ধ নহে। যে স্থানেই তাহার প্রকাশ হউক না কেন, রোগ মাঝেই সর্বাঙ্গীন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নির্দান সেবন জন্ত দোষের চয় হয়, পরে সেই চিত দোষ প্রকুপিত হইয়া গতিশীল হয়; পরে সেই প্রকুপিত দোষ কোন স্থান সংগ্রহ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। ব্যাধি মাঝেই প্রকুপিত দোষের কার্য্য এবং ধর্ম্মের সমষ্টি; তাহা যেখানেই উৎপন্ন হউক না কেন, স্থান ও লক্ষণভেদে ব্যাধির নাম ভেদ হয় মাত্র। যে কোন ব্যাধি উৎপন্ন হউক না কেন তদ্বারা সমস্ত শরীর ও মন উপভোগ হয়, তখন সর্বাপ্রাণ প্রবাহী রক্তের গতির প্রকার উপলব্ধি করিয়া এবং পুষ্কোক্ত চরক ও সুশ্রুতের মতাহুযায়ী পরীক্ষার রোগের যে জ্ঞান লাভ হয় আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাই যথেষ্ট। রক্তের গতির প্রকার উপলব্ধিকে নাড়ী পরীক্ষা কহে। নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা রোগের যে সর্ব প্রকার জ্ঞান হয় তাহা অনেক

পাশ্চাত্য চিকিৎসকেও স্বীকার করেন। এমন কি অনেক ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা কবিবাক্ত কর্তৃক রোগ নির্ণয় দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষিত লোক এসকল কিছু বুঝিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা এরূপ শিক্ষা পান নাই। ডাক্তার এক প্রকারে রোগ নির্ধারণ করেন; কবিবাক্ত অল্প উণ্ডারে রোগ নির্ধারণ করেন। উভয় বিজ্ঞানে যখন রোগও তাহার পরীক্ষা ভিন্ন তখনই সকল যন্ত্রদ্বারা আমাদের কি উপকার হয় পাঠক তাহা আমাদিগকে

বুঝাইয়া দিতে পারেন? ডাক্তার বলিলেন রোগীর অমুক অঙ্গের অমুক স্থানের এই বিকৃতি হইয়াছে। কবিবাক্তকে যদি সেই রোগের চিকিৎসা করিতে হয় এবং ডাক্তার তাঁহাকে রোগের কথা বলিয়া দেন যে অমুক রোগ হইয়াছে; তাহা দ্বারা কবিবাক্তের কোনই উপকার হইবে না তাঁহাকে আবার নিজেব মত করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে নতুবা আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা সম্ভব।

কবিবাক্ত শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ ।

## চিকিৎসা তত্ত্ব ।

(পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর)

### দেশীয় চিকিৎসায় অনাস্থা ।

দেশীয় ঔষধ পথ্যের উপযোগিতা সংক্ষেপে বলা বলা হইল, বুদ্ধিমান আরোগ্য-কামি তাহার সাহায্যে আপনাদের কর্তব্য-কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন। এক্ষণে তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কার বশতঃ দেশীয় চিকিৎসায় অনাস্থা নাই, তাহাদের উদ্দেশ্য কিছু বলিতে হইবে। অনেকের বিশ্বাস বেরি গেরি (Beri-Beri) নিমোনিয়া (Pneumonia) প্রভৃতি ব্যাধিগুলি বিদেশের নূতন আমদানি, স্তত্রাং প্রাচীনতম আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে তাহার কোন প্রতিকার থাকিতে পারে না। ইহা তাহাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অনভিজ্ঞতার ফল। আয়ুর্বেদের রোগ-নিরূপণ ও তাহার প্রতিকার পদ্ধতি অতি

সূক্ষ্মশীল গ্রথিত; এ প্রণালীতে নূতন হউক, পুৰাতন হউক, দেশীয় হউক, বিদেশীয় হউক সকল প্রকার ব্যাধিরই অনিন্দিত চিকিৎসা করিতে পারা যাইবে। ইহা আমাদের নিজের কথা নহে। আয়ুর্বেদের অল্পতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চরকসংহিতায় স্তত্রস্থানের বিংশ অধ্যায়টি ভালরূপ আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা সম্যক উপলব্ধি হইবে। \* অল্প এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া সাধারণ বোধ্য “চিকিৎসা তত্ত্ব”র জটিলতা বৃদ্ধি করিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আয়ুর্বেদে রিজার্ভার

\* এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

‘বেরি বেরি’ শব্দ না থাকিলেও উক্ত ব্যাপির সমলক্ষণ বিশিষ্ট রোগের নাম রহিয়াছে। আয়ুর্বেদের ‘বাতবলাসক’ অরের লক্ষণ,— নিত্য মন্দ মন্দ জ্বর থাকিবে, পদাদিতে শোথ অর্থাৎ ফোলা দেখা যাইবে এবং তজ্জন্ম শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইবে। শরীর রক্ষা শুষ্ক ও শ্লেষ্মাবহুল হইবে। আধুনিক বেরি বেরি রোগেও ঠিক এই সকল লক্ষণই দেখা যায়। এই রোগে কবিরাজি চিকিৎসায় সমদিক ফল লাভও হইয়া থাকে। এই যে নিমোনিয়া রোগে এ দেশে সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, এই জ্বর সংযুক্ত শৈথিল্য কাস রোগ নীত প্রধান ইউরোপবাসীর নিকট করালকৃতান্ত স্বরূপ হইলেও উক্তপ্রধান দেশে মারাত্মক হয় না। ইউরোপীয় চিকিৎসায় এই রোগের মৃত্যুর হার দেখিয়া ভালকদ প্ৰতিকার আছে বলিয়া মনে হয় না, তথাপি এ দেশের অনেকেই উক্ত রোগে অল্পপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসায় মৃত্যুপথের পথিক হইতেছেন। অথচ এরূপ অনেক রোগেরই প্ৰতিকারে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের আরোগ্য-কারিতা অনেক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অক্ষ সংস্কারবশে এদেশের অনেক ব্যক্তির বিদেশীয় চিকিৎসায় ধন ও প্রাণহানি হইয়া থাকে।

অনেকের আবার দেশীয় চিকিৎসায় আস্থা আছে, কিন্তু ঔষধে বিশ্বাস নাই, ইহারও কোন মূল্য নাই। শাস্ত্রজ্ঞ, কন্ঠনিপুণ, চিকিৎসা ব্যবসায়ীর ঔষধে অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সন্ধান না লইয়া অবিশ্বাস করিলে সর্বত্রই অবিশ্বাসের কারণ রহিয়াছে। এই যে ডাক্তারি ঔষধ, ইহাতে কি অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই ?

ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত একই ঔষধের এরূপ মূল্যের তারতম্য হয় কেন ? এক কুইনাইনই পৃথক্ পৃথক্ মূল্যে বিক্রয় হয় কেন ? বিভিন্ন প্রস্তুতকারকের প্রস্তুত-প্রণালীর পার্থক্য হইতে, ঔষধের ভাগমন্ড-জন্ম এরূপ মূল্য পার্থক্য নহে কি ? বাজারে যখন ভালমন্দ দুই প্রকার ঔষধই বিক্রয় হইতেছে, দেশীয় ডাক্তারেরা অপকৃষ্ট ঔষধটিও যখন খরিদ করিয়া রোগিদের খাওয়াইতে-ছেন, তখন মাত্র কবিরাজি ঔষধে অবিশ্বাস করিলে চলিবে কেন ?

বলিতে পারেন, চেষ্টা ও অর্থায় করিলে ভাল ডাক্তারি ঔষধ সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সেরূপ করিলে কবিরাজি ঔষধও বিশ্বাসের সহিত পাওয়া যাইত ; সে কথা পরে বলিতেছি। এখন যাহারা কবিরাজি ঔষধের অবিজ্ঞতা সযত্নে দূর বিশ্বাসী তাঁহাদিগকে একবার দেশীয় ডাক্তারি ঔষধালয় গুলির ভিতরের অবস্থা গোপনে অনুসন্ধান করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছি। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে অ-হস্তস্পৃষ্ট যন্ত্রপ্রস্তুত ঔষধগুলির দেশীয় ডাক্তারখানায় কি অবস্থা হয়, তেজ-মিশ্রণগৃহে “সাদারণের প্রবেশ নিষেধ” থাকায় অনেকেই জানিতে পারেন না। আমি একটি বড় ডাক্তারি ঔষধালয়ে যে পাত্র হইতে জল লইয়া ঔষধে মিশাইতে দেখিয়াছি, স্বচক্ষে দেখিলে বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই সে ঔষধ সেবনে প্রবৃত্তি হইত না। অনেক ঔষধালয়েই পুরাতন বায়ীহীন ঔষধ পরিত্যক্ত না হইয়া ব্যবহৃত হয়। কোন একটি ঔষধ উপস্থিত না থাকিলে তাহা যে বাগ দেওয়া হয় না, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? ব্যবস্থাপত্রের নির্দিষ্ট পরিমাণ ঔষধ বইতে

মিশ্র কারিগর অনেক সময় কিছু কিছু ঔষধ কম দিয়া নিজেরা গোপনে হুঁপসয়ার সংস্থান করিয়া থাকে, এরূপ কথাও কোন কোন ক্ষেত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অবগাম করিবার কারণ সর্বত্রই রহিয়াছে।

দেশীয় চিকিৎসকগণের সহিত এক শ্রেণীর ঔষধ বিক্রয়কারি মিশিয়া গিয়া দেশীয় ঔষধে অবিস্বাসের কারণ কিছু বেশী হইয়াছে। এই শ্রেণীর ঔষধ বিক্রয়কারিগণ কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকে, বাহ্যিক যত বিজ্ঞাপনের অধিক আড়ম্বর, তাহার বিক্রয় ও সেই অল্প-পরিমাণেই হয়। সেটী জল্প ইহারা ঔষধের বিশুদ্ধতা বক্ষায় অর্থ ব্যয় করা অপেক্ষা বিজ্ঞাপনের জল্প অর্থ ব্যয় করাই সঙ্গত মনে করে। অবশ্য এই শ্রেণীর অব্যবসায়িকগণের উপর নিজেদের চিকিৎসাভার অর্পণ করিতে পারাও সচলী হয় না; সে কারণেই ইহারা পীড়িতের উপযোগী ঔষধ প্রচার করা অপেক্ষা মকরবজ, চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি স্তম্ভ শরীবে ও সন্দাদা ব্যবহারোপযোগী ঔষধ গুলির প্রচারেই সমর্থক সচেষ্ট, কিন্তু এই সকল অপরিচিত ঔষধগুলিও অব্যবসায়ীকে বিক্রয় করিতে হইলে সাধারণকে এমন একটা সুাবধা দেওয়া আবশ্যক, যাহাতে তাহাদের জায় আচিকিৎসকের নিকট ঔষধ খরিদ করিতে প্ররুতি হয়। তাই ইহারা স্থলভের প্রলোভনে সাধারণকে এই সকল বিশুদ্ধতা অনৌষধগুলি খরিদ করিতে প্রলুব্ধ করিতেছে। এই ঔষধের মূল্যনির্দেশেও তাহাদের অনেক প্রকার চাতুরী দেখিতে পাওয়া যায়, সন্দাদা, ব্যবহৃত ঔষধগুলির মধ্যে যেগুলি উচ্চ মূল্যের ঔষধ, সেগুলিকে

ইহারা অতি স্থলভে দিয়া সস্তা বিক্রোতা সাজিয়া আবার অনেক অল্প মূল্যের ঔষধ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে।\*

আর এক শ্রেণীর পীড়িতের উপর বিজ্ঞাপনে ঔষধ বিক্রয়কারিদিগের অত্যন্ত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল অপরিণাম দর্শি ব্যক্তি অতিরিক্ত ইঞ্জিয়দোষে মেহ, ধাতুদৌষল্য, উপদংশ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত, তাহাদের অনেকে লজ্জাবশতঃ স্থানীয় চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া গোপনে ও ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য লাভের আশায় ইহাদের ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে। ঔষধ বিক্রোতা গণ এই সকল পীড়ার লক্ষণগুলি সন্ধান লিপিয়া ও হাতেহাতে ফল লাভের লোভ দেখাইয়া ইহাদের ধন, প্রাণ উভয়ই নষ্ট করিতেছে। একথাটা লোকে একবার ভাবিবার সময় পায় না যে, ইহাদের সস্তা ঔষধে অসম্ভব অল্প সময়ে, প্রকৃতই যদিবাধি আরোগ্য হইত, তবে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া এত বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর করিবার আশঙ্ক্য কি ছিল? কোন চিকিৎসক ত কখনও বিজ্ঞাপন দেন না, কিন্তু তাহাদের

\* দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ঢাকার বিজ্ঞাপনে ঔষধ বিক্রয়কারি মথুর বাবুর স্থলভ মূল্যের মকরবজ, চৈতুমুখ প্রভৃতি এবং উচ্চ মূল্যের বৃ: গুড়পিঙ্গলী, পুরাতন গুড় প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিতে পারি। আমি তাহাদের মকরবজের হিসাব লইয়া এখনে তাহাদের সহিত পত্র ব্যবহার, করিয়াছিলাম, কিন্তু যথাবৎ উত্তর না পাওয়ার গত কৈষ্ঠ মাসের পঞ্চমি পক্ষে ইহাদের ঔষধগুলির প্রস্তুত খরচা ও মূল্য নির্ধারণ লইয়া একাংশ আলোচন করিয়াছি। তথাপি তাহারা নিজেদের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না। তাহারা বিজ্ঞাপনের স্থলভ ঔষধের ভুল, তাহাদিগকে উক্ত অবস্থা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কার্য্যনৈপুণ্যই বিজ্ঞাপন অপেক্ষাও দেশ-বিদেশে তাঁহাদিগকে পরিচিত করিতেছে। দেশের কোন শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধ ব্যবহার করেন না, যদি বিজ্ঞাপনের ঔষধ ভাল হইত, তবে তাঁহারা অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা ও উচ্চ মূল্যের ঔষধ লইবেন কেন? মনে রাখিবেন বিজ্ঞাপনের জন্ত প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ও স্নানভে যাহাদিগকে ঔষধ বিক্রয় করিতে হয়, তাহারা ঔষধের জন্ত আর সেরূপ অর্থ ব্যয় করিতে পারে না, আর এই সকল মূল্যবান-উপাদান-হীন ঔষধে কোন উপকার হয় না, বলিয়াই প্রতিবৎসরই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নিত্য নূতন রোগী সংগ্রহ করিতে হয়।

আরও এক কথা রোগ বা স্নাত্যভঙ্গ যেজন্মই হউক না কেন, ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত ঔষধ ব্যবহার করাই কর্তব্য। কারণ; দেশ, কাল, বয়স, প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, এজন্য একই রোগে এক প্রকার ঔষধ সকলের পক্ষে সমান ফলদায়ক হয় না। চ্যবনপ্রাণ মকর-মুখ প্রভৃতি রসায়ন ঔষধগুলি বিবিধ গুণকর ও স্নাত্যোপযোগী হইলেও সকলের পক্ষে সমান ফলদায়ক হয় না। এজন্য বিজ্ঞাপনের গুণাগুণ দেখিয়া বা অচিকিৎসকের পরামর্শ শুনিয়া কোনও ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। মনে রাখিবেন অশেষ গুণকর ঔষধও অগ্রযুক্ত হইলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিকর হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে,—

“ভেষজং বাপি দুষ্টং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে

বিষম্।”

অর্থাৎ উত্তম ঔষধ ও অগ্রযুক্ত হইলে তীক্ষ্ণ বিষের ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং এই সকল অচিকিৎসক ঔষধ বিক্রয়কারি-গণের জন্ত আয়ুর্সেদের চিকিৎসা বা ঔষধের প্রতি দোষারোপ করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। যাহাদিগকে রোগী আবেগা করিয়া যশঃ ও অর্থ উপার্জন করিতে হয়, কার্য্য-নৈপুণ্যই যাহাদের উন্নতিসোপান, তাঁহারা কোন লাভের আশায় ঔষধের পবিত্রতা ও শক্তি হানি করিবেন। যে কার্য্যে চিকিৎসক সম্প্রদায়েব কোন হেঁচ নাই, বরং সম্পূর্ণ অনিষ্ট, তাহারা সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নিজের সম্বলনাশের পথ মুক্ত করিতে পারেন না।

### চিকিৎসক।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, রোগ শাস্তির নিমিত্ত ভিক্ষুক, ঔষধ, পরিচর্যাকারক ও রোগী এই চারিটিই সশুণ যুক্ত হওয়া আবশ্যিক। ইহাদের মধ্যে আবার চিকিৎসকই প্রধান, কারণ শাস্ত্রজ্ঞ, কার্য্যনিপুণ চিকিৎসকই প্রকৃত ঔষধ প্রদান এবং রোগীও সুশ্রবাকারিকে সছপদেশ দ্বারা পরিচালিত করিতে পারেন।

বাণি মানব যাত্রেই অবশ্যস্বামী, সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থেরই পূর্ব হইতে একজন পারিবারিক চিকিৎসক স্থির করিয়া রাখা কর্তব্য। চিকিৎসক স্থির করিবার পূর্বে তাঁহার শিক্ষা ও কার্য্য কুশলতার পরিচয় বিশেষরূপে সন্ধান লইতে হইবে। যিনি গুরুর নিকট শাস্ত্র ও কর্ম্মভাষ্য, অথবা দৃষ্ট-কর্ম্ম ও কর্ম্মনিপুণ এবং শাস্ত্র বিখ্যাত ও পবিত্রচারী তিনিই প্রকৃত আরোগ্যদাতা। চিকিৎসক কর্ম্মনিপুণ হইলেও দয়াশূ-নির্লোভ ও জিহেজির হওয়া আবশ্যিক।

মমগ্রাহন, স্বার্থপর, অর্থলোলুপ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান কর্তব্য নহে।

সংগঞ্জাও, দয়ালু, কার্যকুশল, শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে কোন কালে মনস্তাপের কারণ হয় না।

চিকিৎসকের নিকট রোগ ও আর্থিক অবস্থা গোপনের চেষ্টা করা উচিত নহে। চিকিৎসা যাহাদের জীবিকার উপায় তাহাদিগকে সাধ্যমত অর্থদানে রূপান্তর করা উচিত নহে। অকারণ চিকিৎসকের ক্ষোভ উদ্ভাটন সাভের পরিবর্তে ক্ষতিই হইয়া থাকে। প্রকৃত অর্থহীন ব্যক্তি দয়াবান চিকিৎসকের করুণা নিশ্চয়ই পাইবেন।

গোপী ও তাহার আত্মীয় স্বজন সর্বদা চিকিৎসকের উপদেশ মানিয়া চলিবেন। চিকিৎসকের উপদেশ পালন, ঔষধের তিক্ত, কষাণাদি দ্বাদ, রোগকালীন পথ্য তৎকালে স্বীকার না হইলেও পরিণামে শুভকর হয়।

দাস দাসী অপেক্ষা আত্মীয় জনেরই রোগীর পরিচর্যার ভার গ্রহণ করা কর্তব্য। বৈদ্যশাসন ব্যক্তি ভিন্ন অন্ডের হাতে সূক্ষ্মতার ভার দেওয়া উচিত নহে। মধুরভাষী, রোগীর প্রতি অহুরক্ত, জ্ঞানবান, কর্মকুশল, প্রভাৎপন্নমতি, রোগীর সূক্ষ্মভার গ্রহণ করিবেন। বালাক, বুদ্ধ, দুর্বল, অল্পে কাতর, ককণভাষী, নিষেধ, লোভী, অহিতচারী ব্যক্তি হস্তে রোগীর ভারার্ণ করা কর্তব্য নহে। বভব্যক্তি একত্র হইয়া পরিচর্যাভার গ্রহণ করিলে অনেক সময় ব্যর্থতা গোপযোগ হইয়া থাকে। রোগীর অপ্রিয় ব্যক্তিকে নিকটে বাইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। অতি সমুদায় সমুদায় প্রিয় পরিজনদেরও অকস্মাৎ রোগীর নিকট যাওয়া উচিত নহে।

এক্ষণে চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্বন্ধে সাধারণের উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। যে চিকিৎসার আশ্রয় সর্বদা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মতবাদ সম্বন্ধে যতটুকু পারা যায় অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। এজন্ত অবকাশ মত তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাাদি পাঠ করিতে হইবে, চিকিৎসকের সহিত আলাপ, প্রশ্নাদি করিয়া শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তথ্য বুঝিতে হইবে। ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সূক্ষ্ম-প্রণালী অবগত হইতে পারা যাইবে।

আলাপ পরিচয় হইতে লোকের সদ সং-প্রবৃত্তি জানিতে পারা যায়, চিকিৎসকের সহিত শাস্ত্র ও ভেষজাদি সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় করিলে, তাহার কর্ম নৈপুণ্য বিপুল ঔষধ প্রস্তুত অমুরাগ বুঝিতে পারা যাইবে।

আবার আলাপ পরিচয়ে চিকিৎসককে শাস্ত্রচর্চ্চাধীন, অসৎকর্মী, লোভী, কদাচার, কর্তব্য কথ্যে অর্থ ব্যয়ে কুস্তিত, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী অনভিজ্ঞ বুঝিলে, স্পষ্ট হইলেও তাহার দ্বারা চিকিৎসিত হইবে না। সকল সময়ে সকল দেশেই কতকগুলি ভিষক্-বেশধারী কপট ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল কুণৈষ্ঠ মৃত্যুর অগ্রদূত। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া সকলেরই কর্তব্য। এই সকল কুণৈষ্ঠগণ নিজেদের বৃথা প্রশংসা করিয়া লোকের ভ্রম আকর্ষণের চেষ্টা করে, রোগের সংবাদ পাইলেই গৃহস্থের বাড়ীর সন্নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায়, অথবা আহ্বান না করিলেও স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিজের কার্য প্রশংসা করিতে থাকে। কেহ না বলিলেও নিজেই রোগীর ঔষধ পথ্য

বাবস্থা করে এবং কোনরূপে ঔষধ ব্যবহার করাইধার জ্ঞাত সচেতন হয়। ইহাদের নিকট শাস্ত্র প্রমত্ত উত্থাপন করিলেই অত্র কথায় চাপা দিবার চেষ্টা করে, কিম্বা বিরক্তির সহিত অসংলগ্ন উত্তর দিয়া থাকে। অচিকিৎসিত থাকাত্ত ভাল, কিন্তু একপ কুট্টবৈজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা করান উচিত নহে।

ধনজনবহুল স্থান বাতীত সূচিকিৎসকগণ থাকিতে পারেন না, এজন্ত ক্ষুদ্র পল্লীতে অনেক সময় চিকিৎসকের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল স্থানে কুচিকিৎসক ও বিজ্ঞাপন ব্যবসায়িদিগের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীর জনসাধারণ দলাদলি মামলা মোকদ্দমার জন্ত অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা বা আরোগ্যের জন্ত অর্থ ব্যয় করিতে কষ্ট বোধ করেন। অনেক পল্লীবাসী ঔষধের যে, কোন মূল্য দিতে চায় তাহাও জানেনা, এ জন্তই পল্লীতে কোন ভাল চিকিৎসক থাকিতে চাহেন না,—আর থাকিলেও উপযুক্ত মূল্যের অভাবে ব্যয়সাপেক্ষ কোন ঔষধই প্রস্তুত রাখিতে পারেন না।

এরূপ ক্ষেত্রে পল্লীর অবস্থাপন ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কর্তব্য, সমগ্র গ্রামবাসিগণের সহিত একত্র হইয়া গ্রামের লোকসংখ্যায় বায়ী একজন বা দুইজন চিকিৎসা-নিপুণ ভিষককে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করা,—এবং ধনিগণের নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া ও বিশেষ

প্রয়োজনীয় ঔষধগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখা। কোন জটিল রোগে গ্রাম্য-চিকিৎসকের চিকিৎসার উপকার না পাইলে অগা ঔষধের অভাব হইলে নিকটবর্তী নগর—মহকুমা বা জেলায় যে সকল চিকিৎসকের চিকিৎসায় সুখ্যাতি আছে, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া গ্রাম্য-চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ পূর্বক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। বঙ্গের কোন কোন পল্লীতে ভাল চিকিৎসকের অভাব থাকিলেও জনবহুল নগর, মহকুমা বা জেলায় সূচিকিৎসকের অভাব নাই। চিকিৎসার জন্ত সাধ্যমত অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া বুদ্ধিমানের কাণ্ড নহে, কারণ সামান্য অর্থের জন্ত স্বাস্থ্য ক্ষয় হইলে চিরদিনের জন্ত অর্থাগমের পথ বন্ধ হয়। আরোগ্য—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল। সুতরাং নির্দোষ আরোগ্যের জন্ত কিঞ্চিৎ অধিক অর্থ ব্যয় হইলেও তাহাতে অর্থাগমের পথ মুক্ত হইবে। যাহারা নির্দোষ আরোগ্য, অথের সাশ্রয় ও অক্ষয় স্বাস্থ্যলাভে চক্কর, তাহারা কখনও কুট্টবৈজ্ঞের অথবা বিজ্ঞাপনের ঔষধ ব্যবহার করেন না, কারণ ইহাদের অশাস্ত্রীয় ও অব্যবস্থা প্রদত্ত ঔষধগুলি আরোগ্যদান করিতে পারাই না, অনেক সময় ভবিষ্যৎ বাধির কারণ হইয়া চির জীবনের মত ভগ্নস্বাস্থ্যের ও অর্থনাশের কারণ হয়।

শ্রীজীবনকালী রায় বৈজ্ঞানিক।



## আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য ।

— :: —

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি—তাহা এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে। মুসলমান রাজত্বে চট্টোমানি বা চৌকিম চিকিৎসার পূর্বসমাদর লাভ ঘটিলেও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রাধান্য-হান ঘটি নাই। বাদসাহ এবং আমীর ওমরাহগণ চিকিৎসাব্যাপদেশে সুদক্ষ হেকিম চিকিৎসকদিগকেই আহ্বান করিতেন সত্য কিন্তু তিন্দু বংশধরগণ পারতপক্ষে হেকিম চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হইয়া আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগেরই শরণ গ্রহণ করিতেন। কাজেই হেকিম চিকিৎসা রাজকীয় সাহায্য পাপ হইলেও প্রকৃতি পুঞ্জের অমুরাগাধিকাংশই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাই দেশে যে সমৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই ফলে তাহার উজ্জ্বলতার কিয়দংশ এখনও পর্য্যন্ত বাচ্যবিকৃত হইয়াও নষ্ট হইতে পারে নাই। এই জন্যই মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং ব্রিটিশ রাজত্বের অভ্যুদয় কালে প্রান্তঃস্রবীণ গঙ্গাধরের আয়ুর্বেদসিদ্ধি জন সাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। গঙ্গাধরের শিষ্যগণিও ইহার ফলে প্রভূত খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন পূর্বক বশস্বী হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন এখন চলিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই এখন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি,—তাহা ভাবিবার সময়ও আসিয়াছে।

অগ্রহারণ—৪

কেমন করিয়া কিরূপভাবে সেদিন আমাদের চলিয়া গেল এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইংরাজ রাজত্বের দৃঢ় ভিত্তি গ্রথিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন যাত্রা পরিচালন ব্যাপারেও যেন একটা অভিনব ভাব আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাদের সাহিত্য, আমাদের শিল্প, আমাদের কৃষি—এক কথায় আমাদের সকল বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি কামনায় ইংরাজ রাজ যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাষা-জননী সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা প্রচার উদ্দেশে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, চতুষ্পাঠিগুলিতে এইজন্য বৃত্তি নিদ্ধারিত হইল, কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য agriculture ফার্ম সকল স্থাপিত হইল। আমাদের রাজা এ সকল চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু আমরা নে সকল চাহিলাম না,—আমরা চাহিলাম,—আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি গুলিকে পদদলিত করিয়া,—আমাদের ধর্ম,—আমাদের কর্ম,—আমাদের জাতীয় ভাব,—আমাদের শিক্ষা,—আমাদের দীক্ষা,—সকলই জলাঞ্জলি দিয়া পরকীয় ভাবে আমরা গঠিত হই—ইহাই হইল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারই ফলে আমাদের কি অশন,—কি বসন,—কি বিলাস, কি বাসনা—সকলই যেন পরকীয় ভাবে গঠিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের

পৌরহিত্যের স্ফূর্তি হইল, বৈজ্ঞানিক পুষ্টি বা মোড়কের অনুবাদ নষ্ট হইল, কণ্ঠকার-নন্দনের মনে ইংরাজী শিখিয়া চাক্রে পুরুষ হইবার আশা জাগিয়া উঠিল, কল তৈলের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিল, গোয়ালা ছুফের কেঁড়ে পরিত্যাগ করিল,—এক কথায় সকল জাতির ভিতরই জাতীয় রক্তের স্ফূর্তি লোপ পাইল,—সকলেই এ-বি-সি-ডি'তে হাতে খড়ি দিয়া জজিয়াতি বা ম্যাজেস্ট্রেট চাকরি পাঁইবার জন্ত লালায়িত হইয়া পড়িলেন। আমাদের অবনতির পথ এমনই করিয়াই পরিষ্কার করিতে লাগিলাম।

শুধু ইহাই নাহ, সমাজের ব্যবস্থা-বিপর্যয় হো এইরূপ ভাবে ঘটিলই, সংসারপরিচালনার বিষয়গুলির ভিতরও আমরা অভিনব ব্যবস্থা আনিয়া ফেলিলাম। এই জন্তই আমাদের কাক্সন ফেলিয়া কাচের আদর, এই জন্তই আমাদের টিকি কাটিয়া টেড়ির ব্যবস্থা, —এই জন্তই আমাদের তৈল-ভুলিয়া সাবানের স্ফূর্তি। অধুনা সুরাপায়ীর সংখ্যা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের প্রণয়নব্যবস্থায় দেশের শিক্ষিত পুরুষদিগের ভিতর সুরার স্রোতটা পূর্ণভাবেই চলিয়াছিল। “সধবার একাদশী”তে “নিমচাঁদে”র প্রতিকৃতি সে কালের কবি কুল কেশরীর উজ্জল চিত্র। সে চিত্র প্রকাশে যে শুভ ফল ফলিয়াছিল, এখনকার শিক্ষিত পুরুষদিগের চরিত্রোন্নতি তাহারই স্বাক্ষর প্রদান করিতেছে। যাক্—যে কথা বলিতে-ছিলাম,—সমাজের মত সাংসারিক ব্যবস্থাতেও আমরা অন্ততঃ আনিয়া ফেলিলাম,—রোগাক্রমণে ঔষধ সেবন সম্বন্ধে ও বড়ি ওঁড়া ছাড়িয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দাগ কাটা

শিশি হঠতে লাগল সবুজ রংয়ের তরল পদার্থ অনুরাগী হইলাম। ক্যাশেল এবং মেডিসিন কলেজের রূপায় উত্তরোত্তর ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। টাটাদেপে ষ্টেপেকোপ-থার্মোমিটারের নিকট টিকিদারী বৈজ্ঞানিক নাড়ী টেপার ব্যবস্থা চিকিৎসার পাইল না।

এছাড়া আরও কতকগুলি কারণ ঘটিল। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ এবং কাশিম বাজারে ম্যালেরিয়া জরের যে নূতন স্বর আরম্ভ হইল, ১৮২৪ সালে যশোহর নদীতে এবং ২৪ পরগণায় তাহা পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়া, পাশ্চিম বঙ্গের অনেকগুলি পল্লী ক্ষয়-কারিয়া ফেলিল। ক্রমে পশ্চিম বঙ্গ ছাড়াইয়া পূর্ববঙ্গে হুঁহা বিস্তৃতি লাভ করিল। সে ম্যালেরিয়া বিস্তৃতির বিশদ বিবরণ আমরা ইতঃপূর্বে প্রকাশ করিয়াছি। ফলে বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়া প্রবেশে দেশীয় চিকিৎসার তাহার আশ্রয় দমন হয় না দেখিয়া অনেকে বড়ি ওঁড়া ছাড়িয়া ডাক্তারি চিকিৎসার পক্ষ-পাতী হইল।

তাহার পর বিহুচিকা। বিহুচিকা নিবারণে আমাদের ঔষধ যথেষ্ট থাকিলেও ক্যান্ডার এবং ক্রোরোডাইনে শীঘ্র কার্য হইতে লাগিল। তাহার পর আবার যখন লোকে আমেরিকার হোমিওপ্যাথিতে কলেরা চিকিৎসার সুফল প্রত্যক্ষ করিল, তখন এলোপ্যাথিক ছাড়িয়া তাহার গোঁড়া হইতে আরম্ভ করিল। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার যে কলেরা আরোগ্য হইতে পারে, ক্রমশঃ একথাটা লোকে একবারে ভুলিয়া গেল।

তাহার পর “লজ্জ চিকিৎসা”। “আহুয়ী নাহুয়ী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধা মতা।”—এ

নতন তখন প্রণীত হইয়াছিল, তখন অবশ্য  
চিকিৎসার কথা আর্থী স্বয়ম্ভূত  
অপাত ছিলেন না। এইজন্য “আয়ুর্বিদ্যা”  
চিকিৎসাই যে আমাদের স্বস্থ চিকিৎসা—  
দে কথা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে।  
যখন দেশ হইতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার  
সম্পদ হ্রাস পাইতে লাগিল তখন উপযুক্ত  
ভাবে আয়ুর্বেদ চর্চা করিতে বৈদ্যদিগের  
পর্যবেক নষ্ট হইল। ফলে যে কোন কারণেই  
চিকিৎসা চিকিৎসাটি দেশ হইতে একবারে  
মোছা হইল। সাম্প্রদায়িক দেখিল,—ম্যালেরিয়া  
সমাজিকভাবে ঐক্যে যে সমস্ত সুফল হইয়া  
গেল, কবিবাজীতে বচনিন চিকিৎসা  
করিয়াও যে ফল পাওয়া যায় না। কলেরায়  
এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথিতে যে ফল  
পাওয়া যায়, কবিবাজী চিকিৎসা তাহার  
অনেক গুণেতে পড়িয়া থাকে। আর শস্ত্র  
চিকিৎসা—লোভা কাটা, পোষাতি খালাস—  
এ সকল চিকিৎসায় তো আয়ুর্বেদীয়  
চিকিৎসক যৌনতেই পাবে না। সূত্ররূপ  
কবিবাজ অপেক্ষা ডাক্তারের প্রাধান্য শুধু  
বেশত্বপূর্ণ এবং ব্যবহারিক যন্ত্রের চাকচিক্য  
নিবন্ধনই যে উপস্থিত হইল তাহা নহে,  
কারণ ও কবিবাজ অপেক্ষা ডাক্তারদিগের  
নিষ্ঠা অতি শীঘ্র অধিকতর সুফল হইয়া  
পাশ্বে দেখিয়া লোক ডাক্তারি চিকিৎসারই  
সম্পদিক প্রভাব হইয়া পড়িল। অবস্থার  
ব্যবস্থার বৈদ্য চিকিৎসকগণের দৈন্য বদ্ধিত  
হইল। তাঁহারাও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার  
উন্নতির প্রতি আর মনোযোগ প্রদান না  
করিয়া নিজের জীবন কোনরূপে অভিবাহিত  
করিবেন এই সংকল্প করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধর-  
দিগকে ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া

চাকরিজীবী সাজাইয়া তাহাদিগের উদ্যোগ  
সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ফলে  
আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার আর উন্নতি হইল  
না,—এ চিকিৎসা জাগতিক সকল প্রকার  
চিকিৎসার মূল হইলেও ইহার উন্নতির পথে  
গো বাধা পাড়াহাছিলই, এক্ষণে তাৎ  
চিকিৎসার নিয়ন্ত্রণে পতিত হইয়া কেবল  
পূর্ব সমুদ্রি উল্লেখ বিস্তারে আয়ুর্ভূত  
লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেবল  
কতকগুলি রোগে ইহা ভিন্ন অল্প গতি নাই  
দেখিয়া সাধারণে ইহাকে ছাড়িল না; সেই-  
জন্য এখনো ইহার অস্তিত্ব একবারে লুপ্ত হয়  
নাই,—নতুবা অনেক কাল পূর্বেই সমাজের  
সর্বপ্রকার অভিজাতের মত অধুনা শিক্ষি  
তাভিমাত্রী নব্যযুগে মিশিয়া ইহার অস্তিত্বও  
চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোন অতীত প্রদেশে  
মিলাইয়া যাইত—তাহা বলা যায় না।

আমরা যে বিষয় লইয়া অল্প এই প্রবন্ধ  
আরম্ভ করিয়াছি—“আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার  
উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি”—ইহা  
যদি স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে যে যে  
কারণে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি হই-  
য়াছে দেখাইলাম, সেগুলির উন্নতি করিতে  
হইবে। শলা, শালাকা, কায়-চিকিৎসা  
ভূতবিদ্যা, কোমার ভূত, অগদ ভক্ত, রসায়ন  
ভক্ত, বাজীকরণ ভক্ত—সকল শাস্ত্রগুলি  
আবার আমাদের কাছে আয়ত্ত করিতে হইবে।  
শুধু আলমারি সাজাইয়া, সাইনবোর্ড দিয়া  
লম্বা লম্বা বাক্য বিজ্ঞানে ‘ছদ্মচর’ সাজিয়া  
সাজিয়া রোগিসংগ্রহের চেষ্টা করিলে চলিবে  
না,—শাস্ত্র শিক্ষা পূর্বক দৃষ্টকর্ম হইয়া  
সর্ব প্রকার চিকিৎসার সিদ্ধিলাভ করিতে  
হইবে। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া—বাহা কুই-

নাইন ভিন্ন নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই বলিয়া একবাক্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, 'নাটা'র পার, 'গুলফে' পার, 'ভাঁটপাতা'র রস সেবন করাইয়াই পার,—তোমাদিগকে তন্নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলেরা তাড়াইবার জন্য হোমিওপ্যাথের নিকট ষাইবার স্পৃহা রহিত করিয়া বর্তমান সময়ের রোগের প্রকৃতির গতি উপলব্ধি করিয়া ঔষধ নির্বাচন করিতে হইবে। আর কোড়া কাটা, পোয়াতি খালাস—এ সকলও আয়ুর্ষ করিবার জন্য এনাটাম, সার্জারির পূর্ণ সাধনা করিতে হইবে। যদি এ সকল ব্যবস্থা করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পার,—এই প্রতিযোগিতার যুগে এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অপেক্ষা তোমাদের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় যদি সর্ব বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পার, তাহা হইলে আয়ুর্বেদের উন্নতির পথ আপনা হইতে এমনই উন্মুক্ত হইয়া পড়বে যে, সহস্র ঋণ্যবাস্তেও কেহ তাহা রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

সে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবার সময়ও

উপস্থিত হইয়াছে। তোমাদের "মকব্ব্বজ্জ"র গুণ পরিচয় এখন বিলাতী চিকিৎসকেষণ অবগত হইয়াছেন,—অর বিকারের দ্যে অবস্থায় 'গালিসাই' সেবন করাইয়া দল পাওয়া যায় না, সে অবস্থায় তোমাদের 'মকব্ব্বজ্জ মুগনাভি'র সত্ত্বঃ কার্যাকরী শক্তি দেখিয়া ডাক্তারগণ মুগ্ধ হইতেছেন। তোমাদের 'কালমেঘ', তোমাদের 'অশোক', তোমাদের 'অশ্বগন্ধা'—তোমাদের 'কটু-কারি'—রোগ আরোগ্যে বিরূপশক্তি সম্পন্ন—ইহা যদি এক্ষণে বিলাতী চিকিৎসক মণ্ডলী অবগত না হইতেন, তাহা হইলে বেঙ্গল কেমিকাল ওয়ার্কসে আজি এ সকল গুস্তভেব ব্যবস্থা হইত না। সেইজন্য বলিতেছি, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির পথ এখন আর রুদ্ধ নাই,—এখন চেষ্টা করিলেই ইহার উন্নতি করা যাইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টার মূলভূত বিষয় অষ্টাদশ আয়ুর্বেদে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ। সে শিক্ষার সাফল্য লাভ করিলেই যে আয়ুর্বেদের পুনরুন্নতি লাভ ঘটবে—ইহা ধ্রুব সত্য কথা।

## মহিলাগণের চিকিৎসা-শিক্ষা।

( ২ )

### প্ৰীহা ও যকৃৎ রোগের ব্যবস্থা।

আমার একটি বাল্যসঙ্গিনী—তাহার নাম ছিল সুরমা। আমি যখন প্রথম শিশু-বয়স করিতে আসিয়াছিলাম, তখন সুরমাই হইয়াছিল আমার সুখ-দুঃখের, আশা নিরাশার, কামনা-বাসনার এক মাত্র সহ-

চরী। অত্যন্ত কার্যে গুরু গল্পনার বহন আমার মুখে বিবাদের কালিমা প্রতিকলিত হইত, দারুণ অভিমানে আত্মহার্য হইয়া যখন নৈরাশ্রের ঘনাককার আমার কাছ মূর্তিতে প্রকটমান হইত, মর্দকণ্ড মুখে

না কুটিয়া বথন অন্তঃস্থ দেশে সিকুবারির মন শুষ্ক করিয়া বহিয়া যাইত, তখন সুরমা আসিয়া আমাব সকল কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমি বলিতে না চাছিল সে সকল কথা খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া জোর করিয়া আমার নিকট হইতে বাহির করিয়া লইত। সকল কথা বাহির করিয়া লইয়া কত সাধনার কথা বলিত। তখন বয়সটা খুবই অল্প ছিল, সংসারের রহস্য যে তখন কিছুই বুঝিতাম না, কাজেই প্রতিপদে কণ্ঠ দুলষ্ট না করিয়া বসিতাম।

পুণীটি আমার বেদিন পুড়িয়া গিয়াছিল, শব্দ পর দিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম, সুরমা শিশুর বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। তাহার পিত্রালয় ছিল আমাদেরই বাড়ীর পার্শ্বে। আমি পিশিমার নিষ্ঠা অনুমতি লইয়া সংবাদ শুনিবা মাত্র সন্মোকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া গেলাম।

অনেক স্থত ছুথের কথার পর সুরমা বলিল, “আমার ছেলেটি ভাই কিছুতেই বাঁচিয়াছে না, পেট গোড়া প্রীহা, লিভারটাও বড় হইয়াছে। জব রোজ হয়না বটে কিন্তু এমন মাস নাই, যে মাসে দু’বার তিন বার দিয়া না হয়। কত চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহাকে ভাল করিতে না পারিয়া মনের স্থত কিছুতেই পাইতেছি না।”

আমি বলিলাম—“ডাক্তার বন্ধিরা কেউ কিছু করিতে পারেন না।”

সুরমা বলিল—বন্ধি দেখাই নাই, কারণ বন্ধি-চিকিৎসার উপর ওঁদের বড় ভক্তি নাই, একবার নাকি কোন্ একটা বন্ধি আসিয়া ওঁর কি একটা অস্থি আত্ম একটা ভুল করিয়া বসিয়াছিল, সেই থেকে উনি বন্ধি

চিকিৎসার উপর বড় চটা। ডাক্তার অনেক দেখান হইয়াছে কিন্তু তা’রা কেবল গাদা গাদা কুইনাইন দেয়, তা’থেকে আর বন্দ হয় বটে কিন্তু একবারে যায় না।

আমি বলিলাম,—তা’ তোমার স্বামী তো ভাই বন্ধি চিকিৎসার উপর একেবারেই চটা। আমি কিন্তু তা’র চেয়েও একটা অজ্ঞান কাজ করিতে বলি, তা’ তুমি করবে কি!

সুরমা বলিল—কি!

আমি বলিলাম আমার পিসীমা, ডাক্তার বন্ধি না হ’লেও চিকিৎসার অনেক বিষয় জানেন। আমি বলি কি,—দিন কতক তাঁর উপর নির্ভর করলে মন্দ হ’ত না।

সুরমা সন্মতি প্রকাশ করিল। বলিল, তা’ ক্ষতি কি, তিনি তো এখানে নাই, ভাল দেখাই যা’ক্না,—যদি পিসীমা সারাইতে পারেন, তখন তাঁকে সব কথা বলব, নইলে কিছুই বলবার দরকার নাই।

এই পরামর্শের পর আমরা উইকেন পিসীমার নিকট আগমন করিলাম, সুরমার ছেলেটিও অবশ্য আমাদের সঙ্গে আসিল।

আসিয়াই আমি পিসীমাকে পাইয়া বসিলাম। বলিলাম,—পিসীমা আমাকে সেবার শিখা করিবে বলিয়াছিলে, শুধু মুখের উপদেশে শিক্ষা দিলে চলিবে না, চিকিৎসার ধরণ দেখাইয়া শিখা করিতে হইবে।

এই বলিয়া সুরমার ছেলেটির অস্থির কথ্য তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম।

পিসীমা সুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—খোকার বয়স কত হইয়াছে।

সুরমা বলিল—এই যেটের কোলে তিন বছরে প’ড়েছে।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাত্ৰথায়।  
সুরমা বলিল—খায় বইকি? মাই না দিলে  
কচি ছেলে থাকবে কি ক'রে?

পিসীমা বলিলেন—ওইটা আগে বন্দ  
ক'ৰ্ত্তে হ'বে। যে সব ডাক্তারদের দেখাইয়া  
ছিলে তাঁরা কি মাই বন্দ ক'ৰ্ত্তে বলেনি!

সুরমা বলিল,—কেউ কেউ বলেছিল,  
কিন্তু খোকা মাই না পেলে যে অস্তির হ'য়ে  
উঠে, পিসীমা। কাজেই মাই বন্দ ক'ৰ্ত্তে  
পারিনি।

পিসীমা বলিলেন,—যদি সহজে বন্দ  
ক'ৰ্ত্তে না পার, তা'হলে মাঠিতে তেতো  
জিনিস মিশিয়ে দিতে হবে। নিমপাতা  
বেটে, ভাঁটপাতা বেটে কি বেনের দোকানে  
যে চিরাতা পাওয়া যায়, তাই বেটে, কি  
কালমেঘের পাতা বেটে মাইতে লাগা'তে  
হয়, ওরই কোন একটা জিনিস লাগা'লে  
মাইয়ের ছপের মটিভাব ততো হ'য়ে যায়,  
তখন আর মাই খেতে চা'বেনা। এমনই  
ক'রে মাই বন্দ ক'ৰ্ত্তে হ'বে। মাই বন্দ  
না ক'রলে হাজার ডাক্তার বদ্বি দেখা'লেও  
এ রোগ কিছুতেই সারবেনা।

সুরমা বলিল,—আচ্ছা আমি ঐকপ  
ক'রে বন্দ ক'রব পিসীমা। এখন তার  
পর কি ক'রব—তা'বল।

পিসীমা বলিলেন,—আগে নিয়ম, তা'র  
পর ওষুধ। অনেক সময় ওষুধ না খাইয়েও  
শুধু নিয়মে রেখে অনেককে ভাল করা যায়।  
বা'হোক নিয়মগুলার কথা আগে বলি শোন।  
ছপ বা' দেবে, তাতে প্রত্যেকবারেই একটু  
পিপুলের শুঁড়া মিশিয়ে দেবে আর ছপ  
গরম ক'রবার সময় অর্দ্ধেক ছপ আর অর্দ্ধেক  
জল দিয়ে আর তা'কে একখানা আত

পিপুল ফেলে দিয়ে সিক্ত ক'রে নেবে। বা'টি  
ঘন ছপ এ রোগে মোটেই ভাল নয়।

সুর। বা'টি ছপ ভাল নয় কেন পিসীমা?  
পিসী। বা'টি ছপ ভাল নয় এইকথা যে  
বা'টি ছপ হজম ক'রতে যে শক্তি দাবায়,  
পীলে নীবার বড় হ'লে সে শক্তি কমে  
যায়। পীলৈয় ছপ দেওয়া চলে কিন্তু নাগবে  
ছপের মাত্রাটা যত কম দেওয়া যায় ততই  
ভাল।

সুর। তা' পিসীমা আমি ছপ না হয়  
কমই দেবো কিন্তু ছপ কম দিলে আরও  
তো কিছু খেতে দিতে হ'বে। তা' আর  
কি খেতে দেবো—তা'রও ছ'একটা ব্যবস্থা  
ব'লে দাও।

পিসী। দেখ,—শঠীর পালো ব'লে  
আজকাল এক রকম খাবার বাজারে পাওয়া  
যায়। সেই শঠীর পালো দিয়ে ছপ সিক্ত  
ক'রে দিতে পরলে এ রোগে খুব উপকার  
পাওয়া যায়।

সুর। শঠীর পালো পিসীমা ডাক্তারেরা  
ও ব্যবস্থা ক'রেছিল। এখনো মাঝে মাঝে  
দিয়ে থাকি।

পিসী। মাঝে মাঝে নয়, ওটা রোগই  
দিও;—শঠী নীবারের একটা মস্ত ওষুধ।  
তা'ছাড়া ছ'টি ছ'টি পোরের ভাত দিতে  
পারলে ভাল হয়।

সুর। তা' আর পারবেনা কেন  
পিসীমা, তা' খুবই পারবো। তবে ভাত  
খাওয়ান এখনো অভ্যাস ক'রেনি—এই বা'  
কথা।

পিসী। ভাত খাওয়ান অভ্যাস ক'রতে  
হ'বে। ভাত খাওয়ান এ রোগে খুব  
উপকারী। তবে সে ভাতটা পোরের

চাই। আর তা'র সঙ্গে কাঁচা পেপে, মনচু, ওল—এসব কিছু কিছু সিক ক'রে দু' টিপে একটু আদুটু খাইয়ে দেওয়া ভাল। পেপে, মানচু আর ওল—এ তিনটি জিনিস আহার, ওষুধ দুইই জান্বে। পাকা পেপেও একটু একটু দিতে পার। তাতেও বেশ উপকার হ'বে।

স্বঃ। জল খাবারের সময় ছ'টি কিসমিস, খেজুর, মিছরি এ সব দিতে পারি কি।

দিশী। খুব পার। ও গুলিও ও রোগের আহার ওষুধ। তবে মিছরিটা খুব বেশী দিওনা—মিছরি বা কোন মিষ্টি বেশী খেলে ক'রম সৃষ্টি হয় আর ছেলে বয়সে বেশী দিই সমস্যা ক'রলে হোতলা হয়ে পড়ে।

স্বঃ। পিসীমা, আমরা যেখানে থাকি, সেখানে আনারসটা খুব বেশী পাওয়া যায়, এতজ্ঞ আমরা আনারসটা খেতে একটু বেশী ভাগ্যবান। থোকাকে কি সে আনারসের ও এক টুকরা দিতে পারি?

দিশী। অর ভাগ হলে আর খুব মিষ্টি আনারস হলে পার। আনারসে নীবারের জিন্স ভাল হয় ক্রিমি থাকলেও আনারস খেলে উঠা নষ্ট হ'য়ে যায়। পীলে আর নাগর—এ ছ'টা রোগে যাতে রোজ দান্ত পবিদ্য হ'ব এমন ব্যবস্থা করা দরকার। আনারসে কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা সহজেই হ'ব থাকে ব'লে আনারস পীলে নীবারে উপকারী।

স্বঃ। থাক্—তা'র পর এখন ওষুধের কথা বল।

দিশী। হাঁ এইবার তাই বল্বে। কাল-কোরে গাছ দেখেছিস্তো? সেই কাল-

মেঘের ১০১২টা পাতা আর আড়াইটে গোলমরিচ একসঙ্গে বেটে ৪টে ক'রে বাড়ি ক'রবি—তাই সকাল বেলা একটা, ছ'পর বেলা একটা আর সন্ধ্যাবেলা ১টা জ্বের সঙ্গে কি জলের সঙ্গে গুলে খাইয়ে দিবি। এই শুধু কালমেঘট জান্বে নীবারের মহা ওষুধ। এই কালমেঘের আরক ঠিক ক'রে এখন নাকি অনেক ডাক্তারেও বিক্রি ক'রছে। তা' তার চেয়ে কিন্তু টাটকা কালমেঘ তুলে নিয়ে বাড়ি তৈরি ক'রে নেওয়া কি কালমেঘের রস খাওয়ান অনেক ভাল। এতে উপকার বেশী পাওয়া যায়।

স্বঃ। মাঝে মাঝে যে অর হয়, তা'র জ্ঞান কি ক'রব?

দিশী। এতে অরও যাবে। তা' ছাড়া আর একটা কাজ ক'রতে পারিস্। শিউলি-পাতা, ক্ষেংপাপড়া আর গাঁট বাদ দিয়ে গুলধূলতা—এক একটা জিনিস ১০০ আনা ওজনে নিয়ে বেশ ক'রে খেঁতো ক'রে কলার পাতার জড়িয়ে একখানা তাওয়া বা চাটুর ওপর আগুনের জ্বালে গরম ক'রে নিয়ে সমস্ত রাত্রি শিশিরে রেখে দেবে। তা'র পর সকাল বেলা কলার পাতাটা গুলে ফেলে নেকড়ার পুটুলি ক'রে রসটা নিঙড়ে নেবে। এই রকম ভাবে যতটা রস হ'বে, তা'র অন্ধেকটা ফেলে দেবে, বাকী অন্ধেকটা খুব ভোরবেলা ঝিল্লুক নিয়ে খাইয়ে দেবে। দিন কতক এই রকম ব্যবস্থা ক'রলেই অর বন্দ হ'য়ে যাবে। এটাকে চলতি কথায় 'ঘুসড়ো' ব'লে থাকে।

স্বঃ। যে ক'টা জিনিসের নাম ক'রলে ওর সব গুলিই যে বড় ততো পিসীমা, অত ততো জিনিস ক'চি ছেলে খাবে কি ক'রে?

পিসী। একটুখানি মধু মিশিয়ে দিও। তা'হ'লে তেতোটা কিছু কম লাগ'বে। আর একটা কাজ ক'রতে হবে,—রোজ একটু একটু চোণা খাওয়াতে হ'বে, তা' সে চোণা আবার যে সে গরুর হ'লে হ'বে না, কৈলে বাছুরের হওয়া চাই।

স্বর। কৈলে বাছুরের ভাবনা নাই, কৈলে বাছুর আমাদের বাড়ীতেই আছে কিন্তু চোণা যে খেতে বড্ড খারাপ, খা'বে কি রকম ক'রে ?

পিসী। কিছুকে নিয়ে ঢক্ ক'রে গিলিয়ে থাইয়ে দিবি,—আর খা'বে কেমন ক'রে ? আর শুধু খাওয়ান নয়, একটা ভাঁড়ে ক'রে খানিকটা চোণা গরম ক'রে সেই ভাঁড়টা পীলে আর নীবারের উপর ছ'বেলা সেকও দিতে হ'বে।

স্বর। সে কি পিসীমা, কচিছেলে, গরম তাত্ সইতে পা'রবে কেমন ক'রে ?

পিসী। খুব পা'রবে, যা'তে নয়, তাই ক'রে দিতে হ'বে। চোণার সেকতো নয়, আমরা ওকে সেক বলি কিন্তু বদ্বিরা ওকে শ্বেদ বলে। চোণার যেদের মত উপকারী পীলে নীবারে আর অল্প জিনিস নাই।

স্বর। ওষুদগন্তরের আর কি ব্যবস্থা ক'রতে হ'বে ?

পিসী। তোর ছেলের জন্ত আর কিছু ব্যবস্থা ক'রতে হ'বেনা, যে সব ব্যবস্থা ব'লে দিলাম, শুধু এই সব ক'রলেই তোর

ছেলে বেশ সেরে উঠবে। লোকনাথ বদি বলত শাস্ত্রের কচিছেলেদের জন্ত নাকি বেশী ওষুদ দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। কচি ছেলেদের যত অল্প ওষুদ খাইয়ে রোগ মারাত্তে পারা যায় তা'রই চেষ্টা করা উচিত।

স্বর। তবু পিসীমা আরও গোটাকতক মুষ্টিযোগ ব'লে দাওনা, যদি এতে না পাবে, তা'হ'লে সেই সকল ব্যবস্থা ক'রব।

পিসী। আচ্ছা তোর ছেলের জন্ত যা বল্লম আগে তা করে দেখ—পরে ছেলে আরাম হলে যদি বদ্বিগিরি করবার জন্তে আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা হয় তখন বলবো।

স্বরমা বলিল—আচ্ছা পিসীমা, তুমি আমার ছেলের জন্ত যে সকল ব্যবস্থার কথা ব'লেছ, আমি সেই সকলই পালন কর'ব। এই বলিয়া স্বরমা পিসীমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে শুনা গেল, স্বরমার ছেলেটি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আমার পিসীমার উপর আরও ভক্তি বাড়িয়া উঠিল। আমার অপেক্ষা আরও বাড়িল স্বরমার স্বামীর। তিনি স্বস্তুরালয়ে আসিয়া সমস্ত কথা অবগত হইলেন এবং সেই সময় হইতে স্থির করিলেন, যে কোন রোগই হউক না কেন, বৈজ্ঞানিকিংনা ভিন্ন আর কিছুই করাইবেন না।



## সালসার মসলা ।

দেশে আজকাল সালসার ছড়াছড়ি। যত-  
গুলি কাবরাজি—তত সংখ্যক “সালসা”তো  
অছেট ভাটা ছাটা—মুনী, পশারী,  
কোকানী, কোম্পানী, অনেকেই সালসার  
আবিদ্যাবহ। সাধুভাষার সালসার এত  
নাম পাঠত হইয়াছে যে, সে নামের “নামা-  
বনো” গায়ে দিয়া বঙ্গ জননী কিছু ভারাক্রান্ত  
হইয়া পড়িয়াছেন। সালসার বিজ্ঞাপনেরই  
বা চটক কত! সকলেই বলিতেছেন—  
“আমার সালসাই আদ ও অকৃত্রিম, এমন  
সালসা এ পর্যন্ত মন্ত্যগামে আর আবির্ভূত  
হয় নাই। ভবিষ্যতেও হইবে না।” সালসা  
ওগু জননাধরিকার কোনটা ছাড়িয়া কোনটা  
কিনিবে, —তাহা স্থির করিতে পারে না।  
সংসারের সালসান-সঙ্গী এমন চমৎকার—যে,  
হুঁম বোগী হও, নিরোগী হও, ভোগী হও,  
মোহ হও—কিছুতেই তোমার পরিভ্রাণ  
নাই, তোমাকে সালসা কিনিতেই হইবে।  
সালসা হইতে বায়ী পর্যন্ত সকল রোগেই  
সালসা ব্যবহার। সালসার কাটতি—  
বৈষ্ণবের সালসা ভোগকেও ছাড়াইয়া  
ডাঙিয়াছে।

সালসা আজ সালসা লইয়া পাঠকগণের  
সদৃশে ভাজির হইলাম। তবে আমার  
সালসা আমার আবিষ্কৃত নহে। আমার  
পিতামহ—এই সালসার ফদখানি সংগ্রহ  
করিয়াছিলেন। তাঁহার সুখে শুনিয়াছি,—  
আমার পিতার আমলেও দেখিয়াছি—এই  
সালসা সেবন করিয়া অনেকে উৎকট রোগ

হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আমিও অনেককে  
এই সালসা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল  
পাইয়াছি।

সাধারণের উপকারের জন্ত—নিম্নে  
সালসার ফদখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মসলা।	ওজন।	গুণ।
অনন্তমূল	১০ আদভরি	শোণিত শোধক
সালসা রুট	১০ চারি আনা,	শোণিত শোধক
জাঙ্গী হারতকী	১০ আনা, মারক,	
বড় হরিতকী	১০ ”	
যষ্টিমধু	১০ ”	বলকারক,
তোপচিনী	১০ ”	পারার দোষ নাশক, বাত নাশক,
মাচি ফরাস্	১০ ”	পিত্ত নাশক,
মিএন্	১০ ”	কফ নাশক,
ইশব্গুল	১০ ”	ঠাণ্ডা ও বায়ুনাশক,
অশ্বগন্ধা	১০ ”	বলকারক রসায়ন,
গোয়াকম্	১০ ”	বেদনা নাশক,
আরবী গদ	১০ ”	মেহ নাশক,
মোরী	১০ ”	ঠাণ্ডা, তৃষ্ণা নাশক,
পদ্মকাষ্ঠ	৩ রতি, অর ও দাহনাশক,	
ছোট এলাচ	৩ ”	গরম, কফ নাশক,
বড় এলাচ	৩ ”	ঠাণ্ডা পিত্ত নাশক,
সফেদ মুবলী	১০ ”	শুক্রেবদ্ধক,
জৈত্রী	৩ রতি, গরম, উত্তেজক,	
তেজবল	১০ ”	উত্তেজক,
তিথুর	১০ ”	পাচক,
কাবাব চিনী	২ রতি, বঙ্গদোষ ও মেহনাশক,	
ডোন্মারী	৩ রতি, শুষ্ক কারক,	

বিহাদানা	৩ রতি, মূত্রকারক,
সালম্ বিছরী	/০ ,, বলকারক,
যেত চন্দন	/০ ,, মেহ নাশক,
রক্ত চন্দন	/০ ,, পিত্ত নাশক,
ভেজপাত	২ রতি, কফ নাশক,
জাফরাণ	১ রতি, উত্তেজক,
দারুচিনি	৩ রতি, উত্তেজক, কফনাশক,
জোলাফা	৩ ,, সারক,
তোক বলাসু	৩ ,, ক্ষত নাশক,
কালপিন ফুল	৩ ,, মেদোবদ্ধক,
রেউচিনি	/০ ,, সারক,
লবঙ্গ	/০ ,, কফনাশক, পাচক,
যোয়ান	৩ রতি, পাচক,
গোক্ষুর বীজ	৩ ,, মূত্র কারক
বংশলোচন	৩ ,, হৃদপিণ্ডের বল বর্দ্ধক,
গোলাপ ফুল	/০ আনা, ঠাণ্ডা, সারক,
মোণামুখী	৩ রতি, সারক,
কালাদানা	৩ রতি, ঐ
ধনে	/০ আনা, পিত্তনাশক,
পিপুল	/০ ,, অগ্নি বদ্ধক।

মসলাগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া হামাম-  
দিয়ায় কুটিয়া, মাটির হাঁড়িতে কাঠের  
আলে, তিন সেব জলে সিদ্ধ করিতে হয়।  
তিন গোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া  
বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে। এক

ছটাক মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন  
করিতে হইবে। এই সালসা, পুরাতন মেহ,  
রক্তদৃষ্টি উপদংশ, বাত, ঘৃণ্মুণ্ডে অব, পুণ্ডেন  
সদ্বি, কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিদ্রা, দৌলগ্য; বক্ত-  
হীনতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, পক্ষা-  
রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ৪০ দিন  
খাইতে হয়। এই সালসার উপকরণগুলি  
কতক কবিরাজী কতক হাকিমী। অগ্নি  
যতগুলি রোগীকে এ সালসা খাওয়াইয়াছি—  
সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সালসা সেবনে—দাপ্ত, মূত্র ও বহু  
হইয়া এক সপ্তাহেই শরীর স্নানিশুভ  
হইবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে—ক্ষুধা বাড়ে,  
তৃতীয় সপ্তাহে—দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইবে,  
চতুর্থ সপ্তাহে নূতন রক্ত-কণিকা জন্মিবে;  
পঞ্চম সপ্তাহে ব্যাদি নষ্ট হইবে। ষষ্ঠ সপ্তাহে  
শরীরের বল বৃদ্ধি হইবে।

সালসা সেবন কালীন—শাক- অন্ন,  
পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য, ডিম্ব, মাংস, গুড়,  
দধি, পাকাকলা তৈলের তরকারী এবং  
কলায়ের দাল খাইতে পাইবে না। কাঁচা-  
পাকা জলে স্নান করিবে। রাত্রি জাগরণ,  
দিবা নিদ্রা ও জ্বী-মঙ্গ—পরিতাগ করিবে।

মুন্সী শ্রীআসরাফ আলি হাকিম।

## চূড়ান্ত-সস্তার চ্যবন প্রশ।

—:0:—

### [ ভূতভোগীর ইতিহাস ]

তিন বৎসর পূর্বে বর্ষার আদি বাতাসে—  
আমার সঙ্গী কাসি আরম্ভ হয়। ১০, ১২  
দিনেও যখন কাসি কমিল না, তখন

আমাদের ক্যামিলি ডাক্তারকে ডাকা হয়।  
ডাক্তার আসিয়া বলেন—“ও সামান্ত ব্রুকাই-  
টিম্—হুইদিনে সারিয়া যাইবে।” কিন্তু

আমার ভাগ্যদোষে—ছই দিনের স্থানে দুই বৎসরের রোগ সারিল না। স্থান-পরিবর্তন, গোটোট্ ঔষধ সেবন—কিছুই বাকি থাকিল না। কিছুতেই কিছু হইল না। আমার দ্বী কত দেশ হইতে কত মংলুই আনাইয়া আমার কটী কষ্ট ও গাভ-যুগলে ঝুলাইয়া বিদেহ। কত জাগ্রত দেবতার পাবান মন্দিরে ‘বরা’ দিয়া আসিলেন, কত “সোমবার” “মঙ্গলবার” “রবিবার” করিলেন, তাঁহার প্রত্যেক কামনা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। কত ‘কদ বেগিতি’ ‘কডলিভার’ অতলে গেল। আমার দেহ ও দিন দিন অস্তিত্ব-শীঘ্রই নষ্ট হইল। গৃহে অবিবাহিতা ছই কল্যা—নিজে সামান্য কেরানীগিবি করি শ্রম—বৈতনিক সঞ্চয় কিছুই নাই—ছুটির মধ্যে বেতনে সংসারই চলে না, কাজেই সঞ্চয় নৈলে সেই অগতির গতি ভগবানকেই ডাকিতে আসিলাম।

এই সময় আমার এক মাতুল পুত্র আসিয়া বলিলেন—“দাদা! দিন কতক কাঁপাখা চ্যবনপ্রাশ খাইয়া দেখনা কেন?” গুণিগা ও তাঁহার মতে সাহা দিলেন। খবরের কাগজেই বিজ্ঞাপন গড়িয়া ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠাইতে পত্র লিখিলাম। ৫৬ দিন পাবে দিব্য চক্চকে টিনের কোটায় ভরা গেবেল খাঁটা, ব্যবস্তাপত্র সম্বলিত নিকম-কৃত্য মেয়ে বর্ষ ‘চ্যবনপ্রাশ’ আমার হস্ত-গত হইল। আমি আশ্বস্ত হৃদয়ে “চ্যবনপ্রাশ” সেবন আরম্ভ করিলাম। চ্যবনপ্রাশের গুণাবলী পাঠ করিয়া মনে হইল—এমন চমৎকার ঔষধ থাকিতে এতদিন বুঝি কষ্ট পাচ্ছি। ইহার মূল্যই বা কত সুলভ—এতদূর ঔষধের “মূল্য ৩ টাকা” মাত্র।

আহা! যাহারা এ ঔষধ বেচিতেছে—তাহারা প্রকৃতই নিকাম ধন্য—পরোপকারই তাহাদের জীবনের ব্রত!

একমাসে একপোয়া ঔষধ আমি খাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হইল না। যাহারা ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের কাছে রিপ্লাই কার্ডে পত্র লেখা হইল। উত্তর আসিল—“আপনার অসুখ অনেক দিনের, আরও কিছু দিন চ্যবনপ্রাশ সেবন করুন”। কথাটা সম্ভব বলিয়াই বিশ্বাস হইল। তৎক্ষণাৎ অর্ডার দিলাম আবার ঔষধ আসিল। আবার একমাস খাইলাম; কিন্তু রোগের অবস্থা “বণা পূর্বম তথা পরং”! আবার পত্র লিখিলাম, শরীরের অবস্থার কথাও জানাইলাম। এবার চ্যবনপ্রাশের সঙ্গে এক রকম ঔষধ আসিল, তাহার নাম “চন্দ্রামৃত”, তাহিলাম—একা রামে রক্ষা নাই, স্ত্রীও তার মিতে—আর আমার ভয় কি? এবার নিশ্চয়ই ভাল হইব। আমি আশায় বুক বাধিলাম। পত্রীর মুখ প্রফুল্ল হইল। আমাদের ভাগ্য-দেবী, অলক্ষ্যে একবার হাসিয়া লইলেন।

এই “চ্যবনপ্রাশ” ও “চন্দ্রামৃত”—ভক্তিপূর্বক ৬ মাস কাল যথাবিধি সেবন করিলাম। ইহাতে লাভ এই হইল—আমলকী পিণ্ড খাইয়া খাইয়া আমার পেটের অসুখ দেখা দিল। দিনে যেতে ১০।১৫ বার করিয়া আমসংযুক্ত তরল ভেদ হইতে লাগিল। মাতুল পুত্র আমার অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তখন স্থির হইল—“চ্যবনপ্রাশ” বিক্রেতার সঙ্গে—মাতুল পুত্র সাক্ষাৎ করিবেন। আমার এমন শক্তি ছিল না যে আমি নিজে যাই।

মাতুল পুত্র সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে সংবাদ পাইলাম—“চাবনপ্রাশের” কারখানার মালিক আমার জন্ত বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার ঔষধালয়ে ৫৭ জন বৈজ্ঞ কৰ্মচারী আছেন, তাঁহারা এক একজন ঋষিতুলা ব্যক্তি, আমার এই অসুখটী আরাম করিবার জন্ত—তাঁহাদের অনন্ত—গবেষণা—প্রস্থ বিরাট মস্তিষ্ক আন্দোলিত হইয়াছে। সেই আন্দোলনে—মহাসিদ্ধি—আলোড়নে অমৃত উত্থানের মত ‘শঙ্খবটী’ ও ‘ভুবনেশ্বর’ নামক দুইটী অমৃত আমার জন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। পেটের অসুখ না সারা পৰ্যন্ত আমি ত্রি দুইটী ঔষধ আপাততঃ খাইব। তাহার পর আবার চাবনপ্রাশও চলিবে! স্বাস্থ্য জন্মের অহুরোধে পড়িয়া—‘শঙ্খবটী’ ও ‘ভুবনেশ্বর’ ৬ দিন সেবন করিলাম। আমাশয় বাড়িতেই লাগিল। শেষে ডাক্তার আসিয়া—‘বিষমথ’ খাওয়াইয়া অকূলে কূল দেখাইয়া দিলেন। সে যাত্রা তাহাতেই বাঁচিয়া গেলাম। ঔষধ খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম।

কিন্তু বেশীদিন চুপ্ করিয়া থাকা ভাল বোধ হইল না। কেন না—কাসি তখন বৃদ্ধি পাইয়া বারাগদীতে দাঁড়াইয়াছে। ঐতিবাদীরা পরামর্শ দিলেন—“একবার কলিকাতায় গিয়া কবিরাজ দেখাও।” বলা-বাছল্য আমাদের পল্লীগাম্যে একজনও কবিরাজ ছিল না।

কলিকাতায় গিয়া—একজন নামজাদা কবিরাজের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—“ভরসার মধ্যে আর নাই। আপনি ভাল

হইবেন।” তাঁহার ঔষধে আমার বিশেষ উপকার হইল। কিন্তু তিন সপ্তাহ পর্যন্ত,—অতি কষ্টে দাম যোগাইয়াছিলাম, আর পারিলাম না। কবিরাজ মহাশয়কে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার সহকারী এক ছাত্রকে বলিলেন—“এট ভদ্রলোক বড় গরীব, ইহাকে অপোয়া চাবনপ্রাশ দাও—একটা টাকার বেশী মূল্য লইও না।”

চাবনপ্রাশের নাম শুনিয়া ঘুগায় আমার মুখ বিবর্ণ হইল। আমি বলিয়া ফেলিলাম—“দোতাই আপনাব, আমার ‘চাবনপ্রাশ’ আর দিবেন না। আমি তিন টাকা সেবের চাবনপ্রাশ—২ মাস ২/১০ পোয়া খাইবাছি। তাহাতেই আমার পেট ভাঙ্গিয়াছিল। আপনি দয়া করিয়া আমার জীবন বক্ষা করিয়াছেন, চাবনপ্রাশ দিয়া আব আমার হতা করিবেন না।” কবিরাজ মহাশয় কোতুহলী হইয়া—আমার চাবনপ্রাশ সেবনের ইতিহাস আত্মপূর্ণ, শুনিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে—তাঁহার ঔষধালয়ের সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই একটা টানের কোটা আমার হস্তে দিয়া বলিলেন—“এই ঔষধ আপনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আধতোলা ওজন সেবন করিবেন। ঔষধ সেবনের পর একটু উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবেন।” আমি তাঁহার কৰ্মচারীর হাতে একটা টাকা দিয়া কোটাট লইয়া বাটতে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন ঔষধ খাইতে গিয়া দেখিলাম—কোটার গায়ে নাম লেখা রহিয়াছে—“ভার্গ্যাদি লেহ” কিন্তু ভিতরে সেই মধী কৃষ্ণ পিণ্ডাকার ঠিক চাবনপ্রাশের

কিমান্ কিমান্কার বস্ত্র! মনে সন্দেহ হইল—  
“চ্যবনপ্রাশই” বুঝি “ভার্গ্যাদি লেহ” নাম  
দ্বারা আবার এই ভ্রান্ত্যমকে ছলনা  
করিতে আসিয়াছেন! হে অথও মণ্ডলাকার  
চ্যবনপ্রাশ! তুমি কি আমার ছাড়িয়ে না?

প্রশ্ন—আমার কোনও কথা শুনিলেন  
না, তিনি জোর করিয়া আমার ঔষধ  
দাওয়াইলেন। বলিলেন—“এ চ্যবনপ্রাশ  
নয়, অল্প ঔষধ—তুমি খাও। কবিরাজদেব  
কাছে—একরকম চেহারার অনেক ঔষধ  
থাকে”

আমি ঔষধ খাইতে লাগিলাম। দুই  
দিন দিন পরেই ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল, বেশ কোষ্ঠ  
পারদ্বার হইতে লাগিল। একটু বলও যেন  
দাঁড়াইল, ১০-১৫ দিন পরে—সকাল সন্ধ্যায়  
নাঠে দুই এক মাইল বেড়াইতে পারিলাম,  
ঔষধের উপব বড় ভক্তি হইল। কোট্যাটি  
নিঃশেষ হইলে আবার একদিন কবিরাজের  
সঙ্গে দাক্ষ্য করিলাম। একটা টাকা তাঁহার  
কাপনের সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম—“আমাকে  
আবার একটু “ভার্গ্যাদি লেহ” দিন।” কবি-  
রাজ মহাশয় হাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—  
“কেমন চ্যবন প্রাশে উপকার হইয়াছে  
কিনা? বল পাইয়াছেন কিনা?” আমি  
বলিলাম—চ্যবন প্রাশতো আমি খাই নাই।  
আপনি প্রথমে চ্যবন প্রাশ ব্যবস্থা করিয়া  
দিলেন বটে :—কিন্তু শেষে আমাকে  
“ভার্গ্যাদি লেহ” দিয়াছেন। উহাতে আমার  
নিঃশেষ উপকার হইয়াছে। কাসি—একদম  
নাঠ, ক্ষুধা ও বল বাড়িয়াছে। মনে হই-  
হইতেছে—এইবার ভাল হইয়া গিয়াছি।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—হ্যাঁ—আপনি  
এবার ভাল হইয়া গিয়াছেন। চ্যবন প্রাশ

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে একটি উল্লেখ যোগ্য  
মহৌষধ। আপনার চ্যবন প্রাশে অভক্তি  
দেখিয়া—“ভার্গ্যাদি লেহ” নাম দিয়া, আমি  
আপনাকে সেই চ্যবন প্রাশই দিয়াছি। সুধু  
আপনি কেন? অনেকের মুখেই আমরা  
চ্যবন প্রাশের নিন্দা শুনিতে পাই, চ্যবন  
প্রাশের নকলে—দেশ ছাইয়া গিয়াছে।  
কাজেই অনেক স্থলে—আসল চ্যবন প্রাশকে  
নকল নাম দিয়া—আমরা ব্যবস্থা করিতে  
বাস্য হই।”

আমি অবাক হইয়া বৈজ্ঞানিকের মুখের  
পানে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—  
—আমাদের দেশে যেমন খাদ্য দ্রব্যগুলি  
ভেজালে পূর্ণ হইয়াছে,—জীবন রক্ষক ঔষ-  
ধের ভিতরেও কি তেমনি ভেজাল চলি-  
তেছে? শাস্ত্রীয় ঔষধের ভিতরেও এত  
প্রতারণা? দরিদ্র বাঙ্গালী জাতিকে—  
অল্প মূল্যের প্রলোভন দেখাইয়া—এমন  
সর্বনাশ কি করিতে আছে?

হায়!—আমার এ কথা—কোন হৃদয়-  
বান্ ভাষিয়া দেখিবেন? যাহারা বড়ী বেচা  
বাড়ির মহিমা বুঝিয়াছে, তাহারা আমার  
মত লোকের অনুরোধে—“দুর্ধর্মের কাহিনী”  
শুনিলে কেন? তাহাদের ব্যবসায়ের “মূল”  
যে অক্ষয় বটের মত বহু শাখা প্রশাখার  
দেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এবার অতি বর্ষার কলে—অনেকেই  
কফ রোগে আক্রান্ত হইতেছেন, সম্মুখে—  
শীত ঋতু,—অনেকেই ফুস্ফুস-প্রদাহ ও  
কাসির পীড়ার—কষ্ট পাইতে পারেন। তাই  
পাছে কেহ—রামা আমাদের অপূর্ণ আবিষ্কার  
আমলকী পিও খাইয়া “চ্যবন প্রাশ” খাই-  
তেছি মনে করেন,—সেইজন্য আমার চ্যবন

প্রাণ দেবনের ইতিহাস আজ সর্বসমক্ষে প্রচার করিলাম।

আমার বিশ্বাস—কবিরাজী চিকিৎসার উপর সাধারণের যেমন দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়িতেছিল, যার তার হাতের নকল ঔষধ—সে শ্রদ্ধা আর বেশী দিন থাকিতে দিবে না। আমরা অতি পশু ভাতি, একদিকে আমরা ঘৃত বলিয়া বিধি পাইতেছি, ভেজাল খাওয়া ভক্ষণে স্বাস্থ্য হারাইতেছি; অন্যদিকে—মকরমূত্রের পরিবর্তে—পারা গন্ধক মনছালের সংযোগ, চাবন প্রাণের পবিত্রের ‘আমলকী পিও’ পাইতেছি। আমাদের ঔষধ পথ্য দুইই বিগড়াইয়াছে, অতএব আমাদের ভাগ্যে—‘ফলং অপ মৃত্যুঃ’

কবিরাজী ঔষধ আমাদের প্রকৃতির প্রকৃত উপযোগী। কিন্তু আমার অনুরোধ—জীর্ণ জটিল ও দ্রুশ্চিকিৎস রোগে যাহারা কবিরাজী চিকিৎসা করাষ্টবেন,—তাহারা যেন বিজ্ঞাপনের চটকে বিভ্রান্ত হইয়া নিজের সর্বনাশ নিজে না করেন। যাহারা কবিরাজের বংশে জন্মিয়াছেন, কবিরাজের শিষ্য হইয়াছেন, কবিরাজী শাস্ত্র পড়িয়াছেন,—তাহারা ভিন্ন কবিরাজী ঔষধের গৃঢ়রহস্য অপরের বোধগম্য নহে। রোগিগণ আমার এই কথা স্মরণ রাখিবেন।

আর কবিরাজ মহাশয়দের কাছে ও আবার একটা ভিক্ষা আছে।—তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিতেছি—কতকগুলি অর্থলুকাবাবসায়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া সাধারণকে সস্তার প্রলোভন দেখাইতেছেন। তাহাদের জানা উচিত—শাস্ত্রীয় ঔষধ—একপ “হেলাফলা” সামগ্রী নহে। শাস্ত্রীয় ঔষধ—“নকড়া ছকড়ার”

নিলামী মাল নহে। শাস্ত্রীয় ঔষধ—সেই সত্য যুগ হইতে আজ পর্যন্ত—চিরদিন দেব-নির্ম্মাণের মতন পবিত্র।

অনুকরণের হস্তক্ষেপে—আয়ুর্বেদের সন্ধান করিও না। যাহারা চাকুরী জুটাইতে না পারিয়া, কবিরাজী ঔষধেব ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে—তাহারা সামান্য দোকানদার, ভগতে তাহারা গৌরব-প্রতিষ্ঠার দাবি করে না, তাহারা আয়ুর্বেদের মহিমা বুঝে না, তাহারা—চায়—যেন তেন প্রকারে কর্তব্যো দনসংগ্রহঃ।—

আর তোমরা—বৈদ্য, ঋষি—বংশধর, আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজের শিরোভূষণ, ভগবন্তের জীবনদাতা—কৃষ্ণ দোকানদারের সঙ্গে তোমরা কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাও? তাহাদের সঙ্গে তোমাদের কি তুলনা হয়?

একজন সুরসিক সাহিত্যসেবীর মুখে গল্প শুনিয়াছিলাম—পি, সি, মার “দক্ষ দমন” নামক ঔষধের প্রচার দেখিয়া,—কেবলরাম নিজ পুত্রের নাম দীতাম্বর রাখেন। তাহার সাধু উদ্দেশ্য—পি, সি-মার ঔষধটার নাম ও মার্কা আয়ুসাৎ করা। শেষে পিনাল কোর্টের ভয়ে—“পি সি, মার দক্ষ দমন মলম” ছাপাইয়া দিলেন। এবং পি, সি, মার দোকানের পার্শ্বেই একখানি দোকান খুলিলেন। পি, সি, মারের শুধু “দক্ষ দমন”—কেবলরামের—“দক্ষ দমনের” পর “মলম” প্রত্যয়। বিক্রী দেখে কে? ইহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে—অনেকেই দোকান খুলিতে লাগিল। ‘মা’ সি, মার,’ ‘পি, সি, মার’ পি, চ, মার, পি, এস, মার—একে একে মার্টী হুঁড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে—স্থানীয় মিউনি-

‘দুগা বসী সে রাস্তাটির নাম রাখিয়াছিলেন  
—‘দুগা দমন রোড’। সস্তার চ্যবন প্রাশ  
কলকাতা ও অনেকগুলি দোকান হইয়াছে,  
এক দোকান আমাদেরও মনেও ভরসা হই-  
তেছে শীঘ্রই সস্তারের একটা রাস্তার নাম  
হইবে—‘চ্যবন প্রাশ রোড।’ সেই দৃষ্ট  
দেখিয়া—ভগবান্ আমাকে বাচাইয়া  
রক্ষা। প্রৌঢ়ের শেষ সীমানা দাড়াইয়া—

দিন কয়েকের জন্ত আজ আমি জীবন ভিক্ষা  
চাতিতেছি।\*

শ্রীকেশব নাথ মুখোপাধ্যায়।

\* সত্য মিথ্যা জানি না। একজন অতি নিপুণ  
ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার এক বন্ধু—  
কোণারখিনি সঙ্গে সঙ্গে একটু আদর্শ চিকিৎসা  
কাব্যও কাবতেন। এই বন্ধু—একজন সস্তার চ্যবন  
প্রাশ বিবেকতাকে—বাঙ্গা আল সিদ্ধ কবিয়া সেই রাস্তা  
আদর্শভাবে তখন তৈরী ভাঙ্গিয়া, ক্রিষ্ট আমলা  
চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ সহযোগে চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত  
কবিতো দেখিয়াছেন।

—লেখক।

## রক্তপিত।

আজকাল আমাদের দেশে দিন দিন  
এই রক্তপিতবাদের প্রাচুর্য বৃদ্ধি  
হইতেছে বাস্তব অনুমান হয়। এই ভীষণ  
ব্যাধির আক্রমণে প্রতিবৎসর শত শত  
নবাবী অকালে কাগজাসে পতিত হইয়া  
জান বসুজ্ঞান দিতেছেন। ইহা চির  
বিবর্তনশীল কাল-মাহাত্ম্যজনিত অথবা  
আবহ, বিহার ও সামাজিক রীতিনীতির  
পরিবর্তন মত, তাহা তত্ত্বানুসঙ্গিক মহাত্মা-  
গণ পিতার কারণ নিষ্কারণ করিতে পারেন,  
কিন্তু, বাহাই হউক একটা কিছু কারণ  
যদিও, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও  
ব্যাধির হেতু নির্ণয় করতঃ তাহার পরি-  
বর্তন করাষ্ট প্রথম চিকিৎসা বলিয়া শাস্ত্র-  
কারগণ নির্দেশ করিয়াছেন এবং যোগোৎ-  
পাদকহেতু পরিহার বাস্তব, আরোগ্যলাভ  
সম্ভবপর হইতে পারে না, তথাপি বর্তমান  
সময়ে, দেশ ও সমাজের অবস্থা অনুসারে  
বিবেচনা করিলে, উক্ত কারণের পরিত্যাগ  
বিষয়ে, ব্যর্থ চিন্তা করিয়া হতাশ হওয়া

অপেক্ষা সাঙ্গাৎ কার্যকারণের আলোচনা  
অথবা ব্যাধিপ্রতীকার কল্পে সাধ্যমত  
কর্তব্য নির্ণয় করাই সমিচীন ও সম্ভাবিত  
বলিয়া মনে হয়। সমাজের মতিগতি শিক্ষার  
অগ্রতিবিধেয় সংস্কার, কাল মাহাত্ম্যের  
অলঙ্ঘনীয়তা প্রভৃতি দ্রুতক্রমণের কারণে  
বাহ্য ঘটনার তাহাকে কে প্রতিরোধ  
করিবে? তথাপি যতদূর সাধ্যান তা অবলম্বন  
করা সম্ভবপর হইতে পারে, তৎপ্রতি  
সকলেরই মনোযোগ কর্তব্য। ইহাতে সম্পূর্ণ-  
ভাবে না হইলেও সমাজের ও দেশের কতকটা  
উপকার সাধিত হইতে পারে বর্তমান সময়ে  
আমাদের জীবনযাত্রা, যেমত কার্য শৃঙ্খলার  
দ্বারা আবদ্ধ, তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধির  
অনুসারে যথাযথ আচার ব্যবহার সর্ব-  
সাধারণ পক্ষে কখনই সম্পাদ্য হইতে  
পারে না; সুতরাং তল্লবন্ধন শারীরিক বা  
মানসিক বৈষম্য বাহ্য ঘটবে, তাহা প্রতি-  
রোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, কিন্তু,  
তথাপি আমরা যদি অবাস্তব ও প্রতিবিধান-

যোগ্য কারণগুলির প্রতি সাবধান থাকি, তাহা হইলেও অনেকটা সুখ শাস্তিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতে পারিব, সেই অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধের অব্যর্থতা।

রক্ত ও পিত্ত উভয়ের প্রকোপজনক যে সমস্ত কারণ, তাহা প্রাথমিক পরিসরে সেবিত হইলে রক্তপিত্ত রোগ জন্মিতে পারে। সাধারণতঃ আত্মরিক কটুদ্রব্য (মরিচ, পিপূল প্রভৃতি) অন্ন ও লবণরস-যুক্ত বস্ত, আদা, রসোন প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীৰ্য্য পদার্থ, ক্ষারপদার্থ, অধিক বোদ্ধ বা অগ্নি-সম্ভাপ, অতিরিক্ত পথপৰ্য্যটন, গুরুতর শোকপ্রাপ্তি, অপরিমিত ব্যায়াম, অধিক জীসংসর্গ প্রভৃতি কারণে পিত্তের প্রকোপ বদ্ধিত হইয়া থাকে। পূর্ববার্ত্ত-কারণ বশতঃ বিনদ্ধভাবাপন্ন পিত্ত যদি এই সমস্ত হেতু জন্ত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শরীরস্থ বাব্হীয় রক্তকেও কুপিত ও বিনদ্ধ কবে, এবং জবস্তভাববশতঃ ঐ রক্ত ও পিত্ত উভয়েই মিলিত ও সমবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সর্বাবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পিত্তের বুদ্ধির সহিত ঐ চুই রক্তও বদ্ধিত হইতে থাকে। যেহেতু পিত্তই রক্তোৎপাদনের কারণ। সুতরাং তাহার প্রকোপ, ছুটি, ও বদ্ধিতে রক্তও কুপিত, চুই ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এবমিধ পিত্ত ও রক্ত প্রমাণাতিরিক্ত রূপে সঞ্চিত হইলে, রক্তবাহি শিরাসমূহের দ্বারা নাসা, কর্ণ, মুখ, পুরুষাঙ্গ, যোনিদেশ, গুহ্বদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে বাহিরে নির্গত হইতে থাকে। এই অবস্থাপন্ন ব্যাধির নাম রক্তপিত্ত।

এই রোগের উৎপত্তির প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রায়ই উপস্থিত হয়,

যথা মস্তকে ভারবোধ, আহারে অরুচি, শীতল বস্ত্র ব্যবহারে অতিলাঘ, ধূমক উদগার, বমি, নিজেব বমন দশনে দ্রবাবোধ, কান, খাঁস, ভ্রমি, শরীরের অবসন্নতা, মুখ ও নাসিকামধ্যে গৌহ, রক্ত বা মস্তকের দ্বায় পঞ্চাঙ্গুভব, চক্ষু, চক্ষু, মল ও মূত্রাদিতে হরিদ্রা, রক্ত কিসা পীতবর্ণতা, স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত দৃশ্যে রক্তবর্ণ দর্শন। উক্ত লক্ষণ-গুলি প্রকাশ পাইলেই অচিরভাবা বক্ত-পিত্তের আবির্ভাব বুঝিতে পারা যায়, এই জন্ত এই সমুদয় লক্ষণ রক্তপিত্ত রোগের পূর্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

রক্তপিত্ত, উদ্ধ, অধঃ ও উভয়মার্গ ভেদে তিন প্রকার জন্মিয়া থাকে। উদ্ধ-গত রক্তপিত্তে নাসিকা, চক্ষু, মুখ ও কর্ণ দ্বারা রক্ত নির্গত হয়, অধোগত রক্তপিত্তে পুরুষাঙ্গ, যোনিদেশ ও গুহ্বদ্বার হইতে এবং উভয় মার্গগত রক্তপিত্তে একদা উক্ত উভয়বিধ মার্গ দ্বারা রক্ত বহির্গত হয়। রক্তপিত্ত রোগ অত্যন্ত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সমস্ত রোমনকূপের ছিদ্র হইতেও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

মুখ নাসিকাদির দ্বারা অমিত রক্তস্রাব, তৎসংঘটন ও জ্বর এবং রোগীর পাত্তবর্ণতা লক্ষণ দেখিয়া আজকাল কোন কোন চিকিৎসক এই ব্যাধিকে ক্ষয়জ ব্যাধি মনে করতঃ বিষম ভ্রমে পতিত হয়েন, বস্ততঃ রক্তপিত্ত রোগের সহিত বস্তা শোষ প্রভৃতি ক্ষয়জনিত ব্যাধির কোন কার্য্য কারণতা সম্বন্ধ নাই। এই রোগে যে রক্ত নিঃসৃত হয় তাহা সমস্ত রক্ত নহে, অধিকাংশই রক্তিত পিত্ত ও কতকাংশ দুগ্ধজ রক্ত। এই বিষয় রোগের উৎপত্তি বর্ণনাকালেই বর্ণা



হৃৎপ্রাচ্যে, পিত্তের বিকৃতি দোষেই বিকৃত ও পিত্তবৃদ্ধ উদ্ভিক্ত রক্তগুলি নিঃসৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক যদি ঐ রক্ত শরীরস্থ বিকৃত রক্তধাতু হইত তবে তৎপরিমিত রক্তস্রাবে রোগী অত্যন্ত সময় মধ্যেই নিতান্ত অবসন্ন বা মৃত্যুমুখে পতিত হইত, সন্দেহ নাই। রক্তপিত্তে সময়ে সময়ে এক-সের বা ততোধিক পরিমাণে রক্তস্রাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, রোগী যদিও স্রাবসমকালে কয়েকটা অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সুপথ্য ও দোষোচিত পরিচর্যাাদিগুণে, সে অবস্থা দীর্ঘ সময় থাকে না।

আবার দেখা যায়, অনেক সময়ে রক্ত বা পিত্তের শমনকারী সাধারণ মুষ্টিযোগ ঔষধ সচরাচর সেবনেই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, রোগী অল্পকাল মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছ-দেহাশয় করিতে সমর্থ হয়। ক্ষয়জনিত রোগে স্বেদন পরিবর্তন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না, ইহা সাধারণ জ্ঞানেই বুঝিতে পারা যায়। যদিও “কাসোজরোরক্তপিত্তং ঐক্যপেদ্রাজ্জবজ্জগ্নি” এই ভোজ্যোক্ত বচন-প্রমাণে যথারোগে মধো রক্তপিত্ত ও একটা লক্ষণ স্বরূপ কণিত হইয়াছে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা দ্বারা রক্তপিত্তের রাজ-দ্বন্দ্ব প্রতাপ হয় না,—বরং স্বতন্ত্রতাই বলা যায়, তবে যক্ষ্মারোগের সহিত রক্ত-পিত্তাদি রোগ সংশ্লিষ্ট হইলে উহা অতি চঃসাধ্য হয়, কিন্তু রক্তপিত্তে যদি কাসি বা অর বর্ধমান থাকে, তাহা কখনই রাজবক্ষ্মা নামে অভিহিত বা অসাধ্য বলিয়া পরিগণিত নহে।

সর্ববিধ রক্তপিত্ত মধ্যে উদ্ভিক্ত রক্তপিত্ত অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কারণ উক্ত রোগে

পিত্তের সহিত কফের অল্পবন্ধ থাকে। পিত্ত-দোষ নিবারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিরচনই প্রধান ঔষধ, অথচ বিরচন প্রয়োগে উদ্ভিক্ত রক্তপিত্তে যে কফের অল্পবন্ধ থাকে তাহারও উপশম হয়, অধিকন্তু তিক্তকষায়-রসবিশিষ্ট বিবিধ ঔষধ পথ্যাদির প্রয়োগে ঐ পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে সহজে উপশমিত করা যায়। অনেক সময়ে একমাত্র বিরচন প্রয়োগেই এ অবস্থায় বিশেষ উপকার দেখা গিয়াছে।

এতৎ সম্বন্ধে চরক সংহিতায় উক্ত হই-  
য়াছে যে—

“সাধ্যং লোহিত পিত্তং তৎ যদুর্দ্ধং প্রতিপত্ততে  
বিরেচনশ্চ যোগিত্বাৎ বজ্রদ্ব্যন্তেষজ্ঞশ্চ।

বিরেচনং হি পিত্তস্ত জঘার্থে পরমৌষধঃ।

যশ্চ তত্রাম্লগুঃ শ্লেষ্মা তস্ত চানধমঃস্বতম্॥

ভবেদ্ যোগাবহং তত্র কষায়ং তিক্তমেবচ।

তস্মাৎ সাধ্যতমং রক্তং যদুর্দ্ধং প্রতিপত্ততে”॥

অর্থাৎ—উর্দ্ধগামী রক্তপিত্ত বিরচনোপযোগী বলিয়া সাধ্য হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উহার প্রতিবিধানার্থে নানাবিধ পিত্তকফনাশক যোগবাহী ঔষধ প্রয়োগ করা বাইতে পারে, পিত্তদোষ হরণে বিরচনই সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা, উহাতে পিত্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট শ্লেষ্মার ও উপশম হয় স্বতরাং উর্দ্ধগরক্তপিত্তই সহজেই আরোগ্যলাভ করে।

অধোমার্গরক্তপিত্ত প্রায়ই বাপা (অর্থাৎ যথোপযুক্ত ঔষধ পথ্যাদি প্রয়োগে সামান্যভাবে) থাকে। এই রোগে পিত্তের সহিত বায়ুর অল্পবন্ধ থাকার প্রধানতঃ মধুর রস-বিশিষ্ট ঔষধপথ্যই উপযোগী। যদিও এ অবস্থায় বমনের দ্বারা চিকিৎসার বিধান উক্ত আছে, কিন্তু বমন ক্রিয়া সক্ষিত পিত্তনাশে উপযোগী হইলেও পিত্তদোষ হরণে বিশেষ

ফলপ্রদ নহে। পিত্তহর তিক্তকষায় রস বায়ুর প্রকোপজনক সূত্রাং ইহাতে প্রয়োগ করা যায় না। অপরন্তু এ অবস্থায় যে বায়ুর অনুবন্ধ থাকে, বমন দ্বারা তাহার উপশম হওয়া সম্ভবপর নহে। সূত্রাং বায়ু ও পিত্তের উপশমকারী মধুররসাদিযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদি প্রয়োগে এবং অনুকূল স্বাস্থ্যকর দৈর্ঘ্যে অবস্থানাদির দ্বারা যতদূর সম্ভবপর হয় উক্ত বাদিকে উপশান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে।

উভয় মার্গগত রক্তপিত্ত রোগ প্রায়ই অসাধ্য হয়। রোগজনক দোষ সমূহের পরস্পর বিপরীত ধর্মবশতঃ একের প্রতীকারে অত্রের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, সূত্রাং ঔষধাদির প্রয়োগে বিশেষ সফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব এ অবস্থায় দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্বক যথাযথ ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা দ্বারা রোগীকে কোন প্রকারে সামান্যবস্থায় রাখাই চিকিৎসকের কর্তব্য।

রক্তপিত্তে দোষের ও সাধ্যাসাধ্যত্বের পরিচয়।

উর্দ্ধগামী রক্তপিত্ত শ্রেয়সংসৃষ্ট। অধোগত রক্তপিত্ত বাতাহুগত এবং উভয় মার্গগত রক্তপিত্ত, কফ-বাতাহুগত হইয়া থাকে।

১। এক মার্গগামী (এস্থলে টাকাকার উর্দ্ধগামীকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই মতই সর্বসম্মত ও সমীচীন) রক্তপিত্ত যদি প্রবল প্রাবল্য না হয় ও রোগী সবল থাকে এবং শিশির বসন্তাদি সুখকর সময়ে যদি চিকিৎসার সুযোগ বটে ও রক্তপিত্তোক্ত উপদ্রবগুলি যদি উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে সুখসাধ্য হয়।

২। এক দোষাহুগত রক্তপিত্ত সাধা, দ্বিদোষাহুগামী যাপ্য এবং সর্বদোষযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়।

৩। অগ্নিমান্দ্যরোগীর প্রবল প্লেগযুক্ত রক্তপিত্ত অসাধ্য।

৪। অত্র ব্যাধির দ্বারা ক্ষীণদেহ, বৃদ্ধ, অরুচিবশতঃ যথোচিত ভোজনে অদম্ভ ব্যক্তির রক্তপিত্ত অসাধ্য।

৫। যে সমস্তদৃশ্যপদার্থ বা নভো-মণ্ডল রক্তবর্ণময় দর্শন করে, তাদৃশ রক্তপিত্ত রোগী অসাধ্য।

৬। রক্তপিত্তে যদি রোগীর চক্ষু গোহিত বর্ণ হয় এবং বমন বা উল্কার সময়ে সমস্তই রক্তবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় তাহাৎও অসাধ্য বুলিতে হইবে।

### রক্তপিত্তের উপসর্গ।

দৌরল্য, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমন, মত্ততা, শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা, দাহ, মুচ্ছা, ভুতান্নের বিদাহ, সন্ধ্যা অধীরভাব, বক্ষঃপ্রদেশে প্রবল ব্যথা, পিপাসা, তরল মলভেদ, মস্তকে সম্ভাপবোধ, মুখ ও নাসিকার দ্বারা দুর্গন্ধযুক্ত স্লেষ্মার নিঃসরণ, ভোজনে অরুচি, অন্নের অপরিপাক। এই সমস্ত উপস্রবের নানতা ও আধিক্য অনুসারে রক্তপিত্ত কঠিনাধ্য এবং অসাধ্য হয়। যদি উপস্রব একেবারেই না থাকে তবে সুখসাধ্য হয়। ইহাণ্যতীত উক্ত রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়ের জ্ঞান প্রকৃতরক্তের ও প্রকারভেদ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য। যথা—এইরোগে রক্তেরবর্ণ মাংসধোয়া কলের জায় অথবা কদমার্জ জলের, তুল্য হইলে

কথা বলা, পূর্ব, বা যকৃত থণ্ডেরস্থায় রক্ত  
নির্গত হইলে উহা অমাধা। যদি পক  
জ্বাংকনের জ্বাং বর্ণবিশিষ্ট, বা গাঢ় কৃষ্ণ-  
বর্ণ, নানাবর্ণ অথবা উল্লংঘনর মত নানাবর্ণ  
বিশিষ্ট রক্তস্রাব হয় তাহা হইলে ও উহা  
অমাধা হওয়া থাকে। প্রসূত শোণিতের  
গন্ধ দ্রব শব্দে (যুতদেহের) গন্ধবৎ অমুভূত

হয় তবে উক্ত রক্তপিত্তও অমাধা বলিয়া  
জানিতে হইবে। বারাস্তরে আমরা রক্ত-  
শ্রাবমূলক অজ্ঞাত রোগের সহিত রক্তপিত্তের  
পার্থক্য নির্দেশ এবং রক্তপিত্তের চিকিৎসা  
বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রী অমৃতলাল কবিতৃষণ  
কাব্যাতীর্থ।

## ম্যালেরিয়া ও বিষমজ্বর।

১০১

অনুনা বাঙ্গালার পল্লীগুণি শুধু ম্যালেরিয়া  
উৎপন্ন যাতনেছে না, ম্যালেরিয়ার  
সঠিক কালাজ্ঞাপন বাঙ্গালার পল্লীগুণিতে  
প্রবেশ করিয়াছে। অনেক সময় এই দুইটি  
জ্বরে বেদ নির্ণয় করা বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া  
বড় শক্ত হইয়া পড়ে,—অনেক চিকিৎসক-  
কেই এজ্ঞাত বিভ্রাটে পড়িতে হয়। সঠিক  
অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া অনেকে কালা-  
জ্ঞাপনও ম্যালেরিয়া জ্বব মনে করিয়া  
সেই ধরণের চিকিৎসা করিতে আরম্ভ  
করেন কিন্তু যথোপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে  
বেকপ চিকিৎসককেও ব্যর্থ মনোরণ হইতে  
হয়, সেইকপ অচিকিৎসায় রোগীর অবস্থাও  
ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠে। এজ্ঞাত  
ম্যালেরিয়ার আগে রোগনির্ণয় ভালরূপে  
করিয়া তাহার পর চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ  
করা উচিত।

আমরা গতবারে বলিয়াছি—ম্যালেরিয়া  
জীবাণু পরকৃষ্ণ উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্ত-  
গত ইহারা বক্ত কণিকার ভিতর এক

পার্শ্বে অবস্থিত করে। জীব শরীরে রক্তের  
তিনটি বিভাগ,—একটি রক্তকণিকা, একটি  
শ্বেতকণিকা ও অপরটি জলীয় পদার্থ।  
ম্যালেরিয়ার আক্রমণে রক্তও শ্বেত কণিকা-  
উভয়ই তুলারূপে ধ্বংস হইতেছে—পরীক্ষা  
করিলে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কালাজ্বরে  
শ্বেত কণিকাই বেশী ধ্বংস হইয়া থাকে।  
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির  
করিয়াছেন,—কালাজ্বরে শ্বেত কণিকা হঠাৎ  
হইতে হঠাৎ পর্যন্ত কমিয়া গিয়া থাকে।  
শ্বেত কণিকাগুলি রক্তের ভিতর অবস্থিত  
থাকিয়া সর্বদাই আমাদের দেহ রক্ষার  
কার্য্য করিতেছে কাজেই উহারা কমিয়া  
গেলে শরীর নানারূপ ব্যাধি সম্মুল হইয়া  
পড়ে।

ম্যালেরিয়ার সকল জীবাণু এক রকমের  
নহে। সাদাসিধা জ্বর একরূপ জীবাণু  
হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর এক  
রকমের জীবাণু হইতে সাংঘাতিক জ্বরের  
উৎপত্তি হয়। সহজ জ্বর-জীবাণু আবার

কয়েক রকমের জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে,—  
এক রকম প্রাত্যহিক, এক রকম তৃতীয়ক  
ও এক রকম চতুর্থক। ইহার নিদান  
আমরা অনেকটা বিষমজ্বরের মত দেখিতে  
পাই। “রোগ বিনিস্চয়” গ্রন্থে উল্লিখিত  
হইয়াছে—

“দোষোল্লোহিত সংভূতো জরোৎ সৃষ্টঃ  
বা পুনঃ।

ধাতুমজ্জতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্॥”

অর্থাৎ জ্বর-মুক্তির পর দেহের ক্ষীণতা  
থাকিতে অবৈধ আহার বিহার করিলে  
অনতি বল দোষও প্রবৃদ্ধ এবং বায়ু কর্তৃক  
প্রেবিত হইয়া রস রক্তাদি কোন ধাতুকে  
আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

বর্তমান সময়ে সেকালের মত রস  
পরিপাক করাইয়া চিকিৎসার বিধি একরূপ  
উঠিয়াই গিয়াছে। এমতাবস্থায় ম্যালেরিয়া  
জ্বর বা বিষমজ্বর উপস্থিত হইবার কারণ  
তো যথেষ্টই রহিয়াছে। তা’ ছাড়া কখন  
কখন প্রথম হইতেই বিষমজ্বরের উৎপত্তি  
হইয়া থাকে—ইহার প্রমাণও চিকিৎসা  
গ্রন্থে পাওয়া যায়, সুতরাং ম্যালেরিয়া  
জীবাত্ম রক্তকণিকায় মিশ্রিত হওয়ার জন্তই  
বিষমজ্বর বা ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি  
হইয়া থাকে—একথা বলা বাইতে পারে।

“রোগ বিনিস্চয়” গ্রন্থে সত্তত, সন্তত,  
অন্তেহুক, তৃতীয়ক, চতুর্থক—এই কয়  
শ্রেণীতে যে বিষমজ্বরের বিভাগ করা  
হইয়াছে, ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ সবক্ষেণে  
তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।  
পূর্বেই বলিয়াছি, সহজ জ্বর-জীবাত্ম হইতে  
অন্তেহুক বা প্রাত্যহিক জ্বর এবং তৃতীয়ক  
ও চতুর্থক জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

আর এক প্রকার জীবাত্ম সত্ততক ও সন্তত  
জ্বরের উৎপত্তি করিয়া থাকে। সত্ততক  
জ্বরের জীবাত্ম সুরঞ্জিত, এজ্বর অতি  
সাংঘাতিক; ইহার অপর নাম দৈবানিক,—  
এ জ্বর দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার  
অথবা কেবল দিনেই দুইবার বা রাত্রিতেই  
দুইবার হইয়া থাকে। এ জ্বরের চিকিৎসা  
বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

যে জ্বর সাতদিন, দশদিন ও দ্বাদশ দিন  
নিয়ত ভোগ করে তাহার নাম সন্তত। এ  
জ্বরটি বিষমজ্বর কি না, সে সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ-  
বেত্তাদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও  
বর্তমানের ম্যালেরিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ  
যথেষ্ট নিহিত রহিয়াছে।

দোষ রসজ্বর হইয়া সন্তত জ্বরের সৃষ্টি  
করিয়া থাকে। এই জ্বরে দেহের শুষ্কতা,  
বমনেচ্ছা, অবসাদ, বমি, অরুচি ও চিত্তের  
ক্রান্তিভাব প্রকাশিত হয়। যে ম্যালেরিয়া  
জ্বরে দশ দিন বা দ্বাদশ দিন নিয়ত কাল  
ভোগ হইয়া থাকে, সে জ্বরের সহিত ইহার  
মৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় আমরা  
ইহাকে বিষমজ্বরের অন্তর্গত সন্তত জ্বর  
বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

দোষ রক্তজ্বর হইয়া সত্ততজ্বরের  
উৎপত্তি হয়। এই জ্বরে মুখ হইতে  
রক্তকণিকার, দাহ, মোহ, বমন, বিব্রম,  
প্রণাপ, পিড়কা ও ভূক্ষা—এই সকল লক্ষণ  
উপস্থিত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরের যে  
অবস্থায় সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার  
করিয়া জ্বর হইতেছে দেখা যায়, সে জ্বরের  
লক্ষণও এইরূপ। এই জ্বরে ম্যালেরিয়া-  
জীবাত্ম রক্তকণিকায় আশ্রয় করিয়া থাকে  
একথা পূর্বে বলিয়াছি।

রক্তকণিকা কেই রক্তস্থ বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝা গেল এশ্রণীর ম্যালেরিয়া জ্বর ও আয়ুর্কেন্দ্রের বিষমজ্বর একশ্রণীর অন্তর্নিহিত।

এইরূপ দোষ মাংসাশ্রিত হইয়া অন্তেছক, মেদোগত হইয়া তৃতীয়ক ও অস্থি মজ্জাগত হইয়া চতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। এই মাংসাশ্রিত বা অন্তেছক জ্বরে জায়ুর অধো-জন্মা মাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়েয় ডিমে দণ্ডাদ দ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, মল-মূত্রের অতিপ্রবৃত্তি, বাহিরে তাপ, অন্তরে দাহ, হস্তপদাদি সঞ্চালন ও শ্রানি—এই সকল লক্ষণ যাহা উপস্থিত হয় তাহাও ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবের সন্দেশ। মেদো-গত জ্বরে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূচ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, শ্রানি ও অসহিষ্ণুতা,—অস্থিগত জ্বরে অস্থি-সমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুহন, শ্বাস, মলরোধ, বমন ও হাত-পা ছোড়া,—মজ্জাগত জ্বরে অরুকার দর্শন, হিকা, কাস, শীত, বমি, অন্তদাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়চ্ছেদবৎ বেদনা—

ম্যালেরিয়ার অব বিশেষের সহিত একই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়।

কালাজ্বরও আয়ুর্কেন্দ্রের বিষমজ্বরের অন্তর্গত কিন্তু ইহা ম্যালেরিয়ার সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাহ্যেটক ম্যালেরিয়া জ্বরের নাম আমাদের দেশের লোকে আগে না জানিলেও ইহার সহিত আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত বিষমজ্বরের যে সাদৃশ্য রহিয়াছে—সে সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নাই। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, ম্যালেরিয়া জ্বরে যদি প্রথমেই সাবধানতাসহ আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত পাতন এবং ঔষধ সকল সেবন করা যায়, তাহা হইলে রোগ আর ভীষণভাবে ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু জ্বরের বিরামকালে ডাক্তারেরা যেকোন কুইনাইন প্রয়োগে উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন, সেইরূপ আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত হরি-তাল প্রভৃতি তীব্র ঔষধ ব্যবহারে উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু উহা কালাজ্বর কি না ইহা ঠিক বিবেচনা করিয়া তবে ম্যালেরিয়া নিবারণের ঔষধ দেওয়া কর্তব্য।

## ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

[ নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগগুলি আমাদের বাগিতে পুরুষ পরম্পরায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সাধারণের উপকার হইবে ভাবিয়া “আয়ুর্কেন্দ্রে” ইহা মুদ্রিত করিলাম। এই সকল মুষ্টি যোগের মধ্যে—আদি স্বয়ং

কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছি এবং চমৎকার ফল পাইয়াছি। আমার বিশ্বাস—পাঠকগণ ইহা ব্যবহার করিলে বৃষ্টিতে পারিবেন। জ্বরের অন্তর্গত—কত সামান্য জিনিষে কত বড় উৎকট ব্যাধিও আরাম হইতে পারে।

মুষ্টিযোগগুলি আমার পিতৃদেবের একখানি  
খাতায় লিপিবদ্ধ ছিল।]

আধ কপালে—

পেটারীর মূল ছেঁচিয়া, নেকড়ার পুঁটুনীতে  
বাধিয়া নস্ত হইলে তৎক্ষণাৎ—আধ কপালে  
নামক শিরোরোগ নষ্ট হয়।

অনিদ্রার—

কাকমাটা, পিপুল, মুগাই, এই তিনটা  
গাছের যে কোনও একটীর মূল-স্থায়  
বাধিয়া মাথায় বাধিলে নিদ্রাকর্ষণ হইয়া  
থাকে।

নিদ্রার—

কান্দু কুড়িয়ার মূল স্থায় করিয়া মাথায়  
বাধিলে—সে দিন আর নিদ্রা হইবে না।

কাজিড়ার পাতা বাটিয়া চক্ষুর চতুর্দিকে  
প্রলেপ দিলে—ঐ প্রলেপ যতক্ষণ থাকিবে,  
ততক্ষণ আর নিদ্রা হইবে না।

দন্তশূলে—

কুড়চীর ছাল বাটিয়া দাঁতের গোড়ায়  
দিবে তৎক্ষণাৎ দন্তশূল আরোগ্য হয়।

দাঁতের পোকায়—

হাঁচুটি কিম্বা কান্দু কুড়িয়ার শিকড়  
চিবাইলে দাঁতের পোকা মরে।

যে দাঁতে পোকা হইয়াছে—সেই দাঁতের  
পোকায় স্থানে নিরুজ্জ্বল আদার রস পুরিয়া  
দিবে। পরে, ডানিপানার মূল চিবাইতে  
বলিবে। ইহাতে পোকা মরে।

দন্ত চালে—

হেজল গাছের ছাল গুঁড়া করিয়া দাঁত  
শাজিলে, নড়া দাঁত শক্ত হয়।

বকুলের ছাল বাটিয়া দন্তশূলে লেপ দিলে  
দাঁত খুব শক্ত হয়।

প্রত্যহ নীল কাঁটার পাতা চিবাইলে দাঁত  
খুব শক্ত হয়।

পিপুলের মূল চিবাইলেও দাঁত শক্ত হয়।  
দন্ত কড় মড় কায়—

কান্দড়ের পাতা ছগ্গে বাটিয়া, পনতলে  
রাত্রিকালে প্রলেপ দিলে দাঁত কড়মড় করা  
ভাল হয়।

কাস রোগে—

পিপুলের গুঁড়া ১০ আনা, গুঁঠের গুঁড়া  
১০ আনা, সৈন্ধব লবণ ১০ আনা। একত্রে  
মিশাইয়া ভোজননের প্রথম গ্রাসের সহিত  
প্রত্যহ খাইলে শীঘ্রই কাস রোগ ভাল হয়।

রাম বাসকের মূল ১০ আনা, কাল তুলসীর  
পাতা ২১ থানা, মরিচ ৫টা একপোয়া জলে  
সিদ্ধ করিয়া এক চটাক থাকিতে নামাইয়া  
গরম গরম ঠিক সন্ধ্যার সময় খাইবে। ইহাতে  
সকল রকম কাশি ভাল হয়।

অনুয্যতার কড়ি ১ কড়া, ছোট সবুজ  
রঙের মাকড়সা ১টা—একত্রে জ্বাকড়ায়  
বাধিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে সকল রকম কাসি  
ভাল হয়।

প্রত্যহ ভোজন শেষে এক আনা সৈন্ধব  
লবণ—একটু গরম জল সহ খাইলে বহুদিনের  
পুরাতন কাস রোগ ভাল হয়।

রক্ত পিত্তে—

গাজার পাকাফল ৪৫টা চুবিয়া খাইলে  
তৎক্ষণাৎ মুখ দিয়া রক্ত ওঠা বন্ধ হয়। টাটকা  
ফল না পাঠিলে শুষ্কফল চূর্ণ করিয়া—মধুর  
সহিত চাটিয়া খাইতে হইবে।

লাক্ষার গুঁড়া ১০ আনা কিসমিস ১০  
আনা, একত্রে বাটিয়া বড়ী করিবে। এই  
বড়ী চুবিয়া খাইলে—রক্ত ওঠা নিবারিত  
হয়।

অজীর্ণ—

শুঁঠের গুঁড়া ১০ আনা, ১ বিহ্বক গরম দুগ্ধ সহ রাত্রে আঁঠরের পর খাইলে—অজীর্ণ ভাল হয়।

আমপোয়া ডাবের জলে—১০।১২টা পুদিনার পাতা, এক আনা মোরো, এক আনা পোধান, ১ কুঁচ মৈন্ধব—রাত্রে ভিজাইয়া পাতকালে সেই ডাবের জলটুকু ছাঁকিয়া গায়েলে সপুষ্পকার অজীর্ণ রোগ ভাল হয়।

বাগ শূলে—

হিজলেব ফল ১টা, মরিচ ১২টা—জল দিয়া বাটায়া খাইলে বাই শূল ভাল হয়।

প্রাণায়—

কেয়া গাছের পাতা শুকাইয়া,—হাঁড়ির ভিতর পুবিয়া, অশ্বপুমে দগ্ধ করিবে। সেই ফল ৩ বাতি, একটু মাংস গুড়ের সহিত খাইলে রক্ত ভাল হয়।

নিসন্দা গাছের শিকড়ের সূক্ষ্মচূর্ণ এক আনা; এক বিহ্বক বাছুরের চোনার সহিত এক মাস কাল ব্যবহার করিবে। ইহাতে গীহা, বক্ত ও জর নিশ্চরই ভাল হইবে।

আম বাত—

বিভাটি গাছের পাতা ৫৬টা গব্য ঘূতে ভাজিয়া ভাতের সঙ্গে খাইলে আমবাত ভাল হয়।

বাত—

শিবীশ মূলের ছাল ২ ভরি, দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় ছটাক থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ পান করিলে বাতের বেদনা নষ্ট হয়।

আপ চটাক—পাকা পুই মেটুলী, এক পোয়া রেড়ীর তৈলে চোয়া চোয়া করিয়া ভাজিবে। সেই তৈল বাতের বেদনা হানে

মালিশ করিবে। ২৩ দিবসেই উপকার জানা বাইবে।

প্রমেহ—

একখানি বাতাসায় ১ ফোঁটা বটের আটা দিয়া খাইলে, ৩ দিনে মেহ রোগের আলা যন্ত্রণা নষ্ট হয়।

কাবাব চিনির গুঁড়া ১০ আনা, কলমী মোরো আপ ভরি, সাদা চন্দনের গুঁড়া ১০ আনা, সকলের দিগ্ধা মিছরীর গুঁড়া দিয়া ১৭ পুরিয়া করিবে। এই পুরিয়া ২ বেলা ২টা জল দিয়া গিলিয়া খাইবে। ইহাতে মেহ, প্রস্রাবকালীন অসহ্য জ্বালা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ও গব্য, সপুষ্পধাতু নির্গম প্রভৃতি উপশম—সব্বর প্রশমিত হয়।

রক্তমাশায়—

বেলগুঁঠা চূর্ণ ১০ আনা, আমের কোলী চূর্ণ ১০ দাড়িমা ফলের গুঁড়া ১০ শিমূল আটা চূর্ণ ১০, মুখা চূর্ণ ১০ আনা, সাদা ধুনার গুঁড়া ১০ আনা, একত্র মিলাইবে। ১৪টা পুরিয়া বাধিবে। ২ বেলা ২ পুরিয়া ছাগল দুগ্ধ অমুপানে খাইলে অসাধ্য কষ্টকর রক্তমাশায়ও আরোগ্য হয়। এই ঔষধটি আমাদেবর বংশে প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া ব্যবহার হইয়া আসিতেছে—এমন চন্দ্রকার ঔষধ প্রায় দেখা যায় না।

আম ছাল বাটায়া, পুরু করিয়া নান্ন স্থানে প্রলেপ দিলে—আমাশয় ভাল হয়।

গ্রহণী রোগে—

বকুল ছালের রস, আমছালের রস, আঁধা কুম্বুক পরিমাণে লইয়া ঘোলের মধিক্ত করিয়া খাইলে গ্রহণী ভাল হয়।

শঙ্কর জটার শিকড় ১০ আনা, পাচটা গোলা মরিচ সহ বাটায়া খাইলে গ্রহণী ভাল হয়।

হারিষে—

লাল আপাং গাছের শিকড় এক আনা, বাটিয়া ইক্ষুরস সহ ভক্ষণ করিলে হারিষের রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

আফুলা শিমুলের মূল বাটিয়া ছাগল দুগ্ধে সহ সেবনে হারিষ ভাল হয়।

দন্তোৎপলের মূল ১০, ২১ গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে রক্ত বন্ধ হয়।

বাতশিরা ও কুরণ্ডে—

মাল কাঁকড়া বাসের শিকড় দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া খাইলে, বাতশিরা ভাল হয়।

কুমিরে পোকাকার বাসা—জলে গুলিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ড ও একশিরার ফুলা এবং যন্ত্রণা সত্ত্ব সত্ত্ব কমিয়া যায়।

ভৃক্ষায়—

কাঁকড়ার গর্তের মাটি লইয়া ৭টা ভাঁটা প্রস্তুত করিবে। ঐ ভাঁটাগুলি আগুনে পোড়াইতে দিবে। লাল বর্ণ হইলে চিমুটায় দ্বারা তুলিয়া ভাঁটাগুলি গরম থাকিতে ২ একে একে তিন গোয়া জলে ডুবাইবে। সেই জল ছাঁকিয়া রোগিকে খাইতে দিবে। এক গোয়া আন্দাজ জল খাওয়ার পরই আর সে জল খাইতে চাহিবে না।

কলমী শাকের গাঁইট ২১টা মরিচ পাঁচটা—একত্রে বাটিয়া আধ গোয়া জলে গুলিবে। এই জল ২১ বিন্দুক খাইবামাত্র বোগীর অসহ্য পিপাসা নিবারিত হইবে।

হিকার—

রজনী গন্ধ কুল ৪৫টা শিলে বাটিবে,— পরে তাহা আধ গোয়া জলে গুলিয়া, সেই জলে ২ তোলা চিনি মিশাইয়া সরবত প্রস্তুত করিবে। এই সরবত পান করিলে, অল্প

উখিত হিকার ভাল হয়। মৃত্যুকালে—

বিশ্বাসাগর মহাশয়কে খাওয়ান হইয়াছিল। কেশের (কমার) শিকড় শুকাইয়া শুঁড়া করিবে, এই শুঁড়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে প্রবল হিকার নিবারিত হয়।

মূচ্ছায়—

ছোট চাঁদের পাতা হাতে রগড়াইয়া রোগীর নাকের কাছে ধরিলে, মূচ্ছা ভাল হয়। পা ফাটায়—

শুড় আধ ছটাক, সর্ষপ তৈল আধ ছটাক, সৈন্ধব লবণ ১০ আনা, এক গোয়া চোনা—একত্রে মিশাইয়া ৭ দিন রৌদ্রে রাখিবে। চোনা শুকাইয়া গেলে মলমের মত হইবে। ইহা মাখাইলে পা ফাটা ভাল হয়। পিত্ত বৃদ্ধিতে—

হিংচা পাকের রস ১ কাঁচা, ধনের শুঁড়া ১০ আনা, হরিতকী চূর্ণ ১০, শুড় ১০, একএ মিশাইয়া খাইলে, হাত পা চথ মুখ জাগা প্রশমিত হয়।

বায়ু বৃদ্ধিতে—

অন্ন দধি ও মাং শুড় একত্রে মিশাইয়া— স্নানের পূর্বে গাত্রে মাখিবে, পরে স্নান করিবে। ইহাতে উন্মাদ পর্যন্ত ভাল হয়।

স্নানের পর—পায়রার ডিমের শাঁস কাঁচা, হলুদের রসের সহিত মিশাইয়া মাথায় লেপ দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়।

কামলা রোগে—(জ্বাৰা)—

আঁকোতে মূল বাটিয়া নাশ লইবে। আমলার শুঁড়া বোল সহ খাইবে।

দাক হরিত্রা—চন্দনের মত জলে দ্রবীভূত খাইবে, চক্ষু কেতয়ে পাতার রসের অল্প দিবে। ইহাতে জ্বাৰা ভাল হয়।



# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৪—পৌষ।

{ ৪র্থ সংখ্যা।

## স্বাস্থ্যকর স্থান।

[ দার্জিলিং ]

### প্রাকৃতিক পরিচয়—

ডাক্তার যখন বোগীকে কোথাও ‘চেঞ্জে’  
বাড়িবার পবানশ দেন, তখন অনেকেই  
 বলেন—“এটা ডাক্তারী মতের গঙ্গা যাত্রা!”  
কিন্তু একপ বিজ্ঞপ—বাস্তব নিতান্ত অকারণ  
 নঃ। অনেক সময় দেখা যায়—চেঞ্জে  
 গিয়া রোগীর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতিই হইল  
 নঃ,—যং রোগ বাড়িয়াই গেল, হয়ত  
 তাহাতেই তাহাকে পৃথিবীর পাছশালা  
 পরিত্যাগ করিতে হইল। একপ ঘটনা  
 প্রায়ই ঘটয়া থাকে। কিন্তু, জল-বায়ুর  
 পরিবর্তনে নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসা—ইহাও  
 ত নিতান্তই ঘটনা। দেশে দীর্ঘ কাল  
 ধরিয়া বোগ ভোগ করিলে অনেক সময়—  
 ‘স্থানভ্যাগেন চর্জনেং,’ এই মহানীতির বলে  
 জল বায়ু পরিবর্তনের আবশ্যক হইয়া থাকে।  
 আমাদের বিশ্বাস,—চেঞ্জে গিয়া বাঁহারা  
 কোনও উপকার পান না, তাঁহারা হয়ত

নিজের উপযোগী স্থান নির্বাচন করিতে  
 পারেন না। সকল স্থান সকলের পক্ষে  
 স্বাস্থ্যকর হইতেই পারেনা। সেইজন্য  
 আমরা সাধারণের উপকারার্থে—প্রসিদ্ধ  
 স্থানগুলির স্বাস্থ্যকারিতার বথাসাধ্য পরিচয়  
 দিব। ইহাতে—কোন স্থানে গেলে কিরূপ  
 রোগীর উপকার হয়—সকলেই তাহা বুঝিতে  
 পারিবেন। দেশের প্রকৃতি-নির্বাচন দোষে  
 কাহাকেও আর বিভ্রম না ভোগ করিতে  
 হইবে না।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দার্জিলিংয়ের  
 স্বাস্থ্যকারিতার উল্লেখ করিব। সম্প্রতি  
 আমাদের এক বন্ধু রোগ-মুক্তির পর  
 দার্জিলিংয়ে হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন।  
 তিন মাসের পর তাঁহাকে রুগ-ভগ্ন দেহ  
 লইয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।  
 বন্ধুর যেরূপ শরীর, তিনি যেরূপ ব্যাধিতে কষ্ট  
 পাইয়াছেন,—তাঁহার দার্জিলিংয়ে বাওয়াই  
 উচিত হয় নাই। অবশ্য দার্জিলিং একটা

স্বাস্থ্যকর স্থান,—কিন্তু সকলের পক্ষে দার্জিলিংয়ের বায়ু শুভকর নহে।

কলিকাতা হইতে প্রায় ৪০০ শত মাইল দূরে, ৭১৬৯ ফিট উচ্চে—হিমালয়ের একটা শৃঙ্গের উপর দার্জিলিং অবস্থিত। যখন “দার্জিলিং-হিমালয়ান্ রেলওয়ে” ছিল না, তখন দার্জিলিং যাওয়ার অনেকটা অসুবিধা ছিল,—পরমাথরচও কিছু বেশী হইত। তখন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ট্রেনে গিয়া, পরে টোঙ্গা বা পাল্কীতে চড়িয়া দার্জিলিং সহরে যাইতে হইত। এখনও প্রাচীনকালের পথের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সুনিঘাছি, বন্ধমানের মহারাজগণ রথন দার্জিলিং যাত্রীদের জন্ত যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিতেন। এখন দার্জিলিং গমনের আর কোন কষ্ট নাই। বিকালে শিয়ালদহ স্টেশনে—দার্জিলিং মেলে চড়িলে,—একেবারেই দার্জিলিং যাওয়া যায়। বিশেষতঃ পথের উভয় পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গেলে পথশ্রমের কথা মনেই থাকে না।

হিমালয়ের সিকিম গিরিশ্রেণীর মধ্যে দার্জিলিং। স্থানটী তত প্রশস্ত না হইলেও অসংখ্য অট্টালিকায় পূর্ণ, দেখিতে অতি সুন্দর—যেন স্বর্গের নন্দন কানন! পর্বতের যে ভাগে দার্জিলিং সহর রচিত হইয়াছে, সে অংশ তত উচ্চ নহে। দার্জিলিংয়ের বাজার দেখিবার জিনিষ। এখানে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিবার জন্ত—মহামাত্র বঙ্গেশ্বরের একটা প্রাসাদ আছে। দার্জিলিংয়ে বর্ধমান ও কুচবিহারের মহারাজার অনেক জায়গা জমী-দেখিতে পাওয়া যায়। ভাড়াটে বাড়ীরও এখানে অভাব নাই তবে ভাড়ার হার বড় বেশী।

দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি পতনের মাত্রাটা অতিরিক্ত, আসাম, কুচবিহার ব্যতীত ভারতের আর কোনও দেশে এত বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ১২০ ইঞ্চি পাকে। এত বৃষ্টি—কিন্তু বৃষ্টি পরিয়া গেলেই পথ ঘাট পুনশ্চ শীঘ্র শুকাইয়া যায়। কলিকাতার মত এক হাঁটু কাদা হয় না। সকল ঋতুতেই এখানকার বায়ু আর্দ্র—শীতে ও বর্ষার আরও অধিক। এখানে বায়ুর তাপের মাঝামাঝি পরিমাণ, ৫৯, ৫১ ও ৩৬ ডিগ্রী। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ৬৫, আষাঢ় শ্রাবণে ৭০, অগ্রহায়ণ পৌষে ৬২ ডিগ্রী হইয়া থাকে।

অতি চমৎকার পরিচ্ছন্ন সহর! ময়লা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত এত সুন্দর যে, চক না দেখিলে বুঝানো যায় না। সহরেব ড্রেন—“রগজিং” নামক নদে মিশিয়াছে। জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো—কিছুই অভাব অপ্রতুল নাই। বাজারে সকল জিনিসই পাওয়া যায়। কিন্তু দাম বেশী। বিপাতা শাক সব্জী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রতি রবিবারে একটা হাট বসে। ভুটিয়া, নেপালী, লেপ্‌চা, সিকিমী প্রভৃতি পাহাড়ী জাতিরা হাটের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কত ফুল, ফল, মধু, এলাচ, তরকারীই যে আমদানী হয়, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

পণে বেড়াইতে বেড়াইতে যখন,—উর্দে তুষার-মণ্ডিত অচল শ্রেণী, নিম্নে নেত্রোৎসব উপত্যকা ভূমির দিকে দৃষ্টি পতিত হয়, তখন প্রাণে এক অপূর্ণ ভাবের আবেশ হয়। প্রভাতে ও প্রমোদে উপত্যকাগুলি তিমিরাবৃত, শিখরগুলি রবিকর দীপ্তিতে স্বর্ণোজ্বল, কি রমণীয় মনোহর! আরও

দ্বি-সেকালের প্যারেড্ হইতে তুষারাবৃত  
ভূমিনাচনের মধুর দৃশ্য দেখেন, বোধ হয়  
জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবেন না! ঐ  
গিরি-শ্রেণীর উপর—২৮ হাজার ফিট উচ্চ  
'কাকন জঙ্গা' ভীমকান্ত মূর্তিতে দণ্ডায়মান!  
পশ্চিম দিকের দৃশ্য—১২ মাইল দূরবর্তী  
একটা পাহাড়ে অবরুদ্ধ, পূর্ব দিকে তিত্তা  
অদিত্য! দক্ষিণে সেকালের নিবিড়  
বনালি—যেন তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের স্রায়  
অনন্ত মিলিয়া গিয়াছে! উত্তর দিকের দৃশ্য  
—উজ্জ্বল, কেবল পরন্ত শ্রেণী মেঘেব স্রায়  
ধবে ধবে সাজানো। ১০১২ হাজার ফিট  
উচ্চে আরোহণ করিয়া নেপাল ও সিকিমের  
মধ্যবর্তী গিরি শিখরে দণ্ডায়মান হইলে  
দক্ষিণে অনন্ত মোক্ষার্থের আধার “কাকন  
জঙ্গা” এবং বামে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরি  
“এভারেস্ট” দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে  
'বর্ণজিতের' স্ফটিক-স্বচ্ছ-সালিলে তিত্তা  
শখার চরিত্রবর্ণ বারিরাশি মিশিয়াছে—  
সেখানকাব দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, এতদিনে  
আমার মানব জন্ম সার্থক!

দার্জিলিংয়ে একটি অপূর্ণ উদ্যান আছে  
—পৃথিবীর সকল দেশের উদ্ভিদ তাহাতে  
সমুদ্রে সংগৃহীত হইয়াছে। দার্জিলিংয়ের  
“গিন্‌কোনা” ফ্রেডও দেখিবার জিনিষ।  
এখানে মক্ষিকা ও মধু উৎপাদনের বিস্তৃত  
কারবার আছে।

দার্জিলিং যে কিরূপ স্বাস্থ্যকর মনোরম  
স্থান, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমি প্রাকৃতিক  
দৃশ্যের কথাঞ্চিৎ আভাষ দিলাম, নহিলে  
দার্জিলিংয়ের সকল চিত্রকটো, কেবল ভারতের  
কবি কালিদাসের এবং বাঙ্গালার কবি  
বিহারীলালের ক্যামেরাতেই উঠিতে পারে।

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, এখানে  
প্রবল বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। এই সময়  
এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল। মার্চ ও মে  
মাসে দার্জিলিংয়ের জল বায়ু ঠিক ইংলণ্ডের  
মত হয়। বাঙ্গালী বাবুবা এই সময়  
দার্জিলিংয়ে বেড়াইতে যান। যদিও বর্ষায়  
শৈত্যও এখানে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকে  
না, তথাপি নবেম্বর মাসেই এ দেশের স্বাস্থ্য  
সব সময়ের চেয়ে ভাল। নবেম্বর হইতে  
ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত—প্রায়ই ঝড়পুষ্টি দেখা যায়  
না। এই সময় দিবসে সূর্য্যোদয় দেখিতে  
পাওয়া যায়, রাত্রে সুশীল নভোমণ্ডলে  
তারা সনাথ চন্দ্রদেব মর্জলিস দরবার  
বসান।

### জল বায়ু ।

এইবার দার্জিলিংয়ের জল বায়ুর কথা  
বলিব। যে সকল শিশু রোগে জীর্ণ ও  
অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছে, দার্জিলিংয়ের জল  
বায়ুতে তাহাদের অত্যন্ত উপকার হয়।  
অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা ফুট পুট ও বলিষ্ঠ  
হইয়া পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করে। বয়ো-  
প্রাপ্ত ব্যক্তিরও দার্জিলিংয়ে আসিয়া নষ্ট  
স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পর্ব্বতের  
“কঠিন শক্ত ঠাই” তথায় ম্যালেরিয়া স্তন্দরী  
যেসিতে পারেন না।

আর্দ্র ভূমিতে বাস করিলে যে সকল  
রোগ জন্মিতে পারে, দার্জিলিংয়ে সে সকল  
রোগের ভয় নাই। তবে খুব শীতের সময়  
একটু আধটু সর্দী কাসি হয় বটে, কিন্তু সে  
সর্দী প্রায়ই বৃকে বসে না বা ফুস ফুস বিকৃত  
করে না।

যাঁহারা জর আলায় ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থি-চর্ম সার হইয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ দুই মাস কাল দার্জিলিংয়ে বাস করিলে, জল বায়ুর গুণে নিশ্চয়ই নবজীবন লাভ করিবেন।

যাঁহারা অসুস্থ শরীর লইয়া দার্জিলিংয়ে যাইবেন,—সে সময়টা যদি শীতকাল হয়,—তবে তাঁহারা পথিমধ্যে ‘খরসান’ নামক স্থানে কিছুদিন থাকিবেন। একেবারে ৭ হাজার ফিট উচ্চ দার্জিলিংয়ে ঘাটবেন না।

দার্জিলিংয়ে গেলে, একে অধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চালিত হয়। তাহাতে স্বক পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, শরীরেও বলাধান হইয়া থাকে। এতজন্ম—এই হিমজাড্য দেশেও অতিরিক্ত শৈত্য সেবনেও দেহের কোনও অপকার হয় না। আমাদের দেশে তাপা-মিকোর জন্ম স্বক স্বভাবতঃ শিথিলও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ফলে এদেশে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সন্দী হয়। কিন্তু শীত-প্রধান দার্জিলিংয়ে স্বকের তেজ ও স্থিতিস্থাপকতা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে—সুতরাং শৈত্য সেবনে অপকার না হইয়া উপকারট হইয়া থাকে। আবার পর্বতারোহণ কালে হৃদপিণ্ডের শোণিতস্রোত দ্রুতবেগে বহিতে থাকে। কি সুস্থ, কি অসুস্থ, দার্জিলিংয়ে গেলে সকলেরই জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়। সে ক্ষুধা কাহারও আগাগোড়া সমান থাকে, কাহারও বা দিন কতক পরে কমিয়া যায়। পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বল ও মাংস বৃদ্ধি হয়, পেশী সমূহ এতদূর দৃঢ় হয় যে, গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও লোকে ক্লান্তি বোধ করে না।

এদেশে নিম্না দেবীর সঙ্গে যাহার প্রণয়

নাই, দার্জিলিংয়ে গেলে নিম্না তাঁহার সহচরী হইয়া দাঁড়ান। আমাদের দেশে বায়ুর উত্তাপে ও মানসিক উদ্বিগ্নে প্রায়ই নিম্নার ব্যাবাত ঘটিয়া থাকে। দার্জিলিংয়ের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মনে বিপুল আনন্দ জন্মে, এবং শৈত্য সেবনে মস্তিষ্কও শীতল হয়, এই উভয় কারণে দার্জিলিংয়ে কৃষ্ণকর্ণের নিম্না মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু এমন নিম্নাকর স্থানে আসিয়াও ছ’এক জনকে নিম্নার জন্ম আক্ষেপ করিতে শুনা যায়। দার্জিলিংয়ে পৌছিলামাত্র—১০:১৫ দিন কাহারও কাহারও ভাল ঘুম হয় না, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এ কষ্ট দূরিয়া যায়।

কোন ব্যক্তির দার্জিলিং যাওয়া উচিত নহে।

যে সকল ব্যক্তি বা রোগী জল-বায়ু পরিবর্তনের জন্ম দার্জিলিংয়ে যাইবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

১। সমতলের বায়ু অবসাদক, পাহাড়ের বায়ু উত্তেজক। সুতরাং চেপ্তে যাইবার পূর্বে, সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা শারীরিক বল পরীক্ষা করান উচিত। যে রোগী অত্যন্ত দুর্বল, দেহ কঙ্কাল-সার, তাহাকে কখনও দার্জিলিংয়ে পাঠাইবেন না, পাঠাইলে উপকার ত হইবেই না, বরং এমন অপকারের সম্ভাবনা যে, দেশে ফিরিয়া আসিলে হয়ত তাহার মৃত্যুও ঘটতে পারে। পর্বতবাসে যে উত্তেজনা জন্মে, রোগীর তাহা সহ্য করিবার শক্তি থাকা চাই।

আমবাত রোগের পর, বসন্ত রোগের পর, কোন কারণে হৃদপিণ্ডের আকায়ণত

দেখা জামলে, দার্জিলিং অথবা কোন পার্শ্বতঃ  
প্রদেশে যাওয়া উচিত নহে।

বৃদ্ধাবস্থার, পুরাতন গ্রহণী বা  
আমাশ্যাদি উদরাময়ে, যক্ষ্মা শ্রীহার অতি  
শক্তিতে পুরাতন কাসে, ফুস্ ফুসের ব্যস্তিক  
বিকারে, দার্জিলিং যাওয়া নিষিদ্ধ।

কাহার পক্ষে দার্জিলিং যাওয়া

উচিত ?

সমতল ক্ষেত্রে বাস করিয়া, অধিক  
পরিশ্রম বা জনতা-বহুল সহরে থাকিয়া  
শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য ঘটিলে,  
দার্জিলিং যাওয়া কর্তব্য।

দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগের পর শরীর  
দুর্বল হইলে, 'ম্যালেরিয়া' বিধে রক্ত দূষিত  
হইলে, শিশুদিগের শরীর পোষণের যে কোন  
কাৰণে বাবাত ঘটিলে, দার্জিলিং যাওয়া  
কর্তব্য।

অধিক শ্লেষ্মাশ্রাব যুক্ত কাস রোগে, ক্ষয়  
বোগেব প্রথমাবস্থায়—পক্ষত বাসের মত  
ওষধ ও পথ্য আর নাই।

বতস্বর রোগে পক্ষতবাস বড়ই  
উপকারী। কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া  
গড়িলে, পক্ষতবাস অসুচিত। অন্ততঃ  
বোগীর দেহে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য থাকা  
চাই। পক্ষতারোহণে ৫৭ দিনের জন্ত  
প্রস্তাব বাড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভয়  
নাই, ইহা স্বাভাবিক।

ম্যালেরিয়া রোগী দার্জিলিংয়ে গেলে,  
প্রথম প্রথম তাহার ২৪ বার জ্বর হইতে  
পারে, সে জন্ত ভয় পাইয়া চলিয়া আসিলে  
চলিবে না। কিছুদিন বাস করিলেই  
দার্জিলিং বাস স্বর্গবাসে পরিণত হইবে।

শ্বাস রোগে—দার্জিলিং গেলে কাহারও  
রোগ বাড়, কাহারও কমে।

হুলকায় ব্যক্তি পাহাড়ে উঠিলে তাহার  
দুঃস্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু কিছু দিন পরেই  
তাহা সারিয়া যায়।

দার্জিলিংয়ে এক প্রকার উদরাময় হইয়া  
থাকে। ইহার কারণ—সেখানকার জলে  
এক রকম খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকিতে  
দেখা যায়, সেই জল পান করিলে উদরাময়  
হয়। দার্জিলিং যাত্রীর প্রথমে এই উদরাময়  
জন্মিতে পারে। কিন্তু পাঠ্যারকৃত ফিল্টারের  
জল ব্যবহার করিলে, উদরাময় সারিয়া যায়।  
বেলা ৫ টার পর কোন তরল দ্রব্য পান না  
করিলেও উদরাময় নিবৃত্ত হয়।

দার্জিলিং গিয়া খুব বেড়াইতে হয়।  
নহিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। তবে  
ক্ষমতায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করা 'কি  
বেড়ানো-উচিত নহে।

সারাঘাট হইতে শিশিগুড়ি পর্যন্ত  
যাইবার সময়—প্রায়ই যাত্রীর নিদ্রাকর্ষণ  
হইয়া থাকে। নিদ্রা যাইবার সময় গাড়ী  
অনাবৃত রাখা অসুচিত। তাহাতে শরীর  
অস্থির হইয়া পড়ে। তিন ঘণ্টা হেঁশন  
হইতেই ভাল রকম শীত বস্ত্র ব্যবহার করা  
উচিত। খুব বলবান ও নীরোগ ব্যক্তিও  
গেন সোনাদহ ষ্টেশনের পর শীতবস্ত্র ব্যবহার  
করেন। কোনও রকমে ঠাণ্ডা না লাগে,—  
এ কথাটা সকলেই স্মরণ রাখিবেন।

দার্জিলিংয়ে বেড়াইবার সময় যেক্রপ  
বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবেন, মুক্ত স্থানে বসিয়া  
থাকিবার সময়, তাহার চেয়ে মোটা কাপড়  
ব্যবহার করিতে হইবে।

দার্জিলিংয়ে উপস্থিত হইয়াই, জীবদ্ভুত  
জলে বেশ করিয়া নান করিবেন, ইহাতে  
শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল হয়।

ডাক্তার ত্রীনগেন্দ্রকুমার দে।

( ক্যাথেলের ভূতপূর্ব হাউস সার্জন )

## ব্রহ্মার্চ্য ও বিবাহ।

প্রবন্ধনিখিবার সেই বিগত স্মৃতি শাস্ত্রের স্মৃতি হৃদয়কে বাকুল করিয়া তুলে। যাহা গিয়াছে, আর কি তাহা ফিরিয়া আসিবে না?

মনে পড়ে প্রাচীন ভারতের কথা, বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা, নিবৃত্তি পথ-গত প্রাচীন ভারতবাসীর কথা, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কথা, আর দেশব্যাপী স্মৃতি শাস্ত্রের কথা। তখন ধর্ম-নিষ্ঠ সর্বস্বত্যাগী ঋষিগণ সমাজের নিয়ামক ছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া রাজা দেশ রক্ষা করিতেন, চতুর্দিক স্ব স্ব নির্দিষ্ট উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিত। তখন-রোগ-শোক অকাল মৃত্যুর প্রাক্তর্ভাব ছিল না, নিত্য অভাব অনটনে লোকে উৎপীড়িত হইত না, প্রবৃত্তি-রাক্ষণের মোহিনী রূপে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহ ও পরলোকে শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইত না।

মাতৃকোড়ে শিশু যেমন স্বচ্ছন্দে পাকে, নিবৃত্তি জননীর কোড়ে থাকিয়া প্রাচীন ভারতবাসীও সেইরূপ স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিত।

প্রাচীন বিজ্ঞান নিবৃত্তিমার্গানুসারী ছিল, নবীন বিজ্ঞান প্রবৃত্তিমার্গানুসারী। এক্ষণে দেখা যাউক—কোন পথ শ্রেষ্ঠ, নিবৃত্তিমার্গ না প্রবৃত্তিমার্গ?

যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রের জনক স্বরূপ মহর্ষি ঋষি বলিয়াছেন—

ন জাতু কামঃ কাম্যাণা মুণভোগেন শাম্যতি।  
হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈব ভূয় এবাবিভবজ্জিতে।

নৈচ্ছতান্ প্রাপ্তুয়াৎ সর্সান্ যদ্বাত্তন্ কেবলং  
তাজেৎ।

প্রাপণাৎ সর্স কাম্যানাং তেভ্য এব বিশিষ্যতে॥

অনুবাদ—কাম্য দ্রব্যের উপভোগে কামনার শাস্তি হয় না। পরন্তু অগ্নিতে ঘুতাকৃতি দিলে তাহা যেমন প্রবলতর হইয়া উঠে, কাম্য দ্রব্য পাইলে কামনাও সেইরূপ অধিকতর প্রকাশ হয়। যে ব্যক্তি কাম্য দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা যে ব্যক্তি কাম্য দ্রব্য সকল ত্যাগ করে সেই শ্রেষ্ঠ।

অপিচ—

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন যন্তে নচ মৈথুনে।  
প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলঃ॥

অনুবাদ—মাংস ভক্ষণ, মদ্য পান এবং মৈথুনে কোন দোষ নাই। পরন্তু ভূত (মানব) গণের প্রবৃত্তি এইরূপ (মাংসাদিতে অন্তরুক্ত)। কিন্তু নিবৃত্তি অর্থাৎ ঐ সকল পরিত্যাগ মহা ফলপ্রদ। সে ফল কি? ইহাও পরলোকে শ্রেয়োলাভ।

ইহাই প্রাচীন ভারতের মূল মন্ত্র ছিল। আর সেই মন্ত্র বলেই প্রাচীন ভারতবাসী স্মৃতি স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিত। হায়! কুক্ষণে আমরা সে মন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছি।

নিবৃত্তি ভোগ বিলাস চায় না, পরিণাম ভয়াবহ বলিয়া ভোগবিলাসকে দূরে রাখিতে চায়। সেইজন্য পূর্বতন মনস্বিগণ এক্ষণ-কার ভ্রায় বিবিধ ভোগ-বিলাসের দ্রব্য সৃষ্টি করেন নাট। কিন্তু এক্ষণে অল্প বুদ্ধি মানব-গণ আপাতমধুর প্রবৃত্তির মোহে মুগ্ধ হইয়া বিবিধ বিলাসের দ্রব্য সৃষ্টি করিতেছে, যাহাতে জগৎ হাহাকারে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক বিজ্ঞান এক্ষণে যে সকল বিষয়কর এবং মনোরম পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে, সে সকলের নিন্দা বাদ করিতেছি বলিয়া অনেকে প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত দ্রব্য সকল কি পারমাণে জগতের হিত বা অহিত সাধন করিতেছে—প্রথমে তাহা দেখা কর্তব্য ।

মানুষ চায় কি ? মানুষ চায়—সুখ ও শান্তি । এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মত বৈদ্য খটিবার সম্ভাবনা নাই । আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত পদার্থ সকল জগতের সুখ ও শান্তি কিছু বদ্ধিত করিতে পারিয়াছে কি ? জ্বর ও মৃত্যুর প্রভাব কিছু রোধ করিতে পারিয়াছে কি ? মানবের জঠর-আগ্নি নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছে কি ?

কেহ বলিতে পারেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান দারুণ তৃষ্ণার সময় বরফ দেয়, দারুণ গ্রীষ্মে বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে গ্রীষ্ম নিবারণ করে, আয়্যাস গম্য দূর দেশে বিনা আয়্যাসে সত্তর লইয়া যায় । তবে জগতের সুখ শান্তি কিছু বদ্ধিত করে নাই—ইহা কি করিয়া বলিব ?

কিন্তু যিনি এক্রপ বলেন তিনি ভ্রান্ত । সুখ দ্রব্য-সাপেক্ষ নহে । শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

তস্মাৎ হুঃখাত্মকং দ্রব্যং নাস্তি কিঞ্চিং  
সুখাত্মকং ।

মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখদুঃখোপলক্ষণঃ ॥  
সুখ হুঃখ দ্রব্য সাপেক্ষ নহে, উহা কেবল মনের পরিণতি মাত্র । একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতেছে ।

আমরা যে গৃহে যেক্রপ শয্যায় শয়ন করি, একজন বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষুক যদি সেই শয্যায় শয়ন করে তবে তাহার কতই সুখবোধ হয় । কিন্তু একজন প্রাসাদবাসী মহার্ষি শয্যায় শয়নে অভ্যস্ত ধনবান যদি সেই শয্যায় শয়ন করে তবে তাহার কতই কষ্ট বোধ হয় । পদার্থ সেই এক শয্যা কিন্তু বাক্তি ভেদে সুখ ও হুঃখ অমুভূতি হইয়া থাকে । সুতরাং সুখ ও হুঃখ পদার্থে আছে এক্রপ বলা যায় না । সুখ মনে, প্রাচীন যুগে ভারতবাসী নিরুত্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া অনায়াসে সেই মানসিক সুখের অধিকারী হইতেন ।

আধুনিক প্রবৃত্তিমার্গানুসারী বিজ্ঞান দ্রব্য সংযোগে সুখোৎপাদনের যতই চেষ্টা করিতেছে, লঙ্ঘন অগ্নির ত্রায় ততই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে । বাঙ্গালীয় শকটের দ্রুত গমন এক্ষণে আর আমাদের সম্মুখে করিতে পারে না, আমরা আরও দ্রুতগামী যান আকাজ্জা করি । বৈদ্যুতিক পাখা সঞ্চালিত বায়ু, বরফ, লেমনেড প্রভৃতিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি । অভ্যস্ত দ্রব্য সুখকর হয় না, কিন্তু তাহার অভাব হুঃখপ্রদ । প্রবৃত্তি অনাবশ্যক অসংখ্য বিলাসিতার উপকরণ সৃষ্টি করিয়া মানব জাতিকে তাহাতে এমন অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহাদের সংযোগে সুখ না হউক—অভাবে হুঃখ হইয়া থাকে । এইরূপে প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বিলাসিতা ও ভৎসংচর হোয় এবং অভাব, অনটন ও হুঃখের সৃষ্টি করিয়া মানব জাতির ঘোরতর অসুখ ও অশান্তি উৎপাদন করিয়াছে । শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

সর্বং আশ্রয়শং সূত্রং সর্বং পরবশং হুতম্।

এই মহাবাক্য বিস্তৃত হইয়াই আমরা চুঃখভোগ করিতেছি। ভ্রমণে, আশ্রয়ে, শয়নে, বিলাসে মানব এক্ষণে নিতান্ত পরবশ। এই পরবশতা এক্ষণে কেবল ব্যক্তিগত নহে পরন্তু জাতিগত ও দেশগত হইয়া পড়িয়াছে।

মানব সমাজে শত অভাব অনটনের সৃষ্টি করিয়াই প্রবৃত্তি ক্ষান্ত হয় নাই। সূত্র শাস্ত্রি বুদ্ধির আশায়, রাজ্য রক্ষার আশায় কুহকিনী প্রবৃত্তি পাশ্চাত্য জাতিকে জল স্থল ও আকাশচারী অসংখ্য রণ সম্ভার নির্মাণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতি কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তাহা সূক্ষ্মপন্ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার ভীষণ পরিণাম দেখুন। হিতের চেতন্য তাহারা বাহা করিয়াছিল, আজ তাহা দ্বারা কি অহিতই না সম্ভবিত হইতেছে। দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম ছারখার হইয়া যাইতেছে। কত ধর্ম্মমন্দির, পুস্তকাগার কল কারখানা ভূমিসং হইতেছে। এই ভীষণ বিপ্লবে সমগ্র যুরোপ মহাদেশ বিধ্বস্ত এবং বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে আরও কি ঘটবে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু এই লোক-ক্ষয়কর মহান অনর্থের মূল কে? মূল প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি মূলক অযথা রাজ্যলিপ্সা এবং অসংখ্য রণসম্ভার নির্মাণের ইহা অবশুস্তাবী ফল।

রাজ্য দুঃখোৎপন্নের প্রবৃত্তি মূলক অযথা রাজ্য লিপ্সার ফলে ভারতেও এইরূপ কুরুক্ষেত্রের লোক-ক্ষয়কর মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

প্রবৃত্তি মানুষকে স্বার্থপর করে, নিবৃত্তি স্বার্থত্যাগ করিতে শিখায়। প্রবৃত্তির দাস

আমরা এতই স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি যে, গৃহপার্শ্বের নরিত্র ভিক্ষুককে এক মুষ্টি অন্নের জন্ত লাগানিত দেখিয়াও অক্লেশে বিবিধ সুখাশ্ব আহ্বার করিতে পারি। প্রতিবাসীর ঘোরতর অর্থকষ্ট উপেক্ষা করিয়া অনায়াসে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে পারি। ইহার ফলে জগতে স্বল্প সংখ্যক মানব প্রচুর বিভবশালী হইয়া, বিলাসিতায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অপব্যয় করিতেছে, আর অপর দিকে অধিক সংখ্যক মানব অশ্বিন-বসন আবাসের অভাবে দারুণ কষ্ট পাইতেছে।

প্রবৃত্তি মূলক বিলাসিতার সহিত মানব সমাজে বিচারও লাঘব ঘটিয়াছে। ব্যাস, বাস্কাকী, কালিদাস, বরাহমিহির, গ্যালিলিও, মক্কাটিস, হোমার, নিউটন, সেক্সপীয়র এখন আর জন্মগ্রহণ করেন না। আড়ম্বরহীন থাকের কলম আর ভূর্জপত্রই বোধ হয় ভারতের প্রিয়। তাই আজ বোড়প মুদ্রা মূল্যের ফাউন্টেন পেন এবং চিত্র বিচিত্র কাগজ দেখিয়া তিনিও ক্রমশঃ অন্তহিত হইয়াছেন।

বাহুলা ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিলাম না। ফলতঃ নিবৃত্তি মূল্যপাত্র গন্ধোদক, প্রবৃত্তি স্বর্ণপাত্র কুপোদক, নিবৃত্তি হীন দীনবেশে সূত্র ও শাস্ত্র, প্রবৃত্তি মনোহর বেশে অসুস্থ ও অশান্তি। নিবৃত্তি পয়োজ্ঞপ্ত বিষমুখ, প্রবৃত্তি বিষকুস্ত পয়োমুখ, নিবৃত্তি কল্পণাময়ী জননী, প্রবৃত্তি মনোহারিনী রাক্ষসী।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মহাশয় প্রবৃত্তির পথেই যাইতে চায়, কিন্তু নিবৃত্তি মহাশয় প্রব। তবে কি উপায়ে প্রাচীন ভারতবাসী প্রবৃত্তির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া



নিরুত্তির সেবা করিয়া কৃত্যব হইয়াছিলেন ?  
কিছু শিক্ষার বলে স্বাধিগণ ভারতবাসীকে  
প্রগতি মূণক বিলাসিতা হইতে দূরে রাখিতে  
সক্ষম হইয়াছিলেন ? কোন্ দীক্ষার বলে  
ভারতবাসী শত সহস্র অনাবশ্যক বিলাসিতার  
দ্রব্য নিষ্কাশন করিয়া দেশবাসী অভাব অন-  
টনের সৃষ্টি করে ? ইহার একমাত্র উত্তর  
ব্রহ্মচর্য ।

খনিতে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা  
ভূষণ বসিবার পরিগণিত হয় না । প্রথমে  
তাহাকে মল ভাগ হইতে বিযুক্ত করিতে  
হয়, পরে গলাইয়া আবশ্যক মত আকৃতি  
বিশিষ্ট করিতে হয়, তা'র পর তাহাতে কারু-  
কার্য্য করিতে হয় । তবে সেই স্বর্ণ—অলঙ্কার  
বলিয়া পরিগণিত হয় । স্বর্ণপ্রসূ ভারতের  
সেই দোনার মাহু বাল্যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে  
এইরূপে পরিবর্তিত ও গঠিত হইয়া মানব  
সমাজে শোভন অলঙ্কাররূপে শোভা পাইত ।

বাণী ব্রহ্মচর্যাশ্রমে থাকিয়াই ভারত-  
বাসীর মন ও চারিত্র্য গঠিত হইত । ইহাতে  
তাঁহাদিগের দেহ ক্রেশনসিঁফু, দৃঢ়, কর্মঠ,  
মোগলী ও অকাল-বান্ধক্য-বর্জিত হইত  
এবং পবনায়ু দীর্ঘ হইত । মন—নিরুত্তি-প্রিয়,  
প্ৰজ্ঞা-কাতর, সুখে বিগতম্পৃহ, দুঃখে  
অতৃপ্ত, কামক্রোধাদি রহিত, প্রশান্ত ও  
উদার হইত । ব্রহ্মচর্য্য ভারতের প্রাণ ছিল,  
ভারতের উন্নতির মূল ছিল, ভারতের সুখ-  
শান্তিও তেজুত ছিল । ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত  
চিন্তিত হয় না এবং চিন্তের স্থিরতা ব্যতীত  
নী, দৈব্যা ও আত্মজ্ঞান সম্যকরূপে জন্মিতে  
পারেনা । ভারতের চির আদৃত সেই ব্রহ্ম-  
চর্য্য । বসুন্ধরাদিয়াই আমাদের এতদূর শারী-  
রিক ও মানসিক অধঃপতন ঘটাইছে ।

গোব-২ :

নিরুত্তিমার্গাশ্রয় ব্যতীত জগতে সুখ-  
শান্তি লাভ করা যায়না, আর ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন  
নিরুত্তিমার্গের অনুসরণ করিবার উপযুক্ত  
মানসিক বল জন্মিতে পারেনা । সেই  
জন্ত সুখ-শান্তি লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য  
পালন নিতান্ত আবশ্যক ।

একণে ব্রহ্মচর্য্য কিরূপে পালন করিতে  
হয় তাহাই বনিব ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মচর্য্য একটী  
আশ্রম । অর্থাৎ শাস্ত্রমতে আশ্রম চারিটী, যথা  
—ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যশ্রম, বাণপ্রস্থ্যশ্রম  
এবং সন্ন্যাসাশ্রম । উপনয়নের পরে গুরু-  
গৃহে অবস্থান করিয়া বেদাধ্যয়ন করার নাম  
ব্রহ্মচর্যাশ্রম । ইহা দুই প্রকার যথা, উপ-  
কুলান এবং নৈটিক । দুই প্রকার ব্রহ্মচর্যা-  
শ্রমের নিয়ম একই । প্রভেদ এই যে, ব্রহ্ম-  
চর্যাশ্রমের শেষে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ্যশ্রমে  
প্রবেশ করিলে তাহাকে উপকূল্যণ বলে ।  
আর যাবজ্জীবন গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য  
পালন করিলে তাহাকে নৈটিক বলে ।

কেবল ব্রাহ্মণগণই যে এই আশ্রমের  
অধিকারী তাহা নহে । ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-  
গণও ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্যশ্রম এবং বাণ-  
প্রস্থ্য আশ্রমের অধিকারী । কেবল সন্ন্যাসা-  
শ্রমে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার । কিন্তু  
মতান্তরে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও সন্ন্যাসাশ্রমে  
অধিকার আছে একপ্ৰণাম পাওয়া যায় ।  
রঘুবংশে “স কিল শ্রমমন্ত্যামিত্রিত” অর্থাৎ  
তিনি (রঘু) অন্ত্য আশ্রম (সন্ন্যাস আশ্রম)  
করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।  
গৃহস্থ্যশ্রমে প্রবেশ করিলেই যে ব্রহ্মচর্য্য  
পরিভ্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে । ভগবদ্গীতা  
মতে ব্রহ্মচর্য্য—

বেদান অধীত্য বেদো বা বেদং বাপি  
যথাক্রমঃ ।

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যেব গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥

অমুবাদ—সমস্ত বেদ, ছই বেদ বা এক বেদ  
অধ্যয়ন করিয়া—ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন  
করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে সকল নিয়ম পালন  
করিতে হয়, গৃহস্থাশ্রমে তাহা পালন করা  
চলে না। কারণ গৃহীর পক্ষে অপত্যোৎপাদন,  
জীবিকা অর্জন প্রভৃতি করিতে হয়। তবে  
এখানে ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ কি? আয়ুর্বেদেও  
কথিত হইয়াছে যে “ব্রহ্মচর্য্য মায়ুজ্যকরাণাং”  
অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আয়ুজ্যকর পদার্থ সমূহের  
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অপিচ শরীর ধারণের উপায়  
তিনটি, যথা আহার, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য। আয়ু-  
র্বেদ সর্বসাধারণের জন্ত। সুতরাং এখানেও  
ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পালনীয় ব্রহ্মচর্য্য  
হইতে পারে না। তবে এ ব্রহ্মচর্য্য কি?

এক কথায় বলিতে গেলে এই ব্রহ্মচর্য্য-  
নিবৃত্তি মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করা। হিন্দু  
বিধবারা যেসকল সংযত ভাবে থাকেন, তাহাও  
এই ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্ৰ, মাংস,  
মৈথুনপরিভ্যাগ, ক্রোধ-লোভাদি পরিভ্যাগ,  
সর্বভূতে দয়া প্রভৃতি এই ব্রহ্মচর্য্যে পালন  
করিতে হয়। অমুসন্ধিৎসু পাঠক মহৎসংহিতার  
তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে গৃহস্থাশ্রমে কিরূপ  
নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহা অবগত  
হইতে পারিবেন।

গৃহস্থের পক্ষে পুত্রোৎপাদন যখন কর্তব্য,  
তখন মৈথুন-পরিভ্যাগ করা কিরূপে সম্ভব?  
পরিভ্যাগ অর্থে এক্ষণে অতিরিক্ত সংযতভাব  
বুঝিতে হইবে। তাহা একতল্লভ্যাসে একটি  
তল্ল আহার করিলে যেমন সে ব্যক্তি

আহার করিয়াছে বলা যায় না, সেইরূপ  
পরিভ্যাগের মধ্যে গণ্য। এ বিষয়ে নিবৃত্তি  
এতদূর প্রবলা হইয়া উঠিয়াছিল যে, শাস্ত্রকার  
নিয়মিত আইন জারী করিতে বাধ্য  
হইয়াছিলেন। যথা:—

ঋতুমতীভূত যো ভাৰ্য্যাং সমিধৌ নোপসর্পতি।  
অবাপ্পোতি সমন্দায়া ক্রণহত্যা মৃত্যুরতো ॥  
অমুবাদ—ভাৰ্য্যার ঋতুকালে নিকটে  
পাকিয়াও যে ব্যক্তি ভাৰ্য্যাতে উপগত হয়  
না, ঋতুকাল শেষ হইলে সে ব্যক্তি ক্রণ-  
হত্যার পাঁচক গুণ্ড হয়।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, প্রবৃত্তি  
মূলক বিলাসিতার বায় নির্বাহ করিবার  
অভাবে ফরাসী দেশের অনেকে বিবাহ করে  
না। এই জন্ত পাছে লোক সংখ্যা ক্রমশঃ  
হ্রাস পায় বলিয়া ফরাসী গবর্ণমেন্টে অবি-  
বাহিত ব্যক্তিগণের উপর করস্থাপন করিয়া  
তাহাদিগকে বিবাহিত করিবার প্রয়াস  
পাইতেছেন। আর আমাদের নিবৃত্তির  
দেশে ব্রহ্মচর্য্যপরাগণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ  
পাছে পত্নীতে উপগত না হইয়া পুত্রোৎপাদন  
করিতে না থাকে সেই ভয়ে এইরূপ ধর্ম্মমূলক  
আইন রাখিতে হইয়াছে। এইরূপ নিবৃত্তি  
সম্বন্ধে অনেক কথা পুরাণাদিতে দেখিতে  
পাওয়া যায়। অগস্ত্য, জরৎকার প্রভৃতি  
মুনিগণ পুত্রোৎপাদনে পরাযুথ ছিলেন বলিয়া  
তাহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে গর্ভমধ্যে হেঁচ-  
মুণ্ডে লম্বমান থাকিতে হইয়াছিল। সেই  
সকল পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিবার জন্ত  
তাহারা বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু  
পত্নীর গর্ভাধান করিয়াই তাহার সমস্ত বর্জন  
করিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে একটি নীতি প্রচলিত আছে।

উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । ভামতী নামক ভাষ্যকার বাচস্পতিমিশ্র বালাকালে—বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পরে গুরুগৃহে বাস করেন এবং বিবাহ সপক্ষে কোন চিন্তাই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই । প্রৌঢ় বয়সে তিনি অগৃহে কিংবা আসেন । তাঁহার স্ত্রী স্বামি-ভবনে বাস করিতেন, গৃহ কার্যা করিতেন, রন্ধন করিতেন, কিন্তু স্বইচ্ছায় স্বামীকে দর্শন দিতেন না । বাচস্পতি মিশ্র মনে করিতেন যে, তাঁহাব শিষ্যেগাই রন্ধনাদি করিয়া থাকে শিষ্যেগণও তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী সপক্ষে কোন কথা বলিত না । এইরূপে দীর্ঘকাল অতি-বাহিত হইল । ভামতী অন্তরাল হইতে স্বামীকে দেখিয়া এবং তাঁহার অধ্যাপনা শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন । ঘটনাক্রমে এক-দিন সমস্ত ছাত্র অন্তর গিয়াছিল । বাচস্পতি স্বয়ং রন্ধন করিয়া আহার করিতে হইবে বিবেচনা করিয়াছিলেন । কিন্তু যথা সময়ে গৃহান্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অন্ন প্রস্তুত রহিয়াছে । তখন তিনি আপনার মনে বলিলেন,—এই অন্ন কে রন্ধন করিয়াছে না জানিলে আমি আহার করিতে পারিব না । তাঁহার স্ত্রী এই কথা শুনিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্বক স্বামীকে প্রণাম করিলেন । বাচস্পতি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে ? ভামতী কহিলেন আপনার দাসী, পরিণীতা পত্নী । তখন বাচস্পতি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, দেবি ! আমি তোমাকে বিবৃত হইয়া বড়ই কুকার্য্য করিয়াছি । এক্ষণে তোমার কি প্রিয় কার্যা সম্পাদন করিব বল । ভামতী আকার ইন্দ্রিতে অপত্য কামনা করিলেন । বাচস্পতি বলিলেন,

আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, পুত্রোৎপাদনের কাল অতীত হইয়াছে । তবে লোকে খ্যাতির জন্ত পুত্র কামনা করে । আমি তোমার নামে যে টীকা রচনা করিব—তাঁহাতে তোমার খ্যাতি তাহাতেই বহুদিন স্থায়ী হইবে । হায় ! সেই নিবৃত্তর দেশে আজ প্রবৃত্তির কি ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য !

যে বর্ণের যে প্রকার কর্ম্ম, যজ্ঞ, দণ্ড, মেথলা ও বসন উপনয়নকালে ধারণ করিতে হয়, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তাহাই পালন করিতে হয় । ব্রহ্মচারী গুরুর নিকটে বাস করিয়া স্বীয় তপস্কার বৃদ্ধির জন্ত এই সকল নিয়মের অমু-ষ্ঠান করিবে । প্রতিদিন প্রাতে স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, দেবতা, ঋষি ও পিতৃদিগের তর্পণ করিবে, দেবতাদিগের পূজা করিবে এবং সাংস-প্রাতে সমিধের দ্বারা হোম করিবে । মধু, মাংস, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, ও মাংস পরি-ভোগ করিবে, গুড়াদি আহার করিবে না, জ্বী সংসর্গ করিবে না, শুক্র ( মধুর দ্রব্য ও জল-সংযোগে প্রস্তুত অন্নরস যুক্ত তরল পদার্থ ) সেবন করিবে না এবং প্রাণী হিংসা করিবে না । শরীরে তৈল মর্দন করিবে না, চক্ষুতে অঞ্জন ( কাজল ) পরিবে না, চর্ম্মপাছকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না, কাম ( বিষয়াভি-লাষ, ভোগেচ্ছা ), ক্রোধ, লোভ, নৃত্য-গীত-বাস্ত পরিত্যাগ করিবে । দ্বাত ( অক্ষকৌড়াদি বাসন ), লোকের সহিত অকারণ-কলহ, পরের দোষের বিষয় কথন, মিথ্যা বাক্য, কামভাবে জ্ঞীলোক দর্শন বা আলিঙ্গন এবং পরের অনিষ্টোচরণ হইতে বিরত থাকিবে । নিয় শয্যার একাকী শয়ন করিবে, কণ্ঠে ইচ্ছাপূর্বক শুক্রপাত করিবে না । কারণ ইচ্ছাপূর্বক শুক্রপাত করিলে স্বকীয় ব্রত সহ

হইয়া যায়। অকাম ব্রহ্মচারীর স্বপ্নে বা অনিচ্ছায় রেতঃপাত হইলে স্নান করিয়া সূর্য্যের অর্চনা করিবে এবং “পুনশ্চাম্ এতু ইন্দ্রিয়ং” এই মন্ত্র তিনবার পাঠি করবে। জল, কলস, পুষ্প, গোময় ও মৃত্তিকা যত প্রয়োজন হয় গুরুকে সংগ্রহ করিয়া দিবে, গুরুর অত্যাগ্ৰযে দ্রব্য প্রয়োজন হয় তাহাও সংগ্রহ করিয়া দিবে এবং নিত্য ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিবে। যে সকল গৃহস্থ বেদবিহিত যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন এবং সৰ্বদা আপন কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন, এইরূপ গৃহস্থের নিকট হইতে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন পবিত্রভাবে সিদ্ধান্ত ভিক্ষা করিবে। গুরুকূলে, জ্ঞাতিকূলে ও বন্ধুকূলে ভিক্ষা করিবে না। অত্র গৃহের অভাবে প্রথমে বন্ধুকূলে, তদভাবে জ্ঞাতিকূলে এবং তদভাবে গুরুকূলে ভিক্ষা করিবে। পূর্ব্ব কথিত গুণ-সম্পন্ন গৃহস্থ না পাইলে শুচি ও মোনৌ হইয়া সমস্ত গ্রামে ভিক্ষা করিবে। কিন্তু মহাপাতকগ্রস্ত গৃহস্থকে পরিত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী দ্রাব্যত বৃক্ষ হইতে সমিধ আহরণ করিয়া কুটারের চালে অথবা কোন আরত স্থানে রাখিবে এবং সেই সমিধ দ্বারা নিরগস ভাবে সাং-প্রাতে হোম করিবে। রোগশূল্য ব্রহ্মচারী ক্রমাগত সপ্তদিন ভিক্ষার আহ্বার এবং সমিধের দ্বারা হোম না করিলে তাহার ব্রত নষ্ট হয় ও তজ্জন্ত অবকৌণি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ব্রহ্মচারী ভিক্ষার একজনের নিকট না লইয়া বহু লোকের গৃহ হইতে সংগ্রহ করিবে। কারণ এইরূপ ভিক্ষা-সমূহ দ্বারা ও সংগৃহীত ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করাকে মহাবিগণ উপবাসের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী

দেবতার উদ্দেশে অথবা পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তা-কর্ত্তক আহুত হইয়া যদি সেই একজনের নিকট হইতে মধুমাংসাদি বঞ্চিত অন্ন আবশ্যকমত সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে ব্রত লোপ হয় না। তবে কেবল শ্রাদ্ধেই ব্রহ্মচারীর গ্রন্থেই এই বিধি নির্দেশ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে একজনের অন্ন ভোজন করা বিহিত নহে। গুরু কর্ত্তক আদিষ্ট হইয়া অথবা আদিষ্ট না হইলেও স্বয়ং ইচ্ছা পূরক নিত্য অধ্যয়নে এবং গুরুর হিত সাধনে যত্নবান হইবে। শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মন সংযত করিয়া কৃতাজ্ঞ হইয়া গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবে, গুরুর অনুমতি ব্যতীত উপবেশন করিবে না। সধাচারসম্পন্ন শিষ্য উত্তরীয় দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত বহিস্কৃত রাখিবেন এবং গুরু “উপবেশন কর” বলিলে উপবেশন করিবেন। গুরুর নিকটে গুরু যেরূপ বস্ত্র পরিধান ও অন্ন আহ্বার করেন, তাহা অপেক্ষা হীনবস্ত্র পরিধান ও হীন অন্ন আহ্বার করিবে। রাজিশেষে গুরু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্বে—উঠিতে হইবে এবং রাজিতে গুরু শয়ন করিবার পরে শয়ন করিবে। শয়ন করিয়া, উপবেশন করিয়া, আহ্বার করিতে করিতে অথবা গুরুর দিকে মুখ না রাখিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় গুরুর আজ্ঞা শ্রবণ বা গুরুকে সম্ভাবণ করিবে না। গুরু আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য দণ্ডায়মান হইয়া, গুরু দণ্ডায়মান থাকিয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য গুরুর দিকে কয়েকপদ গিয়া, গুরু আসন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে, শিষ্য গুরুর দিকে

যাইয়া, গুরু বেগে গমন করিতে করিতে  
আজ্ঞা করিলে, শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান  
হইয়া, গুরুর আদেশ গ্রহণ করিবে এবং  
তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে। গুরু অস্ত্র  
দিকে মুখ রাখিয়া আদেশ করিলে, শিষ্য  
তাঁহার সম্মুখে গিয়া, গুরু দূরে থাকিয়া  
আদেশ করিলে, শিষ্য প্রণত হইয়া, গুরু  
নিকটে থাকিয়া আদেশ করিলে শিষ্য  
অনন্তভাবে আজ্ঞা শ্রবণ করিবে এবং  
সম্ভাষণ করিবে। গুরুর নিকটে তাঁহার  
আসন ও শয্যা অপেক্ষা নিম্নস্তর আসন  
গ্রহণ করিবে। গুরুর দৃষ্টির সম্মুখে কখন  
হস্তপদ বিস্তার করিয়া যশ্ঠে ভাবে  
অবস্থান করিবে না। শিষ্য অস্ত্রের নিকটেও  
গুরুর নামের পূর্বে—আচার্য্য না উপাধ্যায়  
না বলিয়া কেবল গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে  
না এবং গুরুর গতি, হস্ত বা চেষ্টার  
অনুকরণ করিবে না। যেখানে গুরুর পরোবাদ  
(বিপত্তমান দোষের বর্ণন) অথবা নিন্দা (অবিপ্ত-  
মান দোষের কথন) হয়, শিষ্য সেইস্থান হইতে  
চলিয়া যাইবে বা হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন  
করিবে। শিষ্য গুরুর পরোবাদ করিলে  
গর্দভগোনি, নিন্দা করিলে কুকুরগোনি,  
অদথাক্রপে গুরুধন দ্বারা জীবিকা নিরূপ  
করিলে কুমি গোনি এবং গুরুর প্রশংসা  
সহ্য করিতে না পারিলে কীট গোনি  
প্রাপ্ত হয়। শিষ্য স্বয়ং গমনে আশ্রিত না  
হইলে অস্ত্রের হস্তে মালা-চন্দনাদি পাঠাইয়া  
গুরুর অর্চনা করিবে না, ত্রুণ হইয়া গুরুর  
অর্চনা করিবে না, গুরু স্ত্রীলোকের নিকট—  
থাকিলে গুরুর অর্চনা করিবে না এবং শিষ্য  
যান বা আসনে উপবিষ্ট থাকিলে ভাষা হইতে  
অবতরণ করিয়া গুরুর অর্চনা করিবে।

যে ভাবে উপবেশন করিলে বায়ু গুরুর দিকে  
যায় তাহাকে প্রতিবাত এবং যে ভাবে  
উপবেশন করিলে বায়ু শিষ্যের দিক হইতে  
গুরুর দিকে যায় তাহাকে অমুবাত বলে।  
এইরূপ প্রতিবাত বা অমুবাত ভাবে গুরুর  
সহিত উপবেশন করিবে না। শিষ্য গোবান  
অম্বান, বা উষ্ট্রবানে, প্রাণাদের উপরে,  
দীর্ঘ আসনে, তৃণ নির্মিত আসনে, শিলা-  
তলে, কাষ্ঠময় দীর্ঘ আসনে এবং নৌকায়  
গুরুর সহিত উপবেশন করিতে পারে।  
গুরুর গুরুর নিকটে গুরুর জায় বাবহার  
করিবে। গুরুর গৃহে অবস্থান কালে পিতা,  
পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজনকে গুরুর অমুমতি  
ব্যতিরেকে অভিবাদন করিবে না। উপাধ্যা-  
য়াদি বিদ্বাদাতা গুরুদিগকে, পিতৃব্যদিগকে  
অথবামুষ্ঠান হইতে নিষেধকারককে এবং  
ধর্ম্মামুষ্ঠানে উপদেশদাতাকে গুরুর জায়  
বাবহার করিবে। বিদ্বা ও তপঃসম্পন্ন  
ব্যক্তিকে, শিষ্য ভিন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ স্ববর্ণ  
ব্যক্তিকে, গুরু-পুত্রকে এবং গুরুর পিতৃব্যাদি  
জ্যাতিকে গুরুর জায় সম্মান করিবে।  
কনিষ্ঠই হউন, সমান বয়স্কই হউন বা জ্যেষ্ঠই  
হউন, গুরু-পুত্র বেদজ্ঞ হইলে, বজ্র ক্রিয়ার  
অধিকারী ; কিন্তু গুরুপুত্র বজ্র কার্য্যে নিযুক্ত  
হউন বা না হউন গুরুর জায় সম্মানিত  
হইবেন। গুরুপুত্রের গাজে বিলেপন প্রদান  
জ্ঞান করান, গুরুপুত্রের উচ্চিষ্ট ভোজন বা  
পদ প্রক্ষালন করিবে না। গুরুর সর্বাঙ্গ  
গুরুর জায় পূজনীয় কিন্তু অসর্বাঙ্গী কেবল  
প্রভুত্বান এবং অভিবাদন দ্বারা পূজনীয়।  
গুরুপত্নীর গাজে তৈলাদি মর্দন করিবে না,  
তাঁহাকে স্নান করাইবে না, গাজে অঙ্গ  
লেপন করিবে না এবং তাঁহার কেশ স্পর্শ

করিয়া দিবে না, বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক-শিশু যুবতী-গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ পূর্ষক অভিবাদন না করিয়া কেবল ভূমিতেই অভিবাদন করিবে। কিন্তু বালক শিশু যুবতী-গুরুপত্নীর পদ গ্রহণ পূর্ষক অভিবাদন করিতে পারে। জ্ঞীলোকেরা স্বভাবতঃই মনুষ্যদিগকে দূষিত করিয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞীলোক সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তির বিশেষ সাবধান থাকা কর্তব্য। অবদান ব্যক্তি বা বিদান ব্যক্তি (আমি জিতেছি মনে করিয়া) কেহই জ্ঞীলোকের নিকট অবস্থান করিবে না। কারণ দেহধর্মবশতঃ কাম, ক্রোধ-রূক্ত পুরুষকে রমণীরা অনায়াসেই বিপণ-

গামী করিতে পারে। মাতা, ভগিনী বা কন্যার সহিতও নির্জন গৃহে বাস করিবে না। কারণ বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ বিদান ব্যক্তিকেও কুপথগামী করিতে পারে। যুবা শিশু যুবতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ না করিয়া “আমি অমুক” এই বলিয়া ভূমিতে যথাবিধি অভিবাদন করিবে। যুবা-শিশু বিদেহ হইতে সমাগত হইলে শিষ্টাচার অরণ করিয়া প্রথম দিন বয়োদিকী গুরুপত্নীর বামহস্তে বামপদ এবং দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার পর প্রতিদিন ভূমিতে অভিবাদন করিবে।

(আগামী বারে সমাপা)

## ঘৃত।

—:০:—

ঘৃত ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য। পণ্ডিতেরা ঘৃতহীন ভোজনকে উপযুক্ত ভোজন বলিয়া স্বীকার করেন না। অনেকস্থলে ঘৃতহীন-ভোজনকে বারিহীন নদী প্রভৃতি অল্পযোগী পদার্থের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঘৃত শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও বলবর্ধক খাদ্য। অধিক পরিমাণে খাইলে মেদো বৃদ্ধি হয়।

সাধারণতঃ দুই প্রকার ঘৃতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাহিষ ঘৃত ও গব্য ঘৃত। মাহিষ ঘৃত, গব্য ঘৃত অপেক্ষা অধিকতর শুভ্র, এবং ইহাতে শ্রবণীয় এসিড অপেক্ষাকৃত অধিক, অর্থাৎ ৫ গ্রাম মাহিষ ঘৃতে সাধারণতঃ ৩৪ কিউবিক সেন্টিমিটার এসিড পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ পরিমাণ গব্য

ঘৃতে এসিডের পরিমাণ ৩২ কিউবিক সেন্টিমিটার মাত্র। গব্য ঘৃত অতি সঙ্গতযুক্ত।

ঘৃত নানা প্রকারে ব্যবহার করা হয়। সূচি, কচুরি, গজা, মিঠাই প্রভৃতি খাবার প্রস্তুতের জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। ডাল, তরকারি প্রভৃতি রন্ধনের জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। কটিতে ঘৃত মাখান হয়। ভাতের সহিত ঘি ব্যবহার হয়। হোম, যাগ প্রভৃতি দেবার্চন ক্রিয়ার জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। দেবার্চন ক্রিয়ার জন্য কেবল বিশুদ্ধ গব্যঘৃত ব্যবহার হয়। অকোটি ক্রিয়ার জন্যও ঘৃত ব্যবহার হয়। পুরাতন গব্য ঘৃত আয়ুর্বেদের চিকিৎসার ব্যবহারে ব্যবহৃত হয়। দশবার্হাদিকক্রিয়

পুরাণ দ্রুত বলে। ঔষধার্থে দ্রুত যত অধিক পুরাতন হয়, ততই উহার গুণাধিক্য হয়।

অধুনা দ্রুত প্রস্তুতকরণের অল্প দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রথম দধি হইতে, দ্বিতীয় কাঁচা দ্রুত হইতে। সাধারণতঃ দধিতে জলমিশ্রিত করিয়া মছন করিলে মাখন বাহির হইয়া উপরে ভাগিতে থাকে। পরে ঐ মাখন তুলিয়া লইয়া একটা পাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে সংগৃহীত মাখন নোহ-কটাহে করিয়া অগ্নিতে পাক করিতে হয়। মাখন তুলিয়া লইয়া যে তরল অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে তক্র বা ঘোল বলে। প্রথমতঃ অগ্নির তাপে মাখন গলিয়া গিয়া ছানার অংশ ও জল কটাহের তলদেশে পতিত হয়। পরে ক্রমশঃ অধিক তাপযোগে জল বাষ্পাকারে পরিণত হয় এবং ছানার অংশগুলি খাঁকিরূপে পরিণত হয়। পরে দ্রুত ছাঁকিয়া লইয়া খাঁকি ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে পাকা ঘি বলে। কাঁচা দ্রুতের জল বাষ্পাকারে পরিণত করা হয় না এবং দ্রুতও প্রথর তাপ প্রয়োগ করা হয় না। পাকা ঘি সর্বাপেক্ষা ভাল। ইহা যে কেবল খাবার প্রস্তুতের অল্প ব্যবহার হয় তাহা নহে, অন্ন বা অন্ত্রাচ্ছাদে মাখিয়াও পাওয়া হয়।

কাঁচা ঘি খাবার প্রস্তুতের অল্প ব্যবহার হয়। যদি কাঁচা ঘি ক্রয় করা হয় ও উহা ভোজনকালে ভাতে বা রুটিতে মাখিয়া খাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা গোহ পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া লইলে পাকা হয়।

দ্রুত প্রস্তুত করণের দ্বিতীয় উপারে দধি না করিয়া কাঁচা দ্রুত হইতে মছন করিয়া মাখন উঠাইয়া ঐ মাখনের দ্রুত প্রস্তুত হয়।

গোয়ালারা সাধারণতঃ এই উপায় অবলম্বন করে। তাহারা কাঁচা দ্রুত মছন করিয়া কিয়ৎপরিমাণ মাখন তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ ছুগ বলিয়া বিক্রয় করে। মাহিষ দ্রুত দ্রুত অধিক, সেইজন্য মাহিষ দ্রুত সাধারণতঃ এইরূপে প্রস্তুত হয়। বাজারের অধিকাংশ দ্রুতই মাখন তোলা দ্রুত।

বাজারে যে স্থলভ মূল্যের দ্রুত বিক্রয় হয়, উহা সাধারণতঃ ভেজাল বা অল্প দ্রব্য মিশ্রিত। দ্রুতে সচরাচর মাটকলাই বা চীনাবাদামের তৈল, বসা, মোয়া তৈলের ভেজাল দেওয়া হয়। মাট কলাইয়ের তৈলে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়, মোয়া তৈলের কিয়দংশ জমাট ও কিয়দংশ তরল, বসা ঠিক দ্রুতের মত, দেখিয়া প্রভেদ বুঝা যায় না, তবে আবেক্ষিক গুরুত্ব অধিক। এতদ্ব্যতীত নারিকেল, পোস্তদানা, তিল ও ভেরেণ্ডার তৈল দ্রুতে ভেজাল দেওয়া হয়। আজকাল দ্রুতের সহিত কেহ কেহ পেট্রোল মিশ্রিত করেন। ময়রার প্রায় ভেজাল দ্রুতে খাবার প্রস্তুত করে। সেইজন্য দোকানের খাবার খাইয়া অন্ন ও অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়।

দ্রুত মেনো বর্জক, সুতরাং ক্ষয়রোগে নিবারক। অজ্ঞা দ্রুত অর্থাৎ ছাগীদ্রুত হইতে প্রস্তুত দ্রুত ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকারী।

দ্রুত স্বাস্থ্যের পক্ষে এতই উপকারী যে “স্বপ্নং কৃতা দ্রুতং পিবেৎ” কথা বহুকাল হইতে প্রচলন আছে। এ কথা উদ্ভূত এই যে, যতই কেন দ্রুতবস্থা হউক না, তথাপি ঘি খাইতে বিরত থাকিবে না। দ্রুতের পুষ্টি কারিতা এত অধিক যে, সামান্য পরিমাণ খাইলেই অধিক পরিমাণ শক্তির পরিচয়

কায হয়। সেই কারণ চলিত কথায় বলে “পরে তসর থায় বি, তার আবার হুংখ কি?” অর্থাৎ তসর দীর্ঘকাল স্থায়ী, সুতরাং তসর পরিলে কাপড়ের খরচের সাশ্রয় হয়, এবং বি অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুতরাং দ্ব্যুতপায়ীদের অত্যন্ত খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কম হয়।

কিছুদিন হইল মাড়োয়ারী সম্প্রদায় বঙ্গা মিশ্রিত দ্ব্যুত খাইয়া ধর্ম্মহানি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দলে দলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এবং দ্ব্যুত ও দ্ব্যুতপক মিষ্টাদি তাগ করিয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায় দ্ব্যুত ব্যবসায়ীগণ বঙ্গামিশ্রিত দ্ব্যুত বেচিবেন না বলিয়া ধর্ম্মঘটও করিয়াছেন। কেবল বঙ্গামিশ্রিত দ্ব্যুত বন্ধ করিলেই যে অবিভক্ত দ্ব্যুতের অপকারিতা দমন হইবে তাহা নহে। বঙ্গা নিরামিষ ভোজীদের অপবিত্র বটে এবং মৎস্যমাংস-ভোজী হিন্দুসমাজে আবার বিরুদ্ধ থাও বটে কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তত দৃশ্যীয় নহে। কারণ দ্ব্যুত মেদের রূপান্তর মাংস; সুতরাং বঙ্গা ও দ্ব্যুত ধরিতে গেলে একই পদার্থ। তবে দ্ব্যুত বা পীড়িত জন্তু বা সর্পাদির বঙ্গা আবাহ্যকর। যাহা হউক ধর্ম্মঘটের ফলে যদি দেশে পবিত্র ও বিশুদ্ধ দ্ব্যুতের প্রচলন হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ কেন—সমগ্র ভারতবাসীর মহত্বপূর্ণ সাধিত হইবে। দেশের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণ হইবে। পবিত্রতা দেখিলে চলিবে না, বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। স্বাস্থ্য দ্ব্যুত এমন সব দ্রব্য মিশান যাইতে পারে যাহা অপবিত্র না হইলেও আবাহ্যকর।

কিন্তু একটা কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দ্ব্যুত চর্কি মিশ্রণের কথা বালক কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি,

এবং আবাগ-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই একথা জানেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মাড়োয়ারী দ্ব্যুত-ব্যবসায়ীগণ কি এ সম্বন্ধে এতদিন অনভিজ্ঞ ছিলেন? তাই আজ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতেছেন? যাহা হউক ইহার ফলে যদি অবিভক্ত দ্ব্যুতের চলন বন্ধ হইয়া বিশুদ্ধ দ্ব্যুতের প্রচলন হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর পক্ষে নিশ্চয়ই হিতকর বটে। কিন্তু যদি পবিত্রতার ভানে দ্ব্যুতের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া যায় ও অবিভক্ততা রহিয়া যায়, তাহা হইলে পরিণাম বড়ই বিবক্ষণীয় হইবে। যাহাতে দেশে বিশুদ্ধ দ্ব্যুত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও পাওয়া যায়, তাহা দ্ব্যুতের বহুমান হওয়া উচিত। গোহত্যা-নিবারণ করিতে পারিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা হুঃসাধ্য; তবে যদি কৃষক, গোপালক, গোপ, গো-একক গণ সকলেই ধর্ম্মঘট করিয়া কষাইদের গো-বিক্রয় বন্ধ করেন তাহা হইলে কতকপরিমাণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আর যদি সমগ্র ভারতবাসী খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই গোমাংস ত্যাগ করেন, তাহা হইলে গোহুণ বর্জিত হইয়া বিশুদ্ধ দ্ব্যুতের অভাব নিশ্চয় মোচন হইতে পারে। যাহা হউক বিশুদ্ধ দ্ব্যুতের প্রচলনের জন্ত দেশবাসীর যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহা স্বাগত হউক। আমাদের চিরকুম-বান্ধনী সমস্ত বিশুদ্ধ দ্ব্যুতের মর্যাদা বুঝিয়া চা-সরবৎ পরিত্যাগপূর্বক নিয়ম পূর্বক প্রতিদিন দ্ব্যুত সেবনে অভ্যস্ত হউন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবোধগণ দ্ব্যুতের শুণ বর্ণনে বলিয়া গিয়াছেন,—  
দ্ব্যুতঃ রসায়নং বাহু চক্ষুষ্যং বহিঃ কীর্ণনং  
শীতবীৰ্য্যং বিষালক্লী পাগপিভা নিলাপহম।  
অন্নভিচ্ছাদি কান্তোদগঃ তেজো-সাবিধাভিচ্ছাদ  
স্বয়ং স্বতিকরঃ মেধামাহুযাঃ বরুণাভিচ্ছাদ



উদাবৃত্ত জরোন্মাদ শূণানাহ ত্রণান্ হরেৎ ।

দ্বিধ্বং বধকরং কক্ষং ক্ষয় বীসর্প রক্তনুং ॥

অর্থাৎ ঘূত রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুশ্য, অগ্নি-  
দীপ্তিকারক, শীতল বীৰ্য্য, বিষয়, দারিদ্রনাশক,  
পাপক্ষয়ী, পিত্তনাশক, বায়ু শান্তিকারক,  
জ্বর অভিযন্ত্রী, লাবণ্যজনক, ওজোবর্দ্ধক,  
তেজস্বী, কান্তিকারক, বুদ্ধি উৎপাদক, স্রব  
বিশোধক, স্মরণশক্তি বৃদ্ধক, বায়ু বৃদ্ধিকর,

বলকারক, গুরু, শ্লিষ্ণ ও শ্লেষ্মাজনক । ঘূত  
পান করিলে উদাবৃত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল,  
অনানাহ, ত্রণ, উরক্ষত, বীসর্প ও রক্তদোষ  
উপশমিত হয় ।

শাস্ত্রে কথিত স্বাস্থ্যের পক্ষে একগুণ উপ-  
কারী দ্রব্যের ব্যবহারে সকলেই অভ্যস্ত  
হউন—ইহাই আমাদের বক্তব্য ।

ডাঃ শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস ।

## হামজুরে কবিরাজ চিকিৎসা ।

—:—

গত সপ্তম মাসে আমাদের বাড়ীতে  
একটি মেয়ের ভ্রম হয় । মেয়েটির বয়স  
সরি বৎসর । প্রথমে খুণ জ্বর হয় । তিন  
চারি দিন প্রবল ১০২ ডিগ্রি হইতে ১০৫  
ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে থাকে । সেই অবস্থায়  
তিনদিনের পর হাম দেখা দেয়, অনেকক্ষেত্রে  
প্রবল জ্বর ছাড়িয়া যাওয়ার পর হাম দেখা  
দেয় । কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা না হইয়া জ্বরের  
উপরই হাম দেখিতে পাওয়া গেল । যখনই  
হাম দেখা দিল, সেই সময় হইতে পেটের  
অস্বস্তি আরম্ভ হইল । দিনে রাত্রিতে দশ  
বার বার করিয়া মল হইত । মলের রং  
বিভিন্ন প্রকারের । কখনও সবুজ, কখন  
হলধে, কখনবা মিশ্রিত রঙের এবং সেই  
সঙ্গে আমত্ব ছিল এবং ফেনা ফেনা মল  
হইত । এত ভাবে জ্বর ও পেটের অস্বস্তি  
উপর হামও ভীষণ মূর্ছিতে প্রকাশ পাইতে  
লাগিল । সমস্ত শরীর লেপিয়া হাম বাহির  
হইলেও জ্বর এবং পেটের অস্বস্তি কিছুমাত্র  
কমিল না । বরং সেই সঙ্গে শিশিলা ও

গায়ের জ্বালায় কণ্ঠাটী খুণ ছট্‌ফট্‌ করিতে  
লাগিল । এইরূপ ভাবে পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া  
গেলেও যখন রোগের কিছুমাত্র উপশম  
বুদ্ধিতে পারা গেল না, তখন একজন  
ডাক্তার বন্ধুকে ডাকিলাম । তিনি আসিয়া  
বিশেষ করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া ঔষধ দিয়া  
গেলেন । আমরাও তাঁহার উপর নির্ভর  
করিয়া সে সময়কার মত নিশ্চিত হইলাম ।  
বন্ধু ডাক্তারটি তিন চারিদিন চিকিৎসার  
পর একদিন বলিলেন,—বুকের দক্ষিণদিকে  
একটু সর্দি বসিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে ।  
সেজন্ত একটু চিন্তার কারণও ইঙ্গিত করিয়া  
গেলেন । আমরা ভোঁ কণ্ঠাটিকে লইয়া  
বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম । এবং অল্প  
প্রকার নূতন কিছু ব্যবস্থা না করিয়া পূর্ববৎ  
ডাক্তারী চিকিৎসা চালাইতে লাগিলাম ।  
তবে ভগবানের রূপার ইতিমধ্যে হামজুরি  
ক্রমশঃ মিশাইয়া বাইতে লাগিল । হামজুরি  
মিশাইতে লাগিল বটে, কিন্তু জ্বরের  
এক অগন্তক রোগ আসিয়া আমাদের

হতাশ করিয়া দিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন,—বৃকের ছুট দিকেই নিউমোনিয়া দেখা দিয়াছে। কন্ডাটাকে লইয়া শুধু আমরা নয়, ডাক্তার বাবুও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তথাপি আমরা তাঁহারই হাতে রোগী রাখিয়া দিয়া ভগবানের করুণার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু যখন পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল, অঁথচ জ্বর, পেটের অসুখ, পিপাসা, ও নিউমোনিয়া কিছুই কমিল না, তখন আমাদের মনও বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একদিন বৈকালে কন্ডাটা জরের আধিক্যে খুব অভিভূত হইয়া পড়িলে, আমি কলিকাতার একজন বহুদর্শী কবিরাজ মহাশয়ের নিকটে গিয়া কন্ডাটার সমস্ত অবস্থা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন,—“কাল সকালে দেখিয়া ব্যবস্থা করিব।”

পরদিন কবিরাজ মহাশয় আসিয়া একটা পাচনের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তখন ডাক্তার বাবুটাও ভাগ্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন,—তিনি বলিলেন,—আমাদের মতে কন্ডাটার বাঁচিবার আশা খুব কম। তদন্তরে কবিরাজ মহাশয় আমাদেরকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—কোন ভয় নাই,—এই পাচনটা খাওয়াইতে থাক হইতেই সারিয়া যাইবে—অল্প কোন ঔষধ-পত্র দিতে হইবে না।

কবিরাজ মহাশয় যে পাচনটা বলিয়া দিলেন,—তাঁহা এই,—যোয়ান, বাবুচতুলসী, মেথী ও সাদা পেরোজ, প্রত্যেকটা আধতোলা পরিমাণে লইয়া ছেঁচিয়া দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া একসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল একটু একটু করিয়া পিপাসার সময় অথবা অল্প সময় খাওয়াইতে

হইবে। একসের জলে সমস্ত দিন ও রাত্রি চলিবে। সমস্ত না খাইতে পারিলেও ক্ষতি নাই। পথ্য হুধ সাপ্ত।

আমরা যথা নিয়মে উক্ত জিনিস কর্তী সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। প্রথম দিনে পিপাসার আধিক্যে সমস্ত পাচনটাট দিনে রাতে শেষ হইয়া গেল। পরদিন সকালে দেখা গেল, অল্পদিন অপেক্ষা জ্বর কম; রাত্রিতে মলের সংখ্যাও কম হইয়াছিল। এইরূপে একই পাচন আমরা পাঁচ ছয় দিন চালাইয়া গেলাম। দিনের পর দিন কাটার সঙ্গে সঙ্গে—জ্বর, পেটের অসুখ, নিউমোনিয়া, পিপাসা প্রভৃতি সবই কমিয়া গেল। ডাক্তারবাবুও অনুগ্রহ করিয়া প্রতিদিন আসিয়া দেখা যাইতেন। তিনিও কবিরাজী চিকিৎসায়—অত্যাশ্চর্য ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

তা’রপর আমাদের বাড়ীতে আবার দুইটা ছেলের হাম দেখা দিল। একটার বয়স দুই বৎসর, অপরটার বয়স এক বৎসর। এবার প্রথম হইতে উক্ত কবিরাজ মহাশয়কে সংবাদ দিলাম। তখনও হাম বাহির হয় নাই। কেবলমাত্র জ্বর দেখা দিয়াছে। তিনি জ্বর শুনিয়াই হাম হইবে স্থির করিয়া ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন,—আধ তোলা আন্দাজ ব্রাজী শাকের রস প্রত্যেক ছেলেটাকে খাওয়াইয়া দাও এবং পথ্য সাণ্ড দাও। এইরূপে তিনদিন পাতে একবার করিয়া ব্রাজীশাকের রস খাওয়াইলাম। হামও খুব বাহির হইয়া গেল। কন্ডাটার মত ছেলে দুইটারও জ্বর, পেটের অসুখ ও অন্যান্য পিপাসা ছিল। রাত্রি মধ্য ছোটটার বুকে—একটা পিঁপড়ার মত

এবং চক্ষু ছুইটীর মধ্যেও অত্যন্ত হাম দেখা দিল। এপরেও আমরা তিন দিন ব্রাক্সী শাকের রস দেওয়ার পর কবিরাজ মহাশয়ের আদেশক্রমে পূর্ববৎ,—যোয়ান, বাবুই ভুলসী, মেথী ও সাদা পেঁয়াজের জল তৈয়ারী করিয়া পাওয়াইতে লাগিলাম। ভগবানের কৃপায় ছেনে ছুইটাও ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল।

ছোট ছেলেটীর চোকে যে হাম বাহির হইয়াছিল। সে জন্ম তাহার বাম চক্ষুটী হাজিয়া পাওয়ার মত হইল এবং চোকের তাবাব মানটার উপর একটা সাদা বিন্দুর মত দাগ দেখা যাইতে লাগিল। যদিও এই ছেলে ছুইটীর চিকিৎসা কবিরাজী মতে চিনিতছিল, তথাপি ডাক্তার বন্ধুটী অনুগ্রহ কবিরাজ প্রত্যহ আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তিনি ছোট ছেলের চোকটা দেখিয়া ভয়ের কারণ বলিয়া গেলেন এবং একজন অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকে ডাকিয়া দেখাটবার ব্যবস্থা কবিত্তে বলিলেন এবং যতক্ষণ না চোকের ডাক্তার আসেন ততক্ষণ ছুই তিন ঘণ্টা অম্বব “বোরিক্ এ’সড” (ডাক্তারী ঔষধ, সোথাগা হইতে প্রস্তুত) গরম জলে গুলিয়া সেই জলে চোক ধুইয়া দিতে বলিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়কেও একবার চোকের কথা জানাইলাম। তিনি ষষ্টিমধু ও গুলঞ্চ ছেঁচিয়া রস করিয়া সেই রস দিনে তিন চারিবার কোঁটা কোঁটা করিয়া চোকে দিতে বলিলেন। এদিকে অভিজ্ঞ চক্ষুচিকিৎসক ডাকিতে এবং তাঁহার আশ্রিতেও দুইদিন বিলম্ব ঘটয়া গেল। এই দুইদিন আমরা উক্ত ষষ্টিমধু ও গুলঞ্চ ছেঁচিয়া রস করিয়া দিতে লাগিলাম। দুইদিন পরে

আমার বন্ধু ডাক্তারটী বলিলেন, চোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। যাহা হউক কবিরাজী ঔষধেই উপকার হইল বলিয়া আমরা আর ডাক্তারী ঔষধ না আনাইয়া ঐ কবিরাজী ব্যবস্থাই চালাইতে লাগিলাম। মগুম দিনে দেখা গেল, —চোকের আর কোন প্রকার দোষ নাই, সব সারিয়া গিয়াছে।

তা’রপর আমি বহুস্থলে উক্ত কবিরাজী পাচন প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি। হাম হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা সামান্য পরিমাণে হাম দেখা দিলে প্রথম তিন দিন প্রাতে একবার করিয়া ব্রাক্সীশাকের রস দিতে হয়। তাহাতে তিত্তরকার সমস্ত হাম বাহির হইয়া পড়ে। বাহির না হইলেও আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। তা’রপর হামের অবস্থায় পেটের অম্বুথ, জ্বর, সর্দি, কাসি প্রভৃতি যাহাই থাকুক না কেন,—সেই সময়ে যোয়ান, বাবুই ভুলসী, মেথী ও সাদা পেঁয়াজ সিদ্ধ জল একটু একটু করিয়া সমস্ত দিন খাওয়াইয়া গেলে সব উপসর্গ ও হাম সারিয়া যাইবে এবং হাম অথবা বসন্ত চোকে বাহির হইলে, ষষ্টিমধু ও গুলঞ্চ একটু জল দিয়া ছেঁচিয়া রস বাহির করিয়া চোকে কোঁটা কোঁটা করিয়া দিলে চক্ষুও নষ্ট হইবে না।

হাম একটা সাধারণ ব্যাধি। প্রতিবৎসরই উহা একবার করিয়া অনেক গৃহস্থের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। সেই সময় আমার লিখিত মত ব্যবস্থা করিয়া সকলেই দেখিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে যে পাচনটীর কথা উল্লেখ করা গেল, উহা নির্দোষ ভেজা। উহা ব্যবহার করিয়া কোন প্রকার ক্লেশ কলিবে না। অধিকন্তু অল্প সময়ের মধ্যে রোগও সারিয়া যাইবে—ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

ঐরাখালদাস সেন গুপ্ত।

## আয়ুর্বেদ বায়ু।

( তুলনা মূলক আলোচনা )

সে এক অরণ্যভীত যুগের স্বপ্নময়ী কাহিনী। ভারতের সুপবিত্র সাধনা-কুণ্ড নৈমিষ-কাননে সমবেত ঋষিগণ জরাব্যাধিগ্রস্ত মানবের দুঃখ-কষ্ট মোচনকল্পে যে মহান তথ্য সমূহের আলোচনা করিয়াছিলেন—যে সনাতন চিকিৎসাতত্ত্বের প্রচারদ্বারা ভবিষ্যৎ-স্থলীরদের জন্ত অমূল্য রত্নপেটিকা মাদরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বনে বর্তমানকাল ভারতের সিদ্ধ সাধকগণ অকাল মৃত্যুর কবল হইতে দেশ-বাসীদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের ইহ-কালের ও নৃক্ষে সঙ্গে পরকালেরও মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের নানারূপ বিরুদ্ধভাবে তরঙ্গ-তাড়নায়, নানাপ্রকার সামাজিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয়-বিলম্ব-প্লাবনে ভারতবর্ষ ওলট পালট হইয়া গেল। অত্যাচারের নিশ্চয় পেষণে ক্রিষ্ট—তাজিলোর হিমালী প্রবাহে জড়ীভূত ভারত, আপনার অতীত কীর্তির গরিমাময় স্মৃতিটুকুমাত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া রহিল। সমগ্র ভারত-বর্ষ যখন এমনি অবসাদ ক্রিষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বাঙ্গালার ভাব-সাগরে একটা চাক্ষুষ পরিলক্ষিত হইল—একটা সুসমুদ্র স্রোতান্দে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস স্পর্শিত হইয়া উঠিল—বাঙ্গালীর অন্তরে একটা প্রবল কম্পস্পৃহা জাগ্রত হইল। তাহারই ফলে বাঙ্গালার গীতি কবিতার সৃষ্টি হইল—নব্য জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইল—আয়ুর্বেদের বিরূপ বিপ্লবিত্তি আরম্ভ হইল।

যে স্পন্দন-প্রেরণায় অমুপ্রাপিত হইয়া সেই যুগের বাঙ্গালী এমনি জাগ্রত হইয়া এই তিনটি বিষয়কে গৌরবের উচ্চতম সোপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—বাঙ্গালীর ভাগ্যদেবে সে স্পন্দন একেবারে থামিয়া গেল।

বাঙ্গালার সে দিন আর নাই! বাঙ্গালার গীতি কবিতা আর বাঙ্গালীর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া, প্রাণ আকুল করে না—নবদীপের পুষ্পা প্রাঙ্গনের প্রজ্জ্বলিত জ্ঞান প্রদীপ জলিয়া জলিয়া নিবিয়া গিয়াছে। আয়ুর্বেদ বলিতেও কেবল চরক ও মুশ্বতের কঙ্কাল, মাধবকর ও চক্রদত্ত, বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠের প্রাণহীন দেহগুলি জড়াইয়া ধরিয়া দেশমাতৃকার সুসন্ধান কতিপয় প্রবীণ চিকিৎসক হিন্দুর গৌরবের এতবড় একটা জিনিষ মাদরে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

আয়ুর্বেদ যে কতবড় উচ্চাঙ্গের চিকিৎসা বিজ্ঞান, তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত সুখবচন উদ্ধৃত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইতে পারে না। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এত আবর্তন, বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আজও যে ইহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সনাতন শাস্ত্ররূপে পূজিত হইতেছে—ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠতার চরম নিদর্শন। কিন্তু মধ্যযুগ তখনই উজ্জল আলোক যেমন লঙ্কারমান জলদজালে আবৃত হয়, তেমনি বীকার করিতেই হইবে যে, আয়ুর্বেদের গৌরব-ভাতি আজ ম্লান হইয়া গিয়াছে।

দীর্ঘকালের এই চিকিৎসা-ক্ষেত্র কোন্ কোন্ অংশে পরিবর্তিত, পরিমিত হইয়াছে

তাক হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুক্ল বাপার,—তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, আধুনিক গ্রন্থসমূহ ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে। মাঝে মাঝে এমন সব পরস্পর বিরোধী অসংলগ্ন প্রয়োগ লক্ষিত হয় যে, তাহাতে বর্ণিত বিষয়গুলি ত মীমাংসীত হয়ইনা—অধিকন্তু উহাদিগকে প্রহেলিকার মতই ভ্রমোদ করিয়া তোলে।

আধুনিক গ্রন্থসমূহে এইরূপ যে সকল ভ্রুটি দেখা যায়, তাহার জন্ম আয়ুর্বেদ প্রচারকগণ দায়ী নহেন। পূর্বপুরুষদিগের প্রাচীন ইহার জন্ম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে আমাদের প্রায়োগিক নিয়মগামী হইতে হইবে। তাঁহারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া আজও আয়ুর্বেদ বাঁচিয়া আছে—নতুবা ভারতবর্ষে অস্ত্রান্ত্র বহু অমূল্য রত্নের ত্রায় ইহাও বহুদিন পূর্বে লুপ্ত হইয়া বাইত।

আয়ুর্বেদোক্ত কোন জটিল বিষয় মীমাংসা করিবার চেষ্টার মত ধৃষ্টতা আমার নাই, তবে অধ্যয়নকালে যে সকল প্রশ্নের সহজতর না পাইয়া পাশ্চাত্য-চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ পূর্বক একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আয়ুর্বেদের সিদ্ধসাধকগণ দমোপে তাহাই নিবেদন করিতেছি মাত্র। যদি কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক কৃপা পূর্বক আমার ভ্রম প্রদর্শন করতঃ বিষয়গুলির ব্যাখ্যারূপ ব্যাখ্যা করিবার কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা হইলে এই দান লেখক এবং অস্ত্রান্ত্র বহু আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

শাস্ত্রকারদিগের মতে 'বোধধাতুলমূলং হি শরীরম্'। সুতরাং আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীর মনে প্রথমেই বোধধাতুর সহিত পরিচিতি

হওয়া আবশ্যক। বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই সর্বাপেক্ষা বলবান ও সর্বকর্ষ নিয়ন্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা বায়ুসম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

“বায়ুত্ত্বং নস্তধরঃ প্রণোদানসমানব্যানা-পানায়্যা, প্রবর্তকশ্চেষ্টানাম.....” প্রভৃতি চরক বর্ণিত বায়ুর কার্যাবলী পর্যালোচনা করিলে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ—ব্যাখ্যাত 'নার্ভের' ক্রিয়ার অনুরূপ বলিয়াই মনে হয়। আমাদের এই ধারণা যে নিত্যন্ত অমূলক নহে তাহাই দেখাইবার জন্ম তুলনা-মূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তুল্যদণ্ডে ওজন করিয়া আমরা আয়ুর্বেদের মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। বিদেশীয় পণ্ডিত দিগের নব-লব্ধ-জ্ঞানালোকের সাহায্যে অধুনাতন 'কুহেলিকা' সমাচ্ছন্ন অর্থারদ্বরাজি সন্ধানের প্রয়াস পাইয়াছি। প্রতীচাবুধমণ্ডলীর সাধনার ফল এত তুচ্ছ ও এত অকিঞ্চিৎকর নয় যে, আমরা তাহার দিকে করিয়াও চাহিব না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উন্নতিলাভ করিয়া প্রতীচির পণ্ডিতগণ যে, আমাদের পূর্বপুরুষদিগের জ্ঞানসীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে অগ্রসর হইয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই; তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীর ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের গবেষণা গভীর ও ব্যাপক। বাহ্য হটক, অধিগণ শরীর বায়ুকে পক্ষা বিতক্ত করিয়া তাহাদের যে সকল কার্য নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন—এক্ষণে আমরা তাহার সহিত প্রতীচা মতে

১। প্রাণবায়ু।—চরক প্রাণবায়ুর স্থান মণ্ডক, কর্ণ, জিহ্বা মুখ ও নাসিকা এবং তাহার কার্য্য “জীবনক্ষবৎদগার ঋসাহারাদি কর্ম্মচ” বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় প্রাণবায়ুকে অম্লজান বাহক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পশ্চাত্তাত্ত্বিকগণ জীবন প্রভৃতি কার্য্য নিম্নলিখিত ভাবে সম্পন্ন হয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন :—

(ক) জীবন—Chorda Tympanii নামক মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ “নার্ড”-কেন্দ্রের উত্তেজনা বশতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কখনও কখনও স্থানবাদের প্রতিক্রিয়া-জনিত কার্য্যের (Reflex-action) দ্বারা সম্পাদিত হয়। যেমন দূষিত গন্ধ আশ্রয় করিলে অথবা বিরস দ্রব্য রসনাসংস্পর্শে আনয়ন করিলে নিজীবন পরিত্যাগ করিতে হয়।

(খ) ক্ষবৎ—নাসারন্ধ্রের কলা সমূহ উত্তেজিত হইয়া Superior Laryngeal ও vagus ফুসফুসের বায়ু সশব্দে নির্গত করে। এই বায়ুর সহিত শ্লেষ্মাও নির্গত হয়।

(গ) উদগার—বমনের বাচক শব্দ। কর্ণনালীর উত্তেজনা বশতঃ Fifth nerve ও Glosso-pharyngeal নার্ডের উদ্ভিক্ত হইয়া উদরের মাংসপেশী-সমূহের আকৃকন দ্বারা পকাশয়ের দূষিত দ্রব্যের সঞ্চার হইলে Vagus নার্ড দ্বারা বমন কার্য্য সম্পাদিত হয়। কখন কখন মস্তিষ্কের (Vomitting centre in the medulla) উত্তেজিত হইয়া

বমন করায়। যেমন কোন অকারজনক পদার্থ দেখিলেই আমরা বমন করি। এখানে সাক্ষাৎভাবে পকাশয় অথবা উদরে মাংসপেশী সমূহের সঙ্কোচ হয়না। দৃষ্ট পদার্থ আমাদের মনে যে স্থগার ভাব জাগাইয়া দেয়, তাহাই Vomitting centre কে উদ্ভিক্ত করিয়া বমন করায়।

(ঘ) ঋস—ফুসফুসের নিজের আকৃকন প্রসারণের শক্তি নাই। বক্ষ ও উদরের মাংসপেশী সমূহের আকৃকন প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ফুস কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। (The movements of the lung are therefore passive, not active, and depend upon the changes of shape of the closed cavity in which they are contained - Halliburton.)

Vagus, Splanchnic এবং Glosso-pharyngeal নামক নার্ডের ঋস প্রাণ কার্য্য সম্পন্ন করে।

(ঙ) আহার—অন্ন চর্ষণ ও অধঃকরণের সমবেত কার্য্যদ্বারা আহারক্রিয়া সম্পাদিত হয়। 5th Nerve, Glosso-pharyngeal Sup-Laryngeal এবং Hypoglossal ‘নার্ডের’ সাহায্যে খাদ্য দ্রব্য চর্ষিত হয়। চর্ষিত অন্ন অধঃকরণকালে খাদ্যতে নাসিকা বা ফুসফুস-পথে প্রবেশ না করে, তজ্জন্ত উপজিহ্বা দ্বারা এই দুই হিত্র-পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অন্ননালীর আকৃকন দ্বারা উহা পকাশয়ে পতিত হয়।

উপযুক্ত কার্য্যাবলী পর্যালোচনা করতঃ

৯ শরীর প্রচারাঘলিনীভূতং হি শোণিতং ফুসফুসপ্রচারণে প্রাণবায়ুসমানীতং বিহু পদার্থং (Charaka) সন্নিবেশং তজ্জীভূতং স্ববসন্তং বিকিপ্যতে সর্ব্বতো ধমনীতিঃ—প্রত্যক্ষ শারীরিক।

আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মস্তিষ্কাভ্যারস্থ 4th Ventricle নামক স্থান কতগুলি 'নার্ড' বাহির হইয়া শীর্ষোঃ কর্ণ জিহ্বান্তে নাসিকায় বাপ্ত হইয়া "জীবনক্ষবৎসগার স্বাসাহারাদি কর্ম" সম্পাদন করে ।

উদান বায়ু ।—চরকে উদান বায়ুর স্থান "নার্ভারঃ কর্ণ" এবং তাহার কার্য্য 'বাক্প্রবৃত্তি প্রসন্নোজ্জ্বল বর্ণাদি কর্ম' বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। সুশ্রুতে 'প্রসন্নোজ্জ্বল বর্ণাদির উল্লেখ নাই। সুশ্রুতের মতে উদান বায়ু "ভাষিতগীতাদিবিশেষোহভি-প্রবর্ততে।"

পশ্চাত্য মতে মস্তিষ্ক স্থিতবাক্কেজ্রে (Speech Sup. Laryngeal ও vagus প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় এবং 'নার্ড'বয়ের কার্য্যদ্বারা স্বর যন্ত্র ও উদরের মাংস পেশীর সঙ্কোচ-জনিত নিঃসৃত-বায়ুই শব্দে সৃষ্টি করে। বাক্কেজ্রে কোনরূপে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিলে মানব-মুক্ত প্রাপ্ত হয়। বাদকের চেষ্টা—যন্ত্র এবং বায়ু নির্গমের সমবেত কার্য্য দ্বারা যেরূপ বংশীবাদন সম্পন্ন হয় তেমনি বক্তার ইচ্ছা—স্বরযন্ত্র ও উদরের পেশীসমূহের সমবেত কার্য্যদ্বারা বাক্য নির্গত হয়। বায়ুকে স্বরযন্ত্র দিয়া বাহির করিতে হইলে নাভির উপরের মাংসপেশী সমূহ এবং 'মহাপ্রচারিকা পেশী (Diaphragm) আকু-ঞ্চন আশ্রয়ক। এই সকল মাংসপেশীর কার্য্য তত্তৎ স্থানের নার্ড সমূহের কার্য্য ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং 'নার্ভারঃ কর্ণ' দেশের নার্ডের সাহায্যে 'ভাষিত গীতাদি' সম্পন্ন হয়।

৩। সমান বায়ু ।—সমান বায়ুর স্থান আমাশয় ও পাকায়ন। অন্নপাক ও

পুষ্টি কর রস সমূহ এবং মূত্রপুত্রীবাদি যথাস্থানে প্রেরণ করা সমান বায়ুর কার্য্য। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মতে ভুক্ত অন্ন পাকায়নে প্রবেশ করিলে পাকায়নের উর্দ্ধ ও অধঃ প্রদেশের ছিদ্রদ্বয় রুদ্ধ হইয়া যায় এবং পাকায়নের সূক্ষ্ম পেশী সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে মুহু পেষণ করে। অন্ন চর্ষণ ও অধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে পাকায়নে Pepsin Hydrochloric acid নামক এক প্রকার অন্ন-দ্রাবক রস ক্ষরিত হয়। এই দ্রাবক রস পাকায়নস্থ অন্ন কিয়ৎপরিমাণে জীর্ণ করে। অন্ন অর্দ্ধ জীর্ণ হইলে পাকায়নের অধঃ দেশস্থ ছিদ্র উন্মুক্ত হয় এবং অর্দ্ধ জীর্ণান্ন আমাশয়ের ক্ষুদ্রাজে প্রবেশ করে। এই স্থানে অন্ন কিলে (cyle) পরিণত হইয়া Thoracic duct নামক প্রণালী বহিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং খাদ্যের অজীর্ণাংশ পুরীষে পরিণত হইয়া মূলাস্ত্রে জমিয়া থাকে। (kidney) নামক যন্ত্র রক্ত হইতে মূত্র পৃথক করিয়া লয়। (The main function of the kidneys is to separate the urine from the blood) পাকায়ন ও আমাশয়ের এই সমস্ত কার্য্য vagus ও solar Plexus নামক Sympathetic nerves কর্তৃক সম্পাদিত হয়। পশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ Solar Plexus কে Abdominal Brain (উদরের কর্মকেন্দ্র) বলিয়া বর্ণনা করিয়া উহার স্থান পাকায়নের পশ্চাতে নির্দেশ করিয়াছেন। চরকে সমানবায়ু বেদ, দোষ ও অশুভবাহী বলিয়া কথিত হইয়াছে। Sympathetic নার্ডের বিকৃতিবশতঃ স্বর্ণ নির্গমের যে ব্যাঘাত ও ব্যতিক্রম হয়, তাহা প্রতীচ্য চিকিৎসক-গণ ও স্বীকার করেন (increase of tem-

perature on the same side, alteration of the sweat secretion on the side, sometimes diminution at other even an increase.) সুতরাং এক্ষেত্রেও সমান বায়ুর স্থান ও কার্যের সহিত পাঁচাত্তা নার্ডকেন্দ্র ও তাহাদের কার্যাবলীর সহিত কোন অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না।

৪। ব্যান বায়ু।—ব্যান বায়ু “দেহং ব্যাপ্রোতি সর্বস্ত” এবং উহার কার্য গতি, প্রসারণ, আক্ষেপ ও নিমেষাদি ক্রিয়া। পাঁচাত্তামতে শরীরের যাবতী কার্যই জিবিধ নার্ড-ক্রিয়াধারা সম্পাদিত হয় (ক) Efferent (খ) Afferent ও (গ) Reflex অথবা প্রতিক্রিয়া জনিত কার্য। পুনরায় Excito motor Excito-secretory Excito-accelerator এবং Excito Inhibitory—এই চারি প্রকারে কার্য করে। শেষোক্ত দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া জনিত কার্যের উপর আমাদের “নার্ডা” বিজ্ঞানের তিন্তি প্রতিষ্ঠিত। রক্তবাহী শাখালী সমূহ (arteries and veins) sympathetic nerves দ্বারা চালিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে, প্রত্যেকাংশগুলি এ বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও, আর্ধ্য চিকিৎসকদিগের দ্বারাই তাহারা এ সম্বন্ধে এখনো যে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা তাহারা ই স্বীকার করিয়াছেন। (Morbid his to logical changes, such as atrophy, pigmentary or patty deegenerations fibrosis and hemorrhage, have been found in the ganglia of the sympathetic system, but little appears to be known of definite association between

such changes and functional disturbances or symptoms as a consequence —Jaylor) সুতরাং গতিপ্রসারণ, আক্ষেপ, নিমেষাদি ক্রিয়া যে নার্ডবারা সম্পাদিত হয় এবং ঐ সকল নার্ড যে সর্বদেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এখানেও ব্যান বায়ু ও Motor sensory নার্ড সমূহের কার্যাবলীতে কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

৫। অপান বায়ু।—অপান বায়ুর স্থান “ব্রবণৌ বন্তি মেট্রঞ্চ নাভ্যাক্র বঃকনৈ শুদম্” এবং তাহার কার্য শুক্র, মূত্র, পুরীষ, গর্ভ ও অর্তিব পরিত্যাগ করা। পাঁচাত্তামতে মূত্র, পুরীষ ত্যাগ প্রভৃতি কখনো কখনো volition বা স্বতঃপ্রযুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শিশুদিগের মূত্র, বিষ্ঠা-ত্যাগ, ক্রিমি অথবা অন্ত্র কোন দ্রব্যের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সম্পন্ন হয় (It also may be reflexly in children, who suffer from intestical worms, or other such irritation—Hallsburton) সাধারণতঃ শুক্র, মূত্র, পুরীষ, গর্ভ ও অর্তিব নির্গমের মার্গসমূহের মাংসপেশীগুলির আকৃ-কনের দ্বারা উহার নির্গত হইয়া থাকে। Lower dorsals, upper hunbers, sym- pathetics, Hypogastric, pudic ও sacoral নার্ড সমূহ সাক্ষাৎভাবে মূত্র পুরীষ প্রভৃতি নির্গমের সাহায্য করে। উদাহরণ স্থান “ব্রবণৌ বন্তি...” ইত্যাদি। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেও প্রাণ ও পাঁচাত্তামতে কোন বিরোধ বা ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সরকার



## ভাজকাল কাস রোগের এত আধিক্য কেন ?

—:—

আম্র তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক গুরুত্ব সম্বন্ধে একমাত্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই আছে। ইহা তত্ত্বোক্ত শাস্ত্র এবং অর্থক্স ও ব্রহ্মবৈদ্যের প্রাণ। ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি প্রভৃতি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বাদি প্রাচীন জন সমূহের মঙ্গলার্থে ভারতবর্ষেই ইহা প্রথম প্রচার করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যাহা চর্চা কর, — যথা দোষজ, কশ্মল, কুলজ ও পাপজ। দোষজ অর্থাৎ ইহা জন্মে পাপাচারে জনিত বাতাদি দোষের প্রকোপে হেতু যে ব্যাধি। কশ্মল অর্থাৎ ইহা জন্মে নিজকশ্মল দোষে অর্থাৎ জ্ঞানকৃত পাপাচরণ হেতু যে ব্যাধি। কুলজ অর্থাৎ বংশ পরম্পরা ক্রমে যে ব্যাধির উৎপত্তি। আর পাপজ অর্থাৎ পুণ্যজন্মের অপরাধ হেতু যে ব্যাধি। এই ত্রিবিধ কারণে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মহাদেবকে (মহাক্রুদ্ধকে) দণ্ডার কড়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ৩৮ মহারাজদেবের ক্রোধজনিত নিশ্বাস হস্তে অতি স্থূল স্থূল অসংখ্য রুদ্রাক্ষচর উপর হইয়া বাধিরূপে পৃথিবীর সমস্ত পরিভ্রমণ করিতেছে এবং অশ্বশ্রীদিগকে পাণ্ডিত্য দিতেছে ও নাশ করিতেছে। তাই ঋক্বেদে রুদ্রাধ্যায়ে উক্ত আছে যে “অসংখ্যাতা মহাপ্রাণি যে রুদ্রা আবিক্ত্যাম্। তেযাং সহস্র যোজনে অবধরানি তত্ত্বাস” ইত্যাদি। অর্থাৎ হে ভগবন্, যে সকল অসংখ্য অসংখ্য অমঙ্গলময় রুদ্র মৃত্তিকার উপর (পৃথিবীতে) বিচরণ করিতেছে, আমরা

যেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে সহস্র যোজন দূরে থাকি। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষচর বা (সংহার বীজের) সহিত ডাক্তারদিগের বীজাক্ষর কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-বিদ ডাক্তারদিগের মতেও অধিকাংশ রোগই বীজাক্ষর সমৃদ্ধ। আর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মতে পৃথিবী অপর্যবহল হইলেই রুদ্রাক্ষচরেরা অশ্বশ্রীদিগকে বায়ু, জল, আকাশ প্রভৃতি নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রবাস করিয়া থাকেন। এজন্য আর্ষ্য ঋষিগণ, অথবা আহার-বিহার নিবারণ করে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া (অর্থাৎ অমুক ত্রিধিতে অমুক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতকগ্রস্ত হইতে হয় ইত্যাদি) সমুদায় কার্য্যই শুদ্ধাচার সম্পন্ন হইয়া নির্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এইজন্য আর্ষ্য গণ যান, পান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি সর্ববিষয়েই সেকালে শুদ্ধাচার সম্পন্ন থাকিতেন, এবং স্পর্শক্রামক রোগের ভয়ে নীচ জাতির কথা দূরে থাকুক, স্বজাতি ত্রিণ কোনও জাতির সহিত একাসনে উপবেশন করিতেন না, এবং পরিকার-পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধসত্ত্বতা ও নিষ্ঠাবান থাকিয়া সমুদায় কার্য্য নির্বাহ করিতেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ অধিকাংশ রোগই যে, সংক্রামক, এ তথ্য জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই সংস্পর্শ দোষ ও শুদ্ধাচারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর এক্ষণে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিদ-ডাক্তারের চিকিৎসা বিজ্ঞান অপেক্ষা (হাইজিন) স্বাস্থ্য

বিজ্ঞানেই বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ডাক্তারদিগের মতে সর্দি-কাসি-নিউমোনিয়া প্রভৃতির বীজাণু সর্বদাই দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। আয়ুর্বেদ মতে “প্রতিশ্যায়াদ-থোকাসঃ কাসাং সংজায়তে ক্ষয়ঃ।” উপেক্ষিত হইলে প্রতিশ্যায় অর্থাৎ নাসাস্রাব (সর্দি) হইতে কাস এবং কাস হইতে ক্ষয়রোগ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু হায়, কালস্রোতে আমাদিগের কি অধঃপতনই হইয়াছে! পেটের দায়ে অর্থোপার্জনের জগু আমরা এক্ষণে আহাৰ, বিহার, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সৰ্ববিষয়েই নানা জাতীয় লোকের সংস্পর্শে থাকিয়া স্পর্শাক্রমিক ব্যাধি সকল দ্বারা আক্রান্ত হইতেছি। ডাক্তারদিগের মতে লোক সংখ্যা যেখানে অধিক, তথায় বীজাণু সংখ্যাও অধিক, এবং রোগ-বীজাণু রোগী-দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। আর আমাদিগের মতে অল্পস্থানে অধিক লোকের অবস্থান ও নানা জাতীয় লোকের সহিত সহবাসহেতু সংস্পর্শ দোষই কাস রোগের প্রধান কারণ, দ্বিতীয় কারণ বদ্ধ বায়ুতে অবস্থান, তৃতীয় কারণ চাক্রির জন্ত অসময়ে ও অযথা আহাৰ। এইজন্ত কলিকাতা মহানগরীতে কাসরোগের এত আধিক্য দেখা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ ডাক্তারদিগের মতে অধিকাংশ রোগই বীজাণু সমুদ্ভূত। এই বীজাণু আবার দুই অংশে বিভক্ত, জীবাত্ম ও উদ্ভিজ্জাত। প্রাণীদেহের ভায় উদ্ভিদ-দেহও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা গঠিত। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কয়েকপ্রকার রোগ শুদ্ধ জীবাত্ম কর্তৃক উৎপন্ন। উদ্ভিজ্জাত হইতে অধিকাংশ রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই বীজাণু দ্বারা আকাশ, বায়ু, জল প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পূর্ণ। তবে বে স্থানে জল সংখ্যা অধিক, তথায় বীজাণুর সংখ্যাও অধিক। এই বীজাণু শ্বাস-প্রশ্বাস, পানীয় জল, আহাৰ্য্যসামগ্রী, ধূলিকণা এবং মশা-মাছি ইত্যাদি দ্বারা মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে। তবে সকল প্রকার বীজাণু রোগোৎপাদন করে না। রোগোৎপাদনকারী বীজাণু সংখ্যা অল্প। মানবদেহে দেহস্থ রসের এবং কোষ সমূহেরও বীজাণু নাশক ক্ষমতা আছে, এজন্য সৰ্বদা রোগাক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ শরীরস্থ রোগ-প্রতিষেধক শক্তির হ্রাস হইলে, অর্থাৎ শারীরিক অত্যচারবশতঃ বা অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা বশতঃ অতিরিক্ত পরিশ্রম বা ব্যায়াম বশতঃ, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম বশতঃ এবং রাত্রি জাগরণ, অনুপযুক্ত আহাৰ, রুদ্ধগৃহে অবস্থান, উদ্বেগ, ভয় ও মানসিক অবসন্নতা প্রভৃতি কারণে কোষ সমূহের বীজাণু নাশক ক্ষমতার হ্রাস হইলে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রোগ-বীজাণু রোগীর দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এইজন্য রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, আহাৰ্য্য-পাত্র প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত নহে। অধিক কি—রোগীর মল, মূত্র, থুথু, কফ, বমিত পদার্থ, এমন কি নব লোমাদি কৰ্ত্তিত পদার্থের সহিত তাহার শরীরের অসংখ্য বীজাণু নির্গত হইয়া দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইজন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ ডাক্তারেরা আজকাল চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছাড়িয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানেই বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। অর্থাৎ স্বহাবস্থায়, কিরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

আবশ্যক, কিরূপ আচার ব্যবহারে থাকি  
কর্তব্য, কিরূপ জলবায়ু ব্যবহার্য্য, কিরূপ  
আহারাদি আবশ্যক ও শ্রেয়স্কর এবং কিরূপ  
লোক সমূহের সংস্পর্শ তাগ করা সর্ব্বতো-  
ভাব কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যানু-  
সন্ধানই অধিকতবে মনোযোগ প্রদান

করিয়াছেন। ইহাদিগের মতে সর্দি-  
কাসি-নিউমোনিয়া প্রভৃতি বীজানু সর্ব্বদাই  
দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা  
লাগিয়া বা অল্প কোন কারণবশতঃ দেহের  
রোগপ্রতিবেদক ক্ষমতার হ্রাস হইলেই কাস  
রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। \*

শ্রীশশিভূষণ গুপ্ত।

## আয়ুর্বেদ-সমস্যা ।

—•••—

আয়ুর্বেদীয় ঔষধসমূহের ফল যেরূপ  
শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, আজকাল অনেক ঔষধেই  
তাহার ক্রিয়ংপরিমাণও প্রত্যক্ষীভূত হয়না  
দেখিয়া, আমাদের মনে কতগুলি গুরুতব  
সমস্যার উদয় হইয়াছে। যে সর্ব্বরোগহর  
মধৌবধ জরামরগনাশন, তাহা অবিশ্রান্ত  
সেবন করিয়া আমরা সামান্য ব্যাধির উৎ-  
পাদন হইতেও অব্যাহতি পাইতেছিলাম,  
এবং যে পরম রসায়নের প্রভাবে বিগতেজিয়  
চাপন মুন “সুবুদ্ধোহভূত পুনরুবা”, তাহা  
অধিরত উদরস্ত করিয়া ঘোঁবনেও আমরা  
আমাদের সামান্য শক্তিতুকু পর্য্যন্ত কয়েক

দিন মাত্র অব্যাহত রাখিতে পারিতেছি না,  
এতদপেক্ষা বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় আর  
কিছু হইতে পারে কি! এই বৈচিত্র্যের  
নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ বিস্তারিত আছে।  
আর্য্যাবার উক্তি যদি প্রমত্তের প্রণোদনা  
হয়, তাহা হইলে আমরা যে এখন ঠিক সেই  
ঔষধই পাইতেছি, অথচ উহাতে পূর্ব্ববৎ  
সুফললাভ হইতেছে না, এমন কথা কখনই  
অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিতে পারা যায় না।  
সত্য বটে, বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্বেদীয়  
চিকিৎসার ফল যতটুকু দেখা যায়, তাহাও  
অনেকস্থলে অগ্রাশ্রিত চিকিৎসা-প্রণালী অপেক্ষা

\* সংস্পর্শ দোষই সংক্রামক রোগ বৃদ্ধির কারণ। এক হাঁকায় তামাকুসেবন, এক পেয়ালার চা পান—  
এ সকল কারণেও যে দেশে কাস রোগের আধিক্য ঘটিতেছে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ইতঃ-  
পূর্বে আমাদের “কাজের কথা” শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা এ সকল কথা উল্লেখ করিয়াছি। সিগারেটের  
প্রচলনবিধিও কাসরোগ বাড়িবার একটি কারণ। আমাদের এই যুক্তির সহিত মাধবের কাস নির্দোষের  
তত্ত্বানৈক্য নাই। মাধব ত বলিয়াই গিয়াছেন,—

“ধূমোপযাতঃসততুধৈব ব্যায়াম রক্ষাম নিষেব্যাচ্চ

বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ স্ববোধতুধৈব।”

—আঃ সং

অধিক ; কিন্তু আমার মনে হয়, আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলি যদি যথোচিত ফলবিধানে সমর্থ হইত, তাহা হইলে তাহাদের আশ্চর্য্য প্রতীকার-শক্তি দশনে নিশ্চয়ই জগদ্বাসী স্তুতিত হইয়া যাইতেন।

অবশ্য কালপক্ষে বনজ ভেষজাদির কণা কিং হীনদীর্ঘ্য হওয়ার আশঙ্কা একেবারে অমূলক নহে ; কিন্তু দ্রব্যাদিব শক্তি কথ-কিং হ্রাসপাপ্ত হইলেও তদ্রিমিত্ত ফলের এত পার্থক্য কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। অবিকল্প, কালপক্ষের প্রভাব হইতে যখন আমরাও অব্যাহতি পাই নাই, তখন দ্রব্যাদির এই শক্তিহীনতা আমাদের তত ক্ষতির কারণ না হইতে পারে। বিশেষ কয়েক বৎসর যাবত আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে সম্মান লইয়া আমি যে সকল বৈচিত্র্যের পরিচয় পাঠিয়াছি, আমার বিশ্বাস, ঔষধের ফলহানিব নিমিত্ত তাহাট প্রধানতঃ দায়ী ; সুতরাং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির নিমিত্ত যে সকল গোল-যোগের মীমাংসা করিয়া, ঔষধপ্রস্তুতের প্রকৃতপ্রণালী-প্রচারই আমি এখন আয়ুর্বেদ-হিতৈষিগণের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করি। এ সম্বন্ধে বহু বিষয়েরই আলোচনা করা আবশ্যক হইলেও, প্রধানতঃ যে সকল ব্যাপারে আয়ুর্বেদব্যবসায়িগণের এবং দেশবাসী সর্বসাধারণের সমান স্বার্থ বিজ্ঞপ্তি রহিয়াছে, তৎপতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান প্রবন্ধে আমি নিম্নলিখিত বিষয় কয়টা মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি :—১। ঔষধার্থ ব্যবসস্ত ভেষজাদি, ২। মান-পরিভাষা, ৩। ঔষধের মাত্রা, ৪। ঔষধের উপাদান-বৈষম্য, ৫। ঔষধ-

পত্র-প্রণালী, ৬। জারিত ধাতু, ৭। দ্রব, ৮। মকরধ্বজ ও স্বর্ণাসন্দ্র, ৯। চাবনপ্রাশ।

### ঔষধার্থ ব্যবহৃত ভেষজাদি

—ঔষধ-প্রস্তুতের জন্ত যে সকল দ্রব্য গৃহীত হয়, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার গোলযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাবে এখন অনেক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকই উদ্ভিদ ও খনিজ ভেষজাদি নিঃসংশয়িতরূপে চিনিতে সক্ষম নহেন ; কাজেই ঔষধ-সমগ্রব্যবহারে “বেদে” ও “বেদে”বিগের উপর এ নিমিত্ত তীর্থাঙ্গিকে নির্ভর করিতে হয়। এই বেদে এবং বেদেয়া যে সকল সময় প্রকৃত জিনিষ আচরণ করিয়া থাকে, এমন কথা যৌবন হইতেই শপথ করিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইবেন না।

ঔষধার্থ গৃহীত দ্রব্যাদির কথাই আমার এখানে বিশেষভাবে আলোচ্য। সকলই জানেন, শাস্ত্রধর বলিয়াছেন—

“শুষ্কং নবীনং বৎ দ্রব্যং যোজ্যং সকলকর্ম্মহু”।

“শুভ্রুচী কুটজো বাসা কুয়াণ্ডশ্চ শতাবরী, অশ্বগন্ধ সহচরৌ শতপুষ্পা প্রসারণী।

প্রমোহব্যা সদৈবদ্রা।।”

সুতরাং শাস্ত্রধরের মতে শুভ্রুচী, কুটজ প্রভৃতি দশটী, এবং মতান্তরে “বাসানি-পটোলকৈতকি” প্রভৃতি বচনানুসারে বাস-কাদি উনিশটী দ্রব্য ব্যতীত ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য অপর সমস্ত দ্রব্যই “নবীন অথচ শুষ্ক” হওয়া আবশ্যক। “শুক্লদ্রব্যস্ত বা মাত্রা অর্দ্ধস্ত দ্বিগুণা হি সা” এই বচন যে কেবল নিত্য প্রয়োজনের সময় অভাবপক্ষেই প্রযোজ্য, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই ; বিভিন্ন ঔষধ সংগ্রহের জন্ত বিভিন্ন কালনির্দিষ্ট ভেষজকেই প্রয়োজনীয়

পনের উক্ত উদ্দেশ্য উত্তম রূপে উপলব্ধি করা যাউতে পারে। কিন্তু আমি বহু স্থলে দেখিয়াছি, উল্লিখিত তালিকার বহির্ভূত অনেক দ্রব্য কাঁচা অবস্থায়ই ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং কোন কোন প্রধান চিকিৎসকও আমাকে বলিয়াছেন যে, কাঁচা জিনিষই নাকি অবিকতর ফলপ্রসূ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দশমূলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দশমূলে মূলের পরিবর্তে অনেক স্থলে যে কেবল বকুলই প্রদত্ত হয়, এমন নহে, ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি উল্লিখিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত না হইলেও বেল, শোণা, গণিয়ারী, শালপানি প্রভৃতি প্রায় সকলই কাঁচা গৃহীত হইতে দেখা গিয়া থাকে। তা'রপর, যে কয়েকটা জিনিষ কাঁচা ব্যবহার করার কথা উল্লিখিত বচনে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে কোন কোন জিনিষ শুদ্ধই গ্রহণ করা হয়, অশুদ্ধই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত বেগেরা যে সকল বনজ ভেষজের সরবরাহকারী, সে সকল অতিশুদ্ধ দ্রব্যের “নবীনত্বের” সীমা কোথায়, তা'হা বোধ হয় কোন আয়ুর্বেদব্যবসায়ীরই অবদিত নহে। বেগের দোকানে ঐ সকল দ্রব্যাদি কিভাবে রক্ষিত হয়, তা'হাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ভেষজসরবরাহের ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিলে ইহার সমুচিত প্রতিকারের আশা সূর্যদূরপরাহত। এইরূপে শুদ্ধদ্রব্যের স্থলে কাঁচা জিনিষ, কাঁচার স্থলে শুদ্ধ পদার্থ ও অতি পুরাতন শুদ্ধ দ্রব্যাদি এবং মূলের স্থলে বকুল গ্রহণের ফলে ঔষধের গুণবৈষম্য ঘটিতেছে কি না এবং ঘটিলেই বা কিরূপে ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে, আশা করি, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক

মাঝেই তা'হা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

এ প্রসঙ্গে আমি আর একটি বিষয়েও চিকিৎসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমি দেখিয়াছি, একই নামে বিভিন্ন জিনিষ বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রাখাল-শশা, গাস্তারী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাউতে পারে। এই সকল একই নামের বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে কোনটী প্রকৃত ভেষজ—তা'হা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত একই জিনিষের বহু প্রকারভেদও দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে; যেমন “তুলসী”, “ধূতুরা”, “পান” প্রভৃতি। ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোনটী ঔষধে ব্যবহায়া, তা'হা নির্ধারিত এবং সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। প্রসিদ্ধ ভেষজ বিদ্যারী সম্বন্ধেও নানা গোলযোগ চলিতেছে। এই বিদ্যারী ছই প্রকার; ইহাদের লতা যেমন ভিন্ন রকমের, আদও তেমন বিভিন্ন, এবং সম্ভবতঃ গুণেও কতক বৈষম্য থাকিতে পারে। এদেশে সাধারণতঃ ইহার একটিকে ক্ষীরবিদ্যারী এবং অপরটিকে ভূমিকুয়াণ্ড বলা হয়। আমি যতদূর দেখিয়াছি, ঔষধাদির বর্ণনায় প্রায় সর্বত্রই “বিদ্যারী” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং কচিং ছই এক স্থলে “ভূকুয়াণ্ড” (যথা—সিদ্ধশাল্মলীকল্পে) এবং কোথায়ও বা “বিদ্যারীদ্বয়ং” (যথা—শিবাজুড়িকায়) এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকার যে উভয় প্রকার বিদ্যারীই গ্রহণ করিয়াছেন, “বিদ্যারীদ্বয়ং” কথা হইতেই তা'হা প্রকাশ পাইতেছে। এখন যে স্থলে কেবল বিদ্যারী লিখিত আছে, তথায় উভয় প্রকার বিদ্যারীর মধ্যে কোনটী গ্রহণীয়

তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ বাহার যেট ইচ্ছা, সেট ব্যবহার করিলে, ঔষধের ফলবৈষম্য অবশ্যজ্ঞাবী। সুতরাং কোন্ শ্রেণীর বিদারী কোন্ স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে, চিকিৎসকগণ তাহা নির্ণয় না করিলে অসুবিধা দ্রবীভূত হইবেন।

**মান-পরিভাষা**—ঔষধ প্রস্তুতের ক্ষুদ্র গৃহীত দ্রব্যাদির পরিমাণ সম্বন্ধে নানা স্থানে বিভিন্নমত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের মান অনেকস্থলে মাষা ও কর্ষ হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে, এই মাষা এবং কর্ষের পরিমাণ লইয়াই মতভেদ। মাগধ এবং কালিঙ্গ ভেদে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে বিবিধ মানের পরিচয় পাওয়া যায়; এই মাগধ মানের পরিমাণ কালিঙ্গ মানের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। শাস্ত্রধর মাগধ ও কালিঙ্গ মানের যে পরিভাষা দিয়াছেন, “পরিভাষা-প্রদীপ”—বৃত্ত বচনে তাহার কণ্ঠিকং পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। শাস্ত্রধরের মতে মাগধ মানে মাষার পরিমাণ ৬ রতি যথা—

ষড়্ভিত্ত রক্তিকান্তিঃ স্ত্রাস্মানকো হেম-  
খান্তকৌ।”

কিন্তু পরিভাষা প্রদীপে ঐ মাষার পরিমাণ ১০ রতি যথা :—

“গুঞ্জাতি দশতিঃ প্রোক্তো মাষকো ব্রহ্মণা  
পুত্র।”

ইহার পর শাস্ত্রধর এবং পরিভাষা প্রদীপ উভয় গ্রন্থেই মাগধমানে ৪ মাষায় ১ শাণ, ২ শাণে ১ কোল এবং ২ কোলে ১ কর্ষ ধরা হইয়াছে। পরন্তু কালিঙ্গ মানে শাস্ত্রধরের মতে ১ মাষার পরিমাণ ৮ কদাচিং বা ৭ রতি—

“মাষো গুঞ্জাতিরষ্টাতিঃ সপ্ততিবা ভবেৎ  
ক’চৎ”।

কিন্তু পরিভাষা প্রদীপে দেখা যায়, কালিঙ্গ-মানের মাষা ৬ রতি। কালিঙ্গ মানের কর্ষ শাস্ত্রধরের মতে ১০ মাষায় ( কর্ষ ত্রাদশ-মাষকঃ ) ; কিন্তু পরিভাষা-প্রদীপের মতে এই মানের কর্ষ ১৬ মাষায় ( মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্তাৎ • তদ্বয়ং কোল উচ্যতে • কোল-দ্বয়ক কর্ষঃ স্তাৎ ) । এই উভয় মতের মধ্যে কোন্টি প্রকৃত, তাহা বুঝিবার উপায় আমাদের নাই; তবে শাস্ত্রধর মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া উহাই প্রামাণ্য মনে হয়। দেশ-বাসীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রধর কালিঙ্গমানকেই এ কালের উপযুক্ত মান করিয়াছেন যথা—

যতো মন্দায়য়ো হুশ্বা হীনসত্ত্বা নরাঃ কলৌ।  
অতস্ত মাত্রা তদেবাগ্যা প্রোচ্যতে সূক্তসম্মতঃ।

চরক এবং সূত্রভেদে মান আবার ক্ষুদ্র-রূপ। চরক ১০ রতিতে এবং সূত্রভেদে তাহার অদ্ধ অর্থাৎ ৫ রতিতে মাষা নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশের আয়ুর্বেদীয় ব্যবসায়িকগণের মধ্যে কেহ বা চরক, কেহ বা শাস্ত্রধর এবং কেহ বা পরিভাষা-প্রদীপের মত অনুসরণ করিলেও, অধিকাংশ চিকিৎসকই আর এক অভিনব মানের মাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন; সেই হিসাবে ১ মাষার পরিমাণ ১২ রতি বা ৯০ আনা। মাষার পরিমাণের এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা ফলের কোনরূপ বৈষম্য ঘটে না, এমন কথা বোধ হয় কেহই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিবেন না।

চরকসংহিতার প্রণেতা যদি অগ্নিবিশ্বাসী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই শাস্ত্রধর ও সূত্রভেদে পূর্ববর্তী গ্রন্থে—

অনুমান সত্য হইলে, চরকের মাধার মান-বুদ্ধির একটা যুক্তিযুক্ত কারণ কল্পনা করা যাইতে পারে; কারণ সে সময় মানবগণ অতিশয় বীৰ্য্যবান ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মানবগণের দুর্বলতা দর্শন করিয়া, শাস্ত্রধর ৬ রত্নে এবং সূক্ষ্মত ৫ রত্নে মাধা গ্রহণই সমীচীন মনে করিয়া থাকিবেন। আমাদের বর্তমান বল-বীৰ্য্যাদি বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ঔষধের অভাবতার যে অত্যধিক ক্ষমতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদ্বিনয় চিন্তা

করিয়া, একালে শাস্ত্রধর কি সূক্ষ্মতের অনুসরণই সূক্ষ্মত মনে হইলেও, এ দেশের আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ ১২ রত্নে মাধা ধরার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন কেন, তাহা বুঝিবার শক্তি আমার মত অবোধের নাই। কাষেই এই মানের গোলযোগে ঔষধের ফলবৈষম্য ঘটিতে পারে কি না, এবং ঘটিলেই বা তাহার কিরূপ প্রতিকার করা যাইতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আমি কবিরাজ মহাশয়দিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্তী ।

## পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ।

—•••—

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র (Modern Medicine) প্রবর্তন হইবার পূর্বে ভগতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রবর্তন হয়। তন্মধ্যে কতকগুলিও লোপ পাইয়া গিয়াছে, কতকগুলি কঙ্কালসার অবস্থায় পরিণত হইয়া কোন মতে জীবন ধারণ করিতেছে। ঐ পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলির মধ্যে আমরা অল্প প্রধানগুলির উৎপত্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ১। পুরাতন “মিশর” দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র (old Egyptian Medicine.) ২। পুরাতন “গ্রীক” চিকিৎসা শাস্ত্র (old Greek Medicine) ৩। আরব চিকিৎসা শাস্ত্র বাহাকে আমাদের দেশে “হেকিমী” চিকিৎসা শাস্ত্র কহে এবং বাহার অপরাধকটর নাম “ইউনানি” চিকিৎসা শাস্ত্র।

(Arabian Medicine) ৪। আমাদের “আয়ুর্বেদ”—চিকিৎসা শাস্ত্র। (Hindu Medicine) এইসব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি—সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনিষীগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন মতগুলি প্রদর্শিত হইল।

১। আয়ুর্বেদ সর্বপ্রথম চিকিৎসা শাস্ত্র। উহা হইতে মিশর, মিশর হইতে গ্রীক এবং গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ২। আয়ুর্বেদ ও প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র উভয়েই পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত। মিশর হইতে গ্রীক এবং গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৩। প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র—সর্বপ্রথম চিকিৎসা শাস্ত্র। উহা

হইতে গ্রীক ও আয়ুর্বেদের উৎপত্তি। গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৪। গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্র পুরাতন মিশর ও হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র এই উভয়বিধ চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে উৎপত্তি। গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৫। পুরাতন মিশর হইতে গ্রীক, গ্রীক হইতে আরব এবং আরব চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি।

পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা সামান্য অগত্যা আছে। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ মিশর হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে ছয়টা হস্তলিপি (papyrus) উদ্ধার করিয়াছেন।

১। ইবার্স বা নিপ্ত্রিক্ প্যাপিরাস্ অম্বান খৃষ্ট জন্মবার নাড়ু গোনেব শত বৎসর পূর্বে লিখিত। ২। প্রধান বাদিন বা লিডেন প্যাপিরাস্ অম্বান খৃষ্ট জন্মবার চতুর্দশ শত বৎসর পূর্বে লিখিত। ৩। দ্বিতীয় বাদিন প্যাপিরাস্। ৪। ত্রয়োদশ প্যাপিরাস্। ৫। কুটাম মিউজিয়ামে রক্ষিত প্যাপিরাস্। ৬। প্যারিসে রক্ষিত প্যাপিরাস্।

উপরিউক্ত ছয়টা প্যাপিরাস্ মধ্যে “ইবার্স প্যাপিরাস্” অতি পুরাতন এবং উহা হইতে পুরাতন মিশর দেশীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রধান বাদিন প্যাপিরাসের সহিত আমাদের “অথর্ক-বেদের” অনেক বিষয়ে ঐক্যতা দেখা যায়।

যাঁহারা বলেন যে প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্বেদ হইতে উদ্ভূত তাঁহাদের ঐরূপ মতের প্রধান কারণ যে ঐতিহাসিক যুগের পূর্বে ভারতবাসী মিশরে যাইয়া সভ্যতার আলোক বিস্তার করেন। অপর পক্ষে বলেন

যে আয়ুর্বেদ ও পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র পরস্পরের সাহায্য বাতিরেকে উন্নত ও পরি-বর্দ্ধিত। আমাদের শেষোক্ত মতই বিশ্বদ্র-দোপ্য বলিয়া মনে হয়, কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মত এই যে, মিশরের সভ্যতা আমাদের সভ্যতা হইতে অতি প্রাচীন। আম-দের অথর্কবেদ ও মিশরের প্যাপিরাস্ যদি সমনাম্যিক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে যে মনুষ্যের চিকিৎসা শাস্ত্র চিকিৎসার প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রসূত; দৃষ্টি বা পরীক্ষা প্রসূত নহে। “Primitive stage by Instinct”। অবশ্য মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র প্রাথমিক অবস্থা হইতে অনেক অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, উহা আমাদের আয়ুর্বেদের তায় এত উন্নত হয় নাই এবং মিশরের সভ্যতার সহিত মিশরের চিকিৎসা শাস্ত্র কালের স্তূপ-গর্ভে ধীন হইয়া গিয়াছে। বাজ সাহেবের মত হইতেও জ্ঞানিতে পারা যায় প্রাচীন মিশর-চিকিৎসা প্রাচীন গ্রীক বা আয়ুর্বেদের তায় উন্নতি সাধন করে নাই।

(২) প্রাচীন গ্রীক ও রোমক চিকিৎসা শাস্ত্র—এই শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি চারিটা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রথম অবস্থা—primitive stage derived from instinct up to 1200 B.C.

৪। দ্বিতীয় অবস্থা—Sacred or my-  
stic stage—Rise of Pythagorean school up to 500 B.C.

৩। তৃতীয় অবস্থা—Philosophic stage—Rise of Hippocratic and other schools up to 300 B.C.



৫। চতুর্থ অবস্থা—Anatomic stage  
—up to Gahn is 200 A D.

গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্র, পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র উদ্ভূত—ইহা সর্ববাদিসম্মত মত। এখন দেখা যাউক, আয়ুর্বেদের সহিত গ্রীক চিকিৎসা সম্বন্ধে কি সম্পর্ক? এ বিষয়ে তিনটা মতভেদ আছে।

১। গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্র মিশর ও হিন্দু উভয়বিধ চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে উদ্ভূত।

২। গ্রীক ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পরস্পরের সম্যক বোধ্যবোধে উন্নত ও পরিবর্তিত অর্থাৎ উভয়ই এক বৃক্ষের ফল।

৩। গ্রীক হইতে আরব এবং আরব হইতে হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি।

প্রাথমিক অবস্থা—কি মহাশয় কি জীবজন্তু, প্রাণীমাত্রেরই চিকিৎসা সম্বন্ধে সম্ভাবিত বুদ্ধি প্রকৃত একটা জ্ঞান ছিল। অত্যা নানবিধের এবং জাতি মাত্রেরই সম্ভাব্য পুষ্টি ঔষধাদির একটা জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান সভ্যতার উন্নতির সহিত বর্দ্ধিত হইল। চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। গ্রীক, হিন্দু প্রভৃতি সভ্যজাতির সভ্যতার প্রথম অবস্থায় কতকটা সাধারণ জ্ঞান ছিল।

দ্বিতীয় অবস্থা—এই অবস্থায় চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি হয়। এই সময়ে পণ্ডিত ও বৈদ্যপাইথোগোরাসের অভ্যুদয় হয়। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার প্রধান দান—রোগের দিন নিরূপণ “the celebrated doctrine of numbers—the doctorin of critical days”—Encyclopaedia Britannica.

রোগভোগের দিন সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ বিশেষ-  
পোষ—৫

রূপে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বায়ুজ্বরের ভোগ ৭ দিন, পিত্তজ্বরের ১০ দিন, কফ জ্বরের ১২ দিন প্রভৃতি।

আয়ুর্বেদের জ্ঞায় হেকিমী চিকিৎসাশাস্ত্রেও রোগ-ভোগের দিন সম্যকভাবে নির্দ্ধারিত আছে। অবশ্য হেকিমগণ গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র রোগভোগের নিরূপিত দিনের কথা বিশ্বাস না করিলেও একেবারে উহা বিশ্বস্ত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—নিউমোনিয়ার ক্রাইসিস (নিরাম অবস্থা) সাত দিনে হয় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত আছে—উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিন দিনের জ্বর (Three day Fever) সাত দিনের জ্বর (seven day fever) প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত ডাক্তারগণও স্বীকার করেন।

ইলিয়ট সাহেব তাঁহার গ্রীক ও রোমান মেডিসিন নামক পুস্তকে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিয়াছেন যে, নাইথেগোরাস, মিশর, ফিনিসিয়া, ব্যালডিয়া এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে জ্ঞান অর্জন করিতে আসিয়াছিলেন।

তৃতীয় অবস্থা—এই সময়ে গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্রে দুইটা ভিন্ন মতাবলম্বী দলের অভ্যুদয় হয়। এক দলের নাম এম্পিরিক্স (Empiric-)। উহাঁদের বিশ্বাসমন্দির সিনিডম্ (cenido-) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। অন্য দলের নাম ডগমেটিষ্ট (Dogmatists) ইহাঁদের বিশ্বাসমন্দির কস্ (cos) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

১। এম্পিরিক্স—ইহাঁরা চিকিৎসা-  
সার অস্ত্র রোগের কারণ নির্ণয় বা শরীর স্বাভা-

চ্ছেদ বিজ্ঞা (Anatomy) শিক্ষা আবশ্যক মনে করিতেন না। চিকিৎসার জ্ঞান পর্যবেক্ষণ (observation) প্রত্যক্ষ লব্ধজ্ঞান (experience) এবং পরীক্ষিত ঔষধ সকল প্রকৃতির রোগে ব্যবহার করা চিকিৎসার উপায় বলিয়া যাইতেন।

২। **ডগমেটিস্ট (Dogmatists)**—ইহারা চিকিৎসার জ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগের “হেতু”, “পূর্বরূপ” (remote and proximate cause) হাওয়া, জল ও দোষের গুণাগুণ, রোগী যে কার্য করিতেন তাহা, আদ্য স্বভাব ক্রিয়া প্রভৃতি শব্দেব উপরিকল্পনাকার্য্য করে, তাহার অনুসন্ধান করিতেন। রোগের চিকিৎসার জ্ঞান এম্পিরিক্সদের ত্রায় সাধারণ নিয়মানুযায়ী চিকিৎসা করিতেন না। প্রত্যেক রোগীর রোগোৎপত্তির বিশেষ কারণগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা করিতেন। অবশ্য ইহারা ইচ্ছা ব্যতীত এম্পিরিক্সদের ত্রায় পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ লব্ধজ্ঞান প্রভৃতির সহায়তা চিকিৎসার জ্ঞান গ্রহণ করিতেন।

আয়ুর্বেদও ঠিক এই মতাবলম্বী ও এই ভাবে চিকিৎসা করেন। গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্রের তৃতীয় অবস্থার সুবিখ্যাত হিপোক্রেটাসের অভ্যুদয় হয়। তিনি এ সময়ের গ্রীক চিকিৎসকগণের অগ্রণী ছিলেন। (the central figar of this stage). আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র তাঁহাকে চিকিৎসার জন্মদাতা (Father of medicine) বলিয়া স্বীকার করেন। স্বথের বিষয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত চিকিৎসকগণ আমাদের চরক ও অশ্বত্থকে হিপোক্রেটাসের ত্রায় সর্বোচ্চ আসন দিয়াছেন।

৩। **রোগোৎপত্তির কারণ—**হিপোক্রেটাসের মতে রোগোৎপত্তির কারণ

চারিটি “দোষ”—যাহাকে তিনি “ক্রেসিস” (crasis) বলিয়াছেন এবং যাহাকে আবরণ শিষ্ট (khilt) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ “দোষ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই “দোষ”গুলির বিবৃত অবস্থা হওয়া রোগের কারণ বলিয়া সর্ব প্রবর্তন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এই দোষগুলি গ্রীক, রোমক ও আবদ চিকিৎসকগণ চারিটি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা সোফ্রা (sofra—yellow bile) সউদা (souda—Black Bile) বন্ডম (Balgam phlym) খুন (Khun—Blered)। আয়ুর্বেদ মতে দোষ তিনটি—“বায়ু পিত্ত কফ”।

২। **দেহের “মূল” ধাতু—**গ্রীক, আরব ও হিন্দু চিকিৎসকগণ বলেন কতকগুলি মূল ধাতুর (elements) সমষ্ট দেহোৎপন্ন হয়। হিপোক্রেটাসের মতে মূল ধাতু চারিটি—“ক্ষিত্যপ তেজো মরু হিন্দু চিকিৎসকগণের মতে এই মূল ধাতু পাঁচটি—“ক্ষিত্যপ তেজো মরুতয়োম”

৩। **শরীরের অসুস্থতা ও অসুস্থতা—**হিপোক্রেটাসের মতে চারিটি দোষের সম ও চতুর্ভুতের বিশেষ সংযোগে (proper combination) শরীর অসুস্থ থাকে। হিন্দু মতে তাই। তিনটি “দোষের” সমতা ও পঞ্চভুত বিশেষ সংযোগে শরীর অসুস্থ থাকে। হিন্দু চিকিৎসকগণ পঞ্চভুতের বিশেষ সংযোগে সপ্ত ধাতুময় শরীর বর্ণনা করিয়াছেন, যে সপ্ত ধাতু সাম্য অবস্থার না থাকিলে শরীর অসুস্থতা উপাদান করে। শরীরের অসুস্থতায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ বলেন কতকগুলি রোগ দোষের

হয় উৎপন্ন হয়, আবার কতকগুলি দোষ ও দ্রব্য বিকৃত অৱস্থার জন্ম উৎপন্ন হয় ।

#### ৪। রোগের ফলাফল নিরূপণ

—রোগীর সাধারণ অবস্থা জানিয়া রোগের ফলাফল নিরূপণ (Prognosis) সম্বন্ধে হিপক্রেটাস অদ্বিতীয় ছিলেন । “In prognosis the Hippocratic school have perhaps never been excelled” — Encyclopaedia Britannica.

এ বিষয়ে আমাদের আয়ুর্বেদ হিপক্রেটাস অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে । চরকের দ্রবস্থান গ্রন্থাদি, কঠিনাধা ও অসাদ্য রোগীর লক্ষণ যাহা বর্ণিত আছে এবং ইঞ্জিয়স্থানে ইন্দ্রিয় সকলের পরীক্ষা সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে—তাহা হইতে রোগের ফলাফল সম্বন্ধে সম্যকভাবে নিরূপণ করা যায় ।

#### ৫। রোগের পরিচয় (Diagnosis)

—এ বিষয়ে হিপোক্র্যাটাসের জ্ঞান সামান্যতঃ ছিল । এ বিষয়ে আমাদের আয়ুর্বেদ অদ্বিতীয় তথ্যাদি যেহেতু, সামান্য ও বিশিষ্ট পূর্বরূপ, রূপ, সংখ্যা, বিকল, প্রাধান্য বলাবল, কাল প্রমতি নির্ণয় করিয়া রোগের প্রকৃতির নিরূপণ করিতেন ।

নাড়ী (Pulse) সম্বন্ধে হিপোক্র্যাটাস কিছুই জানিতেন না । এ বিষয়ে পাশ্চাত্য গ্রীক ও রোমক চিকিৎসকগণের মধ্যে গ্যালেন (Galen) অদ্বিতীয় ছিলেন । আমাদের আয়ুর্বেদে কনাদ কৃত নাড়ীবিজ্ঞান, গ্যালেনের নাড়ীবিজ্ঞান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ।

প্রসাব (urine) হিপোক্র্যাটাসের এফোরিয়াম (aphorism) নামক পুস্তকে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় । আয়ুর্বেদের

প্রয়োগ-চিন্তামণি নামক গ্রন্থে আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত হই ।

প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে আমরা জিহ্বা পরীক্ষা, মুত্র পরীক্ষা, নাসা পরীক্ষা, নেত্র পরীক্ষা প্রভৃতির বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে দেখিতে পাই, ইহা হইতে আমরা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে রোগ নির্ণয় (diagnosis) করিয়া থাকি । হিপোক্র্যাটাসের রোগ নির্ণয় ও রোগের ফলাফল বিচার সম্বন্ধেও বিশেষ বর্ণনা আছে ।

#### ৬। চিকিৎসা (Treatment) —

আয়ুর্বেদের দ্বারা হিপোক্র্যাটাস ও ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের বিশেষ উপকারিতা বলিয়া গিয়াছেন । “Great importance was given to diet medicines were regarded as secondary” — Encyclopaedia Britannica.

আয়ুর্বেদ—এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ।

বিনাপি ভেষজৈব্যাধি পথ্যাদেব নিবর্ততে ।

নতু পথ্য বিহীনস্ত ভেষজানাং শতৈরপি ॥

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রও ঐ মতের অনুমোদন করেন ।

স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা শরীর ব্যাধি বিমুক্ত হয়—হিপোক্র্যাটাস বলিয়াছেন, রোগের কারণ দোষগুলি প্রথম অন্তর্জ হইয়া রোগ উৎপন্ন করে; পরে সেগুলি স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা পরিপাক (digested) হইয়া দূরীভূত হয় । এই ভাবটা আমাদের আয়ুর্বেদেও দেখিতে পাই । তরুণ অৱস্থার সামান্যবস্থায় লজ্জনা দি ক্রিয়া দ্বারা রসের পরিপাক হইয়া নিরাম অবস্থায় পরিণত হয় । দূষিত রস শরীর হইতে দূরীভূত হওয়ার পর রোগী ব্যাধিমুক্ত হয় ।

উপরিলিখিত বিষয়গুলি হইতে সম্যক অবগত হওয়া যায় যে, হিপোক্রেটাস্ লিখিত অনেকগুলি সত্যের সহিত আমাদের আয়ুর্বেদ-দের অনেক মিল আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, হিপোক্রেটাস্ আয়ুর্বেদকে এই সত্যগুলি দান করিয়াছেন বা আয়ুর্বেদ হইতে হিপোক্রেটাস্ এই সত্যগুলি লইয়াছেন।

এসম্বন্ধে নিয়ে কতকগুলি মত দেওয়া গেল।

ডাক্তার পি, সি, রায় মহাশয় বলেন যে, হিপোক্রেটাস্ জন্মবার পূর্বেই হিন্দু বা “হিমা-রেল প্যাথলজির” উপর ভিত্তি করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি বিধান করেন।

ডাক্তার এন্ড্রো, ক্যাণ্টারিনি, বার্নার্ড সাহেব-দের মতে হিপোক্রেটাস্ চিকিৎসা-সম্বন্ধে হিন্দু ও মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করেন “Hippocrates owes his medical inspirations to Egyptian and Indian medicine.”

ডাক্তার ইলিয়ট সাহেব বলেন যে, হিপোক্রেটাসের সময় অস্ত্র চিকিৎসায় দ্বারা অকর্মণ্য কর্তন করা সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসাভূত ছিল না, যদিও হিন্দুশল্য-চিকিৎসকগণ বহুপূর্ব হইতেই এই চিকিৎসাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে হিপোক্রেটাস্ “চারিটা দোষের” কথা ও হিন্দুগণ ওটা দোষের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয় হিপোক্রেটাস্ হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে প্রথম তত্ত্ব অবগত হন। পরে নিজের বুদ্ধি অনুসারে আরও বিশদভাবে রোগোৎপত্তি বর্ণনা সম্বন্ধে চারিটা “দোষের” কথা বলিয়াছেন। যদিও হঠাৎ মনে হয়—হিপোক্রেটাসের ক্রেসিস্ (crasis) ও হিন্দুদের “দৌষ” এক জিনিষ, অন্ততঃ আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ছুটীটাকেই Homour বলিয়াছেন—তথাপি ক্রেসিস্ ও দৌষের” মধ্যে অনেক প্রভেদ।

শ্রী আশুতোষ রায়, এল্ এম্ এম্।

## শাক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মত।

শাক আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু শাকের স্রষ্টাতি আদৌ নাই। যাবতীয় খাওয়ার মধ্যে শাক নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। কাম-কর্ত্তা লোক-জন খাওয়াইয়া জোড় হাত করিয়া বলেন—গরীবের শাক অন্ন। নীতিশাস্ত্রকার বলেন,—স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকার আহাৰে যে উদর পূর্ণ হয় সে দণ্ডোদরের জন্ত কে মহা পাপ করিবে?

পূরাণে কথিত হইয়াছে যে, অশ্বিনী এবং অপ্রবাসী হইয়া দিবসের তৃতীয় প্রহরে শাকার আহাৰ করাও স্তব্ধ। এইরূপ বেদিক দিয়াই দেখুন—শাক আমাদের দেশে জঘন্ত খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। গ্রাম্য কবির মুখ দিয়া শাকেরা স্বয়ং এ ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। সকল শাকের আয় কাহিনী আমার মনে নাই। একটু লক্ষ্য দেখুন,—

সম্মুখীন শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা।

আমায় মনে পড়বে শুধু টানাটানির বেলা।

এদিকে ত শাকের এইরূপ নিন্দা, আয়ুর্বেদেও শাকের মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত করিয়াছেন। আয়ুর্বেদ বলেন :—

শাকেশু সর্বেষু বসন্তি রোগান্তে হেতবো

দেহ বিনাশনায়।

তন্মান্ বৃধঃ শাক বিবর্জ্জনস্ত কুর্যাৎ তথাস্থে

এব দোষঃ।

অনুবাদ :—সকল প্রকারে শাকেই রোগ সকল বাস করিয়া থাকে এবং সেই সকল রোগ দেহ নাশের হেতু স্বরূপ। এই জন্ত বৃদ্ধিমান ব্যক্তির শাকাহার পরিত্যাগ করা উচিত। অল্পেও এইরূপ দোষ আছে।

এদেশে শাকের এইরূপ অপমান, কিন্তু যুরোপে শাকের খুব আদর। যুরোপীয় চিকিৎসকগণ বলেন যে, নিত্য কিছু কিছু শাক-সবজী বিশেষতঃ সবুজ রঙ্গের শাক-সবজী খাওয়া উচিত। এদেশে শাকের এইরূপ অনাদর এবং যুরোপে শাকের আদরের কারণ কি?

শাকের একটা গুণ এই যে, শাক আহার করিলে কোষ্ঠি শুদ্ধি হয়। “ঘৃতে বল বৃদ্ধি শাকে মল বৃদ্ধি” আমাদের দেশে প্রবাদ স্বরূপ ইহা দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে যথেষ্ট মাংসের প্রচলন আছে। মাংসাহারে স্বভাবতঃ কোষ্ঠিবদ্ধতা জন্মে। শাক খাইলে মাংসের উক্ত দোষ নষ্ট হয় বলিয়া শাক মাংসাহারীদিগের পক্ষে আবশ্যিক পদার্থ। আমাদের দেশে মাংসের ব্যবহার খুব কম এবং যেরূপ খাদ্য লোকে আহার করে, তাহাতে কোষ্ঠি বদ্ধতা হয় না। সুতরাং শাক এতদ্দেশীয় গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

কিন্তু শাক যতই নিন্দিত বা অপ্রয়োজনীয় হউক, আমরা নিত্য যথেষ্ট শাক আহার করিয়া থাকি এবং শাক নহিলে আমাদের চলেনা। ভোজের জন্ত আজকাল লুচি-পোলাও ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু পূর্বে অন্নই ব্যবহৃত হইত এবং অন্নের সহিত প্রথমে পত্র-শাক হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার শাকই নিমন্ত্রিতের রসনার তৃপ্তি সম্পাদন করিত। এখনও আমাদের দেশে চতুর্দশীর চৌদ্দশাক বিশেষ আদরের সহিত গৃহস্থ মাঝেই আহার করিয়া থাকে।

শাক বলিতে এখন আমরা কেবল পত্র-শাক এবং নাল শাকই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু আয়ুর্বেদে আমরা যেগুলিকে তরকারি বলি, সে সমস্তই শাক বলিয়া অভিহিত, পশ্চিমাঞ্চলেও তরকারী অর্থে শাক শব্দ ইহা ব্যবহৃত থাকে।

শাক পাঁচ প্রকার। যথা পত্র-শাক, যেমন পালংশাক, নটে শাক, বেতো শাক প্রভৃতি, পুষ্প শাক, যেমন সজিনা ফুল, কুমড়া ফুল, সরিসার ফুল প্রভৃতি; ফল-শাক, যেমন লাউ, কুমড়া, বেগুন প্রভৃতি, নালশাক, যেমন লাউভাঁটা, পুঁই ভাঁটা, কুমড়াভাঁটা, প্রভৃতি এবং কান্দ শাক, যেমন—ওল, গাজর, মাগকচু মূলা প্রভৃতি। শাক্রে এই পাঁচ প্রকার উত্তরোত্তর গুরু অর্থাৎ পত্রশাক হইবে পুষ্পশাক, পুষ্পশাক অপেক্ষা ফলশাক, ফলশাক হইতে নাল শাক এবং নাল শাক অপেক্ষা কান্দশাক গুরুপাক বলিয়া কথিত হইয়াছে। আয়ুর্বেদে এই পাঁচ প্রকার শাক ব্যতীত সংশ্বেদজ শাক বলিয়া আর এক প্রকার কথিত হইয়াছে এবং ইহা সর্বপেক্ষা গুরুপাক।

আয়ুর্বেদে শাক মাত্রেই বিষ্টগ্ৰী অর্থাৎ পেট ভার করে, রুক্ষ, অতিশয় মল বর্দ্ধক এবং মল-মূত্র নিঃসরক বলিয়া কথিত হইয়াছে। পত্র শাকের মধ্যে বেতো শাক এবং পলতা নিন্দাবাদ তইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। যাঁহারা অপকারিতার ভয়ে শাক ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা বেতোশাক এবং পলতা যথেষ্ট আহার করিতে পারেন। পলতা পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, এবং জ্বর, কাস, ও ক্রিমিনাশক; বেতোশাক ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক, অগ্নি বর্দ্ধক, পাচক, লঘুপাক এবং গ্ৰীহা, রক্ত পিত্ত, অর্শ ও ক্রিমিনাশক।

লাউ কচিই খাওয়া ভাল, পাকা লাউ অপথ্য কিন্তু কুমড়া কচি অপকারী, পাকা কুমড়াই সুপথ্য। পাকা কুমড়া বস্তি শোথক বলিয়া যাহাদের প্রস্রাবের দোষ, পাথরী প্রভৃতি রোগ আছে তাহাদের পক্ষে উপকারী। পাকা কুমড়া ত্রিদোষ নাশক, লঘু, অগ্নিদীপক এবং উন্মাদ, মূর্ছা প্রভৃতি মানসিক রোগে হিতকর। এখানে কুমড়া অর্থে দেশী বা চালকুমড়া। বিলাতী বা মিষ্ট কুমড়ার উল্লেখ আয়ুর্বেদে নাই।

পটোল একটা উৎকৃষ্ট তরকারি। ইহা ত্রিদোষ নাশক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, কচিজনক এবং জ্বর, কাস, শ্বাস, ও ক্রিমিনাশক। কচি বেগুন অগ্নিদীপক, লঘু এবং সুপথ্য। পাকা বেগুন পিত্ত বর্দ্ধক ও গুরু। বেগুন-পোড়া খুব লঘুপাক। হংস ডিম্বের ত্রায় যে এক প্রকার শাদা বেগুন আছে তাহা অর্শ রোগে বিশেষ হিতকর।

ওল - অর্শ রোগে বিশেষ হিতকর, কিন্তু ব্রুক্ষ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে

অহিতকর। ওল অগ্নিদীপক ও লঘু। কচি মলাই সুপথ্য, বড় কাঁচা মলা ত্রিদোষ বর্দ্ধক এবং গুরু। তবে সিদ্ধ করিয়া স্নেহ পদার্থ সহ সেবন করা যাইতে পারে। অল্প সমস্ত শাকই শুদ্ধ হইলে অপকারী হয় কিন্তু শুদ্ধ মলা উপকারী।

উচ্ছে ও করলা—উচ্ছের সুপথ্য বহিরা খ্যাতি আছে। উহারা পিত্তনাশক, বায়ুবর্দ্ধক নহে, লঘু, অগ্নিদীপক এবং জ্বর, কফ, পাণ্ডু রোগ ও ক্রিমি নাশক। ঝিন্বে পিত্ত নাশক কিন্তু কফ ও বায়ুবর্দ্ধক। চিচিঙ্গে (হোপা) পটোল হইতে কিঞ্চিৎ হীন গুণ এবং শোষ রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

নানা প্রকার শাকের নানা প্রকার গুণ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। বাহুলা ভয়ে সে সকলের উল্লেখ করা হইলনা। যে সকল শাক তিক্ত, সেগুলি প্রায়ই পিত্ত ও কফ নাশক। যে সকল শাক মধুর রস-বহুল—সেগুলি কফবর্দ্ধক এবং পিত্ত নাশক। তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট শাক সকল প্রায়ই বায়ুবর্দ্ধক।

কর্কশ, পুরাতন, পোকালাগা, শুষ্ক, অকালজাত অর্থাৎ যে সময়ে যে শাক সাধারণতঃ জন্মে—সেই সময়ে উৎপন্ন, —একপ্রকার শাক আহার করা উচিত নহে। শাক সিদ্ধ করিয়া এবং ঘৃত-তৈলাদি স্নেহ পদার্থ সংযুক্ত করিয়া আহার করা উচিত। কিন্তু কচি এবং যাহা সম্যক পুষ্ট হয় নাই—এরকম কন্দশাক ব্যবহার করা উচিত নহে।

একগে শাক সম্বন্ধে পাশ্চাত্য রত লিখিত হইতেছে। কন্দ-শাককে ইংরেজি

রুটস এবং টিউবরস (Roots and Tubers) এবং অগ্রাশ্য শাককে গ্রীন ভেজিটেবলস, (Green vegetables) বলে ।

কলশাক ব্যতীত অগ্রাশ্য শাকে পুষ্টিকর পদার্থ খুব কম আছে এবং প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ জল আছে । সিদ্ধ করিলে জলীয়ংশ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । জল ব্যতীত অল্প কার্বোহাইড্রেট, অত্যল্প প্রোটিন, চিনি চর্বি, এবং সেলুলোজ ও ধাতব লবণ থাকে ।

এইখানে প্রোটিন প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া উচিত । কেননা সকল পাঠকের উহা জানা নাও থাকিতে পারে । পাশ্চাত্য মতে খাওয়া পাঁচ প্রকার পদার্থ থাকে । যথা প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, নানা প্রকার ধাতব লবণ এবং জল । মাংস, ডিম, ছানা প্রভৃতি প্রোটিন বহুল খাদ্য এবং মনুষ্য শরীর প্রধানতঃ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য দ্বারা নিৰ্মিত । কার্বোহাইড্রেট তিন প্রকার, যথা—শ্বেতসার (struch), চিনি এবং সেলুলোজ । চাউল প্রভৃতির অধিকাংশই শ্বেতসার, এবং শ্বেতসারই পরিপাক প্রাপ্ত চিনির আকারে উদ্ভিদ দেহে সঞ্চারিত হয় । আর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে শ্বেতসার থাকে, সেলুলোজ সেই গুলিকে আবৃত এবং পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখে । কচি সেলুলোজ হজম হয়, কিন্তু পাকা সেলুলোজ কাঠবৎ কঠিন বলিয়া হজম হয় না । আর ধাতব লবণ

নানা প্রকার । আমরা সাধারণতঃ যে লবণ আহরকরি—তাহাও এক প্রকার ধাতব লবণ । এই সকল দ্রব্য শরীরে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে ।

শাকে যথেষ্ট পরিমাণে ধাতব লবণ—বিশেষতঃ পটাশ (Potash) ঘটিত লবণ আছে, সেইজন্য ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকর । শাকে প্রচুর সেলুলোজ থাকে বলিয়া উহার অল্প অংশই জীর্ণ হয়, অধিকাংশ মল রূপে নির্গত হইয়া যায় । কিন্তু যে অংশ জীর্ণ হয়না, তাহা অন্ত্রের কার্য্যকারী শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে । এইজন্য শাক খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় ।

যাঁহাদের পরিপাক শক্তি কম, তাঁহারা শাক সহজে জীর্ণ করিতে পারেনা । কাহারও কাহারও শাক খাইলে উদরে বায়ু সঞ্চয় হয় । শাক হজম হওয়া—নাহওয়া কিন্তু অনেকটা রক্তনের উপর নির্ভর করে, সুস্থিত হইলে শাক সহজে জীর্ণ হয় । পাকা শাকে সেলুলোজ অধিক থাকে এবং উহা কাঠবৎ কঠিন হইয়া পড়ে বলিয়া পাকা শাক হজম হয়না । শাক বাসি হইলে উহার স্বাদ নষ্ট হইয়া যায় এবং সহজে হজম হয় না । এই জন্য শাক টাটকা খাওয়াই ভাল ।

অগ্রাশ্য শাক অপেক্ষা কলশাকের মধ্যে গোল আলুই শ্রেষ্ঠ এবং উহা সকল পরিবারেই নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গোল আলুতে শতকরা ৭১.৭৭ ভাগ

\* গোল আলু পূর্বে এসিয়া বা যুরোপে ছিলনা । স্যার ওয়ালটার ব্যালে কর্তৃক আমেরিকা হইতে আনীত হয় । কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইহা সর্ব গৃহস্থের চলন । স্বতরাং আলুর আবিষ্কারে যে দেশে যথেষ্ট প্রচলিত হইয়াছে । এখন আলু সর্ব ওয়ালটার ব্যালে কর্তৃক অনেক বিখ্যাত নক

জল, ১'৭২ ভাগ প্রোটিন, ০'১৬ ভাগ চর্বি, ২'০৬ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ০'৭৫ ভাগ সেলুলোজ, এবং ০'২৭ ভাগ লবণ আছে। প্রোটিন এবং চর্বির ভাগ অত্যন্ত কম বলিয়া কেবল মাত্র আলু খাইলে মস্তিষ্কের দেহ রক্ষার উপায় হয় না। মস্ত, মাংস, প্রভৃতি প্রোটিন বহুল খাদ্যের সহিত আলু আহার করিলে উহা উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এদেশে চাউল যেমন প্রধান খাদ্য, আর্য্যাবর্ত দেশে আলু সেইরূপ প্রধান খাদ্য। একজন পূর্ণবয়স্ক আইরিস প্রত্যাহ ২১০ সের আলু খাইয়া থাকে।

আলু সুস্বাদু হইলে বেশ সুস্বাদু এবং সহজ-পাথ্য হইয়া থাকে। আলু সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইলে খোসা শুদ্ধ সিদ্ধ করা উচিত। খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিলে কতক লবণ বহির্গত হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে ঝোল, দালনা, চড়চড়ি প্রভৃতির জল ফেলিয়া দেওয়া হয়না বলিয়া ভরকারিতে আলুর খোসা ছাড়াইয়া দেওয়া ভাল।

যে আলু সিদ্ধ করিলে বেশ মাথা-মাথা বা বালি-বালি হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং দৃঢ় পাচ্য। কিন্তু যদি আলু কঠিন থাকে, তাহা হইলে মাথা-মাথা হয় না এবং তাহা দৃঢ় জীর্ণ হয় না। বাহাদের পরিপাক শক্তি হ্রাস তাহাদের ঐরূপ আলু খাওয়া উচিত নহে।

গোল আলু ব্যতীত রাস্কা আলু, মো দালু, চুণ্ডি আলু ও শাক আলু আমাদের

দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাস্কা আলু ও মো আলু এক জাতীয় এবং কাঁচা বা রাঁধিয়া খাওয়া যায়। রাস্কা আলু ও মো আলুতে যথেষ্ট ষ্টার্চ ও চিনি আছে এবং ইহা বেশ পুষ্টিকর। চুণ্ডি আলুতেও যথেষ্ট ষ্টার্চ আছে। উহা সিদ্ধ করিলে গোল আলুর তায় সুস্বাদু হয় এবং উহা প্রায় তদ্রূপ গুণযুক্ত। শাক আলু কাঁচা খাওয়া যায়। ইহাতে যথেষ্ট জল ও যথেষ্ট চিনি আছে।

বিটের কন্দে প্রায় ৮৭ ভাগ জল, ২ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, প্রধানতঃ চিনি ১৬, প্রোটিন, এবং একভাগ লবণ আছে। বিট পাকা এবং কঠিন না হইলে সহজে হজম হয়। শালগম, গাজর, মানকচু প্রভৃতিতে যথেষ্ট ষ্টার্চ আছে, কিন্তু অম্লাত্ম দ্রব্য খুব কম। ইহাদের উপাদানের অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকিলেও সাধারণতঃ ইহারা প্রায় এক প্রকার। কন্দে প্রোটিন ও চর্বি কম বলিয়া মাংস, মস্ত প্রভৃতি প্রোটিন ও চর্বি বহুল খাদ্যের সহিত আহার করা উচিত।

পেঁয়াজ পুষ্টিকর কিন্তু গরম। পেঁয়াজে কিছু প্রোটিন এবং চিনি আছে। গন্ধক বহুল এক প্রকার তীক্ষ্ণ তৈল থাকায় পেঁয়াজে ঐরূপ গন্ধ অনুভূত হয়। কাঁচা পেঁয়াজ অপেক্ষা সিদ্ধ পেঁয়াজ লঘুপাক। রসুন—পেঁয়াজের তায় গুণযুক্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ।

কোঁড়ক বা ভুই কোঁড়ে যথেষ্ট প্রোটিন, কিছু চর্বি ও চিনি এবং একপ্রকার অম্লরস আছে। কোঁড়ক যদি সহজে হজম হইত, তাহা হইলে উহা পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে

ইয়াছিল। মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ। এক্ষণে যাহারা আলু ভক্ষণ করেন, তাহাদের স্যার ওয়ালটার। পনের আশ্রয় সলাতির জন্ত প্রার্থনা করা উচিত।



সংরক্ষিত হইতে পারিত। কিন্তু কোঁড়ক অত্যন্ত তৃপ্ত্যাপ্য এবং অনেকেরই উহা সহ্য হয়না। কোঁড়ককে ইংরাজিতে মশরুম (Mushroom) বলে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, মাংস খাইলে কোষ্ঠ বন্ধ হইয়া যায়। মাংস খাওয়া আবশ্যিক। তাহা ব্যতীত শাক না খাইয়া, কেবল মাংস খাওয়া, স্বাস্থ্যের পক্ষে বলাগায়। যুরোপীয়-দেশের পক্ষে শাক খাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে শাকের এত অধিক ব্যবহার যে শাক কমাইয়া দ্রুপ, ডিম্ব, পুত, মংগু

প্রভৃতি বেশী খাওয়া উচিত। কিন্তু দেশের এমনই দুর্ভাগ্য, অল্প সুখাদ্য দূরে থাকুক—শাকও দুশ্রাব্য হইয়া পড়িতেছে।

তবে দুশ্রাব্য হইলেও অনেক সময় লোকে প্রচুর মূল্য দিয়া শাক ক্রয় করিয়া থাকে। সেই পরমায় অল্প শ্রেষ্ঠ সুখাদ্য অনায়াসে খাওয়া যাইতে পারে। খাদ্য-হিসাবে শাকের উপযোগিতা যে অতি কম, তাহা পাঠকগণ এই প্রবন্ধ হইতে বুঝিতে পারিবেন।

## মহিলাগণের চিকিৎসা শিক্ষা ।

( ৩ )

### ( অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য )

স্নান আজ ক'র মুখ দেখিয়া উঠিয়া উঠাম জানি না,—স্নান করিয়া আসিয়া পিসীমার জন্য পূজার যায়গা করিতে বসিয়াছি—এমন সময় আমার স্বামী আসিয়া ডাকিলেন—“পিসীমা।”

পিসীমা তখন বাড়ীতে ছিলেননা, স্নান করিতে গিয়াছিলেন। আমি তাড়াহাড়ি দর চততে বাহিরে আসিয়া বলিলাম—“এত তাড়াহাটে হয়? সাত আট দিন কোন খবর নাহ, আমরা ভাবনায় মরিয়া যাই।”

স্বামী বলিলেন,—“রোজই আসিব-আসিব কথা হইতেছিল, সেইজন্য ৭৮ দিন খবর পাও নাহ।”

গোব—৬

আমি বলিলাম,—“তা' বা' হোক, এখন ঘরের চল, কাপড় চোপড় ছাড়, হাতে-মুখে জল দাও।”

স্বামী বলিলেন,—“পিসীমা কোথায়?” আমি বলিলাম,—“তিনি এখন আসিবেন, স্নান করিতে গিয়াছেন।”

স্বামী বলিলেন,—“আমি একটু পরে আসিয়া বসিতেছি, তোমাদের খবর দিতে আসিলাম। আমার সঙ্গে আমাদের খাজাঞ্চি বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন, খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রীর বড় ব্যারাম, তাঁহারা নৌকাত্তেই আছেন। আমি একখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের লইয়া আসিতেছি। তাঁহারা আজ আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন, তাঁ'র নয় কাল ক'লকাতাম বাইবেন। সেইখানে

ভাল ডাক্তারের দ্বারা খাজাজি বাবুর স্ত্রীর চিকিৎসা হইবে। আমিও বোধ হয় সঙ্গে যাইব।”

আমি বলিলাম—“তা’ বেশ। তা’—তা’রা কি জাতি? আমাদের রান্না খাইবেন তো’?”

স্বামী বলিলেন,—“খাইবেন, তা’রা আমাদেরই জাতি।” কথা শেষ করিয়া স্বামী চলিয়া গেলেন। আমি নিনির্মেষ-নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরে পিসীমা স্নান করিয়া আসিলেন। আমি বলিলাম—“পিসীমা, ভাড়াভাড়ি পূজা সাদ্ধ করিয়া লও, আমাদের বাড়ীতে হুঁজন কুটম্ব আসিতেছেন। শুধু তাই নয়, তোমাকে বোধ হয় আবার একটা রোগীরও চিকিৎসা করিতে হইবে।”

পিসীমা বলিলেন—“কি রকম?”

আমি সমস্ত কথা খুঁটিয়া বলিলাম।

পিসীমা পূজা করিতে গেলেন। আমি বাহিরের ঘরটা একটু ঝাঁট-ঝোঁট দিয়া পরিকার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া আসিলাম। স্বামী, খাজাজি বাবু ও তাঁহার পত্নীও অল্প কাল পরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমাদের বাড়ীতে একটা ঘন মহা মহারোহ পড়িয়া গেল।

খাজাজি বাবুর স্ত্রী একে অভ্যাগত হইয়া আসিয়াছেন, তাহার উপর রোগী,—আমি ও পিসীমা তাঁহার যত্ন বিশেষ করিয়াই করিতে লাগিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ আপ্যায়ণে আমরাও বড় সমুদ্র হইতে লাগিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার ঘন দ্বন্দ্বী অন্তর্য গেল।

আহারাদির পর, বিশ্রামের পর—বৈকালে

বেলা তাঁহার ধরপী-চুষ্টি-নিবড়ক অলকারাশি বন্ধন করিয়া দিতে দিতে বলিলাম,—“আপনারা কালই যাইবেন? আমার ইচ্ছা, এখানে দিন কয়েক কাটাইয়া যান, কিন্তু সে কথা শুনিবেন কি?”

খাজাজি বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—“শুনিব না কেন? খুবই শুনিব। আপনাদের আশ্রয় দিয়া এখানে তাগ করিয়া বাইতে চঃখ হয়, কিন্তু শুনিয়াছেনতো, আমি রোগে ভুগিতেছি, আর তাহারই জন্ত তো কালকাতা যাইতেছি, স্ত্রীরাং ইচ্ছা থাকিলেও তো থাকিবার ঘো নাই।”

আমি বলিলাম, “আর যদি আপনার রোগ সারাইবার উপায় এইখানেই করা হয়। তা’ হ’লে তো থাকিতে রাজি আছেন?”

তিনি বলিলেন—“তা’ হ’লে আর রাজি হইব না কেন? কিন্তু এত বড় শত্রু রোগ—এখানে কে সারাইবে? সেখানকার বড় বড় ডাক্তারেরা তো হারি মানিয়াছে। সেই জন্তই তো কলকাতায় যাওয়া, নইলে আর ছুটি লইয়া—পয়সা খরচ করিয়া লইয়া যাইবেন কেন?”

আমি বলিলাম—“আপনি যদি নির্ভর ক’রতে পারেন, তা’হ’লে বড় বড় ডাক্তারেরা যা’ আরাম ক’রতে পারেননি, তা’ আমার পিসীমা-ডাক্তারে মস্তের মত আরাম ক’রে দেবেন। পিসীমা আমার এমনতর অনেক রোগই আরাম ক’রেছেন। কিন্তু আপনি নির্ভর ক’রতে পারবেন কি?”

খাজাজি বাবুর পত্নী বলিলেন,—“গম্ভীর উপকার দেবতে পেলে নির্ভর ক’রতে পারব না কেন; তা’ যদি ক’রতে পারেন

তো আমাদের ক'লকাতা যাওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচও বেঁচে যেতে পারে, আব উনিও দিন কতক আমাকে এখানেই রেখে চাকরি স্থানে গিয়ে আবার চাকরিতে লাগতে পারেন।”

আমি বলিলাম—“দেখুন, আপনারা যে নোকায় আসিয়াছেন, তা' এখান থেকেই ছাড়িয়া দিন। আপনার স্বামীকে ব'লে এখানে এক সপ্তাহ থেকে যদি কোন ফল দৃষ্ট না পারেন, তা'র পর কলকাতা যাবেন। তখন এখান থেকেই নোকা ক'রে গেলে চলবে, এখানেও তো নোকা পাওয়া যায় না—এমন নয়।”

খাজাজী বাবুর পত্নী সে কথায় সম্মত হইলেন, তাঁহার স্বামীও এপ্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না, পিসীমাও তাঁহার চিকিৎসার ভাব গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বয়সটা ক'য় হইয়াছে?” খাজাজী বাবুর গৃহিণী বলিলেন,—“সতের বৎসর।”

পিসীমা শুধাইলেন—“ছেলে পিলে হয় নি?”

খাজাজী।—না।

পিসী। অসুখের অবস্থাটা সব খুলে বল দিকিনি।

খাজাজী। এক বছর থেকে এরকমটা হ'য়েছে। রোগটা কবিরাজেরা ব'লেছিল—অজার্ব। নানা রকম ব্যবস্থাও করা হ'য়েছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

পিসী। কি হয়?—বা' খাও—তা' জীর্ণ হয় না। দান্ত কেমন হয়?

খাজাজী। রোগই তো ঐ। দান্ত প্রায়ই ভাল হয় না, দশ পনের দিন পরে আবার

বা একদিন খুব খানিক হড়হড় ক'রে দশ পনের বার দান্ত হ'য়ে পড়ল।

পিসী। অস্বল হয়? বুক জলে কি?

খাজাজী। হাঁ। বিকেল বেলা 'রোজই বুক জলে। সকাল বেলা পেটটা ফেঁপে থাকে। খেলেও হয়,—না খেলেও হয়—সর্বদাই যেন পেটটা ভ'রে আছে বোধ হয়।

পিসী। তুমি পরিশ্রম কি রকম কর? রান্না-বারা—সংসারের কাজ-কর্ম কি নিজেই কর,—না সংসারের অন্য লোকজন আছে?

খাজাজী। কাজ-কর্ম আমি বড় ক'রতে পারি না,—রান্নাবারা আমাকে ক'রতেও হয় না—অন্য লোকজন বাড়ীতে নাই কিন্তু ঝি ঠাকুর চাকর—সবই আছে,—সেই জন্য আমাকে কাজ কর্ম বড় একটা ক'রতে হয় না।

পিসী। ঐ তো হ'চ্ছে তোমার রোগের কারণ, ও সব যদি না থাকতো, তা' হ'লে তোমার কোন রোগই হ'ত না। আমার চিকিৎসায় থাকতে হ'লে তোমাকে খাটতে হ'বে, চুপ ক'রে ব'সে থাকলে চলবে না।

খাজাজী। তা' খাটতে আমি রাজি আছি, কিন্তু খাটবার শক্তি তো থাকা চাই,—কাজ কর্ম ক'রতে গেলে যে বড্ড কষ্ট বোধ হয়।

পিসীমা। অভ্যাস ওই রকম ক'রেছ—তাই কষ্ট হয়, আবার খাটবার অভ্যাস ক'রলে খাটতে পারবে।

খাজাজী। তা' ওষুধের ব্যবস্থাটা কি ক'রবেন?

পিসী। ওষুধের ব্যবস্থা ব'লব বই কি? তা' ওষুধের ব্যবস্থা তো তোমার শুধু ব'ললে হ'বে না, আমার বউমারেরই ওষুধের কথা

গুলি ভাল ক'রে শুন্তে হ'বে। বউমাই তো ব্যবস্থা শুনে ওষুধ তৈরি ক'রে দেবেন।

আমি বলিলাম—তুমি বল না পিসীমা, আমি তো সব শুনিছি।

পিসীমা বলিলেন,—আমাদের বাগানের গাছে পাতি লেবুর গাছটার লেবুগুলো যে ফুরিয়ে গেল। কাল বাজার থেকে কতকগুলো পাতিলেবু আনা'তে হ'বে। আর খানিকটা বিট হুন আনা'তে হ'বে। কতকগুলো ডাবও চাই। সকাল-সন্ধ্যায় ছ'বার ক'রে ছ'আনা ভ'র বিট হুনের গুঁড়ি মুখে ফেলে একটু জল খেতে হ'বে। সকালে ঐটে খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে—বড় হ'লে আধখানা—আর ছোট হ'লে একটা পাতি লেবুর রস এক ছটাক জলে গুলে সেই জলটা চুষুক দিয়ে খেতে হ'বে। ছ'পর বেলা ভাত খাওয়ার একঘণ্টা পরে আধ পোয়া টাটকা ঘোল ঐ রকম ছ'আনা ভ'র বিট হুনের গুঁড়ি মিশিয়ে সেইটে খেয়ে ফেলবে। বিকাল বেলা পানিকটা ডাবের জল—এ ছাড়া আমি আর কোন ওষুধের ব্যবস্থা ক'রব না,—এই আমার ওষুধ।

খাস্তী। সে কি!—এত বড় রোগ, এতেই সেরে যাবে?

পিসী। এসব রোগ মা, ওষুধ সারে না, এসব রোগ সারে নিয়মে। একটু বেছে-গুছে খাওয়া, পরিশ্রম করা—এই সবই হ'ল—এসব রোগের ওষুধ। লোকনাথ যদি ব'লত—অজীর্ণ সারা'তে হ'লে পরিশ্রমের মত ওষুধ নেই, কোন ওষুধ না খেয়ে শুধু পরিশ্রম ক'রলেও নাকি অজীর্ণ রোগ সেরে থাকে।

খাস্তী। তা' আমি আপনার ব্যবস্থা—

তেই দিন কতক থা'কব, কিন্তু ওষুধ এতে সা'রবে কিনা তাই ভাবছি।

পিসী। ওই ভাবনাই তো হ'য়েছে বোগ না সারবার কারণ। মনটা যদি স্থির ক'রতে পার এবং আমার কথাগুলি যদি সব পালন কর—তা' হ'লে তুমি যে এখন থেকেই সারতে পারবে, তা' আমি খুব জোব ক'রে বলতে পারি। তবে আরও কতকগুলি নিয়ম পালন ক'রতে হ'বে। দিনের বেলায় ঘুমাও কি?

খাস্তী। একটু ঘুমাই বই কি, পাওয়ার পর ছ'দিন ঘণ্টা ঘুমান অভ্যাস আছে।

পিসী। তা'তে আর অজীর্ণ হ'বে না। লোকনাথ যদি ব'লত—

দিবা নিদ্রা আয়ু হয়ে।

এ কাজ যেন কেউ না কবে॥

লোকনাথ যদি আরও ব'লত—যতগুলি কারণে অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয়, তার মধ্যে দিনে ঘুমানো একটি প্রধান কারণ। দিনে ঘুমানো, রাত্রি জাগরণ, অধিক জলপান, অল্প খাওয়া, বেশী খাওয়া বা অসময়ে খাওয়া, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করা—এই সব কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। তা' এখনকার দিনে হেলায়-শ্রদ্ধায় এর অনেকগুলি কারণই অনেকে ক'রে থাকে। বাঙ্গালা দেশে অজীর্ণ রোগেও সেইরকম লোকে বেশী ভোগে শুন্তে পাওয়া যায়।

আমি বলিলাম,—কি রকম নিয়মে থাকলে অজীর্ণ রোগ হয় না পিসীমা?

পিসীমা বলিলেন,—লোকনাথ যদি অজীর্ণ রোগ জন্মাবার যে কারণগুলি ব'লত—ব'ললাম, সেগুলি না ক'রলেই অজীর্ণ রোগ জন্মাবার কোন ভয় থাকে না।

কালে মেয়েমানুষদের রোগের কথা কে কবে আবার জানতে পারিতো। সকালের মেয়েমানুষেরা—যত বড় ঘরের মেয়েই হোন,—ছড়া-কাঁটা দেওয়া, ঘর-ভ্রমার পরিষ্কার করা রান্না বাস্না করা—এই সব নিয়েই থাকত। গৃহস্থ-সংসারের মেয়েরা সকাল বেলা এক পেট ক'রে পাশ্চ ভাত খেয়ে নিয়ে তাঁরপর কাজ কর্ম করত। পরি-শ্রমে গুণে সে পাশ্চ ভাত দণ্ড ছ' তিনের মধ্যে কোথায় যে হজম হ'য়ে যে'ত তার ঠিক থাকত না। শ্বশুর-শ্বশুড়ী, স্বামী-দেওর, ছোলে-মেয়ে সকলকে খাটিয়ে বেলা আড়াই প'র—তিন প'রের সময় আবার তাঁরা বেশ করে আহার করত। এখন সেদুপ কাউকে করণ দেখি? অমনি বুক জ'লবে—অমনি ঢেঁক উঠবে—অমনি অঞ্চল হ'বে। এখন পাশ্চ ভাতের স্থানে হ'য়েছে চা। প্রকৃষেরা ও চা খান, দেখাদেখি মেয়েরাও তা' খেতে শিখেছেন। অনেকের আবার এক বেলা কি দুই বেলা খেয়েও তৃপ্তিলাভ হয় না, দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার এই চা'ই খাচ্ছেন। এত চা খেয়ে ফিদে থাকবে কোথেকে! অর্জাণ হ'বেনা কেন? এই রকম ক'রেই তো আমোদের দেশ নষ্ট হ'তে বসেছে।

আমি বলিলাম—পিসীমা, তুমি এতও জান!

পিসীমা বলিলেন,—না জানলে আর গোমাকে মনের মত ক'রতে পেরেছি। আমাদের পাড়ার সবাই পাশ্চ ভাত খাওয়া বন্ধ ক'রেছে, কিন্তু আমি তোমাকে-সেই মাঝে চালে রেখেছি, সেইজন্যই ব'লতে নেই,—তোমার শরীরটে এত খাটুনিতেও এখনো ভেঙ্গে প'ড়েনি।

খাজাজি বাবুর জ্ঞা সকল শুনিয়া বলিলেন, “আমি আপনার উপদেশ শুনিয়া নিয়ম পালন করণ। আহারের ব্যবস্থাটা আমার কি হবে?”

পিসীমা—জু'বেলাই ভাত, মাছের ঝোল, পটল বেগুন-ঝিঞ্জে-উচ্ছে-করলা-ডুমুর মান কচু-গুল-পেঁপে—এই সমস্তর তরকারি। ডালেব মধ্যে শুধু মুগের ডাল। জল খাবার অল্প কিছু খেতে দেবনা—খুব ভাল সন্দেশ হ'লে ছ' একটা দিতে পারি, তা'ছাড়া মুড়ি-নারকেল—আদা-লুন। দিনের বেলা ঘুমা'তে পা'বে না, রাত্রিও জাগতে পা'বে না। দিনের বেলা দুই প্রহরের মধ্যে এবং রাত্রিতে এক প্রহরের মধ্যে আহার ক'রতে হ'বে। আর সকাল থেকে আমার বউমার সঙ্গে সংসারের কাজ কর্ম ক'রতে হ'বে।

খাজাজি বাবুর জ্ঞা বলিলেন, “আমি আপনার উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'রব।”

তাঁহার পর দিন হইতে তাঁহার চিকিৎসার সকল ব্যবস্থার ভার আমার উপর পড়িল। আমি পিসীমার ব্যবস্থানুসারে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। ফলে এক সপ্তাহেই তিনি একরূপ উপকার বোধ করিলেন যে, তখন আর তাঁহার জন্ম আমাকে আর বেশী ব্যস্ত হইতে হইল না, তিনি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভাবে যখন একমাস কাটিল গেল—তখন আর তাঁহার রোগের চিহ্ন মাত্র থাকিল না। এই সময় তাঁহার স্বামী বাজী যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। পিসীমার নিকট অমৃত্যু প্রার্থনা করা হইল। পিসীমা অমৃত্যু প্রদান করিলেন, কিন্তু

বলিয়া দিলেন, —এইরূপ নিয়মে ৬ মাস থাকিতে হইবে।

সে আজ দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার পত্রে অবগত আছি—তাঁহার তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান হইয়াছে এবং অজ্ঞান কাহাকে বলে—একদিনও তাহা জানিতে পারেন নাই। আমি তাঁহা অপেক্ষা বয়সে একটু বড় বলিয়া তিনি আমাকে ‘দিদি’ সম্বোধন করিয়া পত্র লেখেন। শেষ চিঠি খানিতে লিখিয়াছেন,—‘দিদি, আপনাদের কৃপায় আমি তো নির্ভয়াধি হইয়াছি, তা’ছাড়া

পিসীমার উপদেশে রাধুনি-বামুন ছাড়াইয়া দিয়া রান্না-বারান্ন কাজ আমি সহজে করিয়া থাকি বলিয়া স্বামীর অর্থও অনেকটা বাঁচাইতে পারিতেছি। এখন বুঝিয়াছি, রাধুনি রাখা একটা অপব্যয় মাত্র এবং শুধু অপব্যয় নহে,—শরীর নষ্টেরও একটি কারণ। আমার মেয়েটির বয়স আট বৎসর, আমি এই বয়স হইতেই তাহাকে আমার কাজ কর্মের-সাহায্যকারিণী করিয়া তুলিতেছি।”

আমি পিসীমাকে পত্রের কথা শুনাইলাম। তিনি আহ্লাদে আঁটখানা হইলেন।

## ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

—:—

পালি জরে—

পালির দিন,—অধোত মুখ রোগীকে জ্বাক্‌ডার পুঁটলী করিয়া আঃসেওড়ার পাতা শুকিতে দিবে। ইহা অব্যর্থ।

পালি দিনে—নিমুকার লতা—পুরুষ ডান হাতে, স্ত্রীলোক বাম হাতে বাধিবে, সে দিন আর জ্বর আসিবে না।

ধবল কুষ্ঠে—

জ্বক্‌ডার ফল গোমুত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

লজ্জ রোগে—

বড় এলাচের গুঁড়া—ঘোল সহ প্রলেপ দিবে।

মুখের ত্রণে—

(ক) নিক্কিমীর পাতা হুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

(খ) মহিষির গোবর নেকড়ার বাঁধিয়া গরম করিয়া—ত্রণের উপর সেক দিবে।

(গ) পানবাইয়ের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

মহুরিকায়—

কণ্টকারীর শিকড়, গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে—বসন্তের আর ভয় থাকে না। কাটা ঘায়ে—

(ক) আপাং গাছের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিবে। (খ) গোয়াল চাকুলের পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইবে, বাথা থাকিবে না, যা’ ছুঁড়িয়া যাইবে। (গ) ধরনের গুঁড়া ছাড়াইয়া দিলে কাটা বা শুকায়। (ঘ) কেকুরের পাতার রস দিলে, বাথা থাকে না, রক্ত বন্ধ হয়, যা’ শীঘ্র শুকায়।

অজ্ঞোৰ্ণে ব্যবস্থা।—

(১) দুই আউন্স বা একছটাক জলে একটি পাতি বা কাগজি লেবুর রস নিঙড়াইয়া মিশাইয়া লও। সেই রস মিশ্রিত জল প্রাতে ১ বার ও বৈকালে ১ বার পান কর, উপকার হইবে। (২)

প্রাতঃকালে কিঞ্চিং গরম জল পান করিলে অজীর্ণ রোগে উপকার হইয়া থাকে। (৩) দিবসে আহারে পর টাটকা ঘোল পান করিলে অজীর্ণ-রোগীর উপকার হইয়া থাকে।

শ্রীমদলাল বহু রায়।

## সমালোচনা।

ধর্মের তিনটি পথ।—ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৮০ আনা। কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ—এই ত্রিবিধ পথটিকে ধর্ম শব্দের উপায়—“গীতার” বিশ্লেষণ কবিয়া এই গ্রন্থে তাহাই সহজ ভাবে বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থবস্ত্রে গম ও মৃত্যু কি?—এসকল কথাও বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহার এ প্রয়াস সিদ্ধ হইয়াছে। গীতার বিশ্লেষণে গ্রন্থকারের গীতা আয়তনের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবের দশা সঙ্গ প্রধান ধর্ম। জীবের দয়া করিতে হইলে

জীবের সেবা করিতে হয়। সে সেবার পরম পুরুষেরই সেবা করা হয়। কর্ম-মার্গ, জ্ঞান মার্গ এবং ভক্তি-মার্গ—সকল মার্গেরই মুগা-পন্থা যদি এই “জীবের দয়া” বা “জীবের সেবা করা উচিত” ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র ভাবে আর কোন মার্গ অনুসরণেই আবশ্যকতা হয় না। তখন ধর্ম-মার্গ, জ্ঞান মার্গ এবং ভক্তিমার্গ—একই বলিয়া প্রতীতি হইবে। সহজ ভাবে, সরল করিয়া এই কৃত্ত পুস্তকে অনেক ধর্ম কথাই বলা হইয়াছে। ধর্ম-পিপাসাহরণ এ গ্রন্থে ধর্ম রহস্য জানিতে পারিবেন।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

সুচিকিৎসকের লোকান্তর।—

পাশ্চাত্য-চিকিৎসকমণ্ডলীর অগ্রণী সার চার্লস পাড্রে লিউকিস লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা যারপরনাই হতবিশিত হইয়াছি। ইনি পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান সুপণ্ডিত হইয়া শুধুই যে পাশ্চাত্য চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন এমন নহে, আয়ুর্বেদের সুগভীর রহস্যগুলি ইনি অবগত ছিলেন, এজন্য আয়ুর্বেদীয়-চিকিৎসার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। আমাদের অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ইহার

মুখে সর্বদাই আশার কথা শুনা যাইত। যেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে হাসপাতাল, ঔষধপত্র, সেবা, চিকিৎসা প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিবার জন্য ইনি ভারতের বৈদ্যক বিভাগের নায়কের আসন গ্রহণ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ইহার বিরোধে আমরা যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিয়াছি।

ধর্মস্তরির পূজা।—কিছু দিন হইল মাত্রাজের আয়ুর্বেদ কলেজে ‘ধর্মস্তরির পূজা’ হইয়া গিয়াছে। সহযোগী ‘নাথক’ এই

উপলক্ষে বলিয়াছেন,—“আমাদের দেশে বৈদ্যমণ্ডলে মতান্তর ও মনান্তর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইনা।” আমরা নিজেরা ইহার উপর আর অধিক কি বলিব ? এই জন্তই তো আমাদের দেশে বৈদ্য-চিকিৎসার উন্নতি নাই।

**কবিরাজের বিয়োগ।**—গত ৩১শে অগ্রহায়ণ কবিরাজ প্রকৃতিপ্রসন্ন সেন হৃদরোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৫২ বৎসর হইয়াছিল। হুগলি জেলার সোমড়া গ্রামে ইঁহার পৈত্রিক নিবাস। কালকাতা সিমলা অঞ্চলে থাকিয়া ইনি চিকিৎসা-বাসসায় করিতেন। বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কসের গুণ্য প্রস্তুতের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ ছিল। বিচক্ষণতা-গুণে ইনি এই সহরে একজন সূচিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বিয়োগে আমরা বিশেষ ব্যথা অনুভব করিতেছি। ভগবান ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের আশে শান্তিবারি প্রদান করুন।

### অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়।—

সহযোগী “ধনুস্তরি” সংবাদ দিতেছেন,—“ময়মনসিংহ জেলার অতুর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার সদর ঠেগনে একটি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।” সুখের কথা সন্দেহ নাই। আমরা অনেকবারই বলিয়াছি,—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের পূর্ণ সাধনা না করিলে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মফঃস্বলেও

একরূপ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে।

### আমাদের সম্বন্ধে ‘ধনুস্তরি’।—

কিন্তু এই উপলক্ষে ‘ধনুস্তরি’ আমাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বেতন-নির্ধারণ সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। টাঙ্গাইলের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বেতন-গ্রহণের ব্যবস্থা নাই, উপরন্তু আহার ও বাসস্থানও দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে বেতন গ্রহণ করাও হয়—আহার—বাসস্থানও দিবার নিয়ম নাই—ইহাই তাঁহার বলবার বিষয়। তিনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—আমাদের এ ব্যবস্থার খরচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যয় অপেক্ষা কম পড়িবে না। ব্যয় সম্বন্ধে ‘ধনুস্তরি’ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এট বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রগণ অপেক্ষা দেশের কাজেই হউক—আর আয়্রোপ্যাথির পক্ষেই হউক—সকল বিষয়েই যে অধিক উৎকর্ষ লাভ করিবে, ইহা তো নিশ্চিত কথা। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যয় সমান হইলেও লাভ ভিন্ন তো ক্ষতির কারণ কিছুই দেখি না। তাহার পর, টাঙ্গাইলে ছাত্রগণকে কোন ব্যয়ভারই বহন করিতে হয় না, আমাদের বিদ্যালয়ে করিতে হয়; আমাদের ব্যয়াদিকাই তো ইহার কারণ। কলিকাতার মত সহরে একরূপ বিদ্যালয়ের পরিচালনায় আমাদেরকে যে কিরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, তাহা কি আর বলিতে হইবে ?



# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

২য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৪—মাঘ ।

৫ম সংখ্যা ।

## কাজের কথা ।

—:০:—

ধর্ম ও স্বাস্থ্য ।—ধর্মের সহিত  
স্বাস্থ্যের যে অতি নিকট সম্বন্ধ—একথা গইয়া  
বাঙ্গালীরা করিবার কিছুই নাই । সদাচার-  
পালনে স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া থাকে, ইহা তো  
সর্ববাস্তবিক সত্য । পক্ষান্তরে সদাচার-পালনে  
মানসিক প্রকল্লতা সাধিত হইয়া থাকে । সেই  
মানসিক প্রকল্লতাই মানবের স্বাস্থ্যোন্নতির  
কারণ । সেকাল অপেক্ষা একালে স্কুল-  
কলেজে বিজ্ঞাপিকা জন্ত রাশি রাশি গ্রন্থ  
অধ্যয়ন করিতে হয়, কিন্তু সদাচার-পালন-  
শিক্ষা করিবার জন্ত কোন গ্রন্থই নাই । ফলে  
দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল যুবকগণ  
কম্মমরজাবনে প্রস্তুত হইবার জন্ত যেরূপ  
চেষ্টা করিতেছেন, স্বাস্থ্য-স্থলভ্যের জন্ত  
সেরূপ কন্ট্রোল হইতে প্রয়াস পাইতেছেন না ।  
বাঙ্গালদেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালনে অভ্যস্ত  
হওয়ার বিধি একরূপেই উদ্ভিগ্ন গিয়াছে ।  
কলে অধুনা অনাচারের আবিলভি বাঙ্গালী  
—সন্তানের দেহ যেরূপ কলুষপঙ্কিল হইয়া

পাড়িতেছে, বাঙ্গালী-বয়স্কের অকালে জরা  
ও মরণ উপস্থিত হওয়ার ইহাই কারণ ।

\* \* \*

অম্মতে অরুচি ।—ভৃগুর অপর নাম  
পয়ঃ । এই পয়ঃ অর্থে অমৃতও ব্যাখ্যাত  
হইয়া থাকে । শাস্ত্রকাব ভৃগুর গুণ ব্যাখ্যায়  
তাহাকে অনেকগুলি অভিধান প্রদানের  
ভিত্তির বলকর, মেধাজনক, আয়ুষ্কর ও বয়ঃ  
সংস্থাপক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । সে  
কালে বাঙ্গালী এ সকল শাস্ত্রকথা মানিত  
সেইজন্ত আহারকালে পরম সুখে পয়ঃ বা  
ভৃগু পানও করিত । এখন সে ভৃগু-পানের  
স্মৃতি দেশ হঠাৎ উদ্ভিগ্ন গিয়াছে । ভৃগু  
ঘৃত, ছানা, মাখন—এ সকল পুষ্টিকর  
আহার্যের স্থলে অধুনা চপ-কাটপেট  
কোম্বী-দোম্বীই বাঙ্গালী যুবকের নিকট  
অধিক আদরীয় হইয়া পড়িয়াছে ।  
কলে ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়া, অনাচারের কলুষ  
হইয়া, বাঙ্গালী যুবক—একটিকে

বলক্ষয়ের কারণ করিয়া তুলিতেছে, আয়ুর্ধর  
জবা সেবনের অভাবে সে ক্ষয় আব পূর্ণ  
হইতেছে না। অধুনা অনেকের মুখে  
শুনা যায়—তাঁহার দাঁত পরিষ্কার হয় না।  
ইহার জন্ত তাঁহারা ঔষধ সেবনে প্রস্তুত,  
তথাপি দুগ্ধ—পয়ঃ বা অমৃতের আবাদন  
লইবেন না। ফলে এই অমৃতে অর্থাৎ  
উপস্থিত হওয়াও বাঙ্গালী-যুবকের স্বাস্থ্যের  
তির বিঘ্ন জন্মাইবার আর একটি কারণ।

\* \* \*

শাক-সজির উপকারিতা।—  
সেকালে দেশের পুষ্টি বিধানের জন্ত দুগ্ধ-দুগ-  
ছানা-মাখন—এ সকলের ব্যবস্থা যেরূপ  
দেশমধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, শাক-সজির  
উপকারিতাও দেশের লোকে সেইরূপ  
বিলক্ষণ উপলব্ধি করিত। এখন বাঙ্গালী-  
যুবকের রসনায় আর শাক-সজির আবাদ-  
গ্রহণ রুচেনা। কিন্তু যে সময়ে শুভনি-  
কলমে-হেলেকার আবাদনে বাঙ্গালী বীত-  
শ্রদ্ধ হয় নাহ, সে সময়ে এখনকার মত  
বাঙ্গালা দেশ অর্জাণ-প্রবণ হইয়া পড়ে নাই।  
সে কালের দুগ্ধ-দুগের মত বা এ কালের  
কোম্বা-দোম্বার মত শাক-সজির তির  
সেরূপ প্রত্যক্ষভাবে পুষ্টিবন্ধনের শক্তি  
থাকুক আব না থাকুক, পরোক্ষভাবে সেই  
সকল শক্তি উহাতেও নিহিত আছে, তাহা  
অস্বীকার করিবার যো নাই। বিশেষ-  
বিশেষ শাক-পাতারি সেবনে পাকস্থলীর  
ক্রিয়া সুপরিষ্কৃত হইয়া থাকে। সেই পাক-  
স্থলীর ক্রিয়া সুপরিষ্কৃত হইলেই তো তাহা  
হইতে বল-সকলের উপায়বিধান হইয়া  
থাকে। বাঙ্গালীর শ্রামাপ্রণয় চতুর্দশী  
তিথিতে এইজন্যই চৌদ্দশাক মিশাইয়া

একত্র খাইবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ। শাক-  
পাতারি-সেবী বাঙ্গালী বিধবাদের স্বাস্থ্য-  
নাতিও আমরা এ কথার পোষকতায় স্বাক্ষর  
প্রদান করিতে পারি। বায়ু শাস্তিও জন্ত  
বৈজ্ঞানিক ঔষধের অনুপানেও অনেক সময়  
যে শাক-পাতারির রসের আবশ্যক হয়,—  
ইহাও আমাদের কথার অন্তর প্রমাণ।  
আমাদের দেশের লোকে এ সকল কথা  
চিন্তা করিবেন কি?

\* \* \*

শিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্য।—আমাদের মনে  
হয়—ব্রহ্মচর্য্য পালনের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাইবার  
জন্ত শিক্ষা বিভাগ হইতে ঐ বিষয়ক এক-  
খানি পুস্তক পাঠ্য-ভালকাভুক্ত হওয়া  
কর্তব্য। বাণ্যজীবনই ব্রহ্মচর্য্য-পালনের  
প্রকৃষ্ট সময়। সে কালে গুরুগৃহে অধ্যয়ন-  
নিরত-বালকমণ্ডলীর ব্রহ্মচর্য্য—পালনের কথা  
আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। এখন  
সে গুরুগৃহও নাহ, সেরূপ শিষ্যেরও অভাব  
বাটিয়াছে। দেশেও দুর্গতি তো এইজন্যই।  
অল্পমতি বালকদিগকে কোট-দংশন হইতে  
রক্ষা করিবার জন্ত দেশের কৃতিপুরুষগণ  
এ বিষয়ে চিন্তা করুন—ইহাই আমরা  
দেশিতে ইচ্ছা করি।

\* \* \*

আহারে আয়ুর্ধর্য্য।—আয়ুর্ধর্য্য  
জন্ত উপযুক্ত আহারের নিত্যই প্রয়োজন।  
আহারীয় সারাংশই রস, রক্ত, মাস, মেরু,  
অস্থি, মজ্জারূপে আমাদের বে আয়ুর্ধর্য্য  
সহায়তা করিতেছে, একথা আমরা ইতি-  
পূর্বে অনেক বার বলিয়াছি। বর্ষ বর্ষ অব  
বল, কাম বল, মোক্ষ রস—আমাদের  
সকল বিষয়ের মূল—আমাদের

মাগার দিবা দিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সেই  
আবোগ্য লাভ করিলেই আয়ু রক্ষার উপায়  
করা হইবে। আবোগ্য লাভের জন্য যত-  
শ্রম নিয়মেব প্রয়োজন, আহারের ভক্ষা-  
ভক্ষার বিচারকরণ তাহার অঙ্গতর।  
দেহজগত আমাদের পক্ষে শাস্ত্রাবধি-পালনেব  
একটি প্রয়োজন। একালে—পাশ্চাত্য-  
বিজ্ঞানের যুগে যখন আমরা আহার-বিহার  
—সকল বিষয়েই স্ব স্ব মত প্রচলনে নানা-  
রূপ আদি-ব্যাবির চির সহচর হইয়া পড়ি-  
তেছি, তখন সে সকল মত ছাড়িয়া দিয়া, পুষ্টি  
প্রদায়িত্ব পূরা অনুসরণ করলে হানি কি?  
শাস্ত্র শব্দের অর্থ শাসন-ব্যাক্য। দেশ রক্ষার  
জগত তো সে শাসন-পাকোর প্রয়োজন  
হইয়াছিল। সে বাকোর প্রতি বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ  
প্রদর্শন করিয়া যখন আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির  
অস্তরায়ই ঘটিতেছে, তখন আবার সেই  
শাস্ত্র ব্যাক্য পালন করিবার প্রয়োজনীয়তা  
হয় নাই কি? এখনও যাদ না হইয়া থাকে,  
তাঁহা হইলে আর কবে হইবে?

\* \* \* \*

বাস্তানীর ব্যাধি।—আগেকার সহিত  
তুলনা কর, বাঙ্গালী আগে অধিক ব্যাধি  
প্রবণ ছিল, না এক্ষণে অধিক ব্যাধি সমুল

হইয়াছে? অরজালার নাম বাঙ্গালী  
আগে খুব কমই-জানিত, অজীর্ণ-উদরাময়  
—এ সকলেও সেকালে বঙ্গবাসী বেশী  
ভুগিত—এরূপ কথা শুনা যায় নাই। এখন  
বাঙ্গালদেশে অরজালাও যেরূপ, অজীর্ণ-  
উদরাময়ও তাহাপেক্ষা কম নহে। অগ্নি-  
মান্দ্য তো স্ত্রী পুরুষ সকলেরই। ইহা ভিন্ন  
শত করা নিরানব্বই জন বাঙ্গালী দেশে ধাতু  
দৌর্বল্যাগ্রস্ত। শাস্ত্রব্যাক্য ভুলিয়া, অনাচার-  
শ্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়াই কি ইহার কারণ  
নহে! অভ্যাস-ভোজনে পাকস্থলীটির ক্রিয়া  
সুচারুরূপে হইতে না দেওয়া এবং শুকের পূর্ণ  
পরিণতি হইতে না হইতে অযথা এবং অস্বা-  
ভাবিক ভাবে উহা ব্যয় করাট এই সর্বনাশ-  
কর ব্যাবি উপস্থিতির সর্ব প্রধান কারণ।  
ব্রহ্মচর্য্য পালনের অভাবে দেশের যে ভীষণ  
সর্বনাশ হইতেছে, একথা আমরা বরাবরই  
বলিয়া আসিতেছি। ব্রহ্মচর্য্য পালন বলিলে  
আহার-বিহার—সকল বিষয়েরই সংযম  
বুঝাইয়া থাকে। বাঙ্গালী যে পর্য্যন্ত সে সকল  
বিষয়ে সংযমী না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার  
এই অধঃপতিত জীবন পরিবর্তিত হইবার  
সম্ভাবনা নাই।

## অপত্য-বিজ্ঞান।

—:—:—

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত)

ইংরাজী শিক্ষিত মাঝেই জানেন—  
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অসাধারণ প্রতিভাবান প্রাচ্য-  
তত্ত্বাবধি ডাক্তার সাহেবের “কাজি বৈজ্ঞানিক

উত্তর” নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়া  
পর হইতেই প্রাচ্য-জগতের অনেক রহস্যই  
সাধারণের রোদধর্য্য হইয়া গিয়াছে।

ডার্লিনের অমাত্র্যিক প্রতিভাবে আমরা জীবোৎপত্তির বহুতথ্য জানিতে পারিয়াছি। আমরা জানিতে পারিয়াছি—একটি শুক্রাণু [ Spermatozon ] গর্ভকোষ নিঃসৃত পরিণতাবস্থ একটি ডিম্বাণু সহ সংযুক্ত হইলে সেই বিশেষ ডিম্বাণুটির অভ্যন্তরীণ জীবন্ত পদার্থের [ Porto Plasm ] নিশ্চেষ্টতা ভঙ্গ হইয়া অপূর্ণ কাষ্যকারিতাব বিকাশ ঘটয়া থাকে। প্রাণি উৎপত্তি সেই কাষ্যকারিতার ভাবা ফল। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি—নিবেশিত ডিম্বাণু হইতেই মাতৃ গর্ভে কখনও পুত্র, কখনও বা কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এক্ষণে, জীব-বিজ্ঞানের সমাপেক্ষা জটিল ব্যাপার—সম্মানোৎপত্তি রহস্য—আমাদের কাছে অনেকটা সরল ও সহজ হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু জ্ঞান পরিণতি লাভ করিয়া, কি কারণে যে জী বা পুরুষের মূর্তিতে প্রকাশ পায়, এ তথ্য এখনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। বিজ্ঞান ইহার মীমাংসা করিতে পারে না। কোন্ অনিবার্য নিয়মে—গর্ভস্থ জ্ঞান পুত্রের আকার ধারণ করে, কেনই বা তাহা কন্ডারূপেই বা ভূমিষ্ট হয়,—অমন যে ‘জল জীয়ন্ত’ যুরোপীয় বিজ্ঞান—তাঁহাতেও এ প্রশ্নের অনিশ্চয় সহস্রের অধ্যাবধি রচিত হয় নাই। কিন্তু বিষয়ের বিষয়—যুরোপ সভ্য হইবার বহু শতাব্দি পূর্বে—আর্য্যাবধি এই অপত্যত্বের অপূর্ণ রহস্য অনায়াসেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমি সেই অপত্যত্বেরই আলোচনা করিব।

কিন্তু প্রাচীনতম আলোচনা করিবার পূর্বে—আমাদের চিন্তামতের অনুসরণ

করিতে হইবে। নতুবা আমার বাক্য সাধারণের কাছে পরিস্ফুট হইবে না। অতএব প্রথমেই দেখা যাউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জ্ঞানতত্ত্বের কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বিজ্ঞান বলে—গর্ভবাসের প্রারম্ভ অবস্থায় জ্ঞান কিছুকালের জন্য ক্রৌণ অবস্থায় থাকে—লিঙ্গ বিশেষের দিকে প্রবণতা দেখায় না। এই ক্রৌণ অবস্থা উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে ক্ষণকালস্থায়ী, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিককাল স্থায়ী। শুক্রাণুর জীব ও পাক্‌দিশের জন্মের পাক্‌দিশের অল্পকাল পবেই বলা যায়—উহা পুং বা স্ত্রী অঙ্গ সমন্বিত হইবে। কিন্তু অমেরুদণ্ডক জাতীয় অতি নিম্নশ্রেণীর জীব সম্বন্ধে একরূপ বলা একেবারেই অসম্ভব। ভেক জাতিট এই অমেরুদণ্ডক শ্রেণীর উদাহরণ। ভেকের অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত জ্ঞান দেখিয়াও উহা স্ত্রী কি পুরুষ হইবে, তাহা বলা যায় না।

ডিম্বাণু—শুক্রাণু সহযোগে নিবেশিত হইয়া নিশ্চেষ্টতা ভঙ্গ করিয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার এই আদিম অবস্থা অল্পক্ষণ স্থায়ী। অতি সত্ত্বরই জ্ঞান উভ-লিঙ্গাবস্থ প্রাপ্ত হয়। পরে কোন একটি বিশেষ লিঙ্গ-বিকাশ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মৌলিক উপাদান প্রায় এক-প্রকার। প্রভেদের মধ্যে—ডিম্বাণু বৃহৎ, শুক্রাণু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ডিম্বাণু নিশ্চেষ্ট ও স্থির; শুক্রাণু—কার্যশীল ও চঞ্চল। এই উভয় অণুর সংযোগেই—ভাবী জীবের সূচনা। এককোষী জীবের পরিবর্দ্ধন ব্যাপার পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, একটি ক্ষুদ্রতম জীবের নিবেশিত হইয়া

হঠাৎ দুইটি হইল। সেই দুইটি আবার পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া চারিটিতে দাঁড়াইল। চারটি পরিপুষ্ট হইয়া আটটিতে পরিণত হইল। এইরূপে বিভাজন দ্বারা তাহাদের সংখ্যা হইতে লাগিল। কিন্তু এই একটি কোষ [ Cell ] দেখিতে দেখিতে দ্বিভাগে বিভক্ত হয় কেন? ইহার কারণ আর কিছু নহে—কেবল দুইটি বিপরীতধর্মী শক্তির ক্রিয়া ও পতিক্রিয়া মাত্র। এই শক্তি দ্বয়ের মধ্যে একটি গঠন মূলক, অপবর্তী বিনাশ মূলক। ঐশ্বরিক নীলার আশ্চর্য্য মতিমায়—গঠন ও বিনাশের সম্পাতেই জীবন্ত পদার্থের উৎপত্তি। আপনি বহু বড়ো গণ্ডিত হইন না, একথা অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এটো বিরাট বিশাল জগতেও এমন দুইটি বিপরীত শক্তির ক্রিয়ার ফলে—প্রাথমিক নীহারিকার অবস্থা হইতে এই বিপুলায়তন বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এ সকল কথা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষিত সত্য কথা। অত্যন্ত মানবজাতির পক্ষেও এটো নিয়ম। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগে জীবের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গ উদ্ভাবন করে। এই লিঙ্গ ভেদের মূলে—জনক-জননীর স্বাস্থ্য ও শরীর গঠন; ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর পুষ্টিতা বা পরিপক্বতা—প্রভৃতি কারণ বর্তমান। এই লিঙ্গভেদ বৃদ্ধিবার জন্য যুগোপে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। সকল মত সবিস্তারে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। আমি কেবল প্রধান মত গুলিরই উল্লেখ করিব।

১ম। দুই বিভিন্ন প্রকারের ডিম্বাণুবাদ।

এই মতবাদীরা—স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই

প্রকারের ডিম্বাণু করণা করেন। ইহারা বলেন,—স্ত্রী-ডিম্বাণু হইতে কঙ্কা এবং পুং-ডিম্বাণু হইতে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এ মতবাদীরা অতি সহজ এবং সরল। কিন্তু তলাইয়া বৃদ্ধিতে গেলে—লিঙ্গ-বিকাশ-রহস্য কখনও এত সহজ হইতে পারে না। এই মতবাদীগণকে যদি প্রশ্ন করা যায়—স্ত্রী ও পুং প্রকৃতির স্বতন্ত্র ডিম্বাণু কিরূপে উৎপন্ন হয়? ইহারা সে প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারেন না। বিশেষতঃ—বিজ্ঞান যখন বলিতেছে—জরায়ু-বাস কালে আবেষ্টন গত-কারণে অবস্থাবীন জগৎ এক লিঙ্গের ক্ষণিকান্ত হইয়াও অপর লিঙ্গ উদ্ভাবন করিতে পারে, তখন আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি,—এ মত অযৌক্তিক। স্বতন্ত্র প্রকৃতির ডিম্বাণুই অস্তিত্ব—গভীর সন্দেহা-কার্ণ।

২য়। নিষেক-প্রণালী।

এই মতাবলম্বীগণ বলেন—নিষেক প্রণালীর উপরই লিঙ্গ-পার্থক্য নির্ভর করে। অর্থাৎ ডিম্বাণু প্রতিষ্ট শুক্রাণুর সংখ্যার তারতম্য অনুসারেই জগৎের লিঙ্গ ভেদ ঘটিয়া থাকে। অধিক সংখ্যক শুক্রাণু প্রবেশ করিলে পুত্র এবং অল্প সংখ্যক প্রবেশ করিলে কঙ্কা জন্ম গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য এ মতটিও নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কেন না, ডিম্বাণুর প্রবেশ পথ এতদূর স্বল্প যে, অল্পবীক্ষণেই সাহায্য ভিন্ন তাহা দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু একটামাত্র শুক্রাণু প্রবেশ করিলেই সে পথ বন্ধ হইয়া যায়। যদি বৈষম্য একাধিক শুক্রাণু—ডিম্বাণুর সহিত লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহা অস্বাভাবিক উপ-পদ্ধিতে পরিণত হইয়া থাকে।

৩য়। নিষেক কাল।

এই মতের সিদ্ধান্ত—যদি একটা ডিম্বাণু ডিম্বকোষ হইতে নিঃসৃত হইয়াই শুক্রাণুর সহিত মিশ্রিত হয়, তবে তাহা পুরুষরূপে বিকশিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নূতন হইলে স্ত্রী এবং প্রাচীন হইলে পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এ মত উদ্ভিদ সম্বন্ধে খাটিতে পারে বটে, কিন্তু জীব সম্বন্ধে ইহা একেবারেই খাটেনা। ৪র্থ। জনক জননীর বয়স।

বিলাতের দুইজন বড় বৈজ্ঞানিক বহু দিন পরীক্ষা করিয়া এই তথ্যে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—যদি পিতা—মাতার চেয়ে বয়সে বড় হয়, তাহা হইলে সে দম্পতির কেবল পুত্র সন্তানই জন্মিয়া থাকে। আবার মাতা—পিতার চেয়ে বয়সে বড় হইলে তাহাদের সন্ততির মধ্যে অধিকাংশই কন্যা হইয়া থাকে। উভয়ের বয়স সমান হইলে,—কখন বা পুত্র কখনও বা কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। যুরোপের লোক এ মতের যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু এমতের সারবত্তা স্বীকার করিতে অক্ষম। এ মতটা সত্য হইলে—ভারতবাসীর গৃহে আর কন্যা ভূমিষ্ট হইত না। ভারত-বাসী—নিজের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠা নারীকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইলে এতদিন বাঙ্গালীর ঘরে আর মেয়ে জন্মগ্রহণ করিত না, গরীব-গৃহস্থকে কন্যাতার-কাতর হইতে হইত না, বর-পণের অত্যাচারে গৃহস্থকে সর্বস্বান্ত ভিখারী সাধিতে হইত না;—বাঙ্গালী জাতি তাহা হইলে পুরুষ-প্রধান জাতিতে পরিণত হইত।

৫ম। শারীরিক বল।

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে—যাহার দৈহিক বল অধিক, সন্তান-তাহার অনুরূপ লিঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বামী বলিষ্ঠ হইলে পুত্র এবং স্ত্রী বলিষ্ঠা হইলে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এ মতটাও নিতান্ত অমূলক। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, যক্ষ্মারোগ পীড়িতা মাতাই অধিক সংখ্যক কন্যা প্রসব করিয়া থাকে। আবার অতি ক্ষীণকায় পুরুষও—বহুসংখ্যক পুত্রের জন্মদাতা—ইহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব এ মতটাও সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

৬ষ্ঠ। মিলন স্পৃহা।

পুরুষের যদি স্ত্রীর সহিত মিলনে বেশী আগ্রহ থাকে, তবে পুত্রাদিক ঘটিবারই সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে পুরুষের সহিত মিলনে স্ত্রীর যদি অধিক স্পৃহা হয়—তাহা হইলে কন্যার ভাগই বেশী হইয়া থাকে। এ মতও সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেন বিশ্বাস হয় না—সে কথা প্রাচ্য-মত আলোচনার সময় বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

৭ম। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই পণ্ডিতগণের বিশ্বাস—স্ত্রীজাতি হইতে পুরুষজাতিই শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের মত—স্ত্রী জাতি অবিকাশিত পুরুষ বই আর কিছুই নহে। পুরুষের দেহের ও মনের যখন উচ্চ বিকাশ থাকে, অথচ মাতারও উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়—তখনই পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মাতা যখন দ্রব-অপূর্ণ-বিকাশ-সম্পন্ন—তখন কন্যা-সন্তানই জন্মিয়া থাকে।

কেন পুত্র বা কন্যা জন্মে, যে সম্বন্ধে পরীক্ষালব্ধ মতবাদ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) দৈহিক-হিসাবে জননীর শরীর ও স্নায়ুর প্রতিকূল অবস্থা, আহারের অপ্রাচুর্য্য, অপেক্ষাকৃত ব্যায়ামতা—ইত্যাদি অবস্থায় পুত্র এবং ইহার বিপরীত অবস্থায় কন্যা হইয়া থাকে।

(খ) জনন উপাদান হিসাবে অপৃষ্ট ডিম্বাণু অপেক্ষা পুষ্ট ডিম্বাণু দ্বায়ে পরিণত হয়। নূতন, পূর্ণাঙ্গন, সতেজ ডিম্বাণু হইতে কন্ডার উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

এই স্থানেই আমি পাশ্চাত্য-মত পরি-চয়্য করিয়া প্রাচ্যমতের অমূল্যবোধ করিব।

প্রাচ্যমতে—রজঃস্রাবের আরম্ভ দিবস হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত—স্ত্রীজাতির গর্ভ গ্রহণ কাল। এই গর্ভগ্রহণ কালের মধ্যেও আবার ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়ালী, বৈশ্যালী ও শূদ্রালী—বিশেষ নিয়ম ও বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল কথাই উল্লেখ নিম্নমোজন। অমূল্যবোধ পাঠক, আয়ুর্বেদ তন্ত্র ও স্মৃতি সংহিতা পড়িয়া দেখিবেন।

ঋষিগণ ঋতুমতী নারীকে অনেকগুলি নিয়মের অনধীন রাখিয়াছেন। সে নিয়ম-গুলি লঙ্ঘন করিলে অপত্য উৎপত্তির দোষ জন্মিয়া থাকে। যে নারী ঋষি রচিত নিয়মের শাসন মানিতে চাহে না, তাহার গর্ভস্থ জীব বিকৃত দোষগ্রস্ত হইয়া ভ্রূমিষ্ট হয়। ভারতের জগতত্ত্ব—বিরাট ও বিশাল, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা অসম্ভব। আমি কেবল অতি সংক্ষেপে তাহার আভাস দিব।

তন্ত্র বলেন—জরায়ুর মুখে সমীপণী, চাক্র মসৌ ও গৌরী নামে তিনটি নারী অবস্থিত, নির্ধিকৃত শুক্রাণু যদি সমীরণার মুখে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সন্তানোৎপত্তিই হয় না। 'চাক্রমসৌ'তে প্রবেষ্ট হইলে কন্যা এবং গৌরী-মুখে প্রবেশ করিলে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

ঋতুকালে—বৃষা-রাজে [ ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১২শ রাতিতে ] পুরুষ ভার্গ্যাতে উপগত হইলে পুত্র এবং অশ্লু-রাজে [ ৫ম, ৭ম, ৯ম ১১শ, ১৩শ রাতে ] উপগত হইলে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

শুক্রের আধিক্যে পুত্র ও আন্তবেয় আধিক্যে কন্যা জন্মিয়া থাকে। শুক্রাণুগণিত উভয় সমান হইলে নপুংসকের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার সুরতস্পৃহা অধিক—সন্তান তাহার স্বরূপ হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে।

গর্ভবস্থায় যে নারীর দক্ষিণ চক্ষু বৃহত্তর হয়, দক্ষিণ শুনে অগ্রে দুগ্ধ জন্মে, দক্ষিণ উরু একটু স্থূলতর হয়, মুখ ও বর্ণের প্রায়শঃ দোষা যায়, তাহা হইলে সে নারীর গর্ভে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিলে,—কন্যা জন্মবে বুঝিতে হইবে \*।

বারাহ্মণের আমি আয়ুর্বেদের অপত্য-তত্ত্বের আলোচনা করিব। আজ এই পর্য্যন্ত।

[ ক্রমশঃ ]

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়, এম এ।

\* হরে পুত্র ও কন্যা জন্মবার এইরূপ অনেকগুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

## আয়ুর্বেদে বায়ু ।

( তুলনা-মূলক আলোচনা )

( ১ )

পূর্বে আমরা বায়ু এবং নাভের পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঋষিগণ বায়ুর কার্য বলিতে বাহ্যিক বৃত্তিতে, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ তাহাকেই নাভের ক্রিয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা নাভের পীড়া এবং বাতব্যাধি সংক্রীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

অঙ্গ সঞ্চালন ( motion ) অনুভূতি ( Sensation ) পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য ( Functions of the special senses ) মানসিক-বৃত্তি ( Intellect ) এবং হর্ষ বিবাদ ও রাগ-বৈষাদির ( Emotions ) অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্তি হইলে শরীরে যে বিকার উপস্থিত হয়, প্রত্যেক চিকিৎসক ও স্ত্রীশিক্ষিত পণ্ডিতগণ তাহাকে নাভের পীড়া বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে 'নোটরনাত' সমূহ ( যে সকল নাভ দ্বারা সন্ধ্যারবের মাংসপেশী ও যন্ত্রসমূহের আকৃশন-প্রসারণ ক্রিয়া এবং অঙ্গচালনা সম্পাদিত হয় ) বিকৃত হইলে গাত্রস্তম্ভ, অসমবায় কাষ্য ( Incoordination ) প্রভৃতি উপদ্রব এবং 'সেন্সরি' বা প্রেরণ্যপ্রদায়ক নাভসমূহ ব্যাবিগ্রস্ত হইলে গাত্রম্প্রাপ্ত ( Anesthesia ) স্পর্শবেদ ( Hyperesthesia ) বেদনানুভূতি ( Analgesia )

এবং দ্রব্যসমূহের আকৃতি বিনিশ্চয়ে অক্ষমতা ( Asternognosis ) প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়।

কুণিত বায়ুর উপদ্রব বর্ণনায় চরক বলিয়াছেন—

“সন্ধোচঃ পরানাতঃ স্তম্ভোভস্কাহস্তাং পরানামপি রোমহর্ষঃ প্রলাপশ্চ পানিপৃথিবিরোগহঃ ॥

থাঞ্জাপাঙ্গুলাকুজ্জঃ শোথোহস্তানাম নিদ্রতা গর্ভস্তক রজোনাসঃ স্পন্দনং গাএশুগতা ॥

শিরোনাসাশ্চিজ্জনাং গ্ৰীবায়ান্চাপি হৃৎসম ভেদস্তোদোহস্তিরাক্ষেপো মুহুচ্চায়স এবচা”

শাস্ত্রকারগণ নিম্নলিখিত কারণগুলি গাত্রব্যাদি জনক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—

রক্ষণীতাল্লগযুগ-বাবায়তি প্রজাগরৈঃ ।

বিষমাতৃপচারাক্ত দোষাস্বক্সবগাদপি ॥

লজ্বনপ্রবনাত্যক্ষ-ব্যায়ামাদিবিচেষ্টিতৈঃ ।

ধাতুনাং সংক্ষয়চ্চিত্তা-শোকরোগাতি-

কর্ষণাং ॥

বেগসঞ্চারগাদামাদিভবাতাদভোজনাতঃ ।

মস্ত্রাবাধাঙ্গজোষ্ট্রাধ-লীজ্বনানাপত্যসনাং

দেহে শ্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িষ্যান্নোষণী

করোতি বিবিধান্ বায়োন্ সঙ্গদৈকাদ-

সংগ্রহান্ ॥

সে সকল উক্ত হইল না। কেবল আভাষ মাত্র দেখাইলাম। কেন না, ভ্রমের দৃষ্টি বুদ্ধিবার শক্তি বর্তমান লেখকের নাই। অপত্য তত্ত্ব সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের মন্তব্য সবিচারে আলোচিত হইবে। এই কতাদায়ের বিভ্রমের দিনে সে সকল কথা সকলেরই জানা উচিত।



পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও অতিশয় ক্লান্ত (Excessive Fatigue) অত্যধিকশ্রম (over exertion) আঘাত (Injury) ইত্যাদি হইতে শরীরকে অরক্ষিত রাখা (Exposure to cold and wet) অতিব্যায় (Sexual excesses) উচ্চ হইতে নিম্নে পতন (Falls) সূত্রাবদ্ধ (Retention of urine) রক্তস্রাব (Haemorrhage) মানসিক অশান্তি (Mental distress) অতিরিক্ত মত্তপান (Alcoholic indulgence) রাগ-দ্বেষ, ভয়-বিদ্বেষ ও শোকভয় (Emotions) প্রভৃতি বস্তু নাভের পীড়া উৎপন্ন হয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। কোন কোন রোগে হঠাৎ বাতব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে এবং বস্তুপ্রাণে যে বায়ুর অস্বাভাবিক বিকার প্রদীপিত হয়, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নাভের পীড়ার যে সকল কারণ ও উপদ্রব নির্দেশ করিয়াছেন, আয়ুর্বেদ-বিশারদ স্বাধিকার নিদ্ধারিত বাতব্যাধির হেতু ও উপদ্রবের সহিত তাহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

পক্ষেও বলিয়াছি এবং এক্ষণেও পুনরুল্লেখ করিতেছি যে, সামান্য অসামঞ্জস্যে আলোচ্য বিধের আবদ্ধ কতি-বৃদ্ধি হয় না। প্রতীচ্য-তত্ত্ব এবং ভৈষজ্য পাণ্ডিত্যের রোগ-নির্ণয়ের প্রণালীর সহিত ঐশ্বর্যদেবীর চিকিৎসা-বিধি ও ব্যাধিনিরূপণপদ্ধতি যে অঙ্গের অঙ্গের মিলিয়া যাইবে, একরূপ আশা করা সম্ভব নহে। দোষেতে হইবে,—ভাবগৌর চিকিৎসকগণ কর্তৃক ব্যাধাত এমন কোন ব্যাধি মানবসমাজের অমলগাধন করিতেছে কিনা,—পাশ্চাত্য চিকিৎসক-

গণ বাহার সম্বন্ধে এখনও পান নাই—অথবা প্রতীচিব পণ্ডিতগণ এমন কোন ব্যাধির অস্তিত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন কি না—বাহা আমাদের পুণ্যপুণ্যদিগের অগোচর ছিল।

চরক বাতব্যাধি সংখ্যা অশীতিপ্রকার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। একটিমাত্র প্রবন্ধে সকল প্রকার রোগের আলোচনা সম্ভবপর নহে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত বহুবলবান কয়েকটি রোগের আলোচনা করিয়া আমরা নার্ভেব পীড়া ও বাতব্যাধি ধর্ম একট প্রেক্ষীর রোগ তাহার দোষাচিতে চেষ্টা করিব।

১। আক্ষেপক।—সুশ্রুতমতে শরীরের ধমনীসকল কুপিত বায়ু কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া সুঃস্বভাব হইতে আক্ষিপ্ত কবে। এই আক্ষেপ-জানিত ব্যাধিই আক্ষেপক নামে অভিহিত হইয়াছে। আয়ুর্বেদে বিশারদগণ প্রকরণভেদে আক্ষেপক ব্যাধিকে চারি প্রেক্ষিতে বিভক্ত করিয়াছেন।

দণ্ডপাতনক ব্যাবিক্রিষ্ট রোগীর নব-শরীর দণ্ডের জায়ন্তক এবং তাহার একপ হস্তগ্রহ উপস্থিত হয় সে, যে অতিক্রান্তে স্নান-সেবন কাবতে পারে। আক্ষেপক রোগে শরীর ধনুর জায় নমিত হইলে তাহাকে ধনুস্তম্ভ কহে। ধনুস্তম্ভ দ্বিবিধ—অন্তরায়াম ও বাহরায়াম। যে ধনুস্তম্ভে শরীর সমুখের দিকে নমিত হয়, তাহাকে অন্তরায়াম এবং যাহাতে শরীর পশ্চাদ্ভিক্ষে নমিত হয়, তাহাকে বাহরায়াম বলে। চতুর্থ প্রকার আক্ষেপক অভিঘাতজ। বিজয়রক্ষিত অভিঘাতজ অর্থে ‘দণ্ডান্তিমিতকুপিত বাতজং’ বলিয়াছেন।

গঙ্গাধর দোষত্রয়ের প্রমত্ততা অনুসারে আক্ষেপকের প্রেক্ষা বিভাগ করিয়াছেন—

(গদাধরস্বাহ কপিত্তান্বিত ইত্যাদিনা নিমিত্তভেদেনাক্ষেপকাশচতুর্দ্বা চর্চিত, তদ্বৎ প্রকঃ কফাখতেন বাচেন, দ্বিতীয়ঃ পিত্তাখতেন, তৃতীয়ঃ কেবলেন, চতুর্থোহভিঘাতেনেতি—মপু কোষ।)

পাশ্চাত্যগণিতে 'মোটরনার্ড' সমূহের বিকার বণতঃ বিরুদ্ধকার্যকারী মাংসপেশী সকলের অতিক্রম আকৃশন-প্রণালী ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ইহারই ফলে অবয়ব সমূহ আক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়। মোটর নার্ভের বিকৃতি যে সর্বদাই অঙ্গসমূহকে আক্ষিপ্ত করে; তাহা নহে। কখনো কখনো কম্পন (rigor) স্পন্দন (fremors) ও কেবলমাত্র আকৃশন (Contraction) সম্পাদিত হয়।

প্রত্যচ্য চিকিৎসকগণ—ব্যাখ্যাত 'এপিলেপ্সি', 'হিষ্টেরিয়া' ও 'টিটেনাস্' প্রভৃতি রোগের লক্ষণ ও উপদ্রবের সাহিত আক্ষেপক ও তাহার প্রকরণ চতুর্দ্বয়ের সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। সুতরাং আমরা উক্ত ব্যাধিভ্রমের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক) Epilepsy (এপিলেপ্সি) — নার্ভের বিকার বণতঃ সংজ্ঞালোপ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। কখনো আক্ষেপ হয়, কখনো হয় না। যে শ্রেণীর Epilepsyতে সংজ্ঞা লোপ হয় কিন্তু আক্ষেপ হয় না—তাহাকে Pathifinal বলে এবং যাহাতে সংজ্ঞা লোপ ও আক্ষেপ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে Grandmal বলে।

অপরিস্রুত মস্তপান, অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবা, হস্তমৈথুন (masturbation) ভয় শোক, চিন্তা, অভিঘাত (injuries) এবং ক্রিমির (presence of worms in intestines) উপদ্রব বণতঃ Epilepsy উৎপন্ন

হয়। পিত্তামাণ্ড উন্মাদরোগগ্রস্ত অথবা অল্প কোন প্রকার নার্ভের পীড়া কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সম্ভাবনামূলক Epilepsy কর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে।

Grandmal অর্থাৎ যে এপিলেপ্সিতে সংজ্ঞা লোপ ও আক্ষেপ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, তদ্বারা আক্রান্ত হইবার অব্যবহিতপূর্বে রোগীর সর্বশরীর রিম্-রিম্ স্কিম্-স্কিম্ কবে, সে কোন বিষয়ে মনসংযোগ করিতে পারে না—পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী এবং ঘটনাসমূহ তাহাব নিকট প্রবৃত্ত ও অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। ব্যাপির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে এবং আগ্রহের বিজ্ঞান্য চেষ্টা না করিয়া বাগবিন্দু হরিণের গায় ভূমিকলে পতিত হয়। তাহার শরীরে মাংসপেশীসকল সঙ্কুচিত হইয়া মস্তক, গ্রীবা ও মেরুদণ্ড বক্রীভূত করে এবং বিষম চ্যুতস্ত লক্ষিত হয়।

বোগের দ্বিতীয় স্তরে মাংসপেশী সকল থাকিয়া থাকিয়া সঙ্কুচিত হয়। প্রথমতঃ শরীর কম্পন এবং পরে আক্ষেপ আরম্ভ হয়। কখনো কখনো রোগীর মুখ দ্বিধা রক্তিমিত্র গ্লোয়া নির্গত হয়।

'পেটিমল্' শ্রেণীর 'এপিলেপ্সি'তে আক্ষেপ পরিদৃষ্ট হয় না। রোগী সহসা চেতনা হারাইয়া পড়িয়া যায়।

(খ) Hysteria (হিষ্টেরিয়া)—এই ব্যাধিও নার্ভের বিকারবণতঃ উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ, লক্ষণ ও উপদ্রব অনেকটা 'এপিলেপ্সি'রই অনুরূপ। হিষ্টেরিয়া ও এপিলেপ্সিতে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত রোগে রোগীর বিশেষ কোন কার্য পরিহার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এপিলেপ্সিতে

সেদপ কিছুই দেখা যায় না। হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত লোককে তাহার অভিলষিত কার্যে বাধা দিলে, সে বল প্রকাশ করে। তাহার মুখের মাংসপেশী সমূহ সংকচিত হয় এবং মুখ দিয়া কেন নির্গত হয়; কিন্তু 'এপিলেপ্সির' ক্ষায তাহা রক্তমিশ্রিত থাকে না। মুদগল গাণ্ড অথবা রক্তবর্ণ ধারণ করে। ওষ্ঠ নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়—কিন্তু 'এপিলেপ্সির' ক্ষার মুখ পাংশুবর্ণ (cyanosis) ধারণ করে না। হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ বহুক্ষণস্থায়ী, এপিলেপ্সির আক্ষেপ স্বল্পস্থায়ী। হিষ্টিরিয়ার বহুস্তম্ভ পারিণামিত হয়—এপিলেপ্সিতে তাহা হয় না; তবে হিষ্টিরিয়া লক্ষণাক্রান্ত এপিলেপ্সিতে (Hystero-epilepsy) বহুস্তম্ভ হইয়া থাকে।

(গ) Tetanus (টিটেনাস)—শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে সেইস্থানে 'বাসিলাস্ টিটেনি' নামক এক প্রকার জীবাণু প্রবেশ করে এবং ক্রমে ঐ ক্ষতটাই পুষ্ট হয়। এটি জীবাণুচর্চক যে বিষ উদ্ভাবিত হয়, তাহাই 'নাভ' সমূহকে নিকৃত করে। এইজন্য

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিকে Infections disease বা জীবাণু-ছষ্ট-ব্যাধি পর্যায়-ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকেও নার্ভের পীড়া বলা যায়; কারণ অহিত আহাৰ-বিহার যেমন নার্ভ সমূহকে বিকৃত কবিয়া ব্যাধি উৎপাদন করে, তেমনই টিটে নাই' জীবাণু শরীরে বৃদ্ধি পাইয়া নার্ভসমূহকে বিকারগ্রস্ত করে। নার্ভের বিকার ব্যতীত আক্ষেপ প্রভৃতি হইতে পারে না।

হুগ্ৰহ, ধুস্তম্ভ ও আক্ষেপ—টিটেনাস্ রোগের প্রধান উপদ্রব। ধুস্তম্ভ যে প্রকার-ভেদে বহিরাগাম ও অন্তরাগাম উভয়বিধ হইয়া থাকে, তাহা প্রতীতির চিকিৎসকগণও নির্দেশ করিয়াছেন এবং অঙ্গসমূহ যে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়—তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বর্ণিত এই ত্রিবিধ ব্যাধির সহিত আক্ষেপ ও তাহার প্রকরণ চতুষ্ঠয় তুলনা করিয়া আমরা যাহা দেখিলাম নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে সন্নিবেশ করিলাম;—

পাশ্চাত্য ব্যাধি	মত ব্যক্ত উপদ্রব	আয়ুৰ্বেদোক্ত উপদ্রব	ব্যাধি
Grandmal বা আক্ষেপমুক্ত এপিলেপ্সি	মেরুদণ্ড ও গ্রীবা বক্রীভূত, আক্ষেপ, হুগ্ৰহ, সংজ্ঞা লোপ ইত্যাদি	তদাক্ষিপত্যন্ত মুহুমুহুদেহঃ মুহুশ্চরঃ	আক্ষেপক
Hyster- Epilepsy বা	হুগ্ৰহ, দীর্ঘকালস্থায়ী আক্ষেপ, ধুস্তম্ভ ইত্যাদি।		

পাশ্চাত্য ব্যাধি	মত ব্যক্ত উপসব	আয়ুর্বেদোক্ত উপদেয়	ব্যাধি
হিষ্টিরিয়া লক্ষণাক্রান্ত এপিগেপসি			
Petitmal বা আক্ষেপ বিশীন এপিগেপসি	হলুগ্রহ, আড়ষ্ট দেহ, সংজ্ঞালোপ ইত্যাদি।	দন্তুবৎ শুভ্রাতি কুচ্ছো দণ্ডাপানকঃ। হলুগ্রহ সংশ্লিষ্ট ক্রান্ত কুচ্ছাচরণভাষণম।	দণ্ডাপানকঃ
টিটেনাস্	হলুগ্রহ আক্ষেপ, ধনুশূল—বহিরায়াম ও অন্তায়াম ইত্যাদি	ধনুশূল্যং নমোর যন্ত সং ধনুশূল্য সংজ্ঞকঃ অভ্যন্তরং ধনুরিব যদা নমতিমানবম্ তদা- সাহি ভ্যন্তরায়ামং। বাহ্যায়াম প্রতানন্তো বাহ্যায়ামং করোতি চ।	ধনুশূল্য। অন্তায়াম বহিরায়াম

২। পক্ষাঘাত—কুপিত বায়ু অধঃ  
উর্দ্ধ ও তির্গাকগামিনী ধমনী সমূহকে এক-  
কালে বিকৃত করিলে যে ব্যাপার প্রকোপ  
হয়, স্পষ্টত তাহাকে পক্ষাঘাত বলিয়া নির্দেশ  
করিয়াছেন :—

“অধোগম্যঃ সতিষ্ঠ্যগগা ধমনীরাঙ্কদেহগাঃ।  
যদা প্রকুপিতোহত্যর্থঃ মাত্রিধা প্রবত্ততে ॥  
তদাত্ততরপক্ষাঘাতং সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্।  
হস্তি পক্ষং তমাহুর্হি পক্ষাঘাতং ত্রিযধরাঃ ॥

এই ব্যাধিতে শরীরের যে দিকের বায়ু  
প্রকুপিত হয়, তদ্বিপরীত দিক অক্ষমণ্ড ও

অসাড় হওয়া যায়। পক্ষাঘাত সম্বন্ধে চরকে  
উক্ত হইয়াছে—

“হস্তৈকং মাকতঃ পক্ষং দক্ষিণং বামমেব বা।  
কুর্ঘ্যাদ্ভেষ্ঠানিবৃতিং হি ক্রজং বাকন্তস্তম্বেব চ ॥  
গ্রহীত্বা বা শরীরাক্ষং শিরাস্চায়ুঃ বিপোষা চ।  
পাদং সন্ধোচয়তোকং হস্তং বা তৌদশূণম্ ॥  
একাদ্র রোগং তং বিভ্রাৎ সন্ধাঙ্গং সন্ধদেহম্

অতরাং একাঙ্গগত হইতে পারে, আবার  
সন্ধাঙ্গগত অথবা অঙ্গশরীর গত হইতে  
পারে। অঙ্গশরীর গত পক্ষাঘাত সম্বন্ধে  
মধুকোষ টাকার বিজয় রক্ষিত বর্ণিত আছে।

অঙ্গমিতি অঙ্গমর্যাদয়া অঙ্গনারীশ্বর বঃ ।  
পক্ষং বাতকক্ষ পাশ্বাদিভাগঃ ”

পাশ্চাত্যমতে কোন কোন নার্ভের  
বিভাববশতঃ উৎপন্ন ব্যাধিতে মাংসপেশী-  
সমূহ আড়ষ্ট হয়, অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা লুপ্ত  
হয় এবং স্পর্শজ্ঞান বিরহিত হয়। যে ব্যাধিতে  
এই সব উপদ্রব লক্ষিত হয়, তাহাকে তাঁহার  
‘প্যারালিসিস্’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।  
পার্শ্বের চিকিৎসকগণও প্যারালিসিস্কে  
একাদ্ধগত, সমাদ্ধগত এবং অর্দ্ধশরীরগত  
এই ত্রয় বর্ণনা করিয়াছেন, যথা ‘হেমিপ্লেজিয়া’  
বা অর্দ্ধশরীরগত, ‘প্যারাপ্লেজিয়া’ বা সর্ক-  
শরীরগত এবং ‘মনোপ্লেজিয়া’ বা একাদ্ধগত  
প্যারালিসিস্। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ  
গবেষণা দ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়াছেন।  
এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না  
হওয়া সত্ত্বেও প্যারালিসিসের বিশেষ গুণ  
বিশিষ্ট (Typical) উদাহরণ স্বরূপ একটি  
মাত্র ব্যাধির আলোচনা কারব।

পাশ্চাত্যমতে Facialnerve (যে নার্ভ-  
দ্বারা মুখের যাবতীয় কার্য সম্পাদিত হয়)  
ক্ষিত হইলে মুখাঙ্গের সকল প্রকার কর্ম-  
শক্তি লুপ্ত হয়—ললাট-রেখা অদৃশ্য হয়—  
চোখের চক্ষু স্তম্ভ ও আবিলম্ব ধারণ  
করে—অক্ষিপল্লবদ্বয় নিম্নীলিত করা যায়  
না,—ওষ্ঠ বক্রীভূত হয় এবং বাক্‌সঙ্গ উপস্থিত  
হয়। নাসিকার মাংসপেশী সমূহ আড়ষ্ট হয়  
বলিয়া রোগী হাঁচিতে পারে না—তাহার  
জিহ্বা সমুৎক্ষিপ্ত হয় এবং কখনো কখনো  
তাহার শ্রবণশক্তিও লোপ পায়। প্রতীচ্য  
চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিকে Paralysis of  
the Seventh Nerve অথবা ‘বেলস্প্যালিস’  
নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আয়ুর্বেদে অর্দ্ধিত রোগের যে সকল  
লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে তাহার সহিত  
প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ বিবৃত Bells Palsy  
র লক্ষণ ও উপদ্রবের সম্পূর্ণ ঐক্য পরিলক্ষিত  
হয়। অর্দ্ধিত রোগ সম্বন্ধে চরকে উক্ত  
হইয়াছে—

“অতিবুদ্ধঃ শরীরাক্রমেণ বায়ুঃ প্রাপ্ততে ।  
যদাতিদোপশোষাত্মক বাহ্যং পাদঞ্চ কানুচ  
তান্নন সন্ধোচয়ত্যাক্তে মুখং জিহ্বাং কেরোতিচ  
বক্রীকরোতি নাসাক্র ললাটাক্ষিহ্নুঃ তথা ।  
ততো বক্রং ব্রজত্যাগ্তে ভোজনম্ বক্র-  
নাসিকম্ ।

স্তব্ধং নেত্রং কণ্ঠয়তঃ ক্ষাণ্ডে নিগৃহতে ॥

দীনা জিহ্বা সমুৎক্ষিপ্তা বালা সজ্জতি

চাত্তবাক্

দন্ত্যশচলন্তি বধোতে শ্রবণৌ ভিত্ততে স্বরঃ ॥

পাদহস্তাঙ্কিজ্জৈরুশ্রবণগুণকৃৎ ।

অন্ধে তান্নন মুখাঙ্কে বা কেবলেশতঃ

তদর্দ্ধিতম্ ॥

অর্দ্ধিত ও অর্দ্ধিত রোগের উল্লিখিত উপদ্রব  
সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু চরকের  
সাহিত্যে বিষয়ে অর্দ্ধিতের মতভেদ লক্ষিত  
হয়। চরক অর্দ্ধিত রোগ অর্দ্ধশরীর ব্যাপ্ত  
এবং উহাতে পাদহস্তাঙ্কিজ্জৈরুশ্রবণগুণকৃৎ  
পর্ষ্যন্ত প্রকৃতি হইতে পারে বলিয়া নির্দেশ  
করিয়াছেন। অর্দ্ধিতের মতে অর্দ্ধিত রোগ  
কেবলমাত্র বস্ত্রাঙ্ক ও গ্রীবাদেশের পীড়া  
মাধবকার অর্দ্ধিতের পোষকতা করিয়া ভদীর  
সংগ্রহে তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—  
“উক্লেব্যাংহরতোহত্যর্থঃ খানতঃ কঠিনানিহা  
হসতো জন্ততো বাপি-ভারাবিষমশারিনঃ ॥  
শিরোনাসানোষ্ঠচিবুক-ললাটেকণশক্তিগঃ ।  
অর্দ্ধিতানিলো বক্র-বক্রিতঃ শরীরতঃ ॥

বক্রীভবতি বক্রাঙ্গিঃ গ্রীবা চাপাপবর্ততে।  
শিরশ্চলতি বাকসঙ্গো নেত্রাদীনাক্ষবৈকৃতম্ ॥  
গ্রীবাতিবুকনস্তানানং তন্মিন পার্শ্বে চ বেদনা।  
যন্তাগ্রাণো রোমহর্ষো বেপুথর্নেত্রমাবিলম্।  
বায়ুরুদ্ধঃ স্বচি স্বাপস্তোদো মন্তাহুগ্রহঃ।

তমর্দিতমিতি প্রাহুর্বাণিঃ ব্যাবিচক্ষণাঃ ॥”  
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সূক্ষ্ম চর-  
কোক্ত “অর্দ্রে তন্মিন্ মুখার্দ্রে বা কেবলং  
জ্ঞাতং তদা দিতম্” সংজ্ঞার পোষকতা  
করেন নহে। এই মতবৈষম্য সংক্ষেপে মধুকোষ  
টীকায় বিজয়রক্ষিত লিখিয়াছেন—তন্ত্রান্তরে  
তু মুখাবর্দ্ধবজ্ররীরাঙ্কব্যাপকোহিপাদিত যদাহ  
দৃঢ়বলঃ “অর্দ্রে তন্মিন্ মুখার্দ্রে বা কেবলজ্ঞাত  
মর্দিতং ইতি। নহু যন্তেবং তদা অদিতাং  
অঙ্গাঙ্গবাতয়োঃ কো ভেদঃ? উচ্যতে, বেগি-  
তেনাদিতে কদাচিবেদনা ভবতি, অঙ্গাঙ্গবাত  
তু সর্বদৈবেতি ভেদঃ, অথবা যথোক্ত সন্-  
লিঙ্গোহর্দিত-স্তম্বিপন্নীতস্বর্দ্ধাঙ্গবাত ইত্যাহঃ।”

পাশ্চাত্য মতে এই ব্যাধি কেবল মাত্র  
মুখার্দ্রে ও হইতে পারে—আবার অঙ্গাঙ্গর  
ব্যাধিও হইতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রেও  
দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচ্য  
ও পাশ্চাত্য মতে কোন পার্থক্য লক্ষিত  
হইতেছে না।

৩। গৃধ্রসী।—পায়ের গোড়ালী  
এবং অঙ্গুলি সমূহকে আশ্রয় করিয়া যে সকল  
বস্তু আছে, তাহা বায়ু কর্তৃক বিকৃত  
হইলে পদব্রয়ের চালনা কষ্টকর হইয়া উঠে।  
সূক্ষ্ম এই ব্যাধিকে গৃধ্রসী আখ্যা প্রদান  
করিয়াছেন।

চরকের মতে গৃধ্রসী রোগে প্রথমতঃ নিতম্ব-  
ঘ্নে শূল, তোদ, স্তম্ব এবং মুহুমূহঃ স্পন্দন  
অমুভূত হয়—ক্রমে উহা প্রসারিত হইয়া কটি

গৃষ্ঠ, উরু, জাহ্নু, জস্তা এবং পদব্রয় আক্রমণ  
করে।

“ক্ষিক পূর্বা কটিপৃষ্ঠোক্ত জাহ্নুজস্তাপদংক্রমাৎ  
গৃধ্রসী স্তম্বককতোদৈ গজ্জাতি স্পন্দতে মুহঃ ॥  
পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ sciatica নামক  
ব্যাধির উপদ্রব সম্বন্ধে বলেন যে, প্রথমে  
উরুর পশ্চাত্মদেশে বেদনার অমুভূতি হয়  
এবং ক্রমে বেদনা তীক্ষ্ণ হইয়া সমগ্র পদদেশ  
ব্যাপিয়া যাতনার সৃষ্টি করে।

টেইলর এই ব্যাধিজাত বেদনাকে  
burring and gnawing ( শূল ও তোদ )  
বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন  
যে, এই ব্যাধির প্রেকোপে কখনো কখনো  
মাংসপেশীর স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়।  
কখনো কখনো এই শ্রেণীর বাতব্যাধি  
মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ গর্ভকেজ্রকে পর্য্যন্ত  
বিকৃত করে।

৪। কলায়থঞ্জ।—পাশ্চাত্য মতে  
নার্ভের পীড়াজনিত অব্যবাহিত গতিকে  
( Inco ordination ) লোকোমোটর এটা-  
বন্দী বলে। এই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত  
হইলে রোগী অঙ্গকারে শরীরের সাম্যাবস্থা  
সংরক্ষণ করিতে পারে না। চলিবার সময়  
তাহার দৃষ্টি নিম্নাদিকে সংবদ্ধ থাকে—শরীর  
সম্মুখে যুঁকিয়া পড়ে এবং সে পদব্রয় অপেক্ষা-  
কৃত অধিক ব্যবধানে স্থাপন করে। পদ  
বিক্ষেপকালে তাহার শরীর কম্পিত হয়  
এবং পদাহরূপ স্থানে পদস্থাপন করিতে  
পারে না। চলিতে চলিতে সহসা গতি  
পরিবর্তনের চেষ্টা করিলে সে ঘুরিয়া মাজিতে  
পড়িয়া যায়।

সূক্ষ্ম এইরূপ ব্যাধিকে কলায়থঞ্জসী  
প্রদান করিয়াছেন।

“প্রক্রামন বেপতে যন্ত খঞ্জনিব চ গচ্ছতি।  
কলায়খঞ্জঃ তং বিদ্যানুক্রসন্ধি প্রবন্ধনম ॥  
মধুকোষে বিজয় রক্ষিত বলিয়াছেন—  
“প্রক্রামনিত গমনমারভমাণো বেপতে।  
প্রশন্দোহয়ঃ আদিকর্ম্মণি। খঞ্জনং ব গচ্ছতি  
বিকলয়নীব গচ্ছতি, গমনারম্ভবেপনেন  
গজাদন্ত ভেদঃ।”

আমরা বিভিন্ন প্রকারের এই চতুর্বিধ  
বাত্যাধির আলোচনা করিয়া দেখিতে  
পাছলাম যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-তত্ত্বে বর্ণিত  
নাভের পীড়া এবং আয়ুর্বেদোক্ত বাত ব্যাধি  
সমূহ বস্তুতঃ পক্ষে একই শ্রেণীর রোগ।  
বাত্যাধি বিবেচনায় এবং পাঠকবর্গের বিরক্তি-  
ভঞ্জন হইবার আশঙ্কায় অত্যন্ত বাত ব্যাধির  
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। বায়িসা  
বাকস্বস্ত, খাজা দৃষ্টিনাশ, অববাহক  
বিখাচী এবং মলমূত্রের বিবন্ধ প্রভৃতি যে  
নাভের বিকারবশতঃ হইয়া থাকে, সে  
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সাক্ষিহস্তপ্রবণপুন্নে আমাদের পূর্ব-  
পূর্বগণ অপূর্ণ সাধনার বলে যে তথা  
সমূহেব আবিষ্কার দ্বারা মানব সমাজের  
অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, শত  
শত শতাব্দীর প্রতীচির চিকিৎসকগণ  
আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহারই পুনঃ-  
প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। ইহা পাশ্চাত্য  
জাতি সমূহের জ্ঞানোন্নতির নিদর্শন হইতে

পারে সত্য, কিন্তু ফলমূলসেবী ভারতীয়  
ঋষিগণ পূর্বে যে জ্ঞান প্রচার করিয়া  
গিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতর উন্নত কিছু  
সন্ধান না পাইলে কেমন করিয়া বলিব  
যে, পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-তত্ত্ব বিশ্বমানবের  
জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে।

এমন গভীর সাধনা, এত অর্থব্যয়, দ্বিরী  
লইয়া এত বাদ প্রতিবাদ করিয়াও তাঁহারা  
বিশ্ববাসীকে নূতন কিছু শিখাইতে পারিয়া  
ছেন, বলিয়া আমরা মনে করিতে পার না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শস্ত্রো-  
প্রচার বিধি পাশ্চাত্য চিকিৎসা তত্ত্বের একটি  
অভিনব আশ্চর্য্য বাবস্থা। কিন্তু তাহাতেও  
নূতনত্ব কিছুই নাই।

ঋষিগণ বর্ণিত সেই (১) শিরাবাধন,  
(২) উদরপাটন, (৩) অন্ত্রছেদন, (৪)  
নাসাকর্ণোষ্ঠ বন্ধন, (৫) দোষোদকনিষ্কাশন,  
(৬) অশ্মরী আকর্ষণ, (৭) মুটগর্ভ শল্যোদ্ধ-  
রণ প্রভৃতিই (১) Venesection, (২)  
Laparotomy, (৩) Operations on the  
Intestines, (৪) Plastic operations,  
(৫) Tapping, (৬) Lithotomy, (৭)  
Embryotomy প্রভৃতি নূতন নামে,  
নবীন মুর্ত্তিতে আমাদেরকে বিম্বিত করিয়া  
তুলিয়াছে।

এ সবই যে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। \*

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

\* পুরাতনের পুনরাবৃত্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু ঋষি প্রচারিত সেই শল্য চিকিৎসা যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎ-  
সক সমাজ হইতে একবারে লুপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আমাদেরই পুরাতন জিনিসকে যে  
আমাদের সমুখে নূতন করিয়া ধরিতেছেন, তদ্বশে আমরা বিম্বিত না হইলেও তাহা দেখিয়া আমাদের  
শিখির বিষয় যে যথেষ্ট রহিয়াছে। শুধু মুখে আমাদের অতীত পৌরবের স্মৃতি আনিয়া স্ব-  
থাকিলে চলিবে না, সেই সব লুপ্ত বিষয়ের পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে জাগরিত হইতে হইবে। অতীত  
আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এইজন্যই করা হইয়াছে। আংগং।

## আয়ুর্বেদ-সমস্যা

( ২ )

এইবার আমরা ঔষধের মাত্রা লইয়া আলোচনা করিব। আয়ুর্বেদের গ্রন্থাদিতে প্রায় সর্বত্রই ঔষধের একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত আছে; এই মাত্রার হিসাবে ঔষধাদি প্রস্তুত করাই যে আবিষ্কারাদিগের অভিপ্রেত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। মাত্রার পরিমাণ সর্বত্রই নির্দিষ্ট, উহা সের প্রতি বা তোলা প্রতি এত, এইরূপ হারাহারি হিসাব নহে। কিন্তু আমি অনুসন্ধান জানিতে পারিয়াছি, এদেশে বর্তমান হইতে মাত্রা-ব্যতিক্রমের বিধান চলিয়া আসিতেছে, নির্দ্ধারিত তালিকার হারাহারি করিয়া কেহ বা কম, কেহ বা বেশী মাত্রায় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এরূপ মাত্রা-ব্যতিক্রমের ফল-বৈষম্য ঘটে কি না, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। পাকের ঔষধে মাত্রা-ব্যতিক্রমের সঙ্গে অগ্নিতাপের বিভিন্নতা অবশ্যস্বাভাবী; দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝাইয়া বলিতেছি; মনে করুন, মহামার তৈলের পূর্ণমাত্রায় মাষ-কলাই ৪ সের, দশমূল ৬৭ সের, ছাগ-মাংস ৩০ পল, ৬০ সের জলে জ্বাল দিয়া ১৬ সের থাকিতে কাথ গ্রহণ করিতে হয়; এহ রূপে ধরুণ হইবে, কেহ যদি অদ্ধমাত্রায় ঔষধ গ্রহণ করিয়া ৩০ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ৮ সের কাথ গ্রহণ করেন, অথবা বিগুণ মাত্রায় ১২৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৩২ সের কাথ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই কাথ ঠিক তেমন হইবে কি না, কে বলিতে পারে? ঋষিকল্প আয়ুর্বেদাচাৰ্য্যগণ বিজ্ঞানে অগাধ অধি-

কারের বলে যে মাত্রা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহার একটা গভীর রহস্য আছে। আমি অনেক প্রণীণ চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি, পূর্ণমাত্রার ব্যতিক্রম করিলে ঔষধ তেমন ফলপ্রদ হয় না। বস্তুতঃ এইরূপ মাত্রার কোন অর্থ না থাকিলে, বিভিন্ন ঔষধের বিভিন্ন মাত্রা (যেমন ত্রিশকো-প্রসারণী তৈল ৮ সের, কুজপ্রসারণী ১৬ সের, অষ্টাদশশতিকপ্রসারণী ৬৪ সের) নির্ণয় করা হইয়াছে কেন? যাহা হউক ঔষধের মাত্রার সহিত ফলের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, এ বিষয় দ্বারভাবে বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক মণ্ডলী যদি তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সাধারণ্যে প্রচার করেন, তাহা হইলে দেশে বিশেষ কল্যাণ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

### ঔষধের উপাদান-বৈষম্য—

সামান্য অভিজ্ঞতার ফলেই এমন অনেক ঔষধের পরিচয় আমি পাইয়াছি, যে সকলের বিভিন্ন প্রকার উপাদানের তালিকা দেশে প্রচলিত আছে। একই ঔষধের ২৩০ রকম তালিকার কথা বোধ হয়, চিকিৎসক মণ্ডলীর অবদিত নহে; আমি কোন কোন ঔষধের ৪৫ টি তালিকাও দেখিয়াছি। একই ঔষধ বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত হইলে, উহার ফল কখনই একরূপ হইতে পারেনা। এই উপাদান-বৈষম্য দর্শনেই আয়ুর্বেদীয় ঔষধের আলোচনায় আমার মনোযোগ অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। একবার আমি কলিকতা



দর্শনশূন্য প্রস্তুত করা হইবার প্রয়োজন হইয়াছে, কবিরাজদিগের নিকট উহার প্রস্তুতপ্রণালীর সন্ধান লইয়া আমি দুই বকম তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । একজন কবিরাজ আমাকে যে তালিকা দিলেন, তাহাতে স্বর্ণ ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা, এবং গন্ধক ১৬ তোলা ছিল; অপর এক জনের প্রদত্ত তালিকায় স্বর্ণের পরিমাণ ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা এবং গন্ধক ৮ তোলা। এই পার্থক্য দেখিয়া আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে স্বর্ণসিন্দূরের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই; দেখিলাম, ভৈষজ্য রত্নাবলীতে স্বর্ণসিন্দূরের যে বচন আছে, তাহার সহিত উল্লিখিত তালিকাদ্বয়ের একটারও মিল নাই। এখনেই আমার আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদিসম্বন্ধে আলোচনার সুত্রপাত হয়, এবং তৎফলে নানাপ্রকার সমস্যা আমার মনে জাগিয়া উঠে। তদবধি আমি আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুত করা হইতে প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছি। এবং ঔষধাখ্য অমূল্যসন্ধানের ফলেও সন্তুষ্ট হইতে পারি না। যাহা শুদ্ধ, আমি অমূল্যসন্ধানের উপর স্বর্ণসিন্দূরের নিয়মিত দুইটি পৃথক বচন, এবং একটা বাঙ্গালা তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি:—

১। “পলং রসেন্দ্রস্য চ গন্ধকস্ত্রয়োহপি কৰ্ম্মণিগৃহ্য সম্যক।” অর্থাৎ—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও স্বর্ণ ২ তোলা।

২। রসগন্ধকয়ো গ্রাহং পলং হেমঃ কোলস্তথা। অর্থাৎ—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা।

৩। পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা এবং স্বর্ণ ১ তোলা।

মাধ—৩

এই তিনটি তালিকার পার্থক্য পাঠক স্পষ্টই দেখিতেছেন। শেযোক্ত তালিকায় শাস্ত্রধরের মান পরিভাষা অবলম্বনেই বোধ হয় এইরূপ পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় স্বর্ণের ভাগ যথাক্রমে ২ তোলা ও ১ তোলা। আমি অমূল্যসন্ধানের জানিয়াছি, এদেশে এই দ্বিতীয় তালিকা অমূল্যসন্ধানের স্থলে স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত করা হয়; কিন্তু বর্তমান যুগে একজন প্রধান কবিরাজ আমাকে বলিয়াছেন,—স্বর্ণ ২ তোলা দ্বারা স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত করার ফলে অনেক অধিক হইয়া থাকে।

বসন্তকুসুমাকর একটা প্রধান ঔষধ। এ পদার্থ এই ঔষধের চারিটি তালিকা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। প্রত্যেক তালিকাতেই কিছু কিছু পার্থক্য বিজ্ঞমান আছে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের রসায়নাধিকারোক্ত এবং ভৈষজ্যরত্নাবলীর প্রমেহাধিকারোক্ত বসন্তকুসুমাকরের এক উপাদান হটপেও ভাবনাতে পার্থক্য আছে; যথা—রসেন্দ্রসারসংগ্রহে—“মালত্যাঃ কুঙ্কমোদকৈঃ”, ভৈষজ্যরত্নাবলীতে—“মালত্যাঃ কুঙ্কমেন চ।” পরন্তু যোগরত্নাবলীর বচনে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভৈষজ্যরত্নাবলীর রসায়নাধিকারোক্ত বসন্তকুসুমাকরেও অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহ এবং ভৈষজ্যরত্নাবলী দুই মন্থাভ্ররসের বচনেও পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম গ্রন্থে রস ও গন্ধকের মাত্রা ২ তোলা [ রসগন্ধকয়ো গ্রাহং কৰ্ম্মমেকং ] এবং কপূর অর্দ্ধ তোলা ( কপূরং শাগকং ) কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থের রস ও গন্ধকের মাত্রা

৮ তোলা (রসগন্ধকযেগ্রাহং পলমেকং) এবং কর্পূরের মাত্রা ১ তোলা (কর্পূরং তোলকং দত্তাং)। বৃহৎ কস্তুরী ভৈরবেরও দুইটা তালিকা আমি দেখিয়াছি; একটি ১৪ পদী এবং আর একটি ১৮ পদী।

বহু ঔষধেরই এইরূপ উপাদান-বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঐদৃশ উপাদান-বৈষম্যে যে ফলবৈষম্য নিশ্চয়ই হয়, তাহা কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না। এখন এই সকল বিভিন্ন তালিকার মধ্যে কোন্ তালিকাভূমায়ী ঔষধ অধিক ফলপ্রদ, দেশের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ যদি ধীরভাবে তাহার আলোচনা করিয়া সুমোমাংসায় উপনীত হইতে পারেন তাহা হইলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর একটি গুরুতর অভাব অপসারিত হইবে।

**ঔষধপ্রস্তুত-প্রণালী**—আয়ুর্বেদীয় তৈল, ঘৃত, বটিকা প্রভৃতির প্রস্তুতপ্রণালীতে ও আমি স্থানেস্থানে অনেক পার্থক্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি; দৃষ্টান্তস্বরূপ তৈলপাকের প্রণালী এ স্থলে উল্লেখ করা বাইতে পারে। এ অঞ্চলের অনেক স্থানে মূর্ছাপাকের পরই তৈলে কঙ্কদ্রব্যাদি প্রদত্ত হয়, এবং তৎপর ঐ কঙ্কদ্রব্যযুক্ত তৈলে কাথ পাক করা হইয়া থাকে; কিন্তু অনেক স্থানে আবার মূর্ছাপাকের পরই তৈলের সহিত কাথ পাক করিয়া, সেই তৈলে কঙ্কদ্রব্য প্রদানপূর্বক জলসহ কঙ্ক-পাক করা হয়। ঐ উভয় প্রণালীতে পক তৈল কখনই একরূপ ফল-প্রদ হইতে পারেনা। ঔষধপ্রস্তুত-প্রণালীতে যখন এইরূপ বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তখন চিকিৎসকগণ তৈল ঘৃত, বটিকা প্রভৃতি প্রস্তুতের একটা সাধারণ নিয়ম

নির্ধারণ করিয়া যদি সাধারণে প্রচার করেন, তাহা হইলে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের রোগপ্রতিকার-ক্ষমতা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইতে পারে।

**জারিত ধাতু**—স্বর্ণ, লৌহ ও অল্প এই তিনটি প্রধান ধাতুর জারণ ও মারণ সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশ প্রচারিত হওয়া আবশ্যিক; এ কাণ্ডে নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। শাস্ত্রাহুসারে লৌহ ও অল্প অস্বতঃ শতপুটিত না হইলে বাবহারের যোগ্য হয় না; কিন্তু অনেক চিকিৎসক আমার নিকট সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন, ভালরূপ ২০২৫ টা পুট হইলেই লৌহ ও অল্প বাবহারের যোগ্য হয়, আজকাল সাধারণতঃ যে সকল লৌহ ও অল্প বিক্রয় হয়—তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বড় বেশী ‘পুটের’ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বাহা হউক এই লৌহ এবং অল্পই যখন আয়ুর্বেদীয় ঔষধের এক প্রধান উপাদান, তখন এ সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমি চিকিৎসকদিগের নিকট নিবেদন করিব, আমি জনৈক প্রবীণ চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি, হীরাবস হইতে ১০১৫ পুটের নাকি অতি উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হইতে পারে, এবং তদ্বারা প্রচলিত লৌহ অপেক্ষা নাকি অধিক ফল পাওয়া যায়। চিকিৎসকগণ ইহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঢাকার একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক আমাকে সম্প্রতি জানাইয়াছেন, পল্লী ও চতুর্ধণ এই দুইটা ঔষধে তিনি জারিত স্বর্ণ অপেক্ষা কাঁচা সোনা মিশ্রিত কঙ্কাদি ব্যবহার করিয়া

অনেক অধিক ফল লাভ করিয়াছেন । বংশ-  
পরম্পরা ব্যবহার দ্বারা এইরূপ কাঁচা সোনার  
গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া তিনি  
বলিলেন । আয়ুর্বেদীয় উন্নতির নিমিত্ত  
চিকিৎসকদিগকে আমি ইহাও পরীক্ষা করিয়া  
দেখিতে অনুরোধ করি ।

দ্রুত—আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের জ্ঞান  
নূতন কি পুরাতন দ্রুত ব্যবহার করা কর্তব্য,  
সে সম্বন্ধে এক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত  
হইয়াছে । আজকাল দেখা যায়, অনেকেই  
নূতন দ্রুত ঔষধার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন ।  
কিন্তু ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালীতে শাস্ত্রকার  
স্পষ্টবাক্যে নির্দেশ করিয়াছেন—

ঔষ্যগাভিনবালোব প্রাণস্তানি ক্রিয়াবিধৌ ।

যতে গুড় দ্রুত ক্ষৌদ্র ধাতু কৃষ্ণা বিড়ম্বতঃ ॥

একপ স্পষ্ট নিষেধ বাক্য সত্ত্বে নূতন দ্রুত  
ব্যবহৃত হইতে পারে কিরূপে, তাহা বুঝিয়া  
উঠা কঠিন । চরক, হারীত, সূত্রক, বাগ্‌ভট  
চক্রপাণি প্রমুখ আয়ুর্বেদাচার্যগণ পুরাতন  
দ্রুতের অশেষ গুণ বর্ণন করিয়াছেন । এস্থলে  
আমি মহর্ষি হারীতের বচনটা মাত্র উদ্ধৃত  
করিতেছি :—

সর্পিঃ পুরাণং বিজ্ঞেয়ং দশবর্গস্থিতং তু যং ।

সর্পিঃ পুরাতনং শ্রেষ্ঠং ত্রিদোষতিমিরাপহম ॥

মূর্ছা-কুষ্ঠ বিবোম্বাদগ্রহাণ্মারনাশনম্ ।

দশ সৎসরাদৃকং আজ্যমুক্তং রসায়নম্ ॥

শতবর্গস্থিতং যন্ত কুস্তসর্পিঃ স্তুতম্ ॥

রকোদ্রঃ কুস্তসর্পিঃ স্তাব পরতস্ত মহাব্রতম্ ।

পেয়ঃ মহাব্রতভূতৈঃ সর্কতোহপি গুণাধিকম্ ।

ইথা বণা জরঃ যাতি গুণবৎ স্তাব তথা তথা ।

এখানে দেখা যায়, দশ বৎসরের না হইলে

তাকে পুরাতন বলা যায় না এবং দশ

বৎসরের অধিক পুরাতন হইলেই দ্রুত রসায়ন

গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে । শত বৎসরের  
অধিক সময়ের পুরাতন দ্রুত সর্কোপেক্ষা  
অধিক গুণযুক্ত ; ফলতঃ দ্রুত যত অধিক  
পুরাতন হইবে, উহার উপকারিতাও তত  
অধিক বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছে । ভাব-  
প্রকাশের—

“বর্ষাদৃকং ভবেদাজ্যং পুরাণং তৎ ত্রিদোষগুণং”

এই বচনের দোহাই দিয়া এক বৎসরের  
অতিরিক্ত সময়ের দ্রুতকে পুরাতন বলা  
কেবল নিতান্ত অসুপায় স্থলেই চলিতে পারে,  
কারণ উহার পরই ভাবপ্রকাশ বলিতে-  
ছেন :—

“যথা যথাখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ ।

তথা তথা গুণৈঃ শৈবঃ শৈবদিকং তদ্ভদ্রতমম্ ।

সুতরাং বেশীদিনের পুরাতন দ্রুত ঔষধে  
ব্যবহার করা যে ভাবপ্রকাশেরও অভিপ্রেত  
তৎপক্ষে সংশয় নাই । এ অবস্থায় নূতন  
বা দশ বৎসরের কম সময়ের পুরাতন দ্রুত  
ঔষধার্থ ব্যবহার করা বাইতে পারে কি না,  
এবং ঐরূপ ব্যবহারে ঔষধের উপকারিতা হ্রাস  
পাইতেছে কি না, তাহা সকলে ধীরভাবে  
বিবেচনা করিয়া দেখেন,—ইহাই আমার  
প্রার্থনা ।

মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দূর ।—

জানি না, কোন্ ঋষিবাক্যের অনুবলে এ  
দেশে কিয়ৎকাল যাবৎ মকরধ্বজ ও স্বর্ণ-  
সিন্দূর এক ও অভিন্ন পদার্থরূপে প্রচারিত  
হইতেছে । আজকাল “মকরধ্বজ” (স্বর্ণ-  
সিন্দূর) এইরূপ এক অপূর্ণ আখ্যা দৃষ্টি  
গোচর হইয়া থাকে । আমি যতদূর জানিতে  
পারিয়াছি, তাহাতে মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দূর  
দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন  
হইতেছে । ইহাভেদ উপাদানের জিনিষ এক

হটলেও, এই সকল জিনিষের মাত্রা এবং উভয়ের প্রস্তুতপ্রণালীতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে হইলে—

স্বর্ণদলং পল্লবৈব রসেন্দ্রস্য পল্লবিকম্।

রসস্যং দ্বিগুণং গন্ধং ত্রৈনৈব কচ্ছলীকৃতম্॥

কুমারিকা বনৈর্ভাব্যং কাচিপাত্রে নিধাপয়েৎ  
বালুকাময়গুণং কৃষ্টা ক্রমশঃ স্ত্রিদিনং পচেৎ ॥

স্বর্ণ ৮ তোলা, পারদ ৬৪ তোলা এবং গন্ধক ১২৮ তোলা দ্বারা কচ্ছলী করিয়া কুমারীরসে ৭টা ভাবনা পদানপূর্বক বালুকা-যন্ত্রে তিন দিন পাক করিতে হয়। কিন্তু স্বর্ণসিন্দূরের জন্ত—

পলং রসেন্দ্রস্য চ গন্ধকস্য হেমোহপি কর্যং

পারগৃহ সমাক্।

বটপ্ররোহস্য রসেন নামং বামং বিমন্দিয়াণ

কুমারিকার্যঃ।

তৎ কাচ কুপ্যাং নির্ভিতং প্রযত্নাৎ পচে-

ত্বিনিজঃ সিকতাপ্য বস্ত্রে।

৮ তোলা পারদ ও ৮ তোলা গন্ধক ২ তোলা স্বর্ণের সঙ্গে কচ্ছলী করিয়া, বটাকুলের রস দ্বারা এক পহর এবং কুমারীরস দ্বারা এক পহর মর্দন পূর্বক বালুকা-যন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যতক্ষণ আবশ্যক তত সময় পাক করিতে হইবে। সুতরাং এই উভয় পদার্থে পার্থক্য কত—তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। মকরধ্বজ আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠরত্ন; এই মহৌষধিই সন্দরোগের এবং জরা-মরণ-নাশন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বড় দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, এমন পরমকণ্যাণকর পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালী বোধ হয় এখন এ দেশের অতি অল্প লোকই অবগত আছেন। আমি অনেক চেষ্টা

করিয়াও মকরধ্বজ প্রস্তুতে প্রকৃত পারদশী কোন মহাজনের সন্ধান এ পর্যন্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। কি উপায়ে যে তিন দিন জ্বাল দিয়া ঠিক অবিকৃত অবস্থায় ঔষধ রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা এখন অনেকেই অবগত নহেন।

“মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)” নামে এখন যে অপূর্ণ পদার্থ প্রচারিত হইতেছে, তৎ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইয়া আমি জানিতে পারিয়াছি, ১ তোলা স্বর্ণ, ৮ তোলা পারদ এবং ১৬ তোলা গন্ধক দ্বারা কচ্ছলী করিয়া কুমারীরসে মর্দন পূর্বক বালুকা যন্ত্রে ৮১০ ঘণ্টা জ্বাল দিয়া উহা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বলা বাত্বে, উপাদান ও জ্বালের অন্তর্গত নিবন্ধন ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে মকরধ্বজ তো বলা যায়-কি না, পরন্তু গন্ধকের অধিকা ও স্বর্ণের অন্তর্গত ইহা পাঁচি স্বর্ণসিন্দূর নামেও অভিহিত হইতে পারে না। এভাবে ঔষধ প্রস্তুত হইলে, তদ্বারা জরামরণ কেন, সামান্য ব্যাধির বিনাশ না হইলেও তাহাতে বিম্বিত হইবার কোনই কারণ নাই! বাগা চটক প্রকৃত মকরধ্বজ প্রস্তুত সম্বন্ধে বাহ্য-দেয় যথার্থ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা যদি রূপাপূর্বক সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, অগ্নি-তাপের পরিমাণ কি ভাবে রক্ষা করিলে তিন দিনে পাক-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, এবং কিরূপ চিহ্ন দেখিয়া ঔষধ পাক শেষ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, তবেই একমাত্র এই পরম-কণ্যাণকর ঔষধ অচিরে বিলুপ্ত হইতে রক্ষিত হইতে পারে। দেশের ও আবু-র্বেদের যথার্থ কল্যাণসাধন করিতে হইলে, বাহাতে মকরধ্বজের প্রস্তুতপ্রণালী সকলের শিখিবার সুবিধা হয় তৎসম্বন্ধে কঠোর

জন্ম দেশের ভিষকবর্ণ বদ্ধপরিষ্কর হইবেন, ইগুই আমি যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি। যত্ন ও চেষ্টার ফ্রুটিতে যদি এই অমুল্যরত্ন বিদ্যুৎসিলিলে বিসর্জিত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিকতর দুর্ভাগ্যের বিষয় এদেশবাসীর আর 'কিছুই হইতে পারে না। স্বর্গসিন্দূর প্রস্তুতের "বিধিঞ্জ" ব্যক্তি এদেশে অনেক আছেন, যথার্থ জিনিষ দ্বারা শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করিলে, নিশ্চয়ই অতি উত্তম ফললাভ হইবে। তবে, ববিশালের স্বর্গসিন্দূর ব্যবসায়িগণের অতি শ্রুত পদার্থের মায়ায় যাহারা মুগ্ধ হইতেছেন তাহারা কখনই সেই জিনিষ হইতে শাস্ত্রোক্ত স্বর্গসিন্দূরের সুফল প্রত্যাশা করিতে পারেন না।

চ্যবনপ্রাশ।—অবশেষে আমি আয়ুর্বেদের "পরম রসায়ন" চ্যবনপ্রাশ সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আপনারা সকলেই জানেন, এই মহৌষধের প্রভাবে অতিবৃদ্ধ ও বিগতেক্রিয় চ্যবনমূনি পুনর্বার নবমৌল্য লাভ করিয়াছিলেন। এমন একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ অত্র কোন ঔষধের বর্ণনায় আছে বলিয়া আমি অবগত নহি। কিন্তু, দেখালেব চ্যবনমূনির ভাগ্যে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, চ্যবনপ্রাশ একালের সুকুমার বালক ও যুবকদিগের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য রক্ষায়ও সমর্থ হইতেছে না। তাহা আমাদের নিয়তই প্রত্যাশীভূত হইতেছে! এরূপ ফলবিপর্যয়ের যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে, তৎপক্ষে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। কি সেই কারণ, এবং কিরূপেই বা তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে, আয়ুর্বেদের সম্মান ও

গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তাৎক্ষণ্যে চিকিৎসকদিগের দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক। আমি এ বিষয়ে আয়ুর্বেদ-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

চ্যবনপ্রাশে ৫০০ শত আমলকী প্রদানের বিধান রহিয়াছে, অগচ্ছ অত্রাণ্ড ঔষধ সমস্তই পল-মানে ব্যবহৃত আছে। আজকাল দেশে যে সকল বিভিন্ন আকারের আমলকী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সহিত নির্দিষ্ট পলাদিমানের অত্রাণ্ড ঔষধ সন্মিলিত হওয়াতে ফলবৈষম্য ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, কারণ ৫০০ শত বৃন্দাকারের কাশীর আমলকী এ দেশের ৫০০ শত আমলকী অপেক্ষা পরিমাণে দ্বিগুণেরও অধিক হইবে। সুতরাং অত্রাণ্ড ঔষধাদির সহিত সামঞ্জস্য দ্বারা সুফললাভের নিমিত্ত এই পাঁচশত আমলকীর একটা পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া সম্ভব কি না, চিকিৎসকগণ তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে এই ৫০০ শত আমলকীর জন্য ১/৭৮/০ সাত সের তের ছটাক মাত্রা নির্ধারিত হইয়াছে; ইহা কতদূর সমীচীন, তাহাও চিন্তনীয়।

তার পর, চ্যবনপ্রাশের জন্ম গৃহীত আমলকী শুধু কি অন্তর হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধেও মতভেদ চলিতেছে। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তর আমলকী দ্বারা চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু আমি কোন প্রবীণ চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি, কাস অধিকারে শুধু আমলকী দ্বারা প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশই যে সমধিক ফলপ্রসূ, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। আম-

লকীর আমরস কফরোগের পক্ষে হিতকর  
নহে, এ অবস্থায় অশুক আমলকী ব্যবহারের  
যৌক্তিকতা বিশেষভাবে বিবেচ্য। পরিভাষা-  
প্রকরণে শুক আমলকীই অধিকতর গুণ-  
সম্পন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

“দ্রাক্ষা-বিজা-শিবা-দিনাং ফলং শুকঃ

গুণাধিকম্।”

পরিভাষা প্রথমতঃ সাধারণভাবে শুক দ্রব্য  
গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া, পরে যখন বিশেষ-  
ভাবে শিবা ( আমলকী, হরিতশী, বহেড়া )  
সম্বন্ধে সেই শুকতার পুনরুক্তি করিয়াছেন,  
তখন নিশ্চয়ই ইহার গূঢ় অর্থ আছে।  
চরকোক্ত চাবনপ্রাশে আমলকী শুক কি  
অশুক হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই নাই,  
কিন্তু হারীত সংহিতায় চাবনপ্রাশের বচনে  
দেখা যায়—

“ধাত্রীফলং পঞ্চশতং সূপকরসংযুতম্

আমার মনে হয়, হারীতের এই বচন  
হইতেই অশুক আমলকী গ্রহণের বিধান  
হইয়াছে। কিন্তু চরক ও হারীতোক্ত চাবন-

প্রাশে অনেক পার্থক্য আছে। এখন সকলে  
চরকোক্ত চাবনপ্রাশই প্রস্তুত করিয়া  
থাকেন, সুতরাং চরকের বচনে হারীতের  
বিধান অমুসৃত হওয়া বোধ হয় সমীচীন  
নহে। হারীত চাবনপ্রাশের যে সকল  
উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সম্বয়ে  
অশুক আমলকীর সের দোষ দূরীভূত হওয়া  
অসম্ভব নহে, আমি কিন্তু হারীতোক্ত  
“পিপ্পলীনাং সহস্রৈকং” কথা দ্বারা ইহাই  
বুঝিয়াছি। চরকের চাবনপ্রাশে মাত্র  
“পিপ্পল্যা দ্বিপাণঃ” ব্যবহৃত আছে। এক  
সহস্র পিপুলের তেজে আমলকীর আমদোষ  
নষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক,  
আজকাল চরকোক্ত যে চাবনপ্রাশ প্রস্তুত  
করা হয়, তাহাতে শুক কি অশুক আমলকী  
প্রদান করা কর্তব্য, চিকিৎসকগণ যদি দ্বি-  
কৃত হইলে দেশবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত  
হইবে।

শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্তী।

## সভ্যতার আয়ুষ্কর।

জগতের বাবীঘর সভ্যজাতিদিগের ইতি-  
বৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়  
যে, সভ্যতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের আয়ুঃ  
বৃদ্ধি হইতেছে। এই কথায় অনেকেই আশ্চর্য  
হইতে পারেন। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,  
মানবের আয়ুঃ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে বটে,  
কিন্তু সভ্যতা ইহার কারণ নহে। কিন্তু  
বর্তমানকালে যে যে অরণ্যবাসী নর অসভ্য

জাতি আছে, যাহারা সভ্যতার আলোক  
আদৌ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা সভ্যজাতির  
মানবগণ অপেক্ষা মূর্খ, সর্বল ও নীর্থায়। কথাটি  
প্রথমতঃ আশ্চর্যজনক বলিয়া বোধ হয়  
বটে; কেননা সভ্যতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত  
বিভিন্ন আলোচনা, জ্ঞানের উৎকর্ষ, বিজ্ঞানের  
নব নব আবির্ভাব, কত নূতন বিশ্বের  
আবিষ্কার, শ্রম লাভের

নূতন কল-কারখানা, স্বাস্থ্যরক্ষার অভিনব উপায়াবলী, রোগ নিবারণের জন্ত নূতন নূতন কত ঔষধাবলী, কত নূতন নূতন তত্ত্ব প্রভৃতির অভ্যাস হইতেছে, তাহার ফল কি মানবের আয়ুর্হাস? বাস্তবিকই কথাটা প্রাণে লাগে, এত উন্নতির ফল কি না আয়ুর্হাস!

কিন্তু একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সভ্যতার অমুরোধে আমাদের নানাবিধ অনৈসর্গিক ক্রিয়ার বশবর্তী হইতে হয় এবং আহাৰ, বিহার, পরিবেশ, বাসস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে সভ্যতা বজায় রাখিতে গিয়া অনেক অনৈসর্গিক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। আমরা অপ্রাকৃতিক উপায়ে শরীর রক্ষা করি। সভ্যতার অমুরোধে নানাবিধ পরিচ্ছদে আমাদের দেহ সজ্জা আবৃত রাখিতে হয়। ইহার ফল এই হয় যে, আমাদের ত্বকের তাপ-রক্ষণী ও শৈতানিবারণী শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে। পরিচ্ছদের ওচিতিয়াশুচিত্তের জন্ত শরীরে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পাবে। শুধু তাহাই নহে, সভ্যতার অমুরোধে পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে আমাদের অথবা অথবা ত হইয়াই থাকে, তন্নিমিত্ত এই সভ্যতা বজায় রাখিতে গিয়া হয়ত পরিপোষণপযোগী খাদ্যাদির অনটন হইয়া পড়ে, তজ্জন্ত জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়। পাঁচসিকা দেড়টাকা মূল্যের কম্বল দ্বারা যথেষ্ট শীত নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু সভ্যতার খাতিরের অনেককে ৫০০, ১০০০, ২০০০ টাকা বা তদধিক মূল্যের শাল ব্যবহার করিতে হয়। এই অথবা বায়ু কাহারও কাহারও পক্ষে।

অতি স্বচ্ছলভাবে হইয়া উঠে বটে, কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হয়, এজন্য তাঁহাদিগকে অনুকরণের বশবর্তী হইয়া কুশ্লিৰুজির ব্যবস্থা পূর্ণভাবে না করিয়াও সভ্যতা বজায় রাখিতে হয়। কারণ কম্বল গায়ে দিয়া সমাজে মিশিলে লোকে নিন্দা করিবে, অনেকস্থলে ঘুগাই হইতে হইবে। আবার এমনও দেখা যায়, অনেক সময় পরিচ্ছদের আবশ্যক নাই, গ্রীষ্মে প্রাণ ওষ্ঠাগত, শীতল বায়ুসেবন আবশ্যক, কিন্তু সেইরূপ সময়ও সম্বলশরীর আবৃত করিয়া স্বেদসিক্ত কলেবরে কন্দম্বলে বা সমাজে বাহির হইতে হয়। তাহা না করিলে সভ্যতা বজায় থাকে না। শুধু ইহা নহে, অনেক সময় সভ্যতার খাতিরে মনমুগ্ধ বায়ুনিঃসরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়ারও রোধ করিতে হয়। এই সকল দ্বারা স্বাস্থ্য-হানি হয়, সুতরাং এ সকল জীবনের পক্ষে হানিকর।

আবার বিজ্ঞানের প্রভাবে নানাবিধ বিরামের দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ার কার্যিক পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছে। যে কার্যিক শ্রম দেশের লোকের নিকট একসময়ে অপরিহার্য ছিল, তাহা এক্ষণে সখের বা বিহামের সামগ্রী হইয়াছে। যে দূরবর্তী স্থানে পূর্বে লোকে অনায়াসে হাঁটিয়া বাহিতেন, এক্ষণে তাহার একচতুর্থাংশ দূরও লোকে ট্রামে না চড়িয়া বাহিতে পারেন না। অনেক সময় হয়ত সময়েই লাঘবের জন্ত ট্রামে চড়িতে হইবে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আবার জন্ত ট্রামে চড়া হয়। আবার লজ্জার খাতিরে অনেক শ্রমজনক কৰ্ম পরিচারক বা ভৃত্য দ্বারা করাইতে হয়। জীলোকদের তিক্ত

জল তোলা, বাটনাবাটা, কাপড়কাটা, গৃহ পরিষ্কার, রন্ধনাদি—যে সকল তাঁহাদিগের করণীয় বিষয় বলিয়া বিধিবদ্ধ ছিল, তাহাতে যে জীজাতির মধ্যেও কার্যিক শ্রমের ব্যবস্থা হইত, তাহাও এক্ষণে সমাজে ঘৃণার কার্য্য হইয়াছে। এমন কি—সন্তানপালনও এখনকার দিনে কোন কোন স্থলে লজ্জাস্বর বলিলে অত্যাঁজি হইবে না, এখন অনেকে পরিচারিকা দ্বারা উহাও সম্পন্ন করাইয়া থাকেন!

এখন ভোজন সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা। রসনাতৃপ্তির জন্য আমরা আমাদের খাওয়া নানাবিধ সুগন্ধি ও উগ্র মশলাদি দ্বারা রন্ধন করি। ইহাতে খাওয়াগুলি খুব সুখ-রোচক হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই গুরুপাক হয়। কেবল তাহা নহে, উগ্র মশলা থাকায় লালাগ্রাহিস্থ রায়সমূহ উত্তেজিত হয়। সেই কারণে প্রচুর লাল নিঃসরণ ও ভোজনোচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়, তজ্জন্ত অতিভোজন হয় অর্থাৎ আমাদের শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু আহার আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় আহার করা হয়। সুতরাং পরিপাক যন্ত্র সমূহের অতিরিক্ত শ্রম হয়, কাজেই সেগুলি শীঘ্র অকস্মাৎ হইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রায় অনেক লোকই অল্পবয়সে অর্জাণপ্রবণ হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার শস্তাদি অগ্নিতে পাক করার উহার মধুরতা ও সারাংশ কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং আমরা বাহ্য আহার করি, উহাতে সারাংশ কম থাকায় খাদ্যের পরিমাণও অধিক হওয়া আবশ্যক হয়। এইজন্য বাধ্য হইয়া অনেক সময় অতি ভোজন করা

আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু অতি ভোজনে পরিপাক যন্ত্র যে দুর্বল হইয়া থাকে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

বাসভবন সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। সহরেরত কথাই নাই। জমীর দুর্শ্মল্য বশতঃ অল্প পরি-সর স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া বহুলোককে বাস করিতে হয়। সুতরাং কক্ষগুলিও যে অল্পায়তন হইবে তাহাতে আর কথা কি! তাহার উপর সেই সকল কক্ষও আবার নানাবিধ বিলাস সজ্জায় সজ্জিত, কাজেই বায়ুসমাগমের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। ঐ সকল ক্ষুদ্র সৌধাবলীর উচ্চতাও আবার অত্যন্ত অধিক, অনেকগুলি সৌধ চতুস্তল, পঞ্চতল, কতকগুলি ষড়তলও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক তলে লোকের বাস। একতল অপেক্ষা অত্যাঁজ তলে চতুর্ধণ, পঞ্চগুণ বঃ ষড়গুণ করিয়া লোক বাস করিয়া থাকে, কিন্তু বায়ু চলাচলের পরিমাণ প্রথম-তল অপেক্ষা অত্যাঁজ তলগুলিতে কিছু বিভিন্ন নাই। বাহ্য হউক উপরতলের লোকদিগের স্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা দূষিত বায়ুর গুরুত্ব আকাশ বায়ু অপেক্ষা অধিক হওয়ায় নিম্নে নামিয়া পড়ে, সুতরাং ইহাতে নিম্নতলবাসী লোক-দিগের স্বাস্থ্যহানি বিলক্ষণরূপে হইয়া থাকে। ইহা ত গেল কলিকাতার স্থায়ী সহরের কথা। পল্লীগামের জমীর প্রাচুর্য্য থাকিলেও এখন অনেকে সহরের অসুখকরণে অল্পায়তনে হর্ষা নির্মাণ করিতেছেন এবং অবশিষ্ট জমি ফেলিয়া রাখিতেছেন। তবে পল্লীগামের গৃহ সমূহের পরিমার সহরের গৃহাবলীর পরিমার অপেক্ষা অধিক ও বাসযোগ্য। ইহা ভিন্ন অত্যাঁজ অনেক কারণেও পল্লী-গ্রামের এখন যে স্বাস্থ্যহানি ঘটতেছে, তাহাও



সভ্যতা ফলে অর্থাৎ সহরের অনুকরণে — ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন এখন দাব দিনে পল্লীগ্রামেও বাসগৃহের সংলগ্ন পার্শ্ববাসীর বাসস্থা হইয়াছে কিন্তু সহরের স্তায় ভূগের বন্দোবস্ত নাই, কাজেই মেথর দ্বারা মরণা পক্ষিার করান হয় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এ সমস্তই সভ্যতার পরিণাম। অধুনা রাজবস্ত্র, রেশম প্রভৃতি উচ্চ করিয়া নির্মাণ করিবাব দণ্ড জননির্দেশের পথরোধ না সঙ্কীর্ণ ভোগ্য আবাসভূমি সমূহের আশ্রিতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারই ফলে ঐ সকল স্থান অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে, ইহারও মূলে সভ্যতা নিহিত।

এইরূপ আমাদের প্রত্যেক নিত্য ক্রিয়া-বলী পুণ্ড্রপুঙ্খকণে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যহানি ও আয়ুর্হাস হইতেছে। বাইবেলে কথিত আছে “যে পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, পানী, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সৃজন করিয়া অবশেষে একটী নর ও একটী নারী সৃষ্টি করিলেন। নরের নাম আদম ও নারীর নাম ইভ। উক্ত নরনারীকে তিনি তাঁহার সৃষ্ট ইডেন নামক উজানে বাস, যথেষ্ট বিচরণ ও তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ সমূহের যথেষ্ট উৎসাহের অধিকার দিলেন। কেবল জ্ঞান

বৃক্ষ ও জীবনবৃক্ষ নামক দুইটা গাছের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আদমের অনুপস্থিতিকালে ভূদ্বন্দ্বকপ্যারী শয়তানের কুপরামর্শে ইভ ভগবান্নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া পবিত্রতা লাভ করিলেন। পরে আদম প্রত্যাগমন করিলে স্ত্রীর অনুরোধে তিনিও সেই ফল খাইলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ন মানবের এই পাপের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। আদম ও ইভ পূর্বে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিতেন কিন্তু আর সে অবস্থায় পরমেশ্বরের সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেন না, কারণ জ্ঞানফল খাইয়া তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন সুতরাং লজাপাত দ্বারা কোনরূপে লজা নিবারণ করিয়া তবে বাহির হইলেন এবং আপনাদের কৃত পাপের ক্ষমা লাভ ও অমৃতপ্ত হইলেন। এই জ্ঞানলাভই সভ্যতার প্রথম সোপান। যদি বাইবেল কথিত আদম ও ইভ জ্ঞান ও জীবন বৃক্ষবৃক্ষের ফল না খাইতেন, তাহা হইলে মানব ভেদজ্ঞান রহিত হইয়া অমরত্ব লাভ করিতেন,—ইহা নিশ্চিত।

একপে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার বৃদ্ধি ও তদনুযায়িক আয়ুর্হাস হ্রাস আমাদের যেন অবশ্যসত্তাবী হইয়া পড়িয়াছে।

ডাঃ শ্রীকার্তিক চন্দ্র দাস।

## ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহ ।

—:—

( পুরুষ প্রকাশিত অংশের পর )

ব্রহ্মচর্য্য শ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও বিবিধ উপদেশ আছে । বাহ্যিক ভয়ে আমরা সে সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম না । ব্রহ্মচর্য্য শ্রমের পর গৃহস্থ শ্রমে প্রবেশ করিতে হয় ।

এই সময়ই দার পরিগ্রহের উপযুক্ত কাল শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, ক্ষণমাত্রও অনাশ্রমী থাকিবে না । স্ত্রতরাং একচাৰ্য্য শ্রম হইতে বহির্গত হইয়াই দার পরিগ্রহ করিবে । কেননা গৃহনৌ গৃহ পদ বাচ্য । গৃহনৌ হীন গৃহকে গৃহ বলা যায় না ।

বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃক্রম সম্বন্ধে ভগবান মনু বলিয়াছেন ;—

ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয় মনোরম্য কন্যাকে এবং চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষীয় কন্যাকে বিবাহ করিবে । ইহা অপেক্ষা শীঘ্র করিলে ধর্ম্মহানি ঘটে ।”

ইহা দিগদর্শন মাত্র হইলেও এইরূপ বয়সেই বিবাহ করার নিয়ম পূর্বে ছিল । কারণ শুরু গৃহে অধ্যয়ন শেষ করিতে প্রায় এইরূপ বয়স হইত । স্ত্রতরাং পূর্বে পুরুষের বাল্য বিবাহ ছিল না ।

কন্যার বিবাহও তখনকার দিনে অল্প বয়সেই হইত । কিন্তু বিবাহ হইলেই স্বামী স্ত্রীতে উপগত হইত না । কারণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—ঋতু কালেই ভার্গ্যাতে উপগত হইবে । স্ত্রীলোকের ঋতু সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়সেই এ দেশে হইয়া থাকে । স্ত্রতরাং দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্বে স্ত্রীতে উপগত হইবার নিয়ম পূর্বে ছিল না ।

আবাব বিবাহ ও গর্ভাধানের মধ্যে আর একটা কার্য্য ছিল দ্বিরাগমন অর্থাৎ বিবাহের পরে পিতৃগৃহ হইতে বধূকে ভর্তৃগৃহে পুনরায় বনন ! এখনও অনেক স্থলে বিবাহের পরে এক বৎসর কাল অতীত না হইলে কন্যাকে পিতৃগৃহে পাঠাইবার নিয়ম নাই । কিন্তু সে কালে বেকপ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধ্যে একটা সংঘততাবের ব্যবস্থা ছিল, তাহা বটে ফলে তিথি নক্ষত্র বাছিয়া—পক্ষ দিন বাছিয়া স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা হইত, এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে । বাচা হটক আমরা শাস্ত্রকারগণ পুত্রোৎপাদন সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহারই আলোচনার প্রবৃত্তি হইতেছি । ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—

বিশুদ্ধ গর্ভাশয় এবং রজো সমন্বিত ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক স্ত্রীতে ত্রিংশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ উপগত হইলে উত্তম পুত্র জন্মিয়া থাকে । ইহা অপেক্ষা নান বয়সের স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ হইলে অধম পুত্র জন্মিয়া থাকে ।

ষোড়শ বৎসর অপেক্ষা কম বয়সের স্ত্রীতে পচিশ বৎসর অপেক্ষা কম বয়সের পুরুষ গর্ভাধান করিলে সেই গর্ভ কৃষ্ণিতেই মরিয়া যায় । যদি জীবিত অবস্থায় জন্মিত হয়, তাহা হইলেও অধিক কাল বাচে না, যদিই বা অধিক কাল বাচে, তাহা হইলে দুর্ব্বলোদ্ভূত হইয়া থাকে । এইরূপ অত্যন্ত বালিকাতে গর্ভাধান করিবে না ।

পুরুষের বিংশতি বর্ষে গর্ভাধানের উল্লেখ ছই এক স্থলে থাকিলেও তাহা প্রামাণ্য নহে, কারণ পুরুষের বিংশ বৎসর বয়সে ব্রহ্মচর্যাশ্রম শেষ হয় না। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরে বিবাহ, পবে দ্বিবাগমন পরে গর্ভাধান, সূত্ররূপে পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সের পূর্বে গর্ভাধানের প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল না ইহা সুক্তি যুক্ত। মন্ত্র কথিত বিবাহের বয়স ধরিলেও ঠগাট নাট।

পুন্নে স্ত্রীলোকের বিবাহ যে আট বৎসর বচনে হইত, মনুর বচনেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টম বৎসরে গৌরীদানের ফল হয় এবং একাদশ বৎসরের উর্দ্ধে রজস্বলা একাদানে মহাপাপ হয়। কিন্তু ইহা কেবল বিবাহ সম্বন্ধে;—গর্ভাধান সম্বন্ধে স্মৃত্ত্ব কথ্য।

দর্শশাস্ত্রে এবং আগুর্বেদে শাস্ত্রে গোড়শ বৎসরের পুন্নে স্ত্রীলোকের গর্ভাধান করা উচিত নহে বলা হইয়াছে। কিন্তু দশ্মশাস্ত্রে ঋতুকালে সহবাস না করা পাপজনক বলিয়াও কথিত হইয়াছে। অথচ ঋতুকাল রমণী বাদশ বৎসর হইতেই আরম্ভ হয়। এষ্ট অসামঞ্জস্যের মীমাংসা কি?

প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ক্ষণিক কত্যা এবং রাজকন্তাদিগের অধিক বয়সে বিবাহ হইত ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অল্প বয়সে ঋষি কন্তাদিগের বিবাহের নিয়ম থাকিলে শকুন্তলা, দ্রুপদের হাতে না পড়িয়া কোন তপস্বীর হাতেই পড়িতেন গুরুকন্তার প্রতি অত্যাচার করার ফলে রাজার রাজ্য দগ্ধ হইয়া থাওব বনে পরিণত হইত না। দীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজকন্তার বিবাহ যৌবনকালেই হইয়াছিল।

অতি প্রাচীনকালে বিজয়াদিত্য যখন ভোজ রাজার দ্বিতীয়া কন্তাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি যুবতী। শাস্ত্রস্থ যখন সভাবতীকে বিবাহ করেন, তখন তিনি ছেলের মা। এত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাচীন যুগে স্ত্রীলোকদিগের অধিক বয়সে বিবাহ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

সাধারণের মধ্যে অষ্টম হইতে একাদশ বর্ষ পর্যন্ত বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত থাকিলে গোড়শ বৎসরের পূর্বে গর্ভাধান হইত বলিয়া মনে হয় না। কেননা তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্রে এবং আগুর্বেদে গোড়শ বৎসর অপেক্ষা কম বয়সে গর্ভাধান হইলে যে অপকৃষ্ট পুত্র হইবার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার সম্মান থাকে না। অপিচ সেই নিয়তির দিনে উত্তম পুত্রলাভের প্রত্যাশায় দুই তিন বৎসর সংযত হইয়া থাকা, সেকালের লোকের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর ছিল না। সূত্ররূপে গর্ভাধানের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কন্তা পিতৃগৃহে থাকিত। এখনও বিবাহের পর এক বৎসর কন্তা না পাঠাইবার রীতি অনেক গৃহস্থের মধ্যে প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ ইহা গর্ভাধানকালের জন্য প্রতীক্ষা করার রূপান্তর মাত্র।

সেকালে কন্তা গর্ভাধানের পূর্বে ভর্তৃগৃহে আসিলেও পতির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিত না।

বিবাহ করিবার পর বিজাদিলাভার্থ ভর্তৃ অশ্রয় গমন করিতেন এবং তাহারই জন্ত যে বিবাহের পরেই গর্ভাধান হইত না শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্থা :—

“বিজার্থং প্রোষিতস্ত ব্রাহ্মণস্ত দ্বারা অপত্যোৎপাদনার্থ তদভিগমনে দ্বাদশবর্ষাধি

প্রতীক্ষারস্ত্র গোতমা" অর্থাৎ স্বামী বিজ্ঞা  
শিক্ষার জন্ত অস্ত্র বাইলে স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষ  
অপেক্ষা করিয়া অপতোৎপাদনার্থ তাহার  
নিকটে যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কস্তার আট  
বৎসর বয়সে বিবাহ হইলে কুড়ি বৎসরের  
পরে এবং দ্বাদশ বৎসরে বিবাহ হইলে চব্বিশ  
বৎসরের পরে গর্ভাধান হইত।

সাত বা আট বৎসর হইতে একাদশ  
বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ কাল নিকিষ্ট হইলেও  
এবং রজঃস্রাব কস্তার বিবাহ না দেওয়া  
নরক গমনের কারণ বলিয়া কথিত হইলেও  
উপযুক্ত পাত্র না পাইলে রজঃস্রাব কস্তার  
বিবাহ দেওয়া সেকালে দোষাবহ ছিল না।  
মহু বলিয়াছেন,—

“কস্তা ঋতুমতী হইয়া আমরণ গৃহে  
থাকে, সেও ভাল তথাপি কোন গুণহীন  
পাত্রকে দান করিলে না।

এ সম্বন্ধে মহু আরও বলিয়াছেন :—

ঋতুমতী হইলেও কুমারী উপযুক্ত  
পাত্রের অভাবে তিনবৎসর কাল উপযুক্ত  
পাত্রের অনুসন্ধান করিবে এবং তিন বৎসর  
পরে উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করিয়া লইবে।  
একপ ক্ষেত্রে দ্বাদশ বৎসরে রজঃ প্রবৃত্ত  
হইলেও গর্ভাধানের কাল বোড়শ বর্ষ হইয়া  
পড়ে।

গুণবান পাত্র না পাওয়া যাইলে অধিক  
বয়সে বিবাহ দেওয়া সেকালে যে দোষাবহ  
ছিল না, হরধমুভঙ্গ, লক্ষাভেদ প্রভৃতি দ্বারা  
তাহা অবগত হওয়া যায়। যাহা হউক  
অনেক কারণে পূর্বে অনেক কস্তার অধিক  
বয়সে বিবাহ হইত। অধুনা গুণবান  
পাত্রের ঘেঁরুণ অভাব, তাহাতে ধর্ম্মে  
আস্থা বান হিন্দু যদি গুণবান পাত্রের

অনুসন্ধান করিবার জন্ত বহু বিলম্ব করিয়া  
কস্তার বিবাহ দেন তাহা হইলে সেকালের  
দৃষ্টান্ত অনুসারে পাপভাগী হইবার কোন  
সম্ভাবনা নাই। কারণ ইহা ঋষিবাক্য;  
বাঁহারা ঋতুর পূর্বে কস্তাকে বিবাহ না  
দেওয়া পাপের কারণ বলিয়াছেন, ইহাও  
ঊর্গাদেরই কথা।

দ্বাদশ বৎসর সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের রজঃ  
প্রবৃত্তির কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও  
এখনও দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ,  
পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসরেও স্ত্রীলোক ঋতু  
মতী হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি মার্গানুযায়ী  
আধুনিক ভারতে কস্তাগণ যতশীঘ্র রজঃস্রাব  
হইয়া থাকে, নিরুত্তি মার্গানুযায়ী প্রাচীন  
ভারতে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা বিলম্বের রজঃ-  
স্রাব হইত। প্রবৃত্তিমূলক বিবিধ উত্তেজক  
বাদ্য, নাটক, নভেল পাঠ, পিরেটার দেখা  
প্রভৃতি কারণে অল্প বয়সেই বালকবালিকা-  
দিগের মনের উত্তেজনা বটে, ফলে  
জননেন্দ্রিয়েরও উত্তেজনা ঘটায় অপেক্ষা-  
কৃত অল্প বয়সে এখনকার দিনে পুষ্প দর্শন  
হয়। পূর্বে পুরুষদিগের মন এ বিষয়ে  
কতদূর নিশ্চিন্ত থাকিত, তাহা আমরা  
পূর্বেই বলিয়াছি। শিক্ষা-দীক্ষাপ্রভাবে  
প্রাচীনকালে নারীদিগেরও চিত্তের উত্তেজনা  
ঘটিত না বলিয়া পূর্বে অপেক্ষাকৃত  
অধিক বয়সে রজঃপ্রবৃত্তি হইত। মহাভারতে  
নির্ধিত আছে :—

“ত্রিংশবর্ষ বোড়শবর্ষাং ভার্যাং বিশেষত  
নয়িক্যাং।” অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স পুরুষ  
বোড়শ বৎসর বয়স নারীক। (যাহার রজো-  
দর্শন হয় নাই) কস্তা বিবাহ করিবে।  
বোড়শ বর্ষ বয়স নারীক। কস্তার উত্তেজনা

বাক্য পূর্বে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে রজঃ প্রগতি হইত বলিয়া প্রতীতি হয়। সংবাদ সম্মতি, (consent act) আইন প্রচলিত করিবাব সময় ভারত গবর্ণমেন্ট ভারতের নানা প্রদেশস্থ বহু পণ্ডিত ব্যক্তির মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে বিবাহ এবং গর্ভাধানের বয়স লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ ঘটিয়াছিল। আমরা এ সম্বন্ধে বাতলা ভাষে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কেয়টী সারণ্য বক্তৃতার কিয়দংশ অমুদ্রণ করিয়া দিতেছি।

কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটীতে কায়েল মেডিকেল স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীমত ডাক্তার দয়াল চন্দ্র সোম মহাশয়ের অভিমত অনুযায়ী এম্টি প্রবন্ধ ডাক্তার বলিষ্ট চন্দ্র সোম কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'এগার হইতে তের বৎসর বয়সকাল একুশটি বালিকার প্রসব গ্যাপারে পাঁচটি স্বাভাবিক রূপে প্রসব করিয়াছিল, পাঁচটি অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া প্রসব করিয়াছিল। পাঁচটিকে যন্ত্র দ্বারা প্রসব করা হইতে হইয়াছিল এবং ছয়টি বালিকা মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছিল। এম্টি সকল বালিকা প্রসবের পরে এক-রূপ ভালই ছিল, দুই জনের জ্বর হইয়াছিল এবং শরীর দীর্ঘকাল দুর্বল ও রক্তহীন ছিল কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রসবের পর অনেকেই বিবিধ কঠিন রোগে আক্রান্ত

হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পাঁচজন দীর্ঘকাল জ্বর ও অতিশয় রোগে ভুগিয়া মারাত্মক রক্তহীনতা রোগে মারা যায়, দুই জনের ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়।'

"যে সকল শিশু জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা ক্ষুদ্রাকার বা অসম্যাকপুষ্ট হয় নাই কিন্তু জন্মের পর তাহাদের বৃদ্ধি ভালরূপ হয় নাই। একটা শিশু ধনুষ্কায় রোগে এবং দুইটা এক প্রকার ক্ষয় রোগে জন্মের দুই মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুইটা শিশু জন্মের পাচ মাস পরে অতিশয় রোগে এবং তিনটা দাঁত উঠিবার সময় জ্বর এবং আক্ষেপক রোগে মারা যায় অবশিষ্ট সাতটা শিশু দুর্বল ও হীনবাস্ত্য সম্পন্ন হইয়াছিল\*."

"বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে শাস্ত্রার্থের বৈরূপ বাখ্যা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রদেশের পণ্ডিতগণ তাহা গ্রহণ করেন নাই এবং এ সম্বন্ধে যুক্তি ও আপত্তিকার প্রাপ্তি আইনের সমর্থকদিগের পক্ষেই দেখা যায় যদি একপন্থা হইত এবং আমি যদি এক জন হিন্দু হইতাম তাহা হইলে পণ্ডিত শাস্ত্রাচার তর্ক চূড়ামণি এবং ভিলকের মতামতাদি গ্রহণ পথ অবলম্বন করা অপেক্ষা অধ্যাপন ভাণ্ডারকর, জটিল তেনার এবং দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের মতামতাদি গ্রহণ পথ অবলম্বন করাই আমি প্রেমোবো করিতাম। জয়পুরের মহারাজের বিবেচনায় গোড়া সম্প্রদায় যে আগু পুরুষদিগের বাক

\* পূর্বে অল্প বয়সকাল বালিকার গর্ভাধানবস্থার যে কুফল লিপিত হইয়াছে, তাহার সাহিত্যিক ডাক্তার দয়াল চন্দ্র সোমের এই বিবরণ বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে। কবি বাক্য যে ইচ্ছাও এবং সত্য ইহাতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছে, তাঁহারা যদি এ সময়ে জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহারা স্বয়ং এ বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। মহারাজেব এই মতেব আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি।”

“ক্রান্তিম উদ্ভেজন্য দ্বারা এ দেশের জ্ঞী বালিকাদিগের পুষ্পদশন কাল যে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র উপস্থিত হয় বঙ্গীয় গণপরিষদের নিকট তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন মেজব জেনারেল ডাক্তার বসু ইণ্ডিয়ান মিরর নামক সংবাদ পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বাভাবিক ব্যাবিনা সাংগো পুষ্পবর্ণন বঙ্গদেশে নিত্যস্থ ছলিত। অনারেবল স্যার এনড্রুসাবল এক দিকে অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রকার এবং ভাষ্যকারদিগের মতান্তরে জ্ঞীলোকের বয়ঃপ্রাপ্তির প্রথম চিহ্ন (স্বত্) প্রকাশ পাইবার সময়কে গর্ভাধানের কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অপরদিকে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যাঁহারা নিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বিদ্যালোচনা করিয়া থাকেন এবং আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করেন, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রাচীন আর্য ঋষিগণের লিখিত পাঠ এবং সেই গুলির উদ্দেশ্য এই যে, ঋতুর প্রথম বিকাশেই গর্ভাধান যে কেবল অনাবশ্যক তাহা নহে, পরন্তু ধর্মনিষ্ঠ এবং কর্তব্য জ্ঞানসম্পন্ন স্বামী পক্ষে যতদিন নিজের বয়স পঁচিশ বৎসর এবং জ্ঞীর বয়স ষোড়শ বৎসর পূর্ণ না হয়—ততদিন অপেক্ষা করা উচিত। ডেকান কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার আর, জি,

ভাণ্ডারকর, বঙ্গের সিভিল সার্ভিস বিভাগের মিষ্টার আর, সি, দত্ত অনারেবল জুষ্টিস কে, টি তেলাং এবং অন্তান্ত জগৎ প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজেব যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বঙ্গের ছোট লাট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল সুপণ্ডিত স্যার এলফ্রেড ক্রফট কলিকাতার প্রধান পণ্ডিতদিগের সহিত পরামর্শ ও বাদামুবাদ করিয়া সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনারেবল রাও বাহাদুর কৃষ্ণজী লক্ষণ নলকার।”

“এই দেশের লোকের মধ্যে যে এইরূপ অস্বাভাবিক ইচ্ছার অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং ভারতের অধঃপতিত সময়ের হিন্দু ও মুসলমান কবিদিগের লিখিত কবিতাপাঠের ফল। ভারতের বিগত সময়ে যে অরাজকতা এবং শাসন বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল, যখন শাসন বিহীন ইঞ্জিয় পরায়ণতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে এই সকল কবিতার সৃষ্টি হয়। এক হিন্দি ভাষাতেই অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে নায়ক ভেদ নামে প্রসিদ্ধ অন্যান্য এক শত গ্রন্থ আছে এবং ঐ সকল গ্রন্থে অল্প বয়স্ক বালিকার সহিত সম্মিলন সম্বন্ধে দৃপিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মন্তব্যাত্মক মতানি জনক এই প্রথা যত শীঘ্র তিরোহিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। অনারেবল রাগা অফ ভিক্ষা।”

এই সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ এং পদস্থ কয়েক জনের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।  
মৌতুহনী পাঠক সংগাস সম্বন্ধের বয়স  
সংক্ষেপে বক্তৃত্য নামক পুস্তিকা পাঠে সমস্ত  
অবগত হইতে পারিবেন।

ব্রহ্মচর্যা এবং বাল্য বিবাহ সংক্ষেপে শাস্ত্রের  
মত কি তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই  
বক্তৃতা বাঙ্গালীর শৌচনীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি  
সংক্ষেপে আমাদেব কর্তব্য কি তাহা আলো-  
চনা করা যাইতেছে।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের  
একাদশ বৎসর, এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বৎসর  
বয়সে উপনয়নের বিধি আছে\*। উপনয়নের  
পবিত্র বৎসর, আঠার বৎসর, নয় বৎসর  
বা ষত দিনে অধ্যয়ন শেষ না হয়—ততদিন  
ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করিবার উপদেশ  
আছে। সাধারণতঃ প্রায় চব্বিশ হইতে  
ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম শেষ হয়  
এলিয়া মনু-ঈকণ বয়সে বিবাহের উপদেশ  
দিয়া গিয়াছেন।

বর্তমান সময়ে কোন ছাত্র যোগ বৎসরে  
মহাকুলেশন পাস করিয়া বি, এ, বা এম,  
এ পাশ দিলে তাহার বয়স ২০২২ বৎসর  
হয়। তাহার পর আইন, ডাক্তারী, ইঞ্জি-  
নিয়ারী বা যাহা হউক পড়িতে ৪.৫ বৎসর  
লাগে সুতরাং শিক্ষা শেষ করিতে এখন  
২৫-২৬ বৎসর বয়স হইয়া পড়ে।

এখনও শিক্ষার বয়স সেই একই আছে,  
নাই কেবল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। স্বল্প সংখ্যক ছাত্রই  
এক্ষণে গুরু গৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করে।  
সকলের গুরুগৃহে অধ্যয়নের ব্যবস্থা একরূপ  
দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে ১ কিস্তি তাহা

নাই থাকুক, তাপাশি নিজের পুত্র কন্তার এবং  
দেশের হিতের জন্য যদি পাঠ শেষ না হওয়া  
পর্যন্ত বিবাহ না দেওয়া হয়, তাহা হইলেইত  
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অথবা ঘটনা  
ক্রমে বিবাহ দিতে হইলেও অধ্যয়ন শেষ না  
হওয়া পর্যন্ত কন্তাকে পিতৃ গৃহে রাখাই  
কর্তব্য। এইরূপ নিয়ম করিলে গভীর্ণানের  
বয়স পুরুষের পাঁচশ এবং স্ত্রীর মৌল হইয়া  
পড়ে। যাহারা দেশের প্রকৃত হিতকামী  
তাহারা এ বিষয়ে এতরূপ সূপথ অবলম্বন  
করুন ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে পুরুষ কিস্তি মঙ্গলজনক  
ছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখন  
দেশে ঠিক মেরূপ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ব্যবস্থা  
না থাকিলেও ছাত্রগণ যদি অধ্যয়ন শেষ  
না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যা পালন করেন, তাহা  
হইলে নিজের পুত্র-কন্তার এবং সমাজের  
শ্রেয়োলাভ হইবে।

ব্রহ্মচর্যাব্রত বাঙ্গালী জাতি অস্থি চন্দ্রসার  
বল-বীর্ষ্য-মেধাহীন কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া  
পড়িয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসারহীন  
হে বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ, এই মরণোন্মুখ বাঙ্গালী  
জাতিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিবার ভার  
তোমাদেরই উপর। যদি এই কঠিন কর্তব্য  
পালন করিতে চাও—ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্যা  
অবলম্বন কর। যদি বিদ্যাবৃদ্ধি-বশঃ সম্মানের  
অধিকারী হইয়া সুখে সংসার বাত্মা নির্বাহ  
করিতে চাও—ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন কর, যদি  
স্ত্রী-পুত্র-কন্তাকে সুস্থ ও সুখী দেখিতে চাও—  
ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্যা পালন কর।

ক্রী—

\* এক্ষণে পাঁচ হইতে ষোল বৎসর, ক্ষত্রিয়ের  
হইতে চল্লিশ বৎসর উপনয়নের কাল—মনু।

একাদশ হইতে বাইশ বৎসর, এবং বৈশ্যের দ্বাদশ

## বিসূচিকা ও কলেরা।

আয়ুর্বেদোক্ত বিসূচিকা রোগ কলেরা কিনা এই বিষয় লইয়া বিভিন্ন চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান হইতে বাদামুবাদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন, বিসূচিকাই কলেরা; আবার কেহ কেহ বলেন যে, কলেরা—বিসূচিকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাধি। অবিকাংশ এলোপ্যাথ এবং হোমিওপ্যাথ শেবোক্ত মতের পক্ষপাতী। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এ সম্বন্ধে সত্যোদ্ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইব।

বাহারা বিসূচিকাকে কলেরা বলিতে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রথম আপত্তি এই যে, বিসূচিকা—অজীর্ণ রোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং কলেরা জীবাণু বিশেষের সংক্রমণ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের মতে এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিসূচিকা—কলেরা হইতে পৃথক রোগ—একথা বলা চলে না। আমরা তাহার কারণ নির্দেশ করিব।

প্রথমতঃ দেখা উচিত যে, কলেরা জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় কিনা? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষা করিয়া উহা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু আবার ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেবল কলেরার জীবাণু উদ্ভব হইলেই কলেরা হয় না। অনেকে পরীক্ষার্থ কলেরার জীবাণু থাইয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কলেরা হয় নাই। অনেক সুস্থ ব্যক্তির মূলে কলেরার জীবাণু পাওয়া যায়। সুতরাং কেবল কলেরার জীবাণুকেই কলেরা রোগ

উৎপন্ন হইবার কারণ বলা যায় না। কলেরা—জীবাণু ব্যতীত আরও কিছু চাই—বাহাতে রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। আয়ুর্বেদে কারণ তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সমবায়ি কারণ—যেমন সূত্র-বস্ত্রের সমবায়ি কারণ। দ্বিতীয়তঃ অসমবায়ি কারণ; যেমন সূত্র সমূহের একত্র যোজনে বস্ত্রের অসমবায়ি কারণ। তৃতীয়তঃ নিমিত্তকারণ; যেমন বায়ু (মাকু) বস্ত্রের নিমিত্ত কারণ। এখানে কলেরা জীবাণুকে যদি কলেরা রোগের সমবায়ি কারণ বলা যায়, তাহা হইলেও অত্র কারণের আবশ্যক। আর দুইটি কারণ কি? জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জীবাণুর শরীরে প্রবেশ অসমবায়ি কারণ এবং অজীর্ণকে যদি নিমিত্তকারণ বলা যায়, তাহা হইলে কলেরা-জীবাণুও কলেরার কারণ এবং অজীর্ণও কলেরার কারণ বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ শাস্ত্রের নির্দেশই যথার্থ।

দ্বিতীয়তঃ—অধুনা যে সকল ব্যাধি জীবাণুজাত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে (যেমন যক্ষা প্রভৃতি) আয়ুর্বেদকারণে সে সকল ব্যাধিকে জীবাণুজাত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন কিনা? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে—করেন নাই। (ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে জীবাণু তথাকে (Germ-Theory) আমরা সত্য বা মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। কেবল একমাত্র ক্রিমি-নিদানে বলা হইয়াছে যে, হয় প্রকার ক্রিমি হইত রোগ



উৎপন্ন করে। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, চক্ষুর  
অন্যান্য রোগোৎপাদক জীবাণুগণ তাঁহাদের  
জ্ঞান দৃষ্টির সীমার বহির্ভূত ছিল না। তাহাই  
যদি হউন, তবে অশ্রুজাত জীবাণুজাত  
রোগের জীবাণুব বিষয় তাঁহারা উল্লেখ করেন  
নাহ কেন? ইহার উত্তরে অবশ্যই  
বলিতে হইবে যে, জীবাণু-তথ্য মিথ্যা—  
পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ভ্রমাত্মক পৰীক্ষায়  
উৎপন্ন মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে করিতে-  
ছেন, নচেৎ শাস্ত্রকারগণ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান  
সম্পন্ন বলিয়া জীবাণু-তথ্য অবগত থাকি-  
লেও যে সময়ে আমাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের  
সৃষ্টি না হওয়ায় উহা সাধারণের পক্ষে কোন-  
এক কাণ্ডাকরী হইবে বলিয়া উল্লেখ করেন  
নাহ।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে  
না। জীবাণুর উল্লেখ না থাকিলেও বহু  
রোগের সংক্রামকতার বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত  
হইয়াছে যথা—

প্রসঙ্গঃ গাএসংস্পর্শাৎ নিঃস্রাসাৎ সহ  
যোজনাত্।

এক শব্দাসনাট্টেব বস্ত্র মাগ্যামূলেপনাৎ ॥

অগ্নি কুষ্ঠশ্চ শোষণশ্চ নেত্রাভিযুদ্ধল এৱচ।

ওপদগিক রোগাংস্চ সংক্রান্ধস্ত নবান্নরাং ॥

অশ্রুপাদ—একত্র অবস্থান, গাত্র সংস্পর্শ,  
নিঃস্রাস, একত্র ভোজন, একশয্যা ও আসন  
ব্যবহার, একবস্ত্র, মাণ্য ও অল্পলেপন  
(চন্দনাদি গায়ে মাখিবার দ্রব্য) ব্যবহার  
এবংঃ ব্রহ্ম, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, নেত্রাভিযুদ্ধল (চোখ  
উঠা) এবং ওপদগিক রোগ সকল একজনের  
শরীরে হইতে অগ্নের শরীরে সংক্রমণ করে।

কতকগুলি রোগের নাম বলা হইয়াছে  
এবংঃ এই সকল রোগ যে একেব্র শরীর

হইতে অগ্নের শরীরে প্রবেশ করে  
তাহা বলা হইয়াছে। তা'রপর বলা হইয়াছে  
ওপদগিক রোগ সকল। এক্ষণে দেখা  
যাউক, ওপদগিক রোগ কাহাদের বলে।  
শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—প্রথমে উৎপন্ন যে  
রোগ পশ্চাৎ কালজাত ব্যাধির সৃষ্টি করে  
তাহাকে ওপদগিক রোগ বলে। আর সেই  
রোগ হেতুক পশ্চাৎ কালজাত ব্যাধিকে  
উপসর্গ বলে।

বিসৃচিকা রোগে অতিসার, মূর্ছা প্রভৃতি  
রোগ উপদ্রব রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।  
সুতরাং বিসৃচিকা রোগও ওপদগিক রোগের  
অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সংক্রামক।

এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অধুনা  
পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে যে সকল  
ব্যাধি জীবাণু কষ্টক উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রাতি-  
পন্ন হইয়াছে, আয়ুর্বেদকারগণ তাহা অবগত  
থাকুন আর নাহ থাকুন, রোগ প্রসঙ্গে সেক্রমণ  
কোন কথার উল্লেখ নাই, সুতরাং যক্ষ্মা-  
রোগের জীবাণুর উল্লেখ না থাকিলেও কোন  
সুখী ব্যক্তি যক্ষ্মারোগকে গাইসম্ হইতে  
ভিন্ন রোগ নির্দেশ করিবেন না, সেই-  
রূপ বিসৃচিকা রোগের জীবাণুব উল্লেখ নাই  
বলিয়াহ উহাকে কলেরা হইতে পৃথক রোগ  
বলা চলে না।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, বিসৃচিকা কলেরার  
মত সন্তোমারায়ক নহে। কিন্তু এই  
আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ আয়ু-  
র্বেদে স্পষ্টঃঃ এরূপ উল্লেখ না থাকিলেও  
বিসৃচিকা যে আরও মারাত্মক তাহা বলা  
হইয়াছে। প্রমাণ দেখুন।

বিসৃচিকা রোগের চিকিৎসার প্রায়শ্ছেই  
বলা হইয়াছেঃ—

“সাধ্যাত্ত পাক্ষে’র্দহনং প্রশস্তময়ি প্রতাপো  
বমনঞ্চ তীক্ষ্ণঃ ।”

অর্থাৎ—সাধ্য রোগে পাক্ষি’ (গোড়ালি)  
উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা পুড়াইয়া অগ্নিক্রিয়া  
(শ্বেদ) এবং তীক্ষ্ণ বমন প্রয়োজ্য ।

প্রথমে বলা হইল সাধ্য রোগের এককপ  
চিকিৎসা করিবে । এতদ্বারা এই রোগের  
বাহুলাভাবে অসামান্য নির্দেশ করা হইল ।  
তার পর রোগের চিকিৎসার প্রথমেই পাক্ষি  
দাহের ব্যবস্থা । আয়ুর্বেদেই মাত্রেই  
অবগত আছেন যে, রোগেব মারাত্মক  
অবস্থায় এইকপ দাহক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়া  
থাকে । সাধারণ পাঠ্যবর্ণের অবগতির  
জ্ঞান আমরা দুইটি অনুরূপ প্রয়োগ দেখাই-  
তেছি । সন্নিপাত রোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে  
কথিত হইয়াছে :—

“পাদমোইত্তয়োমূলে কঠকূপ চ শঙ্করোঃ ।  
শ্বেদেষু চ কুণ্ঠাং কণাং চূর্ণ ঘর্ষণম ॥”

অর্থাৎ সন্নিপাত রোগে (রোগী অচেতন  
হইলে) হস্ত ও পদদ্বয়ের কঠকূপে এবং উভয়  
শঙ্করদেশে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দগ্ধ  
করিবে । অত্যন্ত ঘন নির্গম হইতে থাকিলে  
কুণ্ঠি কলায় বা পিপুলের চূর্ণ শরীরে মর্দন  
করিবে ।

সংজ্ঞান রোগের চিকিৎসায় কথিত  
হইয়াছে :—

“সূচীভিস্তাদনং শস্তং দাহপীড়ানথাস্তরে।  
লুক্কনং কেশ রোমাক্ষদৈহদংশন মেঘচ ।  
আস্ত্রপ্তাংস্বর্ষচ হিতান্তস্তাববোধনৈঃ”

অর্থাৎ সংজ্ঞান রোগে নথের অভ্যন্তরে  
সূচী বিদ্ধ করা উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা  
দগ্ধ করা, কেশ রোমাদি আকর্ষণ করা, দস্ত  
দ্বারা দংশন করা এবং আলকুণী ফল গাজে

ঘর্ষণ করা এই সকল ক্রিয়া দ্বারা রোগীর  
সংজ্ঞা লাভ হয় ।

উপরোক্ত দাহ ক্রিয়া যে রোগের মারাত্মক  
অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা বিজ্ঞ  
বাক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । সূতরাং  
কলেরা যে প্রথম হইতে মারাত্মক আকর্ষ  
ধারণ করে এবং অসাধ্য স্থলে সদ্যোমারাত্মক  
হইয়া থাকে তাহা বুঝা যাইতেছে । আর  
একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যুৎ  
নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করা বাইতেছে ।

বিলম্বিকা—বিসৃচিকা রোগের অবস্থাভেদ  
মাত্র ; সে কথা পরে বলিব । বিলম্বিকা  
রোগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

ছষ্টস্ত ভূকং কক্ষমাক্তাভ্যাং প্রবর্ত্তনোদ্ধি-  
মদৃশ্যবজ্ঞা ।  
বিলম্বিকাং তং ভূশদৃশ্চিকিৎসামাচকতে  
শাস্ত্রাবিদঃ পুরাণাঃ ॥”

অর্থাৎ—যে রোগে বায়ু ও কক্ষ কণ্টক  
দ্রব্য ভুক্ত দ্রব্য উদ্ধ বা অধোদিক দিয়া  
নির্গত হইতে পারে না, তাহাকে বিলম্বিকা  
রোগ বলে । পুরাতন শাস্ত্রবিদগণ বলেন  
এই রোগীকে পারিত্যাগ করা উচিত অর্থাৎ  
রোগীর চিকিৎসা করা উচিত নহে ।

পারিত্যাগ করা উচিত কেন? রোগ  
ভাল হইবে না বলিয়া । যে রোগ প্রথম  
হইতেই অসাধ্য এবং বিসৃচিকার স্তায় দারুণ  
উপসর্গযুক্ত, সে রোগ যে আশু মারাত্মক  
হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি । তাই  
শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে এ রোগ নহে  
সাক্ষাৎ বম ইহার চিকিৎসা করায় ফল নেই ।

ইহার ঠিক অনুরূপ কথা পাক্ষাত্য  
চিকিৎসাকোষিড ডাক্তার অসলরের (osler)  
চিকিৎসা গ্রন্থে (Practice of Medicine)  
দেখিতে পাওয়া যায় ।

এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহারা বিসৃচিকা কলেরার জ্বায় সদ্যো-  
মারায়ক নয় বলিয়া উভয় রোগকে পৃথক  
বলিয়া নির্দেশ করেন তাঁহাদের যুক্তি সমী-  
চীন নহে। কেননা বিসৃচিকা আশু মারায়ক।  
এইস্থলে একটা অবাঞ্ছিত কথা বলিতে বাধ্য  
হইতেছি, বিলম্বিত রোগীকে পরিত্যাগ  
করার কথা বলা হইয়াছে বলিয়া যাহারা  
আয়ুর্বেদ পাঠ করেন নাই, তাঁহারা শাস্ত্র-  
কারদিগকে দোষ দিতে পারেন। যত কঠিন  
রোগই হউক রোগীর চিকিৎসা করিবে না  
এ কি উপদেশ? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উক্ত  
বচনের উদ্দেশ্য বোগেব অসাধ্য এবং আশু  
মারক্য নির্দেশ করা, রোগীকে পরিত্যাগ  
করান। কাবণ শাস্ত্রকারেরাই উপদেশ  
দিয়াছেন :—

যাবৎ কর্ণগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ।  
তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্য কালস্ত কুটীলা গতিঃ।

অর্থাৎ—যতক্ষণ ইন্দ্রিয় শক্তি একেবারে  
লোপ না পায়, যতক্ষণ প্রাণ কর্ণাগত থাকে,  
ততক্ষণ চিকিৎসা করা কর্তব্য। কারণ  
কালের গতি অতি কুটিল অর্থাৎ জানি কি  
যদি রোগী ভালই হয়! শুধু ইহাই পর্যাপ্ত  
নহে।

চরক সংহিতায় এই রোগ আশু-  
প্রাণনাশকারী বলিয়া পরম অসাধ্য বলা  
হইয়াছে।

বায়ু এবং জল দূষিত হইয়া এই রোগের  
সংক্রমণ ঘটে, একথা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ  
ও স্বীকার করিয়া থাকেন এবং সংক্রামক  
রোগের প্রাবল্য নিবারণের জন্ত বায়ুশোধনের  
কাবণ ধূনা প্রভৃতি গৃহীতে ও জল  
শোধনের জন্ত পটাসপারামেসন্যাট ব্যবহার

করিতে পরামর্শ দেন। রোগ বীজ মিশ্রিত  
হইয়াই হউক বা অজ্ঞ যে কোন কারণেই  
হউক বায়ু ও জল দূষিত হইলে পীড়া  
দায়ক হইয়া থাকে।

আয়ুর্বেদ বলেন,—কালের অযোগ,  
অভিযোগ এবং মিথ্যাযোগ বশতঃ ব্যাধির  
প্রাবল্য ঘটে। তদ্যতীত কাল-বিশেষে  
সংক্রামক রোগ বিশেষেও প্রাবল্য ঘটে।  
এখনকার দিনে শীতকালে প্লেগ, বসন্তকালে  
বসন্ত রোগ এবং বসন্ত বা গ্রায়ে বিসৃচিকা  
বা কলেরা রোগের প্রাবল্যের উল্লেখ করিয়া  
আমরা একটা প্রমাণ করিতে পারি।

দেশ দূষিত হইলে সংক্রামক রোগের  
প্রাবল্য ঘটে। সংক্রামক রোগ হইতে পরি-  
ভ্রাণ পাহারার জন্ত সেই দেশ পরিত্যাগ  
করিবার উপদেশ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়  
চিকিৎসা শাস্ত্রেই আছে। আয়ুর্বেদে জন-  
পদোৎসর্গ কালে কর্তব্য সম্বন্ধে লিখিত  
হইয়াছে :—

হিঃ জনপদানাঞ্চ শিবানাং উপসেবনম্।  
অর্থাৎ নির্দোষ জনপদে বাস করা হিতকর  
ও পর্যাপ্ত যাহা লিখিত হইল—ইহাতে  
বুঝা যায় যে, বিসৃচিকাদি সংক্রামক রোগ  
সময়ে প্রবল হইয়া বহু লোকের প্রাণসংহার  
করিয়া থাকে।

এই যে দেশ-কালাদির উপলক্ষে রোগের  
প্রাবল্য, ইহার সহিত অজীর্ণের সম্বন্ধে কি ?  
এসব ক্ষেত্রেও কি অজীর্ণ বিসৃচিকা রোগের  
কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে।

অধিকাংশ রোগের সহিতই অজীর্ণের  
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—“রোগাঃ  
সর্বোহপি মন্দোহ্যো” অর্থাৎ প্রায় সমস্ত রোগই  
অধিমান্য হইতে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং

প্রধানতঃ পরিপাক বস্তু আশ্রয় করিয়া যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা যে অজীর্ণমূলক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, কলেরা জীবাণু উদরস্থ হইলেই রোগ উৎপন্ন হয় না, আরও বিস্তর সাহায্য আবশ্যক, সে জিনিসটা আব বিছুই নহে— অজীর্ণ। কলেরার সময় একস্থানের বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বহুলোক বাঁচিয়া যায়। সাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের অজীর্ণ ছিল এবং যাহারা বাঁচিয়া যায় তাহাদের অজীর্ণ ছিল না—একপ অল্পমান করা অসম্ভব নহে। কলেরার প্রাবল্যের সময় নিমন্ত্রণ থাওয়ার পর দিন কলেরা রোগে অনেক লোককে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে; আর কলেরা হইলেও কলেরার পরে যে পরিপাক শক্তি কিরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহা বলা বাতিল্য মাত্র।

বিখ্যাত হেমিওপ্যাথ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী তাঁহার লিখিত “ওলাউঠা সংহিতা” নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে কলেরার যে কয়টা প্রধান উপসর্গ যথা, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া কোমা (coma—অজ্ঞান হওয়া) এবং চাউল ধোয়া জলের ত্রায় ভেদ হওয়া এসকল বিষয়ের উল্লেখ যখন আয়ুর্বেদে নাই, তখন বিস্ময়কে কলেরা বলা যাউতে পারে না। ছঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, লেখক নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভাব প্রকাশের যে বচনটা আছে তাহার অর্থ এইরূপ;—“নিদ্রানাপ, অস্থিরতা, কম্প, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া এবং অজ্ঞান হওয়া এই পাঁচটা বিস্ময় রোগের ঘোর উপদ্রব।” সুতরাং আয়ুর্বেদের বিস্ময়চকা ও এখনকার কলেরা কেন এ রোগ হইবে না?

আয়ুর্বেদকারগণ বিস্ময়চকার অসাদ্য লক্ষণে বলিয়াছেন—যঃ প্রাবল্য দ্যোষ্ট নগো-  
দ্রল সংজ্ঞা” অর্থাৎ রোগীর দন্ত ওষ্ঠ ও নখ শ্রামবর্ণ সংজ্ঞা অল্প প্রভাতি উপসর্গ ঘটিলে রোগী বাঁচে না। পূর্বে যে মুচ্ছার কথা বলা হইয়াছে তাহাকে কোমা (coma) বলিতে আপত্তি থাকিলেও এই অল্প সংজ্ঞা অর্থাৎ অল্প জ্ঞান থাকা যে কোমা আবদ্ধ হওয়ায় পরিচায়ক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তারপর শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে বিস্ময়চকা রোগে অতিসার হয়। বাতজ অতিসারের লক্ষণ এইরূপ :—

“অরুণং ফেনিলং কৃষ্ণমল্লমল্লং মুণ্ডমূত।

শুক্লামং সুরুশঙ্গং মারুতেনাতিসার্যতে।”

অর্থাৎ—বাতজ অতিসারে সন্দেশ বৃক্ষ ও অরুণবর্ণ মল বায়ুর সহিত অল্প অল্প করিয়া নির্গত হয়, শূলপদ বেদনা, তরু প্রস্রাব হয় না, পেট ডাকে, মলদ্বার নির্গত হইয়া পড়ে এবং কটি, উরু ও জন্তবা অবসন্ন হয়।

সুতরাং এতদ্বারা বুঝা যায় বিস্ময়চকার প্রস্রাব বন্ধ হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এখানে অন্ত্রাশ্র অতিসারের লক্ষণ না ধরিয়া বাতজ অতিসারের লক্ষণ ধরা হইল কেন? কিন্তু বিস্ময়চকা রোগে বায়ুরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া বাতজ অতিসারের লক্ষণ ধরা অসম্ভব হয় নাই। বিস্ময়চকার যে বায়ুরই প্রাধান্য থাকে, তাহা নিম্নলিখিত বিস্ময়চকার সাধারণ লক্ষণ দ্বারা জানা যায়।  
হুচীভিরিব গাত্রানি তুদন সঙ্কীর্ণতেনহনিলঃ।  
যন্ত্রাজীর্ণেন সা ঠৈবৈদ্য বিস্ময়চকি নিগম্যতঃ।

অর্থাৎ—অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অত্যন্ত ক্রান্ত হইয়া শরীরে স্থিতিবেধবৎ যন্ত্রণা উৎপন্ন করে বলিয়া বৈজ্ঞানিক ইহাকে বিসৃচিকা রোগ বলিয়া থাকেন ।

তাবপর বিসৃচিকা রোগীর মলের কথা । বিসৃচিকা রোগ প্রসঙ্গে মলের কথা কিছুট বলা হয় নাই, অতিসারের উপর বরাত দেওয়া হইয়াছে । সুতরাং অতিসারের মলের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের বিসৃচিকার মলের বিষয় স্থির করিতে হইবে ।

কলেরায় শরীরের জলীয়াংশ নির্গত হইয়া যায়, অয়ুর্ষেদর অতিসারের শেষ পরিণাম বিসৃচিকাতেও তাহাই হইয়া থাকে ।

পদার্থ বর্ণনা :—

সংখ্যমাণাঃ দাতুঃশ্চৈঃ প্রকৃতঃ

প্ৰকৃতিশোণায়ু নাপঃ পমুদ্রঃ ।

সবাতীতিসারঃ তমাজ্বাবানঃ যোরং বড়-  
বিধঃ তং বদন্তি ॥

অর্থাৎ—শরীরস্থ জলীয় দাতু সমূহ অর্থাৎ কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, জল, মূত্র, শ্বেদ ও মেদ প্রভৃতি বদ্ধিত হইয়া কোষ্ঠাশ্রিত অগ্নিকে নির্যাপিত করিয়া বায়ু কৰ্কটক অধোদেশে প্রেরিত হইয়া অতিরিক্ত পরিমাণে নিঃসৃত হইলে অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে । এই বোঝা বাদি ছয় প্রকার ।

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই রোগে অর্থাৎ বিসৃচিকায় শরীরের জলীয় পদার্থই বহুলরূপে নির্গত হইয়া থাকে । সুতরাং রোগীর মল প্রথমে মল সংযুক্ত থাকিলেও পেনে যে জলবৎ হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ।

তাবপর প্রতাপক্ষগণ চাল খোয়া জলের ত্রায় মলভেদ হওয়ার উল্লেখ নাই, এইরূপ

বলিয়াছেন । পূর্বেই বলিয়াছি যে শরীরের জল নির্গত—জলের ত্রায় মল ভেদ হওয়া সহজে স্থির করা যাইতে পারে । কিন্তু উহা শারীরিক অত্যাশ্রয় পদার্থ সংযুক্ত থাকায় ঠিক জলের ত্রায় বর্ণযুক্ত হয় না—একটু আবিল হয় । অতিসারে যে বহু প্রকার মলের বর্ণের কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে আবিল কথাটিও আছে । ইহা জল বা দুগ্ধের ত্রায় ভেদ হয় বলিয়াও লিখিত হইয়াছে । সুতরাং বিসৃচিকার চালখোয়া জলের ত্রায় ভেদ হয় এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও বুদ্ধিমান চিকিৎসকের বুঝিবার পক্ষে কোন বাধা হয় না ।

কেহ বলিতে পারেন যে, এরূপ সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আয়ুর্ষেদে স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই কেন ; অবশ্য পাশ্চাত্য চিকিৎসক-দিগের রোগ বর্ণনার প্রণালী দেখিয়াই লোকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে । পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের রোগবর্ণন প্রণালী হইতে আয়ুর্ষেদকারগণের বর্ণনার চেষ্ঠা প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন । যে বিষয়টা ভাল করিয়া বলা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন—এমন অনেক বিষয় আয়ুর্ষেদকারগণ সামান্যভাবে বলিয়াছেন । কোথাও চিকিৎসক অনায়াসে বুঝিয়া গইতে পারিবে বলিয়া আদৌ বলেন নাই । বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে সে সকল কথাই আলোচনা করিলাম না । অজ্ঞ-বন্ধিৎসু পাঠক একই রোগের বর্ণনা উভয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে পাঠ করিলে ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন ।

প্রতিপক্ষগণ যে সকল বুক্তি অবলম্বন করিয়া বিসৃচিকা রোগকে কলেরা বলিতে

চাহেন না, আমবা তাহা দেখাইলাম এবং ঐ সকল যুক্তির বিবন্ধে আমাদের যাচা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এক্ষণে কপেরা আর বিস্থিতিকারোগ যে এক তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

আয়ুর্বেদে প্রায় সকল রোগেরই পূর্বরূপ অর্থাৎ কোন রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু বিস্থিতিকা বা কলেরার উভয় শাস্ত্রেই কোন পূর্বরূপ নাই।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র বলেন,— “কলেরার প্রথম অবস্থায় যে অতিসার হয় তাহাতে পূর্বে কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া সহসা প্রবর্তিত হইয়া থাকে।”

পূর্বে মুচ্ছা, অতিসার, বমি প্রভৃতি যে সকল উপসর্গের কথা লিখিত হইয়াছে, কলেরায় এ সকল লক্ষণ ঘটয়া থাকে, নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তদ্ব্যতীত বিস্থিতিকার অসামান্য লক্ষণে যে সকল উপসর্গের কথা লিখিত আছে সেগুলি কলেরা রোগেও ঘটয়া থাকে। লক্ষণগুলি এই :—

যঃ শ্রাবদশ্বোষ্ঠি নখোহয়সংজ্ঞা

বমাদিতোভ্যন্তর যাত নেত্রঃ।

ক্ষামস্বরঃ সর্ব-বিমুক্ত সন্ধির্ধারায়নঃ সাহ-পুনরগমায়। অর্থাৎ :—বিস্থিতিকা রোগে যদি রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্রাববর্ণ, সংজ্ঞা লুপ্ত প্রায়, অত্যন্ত বমি, নেত্রদ্বয় কোটরগত, স্বর অতিক্ষীণ এবং সন্ধি শিথিল হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

এক্ষণে কলেরার লক্ষণ দেখুন। পূর্বে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, ডাক্তারি শাস্ত্রে

তাহার পর যাহা লিখিত আছে :—তাহার অনুবাদ :—(ক) “অধিকাংশস্থলে দুই এক দিন উদরে শূলবদ্বেদনা হইয়া থাকে, তরল মলভেদ হয়, বমি এবং তদানুসঙ্গিক মস্তকের যন্ত্রণা ও মানসিক অসমতাও থাকিতে পাবে। জ্বর নাও থাকিতে পারে।

(খ) প্রবল অবস্থায়—অতিসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কখন বা প্রাথমিক অবস্থা প্রকাশ না পাইয়া প্রবল অতিসার হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র প্রচুরতর মলভেদ হইতে থাকে। কোন কোন স্থলে শূলুনি এবং (প্রবাহিকা বা আমাশয়ের আয়) কোথামি থাকে। অধিকাংশ স্থলে রোগী অসম ও নিজীব হইয়া পড়ে। প্রবল পিপাসা হয়, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হয়, হাতে পায়ের অংশ ঋণ ধরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বমি আরম্ভ হয় এবং অবিরত হইতে থাকে। বোগী একেবারে নিজীব হইয়া পড়ে, গাত্র-চর্ম ছাইয়ের আয় বর্ণ বিশিষ্ট হয়, চক্ষু দুইটা কোটরে ঢুকিয়া যায়, নাক সূক্ষ হইয়া যায়, গাল তুণ্ডিয়া যায়, স্বরভঙ্গ হয়, হাত পা ফ্যাকাশে হইয়া পড়ে, গাত্রচর্ম শুষ্ক কৃষ্ণিত এবং চটে চটে ও ঘামযুক্ত হয়।.....ক্রমে রোগী অতঃতঃ হইতে থাকে, কিন্তু শেষ পয্যন্ত প্রায়ই অল্প চৈতন্য থাকে।

পাঠক ইহা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, অতিসার, বমি, শূল পিপাসা, ঋণধরা, বিবর্ণতা, মস্তকের যন্ত্রণা, মুচ্ছা বা সংজ্ঞার অন্তরতা, চক্ষুকোটর প্রবিষ্ট হওয়া, স্বরভঙ্গ বা স্বরের ক্ষীণতা, ক্ষোমস্বর এবং হস্তপাদি ফ্যাকাশে হওয়া শ্রাব দন্ত, ওষ্ঠ, নখ প্রভৃতি লক্ষণ কলেরা এবং বিস্থিতিকা উভয় রোগেই দেখা যায়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে আর এক প্রকার কলেরা আছে, তাহাকে কলেরা-সিকা বনে। তাহার লক্ষণ এইরূপ :—

“এই রোগে রোগ প্রকাশ পাইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অতিসার না হইয়াই রোগীর মৃত্যু হয়।”

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের এই কলেরা-সিকা আয়ুর্বেদোক্ত অলসক এবং বিলম্বিকা বা দস্তালসক রোগ। অলসক রোগের লক্ষণ যথা :—

কুক্ষিরানয়তৈর্ভার্যং প্রথমোৎ পরিকূজতি।

নিকল্লো মাকতশ্চৈব কুক্ষাবুপরি ধাবতি ॥

বাণবজ্রো নিরোধশ্চ বজ্রাতর্থং ভবেদপি।

কণ্ঠালসকমাচর্থে তৃষোদগারো চ যজ্ঞতু ॥

অর্থাৎ পেট অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, রোগী অবসর হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে (The collapse.), যন্ত্রণায় অব্যক্ত শব্দ করে, রক্ত বায়ু পেটের উপর দিকে উঠিতে থাকে, মন মূত্র রোধ হয় এবং হিকা ও উদগার হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে অলসক রোগ বলা যায়। বিলম্বিকা বা দস্তালসক রোগ অলসক রোগের ভেদ মাত্র।

এইখানে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত যে একটু মতবৈধ আছে, তাহা দেখাইতেছি। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন যে কলেরা-সিকাতে ভেদ হইবার পক্ষেই রোগীর মৃত্যু হয়। ইহাতে বুঝা যায়, রোগী আর কিছুক্ষণ জীবিত থাকিলে ভেদ হইত। কিন্তু আয়ুর্বেদমতে ছট-ভুক্ত-দ্রব্য আমাশয়ে অলস হইয়া থাকে বলিয়াই

ইহার নাম অলসক রোগ। সুতরাং এই রোগে রোগের ধর্ম-বশতঃ ভেদ হয় না।

চরকে কথিত হইয়াছে :—আমদোষ বা অজীর্ণদোষ দুই প্রকার, বিসৃচিকা ও অলসক। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মত ও এইরূপ।

তাহারা বলেন, অজীর্ণ রোগ দুই প্রকার এক প্রকার অজীর্ণ রোগে পরিপাক যন্ত্রের আক্ষেপ হয় এবং আর এক প্রকার অজীর্ণ রোগে পরিপাক যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে।

বিসৃচিকা বা কলেরায় প্রথমোক্ত এবং অলসক বা কলেরা-সিকায় দ্বিতীয়োক্ত অজীর্ণ দোষ ঘটে এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যাহারা বিসৃচিকাকে কলেরা হইতে পৃথক বলিয়া নির্দেশ করেন তাহাদের মত ভ্রাম্যাক।

বিসৃচিকা বা কলেরা চিকিৎসা সম্বন্ধেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মত প্রায় একরূপ। আমরা তাহার প্রমাণের অমূল্য বাদ দিতেছি।

“মুখ দিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করাই ভাল কারণ তাহাতে পাকস্থলীর আরও উত্তেজনা ঘটয়া থাকে। আমাদের বাতটকার বলিয়াছেন :—

বিসৃচিকা রোগে তীব্র বেদনা হইলেও শূলনাশক (শূলনাশক শব্দে বমন ও অতি-সারাদিনাশক ঔষধ বলা হইল ইতি টীকা কর) ঔষধ সেবন করা উচিত নহে; কেননা দোষ কর্তৃক অবসন্ন অগ্নি দোষ, ভুক্ত দ্রব্য এবং ঔষধ পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না।

সাধ্য বিসৃচিকা রোগে উত্তম লৌহ

শলাকা দ্বারা পায়ের গোড়ালি পুড়াইয়া দেওয়া অগ্নিতাপ, ভীক্ষু বমন ও ভুক্ত দ্রব্য পক্ষাভি-  
মুখ হইলে লজ্জন-শ্বেদাদি দোষপাচক  
ক্রিয়া ও ফলবত্তী দ্বারা বিরচন হিতকর।  
এইরূপে বিস্তৃত দেহ ব্যক্তির মূচ্ছা অতিসার  
প্রভৃতি সদ্যই নিবর্ত্তি পাঠয়া থাকে। কেহ  
কেহ বলেন যে আস্থাপন প্রয়োজন  
হিতকর।”

এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে,  
কলেরা বা বিস্ফটিকার প্রথমে মুগ দিয়া ওষধ  
সেবন উভয়বিধ চিকিৎসা শাস্ত্রেরই অতি-  
প্রেরিত নহে।

এস্থলে পাঠকগণের বোধ-সৌকার্যার্থ  
বলিতে হইতেছে যে, বমন, ফলবর্ত্তি প্রভৃতি  
প্রয়োগের যে উপদেশ আছে, তাহা বিস্ফটিকা  
বা অলসক রোগভেদে বিবেচনা পূর্বক  
প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন ফলবর্ত্তি—  
অলসক রোগে প্রযোজ্য।

শাস্ত্রে বিস্ফটিকায় যেকপ অগ্নিতাপ দিবার  
উপদেশ আছে, কলেরা রোগে পাশ্চাত্য  
চিকিৎসা শাস্ত্রেও সেইরূপ আছে। যথা:—

“উত্তাপের বাহ্য প্রয়োগ করা উচিত  
এবং উষ্ণ জল পান করাষ্টয়া দেখা যাইতে  
পারে। উদরে তাপ প্রয়োগ বিশেষ  
উপকারী।

আয়ুর্বেদে যে অগ্নি তাপ দিতে বলা  
হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত বচনের অর্থ  
হইতেই জানা যায়। এ সম্বন্ধে আরও  
স্পষ্ট একটা বচনের অর্থ দেখুন;—

“যবের চূর্ণ ও যবক্ষার (সোয়ার তায়  
শুণবিশিষ্ট) ঘোলের সহিত বাটিয়া উষ্ণ করিয়া  
উদরে প্রলেপ দিলে বেদনা নষ্ট হয়।  
ইহা দ্বারা বহু উষ্ণ বাষ্পপূর্ণ ঘটে; হাত গরম

করিয়া বা অন্ত্র প্রকারে উদরে শ্বেদ নিবে,”

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে উষ্ণ  
জল দ্বারা আমাশয় ধৌত করিবার বিধি  
আছে।

আয়ুর্বেদে আমাশয় ধৌত করার ফাটা  
উল্লিখিত না হইলেও নিম্নলিখিতরূপ বমন  
দ্বারা তাহা দূষিত হইয়া থাকে। যথা,—

“সাধ্য আমদোষে দ্রষ্টে অলসীভূত আম-  
দোষ প্রথমে লবণমিশ্রিত উষ্ণ জল সেবন  
করাইয়া নির্গত করিয়া ফেলিবে।”

“আরও দেখুন,—কবজ, ফল, নিম্ভাল,  
আপাংবীজ, শুণক, বাবুঁতুনদী এবং  
কুড়চি ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা  
বমন করাষ্টলে ঘোরতর বিস্ফটিকা রোগ  
প্রশমিত হয়।”

পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, আয়ুর্বেদে  
বিস্ফটিকা রোগে নিক্রম প্রয়োগের বিধি  
আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও অন্ত্র  
ধৌত করিবার বিধি আছে।

“ইষজ্জল ও সাবান কিম্বা শতকরা  
দুইভাগ ট্যানিস এসিড দিয়া অন্ত্র ধৌত  
করিয়া ফেলা উচিত।”

বিস্ফটিকা রোগ ভাল হইবার মুখে পথ্য  
প্রয়োগ সম্বন্ধে যে বিশেষ সাবধানতা  
আবশ্যক—তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়  
চিকিৎসা শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে। সুপ্রতি  
বলিয়াছেন,—বিস্ফটিকা রোগে যথাযোগ্য  
বমন, বিরচন ও লজ্জনের পর ক্ষুধার্ত  
রোগীকে পাচক ও অগ্নিদীপক ঔষধ-সংস্কৃত-  
পেয়াদি লঘুপাক পথ্য দিবে।

ডাক্তারি শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“রোগ  
ভাল হইবার মুখে রোগীর আহার সম্বন্ধে  
বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য এবং প্রথম আহার



হাততে পুনরায় না হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যিক ।”

আমরা এ পর্য্যন্ত যে রোগের লক্ষণ, উপসর্গ, চিকিৎসা ও পথ্য সম্বন্ধে বলিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আয়ুর্বেদোক্ত বিস্ফটিকা রোগই কলেরা । তবে কি জন্ম যে কতকগুলি চিকিৎসক বিস্ফটিকাকে কলেরা নয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না ।

বিস্ফটিকা রোগ বহুকাল পূর্ব হইতে ভারতবর্ষে বিস্তারিত আছে—ইহা পাশ্চাত্য

চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন । ডাক্তার অসলার প্রমুখ মনস্বিগণ বলেন,— “কলেরা প্রাচীন কাল হইতে দেশগত-ভাবে ভারতবর্ষে বিস্তারিত আছে । বহুদিন পূর্ব হইতেই যদি কলেরা রোগ ভারত-বর্ষে বিস্তারিত থাকে, তবে আয়ুর্বেদে তাহার চিকিৎসাদি সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ থাকিবে না, তহাও কি সম্ভব ? যাহা হউক বিস্ফটিকা ও কলেরা যে একই রোগ— তাহাতে সন্দেহ নাই ।

শ্রী—

## মহিলাগণের চিকিৎসা-শিক্ষা ।

( ৪ )

( রক্ত প্রদর )

আহারাদির পর পিসীমার পাকা চুল ঝুগিয়া দিতেছিলাম । তখন শীতকাল,— পিসীমা রোদে পিঠ দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিতেছিলেন— “আমার মাথার যতগুলি চুল—বউমা, তোমার দেহরূপ পরমায়ু হোক” ।—

আমি বলিলাম—সেকি—পিসীমা— তা’ হ’লে তো’ আর মরায় হ’বেনা দেখছি, তোমার মাথার চুল তো অশুভ্গতি—তা’ তোমার চুলের মত আমার অশুভ্গতি পরমায়ু হ’বে নাকি ? আমি তোমার ও রকম আশীর্বাদ চাই না ।”

পিসীমা বলিলেন—“কেন বউমা, বেশী

মাথ—৬

পরমায়ু চাওনা কেন ? বেশীদিন বাচা হোঁ মা, পুণ্যের লক্ষণ । যা’রা পাপী—তা’রাই অল্পদিনে ম’রে যায় । তুমি মা তো আমার সে রকম কোন পাপ করনি যে তোমাকে অল্পায়ু হ’তে হ’বে । তুমি মা আমার সর্ব-স্বখী হও—তোমার পরমায়ু অক্ষয় হোক ।” আমি বলিলাম—“শুধু আমার পরমায়ু অক্ষয় হ’লেই বুঝি আমার সব হ’বে—তা’র চেয়ে আমাকে বেশী আশীর্বাদ ক’রবার আর কিছুই নেই পিসীমা ?”

পিসীমা আমার মনের কথা বুঝিলেন । বুঝিয়া একটু হাসিলেন । তা’র পর বলিলেন—“মা, সে আশীর্বাদ আমি রোজই

ক'রে থাকি। তোমাকে শুনিযে কি সে আশীর্বাদ ক'রবে? সে আশীর্বাদই তো মা তোমাকে সব আশীর্বাদের মূল।”

আমিও পিসীমার কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তখনি সে কথা চাপা দিয়া বলিলাম,—“আচ্ছা পিসীমা, তুমি যে আমাকে তোমার চিকিৎসা-শিক্ষার শিষ্যা ক'রবে ব'লেছিলেন, তা' কই ক'রলে না? তা' গতদিন তুমি না আমাকে সে সব শেখাচ্ছ—ততদিন কিন্তু আর আমি তোমার পাকা চুল তুলব না।”

পিসীমা আবার হাসিলেন। হাসিয়া আমার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—“পাগলি আর কি?—তা' শিষ্যা কি তোমায় ক'রছি না বউ মা! এই সুরমার ছেলের অস্থখ হ'ল, খাজাঞ্জীরাবুর জ্বর অস্থখ হ'ল—সে সব যা' ক'রে সাব'ল—তা' তে কি তুমি কিছু শিখলে না? শুধু মুখে উপদেশ দিয়ে তোমায় শিষ্যা ক'রবে কেন?—তোমায় তো হাতে-কণ্ঠমে সকল ব্যবস্থা শিখিয়ে খুব ভাল শিষ্যা তৈরি ক'রছি। তবে তুমি আমার পাকা চুল তুল'বে না কেন?”

আমি বলিলাম—রোজ রোজ রোগী পাবে,—তবেতো তুমি আমায় হাতে-কলমে শিষ্যা তৈরি কর্কে। রোগী না পেলে বুঝি মুখের কোন উপদেশ দিতে নেই?”

পিসীমা বলিলেন,—“তা' থাক'বেনা কেন?—তা' আছে। তবে রোগী পেলে যে শিক্ষা দেওয়া হয়—সে শিক্ষা অকাটা হয়।”

আমাদের এইরূপ কথাবাদী হইতেছে, এমন সময় গম্ভাদিক হইতে কে আসিয়া আমার চোখ টিপিয়া ধরিল। টেপনটা

একটু জোরে হইয়াছিল, কাজেই আমার একটু লাগিয়াও ছিল। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—“কে—কে,—ছাড়িয়া দাও।”

যে চোখ টিপিয়াছিল, সে ছাড়িল না, খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

আমি তাহার হাসি শুনিয়া আরও বিরক্ত হইলাম, তাহার হাতটা ধোর পুঙ্ক সরাইয়া দিলাম। তাহার পর কিরিয়া বাহা দেখিলাম—তাহাতে রাগ হইল না, রাগের পরিবর্তে আনন্দ হইল। সুরমা আমাব চোখ টিপিয়াছিল, পিসীমা চুপ করিয়া রহ দেখিতেছিলেন। আমি একটু অশ্রুভ হইলাম। বলিলাম—“সুরমা—তুমি! কখন এলে! বড় জোরে টিপিয়াছিলে, তাই একটু লাগিয়াছে।”

সুরমা আমার চোখের নিকট হাত লইয়া গিয়া, যে স্থানে টিপিয়া ধরিয়াছিল, সেই স্থানে একটু হাত বলাইয়া দিল। তাহার পর বলিল,—“এই বুঝি তুমি আমার ভাল-বাস! একটু টিপিয়া দিলে' সহ করতে পারনা!”

আমি পুনরপি অশ্রুভ হইয়া বলিলাম, “না—না—তেমন লাগে নি, তা—তা—তুমি কখন এলে ভাই! অনেক দিন চিঠি-পত্র লেখনি কেন? ছেলে-পিলে সব ভাল আছে তো?”

সুরমার পার্শ্বে আর একটি যুবতী দাঁড়াইয়াছিল, আমি বলিলাম,—“এটি কে ভাই! বেশ মেয়েটি তো!”

সুরমা বলিল—“অনেক কথা বললে যে! চিঠি-পত্র তুমিও যে অনেক দিন আমাকে লেখনি—সে কথা তো ব'লে না! বয়স হ'লে এই রকমই হয়।”

আমি বলিলাম—“ভাই, আমাকে সংসারের সবই একা দেখতে হয় সেটাতো জান, সূত্রাং আমার সাত খুন মাপ। তা, যা হোক, এ মেয়েটিকে—পরিচয় দিলে না তো!

সুরমা বলিল—“আমার জা,—ছোট দেওয়ার স্ত্রী। রক্তভাঙ্গা রোগ হ’য়েছে, তাই পিসীমার নিকট নিয়ে এসেছি।”

পিসীমা বলিলেন,—“দেখলে বউমা, যে যা চায়—সে তাই পায়। তুমি চিকিৎসা শিপ্তে চাহিলে,—এই তো তোমার আর একটি রোগের চিকিৎসা শেখবার উপায় হ’ল।”

সুরমা ও তাহার জা এ কথার অর্থ বুঝিল না,—তাঁহারা আমাদের দিকে তাকাইল। পিসীমা কিন্তু অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। সুরমা সে অর্থ গুনিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার পর পিসীমা রোগী লইয়া পড়িলেন। প্রথমেই তাহার বা চিকিৎসক-দিগের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস মত বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুরমা বলিল—“কুড়ি বৎসর।”

পিসী। ছেলে পিলে ক’টি?

সুরমা। ছটি।—একটি আমার ঘোল বছরের সময় হয় আর একটি তা’র ছ’ বছর পরে হয়েছে।

পিসী। অসুখটা হ’য়েছে কদিন?

সুর। প্রায় এক বছর।

পিসী। ঋতুটা কি কি মাসে নিয়ম মত হয়?

সুর। না, কখন বা ঠিক সময়ে মাসে একবার হয়, আবার কখন বা মাসে দু’বারও হয়। কিন্তু যখনই হোক—দশ বার

দিন ক’রে রক্ত ভাঙ্গতে থাকে। ঋতুর সময় ছাড়া অত্র সময়ে বেদনার সহিত কখন কখন স্রাব হয় বুঝা যায়।

পিসী। অঞ্চল আছে? যা’ থায়—ইজম হয়!

সুর। না—অঞ্চল হয় না, তবে রাত্রিতে ক্ষিদেও বড় থাকে না—বেন খেলেও হয়, না খেলেও হয়।

পিসী। তা’ হলেই তো যা’ থায়—তা’ ভাল জীর্ণ হয় না। জীর্ণ হ’লে আর ক্ষিদে হ’বে না কেন। দাস্ত কিরূপ হয়!

সুর। প্রায়ই ভাল হয় না!

পিসী। ছেলে কি এই ছুটিই—না আর হইছিল!

সুর। না, আর হয় নি, তবে আর একবার গর্ভ হ’য়ে ছ’ মাসের সময় নষ্ট হ’য়ে গি’ছিল।

পিসী। সে কত দিনের কথা?

সুর। প্রায় দেড় বৎসর, তা’র কিছু দিন পর থেকেই এই অসুখটা হ’য়েছে।

পিসী। তবেই তো এ রোগ জন্মাবার একটা কারণ র’য়েছে বুঝতে পারা গেল। লোকনাথ বন্দি বলত—এক সঙ্গে ক্ষীর-মাছ প্রভৃতি বিরুদ্ধ আহার ক’বলে, অপক্ক জিনিস আহার করলে, মদ্য পান ক’রলে, অভ্যস্ত স্বামী সহবাস ক’রলে, আর অকালে গর্ভ নষ্ট হ’লে এ রোগ জন্মে থাকে। শোক এবং বেশী উপবাস থেকেও এ রোগ জন্মে থাকে। দিনে ঘুমান, বেশী তারি জিনিস ব’য়ে নিয়ে যাওয়াও এ রোগ জন্মাবার একটা কারণ। তা’ যে কারণেই হোক একটা কারণ গর্ভ নষ্ট—এটা বোঝা গেল।

পিসী। চেহারা কি এর চেয়ে বেশী ভাল ছিল? জল কি রকম থায়? কখন মুচ্ছা হয় কি!

সুর। চেহারা এর চেয়ে আগে ভাল ছিল,—এখন ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছে। জল বড় খায়—আমরা বারণ করি, বলি—অত জল খেওনা—বেশী জল খেলে জীর্ণের পক্ষে ব্যাপ্যত হয়—কিন্তু সে কথা শোনে কে?

পিসী। গা-হাত-পা জলে!

সুর। খুব। রোজই বলে—দিদি, গা-হাত-পা জলার একটা উপায় করে দাও।

পিসী। ঘুম কেমন হয়?

সুর। ঘুমের পরিমাণটাও বেশী—তা' কি দিন, কি রাত। তবে ঘুমের পরিমাণ বেশী হ'লেও—ডাক্তারই ঘুম ভাঙ্গে, ঘুমটা যেন তল্লার মত।

পিসী। যে স্নাঘটা নির্গত হয়—সেটা কি মাংস ধোয়া জলের মত? পরিমাণে বেশী না কম? ফেনা ফেনা মনে হয়।

সুর। কখন কখন মাংস ধোয়া জলের মতই হয় বটে, আবার কখন কখন রাঙ্গা টকটকে দেখা যায়, কিন্তু বড় কক্ষ। আর স্নাঘের সময় বেদনা বড় বেশী।

পিসী। এটা হ'চ্ছে, বাতিক প্রদর—এ বায়ুজনিত প্রদর সারবে। লোকনাথ বর্দ্ধি বলি—প্রদর রোগ চার প্রকার,—কফজ, পিত্তজ, বাতজ ও ত্রিদোষজ। ত্রিদোষজ মানে হ'চ্ছে—বায়ু, পিত্ত ও কফ—তিনটে মিশে যে রোগ জন্মায়—সেইটা ত্রিদোষজ। তা' এ ত্রিদোষজ কবিরাজদের সকল রোগেই আছে। যাক্—এ রোগ একটু বহু নিঘেট সহজে সারবে। কোন চিকিৎসা হইছিল।

সুর। ডাক্তারি ওষুধ অনেক খাওয়ান হ'য়েছে, কিন্তু কিছুই হয় নি।

পিসী।—ওই তো তোমাদের দোস,—ডাক্তারি ছাড়া আর কিছু জান্লে না। এদিন যদি কোন কবিরাজকে দেখা'তে, তা'হ'লে সে টোটকা-যুক্তিবাগে এ রোগ সারিয়ে দিতে পারত।

সুর।—তা' যা' হ'য়েছে—তা' হ'য়েছে, এখন তো সারিয়ে দাও পিসীমা।

পিসী। স্বামীর কাছে কিন্তু এক বছর শু'তে পারবে না, আগে এ কথায় রাজি হ'তে হ'বে।

সুরমা হাসিয়া ফেলিল। আমিও হাসি চাপিতে পারিলাম না। পিসীমা একটু রাগের ভরে বলিলেন,—“হাসছ কি—ওরই বেশী বাড়াবাড়ি ক'রেই তো রোগের উৎপত্তি। এখন কিছুদিনের জন্ত ওটা বন্ধ না ক'রলে চ'লবে না।”

সুরমা তাহার জায়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—“শুন্'ছ তো—একবছর একা শু'তে থাক'তে হ'বে, পারবে তো!”

সুরমার জা লজ্জিতভাবে নতদণ্ড হইল। উত্তর দিল না।

সুরমা বলিল—“তা' হ'চ্ছেনা, আগে উত্তরটা দাও। সুরমার দেবরপত্নী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

তাহার পর পিসীমা বলিলেন,—“প্রধান নিয়মের কথাটা তো হ'ল, তার'পর আরও কতকগুলি নিয়মের কথা বলি। এগুলিও পালন ক'রতে হ'বে। শাক, অমল, কলাইয়ের দাগটা মোটেই খেতে পারবে না, লঙ্কার ঝাল, গুরুপাক এবং ভীক্ষুবীর্ষ্য ত্রব্য, দই, বড় মাছ, বেশী ছল, কুমড়া, বেশী ছপ

এ সব খাওয়াও বন্ধ ক'রতে হ'বে। রোদে বেড়াতে পাবেন না, ভাঁরি জিনিস নিয়ে তুলতে পাবেন না, সিঁড়ি বা বেশী উঁচু যাত্রা থেকে বেশী ওঠা-নামা ক'রতে পাবেন না, মল-মূত্রাদির বেগ মোটেই ধারণ ক'রতে পাবেন না, হিম লাগান, রাতজাগা, রোগ স্নান করা, বেশী জোরে কথা কওয়া, আগুণ তাতে বেশীক্ষণ থাকা—এ সবও ক'রতে পাবেন না, এই সব যদি ক'রতে পার, তা'হ'লে আমি চিকিৎসার ভার নিতে পারি, নইলে চিকিৎসা করান মিছে মাত্র।

সুখ। এ সব নিয়ম খুব পালন করা চ'লবে পিসীমা, এ সব তো খুব সহজ নিয়ম। যেটা সব চেয়ে শক্ত—সেটটা যদি পালন ক'রতে পারেন—তা' হ'লে এ সবের জেছ কিছু আটকাবে না।

পিসী। খাওয়ার কথাটা একটু বলি শোন। দিনের বেলা পুরাণ দাদুখানি চালের ভাত, মুগ, ছোলাব দাল, ডুম্ব, পাকা কুমড়া, মোচা, বেগুন আলু উচ্ছে কাচ-কলা—এই সবের তরকারি, মাছটা দিন কতক না খেলেই ভাল হয়, খেলে ছোটমাছ এবং পরিমাণে খুব অল্প। রাত্ৰিতে রুটী বা গুঁড়ি এবং দিনের মত তরকারি। তেলে পাক করা তরকারি না খেয়ে ঘিয়ের তরকারি খেলে বেশী উপকার হয়। জলখাবার—ময়দা, সুজি, ছোলার বেশম, ঘি এবং অল্প মিষ্টি দিয়ে যে সব জিনিস ভ'য়ের হয়। কপের মধ্যে খেজুর, দাড়িম, পানফল, কিসমিস, মিছরি, আক প্রভৃতি। স্নানটা বত কম হয়, তাও যে দিন স্নান করা হ'বে—সে দিন ঠাণ্ডা জলে নয়, জল গরম ক'রে নিয়ে স্নান ক'রতে হ'বে।

সুখ। তা' এসব নিয়ম খুব পালন করা চ'লবে পিসীমা। এইবার তুমি ওষুধের কথা বল।

পিসী। হ্যাঁ বলছি। কাঁটান'টের গাছ চেন তো? সকালবেলা সেই কাঁটা ন'টের শিকড় এক সিকি ভ'র ওজনে নিয়ে আলোচাল ধোয়া জলের সঙ্গে বেটে তা'রপর আর একটু আলোচাল ধোয়া জল নিয়ে ঐটে পাতলা ক'রে তা'র সঙ্গে একটু মধু মিশিয়ে খেতে হ'বে। সন্ধ্যাবেলা কুশ'রমূল—কুশ চেনতো!—গঙ্গার ভাঙ্গনে ঘাসের মত যে গাছগুলো হয়—গঙ্গা নাইতে গিয়ে দেখেছ বোধ হয়—সেই কুশের মূল ঐ রকম সিকি ভ'র ওজনে নিয়ে ঐ রকম ক'রে আলোচাল ধোয়া জলে বেটে পাতলা ক'রে মধু মিশিয়ে খা'বে। আর বিকেল বেলা একবার ক'রে অশোকের কাথ খেতে হ'বে। অশোক এ রোগের একটা মহা ওষুধ।

সুখ। অশোকের কাথ কি পিসীমা?

পিসী। অশোকের ফুল দেখেছ তো? অশোকবৃষ্টিতে অশোকের ফুল লাগে জলি না?—সেই অশোকের ছাল ২ তোলা—২ তোলা মানে হ'চ্ছে দু টাকা ভ'র ওজনে নিয়ে একটু কুটে নিয়ে একছটাক দুধ আর সাতছটাক জল একটা মাটির হাঁড়িতে কাঠের জালে সিদ্ধ ক'রে দুখটুকুমাত্র থাকতে নামিয়ে ক'স্টে ছেকে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে তা'তে একটু চিনি মিশিয়ে সেইটে বিকাল বেলা তিনটা চা'রটা বেলার সময় খেতে দেবে। একে বলে—অশোক-কীর বা অশোক-দুধ। এটি সকল প্রকার প্রদর রোগেরই মহোষধ। কবিরাজেরা এই

অশোক-ফীর বা অশোক-ছুধের বদলে তৈরি করা “অশোক-বি” দিয়ে থাকে, যদি কোন ভাল ক’বুবেজের দ্বারা সেই অশোক-বি তৈরি ক’রে নিতে পার—তা’ হ’লে এ না ক’রে তা’ দিতেও পার। তবে জিনিষটা খাঁটি হওয়া চাই—সেই জন্টই তৈরি করিয়ে নিতে ব’লছি, বাজারে কবিরাজী ওষুধ বিক্রীত অনেক দোকানে তৈরি অশোক-বি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আজকাল অনেকেই ক’বুবেজি ব্যবসা ক’রছে। তা’রা চিকিৎসার ধার পারেনা—শুধু লাভের জন্ট ওষুধ বিক্রীই তা’দের উদ্দেশ্য। এইসব গোণযোগের জন্ট কোন ক’বুবেজের দ্বারা তৈরি ক’রিয়ে নেওয়াই ভাল।

স্বর। আর কোন ওষুধ খাওয়াতে হবেনা? শুধু এই ক’রলেই সেরে যাবে?

পিসী। এতেই সা’রবে বোধ হয়। তবে আরও ছ’একটা মুষ্টিযোগ ও পাচন বলছি, শুনে রাখ, যদি দরকার বোঝ, অর্থাৎ যদি এই সকল ব্যবস্থা দিন প’নের কি মাসখানেক ক’রেও না সারে, তা’ হ’লে সেই সব ব্যবস্থা ক’রতে পার। কিন্তু কতকগুলো ওষুধ একসঙ্গে খাওয়াই ওনা, কতকগুলো ওষুধ একসঙ্গে খাওয়ান ভাল নয়। এ ব্যবস্থায় যদি না সারে, তা’ হ’লে কাঁটান’টে আর কুশের কথা যা’ ব’লেছি—সেই দু’টি বদলে দিয়ে তা’রই যায়গায় আর দু’বার দু’-রকম ওষুধ দিতে পার। কিন্তু অশোক ছেড়না, অশোক এ রোগের পরম ওষুধ কেনে রেখ।

স্বর। তাই ক’রব পিসীমা, এখন ভূমি আরও গোটাকতক ওষুধ ব’লে দাও। শিখে রাখলেও অনেক কাজ হ’বে।

পিসী। কাকমাচীমূল কিষা কাপাসের মূল চাঁল ধোয়া জলের সঙ্গে খেলে প্রদর রোগে উপকার হয়। মধুর সহিত কাঠডুমুরের রস কিষা বেড়েলারমূল ছাগল-হুখে বেটে খেলে প্রদর রোগ ভাল হ’য়ে থাকে। কুশমূল ও বেড়েলারমূল এক-একটি দিকি ভ’র ওজন নিয়ে চাঁল ধোয়া জলের সঙ্গে বেটে খেলেও প্রদর ভাল হয়। কাকমাচী কি কাপাসের মূল বা কাঠডুমুরের রসের কথা যা’ ব’লেছি—ওদের পরিমাণও দিকি ভ’র জান্বে। কুড়, শুকনাকুল আর শুকনা কাচাকলার গুঁড় এক একটি দিকি ভ’র ক’বে নিয়ে দুধ বা ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও প্রদর রোগ সেরে থাকে। কুড় বেণের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। বৈদ্য রক্ত-শ্রাব থামাবার জন্ট শরপুষ্ণ বা বননীর মূল একভরি নিয়ে চালধোয়া জলের সঙ্গে খেতে দিলে সন্তঃ ফল হ’য়ে থাকে।

স্বর। তা’ তো বুঝলাম পিসীমা,—এখন কোন্ ব্যবস্থাটা ক’রব—ব’লে দাও।

পিসী। সে কথাতো ব’লে দিইছি, আগে যে রকম ব্যবস্থায় থাকতে ব’লেছি, তাই ক’রবে, তা’তে না সারে, তবে এ সকল কথা। তবে আমার মনে হয়—যে তিনটি ওষুধের কথা আগে ব’লেছি তাই ক’রলেই সেরে যা’বে।

স্বর। তাই বল পিসীমা—অয়েই সেরে যাক্। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে, দেখলে আমাদেরো কষ্ট হয়।

তাহার পর স্বরমা আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—আমি তো এসেই তোমাদের বাড়ী এইছি তাই—ভূমি কি আমাদের বাড়ী যা’বে না?

আমি বলিলাম—তুমি তো এসেছ  
নিজেব গরজে। আমিও আমার গরজ  
প’ড়লে যা’ব, এখনও তো আমার কোন  
গরজ প’ড়েনি।

সুর। তবে তুমি থাক, আমি চ’ললাম।  
এই বলিয়া সুরমা চলিয়া গেল। সুরমা  
চলিয়া যাওয়ার পর আমি পিসীমাকে  
বলিলাম—“পিসীমা, সুরমা আসিয়া কেবল

তো রোগেরই কথা कहিল। তাহার সহিত  
আমার কোন কথাই হইল না, একবার  
দেখা করিয়া আসিব ?

পিসীমা বলিলেন,—“যাও।” আমি  
পিসীমার অনুমতি পাইয়া বালা সঙ্গিনীর  
সহিত মিলিত হইয়া পরমাল্লাসে সুখ-দুঃখের  
কথা कहিতে লাগিলাম।

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

মানুষের বদলে কুমীর।—

কলিকাতা বা রাস্তাগুলির গর্তের ভিতর এখন  
ধাক্কব নামাইয়া নর্দমা পরিষ্কার করান হয়।  
আমেরিকাব ক্রোয়াচা নগরের নর্দমা  
কুমীরের দ্বারা পরিষ্কার করানর বাবস্থা  
আছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কর্তারা  
এখানে সেই নিয়ম চালাইবার প্রস্তাব  
করিয়াছেন। মন্দ কি ! ইহাতে ধাক্কবদিগের  
স্বাস্থ্য হানি ঘটিবে না। তাহারও তো মানুষ  
ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আয়ুর্বেদ সভার অভাব।—

গত বড় দিনের সময় জাতীয় মহাসমিতির  
অধিবেশন উপলক্ষে এবার কলিকাতায়  
নানারূপ সভারই আয়োজন হইয়াছিল।  
কিন্তু আয়ুর্বেদ সভা বাদ পড়িয়াছে। কেহ  
কেহ বলিতেছেন,—ইতঃপূর্বে আয়ুর্বেদের  
উন্নতির জন্য কলিকাতা হইতে কয়েকজন  
খাতনামা কবিরাজ দিল্লী পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়া

গিয়াছিলেন, সে অবস্থায় কলিকাতায় এত  
জনসংখ্য উপলক্ষে তাঁহাদের চেষ্টা করিয়া  
একটা আয়ুর্বেদ সভার আয়োজন করা  
উচিত ছিল।

পরিদর্শন।—কিছুদিন হইল কোচ

বিহারের মহামন্ত্রী ভূপ বাহাদুর অষ্টাঙ্গ  
আয়ুর্বেদ বিভাগের পরিদর্শনে যথেষ্ট শ্রীতি-  
প্রকাশ করিয়া এই বিভাগের অনুষ্ঠাতৃ বর্গকে  
বিশেষ উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। একজন  
উক্ত মহারাজা বাহাদুরের নিকট আমরা  
বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বালকরক্ষার ব্যবস্থা।—বালক

মহলে সিগারেটের অবাধ প্রচলনের ফলে  
তাহাঙ্গির যে স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয় জন্মাই  
তেছে এ কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি।  
সংপ্রতি শুনিয়া সুখী হইলাম, গবর্ণমেন্ট  
আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া ইহা

রহিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ২১ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন বাগককে কোন দোকানদার, সিগারেট, বিড়ি, সিগার বা নল বিক্রয় বা দান করিলে প্রথম অপরাধের জন্ত অননিক ১০ টাকা, দ্বিতীয় অপরাধের জন্ত ২০ এবং তৎপরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্ত অননিক ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে—ইহাই পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইয়াছে। পুলিশ কর্মচারী, শিক্ষাবিভাগের কর্মচারী, প্রিন্টিং মার্ভিনেথ কর্মচারী অথবা পণ্ড ক্রেশ নিবারণী সভার কর্মচারীরা ২১ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন বাগককে ধুমপান করিতে দেখিলে তাহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইতে পারিবেন—ইহাও পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট এ আইন বিবিবদ্ধ করিয়া ভাগ কাজই করিতেছেন।

দীর্ঘ জীবন।—কলির পরমায়ু ১২০ বৎসর, কিন্তু এখন কোনরূপে ৫০ হইলেই যেন যথেষ্ট হইল। এ অবস্থায় কাহারও দীর্ঘ জীবনের কথা শুনিলে আনন্দিত হইতে হয়। রাণাঘাটের “বাস্তাবহ” সংবাদ দিতেছেন,—“রাণাঘাটের বিশ্বাস বংশের গোষ্ঠীপতি গোপালচন্দ্র বিশ্বাসের দেহান্তর হইয়াছে। মৃত্যুকালে ইহার বয়স ৮২ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সুস্থ মন ও কর্মক্ষম ছিলেন ও নিত্য নৈমিত্তিক সাংসারিক সমাপন করিয়া

ছিলেন।” এই নিত্য নৈমিত্তিক সাংসারিক সম্পন্ন—তথা হিন্দুজনাচিত আচার ব্যবহার মানিয়া চলাই তাঁহার দার্শনিক জীবন লাভের কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা যখন ইন্দোরে গিয়াছিলাম, তখন ইন্দোবের মহারণীর পিতামহের মৃত্যু আমাদের সম্মুখেই হইয়াছিল। একশত বৎসরেরও অধিক বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনিও আমরা স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। এখন লোকে স্বধর্ম পালনও ভুলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানও হইয়াছে।

চায়ের আমদানী।—“এডুকেশন গেজেট” সংবাদ দিতেছেন,—“১৯১৭-এপ্রিল হইতে অক্টোবর মধ্যে আসাম হইতে প্রায় ৮০ কোটি পাউণ্ড চা কলিকাতায় আসিয়াছিল; বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলা হইতে ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ, নিজাম রাজ্য হইতে ৩০ লক্ষ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ১৬০ লক্ষ এবং বিদেশ হইতে জাহাজে ১৯ লক্ষ পাউণ্ড চা আসিয়াছিল। বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ ১৯১৬ অব্দের ঐ ছয় মাসে ৪ গুণ বাড়িয়াছে ঐ ১৯ লক্ষ পাউণ্ড বৈদেশিক আমদানীর ১৭ লক্ষ পাউণ্ড অক্টোবর মাসে।” এত চায়ের আমদানিতে কলিকাতার লোকে অত্যধিক চা খোর হইবে না কেন? কিন্তু ইহার ফল যে বিষময় হইতেছে—তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন?



# আয়ুৰ্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৪-ফাল্গুন।

১ষ্ঠ সংখ্যা।

## কাজের কথা।

সিদ্ধি-প্রার্থী।—আজকাল মদ  
একটা চমকটা শিক্ষিত সমাজে হইতে  
একটা উত্তরা মিতাছে বটে, কিন্তু সিদ্ধির  
সমস্যাতে খুঁজে নাহুঁড়ে, তাহাও প্রত্যক্ষ  
সমস্যা-সমীক্ষার আর্যবৈদ্য-ঔষধাধারগুলির  
সমস্যা-মদক বিক্রয়। সমস্ত এই মদক  
সিদ্ধির ফলে অনেক বাঙ্গালীই সিদ্ধির  
সমস্যা-মদক। মদক সেবনের প্রাথমিক  
ঔষধ-মানসিক প্রবৃত্তি চরিতার্থকরণের  
একটা উপায় অল্পতব হয় বটে, কিন্তু ইহার  
অন্যদিক ব্যবহারে পরিণামে অবসাদ জন্মাইয়া  
পড়িলে সফলতা সাধন দূরে থাকুক, উহা  
হইতে সোপান উৎপত্তি হইয়া থাকে।  
সিদ্ধি-প্রার্থী বা বাধ্য আয়ুৰ্বেদকারগণ ইহাকে  
উপকার উপকার বলিয়াছেন। এ অবস্থায়  
ইহার অত্যধিক ব্যবহারে যকুৎসই-ব্যাপি  
জন্যে বিশেষ সন্ধান। সিদ্ধি-প্রার্থী  
মদক সেবনে আপাতমধুবলভোগী ব্যক্তি-  
সিদ্ধি-এ সকল কথা ভাবিবার বিষয়।

## মদক সেবনের পরিণতি।—

কোন মদকেই পরিণতি শুভজনক নহে।  
নীবোগ ব্যক্তির পক্ষে মদক দ্রব্য ব্যবহারে  
স্বস্ত শরীরকে বাস্তব করা ভিন্ন কিছুই ফলপ্রসূ  
হয় না। সে বাস্তবতার ফলে শরীরে অস্বাস্থ্য  
ব্যাপি উৎপত্তি হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা।  
সামান্য অস্বাস্থ্যের চিকিৎসায় এইজন্তই দুই  
ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে আয়ুৰ্বেদকার-  
গণ মাথার দিয়া দিয়া ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।  
সামান্য সিদ্ধি-প্রার্থীতে যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাসের  
ঔষধ ব্যবহার করিলে তখনকার জন্য সিদ্ধি  
প্রার্থী মাদিয়া বার বটে, কিন্তু পরিণামে যক্ষ্মা  
বা ক্ষয় কাসের সৃষ্টিই হইয়া থাকে। সিদ্ধি  
প্রার্থী মদক সেবনে ব্যাপি অবস্থা ভেদে  
উপকার হইলেও সকল অবস্থায় উহার ফল  
শুভ জনক হয় না। এইজন্তই বিজ্ঞাপন দেখিয়া  
নিজে নিজে মদক সেবনের ব্যবস্থা না করিয়া  
সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক যদি উহা  
ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উপকার হইতে  
পারে, নতুবা নিজে নিজে ব্যবস্থা করিয়া উহা

ব্যবহার করিলে অনেক সময় অনিষ্টেরই সম্ভাবনা।

বিজ্ঞাপনের ঔষধ।—তা' ছাড়া বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া যা' তা' ঔষধ ব্যবহার করা তো কোনক্রমেই কল্প্য নহে। বিজ্ঞাপনের অনেক ঔষধে অনেক সময় 'গুরু হারাইলে গুরু পাওয়া যায়'—এমন সকল কথাও বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু সত্য সত্য তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আয়ুর্বেদের রোগ-চিকিৎসার এক এক অধিকারী রাশি রাশি ঔষধের ব্যবস্থা কখনই সন্নিবেশিত হইত না। শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন প্রকৃত চিকিৎসকের পক্ষেও রোগ-নির্ণয় করিয়া ঔষধ-নির্দাচনের সময় বিশেষ চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে ঔষধের গুণ জানা নাই, সে ঔষধ ব্যবহার করিতে আয়ুর্বেদবেত্তাগণ এইজন্তই নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্বেদ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

“যথাবিধং যথাশাস্ত্রং যথান্নিরূপনিয়ম।

তথোষধম বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা ॥”

অর্থ—যে ঔষধের গুণ অজ্ঞাত থাকে, সেই ঔষধ শাস্ত্র, অগ্নি ও বজ্র সদৃশ অনিষ্টকারী, কিন্তু যে ঔষধের গুণ জ্ঞাত থাকে, তাহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। এ সকল কথা এখনকার দিনে কেহ চিন্তা করেন না—ইহাই ছুঃখের বিষয়।

বঙ্গ শিশু-মৃত্যু।—বাঙ্গালা দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সরকারি হিসাবে প্রকাশ—গত ১৯১১ খৃঃ অব্দে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেক

পাঁচ জনের মধ্যে একজন কবিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে কয়েক বৎসরের জন্ম ও মৃত্যুর তালিকা প্রদান করিতেছি,—

খৃঃ অব্দ	জন্ম	মৃত্যু
	( হাজীব করা )	
১৯১২	৩৫০৩০	২৯৭৭
১৯১৩	৩৩৭৮	২৯৯
১৯১৪	৩৩৮৬	৩৪৫
১৯১৫	৩১৮০	৩২৮৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জন্ম ও মৃত্যুর তুলনায় বাঙ্গালা দেশে মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

শিশু-মৃত্যুর কারণ।—এই শিশু-মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করিতে হইলে মৃত শিশুদিগের পিতা মাতাকে সর্ব প্রথমে সন্দেহ করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যদ্রষ্ট অস্বাস্থ্যকর পিতা মাতার শুক্র শোণিত মিলনের ফলে যে সকল শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, ভ্রূমিষ্ট হওয়ার অল্পকাল পরে তাহারাই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। সুতরাং বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশে শিশু-মৃত্যুর বৃদ্ধির সর্ব প্রধান কারণ। তা' ছাড়া বিপুল গব্য ছন্ধের অভাবে শিশু-শরীরে যে যকৃত রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে, তাহাও শিশু-মৃত্যুর আর একটি কারণ। ইহা ভিন্ন সামান্য ‘বালসা’ হইবাশত্র বড় বড় ঔষধ প্রয়োগে যে তাহা আরোগ্য করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহার ফলেও তাহাদিগকে অকাল-মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত করা হয়। বাঙ্গালী যখন ব্রহ্মচর্য্য হারায় নাই, সভ্যতার চাকচিক্যে বদ জননী যখন সৌন্দর্য্যশালিনী হন নাই, হলুদ-

দেহ মাথাইয়া, রোদে রাগিয়া প্রকৃতির সহজ-  
জাত স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া যখন শিশু  
রক্ষাব্যবস্থা করা হইত, তখন কিন্তু বাঙ্গালী  
শিশুর অকাল মৃত্যুর কথা বড় শুনা যাইত না।  
সামান্য সামান্য অসুখে আনুইয়ের বাট, মধু

আদার রস সেবনে তাহারা নিরাময় তো হইতই  
এবং তাহারই ফলে দীর্ঘজীবনও লাভ করিত।  
বর্তমান সময়ে শিশুমৃত্যুর হার দেখিয়া সে  
সকল অতীত কাহিনী চিন্তা করিবার সময়  
আসে নাই কি ?

## পরিবর্তিত প্রণালীতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত উচিত কিনা ?

আমাদের দেশে ছইশ্রেণীর কবিরাজ  
দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম। রক্ষণশীল, ২য়।  
পরিবর্তনশীল। বাঁহারা রক্ষণশীল—তাঁহাদের  
বিশ্বাস—আয়ুর্বেদ অপৌরুষেয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ  
ইহার প্রবর্তক। সুতরাং আয়ুর্বেদের কোন  
পরিবর্তন—একেবারেই অস্বীকৃত। অন্ততঃ  
আমাদের মত নান্দ্রম আয়ুর্বেদের উপর কলম  
চালাইতে পারিবেনা।

পক্ষান্তরে বাঁহারা পরিবর্তনশীল, তাঁহারা  
আয়ুর্বেদকে ভাঙিয়া গড়িতে চাহেন, আয়ুর্বেদকে  
অল্প জ্ঞাতির বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিতে  
চাহেন, আয়ুর্বেদকে সম্পূর্ণাবয়বে দেখিতে  
ইচ্ছা করেন। বলা বাহুল্য—আমি এই দ্বিতীয়  
শ্রেণীর কবিরাজদেরই পক্ষপাতী। শুধু  
আমি কেন যিনি আয়ুর্বেদের উন্নতি দেখিতে  
চাহেন, তিনি কখনই রক্ষণশীলের অসহকারতা  
ও সঙ্গীতর পোষকতা করিবেন না।

আমরা সকলেই প্রতি নিয়ত প্রত্যক্ষ  
কবিত্তেছি আলোপ্যাথিক চিকিৎসা দিন  
দিন প্রসাং লাভ করিতেছে। ইহার একমাত্র  
কাণ—আলোপ্যাথিক চিকিৎসা সাম্প্রদায়িক

নহে। হিন্দু বিজ্ঞানে, মুসলমানের বিজ্ঞানে  
—যাহা কিছু সার ও সত্য দেখিতে পাওয়া  
যায়, আলোপ্যাথেরা তাহা অকুণ্ঠিত চিন্তে  
গ্রহণ করেন। কোন নূতন ঔষধের স্বকান  
পাইলে, তাহা পরীক্ষা করিয়া সাদরে লইয়া  
থাকেন। এটা আমার—সুতরাং উৎকৃষ্ট ওটা  
পরের অতএব নিকৃষ্ট,—ডাক্তারী মতে একরূপ  
সঙ্গীর্ণতা স্থান পায় না। এই উদারতার জন্তই  
ডাক্তারি চিকিৎসার এতদূর প্রবল প্রভাব।

ছঃখের বিষয় কবিরাজ মহাশয়দের মধ্যে  
অনেকেই একরূপ উদারতা দেখাইতে পারেন  
নাই। তাই আয়ুর্বেদের এতদূর অধঃপতন  
হইয়াছে। খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দিতেও যে  
আয়ুর্বেদ—অপরের কাছে অপরায়ে ছিল,  
সনাতন, জ্ঞানময়, আদি বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ  
আজ ডাক্তারী চিকিৎসার নিকটে হীনপ্রজ  
হইয়া পড়িয়াছে। অথচ অনেকেই মুখে  
গুনিতে পাই, আজকাল দেশের লোকের মতি  
ফিরিয়াছে, আয়ুর্বেদের আদর বাড়িয়াছে, উন্নতি  
হইয়াছে। এই উন্নতির পরিমাপ কতটুকু ?  
ছই চারিজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত কবিরাজ—

কলিকাতায় বসিয়া বিভিন্ন সার্জনের ফিঃ আদায় করিতেছেন, মোটর চাড়িতেছেন—ইহাতেই কি বৃষ্টি, আয়ুর্বেদের উন্নতি হইয়াছে? কোন চিকিৎসায় যে রোগী আরাম হয় নাই, সে রোগী যে আয়ুর্বেদের অমৃত সেতনে প্রবেশিত হইতেছে—এরূপ ঘটনা আমরা শত শত প্রত্যক্ষ করিতেছি—বল দেখি যে আয়ুর্বেদের কি ইহাই উন্নতির লক্ষণ? তিন টাকা সেবের চাবণপ্রাশ—৪ টাকা তোমার “স্বপ্নমিত্র মকরস্বজ” ৬ টাকা সেবের—“নন্দারাজ প্রবারণী তৈল—পথে পথে, গহিতে গহিতে, মোড়ে মোড়ে—নানা বর্ণ রঞ্জিত সাইন বোর্ড দোঁড়লায়ান—দেয়াসে-প্রাচীরে খবরেরকাগজে-পাঞ্জিতে স্মরণ্য কবিরাজ মহাশয়দের নবাবিন্দিত ওষধাবলীর বিরাট বিজ্ঞাপন, ইহাই কি আয়ুর্বেদের উন্নতির পরিচায়ক? তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি এগুলি আয়ুর্বেদের অবনতির চিহ্ন কিনা? যে উদারতার গুণে ডাক্তারী চিকিৎসা জীবন্ত বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, সেই উদারতার অভাবেই আয়ুর্বেদ হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। নাহিলে, বাহার পিতৃপিতামহ আয়ুর্বেদের কল্যাণে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সংসারে সুখী হইয়া গিয়াছেন, সে আজ আয়ুর্বেদের মহিমা ভুলিবে কেন? আর আয়ুর্বেদ যে দেশের কল-পাদপ, সেই দেশের লাভ নর-নারীরা আয়ুর্বেদের গৌরব আজ নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে কেন?

যখন দেখিব এ দেশে আবার নাগাজ্জিন-ভাব মিশ্রের নত সাতদী চিকিৎসক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যখন দেখিব কবিরাজ মহাশয়েরা যাহা নিজে জানিয়াছেন,—তাহা অপরকে জানাইতেছেন, যখন দেখিব বৈদ্যগণ বৈদ্যক

গ্রন্থে স্ব স্ব পরীক্ষাবদ্ধ কল লিপিবদ্ধ করিতেছেন,—তখনই বৃষ্টি আয়ুর্বেদের পুনরুন্নতি হইয়াছে।

এটা উন্নতির যুগ। আমাদের সোঁজাণে—সকল জাতির মধ্যেই একটা সজীবতা দেখা দিয়াছে। জাতীয় উন্নতির প্রতি সকলের চক্ষু পতিত হইয়াছে। তবে আয়ুর্বেদের বা উন্নতি হইবে না কেন? কবিরাজ মহাশয়েরা এ কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি?

আয়ুর্বেদের উন্নতি করিতে হইলে, কি কি করিতে হইবে, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ আমার চেয়ে তাহা ভাল বুঝিবেন। আমি সে সকল কথা বলিতে চাহিনা। আমি কেবল বলিতে চাই—যাহা বা আয়ুর্বেদ পরিবর্তনের বিরোধী আয়ুর্বেদেবরচিত শাস্ত্র—অতএব নূতন কিছু করা চলিবে না—যাহাদের এইরূপ ধারণা, তাহারা যত বড় পণ্ডিতই হউন—তাহাদের হস্তে আয়ুর্বেদের উন্নতি হইবেন, অনুসন্ধিৎসুর সাহস ভিন্ন আয়ুর্বেদের গৌরব রক্ষা অসম্ভব। বাহার আয়ুর্বেদকে বাচাইতে চাহেন, তাহাদিগকে দুইটি কাজ করিতে হইবে:

—১ম। পুরাতনকে অবরণ, ২য়। নূতনকে সমাদর। আয়ুর্বেদকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে ডাক্তারী বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ—নিন্দা বা অগৌরবের কথা নহে। যিনি এ কথাটি সম্মত হইবেন না, তাহাকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়াই বুঝাইতেছি। ধরুন—মৃগনাভি ও এরণ্ড তৈল, এ দুইটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। আয়ুর্বেদে যখন এই মৃগনাভি ও এরণ্ড তৈলের গুণ লিখিত হইয়াছিল—তখন হয় ত ডাক্তারী বিজ্ঞান অতি শিশু। কিন্তু পরে,—বড় বড় ডাক্তারেরা বাহুবাহু পরীক্ষা করিয়া মৃগনাভি ও এরণ্ড তৈলের এত গুণ আবিষ্কার করিয়া

দাঁড়াইছেন বাহ্যতে বিশ্বের অবাধ হইতে হয়। আমাদের দেশীয় অনেকগুলি গাছ-গাছড়াই আনন্দিক প্রাণের ডাক্তারেরা একপ বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে সকল দ্রব্যের ব্যবহার শিখিত হইলে আনন্দিকগণকে আবার ডাক্তারের চিকিৎসা স্বীকার করিতে হয়। “কালমেঘ” প্রদেশের একটি স্বচ্ছন্দ বনজাত উদ্ভিদ। এ দেশের প্রাচীনগণ শিশু-যুগের উপর “কালমেঘ” কার্যকারিতাবলি সর্ব প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখন ডাক্তারী গ্রন্থে—“কালমেঘ” বৈদ্য অদ্বত বিশেষণ দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয়—ডাক্তারেরাই যিনি এ উদ্ভিদেব আবিষ্কার কর্তা। ডাক্তারী পুস্তকে আমরা “কালমেঘ” বৈদ্য বচন গ্রন্থ জানিতে পারি। কেবল পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন—এইরূপ স্থলে—আয়ুর্বেদকে পরিষ্কৃত করিবার জন্ত—ডাক্তারীবিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া উচিত কি না? ইহাতে পাবে—ইহা লক্ষ্য করণ, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে গবেষণা করিবার প্রাণ নাই দেখা দিবে, ততদিন আমরা পালন্যে সাধা কেমন করিয়া করিব? সুতরাং ডাক্তারী ভৈষজ্য বিদ্যার সাহায্যে আমরা যদি আয়ুর্বেদের ভৈষজ্যতত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া লই—তাহা বোধ হয় নিতান্ত দোষের বিষয় হইবে না। কেননা ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। আলোচনা বাতর্ক্যে, বিজ্ঞানই বাড়িতে থাকে।

অজ্ঞ কাল কেহ কেহ মেডিক্যাল কলেজে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের চেষ্টায় কার্যতঃ ডাক্তারী চিকিৎসার উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় অংশ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় প্রবর্তিত হইতেছে। ইহাতে আয়ুর্বেদের কতদূর উন্নতি হইতেছে, তাহা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারিবেন। আমি

কিন্তু সকলকেই আয়ুর্বেদের বিশেষত্ব ও স্বাভাবিক বহ্য রোগিতে অন্তরোধ করি।

আয়ুর্বেদের শারীরবিজ্ঞান ও ডাক্তারী মতের শাস্ত্রীয় বিজ্ঞান—এক নহে। আয়ুর্বেদে বায়ু পিত্ত-কফের যে অসীম প্রভাব উল্লিখিত হইয়াছে, ডাক্তারেরা তাহা স্বীকার করেন না। আবার ডাক্তারী মতকে অনেক স্থলে আয়ুর্বেদ মতের বিবোধী বলিয়া নেন হয়। এরূপ স্থলে—উভয় বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য রাখা অসম্ভব। তবে যেখানে উভয়ের একই উদ্দেশ্য—রোগ চিকিৎসা, সেখানে ডাক্তারী ভৈষজ্য তত্ত্বের সাহায্যে আয়ুর্বেদের ভৈষজ্য কল্পনা—অবশ্যই তুলনা করিয়া পরীক্ষা করা চলে। সেরূপ পরীক্ষা করাও উচিত।

যাহারা ডাক্তারী মতের গোঁড়া তাহারা ডাক্তারী চিকিৎসা গ্রন্থকে ভ্রমপ্রদানশূন্য বলেন। কিন্তু, ডাক্তারী চিকিৎসা বিধিও যে Empirical—তাহা স্বীকার করা চলেনা। শরীরের উপর কোন ঔষধ কি প্রকারে কার্য করে, ডাক্তারী গ্রন্থে অনেক স্থলেই তাহা নিরূপিত হয় নাই। ফিনোলপথেনিন, বিরেচক, কিন্তু উক্ত পদার্থ শারীরিক যন্ত্রে কি কার্য করিয়া যে বিরেচন করিয়া থাকে, ডাক্তারী বিজ্ঞান তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু আয়ুর্বেদ যেখানে বলিতেছেন—“বিরেচনীয় বর্গের মধ্যে এরও তৈল প্রধান”—সে স্থলে বিশুদ্ধ এরও তৈল প্রাপ্তির জন্ত ডাক্তারী ভৈষজ্যতত্ত্বের উপদেশ লইলে বোধ হয় কাজটা খুব ভালই হয়। আমি এই একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। আমার বক্তব্য—যদি আয়ুর্বেদোক্ত উপায় অপেক্ষা, দ্রব্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোনও সরল উপায় ডাক্তারী বিজ্ঞানে দেখিতে পাওয়া যায়, সে

উপায়টাকে আয়ুর্বেদের অঙ্গীভূত করিয়া লইলে মন্দ হয় না। যেমন আয়ুর্বেদে—“গুলঞ্চ” বাতরক্তের একটি মহৌষধ—সুতরাং কবিরাজ মহাশয়েরা গুলঞ্চ প্রয়োগেই বাত রক্তের চিকিৎসা করুন; কিন্তু কিরূপ নিয়মে প্রস্তুত হইলে—গুলঞ্চ অধিক ফলপ্রদ ও বীৰ্য্য বান হইয়া থাকে, কি করিলে গুলঞ্চের কাণ্ড বা স্বরস দীর্ঘকাল অবিকৃতভাবে রাখিতে পারা যায়; সে সম্বন্ধে ডাক্তারী বিজ্ঞানের পরামর্শ লইলে ক্ষতি কি? ঠাহারা এ কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দ্রব্যের বীৰ্য্যধিক্যের বিচার করুন। প্রত্যেক দেশেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ‘ফার্মাকোপিয়া’ দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে—ঐ সকল ফার্মাকোপিয়া মধ্যে মধ্যে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। তবে কবিরাজ মহাশয়েরাই বা কেন আয়ুর্বেদের “ফার্মাকোপিয়ায়” সংস্কার করিবেন না? আয়ুর্বেদ যে স্রগাভীতকালে সংকলিত হইয়াছিল। তারপর কত যুগযুগান্তর চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারি জন মনসী চিকিৎসকও আবির্ভূত হইয়া আয়ুর্বেদের রত্নভাণ্ডারে—নিজ নিজ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখনকার বৈদ্যগণের ভিতর সেরূপ সংস্কার ও বর্দ্ধনের প্রয়াস—কেন আমরা দেখিতে পাইব না?

আমি কিরূপ পরিবর্তনের অভিলাষী বর্তমান প্রবন্ধ ধারাবাহিক নিয়মে তাহা লিপিবদ্ধ করিব। প্রথমে “অরিষ্ট বিধি”ই আলোচনা করা যাউক।

অরিষ্ট ১—চরক-সুশ্রুতাদি প্রাচীনতম গ্রন্থেও আমরা আসব অরিষ্টের প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঋষিগণ দ্রব্যবহ্য ঔষধ রক্ষার

প্রয়োজনীয়তা বহুকাল পূর্বেই অবগত হইয়া ছিলেন। তাঁহারা ই ভেষজ পদার্থকে গুড়, চিনি বা মধু সংযোগে সন্ধিত করিবার প্রথা চিকিৎসা-জগতে প্রথম আবিষ্কার করিয়া ছিলেন। অন্ন, খর্জুররস প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সুরার—কার্য্য ও গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধিত দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশেব ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়া—তাঁহারা রসায়ন জ্ঞানেব যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। “বিনষ্টঃ সন্ধিতো বস্তু তচ্ছুক্ৰম্ অভিধীয়তে।” এই শ্লোকাদ পাঠ কালেই আমরা বুঝিতে পারি—Alcoholic fermentation হইলে যে—Acetic fermentation আরম্ভ হয়, আমাদের ঋষিদের কাছে এ রহস্য অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সুরা পরিশ্রুত না হইলে যে তাহার রক্ষণ ক্ষমতা জন্মিতে পারে না,—এ টুকু বোধ হয় ঋষিরা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। যুরোপীয় বিজ্ঞানের উপদেশ—কোনও জিনিষকে সুরা সংযোগে পচন হইতে রক্ষা করিতে হইলে—কম পক্ষে তাহাতে শতকরা ১২।০ ভাগ সুরা সার থাকা চাই। আয়ুর্বেদ মতে আসব, অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে,—জলে গুড়, মউল ফুল, মিশাইতে হয়,—তাহার সঙ্গে কাষ বা কুট্টিত ঔষধ মিশ্রিত করিলে, তাহা পচিতে আরম্ভ হয়। শেষে এই দ্রব দ্রব্যে—নানাবিধ অনাবশ্যক ও হানিকর পরিবর্তন চলিতে থাকে। কাজেই প্রাচীন মতের অরিষ্ট, আসবে আমরা ভেষজ পদার্থের পূর্ণ গুণ দেখিতে পাই না। শুধু পাই—কতকগুলি অহিতকর জিনিষ মাত্র। ঋষি বলিয়াছেন—“বদশকৌষধ্যুভ্যাং সিদ্ধং মত্তং স আসবঃ” অর্থাৎ, অপক ওয়া ঔষধ দ্বারা যে মত্ত প্রস্তুত হয় তাহার নাম

আসব। কিন্তু এইভাবে প্রস্তুত আসব আমরা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—তাহাতে মস্তুর ভাগ অতি অল্পই থাকে—বোধ হয় শতকরা পাচ ভাগও হইবে না। আবার শাস্ত্রমতে—কোনও আসব একমাস, কোনও আসব বা ১৫ দিন কাল পর্য্যন্ত মুখবন্ধ অবস্থায় রাখিয়া দিবার আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একমাস পরে যে আসব ভাঙ হইতে উদ্ধৃত হয়,—তাহাতে সুরাসার আরও অল্প থাকে। সুরার দ্রব্যের সহিত ভেষজ একত্র করিয়া রাখিলে, সে দ্রব্যে ভেষজ-গুণের বংশনামাত্রই অস্তিত্ব থাকে। অতএব আয়ুর্বেদের আসব, অরিষ্ট-কলনার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আনার মনে হয়, আর্ষা ঋষিগণ যে যুগে ঔষধ রূপে আসবদির কলনা করিয়াছিলেন, সে সময় তাগাণ কেবল সন্ধান প্রক্রিয়া (fermentation) পর্য্যন্তই—যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। সন্ধিত দ্রব্যকে চোয়াইয়া “সুরাসার” করিলে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে—তাহারা এ টুকু ভাবিয়া দেখেন নাই। কেন না আয়ুর্বেদের শেষ স্বাবীন সংগ্রহ “ভাব প্রকাশেও” তাল পদার্থ চোয়াইবার প্রণালী দেখিতে পাই না।

তবে আধুনিক কবিরাজ মহাশয়দের দ্বারা প্রকাশিত “ভৈষজ্য রত্নাবলী” গ্রন্থে—“মৃত সঞ্জীবনী সুরা” প্রস্তুতের যে প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার উপরে ততটা আস্থা স্থাপন করা চলে না। ‘মৃত সঞ্জীবনী’ সুরা ‘মদ্যাতা যন্ত্রে’ পাতন করিয়া লইতে হয়—কেবল ভৈষজ্য রত্নাবলীতেই আমরা ইহা দেখিতে পাই। হস্ত লিখিত গোবিন্দ দাসের ভৈষজ্য রত্নাবলীতে এই মৃত সঞ্জীবনীর নামগন্ধও

নাই। শাস্ত্রধর, চক্রদত্ত, বৃন্দ, বঙ্গসেন, এমন কি ভাবপ্রকাশ গ্রন্থেও—এই মৃত সঞ্জীবনী সুরার উল্লেখ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হয় “মৃত সঞ্জীবনী” নিতান্তই আধুনিক। অতএব আমার বিশ্বাস—আসব অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্ত—তাহার সহিত পরিণত সুরা যোগ করা কর্তব্য। কুটিত ঔষধ—দ্রব্য মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া, তাহাতে গুড়া দি প্রক্ষেপ দিয়া সন্ধিত না করিয়া, ঔষধ দ্রব্যগুলি সুরা মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখিলে আসব বা অরিষ্টের উল্লেখ সিদ্ধি হইতে পারে। এই সুরা মিশ্রিত জলে ঔষধ দ্রব্যের সার উত্তমরূপে মিশিয়া যায়। ইহাতে আর পক্ষ কাল বা একমাস পর্য্যন্ত আসবের জন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। ঔষধ দ্রব্য কুটিত করিয়া সুরা মিশ্রিত দলিলে ভিজাইয়া ৪৫ দিন মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে বেশ করিয়া নিষ্কাইয়া ছাঁকিয়া লইলেই আসব প্রস্তুত হইল। এই প্রক্রিয়ায় ইংরাজী নাম—Maceration.

ডাক্তারী মতে টিংচার প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় অল্পরূপেও অতি সহজে উৎকৃষ্ট আসব প্রস্তুত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ “কনকাসব” নামক প্রসিদ্ধ আসবের প্রস্তুত-বিধি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

“কনকাসব” হাস রোগের একটা মহৌষধ। আমার এক আয়ীয়ার জন্ত—কাঁচরাপাড়ার দুর্গাগতি কবিরাজ এই কনকাসব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার উপাদান—

সংস্কৃত কনকই শাখা মূল পত্র ফলৈঃ সহ।

ততশ্চতুঃপলং গ্রাহ্যং বৃষ মূলম্ভট্টাখ্য।

মধুকং মৌগধী ব্যাক্তী কেশরং বিশ্বভৈষজং।

ভাঙ্গী তাগীপাত্রঞ্চ সংচূর্ণৈষং পঞ্চদশং।

সংগৃহ্য ধাতকী প্রস্থং দ্রাক্ষায়াঃ পলং বিংশতিং ।  
জলং দ্রোণদ্বয়ং দত্ত্বা শকরায়াস্তথা তথা ।  
ক্ষৌদ্রং স্ত্রাক্ষ তুলাঞ্চাপি সর্বং সংমিশ্রয়ত ।  
ভাণ্ডে নিমিষ্ট যাবত্যা নিদধ্যান্মাস মাত্রকং ।

(বিনোদলাল সেনের ভৈঃ রত্না ।)

অর্থায় ধুতুরা [ শাখা, মূল, পত্র ও ফল  
সহিত—কুটিত ] ৪ পল, বাসক মূলের ছাল ৪  
পল, যষ্টিমধু, পিপ্পল, কটিকার্বী, নাগেশ্বর, শুঠ,  
বামনহাটী ও তালাশ পত্র প্রত্যেকের চূর্ণ ২  
পল, ধাতকীপুষ্প ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল,  
জল ১২৮ সের, চিনা ১২০ সের মধু ৬০  
সের। এই সমুদয় দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত  
করিয়া, আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিয়া, পরে  
দ্রব্যংশ ছাঁকিয়া লইবে।

এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমার পিসীমা  
কিছুদিন হাঁপানার ঔষ হইতে মুক্তিলাভ  
করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পমান—৩ বৎসর  
পরে তাঁহার আবার হাঁপানো হয়। কাজেই  
তিনি ‘কনকাসব’ সেবনের ইচ্ছা প্রকাশ  
করেন। জ্বরের বিষয়—ভ্রূগাণ্ডিত গুপ্ত অতি  
অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে অপসারিত হ’ন।  
পিসীমার দ্বিতীয় বার অল্পবয়সেই সময় ভ্রূগাণ্ডিত  
জীবিত ছিলেন না। কি করি! সে সময়  
এত কবিরাজী ঔষধালয় ছিল না যে কনকা-  
সব ক্রয় করিয়া লইব। আমি তখন ইউ-  
নিভার্সিটির উপাসক—কালেক্সর ছাত্র। অল্প  
চিন্তায় নিরুদ্ভূত হইয়া পড়ি নাই। উপেক্ষ  
বরাট তখন কাচরাপাড়ার কবিরাজ। আমি  
তাঁহার কাছেই কনকাসবের প্রার্থা হইলাম।  
তিনি বলিলেন—“কনকাসব প্রস্তুত নাই।  
প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি, কিন্তু একমাস সময়  
লাগিবে। রোগিণী রোগের যত্নে অধীরা—  
এ অবস্থায় ১ মাস কনকাসব পান করিয়া কতকটা

না। আমি উপেন বাবুর নিকট হইতে  
“কনকাসবের” ফর্দ লিখিয়া লইলাম। মসলা  
যোগাড় করিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। দেখে,  
স্বয়ং উক্ত যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দুই  
দিনের মধ্যেই প্রস্তুত করিলাম। আমার নিজ-  
কৃত ‘কনকাসব’—অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়াছিল।  
দেশে কাহারও কাস বা হাঁপানো হইলে,—  
আমার কাছে ছুটিয়া আনিব। দেখিতাম—  
সকলেরই বিশেষ উপকার হইয়াছে। বন্ধুব-  
—সাধা ভাবন—আমার ঔষধ বিতরণ দেখিয়া  
শ্রোতৃক আওড়াইতেন—

ব্রাহ্মণ্য ভিৎসং দৃষ্টা স চেত জলমাত্রং

আমি যে উপায়ে অল্প সময়ের মধ্যে সর্বাধিক  
বীর্য়বান কনকাসব প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহাও  
বিধিতেছি।

ধুস্তুরাদি সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া  
লইয়া, সূত্রা মিশ্রিত জলে (শতকরা ৪৫ ভাগ  
সূত্রা) চূর্ণগুলি ভিজাইতে হয়। পরে “পার  
কোলেটাদ” যন্ত্রে ঐ আর্দ্র দ্রব্য পূর্ণ করিয়া  
‘পার কোলেশন’ বিধি অনুসারে আসব প্রস্তুত  
করিতে হয়। এইরূপে প্রস্তুত আসবের পূর্ণ  
মাত্রা ১ ড্রাম। ইহাতে ১ মাত্রা আসবে ও  
রতি পরিমাণে চূর্ণ ঔষধ থাকে। কনকাসবে  
যে যে ঔষধ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়,—সে গুলির  
মধ্যে প্রায় সকলেরই সার ভাগ জলে দ্রবণীয়।  
সুতরাং এই ধুস্তুরাদি পদার্থকে প্রাচীন আসব  
প্রক্রিয়া মতে প্রস্তুত না করিয়া বক্ষ্যমান মতে  
অরিক্ত করা উচিত। যথা—ধুস্তুরাদি দ্রব্য ৩৮  
পল, বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ গ্রহণ  
করিবে। আবার ঐ তেজস্বী দ্রব্য গুলিকে  
বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া, উভয় কাথ  
একত্র মিশ্রিত কর। এই কাথ বাষ্প উত্তাপে  
ঘনীভূত করিতে হইবে—ঘনীভূত



পরিমাণ হইবে—২৮০০ পল। ইহার সহিত ২১০ পল সুরাসার মিশাইয়া ৩৮ পল অরিষ্ট করিতে হইবে। এই কনকাসব ৫ গুণ অধিক বীৰ্য্য-

বান হইবে। ইহার ২১০ কোঁটা থাইলেই উপকার হয়, খাসের টান কমে। (ক্রমঃ)।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ ।

## বাল্য বিবাহের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ।

[ বিষ কথ্য ]

দ্বিতীয়-প্রস্তাব ।

হাঁহারা “মুদ্রা রাক্ষস” পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে “বিষ-কস্তার” কথা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বাস্তবিক “বিষ-কস্তার” মারণী-শক্তি অতি ভয়ানক ছিল। আমার বিশ্বাস—এই জন্তই সেকালে পুত্র-কস্তার বিবাহে পাত্র ও পাত্রী উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইত।

সে পরীক্ষা কিরূপ? নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

প্রথমে বর-পরীক্ষার একটু আভাষ দিতেছি। স্মার্ত্ত বরুনন্দন তাঁহার উদ্ধাহ-তথ্যে লিখিয়াছেন—

ন মৃত্যুং ফেনিলং বস্ত্র বিষ্ঠাচাপ্পু নিমজ্জতি ।  
মেটুচোন্মাদ শুক্রাত্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স উচ্যতে ।

“বাহার প্রস্রাবে ফেনা জন্মে না, এবং বাহার বিষ্ঠা জলে ডুবিয়া যায় \* \* \* \* \* সেই ব্যক্তি ক্লীব; তাহাকে কখনও কস্তাদান করিবে না।” বর-পরীক্ষার এইরূপ অনেক লক্ষণই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল কথা অস্ত্রকার প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। অতএব এইখানেই আমি সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছি।

কান্তন—২

এইবার কস্তা-পরীক্ষার কথা বলিয়া যাই।

ত্র্যগ্নি যজ্ঞাঃ প্রেলম্বানি ললাট মুদরং ভগং ।

ক্রমেণ ভক্ষয়ন্নারী স্বপ্তরং দেবরং পতিং ॥

যে কস্তার ললাট, উদর ও জননেন্দ্রিয় লক্ষমান দীর্ঘাকার হয়, সে কস্তা স্বতাক্রমে স্বপ্তর, দেবর ও পতিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কস্তা পরীক্ষারও এইরূপ অনেকগুলি লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বাহ্যিক ভাবে আমি কেবল তাহার একদেশ মাত্র দেখাইতেছি। এখন সমাজে—এইরূপ কস্তা-পরীক্ষার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। যে অবধি পণ-প্রথা সমাজে প্রবেশ করিয়াছে—সেই অবধিই কস্তা-পরীক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। বরের বাপ টাকা পাইলেই তুষ্ট,—তাহার উপর পুত্রবধূর রূটা যদি একটু ফরসা হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। সে কস্তা বিষকস্তা কিনা? সে কস্তা পতিবাসিনী হইবে কিনা?—খনলুক-বরকর্ত্তা—একবারও তাহার ভাবিবাক্য অবকাশ পান না।

আমি লক্ষণ । সমাজে একটু সজ্ঞান ব্যক্তি চাহাইবার অবসরই আমার অসম্ভব আছে। আমি এতোক বিদ্যকে, আমায় এতোক বৈজ্ঞানিককে সম্মুখীন করিয়াছি।

তাহারা পুত্র-কন্যার বিবাহে—এইরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করুন, দীন-নির্যাতন-বরণ-পণ উঠাইয়া দিন, দেখিবেন—তাহাদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে—অকাল মৃত্যু তিরোহিত হইবে। হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়া আদিবে। তাহাদের সন্তান-সন্ততি বাহা ভূমিষ্ঠ হইবে, সেগুলি বলবান্ ও দীর্ঘজীবী হইবে। দম্পতির মনের মিল হইবে। সংসারে মঙ্গল ও শান্তি যুগপৎ বিরাজ করিবে।

অবশ্য পুরাকালের মত কন্যা-পরীক্ষা একালে হয় ত চলিবে না। কেন না দৈহিক লক্ষণ দেখিয়া কন্যা নির্বাচন করিতে হইলে—ভ্রূয়োদর্শিতা ও হৃদ্যদৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু জ্যোতিষ মতে কন্যা ও পাত্র পরীক্ষা করা, গণ-রাশি-ঘোটক প্রভৃতির বিচার করা—নিতান্ত কঠিন ব্যাপার নহে। দম্পতীর মনো-মালিন্য, কামোন্মত্ত হইয়া ব্যভিচার প্রবৃত্তি, ক্ষীণাঙ্গ অন্নায়ু সন্তান প্রসব—এই যে আধি-বিভ্রম্নায় হিন্দুর ঋষি-রচিত সংসার দিন দিন ধ্বংস হইতে বাসিয়াছে—ইহার মুখ্য কারণ—বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীকে পরীক্ষা না করা। কন্যাদায়ের আলায় অনেক গৃহস্থেরই সে স্বাধীনতা নাই। অনেক গৃহস্থই পাত্র নির্বাচনের সাহস করেন না, যেমন তেমন একটার হাতে মেয়েটাকে তুলিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিত হন। কিন্তু বরের বাপের ত সে অসুবিধা নাই। তিনিই অনায়াসেই কন্যাকে পরীক্ষা করিয়া গৃহে আনিতে পারেন;—তিনি কেন তাহা করেন না? ইহার কারণ—তাহারও সে সাহস নাই। তিনি অর্থ-শোভী, রূপ-পিপাসু,—তিনি তো সংসারের শান্তি চাহেন না; তিনি চাহেন—কন্যাকর্তার রত্ন মঞ্জুবা। তিনি চাহেন—পুত্রবধূর অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ। সেই রূপবতী কন্যা হয় ত বিধ কন্যা

—সে স্বামী গৃহে আসিয়া স্বামীকে ধীরে ধীরে বিষ জর্জর করিয়া অকালে মৃত্যুপথে অগ্রসর করিয়া দিল; বরের বাপ তাহা বুঝিলেন না। নহিলে তাহারই বাটার পার্শ্বে এক গরীব গৃহস্থের একটা শ্রামাদ্বী কন্যা ছিল—সে কন্যার সহিত তাহার পুত্রের কোম্পীর উত্তমরূপে মিলনও হইয়াছিল, তথাপি সে কন্যাকে পুত্রবধূ করিতে তাহার অসম্মতি হইবে কেন? অর্থের দোভে, রূপের দোভে—এইরূপে দেশের সর্বনাশ হইতেছে! কত মণিভূষিতা ভূজঙ্গিনী সৌন্দর্য্যের আবরণে আত্মগোপন করিয়া রত্নের ঝাঁপি কক্ষে লইয়া স্বপ্ন-গৃহে প্রবেশ করিতেছে! কন্যাদের সে দিকে ভ্রক্ষেপ নাই!

এই বিষ কন্যার বিষ সহ্য করাইবার জন্যই প্রাচীন আর্ষাগণ সমাজে বালা বিবাহের প্রচলন করিয়াছিলেন। এ সকল কথা আমি পূর্বে প্রবন্ধে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে “বিষ কন্যা” সম্বন্ধে আরও দুই চারিটা কথা লিখিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন,—একটা কিম্বদন্তী আছে যে, যে সকল ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগাল অথবা বিষধর সর্প—বারম্বার অপর প্রাণীকে দংশন করিতে থাকে, তাহাদের বিষ-বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া কমিয়া যায়। তখন তাহারা আর কাহাকেও দংশন করিলে, দংশিত ব্যক্তি জ্বার মরে না। এই নিয়মটা বিষকন্যা সম্বন্ধেও খাটে। “জ্যোতিঃসারার্ণব” গ্রন্থে ইহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণা—দামোদরী হুল জন্মা হুগ নাসা চ ব্রাহ্মণ্যে! পত্ন্যোষ্টৌ ত্রিঘোরন সা নবমে কু প্রসূতিঃ। যে কন্যার উদর লব্ধা কর্ণা ও দামিকা হুল,—তাহার আটটা পুত্র পুত্রী, রক্ত পতিতে সে নারী প্রসবী থাকিবে।

এই প্রোক্তা পড়িয়া স্পষ্টই বুঝা যায়—  
যখন একে একে আটটি পতি বিষ কত্তার  
বিষ-সংসর্গে মরিয়া গিয়াছে, তখন তাহার  
বিবের আর কোন জোর নাই, কাজেই সে  
কত্তা নবন পতিকে লইয়া স্ত্রুখে ঘরকন্না  
করিবে ।

ভূমিন্পৃষ্ঠতে যন্তা অঙ্গুণ্যা চ কনিষ্ঠয়া ।

ভর্গারং প্রথমং হত্যাং দ্বিতীয়ঞ্চানি নন্দতি ॥

সে কত্তার চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী  
—চলিবার সময় ভূমি স্পর্শ করে না, সে কত্তার  
প্রথম স্বামী মরিয়া যাইবে । দ্বিতীয় স্বামী  
লইয়া সে স্ত্রুখিনী হইবে ।

যন্তা মধ্যং ভবেদার্ষং সা স্ত্রী পুরুষ ঘাতিনী ।

ভূমিন্পৃষ্ঠতেহঙ্গুণ্যা সা নিহত্যাং পতিত্রয়ং ॥

যে কত্তার মধ্যদেশে দীর্ঘ, সে পুরুষ ঘাতিনী,  
যাহাব মধ্যাঙ্গুলী মুক্তিকা স্পর্শ করে না, সেই  
কত্তা তিনটা পতির প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে ।  
প্রদেশিনী ভবেদীর্ঘা সা স্ত্র্যাং সৌভাগ্যশালিনী  
উক্তা যন্তা ভবেদীর্ঘা পতিং হস্তি চতুঃত্রয়ং ॥

যে কত্তার চরণের প্রদেশিনী অঙ্গুলী বৃদ্ধা-  
ঙ্গুলীভেদে দীর্ঘ হয় সে কত্তা সৌভাগ্যশালিনী  
হইয়া থাকে । কিন্তু সেই প্রদেশিনী দীর্ঘ  
হইয়া যদি উপরে উঠিয়া থাকে, তবে সে একে  
একে চারিটা স্বামীকে বিনষ্ট করিবে ।

বিরলা দশনা যন্তাঃ কৃষ্ণাক্ষী কৃষ্ণ জিহ্বিকা ।

ভর্গারং প্রথমং হস্তি দ্বিতীয়মপি বিন্দতি ॥

যে কত্তার দস্ত বিরল, নেত্রদ্বয় ও জিহ্বা  
কৃষ্ণবর্ণ তাহার প্রথম স্বামী মরিবে এবং সে  
দ্বিতীয় পতি লাভ করিবে ।

যন্তা অত্যাংকটো পাদৌ বিস্তৃতঞ্চ স্ত্রুখং ভবেৎ ।  
উত্তরোষ্ঠে চ রোমানি সা শীঘ্রং ভক্ষয়েৎ পতিং ॥

যে কত্তার পদদ্বয় উৎকট (সম্পূর্ণরূপে ভূতল  
স্পর্শ করে না) আন্ত কুহর অতি বিস্তৃত

ঠোঁটের উপর লোম রেখা দৃষ্ট হয়, সে শীঘ্রই  
স্বামীকে ভক্ষণ করে ।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিষ কত্তার আরও প্রমাণ  
পাওয়া যায়—

রিপুক্ষেত্র গতো তৌতু বগ্নে যদি শুভ গ্রাহ্যে ।

ক্রুরস্তত্র গতোপ্যেকো ভবেৎ স্ত্রী বিষ কত্তকা ॥

যে কত্তার জন্ম লগ্নে ছইটা শুভগ্রহ থাকে,  
এবং ঐ শুভগ্রহদ্বয়ের যদি সেই লগ্নস্থান অরি  
স্থান হয়, এবং একটা ক্রুর গ্রহ সেখানে  
বিদ্যমান থাকে, তবে সে কত্তা বিষকত্তা নামে  
অভিহিতা হইবে ।

ভদ্রা তিথি যদাগ্নেষা শতভিষাচ কৃত্তিকা ।

আঙ্গার রবিবারেবু ভবেৎ স্ত্রী বিষ কত্তকা ॥

মঙ্গলবারে বা রবিবারে, দ্বিতীয়া সপ্তমী  
অথবা দ্বাদশী তিথিতে, অগ্নেষা শতভিষা কির্ষা  
কৃত্তিকা নক্ষত্রের গোণে যে কত্তা জন্ম গ্রহণ  
করিয়া থাকে, তাহাকে বিষ কত্তা বলা যায় ।

বিষ কত্তার সংসর্গে স্বামীর মৃত্যু অবশ্য-  
স্তাবী । বিষকত্তা সর্বদা সুললিত হইলেও  
তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত । এইরূপ  
বিষকত্তার সংক্রামক বিবদোষ হইতে—পুরুষ-  
দিগকে রক্ষা করিবার জন্তই ত্রিকালদর্শী  
ঋষিগণ বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া-  
ছিলেন । আমরা নিরোধ—ঋষি-বাক্যের  
গূঢ় রহস্য না বুঝিয়া বাস্য-বিবাহের দোষ  
কীর্তন করি ।

এক্ষণে আমরা পণের লোভে, রূপের মোহে,  
কত্তার লক্ষণালক্ষণ দেখিবার অবকাশ পাই  
না । রাশি-নক্ষত্র-গণ-ঘোটকের মন্তব্যকেই  
বুঝিতে পারি না । ফলে, আমাদের সমাজে  
বহুরূপে কৃত বিষকত্তাই স্থান লাভ করিতেছে ।  
আমাদের দৈহিক বিবের প্রভাবে—আমাদের  
আশার অবলম্বন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে—বিন-সিন-কর্তা

রোগা রোগে আক্রান্ত হইতেছে, যৌবনে উত্তম-  
উৎসাহ হারাইতেছে, অকালে বলিপনিত  
জরাগ্রস্ত হইয়া মানসিক কষ্টে কালযাপন  
করিতেছে! তাহাদের চক্ষুজ্যোতিঃ ভ্রষ্ট—তাই  
অকালে চক্ষু পড়িতে হইতেছে! মস্তিষ্ক

মেধাশক্তি হীন, শরীর কান্তি ভ্রষ্ট,—যুবাদের  
দুর্দশা চরমে উঠিয়াছে। তবুও বরপণ আদায়  
করিতে হইবে, রূপসী বধু গৃহে আনিতে হইবে,  
—এতদপেক্ষা মাহুঘের আর কি অধঃপতন  
হইতে পারে? \*

শ্রীরামসহায় কাব্যার্থ—

বেদান্ত শাস্ত্রী।

## বঙ্গে অজীর্ণ রোগের এত প্রাদুর্ভাব কেন ?

আজকাল বঙ্গদেশে অজীর্ণ রোগের বিষম  
প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। শতকরা নব্বই জন  
বা ততোধিক ব্যক্তি অজীর্ণ রোগে তুষ্টিয়া  
থাকে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা এই দেশ  
ব্যাপী অজীর্ণ রোগের কারণ নির্দেশ করিতে  
প্রয়াস পাইব। কিন্তু তৎপূর্বে অজীর্ণ রোগ  
সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, জীবন বলের  
উপর নির্ভর করে এবং বল অগ্নির উপর  
নির্ভর করে। বাঙ্গালী জাতির অগ্নিবল  
কমিবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও কমিতেছে। শতবর্ষ  
জীবী লোক বাল্যকালেও আমরা অনেক  
দেখিয়াছি, কিন্তু এখন তাহাদের সংখ্যা বিরল  
হইয়াছে। এখন বাঙ্গালী গড়ে পঞ্চাশ বৎসর বাচে  
কি না সন্দেহ। পূর্বে লোকে যেরূপ আহার

করিতে পারিত, এখন আর সেরূপ আহার  
করিতে পারে না। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই।  
পৌষপার্বণ এক সময়ে বঙ্গের একটা মহৎ  
ব্যাপার ছিল। বর্ষার মেঘযুক্ত শরতের মূল্য  
আকাশ যখন চন্দ্র কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে,  
নিদাঘতাপতপ্ত পৃথিবী বর্ষার জলে নান  
করিয়া তৃপ্ত হইবার পর শরতে যখন আদ্র দেহ  
শুক করিয়া কাশপুষ্পময় বসন পরিধান  
করে, যখন আশু ধাত্ত ভাণ্ডারজাত হর এবং  
হৈমন্তিক ধাত্ত ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র শ্যামল বর্ণে  
আচ্ছাদিত করিয়া বায়ুতরে ছলিতে থাকে,  
তখন যেমন বঙ্গ শারদীয় মহাপূজার মহানন্দে  
মাতিয়া উঠিত, তেমনি যখন স্বর্ণ বর্ণ হৈমন্তিক  
ধাত্ত ভাণ্ডার জাত হইত, মন্দির-কলার-তিল,  
অতশী, যব, গোধূম প্রভৃতি শস্তক্ষেত্রে

\* এগনকার দিনে বিখ্যাতা নিরুপণ করিতে  
হইলে জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা চাই।  
আমাদের মধ্যে অনেকেরই তাহা নাই। হুতরাং  
এ অবস্থায় বাল্য বিবাহ এখাই দিরাপদ। কিন্তু  
হাহারা "ভত্র" আখাখারী, উাহারা বেল্লপ শোষণ

বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে হারিঙ্গ দ্বারা  
কর্তাকে বাধা হইয়াই অধিক বয়স পর্য্যন্ত কল্যাণে  
অনুট। রাখিতে হইতেছে, অতঃপর শাস্ত্র  
মাত্রেই বরপণ উঠাইবার চেষ্টা করিতে

শোভা সম্পাদন করিত, ক্লবক সারা বৎসর পরিশ্রমের পরে যখন দুই দিন বিশ্রামের অবসর পাইত, বৃত্তিভোগী রজক, ক্ষৌরকার হইতে ব্রাহ্মণগণের ভাণ্ডার পর্যন্ত ক্ষেত্রজাত শস্ত্রে পূর্ণ হইত, বর্ষার ক্ষীণ অগ্নিবল হেমন্তে যখন প্রবল হইয়া উঠিত, তখন বঙ্গ পৌষপার্কণের মহানন্দে বেশ মাতিয়া উঠিত। বঙ্গ এমন গৃহ ছিল না, যে গৃহে বিবিধ পিষ্টকের আবির্ভাব না হইত। ধনীর গৃহে বায়সাধ্য খাদ্যাদির আয়োজন হইত, দরিদ্র চালের গুঁড়া, ময়দা, মুগের দাল, নারিকেল, গুড় প্রভৃতি সংযোগে নানাপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিত। আমরা বাল কালে এই মহাপার্কণ দেখিয়াছি, আর দেখিয়াছি লোকে বহু পরিমাণে পিষ্টক আহার করিতে পারিত।

সে পৌষপার্কণ এখন আর নাই বা নাম নাই আছে। কেন এমন হইল? ইহার কারণ দুইটা, পিষ্টক বিলাসিতা। লোকে গৃহ প্রস্তুত পবিত্র পিষ্টক অপেক্ষা বাজারের জঘন্ত কৃত্রিম দ্রব্যে প্রস্তুত দুই পয়সার কচুরী কিনিয়া থাওয়া শ্রেয়ঃ বোধ করে। দ্বিতীয় কারণ—লোকের অগ্নিবল কমিয়া গিয়াছে, পিষ্টক জীর্ণ করিবার শক্তি এক্ষণে অনেকেরই নাই। আগুর্বেদে পিষ্টক অন্ন অপেক্ষা আট গুণ পুষ্টি কর বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে এই পুষ্টি কর খাদ্যে বঞ্চিত হইয়াছে। কবি প্রবাসিনী কন্যার হইয়া যাহা বলিয়াছেন, আমাদের বঙ্গ জননীর নিকট সেই কথা বলিতে ইচ্ছা হয়;—

আসিলে পৌষমাস বদনে মৃদুহাস

আর কি পিঠে গুলি ভাজিবি নাগো।

কেবল পৌষপার্কণ বলিয়া নহে, ৪০১৫০ বৎসর পূর্বের কথা বাঁহাদের শ্রবণ আছে, তাহার

জানেন যে এই ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির আহার কত কমিয়া গিয়াছে। আগরুই জীবন, স্মৃতরাং আহারের সহিত জীবনও যে কমিবে তাহাতে আর বিচিহ্ন কি।

আগুর্বেদ বলেন যে, অগ্নিমান্দ্য হইতেই সমস্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। স্মৃতরাং মন্দাগ্নির ফলে বাঙ্গালী জাতি যে বিবিধ রোগ পীড়িত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রকৃত সুস্থ দেহ ব্যক্তি বাঙ্গালী জাতির মধ্যে নিতান্ত বিরল, আবাল বৃদ্ধ বনিতার কোন না কোন পীড়া আছেই। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর, কাহারও একটা দিন বিনা উপসর্গে কাটে না। কেহ বলিবে—একটা অঘল ঢেকুর উঠিয়াছিল, কেহ বলিবে ভাল খুধা হয় নাই, কাহারও পেট ভার, কাহারও মাথা টিপ-টিপ, কাহারও শরীরটা কেমন মাজ ম্যাজে, কাহারও ভাল দান্ত হয় নাই ইত্যাদি একটা না একটা উপসর্গ আছেই আছে। রাজপথে দাঁড়াইয়া একবার পথবাহী জনস্রোতের দিকে লক্ষ্য করিতে থাক, দেখিবে মাহুঘের মত মাহুঘ কোথায়? হঠাৎ পুষ্ট বলিষ্ঠ তেজোবান্ধক সৃষ্টি নিতান্ত বিরল। প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিরই জীর্ণ শীর্ণ, ম্লানমুখ, চক্ষু কোটর গত, তেজের লেশমাত্র নাই, কোনও রূপে দেহভার বহন করিয়া চলিয়াছে। এক কথায় বাঙ্গালী জাতির জীবন রোগে অর্জকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

অজীর্ণ রোগ হইতে কোন্ কোন্ রোগে জন্মিতে পারে তাহার নিগদর্শন স্বল্প শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—অগ্নির দৌর্বল্য হেতু অজীর্ণ না হইলে অমলকী প্রাপ্ত হইয়া নিববৎ অগ্নি করিয়া থাকে। উহা পিত্তের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া নাহি তৃকা, মুখরোগ, অন্নপিত্ত এবং পিত্ত জন্মিত অজীর্ণ রোগ প্রকাশ করে। কলের সহিত

সংস্ফট হইয়া যক্ষ্মা, পীনস, মেহ এবং অন্যান্য কক্ষ জনিত রোগ উৎপন্ন করে। বায়ুর সহিত মিলিত হইলে বায়ুজনিত রোগ সমূহের সৃষ্টি করে। মূত্রের সহিত মিলিত বিবিধ মূত্র রোগের সৃষ্টি করে। মলের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ কুক্ষিগত রোগ উৎপন্ন করে এবং রস রক্তাদি ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া রসরক্তাদি গত বিবিধ রোগ উৎপন্ন করে।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি নষ্ট হইলে মৃত্যু হয়, আর অগ্নি উপযুক্তভাবে থাকিলে নীরোগ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায়। শুধু ইহাই নয়, স্বাস্থ্য, উৎসাহ, উপচয় (পুষ্টি) প্রভা, বল, আয়ু, সমস্তই অগ্নিবলের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালীর সেই অগ্নিবল ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য উৎসাহ উপচয়, প্রভা, বল ও আয়ুক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। দেশের বৈরাগ্য অবস্থা তাহাতে বাঙ্গালীর অগ্নি বল পুনরায় প্রবল হইয়া তাহাদিগকে স্বাস্থ্য, বল, আয়ু প্রভৃতির অধিকারী করিবে, কি নির্দোষিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিবে, তাহা বিধাতাই জানেন। অনেকের ধারণা আছে যে, তরল দান্ত হইলেই অজীর্ণ বলা যায়। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে, কোষ্ঠকাঠিন বা কোষ্ঠ বদ্ধতা ও অজীর্ণ জন্ম জন্মিতে পারে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আম দোষ (অজীর্ণ) দুইপ্রকার, যথা বিস্ফটিকা ও অলসক। তন্মধ্যে বিস্ফটিকা (Spasmodic dyspepsia) রোগে অস্ত্রের ক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র হয়। ভুক্ত দ্রব্য যাহা জীর্ণ হইবার তাহা শীঘ্র হয় এবং অজীর্ণ অংশ বমি বা মলরূপে শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইয়া যায় আর অলসক রোগে (Paralytic dyspepsia) ভুক্ত দ্রব্য অত্যন্ত বিলম্বে জীর্ণ হয় এবং মলও বিলম্বে নির্গত

হইয়া থাকে। স্মরণ্য কোষ্ঠবদ্ধতাও অজীর্ণ রোগের পরিচায়ক।

শাস্ত্রে অগ্নি চতুর্বিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা সমাগ্নি, বিবমাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও মন্দাগ্নি। এতন্মধ্যে দোষশূন্য বা অধিকৃত অগ্নিকে সমাগ্নি বলা যায়। সমাগ্নি উপযুক্ত অন্নকে যথাকালে সম্যক পরিপাক করে। অপর তিনটি অগ্নি দূষিত বা বিকৃত। বায়ু কতৃক দূষিত অগ্নিকে বিবমাগ্নি বলা যায়। এই অগ্নি কখন ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, এবং কখন কখন পেটকাঁপা, শূলবৎ বেদনা, উদাবর্ত (ভুক্তদ্রব্য উপর দিকে ঠেলিয়া উঠা), অতিসার, পেটভার, পেটে গুড় গুড় শব্দ এবং প্রবাহন (মলতাগ্নি কালে কুহন) উৎপাদন করে। পিত্ত দূষিত অগ্নিকে তীক্ষ্ণাগ্নি বলে। তীক্ষ্ণাগ্নি প্রচুর অন্নকে শীঘ্র পরিপাক করে এবং পরিপাকের পরে গলদেশ তালু ও গুষ্ঠের শুষ্কতা ও দাহ উৎপাদন করে। তীক্ষ্ণাগ্নি অত্যন্ত বদ্ধিত হইলে অতাগ্নি বা তন্মকাগ্নি বলা যায়। কক্ষদূষিত অগ্নিকে মন্দাগ্নি বলে। এই অগ্নি অল্প পরিমিত অন্নকে ও যথাকালে পরিপাক করিতে না পারিয়া দীর্ঘকালে পরিপাক করে এবং পেট ও মাথা ভার, কাশ, খাস, থুথু উঠা, বমি ও শরীরের মানি উৎপাদন করে।

এই তিন প্রকার অগ্নিই অনিষ্টকর। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্নি কদাচিৎ দেখা যায়। বিবমাগ্নি বা মন্দাগ্নি রোগেই অধিকাংশ বাঙ্গালী ভুগিয়া থাকে। সংগ্রহকারণের গ্রন্থে অগ্নিগত স্বতন্ত্র রোগ,—ইহা স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইলেও প্রাচীন সংহিতায় ইহা অজীর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। পিত্তজনিত যে অজীর্ণ রোগ তাহাই অগ্নিগত। বিদ্যাকাশীতে বক্তব্য এই যে, পিত্ত কতৃক বিদগ্ধ হইয়া অগ্নিগত রোগের পরিচায়ক হইয়া থাকে।

জাতীয় অম্পিত্ত রোগ আজকাল বাঙ্গালা দেশে নিত্য প্রবল। সহজে বোধ হয় শতকরা ৭৫ জন এই রোগে পীড়িত।

পূর্বে পিত্ত জনিত তীক্ষ্ণাগ্নির কথা বলা হইয়াছে, উপরে বিদগ্ধাজীর্ণের কথা বলা হইল। সংপ্রাপ্তি ভেদে পিত্ত হইতে এই দুই প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। পিত্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া যদি কেবল তেজাংশ বদ্ধিত হয়, তাহা হইলে তীক্ষ্ণাগ্নি রোগ জন্মিয়া থাকে। আর যদি পিত্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উত্তপ্ত জল যেমন অগ্নিকে নির্দীপিত করে, বদ্ধিত পিত্তও সেইরূপ জঠরাগ্নিকে ঢাকল করিয়া তোলে। ইহাতেই বিদগ্ধাজীর্ণ বা অম্পিত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগ যে কেবল শরীরকে কালান্তরে (দীর্ঘকালে) প্রাণনাশ করিয়া থাকে তাহা নহে, সময়ে সময়ে সদ্যোমারায়কও হইয়া থাকে। কক্ষ জনিত আমাজীর্ণ, বায়ু জনিত ষিষ্টকাজীর্ণ এবং পিত্তজনিত বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে বিস্ফটিকা, অসলক এবং বিলম্বিকা রোগ জন্মিয়া থাকে।

এই বিস্ফটিকা রোগে কুপিত বায়ু শরীরে হঠাৎ বিদগ্ধ হওয়ার জ্বায়া বস্তু উপস্থিত করে বলিয়া, ইহা বিস্ফটিকা নামে খ্যাত। এই রোগে মুচ্ছা (সংজ্ঞাহীনতা coma), অতিসার, বমি, পিপাসা, শূলবেধবৎ বেদনা, ভ্রম, উদ্বেগ (খাল ধরা), হাঁহ উঠা, দাহ, দেহের বিবর্ণতা, কল্প, হৃদয়ে বেদনা ও মস্তকে বিদাহওয়ার জ্বায়া পীড়া হয়। গ্রন্থান্তরে লিখিত হইয়াছে যে, এই রোগে নিদ্রানাশ, অস্থিরতা (Restless), কল্প, মুহাঘাত (প্রস্রাব বন্ধ হওয়া) ও সংজ্ঞাহীনতা এই পাঁচটি ভীষণ উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। অধুনা এই রোগ কলেরা নামে স্থপরিচিত।

অসলক রোগে পেট অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কুজন করে (গেঙ্গায়), মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, রুদ্ধ বায়ু হৃদয় কণ্ঠাদি দেশে প্রধাবিত হয়, বায়ু ও মল রুদ্ধ হয় এবং হিকা ও উল্কার হইয়া থাকে। ইহার ডাক্তারী নাম কলেরা-সিকা (cholera sicca)। এই রোগে ভেদ-বমি হয় না।

বিলম্বিকা অসলক রোগের প্রকার ভেদ মাত্র। এই রোগে বায়ু ও কক্ষ কণ্ঠক দূষিত ভুক্ত দ্রব্য উর্দ্ধ বা অধোদিক দিয়া নির্গত হইতে পারে না। শরীর দণ্ডবৎ হইয়া যায় বলিয়া গ্রন্থান্তরে এই রোগকে দণ্ডালসক বলা হইয়াছে।

পূর্বে দুই প্রকার আমদোষের প্রসঙ্গে যে বিস্ফটিকা ও অসলকের কথা বলা হইয়াছিল তাহা সাধারণ সংজ্ঞা, যেমন অগ্নি। আর এক্ষণে যে বিস্ফটিকা ও অসলক রোগের বিষয় লিখিত হইল—তাহা বিশেষ সংজ্ঞা, যেমন দাবানল। পাঠকের সন্দেহ নিরাকরণ জন্ত ইহা লিখিত হইল। শাশ্বে লিখিত হইয়াছে যে অজীর্ণ রোগে বমি, খুখু উঠা, শরীরের অবসন্নতা, ভ্রম, মুচ্ছা, প্রলাপ এবং মরণ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। পূর্বোক্ত বিস্ফটিকা ও অসলক রোগের আরম্ভ বমি প্রভৃতি উপসর্গ মুক্ত; আর শেবোক্ত বিস্ফটিকা ও অসলক রোগের শেষ — মরণে পর্য্যবসিত।

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অজীর্ণ বিবিধ রোগের কারণ; অজীর্ণ স্বল্পজীবী হইবার কারণ; অজীর্ণ—সময়ে সত্তোমরণের কারণ; ইহা ব্যতীত অজীর্ণের আরও একটি বিষয় ফল আছে; সেটি বংশাত্মকিক অপকর্ষ (Hereditary degeneration)। বিবরণী লিপ্যন্তর করিয়া বলা যাইতেছে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, ৫০ বৎসর পূর্বে

লোকে বহু ভোজন করিতে পারিত এবং অজীর্ণ রোগের এত প্রাচুর্য ছিল না। সে সময়ে শিশুদিগের যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়া এত প্রবল ছিল না। এত প্রবল ছিল না বলিলেও ঠিক বলা হইল না—নিতান্ত কম ছিল। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে শিশুর যকৃৎ রোগ এত প্রবল হইল কেন? দুগ্ধপোষ্য শিশু দোকানের খাবার কিনিয়া খায় না যে, দোকানের খাবারের উপরে এই দোষ আরোপ করা যাইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বাজারের দুগ্ধই দোষী। কিন্তু গৃহ পানিতা গাভীর দুগ্ধ পান করিয়াও যখন শত শত শিশু যকৃৎ-রোগে আক্রান্ত হইতেছে দেখিতেছি, তখন সে কথা কি করিয়া বলিব? আমাদের বিশ্বাস,—পিতামাতার অজীর্ণ রোগ থাকাই ইহার কারণ। অল্পপিত্ত রোগে পিত্ত দূষিত হইয়া থাকে। পিত্তের সহিত যকৃতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আয়ুর্বেদে যকৃৎ বিকৃতিকেই প্রকারান্তরে পিত্ত বিকৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং পিত্ত বিকৃতিবশতঃ যকৃতের বিকৃতি ঘটে। পিত্ত বা মাতার অথবা পিত্ত-মাতা উভয়ের এইরূপ যকৃৎ বিকৃতি ঘটিলে তাহাদের সন্তান যে যকৃৎ রোগগ্রস্ত হইবে তাহাতে আর বিচিৎ কি?

আমরা দিগ্‌দর্শন মাত্র কেবল যকৃৎ রোগের কথা বলিলাম। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত পিত্ত-মাতার সন্তান কখনই সুস্থ-সবল হইতে পারে না। তাহাদের পরিপাক শক্তি দুর্বল হয় এবং আহারাদি সম্বন্ধে একটু অনিয়ম হইলেই সহজে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের শিশুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা সারবস্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সুস্থ, সবল, পুষ্টদেহ শিশু কম, অধিকাংশ শিশুই শীর্ণ ও রুগ্ন। এই সকল শিশুর আবার যখন পুত্র-কন্যা হইবে

তখন তাহারা আরও দুর্বল, শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ ক্রমাপকর্ষ ঘটিলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থার ভবিষ্যতে যে কি ভীষণ হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও অন্তরাগ্না শিহরিয়া উঠে।

পার্কত্যা অজগর যেমন আক্রান্ত পতকে সম্যক বেঠন করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করে, এই ভীষণ অজীর্ণ রোগও সেইরূপ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে আক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে। বাঙ্গালী এখনও সাবধান হও। এখনও চেষ্টা করিলে এই ভীষণ অজগরের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার, এখনও তোমার ক্ষীণ শরীর পুষ্ট করিবার,—স্বল্প আয়ু দীর্ঘ করিবার, অসুস্থ দেহ সুস্থ করিবার সময় আছে। কিন্তু আর কিছুদিন অবহেলা করিলে আর তোমাদের পরিত্রাণের উপায় থাকিবে না। অজীর্ণ রোগের পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর এবং উহা যে কিরূপে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব বিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। এক্ষণে এই দেশ-ব্যাপী অজীর্ণ রোগ কি কারণে দেশে এত প্রবল হইয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ৫০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী জাতি প্রচুর আহার করিতে পারিত এবং বাঙ্গালা দেশে এমন অজীর্ণ রোগের প্রাচুর্য ছিল না। এই ৩০ বৎসরের মধ্যে এমন কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে বাহাতে অজীর্ণ রোগ একরূপ বিষম প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার কারণ অনেক সংক্ষেপতঃ : ১। পরিভ্রমণ, হীনতা ও বিলাসিতা। ২। ভাষিক, সিগারেট চায়ে-প্রচলন। ৩। কল্যাণ, কল্যাণ প্রচলন। ৪।



প্রচলন। ৫। খাদ্যাভাব। ৬। ভেজাল  
খাদ্যের প্রচলন। ৭। জীবনসংগ্রামে  
ও ভীতিকারী উপার্জনে পশ্চাৎপদতা। ৮।  
সংস্রামাভাব। ৯। বিবিধ ব্যাধির প্রাচুর্যাব ১০।  
মানসিক বিকৃতি। ১১। ধর্ম হীনতা।

অন্যত্র বিবিধ কারণ পৃথক না লিখিয়া  
উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেকের  
বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতেছে  
১। পবিত্র হীনতা ও বিলাসিতা। পূর্বে  
বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল এক্ষণে  
তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বাঙ্গালী-  
জাতি পূর্বাশ্রম্য এখন বিলাসী হইয়া  
পড়িয়াছে। পূর্বে যে বাঙ্গালী অনাগ্রাসে  
ছই চারি ক্রোশ পথ চলিত, সেই বাঙ্গালী  
এখন একক্রোশ বা ছই ক্রোশ পথ চলিতে  
হইলে রেল, ট্রাম বা সেয়ারের গাড়ার আশ্রয়  
গ্রহণ করে। পূর্বে আধম্ন ত্রিশের একটা  
মোট লোকে অকুন্তিত চিন্তে বহিয়া লইয়া  
গইত, কিন্তু এখন একটা পাঁচ সের জিনিষ  
বহিয়া দুইরা গাওরাও আমরা অপমান বোধ  
করি। পূর্বে গৃহস্থ মাত্রেই গৃহ সংলগ্ন  
একটু ফুলের বাগান বা তরকারীর ক্ষেত ছিল,  
এবং সেই বাগান বা ক্ষেতের সমস্ত কার্য  
যেমন বেড়া বাঁধা, জমী কোপান, বীজ বা গাছ  
বোপন করা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি সমস্তই  
গৃহস্থ মাত্রেই নিজে নিজে সম্পন্ন করিত। কিন্তু  
এখন চাকুরীজীবী-বাঙ্গালী তাহাতে অপমান  
বোধ করে। অথচ সময়ে পরসাক্ষাতে না যে,  
মজুর খাটাইয়া। বাগানের কার্য করান  
হইবে। কাজেই এখন গৃহস্থের গৃহ সংলগ্ন  
জমিতে ফলের বাগান বা তরকারীর ক্ষেত  
সেখা যায় না। সেগুলি জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া  
উঠিতেছে।

জগতের অনান্য সভ্য জাতির মধ্যে ব্যায়াম  
করিবার একটা ধরা বাধা প্রথা আছে। কিন্তু  
বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহা নাই। যদি কেহ  
সে নিয়ম পালন করেন, তাহা ছই চারি মাসের  
জন্ত মাত্র।

এদিকে ব্যায়াম করা হয় না, অপর দিকে  
শ্রমজনক গৃহকার্য অপমান জনক বলিয়া  
পরিত্যাগ করা হইয়াছে;—তাহার উপর রেল,  
ট্রাম, গাড়ী প্রভৃতির বাহ্যাবশতঃ হাঁটিতেও বড়  
হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমহীনতা বশতঃ  
অজীর্ণ রোগ যে প্রশ্রয় পাইবে, তাহাতে আর  
বিচিত্র কি।

কেবল পুরুষ বলিয়া নহে—মহিলাদিগের  
মধ্যেও এই দোষ ঘটিতেছে। আজ কাল  
অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইলেই ঝি চাকর বামুন  
রাখা একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে  
বিশেষ বড়লোক না হইলে ঝি-চাকরকেই রাখিত  
না, বামুন তো (পাচক) বড় লোকেও রাখিত  
না। যাহাদের চাষ আবাদ ছিল তাহারা কৃষক  
নিযুক্ত করিত বটে, কিন্তু তাহাতে গৃহলক্ষী  
দিগের কাজ বাড়িত ভিন্ন কমিত না। কেননা,  
কৃষক কৃষি কাজ ব্যতীত আর কিছু করিত না।  
অধিকন্তু তাহাকে আহার, জলখাবার পুর-  
মহিলাগণকেই দিতে হইত। কিন্তু এখন  
সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই মহিলাদিগকে  
পরিশ্রম খুব কমই করিতে হয়। এ অবস্থার  
তাহারা যে অজীর্ণ, অরপিষ্ট এবং তদাঙ্গসঙ্গিক  
বিবিধ রোগে ভুগিবেন, তাহাতে আর কথা  
কি!

ফল কথা বলিতে গেলে আমরা বাক্য  
হইয়া পড়িয়াছি এবং মহিলাদিগকেও সম্ভবতঃ  
বাক্য করিয়া তুলিতেছি। বঙ্গদেশে অজীর্ণ  
রোগের প্রাচুর্যব হইয়া একটা প্রধান কারণ

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ক্লবক সম্প্রদায়কে তো যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়,—তবে তাহাদের মধ্যে এই রোগ প্রবেশ করিতেছে কেন? কিন্তু আমরা অজীর্ণ রোগের একটি মাত্র কারণ নির্দেশ করি নাই। স্বাস্থ্যের চিরশত্রু বিলাসিতা ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করিতেছে একথা বর্ণিয়াছি। শ্রবজীবীলোকেও আজ কাল অনেক স্থলে পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক; তাহাদিগের অজীর্ণ তাহারই ফল সত্ত্বত। বহুদিনের একটি ঘটনা প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কোন সময়ে পূর্ববঙ্গ রেলপথের আড়ংঘাটা ষ্টেশনে এই প্রবন্ধের লেখককে গাড়ীর জন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। একটা বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং তিন জন মুসলমান শ্রমজীবীও সেই সময় গাড়ীর জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। ভদ্রলোকটি তাহাদের সহিত কথা কহিয়া অবগত হইলেন যে, তাহারা দৈনিক পাঁচ আনা পারিশ্রমিক পায়, সংপ্রতি রাণাঘাট যাইবে। রাণাঘাট, আড়ংঘাটা হইতে ২১০ ক্রোশ দূরবর্তী এবং তখনও গাড়ী আসিবার দুই ঘণ্টা বিলম্ব আছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাহাদের বলিলেন, বাপু তোমরা তো অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতে পার। তবে কেন অকারণ ছয় পয়সা করিয়া ভাড়া দিবে? ঐ পয়সা পেটে থাইলে উপকার হইবে। আমিও বৃদ্ধের উপদেশের সমর্থন করিলাম। শ্রমজীবী কয়জন চলিয়া গেল। কিন্তু তাহারা অন্তরালে ছিল মাত্র; গাড়ী আসিলে গাড়ীতে উঠিল। ধন্য রেলট্রাম; তোমাদের মোহিনী শক্তি। আমরা পেটে না থাইয়া তোমাদের বন্ধে আরোহণের সুখ অনুভব করি।

২। তামাক, সিগারেট ও চায়ের

প্রচলন।—তামাক বঙ্গদেশে বহুপূর্বে প্রচলিত ছিল না। সয়াট আকবরের সময় হইতে আমাদের দেশে উহার প্রচলন হয়। ক্রমে তামাক সেবনের কদভ্যাস পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্থায় ভারতেও অতি শীঘ্র প্রচলিত হইয়া পড়ে। তামাক যে অজীর্ণ রোগ জন্মাইয়া থাকে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন। আমরা যে সময়ের সহিত বর্তমান সময়ের তুলনা করিতেছি, সে সময়েও তামাকের প্রচলন ছিল বটে কিন্তু এত অধিক—বিশেষতঃ সিগারেট-বিড়ি প্রভৃতি আকারে প্রচলিত ছিল না। বিশেষতঃ তখন বহু অমুকুল কারণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তামাক একাকী কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। এক্ষণে বহু প্রতিকূল কারণের সহিত মিথিয়া তামাক অজীর্ণরোগের প্রাবণ্য বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে।

আমরা অনেক তামাক, চুরুট ও দোক্তা সেবা অজীর্ণ রোগী ও রোগিণীর তামাক-চুরুট দোক্তা বন্ধ করিয়া রোগ প্রশমিত হইতে দেখিয়াছি। তামাক—নস্য, দোক্তা, শুভুক বা চুরুট যে আকারেই ব্যবহৃত হউক—দমন অপকারী। তবে হৃৎকায় থাইলে তামাকের ধূম জলের ভিতর দিয়া যায় বলিয়া অনেকটা বিষ জলে মিশিয়া থাকে এবং সেই জন্ত কম অপকারী হইয়া থাকে।

চায়ের প্রচলন পূর্বে এ দেশে ছিল না, অল্প দিন হইল চাপিতেছে। এই অনাবশ্যক ও অহিতকর পদার্থের প্রচলন যে দেশের মঙ্গলজনক নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহা প্রধান দেশে—চা পান করিলে অজীর্ণরোগ জন্মিয়া থাকে। শীঘ্র প্রচারিত হইয়াছে যে অহিতকর বলিয়া বহু পণ্ডিতগণ তাহা বন্ধ করিয়াছেন।

প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গ চায়ের বহল প্রচলন অজীর্ণ রোগের অত্যন্ত কারণ। চাপাগী অজীর্ণরোগী চা পান তাগ করিয়া অজীর্ণ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে—এরূপ প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি।

৩। কয়লার জাল।—সহরে এবং আজ কাল অনেক পরিগ্রামে কয়লার প্রচলন হইয়াছে। পূর্বে মাটির হাড়িতে কাঠের জালে মন্দির বন্ধন করা হইত। এক্ষণে ধাতু পাত্র কয়লায় জালে রন্ধন করা হয়। যত জালে রন্ধন করিলে তাহা যেমন স্বসিদ্ধ ও মৃদুপাচ হয়, প্রথর জালে সেক্রপ হয় না। তাহাব উপর ধাতু পাত্রের ব্যবহার বশতঃ তাপ অধিক হয় এবং ধাতুর সংসর্গে খাদ্য অল্প বিস্তর দূষিত হইয়া থাকে। বঙ্গ ইহাও অজীর্ণ রোগের প্রাচুর্য্যের অত্যন্ত কারণ। যে অজীর্ণ ও অম্পিত রোগী কয়লার জালে এবং ধাতু পাত্রে সিদ্ধ করা অন্ন বাঞ্জন আহার করিয়া থাকেন, তিনি মাটির হাড়িতে এবং কাঠের জালে প্রস্তুত অন্ন বাঞ্জন আহার করিলে উভয়ের পার্থক্য বঝিতে পারিবেন।

৪। দোকানের খাবার।—সহরে এবং পরিগ্রামে এক্ষণে অসংখ্য খাবারের দোকান হইয়াছে। সহরে মাংসের হোটেলের সংখ্যাও কম নাই। ঐ সকল দোকানের এবং হোটেলের প্রস্তুত খাদ্য দেশে অজীর্ণ রোগের প্রাবল্যের আর একটা কারণ। অনেক অম্পিত রোগীর মুখে শুনা যায় যে, দোকানের খাবার খাইলেই তাঁহাদের অম্বল হয়, কিন্তু ঘরে প্রস্তুত খাবার খাইলে অম্বল হয় না। দোকানের প্রস্তুত খাদ্য রপ্ত মূল্যের নিকট উপকরণে প্রস্তুত হয় এবং প্রস্তুতের সময়ে ও পরে রাস্তার ধুলা ও মলান্দ পদার্থমিশ্রিত হওয়ায় সহজেই অপকারী

হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন।

৫। খাদ্যাভাব।—খাদ্যাভাব অজীর্ণরোগের আর একটা প্রধান কারণ। দুগ্ধ, ঘৃত এবং মৎস্য—এই তিনটা দ্রব্যই বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে দুগ্ধাদি নিত্যন্ত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। ধনবান ভিন্ন ঐ সকল দ্রব্য আহার করা অল্প কাহারও ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। যে গৃহস্থ পরিবারে ১০-১২টা বোক আছে—তাঁহাদের বাড়ীতে জোর ২৩ পয়সার ঘৃত তরকারীতে দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাতে বোধ হয় প্রত্যেকের এক বোলায় এক কাঁটা করিয়া ঘৃত উদরস্থ হয়। মৎস্য সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপ। এইরূপ অবস্থাহীন একটি পরিবারের মধ্যে প্রত্যহ এক পোয়ার অধিক মৎস্য ক্রয় করা হয় না। কাজেই ঐ এক পোয়া মৎস্য মেছুনীর বাটখারা, আইস এবং কাঁটা মুক্ত হইয়া আধ পোয়ার অধিক দাঁড়ায় না। আধপোয়া বা দশ তোলা মৎস্য দশ জনে দুই বেলা খাইলে এক বোলায় এক জনের আধ তোলা মৎস্য উদরস্থ হয়। তা'রপর দুগ্ধ—শিশুদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া দুগ্ধ দিতে এক্ষণে অনেক গৃহস্থেরই শক্তি নাই। তা'র উপর বৃদ্ধ বৃদ্ধা থাকিলে তাহাদের একটু দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং বয়স্কদিগের ভাগ্যে দুগ্ধ বড় একটা জুটিয়া উঠে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অতিরিক্ত আহার বশতঃই অজীর্ণ হয়, আহার অল্প হইলে অজীর্ণ হইবে কেন? কিন্তু অল্প উপযুক্ত ইন্ধন না হইলে যেমন প্রজলিত থাকিতে পারেনা, সেইরূপ অজীর্ণ উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে প্রবল থাকিতে পারেনা।

ভুক্তির সময় ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভুক্তি পীড়িত নর-নারী কয়েক দিন অনশন অথবা বৎসামাত্র আহার করিয়া জীবন রক্ষা করিবার পর যদি সহসা অতিরিক্ত আহার করে, তাহা হইলে অসুস্থ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ইহার কারণ এই যে, অনাহারে বা অনাহারে থাকিয়া তাহাদের জঠরাগ্নি নির্ধাপিত প্রায় হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থার সহসা প্রচুর আহার সেই নির্ধাপিত প্রায় অগ্নি পরিপাক করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, হীন মাত্রায় আহার করিলে তাহা বল ও পুষ্টির হানি করে এবং নানা প্রকার বায়ু রোগ উৎপন্ন করে। কাজেই হীন মাত্রার আহারের ফলে বল ও পুষ্টিহানি ঘটায় পর অতিমাত্রায় আহার জন্ম বে অসুস্থ হইতে হইবে, তাহাতে আর কথা কি ?

পূর্বে বর্ণিয়াছি যে, উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিতে পারেনা, সেইরূপ উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে জঠরাগ্নি প্রবল থাকিতে পারে না এস্থলে উপযুক্ত শব্দের অর্থ কি ? অগ্নিতে শুষ্ক কাষ্ঠ, ঘৃত প্রভৃতি দিলে উহা জ্বলিতে থাকে, কিন্তু আর্দ্র কাষ্ঠ, ধূলা, বালি দিলে জ্বলে না, নিবিয়া যায়,—সুতরাং ঘৃত ও শুষ্ক কাষ্ঠাদিই অগ্নির উপযুক্ত ইন্ধন। জঠরাগ্নির ইন্ধনও সেইরূপ উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, হিতকর অন্নপান রূপ সমিধের দ্বারা নিত্য সমাহিত চিত্তে মাত্রা ও কাল বিচার করিয়া অন্তরাগ্নিতে হোম করিবে। হায়! সমিধ ও হবির অভাবে আমাদের হোমাগ্নি নির্ধাপিত হইয়াছে। অন্তরাগ্নিও কি সেইরূপ সমিধ ও হবির অভাবে নির্ধাপিত হইবে ?

খাওয়ার অভাব ঘটায় উপযুক্ত খাদ্য এক্ষণে বাঙ্গালী জাতির উদরস্থ হয় না। চাউল বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। উহা ঘৃত, মংস্ত, মাংস ও দুগ্ধের সহিত সংযুক্ত হইলে উপযুক্ত খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু কেবল চাউল উপযুক্ত খাদ্য নহে। পাশ্চাত্য দেশীয় মনস্বিগণও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। ঘৃত ও মৎসাদির অভাবে বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে শাক ও অন্ন আহার করিয়া থাকে। এইরূপ অল্পপযুক্ত আহার জঠরাগ্নির উপযুক্ত ইন্ধন নহে। সুতরাং বাঙ্গালীর জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিবে কিরূপে। দুগ্ধের বিধ এই যে, এক্ষণে শুদ্ধ শাকও অনেকের জুটেনা। তরিতরকারী যেকোন দুগ্ধ লা, তাহাতে অল্প লোকেই যথেষ্ট তরিতরকারী কিনিয়া খাইতে পারে। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।

বাঙ্গালী জাতির আর দুই প্রকার খাদ্যের উল্লেখ করা কর্তব্য। দাল এবং ফল। দাল বেশ পুষ্তিকর, প্রায় মাংসের সমতুল্য। অধিকাংশ দরিদ্র পশ্চিম দেশবাসীর চানা ও রহরকি দাল প্রিয় এবং প্রবল খাদ্য। কিন্তু পশ্চিম দেশের স্ত্রায় বঙ্গদেশে দালের প্রচলন নাই এবং উহাদিগের স্ত্রায় দাল হজম করিতে বাঙ্গালী অক্ষম। বাঙ্গালীর দালের ব্যবহার অল্প এবং যেকোন ভাবে রাখিয়া আহার কর হয়, তাহাতে যৎসামান্য দালই উদরস্থ হইয়া থাকে। সুতরাং দালের দ্বারা বাঙ্গালী খাদ্যভাবের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করা হয় না।

কল বাঙ্গালীর প্রচুর জন্মিত এবং এখানে অনেক জন্মে। কল সুখাদ্য হইলেও উহা অনেক জন্মে। কল সুখাদ্য হইলেও উহা অনেক জন্মে। কল সুখাদ্য হইলেও উহা অনেক জন্মে। কল সুখাদ্য হইলেও উহা অনেক জন্মে।

এবং ঘেরূপ মূল্যে এদেশে বিক্রীত হয়, তাহাতে ধনবান ব্যতীত অপরের ক্রয় করিয়া আহার করা ও সম্ভব নহে। সুতরাং ফলের দ্বারা বাঙ্গালীর আহারাভাবের কিছু প্রতিকার হয় না। তবে মন্দের ভাল যে, এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে আমার সময় রসালের আশ্বাদনে অনেক দরিদ্রের জঠর জ্বালায় অনেকটা নিবৃত্তি ঘটে।

বর্তমানে কিরূপ শোচনীয় খাওয়াভাব ঘটিয়াছে, তাহা দেখান হইল। এই খাওয়াভাবই দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগের একটা কারণ। যাহা উৎকর্ষপী দেখা যাউক পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেশে অবস্থা কিরূপ ছিল? কারণ সে সময়ে দেশে অজীর্ণ রোগের প্রাচুর্য্য ছিল না।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এমন গৃহস্থ কম ছিল, যাহাদের দুই তিনটা বা তদধিক গাভী ছিল না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রয়োজন মত দুগ্ধ পাঠিতে পাইত। গৃহিণীরা দুগ্ধ হইতে মাগন, ঘৃত এবং বিবিধ সুস্বাদু প্রস্তুত করিতেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কাহাকেও রুগীন ভোজন করিতে হইত না। গব্য ঘৃত বঙ্গের সর্বত্রই পাওয়া যাইত এবং মূল্যও স্থূলত ছিল। এই সময়ে টাকায় দেড় সের হইতে দুই সের ঘৃত বাজারে বিক্রীত হইত। এখন পল্লিগ্রামেও সহজে ঘৃত পাওয়া যায় না এবং মূল্যও ৫ গুণ অধিক দাঁড়াইয়াছে। কার্যোপলক্ষে আমি বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া, যশোহর এবং ২৪ পরগণা জেলার বহু পল্লিগ্রামে ভ্রমণ করিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে যেখানে নিমজ্জিত বা আতথি হইতাম, সেখানে গৃহস্থ নিজগৃহ হইতেই প্রচুর দুগ্ধ-ঘৃত দিতে পারিত। এখন সেই সকল পল্লিগ্রামে গৃহস্থ নিজ গৃহ হইতে দুগ্ধ-ঘৃত দিতে তো পারেই না, অধিকন্তু পাড়ায়

ঘুরিয়া হয়ত সামান্য মাত্র সংগ্রহ করিতে পারে কখন বা তাহাও পারে না।

মংস্ত্র ও পূর্বে দেশে বেশ স্থূলত ছিল। বঙ্গ দেশে পানা, ডোবা, খাল, বিল ও নদী প্রচুর পূর্বে ঐ স্থলিতে জল থাকিত এবং জলে প্রচুর মংস্ত্র থাকিত। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের ঘরে জাল ছিল। স্নান করিতে যাইবার সময় প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই কোণে না কোন ব্যক্তি জাল, খালুই (মাছ রাখিবার পাত্র) লইয়া বাহির হইত এবং খাল-বিল বা পুকুরিগীতে জাল ফেলিয়া খালুইটা পূর্ণ করিত পরে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিত। সর্বত্রই যে এইরূপ উপায়ে মংস্ত্র সংগৃহীত হইত তাহা নহে, কিন্তু আমি অনেক স্থলে এইরূপ দেখি যাই। মৎস্য তখন এত প্রচুর জন্মিত যে ভদ্রঘরের বালিকা, যুবতী এবং প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকগণের অনেকেও স্নান করিতে গিয়া মৎস্য দেখিয়া ধরিবার লোভ সংবরণ করিয়া পারিত না,—কাপড় ছাঁকা দিয়া প্রচুর মৎস্য ধরিয়া আনিত। এখন খাল, বিল, ডোবা আর জল থাকে না, জলে আর তত মাছ থাকে না, গৃহস্থের ঘরে আর জাল থাকে না।

মংস্ত্র পূর্বে এত প্রচুর ও স্থূলত ছিল যে বাহাদের ধরিয়া লইবার সুবিধা ঘটিত না তাহারা স্বয়ং মূল্যে অনায়াসেই উহা ক্রয় করিয়া পারিত। এখন এত দুস্বাদু এবং দুর্গন্ধ হইয়াছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ সংগ্রহ করিবার সাধ্য অধিকাংশ গৃহস্থেরই নাই।

দিগদর্শন স্বরূপ আমরা কয়েকটা বাস্তুবিষয় আলোচনা করিলাম। তালিকা অনুসারে সর্ব প্রকার খাদ্যই এখন দুস্বাদু ও দুর্গন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জলে অসংখ্য মাছ আর উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করিতে

না। বাঙ্গালী এখন পেট ভরিয়া খাইতে পার না। অপকৃষ্ট খাদ্য হীন মাত্রায় খাইয়া জঠর জ্বালা নিবৃত্তি করে মাত্র। এই সকলই বঙ্গে অজীর্ণ রোগের প্রাচুর্য্যবের প্রধান কারণ।

আগামীবারে এ সম্বন্ধে আমরা আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ক্রী—

## স্বাস্থ্যরক্ষায় ভোজন বিধি।

সুস্থ, সবল ও নিরোগী হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিতে হইলে আমাদিগের নিত্য আহাৰ্য্য বস্তুগুলির গুণ, মাত্রা, সংযোগ, বিরুদ্ধ ক্রিয়া, ভোজনের কালকাল, গুরু-লঘুপাক প্রভৃতির বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকা আবশ্যিক। নিত্য আহাৰ্য্য দ্রব্যের সহিত শরীরের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। আমরা অনভিজ্ঞতা বশতঃ কত প্রকার অহিত জনক, অপকৃষ্ট, সংযোগ বিরুদ্ধ পান-ভোজন দ্বারা স্বাস্থ্য হারায়া চিরকাল হইতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেইজন্য বর্তমান প্রবন্ধে আমরা নিত্য আহাৰ্য্য দ্রব্যগুলির গুণাগুণ, সংযোগ, বিরুদ্ধ ক্রিয়া, দ্রব্যের গুরু-লঘুপাক, মাত্রা, কালকাল, কোন্ ঋতুতে কোন্ দ্রব্য হিতজনক ইত্যাদি আবশ্যিক বিষয়গুলির আলোচনা করিব।

আহাৰ্য্য দ্রব্য ছয় প্রকার—  
১. পেয়, লেহ, ভোজ্য, ভক্ষ্য ও চৰ্ক্য।  
আদিগের মধ্যে চুষ্য হইতে পেয়, পেয় হইতে লেহ, লেহ হইতে ভোজ্য, ভোজ্য হইতে ভক্ষ্য, ভক্ষ্য হইতে চৰ্ক্য দ্রব্য গুরু পাক।

চুষ্য—ইক্ষু, দাড়িম প্রভৃতি। পেয়—চিনি মিশ্রিত সরবত প্রভৃতি। লেহ—রসুলা অর্থাৎ গুঠাল প্রভৃতির রসাবাদন। ভোজ্য—অন্ন-

বাঞ্ছনা, ভক্ষ্য—খাদু, মোয়া প্রভৃতি।  
চৰ্ক্য—চিপটক ( চিড়া ) প্রভৃতি।

ভোজনের পূর্বে হস্ত-মুখ-পদদ্বয় উত্তমরূপে ধৌত এবং দস্ত ও জিহ্বা পরিষ্কৃত করিবে। উপবেশনের জন্ত কাণ্ট আসন ( পীড়া ) অপেক্ষা কম্বল ও গালিচার আসন প্রশস্ত ও সুখজনক। সুখজনক আসনে অঙ্গাদি বিকৃত ভাবাপন্ন না করিয়া সরলভাবে উপবেশন পূর্বক ভোজ্য দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে। ভোজন সময়ে শ্রুতিমধুর সুখজনক গল্প শ্রবণ করিতে করিতে ভোজন করা উচিত।

প্রত্যহ ভোজনের প্রাক্কালে সামান্ত কয়েক টুকরা আদা সৈন্ধবলবণ সহযোগে সেবন করিবে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে উক্ত আছে—

“ভোজন্যাগ্রে সদাপথ্যং লবণাদ্রক ভক্ষণম্।

অগ্নি সন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বা কর্ণ বিশোধনম্॥”  
ভোজনের পূর্বে লবণ ( সৈন্ধবলবণ ) সাধু আদ্রক ভক্ষণ হিতজনক, অগ্নির উদ্দীপক, দৃষ্টি জনক, জিহ্বা ও কর্ণের শোধক।

আদ্রকের সহিত লবণ খাওয়ার ইচ্ছা থাকিলে, তাহা সৈন্ধব লবণ হইতে হইবে। কড়কট এবং বিলাতি লবণ ইহা হইবে না।

পাতিভাষিক শব্দানুসারে লবণ স্থানে সৈন্ধব লবণ প্রযুক্ত। এই প্রকার আরও বহু শব্দ আছে যেমন, গুড় বলিতে ইক্ষু গুড়, চন্দন বলিতে রক্তচন্দন ইত্যাদি। সৈন্ধব লবণ ত্রিদোষগ্র, ঈষৎ মধুর, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ কচিজনক, শীতবীৰ্য্য শুক্ৰজনক, চক্ষুর হিতকারক। এজন্ত ভোজনে সৈন্ধব লবণই প্রশস্ত। পঞ্চ লবণের মধ্যে সৈন্ধব লবণ সর্বোৎকৃষ্ট।

আদ্রকের গুণ—মলভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবৃদ্ধক, কটুরস (বাল) মধুর, স্ফুল্পোত্তামগামী, বায়ু ও কফনাশক। আদ্রক ও সৈন্ধব—এই দুইটা দ্রব্যের সংযোগে পিষ্টের প্রকোপ হয় না, ও ক্ষুধা বদ্ধিত হইয়া থাকে।

গুরু দ্রব্য।—গুরু দ্রব্য তিন প্রকার,—  
মাত্রা গুরু—(অতিবিক্ত মাত্রায় সেবন)  
স্বভাব গুরু (দ্রব্যের স্বাভাবিক গুরুত্ব  
গুণযুক্ত—যাঙ্গা বিশেষ পরিপাক হয়) পগান,  
পেঁয়াজ, মাংস ইত্যাদি।

সংস্কার গুরু—নানাবিধ দ্রব্য ও গরম মসাদি সংযোগে প্রস্তুত। এই ত্রিবিধ গুরুদ্রব্যই মন্দাগ্নি ব্যক্তি কখনই সেবন করিবে না। ফলমুগাদি আহার করিতে হইলে অন্ন আহারের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে করিবে। অনেকের অভ্যাস আছে, ভাতের পাতে লুচি, রুটি ভোজন করিয়া থাকেন, কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহা নিষিদ্ধ।

“গুরু পিষ্টময়ং দ্রব্যং তণ্ডুলান্ পৃথকানপি ।  
ন জাতু তুন্ডবান্ খাদেদ্যাত্রাং খাদে দ্বুভুক্তিতঃ ॥

গুরু দ্রব্য, পিষ্টময় দ্রব্য (লুচি প্রভৃতি)  
তণ্ডুল ও চিপটি (চিড়া) এই সরল দ্রব্য  
তুন্ড ব্যক্তি কখনই ভোজন করিবে না।

ব্যক্তি অর্থে এ স্থলে ভোজন শেষে অথবা ভোজনের অব্যবহিত পরে বুঝাইবে। তাকে আবশ্যক হইলে ঐ সকল দ্রব্য অতি অল্প মাত্রায় ভক্ষণ করিতে পারা যায়।

ভোজনের সময়—ভোজনের উপযুক্ত সময় অতীত করিয়া ভোজন করিলে বায়ু কর্তৃক জঠরাগ্নি উপহত হইয়া ভুক্ত দ্রব্য অতিকষ্টে পরিপাক করে এবং পুনর্বার ভোজনে অতি-লাভ থাকে না। এজন্ত ভোজনের নির্দিষ্ট সময় অতীত করিয়া ভোজন করিবে না। এস্থলে বলা আবশ্যক, যাহার চির অভ্যাস বশতঃ যে সময় ভোজন কাল নির্দিষ্ট আছে, তাহার পক্ষে সেই সময়ই উপযুক্ত কাল জানিবেন।

পাকস্থলীর চারি অংশের দুই অংশ ভোক্ত দ্রব্যের দ্বারা পূর্ণ করিবে, এক অংশ পানীয় দ্বারা পূর্ণ করিবে, অবশিষ্ট এক অংশ বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত শূন্য রাখিবে, আকর্ষ পূরিয়া কখনও ভোজন করিবে না। এস্থলে আমাশি বিগের দেশ-প্রথা অনুসারে বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়,—নিমন্ত্রণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কর্তার আগ্রহাতিশয্যে ভোজন কর্তার মাত্রাতিরিক্ত ভোজন করিতে হয়। ইহাতে দুইটি বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে, কর্তার ক্রমশঃ অপচয় এবং ভোক্তার স্বাস্থ্য হানি; এমনকি ইহাতে কোন কোন স্থলে ভোক্তার বিপুল উল্লাসময়, উল্লাসাখ্যান পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ হইতে পারে। এমত স্থলে নিমন্ত্রিত কর্তা ও ভোক্তা উভয়েরই বিশেষ লতর্কতা অবগত করিয়া একটী প্রবাদ বাক্য আছে—“আমি কচি পাক পুত্র কচি পুত্রনা”,—সকলেরই স্বাস্থ্য উজ্জিত, এক কথাটির দ্বারা আছে।

### ভোজনের সময় জল পান—

অধিক জলপান করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না, এবং একবারে জলপান না করিলেও পরিপাক হয় না। এস্থলে আয়ুর্বেদে উক্ত আছে—  
অত্যধু পানায় বিপচাতেহন্ন মনসু পানাত স  
এব দোষঃ।

তন্মারো বহি বিবর্দ্ধনায় মুহমূর্ছবারি পিবেদ  
ভূরি॥ ( ভাব প্রকাশ )।

অতএব একেবারে জলপান না করা এবং  
অতি জলপান করা—কোনটাই সঙ্গত নহে।

**বিষমাশন।**—ভোজনের সময় অধিক  
মাত্রায় আহার কিম্বা অসময়ে অধিক বা অল্প  
আহার কিলে তাহাকে বিষমাশন বলে।  
ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় অহিতকর।  
আবার ক্ষুধার উপযুক্তরূপে অল্প ভোজন না  
করিলে শরীর কৃশ ও দুর্বল হইয়া থাকে।

**অকাল ভোজন—**ক্ষুধা উপস্থিত না  
হইতে আহার করিলে, বলহানি, শিরোরোগ,  
বিষচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা রোগ জন্মে।  
এই সকল রোগ কালে বদ্ধিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত  
দ্রষ্টাইতে পারে।

**কিরূপে অল্প ভোজন করা উচিত ?**

—যে অল্প মনের প্রফুল্লভাজনক, বল ও পুষ্টি-  
বর্ধক, ও পরমায়ুবদ্ধক—এরূপ অল্প ভোজনের  
পন্থিক। অতিশয় উষ্ণ অল্প বলনাশক, অতি  
শীতল ও শুষ্ক অল্প চুস্পাচা, অতিশয় ক্লিন্ন অল্প  
(করম ভাত) বিবাদকর। নাতি উষ্ণ, নাতি  
শীতল, নাতি কঠিন, নাতি দ্রব অল্প ভোজনই  
সঙ্গত। অল্পের মাড় পরিত্যাগ না করিয়া  
অল্প—আড়ের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া প্রস্তুত  
করা—এই অত্যন্ত বলকারী। সিদ্ধ চাউলের  
অল্প অপেক্ষা আতপায় বলকারী।

**আহারের নিয়ম—**অতিশয় ক্ষুদ্র

আহার করিবে না, ভক্ষ্য বস্তু উত্তমরূপে চর্বণ  
করিয়া উদরস্থ করিবে।

ভক্ষ্য বস্তু উত্তমরূপে চর্বণ না করিয়া  
ভোজন করিলে অজীর্ণ ও অল্প পিত্ত রোগাক্রান্ত  
হইতে হয়। অতি বিলম্বেও আহার করিবে  
না, তাহাতে প্রস্তুতিকৃত আহার্য সামগ্রী অতিশয়  
শীতল হইয়া পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়।

**ঋতু অনুযায়ী আহার—**শীত কালে,  
ও হেমন্ত-শিশির ঋতুতে এবং বর্ষাকালে—অন্ন,  
মধুর ও লবণ রসযুক্ত, বসন্ত কালে—কটু,  
( ঝাল ) তিক্ত, এবং কষায় রসযুক্ত, গ্রীষ্ম কালে  
মধুর রসযুক্ত শরৎ কালে—মধুর, তিক্ত এবং  
কষায় রস সংযুক্ত অন্ন-পানীয় সেবন করিবে।

শরৎ ও বসন্ত কালে রুক্ষ দ্রব্য এবং  
হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে মৃদু দ্রব্য  
সেবন করিবে।

গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে শীতল দ্রব্য, তত্ত্বিন্ন  
অম্লান্ন ঋতুতে ( হেমন্ত শিশির, বসন্ত ও বর্ষা )  
উষ্ণ গুণ যুক্ত দ্রব্য সেবন বিধি। মধুরাদি  
করিয়া ছয়টি রস—( মধুর, অন্ন, কটু, তিক্ত,  
কষায়, লবণ ) সকল ঋতুতেই সেবন করিবে,  
তন্মধ্যে যে সকল ঋতুতে যে যে রসের সেবন  
বিশেষ করিয়া বলা হইল—সেই সেই রস  
অধিক মাত্রায় সেবন করা কর্তব্য।

• **ঋতু ভেদে সেবন বিধি—**বর্ষাকালে  
বায়ু কুপিত হয়, এজন্য বর্ষাকালে বায়ু প্রশমিত  
পান, আহার করিবে। মধুর, অন্ন ও লবণ  
রস বায়ু প্রশমক।—শরীর ঝালি, কটু রস  
বলিয়া এই ঋতুতে কটু ( ঝাল ) তিক্ত ও  
কষায় রস যুক্ত দ্রব্য বিশেষ ভাবে সেবন  
করিতে হয়।

**শ্বেদকর—**শ্বেদকর দ্রব্য—

ভোজনে ও শ্বেদকর দ্রব্য—



সেই সকল দ্রব্যও দধি, উষ্ণ দ্রব্য, জাঙ্গল মাংস, গোধূম, তণ্ডুলের অন্ন, মাষ কলায়ের ঘূষ, কৃপ জল—প্রভৃতি সেবন বিধি ।

বর্ষাকালে বর্জ্জনীয় বিধি ।—  
পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু, বৃষ্টি-রোদ্র, হিম, অতি পরিশ্রম, নদীতীরে ভ্রমণ, দিবানিজ্রা, রুক্ষদ্রব্য সেবন ; নিত্য মৈথুন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এইগুলি বর্ষাকালে বর্জ্জনীয় ।

বর্ষার অবসানে হিতজনক বিধি ।—  
—গ্রহ, মধুর দ্রব্য, কষায় ও তিক্ত রস সংযুক্ত দ্রব্য, লঘু দ্রব্য, হৃৎক, ইক্ষু-বিকার ( ইক্ষু চিনি গুড় ) লবণ, অন্ন পরিমাণে জাঙ্গল মাংস, গোধূম, যব, মুগ, শালিতণ্ডুল, কর্পূর, চন্দন, বাত্মির প্রথম ভাগের চক্ষু কিরণ, মালা ধারণ, অন্ন ব্যায়াম, সরোবরে জল ক্রীড়া, এবং পিত্তাধিকা ব্যক্তির বিরচন—বর্ষা অন্তে প্রশস্ত ব্যবস্থা ।

বর্ষার অবসানে বর্জ্জনীয় বিষয় ।—  
দধি, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অন্ন দ্রব্য, কটু দ্রব্য ( ঝাল ) উষ্ণ দ্রব্য, তাক্ষ দ্রব্য, দিবানিজ্রা, হিম, রোদ্র সেবন—এ গুলি বর্ষা ঋতুর অবসানে আদৌ কর্তব্য নহে ।

শরৎ কালে সেবন বিধি ।—  
ইক্ষু বিকার ( গুড় চিনি ) শালিতণ্ডুল, মুগ, সরোবরের জল, হৃৎক, সন্ধ্যাকালের চক্ষু কিরণ হিতজনক ।

শিশির কালে ( শীত কালে ) হেমন্ত কাল অপেক্ষা অধিক শীত হয়, এজন্য আদান কালের স্বভাব জনিত শরীর বিশেষ রক্ষা হয়, যতএব এইকালে হেমন্ত কালের নিয়ম সকল পালন করাই প্রশস্ত ব্যবস্থা ।

হেমন্ত কালের বিধি ।—প্রাতে বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভোজন, অন্ন দ্রব্য, মধুর

দ্রব্য, লবণ রস সংযুক্ত দ্রব্য, তৈল মর্দন রোদ্র সেবন, ব্যায়াম, গোধূম, ইক্ষু-বিকার, শালিতণ্ডুল, মাষকলাই, মাংস, পিষ্টান্ন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিল, মুগনাভি ( কস্তুরী ) কুঙ্কুম, অগুরু, শৌচাদি কার্যে গরম জল ব্যবহার, স্নিগ্ধ দ্রব্য, স্নায় সংসর্গ, মোটা এবং গরম পশুমাди নিশ্চিত বস্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করিবে ।

বসন্তে ব্যবস্থা ।—বমন, নশ্তগ্রহণ, মধুর সহিত হরীতকী সেবন, ব্যায়াম, উষ্ণর্জন, জাঙ্গল মাংস, গোধূম প্রভৃতি কফ নাশক দ্রব্য ব্যবহার, শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, যব, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু প্রভৃতি গাত্রে অতুলেপন, রুক্ষ, কটু, উষ্ণ এবং লঘু দ্রব্য ভোজন এই ঋতুতে হিতজনক ।

বসন্ত কালে বর্জ্জন বিধি ।—অন্ন দ্রব্য, দধি, স্নিগ্ধদ্রব্য ( যাহাতে কফ বৃদ্ধি হয় ) ছপাচা দ্রব্য ভোজন, দিবানিজ্রা, হিম সেবন বসন্তকালে সর্বতোভাবে বর্জ্জনীয় ।

গ্রীষ্ম ঋতুর বিধি—মধুর দ্রব্য, স্নিগ্ধ-দ্রব্য, শীতল ও লঘু দ্রব্য, রসালো ( কাঠাল ) চিনি, শক্ত ( ছাতু ) হৃৎক, চিনির সহিত থরমুজা, শালি তণ্ডুল, মাংস রস প্রভৃতি আহার, কর্পূর ও চন্দনাদির অমুলেপন, শীতল জল পান, এই ঋতুতে হিতকর । কটু দ্রব্য ( ঝাল ) ক্ষার দ্রব্য, অন্নদ্রব্য, রোদ্র ও অতিরিক্ত পরিশ্রম এই সময়ে একেবারেই বর্জ্জন করিবে ।

এই প্রসঙ্গে আমরা ভোজনান্তর ক্রিয়াগুলির কথা বলিয়া অন্ত্যকার বক্তব্য শেষ করিব । ভোজন অন্তে উত্তমরূপে আচমন করিতে হয়—ইহাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা । এ ব্যবস্থা কিন্তু আজ কাল অনেক তুলিয়া দিয়াছেন । আচমনের কলে জিহ্বা ও দন্তমূল পরিষ্কৃত হয়, এইজন্যই আচমনের ব্যবস্থা । শুধু তাহাই নহে, খড়িকা

দ্বারা দন্তমূল পরিস্কৃত করাও আবশ্যিক, নতুবা দন্ত দংযোগ স্থলে আহাৰ্য্য দ্রব্যের কণিকা থাকায় উহা পচিয়া মুখে ভর্গন্ধ হয় এবং ক্রমশঃ দন্ত বেষ্টিত মাংস শিথিল হইয়া—দন্তমূল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এখনকার দিনে অনেকেরই অতি শীঘ্র যে দন্তরাগ জন্মিয়া থাকে এবং উহার পরিণামে দন্তোৎপাটন পূর্বক কৃত্রিম দন্ত ব্যবহারের প্রয়োজন হয়—আচমনের অভাবই তাহার কারণ। আচমনের শেষে জল সিক্ত হস্ত দ্বারা ৩৪ বার চক্ষু মার্জনা করিবে, ইহাতে চক্ষুর দৃষ্টশক্তি সতেজ থাকে, এবং তিমির রোগ নষ্ট হয়। আয়ুর্বেদে উক্ত আছে—  
আচমা জলগুক্তাভ্যাং পাণিভ্যাং চক্ষুযী শ্ববেৎ।  
ভুক্তপাণি তস্মৈ চক্ষুযো যদি দৌরতে।  
অচিরেনৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি॥

( ভাব প্রকাশঃ )

তাম্বুল (পান) সেবন বা (মুখশুদ্ধি) আচমনের পর কর্তব্য। কটু, তিক্ত, কষায়-বিশেষ ফল, হরীতকী, গুপারি, লবঙ্গ, জাতিফল প্রভৃতি দ্বারা, অথবা কপূর, কন্তুরী স্ফগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত তাম্বুলের দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। কিন্তু অতিরিক্ত তাম্বুল সেবন অতিশয় অবৈধ, ইহার ফলে অকালে দন্ত সকল তো নষ্ট হইয়া থাকেই, অজীর্ণ রোগও ইহার ফলে জন্মিয়া থাকে। তাহার পর, আমরা যে তাম্বুল সেবন করি, তাহাও বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার কর্তব্য। শাস্ত্রকার তাম্বুলের গুণ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—তাম্বুল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, কটিকারক, মলসারক, ক্ষার সংযুক্ত তিক্ত ও কটু রস বিশিষ্ট, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বস্ত্তাজনক, কফর, মুখের ভর্গন্ধ ও মলনাশক, বাতর, শ্রমপনোদক, মুখের বিষাক্তকারক, কান্তিজনক, তনু (চোয়াল) ও দন্ত-

গত মল নাশক, রসনেক্রিয় শোধক, মৃগশ্রাব ও গল রোগনাশক। কিন্তু নূতন তাম্বুল—ঈষৎ কষায় সংযুক্ত, মধুর রস, গুরু, কফকারক। বঙ্গদেশজাত তাম্বুল অত্যন্ত কটুরস (ঝাল) যুক্ত সারক, পাচক, পিত্ত বন্ধক, উষ্ণবীৰ্য্য, কফ নাশক ও পুরাতন তাম্বুল—কটুরসবিহীন, লঘু, কোমলতর, পাণ্ডুরবর্ণ—সেইজন্ত ইহাই তাম্বুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গুপারি সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করা কর্তব্য। আয়ুর্বেদ গুপারি গুণ-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—গুপারি গুরু, শীত-বীৰ্য্য রক্ষ, কষায় রস যুক্ত, কফর, পিত্তনাশক, মত্ততাজনক, অগ্নিপ্রদীপক, কটিকারক, মুখের ভর্গন্ধনাশক। কিন্তু পক্ষ গুপারি ও সিদ্ধ কবা গুপারি ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত, কফ) নাশক, অপক গুপারি ব্যবহার করা প্রশস্ত নহে।

খদির বা খয়ের সম্বন্ধেও বিচার আবশ্যিক। খদির এক প্রকার বৃক্ষের নির্ঘাস। বিত্তর খয়ের প্রায়ই ছত্রাপ্য। খদির বৃক্ষের নির্ঘাস গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ীগণ নানাবিধ দ্রব্য সংযোগে কৃত্রিম খয়ের প্রস্তুত করিয়া থাকে। এজন্ত পানের সহিত আমরা যে সকল খয়ের ব্যবহার করি, তাহা বিত্তর নহে বলিয়া অপকারীই হইয়া থাকে। নতুবা বিত্তর খয়ের কফর এবং পিত্তনাশক, সেইজন্ত ইহা ব্যবহারে উপকারী হইবার কথা।

চূর্ণ বা চূণ—সম্বন্ধেও বিবেচনা করিবার বিষয় আছে। চূণ দ্বিবিধ,—পাথর হইতে জাত—(যাহা কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে) ও শম্বুক হইতে জাত। ইহার মধ্যে শম্বুক জাত চূণ অম্লনাশক, কক্ষ ও বাতনাশক। কিন্তু এ চূণ আমরা ব্যবহার করি না বলিয়া তাম্বুল সেবনে আমাদের অনিষ্ট হইয়া থাকে। পান, গুপারি, খয়ের, চূণ—এই কয়েকটি দ্রব্যের

যোগে এবং সুগন্ধি মসল্লা দ্বারা যে পান প্রস্তুত হয়, তাহা সেবনে কফ, পিত্ত ও বায়ু দ্বন্দ্ব দোষ নষ্ট করে। প্রাতঃ কালে পান সেবন করিতে হইলে, শুপারি, মধ্যাহ্নে খদির, এবং রাত্রিতে চূণের ভাগ কিছু অধিক দিবে।

তাম্বুলের শীস ও বোটা,—অজীর্ণ কারক, বন্ধি দ্রুৎজনক—স্বতি শক্তিনাশক। তাম্বুল চর্ষণে কবিতা প্রথম অংশ (পিক্) ফেলিয়া দিবে, উহা বিদ্রাক্ত। ২য় বার চর্ষণে যে রস উৎপন্ন হয় তাহা ভেদক ও তৃপ্তাচা। তৃতীয় বার চর্ষণে যে রস প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই গুণ-দায়ক।

ভোজনের পর আচমন—আচমনের পর মুখশুদ্ধি, তা'বপর বিশ্রাম, এ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ-চার্যগণ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন,—তাহা আমরা বলিলাম।

ইহাব পর উপবেশন, শয়ন—অথবা দ্রুত গমন নিবন্ধি। ভোজনাগ্রে দীর্ঘ পদে একশত পদ হাটিবে, তাহাতে আলস্যাদির শিথিলতা দূর হয়। ভোজনের পরক্ষণেই উপবেশন করিলে হুঁড়ি বৃদ্ধি হয় (পেট মোটা হয়)। শয়ন করিলে দেহ পুষ্ট ও দ্রুত গমন করিলে মৃত্যু তাহার

পশ্চাদানুসরণ করে, অর্থাৎ উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। ভোজনের পর ধীরে ধীরে একশত পদ ভ্রমণ করিলে পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ভ্রমণের পর অষ্টখাস পরিমিত কাল (আট-বার খাস প্রখাস বহনে যে সময় ক্ষেপ হয়) তৎকাল পর্য্যন্ত উত্তানভাবে সূখে শয়ন করিবে, তৎপর ষোলবার ঐ প্রকার খাস বহনের সময় পর্য্যন্ত দক্ষিণ পার্শ্বে (ডাইন কাতে) শয়ন করিবে, অতঃপর তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ বত্রিশ বার পর্য্যন্ত খাস প্রখাস গ্রহণের সময় অতিক্রম করিয়া ইচ্ছামত ভাবে শয়ন করিবে।

নাতির উদ্ধদেশে বাম পার্শ্বে পঞ্চাশ (অগ্নির স্থান)। এজন্য ভুক্ত বস্ত্র জীর্ণ হইবার জন্য বাম পার্শ্বে শয়ন করা কর্তব্য।

আগেকার লোকে এ সকল বিধি মানিতেন, তাহার ফলে তাঁহারা নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। এখন আমরা তাহা মানি না বলিয়াই আমরা যে স্বাস্থ্য-সুখ হারাইয়া অন্নাযু হইয়া পড়িয়াছি—তাহা জব—সত্য কথা।

শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন।

## বায়ু সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

—\*—

পাঠক, প্রবন্ধের নাম দেখিয়া মনে করিবেন না যে, সেই পুরাতন কথাই পুনরাবৃত্তি হইতেছে। বায়ু আমরা খাস লই; বায়ু আমাদের প্রাণ, বায়ু বৃক্ষলতাদির প্রাণ ইত্যাদি, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এই সকল বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে।

শিথিল শিরাবাহী বায়ু জীব শরীরের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে—তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গ ক্রমে আয়ুর্বেদের বায়ু সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা যাইবে।

কিরূপ বায়ু দূষিত—তাহা বলিবার উপলক্ষে

আয়ুর্বেদে অনার্ত্তব বায়ুর উল্লেখ আছে দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু টীকা-টপ্পনীতে তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা কিছুই পাই নাই। সম্প্রতি ঘটনাক্রমে উক্ত কথাটির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাইয়াছি। পাঠকদিগকে আজ তাহা উপহার দিব।

ব্যাখ্যা কোথায় পাইয়াছি জানিবেন?—কৃষকদিগেব নিকট। মিটিরোলজিষ্ট—যাহারা আবহাওয়ার বিষয় জানে তাহাদিগের নিকট হইতে। কবে মনসুন (Monsoon) (ইহা এক প্রকার বায়ু—যাহাতে জল বর্ষণ করায়) আরম্ভ হইবে—বায়ুর হিউমিডিটি (Humidity—আদ্রতা) এবং ভেলোসিটি (Velocity—বেগ) কত—প্রভৃতি বিষয় জানিতে আমরা ব্যস্ত হই, কিন্তু এই নিরক্ষর কৃষকদিগের নিকট বায়ু সম্বন্ধে যে সকল বিস্ময়কর জ্ঞাতব্য বিষয় আছে—তাহা জানিবার চেষ্টা করি না। বসিতে পারি না—হয়ত পূর্বে এ বিষয়ে কেহ লিখিয়া থাকিবেন, হয়ত অনন্ত শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহা আমাদের এবং সম্ভবতঃ অনেকের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বিষয়টীা যেরূপে যে স্থানে আমার শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল, তাহা পাঠকদিগকে সবিস্তার নিবেদন করিতেছি। কেননা ইহার সহিত আমাদের আহারীয় দ্রব্যের উৎপাদক কৃষক কুলের সুখ-দুখ, উন্নতি-অবনতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। স্তত্রাং তাহা সাধারণের অগ্রীতিকর হইবে না।

গঙ্গাতীরে বালির চড়া। পূর্বে এই সকল স্থান দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। গঙ্গা ক্রমে সরিয়া সরিয়া গিয়া এখন চড়া পড়িয়াছে। স্তম্ভিকা-বালুকাময়। দিবসে খুব গরম, রাত্রে

ঠাণ্ডা। চড়া বালিয়া অনেক পরিসর স্থান মনে করিবেন না। দৈর্ঘ্যে ৫১৬ ক্রোশ, বিস্তারে কোথাও এক, কোথাও দেড়, কোথাও বা চুট ক্রোশ। মধ্যে মধ্যে গ্রাম,—অধিবাসিগণ সকলেই কৃষিজীবী। পূর্বে এই সকল জমিতে বিবিধ শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি। এক্ষণে বহুকাল শস্যোৎপাদন করা অথচ সার না দেওয়ার ফলে জমীভূমি অল্পস্বল্প হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে অধিবাসিগণ নানাবিধ বলিষ্ঠ এবং স্বচ্ছল অবস্থা সম্পন্ন ছিল ও প্রচুর দ্রুত যাইতে পাইত। এক্ষণে তাহাদিগেব মধ্যে বিবিধ রোগের প্রাবল্য। তাহাদের শরীর দুর্বল, অবস্থা শোচনীয়,—এবং দ্রুত যাইতে পারেই আহার কবিতো পায় না।

এইরূপ গঙ্গার চড়ায় একটা গ্রামেব প্রান্তে বসিয়া রোগী দেখিতেছিলাম। সম্মুখে মাঠের পর মাঠ, তাহার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। কিন্তু বিশ বৎসর পূর্বে জ্যোৎস্নাপ্রাবিত মাঠের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, এখন সেদৃশ দেখিলাম না। সৌন্দর্য্যের ভিতর কি যেন একটা আতঙ্ক, একটা বিভীষিকার মূর্ত্তি পরিস্ফুট থাকিয়া সৌন্দর্য্যকে মলিন এবং অপ্রিয়দর্শন করিয়া তুলিয়াছে। রোগী দেখিবার সময় নিম্নলিখিত রূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

আমি—প্রশ্ন। তোমাদের এখানে আগে তো ম্যালেরিয়া ছিল না, তবে ম্যালেরিয়া কিসে হ'ল বাপু?

উ। আজ্ঞে বোধ হয় পাট থেকেই ম্যালেরিয়া হ'য়েছে।

প্র। কেন পাটের চাষ ত আগেও ছিল?

উ। ছিল বটে, কিন্তু সে না থাকাই। ঘর বা বেড়া বাঁধবার যত অল্প অল্প পাটের চাষ লোকে করত। এখন পাটের চাষ হ'ল, তাই ম্যালেরিয়া হ'ল।

তাহার ফলে নগত ঢাকাটা হাতে পাওয়া ও যায়, সেই জন্তে লোকে পাটের চাষ খুব করে। ওই যে গ্রামের নীচে সব খাত দেখেচেন ওই থেকে মাটি ভুলে আমরা বরের পোতা (মেকে) উচু কবি। ওই সব খাতে পাট পচাইতে দেওয়া হয়। সে সময়ে দুর্গন্ধে গ্রামে টেকা যায় না, আর মশার তো অবধিই নাই। তারপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে পাট কাচতে হয়। কাজেই আশ্বিন মাস থেকে ভাদ্র মাসের মালেরিয়া আরম্ভ হয়।

আমি। তা' বাপু তোমরা এমনি করে ঢাকার নোভে গ্রামে মারা যাচ্ছ। আর সে ঢাকাগতো চিকিৎসায় খরচ হয়ে যায়। এক কাজ করতে পার না, অনেক গ্রামের লোক মিলে কিছু দূরে একটা খাল, বিল জমা নিয়ে সেই খালে পাট পচাতে পার না?

উঃ। তেমন উপযুক্ত লোক এ তল্লাটে কেউ নেই। তা'রপর আজকাল কেউ কারো কথা শোনেনা।

এই নিরীহ অসহায় ধ্বংসাত্মক কৃষকদিগের অবস্থা দেখিয়া মনে বড় কষ্ট অনুভব করিলাম। ইহাদিগের পরিত্রাণের কি কোন উপায় নাই? দেশের হিতসাধনের জন্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জিনিয়াছি। যদি কংগ্রেস এই সকল কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সার্বজনীন সুখ্যাতিলাভ করিতে পারেন।

কিছুক্ষণ নিম্নলিখিতভাবে এই বিষয় চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তা' কেবলতো মালেরিয়া নয়, অন্য অনেক রোগও হচ্ছে দেখছি?

উঃ। তা' হ'বে না মশায়, পরিশ্রম করতে হয়, অথচ লোকে খেতে পায় না। আগে দুধ

ঘি, মাছ খুব ছিল, আমরা প্রচুর খেতে পেয়েছি। তাই এ বুড়ো বয়সে যা' খাটতে পারি, আজ কাল জোয়ান ছেলেরা তা খাটতে পারে না। সেইজন্য টপ টপ করে মরেই যাচ্ছে সব।

আমি। তাইত দুধ-ঘি এ অঞ্চলে আগে খুব ছিল, এখন নেই বলেই চলে।

উঃ। আর গরুই সব গেল মশায়।

আমি। হাঁ, যাও আছে তা, মানুষের চেহারাও যেমন, গরুর চেহারাও তেমন। শুধু তাই নয়, পূর্বে যে সব জমিতে সোণা ফলত—এখন সে সব জমীতে কিছুই ফলে না। চৈত্র মাসের শেষে এ অঞ্চলে কত পটোল হত, কিন্তু এবারতো কিছু হয় নাই।

উঃ। হ'বে কি মশায়, চোত মাস শেষ হতে চললো, আজও দখিণে বাতাস নেই, দখিণে ভিন্ন তো পটোল হয় না।

এইবার বাদল প্রসঙ্গে ফসলের উপর বিভিন্ন দিগদিগন্ত বায়ুর প্রভাবের বিষয় আদিয়া পড়িল। আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়া লইতে লাগিলাম।

আমি। বল কি দখিণে বাতাস ভিন্ন পটোল হয় না?

উঃ। আজ্ঞে না—দখিণে বাতাস নইলে লতা বাড়ে না, কাজেই পটোল হয় না। ফুল বা ফল ধরলে চুঁয়াইয়া যায়। আমরা দেখেছি—দখিণে বাতাসে ডগা এক দিনে ৪।৫ আঙ্গুল বড় হয়, কিন্তু অন্য বাতাসে প্রায়ই বাড়ে না, ডগা কুঞ্জে থাকে, হয়ত একটু আধটু বাড়ে।

আমি। আচ্ছা এবারতো বলছ—দখিণে বাতাস হয় নি, তবুও ছাত্রটা পটোল হচ্ছে।

উঃ। আজ্ঞে তা হ'বে না কেন? গাছ যখন হয়েছে—তখন ফল হবে বৈকি। তাহা মশাটা জালি নষ্ট হরে একটা হয়—তাও বড় হয়

না। কিন্তু দখিণে পেলো সব জালিতেই পটোল হয়, আর বেশ পুষ্ট হয়।

প্রঃ। আচ্ছা দখিণে বাতাসে এমন হয় কেন বল দেখি ?

উঃ। দখিণে বাতাসে মাটি রসে, আর শিশির পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে লতা লতিয়ে যায়। এই দেখুন—আখিন-কার্তিক মাসে আমরা পটোলের গঁড়ো (মূল) পুঁতি, আর মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই ৪।৫ মাসে লতা ৫।৬ আঙ্গুলের বেশী বড় হয় না, কিন্তু দখিণে পেলো একমাসেই ৪।৫ হাত বাড়ে, শীতের মধ্যে দখিণে পেলোও বাড়ে।

প্রঃ। আচ্ছা দখিণে বাতাস কোন সময়ে হয় ?

উঃ। এই ধরুন—ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্য্যন্তই বেশী হয়।

আমি। দিন রাত সমান থাকে ?

উঃ। না দিনে পশ্চিমে-বাতাস হয়। তারপর সন্ধ্যার সময় একটু আঙনের হলকার হাওয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে-বাতাস হইতে আরম্ভ করে।

আমি। দখিণে বাতাসে আর কি হয় ?

উঃ। আন্তে পটোল, উচ্ছে, তরমুজ, ছুঁয়ে শশা, মেঠো কুমড়া—এ সবই দখিণে পেলো ভাল হয়। দখিণে ভিন্ন এ সকল ভাল হয় না।

আমি। আচ্ছা জলের সঙ্গে কি এ সকলের সম্বন্ধ নেই ?

উঃ। একটু আধটু থাকতে পারে কিন্তু বেশী নয়। দখিণের সঙ্গেই এর সম্বন্ধ। এই দেখুন—গত বৎসরে এ সময়ে জল হয় নি, কিন্তু দখিণে হাওয়া ছিল, পটোল ও খুব হইয়াছিল। এরবৎসর জল হয়েছে, কিন্তু দখিণে না হওয়ায় পটোল হচ্ছে না।

আমি। আচ্ছা ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্য্যন্তই কি কেবল দখিণে-বাতাস বয় ?

উঃ। বেশীর ভাগ তাই, তবে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেও মধ্যে মধ্যে দখিণে হয়। আর একদিন দখিণে পেলোই খুব পটোল ধরে সে সব পটোলের মার নেই।

আমি। আচ্ছা পূবে বাতাস কবে হয় ?

উঃ। আষাঢ়, শ্রাবণ আর ভাদ্র মাস পূবে বাতাস হয়, মাঝে মাঝে দখিণে কি পশ্চিমে বাতাস হয়। উত্তরে বাতাস প্রায় হয় না।

আমি। পূবে বাতাসের সঙ্গে ফসলের কি কোন সম্বন্ধ নাই ?

উঃ। আন্তে আছে বৈকি। পূবে বাতাসে পাটে পোকা হয়।

আমি। আচ্ছা পূবে বাতাসে যদি পাটে পোকা হয় তা' হলে পোকায় পাট নষ্ট হবারই কথা। কেননা বর্ষায় পূবে বাতাসই বয়।

উঃ। হা—পাটে পোকা হয় বৈকি। কিন্তু একদিন পশ্চিমে জল আর বাতাস পেলোই সব পোকা ম'রে যায়।

আমি। পশ্চিমে জল কি রকম ?

উঃ। এই পশ্চিম দিক থেকে মেঘ এসে যে জল হয়, তা'কে পশ্চিমে-জল বলে। আশ, ধান ফোটার মুখে ২।১ দিন পশ্চিমে জল-বাতাস পেলো ধানের খুব যুত হয়।

আমি। আচ্ছা পূবে ছাড়া অন্ত বাতাসে পোকা হয় না ?

উঃ। হাঁ, দখিণে বাতাসেও হয়।

আমি। আচ্ছা পূবে-বাতাসে কোন জিনিষের ভাল হয় না ?

উঃ। শাক আলু ভাল হয়। পূবে বাতাস না পেলো শাক আলুর গাছ বেগুনের মত। শাক আলু আষাঢ় মাসে পোকে আর ভুয়া মাসে তোলে।

আমি। আচ্ছা, আশ্বিন মাস থেকে কি বৃকম বাতাস হয়?

উঃ। আশ্বিন মাসে পূবে-পশ্চিমে আর দখিণে—এই তিন রকম বাতাসই দেখা যায়। কাঠিকের প্রথমেই আমন ধান ফোলে। সেই সময় পশ্চিমে জল পেলে খুব ভাল হয়। পূবে বাতাসে আমন ধানের অনিষ্ট হয়। ফেলার মুখে বাতাস হ'লেই ধানে আগড়া (শসতীন ধাত্ত) বেশী হয়।

আমি। আচ্ছা উত্তরে-বাতাসে কোন ফসল ভাল হয়?

উঃ। যব, গম, ছোলা, মটর, মসুরী—এসি পদ্ধতি উত্তরে বাতাসে ভাল হয়। দখিণে বাতাস পেলে চুইয়ে যায়, দানা ভাল হয় না।

রুক্ষকদিগের নিকট যাত্রা অবগত হইয়াছি, তাহা লিখিত হইল। এক্ষণে শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কি আছে—তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। সূক্তে বিভিন্ন দিগাগত বায়ুর গুণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—“পূর্ব বায়ুর গুণ—মধুর, ম্লিষ্ট, লবণ রসায়ক, গুরু, বিদাহ-জনক, বক্তপিত্তবর্ধক, এবং ক্ষতরোগী এবং শ্বেত বোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগ বৃদ্ধি করে, বিশেষতঃ রণে ক্রোধ বৃদ্ধি করে। ইহা বাত প্রকৃতি, শাস্ত ও কফক্ষীণ ব্যক্তিদিগেরও পক্ষে হিতকর। দক্ষিণ বায়ুর গুণ—মধুর, অবিদাহী, কষায় রসায়ক, লঘু, চক্ষুর হিতকর বলবর্ধক, রক্তপিত্তনাশক, এবং বায়ু প্রকোপক নহে।”

“পশ্চিম বায়ুর গুণ—বিশদ (পিচ্ছিলের বিপরীত) রুক্ষ, পক্ষ (খরখরে) খর (প্রচণ্ড বেগ বর্ণিষ্ট), মেহ ও বলনাশক, তীক্ষ্ণ, কফ ও মেদ শোধক, সদ্যঃ প্রাণক্ষয়কারক এবং শরীর শোধক।”

“উত্তর বায়ুর গুণ—ম্লিষ্ট, মুছ, মধুর, কষায়-

রসযুক্ত। শীতল, সূক্ষ্ম ব্যক্তিগণের ক্রোধ ও বল বর্ধক, ক্ষীণ, ক্ষয় ও বিষ পীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ হিতকর এবং দোষ প্রকোপক নহে।”

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে হেমন্ত ও শীতকালে উত্তর বায়ু, বসন্তকালে দক্ষিণ বায়ু, গ্রীষ্মে নৈঋত বায়ু, প্রাকটকালে পশ্চিম বায়ু, প্রবাহিত হয় বলিয়া লিখিত আছে, তাহার অন্তথা ঘটিলে তাহাকে অনাবর্ত্ত বায়ু বলে। শাস্ত্রে অনাবর্ত্ত বায়ু অহিতকর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনাবর্ত্ত বায়ু উদ্ভিদ জগতের পক্ষে যে অহিতকর, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। যেমন উত্তরে বায়ুর সময় দক্ষিণে বায়ু প্রবাহিত হইলে যব, গম, ছোলা প্রভৃতি ভাল জন্মে না। সুতরাং অনাবর্ত্ত বায়ু মনুষ্য শরীরেও যে অনিষ্ট উৎপাদন করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি।

বসন্তে দক্ষিণ বায়ুর স্পর্শে শরীর তৃপ্ত হয়, শারীরিক ও মানসিক একটা ক্ষুণ্ণির উদ্বেক হয়, যৌবনোচিত ভাব প্রবলতর হয়। ইহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শীত পীড়িত তরুণতাগুলিও বসন্ত বায়ুর স্পর্শে পুষ্প-পল্লবে সজ্জিত হইয়া যেন নব যৌবন প্রাপ্ত হয়। শীতকালে প্রবল উত্তরে বায়ুর স্পর্শ সুখকর না হইলেও আমাদের শরীরকে সবল এবং অগ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া তুলে। ইহার অন্তথা ঘটিলে বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

অনাবর্ত্ত বায়ু ব্যতীত দিবা সংযোগে যে বায়ু হিতকর বা অহিতকর হইয়া থাকে, তাহা সূক্তের বচন দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সূক্তের টীকাকার ডল্লনাচার্য্য বলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম বায়ু অহিতকর এবং দক্ষিণ ও উত্তর বায়ু হিতকর।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে, উষ্ণ বায়ু বা আতপ কর্তৃক দধ্ব হইলে শীত ক্রিয়া করিবে। উষ্ণ বায়ু বা আতপ দধ্বের অর্থ টীকাকার “আতপে দধ্ববৎ” বলিয়াছেন। পশ্চিম দেশে “লু” নামক যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতে “বৎ”এর ব্যবহার চলে না, দধ্বই হইয়া যায়।

বর্ষার অহিতকর জল সংযুক্ত পূর্ষ বায়ু দ্বারা পীড়িত হইলে কর্তব্য সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিয়াছেন,—

“শীত বর্ষানিলৈর্হতে উষ্ণঃ স্নিগ্ধঞ্চ শস্ততে ॥”

“শীত (হিম, তুষার) বা বর্ষার সজল

বায়ু দ্বারা অভিভূত হইলে উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিবে।”

অনাবর্ত এবং বিভিন্ন দিগাগত বায়ুর বিবদ কথিত হইল। আয়ুর্বেদে ও বিবিধ শাস্ত্রে বায়ু সম্বন্ধে যে সকল তথ্য নিহিত আছে, পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এক্ষণে যেমন সময়ে বৃষ্টি হয় না, বায়ুও সেইরূপ ঋতু অমুখ্যায়ী প্রবাহিত হয় না। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এই বিকৃতির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন কি?

ত্রী—

## শিশু জীবন।

“শরীমাত্ত্বং খলু ধর্ম সাধনম্।” ইহ জগতে ধর্মার্থ অর্জনের একমাত্র উপায় সুস্থ শরীর ও মন। এই শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে আমাদের যে কত পরিশ্রম করিতে হয়—কত অর্থরাশি অকাতরে ব্যয় করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা কোথায়?—কিন্তু একবার অসুস্থ হইলে তা’রপর তা’র প্রতিবিধান, দেহ রোগের আকর হইলে তা’রপর তা’র নিরাকরণ অপেক্ষা স্বাস্থ্য ও সময় থাকিতে থাকিতে উপায় করাই ভাল, সুসুক্রি। Prevention is better than cure. অনেক সময়ই দেখিতে পাই—চিকিৎসকের বিনা প্রয়োজনে—চতুর গৃহস্থ বা শিক্ষিত পিতামাতা—বা সুযোগ্য গৃহিণী তাহাদের সুশিক্ষা ও সুবন্দোবস্তের গুণে সহজেই রোগের হাত এড়াইয়া যান। একজন্ম হরত অনেকখানি ঔষধের আবশ্রুক, অনেকটা স্বার্থত্যাগের দরকার, অনেক সংঘর্ষের

প্রয়োজন। অবশ্য হিন্দুর দেশে, গৃহস্থের লক্ষ্যার সংসারে, দেবতা-ব্রাহ্মণের মিলনমন্দিরে দৈনিক জীবনে আচার-বিচার-সংযম-নিষ্ঠার পরিচয়ই অধিক ছিল—তা’র ব্যবস্থাই তিন ভাগ; তা’রই উপর হিন্দুর বিশাল ধর্মের অতুল্য ভিত্তি—আর তা’র ফল ইহলোকে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, অনন্ত শান্তি—পরলোকে—অক্ষয় স্বর্গ।

আজ অজ্ঞান-তমসায় দেশ ভরিয়াছে, হিন্দু জ্ঞান কর্ম ভুলিয়াছে—তা’র শিক্ষা, দীক্ষা সে বিপুল আদর্শ আজ অতল তলে,—তাই দেশে রোগ শোক, অশান্তি ও দারিদ্র্য জীবন, যেন একটা মহাবিড়বনা মাত্র। এইরূপ দারিদ্র্য বিহীন জীবন বহন করিয়া মানুষ নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই এত উদাসীন যে, অপরের—এমন কি নিজ শিশু সন্তানদের সম্বন্ধেও ঠিক লক্ষ্য রাখিতে পারে না বা রাখিতে চাহে না।



মামাতা একটা বীজ বপন সময় হইতে—চার।  
পঞ্চায় ও পরে তাহার কত তত্ত্বাবধান করিলে  
তবে সময়ে বর্দ্ধিত সে বৃক্ষের ফলভোগের  
অধিকারী আমরা হই।—তুলনায় মানুষের জন্ম  
—তাহা হইলে আমাদের কত অধিক যত্ন ও  
পরিশ্রম আবশ্যিক। “আম্মা বৈজায়তে পুত্র”—  
এ ধেনু আদরের পুত্র—স্নেহের পুত্রলী—নয়নান্দ  
—প্রাণারামকে যথাযথভাবে গড়িয়া তুলিতে  
পিতামাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—সবত্ন আবশ্যিক। শিশু  
জীবন স্মৃতিস্থিত করিতে হইলে পিতা মাতাকে  
পূর্ব জননের পূর্বে হইতেই বেশ সাবধান—বেশ  
প্রস্তুত থাকিতে হইবে—পিতার গুরু বাহাতে  
শিশুর বল ও মাতার শোণিত বাহাতে তাহার  
পুষ্টি-অবিকৃত ও বিপুল থাকা নিতান্তই  
আবশ্যিক। তা’রপর শিশু ভূমিষ্ট হইবার  
পূর্বে ও গর্ভধারণ কালেও শিশুর জননীরা একে-  
বারেই ভুলিয়াছেন। গর্ভস্থ শিশু ঠিক এক  
খানি কামরা—প্রেটের ছায় চতুর্দিকের ঘটনা-  
বলীষ একটা ছাপ লইবার জন্ত যেন প্রস্তুত ও  
উন্মুগ্ন, এ অবস্থায় জননীর চিত্ত প্রফুল্ল ও সংযত  
রাখাও জন্ত—ভাল ভাল পুস্তক পাঠ হুন্দর

হুন্দর মনোহারী চিত্রাদি দর্শন—সুশ্রাব্য সঙ্গীতাদি  
শ্রবণ অতিশয় হিতকর। শারীরিক গুরুতর  
পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি একেবারে  
নিষিদ্ধ, আচার্য্য মন্ম—গর্ভিনীর উপবাসাদি  
নিষেধ করিয়াছেন।—তাহাতে মাতৃ শোণিত  
পুষ্ট—শিশুর স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা।—  
শিশু জননের অতিরিক্ত কষ্ট সহ্য করিবার  
নিমিত্ত সভ্য দেশীয়া অনেকানেক শিক্ষিতা  
মহিলা alcohol (সুরা) সেবন অভ্যাস করিয়া  
থাকেন,—এটা শিশুর স্বাভাবিক দৌর্বল্যের  
একটা প্রধান কারণ ও ভবিষ্যতে তাহার মাদক  
প্রিয়তার একটা পূর্ব পত্তন। দয়াময় ভগবান  
যাহার জন্ত গর্ভ ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া-  
ছেন, তাহাকে তদুপযুক্ত ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন  
দিয়াছেন, কার্য্যেই “খোদার উপর খোদকারী”  
ঠিক নহে। তবে রোগী বা দুর্বলের কথা স্বতন্ত্র,  
গর্ভিনীর পক্ষে বিশ্রাম—শারীরিক ও মানসিক  
—সর্ববিধ নিশ্চিন্ততাই বলাধানের একমাত্র  
সুযোগ—একমাত্র সুপথ।

—ক্রমশঃ

শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি

## ত্রণলেপ বিধি।

প্রথম শোধন, দুই শোণিত-মোক্ষণ,  
তৃতীয়েতে উপন্যাস, চতুর্থ পাটন,  
পঞ্চম শোধন আর ষষ্ঠেতে মোক্ষণ,  
ষষ্ঠেতে বর্ণকরণ ত্রণের লেপন।  
সকল আগন্তুক শোণে হরিদ্রা-উত্তর,  
কানুন—৫

হরীতকী, পুনর্নবা, দুর্কা-পঞ্চম,  
বেণামূল, পলকটি, লোহ, পেরীমটি,  
রসজেন, লেগ দিগে দিশারে একটা,  
অর্ধপাণ্ডা-অর্ধপাণ্ডা, সন্ধিনার মীল,  
কিন, হারিহর, হারি, হারি, হারি

এদের প্রলেপ হয় ত্রণের পাচক  
 ত্রণ পাকাইতে ইহা প্রয়োগে ভিষক ॥  
 দস্তামূল, চিতা ছাল, মনসার আটা,  
 শুভ্র, ভেলা, হারাকস, সৈন্ধব—এ ক'টা,  
 আকন্দের আটা সহ প্রলেপ প্রদানে ।  
 ত্রণ বিদীরণ হয় জানিবা সন্ধানে ॥  
 দস্তী-চিতা-করবীর মূল আর ভেলা,  
 করঞ্জ ; পায়রা, চীল-গৃধ-বিষ্ঠাগুলি ;  
 সর্ষ্প-ববকার আদি ক্ষার বিলেপনে ।  
 শীঘ্র ত্রণ ফাটি যায় এ ক'টি লেপনে ॥  
 যষ্টিমধু, নিমপাতা, হরিদ্রা যুগল,  
 তেউড়ী, সৈন্ধব, তিল,—দস্তী এ সকল,  
 পেষণ করিয়া লেপ করিলে প্রদান ।  
 বিগুজ হইবে ত্রণ করিবে সন্ধান ।  
 নিমপাতা, যত, মধু, যষ্টিমধু, তিলে,  
 দ্বাক্ষহরিদ্রার সহ পেষি লেপ দিলে—  
 ত্রণের শোধন আর রোপণ হইবে ।  
 ( বিগুজ হইয়া ত্রণ পুরিয়া উঠিবে ) ।  
 করঞ্জ, নিসিন্দা, নিমপত্র-লেপ দিলে  
 কিষা হিষ্—রক্তনের প্রলেপ দানিলে,  
 নিমের প্রলেপে ক্ষত ক্রিমি নাশ হয়,  
 শার্ঙ্গধরে সংগৃহীত এই সমুদয় ॥  
 নিমপাতা, তিল, দস্তী, তেউড়ী, সৈন্ধব,  
 মধু সহ প্রলেপনে নিলে এই সব ।  
 জুষ্ট ত্রণ প্রশ্নিত, বিশোধিত হয় ।  
 বিশেষ পুরিয়া উঠে ইহাতে নিশ্চয় ॥  
 কটুকী, মদন ফল—কাঁজীতে বাটরা ।  
 উষ্ণ লেপে নাভিশূল যাইবে সারিয়া ।  
 সজিনা, এরণ্ড ; যুগ, শেফালিকা, যব,  
 গোধূম, সহিত বাট উষ্ণ করি সব ;  
 বাত বিদ্রধিতে তাহা গাঢ় লেপ দিবে,  
 ইহাতে ক্ষয় লাভ অবশ্য হইবে ॥  
 পৈত্তিক বিদ্রধিতে থৈ, যষ্টিমধু যত,

চিনি কিষা তুষ্ণ দ্বারা করিয়া পেষিত—  
 বেণা, ক্ষীরককোলীর মূল ও চন্দন ।  
 প্রলেপ দানিলে উহা হয় প্রশমন ॥  
 ঈষ্টক, বালুকা আর মণ্ডুর, গোময়,  
 গোমুত্রে পেষিয়া যদি অগ্নি-তপ্ত হয়,  
 সুখোষাবহ্নয় তা'র প্রলেপ দানিবে  
 কক বিদ্রধি তা'তে বিনাশ পাইবে ।  
 মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা আর লোহিত চন্দন,  
 যষ্টিমধু, গেরীমাটা, তুষ্ণেতে পেষণ  
 করিয়া প্রলেপ তার অবশ্যই দিবে ।  
 রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধি জানিবে ।  
 হিজল, সজিনা বীজ, দশমূল কিষা  
 জলে পেষি অগ্ন্যুত্তাপে উষ্ণ করি' নিবা ।  
 অপর রাখালশসা, দেবদারু ল'য়ে  
 উষ্ণ করি লও তাহা শিলাতে পিমিয়ে,  
 বাত-কফ গণ্ডগু বুঝিবে যখন ।  
 উপশম এ প্রলেপে হইবে তখন ।  
 সর্ষপ ও নিমপত্র, ভেলা পোড়াইয়া  
 ছাগমুত্রে লেপে যায় অপটা সারিয়া ।  
 সর্ষপ, মসিনা, যব মূল-শন বীজ,  
 অন্নতক্রে পেষি সহ সজিনার বীজ ।  
 প্রলেপ প্রদানে এর প্রশমন হয় ।  
 গণ্ডমালা, গণ্ডগু, অর্কুদ নিচয় ।  
 শুধু বাত প্রপীড়িত অঙ্গ কুরে চিরি,  
 কুঁচের প্রলেপ তথা রাখিবেক পুরি ;  
 বিশ্বচী, অববাহক, গৃধনী অপর  
 অগ্ন বাতব্যাধি শাস্তি লভিবে সহর ।  
 ধুতুরা, এরণ্ড আর নিসিন্দার গাতা,  
 সর্ষপ, সজিনা-ছাল, পুন্নর্নবা তথা ।  
 ইহাদের প্রলেপেতে দীর্ঘকাল জাত ।  
 দারুণ শ্লীপদ রোগ হইবে সংঘাত ।  
 কৃষ্ণজীরা, কুড়, কুল, হরু, এরণ্ড,  
 কাঁজীতে পেষিয়া লেপে নাভিশূল

কববীর মূল জলে করিয়া পেষণ ।  
 প্রদোষে লিঙ্গ সমুত্ত পীড়া প্রশমন  
 হ্রিফনা—লৌহ কটাছে অগ্নি দগ্ধ করি,  
 সেই ভঙ্গ মধুসূহ লইবেক মারি' ।  
 উপদংশ ক্ষতে তাহা করিলে লেপন,  
 বোপিত হইয়া হবে সত্ত্বঃ প্রশমন ॥  
 রসায়ন, হরীতকী—শিরীষ বাটায়া,  
 প্রলেপনে উপদংশ যাইবে সারিয়া ।  
 পাকুড়, বংশলোচন, গেরিমাটি আর  
 শুভ্রক, বক্তচন্দন, কন্ধ করি তা'র ;  
 দ্রুত বিমিশ্রিত করি করিলে লেপন ।  
 অগ্নিদগ্ধ স্থানে তাহা হয় প্রশমন ।  
 কাথে কবি কাটানটে, গাব ছাল নিয়ে  
 অগ্নি দগ্ধ ভাল হয় দ্রুত লেপ দিয়ে ।  
 এন ভঙ্গ করি তাতে তৈল মিশাইয়া,  
 লেপে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত উঠিবে পুরিয়া ।  
 বাটায়া পলাশ আর উড়ুঘর ফল,  
 তৈল মধুসূক্ত লেপে ঘোনি দ্রুতবল ।  
 কাপাস মূলের কাথে নিতা ধোত হলে ।  
 গোনিব দ্রুত হয় সেইরূপ বলে ॥  
 আশ্রমূল, ফল কিছা করিয়া পেষণ ।  
 মধু ও কপূর যোগে করিলে লেপন—  
 ঘোনিতে, গত ঘোবনা নারীর নিশ্চয়  
 ঘোনি দ্রুত হয় তাতে নাহিক সংশয় ।

মরিচ, তগর পাছকা, পিপুল, সৈন্ধব,  
 আপাঙ, বৃহতীফল তিল, কুড়, যব,  
 সর্ষপ, মাযকলাই, অম্বগন্ধা আদি  
 চূর্ণ করি, মধু দ্বারা বিমর্দিয়া যদি,  
 লেপন মর্দন করে তা দ্বারা সতত,  
 তাতে লিঙ্গ বৃদ্ধি হয়, স্তন উপগত ।  
 বাহ ও কর্ণের তাতে পরিপুষ্ট হয়,  
 লিঙ্গ বৃদ্ধি তরে অত্র ব্যবহৃত হয় ।  
 চিনি, অম্বগন্ধা আর সৈন্ধব লবণ  
 ছাগ ছক্ষে পক্ক রত করিবে লেপন ।  
 সঘন রাখালশসা পাতার স্বরসে  
 লাল করবীর দণ্ডে বিমর্দিয়া রসে,  
 তাহা দ্বারা হয় যদি লিঙ্গ বিলোপিত ।  
 তার যোগে শুষ্ক ঘোনি হয় আবাবিত ।  
 জলে পেযি পান, কুড়, হরীতকী চুর,  
 প্রলেপে গাত্র দৌর্গন্ধ হয়ে যায় দূর ।  
 কুলথ কলায় আর ছোলা, ছাতু, কুড়,  
 জটামাংসী, দারুচিনি, চন্দনের চুর,  
 —এসব একত্র করি করিলে লেপন ।  
 যেদ ও গাত্র দৌর্গন্ধা হয় নিবারণ ।  
 সচললবণ কুড়, হরিদ্রা উভয়,  
 বচ ও মরিচ লেপে সর্ববস্ত্র হয় ।

শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ

## মুক্তিযোগ ও টোটকা ।

অগ্নিমান্দ্যোগ—

(১) প্রত্যহ প্রাতঃকালে অন্ন লবণের  
 সহিত আদার কুচি সেবন করিলে অগ্নি  
 বৃদ্ধি হইয়া থাকে । (২) গব্য স্তূতের সহিত  
 ওঁঠ চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে অগ্নির

দীপ্তি হইয়া থাকে । (৩) হরীতকী  
 ওঁঠের ওঁড়া প্রত্যেক ত্রযা চারি আঙ্গ  
 মাত্রায় অন্ন ইক্ষু ওঁড় ও সৈন্ধবের সহিত  
 সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয় ।

ক্রিমি নিবারণের উপায়—

(১) কাঁচা সুপারি বাটিয়া লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (২) খেজুর পাতার রস ও লেবুর রস একত্র সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৩) নারিকেলের জল মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৪) সুপারিগাছের শিকড়ের রস ইক্ষুচিনি মিশাইয়া পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

উকুন নিবারণের যোগ—

ধুতুরা পাতার রস কিম্বা পানের রস খানিকটা কপূরের সহিত মিশাইয়া মাথায় প্রলেপ দিলে উকুন মরিয়া যায়।

উৎকাসি নিবারণের ব্যবস্থা—

(১) ছুই তোলা মিছরি—নেকড়ার পুঁটলি করিয়া খানিকটা জলে টাটকা ভিজাইয়া সরবৎ প্রস্তুত কর। তাহার পর সেই সরবৎ অগ্নিদৃষ্টাপে চড়াইয়া মধুর মত ঘন করিয়া লও। তাহার পর সেইটি সমস্ত দিনে অন্ন অন্ন অবলোহ কর। সঞ্চিত কফ উঠিয়া যাইবে। (২) ছুইতোলা বাসক-পাতার রস গরম করিয়া মধু মিশাইয়া সেবন কর, উপকার হইবে। (৩) ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম অর্দ্ধ আনা, পিপুলের শুঁড়া অর্দ্ধ আনা, ৫৬ কোঁটি মধু একত্র মিশাইয়া উভয় বেলা কর, উপকার হইবে।

আধকপালে নিবারণের ব্যবস্থা—

(১) অতি প্রভূত্রে দুই দিবা স্নান করিলে

আধকপালে রোগে উপকার হইয়া থাকে।

(২) খানিকটা ঠাণ্ডা জল নাক দিয়া পান করিতে পারিলে সদাঃ আধকপালে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) চারি আনা কুন্ম ও চারি আনা চিনি একত্র মিশাইয়া চারিতোলা ঘূতে ভাজিয়া নস্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধ শিরঃশূল বা স্ফ্যাবর্ত নিবারিত হয়।

শয্যা সূত্র নিবারণের ব্যবস্থা—

তেপাকুচা মূলের রস সিকি ভ'র ওজনে লইয়া দিন কয়েক প্রতাহ বালককে খাওয়াইয়া দিলে শয্যাসূত্র নিবারিত হয়।

পাণির রোগে যোগ—

(১) শুড় ও কাজি ১ তোলা হিসাবে লইয়া তাহার সহিত কাঁচা হরিদ্রা চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মিশাইয়া ১ সপ্তাহ সেবন করিলে অশ্বরী বা পাণির রোগের শর্করা নষ্ট হয়। (২) শমার বীজ বা নারিকেলের ফুলের চূর্ণ সিকি ভ'র ওজনে লইয়া দুগ্ধ সহ মিশাইয়া ১ সপ্তাহ সেবন করিলে শর্করা নষ্ট হয়। (৩) পাষণ্ডভেদী, শুঁঠ ও গোক্ষুর প্রত্যেক দ্রব্য ৥৮০ হিসাবে লইয়া আধসের জলে দ্বিত্ব করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া যে কাথ প্রস্তুত হইবে, সেই কাথ সিকি ভ'র ঘবন্ধার ও সিকি ভ'র চিনি মিশাইয়া দিন কয়েক সেবন করিলে শর্করা নষ্ট হয়।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করিত্ত্বর্ণ।

## সরস্বতী স্তোত্র ।

— ১০: —

অমলধবলপদ্মস্ত্রুপাদাঙ্কুশুখা  
জিতশশধরকান্তিঃ কস্তরূপচ্ছটাভিঃ ।  
বশগজদয়বাসা জ্ঞানদা সেবকানাং  
জয়তু জয়তু দেবী ভারতী বিশ্ববন্দ্যা ॥ ১ ॥  
কুরুতিচয়তমোভিঃ সন্ততৈকৌধনেত্রম্  
পরিব্রতমতিমাতঃ কিঞ্চিদিষ্টং ন বৌক্ষে ।  
তদপথগতদাসং বোধদীপং প্রকাশ্য  
স্বদহজকরণাভিঃ দর্শ্যতাং কৃত্যমার্গঃ ॥ ২ ॥  
ক বত কলুবকর্ম্মা মাদৃশো হীনবুদ্ধিঃ  
ক চ শুভমতিবন্দ্যা স্বং বৃধস্বাস্তকাস্তা ।  
তদপিদহমজ্ঞো লব্ধুকামঃ রূপাস্তে  
নথলু স মম দোষঃ কো ন ভদ্রে প্রয়াসী ॥ ৩ ॥  
অথ ন মম ছরাশা সাহসং বেতি বাণি!  
প্রমত্তিরুতিবধাপাং স্বাং যদম্মাপ্তু কামঃ ।  
স্বমসি নিখিললোকে দেবি ! তুলা-প্রসাদা  
তাজতি কিম্ বিমৃঢ়ং পুত্রমজ্ঞং প্রস্থঃ স্বম্ ॥ ৪ ॥  
কুম্ভিকলুবজ্ঞানৈরপ্রকাশাস্তরায়া

কথমিহ মহিমানং বাণি বুধ্যে ভবত্যাঃ ।  
প্রকৃতিরভুগবন্দাজ্জহন্তী তবাস্তি  
ঋণমিতিমিতিহীনং সাহসং মেহপাবুদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥  
ভজনকুসুমমাল্যৈ জ্ঞানমুদ্রে নিবন্ধৈঃ  
স্ববচনরচনাভিঃ প্রার্চতি স্বাং সুবিজ্ঞঃ ।  
ইতি কিমকৃতবুদ্ধিঃ স্মারিতস্তত্ত্বদর্শী  
স্বকৃতিত ইহ কশিচৎ স্বং সমা মাতৃরূপা ॥ ৬ ॥  
ন স্মৃতিরতিহীনস্তাস্তি মে নৈব বিজ্ঞা  
নচ ভজনজপুণ্যং যেন তোষোভবত্যাঃ ।  
তদপি তব মহিমা স্বংপ্রসাদং হি লপ্যে  
জগতি ন থলু নস্ত্রেৎ কাপি বস্ত্তস্বভাবঃ ॥ ৭ ॥  
চিদমৃতময়বোধং দেহি হৃদীতমো মেহ—  
পসরতু হরিদম্বে ধান্তবৎ প্রোত্ততীহ ।  
অহমপি চিরকাম্যং প্রাপ্যতেহজিৎ প্রসাদং  
জগতি তব লভেয়ং সেবকস্বং যথার্থম্ ॥ ৮ ॥  
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্কৌদ বিজ্ঞানায়ের  
ছাত্রবন্দ ।

## সমালোচনা ।

আয়ুর্কৌদ বিষয়ক প্রস্তাব ।—  
কবিবাজ্র শ্রীহরিমোহন দাশ গুপ্ত কবিরত্ন  
লিখিত । জেলা ঢাকা, পোঃ আঃ বেজগাঁও—  
এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য । এ  
পুস্তকের মূল্য নাই । দেশে আয়ুর্কৌদীর  
চিকিৎসার প্রচলনাধিকার জন্ত এ পুস্তকখানি  
লিখিত । আয়ুর্কৌদ প্রণেতা ঋষিগণের কাল

নিরূপণ করিয়া আয়ুর্কৌদীর গ্রন্থগুলির উৎপত্তির  
বিবরণ এবং ঐ সকল গ্রন্থ লিখিত বিষয়গুলির  
বক্তব্য এ পুস্তকে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।  
লুপ্তপ্রায় আয়ুর্কৌদীর চিকিৎসার পুনরুদ্ধার  
জন্ত গ্রন্থকার যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা  
সকল গুলিই গ্রহণযোগ্য । তবে শুধু সংস্কৃত  
ভাষার নহে, বাঙ্গালী এবং ইংরাজী ভাষায়ও

আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রগুলির অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সেই সকল ভাষাতেও ভারতীয় সকল প্রদেশের ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ সকল কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। আমাদের ধাতুতে আমাদের দেশীয় ঔষধই যে সমধিক উপকারী—সে বিষয়ে আর কথা কি! বর্তমান সময়ে যে সকল কারণে আমরা স্বাস্থ্যহীন ও অসুস্থ হইতেছি,—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পরিত্যাগও যে তাহার একটা কারণ, তাহাতো নিশ্চয় কথা। দেশের লোকে এসকল

কথা বুঝেন না—ইহাই তো হুঃখ! পল্লীগ্রাম প্রধান প্রধান জমীদার ও ধনীদিগের বাটীতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন,—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক সমাজ হইতে তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। দেশের জমীদার এবং ধনী সম্প্রদায়ের সেকালের মত এদিকে দৃষ্টি পুনঃ পতিত হইলে আয়ুর্বেদের পুনরুন্নতি হইতে কতকণ লাগে? এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:—

ম্যালেরিয়া দমন।—ম্যালেরিয়ার বাঙ্গাল দেশের যে ভীষণ সর্বনাশ সাধিত হইতেছে, আমাদের মহামান্য গবর্নর লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া উহা দমন করিবার জন্ত চেষ্টাশীল হইয়াছেন। ফলে গত ২৯শে জানুয়ারি প্রাতঃকালে কলিকাতা লাট প্রাসাদে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোর জেলা বোর্ডের সদস্যগণ—নদীয়ার মহারাজ প্রমুখ কয়েকজন জমীদার ও সেনেটারি বোর্ডের সভ্যগণকে লইয়া এক অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর ম্যালেরিয়ার বঙ্গবাসীর যে সকল ক্ষতি হইতেছে তাহার সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া উহা নিবারণের জন্ত বলিয়াছেন, “এনাফেলিস্ মশকের দংশনেই যখন ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে পরীক্ষা দ্বারা এক বাক্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন উহাদিগকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করা অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশে যাহাতে উহাদিগের জন্মিবার কারণই না হইতে পারে, ম্যালেরিয়া

দমনের জন্ত তাহারই উপায় বিধান করিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে—হয় বাঙ্গালাকে জলশূন্য করিতে হইবে, নয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বল্প জলাশয়গুলির পরিবর্তন করিয়া বৃহৎ জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বর্ষাকালে নদীর উচ্ছ্বসিত জল আটক করিয়া রাখিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে।” এই কল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সমবেত সদস্যগণকে এই কার্যের সাহায্যকারী হইবার জন্ত অনুরোধ করেন। স্বয়ং লাট বাহাদুর যখন উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন আমাদের মনে হয়—এইবার বোধ হয় সত্য সত্যই শেষ হইতে ম্যালেরিয়া দমনের একটা উপায় হইবে। ম্যালেরিয়ার তো বাঙ্গালার কম সর্বনাশ হইতেছে না! বঙ্গেশ্বরের বক্তৃতাতেই প্রকাশ,—বাঙ্গালার প্রতি বৎসর কেবল ম্যালেরিয়া রোগে গাড়ে তিন হইতে চারি লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। লর্ড রোণাল্ডশের চেষ্টায় বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া

শুভ্র হইলে তাঁহার যশোগীতি প্রতিদিন বাঙ্গালা পল্লীপ্রান্তরে বিঘোষিত হইয়া তাঁহাকে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

দান।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম,—সুদূর দক্ষিণেশ্বর প্রখ্যাত নামা বাবা রামনাথ কালী কদমীওয়ালা আয়ুর্ষেদের উন্নতি ও প্রদান করেন নগদ ৫২ হাজার টাকা মূল্যের ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এ টাকায় তত্রতা আয়ুর্ষেদ বিদ্যালয়ের পরিচালন কার্যা চলিবে।

‘আয়ুর্ষেদিক প্রাকটিসনাস’ বিল।—অনা-বেবল কুমার শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর আয়ুর্ষেদিক প্রাকটিসনাস’ বিল নামক একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় উপস্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃবিব মত কবিরাজীতেও হাতুরে কবিরাজ মাতাতে দেশে স্থান পাইতে না পারে—ইহাই সে বিলের উদ্দেশ্য ছিল। গত ১৩ই মাঘ কলকাতায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাঙালী ইহা প্রতিনিধাদের জন্ত এক প্রকাণ্ড সভা হয়। কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেক আয়ুর্ষেদায় চিকিৎসকই সে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। একরূপ বিল পাশ হওয়া কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে—সভায় ইহাই স্থির করা হয়। কুমার বাহাদুর ইহার প্রত্যাখ্যান না করিলে সভায় কার্যবিবরণী মাননীয় গবর্ণমেন্ট বাহাদুরে নিকট জ্ঞাপন করা হইবে—ইহাও সভার স্থিরীকৃত হয়। ফলে কুমার বাহাদুর বিলের প্রত্যাখ্যানই করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসকগণের সম্মিলন ঘটিল—ইহাই লাভের কথা।

আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসা। আগে দেশের রাজত্ববর্গ এবং জমীদার সম্প্রদায় মাসিক বেতন দিয়া অনেক আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসককে

পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিতেন। ফলে উদর চিন্তার উপায় থাকায় সেই সকল চিকিৎসক আয়ুর্ষেদের উন্নতি কল্পে মনোযোগ প্রদান করিতেও সক্ষম হইতেন। সেই রাজত্ববৃন্দ এবং জমীদার বর্গের জন্ত তাঁহাদিগেরই ব্যয়ে আয়ুর্ষেদীয় অনেক মূল্যবান ঔষধও সেকালে প্রস্তুত হইত। যাহারা প্রস্তুত করাইতেন, তাঁহাদিগের রোগ সারাইতে উহার অল্পই ব্যয় হইত, অবশিষ্ট দরিদ্র জন সাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রদান করার ব্যবস্থা হইত। এখন সে প্রথা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। এখন দেশের নরপতিগণের অনেকে রাজ্যমাধ্য দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠায় যেরূপ মনোযোগী, বেতন দিয়া আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে সেরূপ ইচ্ছুক নহেন। যতগুলি কারণে আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটয়াছে, ইহার প্রতি দেশের ধনকুবের দিগের ঔদাসিন্য তাহার অন্তর কারণ।

আয়ুর্ষেদের সমাদর।—দেশের এ হেন ছদ্মদিনে কোন দেশীয় নরপতি কোন আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসককে পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন শুনিলে আনন্দিত হইতে হয়। সংপ্রতি-মালদহ—চাঁচোলের মহামান্ত্র রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর “আয়ুর্ষেদ” পত্রের সহঃ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরাজকে তাঁহার কানীপুর-গ্রাসাদের পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া আয়ুর্ষেদের সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। মালদহ-চাঁচোলেও এই রাজা বাহাদুরের অনেকগুলি দাতব্য-ডাক্তারি ঔষধালয় আছে, কিন্তু আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াও ইনি চিরদিন আয়ুর্ষেদের

প্রতি সমাদর দেখাইয়া আসিতেছেন। দেশের সমস্ত নরপতি এবং জমীদার যদি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাহা হইলে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতি হইতে কয় দিন লাগে!

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের কর্তব্য পালন। সঞ্জীবনীতে প্রকাশ—“সংপ্রতি কলিকাতার জগন্নাথঘাটের নিকটবর্তী এক গুদামে স্বাস্থ্যবিভাগের এক কর্মচারী ব্যবহারের অল্পপয়গী ২ মণি ৭৮টা বস্তা ময়দা পাইয়াছেন। উহা মাস্তবের ব্যবহারের পক্ষে একান্ত অল্পপয়গী ও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অমুমতিক্রমে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।” ডেজাল খানদার প্রতীকার করিতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইবে।

চিকণচালে দেশের অবস্থা।—রাণাঘাটের “বার্তাবহ” গত ২৭ শে মাঘের সংখ্যায় “মোটা ভাত, মোটা কাপড়” শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন,—“হাটে যাও, বাটে যাও, সহরে যাও নগরে যাও,—যেখানেই যাও, দেখিবে সর্বত্রই এক “চিকণ চাল” সমভাবে বর্তমান! কৃষক সন্তান দেখ,—চিকণ জুতা, চিকণ ধুতী, চিকণ পীরাম, চিকণ ওচনী, চিকণ চুল, চিকণ টেড়ী, চিকণ ছড়ী, চিকণ ঘড়ী, চিকণ চুরুট, (সিগারেট!) চিকণ হাসি, (চিকণ কান্না ও বা!) চিকণ

আহার, চিকণ বিলাস! ঐ মুটে মজুর দেখ, মোটে ফেলিয়া চিকণ চা’য়ের পিয়ালার চুমুক দিতেছে, চিকণ চুরুটে চিত্ত মশগুল করিতেছে! চিকণ চা’লে ঘরে খাহার মোটা ভাত নাই, পরিবারবর্গের পরিধানে মোটা কাপড়ও বুলি খোটে নাই, তাহার চিকণ চা’ল দেখিলে কি মনে হয় বল দেখি!” এই চিকণ চালেই তো বাঙ্গালার সর্বনাশ হইতেছে। শুধু অর্থ কৃচ্ছ্রতায় পুষ্টিকর আহ্বারের অভাবে নহে, চিকণ চালে স্বাস্থ্যহানি করিয়া আমবা যে অস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছি, তাহা অবিসংবাদিত।

বুদ্ধ বৈজ্ঞের বিয়োগ।—আমরা নিত্য হঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, গত ১লা ফাল্গুন কলিকাতার বুদ্ধ বৈদ্য কাদিদাস বিভাভূষণ ৬২ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। চিকিৎসা ব্যবসারে ইনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে গবর্ণমেন্ট হইতে ইনি “বৈজ্ঞরত্ন” উপাধি প্রাপ্ত হন। নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রামে ইহার নিবাস, ইহা ভিন্ন কলিকাতা—রায় বাগানেও ইহার একখানি ধরিদ করা বাড়ী আছে। শেষ জীবনে সেই বাড়ীতেই অবস্থিতি পূর্বক ইনি ব্যবসায় পরিচালন করিতেন। আমরা ইহার বিয়োগে যথেষ্ট বাখা অকৃতব করিয়াছি ভগবান ইহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রাণে শান্তিবারি প্রদান করুন।



# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৪—চৈত্র।

{ ৭ম সংখ্যা।

## আর্য্যঋষি জীবাণুতত্ত্ব জানিতেন কি না?

সংক্রামক রোগপ্রসঙ্গে সে দিন এক বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা হইতেছিল; ডাক্তার ঋষি বাণেওছিলেন—“জীবাণু রোগ-জননশক্তি দাবিদার—যুরোপীয় বিজ্ঞানেরই নিজস্ব। হিন্দু ঋষিরা জীবাণু তত্ত্ব বুঝিতেন না। তাঁহারা কেবল অসুস্থাবিচারের অনিয়মকেই সকল রোগের কারণ বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন।”

তিনি হইয়া আমি কিন্তু এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না। ঋষিরা জীবাণুতত্ত্বের স্পষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা ঋষি বচিত সংহিতা কয়খানিই বা পড়িয়াছি? ঋষিরা যে জীবাণুরহস্ত যুরোপীয় বিজ্ঞানের চূনিষ্টব বহুকালে পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাহার আভাস দিব।

জীবাণুজাত রোগ মাঝেই সংক্রামক। সেই সংক্রামক রোগ দুই প্রকার। ১ম। যাহা প্রকৃতি প্রকোপজ। ২য়। অস্বঃ প্রকৃতি প্রকোপজ। সাধারণতঃ বিজ্ঞান সংক্রামক রোগকে এষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত

করিয়াছে। সংক্রামক রোগের এ প্রকৃতি আর্য্যঋষির অগোচর ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞান মতে যে সকল সংক্রামক রোগ বাহ্য প্রকৃতি প্রকোপজ, ঋষিদের মতে—তাহার নাম জনপদধ্বংসী মহামারী। ঋতু বিপর্য্যয়ের জন্ত—দেশ-কাল-জল ও বায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইলে, সংক্রামক রোগ জনপদ সমূহ ধ্বংস করিয়া থাকে। মাতৃশ্বের দেহ, প্রকৃতি, আহার বল, বয়ঃক্রম, সাস্থ্য, সঙ্ঘাদি ভিন্ন প্রকারের হইলেও, একই জনপদে বাস করার জন্ত জল বায়ু-কাল প্রভৃতির তুল্যতা থাকে। কাজেই সাধারণ ভোগ্য জল-বায়ু প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত হইলে, এক প্রকার রোগ সংক্রমিত হইয়া মহামারী রূপে আবির্ভূত হয়। ডাক্তারেরা যাহাকে “ম্যালেরিয়া” বলেন, তাহা বাহ্য প্রকৃতি প্রকোপজ সংক্রামক ব্যাধি, তাই ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে গেলে, হয় জল-বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদন, অথবা সেস্থান পরিত্যাগ—এই দুইটির একটা করিতেই হইবে।

অন্তঃপ্রকৃতি প্রকোপজ সংক্রামক রোগ অনেকগুলি আছে। আর্দ্রাঋষি বলেন—

অরঃকুষ্ঠঞ্চ শোষণে নেত্রাভিঘ্নাদ এব চ।

উৎসর্গিক বোগাশ্চ সংক্রামিত্ত নরান্নরং।

অর্থাৎ জ্বর, কুষ্ঠ, বক্ষা, নেত্রাভিঘ্নাদ প্রভৃতি উপসর্গিক রোগ (বসন্ত, বিহুটিকা, হান, বিব, মেহ, উপদংশাদি)—ইহারা পাপজ—এক দেহ হইতে অত্ৰদেহ সংক্রামিত হইয়া থাকে। কিন্তু উপদংশাদি ইহার সংক্রামণ ক্রিয়া নিম্নরূপ হয়? ঋষি কহিয়াছেন—

প্রসঙ্গাৎ গাত্র সংস্পর্শাঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ একশর্যাপাশনাচ্চৈব গন্ধ মাছান্নুপেননাৎ ॥

মৈথুন, গাত্র সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্রভোজন, একশর্যাপাশন, রোগীর ব্যবহৃত গন্ধ মালা, অন্নুলেপন (বস্ত্রাদিও বটে) ব্যবহার—ইত্যাদি কারণে সংক্রামক বোগের সংক্রমণ হইয়া থাকে।

সংক্রমণের উপায়গুলি পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়—যে সকল ব্যাধি সংক্রামক, তাহাদের মধ্যে এমন একটা শক্তি বা পদার্থ আছে, যাহা নিঃশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব এই সকল ব্যাধির প্রত্যক্ষদৃশ্য কোন মূর্তি না থাকিলেও উহাদের এমন একটা অদৃশ্য ও অমূর্ত মূর্তি আছে—যাহা রোগীর নিঃশ্বাসাদির সহিত যাতায়াত করিতে পারে। তাই দার্শনিক ঋষি বলিয়াছেন—“সৌক্ষ্মাৎ কেচিদর্শনাঃ” অর্থাৎ এই সকল রোগ-বীজ সৌক্ষ্ম হেতু সাধারণ লোকলোচনে দেখা যায় না। তপঃ প্রভাবে ঋষিদের যৈ দিব্যদৃষ্টি লাভ হইত, সেদৃষ্টি অতি শক্তিশালী—সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণকারী—অহুবীক্ষণকেও পরাজিত করিত। তাহারা রোগের অমূর্ত বীজ—দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

রোগের বীজ—জীবন্ত ও অণুপরিমিত, তাই তাহারা “জীবাণু” নামে অভিহিত। কিন্তু ঋষিরা এই রোগ-বীজকে ‘কুনি’ বলিতেন। কুনি বলিলে—আমরা এখন বিষ্টাভ্যাস এক প্রকার দৃশ্য কীট বুঝিয়া থাকি। ঋষিরা কুনি এরূপ অর্থ বুঝেন নাই। তাঁহাদের মতে জীবশরীর সম্বৃত্ত যাবতীয় রোগ বজাত্ত ‘কুনি’ নামে অভিহিত। এই সকল কুনি—মন অর্থাৎ পুণীস, মূত্র, শ্লেষ্মা প্রভৃতি শাণাদক রোগ হইতে উৎপন্ন। এইজন্য আমাদের বিশ্বাস—নহর্বি স্মরণত যে সংক্রামক বোগের পূর্বাঙ্গ জ্বরেরও নাম করিয়াছেন, সে জ্বর সাধারণ শ্রেণীর জ্বর নহে। সে জ্বর—এমন জ্বর—যাহার কুনি জনকতা আছে। সে জ্বর—‘ম্যালেরিয়া’ ‘ব্রাঙ্ক ফিবার’ ও ‘টাইফয়েড’ শ্রেণীর বিষম জ্বর।

শরীরে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদের নিদান বা কারণ শরীরেরই অধম। যে সকল নিয়মে শরীর সুস্থ থাকে, তাহাব অন্তর্গত সেই শরীরের অধম। সংক্রামক বোগ সম্বন্ধে ঋষিরা এই কথা বলিয়াছেন। যুরোপে বিজ্ঞান যেমন—‘জীবাণু’কেই সংক্রামক রোগের কারণ বলে; ঋষিদের মতে ‘বীজাণু’ সেজন্য মুখ্য কারণ নহে, গৌণ কারণ মাত্র। কেননা আমরা বেগ বুঝিতে পারি—শুধু সংক্রমণের দ্বারাই রোগের উৎপত্তি হয় না, যদি সেজন্য সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে সংক্রামক রোগীর কাছে—তাহার আশ্রয় স্বজন, দাসী, পরিচারক, চিকিৎসক, যিনিই থাকিতেন, তাহারই রোগ জন্মিত। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি—একজন বসন্ত রোগীর স্বপ্না কারিণী বসন্ত হইল না, অথচ স্বপ্না কারিণী বসন্ত রোগের আশ্রয় হইল। এক পল্লীতে বসন্ত রোগের আশ্রয় হইল।

এই ভগ্নাট ঋষিগণ সংক্রামক রোগের উৎপত্তির কারণকে শরীরের অধর্ম বলিয়াছেন। ঋষিগণের মতে অহিত ও অমিত পাপজনক পান-ভোজন দ্বারা সংক্রামক রোগ আপনা হইতেই জীবদেহে উদ্ভূত হইয়া থাকে। এবং ক্রমে সে রোগ নিঃস্রাসাদির দ্বারা এক দেহ হইতে অগ্নাদেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। যদি কেবল জীবাত্ত্ব হইতেই রোগের উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এক-সংক্রামক রোগেই বোগ জন্মিত। অতএব ঋষিগণ অধর্মই বোগ-জন্মের মূখ্য নিদান। নিঃস্রাসাদির দ্বারা সমাগত জীবাত্ত্ব হইতে সে রোগোৎপত্তি—তাহা রোগের গৌণ নিদান। ঋষিগণের বিজ্ঞান সংক্রামক রোগ-প্রসঙ্গে এক ‘জীবাত্ত্ব’ দোহাই দিয়াই নিশ্চিত। ঋষিগণ সংক্রামক বোগগুলির পৃথক পৃথক নিদান নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সে নিদান জীবাত্ত্ব হইতে পৃথক। ঋষি বলেন—যদি দেহে তালশ নিদান সমূহ নিষেধিত হয়, তবে বিনা সংক্রামেও রোগের উৎপত্তি ঘটিতে পারে। এ কথা পাকা দার্শনিকের কথা।

আপনাবা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—“সংক্রামক রোগের যখন জীবাত্ত্ব আছে এবং ঐ জীবাত্ত্ব হইতে অপর জীবাত্ত্বের উৎপত্তিও ঘটিয়া থাকে—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য; তখন জীবাত্ত্ব ব্যতিরেকে কেমন করিয়া সর্বপ্রথম মানব-শরীরে সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে? একথা কেমন করিয়াই বা বিশ্বাস করিব? যদি অচেতন পদার্থ হইতে চেতন পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হইত, তাহা হইলে না হয় ঋষিদের “নদানেন” রোগজন্মের শক্তির কথা স্বীকার করিয়া গইতাম।” এ প্রশ্নের উত্তরে—অমোহ বলিতে পারি—অচেতন হইতে চেতনের

উৎপত্তি জগতে অসম্ভব বা বিরল নহে। হিন্দুর বিশ্বাস—শ্রীভগবানের উক্তি—“ময়া ততমিদং বিশ্বং জগদব্যক্ত মূর্তিনা।” জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতেই ভগবানের সত্ত্বা বিরাজিত। কি চেতন কি অচেতন, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কি দৃষ্ট কি অদৃষ্ট—সর্বত্রই এক চৈতন্যময় পদার্থ অব্যক্ত ভাবে বিরাজ করিতেছে। সাংখ্য মতে তাহার নামই পুরুষ। সেই অব্যক্ত, অমূর্ত, নিষ্ক্রিয়, চৈতন্যময় পুরুষ যখনই প্রকৃতির সহিত মিলিত হইতেছেন, তখনই তিনি ব্যক্ত, মূর্ত পরিষ্কৃত, সক্রিয় ও কর্তা বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। অতএব মানুষ যখন অহিত, অমিত অমেধ্য পাপজনক আহার বিহারে আত্ম-নিয়োগ করিতেছে, তখন তাহার শরীরে ভুক্ত পদার্থের মধ্যস্থিত অব্যক্ত চৈতন্য বিকৃত বাত-পিত্ত-কফ-ময়ী প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া রোগের জীবাত্ত্বরূপে পরিষ্কৃত হইতেছে। অপর কোনও জীবাত্ত্বের সাহায্যের অপেক্ষা করিতেছেন। দর্শন শাস্ত্রের মতে—নির্বীজ সৃষ্টি বিরল নহে। উদ্ভিজ সৃষ্টি সম্বন্ধে—রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন—“তত্র সিন্ধা জলৈর্ভূমিস্তত্র কৃষ্য বিপাচিতা। বায়ুনা বায়ু মানান্ডু বীজত্বং প্রতি পত্ততে

জল সিন্ধা ভূমি স্বীয় অভ্যন্তরস্থ উন্মার দ্বারা বিপাচিত এবং বায়ু কর্তৃক সজ্জাত ভাবে প্রাপ্ত হইলে বীজরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অচেতন হইতে সচেতনের উৎপত্তি—আরও দুইখানি গ্রন্থেও স্বীকৃত হইয়াছে। যথা,—“স্বৈরজঃ স্বিগ্ধমানেভ্যো ভুবনিকৃত্যঃ প্রজায়তে। যুক মংকুন কীটাত্মা যে চাচ্ছে কণ ভস্মাঃ।” —বিশ্বনাথ।

সিদ্ধমান (অন্তরুখ্য কর্তৃক পচ্যমান) মূর্তি হইলে অমি ও জল হইতে যুক মংকুন প্রভৃতি

নানাবিধ ক্ষণভঙ্গুর কীট জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

মহর্ষি অধিবেশণ বলিয়াছেন—

“স্বপ্ন-মাংস শোণিত-ললিকা কোথ ক্লেশ

সংবেদজাঃ ক্রিয়াগতন্তি মুচ্ছান্তি।”

বৈদ্যবাজ সুশ্রুতও বলিয়াছেন—

“কুমি কীট পিপীলিকা প্রভৃত্যঃ স্বেদজাঃ”

ঋষিদের এই সকল উক্তি ভাবিয়া দেখিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি—ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই চৈতন্যময় পদার্থ নিয়ত অনভিব্যক্ত অবস্থাতে বর্তমান রহিয়াছে, কালক্রমে তাহা অভিব্যক্ত হইতেছে। ঐ অভিব্যক্তির নাম সৃষ্টি। যেমন একই মাটি, ঘটাদি আকারে গঠিত হইয়া নানাবিধ সংজ্ঞালাভ করিয়া নানাকার্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে, তেমনি একই অনভিব্যক্ত চৈতন্য পঞ্চভূতে মিশিয়া নানাবিধ দোষ-গুণের অধিকার লাভ করে। এই ভগ্নাই কুষ্ঠ রোগের বীজাণু, যক্ষা জনক অন্তর্জাত আহার বিহারেজাত ক্ষয়বীজাণু হইতে স্বতন্ত্র। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—“বকশ্ম কলভুক পুমান্”—মাংসের স্তম্ভস্থ তাহার কক্ষফল হইতে উৎপন্ন। যে ব্যক্তি অনাচারী অভক্ষ্যভোজী, অসংযমী, ও অধ্যর্ষাচারী—তাহার শরীরে—সর্বনিয়ন্তা, স্রষ্টা পাপরোগ—জীবাণুরূপে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে সংহার করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে বিনি সদাচারী—ধার্মিক, হইয়া পবিত্রভাবে জীবন বাপন করেন, ভগবান তাহার শরীরে সজীবনী মহাশক্তিরূপে বিরাজমান থাকিয়া সেই ব্যক্তিকে রোগ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রজ্ঞান বীজকে জীবন-দাতা রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল, হিরণ্যকশিপু তাহাকেই সংহারক রূপে লাভ করিয়াছিল। পুরাণের এ উপাখ্যান নিরর্থক নহে।

আমরা হিন্দু—অদৃষ্টবাদী—দার্শনিক জাতি, আমরা নির্বীজ-সৃষ্টি বিশ্বাস করি। আমরা বীজ সৃষ্টিও স্বীকার করি। বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিতেছে—ইহাকে আমরা স্থূল সৃষ্টি বলি। আর অমূর্ত [অব্যক্ত] তাব [হইতে] যে জীবে সৃষ্টি হইতেছে—তাহাকে সূক্ষ্মসৃষ্টি নামে অভিহিত করি। আর্থা বিজ্ঞানের মতে—মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সংহতক জীবাণু জন্মগ্রহণ করে নাই। মানব সৃষ্ট বৃক্ষ-সুগাছের পরে—দেশে অধ্যক্ষের অভ্যুত্থান হইলে তবে পাপরোগ জীবাণুর সৃষ্টি হইয়াছে। কিছুকাল পরে মানব যদি আবণ্ড উৎকট পাপাত্মকতা করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও অসংখ্য নূতন নূতন পাপরোগের জীবাণু জন্মগ্রহণ করিতে পারে। শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া আমরা এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারি।

আর্থা-বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি—সংক্রামক রোগ কেবলমাত্র জীবাণু হইতেই উৎপন্ন হয় না, উচ্ছাদের মুখা নিদান আহার-বিহার আচরণ; গোণ নিদান জীবাণু। আমরা দেখিয়াছি—শরীরে জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করিলেই—রোগ জন্মে না। বীজ হইতে গাছের উৎপত্তি সত্য, কিন্তু উত্তর ভূমিতে বা পানীয় জলে বীজ পতিত হইলে সে বীজ কখনই অঙ্কুরিত হয় না। সৃষ্টি-সাধিকা-কারণ-সমষ্টির ভিতরে একটুও বৈলক্ষণ্য থাকিলে, বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে পারে না। এ রহস্য মহর্ষি চরক গর্ভাবক্রান্তি নামক অমূল্য অধ্যায়ে বিশেষরূপে বিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বীজ হইতে অঙ্কুরোপস্থানের জন্ত কণিষ্ঠ, সারযুক্ত, উর্বর ভূমি আবশ্যিক। জল

জীবাণু হইতে রোগোৎপত্তি হইবাব পূর্বে জীবাণু বিকাশ উপযোগী অতিত আহার ক্ষুদ্রাণাদি সেবিত, পাপময় শরীর চাই। এ কথা স্বীকার করা চলে না।

শেষবে বিদ্যুৎশস্যার গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম—  
“স্বাস্থ্যঃ সর্বমাক্রান্ত মরণানঞ্চ ভূতলে।  
প্রবৃত্তিঃ ক্রম কৰ্ত্তব্য জীবিতব্যং কথং নু বা ॥  
অমরা প্রত্যহ বে সকল জিনিস পানভোজন করিতেছি, অনবরত যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি,—কে বলিতে পারে, তাহাতে আমরা শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিতেছি কি না ?—তথাপি আমরা সকল সময়েই তো রোগাক্রান্ত হই না। এই জন্তই—যাচার ঐকান্তিকতা নাই, আয়ুর্বেদ তাহাকে নিদানের অশুভূক্ত করেন নাই। নতুবা জীবাণু তত্ত্ব যদি তাহা বাকমত জানিতেন।

আর্য্যঋষি চিকিৎসার মূল মন্ত্র —  
“সংক্রপত্যঃ ক্রিয়াযোগোনিদান পরিবৰ্জনম্ ॥”  
হংস অর্থাৎ—রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, নিদান-পরিবৰ্জন—সর্বপ্রায়ে কৰ্ত্তব্য।  
প্রত্যহিক, যে সকল কারণে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই সকল কারণ ত্যাগ করিতে না পারিলে, রোগ কখনই সারে না। সংক্রামক রোগের সাহচর্য্য হইতে দূরে থাকিলে সংক্রামক রোগ উদ্ভাবিত হয় নাই। কিন্তু যদি তাদৃশ রোগোৎপাদক অহুচিত আহার—বিহারাদি প্রতিমিত্রতই আচরিত হয়, তাহা হইলে সংক্রামক রোগের নিকট হইতে লক্ষ্য যোজন দূরে

থাকিলেও আপনা হইতে শরীরে সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইবে—ইহাই ঋষিদের উপদেশ—  
ইহাই আৰ্য্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

অতএব যদি সংক্রামক রোগ হইতে রক্ষা পাইতে চাও, তাহা হইলে শুধু সংক্রামক রোগের সামীপ্য ছাড়িলেই চলিবে না। তোমাকে শারীরিক ও মানসিক—উভয় অধ্যক্ষই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঋষিদের উপদেশ পালন করিলে, তুমি নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন পুরস্কার পাইবে। আর যদি তুমি সদাচারী না হও, নিয়ত অহিত-অমিত অপবিত্র-পান-ভোজন পরিত্যাগ না কর, শাস্ত্র বাক্য না মান, পূজা ব্যক্তির অবমাননা কর, উপভোগকেই জীবনের সর্বস্ব ভাব, লোভ-মোহে মত্ত হও— তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও—তোমার আচরিত পাপ কৰ্ম্ম—তোমাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবে,—তোমার কৃত পাপই একদা রোগ জীবাণুরূপে তোমার দেহে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমাকে ধ্বংস মুখে প্রেরণ করিবে। তখন বায়ু পরিবর্তন, ঔষধ সৈবন, আহাৰ্য্য দ্রব্য হইতে মক্ষিকা তাড়ানোর ব্যবস্থা—বাহাই কিছু কর না কেন, কিছুতেই তোমার রক্ষা নাই। পৃথিবীতে দীর্ঘজীবী হইতে হইলে—অটুট স্বাস্থ্য ভোগ করিতে হইলে—আবার তোমাকে ঋষি-মতেরই উপাসনা করিতে হইবে।

শ্রীরামসহায় কাব্যাতীর্থ  
বেদান্ত শাস্ত্রী

## পরিবর্তিত প্রণালীতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত কিনা ?

—:—

( ২ )

“কনকাসবের” কথায় আরও একটা বিষয় মনে পড়িতেছে। গ্রহকর্তার উপদেশ—ধৃতুরা বৃক্ষে সকল সময় সমান ফল থাকে না। আবাব কোনও গাছে বা অধিক ফল, কোনও গাছে বা কম ফল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ঋতুতে গাছে মোটেই ফল ফল ধবে না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে—ধৃতুরা বৃক্ষের মূল ও শাখাও চেয়ে ফল ও পত্র—ভেজকর। প্রাচীন মতে তৈয়ারী “কনকাসবে” ধৃতুরার বীৰ্য্য কতটা থাকিল, তাহা বৃক্ষবার উপায় নাই। এদিকে ঋতুভেদেও বৃক্ষের তেজ বা বাধ্যের ভ্রাস হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের শীর্ণ বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত আসব যে মাত্রায় রোগীকে দেওয়া যায়, শীতকালের পুষ্ট বৃক্ষজাত আসব—সে মাত্রায় ব্যবহার করা চলে না। বিশেষতঃ ধৃতুরা যখন—উপবিষ, উহার মাত্রাতিশয় জীবনকে বিপন্ন করিতে পারে, তখন ধৃতুরা হইতে জাত ঔষধে একটুও অনিশ্চিত থাকা উচিত নহে। কেবল মাত্র—ধৃতুরার পাতা ব্যবহার করিলে, আর কোন গোলাযোগ থাকে না। ধৃতুরার পত্র—শাখা ও মূলের চেয়ে বীৰ্য্যবান।

কনকাসবের আর একটা উপাদান—বাসক মূলের ছাল। আয়ুর্বেদে যে যে ঔষধে বাসকের প্রয়োগ আছে, সেই সেই ঔষধে বৈজ্ঞগণ বাসকের মূল ব্যবহার করেন।

ঔহাদের বিশ্বাস—মূলের বীৰ্য্যই বেশী। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষায় সম্প্রতি জানা গিয়াছে—বাসকের বীৰ্য্যাংশ মূলের চেয়ে পাতাতেই বেশী থাকে। এরূপ অবস্থায় কষ্টলব্ধ মূল পরিত্যাগ করিয়া, বাসকের পাতাকেই ঔষধের উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ববর্তী গ্রহকারগণ বরং আসব অধি প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পব—ভিষক সমাজে আসব অরিষ্টের আব আদ্য ছিল না। বৌদ্ধযুগের “অর্ক প্রকাশ” ও “আসব বিধান” নামক দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে আসব ও অরিষ্ট প্রয়োগের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ শ্রমণগণ ধর্ম প্রচারকের রত গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন—ঔহাদের সঙ্গে জীবের বস্ত্রণা নিবারণের জন্ত নানাবিধ ঔষধ থাকিত। পাণ্ডুর পক্ষে স্বপ বা টাটকা ঔষধ সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না। কাজেই শ্রমণগণ—আসব প্রস্তুত করিয়া লইতেন। হুই একখানি তন্ত্রেও আসব অরিষ্টের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। শাঙ্গর ও চক্রদত্ত কতকগুলি আসব অরিষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের পরবর্তী কোন গ্রন্থকারই আসব অরিষ্টের তেনন উল্লেখ করেন নাই। অত বড় সংগ্রহ গ্রন্থ “ভাব প্রকাশ”—যাহাতে নষ্ট প্রায় শস্যতন্ত্রও স্থান পাইয়াছে—সে ভাবপ্রকাশেও কেবল মাত্র “দৌহারিষ্ট” ছাড়া অল্প অরিষ্টের ব্যবহার দেখিতে পাই না। ইহাতেই অনুমান হইতেছে—অস্বস্তির দোষে

সেকালে অরিষ্টের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে অনেকেই বাধা হইয়াছিলেন। এক্ষণে নূতন করিয়া, আসব অরিষ্টের প্রচলন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পরিবর্তিত প্রণালী মতে শাস্ত্রাক্ত আসব অরিষ্ট ছাড়া—অনেকগুলি ঔষধের জায় হইতেই নূতন আসব অরিষ্ট প্রস্তুত হইতে পারে। অধিকন্তু—বটিকা, চূর্ণ প্রভৃতির চেয়ে, বেগির দেহে আসব অরিষ্ট যে শীঘ্রই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—ডাক্তারী মতের ট্যাচাপ গুলিই তাহার একমাত্র প্রমাণ।

পারিতোষিত প্রণালীতে প্রস্তুত আসব, অরিষ্ট ব্যবহার করিতে—কবিরাজ মহাশয়ের আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু প্রকারান্তরে অনেক কবিরাজ মহাশয়ই তো পরিবর্তিত প্রণালী অবগতন করিতেছেন। কবিরাজী ক্যাটালগে যে “কপূরাসব” নামক আসবের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই, উহা যে শাস্ত্রীয় প্রণালীতে প্রস্তুত আসব—একথা কেহই বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। ডাক্তারেরা যে “টিক্কার কাম্ফার” বা “স্পিরিট কাম্ফার” ব্যবহার করেন, “কপূরাসব” তাহাই। কেবল জমকাণো নাম লইয়া “কপূরাসব” ও যুগমদাসব” শব্দের দোহাই দিতেছে মাত্র। যে সকল আসব বা অরিষ্ট পেটেন্ট ঔষধের মত বিক্রয় হয়, সেগুলির কেহই প্রায় শাস্ত্রীয় আসব নহে। যে জিনিস শাস্ত্রীয় খোদস পরিমাণ সমাজে বাহির হইয়াছে, তাহা প্রকাশ্যে কেন গৃহীত হইবে না?

পরিবর্তিত প্রণালীতে আসব অরিষ্ট প্রস্তুত করিলে, আর একটা মহত্বপূর্ণ হইবে। অনেক ঝগড়াট বলিয়া আজকাল পাচনের ব্যবহার উঠিয়াই গিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়—গণ যদি পাচনের কাথ-সংরক্ষণ নিয়মে রক্ষা

করিয়া রোগীকে প্রদান করিতে পারেন, রোগী তাহা আনন্দের সহিত ব্যবহার করিবে, যেখানে কাঁচা স্বরস আবশ্যক, সেখানে এইরূপ কাথ অনায়াসেই ব্যবহার চণিবে। প্রয়োজনানুযায়ী—চরক-চক্রদত্তোক্ত অনেক পাচন ও আসব, অরিষ্টের আকারে রক্ষা পাইবে। আমি যতদূর জানি, পাচন ও অন্ত্রপানের ভয়ে—অনেকেই কবিরাজী ঔষধ সহসা ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হন না। পাচনের কাথকে আসবে পরিণত করিতে পারিলে—রোগী ও চিকিৎসক—উভয়ের পক্ষেই সুবিধা হয়।

যাহারা রক্ষণশীল—তাহারা বোধ হয় আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। সুরাসারের সাহায্যে—আসব-অরিষ্ট সংরক্ষণ—তাঁহারা অন্ত্রমোদন করিবেন না। তাঁহাদের প্রতি এ অপমের নিবেদন—সুরাসারের পরিবর্তে তাঁহারা মিসারিন ব্যবহার করিতে পারেন। মিসারিন, মধুর সুযোগ্য প্রতিনিধি, অতএব কবিরাজ মহাশয়েরা যেখানে মধু ব্যবহার করিতে পারেন, সেখানে অনায়াসেই মিসারিন প্রয়োগ করা চলে। যে ভেষজ দ্রব্যের স্বরস খুব উপকারী—অথচ সর্দাদ স্বরস প্রাপ্তির সুবিধা নাই, সে স্থলে কাথের মত স্বরসকেও রক্ষা করা উচিত। ইহা একেবারেই কঠিন নহে। কাঁচা দ্রব্যের নিষ্পীড়িত স্বরসে কিয়ৎ পরিমাণে মিসারিন মিশাইলেই স্বরস রক্ষিত হয়। এইরূপ সংরক্ষিত স্বরস ঠিক Suocus এর মতই হইবে—তবে এইরূপ সংরক্ষিত স্বরস, দীর্ঘকাল কোমল রাখা অসম্ভব। তাহাতে স্বরস, বিকৃত হইবে, ফলে স্বরস কিছু পরিমাণে হ্রাস হইবে।

অবলেহ বা লেহ।—অবলেহ এক রকম ঘন সার। ভেষজ দ্রব্যের কাথ

চিনা বা গুড় সংযোগে ঘন করিলে লেহ প্রস্তুত হয়। স্ততরাং লেহ এক প্রকার কাথ সংরক্ষণেরই নামান্তর। কিন্তু লেহ প্রক্রিয়ার প্রধান দোষ—ইহাতে কাথকে মেরুণ ঘন করিতে হয়, তাহাতে কাথ পুড়িয়া যাইতে পারে। বাষ্প তাপে কাথকে ঘন করিয়া লইলে—সে ভয় থাকে না। আমি “কুটজাবলেহ” নামক প্রসিদ্ধ ঔষধটিকে জলে ফেলিয়া দেখিয়াছি—তাঁহার কতক অংশ জলে অদ্রবনীয় ভাবে রহিয়া গিয়াছে বাষ্পতাপে লেহ পাক করিলে, লেহেব কোনও অংশই জলে অদ্রবনীয় থাকিবে না।

**চূর্ণ, বটিকাদি।**—ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। কেবল উপাদানগুলি, টাটকা এবং চূর্ণগুলি বতদূর সম্ভব যত্নভাবে প্রস্তুত করা চাই।

**ঘৃত ও তৈল।**—“রত” ও “তৈল”—কবিরাজী চিকিৎসার একটা প্রধান উপকরণ। আমি নিজে দেখিয়াছি—এক ভদ্রলোক প্রায় ৩ বৎসর কাগ ঘূষঘূষে জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। প্রত্যহ একই সময়ে তাঁহার জ্বর আসিত। ডাক্তার দেখাইতে তিনি ক্রটা করেন নাই। শেষে ডাক্তারেরা জবাব দিলে, তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না, ভদ্রলোক দেশে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন—তিনি মরিবার জন্যই প্রস্তুত, ঔষধ আর খাইবেন না। এইবার কবিরাজী চিকিৎসার পান। কবিরাজ স্তম্ভ সঙ্কটে পড়িলেন, রোগী পাচন বটিকা-চূর্ণ-বটক—কিছুই খাইতে সম্মত নহে। কবিরাজ মহাশয় তখন—রোগীকে কিরাতাদি তৈল ব্যবস্থা করিলেন। এই তৈল ১৫।১৬ দিন

ব্যবহাৰ করিতেই রোগীর জ্বর ত্যাগ হইল, টেম্পারেচার সবনর্মাল হইল, তিনি অনেকটা স্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা বাড়িল। গায়ের জ্বালা কমিল। প্রায় ছই মাসে তাঁহার শরীরে পূর্বস্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিয়া আসিল। এ ঘটনা—আমার শোণা কথা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার। আমি নিজে ১২ মাস গুড়চূর্ণাদি তৈল ব্যবহার করি—আমার বয়স ৫৮।৫৯, কিন্তু আমাকে দেখিলে ৩০।৩৫ বোধ হয়। আমি কবিরাজী তৈলের অনন্ত শরণ ভক্ত।

এই জন্মই তৈল পাক সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে কল, কাথ, এবং দ্রব পদার্থ (তৃণ, দধির মাত, শতাবরী প্রভৃতির রস, কাঞ্জিকাদি) এইগুলি তৈল ও ঘৃত পাকের অঙ্গ। ঘৃত ও তৈল পাকের নাম “ম্লেহ-পাক”। ম্লেহপাকের সাধারণ নিয়ম—ম্লেহের চতুর্থাংশ কক, চতুর্গুণ দ্রব দিয়া ম্লেহ পাক করিতে হয়। ম্লেহে কাথ দিতে হইলে, কাথ দ্রব্য ৪ গুণ, ৮ গুণ, অথবা ১৬ গুণ। জন দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়।

কাচরাপাড়ার কবিরাজদের মত—ম্লেহের সহিত দধি, ছন্ধ, তক্র, কাঞ্জিক, মাংসের কাথ প্রভৃতি দিতে হইলে,—এই দ্রব পদার্থের সংখ্যা যদি পাঁচ বা ততোধিক হয়, তবে প্রত্যেকটী ম্লেহের সম পরিমাণে দিতে হয়। আর যদি দ্রবের সংখ্যা একটা, ২টা, ৩টা বা ৪টা হয়—তাহা হইলে প্রত্যেকটী ম্লেহের চতুর্গুণ দিতে হইবে। কাচরাপাড়ায় ৮ উপেক্ষ বরাট, জগানন্দ, প্রভৃতি বৈদ্যগণ এই নিয়মে ঘৃত বা তৈল পাক করিতেন।

যদি ম্লেহ পাকে কেবল কতক উষ্ম থাকে, অথচ কোন দ্রবের উষ্ম না থাকে তবে কক দ্রব্যগুলি জলে পেষণ করিয়া



চাটান সহিত মেহের ৪ গুণ জল মিশাইয়া পাক করিতে হয়। আবার যেখানে কেবল মাত্র কাথ দিয়া মেহ পাকের ব্যবস্থা আছে, সেখানে কাথ দ্রব্য গুলিকে কক স্বরূপেও দ্বিতীয় বার গ্রহণ করিতে হয়। নোটাসুটী নিবন—ককের সহিত মেহ পাক কিম্বা কাথের সহিত মেহ পাক। কিন্তু কাথের সহিত পাঁচিহ, উৎপন্ন মেহে আমরা পাই—অর্দ্ধ দধি ঘনীভূত কাথ ও মেহ পদার্থ। ইহা ছাড়া আর মতন কিছু পাই না। কাথ প্রস্তুত করিবার সময়—কাথ দ্রব্যের জলে দ্রবনীয় অংশ কাথের মিশিয়া যায়। এই কাথকে ঘৃত বা তৈলের সহিত দ্বিতীয়বার পাক করিলে—কাথ দ্রব্যের যে অংশ জলে অবিকৃত ভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল, ফুটন্ত ঘৃতের উত্তাপে তাহার কিয়দংশ অঙ্গারে পরিণত হইয়া যায়। প্রত্যহ কাথকে ঘৃত বা তৈলের সহিত পাক করায় কাথের অনেকটাই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শিলাপিষ্ট কক দ্রব্য যদি মেহের সহিত পাক করা যায়, তাহা হইলে, ককের দ্রবনীয় সকল অংশই মেহে মিশ্রিত হয়। ইহাতে আর এক লাভ—জল বাহ্য গ্রহণ করিতে পারে না, ভেষজ দ্রব্যের সে অংশও মেহ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে। যেমন উন্নীতক, ভেলাকে জলে সিদ্ধ করিলে, ভেলার অনেক অংশ বা বীৰ্য—জল গ্রহণ করিতে পারে না, ঐ অগ্রাহ্য অংশ তৈলের মত জলে না মিশিয়া, উপরে বিন্দুর মত ভাসিতে থাকে। কিন্তু ঘৃত বা তৈলের সহিত সজল ভেলা সিদ্ধ করিলে, ভেলার সমস্ত বীৰ্য ঘৃতে বা তৈলে উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়। মোট কথা—যে ভেষজ দ্রব্যে তৈলের

অস্তিত্ব আছে, সে তৈলাংশ, জল গ্রহণ করিতে পারে না অথবা সামান্য পরিমাণে পারে। ঘৃত বা তৈল দ্রব্যের সমস্ত বীৰ্যই গ্রহণ করিতে সক্ষম। আমার বিশ্বাস—যদি বিজ্ঞানকে সম্মান করিতে চেষ্টা, তবে—ককের সহিত মেহ পাকের সার্থকতা আছে। কাথের সহিত মেহ পাক—না করাই ভাল। আমি কবিরাজ মহাশয়দিগকে এই কথা বলিতে চাহি—তাঁহারা কাথের সহিত মেহ পাক না করিয়া ককের সহিত মেহ পাক করুন। ইহাতে পাক করা ঘৃত-তৈল যথেষ্ট বীৰ্যবান ও ফলপ্রদ হইবে। মেহের সহিত দধি-দুগ্ধাদির পাকে—আমার কোনও অভিজ্ঞতা নাই, এ কার্য্য শাস্ত্রকারদের উপদেশ মত করাই উত্তম।

এ সম্বন্ধে আমি চুই একজন পাক বিদ্যুৎ কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাকে বলিয়াছিলেন—পাকের দ্বারা ঘৃত বা তৈল অবশ্যাস্তর প্রাপ্ত হয়। যে রোগী কাঁচা ঘৃত বা তৈল সহ্য করিতে পারে না; ভেষজপক ঘৃত-তৈল সে অনায়াসেই সহ্য করিতে পারে। কথাটা অসঙ্গত নহে। কিন্তু আমার বক্তব্য—ঘৃত বা তৈল পাকে, উহার উদ্বেগ্ন নহে, নিমিত্ত মাত্র। কেবল ঘৃত বা তৈল সহ্য করাইবার জন্য কবিরাজেরা উহাদের ব্যবস্থা করেন না। যদি ঘৃতের সহিত ভেষজ দ্রব্যের পূর্ণ গুণের সবার আবশ্যক থাকে, তবে আধুনিক বিজ্ঞানের মতে—ককের দ্বারা ইহা পাক করিতে হইবে। আমার এই কথাটা কবিরাজ মহাশয়েরা কি ভাবে গ্রহণ করেন, আশা করি এই “আয়ুর্বেদ” পত্রেরই আমি তাহা জামিতে পারিব। \*

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম. এ.

\* এই প্রবন্ধের রচনাকালে রাসায়নিক পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় ঔষধ মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে ছিলেন।

## “অপত্য তত্ত্বের” উপসংহার

—:—

প্রবন্ধের প্রথমেই একখানি পত্র অবিকল উদ্ধৃত করিলাম ;—

“ভাই!

“অপত্যতত্ত্ব” শীর্ষক আমার একটা প্রবন্ধ সম্প্রতি ‘আয়ুর্বেদ’ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তুমি তাহা অবগতই পাঠ করিয়াছ। প্রবন্ধটা সম্পূর্ণ কবিবার জন্ত, পাঠক মহল হইতে ৪।৫ খানি তাগিদ-পত্র পাইয়াছি। কিন্তু অপত্যতত্ত্ব

সম্বন্ধে যুরোপীয় বিজ্ঞানের মত আমি আদোচন করিয়াছি, স্ববিদের সিদ্ধান্তও যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সাধারণের কাছে তথ্য প্রবন্ধটা অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। আয়ুর্বেদ ও তন্ত্র রহস্য আমি বড় বেশী বুঝিনা, স্ত্রতব্য অপত্যতত্ত্বের উপসংহার ভাগ তোমাকেই লিখিতে হইবে। ইতি।

শ্রুতাকাজী-

শ্রীমতীশ চন্দ্র রায়।”

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, আমার অগ্রজ স্থানীয় সতীশ বাবু যখন আমাকে এতটা দিগগজ ঠাওরাইয়াছেন, তখন ত আর চুপ করিয়া থাকা চলেনা! পতঙ্গের উপর মাতঙ্গের ভার আজ আমার মত মহা মুখকেও যে অস্বাভাবিক আত্মভিগানে ক্ষীত করিয়া তুলিয়াছে—বর্তমান প্রবন্ধে পাঠকগণ কেবল সেই টুকুই বুঝিতে পারিবেন। সতীশ বাবুর আদেশেই আজ আমি আমার জীবনব্যাপী মনীষাদৈন্তকে লোক চক্ষুর সম্মুখে সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হইতেছি। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

সন্তানোৎপাদনের জন্ত স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন চাই। কেননা, পুরুষ অমুপ্রাণয়িতা, স্ত্রী তাহার বশবর্তিনী শক্তি। বেদে—পুরুষ হোতা, স্ত্রী ঋত্বিক; বৌদ্ধে—স্বামী প্রবুদ্ধাচার্য্য, স্ত্রী—অম্ববর্তিনী শিক্ষা। তন্ত্রে—স্বামী চিদাধার, স্ত্রী বিশ্ব প্রকৃতি। পুরুষ—সম্যাস, স্ত্রী সংসার।

ঈশ্বরের অপ্রতিহত বিধান বলে—স্ত্রী-পুরুষের ভেদ আমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু কেন যে পুত্র জন্মায়, কেন বা কন্যা জন্মায়, ইহার মিমামসা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। রমানাথ বাবু পুরুষ, তাঁহার পুত্র আছে, কন্যাও আছে, অতএব ভিতরকার রমানাথ—কতকটা পুরুষ, কতকটা স্ত্রী, নতুবা রমানাথ হইতে পুত্র-কন্যার উৎপত্তি হইতেই পারেনা, অথবা রমানাথ এমন একটা পদার্থ, যাহার কোন লিঙ্গ নাই, বাহ্য স্ত্রী ও নহে, পুরুষ ও নহে, অথচ তাহার পুত্র-কন্যা উৎপাদনের শক্তি বর্তমান। সন্তানের লিঙ্গভেদ-ক্রিয়া তাহার বশবর্তী; যদিও রক্ত মাংসের বা স্থূল রমানাথের নিজের ইচ্ছায় সে ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। আবার ইহাও মনে হইতে পারে, গর্ভযোগ সময়ে এমন একটা কিছু ঘটিয়াছিল, এমন কোনও গদাধরের

বংশে পারমাণে সাহায্য পাইয়াছি। আমার অনুজ্ঞাপন, বঙ্গ সাহিত্যে প্রথিত বশা লেখক শ্রী বঙ্গ বরত রায়, কতকগুলি গ্রন্থ যোগাড় করিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন।

হাস বা আধিকা হইয়াছিল, যে জন্ত রম্যনাথের পুত্র বা কন্যা জন্মিয়াছে। ঋষিদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—ইহজন্মে পুত্র বা কন্যা রূপে দৃষ্টিত হয়—শিশুর অদৃষ্ট-ফল মাত্র। পূর্ব জন্মের কামনা পূর্ণ করিবার জন্ত জীবাত্মা পদাঙ্গন মত পুরুষ বা স্ত্রীর আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ তাহাদের জড়াত্মিক বিজ্ঞানে জীবের জন্মের পরিগত মানিতে চাহেন না। আমরা কিন্তু জন্মান্তরের কথা মর্মে মর্মে বিশ্বাস করি।

আমাদের শাস্ত্রে যম ও নিয়ম এক। অমায়িকতা গুরু, আচার্যা অক্ষয় চন্দ্র “পূর্ণিমা” পত্রিকাষ এ সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য লিপিত ছিলেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ১৯১৬ সালের পূর্ণিমা পড়িলে তাহার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। আমরা চিত্রে দেখি—হরব কোলে গোবী বিরাজিতা, ইহার অর্থ মৃত্যু কোলে জীবন, বিলম্বের বৃকে সংশ্লেষ, মতেতনব মধোই চেতনের লীলা। জীবনের উন্মেষ—কম্বুক্ষেত্রে যবনিকা উত্থান মাত্র। জীবন হতে মরণ, মরণ হইতে জীবন, ইহা দার্শনিক সত্য। হরগৌরী মূর্তি—তাই চতুশ্চন্দ্র রবের উপর অধিষ্ঠিত। এই বুধ—ধর্মকপী—মহাসত্য। ইহা তত্ত্বের রূপক।

মাংসখাব জড়পরিমাণ (পঞ্চতন্ত্র) হার জীবনের পরমাণু নামক একটা স্বতন্ত্র পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই জীবনের পরমাণু পুরুষ। ইহার জন্ত উদ্ভিদ, মানুষ প্রভৃতি বিভিন্ন জৈবিক পদার্থে একই রূপ জীবন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ সকল কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আপাততঃ নিম্নরোজন। অবশ্যক হইলে, শারীরবিদ্যা-অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিব।

‘অপত্য তত্ত্ব’ আলোচনা করিবার সময় আমাদের মনে স্বতঃই তিনটি প্রশ্ন উদ্ভিত হইয়া থাকে।

(১) স্ত্রী-পুরুষ ভেদ কত দিনের?

(২) সৃষ্টির প্রথম হইতেই কি এইরূপ লিঙ্গভেদ আছে?

(৩) তাহা না হইলে, ইহা কবে বা কেমন করিয়া হইল?

তত্ত্বই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। মানুষের কেন পুত্র বা কন্যা জন্মায়? এই পুত্র বা কন্যা উৎপাদন তাহার নিজের ইচ্ছামত হয় কিনা? তত্ত্ব ভিন্ন তাহার উত্তর আর কোথাও মিলিবে না। স্বতরাং প্রথমেই আমি তত্ত্বের যুক্তি অনুসন্ধান করিব। আমাদের তত্ত্বের আগা গোড়াই রূপকে পরিপূর্ণ। তত্ত্বের রূপক—আর্ষা-সিন্ধাস্তের অস্থি মাংসময় প্রতিমূর্তি। দার্শনিক সত্য সকলে ধারণা করিতে পারে না, তাত্ত্বিক তাই সেই সত্যকে রক্ত মাংসের সংযোগে স্থূল দেহাবয়ব প্রদান করিয়াছেন। পুরাণের দেবতাগণ—তত্ত্বের রূপক। পাঠকগণ তত্ত্বের অর্দ্ধ নারীশ্বর নামক রূপকটির কথা অবশ্যই অবগত আছেন। আমি এই অর্দ্ধ নারীশ্বরের কথায় ঋষি-মতের লিঙ্গভেদ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

• মহাসংহিতার জগতোৎপত্তি অধ্যায়ে মহা বর্ণিয়াছেন—

“অর্দ্ধেন নারীং + \* বিরাজ মন্বজং প্রভুঃ”

ইহার অর্থ—সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অর্দ্ধ বিরাট মূর্তিকে দুই অংশে বিভক্ত করিলেন। তাহারই একাংশ স্ত্রী এবং অপরাংশ পুরুষ হইল। মহাসংহিতার এই মহাসত্যকে তত্ত্ব সাধারণ বোধ্য করিবার জন্ত স্থূলরূপে অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্তিতে গঠন করিলেন। অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্তি

অর্থ—জীব-জগৎ উৎপত্তি কালে স্ত্রী-পুরুষ তত্ত্ব বিশিষ্ট ভাবে পৃথক হয় নাই। অর্থাৎ বর্তমান জগতে যে সকল পুরুষ বা স্ত্রী-জীব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আদি পুরুষের (কারণের) লিঙ্গ ভেদ ছিল না। সে আদি কারণ—স্ত্রীও বটে পুরুষও বটে। সেই মৌলিক উভয় লিঙ্গ হইতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদের উৎপত্তি।

সুশ্রুতসংহিতা পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি—আর্য্য ঋষিগণ পুং-বীৰ্য্যের মত স্ত্রী-বীৰ্য্যেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহারা আর্ন্তব ও স্ত্রী বীৰ্য্য একাধে প্রয়োগ করিয়াছেন। আর্ন্তবের অর্থ—ঋতু-ভব শোণিত হইলেও, সে রক্তে স্ত্রী-বীৰ্য্য (ovum) ভাসিয়া আসে। অতএব শুক্রার্ন্তবেব সম্মিলনে গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে আর্ন্তব অর্থে স্ত্রী শুক্র বা ‘ওভম্’ বুঝিতে হইবে।

চরক বলেন—“গতে পুরাণে রজসি নরে চাবস্থিতে পুনঃ শুক্র স্নাতাং স্নিগ্ধ মব্যাপন্ন যোনি শোণিত গর্ভাশয়া মুচুসতাং আচক্ষহে।” পূর্ক মাসের পুরাতন রজঃ ঋতু শোণিতে নিঃসৃত হইয়া নূতন রজঃ প্রসূত হইলে সেই শুক্র স্নাতা, অদৃষ্ট যোনি-শোণিত-গর্ভাশয় বিশিষ্টা স্ত্রীকে “ঋতুগতী” বলা যায়। এইরূপ ঋতুগতী স্ত্রীতে অদৃষ্ট বীৰ্য্য পুরুষ উপগত হইলে, রজঃ শুক্রের সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মতে—“শুক্র বাহুলাং পুমান আর্ন্তব বাহুলাং স্ত্রী সাম্যাহুভায়ানপুংসকমিতি। [শারীর স্থান, ৩য় অধ্যায়] অর্থাৎ শুক্র বাহুল্যে পুত্র, আর্ন্তব বাহুল্যে কন্যা এবং শুক্র-র্ন্তব তুল্য হইলে সন্তান নপুংসক হইয়া থাকে। ঋতুর দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভকাল। ঋষিদের মতে—নূতন রজঃ বা স্ত্রী বীৰ্য্য না হইলে

গর্ভোৎপত্তি ঘটে না। সুতরাং ঋতুর দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত গর্ভ গ্রহণের প্রশস্ত কাল। একপা আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতেছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক—“শুক্র বাহুলাং” ও “আর্ন্তব বাহুলাং”—ইহাদের অর্থ কি? বাহুলা শব্দের অর্থ প্রাবল্য। সুতরাং শুক্র বাহুল্যের সাধারণ অর্থ পিতৃ অংশের প্রাবল্য, আর আর্ন্তব বাহুল্যের অর্থ মাতৃ অংশের (রজঃ) প্রাবল্য। যেখানে পিতৃশক্তি—মাতৃশক্তি (রজঃ) হইতে প্রাবল্য, সেখানে পুত্র হইবার সম্ভাবনা।

এইবার দশনের কথা একটু ভাবিতে হইবে। দর্শন শাস্ত্রের মতে—প্রথমে ইন্দ্রিয় তত্ত্বের “উৎপত্তি। সেই ইন্দ্রিয়তত্ত্ব হইতে ফল ইন্দ্রিয় (ঐন্দ্রিয়িক অবয়ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুক্ষ্ম ইন্দ্রিয় তত্ত্ব অহঙ্কারের প্রসব। সুতরাং এস্থলে বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, ইন্দ্রিয় তত্ত্ব পুরুষ বা পুরুষের ইচ্ছা শক্তি বশবর্তী। বাগভট বলেন—“কারণাম্ বিধায়াং কার্য্যানাং তত্ত্ব ভাবতা।” অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ একই পদার্থ। এ উক্তির বাখ্যার্য্য স্বীকার করিলে বলিতে হয়—সন্তানোৎপাদিকা ইচ্ছা ও তাহার ফল শুক্র বা রোতঃ কারণ একই ধর্ম্মযুক্ত। পিতার কাম ভাব বা সন্তানোৎপাদন ইচ্ছা বলবতী হইলে পিতৃ শুক্রে পিতৃ অংশ অত্যন্ত বলবান হইয়া থাকে। আবার মাতার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বলবতী হইলে, মাতৃবীৰ্য্যে (ovum) যে মাতৃ অংশ প্রবল হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। গর্ভোৎপাদনকালে তাহার বীৰ্য্য শীঘ্রই ঋণিত হইবে। তদ্রমতে—পিতৃ অংশ উদাসীন, বৈমেষিক, জীবের উন্মেষক মাত্র। মাতৃ অংশ—কারণ,

সংস্করক, স্থিতিকারী। এখানে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যে অংশ যত বলবান, গভাধান-কালে সে অংশ তত শীঘ্রই ক্ষরিত হয় এবং ক্রমে লিঙ্গ স্ব নিরূপণ করিয়া দেয়। মাতৃ ইচ্ছা প্রবল হইলে, মাতৃবীৰ্য্য অগ্রে ক্ষরিত হইয়া সে গর্ভে কত্কা জন্মগ্রহণ করে। সেই কপ পিতৃ ইচ্ছা প্রবল হইলে, সে গর্ভে পুত্রই উদ্ভূত হয়।

এখানে—ঋষি মতের “শুক্রে বাহুল্য” বা “হৃদয় বাহুল্যের” অর্থ বহু পরিমাণে শুক্র বা হৃদয়ের প্রাচুর্য্য হইতে পারে না। কেন না, গাঠ হইলে, বহু অপত্যের সম্ভাবনা হইতে পারে। তবে ‘বাহুল্য’ শব্দের অর্থ কি? সেই কথাটি বলিতেছি। “বাহুল্য” শব্দের অর্থ—মাতৃ বা পিতৃ ইচ্ছার প্রাবল্য জন্ত স্ব স্ব বীৰ্য্য স্ব স্ব অংশে সংযোগিকা (সংগঠিনী—সংযোগিনী) বা বিসেপিকা (বিয়োগিনী—বিসেপিকা) শব্দ প্রাবল্য বুঝিতে হইবে। এই ‘বাহুল্যের’ অর্থ বয়সিহে গিয়া আচার্য্য দাব্যবাহি অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সহ-বাস কালে পিতৃবীজ যদি মাতৃবীৰ্য্যের পূর্বে ক্ষরিত হয়, তবে সে গর্ভে পুত্র সম্ভব জন্ম গ্রহণ করে। অন্যরূপ কারণে মাতৃবীজ অগ্রে ক্ষরিত হইলে, কত্কাই হইয়া থাকে। যথা,—স্বী পুংসের স্তম্ভবোগে যতাদৌ বিস্ফেপুমান্। শুক্রং ততঃ পুমান্ বীরো জায়তে বলবান্ দৃঢ়ঃ। অথ চেৎ বনিতা পূর্বে বিস্ফেপুমান্ সংযুতং। ততো দপায়িতা কত্কা জায়তে দৃঢ় সংহিতা।

অরুণদত্তোক্ত শ্লোকঃ।

এইবার আপনারা বিধেয়পত্নির সহিত ঈশোপপত্তি—মিলাইয়া লউন। প্রকৃতি স্ব স্ব প্রজাতিমায়ী। ঐশিক, কৌশিক, বিল্লেক্ষ প্রভৃতি গুণের প্রসুপ্ত অবস্থার অ-কার্য্যকরী।

পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলে, তবেই জগতের বিকাশ। মাতৃ রজঃ প্রসুপ্ত শক্তি বৃদ্ধি লইয়া পিতৃ বীজকে ধরিল, অমনি তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির নিদ্রাভঙ্গ হইল; সে অবস্থার—যে শক্তি, যে ইচ্ছা, বা যে অংশ তাহার নিজ ভাগ্যইয়া তাহাকে অ-কার্য্য হইতে কার্য্যে প্রবর্তিত করিবে,—তাহার লিঙ্গত্ব, তাহার বিশিষ্ট বর্ণে, তাহার—বিশিষ্ট ধর্ম বা বিশিষ্ট লিঙ্গত্ব হইবে। অতএব মাতৃ ইচ্ছা বা তাহার স্থূল অভিযুক্তি স্বরূপ মাতৃ অংশ (সংগঠিকা) যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে সে গর্ভে কত্কাই হইবে—ইহার বিপরীত হইলে পুত্রই জন্মিবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নূতন আবিষ্কার “অগনা বলিজিম” ও “ক্যাটা বলিজিম”—কত যুগ যুগান্তর পূর্বে “সংগঠিকা” ও “বিসেপিকা” রূপকে সজ্জিত হইয়া অর্দ্ধ নারীস্বরূপে মৃত্তিতে আমাদের পূর্বপুরুষের মহিমাকীর্তন করিতেছে! আমরা মুর্থ—সে তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করি না! বল দেখি ভাই! কিমার্শচ্য মতঃ পরং? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভূমিষ্ট হইবার বহুকাল পূর্বেই আৰ্য্য ঋষি বলিয়াছিলেন—পিতৃ অংশে বিসেপিকা শক্তির আধিক্য মায় অংশ চিরদিনই সংগঠিকা। এই যে স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গভেদ, ইহার আদিকারণ—“অর্দ্ধ নারীস্বরূপ” অর্থাৎ উভয় লিঙ্গায়ক। আৰ্য্য ঋষি জানিতেন—প্রাণী বিকাশের এমন কোন অবস্থা বা স্থান ছিল—যখন স্ত্রী প্রাণী বা পুরুষ প্রাণী ছিল না, সকল প্রাণীই অর্দ্ধ নারীস্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ উভয় লিঙ্গায়ক ছিল।

ইচ্ছা সবেও—এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের সহজবোধ্য ভাবের লিখিতে পারিলাম না। ইহাতে মানুষ কুসুজনের অক্ষমতা বোঝাই হইতেছে। কিন্তু কি করিব? দাশনিক

বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা এখনও বঙ্গভাষায় রচিত হয় নাই। এ পরিভাষা রচনা করিতে পারেন—বঙ্গের উজ্জল বহু ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র—পণ্ডিত রামেন্দুশ্রম্ভর ত্রিবেদী।

আর দুই একটা কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আয়ুর্বেদে পড়িয়াছি—বৈষ্ণব ইচ্ছা করিলে মানুষের পুত্র বা কন্যা উৎপাদন করাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু সাধাবণে এ কথার তাৎপর্য বুঝিতে অক্ষম। পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি—দুইটা বিভিন্ন শক্তি, ইহাদের হিতের পরস্পর বিনিময় সংসাধিত হইতে পারে কিনা? নাতৃ অংশ বা সংগঠিকা শক্তিকে কোনওরূপে বিশ্লেষণ শক্তি বা তাহার স্থূল অভিব্যক্তিরূপ পিতৃ অংশে পরিণত করা যায় কিনা? এই রহস্যটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। ঋষি বলিয়াছেন—জৈবী শক্তির কেন্দ্র ভিন্ন তার ছতটা বিভাগ থাকিলেও পুরুষ অর্থাৎ দেহবদ্ধ চৈতন্যই তাহার আধার। যাহার ধর্ম আছে, সেই মানুষ। ধর্ম লইয়াই না পশুকে নরকে প্রেতদ? কণাদের মতে—“যতোহুদয় নিঃশ্রেয়স সন্ধিঃ স ধর্মঃ।” তাহা হইতে অভ্যাস ও কল্যাণ সাধিত হয় তাহার নামই ধর্ম। আবার সাংখ্যের মতে—“অথ ত্রিবিধ হুংখ্যাত্যন্ত নিবৃত্তি বতান্ত পুরুষার্থ” — আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক [ মানসিক, শারীরিক, প্রাকৃতিক ] এই তিন প্রকার হুংখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিবার জন্তই মানুষের দেহ ধারণ। চরকও বলিয়াছেন— মানুষ প্রাণরক্ষার জন্ত, ধন উপার্জনের জন্ত এবং পারলৌকিক উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিবে। অতএব দেখা যাইতেছে—মানুষের মানসিক, শারীরিক ও প্রাকৃতিক জেদ তিন পক্ষের

ধর্ম আছে। জৈবী শক্তির সংগঠিকা বা বিশ্লেষণিকা ভেদে যে দুইটা বিভিন্ন কেন্দ্র আছে—প্রাকৃতিক বা যৌথবিক কেন্দ্রে যাহা প্রবর্তক বা নিবর্তক—তাহা এই ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী। আমরা যে পঞ্জিকায় বিভিন্ন রাশিযুক্ত লোকের আয়-ব্যয়ের কথা শুনিয়া থাকি, তাহা এই বিশ্লেষণিক (নিবর্তক) বা সংশ্লেষণিক প্রবর্তক) অর্থাৎ দেহস্থ পিতৃ বা মাতৃ শক্তির আধ্যাত্মিকভেদে ত্রিবিধ কোষ আয়-ব্যয় অর্থাৎ কোন রাশিতে মানুষের আত্মিক, শারীরিক বা প্রাকৃতিক বিশ্লেষণিকা-শক্তি বৃদ্ধি পায়, কোন রাশি বা কোন নক্ষত্রে তাহার সংশ্লেষণিক (মাতৃকা শক্তি) শক্তি বর্ধিত হয়। ধর্ম লইয়াই যখন মানুষের মনুষ্যত্ব, তখন ঋষি বা মানুষের সকল কার্য্যেই ধর্মের অনুষ্ঠান দেখিবেন না কেন? তোমরাই বা পঞ্জিকার কথা অবিশ্বাস করিবে কেন? ঋষি বলিয়াছেন—তিথি অনুসারে, নক্ষত্রানুসারে, পঞ্চাঙ্গসারে, দিবা ও রাত্রিভেদে—পিতৃ ও মাতৃ শক্তির আয়-ব্যয়ের ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি যত বড় নাস্তিকই হওনা কেন, অমাবস্যা-পূর্ণিমার শরীরে যে রস সঞ্চার হইয়া থাকে, শরৎকালে যে পিতৃ প্রকুপিত হয়, বাল্য ও প্রভাতে যে শ্রেয়া বর্ধিত হয়, সান্নিপাতিক বিকারে—৭ম, ৯ম ১১শ, ১৪শ দিবসে যে দৈহিক শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়—একথা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না। দৈহিক হ্রাস-বৃদ্ধি প্রত্যহ সমান ভাবে হয় না। দিবা-রাত্রির মধ্যে—জীবের জন্ম মৃত্যুর কালও বিশেষরূপে নির্দিষ্ট আছে। পঞ্জিকার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তিথি বিশেষে, নক্ষত্র বিশেষে, দিন বিশেষে, পিতৃ, মাতৃ যুগ্ম শক্তিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একটা শক্তির হ্রাস হইলে

অপর্যাপ্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাহ্যিক বাহ্যিক সঙ্কল্প  
ধর্ম, তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে সেই ধর্মের  
প্রবর্তিত করিতে পারা যায়। অধিগণ দ্রব্যের  
সাহায্যে, উপায়ের সাহায্যে জৈবী শক্তির  
আর বায়ুর কেন্দ্র আয়ত্ত করিতে পারিতেন,  
মৃত্যুর পিতৃকা ও মাতৃকা শক্তির উপর  
তাহাদের মধ্যে প্রভুত্ব ছিল। মানব বিজ্ঞান  
স্বকল্প উপায়ে মাতৃ-দেহের সংশ্লেষিকা বা  
নিশ্লেষিকা, প্রবর্তক বানিবর্তক, আর বা বায়ু,  
জ্ঞানার্জনিক্রম বা ক্যাটা বনিজিম প্রভৃতির  
রাস বুদ্ধি করিয়া মাতৃবের পুত্র বা কন্যা উৎ  
পাদনের সাহায্য করিতে পারে। অধিরা ইহা  
জানিতেন। তাই তাহারা একরূপ ঔষধের  
কলনা করিয়া গিয়াছেন, যে ঔষধ খাইলে—  
কন্যা প্রসবিনী-রমণী পুত্রেরও জননী হইতে  
পারে। আয়ুর্কর্মে এমন ঔষধ আছে—  
যাহা সেবনে বন্ধনানারী গর্ভিণী হইতে পারে,  
পুরুষ ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা উৎপাদন করিতে  
পারে। বহু প্রসবিনী নারীর গর্ভগ্রহণের শক্তি  
রাস হইয়া যাইতে পারে। আয়ুর্কর্মে  
যাহাই আমান এ কথার সত্যতা বুঝিতে  
পারিবেন।

তদ্বিক অধি বলিয়াছেন—জৈবী-শক্তির  
এইটি বিভিন্ন কেন্দ্র মাতৃবের শরীরের বাম ও  
দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। পিতৃকা কেন্দ্র  
(Katabolism) শরীরের দক্ষিণার্ধে এবং  
মাতৃকা কেন্দ্র বামার্ধে প্রবাহিত হইয়া থাকে।  
নিখিল শক্তি-কেন্দ্রের ত্রায়, জৈবীশক্তির ও  
প্রবর্তক বা পিতৃকা কেন্দ্র, নিবর্তক বা মাতৃকা  
কেন্দ্রকে আকর্ষণ করে। এক জাতীয় দুইটি  
কেন্দ্র পাশাপাশি থাকিলে বিক্লেপণ বিলম্বণও  
ঘটতে থাকে। অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্তির বামভাগে  
গৌরী দক্ষিণ ভাগে—শিব। ঐ তাই স্বামীর

বামার্ধি ভাগিনী। মহর্ষি সুশ্রুতের উপদেশ  
—“সহদেবানা মনাতমং ক্ষীরে নাভি যুক্ত্যং  
ত্রীংশচতুর বা বিন্দুন দত্তা দক্ষিণে নাসা পুটে  
পুত্র কামায়ৈ। নতান নিসিচেৎ।” আমার পুত্র  
হউক মনে এইরূপ ইচ্ছা হইলে গৃহীতগর্ভা  
স্ত্রীর দক্ষিণ নাসাপুটে [ পিতৃকা কেন্দ্র ] দুধ  
যুক্ত, লক্ষণা বিশ্ব বা সহদেবাদের যে কোনও  
একটাব মূলের ৩৪ বিন্দু রস টানিয়া লইতে  
বলিবে। সে রস যেন সে আর খুতুর সহিত  
ফেলিয়া না দেয়। আচার্য্য বাগভটও  
বলিয়াছেন—

ক্ষীরেণ ধ্বং বৃহতী মূল্য নাসা পুটে স্বয়ং।

পুত্রার্থং দক্ষিণে সিচেদ্রামে হুহিত বাঞ্জয়া।

ধ্বং বৃহতী মূলের রস দুধের সহিত মিশ্রিত  
করিয়া পুত্রার্থিনী নারী দক্ষিণ নাসাপুটে এবং  
কন্যার্থিনী গর্ভিণী বাম নাসাপুটে টানিয়া লইবে।

চরক স্পষ্টই বলিয়াছেন—

“সবাপ্ত গভা \* \* সবাপ্ত প্রজ্ঞে স্মরণেব স্মৃতে”

যে নারীর গর্ভ বাম ভাগে অবস্থিত, বামস্তনে  
বাহার প্রথম দুধ সঞ্চারিত হয়, সে নারী  
নিশ্চয়ই কন্যা প্রসব করিবে।

আয়ুর্কর্মে, তন্ময়, জ্যোতিষশাস্ত্রে—অপত্য

তত্ত্বের বহু রহস্যই জানিতে পারা যায়। ক্ষুদ্র  
প্রবন্ধে সে সকল তত্ত্বের আলোচনা অসম্ভব।  
আমি কেবল এই টুকু বলিতে চাই—যে  
রহস্তের মানাংসার জন্ত যুরোপের বড় বড়  
বৈজ্ঞানিক মাথা ঘামাইয়াছেন,—পরশু স্থির  
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।  
ত্রিকালজ্ঞ অধিগণ বহুগুণ পূর্বে—যুক্তিপূর্ণ  
গবেষণার সাহায্যে—সে সকল রহস্তের নীমাংসা  
করিয়া গিয়াছেন। এক অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্তি  
কলনা দেখিয়াই—আমরা বুঝিতে পারি—ঐ  
বা পুং তত্ত্বের প্রাকৃত্যব উভয় লিঙ্গায়ক।

উভয় লিঙ্গাত্মক আদি কারণ হইতেই স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি। পিতৃকেন্দ্রের ক্রিয়াতিশায্যে পুরুষ বা পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে মাতৃকা কেন্দ্র যখন কার্য্যাকরী,—তখনই কন্যার উৎপত্তি। মানব দেহের বাম ও দক্ষিণার্দ্ধে—এই দুই শক্তিকেন্দ্র, এই দুই আয়-বায়ের হিসাব অবস্থিত। নবাবিকৃত ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথি বা তড়িতবিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতে এই তত্ত্বই প্রতিপন্ন করিতেছে। আর্ধ্য ঋষি কিন্তু অনেক আগেই—এই উভয় শক্তির কেন্দ্রের উপর পাকা বৈজ্ঞানিকের প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন। আমাদের হৃৎ—তোমরা তাহা দেখিয়াও দেখিলেনা। একটু সন্ধানও লইলে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—জড়শক্তির প্রবর্তক (Positive) কেন্দ্রের দুই একটা কথা আজ ১৯০০ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় জানিতে পারিয়াছে। জৈবী শক্তির নিবর্তক বা মাতৃকা (Negative) কেন্দ্রের রহস্য—তাত্ত্বিকের নেত্রে সৃষ্টির প্রথম বিস্ফুরণেই ধরা পড়িয়াছিল। প্রাকৃতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক এই মাতৃকাশক্তির ইন্দ্রজাল ভেদ করিয়াছিলেন। মাতৃকা শক্তির জীবনীয় প্রবাহ তাত্ত্বিকের হৃদপিণ্ডের ভিতর প্রাণ স্পন্দনে নাচিয়া উঠিয়াছিল। তাই তত্ত্বের অর্থ বেদিকায় নারী—লিখনের অধিনায়িকা।

জগতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য জানিতে পারিয়াই তাত্ত্বিক নারীকে মা বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন, জগদ্ধাত্রী জগদম্বা ভাবিয়া নারীর চরণে প্রণত হইয়াছিলেন। স্ত্রী যে স্বামীকে স্বর্গরাজ্যের শেষ সোপানে তুলিয়া দিয়াছিল,—তত্ত্ব ও আয়ুর্বেদ এ উপাঙ্গসমূহ জলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। মাতৃ রহস্য ভেদ করিয়া আর্ধ্য ঋষি বিশ্বমাতাকে জীবনের আরাধ্যা বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। গভাপান ব্যাপার অদ্ভুত রহস্য জালে জড়িত, আর্ধ্য ঋষি তাহা তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। ৫০ বৎসর পূর্বে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এ তত্ত্ব বুঝিবার শক্তিও ছিল না। প্রবীণ তাত্ত্বিকের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া আজ আমরা সর্বসমক্ষে প্রচার করিতেছি—‘মাতৃত্বের মূর্ত্তা নাই। মাতৃগর্ভে জন্ম পরিগৃহীত হয়। মাতৃস্তনে শিশু বুঝা হয়। যুবতীর হাসিতে সম্রাসা ও সংসারী—জীবনের পূর্ণ অর্থ খুঁজিয়া পায়।’ মাতৃত্ব ও নারীত্ব বৃত্তিতে হইলে মহাদেব হইত হইবে। তত্ত্ব ও আয়ুর্বেদ—পূর্ণ নারীত্বের অক্ষুন্ন সংহিতা। যখন অপত্যতত্ত্ব বুঝিবার আবশ্যক হইবে, তখন সকল দম্ভ, পরিহার করিয়া তত্ত্ব ও আয়ুর্বেদের শরণ লইও,—তোমার জন্মবীণে জন্মগ্রহণ সার্থক হইবে।

কবিরাজ শ্রী ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

গর্ভস্থ জগৎ যে প্রথমাবস্থায় উভয় লিঙ্গে থাকে, সৃষ্টি শক্তির পুংসবন প্রক্রিয়াই তাহার আর একটা অঙ্গলয়। পুংসবন বিধির আলোচনা করিলে, আমরা অপত্যতত্ত্বের বহু রহস্য বুঝিতে পারি। আর এক সময়ে তাহার চেষ্টা করিব।

—লেখক।



## দীর্ঘজীবন লাভের উপায় ।

—:—

আমাদের গুরুজনের প্রধান আশীর্বাদ—  
“দীর্ঘজীবী হও” । কেননা মানুষ ধনী হউক,  
দরিদ্র হউক, সে বেশীদিন বাঁচিতেই ভালবাসে ।

“কণামালার” বৃদ্ধ যখন শ্রান্ত দেহে, গুঢ়  
কণ্ঠে, কাতর ভাবে যমকে ডাকিয়াছিল,  
তখন সে ভাবে নাই—তাহার আহ্বানে সত্য  
সত্যই যমরাজ সশরীরে হাজির হইবেন ।  
কিন্তু যম আসিয়া যখন সেই বৃদ্ধ কাঠুরিয়াকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমাকে ডাকিতে ছিলে  
কেন?” বৃদ্ধ অমনি উত্তর দিল—“এই কাঠের  
গোটা আমার মাথায় তুলিয়া দিতে ডাকিয়া-  
ছিলাম” । দীন দরিদ্র-অসহায়-জরাজীর্ণ-বৃদ্ধ মরি-  
বার প্রলোভন পাইয়াও সে মরিতে চাহিল না ।  
গগতে কেহই মরিতে চাহেনা, সকলেই চায়  
বাঁচিয়া থাকিতে । দীর্ঘজীবন সকলেরই  
কামনাব ধন । সাংসারিক আধিব্যাধির  
গণ্ডনয় অস্তিত্ব হইয়া অনেকেই বলে “মরণ  
ইহলে বাচি”, এটা কিন্তু প্রাণের কথা নহে ।  
যেতে থাকাই মানুষের চরম লক্ষ্য । দীর্ঘজীবী  
হইবার জন্ত মানুষ অনেক দিন হইতেই চেষ্টা  
করিয়া আসিতেছে । ভারতের মুনি-ঋষিরা  
দীর্ঘ জীবন লাভের জন্ত যোগাভ্যাস করিতেন,  
ভারতের আয়ুর্বেদে—দীর্ঘজীবন লাভের  
অনেক মহৌষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে । বাহারা  
আয়ুর্বেদ পাঠ করিয়াছেন,—তাঁহারা ইহা  
অবগুই জানেন ।

দীর্ঘজীবন লাভের জন্ত যুরোপের মনীষি-  
গণ যে কিরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, আজ  
আমি তাহারই একটু পরিচয় দিব । আজ  
কাল আমাদের দেশে দীর্ঘজীবী লোক বড়  
চেষ্টা—৩.

একটা দেখা যায় না । অতএব বাহাতে  
পরমাযু বৃদ্ধি পায়, এমন কথা সকলেরই  
শুনা উচিত । আমার বাহা বলিবার, বলিয়া  
যাই,—ঋষিরা দীর্ঘজীবন লাভের যে সকল  
উপায় নির্দেশ করিয়াছেন,—কোনও হুবিজ্ঞ  
আয়ুর্বেদবেত্তা তাহা সাধারণের গোচরীভূত  
করিবেন ।

“সজীবনী সূধা” পান করিলে, মৃত্যুবে  
জয় করা যায় । এই জন্তই সূধাভাণ্ড লইয়  
দেবাসুরে বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল,—  
আর্য্যজাতির ইহাই কল্পনা । এ কল্পনায়  
আর্য্যজাতির মধ্যে দীর্ঘজীবন লাভের যে কণ  
দূর আগ্রহ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়  
৩য় খণ্ডাঙ্কে—চীন-রাজ চিংটী “সুখদীপের  
সন্ধানে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন । সম্রাট  
এক বাজীকরের মুখে সংবাদ পাইয়াছিলেন—  
সুখদীপের অধিবাসীরা এক প্রকার সরবৎ  
প্রস্তুত করিয়া থাকে, সে সরবৎ পান করিলে  
আর মৃত্যুর ভয় থাকে না । বলা বাহুল্য এ  
পানীয়—সুধারই প্রকার ভেদ ।

এ কলুবময়ী কলিমুগে কাহারও ভাগ্যে  
সূধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । তবে কি কলিম  
মানব দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিবে না ?  
অধ্যাপক মেচিনী কফ—মর্ত্যে বসিয়াই এক  
স্বর্গীয় সুধার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন । সে  
সূধা হ্রস্বভ নহে, মূল্যবানও নহে, অল্প  
তাহাতে মানুষ দীর্ঘজীবী হইতে পারে । সে  
সুধার ইতিহাসই আজ আমি পাঠকগণকে  
কাছে কীৰ্ত্তন করিব ।

অধ্যাপক মেচিনী কফ—১৮৪৫ খৃঃ অব্দে  
কফ মার্কোভের চাকরোভে প্রাণে

হইয়াছিলেন। সামান্য কৃষক কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভাগ্য-দেবতার অনুগ্রহে—তিনি ওডেসার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে বরিত হইয়াছিলেন। ইহা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে—বিশ্চিকি রোগ কৃষসাত্রাজ্যের মহামারীর আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই সময়, কৃষ গবর্ণমেন্টের অনুরোধে মহাত্মা মেচিনিকফ জীবাণুতত্ত্বের পরীক্ষায় আত্ম নিয়োগ করেন। সেই অবধি জীবাণুতত্ত্ববাদে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য গণতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি অনেক রোগেরই যে ফ্যাগোসাইট (Phagocyte) নামক জীবাণুর আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি বৈজ্ঞানিক ভগতে অমর হইয়া থাকিবেন।

মানবদেহ বহুবিধ জীবাণুর দ্বারা পূর্ণ, ফ্যাগোসাইট তাহাদেরই অন্ততম। ইহারা রক্তের সহিত মিশিয়া সর্ব শরীরে বিচরণ করে। ইহাদের কার্য—শাস্তিরক্ষক পুলিশের কার্য। অর্থাৎ পুলিশ যেমন রাষ্ট্রের শাস্তি রক্ষা করিয়া থাকে, সমাজের অহিতকারী ব্যক্তিগণের অপরাধের শাস্তি বিধান করিয়া থাকে, অত্যাচার কার্যের প্রতিবিধান করিয়া দেশ রক্ষা করিয়া থাকে, ফ্যাগোসাইট শরীরের মধ্যে ঠিক এইরূপ কার্যেই দীক্ষিত। যদি কোন রোগ-বীজাণু শরীরে প্রবেশিত হইয়া শরীরকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হয়, ফ্যাগোসাইট তাহাতে আধা দেয়। ফ্যাগোসাইট—বিদ্যাতের মত ক্ষুদ্রগামী, ইহাদের ভ্রাম্যশক্তিও বড় তীক্ষ্ণ; কোন রোগ-বীজাণু শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মাত্র—ফ্যাগোসাইট তাহাদের আক্রমণ করে। সে আক্রমণে রোগ-জীবাণু প্রায়ই ধ্বংস হইয়া যায়। ইহারা যখন আক্রমণ করে,

দল বদ্ধ হইয়াই করে। সুতরাং ইহাদের হস্ত হইতে রোগবীজাণুর পরিভ্রাণের আশাই নাই। শরীর সুস্থ থাকিলে, এই ফ্যাগোসাইট অতি সহজেই রোগ-বীজাণুকে নিঃশেষ করিতে পারে। কিন্তু মানুষের দেহ যদি স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে ফ্যাগোসাইট বা বীজাণু ধ্বংসের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। ইহাতে তাহার দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন রোগ-বীজাণুগুলির সহিত মহা যুদ্ধে ফ্যাগোসাইট পরাস্ত হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় রোগ-বীজাণু—মানব-দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া, দেহকে রোগপ্রবণ করিয়া তুলে। মেচিনিকফ সাহেব—২৫ বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া এই ফ্যাগোসাইট জীবাণুর কার্য-কারিতা শক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন।

সম্প্রতি তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন, মানব—দেহে এই ফ্যাগোসাইটের সংখ্যা বাড়াইতে পারিলে, দেহে আর রোগ-বীজাণু প্রবেশ হইতে পারেনা। আবার দেহ রোগাক্রান্ত না হইলে সে দেহে জরা বা বার্ধক্য দেখা দেয় না। অধ্যাপক মেচিনিকফের বিশ্বাস—মানব-দেহে যে জরা বা বার্ধক্য দেখা দেয় এবং শরীরে বিকলতা বা জড়তা আদিয়া উপস্থিত হয়,—তাহা জীবাণুরই কার্য। অনেক জীবাণু আছে, যাহারা পেশী ও স্নায়ুর ক্ষয় সাধন করিয়া থাকে, তাহারই ফলে মানুষ জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার জীবনী-শক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

এই জরা সংঘটনকারী জীবাণুর দল মানব দেহের উদরের ভিতর বৃহৎ নালীর মধ্যে বাস করিয়া থাকে। অনেক রক্তের পরীক্ষার পর মেচিনিকফ এই বার্ধক্য জননকারী জীবাণু অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছেন।

সকল ক্ষয়কারী জীবাণুর হস্ত হইতে মানুষ কিসে মুক্তি লাভ করিতে পারে, মেচিনিকফ তহারও উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সে উপায় আর কিছুই নয়, দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত পদার্থ ভক্ষণ করা। কথাটা আরও একটু বিস্তৃত ভাবে বলিতেছি।

প্রথমতঃ দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লইতে হয়। তৎপরে, সেই দুগ্ধ জাল দিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা করিতে হয়। এইরূপ দুগ্ধে অল্প পরিমাণে দম্বল দিয়া দধি পাতিতে হইবে। এই দধি আহার করিলে, জরা সংঘটনকারী জীবাণুর পতন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অধিকন্তু এই দধির অম্লরসে—শরীর রক্ষক ক্যাগোসাইট গুলিরও পুষ্টিসাধিত হইয়া থাকে।

দধি প্রস্তুত করা কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু ইহার একটু বিশেষত্বও আছে। দধি পাতিবার দুগ্ধটা যেন বিস্কৃত হয়। আর

দম্বলটা যেন বুলগেরিয়া প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হয়। মেচিনী-কফ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বুলগেরিয়া প্রদেশের দুগ্ধজাত দধিতেই—সর্বশ্রেষ্ঠা শক্তিশালী বীজাণু জন্মিয়া থাকে।

আমাদের দেশে—মুনি ঋষিগণ—ফল-মূল ভক্ষণ ও দুগ্ধ পান করিয়া দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতেন। এদেশে দধি ও তক্রের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। আয়ুর্বেদে দধি ও তক্রের নানা গুণ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা দধি ভক্ষণ করি বটে, কিন্তু তাহা “চিনি পাতা।” এক্ষণে দধি শরীরের কোনও উপকারে আসে না। অম্লদধির উপকারিতা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—দোখীন বাঙ্গালি! তুমি “চিনি পাতার” মায়া কাটাইতে পারিবে কি? অম্লদধি ভক্ষণ করিয়া, মেচিনিকফের কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবে কি?

ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে।

( ক্যান্সেল হস্পিটালের ভূতপূর্ব হাউস সার্জন )

## বঙ্গ অজীর্ণ রোগের এত প্রাদুর্ভাব কেন ?

( ২ )

বাঙ্গালী জাতির বিলাসিতাও বহুকারণে প্ররোক্তভাবে অজীর্ণ রোগের হেতুভূত হইয়াছে। পূর্বে আমরা বিলাসিতার অল্প পরিচয়-হীনতার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্বে পরিচ্ছদের অল্প এক জন বাঙ্গালীর যাহা ব্যয় হইত, এখন তাহার অনেক অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। পূর্বে এক জোড়া চটী জুতা, একখানা খুতি ও চাদর

হইলেই চলিত। প্রাতঃস্নানীয় বিজ্ঞানসম্মত মহাশয় চটীজুতা এবং মোটা চাদর ব্যবহার করিয়াই দেশীয়-বিদেশীয়গণের নিকট সম্মানিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সার্ট, কোট, মোজা, বহুমূল্য জুতা কাপড়, রেশমী চাদর নহিলে সম্মান থাকে না। কাজেই খোরাকীর পরশা হইতে যতদূর পারি

পয়সা কাটিয়া লইয়া আমরা পরিচ্ছদ ক্রয় করি। সোজা কথায় আমরা পেটে না খাইয়া বাবু-রানা করি।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিলাসিতা পুরুষ অপেক্ষা জীলোকদিগের মধ্যে অধিকতর প্রবল। “তরল আলতা” হইতে আরম্ভ করিয়া বহুমূল্য নেকলেস পর্য্যন্ত ইহার ক্ষেত্র। রমণীদিগের এই বিলাসিতা অনেক শিশুপুত্রকে উপযুক্ত পরিমাণ হৃৎক হইতে এবং অনেক স্থানীকে উপযুক্ত পরিমাণ স্নানাদ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে।

অনাবশ্যক বিলাসিতাকে আমরা এত বাড়াইয়া তুলিয়াছি যে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

পথে যাইতেছি, দেখিলাম—এক জন কেরীওয়াল চিড়িয়া বাশী বিক্রয় করিতেছে। ৩৪ পয়সা দিয়া একটা বাশী কিনিয়া আনিলাম এবং পুত্রের হাতে দিলাম। পুত্র আনন্দে বাশী বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। পিতা মাতার কি আনন্দ? কিন্তু বাঙ্গালী-পিতা-মাতা, তোমাদের বুদ্ধি যদি বিলাসিতায় বিকৃত না হইত, তাহা হইলে তোমরা ইহাতে আনন্দিত না হইয়া দুঃখিত হইতে। পুত্রদিগকে বাশী বাজাইতে না দিয়া, সে পয়সা যদি তাহাদের পেটে খাওয়াইতে, তাহা হইলে কি শুভ ফলই না হইত!

বিলাসিতার আর একটা দ্রব্যের বিষয় উল্লেখ করিব,—সেটা কাঁচের চুড়ি। পূর্বে জীলোকেরা শাঁখা ব্যবহার করিত। একবার হুই গাছি শাঁখা কিনিলে বহুকাল চলিত। বাহাদের শাঁখা জুটিত না, তাহারা হুই গাছি কাড় হাতে দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রমানাথের জী রাঙা সূতা হাতে বাধিয়াই কত সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এখন

নিত্য নূতন চুড়ি উঠিতেছে, আর বাঙ্গালীর মেয়েরা নিত্য তাহা ক্রয় করিতেছে। নূতন এক রকম উঠিলে পুরাতন আর কেহ পাবে না। বাঙ্গালী জাতির এমনই করিয়াই না ক্রমশঃ অধঃপতন ঘটিতেছে। এই অধঃপতনই বাঙ্গালীর খাথাভাবের কারণ এবং তাহারই ফলে অজীর্ণ রোগের বাহুল্য ঘটিতেছে।

ভেজাল খাওয়ার প্রচলনও বঙ্গে অজীর্ণ রোগের একটি প্রধান কারণ। একে ত বাঙ্গালী খাইতে পায় না, তাহার উপর কষ্ট সৃষ্ট যদি কোন রকম করিয়া একটু তৈল, ঘৃত, ময়দা, চিনি সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাও ভেজাল। সর্ষপ তৈলে শোরগোঁজা প্রভৃতির তৈল, ঘূতে বাদাম তৈল, ময়দায় শাদা পাথর চূর্ণ প্রভৃতি কত রকম ভেজাল যে চলিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই সকল ভেজাল খাওয়া খাইলে যে অজীর্ণ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! খাদ্য নির্বাচন প্রসঙ্গে আমরা ইতঃপূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং পুনরুৎপন্ন অনাবশ্যক।

জীবন সংগ্রাম ও জীবিকা।—এই বিষয় প্রতিযোগিতার দিনে জীবিকাক্ষেত্রের জন্ত যে সকল সদগুণ অস্ত্রাস্ত্র জাতির মধ্যে আছে, বাঙ্গালীর তাহা নাই। একজন হিন্দু স্থানী লোটা-কঞ্চল হাতে করিয়া বাঙ্গালীর আসে। কিছুদিন ভিক্ষা করিয়া অথবা অল্প কোন উপায়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাপড়, ঘৃত বা পাপর মাধ্যম করিয়া বিক্রয় করে। কিছুদিন পরে একখানি ছোট মোকদ্দম করিয়া বসে। শেষে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া ধনী হইয়া পড়ে। প্রথম অবস্থায় সে খাও পয়সার চানা বা ছাড় খাইয়া জীবন যাপন করিত। শেষে দ্বিবিধ বহুমূল্য উপাদান

ও দেহের তৃপ্তি ও পুষ্টি সাধন করে। একরূপ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় বাঙ্গালীর নাই।

একজন কাবুলী কিছু হিং ও সালম মিছরি প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গালায় আসে। প্রথমে ঐ সকল দ্রব্য ফেরি করিয়া বেচিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। তা'র পর দুই আনা স্নদে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে গরম কাপড়ের ব্যবসায়ও (?) চলিতে থাকে। বাঙ্গালায় দরিদ্র কৃষক, কুলি, মজুর, এমন কি, অনেক দরিদ্র ভদ্রলোক তাহাদের নিকট টাকা ধার লয়, কাপড় খরিদ করে। ফলে তাহারা কৃষক-কুলি-মজুরদিগের অর্থ শোষণ করিয়া ক্রমশঃ অর্থবান হইয়া পড়ে, আর কৃষক প্রভৃতি ক্রমশঃই দুর্দশাগ্রস্ত হইতে থাকে। একজন কাবুলীর যেরূপ সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, স্বজাতি প্রীতি ও পরাক্রম আছে, বাঙ্গালীর তাহা নাই।

সর্বত্র একজনের এমন যথেষ্ট অর্থ থাকে না, যদ্বা। সে একাকী একটা ব্যবসায় চালাইতে পারে। সেইজন্য পাশ্চাত্য দেশে কয়েক জন লোকে মিলিয়া একটা কোম্পানী গঠিত করে এবং বহুলোকে সেই কোম্পানীর অংশ ক্রয় করে। ইহার ফলে একটা প্রকাণ্ড কারখানা বা ব্যবসায় স্থাপিত হয়। দেশের বহুলোক সেই কারখানায় প্রতিপালিত হয়, অনেকে অর্থবান হইয়া পড়ে, অংশ ক্রয়-কাবীবাও যথেষ্ট লাভ পায়। একরূপ কোন কারখানা বা ব্যবসায় চালাইবার ক্ষমতা বাঙ্গালীর নাই। বাঙ্গালা দেশে যে কয়েকটা ব্যবসায়ের কারখানা এইরূপে করা হইয়াছিল, সেগুলির শোচনীয় পরিণাম—বাঙ্গালীর এ বিষয়ে অক্ষমতার জলন্ত নিদর্শন। যদি এইরূপ করিয়া দুই একটা কোনমতে টিকিয়া থাকে, তাহা ধর্মব্য নহে। কেননা

বড় ধরণের সবগুলি কারখানারই অধঃপতন ঘটিয়াছে।

জীবন-সংগ্রামে এইরূপে পশ্চাৎপদ হওয়ায় বাঙ্গালী জাতি অত্যাচ্ছ জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট উপার্জন করিতে পারে না। উপার্জন যখন যথেষ্ট হয় না, তখন যথেষ্ট আহার জুটবে কোথা হইতে? হুতরাং উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালী জাতির অগ্নিবল যে ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

ফলে কৃষি এবং চাকরিই এক্ষণে বাঙ্গালীর জীবিকার্জনের প্রধান উপায়। তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াদিতেও অনেক লোকে জীবিকার সংস্থান করে। কিন্তু এই সকল লোকেও জীবিকা অর্জনের নিমিত্ত একরূপ অনিয়ম করিতে বাধ্য হয় যে, তাহাঁরই ফলে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে বিষয় বাদ দিয়া কেবল চাকরিজীবীদিগেরই কথা বলিব।

আমাদের দেশে পূর্বে লোকে সকাল-বিকালে কাজ করিত, মধ্যাহ্নে আহার করিয়া বিশ্রাম করিত। এখনও কৃষিজীবী এবং অনেক শ্রমজীবী তাহাই করিয়া থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এই প্রথা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কেননা দ্বিপ্রহরে অগ্নিবল প্রবলতম হয় এবং আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে ভুক্ত দ্রব্য স্বজীর্ণ হয়। কিন্তু এখন চাকরির জন্য সকলকেই ৮।৯টা বা দশটাত মধ্যাহ্নে আহার করিতে হয়, আর আহার করিয়াই কার্যক্ষেত্রে ছুটিতে হয়। শরীর কণ্ঠিত হইয়াছে যে, আহারের পর শরীর থাকিলে ভুঁড়ি হয়, শুইয়া থাকিলে শরীর শীতল হয়, ধীরে ধীরে পাদচারণা করিলে শরীর বহিষ্কৃত হয়, আর ছুটিতে হুত পিত্ত

ছুটিতে থাকে অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয় না বলিয়া সে ব্যক্তি শীঘ্রই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এক্ষণে চাকুরী-জীবী বাঙ্গালীর পশ্চাতে অজীর্ণরূপী মৃত্যু নিয়ত ছুটিতেছে।

শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে, আহার করিয়া ধীরে ধীরে একশত পদ চলিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে এবং মনের প্রিয় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ উপভোগ করিবে। এরূপ করিলে ভুক্তদ্রব্য অদূষিত থাকে। হৃৎথের বিষয় শাস্ত্রের এই হিতকর বাক্য পালন করা চাকরিজীবী বাঙ্গালীর অসাধ্য। আহারের পরে বিশ্রাম না করিয়াই কেহ পদব্রজে, কেহ ট্রামে, কেহ রেল—কার্য্যস্থলের উদ্দেশে গমন করেন, কার্য্যস্থলে গিয়া বিলম্বে আগমন জনিত ক্রুদ্ধ মণিবের রূপ-শব্দাদি অবশ্যই মনের প্রিয় হয় না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যে অজীর্ণ রোগ জন্মিবে, তাহাতে আর বিচিತ್ರ কি!

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আহারের পর ছই দণ্ড কাল শরীর ও মনের আয়াসজনক কোন কার্য্য করিবে না। পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসকগণও এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। আহারের পর ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের জন্য পাকস্থলীর কার্য্য আরম্ভ হয়। শরীরের যে অঙ্গ যখন কোন কার্য্য করে, তখন সেই অঙ্গে অধিকতর রক্ত সঞ্চালনের আবশ্যকতা ঘটিয়া থাকে। হস্ত দ্বারা কোন কার্য্য করিলে সঙ্গে সঙ্গে হস্তে অধিকতর রক্ত সঞ্চালিত হয়—ইহা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। আহারের পর হস্ত-পদাদির অতিরিক্ত চালনা করিলে সেই সেই স্থানে অধিকতর রক্ত সঞ্চালিত হয় বলিয়া পাকস্থলীতে যথেষ্ট রক্ত যাইতে

পারে না এবং সেই জন্য অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে। অধিকাংশ চাকরিজীবী বাঙ্গালীই এই জন্য অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকে।

সংযমাতাব।—সংযমের অভাবও অজীর্ণ রোগের অন্ততম কারণ। অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস বশতঃ অজীর্ণ রোগ জন্মে, অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাসে শরীর দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং পরমাশু হ্রাস পায়। পূর্বে লোকে ধর্ম্মপালন করিত বলিয়া এ সম্বন্ধে ভিধি—নক্ষত্র বিচার করিত। তাহাতে অনেকটা সংযম আসিয়া পড়িত। কিন্তু এক্ষণে লোকে ধর্ম্মে আস্থা শূন্য, বিধি-নিষেধ মানেনা এবং পালন করে না। ফলে সংযম একেবারেই দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। আর সংযমের অভাবে লোকে হীনবীৰ্য্য দুর্বল দেহ ও দুর্বল লাগি হইয়া পড়িতেছে।

বিবিধ ব্যাধির প্রাচুর্য্য।—অজীর্ণ যেমন বহু রোগের কারণ; প্রায় সমস্ত রোগই সেই-রূপ অজীর্ণের কারণ। শাস্ত্রে অজীর্ণরোগের যে সমস্ত কারণ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্যাধি দ্বারা শরীর ক্লেশ হওয়া একটা। বন্ধে আজকাল বিবিধ রোগের বিষম প্রাচুর্য্য এবং সেই সকল রোগে ভুগিয়া বাঙ্গালী জাতি দিন দিন ক্লেশ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ক্লেশ ও দুর্বল শরীরে অগ্নিবল কখনই প্রবল থাকিতে পারে না। সুতরাং বন্ধে বিবিধ ব্যাধির প্রাচুর্য্যবও অজীর্ণ রোগের প্রাবল্যের অন্ততম কারণ।

মানসিক বিকৃতি।—মনের সহিত শরীরের নিকট সম্বন্ধ। মন অস্থির হইলে শরীর এক শরীর অস্থির হইলে মন অস্থির হইয়া থাকে। বর্তমানে বাঙ্গালীজাতির মনের বেগম অশান্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার শরীরের পক্ষাঘাত

সমুদ্র হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ঈর্ষ্যা, ভয়, ক্রোধ, রোগ, দৈন্ত প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হইলে অন্ন সম্যক পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। বর্তমানকালে বাঙ্গালাজাতির মন ঐ গুলির অন্ততঃ দুই চিন্তা বিষয়ে পীড়িত। দৈন্তের ত কথাই নাই। দেশের প'নর আনা তিন পাই লোক দাবিদাপীড়িত। বাঙ্গালী জাতির গৃহ ভয়, শয়্য ছিন্নভিন্ন—মলিন, খাওয়ার পরিমাণ স্বল্প এবং জঘন্য, দেহ শীর্ণ ও দুর্বল, কাস্তি ম্লান, মুখ বিষন্ন। এই আমজ্জা পরিব্যাপ্ত দৈন্তকে পরিচ্ছদের আবরণে বৃথা ঢাকিয়া বাঙ্গালী জীবন যাপন করিতেছে। বৃথা বর্ণনাম—কেন না, বাঙ্গালার আকৃতিতে, ভঙ্গীতে, গমনে, উপবেশনে দৈন্ত স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। সূদূর পল্লী-গ্রামেব অবস্থা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। দরিদ্র পরাবাসীর চালে খড়, ঘরে অন্ন নাই; পরিধানে ছিন্ন-মলিন বসন, মুখ বিষাদমাখা, শরীর জীর্ণশীর্ণ। এই বিষম-দৈন্তদশায় পাত্ত-বাঙ্গালী যৎসামান্য শাক-অন্ন যাহা আদ্য করিতে পায়—তাহাও জীর্ণ করিতে পারে না। সুতরাং জাতীয় দৈন্তও অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাবের একটি প্রধান কারণ।

দৈন্ত কেবল বাঙ্গালীর আহার এবং বাস-স্থানেই সীমাবদ্ধ নহে। এই দৈন্ত অবস্থার উপর বাঙ্গালী বিবাহ করে তাহার ফলে পুত্র-কন্যা হয়। পুত্রকন্যা জন্মিবামাত্র তাহাদের আহারের জন্ত-দ্রব্ব এবং গাত্রাবরণের জন্ত বস্ত্রের চিন্তা করিতে হয়। তা'র পর পুত্র-কন্যা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিক্ষার ব্যয় এবং ভরণ-পোষণের ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িতে

থাকে। হয়ত ইতিমধ্যে আবার দুই একটা নূতন শিশু আসিয়া পিতামাতার আনন্দ এবং হুশিচিন্তা যুগপৎ বদ্ধিত করিয়া তুলে। তা'র পর কন্যার বিবাহের দায়। অধঃপতিত বঙ্গদেশের অধঃপতিত সমাজে কন্যার পিতাকে পাত্র ক্রয় করিতে হয়! ইহার উপর পিতৃদায়, মাতৃদায়, পুত্রের শিক্ষার ব্যয়, লৌকিকতা প্রভৃতি নানা উপসর্গ আছে। এই শত অভাব—অনটনের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালীর জঠরাগ্নি ক্রমশঃ মাথায় উঠিয়া পড়িতেছে। সুতরাং অন্ন জীর্ণ হইবে কিরূপে? দেশে একটা প্রবাদ আছে “ভাবনায় পেটের ভাত চা'ল'হ'য়ে যাচ্ছে” বা “ভাবনায় পেটের ভাত হজম হয় না?” ইহা অতি সত্য কথা-দেশব্যাপী। দৈন্ত যে দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগের একটি প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্বে বাঙ্গালীর যে মানসিক বল ছিল, তাহা বাঙ্গালী হারাইয়াছে, দুর্বল চিত্তসহজেই ক্রোধে-ঈর্ষ্যায়-ভয়ে বা শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে মন—ক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হইলে অন্ন সহজে জীর্ণ হয় না। সুতরাং মানসিক দুর্বলতাও অজীর্ণের একটি কারণ। বাঙ্গালী জাতি মানসিক বল হারাইল কিরূপে? সে সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাউক।

ধর্মহীনতার ফলে—আমরা মানসিক বল হারাইয়াছি। কেবল মানসিক বল নহে, বল ভিন্ন আরও অনেক জিনিষ হারাইয়াছি। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে, ইতর ব্যক্তিগণ তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। এই সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতির ধর্মহীনতার পরিচয়, পরিদেহ

জাতিরও ধর্মহীনতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালীর ধর্মে আস্থা ছিল। তখন প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে শালগ্রাম শিলা গৃহ-দেবতা রূপে বিত্তমান থাকিতেন। ঠাকুর পূজার জন্ত বাড়ীর সংলগ্ন একটু ফুলের বাগান করা হইত, ফুলের বাগান রক্ষার জন্ত ব্যায়াম করা হইত, ফুলের সৌরভে মন প্রফুল্লিত হইত। গৃহস্থ যে কোন দ্রব্য গৃহ দেবতাকে নিবেদন না করিয়া আহার করিত না। ইহার ফলে সমস্ত খাদ্যাদি পবিত্র-ভাবে রক্ষিত হইত,—কোনরূপ মলিনতা বা অশুচি খাদ্যাদি সংস্পর্শ হইত না। স্থলে গৃহস্থ গৃহ দেবতাকে অগ্রণী করিয়া উৎসব করিত। ঘুংথে গৃহস্থ গৃহ দেবতাকে অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করিত। স্তূপভূংথ গৃহ দেবতার ভিতর দিয়া গৃহস্থকে স্পর্শ করিত, তাই তাহাদের তীক্ষ্ণতা অনুভূত হইত না। পুত্র যেন পিতার অধীনে থাকিয়া, প্রজা যেন রাজার অধীনে থাকিয়া দিন যাপন করিত। এখনও যেন মধ্যাহ্ন সূর্য্যকর প্রতি-ভাসিত ঘণ্টারব মুখরিত পল্লী-ভবনের “সহস্রশীর্ষ পুরুষ সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাদঃ”—এই মহামন্ত্র আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইয়া শরীর পুলক কণ্টকিত করিতেছে।

আত্মপরতা চিন্তকে সন্নিগ্ণ ও দুর্বল করিয়া তুলে আর পরার্থপরতা চিন্তকে উদার ও সবল করিয়া তুলে। আমরা এত স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি যে, এখনকার দিনে অতিথি আমাদের নিকট এক মুঠ অন্ন পায় না। কিন্তু ৬০ বৎসর পূর্বে মধ্যাহ্নে সমাগত অতিথিকে নিজের আহারীয় দ্রব্য দিয়া ৫০-সামান্য কিছু আহার করিয়া গন্তব্য আশ্রয়স্থানে

হইয়াছে দেখিয়াছি। এইরূপ দেব-সেবা এবং অতিথি-সেবা করিয়া তখনকার দিনে গৃহস্থের যে একটা আত্মপ্রসাদ জন্মিত, সে আত্মপ্রসাদ শরীরকে ও মনকে সবল করিত।

অনেকে জানান যে, সাহেবেরা ছুটির দিনে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করিতে যাইয়া থাকেন। ইহাতে শরীর ও মন প্রফুল্ল হয়, অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে। পূর্বে ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যেও এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। গ্রামের অনতি-দূরে একটা বৃহৎ অশ্বখ বৃক্ষ পঞ্চানন ঠাকুর নামে খ্যাত ও পূজিত হইত। চতুর্পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—সকলে মিলিয়া সেই পঞ্চানন তলায় মধ্যে মধ্যে ন্যাঁথাইয়া থাকিত। তাহাতে যে কি আনন্দ—কি স্মৃতি—তাহা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। আরবদেশে একটা প্রবাদ আছে যে, যে দিন শিকার করিয়া বেড়ান হয়, সে দিন জীবনের দিনের মধ্যে গণনা করা হয় না। আমরাও বলি,—সেকালে যে দিন পঞ্চানন তলায় ন্যাঁথাইয়া থাওয়া হইত, সে দিন জীবনের দিনের মধ্যে গণনা করা হইত না। অপিচ এইরূপ দিনে যে কি ক্ষুধা হইত, তাহা অনুভব করিবার সৌভাগ্য লেখকের বালা-কালেই ঘটিয়াছিল।

একাদশী, অমাবস্তা এবং ভিন্ন ভিন্ন পূর্ণ দিনে উপবাস করা আমাদের ধর্ম্মাচরণের মধ্যে পরিগণিত। মধ্যে মধ্যে এইরূপ উপবাস করিলে যদি কিছু অজীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা নষ্ট হইয়া যায় এবং অগ্নি ক্রমশঃ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের অন্তান্ত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই উপবাস



প্রাচীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক চিত্তকর অন্বেষণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। বাস্তবিক ভাবে আমরা যে সকল বিষয়ের আর আলোচনা করিলাম না। অজীর্ণ রোগ যে কিরূপ পরিণাম-ভয়াবহ এবং কিরূপে বিবিধ কারণের সমন্বয়ে অজীর্ণ রোগের এত প্রাদুর্ভাব ঘটয়াছে—সেই বিষয়ই বলা হইল। এক্ষণে চূড়ান্ত অজীর্ণ রোগ কি কি কারণে জন্মিয়া থাকে তাহার আলোচনা করিব।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, অতিরিক্ত জল পান, বিবশাশন (অর্থাৎ কোন দিন অল্প, কোন দিন অধিক, কোন দিন ১০ টায়, কোন দিন ১৫ টায়—এইরূপ অনিয়মে ভোজন), মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ করা, নিদ্রা-বিপর্যায় (দিবসে নিদ্রা ঘাওয়া বা রাত্রি জাগরণ করা) প্রভৃতি কারণে কালে কাল এবং সামান্য দ্রব্য ভোজন করিলেও তদ্রূপ জীর্ণ হয় না। অপিচ, অভোজন, অতি-ভোজন, অসামান্য দ্রব্য (যাহা শরীরের পক্ষে চিত্তকর নহে) ভোজন, গুরু-শীতল ও অতি ক্ষুধা দ্রব্য ভোজন, সংকুচিত দ্রব্য (পচা, বাসি, কৃত্রিম প্রভৃতি) ভোজন, দেশ কাল ও ঋতুর বৈষম্য (স্বাভাবিক অবস্থার বিকৃতি) প্রভৃতি কারণে অগ্নি দুর্বৃত হয় এবং সেই দুর্বৃত অগ্নি লবুপাক অন্নও জীর্ণ করিতে পারে না।

পরিপাক যন্ত্রের কোন অংশের বিকৃতি ঘটিলেও অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে। দস্ত খাদ্যদ্রব্য পেষণ করিয়া পরিপাক কার্যের সহায়তা করে বলিয়া দস্তগুলিও পরিপাক যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। উত্তমরূপে চর্ষণ করিয়া আহার না করিলে দ্রুতদ্রব্য ভালরূপ জীর্ণ হয় না। দস্ত রোগ বশতঃ দস্ত—বিকৃত, শিথিল বা হ্রস্ব হইলে খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ষণিত হয় না,

কাজেই ভুক্ত দ্রব্য ভালরূপ জীর্ণ হয় না বলিয়া দস্তের অসুস্থতা বশতঃ অনেকের অজীর্ণ, উদরাময়, আমশয় প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় অসুস্থ দস্তগুলি ফেলিয়া, কৃত্রিম দস্ত বাধাইয়া লওয়া উচিত। এইরূপ করিলে অজীর্ণাদি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না।

লালা গ্রন্থি (Salivary gland), আমাশয় (Stomach), এবং অন্ত্রের বিকৃতি ঘটিলেও অজীর্ণ-রোগ উৎপন্ন হয়। পূর্বে যে অভোজন, অতিভোজন প্রভৃতি অজীর্ণের কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই সকল কারণেই উহাদের বিকৃতি ঘটয়া থাকে।

শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এক অঙ্গ অসুস্থ হইলে, অল্প অঙ্গও অঙ্গ-বিস্তার অসুস্থ হইয়া পড়ে। আমাশয়ে কোন গোলযোগ ঘটিলে মাথা ধরে, আবার প্রবল মাথাধরা হইলে ক্ষুধা বা আহারে ইচ্ছা হয় না। যক্ষের একটা শাখা ধরিয়া আকর্ষণ করিলে অন্ত্রাশ্র শাখাও যেরূপ আন্দোলিত হয়, ইহাও প্রায় তদ্রূপ। সুতরাং শরীরের যে কোনস্থান পীড়িত হইলেই অস্বাভাবিক পরিমাণে অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে সেই পীড়িত অঙ্গের পীড়ার উপশম হইলেই অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রসারিত হইয়া যায়। এক্ষণে অজীর্ণ রোগে পথ্যাপথ্য এবং অজীর্ণ রোগে যে সকল নিয়ম পালন কর্তব্য, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অজীর্ণ রোগে পথ্য—পুত্রাতন মিহি চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মংস্ত, শাক, বেতো, শাক, কচি মূলা, বেতের ডগা, সজিনার ডাঁটা, পাকা দেশী কুমড়া, কচি কাঁচকালা, শুকনো শাক, পাদাল, পটোল, বেগুন, নিমলাতা, উজ্জ, কাকরোল প্রভৃতির উরকারী, দ্রব

মধ্যে মুগের দাঁড়লের ঘূষ মাত্র, দাল নহে।

সর্ষপ তৈল, হিং, লবণ, আদা, যোয়ান, মরিচ, মেথী, ধনে, জীরা প্রভৃতি মসলার সংযোগে তরকারী রন্ধন করা যাইতে পারে। যেমন সহ্য হয়—অন্ন অন্ন মাখন বা ঘৃত সেবন করা কর্তব্য। কেন না—ঘৃত দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমে খুব অল্প মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বাড়াইতে হয়।

দুগ্ধ অজীর্ণ রোগে স্থপথ্য নহে। কারণ দুগ্ধ থাইলে জীর্ণ হয় না এবং উদরে বায়ু জন্মায়। কিন্তু দুগ্ধ পান অভ্যাস থাকিলে অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় দুগ্ধের সমান পরিমাণ জল-বার্লি মিশ্রিত করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা যুক্ত অজীর্ণ রোগে কখন কখন ইষদুগ্ধ দুগ্ধ পান করিলে বেশ উপকার হয়। অজীর্ণ রোগে তরল দান্ত হইতে থাকিলে তক্র বিশেষ উপকারী। দধির সিকি পরিমাণ জলের সহিত মিলাইয়া মন্থন করিয়া মাখন উদ্ধৃত করিয়া লইলে তাহাকে তক্র বলা যায়। এইরূপ অবস্থায় ছানার জলও স্থপথ্য। সর্দি-কাশ প্রভৃতি উপসর্গ না থাকিলে অজীর্ণ রোগে দধি স্থপথ্য।

সর্ষ প্রকার লেবু, দাড়িম, আঙ্গুর, পানিকল, ও মিছরি অজীর্ণ রোগে হিতকর। গুরুম জল এবং কটু ও তিক্ত দ্রব্য এই রোগে স্থপথ্য।

সহ্য হইলে দুই বেলা অন্নাহার করা যাইতে পারে। সহ্য না হইলে একবেলা অন্ন, আর একবেলা ঐষের মণ্ড, যবের রুটী বা জলবার্লি সেবন করা কর্তব্য। প্রবল অজীর্ণ রোগে আবশ্যক হইলে দুইবেলা অন্নাহার বন্ধ করিয়া অন্ন মণ্ড, ঐষের মণ্ড প্রভৃতি খাওয়া যাইতে পারে। এই রোগে তরকারী ব্যবহার যত কম

হয়—ততই ভাল। তরকারী চুবিয়া ছিবড়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। খাদ্য সংস্থার প্রসঙ্গের উপদেশ অনুসারে হিং, আদা, মরিচ প্রভৃতি পাচক দ্রব্য সংযোগে তরকারী প্রস্তুত করিলে সহজে জীর্ণ হয়।

অপথ্য—জোলাপ লওয়া, মল মুত্রের বেগ ধারণ, রাত্রি জাগরণ, পূর্নাহার জীর্ণ না হইতে ভোজন, দাল, মন্ত, মাংস, পুঁইশাক, পিষ্টক, গুড়, তালশাঁস, তালের ফোঁপল, দুগ্ধ, ছানা, ক্ষীর, সরবৎ, অধিক জলপান এবং সর্ষ প্রকার গুরুপাক দ্রব্য অজীর্ণ রোগে অহিতকর।

এক্ষণে অজীর্ণ রোগে বিশেষ হিতকর কতকগুলি নিয়মের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। ঐষ সেবন অপেক্ষা এই সকল নিয়ম পালনে অধিক উপকার হওয়া সম্ভব।

১। ব্যায়াম।—রীতিমত দুই বেলা ব্যায়াম করা কর্তব্য। অল্প ব্যায়ামের অভাবে সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যাহ দুই এক ক্রোশ করিয়া দুই বেলাই ভ্রমণ করা কর্তব্য।

২। আহার। (ক) উত্তমরূপে চর্কন করিয়া আহার করিবে। (খ) আহারের পূর্বে এবং পরে কিছুক্ষণ (প্রায় একঘণ্টা) পরিশ্রম করিবে না। (গ) আহারের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে জলপান করিবে না, এক ঘণ্টা পরে জল পান করিবে। (ঘ) মনে ক্রোধাদির উদ্বেক হইলে সে সময়ে আহার না করিয়া মন প্রশান্ত হইলে আহার করিবে। (ঙ) আহারের সময় এবং পরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত মন রাখিতে প্রবৃত্ত থাকে তাহা করা কর্তব্য। (চ) উৎকৃষ্ট আহার করিবে। (ছ) অত্যন্ত দ্রব্য না আহার করিবে। (জ) অত্যন্ত দ্রব্য না আহার করিবে। (ঝ) অত্যন্ত দ্রব্য না আহার করিবে।

আহার করিবে। (ক) নিত্য এক সময়ে আহার করিবে।

৩। জলপান।—অজীর্ণ রোগে অল্প জল পান করা উচিত। বাতশ্লেষ প্রধান অজীর্ণ রোগে দিন তিন চারিবার তিন ছটাক বা এক পোয়া করিয়া গরম জল খাইলে বিশেষ উপকার হয়। পিত্ত ও বাতপিত্ত প্রধান অজীর্ণ রোগে উষ্ণ পান অর্থাৎ হৃদ্য উদয়ের পূর্বে শীতল জল আধ সের তিন পোয়া পান করিলে সুফল পাওয়া যায়।

৪। নিদ্রা।—দিবা নিদ্রা এবং রাত্রি জাগরণ উভয়ই অজীর্ণ রোগের কারণ, সুতরাং দিবানিদ্রা এবং রাত্রিজাগরণ বর্জনীয়। রাত্রি ৯।১০ টার সময় নিদ্রিত হইয়া প্রত্যুষে শয্যা-ত্যাগ করিবে।

৫।—নিত্য কিছুক্ষণ মন কাহাতে প্রফুল্ল থাকে একপ নির্দোষ ক্রীড়া বা আমোদ আহ্লাদ করিবে।

৬।—সংযম অভাস করিবে।

## দিনচর্য্যা ।

যেকপ নিয়মে নিত্য আহার-বিহারাদি করিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। আয়ুর্বেদে সেই সকল নিয়ম দিন-চর্যা ও সদাচারের অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তারীতে যাহাকে হাই-জিন (Hygiene) বলে, শাস্ত্রোক্ত দিনচর্যা ও সদাচার বলিতে তাহাই বুঝায়। তবে স্বাস্থ্যনীতির (Hygiene)-কয়েকটা প্রধান অঙ্গ ধর্ম-শাস্ত্রের অনুশাসন বিধির অন্তর্ভুক্ত আছে। অপিচ, ঋতুচর্য্যাকেও ইহার মধ্যে গণনা করা উচিত।

শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন,—

আহার, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য—এই তিনটি শরীর ধারণের তিনটি স্তম্ভ স্বরূপ। এই

তিনটি, যথাযথরূপে সেবিত হইলে—বল, বর্ণ পুষ্ট এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়।

ইতঃপূর্বে ব্রহ্মচর্য্য প্রবন্ধে, ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবে এখানে ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত সংযম অবলম্বন বুঝাইতেছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে শরীর রক্ষার উপায় দুইটি প্রধান উপায়,—আহার ও নিদ্রার বিষয় আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ শয্যাভ্যাগ হইতে আলোচনা করা যাক। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ রাত্রি দুই ঘণ্টা বা ৩০ মিনিট থাকিতে) শয্যাভ্যাগ করিবে।

প্রত্যুষে শয্যাভ্যাগ করা স্বাস্থ্য রক্ষা ও দীর্ঘায়ু লাভের প্রশস্ত উপায়। শাস্ত্রে প্রাণনাশক যে ছয়টা বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, \* তন্মধ্যে প্রভাত কালে নিদ্রা সেবন একটা। প্রকৃতির অনুবর্তনকারী রোগহীন পশু পক্ষীদিগের প্রতিও দৃষ্টিগত করিলে, তাহারাও অতি প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া থাকে দেখিতে পাই। যাহা হউক স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি মাত্রেরই প্রত্যুষে শয্যাভ্যাগ করা উচিত। শয্যাভ্যাগ করিবার পরেই ভগবানের নাম স্মরণ করা কর্তব্য। ইহাতে মনের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, মন প্রশান্ত হয়, এবং অঙ্গ কারণে বিচলিত হয় না। এই-জন্ত অর্ঘ্য ঋষিগণ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া মহাবাক্য সকল অন্তরের সহিত আবৃত্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অনন্তর শরীরের বিষয় চিন্তা করিয়া শৌচ-কার্য্য সমাধা করিবে। শরীরের বিষয় চিন্তা অর্থে শরীর কেমন আছে, পূর্বাহার ভীণ হইয়াছে কিনা ইত্যাদি। এই প্রাতঃকালের শরীর চিন্তার উপরেই সমস্ত দিনের কর্তব্যের অবধারণ নির্ভর করিতেছে। অবশ্য স্বস্থ দেহে স্বস্থ ব্যক্তির ছায়াই দিনচর্য্যা করিতে হয়। কিন্তু অজীর্ণাদি ঘটিলে তাহাতে বিবেচনা পূর্বক স্নান, আহার, পরিগ্রহ প্রভৃতি দৈনিক রূপার নিয়মিত করিতে হয়। এক কথায় প্রকারান্তরে—এই স্থলে বলা হইল যে, শরীরের সামান্য কিছু ভাবান্তর ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকারে মনোযোগী হইবে।

ইহার পর, শৌচ-কার্য্য সমাধা করিবে। প্রত্যহ প্রাতে ঘোষিত মলোৎসর্গ হওয়া স্বস্থের লক্ষণ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল, তাহার পর, দন্ত ধাবন ও জিহ্বা নির্লেখন করিতে হয়। কষায়, মধুর, তিক্ত বা কটু রসাত্মক দন্ত কাষ্ঠ (দাঁতন) প্রশস্ত। নিম, খদির, মৌল, করঞ্জ, কবরী, আকন্দ, জর্জর প্রভৃতি বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার্য্য। ওঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার চূর্ণ, মধু, তৈল ও লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া দন্ত কাষ্ঠের অগ্রভাগ চিবাইয়া কুঁচির ছায় করিয়া উক্ত পদার্থ মাথাইয়া এক একটা দন্ত ঘর্ষণ করিবে। কিন্তু যেন দন্তমাংস আহত না হয়। এইরূপে দন্তধাবন করিলে জিহ্বা, দন্ত ও মুখের মল বহির্গত হইয়া যায়, মুখের চর্গন্ধ ও বিবসতা নষ্ট হয়, দন্ত সকল পবিত্রত হয় এবং আহারে কচি জন্মে।

গলরোগ, তালুরোগ, ওষ্ঠরোগ, জিহ্বা-রোগ, মুখ ক্ষত, শ্বাস, কাস, হিকা, বমি, মূর্ছা, মদাতায় (Alcoholism), অর্জিত ; (Facial paralysis), কর্ণশূল, দন্তরোগ ও হৃদ্রোগ থাকিলে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত নহে। কেবল পূর্বোক্ত চূর্ণ দ্বারা দন্ত মার্জনা করা কর্তব্য।

দন্তধাবনের পর স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, টিন বা লৌহ নির্মিত জিহ্বানির্লেখন (জিব-ছোলা) দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার রাখা উচিত। ইহাতে জিহ্বার মল দূরীভূত হয় এবং মুখ

\* জিহ্বা বৃদ্ধা পুষ্টি মাংস বালকান্তরুণং দধিঃ।

প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা মদ্য প্রাণ হরণি বট ॥

অর্থাৎ বৃদ্ধা স্ত্রী গমন, পচা মাংস আহার, শরৎকালের রৌদ্র সেবন, অসম্মান্য জাত দধি সেবন এবং প্রভাতে মৈথুন ও নিদ্রা সেবন এই ছয়টা গদ্যো গ্রাণনাশক। প্রাণ-অর্থে এখানে জীবিত্য (vitality)।

বিবরে সৌগন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার পব গণ্ডুধারণ করিবার জন্ত শাস্ত্রকারগণ বনিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তৈলের গণ্ডুধ ধারণ করিলে হস্ততে (চোয়ালে) বলজন্মে, স্বর বর্দ্ধিত হয়, অগ্নে রুচি জন্মে, কণ্ঠশোথ ও মুখশোথ হয় না, ঠোটকাটার আদৌ ভয় থাকে না, দন্ত সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং দৃঢ় মূল হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা দন্তশূলও নিবারিত হয়। এক্রপ করিলে অন্নদ্বা ভক্ষণ করিলেও দন্তহর্ষ (দাঁত শির শির করা) হয় না এবং কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া থাইতে পারা যায়। তৈলের গণ্ডুধ ধারণ একপ উপকারী, কিন্তু ছুংথের বিষয়, যে, এদেশে একেবারে ইহা চলিত নাই। যাহা হটক প্রত্যহ এক গণ্ডুধ তৈল খরচ করিয়া দেশের সকল ব্যক্তিই এই হিতকর নিয়মটা পালন করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন। তৈল-গণ্ডুধ ১৫ মিনিট মুখে ধারণ করিলেই উদ্বেগ দীপ্ত হইয়া থাকে।

অনন্তর তৈল মর্দন করিয়া স্নান করিবে। কৃত্তক পুনঃ পুনঃ তৈলাক্ত করিলে, চর্মে বাববার তৈল মাখাইলে—গাড়ীর ধুরায় তৈল দিলে—উহারা যেমন ভারসহ হইয়া থাকে, সেইকপ তৈলাভ্যঙ্গ দ্বারা শরীর দৃঢ় ও উত্তম স্বকৃ বিশিষ্ট হয়, বায়ুরোগ জন্মিতে পারেনা।

মস্তক তৈল দ্বারা আর্জ রাখিলে শিরঃশূল হয় না, খালিতা (টাক) ও পালিতা (চুল-পাকা) জন্মে না, কেশ সকল পতিত হয় না, কেশ সকল দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ ও দৃঢ় হয়, মস্তকের অস্থি সমূহের বল বর্দ্ধিত হয়, ইঞ্জির সকল প্রসন্ন হয়, স্বকৃ সুন্দর ও নির্মল হয়, এবং সহজে নিদ্রা হয়।

নিত্য কর্ণকুহরে তৈল প্রদান করিলে বায়ু জনিত কর্ণরোগ হয় না, মস্তান্তস্ত (ঘাড়ের শির টানিয়া ধরা) কিম্বা হস্তগ্রহ (চোয়াল নাড়িতে না পারা), উচ্চৈঃ শ্রুতি (চোঁচাইয়া বলিলে শুনিতে পাওয়া) কিম্বা বধিরতা রোগ জন্মে না।

বায়ু দ্বারা স্পর্শশক্তি জন্মে এবং স্বকৃই স্পর্শ জ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ। অথচ তৈল স্বকের পরম হিতসাধক। এইজন্ত নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ সেবীর গাত্রে আঘাত লাগিলে অভিঘাতজনিত পীড়া প্রবল হইতে পারে না, বল প্রয়োগ কার্য্য করিলেও সহসা শরীর পীড়িত হয় না। অভ্যঙ্গ বশতঃ জরা সহজে আক্রমণ করিতে পারে না।

পাদদেশে নিত্য তৈল মর্দন করিলে পদের ক্ষয়স্থ শুষ্কতা, ক্রম্বতা, অবসন্নতা এবং মানি সম্বন্ধে নষ্ট হয়, পদদ্বয় স্কন্ধুমার, সবল ও দৃঢ় হয়, দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়, বায়ু প্রশমিত হয়, গৃহসী রোগ (Sciatica) হয় না, পা কাটিয়া যায় না। এবং পাদের শিরা বা স্নায়ুর স্ফোটক হয় না।

শরীরে আমদোষ থাকিলে, অজীর্ণরোগে এবং বমন-বিরেচনের পর তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। কারণ ইহাতে অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

স্নান—পবিত্রতাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ু বর্দ্ধক। শ্রম শেষ ও মলনাশক, বশকারক এবং অত্যন্ত ওষোবর্দ্ধক, অশিচ দ্বন্দ্ব করিলে দ্বাহ ও পিপাসা দূর হয়, মস্তক ইঞ্জির বিশোধিত হয়, মনের প্রীতি হয়, অঙ্গ পরিষ্কৃত হয় এবং অগ্নি উদ্বীপিত হয়।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, উষ্ণ জল দ্বারা অধঃকার (মস্তক বাতীত সমস্ত শরীর) ধৌত করা সুখজনক। কিন্তু মস্তকে উষ্ণ জল দিলে একশ ও চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে। সেইজন্য উষ্ণ জল দ্বারা অধঃশরীর ধৌত করিয়া মস্তকে শীতল জল বা উষ্ণজল শীতল করিয়া তদ্বারা ধৌত করা উচিত। কিন্তু বাত-শ্লেষ্মপ্রকোপজনিত রোগে অবস্থা বিবেচনায় উষ্ণ জলদ্বারা মস্তক ধৌত করা ও ঘাইতে পারে।

শীতকালে অত্যন্ত শীতল জলে স্নান করিলে বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়। আবার উষ্ণকালে অত্যন্ত উষ্ণ জলে স্নান করিলে রক্ত ও পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে। সুতরাং এতদুভয়ই বর্জনীয়।

যাহাদের শরীর সুস্থ,—তাহাদিগের পক্ষে শ্রোত-জলে স্নান করাই প্রশস্ত। কলের জল বহুক্ষণ মৃত্তিকার নিম্নে রুদ্ধ থাকে বলিয়া রোদ্র ও বায়ুর সংস্পর্শবশতঃ কিঞ্চিৎ দূষিত হইয়া পড়ে। যাহারা নিত্য গঙ্গাস্নানে অত্যন্ত, কলের জলে স্নান করিলে তাহাদের সর্দি হয় দেখিয়াছি। কলের জলে স্নান করিতে হইলে জল ধরিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ রোদ্রে রাখা উচিত।

যাহাদের শরীরে বায়ু বা শ্লেষ্মা অথবা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ আছে, তাহাদের পক্ষে অধঃশরীর উষ্ণজলে ধৌত করিয়া মস্তকে উষ্ণ জল শীতল করিয়া তদ্বারা ধৌত করা কর্তব্য। শিশুপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে শীতল জলে স্নান করাই হিতকর।

উষ্ণ জলে স্নান করিতে হইলে কিরূপ উষ্ণ জলে স্নান করা উচিত? এক কথায় ইহার উত্তর—সুখোষ্ণ জলে অর্থাৎ জলের যে পরিমাণ

উত্তাপ থাকিলে তাহা শরীরের সুখকর হইয়া থাকে—তাহাতেই স্নান করা উচিত। উষ্ণজলই হউক, শীতল জলই হউক—যাহা শরীরের সুখকর হয়, সেইরূপ জলে স্নান করা উচিত।

অতিসার, জ্বর, কর্ণশূল, বিবিধ বায়ুরোগ, আখান (পেটফোলা) রোগ, অকৃচি এবং অজীর্ণ রোগে স্নান করা নিষিদ্ধ। আহার করিয়া, পরিশ্রম করিয়া, রোদ্র সেবন ও ভয় পাইবার পর কিম্বা শরীর ও মন সুস্থ না হইলে কদাচ স্নান করিবে না।

প্রসঙ্গক্রমে শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য বিষয়ের গুণ লিখিত হইতেছে।

বস্ত্র ধারণ—নির্মাল বস্ত্রধারণ আয়ুঃপ্রদ ও অলক্ষ্যী নাশক।

গন্ধমালা সেবন—পুস্ত বর্দক, সুগন্ধজনক, আয়ুঃপ্রদ, পুষ্টি ও বলপ্রদ। ইহা মনের তৃপ্তি-জনক।

রত্নালঙ্কার ধারণ—শ্রেষ্ঠতাব্যাজক, মঙ্গল-কর, আয়ুঃপ্রদ, ত্রীজনক, মনের হর্ষজনক, এবং ওজোবর্দ্ধক।

পাছুকা ধারণ—চক্ষুঃ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের হিতকর, পদদ্বয়ের বিপদ নিবারক, বলকর, গমনে সুখকর এবং পুংস্তবর্দ্ধক।

শরীরের কেশাদিকর্তন—কেশ, নখ, ঋশ্র কর্তন—দেহের হর্ষও লঘুতা সম্পাদক, সৌভাগ্যজনক, উৎসাহ বর্দ্ধক, পবিত্রতা সম্পাদক এবং রূপ ব্যাজক।

কেশ প্রসাধন—কেশ প্রসাধন (চুল আচড়ান) দ্বারা মস্তকের ধূলি, উকুন ও বল দূর হয়, কেশের উৎকর্ষ ঘটে এবং ত্রী সম্পাদিত হয়।

অনুলেপন (পায়ে-চক্ষুরাশি-মুখের ও অন্যান্য অঙ্গের উপর) —ইহা সৌভাগ্যজনক, বলকর

ওজঃ ও বলবর্দ্ধক এবং শ্বেদ হ্রগন্ধ, বিবর্ণতা ও শ্রমনাশক। বাহাদিগের পক্ষে মন নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে অনুলেপনও নিষিদ্ধ।

ছত্র ধারণ—ছত্র ধারণ দ্বারা বৃষ্টি, বায়ু, ধূলি, রোদ্র ও হিম নিবারিত হয়। শরীরের বর্ণ ভাল থাকে, চক্ষুদ্বয়ের হিত হয়, ওজঃ বর্দ্ধিত হয়।

দণ্ড ধারণ—দণ্ড (লাঠি) ব্যবহার করিলে কৃক্কর, সর্প প্রভৃতির ভয় নিবারিত হয়, পদ স্থান হয় না, শ্রমের লাভ হয় এবং উৎসাহ, বল, স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

উষ্ণীয় ধারণ—মস্তকে উষ্ণীয় ধারণ করিলে কেশ পবিত্র থাকে এবং বায়ু, আতপ ও ধূলা লাগিতে পারে না।

শৌচ—পাদদ্বয় এবং মল মার্গ সকল ধৌত করিয়া গুচি রাখিলে আয়ু ও মেধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শরীর পবিত্র থাকে।

শরীর পরিমার্জন—নিত্য গাত্র মার্জন করিলে শরীরের হ্রগন্ধ ও গুরুতা নষ্ট হয়, তন্দ্রা, কণ্ঠ ও মল দূর হয়, শরীরের কদর্য্য ভাব নষ্ট হয় এবং আহারে রুচি জন্মে।

উদ্বর্ত্তন—অঙ্গে কুশুম-হরিদ্রাদি মর্দনকে উদ্বর্ত্তন বলে। ইহা দ্বারা মেদ, কফ ও বায়ু নষ্ট হয়, অঙ্গ সকল দৃঢ় হয় এবং চন্দ্র নির্মল হইয়া থাকে।

সংবাহন (গা টেপান)—সংবাহন নিদ্রা ও প্রীতিজনক। পুস্ত বর্দ্ধক, কফ, বায়ু ও শ্রম নাশক, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের প্রসন্নতা কায়ক এবং সুখজনক।

পাদ প্রক্ষালন—পাদ প্রক্ষালন করিলে পদের মল দূর হয়, পদে রোগ হয় না, শ্রম দূর হয়, চক্ষু ভাল থাকে, পুস্ত বর্দ্ধিত হয় এবং প্রীতি জন্মে।

উপবেশন—বসিয়া থাকিলে হৌলা, সৌকুমার্য্য ও সুখ বর্দ্ধিত হয়।

পথ পর্য্যটন—পথ পর্য্যটন করিলে হৌলা ও সৌকুমার্য্য নষ্ট হয়। অতিরিক্ত পথ পর্য্যটন করাও দৌর্য্যল্য জনক।

সংক্রমণ (পাইচারী করা)—পাইচারি করিলে দেহের কষ্ট হয় না, আয়ু, বল, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল শক্তি শালী হইয়া থাকে।

শয্যাশন—উৎকৃষ্ট অর্থাৎ কোমল বিস্তীর্ণ, এবং যথেষ্ট উপাধানাদিযুক্ত শয্যায় শয়ন করিলে সুখে নিদ্রা হয়, শ্রম ও বায়ু নষ্ট হয় এবং বীৰ্য্যের পুষ্টিলাভ হয়। হৃৎকজনক শয্যায় শয়ন করিলে হিয়ার বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

বাজন (পাথার বাতাস)—বাজন দ্বারা মুখাদির শুষ্কতা, দাহ, ত্রণ, মুচ্ছা ও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

বায়ু সেবন—নির্মল বায়ু সেবন করিলে আয়ু ও আরোগ্য লাভ হয়।

আতপ ও ছায়া—রোদ্র সেবন করিলে তৃষ্ণা, পিত্ত, শরীরের উত্তাপ, শ্বেদ, মুচ্ছা, ভ্রম ও রক্তদোষ জন্মে এবং ছায়া সেবন দ্বারা ঐ সকল নষ্ট হয়।

ব্যায়াম—শরীরের আমাশ অর্থাৎ পরিশ্রব জনক কার্য্যমাত্রকেই ব্যায়াম বলা যায়। নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিলে অতিরিক্ত জনিত কোন রোগই আক্রমণ করিতে পারে না। ব্যায়ামের পর সর্ষ শরীর উত্তমরূপে এবং সুখজনকভাবে মর্দনকরান উচিত।

ব্যায়াম দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, অঙ্গ শ্রোত সকল সুবিত্তক হয়, কাষ্ঠি বর্দ্ধিত হয়, শরীর দীর্ঘি হয়, আগ্রহ থাকে না, শরীর শিথিল হয় ও দৃঢ় হয়, এবং কাষ্ঠি, বিশাস, পিত্ত

ও গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারা যায় এবং পরম আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। ব্যায়ামের দ্বার্য শরীরের হোলানাশক আর কিছুই নাই। ব্যায়ামশীল ব্যক্তিকে সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারে না। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির শরীরের মাংস দৃঢ় হয়। ক্ষুদ্র যুগ সকল যেমন সিংহকে আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ ব্যায়াম ও উত্তরনকারী ব্যক্তিকে রোগ সকল আক্রমণ করিতে পারে না, ব্যায়ামকারী ব্যক্তির তরুণ বয়স না থাকিলেও তাহাকে দেখিলে সুন্দর বোধ হয়। নিত্য ব্যায়াম করিলে বিরুদ্ধ (দুষ্ক মংস্ত্র একত্র ভোজন)—যে কোন প্রকার গুরু খাদ্য আহাৰ করা যাউক না কেন, তাহা নির্দোষরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

বলবান এবং শিথিল ভোজনকারী ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ হিতকর। শীতকালে এবং বসন্ত কালে ব্যায়াম বিশেষরূপে হিতকর।

বলের অর্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম করিবে। ইহার অধিক করিলে মৃত্যু ঘটয়া থাকে। জনস্বাস্থ্য বায়ু যখন মুখে উপস্থিত হয় অর্থাৎ যখন হাঁপাইতে হয় বা হাঁ করিয়া শ্বাস টানিতে হয়, তখন অর্ধেক বল পরিমাণ ব্যায়াম করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রাস্তরে কথিত হইয়াছে যে, যখন বগল, কপাল, নাসিকা, এবং হস্ত পদাদিতে ঘর্ষ সঞ্চার হইবে এবং মুখ শুষ্ক হইবে তখন বলের অর্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

বয়স, বল, দেহ, দেশ, কাল, ও খাদ্য লব্ধক লক্ষ্য রাখিয়া ব্যায়াম করিতে হয়। ইহার অভাব করিলে রোগ জন্মিয়া থাকে।

অতিরিক্ত ব্যায়ামবশতঃ ক্ষয়, তৃষ্ণা, অরুচি,

বমি, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লান্তি, কাস, শোথ, জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।

রক্তপিত্ত, শোথ, শ্বাস, কাস, ভ্রম ও কৃত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির এবং জ্বীসহবাসবশতঃ ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ। আহাৰের পর ব্যায়াম করা কর্তব্য নহে।

শাস্ত্রে ব্যায়াম সম্বন্ধে যথেষ্ট লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রোক্তি নিয়ে পরিষ্কৃত করা যাইতেছে।

ব্যায়ামের উপকারিতা—ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে যাহা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, তাহার উপর কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু ব্যায়াম ব্যতীত শরীর যে সুস্থ থাকিতে পারে না, সে সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

কোন সময়ে এক ঋষি—মানবকিমে নীরোগ হয়—এই বিষয় বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতে ছিলেন। এমন সময় একটা পক্ষী বৃক্ষাশ্রমে উড়িয়া আসিয়া সেই বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইল। পক্ষীমাত্রই মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া থাকে, এই পক্ষীটাও বৃক্ষ শাখায় বসিয়া ডাকিল। কিন্তু পাখীর ডাকে একটু বিশেষ ছিল। পাখী ডাকিল, “কোহরক্।” পক্ষী আপনাতত্ত্ব শব্দই করিয়াছিল, কিন্তু তরুতলস্থ ঋষি সেই ডাক শুনিয়া মনে করিলেন, যে আমি যাহা ভাবিতে ছিলাম,—পাখী সেই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছে “কোহরক্” অর্থাৎ নীরোগ কে? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ঋষি উত্তর করিলেন, “হিতভূক্” অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিতকর দ্রব্য ভোজন করে সেই নীরোগ। কিন্তু ইহাতে পাখীর ডাক ঠাট্টা নহে। পাখী আবার ডাকিতে লাগিল “কোহরক্।” ঋষি ভাবিলেন যে,—উত্তর সমস্তকই ঋষি



চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কেবল হিতকর দ্রব্য খাইলেই নীরোগ হওয়া যায় না, সমান পরিমাণে আহার করা আবশ্যক। কারণ হিতকর দ্রব্যও অল্প বা অধিক পরিমাণে আহার করিলে রোগ হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি উত্তর করিলেন,—‘হিতভুক্ মিতভুক্’ অর্থাৎ হিতকর দ্রব্য পরিমিত মাত্রায় যে আহার করে সেই নীরোগ। কিন্তু অত্ৰাপি পাখীর ডাক ধমিল না। পাখী আবার ডাকিতে লাগিল ‘কোহরুক্?’ ঋষি ভাবিলেন, এবারেও উত্তর নমাক হয় নাই। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কেবল হিতকর দ্রব্য পরিমিত ভাবে আহার করিলেই শরীর সুস্থ থাকেনা, পরিমিত আহার ব্যতীত ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবে কিরূপে? এখান তিনি উত্তর করিলেন, ‘হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুকরশ্চ,’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিতকর দ্রব্য পরিমিত ভাবে আহার করে এবং পরিশ্রম করিয়া আহার করে, সেই নীরোগ। পাখীটী যেন উত্তরে সম্মুখে হইয়াই অস্ত্র চলিয়া গেল।

ব্যায়াম কাহাকে বলে—পূর্বেই বলা হইয়াছে! শরীরের আয়াস বা শ্রমজনক কার্যের নাম ব্যায়াম। অস্ত্র কথিত হইয়াছে যে, শরীরের যে চেষ্টা দ্বারা দেহ দৃঢ় ও সবল হয় তাহাকে ব্যায়াম বলে। ফলতঃ যাহাতে শরীরের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ় হয়, তাহাকেই সম্পূর্ণ ব্যায়াম বলা যায়। পথ পর্যটন দ্বারাও আয়াস হয় বটে কিন্তু পদব্রজ বৈরাগ্য সঞ্চালিত হয়, অস্ত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেরূপ সঞ্চালিত হয় না। কুস্তি, ডান করা প্রভৃতিও ব্যায়াম পদ বাচ্য। অধুনা স্যাক্সো সাহেবের আবিষ্কৃত নানা প্রকার উত্তম ব্যায়ামের প্রচলন হইয়াছে।

কুস্তি-মজুর প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর লোক  
চৈত্র—৫

যথেষ্ট পরিশ্রম করে বলিয়া তাহাদের আর স্বতন্ত্র ব্যায়াম করিবার আবশ্যক হয় না। যে সকল মরিদ্র জীলোক সংসারের যাবতীয় কার্য করিয়া থাকেন, তাহাদেরও যথেষ্ট শ্রম হয় বলিয়া স্বতন্ত্র ব্যায়াম অনাবশ্যক। এতদ্ভিন্ন অস্ত্র সকলেরই নিত্য নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করা কর্তব্য। বিশেষতঃ আজকাল গাড়ী-ঘোড়া—যান বাহনের প্রাচুর্যের দিনে লোকে বেশী হাঁটিয়া চলে না, পূর্বে ভদ্রলোকে কোন দ্রব্যাদি বহিয়া লইয়া যাইতে সজ্জিত হইত না। কিন্তু এখন লোকে শ্রমসাধ্য কোন কার্য স্বহস্তে করা অপমানজনক বোধ করে। সেইজন্য সকলের পক্ষেই নিত্য কিছুক্ষণ ব্যায়াম করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যায়াম হীনতা দেশে অজীর্ণদি বিবিধ রোগের প্রাবল্যের মূল।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, বলবান এবং শিথিল ভোজনকারীদের পক্ষে ব্যায়ামে অভ্যস্ত হওয়া হিতকর। ইহাতে বিপর্যয় বাক্যের বৈপরীত্য দ্বারা বুঝা যায় যে, দুর্বল এবং রুক্ষভোজীদের পক্ষে ব্যায়াম হিতকর নহে। বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে দুর্বল এবং রুক্ষভোজী। সুতরাং এখনকার বাঙ্গালীর ব্যায়াম করিতে হইলে অল্প মাত্রায় ব্যায়াম করা উচিত। অল্প ব্যায়াম দ্বারা ক্রমশঃ শরীরের বল বর্দ্ধিত হইলে পরে সম্যক ব্যায়াম করা যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রিষ্ণ শিথিল (দুত মাখন প্রভৃতি) ভোজনও আবশ্যক।

বয়স, বল, শরীর, দেশ, কাল ও কার্য-সম্বন্ধে বিচার করিয়া ব্যায়াম করা উচিত। বয়স অর্ধে বালা ও বৃদ্ধ অবস্থায় ব্যায়াম করা উচিত নহে। বালকেরা যে কুটুম্বী করিয়া

খেলা করে, তাহাতেই তাহাদের যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। বৃদ্ধ বয়সে ব্যায়াম করিবার সামর্থ্য থাকে না এবং এই বয়সে সংক্রমণ (পাইচারি করা) হিতকর। যৌবনে সম্যক এবং প্রোট বয়সে সহ্য মত ব্যায়াম করা উচিত। বলবানের পক্ষে সম্যক ব্যায়াম করা কর্তব্য। দুর্বলের পক্ষে অল্প ব্যায়াম বা সংক্রমণ হিতকর। কৃশ শরীরে অল্প ব্যায়াম করা বা সংক্রমণ করা উচিত। মধ্য-শরীরীর সম্যক ব্যায়াম করা উচিত। স্থূল শরীরে সহ্যমত ব্যায়াম করা উচিত। অবশ্য ব্যায়াম হোলা নাশক বলিয়া স্থূল শরীরীর যথেষ্ট ব্যায়াম হিতকর। কিন্তু সহ্য না হইলে অনিষ্ট ঘটয়া থাকে।

শীতপ্রধান দেশে অধিক এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অল্প ব্যায়াম সহ্য হয়। শীত ও বসন্তকালে অধিক এবং অস্ত্রান্ত ঋতুতে অল্প ব্যায়াম করা উচিত। শিথ ও বহুভোজীদিগের পক্ষে অধিক এবং কৃক ও অল্প ভোজীদিগের পক্ষে অল্প ব্যায়াম করা উচিত।

অতিরিক্ত ব্যায়ামের দোষ পূর্বে কথিত হইয়াছে। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্যায়াম, হাস্ত, ভাষ্য (কথা বলা), পথ-পর্যটন মৈথুন ও রাজিঙ্গাগরণ—কর্তব্য হইলে অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিবে না। কারণ এই সমস্ত এবং এইরূপ অন্তান্ত বিষয় যে ব্যক্তি অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করে,—গজ যেমন সিংহকে আকর্ষণ করিলে বিনষ্ট হয়—সেইরূপ সে ব্যক্তিও সহসা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে আজকাল অনেক দুর্বল বালকদিগকে অতিরিক্ত ব্যায়াম করিতে দেখা যায়। শাকারাহারী দুর্বল বালকগণ হুবক

জলে ভিজিয়া বা রৌদ্রে পুড়িয়া একঘণ্টা বা ততোধিক কাল ফুটবল খেলিলে অতিরিক্ত ব্যায়াম করা হয় বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এইরূপ অতিরিক্ত ব্যায়াম সর্বথা পরিত্যজ্য। অতিরিক্ত নিদ্রা সেবনও অহিতকর। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—

“সুখ, দুঃখ, গুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, সমস্তই নিদ্রার আয়ত্ত। অকালে নিদ্রা সেবন করিলে বা একেবারে নিদ্রা সেবন না করিলেও পরমায়ু ক্ষয় করিয়া থাকে।

সত্য ও সিদ্ধিপ্রদ বুদ্ধি যেমন যোগিগণকে ভজনা করে, সেইরূপ যুক্তিযুক্তভাবে নিদ্রা সেবন করিলে সুখ ও দীর্ঘ আয়ুঃ মহাশয়কে আশ্রয় করে।

এক্ষণে দেখা যাউক—যুক্তিযুক্ত রূপে নিদ্রা সেবন কাহাকে বলে? প্রথম রাত্রিতে শয়ন করিয়া শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করিলেই যুক্তিযুক্ত রূপে নিদ্রা সেবন করা হয়। দিবসে নিদ্রা যাওয়া এবং রাজিঙ্গাগরণ—উভয়ই অহিতকর। অত্যধিক দিবানিদ্রা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ, শিরঃশূল, শরীর আর্দ্রব্রণাভাব্যৎ বোধ, শরীরের গুরুতা, অঙ্গ মর্দ (গা আড়ামোড়া করা), অগ্নিমান্দ্য, হৃদয়ের কফপিত্ততা, শোথ, অরুচি, গা বমি বমি করা, নাকমুখ দিয়া জল পড়া, আধ্বকপালে, গায়ে চাকা চাকা দাগ হওয়া, পিড়কা, কণ্ঠ, তন্ত্রা, গলরোগ, শ্বিত ও বৃদ্ধির নাশ, স্রোতঃ সমূহের রোধ, অর, ইন্দ্রিয় সমূহের দুর্বলতা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। অপিচ, দিবানিদ্রা শরীরের বিকৃত কারক এবং রাজিঙ্গাগরণ ককতা কারক। কিন্তু বসিয়া বসিয়া ধূমান বা তদ্রূপ নহে এবং অতিশয় নীচ নহে।

দিবানিদ্রা এইরূপ অহিতকর নহে।

কালে শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হয়, বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রি অত্যন্ত ছোট বলিয়া এই সময়ে দিবানিদ্রা হিতকর। অপিচ যে সকল ব্যক্তি গীত, অধ্যয়ন, মন্ত্ৰ, মৈথুন শ্রমজনক কর্ম, ভারবহন ও পথ পর্য্যটন বশতঃ রুক্ষ হইয়াছে, অজীর্ণরোগ গ্রস্ত, ক্ষত রোগ গ্রস্ত, ক্ষীণ, বৃদ্ধ, বালক, ও দুর্বল ব্যক্তি, তৃষ্ণা, অতিসার, শূল, ঝাঁস ও হিকা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, রুক্ষ উচ্চস্থান হইতে পতিত ও আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি, উন্মাদ-বোগী, যানারোহণ ও রাত্রি জাগরণ বশতঃ ক্লান্ত ব্যক্তি, ক্রোধ, শোক ও ভয়পীড়িত ব্যক্তি এবং দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকর।

যাহাদের শরীর মেন্দো বহুল, যাহারা নিত্য মেহ পান করে, যাহাদের শরীরে শ্লেষ্মা অধিক, যাহারা শ্লেষ্মা জনিত রোগগ্রস্ত এবং যাহারা বিষপীড়িত—তাহাদিগের পক্ষে দিবা নিদ্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

যে সকল ব্যক্তির নিদ্রা হয় না, তাহাদের পক্ষে তৈলাভ্যঙ্গ, গাত্রে হরিদ্রাদি মর্দন, স্নান,

জলচর জন্তুর মাংসরস, শালি তণ্ডুল, দধি, হৃৎ, ঘৃত, মন্ত্ৰ, মনের সুখ, মনের প্রিয় গন্ধ ও শব্দ, গা টেপান, চক্ষুর তর্পণ, মস্তকে ও মুখে স্নগন্ধি দ্রব্য লেপন, প্রশস্ত শয্যা শয়ন, সুখময় গৃহে বাস প্রভৃতি হিতকর। এই সকল দ্রব্য নষ্ট-নিদ্র ব্যক্তির নিদ্রা পুনরানয়ন করে।

দেহ সম্বন্ধে আহার যেরূপ আবশ্যক, নিদ্রাও সেইরূপ আবশ্যক। আহার ও নিদ্রা হইতে শরীরের রুশতা বা স্থূলতা সম্পাদিত হয়।

নিদ্রা নানা প্রকার, যথা, তমোগুণ বশতঃ উৎপন্ন, শ্লেষ্মাধিক্য হইতে উৎপন্ন, মন ও শরীরের শ্রম হইতে উৎপন্ন, আগন্তুক হেতু হইতে উৎপন্ন, রোগ ধর্ম্মে উৎপন্ন এবং রাত্রির স্বভাব হইতে উৎপন্ন। তন্মধ্যে রাত্রির স্বভাব হইতে যে নিদ্রা উৎপন্ন, সেই নিদ্রাকেই যথার্থ ভূতধাত্রী (জীবের প্রতিপালন কারিণী) বলা যায়। যে নিদ্রা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন, তাহা পাপের মূল এবং অস্তান্ত নিদ্রা রোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

## চরকোক্ত পঞ্চকর্ম সাধন ।

[ বমন ও বিরেচনের ক্রিয়া ] ।

বমনেতে উর্দ্ধদিকে দোষ হৃত হয় ।  
বিরেচনে অধোদিকে হরে তা' নিশ্চয় ॥  
অথবা শরীর মল করে নিঃসরণ ।  
উভয়ের সংজ্ঞা তাই হয় বিরেচন ॥  
বিরেচন দ্রব্য সব করিলে সেবন ।  
স্ববীৰ্য্য প্রভাবে করে হৃদয়ে গমন ॥  
ধমনী সংযোগে স্থূল স্বক্ক স্রোতঃ হতে ।  
ওষু দোষ দ্রব করে আয়ের হেতুতে ॥

স্ব স্ব স্থান হইতে উহা তীক্ষ্ণতা কারণ ।  
বিচ্ছিন্ন হইয়া পরে হয় নিঃসরণ ॥  
বিচ্ছিন্ন ও দ্রবীভূত হইবার আগে ।  
শরীরেতে যেই জন স্নেহাদি প্ররোগে ॥  
তাহাতে সলিল তাহা না থাকে কখন ।  
স্নেহাভ্যঙ্গ পাত্রে মধু না লাগে যেমন ॥  
প্রবলক হেতু তাহা আশাশ্রয়ে মায় ।  
অগ্নি, বায়ু ও গুণে উহা উর্দ্ধদিকে ধায় ॥

ক্ষিতি—জলাশয়ক হেতু অধোগামী হ'বে।

উভয় সংযোগে উহা হৃদিকে বহিবে ॥

তীক্ষ্ণ মধ্য ও মূহু বিরেচনের লক্ষণ।

তীক্ষ্ণ, মধ্য মূহুভেদে বমি-বিরেচন।

বিশেষ লক্ষণ তার করহ শ্রবণ ॥

বিনা বেগে দ্রব মল মহা বেগে বয়।

পায়ুতে অত্যন্ত ক্লেশ অশূল হৃদয় ॥

আমাশয় ক্ষীণ করি কুৎস্ন দোষ সরে।

সে নিরুহ বিরেচনে তীক্ষ্ণ বলি ধরে ॥

ঔষধ জলায়ি কিম্বা কীটে হুষ্ট নহে।

দেশ কাল গুণ যুক্ত তুল্য বীৰ্য্য রহে ॥

প্রয়োগ হইলে কিছু অধিক মাত্রায়।

স্নেহ স্বেদ পরে যুক্ত তীক্ষ্ণ হয় তার ॥

পূর্বোক্ত মাত্রা ও গুণে কিছু হীন হ'লে।

স্নেহ স্বেদ যোগে যুক্ত মধ্য বীৰ্য্য বলে ॥

ক্লম্ব জনে মন্দ বীৰ্য্য, হীন মাত্রা আর।

বিরুদ্ধ দ্রব্য সংযোগে মূহু সংজ্ঞা তার ॥

ইহাতে সম্যক দোষ না করে হরণ।

শুদ্ধ নাহি হয় তাতে বলবানগণ ॥

এ ঔষধে:সিদ্ধি লাভে ইচ্ছা করে যেই।

মধ্যম ও হ্রস্বল জনে প্রয়োগিবে সেই ॥

সমস্ত মধ্যম, অল্প ব্যাধির লক্ষণ।

তীক্ষ্ণ মধ্য, মূহু তারে কহে সুধিগণ ॥

রোগী ও রোগের বল অপেক্ষা করিয়া।

তীক্ষ্ণাদি ঔষধ বৈদ্য দেখে প্রয়োগিয়া ॥

ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম।

বমন-ঔষধ পান করিবার পরে।

দোষ না সারিলে তাহা পুনঃ পান করে।

পিত্ত দরশন নাহি হয় যতক্ষণ।

পুনঃ পুনঃ বমি তারে করাবে তখন ॥

ত্রিবিধ রোগ ও রোগী বল অপেক্ষিয়া।

প্রয়োগ বা সর্বস্বত্যাগে কাশাদি বুঝিয়া ॥

ঔষধ নির্গত কিম্বা জীর্ণ যদি হয়।

অথবা দোষ নির্গত যদি তাতে নয় ॥

তবে পুনর্বার সিদ্ধি লিপ্সু চিকিৎসক।

প্রয়োগ করিবে তাকে দোষ নিঃসারক ॥

পরিপাক পূর্বে দোষ করে নিঃসরণ।

বমন ঔষধে, তথা দিলে বিরচন ॥

পচ্যমান কালে দোষ নিঃসরণ করে।

পাকের অপেক্ষা তেঁই বমনে না ধরে ॥

দোষ নিঃসরণ বিনা জীর্ণ বা বমিত।

হ'লে বিরেচনোষ পুন তাতে হিত।

দীপ্তাগ্নি ও বহুদোষ, স্নিগ্ধ অতিশয়।

তাহাদের কষ্টে হয় শোধন নিশ্চয় ॥

শোধনের দিন তার ক্রিয়া না হইলে।

ভুক্তান্তে পাইবে ক্রিয়া পরে দিন দিলে ॥

বহু দোষ হ্রস্বলের সহজে না সরে।

দোষ পরিপাক পরে মলাদি নিঃসরে ॥

বিরেচন দিয়া তারে না দিবে রেচন।

সারক আহারে হবে মল নিঃসরণ ॥

বমি বিরেচনে যদি বিগুদ্ধ না হয়।

পানাহার অবাস্তরে শেষ দোষ ক্ষয় ॥

শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ।

## টোটকা ও মুক্তিযোগ।

—:—

শরীরের হ্রস্বক—

(১) কদম্বের পাতা, লোধ ও অর্জুন পুষ্প

এই তিন দ্রব্য সমানভাগে কপূর, লবঙ্গ, মরিচ, বাটিকা গায়ে সেপন করিলে শরীরের হ্রস্বক

নষ্ট হয়। (২) রক্তচন্দন বেণারমূল, বালা, তেজপত্র, কুলের আটির শাঁস, অণ্ডক ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া, জল দ্বারা উত্তমরূপে বাটিয়া গাত্রে মাখিলে শরীরের চিরকালের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে। (৩) হরিতকী, লোধ, নিমপাতা, ছাতিম ছাল ও দাড়িসের খোসা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে। (৪) হরিতকী, মুখা, রক্তচন্দন, নাগকেশর বেণাব মূল, লোধ, কুড় ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া একত্রে গাত্রে লেপন করিলে বর্ষজন্মিত দুর্গন্ধ নিবারণ হয়। (৫) মোটা এলাচ, শঠী, তেজপত্র, রক্তচন্দন, হরিতকী, সজিনাছাল, মুখা, কুড় এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। (৬) কাঁচা হরিদ্রা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গাত্রে মাখিলে শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

মুখের দুর্গন্ধ—

(১) আমের আটির শাঁস, জামের আটির শাঁস ও পদ্মের মূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গাত্রে মুখে ধারণ করিলে মুখে দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া সুগন্ধ উৎপন্ন হয়। (২) পিঙ্গলী চূর্ণ, ঘৃত ও নধু একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া সুগন্ধ বাহির হয়। (৩) মুরামাংসী, নাগকেশর ও কুড় এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে লেহন করিলে সকল প্রকার দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রণ ও মেচেতা—

(১) মন্থর, কলাই ও কপূর সমান ভাগে লইয়া জলে উত্তমরূপে চন্দনের সহিত বাটিয়া

বহুবার প্রলেপ দিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

(২) শিমূল বৃক্ষের কাঁটা, কাঁচা ছন্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডস্থলজাত ত্রণ আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) ধনে, বচ, শৈলজ ও লোধ এই চারি বস্তু সমান রূপে লইয়া জলে পেষণ করতঃ মুখে লেপন করিলে মুখ জাত ত্রণ আরোগ্য হয়। (৪) ঋত সর্ষপ ও তিল তৈল সমান ভাগে ছন্ধের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে মুখের লাভণ্য বৃদ্ধি হয়। (৫) মনছাল, লোধ, দাঙ্ক হরিদ্রা, হরিদ্রা ও সর্ষপ সম ভাগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখের ত্রণ ও কৃষ্ণবর্ণ দাগ নষ্ট হইয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

কেশের সৌন্দর্য্য সাধন—

(১) পুরাতন লোহার ঝামা, জ্বাপুষ্ণ ও আমলকী সমান ভাগে জলে বাটিয়া মস্তকে লেপন করিলে অতি অল্পকাল মধ্যে অকাল পক শূক্ৰবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। (২) হরিতকী বহেড়া, ইক্ষুরস, ভুদরাজের রস এবং কৃষ্ণবর্ণ মুক্তিকা সম ভাগে লইয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শীঘ্র শূক্ৰবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। (৩) গুজা ফল, মধুর সহিত পেষণ করিয়া মস্তকের যে স্থানে চুল উঠিয়া যায়, সেইস্থানে লেপন করিলে কৃষ্ণবর্ণ অতি সূত্রী চুল উৎপন্ন হয়। (৪) ধাটুমধু, নীলহলী পুষ্প, হুচমুখীর মূল তিল, গব্যদ্ব্যত, ছাগ দুগ্ধ ও ভুদরাজ পত্র সম ভাগে জলে বাটিয়া কেশহীন স্থানে প্রলেপ দিলে কৃষ্ণবর্ণ ঘন কেশ উৎপন্ন হয়। (৫) তিল বৃক্ষের মূল, পাভী ছুট ও লোধ ছাল সম ভাগে জলে পেষণ করিয়া গব্য দ্ব্যতের সহিত মিশ্রিত লেপন করিলে সঘন ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশ উৎপন্ন হয়। (৬) হাড়ীর পাত, লোধ ছাল, কপূর

করিয়া ভাহার সহিত সম ভাগে রসাজন মিশ্রিত  
করিয়া কেশহীন স্থানে লাগাইলে শীঘ্র কৃষ্ণবর্ণ  
কেশ উৎপন্ন হইয়া হইয়া থাকে।

খুশকি, মরামাস ও উকুন—

(১) বেলের মূলের ছাল, গোমুত্রের সহিত  
বাটিয়া মস্তকে লেপন করিলে সমস্ত উকুন  
মরিয়া যায়। (২) তিল তৈল, বিড়ঙ্গ ও গো  
মুত্র প্রক্ষেপ দিয়া জাল দিয়া নামাইয়া লইবে।  
উহা মস্তকে মর্দন করিলে চুলের উকুন, খুশকি  
ও মরামাস নষ্ট হইয়া থাকে।

দক্ষ রোগের ব্যবস্থা—

(১) দক্ষ স্থান ভাল করিয়া চুলকাইয়া  
সৌদালপাতার রস মর্দন করিলে শীঘ্র  
প্রশমিত হয়। (২) শোধিত গন্ধক ওজন  
করিয়া সমভাগে চিনির সহিত লইয়া সরিষার  
তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে  
দক্ষ নষ্ট হইয়া থাকে। (৩) দক্ষস্থান ভাল  
করিয়া চুলকাইয়া রসনের রস মর্দন করিলে  
সকল প্রকার দক্ষই শীঘ্র আরোগ্য হইয়া  
থাকে।

ছুলির ঔষধ—

(১) পাতিলেবু, বচ ও সোহাগার খই

একত্রে মিশাইয়া ছুলির উপর মর্দন করিলে  
ছুলি শীঘ্র আরোগ্য হয়। গের্ণড়োলেবুর রস  
মর্দন করিলেও ছুলি আরোগ্য হয়।

পদ্ম কাটা—

মুখে সাদা সাদা চক্রের ভ্রায় দক্ষর মত  
একরূপ চর্মরোগ উৎপন্ন হয়, উহাকে সাধারণ  
লোকে পদ্মকাটা বলে।

পদ্মের পাতা ও ডাঁটা অগ্নিতে ভস্ম করিয়া  
লইয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া  
প্রলেপ দিলে পদ্মকাটা শীঘ্র আরোগ্য হইয়া  
থাকে।

পাঁকুই বা হাজা—

(১) পাঁকুই বা হাজা অতি জঘন্ত রোগ।  
উহা প্রায় জ্বীলোক দিগের হাতে ও পায়ে  
দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত জলে  
থাকিলে ঐ রোগ উৎপন্ন হয়। (২) বাবলা  
পাতার কাথ, অশ্বখের আঠা ও খদির সম ভাগে  
মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জাল দিয়া উহা একটু  
নরম অবস্থায় নামাইবে। ঐ কাথ লাগাইলে  
অচিরে পাঁকুই বা হাজা বিদূরিত হয়। (৩)  
ভাল আলতা জলে গুলিয়া গরম করিয়া  
লাগাইলে পাঁকুই নষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেন গুপ্ত।

## সমালোচনা।

∴∴

আয়ুর্বেদীয় ধাত্রী বিদ্যা সংগ্রহ  
খণ্ড। কবিরাজ শ্রীহরিমোহন দাশগুপ্ত  
কবিরাজ প্রণীত। প্রকাশক—কবিরাজ  
জিনিষিল রজন সেন গুপ্ত, কবিভূষণ, বহরমপুর,  
বঙ্গব্রহ্ম ঔষধালয়। মূল্য ১ টাকা। সাধারণ  
লোকের বিশ্বাস, কেবল জীর্ণ-জটিল রোগেই

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা চলিতে পারে, আয়ুর্বেদীয়  
চিকিৎসক শত্রু প্রয়োগ-বিধিতে অভ্যস্ত নহেন,  
ধাত্রী বিদ্যার শিক্ষাও তাঁহাদের নাই। এ  
ধারণা যে অমূলক, তাহাই লক্ষ্যমান কবিরাজ  
জল গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি প্রসিদ্ধ করিয়া  
ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের সত্য প্রমাণ

নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, শৃঙ্খলার সহিত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাই এ পুস্তকে লিখিত। প্রত্যেক শ্লোকের সরল বাঙ্গালা অর্থ লিখিয়া তন্নিম্নে প্রমাণকরণ উদ্দেশে মূল শ্লোক গুলিও দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ধাত্রীবিদ্যার সকল গুণ রহস্যই তিনি এ পুস্তকে সুকোশলে প্রথিত করিয়াছেন। ক্ষতকাল হইতে সম্ভব পালন পর্যন্ত কিরূপ নিয়মে

দ্বীজাতির কালক্ষেপ করা কর্তব্য, তাহার কোন কথাই গ্রন্থকার বাদ দেন নাই। রমণিগণ এ গ্রন্থ পড়িয়া অনেক কথা শিখিতে পারিবেন। তবে পুস্তক খানির মূল্য আর একটু কম করিলে ভাল হইত। ৮০ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য ১ টাকা হওয়া উচিত নহে, প্রতি কপি ১/০ হিঃ ১১/০ এবং বাধানর জন্ত আরও ১/০—মোট ৫০ করিলেই বেশ হইত। যাহা হউক আমরা এ পুস্তক পড়িয়া সুখী হইয়াছি।

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

:১০:

মাদক দ্রব্য।—সুত্র, সিদ্ধি, গাঁজা, অহিফেন, চরস এবং কোকেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহারে ভারতবাসীর যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া, সংপ্রতি ইংলণ্ড, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের অনেক গুলি প্রথিত নামা চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞাপন পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে এইরূপ লিখিত আছে,—“বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা দ্বারা ও ভূগোদর্শনের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে,—(ক) সুত্র, কোকেন, অহিফেন, সিদ্ধি, গাঁজা ও চরস বিষ। (খ) ভারতবর্ষের স্রায় উক্ত প্রধান দেশে ঐ সকল বিষ অত্যন্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলেও স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল মাদক দ্রব্য কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দীর্ঘকালের জন্ত দূর করিতে পারে না। (গ) বাহারা সুত্রাপান বা অস্ত্র কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন না, তাঁহারা মাদকসেবীদের অপেক্ষা অধিক কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম এবং সকল প্রকার সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে

আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন। (ঘ) সুত্রাপানের কুফল এক পুরুষ পরেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। (ঙ) ছুঁতক উপস্থিত হইলে সুত্রাপানী ব্যক্তিগণ অতি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (চ) সুত্রাপানের ফলে প্লেগ নিবারণ করিতে পারা যায় না। (ছ) ম্যাগেরিয়া এবং যক্ষ্মারোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে সুত্রাপানিগণ অতি শীঘ্র ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। বাহারা সুত্রাপানী নহেন, ঐ সকল বীজাণু তাঁহাদিগকে সহজে স্ক্রিষ্ট করিতে পারে না। (জ) সুত্রা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সিদ্ধি, গাঁজা, চরস, অহিফেন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। (ঝ) এইজন্য আমরা ভারতবাসীদিগকে অত্নরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের হস্ত হইতে দূর থাকিয়া তাঁহাদের সনাতন শাস্ত্রমতে সামাজিক প্রথাভঙ্গারে পানাহারের বিষয় কখন।” সনাতন শাস্ত্রাদেশ এবং সামাজিক প্রথা ভুলিয়াই তো আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে। বিবর্তন সত্য।—নিখিল

জাতির সম্মিলনে কলিকাতায় যে “বিদ্যুৎ সভার” প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যাবলীর ঊর্ধ্বে উদ্দেশ্য—“আয়ুর্ষেদের উন্নতি ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা।” কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে তাহার কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। ঐ সভার মুখপত্র—‘ধনুস্তরিতে’ও চিকিৎসা বিষয়ক কোন প্রবন্ধ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়,—সভা এখনো এ বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকতার অবস্থা দিন দিন যেরূপ চাকরিতগত প্রাণে শোচনীয় হইতেছে, তাহাতে বরপণ নিবারণের মত আয়ুর্ষেদ শিক্ষার জন্তও এই সভার কর্তৃপক্ষগণের উষ্ণিয়া-পড়িয়া লাগার দরকার হইয়াছে। আমরা আশা করি, সভার কর্তৃপক্ষগণ আমাদের এই যুক্তিপূর্ণ কথা-গ্রহণে কালবিলম্ব করিবেন না।

আয়ুর্ষেদ সম্মেলন।—শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনাথ নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ষেদ সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, শ্রীযুক্ত লাল্লা সৈন্যদাস আয়ুর্ষেদ প্রদর্শনী সমিতির সভাপতি এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত কাশীরাম প্রদর্শনীর শুভাবধায়ক মনোনীত হইয়াছেন।

দান।—মালদহ-টাটালের বদান্তবর রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর প্রাপ্তি কলিকাতা-অনাথ আশ্রমে পাঁচ হাজার, বোবা ও কালাদিগের স্থলে দুই হাজার এবং বৈজ্ঞানিক কুঠাশ্রমে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আগামী ৮ই চৈত্র তাঁহার পুত্রের উপনয়ন, সেই উপলক্ষে নৃত্য গীতাদিতে অর্থের অপব্যয় না করিয়া এই দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশের ধনকুবেরদিগের তো এইরূপ মতি গতি হওয়াই কর্তব্য।

পরলোক।—কলিকাতার অতিবৃদ্ধ কবিরাজ কুমারটুলির দুর্গাপ্রসন্ন সেন মহাশয় গত ১ চৈত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়সক্রম ৯০ বৎসর হইয়াছিল। ইনি একজন সুপণ্ডিত ও সূচিকিৎসক ছিলেন। ইদানিন্তনকালে ইঁহার মত বৃদ্ধ বৈজ্ঞ কলিকাতায় আর কেহ ছিলেন না। আমরা ইঁহার বিয়োগে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিয়াছি। ভগবান ইঁহার শোক সমুপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তি প্রদান করুন।

অকাল মৃত্যু।—আমরা আর একটি উদীয়মান যুবক কবিরাজের অকাল মৃত্যুতে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। ইঁহার নাম কবিরাজ রাখালচন্দ্র সেন, এল-এম-এল। গত ১লা চৈত্র ইনি আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া, বন্ধু-বান্ধব দিগকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া, চির দিনের জন্ত অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি সনাতন আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসা রূতি অবলম্বন পূর্বক যথেষ্ট উন্নতি করিতেছিলেন। ইনি যুবা মাত্র—ইঁহার বিয়োগে ইঁহার পরিবার বর্গের বিলম্ব কতি হইল।

বৈজ্ঞ বান্ধব সমিতি।—গত ৩রা চৈত্র ৩১-৩৫, শিবনারায়ণ দাসের লেনে বৈজ্ঞ বান্ধব সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। অনেক গুলি বৈজ্ঞ সন্তান এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন সভাপতি হইয়াছিলেন। সময়োপযোগী দুই খানি সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। কয়েকজন বক্তা বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। এরূপ আত্মীয় সম্মিলনের কাল যেরূপ স্নেহ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।



# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

২য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫—বৈশাখ ।

{ ৮ম সংখ্যা ।

নব বর্ষে প্রার্থনা ।

—•••—

এস নূতন বর্ষ—হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,  
তাহে হউক মত্ত চিত্ত তাহারি ক্ষিপ্ত আকুল করা ।  
তব হাশ্ব জড়িত আসাথানি  
অঙ্গ মাঝারে রঞ্জ ছানি’—  
ওগো হউক মগ্ন ভগ্ন-হৃদয়—যুচুক রুগ্ন-জরা ।  
এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,  
এস শান্ত করিতে তুরক-হিয়াটি—রুদ্ধ যাতনা তরা ।  
কণ্ঠে তোলহ রাগিণী-দীপ্ত,  
অমিয়-বর্ষণে করহ সিক্ত,—  
ওই সুধার বর্ষণে স্নাত-তনুটি রহক তোমাতে গড়া ।  
এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,  
তব মঙ্গল-গীতি বহুক বঙ্গে ভাপ-দহন-হরা ।  
স্নুক স্মৃতিটি করহ লুপ্ত,  
লুক আশাটি রাখহ গুপ্ত,  
ওগো স্নিক করহ দক্ষ-হৃদয়—তপ্ত কালুকা-চড়া ।

এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,  
 ওগো অতীত কাহিনী লুপ্ত করিয়া লইয়া নূতন ছড়া।  
 মর্ম্ম মাঝারে মর্ম্ম রাশি  
 গর্ব্ব-বাতাসে বহুক আসি—  
 তাহে পুণ্য-হাসিটি উঠুক ফুটিয়া—শুভ্র-বসন পরা।  
 এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,  
 তাহে ইউক মত্ত চিত্ত তাহারি ক্ষিপ্ত আকুল করা।

ত্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

## SURGEON সুর্গত।

### [ প্রথম অধ্যায় ]

সে এক উন্মাদনাময় সাহসের কথা।  
 এখনও সে ঘটনা, নীলাকাশে নক্ষত্র-ধবল-  
 ছায়াপথের মত, প্রাচীরের স্থিতি-পথে সমুজ্জ্বল!  
 দেশের তখন বড় দুর্দিন। সমাজে দুইটি দলে  
 স্নাতিমত সমর ঘোষণা আরম্ভ হইয়াছে। এক-  
 দল অতীতের অমুরাগী হইয়া “রক্ষণ শীলতার”  
 পরিচয় দিতেছেন। অপর দল “সংস্কারের  
 ধূয়া ধরিয়া প্রাচীন প্রথা পদদলিত করিতেছেন!  
 একে অস্ত্রের ছায়াঘেষণ করিয়া, হাসি-কান্নার  
 ইন্দ্রধনু গড়িতেছেন! বাঙ্গালার তখন এইরূপ  
 বিভীষিকাময়ী অবস্থা। সর্ব্বত্রই ভাঙা-গড়ার  
 বিপুল আয়োজন, উত্থান-পতনের অপূর্ণ দন্দ!  
 এই উদয়ান্তের সন্ধিক্ষেত্রে—নববৃগের অভ্য-  
 সনের সূচনার বাঙ্গালার সকল কেন্দ্রেই এক  
 একজন মহাপুরুষ “অবতারের” মত অবতরণ  
 করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের কথা  
 আজ আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা  
 কেবল মধুহৃদয় গুপ্তের কীর্ত্তি-কাহিনী ইঙ্গিতে  
 উল্লেখ করিব।

যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময়  
 বাঙ্গালার বিজ্ঞান-জগতও বিশৃঙ্খল। যদিও  
 বৌদ্ধগুণে ভারতের শস্যতন্ত্র নাম-শেষে পরিণত  
 হইয়াছিল, তথাপি সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে  
 ইষ্টক-প্রস্তরাদি আহরণ করিয়া অনেকেই  
 শিল্প-সুসমাময়-সৌধ-হর্ম্মা নির্মাণ করিতে  
 ইতস্ততঃ করেন নাই। ভারতেরই কেবল এ  
 চেষ্টা ছিল না। ভারতের দেখাদেখি—  
 বাঙ্গালারও অধঃপতন ঘটয়াছিল। বাঙ্গালী  
 অতীতের স্নানাময়ী স্থিতি ভুলিতে আরম্ভ  
 করিয়াছিল। স্বাধীন চিন্তাকে অভিনবন  
 করিবার প্রবৃত্তিই বাঙ্গালীর ছিল না। শাস্ত্রের  
 শাসন-নীতির অমুজ্ঞা, বাঙ্গালীর মেধা-মনীষার  
 বিকাশ-পথ বিঘ্ন-বাধায় নিবিড় করিয়া তুলিয়া  
 ছিল।

“আয়ুর্বেদ” বাহাদের জাতীয় জীবনে  
 সারাদিপিসার স্বর্গীয় বিজ্ঞতি, তাহাদেরই অমূল্য  
 পুরুষ—স্বপ্না-কুটিল-নেত্রে আয়ুর্বেদের ইন্দ্র  
 উপেক্ষার অপাক নিক্ষেপ করিয়াছিল।

বর্ণের গুরু—তাহারাই প্রথমে প্রত্যক্ষের অর্থাদায় আত্মনিয়োগ করিয়া, আপ্তবাক্যের উপব নিভরশীল হইয়াছিলেন। যে শরীর—“শরীর বিজ্ঞানের” সর্বস্ব, বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক শরীরের গঠন-কোশল বৃদ্ধিতে চাহিতেন না। তাহার শিখিয়াছিলেন—মৃত শরীর স্পর্শে অস্তিত্ব হইতে হয়। সমাজে তখন শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা পাপের কার্য। তপোবনের পাষণ্ড-বেদিকায় বসিয়া ‘খমি যে’ দিন—“কুশলেনাভি পন্নং তদ্বচনাভি প্রবোহতি” বলিয়া রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেদিন সেই জীবন্ত বৈজ্ঞানিক ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও বৃদ্ধিতে পারেন নাই—তদীয় আবির্ভাবকালের সাক্ষী দ্বিসহস্র বর্ষ পরে তাহারই বংশধরগণ—তাহার আশা আকাঙ্ক্ষাকে এইরূপে অন্তর্জলি করিবে।

অন্য আড়াই হাজার বৎসর পরে—অপ-ধর্মের মালিন্য ও অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারের মাঝে, বঙ্গের ভূখণ্ড-শোকদীর্ঘ-জরা-মরণ-জীর্ণ নবলোকে, বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনের আবির্ভাব। পবিত্র শব্দ শব্দাত্মক তখন নরহৃদয়ের নিজস্ব সম্পত্তি। সমাজ শাসন শিখিল করিয়া, কেহই তখন শবদেহ স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। অগত্যা তখন সারাবঙ্গে একটা অভূতপূর্ব “ওলট-পালট” চলিতেছিল। হিন্দুর গোড়ামী—শিক্ষিত সমাজে বিকৃত হইতেছিল। হিন্দু দস্থ্যন দরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া, পাঞ্জির বক্তৃতা শুনিয়া অনায়াসেই ধর্ম পরিবর্তন করিতেছিল। কুসংস্কারের মূলে কঠোরাবাস্তব করিয়া—সৌম্যমূর্তি ইংরাজ—বাঙ্গালীর শিক্ষা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সাম্প্রদায়িক প্রভেদ নাই। বিশ্বের বিজ্ঞানে বিশ্ববাসী মাত্রেই সমান অধিকার। বিজ্ঞান—সাধারণ

তত্ত্ব সমুদায় সামগ্রী;—সুতরাং সার্কভৌমিক ও সার্কজনিক। তাহা একের বলিয়া, অস্ত্রের হয়ে বা অস্ত্রকে অদেয় হইতে পারে না। বিজ্ঞান ঐশ্বরিক আশীর্বাদ, প্রকৃতির প্রধান প্রসাদ, বিজ্ঞানের মুক্ত প্রাঙ্গণ—পৃথিবীর জগন্নাথক্ষেত্র। সেখানে খবন নাই, ব্রাহ্মণ নাই,—জাতিভেদ সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের মত। ইংরাজ যখন সাম্য-নাদের ফুৎকার দিয়া, বিজ্ঞানের ‘পাক্‌জন্তু’ বাজাইতেছিলেন, হিন্দু-সমাজ তখন শুদ্ধিতত্ত্বের উদ্ভট শ্লোক আওড়াইয়া, বাস্তবকে কল্পনার মাধুরী মাখাইতেছিল। দেশের এই স্বাতি-সর্বস্ব যুগে, শুভ-মুহূর্ত্তে—বিজ্ঞানের উদার আহ্বান, একমাত্র মধুসূদনেরই কর্ণবিবরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। সে দিন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় শুভদিন। চতুর্দিকের বিদ্ব-বহুল বাধা, ছই পায়ে ঠেলিয়া, মহা মনস্কী-মধুসূদন মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্ত সবাচীর মত নিপুণ হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সেদিন উৎসবময়ী কলিকাতা অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। বিরাট বিশ্বমণ্ডলে—এই মহানন্দের মহা কাহিনী ঘোষণা করিবার জন্ত—ইংরাজের বিজয়-ভূগ হইতেও মুহূর্ত্তে তোপধ্বনি হইয়াছিল। যে দেশে শবদেহ স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত কয়িতে হয়, সমাজে পতিত হইতে হয়, সেই দেশে এক তরুণ সুন্দর যুবা—স্বয়ংসিদ্ধ সন্ধীচৈতন্যের বিরাম-বিজ্ঞান নীরবে সহিয়া, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার মাঝে বীরের মত দাঁড়াইয়া, বিশ্বমানবের কল্যাণ-সাধনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া বিজ্ঞান-রাজ্যের সার্কজাতিক ভূমি মেডিকেল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছে—একথা যে ভুলিয়া ছিল, সেই বিস্মিত হইয়াছিল। দেশ-মত

মধুসূদনকে দেখিবার জন্ত—রাজপথের মহতী জনতা বাত্যা-তাড়িত-সমূদ্রের মত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদনকে সন্দর্শনা করিবার জন্ত—সেদিন নগররাসীগণ নগর-সজ্জার ক্রটি করে নাই। হিন্দুর চিন্তাশক্তির অধোগতির এই জলন্ত উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিয়া, সুর-লোকের সারস্বত-মন্দিরে কেবল একজনের চক্ষু অশ্রুবাশ্পে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি মতর্ষি সূশ্রুত। তাঁহারই স্মৃতি-চর্চার জন্ত—এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের অবতারণা।

“সার্জন সূশ্রুত” নামে প্রবন্ধের নামকরণ হইয়াছে। বাস্তবিক ‘সূশ্রুত’ের মত পাকা সার্জন বোধ হয় পৃথিবীতে অল্পই আবির্ভূত হইয়াছেন। আমাদের নরজন্ম লাভ করিবার এই প্রধান সফলতা যে, আমরা সেই মহাশ্রার দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহারই মাতৃ-ভূমির জল-বায়ু ও সূর্যালোক, আমাদের শরীরে প্রাণোদ্দান অনিয়া দিয়াছে। কিন্তু আমরা ত সে অপূর্ব মহত্বের সমাদর করিতে শিখি নাই। তাই ভারতের অস্ত্র-চিকিৎসা ভারত-বাসীর অবহেলায় নির্বাসিত-অপরাদীর মত, বিশ্বস্তির ক্রোড়ে নীরবে নির্বাসন লাভ করিয়াছে। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যে অস্ত্র চিকিৎসা—সকল দেশের শিক্ষাগুরু ছিলেন, আজ আমরা তাহা বিবাস করি না। আজ আমরা যুরোপের শল্যতন্ত্র দেখিয়া তাহার নৈপুণ্যের প্রশংসা করি,—কিন্তু সে নৈপুণ্য যে ঋষিযুগের সাধনার একটু ক্ষীণ আভাষ মাত্র—আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। ইতিহাস আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এখন আমরা অনেকেই জানিতে পারিয়াছি—পৃথিবীর শল্যতন্ত্র ভারতের অপরাধু অমূল্যদানের কাছেই ঋণী। অঙ্গ-বিনিময় বিজ্ঞান ‘সূশ্রুত’ বাহ্য বদ্বিয়া গিয়াছেন.

—পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান তাহার অতিরিক্ত বড় কিছু বলিতে পারেন নাই।

সূশ্রুত প্রণীত গ্রন্থের নাম “সূশ্রুত সংহিতা”। বর্তমান যুগে “সূশ্রুত সংহিতা” আয়ুর্বেদের অগ্রতম প্রতিনিধি। সূশ্রুত চরকের অপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারেন, কেন না, চরকসংহিতায় সূশ্রুতের ইঙ্গিতোন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সূশ্রুত একজন আদর্শ অস্ত্র-চিকিৎসক, কাশীরাজ ‘ধনুস্তরি’ তাঁহার উপদেষ্টা; সূশ্রুতের পিতার নাম “বিখামিত্র”। সূশ্রুতের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, ইহার চেয়ে বেশী জানা যায় না।

শারীর বিজ্ঞা, শারীর তত্ত্ব, নিদান, শল্য-তন্ত্র (Surgical Treatment), ধাত্রীবিজ্ঞা, স্ত্রীরোগ, অস্ত্রবিধি, অগদ [Antedotes to Poisons], কোমার ভূত্য [The treatment of Infants and of the Puerperal state), শস্ত্রসাধ্য-চিকিৎসা, ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, গর্ভ ব্যাক্রান্তি, ঔষজ্যবিধান, ভূতবিজ্ঞা [ ইহার মধ্যে জীবাত্মতত্ত্বেরও আভাষ পাওয়া যায় ], রসায়ন,—চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই সূশ্রুতের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ব্রাহ্মণের স্বপ্ন হেতুবাদ, উপনিষদের তত্ত্বস্পর্শী গভীরতা, বিজ্ঞানের বাস্তব রহস্ত,—সূশ্রুত রচিত সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায়ে সত্যের নিখাসে জাগ্রত! সে জন্ম-মৃত্যুর-আক্ষেপ-বিক্ষেপ, সে অকপট-অধ্যবসায়, সে উদার অগ্রগামিত্ব,—বুঝি আর কোথাও এমন যুগপৎ সম্মিলিত হয় নাই। মানুষকে ঈশ্বর বলিলে যদি দেবতার অবমাননা না হয়, জামি ‘সূশ্রুতকে’ই ঈশ্বর বলিতে পারি। সূশ্রুতের মত বৈজ্ঞানিক, সূশ্রুতের মত দার্শনিক—প্রকৃতির বকে আর কিছু দাঁড়ানো যায় না।

নাই। তদ্বদংশীর নিপুণ দৃষ্টি লইয়া, একবার যদি তোমরা সুশ্রুতসংহিতার হিরণ্ময় অধ্যায় পড়িতে পার, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি—তোমাদের নব্যতা-স্বলভ-জ্ঞানের অহঙ্কার চিরদিনের মত চূর্ণ হইয়া যাইবে। সে স্বভাব-বিপুল-প্রতিভার চরণে—তোমাদের সভ্যতাভিনী-উচ্চশির আপনা আপনি নত হইয়া পড়িবে। তোমরা যতই আশ্চর্যস্থিত হইয়া থাক না কেন, ইংরাজী শিক্ষার গোরব-গর্বে তোমাদের মায়ু মণ্ডলের যতই উত্তেজনা থাকুক না কেন, “সুশ্রুত” পড়িলে তোমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে—মৃত্যু-মলিন-মর্ত্যের মাটিতে সে যে জ্ঞান-গবেষণার অনন্ত তাণ্ডার! সুশ্রুতের ভিতর যে সকল তত্ত্ব নিহিত, অত্মাপি তাহা অনেক জাতির জ্ঞান-গোচরও হয় নাই। সুশ্রুতের পদতলে বসিয়া পৃথিবীর বিজ্ঞান এখনও অনেক বিষয় শিখিতে পারে। যুবোপের অমন জীবন্ত বিজ্ঞানও—এমন কোন নূতন কথা বলিতে পারে নাই,—যাহার ‘স্বপ্ন-ছায়া’ সুশ্রুতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

সার্জন সুশ্রুতের সর্ব প্রথম বিশেষণ—“পুরুষ চেহা”। এই ‘পুরুষচেহা’ শব্দের অপভ্রংশেই প্রাচীন মিশরের ‘পরস ছিস্তাস’ (ডিসেস্টার) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি শব্দের করেন—তাহারই গরীয়ান্ অভিধান—‘পুরুষ চেহা’। সুশ্রুত শব্দের করেন। ভগ্নাতির সন্ধান, প্রাণী শল্যের উদ্ধার, ব্রণের শোণন, রোপন, উৎসাদন, অবসাদন প্রভৃতি কার্যে তাহার মত কৃতিত্ব কোন চিকিৎসকই দেখাইতে পারিবেননা। সুশ্রুতের সমস্ত “এয়ের” ছিল না, কিন্তু তিনি এমন প্রলেপ জানিতেন—যাহার সাহায্যে শল্যের অবস্থান-স্থান সহজেই নিরূপিত হইত।

যকৃত বা গ্রীহার কোঁড়া হইলে সুশ্রুত তাহা শস্ত্র প্রয়োগে ভেদ করিতে পারিতেন। তিনি মৃত্যুশয়ের অশ্মরী (পাথুরী) কাটিয়া বাহির করিতেন। যন্ত্রের সাহায্যে মূত্রগর্ভ আহরণ করিতেন। উদরে আঘাত লাগিয়া ছিন্ন ভূক্ত বাহির হইয়া পড়িলে, তিনি তাহা স্বাভাবিক পুনঃ স্থাপিত করিয়া সেলাই করিয়া দিতেন। জলোদরের জলস্রাব করাইতেন। চক্ষুরোগে তাঁহার মত লঘু হস্তে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কয়জন চিকিৎসক পারেন? বিবর্তন (flexion) আবর্তন ক্রমে তিনি যে গভীর স্বথ-প্রসবেদ-বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন, খাত্তী-পরীক্ষা, সন্ধান পরীক্ষা অধ্যায়ে তিনি যে সকল যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন, একবার তোমরা তাহা প্লেফেরারের ‘মিডওয়াইফারির’ সঙ্গে মিলাইয়া দেখিও—মনে হইবে উহা বৃদ্ধি সুশ্রুতেরই ইংরাজী অনুবাদ। আজকাল তোমরা যে ‘বাসিলি থিওরীর’ গুণ করিয়া থাক, তাহাও সুশ্রুতের অজ্ঞাত ছিলনা। সুশ্রুত মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—রাজ্যক্ষা,—কতকগুলি জ্বর, কতকগুলি পাপজ ব্যাধি,—ইহারা সংক্রামক। কুষ্ঠের ক্রম আছে। গর্ভাবস্থায়, পাণ্ডুরোগে রক্তের লাল কণিকা কমিয়া যায়। রক্তাতিসার ও ক্ষয়রোগ জনিত উরঃক্ষত-আভ্যন্তরিক ক্ষতের চিকিৎসা করিতে হয়। বিসর্প রোগের (ইরিসিপ্লাস্) পরিণামে সর্ব শরীরস্থ রক্ত বিযাক্ত হইয়া উঠে। রক্তাক্ত পাকিলে রোগী কিছুতেই বাচেনা। সর্বদংশন করিলে হৃদয়ে রক্তশূন্য জন্মায়, সেই জন্য ক্ষয়-কৃচ্ছতার দংশিত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সন্নিপাত ও বিহুচিকা রোগে, হৃদয়ে রক্তের চাপ বাধিতে থাকে—তাই সূক্ষ্ম চিকিৎসা তৎক্ষণাত—উক্ত রোগে সর্পিণ্ড-মহোষধি

ক্ষয়রোগে হৃদপিণ্ডে কোটির উৎপন্ন হয়। কি  
অমাহুযিক দক্ষতার সহিত—সুশ্রুত যে এ সকল  
তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিশ্বয়ে  
অবাক হইতে হয়।

একণে অনেকের বিশ্বাস—১৬২৮ খৃষ্টাব্দে  
উইলিয়ম হার্ভি নামক এক সাহেব, শরীরে রক্ত  
সঞ্চালন ক্রিয়ার (circulation of the blood  
প্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্তু যুরোপের  
বৈজ্ঞানিকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—হার্ভির  
জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দী পূর্বে, ভারতেরই এক  
ফল-মূল্যশী বৃক্ষতলবাসী ঋষি, এই রক্তের গতি  
আবিষ্কার করিয়া ছিলেন। তাঁহার নাম  
সুশ্রুত। ‘সুশ্রুত’ কৃত সংহিতায় লিখিত  
হইয়াছে—” \* \* \* তন্তু চ  
হৃদয়, স্থানং। স হৃদয়াচ্চতুর্বিংশতীং ধমনী  
রমুপ্রবিষ্ট \* \* কৃৎস্নং শরীর মহরহন্তুর্প-  
য়তি, বর্ধয়তি ধরয়তি যাপয়তি জীবয়তি  
যাদৃষ্ট হেতুকেন কর্মণা।” আড়াই হাজার  
বৎসর পূর্বে—মহর্ষি সুশ্রুত শোণিত-সঞ্চালন-  
ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক-নীমাংসা করিতে গিয়া  
বলিয়াছেন,—রক্ত বাহিনী-শিরামণ্ডলীর দ্বারা,  
রক্ত সমস্ত দেহে চলাচল করিয়া থাকে। এই  
সকল শিরা যকৃৎ ও প্লীহা হইতে উৎপত্ত হইয়া  
সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। প্রকৃতিস্থ  
অবস্থায় রক্ত যতক্ষণ স্থায় শিরায় বিচরণ করে,  
ততক্ষণ ধাতুর পূরণ, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন  
স্পর্শ জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা—প্রভৃতি বর্তমান থাকে।  
সেই রক্ত দূষিত হইলে শরীরে রক্ত জমা নানা-  
বিধ ব্যাধির আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। হার্ভি  
সাহেব রক্তের গতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া  
ছেন,—কিন্তু এ তত্ত্ব যে সর্ব প্রথম ভারতেই  
আবিষ্কৃত হইয়াছিল,—একথা আর অস্বীকার  
করা চলে না।

‘পুরুষ ছেড়া’ সুশ্রুত—শিরা, ধমনী, স্নায়ু,  
প্রভৃতির প্রসার সংস্থিতি, রসাদি ধাতুর পরস্পর  
পরিণতি,—বাতবাহী শিরামণ্ডলীর কার্য  
প্রভৃতি, যেরূপ নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,  
তাহা পড়িলে মনে হয়,—মহর্ষির মত চিন্তাশক্তি  
প্রতিভা ও গবেষণা—অত্যাধি বিজ্ঞান-জগতে  
দুর্লভ। কেবলমাত্র সুশ্রুত পড়িলেই তোমরা  
বুঝিতে পারিবে—আয়ুর্বেদের মত সম্পূর্ণ  
চিকিৎসা—পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে  
পাওয়া যায় না।

যুরোপের জীবন্ত-বিজ্ঞান বলিতেছে,—  
সেল প্রটোপ্লাসমের বিপাকই জীবন। কিন্তু  
ইহাতেও গুরুতব সংশয় বিদ্যমান। সেলের  
জীবন আছে, জীবন তাহাতে উৎপন্ন হয় না।  
তবে জীবনীশক্তি কি? সে শক্তি তোমার  
সেলপ্রটোপ্লাসমের চেয়েও সূক্ষ্ম—তাহার নাম  
“ওজঃ বিন্দু”। তাই সুশ্রুত আত্মজ জীবনী-  
শক্তিকে পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন।  
তোমাদের নিদান বা আময়িক শারীর (Morbid  
Anatomy) ব্যাধির স্বরূপ বলিতে পারে না,  
তাহার বাসস্থানের নির্দেশ করিয়া দিতে পারে।  
আমাদের সুশ্রুত বলেন—“তদুৎপত্তং যোগাৎ-  
ব্যবধায়ঃ। স এব অন্তর্ধানম্।” ইহা—পাকা  
দার্শনিকের কথা, ত্রিকালজ মহাপুরুষের কথা,  
সর্বজ্ঞ ভগবানের কথা। জগতে সকল শক্তির  
ত্ৰায় জীবনী শক্তিরও বিকাশ—বৌদ্ধিক  
বিস্ফুরণের ভিতর দিয়া। “প্রণব” এই  
বিস্ফুরণেরই সঙ্কেত মাত্র। ভূমি, আদি, জল  
—ওষ্কার বা আদিম বিস্ফুরণের প্রসঙ্গ, তাই  
আমাদের শারীরিক পরমাণু মিলিত হই বিস্ফুরণ  
শীল। ইহাকেই কি ডোমরা “আময়িক  
মুভমেন্ট” বল না? তাহা হইলে এই আময়িক  
বিস্ফুরণের দাম্যবস্থা—সহ্য হইবে, তাহা হইবে

বিচার। সূত্রের এই বাস্তবিক, হারীত  
সংহিতায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। সে  
সত্য বহুগুণ পরে মহাত্মা হানিম্যানের কর্ণে  
প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সত্য চিরদিন এক।  
বিজ্ঞান-জগতে—সূত্র, হারীত ও হানিমানে  
কোন প্রভেদ থাকিতেই পারে না।

সূত্র সেখানে ঔষধের কথা বলিতেছেন,  
সেখানে তিনি একজন পাকা রসায়নবিদ।  
আবু-রুহ বলেন—“দ্রব্যের বীৰ্য্যে ব্যাধি নষ্ট  
হয়।” সূত্র বলেন—গুণের গুণ থাকিতে  
পারে না, কেন না গুণ—নিগুণ, “নিগুণাশ্চ  
গুণা দ্ব্যতাঃ।” অতএব ঔষধি তত্ত্বে সূত্রের  
দ্বিবিদ্যাস্ত, দ্রব্যের পরিণতি অপরিণতি ভেদে  
বৈধনা থাকিতে পারে, রসের পরিবর্তন হইতে  
পারে, বিপাক ও সকল ক্ষেত্রে একরূপ হইতে  
পারে না। সূত্রাং আরোগ্য-কল্পে—দ্রব্যের  
বীৰ্য্যই প্রধান। কিন্তু রস গুণ, বীৰ্য্য—দ্রব্য  
ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, অতএব দ্রব্য  
লইয়াই অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইবে।  
বীৰ্য্য যদি অচিন্তনীয় ও অবিনশ্বর হয়, তবে  
দ্রব্যের বিস্তৃত বীৰ্য্যই সেবন করা উচিত।  
তাহার সঙ্গে কতকগুলি জড় আবর্জনা  
মিশাইবার আবশ্যিকতা নাই। এই জন্তই  
মর্দন, সস্তাপ, পীড়ন প্রভৃতির সাহায্যে—সূত্র  
দ্রব্যের জড়পদার্থ নষ্ট করিবার উপদেশ দিয়া  
গিয়াছেন। সূত্রের অনুজ্ঞা—তৈল বা ঘৃত  
শতবার দোত করিও, সহস্রবার পাক করিও,  
লক্ষবার মর্দন করিও। তাহাতে দ্রব্যের বীৰ্য্য  
বিস্তৃত হইবে, তাহার জড়াবৃত্তি ধ্বংস  
হইবে। জীবনও শক্তি, বীৰ্য্যও শক্তি,  
শক্তি না হইলে শক্তিকে আহত করিতে পারে  
না। সূত্র না হইলে সূত্রে আঘাত করা  
অসম্ভব।

সূত্র সেখানে রোগ তত্ত্বের ব্যাখ্যা  
করিতেছেন, সেখানেও তিনি অস্ত্রের কাছে  
অপরাজেয়—আদর্শ বৈজ্ঞানিক। আনবিক  
বিস্ফোরণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলে, পরমাণু পুঞ্জের  
তাপের তারতম্য হয়। শারীর ক্ষেত্রে একরূপ  
তাপ বৃদ্ধি হইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, বায়ু অর্থাৎ  
দৈহিক তাড়িৎ শক্তি বিপর্যাস্ত হয়, শৈত্য বা  
শ্লেষ্মা কমিয়া যায়। এই সকল কথা ভাল  
করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিও, সেল প্রটো প্লাস্ম  
তত্ত্বকে অনেক স্থল বলিয়াই মনে হইবে।

সূত্র ছিলেন “বৈজ্ঞানিক” ও  
“দার্শনিক”—অতি সংক্ষেপে আমি তাহার  
পরিচয় দিলাম। সূত্র প্রণীত-সংহিতার  
সমালোচনা করিতে পারি, সে শক্তি আমার  
নাই। সূত্রের আমলে এ দেশের অস্ত্র  
চিকিৎসা কত উন্নত ছিল, এইবার তাহাই  
দেখাইবার চেষ্টা করিব। ইহাতে আর কিছু  
উপকার না হউক—ভারতের অতীত গৌরবের  
একটা জ্যোতির্ষ্ময় অধ্যায়। এই আশ্চর্য্যম্বৃত্ত  
জাতির নয়ন-সমক্ষে নিশ্চয়ই উল্লসিত হইবে।  
নব্য যুবকগণেরও সূত্র পঠে অনুপ্রাণ  
জন্মিবে।

অস্ত্র চিকিৎসার উৎপত্তি।—

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য—উভয় দেশেরই পণ্ডিত  
মণ্ডলী—“অথর্ক বেদকে” চিকিৎসা বিজ্ঞানের  
আদি গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। আমার গুরু  
স্থানীয় অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র  
সুন্দর দ্রিবেদী মহাশয় ১৩১২ সালে একটি  
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি  
প্রমাণ করিয়াছিলেন—সাম বেদেই শারীরিক  
ও মনো-বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।  
দ্রিবেদী মহাশয়ের মত মৌলিক গবেষণার  
প্রবন্ধ—বাল্যাদি ভাবের বড় বেশী দেখিয়া

বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বিশ্বাস—বৈদিক যজ্ঞে নিহত পশুর ছেদিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম হইতে আয়ুর্বেদীয় শারীরবিজ্ঞার উৎপত্তি। বাস্তবিক সামবেদ আলোচনা করিয়া লেখকের মনেও এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—‘নিহত পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাম নামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া পৃথক করা হইত। যে ব্যক্তি এই কৰ্ম করিত, তাহার নাম শমিত। যজ্ঞ ভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কৰ্ম নিষ্পাদিত হইত, সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই থানেই অগ্নি জালিয়া পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার নাম শামিত্র অগ্নি।’

এইরূপে পশুর বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্ঞান হইতে বৈদিক-যুগের পরবর্তী কালে, শারীরবিজ্ঞার অঙ্গবিশিষ্ট ব্যাপার ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আয়ুর্বেদে আমরা অনেক গুলি বৈদিক পরিভাষার সংগ্রহ দেখিতে পাই। বাহ্য ভয়ে তাহাদের আর উল্লেখ করিলাম না।

সুশ্রুতের সময়ে আয়ুর্বেদীয় অস্ত্র চিকিৎসার প্রকৃত উন্নতি হইয়াছিল। এখন পাশ্চাত্য-জগৎ যেমন তাহার “শল্য বিদ্যা” লইয়া সর্ব সমক্ষে সগৌরবে দণ্ডায়মান, সুশ্রুতের যুগে ভারতবাসীও সেইরূপ শল্যতন্ত্রের গর্ব প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু সুশ্রুতের অত্যাশ্রিত শল্যতন্ত্র একেবারেই—অতটা বিপুল বিস্তার লাভ করে নাই। সুশ্রুতের পূর্ব হইতেই তাহার ক্রম-বিকাশের সম্ভাবনা। তবে বৈদিক-যুগের পর হইতে সুশ্রুতাবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত—এই সূর্য্যকালের কোন ইতিহাসই আমরা পাই নাই। বেদের গল্প-গাথা, পুরাণের মনোজ্ঞ উপভাসে, কেবল এই মাত্র জানা যায়,

—দেবাসুরের যুদ্ধের সময় জগতে প্রথম শল্য বিজ্ঞার উৎপত্তি। সেকালে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়—নামজাদা অস্ত্র চিকিৎসক। তাঁহারা কৃষ্ণ-কর্ত্তা ব্রহ্মারও ছিন্নশির সংযোজন করিয়া ছিলেন। ইহার পরই স্বর্গবেদা ‘ধনন্তরি’ কাশীরাজ ‘দিবোদাস’ নামে—অস্ত্র চিকিৎসার প্রবর্তক।

### সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল।—

ধনন্তরির দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে সুশ্রুত সর্ব প্রধান। সুশ্রুত স্বকৃত সংহিতায় নিজের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সতীর্থ ঔপধেনব, ঔরহ, পৌকলাবত—এই তিনজনেরও মত সংকলন করিয়াছেন। সুশ্রুত-সহাধারীগণের শল্যতন্ত্র অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, শল্যতন্ত্রে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফল কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে বৈদিক যুগের পর, সুশ্রুতের পূর্ব পর্যন্ত যে সময়—তাহার মধ্যেও ভারতে বহু শল্যতন্ত্র রচিত হইয়াছিল। এখন সুশ্রুতই আমাদের অস্ত্র চিকিৎসার আদি ও প্রধান গ্রন্থ। ‘বাগভট’ সুশ্রুতের বহু পরবর্তী, অস্ত্র চিকিৎসার উপদেষ্টা হইয়া ‘বাগভট’ কেবল সুশ্রুত হইতেই সার সঙ্কলন করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ‘বাগভট’ের গ্রন্থে সুশ্রুতোক্ত ব্যতীত কতকগুলি নূতন অস্ত্রেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

হর্গেল সাহেব সুশ্রুতকে বৈদিক-যুগের লোক বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু সুশ্রুতকে অর্থর্ব বেদের পরবর্তী বলিয়াই বিশ্বাস করি। হইতে পারে এ ধারণা ভ্রান্ত। জনরবের “আয়ুর্ষানি” ও “ভৈরব্যানি” সহ অগ্নি পারি করিলে, সে সময়ের চিকিৎসা-প্রণালী বহু মন্ত্র-তন্ত্র-প্রধান ছিল। ইহা হইতেই সুশ্রুতের



সন্দেহই থাকে না। কিন্তু চরকও স্মৃতির চিকিৎসার মত যেরূপ অসংবদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ, ও গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে চরক-স্মৃতিতে অথর্ব বেদের পবিত্র বলিয়াই মনে হয়। এই উভয় গ্রন্থের ভাষাও—শেষ ব্রাহ্মণের ভাষা।

পুর্বেই বলিয়াছি—স্মৃতির প্রকৃত কাল-নির্ণয় কখনই সম্ভবপর নহে। স্মৃতি সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, উৎকল-চণ্ডী বলিয়াছেন—নাগার্জুন স্মৃতির প্রতি-সম্ভাব্য কল্প। তিনি নাকি উত্তর তন্ত্রেরও স্মৃতি। ইহা যদি বিশ্বস্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়,—স্মৃতি হয় ত খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দিতে বর্তমান ছিলেন। কেননা নাগার্জুনের জন্মকাল—খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী বলিয়া, কেহ কেহ প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। নাগার্জুন যজ্ঞের নিশ্চয়ই পরবর্তী। আবার স্মৃতি যে প্রাচীন গ্রন্থ, পঞ্চম-শতাব্দীর সংকলিত—Bower Manuscript পাঠে আমরা ইহা জানিতে পারি। বাস্তবিক স্ত্রে-লিখিত হইয়াছে—“স্মৃতি প্রোক্তং দৌশ্রুতং।” ইহার দাবাও সম্ভব হইতে পারে—স্মৃতি খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বে ভারতভূমিতে প্রচলিত হইয়াছিল।

অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যা।—স্মৃতি কর্তৃক উপদিষ্ট—“অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যা”, যুরোপের শারীর তত্ত্ব অপেক্ষা কোন অংশেই নূন নহে। শারীরতত্ত্ব স্মৃতি যাহা লিখিয়াছেন—তাহা তাঁহার ‘শোনা কথা’ নহে,—“প্রত্যক্ষ দর্শনে”র অভিজ্ঞতা। মানব দেহে স্মৃতি—অঙ্গ ৭টা,

কল্প

৭টা

আশয়

৭টা

বৈশাখ—২

দ্বার	৯টা
কস্তুরা	১৬টা
জাল	১২টা
কৃষ্ণ	৬টা,
রজ্জু	৪টা,
সেবনী	৭টা,
অস্থি	৩০০ খানি
অস্থিসন্ধি	২১০টা
মায়ু	২০০
পেশী	৫০০
শিরা	৭০০
মর্শ	
অঙ্গ	১০৭

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ, স্বরূপ, অবস্থান, কার্য, শক্তি, সন্ধান—স্মৃতি বেশ নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিতে পারি, আমাদের সে শক্তি ও সময় নাই। আমরা কেবল উদাহরণ স্বরূপ মৃৎ-কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতেছি। যিনি বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তিনি স্মৃতি-সংহিতা পাঠ করিবেন।

### অঙ্গ-চিকিৎসা ।

এইবার স্মৃতিতে অঙ্গ চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

অঙ্গ-চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারত যে পৃথিবীর সকল দেশেরই শিক্ষাশুরু—অনেক উদার হৃদয় মহাপ্রাণ যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক একথা যুক্তকণ্ঠে অনুমোদিত চিন্তে স্বীকার করিয়াছেন। শরীরের একস্থান হইতে চর্ম কাটিয়া লইয়া যে অঙ্গ স্থানে তাহা লাগানো যাইতে পারে,—যুরোপ

রহস্য সূশ্রুতের নিকটই অবগত হইয়াছিল।  
 ওয়েবার সাহেব স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়াছেন।  
 চক্ষুরোগে অস্ত্রপ্রয়োগ—ইহাও ইউরোপ  
 ভারতীয় শল্য বৈদ্যের নিকট শিক্ষা করিয়াছে।  
 ডাক্তার হির্সবার্গ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এ  
 বিত্যা—প্রাচীন গ্রীক, মিসর বা অজ্ঞজাতি,  
 পূর্বে জানিত না।

এখন যে যে স্থলে বা যে যে বোগে—  
 ডাক্তারগণ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন,  
 সূশ্রুত তাহা সমস্তই জানিতেন। সূশ্রুতোক্ত  
 অস্ত্র চিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত। যথা—

- ১। ছেদ্য। (ছেদন করা)
- ২। ভেদ্য। (ভেদ করা)
- ৩। লেপ্য। (চক্ষু চাঁচিয়া তোলা)
- ৪। বেধ্য। (শিরা বিদ্ধকরণ)
- ৫। এঘ্য। (নাড়ীরগাদির সীমা সন্ধান)
- ৬। আত্যা। (অশ্রু, মূঢ়গর্ভ প্রভৃতি  
 আহার্য বা বাহির করা)
- ৭। দিশ্রা। (শ্রাব করণ)
- ৮। সীবন। (সেলাই করা)

ইহা ভিন্ন—বন্ধন ক্রিয়া, বস্তিকার্য্য (ডুমু,  
 পিচকারী প্রয়োগ) ক্ষার ও অম্লিকার্য্য—  
 সূশ্রুতের অনামুখিক দক্ষতা ছিল। অস্ত্র  
 প্রয়োগ করিবার পূর্বে তৎকর্ম্মোপযোগী যন্ত্র  
 অস্ত্র, বস্ত্রখণ্ড, তুলা, সূত্র, পাখা, উষ্ণজল, হিম-  
 জল, প্রভৃতি—বলবান্ পরিচারকগণ সংগ্রহ  
 করিয়া রাখিত। অর্শ, অশ্রু, উদর, মূঢ়গর্ভ  
 উর্গন্দর, ও মুখরোগাদিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে  
 হইলে,—রোগীর আহ্বারের পূর্বেই তাহা  
 সম্পন্ন হইত। পাছে কোন হস্তশিরা বা  
 স্নায়ু কাটিয়া গিয়া রোগীর কোনও অত্যহিত  
 ঘটে,—সে বিষয়ে সূশ্রুতের বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি  
 ছিল।

### অস্ত্রোপচারের শেষে—

অস্ত্রোপচারের শেষে—ক্ষতস্থানের রক্তপূর  
 নিষ্কাশিত করিয়া কষায় জলে, ক্ষতস্থান ধৌত  
 করিয়া, তিল, মধু প্রভৃতি পচন নিবানক  
 ভেষজ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া তাহার দ্বারা ক্ষত  
 আবৃত করা হইত। ইহার পর ঝিদ্ধ,  
 শ্বেদ ও বন্ধন। বন্ধন প্রত্যহই খোলা  
 হইত এবং ক্ষতস্থান প্রত্যহ কষায় জলে  
 প্রক্ষালিত হইত। ডাক্তারেরা যেমন ড্রেস্  
 করিয়া থাকেন, সূশ্রুত ঠিক তেমন করিতেন।  
 অস্ত্র ক্রিয়ায় তাহার উপদেশ গুলি, কি ডাক্তার,  
 কি কবিরাজ—সকলেরই পাঠ করা উচিত।  
 সূশ্রুতের ব্রণ চিকিৎসা সর্ব্বদা সুন্দর।

সার্জন সূশ্রুত ১২৫ প্রকার অস্ত্র ব্যবহার  
 করিতেন। ঐ সকল অস্ত্রের দুইটী শ্রেণী  
 ছিল। এক শ্রেণীর নাম যন্ত্র, অপর শ্রেণীর  
 নাম শস্ত্র। যন্ত্রের সংখ্যা ১০১ প্রকার, শস্ত্র  
 ২৪টী। ঐ সকল যন্ত্র ও শস্ত্রের আকার,  
 তাহাদের প্রস্তুত প্রণালী, উপাদানসমূহ, সূশ্রুত  
 তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। চিত্রের  
 অভাবে আমরা পাঠকগণকে বুঝাইতে পারি-  
 লাম না। আমরা কেবল যথাসম্ভব সংক্ষেপে—  
 তাহার পরিচয় দিতেছি।

সূশ্রুতের মতে—চিকিৎসকের হস্তই সর্ব্ব  
 প্রধান যন্ত্র। কেননা সকল যন্ত্রই হস্তের  
 সাহায্যে প্রয়োগ করিতে হয়। সূশ্রুত যন্ত্রের  
 ভিতর নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলিকে স্থান দিয়াছেন—

স্বস্তিক যন্ত্র। ইহা চতুর্বিংশতি প্রকার।  
 ১৮ অঙ্গুলী দীর্ঘ, দুই খণ্ড লৌহ, একটা কীদক  
 দ্বারা আবদ্ধ। এই যন্ত্রের মুখ—সিংহচ্যাব,  
 মৃগ প্রভৃতি দশবিধ পশুর এবং কাক, চিত্র,

শুক্লি প্রভৃতি চতুর্দশ প্রকার পক্ষীর মুখের  
আকারে নির্মিত হইত ।

সদংশ যন্ত্র । ইহা সাঁড়াশী ও সম্মার  
আকারে, প্রয়োজনের অনুরূপ নির্মিত  
হইত ।

তাণ যন্ত্র । দৈর্ঘ্যে ছাদশাস্থুলী । কর্ণ-  
নদিকাদির অভ্যন্তরে প্রয়োগ হইত ।

নাড়ীয়ন্ত্র । নানা আকারে নির্মিত এবং  
নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হইত । অস্থলিগ্রহণ  
প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত ।

শলাকা যন্ত্র । ২৮ প্রকার । ইহাদের  
আকার নানারকম, নানাকার্য্যে ব্যবহৃত  
হইত ।

### শস্ত্রাবলী ।

জুশ্রুতোক্ত শস্ত্রাবলীর নাম ; বথা—১।  
মণ্ডলাগ্র । ২ করপত্র । ৩ বুদ্ধি । ৪ নঘ-  
শস্ত্র । ৫। মুদ্রিকা । ৬। উৎপল পত্র ।  
৭। অর্দ্ধবার । ৮। হুচী । ৯। কুশ  
পত্র । ১০। শারীর মুখ । ১১। আটী  
মুখ । ১২। অন্তর্মুখ । ১৩। ত্রিকুটক ।  
১৪। কুঠারিকা । ১৫। ব্রীহিমুখ । ১৬।  
আরা । ১৭। বেতস পত্রক । ১৮।  
বড়িশা । ১৯। দন্তশঙ্কু । ২০। এষণী ।  
বারাস্তরে এই সকল শস্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী  
বুঝাইবার চেষ্টা করিব ।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ ।

## বৈদিক বৃক্ষাবলী ।

—:o:—

বেদে অনেকগুলি ঔষধের গাছের নাম  
দেখিতে পাওয়া যায় । পরবর্তী চিকিৎসা গ্রন্থে  
ঐ সকল নামের বহু পরিবর্তন দেখিতে পাই ।  
বইমান প্রবন্ধে আমি বৈদিক-সাহিত্য হইতে  
কতকগুলি ভেষজ-বৃক্ষের নামের তালিকা  
প্রকাশ করিতেছি । আশা করি কবিরাজ  
মহাশয়েরা, তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া  
দিবেন ।

উদ্ভিদ জ্ঞাত বৈদিক যুগে দুই শ্রেণীতে  
বিভক্ত ছিল । ১ম। বনস্পতি । ২য়।  
বীৰুধ । বৃক্ষ বলিলে বীৰুধ, বনস্পতি—দুইই  
বুঝাইত । ইংরাজী ভাষায় যাহার নাম Tree,  
সেই তাহাই বনস্পতি, যাহাকে ইংরাজী ভাষায়

plant বলে—তাহার বৈদিক নাম “বীৰুধ” ।  
এই বীৰুধবর্গের মধ্যে যেগুলি ঔষধের উপাদান  
রূপে ব্যবহৃত হইত, ঋষিগণ তাহাদিগকে  
“ঔষধি” নামেও অভিহিত করিতেন । বৃক্ষের  
যে অঙ্গকে আমরা পল্লব বলি, বৈদিক-সাহিত্যে  
তাহার নাম ছিল—“বল্লশ” । বট, অশ্বথ  
প্রভৃতি বৃক্ষের বায়বীয় মূলকে বৈদিক-সাহিত্যে  
“বয়া” নাম দেওয়া হইয়াছিল । বয়াকে  
“ঝুরি” বলে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় “বয়া” বা  
তাহার কোনও প্রতিশব্দ দেখিতে পাওয়া  
যায় না । নিয়ে বর্ণমালার অকারাদি ক্রমে  
বৈদিক-সাহিত্যে উল্লিখিত ভেষজবৃক্ষের নামের  
তালিকা সংগৃহীত হইল ।

অ—

অজশুকী। ইহার অর্থ বাবলাগাছ। ইহার অপর একটি নাম “বকু”। পরবর্তী সংস্কৃত গ্রন্থে “বকু” শব্দ পাওয়া যায় না, “বকুল” শব্দ পাওয়া যায়। তাহার অর্থ বৃক্ষের ত্বক।

অপামার্গ। বাংলা নাম—আপাং।

অমলা। আমলকী।

অমূল। ইহা বৃক্ষের উপর ঝুলিত, মৃত্তিকায় ইহার মূল থাকিত না। ইহার রসে শরের মুখ বিষাক্ত করা হইত। অথর্ব বেদে এই পরিচয় জানা যায়।

অরটু। ইহা যে কোন বৃক্ষ, যায় না। ইহার কাষ্ঠে গাড়ীর চাকার “ধুরো” নিশ্চিত হইত।

অরাটকী। ইহাকেও চিনিতে পারা যায় না।

অরুন্ধতী। ইহা লতা বিশেষ; হিরণ্যবর্ণ, ইহার নাড়িকা বা ডাঁটায় চল থাকিত; দেখিলে ‘লোমশ’ মনে হইত। ইহার একটি বিশেষণ ‘লোমশবক্ষণা’। অথর্ববেদে উল্লিখিত হইয়াছে—ঋষিগণ এই গাছ হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিতেন এবং ইহার রস খাইলে গো-জাতি প্রচুর দুগ্ধবতী হইত।

অর্ক। আকন্দ।

অলাপু। লাউ।

অবকা। ইহার আর একটি নাম শীপাল। গন্ধর্ব্বগণ, কঠম্বর প্রসাধনের জন্য ইহার পত্র ভক্ষণ করিতেন।

অশ্বগন্ধা। প্রস্তর গন্ধি বলিয়া বৈদিক যুগে এই ঔষধের—“অশ্ব” এইরূপ বানান ছিল। পরবর্তী যুগে ইহার নাম হইয়াছে “অশ্বগন্ধা”। ‘ম’য়ের স্থানে ‘ব’ বসিয়াছে।

অশ্বথ।

অশ্ববার। নল জাতীয় তৃণ বিশেষ।

আ—

আদার। সংস্কৃত নাম আদ্রক। আদা।

আবয়ু। সর্ষপ।

আণ্ডীক। পদ্ম।

আল। শস্তক্ষেত্রে জন্মিত, কোন জাতীয় গাছ এখনও বুঝিবার উপায় নাই।

আহা। ছর্ষা বিশেষ।

উ

উশনা। শত পথ ব্রাহ্মণে লেখা আছে, সোমলতা না পাইলে, ঋষিরা এই গাছের রস বাহির করিয়া সোমের কাজ সারিতেন।

উদ্ব্বর। ডুমুর, বজ্রডুমুর।

উশীর। তৃণ বিশেষ, বেণা। অনুলেপনে রমণীয়া ব্যবহার করিতেন। পরবর্তী যুগে—বহুরোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দেখিতে পাই।

উ

উষা। জ্যোতিষ্ময়ী লতা বিশেষ।

এ

এরঙ। বেদে ইহার উল্লেখ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণে আছে।

ঐ

ঔক্ষগন্ধি। স্নগন্ধি ঔষধি বিশেষ। ইহার অর্থ—যাঁড়ের গাছের গন্ধবিশিষ্ট ড্রব্য। কিন্তু জিনিষটা যে কি?—ঠিক জানা যায় না।

ক

কিয়াষু। শব্দ-দাহস্থানের নিকটস্থ লনাশের এই গাছ লাগাইতে হইত।

কারণে ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ইহা শাক  
বিশেষ।

কুমুদ।

কৃষ্ট। সকল রোগেই ব্যবহৃত হইত।  
তাই ইহার আর একটা নাম “বিশ্বভেষজ”।  
আর্যেরাে কিস্ত বিশ্বভেষজ অর্থে শুভী বুঝায়।  
কৃষ্ট হিমালয় জাত, স্নগন্ধি ওষধি।

জ

জম্বিড়। বৃষ্টিতে পারা যায় না। কেহ  
কেহ ইহাকে *Terminuata Arjuneya*  
বিশিষ্টা অভিহিত করেন।

কর্কক্ক। কুম্ভাণ্ড জাতীয়। বোধ হয়—  
লাল কুমড়া (বিলাতী কুমড়া) হইতে পারে।  
উড়িষ্যা দেশে বিলাতী কুমড়ার নাম “বাধারু”।  
দেশ-বিশেষে সাদা কুমড়াকেও কর্কক্ক বলে।  
ইহারই অপভ্রংশ কধু বা কহু।

কাকদ্বীর। কি বৃক্ষ, জানা যায় না।

কুশ।

কাশ।

কুশর। তৃণ জাতীয়, আকার বৃহৎ। ইক্ষু  
হইতে পারে। সংস্কৃতে “কুশর” নাম ব্যবহার  
হয় না। যশোহরে, উত্তর বঙ্গে কুশারি ও  
কুশর শব্দে ইক্ষু বুঝায়।

কিংস্তক।

খ

খদির।

খর্জুর। বৈদিক যুগে দীর্ঘ উকার বানান  
ছিল।

ত

তিল।

তিরক। কোন্ জিনিষ জানা যায় না।

তায়মাণা। কেহ বলেন, বলাড়ম্বর, কেহ  
বলেন—নয়।

দ

দ্রাক্ষাধ। বট।

নারাটী। বিষাক্ত গাছ। শরে ইহার  
রস মাখানো হইত।

প

পক্ষ। পাকুড়।

পাটা। শৈবান। বাংলায় শুড় পরি-  
ষ্কারের জন্ত যে পাটাশেহালা ব্যবহার হয়,  
তাই কি?

পিপ্পল। অম্বথ।

পৃতক্র। পৃতদারু। হিমালয় জাত সরল  
বৃক্ষ।

পলাশ।

পুতিক। পুতীক। পুঁই।

প্রস্থ। চেনা যায় না।

ব

বদর। কুল।

বিষ।

বজ্র। বচ হইবে কি?

বিষ। তিক্তলকুচ।

বিষাক্ষা। বিষাক্ত বৃক্ষ।

ভ

ভঙ্গ। অথর্ব বেদোক্ত মাদকদ্রব্য।  
“ভাং” কি?

ম

মঞ্জিষ্ঠা।

মহুঘ। মত্ত উৎপাদক বৃক্ষ বিশেষ।

শ

শণ। ইংরাজী নাম hemp.

শকক। চেনা যায় না।

শালুক। জলজ পুষ্প।

শমী। *Mimosa Suma*। অথর্ববেদে

উক্ত হইয়াছে, ইহার পত্র-রসে নেশা হয়।

কেশবহুল স্থানে লাগাইলে চুল উঠিয়া যায়।

শাল্মলী। শিমুল। পরবর্তীযুগে আকার

বসিয়া শাল্মলী হইয়াছে।

স

সোমলতা। এখন ব্যবহার নাই, চেনাও  
যায় না।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী।

## আয়ুর্বেদে ভারত বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

—•••—

পূর্বে চীণ, উত্তরে তুরস্ক, দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে ইজিপ্ট, আরব ও যুরোপ—এই সকল দেশের সহিত যে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ—বহুযুগ পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ভেষজ দ্রব্যের নাম-রহস্যের আলোচনা করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য—ভারতকে একদা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছিল এবং সেই সিদ্ধমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া, ভারত পৃথিবীর গুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল।

**পিঁপুল।**—আয়ুর্বেদে পিপুলের অনেকগুলি নাম। তাহার মধ্যে “উপকূল্যা” “বৈদেহী” এবং “মাগধী” এই তিনটি প্রধান। আমার মনে হয়, এই তিনটি নামের সার্থকতা বোধ হয়—পূর্বে বিদেহ বা মগধ দেশ হইতে এদেশে প্রথম আমদানি হইয়াছিল। পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক পাঠে আমরা বুঝিতে পারি—বিদেহ এবং মগধ দেশের লোকেই ভারতে প্রথম বাণিজ্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কোষকার অমর সিংহ বণিক পথায়ের প্রথমেই “বৈদেহকঃ” শব্দ বসাইয়াছেন। এই বিদেহ দেশ মগধেরই অন্তর্গত। যুরোপীয় বণিকগণের

কাছে ভারতীয় পিপুলীই প্রথম পরিচিত হইয়াছিল। ইংরাজীতে পিপুলীর নাম—pepper, ইহা পিপুলীরই অপভ্রংশ। বণিকগণ মলবায় উপকূল হইতেই পিপুল, গোল মরিচ প্রভৃতি মসলা সংগ্রহ করিতেন। এই উপকূলের সহিত সম্বন্ধ থাকার জন্যই বোধ হয় পিপুল ও মরিচের নাম “উপকূল্যা” হইয়াছে।

**এলা।**—এলা বা এলাইচ আয়ুর্বেদোক্ত বহু ঔষধেরই উপাদান। আয়ুর্বেদে—“যক্ষ কর্দম” নামে একটা প্রলেপ দেখিতে পাওয়া যায়। এলাচ, কর্পূর, কস্তুরী, অশুষ্ক—এই গন্ধ চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণের নামই—“যক্ষ কর্দম।” অমর কোষেও “যক্ষ কর্দম” প্রলেপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যক্ষ কর্দমের প্রধান ও প্রথম উপাদানের নাম “এলা”। এই “যক্ষ কর্দমের” কর্দম হইতেই বোধ হয় এলাচের ইংরাজী নাম cardamom হইয়াছে। পূর্বে এদেশ হইতে ভারতীয় বণিকগণ—এলাচ রপ্তানী করিতেন। রাজনির্ঘণ্টে এলাচের নাম “দ্রাবিড়ী” ও “সাগর গামিনী”; ইহাতে বেশ বুঝা যায়, এলাচ দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন হইত এবং তথাকার অনার্যগণ এলাচকে সাগর পথে যুরোপে চালান দিতেন।

লবঙ্গ ।—লবঙ্গের একটি সংস্কৃত নাম—  
“বাসি সম্ভব” । ইহা সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপে  
উৎপন্ন হইত, তথা হইতে ভারতে আসিত এবং  
বিশেষে প্রেরিত হইত ।

কুষ্ঠ ।—“কুষ্ঠ”—একটি গন্ধ দ্রব্য ।  
অনেক রোগে, ঔষধার্থে ইহার প্রয়োগ দেখিতে  
পাই । ডাক্তার অপার্ট বলেন,—ভারতীয়  
ব্যক্তিগণ অতি উচ্চমূল্যে ইহা রোমানদের  
নিকট বিক্রয় করিতেন । কুষ্ঠের ইংরাজী  
নাম—costus.

নলদ ।—“নলদ”—সুগন্ধী দ্রব্য । কবি-  
বাহেরা তৈল পাকের সময় ইহার ব্যবহার  
করেন । ভারতীয় বাণিজ্যগণ—ইহাও যুরোপে  
উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতেন । ইহার যুরোপীয়  
নাম Nard.

বোল ( Myrrh )—“বোল” একটি  
প্রাচীন গন্ধ দ্রব্য । ঔষধার্থে এদেশে ইহার  
বহুল প্রচলন ছিল । ইজিপ্টে ইহার নাম—  
‘বল’ । “বোল” ভারত হইতে ইজিপ্টে  
গইত । পরে ইজিপ্ট হইতেই ইহা যুরোপে  
চলান হইয়াছিল ।

কস্তুরী ।—“কস্তুরী” ভারতের একটি  
মূল্যবান গন্ধ দ্রব্য । সাম্প্রতিক রোগে, কফ  
রোগে, গায়দোর্সলো,—নাড়ীর ক্ষীণতায়,  
দৈহিক তাপের অভাবে, ঔষধার্থে ব্যবহৃত  
হয় । সাধারণের বিশ্বাস—“কস্তুরী” মৃগ  
নামক পশুর নাভিদেশে জন্মে । এই জন্ত  
ইহার নাম “মৃগনাভি” । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে  
ইহার প্রাণের নাভি ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্তী  
কোষ বিশেষ । অণ্ডকোষের সংস্কৃত নাম—  
“মূক” । এই “মূক” শব্দ হইতেই মৃগনাভির  
সারথী নাম হইয়াছে—“মেক” । “মেক”  
হইতে ইহার ইংরাজী নাম—Musk । ইহার

ধায়া বেশ বুঝা যাইতেছে—“কস্তুরী” ভারত  
হইতে প্রথমে আরব দেশে গিয়াছিল, পরে  
আরবীয়গণের নিকট হইতে—ইহা যুরোপের  
মোটরিয় মেডিকাতে স্থান পাইয়াছিল ।

শর্করা ।—“শর্করা”—ইক্ষুজাত বিকার ।  
ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ । বৈদিক যুগ  
হইতে যজ্ঞ কার্যে এবং ঔষধার্থে ইহার যথেষ্ট  
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । ভারতবাসীর  
নিকট হইতেই যুরোপ শর্করার প্রস্তুত-প্রণালী  
এবং গুণাবলী শিক্ষা করে । তাই চিনী  
ইংরাজী নাম Sugar । যুরোপের মহিষদী  
মহিলা, মিসেস্ মেনিং—শর্করাকে ভারতজাত  
পদার্থ বলিয়াই স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন ।  
শর্করা হইতে প্রাচীন ভারতবাসীরা মিছরী  
প্রস্তুত করিতেন । মিছরীর সংস্কৃত নাম—  
“শর্করা খণ্ড” । ইহার ইংরাজী নাম Sugar  
candy । এমন নামগত সামঞ্জস্য সত্ত্বেও কেহ  
কেহ বলিয়াছেন—ভারতবাসীরা শর্করার  
ব্যবহার শিখিয়াছে—চীনদেশবাসীর কাছে,—  
তাই শর্করার নাম “চিনী”—আর মিছরী  
আসিয়াছিল—মিসর দেশ হইতে, তাই—ভাহার  
অপভ্রংশে মিসরী বা মিছরী নামের উৎপত্তি ।  
তাহাদের ধারণা যে ভ্রান্ত, একথা সাহস  
করিয়া বলা যায় ।

বাণিজ্যের রীতি—আদান ও প্রদান ।  
ভারত যেমন বহু জিনিষ বিদেশে, প্রদান  
করিয়াছে, তেমনি বিদেশ হইতে কিছু কিছু  
আদান বা গ্রহণও করিয়াছে ।

যোয়ান ।—যোয়ানের সংস্কৃত নাম—  
“যবানিকা” । তাই মনে হয়, হয়ত ইহা যবন  
দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে । তবে ইহা  
আমার অস্বাভাবিক মাত্র—নিশ্চয় কিনা বলিতে  
পারি না ।

**সিহল।**—“সিহল”—গন্ধদ্রব্য বিশেষ। অমরকোষে ইহার উল্লেখ আছে; “তুরুষ্কঃ পিণ্ডকঃ সিহেলা যবনোহপি”। আবার বিশ্ব মেদিনীকারও লিখিয়াছেন—“তুরুষ্কঃ সিহলকে স্লেচ্ছ জাতৌ দেশান্তরেহপিচ।” ইতিহাস পাঠে জানা যায়—আওনিয়ান গ্রীকগণকেই হিন্দুরা যবনাখ্যা দিয়াছিলেন। এই জন্তই মনে হয়—তুরুষ্ক ও গ্রীকগণ ভারতে “সিহল” নামক দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিলেন।

**রোমক লবণ।**—প্রাচীন হিন্দুগণ “রোমক” নামক লবণ ব্যবহার করিতেন। অমর কোষেও “রোমক” নাম লবণ বিশেষের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ভাট্টজী দীক্ষিত বলেন—“রুমায়াং ভবং”। অতএব রোমক লবণ যে রুমা বা রোম দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

**হিন্দু ও কুঙ্কুম।**—“হিন্দু” ও “কুঙ্কুম” এই উভয় দ্রব্যের নামের পর্যায়ে “বাহ্লিক” শব্দটি স্থান পাইয়াছে। স্মরণ্য মনে হয়—এই দুই জিনিষ বাহ্লিক দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছে।

**রসোন।**—“রসোন”—ইহার সংস্কৃত নাম—স্লেচ্ছকন্দ। আয়ুর্বেদে ইহার আর একটি নাম “যবনেষ্ট”। হয়ত ইহা বহুযুগ পূর্বে স্লেচ্ছ দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিল।

**তাম্র।**—তাম্রের একটি নাম—“স্লেচ্ছ” মুখ”। ভাট্টজী দীক্ষিত বলেন স্লেচ্ছদেশে মুখমুণ্ডপত্তি যন্ত। আবার তাম্রের আর একটি বিশেষণ—“নৈপালী”। স্লেচ্ছ দেশ ও নেপাল হইতে এদেশে তাম্রের আমদানী হইয়াছিল।

**কপূর, লৌহ ও সীসা।**—কপূরের নাম “চীর্ণজ”। লৌহেরও একটি নাম চীর্ণজ। সীসকের নাম “চীর্ণবক্ষ”।—এই তিন দ্রব্য যে চীর্ণদেশ জাত, ইহাই তাহার প্রমাণ।

**হিঙ্গুল।**—হিঙ্গুলের নাম দরদ। বোধ হয়—হিঙ্গুল দরদ অর্থাৎ দর্দিস্থান হইতে এ দেশে আমদানী হইয়াছিল।

**লঙ্কা।**—লঙ্কা। লঙ্কাদ্বীপ হইতে এ দেশে আসিয়াছিল।

এই কয়টিমাত্র দ্রব্যের নাম-রহস্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি ভারত বিদেশ হইতে যাহা আমদানি করিয়াছিল, তাহার শতগুণ দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছিল।

ডাক্তার শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

এম্ বি।

## চিকিৎসকের দুঃখ।

স্কুলমাষ্টার, কেরানী প্রভৃতির দুঃখের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। তাহারা প্রায়ই দগ্ধ। বাস্তব-জগতে দরিদ্রের জীবন দুঃখপূর্ণ।

যতকাল সমাজব্যবস্থা থাকিবে, ততকাল ধনী দরিদ্রের ভেদ থাকিবে এবং দারিদ্র্যহীন অনিবার্য বোধ হইবে। কিন্তু দারিদ্র্য ব্যতীত



দুঃখের অনেক কারণ থাকিতে পারে, তবে সেগুলি প্রায়ই প্রতিগোচর হয় না। এই নিরন্তর বহুদুঃসমাজে দারিদ্র্যের আর্ন্তনাদ-কল্লোলে তাহা ডুবিয়া যায়। আমি আজ সেই কথা বলি।

অনেকে ভাবিতে পারেন,—চিকিৎসকের আবাস দুঃখ কি? অবশ্য অগম্যবশত্বে প্রতিপত্তিহীন-চিকিৎসকের দুঃখ থাকিতে পারে, তাহা ত দারিদ্র্যদুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমি সে কথা বলিতেছি না। আমি যে দুঃখের কথা বলিতেছি, ছোট হটক, বড় হটক—চিকিৎসক-জীবনের তাহা নিত্য সহচর।

এই বিবাত বিশ্বমণ্ডলের মত ক্ষুদ্র মনুষ্য-সমাজমণ্ডলের ভিত্তিও কৰ্ম্মভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বদেহে যেমন ক্রিয়াভেদে হৃদয়মণ্ডির বিকাশ, সমাজদেহেও সেইরূপ কৰ্ম্মবৈচিত্র্য ব্যষ্টির প্রতিষ্ঠা এবং যেমন বিশ্বক্ষেত্রে সেইরূপ সমাজক্ষেত্রে কৰ্ম্মানুসারেই ভূত-বিশেষের উৎকর্ষ অপকর্ষ কল্পনা। অবশ্য স্বল্পদ্রব্যে কেহই ক্ষুদ্র বা নিকৃষ্ট নহে, কিন্তু স্বল্প-জগতে সে স্বল্পের সম্পর্ক অতি বিরল—অন্ততঃ সামান্যতমপক্ষে নহে। স্থূলের সহিতই তাহার আদান প্রদান ও সম্বন্ধ।

চিকিৎসা অতি মহৎ ও পুণ্যকৰ্ম্ম,—ইহা অনেকেরই বিশ্বাস। অন্ততঃ চিকিৎসকগণকে সমাজ এই চাটুবাঁকোই অভিনন্দিত করে। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় কি সত্যই মহৎ? মানুষ—বোগবস্ত্রণায় অস্থির হইয়া, প্রাণের মমতায় হৃৎকল্লুর আশ্রয় চিকিৎসকের নিকট ছুটিয়া আসে, চিকিৎসক অর্থের বিনিময়ে তাহার চিকিৎসা করেন, কেননা, অর্থ গ্রহণ না করিলে চিকিৎসকের জীবিকা নির্বাহ হয় না। অবশ্য অনেক মহাত্মা আছেন—ঋণাত্মক বিনামূল্যে

দীনদরিদ্রের চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আবার ধনবানের গৃহে আহত হইলে প্রভূত অর্থপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা ত্যাগ করিয়া, সমকালীন নিঃস্বদরিদ্রের আহ্বান ঋণাত্মক বরণ করিয়া লইতে পারেন, তাদৃশ চিকিৎসক একান্তই দুর্লভ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্বে রাজ্যেশ্বর্য্যপরাধুখ আকুমার ব্রহ্মচারী ভীষ্ম যুদ্ধিরকে বলিয়াছিলেন

অর্থশ্রু পুরুষো দাসোহর্থো দাসোনকন্তুচিং  
ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহম্মার্থেম কোরবৈঃ।  
অর্থাৎ—মহারাজ, পুরুষই অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, একথা সত্য (তাহার উদাহরণ) কোরবেরা আমাকে অর্থ দ্বারা বন্দী করিয়াছে।

চিকিৎসকগণও রোগীদিগকে ঠিক এই কথাই বলিতে পারেন। বরণ ভীষ্মের পক্ষে অমূল্য একটা কথা বলা যাইতে পারে, উভয় পক্ষই রাজ্যভারের জন্য জ্ঞাতবিরোধে প্রবৃত্ত। চিকিৎসকের পক্ষে সে কথাও বলা চলে না। ধনী-দরিদ্র—উভয়েই প্রাণের মমতায় তাঁহার হারস্ব হয়। চিকিৎসক অর্থের মানদণ্ডেই উভয়ের প্রাণের তুলনা করিতে বাধ্য হন।

অবশ্য পৃথিবীতে প্রায় সমস্ত জিনিষেরই মূল্য লওয়ার রীতি আছে। যে খাণ্ড সামগ্রী ব্যতীত কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না, তাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। যে জল জগতের জীবন, তাহাও স্থান-বিশেষে ও সময় অনুসারে ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রে লোকে তাহাদের কষ্টোপার্জিত অর্থের বিনিময়ে একটা দ্রব্য পাইয়া থাকে, কিন্তু প্রভূত অর্থ-বিনিময়েও মানুষ চিকিৎসকের নিকট কি পাইয়া থাকে? জীবন কি চিকিৎসকের আরম্ভ? চিকিৎসা-বিদ্যা—অত্মপি অসম্পূর্ণ এবং

অনিশ্চিত। নিত্য নব বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাবিত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও অত্যাধি চিকিৎসাবিদ্যা বিজ্ঞান পদবী লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা-বিশারদ-গণও স্বীকার করিতেছেন—মানুষের প্রকৃতিই তাহার রোগ প্রতিষেধক। চিকিৎসক সেই প্রকৃতির সহায়তা করিতে পারেন মাত্র। সেই প্রকৃতির সম্পূর্ণ স্বরূপ কোন চিকিৎসক জানিতে পারিয়াছেন? এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর রূপক \* আছে। গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে রোগীর জীবন এবং রোগের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। রোগীর আত্মীয়-স্বজনগণ রোগীর সাহায্যার্থ চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। চিকিৎসক বৃহৎ লণ্ডু স্কন্ধে রোগীর কক্ষে আবির্ভূত হইলেন। গভীর অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না, চিকিৎসক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লণ্ডু প্রহার আরম্ভ করিলেন। যদি চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের ভাগ্যবশে রোগের উপর লণ্ডু নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তবে রোগ সে যাত্রা পলায়ন করে, আর যদি রোগ ছাড়িয়া জীবনের উপর লাঠি পড়ে, তবে রোগীর জীবনীলা সাঙ্গ হইয়া যায়।

তাই দেখা যায়—লোকে চিকিৎসার জন্ত যে অর্থব্যয় করিতে বাধ্য হয় তাহা প্রায়ই অপব্যয় মনে করিয়া থাকে। একটা উদ্ভট শ্লোক আছে

রোগকালে পিতা বৈভঃ রোগ শেষে সহোদরঃ  
রোগমুক্তো মাতুলস্ত, দানকালে চ শ্রীলকঃ।†

\* স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু কথিত।

† এই অভ্যাসটা কেবল মানুষের নহে। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গবৈরা আশ্বিনীকুমারস্বরকে বেবপূর্ণের লিখিত তুল্যাবে অধিকারী হইলেও যজ্ঞীয় সোমভাগ গ্রহণে বহুকাল ব্যক্তি রাখিয়াছিলেন এবং এইরূপই অবশেষে মহর্ষি চ্যাবনের সহিত তাঁহার বিবম বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। মহাত্মারও দেবীভাবন।

‡ সমু. বিষ্ণু ও বাজবল্য সংহিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ কথায়।

প্রাচীন হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে দেখ, † চিকিৎসক অপাণ্ডুস্ত্রয় বলিয়া নিশ্চিত, তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া কথিত। সুদূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দেই, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বর্তমান যুগে যুগাবতার বলিয়া অনেকের নিকট পূজিত। তিনি যে একজন জীবন্তু মহাপুরুষ ছিলেন, সে সম্বন্ধে কাহারও নতভেদ নাই। তিনি চিকিৎসকের অন্ন গ্রহণ কবিত্তে পারিতেন না বলিতেন, ‡ উহাদের অর্থলোকের চুংখকষ্টের উদ্ধার উপার্জিত। এই তব পরম দূরদর্শী আর্ঘ্য ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সর্বতত্ত্বভেদিনী প্রতিভার আলোকে ইহার যথাসম্ভব এবং কথঞ্চিৎ প্রতিকারের উপায় ও উদ্ভাবিত হইয়াছিল। মর্ত্যভূমিতে হিমগিরির পাদমূলে সম্মিলিত ঋষিসঙ্ঘ কর্তৃক সর্ব প্রথম আয়ুর্বেদের অবতারণা হইয়াছিল, তাহার পর কিছুদিন পর্যাণ্ড আয়ুর্বেদের ভার তাঁহাদেরই হস্তে ছিল। ক্রিয়ংবাল পরে তাঁহারা বুঝিতে পারেন,—আয়ুর্বেদ চর্চার দণ আধ্যাত্মিক অবনতি। পরমার্থ ভগবচ্ছিত্ত। ত্যাগ করিয়া কেবল লোকের রোগের—পাপের চিন্তা করা তপস্তার প্রতিকূল। তখন তাঁহারা স্থির করেন, সম্বৎসর প্রধান ব্রাহ্মণের পক্ষে এ বিভ্রাট ত্যাগ করাই কর্তব্য। কিন্তু কাহার হস্তে আয়ুর্বেদের ভার স্থত করেন? কেননা এ শাস্ত্র সমাজের পক্ষে কথঞ্চিৎ হিতকর এবং প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, অতএব লুপ্ত হওয়া প্রার্থনীয় নহে। ক্ষত্রিয়ের হস্তে দেশরক্ষার ভার। সে কার্য মহত্তর

এবং পরিভ্রতর। অতএব ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও এ বিদ্যা উপযোগিনী নহে। বৈশ্য—বাণিজ্য-জীবী। সে—ব্যবসায়ের হিসাবে এ বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে লোকের উপকার অপেক্ষা পীড়নের মাত্রাই বাড়িবে। অথচ ব্যবসায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করিলে—কেবল সখের হিসাবে এ কার্য স্থায়ী হইবে না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়াই মহর্ষিগণ ব্রাহ্মণ-পিতা এবং বৈশ্য-মাতার সহযোগে অষ্টজাতির সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হস্তে আয়ুর্বেদ অর্পণ করিলেন। পিতৃবীজের প্রাধান্য হেতু ব্রাহ্মণ স্থূলভ জীবদ্ব্যর্থকারতা এবং ধর্ম-ভাবের আধিক্য এবং মাতৃবীজ জনিত বণিগ-বীর্যগোপভাবলইয়া যে জাতির উদ্ভব,—তাহার দ্বারা লোক পীড়ন অধিক হইবে না—অথচ এ বিদ্যাও বিস্তৃত এবং প্রচলিত থাকিবে—এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা বিধান করিয়াছিলেন,—‘অষ্টধানং চিকিৎসিতম’।

ইহকাল ও পরকালের উপর মানুষের আশা ও স্তিতি। ইহকালের হিসাবে চিকিৎসকের কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঘটিয়া থাকে? অত্যাশ্র ব্যবসায় বেকপ অর্থকর, তাহার তুলনায় চিকিৎসা-ব্যবসায় অনেক হীন। জগতে ঐশ্বর্য্য-বান্ধবগণনা-মুখেই হউক আর অবসানেই হউক—কোন চিকিৎসকের নাম কীর্ত্তি কি হয়?

তাহার পর যশঃ। আমাদের দেশেই বল, আর পাশ্চাত্য দেশেই বল,—কোন দেশের ইতিহাসেই চিকিৎসকের নাম উল্লিখিত হয় নাই। কোন সার্থকজন্মা কবির লেখনীমুখে চিকিৎসকের কীর্ত্তি-সঙ্গীত হইয়াছে? এই বর্তমান অন্ধ মহাদেশব্যাপী ভীষণ লোকক্ষয়কর রক্ত উত্তর পক্ষীয় বীরেন্দ্রগণ পরস্পরকে সংহার

করিতে প্রবৃত্ত। আর চিকিৎসকগণ শত্রুজিহ্বা নির্বিশেষে সকলেরই প্রাণ রক্ষায় যত্ন করিতে-ছেন, কিন্তু যখন কোলাহল নিত্য হইবে, ধরিত্রী আবার শাস্তি-শীতলা হইবেন, তখন ইতি-হাসে—কবিমুখে—জনকণ্ঠে দিগ্বিজয়ী বলিয়াই হউন, আর দেশরক্ষাকারী বলিয়াই হউন—শত্রু-জয়ী বীরেন্দ্রগণেরই যশঃ ধ্বনিত হইবে—কৃত-জ্ঞতা মুগ্ধ সমগ্র দেশের সম্মান ঐশ্বর্য্য তাহাদের চরণেই অঞ্জলিরূপে প্রদত্ত হইবে। রাজনীতিক বল, ব্যবসায়ীবল ধনী ভূস্বামীগণই বল,—অল্প বিস্তর সকলেই যে মহোৎসবে সমাদৃত হইবেন, কেবল চিকিৎসকগণের ভাগ্যে হয়ত ক্ষীণকণ্ঠের মুহু ধ্বজবাদ মাত্র—আর না বলাই ভাল।

কেবল চিকিৎসকগণের নিকট চিকিৎসা-গ্রন্থে চিকিৎসকের নাম বিখ্যাত এবং প্রশংসিত। যাহার কথা অস্ত্রে বলে না—তাহার কথা নিজেই বলিতে হয়।

যশের কথা যখন উঠিল, তখন অযশের কথাও বলিতে হয়। চিকিৎসক জন সাধারণের রোগাকাজী,—সমাজের ইহাই বিশ্বাস। কেননা লোকের রোগ না হইলে চিকিৎসকের ব্যবসায় চলে না। তাই কি দূরদর্শী গভর্ণমেন্ট স্বাস্থ্য বিভাগে নিযুক্ত চিকিৎসকগণের চিকিৎসাবৃত্তি নিষিদ্ধ করিয়াছেন? চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ দেশের স্বাস্থ্যবৃদ্ধির পরিপন্থী,—এই ধারণার ফলেই কি এই ব্যবস্থা?

পুরাণকার ঋষি এই তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন কিনা জানিনা কিন্তু যিনি আলি চিকিৎসক স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্বর্গ্যপুত্র অর্থাৎ শনির (গ্রহ) বৈমাত্র এবং যমের সহোদর ভ্রাতা \* বলিয়াছিলেন—তাঁহার স্মৃদৃষ্টি অত্যন্ত বর্তমান যুগের হিসাবে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

\* মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং হরিবংশ ।

ইহা যদি বিগুহ রসিকতা হয়, তবে তাহা তীব্র এবং চিকিৎসক-মর্শভেদিনী বটে।

সংসার মরুক্ষেত্রে বন্ধুলাভ বড় শাস্তিপ্রদ, কিন্তু চিকিৎসকের ভাগ্যে তাহা দুর্ঘট। আমি প্রকৃত বন্ধুত্বের কথা বলিতেছি না, ঘনিষ্ঠতা-সৌহৃদ্যের কথাই বলিতেছি। ব্যবসায়ের অনু-রোধে তাহা রক্ষা করা চিকিৎসকের পক্ষে অতি দুর্লভ। আশ্চর্যের বিষয় এই, অত্যাশ্রয় ব্যবসায়ের বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ দোষাবহ বিবেচিত হয় না, বরং তাহারাই যথাসাধ্য পৃষ্ঠপোষণ এবং সহায়তা করিয়া থাকে, কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে তাহা করা আর বন্ধু বিচ্ছেদ হওয়া একই কথা। বন্ধু বান্ধবগণের এমন কি—দূর আত্মীয়গণের রোগ হইলে অশ্রু সকলেই যাইয়া সংবাদ লইয়া থাকে, সমবেদনা-সংপরামর্শ জ্ঞাপন করিতে পারে, কেবল চিকিৎসকের পক্ষে তাহা সকল সময় সম্ভব হয় না। যে ক্ষেত্রে রোগী—চিকিৎসক-বন্ধু বা আত্মীয়কে আহ্বান করে নাই, সে ক্ষেত্রে অনাহুত এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাইতে চিকিৎসক সঙ্কোচ এবং আয়ুর্মর্যাদা-লাঘবকর বিবেচনা করেন। রোগীও কুণ্ঠিত হয়, অনেকে পছন্দও করেন না। চিকিৎসক উপস্থিত হইলেও অকপট ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না।

চিকিৎসককে কদাচিত দীর্ঘজীবন লাভ করিতে দেখা যায়, বিষাক্ত, দূষিত, সংক্রামক মারাত্মক নানারূপ রোগ লইয়া তাঁহাকে সর্বদা নাড়াচাড়া করিতে হয়, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক—চিকিৎসককে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। একটা প্রবাদ আছে, ভূতের ওয়ার মৃত্যু ভূতের হাতে আর, সাপের ওয়ার

মৃত্যু সর্পাঘাতে হইয়া থাকে। চিকিৎসকের ভাগ্যে এই প্রবাদের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায়।

ভোগ-স্বথ চিকিৎসকের ভাগ্যে দুর্লভ! তাঁহাদের নিকট “ভোগে রোগভয়ম্” বিন্য় ইচ্ছামত আহার বিহার বিভীষিকা-সঙ্কুল হইয়া উঠে। কর্মরাস্ত্র জীবনে বিশ্রাম গ্রহণ বা অবকাশ লাভ সকলের ভাগ্যেই সুলভ, কেবল চিকিৎসকের অদৃষ্টে অবকাশের অবকাশ ঘটিয়াছে।

ইহকালে চিকিৎসকের সুখ ও সুবিধা ত এই। পরকালের পথও তাঁহার ভাগ্যে কণ্টকাকীর্ণ। চিকিৎসককে সর্বদা মেরুপ প্রলোভনের মধ্যে থাকিতে হয়, সর্বদা সেন্দপ কুচিস্তা ও জঘন্য বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়, তাহার ফলে “যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী” বিধি অনুসারে চিকিৎসকের ভাবনামু-যায়ীই জীবনযে গঠিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় নাই। পাঁচজন কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরাময় করিলে চিকিৎসক যে আশ্ব-প্রসাদ বা পুণ্য সঞ্চয় করেন, বুদ্ধি বা চিকিৎসার দোষে একজনের ভবলীলা অবদান করাইলেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। অথচ চিকিৎসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির অর্থ তাহাই। এই প্রাচীন শ্লোকোক্তেও এই কথাই সমর্থিত হইয়াছে—

“শতমারী ভবেঐদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ”  
গড়ে কি এই এই দুই ফলের কাটাকাটি হয়? যদি তাহা না হয়, তবে চিকিৎসক কি জন্ত এই ভীষণ দায়িত্ব-মহান প্রত্যাবার স্বীকার করেন? বিলাতী আইনের একটা মূলতন্ত্র এই—বরং দশজন ছুটি নিষ্কৃতি লাভ করুক, কিন্তু একজন নিরপরাধও যেন দণ্ডিত না হয়। চিকিৎসার মূলতন্ত্র কি তাহার বিপরীত? অথচ তাহা না

হইল হাসপাতালে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি উঠাইয়া দিতে হয় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি বা অভিজ্ঞতা লাভ অসম্ভব। পরীক্ষাযুগে কত মানবের জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছে—বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল কত প্রাণীর ক্লমির-পুত—তাহা স্মৃতিকর্তাই একমাত্র অবগত আছেন।

ধর্ম জগতেও কোন চিকিৎসকের জীবন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে ধ্বংস এবং প্রসিক্ত হইয়াছে? প্রাচীন পুরাণ—মহাভারত-রামায়ণ-দিব-ব্রাহ্মণ, মহর্ষি, ব্রহ্মবিগণের কথা ছাড়িয়া দিই, জনক তুল্য রাজর্ষি, ভীষ্ম অর্জুনাদি তুল্য ধর্মতত্ত্ব ক্ষত্রিয়গণের কথাও ধরিব না, কিন্তু গুরু গোবিন্দ বণিক তুলাধার ও সন্যাসি, ব্যাধ দাসী পুত্রাদিও ধর্মরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়াই পুণ্যলোক ধর্মযুগে অভিনন্দিত হইয়াছেন। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যেও কবিগণ ঐহানিগেব উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছেন, যাহাদেব ভগবদ্ভক্তি ও পরমার্থ লাভ স্মরণ করিয়া অত্যাধি কোটি ভক্ত-হৃদয় বিগলিত, জ্ঞানীচিত্ত আদ্র এবং সংসার তাপ দধ্মের হৃদয় আশা এবং সাধনায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে—তাহাদের মধ্যে ত কোন চিকিৎসকের নাম দেখি না! কোন কাহিনী—কোন উপাখ্যান—কোন সঙ্গীতে চিকিৎসকের পুণ্যস্থিতি সঞ্জীবিত করিয়া

রাখে নাই। যুগে যুগে লোকপাবন অবতার ও লোকোত্তর মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হইয়া পদরেণু স্পর্শে কত কামকান্দনাসক্ত পাপিষ্ঠের উদ্ধার করিয়াছেন, হীন অশুশ্রু জাতি সর্বজন ঘৃণ্য পতিতা গণিকাও তাঁহাদের কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই, কেবল চিকিৎসকই সে অক্ষয় করুণা লাভে অধিকারী হয় নাই। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় মহাদেশেরই ধর্মের এবং সাধনার ইতি-হাসে নৃপতি, মন্ত্রী, যোদ্ধা, পণ্ডিত, বণিক, দাস, ধীর, রজক, নালিকার, চর্ম্মকার, ব্যাধ সকল শ্রেণীর লোকই স্থান পাইয়াছে,—পায় নাই কেবল চিকিৎসক।\* জগতে এমন হতভাগ্য বুঝি আর নাই।

কিত ধাতু হইতে চিকিৎসক শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। কিত ধাতুর ছই অর্থ। সংশয় এবং রোগ প্রতীকার। চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর ইহ-পরকাল গভীর সংশয়াচ্ছন্ন, এই মনে করিয়াই কি শব্দশাস্ত্রকার চিকিৎসক শব্দের ওরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছিলেন?

শুনিতে পাই, লোকে অসহ যন্ত্রণার হাত এড়াইবার জন্ত সুরা পান করে। পূর্বেও বহু চিকিৎসক সুরাসক্ত ছিলেন, এক্ষণেও সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাঁহারা কি এই ছুঃখ নিবারণের জন্তই সেই সস্তাপহারিণীর আশ্রয় লইয়াছেন?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত কাব্যতীর্থ।

\* কেবল মাত্র যুগীয় গুপ্ত প্রভৃতি ২১১ জন মহাপ্রভু-শ্রীচৈতন্যদেবের করুণালাভের অধিকারী হইয়াছেন।

## দিন চর্য্যা।

( পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর )

এইবার আহারের কথা বলিব। আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—“বল, আরোগ্য, আয়ু এবং প্রাণ অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই অগ্নি অন্ন-পানারূপ ইন্দ্রন পাইলে প্রজ্জ্বলিত থাকে, অত্রথা নির্বাপিত হইয়া যায় অন্নই প্রাণীদিগের প্রাণ স্বরূপ, লোকে অন্নেরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। বর্ণের উৎকর্ষ, স্থিরতা, জীবন, প্রতিভা, স্মৃতি, তৃষ্ণা, পুষ্টি, বশ ও মেধা সমস্তই অগ্নি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।”

এই যে প্রাণ স্বরূপ অন্ন—ইহা আহার করা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। কেননা, অন্ন প্রাণীদিগেব প্রাণ স্বরূপ বাটে, কিন্তু অযুক্তিযুক্ত ভাবে সেবন করিলে প্রাণ নাশক হইয়া থাকে, অতএব আহার সম্বন্ধে যুক্তি কি—এই প্রসঙ্গে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, আহার বিধি আটটা বিধয়ের উপর নির্ভর করে। যথা, প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, উপযোগ, সংস্থান ও উপধোক্ত। প্রত্যেকের বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃতি—আহার দ্রব্যের যে স্বাভাবিক গুণ তাহার নাম প্রকৃতি। যেমন মাষকলায় স্বভাবতঃ গুরু এবং এবং মুগ স্বভাবতঃ লঘু, পুষ্কর মাংস স্বভাবতঃ গুরু এবং হরিণ মাংস স্বভাবতঃ লঘু। এইরূপ অন্নদ্রব্য শ্লেষ্মা ও পিত্ত বর্দ্ধক, কষায় ও তিক্ত দ্রব্য বায়ু বর্দ্ধক। দাল উদরে বায়ু সঞ্চয়কারক, তিক্ত দ্রব্য পিত্ত নাশক, কটু দ্রব্য কফ নাশক, মাংস পুষ্টিজনক

শাক মলবর্দ্ধক প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। দ্রব্যের প্রকৃতি বুঝিয়া ক্ষীণাগ্নি ব্যক্তি মাষকলায় পরিত্যাগ এবং মুগ আহার করিবে না। শ্লেষ্মা বা পিত্ত প্রধান ব্যক্তি অন্ন দ্রব্য আহার করিবে না। বায়ু প্রকৃতি ব্যক্তি তিক্ত ও কষায় দ্রব্য আহার করিবে না। যাহাদের উদরে বায়ু সঞ্চয় হয়, তাহার দাল আহার করিবে না। পিত্ত প্রধান ব্যক্তি তিক্ত দ্রব্য এবং কফ প্রধান ব্যক্তি কটু দ্রব্য আহার করিবে। শীর্ণ ব্যক্তি পুষ্টির জন্ত মাংস আহার করিবে এবং অল্প মল ব্যক্তি মল বৃদ্ধির জন্ত শাক আহার করিবে—ইত্যাদি।

করণ—স্বাভাবিক পদার্থের সংস্কার করণ বলে। সংস্কার দ্বারা দ্রব্যের গুণান্তর হয়। জল ও অগ্নির সংযোগ, শোধান, মছন, দেশ-কাল ভাবনাদি, কাল-প্রকর্ষ এবং পাত্রাদি দ্বারা দ্রব্যের সংস্কার হইয়া থাকে। জল দ্বারা সংস্কার—যেমন চিড়া ভিজাইয়া থাইলে অপেক্ষাকৃত লঘু পাক হয়। অগ্নিদ্বারা সংস্কার—যেমন ধাতু হইতে চাল হয়, বেগুন পোড়াইয়া থাইলে লঘুপাক হয়। জল ও অগ্নির দ্বারা সংস্কার—যেমন বিবিধ ধাতু সিদ্ধ করিয়া থাইলে লঘু পাক হয়। শোধান—যেমন ফলাদির বীজ ও ত্বক ফেলিয়া দিয়া থাইলে লঘুপাক হয়। মছন—যেমন \* মথিত দধি ঘোল রূপে পরিণত হয় এবং মাধব উৎপন্ন হয়। দেশ—আনুপ দেশের জল অভিযান্ধী, এবং জাঙ্গল দেশজাত জল ও প্রাণীর মাংস অভিযাজী

নয়। কাল—যেমন উত্তরায়ণ কালে কটু তিক্ত ও কষায় রসের বৃদ্ধি হয় এবং দক্ষিণায়ণে অন্ন লবণ ও মধুর রস বৃদ্ধিত হয়, শরৎকালে জল নির্মল হয়। ভাবনা—যেমন চড়াই পক্ষীর ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ দ্বারা চাউল ভাবনা দিলে তাহা অত্যন্ত শুক্লবর্ণক হয়। কাল-প্রকর্ষ—যেমন কুম্বাও পক্ষ হইলে সুপথা হয়। অত্যন্ত অন্ন বয়স্ক পুস্তর মাংস অপথা ও মাংস কাল প্রকর্ষবশতঃ সুপথা হইয়া থাকে। পাত্রভেদে—যেমন ধাতুপাত্রে অন্নরস এবং কাংসাদি নির্মিত পাত্রে যতাদি বিকৃত হয়। যেমন ঘৃত লৌহময় পাত্রে, পেয়া রৌপ্যময় পাত্রে, ফল ও তক্ষা (লাড়ু প্রভৃতি) কদলী পাত্রে, পরিষ্কৃত ও প্রদীক্ষ মাংস সুবর্ণ পাত্রে, মণ্ডারদি ও মাংস, যুব রৌপ্য ময় পাত্রে, সিদ্ধ লীতল দুগ্ধ প্রায়ময় পাত্রে\* জল সরবৎ প্রভৃতি মৃন্ময় পাত্রে বাজ ঘাড়ব (সরবৎ বিশেষ) কাচ বা ফটিক নিম্নিত পাত্রে দিলে গুণশালী হয়।†

সংযোগ—ছই বা বহুদ্রব্যের একত্র মিলনকে সংযোগ বলে।\* একটী দ্রব্যের যেরূপ গুণ থাকে, ভিন্ন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার পার্থক্য ঘটে, যত ও মধু স্বতন্ত্রভাবে সেবন করিলে অনিষ্ট হয় না, কিন্তু একত্র

মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষবৎ অনিষ্ট করে। আবার সংযোগ দ্বারা দ্রব্য লঘুপাক বা গুরুপাক হইয়া থাকে। হিং, লবণ, মরিচ প্রভৃতি পাচক দ্রব্যের সংযোগে খাদ্য লঘুপাক হয়। য়ত, পেস্তা, ছোলা, বড়ি প্রভৃতির সংযোগে খাদ্য গুরুপাক হয়। লঘুপাক অন্ন মাংস-যতাদি সহ মিশ্রিত করিয়া পোলাও প্রস্তুত করিলে গুরুপাক হয়। রাশি—রাশি ছই প্রকার, যথা—সর্বগ্রহ রাশি ও পরিগ্রহ রাশি। মোটের উপর সমস্ত দ্রব্য বাহ্য আহার করা হইল, তাহাকে সর্ব গ্রহ রাশি, আর পৃথক দ্রব্যের পরিমাণকে পরিগ্রহ রাশি বলে, যেমন তিন পোয়া ছুধ, এক পোয়া চাল, আধ পোয়া দাল, তিনছটাক মাংস ইত্যাদি। এই রাশি জ্ঞান না থাকায় একবার একটী ভদ্র মহিলা বিষম অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। গল্পটি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, পরন্তু উপদেশ জনক হইবে বলিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

কোন সময়ে এক ধনবান গৃহস্থের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী অতিথি হইয়াছিলেন। অতিথি-বৎসলা গৃহিণী স্বয়ং অতিথির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আহারাদির বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করেন। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় অতিথি স্বয়ং

\* আয়ুর্বেদে তাম্রময় পাত্রে দুগ্ধ দিবার নিয়ম আছে, কিন্তু স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে “তাম্র পাত্রে পানং সন্ধ্যা গোমাংস ভোজনম” অর্থাৎ তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান করিলে সন্ধ্যা গোমাংস ভোজন করা হয়। এই বিরুদ্ধ মতাবাদের মীমাংসা এই, তাম্র পাত্রে দেহাদির, উদ্দেশে দুগ্ধ আহারণ করা প্রচলিত আছে। এ যুগে দুগ্ধ অর্থে উক্ত সার (বাথন তোলা) দুগ্ধ। সসার দুগ্ধ তাম্রময় পাত্রে দেওয়া বাইতে পারে।

† হৃশ্ত হৃশ্বান, ৪০ অধ্যায়, ৮৯ সংখ্যক শ্লোক।

\* করণের কাল, ভাবনা, পাত্রভেদ সম্বন্ধে হৃশ্বতের টীকাকারের যে মত আদি তাহার অনুসরণ করি নাই। হৃশ্বতের টীকাকারের মত গতবর্ষের মাঘ মাসের আয়ুর্কোষে ২১৩১৪ পৃষ্ঠায় আয়ুর্কোষে Empirical নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। আহার সম্বন্ধে আটটি বিষয়ের কথা বর্ণন বলা হইয়াছে, তখন আহারের বেশ সম্বন্ধে ঐহিক বিশেষণকে খাদ্য রাশির মধ্যে রাখিলে গুণাত্তর সংযোগ হয়, তিলকে জলের সহিত অধিবাসিত করিয়া দীও কপিলে ফুলেল তেল হয়।

পাক করিয়া আহার করেন। এক সের চাউলের অন্ন দুইটী কাচকলা ভাতে, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ঘৃত লইয়া অতিথি আহারে প্রস্তুত হইলেন। গৃহিণী যখন দেখিলেন যে, অতিথি সমগ্র অন্ন উদরস্থ করিলেন, তখন নিজের পুত্র তিন ছটাক চাউলের অন্ন মাত্র আহার করে মনে করিয়া তাঁহার চিত্ত কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইল।

তিনি অতিথিকে বলিলেন, সন্ন্যাসীঠাকুর-আপনি বেশ আহার করিতে পারেন। আমার ছেলেটী কিছুই খেতে পারে না। সন্ন্যাসী তদন্তেরে কিছু বলিলেননা। কিন্তু ক্ষুধা গৃহিণী কথটা একবার বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারেন নাই, দুই তিনবার বলিয়াছিলেন। তিন বার বলিবার পর অতিথি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন আরে বেটী, আমি বেশী খাই না তোঁর ছেলে বেশী খায়! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি একবার মাত্র আহার করি, আর তোঁর ছেলে দশবার আহার করে। দশবারে তোঁর ছেলে যা খায়—সব্ব একত্র কর দেখি—আমার আহারের চেয়ে বেশী হয় কিনা! গৃহিণীর মুখে আর কথা নাই। তিনি সন্ন্যাসীর সর্ব্ব গ্রহ রাশি এবং নিজের পুত্রের পক্ষে পরিগ্রহ রাশি লইয়া বিচার করিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ ঘটয়াছিল। আশা করি আয়ুর্বেদের পাঠিকা কোন গৃহিণী এইরূপ ভ্রমে পতিতা হইবেন না এবং আয়ুর্বেদের পাঠকগণ সর্ব্বগ্রহরাশি এবং পরিগ্রহ রাশি বিচার করিয়া আহার করিবেন।

দেশ—দ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচার এবং যে দেশে যাহা সাম্রাজ্য—দেশ সম্বন্ধে তাহাই বিচার্য্য।  
উৎপত্তি—যে দেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই দেশের লোকের পক্ষে তাহাই সুপথ্য।  
প্রচার—যে মাংস ও মৎস্যের প্রচলন আছে, পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে নাই, ইংরাজ পণির

আহারে অভ্যস্ত, ভারতবর্ষের উহার প্রচার নাই, দেশসাম্রাজ্য—মধ্যদেশবাসীর পক্ষে শীতল ও শিষ্ণ দ্রব্য এবং আনুপ দেশবাসীর পক্ষে উষ্ণ ও রক্ষ দ্রব্য হিতকর। শীত প্রধান দেশবাসীর পক্ষে উষ্ণ বীৰ্য্য ও উত্তেজক খাদ্য এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসীর শীতল ও অন্তেজক খাদ্য হিতকর।

কাল—ঋতু সাম্রাজ্য ভেদে কালের বিচার করিতে হয়। কাল রোগকে অপেক্ষা করে। এই ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য আছে, অতএব ইহাকে লঘুপাক আহার দাও, এই ব্যক্তির শরীরে পিত্ত প্রকোপ আছে, অতএব ইহাকে পিত্তনাশক আহার দাও ইত্যাদি বিষয় কাল লইয়া বিচার্য্য। আর শীতকালে অগ্নি প্রবল হয় বলিয়া অধিক আহার হিতকর, গ্রীষ্মকালে অগ্নি দুর্ব্বল হয় বলিয়া অল্প আহার হিতকর—ইত্যাদি বিষয় ঋতু সাম্রাজ্য লইয়া বিচার করিতে হয়।

উপবোগ সংস্থা—অর্থাৎ খাদ্যাদি প্রয়োগের নিয়ম, ইহা জীর্ণ লক্ষণকে অপেক্ষা করে। এই ব্যক্তির ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইয়াছে—অতএব ইহাকে পুনরায় আহার দাও, এই ব্যক্তির ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয় নাই—সুতরাং ইহাকে পুনরায় আহার দেওয়া যাইতে পারে না—ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া খাদ্য উপবোগ করিতে হয়।

উপযোক্তা—যে ব্যক্তি আহার করে তাহাকে উপযোক্তা বলে। যেরূপ আহার দ্বারা যে ব্যক্তি সর্ব্ব ঋতুতেই ভাল থাকে—তাহাকে সেইরূপ আহারই সকল সময়ে দিতে হয়।

এই সমস্ত আহার-বিধির বিশেষ ভাব অনুসারে শুভ বা অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। এই সকল বিষয় বুঝিয়া হিতকর উপায় অবলম্বন করিবে। মোহ বা প্রমাদবশতঃ কখনও



অপাত প্রিয় কিন্তু পরিণামে অহিতকর ও  
অসুখ জনক আহার করিবে না।

নিম্নলিখিত আহার-বিধি সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে  
এবং কোন কোন আতুরের পক্ষে হিতকর।  
দধি, উষ্ণ, মিষ্ট, মাত্রাবৎ, পূর্বাহার জীর্ণ  
হইবে, বাগ্য বিরুদ্ধ নহে এমন দ্রব্য, ইষ্টদেশে  
ইষ্ট উপকরণ যুক্ত, নাতি দ্রুত, নাতি বিলম্বিত-  
ভাবে, না কথ্য কহিতে, না হাসিতে হাসিতে  
হাসনা হইয়া এবং আপনার অবস্থা বিবেচনা  
করিয়া ভোজন করিবে।

উষ্ণ খাদ্য আহার করিবে। উষ্ণদ্রব্য  
আহারকরিতে ভাল লাগে, ইহা জঠরাগ্নি উদ্দীপিত  
করে, শরীর পরিপাক পায়, শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করে।  
এই জন্য উষ্ণ খাদ্য আহার করা উচিত।  
কিন্তু এতলে উষ্ণ বলিতে অত্যাধিক নহে,

সুখোষ্ণ অর্থাৎ যেরূপ উষ্ণদ্রব্য খাইতে  
সুখজনক।

মিষ্ট (যত তৈলাদি সংযুক্ত) দ্রব্য আহার  
করিতে ভাল লাগে, অধিক উদ্দীপিত করে,  
শরীর পরিপাক পায়, বায়ুর অল্পলোম করে,  
শরীর পুষ্ট ও দৃঢ় করে, বল বৃদ্ধি করে ও বর্ণের  
প্রসন্নতা সম্পাদন করে। এই জন্য মিষ্ট দ্রব্য  
আহার করা উচিত।

মাত্রাবৎ অর্থাৎ পরিমিত মাত্রায় ভোজন  
করিলে তাহা বায়ু, পিত্ত ও কফকে পীড়িত না  
করিয়া আয়ুরই বৃদ্ধি সাধন করে, ইহা সহজে গুল্ম  
নাড়ীতে উপস্থিত হয়, জঠরাগ্নিকে ত্বরান্বিত করে  
না এবং অক্লেশে পরিপাক পায়। এইজন্য  
পরিমিত মাত্রায় ভোজন করা উচিত। পরিমিত  
মাত্রা কি তাহা পরে লিখিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

## সন্ন্যাসীর হাতে সোণা প্রস্তুত।

—:—

[ রসায়ন-তত্ত্ব ]

তাত্ত্বিক যুগে—পিভল আবিষ্কার।

আমরা উপকথায় শুনিয়া আসিতেছি,  
সকালে অনেক সন্ন্যাসীই স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে  
পারিতেন। ভক্তিভরে সাধু সেবা করিয়া  
মস্ত—গৃহস্থ, রক্ত-স্ববর্ণের প্রসাদে সম্পন্ন  
হইয়া উঠিতেন। এখনও অনেকের বিশ্বাস,  
সন্ন্যাসীরা নগ্নে করিলে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে  
পারেন। তবে, তাঁহারা বাহ্যিক-তাহাকে  
কর্ণের প্রস্তুত প্রণালী শিখাইতে চাহেন না।  
এই বিশ্বাসে এদেশের বহুলোকের সর্বনাশ

হইয়া গিয়াছে। আমরা এমনও শুনিয়াছি—  
জুয়াচোরেরা সন্ন্যাসীর বেশে পল্লীবধুর অন্তঃ-  
পুরে প্রবেশ করিয়া, রূপার মুদ্রাকে স্বর্ণে  
পরিণত করিবার প্রলোভন দেখাইয়া গৃহস্থের  
বথাসর্বস্ব লইয়া চম্পট দিয়াছে। সংবাদপত্রেও  
মাঝে মাঝে এইরূপ বৃজুকির কথা শুনিতে  
পাওয়া যায়। সরল-প্রাণ হিন্দু—চিরদিন সাধু  
ভক্ত, সে ধর্ম-বিশ্বাসে সাধু অসাধু চিন্তিতে  
পারে না। বাটীতে সন্ন্যাসী থাকিলে...

কৃতার্থ হয়, অতিথিকে দেবতার মত পূজা করে, ঘরের কথা, মনের কথা অকপটে খুলিয়া বলে। শেষে প্রবঞ্চকের হাতে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইয়া, হাহাকার করিতে থাকে।

সাবু সন্ন্যাসীরা যে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারে—হিন্দুর মনে এ বিশ্বাস কেমন করিয়া জন্মিল? এ বিশ্বাসের মূলে কি কোনও সত্য নাই? ইহা কি কেবল গল্প কথা? না, তাহা হইতেই পারে না। হয়ত কোনও ভ্রম-ধূসর সন্ন্যাসী—কোন সুদূর অতীতে, এই স্বর্ণ-ভূমি ভারতে একদিন সত্য সত্যই রাসায়নিক উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে ঘটনা গল্পে-গাথায় চিরজীবী হইয়া, ভারতের জন সমাজে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু এখনও তাহা ভুলিতে পারে নাই। এখনও সে বিশ্বাস করে,—ভূর্গম-বন-কান্তারে, দুরারোহ অচল শিথরে, এখনও সেরূপ মহাপুরুষের অভাব নাই।

গল্পের কথা ছাড়িয়া দিই। “ইন্দ্রজাল” “কক্ষপুট” “উড্ডীশ” “তন্ত্র” প্রভৃতি গ্রন্থেও আমরা স্বর্ণ প্রস্তুতের প্রকরণ দেখিতে পাই। তাত্ত্বিকবৃগের যোগী ও সিদ্ধপুরুষগণ—নাগ-খর্পর জশদ প্রভৃতি স্বল্পমূল্যের নিকৃষ্ট ধাতুকে, নানাদ্রব্যের সংমিশ্রণে—উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করিতে পারিতেন। তাঁহাদের রাসায়নিক কৌশলে—তাম্র স্বর্ণকাস্তি ধারণ করিত। জশদ-বন্ধ—রোপ্যে রূপান্তরিত হইত। আমরা সে সকল পুটের অর্থ বুঝি না, উপাদান চিনি না, যৌগিক পদার্থের অর্থও জানি না। তন্ত্র এখন আমাদের কাছে, প্রেহেলিকা, আগম শাস্ত্র পাণ্ডলের প্রলাপ।

হউক প্রলাপ, হউক মিথ্যা, আজ আমি তাত্ত্বিক বৃগের সেই স্বর্ণপ্রকরণ লিপিবদ্ধ করিব।

ইহাতে আর কোনও উপকার না হউক, সেকালের রাসায়নিক অল্পসন্ধিসার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ত জানা যাইবে। এ আয় বিশ্বত জাতির পক্ষে—তাহাই যে পরম লাভ।

অনেক তন্ত্রেই স্বর্ণ ও রোপ্য প্রস্তুতের জন্য “রসায়ন প্রকরণ” লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকতর বলা হইয়াছে—সিদ্ধপুরুষ ভিন্ন রসায়ন কার্যে অপরেব অধিকার নাই। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্ত, আমরা তন্ত্রোক্ত “রসায়ন বিধি” নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাম্রং পলমিতং গ্রাহ্যং তদর্কে বস্ম-খর্পরো।  
কুশারি পত্র রসেন মর্দয়েৎ প্রহর দ্বয়ং ॥  
উর্দ্ধাধো লবণং দত্তা স্থালাগর্ভেনিধাপয়েৎ।  
অজা শকুন্তু বায়িনা পচেৎ কুণ্ডে দিনত্রয়ং।  
স্বাস্থশীতঃ ক্ষিপেৎ চুক্ষে তত্তাম্রং স্বর্ণতাঃ  
ব্রজেৎ।

—সিদ্ধান্ত। ১১শ অঃ

৮ তোলা তাম্র, ৪ তোলা রাং ও দত্তাব সহিত মিশ্রিত করিয়া, কুশারি-পত্র রসে দুই প্রহর মর্দন করিবে। একটা হাঁড়ীর মধ্যে উক্ত মিশ্রিত দ্রব্য রাখিয়া, উর্দ্ধ ও অধোদিকে লবণ চাপা দিবে। পরে—ছাগ-বিষ্ঠা ও ভূষাণি-পূর্ণ গর্ভে—উক্ত ভাণ্ড তিন দিন ধরিয়া পাক করিবে। ভাণ্ড শীতল হইলে, ভাণ্ড মধ্যস্থ পদার্থ—চুক্ষে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে ঐ তাম্র স্বর্ণ হইবে।

প্রক্রিয়া কঠিন নহে। কিন্তু কুশারি পত্র কি? তন্ত্রে কুশারি বৃক্ষের বর্ণনা যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায়—ঐ বৃক্ষ ঠিক ছোলাগাছের জাত। বৃক্ষের তলদেশের যুক্তিকা ঠিক ঘুতাক্ষের মত বোধ হয়। আমরা এরূপ বৃক্ষ দেখি নাই। কোথায় পাওয়া য় তাহাও জানি না।

স্থান্যি তাম্র পত্রাণি কৃতা চার্মো প্রতাপয়েৎ ।  
রুদন্তী-মূল রসেচ নিষিঞ্চৎ বার পঞ্চকং ।  
চুন্নাং দৃঢ়তরে পাত্রে স্থাপয়িত্বা চ শুষ্ককং ।  
পাদাংশং যশদং দত্ত্বা লৌহদার্ক্য্য প্রচালয়েৎ ।  
যাসৈকেন ভবেত্তাম্রং স্নিগ্ধং কাঞ্চন সন্নিভং ॥

ক্রিয়োড্ডীশ । ৭ম পটল

তাম্রের স্থান্য পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাকে  
অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। উত্তপ্ত হইলে, রুদন্তী  
মূলের রসে ফেলিবে। এইরূপে ৫ বার তাম্রকে  
তপ্ত করিয়া উক্ত রসে ফেলিতে হইবে। তার-  
পর, প্রস্কলিত অগ্নির উপর লৌহ পাত্র রাখিয়া  
তাহাতে ঐ তাম্রপত্র গুলি দিবে এবং তাম্রের  
চতুর্থাংশ দত্ত্বা দিয়া লৌহদণ্ডের দ্বারা মর্দন  
করিতে থাকিবে। এক প্রহরের মধ্যেই উক্ত  
তাম্র কাঞ্চন ভূলা হইবে।

এ প্রক্রিয়াটিও বেশ সরল। কিন্তু  
ইহাতেও একটু গোলোযোগ আছে—রুদন্তীর  
মূল ছুশাপা। রুদন্তী একপ্রকার ক্ষুপজাতীয়  
বৃক্ষ—ইহার পত্রও “চণকপত্র নিভং” অর্থাৎ  
ছোলাগাছের পাতার মত। অধিকন্তু এই  
বৃক্ষের “পত্রে পত্রেচ দৃশ্যতে তোয়বিন্দু  
সমদ্বিতং”। পাতায় পাতায় জল বিন্দুর মত  
পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমাদের  
বিজ্ঞান্য—কুশারি ও রুদন্তী কি একই বৃক্ষ ?  
রুদন্তীর জন্ম-বৃত্তান্ত বড় অজ্ঞুত। একদা  
কোন কারণে পার্শ্বতীর একগাছি কেশ  
ছিড়িয়া মাটিতে পড়িয়াছিল। সেই কেশ  
ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। এই বৃক্ষ জন্ম-  
এহণ করিয়াই দেখেন,—পৃথিবীর নয়নারী  
রোগে ও জরায় জীর্ণ! জীবের এই কষ্ট  
দেখিয়া বৃক্ষ কাদিয়া ফেলিল—

“রোদিতীব জনান পূর্বান জরয়া জর্জরী-

কৃতান্ ।

ময়ি ভূবি বিত্তমানে কথং ক্লিষ্টস্তি মানবাঃ ॥

আমি পৃথিবীতে বিত্তমান থাকিতে মানুষ  
কেন রোগে কষ্ট পাইতেছে? এই বৃথা  
জীবের দুঃখ দেখিয়া, জাত মাত্রই রোদিন  
করিয়াছিল, এই জগতই ইহার নাম রুদন্তী।  
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও রুদন্তীর নামোল্লেখ আছে।  
রুদন্তী—জরা অর্থাৎ অকাল বার্দ্ধক্য নাশক,  
অত্যন্ত বলকারক, কাস্তি-মেধা ও আয়ুর্বর্দ্ধক।  
আমরা এ গাছ অত্যাঁপি দেখি নাই। বোধ  
হয় সোম বৃক্ষের মত, ইহা ধরণী হইতে লুপ্ত  
হইয়া গিয়াছে।

গোমূত্রং হরিতালঞ্চ গন্ধকঞ্চ মনঃশিলা ।

সমং সমং গৃহীত্বা তু যাবৎ শুক্ল্যতি পেষয়েৎ ।

একাদশ দিনং যাবৎ যত্নেন রক্ষয়েৎ শুচি ।

মস্ত্বেণ ধূপ দীপাদি নৈবেদ্যে দ্বন্দ্ব মিশ্রিতৈঃ ।

মন্ত্রস্ত—ওঁ নমো হরিহরায় রসায়ন, সিদ্ধিং  
কুরু কুরু স্বাহা। অযুত জপেন সিদ্ধিঃ ।

\* \* \* \* \*

তদ্বীং গোলকং কৃতা বস্ত্রেন বেষ্টয়েৎ পুনঃ ।

মৃত্তিকাং লেপয়েত্তস্য ছায়া শুষ্কস্ত কারয়েৎ ।

মহাকুণ্ডে বিনিষ্কিপ্তে পলাশ কাষ্ঠ বহ্নিণা ।

জালায় দষ্ট যামস্ত —

তদ্ব্য জায়তে সিদ্ধির্জিহ্বা সিদ্ধি সমাকুলং ।

তাম্র পাত্রে অগ্নি মধ্যে বিন্দুমাত্র নিষ্ফলিত।

তৎক্ষণাচ্ছায়তে স্বর্ণং নাত্তথা শঙ্করোদিভং ।

দাতবাং গুরু ভক্তায় ন দত্তাৎ দৃষ্ট মানসে ।

গোপাং গোপাং মহাগোপা দেবামামপি দুর্লভং ।

সিদ্ধ পীঠে ভবেৎ সিদ্ধি গায়ত্রী লক্ষ জাপনৈঃ ॥

\* \* \*

দত্তাভ্যেদঃ

“মহাদেব দত্তাভ্যেদেয় নিকট রসায়ন  
বলিতেছেন; গোমূত্র, হরিতাল, গন্ধক ও মনঃ-  
শিলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া খলে-

পেষণ করিবে। যাবৎ না শুষ্ক হয়, তাৎকাল উত্তমরূপ পেষণ করিয়া, যত্র পূর্বক বিগুহ স্থানে রাখিয়া দিবে। পরে একাদশ দিবস গত হইলে, ধূপ দীপ ও দুগ্ধ মিশ্রিত নৈবেদ্যাদি নানাবিধ উপচারে যক্ষিপীর পূজা করিবে। অনন্তর, ঔ নমো \* \* এই মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে পূর্বপিষ্ট দ্রব্য গোলা-কার করিয়া বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে মুক্তিকার দ্বারা লেপ দিয়া গর্ভ মধ্যে পলাশ কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া তত্ক্ষণি ঐ গোলক রাখিবে এবং উপরে পলাশ কাষ্ঠ দ্বারা অষ্ট প্রহর পর্যন্ত জাল দিবে। তৎপরে ঐ ভস্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। অনন্তর এক খণ্ড তাম্রপাত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাতে ঐ ভস্ম একবিন্দু দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ তাম্র পাত্র স্বর্ণ হইবে। ইহা মহাদেবের উক্তি, কদাচ ইহার অন্তথা হয় না। ইহা গুরুভক্তকে দিবে, সন্ধিগমনা অবিখ্যাসীকে দিবে না। এই রসায়ন-প্রক্রিয়া করিবার পূর্বে কোন সিদ্ধ-ক্ষেত্রে বসিয়া লক্ষ সংখ্যক গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।”

—রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ।

আনীয় বহু যত্নেন সম্বলং তোলকদ্বয়ং ।  
বসুৱাণ্ড শিবক্যাণ্ড মায়াবিন্দু সমধিতং ॥  
বীজত্রয়কাষ্ট শতং প্রজপেৎ সমলোপরি ।  
অশীতি তোলক মানং কৃষ্ণধেনু সমুত্ত্বং ।  
দুগ্ধ মানীয় যত্নেন চাষ্টোত্তর শতং জপেৎ ॥  
বস্ত্রযুক্তেন হস্তেন দুগ্ধ মধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ।  
উত্তাপং আলায়কীমান্ মন্দ মন্দেন বহিণা ।  
রিপূর্বেদাঙ্ক পর্যন্ত মর্দ্য শেষং ভবেৎ যদি ।  
তদৈবোত্তোলা তদ্ভূবাং দগ্ধং তোয়ে বিনিঃক্ষিপেৎ  
ততঃ পরীক্ষা কর্তব্য।  
নিধুং পাবকে দ্রব্যং দৃষ্ট। উত্থাপ্য যত্নতঃ ।  
তত্রৈব প্রজপেদ্ব্যস্ত্রং সর্বমঙ্গল-মাঙ্গল্যং ॥

সাদ্বৈন তোলকং তাম্রং বহ্নি মধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ।  
যথা বহ্নিস্তথা তাম্র দৃষ্ট। উত্থাপ্য যত্নতঃ ॥

গুঞ্জা প্রমাণং তদ্ভূবাং, সত্যং সত্যং তি শঙ্করি ।  
রৌপ্যং ভবতি তদ্ভূবাং, নাত্তথা শঙ্করোদিতং ॥

দত্তাত্রেয়। ১৩শ পটলঃ।

“দুই তোলা পরিমাণ সম্বল আনিয়া তাহার উপরে ঔ হং হ্রীং এই ত্রাক্ষর মন্ত্র আটশত বার জপ করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ ৮০ তোলা আনিয়া তাহার উপরে উক্ত মন্ত্র আটশত বার জপ করিবে। তৎপরে ঐ সম্বল বস্ত্রখণ্ডে পুটলী করিয়া তাহাতে সূত্র বন্ধন দ্বারা উক্ত দুগ্ধ মধ্যে নিক্ষেপ করত মন্দ মন্দ অগ্নিতে জাল দিবে। যৎকালে ঐ দুগ্ধের অর্দ্ধ অর্থাৎ ৪০ তোলা শেষ হইয়া ৪০ তোলা মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তৎকালে ঐ সম্বলের পুটলী দুগ্ধ হইতে উঠাইয়া জল মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, যদি তাহা হইতে ধূম নির্গত না হয় তবেই সম্বল যথার্থ কার্য্যার্থ হইয়াছে জানিবে। পরে ঐ সম্বলের উপরে পূর্বলিখিত মন্ত্র অষ্ট সহস্র জপ করিবে। অনন্তর অর্দ্ধ তোলা পরিমিত তাম্র অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। যখন ঐ তাম্র অগ্নি বৎ হইবে, তখন উহা অগ্নি হইতে উঠাইয়া তাহাতে একগুঞ্জা পরিমিত উক্ত সম্বল দিলেই তৎক্ষণাৎ রূপা হইবে।”

রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ।

“কৃষ্ণসর্প মেকং গৃহীত্বা তস্য মুখে শিব-  
বীর্ঘ্যং দ্রুমিষ্য। সর্পস্য মুখং শুদৃক বহ্না নৃতন  
মুদ্রায় স্থালী মধ্যে সংস্থাপ্য স্থালীমুখং মুদ্রাদিনা  
সংলিপ্য নির্জ্ঞান স্থানে প্রাতরায়ত্ন্য পুনঃ।  
প্রাতর্থাং বহ্নিনা জালং দত্তাতঃ। ততঃ শুভক্ষণে  
স্থালীমুখ মুচ্ছত্য সর্পভস্মঃ বিহার শিববীর্ঘ্য  
গৃহীয়াৎ। ততঃ স্তোত্রকমিতং তাম্রং ধালিষ্য  
তস্মিন্ গলিত তাম্রে রক্তিক মাংসং তচ্ছিববীর্ঘ্য

দৃষ্ট। তেন তৎক্ষণাদেব তত্তাত্ত্বং স্ববর্ণী  
ভূতঃ জাতমিতি ।”

রসিক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত  
তন্ত্র সংগ্রহ ।

ইহার বঙ্গানুবাদ নিম্নপ্রয়োজন । আমি  
কেবল দেখাইতে চাই—দ্রব্যগুণের প্রভাবেই  
হটক আর মস্ত তন্ত্রের মহিমাতেই হটক—  
মাত্রবেশ চেষ্টায় যে নিষ্কণ্ট ধাতু হইতে উৎকৃষ্ট  
ধাতু উৎপন্ন হইতে পারে, সে কালের লোকের  
ইহা দৃঢ় ধারণা ছিল । সুতরাং রাতারাতি  
বহুন্যেক হইবার আশায় গৃহস্থগণ সাধু সন্ন্যাসীর  
শরণাগত হইতেন ।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই—বাস্তবিক  
হি সাধু সন্ন্যাসীরা স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারি-  
তেন ? বা সবল প্রাণ গৃহস্থকে ভুলাইবার জন্ত  
ইহা ঠাণ্ডাদের স্বাভূষ্টিত ইঙ্গজাল ? এ প্রশ্নের  
নির্মামো কবিত্তে হইলে, আমাদিগকে আরও  
একটু মগসর হইতে হইবে । তন্ত্র ছাড়িয়া  
বিজ্ঞানময় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসন্ধান করিতে  
হইবে । আমরা মন্ত্রের অর্থ বুঝি না, তন্ত্রের  
মহিমা জানি না, সুতরাং তন্ত্রের প্রভাব আমা-  
দের মত মহামূর্খের কাছে, অনেক দিন  
হটতেই জুর হইয়া পড়িয়াছে । কিন্তু দ্রব্যের  
দীর্ঘা বিপাক-প্রভাব, আমরা ত অস্বীকার  
করিতে পারি না । আমাদের জীবন্ত বিজ্ঞান  
আয়ুর্বেদ দ্রব্যের গুণ অনুসন্ধান করিয়া  
আমাদের সত্যতার অতীত সাক্ষীরূপে, এখনও  
দণ্ডায়মান । এখন দেখা যাউক—আয়ুর্বেদে  
স্বর্ণ প্রস্তুত প্রক্রিয়া সমর্থিত হইয়াছে কিনা ?

আয়ুর্বেদের চরক ও সুশ্রুত নামক সংহিতা-  
দ্বয় অতি প্রাচীন গ্রন্থ । এই দুই গ্রন্থে কৃত্রিম  
উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত—প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া  
যায় না ।

বৌদ্ধ নাগার্জুন ৭ম শতাব্দিতে—যে রস  
রত্নাকর নামক চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া-  
ছিলেন, তাহাতে আমরা একটা শ্লোক দেখিতে  
পাই—

কি মত্র চিত্রং রসকো রসেন

\* \* \* \* \* ভাবিতঃ ।

ক্রমেন কৃদাষু ধরণে রঞ্জিতঃ

করোতি শুবং ত্রিপুটেন কাঞ্চনং ॥

ইহার অর্থ—ইহাতে আশ্চর্য্য আর কি আছে ?  
রসক নামক রসের দ্বারা ভাবিত তাম্র রঞ্জিত  
হইয়া, তিন পুটে কাঞ্চনত্ব লাভ করে । ইহার  
দ্বারা বেশ বুঝা যায়—তাম্র যে কাঞ্চনে পরিণত  
হইতে পারে, রসরত্নাকর-রচয়িতার তাহা  
অজ্ঞাত ছিল না । আর রসক নামক পদার্থের  
সংযোগেই তাম্র স্বর্ণ হইয়া যায় । এক্ষণে  
দেখা যাউক এই রসক কোন পদার্থ ?

ভিক্ষু-গোবিন্দের “রস হৃদয়” পাঠে আমরা  
জানিতে পারি—“রসক” অষ্টরসের মধ্যে একটা  
রস । “রসার্ণব” নামক গ্রন্থকার রসকের আর  
একটি নাম দিয়াছেন—“ধর্পর” । কিন্তু ধর্পর যে  
কোন পদার্থ, এ গ্রন্থে তাহা বুঝিবার উপায়  
নাই । “রসক” অষ্ট রসের অন্ততম । যথা—  
“বৈক্রান্ত-কান্ত সত্যক-মাকিক-বিমলাজি দরদ  
রসকশ্চ ।

অষ্টৌ রসান্তথৈবাং সন্ধানি রসায়ানি স্যুঃ ॥

হিন্দু কেমিষ্ট্রী, ২য় ভাগ, ৩৪ পৃঃ ।

মতান্তরে অষ্ট মহারস, যথা—

মাকিকং বিমলং শৈলং চপলো রসকস্তথা ।

সস্যকো দরদশ্চৈব স্রোতোহম্বনমথাষ্টকম্ ।

—রসার্ণব ।

এই অষ্ট রসের অন্ততম রস “রসক” যে  
তাম্রামি ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে,  
তাহার প্রমাণ—

“তীক্ষ্ণং নাগং তথা শুষ্কং রসকেন তু রঞ্জয়েৎ।

সমস্তং জায়তে হেম কুয়াণ্ড কুসুম প্রভং ॥

হিন্দু কেমিষ্ট্রী, ১ম ভাঃ। ৮ পৃঃ।

তীক্ষ্ণ (লৌহ) নাগ (সীসা) শুষ্ক (তাম্র)  
রসক দ্বারা রঞ্জিত হইলে, কুয়াণ্ড কুসুমের  
বর্ণযুক্ত স্তবর্ণ হইয়া পড়ে।

“রস প্রকাশ সুধাকর” একখানি রস-গ্রন্থ,  
ইহার রচয়িতার নাম যশোধর। এই গ্রন্থে  
রসক ও ধর্পরর শুদ্ধি প্রণালী সরল ভাষায়  
লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—  
ধর্পরং রেচিতং শুদ্ধং স্থাপিতং নরমুক্তকে।  
রঞ্জায়ৈন্মাস মেকং হি তাম্রং স্বর্ণপ্রভং বরং ॥

হিঃ কেঃ ২য়, ৬০ পৃঃ।

অর্থাৎ নরমুক্ত্রে স্থাপিত হইবে, ধর্পর বিমুক্ত  
হয়। সেই ধর্পর একমাসে তাম্রকে স্বর্ণ বর্ণে  
রঞ্জিত করে।

রসক যে তাম্রকে স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত  
করিবার শক্তি ধরে, নাগার্জুন রচিত “রসরত্ন  
সমুচ্চয়” গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া  
যায়। বাহুল্য ভয়ে, তাহা আর উদ্ধৃত  
করিলাম না। এই সকল গ্রন্থের মতামত  
দেখিয়া, রসক ও ধর্পরকে অভিন্ন বলিয়াই  
আমার মনে হইতেছে। বিশেষতঃ “রুদ্র  
যামন তন্ত্রে”র ধাতু মঞ্জরী পড়িয়া আমার আরও  
বিশ্বাস হইয়াছে—“ধর্পর” ও “রসক” অভিন্ন  
পদার্থ। “ধাতুমঞ্জরীতে” যে পিত্তল প্রস্তুতের  
প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে  
পাই—

“শুদ্ধ ধর্পর সংযোগে জায়তে পিত্তল শুভং।”

হিঃ কেঃ ১ম, ৫২ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ তাম্র ও ধর্পর সংযোগে উত্তম পিত্তল  
প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের মতে—  
“ধর্পর” অর্থে জশদ। জশদ দস্তা ধাতু।

ধর্পরের পর্যায়ে রসক নামও পাওয়া যায়।  
যথা,—

জাসম্ব চ জরাতীতঃরাজতং যশদায়কং।

রূপ্য ভ্রাতা বরীয়শ্চ দ্রোটকং কোমলং লঘু॥

চর্ম্মকং ধর্পরং চৈব রসকং রস বদ্ধকং।

সদা পথ্য বলোপেতং পীতরাগং সূতস্মকং।

এতত্তু ধর্পর নাম কার্য্য কস্মিন্ সিদ্ধিদং ॥

হিঃ কেঃ ২য়, পৃঃ ১০৬ ও ৭।

জাসম্ব, জরাতীত (যাহাতে জরা অর্থাৎ  
মরিচা ধরেনা) রাজত (রৌপ্য সদৃশ)  
যশদায়ক, রূপ্য ভ্রাতা, বরীয়, দ্রোটক, কোমল,  
লঘু চর্ম্মক, ধর্পর রসক, রসবদ্ধক, সদাপথ্য,  
বলোপেত, পীতরাগ (পীতবর্ণে রঞ্জিত কারী)  
সূতস্মক (সহজে ভস্ম করা যায়)—ধর্পর  
এই সকল নাম।

আমার বিশ্বাস—সেকালের তাত্ত্বিকগণ  
তাম্র ও দস্তা সংযোগে যে উত্তম পিত্তল প্রস্তুত  
করিতেন, সাধারণে তাহাকেই স্বর্ণ বলিয়া  
বিশ্বাস করিত। ১৭৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত তাম্র রসক  
(Calumine) ও অক্সার মিশ্রিত করিয়া  
যুরোপের রাসায়নিকগণও পিত্তল প্রস্তুত করি-  
তেন। কিন্তু ইহার বহুকাল পূর্বেই ভারতে  
তাম্র ও জশদ সংযোগে পিত্তল প্রস্তুত প্রক্রিয়া  
প্রচলিত ছিল। পিত্তলের আদরও স্বর্ণের  
অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।

তাহারা স্বর্ণের উৎপত্তি তিন ভাগে বিভক্ত  
করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বর্ণ তিন প্রকারে  
উৎপন্ন হয়, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস ছিল।  
যথা ;—

রসজং ক্ষেত্রজং চৈব লৌহ সঙ্করজং তথা।

ত্রিবিধং জায়তে হেম চতুর্থং লোপলভ্যং তে ॥

হিঃ কেঃ (রসার্ণব) ১ম, ১৪ পৃঃ।

স্বর্ণ ত্রিবিধ উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ক্রিয়া দ্বারা (২) ভূমি হইতে, (৩) ধাতু সংমিশ্রণ হইতে। এই তিন প্রকার ছাড়া আর কোন উপায়ে স্বর্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এই ধাতু সংমিশ্রণ জাত স্বর্ণকে আমি পিত্তল নামে অভিহিত করিতেছি। আমার বিশ্বাস—তাত্ত্বিক সম্রাটদিগা বসক বা খপ্পর সংযোগে যে ধাতু প্রস্তুত করিতেন—তাহার বর্ণ পীতবর্ণ হইত। এবং তাহাই স্বর্ণ নামে কথিত হইত। স্বর্ণের মত বর্ণ হইলেই—তাহাকে স্বর্ণ বলা চলিত। কবিরাজী মতে স্বর্ণবঙ্গ নামক একটা ঔষধ আছে, - উহাতে স্বর্ণের সংস্পর্শ নাই, উহার উপাদান রাঙ, পারদ ও লবণ। কেবল স্বর্ণের বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়াই উক্ত ঔষধের নাম “স্বর্ণ বঙ্গ” হইয়াছে। সেইরূপ তাম্র হইতে জাত পিত্তলকে তাহার উজ্জল বর্ণের জন্য—তাত্ত্বিকগণ স্বর্ণের সম্ভ্রম প্রদান করিতেন। ইহাই আমার বক্তব্য। তবে—মস্ত্রের প্রভাবে তাহা যে স্বর্ণে পরিণত হইতে পারে না,—এ কথা আমি বলিতেছি। কেননা, মস্ত্রের অসীম শক্তি—সে শক্তি আমাদের মত সীমাবদ্ধ জ্ঞান দানবের সমালোচনার বহির্ভূত।

গ্রীক দার্শনিক অরিস্টটলের বর্ণনায় দেখা

যায়—কৃষ্ণ সাগরের তীরে একরকম মাটি পাওয়া যায়। ঐ মৃত্তিকার সহিত তাত্ত্বকে গালাইলে তাহার রক্তবর্ণ হরিদ্রাবর্ণে পরিণত হইত। এই মৃত্তিকার নাম—“কাদমিয়া”। এই কাদমিয়ার রসকের অংশ বিদ্যমান ছিল। তাই পারসিক আলেকেমিষ্ট উহাকে সফেদ তুতিয়া বলিয়াছেন।

বেদে পিত্তলের নাম পাওয়া যায় না। স্বর্ণের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু অথর্ব বেদে রয়ি নামক ধাতুর উল্লেখ আছে। যথা—“রয়িমুদ্রং পিশঙ্গ সদৃশন্”। সাধারণ রয়িকে স্বর্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস—এই রয়িই পিত্তল। চরকে পিত্তলের নাম হইয়াছে—“রীতি”। বেদে হরিৎ শব্দে—পীতবর্ণ বুঝায়। স্তুরাৎ বেদের হরিতায়স্ শব্দও পিত্তলের নামান্তর হইতে পারে। “হরিতায়স্ সংক্ষিপ্ত হইয়া হয়ত হরিতী হইয়াছিল, শেষে চরকের সময়ে “হরিতীর” আদিবর্ণ লুপ্ত হইয়া তাহা “রীতি” নাম পাইয়া থাকিবে। কিন্তু এ সমস্ত অনুমানের কথা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।\*

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় এম, এ।

## পরিবর্তনের প্রতিবাদ।

—:—

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়—  
একজন প্রবীণ সাহিত্যিক। বিবিধ মাসিক পত্রে তাঁহার বহু প্রবন্ধ পড়িয়াছি, ছাত্রের মত

—তাঁহার প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা শিখি  
রাছি। সম্ভ্রতি “আয়ুর্কেদ” পত্রে আয়ুর্কেদ  
স্বন্ধে তাঁহাকে আলোচনা করিতে দেখিয়া

\* এই প্রবন্ধের রচনাকালে, ডাঃ পি. সি. রায়ের “হিন্দু কেমিষ্ট্রি,” কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়ের “আয়ুর্কেদ ইতিহাস” এবং ভারতীয় মুখোপাধ্যায়ের “অশ্বত্থ” নামক সন্দর্ভ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে। আনন্দের একমাত্র কারণ—তিনি যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহার কাছে আমরা এমন কিছু পাইব, যাহা অশ্রুত হুঁসভ।

“পরিবর্তিত প্রণালীতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত কি না?”—সতীশ বাবুর লেখনী-প্রস্তুত স্মৃতিস্তিত সন্দর্ভ। সাধারণের অজ্ঞাবসন যোগ্য, কবিরাজ মহাশয়দের পক্ষেও প্রবন্ধটী অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু চুঃখের বিষয়—উক্ত প্রবন্ধটী মনোযোগের সহিত পড়িয়াও আমি অনেক স্থলে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। হইতে পারে—ইহা আমার অজ্ঞতা, আমি হয়ত তাঁহার কথা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। তথাপি,—কর্তব্যের অনুরোধে তাঁহার দুই একটা মন্তব্যের প্রতিবাদ করিব। আশা করি সে জ্ঞাত সতীশ বাবু আমাকে ক্ষমা করিবেন।

সতীশ বাবুর প্রশ্ন—কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালী—ডাক্তারী মতে পরিবর্তন করা উচিত কি না? আমার উত্তর—সন্দেহ নহে। কেন নহে, তাহা বলিতে গেলে, প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত—কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার অনুরূপ-প্রক্রিয়া ডাক্তারী মতেও আছে কি না? অবশ্য সতীশ বাবু ইহার বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। আমিও দেখিয়াছি—কবিরাজী মতে যাহার নাম “স্বরস”,—তাহা ডাক্তারী মতের Sucous বই আর কিছুই নহে। ইহা ভিন্ন—কবিরাজী কাথ ডাক্তারদের Decoction.

” হিম	”	Maceration.
” ফাট	”	Infusion.
” চূর্ণ	”	Powder.
” বটক বটী	”	Pills.

” লেহ	”	Syrups বা Confection.
” তৈল	”	Oils, Ointments.

উভয় মতে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলির অনেকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমাব বক্তব্য—যে প্রক্রিয়া উভয় মতেই অবিকল এক, যেস্থলে সতীশ বাবুর প্রস্তাব আমি সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। যেমন, কবিরাজী মতে ফাট প্রস্তুত করিতে হইলে, উষ্ণ জলে কুণ্ডিত ঔষধ নিক্ষেপ করিতে হয়। ডাক্তারী মতে Infusion প্রস্তুত-প্রণালীও ঠিক তাই। এখানে ডাক্তারী মতের অনুসরণে আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আয়ুর্বেদ যেখানে, ঔষধ-বিশেষকে রাঙে জলে ভিজাইয়া প্রভাতেই তাহাকে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিতেছেন, সেই আয়ুর্বেদীয় মতের “হিম” প্রক্রিয়ার সহিত ডাক্তারী মতের Maceration এর প্রক্রিয়ার অনেকটা ঐক্য থাকিলেও বৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য বর্তমান। আবার কতকগুলি প্রক্রিয়ায়—কবিরাজী মতে ও ডাক্তারী মতে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে, ডাক্তারী প্রক্রিয়ার অনুসারে কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত করা কতদূর সম্ভব তাহা বলিতে পারি না। ডাক্তারী Liquid Extract, Solid Extract, Tincture প্রভৃতির অনুরূপ প্রক্রিয়া আয়ুর্বেদে আছে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ স্থলে ডাক্তারী প্রণালীতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিলে, ঔষধের উপকারিতার তারতম্য হয় না কি? যেখানে প্রক্রিয়া উভয় মতেই এক, সেখানে ঔষধ প্রস্তুতের মূলতত্ত্ব একই হইক, তাহাতে কতি নাই—বরং লাভ আছে।



স্বরূপ “কুটজাবলেহ”কে আমি পাঠকগণের  
সমুখে উপস্থিত করিতেছি ।

কুটজক্ক তুলাং দ্রোণে জলস্ত বিপচেৎ স্রবীঃ ।

কদাম্বং পাদশেবধং গুহ্মীয়াদ্ বস্ত্র গালিতং ।

ত্রিশং পলং শুভ্রাত্মা দস্ত্য চ বিপচেৎ পুনঃ ।

সাস্ত্রভ্রুনাগতং দৃষ্টা চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ ।

বসাস্ত্রনং মোচরসং ত্রিকটুং ত্রিফলাং তথা ॥

লজ্জালু চিত্রকং, পাঠাং বিবশিমিত্রযবং বচাং ।

ভ্রাতকং প্রতিবিষাং বিড়ঙ্গানি চ বালকং ।

পত্রোকং পলসম্মানং স্নাত্ত্ব কুড়বং তথা ।

সিদ্ধ শীতে ততো দত্তান্মধুনঃ কুড়বস্তথা ॥

ইহার অর্থ কুড়চীর ছাল ১ তুলা ১ দ্রোণ  
( ৩৪ সের ) জলে সিদ্ধ করিবে, ১৬ সের জল  
থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে ।  
ঐ কাথে ৩০ পল পরিমিত শুভ্র মিশ্রিত করিয়া  
আবার জ্বাল দিবে । কাথ গাঢ় হইলে নামাইবে ।

সতীশ বাবুর মত অহুমোদন করিতে  
হইলে, এই ধনত্ব পর্য্যন্তই কুটজাবলেহের  
পাক শেষ হইত । এবং তাহা হইলে ডাক্তারী  
Syrup বা Confectionএর সহিত এই  
কবিরাজী লেহ প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য  
থাকিত । কিন্তু কুটজ কাথের সিরাপ হইয়া  
গেলো, তাহাতে আবার রসাজ্ঞানাদি চূর্ণগুলি  
পক কাথে প্রক্ষেপ দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে  
এবং তাহার সঙ্গে ঘৃত ও মধু মিশাইবারও  
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । যদি ডাক্তারী  
মাত—কুটজ কাথে শুভ্র বা চিনি সংযোগে  
সিরাপ প্রস্তুত করিতে হয়, তবে পাকশেষে  
চূর্ণ দ্রব্যগুলির সংমিশ্রণ কখনই বুদ্ধিযুক্ত  
হইতে পারে না । এই লেহ-পাকের প্রণালী  
দেখিলেই বেশ বুঝা যায়—কবিরাজী লেহ  
এবং ডাক্তারী সিরাপ, উভয়ের পাকে অনেক  
পার্থক্য আছে । এই চূর্ণ পদার্থের প্রক্ষেপই  
বৈশাখ—৫

উভয়কে তক্ষাৎ করিয়া দিয়াছে । কুড়চীর  
কাথের সিরাপ প্রয়োগ করিলে যে ফল পাওয়া  
যায়, চূর্ণ পদার্থ মিশ্রিত কুটজাবলেহে  
তাহার চেয়েও বেশী উপকারিতা দেখা যায় ।  
এরূপ স্থলে, ডাক্তারী সিরাপের প্রক্রিয়ায়  
কবিরাজী লেহ পাক করা সমীচিন কিনা,  
সতীশবাবু তাহা ভাবিয়া দেখিবেন কি ?  
আমার বিশ্বাস, ডাক্তারী সিরাপে আর কবি-  
রাজী লেহে আকাশ-পাতাল তক্ষাৎ, উভয়  
ঔষধ এক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইতে পারে না ।

আবার কবিরাজী মতের বটিকা, ডাক্তারী  
মতের pills এর সমান নহে । কবিরাজী  
বটিকা জব পদার্থ দিয়া মাড়িতে হয়, কতরকম  
রসের ভাবনা দিতে হয়, বরং ডাক্তারী পিল—  
কবিরাজী মতের “বটক”, “মোদক” বা  
পিণ্ডেরই অনুরূপ । কবিরাজেরা ঘন সারকে  
চূর্ণ দ্বারা দৃঢ় করিয়া বটিকা প্রস্তুত করেন না ।  
শুভ্র ঘন কাথ ও চূর্ণ সহযোগে কবিরাজের  
লেহ প্রস্তুত করেন । এই লেহই ডাক্তারদের  
মতে কতকটা pills এর মত । হৃৎস্পন্দ-বিষয়—  
বহুযুগ পরে, কৃতৌষধের সংজ্ঞা বদলানো—  
একেবারেই অসম্ভব ।

তৈল পাক ও ঘৃত পাক—ডাক্তারী  
বিজ্ঞানের উপদেশে হইতে পারে না । কেন  
না ডাক্তারদের Oils ও Ointments এর  
সঙ্গে কবিরাজী ঘৃত-তৈলের তুলনাই হয় না ।  
কবিরাজেরা ঘৃত ও তৈল পাক করিবার  
সময়—প্রথমে মুচ্ছাবিধি, তা’রপর কঙ্ক-বিধি,  
কাথ বিধি, গন্ধপাক প্রভৃতি বহুবিধ প্রক্রিয়াই  
করিয়া থাকেন । অয়েল, অয়েন্টমেন্ট করিতে  
হইলে এ সব কোন বালাই নাই ।

আসব অরিষ্ট সম্বন্ধেও সতীশবাবু খাঞ্চ  
বলিয়াছেন, তাহাও আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি ।

আসব ও অরিষ্ট চিনী, মধু বা গুড়ের সহিত রুদ্ধ তাণ্ডে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সঞ্চিত হয়। সেই সঞ্চিত প্রক্রিয়ার (fermented) সময়ই তাহা গুড়-চিনীর সহিত পচিতে থাকে। পাত্র হইতে তুলিয়া, তাহাকে ছাঁকিয়া অল্প পাত্রে রাখিলে, আর তাহা পচে না। অন্ততঃ সেকরূপ আসব অরিষ্টে ছাঁতা ধরিতে বা গাজনা জমিতে আমি দেখি নাই। আসব, অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া গেলে তাহাতে ঠিক ভিনিগারের মত গন্ধ বাহির হয়। আমার বিশ্বাস—আসব বা অরিষ্টকে তজ্জাত অম্লমসই পচন হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কবিরাজগণ—নির্ম্মাণ্য ফলাদির চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, সঞ্চিত দ্রবপদার্থের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিয়া,—উপরিস্থিত দ্রবাংশ গ্রহণ করেন, অধঃপতিত ঘনকাথ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতায়—আমি আসব, অরিষ্টকে একবৎসর পর্যন্ত সমান গন্ধবর্ণ যুক্ত ভাবে থাকিতে দেখিয়াছি। সতীশ-বাবু আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি দুইবৎসর পূর্ব্বের প্রস্তুত “উশীরাব” প্রয়োগ করিয়া একটা রক্তপিত্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলাম।

সতীশবাবু সুরামিশ্রিত জলে ভিজাইয়া ঔষধ-দ্রব্যের সারগ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন—ইহাতে আসব বা অরিষ্টের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। আমি বলি, পারে না। সুরামিশ্রিত জলে ঔষধ ভিজাইয়া রাখিলে, আসব বা অরিষ্ট হয় না, ইহাকে বরং “পরিবর্তিত হিম” বলিতে পারি; বাহার ডাক্তারী নাম—Maceration—আয়ুর্বেদ মতে “হিম” ১ রাত্রি ভিজাইতে হয়, সেইজন্তই “পরিবর্তিত হিম” নাম দিলাম।

সতীশবাবু “স্বরস” ও “কাথ” সংরক্ষণের

কল্প—সুরাসার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ—কবিরাজগণ কাথকে বাসি করিয়া ব্যবহার করেন না। তাঁহারা সত্ত্ব প্রস্তুত কাথের আদর করিয়া থাকেন। সুরাসারের কার্য্য মিসাবিৎ দ্বারাও চলিতে পারে—সতীশবাবুর ইহাও একটা মন্তব্য। আমার বিশ্বাস—সকল মিসাবিৎ প্রয়োগ চলে না। মধুর দ্বারাও সতীশবাবু কাথ সংরক্ষণের পক্ষপাতী—কিন্তু ইহাও দোষ আছে—মধুসংযুক্ত কাথ আসবের মত Fermented হইতে পারে। মধু পচন নিবারণক বটে, কিন্তু দ্রবপদার্থের সহিত মিশ্রিত মধু বিকৃত হইয়া যায়। সুপক্ক ফল—খাঁট, মধুতে ভিজাইয়া রাখিলে, সে ফল অনেকদিন অবিকৃত থাকে, এইটুকুই মধুর ক্ষমতা।

সুরাসার যে পচন নিবারণ—এ জ্ঞান আর্য্য ঋষিদের ছিল। সুরাসারের সংস্কৃত নাম—“কোহল”। এই কোহল শব্দ হইতে আরবী ও ইংরাজী “আলকোহল” শব্দ উৎপত্তি। আসবে “কোহল” মিশ্রিত হয় ত ঋষিদের উদ্দেশ্য ছিলনা। তাহাতে আসবারিষ্টের গুণাস্তর হইতে পারে। আসব বা অরিষ্ট মত্ত জাতীয় হইলেও, তাহা সুরা নহে। মত্ত—সঞ্চিত দ্রব মাত্র, মত্তকে চুয়াইলে ‘সুরা’ হয়। সেকালে মত্তের অনেক শ্রেণী ছিল। সুরা—অন্ন বা তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত হইত। যথা মত্তর উক্তি—“সুরা বৈ মন মন্যানাং।” অমরকোষের মতে সুরার আর একটা নাম—“পরিষ্কতা”। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে—“সঞ্চিত” পদার্থকে চুয়াইয়া লইতে হয়, আর্য্য ঋষিদের সে জ্ঞান ছিল। তথাপি যে তাঁহারা আসব অরিষ্টকে চুয়াইয়া

লইবার উপদেশ দেন নাই,—ইহার কারণ—  
তাঁহাদের সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। অথবা  
তাঁহারা আসব অরিষ্ট—সকল জাতিকেই  
বৃন্দার্পে ব্যবহার করিতে দিতেন, “সুরা”—পান  
দ্রব্যদের কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। এই-  
জন্তই সম্ভবতঃ তাঁহারা আসব অরিষ্টকে দীর্ঘ-  
কাল স্থায়ী করিবার জন্ত চুয়াইয়া সুরাতে  
পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। চাণক্যের  
অংশঙ্গ পাঠে আমরা বুঝিতে পারি—সেকালের  
নৃপতিগণ সুরার শুদ্ধ আদায় করিতেন।  
আসব ও অরিষ্টের শুদ্ধ ছিল না। যে কারণেই  
হটক—ঋষিরা যখন আসব ও অরিষ্টকে  
চুয়াইবার ব্যবস্থা করেন নাই, আমরাই বা  
তাহা করিতে যাই কেন? আধুনিক  
বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে—ঋষি-প্রতিভা মাপা  
তে না।

সত্যবাদের যে সকল প্রস্তাবে আমার  
অপত্তি ছিল, উপরে অতিসংক্ষেপে আমি  
তাঁহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু  
তাঁহা অনেকগুলি কথা আমার বেশ ভাল

লাগিয়াছে। সুরতাং তাঁহার অনেকগুলি  
প্রস্তাবের সহিত আমি একমত। যদি পরি-  
বর্তিত প্রণালীতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত  
করিতে হয়,—তাহা হইলে প্রক্রিয়ার পরিবর্তন  
করিলে হইবে না। যেখানে রস বাহির করিতে  
হইবে, সেখানে “টিক্কার গ্রেন্স” যন্ত্র ব্যবহার  
করা হউক,—ঔষধ বিশেষে “পারকোলেটার”  
ব্যবহার করা হউক, সহজে ঔষধদ্রব্যকে চূর্ণ  
করিবার জন্ত Disintegrator, ‘বলমিল’  
পটমিল, প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করা হউক,  
ছাঁকিবার জন্ত হুস্ক চালুনি ও রেশমী বস্ত্র  
ব্যবহার করা হউক। দ্রব বিশেষকে পরিষ্কার  
করিবার জন্ত ফিলটার পেপার ব্যবহার করা  
হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমি  
ডাক্তার, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আয়ুর্বেদীয় ঔষধও  
আমাকে নির্বাচন করিতে হয়। তাই সতীশ-  
বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য  
হইলাম।

ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

এল, এম, এন্স।

## মনুষ্য রক্তের লোহিত কণিকার আকার !

মহাস্থায়িক ছাত্রের রক্ত অম্লবীক্ষণ যন্ত্র  
সহযোগে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার ধারণা  
হইয়াছে যে, রক্তের লোহিত কণিকার আকার  
সদ্যে প্রচলিত শারীর-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পুস্তক  
সমূহে যে বর্ণনা আছে, তাহার পরিবর্তন হওয়া  
অবশ্যক।

প্রচলিত মতামতসারে উক্ত কণিকাগুলির  
আকার—গোলাকৃতি, চেপ্টা এবং ধার অপেক্ষা  
মধ্যস্থল পাওয়া। কটা প্রস্তুত করিবার  
লেটিকে ছইদিকে বড়া আঙ্গুল দিয়া চাপ  
দিলে যে আকার হইবে, তাহা ঐ কণিকা-  
গুলির আকারের সদৃশ। ঐ মতামতসারে

কণিকাগুলির মধ্যস্থলে একটা পাংলা ব্লক আছে।

আমার মতে ঐ কণিকাগুলির মধ্যস্থল একেবারে ফাঁক, উহাতে কোনও ব্লক নাই। অর্থাৎ কণিকাগুলির আকার মোটা ও গোল তারে নির্মিত আংটি বা বলয়ের অনুরূপ। ঈমারে যেরূপ Life belt দেখা যায়, তদনুরূপ।

কণিকাগুলির ঐরূপ আকার পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে একটা কাচ স্লাইডের [Slide] উপর বড় এক ফোঁটা রক্ত লইতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণের জন্ত একটা পুরাণ অম্লবীক্ষণ যন্ত্র (যাহার stage ক্ষয় হইয়া গিয়া অসমতল হইয়াছে) হইলে ভাল হয়। ঐরূপ অসমতল অম্লবীক্ষণে দেখিবার সময় কণিকাগুলি ক্ষেত্রের বন্ধুর-নিবন্ধন কোনও একদিকে প্রোত-প্রবাহে চালিত হইতে দেখা যাইবে। নূতন অম্লবীক্ষণ হইলে একটু আধটু কাগজের দ্বারা অসমতল ষ্টেজ করিয়া লওয়া যায়। Cover slip থানি খুব পাংলা হওয়া আবশ্যক। বেশী ভার হইলে উহার চাপে কণিকাগুলি নড়িতে পারিবে না। রক্তের প্রবাহ দেখিয়া তদুপরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সংযোগ করিতে হইবে। প্রবাহে রক্ত কণা-গুলি আকৃষ্ট হইয়া চলিতেছে, দেখা যাইবে। এইরূপ অবস্থায় কয়েকটা কণা উন্টাইয়া-পান্টাইয়া চলিতেছে দেখা যাইবে। ঐরূপ চলন-শীল দুই একটা কণার আকারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উক্ত লোহিত-কণাগুলির মধ্যস্থলে বাস্তবিক ব্লক নাই।

কোনও যন্ত্রের উপকারিতা বা অপকারিতার দিক্ দিয়া দেখিলেও বুঝা যাইবে যে, কণা-গুলির নূতন আকার ধরিয়া লইলে তাহাদের স্বকার্য্য সম্পাদনের বিশেষ সুরবিধা হয়।

(১ম) কণাগুলির বহিরাবরণের আয়তন বদ্ধিত হয়, ইহাতে তাহাদের অক্সিজেন-আদান-প্রদানের খুব বেশী সুরবিধা হইবে।

(২য়) মধ্যস্থানে একটা অনাবশ্যক ব্লকের পরিবর্তে ছিদ্র বা ফাঁক থাকিলে ঘন রক্ত রসের মধ্য দিয়া কণাগুলির গমনাগমনের পক্ষে বাধা কম পড়ে।

(৩য়) ঐরূপ আকারে কণাগুলি অধিক-তর নমনীয় হইবে; তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Capillary-র মধ্য দিয়া যাইবার সময় ও অধিকতর সুরবিধা হইবে।

মাছ, বেড় প্রভৃতি যে সকল জীবের লোহিত কণিকায় Nucleus আছে,— তাহাদিগের কণা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে—Nucleus এর চারিদিকে একটা গভীর খাঁজ আছে। আমার বিবেচনায় উচ্চতর জন্তুদিগের লোহিত কণিকা নষ্ট হইবার কালে Nucleus এর চারিধারের খাঁজ গভীরতর হইয়া Nucleus টা কণিকা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, মধ্য স্থানটা এইরূপে ফাঁক হইয়া যায়। পরে Nucleus টা তপ্প হইয়া Bleed platelets-এ পরিণত হয়।\*

ত্রিনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

\* এই প্রবন্ধ বিজ্ঞান সভার প্রকাশিত ত্রিষুক্ত বোম্বেনগলে রায় এম্ এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে, ডঃ ত্রিষুক্ত প্রফুল্লেন্দ্র রায়, ডি, এম্, সি; পিএচ্ ডি, সি, আই, ই, মহোদয়ের সম্মুখে লেখক কর্তৃক পঠিত।

## টোটকা ও মুষ্টিযোগ

—:—

বসন্তে প্রতিষেধক বিধি।—

(১) এই রোগের প্রারম্ভিককালে পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তে হরিতকীর একটি বীজ ধারণ করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। (২) তেলাকুচা, নাদবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস—ইহাদের পত্রের কাথ পয়ষিতি করিয়া পান করিলে বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

রণে ব্যবস্থা।—

(১) ধুতুরার মূল বাটিয়া সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া এবং ঐ ছইটি দ্রব্য অল্প গরম করিয়া ব্রণ হইবামাত্র প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। (২) টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঠ, কেলোকোড়া ও রান্না—এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-খোঁথে দল দর্শিয়া থাকে।

বকুং রোগে ব্যবস্থা।—

কুলেখাড়া পাতার রস প্রাতে ও বৈকালে এক তোলা লইয়া অল্প মধুর সহিত সেবন করাও—সত্ত্বঃ উপকার পাইবে। ইহাতে

যক্কতের ক্রিয়া ভাল তো হইবেই, তন্নিম্ন ইহা সেবনের ফলে রক্তবৃদ্ধি হইয়া দেহ সবল ও সুস্থ হইবে।

দূষিত জল জনিত জরে।

বাসক ছাল, মূতা, গুলঞ্চ (গাঁট বাদ), পলতা, শুঠ, ধনে ও চিরাতা—এই কয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১৩।০ কুঁচ ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া প্রাতে ও বৈকালে এক ছটাক করিয়া অল্প মধুসহ পান করিতে দাও। এই-রূপ ব্যবস্থায় দূষিত জল সেবন জনিত জর ৩৪ দিনে আরোগ্য হইবে।

অজীর্ণ মুষ্টিযোগ।—

অজীর্ণ হইয়া ভেদ হইতে থাকিলে চারি আনা ঘোয়ান ও চারি আনা লবণ—একত্র মিশাইয়া না চিবাইয়া একটু জলসহ গিলিয়া ফেল, সত্ত্বঃ সফল পাইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবিত্বষণ

## সমালোচনা।

—:—

চিকিৎসা সার সংগ্রহ। ১ম খণ্ড।—

৮ পীতাম্বর কবিরাজ সংগৃহীত ও ঢাকা—

মুড়াপাড়া হইতে শ্রীমদনমোহন কবিরাজ

কবিরাজ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১/০ আনা

এখণ্ড কেবল অল্প-চিকিৎসা লইয়া লিখিত

সকল প্রকার জরে যে সকল নিয়মে চলা

উচিত,—যে সকল পান, মুষ্টিযোগ ও ঔষধাদি ব্যবহার করা কর্তব্য—শাস্ত্রীয় শ্লোক হইতে অনুবাদ করিয়া সেই সকল কথা ইহাতে বলা হইয়াছে। বলিবার প্রণালী মন্দ হয় নাই। তবে কবিরাজী পুস্তকে কুইনাইন ঘটিত ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করা—সঙ্গত মনে করিতে পারি না।—তাহা হইলে আর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষত্ব রহিল কি! এ পুস্তকের সঙ্কলনকার

কম্পজরে যে হরিতাল ঘটিত ঔষধ প্রয়োগের কথা বলিয়াছেন, সেই হরিতাল ঘটিত ঔষধই তো জরের বিরাম অবস্থায় ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। কুইনাইনের ম্যালেরিয়া ভিন্ন অন্য জ্বর বন্ধ করিবার শক্তি নাই; হরিতালের ম্যালেরিয়া ছাড়া অনেক জ্বর বন্ধেরই ক্ষমতা আছে। যাহা হউক এ সকল কথা বাদ দিলে গ্রন্থখানি মন্দ হয় নাই।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:—

গাভীর হিসাব।—গত আদম স্মারীতে প্রকাশ,—সমগ্র ভারতে গাভীর সংখ্যা ৩৭৪০০০০০। ইহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক। বাঙ্গালা প্রদেশে গাভী, ঝাড়, বাছুর এবং মহিষ মিশাইয়া একত্র হিসাব ২৫৩০০০০০। হিসাবে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বাঙ্গালা দেশ হইতে এখনো গো-কুল নির্মূল হয় নাই। তবে বাঙ্গালায় ছুধের দুর্দশা হইল কেন?

ঘূতে চর্কি।—কলিকাতা সহরে আবার নাকি ঘূত বলিয়া চর্কি চলিতেছে, মফঃস্বলে তো কথাই নাই। তবে ঘূত আইন পাশ হইয়া কি ফল হইল।

পূর্ববঙ্গে বৈজ্ঞ-সম্মেলন।—গত ২৪শে ও ২৫শে চৈত্র ঢাকা সহরে পূর্ববঙ্গ বৈজ্ঞ সম্মেলনের ২য় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামের কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ সেন কবিরত্ন সভাপতি হইয়াছিলেন।

টিকায় জুলুম।—‘বরিশাল চিত্রাবী’-তে প্রকাশ—বরিশালের কতিপয় পরীতে টিকাদারেরা জ্বর এবং উদরাময় পীড়াগ্রস্থ শিশুদিগকে জোর করিয়া টিকা দিতেছে। ইহার ফলে বরিশালের ফাণ্ডপাশা গ্রামের একটা শিশুর জীবন-সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল! পীড়িতাবস্থায় টিকা দেওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে, ইহা আইনেরও বিরুদ্ধ। আমরা এজ্ঞা বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শিশু মৃত্যু।—কলিকাতা সহরে জন্ম হিসাবে প্রত্যেক নয় জনের মধ্যে তিন জন করিয়া শিশুর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অস্বাস্থ্যকর পিতামাতার গুরু শোণিতের সংমিশ্রণের ফলেই যে এই অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

যক্ষ্মারোগীর হিসাব।—সরকারি হিসাবে প্রকাশ,—পৃথিবীতে প্রতি বৎসর বৃত্ত

লোকের মৃত্যু হয়, তাহার ৭ ভাগের এক ভাগ যক্ষ্মারোগে মরিয়া থাকে। ব্রিটিশ ভারতের বার্ষিক লোক সংখ্যা ৬ লক্ষ। এই হিসাবে মাসে ৪৩ হাজার ২ শত, প্রত্যেক দিন ১৪৪০, প্রত্যেক ঘণ্টায় ৬০ জন এবং প্রত্যেক মিনিটে ১ জন করিয়া যক্ষ্মা রোগে ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে।

চিকিৎসকের মৃত্যু।—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কলিকাতার লক্ষপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার সাক্ষন জেনারাল কর্ণেল বার্ড সাহেব কোকস্বরিত হইয়াছেন। ইনি মেডিকেল কলেজের অত্যন্ত অধ্যাপক ছিলেন এবং বিশেষ একজন কৃতী চিকিৎসক বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি ছিল।

বাঙ্গালীর ব্যয়।—বাঙ্গালী স্বাস্থ্যরক্ষা করে ১২ লক্ষ, শিক্ষায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ এবং স্বাস্থ্য নষ্ট বা মৃত্যুপানের জন্য ৮ কোটি মুদ্রা বৎসরে ব্যয় করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু দাঁটবে না তো কাহার ঘটিবে?

স্বাস্থ্য শিক্ষা।—কিছুদিন হইল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে অনারেবল মিঃ এষ্টচ, আর, আর উইন এই মর্মে এক প্রস্তাব পেশ করেন যে, বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্ট সাহায্য কৃত বালক এবং বালিকা বিদ্যালয় সমূহে যথাপ্রয়োজন গুণসম্পন্ন শিক্ষকগণ কর্তৃক স্বাস্থ্যরক্ষা সহকীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হউক। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকুলেশন

পরীক্ষারও ইহা বাধ্যতামূলক পাঠ্য হউক। আগামী বৎসরের বজেটে এতদ্রূপযোগী ব্যবস্থা করা হউক। ইহা লইয়া অত্যন্ত সভ্যগণের মধ্যে নানারূপ আলোচনার পর “বাধ্যতামূলক” কথাটির স্থলে “স্বৈচ্ছাদীন” কথাটি গৃহীত হইয়াছে। একজন ইয়ুরোপীয় সদস্য বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলোদ্দেশে এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন,—ইহা আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

ভারতের রসায়ন।—কিছুদিন পূর্বে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মাস্তোজ বিশ্ববিদ্যালয়ে “হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের প্রাচীন তত্ত্ব” সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—তাহাতে প্রকাশ,—“হিন্দুগণ রসায়ন ও গণিত শাস্ত্র আরব দেশ হইতে যে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাহা সত্য নহে। আরবগণই ভারতীয় দিগের নিকট হইতে ঐ ছই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, প্রাচীন আরব গ্রন্থকারগণ কৃতজ্ঞতা সহকারে একথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে প্রকাশ,—থলিফ হারুণ অল্ রসিদের রাজত্বকালে চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদের জন্ত ভারতীয় পণ্ডিতগণ বোগদাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। চরক ও সুশ্রুত ভিন্ন চিকিৎসা সহকীয় আরও বহুগ্রন্থ হিন্দুগণ কর্তৃক আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।” এ সব কথা আমরা বরাবরই জানি। তাঁহাদের এ বিষয়ে অন্তরূপ ধারণা আছে, তাঁহারা ডাক্তার রায়েন্ড কথায় ইহা শিক্ষা করুন।

## আমাদের “নববর্ষ”।

\* \* \*

সেই চম্পক-মালতী-মল্লী-নাগেশ্বরের গন্ধ,  
সেই চঞ্চল-মুক্ত-উদাস-পবনের গতি মন্দ,  
সেই ফল দোলে শ্যাম-পল্লব-শোভন-বৃক্ষের সাথে,  
সেই বিহঙ্গ, স্তবক-নম্র লতার কুঞ্জে ডাকে,  
সেই সুন্দর স্থপ-রচিত রক্তাশোকের বীথি,  
সেই লালসায় অলস নেত্র, অলির গুঞ্জ গীতি,  
সেই উজ্জ্বল চন্দ্র-তপন, সেই নিশি, সেই দিবা,  
সেই স্থিতির জীবন-মৃত্যু, নূতন হ'য়েছে কিবা ?  
সেই পুরাতন, সব “এক ঘেয়ে” গঠন-রক্ষা-নাশ,  
নিখিলের “নব বর্ষ” তথাপি, শুভ বৈশাখ মাস !!

\* \* \*

সেই দলাদলি—রুধির-লিপ্ত, অশ্রুর শুভ-দেব,  
সেই শত্রুতা—স্বার্থপরতা—বিল্ব-বিপদ-ক্লেশ,  
সেই দরিদ্র অর্থ যোগায় ধনীর বিলাস তরে,  
সেই ক্ষুধার্ত-শীর্ণ-শরীর—অন্ন অভাবে মরে,  
সেই সম্ভাপ-শোক-যন্ত্রণা, রোগীর আর্তনাদ,  
সেই সংসার চির-অপূর্ণ—আশা-আকাজকা-সাধ,  
সেই জলাভাব পল্লীগ্রামের—জ্বলে দাবায়ি শিখা,  
সেই ম্যালেরিয়া-কলেরা ও প্লেগে শমনের বিভীষিকা,  
কিছুরি হলোনা পরিবর্তন—কিছুরি নাহিক ক্ষয়,  
তবে কারে বল “নূতন বর্ষ” ? গাও বল কার জয় ?

\* \* \*

ঘুটিবে যে'দিন সারা বিশ্বের দৈন্ত ও গ্লানি খেদ,  
হুঁ-স্বাস্থ্যের মাঝে—প্রতিষ্ঠা লাভিবে “আয়ুর্বেদ,”  
স্বা-বিলাস ত্যজিয়া মানব-দীক্ষিত হ'বে ধর্ম,  
স্বর্গ আসিবে মর্ত্যে নামিয়া, কামনাশূন্য কর্মে,  
নদীর শীর্ণ বক্ষে—ছুটিবে বীচি-বিক্ষোভ-বাণ,  
শ্লিষ্ট-শ্যামল-ক্ষেত্রে শোভিবে কনক শীর্ষ ধান,  
আসিবে ফিরিয়া “আচার্য্য যুগ” ল'য়ে ঔষধ পথ্য,  
সার্থক হ'বে শাস্ত্র-মহিমা—জ্ঞান-বিজ্ঞান তথ্য,  
অকাল মৃত্যু দূর হবে, প্রাণে জাগিবে নূতন হর্ষ,  
স্থিতির মাঝে আসিবে সে'দিন আমাদের “নব বর্ষ”।

শ্রীজবল্লভ রায়, কাব্যজীবী।

[ হৃতপূর্ব “বহুদর্শী” সম্পাদক ]



# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

২য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫—জ্যৈষ্ঠ ।

{ ৯ম সংখ্যা ।

## জাতীয় সঙ্গীত ।

১

তোমরা কি সেই বৈষ্ণব-সম্মান আর্ন্ত-হৃদয়ে অভয়-দাতা ?  
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-স্থাপনে তোমাদের কি স্বজিল ধাতা ?  
নিখিল বেদের শ্রেষ্ঠ যেটুকু—তোমাদের কি সে আয়ুর্বেদ ?  
যাহার প্রসাদে রোগ-নাশিয়ে তোমরা জীবের যুচা'তে খেদ ?  
শল্য-শালাক্য-কায়-চিকিৎসা—সকলি যা'দের আয়ত্ত ছিল !  
জরায় যৌবন যা'দের প্রসাদে ধরণীর মাঝে আসিয়াছিল ?  
তোমরা কি সেই তেজো-নৈপুণ্যে জ্ঞানের জলন্ত উজ্জ্বল ছবি ;  
আছে কি না লুপ্ত হ'য়েছে এখন তোমাদের আজি সে সুখ-রবি ?

২

তোমরা কি সেই জ্ঞান অর্জ্জুনে আগেকার মত লুক্কপ্রাণ ? -  
পীড়িতের তরে মর্শ্ব-মাঝারে তুলিয়া থাক কি করুণ-তান ?  
সামর্থ্য-প্রকাশে অর্থ অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি যা'দের ছিল,  
বাসনা যা'দের গুপ্ত-সাকল্য—এ মন্ত্র যাহারা শিক্ষা নিল,  
রাজত্ব-সমাজে মাচ্ছ যা'দের, কীর্ত্তি যা'দের ধরণী ভরা,  
ধর্ম-যা'দের আর্ন্ত সেবাই,—এমন ভাবেতে হৃদয় গড়া ।  
সে দেশ-বরেণ্য-বংশ-মাঝারে জন্ম লভিয়া পুণ্য-ফলে  
সে সব কর্ম্ম যত্নে রেখেছ ?—না ভাসা'য়ে দিয়েছ অতল জলে ?

৩

তোমাদের বিদ্যা বিশ্ব ঘোষিত—‘মাধব নিদান’ সাক্ষ্য তা’র,  
 তোমরাই ভাষা করিলে সৃষ্টি—‘মুক্তবোধ’ খানি জাননা কা’র ?  
 তোমাদের বংশে জন্ম লভিলা ‘চক্রপাণিদত্ত’—কোথায় সে দিন ?  
 তোমাদের বংশে ‘বিজয় রক্ষিত’—সে টীকার জ্যোতিঃ হয়নি ক্ষীণ।  
 তোমাদের রক্ত মুক্ত হইয়া গ্রীস-আরবের সাধিয়া নিল,  
 আরব হইতে সমগ্র বিশ্ব চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়াছিল।  
 তোমরাই আগে সেবার ত্রুত বিজ্ঞানের ওগো করিয়াছিলে,  
 সে সকল আজি করিছ চর্চা ?—না সমাজ হইতে তুলিয়া দিলে।

৪

দাসত্ব করিয়া ক্লান্ত কখন হওনি তোমরা আছে কি মনে ?  
 জ্ঞানের চর্চায় শ্রান্ত হৃদয়, আপনা ভাবিতে জগত-জনে।  
 তোমাদের দেখি, আর্ন্ত ভাবিত—বুঝি দেবগণ সমুখে মোর,  
 তোমাদেরো হৃদি সে ভাবে মুক্ত,—তোমাদেরো নেত্রে বহিত লোর।  
 তোমরা ভাবিতে অপত্য তা’রে,—শাস্ত্র-উপদেশ শিক্ষা করি,—  
 সে শিক্ষার স্রোতঃ রুদ্ধ এখন,—দুঃখ হয় না সে সব স্মরি’।  
 কোথা তোমাদের সে সব শিক্ষা ? সে দীক্ষা দিবার ক’জন আছে ?  
 তা’রি ফলভোগ, ভিক্ষা-করণ, আর অ’খিজল তাহার পাছে !

শ্রীমত্যাচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

## মকরধ্বজের ঔস্তত-প্রণালী।

—:—

[ রক্তবৈদ্যের উপদেশ ]

আমার বাটী পল্লীগামে। বৈদ্যবংশে  
 জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তিন পুরুষ ধরিয়া বৈদ্য-  
 বৃত্তিই আমাদের অবলম্বন। কিন্তু আমার  
 উত্তরাধিকারিগণ কেহই জাতীয় ব্যবসায়-লিপ্ত  
 নহে। ইহা অবশ্যই চঃখের কথা ! এ চঃখের

কথা আমি এতদিন মনেই রাখিয়াছিলাম,  
 আজ কিন্তু সকলের কাছে প্রকাশ করিতেছি।  
 ইহার কারণ—আমার মত বুড়ার কাছে আমার  
 বংশধরেরা কিছুই শিখিল না। আমাদের  
 বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত এমন কতকগুলি ঔষধ

হচ্ছে, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। আমার জীবন-নাটকে এখন পঞ্চম অঙ্ক চলিতেছে, যবনিকা-পতনের আর বিলম্ব নাই। আর ত অপেক্ষা করিতে পারি না। আজীবন চিকিৎসা-ব্যবসাতে লিপ্ত থাকিয়া আমি যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আমার ইচ্ছা তোমরা তাহা শিখিয়া লও। আমি জানি, তোমরা আমার চেয়ে পণ্ডিত, বংশী ও কন্ঠিনান; কিন্তু আমি যে তোমাদের চেয়ে ব্যসে বড়—তাহা ত অস্বীকার করিতে পারিব না। সত্য বটে, একালের শিক্ষিত কবিগণ তোমরা;—তোমরা রোগীর বাড়ী গেলেন ১৮ টাকা দর্শনী পাও, তোমরা ল্যাণ্ডো-মেট্রি চড়, পেটেন্ট ঔষধ আবিষ্কার কর। আমার চেয়ে তোমাদের কত বেশী সম্ভ্রম! আমি দাঁটা পায়ে চটা পরিয়া, ধূলায় ধূসর হইয়া, পাড়ার পাড়ায় ঘুরিয়া চিকিৎসা করি। টাকটা দিকেটা যে' যা' দেয়—হাসি মুখে দয়। ইহাতেই আনার মরায় ভরা ধান, গোলাব ভরা গাই, বাগান ভরা গাছ, পুকুর ভরা মাছ। আমি কি শুধু আমার দেশের পরিদর্শক? আমি দলাদলিতে মধ্যস্থ, বারবারীতে প্রধান পাণ্ডা, পল্লীর উন্নতি-কামনায় পরামর্শ দাতা, আমি আমার দেশের লোকের বিপদে বন্ধ, সম্পদে সহায়, সাহসনায় স্বহৃদ,—আমি নই কি? নাই বা হইলাম আমি—“বিজ্ঞানরত্ন” “বৈজ্ঞানিক” “কাব্যতীর্থ” “কবিভূষণ”? আমার চতুর্দিক আমার দেশবাসী—চিকিৎসকের সভায় এখনও টের পায় নাই। এই টুকুই আমার স্বপ্ন, এইটুকুই আমার গর্ব।

আমি কোন্ ঔষধ কেমন করিয়া প্রস্তুত করি, কোন্ রোগে কিরূপ ব্যবস্থা দিয়া কোন কণা গাইয়াছি, তোমাদের কাছে একে

একে তাহা বলিয়া যাইব। তোমরা শুনিবে কি?

আজ প্রথমেই “মকরধ্বজের” কথাটা বলি। “মকরধ্বজ” বড় নামজাদা ঔষধ। সাহেবেরাও ইহার গুণের প্রশংসা করেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়—অনেক কবিরাজ মহাশয়ই ইহা প্রস্তুত করিতে জানেন না। অথচ লেবেল আঁটিয়া “ষড়গুণ”, “সিদ্ধ” নাম দিয়া—কেনা “রস সিন্দূর” বিক্রয় করেন। আমি স্বহস্তে “মকরধ্বজ” প্রস্তুত করিয়া থাকি। অনেকের বিশ্বাস—“মকরধ্বজ” প্রস্তুত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আবার কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়া থাকেন,—“মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে বংশ থাকে না।” একথার মূলে কোনও সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। আমার বয়স ৭৬ বৎসর, সংসারে আমি মহাস্বথী। ঈশ্বরশীর্ষাদে—আমার ৪টা পুত্র ও ৪টা কন্যা বর্তমান। তাহাদের সম্মান-সন্ততি হইয়াছে, তাহারা দেশের মাঝে একজন হইয়া সংসার-ধর্ম্য করিতেছে। যাক,—বাজে কথা ছাড়িয়া এইবার কাজের কথা বলি।

আমি যে উপায়ে ষড়গুণ বলিঙ্গারিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করি, তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি।

প্রথমে পারা লইতে হইবে। পারার ষত ওজন—তাহার ৬ গুণ গন্ধক লইয়া বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া একটা পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই পারা বা গন্ধক শোধন করিবার আবশ্যক নাই।

কবিরাজদের কাছে “বালুকা যজ্ঞ” সবিশেষ পরিচিত। একটা বড় হাঁড়ীতে এক হাঁড়ি বালি [গন্ধার বালি হইলেই ভাল হয়] পুড়িবেই বালুকা যজ্ঞ হইল। এইরূপ “বালুকা যজ্ঞের”

ষ্টিক মধ্যস্থলে একটা ছোট হাঁড়ি বসাইবে। হাঁড়ির তলদেশ যেন সমতল হয়। সেই ছোট হাঁড়িতে পারা রাখিবে, তা'র পর পারার হাঁড়ি শুদ্ধ বালুকা যন্ত্রটা উনানের উপর বসাইবে এবং উনানটা আগুন দিয়া ধরাইয়া দিবে। উনানটা কাঠের কিম্বা ঘুটিয়ার দ্বারা আগিবে। পাথুরে কয়লা দিবে না। পূর্বে যে পারার ৬ গুণ গন্ধক গুঁড়াইয়া রাখিয়াছ, সেই গন্ধকের কিয়দংশ লইয়া—যে হাঁড়িতে পারা রাখিয়াছ—তাহাতে দিবে। এমনভাবে গন্ধক দিবে, যেন পারা চাপা পড়ে। গন্ধক গলিয়া তৈলের মত হইলে, আবার তাহাতে গন্ধক দিবে। সে গন্ধক গলিয়া গেলে আবার দিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে সেই ৬ গুণ ওজন করা গন্ধকের সমস্ত টুকু পারার হাঁড়িতে দিতে হইবে। গন্ধক দেওয়া হইয়া গেলে, গলিত গন্ধক তরল থাকিতে-থাকিতে, চিমটা বা সাঁড়াশী দিয়া পারার হাঁড়ি নামাইয়া ফেলিবে। কিছুক্ষণ পরে—হাঁড়ি ঠাণ্ডা হইলে এবং গন্ধক জমিয়া কঠিন হইলে—ভাঁড়ের তলা ছিদ্র করিয়া পারা বাহির করিয়া লইবে। এই পারার নামই “ষড়্গুণ বলিজারিত” পারা। গন্ধকের নাম—বলি। ৬ গুণ বলির দ্বারা জারিত, তাই ইহার নাম “ষড়্গুণ বলিজারিত।” রস-গ্রন্থে ষড়্গুণ বলি জারণ প্রথা বাহা উক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

“ক্ষুদ্র ভাঙে রসং ক্ষিপ্তং। বালুকা যন্ত্র-মধ্যতঃ।  
ষড়্গুণং গন্ধকং দত্তাদল্লাবঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ  
তৈলরূপেণ বদা গন্ধ স্ততোহব তারগ্নেং ক্রতং।  
স্বাস্থ্যীতে দৃঢ়ে গন্ধে ফোটয়িত্বা রসং নরেন্ ॥

এইরূপ বলিজারিত পারা ৮ তোলা এবং গন্ধক ৮ তোলা লইবে। এই গন্ধক শোধন করিয়া লইতে হইবে। গন্ধক শোধন সকলেই

জানেন। গন্ধকের ডেলায় একটু স্নাত মাখাইয়া লোহার হাতায় করিয়া মৃদু আগুনে গলাইতে হয় এবং সেই গলিত গন্ধক জল মিশ্রিত ছপ্পের পাত্রে ফেলিতে হয়। ইহাই হইতেছে—গন্ধক শোধনের সর্বাপেক্ষা সহজ বিধি। শুদ্ধ নির্কাপিত গন্ধককে রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া ব্যবহার করিবে।

প্রথমে পারা ৮ তোলা খলে ঢালিবে, তাহার সঙ্গে ২ ভরি সোণার পাত দিবে। অমি চীনে সোনার পাত ব্যবহার করিয়া থাকি। চীনা পাত—পোদ্দারের দোকানে বিক্রয় হয়। তাহা কিনিয়া আনিয়া কাঁচি দিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া পারার সহিত মিশাইবে। পারার সহিত সোণা খুব শীঘ্র মিশিয়া যায়। পারা ও সোণা খলে ফেলিয়া মুড়ী দিয়া আধ ঘন্টা আন্দাজ মাড়িলেই সোণা পারার সঙ্গে মিশিয়া যায়। সোণা মিশ্রিত পারা একটু ঘন হয়—মাড়িলে যেন স্নাতর মত হইয়া যায়। পারা ও সোণা মিশিয়া গেলে—তাহাতে ৮ ভরি শোধিত গন্ধক দিবে। তা'র পর খুব ধীরে ধীরে লঘু হস্তে মাড়িতে থাকিবে। জোরে মাড়িলে পারা গন্ধক শীঘ্র মেশে না, কখনও বা সমস্ত অংশও মেশে না। যত জোরে মাড়িবে, ততই ভাল। মাড়িতে মাড়িতে পারা ও গন্ধক মিশিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে। এই কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণের নাম—“কজ্জলী।” সোণা না দিয়া, শুধু পারা গন্ধক একত্র মাড়িলেও কজ্জলী হয়। এই কজ্জলী—কবিরাজের অনেক ঔষধেই ব্যবহার হইয়া থাকে।

এক্ষণে, পারা-গন্ধক ও স্বর্ণ-সংমিশ্রণে কজ্জলী প্রস্তুত হইল, সেই “কজ্জলী” স্বর্ণ কুমারীর রসে মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইবে

হেনাদ মাড়িবে, তিনবার শুকাইবে। এই  
রূপে ৩ শুকানোর নাম—“ভাবনা।”

এইবার একটা মাটির থালী যোগাড়  
করিবে। মাটির থালী—এখন আর বড়  
কুমারবা প্রস্তুত করে না। আগে বাজারে  
বড় বিক্রয় হইত। চায়া-ভুয়া লোকে—  
খানীতে তৈল পুরিয়া লইত। ইহার আকার  
চিশ—ঠিক কুঁজাব মত, অথচ ক্ষুদ্র। থালী  
না যোগাড় করিতে পারিলে—সমতল কাল  
পাট বোতল লইবে। বোতলটির গাত্রে—  
কাগ ও বদখণ্ডের দ্বারা বেশ করিয়া লেপ  
দিবে। পরে বোত্রে শুকাইয়া লইবে। এই  
লেপ দেওয়া বোতলটির ভিতর—পূরোক্ত  
ভাবনা দেওয়া কজ্জলী পুরিবে। পরে—  
বোতলটা বালুকাবস্ত্রের মধ্যে বসাইবে। বালুকা-  
বস্ত্রের কথা আগেই বলিয়াছি—৬ গুণ গন্ধকের  
সহিত যে যথেষ্ট পারায়ে জাল দেওয়া হইয়াছিল  
—সেইকণ “বালুকা যন্ত্র।” কিন্তু বালুকাবস্ত্রের  
ইন্ডিয়া এমন হওয়া চাই—যেন বোতলের গলা  
গম্বস্ত—বালিতে ঢাকা পড়ে, অর্থাৎ ইন্ডিয়া—  
যেন গভীর ২৩, ২৪—ভাত-রাঁধা-তোলা-ইন্ডিয়া হইলেই  
চগাবে।

বোতল বসানো বালুকা যন্ত্রটা উনানের  
উপর রাখিয়া—কাঠের আগুণে জাল দিবে।  
সকালে—যদি চট্টার সময় চড়ানো হয়, তাহা  
হইলে রাত্রি চটা পর্যন্ত বীরে বীরে জাল দিতে  
হইবে। আগের এই নিয়ম। খুব খর-জাল  
হইলে—ভাল ‘চটা’ বাধেনা।

“বালুকা যন্ত্রের” বালি গরম হইবামাত্র  
—বোতলের মুখ হইতে গন্ধকের ধোঁয়া এবং  
গন্ধ বারি হইতে থাকিবে। অল্পমান ২ ঘণ্টা  
জাল দেওয়ার পর আর ধোঁয়া দেখিতে পাওয়া  
যাইবে না। এই সময় হইতে পাক শেষ

হওয়া পর্যন্ত ১ ঘণ্টা অন্তর, ১০।১৫ মিনিটের  
জন্ত—বোতলের মুখ, এক খণ্ড প্রস্তর বা  
লৌহখণ্ডের দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে।  
অর্থাৎ মাঝে মাঝে বোতলের মুখ ঢাকিবে  
এবং মাঝে মাঝে খুলিয়া দিবে। এইরূপে  
১২ ঘণ্টা জাল দিলেই মকরধ্বজ প্রস্তুত হইল।  
১২ ঘণ্টার পর জাল দেওয়া বন্ধ করিবে।  
তারপর—সাঁড়শী দিয়া বোতলের গলাধরিয়া,  
বোতলটা নামাইয়া কোনও শীতল বাতাস যুক্ত  
স্থানে, সে দিনের মত রাখিয়া দিবে। পরদিন  
বোতলের নীচের দিক ভাঙ্গিয়া ফেলিবে,  
দেখিবে—বোতলের মধ্যস্থল হইতে গলা  
পর্যন্ত—মকরধ্বজের উজ্জ্বল দানা লাগিয়া  
রহিয়াছে। ছুরি দিয়া চাঁচিয়া উঠা—শিশির  
মধ্যে পুরিয়া রাখিবে। ইহাই—মকরধ্বজ।  
বোতলের নীচে—ঝামার গুঁড়ার মত—এক  
প্রকার পদার্থ পড়িয়া থাকে। এই ভস্মাবশেষ  
—স্বর্ণ ভস্মের স্থানে অনায়াসেই ব্যবহার  
করিতে পার। কেননা, ইহাতে সোণার  
ভাগ থাকিয়া যায়। আবার সোণা ভস্ম  
করিতে হইলে তাহার সঙ্গে পারা ও গন্ধক  
মিশাইতে হয়। সুতরাং বোতলের নীচে  
যাহা পড়িয়া থাকে—তাহাতে স্বর্ণভস্মের গুণ  
সমস্তই থাকে। এই জিনিষ আমি “সোণা  
জীরা” নাম দিয়া মেহ, বহুমূত্র ও ক্ষয়কাসে  
ব্যবহার করিয়া চমৎকার ফল পাইয়াছি।  
পুরাতন উদরাময়েও ইহা অত্যন্ত উপকারী।

আমি যে যড়গুণ বলি জারিত মকরধ্বজের  
প্রস্তুত-প্রণালী লিখিলাম, ইহা আমার  
স্ব-কপোল কল্পিত নহে। ইহা শাস্ত্রীয়-বিধি  
মতা,—

পল মাত্রং রসং শুদ্ধং তাবদ্ব্যাক্ত গন্ধকং ।

শাণং তনুভুক্তং স্বর্ণং সর্বমেকত্রযদ্রদেয়ে ॥

বিধিবৎ কঙ্কালী কৃতা ভাবয়েৎ কত্কা দ্রবৈঃ ।  
 বারত্রয়ঃ ততঃ ঘর্ষে শোষণেদতি যত্নতঃ ॥  
 পশ্চাৎ স্থালীং গৃহীত্বাহু সর্বত্র কুণ্ঠিত মৃদা ।  
 বিলিপ্য ত্রিবারং তাম্বু চণ্ডাতপে চ শোষণয়েৎ ॥  
 তন্মধ্যে কঙ্কালীং ক্ষিপ্তা শুভেহহি পাকবিদগুচিঃ  
 বালুকা পূর্ণ ভাণ্ডে চ তদ্ব্যবস্থাপয়েৎ ভিষক ॥  
 ততঃ বহি জালাং দত্তাং মন্দং মন্দং নিশাবধি ।  
 স্বাস শীতে সমুদ্ভূতা গ্রাহ্য মূর্ধগতং রসং ॥  
 যোজয়েৎ সর্ব রোগেযু গুঞ্জৈকং মাক্ষিকৈঃ সহ  
 মৃত্যুহৃচ্ছ মহাবীর্যো থ্যাতোহয়ং মকরধ্বজঃ ॥

রস কুলার্গব ২য় উঃ ।

যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। পূর্ণ মাত্রায় পাক করিলে, ১০।১২ ভরি পর্যন্ত জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। যিনি প্রস্তুত করিবেন, তিনি মনে করিলে পূর্বোক্ত মাত্রার অর্ধ, সিকি বা ৮ ভাগের এক ভাগ—যে কোনও মাত্রায় প্রস্তুত করিতে পারেন। কম মাত্রায় করিলে, খরচ অবশ্যই কম হইবে, তবে পরিশ্রম—সব তাতেই সমান।

আয় একটা কথা, মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার সময়—একটু শুদ্ধাচারে থাকা ভাল। পাকের দিন হবিষ্য গ্রহণ করিলে বড়ই ভাল হয়। অগ্নি-তাপে বসিয়া পারায় জাল দিতে গেলে, একটু বেশী করিয়া হুত পান করি কর্তব্য।

জালের প্রথম মুখে—যখন বোতল হইতে পারা ও গন্ধকের ধূম বাহির হইবে, তখন

যন্ত্রের নিকট হইতে একটু দূরে থাকিতে হয়। সকলেই জানেন—পারা ও গন্ধকের ধূমে হাঁপানী ও বাতরক্তের পীড়া হইতে পারে। একটু দূরে থাকিয়া জাল দিলে আর সে ভয় নাই।

এখন দেখি—যে-সে যেখানে-সেখানে মকরধ্বজ বেচিতেছে। আমার বিশ্বাস—তা'দের অনেকেই নিজের হাতে মকরধ্বজ করে না। বরিশালের ব্যবসায়ীদের কাছে কেনা—“রসসিন্দূর” “সিন্দু”, “ধড়গুণ বহি-জারিত”—ইত্যাদি বড় বড় বিশেষণ দিয়া “মকরধ্বজ” বলিয়া চালাইতেছে। আবার কেহ কেহ এমন অজবুক যে, মকরধ্বজের বিজ্ঞাপন দিবার সময়—“ইহা আসল স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ।” বলিয়া লিখিতে লজিত হয় না। ইহাদের জানা উচিত, “মকরধ্বজের “স্বর্ণঘটিত” বিশেষণ দেওয়া চলেনা, কেননা—সোণা না দিলে সে ত “মকরধ্বজই” হইবে না। শুধু পারা-গন্ধকে যাহা প্রস্তুত—ত'হার নাম যে “রসসিন্দূর”। তা'রা সেই “রসসিন্দূর” ১ টাকায় ২ ভরি কিনিয়া, প্রত্যেক তোলা ৪১ টাকায় অনায়াসে বেচিতে পারে। তাহাতে আর কৃত্ত্ব কি? বরং ১ টাকার রসসিন্দূর বেচায় তা'দের ৭১ টাকা লাভ। আসল যা “মকরধ্বজ”, সে যে জরামুক্তানারক অমৃত,—ধনুস্তরির কুন্ত না হইলে সে ত কখনই থাকিতে পারে না।

শ্রীসদানন্দ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

## অতিসার রোগ।

:০:

অতিসার রোগের প্রাবল্য আমাদের দেশে অত্যধিক। অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার কারণ, লক্ষণ; মুষ্টিযোগ-দ্বারা চিকিৎসা প্রভৃতি জানিয়া রাখিলে অনেক সময় সাধারণ উপকৃত হইবেন। সেই জন্য তে প্রবন্ধে অতিসার রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

অত্যন্ত সর্বল অর্থাৎ মলভেদ হয় বলিয়া তে রোগের নামক অতিসার। কেহ বলিতে পারেন যে অতিশয় মলভেদ হইলেই যদি এধাক অতিসার বলা যায়, তবে বিসৃচিকায়, ক্রিমিরোগে বা অশরোগ প্রভৃতিতে তরল মল-ও হইলে তাহাকে অতিসার বলিবা কেন? কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে অতিসার মূল রোগ নহে, বিসৃচিকা, ক্রিমি প্রভৃতি মূল রোগ এবং অতিসার উপসর্গ।

প্রবচিকা—চলিত ভাষায় যাহাকে অমিশ্র বলিয়া কানেন, তাহা অতিসার হইতে স্বতন্ত্র রোগ নহে। উহা অতিসারেরই অবস্থা-ভেদ মাত্র। অনেকে গ্রহণী রোগকে পুরাতন অতিসার বলিয়া থাকেন। কোন কোন মতে গ্রহণী—অতিসার হইতে স্বতন্ত্র রোগ। আমরা গ্রহণী—রোগ-প্রসঙ্গে এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইব।

অতিসার রোগ সকল ঋতুতে উৎপন্ন হইতে ও গ্রীষ্মকালে প্রবল হইয়া থাকে। এই-সকল পশ্চাত্য চিকিৎসক গ্রীষ্মকালীন অতিসার (Summer diarrhoea) এই বিশেষ সংজ্ঞা দিয়া উল্লেখ্য রোগকে পৃথক করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ বিশেষ

নির্দেশ করার কোন সার্থকতা নাই। গ্রীষ্মকালে অগ্নি দুর্বল হয় বলিয়া সামান্য কারণেই অতিসার রোগ উৎপন্ন হয়—এবং এইজন্য গ্রীষ্মকালে অতিসার রোগের প্রাবল্য ঘটে। গ্রীষ্মকাল ব্যতীত বর্ষাকালেও অগ্নি দুর্বল থাকে এবং নদী ও সরোবরের জল বর্ষার খোয়াট জল মিশ্রিত হইয়া দূষিত হয় বলিয়া সে সময়ে অতিসার রোগের প্রাবল্য ঘটয়া থাকে। অনেক স্থলে বর্ষার পঙ্কিল জল শোধন করিবার প্রক্রিয়ার দোষে—যেমন অতিরিক্ত ফটকরী প্রয়োগ করিয়া জল শোধন করা প্রভৃতি কারণেও অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার কারণ—শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, পুরাকালীন এক রাজা দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তান্ত পশুর অভাবে যজ্ঞে গো-সমূহের ব্যবহার প্রবর্তিত করিয়া দেন। ইহা দেখিয়া সমস্ত প্রাণী গো-সমূহের উপযোগিতা স্মরণ করিয়া যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছিল এবং যজ্ঞ হত সেই গো সমূহের মাংস ভোজন করায়, গোমাংসের গুরুতা, উষ্ণতা ও অস্বাদ্যতা (অহিতকারিতা) হেতু এবং উহা অযথারূপে ভোজন করায় তাহাদিগের মন ও অগ্নি উপহত হয়। এইরূপে পূর্বে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল।

উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, গুরু, উষ্ণ ও অস্বাদ্য (অনভ্যস্ত ও অহিতকর) দ্রব্য ভোজন করিলে, অযথারূপে (অতিরিক্ত, পূর্ব অন্ন জীর্ণ না হইতে, দুগ্ধ ও মৎস্যাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্রে—প্রভৃতি)

ভোজন করিলে এবং মন ব্যথিত হইলে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপরোক্ত কুপথ্য সেবনের সঙ্গে সঙ্গে যদি চিত্তের বৈকল্য জন্মে, তবে অতিসার রোগ সহজেই উৎপন্ন হয়। স্নতরাং অতিসার রোগ হইতে পরিজ্ঞাণ পাইতে হইলে কুপথ্য আহার বা গুরুতর আহার করা উচিত নহে। অপিচ গুরুতর আহার করিয়া যাহাতে মনের কোন প্রকার ক্ষোভ না জন্মে, তাহা করা উচিত। কুপথ্য সেবন ব্যতীত মনের সহিত অতিসার রোগের যে সম্বন্ধ আছে—উপরোক্ত শাস্ত্রোক্তি দ্বারা তাহাও প্রমাণিত হইতেছে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন,—গুরুপাক দ্রব্য, অত্যন্ত স্নাতাদি মেহযুক্ত দ্রব্য, অতিরিক্ত রুক্ষ দ্রব্য, অত্যন্ত উষ্ণ দ্রব্য, অত্যন্ত তরল দ্রব্য, অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য, অত্যন্ত শীতল দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য ( মৎস্ত ও দুগ্ধ একত্রে ), পূর্বাহার জীর্ণ না হইতে ভোজন, অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন, অসাম্য-দ্রব্য-ভোজন, বমন-বিরেচনের অথবা প্রয়োগ বা অতিরিক্ত প্রয়োগ, বিষবিশেষ ভয়, শোক, দুষ্ট জল বা মত্ত অধিক পরিমাণে পান করা, ঋতু-বিপর্যয় ( শীতকালে বর্ষা হওয়া বা শীত না হওয়া ইত্যাদি ), অতিরিক্ত জলক্রীড়া, মল-মূত্রের বেগধারণ এবং ক্রিমিদোষ এই সকল কারণে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চরক সংহিতায় অতিসার রোগ ছয় প্রকার বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শোকজ এবং ভয়জ। সুশ্রুতে আমজ অতিসার ধরা হইয়াছে। যাহা হউক সুশ্রুতের উপদেষ্টা ধনন্তরির মতে অতিসার ছয় প্রকারই বটে; তবে অবস্থাভেদে নানা প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চরকের সহিত সুশ্রুতের মতভেদ থাকিলেও চরকের মতই প্রামাণ্য। কারণ চরক কায়তন্ত্র-প্রধান এবং সুশ্রুত শল্যতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থ। সুশ্রুতের টীকাকার আচার্য্য লক্ষণে টীকায় বলিয়াছেন যে, “ভয়, অজীর্ণ বিহচিকা, অর্শ, অজীর্ণ প্রভৃতি নিমিত্ত যে অতিসার তাহাদের পৃথক গণনা করা হয় নাই। অতিসার রোগের ছয় সংখ্যা রক্ষাব জন্ম ইহাদের দোষজ বলা হইয়াছে। কিন্তু ভয়জ অতিসার দোষজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। চরকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। কিন্তু ভয়জ অতিসার দোষজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। চরকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

ভয়জ ও শোকজ দুই প্রকার অতিসার আগন্ত। সুশ্রুতে ভয়জনিত জরকে আগন্ত-জর বলা হইয়াছে স্নতরাং ভয়জনিত অতিসারকে কি প্রকারে আগন্ত না বলিয়া দোষজ বলা যাইতে পাইতে পারে?

পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থেও ভয় হইতে যে অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহা পৃথকভাবে বলা হইয়াছে, অতএব আমরা চরক সংহিতায় মতামুসারেই অতিসার রোগের গণনা করিতেছি। প্রকৃতি ভেদে কি কারণে অতিসার রোগ উৎপন্ন হয়, সে সম্বন্ধে চরক সংহিতায় নিম্নোক্ত বিবরণ আছে।

বায়ু প্রকৃতি ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত বায়ু যৌড় ও ব্যায়াম সেবা করে, রুক্ষ দ্রব্য বা অন্ন ভোজন করে, অথবা নিত্য একরূপ রস (মধুর, কটু, তিক্ত প্রভৃতির একটি) ভোজন করে, নিত্য তীক্ষ্ণ মৃদুপান বা স্নান-সেবা করে, অথবা মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করে, তাহা হইলে বায়ু কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করে। অগ্নি নষ্ট হইলে সেই কুপিত বায়ু স্নায়ু ও পেশীকে নষ্ট



শয্যে আনে এবং উচ্চাদের সহযোগে পুরীষ  
দ্রব হইয়া নির্গত হইতে থাকে। এইরূপে  
বাত্যাদির উৎপন্ন হয়।

প্রিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি যদি অম্ল, লবণ, কটু,  
কষায়, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ (হিং প্রভৃতি) দ্রব্য  
অতিবিক্ত আহার করে, নিয়ত অগ্নি, রৌদ্র বা  
উষ্ণ বায়ুসেবন করে, অথবা অত্যন্ত ক্রোধ  
ও ষ্টম্বাঙ্গত হয়, তাহা হইলে পিত্ত কুপিত  
হয়। সেই কুপিত পিত্ত তরলতা হেতু উষ্ণ  
জন যেমন অগ্নিকে নির্বাপিত করে, সেইরূপ  
দৃষ্টব্যিকে নষ্ট করিয়া মলাশয়ে গমন করে  
এবং মলকে তরল করিয়া অতিসার রোগ  
উৎপন্ন করে। শ্লেষ্ম-প্রকৃতি ব্যক্তি যদি গুরু-  
পাক, মধুর, শীতল ও দীর্ঘদ্রব্য ভোজন করে  
বা অতিরিক্ত ভোজন করে, চিন্তাহীন হয়,  
দিবানিদ্ৰা সেবন করে, এবং আলস্য-পরবশ  
হয়, অর্থাৎ কোনরূপ পরিশ্রম না করে, তাহা  
হইলে শ্লেষ্মা কুপিত হয়। শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ  
মধুর, শীতল ও মিষ্ট বলিয়া অধঃপতিত  
হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করে এবং আনাশয়ে আসিয়া  
মলকে বিপন্ন করিয়া অতিসার রোগ উৎপন্ন  
করে।

অত্যন্ত শীতল, অত্যন্ত রুদ্ধ, অত্যন্ত উষ্ণ,  
অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত গুরুপাক, অত্যন্ত খর  
(কর্কশ), অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য সেবন, বিষম  
(কখন অল্প, কখন অধিক, কখন সকালে,  
কখন বিকালে) আহার, বিরুদ্ধ ভোজন,  
অশয্য-দ্রব্য ভোজন, আহারের কাল অতিক্রম  
করিয়া ভোজন, অল্প মাত্রায় ভোজন, দূষিত  
মত্ত বা জল পান, অতিরিক্ত মত্তপান, ঋতুভেদে  
দক্ষিত দোষের (যেমন বসন্তকালে কক্ষের)  
প্রতিকার না করা, বমন-বিরেচনাদি পঞ্চ  
কর্মের অবশ্য প্রয়োগ, অগ্নি, রৌদ্র-বায়ু ও

জলের অতিসেবন, নিদ্রা না যাওয়া বা অত্যন্ত  
নিদ্রা যাওয়া, ঋতু-বিপর্যায়, অযথা-বলপ্রয়োগ,  
অত্যন্ত ভয়, অত্যন্ত শোক, অত্যন্ত মনের  
উদ্বেগ, ক্রিমি, শোষ, জ্বর ও অর্শোরোগের  
দ্বারা ক্লেশ হওয়া—এই সমস্ত কারণে অগ্নি বিপন্ন  
হইয়া থাকে এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ তিনটি  
দোষই কুপিত হয়। কুপিত দোষত্রয় অগ্নিকে  
অধিকতর দুর্বল করিয়া পক্ষাশয়ে প্রবেশ  
পূর্বক ত্রিদোষজ অতিসার রোগ উৎপন্ন করিয়া  
থাকে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভয়জ এবং  
শোকজ অতিসার আগন্তু। ভয় বা শোক  
হেতু বায়ুকুপিত হইয়া অতিসার রোগ উৎপন্ন  
করে। অপিচ ত্রিদোষজ অতিসার-নিদানে  
কথিত হইয়াছে যে, অত্যন্ত শোক বা ভয় হেতু  
ত্রিদোষ কুপিত হইয়া থাকে। শোক এবং  
ভয়ের অতিযোগজাত যে অতিসার,—তাহা  
দুশ্চিকিৎস।

প্রকৃতিভেদে যে সকল কারণ বশতঃ  
অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে বলিয়া কথিত  
হইয়াছে, বিভিন্ন প্রকৃতির স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি-  
গণের পক্ষে সেইসকল কারণ পরিত্যাগ করা  
উচিত। আর ত্রিদোষজ অতিসারের কারণ—  
সকলের অতিযোগ বশতঃ ঘটিয়া থাকে।  
ইতরাং এ সকল কারণের অতিযোগ ঘাহাতে,  
না ঘটে, তাহার উপায় করিলে—ত্রিদোষজ  
অতিসার জন্মিতে পারে না। ভয়জ ও শোকজ  
অতিসার মানস অর্থাৎ মনকে আশ্রয় করিয়া  
উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে। ইতরাং চিত্ত-স্বৈর্য্যই  
উক্ত অতিসারের প্রতিষেধের উপায়।  
অতিসার রোগের পূর্বরূপ (কোন রোগ  
উৎপন্ন হইবার পূর্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ  
পায় তাহাকে পূর্বরূপ বলে) কষয়, নাতি, মল

দ্বার, উদর ও কৃষ্ণি ( নাভির অধোভাগ ) দেশে  
স্থিতিবেদ যাতনা, শরীরের অবসন্নতা, অধো বায়ু  
নির্গত না হওয়া, মলরোধ, পেটফোলা,  
অপরিপাক—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পূর্বরূপ প্রকাশ পাইলে যত্নপি সাবধানতা  
অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে রোগ আর  
প্রবল হইতে পারে না। এই পূর্বরূপ প্রকাশ  
পাওয়ার অবস্থাকে সূক্ষ্মত চিকিৎসার চতুর্থ-  
কাল এবং রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পঞ্চম-  
কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অতিসারে  
পূর্বরূপ প্রকাশ পাইলে—উপবাসই সর্ব প্রধান  
চিকিৎসা।

ভিন্ন ভিন্ন অতিসার রোগের লক্ষণ ;—  
বাতজ্ব অতিসারে—রুক্ষ, ঈষৎ-রক্তবর্ণ-ফেনাসুক্ত  
মল বায়ুর সহিত অল্প অল্প করিয়া নির্গত হইতে  
থাকে, কটদেশ, উরু ও জজ্বা অবসন্ন হয়,  
শূলুণী হয়, প্রস্রাব বন্ধ হয়, পেট ডাকে এবং  
মলদ্বার নির্গত হইয়া পড়ে।

পিত্তজনিত অতিসারে—পীত, নীল, বা  
ঈষৎ লোহিতবর্ণ মল অতিবেগে নিঃসৃত হয়,  
শরীরে ঘাম হয় এবং তৃষ্ণা, মুচ্ছা, দাহ,  
জ্বর ও মলদ্বারের পাক হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ্ব অতিসার রোগে—শ্বেতবর্ণ, ঘন,  
শ্লেষ্মামিশ্রিত মলনিঃসৃত হয়, মলত্যাগ কালে  
শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মলত্যাগ করিবার পরেই  
আবার দাস্ত হইবে বলিয়া মনে হয়, মলত্যাগ  
কালে শব্দ হয় না, এবং আহারে অরুচি, তন্দ্রা  
নিদ্রাদ্রাব্য, শরীরের গুরুতা, অগ্নির অবসন্নতা  
ও উকি উঠা উপসর্গ ঘটে।

ত্রিদোষজ্ব অতিসার রোগে রক্তাদি ধাতুর  
দোষ অসুসারে মলের বিবিধ বর্ণ হয়।  
ইহাতে হরিদ্রা বর্ণ, হরিত বর্ণ, নীলবর্ণ,  
মঞ্জিষ্ঠার কাথের ছায় রক্ত বর্ণ, মাংসদোষ

জলের মত, রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ বা  
শুকরের চর্কির ছায় বর্ণযুক্ত মলভেদ  
হয়, বেদনা থাকিতেও পারে,—নাও  
থাকিতে পারে। কোথাও ভিন্ন ভিন্ন দোষজ  
অতিসারের সমস্ত লক্ষণ, কোথাও কয়েকটা  
লক্ষণ প্রকাশ পায়। মল কখন গ্রন্থিত,  
কখন তরল হয়। বালক ও বৃদ্ধের ত্রিদোষজ  
অতিসার অসাধ্য। রোগীর মাংস, রক্ত ও বল  
অত্যন্ত ক্ষীণ না হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।  
ত্রিদোষজ্ব অতিসারে রোগীর মল—কাথের ছায়,  
রক্তবর্ণ, যক্ষৎ-পিত্তের ছায়, দধির ছায়, মাংস  
দোষা জলের ছায়, ঘূতের ছায়, মজ্জার ছায়,  
তৈলের ছায়, চর্কির ছায়, দুগ্ধের ছায়,  
ঘূতাদি মিশ্রিত কুট্টিত অস্থিরহিত মাংসের  
ছায়, অত্যন্ত নীল, রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ, জলের  
ছায় স্বচ্ছ, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, হরিত-নীল বা  
কষায়ের ছায় বর্ণ, নানাবর্ণ, ঘোনাটে,  
ময়ূর পুচ্ছের ছায় বিচিত্রবর্ণ, আঁসটে  
গন্ধ, বা পচা শবের ছায় দুর্গন্ধযুক্ত, পুণ্ড্র  
ছায় গন্ধযুক্ত, বহু মক্ষিকা দ্বারা আক্রান্ত  
অনেক পচা দ্রব্যাতু ( রক্তাদি ) মলের সহিত  
বা মল রহিত হইয়া অল্প অল্প নির্গত হইতে  
থাকে। এরূপ হইলে রোগ অসাধ্য হইয়া  
থাকে। তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ভ্রম, হিঙ্কা ও  
শ্বাস উপদ্রব ঘটিলে, বেদনা একেবারে  
না থাকিলে বা অত্যন্ত থাকিলে, মলদ্বারের  
অত্যন্তরূহ শঙ্কের প্রাচীর ছায় আবর্তীকার,  
বলি পতিত হইলে, লালাস্রাব, বল, মাংস ও  
রক্তের ক্ষয়, পার্শ্ব ও অস্থি সমূহে শূলবৎ বেদনা  
হইলে, অরুচি, প্রলাপ, ও মোহ ঘটিলে—রোগ  
অসাধ্য হইয়া থাকে। প্রবল অতিসার রোগ  
সহসা নিবৃত্ত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়।

শোকজ ও ভয়জ্ব অতিসারে বাতজ্ব

অতিসারের তায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । শোক বা তয়ের অতিযোগ ঘটিলে ত্রিদোষজ অতিসারের তায় উপসর্গ ঘটে । সুশ্রুত বর্ণনাছেন যে, শোকজ অতিসারে রক্ত দূষিত হয় এবং কুচেন তায় বর্ণ বিশিষ্ট সেই দূষিত রক্ত মলৈব সঞ্চিত বা মল ব্যতীত, হর্গন্ধযুক্ত বা গন্ধহীন হইয়া নির্গত হইতে থাকে ।

অতিসারের প্রথম অবস্থায় পথ্য,—অতি-মলৈব প্রথম অবস্থায় বলবান রোগীর পক্ষে উপবাসের তায় উৎকৃষ্ট চিকিৎসা আর নাই । কেননা, লজ্জনে বুদ্ধিপ্রাপ্ত দোষ সকল প্রশান্ত ও পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কিন্তু যেনে বলবান শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, হর্গন্ধের পক্ষে উপবাস নিষিদ্ধ । বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী প্রভৃতিকে উপবাস দেওয়া কঠিন নহে কারণ উহারা অন্নপ্রাণ বলিয়া উপবাসের দ্বারা ক্ষীণ হইয়া সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে ।

বলবান বোগীকে উপযুক্ত উপবাস দিবার পর এবং হর্গন্ধ, বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতি উপবাসের দ্বারা ব্যক্তিদিগকে ঔষধ-সিদ্ধ-পেয়া, থৈয়ের গুঁড়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া-নগু এবং মসুর দালের রস পথ্য দিতে হয় । মণ্ড ও পেয়ার জন্ত পুস্তান দাদথানি চাউলের গুঁড়া ব্যবহার্য্য । চাউলের গুঁড়ার চৌদ্দ গুণ জল সহ মণ্ড এবং পেয়ার গুঁড়ার সহ পেয়া প্রস্তুত করিতে হয় । গুঁড়ো পাতলা এবং পেয়া কিছু ঘন হয় । আজ কালে বাগির গুঁড়া জল সহ সিদ্ধ করিয়া দ্বার নিয়ম আছে, তাহাও বাগির মণ্ড । দালের রস, মণ্ড বা পেয়া—যে কোন তরল পদার্থই হইতে দেওয়া হউক—সমস্তই কাপড়ে ছাঁকিয়া দেওয়া উচিত । মণ্ডাদির সহিত পাতা বা কাগচি রস মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হিতকর ।

শৈত্য-স্তম্ভন (ধারণ) গুণ বিশিষ্ট বলিয়া মণ্ডাদি শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করাই হিতকর । কিন্তু অত্যন্ত বায়ু অথবা শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে ঈষৎক্ষণ অবস্থায় প্রয়োগ করাই হিতকর । কেননা, শৈত্যগুণ প্রযুক্ত বায়ু বা শ্লেষ্মা বদ্ধিত হইয়া থাকে ।

থৈয়ের গুঁড়া পথ্য দিতে হইলে জলের সহিত চটকাইয়া, মাখনের মত করিয়া, দেওয়া উচিত । থৈয়ের পিণ্ড কঠিন হইলে তাহা গুরুপাক হইয়া থাকে । এইজন্ত চাটিয়া থাইবার মত কোমল করিয়া পথ্য দেওয়া উচিত ।

ছানার জল (whey) অতিসার রোগে একটা উৎকৃষ্ট পথ্য । গরম ছুখে লেবুর রস দিলে ছানা কাটিয়া যায় । উহা কাপড়ে ছাঁকিয়া ঈষদ্বীলবর্ণ যে জলীয়াংশ পাওয়া যায়, তাহার সহিত একটু লবণ ও আবশ্যক মত লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পথ্য দেওয়া উচিত ।

অতিসারের প্রথম অবস্থায় দাড়িমের রস, পেয়া ও ছানার জলই একমাত্র সুপথ্য । দুই তিন দিন এই পথ্য সেবন করিয়া রোগের প্রাবল্য হ্রাস হইলে; মসুর দালের ঘুস বা ঝোল, মাছের ঝোল,—পথ্য দেওয়া যাইতে পারে । মাছের ঝোলের সহিত কচি কাঁচকলা ভিন্ন অল্প তরকারী না দিয়া এবং তৈল-দ্রব্যাদি না দিয়া প্রস্তুত করা উচিত । মাছ না ভাজিয়া কাঁচা মাছের ঝোল করা ভাল । মাছের ঝোল প্রস্তুত হইলে, মাছ এবং কাঁচকলা—ঝোলের সহিত চটকাইয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া, পথ্য দিতে হয় । ঝোলও কাপড়ে ছাঁকিয়া দিতে হয় ।

অতিসার রোগে ঔষধ অপেক্ষা পথ্য সম্বন্ধে সতর্কতাই বিশেষ আবশ্যক । কারণ পথ্য

সম্বন্ধে সামান্য দোষ ঘটিলে রোগ বৃদ্ধি পায় এবং কোন ঔষধেই তাহা নিবারণ করা যায় না। এক্ষণে অতিসার রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে।

অতিসার রোগের প্রথম অবস্থায় আমের প্রাবল্য থাকে, এজন্য উহাকে আমাতিসার বলা যায়। আম-মল গুরু বলিয়া জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় এবং পক মল জলে ভাসিয়া থাকে। কিন্তু মল অত্যন্ত তরল, কঠিন, বা স্লেম্ম সংস্পর্শ জনিত শৈত্য গুণ বিশিষ্ট হইলে উক্ত পরীক্ষার বাতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কারণ আম-মল অত্যন্ত তরল হইলে লঘুত্ববশতঃ জলে ভাসিতে পারে। আবার কঠিন মল-পক হইলেও গুরুত্ব বশতঃ ডুবিয়া যাইতে পারে। স্লেম্ম-সংস্পর্শে শীতল ও গুরু হইলেও পক মল ডুবিয়া যায়। এইজন্য কেবল মল পরীক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া অন্ত্র পরীক্ষা দ্বারাও আমাবস্থা ও পক-বস্থা স্থির করিতে হয়। কারণ অতিসারের আম ও পকাবস্থা অল্পসারে চিকিৎসার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

অতিসারের আমাবস্থায় মলে ভূর্গন্ধ থাকে, পেট গুড়-গুড় করিয়া ডাকে, ভার হইয়া থাকে, পেটে যন্ত্রণা হয় এবং অল্প অল্প করিয়া বারংবার মল নির্গত হয়। ইহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ মলে ভূর্গন্ধ না থাকিলে, পেট না ডাকিলে, ভার না থাকিলে, যন্ত্রণা না হইলে এবং অল্প অল্প মল বারংবার নিঃসৃত হওয়া বন্ধ হইয়া বিলম্বে অধিক মল নির্গত হইতে থাকিলে—অতিসারের পকাবস্থা বুঝিতে হইবে।

আমাতিসারে সঙ্কোচক (ধারক ঔষধ) প্রয়োগ করা কদাচ উচিত নহে। মস্তুর দালের ঘূষ এবং ঘোল—ধারক বলিয়া পথা-

প্রসঙ্গে আমাতিসারে—প্রথমে উহাদের প্রয়োগ নিষেধ করা হইয়াছে। আমাতিসারের প্রথম অবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে দোষ সকল বৃদ্ধি হইয়া শোথ, পাণ্ডু প্রীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, জ্বর, দগু ক ও অলসক (বিস্ফটিকা, ভেদ) পেটফোলা, গ্রহণী, অর্শ প্রভৃতি বহুরোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং অতিসারের আমাবস্থায় পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মলভেদ বন্ধ করা অত্যন্ত অজ্ঞায়। কিন্তু বহু দোষের অতি নিঃসরণ হেতু রোগী বধূ ও বল ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, আমাবস্থাতেও ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মলভেদ বন্ধ করা উচিত। কেন না, এক্রূপ ক্ষেত্রে ধারক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া পাচক ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করিলে রোগী ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। কিন্তু এক্রূপ স্থলে যে মলরোধক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

অজীর্ণ আহার কর্তৃক দোষ সকল বৃদ্ধিত হইয়া যাহাকে অতিসার রোগ উৎপন্ন করে অথবা বাহার অল্প অল্প মল পেট-বেদনার সহিত নির্গত হয়,—তাহাকে হরীতকী এবং পিপ্পল বাটিয়া গরম জলের সহিত খাওয়াইয়া বিরেচন করাইবে। অল্প অল্প করিয়া মল বারংবার যন্ত্রণার সহিত নির্গত হইতে থাকিলে বিরেচন-প্রয়োগ যে কিরূপ সূচিকিৎসা—তাহা যে সকল চিকিৎসক এক্রূপ ক্ষেত্রে বিরেচন-প্রয়োগ করিয়াছেন। ঔষধরাই ইহার গুণ সম্যক অবগত আছেন। ইহাতে বারংবার অল্প অল্প করিয়া ৫৭ দিনে দুইশত বারে যে মল ও দোষ নির্গত হইত, বিরেচনের সাহায্যে একদিনে ৫৭১০ বারে সেই মল নির্গত হইয়া যাইল। অতিসার রোগের মল

শূন্য—বিরেচন-প্রয়োগের ফলে, বিরেচন আরম্ভ হইবার আশ্রয় মধ্যে অবস্থা ভেদে ষোল আনা—বার আনা—অন্ততঃ পক্ষে অধিক কমিয়া যায় ।

আবার একপ ক্ষেত্রে বিরেচন-প্রয়োগ না করিলে রোগীর দীর্ঘকাল ভোগ এবং কষ্টের একশেষ তো হয়ই, তাহার উপর ধারক ঔষধ-প্রয়োগের ফলে যথেষ্ট দোষ শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া যায় এবং তজ্জন্ত রোগী সুদীর্ঘ কাল ভুগিয়া কখন বা পরিত্রাণ পায়, কখন বা পায় না,—বহু স্থলে এরূপ ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি । অতিসার রোগে যাহারা ভুগিতেছে—এরূপ অনেক রোগীকে বিরেচন-প্রয়োগ করিয়া আমরা বিশেষ উপকার দেখাইয়াছি । একবার আমাশয় রোগে একটা বালক দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া নিতান্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে । কলিকাতার একজন সুপ্রসিদ্ধ এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার শেষ কালে তাহাকে দেখিয়া বলেন যে, ইহাব অল্প কোন উপায় নাই,—ক্যান্সার অয়েলের জ্বালাপ দিতে হইবে । ইহাতে যদি রোগ সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলে ভাল হইবে । সুবিজ্ঞ ডাক্তারের উপদেশ মত রোগীকে জ্বালাপ দেওয়া হইল এবং তাহাতেই সে আরোগ্য লাভ করিল ।

জ্বালাপ নানা প্রকারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা শাস্ত্রোক্ত হরীতকী এবং পিপ্পল প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছি বলিয়া উহারই প্রয়োগ-বিধি লিখিত হইতেছে । সাধারণতঃ হরীতকী আধ তোলা এবং পিপ্পল দুই আনা একত্রে বাটয়া গরম জল সহ প্রাতঃকালে খাইতে হয় । বলবান্ বা বৃহৎ কায় ব্যক্তির পক্ষে বার আনা বা একতোলা হরীতকী এবং তিন আনা বা এক সিকি পিপ্পল প্রযুক্ত হইতে পারে । আবার দুর্বল এবং অল্প বয়স্ক বালকের পক্ষে বয়স-ভেদে মাত্রার কম প্রয়োগ করা কর্তব্য । ঔষধ সেবন করিয়া ঠাণ্ডা বা হাওয়া না লাগান এবং গরমে থাকা দরকার । ইহাতে দেড় বা দুই ঘণ্টার মধ্যে বিরেচন আরম্ভ হয় । বিরেচন হইতে বিলম্ব হইলে, দুই একবার গরমজল তিন ছটাক-এক পোয়া করিয়া খাওয়া উচিত । বিরেচন আরম্ভ হইলে দুই একবার গরম জল খাইলে সম্যক বিরেচন হইয়া থাকে । বিরেচনের পর ক্ষুধার উদ্বেক হইলে, বিকালে জল-বাণি লেবুর রস মিলিত করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে ।

( আগামী বারে সমাপ্য । )

## কালাজ্বর ।

আজকাল কলিকাতা সহরে এবং নকস্বলের স্থানে স্থানেও কালাজ্বর নামক এক প্রকার জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে । বহুপ্রকার ঔষধ সেবন

করাইয়াও এ রোগে সুফল না পাইয়া ডাক্তারগণ এ রোগকে এক প্রকার অসামান্য রোগ বলেন । তজ্জন্ত আজকাল ডাক্তার মহলে এই জ্বর লইয়া বিশেষ আশঙ্কাজনক

চলিতেছে। সম্প্রতি ইতালির আবিষ্কৃত Intervenus injection of choridal antimony-প্রচার কল্পে যথেষ্ট চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু ইহার সফলতা আজও নিশ্চিত হয় নাই; বিশেষতঃ anti-mony's chloride ঘটিত কোন প্রস্তুতি-সম্ভব কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে। আশা করি অনুসন্ধানকারিগণ এ বিষয়ে সমস্ত কৃতকার্য হইবেন।

কালাজর বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা যে আমাদের দেশে একটা নূতন ব্যাপার তাহা নহে। মহর্ষি চরকের আমলেও যে এ রোগ ছিল—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ডাক্তারি মতে ম্যালেরিয়ার সমলক্ষণাবিত—বিশেষতঃ প্রীহাযুক্ত এবং কুইনাইন দ্বারা অপ্রতিক্রিয় বিশিষ্ট জরকে কালাজর বলে। কালাজরে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সেই সেই লক্ষণ দেখিলে স্পষ্টই জানা যায়, যে ইহা আয়ুর্বেদের জীর্ণ জরের অন্ততম। আয়ুর্বেদে জীর্ণ জরের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ত্রিসপ্তাহ ব্যতীতস্ত জরো যন্তরুতাং গতঃ। প্রীহাঘ্নিসাদং কুরুতে সজীর্ণ জর উচ্যতে ॥ অর্থাৎ যে জর তিন সপ্তাহ ভোগের পর তরুতা প্রাপ্ত হইয়া প্রীহা ও ঘ্নিসাদ উৎপাদন করে, তাহাকে জীর্ণ জর বলা হয়। স্তবরাং জীর্ণ জরে প্রীহা থাকা অবশ্যম্ভাবী। মরুৎ আদি স্থল বিশেষে থাকে এবং স্থল বিশেষে থাকেনা। জীর্ণজর সমস্ত, সতত, অন্তেহ্রা, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক ভেদে পাঁচ প্রকার। ইহার মধ্যে সমস্ত জর অবিচ্ছেদী অর্থাৎ ইহার বিরাম হয় না, সামান্ত কমে, তাহার উপর আবার জর আসে। ইহাকে ডাক্তারগণ Malarial Remittent fever কহেন। সতত জর

দিবসে ২বার বেগ করিয়া আসে। ইহার ডাক্তারি নাম Double quotidian fever. সাধারণে ইহাকে দৈকালীন জর কহে। যে জর প্রত্যাহ ছাড়িয়া এবং প্রত্যাহই আসে, তাহার নাম অন্তেহ্রা জর। ইহার ইংরেজী নাম quotidian fever। একদিন অন্তর যে জর আসে, তাহার নাম তৃতীয়ক জর। ইংরেজী নাম tertian fever। দুই দিন অন্তর যে জর আসে—তাহার নাম চাতুর্থক জর, ইংরেজীতে ইহাকে quartan fever বলে। বিপদায় ভেদে আর এক প্রকার চাতুর্থক জর আছে—যাহাতে দুইদিন জর থাকে এবং এক দিন জর থাকে না।

আজকাল যে জরকে ম্যালেরিয়া জর বলে। হয়, তাহা উক্ত পাঁচ প্রকারেরই দেখা যায়। কালাজর বলিলে যে জরকে বুঝায়—তাহা সততক জর। ম্যালেরিয়ার অমোঘ ব্রহ্মা কুইনাইন, কালাজর কুইনাইনে আরোগ্য হয় না। ম্যালেরিয়া জরের রোগ-বীজাণু এবং কালাজরের রোগ-বীজাণু এক নহে, এই ভুল পাশ্চাত্য মতে উভয়ের পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। ম্যালেরিয়াই হউক আর কালাজরই হউক—উভয় প্রকার জরই জীর্ণ জরের অন্তর্ভুক্ত।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলেন, যে কোন শরীর রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে অহিত আহার-বিহারাদি দ্বারা শরীরস্থ বায়ু-পিত্ত এবং কফ নামক দোষত্রয়ের পৃথক অথবা মিলিতভাবে প্রকোপ থাকা আবশ্যক। দোষ প্রকোপই সর্বরোগ উৎপত্তির হেতু।

“সর্কেষামেব রোগানাং নিদানং কুপিতামলাঃ। তৎপ্রকোপস্তু শ্রোতং বিবিধাহিত সেবনম্ ॥”  
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন যে, শরীর অসুস্থ হইলে, রোগ-বীজাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ

করিয়া বংশ বিস্তার পূর্বক লক্ষবল হইয়া বিশিষ্ট রোগ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। কারণ জীবদেহে সর্বদাই নানাপ্রকারে নানারূপ রোগের বীজাণু প্রবেশ করে, কিন্তু শরীর সুস্থ থাকিলে, পালনী শক্তির প্রভাবে—হয় তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—না হয় কার্য্যকরণে অসমর্থ হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দোষ প্রকোপের পর শরীরের এমন একটি অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন বিশেষ এক জাতীয় রোগ-বীজাণু শরীরের ভিতর পুষ্ট হইয়া বিশেষ এক প্রকার রোগ উৎপাদন করে। বাহ্য জগতের যে অবস্থায় যে প্রকার রোগ-বীজাণু লক্ষবল এবং বংশ বিস্তারে সমর্থ হয়, শরীরের ভিতরের অঙ্গাঙ্গ দোষ প্রকোপ জন্ম দিক সেইরূপ হইলে সেই প্রকার বীজাণু শরীরের ভিতর লক্ষবল এবং বংশ বিস্তারে সমর্থ হয়। আয়ুর্বেদ মতে বর্ণিত হইলে—এই প্রকার বলা যায় যে, প্রকৃপিত দোষ যখন ব্যাপারশীল হইয়া রোগ উৎপাদনের আয়োজন করে, তখন শরীর—বাহ্য জগতের যে অবস্থায় যে বীজাণু লক্ষবল এবং বংশ বিস্তারে সমর্থ হয় তদবস্থা প্রাপ্ত হয়, ফলে তজ্জাতীয় বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া লক্ষবল এবং বংশ বিস্তারে সমর্থ হয়। বাহিরের জীব-ভিতরে থাকিয়া নানাপ্রকার উৎপাদন করে। বস্তুতঃ তাহারা রোগ উৎপাদন করে না। রোগীর যন্ত্রণা বাড়াইয়া দেয় মাত্র। বীজাণুর পুষ্টিলাভ এবং বংশ বিস্তার—রোগের হেতু নহে, উহা প্রকৃপিত দোষের কার্য্য।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে বীজাণু ধ্বংস করিতে পারিলে রোগ আরোগ্য হয়। আয়ুর্বেদ বলেন, কারণ-ভূত-প্রকৃপিত-দোষ প্রকৃতিস্থ না হইলে কার্য্য-ভূত-ব্যাধি নিবৃত্ত

হয় না অর্থাৎ কারণভূত প্রকৃপিত দোষকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলে কার্য্যভূত ব্যাধি দূর হয়।

এতৎ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বোধ হয় আবাস্তর হইবে না,—জীবদেহে এমন একটা শক্তি আছে—যাহা জীবকে সর্বদা নীরোগ রাখিতে চেষ্টা করে এই শক্তির প্রাচ্যনাম বৈষ্ণবী শক্তি বা পালনী শক্তি। অহিত আহাৰাদি দ্বারা দোষ-প্রকোপ উপস্থিত হইলে, এই শক্তি সেই প্রকৃপিত দোষকে দূর করিবার জন্ত প্রবলা হইয়া উঠে। প্রকৃপিত দোষ এবং পালনী-শক্তির সংঘর্ষে শরীরে যে সমস্ত পীড়া দায়ক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই রোগ বলা হয়। শক্তি—দোষাপেক্ষা প্রবলতর থাকিলে, বিনা চিকিৎসাতেই রোগী আরোগ্যলাভ করিতে পারে, কিন্তু দোষ প্রবলতর থাকিলে দোষ-প্রত্যানীক-ঔষধ-পথ্যাদির প্রয়োগ করিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। দোষ যদি অধিকতর প্রবল হয় এবং শক্তি যদি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া আসে, তবে চিকিৎসায় কোনই ফল ফলেনা।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে জ্বর দিবসে দুইবার করিয়া আসে এবং যাহার সহিত মীহা থাকে, তাহাকে কালাজ্বর বলে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যে জরকে সতত জ্বর কহে, তাহাও দিবসে দুইবার করিয়া আসে। “অহোরাত্রে সততকো দ্বৌকালাবম্ববর্ততে।” ইহা এক প্রকার জীর্ণজ্বর, স্ততরাং ইহার সহিত মীহাও থাকে।

রক্তধাত্বাশ্রয়ঃ প্রায়োদোষঃ সততকং জ্বরম্।

স প্রত্যানীকং কুরুতে কাল বৃদ্ধি ক্ষয়াক্ষয়ঃ ॥

চরক চিঃ স্থান, ৩য় অধ্যায়।

অর্থাৎ দোষ প্রায় রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া

সততজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর প্রতীকার্য্য। যে দোষ ইহাকে উৎপাদন করে, কালে তাহার বৃদ্ধি এবং কালে তাহার ক্ষয় হয়। এখানে বলা হইয়াছে যে, দোষ 'প্রায়' রক্তধাতুকে আশ্রয় করে; এই 'প্রায়' কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—দৈবকালীন জ্বর বা Double Quotidian fever Remittent, Typhoid জ্বরেও দেখা যায়, কিন্তু যেখানে দোষ—রক্তধাতুকে আশ্রয় করে না, তাহাকে কালাজ্বরও বলা হয় না।

রক্তধাতুপ্রায়ীদোষ কর্তৃক উৎপন্ন যে সতত জ্বর তাহা সাধারণতঃ দুই প্রকারের দেখা যায়। প্রথম অরোৎসৃষ্ট ব্যক্তির অর্থাৎ যাহাদিগের কোন প্রকারের জ্বর কেবল মাত্র সারিয়াছে, দোষশেষ অহিত আহার-বিহারাদির দ্বারা লব্ধ বল হইয়া রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সতত জ্বর উৎপাদন করে। দ্বিতীয়—আরম্ভ কালেই প্রকুপিত দোষ রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সতত জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরের বেগ যে কখন হইবে—তাহার নিশ্চয়তা থাকে না। দিবা-রাত্রের মধ্যে দুইবার বেগ হয়। সচরাচর দিবসে একবার এবং রাত্রিতে একবার—এই দুইবার বেগ হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহারও কোন স্থিরতা নাই। দিবসেই দুইবার বা রাত্রেই দুইবার জ্বর আসিতেও পারে। দিবা ভাগে যে সময়ে জ্বর আসে, রাত্রিতেও ঠিক সেই সময় জ্বর আসিতেও দেখা গিয়াছে। জ্বর আসিবার কালে হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া শীত করিয়া জ্বর আসে, কখনও বা শীত মোটেই অনুভূত হয় না। যেখানে শীত করিয়া জ্বর আসে, সেস্থলে শীত দূর হইলে দাহ, পিপাসা এবং সন্তাপাধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রীহা এই রোগের সছত্র। প্রীহারোগেও রক্তদৃষ্টি থাকে। সুতরাং সতত জ্বরগ্রস্ত

রোগীর রক্তের অবস্থা বড়ই খারাপ হয়। প্রীহারোগ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে।

বিদাহভিষান্দিতস্তজজ্ঞো:

প্রচুটমত্যাগমসৃক্ কফশ্চ।

প্রীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধো-

প্রীহাখণ্ডেতজ্জঠরং বদন্তি ॥

তদ্ব্যমপার্শ্বেপরিবৃদ্ধিমতি

বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোহজ।

মনজরাধিঃ কফপিভলিঙ্গো:

রূপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোহতি পাণ্ডুঃ ॥

অর্থাৎ বিদাহী ও কফ জনক দ্রব্য ভোজনরত-  
ব্যক্তির রক্ত ও কফ প্রচুট হইয়া প্রীহার বৃদ্ধি  
সাধন করে। ইহার নাম প্রীহাখণ্ডরোগ।  
প্রীহা—উদরের বাম পার্শ্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।  
ইহাতে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন, মনজ্বর, অধি-  
শক্তি হীন, কফ-পিত্তজ উপদ্রবে উপদ্রুত,  
ক্ষীণবল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়।

কোন কোন স্থলে যকৃতের বৃদ্ধি এবং  
যকৃতে বেদনা দেখা যায়।। কাসিও যকৃৎ  
বিশেষে দেখা যায় এবং তাহার ফলে কখন  
কখন ক্ষয়রোগ আসিতে দেখা গিয়াছে। এই  
জ্বরে অরজ্ঞ এবং প্রীহার জ্ঞ জ্বরের বিশেষ  
দৃষ্টি হয় বলিয়া রোগীর গায়ে চুলকনা, খোস-  
পাঁচড়া দেখা দেয়। দন্তবেষ্ট (মাড়ি) ফুলিয়া  
উঠে, বেদনা ও শূল যুক্ত হয়। মুখের মধ্যেও  
স্থানে স্থানে ক্ষত প্রকাশ পায় এবং নাকদিয়া  
ন্যূনাধিক পরিমাণে রক্ত-নির্গত হয়। ক্রমশঃ  
প্রীহা-যকৃতের আকার বাড়িতে থাকে, ক্রমে  
শক্ত হইয়া উঠে। পাদশোথ, মুখশোথ বা  
সর্বাস্থান শোথ প্রকাশ পায় এবং উদরার  
প্রভৃতি উপদ্রব সর্বশেষে আসিয়া উপস্থিত হয়।  
গুর্কেই বলা হইয়াছে যে, প্রীহারোগে



চিকিৎসায় এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, এলোপ্যাথি মতে এরোগ বিশিষ্ট-বীজাণু কর্তৃক উৎপন্ন। বীজাণু-ধ্বংস হইলে রোগ মারিয়া যাইবে—এই সিদ্ধান্তে তাঁহারা চিকিৎসা করেন। যে দ্রব্যে বীজাণু ধ্বংস হয়, সেই দ্রব্য শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে বীজাণুর কারণভূত প্রকৃতিত দোষকেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে—সেই জন্য বীজাণুপ্রতানীক-চিকিৎসায় অনেক রোগ মারিতে দেখা যায়। কিন্তু কালাজ্বরে রক্তের অবস্থা মতান্তর থাকায় হয় বলিয়া বীজাণু ধ্বংস করিতে পারিলেও রোগীর উপদ্রবের কিয়ৎ-পরিমাণে শান্তি ভিন্ন আর কিছুই হয় না। কারণ দোষ প্রকৃতিস্থ না হইলে বীজাণু পুনঃ পুনঃ পুষ্টিলাভ করিতে পারে।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা দোষ-প্রতানীক। এই চিকিৎসায় প্রকৃতিত দোষ প্রকৃতিস্থ হয়, তাহার ফলে বীজাণু—শরীরের যে অবস্থায় পুষ্ট হয়, সেই অবস্থা দূর হয় বলিয়া তাহারা আর বাচিতে পারে না এবং দোষ প্রকৃতিস্থ হইলে তাহার প্রকোপ জন্ত উৎপন্ন যে রোগ—“কারণ ধ্বংসে কার্য্য ধ্বংস” এই নিয়মে দূরীভূত হয়।

রোগমাত্রেরই সাধ্যসাধ্য ভেদে দুই প্রকার ; ইতরাং কালাজ্বরের ভিতরও সাধ্যসাধ্যভেদ আছে। অসাধ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্বে

দোষ-প্রতানীক-চিকিৎসা করিলে রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। কিন্তু অসাধ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কোন চিকিৎসায় সফল পাওয়া যায় না।

আমরা অবগত হইয়াছি,—অনেক কালোজ্বরাক্রান্ত রোগী,—যাহারা অল্পরূপ চিকিৎসায় কোন ফলই পান নাই, আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু হইলে কি হইবে ?—আজকাল দেশের লোকের রুচি ভিন্ন প্রকারের। যতক্ষণ অর্থ ও সামর্থ্যে কুলায়, ততক্ষণ কেহই আয়ুর্বেদ-মতে চিকিৎসিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না। যখন রোগের প্রতীকার হইবার কোন উপায় থাকে না, তখন কবিরাজের কাছে রোগী আসে। দেশের লোকের বুঝা উচিত,—যে আয়ুর্বেদ এই দেশেরই চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং ইহার ঔষধাদি—এদেশীয় উপাদানে প্রস্তুত। আমাদের জন্ম এই দেশে এবং রোগও এই দেশের, সুতরাং ঔষধ যে ভিন্ন দেশে প্রস্তুত হইবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত। আমাদের উক্ত প্রধান দেশের রোগে আমাদের ঔষধ—পশ্চাই যে বেগী উপকারী, সে সম্বন্ধে সন্দেহান হইবার কোন কারণই তো নাই।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ।

## বন্ধ্যার পুত্রলাভ ।

— ১০১ —

[ সত্যযটনাবলক গল্প ]

( ১ )

বিয়ের ক'নে সুধাকে যখন মানাক্ষণ লাভ-পাকী হইতে ? নাশান হইল, তখন তাহার কোলাহলের মধ্য হইতে বরণ করিয়া লয়।

ভাগ্য—৩

প্রলোভনে ছেলের বিয়ে দিয়া—তাহার স্বামী যে এমন চাঁদপানা বউ ঘরে আনিতে পারিবেন,—ইহা তিনি আগে ভাবিতেই পারেন নাই,—তাই তাহার আনন্দ—হাসিতে যেন ফুটিতে লাগিল। স্বধার স্বাণ্ডী হাসিমুখে স্বধাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। স্বধা যে একটি পরমা সুন্দরী নারী—রক্ত-বিশেষ—গ্রামের মধ্যে একরূপ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। দিন কতক এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া নববধূ পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। তাহার পর বর্ষ ঘুরিল, স্বধা স্বামী-ঘর করিতে আসিল। তখন তাহার বয়স তের বৎসর। পতি, মনোমত পত্নী পাইয়া স্বর্গ-সুখ অল্পতব করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া স্বধার প্রথম জীবন কাটিয়া গেল।

কিন্তু মানুষের সুখ বুঝি চিরদিন সমান ভাবে থাকেনা,—পরিবর্তনশীল-জগতে বিধাতার ইহাই অপূর্ণ নিয়ম! যে স্বধা—একদিন স্বগুরু-স্বাণ্ডীয়া শুভ দৃষ্টি লাভ করিয়া ধন্তমণী হইয়াছিল, সে এখন তাঁহাদের উভয়েরই বিষ-নেত্রে পড়িয়াছে। তাহার কারণ, স্বধার এখন বয়স হইয়াছে—বিংশের কাছাকাছি। অথচ এপর্যন্ত সে পুত্রবতী হইল না। স্বধার স্বামীর এজ্ঞ হুংখ বা ক্ষোভ ছিলনা, কিন্তু তাহার স্বগুরু-স্বাণ্ডী ইহার ফলে তাহার উপর বিষম চটিয়া গেলেন, তাহারাই স্থির করিলেন,—আবার ছেলের বিবাহ দিবেন। নানা স্থানে এজ্ঞ পাত্রী-অঙ্গুসন্ধানও চলিতে লাগিল।

স্বধার স্বামীর কিন্তু এ সকল ভাল লাগিল না, কিন্তু পিতৃ-মাতৃভক্ত পুত্র প্রকাশ্য ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া, বাহাতে স্বধা পুত্রবতী হইতে পারে—তাহার জন্ত—কত

সাধু-সন্ন্যাসী—কত অতিথি-করির,—কত লোকের শরণাপন্ন হইল,—কত লোকে কত বুজুর্গী করিয়া—কত ঔষধ বলিয়া দিয়া, কত পরসা লইল,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা,—এমনি করিয়া কত দিন কাটিয়া গেল।

এ দিকে স্বধার স্বগুরুর এক পাত্রী স্থির করিয়া ফেলিলেন। এ পাত্রী—স্বধার মত সুন্দরী নহে,—স্বধার বর্ণ—ফুটন্ত জোৎস্নার মত,—ইহার বর্ণ উজ্জল শ্যাম। ছেলের পছন্দ হইবে কিনা—তাহা লইয়া প্রথমতঃ তাহার একটু চিন্তা হইল, কিন্তু শেষে ভাবিলেন, বয়স মেয়ে—চৌদ্দবৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, স্তবরাং ছেলে—যুবতী পত্নী পাইয়া তুলিয়া যাইবে। ফলে সম্বন্ধটা একরূপ পাকা পাকিই হইল, তবে সংপ্রতি পাত্রীর মাতা পরলোক গমন করায় আর একবৎসর গত করিয়া—কালার্শৌচ অন্তে বিবাহ হইবে স্থির হইল।

স্বধার স্বামী—স্বধাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। পিতা তাহার ভবিষ্যৎ সুখের জন্ত এতটা চেষ্টা করিতেছেন, তাহার কিন্তু ইহা বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। একদিন শারদীয়-জ্যোৎস্নায়,—চন্দ্রালোকে স্বধার স্বামী ও স্বধা দ্বিতলের ছাদের উপর বসিয়া এই বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতেছিল। স্বধা বলিল,—“তুমি বাহাতে সুখী হও, আমি তাহাতেই সুখী, তুমি বিবাহ কর, আমি তাহাতে সুখী হইব।”

স্বধার স্বামী বলিলেন,—“আমি ইহাতে সুখী—তা’ তোমাকে কে বলিল স্বধা! পিতা-মাতা একরূপ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইহার সহিত আমার যে জীবন-মরণ-সম্বন্ধ নির্ভর করিয়াছে, তা’রা তা’ বুঝিতেছেন না—ইহা আমার

বিবাহ করিয়া সুখী হইব না সুখা । পিতা-  
মাতা যদি আমার পুনরায় বিবাহ দেন, তাহা  
হইলে আমি মরিয়া যাইব ।”

সুখা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল । তাহার  
পব কণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—  
“আমার একটা কথা শুনিবে?”

সুখার বামী বলিলেন,—বলনা !

সুখা বলিল—“দেখ আমার বাপের বাড়ীর  
দেখে একটা দ্রীলোক আছেন, তিনি অনেককে  
অনেক রকম ঔষধ দেন, অনেক লোক তাঁর  
চিকিৎসার সারিয়াছে । বাবা আর মাকে  
ব’লে, আমাদের দিন কতক বাপের বাড়ী  
গঠিয়ে দাও—পাঠিয়ে দেবে কেন?—তুমিও  
দিন কতক চল । তাঁর সঙ্গে দেখা ক’রে,  
তিনি কি বলেন—শোনা যাক্, তা’র পর ভগ-  
বানের দা’ ইচ্ছা—তা’ তো হ’বেই ।”

এই পরামর্শই সাব্যস্ত হইল । সুখার শ্বশুর-  
শাশুড়ী স্বধাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে রাজি  
হইলেন, কিন্তু ছেলে সঙ্গে যায়—এ ইচ্ছা  
উভাদের বড় একটা ছিল না । বাহা হউক  
স্বধাকে বাথিয়া সে চলিয়া আসিবে, এইরূপ  
সাব্যস্ত করিয়া, সুধাকে পিত্রালয়ে পাঠান  
হইল ।

সুখা চলিয়া গাইলে পর, তাহার শ্বশুর,—  
গৃহীণিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—“মন হ’ল  
না, ছেনেটা বউমার কাছ থেকে যত তফাৎ  
থাকে—ততই ভাল, ওর মনটা বদলানর এ  
একটা সুযোগ ।

(২)

হ’পর বেলা রান্না ঘরে বসিয়া ডালের  
হাঁড়িতে আমি কাঠি দিওঁছি—এমন সময়  
‘কেমন আছ’ বলিয়া সুখা রান্নাঘরে প্রবেশ  
করিল । আমি অনেক কাল তাহাকে দেখি

নাই—তাহার এখন বাপের বাড়ী আসারও  
কোন কথা শুনি নাই,—তাহাকে দেখিয়া  
একটু চমকিয়া উঠিলাম । তাহার পর বলি-  
লাম,—ভাল আছি,—তুই কথন এলি,—বস ।

রান্নাঘরের সানের উপরে শুধু আসনে সুখা  
বসিয়া পড়িল । বসিয়া আমার ছেলে-মেয়েদের  
কথা জিজ্ঞাসা করিল । আমি বলিলাম—এই  
তো খেলা করিতেছিল, বোধ হয় রায়েদের  
বাড়ী থেকে বিন্দী আর ভবি এসেছিল—  
তা’দের সঙ্গে খেলা ক’রতে ক’রতে তা’দের  
বাড়ী চ’লে গিয়েছে ।”

সুখার হাতে এক ঠোঙ্গা খাবার ছিল । সে  
উঠিয়া কুলুঙ্গি হইতে একখানি থালা লইয়া,  
ঠোঙ্গা হইতে খাবারগুলি তাহাতে ঢালিয়া  
আবার কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিল । তাহার  
পর বলিল—“খোকা-থুকীকে এইগুলি দিও ।”

আমি বলিলাম—“খোকা-থুকীর জন্ত তো  
খাবার এনেছি। আর তা’দের মায়ের জন্ত  
কি এনেছি।”

সুখা হাসিল । হাসিয়া বলিল—“তোমার  
জন্তও এনেছি দিদি ! তোমার জন্ত ভাল গন্ধ-  
ওয়ালা তেল এনেছি । আজ বিকালে এসে  
সেই তেল দিয়ে—তোমার চুল বেঁধে দেব  
এখন ।”

আমি বলিলাম—“আমার যে আর গন্ধ-  
ওয়ালা তেল মাথবার বয়স নেই । যাক্—ভা’  
তুই আছিস্ ভাল তো? একলা এইছিস্—  
না জোড়ে এইছিস্ ।”

সুখা বলিল—“গুঁরাও এয়েছেন, কিন্তু হ’  
জনের কেহই ভাল নেই ।”

আমি বলিলাম—“কেন?”

সুখা সমস্ত ঘটনা আন্তরিক বিবৃত করিল ।

পিসীমা এতক্ষণ পুত্রার ব্যস্ত ছিলেন।

তিনি পূজা শেষ করিয়া এই সময় রান্নাঘরে আসিলেন। স্নাধা তাঁহাকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। আমি বলিলাম—“পিসীমা, অনেক দিন রোগী পাওনি, আজ এই রোগীট জুটিয়াছে।”

পিসীমা কি অসুখ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত বলিলাম।

পিসীমা বলিলেন,—“আহা লোকনাথ বন্ধি যে ম’রে গেল, তা’র হাতে এ রকম কত বন্ধা জ্বরই যে ছেলে হ’তে দেখেছি, তা’ ব’লতে পারি না। ‘ফলকল্যাণ’ নামে একটা বিধাওয়াইয়া তিনি কত বন্ধাকেই যে পুজুবতী করেছেন তা’র ঠিক নাই। তোমার স্বামীকে কোন একটা ভাল ক’বরজের কাছ থেকে সেই ফলকল্যাণ বিটা তৈয়ার ক’রে নিতে বল, আমার খুব মনে হয়—তাই খেলে তোমার বন্ধ্যাক্ষ দোষ কেটে যাবে।”

আমি বলিলাম—“সে তো তৈরি ক’রতে দেয়ী হ’বে পিসীমা,—এদিকে যে সতীন ঘটবার আর এক বছর মাত্র সময়।”

পিসীমা বলিলেন,—ই্যা সে বি তৈরি ক’রতে একটু সময় লাগবে। এক বর্ণা জীবিত বৎসা গরুর ছদ দিয়ে সে ওষুধ তৈরি ক’রতে হয়। তা’ কোন ভাল ক’বরজের কাছে তৈরিও থাকতে পারে।

আমি বলিলাম—“এর কোন মুষ্টিযোগ খাটোঁকা নেই?”

পিসীমা বলিলেন,—“আছে, কিন্তু বাঁজা কে—সেটা বোঝা বড় শক্ত। বাঁজা মেয়ে মানুষও হ’তে পারে—আবার অনেক পুরুষও বাঁজা থাকে। যদি পুরুষ মানুষ বাঁজা হয়,—তা’ হ’লে মেয়েমানুষকে ওষুধ খাইয়ে কি হবে?”

আমি বলিলাম—“হ’জনকেই খাওয়ালে হয় না?”

পিসীমা বলিলেন—“তা’ হয়। আজ আমি গোটাকতক মুষ্টিযোগ ব’লে দিই, এইটা দিন কতক স্নাধা ক’রে দেখুক, আর ‘ফলকল্যাণ’ বিটাও এর মধ্যে কোন ক’বরজের ঘারা তৈরি ক’রে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।”

আমি বলিলাম—“সেই বেশ।”

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—“মাসিক ঋতুটা ঠিক হয়?”

স্নাধা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—ঠিক হয়।

তা’রপর পিসীমা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—“আর কোন অসুখ আছে ব’লে মনে হয়?”

স্নাধা বলিল—“না।”

পিসীমা বলিলেন—“দেখ এক কাজ ক’রতে হ’বে—অশ্বগন্ধা মূল-২ তোলা, জল এক সের এবং দুধ এক পোয়া—এক সঙ্গে সিদ্ধ ক’রে, এক পোয়া থাকতে নামিয়ে, তা’র সঙ্গে আধতোলা গাওয়া বি মিশিয়ে ঋতু মানের পর পান ক’রতে হবে। এটা লোকনাথ বন্ধির একটা বড় মুষ্টিযোগ ছিল—এতে অনেকেই ফল পেয়েছে। আরও একটা ব্যবস্থা ব’লে দিই—সেটাও ক’রতে হ’বে! ঋতু মানের পর তো যেটা বললাম—সেটা থাকেই, তা’ছাড়া ঋতুর তিন দিন ওলটকম্বলের মূলের চাল ৩৪ রতি, আর গোলমরিচ ৮১০টী—বেশ ক’রে জল দিয়ে বেটে সকাল বেলা খাবে। আমার বোধ হয় ছটো কি তিনটে কুড়ো এই ব্যবস্থা ছ’ট ক’রলে বন্ধি স্নাধা বাঁজা হ’ল, নিশ্চয় সে দোষ কেটে যাবে।

আমি বলিলাম—“আর যদি স্নাধার বাণী বাঁজা হয়?”

পিসীমা বলিলেন—“স্নাধা যদি বাঁজা হয়?”

ঠেরি করার কথা বললাম—তিনি সেটা দিন কতক রোজ খেতে আরম্ভ করুন। যদি তিনি বাজা হন, তা'হলে ওতেই তাঁর বন্ধাত্ব নষ্ট হ'য়ে যাবে।

আমি পুনরপি বলিলাম—“আর কিছু ব্যবস্থা ক'রতে হ'বে না? আর গোটাকতক সুস্থিযোগ বলনা।”

পিসীমা বলিলেন—“এক সঙ্গে তো সব খাওয়ান হয় না? নইলে এর সুস্থিযোগ আমি অনেক রকমই আনি। সে সব কথা তোমার আর একদিন বলব।”

সুধা বলিল—“পিসীমা আমি তোমাকে ধন্যবাদ মনে ক'রে এই ব্যবস্থায় চ'লব—তারপর আমার অদ্ভুত।”

(৩)

পিসীমার ব্যবস্থামতে সুধা, স্বামীকে রোজ অখণ্ডা সিদ্ধ হুগ্গ সেবন করাইতে লাগিল এবং নিজে পিসীমা যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই রূপ দুইটা ঋতুতে অখণ্ডা ও ওলট কদল সেবন করিল।

সুধার স্বামী এ সকল ব্যবস্থার উপরও একজন ভাল কবিরাজের দ্বারা “ফলকল্যাণ যুত” তৈয়ার করাইয়া লইলেন, কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না, কারণ পিসীমার ব্যবস্থায় ২ মাসের পরই সুধার গর্ভ সফল হইয়াছে—প্রকাশ পাইল। ফলে যথা সময়ে

সুধা একটা পুত্র সন্তান প্রসব করিল, সুধার স্বামীর এবং তাহার ঋণ-স্বাণ্ডীর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

এইবার সুধার স্বামীর তাহার পিতার নিকট কথা ফুটিল। তিনি বলিলেন—“বাবা, যে মেয়েটির সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের অবস্থা ভাল নয়—আমাদের কথার উপর তাহার নির্ভর করিয়া আছে, অতএব তাহার জন্ত একটি স্থপাত্রে ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আমাদেরই কর্তব্য।”

সুধার পিতা বলিলেন—“ঠিক।—তা' চেষ্টা করা যাউক।”

সুধার স্বামী বলিলেন—“সে পাত্র আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। আমারই একটা বন্ধু—এবার বি-এস-সি পাস করিয়াছে—কিছু লইবে না, আপনাদের সম্মতি পাইলে আমি তাহার সহিত বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।”

পিতা সম্মতি দিলেন। পুত্র নিজের জন্ত যে পাত্রী স্থির করা হইয়াছিল, তাহার সহিত বন্ধুর বিবাহ দিলেন। সুধা, পিসীমার কৃপায় সপত্নীর ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। এখন সংসারে সুধার সম্মান কত! সে তো এখন আর বন্ধা নহে,—সে যে এখন পুত্রবতী,—জননীপন-বাচ্যা হইয়াছে।

শ্রীমতী কমলাবালা দেবী।

## দিন-চর্যা।

(পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর)

গতবারে যে পরিমিত মাত্রার আহার কবিনাব কথা আমরা বলিয়াছি,—প্রত্যেক

স্বাস্থ্যকারীর পক্ষে তাহা পালন করা কর্তব্য। পরিমিত আহার কবিনাবে পুষ্কাহার

হইলে ভোজন করিবে। পূর্নাহার জীর্ণ না হইতে হইতে ভোজন করিলে পূর্নাহারের অপরিণত রসের সহিত পরবর্তী আহারের রস মিশিত হইয়া—সত্ত্ব দোষ সকলকে কুশিত করে। কিন্তু পূর্নাহার জীর্ণ হওয়ায় পরে যখন দোষ সকল স্বস্থানে অবস্থান করে, অগ্নি উদ্ভিক্ত হয়, ক্ষুধা হয়, শ্রোতঃ মুখ সকল বিবৃত হয়, বিসুদ্ধ উন্মাদ হয়, বায়ুর অমূলোম হয়, বায়ু, মল ও মূত্র নির্গত হয়,—সেই সময়ে আহার করিলে ভুক্তদ্রব্য শরীরের ধাতু সমূহকে দূষিত করে না, পরন্তু আয়ুর্নৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইজন্ত পূর্নাহার জীর্ণ হইলে ভোজন করা উচিত। অবিরুদ্ধ-বীৰ্য্য-খাদ্য আহার করিবে। ইহাতে বিরুদ্ধবীৰ্য্য খাদ্য সেবনজনিত রোগ জন্মিতে পারে না। বিরুদ্ধবীৰ্য্য খাদ্য কি, তাহা পরে বলা যাইবে।

পবিত্র হইয়া, পবিত্র উপকরণ সংযুক্ত আহার করিবে। পবিত্র হইয়া আহার না করিলে, অনভিলম্বিত স্থানে আহার করিলে, তাহাতে অপ্ৰিয় আহার জন্ত মন উপহত হয়।

অতিদ্রুত ভোজন করিবে না। অতিদ্রুত ভোজন করিলে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদগ্রহণও হয় না এবং ভোজ্য পদার্থের দোষ-গুণের উপলব্ধি হয় না, এজন্ত অতিদ্রুত ভোজন করা উচিত নহে।

অতি বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবে না। অতি বিলম্ব করিয়া ভোজন করিলে তৃপ্তি হয় না, অতিরিক্ত ভোজন করা হয় (যেমন নিমন্ত্রণ থাইতে গিয়া অধিক খাওয়া হয়), খাদ্য শীতল হইয়া যায়, ভুক্ত দ্রব্যের বিধম পাক হয় অর্থাৎ কতক খাদ্য পরিপাক হয় এবং আবার কতক খাদ্য নূতন করিয়া আমাশয়ে প্রবেশ করে—এইজন্ত সমস্ত খাদ্য এক সঙ্গে পরিপাক পায় না।

কথা না কহিয়া, না হাসিয়া এবং তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে। অতিক্রান্ত ভোজন করিলে যে দোষ হয়, এই সকল কারণে সেই সকল দোষ ঘটয়া থাকে।

আপনার অবস্থা সম্যক বিবেচনা করিয়া আহার করিলে সেই আহার সাহা অর্থাৎ হিতকর হয়।

এক্ষণে পরিমিত আহার কি তাহা লিখিত হইতেছে।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, উদরের ছই অংশ অন্নের দ্বারা এবং এক অংশ পানীয়ের দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং পানাদির আশ্রয় জন্ত চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিয়া দিবে। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ পেট ভরিয়া আহার করা উচিত নহে। বাল্যকালে বৃদ্ধাদিগের মুখে এ সম্বন্ধে একটা বাক্যলা ছড়া শুনিয়াছিলাম।

“উনভাতে দুনা বল

বিস্তর ভাতে রসাতল ?”

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আহারের মাত্রা অগ্নি-বলের অপেক্ষা করে অর্থাৎ যাহার অগ্নি-বল অধিক, তাহার খাওয়ার মাত্রা অধিক, এবং যাহার অগ্নিবল কম, তাহার খাওয়ার মাত্রা কম হওয়া উচিত। যাহার যেরূপ মাত্রায় আহার করিলে প্রকৃতির (অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য, মল মূত্রাদির প্রবৃত্তি ইত্যাদি) বাধাজন্মেনা, অথচ ভুক্তদ্রব্য যথাকালে বিনাক্রমে জীর্ণ হয়, তাহার পক্ষে তাহাই পরিমিত মাত্রা।

রক্ত শালি ও ঘটিক প্রভৃতির তরুল, মুগের দাল, তিত্তির পক্ষীর মাংস, কুক সার হরিণ, শশক, শরভ ও শবর নামক হরিণের মাংস প্রভৃতি লঘুপাক হইলেও পরিমিত মাত্রায় আহার করা উচিত। আবার পিত্ত ইক্ষু-বিকৃতি (কড়কড়ি) ইত্যাদি

(দধি, ছানা, ক্ষীর) মাংস কলায়, আনুপ  
দেশজাত মাংস, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজ  
মাংস স্বভাবতঃ গুরুপাক হইলেও পরিমিত  
মাত্রায় আহার করা উচিত। গুরু লঘু সকল  
দ্রব্যই মাত্রাপেক্ষী হওয়া উচিত—এইরূপ বলায়  
দ্রব্যের গুরু ও লঘু অকারণ মনে  
করিবে না।

লঘুপাক দ্রব্য সকল বায়ু ও অগ্নিগুণ  
বহল এবং গুরুপাক দ্রব্য সকল ভূমি ও সোম-  
গুণ বহল। এইজন্য লঘুদ্রব্য স্বয়ং অগ্নিকে  
বদ্ধিত কবে বলিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে সেবিত  
হইলেও অন্ন দোষ জন্মায়। আবার গুরুদ্রব্য  
অগ্নি বিপনীত-ধর্মী বলিয়া, অগ্নি বৃদ্ধি করিতে  
পারেনা, সুতরাং অতিরিক্ত মাত্রায় সেবিত  
হইলে অত্যন্ত দোষ জন্মাইয়া থাকে। এইজন্য  
বায়াম দ্বাৰা অগ্নিবল প্রবল না হইলে, গুরু-  
দ্রব্য কখনই অপরিপাক্ত পরিমাণে সেবন করা  
উচিত নহে।

দ্রব্য-বিবেচনায় আহার করিতে হইলে,  
গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধতৃপ্তি বা ত্রিভাগ তৃপ্তি  
পর্যন্ত সেবন করা উচিত। লঘু দ্রব্য তৃপ্তি  
পর্যন্ত ভোজন করা যাইতে পারে, কিন্তু তৃপ্তির  
অতিরিক্ত ভোজন করা উচিত নহে। পরি-  
মিত ভাবে আহার করিলে প্রকৃতি উপহত হয়  
না এবং তদাৰ্থ বল, বর্ণ, স্মৃতি, ও আয়ু বদ্ধিত  
হইয়া থাকে।

পিষ্টক চিপটক প্রভৃতি তণ্ডুলজাত  
পদার্থ গুরুপাক বলিয়া তুচ্ছ অবস্থায় কদাচ  
সেবন করা উচিত নহে এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির  
পরিমিত মাত্রায় আহার করা উচিত। গুরু  
মাংস, শুষ্ক শাক, কুশ পণ্ডুর মাংস, ক্ষীর, ছানা,  
মুগ, দধি, মাষকলায় প্রভৃতি দ্রব্য গুরুপাক  
বলিয়া নিত্য ভোজন উচিত নহে।

ঘেটে-ধান, শালিধান, মুগের দাল, সৈন্ধব,  
আমলকী, যব, বুট্টির জল, দুগ্ধ, ঘৃত, জাঙ্গল  
মাংস ও মধু নিত্য—সেবন করা উচিত। যে  
সকল দ্রব্য সেবন করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে  
এবং রোগের উৎপত্তি না হয় সেই সকল  
দ্রব্য ভোজন করিবে।

উপরে যে সকল খাদ্য নিত্য সেবন করিবার  
কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বর্তমান কালের  
বৈজ্ঞানিকগণের মতের সহিত সম্পূর্ণ—  
সামঞ্জস্য আছে। পাঠকগণের অবগতির  
নিমিত্ত আমরা তাহা দেখাইতেছি। অবশ্য  
উপরোক্ত খাদ্যের তালিকা দিগদর্শন  
মাত্র। উহার সহিত ফল ও তরকারী ধরিয়া  
লইতে হইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে; পাঁচ  
প্রকার দ্রব্য আহার করা উচিত। যথা  
প্রোটিন (Proteid) কার্বোহাইড্রেট (car-  
bohydrate), চর্কি (fat), ধাতব লবণ  
(Mineral salts) এবং জল। কথিত  
থাকে এই সমস্ত দ্রব্যই উপযুক্ত মাত্রায় বর্তমান  
আছে। আধুনিক মতানুযায়ী খাদ্য গুলির  
উপাদানের তালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।  
প্রত্যেক দ্রব্যে শতকরা যে উপাদান বসে থাকে,  
তাহা লিখিত হইল। বিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা  
করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে,  
ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য আহার করিলে পাশ্চাত্য  
বৈজ্ঞানিক-দিগের কথিত শরীরের প্রয়োজনীয়  
সমস্ত খাদ্যই আহার করা হয়। এক্ষণে  
বিরুদ্ধভোজন কি—তাহাই সংক্ষেপে কথিত  
হইতেছে।

বিরুদ্ধভোজন মানা প্রকার,—যথা শুষ্ক  
বিরুদ্ধ, সংযোগ বিরুদ্ধ, সংস্কার-বিরুদ্ধ, দোষ  
কাল ও মাত্রা-বিরুদ্ধ এবং স্বভাবতঃ বিরুদ্ধ।

	প্রোটিন	কার্বোহাইড্রেট	চর্বি	লবণ	জল
চাউল	৬০.৯	৭৯.৪	০.৪	০.৫	১২.৪
যব	১০.১	৭১.২	১.৯৭	১.৯	১২.৩
দাল	২৩.১	৫৩.৬	২.২	৩.৫	১৩.৬
ছন্ধ	৩.৯৭	৪.৮	৪.২৮	০.৬	৮৬.৮
মুত	—	—	১০০	৬	—
মাংস	১৮.১১	—	৭.৭৭	—	৭৫.৯৯
লবণ	—	—	—	১০০	—

ছন্ধ ও মৎস্য সংযোগ বিরুদ্ধ বলিয়া একত্রে আহার করা উচিত নহে। মধু, গুড়, তিল, ছন্ধ-মাকলায়, মূলা, অক্লুরিত ধাতুর অন্ন—ইহাদের কোনটার সহিত ছাগাদি মাংস, এবং মৎস্যাদি ভক্ষণ করা উচিত নহে। মূলা রসুন বা সজিনা শাক আহার করিয়া ছন্ধ পান করিবে না। মধু ও ছন্ধের সহিত অথবা মাকলায়, গুড় ও যুতের সহিত একত্রে আহার করিবে না। ছন্ধের সহিত সর্ষপ প্রকার অন্ন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবন করিলে উৎকট রোগ—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে পারে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, লজ্জা, শোক, অভিধান, উদ্বেগ ও ভয়দ্বারা মন পীড়িত হইলে, সে সময়ে আহার করিবে না, কারণ তাহাতে অন্ন জীর্ণ হয় না এবং আম দোষ জন্মে।

আচমন—আহারের পর আচমন করিবে এবং

দন্ত মধ্য গত অন্ন তৃণাদি দ্বারা নির্গত করিয়া ফেলিবে। কেননা উহা বাহির করিয়া না ফেলিলে মুখে দুর্গন্ধ জন্মে এবং দন্তের আনিষ্ট হয়।

তাম্বুল সেবন—আহারের পর তাম্বুল, কর্পূর, লবঙ্গ, জায়ফল প্রভৃতি সংযুক্ত তাম্বুল সেবন করিবে। তাম্বুল সেবন করিলে মূত্র পরিষ্কৃত ও স্নগন্ধ যুক্ত হয়, দন্ত, মল, শ্বস, জিহ্বা ও ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধ হয়, কফাদির আব্রনষ্ট হয় এবং গলরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তপিত্ত, উরঃকৃত, ক্লীণ, পিপাসা ও মূর্ছারোগে এবং রক্ষ ও দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে তাম্বুল হিতকর নহে।

আহারান্তে কর্তব্য—আহারের পরে দীর্ঘে দীর্ঘে এক শত পদ চলিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে এবং নব্বৈ প্রদক্ষিণ করিয়া পুনঃ উপভোগ করিবে। ইহাতে কৃত্তক অন্ন জীর্ণ হয় না।



আহারান্তে অগ্নি বা রৌদ্রের তাপ লাগান এবং অশ্বাদি যানে আরোহণ পূর্বক ভ্রমণ প্রভৃতি শ্রমজনক কার্য্য অহিতকর।

জলপান,—শরীরে জলের যতটুকু আবশ্যকতা ঘটে তাহার অধিকাংশ খাদ্য ও জলীয়ের সহিত উদরস্থ হয়, তদ্ব্যতীত বিশুদ্ধ জল পান করিয়াও আমরা তাহার কিয়দংশ পূরণ করি। শাস্ত্রে শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অল্প ঋতুতে মৃদু বাজিকে ও অল্প মাত্রায় জলপান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আহারের পূর্বে জল পান করিলে শরীর ক্লান্ত এবং আহারের পরে জলপান করিলে শরীর শুল হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে আন্তরীক্ষ-গাঙ্গ নামক জলকেই উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। যে আন্তরীক্ষ-জল বজ্রত পাত্রস্থিত শাল্যকে স্কিন্ম করে না, তাহাকে গাঙ্গ-জল বলে। এতদ্ভিন্ন অল্প আন্তরীক্ষ-জলকে সামুদ্র বলে। সামুদ্র এবং আন্তরীক্ষ-জল আধিন মাস ব্যতীত অল্প সময়ে পান করিতে নাই।

আন্তরীক্ষ-জলের অভাবে ভোম জল গ্রহণ করিতে হয়। মৃত্তিকা ভেদে এবং নাদেয়, কোপ প্রভৃতি ভেদে জলের নানা প্রকার গুণ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় সে সমস্ত লিখিত হইল না। ভোম (ভূমি জাত) জল প্রাতঃকালে গ্রহণ করিতে হয়। যে জল আশ্বাদন ও গন্ধহীন, বিবর্ণ নহে, স্বচ্ছ এবং মল রহিত—তাহাই বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ জলের অভাবে অবিশুদ্ধ জল অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া ফল বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে।

পিত্ত-প্রধান ব্যক্তির পক্ষে শীতল জল; বায়ু ও কফ প্রধান ব্যক্তির পক্ষে ঈষদ্ভূষ জল হিতকর। দিবসের সিদ্ধ জল—রাত্রিতে এবং রাত্রির সিদ্ধ জল দিবসে ব্যবহার করা উচিত নহে।

বর্ষাকালে নদীর জল কদম এবং বিবিধ প্রাণীর লালা, মূত্র, অণুাদি দ্বারা দূষিত হয় বলিয়া সে সময়ে নদীর জল ব্যবহার করা উচিত নহে। শরৎকালে সর্বপ্রকার ভোম জল হিতকর হইয়া থাকে।

তৃষিত ব্যক্তি জল না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয় এবং নোহ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে, সেইজন্য কোন অবস্থাতেই জল পান নিষেধ করা উচিত নহে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রোগ প্রতি-কার এবং দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় স্বরূপ বহুবিধ নীতি—ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশ অবশ্য পালনীয় বলিয়াই সম্ভবতঃ আয়ুর্বেদে ঐ সকলের পুনরাবৃত্তি করা হয় নাই। অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিবিধ বচন যখন আয়ুর্বেদে শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তখন হয়ত সে সকল বিষয়ও আয়ুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। বহুকালব্যাপী বিপ্লবের ফলে সেই সকল গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নচেৎ এরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে হৃদয়ঙ্গম আয়ুর্বেদকারগণের দৃষ্টি পতিত হয় নাই,—ইহা সম্ভবপর নহে।

মহু সংহিতায় লিখিত হইয়াছে :—  
“জলে—মূত্র, পুরীষ, থুথু, পুয়াদি অমেষ বস্ত্র-লিপ্ত দ্রব্য, রক্ত বা বিষ নিক্ষেপ করি-  
না। এই বিধি পালন করিলে—পাশ্চাত  
চিকিৎসকগণ কলেরা রোগের প্রতিষেধে  
জন্তু যাঁহা প্রধান উপায় বলেন—তাহা অবলম্বন  
করা হয়। তাঁহাদিগের মতে কলেরা রোগী  
মল কোনরূপে জলে মিশ্রিত হইলে রোগে  
সংক্রমণ ঘটে। এই উপদেশ পালন করিলে  
ইহা ঘটিতে পারে না।”

মহু সংহিতায় আরও লিখিত আছে—

“গৃহ, পা খোয়া জল, উচ্ছিষ্টান, গুরু প্রভৃতি গৃহ হইতে দূরে (একটা তীর ছাড়িলে যত দূর যায়—তত দূরে) পরিত্যাগ করিবে। এই বিধি পালন করিলে গৃহাদি পবিত্র থাকে,—কোনরূপ আবর্জনা গৃহের নিকটে জমিতে পায় না, কোনরূপ দুর্গন্ধ আত্মাণ করিতে হয় না এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে।” বাহ্যিক ভয়ে আমরা অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না। অম্লসন্ধিস্ত্র পাঠক মনু সংহিতা পাঠ করিলে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত বহু স্বাস্থ্য-নীতি নিহিত আছে তন্মধ্যে দেখিতে পাইবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, গৃহাদি নির্মাণ করা সম্বন্ধে পূর্বে আমাদের দেশে একরূপ অনিয়ম ছিল যে, সেই সকল নিয়মাত্মক গৃহ নির্মাণ করায় গৃহমধ্যে যথেষ্ট বায়ু ও রৌদ্রের সমাবেশ ঘটিত। সেই নিয়ম অনুসারে এই কারণেই আজিও দক্ষিণদ্বারী ঘর-ঘরের রাজা এই প্রবাদ বাক্যের প্রচলন দেখা যায়।

আয়ুর্বেদের সদাচার বিধি রোগ প্রতিষেধক এবং দীর্ঘজীবন লাভ সম্বন্ধীয় নীতির অন্তর্ভুক্ত। এই জন্ত সদাচার বিষয়ক কয়েকটা নীতি লিখিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

নিত্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিবে, প্রসন্নমনা ও সুগন্ধধারী হইবে। শ্রান্তি বোধ

হইবার পূর্বেই শ্রমজনক কার্য পরিত্যাগ করিবে। ছুটি ঘোটকাদি-যানে আরোহণ করিবে না। উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় পদার্থের প্রতি চাহিয়া থাকিবে না। উর্দ্ধ জাহ্ন হইয়া অধিকক্ষণ রসিয়া থাকিবে না। শ্রান্তি দূর না হইলে স্নান করিবে না। স্নান করিয়া সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া, অধিকক্ষণ থাকিবে না। শরীর বক্রভাবে রাখিয়া হাঁচিবে না, আহার করিবে না এবং শয়ন করিবে না।

চঞ্চল মনকে অধিকতর চঞ্চল করিবে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতি চালনা করিবে না। অতিশয় দীর্ঘস্থত্রী হইবে না। ক্রোধ ও হর্ষের অনুবর্তী হইয়া কার্য করিবে না। শোকের বশীভূত হইবে না। কার্য সিদ্ধিতে অত্যন্ত আনন্দিত কিংবা কার্যের অসিদ্ধিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইবে না। কার্য-কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত-বুদ্ধি হইবে অর্থাৎ এইরূপ কার্য করিলে এইরূপ ফল হইবে ইহা নিশ্চয় বুঝিবে।

হর্ষ-পরায়ণ হইবে, অর্থাৎ সর্বদা আনন্দিত চিত্তে কাল অতিবাহিত করিবে। ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ হইবে। উপেক্ষা পরায়ণ হইবে অর্থাৎ মান-অপমান, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিতে উত্তেজিত বা ক্লিষ্ট না হইয়া, সমতাবাপন্ন হইবে, কিছুতেই মনের শান্তিকে নষ্ট হইতে দিবে না।

## রসায়ন ও বাজীকরণ।

—:—

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রোক্ত রসায়ন এবং বাজীকরণ—  
হইতে অপূর্ণ পদার্থ। ছুথের বিষয় আজকাল  
বাজীকরণ আদৃত হইলেও রসায়নের ব্যবহার

এক প্রকার ষোণ পাইয়াছে। অগ্নি, বায়ু  
করণ-ঔষধ প্রচলিত থাকিলেও রসায়নের  
এবং সহজলভ্য বাজীকরণ প্রচলিত হইয়াছে।

নির্ভর কম। চিকিৎসকের নিকট—যে সকল বাজীকরণ ঔষধ কিনিতে পাওয়া যায়,—সেগুলি বহুমূল্য। এই প্রবন্ধে আমরা রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমে রসায়নের বিষয় কথিত হইতেছে।

রসায়ন ঔষধ দুই প্রকার, কতকগুলি স্নাত্ত ব্যক্তির ওজোবর্দ্ধক এবং কতকগুলি রুগ্নের রোগ নাশক। যে সমস্ত ঔষধ স্নাত্ত ব্যক্তির ওজোবর্দ্ধক, সেইগুলি রসায়ন ও বাজীকরণ নামে খ্যাত।

রসায়ন ও বাজীকরণ প্রধানতঃ স্নাত্ত ব্যক্তির জ্ঞাত ক্রিয়ত হইলেও রোগীর রোগ প্রশমনের জ্ঞাত ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যতদূর চরকে,—প্রায়ঃ প্রায়ঃ বোগাণাং দ্বিতীয়ঃ প্রশমেমতং। প্রয়োঃ শব্দো বিশেষার্থেহ ভাষ্যং জ্যৈষ্ঠার্থকৃতং ॥

অর্থাৎ রসায়ন প্রায় সকল প্রকার রোগ-নাশক। কিন্তু প্রশ্নের শব্দ এখানে বিশেষার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ দুইটাই (রসায়ন এবং বাজীকরণ) স্নাত্তের ওজোবর্দ্ধক এবং রুগ্নের বোগাপহারণ—এই উভয় কার্য সাধক।

রসায়ন ঔষধ প্রায় সর্বপ্রকার রোগনাশক—এই কথায় কেহ এমন বুঝিবেন না যে, নবজরে, মারিপাতিক জরে, বা অতিসারে রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাছে কেহ এইরূপ মনে করেন—সেই জ্ঞাত শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—“স্নাত্তব্যক্তির ওজবর্দ্ধক ঔষধের বিষয় বলা যাইতেছে। যে সকল ব্যাধিনাশক তাহা চিকিৎসা স্থানে বলা যাইবে। রোগ সমূহের বাহা ঔষধ তদ্বারাই চিকিৎসা করা যায়।”

এখন সহজেই মনে হইতে পারে, পূর্বে বলা হইল যে, রসায়ন ঔষধ প্রায় সমুদায় রোগনাশক, এবং পরে বলা হইল যে, তিন তিন

রোগের যে সকল ঔষধ,—তদ্বারাই তাহাদের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে বুঝিবে কি?

ইহার যীমাংসা এই;—রোগনাশের জ্ঞাত রোগনাশক ঔষধ এবং স্নাত্তের ওজোবর্দ্ধন জ্ঞাত রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ প্রধানতঃ প্রয়োজ্য। কিন্তু রসায়ন ও বাজীকরণ বিশেষতঃ রসায়ন ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা অধিকাংশ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। রসায়নের রোগনাশকতা সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

গত বর্ষের ২য় ও ৩য় সংখ্যক “আয়ুর্বেদে” “হরীতকী” শীর্ষক প্রবন্ধে ঋতু হরীতকী নামক রসায়নের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অপিচ, উক্ত প্রবন্ধে হরীতকী যে সকল রোগ-নাশে সক্ষম, তাহাও বলা হইয়াছে। এতদ্বারা বুঝা যায়—হরীতকী যে সকল রোগনাশে সক্ষম, ঋতু হরীতকী সেবনে সেই সকল রোগ নিরাকৃত হয়। কিন্তু এইটুকু বুঝিলেই চলিবে না। ঔষধ প্রয়োগ সর্বত্রই যুক্তির উপর নির্ভর করে। কারণ হরীতকী-গুণ প্রসঙ্গে—হরীতকী অতিসারনাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু অতিসার হইলেই তাহাকে ঋতু হরীতকী প্রয়োগ করা চলে না। বিবদ্ধতামুক্ত পুরাতন অতিসারে ঋতু হরীতকী ফলপ্রদ। সর্বত্রই এইরূপ বিচার করিয়া রসায়ন ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

“যজ্ঞরা ব্যাধি বিধ্বংসী ভেবজং তদ্রসায়নম্” অর্থাৎ যে ঔষধ জরারূপ ব্যাধি বিধ্বংসী তাহাই রসায়ন।

এহলে জরারূপ ব্যাধি-বিধ্বংসী অর্থে জরার প্রতিবেদক,—জরা নাশক নহে। কারণ, জরা মৃত্যুরূপ স্বাভাবিক ব্যাধির কবল হইতে কেহই রক্ষা পায় না। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব একদিন স্বপ্নমানে কার্তিককে বলিয়াছিলেন—

“মমায়ুঃসতে কালঃ কুতো পুত্র রসায়নম্।”  
অর্থাৎ,—হে পুত্র, কাল আমার আয়ুঃ গ্রাস  
করিতেছে, রসায়ন ঔষধে আর কি ফল হইল !

তবে রসায়ন ঔষধ একেবারে জরার  
আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে না পারিলেও  
মনুষ্যকে সুদীর্ঘকাল জরার আক্রমণ হইতে  
অবাহিত রাখিতে পারে । রোগভোগ, শরীরের  
প্রতি অত্যাচার এবং অত্যধিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতি  
কারণে মনুষ্য যেমন অকালে জরাগ্রস্ত হয়,  
সেইরূপ স্ত্রনিয়মে থাকিয়া রসায়ন ঔষধ সেবন  
করিলে মনুষ্য দীর্ঘকাল জরার আক্রমণ হইতে  
পরিত্রাণ পাইতে পারে ।

চ্যবন প্রাশ নামক স্তুপ্রসিদ্ধ রসায়নের ফল-  
শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে :—

অস্ত্র প্ররোগাচ্চ্যবনঃ স্রব্দ্ধোহুত পুনযুবা ।

অর্থাৎ,—এই ঔষধ প্ররোগের দ্বারা  
বৃদ্ধ চ্যবনস্বয় পুনরায় যৌবন লাভ করিয়া-  
ছিলেন ।

রসায়ন ঔষধ সেবন দ্বারা কি ফল পাওয়া  
যায়,—সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন,—  
দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিঃ মেধামারোগাৎ তরুণং বয়ঃ ।  
প্রভাবর্ণ স্বরোদার্যং দেহেন্দ্রিয়বলং পরং ।  
বাকসিদ্ধিং প্রণতিং কাস্তিং লভতে না রসায়নাৎ ।  
লাভোপায়ো হি শাস্তানাং রসাদীনাং রসায়নং ॥

অর্থাৎ—রসায়ন ঔষধ সেবন দ্বারা  
মনুষ্য দীর্ঘ পরমায়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য,  
( অর্থাৎ রোগ না হওয়া ), তরুণ বয়স ( অর্থাৎ  
দীর্ঘ স্থায়ী যৌবন ), প্রভা, বর্ণ ও স্বরের উৎকর্ষ;  
মেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতিশয় বল, বাকসিদ্ধি,  
বিনয় এবং কাস্তিলাভ করিতে পারে । উৎকৃষ্ট  
রসাদি ধাতু লাভের উপায় স্বরূপ বলিয়া ইহা  
রসায়ন নামে কথিত হইয়াছে ।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ আয়ুঃ প্রভৃতি

লাভ করা কি এতই সহজ যে, কেবল মাত্র কিছু  
বায় করিয়াই রসায়ন সেবন করিলে, দীর্ঘ আয়ুঃ  
লাভ ঘটয়া থাকে ? যদি তাহা হইত তাহা  
হইলে পৃথিবী স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া  
বিবেচিত হইত । রসায়ন ঔষধের সম্যক ফল  
লাভ করিতে হইলে বিশেষ আয়াস স্বীকার  
আবশ্যক ।

শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—শারীরিক  
ও মানসিক দোষ রহিত না হইলে মনুষ্য  
কখনই রসায়ন ঔষধ সেবনের ফলপ্রাপ্তি  
হয় না । যাহারা শারীরিক ও মানসিক দোষ  
রহিত এবং সংবতাত্মা—তাহারাই পরমায়ুবর্দ্ধক  
এবং জরাযাধি প্রতিবেধক রসায়নের ফল  
লাভ করিয়া থাকেন ।

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—“যে ব্যক্তি  
সত্যবাদী, অকোষী, মদ্য ও মৈথুন সেবার  
বিরত, অহিংস্রক, অধিক পরিশ্রমী নহে,  
প্রশান্তচিত্ত, প্রিয়বাদী, জপ ও শৌচ পরায়ণ,  
ধীর, নিত্য দানশীল, তপস্বী পরায়ণ, দেব-গো-  
ব্রাহ্মণ-আচার্য্য-গুরু ও বৃদ্ধের অর্চনায় রত,  
কুর কার্যে বিরত, নিত্য করুণাশীল, সমভাবে  
জাগরণ ও নিদ্রাশীল, নিত্য দুগ্ধ যুতসেবী,  
দেশ কাল প্রমাণজ্ঞ ( অর্থাৎ দেশ কাল বুঝিয়া  
চলেন ), যুক্তিজ্ঞ, নিরহঙ্কার, সমাচারী,  
সন্ধীর্ণ চিত্ত নহে, এবং যে ইহকাল ব্যতীত  
পরকাল ভাবিয়া ইন্দ্রিয় সকলের চালনা  
করে ) তাহারই রসায়ন সেবন উচিত ।

জিতাত্মবুদ্ধ আন্তিকগণের সেবক এবং  
ধর্মশাস্ত্র পরায়ণ ( অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ  
অনুসারে চলেন )—সে ব্যক্তি নিত্য রসায়ন  
সেবনের ফললাভ করিয়া থাকেন ।

রসায়নের সম্যক ফল লাভ করিতে হইলে  
যে সকল গুণের প্রয়োজন, তাহারা নিম্নলিখিত

প্রাণব অধিকারী কেহ আছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং রসায়ন ঔষধ সেবন অধুনা প্রচলিত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে বিষম সন্দেহ। তবে সেবন একেবারে নিরর্থক হইবাব নচে, কাজেই যথাযথ নিয়মে থাকিয়া উহা সেবন করিতে না পারিলেও ইহা সেবনে যে কথঞ্চিৎ ফল পাওয়া যায়, তাহা নিশ্চিত।

এক্ষণে দেখা যাউক—রসায়ন ঔষধ কিরূপ বয়সে সেবন করিলে ফলপ্রদ হইয়া থাকে! শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

পূর্বে বয়সি মধ্যে বা—(অর্থাৎ পূর্বে বয়সে যৌবন কালে) অথবা মধ্য বয়সে (প্রৌঢ়াবস্থায়, রসায়ন ঔষধ সেবন করা উচিত। এতদ্বারা বৃদ্ধা যাইতেছে যে, বালক বা ক্রুশ—রসায়নের অধিকারী নহে।

রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হইলে পূর্বেই শরীর শুদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যিক।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—শুদ্ধ দেহ হইয়া রসায়ন ঔষধ সেবন করা উচিত। কারণ মলিন বস্ত্র রং করিলে যেমন সে রং বেশ লাগেনা, সেইরূপ অশুদ্ধ দেহে রসায়ন সেবন করিলে সম্যক ফল হয় না।”

এখন কথা হইতেছে যে, শুদ্ধ দেহ কি—এবং অশুদ্ধ দেহই বা কি? সাধারণতঃ আমাদের শরীর অশুদ্ধ। কারণ আমাদের শরীর গ্রাম্য আহার বিহারাদির দ্বারা দূষিত। এই গ্রাম্য-আহার-বিহারাদি বশতঃ শরীরের যে দোষ জন্মে, বমন-বিবেচনাদি দ্বারা সেই দোষ সংশোধন করিয়া, পরে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়।

রসায়নের প্রয়োগ দুই প্রকার। এক কুটী প্রাণেশিক, অপর বাতাতপিক। কুটী প্রাণেশিক বিধি যেকোন কঠিন, তাহাতে অধুনা

কেহ যে কুটী প্রাণেশিক বিধি অনুসারে রসায়ন সেবন করিতে পারিবেন; এক্ষণ মনে হয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে, বাহারী সমর্থ, নীরোগ, ধীমান, সংযতাত্মা, সহিষ্ণু এবং ধন-জনসম্পন্ন,—তাঁহাদের পক্ষে কুটী প্রাণেশিক রসায়নই প্রশস্ত। অত্যান ব্যক্তির পক্ষে সৌখ্য মাত্র-তিক অর্থাৎ বাতাতপিক রসায়ন সেবন করা কর্তব্য। কিন্তু বাতাতপিক অপেক্ষা কুটী প্রাণেশিক রসায়ন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উহা দ্রুত।

কুটী অর্থাৎ গৃহমধ্যে থাকিয়া বাতাতপ বর্জন করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হয় বলিয়া উহাকে কুটী প্রাণেশিক রসায়ন বলে। কুটী প্রাণেশিক বিধি সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিম্নলিখিত রূপ উপদেশ আছে।

রাজা, বৈষ্ণ, ব্রাহ্মণ এবং পুণ্যকর্মী সাধু-দিগের আবাসস্থানের নিকটে, সর্পাদির ভয় রহিত, প্রশস্ত রসায়নের আবশ্যকীয় উপকরণ-যুক্ত এবং উত্তম মৃত্তিকাবিশিষ্ট স্থানে পূর্বে বা উত্তর দিকে কুটী প্রস্তুত করিবে। কুটী বেশ বিস্তৃত ও উচ্চ, ত্রিগর্ভ এবং হৃৎকলোচনা (যাহাতে বহু বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্ত ভিত্তির উপরিভাগে বহু ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত) হইবে। কুটী ঘন ভিত্তিযুক্ত, সকল ঋতুতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মনের প্রিয় হওয়া উচিত। কুটী যেন জীবজন্তু হই এবং তাহার মধ্যে যেন অগ্নির শব্দাদি প্রবেশ করিতে না পারে। উপযুক্ত উপকরণ এবং বৈষ্ণ, ঔষধ ও ব্রাহ্মণ—কুটীর মধ্যে থাকা উচিত।

অনন্তর উত্তরায়ণ কালে—শুক্ল তিথিতে, শুভ নক্ষত্রে, ক্ষৌরকার্য্যাদি করিয়া, ধৃতিমান, মৃতিমান প্রজাবল ও সমাহিত চিত্ত হইয়া, রাজা, ধৈর্য্যবান মানস দোষ পরিত্যাগ করিয়া, নক্ষত্র-মিত্রতা চিন্তা করিয়া, প্রথমে দেহের ও ব্রাহ্মণ

গণের পূজা করিবে। পরে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গো প্রদক্ষিণ করিয়া কুটী প্রবেশ করিবে। কুটীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বমন-বিরেচনাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়া লইবে। অনন্তর রসায়ন ঔষধ সেবন করিবে।

ইহার পর কি প্রকারে শরীর শুদ্ধ করিতে হয়, তাহা বলিয়া পরে নানা প্রকার রসায়ন ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে। রসায়নার্থ ঔষধ সকল শৈল সত্তম হিমবান পর্বত হইতে গ্রহণ করা উচিত এবং ঐ সকল ওষধি কাল জাত, পূর্ণবর্ষা ও কোনপ্রকার দূষিত না হয়, এক্রপভাবে গ্রহণ করা উচিত—এইরূপ উপদেশ আছে। আমরা অনাবশ্যক বিবেচনায় ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিলাম না। তবে কেহ রসায়ন সেবনেচ্ছা হইয়া জানিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের সাধ্যমত উপযুক্ত উপদেশ পাইতে বিলম্ব হইবে না।

রসায়নের জন্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নানা প্রকার দ্রব্য ওষধির উল্লেখ আছে। ঐ সকল ওষধি সম্বন্ধে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই এবং উহার সাধারণ মানবের লভ্য এবং সেবা নহে। সুশ্রুত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, যাহারা অধার্মিক, কৃত্তর, ঔষধদ্রব্যী ও ব্রাহ্মণ-ষেথী,—তাহারা কদাচ সৌমলতা নামক দ্রব্যবোষধি দেখিতে পায় না। ভগবান আত্রেয়

অম্বিবেশ ঋষিকে নানা প্রকার দ্রব্যবোষধি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পরে বলিয়াছেন,—“দ্রব্যবোষধি প্রভাব আপনার জ্ঞান সূক্ষ্মতায় ব্যক্তিই সজ করিতে পারে, অসূক্ষ্মতায় ব্যক্তিগণ সহ্য করিতে পারে না।”

দ্রব্যবোষধি সেবনের যে নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা শুনিলেও ভয় হয়, নিয়ম পালন করাতো বহুদূরের কথা। পাঠকদিগের কৌতুক নিবৃত্তির জন্ত উক্ত বিধির বিষয় লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মা সুবর্চলা, আদিত্যপর্ণী, বা হৃদ্যাকান্তা, নারী বা অশ্ববলা, কাষ্ঠ-গোশা, সর্প, সোমলতা, পদ্মা, অজ্ঞা বা অজগুদী, এবং নীলা—এই আট প্রকার ওষধির মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের রস তৃপ্তিপূর্বক পান করিয়া, কাঁচা পলাশকাষ্ঠের স্নেহভাবিত সিন্দুরের মধ্যে উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে। ঐ সিন্দুরের উপর যে আবরণ থাকিবে তাহাতে একটা গর্ত করিবে এবং ঐ গর্তের মধ্য দিয়া রসায়ন সেবনকারীর জীবন ধারণার্থ একটু একটু করিয়া ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিবে। এইরূপ ভাবে ছয়মাস কাল থাকিলে দেবতার জ্ঞান বয়স, বর্ণ, স্বর আকৃতি বল ও প্রভা লাভ করা যায়।

(ক্রমশঃ)

## ধলু আঁকোড় বা ধলু আঁকড়া।

—:—

বাত্তে।—

ধলু আঁকড়ার পাতা বা ছাল প্রলেপ দিলে—

বাত্তের কোলা-ব্যথা যায় গো.চ'লে।

বিসর্পে।—

ধলু আঁকড়ার পাতার রস

কতখানি দিলে বিসর্প যায়।

মলবদ্ধতায়।—

- (১) ধল আঁকড়ার শিকড় আধভরি সিদ্ধ  
পান ক'রলে যায় মল বদ্ধ।
- (২) সিকি ভরি ধল আঁকড়ার গুঁড়—  
গরম জলে সেবন কর।

ইঁদুর ও সর্প বিষে।—

- ইঁদুর ও সর্পবিষে  
ধল আঁকড়ার পাতা দাও পিষে।  
ফেপা কুকুরে কামড়ায় যারে—  
তারও এতে সফল ধরে।  
পাচন ক'রেও ধল আঁকড়ার  
পেতে দাও গে বারম্বার।

ফোড়া বসান।—

- ধল আঁকড়ার ফল মরিচ সহ—  
ফোড়া ব'সবে দিতে কহ।

বাতরক্তে।—

- ধল আঁকড়া, অনন্তমূল,  
ছাটমছাল আর গুগ্গল,

এক একটি নাও—আধ আধ ভরি,  
আধসের জলে সিদ্ধ করি,  
একছটাক থা'কতে নামিয়ে নিয়ে,  
রক্ত দোষে থাও চুমুক দিয়ে।  
পারা দোষ, বাত, বাতরক্ত, শূল  
কুষ্ঠ পর্যন্তের ঘোচে মূল।

ক্রিমিতে।—

- (১) ধল আঁকড়ার পাতার রস ছটাক সিকি  
ছ'রতি কর্পূরের মিশাও ফাঁকি,  
ক্রিমি মারে ক'রলে সেবন,  
ধল আঁকড়ার গুণ জেন' এমন।
- (২) ধল আঁকড়া, দাড়িমছাল আধ আধ ভরি,  
সোঁদাল ছাল নাও দ্বিগুণ করি,—  
আধসের জলের একছটাক শেষ,  
সেবনে রয়না ক্রিমির লেশ।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

## প্রেরিত পত্র।

(পরীক্ষিত দুইটি ঔষধ।)

(১ম—মূর্ছা বা অগম্য রোগে।)

আমার জনৈক কবিরাজ বহু একটি  
রোগীর মূর্ছা ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া  
ডাক্তারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।  
ডাক্তার বাবুকে Ammon carb.এর সহায়তায়  
মহর্ষমধ্যে রোগীর মূর্ছা ভঙ্গ করিতে দেখিয়া

তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন এবং ডাক্তার  
চিকিৎসার অপেক্ষাবিধ প্রশংসা করিলেন।  
তিনি আরও বলিলেন, আয়ুর্বেদীয় মতে  
একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হইতে পারে, যা  
মৌর্ছিত হইতে রক্তবহন প্রণালীকে

ডাক্তারী মোটরিয়া মেডিকা অল্পসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এবং অন্তর্দিনের চেষ্টাতে নিম্নলিখিত ঔষধটি আবিষ্কার করিলাম।

প্রথমতঃ Ammon carb এর প্রস্তুত-প্রণালী লইয়া অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। একদিন হঠাৎ Liquor Ammonia Fortis এর প্রস্তুত-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করি এবং নিম্ন লিখিত বিষয়টি জানিতে পারি। “Ammon chloride (নিশাদল) কে Slaked lime (আজ চূণ) এর সহিত উত্তপ্ত করিলে গ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আমি নিশাদলকে আজ চূণের সহিত মিশ্রিত করিলামাত্র দেখিলাম যে—একটি গ্যাস উঠিতেছে এবং ঐ গ্যাস ঠিক গ্যামোনিয়ার স্থায়ী গন্ধবিশিষ্ট। অতঃপর আমি কয়েকটি মূর্ছারোগীকে ইহা প্রয়োগ করিয়া আশাহরূপ সফল পাইয়াছি। সম পরিমাণ নিশাদল ও আজ চূণ লইয়া যে কেহ এই ঔষধটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ইহার ঘ্রাণ লইলে মাথার বেদনারও উপকার হয়।

( ২য়—প্রদর রোগে )

রোগিণীর বয়স ১৭।১৮ বৎসর। কোন সম্ভাবনা দিই হয় নাই। ৩৪ বৎসর যাবত অনিয়মিত ঋতু স্রাব হইতেছিল। ততদিন কোনরূপ চিকিৎসা নাই। তাহার পর একমাস যাবত অনবরত ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হওয়ায় ডাক্তারী মতে, পরে আয়ুর্বেদীয় মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করান হয়। কিন্তু কিছুতেই ফল লাভ হয় নাই। ক্রমে রোগিণী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, ঘন ঘন মূর্ছা হইতে লাগিল। একদিন রোগিণী মূর্ছিতা হইয়া পড়িলে একজন লম্বা আমি চিকিৎসার জন্ত আহৃত হইলাম।

আমার ব্যবস্থায় অনেক চেষ্টার মূর্ছা ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু রোগিণী বুকের বেদনায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। আমি বিশেষ কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া একমাত্র মকরধ্বজের ব্যবস্থা করিয়া পূর্বে যে সমস্ত ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল তাহাই পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ডাক্তারী মতে পটাস পার ম্যাঙ্গে-নাস্ লোসন্ দ্বারা পিচকারী প্রয়োগ করা হইয়াছিল। সেবনের জন্ত কি কি ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিলাম না। পিচকারী প্রয়োগে ২৩ দিবস কিছু কম থাকিয়া পুনরায় মাংস খোঁত জল সদৃশ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত অত্যধিক পরিমাণে স্রাব আরম্ভ হইয়াছিল—জানিলাম। সেই সময় আয়ুর্বেদীয় মতে চিকিৎসা করান হয়। যে কবিরাজ মহাশয়কে ডাকা হইয়াছিল, তিনি প্রদরাস্তক লৌহ খণ্ডকাত লৌহ, অশোকারিষ্ট, কুটজাষ্টক প্রভৃতি অনেক ঔষধ ও মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমি সেই ব্যবস্থার উপর অত্র কোন নূতন ব্যবস্থা খুঁজিয়া না পাইয়া রাত্রির জন্ত আর একমাত্র মকরধ্বজ প্রয়োগ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

রাজ্যে আমার মাথায় সহসা এক খেয়াপ চাপিল। পরদিবস, থানিকটা জলে কিছু ফটকিরী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা দুই বেলা দুইটি বস্তি (ডাক্তারী মতে পিচকারী) প্রয়োগ ও দুই বাট প্রদরাস্তক রস (অল্পপান আদ্যপান রস) ব্যবস্থা করিয়া চণ্ডি আসিলাম। সেবনের জন্ত একটি ঔষধ না দিলে নয় বলিয়াই প্রদরাস্তক রস ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

তৃতীয় দিকল যাইয়া শুনিলাম, লম্বা আমি মাত্রার স্রাব হইয়াছে।



সকল টাঙ্গিয়া আসিলাম। চতুর্থ দিবস শ্রাব  
করাইয়া হয় নাই। ঐবধ পূর্ববৎই  
করাইয়া অশোকরিষ্ট ব্যবস্থা  
করিলাম।

যুবকটির এক সপ্তাহ মধ্যেই রোগিনী  
মৃত্যুবরণ করিয়া গিয়াছিল। একমাস পর্য্যন্ত  
ডাক্তার চিকিৎসা চলিল। আসাতিবাহিত  
হইয়া দেহাশয়—নিয়মিত ভাবেই ষড়মাস

হইতেছে। তখন প্রাতে অশোক ঘৃত,  
বৈকালে প্রদরাস্তক রস ও বাত্রে অশোকা-  
রিষ্ট ব্যবস্থা করিলাম। ছয় মাস পরে  
শুনিলাম রোগিনী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।  
অতাবদি তাঁহার অস্ত্র কোন অস্থায়ী হয়  
নাই।

কবিরাজ—শ্রীমৈত্র ।

## “চিকিৎসকের দুঃখ” প্রবন্ধের প্রতিবাদ ।

—::—

লেখকের

ঐশ্বর্য্য “আয়ুর্বেদ” সম্পাদক  
মহাশয়গণ সমীপেষু—

মহাশয়গণ, গত বৈশাখমাসের “আয়ুর্বেদে”  
“চিকিৎসকের দুঃখ”—শীর্ষক প্রবন্ধটি যাহা  
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া চমকিত  
হইলাম। বর্ণিতব্য ভুলে কেহ হয়তো ঐরূপ  
প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, কিন্তু কেমন করিয়া  
অপনাম “আয়ুর্বেদে”র মত উচ্চ শ্রেণীর  
চিকিৎসা বিষয়ক পত্র উহা স্থান দান করিলেন  
পত্রিতে পারিলেন না। আমার দুঃখের কারণ  
ইহা—নতুবা ঐরূপ প্রবন্ধ কেহ পড়িয়া  
কেন হইবে, উহাকে প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া  
দেখিতে পারিতাম।

লেখক বলিয়াছেন,—“চিকিৎসা অতি  
মহৎ ও পুণ্য কৰ্ম্ম,—ইহা অনেকেরই বিশ্বাস,  
কিন্তু চিকিৎসকগণকে সমাজ এই চাটুবা কোই  
অভিনন্দিত করে। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসা  
কি সত্যি মহৎ?”

জ্যোতি—৫

লেখকের এই স্থানেই তো মহা গলদ  
দেখিতেছি। “চিকিৎসা যে অতি মহৎ ও পুণ্য  
জনক কৰ্ম্ম,—তাহা অনেকের বিশ্বাস”  
হইলেও লেখক তাহা বিশ্বাস করেন না। এই  
জন্ত সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সমাজকে  
চাটুকায় বলিতে তিনি কুন্তিত হন নাই। বলি,  
সমাজ এই চাটুবৃত্তি করিবে কিসের জন্ত?  
লেখক তো একটু পরেই বলিয়াছেন,—  
“অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করা হয়।” যদি  
অর্থ লইয়াই চিকিৎসা করা হইল, তবে সমাজ  
—চিকিৎসকের নিকট কোন্ বাধ্যতা গুণে  
তাহার চাটুবৃত্তি অবলম্বন করিবে? সমাজ  
চিকিৎসা কার্য্যকে মহৎ ও পুণ্যকৰ্ম্ম কেন  
বলেন, লেখক তাহা বলিয়া বলিতে পারেন  
নাই, আমরা বলি শুধু—শাস্ত্রে আছে,—  
“কপিলা কোটি দানান্নি যৎকলং পরিকীৰ্ত্তিতম্  
ফলং তং কোটিগুণী তমেকাভূর-চিকিৎসয়া।”  
অর্থাৎ কোটি কপিলা দান করিলে যে ফল  
লাভ হয়, একটীমাত্র রোগীকে আয়োগ্য

করিলে তাহারও কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। চিকিৎসক এবস্থিৎ পুণ্যজনক কার্য্যে ব্রতী বলিয়াই তিনি সমাজের চক্ষে প্রাকৃতই মহান এবং পুণ্যবান। লেখক কি এ কথা অবগত নহেন?

মহাপুরুষ চাণক্য চিকিৎসকের গুণব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

“আয়ুর্বেদ কৃতাত্যাসঃ সর্বেষাং প্রিয় দর্শনম্  
আর্য্যশীল গুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে ॥”

অর্থ লইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন সম্বন্ধে লেখক যে উহা অপকর্ম্ম বলিয়াছেন—ইহাও অতি বিস্ময়ের কথা। তিনি তো নিজেই বলিয়াছেন,—“অর্থগ্রহণ না করিলে চিকিৎসকের জীবিকা নির্বাহ হয় না।” এ স্থলে একই লেখকের উভয় কথার সামঞ্জস্য কিরূপ রহিয়াছে—তদৃষ্টে হাস্য সম্ভবণ করা যায় না।

অর্থ গ্রহণ না করিয়া চিকিৎসক করিবেন কি? পেটের দায়ে তাঁহাকে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রও তো সকলেব নিকট অর্থ লইতে নিষেধ করেন নাই। শাস্ত্রকার তো বলিয়া গিয়াছেন,—জীবিকানির্বাহার্থ রাজা এবং ধনবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ অবশ্য গ্রহণীয়। যথা—

“ঈশ্বর্যাণাং বহুমতাং লিঙ্গেতার্থস্ত বৃত্তয়ে।”

লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন,—“মাসুঘের প্রকৃতিই রোগ প্রতিবেদক। চিকিৎসক সেই প্রকৃতির সহায়তা করিতে পারেন মাত্র। সেই প্রকৃতির সম্পূর্ণ স্বরূপ কোন চিকিৎসক জানিতে পারিয়াছেন?”

হা অদৃষ্ট, লেখক আয়ুর্বেদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্বেদের মূলমন্ত্রটুকুও যে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতাম না! আয়ুর্বেদের মূল মন্ত্র—

“ব্যাধেষুস্তত্ত্বঃ পরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহম্।  
এতৎ বেদন্য রৈত্তত্ত্বং নবৈদ্যঃ প্রভুরায়ুসঃ ॥”

অর্থাৎ ব্যাধির তত্ত্ব অবগত হইয়া উপদ্রবের দূর কবাই চিকিৎসকের কার্য্য; বৈদ্য কখন আয়ুর প্রভু নহেন। এই কথাতেই তো সং কথা বলা হইয়াছে। তবে লেখক মহাপুরুষ আবল-তাবল বকিতে বলিয়াছেন কেন?

লেখক বৈদ্যের জন্ম বৃত্তান্তের স্মৃতি তাহার যে বৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা একেবারেই অসঙ্গত। কোন শাস্ত্র—কোন পুরাণে—ব্যবসায় স্থির করিবার জন্ম বৈদ্যের জন্ম রহস্য লিপিবদ্ধ হয় নাই। নিজেব জাতিগত ব্যবসায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার জন্ম-রহস্য আনিয়া—তাহাকে যে এতাদৃশ নীচতার আসনে স্থান দান করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার কল্পনা,—তাহার লেখনী—তাহার প্রবন্ধ—বৈদ্য সমাজে যে ক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত, সে বিষয়ে অল্পমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাদিগকেও ধিক বে,—সে লেখার আবার আমরা প্রতিবাদ করিতেছি।

লেখক বলিয়াছেন,—“আমাদের দেশে কি পাশ্চাত্য দেশে—কোন দেশের ইতিহাসে চিকিৎসকের নাম উল্লিখিত হয় নাই!” বাহবা বুদ্ধি! এত বুদ্ধি না হইলে আর কেহ নিজের ভ্রংশ সমাজে প্রকাশ করিতে বসে! পাশ্চাত্য সমাজের কথায়-কাজ নাই, আমাদের সমাজের কথা বলি।—চিকিৎসক-অধিনী কুমারধ্বং ছিন্নশিরঃ-ব্রহ্মার শিরোযোজন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বজ্রজপী হইয়াছিলেন। রামায়ণ জানা আছে তো? ভিন্ন জাতি হইলেও স্মরণ যে বৈদ্য বা চিকিৎসক ছিলেন তাহাভ্রো অস্বীকার করিবার জো নাই। সে স্মরণের নাম রামায়ণ কীর্তিত কেন? এই বৃত্তির স্মৃতি।

সকল কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিবাদ করিয়ে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবে। তাই আর বেকী বলিব না। সংক্ষেপে আর হু' একটা কথা কহিয়া নাই।

লেখক বলিয়াছেন,—“চিকিৎসা বৃত্তির দ্বারা সমগ্রাণে বদ্ধতা লাভ হয় না।” আশ্চর্যের সমগ্রাণে অথ কেহ যে শাস্ত্রের সকল কথাও উপেক্ষা করিতে পারে, ইহা জানিতাম না। চিকিৎসা বৃত্তির ফলে—

কচিৎকিঃ কচিৎমৈত্রী কচিৎদ্বন্দ্বঃ কচিৎদবশঃ ।  
কর্মভ্যাসঃ কচিৎকপি চিকিৎসা নাস্তি নিফলা ।  
অর্থং চিকিৎসাবৃত্তির ফলে কোন স্থানে অর্থ লাভ, কোন স্থানে মিত্রতালভ, কোন স্থানে ধর্মলাভ, কোন স্থানে যশঃলাভ এবং যেখানে কিছুই লাভ হয় না, সেখানে কর্মভ্যাস বা Practical knowledge লাভ হয়—অতএব এ বৃত্তি নিফল নহে,—এ কথা যে লেখক কহিয়া গেলেন—ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয়।

লেখক একস্থলে বলিয়াছেন,—“চিকিৎসা

সক অপাংক্লেয় বলিয়া নির্দিষ্ট, তাহার অঙ্গ অভক্ষ্য বলিয়া কথিত।” আমরা পরাশর সংহিতার মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, চিকিৎসক অপাংক্লেয় নহেন। যথা—

বৈশ্বকৃত্যাসমুৎপন্নম্ ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতম্  
অষ্টজায়তে নামাঃ ব্রাহ্মণেন সহ ভোজনেঃ ॥”  
এ অবস্থায় বৈদ্য বা চিকিৎসককে অপাংক্লেয় বলিব কেমন করিয়া? লেখক বলিয়াছেন—  
“রামকৃষ্ণ পরমহংস চিকিৎসকের অন্নগ্রহণ করিতেন না।” জানি না রামকৃষ্ণ পরমহংস কি করিতেন, কিন্তু সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য চিকিৎসককে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহারই প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—

“বৈদ্যঃ নারায়ণঃ হরিঃ ।”

লেখক সর্বশাস্ত্রবিদ কি না জানি না, কিন্তু সকল কথা তাঁহার মনে নাই—এবং সকল কথা না জানিয়া—না বুঝিয়া এরূপ প্রবন্ধের অবতারণা যে করিতে নাই—ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

শ্রী বিনোদবিহারি রায় গুপ্ত ধন্যস্তরি ।

## ক্ষয়রোগ ।

যজ্ঞ পৃথিবী ব্যাপী এবং বহু প্রাচীন গৌণ। পৌরাণিক কাহিনীতে চন্দের যক্ষারোগ হইয়াছিল এইরূপ কথিত হইয়াছে। তারকা-যজ্ঞ-চন্দের ক্ষয়রোগ ‘রাজ’-যক্ষা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। রসাদি ধাতুর ক্ষয় করে বলিয়া ইহাও নাম ক্ষয় এবং শরীরকে শুষ্ক করে বলিয়া ইহার নাম শোষ।

ক্ষয়রোগ যে সংক্রামক—আধুর্কোদে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। যথা,—  
প্রসাদাদ্ গাজসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ  
সহভোজনাত্

এক শবাসনাজেব বস্ত্রমালায় লেপনাত্ ।  
কুষ্ঠং অরুচ্য শোষণং নেত্রাভিঘ্নাদ্ এতৎ ।  
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরায়রম্

অর্থাৎ একত্র অবস্থান, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস লাগা, একত্র ভোজন, এক শয্যা বা আসনে শয়ন বা উপবেশন, এক বস্ত্র, মালা বা অমুলেপন, চন্দনাদি ব্যবহার প্রভৃতি কারণে কুষ্ঠ, জ্বর, শোথ, নেদ্রাভিযান্দ (চোখ উঠা) এবং উপসর্গিক রোগ সকল এক ব্যক্তির শরীর হইতে অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উপরি উক্ত কারণে রোগ বীজ একেব শরীর হইতে অন্তরে শরীরে প্রবেশ কবে। পাশ্চাত্য চিকিৎসক গণের মতেও এক প্রকার জীবাণু একের শরীর হইতে অন্তরে শরীরে প্রবেশ কবিয়া ক্ষয় রোগ উৎপন্ন করে।

কিন্তু রোগবীজ শরীরে প্রবেশ করিলেই যদি রোগ উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে এতদিন পৃথিবী হইতে মানব জাতিব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত।

মানব শরীরে একটা পালিনী শক্তি আছে। সেই শক্তি শরীরের অনিষ্টকারক যাবতীয় কারণের ধ্বংস সাধন করিয়া শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। যতদিন সেই শক্তি প্রবল থাকে, ততদিন কোন রোগই শরীরকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতে পারেনা। বিবিধ অত্যাচারের ফলে দেহস্থ ঐ পালিনী শক্তি বধন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন সেই দুর্বল শক্তির বাধা অতিক্রম করিয়া দেহ প্রবিষ্ট রোগবীজ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

শাস্ত্রে যক্ষ্মারোগের চারিটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা সাহস, বেগরোধ, ক্ষয় এবং বিষমাশন। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক ভাবে বলা হইতেছে।

সাহস—নিজের শরীরে বেক্রপ বল, তাহার অতিরিক্ত বল-প্রয়োগ-সাধ্য কোন কাৰ্য্য করাকে সাহস বলে। গুরুভার বহন, অতিরিক্ত বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ (কুস্তি কদ), ক্ষতগামী অশ্বকে, বৃষকে বলপূর্বক ধাবন কদ, সম্ভরণ করিয়া মহানদী পার হওয়া—প্রভৃতি সাহস পদ কার্য্য।

এইরূপ সাহসের জন্ত বক্ষঃস্থলে ক্ষত হয় এবং বায়ু সেই ক্ষতকে আশ্রয় কবে। অনন্থর সেই বায়ু বক্ষঃস্থ গ্লেয়ার সহিত উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক দিকে প্রসরণ করে।

দেহে সকল মস্তকে আশ্রয় কবিয়া শূল, গলদেশে আশ্রয় কবিয়া কণ্ঠোক্তস (কণ্ঠ থুস থুস), কাস, স্বরভঙ্গ ও অরুচি, পাশ্চাত্য আশ্রয় করিয়া মলভেদ, সন্ধি আশ্রয় কবিয়া জৃমণ (হাই-উঠা) ও জ্বর, বক্ষঃস্থ আশ্রয় কবিয়া বক্ষোবেদনা উৎপন্ন করে। বক্ষে ক্ষত হওয়ার কাসের সহিত কফ মিশ্রিত রক্ত নির্গত হয় এবং কাসের সময় বক্ষে শূলনিবাতব্য বেদন অনুভূত হয়। শাস্ত্রে সাহসজ বক্ষারোগের এই একাদশ প্রকার উপদ্রবের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই সবগুলিই যে প্রকাশ পায় তাহা নহে।

বেগধারণ—লজ্জা, ঘৃণা বা ভয় বশত অধোবায়ু, মূত্র ও পুরীষের উপস্থিত বেগ ধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া এবং অত্যন্ত দোষের সহিত মিলিত হইয়া উর্দ্ধ তির্য্যক ও অধোদেশে প্রসারিত ক্ষয়রোগ উৎপন্ন করে।

প্রতিশ্রাব, কাস, স্বরভেদ, অরুচি, পাশ্চাত্য শিরঃশূল, জ্বর, অন্ধবেদনা, গা আড়া-ঝেড়া করা, বার বার বমি হওয়া এবং মলভেদ—এই সকল লক্ষণ—এইরোগে প্রকাশ পায়।

ক্ষয় যক্ষ্মা—অতিমাত্র শোক, চিন্তা, ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ক্রোধ, প্রভৃতি কারণে, কৃশ বৈক্লব উপবাস এবং ক্রমশঃ অন্ন পান-সেবন হেতু, জরিল প্রকৃতির অনাহার বা অনাহার হেতু, এবং অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস বশতঃ শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্তু কুপিত বায়ু অজ্ঞাণে পোষ্যের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষয় রোগ উৎপন্ন করে ।

ক্ষয়রোগে যক্ষ্মারোগে প্রতীক্শায়, জ্বর, কাস, ক্ষতমূদ্র, শিরোবেদনা, শ্বাস, মলভেদ, অরুচি, পাণ্ডুতা, স্বরভঙ্গ, এবং স্বল্প দেশে বেদনা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

বিষমাশন—কোন সময়ে অন্ন, কোন সময়ে মন্দিক, কখন বিকালে, কখন ছাপরে, কখন মৃদানে অহার করাকে বিষমাশন বলে । এই বিষমাশন ক্ষয় বোগের হেতু । বাতট বর্ণিতেন “অন্ন পান বিধি ত্যাগ” অর্থাৎ আহার ও পানের নিয়ম পরিত্যাগ যক্ষ্মারোগের হেতু । স্তব্ধা পানাহার সম্বন্ধে সর্বপ্রকার সন্ধিবন হইতেই যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে পারে । ঢপকে কথিত হইয়াছে যে, বিষমাহার বশতঃ প্রাণের প্রকৃতি হইয়া শরীরস্থ স্রোতঃ সকলের মূখ রুদ্ধ করে । স্রোতোমূখ রুদ্ধ হওয়ায় ভুক্ত দ্রব্য সম্যক রূপে শরীর পোষণ করিতে পারে না । পরন্তু অধিকাংশ মল-মূত্র রূপে পবিণত হয় । এইজন্ত পোষণভাবে দেহ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে ।

বিষমাশন জনিত যক্ষ্মারোগে প্রতীক্শায় মূখ দিয়া ধূপু উঠা, কাস, বমি, অরুচি, জ্বর, প্রক দেশে বেদনা, রক্তবমন, পার্শ্বদেশে এবং মস্তকে শূল নিবাং-বং বেদনা এবং স্বরভঙ্গ হয় । এই চারিটা কারণ বশতঃ যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয় । এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—

প্রাণিষ্ঠায়াদিপো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ ।

অর্থাৎ প্রতীক্শায় (সর্দি লাগা—নাক মুখ দিয়া জলপড়া) রোগ উপস্থিত হইলে কাস এবং কাসরোগ উপস্থিত হইলে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

ইহার সার্থকতা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করা যায়, সামান্য কারণ হইতে (যেমন একদিন জলে ভেজা বা অল্প কারণে ঠাণ্ডা লাগা)—পরিণামে উৎকট যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয় । ইহার কারণ রোগকে উপেক্ষা করা । ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি হইল, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সুস্থ ব্যক্তির হায স্নানাহার চলিতে লাগিল, হয়ত কিছু অত্যাচারও হইল, কলে কাস রোগ জন্মিল । সেই কাস রোগও উপেক্ষিত হইল, ক্রমে কুসুসু বিকৃত হইল, শরীরের রোগ প্রতিষেধক শক্তি কমিয়া গেল তখন কোনরূপে যক্ষ্মারোগেব বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে আর নিস্তার নাই । চাষ করা সার দেওয়া জমিতে উক্ত বীজ যেমন সহজে বৃক্ষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রূপ দেহে রোগ-বীজ সহজেই যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে । এই জন্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—

“রোগ জন্মিবামাত্র প্রতিকার করা উচিত সামান্য রোগকেও উপেক্ষা করিবে না ।

কারণ অগ্নি, শব্দ ও বিয়ের ছায় সামান্য রোগও মহান অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে ।”

সর্বপ্রকার কাস রোগই উপেক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে পারে । কাস নিদানে কথিত হইয়াছে, “সর্বপ্রকার কাস (বাতজ, পিত্তজ, ক্লেমজ, ক্ষতজ, এবং ক্ষয়জ পাঁচ প্রকার) উপেক্ষিত হইলে ক্ষয় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—

“অজীর্ণ অন্ন-দোষ বিধ । এই অজীর্ণ অন্ন

কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া যক্ষ্মা ও পীনসাদি রোগ সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে।”

পূর্বে সাহসাদি ক্ষয়রোগের চারিপ্রকার নির্দান বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই দুইটিও তাহার অন্তর্ভুক্ত। নচেৎ পূর্বোক্ত কারণ চতুষ্ঠয়ের অব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়ে। কাস রোগে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া কাস হইতে ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাও ক্ষয় বা যক্ষ্মা রোগের অন্তর্ভুক্ত।

অজীর্ণ হইতে যে ক্ষয় রোগ জন্মে, তাহাও এইরূপ বৃত্তিতে হইবে। কারণ অজীর্ণ অন্ন সম্যক জীর্ণ হয় না বলিয়া ধাতু সমূহের পোষণ করিতে পারে না। পোষণাভাবে ধাতু সমূহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। সুতরাং ইহাকে ক্ষয়জ যক্ষ্মা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

ক্ষয় দুই প্রকারে হইয়া থাকে ; যথা অম্ললোম ক্ষয় এবং বিলোম ক্ষয়। রস ধাতুর ক্ষয় ঘটলে পরবর্তী রক্তাদি ধাতুর ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। ইহাই অম্ললোম ক্ষয়। আবার শুক্র ধাতুর ক্ষয় ঘটলে পূর্ববর্তী মজ্জাদি ধাতুর ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। ইহাকে বিলোম ক্ষয় বলে। অতিরিক্ত ক্রীসহবাস, শোক প্রভৃতি কারণে শরীর শুষ্ক হইতে থাকিলেই তাহাকে ক্ষয়রোগ বলা যায় না। যতক্ষণ ক্ষয়রোগের বীজ পরীয়ে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয় না। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্ত শাস্ত্রকার পৃথক শোষ রোগের নির্দেশ করিয়াছেন।

“অতিরিক্ত ক্রীসহবাস, শোক, বান্ধকা, ব্যায়াম, পথ-পর্গাটন, উপবাস—এই সকল কারণে এবং ব্রণ ( ক্ষত ) ও উরঃক্ষত ( অতি-রিক্ত বলপ্রয়োগ করিয়া কার্য্য করার জন্য বক্ষের অভ্যন্তর ভাগে ক্ষত হওয়া ) হইতে শোষরোগ উৎপন্ন হয়” কোন কোন চিকিৎসক এইরূপ বলিয়া থাকেন।

বুদ্ধিমান পাঠক, লক্ষ্য করিয়া দেখুন যে, অতিরিক্ত ক্রীসহবাস, শোক, অতিরিক্ত বল প্রয়োগ পূর্বক কার্য্য করার জন্য বক্ষে ক্ষত হওয়া প্রভৃতি কারণে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, আবার ঐ সকল কারণে রোগ উপস্থিত হয়—নির্দেশ করা হইল, এই পার্থক্যের মধ্যে কি আছে? আছে “সংক্রামন্তি নরান্নরং”—রোগবীজ সংক্রমণ হওয়া চাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, আধুনিক যক্ষ্মারোগের জীবাণু তত্ত্ব শাস্ত্রকারদিগের সুবিদিত ছিল।

কেহ বলিতে পারেন যে, জীবাণুতত্ত্ব যদি সুবিদিতই ছিল—তবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই কেন? তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে, বর্তমানে আমরা কেবল আয়ুর্বেদের কঙ্কালটুকু মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আয়ুর্বেদের রক্ত-মাংস-মেদে কি ছিল না ছিল—তাহা কি করিয়া বলিব? জানি না আবার কতদিনে আয়ুর্বেদের কঙ্কালে রক্ত-মাংস-মেদ সংযুক্ত হইবে।

( ক্রমশঃ )

## সৃষ্টিযোগ ও টোটকা

ক্রিমিতে ব্যবস্থা।—(১) পালিধা মাদারবেদ পাতার রস প্রাতঃকালে পান করাও, শিশুদিগেব ক্রিমি সারিয়া বাইবে। ৫ বৎসরের শিশুব পক্ষে মাত্রা সিকি ঝিঙ্ক। উহার কম বয়সেব এক ঝিঙ্কের ৮ অংশ। (২) দাড়িমের শিকড়ের দ্বাখ পান করাইলে ক্রিমি মরিয়া যায়। উহার মাত্রাও পূর্ববৎ। (৩) পলাশ-বাজ ইন্দ্রাব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরাতা চূর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য দুই বতি এবং গুড় একআনা, একত্র সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৪) পলাশবীজ আধআনা ও বমানী একআনা একত্র কাংরা কয়েক দিন সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৫) ঘেটুপাতার রস ও আনারসের রসি পাণ্ডার রস এক একটি সিকি ঝিঙ্ক লইয়া দিক্দিগে মধুর সহিত মিশাইয়া শিশুদিগকে পান করাও,—ক্রিমি নষ্ট হইবে।

হৃদশূল ও হৃদরোগে।—(১) দুই-তোলা শুঠ, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান কর—হৃদশূল ও হৃদরোগ প্রশমিত হইবে। (২) অর্জুন ছালের গুড়া দুইআনা লইয়া একছটাক গরম দুগ্ধের সহিত পান কর—হৃদয়ের যন্ত্রণার আশু নিবৃত্তি হইবে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে ব্যবস্থা।—(১) কুশ মূল, কেশ মূল, শরমূল, খাগড়া মূল ও ইক্ষু মূল—প্রত্যেক দ্রব্য ১৮/১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে সহজে প্রশ্রাব

হইয়া মূত্রকৃচ্ছের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়। (২) গোম্বুর বীজ দুইতোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে এক আনা পরিমিত সোরা ফেলিয়া মিশাইয়া লইয়া পান কর,—মূত্রকৃচ্ছের যন্ত্রণার সত্তা শাস্তি হইবে। (৩) শ্বেত বেড়োলা দুইতোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া লইয়া পান কর, মূত্রকৃচ্ছের শাস্তি হইবে।

প্রমেহ চিহ্নংসা।—(১) ছুকা, কেশুর, নাটাকরঞ্জার ছাল, টোকাপানা, কৈবর্ত মূতা ও শেওলা—প্রত্যেক দ্রব্য ১/১০ সাড়ে পাঁচ আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান কর, শুক্রমেহ প্রশমিত হইবে। (২) হরীতকী, আমলকা, বহেড়া, (প্রত্যেক দ্রব্যের আটটি বাদ) সৌদাল ফলের শাঁস ও কিসমিস—এই পাঁচটা দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১৮/১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া একটু মধু মিশাইয়া পান কর—ফেনা যুক্ত মেহের সত্তা শাস্তি হইবে। (৩) দারুহরিদ্রা, বটম, হরীতকী, আমলা, বহেড়া (এই তিনটি দ্রব্যের আটটি বাদ) ও চিতামূল প্রত্যেক দ্রব্য ১/১০ সাড়ে পাঁচ আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কয়েক দিন পান কর,—প্রমেহের শাস্তি হইবে।

বহুমুত্রে যোগ।—(১) কলার এঁটের রস প্রাতে ছই তোলা ও বৈকালে ২ তোলা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন কর, উপকার হইবে। (২) পাকা কলা ২টা, আমলকীর

রস ২ তোলা, মধু ৮/১০ সাড়ে ছয় আনা, চিনি ৮/১০ সাড়ে ছয় আনা ও ছন্ধ এক পোকা একত্র মিলাইয়া কয়েক দিন সেবন কর,— বহুমুত্রে উপকার হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিভূষণ।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

দান।—মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত এ. চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী মিসেস চৌধুরী মহোদয়া সংপ্রতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিদর্শনে তৃপ্তি লাভ করিয়া বিজ্ঞান্যের উন্নতিকল্পে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

রোগীর হিসাব।—বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক ১৫ জনের মধ্যে ৬ জনের চক্ষুরোগ; প্রত্যেক ৫ জনের মধ্যে ১ জনের দন্তরোগ, প্রত্যেক ৬ জনের মধ্যে ২ জনের আল্জীব বুদ্ধি বা টনসিল রোগ এবং প্রত্যেক ৭ জনের মধ্যে ১ জনের করিয়া অস্ত্র ফুলা রোগ।

মাদক দ্রব্য।—সমগ্রবর্ষে গত ১৯১৫ খৃঃ অব্দে মদ বিক্রয় হইয়াছিল—৩১৩৯৫০০ সের, গাঁজা বিক্রয় হইয়াছিল—৯২০১৬ সের, অহিফেন বিক্রয় হইয়াছিল—৫২৮২৩ সের। ১৯১৬ খৃঃ অব্দে মদ ৩০১০০০০ সের, গাঁজা ৭৩২১৮ সের এবং অহিফেন ৪৩৪৭৯ সের। ১৯১৭ খৃঃ অব্দে মদ ৩১৮৫০০০ সের, গাঁজা ৭৫১৯৩ সের এবং অহিফেন ৩৮১১৮ সের। হিসাবে বুঝা যায়—বাঙ্গালা দেশ নেশায় মজ-পুল হইয়া পড়িয়াছে। গাঁজা ও আকিংখোর অপেক্ষা মাতালের সংখ্যাই হিসাবে অধিক।

মত্ততায় দণ্ড।—বাঙ্গালাদেশে মাতা-মির জন্ম ১৯১০-১১ খৃঃ অব্দে দণ্ড পাইয়াছিল ৯২৮৭ জন। ১৯১৫-১৬ খৃঃ অব্দে একপদ দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৯৩৭৮ জন এবং ১৯১৬-১৭ খৃঃ অব্দে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৯৮৬৫ জন। ইহার মধ্যে কেবল কলিকাতায় ১৯১০-১১ খৃঃ অব্দে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৮২১৬ জন; ১৯১৫-১৬ খৃঃ অব্দে ৬৭৬৩ জন এবং ১৯১৬-১৭ খৃঃ অব্দে ৬৯৬৫ জন। কলিকাতা বাঙ্গালার সকল স্থানের সেরা, কাজেই কলিকাতায় সব বিষয়েরই বাড়াবাড়ি।

শোকসভা।—৩৬তম প্রসাদ সেন কবি-রাজ মহাশয়ের জন্ম গত ৮ই বৈশাখ কলিকাতা ইন্ডাস্ট্রিসিটি ইনস্টিটিউট হলে এক বিরাট শোকসভা হইয়াছিল। অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক সর্গদ্বার জন্ম একটি স্মৃতি সংরক্ষণ করা হইবে সাব্যস্ত হইয়াছে।

কর্পোরেশনের সাহায্য।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান্যের দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের জন্ম কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এ বৎসর আড়াই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।



# আয়ুর্ষেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

২য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫—আষাঢ় ।

১০ম সংখ্যা ।

## স্বাস্থ্যরক্ষায় সমুদ্রতীর ।

— :: —

দরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া মুক্তাজাল  
ডুডাইতে ডুডাইতে গভীরগর্জনে বেলাভূমির  
দিকে পুনঃ পুনঃ সমুদ্র বেগে ছুটিয়া আসিতেছে,  
আবার নাথা আচ্ছড়াইয়া তীরস্থ বা' কিছু  
এইয়া মুহুর্তে সবিয়া যাইতেছে, আবার তরঙ্গ  
ধুঁকিতেছে, মুক্তাবৃষ্টি করিতেছে, তীরের দিকে  
ছুটিতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে, এ আসা-  
যাওয়ার বিয়ান নাই, এ লীলা-খেলার অন্ত  
নাই; অনন্ত অগাধ অকূল অসীম সমুদ্র  
আপনার লীলায়, আপনার খেলায় আপনিই  
বিহ্বল, আপনিই উন্মত্ত, আপনিই মোহিত !  
লহরে লহরে হীরা, চুল্লি, পান্নার গড়  
বাধিতেছে, পলকে ভাসিয়া দিতেছে,  
বুক দুলাইয়া আপনার মনে আপনি  
হাসিতেছে, শতব্রজধ্বনিকে ছাপাইয়া গভীর-  
গর্জনে নিজের বল বিক্রম বিশ্ববাসীকে  
বুঝাইয়া দিতেছে। চক্ষুঃ পলক তুলিয়া  
নিরন্তর এই দৃশ্য দেখিতে চায়, গড়ের মাঠে

ঘোড়ার মত সমুদ্রের বৃকে ছুটিয়া যায়, আকাশ  
নুইয়া পড়িয়া সমুদ্রের বৃকে আবারণের সৃষ্টি  
করিয়াছে; সেইখানে বাধা পাইয়া আবার  
ফিরিয়া আসে। সমুদ্রের বৃকে পলকে পলকে  
যে কত রঙের পরিবর্তন, কত রঙের একত্র  
সমাবেশ হইতেছে, কত রঙের কতরকমের  
ছোট বড় কত ধে উজ্জল চকচকে—রকরকে  
ফুল ফুটিতেছে, তাহা দেখিয়া চোখ ফিরিতে  
চায়না, দেখিতে দেখিতে পরিশ্রান্ত হয়না,  
অবসাদ পায়না, আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া  
থাকে।

বৃক্ষশুবকের চক্ষুও বালাকের চক্ষুর মত  
জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে, বিষয়ে সাগরে ভাসিয়া  
বেড়ায়। দৃষ্টিশক্তি তাহার পুনঃ পুনঃ নতুন  
নতুন খাত্ত পাইয়া বাড়িয়া উঠে, সবল হয়।  
সমুদ্রের বকঃস্থল অসীম, কেবল ধুঁক করিতেছে  
নাহু কোনস্থলেই বাধা পায় না, সমুদ্রের বৃকে  
অসীম নির্মল আকাশ পাইয়া কেবল বেগিয়া

বেড়াইতেছে, কাচস্বচ্ছ লবণাধুর তরঙ্গে শত শত স্বেতপদ্ম ফুটাইতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে সন্তরণ করিয়া আকাশ সাগরে ভাসিয়া পুনঃ পুনঃ আসিয়া মানবমানবীর সর্বদ্বন্দ্ব আঁকড়াইয়া পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিতেছে। বায়ুর সেই অনুস্মাণীত স্পর্শে সর্বদ্বন্দ্ব এক নবভাবে আসিতেছে, সন্তাপ ও জড়তা দূরে সরিয়া পড়িতেছে। বায়ু-হিল্লোলে ভাসিয়া মানবের কর্মাশক্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিতেছে। হস্ত, পদ, সবল হইতেছে, মনে ক্ষুধা ও উৎসাহ জন্মিতেছে। সমুদ্র গর্জনের বিরাম নাই, শতশত ঝড়, শতশত সাইক্লোন—সমুদ্রবক্ষে ঘনীভূত হইয়া অবিশ্রাম শব্দ উঠাইতেছে, তরঙ্গের উপরে সবেগে সবলে তরঙ্গ পড়িয়া শতকমানের ঘোরগর্জনে ছাপাইয়া নবীন মেঘের শতবজ্রপাতী ঘনগভীরধ্বনিকে নীচু নীচু করিয়া অনবরত গুড়ুম গুড়ুম শব্দ তুলিতেছে। এই শব্দরাশির ভিতরে পড়িয়া কর্ণের বিশ্রাম নাই, শব্দেও কঠোরতা নাই, জল ও বায়ুর মিলনে সেই গভীর ঘোরগর্জনের মধ্যেও কোমলতা আসিয়াছে।

গাভীর্ষ্য ভীষণতা ও কোমলতার একত্র মিলন ঘটাইয়াছে। এই গভীর ঘোর গর্জন গ্রহণে কর্ণ সমর্থ। কর্ণ প্রস্তুত হইয়া এই সব গ্রহণ করিতেছে, করিতে করিতে তাহার সামর্থ্য বাড়িতেছে, শক্তিবর্দ্ধিত হইতেছে। স্নানার্থী সমুদ্রজলে আবক্ষঃ মথ করিয়া সমুদ্রের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছে; সমুদ্র পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ তুলিয়া বেগে আসিয়া তাহার গায়ে ছুটয়া পড়িতেছে, সর্বদ্বন্দ্ব আঘাতিত করিয়া মাথার উপর দিয়া সেই পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ চলিয়া যাইতেছে, আবার ফিরিবার সময়ও সবলে নাকে, মুখে, লবণাধুর ঝটকা

লাগাইয়া স্থানভ্রষ্ট করিয়া আছড়াইয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। এইভাবে সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্নানার্থীর ব্যায়াম হয়, সেই ব্যায়ামে সর্বশরীর দৃঢ় হয়, শরীরে বলের প্রতিষ্ঠা হয়, লবণাধুর ঝটকায় লোমকূপগুলি পরিস্কৃত হয়, শরীরের মল অপসারিত হয়, নিয়তচঞ্চল ফেনি লবণাধুর পুনঃপুনঃ সবেগ-স্পর্শে শরীরে উত্তাপবৃদ্ধি পায়, বাতরোগ বিদূরিত হয়, আর যে সকল রোগ কীটাণু-পুঞ্জের আশ্রয়ে জন্মিয়াছে; সেই সকল রোগের কীটাণুপুঞ্জও জলোৎকার হাওয়া লবণাধুর সংস্পর্শে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। পচা জীবদেহে, পচা উদ্ভিদে, পচা আবর্জনায় ছুট কীটাণুর বর্দ্ধন হয়, অগাধ অসীম আবর্তনময় লবণাধুরাশির বক্ষে কিছুই পচিতে পারে না, তাহাতে ছুট কীটাণুরও অস্তিত্ব নাই।

যক্ষ্মার কীটাণু মাছবের ফুসফুস প্রবেশ করিয়া সেইখানে ঘরবাড়ী করিয়া লয় সত্য, কিন্তু কেবল সেই কীটাণুই মাছবকে মারে না; দূষিত বায়ুর রূপায় অস্ত্রজাতীয় ছুট কীটাণুও নাসারন্ধ্রের পথে ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মার কীটাণুর সহায়তা করে। এই বিবিধ কীটাণুর যুগপৎ আক্রমণ আর মাছব সহ্য করিতে পারে না, অল্পদিনেই তাহার ভবলীলার শেষ হইয়া যায়। সমুদ্রবক্ষে আবধ সঞ্চারী স্বচ্ছন্দ বিহারী বায়ুতে ছুট কীটাণুর স্পর্ক নাই; সুতরাং সেই নির্মল বায়ুগ্রহণে যক্ষ্মার কীটাণু আর নিজের সহায়তাকারী অন্তর্কীটাণু পাইতে পারে না। তাপের বৈষম্য বক্ষা-ক্রান্তের বিশেষ অপকারী, সমুদ্রে তাপের বৈষম্য নাই, সর্বদা তাপের সাম্যই তাহাতে বিরাজ করে। এই তাপসাম্যই সমুদ্রের বায়ু নাতিশীত, নাভূক্ষ। এই বায়ুই তাপ

হস্তাক্রান্তের উপকারী, হৃদরোগেও উপকারী, শ্বাস রোগেও উপকারী। কেন উপকারী বলিতে গেলে অল্পকথায় হয় না, অনেক কথা বলিতে হয়।

মেঘের উপরে মেঘ পড়াতে মেঘে যেমন বিচ্ছিন্নতাব সঞ্চার হয়; সেইরূপ তরঙ্গের উপরে প্রবলবেগে তরঙ্গ পড়াতে সমস্ত সমুদ্র বিছিন্নতাব হইয়া উঠে; সেই বিছিন্ন সাগরবিকারী বায়ুকে মুহূর্তে অল্পজ্ঞানে পরিণত করে, আবার বিচ্ছিন্নতাব সংস্পর্শে সেই অল্পজ্ঞান বায়ু মুহূর্তে ওজন (ভঙ্গপ্রবণ বায়ুতে) পরিণত হয়। ওজন আবার দূষিত পদার্থের সম্মুখীন হইলে মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া 'ও' রূপ (বায়ুবিশেষের রূপ) ধারণ করে। এই 'ও' এর এত শক্তি বাড়ে যে, সে সেই ছোট কীটাপুণাশিকে ও তাহার বিষকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়। সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রে, চিকিৎসাশাস্ত্রে বা কাব্যসাহিত্যে অল্পজ্ঞান, ওজন 'ও' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত কোন শব্দ এ পর্যন্ত স্পষ্টত: পাই নাই। না পাইবার অনেক কারণ আছে, জল-বায়ুদোষে অনেক পুস্তক নষ্ট হইয়াছে, অনেক পুস্তক অগ্নি ও কীটে নষ্ট করিয়াছে, রাশিরাশি পুস্তক বর্ষের সেনানীর হস্তে অগ্নিসাং হইয়াছে, অনেক পুস্তক অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবে হতাদরে জীর্ণ হইতে হইতে বৃত্তান্তে পড়িয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার অনেকগুলি দুর্বল, জলন্ত পুস্তকের মধ্যেও সকলগুলি পুস্তকে চক্ষু: সংযোগ হয় নাই, চক্ষু:সংযোগ হইলেও সমস্ত অংশের অর্থবগতি করিতে সামর্থ্য হয় নাই। নয় ত যে আর্ধ্য ঋষিগণ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বান এই পাঁচপ্রকারে ও নাগ, কৃষ্ণ, বৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই পাঁচপ্রকারে বায়ুকে

বিভক্ত করিয়াও সন্তুষ্ট হয়েন নাই, আবার উনপঞ্চাশৎ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা যে সামান্য অল্পজ্ঞান, ওজন 'ও' জাতিভেদ না, একথা বলিতে পারি না। নী জানিলেই বা কেন তাঁহারা ধর্ম-ব্যাজে সমুদ্র-তীরে বাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন? যে বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরা জীবন রক্ষা করি; তাহার নাম প্রাণবায়ু, বাহা ত্যাগ করি, তাহার নাম অপানবায়ু। এই প্রাণবায়ুকে কি অল্পজ্ঞান বলা যাইতে পারে না? স্বাস্থ্যের কথা বলিলে, রোগবিনাশের কথা বলিলে, শরীর রক্ষার কথা তুলিলে, ধর্মপ্রাণ ভারতের নরনারী শুনিবে না; জগতের একান্ত কল্যাণ কাম ঋষিবৃন্দ সেইজন্ত সেই কথা না উঠাইয়া সমুদ্রকে তীর্থরাজ বলিয়াছেন। সমুদ্রের জলে দাঁড়াইয়া অর্ধমর্ষণ মন্ত্রজপ ও সন্ধ্যা তর্পণ করিবার বিধিপ্রদর্শন করিয়াছেন, পুণ্যতীর্থ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, পুণ্যতিথিতে অব-গাহন স্থানের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সমুদ্রে স্নান, দান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, পূজা—যাহা করিবে, তাহাতেই অনন্ত ফল হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, দুন্দুভিনাদে এইরূপ ঘোষণা করিয়াও তাঁহারা পরিতুষ্ট হয়েন নাই; মহারাজ ইন্দ্রচান্দকে আদেশ করিয়া সমুদ্রতীরে দেবাদিদেব পুরুষোত্তমের ত্রিমূর্তির স্থাপন করাইয়াছেন। শক্তির উপাসকদিগকে পাঠভূমি বলিয়া বিমলাক্ষ অধিষ্ঠান বিমলাক্ষেজ বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, আবার শৈবদিগকে সপ্তকলান্তকীর্ষী মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রয় দেখাইয়া মার্কণ্ডেয় পুজিত মার্কণ্ডেয়েশ্বরের পূজার উপদেশ দিয়াছেন, ও এখানে অবস্থিতি করিলে অমায়ুও দীর্ঘজীবন লাভ করে ইঞ্জিত করিয়াছেন। সমুদ্রতীরে অদূরে সৌরদিগের জন্ত কোণার্কের

ভাস্করক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। গাণপত্য-দিগের জন্তও গণেশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া কি বলিব, আৰ্য্য ঋষিগণ সমুদ্রতীরে বাসের উপকারিতা জানিতেন না? সমুদ্রজলে অবগাহনের রোগ-সংহারতা বুঝিতেন না? ধর্মশাস্ত্রের অনেক উপদেশেই যে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থা নিহিত আছে, যিনি মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত পূর্বমীমাংসা অধ্যয়ন করিয়াছেন; তিনি তাহা জানেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে বাস করিবার জন্ত ঋষি বলিয়াছেন, “সংবৎসর মুপেখিত্বা মাসত্রয় মথা পিবা। তেন যষ্টং হৃতং তেন তেন তপ্তং তপো মহৎ। সযাতি পরমং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ। যে ব্যক্তি সংবৎসর কাল, অগত্যা তিন মাস কাল এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিয়া (অন্ত্র না যাইয়া) অবস্থান (উহ) ক্ষরে; তদ্বারা সে মহতী দেবপূজা, মহাবজ্র, মহতীতপস্তা করিয়াছে; যেখানে যোগেশ্বর হরি বাস করেন; দেহাবসানে (উহ) সেই পরমস্থানে তাহার গতি হয়।

“বার্ষিকং চতুরোমাসান্ যাবৎ স পুরুষোত্তমে। কাশীবাস যুগান্তাটো দিনেনৈ কেন লভাতে।” আটবৃগ পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিলে যে পুণ্য হয়; বৎসরে চারিমাস পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিলে তাহার একদিনে সেই পুণ্য হয়।

“বট সাগরয়ার্মধো যে ত্যজন্তি কলেবরং। তে হ্রলভংপরংমোক্ষমাপ্নু রন্তি ন সংশয়ঃ।” অক্ষরবট ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে যে সকল ব্যক্তি দেহত্যাগ করে; তাহার পরম হ্রলভ মুক্তি লাভ করে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কত বচন দেখাইব? উদ্ধৃত বচন কয়েকটির জ্বায় পুরাণ শাস্ত্রে অনেক বচন আছে, অনেক

আখ্যায়িকা আছে। বিমলস্বাস্থ্যে বাধাব দেহপুষ্ট, মনঃ হৃষ্ট ও সবল; সে কখনও মৃত্যুর জন্ত চিন্তা করে না, মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হয় না, যাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, উৎকটরোগের হাতে পড়িয়া চিকিৎসায় যাহার কোন ফল হইতেছে না; সেই ব্যক্তিই মৃত্যুদম্ভবীন হইতেছে মনে করে, মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হয়; তাহাকেই ঋষি “বটসাগরয়ার্মধো” ইত্যাদি বলিয়া মোক্ষের প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া রোগমুক্তির উদ্দেশে সমুদ্রতীরে বাসের ব্যবস্থা দিতেছেন। যিনি একবৎসরকাল—অন্ততঃ তিনমাসকাল সমুদ্রতীরে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সকলের পক্ষে প্রতিবর্ষে চারিমাস সমুদ্রতীরে বাসকরা কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে কতদূর পারদর্শিতা ছিল তাহা বিস্তৃত হইতে হয়, ঋষিদিগের উপরে ভক্তিশ্রোতঃ বর্ধিত হইয়া পড়ে।

“প্রাণস্বং সর্বভূতানাং যোনিঃ সৱিতাপতিঃ।

তীর্থরাজ নমস্তভ্যং ব্রাহ্মামৃত্যুতপ্রিয়।

“ত্বমগ্নি দ্বিপদাং নাথ রেতোধাঃ কাকদীপন।

প্রধানঃ সর্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরবায়ঃ।

“অমৃতস্তারণিস্বংহি দেবযোনি রপাং পতিঃ।

যুজিনং হরমে সর্বং”—

“অগ্নিশ্চ তেজো বড়বাচ দেহো রেতোধাঃ।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

তুমি সকল প্রাণীর প্রাণ; সকল প্রাণীর উৎপাদক, অমৃতপ্রিয় (ভগবানের প্রিয়, রা চ্যুত হয় না প্রিয় বাহা হইতে) তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার নিত্যরক্ষক। হে নাথ, তুমি বিপদদিগের (মহুস্ত্রদিগের) অগ্নি, তুমি তাহাদিগের রেতোধাঃ (বীরধারবাহী বা বীর্যদানকারী); তুমি ভাষ্যদ্বিপন কাকদীপন ( কাকের, অমৃতপ্রিয়, প্রধান)

শ্রব—উদ্ভীপক ) পঞ্চভূতের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ, তুমি সর্বজীবের প্রভু (রক্ষাকর্তা) তুমি সমস্ত পাপ নষ্টকর। সমুদ্রই অগ্নি, সমুদ্রই বড়বা; সমুদ্রই দেহ, সমুদ্রই রেতোধাঃ।

যখন বায়ুকে প্রথমে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একটি বায়ুর নাম প্রাণ বলা হইয়াছে। তখন বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত নাহিতো যে বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলা হইয়াছে, সে জগৎ প্রাণ অর্থে সমস্ত বায়ু নহে, বায়ু বিশেষ। এই বায়ু সমুদ্রে নিয়ত উৎপন্ন হইয়াছে, এইজন্য মস্ত্রে সমুদ্রকেই প্রাণীর প্রাণ বলা হইয়াছে। “অপেষশ্চ মহোদধিঃ” ইত্যাদি বলিয়া ঋষি সমুদ্রের জলপান অকর্তব্য বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন। লবণ স্বাদ ও তিক্তস্বাদ বর্ণিয়াই কেবল নিষিদ্ধ নহে, অজীর্ণতার উৎপাদন করে বলিয়াও সমুদ্রজল নিষিদ্ধ, একরূপ অবস্থার কাকের জঠরাগ্নির স্থায় সমুদ্র জঠরাগ্নির উদ্ভীপক কি করিয়া হয় চিন্তা করিবার বিষয়। সমুদ্রতীরে বাস করিলে নানাপ্রকারে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, শরীরের উন্নতি, শারীরিক যন্ত্রের উন্নতি হয়, শরীর সবল হয়। ঋষি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন; “জীর্ণস্থচৈরোরগঃ” সর্প যেমন পুরাতন ঝক্ ত্যাগ করিয়া নব কলেবর লাভ করে; সমুদ্রতীরে বাস করিলে মানুষও সেইরূপ পূর্ব শরীর ত্যাগ করিয়া নব কলেবর লাভ করে। শারীরিক বল লাভ করিলে তাহার জীর্ণ করিবার শক্তিও বাড়ে; এইজন্য মস্ত্রে “কাকদীপনঃ” পদ রহিয়াছে, আর যদি “কাকদীপনঃ” না হইয়া “কাম দীপনঃ” পাঠ হয়; তবে আর তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্ত বেগ পাঠিতে হয় না। “অমৃতস্মারণি” অর্থ কি? ভাববাচ্যে ক্র প্রত্যয় করিলে মৃত অর্থে মৃত্যু বঝায়, মৃত্যুর অভাব অমৃত; অমৃত্যু অর্থ

জীবন, জীবন আত্মা নয়। মোটরকার বা টেনের কল বিগড়াইলে বা তাহাতে তাপ না থাকিলে কেহ তাহাতে আরোহণ করে না; সেইরূপ শরীরের যন্ত্র বিগড়াইলে বা তাপ না থাকিলে তাহাতে আর আত্মার অধিষ্ঠান থাকে না; সুতরাং শরীর যন্ত্রের পরিচালন ও শরীরস্থ তাপই জীবন। সমুদ্র—হৃদয় হৃদয় যন্ত্রের উপকারক; এজন্য সমুদ্রকে অমৃতের অরুণি বলা হইয়াছে। আর্ঘ্য বিজ্ঞানে অগ্নি, বিদ্যাৎ, তাপ—এ সমস্তকে সামান্যতঃ অগ্নি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাপ যখন অগ্নি—তাহাকে জালাইবার জন্ত কাষ্ঠ চাই, এই কাষ্ঠ সমুদ্র; কাষ্ঠেরই নামান্তর অরুণি। সমুদ্র মন্বনের আধ্যাত্মিক ভারতবাসী মাত্রেই অবগত রহিয়াছে। এই মন্বন কার্যের পরিসমাপ্তি আজও হয় নাই। তরঙ্গের উপরে তরঙ্গের সবেগে পতন ও সেইরূপ আলোড়নই সমুদ্র মন্বন; সেই মন্বনের ফলে বিদ্যাতের আবির্ভাব, তাহার ফলে বিশুদ্ধ অম্লজানের আবির্ভাব; সেই অম্লজানই অমৃত—সুখ। নাশারক্কে সেই সুখ পান করিয়া মানব অমরত্ব লাভ করে, এতদ্ব্যতীত আমরা সেই মন্ত্রস্থ “অমৃতস্মারণি” এই পদ্যের অর্থে অবগত হই। সমুদ্রস্থ বিদ্যাতের নাম বাড়বাগি ও ফস্ফরাসের নাম ঔষধ।

বড়বা শব্দের অভিধানিক অর্থ ঘোটকী; সমুদ্রের তরঙ্গগুলি ঘোটকীর মত তীরের দিকে ছুটিয়া আসে; সেই জন্ত কবির ভাষায় তাহাকে বড়বা বলা হইয়াছে। সেই বড়বা হইতেই সামুদ্রিক বিদ্যাতের উৎপত্তি; সেইজন্য তাহার নাম বাড়ব। সেইজন্য মস্ত্রে সমুদ্রের সমস্ত দেহকেই বড়বাময় বলা হইয়াছে। “রেতোধাঃ” শব্দের অর্থ = স্পষ্ট। শাস্ত্রে বড়বা

বিধানের উদ্দেশ্যেও সমুদ্রতীরে রোগীর পক্ষে বাসের ব্যবস্থা; আগুন জ্বালাইয়া আগুনের কাছে বসিয়া স্বহস্তে পাক করিলে তাপের বৈষম্য হইবে; এইজন্য স্বয়ং পুরুষোত্তম প্রকাণ্ড হোটেল খুলিয়া বসিয়াছেন। শাস্ত্রকার ঋষিরাও উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, এই ক্ষেত্রে পাক করিয়া থাইবে না, থাইলে পাপ হইবে, এই হোটেলের অন্ন না থাইলেও পাপ হইবে। উড়ে ঠাকুরেরা সম্প্রতি বঙ্গ গৃহিনীদের শিষ্যে আদ্যার সস্তার প্রভৃতি শিখিয়াছে; পূর্বে জানিত না, তাহাদিগের পূর্ষ পুরুষেরাও জানিত না; আদি ঠাকুর ও আদি ঠাকুরাণী আর কি করিয়া তাহা জানিবেন? তারপর তাহাদিগের হাতের আগাও নাই, কণ্ঠে সৃষ্টে

না হয় একবার হাঁড়ী উঠাইতে ও নামাইতে পারেন; পুনঃ পুনঃ নামান উঠান তাহাদিগের সাধ্যাতীত; কাজে কাজে সস্তার, সাতসান প্রভৃতি তাহাদিগের দ্বারা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এজন্য ইন্দুমাধব মল্লিকের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের জন্মবার যুগ যুগান্তর পূর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ইউপিচ্ছুকারে তাহারা সেই হোটেলের অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্তই রাখিতেন। এখন তাবিয়া দেখুন, এইরূপ প্রসাদী অন্ন ব্যঞ্জন কত সহজে হজম হয় যাইতে পারে; রোগীর পক্ষেও ভাল, ভোগীর পক্ষেও ভাল। এক প্রসঙ্গে অনেক বলিলাম, আর বলিব না, আধ্যাত্মিকতার কথা আর উঠাইব না।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

## সার্জন-সুশ্রুত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

—:—

(ধাত্রী-বিদ্যা।)

ধাত্রী বিদ্যায় সুশ্রুতের কিরূপ পারদর্শিতা ছিল, নিম্নে তাহার একটু আভাস দিতেছি।

সুশ্রুতগর্ভস্থিত মৃত সন্তান বাহির করিয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেছেন; —“যদি গর্ভস্থ মৃত সন্তান হাতের সাহায্যে বাহির করিতে না পার, তাহা হইলে অস্ত্র দ্বারা ক্রণ ছেদন করিয়া বাহির করিবে। কিন্তু সাবধান—সন্তান জীবিত থাকিলে, কখনও অস্ত্র প্রয়োগের চেষ্টা করিও না, তাহাতে গর্ভ ও

ও গর্ভিণী উভয়েরই বিপদ ঘটতে পারে। মৃত সন্তান প্রসব করাইবার পূর্বে, গর্ভিনীকে মধুর বচনে আশ্বস্ত করিবে। তাহার পর মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রের দ্বারা ক্রণের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে, এবং ঋপর স্তম্ভি খণ্ড খণ্ড করিয়া শব্দ অর্থাৎ আকর্ষণী অস্ত্রের সাহায্যে বাহির করিবে। শেষে বক্ষঃস্থ কক-দেহ ধরিয়া ধীরে ধীরে মৃত সন্তানকে বাহির করিবে। যদি মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া

গাছা হইলে অক্ষিপুট ও গণ্ডদেশ ধরিয়া স্থানকে বাহিরে আনিবে। সন্তানের স্বক্ৰদেশ মপতা পথে আবদ্ধ হইলে, বাহুদ্বয় ছেদন করিবে। ক্রশের উদর বায়ু কর্তৃক ফুলিয়া গাকিলে, তাহা চিরিয়া অস্ত্র সমূহ বাহির, করিয়া ফেলিবে। ইহাতে শিশুর দেহ শিথিল হইয়া পড়ায় তাহাকে অনারাসে বাহিরে আনা যায়। জঘন-দেশ দ্বারা অপত্য পথ অবরুদ্ধ হইলে, জঘনাস্থি ছেদন করিবে। \* \*

মৃতগর্ভ নিকাশনের পক্ষে মণ্ডলাগ্র অস্ত্রই খুব ভাল। তীক্ষ্ণগ্র বিশিষ্ট বুদ্ধি পত্র অস্ত্র প্রয়োগে গভীরকে আঘাত লাগিতে পারে। ”

অতি সংক্ষেপে আমি মহর্ষির উপদেশের মধ্যমূলাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। বলিতে লজ্জা হয়—সেই সুশ্রুতের বংশধর আমরা—গর্ভস্থ মৃত সন্তান ছেদনের কথা শুনিতে এখন আমাদের হৃদ কম্প হইয়া থাকে। প্রেসব-সাধনের প্রধান অস্ত্র মণ্ডলাগ্রের আকারও আমরা চক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইলাম না! এমন আমাদের হৃভাগ্য!

### বন্ধন ।

পতন, আঘাত প্রভৃতি কারণে দেহের অঙ্গ সমূহ ভগ্ন হইলে, “বন্ধনের” প্রয়োগ করিতে হয়। বন্ধনের ইংরাজী নাম Bandage. অস্ত্র প্রয়োগের পর আহত বা ক্ষত স্থানেও অস্ত্র চিকিৎসকগণ বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সুশ্রুত এই বন্ধন ব্যাপারেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাহার গ্রন্থে অনেকগুলি বন্ধনের নাম পাওয়া যায়। যথা;—১। কোশ বন্ধন, ২। দাম বন্ধন, ৩। স্বস্তিক বন্ধন, ৪। তম্বু বেস্তিত বন্ধন, ৫। ছ তোলা বন্ধন, ৬। মণ্ডল বন্ধন, ৭। সুগিকাবন্ধন, ৮। বচক বন্ধন, ৯। খট্টা বন্ধন, ১০। টীল

বন্ধন, ১১। বিবন্ধ বন্ধন, ১২। বিতান বন্ধন, ১৩। গোফণা বন্ধন, ১৪। পঞ্চাঙ্গী বন্ধন। এই সকল বন্ধনের প্রণালীই যুরোপের ডাক্তার-গণ ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক কাছের বহুগুণ পূর্বে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ” “ভারতী” পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, মহাশয় চিত্রের সাহায্যে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

সুশ্রুত বন্ধন কার্যের জন্ত প্রয়োজনমত—কার্পাস বস্ত্র, মেঘ লোম নির্মিত বস্ত্র, রেশমী-ক্ষৌম বস্ত্র, চর্ম, বংশাদির চটা বা চেয়াড়ী, সুত্র, লৌহ এবং কাষ্ঠ ফলক প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। দেহের স্থান বিশেষে যেরূপ যেরূপ বন্ধন সু-নিবিষ্ট হইতে পারে, সুশ্রুত তাহা উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। এই সকল বন্ধন আবার তিন প্রকার ছিল। যে বন্ধন খুব শক্ত অথচ বেদনা প্রদ নাহে, তাহার নাম ছিল—“গাঢ় বন্ধন”। যে বন্ধনের ভিতর দিক ফাঁপা থাকিত তাহার নাম “শিথিল বন্ধন”। যে বন্ধন খুব শক্তও নাহে, শিথিলও নাহে—তাহার নাম “সমবন্ধন”।

সুশ্রুত শুধু সার্জন ছিলেন না, তিনি এক জন ফিজিসিয়ান ও ছিলেন। সুশ্রুত সাংহিত্য কণ্ড চিকিৎসার অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। কায় চিকিৎসক-শিরোমণি চরক ৫০০ ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন, ৩৭টা ঔষধে সুশ্রুত ৭৬০ টা ঔষধ বর্ণনা করিয়াছেন। সুশ্রুতের গ্রন্থে আমরা বিবিধ লবণ, খাতু জন্ম, এবং নান্ন খনিজ পদার্থের ঔষধার্থে প্রয়োগ দেখিতে পাই।

### সুশ্রুতের মতের আদর ।

আজকাল যে সকল রোগে অস্ত্র প্রয়োগ অতি কঠিন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুশ্রুতের মতের আদর

থাকেন, সূক্ষ্মতের সময় তাহার অধিকাংশই প্রচলিত ছিল। major operation. Amputation Abdominal Section—সূক্ষ্মত এসব ভালরকম জানিতেন। ১৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ও—ভারতে সূক্ষ্মতের অস্ত্র চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। পাঠক মহাশয় বল্লাল পণ্ডিতের “ভোজ প্রবন্ধ” পড়িলে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন সূক্ষ্মত এবং তাঁহার মতাবলম্বী শল্য বৈদ্যগণ রোগীর শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্বে, “সন্মোহিনী” ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর জ্ঞান তিরোহিত করিতেন। অস্ত্র চিকিৎসার পরে, “সঞ্জীবনী” নামক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার রোগীর চেতনা সম্পাদন করিতেন। এখন ডাক্তারদের “ক্লোরোফর্ম” “সন্মোহিনার” স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু “সঞ্জীবনীর” ছায় কোনও ঔষধ অদ্যাবধি যুরোপের Pharmacopoeia তে দেখিতে পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় ষড়্বেকের প্রারম্ভে আরব দেশের বিখ্যাত চিকিৎসক সিরায়িন, স্ব প্রণীত চিকিৎসা-গ্রন্থে, সূক্ষ্মত ও চরকের বহু মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আফলাতুন (Alhutoon) নামক মুসলমান চিকিৎসক নবম শতাব্দিতে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহার গ্রন্থে সূক্ষ্মত প্রভৃতির নাম সসম্মানে উল্লিখিত হইয়াছে। ৭ম শতাব্দিতে খালিফ আল মল্লুরের আদেশ, “সূক্ষ্মত সংহিতা” আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। ঐ গ্রন্থ “খালেদ শাওর আল হিন্দী” [Khalale Shaw shooral-Hindi] নামে পরিচিত। এই সময় “চরক” প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই সকল অনুবাদিত গ্রন্থ আবার ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদিত হয়। সেই

সকল অনূদিত গ্রন্থই যুরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুদূর ভিত্তি। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, যুরোপে চিকিৎসা শাস্ত্র, ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ—মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গোড়ার কথাটা যাহারা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান না, “আয়ুর্বেদের” বিজ্ঞান রক্ষা যাহাদের ভেদ করিবার শক্তি নাই, আয়ুর্বেদের বিরাট বিস্তৃতি যাহারা কখনও চক্ষেও দেখেন নাই, কেবল সেই ক্ষীণ বুদ্ধি, মোহ মূগ্ধ ব্যক্তির কাছেই আয়ুর্বেদ—Quackery! প্রার্থনা করি ভগবান্ এরূপ আত্মঘাতী মানবের মনোদৈর্ঘ্য নিবারণ করুন। ইহার আয়ুর্বেদের অঙ্গে বিশ্বরূপের প্রকট মহিমা দেখিয়া জীবন সার্থক করুক।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহাত্মা মুহম্মদ মন্থর আবদুল্লাহ সিরাজী সাহেব, সম্রাট সাহজাহানের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন।, ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তিনি যে “আল্ ফাজেল আদ্বী” [Alfazel Adwiche] নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সূক্ষ্মতাক্ত অনেকগুলি ঔষধই গৃহীত হইয়াছে। সম্রাট্ গুরুজ্ঞানের প্রিয়তম হাকিম মুহম্মদ আকবর মার্কানি, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে “কারাবাদিন্ কাদেরি” (Karabadino Kaderi) নামক গ্রন্থে সূক্ষ্মতের বহু ব্যবস্থা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বেশ বুঝা যায়—অবশিষ্ট দিনেও, মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হিন্দু আয়ুর্বেদ কত আদৃত ছিল।

সূক্ষ্মতের প্রতিসংস্কর্তা কে? আমরা দেখিলাম—সূক্ষ্মত প্রকল্পের কাদের বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক



রসায়ন-শাস্ত্রে তাঁহার রীতিমত অধিকার ছিল। কিন্তু তাহার গ্রন্থখানি কেবল চিকিৎসা-শাস্ত্র নহে,—তাহাকে ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র, এমন কি সকল শাস্ত্রের সমন্বয় বলিতে পারা যায়। বিশ্ব রহস্যের বিপুল আবর্তনে—তাঁহার ঋষি পণ্ডিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব তেদীনো দূব প্রসারিণী অক্ষুণ্ণ দিবা দৃষ্টি—মানব-মস্তকের মায়ালোকে প্রবেশ করিয়া, যে অপার্থিব রহস্যজ্ঞি আহরণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহারই অমর-রথ-রেখাময়ী সংহিতা ধানিকে জগতের চিরন্তন সম্পত্তিরূপে পরিণত করিয়াছে! যিনি সুশ্রুত পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ জ্ঞান—কেবল মানব দেহ হইতেই লাভ করা যায়। সুশ্রুতের প্রত্যেক “দ্বন্দ্ব”—প্রতিভার জ্বালাময় ফুৎকারে উদ্দীপ্ত-চেতন, প্রত্যেক অধ্যায়—বিজ্ঞানের হিল্লোলে ও কল্লোলে স্পন্দমান, প্রত্যেক শ্লোক ওকারের মত পবিত্র। সুশ্রুতের ভাষা সুন্দর, সরল, যেন অবিরাম গতিতে অনাবিল জলস্রোতের জার কলকলে ছুটিয়া চনিয়াছে! তাহাতে আবেগ আছে, আবর্ত নাই, কল্লোল আছে, কোলাহল নাই। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে—সুশ্রুতের সকল কথা আলোচনা করিতে পারি, আমার সে শক্তি নাই। সুতরাং সমালোচনা হিসাবে আজ আমার ক্ষীণ উদ্যম নিতান্তই নিম্নল। আমার সোভাগ্য—বোবনোয়েষের সঙ্গে সঙ্গে আমি সুশ্রুত পাঠের একটু সামান্য অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। ভিৎক কুল তিলক পাতিলপাড়া নিবাসী শ্রীমল্লেক নাথ মল্লিক মহোদয়ের চরণ তলে বসিয়া অল্পটু অভ্যর্থনায় আমি সুশ্রুতকে বন্দনা করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সাধক যেমন একে একে পদবীজ মালার এক একটা বীজ ধরিয়া

মস্তকের আবৃত্তি করে, আমিও তেমনি এক একটা করিয়া সুশ্রুতের মহাগ্রন্থিক মালা জীবন-মস্তকের মত উচ্চারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কৈ সিদ্ধিলাভ করিতে ত পারি নাই। এখনও ইচ্ছা হয়—যোগ্যগুরুর মুখোদয়ী সুশ্রুতোক্তি-কর্ণভূষণ করিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করি। কিন্তু হয়, সেরূপ গুরু বে আর খুঁজিয়া পাইনা। সে ঋষির আত্মা যে চিরদিনের মতই নেপথ্য-চারী হইয়া রহিয়াছে!

সুশ্রুত সঘর্ষে আর আমার একটা কথা বলিবার আছে। বৈদ্য সমাজের বিশ্বাস—বৌদ্ধ নাগার্জুন সুশ্রুত সংহিতার প্রতি সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। আমি কিন্তু এ মত সমর্থনের কোনও প্রমাণ এ পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই। আপনারা বলিবেন,—“কেন প্রমাণের অভাব কি? সুশ্রুতের টীকাকার স্বয়ং ডল্লনাচার্য্যইত এ কথা বলিয়া গিয়াছেন।” আমি কিন্তু ডল্লনাচার্য্যের কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইতে অক্ষম। কেননা, ডল্লনাচার্য্য নাগার্জুনকে যে সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার কর্তা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারই যেন সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। সুশ্রুতের এক স্থানে “স্বভূতি গোতম” এই নামটি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেই যত গোচরযোগ্যের স্মৃতি মহাত্মা চক্রপাণি দত্ত—সুশ্রুতের টীকাকার গণের অন্ততম। নাগার্জুন—সুশ্রুতের প্রতি সংস্কর্তা—ডল্লনের এই কথার চক্রপাণিও একটি সন্দেহ হইয়াছেন।

সংহিতাএই সাধারণতঃ চারিপ্রকার পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারি প্রকার পুস্তক মধ্যে প্রথম সংস্কর্তার রচিত এবং দ্বিতীয় প্রকার

জানেন। অগ্নিবেশ কৃত পংহিতার মহর্ষি চরক সংস্কার করিয়াছিলেন, আবার চরক সংহিতারও অংশ বিশেষ “দ্রুতবল” কর্তৃক প্রতি-সংস্কৃত হইয়াছিল। চরক গ্রন্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সূত্রগ্রন্থে সেরূপ স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সূত্রগ্রন্থের প্রতি সংস্কর্তা থাকিলে সূত্রগ্রন্থেই তাহার উল্লেখ থাকিত। অনেকে “সুভূতি গোতম” নামক বুদ্ধদেবের শিষ্যকে সূত্রগ্রন্থের প্রতি সংস্কারক বলেন। কিন্তু ইহাকেও প্রমাণ বলা যায় না। বরং অসুমান বলা চলে। বিশেষতঃ গোতম নামটি বংশ পরিচায়ক, শাক্য সিংহের বহুকাল পূর্বে উহা যে বর্তমান ও প্রসিদ্ধ ছিল একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে—সূত্রগ্রন্থ সংহিতার সর্বত্রই আমরা সনাতন বৈদিক ধর্মের অনুশাসন দেখিতে পাই। বৌদ্ধ নাগার্জুন যদি সূত্রগ্রন্থের প্রতি সংস্কার করিবেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ থাকিত না। বেদ বিরোধী বৌদ্ধ কর্তৃক বৈদিক অনুশাসন কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। সূত্রগ্রন্থের কোন স্থানেই—বৌদ্ধ ধর্মের একটু আভাষও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আবার নাগার্জুনও একজন ছিলেন না। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ—অনেকগুলি নাগার্জুন প্রত্নতত্ত্ব করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি নাগার্জুনকে সূত্রগ্রন্থের সংস্কারকর্তা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়—তবে তিনি কোন্ নাগার্জুন? বুদ্ধ, চক্রপাণি প্রভৃতি উক্ত কালীন তত্ত্বকারগণ এক নাগার্জুনকে ‘আচার্য্য’ ‘রসায়নবেত্তা’ ‘মুনীজ্ঞ’ ইত্যাদি সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। নাগার্জুন বহুশব্দের প্রয়োগ। কিন্তু রসায়নবেত্তা নাগার্জুন আর

বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন কি একই ব্যক্তি? আমরা “যোগসার” নামক একখানি গ্রন্থ পড়িয়া দেখিয়াছি, উহা নাগার্জুন নামের জনৈক আচার্য্যের লেখনী গ্রন্থত। এই গ্রন্থে মাধবকর, ‘চক্রপাণি’ বঙ্গসেন প্রভৃতি নব্য পণ্ডিতগণের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি আবার কোন্ নাগার্জুন? নাগার্জুন—যিনি রসায়নবেত্তা বলিয়া বিখ্যাত—তিনি ত ষাণ্ডভটের ও পুরোবর্তী।

সূত্রগ্রন্থে অনেক পাঠ পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্রগ্রন্থেই সূত্রগ্রন্থের ভিতর যুগ যুগান্তর ধরিয়া, বহু ব্যতিক্রম ঘটয়া গিয়াছে। উহাতে অনেক অনবধান ও ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে। সূত্রগ্রন্থে কোনও অসঙ্গতি নামের উল্লেখ মাত্র দেখিয়া প্রাচীন সংহিতার বিচার করা সমীচীন নহে।

সূত্রগ্রন্থের গুরু ভগবান ধনুস্তরি। এই রক্ত—সূত্রগ্রন্থ সংহিতাকে ধনুস্তরি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া অনেকেই প্রচার করিয়াছেন। ইহাদের মতে—“চরক সংহিতা” আত্রের সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কিন্তু পৌরাণিক প্রমাণে আমরা দেখিতে পাই—

“তন্ত্ৰং গেহে সমুৎপন্নো দেব ধনুস্তরি স্তথা।

কাশীরাজো মহারাজঃ সর্করোগ প্রণাশনঃ॥

আয়ুর্বেদঃ ভরদ্বাজাং প্রাপ্যেহ স তিথ্যগ্নিতঃ॥

তমষ্টধা পুনর্কন্ত শিষ্যোভ্যঃ প্রতাপায়েরং॥”

অর্থাৎ কাশীরাজ ধর্মের গৃহে ভগবান ধনুস্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্বেদের জ্ঞান লাভ করেন এবং সেই আয়ুর্বেদকে আত্রের নিকট করিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন।

এই পৌরাণিক কথা বিচার করিলে হইলে,—আত্রের সম্প্রদায়ের

এক হইয়া যায়। মৎপ্রণীত “আয়ুর্বেদের ইতিহাসে” আমি এ সকল কথা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এইবার সুশ্রুতের মধ্যে যে বৈদিক অনুশাসন আছে, তাহারই দিগ্‌মাত্র নির্দেশ করিব।

সুশ্রুতের প্রথমেই আয়ুর্বেদের গুরু পরম্পরা ধ্বংস কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়াছে,— “ব্রহ্মা প্রোবাচ, ততঃ প্রজাপতি রথিজগে, তন্মাদবিনো, অথিতামিত্রঃ ইন্দ্রাদহং।” তাহার পর দীক্ষাবিদির অন্তর্গত বৈদিক-বিধানে অনুপ্রাণিত। রোগীর রক্ষাবিধি সুশ্রুত যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও দৈবাচারের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। হোম স্তম্ভিবাচন কিছুই বাদ পড়ে নাই। সুশ্রুতের আয়ুর্কর্ক সন্নীতি ব্রহ্মণ পুজায় ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলন উপদেশে পরিপূর্ণ। সুশ্রুত দৈব ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা বিধিকেও উপেক্ষা করেন নাই। মন্ত্র শক্তিকেও অবিশ্বাস করেন নাই। স্বতিশাস্ত্রের সকল বিধান সুশ্রুত অবনত শিরে গ্রহণ করিয়াছেন। কর্মক্ষেত্রে কর্মফলকে প্রাধান্য দিয়াছেন। পূর্ব জন্ম, পর জন্ম মানিয়া লইয়াছেন। যাগযজ্ঞের শুদ্ধস্ব স্বীকার করিয়াছেন সর্বোপরি পারমেশ্বরী ইচ্ছাকেও প্রাশ্রয় দিয়াছেন। যে গ্রন্থ এত মন্ত্র বহুল, যে গ্রন্থ এত ধর্মতাবে পূর্ণ, যে গ্রন্থ এত যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, সে গ্রন্থ কি নীরীশ্বর বোদ্ধ মতাবলম্বী নাগার্জুন কর্তৃক প্রতীসংস্কৃত হইতে পারে? যদি ইহা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বোদ্ধ নাগার্জুন সুশ্রুত হইতে বৈদিক প্রত্যাব একবারেই দূর করিয়া দিতেন। সুশ্রুতের কোথাও না কোথাও বোদ্ধমত সিদ্ধি বাক্য করিতেন। আয়ুর্বেদের অপৌরুষেয় স্বীকার করিতেন। আমরা জানি, যৌরবে

আয়ুর্বেদ যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল, বোদ্ধ নৃপতি গণ—জীবের কল্যাণ-কামনায় আয়ুর্বেদের চর্চা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অসীম অহুগ্রহের ফলে এ দেশে “আয়ুর্বেদ কলেজ” পশুমানবের জন্ত রুম্যবাস বা আতুরাশ্রম (হাসপাতাল) স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বোদ্ধগণ যে আয়ুর্বেদের বৈদিকাচার অক্ষুণ্ন রাখিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

মহর্ষি সুশ্রুতকে উদ্দেশ করিয়া—একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলিয়াছেন—“হে ঋষি! শুনিয়াছি তুমি সার্ক দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলে। কিন্তু তুমি এ মরু জগতে চিরকালই অমর হইয়া রহিয়াছ—তোমার রচিত সংহিতা চিরকালই তোমার অমর করিয়া রাখিবে। তুমি যে অসামান্য অল্প চিকিৎসার উপদেশ জগৎকে দিয়া গিয়াছিলে, আমরা ভারতবাসী হইয়াও তাহার সম্যক সমাদর করিতে পারি নাই, তোমার উপদিষ্ট অল্প-শত্রু স্বচক্ষে কখন দেখিতেও পাইলাম না। আশীর্বাদ কর—ভারতের অতীত গৌরবের, অতীত জ্ঞান, গরিমায়, অতীত স্বাধীন চিন্তার নিদর্শন স্বরূপ তোমার সংহিতার গৌরব করিবার অধিকার যেন আমরা কখনও বিস্তুত না হই।”

আয়ুর্বেদের সেই অল্প চিকিৎসা গৌরব রক্ষা করিবার জন্তই—অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিভাগের প্রতিষ্ঠা। সুশ্রুতের স্বর্গীয় আশ্রয় দেব-নির্যাত্য নিক্ষেপ করিয়া—ইহার উচ্চাঙ্গ কারিগরের প্রাণগত চেষ্টাকে সফল করিতে মনোনিবেশ করুন,—ভারতে আয়ুর্বেদ বিদ্যার আশ্রয়,—ভগবতের ইহাই আশ্রয় প্রার্থনা।

ভারতবর্ষের সকল কামনা

## ম্যালেরিয়ার দেশীয় মহৌষধ।

—:~:—

আমি ডাক্তার। আমার কর্মক্ষেত্র—  
পল্লীগাঁমে। আমার বাসগ্রামের আসে পাশে  
অনেকগুলি গ্রাম আছে। সে সকল গ্রামেও  
আমাকে সর্বদা যাইতে হয়। আমি যে  
সকল রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকি, তাহার  
পনেরো আনাই ম্যালেরিয়া। আমার কর্ম্ম-  
ভ্যাস অর্থাৎ প্রাকটস ১৬ বৎসর চলিতেছে।  
সুতরাং ১৬ বৎসর কাল ম্যালেরিয়ার লীলা-  
ভূমিতে বাস করিয়া, অসংখ্য ম্যালেরিয়াগ্রস্ত  
রোগীর চিকিৎসায় ব্যাপৃত থাকিয়া ম্যালেরিয়া  
সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

আমাদের বিজ্ঞান বলে—ম্যালেরিয়া দমন  
করিতে কুইনাইনের মত আর দ্বিতীয় ঔষধ  
নাই। এই বিশ্বাস আমারও বরাবর ছিল।  
যেখানেই দেখিয়াছি—“ন্যাকেরিয়া” সেখানেই  
আমি রোগীকে উপদেশ দিয়াছি—“কুইনাইন  
মেব কেবলং।” কিন্তু এখন আমার মতের  
পরিবর্তন হইয়াছে। কেন হইয়াছে? সেই  
কথাটাই বলিধ।

বোধ হয় ৭৮ মাস পূর্বের কথা। আমার  
এক আত্মীয়কে লইয়া তাহারই চিকিৎসার  
জন্ত এক বয়োবৃদ্ধ ডাক্তারের পরামর্শ লইতে  
গিয়াছিলাম। সেখানে বহুবর ব্রজবল্লভ বাবু  
এবং বক্রিম যুগের লোক দীননাথ ধর বি-এ  
বি-এল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের  
সহায়্যে বিশদালাপ চলিতেছিল। সহসা এক  
জ্যেষ্ঠ ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—  
“ডাক্তার বাবু! আগে ত এ দেশে এত অর-

হইত না, এখন এমন ঘন ঘন জ্বর হয় কেন?  
ডাক্তার বাবু বলিলেন,—“আগে দেশের জন-  
বায়ু ভাল ছিল, তাই জ্বর হইত না, এখন জন  
বায়ু খারাপ হইয়াছে, দেশে ম্যালেরিয়া প্রবেশ  
করিয়াছে, তাই এত অরহইতেছে।” ডাক্তার  
বাবুর কথায় বুদ্ধ স্মরসিক দীন বাবু একটু  
হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“তা’ নয় ডাক্তার,  
আগে জরের নাম ছিল “জর” এখন তোমরা  
জরের নাম দিয়াছ “ফিবার”—কাজেই সে হয়ও  
ফি—বার। “দীনবাবুর কথায় সকলেই  
হাসিয়া উঠিলেন। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া  
আত্মীয়ের সঙ্গে আমি আমার বাস-গ্রামে  
ফিরিয়া আসিলাম। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে  
নূতন কিছুই ছিলনা, আমি বাহা বাহা ব্যবস্থা  
করিয়াছিলাম, অবিকল সে সমস্ত ঔষধ বজায়  
রাখিয়া তিনি কেবল কুইনাইনের মাত্রা একটু  
বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

ঔষধ সেবন চলিতে লাগিল। কিন্তু যে  
জন্তু অপর ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন  
বুঝিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। আমার  
আত্মীয়ের অসুখ এমন কিছু বেশী নহে, ২৪  
দিন জ্বর কাঁপিয়া অর হয়। উপর্য উপর,  
কুইনাইন খান, জ্বর বন্ধ হয়। কিন্তু কৌ-  
সিন বন্ধ থাকিলে কুইনাইনের চিকিৎসা  
খাইতে খাইতেই আবার জ্বর হয়। জ্বরকে  
পুনরাবর্তনের কোন প্রতিকারই হয় নাই।  
না। বন্ধ রক্ত-নাম জ্বরকে বন্ধ করিয়া  
করিয়াও জ্বর বন্ধ হয় না।

ফলে রোগিণী ডাক্তারী ঔষধের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছিলেন, আমি বাতীর ডাক্তার—তাহাকে কেবল বুঝাইতেছিলাম—“আপনি ভাববেন না, অর নিশ্চয়ই বন্ধ হইবে। এ ম্যালেরিয়া—ইহার একমাত্র ঔষধ—কুইনাইনমের কেবল!”

এইভাবে, দুইমাস কাটিয়া গেল। আমি ত সাধ মিটাইয়া কুইনাইন চালাইতে লাগিলাম। শেষে তিনি আর কুইনাইন খাইতে চাহেননা, কি করি? কুইনাইনের ইনজেক্সন্স দিতে লাগিলাম। তাহার পরই তিনি আমার হাত হইতে পরিজ্ঞাপ পাইবার জন্ত—পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। পিত্রালয়—আমার বাস গ্রামের এক ক্রোশ দূরে, সে গ্রাম অতি ভয়ানক গ্রাম, ম্যালেরিয়ার পরিপূর্ণ, সেখানকার লোক মরিয়া ভূত হয়, তথাপি ম্যালেরিয়া তাহাকে ছাড়েনা! এমন স্থানে তিনি প্রায় একমাস থাকিলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন, আমি আশ্চর্য্য হইলাম—তাহার অর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একি স্থান পরিবর্তনের গুণ? অসম্ভব! ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থানে বাস করিলে কি ম্যালেরিয়া ভাল হয়? তবে কি? আশ্চর্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—“বাপের বাড়ীতে গিয়া আমি আর এক দিনও কুইনাইন খাই নাই। আমার এক মামী আছেন, তিনি আমাকে নাটার ডগা বাটিয়া খাইতে বলেন। তাহাতেই আমার অর বন্ধ হইয়াছে। আমি ৫০টা নাটার ডগা শিলে বাটিয়া ৩টা বড়ী তৈয়ার করিয়া লই, সেই বড়ী মাঝে মাঝে একটা করিয়া খুল দিয়া গিলিয়া খাই। নাটা—অরে বড় উপকারী” একজন পাশ করা উপানিধারী ডাক্তারের সমুখে দাঁড়াইয়া একজন অনিশ্চিতা প্রিয়জন

বলিতেছে কিনা—নাটা অরে বড় উপকারী! হা—ভাগ্য! ইহাও আমাকে শুনিতে হইল? যে অর কুইনাইনে বন্ধ হয় নাই—সে অর নাটার বন্ধ হইল? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? আমার মুখে হাসি আসিল। আমি আশ্চর্য্যাকে বলিলাম—বোধ হয় নাটার কাঁটার ভয়ে অর আপনার দেহে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই! আমার কথায় তিনিও একটু হাসিলেন। আমি কিন্তু নাটার কথা মনে করিয়া রাখিলাম।

এই মহাযুদ্ধে সকল দ্রব্যই মহার্ঘ হইয়াছে। ডাক্তারী ঔষধের দাম চতুর্গুণ চড়িয়াছে, অনেক ঔষধ দুশ্রাপ্যও হইয়াছে। আমি পাড়ারগে ডাক্তার, বিশেষতঃ গরীব-দুঃখী ও মধ্যবিত্ত লোক লইয়াই আমার কাজকর্ম, ঔষধের মূল্য-বৃদ্ধি হওয়ার আমি বড় বিব্রত হইলাম। অল্প হইলেও লোকে হঠাৎ দেখাইতে চাহে না, কেননা ভিজিটের টাকা যোগাইবে কেমন করিয়া? ইহার উপর ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথীর বাগিস করা বাস্তব, নিতান্ত দরিদ্রগণ বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথী ঔষধ সেবন করিতে লাগিল। বিনা চিকিৎসায় বাহাদের ক্ষৌ-বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কেবল তাহারই ডাক্তার ডাকিল। কিন্তু ইহাও প্রাণের দ্বারে কেননা দুই এক শিশি ঔষধ খাওয়াইয়া তাহার চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিল। ঔষধের দাম আর যোগাইজে পারিল না। ২০ কো কুইনাইন না খাইলে বাহা অর বন্ধ হয় না, সে দৃষ্টান্তে কুইনাইন খাইয়াই নিরস্ত হইল। এইবার আমারও মতি কিরিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—যখন এ দেশে কুইনাইন আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন কি এসেদের কোন অর ভাল হইত না? কুইনাইন

অর বন্ধ করিতে পারে, এমন ঔষধ কি  
রত্নগর্ভা বড়ৈখ্যাময়ী ভারতভূমিতে দ্রুত ?  
যে দেশে “চরক” “সুশ্রুত” “বাগভট”  
“হারীতের” গবেষণাময়ী সংহিতা এখনও  
অজ্ঞাতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে, যে দেশে  
জরস বর্গের মধ্যে—নিম, নিসিন্দা, দেফালী  
শুল্ক, ক্ষেপাঁপড়া, চিরাতা, ছাতিম, আতিম,  
কটুকী, পলতা প্রভৃতি—তিল্লগণ ঋষি-প্রতি-  
ভার অপূর্ব বিশ্লেষণ—জগতকে এখনও  
দেখাইয়া দিতেছে,—সে দেশ কি চিরদিনই  
কুইনাইনের উপাসনা করবে ?

সহস্রা নাটার কথা আমার মনে পড়িয়া  
গেল। পল্লীগ্রামে পথে-বাটে-বনে-জঙ্গলে  
যথেষ্ট নাটার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি  
তাহা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম।  
আয়ুর্বেদের কোন্ গ্রন্থে নাটার গুণ বর্ণিত  
হইয়াছে, কবিরাজ মহাশয়দের নিকট তাহার  
সন্ধান লইতে লাগিলাম। কিন্তু পরিতাপের  
বিষয় কোন কবিরাজই আমার আশাপূর্ণ  
করিতে পারিলেন না। সকলেই মুখে বলেন,—  
—“নাটা অরর বটে।” তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ  
কেহই দেখাইতে পারিলেন না। অনেকেই  
বলিলেন—“আমরা নাটার গুণ পরীক্ষা করিয়া  
দেখি নাই।” হতাশ হইয়া আমি ইংরাজী  
ভাষায় রচিত মেটরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া  
এবং “ফার্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা” নামক গ্রন্থ  
দ্বয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি  
বিস্মিত হইলাম—কবিরাজ মহাশয়েরা যে  
নাটার গুণ কেবল পুথিগত বিজ্ঞার পর্য্যবসিত  
করিয়া নিশ্চিন্ত, ডিমকও কোরি সে নাটার  
গুণ তর তর করিয়া পরীক্ষা করিয়া গিপিবদ্ধ  
করিয়াছেন। আচার্য্য অক্ষর চন্দ্র একদিন  
দ্রুত করিয়া বলিয়াছিলেন—“ভারতবাসী ভারত

দেখিল না, ভারত বুঝিল না, এত বড় মহা-  
দেশ—তাহার কোন্‌খায় কি আছে—তাহার  
খোঁজ লইল না” তখন আমার সেই আক্ষে-  
পোক্তির চরম সার্থকতা মনে পড়িতে লাগিল।

দরিদ্রের দেশে, দরিদ্রের সমাজে, দরিদ্রের  
মাঝে বসিয়া আমি নাটার পরীক্ষা আরম্ভ  
করিলাম। যে রোগীকে কুইনাইন-প্রয়োগের  
উপযুক্ত দেখিতাম, তাহাকে নাটা খাওয়াইতে  
লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমি বুঝিতে  
পারিলাম—নাটার অর নারিশনী শক্তি অদ্বুত।  
নাটার বড়ী—২১৩টা খাইয়াই অনেক রোগীর  
অর বন্ধ হইতে লাগিল। নাটার আর একটি  
মহৎ গুণ দেখিলাম—নাটা অরের রিগ্যাপ বা  
পুনরাক্রমণ বন্ধ করে। ইহাতে রোগীগণ—  
অপব্যয়ের হাত এড়াইল, আমার ঔষধের তারিক  
করিতে লাগিল। আমারও উপকার হইল—এই  
মহাশয়ের দুর্দিনে, চড়ার বাজারে, আমি একটা  
মহোষধ বিনামূল্যে লাভ করিলাম। নাটা  
বিনা যত্নে বনে জন্মায়, পরসা দিয়া কিনিতে  
হয় না, কেবল একটু পরিশ্রম করিয়া লইয়া  
আসা এবং তাহা চূর্ণ করিয়া শিশিতে পুরিয়া  
রাখা। নাটার প্রসাদে আমিও খরচার দায়  
হইতে মুক্তি পাইলাম।

প্রথমে আমি নাটার ডগা বাটার বট  
প্রস্তুত করিতাম, তাহার পর—মূলের ছাল  
চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিতাম। কিন্তু ইহা  
বড় অধিক মাত্রার দিতে হইত, নইলে অর  
আটকাইত না। রোগীকে অমেদকারিত  
খাইতে হইত। শেষে বীজের চূর্ণ ব্যবহার  
করিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম নাটার  
গুণ ও বীজ তাহার বীজের অধিক কার্যকর  
নিহিত আছে। নাটা বীজের চূর্ণ অর  
ওকলে একবার দায়

জরের বেগ অতি মন্দ হইয়া যায়, পরদিন আর একবার খাইলে জ্বর আর আসে না। তৃতীয় দিন আর নাটা সেবনের আবশ্যকতা নাই।

আমি যে প্রণালীতে নাটা ব্যবহার করিতেছি, পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিম্নে তাহা লিখিতেছি।

নাটার ফল ঠিক কণ্টকময় বস্ত্ররঞ্জক লটকান ফলের মত। এই ফলের মধ্যে ১টা বা ২টা কখন বা ৩টা পর্য্যন্ত বীজ থাকে। বীজের উপরের আবরণ বড় কঠিন। বীজগুলি দেখিতে ঠিক কড়ীর মত। উপরের আবরণ মোচন করিলে—ভিতরে শ্বেতবর্ণের শক্ত বা শাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাঁস কিঞ্চিৎ তৈলাক্ত। শাঁসগুলি রোদ্রে দিলে বেশ খটখটে হইয়া যায়, তখন তাহাকে হামান দস্তার গুঁড়া করিয়া হুস্ত বস্ত্রে ছাকিয়া লইতে হয়। এই চূর্ণ ৩ ভাগ, পিঁপুল চূর্ণ ১ ভাগ, একত্র মিশাইয়া জল দিয়া মাড়িয়া বড়ী করিয়া রোদ্রে শুকাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। কিন্তু সেরূপ কঠিন বটাকা সেবনকারীরা আবার জল দিয়া মাড়িতে হয়। সর্বাপেক্ষা সুবিধা মধু দিয়া মাড়িয়া বড়ী পাকানো। এই বড়ী জল দিয়া গিলিয়া খাইলেই নাটার উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

যে জ্বর কম্প দিয়া আসে, মাথার যন্ত্রণা, পিপাসা, হাত-পা কামড়ানি প্রভৃতি উপসর্গ যে জরে থাকে, অথচ জরের উত্তাপ খুব বেশী হয়, —এইরূপ জরে—বিরাম কালে অথবা জর কমিবার মুখে নাটা ব্যবহার করিতে হইবে। নাটা সেবনের পূর্বে—রোগীকে একটু গরম ছয় পান করান উচিত, খানি গোটে নাটা সেবনে পা বমি বমি করে। নাটা শিশুদের

—সকলকেই খাওয়ান চলে। এমন কি উদরাময়, মুচ্ছা, গর্ভাবস্থা—সকল অবস্থাতেই নাটা ব্যবহার করা যায়। ইহাতে কোনও বিপদের ভয় নাই। ঘৃণঘৃণে পিত্ত প্রধান পুরাতন জরেও নাটা অত্যন্ত উপকারী। আমি প্রায় ৪ মাস কাল অনেক রোগীর দেহে নাটা প্রয়োগ করিতেছি, সর্বত্রই নাটা ব্যবহারে উপকার পাইয়াছি। আমি নাটার নিম্নলিখিত গুণাবলীর পরিচয় পাইয়াছি।

১। নাটা—অত্যন্ত জরঘ্ন। একমাত্র সেবনেই উপকার জানিতে পারা যায়। সত্ত্বই জ্বর বন্ধ করে।

২। নাটা সকলকেই খাওয়ান চলে। উদরাময়, গর্ভাবস্থাতে, নিষিদ্ধ নহে।

৩। নাটা সেবনে জ্বর বন্ধ হইলে প্রায়ই রিলাপ্স হয় না।

৪। নাটা সেবন করিলে মাথা ঘোরা, কান ভেঁা ভেঁা করা কোন উপসর্গই হয় না।

৫। নাটা ব্যবহার করিবার পূর্বে—রোগীকে একবার জ্বোলাপ দ্বিত্ত পারিলে ভাল হয়।

৬। নাটা—নূতন—পুরাতন উভয়বিধ জরেই ব্যবহার্য্য।

৭। নাটার বীজে একটা বুনো গন্ধ আছে, এই গন্ধ নিবারণের জন্ত আমি ২১ ফোঁটা ঘোঁরা বা দারুচিনির তৈল নাটার সহিত ব্যবহার করি।

৮। নাটার আবাদ তিক্ত—কিন্তু কষ্ট নাইনের মত বিকট নহে।

৯। নাটা—গ্রীষ্ম ও শরৎকালের বিকট জ্বর করে, বিবৃতির দ্বারা করে। জরীয়ে নূতন জ্বর কমিবার উপকারিতা আছে।

১০। নাটা ঘর্ষ ও মূত্রের প্রবর্তক।  
কোষ্ঠগত বায়ু নাশক।

কুইনাইন ভিন্ন ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই—  
এ ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই আছে। আমার  
বিশ্বাস—সে শক্তি নাটারই আছে। যাহারা  
ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্ত  
রোগীকে ক্রমাগত কুইনাইন খাওয়ান,  
ঔষাদিগকে আমি ডাক্তার রসের উক্তি পাঠ  
করিতে বলি।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের খাস গোরা  
ডাক্তার মেজর রস্ বলিয়াছেন,—“ম্যালেরিয়ার  
প্রতিষেধক বলিয়া অনেকে কুইনাইন ব্যবহার  
করে; কিন্তু তাহাতে উন্টা ফল হয়।  
কুইনাইন খাইলে ম্যালেরিয়া দিন কতক  
হমনে থাকে বটে, কিন্তু একেবারে যায় না।  
ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত উহা মাহুকের শরীর-  
বস্ত্রে অবস্থান করিতে থাকে।”

ইহার পরও কি আপনারা বলিতে চাহেন  
—কুইনাইনে ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়? আম  
স্বয়ং একজন কুইনাইনের গোড়া ভক্ত ছিলাম।  
অনেক রোগীর দেহেই আমি কুইনাইনের  
ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি! পরে আমার মত  
পরিবর্তিত হইয়াছে। নাটার জরনাশিনী  
শক্তি দেখিয়া আমি বিশ্বসে মুগ্ধ হইয়াছি।  
সেকালের বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি—পূর্বে  
কবিরাজী ঔষধ খাইয়া যাহাদের জর ভাগ  
হইত, ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে আর তাহাদের  
জর হইতে দেখা যাইত না। এখনকার  
কবিরাজেরা সেরূপ ঔষধ প্রয়োগ করেননা  
কেন? আগেকার কবিরাজেরা যে নাটার  
কষ্টে ব্যবহার করিতেন, নিয়মিত ছড়টিতে  
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। “সংবাদ প্রভা

করের” পুরাতন কাহিলে আমি এই পত্রটি  
দেখিতে পাইয়াছি। যথা,—

“চিরাতা, নাটার ডগা, পলতা, ধনিয়া।  
ক্ষেৎপাঁপড়া, নিমছাল, গুলঞ্চ আনিয়া।  
প্রত্যেক জিনিষ ল'বে ভরি পরিমাণে।  
তিন সের জলে সিদ্ধ—বিহিত বিধানে।  
ছটাকার্কি মাত্রা—দিনে দুইবার খাবে।  
যে রূপ হউক জর অবশ্যই যাবে॥”

এমন সহজ লভ্য ঔষধটিও লোকে পরীক্ষা  
করিয়া দেখেন না, ইহাই গভীর পরিতাপের  
বিষয়।

নাটা সম্বন্ধে আমি আমার পরীক্ষার  
ফলই প্রকাশ করিলাম। আশা করি এ  
দেশের চিকিৎসকগণ—কুইনাইনের পরিবর্তে  
এই বিনামূল্যে প্রাপ্ত সামান্য উদ্ভিদের একটু  
আদর করিবেন। আয়ুর্বেদে শাস্ত্রে নাটার  
কিরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে, আমি তাহা  
অবগত নহি। আমার অহরোধ—কোনও  
কবিরাজ মহাশয় নাটার গুণ সাধারণের  
গোচরীভূত করুন। ইহাতে দেশের অনেক  
উপকার হইবে, দরিদ্র রোগিগণও বাচিয়া  
যাইবে। এই হুঃসমনসে আমাদের দেশীয় ঔষধ  
গুলির গুণাগুণ পরীক্ষিত হওয়া উচিত। কত  
বিদেশী আসিয়া আমাদের দেশের উদ্ভিদের গুণ  
পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মতামত সাধারণের  
উপকারার্থে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আর  
আমরা এমন অলস ও কর্তব্য বিমূখ যে,  
নিজের হাতের নিধি ফেলার হায়ইতে  
বসিয়াছি! একান্ত আশা করি পক্ষা কি  
অহুতাপও হয় না। আমাদের শিক্ষণীয়  
কি চিরদিনই এইরূপে অগতের দৃষ্টান্ত  
হইবে? আরও কি আমাদের বিচার  
চিন্তার চেষ্টা করিবেন।



আমি অনেকগুলি দেশীয় উদ্ভিদের ক্রিয়া-  
পরিপীক্ষা করিয়াছি। স্বযোগ ও সুবিধা  
পাইলে একে একে তাহা প্রকাশ করিব।\*

ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

L. M. F.

## অতিসার রোগ।

(২)

—:—:—

অতিসারে প্রচুর পরিমাণে মলশ্রাব হইতে থাকিলে প্রথমে পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। শূল ও আয়ান থাকিলে বিশেষতঃ আমাশয়ে দোষ সঞ্চার অনুভূত হইলে পিপ্পল চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত জল প্রয়োগ করিয়া বমন করান উচিত। বমনের পর গণ্ডন এবং লজবনের পর পেয়া পথ্য দেওয়া কর্তব্য।

উদরে যন্ত্রণা থাকিলে স্বেদ দেওয়া কর্তব্য। গবন জল পূর্ণ বোতল, বস্ত্রখণ্ড বা হস্ত উত্তপ্ত করিয়া স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

অতিসারে জল প্রয়োগ;—অতিসার রোগে পিপাসা থাকিলে কলা ও গুঠের সহিত অথবা মুতা ও ক্ষেং পীপড়ার সহিত কিম্বা মুতা ও কলার সহিত জল সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবে। সমভাগে মোট দুই তোলা দ্রব্য লইয়া খেঁতো করিয়া চারি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। দুই তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ধনে এবং কলার সহিতও

এইরূপ নিয়মে জল সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপে সিদ্ধ জল প্রয়োগ করিলে তৃষ্ণা ও অতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

অতিসারে ঔষধ সিদ্ধ পেয়া;—আয়ুর্বেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগে ঔষধ সহ পেয়াদি সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ঐ সকল ঔষধ সিদ্ধ পেয়া পরম হিতকর এবং একমাত্র আর্ষ্য চিকিৎসাশাস্ত্রেই উহাদিগের প্রয়োগ দেখা যায়। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এক্ষণে এইরূপ পথ্য-প্রয়োগ একরূপ লোপ পাইয়াছে। আধুনিক বিলাসিতার যুগে ঐ সকল পয়স হিতকর পথ্যের পুনঃ প্রচলন হওয়া সম্ভব পর বলিয়া মনে হয় না। তথাপি পাঠকগণের অবগতির জন্য এবং যদি কেহ এইরূপ পথ্য সেবন করিতে ইচ্ছা করেন বলিয়া ঐরূপ কতকগুলি পথ্যের বিষয় লিখিত হইতেছে।

এইরূপ পথ্য প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে কাথ করিয়া লইতে হয়। বীধ্যভেদে ঔষধ দ্রব্য তিন প্রকার। তীক্ষ্ণবীৰ্য—যেমন পিপ্পল

\* অমাবস্তা পূর্ণিমা বা একাদশীর সময় ঔষধের আর হয়, তাহারা ঐ সময়ের ২১ দিন পূর্ণ হইতে পূর্ণ যাবৎ করিলে তাহাদের আর হয় হইবে না। ইহাও আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।—লেখক।

মরিচ প্রভৃতি। মধ্যবীৰ্য্য যেমন বেগছাল, গনিয়ারী ছাল, শোণা ছাল প্রভৃতি। মুহুবীৰ্য্য—যেমন আমলকী, কিসমিস প্রভৃতি। পূর্বে তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য দুইতোলা, মধ্যবীৰ্য্য দ্রব্য চারি তোলা এবং মুহুবীৰ্য্য দ্রব্য আটতোলা লইবার বিধি ছিল। কিন্তু এক্ষণে অল্পপ্রাণ মানব গণের এরূপ মাত্রা সহ হয় না। পূর্বে এইরূপ মাত্রাও আবার কক্সসাধ্য যবাগু সম্বন্ধে অর্থাৎ ঔষধ বাটার সহিত পাক করিয়া পেয়াদি প্রস্তুত করার রীতি ছিল। কাথ সাধ্য যবাগুর অর্থাৎ ঔষধের কাথ করিয়া সেই কাথের সহিত যে পেয়াদি পাক করা হয়, তাহার মাত্রা আরও অধিক। কিন্তু এক্ষণে পূর্বে যে কক্স সাধ্য যবাগুর ঔষধের মাত্রা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বা তদপেক্ষা কম মাত্রায় কাথ সাধ্য যবাগু প্রস্তুতের জন্ত ব্যবহার করা উচিত। কক্স সাধ্য যবাগুর জন্ত উহার সিকি মাত্রায় দ্রব্য লওয়া সঙ্গত।

পূর্বেকৃত নিয়মে ঔষধ দ্রব্য দুইতোলা, চারি তোলা বা আট তোলা লইয়া চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। পরে যে দ্রব্যের যবাগু প্রস্তুত করিতে হইবে, মণ্ড করিতে হইলে তাহার চতুর্দশ গুণ; পেয়া করিতে হইলে ছয় গুণ এবং বিলেপন করিতে হইলে চার গুণ উক্ত কাথ জলের সহিত পাক করিয়া লইতে হয়। মণ্ড খুব তরল (যেমন জল বালি) হয়, পেয়া কিঞ্চিৎ সিটায়ুক্ত হয় এবং বিলেপী বহু সিটায়ুক্ত এবং যৎসামান্য তরল দ্রব্য সমন্বিত হয়।

শালপানি, বেড়োলা, বেলগু'ঠ ও চাকুলের সহিত পেয়া পাক করিয়া দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিত্তশ্লেষ্ম জনিত অতিসার

রোগে পথ্য দিবে। ধনে ও শু'ঠের সহিত পেয়া পাক করিয়া বাতশ্লেষ্ম বা অতিসার রোগে প্রয়োগ করিবে। বাতপিত্তজ অতিসারে শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুরের কাথে পেয়া প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কক্ষজনিত অতিসারে পি'পুল, পি'পুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শু'ঠের কাথ সহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

এক্ষণে আমাতিসারের কয়েকটি ফলগ্রন্থ ঔষধের বিষয় কথিত হইতেছে।

ধাত্তপঞ্চক—ধনে, শু'ঠ, বাল্য, মুতা ও বেলগু'ঠ—প্রত্যেক দ্রব্য সম পরিমাণে—মোট দুইতোলা লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পেয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, এই কাথ পান করিলে আমাশয়, শূল্মনি ও মলের বিবন্ধতা নষ্ট হয় এবং অগ্নিদীপ্তি হয়।

সমস্ত কাথই এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়, অর্থাৎ দ্রব্য যতই হউক সমভাবে মোট দুইতোলা লইতে হইবে।

একটা দ্রব্য হইলে তাহাই দুইতোলা, দুইটা হইলে একতোলা করিয়া দুইতোলা, চারটা হইলে আধতোলা করিয়া দুইতোলা, আটটা হইলে এক সিকি করিয়া মোট দুই তোলা, এইরূপ নিয়মে দ্রব্য লইতে হয়। পরে উক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে ধৌত ও কুট্টিত করিয়া আধসের জল সহ মুহু জলে সিদ্ধ করিতে হয়। আধ পেয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য।

ধাত্তচতুষ্ক—ধনে, মুতা, বাল্য ও বেলগু'ঠের কাথ পিত্ত প্রধান অতিসারে বিধিঃ—পিপুল, শু'ঠ, ধনে, মরীচী ও বরীষকী কাথ কক্ষজনিত অতিসারে, শালপানি, বেলগু'ঠ ও চাকুলের কাথ বাতজনিত অতিসারে, শু'ঠ ও বেলগু'ঠের কাথ বাতপিত্তজনিত অতিসারে

চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহকান্তা ও কণ্টকারী বাতজ্ব অতিসারে হিতকর। এই সকল যোগ অগ্নিদীপক ও আম পাচক।

শুঠ, পিপুল, মরিচ, আতাইচ, হিং, বেড়েলা মচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে প্রবল আনাতিনার প্রশমিত হয়। পিপুলমূল, পিপুল, গজপিপুল ও চিতামূল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া কিম্বা মচল লবণ, বচ, মরিচ, পিপুল, শুঠ, হিং আতাইচ ও হরীতকী চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজ্বনিত অসিয়ারে শান্তি হয়। এই সকল চূর্ণ দুই আনা হইতে এক সিকি মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

লব্ধন এবং উপরোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করার পর রোগীকে পূর্ব কথিত ঔষধ সিদ্ধ যবাগু, বিলেপী, এবং মাংসরস পথ্য দিবে। অতিসারে রোগী ক্ষুধার্ত হইলে লঘু পাক দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত। কেননা লঘু পথ্য ভোজন দ্বারা অতিসার রোগী শীঘ্রই কঠি, অগ্নি ও বল লাভ করিয়া থাকে।

তক্র চার সের, মরিচ, জীরা ও চিতামূল প্রত্যেক সমভাগে মোট দুই তোলা কদ বেল ও আমরুল শাক প্রত্যেক চারি তোলা ও কাঁচা মুগের দাল এক ছটাক একত্র পাক করিয়া দুই সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা আহার এবং ঔষধ—উভয়ের কার্য্যই করিয়া থাকে।

শশক, হরিণ, কুকট বটের ও তিতিরের মাংসরস অতিসার রোগীর পক্ষে হিতকর। শিঙ্গি, ছোট মাগুর সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্ত এবং মোরলা মৎস্ত অতিসার রোগে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রবল

অবস্থায় পূর্ব কথিতরূপে যুব মাত্র দেওয়া উচিত।

এইরূপ পথ্য ও ঔষধ প্রয়োগের পর অতিসারের পক্ষ অবস্থা ঘটিলে শুভ্রন অর্থাৎ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

এক সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা ধলআঁকড়ার মূলের ছাল বাটিয়া ঘোলের সহিত সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয়। কচিবাবলা পাতা এক সিকি হইতে আধতোলা মাত্রায় চালুনী জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে অতিসার ভাল হয়। বটের খুরি এক সিকি বা আধ তোলা চালুনী জলের সহিত বাটিয়া কিঞ্চিৎ ঘোলের সহিত সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয়।

কাঁচড়া দাম, জামপাতা, দাড়িমপাতা, পানিকলের পাতা, বেলগুঁঠ, বাহা, পাথরকুচি, মূতা ও শুঠ সমভাগে দুই তোলা লইয়া কাথ করিয়া সেবন করিলে প্রবল অতিসারের বেগও রুদ্ধ হয়। কুড়চিছাল, ইক্ষুবব ও মুতার কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অতিসার ভাল হয়। বেলগুঁঠ ও আমের আটির শাঁসের কাথে চিনি ও মধু মিশাইয়া সেবন করিলে বমি ও অতিসার নষ্ট হয়।

অতিসারে হৃদয় প্রয়োগ—অতিসারের প্রথম অবস্থায় হৃদয় হিতকর নহে। কিন্তু পক্ষাতিসারে এবং পুরাতন অতিসারে হৃদয়, অমৃতের জ্বর হিতকারী। অতিসার রোগে বায়ু ও মল বিবদ্ধতার সহিত অগ্নি অগ্নি নির্গত হইতে থাকিলে, তৃষ্ণা থাকিলে অথবা রক্ত কি পিত্তের দোষ থাকিলে—হৃদয় প্রয়োগ বিধেয় হিতকর। অধিক দিনের অতিসারে যে সৌভেদ্য পথ্য থাকে, তাহা হৃদয় পান দ্বারা প্রশমিত হয়। তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ হৃদয় পথ্য

পাক করিয়া হৃৎ শেষ থাকিতে নামাইয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য।

গো হৃৎ অপেক্ষা ছাগল হৃৎ লঘুপাক এবং ধারক বলিয়া অতিসার রোগে ছাগ হৃৎ প্রশস্ত। কিন্তু ছাগহৃৎের অভাব ঘটিলে গো হৃৎ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কুড়িটা মূত্র, ছাগ হৃৎ এক পোয়া এবং জল তিন পোয়া একত্র পাক করিয়া হৃৎ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে অতিসার রোগ প্রশমিত হয়। এইরূপ নিয়মে বেল শুঁঠের সহিত সিদ্ধ করা হৃৎও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতিসারে ঔষধ ও জল সহ সিদ্ধ হৃৎই হিতকর।

অতিসার রোগের অবস্থা ভেদে চিকিৎসা—  
অতিসার রোগে আমদোষ পরিপাক পাইলেও যে রোগীর মূলের বিবদ্ধতা অর্থাৎ আটকে আটকে দাস্ত হওয়া ও পিচ্ছিলতা এবং শূলুনি থাকে, তাহাকে মূলা কি কুলের যুথের সহিত পুঁইশাক, বেতোশাক, ব্রাক্ষীশাক, আমরুল শাক, দধি ও দাড়িম ছাল সিদ্ধ ও স্নেহ সংযুক্ত করিয়া পথ্য দিবে।

অতিসার রোগে মলক্ষয় বশতঃ অত্যন্ত মুখ শোষ হইলে যব, মুগ, মাষকলাই, শালি তণ্ডুল, তিল, কুল, কচি বেল—এই সকল দ্রব্য ধনে, দধি ও দাড়িমের সহিত পাক করিয়া যুথ প্রস্তুত করিবে এবং সেই যুথ, ঘৃত ও তৈলে সীতলাইয়া পথ্য দিবে। কিংবা কচ্ছপের মাংস রস—ঘৃত ও দধি সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ওদভ্রংশ (হারিশ মলদ্বার বাহির হওয়া)—  
অত্যন্ত বেগ দিয়া মল ত্যাগ করিবার কালে অনেক সময় মলদ্বার নির্গত হইয়া পড়ে। সাধারণ ওদভ্রংশ রোগে মলদ্বারে পুঙ্করের

চর্কি মাথাইয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং গো ফণা নামক বন্ধন দ্বারা মলদ্বারে বহিনির্গমন পথ রুদ্ধ করিয়া মুখিক মাংসে সেক দিতে হয়। কিন্তু অতিসার প্রশমিত হইবার পর উপরোক্ত চিকিৎসা অবলম্বন কর উচিত।

এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্ত্রে অন্ন দ্রব্য সহ সিদ্ধ ঘৃত পান এবং অন্নবাসন (স্নেহ বস্তি Enema) প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। আমরুল শাক, কুল, দধি, কাঁজি, শুঁঠ ও যবক্ষার সহ সিদ্ধ ঘৃত পান করিতে হয়। মলদ্বারে স্নেহ প্রয়োগ (চর্কি মালিষ) ও স্নেহ দিয়া মল দ্বার বন্ধ ও মুহু হইলে তুলা দ্বারা ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

মল দ্বারের পাক—মলদ্বার পাকিয়া উঠিলে পটোলপত্র ও যষ্টিমধুর কাথ, অথবা বট, অম্বথ, যজ্ঞভূমুর, পাকুড়, বেতস ইহাদের কাথে শর্করা ও মধুমিশ্রিত করিয়া অথবা ইক্ষুরস, ঘৃত, ছাগ হৃৎ বা গো হৃৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। কিংবা পূর্বোক্ত বটাদির ছাল বাটিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে বা উহাদের চূর্ণ মলদ্বারে সংলগ্ন করিবে। ইহাতে ধাইকুল ও লোধ চূর্ণও যোগ করা যাইতে পারে। ইহাতে রক্ত নির্গত হইলে ঘৃত বা শত ধোত ঘৃত বাণিষ করিয়া মলদ্বার ও কুঁচকিতে পূর্বোক্ত নীতল কাথ সেচন করিবে।

রক্তাতিসার—পিত্তজঅতিসারে—পিত্ত বর্ধক অল্পপান সেবন করিলে পিত্ত ক্রান্ত প্রবল হইয়া রক্তকে দূষিত করে এবং রক্ত রক্তাতিসারী ভূম্বা, শূল, দাঁত জন্মদ্বারের পাক হয়। রক্তাতিসার হইলে পানীয় দ্রব্য যুথ ঘৃতে সীতলাইয়া পথ্য দিবে।

পথা দিবে। কিম্বা হরিণ বা ছাগের রক্ত ঘূতে মতলাইয়া আহার করিতে দিবে। শশক প্রভৃতি শীতবীৰ্য্য বনচর পশু-পক্ষীর মাংস-রসও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইক্ষুবেবের সহিত সিদ্ধ পেয়া এই রোগে বিশেষ হিতকর।

রক্তাতিসারে অন্ন মধ্যে ক্ষত হইয়া থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় কঠিন খাদ্য না দিয়া তরল খাদ্য (পেয়াদি) প্রয়োগ করা উচিত। এই অবস্থায় পেয়া, মাংসরস, ছাগ দুগ্ধ, ছানার জল প্রভৃতি সুপথ্য।

আম, জাম ও আমলকী পাতার রস ছাগ দুগ্ধ ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তরোধ হয়, বাবনা, কুল, জাম, আম ও অজুন—ইহাদের কোন একটি গাছের ছাল—আধ তোলা বা এক তোলা বাটিয়া ছাগদুগ্ধ ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার ভাল হয়। কাঁটানটেের মূল এক দিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ চেনুনী জলের সহিত বাটিয়া এবং মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। কৃষ্ণ তিল এক তোলা এবং চিনি এক তোলা বাটিয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সম্বর রক্তশ্রাব বন্ধ হয়।

কুড়ি ছাল, আতাইচ বেলগুঠ, বালা ও মৃতার কাথ—আম ও বেদনা যুক্ত রক্তাতিসার প্রশমিত করে। কুড়ি ছাল এবং দাড়িম বৃক্ষের ছালের কাথ—মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। কুড়ি ছাল আট তোলা, একসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পেয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং দাড়িমের কচি ফল আট তোলা বাটিয়া ঐরূপ নিয়মে কাথ করিয়া লইবে। অনন্তর এই দুই প্রকারে কাথ একত্র করিয়া পাক করিবে এবং একটু ঘন

হইলে নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ একসিবি হইতে আধ তোলা মাত্রায় তক্তের সহিত সেবন করিলে মৃতপ্রায় রক্তাতিসার রোগীও আরোগ লাভ করে।

পুট পাক প্রয়োগ—অধিকদিনের অতিসার রোগে মলের আঁমাবস্থা দূর হইয়া যদি অগ্নির দীপ্তি হয় এবং বেদনা না থাকে, অথচ নানা বর্ণে মল নিঃসৃত হয়—তাহা হইলে পুট পাক প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য।

মিষ্ণু, ঘন, অথচ কাঁটা দি কর্তৃক ভক্ষিত নহে—এরূপ কুড়িছাল লইয়া খেঁতো করিয়া জাম পাতার চৌদ্দায় স্থাপিত করিয়া তাহাতে চেলুনীর জল সিঞ্চন করিবে। পরে উক্ত চৌদ্দা কুশের দ্বারা জড়াইয়া বহির্ভাগ দুই অঙ্গুলি পুরু করিয়া কদম দ্বারা লেপ দিবে। অনন্তর ঘূটের আঙনের রাখিয়া পোড়াইবে। পরে মৃত্তিকা রক্তবর্ণ হইলে উহা বাহির করিয়া অভ্যন্তরস্থ কুড়িছালের রস এক তোলা হইতে দুইতোলা মাত্রায় মধু সহ সেবন করিলে সর্বপ্রকার অতিসার—বিশেষতঃ রক্তাতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাকে কুটজ পুটপাক বলে।

কুটজ পুটপাকের দ্বারা শোণা ছালের পুট পাক প্রস্তুত করিলে তাহাকে শোণাক পুটপাক বলা যায়। প্রভেদ এই যে, শোণা ছাল কুটিয়া গাভীর পাতার চৌদ্দায় রাখিয়া কুশ দ্বারা জড়াইয়া লেপ দিয়া পোড়াইতে হয়। ইহাও অতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অতিসারে যে সকল যোগ-মূল্য এই সহজ প্রাপ্য—সেই সকলের বিবরণ কথিত হইল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে বহুবিধ যোগের বিবরণ বিদ্যমান আছে। অতিসারের অবস্থাক্রমে নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। এখানে

নানাপ্রকার ঘৃত ও অতিসারের অবস্থাতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পুরাতন অতিসারে পথ্য—অতিসার রোগ পুরাতন হইলে এবং অগ্নির দীপ্তি হইলে অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন দাঁদ-খানি চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন এবং কচি কাঁচ কলা ও পূর্ব কথিত মৎস্তের ঝোল সুপথ্য। মাংস-সাম্রা রোগীকে পূর্বোক্ত মাংসের ঘৃষ পথ্য দেওয়া পারে। তত্ত্বাতীত ছাগদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ কথিত নিয়মে সিদ্ধ করিয়া এবং অবস্থাতেই দধি, তক্র ও সন্তোজাত মাখন দেওয়া যায়। কচি বেলপোড়া, দাড়িম, পাকা গাব জল খাবার দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষুধা বৃদ্ধি এক বেলা অন্ন ও একবেলা পেয়াদি পথ্য দেওয়া উচিত। রোগ সম্পূর্ণ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ নিয়মে পথ্য দিতে হয়। রোগ প্রশমিত হইলেও অতি সাবধানে পথ্যের মাত্রা বাড়ান উচিত। কেননা সহসা অধিক মাত্রার আহার করিলে অথবা কুপথ্য আহার করিলে, রোগ পুনরাক্রমণ করিতে পারে। অতিসারে অপথ্য—গোধূম, মাষ কলায় যব, শিম, ওল, সজিনার ফুল বা উঁটা, কাঁটাল, কুমড়া, লাউ, কুল, গুরুজব্য, পান, ইক্ষু গুড়, মন্ত, কিসমিস, রঙুন, দূষিত জল, নারিকেল, সর্বপ্রকার পত্র শাক, ক্ষার জব্য, লবণ মসলা-যুক্ত ব্যঞ্জন, অন্ন রসযুক্ত জব্য, ম্যান, তৈলাদি সর্দন মিশ্র জব্য, ব্যায়াম ও অগ্নি সন্তাপ অতিসার রোগীর পক্ষে অহিতকর।

প্রবাহিকা—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রবাহিকা অতিসার রোগের প্রকার ভেদ আছে। অহিতকর আহার হেতু বায়ু কুপিত হইয়া সঞ্চিত মল সহ সহস্র অধঃপ্রেরণ করিতে থাকে। এই রোগে মল ত্যাগ কালে

অতিরিক্ত প্রবাহন (কোঁতান) করিতে হয় বলিয়া ইহাকে প্রবাহিকা বলে।

প্রবাহিকা রোগে বায়ুর প্রকোপ থাকিলে অত্যন্ত শূলুনি, পিত্ত প্রকোপ থাকিলে দাহ এবং কফ প্রকোপ থাকিলে অত্যন্ত কফ নির্গম হয়। আর রক্তের প্রকোপ থাকিলে মলের সহিত কখন বা মল ব্যতীত রক্ত নির্গত হয়। ইহাই সাধারণতঃ রক্তমাশর নামে খ্যাত। প্রবাহিকা রোগের অস্তান্ত লক্ষণ অতিসারের তায় এবং অতিসারের তায় ইহার আম ও পক অবস্থা নির্ণয় করিতে হয়।

অতিসার রোগের প্রথমাবস্থার বৈরূপ হরীতকী ও পিপ্পল বাটিয়া জোলাপ লইবার কথা বলা হইয়াছে, প্রবাহিকা রোগে রক্তভেদ থাকুক আর নাই থাকুক, সেইরূপ নিয়মে জোলাপ লইতে হয়। ইহাতে রোগী কষ্ট পায় না এবং রোগ ও সত্ত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিরেচনের পর অতিসার রোগের প্রথমে যে সকল তরল পদার্থ পথ্য দিবার কথা বলা হইয়াছে, প্রবাহিকা রোগেও সেই সকল পথ্য প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রবাহিকার ঔষধ—কচি বেলপোড়ার শাঁস ছইতোলা, ইক্ষু গুড় এক তোলা, পিপ্পল চূর্ণ এক আনা, শুঠ চূর্ণ এক আনা ও কিঞ্চি তিল তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়। ছাগদুগ্ধ আট তোলা এবং মরিচ চূর্ণ ছই আনা বা পিপ্পল চূর্ণ এক সিকি একত্র করিয়া সেবন করিলে মল-বিবদ্ধতা হ্রাস প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়। কচি বেলপোড়ার শাঁস এক তোলা, তিলবাটা একতোলা ও শাঁস এক তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগের সত্ত্বর প্রশমিত হয়।

গুঠ, মরিচ ও শোধ কাষ্ঠ সমভাগে চূর্ণ করিয়া এক সিকি মাত্রায় তিল তৈলের সহিত লেহন করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়।

ছাগ দুগ্ধ বা গোরু দুগ্ধের মধ্যে রক্তবর্ণ উত্তপ্ত নৌহ নিষ্ক্ষেপ করিয়া সেই দুগ্ধ শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। স-সার দধি, মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাহিকা রোগীর অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে অণচ ভালরূপ মল নির্গত না হইয়া ফেণা ফেণা মল নির্গত হইলে মাত গুড়, ১ তোলা, গুঠ চূর্ণ দুই আনা, সাবয়ুক দধি দুইতোলা, তিল তৈল আধ তোলা, দুগ্ধ আট তোলা ও ঘৃত আধ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

প্রবাহিকা রোগে যে সকল বস্তি প্রয়োগের উপদেশ আছে, সেগুলি বিশেষ হিতকর। কিন্তু ঐ সকল বস্তি আর এক্ষণে প্রযুক্ত হয় না বলিয়া সে সকলের বিষয় উল্লিখিত হইল না।

প্রবাহিকায় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে রক্তাতিসারের কথিত যোগ সকল প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

রুদ্ধতা বশতঃ অতিসার জন্মিলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া এবং স্নিগ্ধতাবশতঃ জন্মিলে রুদ্ধ ক্রিয়া করিবে। ভয় ও শোক জন্ত অতিসারের প্রথমে সাহসনা বাক্য দ্বারা ভয় ও শোক নাশক বাক্যাদি দ্বারা শোক নাশ করিবে। বিষ, অর্পণ ও ক্রিমি জনিত অতিসারে ঐ সকল যোগ এবং অতিসার উভয়ের প্রতিকারক চিকিৎসা করিবে। বমন, মুচ্ছা, তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে অতিসারের অবিরোধীভাবে তাহাদের চিকিৎসা করিবে।

অরাতিসার—অরাতিসার একটা পৃথক রোগ নহে। অর ও অতিসার একই সময়ে এক ব্যক্তির শরীরে উৎপন্ন হইলে তাহাকে অরাতিসার বলা যায়। যদি পিত্তজ্বরে পিত্ত জন্ত অতিসার হয় অথবা অতিসার রোগে অর হয়, তবে ঐ মিলিত রোগকে অরাতিসার বলা যায়।

অরাতিসারে বিরুদ্ধ চিকিৎসা আবশ্যক। বৈজ্ঞগণ অরাতিসারকে কষ্টসাধ্য বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ অরে বিরোচন হিতকর, অণচ বিরোচন অতিসার রোগ বর্দ্ধক। আবার অতিসার রোগে ধারক ঔষধ প্রয়োগ হিতকর, অণচ ধারক ঔষধ অর বর্দ্ধক।

অতিসারের স্থায় অরাতিসারেও আম ও পক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। পথ্য প্রয়োগও অতিসারের স্থায়, তবে যাহাতে পথ্য জরের বিরুদ্ধ না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অরাতিসারের নিম্নলিখিত যোগ সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। (১) আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুতা, ক্ষেপ পাণ্ডা, গুলঞ্চ ও গুঠ ইহাদের কাথ অরবৃদ্ধ আমাতিসার নাশক। (২) বেণার মূল, বালা, মুতা, ধনে, বরাহকান্তা, ধাইফুল দোষ ও বেগুঠ ইহাদের কাথ অরাতিসার, অরুচি ও আম দোষ নাশক।

(৩, ৪) ইন্দ্রযব, আতইচ, গুঠ, চিরাতা, বালা ও ছয়ালতার কাথ অথবা ইন্দ্রযব, বরাহকান্তা, কটকী ও গজপিপ্পলীর কাথ সেবন করিলে অরাতিসার ও সাহ প্রশমিত হয়।

(৫) বেণার মূল, বালা, ধনে, মুতা, ক্ষেপ পাণ্ডা, গুলঞ্চ ও গুঠ ইহাদের কাথ অরবৃদ্ধ আমাতিসার নাশক। (৬) অর ও অতিসার একই সময়ে

আতাইচ, মুতা, বেলগুঠ, গুঠ, ও ধনের কাথ পান করিলে রক্তস্রাবযুক্ত জ্বরাতিসার প্রশমিত হয়। (৭) গুলঞ্চ, আতাইচ, ধনে, গুঠ, বেলগুঠ, মুতা, বালা, আকনাদি, চিরাতা, কুড়চি ছাল, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও পদ্ম কাষ্ঠ ইহাদের কাথ শীতল অবস্থায় পান করিলে জ্বরাতিসার, বমন বেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নষ্ট হয়। অতিসারের ঔষধ সকল

বিবেচনা পূর্বক জ্বরাতিসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আরোগ্য লক্ষণ—যাহার অধোবায়ু সম্যক-রূপে নির্গত হয়, দান্ত ব্যতীত প্রস্রাব হয়, অগ্নির দীপ্তি ও কোষ্ঠ লঘু হয়, তাহার রোগ ভাল হইয়াছে জানিবে।

ক্রী—

## চক্রপাণির জাতি নাশ।

চক্রপাণি দত্ত—একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার সর্বপ্রধান চিকিৎসা গ্রন্থখনি “চক্রদত্ত” নামে বিখ্যাত। বঙ্গের বৈজ্ঞানিক সমাজে “চক্রদত্তের” অসাধারণ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক “চক্রদত্তের” মৃত সর্বাঙ্গ সুন্দর চিকিৎসা বিদ্যক গ্রন্থ—এ দেশে আর দ্বিতীয় আছে বলিয়া মনে হয়না। চক্রপাণি একজন স্বাধীন-চিন্তাশীল চিকিৎসক ছিলেন। বৌদ্ধ যুগের শেষাবস্থায় যখন আয়ুর্বেদের সর্বনাশ হইয়াছিল,—আয়ুর্বেদের প্রধান অঙ্গ—শল্য-তন্ত্র একরকম উঠিয়া গিয়াছিল, সেই সময় চক্রপাণি—সত্যাত্মের অদ্বুত বীৰ্য্য সংযোগে শল্য-তন্ত্রের সকল প্রয়োজন সাধন করিয়াছিলেন; চক্রপাণির এ ঋণ বৈজ্ঞানিক সমাজ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেনা। আমি চক্রপাণির জীবনী লিখিতে বসি নাই, তাহার চিকিৎসা-গ্রন্থের সমালোচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। আমরা চিরদিনই চক্র-

পাণিকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া জানিতাম, সম্রাতি একজন কায়স্থ, সেই চির বৈজ্ঞানিক-চক্রপাণিকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। চক্রপাণির জাতি মারা যাইতেছে,—“ভেড়ার খুঁদে” পড়িয়া হীরার ধার ভাঙিতে বসিয়াছে, সেই টুকু জানাইবার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

সকলেই জানেন—আমাদের দেশে এখন জাতীয়তার একটা সাড়া পড়িয়াছে। সকলেই আপনার জাতিকে বড় করিবার চেষ্টা করিতেছে। এক সময় সাম্যের অভিনয় দেখাইবার জন্য অনেক ব্রাহ্মণও “পৈতা” ফেলিয়া ভগবান হইয়া ছিলেন, এখন আবার উপনয়নে অন্তিম কারী দল, সেই কুড়ানো পৈতা গলায় পরিতে চাহিতেছেন! এ রহস্য মক্ষ নহে। আমি এ উন্নয়ন চেষ্টারও নিন্দা করিতেছি না। আমি বলিতে চাই—বিশেষ উন্নয়ন চেষ্টা করিতে হইলে দেশের জাতি-জীবনকে রক্ষা করা



দড়কে ছোঁটা কর কেন? কথটা একটু বিস্তৃত করিয়াই বলি ।

“কারস্থ পত্রিকা” কারস্থ সমাজের এক পানি মুখপত্র । উহার এখন “নব পর্যায় ।” এই পত্রিকায়—“মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত”র বর্ণ নির্ণয় শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবন্ধটা নিত্যই অসার, একজন বৈজ্ঞানিক নিজের স্বজাতি শ্রেণীভুক্ত করা ইচ্ছা—বোধ হয় এইজন্তই সম্পাদক এই অক্লিষ্টকর প্রবন্ধ পত্রস্থ করিয়াছেন ! চক্রপাণি দত্ত—বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কিন্তু হইলে কি হয়—তাঁহার উপাধি যে “দত্ত”, আর রকা আছে? নিশ্চয়ই চক্রপাণি কারস্থ ছিলেন ! একপ যুক্তির বালাই লইয়া মরিতে চাচ্ছিলেন । এইরূপ যুক্তির বলে, স্ববর্ণ বণিক, তত্ত্বাবধি প্রভৃতি যে সকল জাতির দত্ত উপাধি আছে—তাঁহারা সকলেই মহাত্মা চক্রপাণিকে স্বজাতি বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিতে পারে ! দ্বিতী পৃষ্ঠক লেখকের কথাতেই শুভুন—

“চক্রদত্ত মধ্যে তিনি যে আত্ম-পরিচয় মূলক শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এত সংক্ষিপ্ত যে, তাহা হইতে প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করা দুঃসাধ্য বলিলেও অতুক্তি হয় না । শ্লোকটী এই—

গোড়াধি নাথ রসবত্যাধিকারি পাত্র—

নারায়ণ তনয়ঃ সুনয়োহস্তরক্ষাং ।

ভানোরণু প্রথিত লোপ্রবলী কুলীনঃ

শ্রীচক্রপাণিরিত কর্ণ পদাধিকারী ।

উক্ত শ্লোকের ‘টীকার প্রসিদ্ধ টীকাকার

শিবদাস সেন লিখিয়াছেন—গোড়াধিনাথো নর

পাল দেবঃ, তন্তু রসবতী মহানসং তত্ত্বাধিকারী,

উপঃ পাত্র মতি মন্ত্রী, স্নানশো বো নারায়ণন্ত

তনয়ঃ সুনঃ ইতি নীতিমান, অন্তরঙ্গাদিতি

আম্বা—৪

লঙ্কান্তরঙ্গ পদবিকাং ভানোরহু নারায়ণন্ত তনয় ইতি বোজ্যঃ । তেন ভানোরহুজ ইত্যর্থঃ । বিভািকুল সম্পন্নো হি ভিষগন্তরঙ্গ ইত্যুচ্যতে । লোপ্রবলী কুলীন ইতি লোপ্রবলী সংজ্ঞকঃ দত্ত কুলোৎপন্নঃ ।

“উদ্ধৃত শ্লোক ও টীকাই আমাদের প্রধান অবলম্বন । উহা হইতে জানা যাইতেছে যে, গোরাধিপতির [ নর পাল দেব ] নারায়ণ দত্ত নামক মন্ত্রী ছিলেন । তিনি রাজার রক্ষন শালার তত্ত্বাবধান করিতেন । নীতিমান, লোপ্রবলী ও কুলীন ( লোপ্রবলী সংজ্ঞক দত্ত কুলোৎপন্ন ) চক্রপাণি দত্ত উক্ত নারায়ণ দত্তের পুত্র ছিলেন । চক্রপাণির জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম তাহ দত্ত—তিনি রাজার অন্তরঙ্গ ( অর্থাৎ বিজ্ঞা কুল সম্পন্ন ভিষক ) ছিলেন । বলা বাহুল্য বন্ধনীর মধ্যবর্তী বাক্যাংশটি টীকাকারের । তাহা মূল নাই ।

“পূর্বেউদ্ধৃত শ্লোকে ( এমন কি টীকার যদিও চক্রপাণি দত্ত মহাশয় ( কিম্বা তাঁহার টীকাকার শিবদাস সেন ) তাঁহার জাতি সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনই পরিচয় প্রদান করেন নাই, তথাপি নিজেকে ‘লোপ্রবলী কুলীন’ সংজ্ঞায় পরিচিত করায় তাহা হইতেই তাঁহার জাতি-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে । টীকাকার শিবদাস সেন তাহা শত চেষ্টাতেও গোপ করিতে পারেন নাই । আজীবন মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রচার করিবার অনর্থক চেষ্টার ব্যাপ্ত থাকা প্রযুক্ত কারস্থদেবী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ও গ্রন্থকারের ইঙ্গিত সম্যক প্রণিধান করিতে পারেন নাই । কেবলমাত্র ‘দত্ত’ উপাধি দেখিয়াই নির্দিষ্টারে তাঁহাকে ‘বৈদ্য’ সারাস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন ।

“চক্রপাণি নিজেকে ‘লোপ্রবলী কুলীন’ বলিয়া পরিচয় প্রদান করায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভানু দত্ত ( শিব দাস সেনের মতে ) “বিভাকুল সম্পন্ন” হওয়ায় চক্রপাণির বংশ যে মহা কুলীন ছিলেন তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র কায়স্থজাতি ব্যতীত অল্প কোন জাতি মধ্যেই দত্ত উপাধিদারী ব্যক্তি ( শ্রেষ্ঠ ) কুলীন বলিয়া স্বাক্ষরিত হ’ন নাই। বৈষ্ণব জাতি মধ্যে ‘দত্ত’ উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিকৃষ্ট বলিয়াই পরিগণিত।

\* \* \* \*

“অল্প কোন জাতিতে বিশেষতঃ বৈষ্ণবজাতির মধ্যে ‘দত্ত বংশ’ কুলীন বলিয়া কখনই গণ্য ছিল না। এরূপ স্থলে ‘চক্রপাণি দত্ত শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করায় তিনি কায়স্থই হইতেছেন। \* \* শুধু ‘কুলীন’ শব্দের প্রয়োগ দ্বারাই মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের কায়স্থ জাতির পরিচুতি হইয়া উঠিয়াছে, এবং তিনি যে কুলীন শ্রেষ্ঠ কায়স্থ পুরুষোত্তম দত্তের বংশ সম্ভূত ছিলেন তাহাই স্মৃতি করিয়া দিতেছে। সম্ভবতঃ আধুনিক কালের গঙ্গা স্রোতঃ” প্রভৃতি কুলসংজ্ঞার আয় ‘লোপ্রবল’ শব্দ তাৎকালিক ( পুরুষোত্তম দত্তের ) দত্ত কুলের কুলীন প্রকাশক বিশেষ সংজ্ঞা ছিল। দত্ত কুলের কোলিনা লোপের সহিত উক্ত “লোপ্রবলী সংজ্ঞাটিও কুলসংজ্ঞা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্মা।”

এক্ষণে পাঠক মহাশয়! বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন—এই সেনবর্মা স্বাক্ষরকারী প্রভাস চন্দ্র—একজন বৈষ্ণব ঘোষী বটেন। তাই গোটীন পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিহার্যের মত একজন শাস্ত্র-বিশারদকে আক্রমণ করিতে ইনি

একটুও সঙ্কুচিত হন নাই। ইহা অবশ্যই নূতন ক্ষাত্র ধর্মের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। এ সম্বন্ধে আমি একটী কথাও কহিতে চাহিনা।

লেখক প্রকাশ করিয়াছেন—“টাকাকার শিবদাস সেন তাহা শত চেষ্টাতেও লোপ করিতে পারেন নাই।” ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, চক্রপাণি যে কায়স্থ ছিলেন, শিবদাস সেন কোশলে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি বিস্মিত হইতেছি,

—লেখকের এ ধারণা কেমন করিয়া হইল?

শিবদাস সেনের সময়ে ত “বৈষ্ণব বড় কি কায়স্থ বড়?”—এরূপ আন্দোলনের সূত্রপাতও ছিল না। উমেশচন্দ্র কায়স্থ ঘোষী হইতে পারেন, কিন্তু তাহা নগেন্দ্র নাথ বহুর বৈষ্ণব বিদ্বেষের পুরোবর্তী নহে। নগেন্দ্র বাবু নিজের স্বজাতিকৈ বৈষ্ণবের চেয়ে বড় বলিয়া প্রকাশ করিবার পর, বাধ্য হইয়াই শাস্ত্রজ্ঞানী উমেশচন্দ্র, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। উমেশ বাবুর উপর এই রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্বে—লেখক যদি নগেন্দ্র বাবুর বৈষ্ণব বিদ্বেষের কথাটা একটা ভাবিয়া দেখিতেন, আমরা তাঁহার বুদ্ধি প্রশংসা করিতে পারিতাম। তিনি (অর্থাৎ লেখক) সংস্কৃত ভাষা জানেন না, ইতিহাসোদ্ধার ধারেন না, বৈষ্ণব কুলকারিকা বুঝে না, অথচ সাদা কাগজে কাসির অক্ষরে চক্রপাণিকে কায়স্থ লিখিয়া নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

লেখক প্রভাস চন্দ্র সেনবর্মা তনয় থাকিবেন—এক সময় এই বর্ষদেপে বৈষ্ণব প্রভাব বড় প্রবল হইয়াছিল। বৈষ্ণব রাক্ষস প্রজা সকলেই, বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব রাক্ষস হইয়াছেন।

অভিজ্ঞাতের গর্ভ—উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পরই নবীন হিন্দুধর্ম অনুষ্ঠান। দেশে তখন বেদবিদ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় নাই। মহারাজ আদিশুরকে যন্ত্র অন্তঃস্থানের জন্ত বজ্রের বাহির হইতে ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। পাল রাজগণ যে বৌদ্ধমতাবলম্বী রাজা ছিলেন, এ কথাও প্রিয়ান প্রভাসচন্দ্র শুনিয়া থাকিবেন। এই বৌদ্ধ প্রভাব—পূর্ববঙ্গের বহু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে উপবীত ত্যাগ করাইয়াছিল। বৌদ্ধ শাসনে ষাণ্ঠবা উপবীত ত্যাগ করেন নাই, নিজের জাতির গৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন,— তাঁহাদের নাম হইয়াছিল “লোথবলী”। এরূপ ব্যক্তির সমাজ-সম্মান যথেষ্ট ছিল। এরূপ ব্যক্তির ঘোঁষানে বাস করিতেন, সেই স্থানকে “লোথবল” বলিত। বৈষ্ণবদের কুলপুস্তকেও ইহা প্রমাণ পাওয়া যায়;—যথা,—

মালকঃ সেন কুলস্য গুণান্যং খণ্ডমেবচ।

লোথবলঃ দত্তানাং কুলস্থানং প্রকীর্তিতং ॥

বৈষ্ণব পঞ্জী। ২য় অঃ।

চক্রপাণি, পিতা নারায়ণের নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন, পিতামহের নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই। ‘সেনবর্মা’ (৭) জোর করিয়া সেই নারায়ণকে পুরুষোত্তমের পুত্র বলেন কোন্ সাহসে?

সেন বর্মা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিয়াছেন, —“লোথবল” দত্ত উপাধিধারী বৈষ্ণবদের একটি কুল স্থানের নাম। দত্তোপাধিক যে সকল বৈষ্ণব উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন, তাঁহাদের সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়া

পড়িয়াছিল। চক্রপাণি এ শ্রেণীর বৈষ্ণব ছিলেন না, পাছে তাঁহার দত্তান্ত নাম দেখিয়া কাহারও মনে সে সন্দেহ হয়, সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্তই, তিনি যে লোথবলী কুলীন—এরূপ কথায় “চক্রদত্তের” উপসংহারে—যৎকিঞ্চিৎ আশ্রয় পরিচয় দিয়াছিলেন। শিবদাস সেন সে পরিচয় ঢাকিবার চেষ্টা করেন নাই। চক্রপাণি যে বৈষ্ণব ছিলেন—চক্রপাণিশিষ্য হরিশ্চন্দ্র ‘ক্রিয়া কৌমুদী’ গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলা-চরণ শ্লোকে শিবকে প্রণাম করিয়া তাহার পরেই চক্রপাণিকে নমস্কার করিয়াছেন—

“অষ্টম বংশোদ্ভব চক্রপাণি রাজস্ব পুণ্য

প্রথিতঃ স্বনামা।”

অতএব চক্রপাণি দত্তের জাতি মারিবার চেষ্টা করিয়া “সেন বর্মা” কেবল উপহাস্যাপদই হইয়াছেন। সেনবর্মা নিজেই ভাবিয়া দেখুন—চক্রপাণির “দত্ত উপাধি দেখিয়াই নির্দিষ্টারে তাঁহাকে” তিনি কায়স্থ সাব্যস্ত করিয়াছেন—

কি না? গ্রন্থ শেষে চক্রপাণি লিখিয়াছেন—

যঃ সিদ্ধবোণ লিখিতাধিক সিদ্ধ বোণা

নত্রেব নিক্ষিপতি কেবল মুক্তরেখা।

ভট্টজয়-ত্রিপথ-বেদ-বিদা জনেন

দত্তঃ পতেৎ সপদি মুক্তি তস্য শাপঃ।

ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব ভিন্ন এরূপ শপথ কি কার্যস্থ কখনও উচ্চারণ করিতে সাহস করে?

চক্রপাণির বংশ এখনও চৌপাঁড়া গ্রামে—

বর্তমান রহিয়াছে, “সেন বর্মা” সে সকল লইয়াছেন কি?\*

শ্রীরাম সহায় কাব্যতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য।

\*এরূপ জাতি মারিবার চেষ্টা, ইহাই নূতন নহে। “নব্য ভারত” নামক অসিদ্ধ সাময়িক পত্রে কৈলাস চন্দ্র সিংহ, বৈষ্ণব রাম প্রসাদ সেনকে “কায়স্থ” বলিয়া—একবার চক্রপাণির চেষ্টা কায়স্থ ছিলেন। রাম প্রসাদ

## ‘বকে’র গুণ।

—:—

## সর্দিতে।

বকের ফুল সব্বের তেলে  
সর্দি ভাল হয় ভেজে খেলে।

## সর্দি-কাশিতে।

বক মূলের ছাল আধ ভরি,  
বচ নাও সমান করি—  
এক পোয়া জলের এক ছটাক শেষ,  
মধু দিয়ে লাগবে বেশ।  
ছ’ তিন বারে সেবন কর,  
সর্দি-কাশিতে উপকার বড়।

## জ্বরে।

বকছাল, অনন্তমূল, আধ আধ ভরি,  
গোক্ষুর বীজ, হরীতকী সমান করি,  
আধসের জলের এক ছটাক শেষ,  
বাত-জ্বর এতে হয় বিশেষ।  
ওষুধ এটি চাতুর্থক জ্বরেও,  
প্রয়োগ কর আর ত্র্যাহিকেও।

## চাতুর্থক জ্বরের পরিচয়।

এক দিন হ’য়ে ছ’ দিন পর  
আবার দেখা দেয় জ্বর,

চাতুর্থক জ্বর নাম তাহার,  
বকফুল ভাজা খেলে হয় উপকার।

## কফ-পিত্তরোগে।

কফ-পিত্ত রোগ যাহার  
বক ফুলের মধু উপকার তা’র।

## রাতকাণা রোগে।

এক সের গাওয়া ঘৃত নিয়ে  
বকের পাতা এক পোয়া-মিশিয়ে দিয়ে,  
মুহু আঙুনে পাক কর,  
রাতকাণায় খেলে উপকার বড়।

## অপস্মারে।

বকের পাতা ছই ভরি,  
গোল মরিচ তার সিকি করি,  
চোণা দিয়ে বেটে নিয়ে  
অপস্মারে দাও নস্য দিয়ে।

## বাতরক্তে।

ম’ষের ছুধে বকফুলের গুঁড়  
ভাল ক’রে মিশাল কর,  
তা’র পর তাহার দধি খেকে—  
ননিটা দাঁওগে গলায় মেখে।

মৌহিত্য বংশের বংশধর একজন উকীলের এবং ক্রীষ্ণ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কণাধাতে কৈলাস চন্দ্রের চেষ্টায় হইয়াছিল। আমরা চক্রপাণির পরিচয় জানি, পৃথক অবধে তাহা একটু হইবে। “পুরুষোত্তম রত্ন” কামরূপে কুলে একজন অসিদ্ধ ব্যক্তি। চক্রপাণি যদি তাহার পৌত্র হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পদবি বিখ্যাত পিতামাতার নামোন্মেষ করিতে বিরত হইতেন না।—আঃঃঃ

বাতে।

বক গাছের মূল আর খুতুরা মূল.

সমান ভাগে কর তুল,

বাথা—ফোলায় প্রলেপ দাও

হাতে হাতে যদি স্ফুল চাও।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

## রসায়ন ও বাজীকরণ।

(পূর্ব-প্রকাশিত অংশের পর।)

—:—

শাস্ত্রে নানা প্রকার রসায়নের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বহুবায়-সাধ্য এবং বহু উপকরণ সাপেক্ষ। এই প্রবন্ধে আমরা সেই-সকলের উল্লেখ না করিয়া অনায়াসে লাভ কৃতকগুলি ঔষধের উল্লেখ করিতেছি। “হরিতকী” শীর্ষক প্রবন্ধে ঋতু হরিতকী নামক বসায়নের বিষয় লিখিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে এতদ্বারা উল্লেখ করা হইল না। সর্বজন পরিচিত চ্যবনপ্রাশ ও একটি উৎকৃষ্ট রসায়ন।

(১) মধুকর্ণীর (খলকুড়ির রস, (২) ছন্ধের সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ, (৩) মূল ও পুষ্প সহ গুলকের রস সেবন করিলে আয়ু, বর্ণ, বল, শব ও স্মরণ শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

অধগন্ধা চূর্ণ পিত্ত প্রধান ধাতুতে ছদ্ধ সহ, বাতপিত্ত প্রধান ধাতুতে তিল তৈল সহ এবং বায়ু ও কফ প্রধান ধাতুতে উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে শরীর পুষ্ট হয়। সহমত একটা হইতে ৪৫ টা পিপুল, য়ত ও মধু সহ এক বৎসর কাঁচ সেবন করিলে রসায়ন হয় এবং কাস, খাস গলরোগ, পাণ্ডু, বিষম জ্বর, বরভঙ্গ, পীনস, শোথ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

পিপুলী বর্দ্ধমান যোগ,—প্রথম দিন তিনটা পিপুলী সেবন করিয়া, প্রত্যহ তিনটা করিয়া বৃদ্ধি করিবে, অর্থাৎ প্রথম দিন তিনটা, দ্বিতীয় দিন ছয়টা, তৃতীয় দিন নয়টা, এইরূপ দশ দিন করিতে হইবে। দশ দিনের পর আবার তিনটা করিয়া প্রত্যহ কমাইতে থাকিবে। আবার দশ দিন পরে তিনটা করিয়া বর্দ্ধিত করিয়া, আবার দশ দিন পরে তিনটা করিয়া কমাইবে। এইরূপ নিয়মে এক সহস্র পিপুল সেবন করিতে হয়। এই পিপুলী-রসায়ন পুষ্টিকর, স্মরণ জনক, আয়ু বর্দ্ধক, প্রীহানাশক, বয়োস্থাপক এবং মেধাজনক। শাস্ত্রে বাহা অধম মাত্রা—তাহাই লিখিত হইল। এই মাত্রায় সহ্য না হইলে, আরও কম মাত্রায় সেবন করা উচিত। বলবান ব্যক্তির পক্ষে পিপুল পেষণ করিয়া ছন্ধের সহিত সেবন করা উচিত, মধ্য-বল ব্যক্তিগণের পক্ষে কাথ-প্রশস্ত এবং হীন-বল ব্যক্তিগণের শীত-করায় করিয়া সেবন করা কর্তব্য। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত ও ছদ্ধ সহ বষ্টক তত্বুলের অন্ন পথ্য করিবে।

(১) মৌহভঙ্গের সহিত, (২) সর্পভঙ্গের সহিত, (৩) বাতের সহিত, (৪) ঘৃত ও মধু

সহিত, (৫) বিড়ঙ্গ ও পিপ্পল চূর্ণের সহিত, (৬) অথবা সৈন্ধব লবণের সহিত একবৎসর কাল ত্রিফলা সেবন করিলে মেধা, স্মৃতি, বল ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং জরা নষ্ট হয়।

পূর্বদিনের আহার জীর্ণ হইলে প্রাতে একটা হরীতকী, মধ্যাহ্ন আহারের পূর্বে দুইটা বহেড়া এবং আহারের পরে চারিটা আমলকী ( প্রত্যেকটা ) ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে সুস্থ শরীরে একশত বৎসর জীবিত থাকা যায় এবং সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারে না। আমলকী ও কৃষ্ণ তিল ভৃঙ্গরাজের ( ভীমরাজ ) রসে পেষণ করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় নির্মল, শরীর ব্যাধিহীন এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ হয়।

বৃদ্ধদারকের ( বীজতারক ) মূল চূর্ণ করিয়া, শতমূলীর রসে আর্জ করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে পরদিন পুনরায় শতমূলীর রসে মাখিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহাকে ভাবনা দেওয়া বলে। এইরূপ সাত দিন করিয়া সেই ঔষধ সহমত মাত্রায় ( দুই আনা হইতে আধতোলা ) কিঞ্চিৎ ঘৃত সহ সেবন করিলে বলিপলিত নষ্ট হয় এবং মেধা ও স্মৃতি বদ্ধিত হইয়া থাকে।

হস্তিকর্ণ পলাশের মূল চূর্ণ, ঘৃত কিংবা মধুর সহিত সেবন করিলে দীর্ঘ আয়ু এবং মেধা লাভ করা যায়। ইহা একটা উৎকৃষ্ট বাজী-করণও বটে।

আমলকী চূর্ণ আট সের—এক সহস্র আমলকীর রসে একুশ বার ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত ঘৃত ৮ আটসের, মধু আটসের, পিপ্পল চূর্ণ একসের ও চিনি দুই সের মিশ্রিত করিয়া একটা পায়ে রাখিয়া পাত্রেয় যথ ক্রম

করিবে। বর্ষান্ত্রে উক্ত পাত্র ভস্মরাশির মধ্যে রাখিয়া, শরৎ কালে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় ( আধ তোলা হইতে দুই তোলা ) সেবন করিলে বল, বর্ণ, মেধা, স্মৃতি, জীবনীশক্তি ও আয়ু বদ্ধিত হয়।

বিড়ঙ্গ রসায়ন—বিড়ঙ্গ চূর্ণ, ঘটযধু ও শীতল জল কিম্বা মধু ও কিসমিসের কাথ, অথবা মধু ও আমলকীর কাথ কিম্বা গুলঞ্চের কাথের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত সংযুক্ত লবণ-বিহীন দুগের ঘূষ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ যথেষ্ট ঘৃতযুক্ত অন্ন আহার করিবে। ইহাতে অশ্রোগ ও ক্রিমি নষ্ট হয় এবং মেধা ও আয়ু বদ্ধিত হয়।

খেত বেড়েলা, পীত বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, ভুইকুমড়া ও শতমূলী—ইহাদের যে কোন একটার মূল চূর্ণ, দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত-দুগ্ধ-প্রধান খাদ্য আহার করিবে। এই ঔষধ পরমায়ু বর্দ্ধক, বলকারক এবং রক্তপিণ্ড রোগনাশক। পীত বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলে জলের সহিত সেবন করা প্রশস্ত। গৃহমধ্যে থাকিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে সমধিক ফল লাভ হয়।

খেত সোমরাজী, রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ইক্ষু গুড় মাখিয়া ঘৃতাক্ত কলসের মধ্যে রাখিবে এবং কলসের মুখ বন্ধ করিয়া তাহা ধাতু রাশির মধ্যে স্থাপিত করিবে। সাত দিন পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিদিন স্বর্ধ্যোদয়ের পূর্বে সহ মত মাত্রায় সেবন করিয়া উক্ত বল পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে শরীর শীতল জলে ধুইয়া ফেলিবে এবং শালিধাজের অন্ন হস্ত ও চিনি সংযোগে আহার করিবে। ইহা বল, বর্ণ, স্মৃতি ও পরমায়ু বর্দ্ধক।

কৃষ্ণবর্ণ সোমরাজী চূর্ণ, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ, পাণ্ডু, ও উদর রোগ নষ্ট হয় এবং বল, স্মৃতি ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়। এই ঔষধ প্রাতে সূর্য্যের রক্তিমবর্ণ দূর হইলে সেবন করিতে হয় এবং লবণবিহীন আমলকীব ঘূষের সহিত সংযুক্ত অন্ন পথা করিতে হয়।

মধুক পণী রসায়ন—মধুক পণীর (খুল-কুড়ির) রস ছুঙ্কসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে অথবা রস সেবন করিয়া ছুঙ্ক পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ছুঙ্ক, ঘৃত, তিল এবং ধব দ্বারা প্রস্তুত খাণ্ড আহার করিবে। অন্ন (ভাত) পরিত্যাগ করা উচিত। এই ঔষধ সেবন করিলে মেধা ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়। কুটা প্রাণেশিক নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে অধিক ফল হয়। প্রথমে ২১ দিন উপবাস করিয়া ঔষধ সেবন করা কর্তব্য।

ত্র্যক্ষী রসায়ন—অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া ত্র্যক্ষী শাকের রস সহ মত মাত্রায় পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে লবণ বিহীন মণ্ড, পেয়াদি ছুঙ্ক সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অত্যন্ত মেধা বৃদ্ধি হয় এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়।

প্রাতঃকালে ধারোক্ষ ছুঙ্ক বা শীতল জল পান করিলে কাস, শ্বাস, অতিসার, জ্বর, পীড়কা, কুষ্ঠ, কোষ্ঠ, মূত্রাঘাত, অর্শঃ, শোথ, গলরোগ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, বাত, পিত্ত, কফ ও ক্ষত জনিত রোগ সকল নষ্ট হয় এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়।

প্রাতঃকালে শীতল জলের নস্ত গ্রহণ করিলে বান্ধ, বলি, পলিত, পীনস, স্বরভঙ্গ ও কাস ভাল হয় এবং শরীর পুষ্ট ও দৃষ্টি শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

নিগুণ্ডী কল্প—নিসিন্দা মূলের ছাল চূর্ণ এক সের ও মধু দুই সের একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। পরে উক্ত ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া একমাস ধাতু রাশির মধ্যে স্থাপিত করিবে। অনন্তর উদ্ধৃত করিয়া তক্র বা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বলি-পলিত নষ্ট হয়, বল, বার্ষ্য, আয়ু, মেধা ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং বিবিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ এক ভাগ, তিল অর্দ্ধভাগ এবং আমলকী চূর্ণ অর্দ্ধভাগ—একত্র করিয়া চিনি বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে অকাল জরা ও বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

খণ্ডায়ক—সুপক মিষ্ট আত্মের রস ৬৪ সের, চিনি ৮ সের, গব্য ঘৃত ৪ সের, শুঁঠ চূর্ণ ৩২ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপ্পল চূর্ণ ১৬ তোলা এবং জল ৮ সের একত্র করিয়া মৃৎ পাত্রে পাক করিবে। যখন হাতায় লাগিবে, এরূপ ঘনীভূত হইলে তখন নামাইয়া তেজপাত্রে চূর্ণ ৩২ তোলা এবং গেটোলা, চিতামূল, ধম্ব, মূতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিপ্পল, মরিচ, জায়ফল, তালীশপত্র, দারুচিনি, ছোট এলাচ ও নাগকেশর প্রত্যেকের চূর্ণ আট তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনন্তর শীতল হইলে ৪ সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ একতোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় আহারের পূর্বে সেবন করিবে। অর্শঃ, অন্নপিত্ত কাস, শ্বাস, ক্রম, মুচ্ছা, বমি, মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয় এবং মেধা ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট রাজীকরণ।  
যষ্টিমধু চূর্ণ, বংশলোচন চূর্ণ, পিপ্পল চূর্ণ, চিনি অথবা মধু ও ঘৃত—ইহা

একটার সহিত ত্রিফলা চূর্ণ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়ন হয়।

লৌহ ভস্ম বা স্বর্ণ ভস্ম, বচের চূর্ণ সহ অথবা স্নাত ও মধুসহ কিম্বা বিড়ঙ্গ ও পিপ্পল চূর্ণের সহিত এক বৎসর সেবন করিলে জরা নষ্ট হয় এবং মেধা, স্মৃতি, বল ও পরমায়ু বদ্ধিত হইয়া থাকে।

রসায়নের পুষ্টিজনক অনেক ঔষধ প্রয়োগে বাজীকরণ এবং 'বাজীকরণের অনেক ঔষধ প্রয়োগে রসায়ন হইয়া থাকে। বৃদ্ধমান ব্যক্তি বিবেচনা পূর্বক এক অধিকারের ঔষধ অল্প অধিকারে প্রয়োগ করিতে পারেন।

## ক্ষয়রোগ।

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

যক্ষ্মারোগের সাধারণ লক্ষণ—ক্ষুধা ও পার্শ্ব দেশে বেদনা, গাত্র গরম হওয়া ও জ্বালা করা এবং সর্বদা জ্বর থাকা ক্ষয়রোগের সাধারণ লক্ষণ। এই কয়টি উপসর্গ যুগপৎ ঘটিলে ক্ষয় রোগ বলিয়া আশঙ্কা করিবে।

যক্ষ্মার একটি প্রধান উপসর্গ অতিরিক্ত ষাম হওয়া। অনেকে যক্ষ্মা রোগের নিদানে ইহার উল্লেখ না দেখিয়া ক্ষুধা হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষুধা হইবার কোন কারণ নাই। জ্বর-নিদান অল্পসন্ধান করিলেই ইহার মীমাংসা হয়। ক্ষয়রোগে জ্বর হইলে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। ক্ষয় রোগে প্রলেপক নামক জ্বর হয়। প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ যথা :—

প্রসিদ্ধিগ্নি গাত্রাণি ঘর্ষণে গোববে ন চ।

জ্বর বিলেপী চ সশীতঃ স্রাবঃ প্রলেপকঃ ॥

অর্থাৎ যে জ্বরে শরীর ঘর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত ও শুষ্ক হয় এবং শীত লক্ষণ বিশিষ্ট মন্দ মন্দ জ্বর হয় তাহাকে প্রলেপক জ্বর বলে। ক্ষয়রোগে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ক্ষয়রোগের পূর্বরূপ—ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাস, অঙ্গ মর্দ (গাত্র বেদনা), কফ নির্গম, তালুশোথ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, নাসিকা দিয়া জল ও কফস্রাব, শ্বাস, পীনস ও নিদ্রাধিক্য উপসর্গ ঘটে। রোগীর চক্ষু ষেত বর্ণ হয় এবং মাংস ভক্ষণ ও স্ত্রী সহবাসে ইচ্ছা হয়। রোগী স্বপ্ন দেখে—কাক, শুক, নীলকণ্ঠ, শকুন—এই সকল পক্ষী এবং বানর ও কীট-লাস যেন তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, নদী জলশূণ্য হইয়াছে, শুক বৃক্ষ সকল যেন বার ও ধূমে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

রোগ মাত্রাই প্রবল বা মুহূর্ত্তাবে প্রকাশ পাইতে পারে। জ্বর বলিতে দুই এক দিনে মারাত্মক জ্বরও বুঝায়। আবার সামান্ত-সাধ্য জ্বরও বুঝায়। যক্ষ্মা রোগও সেইরূপ প্রবল বা অপ্রবল ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। রোগের প্রাবল্য বা অন্তত রোগীর শরীরের অবস্থা ও রোগবীজের উপর নির্ভর করে। প্রবল রোগে হঠাৎ শীত করিয়া জ্বর হয়, অপ্রবল



হাস্যরস ও পীড়ার বেদনা উপসর্গ ঘটে এবং উপসর্গ সকল ক্রমে বাড়িতে থাকে। নীলবর্ণ পুরের স্রাব ক্রমে নির্গত হয়, কখন কখন মুখ দিয়া রক্ত উঠে! ক্রমে পূর্ব কথিত উপসর্গ আসিয়া জোটে।

অপ্রকাশ যক্ষ্মা নানা আকারে প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে রোগ একরূপ ভাবে প্রকাশ পায় যে, সহজে ক্ষয়রোগ বলিয়া ধরা পড়ে না। কাহারো ক্ষয় আমরা যত প্রকার দেখিয়াছি, নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ঘূর্ণ ঘূর্ণে অর, ঘূর্ণ ঘূর্ণে কাস—এইরূপ আকারে অনেক স্থলে প্রকাশ পায়। রোগী প্রথমে গ্রাহ্যই করে না, বিশেষ বিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যতীত সহজে রোগ ধরিতে পারে না। অর ও কাসের চিকিৎসা চলিতে থাকে। কখন কখন হঠাৎ রোগ প্রবল আকারে প্রকাশ পায়, কখন বা ধীরে ধীরে রোগীর দেহ ও প্রাণ ক্ষয় করিতে থাকে। যখন ধরা পড়ে, তখন রক্ষার আর উপায় থাকে না। মুখ দিয়া রক্ত উঠা—কখন কখন হঠাৎ মুখ দিয়া রক্ত উঠে, সঙ্গে সঙ্গে অর বৃক্কে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। কখন বা একদিন মুখ দিয়া রক্ত উঠে, দীর্ঘকাল পরে আবার একদিন উঠে, কিছুদিন পরে আবার উঠে, শেষে রোগ প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়। একবার রক্ত উঠার পর দুই বৎসর রক্ত উঠে নাই, দুই বৎসর পরে রক্ত উঠার পর আবার এক বৎসর উঠে নাই, কিন্তু ছয় মাস পরে রোগ প্রবলভাবে প্রকাশ পাইল এবং রোগী সম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হইল—ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

স্বপ্নদোষ ও রক্তহীনতা—রোগীর বয়স ২৭২০ বৎসর, নিত্য স্বপ্নদোষ হয়, শরীর আধাচ্—৫

অত্যন্ত রক্তহীন হইয়া পড়িতেছে, ক্ষুধা ও কোষ্ঠকৃদ্ধি ভাল হয় না, বিকালে একটু জ্বর ভাব হয়।—কবিরাজ জ্বরের চিকিৎসা করেন, কোন ফল হয় না। ২১৩ মাস পরে অল্প একজন বিজ্ঞ কবিরাজের চিকিৎসায় কিন্তু আরোগ্য লাভ করিল—এমনও দেখা গিয়াছে।

অজীর্ণ ও রক্তহীনতা—রোগীর বয়স ২৭১২৮ বৎসর, আসিয়া বলিল—অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছি, অন্ন ঢেকুর উঠে, বমি হয়। অমুক অমুক দেখিয়াছেন কিছু হয় নাই। অজীর্ণ রোগের যেরূপ অবস্থা এবং যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল—তাহাতে উপকার হইবার কথা—তবে হইল না কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাতর শরীর কি এইরূপ ক্লান্ত? রোগী বলিল, না মহাশয়, আমি এর ডবল ছিলাম, দেড়মাসে এইরূপ হইয়া গিয়াছি। ক্ষয় রোগ স্থির করিলাম, রোগীর বোধ হয় বিশ্বাস হয় নাই। অল্প চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে ক্ষয়রোগে মৃত্যু হইল—এরূপ কপাও শুনিয়াছি।

স্বরভঙ্গ, গলা বেদনা—রোগী আসিয়া বলিল, কবিরাজ মহাশয়, স্বরভঙ্গ হ'য়েছে, গলায় ঝড় বেদনা আর সর্সদা সর্দি জ'মে আছে। অমুক অমুক দেখিয়াছে, কোন ফল হয় নাই। দুই সপ্তাহ চিকিৎসা করা হইল, কোন ফল হইল না। তৃতীয় সপ্তাহে রোগী আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, কখন গলার ব্যায়াম হ'য়েছিল কি? উত্তর “না।” রোগীর শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে দেখিয়া রোগ স্থির করিয়া চিকিৎসা করা হইল, আরোগ্য লাভ করিল। এরূপ অবস্থায় দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডু রোগ, উদরী।—রোগী পরিচিত, নিবাস ইটালিতে ছিল। পাণ্ডুরোগের মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কলিকাতার কয়েকজন জ্ঞপ্রসিদ্ধ কবিরাজ, এলোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা করেন। তাঁহারা রোগীকে পেটে জল হইবে বা হইয়াছে সন্দেহ করেন। ইহাকে কিন্তু গুপ্ত যক্ষ্মা মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় মূর্ত্তি দেখাইয়াছিল।

আশ্চর্য্য রোগী।—রোগীর বয়স প্রায় চল্লিশ। মুদিখানার দোকান আছে, বাগানে তরকারী করিয়া বিক্রয় করে। আসিয়া অবস্থা জানাইল,—জ্বর, কাস, মুখ দিয়া রক্ত উঠে, মস্তিষ্ক উপসর্গ আরও ছিল, স্মরণ নাই। ক্ষয়রোগ স্থির করিলাম। রোগী—ম'শায় ছ বৎসর হ'ল বিয়ে করেছি বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দুই সপ্তাহ

চিকিৎসার পরে রোগী কোথায় গেল জানি না। এক বৎসর পরে দেখি, রোগী এক প্রকাণ্ড বজ্র মাথায় করিয়া বাজারে চলিয়াছে। কি ব্যাপার, অপ্রবল ক্ষয়রোগ,—না ক্ষয় রোগ নয়, না তাহার নব বিবাহিতা পত্নীর এয়োতের জোব,—এ সমস্তার মাঁমাংসা হয় নাই।

ম্যালেরিয়ার বেশে যক্ষ্মা।—কখন কখন যক্ষ্মারোগ ম্যালেরিয়ার আকারে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা প্রায়ই ম্যালেরিয়া-প্রধান-স্থান হইয়া থাকে, প্রথমে ধরা পড়ে না। ম্যালেরিয়া অপেক্ষা শরীরের অধিকতর ক্ষয় হয় বলিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসক কিছুদিন পরে ধরিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

## মকরধ্বজের প্রস্তুত প্রণালী।

(২)

আমি যে নিয়মে “মকরধ্বজ” প্রস্তুত করিয়া থাকি, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে “মকরধ্বজ” সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিব।

অন্য কয়েকদিন পূর্বে আমার এক পোত্র একখানা ঔষধের তালিকা পুস্তক আনিয়া আমার দেখায় এবং রহস্ত করিয়া আমাকে বলে—“দাদামশায়! তোমাদের মকরধ্বজ প্রস্তুতের সমস্ত বুজঝুকা এইবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই দেখ—এই পুস্তকে লেখা রহিয়াছে—মকরধ্বজ খুব কম খরচে তৈয়ার হয়। কবিরাজেরা অনর্থক বহুমূল্য লইয়া

মকরধ্বজ বিক্রয় করে। মকরধ্বজের ভরি ৪১ টাকার বেশী হইতে পারে না।”

নাভী আমাকে বইখানা পড়িতে দিয়া চলিয়া গেল। মাধ্যাহ্নিক আহ্বারের পর আমি বেশ অভিনিবিষ্ট হইয়াই বইখানা পড়িয়া ফেলিলাম, পড়িয়া বুঝিলাম—এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও ঔষধের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অপূর্ণ মূল্য-গুরুগণ পুস্তিকায় সমস্ত কবিরাজের বিবরণেই এক চাতুরীময় সমস্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে! বইখানা পড়িয়া আমার হাসি আসিল। কেননা এই ব্যক্তি লিখিয়াছে—“আমি যে গুরুতর রোগে ভুগিয়াছিলাম,

কবিরাম, তাহাতে অনেক কবিরাজই আমাদের দোষের বিরোধী ও শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয় সন্নিশ্চিত।” অর্থাৎ এই লোকটার বিশ্বাস—এ যে তিন টাকায় এক সের চাবনপ্রাণ এবং চারি টাকায় একভরি “স্বর্ণধতি বিস্ত্রু আসল মকরধ্বজ” দিতেছে—ইহাতে স্বার্থে আঘাত লাগিবে বলিয়া বঙ্গদেশের সমস্ত কবিরাজ অসন্তুষ্ট হইবেন! কিন্তু স্তম্ভের কথা—কোন শিক্ষিত কবিরাজ—এই চক্ষানির্মাণী-বিজ্ঞাপন পড়িয়া,—লোকটার একটা কথাও প্রতিবাদ যোগ্য মনে করেন নাই। তাহা বা জানেন—কানাই আসল নকলের বিচার করিয়া দিবে। অনাদিকাল হইতে কবিরাজ মহাশয়গণ যে সম্মান উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, একজন অজ্ঞাতকুলশীলের ব্যবসাদারী কথায় সে সম্মানের অণুমাত্রও নষ্ট হইবে না।

এই ব্যক্তি কেমন করিয়া “আসল মকরধ্বজ” সম্ভাব্য দিতেছে, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে চাড়ে নাই। পাঠকগণ অগ্রে তাহার কথা শুনি পড়ুন, তাহার পর আমার বক্তব্য আমি বলিব।

“অতি পাতলা স্বর্ণপত্র ১ পল (৮ তোলা) পান ৮ পল (৬৪ তোলা) এবং পারদের বিশুদ্ধ গন্ধক অর্থাৎ ১৬ পল (১২৮ তোলা) কেঁচো একত্র কজ্জলী করিয়া ঘৃত কুমারীর রসে ভাবনা দিয়া সমতল বোতলে পুরিয়া বালুকা দ্বারা ৩ দিন পাক করিবে। এবং শীতল ইটলে পুষ্পরেণুর দ্বারা লালবর্ণ ওষধ উঠাইয়া লইবে।”

“পূর্ণমাত্রায় হিসাব দেখাইতে একটু অল্পবিধা বলিয়া ৮ ভাগের একভাগের হিসাব দেওয়া গেল।”

“শোধিত স্বর্ণ ১ তোলা ২৫ টাকা+ হিন্দুলোখ পারদ ৮ তোলা ৪৫ টাকা+শোধিত আমলাস গন্ধক ১৬ তোলা ২৫ টাকা+কাঠ ১৫ টাকা+বোতল বালি, হাড়ী ইত্যাদি ১৫ টাকা+একটা দক্ষ লোকের পারিশ্রমিক ২৫ টাকা মোট ৩৫৫ টাকা। খরচ একটু বেশী করিয়াই ধরা গেল।”

\* \* \* \* \*

“স্বর্ণ যদিও মকরধ্বজের গুণ জন্মায় কিন্তু তাহা কখনও মকরধ্বজের সহিত মিশ্রিত হয় না। বোতলের নীচে যে স্বর্ণভস্ম পড়িয়া থাকে, তাহা আব্রুর্কোদোক্ত কোন ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারেনা বটে, কিন্তু সোহাগা দিয়া গালাইয়া পোদ্ধার দোকানে বিক্রী করা যায় অথবা তাহা দ্বারা অলঙ্কারাদিও প্রস্তুত হয়। অতএব পূর্বে প্রদর্শিত মোট খরচ ৩৫৫ টাকা হইতে ২৩৫ টাকা বাদ দেওয়া যাইতে পারে। ৩৫৫—২৩০=১২৫ টাকায় অন্ততঃ ৭ তোলা মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় অর্থাৎ প্রত্যেক তোলা মকরধ্বজে কোন ক্রমেই ২৫ টাকার অধিক খরচ পড়িতে পারেনা।”

সুতরাং এই ব্যক্তির মতে কবিরাজগণ যে ৩২, ১২৪, ১৬৮ টাকা দরে মকরধ্বজ বিক্রয় করেন, ইহা অতিবড় অমার্জিতিক নৃশংস ব্যাপার!!

আমি স্বয়ং স্বহস্তে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া থাকি। মকরধ্বজ পাক সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতার বলে আমি বড় গলা করিয়া বলিতে পারি—বাপু হে! বৈজ্ঞানিক বাবসায় খরিয়া পরিবার পালন করিতেছ, কর, তাহাতে কেহ বাধা দিবেনা, কিন্তু বি এ পাশ করিয়া বিজ্ঞান বিষয় কথা বলিতে যাও কেন? নিজের কথার

তুমি যে ধরা পড়িয়াছ। তিন দিন মকরধ্বজে জ্ঞান দিতে পারে—এমন “দক্ষ লোকের” পারিশ্রমিক কি ২০ টাকায় হয়? তুমি কি সভা-যুগের লোক? আমরা ২৫ টাকার কম পারিশ্রমিকে ত দক্ষ লোক পাইতেই পারি না। ৮ ভরি হিঙ্গুলে এক ভরি পারা বাহির হয়—এটা বোধ হয় তোমার জানা আছে। এখন হিঙ্গুলের ভরি ১০ আনা, এই হিসাবে এক পারার দামই যে ৮ টাকা হয়। হিঙ্গুলের দাম বাড়িয়াছে, তোমার মকরধ্বজের দাম তো বাড়ি নাই।

তোমার নিজের কি হিঙ্গুলের খনি আছে? না, “কাশীমপুরের ও ভাওয়ালের গড় এবং টেকর (পার্বত্য ভূমি) নিকটে থাকতে”—তোমাকে হিঙ্গুল কিনিতে হয় না? তুমি বোধ হয় হিঙ্গুল “সজীব অবস্থার” “সকল সময়” “জতি সহজে” ও “স্থলতে” মিলাও।

তোমার কামদ্বারা দেশে—আলানী কাঠ একটাকায় ৪ মণ পাওয়া যায়, কিন্তু ৩ দিন মকরধ্বজে জ্ঞান দিতে যে ১২ মণেরও বেশী কাঠ লাগে! তোমার দেশের কাঠ কি বৈদিক যুগের অগ্নিমহু—অরুণি? সে কাঠ ক’ অতি ধীরে ধীরে পোড়ে?

আমরা মকরধ্বজে যে স্বর্ণ দিয়া থাকি, গাঁহার ভস্মাবশেষ—ঔষধে প্রয়োগ করিয়া থাকি। তুমি তাহা “সোহাগা দিয়া গালাইয়া” “সোন্ধার দোকানে” বিক্রী কর, অথবা জিন্মারের গহনা গড়াও! তোমার হাতের হাতুড়ী আছে। কিন্তু তুমি রসায়ন শাস্ত্রে এমনই অজ্ঞ যে—পারদ ও গন্ধক সংযোগে তিন দিন জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে স্বর্ণ যে “নিরুণ” গবে তত্ত্ব হইয়া যায়, সে জারিত স্বর্ণ যে আর পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না—এ সহজ

বুদ্ধিটুকুও তোমার ‘ঘটে’ নাই। মকরধ্বজের বোতলের নিম্নদেশে পতিত স্বর্ণ—ঠিক কামার মত হইয়া যায়, তাহা আঙুল দিয়া চাপিলে ছাইএর মত চূর্ণ হইয়া যায়। তুমি তো তুমি, স্বয়ং ভরদ্বাজ, অগ্নিবেশ, অজি মুনিও সে স্বর্ণ “সোহাগা সংযোগে গালাইয়া”—পূর্বাবস্থা পরিণত করিতে পারেন না। ধন্ত তুমি—সমস্ত বাঙ্গালা দেশটাকে ত্রাকা বুঝাইয়া দিতে চাও! তুমি যখন এত বড় রাসায়নিক—তত্ত্ব সোণাকেও আসল সোণা করিতে পার—তখন নিশ্চয়ই মুকুল হুরি রচিত “রস-হৃদয়” গ্রন্থখানা পড়িয়াছ। তিনি কি বলিয়াছেন, একবার পড়িয়া দেখ;—

“রসস্তৈকং দ্বিধা গন্ধং সন্ধেম রসপাদিকং  
মৃগ্মাভ্যন্তরে কিপ্ত। পুটেঋত্ৰিংশনাপলেঃ  
এবং পুটদ্বয়াৎ স্বর্ণং নিরুণং তত্ত্বায়তে।

রস হৃদয়।

অর্থাৎ একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধকের সহিত, পারদের সিকিভাগ স্বর্ণকে মৃগার মধ্যে রাখিয়া ত্রিশখানি বিল ঘুঁটিয়ার দ্বারা পুট দিবে। এইরূপ দুইটা পুটে স্বর্ণ নিরুণ তত্ত্ব হইয়া থাকে। “নিরুণং যৎ পুনর্নজীবতি”—ইতি ভাব নিশ্চ। ধাতু যেরূপ ভাবে তত্ত্ব হইলে, আর পুনর্জীবিত অর্থাৎ পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না,—তাহার নামই নিরুণ। ৬০ খানি ঘুঁটিয়ার জ্বালে যখন স্বর্ণ নিরুণ তত্ত্ব হয়, তখন ৩ দিনের ক্রমাগত জ্বালে কি হয় ভাব দেখি।

রসজ্ঞ পাঠক! বোধ হয় এইবার বুঝিয়াছেন—পারা ও গন্ধক সংযোগে পতিত স্বর্ণ আর পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। এরূপ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে তিনি সক্ষম—তিনি মাষ্টার নহেন। তিনি সর্বশক্তিমান।

একপাণে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—  
“তবে ৪ টাকায় এক ভরি মকরধ্বজ অল্পে  
বিক্রয় করে কেমন করিয়া?”  
আমিহ উত্তর দিতেছি।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন—বরিশাল  
জেলার কাউগাছী গ্রাম, যশোহর জেলার  
সিন্ধুনী গ্রাম এবং পূর্ববঙ্গের অল্প কতকগুলি  
গ্রাম হইতে—কায়স্থ এবং জুগী জাতীয় ঔষধ  
বিক্রেতারা মধ্যে মধ্যে ঔষধ বিক্রয় করিবার  
জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে।  
ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটা  
টিনের বাস্ক—বাস্কটি লালবর্ণের “থেরো”  
বস্ত্রে মণ্ডিত। এই বাস্কে বিক্রেতা  
গণ “লৌহ” “তাম্র” “বঙ্গ” “খর্পর” “স্বর্ণবঙ্গ”  
“বসসিন্দুর” প্রভৃতি ধাতোষধ লইয়া—বৈজ্ঞা-  
ন্যাবদারীগণের দ্বারে উপস্থিত হয়। ক্রেতাকে  
ইহারা ১ টাকায় ৮ ভরি “সহস্র পুটিত লৌহ”  
১০ ভরি “সহস্র পুটিত অম্ল”, ৪ ভরি “বঙ্গ” ও  
“স্বর্ণবঙ্গ”, ১৬ ভরি “খর্পর” এবং ৪ ভরি “রস  
সিন্দুর” বিক্রয় করিয়া থাকে। অনেকেই না  
জানিয়া ইহাদের নিকটে—ধাতুদ্রব্য কিনিয়া  
থাকেন। কিন্তু ইহারা যে লৌহের পরিবর্তে  
গেবিমাটি, অম্লের পরিবর্তে অম্লচূর্ণ মিশ্রিত  
উনানের দগ্ধ মৃত্তিকা, ( পাছে কেহ অম্ল বলিয়া  
বিবাস না করে, সেইজন্য ইহারা কাঁচা অম্লের  
বস্ত্র গালিত স্বল্পচূর্ণ—পোড়ামাটির সহিত  
মিশ্রণ ) বস্ত্রের পরিবর্তে হোয়াইট লেড বা  
সং সন্দেশ, খর্পরের পরিবর্তে বিলাতীমাটি দিয়া  
খবিদারগণকে প্রবঞ্চিত করে,—এখন অনেকেই  
তাহা জানিতে পারিয়াছেন। ইহাদের প্রস্তুত  
“বস সিন্দুর” অতি উজ্জলবর্ণ, তাহার চট—  
দিব্য পরিপাটি, মূল্যও কত স্নলভ—একটাকার  
৪ ভরি! এই “বস সিন্দুরই”—শিব কণ্ঠস্থিত

সর্পের মত কখনও “আসল স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ”  
কখনও “বড়গুণ বলিজারিত সিদ্ধ মকরধ্বজ”  
কখনও বা “স্বর্ণসিন্দুর” নামে—আলমারী  
শিশিতে স-গোরবে শোভা পাইয়া থাকে  
এখন পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন—  
এক টাকায় ৪ ভরি “মকরধ্বজ” কিনিয়া  
তাহার প্রত্যেক তোলা আমি যদি প্রলোভ  
পূর্ণ বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ৪ টাকা দরে বিক্র  
করি, তাহা হইলে ১ টাকায় আমার ১৫  
টাকা লাভ হয় কিনা?

এই সকল “লৌহ-অম্ল-মকরধ্বজ” বিক্র  
কারিগণ—ইহাদের কুলক্রমাগত শিক্ষার ফলে  
৩ ঘণ্টায় এক পাক “মকরধ্বজ” প্রস্তুত করি  
পারে। এই “মকরধ্বজ” হিন্দুলেরই রূপান্তর  
মাত্র। সামান্য পারিশ্রমিক পাইলে এবং এ  
বেলা পেট ভরিয়া খাইতে দিলে—ইহারা  
কবিরাজের বাটীতে বসিয়া তথা-কথিত “মক  
ধ্বজ” পাক করিয়া দেয়। পারায় আস দিতে  
বংশ থাকেনা—যাহাদের মনে এইরূপ ভা  
আছে, তাঁহারা ইহাদের দ্বারাই “বস সিন্দুর  
ওরফে “মকরধ্বজ” প্রস্তুত করাইয়া লন  
বসসিন্দুরকে স্নদৃশ চাকচিক্যশালী করিবার  
জন্য ইহারা কজ্জলীর সঙ্গে মনছাল এবং তাহ  
চূর্ণ মিশ্রিত করে। ইহাতে চট বেশ স্বককার  
এবং পাতলা হয়, কখনও বা ময়ূরপঙ্খের  
চক্রিকার মত বিচিত্র বর্ণের আভাও দায়  
করে।

কিন্তু, যাহা প্রকৃত ‘মকরজঙ্ঘ’, তাহা  
কখনই অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না।  
আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। ভারতের  
অধিতীয় বৈজ্ঞানিক ডাঃ পি.সি. রায়, যাহার  
প্রতিষ্ঠাতা, সেই অগাধিষ্ঠাতা বেলগকেবিলে  
ও ক্যান্সারিটিকেল ডিপার্কসে—আজ কাল মকর

ধ্বজ প্রস্তুত হইতেছে, এ মকরধ্বজের কাটিতিও খুব, কিন্তু এই ঔষধখালের সুবিজ্ঞ কার্য্যাদক্ষ—৪৮ চারি টাকায় ১ ভরি মকরধ্বজ বিক্রয় করেন না। ডাক্তার কার্তিক চন্দ্র বসু এম বি—তঁাহার প্রসিদ্ধ ল্যাবরেটরীতে বিশুদ্ধ “মকরধ্বজ” প্রস্তুত করিতেছেন, তিনিও ১৬ টাকা ও ২৪ টাকার কমে “মকরধ্বজ” বিক্রয় করেন না। বসুর ল্যাবরেটরীর “মকরধ্বজ”ও লোকে আদর করিয়া কিনিয়া থাকে। বেঙ্গল কেমিকেল এবং বসুর ল্যাবরেটরীতে—এক সপ্তাহ মকরধ্বজের মূল্য ৮০% চৌদ্দ আনা। মকরধ্বজ যদি সস্তা দামে বিক্রয় করা সম্ভব হইত, তবে সর্ব্বাগ্রে এই উভয় কারখানার সম্বাদিকারিগণ সম্ভায় দিতে পারিতেন।

এইবার “মকরধ্বজের” অমুপানের একটু আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ—যিনি বৈজ্ঞানিক অবলম্বন করিয়া “চূড়ান্ত সস্তায় ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন,” তিনি মকরধ্বজ সেবনের এক অমুপানের তালিকাও ছাপিয়াছেন। নহিলে অমুষ্ঠানের ক্রটি হইবে যে! পাঠক মহাশয়! একটু নমুন্য দেখিবেন কি? যথা;—

“স্বাভাবিক দুর্লভতা ও বায়ুর জন্ত—চাউল ধোয়া জল ও মিষ্টি অথবা মাখন বা হুধের সর এবং মিষ্টি, ত্রিফলা (হরিতকী বহেড়া আমলকী) ভিজানো জল, মিশ্রি অথবা বাদাম কিম্বা বড় এগাচি বাটা মিষ্টি সহ বৈকালে উপযুক্ত মাত্রায় মকরধ্বজ সেবনীয়।”

“পিত্ত রোগে—ধনে মোরী ভিজান জল মিষ্টি সহ অথবা গুলঞ্চ বা পটোল পাতার রস মধু সহ প্রাতে উপযুক্ত মাত্রায় মকরধ্বজ সেব্য।”

“কফরোগে—আদার রস মধু অথবা আদার রস মিষ্টি সহ কিম্বা তুলসী পাতার রস

আদা ও মধুসহ, পানের রস মিষ্টি কিম্বা পিপ্পল চূর্ণ ও মধু সহ মকরধ্বজ সেব্য।”

“নব জরে—তুলসী পাতার রস, পানের রস আদার রস মধু অথবা পানের রস, সৈন্ধব লবণ (শরীরে বেদনা থাকিলে) বেল পাতার রস ও মধু সহ মকরধ্বজ সেব্য।”

“পুরাতন জরে—সেফালিকা পাতার রস মধু বা গুলঞ্চের রস মধু অথবা চিরতা ভিজান জল মধু সহ সেব্য।”

“প্রমেহ রোগে—কাঁচা হরিদ্রা রস মধু বা কেশুর্ভার রস মধু অথবা কাবাব চিনি চূর্ণ মধু কিম্বা গর্দ বা স্বেদগুণ ভিজান জল মিষ্টি সহ \* \* সেব্য।”

“অর্শোরোগে—নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ এবং মাখন মিষ্টি অথবা গাঁদা ফুলের পাতাব রস ও সাফ চিনি সহ কিম্বা হমানী চূর্ণ বিট লবণ ও ঘোল সহ \* \* সেব্য।”

মকরধ্বজের এইরূপ অমুপানের স্থগীর্ণ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। অধিক উদ্ধৃত করিব না। এক কথায় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে,—যে যে মুষ্টিযোগে যে যে রোগ ভাল হয়—ব্যবসায়ী বাবুটার পুস্তকে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। রসুন বাটা, এরওমুল, কিছুই বাদ যায় নাই। হুঃখের বিষয়—শাস্ত্রে এরূপ অমুপানে মকরধ্বজ সেবনের ব্যবস্থা আদৌ লিখিত হয় নাই। বাবু যে রোগে যে টোটকার ব্যবহার দেখিয়াছেন তাহাই মকরধ্বজের অমুপান করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমার বক্তব্য—ঐ সকল অমুপান শুধু সেবন করিলেই ত ফল পাওয়া যায়। উহার সঙ্গে “মকরধ্বজ” মিশাইবার প্রয়োজন কি? কাঁচা হলুদের রস মধুসহ সেবনে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়,—তবে ইহার সঙ্গে মকরধ্বজের প্রয়োজন

সম্বন্ধে কোথায়? ঘুঁটেরছাই, সিউলী পাতার রসের সহিত সেবন করিলে পুরাতন জ্বর ভাল হইতে পারে। এ আরোগ্য ফল—সিউলী পাতারই প্রাপ্য, ঘুঁটেরছাইয়ের নহে। ইহা দ্বারা ঘুঁটের ছাইএর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা যায় না। অমুপানের অর্থ—ঔষধের সহিত কোনও বিকট বিষাদ পদার্থের মিশ্রণ নহে। অমুপান অর্থে পশ্চাৎ পান বুঝায়। ঔষধ সেবন করিয়া মুখ বিকৃত হইলে, সেই বিকৃত সংশোধনের জন্ত যাহা সেবন বা চর্কণ করা যায়—তাঁহারই নাম “অমুপান”। এই সাদা কথাটা যে বুঝেনা, সে যদি আপনাকে আনন্দে বসিয়া জাহির করিতে চায়, হাসি পাব না কি?

পরিভাষায় বৈজ্ঞানিক শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন—  
ভক্ষয়েৎ ভেদজং মুখ্যং জলৈর্বা মধুনা সহ।  
ক্ষীরনিষ্কবসং ঘৃষমমুপানং প্রশস্ততঃ ॥

ধাতুঘটিত মুখ্য ঔষধ জল অথবা মধুর সহিত মাড়িয়া খাইবে। অনন্তর দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মগ্ন বা মস্তুরাদি ঘৃষ অমুপান করিবে। বলা বাহুল্য মকরধ্বজ একটা মুখ্য ভেদজ ইহা অক্লিষ্ট হইলে কেবল মধু দিয়া মাড়িয়া খাইলেই যথেষ্ট। সেবনান্তে ইচ্ছামত দুগ্ধাদি পান করিতে পার। ইহাই হইতেছে অমুপান।

রহনবাটা, পলতা ছেঁচা, এরও মূলের রস, প্রভৃতির দ্বারা মকরধ্বজ মাড়িয়া খাওয়া—আয়ুর্বেদ সম্মত নিয়ম নহে। উহার নাম অমুপান নহে, উচ্চা সহপান। তোমরা এইরূপ উৎকট উদ্ভট বিকট স্বরস কক চূর্ণাদি—ঔষধের সহিত মিশাইবার ব্যবস্থা দিয়া, লোকের পক্ষে কবিরাজী ঔষধ সেবন—বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছ। তোমাদের মত শাস্ত্রে অনধিকারী অথচ অহঙ্কারে ক্ষীত ব্যক্তির সহিত তর্ক করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

কত গুজনের মসলা আগুনে চড়াইলে, কতটা মাল উৎপন্ন হইতে পারে, এ জ্ঞানও তোমার নাই। কেননা তুমি যে ৮ ভাগের এক ভাগের হিসাব দিয়াছ, তাহাতে ৭ ভরি মকরধ্বজ উৎপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ ৩ দিন পাক করিলে পারা অনেকটা উড়িয়া যায়। এমন কি, সাড়ে তিন ভরি কিম্বা পোনে চার ভরির বেশী মাল জন্মে না। তুমি নিজে “কাজের কাজী” নহ, কেবল পরের কথাই বিশ্বাস করিয়া হিসাব দিয়াছ। আগে নিজে মানুষ হও, পরে—অপরের কার্যের সমালোচনা করিও। নহিলে তোমাকে দেখিয়া বৈষ্ণব সমাজ “ভূতাপ সরণ” মন্ত্রই পাঠ করিবে।

শ্রীসদানন্দ সেন গুপ্ত ।

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

বিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ।—করণাময় জগদীশ্বরের অপার করুণাবলে অষ্টাঙ্ক আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইয়া আসিল। এইবার এই বিদ্যালয় তৃতীয় বর্ষে পদাৰ্পণ

করিবে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্তই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বর্তমান সময়ের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ অষ্টাঙ্ক আয়ুর্বেদের চিকিৎসা যে তুলিয়া গিয়াছেন, এ

অস্বীকার করিবার যো নাই। যতগুলি কারণে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটয়াছে,— আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক মণ্ডলী অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে সুশিক্ষিত না হওয়া তাহার সর্বপ্রধান কারণ। এই বিত্বালয়ের প্রতিষ্টায় ছাত্রগণকে সেই লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদের শিক্ষাই যত্নপূর্বক দেওয়া হইতেছে। সুতরাং এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ কায়-চিকিৎসার মত কাটাফাড়া, পোয়াতিথালাস প্রভৃতি সকল প্রকার চিকিৎসাতেই কৃত্রিম লাভ করিয়া আয়ুর্বেদের গৌরব বর্দ্ধনে যে সক্ষম হইবে, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

**বৈদ্যের কর্তব্য।**—চিকিৎসা বৃত্তিতে বৈদ্যজাতির যেরূপ গৌরব, এমন আর কিছুতে নাই। রাজা—মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্ত গৃহস্থ পর্য্যন্ত—সকলকেই চিকিৎসকের বশ্তা স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি লাভে বঞ্চিত হইয়া যাঁহার জীবিকা নির্বাহের কোন পন্থাই স্থির করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে পাঁচ বৎসর কাল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের শিক্ষা সমাপ্তি পূর্বক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের, ইহা যে মাহেঞ্জ সুযোগ, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। চিকিৎসার সিদ্ধিলাভ করিলে অর্থপ্রাপ্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহের চিন্তা তো থাকেই না, তন্নিম্ন মিত্রতা, ধর্মসঞ্চয় এবং যশঃ লাভও যে ইহা দ্বারা স্ফুটয়া থাকে ইহা সুনিশ্চয়। সেইজন্ত আমরা আগার গ্রাউন্ডেট ছাত্রবৃন্দকে—পরামর্শ প্রদান করিতেছি, তাঁহারা সামান্ত চাকরির চেষ্টায় সময় নষ্ট না করিয়া এই নূতন সেসম্পের আরম্ভ কালেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া আয়ুর্বেদ শিক্ষার মনোভিনিবেশপূর্বক নিজের জীবিকা নির্বাহের সংস্থান এবং সেই সঙ্গে দেশের-দেশের-

সমাজের মঙ্গল সাধনে যত্নবান হউন। পরোপকার করিবার একরূপ বৃত্তি জগতে যে আর একটুও নাই।

### আয়ুর্বেদের উপর আবগারি।—

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠের “হিতবাদী”তে ঢাকা চহিতে শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র দত্ত কবিরাজ একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ,—

“প্রায় দুইমাস হইল একটি সাহেব Excise Inspector ঢাকা বায়ু বাজারস্থিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র কবিরঞ্জন মহাশয়ের একটি রোরিত কারিগরের বোতল খরিন করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখেই খুলিয়া লইয়া বান। ইহাতে নাকি Chemical Examinationএ শত করা ১৭ এলকোহল পাওয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে গত কলা সন্ধ্যাকালে কবিরাজ মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়া অবাঞ্ছিত সময়ে উপস্থিত হইবার জন্ত জামিন লওয়া হইয়াছে। গতকলা কবিরাজ মহাশয়ের দোকানের অস্থায়ী প্রভৃতি সকলপ্রকার অরিষ্টই পুলিশ লইয়া গিয়াছে।”

বিচারে ইহার কি হইল, তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিবনা, তবে কবিরাজী আসব এবং অরিষ্ট যে অ্যালকোহলের বিন্দুনাড়ও পাওয়া যায় না—ইহা তো নিশ্চয় কথা, সেই জন্ত ধৃত কবিরাজ মহাশয়ের আসবাদিতে কি করিয়া অ্যালকোহল পাওয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। মৃত সঞ্জীবনীর মত যে ঔষধ চুঁয়াইয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে অ্যালকোহল আছে এবং সেইজন্ত সে ঔষধের প্রচলন দেশ হইতে একরূপ লোপই পাইয়াছে। আসব এবং অরিষ্টকেও যদি সেইপ্রণীতে ফেলা হয়, তাহা হইলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করা যে দ্বার ইহা উঠিবে। যাহা হউক আমরা এই মঙ্গলদায়ক বিচার ফল জানিবামাত্র সন্তোষিত হইয়া



# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

২য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫—শ্রাবণ ।

{ ১১শ সংখ্যা ।

## কাজের কথা ।

বালক রক্ষা ।—বাঙ্গালীর অকালমৃত্যুর পরিমাণ বহু অধিক, পৃথিবীর কোনো দেশে যাব এমনটা নাই। ইহার প্রধান কারণ বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যেব অভাব। একদিন অবশ্য এমনটা ছিল না, একদিন বাঙ্গালী ব্রহ্মচর্য্য-পালনই ধর্ম্মবাক্য মূলগ্রন্থি বলিয়া মনে করিত। তাহার ফলে বাঙ্গালী-বালকের গুরু গৃহে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইত। এখন সে পদ্ধতি দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, ফলে চিরকুম-বাঙ্গালীজাতি পরন্যু থাকিতেও মৃত্যুকে প্রিয় সুহৃদ জ্ঞানে সকালে আলিঙ্গন করিতেছে।

ব্যাপির কারণ ।—ব্যাপির কারণ যে পাপ-প্রবণতা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ বাঙ্গালীর শতকরা নিরানব্বই জন ডিম্বেপসিয়া বা অজীর্ণ রোগগ্রস্ত কেন?—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে পাপের প্রসার বৃদ্ধিই তাহার

কারণ। অজীর্ণরোগে ভুক্ত অন্ন সম্যকরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না কেন?—অগ্নির অভাবে। পরিপাক ক্রিয়ার সম্পাদন করাই তো অগ্নির কার্য্য, তবে তাহার ব্যতিক্রমের কারণ কি?—পাপ সঞ্চয়। শুক্ররক্ষা জঠরাগ্নির ক্রিয়া সম্পাদনের মূল। বাঙ্গালী সেই শুক্র রক্ষার অভাবে যে পাপ সঞ্চয় করিতেছে, বাঙ্গালীর অজীর্ণ তাহারই মুখ্যতম কারণ। আজি অজীর্ণ সারাইবার জন্য বাঙ্গালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে অজীর্ণ সারিবে কেমন করিয়া! আগে শুক্ররক্ষার চেষ্টা কর, তাহার পর রোগ আরোগ্যের চেষ্টা করিও।

অকাল মৃত্যু ।—শুক্ররক্ষাই অকাল মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান কারণ। শুক্ররক্ষা করিতে পারিলে, যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকল, স্বস্থ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। বাঙ্গালী অপেক্ষা অন্যান্য জাতি

এই জন্তই সবল, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু। তাহার পর পিতামাতার মনোপ্রবৃত্তির সহিত অপত্য কুলের মনো প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই সুসম্বন্ধ। কাজেই ব্রহ্মচর্য্য বিহীন পিতামাতার বংশধরগণ যে শুক্ররক্ষার একান্ত উদাসীন হইবে, তাহা তো নিশ্চয় কথা। বালক রক্ষা করিতে হইলে,—সমাজ রক্ষা করিতে হইলে—দেশ রক্ষা করিতে হইলে—আনাদিগকে এ সকল বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিতে হইবে। প্রত্যেক জনক-জননীকে অপত্যগণের দীর্ঘ জীবন-কামনায় নিকলঙ্ক চরিত্র—আদর্শ পুরুষ-প্রকৃতি হইতে হইবে,—শুধু বচনে চলিবেনা।—কার্য্যতঃ ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বালক রক্ষার—বাস্তালী-রক্ষার ইহা ভিন্ন আর অল্প উপায় নাই।

\* \* \* \*

**ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য।**—ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার জন্ত শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ একটু চিন্তাশীল হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইয়াছি, কিন্তু এ শিক্ষাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের মত একান্ত প্রয়োজনীয় হইবে না। আমাদের মনে হয় এ শিক্ষাটাও অত্যন্ত শিক্ষার মত একান্ত প্রয়োজনীয় হইলে মন্দ হইত না। আমাদের দেশের বালকগণ অধঃপতনের পথ কিরূপ পরিকার করিতেছে, রেল-স্টামারে এবং কলিকাতার দোখগুলির দেওয়ালগুলি লক্ষ্য করিলেই তাহার যথার্থ্য নির্ণীত হইতে পারে। বালকগণের পাশাশক্তির প্রাণবেশ উচ্ছাস যখন প্রবল হইয়া পড়ে, তখনই এই সকল স্থলে কুৎসিত কথা লিখিয়া তাহাদিগের শিরিষ কুসুম-সুকোমল-হস্ত কলুষিত করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। দেশের-

চিন্তাশীলগণ এ সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন কি? এই সকল বিভৎস ব্যাপার যখনই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে, তখনই আমরা দেশের অধঃপতন কতটা গড়াইয়াছে, বুঝিতে পারি,—বুঝিয়া মর্মান্বিত হই; কিন্তু প্রতীকার করিবার উপায় আমাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত।

\* \* \* \*

**প্রতীকারের উপায়।**—প্রতীকারের উপায় কিন্তু আছে, তবে সে উপায়টার জন্ত আমাদের রাজকীয় শাসনের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাসাদের দেওয়ালে ইউক, রেল গাড়ীতে বা স্টামারে ইউক—কেহ ঐরূপ লিখিতেছে দেখিলেই, আগে আইনের বন্ধন আঁটিবার ব্যবস্থা করিয়া, পুলিশ কর্মচারীর হস্তে তাহাদিগকে অর্পণ করিতে হইবে। যদি এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে এরূপ কুৎসিত লেখার চলনটা হাটে-বাটে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এরূপ লেখার ফলে—যাহারা ঐরূপ লিখিয়া থাকে—শুধু তাহাদেরই যে অবনতি ঘটতেছে তাহা নহে, এরূপ লেখা পাঠ করিয়া অনেক চরিত্র বান-বানকও চরিত্রহীনতার পথে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইতেছে। বাস্তবিকই আমরা যখন রেল বা স্টামার যোগে গমন করি, তখন আমাদের সহিত আমাদের সম্মান-সম্মতি বা ঐ শ্রেণীর কেহ থাকিলে, লজ্জার—দুগায় অধোবদন হইয়া থাকি। ইহার প্রতীকারের জন্ত কর্তৃপক্ষগণের যে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীসত্যচরণ সেন ঋণ কবিরঞ্জন।

## হোমিওপ্যাথি—আয়ুর্বেদ সমুদ্রের একটি তরঙ্গ।

— :: —

বর্ষকাল পূর্বে, এই “আয়ুর্বেদেরই” অবতারণিকায় আমরা শিখিরাছিলাম—  
“আয়ুর্বেদ একটি মহা সমুদ্র, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, টিসুয়েমিডি, চার্মা—সেই মহা সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ।” আজ আবার সেই কথার পুনরুক্তি করিতেছি।

আমেরিকার অধিতীয় হোমিওপ্যাথ, ডাক্তার গ্রাশ—তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও কন্সল্টেটরের বুদ্ধিমত্তা গবেষণা—একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তক খানির নাম—How to take the case. সম্প্রতি ঐ পুস্তকের এক সর্কাস্ক হুন্সর প্রসারবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এন্স—এই পুস্তকখানি আমাদিগকে পড়িতে দিয়াছেন। গ্রন্থের বিশেষত্ব—গ্রন্থকার প্রকৃত সাধকের আয় হোমিওপ্যাথির বিজ্ঞান-বৈচিত্র্যকে মহত্তর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ণ লিপি-কোশলে, মহা প্রলয়ের নিখালোক শূন্যতা—অভয়হস্তের সেবা-সামান্য ভরিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে আমরা এক ত্যাগশীল তপস্বীর উদার হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছি।

এখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে—“পল্‌সোটো-নন্সসম্মিলিত বন্ধু!” অনেকের ধারণা—হোমিওপ্যাথি ঔষধে উপকার না হইলেও অপকার হয় না। এইরূপ হোমিওপ্যাথকে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার বলিতেছেন—“উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে শরীর হইতে যেমন উৎকট

ব্যাধি দূরীভূত হয়, তেমনি অল্পপমুক্ত ঔষধ প্রয়োগে নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হয়। স্বস্থের প্রাণ বিনাশ করিবার ক্ষমতা যদি আমাদের ঔষধের না থাকে, তবে অল্পস্থকে আরোগ্য করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই।” কেমন সরল স্থূল্য সত্য কথা! গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন—  
“একখানা তীক্ষ্ণ ধার ক্ষুর ব্যবহারে বেরুপ বিপদের সম্ভাবনা, ঔগধের অল্পপমুক্ত ব্যবহারেও তজ্রপ বিপদের সম্ভাবনা। \* \* এই সকল ঔষধ দ্বারা বেরুপ মহা উপকার সাধন করা যাইতে পারে, তজ্রপ মহা অনিষ্টও করা যাইতে পারে।”

যাঁহারা বলেন হোমিওপ্যাথি ঔষধে উপকার না হইলেও কোন অপকার হয় না;— আশা করি আত্মকালন করিবার পূর্বে, তাঁহারা ডাক্তার গ্রাশের কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। যাঁহারা হোমিওপ্যাথি-বিজ্ঞানের রহস্য বুঝেন না, তাঁহারা হোমিওপ্যাথি ঔষধে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্ত যে সকল কৌশল অবলম্বন করেন, পূর্বোক্ত মন্তব্যটা (অর্থাৎ হোমিও ঔষধের দ্বারা অপকার হয় না) তাঁহার অত্যন্তম। এইরূপ যুক্তিহীন মতবাদীগণকে আমরা মহাত্মা কেন্ট ও ডাক্তার গ্রাশের উপদেশ অনুধাবন করিতে পরামর্শ দিতেছি।

ডাক্তার গ্রাশ হোমিওপ্যাথিকে ক-  
করিবার জন্ত আর একটি কথা বলিয়াছেন  
নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

“হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বর্ত্তমান  
কোন উপায়ে কোনও রোগীকে হত্যা করে

হইবেও না। কারণ এই চিকিৎসা ভিন্ন 'রোগের' সমূহ উৎপাদন করিবার আর অত্ন পন্থা নাই।" একথাটা অবশ্যই গ্রাশ সাহেব অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন; আমরা কিন্তু হোমিওপ্যাথির এই দাবীটুকু সমূলক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ডাক্তার গ্রাশ যদি মনোবোগ দিয়া ভারতের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পাঠ করিতেন, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি—নিশ্চয়ই তাঁহার মতের পরিবর্তন ঘটিত। কেননা আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলি রোগীকে নির্গদ-রূপে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ কর্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছিল। তাহা শিম্বোদর-পরায়ণ-মানব মস্তিষ্কের বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধি নহে। আয়ুর্বেদের যুক্তি ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা, আজ যাহাকে "হয়" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কাল তাহাকে "নয়" বলিয়া বিসর্জন দিতে পারে নাই। বিশেষতঃ আয়ুর্বেদ বেত্তাগণ—যে রূপ অমানুষিক প্রতিভা বলে ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন,—সে রূপ প্রতিভা স্বল্পজীবী কনিষ্ঠ মানবে বিকশিত হইতে পারে না। তবে ইহাও নিশ্চয়—আমরা যে লোকাতীত জ্ঞানের যথার্থ উত্তরাধিকারী নহি।

ডাক্তার গ্রাশ যে হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ সাধক, সেই হোমিওপ্যাথিও—ভারতের আয়ুর্বেদের অঙ্গীভূত। আয়ুর্বেদ সমুদ্র, হোমিওপ্যাথি তাহার একটা তরঙ্গ মাত্র। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আমরা তাহা দেখাইয়া দিব।

জগতে সকল শক্তির হ্রাস জীবনী শক্তিরও বিকাশের পথ বোমিক বিক্ষুরণের ভিতর দিয়া। প্রণব—এই বিক্ষুরণের সত্ত্বত। তুমি, আমি, তুমি, লতা, বিশ্বের যাহা কিছু সর্বস্ব—সমস্তই

ঔকার বা আদিম বিক্ষুরণের প্রসব। তোমার আমার দৈহিক পরগাপুঞ্জ নিয়তই বিক্ষুরণ-শীল। যুরোপের বিজ্ঞানে ইহারই নাম "আমি বিক মুভমেন্ট।" যে কোন কারণেই ইউক—এই আনবিক ক্ষুরণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলে তাহাকে বিকার বা রোগ বলে। আয়ুজ জীবনী শক্তি—পুরুষ-শরীরের সর্বত্র ব্যাপী, শরীরের স্তম্ভ (অস্থি বাত) উপাদানের উপর আদেশ চালাইয়া—এই পুরুষই আপনার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অভিযুক্ত করেন। ঋষিকল্প বৈজ্ঞানিক হানিমান বলিয়াছেন—

When a person falls ill, it is only this spiritual self acting vital force, every where Present in the organism, that is Primarily deranged by the dynamic influence of a morbid agent inimical to life or genou. বিজ্ঞান যেখানে সত্য প্রচার করিতেছে সেখানে হারীত ও হানিমনে প্রভেদ কোথায়?

ধ্বস্তির কল্প বাগভট একজন পাকা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বাগভট বলিয়াছেন—“লক্ষণ ভিন্ন ব্যাধির স্বরূপ মানুষ জানিতে পারে না।” পঞ্চ-তন্মাত্র স্পৃষ্টা প্রকৃত দ্রৌপদীকে বিবসনা করিয়া, তাহার স্বরূপ দেখিবার শক্তি কাহার আছে? বিপর্যয় প্রকৃতির আর্ন্তস্বরের নামই ব্যাধি; প্রকৃতি বখন প্রকৃতত্বা হইবার জন্ত মানবের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন তিনি নিষ্বেদ অভাব অত্রান্ত রূপেই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। শবচ্ছেদের প্রয়োজন নাই, শরীর তব নিরূপণের জন্ত নয় বলি অনাবরক্ত; শরীরই সর্ব। সম্পূর্ণ লক্ষণে সম্পূর্ণ রোগীকে বুঝে

কাণ্ডাও কারণ একই পদার্থ।” এই বাগ্‌ভটের যুগেই পৃথিবীতে প্রথম লাক্ষণিক চিকিৎসার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই মহাকাথাই, বহু শতাব্দী পরে, মহাত্মা হ্যানিমানের কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল।

আয়ুর্বেদের “সদৃশ-সূত্র” যাহা, যুরোপের হোমিওপ্যাথিও তাহা। এই সদৃশ-সূত্রের চিত্তির উপর—হ্যানিমান যে মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, একথা অস্বীকার করা চলে না। “সমঃ সমঃ শময়তি” এই সদৃশ-সূত্রের ইংরাজী অনুবাদ—*Similia Similibus curantur*. সদৃশ চিকিৎসার মুখ্য উপদেশ—“রোগের সমস্ত লক্ষণগুলি সম্পূর্ণরূপে না জানিলে চিকিৎসক তাহার প্রতিকার করিতে পারেন না। অতএব রোগমাদৌ পরীক্ষিতে: ততোহনন্তর মোষণং। ততঃ কস্ম ভিসক্ পশ্চাৎ জ্ঞান পূৰ্ণঃ সমাচর্যেৎ।”

আয়ুর্বেদের সদৃশ-সূত্র যে কি গবেষণা-ময়—এক কাথায় তাহা বুঝান যায় না। এই মতে চিকিৎসা করিতে গেলে চিকিৎসককে রোগের অবস্থান স্থান, “অনুভূতি ‘উপচয়’” “অপচয়” “কারণ [ বিপ্রকৃষ্ট, সন্নিবৃষ্ট ] ধাতু” “প্রকৃতি” “পূৰ্ণরূপ” “লক্ষণ” বিশেষ লক্ষণ সাব্যস্ত প্রভৃতি সকল তথ্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে। উপাদানের বিশ্লেষণ করিয়া নিপুণ হস্তে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। হোমিওপ্যাথির Location, sensation, modality, causes, constitution and temperament প্রভৃতির সহিত আয়ুর্বেদের সদৃশ-সূত্রের রীতি-মত এক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃকালে শিশির পড়ে, মধ্যাহ্নে তাপ বৃদ্ধি হয়, সন্ধ্যায় বায়ু বলবান হইয়া উঠে। বাল্যে স্নেহা বৃদ্ধি হয়, যৌবনে পিত্ত, বাক্যকে রাগ—কালের ধর্ম

শরীর মানস ও জড় ভেদে ত্রিজগতেই এক, এই ত্রিতত্ত্বের একীকরণ—আয়ুর্বেদের বিশেষত্ব। ইহা হইতেই রোগের উপচয় উপশমের কারণ বুঝিতে পারা যায়। বহু যুগ পূর্বে ভারতের ঋষি এ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। হিন্দু সন্তান এ সকল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, তাই সে অস্ত্রের মুখের একটা কথা শুনিলে বিশ্বয়-মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা—তাহাকে আত্মহারা করিয়াছে। বিপ্লবাতন ভারতে যে জিনিষ অতি পুরাতন, তাহাকেই সে অপরের আবিষ্কার মনে করে।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি—আয়ুর্বেদই জগতের একমাত্র আয়ুর্বেদ ছিল। বেদ-অনন্তকাল ব্যাপী, “আয়ুর্বেদও সেই বেদ,—সকল রূপ চিকিৎসা তত্ত্বই আয়ুর্বেদের ভিতর নিহিত, রহিয়াছে। এখন আয়ুর্বেদের, অবনতির যুগ, তথাপি সমগ্র চিকিৎসার মৌলিক তত্ত্বগুলি আজিও আয়ুর্বেদ-সূত্রের উপর স্থাপিত। খৃষ্ট-ধর্ম—যেমন বৌদ্ধ ধর্মের অনুবাদ, জগতের চিকিৎসা গ্রন্থ তেমনি আয়ুর্বেদের প্রভা-পুষ্ট। জীবের দেহ ধাতু সর্বদাই পরিবর্তন-শীল—স্বতঃই ক্ষয়-প্রবণ, “তোমরা ধাতুর সেই সাব্যস্ত দিয়া ক্ষয় পূরণ কর,—তোমাদের দেশ হইতে অকাল মৃত্যু অকাল বার্কক্য, অস্বাভাবিক রোগ শোক, বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।”—ভারতের উদার-বিজ্ঞানের ইহাই একমাত্র উপদেশ। আয়ুর্বেদে যে তত্ত্ব নাই, সে তত্ত্ব জগতের কোথাও নাই। চরকের উক্তির চরম সার্থকতা—

“যন্মেহান্তি নভং কচিৎ।”

তাই বলিতেছিলাম—আয়ুর্বেদে যাহা নাই,—হোমিওপ্যাথি তাহা কোথায় পাইবে? হোমিওপ্যাথির ঔষধ-নির্মাণে আয়ুর্বেদের

সেই দ্রব্যের বীৰ্য্য ও শক্তি-রহস্যই পরিক্ষুট, হোমিওপ্যাথেরা অল্প মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করেন। আয়ুর্বেদও তীক্ষ্ণ ঔষধের হৃদয় মাত্রায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আপনারা মান পরিত্যক্তার উপক্রমণিকা পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। যথা ;—

আলাস্তুর গঠৈঃ সূর্য্য কঠৈঃ ধ্বংসী বিলোক্যতে।  
ষড়্ধ্বংসীভিমরীচিঃ শ্রাং তাভিঃ ষড়্ভিশ্চ

রাজিকা॥”

কালিদাস মানং ।

[ পরিভাষা প্রদীপ ]

ত্ৰ্যাস রেণুস্ত বিজ্ঞেয় জ্বিংশতা পরমাণুভিঃ ।

ত্ৰ্যাস রেণুস্ত পর্য্যায় নাম্না ধ্বংসী নিগন্ততে ॥

মাগধ পরিমাণং ।

[ পরিভাষা প্রদীপ ]

আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী আলোচনা করিলেও আমরা জানিতে পারি—  
ভেষজ দ্রব্যের জারণ-মারণ-মর্দন-সস্তাপন

সমস্তই তাহার জড় ধর্ম নষ্ট করিবার জন্ত। কেননা শক্তি না হইলে শক্তিকে আঘাত করিতে পারেনা।

হোমিওপ্যাথির যাহা মূলমন্ত্র—তাহাও অনন্ত আয়ুর্বেদের এক ভগ্নাংশ। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই স্থানেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

যদিবাং ভক্ষণাদেহে যজ্ঞপ মুপলক্ষ্যতে।

তত্ত্ব তদগদং জ্ঞেয় মিথ্যাচে হারীতঃ স্বয়ং॥

অর্থাৎ যে বিষ ভক্ষণ করিলে শরীরে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেই বিষই সেই লক্ষণ নিবারক অগদ (ঔষধ)—স্বয়ং হারীতীশ্বরি একথা বলিয়াছেন। “বিষস্ত বিষ মোষণং”—ভারতের পুরাতন সিদ্ধান্ত। এখন পাঠক মহাশয় ভাবিয়া দেখুন—হোমিওপ্যাথি—আয়ুর্বেদ মহা সাগরেরই একটা তরঙ্গ কি না?

শ্রীবৃজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

## রসায়ন ও বাজীকরণ ।

( পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর )

—:~:—

এইবার বাজীকরণের কথা বলা যাউক। বাজীকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে ;—  
“যাহা বহু পুত্রজনক, সত্তাই জীতে হর্ষজনক, বাহাতে অপ্রতিহত কলের সহিত জীগমনে সামর্থ্য জন্মে, বাহাতে জীলোকের অত্যন্ত জিয় হওয়া যায়, যহার জরাত্রস্ত পুরুষেরও জীবনপ্রাপ্তি আশ্রয় ও পুত্রোৎপাদন ক্ষমতা জন্মে,

বাহাতে বহুশাখা বিশিষ্ট মহান চোড়া বৃক্ষের তায় মনুষ্য বহু অপত্য বিশিষ্ট হইয়া লোকের সম্মানভাজন করেন, যাহা দ্বারা ইহ ও পরলোকে সন্তান মূলক যশস্বী ব্রহ্মপুষ্টিলাভ করা যায়, তাহাকে বাজীকরণ বলে। বাজীকরণ ঔষধ রসায়ন সম্বন্ধে লিখা হইয়াছে ;—“আয়ুর্বেদে

বাজীকরণ ইচ্ছা করিবেন। কারণ বাজীকরণ দ্বারা পুত্র হইবে এবং পুত্র হইতে ধর্ম, অর্থ, প্রীতি ও যশোলাভ হয়। সুতরাং বাজীকরণ ঐ সকল লাভের হেতু স্বরূপ” শাস্ত্রে অপুত্রক পুরুষকে ছায়াহীন, বলহীন, একশাখাবিশিষ্ট এবং পৃথিবীস্থিত বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, অপিচ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“অপুত্রক পুরুষ চিত্রিত দীপের ত্রায়, জলশূন্য পদার্থের ত্রায়, আকৃতি বিশিষ্ট কিন্তু অধাতব পদার্থের ত্রায় এবং তৃণ নির্মিত প্রতিকৃতির ত্রায়। অপুত্রক পুরুষ প্রতিষ্ঠা রহিত, নগ্ন, একচক্ষুঃ এবং নিষ্ক্রিয়।”

বহু সন্তান বিশিষ্ট পুরুষ বহুমুর্তি, বহুমুখ, বহুবাহু, বহুক্রিয়, বহুচক্ষুঃ, বহুজ্ঞান ও বহু আশ্রয়। বহুপুত্রক ব্যক্তি মঙ্গলময়, প্রশস্ত ধর্ম, বীরাণ্য এবং বহুশাখ বলিয়া প্রশংসিত হইবে। প্রীতি, বল, বিস্তার, বিভব, কুল, যশ, প্রভৃতি অপত্য সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যিনি ঐ সকল গুণ লাভে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন নিত্যভোগ সুখের বীৰ্য্য বর্ধন এবং অপত্য বর্ধন বাজীকরণ পরায়ন হইবেন।

মনের হর্ষোৎপাদনকারিণী জীই বাজীকরণের প্রধান ক্ষেত্র। কারণ অভিলষিত রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের এক একটির দ্বারা মনের প্রীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। জী গুরুরে ঐ পাঁচটাই যখন একত্র অবস্থিত, তখন জীই যে সর্বাশ্রয়। অধিক হর্ষোৎপাদনকারিণী তাহাতে আর সন্দেহ কি। জী ব্যতীত অন্য কোথাও রূপ-রসাদি পাঁচটির একত্র সমাবেশ দেখা যায় না। জীতেই বিশেষরূপে প্রীতি, অপত্য, ধর্ম, অর্থ, লক্ষ্য ও লোক সকল প্রতিষ্ঠিত। তবে শাস্ত্রকার ইহাও বলিয়াছেন, যে জী স্বরূপা, যৌবন সম্পন্ন, সুসংকলিত, দীপ্তবর্ত্তা এবং সুশিক্ষিত সেই জীই প্রকৃত বাজীকরণ।

শাস্ত্রকার বাজীকরণ সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—“বিবিধ মনোজ্ঞ ভোজ্যাদ্রব্য আহার, নানাবিধ পানীয় দ্রব্য, পান, শ্রুতি মধুর বাক্য শ্রবণ, সুখকর স্পর্শ, জ্যোৎস্নারাজি, নবযৌবন সম্পন্ন কামিনী, শ্রুতি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ, তাষূল ভক্ষণ, মস্তপান, পুষ্পমালা ধারণ, ও মনের প্রফুল্লতা, প্রভৃতি দ্বারা বাজীকরণ হইয়া থাকে।”

বাজীকরণ ত্রিবিধ, যথা, শুক্রজনক, শুক্র প্রবর্তক এবং শুক্রের জনক ও প্রবর্তক। যুতাদি শুক্রজনক, কুঁচের মূল চূর্ণ প্রভৃতি শুক্র প্রবর্তক এবং গোমুখ, মাষ কলার ডিম্ব প্রভৃতি শুক্রজনক ও প্রবর্তক।

একণে বাজীকরণ যোগ সকল লিখিত হইতেছে। এই সকল যোগ সুস্থ ব্যক্তির শুক্রবর্ধক এবং ক্ষীণ শুক্র ও শুক্র দৌর্বল্য বিশিষ্ট পুরুষের পক্ষে পরম হিতকর। সুস্থ ব্যক্তি এই সকল যোগ সেবন করিলে শুক্র ক্ষয় জনিত কোন প্রকার রোগ জন্মিবে পারে না।

পাঁঠার কোষ জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে পরে একটা পাণ্ডে দুগ্ধজাত গব্য ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে সেই জল সহ কোষ, সৈন্ধব লবণ এবং পিঁপুল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া পাক করিয়া লইবে। ইহা অত্যন্ত রতি শক্তিবর্ধক।

পাঁঠার কোষ এক ছটাক, দুগ্ধ আধ সের এবং জল দুই সের একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ বশেষ থাকিতে অর্থাৎ আধ সের থাকিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। এই দুগ্ধ দ্বারা ঘোষা রহিত তিল সাতবার তাবল দিয়া সেই তিল সেবন করিলে প্রতিশক্তি বর্ধিত হয়। ইহা অশেষকর অঙ্গ মাজার রোগনাশক এবং শুক্র বর্ধক করিত হইলে, পাঁঠার কোষ

আটগুণ পরিমাণ হুঙ্ক এবং দুধের চারিগুণ জল একত্র সিদ্ধ করিয়া হুঙ্কাবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে।

ভূমিকুয়াণ্ড চূর্ণ, ভূমিকুয়াণ্ডের রসে সাত দিন ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে বাজীকরণ হয়। এইরূপে আমলকীর চূর্ণ আমলকীর রসে সাতদিন ভাবনা দিয়া ঘৃত, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলেও ফল হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া হুঙ্ক পান করা কর্তব্য।

ভূমি কুয়াণ্ড বাটিয়া হুঙ্ক ও ঘৃতসহ সেবন করিলে ঘোবন দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

আলকুশী বীজের শস্ত্র এবং কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ করিয়া বা বাটিয়া চিনি ও ধারোক্ষ হুঙ্ক সহ পান করিলে রতিশক্তি বদ্ধিত হয়। হুঙ্ক দোহন কালে যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে ধারোক্ষ হুঙ্ক বলে।

কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ বা কুঁচের মূল চূর্ণ, চিনি ও ধারোক্ষ হুঙ্ক সহ সেবন করিলে বাজীকরণ হয়।

শতমূলী ও কুঁচের মূল চূর্ণ করিয়া চিনি ও ধারোক্ষ হুঙ্ক সহ পান করিলে অথবা যষ্টিমধু চূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে রতিশক্তি বদ্ধিত হয়।

গোক্ষুর বীজ, কুলে খাড়ার বীজ, শতমূলী, আলকুশী বীজ, গোরক্ষ চাকুলের মূল ও বেড়ে লার মূল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া লহমত মাত্রায় হুঙ্ক সহ রাত্রে সেবন করিলে বাজীকরণ হয়।

মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া হুঙ্ক ও চিনি সহ পার্ক করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ। দধির সর, চিনি, মধু, মরিচ চূর্ণ, ছোট এলাচ চূর্ণ ও বংশলোচন চূর্ণ

একত্র মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধযুক্ত ভাণ্ডে রাখিবে। ঘৃত বহুল যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন সেবন করিয়া এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বর্ণ, স্বর, বল ও রতিশক্তি বদ্ধিত হয়।

এই স্থলে দধির সর এক পোয়া, চিনি এক ছটাক, ঘৃত ১ তোলা, মধু ১ তোলা এবং অস্ত্রাভ্র দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় (এক সিকি বা তদ্রূপ) গ্রহণ করিতে হইবে।

টাটকা মাংস ও রোহিত মংস্ত্র আগার করিলে বাজীকরণ হয়। বিশেষতঃ বড় পুঁটি (সরল পুঁটি) ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে রতিশক্তি বদ্ধিত হয়।

পিঁপুল, মাষকলায়, শালিধাত্রের তণ্ডুল, বব ও গোধূম একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত সহ পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া চিনি মিশ্রিত হুঙ্ক পান করিলে রতিশক্তি বদ্ধিত হয়। এই স্থলে পিঁপুল চূর্ণ এক সিকি এবং অস্ত্রাভ্র দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় লইতে হইবে।

কাঁকড়া, কচ্ছপ ও কুষ্ঠীরের ডিম ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত শুক্রবদ্ধি হয়।

অশ্বথের ফল, মূল, ছাল ও কুঁড়ির সম ভাগে দুই তোলা, হুঙ্ক ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া লইবে। এই হুঙ্ক ছাঁকিয়া চিনি ও মধুসহ পান করিলে রতিশক্তি বদ্ধিত হয়।

মাষকলায় চূর্ণ, ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিয়া হুঙ্ক পান করিলে রক্তি শক্তি বদ্ধিত হইয়া থাকে।

প্রথম প্রসূতা গাভীর বৎস বড় হইলে তাহার হুঙ্ক পান করিলে অথবা যে গাভী বা কলারের পত্র ভক্ষণ করে, তাহার হুঙ্ক পান করিলে বাজীকরণ হয়।



আলকুশী বীজ চূর্ণ ও গোধূম চূর্ণ দুই সহ পাক করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে ভোজন করিবে; এবং পরে দুই পান করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ।

চড়াই পাখীর মাংস তৃপ্তিপূর্বক আহাৰ করিয়া দুই পান করিলে রতিশক্তি বদ্ধিত হয়। কলায়ের ঘূষের সহিত ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিয়া দুই পান করিলে বাজীকরণ হয়। মংস্ত ও হংস, ডিম্ব—ঘৃতে ভাজিয়া থাইলে বাজীকরণ হয়।

আলকুশী বীজ, মাষকলায়, পিণ্ডথজ্জুর, শত-মূলী, পানিফল ও কিসমিস সমানভাগে মোট দুই সের, দুই চারি সের এবং জল চারি সের একত্র সিদ্ধ করিয়া চারি সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে তাহার সহিত চিনি তিন পোয়া, রংশলোচন তিন পোয়া এবং নূতন ঘৃত দেড় সের মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সহন্যত মাত্রায় সেবন করিয়া ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলে বহু পুত্র লাভ করা যায়।

টাটকা রোহিত মংস্ত ঘৃতে ভাজিয়া দধি, দাড়িমের রসের সহিত প্রস্তুত ছাগমাংসের ঘূষের সহিত পাক করিয়া অগ্রে মংস্ত, পরে ঘূষ ইহা সেবন করিবে, বৃষা ও পুত্রজনক।

মংস্ত বা মাংস কুটিত করিয়া তাহার সহিত

হিং, সৈন্ধব, ধনে ও গোধূম চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে পাক করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ।

ছাগাদির মাংস রসে দধি ঘৃত, লবণ এবং দাড়িমের রস সংযোগে মংস্ত পাক করিবে। মাংস রস মংস্তের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা পেষিত ও কণ্টক শূন্য করিয়া মরিচ, জীয়া, ধনে, অন্ন হিং এবং নূতন ঘৃত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর মাষকলায়ের ধূলি প্রস্তুত করিয়া উক্ত মংস্ত তন্মধ্যে পূর দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ইহা পুষ্টিকর, বলকর, পুত্রোৎপাদক, শুক্রবর্ধক এবং হর্ষজনক।

বৃষালপিকা—চিনি দশসের, নূতন ঘৃত পাঁচ সের মধু আড়াই সের, এবং জল আড়াই সের একত্র পাক করিবে। অনন্তর ঘন হইয়া আসিলে উহাতে গোধূম চূর্ণ আড়াইসের নিক্ষেপ করিবে। অন্ন পাকের পরে নামাইয়া শিলায় উত্তমরূপে মর্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে রতিশক্তি বদ্ধিত হয়।

যে সকল দ্রব্য মধুর, ত্রিধ্ব, জীবনীশক্তি বর্ধক, পুষ্টিকর, শুক্র ও মনের হর্ষজনক তৎসমস্তই বৃষা, স্তবরাং বাজীকরণের জন্য এবিধ দ্রব্য প্রয়োগ করিবে।

ক্রী—

## ছাত্র জীবনে—স্বাস্থ্যরক্ষা।

—:~:—

আয়ুর্বেদের সহযোগী সম্পাদক কবিরঞ্জন মহাশয় এবার কুস্তকারকে দিয়া কণ্ঠকারের কাজ করাইবেন। আশায় নাকি ‘আয়ুর্বেদ’

প্রাণ—২

পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেই হইবে। আয়ুর্বেদ শব্দের যোগরূপ অর্থটাই আশায় লিখাই। সেক্ষিপ্তমিষ্টন ও চরক ব্রহ্মসূত্র

সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতে বাস করেন, ইহা মহা-  
 মায়া কবিরঞ্জন মহাশয় কিছুতেই গুনিবেননা।  
 তিনি বলিলেন, “কিছু না কিছু আয়ুর্বেদ-নিশ্চয়ই  
 আপনার জানা আছে। এক কথায় যাহা  
 আয়ুর্বিদ্যার নিদান, তাহাই আয়ুর্বেদ। এত শত  
 বহি পড়িলেন, কোন গ্রন্থেই কি আয়ুর্বিদ্যার  
 কথা নাই? এ হইতেই পারেনা।” সত্য  
 বলিতে কি, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞের সঙ্গে তর্কে  
 আমি অজ্ঞ—হারিয়া গিয়াছি। তিনিই আমাকে  
 লিখিতব্য প্রবন্ধের শিরোনামা ধাৰ্য্য করিয়া  
 দিয়াছেন। আপনারা জানেন, চোখে ঠুলি  
 দেওয়া-জন্ম-বিশেষ বাধ্য হইয়া কিরূপ ঘুরিয়া  
 ঘুরিয়া তৈল বাহির করে। আমারও চোখে  
 ঠুলি দেওয়া,—এ শাস্ত্র আমার নিকট অন্ধকার  
 ময়। তা’র পরে বাধ্যবাধকতাও যথেষ্ট।  
 প্রথমতঃ অজানা বিষয়েও আমাকে লিখিতে  
 হইবে, অধিকন্তু আবার নির্ধারিত বিষয়ে!  
 যখন হিঁড়িয়া পলাইবার সাধ্য নাই, তখন  
 আমাকে ঘুরিতেই হইবে। আমি বেশ  
 বুঝিতেছি, আপনারা হাসিতেছেন, কিন্তু কি  
 করিব—কপালের গেথা—উপায় নাই।  
 অতএব আপনারা হাসুন, আমি ঘুরিতে থাকি।  
 প্রথমেই বলিয়া রাখি আমি ভাণধরিব না,  
 যাহা জানি না—সে বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখাইতে  
 গেলে ঘোরাই সার হইবে—তৈল বিন্দুও বাহির  
 হইবে না। আমার প্রবন্ধ দয়াবান্ সম্পাদক  
 মহাশয়ের প্রশস্ত হৃদয়ের প্রশস্ত অর্থ অমুসারে  
 কতকটা আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে,  
 কিন্তু নিশ্চয়ই আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র-সংগৃহীত নহে।  
 আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা কতকটা নিজের  
 অভিজ্ঞতা প্রসূত, কতকটা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য  
 অবস্থা পঠিতব্য পুস্তক পাঠের ফল। তবে  
 আমার বিশ্বাস, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একদম প্রবন্ধেরও

কথঞ্চিৎ সার্থকতা থাকিতে পারে—কারণ যদ্বা  
 সহজ, যাহা সবাই জানে বা বুঝিতে পারে—  
 অথচ আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সংগ্রহ  
 করিলেও তাহার ভ্রমপ্রমাদের মধ্যে হ্রত  
 কিঞ্চিৎ এমন সত্য নিহিত থাকিতে পারে,  
 যাহা বিশেষজ্ঞেরা নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে না  
 দেখিবার সম্ভাবনা। আরও এক কথা,—সহজ  
 কথা—প্রাণের কথা প্রায়শঃই সত্য হয়,—কেন  
 না তাহা অনেক সময়েই দৈশ্বরাহুপ্রেরিত। এই  
 জন্তই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের যুগেও গ্রাম্য  
 নিরক্ষর কবির সহজ সরল কবিতা প্রবাসী  
 ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিতেছে এবং  
 এই জন্তই হয়ত গুণগ্রাহী আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নিক  
 সুবিশাল ঔষধাধারে সামান্য মুষ্টিবাণের জন্ত  
 ও স্থান নির্দেশ করিতে ভুলিয়া যায় নাই।

ছাত্র জীবন, শিক্ষার জীবন—সর্ব বিষয়ে।  
 এ শিক্ষা আবার লাভ করিতে হইবে সামঞ্জস্যের  
 ভিতর দিয়া,—শারীরিক ও মানসিক যাহা কিছু  
 ধর্ম, আছে তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া  
 ক্রমোন্নতি করিতে হইবে—সামঞ্জস্য ভিন্ন  
 ক্রমোন্নতি সম্ভব হইবে না। কথটা স্পষ্ট  
 করিয়া বলি। ছাত্রদের অবস্থা মানসিক উন্নতি  
 —মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই বলিয়া শরীরের স্বাস্থ্যে  
 অবহেলা করিলে চলিবে না, কেন না শরীরে  
 মনে বড় নিকট সম্বন্ধ, একের ভাল-মন্দ অত্রের  
 ভাল-মন্দের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। শরীর  
 ও মন যেন একই জিনিসের দুইটা দিক—এই  
 দুই দিক লইয়াই জিনিসটার সম্পূর্ণতা, এবং  
 দিকের অভাবে আসল জিনিসটার ক্রান্তি হইয়া  
 পড়ে। অতএব গোণ হইলেও শরীরের  
 ছাত্র-জীবনের একটা উদ্দেশ্য। এটিই জীবন  
 মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে, কিন্তু কেন না মনের  
 প্রাণী।

দীর্ঘ তৈল প্রদান গোণ হইলেও একটা উদ্দেশ্য। মনের কাজ করিতে হইবে, শরীরের সাহায্য—তাই স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগী না হইলে উপায় নাই। এই কারণেই ছাত্র-জীবনেও হুইটী ঋষিবাক্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চণিতে হইবে—একটা “ছাত্রাণাং স্বধায়নং তপঃ,” অপরটা “শরীরমাশ্রয়ং খলু স্বধায়নং।” তপশ্চর্য্যাই প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু তপোবিয় নিরাকরণের জন্য সুগঠিত, সুবেষ্টিত, সুসজ্জিত-শরীর-মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তপস্বী মনকে স্থাপন করিতে হইবে। ‘ব্যাধি মন্দিব’—তপস্তার পক্ষে কখনই সুকর নহে।

আগে শরীর মন্দির নির্মাণের কথাই বলি। মন্দিব নির্মাণের কথাতেই তপস্তার কথাটাও আপনা আপনি যেন আসিয়া পড়ে; কেননা নির্মাণ করিবার সময়ে সর্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, মন্দির সম্পূর্ণরূপে তপশ্চর্য্যার উপযোগী হইতেছে কি না।

মন্দিরের মধ্যে শরীরের সনাতন প্রথা অনুসারে উপমা স্থাপন করিয়াছি বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—হুইটের মধ্যে বিশেষ একটু প্রভেদ আছে। মন্দিরের মধ্যে ভিত্তি স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ চূর্ণকাম পর্য্যন্ত সমস্তই মানুষকে নিজে করিতে হয়, মন্দির নিজে অচল জড়; কিন্তু শরীরের উপযুক্ত আহারীয় সংগ্রহ করিয়া দিরা, একটু যত্ন করিতে থাকিলে, শরীর নিজেকে নিজে গড়িয়া তোলে। হুইটী ইংরাজী শব্দে এ পার্থক্য বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। মন্দির mechanical জিনিস, শরীর organic সৃষ্টি। আর একটু কথা এই;—তপস্তার উপযোগী করিয়া মন্দির নির্মিত হইবে, কিন্তু তপস্তা—মন্দিরকে গড়িতে পারে না, কিন্তু মন্দির তপস্তাকে উন্নত করিতে পারে না, কিন্তু

শারীরিক অবস্থা অনেক সময়েই মনের অবস্থার সৃষ্টি করে এবং মানসিক অবস্থা প্রায়শঃই শরীরকে গড়িয়া লয়। অর্থাৎ তপস্তা ও মন্দিরের মধ্যে co-existence সম্বন্ধ থাকিলেও শারীর ও মানসিক অবস্থার মধ্যস্থিত interaction সম্পর্ক নাই। এই interaction সম্পর্ক আছে বলিয়াই সর্ব চিকিৎসা শাস্ত্রেই অনেক সময় শরীরের চিকিৎসা করিতে বাইরা বিশেষজ্ঞেরা অগ্রে মনের চিকিৎসা করিয়া থাকেন এবং মনের চিকিৎসা প্রধানতঃ শারীর-চিকিৎসা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শরীর তিনটা প্রক্রিয়া দ্বারা নিজেকে গঠন, পরিপোষণ ও রক্ষণ করে, যথা আহাৰ্য্য গ্রহণ, গৃহীত আহাৰ্য্যের পরিপাক, পরিপাক প্রাপ্ত সারাংশের দেহ মধ্যে স্থিতি।

আহাৰ্য্য গ্রহণ—সরল চিত্তে নিরমিত সময়ে পরিমিতরূপে পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য লঘু আহাৰ্য্য গ্রহণ করা কর্তব্য। ছাত্রের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য শরীরের পুষ্টি করিবেন। অতএব মন উত্তেজিত হয়—ধারণা শক্তির হ্রাস হয় কা কুপ্রবৃত্তির উদ্বেগ হইতে পারে এমন আপাততঃ রসনাচুপ্তিকর আহাৰ্য্য তিনি কদাপি গ্রহণ না করেন। মাদক দ্রব্য বা কোনোরূপ stimulant দ্রব্যমাত্রই বর্জন করা কর্তব্য; কেননা ইহা মানুষকে একটা সাময়িক অনুপ্রেরণা প্রদান করে বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অব্যাবস্থিকরূপে উত্তেজিত হইয়া দায়ুশূলী যখন নিত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন শরীর নাকি রোগ-কবলিত হইয়া পড়ে। মাছ-মাংস অপেক্ষা দুগ্ধ-বিহীন ব্যবহার বেশী হওয়া আবশ্যিক। আমিনিক নিরামিষ—উভয়বিধ খাদ্যই বলকারক বীজকর, কিন্তু আমিনিক-তালি-বীজকর নহে।

বায়ুদিগের মত হিংসার পক্ষে উপযোগী ও নিরামিষ ভোজীর বল যেন হাতীর মত দৌশীল্য ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনের পক্ষে হিতকর। কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন—মাংসের মাংস হজম করিবার উপযোগী পাকস্থলী ও মাংস ছিঁড়িয়া খাইবার উপযোগী মাংসাশী জন্তুর মত চারটা স্ফাদাস্ত আছে এবং বঙ্গদেশে মাংস না হউক, মৎস্য গ্রহণ না করিলে নাকি শরীরের বিশেষ কিছু প্রত্যাবায় হইয়া থাকে। তা' যাই-হউক এগুলি যখন রোগোপ্তনের বর্ধক, তখন খুব বিবেচনার সহিত নিতান্ত কম মাত্রায় ছাত্রাগণের এগুলি গ্রহণ করা বিধেয়।

**আহার্য্য পরিপাক।**—আহার্য্য গ্রহণ করিলেই হইল না। শরীর রক্ষা পরিপাক ক্রিয়ার উপরে সর্বতোভাবে নির্ভর করে। খাওয়ার সারাংশ হইতেই রস উৎপন্ন হয় এবং রসই ক্রমান্বয়ে রক্তাদিতে পরিণত হইয়া শরীর পোষণের কারণ হয়। আয়ুর্বেদে উক্ত হইয়াছে :—

রসাদ্রব্জং ততো মাংসং মাংসান্নেদঃ প্রজায়তে।  
মেদমোহস্থি ততো মজ্জা ততঃ শুক্রম্য সম্ভবঃ ॥  
কিন্তু খাদ্য পরিপাক না হইলে শরীর খাওয়ার এই সারাংশ গ্রহণ করিতে পারে না, কাজেই শরীরের পক্ষে অত্যাवশ্যক উপাদানগুলির স্বল্পতা বশতঃ শরীর ক্রমেই নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

এই অজীর্ণ রোগ নানাকারণে ঘটয়া থাকে। ছাত্রদের পক্ষে সাধারণতঃ অনিয়মিতাহার অপরিসমিতাহার, আবদ্ধ বায়ুতে অধিকক্ষণ যোজন করিয়া অধ্যয়নাদি, মানসিক পরিশ্রমজনক কার্য্যকরণ, অধিক রাত্রিজাগরণ, হুচিন্তা বা অতিচিন্তা ইত্যাদিতে অজীর্ণরোগ

উদ্ভব হইয়া থাকে। রাত্রিজাগরণের মত হৃৎকর্ষ অতি কমই আছে। ইহাতে শরীর নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আহার যেমন প্রয়োজনীয়, আরাম দায়িনী নিদ্রা ততোধিক আবশ্যক। পরিপাকক্রিয়ার নিদ্রা অত্যন্ত সাহায্য করে। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন,—রজনীর শেষার্দ্ধে একঘণ্টা জাগিলে বেষ্মতি হয়, পূর্বার্দ্ধে দুই ঘণ্টা নিদ্রা যাইলেও তাহার পূরণ হয় না। তৎপরে হুচিন্তায়ও শরীরের কম ক্ষতি হয় না। হুচিন্তা যে একরূপ মর্মান্তিক জর—সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

ভারতবাসী ছাত্রদের সম্বন্ধে কম পড়া অপেক্ষা বেশী পড়ার অভিযোগই অধিকতর শ্রুত হওয়া যায়। প্রাণের দ্বারে উদরারের সংস্থানের জন্ত যাহাদের পড়া, তাহাদের পক্ষে অধ্যয়নের জন্ত অতিশ্রমকরা খুব সম্ভবপর। কিন্তু প্রকৃতি তা' বুঝিবে কেন? এই অতিরিক্ত মানসিক শ্রমের শান্তি তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। অনেক ছাত্র মানসিক শ্রমাহ্বারী আহারীয় পান না বলিয়া তাঁহার পিতৃমিত্রা জন্মে তাহাতে শরীর গরম হয়, হাত-পা চক্ষু জ্বালা করে। অধিকন্তু ভারতবাসী অনেক সময় বিনা কাজে এত ব্যস্ত যে, শারীরিক ব্যায়াম করিবার জন্ত দশ মিনিট সময় তাহার দিবারাত্র মধ্যে হইয়া উঠে না। অনেক ব্রাহ্মণ ছাত্রের কথা শুনিয়াছি, তাঁহার পড়াঠনা নষ্ট হইবার ভয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন না, তাঁহার অল্প ব্যায়াম করার কথা ক্রমেও মনে আনিতে পারেন না। ফলে এই হয়—উষ্ণ পাকস্থলীতে যে খাদ্য পড়ে তাহা হজম হয় না। কাজেই উদরার পিত্ত বায়ু এবং অন্ন ক্রেশের কারণে হইয়া পড়ে। অনেক সময় নিঃশব্দে ঘুম আসে। অনেক

শরীরে উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত সঞ্চারিত হয় না। কাজেই পাকস্থলী দুর্বল বা অসাড় হইয়া পড়ে। হুতরাং খাদ্য-পরিপাকের জন্য পাকস্থলীর নিয়মিত সঞ্চালন হয়না বলিয়া খাওয়ার পরিপাক হয় না কিংবা আংশিক পরিপাক হয়। কাজেই হয় উদরাময়, না হয় কোষ্ঠবদ্ধ রোগের সৃষ্টি হয়।

অজীর্ণ রোগে প্রথমতঃ সেই সনাতন উপদেশ—যে সকালে-সন্ধ্যায় পর্যাপ্ত নিশ্বল বায়ু সেবন করিতে হইবে,—সমুদ্র বা নদী তীব্র বায়ুই হউক বা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বায়ুই হউক, অগত্যা পার্কে প্রভৃতির বায়ুতেও চলিতে পাবে। সম্ভব হইলে প্রতিদিনই কয়েক মিনিট ধবিয়া শারীরিক ব্যায়াম করিয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হওয়া উচিত। কোষ্ঠ যাঁহাতে পথিমার হইয়া যায়—কয়েকদিন অন্তর বিবেচনা করিয়া এইরূপ মুহু বিরেচক ঔষধ বা জোলাপ লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মনে রাখা কর্তব্য—ঔষধ সেবন যতটা পারা যায়, না করাই ভাল, কারণ পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবনে ঔষধ নিত্য খাওয়ার মধ্যে পরিণত হইয়া যায় এবং শেষে ঔষধে আর ফললাভ হয় না। অধিকন্তু প্রকৃতির যে স্বাভাবিক রোগ-নিবারিকা শক্তি আছে, সেটা লোপ পাইয়া যায়।

অজীর্ণরোগীর খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। আহার করা সম্বন্ধে সর্ব সময়েই সেই সনাতন প্রথাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়—“বরং কম খাইয়া পস্তাইও, ভুবে বেশী খাইয়া ভুগিও না।” এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ডাক্তার Andrew Wilson এবং Robert Bell বলিতেছেন,—“muscular exercise is essential to the proper performance of the intestinal functions.”

Therefore, those who must sit for hours at a desk for a livelihood should make it a rule to have their morning and evening walks regularly, when constipation would trouble them but little. \* \* \*

If individuals would systematically conform to a well-considered dietetic regimen, and would, moreover, give full attention to a daily and complete clearance from their bodies of the waste products of food, indigestion would cease to trouble and dyspepsia would vanish.”

এইরূপ ভাবে যিনি জীবন যাপন করেন, তাহার সহজে কোন রোগের করালগ্রাসে পতিত হইবার আশঙ্কা করিতে হয় না। যিনি বাহ্য আহার করেন, তাহাই হজম করিয়া ফেলেন—তিনি বাতবিকই স্থখী। কারণ তিনি সুনিশ্চিত শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ করেন এবং শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান হইলে মনের স্বাস্থ্য আপনিই ফুটিয়া উঠে।

তার’পর অতিরিক্ত পাঠের জন্য যে যোগ উপস্থিত হয় তাহা প্রত্যেক ছাত্রই অনায়াসে এড়াইয়া চলিতে পারেন। পড়া-শুনায় work while you work, play while you play এ বড় সুন্দর রীতি। কিন্তু দুঃখের বিষয়—আমরা স্বতঃই

পড়ার সময় খেলি, খেলার সময় পড়ি আর পরীক্ষার আগে রাত জেগে জেগে থাকি।

পরিপাক প্রাপ্ত সারাসংশের মধ্যে স্থিতি।—এখন হইতেছে খাদ্যের কথা। খাদ্যগ্রহণ করিয়া পরিপাক করিয়া রক্তমাংসে পরিণত করিলেই

একপ যত্ববান হইতে হইবে—যাহাতে ঐ স্নায়ুশরীরের মধ্যেই অবস্থিতি করিয়া ক্রমাগত শরীরের ও তৎসঙ্গে মনের শক্তি-বর্দ্ধন করিতে পারে। ওজো ধাতুর বর্দ্ধন করাই শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্য, কেননা এই ওজঃই মানসিক উৎসাহ-প্রতিভাদি বর্দ্ধনের কারণ। বাগভট এই ওজো ধাতুর গুণ নিম্ন লিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,  
 “নিম্পাণ্ডতে যতো ভাবা বিবিধা দেহ সংশ্রয়াঃ  
 উৎসাহ প্রতিভা-ধৈর্য্য-লাবণ্য স্নকুমারতাঃ ॥”  
 সূক্ষ্মত বলেন,

রসাদীনাং শুক্রাঘ্নানাং ধাতুনাং

যৎপরং তেজস্তৎ খরোজ স্তদেবলমিতি।”

অর্থাৎ রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর যে পরম তেজোভাগ তাহাই ওজঃ। ওজঃই বলের কারণ।

তাহা হইলে ওজঃ বৃদ্ধি করিতে হইলে শরীর মধ্যে ওজো ধাতুর কারণ ভূত এই সপ্ত ধাতুর সংরক্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। সুতরাং বীৰ্য্যধারণ বা বিন্দু ধারণ করিতে হইবে। “মারেতঃ স্কন্দয়েৎ কচিং” এ শ্লোকবাক্য ছাত্রগণের পক্ষে সর্ব্বথা পালনীয়। বাস্তবিকই “মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।” বীৰ্য্যের ক্ষয় প্রায় অধিকাংশ রোগেরই মূলভূত কারণ বলিয়া আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র একবাক্যে ঘোষণা করিতেছে।

আমার মনে হয়, এই বীৰ্য্যধারণই শরীর রক্ষার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। শরীর মধ্যে বীৰ্য্যের স্তম্ভন করিতে পারিলে আহাৰ-বিহারের লামাশ নিয়ম ভঙ্গ শরীরের বেশী কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু বীৰ্য্যধারণের ক্ষমতা না থাকিলে অল্প দুইটা নিয়ম খুব স্বল্প সহকারে পালন করিলেও ফল মধ্যস্থদাই হইয়া থাকে। কিন্তু বীৰ্য্যধারণ কিরূপে সম্ভবে?

মনের চিকিৎসা।—বীৰ্য্যরক্ষার কথায় মনের চিকিৎসায় আসিয়া পড়িলাম। কাম বাসনা মনের বিকার হইতে উৎপন্ন। বাস্তবিক পক্ষে পরিশুদ্ধ মন না হইলে মানবের পদে পদে বিপদ। শত চেষ্টার ফলে শরীর মধ্যে যে শুক্রধাতু উপার্জিত হয়, মানসিক ক্ষণিক চাক্ষুণ্যে তাহার স্কন্দন করিয়া, মানব নিজ শরীরকে “ব্যাধি-মন্দির” করিয়া তুলে। অনেক সময় শরীরের চিকিৎসায় যে রোগের বিন্দু মাত্রও আরোগ্য লাভ হয় না, তাহার কারণ, যে পাপমন পাপের স্রষ্টা, তাহার ত কোন চিকিৎসা হয় না। তাই ম্যাকবেথ শারীরিক চিকিৎসায় লেডি ম্যাকবেথের কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন,—

“Canst thou not minister to a mind diseased etc.?” কিন্তু মনের চিকিৎসা অনেক সময়ই শারীরিক চিকিৎসা দ্বারা সম্ভবে না। কেননা, মানসিক যে বেগ শারীরিক রোগের ফল মাত্র, শারীরিক ঔষধ প্রয়োগে সেই মানসিক রোগের কথঞ্চিৎ উপশম সম্ভবপর, কিন্তু মানসিক রোগই যেখানে শারীরিক রোগের কারণ, সেখানে ঔষধ সেবন নিষ্ফল। সেখানে প্রক্ৰিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। রোগীকেই চিকিৎসকের আসন গ্রহণ হইবে। তাই ডাক্তার ম্যাকবেথকে বলিলেন—“Therein the patient must minister to him self.”

মনের চিকিৎসা, মনের উন্নতি বিধান—তাহাকে কলুষের অন্ধরূপ হইতে পবিত্রতার বিমল আলোকে জ্ঞানঘন করা। সাধুসঙ্গ, সর্বদা সদ্বিষয়ে চিন্তা ও আলোচন, কলুষের পরিবর্তে স্নেহের ও ভগবৎকৃতির সান্নিধ্য, হৃদয়স্থিত উপাধি, মনের পরিষ্কার, ইত্যাদি।

সর্বদা প্রকৃত চিত্তে অবস্থান, প্রভৃতি মনকে উন্নত করিবার প্রধান উপায়।

একদিনে মন বশ না হইতে পারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে হইবেই হইবে। তৎপরে শরীরের স্বাস্থ্য ও বলবৃদ্ধি করিতে পারিলে মনের অনেকটা স্বাস্থ্য বিহিত হওয়া খুবই সম্ভব। “sound mind in a sound body”—এ আজগুবি কথা নয়। দেবমন্দিরে পিশাচের বাস কঠিন সম্ভবপর। পরিশুদ্ধ শরীরে কন্মিত মন থাকিতে লজ্জা বোধ করে, পূর্ণিপাক্ষিক অবস্থা তাই মনকে অনেকটা পরিশুদ্ধ হইতে বাধ্য করে।

বাস্তবিকই সেদিন ভারতের কি আনন্দের দিন—যে দিন ভারতে এমন ছাত্রবৃন্দ দেখা দিবেন—যাঁহাদের বার্ষ্যবান্ দেহ ওজো লাভণ্যে দেদীপমান, এবং সেই দেহে যাঁহাদের বিমল মন সুশিক্ষার আলোকে ভাস্বর। এমন দিন ভারতবর্ষেই একদিন ছিল—যেদিন ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে একমুত্রে গ্রথিত ছিল। এ যুগে যদি পুনরায় ভারতের শুভার্থিগণ শরীর-মনের সামঞ্জস্যকে তিষ্ঠি করিয়া ছাত্র-শিক্ষার প্রবর্তন করিতে পারেন, তবে আবার আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, ছাত্র জীবনে শীর্ণ দেহ, নিকৃৎসাত মন, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অকালবার্দ্ধক্য অবশ্যস্তাবী নহে বরং ছাত্র জীবনেই শারীরিক

ও মানসিক সর্ববিধ গুণের পূর্ণ সুখমা বিকাশ হইয়া থাকে এবং ইহাও উপলব্ধি করিতে পারি—কেমন করিয়া গৃহে গৃহে ছাত্রের মধ্যে প্রফুল্লতার সঙ্গে গাভীর্ঘ্যের সংযোগ হয়,—প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সুশিক্ষাজনিত বিনয়ের একত্র সমাবেশ হইতে পারে এবং বীর্ঘ্যের সঙ্গে প্রতিভার শুভ পরিণয় সম্ভবে। ভারতের জীবন তখন পরিপূর্ণতার, সফলতার আনন্দে শিহরিত হইবে। ভারতের মনস্বী চিন্তাপ্রবৃত্ত-আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সার্থক হইবে, আয়ুর্বুদ্ধি তখন নিরর্থক হইবে না; বাঁচিয়া থাকা তখন লাঞ্ছনার হইবে না। তখন বাঁচিবার জন্ত লোক পাংগল হইবে। কারণ, তখন দীর্ঘজীবন, সুস্থ শরীর, জ্ঞানময় মন—একই স্থানে বাস করিবে, কারণ তখন বাঁচিবার আশা ও জ্ঞানলাভের তৃষা করবদ্ধ হইয়া ভবিষ্যের আলোকময়-লোকের পথে যাত্রা করিবে।

আয়ুর্বেদ আমাদের অতীত গৌরবের চিহ্ন। এ অতীত মহিমার গৌরব যখন আমরা বৃক্ষিষ্ণাছি, যখন এই পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রাবনের যুগেও আবার “আয়ুর্বেদ কলেজ” স্থাপিত হইয়াছে, খুব আশা হয়—এই আয়ুর্বেদ কলেজই আমাদের সেই অতীত সামঞ্জস্য-শিক্ষার পুনরুদ্ধারের গৌরবে গৌরবাবিস্ত করিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

## বর্ষা-বন্দন।

এস, সিন্ধু জাম শান্ত প্রকৃতি মোহন!  
বারি বরিষণ! এস, সস্তাপ হরণ!  
নিদাঘে দারুণ রবি

লীর্ণ করি দেহ-ছবি—

প্রথর কিরণে বশ করেছে হরণ,  
তপ্ত স্রব্দে দেহে ভাই করি আবহন।

কদম্ব পরাগ-বাহী সুরতি সমীর  
 নখি সারা কায়ে এস শীতল-শরীর!  
 জলদের নীলাশ্বর  
 পরি অঙ্গে ঋতুবর!  
 এস সাজি বিছাতের কণক-মালায়,  
 তাপিত ধরণী আছে তব প্রতীক্ষায়।  
 বাবে এবি দিনকর দক্ষিণ অয়ন  
 গুনিয়ে তোমার সনে অবনী মিলন,  
 বলীয়ান সোম-সখা  
 আসিয়া করিবে দেখা  
 বাড়াইবে মানবের ক্ষীণ দেহে বল,  
 নব পল্লবিত হবে ওষধি সকল।

তাই বলি এস ত্বরা তাপিত জীবন!  
 আদেশ জানাও নরে করি গরজন,  
 তোমার পরশ লাভে  
 ভ্রূবায়ু শীতল হ'বে  
 মন্দ হবে মানবের জঠর অনল,  
 লঘুভোজী নরনারী পাবে নব বল।  
 ধৌত শুভ্র বাস যার স্নগন্ধ বিলাসী  
 শীতল-শীকর-বায়ু-হীন-হৃদ্যবাসী  
 দিবানিদ্রা পরিহরি  
 ব্যায়াম বর্জনকারী  
 রবির কিরণ ত্যাগী রবে নিরাময়  
 এসে এই বলে দাও জীবদয়াময়।

শ্রীহরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ

## আয়ুর্বেদে ক্ষার-কম্পনা।

[ রসায়ন তত্ত্ব ]

— :: —

এ দেশে এখনও এমন অনেকে আছেন, তাঁহাদের চক্ষে বৈদিক ঋষি বর্তমান হটেনটু বা সাওতালেরই একটু মার্জিত সংস্করণ মাত্র। যুরোপ সভ্য হইবার পূর্বে—আর্য্য ঋষি যে পার্থিব বিজ্ঞানেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, একথা হয়ত তাঁহাদের কাছে আরব্য উপস্তাসের আখ্যায়িকার মতই অসম্ভব শুনাইবে। তথাপি আজ আমরা আয়ুর্বেদের "ক্ষার কল্পনাকে" উপলব্ধি করিয়া ঋষি প্রতিভার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

অনেকের ধারণা—আর্য্য ঋষিগণ মনস্তত্ত্বের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভৌতিক বিজ্ঞানে তাঁহাদের আদৌ কোন অধিকার ছিল না। আমরা তাঁহাদিগকে ভারতের জীবন্ত বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পাঠ করিতে অহুরোধ করি।

যুরোপের "রসায়নী বিজ্ঞান"—এখন সভ্য সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে, কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই—এই রসায়নী বিজ্ঞান সর্ব প্রথম ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।



বৈদিক যুগের সোম-সন্ধান যিনি মন দিয়া পড়িয়াছেন, তাহাকে আর নূতন করিয়া বুঝিতে হইবে না—হিমালয়ের সান্নিপর্ণকুটিরে যেদিন সৈন্ম পাত্রে সোম বিন্দুর উজ্জ্বল উষ্ণি-  
ছিল, সেই দিন ভারতেই জগতে রসায়নশাস্ত্রের জ্যোতিষম্বর সম্পন্ন করিয়াছিল।

সুশ্রুতের ত্রিবিধ ক্ষার কল্পনা পাঠ করিলে প্রাচীন হিন্দুর বসায়নের ইতিহাস বেশ বুঝিতে পারা যায়। সে ক্ষার প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান সম্মত। শাস্ত্রকারের উপদেশ—যে সকল পদার্থের ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইবে, প্রথমেই তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে সেই ভস্মাবশেষ জলে গুলিয়া অগ্নির তীব্র তাপে জাল দিলে যে চূর্ণবৎ পদার্থ পাক পাত্রে অবশিষ্ট থাকিবে, উহারই নাম ক্ষার। আয়ুর্বেদে অনেক প্রকার ক্ষার ও তাহাদের বিভিন্ন কার্য প্রণালীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকলগুলির পরিচয় দেওয়া চলে না। আমি কেবল প্রধান ক্ষারগুলির উল্লেখ করিব।

যবক্ষার।—বহু শতাব্দী অতীত হইল—ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞানচরক ও সুশ্রুতে, এই যবক্ষারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইতর্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে এই যবক্ষারের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহার অনেকগুলি পর্যায় আছে, যথা—“যবাশ্রজ” “যবলাস” “যবশুক” “যবনালাজ” “যবজ” ও “যবাপত্য”। এই প্রতিশব্দগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে জানা যায়—যব ভস্ম করিয়া যে ক্ষার পদার্থ পাওয়া যায়—তাহার নামই যবক্ষার। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ;—

প্রথমে যবের শূক ( শিষ বা শুষ্ক ) অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, সেই ভস্ম একসের পরিমাণে লইবে,

প্রাণ—৩

এবং তাহা ৬৪ সের জলে গুলিবে। পরে সেই ক্ষার মিশ্রিত জলকে উপযুগপরি একবিংশতি বার বস্ত্র খণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে। শেষে সেই জল কোনও পাত্রে রাখিয়া তীব্র অগ্নিতাপে জাল দিবে। জলীয়াংশ মরিয়া গিয়া যখন দেখিবে পাত্রে একরকম চূর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট রহিয়াছে—তাহা গ্রহণ করিবে। ইহাই হইল যবক্ষার। এই প্রণালীতে যে ক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে, ডাক্তারেরা তাহাকে Corbounate of Potash বলেন। কিন্তু অনেকস্থলেই আমরা দেখিতে পাই—আধুনিক বিজ্ঞানে যব-ক্ষারকে ‘সোরা’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই জন্ত—নাইট্রোজেন গ্যাসের বাঙ্গালা নাম “যবক্ষার জল”।

সোরার ইংরাজী নাম—“নাইটেট অফ পটাস”। যব হইতে জাত যবক্ষারের সঙ্গত অভিধান—“কার্বনেট অফ পটাস”। এই দ্রব্য সম্পূর্ণ পৃথক।

ক্ষারতত্ত্বের সম্যক আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি,—প্রাচীন কালে স্থলজ বৃক্ষ পোড়াইয়া ঋষিরা তাহার ক্ষার ব্যবহার করিতেন। ডাক্তারী বিজ্ঞানেও দেখা যায়—অধিকাংশ স্থলজ বৃক্ষ আছে, যাহা পোড়াইলে—অবিদ্যুৎ পোটাসিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়। পল্লীর অশিক্ষিত সমাজেও আমরা দেখিয়াছি—কদলী বৃক্ষের ভস্ম দ্বারা লোকে বস্ত্রাদি ধোত করিয়া থাকে। যুগ যুগান্তর পূর্বে যুগাবতার সুশ্রুত নিয়মিত বৃক্ষগুলি পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যথা;—

বটাপান্নল, কুড়টী, অখকর্ণ, পারিতন্ত্রক, বহেড়া, সোঁদাল, তিবক ( লোধবৃক্ষ ) আকর্ণ, মনসাদিহু, আপাং, পাক্কল, উহলকবন্ধ,

বাসক, কদলী, রক্তচিট্রক, নাটাকরঞ্জ, ইন্দ্রবৃক্ষ (কুটজ ভেদ) আশ্বোতা, অশ্বমারক (করবীর), ছাতিম, গণিয়ারী, কুঁচ এবং ঘোষাবৃক্ষ।

কেনেডা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ কশিয়ার প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে স্থলজ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।—এ সকল দেশবাসীরা এখনও পর্যন্ত বৃক্ষাদি দন্ধ করিয়া কার্বনেট অফ পটাশ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

**সর্জিকফার**—আয়ুর্বেদে আর একটি ক্ষারের নাম—সর্জিকফার। ইহার অপভ্রংশে—সার্চি-ক্ষারের নামের সৃষ্টি। স্থলজ বৃক্ষ-লতাদি দন্ধ করিয়া যেমন কার্বনেট অফ পটাশ পাওয়া যায়, সেই রূপ জলজ ও সমুদ্রতীর জাত বৃক্ষ-লতাদি দন্ধ করিয়া সেই ভঙ্গ্য হইতে কার্বনেট অব সোডা পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে মিশ্র (মিশর) দেশে এই সোডা—সাবান ও কাচ-নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হইত। চরক ও সুশ্রুত পাঠেও আমরা জানিতে পারি—স্মরণাতীত কাল হইতেই এই জ্ঞান-পুণ্য-বহুলা ভারত ভূমিতেও ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

বাজারে সচরাচর সার্জিমাটি নামে যাহা বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা আর কিছুই নহে—মৃত্তিকা মিশ্রিত কার্বনেট অফ সোডা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন দেশের লবণাক্ত ভূমিতে একপ্রকার সামুদ্রিক লতা জন্মিয়া থাকে, তাহা দন্ধ করিলে যথেষ্ট পরিমাণে সর্জিকফার সংগৃহীত হইয়া থাকে।

বহুকাল পূর্বে—চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যকাচার্যগণ, যবক্ষার (Carbonate of Potash) এবং সর্জিকা ক্ষার (Carbonate of Soda)—এই দুইটি যে পৃথক পদার্থ তাহা

জানিতেন। কিন্তু যুরোপে বহুদিন পর্যন্ত এই দুইটী ক্ষার একই পদার্থ বোধিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল; এখন সে সন্দেহের নিরসন হইয়া গিয়াছে।

সুশ্রুত একজন অদ্বিতীয় অঙ্গ চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার শল্য-তন্ত্রের প্রভাব—যুরোপ সভ্য হইবার পূর্বে—নিখিল বিশ্বকে একদা বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তৎপরে বিষয়—সেই সুশ্রুতের বংশধরগণ, মাজ সুশ্রুতোক্ত যন্ত্রণাত্মক আকৃতি চিনিতে পারিল না! সুশ্রুত অঙ্গ চিকিৎসার অঙ্গ স্বরূপ—ক্ষার প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে ক্ষারত্রিবিধ। ১। মৃদু। ২। মধ্যম। ৩। তীক্ষ্ণ। মৃদুক্ষার (mild) মধ্যম ক্ষাব (caustic) সুশ্রুতের তীক্ষ্ণক্ষার ভিন্নপ্রকারের ক্ষার পদার্থ নহে। মৃদুক্ষারে দস্তী দ্রবণ প্রভৃতির সংমিশ্রণ ঘটাইয়া তীক্ষ্ণক্ষাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মধ্যম ক্ষারকে caustic Alkali বলা যায়। মহাত্মা সুশ্রুত তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুতের যে প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বিলাতী বৈজ্ঞানিকগণও তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। ঘণ্টাপারুল, কুটজ প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষারায়ক ভস্মাবশেষ জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া, তাহাতে ভঙ্গ্য শর্করা, ক্লিস্ক, শঙ্খনাভি—অগ্নিদন্ধ করিয়া যে চূর্ণ (caustic lime) পাওয়া যায়—সেই চূর্ণ মিশাইয়া অগ্নিতে পাক করিলেই তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত—বহুযুগের ব্যবধান, কিন্তু এখনও যুরোপের রাসায়নিকগণ সুশ্রুতের মতেই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা এখনও মৃদুক্ষারের সহিত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত করিয়া

থাকেন। সুশ্রুত লৌহ-কলসীর মধ্যে মুগধক করিয়া তীক্ষ্ণক্ষার সংরক্ষণের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এই ব্যবস্থামত ক্ষার রক্ষা করিয়া থাকেন।

তীক্ষ্ণক্ষার হীনবীৰ্য্য হইলে, অর্থাৎ Carbo-nated হইয়া গেলে, পুনরায় চূর্ণের সহিত ত্রাত্যকে জ্বাল দিয়া লইতে হয়। এই অধুনিক বিজ্ঞানের মতটীও সুশ্রুতের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র।

সুশ্রুতের মতে—ক্ষার ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল। নব্য রাসায়নিকগণও এই কথা স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। অম্লরসের (Acids) দ্বারা তীক্ষ্ণক্ষারের তেজ নষ্ট (Neutralisation) হয়,—ভারতের অধিতীয় বৈজ্ঞানিক সুশ্রুতই ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুশ্রুত বলেন—ক্ষার পদার্থে লবণ রস আছে, সেহজ্ঞান অম্লরসের সহিত লবণ রস মিশ্রিত হইলে, ক্ষারের তীক্ষ্ণতা দূর হয়—ক্ষার মাধুর্য্য গ্রন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নব্য রাসায়নিকগণের প্রকৃতিবিশ্বাসে—এই মত সমর্থিত হইতে পারে। অম্ল ও ক্ষার সংযুক্ত হইয়া যে এককেন নূতন পদার্থ উৎপাদিত হয়, তাহার নাম লবণ (Salt) ; এই লবণ আত্মীয় পদার্থে অম্ল বা ক্ষারের গুণ না থাকায়, অম্ল ও ক্ষারের সংযোগে—ক্ষারের তেজ প্রশমিত হয়। ইহাই নব্য বসায়নের সিদ্ধান্ত।

মৃদুক্ষার।—যব ভিন্ন বহু স্থলজ বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে যে ক্ষার পদার্থ পাওয়া যায়, আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাহা জানিতেন। ষ্টোপাকুল, কুড়চী, পারিত্রিক প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে মুদুক্ষার প্রস্তুত-প্রণালী অল্পধাবন করিলেই জানা যায় তাহা বহুতে পারি। বাহুল্য হইলে সে সকল বিধি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

না। অম্লসন্ধিৎসু পাঠক সুশ্রুতকে “ক্ষার পাক বিধি” পড়িয়া দেখিবেন। ষ্টোপাকুল, কুড়চী প্রভৃতির ভস্ম এক এক ভাগ লইয়া (মোট ৩২ সের) ১২২ সের জলে (অথবা গোমুত্রে) গুলিয়া, তাহা উপযুগপরি ২১ বার বস্ত্র পরিশ্রুত করিয়া সেই ক্ষারজল গ্রহণ করিবে। পরে ঐ জল কটাহে চড়াইয়া অগ্নির জ্বালে পাক করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে হাতা দিয়া উহা নাড়িয়া দিবে। যখন দেখিবে উহা স্বচ্ছ রক্তবর্ণ ও পিচ্ছিল হইয়াছে, তখন নামাইয়া জাঁকিয়া সিঁচা বাদ দিবে। ইহারই নাম মুদুক্ষার।

মধ্যম ক্ষার।—মৃদুক্ষার অর্থাৎ কার্বনেট হইতেই মধ্যম ক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। নব্য রাসায়নিকগণ—চূর্ণের সহিত কার্বনেটকে উত্তপ্ত করেন। সুশ্রুতেরও ইহাই অভিমত।

পূর্বোক্ত নিয়মে প্রস্তুত ক্ষারজল হইতে ১১০ জল পৃথক করিয়া রাখিয়া বাকি জল কড়ায় করিয়া জ্বাল দিবে। পরে নাটা, ভস্ম শর্করা, ঝিলুক ও শঙ্খ নাভি এই ৪ দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যে চূর্ণ প্রস্তুত হইবে—সেই চূর্ণ ৮ সের লইয়া—পৃথক রক্ষিত পেড় সের ক্ষার জল সহ পেষণ করিয়া চুল্লীস্থ ক্ষার মধ্যে উহা নিক্ষেপ করিবে। হাতা দিয়া যখন নাড়িতে থাকিবে—যেন উহা তরল হইয়া না যায়। পাকশেষে নামাইয়া, লৌহ কলসে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। ইহারই নাম মধ্যম ক্ষার।

তীক্ষ্ণ ক্ষার।—তীক্ষ্ণক্ষার—একটা স্বভাব ক্ষার নহে। মৃদুক্ষারে, দস্তী, দ্রবস্তী, রক্ত চিত্রক, গণিয়ারী, নাটাকরজ, তোলমুলী, বিটলবণ, সুবর্জিকা, কনকক্ষারী, হিং, রক্ত, এবং কাষ্ঠ বিষ—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪

তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া পাক • করিলে  
তীক্ষ্ণকার প্রস্তুত হয়।

ক্ষার-করনায়—সুশ্রুতোক্ত প্রণালীই যে  
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন,  
সংক্ষেপে আমরা তাহা দেখাইলাম। সুশ্রুত  
অন্ত চিকিৎসার সময় প্রয়োজনীয় স্থলে এই  
সকল ক্ষারের প্রয়োগ করিতেন। সুশ্রুত  
বলিয়াছেন, পীড়িত স্থান ক্ষার দ্বারা দধ্ব করিলে  
জ্বালা করিতে থাকে। সেই জ্বালা নিবারণের  
জন্ত, সুশ্রুত দধ্ব স্থানে রক্ত ও মধুসহ অন্ন

বর্ণের প্রলেপ দিবার উপদেশ দিয়াছেন।  
ক্ষার দ্রব্যে অন্নরস ব্যতীত সকল প্রকার  
রসেরই অস্তিত্ব আছে। তবে ইহাতে  
কটুরস ও লবণ রসের আধিক্য দেখিতে  
পাওয়া যায়।

হায়! সুশ্রুতের যুগ ত অনেক দিন চলিয়া  
গিয়াছে, তাঁহার শল্যতন্ত্রও নামশেষ হইয়াছে,  
কিন্তু তিনি যে জগতের প্রথম বৈজ্ঞানিক—  
কেবল এই কথা বলিয়াই আমরা সভ্যজগতে  
এখনও গর্ব প্রকাশ করিতে পারি।

শ্রীস্বধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত।

## ক্ষয়রোগ।

( পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর। )

দ্রীলোকের ঋতু বন্ধ।—ক্ষয়রোগ জন্মিলে  
দ্রীলোকের ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। ঋতু সকলের  
ক্ষয় এবং শরীর রক্তহীন হয় বলিয়া এইরূপ  
ঘটে। যেমন প্রসবের সময় অতিরিক্ত রক্ত  
স্রাব হয় বলিয়া শরীরে পুনরায় যথেষ্ট রক্ত  
সঞ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত ঋতুস্রাব হয় না, ইহাও  
সেইরূপ রক্তের অভাবে ঘটিয়া থাকে।

জ্বর, অরুচি ভয়ানক উৎকাসি।—রোগিনী  
মুসলমান জাতীয়। কথিত উপসর্গ ব্যতীত আর  
কোন উপসর্গ ছিল না। প্রথমে কাস সংযুক্ত  
জ্বর মনে করিয়া চিকিৎসা করি। কিন্তু কাস,  
কিছুতেই কমে না। দিবারাত্রি রোগী কাসে,  
বিরাম নাই বলিলেই চলে। কাস যখন  
কিছুতেই কমিল না, জ্বর সর্বদাই থাকে এবং  
শরীরে অত্যন্ত ক্ষয় হইতেছে দেখিলাম, তখন  
ক্ষয়রোগ বলিয়াই স্থির করি। অল্পদিন পরেই  
রোগী মারা যায়।

যত প্রকার ছদ্মবেশে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়,  
তন্মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিলাম।  
বোধ হয় ইহার আরও প্রকারভেদ থাকিতে  
পারে। ফলকথা যক্ষ্মা রোগ এইরূপভাবে  
চোরের মত লুকাইয়া আক্রমণ করে বলিয়া  
অনেক সময় প্রথমে রোগ ধরা পড়ে না,  
সেইজন্ত প্রায়ই মারাত্মক হয়। সুতরাং এ  
সম্বন্ধে সাধারণের ও চিকিৎসকগণের যথেষ্ট  
সতর্ক হওয়া উচিত।

ক্ষয়রোগের অসাধ্য লক্ষণ. সম্বন্ধে শাস্ত্রে  
লিখিত হইয়াছে,—“পূর্ব কথিত একাদশ  
প্রকার উপসর্গ, অথবা কাস, অতিসার, পার্শ্ব  
বেদনা, স্বরভঙ্গ, অরুচি ও জ্বর এই  
ছয়টা উপসর্গ, অথবা জ্বর, কাস ও রক্ত  
নির্গমন এই তিনটা উপসর্গ ঋতুস্রব, রোগী  
বাঁচে না।” গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে—  
“কাসও মাংসের ক্ষয় ঘটিলে স্থির।”

লক্ষণ, অনেক লক্ষণ বা তিনটি ( পূর্ব কথিত )  
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগী রক্ষা পায় না ।”

অপব অস্বাধ্য লক্ষণ যথা—“যে ক্ষয়রোগী  
প্রচুব আগ্রহ করা সত্ত্বেও ক্ষীণ হইতে থাকে,  
হাস্যর অতিসাব হয় এবং মুক ও উদর ফুলিয়া  
উঠে সে রোগী বাচে না । যে রোগীর চক্ষু  
শুক্লবর্ণ, অরে ঘেব হইয়াছে, কণ্ঠে প্রস্রাব  
করে এবং উল্লুখাস হয়, সে রোগীর শীঘ্র  
মৃত্যু হয় ।

চিকিৎসাযোগ্য ক্ষয় রোগীর সম্বন্ধে লিখিত  
হইয়াছে,—

“যে রোগীর জরাভবক নাই ; যে রোগী  
বদনান, যে রোগী চিকিৎসা ক্রিয়া ( বমন,  
বিরচন, ওষধ ) সম্বন্ধে করিতে সক্ষম, যে রোগী  
অভ্যাচারি নহে ), দীপ্তাগ্নি সম্পন্ন এবং অক্লশ  
—এইরূপ বোগীর চিকিৎসা করিবে ।

জননঃ ক্ষয় রোগীর আরোগ্য লাভের  
পক্ষে দুইটা বিষয় প্রধান, বল, মাংস প্রথমতঃ  
ক্ষয় না ওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ অগ্নি প্রবল থাকা ।  
অবশ্য ক্ষয়রোগ জন্মিলে বল, মাংসের কিছু  
ক্ষয় হইবেই, কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষয় হইলে আর  
আরোগ্য লাভের আশা থাকে না । তারপর  
অগ্নিবল । শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“পুরুষের জীবনের মূল বল এবং বলের  
মূল অগ্নি । সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই এই,—ক্ষয়  
রোগীর কথাই নাই । ক্ষয়রোগীর অগ্নি  
দি যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পরিপাক করিয়া  
ক্ষয়ের পূরণ করিতে না পারে, তবে সে রোগীর  
জীবনের আশা কম ।

ক্ষয়রোগ ভাল হয় কি না ?—এ সম্বন্ধে  
হামাদের ভাবিবার কিছু নাই । পৌরাণিক  
সাহিনীতে বহু প্রাচীন কালে চন্দ্রশেখরের যক্ষ্মা  
বোগ হইতে মুক্ত হইবার পরিচয় পাওয়া যায় ।

চিকিৎসা শাস্ত্রেও ক্ষয়রোগের সাধ্যসাধ্য অবস্থা  
লিখিত হইয়াছে । কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা  
এই বিষয় লইয়া বহুকাল হইতে মাথা ঘামাইয়া  
আসিতেছেন । এতদিন যক্ষ্মারোগ ভাল  
হয় না বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল । সুতরাং  
বিষয় এক্ষণে তাঁহারা ইহা সুস্থসাধ্য বলিয়া স্থির  
করিয়াছেন । অবশ্য প্রথম হইতে চিকিৎসা  
করা আবশ্যক এ কথাও তাঁহারা বলেন ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত সকল, মুক্তবায়ু  
—সেবনই ক্ষয়রোগের প্রধান চিকিৎসা বলিয়া  
স্থির করিয়াছেন । কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্র—নার-  
বান পদার্থ—যথা দ্ধন, মাংস, স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম  
প্রভৃতির পক্ষপাতী । একথার কেহ বেন মনে না  
করেন যে আয়ুর্বেদ ক্ষয়রোগে মুক্তবায়ু-  
সেবনের উপকারিতা বুঝেন না ; আয়ুর্বেদ  
মুক্তবায়ু সেবনের উপকারিতা বিলক্ষণই  
বুঝিতেন । তাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে  
যে, “বায়ুই আয়ু ।” তদ্ব্যতীত শাস্ত্রে আরও  
কথিত হইয়াছে যে, ঋতুবিষম অর্থাৎ যে  
ঋতুতে যেরূপ হওয়া উচিত তাহার বিপরীত—  
যেমন বসন্তকালে উত্তরবায়ু, অতি স্তিমিত  
( শুষ্ক ), অতি চল ( দ্রুতগামী ), অতি পুরুষ  
( থরথরে ), অতি শীতল, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত  
রুদ্ধ, অত্যন্ত অভিযান্দী ( জল সংযুক্ত ) অতি  
ভয়ঙ্কর শব্দযুক্ত, ও পরস্পর অতি প্রতিহত,  
অতি ( ঘূর্ণমান ) এবং অহিতকর গন্ধ,  
বাস্প ( গ্যাস ), সিকতা, ধূলি ও ধূম সংযুক্ত  
বায়ু দূষিত । আবার ধূমও শোধ ও কাঁস  
রোগের কারণ স্বরূপ । সুতরাং ক্ষয়রোগীর  
পক্ষে যে দূষিত বায়ু সেবন পরিত্যাগ করা  
উচিত—সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? আরও  
সহরের ধূলিধূসংযুক্ত বায়ু অপেক্ষা পাহাড়  
নির্মল বায়ু যে হিতকর তাহা নিঃসন্দেহ ।

প্রকৃত কথা, বিগত বায়ু যে ক্ষয়রোগীর পক্ষে হিতকর এবং ধূমধূলি সংযুক্ত বায়ু যে অনিষ্টকর ইহা অবিসংবাদিত। কিন্তু তদ্ব্যতীত ক্ষীণমাস যক্ষ্মারোগীর দেহের ক্ষয় নিবারণ জন্ত পুষ্টি-জনক ঔষধও নিতান্ত আবশ্যক। ফলতঃ ক্ষয়রোগীর শরীরের পুষ্টি সাধনই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। সেইজন্তই আয়ুর্বেদে ক্ষয়রোগীকে ক্ষয়নিবারক এবং ধাতুপোষক ঔষধ দিবার ব্যবস্থা আছে।

স্বর্ণভস্ম, রোপা, তাম্র, হীরকভস্ম, মুক্তাভস্ম লৌহভস্ম প্রভৃতি সর্বপ্রকার পুষ্টিকর ধাতু, উপধাতু যক্ষ্মারোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগীর যে ক্ষয়কর ঘর্ম হয়, তাহা নিবারণের জন্ত ক্ষয়নিবারক অনেক ঔষধের সহিত প্রবাল ভস্ম সংযুক্ত করা হইয়াছে। প্রবালের ত্রায় উৎকৃষ্ট ঘর্ম-রোধক ঔষধ আর নাই। যাহাদের স্বভাবতঃ অত্যন্ত ঘর্ম হয়, তাহাদিগের পক্ষে প্রবালের মালা ধারণ করিলে ঘর্মসাধিক্য নিবারিত হইয়া থাকে।

কন্তুরী বা মৃগনাভিও ক্ষয়রোগের একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা যে কেবল পুষ্টিকর এবং ক্ষয়নাশক তাহা নহে। ইহা শারীরিক ক্রিয়ার উত্তেজক বলিয়া যক্ষ্মারোগে মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। অপিচ কন্তুরী কফ, বায়ু, শীত এবং বিষনাশক।

ক্ষয়নিবারণের জন্ত শাস্ত্রকারগণ চ্যবনপ্রাশ, ছাগলান্ত ঘৃত প্রভৃতি বিশিষ্ট পুষ্টিকর ঔষধ প্রয়োগের বিধি দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যুতাদি ক্ষয়রোগীর সকল অবস্থায় প্রযুক্ত্য নহে। অর, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি থাকিলে যুত সঙ্ক হয় না। তবে অজীর্ণ সম্বন্ধে ভোজনের প্রথম গ্রাসের সহিত অল্প মাত্রায় ছাগলান্ত ঘৃত প্রয়োগ করিয়া সন্ধ্যা হইতে দ্বিবিহারি। যাহা

হউক অর প্রভৃতি উপসর্গ না থাকিলে যুত প্রয়োগে বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

পথ্য সম্বন্ধে কবিরাজদিগের একই দুর্গম আছে। অর, অতিসার প্রভৃতি রোগের প্রথম বস্থায় তাঁহারা রোগীকে লজ্বন দিয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষয়রোগের পথ্য সম্বন্ধে ঠিক তাহা বিপরীত। ক্ষয়রোগে সর্বপ্রকার পুষ্টিকর পথ্য দিবার বিধি আছে। যব, গম, মৃগ, ছোলা, উত্তম চাউল, মাখন, যুত প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্য এই রোগে সুপথ্য। মাংসেরত কথাই নাই, মাংসের ঘূষ, মাংসের বড়া, মাংস রোদ্রে শুক ও চূর্ণ করিয়া তাহা হালুয়ার ত্রায় করিয়া, মাংসের লাড়ু—এইরূপ বিবিধ উপায়ে ক্ষয়রোগীকে মাংস দিবার ব্যবস্থা আছে। জাম্বল দেশজ মৃগ, পক্ষীর মাংস, যক্ষ্মারোগে হিতকর। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় সর্বাপেক্ষা ছাগের বড়ই আদর। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“ছাগমাংস, ভক্ষণ, ছাগছন্ধ চিনি সংযুক্ত পান, ছাগী যুত, ছাগসেবা এবং ছাগমধ্যে শয়ন—ক্ষয়রোগ নাশক।

সুশ্রুতে—লিখিত আছে যে, ছাগবিষ্ঠা, ছাগমূত্র, ছাগছন্ধ, ছাগযুত, ছাগরক্ত ও ছাগমাংস সেবন যক্ষ্মারোগ নাশক।

ছাগের যে যক্ষ্মারোগ প্রতিষেধক শক্তি আছে, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও প্রমাণ করিয়াছেন। ছাগের শরীরে যক্ষ্মারোগের বীজ প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেও উহাদের যক্ষ্মারোগ হয় না।

যক্ষ্মারোগের পথ্যাপথ্য শাস্ত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে,—আমরা নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আর, অজীর্ণ, উদরাময়, পাক, আম,

খেজুর, ফলশা ফল, আমলকী, কিসমিস, সূঁচিনাথ ফুল ও উঁটা, পলতা, কচি তালশাঁস, কর্পূর, মিছনী প্রভৃতি ক্ষয়রোগে হিতকর।

মনমুগ্ধাদির বেগধারণ, পরিশ্রম, স্ত্রীসহবাস, শ্রম, বাঁজিগরণ, বলপ্রয়োগসাধ্য কার্য্য করা কক অন্নপান, তাষুল, তরমুজ, কুলথ কলায়, মাছকলায়, রতন, বাশের কোঁড়, হিং, অন্নদ্রব্য, ত্রিকু দ্রব্য কদায় দ্রব্য, কটু দ্রব্য, সর্বপ্রকার গুদশাক, ফারদ্রব্য, শিম, প্রভৃতি ক্ষয়রোগে ক্ষপথা।

ক্ষয়রোগীর মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে, হৃদয় বাদ্যস্তা করিবার উপদেশ শাস্ত্রে বিশেষ-ভাবে দেওয়া হইয়াছে। সুবেশবিশ্বাস, মল্যপাষণ, ধর্মজনক বাক্যশ্রবণ, সঙ্গীতশ্রবণ, চিত্তাশ্রম, চক্ষুকিরণ দর্শন, মুক্তামণি নিম্নিত প্রভৃৎ ভূষণপাষণ, যজ্ঞ, দান, দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা—ক্ষয়রোগীর পক্ষে হিতকর। এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা রোগীর মন বেশ প্রফুল্ল ও নব্বু থাকে। অপিত, সর্বদা রোগের বিষয় ভাবিয়া বোপী রোগকে বর্জিত করিয়া তুলিতে পারে না। মনের সুখ আরোগ্যের সর্বপ্রধান স্রায়।

ক্ষয়রোগীর মল ও শুক্র যত্নপূর্বক রক্ষা করা উচিত, কারণ ক্ষীণমান যক্ষ্মারোগীর সর্বদা যুসাব শুক্র—ক্ষয় হইলে তাহাকে আর কতদিন বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে! সেই-জন্ত যক্ষ্মারোগীর শুক্র-ক্ষয় যাহাতে না হয়, তাহাৎ জনা সর্বতোভাবে যত্ন করা কর্তব্য।

ক্ষয় রোগীর মল রক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্র বর্ণিয়াছেন, —রাজযক্ষ্মারোগীর মল বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত। কারণ সর্বদা শুক্র পীড়িত রোগীর মলই বলবরূপ হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা বঙ্গদেশে ক্ষয়রোগের

প্রাবল্যের কারণ আলোচনা করিব। পূর্বে যক্ষ্মারোগের সাহসাদি যে কয়টা কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেকটি অবলম্বন করিয়া বলা যাইতেছে।

সাহস।—সাহস বল প্রয়োগসাধ্য। বাঙ্গালীর বলই নাই, সূতরাং বল প্রয়োগ করিবে কিরূপে? যদিও এইজন্য দুই চারি জনের ক্ষয়রোগ হয়। কিন্তু তাহা রোগের প্রাবল্যের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বিষমাশন—কোন দিন অন্ন, কোন দিন অধিক কোন দিন সকালে, কোন দিন বিকালে, এইরূপ অনিয়মে আহার করাকে বিষমাশন বলে। আমাদের দেশে ইহার অভাব নাই সেইজন্যই ইহাকে ক্ষয় রোগের প্রাবল্যের কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে, রন্ধনশালা বিশ্বস্ত-জন পরিবেষ্টিত, প্রশস্ত এবং পবিত্র স্থানে হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে আমাদের রন্ধনশালার “বামুন ঠাকুর” বা রহস্যে বামুন বা চপ-কাটলেট প্রস্তুতকারী ইতর জাতীয় লোক, ময়রার দোকানের ময়রা বা অন্যজাতি একেবারেই বিশ্বস্ত নহে। ইহারা অর্থোপার্জনের দিকে লক্ষ্য রাখে, ভোক্তার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে একেবারেই লক্ষ্য রাখে না। ধর্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, মাতাকে বা মাতৃতুল্য ব্যক্তিকে আহারীয় প্রস্তুতের ভার প্রদান করিবে। হার বঙ্গজননীগণ; তোমরা আজ ইহার ব্যতিক্রম করিতেছ বলিয়াই বঙ্গের আজ এই দুর্দশা।

থাই রক্ষা সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন যে, বিবিধ গুণযুক্ত সুসংযুক্ত অন্ন গোপনভাবে পবিত্রস্থানে রাখিয়া দিবে। কিন্তু আমাদের ময়রার

দোকানের খাবার, হোটেলের চপ-কাটলেট পথের ধূলি রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ্য এবং অপবিত্র স্থানে আনন্দে বিরাজ করে। রসুয়ে বামুনের রন্ধন করা অন্ন আহার করা বাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটে, তাঁহাদের অবস্থাও এইরূপ।

তারপর, শাস্ত্রে স্নাত, দুগ্ধ, জাঙ্গলমাংস, প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য নিত্য আহার করিবার উপদেশ আছে। আমাদের অনেকেরই ভাগ্যে ঐ সকল জোটে না। বাঙ্গালীর ঘরে শাক আর ভাত! তাহাও আবার অনেকের ভাগ্যে টাটকা মেলে না, অনেককে বাদী ও শুষ্ক তরকারীই প্রায় আহার করিতে হয়। বাঙ্গালী ক্ষয়রোগগ্রস্ত না হইবে না তো হইবে কাহারো?

আহারের সময় সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশের অনুসরণ আমরা করিতে পারি না। ইহার

প্রধান কারণ—চাকরী বা অন্য কাজ কন্ঠে অল্পরোধে অনেককেই ৮১২।০ টার মধ্যে থাইতে হয়। আর থাইয়াই কন্ঠস্থলে উদ্বেগে বেগে ধাবিত হইতে হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার বিধি শাস্ত্র যে মাথার দিবা দিয়া বলিয়া গিয়াছেন! আমরা সে সকল কথা মানিন বলিয়াই তো আমাদের এই দুঃখ! আমরা নিজের দোষে রোগ ভোগ করিতেছি—আমাদের ব্যাধি আমাদেরই অনিয়মের ফল সম্ভূত। কবি এইজন্তই না বলিয়া গিয়াছেন,—

“কারো দোষ নয় গো মা!

আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্রুমা!”

(আগামী বারের সমাপ্য)

শ্রী—

## সূচিকাভরণ ও INJECTION

—:—:—

আয়ুর্বেদ অনন্ত ঔষধের ভাণ্ডার—এ কথা সত্য। কিন্তু তথাপি অনেক স্থলেই আধুনিক আয়ুর্বেদজ্ঞকে অপদস্ত হইতে হয়। নিম্নে এরূপ একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

আমি এক বৎসর হইল কার্ঘ্যোপলক্ষে মুক্তা-পাছার নিকটবর্তী এক পরীতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটি অর রোগীর আয়ুর্বেদীয় মতে চিকিৎসা হইতেছিল। সন্ধ্যার সময় রোগীর নাতীর গতি বিশৃঙ্খলা, বাকরোধ ও হিমাক্ত উপস্থিত হইল। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দিলেন, কিন্তু রোগীর গলাধঃকরণের শক্তি নাই। বেগতিক বুঝিয়া তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন।

তৎক্ষণাৎ একজন sub assistant sur-

geonকে ডাকা হইল। সেই সময় আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার বা রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “অবস্থা খারাপ আরও পূর্বে যেমন তেমন একজন এলো প্যাথিক ডাক্তার আনাইলে ভাল হইত এরূপ অবস্থায় কবিরাজের উপর নির্ভর করি থাকা সম্ভব হয় নাই।” কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় স্রিয়মান হইয়া পড়িলাম। ডাক্তারবা রোগীকে Injection করিলেন। রাত্রি ১ টার সময় রোগী কথা কহিল। তখন তিনি ‘মকরধ্বজের’ ব্যবস্থা করিলেন। উহা অত্যন্ত সফল হইয়াছিল। এক মাত্র প্রয়োগ করিয়া বেশ ফল পাওয়া গেল। দুই ঘণ্টা পরে আ এক মাত্রা দিতে বসিলেন। আমি, স্বাক্ষর



ক ডাক্তার বাবু। ডাক্তারীতে বুঝি কুলাই-  
তেছে না—রাতিমত যে কবিরাজী আরম্ভ  
করিয়া নিলেন? এখন দেখছি ডাক্তারের  
উপন নিভর করিয়া থাকাই অসম্ভবত হইয়া  
পড়ায়! ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন,  
“আমি মকরন্দজের খুব পক্ষপাতী এবং চিরদিন  
ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি।” এই স্বত্রে  
গ্রাম্য সহিত আমার বেশ আলাপ-পরিচয়  
হইল। তিনি কথায় কথায় বলিলেন,  
“আপুর্বেদে কি Injection নাই?” আমি  
বলিলাম, “ডাক্তারী মতে Injection  
বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু  
আপুর্বেদে মতে ওরূপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগের  
কেন প্রয়োজনীয়তা নাই। একরূপ অবস্থায়  
সূচিকাভরণ শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা সেবন করাইতে  
না পারিলে রোগীর মস্তকে কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষত  
করাইয়া প্লাস্টার দিলে বিড়্যাধোগে সমস্ত শরীরে  
ইহা বিক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে  
আপুর্বেদের মত Spirit Lamp, Syringe  
প্রভৃতি কোন আপদ বালাইয়ের দরকার হয়  
না।” ডাক্তার বাবু বলিলেন, “তিনি সূচিকা-  
ভরণ প্রয়োগ কবিলেন না কেন?” আমি  
বলিলাম, “উহাতে সর্পবিষ আছে, কাজেই উহা  
সকলে প্রয়োগ করিতে পারেন না।” তিনি  
সম্মত হইয়া বসে প্রশংসা করিয়া দুঃখের সহিত  
বলিলেন, “আপুর্বেদীয় ঔষধের শ্রেষ্ঠ উপাদান-  
গুলির ব্যবহার সম্বন্ধে যদি এখন এইরূপই  
হইল থাকে, তবে আপুর্বেদের উন্নতি  
কল্পে সম্ভবে? কবিরাজ মণ্ডলী যদি  
এখনও এবিষয়ে গুদাসীন্ত প্রকাশ করেন,  
তবে নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়াই বা

লাভ কি?” বলাবাহুল্য যে, আমি ডাক্তার  
বাবুর এ কথার কোন প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম  
হই নাই। কিন্তু ডাক্তার মহাশয়ের কথা  
অনুসারে আমি বলিতে বাধ্য যে, ইহা কবিরাজ  
মহাশয়ের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা।

আপুর্বেদোক্ত বিষ-চিকিৎসাগুলি ক্রমেই  
কালের করালগর্ভে বিনীত হইয়া যাইতেছে।  
প্রত্যক্ষ ঔষধগুলি লুপ্ত হওয়ার দুইটা কারণই  
প্রধান। (ক) উপকরণের অভাব, (খ) প্রাচীন  
চিকিৎসকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধের  
লোপ। এক সময়ে এতদঞ্চলে কয়েকজন  
প্রাচীন কবিরাজ বিষ-চিকিৎসায় বিশেষ  
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের  
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঔষধগুলি প্রায় লুপ্ত  
হইয়া গিয়াছে। ডাক্তারী Injectionএর  
সঙ্গে ঐ সকল ঔষধের বেশ তুলনা হইতে  
পারে। রোগীর যখন জীবনের আশা থাকিত  
না, তখন শরীরের কোন স্থানে ক্ষত করিয়া  
তাঁহারা ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতেন।  
প্রাচীন লোকমুখে শুনা যায়, এই উপায়ে অনেক  
মুমূর্ষু রোগী বাঁচিয়া গিয়াছে। আমরা বহু  
অনুসন্ধানে এইরূপ একটি চিকিৎসকের  
আত্মীয়ের নিকট হইতে ৪০ বৎসরের পূর্বেরকার  
তৈয়ারী তিনটি বাটী প্রাপ্ত হইয়াছি। দুঃখের  
বিষয় কিন্তু উহার প্রস্তুত প্রণালীর লিখিত  
কোন ফর্দ পাই নাই। অতএব এক স্থান  
হইতে সংগৃহীত একখানি হস্তলিখিত ছিন্ন  
পুস্তকে মাত্র কয়েকটি ঔষধের ফর্দ পাইয়াছি,  
তাহার একটি নিম্নে প্রকাশ করিলাম।  
\* কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক মহোদয় ইহা  
প্রয়োগ করিয়া ফলাফল ‘আপুর্বেদে’ প্রকাশ

\* পোষ্য প্রতিম কবিরাজ শ্রীমান যোগেন্দ্রকিশোর লোহ এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

করিলে বাধিত হইব। আমরা উহা কাহাকেও প্রয়োগ করিতে সাহসী হই নাই। কেননা অজ্ঞাত ঔষধে রোগমুক্তি অপেক্ষা জীবন মুক্তির আশঙ্কাই বেশী বলিয়া বোধ হয়।

### বিশ্বনাথ রস।

বংশপত্র হরিতাল	১
মনঃশিলা	১
শিমুলক্ষার	১
অমৃত	১
তুঁতে ভগ্ন	১
শ্বেত করবীর মূলেরছাল	১
কঙ্কলী	১০

চিতামূলের রসে ৭ ভাবনা ও নিসিন্দা পত্র রসে একদিন মর্দন করিয়া ১ রতি বটা করিতে হইবে। হরিতালকে ফুয়াগুরস, তিন তৈল ও ত্রিফলার কাথে পৃথক পৃথক দোলায়ত্রে শোধন। তুঁতে পায়রার বিষ্ঠাসহ একটি মুছিতে ভরিয়া গজপুট। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য দুগ্ধ, চুত, মিঠাই, অন্ন, অবস্থাদৃষ্টে দেয়। লবণ জল বর্জিত। সন্নিপাতে, বাক্বোধে নাড়ী ডুবিলে।

বারাস্তরে অন্ত্যান্ত ঔষধ গুলিও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্যামাচরণ মৈত্র কবিরত্ন।

## উচ্ছে।

( "পল্লীবাণী" হইতে উদ্ধৃত )।

উচ্ছে দুই প্রকার। ১। বড় উচ্ছে ও ২। ছোট উচ্ছে। বাজারে বড় উচ্ছেকে করেলা এবং ছোট উচ্ছেকে শুধু উচ্ছে বলে।

কারবেল বড় উচ্ছের সংস্কৃত নাম। ইহার অপভ্রংশ কঙ্কলা। কারবেলী ছোট উচ্ছের সংস্কৃত নাম। বড় উচ্ছের ইংরাজী নাম *Momordica Charantia*; হিন্দি নাম করেলা; এবং ছোট উচ্ছেকে ইংরেজীতে *M. Muricata* এবং হিন্দিতে করেলী বলে।

সুশ্রুত মতে উচ্ছেলতার কাথ দ্বারা পক দ্রুত বাতরক্তে বিশেষ হিতকর ঔষধরূপে গণ্য। (চিঃ—৫ অঃ।) ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে—উচ্ছে রক্ত শোধক; ডাক্তারেরা বলেন, "ব্যালিলাস লেপ্ত্রি" বলিয়া এক প্রকার কীটাণু

বাতরক্ত জন্মাইয়া থাকে, তবে উচ্ছে এই কীটাণু ধ্বংস করিতে পারে বলিয়াই উচ্ছেকে বাতরক্ত রোগের ঔষধ একথা বলা যাইতে পারে। কীটাণু শরীরে থাকিলে রোগের উপশম হয় না, বাতরক্ত রোগ হইতে মুক্তি পাইলেই যে শরীরের ঐ কীটাণু নষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক হইতে পারে না। মৃত্যুরিকা রোগের চিকিৎসা-ব্যবস্থার ভাব প্রকাশে কুট রোগে যে সকল লেপনাদ ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে এবং পিত্তশ্লেষ্ম বিসর্পে যে সকল ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ঐ, রোগ হিতকর ও প্রশস্ত বলা হইয়াছে।

ভাব প্রকাশ বলেন, করেলা পত্রের রসে হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে রোমাটী

জ্বর, বিদগ্ধ ও ত্রণের প্রশমন হয় (মঃ খঃ  
ঃঃ ভাঃ)।

চক্রদন্ত বলেন,—জ্বর রোগীর সেবনার্থ  
উচ্ছে শাক ব্যবস্থা করিবে (জ্বর - চিঃ)।

Its action & uses—

Stimulant and alternative; the fruit  
pulp & juice of the leaves & also seeds  
are anthelmintic & given in lumbrici.  
The fruit is also tonic and alternative  
& given in rheumatism, gout and  
diseases of the liver & spleen. The  
whole plant powdered is used for dust-  
ing over leprous & other invulnerable  
sores. (Materia Medica of India—  
R. N. Khory, part II, p, 314)

উচ্ছে শীতবীৰ্য্য, ভেদক, লঘু ও তিক্ত রস।  
ইহা দ্রব, পিত্ত, কফ, কণ্ডু ও কুমিনাশক এবং  
বক্তশোধক। ফল, বীজ এবং পত্ররস কুমিষ,  
এসান, বিবিধ বাত ও প্লীহা যকৃৎ পীড়ার  
উৎপাদক। দুই প্রকার উচ্ছের একই গুণ।  
জৈট উচ্ছে লঘু ও অগ্নি দাপক। মাত্রা  
১ তোলা হইতে ২ তোলা, নিত্য ব্যবহারে  
মাত্রা দুই একটুকু কম বেশী হইলে কোনও  
অপকার হয় না।

উচ্ছে সৰ্ব্বপ্রকার বসন্ত রোগের উত্তম  
প্রতিষেধক; ইহা কয়েক বৎসর পূর্বে কোন  
কেন্দ্রী ব্যক্তির নিকট হইতে অবগত হইয়া-  
ছিলাম। এ কথা প্রমাণার্থ আমি নিজে  
ক্রমাগত যাত দিবস কাল উচ্ছে খাইলাম,—  
যেদিন পথ বসন্তের টিকা লইলাম। বসন্তের  
টিকা লইবার পরও উচ্ছে খাইতে লাগিলাম;  
তিন বাবট ফলা ফল ফলিয়াছিল। ১৩২০  
সনে অল্প সাত ব্যক্তিকে দিয়া আমি এই  
কথা কবিত্তিলাম, ১৩২১ সনে ৫১ জনকে

দিয়া এই পরীক্ষা করিয়াছি,—ইহাদের কোনও  
ব্যক্তির টিকা উঠে নাই। ইহাতেই প্রমাণিত  
হইতেছে উচ্ছে বসন্ত ব্যাধির প্রতিষেধক।  
একই ‘লিম্প’ হইতে দুই জনকে টিকা দিয়া  
দেখা হইয়াছে,—যে উচ্ছে খাইয়াছে তাহার  
টিকা উঠে নাই, আবার যে উচ্ছে খায় নাই—  
তাহার টিকা হইয়াছে; ইহাতে “লিম্প” যে  
কার্যক্ষম ইহা প্রমাণিত হয়। এ বৎসরও বহু  
প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সমফল।

যাঁহারা প্রবল বসন্ত রোগীর চিকিৎসা বা  
শুশ্রূষা করেন, তাঁহাদের প্রত্যহ এই উচ্ছে  
আহারীর সঙ্গে ব্যবহার করা কর্তব্য। প্রবল  
বসন্ত ও হাম রোগীকেও উচ্ছে ভাতে সিদ্ধ  
করিয়া পথ্য স্বরূপে প্রত্যহ খাওয়ান একান্ত  
প্রয়োজন; ইহাতে এ পর্যন্ত কোন রোগীর  
মৃত্যুসংবাদ আমরা পাই নাই; রোগও ধীরে  
ধীরে বেশ সারিয়া যায়। কোনও দুষ্ট উপসর্গ  
দেখা দেয় না। যাঁহারা বসন্ত রোগীর শুশ্রূষা  
করেন, তাঁহারা প্রত্যহ উচ্ছে ব্যবহার করিলেও  
প্রবল বসন্ত-বিষের একান্ত সংশ্রব থাকা হেতু  
কোন কোন সময়ে ২৪টি বসন্ত গাড়ে উঠিতে  
পারে, কিন্তু ইহাতে প্রবল জ্বর হয় না। শরীরে  
সামান্য বেদনা মাত্র হয়, মারাত্মক হইতে দেখি  
নাই। \* \* \*

উচ্ছে ভাত ও ডালের সহিত সিদ্ধ করিয়া,  
তরকারীরূপে অথবা তৈল বা ঘূতে ভাজিয়া  
আহারের প্রথমেই অল্পের সহিত খাইবার  
ব্যবস্থা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া  
আসিতেছে। সেইরূপই ব্যবহার করিতে  
হয়। শুধু খাইলেও হয়—অল্প কোন নুতন  
প্রণালীতে খাইবার নিয়ম নাই। উচ্ছে সপ্তাহে  
২১ দিন না খাইয়া বসন্ত রোগের সময় প্রত্যহ  
ব্যবহার করা প্রয়োজন; নতুবা উপরোক্ত

ফল নাও ফলিতে পারে—একথা স্বরণ থাকা বাবহারে কাহারও কোনও ক্ষতি হইবে  
প্রয়োজন। উচ্ছেদ খাওয়া ও ঔষধ উভয়ই; ইহা সম্ভাবনা নাই। \* \* \*

শ্রীপেঙ্গনাথ রায়, কবিভূষণ

## শিশুর ক্রিমি-চিকিৎসা।

(মহিলাদিগের জন্য ছড়ায় লিখিত)

ক্রিমি শিশুদের শত্রুবড়,  
উপেক্ষা করু নাহি ক'র।  
রসতড়কা যা' শিশুর হয়,  
ক্রিমি প্রায়ই তা'র মূলে রয়।  
ক্রিমি নাশক ঔষধ দিলে,  
রসতড়কায় সুফল মিলে।  
ক্রিমি নাশক ঔষধ সহ,  
বিরেচন তড়কার ব্যবস্থা দেহ।  
ক্রিমি থেকে হয় ওলাউঠা,  
জ্বর, অতিসার—এটা—ওটা।

বিছানা আঁচড়ায় মাগে টানে,  
নাক চুলকায় দেখবে যেখানে,  
সেখানে ক্রিমি বুঝে নিও,  
বিরেচনা ক'রে ঔষধ দিও।

দাত কিড়মিড়্ চিহ্ন ক্রিমির,  
পেটের বাথায় করায় অস্থির।  
মুখে জল উঠে—থুতু ফেলে,  
ক্রিমিতে জোর দাও সে স্থলে।  
শয্যামুত্রও এই কারণে,  
প্রায়ই হয়—ক'ন বিজ্ঞগণে।

বিড়স্বেব অন্ন গুঁড় নিয়ে,  
ক্রিমি হ'লে দাও খাওয়াইয়ে।  
বিড়স্বে বড় উপকারী,  
ব্যবস্থা ক'র সদা এরি।  
চূণের উপকার থিতান জল  
দ্বিগুণ জল নাও—শীতল,  
আর একটু সৈন্ধব নিয়া,  
ক্রিমি হ'লে দাও খাওয়াইয়া।

কচি পাতা আনারসের,  
মধুসহ খাওয়ালে উপকার চের।

কালমেঘের পাতা বড় উপকারী,  
ক্রিমিতে ব্যবস্থা দিও এরি।  
মাঝে মাঝে কালমেঘ দিলে,  
শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি মিলে।

পালতে মাদার বা চাঁপা ফুলের  
পাতার রসে উপকার চের।  
ক্রিমি রোগে মধুর সহ  
যে কোনটি দিতে বহ।

ভাট বা কদম পাতার রস  
মধু সহ খেলে ক্রিমি বশ।

চাপাকুল, শুঁঠ এক এক আনি,  
দাঁড়িম শিকড়, বিড়ঙ্গ তিনগুণ জানি,

মধু আধু আনা সোমরাজ, সোনাযুখী,  
এক পোয়া জলের এক থিমুক রাখি,  
মন পরম—চারি বারে,  
গাইবে দিলে ক্রিমি সারে।

ছাটন শিকড়, বিড়ঙ্গ এক এক আনি,  
চাপাকুল, শুঁঠ অন্ধক জানি,

নিম শিকড়ের ছাল রতি দুই,  
সোমরাজীরও মাণ নাওগে ওই।  
পালতেমাদার আর সোনাযুখী,  
ওজন কর তিনটি কুঁচ রাখি।  
আধ আনা নাও বীজ পলাশের,  
ছ' আনা কিস্মিস্ নাওগে ফের'।  
সিদ্ধ কর এক পোয়া জলে  
নামিয়ে নাও এক কাচ্চা র'লে।  
ছ'রতি বিট মুন প্রক্ষেপ দিয়ে,  
ছ' তিন বারে দাও খাওয়াইয়ে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত, কবিরঞ্জন।

## গভিণীর সাধভক্ষণ।

—:—

এতদেশে “গভিণীর সাধভক্ষণ” প্রথাটি যে  
কতকাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা  
জ্ঞাত না থাকিলেও প্রথাটি যে, বহুকালের  
এবং স্বাভাবিকগণ কর্তৃক আবিস্কৃত ও উন্নত  
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত তাহাতে  
অণুসন্ধানও সন্দেহ নাই। কেন না, চরক,  
সুশ্রুত এবং ভাবপ্রকাশ, প্রভৃতি প্রাচীন আয়ু-  
র্বেদীয় গ্রন্থাদিতে এতদ্বিষয়ক বহু গবেষণা  
পূর্ণ গুণ্ডি এবং ব্যবস্থাদির উল্লেখ দেখিতে  
পাওয়া যায়। অপিচ জ্যোতিষাদি দর্শনশাস্ত্রেও  
সাধভক্ষণ ব্যাপারের জন্ত শুভদিন ও শুভ-  
ক্ষণের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা গিয়া থাকে।  
এই সাধভক্ষণ ব্যাপারটি গভিণীর স্বাস্থ্য  
এবং ক্রমের ভাবি জীবনের উন্নতির দিকে  
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি রাখিয়া প্রবর্তিত। কিন্তু  
এতদেশে এখন এই যে, অধুনা সে পরিণাম

হিতকর উচ্চ বৈজ্ঞানিক-লক্ষ্য-যুক্তির দিকে  
আদৌ দৃষ্টি না করিয়া একটা যথেষ্টভাবে  
প্রথা গঠন করিয়া লওয়ায় মহর্ষিদের বাক্যটির  
অস্তিত্বমাত্র রক্ষিত হইতেছে। কারণ এক্ষণে  
আয়ুর্বেদীয় ভিষক বা জ্যোতিষ গণ্ডিত  
গ্রহাচার্য্য প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বিগের সমাদর  
আর পূর্বের ভায় গৃহস্থগণের গৃহে নাই।  
সুতরাং গৃহে সমাদরের ত্রুটি প্রযুক্ত তাদৃশভাবে  
কবিরাজ এবং গ্রহাচার্য্যগণ আর শিক্ষিত  
হইতেছেন না। ফলতঃ সাধভক্ষণের উদ্দেশ্য  
কি? উহাতে প্রসূতি এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের কি  
কি উপকার হয়, সাধভক্ষণ না করিলেই বা  
প্রসূতির ও ভ্রূণের কি কি অপকার হয়,  
এসকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমালোচনা দেশ-  
মধ্যে আদৌ অনুশীলন না থাকায় ইহা একটা  
কথার কথামধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।

আজকাল সাধভক্ষণে ভাল কাপড়, উত্তম অলঙ্কার আর পরমান ও মিষ্টদ্রব্য অথবা মৎস্তাদির অমুষ্ঠান করিয়া প্রতিবেশীবর্গকে নিমন্ত্রণ এবং বাগ্গভাণ্ড প্রভৃতি ধুমধাম করিলেই যথেষ্ট হইয়া গেল মনে করা হয়।

কিন্তু সাধভক্ষণ ব্যাপার যে শুভক্ষণেই শেষ নহে, উহা আরম্ভমাত্র এবং উহা একদিনের ব্যাপার নহে, উহার সহিত ভাবি সন্তানের সুখ দুঃখ বিজড়িত আছে, তাহা যদি বুঝাইয়া দিবার লোক এখনকার দিনে বর্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে শতকরা হয়ত দুইচারজনও উহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কার্য্য করতঃ দেশমধ্যে আদর্শ সাজিতে পারিতেন।

অল্প আমরা প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে এতদ্বিষয়ক বৈজ্ঞানিক হেতুবাদ সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ভরসা করি ইহা দ্বারা পাঠকগণ নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন।

সাধভক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।—

শাস্ত্র বলেন—চতুর্থমাস গর্ভের বয়স হইলে তখন ভ্রূণের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, হৃদয় জন্মে ও চৈতন্য প্রকাশ হয়; এ নিমিত্ত চতুর্থমাসে গর্ভস্থ সন্তান নানাবিধ ভোগ করিতে অভিলাষ করে। আমাদের হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে এরূপ ভোগবিলাসও শিশু এবং জননীর ভাবিমঙ্গলজনক। অর্থাৎ যাহার ভাবি মঙ্গল জননে যেরূপ বস্তুর প্রয়োজন, সে তাহাই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তৎকালে প্রসূতির দেহ দুইটি জন্মদয়বিশিষ্ট (নিজের ও গর্ভস্থ সন্তানের) হয় বলিয়া তাৎকালিক আকাঙ্ক্ষাকে দৌহদ বলা যায়। সেই আকাঙ্ক্ষা যথোচিত ভাবে পূর্ণ

না হইলে গর্ভস্থ সন্তান কুন্ড, কুনি খন্ড, বামন, বিকৃতাক্ষ অথবা অন্ধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, একদিন একবার মাত্র কতকগুলি মিষ্টান্ন ভক্ষণেই গর্ভিনীর সাধ পূর্ণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ সাধ যে শুধু মিষ্টান্নেই পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ইহাতে অনেকপ্রকার দ্রব্যের জুড়ই আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে। নিয়ে সে সকল বিধয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে।

যতঃ স্ত্রী দৌহদ প্রাপ্যবীৰ্য্যবন্তঃ চিরাব্রম।

পুত্রং প্রসূরতে তস্তাতন্মৈ বাঞ্ছিতমর্পয়েৎ।

(ভাবপ্রকাশ)

অর্থাৎ গর্ভিনী দৌহদ প্রাপ্ত হইলে সন্তান বলবান ও আয়ুর্মান হয়। অতএব গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের অভিলষিত সামগ্রী দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য।

উক্তবচনেও একদিন মাত্র শুভক্ষণ দেখিয়া একবার যে কোন মিষ্টদ্রব্য বা বস্ত্রালঙ্কারদিবার ব্যবস্থা নাই। আবার—

ইন্দ্রিয়ার্গনসৌ যান্ যান্ ভোক্তু মিচ্ছতিগর্ভিনী।  
গর্ভবাধাভয়স্তাস্য ভিবগাঙ্কতা দাপয়েৎ ॥

ভাবপ্রকাশ।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিনীর ইন্দ্রিয়দিগের যাহা যাহা ভোগ করিবার অভিলাষ জন্মে গর্ভপিড়া বা গর্ভবাধা জন্মিবার আশঙ্কায় সেই সকল অভিলাষ পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য।

ভাবপ্রকাশ আরও বলিয়াছেন,—

“গর্ভিনীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়,—সন্তানের সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে।”

এ সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—  
গভিণীর রাজদর্শনে ইচ্ছা হইলে, সন্তান  
মহতাগাবান ও ধনবান হয়। পটুবস্ত্র বা  
বেশী-বস্ত্র কিম্বা অলঙ্কারের জন্তু গভিণীর  
আকাঙ্ক্ষা হইলে, সন্তান অলঙ্কার-প্রিয় হয়।

উক্ত কথায় ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে,  
যে, আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলির উপভোগ  
করিতে তবে ঐ সকল স্মকল প্রাপ্ত হওয়া  
হয়, নতুবা গভপীড়া হইবার সম্ভাবনা।

“গভিণীর তপস্বীদিগের আশ্রমদর্শনে অভি-  
লাষ হইলে পুত্র ধর্মশীল ও সংযতাত্মা হয়।  
দেবপ্রতিমা দর্শনাভিলাষী গভিণীর গর্ভস্থ সন্তান  
সত্যদম ও প্রমথোপম হয়। গভিণীর সর্পাদি-  
বাল জাতি দর্শনে আকাঙ্ক্ষা হইলে সন্তান  
হিংসাশীল হয়।”

“গভিণীর মহিম্যাংস ভক্ষণে অভিলাষ  
জন্মিলে সন্তান পরাক্রমশীল, রক্তাক্ত ও লোম-  
বস্ত্র হয়। বরাহমাংসে লোভ হইলে সন্তান  
নিদ্রাশীল ও পরাক্রমশীল হয়। মৃগমাংসের  
অভিলাষে সন্তান দ্রুতগমনশীল ও বিক্রমশীল  
এবং বনচর হইয়া থাকে।”

উক্ত সকল জন্তু ব্যতীত অত্র কোন জন্তুর  
মাংসভক্ষণে গর্ভবতীর অভিলাষ জন্মিলে সেই  
সেই জন্তুর স্বভাবানুসারে সন্তানের স্বভাব ও  
আচরণ হওয়া স্বাভাবিক বোধিতে হইবে।

হিন্দুশাস্ত্রকর্তা মহর্ষিগণ হিন্দু সন্তানকে  
চুপতে অজ্ঞেয় এবং দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্যবান, বলবীর্ষ্য

এবং সৌন্দর্য্য ও অসীম মেধাবী হইবার উপযুক্ত  
উপায়ের যে সকল সুপথ আবিষ্কার করিয়া  
গিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই সম্মান করিতে  
শিক্ষা করি নাই বলিয়াই আজি চিরকুণ্ডলা লাভ  
করিতেছি।

আর্য্যঋষিগণ আমাদের জন্মের পূর্বে  
হইতেই যেরূপে বিবাহ, রজঃসলা—  
গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোয়ন এবং সাধ  
ভক্ষণাদির সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার সকল  
গুলিই আমাদের দীর্ঘজীবন ও উন্নত স্বাস্থ্য লাভের  
বিবিধ উপায় স্বরূপ। ব্রহ্মচর্যাতির বাবস্থা  
ও এই জন্ত। আর্য্য মহর্ষিগণ আমাদের  
মঙ্গলার্থে যে সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া  
গিয়াছেন, সেই ব্যবস্থাগুলিকে সমাদরপূর্ব্বক  
তাহাদিগের অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর থাকিতে  
পারিলে আর আমাদের চিন্তা কি?

বর্তমানকালে এ সকল আলোচনায় প্রবৃত্ত  
হইলে নিতান্ত উপহাস্যাপদ হইতে হয়।  
কারণ অনেকই উক্ত সংস্কারগুলিকে বড়ই  
বাড়াবাড়িযুক্ত কুসংস্কার বলিতে ক্রটি করেন  
না। যাহা হউক আমাদের অধঃপতন ঘখন  
অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ইহা হইতে  
পুনরুত্থান আমাদের পক্ষে বড়ই শক্ত কথা।  
জানিনা, এ শ্রোত আর কতকাল চলিবে? ?

শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

## সে কালের চিকিৎসা।

—:~:—

প্রথমে একটা গল্প বলি।—জনৈক ব্রাহ্মণ জীপুত্রাদি লইয়া দরিদ্র ক্লিষ্ট হইয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। এমন কি মধ্যে মধ্যে অনাহারেও তাঁহাকে দিনাতিপাত করিতে হইত, তথাপি অপমানিত হইবার ভয়ে তিনি ধনী লোকের দ্বারস্থ হইতে পারিতেননা। একদিন বিপ্র পত্নী শুনিলেন যে, এক রাজা দানছত্র খুলিয়া আগন্তুক বিপ্রবর্গকে বহুল অর্থদানে সন্তুষ্ট করিতেছেন। তিনি স্বীয় স্বামীকে উক্ত রাজ সভায় উপস্থিত হইবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু প্রথমে অপমানিত হইবার ভয়ে কিছুতেই যাইতে সম্মত হইলেন না। পরে জীবর বারধার অনুরোধে এবং পরিবারবর্গের অন্তর্কষ্টে বাধ্য হইয়া রাজ সভায় যাইবার জন্ত কৃতসংকল্প হইলেন। রাজভবনে যাইবার পথে একটা ক্ষুদ্র সরিং পার হইতে হয়। সেই সরিং পার হইবার সময় ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্র জলসিক্ত হইয়া গেল। দ্বিতীয় পরিধেয় না থাকায় তিনি আত্মবস্ত্রেই রাজসভায় উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ স্বস্তিবাদনপূর্বক রাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, রাজা আশ্চর্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নদীপার হইবার সময় যেক্রমে পরিধেয় জলসিক্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ তাহার আত্মপূর্বক বর্ণনা করিলেন। রাজা সবিশেষ শ্রবণ করিয়া মহাশ্রবদনে ব্রাহ্মণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক—“সেই আর এই” এই কথা বলিয়া সভাত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে

প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ ভয়ঙ্করদয়ে রিক্ত হস্তে নিজ কূটরে প্রত্যাগমন পূর্বক পত্নীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করতঃ দুঃপ্রকাশ ও নিজ ভাগ্যে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। বিপ্রপত্নী বড়ই চতুরা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে শাস্ত্যনাপূর্বক গৃহে যে ৪২-কিঞ্চিৎ আহাৰ্য্য ছিল—তাহাই স্বামী ও পুত্র সম্ভানগণকে আহাৰ্য্য করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণকে পুনরায় পরদিবস রাজসভায় যাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ একবার অপমানিত হইয়া আর কিছুতেই রাজসভায় যাইতে সম্মত হইলেন না। ব্রাহ্মণী কহিলেন, “আপনাকে ভিক্ষার জন্ত আর রাজসভায় যাইতে বলিতেছি না। রাজা যে কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তর দিয়া চলিয়া আসিবেন।” ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“রাজাকে কি উত্তর দিব?” ব্রাহ্মণী বলিলেন, “কল্য প্রাতে যাইবার সময় শিখাইয়া দিব।” পরদিন প্রাতে বিপ্রপত্নী একটা জলপূর্ণ পাত্র ও একটা ক্ষুদ্র লোষ্ট্র স্বামীর হস্তে দিয়া তাঁহাকে রাজসভায় পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, এই জলপাত্রটী রাজহস্তে দিয়া তত্বাস্থ জলে লোষ্ট্রটী নিক্ষেপ করিতে বলিবেন। লোষ্ট্রটী জলময় হইলে বলিবেন যে, “এই আর সেই”। বিপ্রবর জলপাত্র ও লোষ্ট্র লইয়া রাজভবনভিত্তিতে গমন করিলেন। রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জলপাত্রটী নৃপকরে সমর্পণ পূর্বক লোষ্ট্রটী পাত্রহ জলে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। রাজা জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা জলময় হইলে



এক্ষণ বলিলেন ‘এই আর সেই’। রাজা  
তৎপ্রভৃত হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থদান  
করিলেন। ব্রাহ্মণ অর্থরাশি সমভিব্যাহারে  
হৃৎকর চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।  
ত্রিফলধনরত্নাদি স্বীয় পত্নীকে দিয়া জিজ্ঞাসা  
করিলেন, “প্রিয়ে। গত কলাই বা নরপতি  
আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন কেন, আর  
অষ্ট বা তোনার শিক্ষামত কথাটা বলায়  
লজিত হইয়া ধনরাশি দান করিলেন কেন?  
অমি ইহাব কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।”  
বিপ্রপত্নী বলিলেন “পুরাকালে অগস্ত্য মুনি  
গুপ্তপন্থক সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন, আর  
অপনি সেই বিপ্র বংশোদ্ভব হইয়া একটা ক্ষুদ্র  
সিংহ পাব হইতে গিয়া জলসিক্ত হইয়াছিলেন।  
ইহা ব্রাহ্মণদিগের অবনতির পরিচায়ক। সেই  
জন বাক্য বিদ্রূপ করিয়া “সেই আর এই”  
বলিয়াছিলেন। অতঃ আপনার নিকট ইহার  
উত্তর পাইলেন যে, এখন রামচন্দ্র রাজা ছিলেন,  
তখন দাশরথী জনৈক প্রস্তুত ভাসাইয়া সেতু নির্মাণ  
করিয়াছিলেন, আর এখনকার নরপতিদের  
সেই মন্ত্রিও ভাসাইবার সামর্থ্য নাই। আপনার  
এই উত্তরে লাজিত হইয়া রাজা পুরস্কার স্বরূপ  
অর্থদান করিয়াছেন।” ব্রাহ্মণ এই কথা  
শ্রবণে স্বীয় পত্নীর বুদ্ধিমত্তার বহুল প্রশংসা  
করিতে লাগিলেন।

ইহা ত গেল যুগ যুগান্তরের কথা। আমরা  
বাহ্য শ্রুতিমাছি ও দেখিয়াছি এক্ষণে আর তাহা  
দেখিতে পাই না। আনুর্ভবীয় চিকিৎসা  
দৃষ্টে বাহ্য দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি এক্ষণে  
তাহা দেখিতে পাই না,—এক্ষণে তাহা  
অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়।

দৈশবাস্তব আমার স্বাস্থ্য একরূপ ধারাপ  
ছিল যে, স্নান করিলেই জ্বর হইত। ডাক্তারি

(এলোপ্যাথিক) চিকিৎসায় জ্বর আরোগ্য  
হইত, কিন্তু কিছুদিন ভাল থাকিয়া যে দিন স্নান  
করিতাম, সেই দিন হইতে আবার জ্বর হইত।  
আমাদের জনৈক কর্মচারী (সরকার)  
আমাকে স্নান করাইবার জন্ত একেবারেই  
নিষেধ করিতেন। আমার ভাগ্যে স্নান প্রায়  
ঘটিত না, মাসান্তে হয়ত একদিন স্নান করিতাম  
ও সেই দিন হইতেই আবার জ্বরভোগ করি-  
তাম। স্বর্গীয় কবিরাজ জনবীন চন্দ্র সেন গুপ্ত  
মহাশয় মদীয় পিতৃদেবের বন্ধু ছিলেন। তিনি  
প্রায়ই আমাদের বাটীতে আসিতেন। একবার  
গল্পচ্ছলে আমার কথা উঠিল। তিনি বলি-  
লেন,—এবার জ্বর হইলে যেন তাঁহাকে সংবাদ  
দেওয়া হয়। পর বার জ্বর হওয়ায় ডাক্তারি  
চিকিৎসা না করিয়া উক্ত কবিরাজ মহাশয়কে  
সংবাদ দেওয়া হইল ও তিনিই চিকিৎসা করিতে  
লাগিলেন। কিন্তু সেবার জ্বর আর কিছুতেই  
ছাড়ি না। অনেক দিন ভোগ হইয়া একটু  
কমিল। একদিন কবিরাজ মহাশয় আসিলে  
আমি সাগু বা খই আর খাইব না বলিয়া  
কান্নাকাটি করিতে লাগিলাম। সে দিন তিনি  
অন্ধখানি বড়ী দিলেন এবং তাহার অন্ধখানি  
অর্থাৎ সিকিখানি খাওয়াইতে বলিলেন। আর  
অন্য পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন ও ১১টা জামরুল  
খাইতে বলিলেন। অনেক দিন পীড়ার পর  
একেবারে অন্তপথ্য না দিয়া মাড়ুঠাকুরাণী  
আমাকে সে দিন রুটি খাইতে দিলেন। বহু  
দিনের পর পথ্য পাইব, অনেক রুটি খাইব  
আশা করিয়া আছি। কিন্তু একগ্রাস মাত্র  
মুখে তুলিয়া বমি করিতে লাগিলাম। পরদিন  
মাড়ুঠাকুরাণী অন্য পথ্য দিলেন। তাহাও  
সামান্য মাত্র খাইয়া আর খাইতে পারিলাম না।  
প্রত্যহ পেট ফাঁপিতে লাগিল। কনিষ্ঠ

মহাশয়কে পুনরায় সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া প্রত্যহ স্নানের ব্যবস্থা করিলেন, স্নানের পর ভিজা ভাত ও মাগুর মাছের ঝোল, আহারের পর পানার্থ ভাবের জন। সেই হইতে আমার প্রত্যহ স্নান সহ হইতে লাগিল। এমন কি, এখন গ্রীষ্মকালে ২৩ বারও স্নান করিয়া থাকি। আমার সন্ধে যে কথা বলিলাম, ইহা চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা।

আবার মদায় পিতৃদেবের নিকট গল্প শুনিয়াছি যে, বালাবহুয় তাঁহার বাতশ্লেষ্মা জ্বর হয়। স্বর্গীয় ৮রামেশ্বর কবিরাজ মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করেন। একদিন তিনি জরত্যাগের জন্ত ঔষধ দিয়া গেলেন। সেই ঔষধ সেবনে একেবারে বিজর হইয়া হিমাক্স (collapse) হইয়া যাইলেন, সেই রাত্রে সকলেই ভীত হইয়া পড়িলেন। প্রতিবাসী সকলে মিলিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট ছুটিলেন। তাঁহাকে পাওয়া গেল না। তিনি স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি স্বয়ং আসিলেন। রোগীকে স্নান করিতে বলিলেন এবং সত্ত্বঃ দধি ও পাস্তভাত পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন। আরও বলিলেন যে, জীবনে কখনও জ্বর হইবে না। যদি কখনও জ্বর হয়, স্নান করিয়া সত্ত্বঃ দধি ও পাস্ত ভাত খাইলেই জ্বর ত্যাগ হইবে। এই ঘটনার পর হইতে আমরাও তাঁহাকে জ্বর হইলে স্নান করিয়া সত্ত্বঃ দধি ও পাস্ত ভাত খাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু আজীবন মাষকলাই খাইতে নিষেধ ছিল।

এরূপ চিকিৎসা আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহা যে কেবল চিকিৎসকের অভাবে হইয়াছে—তাহা নহে। চিকিৎসক, চিকিৎসাদী—উভয়েরই অভাব। চিকিৎসাখীর অভাবে চিকিৎসকেরা নিজেদের বিজ্ঞানগতি ও মূল্যবান ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার সুযোগ পান না। আবার আজকাল চিকিৎসকেরা অধিকাংশই পরস্পরের ছিদ্ৰায়েষী। চিকিৎসাখীরও অধিক দিনেব জন্ত একজনের চিকিৎসাধীন থাকিতে ভালবাসেননা। তাহাতেও সুচিকিৎসার আশা করা যায় না। কারণ বোগের লক্ষণ-বলী ক্রমশঃ প্রকাশিত হয় এবং এই লক্ষণ সমষ্টির উপর রোগ-নির্ণয় নির্ভর করে। সুতরাং চিকিৎসা বিভ্রাট হইয়া পড়ে। কেহই রোগ-নির্ণয়ের উপযুক্ত সুযোগ পান না। আবার ডাক্তারি চিকিৎসার উপর লোক দীর্ঘকাল নির্ভর করিয়া থাকে, কিন্তু কবিরাজী চিকিৎসার উপর সেরূপভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না, যদি থাকে তাহা একেবারে শেষ অবস্থার উপর, যখন ডাক্তারীতে আরোগের আশা একেবারে থাকে না। এই সব নানা কারণে বোধ হয় কবিরাজ মহাশয়ের উপযুক্ত ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত রাখিতে সক্ষম হন না।

ফলে দেশের লোকের রুচি বিপর্যয়ে অধুনা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি তো ঘটিয়াছেই, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক মণ্ডলীও যে ইহার জন্ত দোষী নহেন, তাহা নহে, সে কালের মত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মননপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ সকলের প্রস্তুত কার্যেও তাঁহারা বৃষ্টি আর মনোযোগী নহেন।

ডাক্তার শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস।

## স্বর্ণ সিন্দুর বা মকরধ্বজ।

স্বর্ণ সিন্দুর বা মকরধ্বজের জায় ঐষধ পৃথিবীতে আবিস্কৃত হয় নাই বা অল্প কোন দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই। ইহার প্রস্তুত প্রণালী কেবল আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ জানিতেন। এই ঐষধ প্রত্যেক আৰ্য্য সম্ভ্রানের ক্ষেত্রে যৌবনের বিষয়। মকরধ্বজের উপাদান গন্ধক ও সোনা। পারদ ও সোনা একত্র মিশ্রিত করিয়া মিশ্রিত হইলে তাহার সহিত এক মিশ্রিত কজ্জলা প্রস্তুত করিতে হয়। এই কজ্জলা মৃত্তিকালিপ্ত বোতলে পূর্ণ করিয়া বাতাস হইতে পাক করিলে গন্ধক উঠিয়া যায়, সোনা বোতলের নিম্নে পতিত হয়, মকরধ্বজ বোতলের গলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

এখন বিজ্ঞানে প্রপণ্ডিত এ দেশের কেহও বলেন, মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে স্বর্ণের প্রয়োজন কোন তাৎপর্য্য নাই। যদিও প্রকৃত স্বর্ণ সংযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাহাতেও স্বর্ণ প্রস্তুত রসসিন্দুর নামক পদার্থে নিপাৰ্থক থাকে না। যেহেতু উভয়ের রাসায়নিক পরীক্ষায় কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিবার ইচ্ছা এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মকরধ্বজে সোণাও থাকে না, গন্ধকও নাই। কিন্তু সোণা বা গন্ধকের স্ফুলাংশ প্রস্তুত না থাকিলে ও তাহাদের গুণ, বীৰ্য্য ও ভঙ্গি বিস্তরমান থাকে এবং তদ্বারা অনন্ত-সংখ্যক বহোপকার সাধিত হইতেছে।

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এভাবে ইহা বুঝিতে রাজী হইবেন না। আজকালকার দিনে অনেকেরই ঋষি বাক্য গুলির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। তাই তাঁহারা অবলীলাক্রমে প্রাচীন ঋষি বাক্যগুলি পদদলিত করিতে পরামুগ্ধ নহেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, এফ, সি, এস মহাশয় তাঁহার “আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন গ্রন্থে স্বর্ণ সিন্দুর ও রসসিন্দুরের রাসায়নিক পরীক্ষায় কোন পার্থক্য নাই বলিয়া স্বর্ণ সিন্দুরের প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় “স্বর্ণ নিরর্থক ব্যবহৃত হয়,.....স্বর্ণ সিন্দুর প্রস্তুত কালে স্বর্ণ একেবারে বাদ দেওয়া উচিত”—ইত্যাদি অনেক কথাই বলিয়াছেন। এমন কি ডাক্তার শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট রাসায়নিকগণের দ্বারা পরিচালিত “বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস” নামক রাসায়নিক কারখানায় এখন পর্য্যন্তও এই “স্বর্ণ ঘটত” স্বর্ণ সিন্দুর ২৪ টাকার ভরি বিক্রয় হইতেছে বলিয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্চানন বাবু একজন এম-এ ও রাসায়নিক পণ্ডিত। কাজেই তাঁহার মত বিজ্ঞানার্চা ব্যক্তির কথার প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা আমাদের আদৌ নাই। কোর্ট পেট্রোল-বুট বিহীন-নিরাশ্রিতভোজী জীর্ণ শীর্ণ কলেবর ঋষিদিগের বাক্যগুলি তিনি যে শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইবেন, সে আশা অদূর পরাহত। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের আশ্রয় লইতে হইবে।

দ্রব্য মাত্রেরই রাসায়নিক (Chemical action) ও শারীরিক কার্যকারিতাশক্তি (Physiological action) এক প্রকার নহে। রসায়নবিদ দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া তাহার সাধারণ গুণ প্রকাশ করিলে ভিষক মানব শরীরে প্রয়োগ পূর্বক তাহার শারীরিক কার্য কারিতা শক্তি নির্ণয় করেন। তৎপর তাহা ঔষধরূপে পরিগৃহীত হয়। কেবল রসায়ন বিদের পরামর্শানুসারে প্রাচীন ঋষিগণ ঔষধ নির্ণয় করেন নাই এবং বর্তমানেও বোধ হয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান কেবল রসায়ন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাহা হইলে সর্বাবস্থায় সাপের বিষও মানব শরীরের বিশেষ উপযোগী হইয়া পড়িত। \* সর্প বিষের মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষায় যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা মানব শরীরের বিশেষ পুষ্টি সাধনেই সক্ষম। দ্রব্যের বিশ্লেষণবিচার করিলেও বর্তমান রসায়নবেত্তাগণ এখনও বহু পদার্থের গুণ বিচারে অক্ষম। সুতরাং এস্থলে ভিষকদিগের ব্যবহারিক বচনেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যে স্থলে রসসিন্দূর “অনুপান বিশেষণ করোতি বিবিধান গুণান” সে স্থলে স্বর্ণসিন্দূর “রসায়নং ব্য্যতরঞ্চ বলং মেধায়ি কাস্তিস্ববন্ধনচ।” সুতরাং ‘বল ও ব্য্যতরঞ্চ’ ইহার বিশেষ গুণ বলিতে হইবে। রোগীর অবসন্নতায় একমাত্র স্বর্ণসিন্দূরে যে কাজ হয়, তাহা রস সিন্দূরে হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে বুঝা যায়—রাসায়নিক পরীক্ষায় স্বর্ণসিন্দূর এবং রসসিন্দূর একই পদার্থ হইলে ও তাহাদের গুণগত পার্থক্য অবশ্যই আছে।

দ্রব্যগত উপাদান এক হইলেই যদি তাহার গুণগত কোন পার্থক্য না থাকে, তবে আর চিনীর জন্ত এত ভাবনা ভাবিতে হইত না। আধুনিক রাসায়নিক পণ্ডিতগণ সর্বত্র জলন্ত করিয়া ১২ ভাগ ও জল ১১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া চিনীর পণ্যবস্ত্রে ব্যবহার করিতেন। (came & sugar = C 12 H 22 O 11.)

স্বর্ণসিন্দূরের ত্রায় স্বর্ণবঙ্গ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্বর্ণসিন্দূর স্বর্ণের সহিত এবং স্বর্ণবঙ্গ বঙ্গের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাধিত হইয়া থাকে। বঙ্গ মেহ নাশক। স্বর্ণবঙ্গ বঙ্গ সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয় বলিয়া স্বর্ণ বঙ্গ প্রমেহ রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি পাতের আকর্ষণী শক্তিতে স্বর্ণসিন্দূরে স্বর্ণের গুণ, বীর্ঘ্য ও প্রভাব না থাকে তবে এই প্রক্রিয়ায়ই প্রস্তুত স্বর্ণবঙ্গে বঙ্গের গুণ, বীর্ঘ্য, প্রভাব কেমন করিয়া আসিল? এবং স্বর্ণ বঙ্গ ও স্বর্ণসিন্দূর দেখিতে একই রকম পদার্থ না হইয়া ভিন্নাকৃতি ও ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হইল কেন পঞ্চানন বাবু ইহা ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন কি তিনি যেন একথা স্মরণ রাখেন, আয়ুর্বেদী ঔষধ মাত্রেরই ভিত্তি বর্তমান রসায়নী বিদ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিজ্ঞান উপর প্রতিষ্ঠিত।

আয়ুর্বেদীয় যে সমস্ত ভেষজপত্র—যুত আছে, উপাদান জানা না থাকিলেও কোন দ্রব্যে উহা প্রস্তুত রাসায়নিক পরীক্ষা তাহা জানা যায় না। কেননা বহুগুণ বি বহু ভেষজের গুণে উহা প্রস্তুত হয় এবং

\* Chemistry has not yet succeeded in separating the active snake-poison. Ency, 9th Edition, 22 vol 191 p. p.

দিক্কে যেমন সোনার স্থলাংশ থাকে না, তদ্রূপ ভেষজপক-তৈল-স্বতেও ভেষজের স্থলাংশ থাকে না, কেবল মাত্র গুণ, বীৰ্য্য ও প্রভাব উঠাতে অাকৃষ্ট হইয়া থাকে । কাজেই আমরা গুণের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি । সামান্য একটু তৈলের নমু গ্রহণ করিলেই মাথার বেদনা ছাড়িয়া যায়, শূলরোগে তৈল মর্দনে তৎক্ষণাৎ বেদনার লাঘব হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিয়াও কেহ কি বলিতে সাহস করেন—উহা কিছই নহে ?

অপারমার্গের শিকড় হস্তে ধারণ করিলে ঐক্যাহিক অর আরোগ্য হয়, কার্পাস মূল পদ-দ্বয়ে বন্ধন করিলে শোথ প্রশমিত হয়, পশুর ক্ষতে পোকা হইলে অগ্নেশ্বর লতার অগ্রভাগ ছিড়িয়া ফেলিবামাত্র সমস্ত পোকা পড়িয়া যায় । পঞ্চানন বাবু রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া ইহার কি কোন মীমাংসা করিতে পারিবেন ? অথবা কোন রসায়নবিদ বলিতে

পারিবেন যে, অপারমার্গ, কার্পাস মূল ও অগ্নেশ্বর লতার মধ্যে এমন কি শক্তি বিद्यমান আছে—যদ্বারা জরাদি রোগের উপশম হইতে পারে এই শক্তিকে আৰ্য্য ঋষিগণ “প্রভাব” বলিয়াছেন । এখানেই বৈজ্ঞানিকের পরাজয় । এ শক্তি জড়তত্ত্ববাদীগণের জ্ঞানের অতীত । ইহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত । বস্তুতঃ মনোবিজ্ঞানে সীমায় না পৌঁছিতে পারিলে জ্ঞানের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই । পৃথিবীতে কেবলমাত্র আৰ্য্যেরা ইহা অবগত ছিলেন ।

আমাদের শেষ ব্যক্তব্য এই যে, ন রসায়নের দ্রব্য-বিশ্লেষণী-শক্তি থাকিলে গুণ ও প্রভাব নির্ণয়ে সর্বথা প্রভূত নাই সুতরাং পঞ্চানন বাবুর মত যাহারা কেবলমা রসায়নী বিভাগ সাহায্যে প্রাচীন চিকিৎসা সম্বন্ধে ভেষজ সমূহ পরিবর্তন করিতে বাসনা করে তাঁহাদের যে বিশেষ ভ্রম হইয়াছে, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই ।

কবিরাজ শ্রী—মৈত্র

## সমালোচনা ।

—\*—

সুবর্ণ বণিক সমাচার ।—আবাচ । সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃসিং প্রসাদ দত্ত বি এল । কার্যালয় ২৭ নং মদন বড়াল লেন, বহুবাজার, কলিকাতা । বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা । ইহা নামে “সুবর্ণ বণিক সমাচার” হইলেও এখানি প্রকাশ করিয়া ইহার কর্তৃপক্ষগণ মাসিক সাহিত্য-বিপণির সম্পদ-বৃদ্ধিই করিয়াছেন । সাহিত্য বিষয়ক অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ এ

সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে । “শ্রীশ্রীনিবাস আঠাকুরের জীবনী”তে বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর্ষণ অবগত হওয়া যায় । “যোগিনী” এর ক্রমশঃ প্রকাশ উৎকৃষ্ট গল্প । “কন্দিনী” মাহুষকে কর্মী করিবার গবেষণা মূলক ও “দেবতা আমার” ভ্রমভী-কণ প্রভৃতি মত অপরিচিতা লেখিকার লেখা হইলেও অস্তিত্ব কিন্তু ক্ষণমুহূর্তে লয় পাইবে ।

“ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত” পাকা হাতের লেখা। “সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে” অনেক কথা শিখিবার আছে। “হরিশ-ভাগুরী” গল্পে মুন্সীমানা যথেষ্ট। “মহাযুদ্ধে” সাময়িক কবিতা। “জাতিভেদ” অনেক যুক্তি অবলম্বনে লিখিত। “ত্ৰিপাট পানিহাটি” প্রাচীন কীর্তি কথায় পূর্ণ। “মধুমক্ষিকার চাষ” পাঠে অনেকের উপকার হইবে। মোটের উপর এ সংখ্যার সকল

প্রবন্ধই বিশেষ মনোমদ হইয়াছে। প্রবন্ধ নির্বাচনে সম্পাদক মহাশয় স্মৃতিশক্তি পাইবারই উপযুক্ত। কাগজ ও ছাপা স্ফুট উৎকৃষ্ট। বর্তমান এই দুর্দিনে একরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে এখনও ইহারা এ পত্র বাহির করিতে পারিতেছেন দেখিয়া আমরা আরও সুখী হইয়াছি।

## নূতন জ্বর।

—:~:—

কলিকাতার অবস্থা।—কলিকাতায় নূতন সংক্রামক জরের আবির্ভাব হইয়াছে, গাংহাতে কলিকাতার প্রায় তৃতীয়াংশ অধিবাসী পীড়িত। এ জর বেশী দিন স্থায়ী নহে, প্রাথমিকতঃ ৩ দিন বা ৫ দিন ভোগের পর এই জর ছাড়িয়া থাকে। কিন্তু ইহার ফলে সর্বদা বেদনা, অরুচি এবং দৌর্বল্য দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হয়। এই জরাস্রবের আক্রমণে কলিকাতার স্কুল-কলেজ-অফিসাদির কার্য-পরিচালন বিষয়েও বহু বিঘ্ন ঘটয়াছে। আমাদের হযোগী সম্পাদক এই জরে বিশেষ পীড়িত হইয়াছিলেন। প্রেসের অধিকাংশ কর্মচারীও এই জরে আক্রান্ত হন। “আয়ুর্বেদ কলেজে”র নক ছাত্রও এই জরে পীড়িত। এবারের “আয়ুর্বেদ” বাহির করিতে সেই জন্ত আমরা এক বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

এই নূতন জ্বরটি কি?—এই নূতন জ্বরটি যে কি,—তাহা লইয়া অনেকে অনেক কথা কহিতেছেন। কেহ বলিতেছেন,—ইহা জ্বর, কেহ বলিতেছেন, ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জা,

কেহ বলিতেছেন, ইহা যক্ষ জ্বর। প্রথমে এ জর বোম্বাইয়ে আসিয়াছিল। বোম্বাইয়ের প্রায় সমগ্র অধিবাসীকে বিপর্যস্ত করিয়া ইহা কলিকাতায় আগমন করে। কলিকাতা হইতে কলিকাতার নিকটবর্তী মক্কাশ্বলের অনেক স্থানেও ইহা সংক্রামিত হইয়া দেশে একটা বিষম বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছে।

এই জ্বরের পরিণাম।—এই জ্বরের পরিণামে ভয়ানক গাং দাহ, সর্বদা বেদনা, অরুচি এবং দৌর্বল্য উপস্থিত হয়। জ্বর বন্ধ হইলেও শ্রোত্রা দূর হয় না, তাহার ফলে কাসিটা অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। দাহ হওয়ার ফলে শৈত্য ক্রিয়ায় স্বভাবতঃই আসক্তি জন্মে। সে আসক্তি সম্বরণ করিতে না পারিলে পুনরাক্রমণ ঘটয়া নিউমোনিয়া উপস্থিত হয়। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে জীবন রক্ষার আর আশা থাকে না। সংপ্রতি কলিকাতায় এই ভাবের মত সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। একবার জ্বর ভোগের পর আরও বাহ্যিক

পান্টাইয়া পড়িতেছে, নিউমোনিয়া হইয়া তাহা প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সেই জন্ত এই জ্বর হইতে মুক্ত হওয়ার পর শৈত্য ক্রিয়া একেবারেই বর্জন করা কর্তব্য।

এই জ্বরে সংক্রমণের কারণ।—

এই জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির নিঃশ্বাসে অস্ত্রের শব্দ। এই বিষ প্রবেশ করে, সেই জন্ত এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর অঙ্গস্পর্শ যতটা না করিতে পাওয়া যায় ততই ভাল। এই সকল রোগী ইচ্ছাচার, কাসিবার এবং কথা কহিবার সময় অপব্যবহার করিতে পারে। এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর গামছা ও গ্লাস ব্যবহার করিলে, এক শয্যায় শয়ন করিলে, খুঁতু এবং সিঁদুনি স্পর্শ করিলে—এই জ্বরের বিষ অস্ত্রের শব্দে প্রবেশ করিতে পারে। যে বাড়ীতে এই জ্বরে একজন আক্রান্ত হইতেছে, সে বাড়ীর সকল লোকের জ্বর হইবার ইহাই কারণ। এই জন্তই এ জ্বর এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতিষেধক বিধি।—(১) বিশেষ স্বেচ্ছাচরিত্র্য এ সময় করা উচিত নহে।

(২) মুক্ত বাতাসে অবস্থিতি—বিশেষতঃ রাত্রি কালে গ্রীষ্মাতিশয়ো থোলা যায়গায় শয়ন করা একেবারে পরিহার করা উচিত। (৩)

অত্যধিক জনতার সমাগমে গমন অবিধেয়।

(৪) শব্দ সামান্য মাত্র অল্পস্থ বোধ করিলেই দরকারী অবলম্বন করিবে। (৫) এ জ্বরে

আক্রান্ত হইবামাত্র শয্যা গ্রহণ করিবে এবং

সম্পূর্ণ স্থান না হওয়া পর্যন্ত শয্যা ত্যাগ করিবে না। (৬) বাটীতে কেহ এই জ্বরে আক্রান্ত

হইলে তাহাকে পৃথক রাখিবে। (৭) এই জ্বরে

আক্রান্ত রোগীর খুঁতু এবং কাস ফেলিবার স্থান সতর্ক করিয়া দিবে। (৮) থিরেটার ও

বায়স্কোপ দেখিবার স্পৃহা এ সময় একেবারেই পরিত্যাগ করিবে।

মৃত্যুর কথা।—এই জ্বর প্রথমে একবার

হইয়া ৩ দিন বা ৫ দিনের মধ্যে ছাড়িয়া যায়

বটে, কিন্তু ইহাতে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা ঘন

ঘন। দুর্বল শরীরে এই ঘন ঘন আক্রমণের

ফলে জীবনী শক্তি কতক্ষণ স্থির থাকিতে

পারে? তাহার উপর শৈত্য ক্রিয়ায় যে বিষম

ফল উৎপন্ন হয়, তাহার কথা তো পূর্বেই

বলিয়াছি। সেই জন্ত দেশবাসীর সকলেই

এ সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন—

ইহাই আমাদের পরামর্শ। স্বরণ রাখিবেন,

কলেরা এবং প্লেগের বিভীষিকাময়ী মূর্তি

অপেক্ষা এ জ্বরের মূর্তি কোন অংশে কম

নহে। বায়ু এবং স্লেয়ার আধিক্য লইয়াই

এ জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে—সেইজন্তই

ইহার পরিণাম ভয়ঙ্কর ভাবধারণ করিতেছে।

আমরা এইজন্ত পরামর্শ দিতেছি, দেশবাসিগণ

এ সময় বিশেষ সতর্ক হউন, একবার যাহা

এই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া

ছেন, তাহার আর বাহাতে পান্টাইয়া না

পড়েন, তাহার জন্ত যতটা নিয়মে থাকিতে

পারেন—তাহার চেষ্টা করুন। পানীয় জল

গরম করিয়া প্রতিগৃহে পান করিবার ব্যবস্থা

করুন। কদাচ ঠাণ্ডা ক্রিয়া করিবেন না। এই

রূপ করিলেই এ জ্বর দেশ হইতে পলায়ন

করিবে।

ঔষধের কথা।—হুই বেলা এক রাত্রি

করিয়া “মকরধ্বজ” সেবন এ সময় বিশেষ

কর। আমরা চা পানের পক্ষপাতী না হইলে

এ সময় চা পানের পরামর্শ দিতে পারি। ‘জা’য়ের

সহিত একটু আদার রস মিশাইয়া পান করিলে

আরও ক্ষুদ্র লাভের সম্ভাবনা। আমরা এই

জ্বর সম্বন্ধে পরবর্তী প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা

করিব।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:—

ঢাকার মামলা।—ঢাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার “রোহিতকারিষ্টের” জন্য যে বিপন্ন হইয়াছেন, তাহার প্রতীকার কল্পে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক সম্প্রদায় হইতে আবগারি কর্তৃপক্ষদিগকে উহার প্রত্যাহার করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। গত ৫ই জুলাই এই মামলার প্রতিবাদ করিবার জন্ত কলু-টোলায় সেন মহাশয়দিগের বাটীতে কলিকাতার সমস্ত কবিরাজদিগকে লইয়া এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেনের মানলা যে নজীরে তুলিয়া লওয়া হইল, ঢাকার মামলাও সেই নজীরে তুলিয়া লওয়া হউক এবং ভবিষ্যতে আবগারি বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ কোন স্থানেই যাহাতে একরূপ মামলা দায়ের করিতে না পারেন, ভারতগবর্ণমেন্টের তরফ হইতে তাহার জন্ত সাকুলার জারি করা হউক—এই সকল প্রসঙ্গ ঐ সভায় বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। ঐ সভায় অধিবেশনের ফলে অনাবেরল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন, এই অভিযোগ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজ পত্র ব্যবস্থাপক সভায় দাখিল করা হউক। গবর্ণমেন্ট কিন্তু ইহাতে সম্মত হন নাই। এই মামলা রুজু করিবার পূর্বে গবর্ণমেন্ট হইতে উকীলের পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা—ব্রজেন্দ্রবাবু সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট উত্তর দিয়াছিলেন,—“করা হয় নাই।” পুনরায় ব্রজেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করেন,—“ইহা কি একটা পরীক্ষা স্বরূপ মামলা?” গবর্ণমেন্ট

উত্তর দিলেন,—“না।” গবর্ণমেন্টের এইরূপ উত্তরে আমরা আরও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। বোম্বাই গবর্ণমেন্ট একরূপ মামলা চালানয় কবিরাজী চিকিৎসার মূলে কুঠাধাতু করা হইবে বলিয়া ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে এই মামলাও উঠাইয়া লইয়া বাঙ্গালাদেশে কবিরাজী চিকিৎসার বাধা বিঘ্ন দূর করা কি কর্তৃপক্ষের ‘কর্তব্য’ নহে। একদা সার পারডি লিউকিসের মত একজন বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়াছিলেন যে, “অ্যালোপ্যাথির মত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সমর্থনও গবর্ণমেন্টের করা একান্ত কর্তব্য।” “দেশে একরূপ মামলা চলিলে আয়ুর্বেদের প্রসার বৃদ্ধি আর কেমন করিয়া হইবে?”

সংক্রামক জ্বরে ‘নায়ক’।—সহযোগী ‘নায়ক’ সংক্রামক জ্বরের হস্ত হইতে পরিদ্রাণ পাইবার জন্ত বলিয়াছেন,—“পূর্বে সকালে সন্ধ্যায় প্রতিঘরেই ধূপ ধূনা জলিত। ইহা নিত্য নৈমিত্তিক কর্তব্য কার্য ছিল। পিতৃ পিতামহাদির আচরিত নিয়মাদি পরিহার করিয়া আমরা পদে পদে ভুলিতেছি। প্রাণ রক্ষার জন্ত আমাদের কথামত সকলে চলিয়া দেখুন। ধূপ ধূনা গজাজল ব্যবহার করুন। শরীর ও মন পরিষ্কার ও পবিত্র রাখুন। আচার মত অন্ততঃ কয়েক দিন চলুন। দেখিবেন, ধীরে ধীরে রোগ পলায়ন করিবে।” সহযোগীর পরামর্শ যে খুবই সঙ্গত সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই।



# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫—ভাদ্র।

১২শ সংখ্যা।

## কাজের কথা।

—:~:—

অতীত ও বর্তমান।—অতীত ও বর্তমানের কথা চিন্তা করিলে আমাদের অনেক কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে,—যখন আমরা দাড়াই নাই,—ইংরাজী শিক্ষা পাই নাই, উদ্বোধন সংস্থানের জন্ত যখন আমাদের কাছে পুরা মাথা বসে গেল দিয়া বিদেশবাসী হইতে হয় নাই, তখন—সেই অতীত কালে শাস্তি বলিয়া আমাদের মধ্যে সে একটা জিনিস ছিল, এখন আর তাহা নাই। সুজলা-সুফলা-মলয়জ কীতলা-শঙ্করামলা-পল্লী-প্রান্তরে মার্ভিও-মণ্ডু-পীড়িত কৃষকের গানে আমাদের প্রাণের মধ্যে যে একটা ক্ষুধা অনিয়া দিত, সহরের জন কোলাহলের মধ্যে সে ক্ষুধা আমরা যেন আমাদের উপলব্ধি করিতে পারিমা। পল্লীবাসী অবস্থার গোলাও-কালিয়া-লুচি-কচুরি আমাদের রসনা তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা তখন কার দিনে আমাদের ভাগ্যে অন্ন ঘটিবে—কাজের দান, বাগানের তরকারী এবং পুকুরের

মাছে আমরা যে তৃপ্তিলাভ করিতাম, সে তৃপ্তি—সে আনন্দ—সে সুখভোজন এখন যেন আর আমাদের ভাগ্যে জোটে না। বাঙ্গালী যে আজি এত রোগক্রিষ্ট, তাহার অনেকটাই কারণও ইহাই।

\* \* \* \*

খাদ্যাভাব।—সহরে অবশ্য খাদ্য সম্ভারের অভাব নাই। অর্থও এখনকার দিনে যথেষ্ট সুলভ। কিন্তু হইলে কি হয়? আমরা এখন যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করি, সে অর্থে শুধু উদরাসনের ব্যবস্থা করিলেই ভেঁ হইবেনা—এখন সে অর্থে আমাদের অবস্থা চিত্তবাক্য বিষয়ই রক্ষা করিতে হয়। যিনি বেকার চাকরি করেন, তাঁহাকে সেইরকম styleএ থাকিতে হয়। ভিতরের অবস্থা বাহ্যিক হউক, বাহ্যিক সম্পদটুকু লোককেই ঠিক রাখিতে হয়। সেই লোক ঠিক রাখিয়া তাহারই আমাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা।

এই অবস্থায় অনেকস্থলে ব্যবহার বিপর্যয় ঘটয়া থাকে। তাহারই ফলে দেশে এখন এত রোগের সৃষ্টি। অকাল মৃত্যু—শিশু মৃত্যু—আজীবন মৃতকল্প অবস্থা—সকলই এই ব্যবস্থা-বিপর্যয়ে খটিতেছে।

\* \* \* \*

**শাস্ত্র-বিধি।**—শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—“শরীরমাদাং।” সে কথাটা এখন কার দিনে দেশের লোক বাস্তবিকই বোঝেন না। শাস্ত্রের তাবৎ বিধিই তো এখন আমরা উল্লঙ্ঘন করিতে বসিয়াছি। সদাচার-পালনে শুধু যে ধর্ম্মরক্ষা হয়,—তাহা নহে, সদাচার-পালনে স্বাস্থ্যোন্নতিরও মূল; কিন্তু সে সদাচার-পালনের বিধিটা এখন দেশ হইতে একরূপ লোপ পাইতেই বসিয়াছে। সহরে আসিয়া এখন আমরা যথেষ্ট মাংসানী হইয়াছি, দোকানের জবাই করা মাংস কিনিয়া লইয়া গিয়া আমরা খাইতে শিখিয়াছি। কিন্তু এইরূপ আহারে আমরা যে সদাচার-বিধি উল্লঙ্ঘন করিতেছি—আমাদের অজীর্ণ—আমাদের বক্ষা—আমাদের ক্ষয়রোগ তাহারই ফল সম্ভূত।

\* \* \* \*

**‘খনার’ বচন।**—মাংস শরীর ধারণের সহায়তা করে সত্য, কিন্তু সে মাংস উপযুক্ত হওয়া চাই। ছাগ মাংস ভক্ষণে—কচি ছাগই ব্যবহার করা উচিত। দোকানের মাংস যে কি—তাহা কিন্তু কাহারও দেখিবার প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্রবিধি অবলম্বনে ‘খনা’ আমাদের আহারীয়ের ব্যবস্থায় বলিয়া গিয়াছেন—

“শাকের ছাঁ, মাছের মা’—

কচি পাঠা, বৃদ্ধ মেঘ,

দধির অগ্র, ঘোলের শেষ।”

অর্থাৎ শাক কচি অবস্থায়, মাছের মাথা, কচি

পাঠা, বৃদ্ধ মেঘ, দধির অগ্রভাগ—এবং ঘোলের শেষ—শরীর পুষ্টির সহায়তা করে। কিন্তু এখন এ সকল কথা, শোনেই বা কে?—আর মানেই বা কে?

\* \* \* \*

**দুগ্ধ ও ঘৃত।**—দুগ্ধ ও ঘৃত শরীর রক্ষার যে দুইটি দ্রব্য সর্বোপেক্ষা উপকারী, সে দুইটির আশ্বাদন সহরের বাঙ্গালী তো এখন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।” কিন্তু খাটি ঘৃত পাইবার উপায় নাই, ঘৃত সেবনে সহরবাসীর প্রবৃত্তিও নাই।—তাহার পর পল্লী-মায়া তাগ করিয়া সহরে আসিয়া, বাঙ্গালী সন্তান অর্ধের দুগ্ধ অধিক করিয়া দেখিতে পাইতেছে সত্য, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, পুষ্টির আহারীয় গ্রহণ অনেকের ভাগেই যে ঘটিতেছেন—ইহা অবিসংবাদিত। সহর প্রবাসী-বাঙ্গালীও রোগ-প্রবণতার প্রসার-বৃদ্ধির ইহাই কারণ। কিন্তু ইহার আর প্রতীকার নাই।

\* \* \* \*

**পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া।**—আমাদের পল্লী-জননী আজি কানন-বহলা হইয়া—ম্যালেরিয়া প্রপীড়িতা সত্য, দারুণ গ্রীষ্মভি-শয্যে পল্লীমাতার পুষ্করিণীগুলি দাম-শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া নষ্ট হইতে বসিয়াছে সত্য, নৈশ অন্ধকারে পল্লী-ভিটার ব্যাঘ্রের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু যদি আমরা—কায়মনোপ্রাণে সহর বাসের শূল ছাড়িয়া দিই,—আমাদের পল্লীভাঙ্গা পল্লী-জননী শান্তিময় ক্রোড়ে আবার যদি আমরা স্থায় লইতে পারি, কেন্দের ধর্ম, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছের ব্যবস্থা করিয়া আবার যদি আমরা অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, তবে

হইলে আবার আমাদের শরীর রক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর আহাৰীয়েৰ ব্যবস্থা হইতে পারে। বনজঙ্গলগুলি কাটাইয়া, সুপেয় জল

সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া, পল্লীভূমির ম্যালেরিয়া দূর করা বাইতে পারে। কিন্তু সহর প্রবাসী বাঙ্গালী বাবুর সে প্রযুক্তি কি আর হইবে?

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

## শিক্ষায় স্বাস্থ্য হানি।

—:~:—

আবার ফরমাস্.—‘আয়ুর্বেদ’ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে—তাহা শুদ্ধ একটা নহে, মাসে মাসে—ধারাবাহিক রূপে। অধিকন্তু ফরমাস্ এবার একজনের নহে;—শুদ্ধ সহস্র সহযোগী সম্পাদক কবিরঞ্জন মহাশয়ের নহে। কবিরাজ শিবোভূষণ মাননীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত ষামিনী ভূষণ রায় এম, এ, এম, বি মহাশয়ের ও স্নলেখক গুণাহিত্যিক-বিদ্বান শ্রীযুক্ত ব্রজ-বল্লভ বায় কাব্যার্থী কাব্যকণ্ঠ বিশারদ মহাশয়েরও এ ফরমাসে যোগাযোগ আছে। স্বামী হেন অকিঞ্চনের পক্ষে এপরম সৌভাগ্য-সঞ্চার—সন্দেহ নাই।

কিন্তু মানি—এ সৌভাগ্য তাঁহাদের সঙ্কল্পতা ও ব্রহ্ম প্রমত্ত মানি তাঁহাদের উদ্দেশ্য কখনই এ দীনকে অপদস্থ করা নহে, কিন্তু তথাপি প্রাণ যে অত্যন্ত ব্যস্ত না হইয়া পারি ছেই না। মুচিরাম গুড় recommendation বলে ডেপুটী হইতে পারিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ হইতে গ্রন্থকার তাহাতে ‘হরিবোল’ দিতে বিরত হইলেন কই? আরি মহাজনের অগ্রগৃহে লেখক মহলেই যের চলিয়া গইলাম, কিন্তু এ পদোন্নতিতে পাঠকের কণ্ঠে অবাক ‘হরিবোল’ ফুটিতে চাহিবে না কি?

কুসুমের প্রসাদে কীট যেন সুর-শিরই প্রাপ্ত হইল, কিন্তু কীটের তাহাতে গোরব বাড়িল কই?

এবারের প্রবন্ধটীও সহযোগী সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক অবধারিত। ও বারের প্রবন্ধটী যে মোটেই ভাল হইয়াছিল—সে বিষয়ে বিন্দু মাত্রও প্রতীতি আমার নাই। আমার মনে হয়, ও বারে সহস্র হইলেও কবিরঞ্জন মহাশয় আমাকে একটা কড়া প্রশ্নের সমাধান করিতে দিয়াছিলেন,—কারণ সে প্রবন্ধে আমার গভীর বাহিরে আমার ভ্রমণ পথ নির্ধারিত হইয়াছিল,—রোগীকে চিকিৎসকের কাজ করিতে বলা হইয়াছিল,—তথ্যস্বাস্থ্য—ছাত্রকে স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধান করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু এবারের প্রশ্ন পত্র অনেক সহজ—রোগীকে তাহার রোগের ইতিহাস বলিতে হইবে,—সে যে বিষয়ে ভুক্তভোগী, তাহাই তাহাকে বর্ণন করিতে হইবে,—ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—“আধুনিক শিক্ষার তোমার স্বাস্থ্য কেন ভয় হইতেছে লিখ।” ছাত্রের কার্য যখন উত্তর-প্রদান, তখন আশি-অবস্থা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রশ্ন সহজ বলিয়া যে উত্তর

স্বপ্নর দিতে পারিব—তেমন গর্ব করিতে পারি না। হয়ত কঠিন প্রশ্নের ছাত্র যাঁহা উত্তর দেয়, সহজ প্রশ্নের উত্তর তাঁহা হইতেও খারাপ দিয়া ফেলে,—উত্তরের এই অনিশ্চয়তা আছে বলিয়াই ছাত্র—ছাত্র, এবং অজ্ঞতার এই অনিশ্চয়তাকে নিরাকরণ করিবার জন্তই শিক্ষকের আবশ্যকতা। তবে ভরসা মাত্র এই যে, দয়া ও মেহের চক্ষে সন্দেহের ক্ষমা মিলে। তাই কবির বাণী সার্থক—“How sweet is mercy” এবং “mercy is twice blessed.”

পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—উপযুক্ত শিক্ষা দেহ ও মনের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। এখন শিক্ষায় কতটা স্বাস্থ্য হানি হইতেছে বুঝিতে হইলে, প্রথমেই দেখিতে হইবে—বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে এই সামঞ্জস্য বিধানের কতটা ক্রটি পরিলক্ষিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, আমি এই পঞ্চা অবলম্বন করিয়াই আমার বক্তব্যের অঙ্কারণা করিব।

আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল মনে করি,—পূর্ব প্রবন্ধের মত এ প্রবন্ধেও আমি ‘স্বাস্থ্য’ শব্দটির অর্থ একটু বিশদ করিয়া ধরিয়াছি। এই শব্দটাতে আমি শরীর ও মন—উভয়ের স্বাস্থ্যের কথাই বুঝিয়া লইয়াছি। তবে বর্তমান প্রবন্ধে মনের স্বাস্থ্য হানি সম্বন্ধে পৃথক করিয়া বলিব না; কারণ পূর্ব প্রবন্ধে এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছি—তাঁহাই যথেষ্ট।

আর একটা কথা এই যে, রোগের চিকিৎসার কথা বলিতে গেলেই রোগের কথা পূর্বেই বলিতে হয়। সুতরাং পূর্ব প্রবন্ধেও যে স্বাস্থ্যহানির কথা মোটেই বলি নাই, তাঁহা

নহে। এ প্রবন্ধে,—পূর্ব প্রবন্ধে স্বাস্থ্যহানি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহার পুনরুক্তি যতটা পারি—না করিতে চেষ্টা করিব। পুনরুক্তির জন্তই যে এ বিষয় ত্যাগ করিতেছি তাঁহা নহে, স্থানাভাবের কথাও ভাবিতে হইতেছে। বলা বাহুল্য পুনরুক্তির ভয় করিলে বিষয় অনেক সময়ই বিশদ করিয়া বলা যায় না, তাই বিশেষ আবশ্যক মনে হইলে পূর্ব প্রবন্ধের কথাও পুনরুক্ত হইবে। পুনরুক্তি বা অন্ততঃ পুনর্ধারণা ভিন্ন মানুষ এ জগতে কি বলিতে পারে? মানুষের মৌলিকতা যে অল্পচিন্তনকে আশ্রয় করিয়াই জন্মগ্রহণ করে। এমন কথা কি কেহ কখন ভাবিতে বা বলিতে পারিগাছে—যাহা অল্প কেহ না হউক—অন্ততঃ ঈশ্বরও কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই?

আশা করি যাহা বলিয়াছি তাঁহাতে আমার প্রবন্ধ কোন্ ধারা বাহিয়া চলিবে—তাঁহা বুঝিতে আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। আমার এই দুইটা প্রবন্ধ একই সময়ে “companion pieces” ভাবে পড়িলে আমার বক্তব্য আরও সহজ বোধ্য হইবে।

যতদূর দেখা যাইতেছে, বিদেশীয় ও বিজাতীয় শিক্ষার সংঘর্ষে আমাদের শিক্ষার যতটা অবনতি হইয়াছে ও ততজ্ঞ আমাদের স্বাস্থ্যের যতটা হানি হইতেছে ততটা আর কিছুতেই হইতেছে না। স্বীকার করি, মানুষকে চরম শিক্ষা পাইতে হইলে, মাত্র নিজের শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে তাঁহার চলিবে না,—তাঁহাকে বিদেশীয়ে নিকট হইতেও সংগ্রহ করিতে হইবে। এইক্ষণ সব জাতিই করিয়াছে। অরব্ধ ইংরাজ জাতি—বাস্তবিক শিক্ষার আজ আমরা চরম আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি—ও এতদূর শিক্ষার পাত্র

কবিতেছি—তাহারাও বিভিন্ন সময়ে ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতি জাতির শিক্ষা হইতে অনুকরণ করিয়াছে ; ফ্রান্স-ইংরাজী রোমান্সের আদর্শওরা না পাইলে, ত্রুবের (Trouvere) ও ত্রুবদুর (Troubadour) কবিগণ তাহার যে শিশুশিক্ষা যুগের প্রবর্তন করিয়াছিল, তাহার শেষ হইত না। আবার ইউরোপীয় সর্ষসাহিত্যই গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের নিকট চিরঋণী। কিন্তু তাই বলিয়া এত অনুকরণের মধ্যেও ঐ এই জাতি তাহাদের নিজ জাতীয় শিক্ষার প্রাণটাকে হারাইয়া ফেলে নাই,—এই প্রাণটা অটুট ছিল বলিয়াই উহারা আজ নিজ নিজ সাহিত্যের গর্ব করিতে পারিতেছে।

মথানাদিকারে বোর ভাগ্য-বিপর্যয়ে ইং-মর্তী ভাষা অঙ্গিয়া চূর্ণকার হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই চূর্ণ—পুনরায় যে মহা সৌধ হইয়া গড়িয়া উঠল—তাহার কারণ, সে ভাষা, সে সাহিত্য এই অবসানের মহাঝড়ের মধ্যেও তাহার জাতীয় প্রাণটাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার অদৃষ্ট অন্তরূপ, এ অনুকরণশীল, কিন্তু রক্ষণশীল নহে, এ হৃদয়ে নানিয়া চলিয়াছে, নিজের দিকে ইংরেজ লক্ষ্য নাই, এ কেবল গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু হজম করিতেছে না। অধিকন্তু ইহার অহংবোধ স্পষ্ট—এতদূর বলবতী হইয়া উঠিয়াছে যে, নিজস্ব তাগ করিয়াও পরস্ব সমাদরে বসে চুলিয়া লইতে ইহার লজ্জা বোধ হয় না। এই ভগ্নত ইহার নিজস্ব প্রায় বিলুপ্ত, জীবনী শক্তি ক্ষীণ। এই লুপ্তপ্রায় প্রাণকে সজীব করিতে পারিলে তবে ইহার বাড়িবার আশা। নতুবা ভগ্নস্বাস্থ্য ইহাকে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত করিবে। সমসাময়ী অনুকরণ করা ভাল,

অন্তের নিকট হইতে গ্রহণ করা ভাল, কিন্তু গ্রহণ করিবার সময় বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে—সমীকরণ করিতে পারিব কিনা। বিদেশীয় শিক্ষা যতটা আমার শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে, ততটাই গ্রহণ করা উচিত—তদতিরিক্ত গ্রহণ করিলে, সে শিক্ষাকে আমি ‘আমার ঘরে’ রাখিতে পারিব না, সে শিক্ষা আমাকে ‘তাহার ঘরে’ লইয়া যাইবে। পর-শিক্ষা—পর-ধর্মেরই মত অনেক সময় ভয়াবহ হইয়া উঠে। আমরা কিন্তু এ সব বুঝি না—আমাদের শিক্ষক ছিলেন—গুরু পিতা ; এখনকার শিক্ষক হইয়াছেন—বন্ধু, সখা ! আগের শিক্ষক—ছাত্রকে সন্ধান করিতেন—‘বৎস’, এখন স্কুলের শিক্ষক ডাকিবেন,—‘my dear boy’—কলেজের শিক্ষক ডাকিবেন ‘gentleman’। এসবকে কি আমাদের চলে ? ফল তাই বিষময় দাঁড়াইতেছে। etiquette রূপ বিদেশীয় মদিরা প্রথম হইতেই আমাদের ছাত্রের মাথা নষ্ট করিয়া দেয়। তাই বলক এই ভ্রাতৃত্বের শিক্ষার প্রথম হইতেই একটু স্বেচ্ছাচারী হইয়া গড়িয়া উঠে,—এই স্বেচ্ছাচারীতাই পরে তাহার মনের ও শরীরে স্বাস্থ্য-হানির কারণ হয়,—যথেষ্টাহার, যথেষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ, উজ্জ্বল চিন্তাকরণ, ছাত্রদের বিক্ষতি করিতেছে,—তাই বলিবার অন্তই আজ উপস্থিত হইয়াছি।

ছাত্র-শিক্ষকে এই সখ্যভাব—ছাত্রকে নিজেকে শিক্ষকের সহিত সমান গণ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছে,—তাই ছাত্র আজ আর বড় একটা শিক্ষককে মানিয়া চলিতে চাহেনা,—তাই ভারতীয় শিক্ষার একটা কেন্দ্রহীন,—এই কলিকাতা সহরেও শিক্ষকের সহিত ছাত্রের

Strike রূপ অভাবনীয় ব্যাপারের আকির্ভাব সম্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপার কি ছাত্রের ঘোর মানসিক স্বাস্থ্যহানির পরিচায়ক নহে? আজকালকার ছাত্র-সমাজ শিক্ষককে ধরিয়া লইয়াছে—শুদ্ধ বাহ্যিক শৃঙ্খলা সাধনের একটা যত্ন স্বরূপ। তিনি দেখিবেন—শুদ্ধ তাঁহার ক্লাসে ছেলেরা অসদ্ব্যবহার—পাশ্চাত্য ধরণের অসদ্ব্যবহার না করে। ছাত্রের মন—তাহার চরিত্র—শিক্ষকের শিক্ষক তার বাহিরে। তিনি শুধু বলিবেন পুস্তকের উপদেশ; কিন্তু কোন কিছু সংশিক্ষা মনে প্রবেশ করাইয়া দিবার ইচ্ছা ও অনেক সময় ক্ষমতা তাঁহার নাই। ব্যবসায়ী জ্ঞাতির নিকট হইতে আমরা শিখিয়াছি, শিক্ষাও ব্যবসাগত। টাকা দাও, পড়। শিক্ষক বলিবেন,—তুমি শুনিবে। তিনি তোমার নিকট পুস্তকের বুলি আওড়াইবেন, তুমি ঘরে গিয়া তোতা পাখীর মত তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে।—সে উপদেশ তোমার মস্তিকে প্রবেশ করিয়া, তোমার জীবনের প্রতি কার্য্য কলাপের সহিত যাহাতে সংমিশ্রিত হইয়া যায় তাহা দেখা শিক্ষকের গভীর বাহিরে। শিক্ষক তাহা দেখিবেন না—তিনি দেখিবেন—তাঁহার ক্লাসে ‘ডিসপ্লিন’ নামক পাশ্চাত্য etiquette রক্ষিত হইতেছে কিনা। ঘরে তুমি যদিচ্ছা ব্যবহার করিতে পার, শিক্ষকের তাহাতে কি আসিয়া গেল? আজকাল আইন-কানুনের শিক্ষা,—আইন মানিয়া চলিলেই হইল—আইনের একচুল ব্যবধান করিলেই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই দণ্ডনীয়। Law must be observed to the letter. আইন Shylock এক পাউণ্ড মাংস দোব পাইলেই বুক হইতে ছুসি দিয়া কাটিয়া লইবে। Meery এখানে নাই—দয়া ও রেহের শিক্ষা

ভারতের নিজস্ব ছিল, সে শিক্ষার নির্কাসনের যড়যন্ত্র চলিতেছে। শিক্ষক আইনের সদা ভীতি লইয়া নিজে দেখিবেন? না ছাত্রের শিক্ষার মনোযোগী হইবেন? পূর্বে এটা ছিল না। পড়ার বয়স হইবামাত্র শিক্ষক ছাত্রকে নিজ গৃহে লইয়া বাইতেন। সেখানে পুস্তকের শিক্ষা ত হইতই, অধিকন্তু ছাত্রের জীবন সূত্রে অতি-বাহিত হইতে পারে—এমন যাবতীয় শিক্ষায় তাহাকে শিক্ষিত করা হইত। তাহার চরিত্র, তাহার শরীরপোষণ, তাহার খাদ্যাভ্যাসের ব্যবস্থা, তাহার ধর্ম প্রবৃত্তির উন্মেষ সাধন—এইরূপ সর্ব বিষয়ে শিক্ষা দিয়া, তাহাকে একটা ‘কাজের লোক’ করিয়া পুনরায় পিতৃ ভবনে হাজির করিয়া দেওয়া হইত। এখনকার মত শিক্ষাকে ‘পুস্তক গত শিক্ষা’ এইরূপ সর্গীর্ণ অর্থে তখন ধরা হইত না। সুখের বিষয় এ আদর্শে এ যুগেও অন্ততঃ একটা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—বোলপুরে—কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের প্রসাদে। সেখানে ছাত্রগণ কিরণে যুগপৎ শরীর ও মনের স্বাস্থ্যলাভ করিয়া শিক্ষিত হইতেছে তাহা প্রগিধান বোধ্য। কিন্তু কে প্রগিধান করে! ভারতের সে জাতীয় প্রাণ যে মৃত্যুশয্যা অচেতন? তাই কবির যে কবিত্ব—কল্পনার আতিশয্যে মূর্ত হইয়া ফুটিয়াছে এ ভারতে তাহা হয়ত আর তা’র অনুরূপ সৌন্দর্য্যকে খুঁজিয়া পাইবে না, হয়ত তাই আপনাকেই বরণ করিয়া ফোতে Narcissus এর মত যৌবনেই আত্মহত্যা করিয়া বসিবে।

আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার নিন্দা করি না,—বরং কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি, পাশ্চাত্য শিক্ষাই আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছে—আমাদের অতীত গোঁববন্ধে সন্ধান করিতে শিক্ষার দ্বার

—আমাদের চতুর্দিকে যে জাতীয়তার অভাবের মাড়া পড়িয়াছে, তাহাও ভাবিয়া দেখিলে পাশ্চাত্য শিক্ষাই জাগাইয়া দিয়াছে। আমার উদ্দেশ্য—পাশ্চাত্য শিক্ষার নিরাকরণ নহে, আমাব উদ্দেশ্য—পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আমাদের জ্ঞাত শিক্ষার সহিত একীকরণ, আমার উদ্দেশ্য এই দেখান যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা অত্যা-ভাবে গ্রহণ করিয়া আমরা জাতীয় শিক্ষাকে হারাইয়া ফেলিতেছি ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার শক্তির অভাবে স্বাস্থ্যহীন হইতেছি।

দেশ-কাল পাত্র ভেদে সবটাই পরিবর্তন আবশ্যক—এটা আমাদের বুঝিতে হইবে। না বুঝিয়া স্বাস্থ্যের কি অবনতি সাধিত হইতেছে শুধু।

শীত প্রধান দেশে প্রভাতে বরফের গুতায় বাহিব হওয়া হয় না, গায়ের রক্ত জমাট বাঁধে, তাই বিলাতে বেলা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলে, কলেজে, পড়ার সময়। বিলাতে এটা সূর্যময় সন্দেশ নাই। তাই বলিয়া যে দেশে দ্বিপ্রহর বোদ্রে কাঠ ফাটে, সে দেশে ১০টার সময় জামাজুতা আঁটিয়া, ঘর্মাক্ত কলেবরে, রাস্তার ধূলা পাইয়া, জনাকীর্ণ ক্লাসে ৪।৫ ঘণ্টা গিয়া একই ভাবে বসিয়া থাকিলে ছাত্রের রক্ত যে দিন দিন শোষিত হইতে থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এইরূপ ভাবে গিয়া বসিয়া থাকিলেই মাথা ঘুরিতে থাকে, তত্পরি সেখানে লিখিতে-পড়িতে হইলে, শিক্ষক মহাশয় কি বলিতেছেন—তাহাতে মনোযোগী হইতে হইলে, মস্তিষ্কটাই যে অল্পেই নষ্ট হইবে সেটা কি বড়ই অস্বাভাবিক?—কাজেই ১৬ বৎসর না হইতেই ছাত্র যে চন্দ্রা লইবেন, নানারূপ আধিযায়ি যে তাঁহার জীবনের সাথী হইবে তিনি যে ক্রমে ‘তালপাতার সিপাই’ হইয়া গড়িয়া উঠিবেন, ভিন

হাতের বেশী বাড়িবেন না, না হাসিলেও যে তাঁহার দর্শন পংক্তি বিকশিত হইয়াই থাকিবে, ২০ বর্ষেই তাঁহার চুল পাকিবে, ৩০ বর্ষে তিনি উন্মাদ হইবেন বা ৪০ বর্ষের মধ্যেই ‘থাইসিসে’ মারা যাইবেন—এ কি বড়ই আশ্চর্য্য কথা?

এত গেল মুখবন্ধের কথা। কোন কোন ছাত্রের অভিভাবক শিক্ষা বিষয়ে এতদূর অমু-রাগ-পরায়ণ যে, হয়ত ৪।১০ টার সময় স্কুল হইতে আসিয়াই ছাত্র দেখিলেন, গৃহ-শিক্ষক মহাশয় অবতীর্ণ হইয়াছেন। মনোযোগে বা অমনো-যোগে তাঁহাকে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল পড়িতেই হইবে—তা’হয়ত বা চারিটা মুড়ি খাইয়া বা ২টা সন্দেশ জলযোগ করিয়া। মাষ্টারমহাশয় ত চলিয়া গেলেন, তবু কি ছাত্রের নিস্তার আছে? সাক্ষ্যভোজন—বোর্ডিং বা মেসের অপেক্ষা অল্প ব্যয়জন বা গৃহের প্রায়শঃ অসার খাঞ্চে যেমনই হউক—তাঁহার ঘুমাইবার জো’টা নাই। পরদিনকার স্কুল বা কলেজের পড়া তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত ত পড়া কেবল বুঝিলেনই, এবার তাঁহার মুখের পালা। নিদ্রাভরে চকু ঢুলু ঢুলু—তথাপি ছাত্র পড়িতেছেন—তা “A point has position but no magnitude” ই হউক বা “The total quantity of energy is conserved” ই হউক—তাঁহার পাঠে কতকটা আত্মকাহিনীই তাহার বিবৃত করিতেছে তাহার নিজেরও স্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, শরীর মনের energy ত ক হইতেছে, কোন জগতে বাইরা যে তাহার ক্ষতি পূরণ হইবে তাহা বিধাতাই জানেন। রাতি ১২টার সময় ত ছাত্র শয়ন করিলেন,—বাড়ির চক্কিয়া ঘাঙস্যার সমস্ত রাত্রি হয় দেখিলেন, অল্প নিদ্রা ঘোরের অনন্ত স্বপ্ন, পর ভুগিলেন।

mis। ক্রমে দেখা যাইতে লাগিল—ছাত্রের চক্ষু কোটর-গত, গণ্ডস্থল শুকাইয়া যাইতেছে, কিছুই হজম হয় না—কখনও উদরাময়, কখনও কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ লাগিয়াই আছে। প্রাতঃ ভ্রমণ ও ব্যায়াম সম্বন্ধে অতিভাবক ও অভি-ভাবকের প্ররোচনায় ছাত্র ক্রমে নিতান্ত অমনোযোগী—কেন না সেটা বাজে কাজে সময় ক্ষেপ মাত্র। \*

যে জাতির শিক্ষাকে আদর্শ করিয়া মানুষ চলে, ক্রমে সেই জাতির আচার নীতিও তাহার মজ্জাগত হইতে থাকে। ছাত্রও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিথিতে লাগিলেন—এই ছুনিয়ার সব খাওয়া যায়—জাতিভেদ বর্ধর জাতিস্থূলত কুসংস্কার,—সাংস্কারের আদর্শায়ুষ্করণ শততীর্থ দর্শনফলের সমান,—কেন না তাঁহাদের আদর্শই সভ্যতার চরম,—কেন না তাঁহারা সভ্য ধরণে পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, সভ্যধরণে বসেন, পা কাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট খান, অভিনব ধরণে হাসেন, কাসেন, আহ্বার করেন। ফলে ছাত্র থাইতে লাগিলেন—যাবতীয় রেষ্ঠরেটে উচ্ছিষ্ট পাত্রে—যেমন তেমন রকমের মাংসাদি—বাহার তাহার হাতে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অতঃ হৃৎপিণ্ড, গরম মাংস, পেরোজ-রসুন, হজম হইবে কেন? অম্লরোগ, দ্রুত হইতে আরম্ভ করিয়া কুষ্ঠ পর্য্যন্ত যাবতীয় চর্মরোগ, ওলাউঠা প্রভৃতি নিত্য নূতন রোগ দল বাঁধিয়া ভারত ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া ছাত্রের জীবন শেষ করিতেছে। আঁটা পোষাকে ছাত্রের রক্ত সঞ্চারণ বদ্ধ, শরীরটি

ঠেঙ্গার মত টিকটিকে, রক্তহীনতায় সঁতসেতে। যথেষ্টহারে মন উত্তেজিত হইতে লাগিল, নৈতিক জীবনের অধঃপতন জন্ত ব্রহ্মচর্যের অভাব ঘটিতে লাগিল—ছাত্র শীর্ণ দেহে মরণের পথের যাত্রী হইলেন। ছাত্রদের আদর্শ সাংস্কার,—কাজেই যে যত বেশী সিগারেট বিদ্যপান করিবে, ভেসলিন মাখায় মাখিবে, সোপ গায়ে ব্যবহার করিবে সে তত বেশী সভ্য ও শিক্ষিত। সরবতের পরিবর্তে চা, তৈলের পরিবর্তে লোশন, কাপড়ের পরিবর্তে হ্যাটকোট চণিতছে। চা—ডিসপেন্সিয়া, লোসন—চর্ম ফাটা বা চর্মরক্ষতা, কোট পেণ্টালুন—বুদ্ধিহীন শীর্ণদেহ, হ্যাট—অকালে পক্ষেশ বা মস্তকদেশে টাকরূপ মরুস্থলের সৃষ্টি করিতেছে—মঝে মঝে উই একটা oasis পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কতটা প্রাণারাম তাহা ছাত্রগণই মাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন।

শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে অপব্যয় চারিটা পাঁচটার সময় ধরনী শীতল হইতে থাকে, তখন একপেট মাংস বিস্কুট টিকি খাইয়া পাশ্চাত্যেরা যে খেলা খেলেন, একদেশে সেই প্রাণহরণকারী foot-ball খেলা ঐ চারিটা পাঁচটার সময়ই যখন রোদ্রে ছাতি ফাটে, তখন সুবিস্তীর্ণ ময়দানে যৎকিঞ্চিৎ কচুরিসদৃশ জলযোগ করিয়া, খেলিয়া, ছাত্রেরা কি সুন্দর স্বাস্থ্যই লাভ করেন, তাহা সহজেই অস্বীকার হইতে পারে। শীতকালের cricket খেলাটাই কি কম? এটা শীতকালের খেলা। বিলাতে ১১টার আরম্ভ—এখানেও তাই—দর্শকেরা

\* প্রবন্ধ লেখক সতীশবাৰু B. A. পাস করিলেও এখনও ছাত্র, M. A. এবং আইন শিক্ষা করিতেছেন। উচ্চশিক্ষার উচ্চ আকাঙ্ক্ষার তাহার নিজের স্বাস্থ্য প্রায়শঃই ভাল নয়, সেইজন্য তিনি বর্তমান শিক্ষার ব্যয়-হাদি কিরণ ঘটয়া থাকে, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ উত্তোষা। এইজন্যই তাহার কথাতলি বড় ভরসারী হইয়াছে।—আং সং।



রোদ্রে ছত্র মাথায় দিয়া বা ছায়ায় দাঁড়াইয়া দেখেন,—আর যুবক-ছাত্রেরা বিলাতের অল্প-কল্পে একরাশ কোট পেণ্টালুন আঁটিয়া হাট মাথায় খেলেন—মুখটা কাল, চক্ষু দুইটা কোটের গুত, গাওহল শুষ্ক। ইংলেণ্ডে এ খেলা স্বাস্থ্যকর, এখানে ইহা প্রাণান্তকর।—ভারতের নারী শীতকালের মধ্যাহ্ন রোদ্রে যেরূপ উত্তপ্ত থাকে, তাহা মানুষের রক্ত শোষণ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

এতটা গেল মোটা মোটা অল্পকরণে কথা। একটু তলাইয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি—বিলাতের সংঘর্ষে আমাদের শিক্ষার আদি হইতে বড় একটা ভুল চলিয়া আসিয়াছে। যে জাতির যেটা মাতৃভাষা, সেই ভাষার ভাব সে জাতি পূর্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম করে এবং সেই ভাষার ব্যুৎপন্ন হইলে অস্ত্রভাষা শিক্ষা সে জাতির পক্ষে আর ততটা কষ্টকর হয় না। স্বাক্ষর কবি ভাষার আধুনিক চলিত ভাষা-গুলি গ্রন্থও দ্বিবিদ এবং বিভিন্ন ভাষার ভাব প্রবাহ দ্বারা ইহাদের ক্ষীণ কলেবরের পুষ্টি লাভন করিতে হইবে। কিন্তু আগে আমার কি অভ্যাস—সেটা বুঝিয়াই কি অস্ত্রের গৃহে ধার করিতে যাওয়া উচিত নহে?

বিশেষতঃ মানুষের ভাব প্রবাহ ও সাহিত্য অনেকটা একই নিয়মপথে অগ্রসর হয়—যেমন সর্বদেশের ভাষাতেই পণ্ডের জন্ম গণ্ডের পূর্বে হইয়াছিল। মানুষমাত্রেই যখন একজাতি—অবশ্য বিস্তৃত অর্থে—তখন মানুষের চিন্তা প্রণালী প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী অনেকটা এক পথই বাহিয়া চলে। "Greatmen think alike" না বলিয়া "Men as men think alike" বলিলেও একবারের মততা বলা হয় না। ভাষাপেক্ষা ভাবের বড়ই চিরকালই জগতে স্বীকৃত হইয়া

আসিয়াছে। এই ভাব গ্রহণের জন্তই এক ভাষা অস্ত্রভাষার নিকট প্রধানতঃ খণী। ভাব আসল জিনিস, ভাষা তাহার পরিচ্ছদ—যদিও ভাষারও ভাবকে সুস্পষ্ট, সুন্দর ও সুসজ্জিত করিবার জন্ত সময় সময় বিশেষ আবশ্যকতা থাকুক এবং এই আবশ্যকতার জন্যই সময়ে সময়ে এই ভাষারও অল্পকরণ হইয়া থাকুক। ভাবকে চিনিতে পারাই তাই বেশী কষ্ট, ভাষাকে আয়ত্ত করা ততটা নহে। এই ভাব সব জাতির মধ্যেই যখন একই পছন্দলব্ধন করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তখন আমরা নিজের ভাষার পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া যদি ইহাকে আগে ভাল করিয়া চিনিয়া লই তবে যতটা হৃদয়ঙ্গম হয়, পরের ভাষার পরিচ্ছদে ততটা হয় কি? পরের ভাষা দিয়া আরম্ভ করিলে ভাষা ও ভাব দুইটাই নূতন ঠেকে—শিশুর কোমল মস্তিষ্কে এতটা নূতনত্ব অসহ হইয়া পড়ে।—প্রথম হইতেই তাহার মাথা ঘুলাইয়া দিলে সে শিখিবে কি? জাতীয় ভাষায় প্রথম শিক্ষার প্রবর্তন হইলে চিরপরিচিত মাতৃভাষার পরিচ্ছদে জাগতিক ভাবের প্রাণটাকে যদি একেবারে বুঝিয়া ধরিয়া লইতে পারি, ভাব কি প্রণালীতে জগতে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে—যদি এই মূল সত্যের বোধটা আমার কোনক্রমে জন্মিয়া যায়,—তবে তারপরে—যে কোন দেশের সাহিত্যে প্রবেশ লাভ আর কি কঠিন বোধ হইবার সাধ্য আছে?—তখন ভাষা শিক্ষাটাই যা কষ্ট। একবার ভাষাটা শিক্ষা হইলে পূর্বপরিচিত ভাবকে ধারণা করা আর তখন কঠিন হয় না। বরং নূতন শোষাকে তাহাকে আরও বেশী করিয়া সুন্দর দেখি বলিয়া আরও বেশী করিয়া বুঝিতে পারি। তখন সেই বিদেশীয় সাহিত্য চর্চাকালে যত নূতন ভাবই আমার

আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, স্বদেশভাষার ভাবের সঙ্গে তাহাকে একীভূত করিয়া লইতে পারি। তখনই শিক্ষার সার্থকতা। নূতন ভাষার নূতন ভাবে নিজভাষার ক্ষীণতা পরিপুষ্ট লাভ করিতে থাকে।

কিন্তু আমরা ত তাহা করি না! ইংরাজী আমাদের ধানজ্ঞান হইয়াছে—কারণ ইংরাজী না শিখিলে মোটা চাকরি মেলে না। ‘ক, খ’, এর সঙ্গে ‘A, B, C’র পাঠ আরম্ভ করি। কিছুদিনের মধ্যেই ক-খ’য়ের পাঠ বন্ধ হইয়া A, B, C’র ধারা ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃ-ভাষার স্থান প্রসারিত করা হইয়াছে বটে কিন্তু মান বাড়ে নাই। বাঙ্গালা পড়িয়া এখনও ত বড় চাকরি জুটে না! অধিকন্তু যেরূপ প্রশ্ন পত্র হয় তাহাতে বাঙ্গালার জ্ঞানোন্নতির উপর বিশেষ দাবী করা হয় না—বাঙ্গালীর ছেলে যা বাঙ্গালা স্বভাবতঃ জানে ও বোঝে তাহা লিখিয়াই অন্যায়সে পরীক্ষা বৈতরণী পার হইয়া যায়। ইংরাজীর আসন এতটা উচ্চ হওয়ায় ছাত্রগণের এইরূপ একটা কঠিনভাষাকে ইহার অভিনব ভাবসহ আয়ত্ত করিতে কঠোর প্রয়াস পাইতে হয়—যাবতীয় শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু যে এই চেষ্টার, এই অত্যাশ শক্তিপ্রয়োগের, অন্ততঃ কতকটাও পরিণাম নহে—এ কথা কি কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন?

এ পর্য্যন্ত যা দেখিলাম—অনুকরণের,—*Servile imitation* এর শিক্ষা আমাদের কাল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা শুধু জানি আহরণ করিতে, কিন্তু সমীকরণ করিতে পারি না—কারণ দিন দিন আমাদের জাতীয় জীবনী-শক্তি হ্রাস হইয়া যাইতেছে—তাই এত স্বাস্থ্য-

হানি,—দৈহিক, নৈতিক ও ধর্মজীবনের ক্ষয় লক্ষণ যুগপদ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইলে আমাদের জাতীয় জীবনশক্তির সজীবতা আনয়ন করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃই স্বীয় স্বীয় ভাষার উন্নতির জন্ত আমাদের নিত্য ননোযোগী হইতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে আমরা শিথিল সবই, কিন্তু শিথিল নিজের ভাবে, এবং নিজের ভাষার উন্নতিই তাহার চরম উদ্দেশ্য থাকিবে। আমাদের দেশকাল পাত্রের অনুসারে অস্বদেশীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পরের শিক্ষায় ঘেটুকু ভাল সেটুকুই আমরা গ্রহণ করিব; কিন্তু পরের শিক্ষার যাহা আমাদের অহিতকর তাহা গ্রহণ করিয়া আমরা মরিব না। আমাদের দেশে যখন প্রাতঃকালেই শিক্ষাদানের উপযুক্ত সময়, তখন সেই সময়েই যাহাতে শিক্ষাদান করা হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমাদের দেশ—মুনিখার দেশ—এখানে গুরু—জনক,—‘ইয়ার’ নহে; কারণ তাঁহার নিকট হইতে ছাত্রের ইহকাল ও পরকালের শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরু বাস্তবিকই ছাত্রের জ্ঞানজীবনের জন্মদাতা।

এ আমাদের দেশ চিরকাল ধর্মকে ধর্মের অগ্রে রাখিয়া চলিয়াছে—সেই ধর্মের ভাবে অভাবে এ দেশ যে ধর্ম জীবনে ও নৈতিক শিক্ষায় অধঃপতিত হইতে থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? অতএব এ ভারতভূমিতে শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে বুঝিয়া—ছাত্রকে পুস্তকের বুলি মুখস্থ করাইয়া ছাড়িয়া দিলেই চলিবে না। তাহার চরিত্র গঠিত হইতেছে কিনা—তাহার বুদ্ধিচর্চা ব্রত রক্ষিত হইতেছে কিনা, শিক্ষার

তাহার শরীর ও মনের পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে কিনা—এ সব বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—তবে ছাত্রের দেহ-মন স্বাস্থ্য-সৌরভে চতুর্দিক মুখরিত করিবে। আমাদের বুঝিতে হইবে—কেবল কতকগুলি পুঁথি মুখস্থ করাইয়া বেদম লেখাইয়া এক একটা উচ্ছৃঙ্খল ভ্রমর—গোলামপ্রস্তুত করিবার জন্ত শিক্ষা মেটেই নহে—পুস্তক পাঠ শিক্ষার Medium মাত্র। পুস্তকের শিক্ষা শারীরিক-মানসিক ও আধ্যাত্মিক—এই তিন উন্নতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া গরিপূর্ণ লাভ করে। তাই মানসিক বৃত্তির পরিচালনেন ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত আমাদেব দেশের উপযোগী শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দিবার স্ববন্দোবস্ত করিতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য—আপনার,—স্বদেশের ও জগতের উন্নতি সাধন। কিন্তু সুস্থ দেহ জ্ঞানময় মন ও ধর্মোচ্ছা ব্যতিরেকে এ উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। তাই সর্বপ্রথমে ছাত্রগণ যাহাতে নীলোগ হইয়া সুস্থ দেহের অধিকারী হইতে পারে ও তাহাদের পরস্পরের সংঘর্ষে বা অত্যাচারে কোনও উপায়ে যাহাতে তাহাদের মধ্যে আধি ব্যাধির প্রসার বন্ধ না হয়—এইরূপ ভাবে শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতে হইবে। নির্মল বায়ুর উপভোগ সম্ভব হয়—এমন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। Cleanliness যে godliness—ইহা ছাত্রের মনে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। কেননা অপরিচ্ছন্নতা অনেক সময়েই ব্যাধির মূলাছুত কারণ। ছাত্রের খাড়াখাড়া বিষয়েও বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে—খাণ্ডের অসুন্দর বস্তু মনোবৃত্তির ক্ষুরণ হয় খুব সত্য কথা।

এইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে ছাত্র সুস্থ শরীরে নিগমিত সময়ের অল্পপরিমাণে এখনকার

প্রাণহানিকর শিক্ষার ব্যবস্থায় যতটা সময়ে যতটা শিক্ষা করে, তাহা হইতে অনেক কম সময়ের মধ্যে অনেকটা বেশী শিক্ষা করিতে পারিবে। তদুপরি যদি ছাত্রের মনে ধর্মভাবের পূর্ণ বিকাশ করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে ছাত্রের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন উত্তরোত্তর সজীবতার আনন্দে হাসিয়া উঠিবে—সে স্বচ্ছায় জগতের মঙ্গল বিধান—আপনার মঙ্গল সাধন বলিয়া ধরিয়া লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে।

মনে রাখিতে হইবে—ধর্মশিক্ষা যে জাতির নাই, সে জাতি কখন আদর্শ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে না। নৈতিক অধঃপতন তাহার শিক্ষা-গর্ভের মূলচ্ছেদন করিয়া দেয়। বাস্তবিকই যে জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড নাই, সে জাতি কখন জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। তাই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু সে ধর্মশিক্ষা যেন আজকালকার বিদ্যালয়-বিশেষের মত সাম্প্রদায়িক-ধর্ম শিক্ষা না হয়। যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রগণের সম্মিলন হইয়া থাকে, সেখানে সাম্প্রদায়িক ধর্মে চলিবে কেন? সাম্প্রদায়িক ধর্ম সেখানে গোঁড়ামি করিয়া ছাত্রের প্রাণে শুদ্ধ বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। সে নিজ ধর্মমতের সঙ্গে এ ধর্মের সমতা করিতে না পারিয়া অবিধাসী হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য থাকিবে—ছাত্রের নিজ ধর্ম মতের পরিবর্তন নহে। যা'র যা'র ধর্ম, তা'র তা'র থাকিবে। কারণ কোনও ধর্মই মানিয়া চলিলে মানুষের পক্ষে অহিতকর নহে। কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষা দিবে—সার্বজনীন—ধর্ম—মানুষের আদি ধর্ম, যে ধর্ম না হইলে কোন মানুষেরই চলে না, ধর্মের সেই মূল সত্যগুলি।—বৈদিক

শ্বর আছেন, তিনি অধর্মের শত্রু, কারণ তিনি ধর্মময়, যাহা সত্য তাহার উৎসাহ। নই ধর্ম ইত্যাদি। ছাত্রের মনে এই সনাতন ধর্মের সৃষ্টি করিতে পারিলে, সে একটা প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিকে,—কাজেই মানুষ মাত্রকে সে তাহার নিজ জাতিভুক্ত করিয়া লইতে পারিবে, মানুষমাত্রের মঙ্গলই তাহার মঙ্গল বলিয়া তাহার পূর্ণ প্রীতি জন্মিবে, তাহার মনের সর্ব কুংসকারের নিরাকরণ হইয়া যাওয়ায় তাহার মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য ফুটিয়া উঠিবে।

ভারত তপস্বীর দেশ। এ ভূপোবনে ধর্ম দৃষ্টিতে শিক্ষার যে বিমল জ্যোতিঃ-প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে এ জাতির মহিমোজ্জ্বল হইয়াছিল ও সে জ্যোতিঃ মহা-প্রাণন উজ্জলিয়া পড়িয়া স্বদূরপাশ্চাত্য শিক্ষাকেও ভাঙর করিয়া দিয়াছিল। যে জাতি শরীরকে আগে রাখিয়া শিক্ষা ও সাধনা করিয়াছিল, যে জাতিই প্রচার করিয়াছিল—“শরীরমাংসং ধনুঃ ধর্ম সাধনং”—সে জাতির বংশধর আজ শরীরকে অবমাননা করিয়া যদি কেবলই শিক্ষায় দীক্ষিত হইতে চাহে, তবে কি বুঝিতে হইবে না যে, এ জাতি তাহার অতীত মহিমাকে অবজ্ঞা করিতেছে, তাহার জাতীয়তাকে ভুলিয়াছে,

তাহার নিজস্ব সম্পত্তিকে তুচ্ছ করিয়া পূর্বের অজানিত অনিশ্চিত ‘অশ্রুগ্যা’ ধনের লোভে দিগন্তের পানে ভাসিয়া চলিয়াছে! এটা কি বোঝা বড় শত্রু কথা যে, যে দেশে যে প্রণালীতে ব্যাস-বাস্কিকী, কাণিদাস-ভবভূতি, কপিল-পাতঞ্জল, চরক-সুশ্রুত শিক্ষিত হইয়া ছিলেন, সেই দেশের পক্ষে সেই শিক্ষা-প্রণালীই সর্বোপেক্ষা যুক্তিযুক্ত, ফলপ্রসূ ও মহিমময়? সে দেশের কি অল্পকরণের শিক্ষায় স্বাস্থ্যহানি অশেষ লজ্জাকর নহে? হইতে পারে—সে সময় আজ নাই, সে পাত্র নাই, বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে অনেক পরিবর্তন ঘটয়া গিয়াছে। কিন্তু সে দেশত তেমনি আছে, সে দেশের অতীত মহিমার জাজ্জল্যপ্রমাণ অতুলনীয় গ্রন্থ-রাজি ত এখনও বর্তমান! তবে কেন সে জাতি নিজস্বকে ভুলিয়া গেল? নর্মান সভ্যতা-লালিত ইংরাজের মত পরস্বকে সমীকৃত করিয়া আপন গোরবে আপন আদর্শে দেহ-মনের সামঞ্জস্যে সে কেন আপন শিক্ষা-সৌধ গড়িয়া তুলিল না? কবি বুঝি তাই কাদিয়াছিলেন—

“হে বঙ্গ! ভাঙারে তব বিবিধ রতন,  
তা’ সবে অবোধ আমি অবহেলা করি,  
পরধন লোভে মত্ত।”

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

## চিকিৎসকের কর্তব্য।

[ সয়মনসিংহ বৈদ্যমঙ্গলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীমুক্ত ভ্রামাচরণ মৈত্র কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ। ]

ভারতবর্ষে হিন্দুরাজগণের অন্তর্দ্বানের সঙ্গে সঙ্গে রাজত্বগ্রহের অভাব এবং বৈদেশিক চিকিৎসার অভ্যাস বশতঃ আয়ুর্বেদের বিশেষ

অবনতি ঘটয়াছিল। মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে ভারতবাসী যে বিদ্যাবাক্য প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক গ্রন্থ ভুলিয়া

দিয়েছে। বিশেষতঃ মুসলমান রাজগণ হেকিম চিকিৎসারই প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। তৎপরে ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রসার লাভ করিয়া জগৎ-দ্বাপী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হেকিম চিকিৎসা ও বর্তমান উন্নতশীল পাশ্চাত্য চিকিৎসাও যে আয়ুর্বেদ সমুদ্র মণিত—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চরক এবং সুশ্রুত সংহিতা প্রথমতঃ আরব্য ভাষায় ও পরে তাহা হইতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে—ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত ল্যাটিন ভাষার অনুবাদই চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলভিত্তি। ইউরোপীয় ভৈষজ্যশাস্ত্র সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রাচ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নিকট স্বামী। আজিও ইউরোপের চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদগণ ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ-গুলি আবিষ্কারের জন্য সমুৎসুক। সুখের বিষয় ভারতবাসীও এজন্য উঠিয়া-পড়িয়া গিয়াছেন।

কিন্তু কেবল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইলেই আয়ুর্বেদের উন্নতি হইবে না। আধুনিক অনেকেই নিদান মতক করিয়াই আয়ুর্বেদের পাঠ সমাপন করেন ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে রোগ-পরিচয় না হওয়ার ব্যবহার ব্যতিক্রমে অনেক স্থলে ফল বিপরীত হইয়া দাড়ায়, চরক সংহিতায় লিখিত আছে ;—

কৃতপূর্ণাবদাত্ত্বং বহুশো দৃষ্ট কৰ্ম্মতা ।

দাক্ষ্য শোচমিতিজ্যেং বৈত্তেগুণ চতুষ্ঠয়ম্ ॥

স্বত্র স্থান, নবম অধ্যায় ।

ঔষু পড়িয়া বিদ্বান হইলে চলিবেনা, হাস-পাতাল স্থাপন করিয়া আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থিদিগকে

প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে—এজন্য শরীর তত্ত্ববিৎ উপযুক্ত কৃতবিদ্য অধ্যাপকের প্রয়োজন। কাজেই প্রথমতঃ উপযুক্ত আয়ুর্বেদজ্ঞকেই পাশ্চাত্যমতে অন্তর্চিকিৎসাদি শিক্ষা করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই মহত্বদেয় সাধনের নিমিত্তই কলিকাতা মহানগরীতে “অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়” নামে একটি কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। শুনেতেছি টাঙ্গাইল অঞ্চলেও এইরূপ একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে।† দেশে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের ঘেরূপ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে দুই একটি কলেজে অভাব পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। কাজেই যাহাতে প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ পক্ষে একটি করিয়া কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করা কর্তব্য।

ঔষধ প্রস্তুত বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। অনেক সময় ছাত্র ও ভৃত্যের উপায় ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি। ঔষধ প্রস্তুত করিতে যে শুদ্ধাচার সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, পাশ্চাত্য সংসর্গে পড়িয়া আমরা এ কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। অশুচি শরীরে ঔষধ প্রস্তুত করিলে ঔষধের গুণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপ আমি এ স্থলে ‘কাসন্দের’ কথা উল্লেখ করিতে পারি। ‘কাসন্দ’—সরিষা বাটা ও কতিপয় মসলার একটি সংমিশ্রণ আমাদের ময়মনসিংহ অঞ্চলে ইহা বর্ধে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রস্তুতকালে শরীর কোনরূপ অশুচি থাকিলে,—এমনকি অশুচি ব্যক্তির দ্বারা পর্য্যন্ত লাগিলেও নষ্ট হইয়া যায় এবং স্বাস্থ্য

† প্রস্তাব চলিতেছে,—না আমরা শুনিয়াছি, টাঙ্গাইলেও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

গন্ধ সমস্তই বিকৃত হইয়া পড়ে। তখন ইহা পচিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু শুদ্ধাচারে প্রস্তুত 'কাসন্দ' দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আমাদের আয়ুর্বেদোক্ত আসব-অরিষ্ট সমূহও কাসন্দের মত শুদ্ধাচারের সামান্য ব্যতিক্রমেই নষ্ট হইয়া যায়—তাহা আমি অনেকস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কাজেই প্রত্যেক চিকিৎসকের শুদ্ধাচার পরায়ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ঔষধের উপাদান সমূহ যাহাতে পচা ও কীটদংশন না হয় সে বিষয়ে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল ব্যবসায়ী বেণে ও বেদে জাতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না।

দেবভালয়-বন্দীক-কুপ-রথ্যা-শশানজাঃ।

অকাল তরুমূলোখা নানাধিক চিরন্তনাঃ।

জলাগ্নি ক্রিমি সংক্ষুদ্রা ওষধাস্ত ন সিদ্ধিদাঃ ॥

এই বাক্য প্রতিপালন করিতে হইলে চিকিৎসকে স্বহস্তে দেখিয়া-ভুনিয়া বনজ ওষধি সমূহ সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমরা ইহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন। একপ অবস্থায় আয়ুর্বেদের উন্নতি কিরূপে সম্ভবে? ওষধি উদ্ধৃত করিবার কালাকালও আমরা বিচার করি না।

মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষা বসন্তয়োঃ।

স্বকন্দো শরদি ক্ষীরং যথর্তুং কুসুমং ফলম্।

হেমন্তে সারমোষধ্যা গৃহীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥

আমরা এই বাক্যের কি সার্থকতা রক্ষা করি?

শূর্য্যকালে চিকিৎসকগণ মস্তপূতঃ করিয়া শ্রদ্ধার লবিত ওষধি উত্তোলন করিতেন। আর রক্তমাংসে আমরা পায়খানা হইতে ফিরিবার

সময়ও ওষধি উদ্ধৃত করি। আয়ুর্বেদের কি শৌচনীয় অধঃপতন! একপ অনাচার সত্ত্বেও যে ঔষধের ক্রিয়া হয়, ইহাই ত আশ্চর্য্যের বিষয়!

কতকগুলি বনৌষধির অপ্রাপ্তি এবং অপরিচয়ও আয়ুর্বেদের অবনতির অন্যতম কারণ। মেদ, মহামেদ, জীবক, ধ্বজক প্রভৃতির অভাব সত্ত্বেও চ্যবনপ্রাণ প্রভৃতি ঔষধের আশ্চর্য্য ফল পরিলক্ষিত হইতেছে। মেদ, মহামেদ প্রভৃতি আধিক্য হইয়া ঔষধগুলি যথাযথভাবে প্রস্তুত হইলে বৃদ্ধব্যক্তিও যে চ্যবন মূনির তায় পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বন-জঙ্গলে যে সমস্ত অপরিচিত গাছগাছড়া দেখা যায়, অহুসন্ধান করিয়া ঐ সমস্ত অপরিচিত গাছগাছড়ার আকৃতি, গুণ ক্রিয়া, স্বাদাদি পর্যালোচনা করিয়া চিনিয়া লইতে পারিলে আয়ুর্বেদের মহোপকার সাধিত হয়। আবার কতকগুলি বনৌষধি আছে—তাহা এক নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোকিলাক্ষ, বৃহতী, বিদ্ধড়ক ইত্যাদি। কোকিলাক্ষের সন্দেহ মীমাংসার জন্ত কলিকাতার জনৈক বিখ্যাত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু কোকিলাক্ষ-বীজ আনা হইয়াছিল। তিনি কোকিলাক্ষ নাম দিয়া এলবালুকা \* পাঠাইয়া ছিলেন। কোকিলাক্ষ কখন ও এলবালুকা হইতে পারে না। ইহাকে হিন্দুস্থানে তালমখন, উৎকলে 'মাখুরেণ' নামে অভিহিত করা হয়। তবে কি কোকিলাক্ষ আমাদের দেশে তালমাখনেরই নামান্তর নহে? পদ্মকাঠস্থলে কেহ

\* এ কবিরাজ মহাশয়টি কে—তাহা প্রবন্ধ লেখকের বলা উচিত। যে কবিরাজ 'কোকিলাক্ষ' চাহিলে 'এলবালুকা' দিয়া থাকেন, তিনি কবিরাজ নামেরই অমুণমুস্ত। আমরা জানিতে চাহি—কিহি কবিরাজ বৈদ্য? না বৈদ্যের ব্যবসায়ী? আং সং।

ফুলপত্র কেহ বা বেনে দোকানের একপ্রকার কাঠ (যে কাঠ দ্বারা কেবোসিনের বাকস প্রস্তুত হয় দেখিতে অনেকটা সেইরূপ) ব্যবহার করেন। আমি অনেক প্রাচীন কবিরাজকে আমাদের দেশীয় পাউড়া কাঠ (রঙ্গি কাঠ) ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। পাউড়া—বকম ও নিম দ্বাণীয় বৃক্ষ বিশেষ। ইহার সার পদ্ম গন্ধ বিশিষ্ট ও দেখিতে ঠিক পদ্মবর্ণ। কাজেই আমারও ইহাই পদ্মকাঠ বলিয়া বিশ্বাস। তবে পার্শ্বতা প্রদেশজাত রঙ্গিকাঠ ব্যবহার করা উচিত। বিকটক আমাদের দেশে-ঘিরি গোটা নামক একপ্রকার লতার বীজ ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা গুলঞ্চ পাতা সদৃশ, তলদেশ মসৃন ও শ্বেতবর্ণ। ফুলগুলি ঠিক কদমী লতার ফুলের ছায়। গাছ পান,—সাঁচি, কাল, সাদা ভেদে পান যদিও চারিপ্রকার, কিন্তু সাঁচি পান ব্যবহারই আমি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। হরষের পরিবর্তে ধনের ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং উষা পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকে ধারণা। আমি আইশ্লে নামক একপ্রকার লতা প্রাপ্ত হইয়াছি। উষা বঁটা, পাতা পিপুল গাছের মত। ফল অশ্বথ ফল সদৃশ। পাতা ও ফলে মৎস্যের ছায় গন্ধ পাওয়া যায়। মাছের আইশের ছায় গন্ধ বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম আইশ্লে হইয়াছে। হরষের অকৃত্রিম সহিত সৌন্দর্য বর্তমান বলিয়া আইশ্লেকেই হরষ বলিয়া ধারণা হয়। বৃহৎ ঠারয়ের স্থলে কোথাও ছোট ব্যাকুড় ও বড় ব্যাকুড়, কোথাও বা ছোট ব্যাকুড় ও কণ্টকারী ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদের উন্নতি করিতে হইলে ইহার মীমাংসা এবং অপ্রাপ্য ও অপ্রাপ্য বনৌষধি গুলি আবিষ্কারের জন্য একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

প্রতিবৎসর আয়ুর্বেদ সভার সঙ্গে প্রদর্শনী খুলিলে অনেক উপকার হয়। অনুসন্ধান সমিতিতে যে সমস্ত বনৌষধির আবিষ্কার হইবে, তাহা প্রতিবৎসর উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদত্ত হইলে অপরিচিতি বনৌষধির পরিচয় ও অকৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুত—যুগপৎ সম্পাদিত হইবে।

লৌহ, অন্ন প্রভৃতি ধাতুসমূহের যত অধিক পুট দেওয়া হয়, ততই তাহার কার্যকারিতা-শক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে। ধাতু সমূহ অত্যধিক জারিত হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অণুপরমাণুতে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মানব দেহে ক্রিয়া প্রকাশ করে। শরীরাবয়ব অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র।

শরীরাবয়বাস্ত পরমাণু ভেদে নাপরিসংখ্যায়

ভবন্তি,

অতি বহুবাদতি সৌন্দর্য্যাদতীন্দ্রিয়তাচ্চ।

চরকসংহিতা, শারীর স্থান, সপ্তম অধ্যায়।

এই যে পরমাণু—এই পরমাণুর সহিতই বর্তমান হোমিওপ্যাথিক তত্ত্ব নিহিত আছে। শরীরস্থ এই সূক্ষ্মতম অবগত হওয়াতেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি ডাইলিউসন দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম পরমাণুতে বিভক্ত হইয়াছে। অণুর সহিত অণু, পরমাণুর সহিত পরমাণু মিশ্রিত হয়। পরমাণুর সহিত অণু মিশ্রিত হইতে পারে না। সমধর্ম্মীর সহিত সমধর্ম্মীর মিলন স্বাভাবিক। এই জন্যই জলের সহিত জল, তৈলের সহিত তৈল মিশ্রিত হয়। তৈলের সহিত জল মিশ্রিত হইতে পারে না। মানবদেহের সমধর্ম্মী করণার্থই মহর্ষিগণ লৌহ, অন্ন প্রভৃতি ধাতু সমূহ সহস্রাধিকবার জারণ-মারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাজেই জারণ-মারণে বিশেষ সূক্ষ্মদ্রুতি রাখিতে হইবে। এরূপ সূক্ষ্ম কবিরাজ আছেন—বাহারা বরিশাদের আদিত

দ্রব্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে টাকায় ১৫।১৬ তোলা লৌহ, অন্ন, বঙ্গ প্রভৃতি ধাতু সমূহ খরিদ করিয়া ব্যবসায় করিতেছেন। আবার অনেক নব্য কবিরাজ গেরিমাটি ও হীরাকস ভঙ্গ হইতে কৃত্রিম উপায়ে লৌহ ভঙ্গ প্রস্তুত করিয়া বাখহার করিতেছেন। কিন্তু একথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—চিকিৎসা বিষয়টা অর্থকরী বিদ্যা বা সাধারণ ব্যবসায়ের জিনিষ নহে।

চর্চানা থাকায় আয়ুর্বেদের সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কাহারও স্বাস্থ্য পরিবর্তনের আবশ্যক হইলে ডাক্তারের সাহায্যে স্থান নির্বাচন করিয়া লইতে হয়। অথচ চরকের সূত্রস্থানে স্থান-নির্বাচনের অতি সুন্দর পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তিকর্ম ও চর্চাভাবে আজ লুপ্ত প্রায়। ইহাতে বুঝা যায়,

আমাদের যাহা আছে, তাহার চর্চাই রীতিমত হইতেছে না। অথচ বর্তমানে আমাদের কিছু নাই বলিয়াই চীৎকার করিতেছি।

উপসংহারে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, আয়ুর্বেদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে হিংসা, ঘেঁষ পরিভ্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে এক মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আমাদের সব ছিল বা আছে—একথা বলিলে কেহ শুনিবে না। যতদিন আমরা কার্যক্ষম না হইব বা কাম্যের দ্বারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিতে না পারিব—ততদিন আয়ুর্বেদ যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিবে—ইহা সুনিশ্চিত। নিঃস্বার্থভাবে ও সমবেত চেষ্টায় আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে আশ্রয়-নিয়োগ করিলে আবার ইহার পুনরুত্থানেব আশা করা যায়।

শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর লোহ।

## মানব-জন্ম-রহস্য।

—:—

পূর্ব প্রকাশিত—“গর্তিনীর সাধ ভক্ষণ”, প্রবন্ধে বলিয়াছি,—চতুর্থ মাস গর্ভকালেই দৌলজ্ঞ প্রাপ্তিবশতঃ গর্তিনীর সাধ ভক্ষণ কাল আরম্ভ হয়, এবং তৎকাল হইতেই নিম্নলিখিত রূপে জন্ম বর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অভিলাষ জন্মিতে আরম্ভ হয়, সে জন্ম সম্ভাবন কুমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত গর্তিনীর অভিলাষ পূর্ণ করা গৃহস্থ মাত্রেয়ই একান্ত কর্তব্য, নতুবা ভাবী কুমিষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমাদের এতদ্দেশে এতিষষক সমালোচনা মোটেই না

থাকায় চতুর্থ মাসের স্থলে অধিকাংশই দশম মাসে মাত্র একটি দিন শুভক্ষণ দেখিয়া নির্ভর্য্যে পূর্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন বা পরমার গর্তিনীকে ভক্ষণ করিতে দিয়াই সাধ ভক্ষণ কার্য শেষ হয়। এক্ষণে পঞ্চম মাস গর্ভ কাল হইতে সম্ভাবনের জন্মকাল পর্যন্ত রহস্য বিবরণ আর্ধ্য শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলি বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। আয়ুর্বেদ বলেন,—

“পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ জন্মের বন জন্ম বর্ষ মাসে বৃদ্ধি জন্মে। সপ্তম মাসে গর্ভস্থ



সন্তানের দেহে ওজঃ ধাতু জন্মে, এবং গর্ভিণী ও গর্ভের সন্তান মুহুঃ পরস্পর পরস্পরের ওজঃ গ্রহণ করে—অর্থাৎ কখন বা গর্ভিণীর ওজঃ পাতৃ সন্তান গ্রহণ করে, আবার কখন বা সন্তানের ওজঃ গর্ভিণীর দেহে সঞ্চার করে, এ নিমিত্ত গর্ভিণী ও সন্তান ওজের অভাব ও পূরণ হত্ব যথাক্রমে মান ও প্রফুল্ল হয় ; অর্থাৎ যখন গর্ভিণীর ওজঃপাতৃ গর্ভস্থ শিশু গ্রহণ করে, তৎকালে গর্ভিণী মান ও শিশু প্রফুল্ল হয় আবার যখন শিশুর ওজঃপাতৃ গর্ভিণীর দেহে সঞ্চার করে, তখন গর্ভস্থ শিশু মান এবং গর্ভিণী প্রফুল্ল হইয়া থাকে । সুতরাং অষ্টম মাসে ওজঃপ্রতিরতা না থাকা জন্ত তৎকালে সন্তান ভূমিষ্ট হইলে প্রায়ই জীবিত থাকে না ।\*

অষ্টম মাসে নৈঋত কোণের অধিষ্ঠাতার উক্তোক্ত বর্গ (মাংস অন্ন) প্রদান করা কর্তব্য ।† যেহেতু উক্ত নৈঋত কোণের অধিষ্ঠাতাও পিতৃ শিব অংশভাগী । এমন কি স্বয়ং মহাদেবও উক্ত রাক্ষসকে সন্তান রক্ষার নিমিত্ত বর্গ প্রদান করিয়াছেন ।

কুমার তত্ত্ব উক্ত আছে যে, গর্ভিণীর অষ্টম মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অধিপতিকে মাংস ও অন্ন দ্বাৰা বর্গ প্রদান করিবে ।

যথা—“নবম, দশম একাদশ অথবা দ্বাদশ মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হইয়া থাকে ।\* ইহার অন্তরিক্ত বিলম্ব হইলে বিকার প্রাপ্ত বলিয়া

বুঝিতে হইবে ।” (যদিও এদেশে দশ মাস ও দশ দিনের প্রসবকেই স্বাভাবিক প্রসব বলা হইয়া থাকে, তথাপি উহার ব্যতিক্রমে যথা নবম বা একাদশ ও দ্বাদশ মাসে প্রসবকেও যে অস্বাভাবিক বলা যায় না এতদ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ হইতেছে ।)

এক্ষণে গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের কোন অঙ্গ সর্বাগ্রে জন্মে, তাহাই কথিত হইতেছে ।

শৌনক বলেন যে, গর্ভের অগ্রে শিরোদেশই জন্মে । কারণ মস্তকই দেহ ও ইন্দ্রিরের মূল । কৃতবীৰ্য্য মুনি কহেন যে, অগ্রে হৃদয় জন্মে, কারণ হৃদয়ই বুদ্ধি ও মনের স্থান । ব্যাসদেব কহেন যে, নাভি অগ্রে জন্মে, কারণ প্রাণ তৎস্থানে অবস্থান পূর্বক তেজঃ সহকারে দেহীর সমস্ত দেহ বর্দ্ধন করে । মার্কণ্ডেয়ের মতে অগ্রে হস্তপদ উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত আছে, কারণ হস্ত পদই দেহীর সকল ক্রিয়ার মূল । মুনি শ্রেষ্ঠ গৌতম বলেন যে, কোষ্ঠ অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগ অগ্রে জন্মে, কারণ তাহাতেই সমস্ত অবয়ব উৎপন্ন হয়, কিন্তু উক্ত মত সকল সম্ভব নহে । কেননা ধনুস্তরি বলেন যে,—সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এককালেই জন্মে, চ্যুত ফলের স্থায় অতি ক্ষুদ্রতা প্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না । যেমন আত্র ফল পাকিয়া উঠিলে তাহার কেশর, মাংস, অস্থি ও মজ্জা প্রভৃতি পৃথক রূপে দৃষ্ট হয় । সেই ফলের

\* কারণ ওজঃ ধাতুই মানবের জীবন স্বরূপ । যেহেতু দেহস্থ বস্তুর রস লইতে, ওজঃ পদার্থ সমস্ত পুষ্কর মধ্যে গুহ্যবস্তুর পুষ্করভূমি ছয়টি ধাতুতেই মল থাকে, কিন্তু শুদ্ধ মল থাকে না, সেই শুদ্ধ আহার পরিপাক হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হয় । উহার তুল্যভাগ শুদ্ধ এবং দেহের দুইভাগ, ওজঃরূপে পরিণত হয় । এহলে অষ্টম মাসের সন্তান বাহারা ধাতু ওজঃ গ্রহণ কালে অত্যন্ত প্রফুল্লবস্থায় জন্মে, সেই সকল সন্তানে ছেলেকে জীবিত থাকিতে দেখা যায় । আর বাহারা মাড়াকে ওজঃ অর্পণ কালে ভূমিষ্ট হয় তাহারাও অষ্টম মাসে মরিয়া যায় । এক্ষণে জন্মান বোধ হয় ক্রমবিক বিলম্ব সিদ্ধান্ত না হইতেও পারে ।

† এক্ষণে প্রথা আদৌ প্রচলিত দেখা যায় না ।

তরুণাবস্থায় ঐ সকল কেশর প্রভৃতি অতি  
সুন্দরভাবে থাকে বলিয়া দেখা যায় না, ক্রমশঃ  
কালি সহকারে তাহারা প্রকাশ পায় ; সেইরূপ  
গর্ভেরও তরুণ অবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল  
থাকা সত্ত্বেও অতিব সূক্ষ্ম প্রযুক্ত তাহার উপ-  
লব্ধি হয় না। ক্রমশঃ কাল সহকারে সেই  
সকল প্রকাশিত হয়।

উক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের মধ্যে পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ, আয়ুজ, সহজ ও শাস্ত্রজ এই সকল ভাগের বিবরণ—ক্রমান্বয়ে বিবৃত করা যাইতেছে। যথা,—

পিতৃজ্ঞান,—কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি,  
নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও রেতঃ এই গুলি  
পিতা হইতে জন্মে।

মাতৃজ্ঞান,—মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা,  
 হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অস্ত্র ও গুহ এই  
 গুলি নিতান্ত কোমল পদার্থ এবং ইহারা মাতা  
 হইতে জাত ।

রসজ্ঞান। শারীরিক বৃদ্ধি, বল, বর্ণ ও  
স্থিতি এ সমুদয়ই রস হইতে উৎপন্ন।

আত্মজ্ঞান ।—ইন্দ্রিয় সমূহ, জ্ঞান বিজ্ঞান, পরমায়ু, স্ব্থ ও দুঃখ প্রভৃতি আত্মজাত বিষয় । আত্মজ্ঞ অর্থাৎ আত্মজাত. বিষয় মধ্যেই সম্বন্ধ ও সাংঘর্ষ্য বিষয় সকল অন্তর্ভূত থাকে । কারণ দেহীর আত্ম ইচ্ছাক্রমেই আহার-বিহার ও ব্যবহারাদি সংঘটিত হওয়াতে ইন্দ্রিয় সমূহ পরিচালিত হইয়া স্বীয় কর্ম্মানুসারে—জ্ঞান, বিজ্ঞান, পরমায়ু এবং স্ব্থ ও দুঃখাদি পরিণাম উপস্থিত হইয়া লইয়া থাকে । যদিও উক্ত বিষয় সকল পূর্ব জন্মের অদৃষ্ট ফলের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে বটে, কিন্তু সংসর্গ ও আচার ব্যবহার প্রভৃতি আত্মজ কর্ম্ম দ্বারা সে অদৃষ্টকে বহু পরিমাণে আয়ত্ত কবা যাইতে

পারে। ফল যে কার্ণের আয়ত্ত এবং কন্ম যে  
আত্মজ ইহা সর্ববাদী সম্মত।

গভের বিশিষ্ট উপকারী পদার্থ বণিত হই  
তেছে। অগ্নি, সোম, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ,  
স্ব, রজঃ, তম, পক্ষেদ্রিয় এবং কণ্ঠ পুণ্য--  
ইহার গর্ভকে জীবিত রাখে।

অগ্নি শব্দে এখানে পাচক, আলোচক, রঞ্জক, ভ্রাজক ও সাধক এই পাঁচ প্রকার, অব পঞ্চভূতগত পঞ্চ প্রকার এবং বাত, গত উদ্রাকে বুদ্ধিতে হইবে। উক্ত অগ্নি শক্তিরূপ বান বলিয়া বাক্যের অধিদেবস্থ প্রাপ্ত হয় ও পরিপাকাদি ক্রিয়া দ্বারা গর্ভস্থ শিশুকে জীবিত রাখে। তারপর সোম (জল) পঞ্চায়ত-শ্লেষ্মা, রস ও শুক্র প্রভৃতি সোমায়ক যে সকল পদার্থ—শরীরে নিহিত আছে, তাহা দিগের এবং রসেন্দ্রিয়ের শক্তি স্বরূপ হইয়া দেহে অবস্থিত করতঃ মনের অধিদেবতা স্বরূপ হইয়া সেই সোমায়ক পদার্থ গুণ্ডঃ প্রদীপ্ত সম্পূর্ণ এবং পঞ্চ প্রকার আগ্নেয় পদার্থ ও বায়ু দ্বারা শোষিতাংশকে আর্দ্রতা বিধান করতঃ জীবনের অনুকূলতা সম্পাদন করিয়া থাকে। পৃথিবী, জলদ্বারা ক্লিন্নাবস্থা প্রাপ্ত গর্ভের কাঠিন্য বিধানে শরীরস্থ দোষ, বাত, মল এবং তদবয়ব অঙ্গ, উপাঙ্গ প্রভৃতির সঞ্চারণ ও উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস দ্বারা আকাশ, বায়ু ও অগ্নি কর্তৃক বিদারিত হ্রোতঃ সকলকে উর্ধ্ব, অঙ্গ ও তির্ঘ্যগ গমনে অবকাশ প্রদান পূর্বক শিশুর জীবন রক্ষা করে। স্বপ্ন, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ মনের স্বরূপতার পরিণত হইয়া—জীবাশ্মার শরীরাত্তর গ্রহণ ও সোমের কারণ বলিয়া গর্ভস্থ শিশুকে জীবিত রাখে।

পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ—চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—ইহারা স্ব স্ব কার্য অব্যাহত রাখে।

ক্ষয়, কপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ রূপ ক্রিয়া দ্বারা  
পাণ্ডুর প্রাক্কুল্য করিয়া থাকে।

ভূতাদ্যা অর্থাৎ কশ্ম-পুরুষ। এই কশ্ম-

পুরুষ জাগরিক অনন্ত জন্ত সমুহের চৈতন্ত  
স্বরূপ হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে।

ডাঃ শ্রীমলিনী নাথ মজুমদারঃ

## ক্ষয়রোগ।

—:~:—

• ক্ষয়—ক্ষয় বশতঃই ক্ষয় রোগ বঙ্গদেশে  
এত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। পূর্বেই বলা  
হইয়াছে যে (১) শোক, চিন্তা, ঈর্ষ্যা, উৎকর্ষা,  
ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি কারণে (২) কুশ ব্যক্তি  
কক্ষ অন্ন পান সেবন করিলে, (৩)  
অপ্যাহার করিলে হৃদয়স্থ রস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়  
এবং বজ্রাদি পরবর্তী ধাতু সকলেরও ক্রমশঃ  
ক্ষয় হইয়া থাকে। (৪) অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস  
বশতঃ শুক্রক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং মজ্জাদি পূর্ব-  
বর্তী ধাতু সমূহ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(১) শোক, চিন্তা, ঈর্ষ্যা, উৎকর্ষা, ভয়  
ও ক্রোধ প্রভৃতি উপসর্গগুলি আজকাল  
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সম্যাকরূপে বিদ্যমান।  
বর্তমান অকাল মৃত্যুর যুগে পুত্রকন্টার শোক  
পাইতে হয় নাই—এমন গৃহস্থ নাই বলিলেও  
মতান্ত্রি হয় না। চিন্তার ত অবধি নাই। অন্ন  
চিন্তায় মনস্ত বাঙ্গালী জর্জরিত। তাহার উপর  
নাতিদায়, পিতৃদায়, কন্ডাদায়, সামাজিক দায়  
প্রভৃতি আছে। শাস্ত্রে চিন্তাদি কারণে হৃদয়স্থ  
রস শুষ্ক হয় লিখিত হইয়াছে। চলিত কথায়  
বলে—“ভাবনায় বকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।”  
প্রত্যেকই এখন সমগ্র বাঙ্গালী জাতির এইরূপ  
সংস্থা নাট্যবোধে।

ঈর্ষ্যাও বাঙ্গালার বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ  
করিয়াছে। প্রতিবাসী দুই বেলা পেট ভরিয়া  
থাইতে পাইলে অনেকে ঈর্ষ্যা পরতন্ত্র হন।  
আত্মীয় স্বজনের উন্নতি দেখিলে হিংসায় জলিয়া  
উঠেন।

উৎকর্ষারও অবধি নাই। আজ ছেলে—  
কাল মেয়ের রোগ, কখন কি হয়। কাল সাহেব  
চটিয়াছে, বুঝি চাকরী:যায়:। তার উপর ঋণ  
আছে, মহাজন আছে, কুটুম-কুটুম্বিতা আছে।  
ভয় আমাদের সর্বদাই। পথে গাড়ী-ঘোড়া  
চাপা পড়িবার বা বলবান ব্যক্তির অঙ্গ সংঘর্ষণ  
ভয়, আপিসে সাহেবের ভয়, গৃহে গৃহিণীর  
অলঙ্কারের ও মুদ্রি-ধোপার তাগাদার ভয়!  
আমরা এখন ভয়ে ভয়ে বাই—ভয়ে ভয়ে চাই!

\* শরীর দুর্বল এবং মন নানা কারণে বিরক্ত,  
কাজেই অল্পেই বাঙ্গালীর ক্রোধের উদ্রেক হয়।  
সে ক্রোধ—ভূত্যা-গৃহিণী ও পুত্র কন্টার উপরে  
বা অল্পপরিচিত প্রতিবাসী প্রভৃতির উদ্দেশে  
প্রকাশিত হয়।

২। শাস্ত্রে কুশ ব্যক্তির রক্ষায় সেবন  
ক্ষয় রোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।  
বাঙ্গালী মাজেই এক্ষণে কুশ। দুই একজন  
স্থূল বা অতিস্থূল থাকিতে পারেন, কিন্তু মাষরাশির

ভ্রায় (অর্থাৎ এক রাশি মাষ কলায়ের মধ্যে দুই একটি ছোলা থাকার মত) তাহা নগণ্য। এই কৃশ বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে কক্ষ্মাই সেবন করিতেছে। স্নেহ প্রধান বিপুল যত এক্ষণে অবিশুদ্ধ। যাহা পাওয়া যায় তাহাও অতীব দুর্বল। গড়ে একজন বাঙ্গালীর প্রত্যহ দুই বেলা দুই ফোঁটা যত উদরস্থ হয় কিনা সন্দেহ। তৈল সম্বন্ধেও প্রায় তদ্রূপ। যাহাদের শাকাম জুটে না, তাহারা যত তৈলাদি পাইবে কোথায়? এই স্নেহের অভাবে ক্ষয় রোগ আমাদের প্রতি এত নিঃস্নেহ হইয়া পড়িয়াছে।

৩। দুর্বল ব্যক্তির অনশন বা অন্নানশন ক্ষয় রোগের অন্ততম কারণ। দুর্বল বাঙ্গালী জাতির এক্ষণে অনশন করিতে না হইলেও অন্নানশন প্রায় পনর আনা বাঙ্গালীকে করিতে হয়। যে সকল বস্তু মানবের উপযুক্ত এবং হিতকর খাদ্য, সে সকল বস্তু এক্ষণে দুর্বল। যতাদি যে সকল বস্তু আহার করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়—সে সকল বস্তু এক্ষণে অপ্রাপ্য বা হুপ্রাপ্য। উহাদের অভাবে বাঙ্গালীর অগ্নি-বল এক্ষণে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষীণায়ি বাঙ্গালী এখন আর অধিক আহার করিতে পারে না, যাহা আহার করে তাহাও কুখাদ্য। কাজেই দুর্বল ব্যক্তির অনশন এক্ষণে বঙ্গদেশে বিশেষরূপে ঘটিতেছে। সুতরাং বঙ্গদেশে ক্ষয় রোগের যে প্রাবল্য ঘটবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

৪। দুর্বল শরীরে কাম রিপূর উত্তেজন অধিক হয়। অপিচ, এখন আর পূর্বের ভ্রায় ত্রক্ষচর্চাশ্রমে থাকিয়া সংঘম শিক্ষা করার নিয়ম নাই। শুধু তাহাই নহে, এখন আর বাঙ্গালী স্ত্রী সহবাস সম্বন্ধে তিথিনক্ষত্র-পর্বদিন বিচার করে না। সুতরাং দুর্বল, অন্নাহারী, কক্ষ্ম-

হারী, অপুষ্টিকরজবাহারী বাঙ্গালীর স্ত্রী প্রিয়তা যে বঙ্গদেশে যক্ষ্মা রোগের কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ক) শুক্রক্ষয় দিগদর্শন মাত্র হইলেও সমস্ত ধাতুক্ষয়ই-ক্ষয় রোগের কারণ এবং এট কারণে অনেক প্রযুক্তি ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। আজকাল ১২১৩১৪ বৎসর বঙ্গদেশে জীলোকের সন্তান হয়। প্রথম সন্তান হইবার পরে আবার বৎসরে বৎসরে সন্তান হইতে থাকে। ইহার ফলে প্রযুক্তির শরীর নিত্য রক্তশূন্য এবং ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এইরূপ বহু এবং ক্ষীণ দেহে ক্ষয় রোগ সহজেই বীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত অর্জাণ রোগও যে ক্ষয় রোগের প্রাবল্যের অন্ততম কারণ, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অর্জাণ এক্ষণে বঙ্গদেশব্যাপী। বঙ্গে অর্জাণ রোগের প্রাবল্য নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নোক্ত।

বঙ্গদেশে ক্ষয় রোগের এইরূপ প্রাবল্য নিবারণের উপায় কি? উত্তরে বলিতে হয় যে, যে সমস্ত কারণে বঙ্গে ক্ষয় রোগের প্রাবল্য ঘটতেছে—সেই সকল দূর করা। কিন্তু তাহা দেশের বর্তমান অবস্থায় সম্ভব পর নয়। সম্ভবপর নয় বলিলেও ঠিক বল হইল না, সম্ভবপর হইলেও বর্তমানে আমরা যেরূপ শ্রোতে গা ঢালিয়া চলিয়াছি, তাহাতে আমরা পারি বলিয়া বোধ হয় না। কিসে শ্রোতে আমরা গা ঢালিয়া চলিয়াছি?—বিলাসিতার। কিসের জন্ত আমাদের এই অব্যবসায়িতা?—বিলাসিতার। কিসের জন্ত আমাদের এই চিন্তা-ভ্রম-উৎকর্ষ?—বিলাসিতার। কিসের জন্ত আমরা দুই বেলা

ভরিয়া খাইতে পাই না?—বিলাসিতার।  
 বিলাসিতা ব্যতীত আমাদের এই হৃদশার যে  
 অল্প কোন কারণ নাই, আমরা এমন কথা  
 বলিতেছি না, কিন্তু বিলাসিতাই এজন্ম অধিক  
 পরিমাণে দায়ী। ব্যক্তিগত ভাবে,—সমাজগত  
 ভাবে—দেশগত ভাবে এই বিলাসিতা বঙ্গে  
 প্রচলিত ভাবে বিদ্যমান। দুই একটা উদা-  
 হরণ দেওয়া বোধ হয় অসম্ভব হইবে না।  
 ব্যক্তিগত ভাবে বলিতেছি এইজন্ম যে, যাহার  
 উদরে দিব্যরাজিতে দুই পয়সার স্নাত, এক পোয়া  
 দুগ্ধ বা এক ছটাক মাংস পড়ে না, চা, চুইট,  
 সোডা, সার্ট, কোট, ষ্টকীনে তাহার যথেষ্ট ব্যয়  
 হয়। সমাজগত ভাবে বলিতেছি এইজন্ম যে,  
 যে সমাজের লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া  
 খাইতে পায় না—সেই সমাজে কত্কার বিবাহ  
 দিতে হইলে কত্কার পিতাকে মূল্যবান বস্তু,  
 বড় জাকেট, বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার, অসংখ্য  
 কল্যাণী ও বরখাত্তীর ঘোড়শোপচারে আহাৰ্য্য  
 প্রভৃতি ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়। দেশগত  
 হিসাবে বলিতেছি এইজন্ম যে, এই দরিদ্র দেশ  
 হইতে কৃত্রিম মণিকার—কাঁচের চুড়ি-পুতুল  
 ধাপি প্রভৃতি প্রস্তুত কারক বিদেশী বণিক  
 লক্ষ লক্ষ টাকা লুটিয়া লইয়া যায়। এই  
 বিলাসিতা যদি আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি,  
 তাহা হইলে আমাদের অভাব-অনটন, আমাদের  
 চিন্তা-উৎকর্ষ—একদিনও স্থায়ী হইতে পারে  
 না। কিন্তু বিলাসিতা-প্রোতে আকর্ষ  
 নিমগ্নিত হৃদয়লচিত্ত-বাঙ্গালী তোমরা—তাহা  
 পারিবে কি?

পারিবে না। আর পারিবে না বলিয়াই  
 বলিতেছিলাম যে, সম্ভবপর হইলেও আমাদের  
 বর্তমান অবস্থায় আমরা তাহা করিতে অক্ষম।  
 সেই জন্ম অভাব, অনটন, চিন্তা, উৎকর্ষ, ভয়

ভীতি হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় এক্ষণে  
 আর নাই। তথাপি যে কারণগুলি পরিত্যাগ  
 করা আমাদের সাধ্যানুসৃত—অন্ততঃ সেইগুলি  
 পরিত্যাগ করা উচিত। ইহাতেও দেশের  
 অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে এবং রোগ-শোক-  
 জর্জরিত-বঙ্গদেশে ক্ষয় প্রভৃতির প্রাবল্য  
 অনেক কম হইবে।

সংযম শিক্ষা—পূর্বে বলা হইয়াছে যে,  
 অতিরিক্ত গুরুক্ষয় বশতঃ ক্ষয় রোগ উৎপন্ন  
 হইয়া থাকে। ইহা কেবল শাস্ত্রে পাঠ করি  
 নাই, অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এইজন্ম  
 বাল্যকাল হইতে দেশের বালকগণকে সংযম  
 শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যিক—একথাও  
 আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি। প্রকৃত  
 কথা,—কুসংসর্গে পড়িয়া অপরিণত বয়সে  
 অবৈধ উপায়ে গুরুক্ষয় করা দেশে একটা  
 বিষম কুপ্রথা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে  
 ভবিষ্যতে অনেক বালক—যৌবনের প্রারম্ভে  
 ক্ষয় রোগগ্রস্ত হইতেছে। এই জঘন্য রীতি  
 বঙ্গদেশের যে কি অনিষ্ট করিতেছে, তাহা  
 অনেকেরই অবগত নহেন। যাহাতে এই  
 সর্বনাশী প্রথার একেবারে মূলাচ্ছেদ হয়—  
 যেমন করিয়া হউক, তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক  
 স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির নিত্য কর্তব্য।

একেত বাগ্যাকালে এইরূপ ক্ষয় ঘটে,  
 তাহার পর বাগ্যাবস্থার শেষে, যৌবনের  
 প্রারম্ভে বা যৌবনে বিবাহ করিয়া অনেক  
 রিপূর দাস হইয়া পড়ে। শরীরের প্রতি লক্ষ্য  
 নাই—ভবিষ্যৎ অনিষ্টের ভয় নাই,—অপকৃত্ত  
 পুত্র-কন্যা জন্মিবার আশঙ্কা নাই, বিধি-নিষেধ  
 না মানিয়া যথেষ্টভাবে রিপূ চরিতার্থ করাই  
 তাঁহার। যৌবনের কর্তব্য বলিয়া মনে করেন।  
 তখন একবার বুঝিয়াও দেখেন না—

ভোগে রোগের ভয় আছে। ফলে সেই ক্ষয়িত দেহে যখন বন্ধারোগ আশ্রয় করে, তখন দারুণ অমৃতাপ উপস্থিত হয়। কিন্তু হায়, তখন আর নিষ্কৃতির উপায় থাকে না। যে ব্যক্তি রোগ-মুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিতে ইচ্ছুক, তাহার পক্ষে সংযম শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। শুক্রই জীবন—ইহা সর্বদা মনে রাখিবেন—, শুক্রক্ষয় অর্থে জীবন ক্ষয় করা। দেশের লোকে এই বিষয় সম্যক বিবেচনা করিয়া সংযম শিক্ষা করিলে বঙ্গদেশে ক্ষয় রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম হইবে।

রক্তক্ষয়—ত্রীলোকগণ অল্প বয়সে অনেক-গুলি সন্তান প্রসব করার ফলে প্রচুর রক্ত ক্ষয় বশতঃ ক্ষয়রোগ গ্রস্ত হইয়া থাকে—এ কথা বলিয়াছি। এ বিষয়ের প্রতিকার করিতে হইলেও ত্রীপুরুষেয় সংযত হওয়া আবশ্যক। সহধর্মিণীর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কে না কামনা করে? কিন্তু আমরা জানিয়া শুনিয়া আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারি, প্রসবের পর প্রসূতির শরীর যতদিন না পূর্ববৎ সুস্থ ও সবল হয়—ততদিন সংযত হওয়া উচিত একথা মনে করি না। অল্প বয়সে অধিক সন্তান হওয়ার বিষ-ময় ফল সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। বাহা ইউক দেশের লোকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে বঙ্গ ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম হইবে এবং যেখানে এখন রোগ-পীড়িতা শীর্ণ-দেহা বিষন্নবদনা গৃহকার্য্যে অসমর্থ জননী জীর্ণ-শীর্ণ-বালকবালিকা-বেষ্টিতা হইয়া অকাল মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে দেখিতেছি, সেইস্থান সুস্থদেহা, রোগহীন, গৃহকার্য্য-নিপুণা-প্রফুল্লবদনা জননী সুস্থ সকল বালকবালিকা-বেষ্টিত হইয়া মাতৃস্বের মংগমায় গৃহস্থলী মণ্ডিত করিতেছে দেখিতে পাইব।

কাস রোগ হইতে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং কাসরোগকে কদাচ উপেক্ষা করা উচিত নহে। অজীর্ণ রোগ হইতেও কালে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং অজীর্ণরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির স্নায়মে এবং স্না-ধানে থাকা কর্তব্য। অপিত সুপথ্য ও সূচিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাকরণ করা উচিত। পূর্বে অজীর্ণ-রোগ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে এ বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এক্ষণে ক্ষয় রোগের বীজ যাহাতে এক ব্যক্তির শরীর হইতে সংক্রমিত না হইতে পারে, তৎপ্রতি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ক্ষয়রোগ সংক্রামক। এই রোগীর সহিত একত্র অবস্থান, রোগীর ব্যবসৃত দ্রব্যাদি ব্যবহার প্রভৃতি কারণে রোগ অস্ত্রের শরীরে সংক্রমিত হয়। এইজন্য ক্ষয়রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা কর্তব্য। রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিলে অস্ত্রের সহিত তাহার সংস্পর্শ ঘটে না, সুতরাং রোগও সংক্রমিত হইতে পারে না।

কিন্তু রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিলেও তাহার সুশ্রাব্য জল লোকের আবশ্যক। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সুস্থ ও সবল ব্যক্তির দেহে রোগবীজ প্রবেশ করিলেও রোগ উৎপন্ন করিতে না। সুতরাং সুস্থ ও সবল ব্যক্তির দ্বারা ক্ষয়রোগীর সুশ্রাব্য করা উচিত। শীর্ণ-দুর্বল-দেহ একরূপ ব্যক্তির বন্ধারোগীর নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত নহে। এই নিয়মটি পালন করিলে বন্ধারোগের সংক্রমণ ঘটে না। কিন্তু আমাদের দেশে কাহারও ক্ষয়রোগ হইলে তাহাকে পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি—এমন কি বালকবালিকাগণের সহিত একত্র থাকিতে

দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত অত্যয় প্রাণা এবং ইহার ফলে ক্ষয়রোগ বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমাজের মহান অনিষ্ট সাধন করিতেছে। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ—যাহারাই কেন ক্ষয়রোগ হউক না, তাহাকে এইরূপ স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। পবিত্রাঙ্গ অত্যন্ত ব্যক্তিগণের হিত কামিনায় ক্ষয়রোগপ্রস্তুত স্বতন্ত্র থাকা বিশেষ কর্তব্য।

ক্ষয়রোগের বীজ বিষাক্তরূপে অস্ত্রের শরীরে সংক্রমিত হয়। এই রোগে দোষ সকল কফ, থুথু এবং রক্তের সহিত নির্গত হয়, সুতরাং ঐ সকল পদার্থে রোগবীজ থাকে। এই জন্ত ক্ষয় রোগীর কফ, থুথু, রক্ত প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নহে। ঐ সমস্ত একটা পাত্রে সংগ্রহ করিয়া নির্জল স্থানে পুঁতিয়া ফেলা বা তেলিয়া চূর্ণ ঢাকা দেওয়া উচিত। রোগীর কফ থুথু বয়াদিতে লাগিলে, সেই বস্তাদি ফেলিয়া দেওয়া বা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। কলতঃ কফ ও থুথুর সহিত যখন রোগ-বিষ থাকে, তখন সেই কফ ও থুথুকে বিষবৎ বিবেচনা করিয়া বাহাতে কোন উপায়ে অপরের দেহে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইরূপ উপায় অবগমন করা কর্তব্য। এমন হইতে পারে যে, কোন ব্যক্তিও ক্ষয়রোগ হইয়াছে অথচ ধরা পড়ে নাই, সে লোকের সঙ্গে মিলিতে হয়। অথবা রোগ হইয়াছে জানিয়াও সে স্বতন্ত্র না থাকিয়া, লোকালয়ে গাইতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্ত কাহারও উচ্ছিন্ন দ্রব্য খাওয়া, কাহারও সহিত একত্র থাওয়া, অস্ত্রে যে দ্রব্যে মুখ দিরাছে, তাহাতে মুখে দেওয়া বা অস্ত্রের ব্যবহৃত বস্তু নালাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করাই উচিত।

ক্ষয়রোগের কাঁট পিপীলিকা দ্বারা সংক্র-

মিত হইতে পারে। ইহার প্রতিষেধের জন্ত যক্ষারোগীর কফ ও থুথুতে বাহাতে পিপীলিকা বসিতে না পারে—তাহা করা উচিত এবং খাওয়া ও পানীয়ে বাহাতে কীট-পিপীলিকা বসিতে না পারে এরূপ সাবধানে রাখা কর্তব্য।

ক্ষয়রোগীর হাচিবার বা কাশিবার সময় স্থল থুথু কফের ফেগার সহিত রোগবীজ নির্গত করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এইজন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

“মুখ আবৃত না করিয়া হাচিবে না এবং হাই তুলিবে না।” এই নিয়মটা সকলে পালন করিলে কথিত সংক্রমণ ঘটিতে পারে না।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে গৃহ মধ্যে নির্মল বায়ু এবং রৌদ্র প্রবেশ করিলে ক্ষয় রোগের জীবাণু মরিয়া যায়। আমাদের দেশে বাস্তব গৃহ নির্মাণ করিবার যে সকল নিয়ম আছে, সেই সকল নিয়ম অনুযায়ী গৃহ প্রস্তুত করিলে গৃহে যথেষ্ট বায়ু ও রৌদ্র প্রবেশ করে। সেই জন্তই বোধ হয় আয়ুর্ষেদে ঐ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক নীতি ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে অল্পপ্রবিষ্ট আছে দেখা যায়। ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ পাগন করিলেই সেই সকল নীতির অনুসরণ করা হয়। ধর্মের সঙ্গে আমরা যে কত অমূল্য জিনিষ হারায়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং তাহারই ফলে আমরা আজি এত ব্যাধি সমুল্য যদি আবার আমরা সে কালের মত শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলি—সে কালের রীতি-নীতি—সে কালের শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণ করিয়া আবার যদি আমরা অতীত গৌরবকে সমাদর করিতে শিক্ষা করিতে পারি,—সকল বিষয়ে সৎসঙ্গী হইবার জন্ত আবার যদি আমরা কায়মনো-

বাক্যে বদ্ধ পরিকর হই—তাহা হইলে নষ্ট করিতে পারে। কিন্তু দেশের লোকে এ প্রায় সোনার বাংলা আবার পূর্ব মূর্তি ধারণ সকল কথা বুঝিবেন কি ?

শ্রী—

## ম্যালেরিয়া তত্ত্ব।

—:—:—

ইহা আন্দলের বিষয় যে, বাঙ্গালী জাতির কিসে উন্নতি হয় এ বিষয়ে বাঙ্গালী মাঝেই অমুসন্ধিগ্ন হইয়াছেন এবং বাঙ্গালী জাতির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক পর্যালোচনা করিতেছেন। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গবাদী হিন্দুগণকে “ধ্বংসোন্মুখ জাতি” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসরের সেন্স-বিবরণী হইতে দেখাই-বার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি মুসলমান জাতির সংখ্যা-বৃদ্ধি ও হিন্দু জাতির সংখ্যা-হ্রাস দেখাইয়া হিন্দুর সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে তাহার ধ্বংসের কারণ নিহিত আছে ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয় ঐ প্রবন্ধের উত্তরে ঐ সকল সেন্স-বিবরণী হইতেই দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী-হিন্দু ক্ষয় হইতেছে ইহা সত্য, কিন্তু তাহার কারণ হিন্দুর আচার-ব্যবহারে নহে, তাহার কারণ অশুভ। তাহার প্রধান কারণ বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে আর কিছু উপকার হউক বা না হউক—বাঙ্গালী প্রকৃতই ধ্বংসোন্মুখ কিনা সে বিষয়ে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে ও

তাঁহারা সকলেই সেন্স-বিবরণী যথেষ্ট যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনেক মতভেদ থাকিলেও ইহা সর্বসম্মতিমতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী হিন্দু জাতির সংখ্যাবৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে এবং শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্যতীত অপর সকলেই স্বীকার করেন যে, বাঙ্গালী জাতির কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই সংখ্যাবৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে। এই সংখ্যা হ্রাসের কারণ এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু এক কথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, বঙ্গদেশে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক এবং এদেশে মৃত্যুর হার ঘেরূপ ভীষণ, পৃথিবীর অন্ত কোনও দেশে সে রূপ আছে কিনা সন্দেহ। জন্মের হার এবং মৃত্যুর হার হাজার-করা হিসাবে ধরা হইয়া থাকে এবং সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। বাঙ্গালা দেশে জন্মহার খুব অধিক, কিন্তু মৃত্যুহার দেখিলে মনে হয়—এ কেবল মরিবার জন্তই জন্ম।

### জন্মহার

দেশ	১৮৮১	১৮৯০	১৯০১	১৯০৪	১৯০৫
বঙ্গদেশ	৪৭.৯	৫১.৮	৪৩.৯	৪২.৫	৪২.৫
ইংলণ্ড	৩৪.৭	৩৫.২			



## মৃত্যুহার—

দেশ	১৮৮৫	১৮৯১	১৮৯৩	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
ইংলণ্ড	১৯	৮	১৭	১৫.৪	১৫.৩	১৫.২
বঙ্গদেশ	২২.৭৮	২৬.৯৪	৩১.৩২	৩৩.৩৩		
			৩২.৪৫	৩৮.৩		
ব.ম.	২১.২৬	৩২.৩০	৪১.৩৯	৩১.৮৪		
মাদ্রাজ	২৬.২	২২.৩	২২.০৫	২১.০৪		

বঙ্গদেশে মৃত্যুর বন্ডা যে রূপ প্রবলভাবে বহিয়া চলিয়াছে, এমন আর কোথায়? মৃত্যু সকল দেশেই আছে, সকল মানবেরই আছে, জন্মিলে মরিতে হইবে, কিন্তু আমাদের এক মরণ? স্বাভাবিক বান্ধবী অনেক সময় মৃত্যুর কারণ; আকস্মিক আঘাতদেবিক ঘটনা বহুশঃ মৃত্যুর কারণ; অনেক ব্যাধি—যাংহাং হস্ত হস্তে নাশুপ আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম—সেই সকল নিবার্ণ্য-ব্যাধিতেও অনেকে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

এই সকল নিবার্ণ্য-ব্যাধির প্রতিপত্তি ইংলণ্ডে কিরূপ গুণিবেন!—তাহা দ্বারা হাজার করা ৭ জনের অধিক মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। বঙ্গদেশে হাজার করা প্রায় ৩০ জন একরূপ ব্যাধিতে জীবন ত্যাগ করে। আর ঐ ৩০ জনের মধ্যে ২০২১ জনের একমাত্র অরোগেই জীবনের অবসান হয়। এ কি মরণ! মৃত্যুচাহি না—একথা আমি একবারও বলিব না, মৃত্যু ত চাহি, কিন্তু পৃথিবীর লোক যেমন করিয়া মরে—তেমনি করিয়া মরিতে চাহি—এ মৃত্যুচাহি মরণ চাহি না। এ পৃথিবীর আন্তরুড়ে পচিয়া পচিয়া মরিতে চাহি না। বঙ্গদেশে এখন কিরূপ মৃত্যু বিচরণ করিতেছে, তাহার প্রকট জানের জন্য জন্ম-মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু পবিত্র পুণিয়ার সৌন্দর্য্য বৃষ্টিবার জন্য যেমন

কজ গৃহে বসিয়া চাঁদের ছবি না দেখিয়া মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না-মাগরে ডুবিয়া যাইতে হয়, তেমনি বঙ্গদেশের এখন কি অবস্থা, তাহা ছন্দে অল্পভব করিতে হইলে, সেক্স-বিবরণী ফেলিয়া রাখিয়া বান্ধালার পল্লীগ্রামে যাইতে হয়। সেখানে গেলে আর বিচার-বিতর্ক মনে আসিবে না,—বান্ধালার যে কি অবস্থা হইয়াছে—তাহা আর বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কোথায় গেল পল্লীবাসীর সে সৌন্দর্য্য, সে উচ্চহাস্ত, সে ক্রীড়া-কলরোল, সে আত্মীয়-স্বজন-ভরা-প্রফুল্ল সংসার! কোথায় গেল সে সম্মুখ সংগ্রাম—সে জীবন্ত জীবন!—কোথায় গেল সে আনন্দ উৎসব,—কোথায় গেল সে পূজা-পার্বণ? বান্ধালার পল্লীগ্রাম—বাহা একদিন উৎসবের আনন্দ ভবন ছিল, যেখানে একদিন বালকের কলরোলে, যুবকের সঙ্গীতে, যুদ্ধের ক্রীড়ায় আনন্দের অসীম প্রস্রবন উদ্ভূত ছিল,—যেখানে একদিন কুলবধূগণ স্নান-স্নানর দেহে সবল শিশু ক্রোড়ে লইয়া “আয় চাঁদ আয়” বলিয়া মধুর কণ্ঠে আকাশের দেবতাকে মুগ্ধ করিত—নারীগণের এতে—দেবর্জনা, গুরুসেবায় দেব ভাব জাগরিত হইত—যুবক ও প্রৌঢ়জনের কীর্তনে, তর্জায়, যাত্রায়, পাঁচালীতে অনন্ত ক্ষুণ্ণি মুখরিত হইয়া উঠিত—সেই পল্লীগ্রাম আজ নিরানন্দের ছায়ায় অন্ধকার,—সেখানে আজ লোকসংখ্যা বিরল,—যাহারা বাচিয়া আছে তাহারা কঙ্কালসার, ম্রিয়মান, আনন্দের,—ক্ষুণ্ণির চিল্ল মাত্র নাই—সে স্থান শ্মশানের পূর্বাভাস মাত্র।

কোনও কোনও গ্রামে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক গৃহ জনশূন্য, কোণাও বা একটি বৃহৎ অট্টালিকা, একদিন সে বাড়িতে দোল, হুগোৎসব প্রভৃতি বারমাস

তের পার্শ্ব হইত এখন সে অটালিকা ভগ্নপ্রায়,  
—তাহারাই একটা ঘরে দুইটা বিধবা,—কেবল  
বিধবা বলিয়াই প্রাণে বাঁচিয়া আছেন।

অনেক বাটীতে ঘরে ঘরেই জ্বর, গুশ্রবা  
করিবার লোক পাওয়া যায় না। কাহারও  
জ্বর আসিয়াছে—কাহারও আসিতেছে—  
কাহারও বা কিছুক্ষণ পরে আসিবে। কেহ  
মুমূর্ষু, কেহ বা উদ্বিগ্ন রহিত। পাচ-  
জনে দেখা হইলে রোগের কথা, শোকের কথা,  
দুঃখের কথা। এই ত এখন বাঙ্গালার প্রাণের  
কথা,—আমি একথা চাহি না। একদিন জন্ম  
—একদিন মৃত্যু; মাঝের দিন কয়টা প্রীতি-  
ফুলের বেদনা—জ্বর। এই ত এখন বাঙ্গালার  
জীবন! এ জীবন—কি জীবন—না একটা দুর্ভাগ্য  
ভার! এ জীবনে কি আনন্দ আছে, উৎসাহ  
আছে, না আশার আলো আছে? আমি এ  
জীবন চাহি না। ১৯১৬ সালের যে সরকারী  
স্বাস্থ্য বিবরণ (Report on sanitation in  
Bengal for the year 1916) প্রকাশিত  
হইয়াছে, তদনুসারে “ভারতবর্ষ” পত্রিকার গত  
মাঘ মাসের সংখ্যার বঙ্গদেশে ১৯১৬ সালের  
একটা মৃত্যু সংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।  
তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৯১৬ সালে  
সারা বঙ্গদেশ হইতে সর্বমুদ্র ১২,৪১,০২১ জন  
যমপুরে প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র  
জ্বর রোগেই ৯,০৮৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।  
আলোচ্য বর্ষে বর্তমান বিভাগ হইতে ১৭৪৬৮০,  
প্রেসিডেন্সি বিভাগ হইতে ১,৮১,৫৮৩; রাজ-  
সাহী বিভাগ হইতে ২,৮২১৮৭; ঢাকা  
বিভাগ হইতে ১৮৫৩৭৬ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ  
হইতে ৮৬০৫৪ একুশে ৯০৯৮৮০ জন একমাত্র  
জ্বর রোগেই যমপুরে গমন করিয়াছে। কি  
ভীষণ অবস্থা!

ম্যালেরিয়া যে বাঙ্গালা দেশের সর্বনাশ  
সাধন করিতেছে এবং এই ম্যালেরিয়াকে বঙ্গ-  
দেশ হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে যে  
দেশের মঙ্গল নাই—সে বিষয়ে দুইমত হইবার  
কারণ দেখা যায় না।

এই “আয়ুর্বেদের” এক সংখ্যার পূর্বেই  
নিখিত হইয়াছে—“কি কুক্ষণে জানিনি  
ম্যালেরিয়া-বিশ বাঙ্গলার পল্লীগুলিতে প্রবেশ  
করিয়াছিল। এই বিষের জ্বালায় বাঙ্গালার  
কত পল্লীরই যে সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা  
ভাবিলেও বুক ফাটিয়া যায়।” “সর্বপ্রায়ে আমা-  
দের চিরতত্ত্ব পল্লীগুলিকে ‘ম্যালেরিয়ার হস্ত’  
হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পল্লীমাঠকে  
রক্ষা করিতে পারিলে তবে আমরা নিজেরা  
রক্ষা পাইব।” কিন্তু ম্যালেরিয়া বিদূরিত  
করিবার কথা চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই  
একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়,—“একি সম্ভব?  
এত বড় ভীষণ রাক্ষস—যে সমস্ত দেশকে গ্রাস  
করিয়া বসিয়াছে—তাহাকে বিতাড়িত করিবার  
শক্তি-সামর্থ্য কোথায়? আমরা অর্থহীন—শক্তি-  
হীন—আমরা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইয়া  
দিব—ইহা অসম্ভব।” কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে  
শ্রীভগবানের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে।  
তাহার নাম স্মরণ করিয়া দেশবাসীগণ ম্যাল-  
েরিয়াকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য  
কৃতসঙ্কল্প হইলে তাহারা যে কৃতকার্য হইবেন,  
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বস্তু-বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবসে প্রতি-  
ষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় এই  
কথাই দেশ জননীকে নিবেদন করিয়াছেন—  
“কি সেই মহাসত্য—যাহার জন্য এই মন্দির  
প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন  
তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোন

উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্যে কখনও দাঁকা হয় না, বাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে ।” আমাদের দেশে সকলের মনে এই ভাবটা জাগরিত করিতে হইবে, তাহা হইলে স্বর্গাদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, তেমনই এদেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইবে ।

ম্যালেরিয়াকে তাড়িত করিতে হইলে আমাদের কয়েকটা বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যিক :—

১য়—ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ কি ?

২য়—ম্যালেরিয়া নিবার্ণা ও প্রতিকার যো কি না এবং কোনও দেশ হইতে দূরীভূত করা গিয়াছে কি না ?

৩য়—ম্যালেরিয়া নিবার্ণের কি সহজ উপায় আমাদের দেশে অবলম্বিত হইতে পারে ?

এই সকল বিষয়ের আলোচনা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বাৰাই হওয়া সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় । তবে এৰময়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্ত আমি কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব ।

প্রথম কথা ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে । যে দেশ নিম্ন, জলময়—যেখানে পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা নাই, যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চলাশয়ের অধিক্য—যেস্থান জঙ্গলাকীর্ণ—সেই সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় ।

আমাদের দেশে পূর্বে ম্যালেরিয়া ছিল না, এখন সমস্ত দেশ ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছে ইহার কারণ কি ?

এত আমাদের সেই পুরাতন দেশ ? কোথা হইতে ম্যালেরিয়া আসিল ?

(১) অনেক মনীষী এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন—“পাঁড়া বত কারণেই ইউরোপ, তাহার মধ্যে

নবাগত মানব সংসর্গ একটা প্রধান কারণ । যখন কোন দেশে অত্যন্ত হইতে নূতন মানবের সমাগম হয় তখন কি এক অদ্ভুত কারণে নূতন নূতন পীড়াও আসিয়া উপস্থিত হয় । নূতন জাতির সংস্পর্শে পুরাতন জাতির জাতীয় আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতির যে পরিবর্তন হয়, তাহা আপাত দৃষ্টিতে কুফল প্রসূ বলিয়া অনুমিত না হইতে পারে, কিন্তু তাহার ফলও যে মারাত্মক তদ্বিময়ে সন্দেহ নাই । আহা-র-পরিচ্ছদ, উৎসব, আনন্দ, ক্রীড়া—সকল বিষয়েই জাতীয়তা বিসর্জন করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বনে সেই জাতি যে ধ্বংসোন্মুখ হয়, তাহার নিদর্শন পৃথিবীর অত্যন্ত জাতির সঙ্গে আমরাও হইয়াছি ।

(২) এদেশে রেলওয়ে-বিস্তারের সহিত ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব বিশেষ সংশ্লিষ্ট আছে । রেলপথের ছইধারে যে নালা থাকে, তাহাতে জল জমিয়া থাকে এবং রেলপথের দ্বারা গ্রামের জলনিঃসরণের পথ অনেক স্থলে বন্ধ হইয়া যায় । রাজা দিগম্বর মিত্র এইমত সর্বপ্রথমে সাধারণের গোচরে আনয়ন করেন ।

দেশের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান দারিদ্র্য যে দেশবাসীকে দুর্বল করিয়া আনে, তাহার ফলে নূতন রোগের আবির্ভাব সুগম হয় ।

আমাদের বিলাস-বাসনা প্রবল, অথচ আমাদের ক্ষেত্রে ধাত্ত জন্মেনা, যে উপায় অবলম্বনে ধাত্ত জন্মিতে পারে, তাহা আমাদের সাধ্যাতীত, আমাদের শিল্প নাই, বাণিজ্য নাই । আমাদের খাইবার সংস্থান নাই পরিবার সঙ্গতি নাই এরূপ ক্ষেত্রে রোগের বীজ যেমন ফলে এমন আর কিছুই নহে ।

উপরে যে তিনটা কারণের কথা উল্লেখ করিলাম, উহার সম্পূর্ণ পৃথক নহে, পরস্পর

সংশ্লিষ্ট। ঐ সকল কারণ এবং আরও কতকগুলি কারণ পরোক্ষভাবে ম্যালেরিয়া উৎপাদনের সহায়তা করে। ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ সম্বন্ধে এক্ষণে বিজ্ঞান স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া শব্দটি ইটালীয়, উহার ধাতুগত অর্থ মন্দ বাতাস (mala—মন্দ aia—বাতাস) ইংরাজী বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে ১৮২৭ সালে এই কথাটি প্রবেশ লাভ করে। ম্যালেরিয়া জরের লক্ষণাবলী এত স্পষ্ট যে, ম্যালেরিয়া-নির্ণয় আদৌ ভ্রূসাধা নহে এবং যে দেশে এই ম্যালেরিয়া রোগ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেই দেশবাসীর দেহের ও মনের যে ইহা সর্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহাও সর্ববাদী সম্মত। কিন্তু ইহার নিদান সম্বন্ধে পূর্বে কেহই কোনও সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ ইহা একপ্রকারের বিষ বলিয়া অনুমিত হইত, কোনও প্রকারে উক্ত বিষ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর আনয়ন করিত। বৈজ্ঞানিকেরা উক্ত বিষের অনুসন্ধান অনেকস্থলে করিয়াছেন, আর্দ্রভূমিতে, জলায় উদ্ভিদরাজ্যে, কিন্তু তাহাতে সফলতা লাভ করেন নাই।

অনেকে অনুমান করিতেন যে, দিবসের অতিরিক্ত উত্তাপের পর সহসা নৈশ আর্দ্র শীতবায়ু দেহে সংলগ্ন হইয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করিত। ম্যালেরিয়ার-কারণ অনুসন্ধিৎসুগণ অবশেষে দেখিতে পাইলেন, যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তমধ্যে একপ্রকার জীবাণু পরিলক্ষিত হয়—অপর কোন রোগীর রক্তে উক্ত জীবাণুর অস্তিত্ব নাই এবং বাহারই রক্তমধ্যে উক্ত জীবাণু পুষ্ট হইতেছে দেখিতে পওয়া গিয়াছে, তাহারই ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে। উক্ত জীবাণু যে ম্যালেরিয়ার

নিদান তাহা বুঝিতে বাকী থাকিল না, কিন্তু কোথা হইতে ঐ জীবাণু আইসে, উহা কি জাতীয় এবং কিরূপে উহা দেহ হইতে দেহান্তরে পরিচালিত হয়, তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

অনুসন্ধানে যিনি সফলকাম হইলেন তিনি নিজের আত্ম প্রসাদের সহিত পৃথিবীর ধন্যবাদ ও তৎসহ নোবেল পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন। সে অধিক দিনের কথা নহে, ১৮৯৯ সালে মাদ্রাজের জনৈক I, M, S, ক্যাপ্তেন Ranold Ross তাঁহার আবিষ্কার সভ্যজগতের সমক্ষে উপস্থিত করেন। তখন হইতে ম্যালেরিয়ার নিদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে আর মতবৈধ বা সন্দেহ নাই। এক্ষণে ইহা অবিসম্বাদিত রূপে স্থির হইয়াছে যে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তে যে বিশেষ জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত জীবাণু দেহের মধ্যে প্রবেশই ম্যালেরিয়ার একমাত্র কারণ—কোনও রূপে কোনও দেহে উক্ত জীবাণু প্রবেশ নিবারণ করিতে পারিলে সেই দেহে ম্যালেরিয়া জ্বর কিছুতেই আসিবে না। সুতরাং উক্ত জীবাণু দেহের মধ্যে কি প্রকারে সংক্রামিত হয়, তাহাই সর্বাধিক জ্ঞাতব্য বিষয়। নিঃশ্বাসে বায়ুর সহিত, পানে জলের সহিত খাদ্যের সহিত বা অপর কোন প্রকারে উহা সংক্রামিত হইতে পারে কিনা—তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষার চরম সিদ্ধান্ত Ranold Ross এর কীৰ্ত্তি এই যে, একতাত্ত্বীয় মশক আছে—কেবল তাহারাই উক্ত জীবাণু একদেহ হইতে দেহান্তরে লইয়া যাইতে পারে এবং লইয়া গিয়া থাকে। ঐ মশকের নাম anopheles উক্ত মশক রক্ত শোষণ কালে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তসহ উক্ত জীবাণু

শেষণ করিয়া লয় উক্ত জীবাণু উক্ত মশক  
দেহে বিনষ্ট না হইয়া পুষ্টি ও বল লাভ করে ।  
পরে জীবাণুবাহী এনোফিলিস মশক নীরোগ  
ব্যক্তির গাত্রে দংশন কালে উক্ত জীবাণু  
তাহার দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয় । উক্ত  
জীবাণু মনুষ্য রক্ত মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া  
ঈদৃশ ক্ষয় বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং তাহার  
ফলে সাধারণতঃ ১০।১১ দিবস পরে উক্ত  
ব্যক্তির শীত, কম্প পিপাসা হইয়া আর আইসে।  
ইহা হইতে পরিলক্ষিত হইবে যে, এনোফিলিস  
মশক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকের রক্ত হইতে  
ম্যালেরিয়া বীজাণু গ্রহণ পূর্বক নীরোগদেহে  
দংশন কালে উক্ত জীবাণু প্রবিষ্ট করাইয়া  
ম্যালেরিয়া রোগের প্রসার করিয়া থাকে—  
ইহাই ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ । দ্বিতীয়  
কথা—ম্যালেরিয়া নিবার্ণ ও প্রতিকার যোগ্য  
কিনা? মানব শরীরের গঠন প্রণালীর মধ্যে  
এমন কিছুই নাই যে, তাহার ম্যালেরিয়া  
হইবেই হইবে । পৃথিবীর অনেক স্থানেই  
ম্যালেরিয়া আদৌ নাই, স্বতরাং ম্যালেরিয়া  
নিবার্ণ ও প্রতিকার যোগ্য—তদ্বিষয়ে দ্বিধা  
কবিবাব কোনও কারণ নাই । পৃথিবীর যে  
সকল স্থানে ম্যালেরিয়া সংক্রামক রূপে  
লোকক্ষয় করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে যে যে  
স্থানে তাহা নিবার্ণ করিবার উপায় বিধি-মত  
অবলম্বিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে ম্যালেরিয়া  
প্রশমিত হইয়াছে ।

ম্যালেরিয়া যে নরশক্তির নিকট পরাজয়  
স্বীকার করে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে—  
তাহার কয়েকটা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ।

১) ছাভানায় ম্যালেরিয়া জরে মৃত্যু সংখ্যা—  
বৎসর  
১৮৮০

সংখ্যা  
৩২৫

১৮৮৮	১০১
১৮৯০	১৭০
১৮৯৫	২০৬
১৯০০	৩৪৪

তৎপরে ১৯০১ সাল হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত  
করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে—

সাল	১৯০১	১৯০২	১৯০৩
	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬
সংখ্যা	১৫১	১৭৭	৫১
	৪৪	৩২	২৬

(২) সুইডেনহাম বন্দরে

১৯০১ সালে আর বিদূরিত করিবার চেষ্টার  
সূত্রপাত হয় ।

বৎসর	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
মৃত্যু সংখ্যা	৬১০	১৯৯	৬৯	৩২	২৩

(৩) হং কং

বৎসর	১৮৯৭	১৮৯৮	১৮৯৯	১৯০০
মৃত্যু সংখ্যা	১৯৭	১২৬	৬৩	১৬৩

তৎপরে ১৯০১ সালে ম্যালেরিয়া দমনের  
চেষ্টার ফলে—

বৎসর	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
মৃত্যু সংখ্যা	১৩২	১২৮	৬৩	৫৮	৫৪

(৪) ইসম্যাগিয়াতে ১৯০২ সালে ম্যালেরিয়া  
দমনের চেষ্টা হয় । ১৯০২ সালের পূর্বের  
ও পরের মৃত্যুসংখ্যা বিশেষ বিবেচনার বিষয়—

বৎসর	মৃত্যুসংখ্যা
১৮৭৭	৩০০
১৮৮২	৪৮০
১৮৮৭	১৮০০
১৮৯২	২০৫০
১৮৯৭	২০৮৯
১৮৯৯	৩১৭৮
১৯০০	২২৮৪

১৯০১	১৯৯০
১৯০২	১৫৫১
১৯০৩	২১৪
১৯০৪	৯০
১৯০৫	৩৭

ইহা দেখিলে কে না বলিবে যে, ম্যালেরিয়াকে দূর করা মানবের শক্তির অধীন। ইহা দেখিলে নিজের দেশে ম্যালেরিয়ার একরূপ অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত প্রভাব দেখিয়া কে নিশ্চিত থাকিতে পারে? পানামা খাল খনন কালে সহস্র সহস্র কুলিরা কার্য্য করিয়াছিল। প্রথম বার পীত জরে ও ম্যালেরিয়ায় বহু সহস্র কুলি প্রাণত্যাগ করে কিন্তু দ্বিতীয় বারে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করায় ঐতুইটা রোগের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই। সেই জন্ত দ্বিতীয় বারে বাহার চেষ্টায় সফল ফলিয়াছিল—তিনি বলিয়াছিলেন “আমি বিবেচনা করি যে, স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এক্ষণে সহজেই দেখাইতে পারেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে কোনও স্থানের অধিবাসীগণকে পীতজর ও ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যাত্ত এবং তাহার জন্ত যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহাও সহজ এবং অল্পব্যয়সাধ্য।” তিনি আরও বলিয়াছিলেন—“গ্রীষ্ম প্রধান দেশের যে সকল স্থান এক্ষণে ম্যালেরিয়ার কবলগ্ৰস্ত, সেই সকল স্থান মানব ইতিহাসের প্রভাত কালে খনে-জনে-জ্ঞানে যেমন পরিপূর্ণ ছিল, আবার তেমনই হইবে।” এই আশার বানী এদেশে কি পরিপূর্ণ হইবে না?

তৃতীয় কথা ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে।—ম্যালেরিয়ার যে সকল পরোক্ষ কারণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বা অন্ত যে সকল পরোক্ষ কারণ আছে, তৎ সম্বন্ধে কোন

আলোচনা এই প্রবন্ধে উদ্দেশ্য নহে। ম্যালেরিয়ার যাহা প্রত্যক্ষ কারণ তাহা কিরূপে দূর করা যায়—তাহাই আমাদের এক্ষণে প্রধান ও প্রথম আলোচ্য বিষয় হইতেছে। এনোফিলিস বা ম্যালেরিয়া মশক ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া উক্ত মশকের নির্ধাচন ও উহার আকৃতি-প্রকৃতি, উদ্ভব-স্থিতি লত ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের অত্যাবশ্যকীয়। তৎপরে উক্ত মশক যাহাতে আমাদের দংশন করিতে না পারে—তাহার উপায় স্থির করা এবং অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এনোফিলিস বা ম্যালেরিয়া মশকের আকৃতি—সাধারণ মশকের আকৃতি হইতে কিছু ভিন্ন আছে।

উক্ত মশক সাধারণতঃ দূষিত জলে ডিগ ত্যাগ করে—যেখানে ডোবার চতুর্পার্শ্বে নল-খাগড়া বা অন্ত উদ্ভিজের বাছালা আছে—সেই স্থানই ডিগ ত্যাগের প্রকৃষ্ট স্থান। ডিগ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হয়, উক্ত কীট কিছুদিন পরে রূপান্তরিত হইয়া গুটী হয় ও পরে গুটী হইতে মশক দেহ ধারণ করিয়া জল পরিত্যাগ করিয়া বায়ুতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। জলে অবস্থান কালে ইহার মংস্তের পাখ।

ম্যালেরিয়া-মশকের জন্ম ও পুষ্টি—দূষিত জলাশয়ে, সেইজন্ত সকল দেশেই দূষিত জলাশয়ের সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা ম্যালেরিয়া-নিবারণের প্রথম উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেশে কি প্রকারে দূষিত জলাশয়ের সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাই প্রধান বিবেচনার বিষয়।

বঙ্গালা দেশে অনেক নদী পুরাতন প্রবাহ পরিতাগ করিয়া নূতন পথে চলিতেছে, অনেক

নদী শুকাইয়া গিয়াছে—এই সকল নদীর সংস্কার করিয়া গ্রাম সমূহের জলপ্রণালী উদ্ধার নদীর সহিত সংযোগ করিয়া দিবার কল্পনা অনেকের মনে আসিয়া থাকে। কিন্তু একেবারে সমগ্র বঙ্গদেশের উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা কেবলকি বায় ও শক্তি-সামর্থ্য সাপেক্ষ ও কেবল বিপদ সম্মুল, তাহাতে সে কল্পনা করিতে পারেন না। আমি এমন উপায় চিন্তা করিতে বসি—যাহা আমাদের সাধারণের সাধ্যাত্মক স্বপ্ন সাহায্য ফল ও সুনিশ্চিত।

আমি একেকটা বিশেষ গ্রাম অথবা প্রদেশ সংলগ্ন দুই তিনটা গ্রামের এক একটা গ্রাম মণ্ডলী সম্বন্ধে পৃথক ভাবে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করিবার কথা বলি। এইরূপ পৃথক চেষ্টার প্রথম ও প্রধান ফল এই যে, যে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা হইবে—সেই গ্রামের আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তির উৎসাহ, উত্তম ও চেষ্টার অবধি থাকিবে না। নিজের সংস্কার বন্ধ, বংশ রক্ষা, প্রাণরক্ষার কে উদ্যোগী থাকিতে পারে? গ্রামের মধ্যে এই উন্নতি সাধকীয়তা পরিষ্কৃত হইয়া উঠিলে উক্ত উন্নতির জন্য কার্য করা সহজ হইবে।

কোনও একটা গ্রামের অধিবাসীগণ তাঁহাদের গ্রামে ম্যালেরিয়া দমনে অভিলাষী হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন? সর্বপ্রথমে তাঁহাদের মনের একাগ্রতা আবশ্যক এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি, বিরোধ, স্বার্থপরতা—এ সকল ভুলিয়া যাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে বুদ্ধিমান, বলিষ্ঠ ও ক্রেশ-সমৃদ্ধ অল্পসংখ্যক কয়েক জন ব্যক্তির উপর সাধারণতঃ সকল বিষয়ের ভার অর্পণ করিতে হইবে। তাহারা গ্রামে যে সকল পুষ্করিণী

ডোবা, জলপ্রণালী আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যে সকল পুষ্করিণী বৃহৎ—যাহাতে মৎস্য আছে—সেই সকল পুষ্করিণীতে ম্যালেরিয়া মশকের ডিম মৎস্যের কলেবর বৃদ্ধি করে মাত্র, সুতরাং সেই সকল পুষ্করিণী দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে সকল জলাশয় ক্ষুদ্র, জঙ্গলাকীর্ণ, সেই সকল পুষ্করিণীর সংস্কার করা আবশ্যক, কিন্তু পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী-সংস্কার এক দুঃসাধ্য বিষয় হইতেছে। অনেক পুষ্করিণীর অধিকারী এক্ষণে নিঃস্ব হইয়াছেন—তাঁহাদের সংস্কার করিবার সামর্থ্য নাই। একরূপ স্থলে গ্রামের অল্প অধিবাসীগণ অপরের পুষ্করিণী সংস্কারে অর্থব্যয় করিতে কখনই স্বীকার করেন না এবং এমন কি—পুষ্করিণীর মালিকও অপরের সাহায্য লইতে প্রস্তুত হয়েন না। অনেকস্থলে একটা পুষ্করিণীর অনেকগুলি ‘সরিক’ থাকায় কেহই তাহার উন্নতি কল্পে কোনও চেষ্টা করেন না। কিন্তু এখন আর সে গোলযোগ করিবার দিন নাই—যে পুষ্করিণীর সংস্কার গ্রামের স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক, তাহা সকলে মিলিয়া করিতে হইবে—তাহাতে সরিকের তর্ক, স্বদেশের তর্ক, হিন্দু মুসলমানদের তর্ক করিবার আর অবসর নাই। পুষ্করিণী অসংস্কৃত থাকিলে তাহার বিষময় ফল গ্রামের সকলকেই সমানভাবে ভোগ করিতেই হইবে—সুতরাং পুষ্করিণী-সংস্কারের ভারও সকলকেই লইতে হইবে। বৃহৎ পুষ্করিণী ব্যতীত গ্রামে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির সহিত গ্রামের পল্ল-প্রণালীর কোনও সংযোগ নাই, তাহারা বদ্ধ জল মাত্র,—তাহাদিগকে বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। আবার কতকগুলি জলাশয়—যাহা আপাততঃ দৃষ্টিতে বদ্ধজল বলিয়া প্রতীয়মান

হয়—প্রকৃতপক্ষে পয়ঃনালীর অংশমাত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেইগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া সমতলে এক বা বহু পয়ঃপ্রণালী গঠিত করিতে হইবে—যাহা দ্বারা গ্রামের কলুষ জলরাশি কোন স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া দূরে নদীগর্ভে বা অন্ত্র নিঃসারিত হইতে পারে।

এই প্রকারে কোন গ্রামের উন্নতি করিতে গেলে গ্রামবাসীগণকে প্রথমেই একটা অস্থ-বিধা ভোগ করিতে হইবে,—কোন পুষ্করিণীর সংস্কার আবশ্যক. কোন জলাশয় পূর্ণ করা প্রয়োজন, কোন স্থান দিয়া কি ভাবে পয়ঃপ্রণালী গঠন করিতে হইবে, কোথায় ম্যালেরিয়া-মশকের নিবাস—এই সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামবাসীগণের কোনও কার্যে প্রবৃত্ত হইবার সাহস না হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। গ্রামবাসীগণের দ্বিতীয় অস্থবিধা—যাহা না হইলে কোন কাজই হয় না সেই অর্থের জন্ত। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমরা যদি একবার বন্ধপরিষ্কার হইয়া উঠিয়া দাঁড়াই, তবে ঐ ছইট অস্থবিধার কোনটাই আমাদের পথে অন্তরায় হইবে না।

যেমন পল্লীসংস্কারের ভার একদিকে পল্লী-বাসীর উপর হস্ত থাকিবে, তেমনি অপরদিকে বাহ্যিক কৃতবিদ্য, জ্ঞানবৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা পল্লী হইতে হইতে পলাইয়া সহরে আসিয়া অর্থসঞ্চয় করিলেই তাঁহাদের সকল কর্তব্য সম্পাদিত হইবে না। সহর হইতে তাঁহাদের পল্লীর দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পল্লীবাসীর উত্তম ও চেষ্টার সহিত তাঁহাদের সহায়ত্ব ও জ্ঞানের সম্মিলন করিতে হইবে। এই সম্মিলনেই আমাদের সকল আশা ও ভরসা নিহিত আছে।

সহরের মধ্যে কলিকাতা প্রধান—জ্ঞান ও অর্থ কলিকাতা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই কলিকাতা হইতে বঙ্গদেশের অর্ধেক বিচ্ছিন্ন হইতেছিল বলিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ আর্ন্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল—, সমগ্র বঙ্গদেশের প্রতিও কলিকাতার অনেক কর্তব্য আছে। সৌভাগ্যক্রমে এই কলিকাতা সহরে কয়েকটা দেশবৎসল-কৃতবিদ্য চিকিৎসক Anti Malarial League ( ম্যালেরিয়া দমন সমিতি ) নামে একটা সমিতি গঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা দেশ মধ্যে যে কোনস্থানে গিয়া পল্লীবাসীদিগকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত আছেন। এই সমিতিতে লোকবল, অর্থবল দিয়া স্থায়ী করিতে হইবে,—জেলায় জেলায়— এমন কি প্রতি মহকুমায় বাহাতে উহার শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা করিতে হইবে।

কলিকাতায় উক্ত ‘ম্যালেরিয়া দমন সমিতি’ নির্দিষ্ট পন্থা আশ্রয় করিয়া কলিকাতার অদূর-বর্তী পানিহাট মিউনিসিপালিটিতে ম্যালেরিয়া নিবারণ সন্ধক্ষে যে সকল কার্য হইয়াছে ও তাহা যেরূপ ফলদায়ক হইয়াছে তাহা নিতান্তই আশাপ্রদ। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ব্রীজ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের নিকট আমি এই প্রবন্ধের প্রত্যেক তথ্যের জ্ঞানার্থী। তিনিই দশবর্ষাধিক কাল উক্ত পানিহাট মিউনিসিপালিটিতে ধীরে ধীরে কার্য করিয়া আসিতেছেন। প্রথম প্রথম তাঁহার অজিজ্ঞতা, লোকবল বা অর্থবলের কিছুই ছিল না, তজ্জ্বল কোনও কার্য করাও অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন নাই। গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া-মশকের আবাসভূমি খুঁজিতে লাগিলেন,—দেখিলেন যে, বৃহৎ জলাশয়গুলিতে ম্যালেরিয়া-মশকের ডিম নাই।



ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্থলীগুলি প্রতি বৎসর মিউনিসিপালিটি হইতে কয়েকজন কুলি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিত—কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনগুলি পূর্ণ কবা প্রয়োজন, কোনগুলি পরিষ্কার করা প্রয়োজন—তাহার প্রভেদ বিচার না করায় তাহাদের দ্বারা ক্ষতিই হইত। সেই মহামূর্তব ব্যক্তি গ্রামের সর্বস্থান দর্শন করিয়া গ্রামের একটা প্লান প্রস্তুত করিয়া কোন জায়গায়গুলি কোনও সংস্কারের আবশ্যক নাই এবং কোন গুলির কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন—তাহা স্থির করিলেন। গ্রামের পয়ঃপ্রণালী গুলি দ্বারা জল নিঃসরণের পথ স্থির করিলেন এবং সেই পথগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে শিশু ন' হইয়া যায় এবং তাহার কোথায় কিরূপ সমতল রাখা আবশ্যক—তাহা স্থায়ী করিবার জন্য সেই পথ গুলিতে প্রায়শঃ ৫০ ফিট মস্তুরে একটা করিয়া পাকা গাথনী ইটের চিহ্ন রাখিলেন। পানিহাটা-মিউনিসিপালিটিতে ম্যালেরিয়া দমন সংক্রান্ত এই কার্য্য ধীরে ধীরে বৎসরে বৎসরে অল্প অল্প করিয়া হইয়া আসিতেছে। ইহার ফল কি শুনিবেন? কার্য্য্য আবশ্য হইবার ৮ বৎসর পরে যখন ম্যালেরিয়ায় উক্ত গ্রামের সংলগ্ন দুইটা গ্রামে মৃত্যুসংখ্যা ১৫২ হইয়াছিল, তখন উক্ত গ্রামে ম্যালেরিয়ায় একটা লোকও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। উক্ত গ্রামের কার্য্য এখনও সুসম্পন্ন হয় নাই, এখনও কার্য্য চলিতেছে। কার্য্যে কত ব্যয় হইয়াছে জানেন? বৎসর বৎসর মাত্র ৬০৭০ টাকা করিয়া ব্যয় হইয়া আসিতেছে। এ কথা শুনিলে কাহার না আশা হয়?

বিদেশে বাইবার আবশ্যক নাই—নিজের দেশে—নিজের চক্ষে যখন দেখিতে পাইতেছি

৩৫—৫

যে, সামান্য ব্যয় করিয়া ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে দমন করা যায়, তখন কি আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত? পানিহাটাতে যাহা হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা দেশের সকল মিউনিসিপালিটিতে ও সকল গ্রামেই হইতে পারে। ম্যালেরিয়া দমন করিতে হইলে একটা রাজশক্তির প্রয়োগ এবং ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে—এ ধারণা পরিভাগ করিতে হইবে। বৎসর বৎসর ৫০৭০ টাকা খরচ করিলে এবং ধীরভাবে অগ্রসর হইলে যদি ম্যালেরিয়া দমন করা যায়, তবে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ কি? প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে, গ্রামের মধ্যে সামান্য ব্যয়ে—অবশ্য এক বৎসরে নহে—কয়েক বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া একটা গ্রামের ও প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যে উপায়ে এই গ্রামের উন্নতিলাভ হইয়াছে, তাহা বহুকাষ্ট-সাধ্য অথবা বহু ব্যয়সাধ্য নহে,—ম্যালেরিয়া প্রসিদ্ধিত সমস্ত গ্রামের অধিবাসীদিগেরই ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক যে প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যালেরিয়া দমন করা সহজসাধ্য ও অল্পব্যয় সাধ্য। কিন্তু গ্রামের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে ঐতি ও একমত তত সুলভ নহে। কিন্তু ইহা কি চিরকালই হুল্লুত থাকিবে?—কেবল এক প্রাণ হইলে, কেবল চেষ্টা, যত্ন, উত্তম করিলে দেশের সর্বাপেক্ষা যাহা অমঙ্গল, আমড়া তাহাকে দূর করিতে পারি। এ অবস্থায়ও কি আমরা পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ সৃষ্টি করিয়া, আমাদের যাহা কিছু শক্তি ও যাহা কিছু বুদ্ধি আছে, তাহা ঐ বিরোধ-বুদ্ধিতে আহুতি অর্পণ করিয়া দেশের কল্যাণকে ভয়ীভূত করিব? না—দেশের কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া—নিজেদের অতি তুচ্ছ, অতি

সামান্য বিরোধের কথা বিস্মৃত হইবে? এক্ষণে গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীগণ নিজের চেষ্টায় সাহায্যে গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিতে পারেন, তাহার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হউন, এবং সহজে ও অল্পব্যায়ে সঙ্কল্প সিদ্ধি করিবার জন্ত উপায় নিক্কারিত করিয়া লইয়া সেই পথে অগ্রসর হউন।

সাহায্যে অল্পব্যায়ে, সহজে, নিজের চেষ্টায় নিজের কল্যাণ হইতে পারে, আমি সেই কথাই বলিতেছি। আমি অপর কাহারও উপর নির্ভর করার কথা বলি মাই। ধাঁহারা নিজের সাহায্য করেন—ভগবান, এমন কি গবর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত তাঁহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আমাদের বর্তমান গভর্ণর বাহাদুর বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া দমনের জন্ত বিধি-মত চেষ্টা করিবেন তাহাতে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমরা যদি নিশ্চিত হই, তাহা হইলে আমাদের আশ্রয় প্রত্যাখ্যাত হইতে হইবে। গবর্ণমেন্ট যে সকল কার্য্য করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা কবে আরম্ভ হইবে, বা কবে শেষ হইবে—তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। বিশেষতঃ গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের অনেক রূহ ও প্রধান নদীর সংস্কার করিতে পারেন। তাহা সর্ব্বাংশে সুসম্পন্ন হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে আমি যে ব্যবহার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবে না। রূহ নদীর সংস্কার এবং ক্ষুদ্র পল্লীর পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা পরস্পর

পরস্পরের সাহায্য করে। বরঞ্চ পল্লীর পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং তাহা পল্লীবাসীকেই করিতে হইবে। নিজের কর্তব্যভার নিজের মাথার উপর বহন করিতে হইবে, পরের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

বর্তমান যুগধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলে—চারিদিকে ঘূর্ণমান কালচক্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আশায় প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মনে হয়—সে দিন বহুদূরে নাই—যেদিন বঙ্গবাসী বিলাস-বাসনের কুসক বিস্মৃত হইবে, যেদিন সেই পুরাতন পরিত্যক্ত পল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবে,—যেদিন বাঙ্গলার পল্লী লক্ষ্মী পরিপূর্ণ পূর্ণিমা অগাধ অনন্ত জ্যোৎস্না সমুদ্রের মধ্যে বসিয়া পল্লীবাসীর পূজা গ্রহণ করিবেন। সে দিন দূরবর্তী নহে—যে দিন এই অসংখ্য শ্রোতস্বতী বিভূষিত, দিগন্ত প্রসারী-হরিত-ক্ষেত্র-বিমণ্ডিত, শ্রামা-দোয়েল-পিকবব মুখরিত, বিবিধ ফুলফল ভরা তরুজাল সমলঙ্কৃত সোণার বাঙ্গালা সুস্থ-স্ববল-সন্তান জোড়ে ধরিয়া গৌরব অমুভব করিবে। সে দিন কল্লনার কুআশায় আচ্ছন্ন নহে—যেদিন বাঙ্গালী বিজ্ঞান—জ্ঞানে—স্বাস্থ্যে—বলে—নিজের শির উন্নত করিয়া রাখিতে পারিবে। সেদিন আসিবেই আসিবে—যে দিন বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তরালে অমুভব করিবে, যে, বাঙ্গলার জলে—বাঙ্গলার মাটিতে বিধাতার করুণ আশীর্বাদ নিহিত আছে। শুধু আমাদের আশ্রয় মনে রাখিতে হইবে—একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা মানুষ,—আমাদের মানুষের মত বাঁচিতে হইবে, আর আমাদের মানুষের মতই মরিতে হইবে আমরা সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রতিদিন মরিতে বাঁচিয়া থাকিতে চাহি।\*

শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়।

\* “ভারতবর্ষ” পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত “কি চাহিবা” শীর্ষক প্রবন্ধ দেখক কর্তৃক পরিবর্তিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

# আয়ুর্বেদ ।

মাসিক পত্র ও সমালোচক ।

সম্পাদকগণ—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ  
কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন, এম-এ, এম-বি  
কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন ।

তৃতীয় বর্ষ ।

( সন ১৩২৫ আশ্বিন হইতে ১৩২৬ ভাদ্র পর্য্যন্ত )

• বাৎসরিক মূল্য ডাকমাণ্ডলসহ ৩/৮

কলিকাতা ।

১২৪১২।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট—সংস্কৃত প্রেসে কবিরাজ শ্রীহরি প্রসন্ন রায়

কবিরত্ন কর্তৃক মুদ্রিত ও ২৯ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট—

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় হইতে মুদ্রাকর

কর্তৃক প্রকাশিত ।

## তৃতীয় বর্ষের প্রবন্ধ সূচী ।

( বর্ণমানানুসারে )

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
“অশ্বিনী কুমার” —কবিরাজ শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সামাধ্যায়ী ব্যাকরণতীর্থ, বিজ্ঞাবিনোদ,	এইচ, এন্, এম্, এন্, ৪৮	
অষ্টম্ আয়ুর্কৌদে বিজ্ঞান ও ধর্মসূত্র —কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৪৭	
অস্ত্রোপচার —ডাঃ শ্রীমতাজীবন ভট্টাচার্য্য, এন্, এম্, এন্,	১২৮/২৯	
আবার ( কবিতা ) —শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১	
আয়ুর্কৌদেয় চিকিৎসা —কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৫১	
আয়ুর্কৌদেয় চিকিৎসার বর্তমান অবস্থা ও } —কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	২০	
আয়ুর্কৌদেয় চিকিৎসার উন্নতির উপায়		
আয়ুর্কৌদে ওলাউঠা —কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৩১/৩২	
আয়ুর্কৌদে —খণ্ড প্রথম —কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৮	
আয়ুর্কৌদেয় কথা —শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	
“আয়ুর্কৌদে”র নববর্ষ ( কবিতা ) —কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	...	
আয়ুর্কৌদেয় প্রভাষ —শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস	১২	
আয়ুর্কৌদে সভায় পাঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে একখানি পত্র —শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮	
আয়ুর্কৌদেয় স্বপক্ষে একটি সত্য —শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ,	৩৫	
আমাদের দেশে খাদ্য ও পথ্য —কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ	৫১/৫৪	
আয় মা ( কবিতা ) —কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	...	
ইন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস —কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ	১৫	
উপরোপ রক্ষা —শ্রীযুক্ত তারক নাথ বিশ্বাস	৬	
উল্লেখ্যদের উপকারিতা —প্রফেসর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্-এ,	১	
ওয়ার ফিবার —শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী বিজ্ঞানভূষণ	৬৮/৬৯	
ওলাউঠা চিকিৎসা —কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীননাথ কবিরঞ্জন শাস্ত্রী	৩৮/৩৯	
ওলাউঠার প্রতিষেধক —ডাঃ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়, এন্, এম্, এন্,	১১	
ওলাউঠা হইতে আত্মরক্ষার উপায় —ডাঃ শ্রীযুক্ত মহাদেব মণ্ডল	২১	
কাজের কথা কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	৮১/১২১/১৩১/৩২১/৪১	
গর্ভিণী রোগ চিকিৎসা —	ঐ	
গার্ভস্থ মণ্ডিযোগ ও টোটকা —কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরধাংশু ভূষণ সেন	২	

୨୭୫/୨୭୮/୭୨୭/୭୫୯/୭୬୬/୫୭୬/୫୭୯

ব্রহ্মচর্য্যে বালক সমাজ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ	...	২৭০
মকরপুজার অনুষ্ঠান বিধি—কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য	...	২৩২
মঙ্গলাচরণ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	...	১
মদাতায়—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ মজুমদার কাব্যতীর্থ	...	৩৭৮
মহুরিকা বা বসন্ত চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি	...	৩৫৭।৩৭০
মানব জন্মের কথা—ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ মজুমদার	...	১০৫
যক্ষা রোগ ও তাহার চিকিৎসা—ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার দে	...	২৭।২৫০
রক্ত মোক্ষণ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর লোহ	...	২৩৪
রোগ নিবারণ কিসে হয়?—উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ( চট্টোপাধ্যায় ) বি-এল	...	২০৫
রোগের কারণ ও নিরাকরণ উপায়—উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ( চট্টোপাধ্যায় ) বি-এল	...	১৩২
শরীর ও স্বাস্থ্য—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র পাল	...	৩৯১
শিশুদের বক্ষারোগ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন	...	৪৭
শিশুর খাওয়া—কুমার তন্ত্র রচয়িতা	...	৪২২।৪৬৩
শিশুর খাওয়া বিচার—প্রফেসর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ	...	১০০
শিশু চিকিৎসা—ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র গুপ্ত	...	১০৯
সমর জরে প্রতিষেধক আদা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ রায় কবিভূষণ	...	২৩০
সর্ব্বদেশে ক্রিমি বা ছকপোকায় প্রতিকার—( বঙ্গেশ্বরের বক্তৃতা )	...	১৯৭
সমর জ্বর বা নব ইনফ্লুয়েন্স্যা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত কবিরত্ন	...	১৬৫
সমালোচনা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন	...	১৯৯।৩২০
স্বাস্থ্যতত্ত্বে বৈধব্য ধর্ম্ম—ডাঃ নলিনী নাথ মজুমদার	...	৩০৫
স্বাস্থ্যরক্ষায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি—ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র দাস	...	১৭১
স্বাস্থ্যরক্ষায় হিন্দুধর্ম্মের বিধি নিষেধ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার মজুমদার	...	২৯৫
সেবাল ও একাল—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ	...	৩০৮
হিন্দুর স্বাস্থ্য নীতি—ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র দাস	...	৩৫
ছক ওয়ার্ম বা বক্রাসা ক্রিমি—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সারদা চরণ সেন কবিরত্ন	...	৩৭৭
ক্ষয়রোগের বিস্তৃতি নিবারণ—ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ হাঙ্গদার এল এম-এস	...	৩৩

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৩য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫—আশ্বিন ।

১ম সংখ্যা ।

## মঙ্গলাচরণ ।

—:—

যে গান গাহিয়া 'হিরণ্যগর্ভ' মুগ্ধ করিলা বিশ্ব,  
যে গান শিখিতে 'দক্ষ' সানন্দে হইলা 'তাঁ'র শিষ্য ।  
যে গান আবার 'অশ্বিনীকুমার' করিলা ছুঁয়ে শিক্ষা,  
যে গান আবার তাঁদের সন্তান 'ইন্দ্র' লইলা দীক্ষা ।  
যে গান শিখিয়া 'আত্রেয়' ঋষি রক্ষা করিলা আর্ভে,  
যে গান 'অনন্ত'—'চরক' হ'য়ে আনিলা এই মর্মে ।  
যে গান শুনাতে 'ধনুস্তুরি'র 'দ্বিবোদাস' রূপে জন্ম,  
যে গান শিখিয়া 'সুশ্রুত' ঋষি বুঝা'ল তাহারি মর্ম্ম ।  
যে গান শুনিয়া প্রাচ্য জগত দীক্ষা লইল তাঁ'র,  
যে গান সমগ্র বেদেরি ব্যাখ্যা—বেদত্রয়ের সার ।  
যে গানের মূল—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্শ উঠুক স্মৃতি,  
যে গানের তানে স্বাস্থ্যরক্ষার শিক্ষা উঠিছে ছুটি ।  
যে গানে বিজ্ঞান প্রদানি' আলো দীপ্ত করিল দেশ,  
যে গানে মুমূর্ষু প্রাণ পাইয়া ছুটায় হাস্ত রেশ ।  
যে গান শুনিয়া নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন বয়,  
যে গান জানায় রোগ নাশিয়ে আয়ুর্বেদের জয় ।

সে গান গাহি এ সবে মিলি আবার নূতন বর্ষে,  
অমৃতবর্ষণ আবার হ'বে—দ্বিধা মাতিবে হর্ষে ।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ।

## ‘আয়ুর্বেদে’র নববর্ষ ।

—o\*o—

আজি আবার আমাদের নববর্ষ ।  
আশ্বিনে আনন্দময়ীর আগমনের সাড়া পাইয়া,  
শ্রামল শস্ত সস্তারের ডালি সাজাইয়া, ধরিত্রী  
হাসিতেছে । কাননে কাননে রক্তজবা ফুটিয়া,  
—পুষ্পরিণী গুলিতে ইন্দ্রিবর স্তবক প্রফুটিত  
হইয়া,—বৃক্ষবাটিকায় নবপল্লবে বিব বিটপি  
সম্ভা-সম্পদে সৌন্দর্য্যশালী হইয়া, মায়ের  
আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে ।—স্বকুমার  
মতি বালকবৃন্দ নবীন পরিচ্ছদে অঙ্গ সম্পদ  
বৃদ্ধি করিবার জন্ত আশার অপেক্ষায়  
বসিয়া আছে ।—কম্বুকুশল-কেরানীকুল আকুল  
অন্তরে অবকাশের দিন গণনায় সময়ক্ষেপ  
করিতেছে ।—পল্লীপ্রান্তরে নবোচা পত্নী প্রবাসী  
পতির আসঙ্গ-কামনায় অবশ-অলস-দেহে  
অধীর হইয়া ক্রোড়স্থ শিশুকে স্তম্ভদানের  
কালে তাহার চাক্ষু্য দর্শনে তাহাকে  
প্রহারোত্ততা হইতেছেন । কোনো যুবতী  
বহুকাল বিরহ সহিয়া, মিলনের দিন নিকট  
জানিয়া আনন্দে একপ বিহ্বলা হইয়াছেন যে,  
রন্ধন সময়ে বাঞ্ছনে লবণাধিক্য করিয়া বসিয়া-  
ছেন—ফলে সেজন্ত তদীয়া শশ্রুদেবী তাঁহাকে  
যথেষ্ট ভৎসনা করিতেছেন । কোনো প্রোচা  
রমণী অন্নকাল পূর্বে তাঁহার পুত্রের বিবাহ  
দিয়া অর্ধেক রাজত্বসহ এক রাজকন্যা আনিয়া

জীর্ণ প্রাসাদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এদিকে  
তন্মহর চিন্তায় জাগ্রত অবস্থাতেই যেন যন্ত্র  
জালে মিশিয়া পড়িয়াছেন । কোথাওবা দীন  
দরিদ্র-ভক্ত-সাধক তাহার প্রাণান্ত পরিশ্রম  
লব্ধ অর্থে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া, সঞ্চয়সরে  
যাহা কিছু উদ্ধৃত করিয়াছে, তদ্বারা জগৎ  
জ্ঞানী—শিবমনোমোহিনীকে জীর্ণ আটটানায়  
আনিয়া কৃতকৃতার্থ হইবার জন্ত বোধনব  
অপেক্ষা করিতেছে । এমনি দিনে আজি  
আমাদের আবার নববর্ষ । ছুইবৎসর  
পূর্বে—এমনই দিনে—এমনি সময়ে আমরা  
“আয়ুর্বেদে”র উদ্বোধন আরম্ভ করিয়াছিলাম ।  
ইহার উদ্‌ঘোষন নাই, চিরদিনই এই ব্রত  
পালন করিয়া যাইব—জীব কুশলেচ্ছ ত্রিকালজ  
আর্য্য ঋষির প্রগাঢ় জ্ঞান গভীর-গবেষণা সম্বৃত্ত  
উপদেশরাজি স্মরণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ  
তাহারই পুনরাবৃত্তি পূর্বক, পতিত—অধঃপতিত  
—স্বাস্থ্যহীন—অন্নাযু বাঙ্গালী জাতির কল্যাণ  
কামনায় চিরদিনই ঋষিপ্রাণ অল্পসরণ করিব—  
ইহাই আমাদের ব্রতপালন । স্মরণ্যং এ  
ব্রত পালন করিতে হইলে ইহার আদি  
আছে—অন্ত নাই,—আরম্ভ আছে—পরি-  
সমাপ্তি নাই,—উদ্বোধন আছে—উদ্‌ঘোষন  
নাই ।



একদা যে সময়ে আমাদের দেশ ধর্ম  
কর্মের আদর্শস্থান বলিয়া গর্বপ্রবণ ছিল,—  
আহারে-বিহারে, কর্মে-বিশ্রামে, ক্রীড়ায়-  
পরিচাসে যে সময় দেশের মধ্যে ব্যভিচার-  
স্রোত বাত্যা বিক্ষুব্ধভাবে প্রবাহিত হয় নাই,  
—শিক্ষাকাল হইতে সূচনা করিয়া, কর্মকালের  
দক্ষদৈর্ঘ্যে জাতি শাস্ত্রোপদেশের প্রত্যেক  
অক্ষর মানিয়া চলিত, বান্ধক্যে যে জাতির  
বানপ্রস্থের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইত,—পতি-  
বিয়োগে যে জাতির পত্নী জলন্ত চিন্তায় আয়-  
সমর্পণ পুষ্টক সতীধর্মের আভিতি প্রদান  
করিত,—অভক্ষ্য ভক্ষণ—অথাগ্ন ভোজন  
তো পরেব কথা—যে স্থানে অথাগ্ন-কুথাগ্ন  
বন্ধন হইত—সন্তান দিয়া গমনের ফলে  
‘পিবর্গী’ বলিয়া যে জাতির মধ্যে একদা এক  
সম্প্রদায়েব সৃষ্টি পর্যন্ত হইয়াছিল, সে ধর্মপ্রাণ-  
কর্মকণ্ঠ সর্বশক্তিমান জাতির বংশধর হইয়া,  
অধুনা আমরা দৈনন্দিন যে পাপ-পণ্য অর্জন  
করিওছি,—তাহারই ফলে আজি আমাদের  
আত্মবদা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বিলাস-  
পরিচয়িত জন্তু—অদম্য আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার  
জন্তু—অতৃপ্ত পিপাসার আহতি সম্পাদনের জন্তু  
অধুনা আমরা ধর্মধর্ম—কুর্কর্ম সুকর্ম মনে না  
করিয়া অথাগ্ন—কুথাগ্ন অমিত—অহিত—  
সকল দ্রবাই ভক্ষণ করিতেছি।—পানে-  
ভোজনে, বাহ্যদৃশ্যে আচার পরিতৃপ্তিই এক্ষণে  
আমাদের সর্বকর্ম হইয়াছে,—স্থান নাই—কাল  
নাই,—তানন্দ্রের বিচার বুদ্ধি নাই—যে রূপ  
ভাবেই হউক আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা পরিপূর্ণ  
করিতে পারিলেই হইল।—আমাদের আশা  
আকাঙ্ক্ষা—আমাদের প্রাণপাশী পূহা—তা’  
দেমন করিয়া হউক মিটাইতে পারিলেই  
হইল! এই না হইয়াছে আমাদের অবস্থা।

ফলে এই অবস্থার জন্ত যেরূপ ব্যবস্থা-বিপর্যয়  
সংঘটন সম্ভব—আমাদের ঘটয়াছে তাহাই।  
তাহারই ফলে সোণার বাঙ্গালা আজি আধি-  
ব্যাধির ধীলা নিকেতন—জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল-  
বশেষ প্রতিকৃতির জলন্ত আদর্শভূমি!—বাঙ্গালা  
জুড়িয়া আশান ভূমির অর্ন্তিনিদা!

বাঙ্গালার কিছু নাই, বাঙ্গালার আবহাওয়া  
একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার  
সন্তানগণের পরমায়ু আগে আশী নব্বই—  
একশ’ বছর পর্যন্ত ছিল,—এখন তাহাদের  
পরমায়ুর হিসাব উক্ত সংখ্যা পঞ্চাশৎ। তাহাদের  
আবার যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ  
করিতেছে—তাহাদের অনেকে ভূমিষ্ট হওয়ার  
অত্যন্তকাল পরেই মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে,  
অদৃষ্টবশতঃ—পরমায়ুর ঞোড়ে যাহারা না  
মরিয়া বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে—গীহা-যক্ণৎ  
তাহাদের গ্রাস করিয়া বসিতেছে! তাহার পর,  
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর-যৌবনের সন্ধি  
ক্ষেণে উপনীত হইয়ামাত্র ইঞ্জিয় পরতন্ত্র হওয়ার  
ফলে অজীর্ণ এবং ধাতু দৌর্বল্য রোগাক্রান্ত  
হইয়া সংসার সুখের বিষম অন্তরায় ঘটাইয়া  
জীবনযাপন ভীষণ দুর্কম করিয়া তুলিতেছে।  
বাঙ্গালী যে আজি এত যক্ষ্মারোগাক্রান্ত—  
বহুমূত্র বা ডাইবিটিসে আজি বাঙ্গালার যে  
অসংখ্য লোকক্ষয় হইতেছে, সরকারি বাতুল-  
লয় সমূহে বাঙ্গালীর সংখ্যা যে সকল জাতির  
শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে,—বাঙ্গালীর ইঞ্জিয়  
সংযমের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ!

দেশের মহিলা কুলের অবস্থা আরও  
শোচনীয়। পুরুষ অত্যাচারী হউক—কদাচারী  
হউক—ধর্মধর্ম তুলিয়া কুর্কর্মনিরত হউক,—  
কিন্তু পুরুষ যখন স্বীয় কুর্কর্মের ফলে ব্যাধি  
প্রাপ্ত হইয়া অশান্তি উপলব্ধি করে—

তখনই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া প্রতি  
বিধানের ব্যবহার জ্ঞাত প্রয়াসপরায়ণ হয়।  
রমণীর নিকট কিন্তু সেইটাই অভাব। অধুনা  
পুরুষ সম্প্রদায়ের মত রমণীগণও অত্যাচারের  
হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিতে পারেনা,—  
অবশ্য দেশের পুরুষগণই সে জ্ঞাত সম্পূর্ণ দায়ী।  
কিন্তু যে কারণেই হউক দেশের মহিলাকুলের  
অবস্থাও পুরুষদিগের মত দাঁড়াইয়াছে। মহিলা  
দিগেরও অধিকাংশ নানারূপ রোগে আক্রান্ত,  
কিন্তু আরোগ্যের জ্ঞাত তাহাদের যত্ব নাই,—  
চেষ্টা নাই, প্রতীকারের ব্যবস্থা নাই। কাজেই  
দেশের অবস্থা—বাঙ্গালার অবস্থা—আমাদের  
জননী জন্মভূমি মাতৃভূমির অবস্থা বড়ই বিপদ  
সম্মুখ। কলুষ-পঙ্কিলে দেশমাতৃকার সন্তানগণ  
প্রায় জাহ্নুদেশ পর্য্যন্ত মজ্জমান হইয়া পড়িয়াছে,  
—এ সময় তাহাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায়  
সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার। বেদ বিহিত

সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিয়া—দেশের  
আবাল বৃদ্ধ-বনিতাকে তাহাদের প্রকৃত সরণি  
দেখাইয়া দিতে হইবে,—শুধু দেখাইলেই হইবে  
না, সরণি দেখাইয়া দিয়া সেই মার্গ অনুসরণ  
করিবার জ্ঞাত পুনঃ পুনঃ পরামর্শ প্রদান  
করিতে হইবে। আমাদের “আয়ুর্বেদ” সেই  
পরামর্শ-সভার কর্ণধার। আয়ুর্বেদের উপদেশঃ  
স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ। আয়ুর্বেদের বনজ ভেষজ সমূহের  
বৃক্ষবাটিকা সেই পরমশ্রুতি চিত্রকলায় পরিপূর্ণ।  
আয়ুর্বেদের দিব্যোষধি সেই অস্বাভূর কমণ্ডলু  
হইতেই নির্গত হইয়াছে। দেশরক্ষা করিতে  
হইলে, দেশবাসীর সম্মুখে আবার সেই ব্রহ্মার  
কমণ্ডলু নিঃসৃত দিব্যোষধি সকল ধারণ করিতে  
হইবে। এককথাই ইহাই আমাদের জীবন ব্যাপি  
মহাব্রত। কাজেই এ ব্রতের উল্লেখন আছে,  
কিন্তু কোনোকাণেই ইহার উদযাপন হইবে  
না।

## আয় মা ।

—:~:—

আয় মা আনন্দময়ী নিরানন্দ বঙ্গ,  
দমুজ দলনী দেবী —দেবদূত সঙ্গে।  
পাইয়া তোমার সাড়া, বঙ্গবাসী মাতোয়ারা,  
বাঙ্গালীর প্রাণ আজি পুলকিত রঙ্গে,  
রোগ-শোক-জালা তা'র নাই যেন অঙ্গে।

রোগে জীর্ণ তনুখানি—মলিন বদন,  
সব যেন ভুলে গেছে দেখে ঐচরণ।  
পেটে অন্ন নাই তা'র, বরাভাবে হাহাকার,  
অভাব—অভাব শুধু—শুধু অনটন,  
তবু তোরে পেয়ে আজি হয় মগন।

প্রতি বর্ষে আস তুমি—প্রতি বর্ষে যাও,  
তিনটি দিনের ভরে শুধু দেখা দাও।  
সে দর্শনে উখলিয়া ওঠে মা বাঙ্গালী-হিয়া,  
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ—বা'র দিকে চাও—  
এক সুরে বাধা মাগো দেখিবারে পাও।

কিন্তু মা চাহিয়া যদি দেখ তাল ক'রে,  
বুঝিবে কি জালা বঙ্গ বাঙ্গালীর ঘরে।  
হৃদয়েতে বল নাই, মনে কান্দ শক্তি নাই,  
উৎসাহ—উত্তম তা'র গেছে দূরে স'রে,  
স্বাস্থ্য স্বেচ্ছা-স্বার্থী যেন নহে নারী নরে।

কিন্তু পথে রবে স্বাস্থ্য ?—খাত্ত যে মা নাই,  
অমৃতের আশ্রয় আর নাই পাই ।

দুঃখ বা অমৃত পিয়ে বাঙ্গালী রহিবে জীয়ে,  
সে দুঃখ নাহিক দেশে—বল কিবা খাই ?  
দুঃখ তো ভেজালে পূর্ণ—বল কিবা চাই ?

সাহসিক আহার তাই গিয়াছে উঠিয়া,  
অখাত্ত—কুখাত্ত সেবী বাঙ্গালী জুড়িয়া ।  
স্নানোত্তে উত্তরপূর্তি হোটেল খাইয়া ক্ষুধি,  
লোকনের রাধা মাংস নিতেছে লুকিয়া,  
বংশীর কথা আর কি কব খুলিয়া !

নিজ কক্ষদোষে মরে বাঙ্গালী এখন,  
কেন্দ্র আর নাই তার আসন মরণ ।  
দুঃখের শক্তি নাই— অকাল বান্ধক্য তাই,  
বাঙ্গালী শিশুর মৃত্যু তাই অগণন  
কোনোদেশে কোনোজাতি মরেনা এমন !

কোন দেশে অজীর্ণেতে এত লোক মরে ?  
কোন দেশে ঔষধতা প্রতি ঘরে ঘরে ?  
সেখানে এ বঙ্গভূমি, জানমা সকলি তুমি  
বিধবা বালিকা কত চক্ষের উপরে—  
কেনা নাহি যায় আর,—দে উপায় ক'রে ।

না'দের আনন্দময়ী জননী গো হয়,  
আনন্দ তাঁদের কাছে কেন নাহি রয় ?  
এক বর্ষ পরে আজি এলি মা আবার সাজি,

নানা উপচারে পূজি চিতে সাধ হয়,  
কিন্তু মা চাহিয়া দেখ্ সব শূন্যময় ।

অর্থ নাই—শক্তি নাই—মনও বুঝি নাই,  
তা'রি ফলে আজি মোরা এত দুখ পাই ।  
দে অর্থ আবার আনি, দে শক্তি শক্তির রাগি,  
দে বাসনা জাগাইয়ে পদেতে লুটাই,  
মরমের অভিলাষ—এইমা, জানাই ।

তুমি শক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি মোক্ষ—সব,  
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি তোমাতে উদ্ভব ।  
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, বায়ু ব্যোম, তুমি ক্ষিতি,  
তোমারি যে প্রতিমূর্তি বিশ্বের বিতব,  
ব্যাধি হ'য়ে ব্যাধি নাশ'—এতই সম্ভব ।

'আয়ুর্কৌদ'—যাহা হ'তে বিশ্ব বলকিছে,  
তা'তেও তোমারি মাগো মহিমা ক্ষরিছে ।  
জল হ'য়ে ছিলে তুমি, ছিলনা তখন ভূমি—  
'কেশব' তখন ইহা করিলা উদ্ধার,  
মৎস্তাবতার তাই হইল প্রচার ।

দে মা পুনঃ বল চাহি তোমার সদনে,  
'মাহুষ' করিয়া তোলা প্রতি জনে জনে ।  
প্রতিবর্ষে আনি তোমা পূজি শিব মনোরমা,—  
অবহিত মতি রাখি ওই শ্রীচরণে,  
ধর্ম যেন নাহি ভুলি জনমে-মরণে ।  
শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ।

## আমাদের দেশে খাত্ত ও পথ্য ।

—:—

"আজকাল বাঙ্গালী দেশে নব সভ্যতার  
কথায় কথায় ডাক্তার বাবুয়া বিলাতী ফুডের  
দুঃখ সঙ্গে নানাবিধ মত পরিবর্তন হইতেছে । ব্যবস্থা করিয়া বসেন । কিন্তু সকলেরই

ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমাদের দেশের উপযোগী ভাবে ঐ সমস্ত খাদ্য প্রস্তুত কি না ?

রোগীর পথ্যমধ্যে বঙ্গদেশস্থ পল্লীগ্রাম সমূহে দুগ্ধই অধিক ব্যবহৃত হয় ও চিকিৎসকগণ প্রায়ই ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সত্ত্ব দোহন করা টাটকা দুগ্ধ ফুটাইয়া রোগীকে খাওয়াইলে যে উপকার পাওয়া যায়, অল্প কোনরূপ বিলাতী দুগ্ধের দ্বারা সেরূপ উপকারের আশা করিতে পারা যায় না। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে অনেকে বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া বিলাতী দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাহা আমাদের দেশে কিরূপ কার্যকরী। আমাদের দেশস্থ খাঁটী দুগ্ধ রাসায়নিক পরীক্ষা করিলে তাহাতে ৪ প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়, যথা—কেজিন, চর্বিময় পদার্থ, ক্ষীরশর্করা এবং জল। আর জমান দুগ্ধ পরীক্ষার উপরোক্ত দ্রব্য ছাড়া কেন্সুগার, ফারময় পদার্থ, ও ফস্ফরিক এসিড অতিরিক্ত বর্তমান থাকিতে দেখা গিয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইহাদের উপাদানগত পার্থক্য কিরূপ? আমাদের দেশের জিনিষই আমাদের পক্ষে প্রকৃত উপকারী। সকলেই দেখিয়াছেন যে, প্রাতঃকালের দোহন করা দুগ্ধ যদি বহুকণ ফেলিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহা ছিটিয়া যায় বা কাটিয়া যায়, কিন্তু এই তিন চারিমাস বা আরও অধিক দিনের দুগ্ধ কি অবিকৃত ভাবে থাকিতে পারে? আরও এক কথা, একটিন দুগ্ধ এক দিনে প্রায় খরচ হয় না, সে অবস্থায় তাহা খুলিয়া রাখিলে তাহাতে নানাবিধ জীবাণুর বাসভূমি হইয়া থাকে। অতএব ইহা ব্যবহার করা যে শ্রাসঙ্গত নহে, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাঝেই স্বীকার করিবেন।

যখন আমাদের এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পরিবর্তে আৰ্য্য আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা কাৰ্য্য সম্পন্ন হইত, তখন এত অধিক পথা-বিদ্ভট হইত বলিয়া মনে হয় না। সে সময় আমাদেরই দেশস্থ যবের পালো, সাগুদানা, তৈখ, মুগসিন্ধ, পলতার বড়া, মসুরের যুষ, দুগ্ধ, দধি, ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্তে আজ থিনএরারুট-বিস্কুট, বেঞ্জাসফুড, ইত্যাদি নানাবিধ পথ্য আসিয়া দেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মুরগীর যুষ খাওয়াইয়া, কেহ কেহ এসেন্স অব্ চিকেন ব্যবহার করিয়া, তাড়াতাড়ি রোগীকে বল প্রদান করিতেছেন। সদাচার বলিয়া হিন্দুর যে একটা জিনিষ ছিল, তা' আজ স্নেহাচারে পদদলিত হইতেছে। যখন এসব পথ্য আবিকৃত হয় নাই, তখন কি মৃত্যুসংখ্যা এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল? কখনই না। ইহাতে দোষ কাহার? সকলেই এক বাক্যে উত্তর দিবেন—দোষ আমাদেরই, কেননা আমরাই নূতন সভ্যতায় বিলাসিতার চরম সীমার উপনীত হইবার বাসনা করিয়া উৎসন্ন যাইতেছি। আমাদেরই কি ছিলনা,—বা কি নাই, সবই আছে,—গিয়াছে কেবল আমাদের সেই সেকালের বিশ্বাস। এক বিশ্বাসহীন হইয়াই আমাদের এই অবনতি। আমাদেরই দেশের জিনিষ ভালভাবে লেবেল দিয়া উত্তম শিশিতে প্যাক হইয়া বিদেশ হইতে ফেরৎ আসিতেছে; তাহাই আমরা সাদরে গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সকলেরই চক্ষু ফুটিতেছে—“নূতন কিছু করো একটা নূতন কিছু করো”—এ কথাটার পরিবর্তে মধ্যে মধ্যে পুরাণের আদব দেখা যাইতেছে। আমাদের সেই মসুরের যুষের পরিবর্তে এসেন্স অব্ মসুর, কিস্কিমিস

যে ইত্যাদি পথ্যরূপেও সেই পুরাতন নিম, মুস্কি, গুণ্ডা, কালমেঘ, প্রভৃতি ঔষধরূপে ব্যবহার করার অনেক উপকার হইয়াছে । . . . অল্প বিলাতী ফুড্ আমাদের দেশস্থ জীবন দাঙ্গা আমাদের শরীরের উপযোগী—সুস্থরূপ পথ্য ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত । মহর্ষি বরুণ বলিয়াছেন—“অরাদৌ লভ্যনং পথ্যং স্বাস্থ্যং নমু ভোজনং” । একথা মানিয়া চলিতে প্রশ্ন কাহারও দেখা যায় না । এখন ইংরাজ পবিত্রে আমরা নবজ্বরে নানাবিধ পথ্যের ব্যতীলা দ্বারা রোগীর অপকারই করিয়া থাকি । জবাবস্থায় প্রায় অতিরিক্ত পথ্যাদি ইংরাজ নং সেই জন্তই আর্ধ্য স্ববিগণ অত্যন্ত মনঃ সমর পথ্য প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ও জ্বর কম হইলে লঘুপথ্য ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।

. . . আমাদের দেশেও যব জন্মিয়া থাকে । যববই ইংরাজী নাম বার্লি । এই সেই পোড়াই হইয়া বার্লি পাউডার নাম ধারণ পূর্বক এদেশে আসিয়া থাকে, কিন্তু সত্ত্ব প্রকৃত যব চূর্ণ অপেক্ষা কি তাহার পুষ্টিকারিতা বেশী?—কখনই নয় । আরও আমাদের মজিতে যে জব্বা উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

রোগীর তৃষ্ণা পাইলেই অমনি আমরা সাফ-সেমেনেড্ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া বসি । ইংরাজ বিলাতীজল ব্যবহারে রোগীর পিপাসা নিবারণ করা অপেক্ষা জগদীশ্বরের উৎকৃষ্ট দান যবজল অতি উপযোগিতার সহিত ব্যবহার করা গাইতে পারে । তবে একটা কথা আছে, এ যে সুন্দর বোতলে ভরা লেবেল দেওয়া নয়, কাজেই বাবুদের ভক্তি হয় না ।

বিলাতী ফুডে যে কি আছে, তাহার প্রকৃত বিবরণ সাধারণে অবগত নহেন । তাহা গ্রীষ্ম প্রধান বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে কিরূপ উপকারী, কতদিনের পুরাতন, কতদূর হ’তে তা’র শুভাগমন হ’চ্ছে, এ সবও বিবেচনা করিতে দেখা উচিত । যে জিনিষের উপাদান নিশ্চিত জানা নাই—তাহা ব্যবস্থা করাও যা, আর বিষ সেবনের ব্যবস্থা করাও তাই । প্রকৃত গুণাদি অবগত হইয়া পথ্যাদি ব্যবস্থাপিত হইলে—তাহা অমৃত তুল্য হইয়া থাকে ।”

\* \* \* \*

শীর্ষাক্ত কথাগুলি আমার নহে, একজন স্পষ্টভাবী বহুদর্শী ডাক্তারের কথা । শুধু ইহাই নহে, একজন দেশ-বরেণ্য বড় ডাক্তারের স্বযোগ্য হস্তে পরিচালিত মাসিক পত্র—এই সরল সংযত সুন্দর সত্য কথা গুলি সন্দর্ভ-কারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বঙ্গবিশ্রুত কীৰ্ত্তি-ডাক্তার কার্তিক চন্দ্র বসু এম্ বি মহাশয় দেশাঙ্ঘবোধের মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া “স্বাস্থ্য সমাচার” নামে যে মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন, সেই মাসিক পত্রে, প্রসিদ্ধ ডাক্তার রাখাল চন্দ্র নাগ মহাশয় ঐ কথাগুলি লিখিয়াছেন । এমন সার-গর্ভ কথা—ইতঃপূর্বে আর আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই । রাখাল বাবু যাহা বলিয়াছেন—তাহা দেব নির্মাল্যের মত পবিত্র ; তিনি যে ডাক্তার হইয়া দেশীয় পথ্যের আদর বুঝিয়াছেন,—তিনি যে স্বার্থ মোক্ষ জড়পিও দেশবাসীকে নিজের ঘর চিনাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, জানিনা—আমরা কোন্ ভাবায় তাঁহার এ উদারতার প্রশংসা করিব ? ডাক্তার হইয়া কার্তিক বাবুও যে এই প্রবন্ধটা পত্রস্থ করিয়াছেন,—সে স্বস্তি আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ ।

\* \* \*

আমরা রাখাল বাবুর “দেশী ও বিদেশী পথোর কথা”—নামক সন্দর্ভটির অধিকাংশই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। রাখাল বাবুর প্রত্যেক কথাই—আমরা ঐক্য সিদ্ধির মত অভিনন্দিত করিয়া লইতে পারি। বাস্তবিক, যে দেশের ভগবান—কেবল ভোগের জন্তই, এক হইয়াও ‘বহু’ হইয়াছিলেন,—সে দেশের রোগীর জন্ত পথোর অভাব হইতে পারে! হৃৎকের বিষয়—দেশের লোক একথা ভুলিয়া গিয়াছে। নহিলে—ঘরে ঘরে এত অকাল-মৃত্যু-রোগ শোক, অভাব অনটন হইবে কেন?

বর্তমান প্রবন্ধে—আমি আমাদের দেশীয় পথ্য ও খাওয়ার কথা ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিব। কিছুদিন পূর্বে—মাতৃভাষায় আমার দীক্ষা-গুরু, স্বর্গীয় অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় এই বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিবার জন্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সংসারের নানা বিভ্রমের পড়িয়া আমি সেই মহাশয়ের আদেশ পালন করিতে পারি নাই। আমার পরম বন্ধু—হুগলী জজকোর্টের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও দেশীয় পথ্য সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন, সমগ্রা-ভাবে সে অনুরোধও আমি রক্ষা করি নাই। রাখাল বাবুর যুক্তিময়ী কথায়—আজ আমি একসঙ্গে পরলোকস্থিত গুরুর পরিতর্পণ এবং ইহলোকস্থিত বন্ধুর পুলক বর্ধনে অগ্রসর হইতেছি।

এ সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রমপ্রমাদ পরিদৃষ্ট হইবে, আশা করি—বিশেষজ্ঞগণ তাহার সংশোধন করিবেন। বৃন্দসংহিতা, পাকরাজেশ্বর, ভাব প্রকাশ, পথ্যাপথ্য বিধি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে—আমি একে একে স্মৃ-

ব্যক্তির খাওয়া এবং রোগীর পথ্য সংকলন করিব। এ সম্বন্ধে পাঠকগণের কোনও জিজ্ঞাস্তা থাকিলে—অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে পত্র লিখিবেন। আমি তাঁহাদের প্রশ্নের যথাশক্তি সহজতর দিয়া কৃত কৃতার্থ হইব।

### ধাত্ত ।

আমরা বাঙ্গালী,—চাউল আমাদের প্রধান খাদ্য। সকলেই জানেন—“ধাত্ত” হইতে আমরা সেই চাউল সংগ্রহ করিয়া পাকি। ঋষিগণ ‘ধাত্তকে’ পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা;—১। শালি ধাত্ত, ২। ত্রিধি ধাত্ত, ৩। শূক-ধাত্ত [যব প্রভৃতি] ৪। শিথী ধাত্ত [মুগ, কলায় প্রভৃতি] এবং ৫। ক্ষুদ্র ধাত্ত। কান্দলী দানা, জামা-বীজ—প্রভৃতি তৃণ জাত ধাত্তকে ক্ষুদ্র ধাত্ত বলা যায়।

এই শালিজাতীয় ধাত্ত হইতেই উৎকৃষ্ট চাউল প্রস্তুত হইয়া থাকে। শালিধাত্ত আবার অনেক রকম। তাহাদের নামও অনেক—রক্তশালী, কলম, পাখুক, শবুনা হত, স্নগন্ধক কর্দমক, মহাশালি, দূবক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিষমস্তক দীর্ঘশুক, কাঞ্চনক, হায়ন, লোধ্রপুষ্প—ইত্যাদি। এসকল নাম এখন অভিধানের কুক্ষিগত। এখন চাষার—বাঁকতুলসী, বিড়েশাল, ধুধুকলমা, দাদখানি, বাদশাভোগ, কামিনী, লীলাবতী, রাঁধুনী পাগল—প্রভৃতি নানা সংজ্ঞায় ধাত্তের নাম করণ করিয়াছে। এ দেশে এত রকম ধান আছে যে,—তাহাদের নামোল্লেখ করা অসম্ভব। এক কলিকাতার মিউজিয়মেই ৫০০০ রকম চাউলের নমুনা সমস্তে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষ ধাত্তের আদি ভূমি। খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দে চীন দেশে পঞ্চ শতাব্দী উৎসব হইয়াছিল,—এই পঞ্চ শতাব্দীর মধ্যে

ইসরা প্রপান। ভারতের বৈদিক যুগে বজ্র পঞ্চ শস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ধাতুর জন্ত চাষ করা হইত না, তাহা অক্ষুণ্ণ ভূমিতে আপনা হইতেই এ দেশে যত্নে উৎপন্ন হইত। কিন্তু এইরূপ জাত তখন স্বেচ্ছা তিত্ত ও কষায়াবাদে।

এ দেশে কৃষি বিজ্ঞান উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যত্ন ও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বৈদিক যুগে কৃষিকর্ম করিবার ধাতু রোপণ প্রথা প্রচলিত হয়। তখন সেইরূপ ধাতুর মতিল—“কৈলাস”। ইহার পরবর্তী যুগে কৃষ্ণমিত্রা ধাতু বৃক্ষকে উৎপাদন দিয়া ক্ষেত্রের পুনর্বর্ধন করার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। এইরূপে উৎপন্ন ধাতুর নাম—“বাপিত” বা “বাপিত”। বাপিত ধাতু চাউনের তিত্তায়াদ নষ্ট হইয়া তাহাতে খুব রসের আবির্ভাব হয়। অত্যাধি, এ দেশে এই বাপিত প্রথা, কৃষকেরা ধাতুর চাউন প্রয়োগ করে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীয় ধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। সে কাল কণা সবিস্তারে বলিবার আবশ্যকতা নাই। বঙ্গদেশে, বঙ্গকালে, গ্রীষ্মকালে, শ্রবণকালে—এবং শীতকালে, এই চারি মাসে চারি জাতীয় ধাতু জন্মিয়া থাকে। ইহাদের নাম যথাক্রমে—বোরো, আউস, জ্যৈষ্ঠাশাণ, এবং, আমন। আমন ধাতুই সর্বোৎকৃষ্ট, ইহার চাউলই সকলের চেয়ে সুপাচ্য।

এক রকম ধাতু আছে—আয়ুর্কেন্দ্রে তাহা “বৈক” আখ্যায় অভিহিত। “পূর্বস্থা এবং যে সকল বাস্তব তে বস্ত্তিকা মতা”—এই চাউলের আখ্যায়—২

অন্ন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হজম হয়। এই ধাতুরও অনেক জাত আছে। তাহাদের নাম—শণপুষ্প, প্রনোদক মুকুন্দক। ইহারা ব্রীহি শ্রেণীর ধাতু। ঘাইট (৬০) দিনের মধ্যে এই শ্রেণীর ধাতু পরিপক্ব হইয়া থাকে, তাই ইহার চলিত নাম—“ঘাইট”।

যে সকল ধাতু জলাভূমিতে জন্মে, যাহার গাছ নাড়িয়া বসানো হয় না, এবং যে ধাতু বর্ষার শেষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহার চাউল জীর্ণ হয়—বহু বিলম্বে। এ দেশের দীন দরিদ্রেরা এইরূপ চালের অন্ন ভক্ষণ করিয়া, উদর, রক্তহীনতা চর্মরোগ, শ্বাসের প্রদাহ, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

### ধাতুর উপাদান।

উপাদান—	শতকরা
জল ... ..	১২.৩
আমিষ জাতীয় ... ..	৮.০
স্নেহ জাতীয় ... ..	০.৩
শালি জাতীয় ... ..	৭২.৪
লবণ জাতীয় ... ..	০.৪

### চাউল।

(ভাত)

প্রথমেই বলিয়াছি—

\*আমাদের সর্বপ্রধান ধাতুর নাম—“ভাত”। সাধু ভাষায় ভাতের নাম “ভক্ত”। ভক্তের অনেকগুলি পর্যায় আছে। যথা—অন্ন, ওদন, অন্ন, কুর, ভিসলা, অন্ন, ও মিহি। সকলেই জানেন—চাউলকে জলে সিদ্ধ করিয়া ভাত প্রস্তুত করিতে হয়। যত চাউল, তাহার ৫ গুণ জল নিয়া মুহূর্ত্তে সিদ্ধ করিতে হয়। আমাদের গৃহলক্ষ্যগণ—এরূপ নিয়মে ভাত রন্ধন করেন না। তাহারা ৫ গুণ জল রাখিয়া রন্ধন করেন। ইহাতে ভাতের স্বাদ হ্রাস পায়।

হয় না। জল ওজন করিয়া দেওয়াই ভাল।  
কেননা শাস্ত্রের বিধি—

“স্ব ধোতাং শুভ্রলান্ স্ত্রীতাং স্তোয়ে পঞ্চগুণে  
পচেৎ।

তত্ক্ষণঃ প্রস্তুতং চোক্ষং গুণবন্মতং ॥”

প্রথমে চাউলকে বেশ করিয়া ধুইতে  
হইবে; জল পাইয়া চাউল গুলি জুলিয়া উঠিলে  
তাহা ৫ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। চাউলের  
পরিমাণ যদি এক পোয়া হয়, পাঁচ পোয়া জল  
দিয়া তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এক পোয়া  
চাউলে, তিন পোয়া ভাত হয়।

ভাতের ফেন গালা উচিত কি  
না?—ভাতের ফেন গালা উচিত। কেন  
না—“অশ্রুতং শীতং গুরুকচ্যং কফপ্রদং।”  
অর্থাৎ ফেন শুদ্ধ ভাত—শীতবীৰ্য্য, গুরুপাক,  
অরুচিকর এবং কফবর্দ্ধক। কাহারও  
কাহারও বিশ্বাস ভাতের ফেন গালিলে,  
ফেনের সহিত ভাতের সারাংশ বাহির হইয়া  
যায়। এ ধারণা ভুল। ভাতকে বৈজ্ঞানিক  
বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত উপাদান গুলি  
প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

উপাদান	শতকরা।
আমিষ জাতীয় ...	২-৮
শালি জাতীয় ...	৫১-২
লবণ জাতীয় ...	০-২৮
লবণ জাতীয় ...	৩-২৮
জল ...	৩৯-৭২

ভাতের ফেনে (যাহা আমরা ফেলিয়া দিই)  
আমরা নিম্নলিখিত উপাদান দেখিতে পাই—

আমিষ জাতীয় ...	০-৩
শালি জাতীয় ...	০-৮
লবণ জাতীয় ...	১-৪
জল ...	৯৫-৭

ইহা দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতে পারি—  
ভাতের ফেন গালিলে ভাতের লবণ জাতীয়  
উপাদান অনেকটা কমিয়া যায় বটে, কিং  
অত্যাশ্চর্য উপাদান অতি অল্পই নষ্ট হয়।

ভাতের উপাদানের প্রতি লক্ষ্য করিলে  
আমরা জানিতে পারি—তাহাতে আমিষজাতীয়,  
স্নেহ জাতীয় এবং লবণ জাতীয় পদার্থ অতি  
অল্প পরিমাণেই বর্তমান থাকে। এই জন্য যে  
সকল খাঞ্চে পূর্কোক্ত উপাদান গুলি বেশ  
আছে,—ভাতের সঙ্গে আমরা সেই সকল দ্রব্য  
ভক্ষণ করি। মাছ, মাংস, দ্রুত, দুগ্ধ, ডাল—  
ভাতের সঙ্গে খাইতে হয়। শাকসব্জী  
খাইলে,—ভাতের লবণ জাতীয় উপাদানের  
অল্পতার অনায়াসেই পূরণ হইয়া থাকে। কেননা  
শাকসব্জীতে লবণ জাতীয় উপাদানের আধিক্য  
দেখিতে পাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে—ভাত অম্লবদ্ধক,  
কুচিকারক, তৃপ্তিজনক, শরীরের হিত সম্পাদক;  
ইহা মলমূত্রের প্রবর্তক, স্নিগ্ধ, বলকারক,  
বায়ু ও পিত্তনাশক, কিঞ্চিৎ কফকর, এবং  
লঘু। বিজ্ঞান মতে—ভাত পরিপাক হইতে  
সাড়ে তিনঘণ্টা সময় লাগে। ইহা সম্পূর্ণরূপে  
অন্ত্র মধ্যে শোষিত হয়। ইহার সারাংশের  
সমস্তটুকুই—শোণিতের সহিত মিশিয়া যায়।

কোন চাউল ভাল?—নূতন  
চাউলের চেয়ে পুরাতন চাউলই অধিক  
পুষ্টিকর। চাউল পুরাতন হইলে, রাসায়নিক  
পরিবর্তন হইয়া থাকে। এইজন্য পুরাতন  
চাউল সহজে পরিপাক করা যায়। কিং  
অনেক দিনের পুরাতন চাউলও ভাল  
নহে, তাহা একদিকে যেমন অম্লবীর্ণ, পর  
দিকে তেমনি তাহার পুষ্টিমানিক্য অতি  
কমিশ্র থাকে।



চট্টলে পুতান বলা চলে। রোগীকে পথ্য দিতে হইলে, ৪।৫ বৎসরের পুতান চাউল ব্যবহার করা উচিত।

পুতান চাউল—বলকারক, বর্ণ প্রসাদক, হিমেন্দ্র নাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, মূত্র বন্ধক, স্বপ্নপ্রসাদক, অগ্নিবর্ধক, পুষ্টিজনক, এক পিপাসা, দাচ, বিষদোষ, ত্রণ, খাঁস, কাস, ও ব্রশনি নাশক।

নূতন চাউল—অত্যন্ত কফবর্ধক এবং কপক। নূতন চাউল ভোজনে—গাল ও লালনিত পারে, অধিকন্তু উদরাময়, অজীর্ণ, ব প্রভৃতি রোগ ও জন্মিতে পারে। সুতরাং নূতন চাউল না খাওয়াই ভাল।

বর্ষাধিক সমুদ্রাভ্যন্ত গৌরবৎ পরিমুক্তি।

তলু বর্ষাধিক পথ্যং বতো লঘুতরং হিতং ॥

আজকাল বাজারে দুই রকম চাউল দেখা হইয়া থাকে। ১। কলের ছাঁটা, ২। ঢেঁকীর ছাঁটা। কলের ছাঁটা চাউল দেখিতে অতি পিসিমার—মসৃণ, দানা গুলি যত্ন। কিন্তু কলে ছাঁটা চাউল দেহের পক্ষে বেশ পুষ্টিকর নহে। কেননা—কলে যেরূপ প্রক্রিয়া চাউল ছাঁটা হইয়া থাকে, তাহাতে চাউলের কক্ষরাদি উপাদানযুক্ত স্তর উঠিয়া যায়। অতএব ঢেঁকীতে ছাঁটা চাউল ব্যবহার হইতে ভাল।

আবার, ছাঁটা চাউল অপেক্ষা আছাঁটা চাউল পুষ্টিকাবিতা অধিক। ছাঁটা চাউলে প্রকৃত উপাদান শতকরা ০.৫ ভাগ থাকে, আছাঁটা চাউলে উহা প্রায় ২.৫ ভাগ থাকে। আছাঁটা চাউলে আশিষ জাতীয় উপাদান শতকরা ৩.৫ ভাগ, এবং আছাঁটা চাউলে ৭.৬৮ ভাগ থাকে। বিলাতের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা—ছাঁটার সময় চাউলের যে পাতলা

আবরণ উঠিয়া যায়—সেই আবরণে “ভাইটামিন” নামক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাইটামিন পুষ্টিকর। অতএব—খুব মসৃণ ছাঁটের চাউল আহাৰ করা উচিত নহে, তবে বিলাসী বাঙ্গালী বাবুরা কি অপরিষ্কার চাউলের অল্প তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিবেন?

চাউল হইতে জাত খাওয়া।

পায়স—চাউল, ৫ গুণ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া অল্প ঘন হইলে তাহাকে “ক্ষীরীকা” বলে। ইহার বাঙ্গালী নাম—“পরমায়” বা “পায়স”।—গৃহিণীরা মুখপ্রিয় করিবার জন্ত—পাককালে এই পায়সের সঙ্গে চিনি বা গুড় মিশ্রিত করেন। ফলে, ইহাতে “পায়স” অত্যন্ত গুরুপাক হইয়া থাকে। মিষ্ট না দিলে—“পায়স” অপেক্ষাকৃত লঘুপাচ্য হয়। মিষ্ট বর্জিত পায়স—অত্যন্ত পুষ্টিকর; বাঁহাদের শুক্রতারল্য রোগ আছে, তাঁহারা চিনি না দিয়া পায়স ভক্ষণ করিলে, উপকার পাইবেন।

“ক্ষীরীকা দুগ্ধেরা হস্তা মধুবা যাতি পুষ্টিদা।  
রক্তপিত্ত-হরী রচ্যা সন্ধ্যা শুক্র-বিবর্দ্ধিনী ॥”

বৃন্দ। কৃত্য বর্গ।

যজ্ঞে ঋষিগণ—পবিত্র ভাবিয়া এই “ক্ষীরীকা” বা পরমায় ভক্ষণ করিতেন। তখন ইহার নাম ছিল “চকু”।

খিচুড়ী—চাউল ও ডাল একত্র মিশাইয়া পাক করিলে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম “কুশরা।” চলিত কথায় ইহাকে খিচুড়ী বলে। ইহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম—চাল যত, ডালও তত, উভয় পদার্থ জল দিয়া—সিদ্ধ করিতে হইবে। বেশ গলিয়া গেলে, তাহাতে কিছু লবণ, একটু আদার রস এবং অতি সামান্য হিন্দুর “মসুরা” দিয়া সামান্য লবণ

ইহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ডালে আমিষ ও স্নেহজাতীয় পদার্থ বেশী আছে—এই দুই পদার্থ চাউলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায়—খিচুড়ী বড় পুষ্টিকর হইয়া থাকে। উদরাময় রোগী ব্যতীত অপর সকল রোগীকে ইহা অনায়াসে পথ্য স্বরূপে প্রয়োগ করা যায়। এখনও এদেশে খিচুড়ীর প্রচলন আছে। তবে এখনকার খিচুড়ী আর সেকালের “কুশরা” এক নহে। এখন খিচুড়ীর সঙ্গে নানাবিধ মসলা, ঘৃত ও পলাণ্ডু প্রভৃতি মিশিয়া, খিচুড়ীকে একদিকে গুরুপাক, এবং অত্রদিকে বিলাসীরা সখের খাণ্ডে পরিণত করিয়াছে।

**পোলাও**—চাউলের সহিত মাংস, মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। উভয় দ্রব্য গলিয়া গেলে, তাহাতে কিছু ধনে চূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ, লবণ এবং চাচুর্জাত [ এলাচ, লবঙ্গ, তেজপত্র ও দারুচিনী ] চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া দ্রুতাত্য করিয়া নামাইলে—তাঁহাকে ‘অন্নমাংস’ বলে। ইহার আর একটা নাম “পলাশ”—অপভ্রংশে “পোলাও”। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক। ইহার গুণ—বলকারক, শরীরের উপচয়কারক, ধাতুপোষক এবং বাজীকরণে (রতিশক্তি বর্ধনে) অদ্বিতীয়।

অন্নমাংস পরং বল্যং বৃংহণং ধাতুবর্ধনং।  
এখন অন্নমাংস প্রস্তুতে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। মুসলমান শাসনকালে—ইহার সঙ্গে বাদাম, পেস্তা, কিসমিস প্রভৃতি বহু উপকরণ মিশিয়াছে। বলা বাহুল্য পলাশ—এখন অতি শয় গুরুপাক খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

**কুঁরা**—চাউলের সহিত তাহার ৪ ভাগের ১ ভাগ মন্ত, এবং বাস্তীকু, বানমূলক, মানকচু, কাঁচকলা প্রভৃতি তরকারি মিশ্রিত করিয়া প্রচুর জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। সমস্ত

দ্রব্য অত্যন্ত গলিয়া গেলে তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ ও গোলামরিচ চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। ইহার নাম “কুঁরা”। ইহা—বলকারক, কৃচিকারক, স্নায়ুর প্রদাহ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, বিবস জ্বর এবং ধাতুক্ষয় নাশক। ইহা অনেকটা “পিস্পাস” শ্রেণীর খাদ্য।

**তাপহরী**—প্রথমে কিছু ঘৃত জল হরিদ্রা চূর্ণ ভাজিয়া লইবে। পরে তাহাতে মাষকলায়ের বড়ি এবং সুধোত চাউল দ্বন্দ্ব ভাজিয়া, ঐ উভয় দ্রব্য সিদ্ধ হইতে পারে—এইরূপ পরিমাণে জল দিয়া মৃদু আয়তন সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইয়া গেলে তাহাতে ব্যথাপদক মাত্রায় সৈন্ধব, আদা ও হিং নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। ইহার নাম “তাপহরী”। ইহা অত্যন্ত দাহনাশক, বলকারক, গুরুবর্ধক কচিকর, শরীরের উপচয়কারক এবং রক্তশ্রা নিবারক। তবে ইহা গুরুপাক।

**শালী শক্তু**—চাউলকে বেশ করিয়া ধুইবে, পরে শুকাইয়া লইবে; শেষে জাঁহা ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে ইহার নাম “শালী শক্তু”। চলিত ভাষা “সবেদা” এবং ইংরাজী ভাষায় Rice Starch নামে ইহা বিখ্যাত। এই সবেদা দ্বারা পিষ্ট জাতীয় বহু খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকল খাদ্য অত্যন্ত গুরুপাক, বিশেষ অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিবের মত অপকারী। কিন্তু “সবেদা” হইতে রোগী পথ্যও প্রস্তুত হইতে পারে।

চয়ক বলেন—

মধুরা লবণঃ শীতঃ শক্তকঃ শালি সত্ত্বঃ  
গ্রাহিণো রক্তপিত্তা কৃকাঙ্কি অরপকা  
অর্থাৎ শালিপত্র—মধুরা লবণঃ শীতঃ সত্ত্বঃ  
এবং রক্তপিত্ত, কৃকাঙ্কি, অরপকা

এই মহাযুদ্ধে—আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই মহার্ঘ হইয়াছে, রোগীর ঔষধ-পথ্যের দানও অসম্ভব রূপে চড়িয়াছে। বালির মূল্যও তিনগুণ বাড়িয়াছে, দরিদ্র গৃহস্থের বিঘ্ন বিপদ। এইরূপ কতকগুলি দরিদ্র বৌদ্ধিক আমরা শালিশক্ত্য ব্যবস্থা করিয়া-ছিলাম, ইহার যে উপকারিতা দেখিয়াছিলাম—তাহা বালির অপেক্ষা অল্প নহে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—বিনাতী ফুডের পরিবর্তে শালিশক্ত্য অন্যরূপে ব্যবহার করা যায়। ইহাতে খরচও কম পড়ে। শালিশক্ত্য ১ ভরি, আধ সেবজন দিয়া মূহ জালে সিদ্ধ করিবে,—পরে তাহাতে দুধ ও মিছরীর গুঁড়া মিশাইয়া বোণাকে থাইতে দিবে। ইহা শিশুদের খাওয়া দাওয়া বাবদ হইতে পারে। ইচ্ছা হইলে ইহা না দিয়া, লেবুর রস ও অল্প লবণ দিয়া—ইহা বোণাকে দেওয়া যায়। অজীর্ণ ও অতি-সাবণোদ পক্ষে ইহা একটা উৎকৃষ্ট পথ্য।

যে সকল স্ত্রীলোকের স্তনে—ভাল দুধ আসে না, অথবা বাহাদের স্তনের দুধ—শিশুর পোষণের উপযোগী নহে,—শালিশক্ত্য তাহাদের পক্ষে মহৌষধ। “শালিশক্ত্য”—এক মণ্ডাহ কাল চুকের সহিত পান করিলে—স্তনে প্রচুর দুধ বাড়িয়া থাকে। এই সমস্ত প্রসূতিক একটু বেশী পরিমাণে দুধ পান করিতে হইবে। ব্যঞ্জনাদি দিয়া ভাত না থাইয়া কেবল দুধ দিয়া ভাত থাইলে আরও ভাল হয়। শালিশক্ত্য প্রত্যহ ২ তোলা পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। প্রসূতির অবস্থা ও প্রকৃতি বুঝিয়া আধতোলা হইতে আরম্ভ করিবে।

শাল্য পূপ—ডাউল চূর্ণ ২ ভাগ, নারিকেল কক ১ ভাগ, লবণ ও পরিচ চূর্ণ—

যথোপযুক্ত প্রক্ষেপ দিয়া দুধ দ্বারা মাখিয়া পিষ্টকাকৃতি করিয়া তপ্ত তাওয়ায় সঁকিবে। ইহার নাম “শাল্যপূপ”। ইহা গুরুপাক—কিন্তু ক্ষীণশক্ত ও ওজোক্ষয়গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট খাওয়া।

### দুধ কুপিকা।

চাউল চূর্ণ ২ ভাগ, ছানা ১ ভাগ একত্র বেশ করিয়া মাখিবে, পরে তাহাতে গোলাকার কুপিকা প্রস্তুত করিয়া, কুপিকার ভিতর ঘন দুধের ‘পূর’ দিয়া,—তাহা ঘূতে ভাজিবে এবং কপূর বাসিত চিনির রসে ডুবাইয়া রাখিবে। ইহার নাম “দুধ কুপিকা”—ইহা অত্যন্ত পুষ্টি-কারক রুচিজনক, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং দৃষ্টিশক্তিপ্রদ। বাহার চক্ষে কম দেখেন,—তঁাহারা ইহা ভক্ষণ করিবেন।

কূর ধূমনী—চাউল চূর্ণ ২ ভাগ, ডাল (মাষ কলায়) ৪ ভাগ, একত্র মিশাইয়া জল দিয়া তরল করিয়া গুলিবে। ঐ তরল দ্রব্যে কিছু মৌরী, মরিচ, ঘমানী, আদার রস এবং উপযুক্ত পরিমাণে লবণ প্রক্ষেপ দিবে। পরে একখানি লোহের তাওয়া আগুনে চড়াইয়া তাহাতে কিছু ঘূত মাখাইবে। শেষে—পূর্বোক্ত তরল দ্রব্য অগ্নে অগ্নে ঐ তাওয়ায় ঢালিবে এবং খুস্তীর সাহায্যে কটীর মত করিয়া তাহা বিস্তৃত করিয়া দিবে। এক পিঠ ভাজা হইলে অপর পিঠ উল্টাইয়া ভাজিয়া লইবে। ইহার নাম কূর ধূমনী। বাহাদের স্মৃতিশক্তি কম, বাহাদের রোগ আছে, বাহারা সর্বদাই শিরঃপীড়ার আক্রান্ত হন—তঁাহারা ইহা ভক্ষণ করিবেন। এই “কূর ধূমনী” সম্ভবতঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া “নর চিকুনীতে” পরিণত হইয়াছে।

চাউল হইতে আরও নানা রকম পুষ্টি-পাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিস্তারিত

তাহা আর লিখিলাম না। ষাঁহারা ঐ সকল খাণ্ডের বিষয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা ‘বৃন্দ সংহিতা’, ‘পাক’ রাজেশ্বর’ প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া দেখিবেন।

ষাঁহাদের পরিণামশূল আছে, তাঁহারা কোমল নারিকেলের জলে চাউল পাক করিয়া, ভাত হইলে সেই ভাত খাইবেন।

ষাঁহাদের ভাত খাইলেই জ্বর হয়, অথবা ষাঁহাদের ভাত সহ হয় না, তাঁহারা দুইবার ফেন গালিয়া সেই ভাত খাইবেন। চাউল অল্প সিদ্ধ হইলে একবার ফেন গালিতে হইবে, তারপর আবার নূতন জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া চাউল খুব গলিয়া গেলে আর একবার ফেন গালিতে হইবে। এই উপায়ে প্রস্তুত করা ‘অন্ন’ আহাৰ করিলে, তাহা অতি শীঘ্র—এমন কি, একঘণ্টায় হজম হইয়া যায়। রস’ হইবার আর ভয় থাকেনা।

দুই বৎসর পূর্বে আমি একটা রোগী পাইয়াছিলাম, তাহার ভাত সহ হইত না, ভাত খাইলেই তাহার জ্বর হইত। এদিকে উপযুপরি ৪৫ দিন রুটী খাইলেই তাহার আবার উদরাময় দেখা দিত। বন্ধুবর ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এন্ এম্ এম্—মহাশয় কর্তৃক অম্লরুদ্ধ হইয়া এই রোগী প্রায় ৯ মাস ভুগিয়া—শেষে আমার চিকিৎসাদীন হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দুইবার ফেন গালিয়া সেই ভাত খাইবার উপদেশ দিয়াছিলাম। ইহাতেই তাঁহার আর জ্বর হয় নাই।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে—ভেষজ দ্রব্যের কাথেন সহিত অন্নের মণ্ড প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে. পাঠকগণের অবগতির জন্ত আমরা ক্রমশঃ তাহা লিপিবদ্ধ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

## পুরাতন পীড়ায় পপ্প’টি প্রয়োগ।

—:~:—

(বুদ্ধ বৈজ্ঞের লিখিত)

মকরধ্বজের পরই “পপ্প’টি” একটা উল্লেখ যোগ্য সিদ্ধফল রসোষধ। পুরাতন পেটের পীড়ায় পপ্প’টির তুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ বোধ হয় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। গ্রহণী, অতি-সার, প্রবাহিকা [আমাশয় ও রক্তামাশয়] প্রভৃতি প্রাণঘাতী রোগে—“পপ্প’টি” অমৃত

বিশেষ; বিশেষতঃ পূর্বোক্ত রোগগুলির সহিত যদি রোগীর শরীরে শোথ প্রকাশ পায় তাহা হইলে পপ্প’টিই তাহার একমাত্র ঔষধ। পপ্প’টি প্রয়োগে আমি শত শত শোথরুদ্ধ রোগী মুক্তা উদ্বাসনঃ রোগীকে মুক্তা উদ্বাসনঃ ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছি।

মহাশয়দের কাছে পঙ্গ'টির পরিচয় দেওয়া—  
ধৃত্তা মাত্র, তথাপি বর্তমান প্রবন্ধে আমি  
পঙ্গ'টির কথাই আলোচনা করিব ।

“পঙ্গ'টি” অনেক রকম আছে । যথা—  
“বস পঙ্গ'টি” “স্বর্ণ পঙ্গ'টি”, “লৌহ পঙ্গ'টি”,  
“তাম্র পঙ্গ'টি”, “মকরধ্বজ পঙ্গ'টি” ইত্যাদি ।  
কোকেই আবার “বজ্রকার” নামক ঔষধকে  
সোহাগ করিয়া “কার পঙ্গ'টি” ও “শুভ্র পঙ্গ'টি”  
নাম দিয়া থাকেন । পঙ্গ'টির মধ্যে “বিজয়  
পঙ্গ'টি” ও “স্বর্ণ পঙ্গ'টি”—এই দুইটি কিছু ব্যয়  
সাধ্য । ইহাদের অভাব “বসপঙ্গ'টি”, “লৌহ  
পঙ্গ'টি” এবং পঞ্চমুত পঙ্গ'টাব দ্বারাই পূরণ  
হইতে পারে ।

### বস পঙ্গ'টি ।

“বস পঙ্গ'টি” প্রস্তুত করা সর্বাপেক্ষা  
সহজ । ইহার উপাদান—কেবল পারা ও গন্ধক  
মাত্র । প্রথমে পারা ও গন্ধককে শোধন  
করিয়া লইতে হইবে ।

গন্ধক শোধন । ৮ ভরি গন্ধক লইয়া  
একখানি মোহাব হাতার উপর রাখ । পূর্বে  
হাতার ভিতর দিকে একটু গব্যঘৃত মাখাইয়া  
হৌলে ভাল হয় । তা'রপর ঐ হাতা নিম্ন  
অগ্নি উত্তাপে চড়াও । তাপ লাগিয়া গন্ধক  
যেন গলিতে আরম্ভ করিবে, অমনি একটু  
একটু করিয়া তাহা, জল ও ছুঙ্ক পূর্ণ একটা  
পাত্রে ঢালিতে থাকিবে । পরে সেই পাত্র হইতে  
গলিত অণ্ড জনাত গন্ধক তুলিয়া, বেশ  
করিয়া জলে ধুইয়া রোদ্রে শুকাইয়া লইবে ।  
ইহাই হইল গন্ধক শোধনের সহজ নিয়ম ।

পারা শোধন । পারা ৮ ভরি, ছাড়ানো  
রসুনব কোয়া ৮ ভরি—একত্রে একখানি  
পাথরের খলে মাড় । মাড়িতে মাড়িতে যখন  
সমস্ত রসুন বাটা খুব কালো হইবে, তখন

তাহাতে অল্প পরিমাণে জল দিয়া আবার  
মাড়িবে । ইহাতে পারা খলের তলায় পড়িবে  
রসুন বাটা উপরে থাকিবে । এইবার রসুন  
বাটা ও জল টুকু ধীরে ধীরে ফেলিয়া দিয়া  
পারা শুদ্ধ খলখানি রোদ্রে রাখিবে । জল  
নিঃশেষ হইয়া শুকাইয়া গেলে মোটা  
কাপড়ে পারা ছাঁকিয়া লইবে । ইহাতে পারা  
শোধিত হইবে ।

পঙ্গ'টির প্রস্তুত প্রণালী ।—এই  
রূপ শোধন করা গন্ধক ২১০ ভরি ও পারা  
২১০ ভরি ওজন লইয়া মূড়ী দিয়া ধীরে ধীরে  
লঘু হস্তে মাড়িবে । মাড়িতে মাড়িতে পারা  
ও গন্ধক একত্রে মিশিয়া খুব কালো হইবে ।  
যখন দেখিবে পারদের কণা আর দেখিতে  
পাওয়া যায়না, অধিকন্তু খলের তলায় চট  
বাধিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহা খল  
হইতে উঠাইয়া অগ্নত্র রাখিবে । এই পারা  
গন্ধকের মিশ্রণের নাম—“কজ্জলী ।” কজ্জলী  
প্রস্তুত হইলে একখানি লৌহের হাতা, খানিক  
টাটুকা গোবর, দুই একখানা কচি কলার  
পাতা, একখানি ছোট খুস্তী [খুস্তী এমন  
হওয়া চাই—যেন পূর্কোক্ত হাতার মধ্যে  
কিরিতে ঘুরিতে পারে] এবং একটু গাওয়া  
ঘৃত যোগাড় করিয়া লইবে ।

তারপর কতকগুলি শুকনো কুলের কাঠি  
পোড়াইয়া অঙ্গারের স্তূপ প্রস্তুত করিবে । এই  
অঙ্গার স্তূপের পাশেই টাটুকা গোবর দিয়া  
একটা ছোট খাটো বেদী গড়িয়া লইবে ।  
বেদীর উপর কচি কলাপাতা বিছাইয়া দিবে ।  
আর একখণ্ড কলারপাতে খানিকটা গোবর  
পুরিয়া একটা পোটলা বাধিয়া রাখিবে ।

এইবার লৌহার হাতার একটু দি মাঝিবে  
এক তাহাতে আলাদা ২ ভরি কজ্জলী ঢালিয়া

দিবে। পরে কজলীপূর্ণ হাতা খানি—পূর্ণ  
কথিত কুলকাষ্ঠের অন্তরস্তূপের মধ্যে  
বসাইবে। হাতার পার্শ্বের কজলী প্রথমই  
গলিতে আরম্ভ হইবে, সেই সময় পুস্তিখানি  
দিয়া ধীরে ধীরে হাতার মধ্যস্থিত কজলী  
খুঁটিয়া দিবে। সমস্ত কজলী গলিয়া যাইবা  
মাত্র, সেই যে গোবরের বেদী—বাহার উপর  
কলাপাতায় আচ্ছাদন দিয়া রাখিয়াছ—  
তাহারই উপর দ্রব কজলী ঢালিয়া দিবে।  
অমনি আর একজন সাহায্যকারী কলাপাতা  
বাঁধা গোবরের পৌটলাটা দিয়া, বেদীর উপর  
ঢালা তরল কজলীর উপর চাপ দিবে। এইরূপে  
যে ওঁবধ প্রস্তুত হইবে—তাহারই নাম “রস  
পদ্ম” টা”।

পঞ্চামৃত পদ্ম'টি।—৪ ভরি কঙ্কালী  
সহিত আবার ২ ভরি শোধন করা গন্ধক  
মিশাইয়া পুনরায় মাড়িবে, পরে তাহাতে জারা  
লৌহ ১ ভরি, জারা অন্ন ১০ ভরি, এবং জারা  
তামা ১০ চারি আনা দিয়া উত্তমরূপে মিশাইবে।  
শেষে পূর্বোক্ত নিয়মে পদ্ম'টি পাক করিবে।  
ইহার নাম - পঞ্চামৃত পদ্ম'টি।

লৌহ পদ্ম'টী।—দুই ভরি কঙ্কণীর  
সহিত ১ ভরি জারা লৌহ মিশাইয়া, পূর্বোক্ত  
নিয়মে পদ্ম'টী পাক করিলেই—“লৌহ পদ্ম'টী”  
প্রস্তুত হইল।

কোন রোগে কোন পৰ্পটী

ব্যবহার্য।—স্নীপ ও বিষম  
জরে, কক্ষ শোথে, শোথযুক্ত পাণ্ডু রোগে,  
শোথযুক্ত গ্রন্থী, অথবা শোথ রহিত গ্রন্থী  
রোগে, পুরাতন প্রবাহিকায়—“রস পদ্ম”টা  
প্রয়োগ করিবে।

শোণবৃক্ষ, জরবৃক্ষ, পিত্তজ পাণ্ডুরোগে,  
বকুং বিকার জাত শোথে, শোণবৃক্ষ বা শোথে

রহিত গ্রহণী বোম্বে, পুরাতন সরক্ত প্রবাহিকার,  
সর্ববিধ পুরাতন অতিসারে—পঞ্চমৃত পঞ্চটি  
অত্যন্ত ফলপ্রদ। ইহা অনেক স্থলেই আমি  
পরীক্ষা করিয়াছি।

রোগীর দেহে রক্তের শোণিকা অর্থাৎ  
লালকণা কমিয়া গেলে, রক্তে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি  
পাইয়া শোথ জন্মিলে, লৌহ পদার্থ প্রয়োগ  
করিলে চর্মকর ফল পাওয়া যায়। উদরী  
রোগে লৌহ পদার্থ চর্মকর ঔষধ।

সেবনের নিয়ম।—প্রথম দিন প্রাতঃ  
কালে ( বেলা ৯ টার মধ্যে ) ১ রতি ওজনের  
পর্প'টা লইয়া, ২৪ ফোঁটা মধু দিয়া কিছুক্ষণ  
ধীরে ধীরে মাড়িবে, মাড়াইয়া গেলে তাহাতে  
১ কিছুক বলা ছন্দ দিয়া বেশ করিয়া গুনিয়া  
রোগীকে খাইতে দিবে। দ্বিতীয় দিন ২ রতি  
পর্প'টা দিবে। এইরূপে এক এক দিন এক  
এক রতি বাড়াইয়া ১০ দিনে ১০ রতি পর্য্যন্ত  
বাড়াইবে। এই ১০ দিনেই আরোগ্যের লক্ষণ  
প্রকাশ পাইবে। তা'রপর আবার প্রতিদিন  
১ রতি করিয়া ঔষধের মাত্রা কমাইতে  
হইবে। ১০ দিনে বাহার রোগ না কমিবে,  
তাহাকে ১০ রতি মাত্রায় আরও কিছুদিন  
ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শেষে ১ রতি করিয়া  
প্রতিদিন মাত্রা কমাইয়া এক রতিতে নামিলে  
—ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া দিবে।

রোগী যে দিন হইতে পল্লী-টি সেবন আরম্ভ  
করিবে, সেই দিন হইতে লবণ ও জল খাইবে  
না। নিজে লবণ বলাকা গরম করিয়া—যেই  
ছদ্মের সহিত পুরাতন তত্বদের জ্বর, তখন  
করিবে। চিনি ও মিছারীও তত্ব খাইতে  
পারিবে। সিপানো খাইলে একটু একটু হইতে  
পান করিবে। কলস সিপানো খাইলে  
নাড়িরের হুল, করণা

এর অন্ন মাত্রায় শাসনশূন্য ডাবের জল—  
বুটবে ।

পপ্প'টি সেবনকালে জলপান করিলে যদিও  
কষ্ট কোনও বিপদ ঘটবার আশঙ্কা নাই—  
যদিও পপ্প'টি সেবনের সুফল পাওয়া যায় না ।  
মৃত্যু জলপান বন্ধ রাখা বড়ই আবশ্যিক ।  
অথ শোষণ, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগে—দেহের  
স্বল্প কমিয়া গেলে, ডাক্তারেরাও লবণ ভক্ষণ  
দিয়ে দেন । যে সকল রোগে শরীর রক্ত  
হীন হইয়া পড়ে, সেই সকল রোগে লবণের  
হ্রাসবিত্তি বহুদূর পূর্বেই স্বাধীরা বুঝিতে  
পারিতেন । পপ্প'টি সেবনের সময়—  
লবণও বন্ধ রাখা চাই ।

পপ্প'টি সেবন ছাড়িয়া দিলেও ২।১ সপ্তাহ  
—লবণ ও জল বন্ধ রাখা ভাল । ক্রমে ক্রমে  
—উহা সহ্য হইতে হয় ।

এর প্রত্যহ্না নাবার পরে যদি শোথ দেখা  
য, অথবা প্রস্রাব যদি হৃতিকা-গ্রহণী রোগে  
‘জন্ম হইল,—তাহা হইলে বিশেষ বিবেচনা  
কর পপ্প'টি প্রয়োগ করিবে । পপ্প'টি—  
‘৭ ও হৃতিকা-গ্রহণীর শ্রেষ্ঠ ঔষধ বটে,  
‘৮ প্রস্রাবের জরায়ুক্ষেত্র যদি ক্রৈদশূন্য না  
হ, কিংবা অসবধার দিয়া যদি দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব  
হইতে থাকে, অথবা প্রস্রাবের বস্তিদেহে (তল-  
‘৯) হ্রাস বোধ বা বেদনা বিদ্যমান থাকে,  
‘১০ হইলে কখনও পপ্প'টি ব্যবস্থা করিও না ।

পপ্প'টি প্রস্তুত করিতে হইলে, টাটকা  
জলী ব্যবহার করিবে । পুরাতন (অনেক  
দিন প্রস্তুত) কজ্জলীতে পপ্প'টি ভাল হয় না ।

পপ্প'টি শোষণ বা পপ্প'টি প্রস্তুতের পূর্বে—  
‘১১ রক্ত নাশাইয়া লইবার উদ্দেশ্য—উহাতে  
‘১২ রক্ত ও কজ্জলী শীঘ্র গলে, আঙণের তাপে  
‘১৩ পুড়িয়া যায় না ।

স্বাধীন—১

পপ্প'টিতে—শিশুর এবং বৃদ্ধের খুব শীঘ্র  
উপকার হয়, যুবাব দেহে পপ্প'টি একটু বিলম্বে  
শক্তি প্রকাশ করে ।

যাহারা অত্যন্ত মাছ মাংস খায় এবং  
যাহারা মাদক দ্রব্য সেবী, তাহাদের দেহে  
পপ্প'টি প্রয়োগে আশাতুরূপ ফল পাওয়া  
যায় না ।

বর্ষাকাল ও শীতকালে—পপ্প'টি প্রয়োগ  
করিলে, শীঘ্রই উপকার দেখা যায় ।

যে রোগী পপ্প'টি সেবন করিবে, তাহাকে  
—আলোকময় খটখটে শুকনো ঘরে রাখিবে ।  
বেশী স্নান করিতে দিবে না । প্রয়োজন  
বুঝিলে, গরম জলে, গা' মুছবার ব্যবস্থা  
করিবে ।

পপ্প'টি সেবনের পর রোগী আধঘণ্টা কাল  
চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবে, নড়িবে চড়িবে  
না । কাহারও সঙ্গে কথাও কহিবে না ।  
পপ্প'টি সেবনের পর, তাৎক্ষল চর্ষণ করিবে ।

আর একটা পপ্প'টি আছে—তাহার নাম  
—“সর্কেষর পপ্প'টি” । বঙ্গদেশের কবিরাজ  
গণ—ইহা বড় একটা ব্যবহার করেন না ।  
কিন্তু পশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানী বৈজ্ঞানিক ইহা  
সর্বদাই ব্যবহার করেন । এই পপ্প'টি, ঘৃত,  
মধু বা মাখনের সহিত সেবন করিতে হয় ।  
যক্ষ্মা, পুরাতন জ্বর, হৃদ্রোগ, মেহ, অশ্মরী  
প্রভৃতি রোগে এই পপ্প'টি বড়ই ফলপ্রসূ । ইহার  
উপাদান—

- হিম্বুল—১ ভরি,
- গন্ধক—১ ভরি,
- প্রবাল ভস্ম ১০ আনা,
- অন্ন ভস্ম—১০ “
- লৌহ ভস্ম—১০ “
- বসন্ত—১০ “

হরিভাল—০/০ „

মনঃ শিলা—০/০ „

তান্ন ভস্ম—০/০ „

এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, প্রথমে অর্জুন ছালের কাথে, তা'রপর বেড়েলার কাথে, তা'রপর ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিবে। পরে পল্ল'টার মত পাক করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি হইতে

১ রতি। এই পল্ল'টা সেবনে গা' বমি বমি করিলে, ঘোল থাইতে দিতে হয়। স্বাদে একটা স্ত্রীলোকের দ্বোকালীন জ্বর—এই পল্ল'টা প্রয়োগে ১২ দিনে বন্ধ করিয়াছিলাম। আমার চিকিৎসাধীনে আসিবার প্রায় ১ মাস পূর্বে,—রোগিণী ডাক্তার কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

শ্রীসদানন্দ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

## উষোদকের উপকারিতা ।

—৩.১—

পরলোকগত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম ডি—আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বাঙ্গাধার বহু সাময়িক পত্রের অঙ্গ একদা অলঙ্কৃত করিত।

পল্লীবাসের সর্বপ্রধান অন্তরায় জলকষ্ট। অনেক সময় পল্লীবাসীগণকে পঙ্কিল জল পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয়। একদিন এই জলকষ্ট-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। সেই সময় তিনি উষোদকের উপকারিতা সম্বন্ধে—আমার কাছে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে বলিয়া আমি সেই অমূল্য উপদেশের নোট লইয়াছিলাম। পাঠকগণের অবগতির জন্ত, এই প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

হেমচন্দ্র পল্লীগ্রামের লোকগণকে জল গরম করিয়া পান করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—বঙ্গদেশে এই যে বর্ষে

বর্ষে এত নরনারী অজীর্ণ-ম্যালেরিয়া ও কলেরা—মারা পড়ে, ইহার এক মাত্র কারণ—নিম্ন জলের অভাব। তিনি বলিতেন—কেবলমাত্র উষোজল পান করিয়া পল্লীগ্রামের লোকের পূর্বোক্ত মানাত্মক রোগ সমূহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

বাস্তবিক এদেশের অধিকাংশ রোগই জলে দোষে হইয়া থাকে। অতএব জল সঞ্চয় চারিটা কথা সর্ব সাধারণের জানিয়া রাখা উচিত। জলকে বিশুদ্ধ করিবার সর্বাপেক্ষা সহ ও সুন্দর উপায় জল আগুনে ফুটাইয়া ছাঁকি লওয়া। একপ জলে সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে না। আমরা অনেকেই দেখিয়াছি—কলেরা, কয়েক প্রকার জ্বর, ক্রিমি, উদরগ প্রভৃতি ব্যাধি দূষিত জল হইতে উৎপন্ন হই থাকে। সুতরাং জলকে আগুনে ফুটাই ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল ব্যবহার করি উক্ত রোগে গুলির হস্ত হইতে রক্ষা পাই।



১। খালি পেটে গরম জল পান করিলে রক্তক্ষয়িত বৃক্কালা এবং অল্প চেকুর ওঠা নিবৃত্ত হয়।

২। অহার্য্য পদার্থ জীর্ণ না হইলে, পাকস্থলীতে এক রকম বিষাক্ত পদার্থের উৎপত্তি হইতে থাকে। গরম জল পান করিলে সেই বিষাক্ত পদার্থ মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়।

৩। গরম জল পান করিলে বেশ কোষ্ঠি বৃদ্ধি হয়।

৪। গরম জল পানে আমাশয়ে বা পাকস্থলী হইতে গাত্ৰ শ্লেষ্মা বিদূরিত হয়,— ইহাও শ্লেষ্মা ভগ্নিয়া থাকিলে জীর্ণশক্তি কমিয়া যায়। গরম জল পানে এ দোষ থাকেনা।

৫। গরম জল পাকায় হইতে যত্ন প্রদর্শন হইলে গরম করিয়া পিত্ত নিঃসরণের সহায়তা করিয়া থাকে।

৬। গরম জল শুষ্ক কাসের মহৌষধ। যখন শুষ্ক কাসিতে কষ্ট পান, কাসিয়া পাকস্থলীতে বাথা ধরে, অথচ শ্লেষ্মা কিছুই উঠে না, তাঁহারা যদি রাত্রিকালে শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্বে এক আনা সৈন্ধব লবণ সহ শেত পোয়া আন্দাজ গরম জল খাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কফ তরল হইয়া উঠবে, কলে- কাসির কষ্ট অনেকটা কমিয়া যাইবে।

৭। গরম জল হাঁপানির ব্যায়রামেও বিশেষ উপকারী। শ্বাস ক্রোধের সময় লবণ সহ পান করিতে হয়।

৮। গরম জল পানে বাত রোগ আক্রমণের আশঙ্কা দূর হইয়া যায়। ঐহাদের বাত আছে, তাঁহাদের বাতও ভাল হইয়া যায়।

৯। খালি পেটে আদ্র সের আন্দাজ গরম

জল পান করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। ঐহাদের প্রস্রাবের পীড়া আছে (অর্থাৎ প্রস্রাব অল্প অল্প হয়, প্রস্রাবের বর্ণ—রক্ত বা পীত এবং ঐহাদের প্রস্রাব অতিরিক্ত ক্ষারযুক্ত বলিয়া প্রস্রাব কালীন মূত্রদ্বার জ্বালা করিতে থাকে) তাঁহারা গরম জল পান করিবেন।

১০। গরম জল পান করিলে শরীরের মেদ বৃদ্ধি নষ্ট হয়।

১১। গরম জলে কিঞ্চিৎ সর্জিকার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, যকৃতের ভিতর পিত্ত সঞ্চয় জাত—পাথুরী জন্মিতে পারে না। সর্জিকার সকল বেগের দোকানেই পাওয়া যায়।

১২। পিত্ত অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে যকৃতে এক রকম শূল হইয়া থাকে,—এই শূল—পূর্বে বিধানে গরম জল মুছমুছ পানে আরোগ্য হইতে পারে।

১৩। লবণ মিশ্রিত জল জ্বরজ্বর অবস্থায় পান করিলে জ্বর, বিষচিকা, শোণিতপ্রস্রাব প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ২ রতি লবণ এক ছটাক জলে মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। এইরূপ ভাবে প্রস্তুত লবণাক্ত উষ্ণ জল পিচকারী দিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিয়া হেম বাবু ২৩টা মৃতপ্রায় রোগীকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।

১৪। নূতন জরের প্রথমাবস্থায় উদরের অভ্যন্তর গাত্ৰ আময়স বা কফ কর্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য নূতন জরে পিপাসা হইলে, জল পান করিলে সে জল উদরে শোষিত হয় না। এইজন্য জল পানে পিপাসা থাকেনা, পীত জল ও বমন হইয়া যায়। কিন্তু গরম জল পান করিলে, তাহা উদরে শোষিত হয়, পিপাসাও দূর হয়।

১৫। ভোজনের অব্যবহিত পরে জ্বর হইলে, তৎক্ষণাৎ লবণ মিশ্রিত গরম জল পান করিলে ভুক্তদ্রব্য বমি হইয়া উঠিয়া যায়, তাহা আর উদরে থাকিয়া বাস্পাকারে বিযুক্ত হইতে পারে না।

১৬। লবণ মিশ্রিত গরম জল বমনকারক, আবার বমন নাশক। তবে বমন নিবারণ করিবার জন্য অত্যুষ্ণ গরম জল ব্যবহার করিতে হইবে, অথচ যতটা গরম—রোগী সহ্য করিতে পারে, জল তত গরম চাই এবং সেই জল—মুহূর্মুহু অল্প পরিমাণে পান করাই বিধি।

১৭। গরম জল পানে স্বেদনিঃসরণ-ক্রিয়া বদ্ধিত হয়।

১৮। মূত্রযন্ত্রের প্রদাহে গরম জল বিশেষ উপকারী।

১৯। গরম জলের ভাপ লইলে বাত রোগ এবং শোণিত ছুটি আরোগ্য হইয়া থাকে।

২০। গরম জলের বাষ্প—গলার ভিতর প্রবিষ্ট হইলে স্বরভঙ্গ ও বহুবিধ গলরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

২১। নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত গরম জলের বাষ্প কুসুমুসে প্রবিষ্ট হইলে—কুসুমুসের প্রদাহ কমিয়া যায়।

২২। অজ্ঞাত ব্যক্তি যদি চার' মত উষ্ণ জল অল্পে অল্পে পান করে—তাহার হজম শক্তি বাড়ে।

২৩। স্নাত্যবস্থায় নিয়ম করিয়া প্রত্যহ একপোয়া গরম জল খাইলে—শরীরের দূষিত মল নির্ধ্বংসে নির্গত হইয়া যায়,—কোন রোগ

আক্রমণের সহসা আশঙ্কা থাকে না। এই জলের মাত্রা একপোয়া হওয়া উচিত। উষ্ণ জল পানের ২১৩ বর্ণটা পরে—তবে জাহান করিবে।

২৪। ঈষদুষ্ণ জল অর্দ্ধ প্রহরে পরিপাক হয়। উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিলে, তাহা এক প্রহরে জীর্ণ হয়। কিন্তু শীতল জল পরিপাক করিতে দুই প্রহর সময় লাগে।

২৫। কেবল মুচ্ছা রোগে, রক্তাধিক্যে, দাহ থাকিলেও সুরাপান জনিত রোগে এবং মাথা ঘোরায়—উক্ত জল পান করা বিধেয় নহে।

২৬। গরম জল পানে অভ্যন্তর দেশে স্বেদ দেওয়ার কার্য হইয়া থাকে।

২৭। পার্শ্বশূল, অতিসার, বাত, গলগ্রহ, আত্মান, স্তিমিত কোষ্ঠ প্রভৃতি রোগে শীতল জল একেবারেই বর্জন করিয়া গরম জল ব্যবহার করিবে।

২৮। নূতন জ্বর, অরুচি, গুল্ম এবং বিরসি রোগে ও শীতল জলের পরিবর্তে গরম জল ব্যবহার করিবে।

২৯। গরম জলে স্নান করিলে দেহে গলসার কার্য করিয়া থাকে।

৩০। বাহাদের রোগ ভাল হইয়াছে—অথচ শরীরে বল হয় নাই—তাহারা গরম জলে স্নান করিবে।

গরম জলের গুণ আয়ুর্বেদের আয়ুর্বেদ বেত্তা ঋষিগণ—সত্যযুগে কীর্তন করিয়াছেন। পাঠক-গণের আগ্রহ দেখিলে, ক্রমশঃ তাহা লিপিবদ্ধ করিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম. এ।

## প্রদর রোগ ।

### LEUCORRHOEA MENORRHAGIA.

—:~:—

**কবিরাজী মত ।**—বিরুদ্ধ ভোজন, অধাশন (অজীর্ণের উপর ভোজন,) অজীর্ণ, মণ্ডপান, গর্ভপাত, অতি মৈথুন, অশ্বাদিবানে অতিরিক্ত ভ্রমণ, অধিক পণ্ড্রদ্রব্য খোক, অভিঘাত, ভারবহন, উপ-বাসাদির জন্য ধাতুক্ষয়, দিবানিদ্রা—ইত্যাদি কারণে স্ত্রীলোকদিগের চারি প্রকার প্রদর রোগ হইয়া থাকে ।

বেদনা এবং অঙ্গমর্দনের সহিত অতিশয় শ্রাব হইতে থাকিলে, তাহারই নাম প্রদর রোগ । দুর্বলতা, দ্রম, মূর্ছা, মোহ, তন্দ্রা, প্রদাপ, আক্ষেপ, দাহ, তৃষ্ণা এবং দেহের পাণ্ডিত—এইগুলি প্রদর রোগের বর্দ্ধিত লক্ষণ ।

বাতিক প্রদরে—শ্রাবের বর্ণ কতকটা গোলাপী রঙের, কখনও বা মাংস ধৌত জলের মত, কখনো মিশ্রিত, শ্রাব অল্পে অল্পে হয় বলিয়া তলপেট, কটিদেশ এবং উরুদেশে বিক্লবৎ ব্যথা হইয়া থাকে ।

পৈত্তিক প্রদরে—শ্রাবের বর্ণ কখন পীত, কখনও নীল, কখনওবা কৃষ্ণবর্ণ । যখন শ্রাব হইতে থাকে, রোগিনী শ্রাবকে উষ্ণ মনে করে, শ্রাব প্রবলবেগে হয়—তথাপি যন্ত্রণা পক্ষে, গা ঝিম্ ঝিম্ করে, গাত্রদাহ শ্রাব রোগে হয় ।

শৈথিল্য প্রদরে—শ্রাব পিচ্ছিল, আস্টে গর, বর্ণ—কখন পীত, কখনও মাংসধোয়া রঙের মত ।

সান্নিপাতিক প্রদরে—শ্রাব, কখনও মধুর মত, কখনও বা ঘৃত মিশ্রিতের মত, কখনও বা চর্ষির মত, কখনওবা হল্দ্দে রঙ, অত্যন্ত চূর্ণক । এ প্রদর ভাল হয় না । নিরন্তর অতিরিক্ত শ্রাব হইতে থাকিলে, এবং তাহার সঙ্গে জ্বর, গায়ের জ্বালা, পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিলে, রোগী দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িলে—তাহার শরীরে রক্তাক্ততা ঘটে । এক্ষণে রোগিনীও প্রায় বাঁচেনা ।

আর একপ্রকার প্রদর আছে—তাহার শ্রাব—ঠিক জলের মত । প্রচুর পরিমাণে শ্রাব হয় । রোগিনীর মাথা ঘোরে, ব্রহ্মতালু জ্বালা করে, বুক ধড়ফড় করে,—ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হয় না—বিদাহ জনিত বুক জ্বালা করে । ইহার নাম “জলপ্রদর”, চলিত কথায়—“জল-ভাঙ্গা” বলে ।

**ডাক্তারী মত ।**—ডাক্তারী মতে প্রদর একটা রোগ নহে—একটা লক্ষণ মাত্র । অনেক রোগে উপসর্গের মত এ লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে । প্রদরের শ্রাব বৃদ্ধিতে হইলে, প্রথমে স্বাভাবিক শ্রাব বৃদ্ধিতে হইবে । স্বাভাবিক শ্রাব—স্বাভাবিক ইপিথিলিয়াম হইতে নির্গত হয়, তাহাতে লসিকা মিশ্রিত থাকে । যোনির অভ্যন্তরভাগ শ্রাবের পাতলা স্তর দ্বারা আবৃত থাকে । এই শ্রাব—অত্যন্ত তরল, শ্রাবের পরিমাণ বেশী হইলে, একটু একটু জমিয়া যায়, তাহাতে স্তর মত পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায় ।

কুমারীর এবং স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায়, শ্রাবে অধিকাংশ সময়—ভেজাইনা বাসিলাস্ পাওয়া যায়। কখনও বা সামান্য ফঙ্গসও থাকে। ইহা মেনিলিয়া ক্যাণ্ডিড নামে পরিচিত। কিন্তু রোগজনিত শ্রাবে—ইহা একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রাবে—শ্রাকটিক্ অ্যাসিড্ থাকে বলিয়াই ভেজাইনা বাসিলাস্ দেখিতে পাওয়া যায়। অ্যাসিড্ না থাকিলে বাসিলাসেরও অস্তিত্ব থাকে না।

নবজাত কন্তার ও স্তন্যকাবস্থায় শ্রাবে বাসিলাস বর্তমান থাকে না। এই সময়ের শ্রাবের প্রতিক্রিয়া—সমক্ষারাম। ইহা থাকিলে ষ্ট্র্যাফিলোর কোকাস্, ষ্ট্রিপ্টোকো, কাস প্রভৃতি রোগের উৎপাদক জীবাণু পরিবদ্ধিত হইতে পারে না। লোকিয়া প্রভৃতি শ্রাবে,—ভেজাইনা বাসিলাস্ বর্তমান না থাকার জন্য—শ্রাপ্রোফাইটস্ ও ষ্ট্র্যাফিনো কোকাস্ ইত্যাদি পরিবদ্ধিত হয়।

রোগজনিত শ্রাব—তরল, বর্ণ নানারকম, কখনও স্ফেৎপীত, কখনও শুভ্র, কখনও পাটল, কখনও সবুজ, কখনও আরক্ত, আবার কখনও পুষের মত। রক্তের ভাগ বেশী থাকিলে—শ্রাবের বর্ণ ঘোর লাল হইয়া থাকে।

শ্রাব হইবামাত্র তাহা বহির্গত হইলে, কোন গন্ধ থাকে না। কিন্তু শ্রাব যদি জরায়ুর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া, পরে বাহির হয়—তাহা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। এই শ্রাব কখনও জলের মত তরল, কখনও ফেনের মত গাঢ়, এবং চটচটে ও হয়। শ্রাব মাত্রায় কখনও বেশী, কখনও সামান্য। রোগজ শ্রাবে—ষ্ট্রাকিলো কোকাই, গণোকোকাই, ট্রেপ্টো কোকাই প্রভৃতি জীবাণু দেখিতে

পাওয়া যায়। সময় সময় ভেজাইনা বাসিলাস্ ও মেনিলিয়া ও বর্তমান থাকে।

অধিক পুরুষ সংসর্গ, অতিরিক্ত সঙ্গ, অস্বাভাবিক সঙ্গ, পরিষ্কার করিবার হস্ত সাবানাদি দ্বারা পদার্থ ব্যবহার, পুনঃ পুনঃ চুস প্রয়োগ—ইত্যাদি কারণে স্বাভাবিক শ্রাব—রোগজ শ্রাবে পরিণত হইতে পারে।

শ্রাব কখনও শুভ্র—সরের মত, খুব অল্প। এত অল্প যে, অনেক নারী ইহাকে রোগের মধ্যেই ধরেন না।

শ্রাবে গ্লেয়ার আদিক্য থাকিলে, তাহা চটচটে হয়। এইরূপ শ্রাব কখনও আর্দ্র নিঃসরণের পূর্বে, কখনও বা পরেও হয়।

নূতন মেহ ও পুরাতন এণ্ডো মিট্রাইটিস্ থাকিলে—পূর্ব মিশ্রিত পীত বা সবুজ বর্ণের শ্রাব হইয়া থাকে।

জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজিত হইলে জলের মত শ্রাব হইয়া থাকে। কখন কখন ক্যানসার হইতেও এইরূপ শ্রাব হয়।

পুষের পরিমাণ অল্প থাকিলে, শুভ্রশ্রাব—শ্বেতপ্রদর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ক্ষতজন্ত, পেশারী অনেক দিন আবদ্ধ থাকিলে ক্যানসার হইলে,—শ্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

ক্যানসার, এণ্ডো মিট্রাইটিস্, ফাইব্রোমটো, পলিপস্, জরায়ুর এণ্ডোমিটোসিস্, ক্ষত—ইত্যাদি কারণে যে শ্রাব হয়, তাহা কখনও স্ফেৎ লাল, কখনও রক্তের মত গাঢ় লাল হইয়া থাকে।

জরায়ু গহ্বরে পলিপসাদি জন্মিলে পীত বর্ণের শ্রাব হয়।

শ্রাবের জন্য কোন হাঙ্গিয়া সহ্য হইতে পারে, বন্ধ ফাটিয়া যাইতে পারে, উত্তেজিত হইয়া

হইতে পারে। চুলকণার উৎপত্তিও হইতে পারে।

প্রসবের পূর্বে প্রদাহ হইলে, গর্ভাবস্থায় প্রোদিত বহু রক্তাবেগ হইলে, অস্ত্রোপচারের পক্ষে ঘটিলে, আঘাতাদি লাগিলে, প্রদর লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। ক্রিমির জন্ম—বালিকাণেরও ষ্ঠেতপ্রদর উপস্থিত হইতে পারে।

জরায়ু গ্রীবায়া ককটোৎপত্তির—প্রথম লক্ষণ—প্রদর। জরায়ুগ্রীবায়া—ইপিথি নিওমা হইলেও প্রদর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে কোনও রোগ হউক না কেন—শরীরের পোষণ ক্রিয়ার বাধাত ঘটিলেও প্রদর দেখা দেয়, মানসিক উদ্বেগের জন্ম ক্ষয়ক্ষতি প্রদর হইতে পারে। জরায়ুর বৈদিক অক্ষুণ্ণ—প্রদর হইতে পারে, তাহার আরও বর্ধিত অথবা রক্তবর্ণ। প্রমেহের জন্ম ষ্ঠেত প্রদর জন্মিতে পারে—এই প্রকৃতির অবস্থায় সম্পূর্ণ শুক্ৰকট মরিয়া যায়। কাজেই একপ নারীও গর্ভ সঞ্চার হয় না।

প্রদর ঔষধ প্রয়োগে, কখনও বা অস্ত্রোপচারের সাহায্যে আরোগ্য হইতে পারে। ডাক্তারী মতে—ডুন্, ট্যাম্পন, সপোজিটরী প্রকৃতি উপায় অবলম্বনে প্রদর রোগ চিকিৎসিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার দ্বারা রোগ স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইতে দেখি নাই। ঔষধের মধ্যে লৌহ ও সেকো উল্লেখযোগ্য। পুরাতন প্রদরে, Cerevisin কলপ্রদ। ইহা স্থানিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি—পূর্বোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসায় তায়ীফল দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগের প্রকৃতি অনুসারে জরায়ু গহ্বর টাচিয়া দিতে হয়। কখনও বা কোনও অংশ একে-

বারে কাটিয়া উচ্ছেদ করিয়া দিতে হয়। জরায়ু গ্রীবার গ্রন্থিসমূহে প্রসারিত হইয়া পড়িলে, কটারী ব্লেড দিয়া গভীর ভাবে দগ্ধ করাই উচিত, কিন্তু একাধা অতি কঠিন। ২।৪ জন চিকিৎসক একযোগে মিনিয়া, একাধা করিতে হয়। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত একাধা অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। বলা বাহুল্য অস্ত্রোপচারের পূর্বে—রোগিনীকে সংজ্ঞাহারক ক্লোরফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান না করিয়া একপ চিকিৎসা চলিতে পারে না।

কবিরাজী মতে প্রদরের অসংখ্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। “অশোক যুত”, “অশোকা সব” “পুষ্টিমুগচূর্ণ” “লাক্ষাদিচূর্ণ” “চন্দনাদিচূর্ণ” “প্রদরাস্তক লৌহ” প্রভৃতি মহোষধ স্থায়ী আরোগ্য কল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন পিচুধারণ, কাথবিশেষ দ্বারা প্রক্ষালন, সন্ধ্যা আব নিবারণ করে।

দার্ক্যাদি কাথ, পঞ্চবঙ্গল কাথ, গুলঞ্চের কাথ, জটালঙ্কার কাথ—ডুন্ দিয়া প্রয়োগ করিলে কানসার পর্যন্ত আরোগ্য হয়।

আমি একজন কবিরাজকে কেবল মাত্র পাচন প্রয়োগে একটা সাংঘাতিক প্রদর রোগিনীকে আরোগ্য করিতে দেখিয়াছি।

সেই পাচনটা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

দারুহরিদ্রা—

রসাজন—

বাসকছাল—

মুখা—

চিরাতা—

বেল শুঠ—

ভেলার মূত্রা—

নীল জুঁদি—

প্রত্যেক ওজন। ০ আনা, আধসের জলে  
সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইতে  
হয়।\*

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।  
এল, এম, এস্।

## বিবাহের বয়স।

—:—

চিরকাল সর্বদেশেই বিবাহের একটা সময়  
নিরূপণ করিবার প্রবৃত্তি প্রাগরূপ দেখিতে  
পাই। বিবাহের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সর্বদেশের  
মতামতানুযায়ী নহে কিন্তু বিবাহের দৈহিক  
সম্পর্কটা সকল দেশেই একই ভাবে স্বীকার  
করিয়া লইয়াছে।

এই দৈহিক সম্পর্কটাই বিবাহকে আয়ু-  
র্বেদের আলোচনার গণ্ডিতে আনিয়া ফেলি-  
রাছে। এই দৈহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়াই  
বিবাহ—স্বাস্থ্যরক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া  
গিয়াছে।

বিবাহ আদৌ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত কিনা  
—সে কথা এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। সভ্য  
সমাজ-মাত্রেরই সৃষ্টি প্রবাহ যখন এই প্রথার  
আশ্রয়েই সংরক্ষিত হয়, তখন অবশ্য  
বিবাহকে করণীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া  
লইতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এ  
প্রথার সর্ব অত্যাচার ও ব্যভিচারই যে  
শিরোধার্য্য করিতে হইবে—তাহা নহে।  
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বা সামাজিক স্বাস্থ্যের সহিত

দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে এ প্রথার সংশোধন ও  
পরিবর্তন করা কর্তব্য।

মানুষের সভ্যতা তাহার যাবতীয় প্রবৃত্তি  
ও কর্তব্যকে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া  
ফেলে। সন্তানোৎপাদন কর্তব্যকে নিয়মবদ্ধ  
করিবার জন্ত সকল সভ্য সমাজেই বিবাহ  
প্রথার সৃষ্টি।

সন্তানোৎপাদন যদিও সৃষ্টি ধারা রক্ষণের  
নিমিত্ত অবশ্য কর্তব্য, তথাপি ইহাকে নিয়মবদ্ধ  
করার এই উদ্দেশ্য যে, সন্তান-জনন ক্রিয়া  
প্রায়শঃই স্বাস্থ্যহানিকর। তাই এই জনন  
ক্রিয়াকে এরূপ সংযত ও নিয়মিত করিতে  
হইবে—যাহাতে স্বাস্থ্য অটুট থাকিতে পারে।  
আত্মবীৰ্য্যের ক্ষয়দ্বারা সন্তানের সৃষ্টি হইয়া  
থাকে। বীৰ্য্যই আবার শারীরিক বল ও  
মানসিক মেধাদির কারণ। অতএব বীৰ্য্যের  
ক্ষয়ে শরীর ও মনের শক্তির ক্ষয় হইয়া পড়ে।  
তাই এমন সাবধানতার সহিত এই জনন  
কার্য্যে ত্রুটি হওয়া উচিত—বাহ্যতে শারীরিক  
ও মানসিক ক্ষতি সর্বাপেক্ষা কম হয়। এক

\* এ পাচনটি 'দাক্ষাি' নামে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। ইহা 'প্রদর'র বিখ্যাত পাচন। ইহার মূল্য  
বচন এইরূপ—

দাক্ষী রসায়ন দৃষ্টান্তকরিত বিধ—তন্নাতকৈবর কুতো মধুনা কথ্যঃ।

পীতো জ্বরত বলং প্রদরং মলং পীতং সিতাকর্ণ বিলোহিত নীল শুষ্কঃ—অগ্নি সর্ব

কথার বলিলে সন্তানোৎপাদন ও স্বাস্থ্যরক্ষা—  
হুইটাই যখন অবশ্য কর্তব্য, তখন এরূপ ব্যবস্থা  
অবলম্বন করা বিধেয়—যাহাতে সন্তানোৎপাদন-  
ক্রিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার মধ্য দিয়া সাধিত হইতে  
পারে।

মনে রাখা উচিত—সন্তানোৎপাদন একটা  
বড় দায়িত্ব। দেবার প্রবৃত্তি এখানেও  
প্রবল বশ্য কর্তব্য। এমন সন্তান জগতে  
জন্মদান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে—যাহার  
দেহাচারভাব সম্পদ্ব্যবস্থাবিকই বুদ্ধিপ্রাপ্ত  
হয়—জননী জন্মভূমির প্রকৃত সেবা সম্ভবে।  
মৌলিক কাম-বাসনার উত্তেজনার ফল স্বরূপ  
এক নিমিত্তকরিত কাপুরুষের সৃষ্টি করিয়া  
দেবে পাগড়ার বন্ধিত করিবার অধিকার  
বাহ্যে নাই। যিনি স্বদেশের উপর  
এই অত্যন্ত সুবিশেষ গ্রহণ করেন, তিনি নাতৃ-  
ত্বের অগোচর পুত্র ও চিরজীবন কৃতজ্ঞতা  
সংগে বঞ্চিত হইবেন। অতএব যখন মনোবৃত্তি  
সুস্থ সমাজে পূর্ণ হইয়াছে—আমরা  
সংকট আশঙ্ক্য হইতে শিথিয়াছি—বিবাহের  
উৎকৃষ্ট বোধ বোধিরাছি—দায়িত্ববোধ বেশ  
চমকিয়াছে—তখনই সন্তান জনন কার্যে প্রবৃত্ত  
হওয়া কঠিন পাবে, কিন্তু তাহার আগে নহে।  
অতএব সোজা কথায় বুলিতে গেলে—স্বাস্থ্যকে  
বজায় রাখিয়া সন্তানোৎপাদন কার্য যে বয়সে  
শুভবে, সেইটাই পরিণয়ের বয়স।

কিন্তু এখানে একটু ভাল করিয়া বলিবার  
বস্তু আছে। আমার কথার ভঙ্গিতে কেহ  
কেন্দ্র হইতে অস্থান করিতেছেন যে—আমার  
উৎকৃষ্ট-অবিক বয়সে বিবাহের সময় নির্ধারণ  
হয়; কারণ বেশী বয়স ভিন্ন মাহুষের দায়িত্ব  
বোধ ও সংযম শক্তি জন্মে না। বাস্তবিকই  
যদি আমার বক্তব্যকে এখানে একটু অস্পষ্ট

করিয়া ফেলিয়াছি, তাই স্পষ্ট করিয়া কথাটা  
আবার বলিতেছি।

সন্তানোৎপাদন অবশ্যই বয়ঃপ্রাপ্তির পরে  
কর্তব্য। কিন্তু সন্তানোৎপাদন ও বিবাহ—  
হুইটাই কি একই কথা? অন্ততঃ আমার তাহা  
মনে হয় না। আমার মনে হয়, বিবাহ  
যেন একটা বড় বৃত্ত, সন্তানোৎপাদন যেন  
একটা ক্ষুদ্র বৃত্তাংশ। বিবাহ যদি কখন  
সন্তানোৎপাদনের সহিত একই অর্থ প্রকাশ  
করে,—তবে অবশ্য পরিপক্ব বয়সে বিবাহের  
উচিত স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু  
বিবাহের অর্থ যেখানে বিশদ—পুরুষের পক্ষে  
বিবাহ যেখানে স্ত্রীর আধ্যাত্মিক ও জাগতিক  
জীবনের সর্ববিধ ভার বহন, স্ত্রীলোকের পক্ষে  
বিবাহ যে সমাজে যাবজ্জীবন একই স্বামীর  
অর্চনা, সতীত্বের চরম আদর্শ—যে দেশে সেই  
একই স্বামীতে অম্লরক্তি,—স্ত্রীজাতির ধর্ম যে  
সমাজে মহাপাপ,—এক কথায় যে সমাজে  
বিবাহ—সন্তানজননকে ভিত্তি করিয়া  
আধ্যাত্মিকতার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সে  
সমাজে পুরুষের পক্ষে না হউক—অন্ততঃ স্ত্রী-  
জাতির পক্ষে বাল্য বিবাহের যে মোটেই দাবী  
থাকিতে পারিবে না—তাহা কিরূপে বলিব?

আমরা প্রথমে বিবাহ ও সন্তানোৎ-  
পাদনকে একই অর্থে ধরিয়া বিবাহের বয়সের  
আলোচনা করিব, তৎপরে বিবাহকে বিশদ  
অর্থে বুঝিয়া বিবাহের বয়সের পুনরাবলোচনা  
করিয়া দেখিব। সর্বশেষে উত্তরে আলোচনার  
ফলকেই আধুনিক সমাজের বিবাহের আদর্শের  
সহিত তুলনা করিয়া একটা সামঞ্জস্যের স্থাপন  
করিতে চেষ্টা করিব।

ইউরোপীয়গণ, পৃথিবীর অলঙ্কারীভূত  
ও জড়বাদী সভ্যজাতিগণ বিবাহকে সন্তানোৎ-

পাদনের সহিত একই অর্থে ধরিয়া লয়—  
বিবাহের আধ্যাত্মিকতা ইহাদের নিকট অঙ্গীক  
স্বপ্ন। কিন্তু ইতর প্রাণী ও অসভ্য জাতির  
সহিত সভ্যজড়বাদী জাতির কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব  
আছে। ইতর প্রাণীরা সন্তানোৎপাদনের  
দায়িত্বজ্ঞানমাত্র শূন্য, তাই মাত্র প্রযুক্তি  
দ্বারা চালিত হইয়া নৈমিত্তিক বিবাহ করে,  
এমন কি নিষিদ্ধ ও অবৈধ সম্বন্ধের উপ-  
ভোগ করে,—তাই ইতর প্রাণীর মধ্যে সম্বন্ধ  
একেবারে অবাধ,—তাই প্রাচীন অসভ্যজাতির  
যুগে পৈশাচ-রাগস প্রভৃতি নানারূপ নিষিদ্ধ  
বিবাহ প্রথার প্রচলন। কিন্তু আধুনিক যুগের  
সভ্য জড়বাদী এই দায়িত্বটা বিলক্ষণ বোঝে,  
তাই তাহাদের মধ্যে প্রায়শঃ নিত্য বিবাহের  
ব্যবস্থা আছে ও সামাজিক বন্ধনের সুশৃঙ্খলার  
জন্তু অনিয়মিত, অবৈধ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ ও  
দণ্ডনীয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বিবাহের  
আধ্যাত্মিক ভাব অবর্তমান। তাই ইহাদের  
বিবাহ—সন্তানকে জরজরিত্বের অপবাদ হইতে  
বাঁচাইবার জন্তু একটা আইনামুখার চুক্তি  
(contract), ধর্ম এখানে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।  
সুতরাং স্ত্রী সতীত্বের একাগ্রতা এখানে নাই—  
বিভিন্ন সময়ে ইচ্ছামত স্থানী গ্রহণের নিয়ম  
এখানে আছে— স্বামীর জীবন কাল পর্যন্ত  
যে নারী বিশ্বস্ত রহেন—তিনিই চরম সতী।  
বৈধবাকে শিরোধার্য করিয়া পরকালের পানে  
স্বামী-প্রেমের প্রত্যাশায় চাহিয়া থাকার মাধুর্য  
এ সমাজের নারীর মস্তস্পর্শ করে না। এইরূপ  
জড়বাদী জাতির অপ্রাপ্ত বয়সে জ্বালোক ও  
পুরুষ উভয়েরই বিবাহ হওয়া একান্ত অকর্তব্য  
—নিতান্ত গর্হিত। কেননা সন্তানোৎ-  
পাদনই ইহাদের বিবাহের উদ্দেশ্য—কাজেই  
অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ—হয় নিষ্ফল,—না হয়

প্রাণহানিকর এবং রুগ্ন সন্তান সৃষ্টির  
কারণ।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। যদ্যু  
মণ্ডলী যাবৎ বলিষ্ঠ ও সুবিক্ত হয় নাই, মজ্জা  
অপরিপক্ব রহিয়াছে—তাবৎ গুরুত্ব করা  
কোনো সভ্যজাতি সম্মত নহে। সুতরাং  
বিবাহকে যদি আমরা জড়বাদীর মত স্ত্রীমণ  
ছাড়া আর কিছুই না বুঝি—তবে পরস্পর  
বয়সেই মাত্র বিবাহ করা কর্তব্য বোধ মনে  
করিতে হয়।

কোন সময় স্ত্রীমণনব সম্পূর্ণ  
উপযুক্ত—তাহা লইয়া বিভিন্ন দেশে  
চিকিৎসা শাস্ত্রে বহু তর্ক আছে। সে তর্ক  
মীমাংসা আমাদের এ প্রবন্ধের বিষয়ভূত নহে।  
তবে সোজা কথায় বিভিন্ন তর্কগুলি বাছিয়া  
এই একটা সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যাব  
যে—পুরুষের পক্ষে পচিশের পর স্ত্রীর  
যে বয়সটা পর্যন্ত গুরু অপরিপক্ব ও মন চঞ্চল  
থাকে—সেই বয়সটা উত্তীর্ণ হইলে পর  
স্ত্রীমণনের উপযুক্ত সময়। স্ত্রীগণ স্ত্রীমণী হইবার  
অন্ততঃ ছই বৎসর পরে মাতার কার্য করিবার  
উপযুক্ত হয়। তখন তাহাদের শরীর  
সুবিক্ত হয় ও বুদ্ধি—সন্তান পাদনের  
গুরুভার লইবার পক্ষে সমর্থ হয়। তবে একটা  
কথা সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সন্তানোৎ-  
পাদনের বয়স সঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব।  
স্বাস্থ্যের ভেদাভেদে ঐ বয়স নির্ণীত হওয়া  
উচিত। নিতান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য কোনো উৎকট  
বা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সন্তানোৎ-  
পাদনের কার্য করা—অতএব জড়বাদীর মতে  
বিবাহ করা কোনোক্রমেই উচিত নহে।  
তাহাতে পৃথিবীতে যোগের অশাস বৃদ্ধি হয়।  
অকর্মণ্যাজীক প্রবাহের প্রবল বৈশিষ্ট্য।



বস্তুতঃ স্বাস্থ্য ও মন বিশেষ উন্নত থাকিলে, ক্রিষ্টিং কম বয়সেও সন্তানজননের কার্য্য করা নষ্টতে পারে। মোটের উপর জড়বাদীর চক্ষু দিয়া দেখিতে গেলে, যখন শুক্র ধাতু মধুসন্তান জননের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে—ও মনোবিশেষ কর্তব্য বুদ্ধি জন্মিয়াছে—তখনই বিবাহের বয়স।

কিন্তু প্রাচীন হিন্দু কখনও বিবাহকে জড়বাদীর চক্ষু দিয়া দেখে নাই। সে বিবাহকে ঐক্যলাই আধ্যাত্মিকতার সহিত মিলিত করিয়া দেখিয়াছিল। তাহার পক্ষে বিবাহ মনোবিশেষ স্বাস্থ্য সমাবদ্ধ ছিল না—মাত্র চুক্তি বা contract বলিয়া বিবেচিত হইত না—সে বৃহত্ত—বিবাহ একটা অতি বড় ধর্ম্ম—ইহা একটা sacrament—সে বৃহত্ত—সন্তান জননের সচিৎ বিবাহ সম্প্রদায়ীভূত বটে, কিন্তু মধুসন্তানই ইহার উদ্দেশ্য নহে। প্রেমে—বিবাহের চরম ফল,—এই চরম ফলকে একা করিয়া চলিবার পথে সন্তানোৎপাদন একটা পুঙ্খ নুপুঙ্খ উপায়। সন্তান শুদ্ধ যে সৃষ্টি প্রবাহ বন্ধ করে—বংশবধ করে,—নাম রক্ষা করে—হারা নহে, মাতাপিতার আধ্যাত্মিক উন্নতি ধারণ করে, দাম্পত্য প্রেমকে ঘনীভূত করে। বিবাহের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণতালভ অর্থাৎ ঈশ্বরের যত্ন প্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তি। পুরুষ উগ্রতার হইতে স্বীকৃতি কোনলতার মূর্ত্তি। বিবাহে এই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তির—এই উগ্রতার ও এই কোনলতার—মিলন হইয়া থাকে। উভয় শক্তি পরস্পরের মধ্যে গুণের আদান প্রদান করিয়া যকীয় অভাব পূরণ করে ও পরকীয় অভাব মোচন করে। স্বীকৃতি—পুরুষের নিকট শ্রম—স্বাধীনতা, আত্মনির্ভর, মানসিক বল ইত্যাদি। পুরুষ স্বীকৃতির নিকট শিবে—

কোমলতা, বাৎসল্য, ধৈর্য্য, দয়া ইত্যাদি। যখন উভয়ে উভয়ের সহিত আদান প্রদান করিয়া গুণের equilibrium প্রাপ্ত হয় বা গুণ বিষয়ে সমশক্তি সম্পন্ন হয়—তখনই তাহারা ঈশ্বরের চিন্তা করিবার অধিকারী হয়, কারণ ঈশ্বরের ধারণা করিতে হইলে মনকে প্রেমে তন্ময় করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রাচীন হিন্দুর মতে প্রকৃতি-পুরুষের অপূর্ণ সম্মিলনের পরিণাম। দুই বিভিন্ন শক্তির অপূর্ণ সামঞ্জস্য সংস্থাপিত। উগ্রতা, কোমলতার সঙ্গে মিশিয়াছে, ক্রোধের বক্ষে ক্ষমার মণিমালিকা দোহুল্যমান, বীর্ঘ্যের সঙ্গে দৈর্ঘ্যের গরিমাময় পারিণয় সাধিত হইয়াছে।

এই উজ্জ্বল মধুরে মিশিবার পথে সন্তান প্রধান সহায়—তাই সে দুই শক্তির মিলনের পরিণাম দাম্পত্য প্রেমকে ঘনীভূত করিয়া দেয়। সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, সেই সময়ই বিবাহ সার্থক হয়—কিন্তু জড়বাদীর অর্থন নহে। দুইটা বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন প্রাণী প্রথমতঃ কামজ মোহ লইয়া একত্র হয়—তাহাদের মন তখনও পরস্পরের মধ্যে অনেকটা বাবধান সৃষ্টি করিয়া অবস্থান করে—স্বন্দেহ তখনও নিরাকরণ হয় না, কিন্তু সন্তান আসে সন্ধির মূর্ত্তিতে—দুই শক্তির অপূর্ণ সাম্যবিধান করিয়া—সর্বদ্বন্দ্বের নিরাকরণ করিয়া—বিভিন্ন দুইটা শক্তিকে একত্র গ্রথিত করিয়া। সন্তান তাই দাম্পত্য মিলনের মূর্ত্ত অবস্থা—মহা জয়ের মালা তাহার গলে, মুক্তির ঘণ্টা তাহার হাতে বাজিতে থাকে। স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই দেখে—তাহাদেরই শক্তি মিলিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। তাহারা দেখে—তাহাদের সন্তান তাহাদের কাহারই স্বাধীন প্রতিনিধিত্ব নহে, অথচ একই সময়ে উভয়েরই অঙ্গরূপ—তাহাদের উভয়ের সাক্ষ্য

প্রাপ্ত বিভিন্ন শক্তির প্রতিকলিত ছবি—ঈশ্বরের স্বরূপের আলোক চিত্র। সন্তান-স্নেহ তাই ঈশ্বরের পূজার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। স্নেহ, ভক্তির সহিত গিয়া মিশে, মন্ত্যের আনন্দের উপর—ইহকালের সাংসারিক জীবনের উপর—কর্তব্যের উপর—স্বর্গের রশ্মি পরকালের মুক্তির প্রতিবিম্ব আসিয়া পড়িয়া বনসিয়া উঠে।

এই প্রাচীন হিন্দু আদর্শে যদি আমরা বিবাহকে বুঝি—তবে দেখিব—বিবাহের মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে! বিবাহ তখন মানব জীবনের কতিপয় চরম উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্ততম বনিয়া বিবেচিত হইবে। আমরা বুঝিতে পারিব—বিবাহ কেবল দৈহিক সংযোগমূলক নহে—বিবাহের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মনের মিলন—আত্মার আত্মায় অন্তহীন নোন মহাচুপন। সন্তানোৎপাদন এই মিলনের একটা ছেতু। বিবাহের বয়স তাহা হইলে মাত্র শরীরের পরিপতি দিয়া স্থির হইবে না, মনের উন্নতির কথাও ভাবিতে হইবে। মন যখন বিজ্ঞানভ্যাসের ফলে প্রেমের স্বরূপ বুঝিয়াছে, তখনই বিবাহের বয়স আসিবে—তাহার আগে নহে। তাই দ্বিজের পক্ষে হিন্দুশাস্ত্র পঞ্চবিংশ বর্ষের পর বিবাহের বয়স ধার্য্য করিতে চাহে। দ্বাদশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া, বারো বৎসর গুরুপুত্র ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া, নানাবিধ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া দ্বিজের যখন প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও বীৰ্য্য স্তম্ভিত হইয়াছে, তখনই মাত্র সে প্রেমমুক্তি যজ্ঞে ব্রতী হইতে পারে, তাহার আগে নয়। পুরুষের কথা হইল, এইবার স্ত্রীলোকের কথাটা বলি।—স্ত্রীলোকের পক্ষে বাল্যবিবাহ নিতান্ত সঙ্গীতীন বলিয়া মনু প্রমুখ ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ স্থির করিয়াছেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ চঞ্চল, প্রকৃতি ও ভাব প্রবণ, তাই হিন্দু

খাষি বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র-মতী হইবার পূর্বেই—কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে না হইতে—নবম বর্ষে বালিকাকে সংবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ, সুশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স যুবকের সহিত বিবাহ দিতে হইবে। জিতেন্দ্রিয় স্বামী, স্ত্রী মাতৃকার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্তন হওয়া পর্য্যন্ত ভাৰ্য্যাভিগমনে বিরত থাকিতেন। সন্তান জনন কার্য্য স্থগিত থাকিলেও বিবাহ নিষ্কল হইত না। ইতোমধ্যে উপযুক্ত স্বামী, স্ত্রীকে স্বীয় ছন্দানুবর্ত্তিনী করিয়া গড়িয়া তুলিতেন। দৈহিক মিলনের বহুপূর্ব হইতেই আধ্যাত্মিক মানসিক মিলনের ক্রিয়া চলিতে থাকিত। কতাকে ঋতুমতী হইবার পূর্বেই যোগ্যপাত্রের দান করিয়া মাতা পিতা গুরু যে সামাজিক দায় হইতে মুক্ত হইতেন তাহা নহে—কতাকে বাল্যেই স্বামী-হস্তে সুশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হইত, অধিকন্তু কতাই হইতে জাতিনাশের সম্ভাবনা একেবারেই নিরাকৃত হইয়া যাইত।

কিন্তু সে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার যুগ আজ আর নাই,—হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা আজ পাশ্চাত্যের জড়তাদের সঙ্গে মিশিয়া একটা খিচুড়ি করিয়া তুলিয়াছে। আজ ব্রহ্মচর্য্য জীবনের স্বতন্ত্র শিক্ষার বন্দোবস্ত ভারতের বুক হইতে মুছিয়া গিয়াছে। আজ তাই বিবাহের আদর্শ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে,—আজ তাই এই জড় ও আধ্যাত্মিকতার সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া, নূতন করিয়া আবার বিবাহের বয়স নিরূপণের সময় আসিয়াছে। আজ সমাজ বিশেষে স্ত্রী স্বাধীনতা,—প্রকৃত দরবারে স্ত্রীশিক্ষার যুগ ভারতে বর্ত্তমান। এ সম্প্রদায়ের বিবাহের বয়স নির্ধারণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—আমরা বিবাহের বয়স নিরূপণ করিব তাহাদের—স্বামী-স্ত্রীর

হিন্দু আধাঙ্গিকতাকে প্রণাম করে—কিন্তু কাল মাহাত্ম্য জড়বাদের হাত একেবারে এড়াইতে পারে না—যাহারা হিন্দু ছিলাম—হিন্দু বহিব—বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারে—আমাদের সেই অতি আদরের হিন্দু সম্ভানকে আজ আমরা এইরূপে বিবাহের বয়স নিকৃপণ করিতে অনুরোধ করি।

পুণ্য আজ জড়বাদের প্রতাপে বড় উগ্র হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে,—জীজ্ঞাতি আগের মতই চঞ্চল থাকিতে পারে, কিন্তু অনেক সমাজেই আজিও জীলোক সলজ্জ। তাই জীলোকের অপেক্ষা পুরুষের বিবাহের বয়স নিকৃপণ করিতেই আজ আমাদের বেশী বিবেচনা করিতে হইবে। অবশ্য অপরিপক্কশরীর বালিকাকে অস্থির মতি উগ্রস্বভাব যুবকের সহিত সম্ভত হইতে দেওয়া কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে, কিন্তু আমার মনে হয়—তাই বলিয়া আজ আব যুবককে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অপরিণতি বাগিলে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার আশা বেশী করা যাইতে পারে না। এখনকার যুবকগণ আগেকার মত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ নহেন, স্বতরাং ইন্দ্রিয় সংযমে তাঁহারা অধিকারী নহেন। এসব কথা এই “আয়ুর্বেদ” পত্রিকার যথেষ্ট আলোচনা হইয়া থাকে, সুতরাং সে সব কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বর্জিত করার আবশ্যকতা দেখি না। মোটের উপর সমাজ এখন আগেকার অপেক্ষা অনেক বেশী উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে—সেইজন্ম এখনকার দিনে যুবকের পক্ষে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকা বিশেষ নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না, তাই আমার মনে হয় কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এদেশের ছেলেরা যখন বিবাহ কি ব্রূহিতে পারে—তখনই

তাঁহাকে বিবাহিত করা কর্তব্য। তাহাতে তাহার জীবন প্রতি একটা দায়িত্বজ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার অনেকটা সম্ভাবনা। এই দায়িত্ব বুদ্ধি অনেকটা তাহাকে সর্বনাশের ক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিতে বাধা দিবে—একটা শঙ্কা তাহাকে অনেকটা বাচাইয়া রাখিবে। কিন্তু তাই বলিয়া অভিভাবকের সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে—মন না হউক, অন্ততঃ শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টিসাধন না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রীকে কখনও সম্ভত হইবার সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। বিবাহ সাধিত হউক—স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে দেখুক, কিন্তু প্রাপ্ত বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা যেন শারীরিক সম্মিলন লাভ না করিতে পারে।

শেষ কথা ‘আত্মরে নিয়মো নাস্তি’।

‘সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং তাজ্জতি পণ্ডিতঃ’।

যদি এমন অবস্থা হয় যে, যুবক ক্রমেই বিশৃঙ্খল হইয়া চলিয়াছে ও তাহাকে রক্ষা করিবার সর্ব ‘চেষ্টা’ বিফল হইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অপরিপক্ক বয়সেও উপযুক্ত বালিকার সহিত যুবককে পরিণীত ও সম্ভত করা একান্ত কর্তব্য। এরূপ স্থলে যুবক নৈতিক অবনতি হইতে অনেক সময় রক্ষা পাইয়া থাকে। একটু বিবেচনা করিলেই এ বিষয়ের যথার্থ্য অল্পমিত হইতে পারে।

জীলোকের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণের বাক্যই আমার মানিয়া চলিতে ইচ্ছা হয়, কারণ অধিকাংশ স্থলেই জীজ্ঞাতিয় এই জড়বাদের যুগেও পূর্বের যুগের অপেক্ষা বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। জড়বাদের আবহাওয়াটা পুরুষের উপর দিয়াই বেশী বহিতেছে। জীলোকের উপর দিয়াও বহি

আমার কথাটা এক কথায় বলিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়—বিশেষ কারণ ব্যতীত সাধারণতঃ আমাদের আধুনিক হিন্দু সমাজে (কিংবা ভারতের অনেক সমাজেই) স্ত্রী-লোকের ঋতুমতী হইবার পূর্বে ও পুরুষের পরিপক্ব বয়সে বিবাহের সময় নির্ধারণ করা উচিত। অধিকন্তু ভারতের মত উষ্ণপ্রধান দেশে যখন অল্পেই যৌবনকাল আবির্ভূত হয়, তখন বিলাতের আদর্শে আমাদের বিবাহের বয়স স্থির করা অসুচিত। যাহারা পরিপক্ব

বয়স ভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষ-উভয় জাতির পক্ষেই বিবাহ হওয়া উচিত নহে মনে করে—তাহা-দিগকে, ভারতের মানুষের আয়ুর্কালের স্বরূপ ও যৌবনের শীঘ্রোদগমনের কথা স্মরণ করাইয়া বিবাহের বয়স নিরূপণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। মহাদি আর্গ্যান্টবিগণ সেই সকল বিষয়ের বিবেচনা করিয়াই বিবাহের বয়স নির্ধারণ করিয়াছিলেন, এক কথায় আমাদের পক্ষে তাহাই মানিয়া চলা উচিত। শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

## ক্ষয়-রোগের বিস্তৃতি নিবারণ।

[ রোগীর প্রতি উপদেশ ]

—:~:—

আমি যখন প্রথম কশ্মক্শেত্রে অবতীর্ণ হই—সেটা বোধ হয় ১৮৯৯ সাল—তখন এদেশে এত যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। এখন দেখিতে দেখিতে এ রোগ দেশব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। রোগের ভীষণত্ব ও পরিণাম দেখিয়া অনেকেরই ধারণা হইয়াছে,—যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসকের অসাধ্য ব্যাধি। কিন্তু বাস্তবিক এ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। ঐহারা শব্দব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, অল্প শারীরিক যন্ত্রের গীড়া বশতঃ মৃত্যু হইয়াছে—এরূপ শবের ব্যবচ্ছেদ কালীন শতকরা দশজনের হৃদয়সে যক্ষ্মা-রোগের আরোগ্য চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে যক্ষ্মারোগ আপনা আপনিই ভাল হইতে পারে—চিকিৎসিত হইলে ত কথাই নাই। আমি কবিতাজী চিকিৎসায় ৪৫ জন

ক্ষয়রোগীকে ভাল হইতে দেখিয়াছি। আয়ুর্বেদে ক্ষয়রোগের অনেক উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। সে সকল কথা বিশেষজ্ঞেরা বলিবেন। আমি কেবল ক্ষয়রোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্ত কতকগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিব।

১। যেখানে সেখানে থুতু ফেলিবেন। এমন কি পথে ঘাটে যথায় সর্বদা লোক জনের গতিবিধি, সেখানে নিশ্চয়ই ত্যাগ করা একেবারেই নিষিদ্ধ।

২। কাসিতে কাসিতে যে স্লেমা উঠিবে, কদাচ তাহা গিলিবে না। কারণ সেই স্লেমা উদ্ভূত হইয়া জীবাণুর অতি-বৃদ্ধি এবং অত্যন্ত উপসর্গও ঘটাইতে পারে।

৩। একটুকু নির্দিষ্ট পাত্রের স্লেমা কেনিব। ঐ পাত্র হাত পাত্র রাখিলে—প্রত্যহ ২ বার, অত্যন্ত জলে ১ ঘণ্টা করিয়া ডিকাইন রাখিব।

পরে তাহাতে ক্লোরিনেটেড লাইম ও জল পূর্ণ করিয়া তাহাতেই থুথু ফেলিবে। পাত্র অভাবে কাগজে বা নেকড়ার থুথু ফেলিয়া উহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

৪। যে রুমাল বা গামছা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিতে পারিবে না, সেদ্রুপ রুমাল বা গামছায়—মুখ এবং গাত্র কখনও মুড়িবে না।

৫। ক্ষয়রোগীরা প্রায়ই দেবতা বিশেষের কাছে মানত করিয়া দাড়ী, গোঁদ, চুল ও নখ দগ্ধ করিয়া থাকে। ইহা বড় সা-বাতিক। মথের দড়ি গোঁদ—একেবারে কামাইয়া ফেলিবে। গোঁদ নখ—কাটিয়া ফেলিবে। মাথার চুল গাধায়—ত্যাগ আপত্তি নাই।

৬। কোন কিছু আহার করিবার পূর্বে, ৩৭, ৩৪ ও হাত—বেশ করিয়া প্রক্ষালন করিবে।

৭। শরীরের কোন স্থানে ক্ষত থাকিলে, তাহা ঢাকিয়া রাখিবে।

৮। গরম ডগ্ধ শীতল করিবার জন্ত—দুই দিবে না। দুই দেওয়া ডগ্ধ নিজেও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দিবে না।

৯। নিজের পুত্র কন্যাদির মুখ চুষন এবং বস্তুর সহিত করমর্দন করিবে না।

১০। লোকের সম্মুখে কাসির বেগ উপস্থিত হইলে, মুখে চাপা দিয়া কাসিবে।

১১। বহুক্ষণ পারিবে—মুক্ত বাতাসে বসিয়া থাকিবে।

১২। কখনও পরিশ্রমজনক ব্যায়াম করিবে না।

১৩। বোড়, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম—সকল সময়ই ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া নিদ্রা যাইবে। এজন্য ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় করিও না, কেবল গাত্রে একটা আচ্ছাদন দিবে।

১৪। রাত্রি—শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা বাটবার চেষ্টা করিবে, দিনসে আদৌ নিদ্রা যাইবে না।

১৫। কাজ করিতে হইলে বাড়াবাড়ি করিবে না, ধীরে হুস্থে করিবে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামও করিবে।

১৬। চিকিৎসকের উপদেশ ভিন্ন ঔষধ সেবন করিবে না। ঔষধে অনেক সময় উপকারের পরিবর্তে অপকারই হইয়া থাকে—এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখিও।

১৭। সূর্য্য ঘটিত উত্তেজক পদার্থ সেবন করিও না।

১৮। যে দ্রব্য পরিপাক করিতে বিলম্ব হয়, তাহা খাইবে না।

১৯। নিজের রোগকে অসাধ্য ভাবিয়া আরোগ্যে হতাশ হইও না। আজ কাল বিজ্ঞান জগতে সুগাম্য উপস্থিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের কোশলে অনেক ক্ষয়রোগী মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। মনে উৎসাহ এবং প্রতিকারে আগ্রহ থাকিলে, তোমার রোগও ভাল হইবে। এই বিশ্বাস কখনও ত্যাগ করিও না। মানুষের দেহে সৃষ্টিকর্তার এমন কোশল আছে, যে কোশলে ক্ষয়রোগের আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করিতে পারা যায়।

২০। নিজের পীড়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে—এরূপ চিন্তা মন হইতে একেবারেই দূর করিবে।

২১। তোমার রোগে—তোমার আত্মীয়-স্বজন বাহাতে আক্রান্ত হইতে না পারে, সে দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে।

২২। লাগবর্ণের জামা ও বস্ত্র এবং ঐ প্রকারে শীত বস্ত্র কখনও ব্যবহার করিবে না।

২৩। রাগ, হুঃখ, অভিমান ত্যাগ করিবে।

২৪। উচ্চেষ্বরে কথা কহিবে না।

২৫। জ্বীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখিবে না। যে পুস্তকে প্রণয় ঘটিত ব্যাপার বা জ্বীলোকের রূপ বর্ণিত হইয়াছে,—সে পুস্তক পর্য্যন্ত পড়িবে না।

২৬। ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিয়া ধর্ম প্রসঙ্গে দিন কাটাইবে।

২৭। লঘু ও পুষ্টিকর পথ্য ভোজন করিবে।

২৮। সম্ভব হইলে, প্রত্যহ অন্ততঃ এক ছটাক ছাগলের দুগ্ধ পান করিবে, এবং স্বচক্ষে অন্ততঃ একঘণ্টা কাল ছাগলের সাহচর্য্যে থাকিয়া তাহার সেবা করিবে।

২৯। নারিকেল কুরিয়া তাহার দুগ্ধ বাহির করিয়া, সেই দুগ্ধে—তাহার চতুর্গুণ জল মিলাইয়া—একটা কাচ বা প্রস্তর পাত্রে করিয়া রাত্রে শিশিরে রাখিয়া দিবে, একখানি পাতলা কাপড় দিয়া ঐ পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া ঐ পাত্রের উপরস্থিত স্নেহপদার্থ টুকু খাইবে।

৩০। সহ্য করিবার শক্তি থাকিলে, প্রত্যহ টাটকা দুগ্ধের সহিত কাঁচা ডিম মিশাইয়া খাইবে। প্রথমে একপোয়া দুগ্ধে একটা ডিম, তিনদিন পরে, আধসের দুগ্ধে দুইটা ডিম, আরও ৩দিন পরে—তিন পোয়া দুগ্ধে ৩টা ডিম—এইরূপে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিয়া ডিম ও দুগ্ধ বাড়াইবে। ইহাতে দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে।

৩১। উন্মুক্ত বাতাসে দাঁড়াইয়া—প্রত্যহ—২১ মিনিট করিয়া গভীর শ্বাস গ্রহণ করিবে, ইহাতে ফুসফুস সবল হইবে।

৩২। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে জোলাপ নইও না।

ক্ষয়-রোগ বীজাণুর প্রতিষেধক।

—যক্ষ্মা জীবাণু—দেহে প্রবেশ করিলে, তাঙ্গ একেবারে ধ্বংস করা অসম্ভব। ঔষধপ্রয়োগে উক্ত জীবাণুর বংশ বৃদ্ধির হ্রাস করা যায় মাত্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে—এই কার্যের জন্ত যে সব ঔষধ পরিকল্পিত হইয়াছে—ক্রিয়সট তাহার অন্ততম। আমি ক্ষয়রোগে “ক্রিয়সট” বা তদবটিত “গুইএকল” বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। এই ঔষধ—যক্ষ্মাবীজাণু হ্রাস করিবার জন্ত অনেকদিন হইতেই চিকিৎসক সমাজে প্রচলিত আছে।

বৈদ্যমতে—বাসকবৃক্ষ ক্ষয়রোগের একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এমন কি, বাসক ব্যবহার করিলে, ক্ষয়রোগীর বিপদের ভয় থাকে না—ইহাই আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত। যথা—

“ক্ষয়োৎপত্তি বিনাশায় সিংহাতং সেবাতাং সদা।”—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমি বহুস্থলে বাসক পাতার রসের সহিত ক্রিয়সট মিলাইয়া রোগীকে সেবন করিতে দিয়া—আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি।

বাসকপাতার রস ২ ওন্স বা একছটাক, রস অভাবে পাতা সিদ্ধ জল—আধপোয়া লইয়া তাহাতে ২৪ মিনিট ক্রিয়সট মিশ্রিত করিয়া—দিনে রাতে ৪ বারে ইহা খাইতে হইবে। ইহাতে কাসির উপশম হয়, পুষ্য দোষ ও হৃগ্ন দূর হয়, রক্ত গুণা নিবারণ করে। অধিকন্তু—অল্পভুক্ত এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাসক—অন্ন নষ্ট করে—রাত্রিকালের বান্ধ বন্ধ করে, অতিসার ভাল করে।

তবে এই দুইটার মিশ্র খাইতে অভ্যস্ত হইয়া। একে বাসকের ভিত্তি রস, জাম্বার সঙ্গে ক্রিয়সটের হৃগ্নক। পাতার রস বসিতে গেলে বলিতে হয়—

“এবা ‘হুজুন’ স্বকনেরই চুড়ো,

যেমন, আদার রসে গোল মরিচের গুঁড়ো।

ক্রিয়সট জীবাণু নাশক, ইহা নিত্যস্তুই খাইতে  
না পারিলে ইহার স্থলে—পিপারমেন্ট তৈলও  
দেওয়া চলে। কিন্তু বাসককে ত্যাগ করা  
চলে না। বরং বাসকের হুৎবাদ দূর করিবার  
জন্য বাসকের কাণে চিনী দিয়া পাক করিয়া  
দ্রিাপ প্রস্তুত করা উচিত। সামান্য সর্দী  
কাশি, ব্রনাইটিস হইতে—অসাধ্য ক্ষয়কাশি  
পর্যন্ত বাসক প্রয়োগে আরোগ্য হইতে পারে।  
এটা পরীক্ষিত সত্য।

পথ্য।—ক্ষয়রোগী এমন পথ্য গ্রহণ  
করিবে—যাহাতে ক্ষয়ের পূরণ হইতে পারে।  
ক্ষয়ের পূরণ করিতে পারিলেই—রোগীর  
জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর  
বিষ ক্রিয়াও নষ্ট হইবে। অতএব পথ্যের  
দিকে সর্বপ্রায়ে দৃষ্টি রাখা চাই। ক্ষয়রোগীকে  
যে পারিবে খাওয়াইবে। উপবাস দিতে  
দিবে না।

প্রত্যহ প্রাতে ১ গ্রাস উষ্ণজল মিশ্রিত  
৫০ পান করিবে। ১১টার সময়—অবস্থা বুঝিয়া  
কটী বা আলুর সঙ্গে—এক পোয়া মাংসের  
কোল বা মসুর ডালের ঘুস, টাটকা শাক-সবুজ  
হরকারি; ৩টার সময় আঙুর পেঁপে প্রভৃতি  
ফল ও হুৎ; রাতে—লুচি, কটী, মোহনভোগ,  
ফল করিবার সময়—বাগি মিশ্রিত হুৎ—এক  
টি। অবশ্য প্রবল জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য  
অধিক—স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। রোগীর হজমশক্তি  
পাকিলে, এবং মাংস ভোজনে আপত্তি থাকিলে,  
৩টির আটার কটী ও মসুর ঘুস—উৎকৃষ্ট পথ্য।  
৪র ডালে কমফেট ও লোহ থাকার; ৩টার  
৫৫ জাতীয় পদার্থ থাকার—ক্ষয় নিবারণ  
রে। হুৎ ও মাংস যে ক্ষয় নিবারণক—  
আখ্যম—৫

বহুযুগ পূর্বে ঋষিরাও ইহা জানিতেন,  
যথা—

“ক্ষয়ে মাংস রসঃ পরঃ।” আশায় বা  
উদরাময় থাকিলে, প্রথমে শীতল জলে নল  
দ্বারা আশায় ধুইয়া ফেলিবে, পরে হুৎের  
সহিত ডিমের স্বেতাংশ মিশাইয়া খাইতে  
দিবে।

পরিচ্ছদ।—পরিচ্ছদের প্রতিও দৃষ্টি  
রাখিবে। গাত্রে বেশী কাপড় জড়ানো ভাল  
নহে। পোষাক খুব ভারি না হয়। যাহাতে  
হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে, অথচ ঘাম গায়ে না  
বসিতে পারে, এইরূপ পোষাক নির্বাচন  
করিবে। পরিধেয় বস্ত্রাদি—হুইবেলা পরি-  
বর্তন করিলে ভাল হয়। পায়ে সর্বদাই  
মোজা রাখিবে, ঋতুভেদে পরিচ্ছদ পাংলা বা  
মোটী স্থির করিয়া লইবে।

বাসগৃহ। শুষ্ক ও উচ্চভূমিতে স্থিত যে গৃহ  
—ক্ষয় রোগী সেইগৃহে বাস করিবে। অথচ  
ঘরের পার্শ্বে গাছ পালা না থাকে। ঘরে  
রীতিমত রোদ্দ ও বাতাস আসা চাই।

বায়ু পরিবর্তন।—ডাক্তারী মতে চেঞ্জ  
ক্ষয় রোগীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। চেঞ্জের  
আবশ্যক—পুষ্টির বায়ু ও সূর্যালোক প্রাপ্তির  
সুবিধা এবং রমণীয় দৃশ্য দর্শনে মনের প্রসন্নতা  
সম্পাদন। আমাদের এ দেশের সহর গুলি  
কল কারখানা, ড্রেন পাইপানা, বহু লোক  
জনে পূর্ণ, কৃত্রিম আলোকে উদ্ভাসিত।  
অধিকন্তু এ সকল সহর মলমূত্র আবর্জনা, ধূম  
ও কাঁদাধূলায় ভরা; পল্লীগামগুলিও বস  
জমলে থানা জোয়ার পূর্ণ; সুতরাং কি সহর,  
কি পল্লীগাম—সকল স্থানেরই জলবায়ুই দূষিত  
হইয়া পড়িয়াছে। বরং পল্লীগামের তত দূষিত  
নয়, সহরের বাতাস বত দুই। এইরূপ সহরে

স্বস্থ মানুষ বাস করিলেই যক্ষা রোগ হয়।  
প্রাচীন আৰ্য্য চিকিৎসকগণ বলিয়া গিয়াছেন—  
হেতু বিপর্য্যই রোগের উত্তম প্রতিকারের  
পন্থা। অতএব যে স্থানে থাকিলে মাছুষের  
রোগ জন্মে, রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে  
হইলে সে স্থান ছাড়িয়া যাওয়াই সদিবেচনার  
কার্য্য।

এখন দেখা যাউক—ক্ষয়রোগী বায়ু পরি-  
বর্তনের জন্য কোনস্থানে নাহবে ?

যে স্থানের বাতাসে ধূলি প্রভৃতি পার্থিব  
ময়লা নাই, যে স্থানের বায়ু—মলমত্র ও বহু  
লোকের নিবাস হইতে নহে, রোগোৎপাদক  
জীবাণু কল্পিত করিতে পারে না, অপিচ—  
যে স্থানে বাতাসে পূর্ণ মাত্রায় অক্সিজেন আছে,  
এবং পুষ্টিদায়ক “ওজন” আইওডিন,  
ক্লোরিন প্রভৃতি ভাসমান পদার্থ আছে, এইরূপ  
স্থানে রোগীর বায়ুপরিবর্তনের জন্য যাওয়া  
উচিত। যে স্থানে আকাশ পরিষ্কার, প্রায়ই  
মেঘ, কুজঝটা ও অতিবৃষ্টি নাই, যেস্থল প্রথর  
রোদে উজ্জ্বল, এইরূপ স্থান রোগীর বাস  
যোগ্য।

পার্কভা স্থান, মরুভূমি, সমুদ্র তীর ও সমুদ্র  
বক্ষ রোগীর পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান।  
এই সকল স্থানের বাতাস—জীবাণুশূন্য, শুষ্ক, ও  
শীতল রোদ তীক্ষ্ণ। এইরূপ স্থানে থাকিলে,  
অক্সিজেন ও ওজনের উত্তেজনার দোষে  
শোণিত সঞ্চালনের বৃদ্ধি হয়। ফুসফুসের  
রক্তাধিকা প্রশমিত হয়, হোমো কমিয়া যায়,  
উত্তাপের শাস্তি হয়। এই সকল স্থানে  
থাকিলে শারীর যন্ত্রের শক্তি ও ক্রিয়া  
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যাহাদের রোগ অনেকদিন হইয়াছে,  
যাহাদের প্রাণ উত্তপ্ত, যাহাদের রক্তাধিক

দোষ জন্মিয়াছে, ল্যারিক্সেস বা হইয়াছে, শরীর  
অতি জীর্ণ ও হ্রস্বল, ফুসফুস ক্ষত হইয়াছে,  
ঘন ঘন রক্ত উঠিতেছে—তাহাদের পক্ষে  
পার্কভা স্থান ভাল নহে। তাহারা মরুদেশে  
বাস করিলে উপকার হইতে পারে, কেননা—  
মরুপ্রবাহিত বায়ু শুষ্ক, অক্সিজেন ও “ওজন”  
পূর্ণ—জীবাণু শূন্য।

যে সকল রোগীর প্রকৃতি উগ্র, বায়ুনাশক  
উত্তেজনার যাহারা ক্রমাগত কাসিতে থাকে,  
তাহারা সমুদ্রবক্ষে বাস করিবে। সমুদ্র-বায়ু  
নাতি শীতোষ্ণ, সমুদ্র তীরের বায়ুও অনেকটা  
সমুদ্রবক্ষ বায়ুর মত। একমাস সমুদ্র যাত্রায়  
যে ফল পাওয়া যায়, ৬ মাস স্বাস্থ্য নিবাসে  
থাকিয়া, বড় ডাক্তারের ব্যবস্থাপিত সহস্র ঔষধ  
সেবনেও সে ফল পাওয়া যায় না।

সমগ্র শীতকালটা সমুদ্র উপকূল বাস  
করিলে, ক্ষয়রোগীর বহু উপকার হইবার  
সম্ভাবনা।

পার্কভা স্থানের মধ্যে—দাকিণাত্যের নীল-  
গিরি, কলুব উটকামণ্ড, মধ্য ভারতের আরাবরী  
পর্বতমালা, আবু শিখর, উত্তরে মহরী মারী—  
অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। সমুদ্র উপকূলের মধ্যে—  
পুরী, ওয়ালটোয়ার, লঙ্কাবীপের পূর্বভাগ—খুব  
ভাল স্থান। মরুদেশের মধ্যে—রাজপুতান  
শ্রেষ্ঠ।

কোন রোগীর পক্ষে কোদস্থানে যাত্রা  
উচিত,—চিকিৎসক তাহা স্থির করিয়া  
দিবেন।

তরুণ যক্ষারোগী—বাইর উত্তর-পূর্ব  
আফ্রিকা হইয়াছে, বাইর-পূর্ব-পূর্ব-পূর্ব  
বাহার ক্ষয় প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইয়াছে, এক  
যে রোগী যক্ষারোগী হইয়াছে, বাইর-পূর্ব-পূর্ব-পূর্ব  
ইচ্ছুক নহে, এক্ষণে রোগীকে ফলপুষ্ট



পাঠাইবে না। রোগীকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে, অস্বাস্থ্যকর স্থানেও তাহার রোগের হাস হইতে পারে, আর রোগী যদি ভরসাহীন, অবাধ্য, আবদ্ধস্থানবাসী, মুক্ত বায়ু-বিদ্বেষী, আহার-বিচ্যেবের নিয়ম লঙ্ঘনকারী, এবং মনসিক ও কার্যিক অত্যন্তাচারী হয়—স্বর্গের মত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিলেও তাহার অসুস্থতা অবশ্যস্থাবী।

এই প্রবন্ধে আমি যে সকল সুকির উত্থাপন করিলাম, তাহা আমার নিজেরই যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার ফল। আমার একান্ত অনুরোধ—

কি ডাক্তার, কি কবিরাজ, কি হোমিওপ্যাথ, —যিনি যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করিবেন, তিনি যেন তাঁহার রোগীকে ও তাহার গুরুত্ব-কারীকে—এই সকল নিয়ম পাশ্চাত্য করিবার জন্য উপদেশ দেন। ইহা ভিন্ন—এ রোগের বিলুপ্তি নিবারণের অন্য উপায় দেখি না। ইহাতে রোগীরও উপকার হইবে,—রোগীর আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব ও দেশবাসীর উপকার হইবে। যাঁহারা যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা বা সুশ্রুশা করিবেন, তাঁহারা সর্বদাই ক্রমশঃ করিয়া ক্রিয়সূচকের আশ্রয় লইবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার এল্, এম্, এম্।

## হিন্দুর স্বাস্থ্যনীতি।

—:~:—

প্রত্যেক সভ্যরাজ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণ জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ সংগঠিত আছে। রোগপ্রতিরোধ সাধারণ কারণ সমূহ দূর করা এই স্বাস্থ্য বিভাগের কার্য। রাজপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জল নিকাশের সুব্যবস্থা করা, পরিষ্কার আবহাওয়া রাখা, দূরীকরণ, পানীয় জলের কষ্ট নিবারণ, অসহায় দরিদ্র রোগীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, শ্রমজীবন নিবারণ জন্য সংক্রামক রোগপ্রতিরোধ রোগীদিগকে স্থানান্তরিত করণ প্রভৃতি কার্য স্বাস্থ্যবিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। স্বাস্থ্য শাসনিক কার্যাবলীতে বা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি বহুতর আচরণে সকলকে বিরত রাখিবার জন্য আইনাদি বিধিবদ্ধ করাও স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য।

বর্তমান সভ্যজগতে স্বাস্থ্য বিভাগ দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষা করা হয়। প্রাচীন ভারতে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কি-বন্দোবস্ত ছিল, তাহাই আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। হিন্দু চিরকালই ধর্মভীরু। যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে এই ধর্মভীরুতার আংশিক অপ-মোহন হইয়াছে, তথাপি জীলোকদের মধ্যেও যাঁহারা সহস্র খেলা নহেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই ধর্মভীরুতার প্রাবল্য এখনও বর্তমান রহিয়াছে। বর্তমানকালে আইন আদালত দলিল, দস্তখত, সাক্ষী, রেজিস্টারী প্রভৃতি সবেও সভ্য-অসভ্য হইয়া বাইতেছে, কিন্তু পূর্বে ধর্মভীরুতার প্রভাবে কেবল ধর্মের কথায় সভ্য রক্ষা হইত। তদুপায় সভ্য নোহাই দিয়া স্বাস্থ্যরক্ষাও অসুস্থ-সবকে লক্ষ্য

হিত হইত। হিন্দু নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বা রাত্রির শেষ যামাক হইতে হিন্দু প্রাতঃকৃত্য আরম্ভ। এইকালে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণকেই নিদ্রাত্যাগ করতঃ শয্যার উপর উত্তরাস্ত বা পূর্বাস্ত হইয়া উপবেশন পূর্বক দীক্ষাশুককে ধ্যান ও প্রণাম করিতে হয়—এবং দেবদেবী ও পুণ্যশ্লোক মহাভাগণের নামাঙ্ককীৰ্ত্তন করিয়া পবে পৃথিবীকে প্রণাম পূর্বক শয্যাত্যাগ করিতে হয় ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের বিধি। এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রাত্যাগ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে early rising বা প্রত্যুষে নিদ্রোত্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ আলোক-ক্রিয়া দ্বারা স্বাস্থ্যসাধন যে কেবল শারীর-বিজ্ঞান (Physiology) অবলম্বনে সংগঠিত তাহা নহে, ইহাতে Psychology বা মনো-বিজ্ঞানও অন্তর্নিহিত আছে। মহাভাগণের নাম স্মরণ ও কীৰ্ত্তন দ্বারা মানবের মনোভাব গঠিত হয়। মনের সহিত শরীরের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সুতরাং মানসিক উৎকর্ষও স্বাস্থ্যেরতির জন্য প্রয়োজনীয়।

নিদ্রোত্থানের পর মলমূত্রত্যাগ বিধি। গ্রামে বাসস্থানের দোষশূন্য হস্ত দূরে ও মগ্নে তাহার চতুর্দিক দূরে নৈঋত কোণে মলত্যাগের স্থান নির্ধারণ করা শাস্ত্রীয় বিধি। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, আবাস ভূমির বায়ু বাহাতে দূষিত না হয় তাহারই ব্যবস্থা। পল্লীগাম অপেক্ষা নগরের লোক সংখ্যা অধিক, সুতরাং পুরীষ রাসির পরিমাণও অধিক, তজ্জন্ত সেকালে গ্রামা-বাসস্থান অপেক্ষা নাগরিক বাসস্থানের অধিক দূরে মলমূত্রপত্রের স্থান নির্দিষ্ট হইত। নৈঋত

কোণ নির্দিষ্ট হইবার কারণ, বোধ হয়—নৈঋত বায়ু প্রায় প্রবাহিত না হয়,—বা যদি প্রবাহিত হয়—তাহাও ক্ষণিক। মলমূত্র ত্যাগকালে মনোবলম্বন আবশ্যক, এবং নিদ্রাবন ত্যাগ ও শ্বাস গ্রহণ নিষিদ্ধ। মলত্যাগ কালে পরিধেয় বসন কটিদেশের উর্দ্ধভাগে স্থাপন করিতে হয়। পাছকা পরিধান করিয়া, দণ্ডায়মান বা ভ্রাম্যমান অবস্থায় মলমূত্রত্যাগ নিষিদ্ধ। এই সব পদ্ধতি যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সেকালে কেবল যে মানবজাতির বাসস্থান স্বাস্থ্য জনক রাখিবার জন্য ব্যবস্থা ছিল তাহা নহে, গবাদি গৃহপালিত পশুদির স্বাস্থ্যের প্রতিও লক্ষ রাখিবার নিয়ম ছিল। যথা :—

“সদেব গো ব্রাহ্মণ বহ্নিমার্গে ন রাজমার্গে

ন চতুঃপথে চ।

কুর্য়াদথোৎসর্গমণীহ গোষ্ঠে পূর্বাং

পরাক্ষেব সমাপ্রিতাং গাম্॥”

দেবতা, গো ব্রাহ্মণ ও অগ্নির অভিমুখে রাজপথে, চতুঃপথে, গোষ্ঠে, অথবা যে স্থানে পূর্বে গো চারণ হইয়াছিল বা পরে হইবে—সে রূপ স্থানে মলত্যাগ নিষিদ্ধ।

মৃত্তিকা দুর্গন্ধ হারক এবং কারাদি সংগীত থাকায় ক্রোদাদি অঙ্গমল দূরীভূত করে। তন্নিমিত্ত ইহা Disinfectant বা সংক্রমণ দোর নাশক। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে শোচার্থে ইহা ব্যবহৃত করিবার নিয়ম। কিন্তু হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সহিত স্বাস্থ্যনীতির একই মনোভাব লক্ষ্য যে, মৃত্তিকাও আবাস বিপুল হওয়া আবশ্যক তাই শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

“জলমধ্যা হইতেও মৃত্তিক গর্ভ হইতে, অগ্নি বা অস্ত্রের শোচাশক্তি হইতে অথবা পানীয় হইতে শোচার্থ মৃত্তিকা আহরণ করিবে।

ইহাব পর প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থা। কিন্তু তাগতেও নিয়মাদি বিধিবদ্ধ। সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রাতঃস্নানের সময়। প্রাতঃস্নান ভিন্ন শ্রব ও পিতৃক্রিয়ার অধিকার হয় না। সুতরাং ধর্মভীরু হিন্দুর পক্ষে প্রাতঃস্নান অবশ্য কর্তব্য। প্রোক্তভাষ্যে স্রোতাভিমুখীন হইয়া ও স্রোতঃ-ধীন ভূমি সূর্য্যভিমুখীন হইয়া, নাভিমগ্ন জলে পাড়িয়া, করদ্বয় দ্বারা মুখ নাসিকা, কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক ডুব দিতে হয়। জলাশয় জপবৎ হইলে ডুব দিবার পূর্বে উহা হইতে তিনটা বা পাঁচটা মুংপিণ্ড উঠাইয়া তীরে নিক্ষেপ করিয়া “উত্তিষ্ঠোপাশ্রিতঃ স্বং তাজ্জ পুণ্যং পবন্ত চ। পাপানি বিলয়ঃ যাস্তি শাস্তিঃ স্বেতি সঙ্গা মম ॥”—এই মন্ত্রপাঠ করিতে হয়।

ইহাও স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য। প্রত্যেকে যদি প্রতিদিন স্নান কালে তিনটা বা পাঁচটা মুংপিণ্ড জলাশয় হইতে উঠাইয়া ফেলে, তাহা হইলে জলাশয়ের পক্ষেজ্বর ক্রিয়া অতি সহজেই সম্পাদিত হয়। এক কথায় এইজন্তই ইহার ব্যবস্থা।

আবার স্নান কালে মস্তক, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি অঙ্গ মুতিকা দ্বারা মাৰ্জ্জনা করিবারও বিধি আছে, তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি—মুতিকা ভগ্নকহারক, ক্রেন বিমোচক ও Disinfectant বা সংক্রমণ নিবারণ।

এইরূপ শয়ন, ভোজন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে হিন্দুর যে সব পদ্ধতি আছে, তৎসমুদয়ই স্বাস্থ্যোন্নতিকর। পরিচ্ছন্নতা হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। রাত্রিবাস বা অধোত বসন গবিধান করিয়া আঙ্গিকপূজা ও ভোজনাদি ক্রিয়া হিন্দুর পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ। এমন কি, অধোত বসনে ও স্নান না করিয়া রন্ধনাদি ক্রিয়া ও পূজাদির আয়োজন করিতে পারা যায় না।

তিথি, বার, মাস ও ঋতুভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব নিষিদ্ধ আছে, তাহাও সংরক্ষণার্থ ব্রহ্মহত্যা দি মহাপাতকের দোহাই দিয়া নিবাহিত হইয়াছে। বিরুদ্ধভোজন সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

আবার গৃহমধ্যে যাহাতে আবর্জনা রাশি স্তুপিকৃত করিয়া না রাখা হয়—তাহারও বিধি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত।

আবার infection বা স্পর্শাদি দ্বারা রোগাক্রমণ নিবারণের জন্ত ও ব্যবস্থা আছে।

এইরূপে হিন্দুর সংক্রিয়া পদ্ধতি সমুদায় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—শারীরিক বা স্বাস্থ্য সাধন করিবার জন্ত প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

## গার্হস্থ্য মুষ্টিযোগ ও টোটকা ।

—:~:—

চক্ষুরোগে—(১) হরীতকীর শাঁস গুড়ে ঘষিয়া গরম করিয়া চক্ষের পাতায় লেপ দিলে চক্ষু ব ফুলা ভাল হয়। (২) লবক

—মধুতে ঘষিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষুর ফুলা ভাল হয়। (৩) পাতিলেবুর রস দিয়া পাতিলেবুর লিকড় বাটিকা চক্ষের বাটে

ও উপরে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

(৪) শ্বেত পুনর্নবার শিকড়—পুরাতন কঁজির সহিত ঘসিয়া চক্ষে দিলে ছানি ফাল হয়।

কাণ পাকায়।—(১) থানিকটা সরিষার তৈল আঙুণে চড়াইয়া একটা শামুক তাহাতে ভাজিয়া ঐ তৈল ছাঁকিয়া কর্ণে দিলে কাণ পাকা রোগ ভাল হইয়া থাকে। (২) শাঁথের গুড়া ও চোণা একত্র মিশাইয়া কিছুক্ষণ কাণের ভিতর রাখিলে কাণপাকা ভাল হয়।

মুখ রোগে—(১) ভেরেণ্ডার আটা এক তোলা, সিকি ভবি সৈন্ধব লবণ—একত্র মিশাইয়া পিতলের পাত্রে গরম করিয়া দস্ত-পাটির ঠুউভয়দিকে কিছুক্ষণ লাগাইয়া ধুইয়া ফেলিলে দাঁতের গোড়ায় নালী হইয়া যদি পুঁজ পড়ে, তাহা হইলে তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থা দিবসে ২১৩ বার করিবে। ২১৩ দিন এইরূপ করিলেই দস্ত হইতে পুঁজ পড়া নিবারিত হইবে। (২) দাঁতের গোড়া কিয়া জিহ্বায় লা হইলে, গোয়ালিয়ালতার ডাঁটা আনিয়া ডুমা ডুমা করিয়া রুতে ভাজিয়া ঐ রুতেই ডাঁটা গুলি বাটিয়া লইয়া অবলেহ করিবে। ২১৩ দিন এই ব্যবস্থা চলিলেই বা আরোগ্য যাইবে।

অরুচিতে। (১) জীরাভাজার গুঁড়া ভোজনের পূর্বে জিহ্বাতে ঘসিয়া ভোজন করিলে আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে। (২) শস্যের পাতা পাতপোড়া করিয়া তৈল ও লবণ মাখিয়া ভোজনের সময় আগে ২১৩ বার খাইবে এবং ভোজনের সময়ও মধ্যে মধ্যে খাইবে। ইহাতে অরুচি ভাল হইবে। (৩) লালিতা-পাতা, পাতপোড়া করিয়া ঐরূপভাবে ভোজনের সময় খাইলেও অরুচি ভাল হয়। (৪) খোল

দিয়া কুলকুচা করিয়া তাহার পর আহার করিলে আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে।

টাকে।—হরিভাল, বহেড়ার শাঁস ও বৃহতীর মূলের গুঁড়া সমভাগে মধু দিয়া মাড়িয়া লেপ দিলে টাক আরোগ্য হয়।

রাতকাণায়। বিষ্ণু গাওয়া ঘি থানিকটা গলাইয়া লইয়া সন্ধ্যার পর রোগীর ব্রহ্মভালুতে, চক্ষের উপর হাতের ও পায়ের তালুতে মালিস করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বিছার কামড়ে।—(১) ছাগলেন নাড়ি জল দিয়া গুলিয়া কিঞ্চি শুধু ঘসিয়া দিলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। (২) রাঙা শাকের পাতা যথেষ্ট চিবাইয়া যেখানে কামড়াইয়াছে—লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। (৩) গাওয়া ঘি গরম করিয়া লাগাইলেও উপশম হইয়া থাকে।

বোলতা, ভিন্নরুল ও মৌমাছির কামড়ে।—সৈন্ধব লবণের গুঁড়া মালিস কর উপশম হইবে।

আঁচিলে।—চলুদ পাড়াইয়া চুপে মিশাইয়া আঁচিলের উপর মা হইলে উহা নষ্ট হয়।

চুলকণায়। শ্বেতচন্দন ঘসিয়া কিঞ্চি কপূরের সহিত মিশাইয়া ২১৩ দিন মাখিলে গায়ের চুলকনা আরোগ্য হয়।

মাথার ব্যায়ে।—(১) মুজাম্বা ও তেঁতুলের বীচির শাঁস সমান ভাগে লইয়া জল দিয়া ঘসিয়া মাথার ব্যায়ে লাগাইলে তাহা আরোগ্য হয়। (২) পশু-তেঁতুলের বীচির শাঁস, জল লবণের সহিত মিশাইয়া মাথার ব্যায়ে দিয়া ঐরূপভাবে ব্যায়ে লইয়া কেবির।

১৩ দিন এইরূপ করিলেই মাথার ব্যাধি সারিয়া যাইবে।

পাচড়া ও ঘামাচিতে।—গাওয়া যে একছটাক মুদ্রাশি আধতোলা, ফটকিরি বাব আনা, ভুঙ্গরাজের পাতার রস একভরি চাবি আনা, তুঁতে ছই আনা একত্র মিশাইয়া আশুগে ফুটাইয়া লইয়া পাচড়া এবং ঘামাচিতে লাগাইলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

মাথা ব্যথায়।—(১) মুখের রস রূগে দিলে মাথার ব্যথা আরোগ্য হয়।

বসন্তের প্রাতিষেধক।—(১) কটিকারির মূল গোলমরিচের সহিত মিশাইয়া থাইলে বসন্ত রোগ হয় না। (২) পুনর্নবারমূল গোল মরিচের সহিত বাটিয়া থাইলে এক বৎসরের মধ্যে বসন্ত হয় না।

শ্রীস্বধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত করিবরত্ন।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:~:—

চিকিৎসকের অব্যাহতি।—আমরা শুনিয়া যুখী হটলাম।—ঢাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার “রোহিতকারিষ্ট” প্রস্ততের জন্য আবগারি আইনের আমল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। আবগারি কর্তৃপক্ষ ইহার যামলা তুলিয়া লইয়াছেন।

মাদ্রাজে আয়ুর্বেদ।—সংপ্রতি মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় অনারেবল শ্রীযুক্ত রঙ্গ চারিয়ার আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি বিধানের জন্য গবর্ণমেন্টের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া গিয়াছেন। আমরা শুনিয়া হুঃখিত হইলাম, গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে সার আলেকজান্ডার কার্গিস বলেন,—“আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাটা কিছুটা নত উড়া হাতুড়ে চিকিৎসকগণের জীবনযাত্রা নির্বাহের একটা উপায় মাত্র। সার আলেকজান্ডারের একরূপ মন্তব্য আমরা শুধু নম্রাচত হই নাই,—বিস্মিতও হইয়াছি। তাহারই শেষের—তাঁহারই স্বজাতি—বহুতর

লব্ধ প্রতিষ্ঠা ইংরাজ ইতঃপূর্বে এই আয়ুর্বেদের যথেষ্ট স্বখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর সার্জন ফ্রাঙ্কলিন চার্লস একদিন ছাত্রগণকে উপদেশ দিতে বলিয়াছিলেন,—“আর্য্যচিকিৎসা বিজ্ঞানে যাত্রা তই সহস্র বৎসর পূর্বে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আমি আজ তাহাই তোমাদিগকে পুনর্ব্বার বলিতেছি। চরকে কথিত চিকিৎসার একটু সামান্য অংশমাত্র আমি তোমাদিগকে বলিতেছি।” আমেরিকা—ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার ক্লার্ক, একদা বলিয়াছিলেন, “যদি ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার সমস্ত অংশ পরি-ত্যাগ করিয়া ‘চরকে’র চিকিৎসা অবলম্বন করা যায়—তাহা হইলে দেশের লোকের অকাল মৃত্যু অনেক কমিতে পারে।” সার আলেকজান্ডার আয়ুর্বেদের কিছুই জানেন না, এ অবস্থায় একরূপ অবস্থা মন্তব্য তাঁহার মুখ হইতে কেমন করিয়া নির্গত হইল—তাহা আমরা

যুক্তিতে পারিতেছি না। কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে, সেই শাস্ত্র যে রীতিমত অধ্যয়ন করা উচিত—এ কথা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

বঙ্গে বাতুল বৃদ্ধি। সরকারি হিসাবে প্রকাশ,—বাঙ্গালার বাতুলালয় সমূহে বাতুল রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯১৫ হইতে ১৯১৭ খৃঃাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে মোট ১,২৮৩ জন রোগী বাতুলালয় সমূহে প্রবেশ করিয়াছিল এবার তাহাদের সংখ্যা ১,৩৩১ হইয়াছে। যতগুলি কারণে লোকের পাগল হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে—অভাব অনটনও অত্যন্ত কারণ। এরূপ অবস্থায় বর্তমান সময়ে বাতুলকুলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণই নাই। দেশের নেতৃ-বর্গ এ সকল কথা ভাবিতেছেন কি?

নূতন জরে পাবনার কবিরাজ।—নূতন সংক্রামক জরের চিকিৎসা—প্রসঙ্গে পাবনার কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিহারী “বঙ্গ-বাসী”তে লিখিয়াছেন,—“আয়ুর্বেদ মতে এই জর কাল বিপর্য্যাদ জন্ত কাল বিপর্য্যাদ জর মাত্র; কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতজ্বর এবং কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতশ্লেষজ্বররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এ জরে লক্ষ্মীবিলাস এবং অগ্নিকুমার রস দিবসরাত্রে ২১০ বার পর্য্যায়ক্রমে পান, আদার রস, পিপ্পল চূর্ণ এবং মধু অল্পপানে সেবন করিলে রোগীর বেদনা,

শ্লেষ্মা ঘোষ ও কাসি ইত্যাদি কমিয়া গিয়া রোগী ২১০ দিনে সুস্থ হইয়া থাকে।—কথাটা আমাদের কিন্তু ভাল লাগিলনা,—ইহাতে পারে ইহা কাল-বিপর্য্যাদ জর, কিন্তু কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতজ্বর, আবার কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতশ্লেষ—এ কেমন কথা? আমরা ইহাকে বাত জর বলিব না, বায়ুর সহিত শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকায় আমরা ইহাকে বাতশ্লেষজ্বরই বলিব। তাহার পূর্ব বঙ্গ বাসী’র পত্র লেখকের কথা অনুসারে ইচ্ছা যদি বাতজ্বরই হয়, তাহা হইলে ‘লক্ষ্মীবিলাস’ এবং ‘অগ্নিকুমারে’ ইতার কি হইবে? বাত শ্লেষ জর হইলে ‘লক্ষ্মীবিলাসে’ উপকার হইবার কথা। আমরা গতবারে এই জর প্রসঙ্গে “মকরধ্বজ সেবনের যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, তাহাই সমীচীন ব্যবস্থা। প্রথম বার এই জরের আক্রমণ কালে কোন ঔষধ দাও—না দাও, আসিয়া যাইবেনা কিন্তু জর অন্তে শ্লেষ্মা এবং চর্কলতা দূর করিবার জন্ত ‘মকরধ্বজ’ সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে—এ বিষয় এই বৎসরই আমরা বহুস্থলে পরীক্ষা করিয়াছি। ‘মকরধ্বজের’ সহিত ‘লক্ষ্মীবিলাস’ ব্যবহারে আরও উপকার হইয়া থাকে। যাহা হউক এ জর, শুধু বাতজ্বর মতে, ইহা যে বাতশ্লেষ জর—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৩য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫—কার্তিক ।

২য় সংখ্যা ।

## বিজয়া ।

—:—

পূজা ফুরাইল । বিসর্জনের কক্ষণ রাগিনি—  
—উৎসব, আনন্দ ফুরাইয়াছে জানাইবার জন্ত  
ক্ষণেই বাজিয়া উঠিল । কর্মকুশল বাঙ্গালী  
বঙ্গিনীর জন্ত অবসর পাইয়া যে শান্তি-সুখ  
উপলব্ধি করিতেছিল, তাহার পরিসমাপ্তি  
দেখিয়া আবার কর্ম-জুয়াড়ে গা' ঢালিয়া দিল ।  
আমরা ও আমাদের গ্রাহক-অনুগ্রাহক পাঠক  
ও লেখকদিগকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ  
জানাইয়া 'আয়ুর্বেদে'র সেবায় মনোনিবেশ  
করিলাম ।

কিন্তু এই আবাহন ও বিসর্জনের ব্যাপারে  
আমরা কি বুঝিলাম ? আশৈশব বার্কিক্য  
পরাণ আমরা সকলেই তো জানি—এ আনন্দ  
—এ উৎসব ক্ষণিকের জন্ত,—ইহা চিরস্থায়ী  
নহে,—মাত্র তিনটি দিনের জন্ত এই উৎসবের  
শ্রোত প্রবাহিত থাকিয়া তিন দিন পরেই ইহা  
ফুরাইয়া যাইবে,—এত আশা—এত উৎসাহ  
—এত আকাঙ্ক্ষা—এত কামনা—মাত্র তিন

দিন পরেই তো অতীতের গর্ভে বিলয় প্রাপ্ত  
হইবে । তবে বাঙ্গালী এই অস্থায়ী আনন্দ  
উপভোগ করিবার জন্ত, সারা বৎসর ধরিয়া  
একটা অভাবনীয় আকাঙ্ক্ষা—একটা  
অনির্করণীয় উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া  
থাকে কেন ? যাহা চিরস্থায়ী নহে,—যাহা  
আসিয়াই ফুরাইয়া যাইবে—যাহা উদয় হইয়াই  
বুদ্বুদে মিলাইয়া যাইবে—যাহার আরম্ভ মাত্রের  
সমাপ্তি হইবে, তাহার জন্ত সমগ্র বঙ্গসংসার  
উন্মত্ত হইয়া উঠে কেন ?

কিন্তু 'কেন' যে এই উৎসবে—বাঙ্গালীর  
প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠে—তাহা সাধক ভিন্ন  
অন্তে বুঝিবেনা । স্থিতি-স্থিতি লয়—এই ত্রিবিধ  
ব্যাপার লইয়াই তো শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ ।  
মুগ্ধরী মূর্তিতে স্নিগ্ধরীকে আনিয়া সাধক সেই  
ত্রিবিধ ব্যাপারেরই রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া  
থাকেন । যে মূর্তিকা লইয়া মায়ের প্রতি-  
কৃতি নির্মাণ পূর্বক তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠার

ব্যবস্থা করা হয়, সেই মৃত্তিকা—সৃষ্টবস্তুর সর্ব প্রথম। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত লইয়াই তো সৃষ্টির গঠন। জীব-সৃষ্টিতে ক্ষিতি হইতে উদ্ভবের পর, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের সাহায্যে তাহার পরিপুষ্টির ব্যবস্থা। বিলয়কালেও ক্ষিতি ভিন্ন অপর সকল গুলির সাহচর্যের সন্ধোচন হইয়া আবার ক্ষিতিতেই তাহার বিলয় সাধন হইয়া থাকে। জগদম্বার মুগ্ধায়ী মূর্তিতেও এই সৃষ্টি ও লয়ের কোশল সুসংবদ্ধ। ভক্ত সাধক ইহাই উপলব্ধি করেন বলিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা সারাবৎসর ধরিয়া জাগিয়া উঠে। সাধকের সেই আকাঙ্ক্ষা-জাগরণে বিশ্বসংসার এমন একটা অজানা স্রোতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে—যাহার ফলে বিশ্ববাসী পূজার অপেক্ষায় উন্মত্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

দ্রুত দশাননের প্রবল প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্ত শ্রীশ্রীরামচন্দ্র অকালে জগন্নাথের অর্চনা করিয়াছিলেন। রাবণ-নিধন সেই অর্চনার ফল। হ্রস্বৃত্ত দমনে বিশ্বসংসার সে দিন ভাবোন্মেষে মত্ত-মধুর হইয়া পড়িয়াছিল। বিসর্জনের পরে শূন্তবেদিকা নিরীক্ষণে সাধকের প্রাণ ফাটিয়া যাইলেও এ দিনে যে প্রণাম, আশীর্বাদ, আলিঙ্গন, সন্তানগণের ব্যবস্থা—তাহাও হ্রস্বৃত্ত দমনে ভাবোন্মেষ মত্ততাবই ফল সম্ভূত। স্মরণে আজিকার দিনে মাহু হারা হইলেও সাধক বিশ্ববিজয়ী। মাহুতক্ত বাঙ্গালী এই জন্তই এ দিনের অপেক্ষায় নাবা বৎসর আকুল হইয়া থাকে। এ আকুলতার যে কত সুখ—তাহা বাঙ্গালী ভিন্ন আব কেহ বুঝিবে না।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

## জল-সংশোধনে তাত্রের অদ্ভুত শক্তি।

—:~:—

“কাঞ্চনে ভক্ষয়েদমং হৃৎকং রজত ভাজনে।  
আয়সে চাপুং মংস্তং দধিতক্রে শিলাময়ে ॥  
রীতি-পাত্রে তিলকঙ্কং পায়সং শক্তবঃ মধু।  
মুগ্ধয়ে শাক-সুপাদীন তাত্র পাত্রে জলং

পিবেৎ ॥

—পাক-রাঃ

এ দেশের যখন সমৃদ্ধিশালী গৌরবময়ী অবস্থা—তখন এই শ্লোকটা ঋষি রচিত স্বাস্থ্য নীতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। হৃৎকের বিষয়—সোণার থালে ভাত খাইলে, রৌপ্য পাত্রে

হৃৎক পান করিলে, লৌহ-পাত্রে পিষ্টক ও মংস্ত ভক্ষণ করিলে, পাথরের বাটিতে দধি ও ব্যোম এবং মুৎপাত্রে শাক সুপাদি আহার করিলে শরীরের যে কি উপকার হয়,—ভোজ্যদ্রব্যের বা পাত্র বিশেষে কিরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত সাধিত হয়, অনেক সময় আমরা তাহা বুঝি উঠিতে পারিনা। অনেক সময় মনেও হয়—এ সকল বুঝি প্রাচীন কালের কুসংস্কার! কিন্তু তাত্র-পাত্রে জলপানের বিধি যে খুব ভাল, কথা আর অস্বীকার করা চলেনা। কেন



এই সভ্যতার স্বর্ণযুগে স্বয়ং সাহেবের মুখে আমরা তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিতে পাইতেছি।

আমাদের দেশে—পূর্বে তাম্র-পাত্রের দ্বারা জল পান করিতেন। বড় বড় ভদ্র কলমীতে পানীয় জল সযত্নে রক্ষিত হইত। তাম্রের কোষাকুশীভূত জলে—দেবলোক ও পিতৃলোকের পরিতর্পণ হইত। গ্রীষ্ম গৃহিণীগণ—সন্তানের আরোগ্য বাসনায় জলকুস্তব মধ্যে দেবতার নামে তাম্রমুদ্রা বুঝাই রাখিতেন। রুগ্ন শিশু সেই জল পান করিত। এ সকল প্রথা এখনও বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন সাহেবেরা বলিতেছেন—তাম্র কর্তৃক অপরিষ্কার জল পরিষ্কার হয়। তাম্র পাত্রে কেন রাখিলে—জলস্থিত রোগবীজাণু ধ্বংস হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে—পরিষ্কার তাম্রপাত্রে জল রাখিলে সেই জলস্থিত জীবাণু এবং অপর আনুবীক্ষণিক জীবাণু সহজে নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরিষ্কার তাম্রপাত্রে জল থাকিলে, সেই জলদ্বারা তাম্রের অতি সামান্য অংশ দ্রব হয়। এই দ্রব তাম্রই আনুবীক্ষণিক রোগ বীজাণু নষ্ট করে। শুধু ইহাই নহে। তাম্র জলের দুর্গন্ধ ও বিবর্ণ নষ্ট করে। তাম্র সংস্পর্শে জল স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ বিহীন হইয়া থাকে।

যদি বিভাগের কর্মচারীগণ বলেন—  
১০০০০০ ভাগ জলে, একভাগ সালফেট অফ কপাসের দানা দ্রব হইলে—সে জল বীজাণু শূন্য ও সুপেয় হইয়া থাকে। জলের পরিমাণ যতদূর হওয়া প্রযুক্ত একখণ্ড তাম্রফলক

ডুবাইয়া রাখিলেও জলের সমস্ত দোষ দূর হইয়া যায়। এই প্রণালীতে জল পরিষ্কার করা অতি সহজ, যে কোন ব্যক্তি যখন তখন ইহা অনায়াসেই করিতে পারে।

জল মধ্যে যে পরিমাণ জৈবিক পদার্থ বর্তমান থাকে, সেই পরিমাণে তাম্রও জলের সহিত দ্রব হয়। এইটি তাহের আশ্চর্য্য শক্তি। দ্রব তাম্র জৈবিক পদার্থের সঙ্গে মিশিয়া অদ্রবনীয় পদার্থ রূপে অধঃপতিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাম্রসংযোগে জল ধাতব পদার্থ বিহীন, নির্দোষ ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

লেটান গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যবিভাগের জল পরীক্ষক যিনি আনুবীক্ষণিক জীবাণুতত্ত্ববিদ বলিয়া বিখ্যাত—সেই ডাক্তার Pitchford জল পরিষ্কার করণে তাহের শক্তি ভাল রকম করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার পিচ-ফোর্ড বলেন—১০০০০০ জলে এক ভাগ সালফেট অফ কপার মিশ্রিত হইলেই জলস্থিত সমস্ত আনুবীক্ষণিক জীবাণু ধ্বংস হইয়া যায়। বীজাণু ধ্বংস করিতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পরে ঐ জলে আর জীবাণুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। যে জল টাইফয়েড-বাসিলাস কর্তৃক দূষিত হইয়াছে, সেই জলের ৭৫০০০ ভাগে ১ ভাগ সালফেট অফ কপার মিশ্রিত করিলে, ৩ ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে,—ঐ জলে আর টাইফয়েড জীবাণু নাই। এক গেলন জলে, ১ গ্রেণ সালফেট অফ কপার দেওয়াই নিয়ম। শুই উগায়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে জলস্থিত জীবাণু বিনষ্ট করিতে পারা যায়।

খুব পরিষ্কার মাজাবা তাম্র পাত্রে—আনু-বীক্ষণিক জীবাণু কুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় জলের দোষে নানাবিধ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইত। পরে ডাক্তার ওয়াটকিন্স—তথাকার জলে সালফেট অফ কপার মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা করায়, জল বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং জলদ পীড়ার আশঙ্কাও কমিয়া গিয়াছে।

অতি সামান্য মাত্রায় সালফেট অফ কপার জলের সহিত দ্রবায়ন থাকিলে, সে জল পান করিলে একটুও অনিষ্ট হয় না। ইহা বৈজ্ঞানিক জগতের একটা পরীক্ষিত সত্য। যে সকল পল্লীগ্রামে—জলের দোষে লোকের নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে, সেখানে বক্ষ্যমান প্রণালীতে তান সম্পর্শে জলকে বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। এত অল্প খরচে আর কোনও উপায়ে জল নির্দোষ হইতে পারে না।

এখন সাহেবেরা তাম্রের এই জল সংশোধক গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাম্রের অনু-রাগী হইয়া পড়িয়াছেন—সাহেবের কথায় আমরাও তাম্রের প্রভাব বুঝিয়াছি। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে—আমাদের ঋষিগণ কেমন করিয়া যে তাম্রের এই গুণ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। এই জ্ঞানই কবি বলিয়াছেন—  
ওরে বাছা গৃহে তোর রতনের রাজি।

এ ভিখারী দশা তোর কেন তবে আজি?

হায়রে! তথাপি আমাদের চৈতন্যদেয় হয় না! তাম্র স্বয়ং বিষ হইয়াও, দূষিত জলকে অমৃতে পরিণত করিতে পারে—ঋষিগণেব এই মহাসত্য সাহেবদের অনুগ্রহে আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি! আমাদের মত আয়ু-বিস্বস্ত—জাতি জগতে আর আছে কি?

শ্রীলক্ষ্মীকুমার দে, এম্বি।

## শিশুদের যক্ষ্মারোগ।

—:~:—

সহরের এক বড়লোকের বাড়ীতে চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম। রোগী একটা শিশু, তাহার দেহ একেবারে জীর্ণ শীর্ণ। শিশুটা অনেকদিন হইতে ভুগিতেছিল, বলা বাহুল্য তাহাকে নিরাময় করিবার জন্য ক্রমাগত চিকিৎসক পরিবর্তন চলিতেছিল। বাকী ছিলাম কেবল আমি। আমার পূর্বে অনেক বড় ডাক্তারও দেখিয়াছিলেন। পর্যায়ক্রমে কেহ জরের, কেহ যকৃতের কেহ কৃমির, কেহ বা অঙ্গীর্ণের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই ছেলেটা সুস্থ হয় নাই।

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া শিশুকে পরীক্ষা করিলাম। শিশুর অভিভাবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ইহার রোগ কি?” আমি বলিলাম—“যক্ষ্মা”। বৈঠকখানায় অনেক লোক বসিয়াছিলেন, আমার কথায় তাঁহারা সকলেই যেন বিস্মিত হইলেন। আমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া একটা বাবু জনান্তিকে গৃহস্থানীকে বলিয়া কেলিলেন—“এত ছোট ছেলের যক্ষ্মা হয়, এই নূতন ঔনিলাম। বলা-রোগের কারণ—খাড়ুক্ষ্ম। এ ছেলের মত শুকনো জন্মায় নাই, তাকে যক্ষ্মা হইল কেমন করিয়া?”

একথায় উত্তর দিবার তখন আর আমার প্রত্নি হইল না। গৃহস্থানী কিন্তু আমারই উপর শিশুর চিকিৎসার ভার অর্পণ করিলেন। আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে—স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণ ও স্ত্রীভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া শিশুর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

৩ মাস পরে শিশুর শরীরে স্বাস্থ্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। ৮ মাসে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। গৃহস্থানী অবশ্যই আমার প্রতি প্রীত হইলেন। ষাঁহারা র্নালকের ক্ষয়রোগের কথায় চমকিত হইয়া, আমাকে উপহাস করিয়াছিলেন, তাঁহার একদিন আমাকে ধরিয়া বসিলেন—“কবিরাজ! এইবার সত্য করিয়া বল দেখি,—অত ছোটছেলের কি যক্ষ্মা হইতে পারে? আমাদের বিশ্বাস ছিল—শুক্রক্ষয় না ঘটলে যক্ষ্মা হইতেই পারেনা।” আমি তাঁহা-দিগকে যে উত্তর দিয়াছিলাম—বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই লিখিতেছি।

বাস্তবিক অনেকেরই বিশ্বাস আছে—খুব ছোট ছেলের যক্ষ্মারোগ হয় না। ডাক্তারী পুস্তকে শিশু-যক্ষ্মার উল্লেখ আছে। আয়ুর্বেদে ও—শিশুদিগের যক্ষ্মারোগের যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু যে মতেরই অনুসরণ করা যাউক না, শিশুর যক্ষ্মারোগ হইয়াছে কিনা, তাহা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপ্তর। যুব বরের সহিত পর্যবেক্ষণ না করিলে রোগ ধরা যায় না।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, সহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগুলির গলায় গ্রন্থি মালা আয়ুই ক্ষীত হইয়া থাকে। এই প্রকৃতির শিশুগণকে ডাক্তারেরা Scrofulous tendency সংযুক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যে সকল শিশুর গলদেশে গ্রন্থি ক্ষীতি লক্ষিত হয়, তাহার

অতি সহজেই সর্দি ও কাসিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই সকল শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্যও ভাল নহে, দেহ ক্ষীণ, মন ক্ষুধিহীন। ইহা-দিগের লালনপালনে অভিভাবকগণ যদি ভাল রকম যত্ন না করেন, তাহা হইলে এই সকল শিশু যক্ষ্মারোগে অনায়াসেই আক্রান্ত হইতে হইতে পারে। কিন্তু ভ্রূংখের বিষয় এই শ্রেণীর শিশুদের যক্ষ্মারোগের প্রকৃত চিকিৎসা হয় না। কেননা—ইহাদের রোগ নির্ণয় করা অনেক সময়ই বড় কঠিন হইয়া পড়ে। খুব বিস্তৃত চিকিৎসকও শিশুদের যক্ষ্মারোগ সহসা ধরিতে পারেন না। ইহার কারণ—যুবক বা কিশোর বয়স্ক মানুষের যক্ষ্মারোগ হইলে, যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়—সে সকল লক্ষণ শিশুর দেহে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কখনও বা অস্পষ্ট ভাবে লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি—“Course breathing এবং Dry rhonchuse ও creaking শব্দ—যদি clavicleএর নিম্নে পাওয়া যায়, কিম্বা সেইখানে স্পষ্টতর বোধ হয়, তবে বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইলে, তথায় যক্ষ্মারোগের সূচনা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। কারণ বয়স্ক ব্যক্তিদের ফুসফুসে সাধারণ ভাবে Tubercle পরিব্যাপ্ত না হইয়া স্থানিক ব্যাধিরূপেই যক্ষ্মারোগ হইয়া থাকে। কিন্তু শিশুদের ফুসফুসে যক্ষ্মা সাধারণ ভাবেই পরিব্যাপ্ত হইয়া দেখা দেয়। শুধু ইহাই নহে—শিশুদের এত সামান্য কারণে এবং এত রকমের কারণে শ্বাস প্রশ্বাসের সূক্ষ্মতম প্রভেদ হইতে থাকে যে, উপযুক্ত স্থানে উল্লিখিত চিহ্ন-গুলি একত্রে অনেক সময় পাওয়া যায় না, আবার পাওয়া গেলেও তাহা যে প্রকৃত যক্ষ্মা-রোগ তাহা স্থিররূপে জানা যায় না।

শিশু প্রকৃতি উত্তেজনাপ্রবণ, উত্তেজনা বশতঃ তাহাদের উভয় পার্শ্বের বক্ষঃ প্রাচীর—ভিন্ন ভিন্ন বেগে পরিচালিত হইতে পারে। সুতরাং একদিকের বক্ষঃপ্রাচীর অন্তদিকের সহিত পৃথক কার্য্য দেখাইলে, জোর করিয়া বলা যায়না যে—তাহার যক্ষ্মাই হইয়াছে।

শিশুদের প্রায়ই রক্তোৎকাস হয় না, অর্গাৎ কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে না।

শিশুরা কাসে খুব কম, এবং খুঁখু ও ফেলিতে পারে না।

শিশুদের দেহে যক্ষ্মার প্রধান চিহ্ন অতি ঘর্ম্ম ও হেকটিক বোধ—প্রায়ই প্রকাশ পায় না।

শিশুদের যখন যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হয়, তখন তাহার বায়ু নলির প্রদাহ ( ব্রঙ্কাইটিস ) রূপেই দেখা দেয়। ৩৪ বার উপশ্বাসপরি—ব্রঙ্কাইটিস্ হইয়া তবে যক্ষ্মারূপে প্রকাশ পায়। ফুস্ফুসের প্রদাহ কখনও এত বেশী হয় যে—শিশু তাহাতেই মরিয়া যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জার পূর্বে যেরূপ কাসি হইয়া থাকে, শিশুদের যক্ষ্মার সূত্রপাতে সেইরূপ ধরণের কাসি হইয়া থাকে।

এই সকল কারণে শিশুদের যক্ষ্মারোগ ধরা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। ইহার লক্ষণগুলি বিশিষ্টরূপে চিহ্নিতও নহে। তবে ইহা নিশ্চয়—বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহে যক্ষ্মারোগের যে সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয়—শিশু-শরীরেও তাহা দেখা দিতে পারে।

Course respiration, Prolonged Exairation, interrupted breathing, এইগুলির উপর নির্ভর করিয়া শিশুদের ক্ষয় রোগ নির্ধারণ করা চলে না।

অনেক সময় শিশুদের কণ্ঠস্বরের বিকৃত বুঝা যায় না।

উভয় Scapula মধ্যস্থলে যদি dullness লক্ষিত হয়, তবে তাহা যক্ষ্মার জ্ঞাত হইতে পারে, পরন্তু বক্রিতায়তন Bronchial গ্রন্থির জ্ঞাতও হইতে পারে। তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই টুকু—শেষোক্ত অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দ ও বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধাংশে resonance পাওয়া যায়।

শিশুর যক্ষ্মারোগের লক্ষণ এইগুলি—

(ক) ঘন ঘন ফুস্ফুসের পীড়া বা ব্রঙ্কাইটিস হওয়া।

(খ) দৈহিক গুরুত্বের হ্রাস।

(গ) বহুকাল ধরিয়া উদরাময়ে ভোগা।

(ঘ) ২৪ ঘণ্টা ঘুমঘুমে জর।

(ঙ) প্রায়ই বমি করা।

(চ) অগ্নিমান্দ্য।

(ছ) অরুচি।

(জ) শৈথ্য সেবনে আসক্তি। ( ইহা গাত্র দাহেয় জ্ঞাত হইয়া থাকে। )

(ঝ) ল্যারিক্সে ক্ষতোৎপত্তি।

(ঞ) কুশতা।

(ট) কখনও শুষ্ক কাসি, কখনও আর্দ্র কাসি।

(ঠ) বক্ষ বিকৃতি ( বুক বসিয়া যাওয়া বা বাঁকিয়া যাওয়া ) শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বুকের কোন স্থান ওঠে, কোন স্থান উঠে না।

(ড) স্পর্শ কম্পন। শিশু যখন কথা কহিবে, তখন বুকে হাত দিয়া দেখিলে মনে হইবে—ভিতরে খুব কাঁপিতেছে।

(ঢ) বক্ষ বাদনে—শব্দের তৈমিত্য।

(ণ) ট্রেখিসকোপ দিয়া ঋতি পরীক্ষার—নানারূপ স্নাগজ্বক শব্দ, রোগ-স্বত্ব হইলে কখনও কটকট শব্দ, কখনও তুড়তুড় শব্দ, কখনও ভড় ভর শব্দ—নানারূপ শব্দ।

- (ত) উগ্র প্রকৃতি ।  
 (থ) চক্ষুদ্বয়ের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ।  
 (দ) মাঝে মাঝে গ্রন্থি ক্ষীতি ।  
 (ধ) জিহ্বার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণের ছোব

ধবা ।

- (ন) নৃত্তিকা ভক্ষণে আগ্রহ ।  
 (প) মূত্রদ্বার মাঝে মাঝে উত্তেজিত হওয়া ।

(ফ) সর্বদা বিমর্ষ ভাব ।

(ব) কেশ পাত ।

(ড) পেট ফাঁপা । ইত্যাদি ।

কি কারণে শিশু যক্ষ্মাক্রান্ত

হইতে পারে ?—

কাণ অনেক গুলি । তন্মধ্যে প্রধান কারণ গুলির উল্লেখ করিতেছি ।

- ১। পিতৃবির্ষ্য ও মাতৃ রক্তের দোষ ।  
 ২। হৃষ্ট দুগ্ধ পান । ৩। অতিরিক্ত মিষ্টান্ন ভোজন । ৪। জনাকীর্ণ সহরে বাস । ৫। বিগুণ বায়ু ও সূর্যালোকের অভাব । ৬। জ্ঞাতনে স্থানে বাস । ৭। সর্বদা কোণে থাকা । ৮। সর্বদা জামাজোড়া গায়ে থাকা । ৯। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব । ১০। স্নেহ বহুল দ্রব্যের অতি ভোজন । ১১। ভয় দেখানো । ১২। কাঁদানো । ১৩। শরীরে প্রায়ই ক্ষতোৎপত্তি । ১৪। যক্ষ্মা-গ্রস্তা জননীর

স্তন্য পান । ১৫। উচ্চ স্থান হইতে পতন ।

যে পর্য্যন্ত শিশুর দন্তোদগামন না হয়—সে পর্য্যন্ত তাহাকে কেবল স্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত ।

আমি যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত শিশুটীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম, তাহাকে কেবল “চ্যবনপ্রাশ” খাইতে দিয়াছিলাম । বাস্তবিক চ্যবনপ্রাশ ক্ষয় নিবারণে অধিতীয় মহৌষধ । তবে তাহা চ্যবনপ্রাশ হওয়া চাই । মুদ্রী পসারীয় দোকানের দুই তিন টাকা সেরের গাখ না হয় ।

যখন দেখিবেন—শিশুর প্রায়ই সর্দী কাসি লাগিয়া আছে; মাঝে মাঝে গলায় বীচি হইতেছে, টনসিল্ বৃদ্ধির জন্ত—শুক কাসি দেখা দিয়াছে, মধ্যে মধ্যে উদরাময় হইতেছে, অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা আরম্ভ হইয়াছে, শিশু যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে,—আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাকে ছাগ দুগ্ধের সহিত চ্যবনপ্রাশ খাওয়াইবেন । প্রথমে দুই বেলা ২টী বড় মটরের মত মাত্রায় দিবেন । সপ্তাহান্তে মাত্রা বৃদ্ধি করিবেন । তৃতীয় সপ্তাহেই দেখিতে পাইবেন—শিশুর অত্যন্ত ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে, চতুর্থ সপ্তাহে—তাহার দেহের ওজন বাড়িয়াছে। যে শিশুর প্রকাত্রে কোন রোগ বুঝা যাইতেছে না, অথচ দিন দিন রোগা হইতেছে, চ্যবন-প্রাশ তাহার একমাত্র মহৌষধ ।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন । \*

\* লেখক ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরত্ন ভূধর চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের মধ্যমাজ্জ । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের কার্যবিৎ । আমরা সাদরে প্রবন্ধটি পত্রস্থ করিলাম । আং সং ।

## উপরোধ রক্ষা।

—:~:—

আমি গলিতদন্ত, 'লোলিতচর্ম', স্থলিত পদ, পলিতকেশ—বৃদ্ধ; এখন কক্ষক্ষেত্রে অবসর গ্রহণ করিয়া “শেষ-থেয়ার” প্রতীক্ষায় নদীর কূলে বসিয়া আছি।

আমার অবস্থা—

“পর পারে উত্তরিতে, পা’ দিয়েছি তরণীতে” কিস্ত একি! “পিছু হ’তে আবার আহ্বান!” স্রীমান্ ব্রজবল্লভ ভাষা এখনও আমায় ছাড়িতে চাহেন না! যখন দেখা হয়, তখন বলেন—“দাদা! কিছু লিখুন না।” এ অনুরোধ অবহেলা করিবার সাধ্য তো এ বুড়ার নাই। এ আদেশ যে বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভাষ্যায় আদেশের মত অলজ্জা! তবে আমি করি কি? আমাকে যে লিখিতেই হইবে। আমার লেখার প্রধান অন্তরায়—আমি আজীবন কেবল গল্প-গাথা আর কাব্য লিখিয়াই মরিয়াছি; “আয়ুর্বেদ” কবিরাজী কাগজ—ইহাতে “দর্শন” “বিজ্ঞানে”র আলোচনা হয়; ইহাতে কেবল—“হ-ব-ব-বল ঝ-ঢ-ধ-ধ—ঙ—ভুরিভুরি শাস্ত্র বচনঃ!!” এখানে ত আমার দস্তফুট চলিবে না। দস্তই বা আমার কোথায়?

কিস্ত একটা কথা আছে—আমার ভাই ডাক্তার, তবু আমি “নার্ডিকা”র বদলে “মকর-ম্বজ” খাই; আমার মুখে কাটলেটের চেয়ে শুকানি ভাল লাগে। আমি অনেক কবিরাজের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া—জাহাদের চিকিৎসা-নৈপুণ্য ছ’ একস্থলে প্রত্যক্ষও করি-

য়াছি। আমি করিবাজী কাগজে লিখিবনা কেন? অতএব জ্ঞানদাসের ভাষায়—আমাকে বলিতে হইতেছে—

লিখিব লিখিব সখি! নিশ্চয়ই লিখিব।

পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা। আমার ২২-কালের প্রতিবাসী এক ব্রাহ্মণ যুবাব একদিন খুব অর হইয়াছিল। প্রথমে অরটাকে আমরা গ্রাহ্যই করি নাই। কিস্ত ৫ দিন পর্য্যন্ত যখন অর ছাড়িল না, তখন একজন ডাক্তারকে ডাকা হইল, ডাক্তারটা নোটভ ডাক্তার হইলেও বেশ বিজ্ঞ। তিনি রোগীকে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—“নিমোনিয়া হইয়াছে।” শুনিয়াত আমাদের চক্ষুস্থির! ডাক্তার প্রথমে একটু সাহস দিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—সদীর লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ৪ ঘণ্টা অন্তর ১০ গ্রেণ মাত্রায় Pobase Iodide” ১ আউন্স জলের সহিত সেব্য। সঙ্গে সঙ্গে Spongio pillne দ্বারা বক্ষঃস্থল বন্ধন। ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত রোগ সমভাবেই রহিল। ডাক্তার বলিলেন—“এ ‘লোবার নিমোনিয়া’, ইচ্ছা করিলে আর কাহাকেও ডাকিতে পারেন!” সেইদিন অপরাহ্নে স্থানীয় বড় ডাক্তারকে ডাকা হইল। পটাশ আইডাইডে স্নেহাতরল হয় নাই শুনিয়া তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন। শেষে প্রেসক্রিপসন্ লিখিলেন—†

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড—১৫ গ্রেঃ  
স্পিরিট ক্লোরফর্ম—১৫ মিঃ

\* আমার চিরকালের স্বভাব—নোটবুকে প্রেসক্রিপসনের নকল লিখিয়া রাখা—লেখক।

টিকার ডিজিটেলিস—৫ „

স্নাণ্ডা—২ ড্রাঃ

স্নাণ্ডা—১ ওন্স

২৫ দণ্ডা অন্তর খাওয়াইতে। ইহার সঙ্গে  
ফ্রান্স জ্যাকেট। পথ্য—দুধস্নাণ্ডা ও  
স্নাণ্ডা।

রোগে কিন্তু বাড়িতেই চলিল ডাক্তাররা  
আদিদা ঘন ঘন ঔষধ পরিবর্তন করিতে  
লাগিলেন। কোনদিন লাইকার ট্রিক্লিনিয়া,  
০'অপটি ইথারিস্, কোনদিন এল কানাইল্  
মিক্শার, কোন দিন বা অ্যাসিড মিক্শার,  
কোনদিন বা একার ভেসেনস্ মিক্শার,—  
এইরূপ নিতা নূতন পরিবর্তন চলিতে  
লাগিল।

২৩ দিনের দিন—ডাক্তারব্ব বলিলেন—  
‘জীবনের আব আশা নাই। এখন আপনারা  
হস্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন।’

দুবুন এইবার গৃহস্থের কি বিপদ।  
রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা—ভয়ানক দুর্বল—  
এইরূপ চরমময়ে ডাক্তার জবাব দিলেন!!  
গ্রামস্থের আব একজন প্রবীণ ডাক্তার ছিলেন,  
তিনি ২ টাকার কম রোগীর গৃহে পায়ের  
দগা দিতেন না। দায়ে পড়িয়া তাঁহাকেই  
ডাকা হইল। তিনিও বড় আশ্বাস দিলেন  
না। কেবল বলিলেন—এ নিমোনিয়ার সঙ্গে  
মার্গেবিদ্যার সংযোগ আছে। প্রেক্ষপসন লেখা  
হইল—

Re.

কুইনটিন সাল্ফ—২ গ্রেণ,

সাইট্রিক এসিড—১০ গ্রেণ,

সিরপ সিমপ্রেকস—১ ড্রাঃ

জল—১ ওন্স।

১ ঘণ্টার পরে।

কার্টিক—২

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অধি-  
কন্ত রোগীর দেহে আর একটা উপসর্গ দেখা  
দিল—পেটকাঁপা। ক্রমে রোগীর জ্ঞান  
পর্যাস্ত লুপ্ত হইয়া আসিল।

তা'রপর সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে—  
মরণকালে বৈথকে স্মরণ! পার্শ্বের গ্রামে  
এক বৈথ ছিলেন, লোকটা বেশ সদাচারী,  
মিতভাষী এবং বিজ্ঞ। তাঁহাকেই ডাকা  
হইল। কবিরাজ আসিলেন, অনেকক্ষণ  
ধরিয়া নাড়ী টিপিলেন, পেটটা একবার  
বাজাইলেন। তা'রপর—আনাকে ডাকিয়া  
বলিলেন—“যেহা সাম্প্রতিক বিকার।  
বাচিবার আশা কম। বসেন তো ঔষধ দি।  
কিন্তু আরোগ্যের জন্ত দায়ী হইতে পারিব  
না।

আমাদের আগ্রহাতিশয্যে কবিরাজ মহাশয়  
ঔষধ দিলেন—প্রাতঃকালে “কস্তুরী ভৈরব”।  
বৈকালে—পিপুলচূর্ণ সহ দশমূল পাচন।  
রাত্রে—“মকরধ্বজ।” আমরা পথ্যের কথাটা  
জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—“এত-  
দিন কি পথ্য দিতেছিলেন?” উত্তর দিলাম—  
“দুধ ও স্থপ।” কবিরাজ মুখ বাকাইয়া  
বলিলেন—“সর্বনাশ! স্থপ দিতেছেন?  
যাহারা সর্বদা মাংস ব্যবহার করে,—স্থপ  
তাহাদের পক্ষে স্থপথ্য হইতে পারে। এ  
শাক-ভাত-খেগো বাঙ্গালী—এর পেটে কি  
স্থপ সহ হয়? স্থপ খাইয়াই হয়ত পেটকাঁপা  
দেখা দিয়াছে। কবিরাজ দুধ পর্যাস্ত বারণ  
করিয়া দিলেন। পথ্যের ব্যবস্থা হইল—মহুর  
ডালের তরল ঘৃষ। তা'ও—দিনে রোতে ৩  
বার মাত্র।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই—যে রোগীর শরীরের  
বল্যধানের জন্য আমরা হিন্দু হইয়াও—প্রত্যহ

ছুইটা করিয়া কুকুট শাবক সংহার করিতাম, ত্রিসন্ধাকারী ব্রাহ্মণ সন্তানকে—মুগীর ঘৃষ খাওয়াইতাম,—এতদিন তাহার পাশ্বপরি-বর্তনেরও শক্তি ছিল না,—কুকুটবংশ ধ্বংস করিয়াও তাহার শরীরে যে বলটুকু হয় নাই, কবিরাজের এই নিরামিষ মশুর-কাথে সেই রোগীর দেহে দিন দিন বল বাড়িতে লাগিল। রোগীর পেটকাঁপা কমিল, মলমূত্রের যথারীতি প্রবর্তন হইতে লাগিল। অতি সহজে অন্ন কাসিবা মাত্র—পাটল বর্ণের প্রচুর শ্লেষ্মা উঠিতে লাগিল। কবিরাজের হাতে ১১ দিন থাকিবার পর—রোগীর অন্ন ছাড়িয়া গেল, গা' ঠাণ্ডা হইল। আমরা ত ভয়েই অস্থির,—কোলাপ্স নহে ত ? কবিরাজকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া রোগীর হাত দেখিয়া বলিলেন—“আর ভর নাই, বিকার কাটিয়া গিয়াছে।”

১৭ দিনের দিন রোগী - বালিস ঠেসান দিয়া বসিতে পারিল। ক্ষুধার তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত—হায়! তথাপি সেই নিষ্ঠুর কবিরাজ—কোন নূতন পথের ব্যবস্থা করিলনা। ৪০ দিন কাটিলে রোগী একটু পল্লভার ঝোল পাইল। তা'রপর মুগসিদ্ধি, খৈ ও মশুরডাল, অবশেষে ওজন করিয়া একছটাক পরিমাণ পুরাতন চালের অন্ন। ২ মাস পরে রোগী যখন বেশ বেড়াইতে লাগিল, তখন—মাষকলাই সিদ্ধ তৈল মাখিয়া সর্কোবধি জলে স্নান। ইহার

পূর্বে—আমরা রোগীর গা মুছাইয়া দিবার জন্ত অনেকবারই অমুমতি চাহিয়াছিলাম, কবিরাজ তাহা অনুমোদন করেন নাই। স্নানের কথা বলিলেই বলিতেন—“যাবন্ন বলবান্ তবেৎ।”

এই রোগী—এখন আমার কাছেই কার্য্য করে। এ ঘটনাটা আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট। ইহার পূর্বে—কবিরাজের ছাগবিষ্টা সদৃশ বটিকার যে নিদারুণ নিমোনিয়ার নিবৃত্তি হইতে পারে—আমার সে ধারণাও ছিল না! এরূপ অনেক ঘটনা আমরা নিত্য দেখিতেছি, তবুও কবিরাজের প্রতি আমাদের ডাক্তারের মত শ্রদ্ধা নাই! আমরা কবিরাজ ডাকি কখন? যখন ডাক্তারের ফি: গুণিয়া, মিক-শচারের মূল্য যোগাইয়া গৃহস্থ নিতান্তই দশাহীন হইয়া পড়িয়াছে,—ভুগিয়া ভুগিয়া রোগী যখন জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, তখন আমরা কবিরাজের কাছে উপস্থিত হই, এবং প্রথমেই নিজের দারিদ্র্য জ্ঞাপন করি! আমার মনে হয়—যদি দিন কতকের জন্ত কবিরাজ মহাশয়েরা ধর্ম্মঘট করিতে পারেন, তাহা হইলে—এ দেশের অসংখ্য জীর্ণ রোগীকে পটলোপাটনের জন্ত খুড়ির অন্বেষণ করিতে হয়। রোগী ও বৈজ্ঞ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই—কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। আমারও উপরোধ রক্ষা হইয়াছে, এখন ‘ইতি’।

শ্রীতারক নাথ বিশ্বাস।

## তুলসী।

—:~:—

তুলসী হিন্দুর একটা প্রধান অর্চনার বৃক্ষ। নাই, হিন্দুর চক্ষে সে কখন হিন্দু নহে। ইংকর যে হিন্দুর গৃহ-প্রাঙ্গনে বহু রক্ষিত তুলসী বৃক্ষ গণ বিষ্ণু অপেক্ষা প্রিয়। তুলসীর স্মৃতি নবাব



করিয়া থাকেন। যিনি প্রতাহ তুলসী বৃক্ষে  
জল দান, তুলসী প্রদক্ষিণ, তুলসী তলে প্রণাম  
না করেন—তিনি কখন বৈষ্ণব নহেন। তুলসী  
কাহারও নিকট অনাদৃত নহেন। পঞ্চ উপাসক  
সমন্বয়ে তুলসীর আদর করিয়া থাকেন।

তুলসী বৃক্ষে বৈজ্ঞাতিক শক্তি বড়ই প্রবল-  
ভাবে নিহিত আছে। ইহার কাষ্ঠের মালা  
ধারণ করিলে মনুষ্য শরীরে বিদ্যুৎ বেগ স্থি-  
তাবে বঞ্চিত হয়, স্তত্রাং উহাতে অনেক ব্যাধি  
আরোগ্য হয়,—সহসা শরীরেও কোন ব্যাধি  
প্রবেশ করিতে পারে না। অন্ততঃ রোগ  
প্রতিরোধক জন্ত আমি সকলকেই তুলসী মালা  
ধারণ করিতে অনুরোধ করি। তুলসী—কাষ্ট-  
ধারী—সাপারণ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ও সংপথা-  
বদ্য হয়। যাহারা মালা ধারণে অনিচ্ছুক,  
তাঁহারা ইহাও কাষ্ট কোমরে অথবা বাহতে  
বন্ধন করিয়া রাখিতে পারেন।

তুলসীর রস - অর ও সর্দি নাশক। প্রবল  
শক্তিক্ত অরো—তুলসীর রস সহ মকরধ্বজ  
সেবন করাইয়া আমি অনেক রোগী আরোগ্য  
করিয়াছি। দুই বেলা খাইতে হয়। কৃষ্ণ তুলসী  
শিউলিপাতা ও উচ্ছেপাতার মিলিত রস ১  
তোলা গবন করিয়া মধু ও পিপুল চূর্ণ সহযোগে  
সেবন করিলে কক অর শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

তুলসীর রস শরীরের দূষিত রক্ত শোধন  
করে। ইহা বাতরক্ত ও গলিত কুষ্ঠ নাশক।  
কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তের সুস্থ থাকিতে হইলে তুলসী  
তাহার একমাত্র অবলম্বন। প্রতাহ তুলসীর  
রস দুই বেলা সেবন ও গাত্র মর্দন করিলে  
এক জিতেন্দ্রিয় হইয়া গোমূত্র পান করিলে  
অনেক স্থলে কুষ্ঠ ব্যাধি যায় হইয়া থাকে।  
তুলসীর গন্ধও মন্দ নহে, ইহার গুণে কোন  
স্বপ্ন নাজন্ম শরীরে প্রবেশ করিতে পারে

না। সপত্র তুলসী শাখা হস্তে ধারণ করিয়া  
থাকিলে তাহার গাত্রে কদাপি মশক দংশন  
করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে—মশকগণ  
তুলসী বৃক্ষের ত্রিসীমায় বাইতে পারে না।  
মশক ম্যালেরিয়াবাহী বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস,  
তাঁহারা প্রতাহ তুলসী ভক্ষণ ও তুলসীর রস  
অঙ্গে মর্দন করুন, মশক নিকটে বাইবে না।

যাহাদের শরীরে নানাবিধ চর্মরোগ আছে,  
তাঁহারা তুলসী রস ভক্ষণ ও গাত্র মর্দন  
করুন। বজ্রাঘাতে হতজ্ঞান রোগীকে সত্ত্বর  
তুলসীর রস ভক্ষণ করাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার  
মেহে বৈজ্ঞাতিক ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার  
জ্ঞান সঞ্চার করে।

যিনি দুই বেলা তুলসী পত্র ভক্ষণ করেন,  
তাঁহার শরীর মেঘমুক্ত চন্দ্রের স্থায় উজ্জল  
হইতে থাকে। ইহা একটি কম রসায়ন নহে।

বীৰ্য্যাস্তম্বে তুলসীর শক্তি অসীম। কিয়ৎ  
পরিমাণ তুলসীর মূল পানের সহিত ভক্ষণ  
করিলে বীৰ্য্যাস্তম্ভ হয়। আয়ুর্বেদ কি বলিতে  
ছেন শুনুন,—

শ্রবণ তুলসী মূলং তাম্বুলৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ  
ন মুঞ্চন্তি নরোবীৰ্য্য মে কৈকেন ন সংশয়।

যাহাদের স্বপ্নদোষে মধ্যে মধ্যে শুক্র ক্ষয়  
হয়, তাহারা সপ্তাহে ২ দিন অন্ন মাত্রায় তুলসী  
মূল সেবন করিবেন, দেহস্থ বিদ্যুৎ সংরক্ষিত  
হইয়া আর অযথা শুক্র ক্ষয় হইবে না। মনুষ্য  
দেহে বিদ্যুৎ অবচলিত রাখিতে তুলসীর মত  
আর বৃকি কাহারও শক্তি নাই।

তুলসীর মূল বাহতে বন্ধন করিয়া রাখিলে  
তাহার বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না। অনেক  
চতুর গৃহস্থ নতুন গৃহ নির্মাণকালে মটকার  
কাঠে হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্রে তুলসীর মূল বাধিয়া  
দেন, সে গৃহে কখন বজ্রাঘাতের ভয় থাকে

না। ইহা বহু-রোধক দণ্ড অপেক্ষা গুণশালী।  
শাস্ত্রকার বলেন,—যাহার গৃহে সতেজ তুলসী  
বৃক্ষ থাকে তথায় কি বহুপাত হয়?

রক্তপিত্ত রোগীকে তুলসী ও কামিনী  
পাতার রস খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত-বমন  
বন্ধ হয়। তুলসী তলের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত  
তুলসীর গুণ প্রাপ্ত হয়, তুলসীতলের কেবল

মৃত্তিকা থাইয়া অনেকে যে রোগ মুক্ত হন—

ইহাই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ।

শ্বাস, শ্বশ্মা প্রভৃতি রোগেও তুলসীর রস  
পান করিলে উপকার হয়। ধ্বজভঙ্গ রোগী  
ঘূতের সহিত প্রত্যহ দুইধান তুলসী মূল ভক্ষণ  
করিলে শরীরে আবার বৈজাতিক ক্রিয়া চলিত  
থাকিবে, রোগও আরোগ্য হইবে।

শ্রীবক্ষু বিহারী মেন গুপ্ত কবিরাজ।

## চা পানের অপকারিতা।

—:—

বর্তমান কালে আমাদের দেশে চাএর  
প্রচলন বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকে  
অনায়াসে ২টা পরসী ব্যয় করিয়া চা থাইয়া  
থাকে। কলিকাতার প্রতি রাজপথে অসংখ্য  
চাএর দোকান বসিয়াছে এবং প্রতি দোকানেই  
বহু খরিদারের সমাগম হইয়া থাকে। আমার  
কোন বন্ধু একদিন হারিসন রোড, কলেজ  
স্ট্রীট, বহুবাজার স্ট্রীট ও মার্কেটার রোড, এই  
চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানের চাএর দোকান গণনা  
করিয়াছিলেন, গণনায় দোকান ১১০ থানি  
হইয়াছিল। ইহাতেও অনেক দোকান বাদ  
পড়িয়াছিল। এই সকল দোকানেই ঘরভাড়া,  
সরঞ্জামী খরচ প্রভৃতি ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া বেশ  
লাভ হইয়া থাকে, নতুবা দোকান উঠিয়া  
যাইত। এই সমস্ত টাকাই আমাদের দেশের  
মধ্যবিত্ত লোক এবং সামান্ত ব্যবসায়ী—মুটে,  
মজুর, ফেরিওয়াল প্রভৃতি দিয়া থাকে। যাহাদের  
চা বাগান আছে, তাহারা এবং চাএর বড় বড়  
ব্যবসায়ীগণ প্রথমতঃ বিনা পরসায় চাএর

প্যাকেট বিতরণ করিতেন, তারপর ক্রমে যখন  
লোকের নেশা ধরিল, তখন বিতবিত চাএর  
মূল্য হ্রদসহ আদায় করিয়া লইলেন। শুধু  
কলিকাতায় নহে, আমাদের দেশের সকল  
প্রধান সহরেই এইরূপে চাএর বহুল প্রচলন  
হইয়াছে। আমি যখন বোম্বাই নগরে  
গিয়াছিলাম, তখন সেখানে অসংখ্য ইবাণী  
দোকান দেখিয়াছিলাম। ঐ সব দোকানে চা  
বিক্রয় হইত। সে সময়ে কলিকাতায় চাএর  
দোকান বসে নাই। বর্তমানে বোম্বাই সহরে চা-  
বিক্রয় আরও বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ  
নাই। কেহ কেহ বলেন যে, চাএর একটু  
উপকারিতা আছে। তাহাতে শরীর স্বরব্বের  
সাথে এবং উৎসাহ ভাগাইয়া তোলে। বাস্তবিক  
পক্ষে যদিবা ঐ গুণ চাএর থাকে, তাহা সাময়িক  
মাত্র এবং যেমন প্রত্যেক সাময়িক এবং ক্ষত্রিয়  
উপায়ে উৎপাদিত উত্তেজনায় অবসানে শিথিল  
অবসাদ আসে, চাএর প্রভাবটুকু জরায়  
হইলেও শরীরে সেইরূপ অবসাদ আসি

পক্ষে। এ কারণ একবার চা ধরিলে তাহা ভাঙে করা বড়ই কষ্টসাধ্য। সমস্ত নেশার ত্রিনিষেব সপক্ষেই এই কথা প্রযোজ্য।

ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, চায়ে Dyspepsia আনয়ন করে। কিছুদিন নিয়মিত চা সেবন করিলে পাকবস্তুর পূর্বের তেজ থাকে না, ট্রুজ দ্রব (Gastric juice) পাতলা হয় এবং তাহার কার্যকারী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এ কারণ ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ বাবামেব সৃষ্টি হইয়া থাকে। চাএর এই কুফল একদিনে অথবা ইষ্টাৎ উপস্থিত হয় না, এ কারণ লোকে মনে করে, ঐ সব বাপন অজ্ঞাত কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রকৃত ওভাবে চা পান যে ঐ সব রোগের এক প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চা সেবনে নিদ্রার বাধাত হইয়া থাকে যে ক্রমে ক্রমে নিদ্রার পরিমাণ কমিয়া যায় ও তাহাতে পিণ্যানে নানাবিধ দুঃসাধ্য ব্যাধি হইয়া থাকে। যদিবা শীতপ্রধান দেশে চাএর যেমন উপযোগিতা থাকে, আমাদের দেশের মত গরমপ্রধান স্থানে চা—বিষের মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। ঘর লোকে চা পান করিয়া তাহার অনিষ্টকর কণ্ঠভোগ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে চাএতে তাহাদের অপ্রবৃত্তি হয় নাই। এইটাই চাপানের সম্ভাব্য গুরুতর কুফল। পয়ের অন্তরালে উন্নত হইয়া আমরা বাহা করি, তাহার পরিণাম ফল বিবেচনা করি না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে?

চা পানের আর একটি অনিষ্টকর ফল আর্থিক ক্ষতি। যে পরিবারের ৪ জন লোক

চা পানে অভ্যস্ত, তাহাদের ছ'বেলা চা পানে অন্ততঃ ১০ আনা ব্যয় হইয়া থাকে অর্থাৎ মাসে প্রায় ৮ টাকা ব্যয় হয়। একটি দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাসিক ৮ টাকা ব্যয় করা সহজ কথা নহে। ফলে তাহাদের অজ্ঞাত আবশ্যকীয় ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয়। এই ভাবে আমাদের দরিদ্র দেশের কত টাকা যে চাএর জন্য ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে।

চা পানের এতগুলি কুফল। আমাদের দেশে জন সাধারণের অবগতির জন্য গৃহে গৃহে চা পানের কুফল সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচারিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এবং আমাদের দেশের লোকের বিশেষ বিবেচনাপূর্বক হিতপথ গ্রহণ করিয়া চা পান একেবারে ত্যাগ করা উচিত।

চা পানের আরও একটি কুফল এই যে, বাড়ীর পুত্র-কন্যাগণ সকলেই চা পানে উৎসাহিত হইয়া থাকে। কোন কোন পিতা মাতা নিজ হাতে স্বীয় পুত্র কন্যাগণকে চা পান করিতে শিখাইয়া থাকেন। পরিণামে এজন্য তাহাদের সকলেই নানাবিধ কষ্টভোগ করিতে হয়।

এই সব কারণে এই অশীতিপর বৃদ্ধের অনুরোধ—দেশস্থ সকলেই এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন এবং বালক বালিকাগণের ভবিষ্যৎ জীবনপথে কণ্টক রোপণ করিবেন না।

চা পান ত্যাগ করা অভ্যস্ত প্রয়োজন মনে করিয়া সকলেই চাএর বিরোধী হন, এই আশার নিবেদন।

শ্রীশিশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা।

—:~:—

( আয়ুর্বেদ সভার ৮ম বার্ষিক ৩য় সাধারণ অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ বাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠিত )

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার কোন সময়ে উৎপত্তি হইল,—কেমন করিয়া—কি জন্ত সে চিকিৎসা দেশের মধ্যে প্রবর্তিত হইল,—সে প্রবর্তনায় দেশবাসীর কিরূপ উপকার হইল,—সে সব কথা আমি কিছুই বলিব না। শাস্ত্রকুশল সত্বেও পরিবৃত্ত আজিকার এই সভায় সে সব কথা বলার আবশ্যকতাও আমি কিছু মনে করি না,—কেননা, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেই সে সব কথা অবগত আছেন, সুতরাং সে সব কথা উত্থাপনে আয়ুর্বেদের ইতিবৃত্তেরই পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং সে পুনরাবৃত্তি স্বধী সমাজে বিরক্তিরই কারণ হইয়া থাকে।

আমার আজ বলিবার বিষয়—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা এখন যে ভাবে দেশের মধ্যে চলিতেছে—ইহাই ঠিক?—না বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া লইয়া, অথচ ঋষিপ্রদর্শিত পন্থা হইতে বিচ্যুত না হইয়া, একটু মার্জিত ভাবে ইহার কতকটা পরিবর্তন করা উচিত? সে নিমাংসা করিতে হইলে এ চিকিৎসা আগে কি ভাবে প্রচলিত ছিল, সেই কথার একটু আলোচনা করিতে হয় ॥

যে সময় ইংরাজী সভ্যতা আমাদের দেশে প্রবাহিত হয় নাই,—ইংরাজী ছাঁচে—ইংরাজী অমুকরণে—ইংরাজী আবহাওয়ার—ইংরাজী চংগে—ইংরাজী রংয়ে,—এক কথায় ইংরাজের

চালচলন—অশনবসন,—কথাবার্তা—ভাবভঙ্গিমা—ধরণ ধারণ—করণ কারণ—ইংরাজের তাবৎ বিষয়েই হিন্দুসন্তান—তথা বাঙ্গালী সন্তান আদৌ অভ্যস্ত হয় নাই,—শিক্ষার জন্তই বল—আর অর্থোপার্জনের জন্তই বল—যৎকালে শ্রামলশস্ত্রসম্ভারপরিমণ্ডিত,—চ্যুতগণ্য—জম্বু-কপিথ-বিব-বদরী-বিটপি স্নমজ্জিত,—শ্বেত—স্বচ্ছ—পুষ্করিণী—দীর্ঘিকা-সম্পদ সম্ভারে স্নমণ্ডিত—মুক্ত বায়ু প্রবাহিত—জননী—জন্মভূমি—পল্লীভূমি হইতে পরিবার গোষণের চিন্তায় আকুল হইয়া বাঙ্গালী সন্তানকে সহরের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হয় নাই, সে সময় সর্বাপেক্ষ সংস্কৃত রোগ সকলের—ঋণ্যভ্র, অতিসার, উন্মাদ অপস্মার প্রভৃতির প্রশমনোপায়ের জন্তই হউক,—আর দেহ নিবন্ধ শল্য উদ্ধারের জন্তই হউক, কিম্বা চক্ষু, কণ, মুখ ও নাসিকাদি সংশ্লিষ্ট ব্যাধি সকলের প্রতীকারের আবশ্যকই হউক—এই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এক কথায় শল্য, শালাক্য, কায় চিকিৎসা, ভূতবিজ্ঞা, কোমার ভূত্যা, অগদভজ্ঞ, রসায়ন ভজ্ঞ ও বাজীকরণ ভজ্ঞ—এই অষ্টাঙ্গের চিকিৎসাই সে সময় দেশের মধ্যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। দ্বিতীয় দশকটির সূচন জীবনবয়স বাতট,—দ্বাপরে পাণ্ডবদিগের চিকিৎসক পণ্ডিত বনন নিযুক্ত ছিলেন, তখন ভারতবর্ষে

মহাসমরে উপস্থিত থাকিয়া যে আহতদিগের দৈহিক হইতে শল্যোদ্ধার করিতে হইয়াছিল,— ইহা তো সকলেই অবগত আছেন। শুধু কুরুক্ষেত্রের কথা কেন,—পুরাকালে ভারতীয় নরপতিদিগের মধ্যে সম্মুখসমরে বাণযুদ্ধের প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়—দেশীয় চিকিৎসকগণ সেই সকল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন এবং আহত যোদ্ধাবৃন্দের শরীর হইতে বাণফলকাদি শল্যোদ্ধারণ, রক্তস্রাব নিবারণ, আবশ্যিক মত অস্ত্র অঙ্গ বিশেষের ছেদন, ক্ষতাদির প্রচিকিৎসা—সকল কন্মই নির্বাহ করিতেন।

এখনকার দিনে প্রচার—শরীরে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রথম আবিষ্কার ১৬২৮ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম হার্ভি নামধেয় এক সাহেব করিয়াছিলেন, কিন্তু ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্বে যখন হার্ভির অস্তিত্ব পৃথিবাসীরা একে-বাবেই অগণিত ছিলনা,—অশ্রুতের আবির্ভাব কাল সেই সময়। ভারতের সেই ফল হৃদাশী অর্ধাঙ্গবিহী রক্তের গতির প্রথম আবিষ্কারী। এ কথার প্রমাণের জন্য খোঁজ সমষ্টি উদ্ধৃত করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না।

গত বর্ষের “আয়ুর্বেদ” পত্রিকার ৮ম ও ৯ম সংখ্যায় প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধ লেখক বঙ্গবন্ধু কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্য-ভীরু ‘সার্জন সূত্র’ নামে একটি উপায়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। অল্পসঙ্কীর্ণ চিকিৎসকগণ সেই প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করিলে, এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

ফল কথা, এখন আমাদের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগের অবস্থা বেক্ষণ পাড়াইয়াছে, তাহাতে একমাত্র কায়চিকিৎসা ভিন্ন অন্য

চিকিৎসায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগের সেরূপ ব্যুৎপত্তি নাই। আগে এরূপ ছিল না। সেকালে কায়চিকিৎসা শিক্ষার মত শল্য শালক্য প্রভৃতি চিকিৎসাও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে যথারীতি শিক্ষা করিতে হইত। শল্যতন্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে, শব ব্যবচ্ছেদ না করিলে কোনপ্রকারেই চিকিৎসা কার্য শিক্ষা হয় না এবং যিনি শবব্যবচ্ছেদ না করিয়া চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি যমদূত সঙ্গী। কিন্তু কাল বিপর্যয়ে এ সকল পদ্ধতি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক সমাজ হইতে লোপ পাইল,—যখন অধিকারে রাষ্ট্র বিপ্লবে সকল বিষয়ের মত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে অল্প চিকিৎসায় হঠাৎ বিপদ সম্ভাবনা হেতু দণ্ড ভয়ে ও রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে উৎসাহ প্রাপ্তির অভাবে অল্প চিকিৎসা আমাদের মধ্য হইতে একেবারে লোপ পাইল, ফলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ একমাত্র অর, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির চিকিৎসা ভিন্ন যে আর কিছুই জানেন না—ইহাই হইল দেশের লোকের ধারণা এবং সেই ধারণার ফলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণও লুপ্ত রক্তের পুনরুদ্ধারের জন্য—অতীত গৌরবকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য—অসম্পূর্ণ চিকিৎসাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য—আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, আস্থা—সকলই ত্যাগ করিলেন।

ফলে যতগুলি কারণে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটয়াছে—আমার মনে হয়—আমাদের অল্প চিকিৎসার অনভিজ্ঞতা তাহার প্রধান কারণ। হোমিওপ্যাথিতে অল্প চিকিৎসার প্রচলন নাই—সেই জন্য এখনকার দিনে হোমিওপ্যাথির উপর দেশের

লোকের আগ্রহ যতটাই বর্ধিত হউক, ইহা কিন্তু অ্যালোপ্যাথিককে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই, সে উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা হোমিওপ্যাথির কখনও আসিবে বলিয়াও আমি মনে করি না।

আলোপ্যাথি যে বর্তমান কালে সকল চিকিৎসার শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহার প্রধান কারণ—অল্প চিকিৎসায় অ্যালোপ্যাথির অদ্ভুত ক্ষমতা। মৃতদেহে জীবন প্রদান ভিন্ন পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আর সকলই প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। শুধু অল্প চিকিৎসা কেন,—কায় চিকিৎসায়—জর মধ্যে কুইনাইনের আণ্ডকার্যকরী ক্ষমতা—সত্য কথা বলিতে গেলে—এখন আমরা যে সকল ঔষধ লইয়া নাড়াচাড়া করি, তাহা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আমাদের ‘নাটা’র জর বন্ধ হয়, ভাঁট পাতার রসে সে কার্য সাধিত হয়,—‘হরিতালে’ কুইনাইনের অনুরূপ কার্য করিয়া থাকে,—এসব তো কেবল আমাদের বচন মাত্র,—আমরা কি কেহ সে সকল লইয়া কোনো পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছি! ‘নাটা’র সত্য সত্য কুইনাইনের মত জর বন্ধ হয়—একথা আমি নিজে পরীক্ষা করিয়াছি,—কিন্তু কলিকাতার আসিয়া সে ‘নাটার’ ব্যবহার আমি মোটেই করিনা,—আর কেহ করেন কিনা—তাহাও আমি বলিতে পারি না। তবে এটা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—কুইনাইন বা নাটা প্রয়োগের মত রোগীও কবিরাজদিগের হস্তে এখানে কোনো উন্নত গৃহস্থ একেবারেই দিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়াই আমাদের নাটা ব্যবহারের বড় আবশ্যকও হয় না।

কিন্তু দেশের যে এই কটি পরিবর্তন—ইহার প্রধান কারণই আমরা চিকিৎসার সকল অঙ্গ শিক্ষা করিনা। প্রাক্তনরূপ ‘গঙ্গাধর’ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানগভীর গবেষণা—পাণ্ডিতেই স্মৃতি হইত—এখনকার বিজ্ঞান বিদ চিকিৎসক-দিগের মত Experimental, (চিকিৎসার স্বকীয় চিকিৎসার উন্নতির জন্ত তিনি বেশী প্রয়াস পরায়ণ ছিলেন কিনা, তাহা আমার ততটা জ্ঞান নাই, কিন্তু এটা আমি নিশ্চয় জানি যে, তাঁহার শিবানুগীত অনেক অ্যালোপ্যাথদিগকে মড়াকাটা-চিকিৎসক বলিয়া ঘৃণা করিতেন। সত্য কথা বলিতে গেলে; সেই ঘৃণাকুটিল বদ্ধ ধারণাই আমাদের অধঃপতনের কারণ।

আমরা এখন লম্বা চওড়া সাইনবোর্ড আঁটিয়া, ঘমক অল্পপ্রাসে বিজ্ঞাপনের বাহার করিয়া মটর জুড়ি হাঁকাইয়া চিকিৎসায়িত্তি অবলম্বন পূর্বক আমাদের জীবনের সাফল্য সাধন হইতেছে মনে করিয়া থাকি বটে, কিন্তু যখন একটি জীর্ণ জটিল রোগীর চিকিৎসার জন্ত কোন একটি বাড়ীতে উপস্থিত রহিয়াছি, ~~যদি~~ যদি সেই পরিবারের কাহারও কোড়া কাটিবার আবশ্যক হয়, কিম্বা পোয়াতি খালাস বা delivery করাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমাদের সমক্ষেই পাশ্চাত্য চিকিৎসককে আহ্বান করা হইবে—গৃহস্থানী তখন আমাদের ফেলিয়া তাঁহাকে লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িবেন,—ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা—কলঙ্কের কথা—স্থগার কথা—উপহাস হইবার কথা নহে। আমাদেরই রস আমাদের বুজির মোহে আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া ~~অবশ্যে~~ অবশ্যে ~~করিতে~~ করিতে

হইবে।—আমরা রত্ন তো হারাইয়াছি,—  
তা' ছাড়া সেই রত্ন কুড়াইরা লইয়া বাঁহারা  
দেশ বন্ধা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ঘৃণা  
করিতেছি—এটা কি আমাদের পক্ষে বড়  
সৌভাগ্যের কথা?—এই যুগের এই দুর্গতি  
দেখিবার মনে হয়—সুশ্রুতি, দিবোদাস বাতট!  
একদা বিশ্ববাসীর কল্যাণ-কামনায় তোমরা  
বেকসে সমগ্র ধরণী মাতাইয়া বিশ্ব আলোকিত  
করিয়া তুলিয়াছিলে, সেইরূপে আর একবার  
হাস্যে অবতীর্ণ হও,—তোমাদের প্রসাদ-  
লাভে ভাবতে সৌভাগ্য আবার কিরিয়া  
আমুক।

প্রাণ পুথিয়া সত্য কথা বলিতে গেলে  
একথা অবিস্মারিত সত্য যে, আমরা এখন  
হাস্যে বাব হইয়াছি। আমাদের সৌভাগ্য  
বহু হস্তগত করিয়া অধুনা বাঁহারা সৌভাগ্যের  
গম্য করিবার অবিকারী—আমরা তাঁহা-  
দিক্কেও ছাটিয়া ফেলিব—নিজেরাও পুনরুন্নত  
হইবার চেষ্টা করিবনা। আয়ুর্বেদীয়  
চিকিৎসক মণ্ডলীর অনেকে হয়ত আমার স্পষ্ট  
কথার রাগ করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের  
মণ্ডলী না করিলে অনেককেই স্বীকার  
করিতে হইবে যে, অধুনা আমরা চিকিৎসা  
বৃত্তি অবলম্বন করিলেও প্রকৃত চিকিৎসক  
হইবার উপযুক্ত নহি। তাহার প্রধান কারণ,  
—আমাদের মধ্যে অনেকে এখন এক একজন  
পুত্র ব্যবসাদার হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু  
চিকিৎসা কার্যটি যে ব্যবসায়ের অন্তর্গত হইতেই  
পারে না—তা'হা তো আধ্যাত্মবিমণ্ডলী পট্টই  
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা ঋষি-  
প্রদর্শিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহা-  
দের উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছি,—ইহা কি  
আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা?

ব্যবসায় বলিব না তো কি? এখন কলি-  
কাতার অলিতে গলিতে অসংখ্য ঔষধালয়।  
অনেকগুলি চিকিৎসালয় নহে—কেবলই  
ঔষধালয়—কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে ঔষধ  
বিক্রয় করিয়া লাভবান হওয়াই অনেক  
ঔষধালয়ের উদ্দেশ্য। সূত্রেরা সে সকল ঔষধা-  
লয়ে পাওয়া যায় না—এমন ঔষধ নাই, কিন্তু  
তাহার ভিতরের তথ্য উন্মোচন করিলে সে  
সকল ঔষধের অকুত্রিমতা সন্দেহে অনেক রহস্য  
আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। এখন আপনারাই বলুন,  
—যে চিকিৎসার এরূপ পছন্দ অবলম্বন করা  
হয়, সে চিকিৎসায় গৌরব নষ্ট হইবে না তো  
হইবে কাহার! সুশ্রুতের অস্ত্র এখন বৈষ্ণ  
ভুলিয়াছে,—নাপিত তাহা গ্রহণ করিয়াছে,—  
প্রশস্ত স্থান হইতে প্রশস্ত দিনে প্রশস্ত গাছ-  
গাছড়া সংগ্রহ আগে বৈষ্ণগণ বাঁহারা নিজের  
হাতে করিতেন তাহা এখন বেদের হাতে  
পড়িয়াছে,—মসলা কিনিবার সময়ফর্দ পাঠাইয়া  
বেণের নিকট বাহা পাওয়া গেল, তাহা আর  
চিনিবার ক্ষমতা নাই—তাহাই অকুত্রিম জানে  
বৈষ্ণ কিনিয়া আনিয়া ঔষধে ব্যবহার  
করিতেছে,—এ অবস্থায় ব্যবস্থা ঠিক হইলেও  
ঔষধে আর সেরূপ কার্য্য হইবে কেন? অথচ  
চুক্তাধ্বনি করিয়া জানাইব—আমাদের ঔষধ  
অকুত্রিম,—আমাদের ঔষধ যথাস্থান প্রস্তুত—  
আমাদের ঔষধ ডাকিলে কথা কহিয়া থাকে।  
এই সকল কারণেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আয়ুর্বে-  
দীয় চিকিৎসা যবনাধিকারে বাহা অধঃপতিত  
হইল, তাহা আর মাথা তুলিতে পারিল না।

ধাওয়াদি ভিন্ন তো অনেক চিকিৎসকই  
এখন করিতে রাজি নহেন, সে গুলি এখন  
জুগি এবং বস্ত্রিশাল জেলার কায়স্থের হাতে।  
তাহাদের প্রস্তুত এখনকার দিনের টাকার ছই

ভরি রসসিন্দূরও অনেক সময় ১৬, ২৪, ৩২, ৮০, মূল্যে আসল স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ রূপে কাহারও কাহারও আলমারির শোভা অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। যে ব্যবসায়ে এতটা অধর্ম—সে ব্যবসায়ের উন্নতি ভগবান সহিবেন কেন? ফলকথা, ইংরাজ রাজত্বে আমরা রাজসাহায্য পাইনা বলিয়া আয়ুর্বেদ মাথা তুলিতে পারিতে ছেনা—ইহা সর্ববাদী সম্মত হইলেও আমাদের কৃতকার্যের ফলেও যে ইহার উন্নতির বিষয় ঘটিতেছে—ইহাও নিতাজ সত্য কথা। ফলে আমাদের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের পক্ষে আর নিশ্চিত থাকা উচিত নয়। আমাদেরকে আবার সেই সত্যনিষ্ঠ—ধর্মপ্রাণ—কর্মকুশল আৰ্য্য ঋষির যুগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—আমরা নিজেরা যাচাই হইরাছি, তাহার আর উপায় নাই,—কিন্তু আমাদের সম্মানগণ অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদের সকল অঙ্গই যাহাতে পুঞ্জীভূতরূপে শিথিতে পারে,—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং শিক্ষালাভের পর তাহার যাহাতে বিলাসজুয়ারে গা ঢালিয়া আমাদের অনুকরণপ্রিয় না হয়, যাহাতে তাহার নিজেরা সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান পূর্বক ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে পারে—তাহার জন্য কঠোর শপথ প্রদানে তাহাদিগকে অঙ্গীকৃত করিতে হইবে। ডাক্তার দিগকে ঘৃণা করিলে চলিবে না, বিলুপ্ত শল্য ও শাল্যাক চিকিৎসা তন্ন তন্ন করিয়া ডাক্তার দিগের নিকটই শিক্ষা করিয়া আমাদের প্রধান অভাবগুলি পূর্ণ করিতে হইবে,—মহর্ষি চরকের কথার

“তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদা রোগায় কল্পতে ।

স চৈব ভৈষজ্যং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ ।”

এই কথা স্মরণ করিয়া ডাক্তারদিগের সহিত

আমাদের লম্বা স্থাপন করিতে হইবে,—গোড়ামি—ভণ্ডামি—ঘটাপূর্ণ বাকের ছটা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে,—তবেই আমাদের মৃতকল্প আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবিত সম্ভবপর হইবে,—নতুবা ক্রমশঃ আরও ইহার অধঃপতন ঘটয়া চিরদিনের জন্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা “যে তিমিরে—সেই তিমিরে”ই থাকিয়া যাইবে,—আমাদের জীবন কোনোরূপে কাটাইয়া যাইলেও আমাদের পুত্রকলত্রগণ এ চিকিৎসা অবলম্বনে যে আর উন্নত হইতে পারিবে না—সে কথা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য—অতি অপ্রিয় হইলেও খাটি সত্য কথা। সমবেত চিকিৎসকমণ্ডলী একত্রে মর্মে মর্মে অনুধাবন করুন—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।

আমার আর একটু বলা হইলেই অগ্রকার প্রবন্ধের শেষ করা হয়। সাফল্য-সাধনই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু চিকিৎসার উদ্দেশ্য কেন,—সকল কর্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি যে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের নিকট হইতে বিষয় প্রাপ্ত শত্রু চিকিৎসা শিক্ষার কথা বলিয়াছি,—চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে, তাহা ভিন্ন আমাদের আরো উপায় নাই। গোড়া বৈষ্ণবেরা যেমন শক্তিমুক্তি অবলোকনে প্রণাম করা দূরের কথা,—জগজ্জননী—মহামায়া আত্মশক্তির প্রসাদ প্রাপ্তিকালে তাঁহার যেমন চৈতন্যচরিতামৃতের কথায় “না করিবে অজ্ঞানবের প্রসাদ ভক্ষণ”—বুলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমাদের মধ্যে যাহারা গোড়া কবিরাজ—তাঁহার “মড়াকাটা চিকিৎসা”-দিগের নিকট আমাদের শত্রুচিকিৎসা শিক্ষা গ্রহণে কখনই সম্মতি প্রদান করিবেন



না। কিন্তু ইহা ভিন্ন যে আমাদের গতাস্তরও নাই,—তাহা কি তাঁহাদের মনে করা উচিত নয়? আমরা ডাক্তারদিগের নিকট Practical শিক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইব, কিন্তু Practical শিক্ষার জন্ত আমরা যাহা অভ্যাস করিব—তাঁহা আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের তো বহির্ভূত বিষয় নহে। ভগ্নাঙ্গির সন্ধান, প্রণেয় শল্যের উদ্ধার, ত্রণের শোধন, রোপন, উৎসাদন, অবসাদন প্রভৃতি পুরুষচ্ছেদাঙ্গুশ্রুত যাহা কবিতেন, আধুনিক ডাক্তার মহাশয়েরা তাহাই অবলম্বনে তাঁহাদের শল্যচিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। অঙ্গুশ্রুতের নরদেহতত্ত্ব ও ভাববিজ্ঞানের নাম তাঁহারা দিয়াছেন—‘আনটমি ও কিজিওলজি’! আমাদের কোষের নাম তাঁহারা দিয়াছেন—‘সেল’। আমাদের ‘পল্লব’ের নাম তাঁহারা দিয়াছেন—‘প্রটোপ্লাজম’। আমাদের ‘অস্থি’র নাম ডাক্তারদিগের ‘বোন’। ডাক্তারি শাস্ত্রে মানব দেহের অস্থিনির্ণয়ে তাঁহারা বলিয়াছেন,—“মানব দেহে দুই শতের অধিক পৃথক পৃথক অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদশাস্ত্র কিন্তু—এই ‘দুই শতের অধিক’ বলিয়া বাক্য অসম্পূর্ণ রাখেন নাই,—অস্থির সংখ্যা নির্ণয়ে নবকালে ২৪৬ খানি অস্থি বিভক্ত বলিয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অস্থির সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তারি ‘প্যারাইটালে’র আমাদের দেশীয় নাম—‘পার্শ্বকপালাস্থি’। ডাক্তারি ‘অক্সিপিটালে’র আমাদের দেশীয় নাম—‘পশ্চাৎকপালাস্থি’। ডাক্তারি ‘টেম্পোর্যাল’র আমাদের দেশীয় নাম—‘শ্রীবা’। ডাক্তারি ‘ইপিগ্লার ম্যাকসিলারি’র আমাদের নাম ‘উরু হস্তি’। ডাক্তারি ‘সার্ভাইক্যাল ভাইব্রি’র আমাদের নাম—‘শ্রীবাবলম্বী কেশরিকা’।

ডাক্তারি ‘রিবস’ের আমাদের নাম—‘পশ্চ’ বা ‘পঞ্জরাস্থি’ সকল। ডাক্তারি—এলবো-জয়েন্ট’র আমাদের নাম ‘কপূর’ বা ‘কফোনি সন্ধি’। ডাক্তারি ‘রেডিয়াসে’র আমাদের নাম ‘কোদগুস্থি’। ডাক্তারি ‘কাপসে’র আমাদের নাম ‘মণিবন্ধস্থ সন্ধি’—ইত্যাদি। তবে আমাদের অঙ্গুশ্রুতের সহিত ডাক্তারির সংজ্ঞা-নির্ণয়ে এক আধটুকু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। যেমন অঙ্গুশ্রুতের মতে অস্থি পাঁচ প্রকার, আর ডাক্তারি মতে অস্থি চারি প্রকার। কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় ও নলক—অঙ্গুশ্রুতের মতে অস্থি সকল এই পাঁচভাগে বিভক্ত। আর ডাক্তারি মতে—অস্থিনির্ণয়ে—দীর্ঘাস্থি, খর্ব্বাস্থি, প্রশস্তাস্থি এবং বিবিধাকার অস্থি সকল। অঙ্গুশ্রুত বলেন,—জাহ্নু, নিতম্ব, স্বক, গাও, দন্ত, তালু, শঙ্খ এবং মস্তকে কপাল নামক অস্থি সকল আছে। দন্তগুলিকে রুচক অস্থি বলা যায়। নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষু কোণে তরুণ অস্থি অবস্থিত। এই তরুণ অস্থি সকলকে ইংরাজীতে কার্টিলেজ অর্থাৎ উপাস্থি বলা হয়। ‘বলয়’ নামক অস্থি সকল পাণি, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষে দেখা যায়। অবশিষ্ট সকল স্থানে ‘নলক’ নামক অস্থি সকল অবস্থিত। অঙ্গুশ্রুতের তরুণ অস্থি অর্থাৎ ডাক্তারি ‘কার্টিলেজ’টিকে পরিত্যাগ করিয়া ডাক্তারেরা চারি প্রকার অস্থি নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বড় আসিয়া যায় না। ফল কথা আমি বলিতে চাহি—ডাক্তারদিগের নিকট আমাদের আনটমী ও সার্জারি শিক্ষা করিলেও তাহা আয়ুর্বেদশাস্ত্র বহির্ভূত হইবে না। আধুনিক পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান অস্থি সমূহের যে সকল নাম নির্দেশ করিয়াছেন, মর্হর্ষি অঙ্গুশ্রুতের নামকরণের সহিত

তাহার কিছুনাথ পার্থক্য নাই। প্রভেদের মধ্যে যা, কেবল—ডাক্তারদের ভাষা ইংরাজী ও আমাদের ভাষা সংস্কৃত।

হিন্দুশাস্ত্র মতে অধ্যাপনার ভার ব্রাহ্মণ এবং বৈজ্ঞানিক লইবার অধিকারী। অত্র সম্প্রদায়ের নিকট অধ্যয়ন দূরের কথা, ব্রাহ্মণের নিকটও হিন্দুর অধ্যয়নের রীতি কোনো কালে ছিল না। কিন্তু এখন তো সে রীতির পরিবর্তন হইয়াছে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সময় সাহেবদিগের নিকট পর্য্যন্তও আমাদের শিক্ষা লইতে হয়। সেটা হইয়াছে কেন?—না ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে সাহেবেরাই অধিক কৰ্ম্মকুশল। ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে হইত কখন?—যখন ব্রাহ্মণেরা নিজেরা সুশিক্ষিত ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা যখন সুশিক্ষিত ছিলেন তখনই তাঁহারা সমাজের সকল কৰ্ত্তব্য হাতে লইয়া ছাত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেন। কাশ বিপর্য্যয়ে ব্রাহ্মণের সে গৰ্ব্ব এখন খর্ব্ব হইয়াছে। সমাজবন্ধন আঁটবার ক্ষমতা এখন দেশের ধনাঢ্য মোড়লের। অথাত্ত—কুখাত্ত—অমিত—অতিত—হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ আহারীয় গ্রহণ ধনাঢ্যের পক্ষে এখনকার দিনে আর অতি গোপনে করিবার বড় প্রয়োজন হয় না, —আপন আলয়ে বাবুচি রাখিয়া নিষিদ্ধ মাংস রন্ধন করাইলেও আর সমাজচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে শক্তি লইয়া ব্রাহ্মণের তেজঃপ্রতিভা ফুটিয়া উঠিত,—সে তেজঃপ্রতিভা যে এখন লুপ্ত হইয়াছে, স্বতরাং তাঁহার শাসন দণ্ড আর লোকে মানিবে কেন? এম-এ পাশ করিয়া পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত হওয়ার জন্তই বল, আর অতুল ধনের ঐশ্বর্য্য গর্বেই বল—অনেকেই এখন সমাজের মস্তকে

পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। হিন্দুসমাজ নামে আছে, কিন্তু সত্যের অপলাপ না করিলে ইহা যে এখন থিচুড়িতে পণ্ডিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

যাক্ - যা' বলিতেছিলাম—অধ্যাপনার জন্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈজ্ঞানিক ভিন্ন আর কাহাবও অধিকার না থাকিলেও যখন সুশক্তের যুগ পরিবর্তিত হইয়াছে, তখন আমাদের অন্যতর বিষয় গুলি আয়ত্ত করিতে হইবে—অন্তর্জাতিক নিকট। কিন্তু তাহাতে কিছু আশিষ্টা যাইবে না। অন্তর্জাতিক ডাক্তারদের নিকট আমরা শিক্ষা করিলেও আমরা বেদ বিহিত চিকিৎসাই শিক্ষা লাভ করিব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় দেশের পণ্ডিত মণ্ডলীই অথর্ব বেদকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে সামবেদেই শারীর বিদ্যা ও শল্য বিদ্যার প্রথম পরিচয় পরিস্ফুট। সেই সকল পণ্ডিতের বিদ্যাস, —বৈদিক যজ্ঞে নিহত পশুর ছেদিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম হইতে শারীর বিদ্যার উৎপত্তি। বাহা হউক—অথর্ববেদ হইতেই হউক আর সামবেদ হইতেই হউক—বেদ হইতে যে শারীরবিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে—সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং আমরা অন্তর্জাতিক শিক্ষা করিলেও বেদ বিহিত চিকিৎসাই শিক্ষা করিব। এখন আমরা জানিবা বলিয়া অস্ত্রের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু সে অপমানের বোঝা আমাদেরকে বেশী দিন বহিতে হইবে না—আমরা জনকস্বয়ং এই বিদ্যার সুশিক্ষিত হইলেই আমরাই আবার ইহার শিক্ষাদানে সমর্থ হইব। আমাদের দ্বারাই ক্রমশঃ সুশক্ত কালের মত অন্তর্জাতিক যুগ প্রভূত উন্নত হইয়া পড়িবে।

শ্রব কথ্য—ভেদবুদ্ধি কোনো কালেই  
সমীচীন নহে, এজ্ঞা ভেদবুদ্ধি কোনো কালে  
—কোনো বিষয়েই প্রশংসিত হয় নাই।  
জগৎব পূর্বাত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা  
যায়—অনিষ্টের মূলোৎপত্তি এই ভেদবুদ্ধির  
ফলেই সংঘটিত হইয়াছে। সেই জ্ঞা আমার  
মনে হয়—ডাক্তারেরা মুখে যাহাই বলুন—আমা-  
দের কালমেঘ—আমাদের অশোক—আমাদের  
অশ্বগন্ধা—আমাদের বাসক—আমাদের গুলঞ্চ  
—আমাদের পুনর্গবা—আমাদের কণ্টকারী—  
আমাদের মকরপরজ প্রভৃতি লইয়া তাঁহারা  
যেমন চিকিৎসায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে চাহেন,  
—আমরাও সেইরূপ আমাদের যাহা নাই—যে  
অস্ত্র চিকিৎসা হারাইয়া আজি আমরা চিকিৎ-  
সায় সর্বপ্রকারে সাফল্য লাভ করিতে পারি-  
তেছি না,—দেশের মধ্যে যে জ্ঞা আমাদের  
নিস্কা আছে—অথ্যাতি আছে—অপযশের  
বোঝা যাহার জ্ঞা আমাদের অমান বদনে  
সহ করিতে হয়—পক্ষান্তরে যে অস্ত্র চিকিৎসা  
হারাইয়া অনেক সময় আমরা নিজেকেই  
অকর্মণ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি,—সেই  
চিকিৎসা আমাদের সমাজে আবার যাহাতে  
প্রচলিত হয়,—স্বশ্রুতের যুগের মত সেই  
চিকিৎসা আবার যাহাতে আমাদের দেশে  
কিরিয়া আসে,—ডাক্তারেরা আমাদের ঔষধ-  
প্রোগে দেখিয়া যেরূপ বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে

মুহমান হইয়া পড়েন, সেইরূপ আমাদের  
অস্ত্র চিকিৎসায় সুপণ্ডিত দেখিয়া তাঁহারা  
আরও যাহাতে বিস্ময় হইয়া পড়েন,—  
অতীতের উদ্ধার করিয়া,—আমাদের লুপ্ত রত্ন  
ফিরাইয়া আনিয়া আবার যাহাতে আমরা সুপ্ত  
ভারত জাগাইয়া তুলিতে পারি—আমাদের  
জ্ঞানবহুলপাণ্ডিত্য দেখিয়া সমগ্র মেদিনী  
একদিন যেরূপ আমাদের গুরুপদে অভি-  
ষিক্ত করিয়াছিল,—সমগ্র পৃথিবাসী আমা-  
দিগের নিকট দীক্ষা লইবার জ্ঞা অতৃপ্ত  
অগ্রহ আকাঙ্ক্ষায় যেরূপ একদিন উন্মত্ত হইয়া  
উঠিয়াছিল, যাহাতে আমরা আবার সেই দিন  
ফিরাইয়া আনিতে পারি,—সেই অতীত গর্বে  
আর্যাসন্তান আবার যাহাতে জাগিয়া উঠিতে পারে,  
—ধর্ম্য কশ্মের মূর্ত্তহৃদয় মহামহিম মহিমাষিত  
বৈজ্ঞান্যি আবার যাহাতে বৈজ্ঞান্যের  
সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হয়—আমরা সমবেত  
বৈজ্ঞান্যগুণী—আমরা তাহারই জ্ঞা কৃতসংকল্প  
হই। আমাদের এই বয়সে আর শিক্ষাভ্যাসের  
উপায় না থাকিলেও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ-  
ধরদিগকে আমাদের আর্ধ্য ঋষির অন্ত্রমোদিত  
—বেদ বিহিত সকল প্রকার সুশিক্ষায়  
সুশিক্ষিত করিয়া আমাদের লুপ্তকীর্তির পুনঃ  
প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হই। বৈজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেয়  
এখন ইহাই প্রধান কর্তব্য এবং আমি এই  
জ্ঞাই এত কথা বলিলাম।

ত্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ।

## বংশ রক্ষায় কর্তব্য অবধারণ ।

—:~:—

(প্রাপ্ত)

মহাশয়গণ, সংখ্যায়	শ্রাবণের “কাজের কথা”	“আয়ুর্বেদ” শীর্ষক	প্রবন্ধে কারণ	“বালক রক্ষা,” “জকাল মুড়া”	“ব্যর্থির ছাত্র জীবনে
-----------------------	----------------------------	-----------------------	------------------	-------------------------------------	-----------------------------

ব্রহ্মচর্য্য” ও “প্রতীকারের উপায়” পাঠ করিয়া মনে বড়ই শঙ্কা ও চিন্তার উদয় হইল। ভাবিতে ভাবিতে মনে কয়েকটি কথা উদয় হইল ও আপনাদের লিখিতে ইচ্ছা হইল। যদি এই কথা গুলি আপনাদের রোচক হয় ও ইচ্ছা হয় তবে পত্রে প্রকাশিত করিতে পারেন, নতুবা ফেলিয়া দিবেন।

সন্তান—বিশেষ পুত্র সন্তান না হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মনে কষ্ট হয় এবং যাহাতে উহা লাভ হয় তাহার জন্ত অনেকে দেবতা, সাধু প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং একটি সন্তান—বিশেষ পুত্র লাভ হইলে বড়ই আনন্দিত হন। আবার যাহাদের এমনই সময়ে পুত্র লাভ হয়, তাঁহারা পুত্র মুখ দেখিয়া আনন্দিত হন আর কতাই হইলে প্রথমতঃ মনোকষ্ট ভোগ করিয়া পরে মায়াতে মোহিত হইয়া কতাতৈই প্রীতি লাভ করেন। কিন্তু এই পুত্র বা কন্যা লাভ করা পর্য্যন্তই আগ্রহ। কিসে পুত্র বা কন্যা গুণবান বা গুণবতী,—সুস্থ ও সবল হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জগতের মঙ্গল করিবে—সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। কেহ বা জীবিকানির্বাহের জন্ত ব্যাপৃত থাকায় সময় না পাইয়া, কেহ বা আলস্যের বশবর্তী হইয়া, আর যাহারা অর্থশালী তাঁহারা শিক্ষক ও গৃহশিক্ষকের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া—বালক-বালিকার সংশিক্ষা, চরিত্র গঠন ও সুস্থ রাখা বিষয়ের মধ্যে—কিছু তিরস্কার বা প্রহার ছাড়া সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। পুত্র কন্যারাও পিতা মাতার স্বভাব বা প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই স্রোতে ভাসিতে থাকে। এইরূপে দেশের অবস্থা ক্রমে বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ফলে দেশের যেকোন শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর

উপেক্ষা করিবার সময় নাই। সকলেরই এ বিষয়ে দৃষ্টপাত করা আবশ্যক হইয়াছে ও বন্ধপরিষদ হইয়া যাহাতে আমাদের বংশ-বলী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে লোপ না পায়—তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও সম্বর প্রতীকারের উপায় করার প্রয়োজন। ছেলেরা যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয় তদ্বিষয়ে সম্বর দেখিতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা যতটুকু সময় কাটাই, তাহা অপেক্ষা যদি অনেক কম সময়ও এই বিষয়ে প্রদান করি, তাহা হইলে দেশের মহৎ উপকার হয়। এখন রাজনৈতিক বিষয়ে চীৎকার করিবার পূর্বে বালক বালিকা রক্ষার উপায় করিবার জন্ত আমি দেশবাসীকে অমরোধ করিতেছি। আমি দেশ বিদেশে হোমস্কুলের বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমার নিজের গৃহে সেই গৃহশাসনের অভাব। আগে আমরা সুস্থ, সবল ও নীরোগ হইয়া বাচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করি, তাহার পর রাজনৈতিক অধিকার প্রসারিত করিয়া সুখে থাকিবার চেষ্টা করিব। সকলে একবার চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি যে, বালক রক্ষা আমাদের সর্ব প্রথম প্রধান কার্য্য কিনা! কেবল সন্তান জন্মিলে হইল না। সেই সন্তান সদৃশগাভিত, শান্ত-শিষ্ট-ধার্মিক-নীরোগ-সবল ও দীর্ঘজীবী কিসে হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত কিনা? এ বিষয়ে পিতা মাতা উভয়েই উদাসীন। পিতা মাতার ব্রহ্মচর্য্য নাই—চিন্তা সংঘম নাই—বর্ণ প্রভাব নাই—আহার শুদ্ধি নাই—বলিতে গেলে গৃহস্থাত্রমে থাকিতে যে গুণগুলির আবশ্যক, তাহার কিছুই নাই—সন্তানে তাহা বর্ত্তিবে কিরূপে? আহার শুদ্ধি না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হইলে বর্ণধারণে অক্ষম

হইবার উপায় নাই। ধর্ম্মার্থে—যিনি ধরিয়া রাখেন অর্থাৎ ইহকালে সাংসারিক অভাব হইতে মুক্ত করিয়া সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন করেন ও মৃত্যুর পর পথপ্রদর্শক হইয়া সেই বর্ম্মীয় দর্শনকে দর্শন করান। ফলে ধর্ম্মহীন আমরাই হইয়াছি,—পুত্রদের দোষ দিলে কি হইবে? কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন “তোমরা সবাই পুত্র চাও, কিন্তু কেহ শ্রীভগবানের মত পুত্র চাও না। কামজ সন্তানে কি উপকাব হইবে। সেইজন্য তোমাদের নিকট ভিক্ষা করি যে, তোমরা শ্রীভগবানের মত পুত্র চাও, মা জগদমহার মত কন্যা চাও—তবে তোমাদেরও চুখ দূর হইবে জগতেরও দুঃখ দূর হইবে। কিন্তু শ্রীভগবানের মত পুত্র—মা জগদমহার মত কন্যা চাহিতে হইলে সেই রূপ গুটি গুচ্ছভাবে জীবন কাটাতে হইবে—যেমন দেবকী-বল্লদেব, যেমন কৌশল্যা-দশরথ, যেমন মেনকা, হিমালয় কাটিয়েন।” পূজাপাদ স্বর্গীয় ভূদেব বাবুও এই কথা তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যেক গৃহস্থ দম্পতি এই রূপ ভাবে গুচ্ছাচারে চিত্ত সংযম লইয়া থাকিবেন যেন শ্রীভগবান তাঁহার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। এখন আমরা যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপায় নাই—কিন্তু ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান হই ও অতকে সাবধান করাই—ইহাই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য।

উপস্থিত আমাদের কি করা উচিত? প্রথমে যাহাতে আমাদের বালকগণ পুষ্টিকর বাস্তবিক আহার পায় তাহা করিতে হইবে। আমরা যাহাদের হাতের রান্না খাই, তাহাদের প্রকৃতি আমাদের উপর ক্ষুণ্ণভাবে ক্রিয়া করে, সেইজন্য রান্নাই বামনের হাতে বা হোটেল প্রকৃতিতে খাওয়া যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়া নিজ

মাতার হস্তের রান্না খাওয়া উচিত। প্রত্যেক মাতা, আপন সন্তানকে যতটুকু পারেন, নিজের হাতে খাওয়াইবেন এবং সেই রান্না যাহাতে এমন শুদ্ধভাবে হয় যে, যিনি বাঁহার আদিষ্ট দেবতা তাঁহাকে বা শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। আজকাল পিতামাতা সন্তানকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া দেখিতে বড় ভাল বাসেন, তাহাতে বিলাসিতা আসিয়া পড়ে। আমার বোধ হয়, যদি বালককে ৫ টাকা দামের বুট জুতার পরিবর্তে ১৭ ১১০ দামের চটি জুতা কিনিয়া দিয়া, যে টাকা বাঁচিবে— তাহাতে বিদ্যুৎ যন্ত্র ও ছদ্ম ও ফল খাওয়ান, তবে সন্তানের মহোৎসব করা হয়। বৃথা মাংস, বাসি মাছ একবারে ত্যাগ করান উচিত, দ্বিতীয় উপায় ব্যায়াম,—প্রত্যেক বালককে ডন্, উঠব্ করা, আসন করা, ডম্বল দ্বারা বা ছোট হালকা মুণ্ডর দিয়া ব্যায়াম করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। ফুটবল্ প্রভৃতি খেলায় পয়সার অনর্থক খরচও ছেলেরদের একটা খেলার নেশা জন্মাইয়া দিয়া খেলা যে শরীরের উপকারের জন্ত তাহা ভুলাইয়া দেওয়া হয়। তা' ছাড়া ঐ সব খেলায় যেরূপ পরিশ্রম হয় তাহার উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার যোগাইতেও আমরা পারি না। উহাতে খরচ বেশী হয়। যাহাতে খরচ কম হয়— সেইরূপ ব্যায়াম শিক্ষা করানই আবশ্যিক। প্রাণায়াম অল্পে অল্পে শিখাইতে পারিলে ভাল হয়। বালক ব্যায়ামে প্রত্যাহ বুঝিবে যে, শরীরের উপকার হইতেছে। তৃতীয়— সর্জনব্যাপি নিবারণের ঔষধ “রাস” রসায়ন। সন্ধ্যায় ও শয়নকালে অন্ততঃ বালকগণ, পিতা-মাতা-ভাই-ভগ্নী সকলে মিলিয়া যে পরিমাণের

যে ধর্ম বা যে দেবতার উপাসনা করেন, তাহা চিন্তা করা নিতান্ত আবশ্যিক। সংসার অজ্ঞানের মূল, জ্ঞান অর্জন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। সেই জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে আত্মাকে জানা ও দর্শন করা ও তাহাতে পর-

মাত্মাকে দর্শন করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল করিলে বালকগণ সং হইবে, দম্বাবান হইবে ও যে অক্ষর সেই ভগবানের পরিচায়ক, তাহাতে অশ্রীলতা লিখিয়া নিজের হস্ত দূষিত করিবে না। ইতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, বি, এল উকীল।

## ডাক্তারের আত্মকথা।

—:~:—

আমি যখন ডাক্তারী ডিগ্রি লইয়া বাহির হইলাম, তখন হৃদয়ের আশা পূর্ণতাপেক্ষা উচ্চ—মনের অহঙ্কার সাগর অপেক্ষা বিস্তারিত এবং গর্ভ-তরঙ্গে তাহা নিয়ত আন্দোলিত। মনের আনন্দে আটখানা—সদাই ভাবিতাম যে, আমি যাহা শিখিয়াছি, ইহা অপেক্ষা জগতে আর কোন চিকিৎসাশাস্ত্র বা উপদেশ উৎকৃষ্ট নাই। আর আমি যতদূর বুঝিয়া যেমন তেজের সহিত পাশ করিয়াছি, তাহা অস্ত্রের পক্ষে হুঁসাখা। ফলতঃ আমি একটা খুব জাঁহাদার? একরূপ বিশ্বাস একা আমারই মনে যে হইত তাহা নহে। আমি আমার সমপাঠিদিগের সহিত আলাপেও বুঝিতাম যে, অধিকাংশ ব্যক্তিরই আমার শ্রায় ধারণা বদ্ধমূল।

ক্রমে এইভাবে দিন যাইতে লাগিল। একদা আমাদের পল্লীগামের দ্বারকানাথ কবিরাজ মহাশয় আমাকে প্রশ্ন করিলেন। বলিলেন, “ওহে বাপু? তোমরা ত ডাক্তারী পাস করিয়াছ; আচ্ছা সন্নিপাত অরের লক্ষণ কি বলিতে পার?” আমি প্রথমতঃ কতক-

ক্ষণ অবাক হইয়া রহিলাম। পরে বারবার উত্তেজনা করায় ধুঁয়াইয়া ধিয়াইয়া আমার প্রাক্টিস অব মেডিসিনে টাইফয়েড জরের যে যে লক্ষণ পড়িয়াছিলাম, তাহারই দুই-চারটা যতদূর স্মরণ হইল, বলিলাম। কবিরাজ মহাশয় “হু” এই শব্দ করিয়া যুগা ব্যঞ্জকভাবে এমনই অঙ্গভঙ্গী করিলেন, যাহাতে ডাক্তারী পাস করা ব্যাপার যে অতি তুচ্ছ, এমনকি—কিছুই নহে—এইরূপ ভাব প্রকাশিত হইল। তদদর্শনে যদিও আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলাম বটে, তথাপি অহঙ্কারী আমি—নির্ভজ্ঞ আমি—অর্কাটীন আমি—তাঁহার সহিত অজ্ঞতাপূর্ণ তর্কাদি করিতে ছাড়িলাম না। অবশেষে আমার অমুসন্ধিৎসা বশতঃই হউক, বা যে কারণেই হউক, তাঁহার বিজ্ঞা পরীক্ষার্থে প্রশ্ন করিলাম যে,—“আপনি সন্নিপাত জরের কি লক্ষণ অবগত আছেন?” তখন তিনি নিতান্ত মনঃগম্ভীর ভাবে এবং বিক্রপাঙ্ক স্বরে নির্দাম্বিত বিদ্যা পশু স্লোক আবৃত্তি দ্বারা প্রশ্নের জবাব

লক্ষণগুলি বলিয়া যেন ডাক্তারী চিকিৎসা প্রণালীকে এবং তাহার অসীমতাকে ও শুধু জটিল গন্তবিন্দুকে ভাষায় চিকিৎশাস্ত্র প্রণয়ন প্রথাকে শত ধিকার দিলেন। তচ্ছবনে আমি লক্ষ্য, ক্ষোভ, হুংস এবং অপমান বোধ করিয়া এবং পাসকরা ব্যাপারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তৎপরে দিবসই মাধব করের কৃত “নিদান” সংগ্রহ করিয়া পড়া আরম্ভ করিলাম। সংস্কৃত শিক্ষা করি নাই বলিয়া নিতান্ত অসুতপ্ত হৃদয়ে বঙ্গানুবাদ পড়িতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে কতক কতক সংস্কৃত বচনও মুখস্থ করিয়াছিলাম। উক্ত পুস্তক পাঠ করিতে গিয়া বুঝিলাম যে, আমার গানের দ্বারা শিক্ষার কিছুই হয় নাই।

অনন্তর বর্ষাকালে যখন দেশমধ্যে অরোগ্য অত্যন্ত বিরুদ্ধের সহিত প্রাহতু হইল, তখন আমিও বিস্তর রোগী পাইতে লাগিলাম। ‘দিবার মিকশ্চার ও কুইনিন মিকশ্চার’ ঔষধ আর হুৎসাও পথ্য দিয়া চিকিৎসা করিতে থাকিলাম। তাহাতে পিত্তজ্বরগুলি কিছু দিনের জন্য বন্ধ হইল বটে, কিন্তু স্নেহ্যার লেশ থাকিলে সে অর আর কিছুতেই যাইতে চাহে না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অরের উপরে কাস, বুকের বেদনা, গলা বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ জুড়িতে লাগিল। লোকে আর ঔষধ ধরিতে না পারিয়া কেহবা কেহবা কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইখানে প্রকাশ থাকে যে, আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। এলোপ্যাথগণ যেমন সকল সময়েই এলোপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া কলেরার সময় হোমিওপ্যাথি ধারণপূর্বক স্বীয় অজ্ঞতার পরিচয় দেন, আমিও তেমনি সকল চিকিৎসা হোমিও-

প্যাথিতে করিয়া তৎকালে অর চিকিৎসাটা এ্যালোপ্যাথিতে করিতে যাইয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতাম।—ফলতঃ উক্তপ্রকার ঘটনা অনেকস্থলেই সংঘটিত হওয়া দেখিয়া মনে মনে বড়ই আত্মকট অসুভব হইতে লাগিল। ইহা শুধু আমার একার চিকিৎসায় নহে, আমার সমপাঠীগণ এবং অধ্যাপক স্থানীয়গণ প্রায় অধিকাংশই বিষয়ে কুইনাইন দ্বারা অর চিকিৎসায় ত্রুটি হওয়ায়,—দেশ মধ্যে ইহা স্বর্ণাঙ্করে বিজ্ঞাপিত হইয়া পড়িল যে, হোমিওপ্যাথিকে অর চিকিৎসা হয় না। এজন্য যে কলেরা রোগ হোমিওপ্যাথির একচেটিয়া ছিল, একটু অর সংশ্রব থাকিলে উহা আর হোমিওপ্যাথির আয়ত্ত নহে মনে করিয়া লোকে এলোপ্যাথির আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে কয়েকবৎসর কাটিয়া গেল।

এতদ্দেশে অরই সর্বোৎকৃষ্ট প্রধান রোগ। তাহার চিকিৎসায় অকৃতকার্য—হইলে আর পমার, প্রতিপত্তি কি করিয়া থাকিবে? কাজেই আমি জনসমাজে দিবাভাগের চন্দ্রমাবৎ হীনপ্রত হইয়া রহিলাম। ক্রমে অত্যন্ত স্থানের হোমিওপ্যাথগণের সংবাদ লইয়া জানিলাম যে,—“সব রক্তনের একই স্বাদ।” সকল স্থান হইতেই সৌরভ বাহির হইয়াছে যে,—হোমিওপ্যাথিতে অর চিকিৎসা হয় না।” বড়ই আক্ষেপ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, অরের এত পুস্তক, এত গবেষণা পূর্ণ লক্ষণ অবধারণ, এত সমগ্রাহসারে দোষাদি বিচারাহসারে চিকিৎসার ইঞ্জিত, ইহা কি সর্বট ফাঁকি? না, কখনই তাহা হইতে পারেনা। অবশ্যই এখানে আত্মকট আছে। এইরূপে বহু চিন্তা করিয়া—বারবার অর চিকিৎসা পুস্তক অধ্যয়ন ও বহু পরিশ্রমপূর্বক ঔষধ

নির্কীচন দ্বারা জ্বর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দেখি যে,—হোমিওপ্যাথির মত জ্বর চিকিৎসার সুন্দর ঔষধ জগতে আর নাই বলিলে অত্যাক্তি হয় না। কেননা উপযুক্ত ঔষধের একটি মাত্র মাত্রা সেবনেই অতি তীব্রজ্বর—দশ পনের মিনিট মধ্যে ঘর্ম হইয়া পরিত্যাগ হয় এবং পুনরাগত হয় না। ইহা যদি দশটা স্থলে হয় তবে একশত স্থলে হইবে না কেন? যদি না হয় তবে নিশ্চয়ই ঔষধ নির্কীচনের ক্রটি আছে ইহা স্পষ্ট বুদ্ধিতে হইবে। বস্তুতঃ উক্তরূপে প্রত্যক্ষ সুফল দেখিয়া পরম আনন্দিত হইতে লাগিলাম। তখন “হোমিওপ্যাথিতে জ্বর সারে না” এই ক্রম বিদূরিত হইল। যেখানে সারেনা সেইখানেই নিজের ক্রটি বুঝিয়া বিশেষ চেষ্টা পূর্বক ঔষধ নির্কীচন করিয়া দেখিতাম, তৎপরে সহজ আরোগ্যও হইত। কিন্তু শ্লেষ্মা সংযুক্ত জ্বর গুলি উপযুক্ত ঔষধ নির্কীচিত হইলে বেশ ছাড়িত বটে, কিন্তু আবার হইত ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইত। ক্রমশঃ ইহার কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী রহিলাম। কিছুতেই কিছু ঠিক করিতে না পারায় নিতান্ত ক্ষুণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

আমার সহিত একজন খ্যাতনামা সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের বন্ধুতা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠে। তাহার বিশেষ কারণ আমার আয়ুর্বেদপ্রিয়তা ও নিদানাদি পাঠ। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই—চিকিৎসা বিষয়ক আলাপেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। সেই প্রসঙ্গে একদা তাঁহার মুখে শুনিলাম যে,—

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ততে  
নতু পথ্য বিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি।

অর্থাৎ বিনা ঔষধে শুধু পথ্যেই রোগ নিরাম হয়। কিন্তু পথ্য বিহীন শত শত ঔষধ প্রয়োগেও কোনো ফল ফলিতে পারে না।

আবার তিনি আর একদিন ডাক্তার দিগের তরুণ জরে হৃৎ পথ্যের ব্যবস্থা করা দেখিয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে বলিলেন যে—“পথ্যের অব্যবস্থাই ডাক্তারী চিকিৎসার সর্বাংশে অনভিজ্ঞতা। যেহেতু ডাক্তারী চিকিৎসার লোকসকল উক্ত কারণেই চিররুগ্ন হইয়া পড়ে, কারণ বহু পরীক্ষিত ঔষধিবাক্য আছে :—  
“জীর্ণজরে কফক্ষীণে ক্ষীরোত্তাদমৃতোপমং।

তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধস্তি মানবং ॥  
অর্থাৎ যেখানে শ্লেষ্মা ক্ষয় প্রাপ্ত অথচ জীর্ণ জ্বর (যুসুযুসে প্রাচীন জ্বর) হইতেছে; সেইখানে হৃৎ পথ্য দিলে উহা অমৃত সম ঔষধ ও পথ্য উভয়েরই কাজ করে। আর উহা (হৃৎ) যদি তরুণ জরে দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিধের স্থায় মানবগণকে হনন করিয়া থাকে।

বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত বচন প্রমাণ শ্রবণে স্পষ্টই বুঝিলাম যে, তরুণ জরে হৃৎ পথ্য দেওয়া আমার অভ্যাস থাকতেই জ্বর চিকিৎসা ক্ষেত্রে সচরাচর কৃতকার্য হইতে পারি নাই। বাস্তবিকই প্রাপ্তকৃত অকটা ঔষধ বাক্যাবলম্বনে রোগীকে উপযুক্ত স্থপথে রাখিলে বিনা ঔষধেও অন্তর্য কালেই জ্বরাদি পীড়া আরাম হইতে পারে। এইরূপ আগ্রহ প্রসঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে, উক্ত প্রসঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে, উক্ত আয়ুর্বেদ বেত্তাগণ “জ্বরার্শো লজ্জনঃ পথ্য জ্বরান্তে লঘু ভোজনং” বলিয়াছেন, অর্থাৎ জ্বরের প্রথম ভাগে (আমাবস্থার) অনশন এক জর পরিত্যাগান্তে—লঘুপথ্য—তাহাও হৃৎপাথ্য গুরু ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক পথ্য বর্জিত করিয়া ক্রমশঃ করিয়াছেন। তদনন্তর মনোবল প্রভৃতি



কোনপ্রকার ঔষধ দিবার বিধিই প্রদান করেন নাই। কেননা রোগীর স্বাভাবিক রোগের আরোগ্যকারী শক্তি (Vismeditetrix maturity) ঔষধ কর্তৃক হ্রাস না হয়। অষ্টাহেও যদি স্বভাবে জ্বর আরাম করিতে অক্ষম হয়, তবে মুহূর্ত্তার্থ ঔষধাদির ব্যবস্থা তাহাও অত্যন্ত মাত্রায় দিবসে - জোর দুইবার (এখনকার মত এক বা দু'ঘণ্টান্তর নহে) ব্যবহার করাইয়া জ্বর আরাম করিয়া দিতেন। তাহাতে স্বাভাবিক আরোগ্যকারী শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিত বলিয়াই লোক একবার জ্বর হইতে সারিতে পারিলে আবদশ পনের বৎসরের মধ্যে জ্বরে পড়িত না। অধুনা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়ও যদি প্রকৃত ঔষধ নির্বাচিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে (অর্থাৎ অষ্টাহ অবধি ভোগান্তে) প্রযুক্ত হয়, তাহাতে উল্লঙ্ঘ্য স্তূর্দার্কাল নীরোগ থাকিতে দেখা যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অতি শাস্ত্রীয় অসময়ে ও অধো ঔষধ প্রযুক্ত হওয়ায় লোকের প্রকৃতি এমন এতই হ্রাস হইয়াছে.--স্বাভাবিক আরোগ্যকারী শক্তি এমনি হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, কেহই দুইদিন কালও অনশনে থাকিতে পারিবে না, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে দুই দিনের তীব্রতর সহ করিবার উপযোগী নহে। অনেক স্থলে দুই একদিনের জ্বরেই লীলা সম্বরণ করিতে দেখা যায়। ইহার কারণ চিন্তা করিলে উপলব্ধি হয় যে, অতিরিক্ত ঔষধ অধো বহুদিন সেবন করিতে করিতে তাহা-নিগেব স্বাভাবিক আরোগ্যকারী শক্তি এতই

নষ্ট হইয়াছে যে, সামান্য জ্বরবেগ শাস্ত্রেই ইচ্ছিয় সকল অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সে যেন মরিয়াই থাকে, কেবল ঐ জ্বরটুকু উপলক্ষ্য হইলেই জীবন শেষ হয়। তবে শাস্ত্রাদিতে যে অভিত্যাস জ্বর প্রভৃতি হঠাৎ মৃত্যুজনক কতিপয় রোগের কথা উক্ত আছে, সে সংখ্যা নিতান্ত বিরল।

কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত বচন প্রমাণে আমার মনোমধ্যে আর একটা চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলাম যে পথ্য উপযুক্ত হইলে বিনা ঔষধেই রোগ শান্তি হইতে পারে, সেই জন্য পথ্য ব্যবহার প্রণালী সর্বত্র বিশেষ করিয়া শিক্ষা করার দরকার। তজ্জন্ত পথ্য শাস্ত্র অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া ভগ্নমনোরথ হইলাম কারণ কেবল পথ্য বিষয়ের প্রকৃত পুস্তক কবিরাজী এ্যালোপ্যাথী কোন শাস্ত্রেই নাই।\* কবিরাজী শাস্ত্রে রোগ হইলে তাহার দেশীয় পথ্যাপথ্য সম্বন্ধীয় যে কয়েক খানি পুস্তক দেখা যায়, তাহাতে অনাগত প্রতিষেধ বিষয়ের কোন উক্তি নাই। তারপর এ্যালোপ্যাথি মতেও বিদেশীয় Beef tea, Beef juice, cheaken broth প্রভৃতি অস্বাভাবিক অযৌক্তিক যে সকল পথ্য অতি সামান্যভাবে লিখিত আছে, তাহাও দেশবাসীর পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী। হোমিওপ্যাথী তাহারই নকল, কুপথ্যের কথাত উল্লেখই নাই।

শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

\* আশ্চর্যের পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা খুব ভালরূপই আছে। দেখক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আঃ নঃ।

## ওয়ার ফিভার।

—:~:—

ওয়ার ফিভার বা সমর জ্বর আমাদের দেশে আমদানী হইলেও তাহার স্বতন্ত্র নাম আমদানী হয় নাই। সমরে যেমন অধিকাংশ মানুষেরই প্রাণনাশ হওয়া সম্ভাবনা, কিন্তু সমর জ্বরে প্রাণনাশের সম্ভাবনা নাই।\* “বাহা হউক এ জ্বরের নাম বিংশ শতাব্দীর জ্বর” নাম দিয়াই আমরা খালাস হইতে পারিতাম, কিন্তু বিংশ শতাব্দীরও যে এখন অনেক দিন বাকী আছে। আর কতিপয় বৎসর পরে হয়ত বর্তমান ওয়ার ফিভারকে একটা নব প্রতিষ্ঠিত পরাক্রান্ত জ্বর আসিয়া পরাস্ত করিষ্ট দিবে। স্মরণ্য একটা সঠিক একটানা নাম ওয়ার ফিভারের হইতে পারে না। আমরাও ইহাকে তাই বলিয়াই সম্বোধন করিব।

সমর জ্বর কেনন করিয়া আসে, কিরূপে কয়দিন মানুষের দেহে বাসা গাড়িয়া বসে, কি করিয়াই বা উৎপাত করে, তাহা জানা দরকার। এক একবার এক এক সময়, এক একটা বারাম আসিয়া প্রচণ্ড ভুফানের মত দেশের মানুষ গুলাকে ছয়ছাড়া করিয়া দেয়। আমাদের স্মরণ আছে—একবার বাঙ্গালাতে কালাজ্বর আসিয়া বিধ্বস্ত করিল, তা’রপর আসিল ডেঙ্গুজ্বর। ডেঙ্গুর পর আসিল—ম্যালে-

রিয়া। ম্যালেরিয়া সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ম্যালেরিয়ায় যত মড়ক—তত আর কিছুতেই হয় নাই। ম্যালেরিয়া যে দিকে পদার্পণ করিয়াছে—তথায় সে বিজয়ী সেনার ছায় দেশকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তারপর আসিল—ইনফ্লুয়েন্সা। ইহার পর আসিল সর্দঙ্গরী প্লেগ। ইহাও এক প্রকার জ্বরবিশেষ। প্লেগের জীবনচরিত সকলেরই জানা আছে বলিয়া আর কিছু বলিলাম না।

এই যে সমর জ্বর আমরা দেখিতে পাই তেছি, ইহা অতিরিক্ত সংক্রামক ব্যাধি। ডেঙ্গু জ্বর যেমন সংক্রামক—ইহা ততোধিক। প্রথমতঃ এই জ্বরের আদি বা জন্মস্থান ইয়ুৰোপ, অর্থাৎ যেখানে যুদ্ধের প্রভাব—সেইখান হইতেই আসিয়াছে বলিয়া ইহার নাম ওয়ার ফিভার বা সমর জ্বর। যুদ্ধস্থলে কামানের গোলা হইতে দূষিত বাষ্প বাহির হইয়া যুদ্ধস্থানের চতুর্দিকে সর্ব প্রথমে আক্রমণ করিয়াছে। জাহাজে প্রথমতঃ বোম্বাই, পরে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। স্মরণ্য আমিও ইহার জীবন চরিত ও চৌহদ্দি বর্ণনার সমর্থ হইতেছি।

\* সমর জ্বরে প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে, এ প্রবন্ধ লেখক যে সমর ইহা লিখিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, সে সময় এতদূর যত্নের কথা বড় শুনা বাইত না, যে সমর কলিকাতায় এখন এই জ্বরের আমদানি হয়, এ প্রবন্ধ সেই সময়ের লেখা। কিন্তু তাহার পর এই জ্বর একশে বৎসর বাকীহইয়াছে। তাহাতে ইহার পরিণামে নিউমোনিয়া হওয়ার ইহা ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই ভীষণ মারাত্মক জ্বর আক্রান্ত হইয়া প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক যুদ্ধস্থলে গতি হইতেছে। শুধু বঙ্গদেশ কেন, ভারতের সর্বত্রই এই জ্বরের ভয়ঙ্কর প্রভাব। পৃথিবীর অত্যাধিক স্থানে এই জ্বরের আক্রমণ সংপ্রতি পূর্ণভাবে একটি। আংং।

বোধ হয় ইহাতে সাধারণের উপকার হইবে।

সমর জর বা ডেঙ্গুজর সর্বাগ্রে বাঙ্গালায় আসে কলিকাতায়। কলিকাতার অবস্থা অবর্ণনীয়। সে ছরবস্থার কথা অনেকেই অবগত আছেন। যাহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা বাতীত সংবাদ পত্র পাঠকেরাও বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই জরটা একটা অদ্ভুত প্রকৃতির, জরটা আসিবার আগে কিছু অনুভব করা যায় না। হাত, পা, মাথা বেদনা হয়; সর্দিভাব দেখা যায়। তারপরই জর। জরের সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ গা বেদনা। এই বেদনা সংযুক্ত জর তিন দিনই প্রবল থাকে। তারপর কমিতে থাকে। ৪৫ দিনের বেশী জর ও বেদনার উৎপাত থাকে না। তারপর হয় অতিশয় দুর্বলতা। এই দুর্বলতা অনেক দিন পর্য্যন্ত রোগীকে কাবু করিয়া বসে। জরের প্রথমাবস্থায় রক্ত বেশী ঘুম হইতে থাকে, জরের প্রাবল্য কমিলে নিদ্রাক্লান্ত ঘটিতে থাকে এবং ক্রমশঃ দুর্বলতা বাড়িতে থাকে। কফ কাশের উপদ্রবে অনেকের গলা, বুক ও পেটে বেদনা হয় কিন্তু তাহাতে ভয়ের কারণ বৃদ্ধিতে হইবে না।

জরটা আসিবার আগে শরীরটাকে খুব হালকা করা প্রয়োজন, যাহাতে সর্দি লাগিতে না পারে সেই আয়োজন করিতে পারিলে জর ও বেদনা হইলেও ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতে পারে না। জর ও বেদনা হইলেও শরীরটাকে হালকা রাখিতে হইবে। আত্মবিস্ময় লক্ষণ—উত্তম-ঔষধ। সাণ্ড ও খই ব্যতীত অন্য পথ্য বিধেয় নহে। দুই দিন জরের পর রুটী ব্যবস্থা হয়। জরের উত্তাপ চারি ডিগ্রীর অধিক হইতে দেখা যায় না। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা ও বেদনা অত্যধিক প্রকারে আক্রমণ

করে। রাত্রি প্রলাপ, মুখ শোষ, হাত, পা আলা, মাথা বেদনা এই জরের অঙ্গ বিশেষ। কিছু দিন হইল “হিতবাদী” পত্রিকায় মুন চাও ইউসিলেপটাস্ অয়েল ব্যবহারের উল্লেখ কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়াছে ইউসিলেপটাস্ অয়েল রোগ আক্রমণের পূর্বে ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে বিষতুল্য। ইহা ব্যবহার করিলে তদবস্থায় রোগীর মস্তিষ্ক ভয়ানক রকমে উত্তেজিত ও আক্রান্ত হয়। তাহার পর রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে। অবজ্ঞাহ্বায় রোগীর আত্মীয়গণের চিন্তা করিবার কারণ নাই। দুই দিন পরেই শরীরটা ঝরঝরে, তরতরে হইলেই প্রলাপটা দূর হইবে। তারপর ক্রমশঃ জর ও বেদনা কমিয়া তিন চারি দিন পর্য্যন্ত কাহারো কাহারো পাঁচ ছয় দিন থাকিতেও দেখা যায়। জর ও বেদনা দূরীভূত হইলে রুটী বা খিচুড়ী পথ্য বিধেয়। কফ ও বেদনা কম থাকিলে দুধটাও দেওয়া যাইতে পারে। জর ও বেদনা প্রবল থাকাবস্থায় দুধ কোন প্রকারেই ব্যবস্থা নহে। কফ যখন নাক দিয়া জলের মত পড়িতে থাকে, তখন দুধ বিষতুল্য। কফ যখন গলা দিয়া ঘন হইয়া বাহির হইতে থাকে তখন দুধ অপথ্য নহে। কিন্তু গরম দুধই বিধেয়। ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা করে। কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়া একটা উপসর্গ। চারি পাঁচ দিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, এরূপবস্থায় জরের পর কোন প্রকার কোষ্ঠ পরিষ্কারের ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত, রীতিমত আহারাদি করিলেও কোষ্ঠ বদ্ধি ও প্রস্রাব হইয়া থাকে।

এই ব্যাধামের আর একটা উপসর্গ এই

ষে, রোগীর দান্ত ও প্রস্রাব এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। তবে গ্রহণী ও বহুমূত্র রোগীর পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। খুব গরম ভাবে থাকিলেই এই ব্যারামের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, অথবা রোগ হইলেও তাহার উৎপাতটা তেমন হয় না। জ্বর আক্রমণের সময় পিপাসা ও দাহ খুব বৃদ্ধি হয়, কোন কোন ব্যক্তি বরফ, সোডা, লেমনেড্ প্রভৃতি শৈত্য ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহার মন্দ ফল বড় ভীষণ ভাবে উপস্থিত হয়। এই বাধি মারাত্মক না হইলেও অত্যাচারের নিদর্শন স্বরূপ নিউমোনিয়া প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া মারাত্মক হইয়া পড়ে। এই সব রোগীকেই এই জরে মারা যাইতে দেখা যায়। এই জ্বরের প্রথম ও

মধ্য ভাবে সুপক্ক আনারস সুপথ্য কিন্তু অল্প বিষতুল্য, লেবুটাও সুপথ্য বটে।

জ্বর ও বেদনা সারিয়া গেলে অল্প পথ্য প্রয়োজন। তাহার পর রীতিমত ঘান, আহাবাদি করিয়া শরীরটাকে শোধরাইয়া লইতে হইবে। এই সময়ে বলকর ঔষধ ব্যবহার করিলে সহজেই পুষ্করল সংগ্রহ হইতে পারে। যাহাদের পেঁয়াজ খাইতে আপত্তি নাই, তাঁহারা তেলে-ভাজা পেঁয়াজ গরম গরম খাইলে কক ও বেদনা হইতে উপশম বোধ করিতে পারেন। সর্কো-পরি সাবধান থাকাই ইহাতে ব্রহ্ম ঔষধ।

শ্রীরাজেন্দ্র কুমার মজুমদার।

শাস্ত্রী, বিজ্ঞানভূষণ।

## প্রদর রোগ চিকিৎসা।

( মহিলাদিগের জন্য ছড়ায় লিখিত )

—:~:—

কুশের মূল চালের জলে,  
প্রদর সারে বেটে খেলে।

হরিণের রক্ত, মধু, চিনি,  
খেলে প্রদর সারে জানি।

অশোক ছাল দুই ভরি,  
দুধ নাও আট গুণ করি,  
জল নাও দুধের চারি গুণ  
পাক ক'রে রাখ দুধ টুকুন।  
দিন কতক খাওগে এই ক্বাথ,  
প্রদর রোগ হ'বে নিপাত।

যজ্ঞ ডুমুরের রস মধুর সহ  
প্রদর হ'লে খেতে কহ।

দুধে বেটে বেড়োলা মূলে  
খাও গে প্রদর রোগ হ'লে।

কুলের গুঁড়ো গুড়ের সহ  
প্রদর রোগে খেতে দেহ।

গুড় দিয়ে খাও কলার গুড়  
প্রদর রোগে উপকার বড়।

দুধ, ঘি আর লাক্ষাচূর,  
প্রদর রোগ করে দূর ।

রোড়া মুলের ছাল, চিনি, মধু  
কিন্দা আমলকীর বীচির শাঁস শুধু,  
জলে বেটে দাও মধু, চিনি,  
প্রদরে খাও উপকার জানি ।

ধাইফুলের কি আমলার গুঁড়,  
মধুর সহিত সেবন কর ।  
কাকজফা কি কাপাস মূলে  
বেটে খাওগে চালের জলে  
পাণ্ডু প্রদর হয় গো যাদের  
এ ছ'টী যোগে উপকার তাদের

বাসকমুলের ছাল, দারু হরিদ্রা, মুখা,  
রসাজন, বেলশুঁঠ, ভেলা চিরাতা,  
সাড়ে সাতাশ কুঁচ এক একটি নিয়ে—  
আধসের জলে চাপিয়ে দিয়ে,  
আধপায়া খাক্তে নামিয়ে নাও

মধু দিয়ে এই ক্রাথ খাও ।  
সব রকম প্রদর এতে সারে,  
'দার্ববাদি' নাম কয় এরে ।

রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, বাসক, মুখা,  
আকন্দমূল, রসাজন, দারু হরিদ্রা,  
চিরাতা,

সিকিভরি এক একটি নিয়ে  
আধ সের জলে ক্রাথ করিয়ে,  
মধু দিয়ে খাও প্রদর হ'লে,  
শিগ্গিরি এতে সুফল ফলে ।

ভূঁইআমলাচূর, চালের জল  
প্রদরে খেলে বড় ফল ।

ছ'তোলা যষ্টীমধু, দু'তোলা চিনি  
চা'ল ধোয়া জলে খেলে উপকার  
জানি ।

শরপুষ্ক—চালনি জলে বেটে  
রক্তস্রাবে খাও-গে বেটে ।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ।

## গার্হস্থ মুষ্টিযোগ ও টোটকা ।\*

—:—

চমিপোকায় ।—হাতের তালুতে কি  
আঙ্গুলে চমিপোকা হইলে প্রাতে মুখে জল না  
দিয়া তেলাকুচার পাতা হাতে রগড়াইলে ঐ  
পাতার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা বাহির হইয়  
রোগ আরোগ্য থাকে ।

আঙ্গুল হারায় ।—ছোট গোয়ালিয়া  
লতার পাতার সর্ব ভাগ বাটীয়া প্রলেপ দিলে  
৩৪ দিবসে বা ভাল হয় ।

গলায় বিচি আড়াইলে ।—  
কালজীরা ২ তোলা, রক্তচন্দন ১সা ২ তোলা,

আফিং ১০ ছই আনা, মনসা সিজের পাতার রস দিয়া বাটীয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

**আধুকপালে।**—যে রগে বৃবেদনা হইবে গামছা পাকাইয়া সে রগ করিয়া বাকিলে উহা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়।

**নাসায়।**—বাসক পাতার রস আধ পোয়া, ভাল মধু আধপোয়া একত্র করিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়। ইহা সেবনের পর যদি গা বমি বমি করে—তবে থানিকটা মিছরি খাইতে দিবে।

**শিশুর শয্যা মুত্রে।**—শনি কিম্বা মঙ্গলবারের ভোরের বেলায় একটা বাঁশের আগা ধরিয়া বালককে বাঁশগাছের মাথায় প্রস্রাব করাইবে, ইহাতে ঐ রোগ ভাল হইবে।

**চক্ষু উঠায়।**—নারিকেলের ফুল ১টা চোণায় বাটীয়া চক্ষুর চারিদিকে প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

**স্রীজাতির স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি।**—ভূমি কুম্ভাণ্ডের গুঁড়া আধ তোলা, আতপ চাউলের গুঁড়া আধতোলা থানিকটা তুণ্ডে গুলিয়া ৭ দিন খাইলে স্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

**চুলকণায়।**—গায়ের কোনো স্থানে চুলকণার মত বাহির হইলে কিম্বা চুলকাইয়া দাগড়া দাগড়া হইলে, পুরাণ তেঁতুলের মজ্জা সেই স্থানে মাখাইয়া শুকাইয়া ফেলিবে ২১০ দিন এইরূপ করিলেই উহা ভাল হইবে।

**অম্লশূলে।**—খাত্তের গুঁড়া ১ তোলা চা খড়ির গুঁড়া ১ তোলা কাটানটে শাকের শিকড় ১ তোলা উত্তমরূপে একত্র বাটীয়া গরম রুটীতে মাখাইয়া তাহার পর আবাব একটু চা খড়ির গুঁড়া মিশাইয়া প্রাতঃকালে কয়েকদিন খাইলে অম্লজনিত শূল বেদনার উপশম হয়।

**ক্রিমি শূলে।**—ক্রিমি জনিত শূল হইলে আধপোয়া ছাতিমের মূলের রস আধ ছটাক চুণের জল একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে উপকার হয়।

**অজীর্ণজনিত পেট ফাঁপা।**—জাদ্বীহরীতকী কাটখোলায় ভাজিয়া, কাল লবণের সহিত মিশাইয়া প্রাতঃকালে ২০ দিন খাইলে অজীর্ণজনিত পেটফাঁপা আরোগ্য হয় জাদ্বীহরীতকীর পরিমাণ প্রত্যহ একটি এবং লবণের পরিমাণ চারি আনা।

**ক্রীড়াংশুভূষণ সেন গুপ্ত।**

\* আমার পিতামহ স্বর্গীয় ১৮ই বরেন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় কলিকাতা ইটালির একজন ব্রহ্মদিক্ষিত ছিলেন। আমি পাইব মূলধোপ বাহা লিখিতেছি তাহা তাহারই সহস্রে লিখিত জীর্ণ বাহা হইতে সংগৃহীত।

## ধর্মপালনে স্বাস্থ্যরক্ষা ।

—:—

কতকটা এই বিষয় লইয়াই একটা সূচিষ্টিত প্রবন্ধ আধিন মাসের 'আয়ুর্বেদে' বাহির হইয়া গিয়াছে। তথাপি এই একই বিষয়ে আমার মধ্যে একটা প্রবন্ধ লিখিবার কারণ—আমার মনে হয়, আমার পূর্ববর্তী শ্রদ্ধের লেখকের প্রবন্ধটা সুন্দর ও সুসজ্জিত হইয়া থাকিলেও যেন সর্বব্যাপক হইয়া উঠে নাই। সম্ভবতঃ এইরূপ সঙ্কীর্ণভাবে লেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আমি কিন্তু এই বিষয়টা একটু বিশদভাবে বলিতে চাই। কারণ আমার মনে হয় এইরূপ বিষয় একটু বিশদভাবে বলিবারই আজ 'ম' আসিয়াছে। অতএব পূর্ববর্তী লেখকের নকট বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত স্বামী রহিয়া গাংবই উৎকীর্ণ নার্গে অগ্রসর হইব। ষড়নের মৌলিকতার জন্ত যশঃ ও খ্যাতি গাহারই রহিল, বিস্তৃতাবতারণার দোষ ও ক্ষতি আইহি শিরোধার্যা করিয়া লইলাম।

গাংবার আমার বলিতে ইচ্ছা হয় যে, 'শরীর মাতঃ' হিন্দুধর্মচর্চার মূল সত্য। এবং এই মূল সত্যের নিদান বলিয়াই আয়ুর্বেদও একটি ধর্মশাস্ত্র। ইহাও একটা বেদ। হিন্দু ধর্মবিশ্বাস মনস্তত্ত্ববিদ ছিল—সে শরীর মনের প্রণালী সম্বন্ধেই বুঝি বুঝিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল—ধর্মরাজ্যের মনই নেতা, কিন্তু শরীর মন মনের পোষক, আবাস, কর্মপথে সহায়, তখন শরীরকে আগে রক্ষা করিতে হইবে। এট মনের সঙ্গে অমুঠান হিন্দুধর্মচর্চার একই ক্ষেত্র হয়ে চির-কাল গ্রথিত। এই বত সব

অমুঠান তলাইয়া বুঝিলে এগুলিই শরীরোন্নতির সহায়। এই উন্নত শরীরই পরে উন্নত মনের স্রষ্টা। প্রত্যক্ষ ভাবে কতকগুলি অমুঠান শরীরের হানিকর মনে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষণিক চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হয় যে, এই সাময়িক হানিই পরিণামের স্বামী স্বাস্থ্যের কারণ। একাদশীর উপবাস সাময়িক কিঞ্চিৎ ক্লেশ আনয়ন করিলেও পরে কক্ষহীন সুস্থদেহ ও ধারণাশীল মন প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করে। বাস্তবিক পক্ষে জগতের সর্ববিধ সফলতাই বৃষ্টি সাময়িক হানি দ্বারা উপার্জিত। ছাত্র জীবনের কঠোর শ্রম পরিণামের চিরস্থায়ী জ্ঞানময় মনের জনক। ব্যায়াম সাময়িক শ্রান্তিদান ও শ্বেদপ্রাব করাইয়াই পরে বলিষ্ঠ দেহ প্রদান করে। অতএব হিন্দুর কঠোর তপস্ব্যাকে তথাকথিত সুসভ্যজাতির আদর্শমুসারে—damn your penance বলিয়া উপেক্ষিত করা আদৌ ভব্যতার, অন্ততঃ হৃদয়দর্শিতার পরিচায়ক নহে।

আদি হিন্দুর সমস্ত জীবন স্থূলতঃ দুইটা প্রণাসকে বক্ষে ধরিয়াই কৃতার্থ হইয়াছিল। একটা ধর্ম আর একটা তৎসঙ্গে অস্বাভাবিকভাবে গ্রথিত স্বাস্থ্যরক্ষার কারণভূত অমুঠান। একটা মুখ্য উদ্দেশ্য, অমুঠান ঐ মুখ্যটিকে লাভ করিবার জন্ত গোণ হইয়াই বরণীয় হইল। বাস্তবিকই গোণ অনেক সময় গোণ হইয়াই যেন মুখ্যকেও ছাপাইয়া উঠে। ইহারই কারণে বোধ হয় ভগবান অগ্রেপক্ষ তত্ত্ব বদ্ধ। লক্ষ্য-

হুমান—রামকেও বুঝি আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে। লক্ষণ ও হুমান না হইলে বুঝি রামায়ণের রামত্ব বজায় থাকিত না। অহুষ্ঠান ও স্বাস্থ্যরক্ষা না থাকিলেও হিন্দু বুঝি ধর্ম-গুরুর মণিময় রক্তাক্ষহার গলদেশে ধারণ করিয়া মানবেতিহাসে 'বর্ষ্য' বা মহাবি আখ্যা লাভ করিতে পারিত না।

স্বাস্থ্যকে অগ্রে রাখিয়া সাধনা করিবার পথে হিন্দু চতুর্ধর্ম ও চতুরাশ্রমের সৃষ্টি করিল। মনে রাখা উচিত যেমন সব জিনিষেরই একটা ভিতর পিঠ বাহির পিঠ, একটা পোষাকী আট পোরে ভাব আছে, ধর্মেরও তাই। ধর্মও, আট পোরে ও পোষাকী হিসাবে, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক এই দুই প্রকার। সামাজিক ধর্ম সেইটা—যা রাজা রক্ষা করে, দেশকে ঐচ্ছিক, মানব জাতিকে নৈতিক অধঃপতন হইতে মুক্ত করে। আর গভীরতর স্বস্ত্যতর যে আধ্যাত্মিক সার্বজনীন ধর্ম, তা মানবের মনকে উন্নত করে, তাহাকে গড়িয়া তোলে, বিভিন্নের মধ্যে এক কে বোঝায়, মানবের সঙ্গীম জীবাত্মাকে অঙ্গীম পরমাত্মার সহিত যুক্ত করে। সকল মানবই কিছু আধ্যাত্মিকতার অধিকারী নহে কারণ সকল মানবই কিছু ভ্রয়োদর্শন বা স্বক্ষামুভবের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুতঃ সামাজিক ধর্ম, — শাসনের ধর্ম—রক্ষার ধর্ম না থাকিলে সাধারণ অল্পবুদ্ধি মানবের ধর্ম প্রবৃত্তির প্রদাপ একেবারে নির্দীপিত হইয়া যাইত।

আমরা ক্রমশঃ এই সামাজিক চাতুর্ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চাতুরাশ্রম ধর্মপালনের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার অহুষ্ঠানগুলির আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য বিষয়টা অত্যন্ত বড়, ও স্থান অপ্রচুর বলিয়া বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষেত্রে

অসম্ভব। তবে আর কিছু না হউক—দমস্ত বিষয়টার একটা সম্পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র মানচিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হইতে আপত্তি কি?

পূর্বেই বলিয়াছি—সামাজিক ধর্ম—শাসনের ধর্ম, দেশ ও সমাজ রক্ষার ধর্ম। এই শাসন ও রক্ষাকল্পে অন্ততঃ চারিটা স্ত্রিনিস্ চাই—চাই কর্মনেতা, চাই কর্মচারী, চাই সেবক। এই উপদেষ্টাই জ্ঞান গুরু ব্রাহ্মণ, এই কর্মনেতাই ভীমবল যুদ্ধকৌশলী শাসনক্ষম রাজা—কবির, এই কর্মচারীই বাণিজ্যকুশল বৈষ্ণ, এই সেবকই শূদ্র। ব্রাহ্মণ সনাজের মস্তক, তিনি জ্ঞানদান দ্বারা সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করেন। তাঁহারই উপদেশে চাপিত হইয়া রাজার বারত্ব ও ভীমগুণ জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হইয়া হৈর্যা ও কান্ত গুণ লাভ করে ও স্বাধঃশাসনের কারণ হয়। ব্রাহ্মণের জ্ঞানলাভ—ধর্ম, জ্ঞানদান তাঁহার অহুষ্ঠান এবং এই অহুষ্ঠানই সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য বিধান করে। কবিরের ধর্ম—রাজত্ব শাসন অর্থাৎ যুদ্ধ, দেশ-রক্ষা বা প্রজাপালন তাহার অহুষ্ঠান। এই দেশ রক্ষার মধ্যেই সামাজিক সর্ববিধ স্বাস্থ্য-রক্ষা নিহিত আছে। কবিরই তাহা হইলে সাফাভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা করেন একেবারে কর্মের মধ্য দিয়া। ব্রাহ্মণ করেন একটু পরোক্ষভাবে জ্ঞানের মধ্য দিয়া। এই জ্ঞানই কর্মপথে আত্মপ্রকাশ করে, এই জ্ঞানই কর্মকে বল প্রদান করে। ব্রাহ্মণের স্বাস্থ্যরক্ষার পরোক্ষ সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি কবিরের পূজ্য। কেননা কবির নিজের শাসন নীতির জ্ঞানের অল্প ব্রাহ্মণের নিকট স্বামী। এই কর্মনেতার—এই শাসন কর্তার—এই কবিরের কার্য সৌকার্য্য বৈষ্ণ কর্তারী স্বাস্থ্যরক্ষার তিনি যোগদান করেন। এই ইচ্ছার সাধন



ক্ষত্রিয় উপযুক্ত শাসনকটাহে দেশের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য প্রস্তুত করেন। বৈশ্যের শিরবানিজ্য দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়স্বরূপ খাজ ও ধনের সৃষ্টি করে। আর শূদ্র করে একটা ছোট অথচ সবার অপেক্ষা উদার কাজ। সে কর্মকর্তাস্ত উপরোক্ত তিন জাতির মুখ্যনিম্নেষ্কাঙ্কলে মুছাইয়া দেয়। সেবার দ্বারা তাহাদের সর্ববিধ ক্রেশের অপনোদন করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে কর্মক্ষম করিয়া তোলে। শূদ্রের কাজ কদাপি নিম্ননীয় নহে। তার কাজ মায়ের কাজ, কন্ডার কাজ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাজ। এ কাজের স্মৃতি—কৃতজ্ঞতা জড়িত, অশ্রু ইহার স্বভাব, স্নেহ ইহার প্রাণ, সেবা ইহার ব্রত বা আজন্ম সাধনা।

সমাজকে যদি একটা মানুষ ধরিয়া লই, তবে দেখিব সে কতকগুলি শরীররক্ষক ও ডাক্তার কতক পরিবৃত। ব্রাহ্মণ তাহার মস্তক ও তৎসঙ্গে তাহার মন রক্ষা করিতেছে, বৈশ্য তার উদরপুষ্টি করিয়া তাহার শারীরিক বলের ও তৎসঙ্গে তাহার মানসিক তেজের সৃষ্টি করিতেছে—এই মানসিক তেজের বলেই সে কত গভীর চিন্তা করে, কত সুখদুঃখের সমরে জয়ী হয়, কত শত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। শূদ্র তাহার কর্মকর্তাস্ত দেহটিকে মাজিয়া ঘষিয়া, স্নান করাইয়া সুস্থ রাখে। আর ক্ষত্রিয় সর্বোপরি তাহার body guard এর মত ; শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের মত, তাহার সমস্তটা পর্যবেক্ষণ করিতেছে। দেখিতেছে সে কি খায়, কি ভাবে, কিরূপ তাহার স্বাস্থ্য, অস্ত্রে তাহাকে আক্রমণ করিতে না পারে। এইরূপ যত্নে লালিত হইয়া সমাজ ক্রমশঃ একটা সুস্থশরীর জ্ঞানী মানুষের আশ্রমে গড়িয়া উঠিত।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষায় নিযুক্ত এই চারিটা বর্ণের এক একটা বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম ছিল ও এক একটা বিশেষ কর্ম বা অনুষ্ঠান তাহাদের সাধন করিতে হইত। এই জন্ত চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ হইলেন, বাণিজ্যকুশলী বৈশ্য ও সেবারতী শূদ্র হইলেন। ভগবানও এই কপাই গীতায় প্রকাশ করিতেছেন—“চাতুর্ক্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগঃ।”

এইবার চতুরাশ্রমের কথা। ব্রাহ্মণ জ্ঞানগুরু ও চিন্তাশীল, অপর তিনবর্ণ মানসিক বলে তাঁহার অপেক্ষা অনেক নান? সুতরাং আধ্যাত্মিকতার ধারণায় সম্পূর্ণ অসমর্থ। ব্রাহ্মণ এই আধ্যাত্মিকতাকেই আজীবন বরণ করিয়াছেন—অসীমকে, অনন্তকে, ব্রহ্মকে জানাই তাঁহার জীবনের ব্রত, তাঁহার বার্য্যকত্তা। তাই ব্রাহ্মণের আজীবন প্রয়াস, নিজেকে এই ব্রহ্মোপাসনার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা। তাই শরীরকে অগ্রে রাখিয়া সাধনার পথে এবার তিনি চতুরাশ্রমের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম, আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্ত শাস্ত্রচর্চা ইহার ধর্ম এবং বীৰ্য্যরক্ষা ইহার অনুষ্ঠান। এ উপার্জনের আহরণের কাল। এ সময় বীৰ্য্য ধারণ করিয়া বলের আহরণ করিতে হইবে এবং এই বল ও এই ওজঃ যে সুস্থ ও মেধাবীগণকে সৃষ্টি করিবে। তাহাকে শাস্ত্রাভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য। এই আশ্রম practical আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যশ্রমের কালনিক (theoretical) জ্ঞান এখানে বাস্তবের মাঝে পরীক্ষিত হইবে। উপদেশ এখানে উদাহরণ দেখাইকে। সৃষ্টি প্রবাহরক্ষণের মধ্য দিয়াও কেশব

ব্রহ্মচর্য্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে; জী-  
প্রেম, সন্তান-প্রেম, তত্ত্ব প্রীতির স্বন্দেহ  
মধ্যেও কেমনে নির্লিপ্ত শাস্ত্রজ্ঞ মন জ্ঞানের  
প্রদীপ রাখিয়া সজাগভাবে জনকশায়ির মত  
ভগবদ্ধারণায় অগ্রসর হইতে পারে; প্রেমই  
কেমনে ধীরে ধীরে মানবকে মুক্তিমার্গে  
পৌছাইয়া দেয় এ সেই শিক্ষার আশ্রম।  
তৃতীয় আশ্রমে কর্মক্লাস্ত কিন্তু কর্তব্যসাধনে  
আত্ম প্রসাদপ্রাপ্ত মন এবার সংসারের, জননের  
কাজের অবসানে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া  
বিজনে ভগবৎস্বরূপ নির্ণয় করিতেছে। বনের  
নির্মল বাতাস, আসন্ন সমুদ্রসমীর, প্রভাতের  
অবাধ সহজ খগ-রুতি, সুপ্রফুটিত-কুসুমসুরভি  
বুদ্ধের দেহবল ও মনের প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ণ  
রাখিতেছে। বানপ্রস্থ্যশ্রমী ক্রমশঃ নিজেকে  
ঈশ্বরের নিকটতর এবং অতরূপ করিয়া গড়ি-  
তেছে। সর্বশেষ আশ্রম কি উদাত্ত! কি  
গভীর, কি মহিমময়! সর্বস্বত্যাগী যতি, ভগব-  
জ্ঞ্যাতিঃ লাভ করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ প্রাপ্ত  
হইয়াছে, তাহার আজন্ম শরীররক্ষা, মনের  
উন্নতিসাধন চেষ্টা সফল হইতে বসিয়াছে—সে  
মুক্তির সোপানে ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া  
দাঁড়াইয়াছে। সে নিজেকে জানিয়াছে ‘ব্রহ্মো-  
হং’ এবং ব্রহ্মাকে জানিয়া বলিতেছে—

ধ্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং,

ধ্বমন্ত বিশ্বন্ত পরং নিধানং।

ধ্বমব্যয় শাস্ত্রত ধর্ম্মগোপ্তা,

সনাতনং পুরুষোত্তমো মে।

ঈশ্বরও যেন প্রসন্ন হইয়া তাহার সফল সাধনাকে  
পদে স্থান দিয়াছেন। তাহার কর্ম্মানুষ্ঠান,  
তাহার আজন্ম ভক্তি, তাহার পুত্রকলত্রের প্রতি  
আসক্তিরহিতভাবে বিজ্ঞ সাধনা তাহাকে  
ঈশ্বর প্রাপ্তির, মুক্তির সম্পূর্ণ যোগ্য করিয়াছে।

স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম এইরূপ সামঞ্জস্য আর  
কোনো জাতির ভাগ্য সমুজ্জ্বল করে নাই।  
হিন্দু-সনাতন-ধর্ম্ম জগতে অতুল কিন্তু বিশ্বের  
কথা এই যে, এত বড় মানসিক অতুলীন  
ক্ষেত্রের তরে ও স্বাস্থ্যকে এতটা উচ্চাঙ্গ না  
দিলে মানসিক এতটা উন্নতির সম্ভাবনা ও  
সুযোগ ঘটিত না। কেন না শরীর বলের  
সাধারণ্যই মন কার্য্য করিয়া থাকে।

আমার আসন্ন কথা ত প্রায় বলিয়া  
ফেলিয়াছি, কিন্তু তবু বুঝি বেশ দৃঢ়তর  
করাইতে পারি নাই—এমন আশঙ্কা হইতেছে!  
মনে হয় এত অল্পস্থানে অতবড় বিষয়টা চাপিয়া  
ঠাসিয়া ভরিতে যাইয়া তাহার অঙ্গসৌষ্টব্য সমাক-  
রক্ষা করিতে পারি নাই। কেবল theoryটাই  
যেন বলা হইয়াছে, কিন্তু উদাহরণ দ্বারা বিষয়টা  
সরল করিতে পারি নাই। এবার তাই হিন্দুর  
নিত্য কার্য্যকলাপের মধ্য হইতে কয়েকটি  
উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া আমার বক্তব্যকে  
বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মণের দিনচর্য্যা একটা অত্যাবশ্যক  
ধর্ম্ম। ত্রিসন্ধ্যা না করিলে ব্রাহ্মণ মহাপাপকে  
নিমগ্ন হয়। এই আত্মিক ধর্ম্মের সহিত স্বাস্থ্য-  
রক্ষা কি সুসংগঠিত! ব্রাহ্মমুহুর্ত্তে শব্যাতাগ  
ইংরাজী Early rising এর পূর্ণ সমর্থন।  
হর্য্যোদয়ের পূর্বে প্রাতঃস্নান নিরাময় দেহ  
প্রদান করে।

প্রভাতে মধুর ভ্রমরগুণ্ডন প্রবণ করিতে  
করিতে সুরভিকুসুম চরনে সুগণ্ড-স্বন্দেহ ও  
প্রফুল্ল মন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রভাতের স্নান  
বিহগকুজল যখন বর্ণোৎকীর্ণা: নিকট ধর্ম্মীয়  
শব্দিত করিয়া তোলে, ‘বন্ধারে বন্ধারে’ নদীর  
বকের উপর দিয়া হর্য্যের নিকট আস্থান প্রেরণ  
করে, মন কি তখন আনন্দান্বিত হইয়া

করিয়া উঠে না? একটা স্নানের প্রেরণা কি  
ব্রাহ্মণের বৃক্ক আসিয়া মধুরে বাজিতে থাকে  
না? এই বিজনে প্রকৃতির নগ্নকোলে এমন  
পারও কে আছে যে—ঈশ্বরকে :বারেকের  
জন্তও স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে? তার-  
পর তীর্থমূলে বসিয়া বেদগান করিতে করিতে  
বধন ব্রাহ্মণ দেখে—গরিমময় সূর্য্য সুনীল  
আকাশের পূর্ব্বভাগে রক্তিমরাগে ভাঙিয়া  
ফাটিয়া পড়িয়াছে, আর এদিকে পাদমূলে কুল  
কুলধরে নদী যেন তারই উদাত্ত সঙ্গীতের  
সহিত তাল রাখিয়া বাজাইতে বাজাইতে  
বন জসীমের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন  
পূজার আর কি বাকী? মন্তোচ্চারণ তখন  
নিমরক্ষা মাত্র। প্রফুল্ল মন, প্লবিত শরীর  
তখন আপনাপনি বালরবির গরিমার তলে  
চলিয়া পড়ে, হাতের ফুল পরম পিতার চরণে  
একটা দিনের একান্ত পূজার নিদর্শনস্বরূপ  
লাগিয়া থাকিবার জন্ত আপনাপনি খসিয়া  
পড়িয়া সলিলে ভাসিয়া চলে।

তারপর সন্ধ্যার অম্লতানগুলি সমস্তই  
স্বাস্থ্যরক্ষার নিত্য জলসেচন দ্বারা স্নিগ্ধ ও  
পবিত্র করিয়া লয়; রাত্রির, মধ্যাহ্নের ও দিবা-  
বসনের পাপায়ুশোচনা মনের কলুষনাশ করে,  
ত্রিবিধ গায়ত্রীর আব্বান আত্মাকে স্থির করিয়া  
দেয়। এইরূপ ভক্তিতে একই দিনের মধ্যে  
তিন তিনবার সন্ধ্যাপাসনায় নিরন্তর হইলে আর  
কি মন পাপ-প্রবল হইয়া স্বাস্থ্যহানি করিতে  
পারে?

তারপর হিন্দুর ঐতিহ্যবাহী সহিত ও  
যেহা কি স্বন্দর সম্বন্ধ! অমাবস্তা-পূর্ণিমার  
দিন রসেব, শৈত্যের পূর্ণাবির্ভাব হয়, তখন  
স্বন্দরের দ্বন্দ্ব হয় উপবাস দাও, নয় অন্ততঃ

নিশিপালন কর। এইরূপ মাসের মধ্যে তিথি-  
বিশেষে, পক্ষবিশেষে, ব্রত নিয়মকে উপলক্ষ্য  
করিয়া দুই চারিটা দিন উপবাস করিলে বা  
নিরামিষাহারী হইয়া অর্দ্ধাশনে সংযম অবলম্বন  
করিয়া থাকিলে বৎসরভোর, জীবন ভোর—  
সুস্থশরীরে ধর্ম্মাচরণ করিতে পাইবে। অতি  
লোভ, অমিতাহার, অবৈধাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে  
অহিতকর, তাই মহাপাপের দোহাই দিয়া শাস্ত্র  
এগুলি বর্জন করিয়াছে। সময়ভেদে আহারের  
ভেদাভেদ, আচারের বিভিন্নতা অত্যন্ত সমীচীন,  
তাই শৈত্যকালে গুরু বা উষ্ণদ্রব্য, গ্রীষ্মকালে  
স্নিগ্ধ ও শীতলদ্রব্য গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।  
ভাদ্রমাসের বুড়া লাউ, মাঘমাসের মূলা ভক্ষণ  
করা কেন শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ, বোধ হয় এবার  
তাঁহা সহজবোধ্য। বারবিশেষে মংস্ত, মাংস ও  
জ্বাসন্তোগ ইত্যাদি এই নীতি-অনুসারেই  
বর্জনীয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার এই সব আচরণ যে প্রায়শঃই  
মহাপাপের দোহাই দিয়া শাস্ত্রকারগণ নিষেধ  
করিয়াছেন, তাহার কারণ হিন্দু চির চির-কাল  
ধর্ম্মভীরু। প্রাণকে সত্য মূল্যবান মনে করে  
না—যত মূল্যবান তার ধর্ম্মকে মনে করে।  
ধর্ম্মের ছয়ারে চিরকাল সে আত্মবলিদান দিয়া  
আসিয়াছে। যে কার্য্যেই যখন ধর্ম্মের হানির  
সম্ভাবনা হইয়াছে সেইখানেই তখন হিন্দু  
অবনত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই  
মহাপাপের সম্ভাবনার ইঙ্গিতে হিন্দু এই লম্বত  
বিধি-নিষেধকে এতকাল মানিয়া চলিয়াছে।  
আজ যদি সে বিদ্রোহী হইয়া থাকে, তাহা পদ-  
শিক্ষা, পরধর্ম্মের অঙ্গকরণে। হিন্দু যদি কোন  
দিন আপনাকে দেখিতে শিখে, তবে বুঝিবে এ  
বিধি-নিষেধ মহাপাপের ভয়েই হটক বা  
কর্তব্যবুদ্ধির অগ্ররোধেই হটক মানিয়া চলিয়া

তাহার পক্ষে হিতকর, নতুবা স্বাস্থ্যের সমৃদ্ধি অবশ্যস্বাভাবী। আজিকার পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের যুগে ছফের সহিত লবণ ভক্ষণ বা কাংসপাত্রে অন্নভোজন যে মাত্রেরও মহাপাপের সঙ্গে সংযুক্ত এ কথা কেহই বিশ্বাস করিতে চাহে না, কিন্তু অমৃততুল্য, দুগ্ধ—লবণপ্রয়োগে যে গুণহীন ও বিযাক্ত হয়, কাংসপাত্রে অন্ন রাখিলে যে নীলবর্ণ বিযাক্ত এক প্রকার লবণের উদ্ভব হয়—একথা আধুনিক বিজ্ঞান নিজেই মানিয়া লইয়াছে। কতকগুলি অল্পজ্ঞানের প্রত্যক্ষফল আবার বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র সাহায্য ব্যতিরেকে শুদ্ধ সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকের বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব কেন গঙ্গার শুদ্ধ মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করিত—তাহা মৃত্তিকা সর্কাক্ষে লেপন করিয়া কুণ্ঠিত করিয়া সূক্ষ্ম দেহপ্রাপ্ত মানুষকে দেখিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। হিন্দুর সমস্ত বিধি-নিবেদ আমি জানিও না, আর জানারও বোধ হয় এক্ষেত্রে বিশেষ আবশ্যকতা নাই। তবে যাহা জানি, তাহা দেখিয়া আমার সেই পূর্ব বিশ্বাসই দৃঢ় হইয়াছে যে ‘শরীরমাংসং’ হিন্দুশাস্ত্রার্থ্যার মূল সত্য।—হিন্দুর আচার পদ্ধতিকে উপেক্ষার হাসিতে উড়াইয়া দেওয়া কোনোক্রমেই বিবেচনার কাজ নহে। হইতে পারে—(যেমন সর্বত্র হয়) কালক্রমে অনেক অমূলক বিধিনিষেধ ব্যক্তি বিশেষের কারসাজিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া বিশেষ না জানা পর্যন্ত কোনো বিধিরই লঙ্ঘন বা অন্ততঃ উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ এ কথা সত্য যে সেকালের হিন্দু চরমবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বল প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ তার অধঃপতিত বংশধর অজ্ঞতার অন্ধকূপ হইতে তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে প্রারম্ভই অক্ষম। হয়ত

তাহার বিচারে আজ যাহা বর্জ্যনীয় বলিয়া ধরা হইবে—হিন্দুর হয়ত তাহাই একটা মহিমাময় আবিষ্কার ছিল। আজ তাই হিন্দুর বংশধরকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। তাহার উচিত আজ তার অতীত গৌরবকে বিশ্বাস করিয়া চলা—কারণ যজ্ঞের বিশ্বাসই মুক্তির উপায়; আজ তার উচিত—তার অতীত গৌরবকে, পোষণ করা—তার পক্ষপাত করা। তাহা হইলেই আজ তার পূর্ব পুরুষকে উপযুক্ত সম্মান করা হইবে। আমি যাহা বুঝি না, তাহাই যে মিথ্যা অজ্ঞতাসূচকধারণা—আজ যেন হিন্দুর পুত্র বক্ষে আর পোষণ না করে।

শেষ কথা, আমাদের যাহা ছিল, তাহা যেন আমার আশঙ্কায় না ঢাকিয়া জগতের প্রদর্শনীতে যাঁচাই হইবার জন্ত খুলিয়া রাখি। আমার বিশ্বাস, হিন্দুর অতীত আজিও কোনো সভ্য জাতির গরিমার নিকট হীনতার আশঙ্কায় মাথা হেঁট করিবে না। হিন্দুর এই ধর্মপালনে স্বাস্থ্যরক্ষা পৃথিবীর ধর্মোত্তিহাসে স্নানচিত্র একটা নূতনত্ব। এ নূতনত্ব অমৃতর করিতে, সমীকরণ করিতে পারে নাই বলিয়াই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি হিন্দুর অমর্যাদাকে useless penance বলিয়া নিন্দা করিতেছে। আজ যখন নূতন করিয়া জাগরণের দৃষ্টি বাজিয়া উঠিয়াছে তখন আমরা দেখাইতে চাই—বুঝাইতে চাই যে হিন্দুকে বাহিরের জাতি তোমরা বোঝ নাই, জান মাইনা? শিল তোমাদিগকে ঢের দিয়াছে। হিন্দু তোমাদের দিয়াছে—তার বিজ্ঞান, তার চিকিৎসা, তার দর্শন। হিন্দুর ব্রাহ্মণকে তোমরা *conservative* বলিয়া নিন্দা করিয়া নিরর্থনামী হইতে চাও? হিন্দুব্রাহ্মণ পীতাম্ব সার্বজনীন ধর্ম বিশ্বাসী বন্ধে জড়াইয়া ধরিয়াছে, যে হিন্দু ব্রাহ্মণ

ধর্মের দ্বারা বিশ্বমানবকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত  
করিয়া সামাজিক ধর্মরক্ষার উৎকৃষ্ট পন্থা  
দেখাইয়া দিয়াছে, যে হিন্দু চতুরাশ্রমের ধর্মে  
জানার্জনের নামে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া  
কেমন করিয়া ব্রাহ্মের পরিপূর্ণ অমৃতভূতি লাভ  
করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে হয়—তাহা শিখাইয়া দিয়া  
জগৎবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে,—

"যে দিয়াছে বেদ, যে দেছে পুরাণ অমর  
কাব্য কথা

যে নামাবে আনি স্বরগের বাণী  
হরিয়াছে শোক বাথা ।"

তাহাকে তোমরা মিন্দা করিও না। তাহাকে  
তোমরা সকলে স্বীকার কর, তাহাকে বরণ  
কর, তাহাকে প্রণাম কর, আর তাহারই বংশ  
ধরকে তাহার অতীত। মহিমোজ্জ্বল আদর্শকে  
পুনরুদ্ধার করিবার উৎসাহ দিতে দিতে  
বল—

ব্রাহ্মণদেব ব্রাহ্মণগুরু, পতিতের তুমি প্রাণ,  
সম্রাট তুমি ধর্মরাজ্যো, ভারতের তুমি প্রাণ,

\* \* \* \* \*

নমো নমো নমো ব্রাহ্মণদেব, ধন্য ভারতভূমি  
ধন্য আমার জীবন জন্ম তব পদধৌচুমি।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এ.

## বিবিধ সংবাদ ।

— — \* — —

গোয়ালিয়ার যাত্রা ।—সিদ্ধিরার  
গজনাথ চিকিৎসার জন্ত 'আয়ুর্বেদ'র  
দ্রষ্টব্য সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী  
কুশল রায় কবিরর এম এ, এম বি গত ২২শে  
মাগষ্ঠ গোয়ালিয়ার যাত্রা করিয়াছেন। গত  
বৎসর এমনি সন্ধ্যা তাহাকে ইন্দোরের মহা-  
শয়ী চিকিৎসার জন্ত ইন্দোর যাইতে হইয়া-  
ছিল।

আয়ুর্বেদ সভা ।—গত ১৬ই আশ্বিন  
মাস ৭টার সময় কলিকাতা ৩নং কুমার  
ইলীতে "আয়ুর্বেদ সভার" ৮ম বার্ষিক তৃতীয়  
সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভার  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরজন

কর্তৃক রচিত প্রথমে একখানি উদ্বোধন সঙ্গীত  
গীত হয়। তাহার পর ঐ সঙ্গীত রচয়িতা কর্তৃকই  
"আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা" নামক একটা প্রবন্ধ  
সম্প্রদিত হয়। ঐ প্রবন্ধ স্থানান্তরে প্রকাশিত  
হইল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযুক্ত  
পাঁচকড়ি রায় বি,এ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহন  
মজুমদার কাব্যতীর্থ এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত  
সুরেন্দ্র কুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ  
ঐ প্রবন্ধ অবলম্বনে বক্তৃতা করিয়া উহার  
সমর্থন করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদার  
নাথ কাব্যতীর্থ ও সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত  
শ্রীমানদাস বাচ্চস্পতি মহাশয়—যে বক্তৃতা  
করিয়াছিলেন, তাহা প্রবন্ধের প্রতিফল হইয়া

ছিল। সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে অল্প অধি-  
বেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন বলিয়া  
আমাদিগকে আশাবিত্ত করিয়াছেন।

**সর্ববিশেষ কুমিরোগ।**—ইংরাজী  
'হুকওয়ার্ম' রোগে অর্থাৎ সর্ববিশেষ কুমিরোগে  
এ দেশের ভীষণ অনিষ্ট করিতেছে বলিয়া  
বাক্সালার গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে সেনিটারি  
বোর্ড অর্থাৎ স্বাস্থ্য সংরক্ষণী সমিতির সভা-  
পতি মিঃ ষ্টিভেনসন্ মুরকে একখানি পত্র লিখিয়া  
এই ভীষণ ব্যাধির প্রতীকার প্রার্থী হইয়াছেন।  
আমরা লাট সীহেবকে এ জ্ঞাত ধন্যবাদ দিতেছি।

**মৃত্যু তালিকা।**—১৯১৭ সালে ভারত  
বর্ষে সর্প দংশনে মৃত্যু ২৪০০০, ব্যাঘ্র আক্রমণে  
১০০০, চিতাবাঘ দ্বারা ৩৮০, নেকড়ে ও  
ভালুকের আক্রমণে ২৩০, হস্তী ও তরঙ্গুর  
আক্রমণে ৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

**নূতন জ্বর।**—নূতন জ্বর বা সমর  
জ্বরে সমগ্র পৃথিবীর যে কি ভীষণ সর্বনাশ  
সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভার  
তের সকল স্থানেই এই জ্বরের পূর্ণ প্রভাব  
প্রকটিত। গত ১২ই অক্টোবর যে সপ্তাহ  
শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে এই রোগে  
কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা ১২১ জন কিন্তু তাহার  
পূর্বে সপ্তাহে মরিয়াছিল মাত্র ৪৫ জন। বঙ্গ-  
দেশের বাহিরেও এই রোগের আক্রমণে  
প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু কবলিত হই-  
তেছে। হাজারিবাগ, রাঁচি, নাগপুর, কুর্নাচি,  
মাদ্রাজ, দার্জিলিং প্রভৃতি নগরও এই জ্বরের  
আক্রমণে বিপর্যস্ত হইতে বসিয়াছে। জানি  
না, কতদিনে দেশ হইতে এই ভীষণ প্রাণহা-  
কর জ্বরের অবসান হইবে।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৩য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫—অগ্রহায়ণ ।

৩য় সংখ্যা ।

## কাজের কথা ।

—:~:—

অজীর্ণে বাঙ্গালী । —অজীর্ণে বাঙ্গালী দেশের হোক যত ভুগিয়া থাকে, এমন আর কোন দেশের নহে। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালী দেশে মৃত ৭৫ জন পুরুষ ও মহিলা অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। আজকাল যে গুজরা বা থাইসিসে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, একটু তলাইয়া দেখিলে, এই অজীর্ণ রোগই তাহার কারণ ।

\* \* \* \*

অজীর্ণের নিদান । —শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—অধিক জলপান, বিষম ভোজন অন্ন ভোজন, বহু ভোজন ও অসময়ে ভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবা নিদ্রা, দিবা জাগরণ—এই সকল কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে অধিক জলপান এবং রাত্রি জাগরণেই সহর বাসীর অজীর্ণ বর্ধিত হইতেছে। চা এবং সোডা-লোমোনেডের কল্যাণে কলিকাতায় অধিক জলপান অবস্থ-

স্তাবী হইয়া পড়ে। আর রাত্রি জাগরণ,—তাহার আয়োজনও নানাপ্রকারে। এ অবস্থায় বাঙ্গালায় অজীর্ণ বৃদ্ধির যথেষ্ট কারণই বর্তমান রহিয়াছে।

\* \* \* \*

ছাত্র জীবনে অজীর্ণ-বাহুল্য । —অজীর্ণ বাহুল্যের প্রধান স্থান কলিকাতা এবং অজীর্ণপ্রবণপুরুষদিগের মধ্যে কলিকাতা প্রবাসী মফঃস্বলের ছাত্রগণের সংখ্যাধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ছাত্রজীবনে এই অজীর্ণের সঞ্চায় মাত্র আরম্ভ হইয়া, ক্রমশঃ জীবনে উহার পূর্ণ প্রভাব যখন প্রকটিত হয়, তখন উহা একেবারে হুরারোগ্য হইয়া পড়ে। এই ছাত্রজীবনে অজীর্ণবাহুল্যের প্রধান কারণ—চা, সোডা, লোমোনেড প্রভৃতি পানীয়ের অত্যধিক ব্যবহার। ইহা ভিন্ন আর একটা কারণে ছাত্রজীবনে অজীর্ণ বাহুল্য বৃদ্ধিভেদে—যেটি ব্রহ্মচর্যের অন্তর্ভুক্ত। সে

কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। বাস্তবিক স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে সকল বিষয়েই সংযমী হওয়া একান্ত আবশ্যিক! সকল রোগের কারণই সংযমের অভাব।

\* \* \* \*

**সেকালের বাঙ্গালী।**—সেকালের কথা তুলিলে অনেক কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে—বাঙ্গালীর প্রাতঃকৃত্যের কথা, পূজা আহিকের কথা, স্নান-ভোজনের ব্যবস্থা, শিক্ষা বা কর্মকালের সময় নির্দেশ—সকল বিষয়েই যে একটা স্বাস্থ্যরক্ষার শৃঙ্খলা সুসংবদ্ধ ছিল,— বাঙ্গালী এখন তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিবাহ সেকালে অল্প বয়সেই হইত, কিন্তু তিথি-নক্ষত্র বাছিয়া জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণমাসের মিলনকাল নির্দিষ্ট ছিল। এখন সে ব্যবস্থা তো একেবারেই অন্তর্হিত। সুকুমারমতি ছাত্রজীবনে সেকালে ধাতুক্ষয়জনিত, পাপসংস্পর্শের কোনো কারণই উপস্থিত হইত না, এখন চৌদ্দ বৎসরের একটি বাচ্চের মুখের প্রতি চাহিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—তাহার চক্ষুপ্রান্তে কালিমা পড়িয়াছে, গণ্ডস্থলে ত্রণ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, গলার স্বর বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর শিক্ষা-মন্দিরে রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়নের ব্যবস্থা! আমাদের দেশের অবস্থা শোচনীয় হইবে না কেন?

\* \* \* \*

**আহার ও স্বাস্থ্য।**—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পবিত্র আহার্যের একান্ত প্রয়োজন—একথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। পবিত্র আহারে যে চিন্তাভক্তি হয়—স্বাস্থ্যরক্ষা তাহারই ফলসম্পত্ত। সেকালের বাঙ্গালী অজীর্ণরোগ গ্রস্ত ছিল না—দৌর্যলোর নাম তাহার জানিত না—এখনকার মত এক পোয়া পথ

যাইবার জন্য তাহাদিগের যে ট্রাম-অবধান-মোটর গাড়ীর প্রয়োজন হইত না,—পুষ্টিকর আহার্যভক্ষণই তাহার প্রধান কারণ। অনেক কারণে দেশ হইতে সে পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা লোপ পাইয়াছে। ফলে নানাকারণে দেশের যে বড় দুর্দিন ঘটয়াছে—ইহা খাটি সত্য কথা।

\* \* \* \*

**দুগ্ধ ও ঘৃত।**—দুগ্ধ ও ঘৃত বাঙ্গালীর সর্ব প্রধান আহার্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখন সে দুইটির প্রচলনই—বাঙ্গালী দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সে কালের বাঙ্গালী প্রাতঃকালে ধারোষ্য দুগ্ধ পান করিয়া বল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিত, এখন তাহার পরিবর্তে চায়ের প্রচলন হইয়াছে—দুগ্ধপানে বায়ু পিত্ত কফের প্রশমন হয়, সদ্যঃ গুরু সঞ্চয় হয়, জীবনশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আয়ুর্বেদে ইহা সকল প্রাণীর সান্ধ্য, বৃহৎ, বলকারক, মেধাবদ্ধক, উৎকৃষ্ট বাজীকরণ, বয়ঃসংস্থাপক, আয়ুষ্ক, দেহস্থ পদার্থ সকলের সংশ্লেষকারক ও রসায়ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর এখন দুগ্ধের মত অমৃত অকিচিৎ বাঙ্গালী অজীর্ণগ্রস্ত হইয়া ক্ষীণ হইবে না তো হইবে কাহার?

\* \* \* \*

**বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ।**—প্রকৃতই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। শিশু জীবন হইতেই পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-হানি ঘটতেছে, যৌবনে সহজ রোগে ক্রিয়াও তাহার আর পুনরুদ্ধার ঘটিতেছে না উন্মার্গগামী। বাঙ্গালী বর্তমানের পূর্ব-স্বভাব প্রাপ্ত হইবে,—সকল রোগের কারণ-পরিহার—সকল রোগের নিবারণ



নানাধর্মের সকল বিষয়েই যে পর্য্যন্ত  
জ্ঞানী আবার সেকালের মত চলিতে না  
ধরিলে, ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষার  
সাধ বিধান কিছুতেই হইবে না। এক  
ধর্মের বাঙ্গালীকে সকল বিষয়েই আবার  
পারেক চালে চলিতে হইবে সাবেক  
কতিপয় ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্ত সংঘর্ষ হইতে  
হবে—কুসুমধ্বজমার বালাজাবন যাহাতে  
গটনষ্ট না হয়—তাহার প্রতি সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ্য  
কিতে হইবে,—তবেই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যস্থ  
সাধন দ্বিরিয়া আসিবে, নতুবা সহস্র সহস্র  
ঔষধ সেবন কর—তাহাতে কিছুই সফল লাভ  
হইবে না।

\* \* \* \*

ঔষধে আরোগ্য ।—ঔষধে রোগ  
সংযোগ্য হয় না,—রোগ আরোগ্য হয়—  
নয়নে। ঔষধ—রোগ হইলে উপদ্রব সকলের  
প্রতীকার করে মাত্র। এখনকার দিনে নানা-  
ধর্মের বাঙ্গালীর শরীর যেরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত  
হইতেছে। তাহাতে সেই ক্ষয়ের মূল কারণ  
যে না কবিয়া ঔষধের দ্বারা উপদ্রব দূর করিয়া  
করদিন তাহাকে জাবিত রাখা যাইতে  
পারে। অনেক সময়ে অজীর্ণ এবং ধাতু  
দৌর্ব্বল্যপ্রাপ্ত অনেক উৎকট রোগী এই জন্তই

নানাপ্রকার ঔষধ সেবনেও বিফলমনোরথ  
হইয়া থাকেন। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

“ব্যাধেস্তম্ভঃ পরিজ্ঞানং বেদনাশ্চ নিগ্রহ  
এতদ্বৈতম্ভ বৈতম্ভং ন বৈতম্ভঃ প্রভুরায়ু সঃ।”  
অর্থাৎ ব্যাধির উপদ্রব দূর করাই বৈতম্ভের  
কার্য্য,—বৈতম্ভ কখন আয়ুর প্রভু হইতে পারেন  
না। এ অবস্থায় এখনকার দিনে বাঙ্গালী যে  
নিজ কৃতকর্ম্মের ফলে আয়ুক্ষয় করিতেছে,  
বৈতম্ভ তাহার প্রতীকার করিবেন কি ?

\* \* \* \*

কর্তব্য নির্দেশ ।—যাহা ইউক  
আমাদের এখন কর্তব্য নির্দেশের সময় আসি-  
য়াছে। ব্যাধি উপস্থিত হইলে ব্যাধি প্রশমনে  
সচেষ্ট হওয়া অপেক্ষা যাহাতে ব্যাধি কতৃক  
আক্রান্ত হইতে না হয়, আমাদিগকে এখন  
তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। সনাতন আয়ু-  
র্বেদ শাস্ত্রেরও ইহাই উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য  
সিদ্ধির জন্তই স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে সদাচারবিধি  
প্রবর্তিত। প্রত্যেক বাঙ্গালী-অভিভাবক এ  
সকল কথা মনে রাখুন,—এ সব কথা মনে  
রাখিয়া নিজেদের সংযম ব্রত অবলম্বন করুন,  
তবেই বাঙ্গালীবংশধরগণ সংযম শিক্ষালাভ  
করিয়া নীরোগ ও দীর্ঘজীবনলাভে সমর্থ  
হইবে।

ত্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ।

## আয়ুর্বেদে—খণ্ডপ্রলয় ।\*



সে একদিন ছিল—যেদিন সাহিত্য-দর্শন-  
ইতিহাস-পুরাণ-শিল্প-বিজ্ঞান-চিকিৎসা-জ্যোতিষ

—সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ সমুন্নত হইয়া  
সকল দেশের শীর্ষস্থান অধিকারে গর

\* কলিকাতা-আয়ুর্বেদ সমাজ ৮৮ বার্ষিক বর্ষ সাধারণ অধিবেশনে গঠিত। তারিখ ২০শে ফাল্গুন, ১৩০৬।

প্রকাশ করিতে পারিত। সে একদিন ছিল—  
যে দিন ব্যাস-বাল্মিকীর সাহিত্য-রচনায় চমৎ-  
কৃত হইয়া বিশ্বদমণ্ডলী মন্থমুগ্ধের মত তাঁহাদের  
বাক্যশ্রুধা পান করিবার জন্য উদ্গীব হইয়া  
থাকিত। সে একদিন ছিল—যে দিন মন্থ  
পর্যায়ের দেশরক্ষার জন্য—দেশ মাতৃকার  
সন্তান-সন্ততিগণকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে  
রক্ষা করিবার জন্য স্রমধুর শৌকগন্থনে যে  
সব নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, অবশ্য প্রতি-  
পাল্য মনে করিয়া ভারতের তাবৎ অধিবাসীই  
সে সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবার জন্য  
প্রস্তুত হইত। সে এক দিন ছিল—যে দিন  
ভারতে এখনকার মত শিরশিক্ষার জন্য কোনো  
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, অথচ বিশ্ব-  
কন্ধ্যার মত শিরশিষ্য-পুরুষের কীর্তিকলাপ  
আজিও সমগ্র জগতকে বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ  
হইতেছে। বিজ্ঞানের কিরূপ চর্চা ছিল—  
খুতরাই সঞ্জয়-সংবাদেই তাহা সুপ্রকট।  
আর চিকিৎসা—তাহার উন্নতি ভারতে যেরূপ  
হইয়াছিল, সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেরূপ আর  
কোনো দেশে কখন হইবে কিনা সন্দেহ।

আমি গত মাসের অধিবেশনে “আয়ু-  
র্বেদীয় চিকিৎসা” শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ  
করিয়াছিলাম,—এক সময়ে সমুদ্রত আয়ু-  
র্বেদীয় চিকিৎসা অধুনা যে রূপে অধঃপতিত  
হইয়াছে, তাহার পুনরুন্নতির পন্থা-নির্দেশ  
করাই সে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। যাহারা সে  
প্রবন্ধের পোষকতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা  
আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন বলিয়া আমি  
তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু  
যাহারা তাহার প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ  
করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উত্তরে আমার কিছু  
বলিবার আছে,—আমার অন্তকার আলোচ্য

বিষয়েই সে সকল কথার উত্তর দেওয়া  
হইবে।

প্রথম কথা—‘আমাদের ছিল সব’—এ  
কথার পৌনঃপুনিক আবৃত্তি আশ্চর্যব সর্বদাই  
শুনিয়া আসিতেছি, সুতরাং আমাদের ‘সকলট  
ছিল’—ইহা সত্য, কিন্তু ‘ছিল’ বলিয়া যাহা  
গিয়াছে—তাহার কি পুনরুদ্ধার করা কর্তব্য  
নহে? বায়ু পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া,  
আমরা সর্বজ্ঞ বলিয়া আশ্বালন করিলেই কি  
আমাদের লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার  
কীর্তিকলাপ আবার আমরা ফিরাইয়া আনিতে  
পারিব? জানি,—বায়ুর প্রকৃতি, পিত্তের  
গতিনির্দেশ এবং কফের রিতস্থাপনে জ্ঞান  
থাকিলে চিকিৎসায় কৃতিত্ব লাভ করিতে  
পারা যায়, কিন্তু সেই নাড়ীজ্ঞানে দীর্ঘ  
লাভ একেবারে যে কাহারও নাই—এরূপ কথা  
আমি বলিতেছি না,—কিন্তু সকলের আছে  
কি না—তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি  
কি? আমি পূর্বেই বলিয়াছি—সে একদিন  
ছিল,—যে দিন সাহিত্যদর্শনাদির মত  
চিকিৎসা বিজ্ঞানও একটা যুগ-প্রদায়  
উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।  
তাহারই ফলে সেকালের চিকিৎসকদিগের  
অনেকে সুস্বব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, ছ  
মাস পূর্বে তাহার অস্তিত্বের কথা বলি  
দিতেন। খুব বেশী দিনের কথার কাজ নাই  
—আমাদের এক পুরুষ পূর্বেও নাড়ীজ্ঞানে  
সিদ্ধিলাভের পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি  
কিন্তু সত্য করিয়া বলুন দেখি—এখন  
নাড়ীজ্ঞান করণের আছে? বায়ু-পিত্ত-  
কফের দোহাই দিয়া মুখে-কণ্ঠেই করিতে  
চলিবেনা, যুতা-রোগ-পীড়িতের আছে  
কতক? পরে

কি এখনকার কবিরাজ নামধারী সকল চিকিৎসকই যুত্বার পূর্ব দিন পর্যন্ত নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন? বায়ু-পিত্ত-কফ-নির্ণয়ে বাঁগার জ্ঞান আছে, তাঁহার নিকটে যুত্বাকাল নির্দেশ করা অসম্ভব হইবে কেন? সুতরাং অধুনা আমরা অনেকেই যখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, তখন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সকলই আছে বলিয়া আমাদের বৃথা আশ্বাসন করা কর্তব্য কি? রন্ধনব্যবসায়ীর মত হীন কর্মে নিরত কোনো ব্রাহ্মণের উন্নতন তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ চতুর্বেদবিশারদ ছিলেন বলিয়া তাহার অভিজ্ঞাত্যের গর্ব-প্রকাশ যেমন বাতুলতার পরিচায়ক, অধুনা অনেক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের অবস্থাও যে তদ্রূপ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ফলে এই অবস্থান্তরে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুদ্ধারের যে বির ঘটিতেছে—তাহার দূরীকরণ নির্দেশই এক কথায় আমার বক্তব্য।

চিকিৎসা যে মতেই করা হউক, শারীর তরে জ্ঞান থাকা একান্ত কর্তব্য। যেমন বর্ণ পরিচয়ে জ্ঞান না থাকিলে কোনো পুস্তকই অধ্যয়ন করা চলে না, সেইরূপ শারীর যন্ত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য্য সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন না। তবে শারীরতত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসকের ঔষধেও রোগ-বিশেষে যে সুফল পাওয়া যায়, তাহার জন্ত আশ্চর্য্য হইবার কোনো কারণ নাই, কেননা সেটি পঞ্জাগ্রামের কোনো কোনো মহিলা যেরূপ ঘাঁটারটি মুষ্টিযোগে কখনো কখনো কোনো কোনো রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন,—সত্য কথা বলিতে গেলে তাহারই অসুস্থরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সুচিকিৎসক মাঝেই একথা স্বীকার করিবেন। যে, রোগ অনেক সময় বিনা

চিকিৎসাভেও আরোগ্য হইয়া থাকে,—হোমিওপ্যাথি তো এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই প্রচারিত। এরূপ অবস্থায় আমি চিকিৎসার সকল বিষয় শিক্ষালাভ করি নাই—অথচ আমার ঔষধে অনেক রোগ আরোগ্য হইতেছে বলিয়া আমার গর্ব করিবার কিছুই নাই। গর্ব করিবার তো কিছুই নাই, বরং যে কার্য্যে ত্রুটি হইয়াছি—তাহাতে সম্যক জ্ঞানলাভ করি নাই বলিয়া দুঃখ করিবার আছে। আমার বক্তব্য—এক কথায় সেই দুঃখ প্রকাশ। আমি নিজের ইহার জন্ত সন্তুষ্ট এবং আমার ঋণ চিকিৎসকগণও যাহাতে এজন্য সন্তুষ্ট হন—ইহার ব্যবস্থাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

গত অধিবেশনে কথা উঠিয়াছিল—“শল্য চিকিৎসা আয়ুর্বেদের অঙ্গীভূত হইলেও এখনও সে শিক্ষার সময় আমাদের আসে নাই,—কায়চিকিৎসায় সম্যক সিদ্ধিলাভের পর—অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর গত হইলে আমাদের সে শিক্ষা লাভের সময় আসিবে।” কিন্তু এক কথার অর্থও আমি আদৌ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। মহাত্মা সুশ্রুত যখন ধবস্তুরির অবতার দিবোদাসের নিকট শল্যচিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন কি কায়চিকিৎসা শিক্ষা করেন নাই? সুশ্রুত সংহিতায় শারীর বিত্তা, শারীর তত্ত্ব, নিদান, শল্যতত্ত্ব, ধাত্রীবিত্তা, জীৱোগ, অঙ্গবিধি, অগদ, কৌমারভূতা, শস্ত্রসাম্য, চিকিৎসা, ইজ্জদবিজ্ঞান, ব্যাক্রান্তি, ভৈষজ্য বিধান, ভূতবিত্তা, রসায়ন—চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বিষয়েরই তো পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের সূক্ষ্ম হেতুবাদ, উপনিষদের তত্ত্বসঙ্গী—গভীরতা, বিজ্ঞানের বাস্তব রহস্য—সুশ্রুতের প্রত্যেক অধ্যায়ে সুপ্রকাশিত। সুশ্রুত—কি অঙ্গচিকিৎসা—কি কায়চিকিৎসা—চিকিৎসার

সকল অপ্সেই সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়া তবে চিকিৎসা কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমরা আজি সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি। সুতরাং সেই দুর্গতি দূর করিতে হইলে,—আমরা যাহা ছিলাম, আবার তাহা হইতে হইলে—আমাদিগকে কার্যচিকিৎসার মত শল্য চিকিৎসা একান্তই শিক্ষা করিতে হইবে, আমাদের লুপ্তরত্ন ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—আমাদের জ্ঞানগভীরগবেষণা তবেই লোকলোচনে আবার ফুটিয়া উঠিবে,—নতুবা এ চিকিৎসার অবনতি যাহা হইয়াছে, তাহাশিক্ষা আরও দুর্গতি অবশুস্তাবী।

সেদিন আর একটি কথা উঠিয়াছিল—“যদি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে যাহারা তাহা শিক্ষা করিবেন, তাঁহাদিগকে ধ্বস্তুরি সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইবে এবং তাঁহা দিগকে কার্যচিকিৎসা করিতে দেওয়া হইবে না।” এখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক যদি এ কথা না বলিতেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমি কোনো উত্তর দানেই ইচ্ছুক হইতাম না, কিন্তু যিনি একথা বলিয়াছেন, তিনি এখনকারদিনে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগের শিরোভূষণ—আমাদের মাথার মণি, সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা চলে না।

সুশ্রুতের গুরু ভগবান ধ্বস্তুরি। এইজন্ত সুশ্রুত সংহিতাকে ধ্বস্তুরি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া অনেকে প্রচার করেন। ইহাদের মতে চরকসংহিতা আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কিন্তু পুরাণে আমরা দেখিতে পাঈ—

তন্তু গেহে সমুৎপন্নো দেব ধ্বস্তুরি স্তন্য।

কাশীমাজো মহারাজঃ সর্বরোগে প্রণাশনঃ।

আয়ুর্বেদঃ ভরদ্বাজাৎ প্রাপোহসতিষগজিতঃ।

তমষ্টধা পুনর্কস্তু শিষ্যেভ্যঃ প্রতাপাদয়ৎ॥

অর্থাৎ কাশীমাজ ধরের গৃহে ভগবান ধ্বস্তুরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সেই আয়ুর্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন।

এই পৌরাণিক কথা মানিতে হইলে আত্রেয় সম্প্রদায় ও ধ্বস্তুরি সম্প্রদায় এক হইয়া যায় না কি? সুতরাং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিলে সেই চিকিৎসকগণকে কার্যচিকিৎসা করিতে দেওয়া হইবে না কেন—ইহা তো আমার মাথায় আসিল না। যদি বলেন, মেডিকেল কলেজ হইতে যাহারা উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন—তাঁহারা কেহ কার্যচিকিৎসায়, কেহ বা শস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া কোনো সার্জেন যদি কিজিসয়নের কার্য করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যে তাহা করিতে দেওয়া হইবে না, বা তিনি তাহা জানেন না,—এমন কথা তো কখনো শুনি নাই। আমাদের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেহ শূলরোগের চিকিৎসায় বিখ্যাত, কাহারও বা তৈল-ঘূতে পাগলের চিকিৎসায় অতি সূক্ষ্ম ফল পাওয়া যায়,—কিন্তু তাহা বলিয়া সেই শূলরোগ আরোগ্যকারী বা উন্মাদরোগ নিবারক চিকিৎসক যে অস্ত্র চিকিৎসায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না—এমন কথা কিছু আছে কি? অষ্টক আয়ুর্বেদের প্রধান অঙ্গ শল্য চিকিৎসা শিক্ষা লাভ করিয়া যিনি কেহ শল্য চিকিৎসায় ফুটিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলেও তো আয়ুর্বেদের অতি প্রাচীন আবার ফিরিয়া আসিবে—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা

সকল পূর্ব-কীর্তি ফিরাইয়া আনিয়া এখনকার শারীরতত্ত্ববিদগণের নিকট সগৌরবে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে, শুধু বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে না,—সত্য সত্য তাহা দের দ্বারা জগতের আবার হিতসাধন হইবে ।

আর একটা কথা—বর্তমান মহাযুদ্ধে ইংরাজ এখন এদেশী সৈন্য লইতেছেন, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে বাহারা পদাতিক দলে প্রবেশ করিতেছে, তাহারা যদি বলে—আমরা আমাদের দেশীয় প্রথায় সড়কি বস্ত্রের চালনা করিব কিন্তু অসি চালনা করিব না—তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হয়—তাহা কি আর খুলিয়া বলিতে হইবে? বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া আমরা শুধু কায়চিকিৎসা লইয়া থাকিব—আমরা যদি ইহাই বলিয়া বসিয়া থাকি—তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কথিত পদাতিক সৈন্যের মত হইবে না কি? যিনি রক্ষন করিতে জানেন, তিনি আহারীয়ে র কতক দ্রব্য রক্ষন করিতে পারেন, আর কতক দ্রব্য বন্ধন করিতে পারেন না—তাহাকে পাক্য গ্রাধুনি বলা যায় না। পুরোহিত, গৃহস্থের প্রয়োজনীয় বস্তু-মাকাল হইতে দুর্গাপূজা পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া কক্ষে অধিকারী না হইলে তাহাকে, প্রকৃত পুরোহিত বলিতে পারা যায় না। গুরু, পুরোহিত এবং চিকিৎসক একদা হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারে যে সমর্থ ছিলেন, তাহাদের নির্দিষ্ট সকল কর্তব্যে কুশলতা লাভে সিদ্ধ হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। গুরু, পুরোহিত এবং চিকিৎসকের উন্নতিতেই এক সময় এদেশ উন্নত হইয়াছিল,—এখন এই ত্রিবিধ ব্যবসায়ীরই অধঃপতনে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। বাহা হউক নিজেদের কথা বলিতে

গিয়া অগরের কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই আমাদের আধ্যাতিকিৎসকদিগের পুনরুন্নতি করিতে হইলে অস্ত্রচিকিৎসায় আবার আমাদিগকে অধিকার লাভ করিতে লইবে,—জ্ঞানতের যুগ আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—আমরাই কায়চিকিৎসার জ্ঞান নাড়ী দেখিয়া বায়ু-পিত্ত-কফের নির্ণয় করিব—আমরাই ধাত্ত্রীবিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রসবকাল উপস্থিত হইলে প্রসববাধা দূর করিতে সমর্থ হইব, আমরাই শারীরতত্ত্বে সম্যক অধিকার লাভ করিয়া, প্রয়োজন হইলে ফোড়া কাটিবার জন্ম অস্ত্র চালনা করিব—এ সকল ব্যবস্থা যতদিন না হইতেছে—ততদিন পর্যন্ত আমরা প্রকৃত চিকিৎসক বলিয়া বড়াই করিতে সক্ষম হইব না—ইহা সুনিশ্চিত—নির্ভাঁজ সত্য কথা।

কিন্তু কথা হইতেছে—আমরা অস্ত্রচিকিৎসা তুলিয়া গিয়াছি, এখন তাহা শিখিতে হইলে গুরুকরণ কাহাকে করা হইবে? গত অধিবেশনে আমি ইহার নিরাকরণ করিয়া এখনকার দিনে শারীরতত্ত্বে বাহারা অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট ইহা শিক্ষা করা উচিত—এই কথা বলায় কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহারা সেরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট আমার নিবেদন,—তাহাদের পুত্রকলত্রদিগকে এখন হইতে তাহারা ইংরাজী বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে নিরত হউন—কেন না, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সকল প্রকার শিক্ষা লাভই ব্রাহ্মণের নিকট করা কর্তব্য। ইংরাজ অধিকারে দেশের সকল বিষয়ের পরিদর্শনের সহিত শিক্ষাগার জালিতেও কেবল ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা লওয়া হইয়া

একাকার চলিয়াছে, সুতরাং আমাদের অপত্য-  
গণ শুদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শিষ্য স্বীকার  
করিবে—ইহা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই নিন্দার  
—তথা প্রত্যাবার্তাগী হইবার কথা। কিন্তু  
তাহা যখন আমরা চালাইতে কুণ্ঠিত হইতেছি  
না,—তখন ব্যবসায়ের পরিচালন কার্যে যাহা  
আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—তাহা শিখিবার জন্ত—  
এখনকার শল্যতন্ত্রবিদগণ পরদেশীয় চিকিৎসা  
কার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহাদিগের নিকট  
শিক্ষা করিতে হানি কি? পর দেশীয় চিকিৎসা-  
সার ও আর্থা চিকিৎসার যে বড় বেশী পার্থক্য  
নাই—পক্ষান্তরে আর্থা চিকিৎসা হইতেই যে  
সমস্ত চিকিৎসার উৎপত্তি হইয়াছে—এ সব  
কথা গত প্রবন্ধে আমি বিশেষভাবে বুঝাইয়াছি।  
যাহা হউক অত্র চিকিৎসা-শিক্ষার জন্ত আমা-  
দিগকে অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে, শল্য-  
তন্ত্রবিদগণের নিকট হইতে লুপ্ত রত্নের উদ্ধার  
করিতে হইবে, তাহার পরে আমরা নিজেরা  
শিখিয়া, আচার্য্য হইয়া আমাদের বংশধরদিগকে  
ইহার শিক্ষাদানে সমর্থ হইব। আয়ুর্বেদের  
উন্নতি করিতে হইলে ইহা ভিন্ন আর অজ  
উপায় নাই।

পুরাকালে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ যে  
শল্য চিকিৎসায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করি-  
তেন, সুশ্রুত সংহিতাই তাহার প্রমাণ। চক্ষুশ  
প্রকার স্বস্তিক যন্ত্র, কুড়ি প্রকার নাড়ী যন্ত্র,  
আটাশ প্রকার শলাকা যন্ত্র, পঁচিশ প্রকার  
উপযন্ত্রের বিবরণ, ক্রিয়া ও প্রতিকৃতির প্রকটন  
করিয়া, ছেদন, ভেদন, লেখন বিপ্রাবন, ব্যধন,  
আহরণ, এষণ ও সীবন প্রভৃতি কার্যের জন্ত  
যন্তলাত্র, বুদ্ধিপত্র, করণত্র, প্রভৃতি বিংশতি  
প্রকার অস্ত্রের বিবরণ ও প্রতিকৃতি প্রকাশ  
করিয়া, তাহার পর উহার প্রচার কামনার বৈজ্ঞ-

বিচারে তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—“শস্ত্রক্রিয়া  
ও স্নেহাদি ঔষধ প্রয়োগে যাহার অভিজ্ঞতা  
নাই, সে চিকিৎসার লোভবশতঃ রোগীর  
প্রাণনাশ করে। অতএব উপযুক্ত চিকিৎসক  
হইতে গেলে শস্ত্র ও কার্যচিকিৎসা—উভয়  
বিষয়েই পারদর্শী হওয়া কর্তব্য।” আমরা  
বিশ্বামিত্র-পুত্র-আচার্য্য-সুশ্রুতের সে কথা  
এখন ভুলিয়া যাইতেছি কেন? সেই অমূল্য  
উপদেশ ভুলিয়া যাওয়ার জন্তই আয়ুর্বেদে ধও  
প্রলয় হয় নাই কি? বিদেশীয় চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ  
নহে,—উহার মতৈস্থ্য ও অজ্ঞাপি সম্পূর্ণ হয়  
নাই,—ঐ চিকিৎসায় আজি যাহা উৎকৃষ্ট,  
কালি তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া প্রচারিত হইতেছে,  
কিন্তু সনাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা তাহা  
নহে,—ইহার চিকিৎসা-প্রণালী যেভাবে বিধি-  
বদ্ধ হইয়াছে, তাহার আর পরিবর্তন করিবার  
কখনো দরকার হয় না, পরিবর্তন করিবার  
ক্ষমতাও বুদ্ধি কাহারও নাই,—সেইজন্ত এই  
চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত,—এ চিকিৎসা-প্রণালী  
যে ভাবে প্রণীত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ও  
অত্রান্ত বলিয়া আমরা গর্স করিবার অধিকারী,  
কিন্তু শল্য চিকিৎসা লুপ্ত হওয়ার এ চিকিৎসার  
যে খণ্ডপ্রলয় ঘটয়াছে, তাহারই ফলে এ  
চিকিৎসাব্যবসায়ীগণ এখনকার দিনের শল্য  
তন্ত্রবিদগণের নিকট লজ্জিত। সেইজন্ত  
আমার বক্তব্য—আমুন আমরা ভেদবুদ্ধি  
পরিভ্যাগ করি। ভেদবুদ্ধি পরিভ্যাগ  
করিয়া—ষেব-হিংসা ভুলিয়া গিয়া, নিজেদের  
মঙ্গলের জন্ত—সমাজের কল্যাণের জন্ত—বৈজ্ঞ-  
চিকিৎসার কলঙ্ক-কালিকা অপসারণের জন্ত—  
চিকিৎসার লক্ষ্য অস্ত্রের শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ণ  
দেশে আবার চরক-সুশ্রুতের মত শিক্ষার  
আনিতে চেষ্টা করি।

তাদেই—কোনো বিষয়েই কর্তব্য নহে,—  
 বিশ্ব জীবন মরণের দায়ীত্বপূর্ণ কার্যে—  
 চিকিৎসা বৃত্তিতে তো একেবারেই কর্তব্য নহে।  
 —সুতরাং আমন, আমরা বিদ্যেপ্রণোদিত-  
 ভেদবুদ্ধি বিসর্জন সলিলে নিমজ্জিত করিয়া  
 খণ্ড প্রলয় হইতে সনাতন আয়ুর্কেদীয় চিকিৎ-  
 সার পুনরুদ্ধারে যত্নপর হই,—আমরাই  
 জগৎ আয়ুর্কেদের সকল অঙ্গের শিক্ষায়  
 সুপণ্ডিত হইয়া দেশবরেণ্য চিকিৎসক বলিয়া  
 পরিগণিত হই,—আমাদের দেখিয়া সমগ্র  
 জগৎ আবার স্তম্ভিত হউক, আমাদের পদ  
 বেৎসংস্পর্শে কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য বিশ্ববাসী  
 আবার বাধা হইয়া উঠুক। আমার  
 আয়ুর্কেদ! তোমার এক একটি শোকের  
 বংশাবতি দিগ্ভ্রমণ বহন করিয়া বিশ্ব  
 সংসারের সমগ্র প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষার

জন্ত যত্নপর হউক। আমার আয়ুর্কেদ!  
 তোমার অমূল্য সন্তান মণ্ডলীর স্মৃতি প্রদান  
 কর,—তোমার লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিয়া—  
 তোমার অষ্টাঙ্গ শিক্ষার পরিসমাপ্তি করিয়া—  
 তোমার কৃতি পুত্রগণ তোমারই চরণে যাহাতে  
 অঞ্জলী প্রদান করিতে পারে,—আমার আয়ু-  
 র্কেদ! আবার সেই ব্যবস্থা কর! দেশভক্ত  
 বৈদ্যসন্তান আবার জাগিয়া উঠুক,—সে  
 জাগরণে সুরলোক হইতে দেবনির্ঘোষ  
 তাহাদের মস্তকে নিক্ষেপ হউক,—কীর্তি-  
 কলাপে তোমার শিব্যমণ্ডলী অন্তর নিকট  
 অপরাঞ্জের—অক্ষর-অমর বলিয়া কথিত হউক  
 —ইহাই তোমার চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা।  
 আমার জীবনে ইহা ভিন্ন আর অন্য কামনা  
 নাই।

শ্রীমত্যাচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

## বালক রক্ষা।

—:~:—

আমাদের সন্তান সন্ততিগণ ক্রমশঃ বেক্ষপ  
 চকল হীনতেজ, খর্বাকৃতি, রুগ্ন ও মেধাহীন  
 হইয়া আসিতেছে, বোধহয় এরূপ দ্রুত অবমতি  
 এক ভাবতবর্ষ—বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশ ছাড়া  
 পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ হইতেছে না।  
 এইরূপ অল্পপাতে চলিলে আমাদের বংশ বে  
 অচিরে লোপ পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ  
 নাই। ইহা একবার স্থিরভাবে চিন্তা করিলে  
 আর চিন্তার কলকিনারা পাওয়া যায় না ও  
 হঠাৎ ভবিষ্যৎ ফল বড়ই ভয়ানক বলিয়া  
 মনে হয়। এখন নিজেদের দেহরক্ষা যেমন

প্রথম ও প্রধান কর্তব্য, সেইরূপ আমাদের  
 সন্তান সন্ততিগণকে ক্ষয়ের হাত হইতে রক্ষা  
 করাও সর্বপ্রধান কর্তব্য হইয়া পড়ি-  
 য়াছে। অথচ আমরা এবিষয়ে তত তৎপর  
 না হইয়া বিষয় ভোগে মত্ত হইয়া সংসারের  
 সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত ও লালসিত থাকিয়া এ  
 বিষয়ে এক রকম উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি।  
 সংসারের তাড়নায় অবশ্য আমাদের এ চেষ্টার  
 অনেক অন্তরায় রহিয়াছে—কিন্তু যতটুকু  
 করিতে পারি, ততটুকু করি না কেন?  
 বাহা হউক এখন দেখা যাক এ বিষয়ে আমাদের

চেষ্টা করিয়া কতটুকু করিতে পারি। যতটুকু আমাদের করায়ত্ত, ততটুকু অবধারণ করিয়া আমরা যেন কাল বিলম্ব না করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

ছেলেদের সংপথে আনিবার জন্ত এখনকার দিনে অনেক সভা সমিতি, অনেক বক্তৃতা, অনেক পত্রিকা প্রকাশ, অনেক উপদেশ দেওয়া হইতেছে, অথচ তাহাতে কাজ হইতেছে না কেন; ইহার কারণ অল্পসন্ধান করিতে হইবে। যাহার মূলে ধর্ম ও সত্য নাই, তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে না। আমাদের পুত্রকন্যাগণকে উন্নত করিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদেরকে উন্নত হইতে হইবে। আমাদেরকে স্বয়ং ধর্ম ও সত্যকে অবলম্বন করিয়া আত্মসংযম অভ্যাস দ্বারা আমাদের পুত্রকন্যাগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। কোন এক সাধুর নিকট—একটি কাশরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কোন দূর গ্রাম হইতে আসিয়া কাশরোগের ঔষধ প্রার্থনা করে। সাধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এই ব্যক্তি বড় মিষ্টদ্রব্য প্রিয় ও সেইজন্য বেশী পরিমাণে মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে। তাহার পর তিনি তাহাকে তাহার পর দিন আসিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি অতিকষ্টে দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তাঁহার নিকট আসিল। সে দিনও তিনি তাহাকে বলিলেন—“কাল আসিও।” সে ব্যক্তি তৃতীয় দিন আসিয়া আবার সেইরূপ উত্তর পাইয়া কিছু বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কাশের যন্ত্রণার উপশমের লোভ হেতু ও সাধুর ঔষধের গুণ বহুলোক মুখে শুনিয়া তাঁহার ব্যবস্থা ও ঔষধে দৃঢ় বিশ্বাস হেতু আবার চতুর্থ দিনেও অতি কষ্টে আসিল। তখন সাধু তাহাকে বলিলেন—

“বাবা যতদিন তোমার কাশ রোগ একবারে ভাল না হয় এবং একবারে ভাল হওয়ার কিছু দিন পর পর্যন্তও সর্বপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া ত্যাগ করিবে।” সে লোকটি শুনিয়া অবাক হইয়া বলিল—“বাবা এই যদি আপনার ব্যবস্থা ও ঔষধ হয়, তাহা হইলে প্রথম দিন বলিয়া দেন নাই কেন?” সাধু বলিলেন—“বাবা, আমার বাক্যের প্রভাব আনিবার জন্ত আমাকে এই কয় দিন মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ ত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং যে পর্যন্ত না উহা খাওয়ার ইচ্ছা একবার আমার মন হইতে অপস্থত হইয়াছে—ততদিন তোমাকে উহা ত্যাগের উপদেশ দিই নাই। আমি যখন স্বয়ং মনে মনে উহাকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন তাহার প্রভাব তোমাতে অর্পণ করিতে পারিব জানিয়া অল্প তোমাকে বলিলাম। যাও—মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া উপস্থিত ত্যাগ কর, তোমার কাশরোগ ভাল হইবে।” সেই ব্যক্তি আনন্দে সাধুর বাক্যের সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ ত্যাগ করিল এবং রোগ হইতে মুক্ত হইল। ইহার দ্বারা আমরা কি শিখিলাম? প্রথম—ভোগে রোগ উপস্থিত হয়। কোন দ্রব্য অপরিমিত ভাবে ভোগ করিলে তাহাতে রোগ হয় এবং সেই ভোগের লাগল ত্যাগ করিতে না পারার জন্ত সেই রোগ ভোগ করিতে হয় এবং রোগও ভোগের দ্বারা এবং সুপথ্য গ্রহণ, কুপথ্য ত্যাগ, তিক্ত ঔষধাদি ভক্ষণ ও অন্যান্য অনেক প্রকার সংযমের দ্বারা দূরীভূত হয়। সংসারে বাহিরে সুখ নাই, ভিতরে সুখ। সুখের সমস্ত জাহাজে আসক্ত না হওয়া এবং হৃৎকেন্দ্র দ্বারা তাহাকে বিরক্ত না হইয়াই ভিতরে সুখ



পাইবার পথ । দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে—  
 আদর্শ । যিনি যে বিষয়ে উপদেশ দিবেন,  
 তিনি সেই পথাবলম্বী স্বয়ং হইবেন । তাহা  
 না হইলে সেই উপদেশে কোন ফল হয় না ।  
 আমি নস্য ব্যবহার বা তামাক খাওয়া বা  
 চুরুট-সিগারেট-খাওয়ায় অভ্যস্ত—আমার পুত্রের  
 কাছে তাহাই করিতেছি—অথচ পুত্র অল্প বয়সে  
 বিড়ি বা সিগারেট পান করিতেছে দেখিয়া  
 তাহাকে ভৎসনা করিলাম বা মারিলাম, কিন্তু  
 তাহাতে তাহার বিশেষ ফল হইল না । কেননা,  
 ভয়ে হয়ত সে আগেকার মত বিড়ি সিগারেট  
 পান করিল না । কিন্তু সুযোগ পাইলে সে কখনই  
 তাহা হইতে বিরত থাকিবে না, অধিকন্তু  
 তাহা গোপন করিবার জন্ত তাহার সঙ্গে  
 আর একটা পাপের সৃষ্টি করিবে অর্থাৎ  
 আমি জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কথা বলিয়া  
 তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিবে । আমি  
 তাহাকে যদি ভাজার বার শিক্ষা দিয়া বলি—  
 “বাবা নম্র লইলে তাহাতে যে নিকটন বিষ  
 আছে, তাহাতে মস্তিষ্ক—যাহা আমাদের জ্ঞানের  
 আধার অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমরা সমস্ত  
 হস্তিয়েব ক্রিয়া অনুভব, স্মরণ, চিন্তন, ধ্যান  
 প্রভৃতি কাষ্য করি, তাহার ক্রিয়া ক্রমশঃ নষ্ট ও  
 হানবল হইয়া আসিবে,—তাহাতেও সে তাহা  
 হইতে বিরত হইবে না । এইরূপ যদি অল্প  
 বয়সে বিড়ি সিগারেট-পান করিলে বা পানের  
 সহিত দোক্তা খাইলে (যাহা আজকাল  
 স্ত্রীলোক এবং পুরুষদের মধ্যে একটা ভ্রম্যনক  
 বিব হইলেও অতি আদরের ও উপদেশে খান্ত  
 বা পানের মশলা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে )  
 শরীর নষ্ট করে বলিয়া উপদেশ দিই বা ঐ সব  
 ব্যবহার দ্বারা উদরের ও বুকের মথোর বস্ত্র  
 সকল কি প্রকার বিকৃত ও ক্রিয়াহীন হয়—

চিকিৎসা পুস্তক বা ছবি হইতে দেখাইয়া দিই,  
 অথচ আমি যদি স্বয়ং নম্র লই, তামাক বা  
 সিগারেট ব্যবহার করি ও আমার স্ত্রী পানের  
 সহিত দোক্তা ব্যবহার করেন অথচ আমরা  
 আমাদের পুত্রের নিকট ইহার কারণ  
 দেখাইয়া বলি যে, আমাদের বয়স হইয়াছে—  
 আমাদের অনিষ্ট করিবে না, কিন্তু তাহা হইলেও  
 আমাদের পুত্রগণ উহা হইতে বিরত হইবে  
 না । আজ কাল তামাক কোথাও নম্ররূপে,  
 কোথাও বিড়িরূপে, কোথাও সিগারেট-রূপে,  
 কোথাও দোক্তারূপে, ব্যবহৃত হইয়া শরীরের  
 ও সমাজের কি ভীষণ অনিষ্ট করিতেছে, তাহা  
 চিকিৎসকগণ বেশ বুঝিতে পারেন । আর  
 চিকিৎসকগণই বা বুঝিয়া কি করিবেন, অনেক  
 চিকিৎসককে তামাকের ভীষণ অনিষ্ট করি-  
 বার কথা বলিতে শুনিয়াছি অথচ তাঁহাকেই  
 পানের সঙ্গে দোক্তা খাইতে দেখিয়াছি ।  
 অজ্ঞ লোকেরা এই সকল দেখিয়া উহাতে  
 আরও রত হয়, তাহাতে যাহারা উহার অনিষ্ট-  
 কারিতা বুঝিয়াও উহা ত্যাগ করেন না—  
 তাঁহারা প্রকৃতই সমাজের অনিষ্ট করিয়া পাপ  
 পক্ষে লিপ্ত হন । এ বিষয়ে উপদেশ দিতে  
 হইলে ও কেবল কথায় বা তিরস্কারে চলিবে  
 না, আমাদের গকে উহা একবারে ত্যাগ  
 করিয়া তবে উপদেশ দিলে ফল হইবে ।  
 সাধুর বাক্যে লোকে বিশ্বাস করে কেন ?  
 কারণ তিনি ত্যাগী, নিজের সুখ-দুঃখের দিকে  
 না দেখিয়া পরের দুঃখের দিকে সাধুগণের দৃষ্টি  
 ও নিজের কষ্ট স্বীকার করিয়াও অন্তের দুঃখ  
 বিমোচন করা তাঁহাদিগের কার্য । শুধু সাধুর  
 প্রভাব থাকিলেই হইবে না, সাধুগণ প্রাণ  
 ব্যক্তিগণের সেই প্রভাবে বিশ্বাসও থাকে চাই ।  
 তবে এই বিশ্বাসের মূল কারণ হইতেছে—সাধুর

নিজের কার্যের উদাহরণ বা আদর্শ বা ত্যাগ ধর্মকে সর্বতোভাবে অবলম্বন। ধর্মই আমাদের দিগকে ধারণ কর্তে,—সেই ধর্মকে অবলম্বন করিতে শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, সেইজন্ত এ বিষয়ে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা না মানিয়া থাকা চলে না। শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন—“শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন—অত্যাচ্ছ লোকেও তাহাই করিয়া থাকে, তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া মানেন অচ্ছ লোকেও তাহারই অনুবর্তন করে।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদোবতরাজনঃ।

স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ততে ॥

শ্রীভগবানের কার্য না থাকিলেও তিনি স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়া লোক শিক্ষা দিয়াছেন। তাই আমাদের দিগকে যখন আমাদের পুত্র কন্যারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানে বা জানে, তখন আমাদের দিগকেও সাধুর জীবন বা ব্রতগ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না করিয়া আমরা বিনাসে গা ঢালাইয়া দিয়াছি, কামনার পূর্ব আবার হইয়া বসিয়াছি, একটু কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, একটু জ্বিতেন্দ্রিয় হইতে পারি না, একটু দয়া দেখাইতে পারি না, একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি না, একটু মন খুলিয়া শ্রীভগবান্ কে ডাকিতে পারি না, এরূপ অবস্থায় আমাদের সন্তান সন্ততিপণকে কি করিয়া ভাল করিতে পারিব? যাহা হউক যাহা হইয়াছে তাহা লইয়া এখন আর বাদানুবাদ বা দোষ দর্শনের সময় নাই,—যিনি যতটুকু পারেন, এরূপ যথার্থ গৃহস্থশ্রমের উপযুক্ত হইয়া নিজ পরিবারের মধ্যে সাধু বা রাজা বা বক্ষাকর্ভা হইয়া ইহার উপায় বিধান করিতে হইবে, এখনকার দিনে ইহাই আমাদের প্রধান কর্তব্য এবং ইহা ভিন্ন যে দেশ রক্ষার

অচ্ছ উপায় নাই ইহা স্থানান্তিত,—খাটি সত্য কথা।

পূর্বে গুরুগৃহে বাস করিয়া গৃহস্থশ্রমের উপযুক্ত হইলে অর্থাৎ সংযত দেহ, নির্মল চিত্ত ও ঈশ্বরপরায়ণ হইলে গুরু তাকাকে গৃহস্থশ্রমের উপযুক্ত মনে করিয়া গৃহস্থশ্রমে পাঠাইয়া দিতেন এবং তখনই দার পরিগ্রহাদি হইত। এখন সে দিন নাই। বাল্যকালে আমরা সে শিক্ষা পাই নাই, এক্ষণে কিছু সময়ের যেরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে এই বয়সেও গৃহস্থশ্রমের উপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়া, আমরা ঠেকিয়া যে টুকু শিখিয়াছি, তাহাই বড় মূল্যবান। আমরা তাহাই লইয়া ও শাস্ত্রের উদাহরণ লইয়া আমরা এক্ষণে কার্য করি। একজন সাধু আমাদের বলেন “বাবা আমরা ভাতমারা সন্ন্যাসী অনেক আছি, আমাদের দ্বারা বিশেষ কিছু হইতেচেনা, কতক গুলি ভাত দেওয়া সন্ন্যাসী তৈয়ার না করিতে পারিলে সন্ন্যাসের উন্নতির উপায় নাই”। সাধুর সেই কথায় আমাদের দিগকে গৃহস্থশ্রমে থাকিয়া এক্ষণে “ভাত দেওয়া সন্ন্যাসী” হইতে হইবে।

আমাদের প্রধান শত্রু কাম ও ক্রোধ, তন্মধ্যে কামই সর্ব প্রধান, কারণ কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধের উপত্তির হেতু হয়। এই কামকে আমাদের সর্বতোভাবে দমন করিতে হইবে। কিন্তু ইহার এমন প্রভাব যে কোন কৌশলে বা বলে ইহাকে পরাস্ত করা যায় না। যেমন শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ‘ভূতে’র সংহতা বলিয়া রাখ নান্ন করিলে ভূত পালায়, তেমনি যিনি কামের সংহতা বা সম্মোহবিভতা, তাহার নাম লইলে কাম পলায়ন করেন বা পরাস্ত হন। কামের প্রভাব বিষয়ে শ্রীভগবানের দ্বিগুণী উদাহরণ।

রক্ষার অঙ্গ ও প্রকাশ, বেদের বক্তা  
প্রকা প্রথমে পঞ্চনন ছিলেন, তিনি কামকে  
নষ্ট করিয়া তাহার ক্ষমতা কিরূপ হইয়াছে—  
পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজের উপরেই পরীক্ষায়  
দেখিলেন যে, যেমন তাঁহার মনে কামের প্রভাব  
দাঁড়িল—অমনি তিনি নিজ মানস কথার  
প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, হইবামাত্র সেই ভাব  
তাঁহার পবিত্র দেহে স্রষ্ট করিতে না পারিয়া  
তাঁহার পঞ্চম মস্তকটি উড়িয়া গেল। ইহাতে তিনি  
লোককে এই শিক্ষা দিলেন যে “বাবা আমার  
পুত্রী মাথাব একটা উড়িয়া গেল, তাহাতে  
বচ ক্ষতি হইল না, কিন্তু বাবা, তোমাদের  
একটা মণ্ডার যদি কামের প্রভাব আসিতে দাও  
—তাহা হইলে সেই একটা মস্তক উড়িয়া গেলে  
তোমার জ্ঞান কি থাকিবে? অতএব সাবধান  
২৩। শিব যখন বোর তপস্তায় নিমগ্ন—তখন  
বেদগণ নিজকার্য্য উদ্ধার অর্থাৎ তারকাসূত্র  
বধে ভক্ত মহাদেবের ঔরসজাত পুত্রের দ্বারা  
প্রদত্ত বসুর জন্ত তাঁহাকে উমার সহিত  
বিবাহ দিবার জন্ত কামকে পাঠাইয়া ছিলেন।  
এখানে কাম-রক্ষার প্রতি স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার  
করিয়া, নিজ বলের গর্বে রক্ষার শাপের কথা  
হুঁসিয়া বেদগোত্র মহাদেবের নিকট স্বীয়  
প্রভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া  
ছিলেন।

“হরন্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্য্যঃ তাহার  
পরেই আয়সংযম করিয়া জ্ঞানপত্র অর্থাৎ  
ইতার নেত্র দ্বারা “ভয়বশেষং মদনং চকার”।  
মহাদেব একটু অসাবধান হওয়াতে যে কিরূপে  
কাম আক্রমণ করিতে পারে—তাঁহার উদাহরণ  
দিয়া—পুনর্বার সংযম বায়ু বিক্ষাভিত জ্ঞানায়ি  
দ্বারা কামকে নষ্ট করিয়া তবে বিবাহ করিলেন  
ইহার দ্বারা মহাদেব জগৎকে এই শিক্ষা দিলেন—

যে, বিবাহ করিয়া সংসারশ্রমে প্রবেশ করিবার  
পূর্বে কামকে সম্পূর্ণ রূপে দমন করিতে  
হইবে। আজকাল বিবাহ কেবল সুখের  
লালসায় প্রণোদিত। ফলে তাহাতে ইন্দ্রিয়  
সংযমের সম্পূর্ণ অভাব। শ্রীভগবান্  
শ্রীকৃষ্ণও কামকে মোহন করিয়া তাহার  
প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া তবে বিবাহ  
করিয়াছিলেন। শ্রী লইয়া আমরা সংসারে  
কেবল সুখেরই কল্পনা করি। স্ত্রী যে সহ-  
ধর্ম্মিণী—একথা এখন একেবারেই কাহার  
কল্পনাতেও আসেনা। পুত্রার্থে ক্রিয়তে  
ভাৰ্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনঃ। এখন বিবাহ  
যে পরকালে প্রেতদেহের কষ্টের লাঞ্ছনের  
জন্ত—তাহা কেহ ভাবেননা। যতক্ষণ  
আমাদের এই দেহে দেহী বাস করিতেছেন,  
ততক্ষণই সেই পুরুষ জীবাত্মা কর্ম্মক্ষম, তত-  
ক্ষণ তিনি নিজের সুখ দুঃখ গাইয়া লইতে  
পারেন, কিন্তু সেই জীবাত্মা বিদেহ হইলে,  
কর্ম্ম করিতে না পারায় গতিহীন অবস্থা  
প্রাপ্ত হইয়া প্রেত অবস্থায় দুঃখ ভোগ করেন,  
সেই জন্ত সেই সময়ের পিপাসা নিবারণ—পুত্র  
দত্ত তর্পণ কালে এবং ক্ষুধা নিবারণ—পুত্র দত্ত  
পিণ্ড দ্বারা হয় এবং উপনিষদাদি সংগ্রহ পাঠে  
সেই পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিলাভ হয়।  
পুত্রের ইহাই প্রধান কার্য্য। তা’ এখনকার  
পুত্রের সে শ্রদ্ধা নাই বলিয়া যথার্থ শ্রদ্ধা  
হয় না এবং পরলোকে পিতামাতার কোন  
উপকার হয় না। পশুপক্ষী কোন স্বার্থের  
বশবর্তী হইয়া সন্তান পালন করে না,  
কিন্তু মনুষ্য লোভ এবং প্রতাপকারের বশবর্তী  
হইয়া পুত্র কামনা ও পালন করে,  
কিন্তু যদি সেই পুত্র হইতে এই  
আশাপূরণ না হয়—তবে পুত্রের

কি? আমরা যদি কেবল স্বার্থ ভাবিয়া পুত্র কামনা করি ও পুত্র প্রাপ্ত হই—তাহা হইলেও নিজের হিতের জ্ঞান ও যাহাতে সেই পুত্র সংপূত্র হয় তাহা দেখা কি উচিত নয়?—পুত্র সুস্থ, সবল, নীরোগ, ধার্মিক, দয়াবান্ এবং দৈবপরায়ণ হইলেই পিতামাতার সুখ ও সমাজের সুখ, নতুবা কেবল দুঃখময়। আজ কাল পুত্রের দ্বারা পিতামাতার কষ্ট বই সুখ হয় না, তাহার কারণ পিতামাতার দৌষ। সম্ভবতঃ হয়—তাহাও পিতামাতার দৌষ। কেননা, পিতামাতা ঐশ্বর্য্য বিলাসের মধ্যে খালি মগ্ন থাকেন বলিয়া সদৃশ্যায়িত পুত্র লাভ এখনকার দিনে আর দেখা যায় না।

মহামনা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ—দিলীপ রাজা পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম করিয়া পাপার্জ্জনে শাপগ্রস্ত বলিয়া পুত্র লাভ করিতে পারিতেছেন না ও বংশলোপ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাজাকে বনে গোচারণ পূর্ব্বক—ব্রহ্মচর্যা অবলম্বনে স্বাভিক গুণের বৃদ্ধির জন্ত সুরভি কন্তার সেবা করিতে বলিলেন। সেই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে—বিলাসের মধ্যে রাজসিক ও তামসিক ভাবে থাকিয়া—পুত্র হইলে সেই পুত্র অষ্ট-সুরেন্দ্র গুণযুক্ত হইয়া—প্রজাপালক ও প্রজারঞ্জক ও যথার্থ রাজা হইতে পারিবেন। বলিয়া, বশিষ্ঠ রাজাকে সপত্নিক বনে ব্রহ্মচর্যা আচরণ করিয়া গোচারণের ব্যবস্থা করিলেন। ভাবিয়া দেখা যাক—কোথায় সেই একাধিপত্য রাজ্যোচ্চয়ের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগের মধ্যে দিন কাটাইতেন—আর কোথায় তিনি বস্ত্র লতা প্রতানবায় কেশ বন্ধন করিয়া সামান্য বেশে তুণীর ও ধনু ধারণ করিয়া মুনিহোমধেয় রক্ষা করিতেছেন। সমস্ত দিন গোচারণ করিয়া বস্ত্র ফলমূল খাইয়া সন্ধ্যা করিয়া

সেই গাভীর দুগ্ধ পান পূর্ব্বক সংবর্তচিত্তে—সাম্রাজ্ঞী সুদক্ষিণার সহিত কুশলস্বায়ম্বন করিয়া রাজির শেষ গ্রহের মুনীগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে—শুদ্ধ স্বভাবের শ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে শয্যা হইতে উভয়েই গাত্রোত্থান করিতেন। আর আজকাল কি স্বামী—কি স্ত্রী—কাহারও হৃদয় উদয় না হইলে ঘুম ভাঙ্গেনা। তাহার পর—ঘুম ভাঙ্গার পর শ্রীভগবানের নাম পর্য্যন্ত লওয়া নাই—চা প্রভৃতি উত্তেজক অনিষ্ট করণী যের চেষ্টা। কোথায় সেই রঘুর মত পুত্র—আর কোথায় এখনকার পিতামাতার চিরব্যাপি কষ্টদায়ক পুত্র।

রাজা দিলীপ এই প্রকারে দীর্ঘকাল আচরণ করার পর, তাহার যথার্থ ভাগ্য ধন আসিয়াছে—যথার্থ রক্ষা ধন—ঋত্রিয়ার ধন আসিয়াছে কিনা—তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত পরীক্ষা হইল, রাজা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। বরেন্দ্র প্রতিশ্রুতি শুনিয়া বর চাহিলেন কি—“বংশস্ত কর্তার মনস্তকীর্তিঃ সুদক্ষিণায়াঃ তনয়ঃ যযাচে” এমন পুত্র যিনি অনন্তকীর্তি হইবেন ও বংশের কর্তা হইবেন। তাহার পর সন্মূলক্ষণ—পঞ্চভূজগ্রহ দ্বারা সূচিতভাগ সম্পদ পুত্র রঘুকে লাভ করিলেন। গোসেবা দ্বারা যে আনাদের কত উপকার হয়—তাহা আমরা জানি না। টাটকা গোমূত্র ও গোময়ের জ্বাণে বহুবিধ রোগ নষ্ট হয় এবং উহা দ্বারা রোগের বীজাণু ধ্বংস হয়। চরকে আছে—যে দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করিলে গোমূত্র শালের মধ্যে থাকিতে ও আমলকী-তক্ষণ করিতে হয়। এক সন্ধ্যানীর মুখে পুনরায় যে, একজন জরীদারের এক পুত্রের আত্ম করক বংশের রাজা ছিল—সেই বংশের কোটি বিলাস করি

দেখেন। সাধুর আদেশে সেই পুত্রকে বাংলা-  
বন্দ্য হইতে গোসেবার লাগান হয়, তাহাতে  
সেই পুত্র সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু লাভ করে।  
আমাদের দেশে এক বড়লোকের কোন কঠিন  
ব্যাধি হয়। রোগের যাতনায় ৬ বৈজ্ঞান্যে  
হতা দেওয়ায় স্থপ্ন হয়—গোসেবাও গোচিকিৎসা  
শিক্ষা কবিয়া বিনা পয়সায় গোচিকিৎসা  
করিল ব্যাধি আরোগ্য হইবে। তিনি তাহাই  
করিতেছেন এবং নীরোগ্য হইয়া—সুখে কাল-  
যাপন করিতেছেন। আজকালকার দিনে  
আমাদের প্রধান খাত ঘৃত-দুগ্ধ বেশী মূল্য  
দিত ও বিক্রয় পাইবার উপায় নাই ; কিন্তু গাভী  
পোষ ও তাহার যত্ন করিলে উহা পাওয়া যায়  
এবং তাহার বহু উপকার লাভ হয় ; আমরা  
গাভী কবি না বলিয়াই—আমাদের এত দুঃখ।  
যদি এত প্রসঙ্গে কিছু গোসেবার কথা বলা  
গেল।

যাহা হউক সংপূত্র লাভ করিতে হইলে  
প্রত্যেক পিতামাতাকে পূর্ন হইতেই বিশেষ  
সাবধান, সতর্ক, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম ও ঈশ্বর  
পরায়ণ হইতে হইবে। তাঁহাদের দৈহিক ও  
মানসিক অবস্থা উপর সন্তানের দৈহিক ও  
মানসিক অবস্থা নির্ভর করিতেছে একথাটি  
সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। সেই  
জন্ত বর্তমান প্রবন্ধে এত কথা বলিতে  
হইল। বাগ্যের মাতৃগর্ভে সঞ্চার হইবার  
পূর্ন হইতেই পিতামাতাকে সুস্থ, সবল ও  
শুদ্ধ দেহ ও শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে। এই হইল  
লিঙ্গরক্ষার মূলস্বরূপ, এবং এইজন্ত এই বিষয়টি  
এত দীর্ঘ ভাবে বলা হইল। সম্পাদক মহাশয়  
এই প্রসঙ্গে আবার ইহার পরেই কি কি  
কিছু কথা জ্ঞান বলিবার চেষ্টা করিব। সন্তান  
গর্ভে আসিবার পূর্ন হইতেই পিতামাতাকে

সত্য, ধর্ম ও ঈশ্বরকে অবলম্বন করিতে হইবে  
এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জিতেন্দ্রিয় হইতে  
হইবে। তজ্জন্ত যথাসাধ্য যম, নিয়ম, আসন,  
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারনার সাধনা  
করিতে হইবে ও সঙ্গুকের আদেশানুসারে  
জপপরায়ণ হইতে হইবে। কাতর শ্রম,  
জগতের দুঃখ ও বিপদের দুঃখ বিমোচক গণকে  
শ্রীভগবানকে ডাকিতে হইবে। তিনি রক্ষা  
বলিয়াছেন যে, যখন অধর্মের অভ্যা-  
ধর্মের প্রাণি হইবে—তখনই আমি মানব কীল  
অবতীর্ণ হইয়া অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের পরি-  
করিব। তাঁহার সৃষ্টিরক্ষা—তাঁহাকেই করিতে  
হইবে ও ধর্মরক্ষা না করিলে সৃষ্টি থাকিবে না।  
কিন্তু তাঁহাকে ডাকিয়া জানাইতে হইবে যে—  
“প্রভু তোমার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ কর, আর  
আমাদের দুঃখ সহ হয় না,—এস—এস—অব-  
তীর্ণ হও।” পূর্বে ধরাদেবী কান্দিয়া শ্রীভগবানের  
কাছে গিয়া নিজ দুঃখ জানাইতেন, আমরাও  
ধরাবাসী সকলে আজ তাঁহাকে জানাই—  
ভগবান, এস—এস—তোমার সৃষ্টি যন্ত্র—  
আমাদের দুঃখ আর সহ হয় না, রক্ষা  
কর।” দশরথ-কৌশল্যা অপুত্রক হেতু  
পরশুরামের অত্যাচারের জন্ত কান্দিয়া  
শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে ডাকিয়াছিলেন এবং  
সেই ডাকার সাহায্যার্থে বলী-বশিষ্ঠকে  
ডাকিয়াছিলেন। তিনিও দশরথকে সম্পূর্ণ  
সাহায্য করিতে না পারিয়া শ্রীপুরুষ ভেদজান-  
হীন জিতেন্দ্রিয় মহামুনি স্বয়ম্ভুকে ডাকিয়া  
—বজ্র করিয়া—তবে সর্বগুণাধার শ্রীভগবান  
শ্রীরাঘকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। দেবকী-  
বল্লভেব কংসের অত্যাচারে সকল লোককে  
কাতর ও বিষম বেধিয়া ও নিজে কঠোর  
কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া এককল

প্রাণ ভরিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলেন। উপস্থাপরি ছয়টি পুত্র কংস কর্তৃক হত হওয়ায় পুত্রশোকে কাতর হইয়া শ্রীভগবানকে ডাকিয়া ছিলেন। তাই তাঁহারী ক্রীকৃষ্ণকে পাইয়া পুত্র নন। তখন তাঁহাদের অবস্থায় কাম ছিল এবং তাঁহাদের আস্থানে কামনা ছিল বটে, কিন্তু সমাজের মত, শমিত কাম বাজিতকাম, সে কাম কাল শ্রীভগবানের দিকে প্রযুক্ত কাম, সে হয় না। তখন ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সন্তান দর ও এই দুদিনে জগতের ছুংখ দুই কেন। পরিবার জন্ম—সর্বপ্রকার অবস্থার সামঞ্জস্য করিবার জন্ম সেই কামকে দমন করিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে হইবে। সেই কামকে দমন করিতে হইলে মায়াকে আগে দমন করিতে হইবে; কারণ কামের মূল মায়া। আবার মায়াকে অতিক্রম করিতে হইলে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

যেমন মৎস্য ধীবরের জাল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ধীবরের পদদ্বয়ের কাছে কাছে থাকিলে তাহার জাল-বিস্তৃতি হইতে রক্ষা পায়, আমরাও সেইরূপ শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণ লইলে তাঁহার দৈবী স্বত্ব-রজ-তম ত্রিগুণময়ী দূতা মায়ায়চ্ছুর বন্ধন হইতে রক্ষা পাইব। তাহা হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িলে কিছু চলিবে না, যেমন মা দেবকী অনবরত পুত্র শোকের মধ্যে শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলেন, তেমনি কাম দমনের প্রধান উপায় মৃত্যুচিন্তা অর্থাৎ আমাকে মরিতে হইবে অস্ত্রের মৃত্যু বিকার হইয়াছে—তাহা ভাবিয়া মনকে কাঁদাইয়া শুদ্ধ করিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে হইবে তবেই কাম দমন হইবে।—

এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা সংশ্যভাষ্যানমাশ্বনা

জহিশক্র মহাবাহো কামরূপং হুরাসদম্

আমাদিগকে মহাবাহু অর্থাৎ বলশালী অজ্ঞান মত সুদীর্ঘ বীর হইতে হইবে। শরীরে বল না হইলে কামরিপুকে জয় করা চলিবে না, সেই জন্ম সাহসিক আহার ও ব্যায়াম দ্বারা সুস্থ ও সবল হইতে হইবে। আসন ও প্রাণায়ামের মত শরীরের বায়ু ও মন স্থির করা ভিন্ন আর কোন ব্যায়াম নাই। তাহার পূর্বে কিছু যম নিয়ম ও নাড়াগুন্নি শিক্ষা করিতে হইবে। তাহা পর মনকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহিবে বাইতে না দিয়া তাহাকে ফিরাইয়া অভ্যাসে গতিতে ভিতরে অর্থাৎ নিজের স্থানে আনিয়া তথা হইতে বুদ্ধিতে লইয়া গিয়া, বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া তথায় গয় করিবে অর্থাৎ নিশ্চয়ায়িক বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া সেই চূর্ণিবার শত্রু কামকে দমন করিতে হইবে। আত্মাকে জানিতে না পারিলে কিছুই হইবে না, তাহার জন্ম বল সঞ্চয় আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বার্ধ্যধারণ না করিলে উহা হয় না। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে স্থির করিয়া ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারিলে কামকে জয় করিতে পারা যাইবে, নতুবা নয়। ফলে এই ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারিলে তবে শ্রীভগবানকে ডাকিলে তাঁহাকে বা মা পার্শ্বতীকে কথারূপে ডাকিলে তাহাতে যদি তাঁহাদিগকে না পাইতে পারা যায় তাহা হইলেও তত্ত্বল্য পুত্র বা কন্যা লাভ করিয়া বংশরক্ষা ও অনন্তকীর্ত্তি বৃত্ত হইতে। দিলীপরাজা কেন বংশভরতীর মনস্তকীর্ণিস্—তনয় বাচ্চা করিয়াছিলেন, এই বার বৃত্তিতে পারিবে না। ঈশ্ব না আসিলে শ্রীভগবান আসেন না। শ্রীভগবানের আসা পূর্ব হইতে দেবভাগ্যের আসা আবশ্যক। আমরা যদি ঈশ্বকে পূর্বক পাইব তবেই

কৃত্রিম পান্য গ্রহণে ভাবিয়া যদি দেবতা না হই, — তবে দেবতার। কেন আসিবেন ? আর দেবতারা না আসিলে ত্রীভগবানও আসিবেন না। মা জগদমাকে ডাকিতে হইলে তবে তিনি “উম্মাবমক্ সা কন” আসিবেন। যুধিষ্ঠিররূপে ধর্ম, ভীমসেনরূপে মহাবল পবন, পার্থরূপে ইন্দ্র ও বসন্ত, নকুলসহদেবরূপে চিকিৎসক ও নৈন্দ্র এক ইন্দ্রের এই পঞ্চ অংশ ও ত্রিকর্মিণী শচী যাক্সসেনীরূপে আসিয়া তবে সেই ভগবানকে ত্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তিরজ্জুতে

বান্ধিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম, বল, রূপ ও গুণের সমন্বয়, — জ্ঞান ও ভক্তি না আসিলে ত্রীভগবান আসিবেন কেন ? যাহা হউক তিনি আর না আসিলে চলিবে না। কংসের আদেশানুসারে নিয়োজিত পুতনা প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ তিনিই করিয়াছিলেন, আবার তিনি আসিয়া আমাদের বালকগণকে অকালমৃত্যু ও ব্যাধি প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করুন।

শ্রীমতীশ চন্দ্র রায় বি, এল, উকীল

## যক্ষ্মা রোগ ও তাহার চিকিৎসা ।

—:~:—

( লক্ষণ । )

রোগে কঠিন ! রোগের চিকিৎসা কঠিন ! রোগে হইতে মুক্তি লাভ সর্বাপেক্ষা কঠিন। রোগের এই ভীষণত্ব দেখিয়া সাধারণেরই মধ্যে এই সিদ্ধান্তে—যক্ষ্মারোগ হইলে মানুষের মধ্যে পরিভ্রাণ নাট, এ রোগ শিবের অসাধ্য। কিন্তু যাক্সের মনে এরূপ ভ্রান্তধারণা থাকা ভাল নাহি। প্রথম হইতে যত্ন লইতে পারিলে—যক্ষ্মা রোগে নিশ্চয় ভাল হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা এই, — প্রথম হইতে রোগটাকে ধর্ম বশত কণা। কেননা আদি অবস্থায় রোগের দোষে রোগের প্রধান লক্ষণগুলি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগী হয়ত চিকিৎসককে তাহার অজ্ঞান, অগ্নিমান্দ্য বা রোগের কথা মাত্র জানায়, কেহবা জুই একবার শুক কানির অস্তিত্ব স্বীকার করে। চিকিৎসক অজ্ঞানের লক্ষণ বুঝিয়া হজমশক্তি বাড়াইবার ঔষধ দেন। কিন্তু অল্পদিনের

মধ্যেই হয়ত তাহার দেহে যক্ষ্মারোগের বহু উপসর্গ আবির্ভূত হইয়া থাকে। তখন তাহার বক্ষঃপ্রদেশ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক দেখেন — রোগ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন যক্ষ্মা রোগকে অজ্ঞান মনে করিয়া তিনি বৃথা চিকিৎসা করিয়াছেন।

যাহাতে আদি অবস্থায় যক্ষ্মারোগ ধরিতে পারা যায়, এ প্রবন্ধে আমি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যক্ষ্মা রোগের প্রধান লক্ষণ চারিটা ; যথা,—

- ১। কাসি,
- ২। শরীর ক্লশ হওয়া,
- ৩। রক্ত ওঠা,
- ৪র্থ। জ্বর।

কাসি। — প্রথমাবস্থায় কাসি অতি সামান্য থাকে। কখনও বা প্রাতে কখনও রাতে একটু কষ্ট দেয় মাত্র। দিনে কাসি

প্রায়ই থাকে না। কফ প্রায়ই নির্গত হয় না, যদি হয়—তবে চট্টটে ও হরিদ্রাত। কিন্তু যেদিন আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে, সেদিন কাসি কিছু ঘন ঘন হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে, কফে বিশেষ কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না।

শরীর কৃশ হওয়া।—অনেক রোগেই শরীর কৃশ হইয়া থাকে, অজীর্ণে প্রায়ই শরীর কৃশ হয়। কিন্তু যক্ষ্মারোগে শরীর উত্তরোত্তর কৃশ হইয়া পড়ে। অতুরোধে এমন দৈনন্দিন কৃশতা পরিলক্ষিত হয় না।

রক্ত ওষ্ঠা।—আদি অবস্থায় প্রায়ই রক্ত ওঠেনা। রোগ যখন বন্ধমূল হইয়াছে—ফুস্ফুস গলিতে আরম্ভ হইয়াছে—সেই সময় ইহা দেখা দেয়। তবে কাহারো কাহারো প্রথমেই রক্ত উঠিতে থাকে। যে রক্ত বাহির হয়, তাহার পরিমাণ অল্প। ফুস্ফুস পরীক্ষা করিলে কেবল Moisserales, পাওয়া যায়—রক্ত নির্গমনের স্থান ঠিক করিতে পারা যায় না। এই রক্ত—স্বক্ষ্মশিরা হইতে বাহির হইয়া থাকে। স্তত্রাং অধিক বা মারাত্মক হইবার আশঙ্কা নাই।

জ্বর।—প্রায়ই থাকে। কখনও নাও থাকে। পূর্বোক্ত তিনটি লক্ষণের সহিত যদি এই জ্বর বর্তমান থাকে, তবে রোগকে যক্ষ্মা বলিয়া অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়। প্রথমে এই জ্বর সামান্য ভাবেই দেখা দেয়। বৈকালে একটু হয়, রাতে ছাড়িয়া যায়। সকালে কিছুই থাকে না। এরূপ জ্বরকে বিশ্বাস করা উচিত নহে, তখনি সন্দেহ করা উচিত।

এইরূপে ধীরে ধীরে—এই মহারোগের স্তত্রাপত্ত হয়। তাহার পর ব্যাধি যেমন প্রবল হইতে থাকে, লক্ষণগুলিও তত স্পষ্টতর হইতে

থাকে। এই জন্ত চিকিৎসকগণ—এই রোগকে তিনস্তরে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্রথম স্তর—টিউবারকুল অধিষ্টান।

দ্বিতীয় স্তর—Consolidation.

তৃতীয় স্তর—ফুস্ফুসাংশ কোমল ও গলিত হওন।

প্রথম স্তর।—টিউবারকুল ফুস্ফুসেব একাংশ আক্রমণ করে। ইহা ভিতরের ব্যাপাব। বাহিরের লক্ষণ—বক্ষঃস্থলের সম্মুখ ভাগ কিছু চেপ্টা বলিয়া বোধ হইবে। অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে শব্দ অপেক্ষাকৃত কম মনে হইবে। রোগীর নিশ্বাস মৃদু এবং প্রাশাস অধিকক্ষণ স্থায়ী (Prolonged) হইবে।

দ্বিতীয় স্তরে।—ফুস্ফুসের আক্রান্ত স্থান ঘন হইয়া আসে—ইহা প্রায় ফুস্ফুসেব (apex) শীর্ষদেশে ক্লাভিকেলের নীচে হইয়া থাকে। বাহির হইলে দেখা যায়—নিশ্বাস লইবার সময় রোগীর বক্ষঃস্থল সমান ভাবে স্ফীত হইতেছে না, একদিক চেপ্টা হইতেছে। রোগী স্থানীয় বেদনা অনুভব করিতেছে। অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে dullness অর্থাৎ স্পষ্ট কম পাওয়া যায়। যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে নিশ্বাসের শব্দ রক্ষণ ও ফুৎকারবৎ (belowing) বোধ হয়, এবং রোগী শব্দ করিলে তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। ২১টি বাল্‌স পাওয়া যায়, কখনওবা ফুস্ফুস বেষ্টক অর্থাৎ প্লুরায় ঘর্ষণ অনুভূত হয়।

তৃতীয় স্তরে।—ফুস্ফুস নরম ও গলিত হয়, তাহাতে কোটর (cavity) উৎপন্ন হয়। ইহা তরল হইয়া কাসির সঙ্গে নির্গত হইয়া থাকে। এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ (ক) নিশ্বাস ফেলিবার সময় কটকট শব্দ (crackling sound) পাওয়া যায়। চটে চটে শ্বাসের মধ্য দিয়া বাহির হইতেছে।



ঐক্য শব্দ উখিত হইয়া থাকে । (খ) ময়েষ্ট রাল । (গ) কষ্টদায়ক কাসি । (ঘ) উত্তবোত্তব শরীর শীর্ণ হয় । (ঙ) উদরাময় দেখা দেয় । (চ) অঙ্গুলীর দ্বারা বক্ষে আঘাত করিলে cracked pot চিনা মাটির পেয়ালার মত শব্দ হইতে থাকে ।

প্রথম স্তরে ।—শ্লেষ্মার সহিত টিউবার কুল্ বেসিলাস্ (ক্ষয় বীজাণু) প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কদাচিৎ পাওয়া যাইতে পারে । দ্বিতীয় স্তরে সর্বদা দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে ।

ট্রোফোনিমিয়ার সহিত যক্ষ্মারোগের ভুল হইতে পারে । কেবল প্রভেদ এই—ত্রোফোনিমিয়া প্রায় ফুস্ফুসের এপেক্সে হয় না । কিন্তু যদি gumina হয়, তবে ধরা বড় শক্ত । গামা হইলে—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বিকৃত শব্দ থাকে না । অধিকন্তু বেদনা থাকে না, গলস্ থাকে না, কাসি থাকে না, জ্বরও থাকে না । রোগী ক্লান্ত হইয়াও পড়ে না । কিন্তু তথাপি গামা নির্ণয় করা বড় কঠিন ।

### চিকিৎসা ।

পরিপাক শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিবে ।

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে হয় । এই দীর্ঘকাল শব্দে—অন্ততঃ ২১০ বৎসব বুঝিতে হইবে । রোগীর অবস্থা যখন প্রথম স্তরে থাকে, তখন হইতে সাবধানে থাকিয়া চিকিৎসিত হইলে রোগ নিশ্চয়ই ভাল হয় । দ্বিতীয় স্তরের অবস্থাতেও—যদি লইতে পারিলে রোগী ভাল হইতে পারে । কিন্তু বোগ তৃতীয়স্তরে পৌছিলে আর আরোগ্যের আশা থাকে না ।

রোগীকে অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে । মন

হইতে হুশিষ্টতা ও বিষমতা দূর করিতে হইবে । বাটার বাহিবার বিস্তৃত বায়ু সেবন ও অঙ্গ চালনা একান্ত প্রয়োজন । আহাৰ—সহজ পাচ্য, যেন গুরুতর না হয় । শরীর আবৃত থাকিবে, তবে ফ্লানেল ব্যবহার করা এদেশে সহ্য হয় না, ইহার দ্বারা বহুস্থলে কুফল ফলিতে দেখা যায় ।

চিকিৎসককে সর্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে—রোগীর পরিপাক শক্তি যেন অব্যাহত থাকে । নতুবা ঔষধ প্রয়োগ বৃথা । কেননা, কড্ লিভার অয়েল বা মল্ট্ এম্ব্রোস্ট প্রভৃতি পুষ্টিকর ঔষধ—পরিপাক শক্তি না থাকিলে, দেওয়া চলে না ।

### জ্বর ।

যক্ষ্মা জর থাকেই । এই জর দুইটি কারণে হইয়া থাকে । (ক) ব্যাধি ক্রমে ক্রমে ফুস্ফুসের অধিক স্থান আক্রমণ করে । (খ) ফুস্ফুসের আক্রান্ত ভাগ নরম ও গলিত হওয়ায় তাহা রক্তের সহিত সংকরণ করে ।

যখন রোগের প্রবল (Acute) অবস্থা—তখন জর অবিচ্ছেদ্যে অর্থাৎ রেমিটেট ভাবে থাকে, প্রাতঃকালে জরবেগ কিছু কম, অপরাহ্নে পুনর্বৃদ্ধি । রোগের প্রকোপ অল্প হইলে জ্বরও অবিচ্ছেদ্য হইয়া থাকে ; সকালে ছাড়ে, অপরাহ্নে কিছু বাড়ে । এই উভয় অবস্থার চিকিৎসাও স্বতন্ত্র ।

### দর্শন ।

রাহ্নে দর্শন—এ রোগের একটা উল্লেখযোগ্য উপসর্গ । ইহাতে রোগী অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে । রাহ্নে শয়নকালে রোগীকে কিছু খাইতে দিলে, ঘাম কম হয়, রোগীও তত দুর্বল হয় না । অতঃ কিছু না খাওয়াইয়া একই স্থানস্থ থাকান সর্ব চেয়ে ভাল । ইহাতে

প্রযুক্তি না হইলে—ট্যাটকা দুধ পান করা উচিত।

### রক্ত উঠা।

যক্ষ্মারোগে সকল রোগীর রক্ত ওঠেনা, তবে অনেকেরই ওঠে। এইটা বড় আশঙ্কাজনক উপসর্গ। ইহাতে বোগীর আত্মীয়-স্বজন যেমন উদ্বিগ্ন হ'ন, রোগীও তেমনি ভীত হইয়া পড়ে। আত্মীয়গণ চিকিৎসককে—রক্ত বন্ধ করিবার জন্ত ব্যগ্র ভাবে অনুরোধ করেন। চিকিৎসকও উচা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি রক্ত বন্ধ করা ভাল নহে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহা ভূয়ো ভূয়ো করিয়া নিষেধ করা হইয়াছে। ডাক্তারী-বিজ্ঞানেও বলে—প্রথমেই রক্ত বন্ধ করিবার জন্ত ব্যস্ত হওয়ার আবশ্যক নাই। যদি রোগের প্রারম্ভেই রক্ত উঠিতে থাকে, তাহা বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং কতকটা রক্ত উঠিয়া গেলে, রক্তাধিক্য দশতঃ স্থানীয় যে

congestion ও tension হয়,—তাহা দৃঢ় চর এবং অপকারের পরিবর্তে বোগীর যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক (natural) ক্রিয়া মাত্র। আমরা ব্লিষ্টার বসাইয়া, কবিরাজ মহাশয়েরা ভৌক লাগাইয়া—যে কাজ করি ও করেন, রক্ত ওঠার জন্ত সে কাজ আপনাআপনিই হইয়া যায়। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি—রক্ত ওঠার পর কিছুদিন রোগ আর বাড়ে না। কিন্তু যদি রক্ত ওঠার পরিমাণ বড় বেশী হয়,—সে রক্ত শরীর বন্ধ কবিতে হইবে। নতুবা রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িবে, হয়ত বা তাহার হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। রোগের প্রবল অবস্থায় রক্ত উঠিলে—তাহা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এরূপ অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে—রোগীর হৃদস্পন্দন কোটর (cavity) হইয়াছে এবং বৃহৎ urtery গুলি হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ শ্রীনাগেন্দ্র কুমার দে (ক্যান্সেল হস্পিটালের  
ভূতপূর্ব হাউস্, সার্জন।)

## শিশুর খাওয়া-বিচার।

—:~:—

প্রথম পক্ষের পক্ষীর মৃত্যুর পর দুইটা অপোগণ্ড শিশুকে পালন করিবার জন্ত আমাকে শিশুর খাওয়ার বিচার করিতে হইয়াছিল। সেই সময় যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলাম, বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব। যাহারা আমার মত অবস্থায় পড়িয়া—শিশু

পালনে বিব্রত, এ প্রবন্ধে হয়ত তাঁহাদের কিছু উপকার হইতে পারে।

“শিশু” বলিতে, জন্মাবধি ৬ মাস বয়সের—ছেলেই আমি বুঝি। এ হেন শিশুর শারীরিক উত্তাপ রক্ষা করিতে হইলে কিরূপে খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে হইবে—এ রহস্য সম্বন্ধেই

জানা উচিত। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় “আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য” সম্বন্ধে—কেটা উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাব ভরসা হয় না, তিনি এ প্রবন্ধটা শেষ করিতে পারিবেন। অনেক কাগজেই তাঁহাকে জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটাই শেষ করিতে দেখি নাই। একথার একমাত্র প্রমাণ—এই ‘আমাদের’ প্রকাশিত “জর” নামক প্রবন্ধ। এমন অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধটা—অসীম শ্রমের ভাই আমার শেষ করিতে পারিলেন না। ইহা “আমাদের” পাঠক বর্গের দুর্ভাগ্য। “আমাদের” এমন সুন্দর প্রবন্ধ এ পর্যন্ত একটাও বাহির হয় নাই, বোধ হয় হইবেও না। “আমাদের দেশের খাদ্য” প্রবন্ধও শেষ হয় নাই। এ বিষয়ে আমি ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারি।

বাহ্যতঃ, “আমাদের দেশে খাদ্য ও পথ্য” প্রবন্ধ প্রথমেই শিশু খাদ্যের বিচার করা হইত ছিল। ব্রজবল্লভ তাহা করেন নাই। কেই প্রবন্ধটা “অস্বহীন” হইয়া পড়িয়াছে। শিশু—শিশু অবস্থাতে দৈহিক উত্তাপ

রক্ষা করা—অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু কাজটা বড় শক্ত। আমি সেই কথাটাই বুঝাইব।

Caloric value ইংরাজী কথায় বাক্সালা প্রতিশব্দ—“তাপ বদ্ধ বা শক্তি।” এক Kilogramme (=২ পাউণ্ড ও ৬ উন্স প্রায় এক সেব) জলের ১ ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে যে উষ্ণতার আবশ্যক হয়, তাহাকেই ১ caloric বা ১ভাগ তাপবদ্ধক শক্তি বলে। ১গ্রাম চর্বি হইতে ৯০০ ভাগ তাপ বদ্ধক শক্তি পাওয়া যায়। 1 gramme = 154 guirs, ১ গ্রাম carboly drate (তেজবদ্ধক খেতসার) ও ১ গ্রাম Proteid (মাংস বদ্ধক) উভয় হইতেই ৪০১ তাপ বদ্ধক শক্তি পাওয়া যায়। যে জননী স্বাস্থ্যবতী, তাঁহার ১০০ গ্রাম স্তন দুগ্ধ হইতে ৬১ ভাগ; এবং ভগ্নবাহ্য মাতার দুগ্ধ হইতে ৩৬ ভাগ তাপবদ্ধক শক্তি পাওয়া গিয়া থাকে। আবার স্থলাঙ্গী বিলাসিনীর স্তন দুগ্ধে ১০০ গ্রামে ৩০ ভাগ তাপবদ্ধক শক্তি পাওয়া যায়। ইহাই সাধারণ হিসাব। এক্ষণে মানবী, ছাগী, গাভী ও গর্দভীর দুগ্ধ তুলনা করিয়া দেখা যাউক।

	১০০ গ্রামে তাপবদ্ধক শক্তির অনুপাত	প্রোট অংশ	শর্করা অংশ	বসার অংশ
মানবী				
স্থলা মাতার	৬১ —	১ —	৭ —	— ৪
ছাগী মাতার	৩৬ —	২০.৫ —	৪ —	— ২
বিলাসিনীর	২০ —	৩০.৫ —	৭০.৫ —	— ৫
গাভীর—	৬৮ —	৩০.৩ —	৪০.৫ —	— ৩.৮
ছাগীর—	৮০ —	৪ —	৫ —	— ৪.৮
গর্দভীর—	৫০ —	২ —	৬ —	— ১.৬

উল্লিখিত তালিকাটি দেখিলেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন; গর্দভীর দুধে বসার ভাগ অত্যন্ত কম, সুতরাং ঐ দুধ শিশুর খাওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু যদি ঐ দুধের ১০০ গ্রামে ২ চা চামচ পূর্ণ মাখন সংযোগ করা যায়, তবে উহার তাপবর্দ্ধক শক্তি ৫২ ভাগে দাঁড়ায়। তখন ঐ দুধ—স্বাস্থ্য জননীর স্তন্য দুধের সমান হইয়া থাকে।

মাতৃহীন শিশুকে ফিডিং বোতলের সাহায্যে পালন করিয়া দেখিয়াছি ১০০ cubic centimetre (৩৬ আউন্স খাত্তদ্রব্যের মধ্যে) ৪০ ভাগ তাপবর্দ্ধক শক্তি না থাকিলে চলে না। এই হিসাবে মাসে মাসে কি পরিমাণ পাত্তাংশ দেওয়া কর্তব্য তাহারও একটা তালিকা দিতেছি—

কোন মাসে	প্রোটিন গ্রাম	বসা গ্রাম	শর্করা গ্রাম	১০০ গ্রাম করা তাপ বর্দ্ধক শক্তি	নাইট্রোজেন ও নন নাইট্রোজেন উভয়ের অনুপাত
১ম	২.৩	৪.৫	৬.৬	৫০	১:৫
২য়	৩.১	৩.৬	৮.৩	৩০	১:৩.৭
৩য়	২.৮	৩.৩	৯.২	৩৩	১:৪.৭
৪র্থ	৪.২	৪.৮	১১.৮	৪৪	১:৪
৭ম	৩.০	৫.৩	৭.৭	৩৩	১:৪.৩

এই দ্বিতীয় তালিকাটি বোধ হয় সাধারণের বোধগম্য হইবে না। সেইজন্য নিম্নে একটা মোটামুটি হিসাব দিলাম;—

আমি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিয়াছি গোছের চেয়ে স্তন্যদুধে শিশু অধিক পোষণ হইয়া থাকে। প্রোটিনের ক

কত বয়সে কতবার খাওয়াইবে

প্রতিবারে ২৪ ঘণ্টায় কতখানি যাইবে খাচ্ছে কতভাগ তাপবর্দ্ধক শক্তি

১ম সপ্তাহ ১০  
১ মাস ২  
২য় " ৮  
৪র্থ " ৭  
৬ষ্ঠ " ৬

গ্রাম ওন্স  
৩০ ১ ১৮০  
৪৫ ১ ২৪০  
৮৫ ৩ ৪০০  
১২০ ৪ ৪০০  
১৭০ ৬ ৪০০

ধরা থাকে। গাভী দুগ্ধে প্রতিপালিত শিশু শরীরেব মধ্যে বেশী নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না। পারে না—অতিরিক্ত প্রোটিন ভোজনের জন্ত। অতিরিক্ত মাত্রায় প্রোটিন ভোজনে উদরাময়, পেট্ কামড়ানি, এবং অল্প দায়ব প্রকোপ উপস্থিত হইয়া থাকে। মাতৃ দুগ্ধ পাননে দেড় ঘণ্টা পরে যে শিশুর পাকস্থলী শূন্য দেখা গিয়াছে, সেই শিশুরই পাকস্থলীতে ২০ দণ্টা পরেও গোহুগ্ধ পাওয়া গিয়াছে। মাতৃদুগ্ধপায়ী বালকের মলে রিএক্সন (acid) হয় এবং গোহুগ্ধ পালিত বালকের বিষ্ঠায় রি অ্যাকসান ক্ষার (alkaline) থাকিবার কথা। কিন্তু গোহুগ্ধ পালিত বহু শিশুর বিষ্ঠা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে—তাহা ক্ষার না হইয়া মম হইয়াছে। অর্থাৎ সে সকল শিশুর উদরে --গোহুগ্ধ সম্পূর্ণ পরিপাক হয় নাই।

এইবাব সর্কিয়া ষ্টার্চের কথা ধরি। শতকরা ৭ ভাগের বেশী ষ্টার্চ শিশুখাদ্যে থাকা ভাল নহে। থাকিলে বালক মোটা হইয়া পড়ে এবং অর্ডবেই rickets গ্রস্ত হয়। তাহার উদরাময় ও দেখা দেয়—মল অম্লযুক্ত, বর্ণ হরিৎ। fat এর অংশ বেশী হইলে উদরাময় অবশ্যস্তাবী। এইরূপ উদরাময়ের শিশুর মল কখনও কখনও সাবান গোলার মত, কখনও চক্কী মিশ্রিতের মত হইয়া থাকে।

অনেক শিশুই সচরাচর গোহুগ্ধ পান করিয়া থাকে—বিশেষতঃ যে সকল শিশু উপযুক্ত মাত্রায় মাতৃদুগ্ধ পায় না। অনেকে বলেন—এইরূপ শিশুকে গোহুগ্ধ ৫০০ হইতে ৭০০ গ্রাম পর্যন্ত দেওয়া চলে। কিন্তু তাহাতে সম্যক তাপ রক্ষা হয় বটে, তথাপি তাহাতে এত বেশী প্রোটিন এবং এত কম দুগ্ধ শর্করা আছে যে, শিশুর পক্ষে তাহা ঠিক উপযোগী নহে।

এইজন্য অনেকে গোহুগ্ধকে কৃত্রিম উপায়ে স্তন দুগ্ধের মত করিবার উপদেশ দেন। কেন না, তাহা হইলে গোহুগ্ধ মাতৃদুগ্ধের মত লঘুপাচ্য হইতে পারে। ইহা দুই উপায়ে হইতে পারে, (ক) গোহুগ্ধের নবনী উঠাইয়া লইয়া, এবং casein ফিলটার করিয়া তাহাতে দুগ্ধ শর্করা মিশান। (খ) নবনী ৫ ওন্স, চূণের জল ১ ওন্স, জল ১৪ ওন্স, দুগ্ধশর্করা ১ ওন্স। একত্রে মিশান। ইহাতে কৃত্রিম স্তনদুগ্ধ প্রস্তুত হয়।

সম্বজাত, পীড়িত, দুর্বল, এবং উদরাময় গ্রস্ত শিশুকে whey হোয়ে বা ছানার জল খাওয়ান খুব ভাল। হোয়ে খাওয়াইলে বালি খাওয়াইবার প্রয়োজন হয় না। আমি নিজের শিশুকে খাওয়াইবার জন্ত—১ পাঁইট wheyতে ২—৪ গ্রেণ বাই কর্কসেট অফ্ সোডা এবং ৩ ড্রাম দুগ্ধ শর্করা মিশাইয়া দেখিয়াছি—ইহাতে ঐ খাদ্যের ৪০ ভাগ তাপবর্ধক শক্তি জন্মিয়াছে।

জলমিশ্রিত দুগ্ধ। ১ ভাগ দুগ্ধে ১ ভাগ জল মিশাইলে তাহার তাপরক্ষণ শক্তি ৩৪ ভাগে দাঁড়ায়।

শিশুর পরিপাক শক্তি স্বভাবতঃই কম। এইজন্য উদরাময়গ্রস্ত বা দুর্বল শিশুকে খাওয়াইবার জন্ত বৈজ্ঞানিকেরা—Predigested milk ব্যবস্থা করেন। আমি এইরূপ দুগ্ধের নাম দিয়াছি—কৃতজীর্ণ দুগ্ধ। নিম্নলিখিত নিয়মে এই কৃতজীর্ণ দুগ্ধ প্রস্তুত হয়—

(১) দুগ্ধ—২ ওন্স, জল ২ ওন্স, নবনী ১ ওন্স, ফেরার চাইন্ডের মিড পাউডার—১ চামচ। একত্র মিশাইয়া এই মিশ্রিত পদার্থ ১১৪ কাঃ পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া, ৫৬ মিনিট

রাখিয়া, শিশুকে খাওয়াইতে হয়। ইহার তাপ রক্ষণ শক্তি ৭৭ ভাগ।

(২) দুগ্ধ ১ পাঁইট, লইকর প্যান ক্রিয়েটিস ১ ড্রাম, সোডি বাই কার্ব ২০ গ্রেন। প্রথমে দুগ্ধকে ৪ চামচ চুণের জল মিশাইয়া ১৫০ ফাঃ পর্যন্ত উত্তাপ দাও, পবে প্যান ক্রিয়াটিন্ সোডা তাহাতে মিশাইয়া সাধারণ উত্তাপে ৩ ঘণ্টা রাখ। এইরূপে এই দুগ্ধ—শিশু খাওয়ার উপযোগী হইবে। কিন্তু যখনই খাওয়াইবে, গরম করিয়া লইবে।

(৩) ২ ওন্স টাটকা কাঁচা দুগ্ধ একটা শিশির মধ্যে পুরিয়া, তাহাতে ফেরার চাইল্ডের মিল্ক পাউডার ১ ড্রাম দিয়া, শিশিটা ২০ মিনিট গরম জলে রাখ। পরে এই দুগ্ধ শিশুকে খাওয়াও। খাওয়াইবার পূর্বে নিজে চাখিয়া দেখিবে, তিস্তাস্বাদ হইয়াছে কি না? যদি তিস্ত হইয়া থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ ঐ শিশিটা বরফ জলপূর্ণ পাত্রে ডুবাইবে। ইহাতে তিস্ততা দূর হয়। Fair child's Peptonising powder এ প্যানক্রিয়েসন, সোডি বাই কার্ব, এবং মিল্ক স্কয়ার আছে।

বিলাতে এবং এদেশে আজকাল কন্ডেন্স মিল্ক বা জমান দুগ্ধ শিশুখাত্ত রূপে ব্যবহার হইতেছে। এদেশের শিশুর পক্ষে জমান দুগ্ধ উপযোগী নহে। কারণ জমান দুগ্ধে—নবনীর ভাগ কম, এবং শর্করার ভাগ বড় বেশী। জমান দুগ্ধ খাইলে কোন কোন শিশু হৃষ্টপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে পুষ্টতা অন্তঃসার শূন্য। বিলাতে জমাট দুগ্ধসেবী শিশুরা পূর্বেই rickets গ্রস্ত হয়, আমাদের চেষ্টার শিশুরা পেট রোগা হয়। বিশেষতঃ জমানদুগ্ধ বিক্রয়কারীরা ১ ভাগ দুগ্ধে ৭ ভাগ জল মিশাইতে বলেন—ইহা সমীচীন বোধ হয় না। অন্ততঃ ২৪ ভাগ জল মিশাইলে এবং

তাহাতে কিঞ্চিৎ নবনীত সংযোগ করিতে পারিলে—উপরে উত্তাপ রক্ষণ শক্তি ৫০ ভাগে দাড়ায়।

দাত উঠিবার পূর্বে শিশুকে স্বেতসারবহু খাত্ত দেওয়া উচিত নহে। তবে যদি নিত্যশুষ্ক দিতে হয়, তাহা হইলে কোন ঔষধ পদার্থ দ্বারা ঐ স্বেতসারকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করিয়া দিতে হইবে।

কতকগুলি দুগ্ধবহুল শিশুখাত্ত।—

অ্যানেনকরিজ ফুড। নং ১। ৪ মাসের শিশুকে খাওয়ান চলে। তাহার অধিক বয়স হইলে এই খাত্তের ২নং ব্যবহার্য। এই দুড প্রস্তুতকারীদের মতে—এই খাত্তে ৬৮ ভাগ তাপবর্ধক শক্তি আছে, কিন্তু যদি এই দুড পূর্ণ ১ টেবিল চামচ না লইয়া, ২ চামচ লইয়া ৩ ওন্স জল ও ২ চামচ নবনী মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে ইহাতে ৬০ ভাগ তাপরক্ষণ শক্তি জন্মে এবং ইহা মাতৃস্তন্যেব অনেকটা সমকক্ষ হইতে পারে। ২ নং এই খাত্তের তাপরক্ষণ শক্তি—৮৬ ভাগ।

হলিকস্ মলটেড মিল্ক। তাপরক্ষণ শক্তি ৪২ ভাগ। যদি ইহাতে ১ টেবিল চামচে নবনী মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে তাপরক্ষণ শক্তি ৬০ ভাগ জন্মে।

মেলিন্স ফুড। ৩ মাসের কম বয়সের শিশুর খাত্তে ৪৫ ভাগ এবং তদুর্দ্ধ বয়সের খাত্তে ৭০ ভাগ তাপরক্ষণ শক্তি আছে।

বেজার্স ফুড। তাপরক্ষণ শক্তি ৫৬ ভাগ। ২ কাঁচা নবনী মিশাইলে তাপরক্ষণ শক্তি ৬৫ ভাগ হয়।

শিশুদের বড় বড় বিলাতী খাত্তের কথা লিখিলাম। দুগ্ধের বিষয়—আমাদের দেশের একটা খাত্তেরও নাম করিতে পারিলাম না। এদেশে ত বড় বড় বৈজ্ঞানিক আদর্শে

মাতন, কবিবাজ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি একটা শিশুখাত্ত আবিষ্কার করিতে পাবেন না? বিলাতী খাত্ত যে সকল সময় অনাদেব শিশুদের উপযোগী হয় না, - একথা সন্দেহান্বিত। অথচ এমন সুজলা সুফলা

শিশুখাত্তমালা দেশে শিশু বজ্র একটা খাত্ত প্রস্তুত হইল না। ইহার মত লজ্জাকর ব্যাপার আর আছে কি?

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় এম্ এ,

## মানব জন্মের কথা ।

—:~:—

অনন্তর গর্ভের জীবনোপায়ের নিয়ম কথিত হইয়াছে ।

গভিরাশ্রয় বাহিনী নারী, গর্ভস্থ সন্তানের নাভি নারীর সন্ধিত সংঘর্ষ থাকে বলিয়া নিয়ত গভিরাশ্রয়ী আহাবাদির দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান বঞ্চিত হয়। মাতার নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সঞ্চালন ও নিদ্রা প্রকৃতি অন্তরদ্বারা গর্ভস্থ সন্তান নিশ্বাস উচ্ছ্বাস, সঞ্চালন ও নিদ্রা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ গভিরাশ্রয়ী নিশ্বাসাদি যখন যে ক্রিয়া করি, সন্তানও গর্ভে থাকিয়া তৎতৎকালে সেই সেই ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়।

গর্ভস্থ সন্তানের নাভিমণ্ডল তেজের আবরণ ভূমি, তদ্বারা আবৃত্তালিত হয়, এই ভিন্ন গর্ভস্থ শিশুর দেহ বঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং উক্ত বায়ু—উদ্বার সহযোগে শরীরের উর্দ্ধ তিষ্ঠাক ও অধোভাগে এবং স্রোতাদির যে যে স্থানে প্রসারিত হয়—গর্ভস্থ সন্তানের সেই সেই স্থান বঞ্চিত হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকারের নাভি হইতে দৈহিক আবরণ স্রোত (Avarta and artary) মন্থ প্রসৃত আরম্ভ হওয়া প্রযুক্ত নাভি হইতেই

মানব দেহে রক্তসঞ্চালন কার্য্য যাবজ্জীবন চলিয়া থাকে। এই নির্মিতই নাভিকে দেহস্থ যাবতীয় শিরা ও ধমনীর মূল স্থান বলা হইয়াছে।

মানবগণের দৃষ্টি (নেত্রমাণ) ও রোমকূপ কখনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। উহারা নিশ্চিত একভাবেই থাকে—ইহাই ভগবান ধনন্তরির অভিমত।

মহুঘোর শরীর ক্ষীণতর হইলেও নখ ও চুল এতদুভয় বস্তু প্রাকৃতিক স্বভাব প্রযুক্ত সর্বদা বৃদ্ধিত হইয়া থাকে। মন ও দেহ চেতনার আশ্রয়। কেশ, রোন, নখাদি অন্তরস্থ মল ও দ্রব্যগুণ ইহারা অচেতন।\*

গর্ভস্থ সন্তানের পুরীষ ও মূত্র উৎসর্গ না হওয়ার কারণ এই যে, বায়ুর অল্পতা এবং পাকায়গত বস্তুর অত্যল্পযোগ হেতু উহা হইতে পারে না। অতঃপর গর্ভস্থ সন্তানের মুখজরায়ু কর্তৃক আবৃত এবং কণ্ঠদেশ কক্ষপূর্ণ থাকে—এজন্ত বায়ুর পথ প্রতিরোধ হেতু গর্ভস্থ শিশু রোদনাদি করিতে পারে না।

\* আধুনিক পাক্ষাত্য মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বহু যে সমুদয় পদার্থেরই জীবন থাক। সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ভাষা মৃতদেহেরও জীবন থাকার তার স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। —লেখক।

গর্ভধারণের দিবস হইতে গর্ভিণী রুচিহীন, শোভন অলঙ্কার সমূহে ভূগিতা ও সদাচারী হইয়া গুরুবস্ত্র পরিধান করতঃ গুরু এবং ব্রাহ্মণ-গণের পূজানিরত থাকিবেন এবং প্রতাহ স্নানধুর রসযুক্ত স্নিগ্ধ, হৃদয়গ্রাহী, তরল, লঘু, ও অগ্নিদীপ্তিকারক আত্মন্যাসামগ্রী ভোজন তৎপর হইবেন। তৎকালে ব্যায়াম, উপবাস মৈথুন, অতিশয় সন্তপণ ক্রিয়া, রাত্রি জাগরণ শোক, অশ্বাদিনানারোহণ, রক্তমোক্ষণ, মল ও মূত্রাদির বেগধারণ এবং বিপর্যাস্ত ভাবে অবস্থান এই সমুদয় গর্ভিণী জীর্ণগণ পরিত্যাগ করিবেন। কারণ দোষ কিস্বা অভিঘাতজনিত যে যে অংশ গর্ভিণীর শরীরে পীড়িত হয়, গর্ভস্থ শিশুরও সেই সেই অংশ পীড়িত হইয়া থাকে।

মলিনবেশবিশিষ্টা,—বিকটাকৃতিযুক্তা কিস্বা অঙ্গহীন, এবম্বুতা কোন স্বাক্ষে গর্ভবতী নারী কদাচ স্পর্শ করিবেন না। এবং দুর্গন্ধ গ্রহণ কিস্বা অপ্রিয় ভোজন প্রভৃতি সর্বদা পরিত্যাগ করিবেন। কপাহ বা পরানন্দাদি ও গৃহের বহির্দেশে গমনাগমন বা জনশূন্য গৃহাদিতে গমন এবং ক্রোধ প্রভৃতি কার্য্য গর্ভিণীগণ মনোযোগসহকারে পরিত্যাগ করিবেন। গর্ভিণী জ্ঞা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবেন না,—কেননা তদ্বারা গর্ভ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং অত্যন্ত তৈল, মর্দন বা অধিক উত্তর্জন অথাৎ গাত্রমার্জন বা ঘর্ষণ কদাচ করিবেন না। কঠিন শয্যাতে কিস্বা অত্যন্ত উচ্চ স্থানে শয়ন বা অবস্থান করিবেন না; গর্ভিণী অতি যত্ন সহকারে উক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবেন। তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই নিরোগ দীর্ঘায়ু, বুদ্ধিমান, বলিষ্ঠ, স্বন্দর এবং মেধাবী সুসন্তান লাভ করিতে পারিবেন।

সূতিকাগৃহ কিরূপ করা উচিত ?

—দাৰ্ঘ্যে আট হাত প্রস্থে চারিহাত এবং

পূর্বদ্বার বা উত্তর দ্বার বিশিষ্ট করিয়া সূতিকা

গৃহ নির্মাণ করিবে। এতদ্দেশে নিত্য সর্বসেসে স্থানে অতি ক্ষুদ্রতম একটিমাত্র ক্ষুদ্রতম দ্বার বিশিষ্ট যে সূতিকা গৃহনির্মাণের প্রথা দৃষ্ট হয়, তাহা অতীব অনিষ্টকর। কারণ তদ্রূপ ক্ষুদ্র গৃহে বায়ু সঞ্চালিত হইতে না পারায় মেঝেটি সমধিক আর্দ্র অবস্থা যুক্ত হয় বলিয়া প্রভৃতি ও নবজাত শিশুর অনেক প্রকার রোগ সৃষ্টি হইতে পারে, অনেক সময় এতাদৃশ অবস্থায় সূতিকা গৃহেই শিশুদিগের ধলুপ্তস্কার, ব্রুকাইটিস এবং নিউ-মোনিয়া প্রভৃতি স্লেয়াঘটিত রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

এক্ষণে আসন্ন প্রসবা জীর লক্ষণ বলা হইতেছে। যখন গর্ভবতীর কুক্ষিদেশ শিথিল ও হৃদয়ের বন্ধন বিমুক্ত হয় এবং নিত্যের সমুখ-ভাগে বেদনা উপস্থিত হয়, মূতমূত্র কটি ও পৃষ্ঠদেশে তীব্রতর বেদনা হয়, মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে আসন্ন প্রসবা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা বুঝিতে পারিলেই গর্ভিণীর গাত্রে তৈল মর্দন করা হইয়া উষ্ণ জলদ্বারা স্নান করা হইতে হয়। এই সময় সুশিক্ষিত প্রসব-কারিণী অভিজ্ঞ দ্বাত্রী ও চারিজন পরিচারিকার আবশ্যক। ঐ চারিজন পরিচারিকার মধ্যে এক জন গর্ভিণীর প্রসব দ্বারের চারিদিকে তৈল মর্দন করিয়া মিষ্টবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিবে। এই সময় যখন ভগবানের প্রাকৃতিক বিধানানুসারে মলমূত্র বেগের জ্বায় আপনা আপনি প্রসবের বেগ উপস্থিত হইবে, তখন সেই পরিচারিকা সুমিষ্ট কথায় গর্ভিণীকে বলিবে “হে সৌভাগ্যবতী, এক্ষণে কুছন কর।” অনন্তর তদ্রূপ প্রাকৃতিক বেগ প্রাপ্ত গর্ভিণী সখ্যমত কুছন করিতে থাকিবে। কিস্বা দ্বাত্রী



বেগ না আসিলে অথবা বেগ আসিয়া নিবৃত্ত হইয়া গেলে কদাচ কুছন করিবে না । প্রথমতঃ অন্ন অন্ন—তৎপরে যেমন বেগ আসে তাদৃশ অধিক বস্তু সহিত কুছন করিতে থাকিবে । সন্ধান-গোনির দ্বারদেশ প্রাপ্ত হইলে যে পর্য্যন্ত জ্বাৎ হইতে শিশু ভূমিষ্ট না হইবে, তাৎকাল স্বকীয় শক্তি অনুসারে গাঢ়তর কুছন করিতে থাকিবে ।

দ্রব্যঃ স্বাভাবিক বেদনার সহিত বেগ উপস্থিত না হইলে কদাচ কুছন করিবে না । দ্বিতীয়ঃ যদি ভ্রম বশতঃ গর্ভিনীকে অকালে কুছন করিতে অনুরোধ করে, তাহা কখনই প্রতিপালনীয় হইবে না । প্রসব বেদনা ঠিক না হইতে কুছন করিলে, শিশু মুক, বদির, কুষ্ঠ,

শ্বাশ, কাশ রোগযুক্ত এবং শিথিল দেহ যুক্ত হয় । তজ্জগৎ কুছন বিষয়ে সত্বপদেশ সমূহ যত্নসহকারে প্রতিপালনীয় ।

অনন্তর বালকের জন্ম হইলে বালক এবং গর্ভিনীকে যথোপযুক্ত বিধানে স্নান করিয়া যথা বিধি স্ত্রীমাচার এবং কুলাচার যাহা যাহা পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় নিয়ম প্রতিপালন করিবে ।

উক্ত প্রকার কাৰ্য্য সকল অবগত থাকা গৃহস্থ মাত্রেয়ই নিতান্ত কর্তব্য । অধুনা তাহা অজ্ঞাত থাকার জগুই অনেক গর্ভিনীকে বিপন্ন হইয়া ডাক্তার প্রভৃতিব আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতে হয় ।

ডাঃ শ্রীনলিনীমাথ মজুমদার ।

## বনৌষধি ।

—\*—

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বনৌষধির বিষয়ে আলোচনা করিব । আমাদিগের সাংসারিক ব্যবস্থায় ডাক্তার বৈজ্ঞানিক খরচ একটা প্রধান খরচের মধ্যে ধর্তব্য ।

নিতাই আমাদিগের গৃহে রোগ বর্তমান, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই রোগ ক্রিষ্ট । একটু অসুস্থ হইলেই চিকিৎসকের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই । কিন্তু আমাদিগের গৃহ প্রাক্কনে, বাড়ীর বাগানে—নানাস্থানে যে অল্পত্র রক্ষিত কত শত প্রকার রোগনাশক ঔষধি বর্তমান রহিয়াছে, তাহার গুণ গ্রহণ করিতে আমরা অবসর পাই না, চেষ্টাও করি না, আমাদিগের প্রবৃত্তিও হয় না ।

পরন্তু প্রকৃতি দেবী—বিনামূল্যে যে সমস্ত বনৌষধি আমাদিগের জন্ত সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন—আমাদিগের অজ্ঞানতা নিবন্ধন সেই সমস্ত ঔষধি রূপান্তরিত ভাবে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় ক্রয় করিয়া গৌরব বোধ করিতেছি । উদাহরণ স্থলে দেখাইব—যে বাসক পত্র নানা স্থানে এমন কি বাড়ীর চতুর্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, যাহার স্বরস পান করিলে সামান্য কাসি হইতে হৃৎসাম্য ক্ষয়কাসিও আরোগ্য হইতে পারে—যাহা সংগ্রহ করিতে একটা পরস্কা মাত্র ব্যয় নাই, যাহার টাটকা রস বিশেষ ফলপ্রসূ,—সেই বাসক রস ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন নামে রূপান্তরিত হইয়া পর্য্যুসিত ভাবে একখানি

চক্চকে সেবেল আঁটা শিশিতে স্নসজ্জিত হইয়া আমাদিগের হস্তগত হইতেছে! আর আমরা হাসিমুখে তাহাই গ্রহণ করিতেছি।

যাহা হউক আমরা এই বনৌষধি প্রবন্ধে ক্রমান্বয়ে বহুবিধ বনৌষধির রোগ নিবারণ শক্তি প্রকাশ করিব, পল্লীবাসী গৃহস্থ পরিবার বর্গের ইচ্ছা দ্বারা যে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ যাহার দৃষ্টাও দেখাইলাম তাহারই শক্তি বর্ণনা করিব।

বাসক।—সামান্য কাসি, ক্ষয়কাসি শ্বাসকাসি ও রক্তপিত্ত রোগে বাসক একটী মহৌষধি, আয়ুর্বেদে বাসক সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

বর্ণা—

“বাসায়াং বিত্তমানায়াং.

আশায়াং জীবিততঃ চ

রক্ত-পিত্তী ক্ষয়ী কানী

কিমর্গ মবসীদতি ?”

বাসক বিত্তমান থাকিতে রক্তপিত্ত, ক্ষয় কাসি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কেন অবসাদ প্রাপ্ত হয় ?

উক্ত শ্লোকে বাসকের যেরূপ শক্তি উল্লেখ করা হইল, তাহাতে বাসক যে উক্ত ব্যাধি সমূহের একটী মহৌষধ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাসক পৃথক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং পাচন, কল্ল, অরিষ্ট, অবলেহ প্রভৃতি রূপেও ব্যবহার্য। যাহারা পুরাতন কাসি, হাঁপ কাসি ও ক্ষয়কাসিতে কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহারা প্রত্যহ প্রাতে অর্দ্ধ ছটাক বাসকের টাটকা রস—রসের অর্দ্ধ পরিমাণ বিশুদ্ধ নম্ ও কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি সংমিশ্রণে সেবন করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন,

ইহা অন্ততঃ রীতিমত একমাস পর্যন্ত সেবন করিতে হইবে।

বাসকের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও শাখা সমস্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাসক পুষ্প মধু কাসি রোগে বিশেষ উপকারী,—বাসক বনে—কোন কোন সময়—এই মধুচক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ মধু চক্রের আরতন ক্ষুদ্র, এই হেতু মধুও অল্প প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাসক যে কেবল রক্ত পিত্ত ও ক্ষয়কাসির মহৌষধ তাহা নহে—

পিত্ত শ্লেশ্মা জ্বরে বাসক।—

বাসক পত্রের অর্দ্ধ ছটাক পরিমিত স্ববস শর্করা ও মধু সংযোগে সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর উপশম হইয়া থাকে।

জীর্ণ জ্বরে বাসক।—বাসক কাপে

যথারীতি দ্ব্যত পক্ক করিয়া তাহা পান করিলে বহুকালের জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠে বাসক।—কচি বাসক পত্র

গো মূত্রে পেষণ করিয়া কুষ্ঠে লেপন করিলে কুষ্ঠ রোগ নিরাময় হইয়া থাকে।

বিচর্জিকায় বাসক।—বিচর্জিকা

রোগে বাসক পত্র বেঠন করিয়া বন্ধন করিলে দপ্ত দিবসের মধ্যে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

স্তম্ব প্রসবে বাসক।—বাসকমূল

কচিদেলে স্তম্বদ্বারা বন্ধন করিয়া দিলে এবং ঐ পত্র পেষণ করিয়া বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে অনতিবিলম্বে স্তম্বপ্রসব হইয়া থাকে।

অর্শ-রোগে বাসক।—কফজ অর্শের

বলিতে বাসক পত্র কুচি-কুচি করিয়া তাহা পোটলী বন্ধকরতঃ কাষ্ট-অগ্নি-সম্বাপে উত্তপ্ত করিয়া শ্বেদ প্রদান করিলে অর্শের উপশম হইয়া থাকে।

বসন্ত রোগে বাসক ।—বাসকের : লইবে, এবং হরীতকী সমভাগ গ্রহণ করত  
 স্বদস মধুর সংযোগে কফ প্রধান বসন্ত রোগে কলিকাতে সাজিয়া কাষ্টের অগ্নিধারা শুষ্ক  
 পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে । ছাঁকায় তামাকের তায় টানিয়া ধূম অধঃরণ  
 শ্বাস রোগে বাসক ।—বাসকের করিলে শ্বাস কাসে বিশেষ উপকার দর্শে ।  
 শাখা পত্র শুষ্ক করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে কাটিয়া কবিরাজ শ্রীহরি প্রসন্ন রায় কবিরত্ন ।

## শিশু চিকিৎসা ।

—:—

### উদরাময় ।

শিশুদের উদরাময় অর্থাৎ অতিসার হইলে, প্রথমেই দুগ্ধ বন্ধ করা উচিত । কেননা  
 হঠাৎবে দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ অনিষ্ট  
 হইয়া থাকে । দুগ্ধের সহিত বিষাক্ত পদার্থ  
 পরিচালিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । পরিপাক  
 প্রণালীতে দুগ্ধে রোগের বীজাণু পরিপুষ্ট হয়,  
 বেশ বৃদ্ধিও করে ।

পাঁড়ার প্রথাবাবস্থায় পাকস্থলীতে দুগ্ধ  
 পরিপাক হয়না । এ সময় যাহাতে পরিপাক  
 প্রণালী পরিষ্কার হইয়া যায়, এরূপ উপায়  
 করা উচিত ।

শুধু দুগ্ধ কেন, রোগের তরুণ অবস্থায়—  
 দনস্ত খাদ্যই বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল সিদ্ধকরা  
 জল কিম্বা বার্লিওয়াটার খাইতে দেওয়া  
 কর্তব্য । এইরূপ পথ্যের উপর ২১ দিন  
 নিস্তর করা চাই ।

অনেক স্থলে দেখা যায়—এইরূপ পথ্যের  
 উপর শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকগণ  
 বড় আস্থা স্থাপন করেন না । তাঁহারা ভাবেন  
 —জলে কেবলমাত্র একটু জল বা জলবাণী  
 থাইয়া কেমন করিয়া বাচিবে ? তাই তাঁহারা

শিশুকে অল্প কোন রকম পথ্য দেওয়া চলে  
 কিনা, বারম্বার তাহা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা  
 করেন । পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে—  
 চিকিৎসকও হয়ত শিশুকে অল্পরূপ পথ্য দিতে  
 বাধ্য হন । ইহা কিন্তু অত্যন্ত অত্যাচার । এ  
 অবস্থায় চিকিৎসকের কর্তব্য—তাহার  
 অভিভাবককে বুঝানো, শিশুর এখন অল্প  
 খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি নাই, তাহার  
 পরিপাক প্রণালীতে অল্প পথ্য আদৌ শোষিত  
 হইবে না । এই সময় শিশুর অভিভাবকগণকে  
 শিশুর মল দেখাইয়া দিয়া বলা উচিত—এখন  
 দুগ্ধাদি পান করিতে দিলে—তাহা হজম হইবে  
 না, পীত দুগ্ধ সমস্তই অল্প হইতে বাহির হইয়া  
 যাইবে ।

তরল ভেদ হইতে থাকিলে, পিপাসা  
 অত্যন্ত প্রবল হয় । এরূপ অবস্থায় শিশুকে  
 বারম্বার জলপান করিতে দেওয়া উচিত । তবে  
 একেবারে অধিক মাত্রায় জল না দিয়া এক  
 ঘণ্টা, আধঘণ্টা, কিম্বা ১৫ মিনিট অন্তর, আধ  
 তোলা পরিমাণে জল পান করিতে দিতে হয় ।  
 জল বেশী দিলে—শিশু বমি করিতে পারেন ।

অনেক ডাক্তার সমস্ত দিনে এক পোয়া জলের সহিত ১ ড্রাম ব্রাণ্ডী মিশাইয়া পান করাইতে বলেন।

কোন শিশুর চব্বিশ ঘণ্টার পর, কাহারও বা ৪৮ ঘণ্টার পর, পরিপাক-প্রণালী পুনরায় পরিশোধন শক্তি লাভ করে। অন্ত্রমণ্ডলও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যায়। এই সময়—একপোয়া বার্লিওরাটারের সঙ্গে আধ আউন্স ডিমের অণ্ডলান মিশাইয়া শিশুকে খাওয়ান যাইতে পারে। দেশীয় প্রণালীসারে—চিঁড়া ধোয়া জলের সহিত অণ্ডলান মিশ্রিত করিয়া তাহাও খাওয়ান চলে। এই পথ্য দিবসে ২ ঘণ্টা অন্তর এবং রাত্রে ৪ ঘণ্টা অন্তর অল্প অল্প দিতে হইবে। এই ভাবের পথ্য ছ'এক দিন দিয়া যখন দেখিবে—অতিসারের লক্ষণ তিরোহিত হইয়াছে বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন অল্প পথ্য দিতে পার।

অতিসারের লক্ষণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলে, প্রথমে ছানার জল, পরে প্রোপ্টোনাইজ করিয়া, তাহার পর চূণের জল মিশাইয়া গোড়ফ্র সহ পান করিতে দিবে। এইরূপ নিয়মে পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলে,—বিনা ঔষধেও রোগ সারিতে পারে।

ঔষধের মধ্যে এমন ঔষধ প্রথমে ব্যবস্থা করিবে—যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া অল্প পরিষ্কার হইয়া যায়। এরও তৈলের এই গুণ নথেষ্ট আছে। কিন্তু বমনোদ্বেগ বেশী থাকিলে, এরও তৈলের

পরিবর্তে পায়দ ঘটিত ঔষধ দেওয়া ভাল। তরুণ লক্ষণ অন্তর্হিত হইলে অর্গাং বন বন মলত্যাগের প্রবৃত্তি প্রশমিত হইলে—অবসাদক ঔষধ দেওয়া উচিত।

### আক্ষেপ।

আক্ষেপ কিছু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইলে, শিশুকে প্রথমেই গরম জলে নিমজ্জিত করিবে; অথবা একসের গরম জলে একতোলা সর্বপ চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া এই জলে গামছা ভিজাইয়া তাহার দ্বারা শিশুর অঙ্গ আবৃত করিবে। এই ভাবে ১০।১৫ মিনিট রাখিতে হইবে।

ইহাতেও যদি আক্ষেপ নিবারিত না হয়, কিম্বা ক্ষণস্থায়ীভাবে নিবারিত হইয়া পুনরায় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে—অবসাদক ঔষধের প্রয়োজন। শিশুর প্রকৃতি ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া—এইরূপ ঔষধ নির্বাচন করিয়া লইতে হয়। ডাক্তারী মতে—কোরোফরম ফ্রোরাল হাইড্রেট—এমন কি মফিয়া পর্যন্ত আক্ষেপ নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।\*

### দস্তোদম।

দস্তোদম সময়ে শিশুদের নানাবিধ রোগ হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে এ সময় শিশু কোন অসুখ না হইতে পারে—প্রথম হইতে তাহার উপায় করা কর্তব্য। খাত্তের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে—অতিসার, উদরের বদ্বণা ও আত্মান প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এই পীড়ায় এরও তৈল ও রিয়াই (রেউটিনী) উৎকৃষ্ট ঔষধ।†

\* কুমারিকা লতা বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ আক্ষেপ নিবারিত হয়। আয়ুর্বেদে—আক্ষেপ নিবারক বহুবোণ উল্লিখিত হইয়াছে। পৃথক প্রবন্ধে আমরা তাহা লিখিব।—আং সং।

† ছুছুরী শুক দশনাং শুদোষ্টং বিদোষ্ট। কঠিন্ধ বসনে নিবন্ধ।

দস্তোদমঃ বালকঃ ক্রজঃ অরকঃ ঐকাহিকঃ হস্তি হুচ ভার নস্তে।  
ছুঁচার দাঁত এবং চোঁটী রোঁজে শুকাইয়া কাপড়ের পুঁচুলিতে বাঁধিয়া শিশুর পলাইয়া দিলে, বালক কাম কাণীষ সকল ব্যাধি নষ্ট হয়। আং সং।

পেটের বেদনা খুব বেশী হইলে অল্প মাত্রায় আফিং প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু অনেকেই বিশেষতঃ কবিরাজ মহাশয়েরা—আফিং দিতে অপত্তি করিতে পারেন। তবে আফিং দিতে হইলে খুব সাবধান হইয়া দিতে হইবে। যেন নারী বেশী না হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ আফিং দেওয়াও উচিত নহে। এক ফোটা আফিমেব আরক (টিকার ওপিয়াই) দিলে যথেষ্ট। তন্দ্রাভাব দূর না হওয়া পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয়বার আফিং দিবে না। আফিং খাইলে শিশু বচক্ষু যেন জড়াইয়া আসে, নিদ্রাকালীন অবস্থায় উপস্থিত হয়, ইহাকেই তন্দ্রাভাব বলে। তন্দ্রাভাব—অর্থাৎ ঝিমঝিম। যতক্ষণ এই ঝিমঝিম, বা নেশার ভাব দূর না হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় মাত্রা আফিং প্রয়োগ করিতে নাই, এটুকু অবশ্য রাখিবে। শিশু অনিদ্রাগ্রস্ত এবং অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলে—ডাক্তারী মতে “হোমোট” প্রয়োগ করিতে হয়।

দশমস্তব কালের পেটের অস্বস্তি সহসা বন্ধ করিবে না; এ সময় পেটের অস্বস্তি হওয়া এবং ভাল, তাহাতে আর আক্ষেপের (রস তরকারি) ভয় থাকে না। যে সকল শিশুর দাঁত উঠিবার সময় পেটের অস্বস্তি না হয়, তাহাদের বসন্তজ্বর হইতে পারে। অতএব দাঁত উঠিবার সময় মল বাহাতে পরীক্ষার থাকে—তৎপূর্ব ব্যবস্থা সন্দেহে করা চাই।

দাঁত উঠিবার সময়—ছেলেরা যা’ তা’ মুখে দেয়। ইহাতে অনেক রোগের বীজাণু তাহাদের দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে। শিশু বেশী মুত্রিকা মুখে দিলে—ঐ মুত্রিকা উদরস্থ হইয়া বৃক্কের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়, মাটির সঙ্গে ক্রিমি বীজাণুও উদর গহ্বরে আশ্রয় লাভ করে।

এ সময় দাঁতের মাড়ী শোণিত পূর্ণ ও বেদনায়ুক্ত হয়। সোতাগার থৈ মধুব সজ্জিত মর্দন করিয়া দন্তমাড়িতে প্রলেপ দিলে—বেদনাইয়াস হইয়া থাকে। আমেরিকায় এক দন্ত চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায়—একজন বড় ডাক্তার লিখিয়াছেন—“দন্তোদগম সময়ে দাঁতের মাড়ি কাটিয়া দিলে অনেক ছেলে মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পায়। দন্তোদগমকালীন বেদনা হইতে আক্ষেপের উৎপত্তি প্রায়ই হইয়া থাকে।” এ যুক্তি কিন্তু সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। শিশুর আক্ষেপ হয়—পরিপাক প্রণালীর দোষে। মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীর প্রদাহের জন্ত টিউবার কিউলোসিসের জন্ত, নিমোনিয়া হইবার প্রারম্ভে শিশুর শরীরে আক্ষেপের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। দাঁতের মাড়ী কাটিয়া দিলে—আক্ষেপ নিবারিত হয় না। তবে শোণিত স্রাব হওয়ায় স্থানিক বেদনা কমিয়া যায় বটে।

কেবল একটু রক্তস্রাব হইতে পারে—এইরূপ ভাবে দাঁতের মাড়ি কাটিয়া দিলে মন্দ হয় না। গভীরভাবে কর্তন করা একেবারেই অমুচিত। মাড়ি শোণিত পূর্ণ বোধ না হইলে অথবা শিশু বেদনার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিলে, কখনই দাঁতের মাড়ি চিরিয়া দিবে না।

আমাদের দেশের প্রাচীন গৃহিণীগণ—শিশুর দন্তোদগমের বিলম্ব দেখিলে—ধানের দ্বারা মাড়ি সামান্য বিদ্ধ করিয়া দিতেন। ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া শিশু সুস্থতা লাভ করিত। মাড়ি শোণিত পূর্ণ হইয়া—তাহাকে আর কিছু দিতে পারিত না।

স্তনের দোষ।

মাতৃস্তনের দোষে—শিশুর অনেক রোগ হইতে পারে। জাহার—মধ্যে পরিপোষণের

ব্যাঘাত—সর্ব প্রধান। কোন কোন প্রস্থতির স্তনের দুগ্ধে এমন কোন রাসায়নিক বিশেষত্ব থাকে যে, সে স্তন্য পান করিলে শিশুর হজম হয় না। অগতঃ এইরূপ স্তনের মেদে অংশ অল্প থাকায়—শিশু দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেরূপ শীর্ণ শিশুকে পরীক্ষা করিলে, বিশেষ রোগ ধরিতেও পারা যায় না। শিশু সর্বদা কাঁদে, নিয়ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, বাহ্যে ভাল হয় না। যাহা হয় তাহাও অত্যন্ত কঠিন। বিলাতে এইরূপ মেনবজ্জিতস্তন্থে ক্রিম মিশ্রিত করিয়া শিশুকে খাওয়াইবার প্রথা আছে। আমাদের দেশের শিশুকে এরূপ অবস্থায় বার্লিসহ ছাগদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ \* খাওয়ান ভাল। ইহা মাত্র দুইবার খাওয়াইতে হইবে। বাকী সময় মাতার স্তন্যপান করিবে।

প্রস্থতি-স্তন্থে দুগ্ধ শর্করার অল্পতা হইলে, সে স্তন্য পানেও শিশু শীর্ণ হইয়া পড়ে। এরূপ শিশুকে একটু করিয়া চিনি খাওয়ান উচিত।

কোন কোন প্রস্থতির স্তন্য পান করিলে শিশুর পেটের কানড়ানি ও ভেদ হইয়া থাকে। শিশুর নলে ছানার অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ প্রস্থতিকে ক্ষার ঔষধ খাইতে দিবে, তাহার স্তন্য সংশোধিত হয়। ডাক্তারী মতে এরূপ প্রস্থতিকে—সোডিবাইকার্ক এবং সোডা এবং সোডা সাইট্রাস খাওয়ানর ব্যবস্থা আছে। কবিরাজী মতে—শর্ক ভস্ম ও মৌরীচূর্ণ খাইলে প্রস্থতির স্তন দুগ্ধ বিপুল হয়।

নিদ্রিতাবস্থায় ভয়ানক স্বপ্নদর্শন।

অতি অল্প সংখ্যক বালকেরই এ রোগ হইয়া থাকে। ইহার ঔষধ—অবসাদক। যথা এণ্টপাইরিন,—প্রভৃতি। বৈজ্ঞ মতে তেজা কুচার পাতার রস চিনি সহ পান করাইলে বেশ সফল পাওয়া যায়।

শয্যামুত্র।

পেটে ক্রিম থাকিলে প্রায়ই এ রোগ উপস্থিত হয়। বেলেডোনা ও আফিং ইহার ঔষধ। উভয় ঔষধ অল্পমাত্রায় আরম্ভ করা উচিত। তেলাকুচার পাতার রস, চাউন ভাজার গুড়া, জটামাংসীর রস প্রভৃতি প্রয়োগে—এ রোগের শাস্তি হইয়া থাকে।

দিঃ হসপিটাল হইতে অবসর প্রাপ্ত

ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত।

## পঞ্চকর্ম।

—:—

ডাক্তার-কবিরাজ সংবাদ।

ডাক্তার। আহ্নান কবিরাজ মহাশয়, ভাল আছেন ত ?

কবিরাজ। এক রকম মন্দ নয়, আপনাদের খবর কি ?

ডাক্তার। শারীরিক ভালই বটে, কিন্তু বাজার বড় মন্দ। রোগীপ্তর খুব কম। ক। রক্কে করুন মশায়, বার মাস সমান টানে লোকে যদি রোগ ভোগ করে, তা,

\* এরূপ অবস্থায় গবা দুগ্ধে শালপানি মিশাইয়া চিনি সহ লিঙ্গ করিয়া শিশুকে খাইতে দিলে, বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।—আঃ সং।

হলে শেষে 'যে একেবারেই রোগী পাবেন না।

ডাঃ। তা' তো বলছেন, কিন্তু মনে ক'রে দেখুন দেখি খরচাটা কি। বাড়ী ভাড়া, লোক জন সহিস কোচমানের মাইনে, ঘোড়ার খোরাক, ইলেকট্রিক আলো, পাখায় বিল—এগুলো ত মাস পেলেই গুণতে হবে। আপনারাও তো ক্রম খরচা বাড়িয়ে তুলেছেন।

ক। মহাজনঃ যেন গতঃ স পত্না—আপনারা হ'লেন মহাজন,—যে পথে আপনারা হ'লেন, আমরাও সেই পথে চলিছি।

ডাঃ। পূর্বে আপনারদের তো এরকম চাল ছিল না?

ক। কিছুমাত্র না। আয়ুর্কেন্দ্রের স্রষ্টা ঈশ্বর—তাঁরা গাছের বাকল প'রতেন। তার পত্রতদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যারা জীবের স্বার্থবধান এবং প্রাণরক্ষা রূপ মহাব্রত অবলম্বন ক'রতেন, তাঁরা মোটা চাদর কাপড় খাব চটা জুতো হ'লেই সন্তুষ্ট থাকতেন। এখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যেমন দেখচেন—আগেকার কবিবাজেরা ঠিক সেই রকম একেবারে বিলাসিতা বর্জিত ছিলেন। তাছাড়া শাস্ত্রচক্র ও চিন্তায় তাঁরা এত নিমগ্ন থাকতেন যে, বিষয়বুদ্ধি তাঁদের কিছুমাত্র ছিল না—টাকা, মোহরব প্রভেদ জানতেন না।

ডাঃ। বলেন কি!

ক। বলি সত্য কথা। এই কিছু দিন পূর্বে ঘটনা শুনুন। দর্প নারায়ণ ব'লে এক জন কবিরাজ ছিলেন, তিনি এক সময়ে মহিষাসুরের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার জন্ত আহূত হন। বা'বার সময় কবিরাজ মহাশয়ের জী ব'লে দেন যে, তিনি বেন ইলদে টাকা চান। কবিরাজ মহাশয়ের স্মৃতিচিৎসায় রোগী

আরোগ্য লাভ করিলে বিদায়ের সময় তিনি রাজার নিকট হলদে টাকা চাহিলেন, রাজাও দাওয়ানকে যথেষ্ট মোহর প্রস্কার দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দাওয়ান দেখিলেন যে, কবিরাজ নিতান্ত বোকা। তিনি টাকায় হলুদ নাখাইয়া কবিরাজ মহাশয়কে দিলেন। রাজকীয় প্রহরী এবং কর্মচারী সঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং গৃহিণীকে টাকা দিয়া মহা আনন্দে বলিলেন,—‘এই দেখ গৃহিণী, হলদে টাকা এনেছি।’ গৃহিণী দেখিয়া ভাবিলেন যে, উহা কখনই রাজার কার্য্য নহে। কোন ছুষ্ঠবুদ্ধি কর্মচারী এরূপ করিয়াছে, তিনি সমাগত কর্মচারী এবং প্রহরীদেরকে রাজার নিকটে একখানি পত্র লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা—ইহা উদ্ধতন কর্মচারীর কার্য্য এবং রাজার নিকট পত্র লইয়া গেলে তাহাদের চাকরী থাকিবে না—এইরূপ ভাবিয়া পত্র লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। কেবল একজন পালকী-বেহারী কবিরাজ মহাশয়ের গুলে মুগ্ধ হইয়া বলিল, আমি খাটিয়া খাই, চাকরী যায়—অন্ততঃ চাকরী করিব, আমি পত্র লইয়া যাইব। যাহা হউক তাহারই হস্তে পত্র দেওয়া হইল। পত্রে লেখা ছিল যে, মহারাজ, এরূপ লোককে আপনার ঠকান ভাল হয় নাই। রাজা পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই ছুষ্ঠ কর্মচারীকে পদচ্যুত করিলেন এবং যথেষ্ট মোহর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন।

ডাঃ। একি গল্প নাসত্য কবিরাজ মহাশয়?

ক। এখন গল্প ব'লেই মনে হয়, কিন্তু সত্য সেকালের কবিরাজদের বিষয় বুদ্ধি মোটেই ছিলনা। টাকা মশক্কে আর একটা ঘটনার কথা বলি শুনুন। একবার জনৈক

কবিরাজ কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার জন্ত আহূত হন। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, রাজা কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি চান? কবিরাজ মহাশয় পূর্বে হাতী দেখেন নাই, এখানে হাতী দেখিয়া খুব আনন্দ হইয়াছিল, তিনি রাজাকে একটা হাতী দেখাইয়া বলিলেন—আমি এইটে নেব। রাজা হাতী পুরস্কার দিয়া কবিরাজ মহাশয়কে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কবিরাজ গৃহিণী ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি এনেছ? কবিরাজ সানন্দে হাতী দেখাইয়া বলিলেন, আমি এইটে চেয়ে এনেছি। তখন গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন,—আঃ আমার কপাল! কবিরাজ মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কেন, কি হল? কবিরাজ গৃহিণী বলিলেন, দাড়াও দেখাচ্ছি। এই বলিয়া প্রচুর ধান ও চাউল হাতীকে খাইতে দিলেন। গজরাজও মহা আনন্দে সেই ধান ও চাউলের স্তূপ উদরংসাং করিল। গজরাজের আহার দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় অবাক। তখনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে পত্র লিখিলেন যে, আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছেন। আমাকে একটা রাফস দিয়াছেন। রাজা কবিরাজ মহাশয়ের শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং বিষয়বুদ্ধির হীনতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া হস্তীর পরিবর্তে প্রচুর অর্থ দিয়া পাঠাইলেন।

ডাঃ। আশ্চর্য্য ব্যাপার, যা'রা এত বিষয়-বুদ্ধিহীন,—তা'রা পণ্ডিত হ'য়ে কি করে?

ক। কিছুই আশ্চর্য্য নয়। পাশ্চাত্য দেশের গালিলিও, সক্রোটিস প্রভৃতিও এইরূপ ছিলেন। নিউটন এত চিন্তামগ্ন থাকিতেন

যে, আহার ক'রতে ভুলে যেতেন। প্রকৃত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিলাসিতা ও অর্থচিন্তার বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। কবিরাজগণ যত বিলাস ও অর্থপ্রিয় হ'তে লাগলেন, ততই তাঁদের পাণ্ডিত্য ক'মে আসতে লাগল। ফলে আয়ুর্বেদের ক্রমশঃ অবনতি ঘটলো। এগুন এমন হয়েছে যে—একটা ফোড়া কটিতে হ'লে—কি পিচকারী দিয়ে বাহ্যে করা'তে হ'লে আপনাদের দ্বারস্থ হতে হয়।

ডাঃ। পিচকারী দিয়ে বাহ্যে করান আগে ছিল নাকি?

ক। (হাসিয়া) এখন তাই মনে হয় বটে, কিন্তু পিচকারী দিয়ে বাহ্যে করা'বার যে সুন্দর নিয়ম আয়ুর্বেদে ছিল, আপনাদের শাস্ত্রে তাঁর সিকির সিকিও নেই।

ডাঃ। বলেন কি?

ক। বলি ঠিক। কেবল বাহ্যে করা'বার জন্ত পিচকারী দেওয়া নয়, পিচকারী দিয়ে অনেক রোগের চিকিৎসাও হ'ত।

ডাঃ। অবাক কল্লেন আপনি! রেক্টাল ফিডিং (Rectal feeding) কবিরাজ্যে ছিল নাকি?

ক। ছিল বৈ কি। এক বস্তিকেই শাস্ত্রে অন্ধ্রিক চিকিৎসা—মতান্তরে সম্পূর্ণ চিকিৎসা বলা হ'য়েছে।

ডাঃ। বস্তুটা কি?

ক। মলদ্বারে পিচকারী দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করার নাম বস্তিপ্রয়োগ। আর মূত্রদ্বার পথে ঔষধ প্রয়োগ করার নাম উত্তর বস্তি।

ডাঃ। আপনি আমার কৌতূহলী ক'রে তুল্লেন দেখছি। তা'র খণ্ডন ক'রে তুলেছেন,—তখন সব শোনাতে হবে আপনাকে।



ক। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তা' হ'লে পঞ্চকৰ্ম সবই শুনতে হয়।

ডাঃ। হাঁ হাঁ পঞ্চকৰ্ম ব'লে একটা প্রবন্ধ প্রথম বছরের আয়ুর্কোষে বেরিয়ে ছিল বটে। কিন্তু তা'তে কেবল স্বেদের কথাই লেখা ছিল।

ক। স্বেদ—পঞ্চ কৰ্মের মধ্যে নয়, ওটাকে প্রাককৰ্ম বলে। পঞ্চকৰ্মের পূর্বে প্রথমে মেহ পান করিয়ে স্বেদ দিতে হয় তা'রপর পঞ্চ কৰ্ম ক'রতে হয়।

ডাঃ। মেহ পান কি ?

ক। হাবর ও জঙ্ঘম ভেদে মেহ দুই প্রকার। আবার ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা-চোদে মেহ চারি প্রকার। হাবরমেহের মধ্যে তিল তৈল ও জঙ্ঘম মেহের মধ্যে ঘৃতই প্রধান। পঞ্চকৰ্ম ক'রবার পূর্বে প্রথমে বোণীকে মেহ পান ক'রাতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা মেহ পানের নিয়ম কি ?

ক। নিয়ম নানারূপ আছে, ক্রমশঃ ব'লছি। পূর্বে যে চারি প্রকার মেহের কথা ব'লছি, তার মধ্যে পিত্তপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত, বাত প্রধান ব্যক্তির পক্ষে সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত ঘৃত এবং কফ প্রধান ব্যক্তির পক্ষে উঠ পিপ্পল, মরিচ ও যবক্ষার চূর্ণ সংযুক্ত ঘৃত প্রশস্ত। আর বৃদ্ধি স্থিতি ও মেধা প্রার্থী ব্যক্তিগণের পক্ষে ঘৃতই প্রশস্ত। গ্রন্থি (এই রোগে শরীরে গোলাকার গাউন্টের মত হয়) রোগ ও নালী ঘা রোগে অজ্ঞাত ব্যক্তি, ক্রিমিরোগী, শ্লেষ্মরোগী, মেদরোগী, বায়ুরোগী, এবং ক্রুরকোষ্ঠ ব্যক্তি নিগের শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তার জন্য তৈল প্রয়োগ ক'রতে হয়। প্রবল বায়ু, রৌদ্র পথ পথটন, ভারবহন, স্ত্রী সংসর্গ ও ব্যায়াম বশতঃ

ক্ষীণ ধাতু ব্যক্তিগণের পক্ষে এবং রুক্ষ ক্লেশ সহ, অত্যগ্নি বিশিষ্ট এবং বায়ু কর্তৃক রুদ্ধ শ্রোত ব্যক্তিগণের পক্ষে বসা ও মজ্জা হিতকর। সন্ধি, অস্থি, মন্মথপ্রকোষ্ঠে বেদনা থাকিলে এবং দগ্ধ আহত, ভ্রষ্টযোনি, কর্ণ ও মস্তকে যন্ত্রণাসুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে 'একমাত্র বসা (চর্কি) হিতকর।

ডাঃ। মেহ কি সকলকেই পান করান যেতে পারে ?

ক। না, তা' যায় না। এক নিয়ম কি সকলের পক্ষে খাটে ? যাহাদের বেদ দিতে হবে—বা বা'দের শরীর বমন বিবরণের দ্বারা শোষণ ক'রতে হ'বে—তা'দের পক্ষে, মদ্য, স্ত্রী ও ব্যায়ামাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে, চিন্তাশীল, বৃদ্ধ, বালক, দুর্বল কুশ, রুক্ষ, অন্নরক্ত, অন্ন শুষ্ক, বায়ু পীড়িত, পুরাতন অভিযান্দ নামক নেত্র রোগ, তিমির নামক নেত্ররোগ, দৃঃসাধ্য রোগ গ্রস্ত এবং জাগরণশীল ব্যক্তির পক্ষে মেহ পান হিতকর। আর মন্দাগ্নি বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্নি বিশিষ্ট, অতি স্থূল, অতি দুর্বল, তৃষ্ণা ও মত্ত দ্বারা পীড়িত এবং উরুস্তম্ভ, অতিসার, গলরোগ, বিষরোগ, উদররোগ, মূচ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মা রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিগণ মেহ প্রয়োগের অযোগ্য। যে সকল স্ত্রী অকালে প্রসূতা হয়, তাহারাও মেহ পানের অযোগ্য।

ডাঃ। মেহ পান সম্বন্ধে আর কি নিয়ম আছে ?

ক। নিয়ম অনেক আছে, তবে মোটা-মুটি এই। আর ঘৃত পানের পর উষ্ণ জল, তৈল পানের পর যুষ এবং বসা ও মজ্জা পানের পর মণ্ড পান করিতে দিবার বিধি আছে, কিন্তু সকল প্রকার মেহ পান ক'রে গরম জল খাওয়া চলে, তবে রোগভেদে জেলার তেল, চাল মুগয়ার তেল পান ক'রে ঠাণ্ডা জল খেতে হয়।

ডাঃ। ভেলার তেল খেতে হয় নাকি ?

ক। সে রোগ ভেদে,—পঞ্চ কশ্মের প্রাক্ কশ্মে নয়। সে কথা পরে বলব। স্নেহ পান সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা আছে—প্রথমে বলি। স্নেহ পান ক'রে দুটি উপসর্গ ঘ'টতে পারে,—এক পিপাসা, দ্বিতীয় স্নেহ জীর্ণ না হওয়া। স্নেহ পান ক'রে পিপাসা হ'লে গরম জল পান ক'রতে দিতে হয়। তাতে যদি পিপাসার শান্তি না হয়, তা' হলে প্রচুর পরিমাণে গরম জল পান করিয়ে বমি করা'তে হয়। এতে স্নেহ পদার্থ নিঃসারিত হ'য়ে পিপাসার শান্তি হয়। যদি স্নেহপদার্থ জীর্ণ না হ'য়ে থাকে, তা' হলেও গরম জল পান করিয়ে বমি করা'তে হয়। পরে কোষ্ঠ লঘু হ'লে পুনরায় স্নেহ পান করা'তে হয়। স্নেহ জীর্ণ হ'য়েছে কিনা—সন্দেহ হ'লে গরম জল পান করা উচিত। এতে স্নেহ জীর্ণ হয় এবং উদ্যার বিস্তৃক্ত ও অগ্নে দ্রুতি হ'য়ে থাকে।

ডাঃ। এইবার ভেলার তেল পান করা ব্যাপারটা কি বলুন।

ক। পূর্বেই ব'লেছি, যে স্নেহপানের কথা বলেছি সেটা প্রাক্ কশ্মের জন্ত। এ ছাড়া নানা রোগে স্নেহপান করার বিধি আছে। সূক্ষ্মত ব'লেছেন—বহুরোগে স্নেহসাধ্য। পান, অনুবাসন, শিরোবস্তি ( মাথার উপর চামড়ার চুলি রাখিয়া তাহা তৈলপূর্ণ করা ) মস্তিষ্ক তপ্পন, উত্তর বস্তি, নস্ত্র, কর্ণ পূরণ, অভ্যঙ্গ ও ভোজন কার্যে স্নেহ প্রয়োগ করিতে হয়। বাহ্যিক ভয়ে কেবল কয়েকটির নাম মাত্র বলা যাইতেছে। যথা, বিরেচক স্নেহ, বমনকারক স্নেহ, শিরো বিরেচক স্নেহ, চুষ্ট ব্রণনাশক স্নেহ, মহাব্যাধি বিনাশক স্নেহ, সূত্ররোধনাশক স্নেহ, শর্করা ও অশ্মরী ( পাথরী ) নাশক স্নেহ,

প্রমেহনাশক স্নেহ, পিত্ত সংশ্লিষ্ট বায়ুনাশক স্নেহ, ক্ষতস্থান কৃষ্ণবর্ণ কারক স্নেহ, ক্ষতস্থান পাণ্ডুবর্ণকারক স্নেহ, দক্ষ ক্রিষ্টিম নাশক স্নেহ, ইত্যাদি। কুষ্ঠ রোগে চাল মুগবা এবং ভেলার তেল পান করিবার বিধি আছে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সহিত স্নেহ পাক করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

ডাঃ। তাই ত ব্যাপার ত বড় সোজা নয় !

ক। ব্যাপার আরও অনেক আছে, ক্রমশঃ শুধুন। এইত গেল স্নেহ পান। স্নেহ পানের পরেই শ্বেদ দিতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে যে স্নেহ পানের কথা ব'লেন, তা'দের কি পরে শ্বেদ, বমন, বিরেচন নিষিদ্ধ।

ক। না নিষিদ্ধ কেন? স্নেহপান, শ্বেদ, বমন, বিরেচন প্রভৃতি দ্বারা সংশোধন অনেক রোগে ক'রতে হয়। কিন্তু বিস্তারিত ভাবে সে সব কথা ব'লতে গেলে সমগ্র আয়ুর্বেদই ব'লতে হয়। সেইজন্ত আমি সাধাবণ ভাবে পঞ্চকশ্মের কথা ব'লছি।

ডাঃ। সাধারণ ভাবে কি ?

ক। এই মনে করুন—সূক্ষ্ম শরীরে প্রথমে পঞ্চ কশ্ম ক'রে তারপর, রসায়ন—বাজীকরণ ঔষধ সেবন ক'রতে হয়। তবে এভাবে বলতে গেলেও অনেক রোগের কথা আপনি এসে পড়বে। কেন না, বা'দের বমন-বিরেচন করা'তে হয়—সে কথাত বলতে হবে।

ডাঃ। আচ্ছা, স্নেহপানের কথা শুনিলাম। স্নেহ পানের পর শ্বেদ। তা' শ্বেদে কথা প্রথম বছরের আয়ুর্বেদে প'ড়েছিল। এই গেল আপনার প্রাক্ কশ্ম, এখন পঞ্চকশ্মের কথা বলুন।

ক। ঘেহ ও শ্বেদ প্রয়োগের পর প্রথমেই বমন করাতে হয়। যে দিন বমন করাতে হবে, তা'র পূর্বেদিন রোগীকে মৎস্ত, মাংস, তিল প্রভৃতি কফের উৎক্লেশকর পথ্য ভোজন করিতে দিবে।

ডাঃ। তা'র মানে কি?

ক। তার মানে এই যে, ঐরূপ না ক'রলে বমন কষ্টকর হ'য়ে পড়ে।

ডাঃ। আচ্ছা তার পর?

ক। তা'রপর দিন রোগীকে ভান্নতুলা উচ্চ মদনে বসিয়ে প্রাতঃকালে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে হয়। আবার রোগভেদে বমনকারক ঔষধেরও ভেদ আছে।

ডাঃ। সে কি রকম?

ক। ব'লতে গেলে পু'ণি বেড়ে যাবে, যা' শোক বলি শুদ্ধন, কিন্তু তা বলবার আগে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। একবার আমার এক মন ডাক্তার কবিরাজ বন্ধু ব'লেছিলেন, ওহে জোনাপেব একটা কিছুই ঠিক পাই না, এক জনকে যে মাত্রায় দিই—তার কিছুই হয় না সেই মাত্রায় অন্য লোককে দিলে বেশ কোষ্ঠী উদ্ভি হয়, আবার অপর একজনের সেই মাত্রায় অতিবিক্ত দাস্ত হয়।

ডাঃ। আপনি কি উত্তর করলেন?

ক। আমি বললাম, দেখ হে সেটা জোনাপেব দোষ নয়, এক রকম জোনাপ যদি সকল পোগে আর সকলের শরীরে সমানভাবে ক'জ় করতো, তা হ'লে আরেয় খাবি কষ্ট স্বীকার ক'রে ছয় শত জোনাপের উল্লেখ করতেন না।

ডাঃ।—বলেন কি ছয় শত রকম জোনাপ?

ক।—সেটাও কেবল দিগদর্শন মাত্র। চিকিৎসক ইচ্ছা ক'রলে আরও ছয়শত কোন্ না করনা ক'রে নিতে পারেন।

ডাঃ।—আপনার সংসর্গে আয়ুর্বেদের উপর আমার ভক্তি বেড়ে উঠছে। আগে আমি আয়ুর্বেদকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখতাম।

ক।—অনেকেরই তাই হয়। ভিতরে কি আছে না দেখে ঘৃণা করাটা অনেকেরই স্বভাব। কিন্তু আয়ুর্বেদ আলোচনা ক'রলে বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই আয়ুর্বেদকে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারবেন না। অনেক অনেক মার্কিন, জার্মান ইংরাজ এবং ফরাসী পণ্ডিত শতমুখে আয়ুর্বেদের সুখ্যাতি ক'রেছেন।

ডাঃ। কিন্তু একটা কথা বলি কবিরাজ মশায়, কিছু মনে ক'রবেন না। আয়ুর্বেদের উপর ভক্তি যতই বেড়ে যাচ্ছে, আপনাদের উপর ততই অশ্রদ্ধা হচ্ছে। কি জিনিসটাকে আপনারা কি ক'রে তুলেছেন।

ক। আপনি যদি কাণ ছুটো ম'লে দিয়ে হু'গালে ছু'টো চড় মেরে এ কথা ব'লতেন, তা হ'লেও রাগ বা হুঃখ হতো না। ত্রুটি কেবল শুধু আমাদের একলার নয়, আমরা পুরুষানুক্রমে দোষী। একথা যখন মনে করি, তখন আপনি আপনি গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা হয়।

ডাঃ। যাক এখন আপনি রোগভেদে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগের কথা বলুন।

ক। ব'লছি, আর একটু ব'লে নিই, দাঁড়ান। আমাদের দোষত স্বীকার করলাম! কিন্তু দেখুন, আপনাদের মধ্যে অনেকে আয়ুর্বেদ না জেনে বা জেনেও ইচ্ছাপূর্বক আয়ুর্বেদীর চিকিৎসকেও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। আপনিও তা'র একজন ছিলেন।

ডাঃ। আমাদের অনেকের এই দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছি। কিন্তু অনেকে আয়ুর্বেদে শাস্ত্রকে খুব ভক্তির চক্ষে দেখেন—একথাও মানতে হ'বে।

ক। নিশ্চয়, আর এর জন্যে তাঁদের কাছে যে আমরা কতদূর কৃতজ্ঞ—তা' ব'লে বোঝাবার নয়।

ডাঃ। থাক সে কথা, আপনি এখন যা' ব'লছিলেন, বলুন।

ক। হাঁ বলছি। ঘোষার ফল ও পুষ্প জ্বর, শ্বাস, হিকারোগে, তিতলাউ কাস, শ্বাস, কফজ বমি, পিপাসা, কফজরোগ ও মূছারোগে, ঘোষার পুষ্প, ফল ও পল্লব বিষছটি, গুল্ম, উদর, কাস, বাতশ্লেষ্মজ রোগ, কঠগত ও মুখগত, কফছটি, কফজনিত রোগ এবং কষ্টসাধ্য ও বহুদিনস্থায়ী রোগে, কুড়ুচি জন্মোগ বাতরক্ত ও বিসর্প রোগে, শ্বেত পুষ্প কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রীহা, শোথ, গুল্ম ও সংযোগ বিষজাত রোগে এবং মদন ফল অধিকাংশ রোগে বমন কার্যের জন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমি আপনাকে নিতান্ত সংক্ষেপে

বলিলাম, বমনকারক বহুবিধ দ্রব্য আছে এবং প্রত্যেকের প্রয়োগ-কল্পনাও নানাপ্রকারে করা যাইতে পারে। এক তিতলাউয়ের ৪৫টা যোগ কল্পনা করা হইয়াছে; তন্মধ্যে আটটা দুগ্ধ সহ; সুরাখণ্ড সহ ১টা, দধিমণ্ড সহ একটা, তক্র সহ একটা, যাহাতে আত্মন লইলে দান্ত হয়—এরূপ অবস্থার রোগে একটা মাংস যোগে একটা, তৈল যোগে একটা, বর্দ্ধমান (ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করা) ও আসব যোগে ছয়টা, ঘৃত সহ একটা, যষ্টিমধু প্রভৃতির কাথ সহ নয়টা, বতি ক্রিয়ার জন্ত আটটা, লেহনোগে পাচটা, মহ (জলে গোলা ছাতু) যোগে একটা ও মাংস রস যোগে একটা প্রয়োগ করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বমন কারক দ্রব্যেরই এইরূপ বিবিধ কল্পনা করা হইয়াছে।

ডাঃ।—এঘে বিরাট ব্যাপার দেখছি। ইহে হ'চে যে, আয়ুর্বেদ আগাগোড়া পড়ে ফেলি।

(ক্রমশঃ)

## বিবিধ সংবাদ।

—:~:—

কাশী আয়ুর্বেদ সম্মিলনী।—

গত ১০ই কার্তিক ৮কাশীধামে বাঙ্গালীটোলা জুল গৃহে “কাশী আয়ুর্বেদ সম্মিলনী”র ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের জ্ঞানানন্দ স্বামী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই আদেশে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নায়ক মহাশয় সভাপতির আসনে উপবেশন করেন। “আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা” শীর্ষক সংস্কৃত প্রবন্ধ এবং “ভারত-বর্ষে আয়ুর্বেদ চর্চা” নামক বাঙ্গালা প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। আমরা ইহার বার্ষিক

কার্য্য বিবরণী পাঠ করিয়া দেখিলাম—লুপ্ত প্রায় শল্য ও রসায়ন শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি সাধন করাও সম্মিলনীর উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সে সাধু, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী।—কলিকাতা এবং মফঃস্বলের অনেক স্থানেই ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী একজন প্রভূত অর্থ ব্যয়পূর্বক প্রকৃতিগুণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মফঃস্বলের অনেক স্থলে লোকের অসুস্থি

সকল মিলিতহেন। কলিকাতার স্কুল কলেজ  
গুলি শাবদীয়া পূজার অবকাশের পর ছু'বার  
বন্ধ হইয়াছে। আমাদের অষ্টাদশ আয়ুর্ক্বেদ  
বিদ্যালয়ও এই উপলক্ষে ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত  
বন্ধ হইয়া নাই।

কলিকাতায় মড়ক।—কলিকাতায়  
ইন্দুরেজা রোগে কিরূপ লোকক্ষয় হইতেছে  
এক সম্ভাষ্যেব হিসাব হইতে তাহা উপলব্ধি  
হইবে। নবেম্বর মাসে ১১ই ৭৬, ১১ই ৭০,  
১৫ই ৬১, ১৪ই ৬২, ১৫ই ৫৯, ১৬ই ৫৯, ১৭ই  
৫১ জন এই মহামারীর প্রকোপে ইহলীলা  
লঙ্গ করিয়াছে।

সিন্ধিয়ার রাজমাতা।—আমাদের  
পটকদর্প ভূমিগা সুখী হইবেন,—সিন্ধিয়ার রাজ-  
মাতা উত্তরোত্তর আরোগ্য লাভ করিতেছেন,  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন  
এম-এ এম বি অতি শীঘ্রই স্বদেশে  
প্রত্যাপ্ত হইবেন।

আয়ুর্ক্বেদ সভা।—গত ২৯শে  
বার্ষিক কুমাৰটুলা গঙ্গাপ্রসাদভবনে কলি-  
কাতা আয়ুর্ক্বেদ সভার ৮ম বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ  
সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত  
শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন “বৈদ্যক চিকিৎ-  
সার উন্নতি সাধন” এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত  
সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন “আয়ুর্ক্বেদে—  
খণ্ডপ্রলয়” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।  
২য় প্রবন্ধটি পাঠ করিবার পূর্বে স্থায়ী সভাপতি  
মহাশয় ঐ প্রবন্ধ পাঠের সময় পর্য্যন্ত কবিরাজ  
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সভা-  
পতির পদে বরণ করেন। ২য় প্রবন্ধটি শল্য  
চিকিৎসার অভাবে অষ্টাদশ আয়ুর্ক্বেদের অংশ  
স্বর্গ্য খণ্ড সকল যে বিলয় প্রাপ্ত  
হইয়াছে—

তাহাই অবলম্বনে লিখিত, সেই সঙ্গে ইহার পূর্ব-  
বর্তী অধিবেশনের পঠিত প্রবন্ধের সমালোচনা  
সম্বন্ধেও যে সকল কথা বলা আবশ্যক, তাহারও  
উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। “বৈদ্যক চিকিৎ-  
সার উন্নতি সাধন” প্রবন্ধেও শল্য চিকিৎসার  
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল।  
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি রায় B.A. কবিরাজ শ্রীযুক্ত  
সুরেন্দ্রকুমার কাব্যার্থী এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত  
হরমোহন নজুমদার মহাশয়গণ এই উপলক্ষ্যে  
যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বড়ই যুক্তি-  
পূর্ণ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-  
ব্যাকরণার্থী মহাশয়ও এ সম্বন্ধে অনেক সার-  
গর্ভ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি “আয়ুর্ক্বেদে  
খণ্ড প্রলয়” নামকরণের জন্ত যে সকল কথা—  
বলিয়াছিলেন এবং ঐ প্রবন্ধে কলিকাতার  
কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের কথার উত্তর দেওয়া  
হইয়াছে বলিয়া ‘ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে  
দেওয়া উচিত ছিলনা’—প্রভৃতি যে সকল কথা  
বলিয়াছিলেন তাহার জন্ত আমরা বাস্তবিকই  
আশ্চর্য হইয়াছি। শ্রায়শাস্ত্র সম্বন্ধে ঐ  
প্রবন্ধের নামকরণ “আয়ুর্ক্বেদে খণ্ডপ্রলয়”  
হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ হইলেও ‘খণ্ড’ শব্দের অর্থ  
‘অংশ’ করিলে নামকরণ কখনই অসঙ্গত হয়  
না। তাহার পর কবিরাজ শরচ্চন্দ্র কি  
বলিতে চাহেন যে, এ সভার প্রত্যেক সভ্যই  
কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ লিখা বাহা বলিবেন,  
তাহাই অবনত শিরে মানিয়া চলিবেন!  
যদি ইহাই সভার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে  
কোনো আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ঐ সভার  
‘সভ্য’ নাম লিখাইতে রাজি হইবেন না। শরচ্চন্দ্র  
অসাধারণ পণ্ডিত, কিন্তু ওরূপ অসঙ্গত কথা  
বলিয়া তিনি বাস্তবিকই আমাদের মনে একটা  
অস্বস্তিকর সন্ধানের সন্ধান করিয়া দিয়াছেন।

### আয়ুর্বেদ সভার উদ্দেশ্য।—

এই সভার উদ্দেশ্যের প্রথমেই লিখিত আছে—  
‘বিবিধ উপায়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদশাস্ত্র-প্রসার, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসা প্রণালীর উন্নতি সাধন এবং সর্বত্র নানারূপে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার গৌরব ঘোষণা এই সভার উদ্দেশ্য।’  
ইহার পর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নির্ধারণে লিখিত আছে ‘(খ) উদ্দেশ্যের অনুকূল বিষয় সমূহের আলোচনা।’ এ অবস্থায় ‘আয়ুর্বেদে খণ্ডপ্রলয়’ শীর্ষক প্রবন্ধ উদ্দেশ্যের প্রতিফলনে নহে—ইহা শরচ্চক্রে মনে করা উচিত, কেননা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রসার যখন ইহার উদ্দেশ্য, তখন সেই উদ্দেশ্যের অনুকূলে যিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন,—তঁাহাকে উহা পাঠ করিতে দেওয়া উচিত ছিলনা—এ কথা বলায় সভ্য সভাই প্রবন্ধ পাঠকের মর্যাদার হানি করা হইয়াছে কিনা এবং তাহার ফলে এখন হইতে যাঁহারা কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদিগের মতের বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারিবেন না,—তঁাহাদের আর এ সভায় প্রবন্ধ পাঠ করা উচিত কিনা—সে সম্বন্ধে ভাবিবার বিষয়।

### প্রবন্ধ প্রেরণের কথা।—কবিরাজ

ত্রিযুক্ত সভ্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ইহার পূর্ববর্তী অধিবেশনে যে ‘আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা কবিরাজীর গোঁড়ামি প্রবন্ধ হয় নাই। ইহার পর তিনি যখন আবার প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্ত সম্পাদক ও সভাপতি মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইলেন, তখন সভাপতি মহাশয়ের নিকট হইতে উত্তর আসিল,—তিনি বর্তমান অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় লিখিয়া পাঠাইলেন—তঁাহাকে প্রবন্ধ পাঠের ৩৪ দিন পূর্বে প্রবন্ধ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কবিরাজ সভ্যচরণ ইহার উত্তর দিলেন, তিনি একরূপ মর্মে প্রস্তুত নহেন। সে পত্রের আর উত্তর আসিল না। ছাপান কাডে তাঁহার প্রবন্ধ পঠিত হইবে বলিয়া পরদিনই উত্তর আসিল।

যথাসময়ে প্রবন্ধও পাঠ করা হইল। ঐ প্রবন্ধ ১ম দিনের পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে সমালোচনার যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে—কবিরাজ সভ্যচরণ পত্র লিখিবার সময় সে সত্য জানাইয়া ছিলেন। এ অবস্থায় তঁাহারা আপত্তি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাও করা উচিত নহে এবং সেই জন্তই তাঁহারা আপত্তি করেন নাই বলিয়া আমরা মনে করি। আর নিম্নঃ বলীতে যদিও ‘প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্বে তাহা বা বিশেষ আলোচনার স্থচনা পাঠানর কথা বাহ্য, নিয়ম বন্ধ আছে, কিন্তু তাহার সহিত কোনো আয়ুর্বেদ-জ্ঞানবান্ধাই একমত হইবেন না। অতএব ঐ নিয়মটি তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া উচিত।

### সভাপতির মন্তব্য।—

মহাশয় সে দিন সভাপতি বদল করিয়া বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বক্তৃতা বেক্রপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম—তিনি শল্য চিকিৎসার বিরোধী কোনোকালেই নহেন, বরং শল্য চিকিৎসা শিক্ষা না করিলে, কাহারও হৃৎকিৎসক হইবার অধিকার থাকেনা, তবে কার চিকিৎসার যে সকল গলদ চলিতেছে, আগে সেই সকল দূর করা কর্তব্য। প্রবন্ধপাঠক প্রথমদিনের প্রবন্ধে কায় চিকিৎসার যে সকল গলদের কথা বলিয়াছিলেন,—কবিরাজ ত্রিযুক্ত শ্রামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সে সম্বন্ধে বলেন, “আমি এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিতে পারি, কিন্তু এখানে আয়ুর্বেদব্যবসায়ী ভিন্ন অনেক বিষয়ী লোকও রহিয়াছেন, তাই

“ভয়ে ভয়ে বলি—কি বলি আর,

তা’না হ’লে শুনাতাম বিগার বক্তার।”

ফলে আমরা কবিরাজ ত্রিযুক্ত শ্রামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি যে শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার জন্ত এ প্রবন্ধ পাঠ সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি। ঐ প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৩য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫—পৌষ ।

৪র্থ সংখ্যা

## কাজের কথা ।

—:~:—

স্বাস্থ্যরক্ষা ।—স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে না পারিলে ধর্ম, স্বর্গ, বন্য, কাম বন্য, আর মোক্ষের কথাই বলা—কিছুট লাভ করিবার উপায় নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা এই দুজুই সর্বোপায় স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন—নীরোগ ও সুস্থ হইতে পারিলে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়—আমাদের দৈনন্দিন কর্তব্যের ভিতর দিয়াই তাহার বিধি সকল প্রবর্তিত করিয়া দিয়াছেন। সে সকল বিধি এখন আমরা মানিয়া চলি। ফলে অধিকাংশ বাঙ্গালীই যে এক্ষণে এত রোগজীর্ণ—তাহার প্রধান কারণই তাহাই ।

সেকালের বাঙ্গালী ।—সেকালের বাঙ্গালী এখনকার মত বিলাসিতার ধার বেটেই পারিত না। বিলাসি হইবার উপায়ও তখনকার দিনে বুঝি বাঙ্গালীর এতটা ছিল

না। তাহার কারণ—সেকালের অধিকাংশ বাঙ্গালীই আশৈশব মরণ পর্য্যন্ত পল্লী-জননীর ক্রোড় ছাড়িয়া সহরের সম্পদ উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায় নাই। চাকরি তখনকার দিনে অধিকাংশ বাঙ্গালীকেই করিতে হইত না, ফলে অধিকাংশ—বাঙ্গালী সস্তান সেকালে ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ এবং গোয়ালভরা গাভীর দুধে উদরপূর্তি করিয়া নিরুদ্ধেগ চিত্তে জীবনযাত্রা নির্বাহে সমর্থ হইতেন ।

একালের কথা ।—একালের বাঙ্গালীর সে সকল ব্যবস্থা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ এবং গোয়ালভরা গাভীর ব্যবস্থা করিতে একালেও যাহারা সমর্থ, সহর বাসের স্পৃহা বলবতী হওয়া তাঁহারাও সে সকল বিসর্জন দিয়াছেন। ফলে এখনকার

দিনে 'চাকরি'ই হইয়াছে অনেকের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায়। কিন্তু সত্য কথা কহিতে গেলে—সে চাকরিলব্ধ অর্থ সহরে থাকিয়া সেকালের মত স্বচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য হানির ইহাও একটা কারণ।

\* \* \*

**দৈনন্দিন কর্ম**।—সেকালের বাঙ্গালী যখন চাকরী করিতে জানিতনা,—তখন তাঁহাদের দৈনন্দিন কর্ম যে ভাবে নির্বাহিত হইত, এখন তাহারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে অতি প্রত্যয়ে শয্যাভাগ, সর্কাস্প তৈলাক্ত করিয়া সে প্রাতঃস্নান, সে পূজা আফ্রিক চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা, শাস্ত্র-পুরাণাদির আলোচনায় সেকালের মত বৈকালিক সময় ক্ষেপণ, সন্ধ্যার পর মজলিস্ বসাইয়া কিছুক্ষণ গীতবাহ্যে আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা—একালে সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে। সে সকল করিবার সময়ও এখন কাহারও নাই। সে প্রতিভাও এখন লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি হইবে না তো হইবে কাহার?

\* \* \*

**বিলাসিতায় স্বাস্থ্যহানি**।—সে সকল ব্যবস্থা তো বাঙ্গালীর নিকট হইতে লোপ পাইয়াছেই—তা' ছাড়া বাঙ্গালী এখন সর্ব প্রকারেই ঘোর বিলাসি হইয়া পড়িয়াছে। আগেকার বাঙ্গালী দশকোশ পথ চলিতেও কষ্ট বোধ করিতেন না, এখনকার বাঙ্গালীর এক পোয়া পথ চলিবারও ক্ষমতা নাই। যাহারা সহরে থাকেন, তাঁহাদের অর্দ্ধপোয়া যাইতে হইলেও ট্রামের দরকার। আগেকার মত সে তৈল মর্দনের ব্যবস্থাও এখন অনেকের নিকটই

যেন ঘৃণাজনক হইয়া পড়িয়াছে। সাবান এখন 'বাবু'দের তৈলের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেকালের 'কেওরা' 'আতরে' এখন আর কাহারও মন উঠে না, নানারূপ বিলাসী 'সেণ্টে' তাহার স্থান পূর্ণ হইয়াছে। তামাকের ব্যবহারটা একেবারে উঠিয়া না যাইলেও 'সিগারেটের' চলন—তামাক অপেক্ষা দশগুণ—দশগুণ বলিলেও বোধ হয় কম হয়—বিশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আর চা, সোডা—লেমোনোডের কথা তো আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। ফলে বাঙ্গালী—পূর্বাপেক্ষা এখন অর্থের মুখ অধিক দেখিলেও সার্বিক পদ্ধতি ছাড়িয়া বাঙ্গালী এখন যে সকল পদ্ধতিতে চলিতে শিখিয়াছে, তাহাই তাহার স্বাস্থ্যহানির কারণ।

\* \* \*

**মহিলাদিগের কথা**।—শুধু পুরুষদিগের কথা নহে—বর্তমান সময়ে বাঙ্গালী মহিলাগণেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। অনেক স্থলে তাহারও প্রধান কারণ—তাঁহাদিগের শারীরিক পরিশ্রমের অভাব। অনেক 'বাবু'ই এখন অধ্বাঙ্গিনীদিগকে 'বিবি' করিয়া তুলিতে চাহেন। ফলে অনেক সংসারেই এখন উড়িয়া বা বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের 'বামুনঠাকুর' ঢুকিয়াছে। বি-চাকরেরও অভাব নাই। কাজেই সেকালের মত মহিলাদিগকে ভোরে উঠিয়া ছড়া ঝাঁট দিয়া, আঙ্গিনা পরিষ্কার করিয়া, থালা-বাসন মাজিয়া আয় রন্ধনাদির কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় না। কাজেই 'বাবু'দিগের মত বাঙ্গালী 'বিবিরাত্ত' এখন শারীরিক পরিশ্রম একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাবুরা চাকরির জন্ত—মানসিক শ্রম করেন, আর 'বিবিরা' নাটক—নবল



পাত্র তাহাদের সে শ্রমের অংশভাগিনী হইয়া থাকেন। কাজেই বাঙ্গালী এখনকার দিনে এত হিষ্টরিয়ারোগাক্রান্ত। আজকাল প্রসব করা হইবার জন্তও এত যে ধাত্রীবিশারদ চিকিৎসকেব প্রয়োজন হয়—তাহার কারণও হয়ই। বাঙ্গালী এ সকল কবে বুঝিবে?

দেশের ভবিষ্যৎ।—ফলে দেশের দ্রব্য ক্রমেই যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেয়ই আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্তব্য নহে। নানারূপ রোগ-তড়নে রক্তাশী গুরুত্ব ও মহিলাদিগের দেহ যেরূপ জন্মই ক্ষণ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বাঙ্গালী

মাত্রেয়ই আত্মরক্ষার জন্ত চিন্তাশীল হওয়া কর্তব্য। শারীরিক শ্রম না করিলে স্বাস্থ্য-রক্ষা যে একেবারেই অসম্ভব, বিলাসি—বাঙ্গালী-গণ এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করুন। বুঝিয়া সংসার পরিচালনার প্রত্যেক বিষয়েই পর মূখ্যপেক্ষী না হইয়া, নিজেরা কর্ম্ম হইতে চেষ্টা করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরমহিলাদিগকেও কর্ম্মনিরতা করিতে প্রয়াসপরায়ণ হউন,—তবেই আবার বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলাগণের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্ভবপর হইবে, নতুবা দেশের ভবিষ্যৎ বে ক্রমেই তমসাক্ষর হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

ত্রীমত্যাচরণ সেন ও পু কবিরঞ্জন।

## আয়ুর্বেদের প্রভাব।

বৈদ্য চিকিৎসার—মাফল্য।

—:~:—

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

মানিদের তখন পূর্ণ যৌবন। মনে পূর্ণ প্রাণে পূর্ণ শান্তি, সংসারে পূর্ণ সুখ। তাঁহাদের পেরাল চাপিল—একখানি মাসিক পত্র লিখিতে হইবে। রাধাকীর্তন তখন মনে কবিতা লিখিতে শিখিয়াছে; আচাধ্যককে—সেই কবিতা “সাধারণীতে” ও “নবজীবনে” ছাপিতেছেন! স্বভাবকবিতা সাহিত্যিক সমাজে তাহার একটু আদর! কবিতা! কাজেই আমরা তাহাকে আমাদের কাগজে লিখিবার জন্ত ধরিয়াম। সে কতকগুলি লেখকের সঙ্গে আমাদের

পরিচয় করাইয়া দিল। আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে—মাতৃভাষার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

বন্ধুবর \* \* \* বাবু তখন ছোট গল্প লেখেন। যৌবনে বিপত্রীক হইয়া তাঁহার হৃদয় সঞ্চিত প্রেম গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছিল। সেই প্রেম তাঁহার গল্পগুলিকে বেশ রসাল ও মধুর করিয়া তুলিত। তাঁহাকে দিয়া আমাদের কাগজে গল্প লিখাইতে হইবে। এই শুভ কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়া, রাধাকীর্তন, আমি ও অধিকাংশ বন্ধুবর

বাসায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার ভূতের মুখে শুনিলাম—বন্ধুর অনেকদিন হইতেই শয্যাগত। তাঁহার নীচে নামিবার শক্তি নাই। আমরা সংবাদ দিয়া উপরে উঠিলাম। দেখিলাম—একটা ক্ষুদ্র কক্ষে—এক মগ্ন শয্যার উপর বন্ধু শুইয়া আছেন। তাঁহার হস্ত ও পদদ্বয়ের গ্রন্থিতে ফ্র্যানেল জড়ান। বন্ধু অতিকষ্টে আমাদের বসিতে বলিলেন। আমরা যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া গিয়া, বন্ধুর রোগের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

বন্ধু কোন কথা গোপন করিলেননা। অকালে পত্নী-বিয়োগ, পত্নীর প্রতি অগাধ ভালবাসার পাতিরে পুনর্বিবাহের অস্বীকার; তাহার পর সঙ্গদোষে পদস্থলন, সর্বশেষে চরিত্রহীনতার প্রতিকূল এই নিদারুণ সন্ধিবাত রোগে—উপান শক্তি রহিত। ছুঃখের কথা, রোগের কথা, প্রাণের ব্যথা, বলিতে বসিতে বন্ধুর চক্ষু দু'টা সজল হইয়া উঠিল।

এই সময় একজন ডাক্তার সেইগৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলাম—দুই মাস ধরিয়া ইনিই বন্ধুর চিকিৎসা করিতেছেন। ছুঃখের বিষয় এমন সূচিকিৎসকের হাতে পড়িয়াও বাতের যন্ত্রণা একদিনের জন্তও কমে নাই। ডাক্তার বাবু প্রেস্ক্রিপশন লিখিয়া দিয়া যথারীতি ভিজ্জিট লইয়া চলিয়া গেলেন।

বন্ধুর কাতরতা দেখিয়া তাঁহাকে আর একজন ডাক্তারকে ডাকিবার উপদেশ দিলাম। চাঁৎপুর রোডের উপর একজন বড় ডাক্তার ছিলেন। তাঁহারই নাম করিলাম। বন্ধু স্নান হাসি হাসিয়া বলিলেন—“উহাকেও দেখান হইবাছে। ডাক্তারী চিকিৎসার হৃদযুদ্ধ করিয়াছি। কেবল সামর্থ্যে কুলাইবেনা।

বলিয়া সাহেব ডাক্তার ডাকি নাই। বড় বড় বিলাতী পেটেন্ট ঔষধ ও মাদিশ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছি। কোন কোন ঔষধ সাময়িক উপকারও পাইয়াছি, রোগ কিন্তু সারে নাই। বেদনা, যন্ত্রণা, জ্বর,—এই সাত-মাস সমভাবেই রহিয়াছে।” এই বলিয়া বন্ধু তাঁহার মাকে ডাকিয়া একটা ছোট বায় আনিতে বলিলেন ঐ বায় উদ্ভাটিত হইলে আমরা দেখিলাম—উহা প্রেস্ক্রিপশনে পূর্ণ!!

বন্ধুকে যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রত্যেকেই জন-সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গাউট ও সন্ধিবাতের—বড় বড় ঔষধ—কার্বনেট অক গোবেরাণ, পটাসিয়াম থাইওডাইড, নক্সভনিকা, কল্লাউণ্ড গাই-সিকো ফস্ফেট, আর্সেনিক, আয়রন,—সমুদয় প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিছুতেই কিছু হয় নাই।

ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশন দেখিয়া, আমরা প্রযুক্ত্য ঔষধের নাম শুনি জানিতে পারিলাম। মনে মনে বুঝিলাম—এ বাত ভাল হইবার নহে। শুধু ঔষধ সেবন কেন, লোকের পরামর্শেই বন্ধু নাকি দিনকতক আক্টিব মেডিসিন ডোজে মত্ত অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহাতেও যন্ত্রণার ভ্রাস হয় নাই। শেষে ও ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি বন্ধুকে বদভ্যাস হইতে মুক্ত করিয়াছেন। শেষোক্ত ডাক্তারের ব্যবস্থায় বন্ধু দুই মাস ধরিয়া সালসা সেবন করিতেছেন, কিন্তু ভ্রাস দোষে,—বীধাসালসাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

রাধাজীবন আগাগোড়া সার কথা শুনি ছিল এক বন্ধুর কণ্ঠে শরীরের যানে এক চাহিয়াছিল। সে সকল বলিয়া উঠিল।

“একবার কবিরাজ দেখাইলে হয় না? বন্ধুর বৃদ্ধা মাতা—এ কথায় সর্বপ্রথম সায় দিলেন। আমরাও ভাবিলাম—মন্দ কি? একটু রকম ফের হইবে এ বাঙ্গালীর বিদ্যুটে বাত—বাঙ্গালী ঔষধেরই দরকার।

সেদিনের মত আমরা বিদায় লইলাম। পথে পরামর্শ হইল—রাধাজীবন নিজে কবিরাজ লইয়া আসিবে। আমি ও অধিকা, বন্ধু বার্তাতে অপেক্ষা করিব। সময়—অপেক্ষা।

পরদিন আমাদের ঘাইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু আমরা গিয়া দেখিলাম—রাধাজীবন তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে। সে কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া আসিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া আমাদের বড়ই ভক্তি হইল। দীপ্ত গৌরবর্ণ—সুন্দর চেহারা। যেন ঋষিগণের মাহুস। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

কবিরাজ মহাশয় রোগীকে ক্রমাগত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সে যেন মহা-অপরাধীর প্রতি উকালের জেরা! এই স্তবোধে রাধাজীবন বলিল—“ইনিই এখন কলিকাতার বড় কবিরাজ; আমার পিতার পরম বন্ধু; নান্য নোকনাথ মল্লিক, পাতিলপাড়ায় নিবাস; এক্ষণে ফকিরচাঁদ চক্রবর্তীর গলেনে বাড়ী করিয়াছেন।”

কবিরাজ মহাশয় উঠিলেন; রোগীর অবস্থা দেখিয়া, রাধাজীবনের মুখে রোগীর দুরিত্তের পরিচয় পাইয়া ভিজিটও লইলেন না। পরদিন ঔষধ আনিবার উপদেশ দিয়া কবিরাজ পাশাতে চড়িলেন।

যথাসময়ে ঔষধ আসিল। রোগী লবণ-জল বন্ধ করিয়া ঔষধ সেবন আরম্ভ করিল। এবং ৪ দিন অন্তর রেড়ির তৈল ও গোমূত্র একত্র মিশাইয়া পান করিতে লাগিল। ঔষধ—একখণ্ড শালপত্রের মোড়া ছিল। তাহার বর্ণ—ঘোর কাল, তিংএর উগ্রগন্ধ। গুণিলাম—ঔষধটার নাম “রসোন পিণ্ড।” কিন্তু আশ্চর্য্য তাহার শক্তি—১২ দিনের পর বন্ধুর সন্ধির অমন বেদনা যেন মস্তবলে উড়িয়া গেল। একমাসের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। সামান্য “রসোন পিণ্ড” তাঁহাকে নব জীবন দান করিল। বন্ধু অহুতাপ করিতে লাগিলেন—হায়! নিজের ঘরে এমন সহজলভ্য মহৌষধ থাকিতে—বৃথা চিকিৎসায় কত টাকাই তিনি নষ্ট করিয়াছেন।

এ ঘটনা—আমার কল্পনাগ্রস্ত আখ্যায়িকা নহে। ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট, বাস্তব ঘটনা। অধিকা মরিয়াছে, রাধাজীবনও কালস্রোতে ভাসিয়াছে, বৃদ্ধবর এখনও জীবিত থাকিয়া মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন। আর কবিরাজ চিকিৎসার এই অপূর্ব সাফল্যের একমাত্র সাক্ষী হইয়া, এখনও আমি আমার সত্তা অহুতাব করিতেছি।

রত্ননপিত্তী থাইয়া বন্ধু আমার নবজীবন, —নব যৌবন লাভ করিয়াছেন; আবার তাহার বিবাহ হইয়াছে, তিনটি পুত্র ও একটা কন্যা—নূতন-বধূর ক্রোড়শোভা করিয়াছে। সর্ব-কণ্ঠিষ্ঠ পুত্রটি গতবারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

## অস্ত্রোপচার।

অবতরণিকা।

— :: —

আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থী ছাত্রগণকে অস্ত্র চিকিৎসা শিখাইবার উদ্যোগ এ পর্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তাই যে দিন আমার অমুজতুল্য শ্রীমান ব্রজবল্লভ রায়ের মুখে কলিকাতায় ‘আয়ুর্বেদ কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুনিলাম, সে দিন আমার মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। আমি অনেক দিন হইতে হাসপাতালে কার্য্য করিয়াছি,—আমাকে অনেক রোগীর অস্ত্র অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে। এখন চাকুরী ছাড়িয়া বাড়ীতে বসিয়া আছি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চর্চা করিতেছি। আমিত ‘কমলী’ ছাড়িয়াছি, কিন্তু “কমলী” তো আমাকে ছাড়ে না। এখনও কোথাও অস্ত্র চিকিৎসা করিতে হইলে—লোকে আমাকে ডাকিতে আসে। বৃদ্ধবয়সেও আমার কপালে অবসর-সুখ নাই!

সেদিন একটা ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার জন্য হুগলীর এক ভদ্রলোকের বাটীতে আহূত হই। সেখানে বৈজ্ঞানিক অসাধারণ পণ্ডিত ব্রজবল্লভ ভায়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় ব্রজবল্লভ ভায়া আমাকে বলেন—“দাদা! আমাদের আয়ুর্বেদ কলেজের মাসিক পত্র “আয়ুর্বেদে” আপনাকে অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিতে হইবে।” ভায়ার কাছে প্রতিশ্রুত হইলাম—“লিখিব।” আজ সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বসিয়াছি। আমার মত লোকের অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধে

যদি আয়ুর্বেদপাঠার্থী কোন ছাত্রের কিছু উপকার হয়, আমার লেখনি সার্থক হইবে।

### সংজ্ঞাহারক ঔষধ এবং তাহার প্রয়োগের পরবর্ত্তী ফল।

ভগবান স্বর্গতের সময়ে এবং তাহার পর-বর্ত্তীকালে—এদেশের বৈজ্ঞ-সমাজে অস্ত্র চিকিৎসার প্রচলন ছিল। সে কালের বৈজ্ঞগণ যে সকল যন্ত্র ও শস্ত্র ব্যবহার করিতেন, এখনকার উন্নত শল্যতন্ত্রেও সে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে এখনকার অস্ত্র-শস্ত্রে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অনেক নূতন অস্ত্রও বাহির হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই—সেকালের ঋষি-বৈজ্ঞগণ যে যে রোগে অস্ত্র চিকিৎসা করিতেন, একালের বড় বড় সার্জ-নেরাও প্রায় সেই সেই রোগে অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

আয়ুর্বেদের “শল্য তন্ত্র” পাঠে জানা যায়—সেকালের বৈজ্ঞগণ পূর্বে—রোগীর শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্বে রোগীকে উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতেন। পরে অস্ত্র প্রয়োগের অব্যবহিত পূর্বে—“সংজ্ঞা হারিদী” ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া রোগীর চেতন লোপ করিতেন। এই শ্রেণীর ঔষধের নাম ছিল “সম্মোহিনী।” শেষে অস্ত্র চিকিৎসা হইয়া গেলে—“সঞ্জীবনী” ঔষধ প্রয়োগ করা—অস্ত্রোপচারের পর রোগীর জীবন রক্ষা

হইত, কোনও অংগস্থক উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারিতনা। ‘ভোজ প্রবন্ধ’ প্রভৃতি গ্রন্থে—এই সকল বিবরণ জানা যায়। যাঁহারা জানিতে চাহেন, পড়িয়া দেখিবেন। আমি বোধী কথা বলিব না। আমি কেবল বলিতে চাই—এখনকার আয়ুর্বেদপাঠার্থীগণ যদি অস্ত্র চিকিৎসা শিখিতে চাহেন, তবে তাঁহারা সে কালের সেই “সন্মোহনী” ও “সজীবনী” বুঝিবার চেষ্টা করুন। উহা যে কিরূপ ঔষধ ছিল আমরা মত লোকে তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিবে না। কিন্তু কবিরাজগণ এতদ্বয়ের অনুসন্ধান করিলে, দেশের একটা মহা অভাব দূরীভূত হইতে পারে।

### ক্লোরোফরম ।

এখনকার ডাক্তারী “সন্মোহনী” নাম “ক্লোরোফরম্”। বড় বড় অস্ত্র চিকিৎসার ব্যাপারে—আমরা ক্লোরোফরমের সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়—“ক্লোরোফরম” প্রয়োগ—নিরাপদ নহে। অনেক ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা রোগীর দেহে মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এমন কি ক্লোরোফরম-প্রয়োগের দূর-বর্তী ফলে—অনেক রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম—কবিরাজ মহাশয়গণ যদি প্রাচীন কালের “সন্মোহনী” ও “সজীবনী” ঔষধের তত্ত্ব নির্দেশ করিতে পারেন, বড়ই ভাল হয়।

রক্ত ও দুর্বল রোগীর দেহে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করিলে, বিপদের সম্ভাবনা অধিক! অগতঃ সেখানে দেখা যায়, ক্লোরোফরম-প্রয়োগ ভিন্ন গভাস্তর নাই, সেখানে রোগীকে পূর্ণ হইতে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু চিকিৎসার বিষয়—অনেক সময় এমন রোগীও

পাওয়া যায়—তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে অজ্ঞোপচারের আবশ্যক। এরূপ রোগীকে আগে থেকে প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে কি? এমন অবস্থায় অর্থাৎ রোগীকে প্রস্তুত করিয়া লইবার সময় না পাইলে—ক্লোরোফরমের গোণ ফলে—রোগীর বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

আগে থেকে রোগীকে প্রস্তুত না করিয়া লইলে, ক্লোরোফরম-প্রয়োগে রোগীর বড়ই যত্নগ্ৰাহী হইয়া থাকে। ক্লোরোফরমের যত্নগ্ৰাহী, অস্ত্র প্রয়োগের যত্নগ্ৰাহী উভয়ে একত্র হইয়া রোগীকে কাতর ও বিপন্ন করিয়া তোলে। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি—যে স্থলে অধিক সময়-ব্যাপী ক্লোরোফরমের প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছে, সেই স্থলেই রোগীর বিপদ ঘটয়াছে। ক্লোরোফরম প্রয়োগে রোগীর দেহে কি কি মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে, একে একে তাহা দেখাইতেছি।

### (ক) বমন ।

বমন।—ক্লোরোফরমের প্রয়োগ করিয়া অস্ত্রোপচার করিলে, সংজ্ঞালাভের পূর্বে রোগীর বমন উপস্থিত হয়। এই বমনে স্লেষ্মা ও পিত্ত মিশ্রিত থাকে। কিছুক্ষণ পরে কাহারও কাহারও বমি আপনা আপনি বন্ধ হয়, কাহারও বমি ৭৮ দিন পর্য্যন্ত থাকে। এমনও দেখিয়াছি—অনবরত বমি করিয়া রোগী বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, অধিকন্তু পুষ্টিকর পথ্য পরিপাক না পাওয়ায় রোগী ক্রমে জীর্ণ ও দুর্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

যাঁহারা ক্লোরোফরমের সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করিবেন, তাঁহাদের স্বরণ রাখা উচিত—রোগী সংজ্ঞালাভ করার পর যেন উত্তীর্ণ না বসে, এমন কি শয্যা বা বস্ত্র পরি-

বর্ধনের সময় তাহার শরীরে যেন বাঁকানী না লাগে। রোগী স্থিতিরভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে—বমনোদ্বেষ্ট নিবারিত হইতে পারে।

১৫ বৎসর পূর্বে আমি যে সাহেব ডাক্তারের সাহায্যকারী ছিলাম—তিনি সংজ্ঞাহরণের জন্ত ‘ইথর’ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইথরের বাষ্প পাকস্থলীর ঐশ্বিক বিল্লীর পথে বর্হিগত হওয়ায় তথায় উত্তেজনা উপস্থিত হয়, এইজন্ত বেশী বমি হইয়া থাকে। আবার ক্লোরোফর্ম পাকস্থলী পথে না যাইলেও,—ইহার দ্বারা প্রবল বমন হইতে পারে। ফলে আমার মনে হয়—স্নায়ুকেন্দ্রের উপর সংজ্ঞাহারক ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ—এই বমনোদ্বেষ্টের একমাত্র কারণ। তবে ‘ইথর বা’ ক্লোরফর্ম যাই প্রয়োগ করা হউক না কেন, মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার কিয়দংশ যে পেটের ভিতর গিয়া বমনোদ্বেষ্ট উপস্থিত করে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? পাকস্থলীর প্রদাহ না হইলে বমি হয় না, এই জন্তই বোধ হয় প্রবীণাচার্য্যগণ অস্ত্রোপচারের অব্যবহিত পূর্বে—রোগীকে পঞ্চপল্লবের কঙ্ক, উশীর-কষায় বা গুড়ুচীর কাথ পান করাইতেন। আমরা একালের ডাক্তার—আমরা রোগীর পাকস্থলীস্থিত উত্তেজক পদার্থ তরল করিবার জন্ত—ক্লোরোকরম করিবার পূর্বে রোগীকে একঘাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াই। ইহাতে রোগীর কতকটা উপকার হয়।

অস্ত্রোপচারের ফলে পাকস্থলীতে রক্ত প্রবিষ্ট হইলেও, সেই রক্তের উত্তেজনায় রোগীর বমন হইতে পারে। কিন্তু রোগী বয়স্ক হইলে, বমন খুব কম হয়। কখনওবা

ইউরিয়ার জন্ত রোগীর শরীর বিবাক্ত হইয়া বমন উপস্থিত করে।

ক্লোরোফর্ম-প্রয়োগ করিয়া রোগীকে দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করাইলে, তাহার পাকস্থলী-স্থিত পদার্থ অতি সহজে ডিউডিনমে প্রবেশ করে। কাজেই আর উত্তেজনা উপস্থিত হইতে পারে না, বমিও বন্ধ হইয়া যায়। রোগীকে সম্পূর্ণ চিৎ করিয়া না শোয়াইয়া অঙ্গশায়িত-বস্থায় রাখিলেও—বমন বন্ধ হইতে পারে। ছদ্মদি তরল পদার্থ পান করিবামাত্র যদি রোগীর বমনোদ্বেষ্ট উপস্থিত হয়, তবে তাহা না দেওয়াই উত্তম।

যে রোগীর বমন আরম্ভ হইয়াছে, অথচ সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, তাহাকে শযায় শয়ন করাইবে এবং তাহার মাথা একপার্শ্বে এমন ভাবে নীচু করিয়া রাখিবে, যেন বাস্ত পদার্থ—মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইয়া যায়। মুখ উচু করিয়া রাখিলে, যদি বমন হয়, তবে বাস্ত পদার্থ দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া রোগীর তৎক্ষণাৎ পঞ্চম প্রাপ্তি ঘটে। আমি বাগ্টা রোগীকে এইরূপে মরিতে দেখিয়াছি।

বৈত্তশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে—অস্ত্রোপচারের পূর্বে—পঞ্চকর্ম দ্বারা শরীরকে সংশোধন করিয়া লওয়া। ইহার তুল্য নিরাপদ ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর হইতে পারেনা। এমন অস্ত্রোপচার আছে—যাহাতে রোগীর বমি হইলেই বিপদের সম্ভাবনা। ডাক্তারী মতে এইরূপ অস্ত্রোপচারের পরে, রোগীর পাকস্থলী গরম জলের ডুন্ দিয়া খুইয়া দিতে হয়, কিন্তু পঞ্চকর্ম দ্বারা সংশুদ্ধ দেহে এইরূপ ডুন্ দিবার প্রয়োজনই হয় না।

সংজ্ঞানশক্ত ঔষধের প্রয়োগ করিয়া আসিলে অর্থাৎ রোগীর বমন বন্ধ হইয়া আসিলে

যদি বমন হয় তবে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া গুলি কবিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে ।

(ক) এক গেলাস গরম জল পান ।

(খ) ২টী বড়এলাচ বাটিয়া একপোরা জলে গুলিয়া পান ।

(গ) ভাজা মুগ ৫ ভরি, ১/২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ দ্রব্ধ থাকিতে থাকিতে পান ।

(ঘ) কমলালেবুর শুষ্ক খোলা অর্দ্ধ তোলা, আধসের গরম জলে আধঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল পান ।

(ঙ) ২৫ গ্রেন বাইকার্বনেটঅফ পটাশ একপোরা গরম জলে গুলিয়া পান ।

(চ) ৩ মিনিম টিংচার আইওডিন এক পোরা ঠাণ্ডা জলের সহিত পান ।

(ছ) গাঢ় করিয়া কাকী ১ পেয়ালা পান ।

(জ) গ্রাম্পেন নামক মত্ত পান ।

(ঝ) ২ গ্রেন অ্যাসিটি-নিসিড—আধ ঘটাঘর সেবন—এইরূপ ৪ বার ।

(ঞ) মধুর সহিত ১/১০ আনা পরিমাণ হরীতকী চূর্ণ লেহন ।

(ট) পূর্বদিন প্রস্তুত করা গুলকের কাথ পান ।

(ঠ) আতপ চালের চেলুনী সহ শ্বেত চন্দনের রস পান ।

(ড) আমলকীর রস ২ তোলা মাত্রায় পান ।

পূর্বোক্ত যোগ গুলি ২৭ কর্তৃক বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে । ডাক্তারী পুস্তকে বম্বন নিবারণ আরও কতিপয় ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় । যথা—

১। ডাইলুট হাইড্রোসিয়ানিক এসিড অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ।

২। মুষ্ণু পথে বা অধস্তারিক প্রণালীতে মর্ফিয়া প্রয়োগ ।

৩। রোগী মায়রিক ধাতু প্রকৃতির হইলে পটাশ ব্রোমাইড প্রয়োগ । ব্রোমাইড দুই উপায়ে দেওয়া যায়, মলদ্বারে মুষ্ণু পথে । ২০ গ্রেন ব্রোমাইড ২ উন্স জলে গুলিয়া পিচকারীর সাহায্যে মলদ্বারে প্রয়োগ করিতে হয় । ১০ গ্রেন ব্রোমাইড ত্রিস্কার তলায় রাখিয়া দিতে হয় ।

সাহেব ডাক্তারের মধ্যে ২১ জনকে এই বমন নিবারণের জন্য—রোগীর পেটে (পাক-স্থালী প্রদেশে) গরম জলে সিদ্ধ ক্লানেলের পুনঃ পুনঃ ফোমেণ্টেশন্ প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি ।

অত্যাগ্র পিপারমেন্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় কিঙ্কিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া রোগীকে চুষিয়া থাইতে দিলেও বমি নিবারণিত হইতে পারে । অল্পজানবাশ্প পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলেও প্রবল বমি থামিতে পারে ।

অনেক দিন ধরিয়া রোগীর বমি হইতে থাকিলে, বমনের বেগে পেশীতে আঘাত লাগে, রোগী তাহাতে বক্ষস্থলে বেদনা বোধ করে । এই বেদনা অতি কষ্টপ্রদ । অনেক সময় মনে হয়—বুঝিবা রোগীর প্লুরিসি হইয়াছে ।

(খ) ফুসফুসের পীড়া ।

ক্লোরোফর্ম বা ইথর প্রয়োগে—রোগী ফুসফুস আক্রান্ত হইতে পারে । ক্লোরোফর্মের চেয়ে ইথরেই ইহার অধিক সম্ভাবনা । ফুসফুস আক্রান্ত হইলে ব্রঙ্কাইটিস দেখা দেয় । রোগী মন্দ প্রকৃতির হইলে সেই ব্রঙ্কাইটিস ক্রমে নিম্নোক্তর আকার ধরিয়া তাহার জীবিতকাল সংক্ষিপ্ত করিয়া দেয় । এই

নিমোনিয়াকে ইংরাজীতে—“পোষ্ট অপারেটিভ নিমোনিয়া বলে।”

বস্তু ও উদর গহ্বরে অস্ত্রোপচারের পর— এইরূপ নিমোনিয়া হইতে পারে। ক্লোরোফরম করিয়া অস্ত্রোপচার অন্তে, রোগীর দেহে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেও—ইহা হইতে পারে। অতএব ঘাহাতে ফুসফুসের ইনফার্কশন না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। নিমোনিয়া হইলে নিমোনিয়ার চিকিৎসা করিবে। বৈজ্ঞানিক—বাসক, কণ্টকারি, ষষ্টিমধু, কুড়, কটফল, পিঁপুল, কঁকড়াশুল্ক ও বামনহাটীর পাচন—নিমোনিয়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

#### (গ) মূত্র যন্ত্রের রোগ।

ক্লোরোফরম প্রয়োগের পর অস্ত্রোপচার শেষে—রোগীর মূত্রযন্ত্র আক্রান্ত হইতে পারে। প্রথমে ইহা এলবুমিনুরিয়ার আকারে দেখা দেয়। অস্ত্রোপচারের পর রোগী ক্ষণ কালের জ্ঞাত চেতনা লাভ করিয়া আবার অজ্ঞান হইয়া পড়ে। আর তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসেনা। এই অবস্থায় মৃত্যু ঘটে। লোকে মনে করে—অস্ত্রোপচারের ফলেই বুঝি রোগী মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। এই অজ্ঞানতার নাম—“ইউরিমিক কোমা।” এইরূপ অবস্থায় মৃতরোগীর শবচ্ছেদ করিয়া মূত্রযন্ত্রের পীড়া দেখা গিয়াছে। এ রোগের ফলপ্রদ ঔষধ অত্যাধি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নাই। কবিরাজী বিজ্ঞানে ইহার ঔষধ আছে কিনা, আমি জানি না।

অতএব ক্লোরোফরম প্রভৃতি প্রয়োগ করিবার পূর্বে—রোগীর মূত্র পরীক্ষা করা উচিত।

অস্ত্রোপচারের পর অবসন্নতা বা সংজ্ঞাহীনতা অধিকক্ষণ স্থায়ী দেখিলে, বর্ষকারক

ঔষধ ব্যবস্থায়। শিরা মধ্যে লবণ দ্রব্য প্রয়োগও ভাল। কোমল রবারের নলের সাহায্যে—রোগীর মলদ্বারে—ঈষৎ জলের লবণ দ্রব্য ১ পাইট মাত্রার ধীরে ধীরে প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথম বারে ফল না পাইলে ৩ ঘণ্টা পরে আবার দিতে হয়। ইহাতে প্রস্রাব পরিষ্কার হইতে পারে।

#### (ঘ) পাণ্ডু।

ক্লোরোফরমের পর অনেক সময় রোগীর জিহ্বা (কামলা-পাণ্ডু) রোগ দেখা দিতে পারে। ইহার কবিরাজী ঔষধ—নবায়ন নৌচ, ফল ত্রিকাদি পাচন বা দারু—হরিতার কাথ।

#### (ঙ) উন্মত্ততা।

রোগীর পূর্বে কখনও উন্মাদ রোগ হইয়া থাকিলে, ক্লোরোফরম—প্রয়োগে আবার তাহা দেখা দিতে পারে। অত্যন্ত বায়ু প্রকৃতির লোকেরও উন্মত্ততা আসিতে পারে। ইহার চিকিৎসা—আশ্বাস ও স্বিঞ্চ তৈল।

#### (চ) অচেতনতা।

বহুমূত্ররোগীর শরীরে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করিলে, তাহার ডাইবিটিক কোমা হইতে পারে। এ রোগ অসাধ্য। তবে অস্ত্রোপচারের পূর্বে উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করিলে উপকার হইতে পারে।

#### (চ) পক্ষাঘাত।

ক্লোরোফরম-প্রয়োগের পর রোগীর পক্ষাঘাত হইতে পারে। রক্তাধিক্যজনিত আক্কেপের ফলেই ইহা দেখা দেয়। চিকিৎসা—সাধারণ পক্ষাঘাতের।

#### (ছ) রক্ত বমন।

ক্লোরোফরমের পর অস্ত্রোপচার করিয়া ২১ জনের রক্ত বমন হইয়া যায়। এ রোগ



কিছু বিবল। ছাগছন্ধ ও বজ্রডুমুরের রস পান—ইহার প্রতিষেধক।

### ( জ ) রক্তোৎকাস ।

বোগীর যদি ফুস্ফুসের ক্ষয়রোগ থাকে, তবে ক্লোরোফর্মের পর—কাসির সহিত রক্ত উঠিতে পারে। বাসকপাতার রস, মধু ও লাক্কটর্ণ—একসঙ্গে চাটিয়া খেলে ইহা নিবারিত হইয়া থাকে।

### ( ঝ ) হিক্কা ।

ক্লোরোফর্মের পর রোগীর হিক্কাও উপ-  
শান্ত হইতে পারে। এ হিক্কা সহজে বন্ধ হয় না। জিহ্বা টানিয়া ধরিলে বন্ধ হইতে পারে। বৈধমতের হিক্কানাশক মুষ্টিযোগ গুলি পরীক্ষা করিলে উপকারের সম্ভাবনা। যেমন শুনিলে বন্ধ চন্দন ঘষিয়া সেবন।

ক্লোরোফর্ম বা ইথর প্রয়োগ করিলে কত রকম বিপদ ঘটিতে পারে, আমি তাহার বহুভাষা দেখাইলাম। অগতঃ অস্ত্রোপচারের পক্ষে এই শ্রেণীর সংজ্ঞাহারক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। সেই জন্য আমার অনুরোধ—প্রাচীন শল্যতন্ত্রে যে “সন্মোহনী” ঔষধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কবিরাজ মহাশয়েরা তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলে ঐ ঔষধের শল্যতন্ত্রে আবার বাচিয়া ওঠে।

ক্লোরোফর্মজনিত উপসর্গ গুলির যখনই আমি চিকিৎসা করিয়াছি, তখনই কবিরাজী ঔষধে প্রয়োগ করিয়াছি, অনেক ক্ষেত্রে বশ ফলও পাইয়াছি। তাই আমার জানিতে,

ইচ্ছা হয়—“সন্মোহনী” ঔষধটী কি? হায় ঋষি! তোমরা ত অপূর্ণ প্রতিভা বলে, সংজ্ঞা-হারিণী “সন্মোহনী” আবিষ্কার করিয়া গিয়া-  
ছিলে, আমরা তাহার নামও ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা তোমাদের এমন কৃতজ্ঞ সন্তান!।

সেদিন এক ইংরাজী নবিশের বাঙ্গালা গ্রন্থে পড়িতেছিলাম—শল্যতন্ত্রের “সন্মোহনী” ঔষধ আর কিছুই নহে—“গঞ্জিকা”। বিলাতী শিক্ষার স্পর্শে লইয়া ঋষিপ্রতিভার অপূর্ণ সমালোচনা! কোথায় তুমি মহর্ষি ক্ষুণ্ণ! আর একবার—এই দেশাত্মবোধের মাঝে ফিরিয়া এস,—আমাদের মত পিতৃ পরিচয় বিস্মৃত অজ্ঞকে একবার “সন্মোহনী” ও “সঞ্জীবনী” স্বরূপ চিনাইয়া দাও, শল্যতন্ত্রের সম্মান রক্ষা কর।

আয়ুর্বেদের প্রভুত্ব লইয়া বিচার করিতে পারেন,—শ্রীমান ব্রজবল্লভ ভায়া। কিন্তু তিনি পেটের দায়ে বিব্রত,—স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার তাঁহার সময় কৈ? বাঙ্গালার সর্বত্র—সাইন বোর্ডে—বৃহদক্ষরে নাম লেখা অনেক কবিরাজ দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি এই “সন্মোহনী”র স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন না? তাঁহাদের আয়ুর্বেদ শিক্ষার ফল কি কেবল—‘সস্তায় চাবনপ্রাশ’ বিক্রয় করা?

( ক্রমশঃ )

ডাঃ শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য ।

( অবসর প্রাপ্ত—অ্যাসিষ্টেন্ট সার্জন )

## বর্তমান জনপদ্বিধ্বংসী রোগের কারণ ও নিরাকরণ-উপায়।

—:~:—

কি সঙ্কট সময় আসিয়াছে ; মৃত্যু নিজ করাল ছায়া বিস্তার করিয়া চতুর্দিকে অসংখ্য নরনারী, বালক-বালিকা, শিশু বৃদ্ধকে কাল-কবলিত করিতেছে। সকলেই শঙ্কিত। শোকের নিদারুণ ধ্বনি দেশ প্রাণিত করিতেছে। এই সময় অনেক স্থানে চিকিৎসক নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই, এমন কি অনেক স্থানে রোগীর দেহে শীত নিবারণের সামান্য বস্ত্র নাই। স্বদেশের ধনী,—বিলাসী—বড় লোকদের বলি, একবার পল্লীগামে গিয়া দেখিয়া আসুন, যে, কি ভীষণ অবস্থা। বিশাল বিস্তার মাঠ—সব অগ্নিগা পুড়িয়া গিয়াছে। যেখানে দশহাজার মন ধান হইত, সেখানে দশ মন ধান্য নাই। গত বৎসরের যৎসামান্য যাহা ছিগ, তাহা ফুরাইয়া আসিতেছে। তাহার পর উপায় কি হইবে ভাবিয়া পল্লাবাসী কুল-কিনারা পাইতেছেন। দেহে জীর্ণ বস্ত্র শতছিদ্রে শীতের প্রকোপ আরও বাড়িয়া দিতেছে। যেমন তুধানলে দগ্ধ হইলে বহুবিলম্বে বহুকষ্টে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, তদ্রূপ তাহাদের মৃত্যু ভয়ানক কষ্টে হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সকল পল্লাবাসিগণ তাহাদের কঠোর পরিশ্রম দ্বারা শস্ত উৎপন্ন করিয়া সহরের লোককে খাওয়াইতেছে। শস্ত কিছু সহরে হয়না; সবই পল্লীগাম হইতে আইসে। কিন্তু এক-দিকে এই ভীষণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য, অতৃদিকে সহরে যথাপূর্ব বিলাস স্রোত! সেই বেশ-

ভূবা—সেই বিলাস—সেই চুকট চা পান—সেই মোটর গাড়ি—সেই চিন্তাবিনোদনের জন্ত মৃত্যু গীতাদি শ্রবণ-দর্শন,—সেই সকল বিলাসের কিছু কি কমিয়াছে? এহ কি আমাদের কর্তব্য জ্ঞান? সহরের বিলাসী বাবুরা ভাবেন না কি যে, তাঁহারা পূর্জন্মের সঞ্চিত পুণ্য ফল ভোগ করিতেছেন যেমন কান্দনাপূর্ণ ব্যক্তি ইষ্টজনক কার্যের দ্বারা বর্ণভোগ করেন এবং “ক্ষীণে পুণ্য মর্ত্যলোকে জায়ন্তে”,—যেমন সঞ্চিত অর্থ ব্যয়কারী ব্যক্তি সঞ্চয় ভাগ করিয়া ছ’হাতে ব্যয় করিয়া আবার ভিত্তারী হয়—সেইরূপ তাঁহারা কি ভাবেন না যে, তাহারাও ক্ষাপপুণ্য হইলে এবং আর পুণ্য সঞ্চয় না করিলে ঐরূপ দারিদ্র্যের হৃদয় পতিত হইবেন। যদি তাঁহাদের এই ভাবনার চৈতন্য হয় তবে তাঁহারা আবার সুখভোগের অর্থাৎ বাহ্যিক ছুঃখমিশ্রিত সংসার সুখ বলে, শ্রুতি বাহ্যিক “প্রেম” বলেন, তাহার জন্ত পুণ্য অর্জন করিতে থাকুন। দয়াময় জগদীশ্বরের দয়াগুণকে অবলম্বন করিয়া ঐশ্বর্য দারিদ্র্যমুক্তির সেবায় নিযুক্ত হইয়া অন্নবস্ত্র-ঔষধ পথ্য ও চিকিৎসকের সাহায্য দানে আপনাদিগকেও ব্যাধির করাল আক্রমণের আশ্রয় হইতে রক্ষা করুন। পল্লীগামে যেমন লোক কষ্টের দারুণ ব্যথা মরিতেছে, সহরের লোক সেইরূপ ভীষণ ভীষণ রোগের আক্রমণে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের রোগের কারণ ও নিরাকরণ-উপায়।

যাহারা বাচিয়া আছেন, তাঁহারা কেহ শোক করিতেছেন, কেহ আত্মীয়-স্বজন বা নিজের ঐ ভীষণ বাধি হইতে পারে সেই আশঙ্কায় নানাবিধ উপায় অবলম্বন ও ঔষধাদি সেবন করিতেছেন। দেশে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্রেগ প্রভৃতি নানাবিধ ভীষণ বাধি লোক সকলকে অকালে অকস্মাৎ গ্রাস করিতেছিল, কিন্তু বিধাতা ঐ সকল ভীষণ বাধি দ্বাবা লোক সংহার কার্য্য পর্য্যাপ্ত না ভাবিয়া ভীষণ যুদ্ধ লাগাইয়াছিলেন এবং সেই ভীষণ লোমহর্ষণ কন যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই এই নতুন বাধি—যাহাকে একপ্রকার প্রেগ বলা যাইতে পারে এবং যাহাকে আজকাল লোকে “ইন্-ফ্লুয়েন্স” বা ককজর বলিতেছেন, তাহার সৃষ্টি করিয়া সংহার কর্ত্তা শিব জগতের শিব অর্থাৎ নঙ্গনময় কার্য্য করিতেছেন।

কেহ বলিবেন যে, শিব মহা অমঙ্গলময় চঃ শোকদায়ক সংহার কার্য্য করিয়া কিরূপে মঙ্গলময় হইলেন? সন্তান দুই প্রকৃতি হইলে নানাপ্রকার অশান্তিকর কার্য্য করিলে, পারিবারিক শান্তিরক্ষা ও বালকের স্বভাব সংশোধন দ্বারা পিতামাতা তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্ত কাৰুণ্যত্যাগ করিয়া তাড়ন-পীড়ন করেন। কুবক যেমন প্রয়োজনীয় গাছকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আগাছা উন্মূলন করিয়া ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ সেই দয়াময় জগদীশ্বর তাঁহার সৃষ্টি-প্রবাহ ও প্রাকৃতিক নিয়মরক্ষার নিমিত্ত সৃষ্টি ও স্থিতিকার্য্যে নিরত থাকিয়াও বিপথগামী ও তাঁহার সৃষ্টির ও প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিবন্ধ-গানীকে নষ্ট করিয়া শিবরূপেতে লয়কার্য্য করিয়া জগতের মঙ্গল করিতেছেন। যাহারা তাঁহার সৃষ্টির অধিকুল কার্য্য করিতেছে—তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুব-ধাতুর সাকল্য দ্বারা

যত্ববান কুবকের ত্রায় শিবরূপে আগাছা নিড়াইতেছেন। এখন এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যাহাতে আমরা আগাছা না হইয়া—চক্রতিবান্ না হইয়া, ধর্ম্মপরাণ ও ভগবদ্-ভক্ত হইয়া, দয়া দাক্ষিণ্য-কমা শৌচ-সুতা প্রভৃতি দৈবীসম্পদ সকল গ্রহণ ও অভ্যাস করিয়া তাহার ‘কাজের গাছে’ পরিণত হইতে পারি, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। রাজা যেমন অপ-রাধীর দণ্ডবিধান করিয়া অপরাধীর চরিত্র-সংশোধন ও অন্তের অপরাধ করার দণ্ডের ভয় সঞ্চার করিয়া দণ্ডনীতি দ্বারা নিজ রাজ্যের সুশাসন করেন, সেইরূপ সেই রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের রক্ষা ও সুশাসন জন্ত দণ্ডনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক রোগ-শোক-মৃত্যু প্রভৃতি কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা কঠোর পাপীর গুহ্মি ও অল্পপাপীর মনে ভয়-সঞ্চার দ্বারা গুহ্মিকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এমন অবস্থায় তাঁহাকে একলা এইরূপ ভাবে গুহ্মিকার্য্য করিতে না দিয়া, আমরা সকলে যদি গুহ্মচিত্ত হইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহাকে সাহায্য করা রূপ মহত্বর্ষ ও আত্মরক্ষা—উভয় কার্য্যই সম্পাদন করা হয়। দেশের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ধনী, বিলাসি, দরিদ্র প্রভৃতি কেহই নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। ইহার উপায় কি—যদি সকলে চিন্তা করেন, তবে নিশ্চয়ই উপায় উদ্ভাবন করিয়া সকলে সুখে—সুস্থশরীরে সেই শান্তিময় শ্রীহরিকে সদা সর্ব্বদা সবিস্তমূল মধ্যবর্ত্তী হৃদয়পথে চিন্তা করিতে করিতে—তাঁহারই যত প্রিয়কার্য্য সমস্ত সম্পাদন করিতে করিতে, ইহকালে ভোগ ও পরকালে সেই পরম রমণীর দর্শনকে দর্শন করিবার অধিকারী হইয়া পূর্ণ আয়ুর্কাল ভোগ করিয়া, যত্নবান্

শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সেই মৃত্যু দ্বার দিয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অমৃত মূর্তিকে প্রাপ্ত হইয়া, নরজন্ম সার্থক করিতে পারেন। এখন দেখা যাউক, এই উপায় উদ্ভাবন করিতে গিয়া কি করা উচিত? ভাবিয়া দেখিলে জ্ঞান হইবে যে, এই সকল কষ্টের মূল কারণ কি? উপস্থিত এই জগদ্বিশ্বংসী মহামারীর মূল কি? সকল শাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র রোগের পর পর কারণ অব্বেষণ করিতে করিতে সর্বনিম্নমূলে দেখিলেন “তত্তাপি মূলমধ্বম” সকল ব্যাধির মূল অধ্বম। কোথাও আমাদিগকে নিজের অধ্বম ফল ভোগ করিতে হইতেছে ও এইটাই বেশী ভাগ, কোথাও আমরা বাহ্যার সঙ্গে থাকি বা বাহ্যদের সঙ্গে একদেশে থাকিয়া সেই দেশোৎপন্ন স্ব্থ ভোগ করি, তাহাদের পাপ-রাশি দ্বারা কলুষিত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধির হাতে পড়ি। আজকালকার বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, নানাপ্রকার রোগের ‘বীজাণু’ অতি ক্ষুদ্রভাবে সকলের অলক্ষিতে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান আছে। কোথাও এই বীজাণু বেশী পরিমাণে আছে, কোথাও অল্প পরিমাণে আছে, কোথাও নাই। কোন ব্যক্তির রোগ-প্রবণতা এত বেশী যে, কোন ব্যক্তির কোন ব্যাধির বীজাণু নিখাস প্রখাস দ্বারা বা খাদ্য-পানীয় দ্রব্য দ্বারা বা স্পর্শাদি দ্বারা রক্তে সংযোগ দ্বারা বা রোগক্রিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শ দ্বারা সেই রোগাক্রান্ত হইতে হয়। কেহবা এই সকল কারণ বিত্তমান থাকা স্বত্ত্বেও রোগাক্রান্ত হন না। রোগের কারণ—রোগের বীজাণুই কেবল যে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান আছে—তাহা নহে, উহা জলে এবং মৃত্তিকাতেও বিত্তমান আছে। বস্তু-বস্তু প্রভৃতি রোগের বীজাণু বায়ুমণ্ডলে ভাসমান,

ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু জলে মিশ্রিত থাকে এবং প্লেগ ইত্যাদি রোগের বীজাণু পৃথিবীতে মৃত্তিকার অন্তরস্থ। মহামুনি ত্রিকালদশী মহর্ষি বেদব্যাস মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিয়াছেন, “মম্বস্যোর পাপ প্রথমে বায়ুকে, পরে জলকে ও অবশেষে পৃথিবীকে দূষিত করিয়া নানাপ্রকার ব্যাধি—এমন কি মহামারী পর্যন্ত উৎপন্ন করে।” আজকাল দেশে যজ্ঞ একরকম উঠিয়া গিয়াছে। পূর্বে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতাহ গব্যযজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ হইত। এখন বিশুদ্ধ গব্যযজ্ঞ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা না করিয়া ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, “একটু গব্যযজ্ঞ খাইতে পাইনা, তা’ হোম কি প্রকারে করিব?” অহোরাত্র গায়ত্রী জপ না করিলে, তিনদিন সন্ধ্যাবন্দনা না করিলে এবং দ্বাদশ দিন হোম না করিলে ব্রাহ্মণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। একথা আধুনিক ব্রাহ্মণগণ একবারে ভুলিয়া গিয়া, অথাত্ত কুখাত্ত খাইয়া, নানা কুসঙ্গে মিশিয়া ভারতীয় মনুষ্য সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া—সমস্ত সমাজকে দূষিত করিতেছেন। মন্তকে যে প্রকার দূষিত জল ঢালা যায়, সেই দূষিত জল উদ্ধ অঙ্গ দৌত করিয়া তত্রত্য মলা গ্রহণ করিয়া আরও দূষিত হইয়া অধঃ শরীরকে বিশেষভাবে দূষিত করে। আমাদের আজ সেই দশা হইয়াছে! সমাজের নেতা ও শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণ অধঃপতিত হওয়ার ও বর্ণপ্রম ধর্ম ত্যাগ করার অন্তান্ত বর্ণও পতিত হওয়ার পাপের স্রোত ও স্রব্যাহত গতিতে চলিতেছে। পূর্বে সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ অরণ্যবাসী হইয়াও গাভীপালন করিতেন ও গাভীদুগ্ধ পান ও বৃক্ক ভোজন ও বৃক্কাহতি দ্বারা হোম করিয়া ব্রাহ্মণ্য অবলম্বন পূর্বক শ্রীভগবানের পাদে নিমজ্জিত থাকিয়া স্বাধার প্রভৃতি দ্বারা ও নিজ-জ্ঞানদ্বারা

বেদধ্বনি নিনাদিত করিয়া, নিজেরা স্নস্ত শরীরে  
ধাকিতেন ও বায়ু, জল ও পৃথিবীতে পবিত্র  
রাখিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতেন।  
এখনো আমরা যতটুকু বিদ্যুৎ গব্য যত খাইতে  
পাই, তাহাতে যদি হোম করি, তাহা হইলে সেই  
হোমের দ্বারা তত্ত্বের সুগন্ধে মনকে আনন্দিত  
ও প্রসন্ন করিয়া বহু গুণ ফল প্রদান করিতে  
পারে। ইহাতে যে কেবল আমাদের উপকারেরই  
নষ্টাবনা, তাহা নহে, সেই হোমদ্বারা দেবতারা  
তৃপ্ত হন, গৃহ পবিত্র ও বায়ু বিশুদ্ধ হয় ও যত  
দূর সেই হোম-ধূম বিস্তৃত হয়—ততদূর প্রতি-  
বেশীদেব ও কল্যাণ করে এবং সমস্ত রোগের  
বাজপু নষ্ট করিয়া ফেলে। দেশ হইতে সেই  
মহান হিতকর হোমকার্য উঠিয়া গিয়াছে,  
সেই বেদধ্বনি উঠিয়া গিয়াছে, সেই পবিত্র  
মন্ত্রোচ্চারণ উঠিয়া গিয়াছে, তাহার উপর  
মন্ত্রের নানা প্রকার পাপ বাড়িতেছে, তাই  
দেশে এই মহামারী। আমাদের চেষ্টা নাই,  
কাজেই নানা প্রকার ওজর ও আপত্তি দ্বারা  
আমরা এখনকার দিনে হোম অসম্ভব  
বলিয়া প্রকাশ করি। কিন্তু চেষ্টা করিলে  
এখনও অধিকাংশ গৃহস্থ গাভী পালন করিতে  
পারেন এবং টাটকা গোময়ে ও গোমূত্রের  
গন্ধে গৃহকে পবিত্র রাখিতে পারেন ও গব্যহৃৎ  
পান দ্বারা নিজ ও পরিবারবর্গের সকলের  
বল ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন ও গব্য  
হৃত দ্বারা হোম করিয়া নিজের ও জগতের  
অকল্যাণ নিবারণ করিতে পারেন। বাহারী  
মন, ইন্দ্রিয় এবং আত্মাকে সংযত পূর্বক  
যোগের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেন, স্বর্ণ মর্ত্ত  
পাতালে তাহাদের অপ্রাপ্য বা অগম্য কিছুই  
থাকে না। সামান্ত পিপীলিকা সর্কদা উড়োগী  
বলিয়া গমন করিতে করিতে সহস্র ক্রোশ

পথ যাইতে পারে, কিন্তু বেগগামী পক্ষিরাজ  
গরুড় অনুপযুক্ত হইলে এক পা'ও যাইতে সমর্থ  
হয় না। মার্কণ্ডের পুরাণে আছে —

নাগাবহরণক্ষেব ক্রতুভাবশ্চ লক্ষ্যতে ।  
ন বাপ্যায়ণ মন্যাকং বিনা হোমেন জায়তে ॥  
বয়মাপ্যায়িতা মত্যা যজ্ঞভাগৈর্ঘথোচিততম্ ।  
বৃষ্টা তানহু গৃহীমো মর্ত্যান্ শস্তাদি সিদ্ধয়ে ॥  
নিম্পাদিতা যৌবধীষু মর্ত্যা যজ্ঞে যজ্ঞস্তিনঃ ।  
তেষাং বয়ং প্রযচ্ছাম কামান্ যজ্ঞাদি পুঞ্জিতাঃ ॥  
অধোহি বর্ধাম বয়ং মর্ত্যাস্তোচ্চৈর্ঘথৈর্ঘথৈঃ ।  
তোয় বর্ধেণ হি বয়ং হবিবর্ধেণ মানবাঃ ॥  
যে নাম্যাকং প্রযচ্ছন্তি নিত্য নৈমিত্তিকৈঃ ক্রিয়াঃ ॥  
ক্রতুভাগং দুবাস্তানঃ স্বয়ংকামস্তি লোলুপাঃ ॥  
বিনাশায় বয়ং তেবাং তোয় স্থ্যামি মাক্ততান্ ।  
ক্ষিতিক সন্দেহমামঃ পাপানামপকারিণাম ॥  
দুষ্ট তোহাদি ভোগেন তেবাং দুস্তুত কশ্মিণাম ।  
উপসর্গাঃ প্রবর্তন্তে মরণায় হৃদাংগাঃ ॥

অর্থাৎ অগ্নিচরণ হইতেছেন, যজ্ঞ সকলের  
অভাব লক্ষিত হইতেছে। হোম ভিন্ন আমা-  
দেরও অন্য উপায় নাই। মর্ত্যগণ যথো-  
চিত যজ্ঞভাগে আমাদিগকে আপ্যায়িত করে,  
আমরাও শস্যাদি সিদ্ধির নিমিত্ত বৃষ্টিদ্বারা তাহা  
দিগকে অনুগ্রহ করি। ওষধি সকল নিম্পাদিত  
হইলেই মর্ত্যগণ তদ্বারা আমাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ  
করে, আমরাও যজ্ঞাদি দ্বারা পুজিত হইয়া  
তাহাদিগের অভিলষিত বিষয় সকল সম্পাদন  
করিয়া থাকি। আমরা অধোদিকে বৃষ্টিদ্বারা  
বর্ষণ করি, মর্ত্যগণ উর্দ্ধদিকে স্বতদ্বারা বর্ষণ  
করে, যে দুর্বাস্তারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া  
সকল আমাদিগের উদ্দেশ্যে অর্পণ করে না এবং  
লোলুপ হইয়া যজ্ঞভাগ সকল স্বয়ং ভোজন  
করে, আমরা সেই অপকারী পাপাশ্বাদিগের  
বিনাশের জন্য জল, অগ্নি, হৃদ্য, বায়ু ও  
পৃথিবীকে দ্রুত করি। দুষ্ট জলাদি উৎসে

দ্বারা সেই দ্রুক্ষাদিগের বিনাশস্থচক দারুণ উপসর্গ সকল প্রবর্তিত হইয়া থাকে।

এক হোম দ্বারা কত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেই হোমের সাধনভূত হোমধেয় রক্ষা না করিলে আমাদের আর উপায় নাই। স্নাত্য-হতির সঙ্গক্ষে ব্যাধি বিনিষ্ট হয়, তদ্বিধয়ে কোন সন্দেহ নাই। গব্য ঘূতের গুণ আয়ুর্বেদে লিখিত আছে :—

গব্যং স্নাত্যং বিশেষেণ চক্ষুণ্যং রুচ্যমগ্নিকৃতং ।  
ষাঙ্ক পাকরসং শীতং বাতপিত্তং কফপহন্থং ॥  
মেধা লাভায়া কাণ্ডোজ্ঞ স্তোত্রো বৃদ্ধিকরং পরম্ ।  
অলম্ভা পাপকক্ষোদ্রং বরসং স্থাপকং ধ্রুৱং ॥  
বলাৎ পবিত্র মাযুগং স্নবঙ্গলাং রসায়নম্ ।  
সুগন্ধং রোচনং চাক্ষু সর্বাঙ্গোষু গুণাধিকম্ ॥

গব্যঘূত চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর, শুভজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীৰ্য্য, বাতহর, পিত্তনাশক, কফপহারক, মেধাজনক, লাভ্যবর্দ্ধক, কাস্তিপ্রদ, ওজোধাতুবর্দ্ধক, অত্যন্ত তেজস্কর অলম্ভী বিনাশক, পাপহারক রক্ষোহর, বরঃস্থাপক, গুরু, বনকর, পবিত্র, আয়ুস্কর, মঙ্গলজনক, রসায়ন, সুগন্ধি, রুচিকারক এবং মনোজ্ঞ। ইহা ছাড়া অগ্নি ঘূতের ঞ্চায় বৃদ্ধিজনক স্বর বর্দ্ধক, স্মৃতিকারক রক্ষোহর উদাবর্ত্ত, অর উন্মাদ, শূল, আনাহ, ত্রণ, ক্ষয়, বীষপ ও রক্তদোষনাশক। এক-দ্রব্যে এত গুণ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জিনিষে নাই। কিন্তু যদি ইহাতে চর্কি ইত্যাদি অপবিত্র দ্রব্য বা অগ্নি স্নেহপদার্থ সংমিশ্রিত হয়, তবে বিষক্ষয় না করিয়া বিষয়েই কার্য্য করে। ঘূতের ও তৈলের একটা বিশেষ গুণ এই যে, উহা যে দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকে—তাহার বীৰ্য্য ও প্রভাব গ্রহণ করিয়া তাহার প্রভাব হৃদয় ও বলবৃত্তভাবে প্রকাশ করে। এই জন্ত কবি-

রাজী স্নাত ও তৈল যে যে দ্রব্যে পাক করা হয়, তাহা তাহার সহিত সংমিশ্রিত না থাকিলে ও তাহার গুণ গ্রহণ করিয়া তাহার ক্রিয়া দেহে প্রকাশ করে।

হোমের বিষয় শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

“সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।  
অনেন এসাবিষ্যাক্ষমেব বোহস্তিষ্ঠি কাম যুক্ ॥  
দেবান ভাবয়তানেন যে দেবা ভাবয়ন্ত যঃ ।  
পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্যথা ।  
ইষ্টান্ ভোগান্ হি যো দেবা দামাস্তে যজ্ঞ  
ভাবিতাঃ ।

তৈ র্গণান্ প্রদায়ৈভো। যে ভুক্তে স্তেন এব সঃ ।  
যজ্ঞশিষ্টাশিলঃ সন্তো মৃত্যুস্তে সৰ্ব্ব কিম্বিধেঃ  
ভুক্ততে তে ত্বয়ঃ পাপা য়ে পচন্ত্যাহুকারণাং ।  
অন্নাদ ভগন্তি ভূতানি পৰ্জ্জন্তাদি সন্তবঃ ।  
যজ্ঞাদ ভবতি পৰ্জ্জন্তো যজ্ঞ কর্ণ সন্তবঃ ।

\* \* \*  
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।  
অঘায়ুরিপ্রিয়রামো যো যো পার্থ সজীবতি ॥”

এই যজ্ঞ আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমাদের পায়েরা বলিয়াছেন, শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এত অধঃপতিত হইয়াছে যে, তাহা কেহ মনে স্থান দিবে না। তবে যদি কোন বড় ডাক্তার—বিশেষ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, তবে তখনই লোক তাহা মানিয়া চলিবে। আজকাল এই ইন্দুরেজা বা মহামারী প্রতিবেধের জন্য ইউকিপটান তৈল, থাইমল, তৈল ও মেমথল সর্বদা ক্রমশঃ ভ্রাণ লইবার ব্যৱস্থা হইয়াছে, কেননা উহাদের অল্পপরিমাণে নাগারদে ও কর্করদেয় সর্বদা বর্তমান থাকিলে উক্ত রোগের বিকাশ খাস দ্বারা বা আফ্রিকা দ্বারা থাকিলে তাহা হইয়া যাইবে।

দুঃ—বিশেষ শব্দযুক্ত বিষদোষনাশক ও অত্যন্ত  
 তেজস্বর হইয়া পবিত্র মন্ত্রযোগে অগ্নিমুখে  
 দেবদেবে প্রদত্ত হইয়া, অতিশয় বীৰ্য্যবান  
 হইয়া, পাপনষ্ট পূর্বক রোগের বীজাণু সকলের  
 মূলে বিনষ্ট করিবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ  
 হইতে পারে কি? আর যেমন প্রত্যহ  
 মার্গার সংগ্রহের জন্য চেষ্টা আবশ্যক, তেমনি  
 তাহার আমাদের আহার্য্য জোগাইতেছেন,  
 রোগের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহাদের আহার্য্য এই  
 হইতে না দেওয়া কি আমাদের চৌরের  
 মত কার্য্য—মহাপাপের কার্য্য নয়? এই পাপ  
 ডা জগতে আরও কত মহা মহা পাপ  
 হইতেছে; নিপায়া প্রবঞ্চনা, চুরি, জাল, জুয়া-  
 দি, দহাতা হিংসা, পশুবলবৃদ্ধি বা জিহবার  
 বৃদ্ধিগণন জন্য অসংখ্য প্রাণীর নির্দয়ভাবে  
 সংহাৰ, ইঞ্জিন-সেবার জন্য—ভোগ বিলাসের  
 জন্য দুর্বলকে পীড়ন, পরস্পরগমন, মর্মে মর্মে  
 অন্যজ্ঞকে মাতা না ভাবিয়া ভোগের বস্তু জ্ঞান  
 করিয়া ক্রমভাবের বিস্তার দ্বারা জগদস্থার  
 রক্ষার অবমাননা ইত্যাদি কত পাপের কথা  
 বলিব! এই রাশি রাশি পাপ এক দিকে, আর  
 অন্যদিকে ধর্ম্মচর্চা নাই, কাজেই বহুসংখ্য  
 ভীষণ পাপভারে পীড়িত! পূর্বকালে এইরূপ  
 বহুসংখ্য পাপ অত্যাচারাদি প্রপীড়িত হইলে  
 তখন বিষ্ণুর নিকট গমন করিতেন, অর্থাৎ  
 জগতের সকল পাপ প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে  
 তর্কিত ও ইহা বলিয়া গাহিত যে  
 “ধর্ম্মের মানি আসিবে আপনি শ্রীমুখেতে  
 বসেছিলে, আজ অকূলে আকুল, ডাকে জীব  
 ফুল, ও কোলে নাওহে তুলে” এখন আর  
 সকল মিলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন, তাই  
 তিনিও আসিতেছেন না; কিন্তু বহুসংখ্য ভীষণ  
 পাপের জন্য কতকগুলি ভীষণ ব্যাধি হইবে।

পাশ—

করিয়া সংহার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার স্তব-  
 স্তুতি-প্রণাম ইত্যাদি যে সকল ঋষিবাক্যে সংস্কৃত  
 ছন্দে বদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে কেবল যে  
 চিত্তশুদ্ধি হয়, হৃদয়ে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়—  
 তাহা নয়, সেই পবিত্র শব্দের কীর্ত্তনে, তাঁহার  
 হরি হরাদি নাম উচ্চারণে শব্দত্রয়ের সাহায্যে  
 পরতন্ত্রকে পাইবার চেষ্টায় বায়ু, জল, পৃথিবী  
 পবিত্র হয় এবং সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট হয়।  
 আমাদের দেশে গৃহস্থের গৃহে প্রাতে ও সন্ধ্যায়  
 দেবদেবে ধূপদীপ দান ও শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থা  
 ছিল, তাহা প্রায় লোপ পাইল! কিন্তু যেমন  
 একজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ বলিলেন, শঙ্খের  
 ধ্বনিতে রোগের বীজাণু নষ্ট হয়, ধূপের গন্ধে  
 বায়ু শুদ্ধ হয়, অমনি অনেকে ধূপ দেওয়া ও  
 শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু সেই শঙ্খ-  
 চক্র গদাপন্নধারী শ্রীহরির পবিত্র নাম পরিবারের  
 সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া উচ্চারণ করিবার  
 ব্যবস্থা কই করিলেন! শ্রীহরি পূজায় পয়সা  
 খরচ নাই। তিনিই শ্রীমুখে তাহার ব্যবস্থা  
 করিয়াছেন :—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোরং যো মে ভক্ত্য। অযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপকৃতং মম্মামি অযত্নায়ন ॥

তাহার পর—

যংকরোবি বদশাসি বর্জ্জহোমি দদামি যং ।

যন্তংপশাসি কোন্তেয় তৎস্বকৃন্ত মদপণম ॥

যা কিছু করি, তাঁহারই কার্য্য করি এবং তাহা

তাঁহাকে অর্পণ করি—এই তো তাঁহার পূজা।

প্রাতঃকাল হইতে সায়াংকাল, সায়াংকাল হইতে

প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বাহা করি—তাহাতে তাঁহার

পূজা হউক। এই ভাবনায় কাজ করিলে

পাপ আসিতে পারে না। তাহার পর শ্রীভগ-

বান যে ফুল, ফল, পাতা, জল দ্বারা তাঁহার

পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার

পূজা ও হয় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে ও বায়ু প্রভৃতি পবিত্রযুক্ত হয়। একে দেবতারা আমাদের পাপের জন্য বায়ু, অগ্নি, জল পৃথিবী, সূর্য্য (সূর্য্যের কিরণ) অপবিত্র পূর্বক আমাদের রোগের ও সংহারের ব্যবস্থা করিতেছেন, আমরাও অন্ধ হইয়া, নিজের পায়ে নিজে কুঠারাবাত করিয়া এই সকলকে দূষিত করিতেছি। যে অগ্নিতে নানাপ্রকারমুগন্ধি—সুমিষ্ট পবিত্র দ্রব্য দেবোদ্দেশে পূতঃ হইয়া মহাসৌভ বিস্তার পূর্বক অগ্নির, সূর্য্যকিরণের বায়ুর দোষ ও রোগের বীজাণু সকল নষ্ট করিত, এখন সেই অগ্নি ‘মোটর’ চালান তৈলের দুর্গন্ধবিস্তারে, অ্যাসিটিলিন কোলগ্যাস প্রভৃতির দুর্গন্ধময় পদার্থের দহনদ্বারা বায়ুকে দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত করিতেছেন। যে ব্রাহ্মণগণ শ্রীভগবানের বিভূতি বেশী থাকার জন্য অগ্নিকে জড় পদার্থ না ভাবিয়া ভগবানের বিশেষ সম্বাদ সন্ধানিত ভাবিয়া দেবভাবে পূজা করিতেন, সেই নমস্ অগ্নি আজকাল বিড়ি, চুরুট, সিগারেটের হোমকারী সম্পাদন করিয়া পান্য বশিষ্ট বিড়ি ইত্যাদির সহিত সবুট পদদলিত হইতেছেন! একদিন কোন বিখ্যাত উকীল বাবুর বাসায় প্রবেশ করিবার পথের ধারে দেখিলাম যে, রক্তপুষ্প মিশ্রিত তুলা অগ্নি দ্বারা অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। তাবিলাম ও মনে মনে কান্দিলাম যে, হে অগ্নিদেব! কোথায় তোমার দেবভাবে দ্ব্যতাহতি দান, আর কোথায় তোমার অমেধ্য হরণ। যাহা ভুগর্ভে প্রোথিত হইলে বায়ু দূষিত করিতে পারেনা তাহাই অবাধে অগ্নিসংযোগে বায়ুতে বিস্তৃতি লাভ পূর্বক আমাদের ইহকাল ও পর কালের অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে। এই ত অগ্নির দুর্দশা। সূর্য্য স্বয়ং পবিত্র, কিন্তু আমরা

মলাদি সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শ দ্বারা দূষিত করিতেছি। পূর্ব্বে মাঠে মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা ছিল এবং তাহার পর তাহার উপর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মৃত্তিকা চাপা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল, — যাহাতে সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শে ইহা বায়ুমধ্যে সঞ্চালিত না হয়। আজকাল কিন্তু সে প্রথা গলা গ্রামে লোপ পাইয়াছে ও সহরের ময়লা গুলিও সহরের বাহিরে ট্রেকিং গ্রাউণ্ডে কোথাও অর্দ্ধ প্রোথিত কোথাও প্রোথিত না করিয়াই ফেলা হইতেছে, কোথাও বান্দী-জলে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। আমি একবার শ্রীবন্দাবনে কেশীঘাটে যমুনায় স্নান করিবার সময় জলে বাঙ্গালার চিরপ্রচলিত মতে কুলকুচা করিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া একটি ব্রজবাসী আমার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “এ বাঙ্গালি! তুমি যমুনা মাইপর কুলকুচা কর দিয়া।” হরিদ্বারেও এইরূপ। সেখানে পাণ্ডারা গঙ্গায় দস্তধাবন করিতে দেন না। ‘বটি’তে করিয়া জল তুলিয়া লইয়া দূরে মুখ ধুইতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কি ঘোর কুৎসিৎ প্রথা! লিখিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়, পল্লীগ্রামে বঙ্গললনারা যে পুষ্করিণীর জল লইয়া রন্ধন পূর্বক প্রিয় পুজ ও স্বামী প্রভৃতিকে ভোজন করান, তাহারই অল্পে মূত্রতাগ ও শৌচাদি করেন, ছেলের মলমূত্রসিক্ত বস্ত্র প্রক্ষালনও করেন। অন্ন চৌর্য্য এই জঘন্য ও ভয়ানক স্বাস্থ্যহানিকর প্রথা উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কেহই এমনি দৃষ্টিপাত করেন না। জলকে ন্যায়রূপ ক হইয়াছে। জলে ভগবানের বিভূতি ধুব বো বলিয়া ব্রাহ্মণের সাক্ষ্যই আমাদের বিশ্বাস। ভগবানের আরাধনার ব্যবস্থা। জলকে পরি-  
হইয়া তাহারই উপাসনা—স্বাস্থ্যহানিকর



বাবস্থা। ●পুকুরের জলে পুরুষেও কাপড় গামছা কাটা, কুলকুচা করা, মুখ ধোয়া থুঁথু ফেলা প্রভৃতি কার্য দ্বারা জলকে নানা প্রকারে দূষিত করিয়া সেই জলপানের ফলে স্বল্পমাত্রায় বিষপানে আত্মহত্যার ছায় নিজের প্রাণকে অকালে কালকবলে প্রেরণ করিতেছেন। সহরে কলের জল বলিয়া ততটা দূষিত হয় না। কিন্তু যে নল দিয়া জল অনবরত আসে, তাহা শুদ্ধিকর বায়ু বা সূর্য্যকিরণের মূখ দেখনাও নলের মধ্যে যে ময়লা জমে, জল আদিবার সময় তাহাও দৌত হইয়া আসে। তাহাব পর নদ নদীর কথা। নদ নদীতে তো আজকাল ময়লাবহারের কার্য পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে। যে পতিতপাবনী সুরধনী বিষু পাদোদ্রবা বলিয়া বিখ্যাত ঘাঁহার এক বিন্দু জল মৃত্যুকালে মুখে পড়িলে মানব মুক্ত হয় ইহাই শাস্ত্র বাক্য—ঘাঁহার পবিত্র বায়ু অঙ্গে স্পৃষ্ট হইলে জারিত অবস্থায় নিষ্পাপ অর্থাৎ স্বয়োরতি ও অন্তে স্বর্গভোগের হেতু হয় এবং ঘাঁহার তীরে দেহ ত্যাগ করিয়া কত কোটি কোটি সাধু, স্ত্রী, জ্ঞানী প্রভৃতি এবং উপস্থিত নিজ কার্যের দ্বারা মহাত্মা ৬গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কষ্টকর মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন, সেই সুরধনীর আজ কি অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, গঙ্গাজলে সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট হয়, কিন্তু যদি আমরা উহাতে রাশিরাশি ময়লা নিক্ষেপে উহাকে অপরিষ্কার করি তাহা হইলে আমরা যে অনিষ্টের পথ প্রশস্ত করিব, সে বিষয়ে আর কথা কি? পবিত্র কাশীধামেও সহরের নদীমায় ময়লা গঙ্গার অনিয়া ফেলা হইতেছে। ইহাতে কি

কাশী মহাত্মা ধ্বংস করা হইতেছে না। আজ কাশীধামে এই মহামারী কি ভয়ানক সংহার কার্য অবলম্বন করিয়া আমাদিগের চক্ষু ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। এতেও যদি দেশের লোকের ও স্বাস্থ্যবিভাগের লোকের চৈতন্য না হয়, তবে কি দেশ শ্মশানে পরিণত হইলে তবে চক্ষু ফুটিবে? যা' হবার হইয়াছে এখনও যদি আমরা সাবধানও যত্নপর হই. তবে আমাদের বংশ থাকিবে, নতুবা যেক্রপ মহামারী আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যদি উহা শীঘ্র না কমে, তবে যে কি ভীষণ অবস্থা ঘটবে, তাহা ভাবিবার বিষয় নয় কি? জল কল্পে দূষিত হইয়া ব্যাদি সৃষ্টি করিতেছে তাহা বলা হইল। ঈশ্বরের কেহ প্রিয় কেহ অপ্রিয় নাই। তাঁহার নিকট সকলেই সমান, তবে যেমন অগ্নির নিকট গেলে শৈত্য নিবারণ ও আলোক পাওয়া যায়, তেমনি ঈশ্বরের উপাসনা, আরাধনা পূজা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার প্রিয় হওয়া যায় ও ইহকালে সাংসারিক স্বভোগ করিয়া অন্তে তাঁহাকেই পাওয়া যায়। আমরা না ইহকালের উপায় করিতেছি, না পরকালের ব্যবস্থা করিতেছি। আলসো বিলাসে, ব্যসনে, পর নিন্দায় পরচর্চায় খেলায়, মত্ততায় ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত হইয়া আমরা অতল জলে ডুবিতে বাইতেছি। ভক্তের এই গানটি বড়ই ভাবোন্মেষক।

“হরি বলরে ভাই—নাম বিনে আর ভব পারের বন্ধু নাই,

হরিনামের মতন কি আছে রতন, করনা বতন কেন ভাই।

অলসে বিলাসে নির্লি না মুখে—বিবর লাগসে মজিলি মুখে,

বরষে বরষে পলকে পলকে সময় বহিয়া যায়, (ও মাম) যদি এখনও না বলাবি—তবে কি আর করবি—ঘটে বসে কাঁদিবি ভাই।

কি ছার অসার আনন্দে মেতে, স্থপথ ছাড়িলি,

খাইলি কুপথে,

কুসঙ্গে মজিলি ডুবিয়া মরিতে—কুসঙ্গে লইলি ঠাই,

যখন সাতারে পড়বি, পাব না পাইবি, হাবু ডুবু

খাইবি ভাই।

না বুঝে না বুঝে যা হয় তা করিলি, এগনো ফিরিলে

পাইবে সকলি,

এখনও ডাকিলে শুনিবে কাণ্ডারী—ধরিয়া তুলিবে

নায়।

(ও তুই) আর কত হবি তল, হরিবল হরিবল,

পারের সখল কর ভাই।

যত পঠিতে তারিতে করণা কবিরে মন্ডেত ভানিয়ে

হরিনাম আনিয়ে দিয়েছে ঢালিয়ে জগত ভরিয়ে

গৌর আর নিতাই।

তোরা আয় সব ছুটিবে, নিয়ে যা নুটিয়ে, এমন

দিন কি পাবি ভাই।”

সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম সমূহের সাধারণতঃ যাহা কর্তব্য, তাহা এই ভগবতুপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা আটিট—

সত্যং শৌচমহিংসা চ অনহর্য তথা কমা।

আনুশংখ্যাকর্পণ্যং সন্তোষ শ্রাষ্ট্রমে ওণাঃ ॥

পত্র পুষ্প পূজার ব্যবস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা চিকিৎসা শাস্ত্র দেখাইতেছেন। তুলসী পত্র যে কত রোগ ও রোগের বীজাণুনাশক, তাহা “আয়ুর্বেদে” পূর্বেই বাহির হইয়াছে। বিশ্ব-পত্রের রস পান করিলে বহুবিধ রোগ নষ্ট হয়। যে জিনিসের গুণাধিক্য বেশী, সেই জিনিসেই ভগবান বিশেষভাবে আছেন। তুলসী বৃক্ষে নারায়ণের অধিষ্ঠান, বিশ্ববৃক্ষে মা জগদম্বা ও শিবের অধিষ্ঠান। পদ্ম যেমন শোভাবিশিষ্ট, তেমনিই স্বপ্নস্বপ্ন। জবার শোভা মা জগদম্বা এবং মহেশ ও নারায়ণের পদতলের ভাষ। অপরাঞ্জিতার শোভা মা কালী ও ত্রীকূষের

ভাষ। এই সব পুষ্পপত্র দ্বারা পূজায় মন আনন্দিত, ভগবচ্চরণে ধ্যান ঘনীভূত এবং চিত্তশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। ইহাও আমরা ছাড়িয়াছি। ডাক্তারেরা বলেন যে, তুলসীর গুণ থাইমলে আছে। অথচ আমরা পরসাদ দিয়া থাইমলের ঘ্রাণ লইতেছি, কিন্তু বিনাপরসাদ নারায়ণপাদপদ্মে অর্পিত—রক্ত-চন্দনচর্চিত তুলসীপত্র ভক্ষণ করিতেছি। রক্ত বা শ্বেতচন্দনচর্চিত বিষদল মহাদেব ও মা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ পূর্বক ভক্ষণ করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আমাদের চর্চায়া আর কি হইতে পারে? যে বিশ্ববৃক্ষ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে “দর্শনং বিশ্ববৃক্ষস্য স্পর্শনং পাপনাশনং” সেই বিশ্ববৃক্ষ কর্তন করিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি!

যঃ শাস্ত্রবিধিযুঃস্বজ্ঞা বর্ততে কামকারতা।

ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন মুখং ন পরাং পতিম্ ॥

ফলে আমরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া, স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হইয়া তত্ত্বজ্ঞান, শাস্ত্র ও মুক্তিলাভের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, ইহাই আমাদের পক্ষে অনিষ্টের প্রধান কারণ।

মৃত্তিকার দোষ নিবারণের প্রতীকার—গোময় লেপন। এখন আমাদের ‘কোটা ভিত্তি’ হওয়ার ফলেও তাহাও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে! এখন আমাদের ঘরগুলি পরসাদ ধরত করিয়া ফেনাইল দিয়া ধোয়ান হয় ও তাহার চর্গাক্র ভোগ করা হয়, অথচ টাটকা গোবর বাহা বিনা পরসাদ লাভ্য—তাহার সঙ্গগ ‘বানুদে’র ভাল লাগে না।

আমরা আমাদের অধিবাস্য না শুনি গোবরকে অবহেলা করিয়াছি। যাহোক ডাক্তার কিন্তু গোবর সম্বন্ধে কি বলিতেছেন? শুধু “শ্বেত্ররোগ বিস্তারের সময় পুষ্করাস্ত্র করি

হয় এবং সেই গৃহে আসিবার পূর্বে শুষ্ক গোময়, শুষ্ক নিমপত্র ও গন্ধক একত্র জ্বালাইবে ।”

Burn Cowdung and Neem leaves and Sulphur in it.

Sd. W. C. Ross Major, I. M. S.

Sanitary commissioner B + O.

গোমূত্রের গুণ অনেক—ইহা তীক্ষ্ণ, প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, শোথ, মলবদ্ধতা, শূল, গুহ্ম-রোগ, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক । ইহা অগ্নি দীপ্তিকারক, মেধাজনক, কৃমি ও কুষ্ঠ-রোগ নাশক । গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নষ্ট হয় । গোময় ১ ভাগ গোমূত্র ২ ভাগ, গোমূত্রের চারিগুণ ঘৃত, ঘৃতের আটগুণ চুর্ণ এবং চুর্ণের আটগুণ দধি গ্রহণ করিবে । এই সকল মিলাইয়া যে পঞ্চগব্য হয়, তাহা মস্ত দ্বারা শোধিত করিয়া নারায়ণের এবং শিবশিব প্রভৃতির মানে দেওয়া হয়, দধি, চুর্ণ ঘৃত, চিনি মধু এই পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান ও পানীয় দেওয়া হয় । চন্দনমিশ্রিত জলে স্নান করান হয় । ঐ জল, গঙ্গাজল বা কূপ বা নদীর জল তাম্র-নির্মিত কোষায় থাকিয়া পবিত্র হইয়া—শক্তি-যুক্ত হইয়া দেবতার পাণ্ডুরার্থ্য স্নান প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয় । সেই স্নানজল পূজার পাত্রে সংগৃহীত হয় এবং তাহার সহিত সচন্দনতুলসী পত্র, সচন্দন বিষপত্র, সচন্দনজবা পুষ্প ( যাহার সিক্তজল জ্বাপুষ্ক উভয়েরই উপকারক ) এবং অস্ত্রান্ত্র অগন্ধি পুষ্প মধুদ্বারা সংমিশ্রিত হইয়া কি অপার্থিব অমৃত উৎপাদন করে, তাহা আধুনিক সভা জগতের ‘বাবুরা’ তান্ত্রিতে পারেন না । এই স্নানজল বা ভগবানের চরণ ধৌত জ্বলকে ঋষিরা কত রোগের বীজাণু-নাশক ও কত উপকারক বলিয়া—অকাল মৃত্যুহারক বলিয়া এই মন্ত্র অঙ্গী করিয়াছেন,—

অকাল মৃত্যু হরণঃ সকল ব্যাপি বিনাশনম্ ।

বিষ্ণু পানোদকং পিতৃা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥

এখন ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া ইহার উপসংহার করা যাউক । আমি এক সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “বাবা আপনি যে স্থানে আছেন ওখানে ত প্লেগের প্রকোপ শূন্য, আপনি নিশ্চয় কি প্রকারে সেখানে থাকেন ?” তাহাতে স্বামীপূজাপাদ শ্রীযোগানন্দ সরস্বতী লেখেন যে, “ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত থাকায় কোন ভয় বা আশঙ্কা হয় না ।”

রোগীর সংসর্গে রোগ হয় । কিন্তু ঐহারা রোগীর স্পর্শ বা চিকিৎসা করেন, তাহারা মনে একটা সাত্বিক বল লইয়া কার্য্য করেন বলিষা সংক্রামক রোগ সকল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না । একটা গোন্ধর কাছে ভয়ে ভয়ে গেলে সে সিং নাড়া দেয়, কিন্তু সাহস করিয়া গেলে সে কিছুই করেনা, অথচ উভয় অবস্থায় যে যায়, তাহার বাহ্যিক আকার একই প্রকার । মনের গতির জন্ত এই দুই প্রকার ভাব হয় । রোগও বোধ হয় মনের বল ও শরীরের বল দেখিয়া আক্রমণ করে । বীৰ্য্যধারণই প্রধান ব্রহ্মচর্য্য । বীৰ্য্যধারণ না হইলে মস্তিষ্ক বলবান হয় না । বুদ্ধিতেজস্কর না হইলে ভগবান বুদ্ধিযোগ দিয়া তাহাতে আশ্র-যোগে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশাস্ত্রী জ্ঞানালোক দ্বারা আমাদের মোহান্ধকার নষ্ট করেন না । পূর্বেও এই বাঙ্গালা দেশ ছিল, কিন্তু এখানে এত ম্যালেরিয়া ছিল না, তাহার কারণ তখন দেশের লোক বায়ু প্রভৃতি পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করিত এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা ঈশ্বরের চিন্তায় নিরত থাকিত । তখন সকল গ্রামেই হরিনাম হইত । এখন

তাহার বদলে পরনিক্কা, পরচর্চা, দাঁবা, তাস, পাশা প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। তামাকটা কোনরূপে না কোনরূপে আমাদের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক আমাদের ভীষণ অনিষ্ট করিতেছে। ইহাতে আমরা হীনবল হইয়া নানারোগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছি। এখন এই ভীষণ মহামারীর হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, তামাক—কি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে। বাজারের খাবার ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সাম্বিক ভাবে গৃহপ্রস্তুত অন্নবাস্তন, জলখাবাদি শ্রীভগবানকে নিবেদন পূর্বক সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। দেবপূজা করিতে হইবে, হোম করিতে হইবে এবং উপরে যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইল—তাহার ত্যাজ্য বিষয় ত্যাগ ও গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে। হরীতকী প্রত্যহ একটু করিয়া খাওয়া উচিত। শ্রীভগবানকে নিবেদন করিবার সময় আগ্ন ও পানীয় জলে তুলসী পত্র দেওয়া উচিত। বিষ্ণুপাদোদক পান ও প্রত্যহ পূজা করা এবং বিষ্ণুপত্র ভক্ষণ করা উচিত। প্রাতে পূজার পর বিষ্ণুপত্র এবং জলপানের সময় পূজা পূর্বক তুলসী পত্র দিয়া সেইজল পান করা ও সেই তুলসী পত্র চর্চণ পূর্বক ভক্ষণ করা উচিত। যে গৃহে হোম হইবে—তথায় দ্বাররুদ্ধ করিয়া পরিবারের সকলে কিয়ৎকাল হোম-কালীন অবস্থান করা, হোমের তিলক ধারণ করা ও চরণোদক পান করা উচিত, কারণ হরি সকল দেবতাকেই বুঝায়। আর

হরি হরতি পাপানি দুষ্ট চিহ্নেরূপি নৃত্যতঃ।

অনিচ্ছয়াপি সংশ্লিষ্ট দহতোষ হি পাবকঃ।

হরিং হরীতকীঞ্চৈব পারিত্রিক জাহ্নবী জলং।

অন্তর্মলবিনাশায় স্মরেৎ খাদেৎ তপেৎ পানেন্দ্ৰবঃ।

সর্বাগ্রে ব্রহ্মচর্যা আবশ্যক। বীর্ষাধারণে

রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিতে দেয় না।

পরম পূজ্যপাদ ৬কৈলাসপতি গোস্বামী

স্বামীজি বলিয়াছিলেন,—“বাবা বাঙ্গাল-

দেশের মত দেশ নাই,—যদি প্রত্যেক ব্রাহ্মণ

ত্রিসন্ধ্যা করে, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, গুরুপূজা

ও ইষ্টপূজা করে, কিম্বা সকলে না পারিলেও

প্রত্যেক গ্রামে কেহ কেহ নিত্য হোম কবে,

তবে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি কোথায়

পলাইয়া যায়।” এই সব করার সঙ্গে কিছু

ঔষধ ব্যবহারে আত্মরক্ষাকে বড়ই দৃঢ় করে।

আমি নিজে ও পরিবারে সকলে ম্যালেরিয়া

মিশ্রিত ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হই, শ্রীভগবানের

রূপায় সকলে ডাক্তারি ঔষধ সেবন করিয়া

ভাল হই, কিন্তু দুর্বলতা ও অগ্নিমান্দ্য ও

অরুচি কিছুতেই যায় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া

নিম্নলিখিত পানচিহ্ন সেবন করিয়া সকলেই

বিশেষ উপকার পাই। ইহা প্রতিষেধকরূপেও

ব্যবহৃত হইলে উপকার বই অপকার

করিবে না।

নিমছাল, চিরাতা, ক্ষেতপাঁপড়া, গুলক,

বাসক, কণ্টকারি, হরীতকী ও আমলা প্রত্যেক

১০ চারি আনা, জল অর্দ্ধসের, পাকশেব অর্দ্ধ-

পোয়া, ঈষদ্রব্য অবস্থায় প্রাতে সেব্য।

এখন যেকোন মহামারী হইতেছে, এইরূপ

গৃহে গৃহে পূজাদি হোম ও সন্ধ্যার হরিনাম

সংকীর্তন হওয়া অত্যাবশ্যক। নগর-সংকীর্তন

আরও ভাল।

শরীরের নবজিহ্বা ব্যাধিগ্রস্ত কলেবরম্।

ঔষধ জাহ্নবী-তোয়ং বৈজ্ঞানিকায়ণোহরিঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি. এল।

## পৌষ-পার্বণ ।

—:~:—

শীতের জড়তা ঠেলি'— এ উল্লাস কোথা পেলি—  
 অয়ি ! বিষাদিনী—বঙ্গ জননী আমার  
 কিসের এ আয়োজন ? পূজা আজি কা'র ?  
 চির অভিশপ্ত দেশে, সাক্ষাৎ কমলা এসে—  
 সহসা কি খুলে দিল “লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ?”  
 কোথা' গেল—ক্ষীণ কণ্ঠে দীন-হাহাকার ?

বল কোন মহোৎসবে, মাতিয়াছে আজ সবে,  
 ঘরে ঘরে কেন হেরি আনন্দ তুফান ?  
 কি প্রাসাদ—কি কুটীর, সকলই সমান ।  
 গৃহিণীরা ভোরে উঠে, এনেছে চাউল কুটে,  
 কোন মহাব্রত আজ হ'বে উদ্‌ঘাপন ?  
 অতীতের স্মৃতি এ যে । প্রেমের তর্পণ !

গৃহ-কোণে বঙ্গ বধু বৃকে স্নেহ, মুখে মধু,  
 “নবান্নে”—নূতন শস্য, দেবতারে দিয়া,  
 রেখেছিল শেষ ভাগ যতনে তুলিয়া ।  
 বাহান্ন সপ্তাহ তরে, কতই আগ্রহ তরে,  
 সে সম্বলে “রত্ন কাঁপি” ভরিয়া যতনে,  
 “বাউনী” বাঁধিল বালা খড়ের বন্ধনে ।\*

তিন দিন গৃহ ছাড়ি' ষেওনা কাহারো বাড়ী’  
 মমতায় স্তম্ভধুর—বধুর শপথ,—  
 বাঙ্গালীর কি সৌভাগ্য দেখে জগৎ।

\* বাহান্ন (৫২) সপ্তাহে বর্ষ পূর্ণা করিয়া, সপ্তমসরের জন্ত পুরাকালের গৃহিণীগণ শস্য সঞ্চয় করিয়া গোলায় বাঁধিয়া রাখিতেন । ইহার নাম ছিল “বাহান্নী”, তাহাই অপভ্রংশে “বাউনী বাঁধা” নাম পাইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য পড়িলে পাঠক ইহা-সম্বন্ধে জানিতে পারিবেন ।—লেখক।

পতি-পুত্র-পরিজনে—

তুঘিতে প্রফুল্ল মনে

অন্তঃপুরে—অবতীর্ণা “অন্নপূর্ণেশ্বরী”—

রাঁধিয়াছে কত খাওয়া বঙ্গের স্তন্দরী।

মধুর “মোচার ঘণ্ট”

স্বধারসে সিক্ত কণ্ঠ,

কোমল ‘পালমশাকে’ মটরের বড়ী ;

রসাল ক’রেছে তা’রে—মিশাল চিঙ্গড়ী।

বিবিধ মসলা যুক্ত—

মূলার “মোহন শুভ্র”

ঘন অরহর ডালে—‘জীরার ফোড়ন’।

‘কপি’ সহ ‘কই মাছ’—বিশ্বে অতুলন।

‘তিল-পিটুলীর’ বড়া

ছাঁকা তেলে ভাজা কড়া,

‘আমড়ার’ “গুড়াম্বল” স্বেচ্ছা সরস।

ভেটকী মাছের ঝোলে কে না হয় বশ ;

স্বতে ভাজা তণ্ডুলুটী,

সত্ত্ব অরুচির রুচি,

আস্কে, চুঘী, পাটী-সাপ্টা, পাঁপর, কচুরি,

নূতন “ন’লেন” গুড়ে” মণ্ডার মাধুরী।

রসে মোলায়েম মিঠা,

গোলাপী গোকুল পিঠা,

মুগের মগধ লাড়ু, কৃষ্ণ তিলে ছাঁই,

পাস্তুরা, নিখুঁতি, বোঁদে, মালপো মিঠাই।

পায়স—কামিনী চেলে,

দেবরাজ খান পেলে,

পূর্ণিমার পূর্ণ শশী—সে ‘সরুচিকুলী,’

দেশী মেওয়া, পূর দেওয়া, নানাবিধ ‘পুলি’।

হা নিষ্ঠুর ! হা নির্বোধ !

মাতৃ ধনে তুচ্ছ বোধ ?

কেন সে’ অখাওয়া খাও, কোন্ অমুরাগে ?

এর কাছে, ‘কাটলেট’ কোন্সী কোথা লাগে ?

আর কত দিন ওরে !

গার্কিবি এ মোহ ঘোরে ?

জননী-পীযুষ কিরে, অযত্নের ধন ?

এত কি লেগেছে ভাল গোহাড় চৰ্চণ ?

শ্রী ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকীর্ত্তন।

## ডাক্তারের ডায়েরী।

—:—

দিল্লীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাত্মা ৬/হেমচন্দ্র সেনেব নাম কোন বাঙ্গালী না শুনিয়াছেন? তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য, আতিথেয়তা, তাঁহার সমদর্শিতা অত্যাধিক প্রবাদে মত পশ্চিমভারতে ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার রোগীগণ তাকে ধন্যস্তরির অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। দিল্লী প্রবাসী কোনও বাঙ্গালীব কাছেই তিনি ভিজিট লইতেন না। তীর্থ-যাত্রী ভদ্রলোকগণের আদর অভ্যর্থনার জন্য—তাঁহার প্রাসাদ তুল্য অটালিকার দ্বার সর্বদাই মৃত থাকিত।

চিকিৎসা কার্যে—তাঁহার অনন্ত সাধারণ “হাত বশ ছিল। তাঁহার অভিমত—নব্য ডাক্তারগণ ওক উপদেশের মত শিরোধাৰ্য্য করিয়া লইতেন; হেমবাবু তাঁহার বহু অভিমত ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতেন। সেই পুৰাতন ডায়েরীতে আমাদের মত লোকের অনেক জিনিষ শিখিবার আছে। “আয়ুর্বেদে” ক্রমশঃ তাহা প্রকাশিত হইবে।

[—সঙ্কলনিতা।]

উদ্ভেজনার কার্যে ব্রাণ্ডী প্রয়োগ করা ভ্রম।

“সাধারণ লোকে ব্রাণ্ডীকে উদ্ভেজক বলিয়াই জানে। তাহাতে তত দোষ ধরি না। কিন্তু অনেক ডাক্তারও যে ব্রাণ্ডীকে উদ্ভেজক পদার্থ মনে করেন না, ইহাই বিশ্বস্তের বিষয়। আমি দেখিয়াছি, বেশ নামজাদা ডাক্তার—প্রহ্লাদ নারীকে, অজীর্ণ ও উদরাময় রোগীকে,

—পুনঃ পুনঃ অরাক্রান্ত ব্যক্তিকে—পোর্ট, সেরী, ব্রাণ্ডী ও ভাইব্রোণা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহারের পরামর্শ দিয়া থাকেন। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত—প্লেগাদি মহামারীর প্রকোপ কালে সামান্য সর্দিতে, সহর হইতে পল্লীগ্রামে গমনের সময়ে—পোর্ট, সেরী, ব্রাণ্ডী ও ভাইব্রোণা ব্যবহার করা খুব ভাল। কিন্তু এই ধারণাটা তাঁহাদের মারাত্মক ভ্রম। কেননা ব্রাণ্ডী ক্ষণিক উদ্ভেজক হইলেও উহা একটা অবসাদক পদার্থ। যেখানে উদ্ভেজনার আবশ্যক, সেখানে ব্রাণ্ডী প্রয়োগ করা অত্যন্ত অনিষ্টকর।

ব্রাণ্ডী পান করিলে, শরীর উষ্ণবোধ এবং দেহে বলাধান বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। ব্রাণ্ডীপানের পরবর্তী অবসাদ অতি ভয়ঙ্কর। অতএব যেখানে হৃদপিণ্ডের শক্তি নাশের সম্ভাবনা—সেখানে কখনও ব্রাণ্ডী প্রয়োগ করিবেনা। ইহাতে কুফল ফলিতে পারে। ব্রাণ্ডীপানের অন্তর্যঙ্গের পর—ঔষধিক রক্তাধিক্য হইয়া থাকে, ফলে—হৃদপিণ্ডের রক্ত চাপের হ্রাস হয়, এবং শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া পড়ে। ব্রাণ্ডী বা ব্রাণ্ডীজাতীয় ঔষধ—হৃদপিণ্ডকে কখনই সতেজ অবস্থায় আনিতে পারে না।

বিষ্ময়িকা রোগে—রোগীর হিমাদ অবস্থা উপস্থিত হইলে, অনেক চিকিৎসক ব্রাণ্ডী ব্যবহার করেন, বাহার এই ব্যবস্থা করিয়া

থাকেন, আমার বিশ্বাস—তাঁহারা প্রকৃত ঔষধ নির্ধারন করিতে না পারিয়া গতান্তর বিহীন হইয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিস্ম-চিকা রোগে—ব্রাণ্ডী কখনও ঔষধরূপে প্রয়োগ করা উচিত নহে।”

### ঋতু স্নান ।

“আমাদের দেশে—ঋতুর চতুর্থ দিবসে জ্বীলোকদিগের স্নানের ব্যবস্থা আছে। স্মৃতি শাস্ত্রেও এ মত সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক রমণীর ঋতু চারিদিনের ও অধিক কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর জ্বীলোকগণ—পূর্ণঋতুর অবস্থায়—আতব থাকিতে থাকিতে, চতুর্থ দিবসে—গুচি হইবার লোভে স্নান করিয়া, নিজের অমঙ্গল নিজেই ডাকিয়া আনেন। এই সকল নারীর প্রায়ই বাধক বেদনা জন্মিয়া থাকে। “ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নান করিবে” শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ, কিন্তু এই চতুর্থ দিবসের অর্থ অনেক নারীই বুঝেন না। তৃতীয় দিবসের মধ্যে যাহাদের আর্তব সন্মত স্রাব হইয়া যায়, তাঁহারা ৪র্থ দিবসে স্নান করিবেন। যাহাদের ঋতু ৪র্থ দিবসেরও অধিক দিন থাকে,—তাঁহারা ৪র্থ দিবসে স্নান করিলে—কখনই গুচি হইতে পারেন না। ঋতুকালে স্নান—জরায়ু রোগের নিদান। অতএব ঋতু থাকিলে—চতুর্থ দিনে কখনই স্নান করিতে দিবে না।”

### মানসিক শ্রমের পর কায়িক শ্রম ।

“কতকগুলি লোকের বিশ্বাস অত্যধিক মানসিক শ্রমের পর কায়িক পরিশ্রম করা উচিত। আমাদের দেশের ছাত্রগণ, তাই অধিক পাঠের পর কিয়ৎকালের জন্ত অঙ্গ-চালনা বা ব্যায়াম করিয়া থাকেন। একজন বৈজ্ঞানিককেও বলিতে শুনিয়াছি—এইরূপ

ব্যায়ামের দ্বারা, রক্তাধিক্য সমস্ত শরীরে পরি-বাস্ত হইয়া মস্তিষ্কে শীতল রাখে। বৈজ্ঞানিক বলেন—তখন শরীরের যে অংশ কোন কক্ষে নিযুক্ত থাকে, তখন সেই কক্ষশীলয়্য বিশেষেই রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে সেই যন্ত্রবিশেষ কক্ষে রত থাকে, সেই পরিমাণে তজ্জনিত শরীরক্ষয়ও হইতে থাকে। স্নাতরাং মস্তিষ্ক পরিচালনায় যেমন শরীর ক্ষয় হয়, ব্যায়ামেতেও তদ্রূপ শরীর ক্ষয় হয়, অতএব একটা যন্ত্রের ক্ষয়পূরণের জন্ত অপর যন্ত্রকে ব্যবহার করা চলে না। তবে একথা নিশ্চয়, গুরুতর মানসিক পরিশ্রমের পর ব্যায়াম করিলে, শরীর কিছু স্বচ্ছন্দ বোধ হয়।

যাহারা গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিবেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ পাঠাদি মানসিক শ্রমে ও নিযুক্ত হইবেন না। উভয় ব্যাপারই শরীরের অনিষ্ট কর।”

### জরের কোন অবস্থায় কুইনাইন দিতে হয় ?

“কি ডাক্তার, কি গৃহস্থ, উভয়েরই ধারণা—বিজ্ঞর অবস্থায় অথবা জ্বর নামিবার মুখে কুইনাইন প্রয়োগ করা উচিত। আমি কিন্তু এরূপ মতের পক্ষপাতী নহি। জরের কম্পনাবস্থা কাটিয়া গেলেই, কুইনাইন দেওয়া চলে। বিজ্ঞর অবস্থায় কিবা জ্বর নামিবার মুখে কুইনাইন দিয়া যে ফল পাওয়া যায়, জরের অতি প্রবল অবস্থায় কুইনাইন দিলে—তাঁর চেয়ে অনেক ফল পাওয়া যায়। ইহা আমার পরীক্ষিত সত্য। আমি ২০ বৎসর ধরিয়া এইভাবে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া আসি-তেছি। যদি ক্যান্সারের জ্বর বা বায়সেটিক বসিয়া জ্বর করিতে চাই, তবে কুইনাইন



কাটিয়া গেলেই—প্রবল জরে নির্ভয়ে কুইনাইন প্রয়োগ করিবও। কিন্তু জ্বর ম্যালেরিয়া না হইলে, কুইনাইন দেওয়া ভাল নহে।”

### জ্বরের পিপাসা।

“পিপাসা—জ্বরের একটা যন্ত্রণাপ্রদ প্রধান উপসর্গ। পিপাসা নিবারণের জন্ত রোগীকে জলপান করিতে দিতে হয়। কবিরাজ মহাশয়েবা জরগ্রস্ত রোগীকে কাঁচা জল পান করিতে দেন না,—তাঁহারা সিদ্ধ করা জল শীতল করিয়া পান করিতে বলেন। এ ব্যবস্থা নন্দনহে। আমি ছই চারিজন বিজ্ঞ ডাক্তারকে শীতল জল পানের বিরোধী হইতে দেখিয়াছি। তাঁহারা রোগীর পিপাসার জন্ত—উষ্ণ জল দিবেন। এখানে উষ্ণ জল অর্থে luke warm অর্থাৎ করোঞ্চ (কুহুম কুহুম) বর্ণিতে হইবে। আমি এই উষ্ণজল পানের অত্যন্ত বিরোধী, উষ্ণজল পানে রোগীর পিপাসা দূর হয় না, বরং বাড়ে; অধিকন্তু বমনোদ্বেগ উপস্থিত হয়। উষ্ণজল বিষাদ,—তাঁহা পানে রোগীর প্রবৃত্তি বা ক্রটিও হয় না। একজন বহুদর্শী কবিরাজকে আমি আমার অভিমত জানাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—গরম জলে রোগীর বমি হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই বমিতে অনেক উপকার হইয়া থাকে। বমির সঙ্গে সঙ্গে পাকাসয় বোত হইয়া যাওয়ায়—রোগী শান্তি বোধ করে।” আমি কিন্তু আমার রোগীগণকে ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিরা থাকি। অনেকে জ্বর-জরে ঠাণ্ডা জল দিতে সাহস করেন না, জ্বর-পাছে বকে সন্দী বসে। ইহা, অবশ্যই ভ্রান্তবিশ্বাস। নিমোনিয়া, প্রুরিসি, ব্রুসাইডিস্ প্রভৃতি রোগেও—ঠাণ্ডা জল পান করিতে দেওয়া যায়। কেননা—জল পানে বকে সন্দী

বসিতেই পারে না। বিশেষতঃ এ সকল রোগ জীবাণু-জাত। জরারবস্থায়—শরীর ক্ষয় জনিত ক্রেদাদি দেহমধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা জল পানে সেই সকল ক্রেদ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। মূত্র-গ্রন্থির কণ্ঠস্বাধ লাঘব করিবার জন্ত রোগীকে প্রচুর পরিমাণে মুহূর্ত্ত শীতল জল পান করিতে দিবে। শীতল জল পানের আর একটা উপকার—দেহের উত্তাপ কমিয়া যায়।

তথাপি যদি রোগীকে শীতল জল দিতে সাহস না কর, তবে—চায়ের মত অত্যঙ্গ জল পান করিতে দিও। তাহাতে বরং উপকার পাইবে। কদাচ দ্রব্য উষ্ণ জল পান করিতে দিও না।”

নূতন জ্বরে ছুঙ্ক পথ্য অনিষ্ট কর।—

“ডাক্তারেরা নূতন জ্বরে ছুঙ্ক পান করিতে দেন; কবিরাজী মতে নূতন জ্বরে ছুঙ্ক পান—বিষপানের ভুল্য, আমি ডাক্তার হইয়াও, এই কবিরাজী মতটিকে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি। বাস্তবিক বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—নূতন জ্বরে ছুঙ্ক প্রদান করিলে, রোগীর দেহে কফের সঞ্চয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে অবস্থায় রোগীকে উপবাস দেওয়ার ব্যবস্থা—সে অবস্থায় ছুঙ্কের মত গুরুপাক খাওয়া কখনই দেওয়া উচিত নহে। অল্পদিন জ্বরে ভুগিতে না ভুগিতে আজকাল যে অনেক রোগীর পেটে প্রীহা-বক্রতের আবির্ভাব হইয়া থাকে, নব জ্বরে ছুঙ্কপান তাহার একটা কারণ।”

কডলিভারের চেয়ে চ্যাবনপ্রাশ ভাল।

“ফুলফুলের ক্ষয়-স্থচনার কডলিভার অয়েল একটা ফলপ্রদ ঔষধ। যুষ্মবে জ্বর, তাহার সঙ্গে খুঁ খুঁ কাসি—এরূপ অবস্থার আধারা কডলিভার বা কডলিভার মিশ্রিত ঔষধের

ব্যবস্থা দিয়া থাকি। কিন্তু কডলিভার যে ক্ষয় নিবারণে সর্বত্র সক্ষম—একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। অনেক ক্ষয়রোগীর কডলিভার সহ হয় না। থাইতে থাইতে উদরাময় দেখা দেয়, যকৃতের ক্রিয়া হ্রাস হইয়া পড়ে, আহায়ে অরুচি উপস্থিত হয়। রোগীর এরূপ অবস্থা দেখিলে, ডাক্তার কডলিভার বন্ধ করিবার পরামর্শ দেন, তা'রপর পেটের অস্থখ সারিলে, আবার কডলিভার থাইতে বলেন। আবার থাইতে থাইতে পেটের অস্থখ দেখা দেয়, আবার বন্ধ রাখিবার হুকুম হয়। এইরূপে অনেক রোগীকে মাঝে মাঝে বন্ধ রাখিতে হয়। আমি এরূপ চিকিৎসার পক্ষপাতী নহি। আমার বিশ্বাস—কডলিভারের পরিবর্তে কবিরাজী “চাবনপ্রাশ” ক্ষয়-রোগীকে থাইতে দেওয়া ভাল। চাবনপ্রাশ ক্ষয় নিবারক ও উৎকৃষ্ট রসায়ন। আমি নিজে অনেক রোগীকে চাবনপ্রাশ ব্যবহারে উপকৃত হইতে দেখিয়াছি। “চাবনপ্রাশ”—উদরাময়ের আশঙ্কা প্রায়ই নাই। অধিকন্তু—উহা স্নেহাদবৃত্ত, স্মরণতি, মুখপ্রিয় এবং ফলপ্রদ। তবে চাবনপ্রাশ বিশুদ্ধ ও টাটকা হওয়া চাই। হুঃখের বিষয়—এমন একটা ক্ষয়নিবারক মহোষধ, দিন দিন তাহাতে কৃত্রিমতার আবির্ভাব হইতেছে। ব্যবসায়ের খাতিরে—অনেকেই চাবনপ্রাশ খেচিয়া বড় লোক হইতে চাহিতেছে। অনেক রোগী আবার বিজ্ঞাপনের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া, সামান্য সর্দী কালীতে পর্যন্ত চাবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে জিনিষে চাহিদা যত বেশী, সে সে জিনিসের নকলও তত বেশী। অতএব চাবনপ্রাশ সেবন করিতে হইলে সুপণ্ডিত বৈজ্ঞানিক শরণাগত হওয়াই উচিত।”

নূতন ক্ষত—আরংজেব সোর।

“দিল্লীতে—শুধু দিল্লী কেন—জয়পুরেও দেখিয়াছি—লোকের শরীরে একরকম ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্ষতকে স্থানীয় অধিবাসীগণ “আরংজেব-সোর” বলেন। এই ক্ষত অতি ভয়ানক। ইহাতে পূর্ব-রক্ত বা শ্রাব বড় একটা থাকেন। টকটকে লাল বা—ভিতরে অগ্নিদাহের মত অত্যন্ত জ্বালা। বা একবার হইলে শুকাইতে চাহেনা, ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। আমি এই “আরংজেব সোরের” অনেক চিকিৎসা করিয়াছি। ডাক্তারি মতে নানারকম লোসন-মলম প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়াছি—কিন্তু কিছুতেই বা ভাল করিতে পারি নাই। অথচ আমি একজন প্রসার-প্রতিপত্তিবান্ ডাক্তার বলিয়া অনেক রোগীই এই ঘার চিকিৎসার জন্ত আমার কাছে আসিত। কলিকাতায় অবস্থানকালীন একদা বন্ধুবর ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম ডি ব সঙ্গে এই ক্ষতরোগের সম্বন্ধে আলোচনা করি। বন্ধুবর—চিরদিন “আয়ুর্বেদের” গোড়া। তিনি আমাকে একটা কবিরাজী মলম প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দেন। সেই মলমে আমি অনেকগুলি রোগীর “আরংজেব সোর” ভাল করিয়াছি। এই মলম লাগাইবা মাত্র ঘায়ের জ্বালা কমিয়া যায়, ৭।৮ দিনে বা শুকায়। মলমটা এই—

গব্য সূত—১ ছটাক,

মোম—১ ছটাক।

একত্রে যুহু অগ্নিতে মাটির পাত্রে গলাইতে হয়। উত্তম পদার্থ গুলিয়া সেল—পাত্রী হয়। তখন হইতে আমাইয়া গাইতে, নিম্নলিখিত দ্রব্যের শুদ্ধা দিয়া বড়িমা-চাউমা মিশাইয়া হয়।

অনন্ত মূল চূর্ণ—০/০।

গলতা চূর্ণ—০/০।

ডালকরমচার বীজ চূর্ণ—০/০।

নিসপাতা চূর্ণ—০/০।

নিসিন্দা পাতাচূর্ণ—০/০।

হাকরমানীয়া পাতা চূর্ণ—০/০।

ছোট গোয়ালের পাতা চূর্ণ—০/০।

পাকা আকন্দ পাতা চূর্ণ—০/০।

এই মলমে নালী ঘা, এবং সর্বপ্রকার দূষিত  
বা—সমস্তই ভাল হয়।

এই ঘা প্রথমে নাকি সন্নাট আরংজেবের  
অঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাই ইহার নাম  
“আরংজেবসোর।”

শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত এল, এম, এস।

## ইন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস।

—:—

বিগত আশ্বিন মাসে, আমার এক হিন্দু-  
স্ত্রী প্রতিবেশীর চক্ষুরোগ হইয়াছিল। আমি  
তাহাকে লইয়া বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক,  
বন্ধুবর—ডাক্তার যতীন্দ্র নাথ মৈত্রের শরণা-  
গত হইয়াছিলাম।

ডাক্তার মৈত্র সে দিন বড়ই বাস্ত। দুই  
শতেরও অধিক রোগী সেদিন তাঁহার  
আতুরাশ্রমে উপস্থিত। মুহূর্তের জন্ত এ  
অভাগা-আগন্তকের দিকে একটু স্বাগত দৃষ্টি  
নিষ্ক্ষেপ করিয়া, ডাক্তার মৈত্র তাঁহার এক  
ভৃত্যের দ্বারা এক বাস “সিগারেট” ও এক  
চিবা তাবুল পাঠাইয়া দিলেন; আমি  
বিজলী-চালিত-পাখায়—অঙ্গুরার অঞ্চল বাতাসে  
মিশ্র হইয়া—সেগুলির সদ্যবহার করিতে  
লাগিলাম।

“গুরুভক্তের” পার্শ্বদেশ হইতে মহাপ্রভুর  
জগন্নাথ দেখার মত—আমি কেবল ডাক্তারের  
দিকে চাহিয়াছিলাম। কক্ষবেষ্টনী পদ্ম-  
রাগ ঘণির মত, অসংখ্য রোগী ও রোগিনী

পরিবৃত হইয়া, আজ তাঁহাকে বড় সন্দেহ  
দেখাইতেছিল। মহাপ্রকৃতির মাঝে ভবিষ্য  
সৃষ্টির ক্রমবিকাশের চায়, :তাঁহার দুইজন  
সাহায্যকারী এক একটা রোগীকে—তাঁহার  
সম্মুখে উপস্থিত করিতেছিল। ডাক্তারের  
শাস্ত-সৌম্য-সুন্দর মুখখানি—অনন্ত চিন্তা-  
গামিতায়, কোৎস ঋষির কোষেরবাসের মত  
আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল। অসংখ্য রোগী  
পরীক্ষা করিতে করিতে, এমন পেশী-পুষ্টি  
কর্ম-কুশল হাত হু’খানি, যেন বিপুল অবসাদে  
অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ক্ষুদ্র দৃষ্টি বহু নর  
নারীর আত্মকাহিনী শুনিতে শুনিতে কক্ষ  
মধ্যস্থ পবনও বুধি ব্যাকুল হইয়া উঠি-  
ছিল! আমি ভারিতেছিলাম—সৃষ্টিরহস্ত  
উদঘাটনের জন্ত, ভগবান যেমন “একোহং  
বহুস্যামঃ” বলিয়া প্রকৃতির বকে বহুমুখি ধারণ  
করিয়াছিলেন; নব্বর মানব নরনের কুলী  
ড্রেদ করিতে ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ কেন এক  
হইয়া অনেক ইউন না। হার তখন ও আবহ

মনে হয় নাই—বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতার প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ আজ কর্মরূপী বহিস্ফুরণ !

আমাদের পাড়ায় একজন দশকক্ষাধিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। লক্ষ্মীপূজার দিন—যখন তাঁহাকে বহু যজ্ঞমানের যাজনা করিতে হইত, অতি সংক্ষেপে দেব-সেবা সারিবার জন্ত তিনি কম করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেন। এইরূপে এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি পঞ্চাশ ঘরের পূজা শেষ করিয়া ফেলিতেন। সেই পুরোহিতের কথা সহসা আমার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল। ডাক্তার মৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলিয়া ফেলিলাম—“পুরোহিতের হাতে যেদিন কাজ বেশী থাকে, সেদিন তিনি কম করিয়া মন্ত্র পড়িয়া থাকেন।” রহস্যভূষণাভাষায় ডাক্তার মৈত্র উত্তর দিলেন—“মন্ত্র কম বলিলে দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন কেন?” বুঝিলাম—রোগ পরীক্ষায় এমন অসীম ধৈর্য ও অপূর্ণ অধ্যবসায় না থাকিলে ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ এত বিরাট ও মহান হইতেন না।

ডাক্তারের পরীক্ষা গৃহে, সমাগত অসংখ্য রোগীর মধ্যে অনেকগুলি রমণীও ছিলেন। কেহ বৃদ্ধা, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ তরুণী, কেহ কিশোরী। আরও দেখিলাম—ওষ্টে ও গণ্ডে গোলাপের লালিমা মাখা দুই চারিটা বালিকা! হায়! ইহারা সকলেই চক্ষুরোগাক্রান্ত !! পরিচয় পাইলাম—ইহাদের মধ্যে অনেকে সহর বাসিনী, অনেকে সুদূর পল্লীগামের কুললক্ষ্মী।

এই সকল রোগীকে ডাক্তার মৈত্র অতি যত্নে ও অতি আগ্রহে পরীক্ষা করিলেন। মধ্যগগনম্পর্শী মার্ত্তণ্ডদেব ক্রমে পশ্চিম দিকে ঈষৎ ঢলিয়া পড়িলেন। আমাদের মধ্যে একটু বিশ্রান্তালাপ আরম্ভ হইল। এমন সময়

একটা ভদ্রলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটা স্নকুমার শিশু। একটার বয়স ৭ বৎসর, ২য়টি এখনও পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করে নাই। বালকদ্বয়ের পিতা বলিলেন—ছেলে দুটা রাত্রে কিছুই দেখিতে পায় না। ডাক্তার মৈত্র অর্দ্ধ ঘটিকা ব্যাপী পরীক্ষার পর, বালকদ্বয় সম্বন্ধে তদীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন—ইহারা উভয়েই রাতকানা। ইহাদের নেত্র মণ্ডলের কতকগুলি স্নায়ুবিভান শুকাইয়া গিয়াছে। চিকিৎসায় কোন ফল হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।”

এইবার আমার ধারণা হইল—মাছবের দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে !!

আমরা যখন “ছাত্রবৃত্তি”শ্রেণীর ছাত্র, তখন বাঙ্গালার প্রাচীনতম পুণ্যপ্রাঙ্গণ বিত্তা-সাগর মহাশয়ের “বেতালপঞ্চবিংশতি” আমাদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। পুস্তক খানি হিন্দী “বেতাল পঁচিশী” হইতে ভাষান্তরিত। এখন আর ইহা বিত্যালয়ে পঠিত হয় না। বই খানি এখন বোধ হয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে স্থান লাভ করিয়া প্রত্নতত্ত্বের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। ছুঃখের কথা নহে কি? এখনকার ছাত্রেরা বইখানি পড়ুন আর নাই পড়ুন—ইহার গল্পগুলি অনেকেই শুনিয়াছেন। এই সকল গল্পের মধ্যে “ভোজন বিলাসী” ও “শয্যা বিলাসী” গল্প সর্বজন বিদিত। ভূখণি এ স্থলে সেই গল্পটার ভাবার্থ আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি—

ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র। ছোট পুত্র “ভোজন বিলাসী”—অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ায় মগ্ন হইয়া থাকিলে, অন্য পুত্র “শয্যা বিলাসী”—অর্থাৎ শয়নে মগ্ন হইয়া থাকিলে, অসুস্থ হইয়া পড়িত।

সে তাহা ধরিতে পারিত। কনিষ্ঠ পুত্র—  
“শয্যা বিলাসী”। শয্যায় কোনও জলক্ষ্য বিষ  
ঘটিলে—তাহার আর নিদ্রা হইত না। উভয়  
ব্রাহ্মণ সম্ভানের এইরূপ বিশ্বয়জনক ক্ষমতার  
কথা শুনিয়া, সে দেশের রাজা—একদা দুই  
ব্রাতাকে পরীক্ষা করিবার মনস্থ করিলেন।  
উভয়ে রাজ-প্রসাদে নিমন্ত্রিত হইল।

“ভোজন বিলাসী”—তাহার জন্ত রাজা  
সর্বশ্রেষ্ঠ পাচককে নানাবিধ সুখাত্ত প্রস্তুত  
করিবার আদেশ দিলেন। “ভোজন-বিলাসী”  
বৎসরময়ে আহার স্থানে উপস্থিত হইল।  
পাচক সব্বত্র প্রস্তুত—চর্ব্ব, চুয়া, লেহ, পেয়—  
চতুর্বিধ পাণ্ড সন্তার ব্রাহ্মণের সম্মুখে সজ্জিত  
করিল। কিন্তু “ভোজন বিলাসী” আসনে  
উপবেশন করিয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল।  
অনন্যদেব-ভোগ্য ভোজ্য বস্তু আহার করিতে  
তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

ক্ষণকাল পরে রাজা আসিয়া “ভোজন  
বিলাসীকে” জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেমন,  
তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়াছ ত?” ব্রাহ্মণ  
বিবলবদনে উত্তর দিল—“না মহারাজ!  
আমার আহারই হয় নাই, তৃপ্তি ত দূরের  
কথা!” রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—  
“কেন, আহার হয় নাই কেন?” ভোজন  
বিলাসী বলিল—“মহারাজ সকল খাওয়ার শ্রেষ্ঠ  
খাত্ত অন্ন, আপনার পাচক যে অন্ন পাক করিয়াছে,  
সে অন্ন আমি শব্দাহের পুতিগন্ধ অমৃতব  
করিয়াছি। কাজেই আমার খাওয়া হয় নাই।”

ব্রাহ্মণকে উদ্ভাদ মনে করিয়া, রাজা  
প্রথমে হাসিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সবিশেষ  
অভ্যুসন্ধানে জানিতে পারিলেন—যে ততুলে  
অন্ন পাক করা হইয়াছিল, সে ততুল স্থান  
সম্বিত কোন ক্ষেত্র জাত খাত্ত হইতে উৎপন্ন।

বিশ্বয়-বিমুক্ত-নৃপতি তখন সেই “ভোজন বিলা-  
সীর” যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।  
পর্যাপ্ত পুরস্কারে প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণ স্বগৃহে  
প্রস্থান করিল।

এদিকে রাজ প্রসাদের এক মন্দির খচিত  
কক্ষে পুষ্পিত যৌবনা সুলভ বৃন্দের সেবা-নিপুণ-  
করণরিচালনায় “শয্যা-বিলাসীর” জন্ত দুগ্ধ  
ফেণনিভ সুকোমল শয্যা রচিত হইল। ব্রাহ্মণ  
সেই শয্যায় নিশা যাপনের অমুমতি পাইল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে রাজা সেই শয়ন  
কক্ষে উপস্থিত। দেখিলেন—“শয্যা বিলাসী”  
কক্ষতলে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার জাগরণ-  
রূপ নেত্র ও কেশপাণ্ডুর মুখের পানে স্থির  
দৃষ্টিতে চাহিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—  
“কেমন ব্রাহ্মণ! তোমার ভাল ঘুম হইয়াছে  
ত?” জড়িত কণ্ঠে “শয্যা বিলাসী উত্তর দিল—  
—“না মহারাজ! আমার আদৌ ঘুম হয় নাই।

আপনার এই শয্যার সপ্তম তলে একগাছা চুল  
আছে, সেই জন্ত এই শয্যায় শয়ন করিবার  
আমার পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে।  
সারারাত্রি আমি ঘুমাইতে পারি নাই।” শয্যা  
বিলাসীর কথায় রাজা চমকিত, বিত্রস্ত ও  
বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিস্করীগণ ছুটিয়া  
আসিল, একে একে শয্যাতল পরীক্ষা করিতে  
লাগিল। রাজা দেখিয়া অবাক হইলেন—  
সেই শিরীষপুষ্পপেলব অমল ধবল সুখ শয্যার  
ষ্টিক সপ্তম তলে—নারী শিরঃচূত একগাছি  
কেশ পড়িয়া রহিয়াছে। এই একগাছি কেশের  
জন্তই—অমন সুলভ সুখশয্যাও “শয্যা  
বিলাসীর” পক্ষে বিষকটকিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য “শয্যা বিলাসীর” স্বপিজিরের  
এইরূপ অপূর্ব্ব তীক্ষ্ণতার প্রমাণ পাইয়া, রাজা  
তাহার উপর অভ্যন্ত প্রীত হইলেন।

গল্পটীতে—একজনের স্বাণ শক্তি এবং অপরের স্পর্শশক্তির যেরূপ আতিশয্য বর্ণিত হইয়াছে, বিংশ শতাব্দির সভ্যযুগে তাহা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়—যখন এ গল্পটী আমাদের পড়াইয়া শুনাইয়াছিলেন, আমরা বালক হইলেও—আমাদের মনে হইয়াছিল—“শ্মশান-সন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধাতুর তণ্ডুলের অগ্নে” শবদেহের হুগন্ধ অনুভব করা, আর সাতখানা গদীর তলায় একগাছা ক্ষুদ্র চুল থাকায় সারারাত্রি ঘুম না হওয়া—দুই অসম্ভব! মানুষের গ্রাণেশ্রিয় ও ত্বগিশ্রিয়—এতদূর তীক্ষ্ণশক্তিসম্পন্ন হইতেই পারে না। আমাদের কথা ছাড়িয়া দিই,—কোন্ সুদূর অতীতের ধর্ম্মপুরের নরপাল, তিনিও তো প্রথমে একথা বিশ্বাস করেন নাই। তখনও তাঁহার মুখে হাসি আসিয়াছিল, এখনও আমাদের মুখেও হাসি আসে।

কিন্তু চিন্তার কথা এই—ধর্ম্মপুরের রাজা “ভোজন বিলাসী” ও “শয্যা-বিলাসী” কথা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই; শেষে যখন উভয় ভ্রাতার নির্দেশ, নানা অনুসন্ধানে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল,—তখন তো রাজা এ ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন! তবে আমরা ইহা বিশ্বাস করি না কেন? ইহার কারণ,—মানবেশ্রিয়ের এরূপ তীক্ষ্ণতার উদাহরণ আমাদের মধ্যে আমরা কখনও দেখি নাই। কাজেই গল্পের “ভোজন বিলাসী” ও “শয্যা-বিলাসীকে” আমাদের পাগল বলিয়াই মনে হয়।

ঠিক স্মরণ হয় না—বোধ হয় ১৩০৮ কি ১৩০৯ সালে, আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের কলিকাতার বাসায়, বঙ্কিম চন্দ্রের অন্ততম জ্যোতিষ স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একদিন বেড়াইতে

আসিয়াছিলেন। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বাবু “বেতালপঞ্চবিংশতির” কথা উত্থাপন করেন। “ভোজন বিলাসী” ও “শয্যা বিলাসী” কথায় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বলেন—“এ গল্পে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। যে যুগে “বেতাল পঁচিশী”র গল্প রচিত হইয়াছিল, সে যুগের মানুষের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা যে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। গল্পের কল্পনাকাণ্ডে, মানুষের প্রকৃত অবস্থার আভাস ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে। কল্পনা যতই উদাম উচ্ছ্বল হউক না কেন,—বাস্তব ঘটনাই তাহার ভিত্তি। আমাদের চেয়ে আমাদের পূর্ব পুরুষদের ইন্দ্রিয়ের যে তীক্ষ্ণতা অধিক ছিল, ইহা নিশ্চিত।

চন্দ্রনাথ বাবু, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের মত সমর্থন করিয়াছিলেন।

“বেতালে বহু রহস্য” নামক উপায়ে প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সভ্যতার প্রসাদেই হউক আর জল বায়ুর বিকৃতি বশেই হউক,—আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি যে ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া বাইতেছে—যুক্তিপূর্ণ কথায়, চন্দ্রনাথ বাবু উক্ত প্রবন্ধে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—অসভ্যাবস্থায় মানুষের কোন কোন ইন্দ্রিয়ের অসাধারণ তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্য এশিয়ার তাতারদিগের দর্শন শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাহারা বহুদূরস্থিত পদার্থ দেখিতে পায়। কতকগুলি জাতির ত্রাণেশ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এত অধিক, তাহারা ত্রাণেশ্রিয়ের দ্বারা যোজনান্তরস্থিত জলাশয়ের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে।—এমনকি উৎকল ব্যক্তি “বেতালে” বহু রহস্য খুঁজিয়া দেখিবেন।

বেতাল পঞ্চবিংশতির আদ্য একটা গল্প ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতার প্রমাণ।

বর্ণিত হইয়াছে । এক রাজার তিন মহিষী ছিল । রাজার নাম “ধর্মধ্বজ” । একদা বসন্তকালে তিন মহিষীকে লইয়া তিনি উপবন বিচাবে যাত্রা করিয়াছিলেন । সেখানে, যোষ্ঠা মহিষীকে রাজা একটা ফুটন্ত ফুল প্রেমোপহায্য দিয়াছিলেন, সেই ফুলটা করচ্যুত হইয়া বাতীর বামপদে পতিত হওয়ায় সে যেমন চরণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল । চন্দ্রের স্নানকালক্রমে দ্বিতীয়া মহিষীর গাত্রের স্থানে স্থানে অগ্নিদগ্ধের মত ফোকা উঠিয়াছিল । তৃতীয়া মহিষী গৃহ হইতে আগত উজ্জ্বলের দ্বারা শব্দ শুনিয়া কনিষ্ঠা রাজ্ঞী মুচ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন । এ ঘটনাও চন্দ্রনাথ বাবু অসিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই । স্নায়ুর অবস্থা বিশেষে একপ ধটিতে পারে । চন্দ্রনাথ বাবুর কোন এক—সেতারের স্নায়ুর বন্ধারে—শিরঃ প্রাচীর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইতেন । অঘোষ্যার মৃত নবাব ওয়াজেদআলিশাহ অপবাহু জল-যোগেব সময় ৪ খানি ছানার জিলিপি ও ৪টা ফাঁদের পান্ডুরা ভক্ষণ করিতেন । তদীয় আদেশানুসারে জিলিপি ভাজা হইয়া গেলে, সেই দ্রুত পরিবর্তন করিয়া আবার নূতন স্বতে পান্ডুরা ভাজা হইত । নবাবের এক নূতন কণ্ঠ্যাবী—স্বতের এইরূপ অনর্থক অপচয় নিবারণ করিবার জন্ত, জিলিপি ভাজার পর সেই দ্রুতই পান্ডুরা ভাজিবার হুকুম দেন । যে দিন এইরূপ করা হয়, সেদিন নবাব সাহেব একটা পান্ডুরার ক্রিয়দংশ মুখে দিয়াই দ্রুত-বশত তাহা খাইতে পারেন নাই । নাসিরের মহাবাজার মুখে শুনিয়াছি—তাহাদের পূর্ব পুরুষ রাজা আনন্দ নাথ রায়, প্রত্যহ তুলা খুনিয়া সেই তুলা নূতন খোলে পুরিয়া—তাহার উপর শয়ন করিতেন । বিষ্ণু কণ্ঠ্যপান্ডুরা,

একবার তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া, রাজা রাধাকান্ত দেবের ভবনে বাস করিতে হয় । তাঁহার দর্জি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল । প্রত্যহ নূতন করিয়া তুলা ধুনিয়া নূতন খোলে পুরিয়া গদী প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া, রাজা রাধাকান্ত দেব গোপনে দর্জিকে প্ররূপ করিতে নিষেধ করেন । কাজেই নাটোরেশ্বরকে সেদিন পূর্বদিনের প্রস্তুত গদীতে শয়ন করিতে হইয়াছিল । সমস্ত নিশি ঘোর অশান্তি ও অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে আনন্দনাথ তাঁহার দর্জিকে কণ্ঠ্যচ্যুত করিয়াছিলেন । শেষে রাধাকান্ত দেবের কাছে সকল রহস্য অবগত হইয়া দর্জির অপরাধ মার্জনা করিয়াছিলেন ।

বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্পে বর্ণিত ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ও কোমলতার কথা যখন আমাদের কাছে উপহাসযোগ্য হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে—আমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ও কোমলতা নিতান্তই হ্রাস হইয়া গিয়াছে । এই হ্রাসের পরিমাণ কিরূপ—তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে বড়ই কঠিন ব্যাপার । আমাদের নিজের ইন্দ্রিয়ের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি আমরা কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু পরের বেলা তাহা পারি না । আমাদের পূর্ব পুরুষের ইন্দ্রিয় শক্তি কতদূর প্রবল ছিল, তাহা আমরা জানি না । বেদে-পুরাণে কাব্য-দর্শনে সে শক্তির যে টুকু স্বপ্ন ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারি,—তাহাদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, শরীরের স্বাস্থ্য, মনের বল, মস্তিষ্কের প্রতিভা, জীবনের স্পন্দন,—আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল । এখন তাহার তুলনা করা চলে না । মহাত্মা চন্দ্রনাথ রায় বলিয়াছেন—“আমাদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, শরীরের স্বাস্থ্য, মনের বল, মস্তিষ্কের প্রতিভা, জীবনের স্পন্দন,—আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল । এখন তাহার তুলনা করা চলে না । মহাত্মা চন্দ্রনাথ রায় বলিয়াছেন—“আমাদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, শরীরের স্বাস্থ্য, মনের বল, মস্তিষ্কের প্রতিভা, জীবনের স্পন্দন,—আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল । এখন তাহার তুলনা করা চলে না ।

আমাদের [ বাঙ্গালী জাতির ] প্রকৃত বিপদ ও বিষম ভয় ভাবনার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।”

একথা পাকা বৈজ্ঞানিকের—পাকা বহু-দর্শীর কথা! বাস্তবিক আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তির দিন দিন অধঃপতন ঘটিতেছে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা যে কিরূপ দ্রুতবেগে নষ্ট হইয়া আসিতেছে আমি তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভাতার মৈত্রের বাটীতে আমি এত চক্ষুরোগগ্রস্ত নয়নারী এবং বালক বালিকা দেখিয়াছি, যে, সাহস করিয়া বলিতে পারি—পূর্বে এদেশে এত লোকের চক্ষুরোগ হইত না। প্রাচীনভারতে চন্দ্ৰমার প্রচলন ছিল না, সংস্কৃত ভাষায় চন্দ্ৰমার প্রতি-শব্দ পাওয়া যায় না। প্রবীন সাহিত্যিক দাদা দীননাথ ধরের মুখে শুনিয়াছি—তাঁহার বাল্য-কালে তিনি কদাচিৎ কোন বৃদ্ধকে চন্দ্ৰমা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন। একথা অশীতি বর্ষের পূর্বের কথা। আমাব বাল্য-কালে আমিও অধিক লোককে চন্দ্ৰমা ব্যবহার করিতে দেখি নাই। ব্রাহ্মধর্মের প্রথম প্রভাবের সময়—বিজ্ঞতা ও গাভার্যের ব্যঞ্জনাত্মক—অনেকে চন্দ্ৰমার আদর আরম্ভ করেন। কিন্তু এখন যেহাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে—যুবক যুবতী-দের চক্ষে কনক বেষ্টনে নানাবর্ণের কাচখণ্ড দেখিতে পাই, ইহা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিকার বা দৌর্বল্যের জন্মই। ৩০ বৎসর পূর্বে—বৃদ্ধ-দের চক্ষে চন্দ্ৰমা দেখিয়াছি,—যুবক-যুবতী বা বালক-বালিকারা আবার যে চন্দ্ৰমা পরিতে পারে—তখন ইহা কল্পনাও করি নাই। এখন দশ বছরের বালকেও চন্দ্ৰমা পরিয়া স্কুলে যাইতে দেখিতেছি। যে সকল ছাত্র অতাপি চন্দ্ৰমা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রমাণ

—১৩০৬ সালে মহীশূর প্রদেশের এক উচ্চ রাজকর্মচারী, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের অনু-মতি লইয়া এদেশে আসিয়া ‘হিন্দু’ ‘হেয়ার’ প্রভৃতি অনেকগুলি স্কুলের ছাত্রের নেত্র পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সে পরীক্ষায় প্রমাণিত হই-য়াছে—এদেশের ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৬৬ জন চক্ষু রোগগ্রস্ত! আমাদের দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের ইহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে কি?

এখন আমাদের মধ্যে কেহ দূরে দেখিতে পান না, কেহ নিকটে দেখিতে পান না, কেহ নিকটে-দূরে—কোথাও দেখিতে পান না।

একজন প্রবীন বৈজ্ঞানিক আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, “পূর্বে চিকিৎসককে সংযত হইয়া রোগীর আপাদ মস্তক ধীরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার দেহের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতে যত্নরূপ দেখিয়াছি, এখন আর প্রায় সেরূপ দেখি না। সে অন্তর্ভেদনা দৃষ্টি, বোধ হয় এখন কমিয়া গিয়াছে। যাত্রিক পরীক্ষার প্রচলনে চক্ষু: স্থূলতা প্রাপ্ত হইতেছে। আনার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্ম-তেছে যে, রোগ নির্ণয়ে ও রোগের চিকিৎসায় ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার যত বাড়ি-তেছে ইন্দ্রিয় সকল তত স্থূল, ও জ্ঞানকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে মানুষের মঙ্গল কি অমঙ্গল, যথার্থই ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।”

[ সাহিত্য সংহিতা তৃতীয় খণ্ড

১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ৬১৪ পৃঃ ]

বাস্তবিক—জগতে যত যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িতেছে, ততই মানুষের ইন্দ্রিয়ের শক্তি, তীক্ষ্ণতা কার্যকারিতা এবং অন্তর্দৃষ্টি কমিয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকের বিদ্যা-ভাজারের চেয়ে বৈদ্যগণ ভাল বক্তা নহী-



দেখিতে পারেন। এ বিশ্বাস অমূলক নহে। বৈদ্যশাস্ত্রে উদ্ভাপ মাপিবার মাপকাটি নাই। কাজেই বৈদ্যগণকে ভাল করিয়া “নাড়ী-জ্ঞানী” হইতে হয়। ডাক্তার ষ্টেথিস্কোপ বসাইয়া হৃদপিণ্ড ও ফুফুসের অবস্থা যেরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞ তাহা বুঝিতে পারেন। বৈজ্ঞমতে ভিন্ন ভিন্ন রোগে নাড়ীর গতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। নাড়ীর সর্পগতি, ডেকগতি, জলৌকা গতি, পারাবতগতি,—ডাক্তারগণ হয়ত বিগদাই করিবেন না। যন্ত্রের পরীক্ষায় ত এ সব জানা যায় না। দুঃখের বিষয় স্পর্শেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা কমিয়া বাওয়ায় আজকাল অনেক বৈজ্ঞই নাড়ী পরীক্ষায় কৃতৃত্ব হাবাইতেছেন।

আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা যে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে ইহা বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায় না। কর্ণের বহির্দেশ দেখিয়া, কে বধির কে কম শুনে, তাহা জানা যায় না। আমি কিন্তু কতকগুলি ধনী সন্তানকে ‘ইয়ার ট্রাম্পেট’ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। যুরোপে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন আছে। আমাদের দেশে উহার ব্যবহার এখনও বিরল হইলেও আমাদের শ্রবণ শক্তির যে স্বল্পতা ঘটিয়াছে—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আমাদের রসেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতাও নষ্ট হইতে বাসিয়াছে। অনেকেরই জিহ্বার অবস্থা ভাল নয়। কেহ কেহ অন্নব্যঞ্জনে অধিক লবণ ব্যবহার করেন, কেহ খর বাল না হইলে তরকারীর আশাদ পান না। একটু সামান্য অন্নবস লেহনে কাহারও জিহ্বায় জাড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যের প্রতিকূল জাতিয়াও

আমরা অধিক মসৃলা সংযোগে পাচিত বাজ্ঞ ভিন্ন কচি পূরক আহার করিতে পারি না। অনেক দ্বিজাতির গৃহেও এখন নিষিক্ত মাংস, পলাণ্ডু রস, সাদরে ব্যবহৃত হইতেছে।

আমার বেশ মনে পড়ে—বাল্যকালে লুচির নিমন্ত্রণে—লুচি ও চিনি ভিন্ন আর কিছু উপকরণ বড় একটা দেখিতে পাইতাম না। শূদ্রের বাটিতে ব্রাহ্মণ বা নবণাথ কেহই তরকারী থাইতেন না। সামান্য শর্করা সংযোগে—অনেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে লুচি উদরস্থ করিতেন। বড়লোকের বাড়ী হইলে, একটু দধির আয়োজন হইত, তাহাও ভোজনের শেষভাগে পাতে পড়িত। এখনকার ভোজে—লুচির সঙ্গে, শাক, ভাজা, তরকারী, ডাল, চাটনী প্রভৃতির আয়োজন করিতে হয়। ক্রমশঃ দেখিতেছি—চাটনীর সমাবেশ দ্রুততর বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন কর্ম্মকণ্ঠাকে নিমন্ত্রিতের জন্য নানাবিধ চাটনী প্রস্তুত করিতে হয়। জয়পুরাধিপতির ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীর সংসার চক্রে সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ ভোজে—আমি ১১ রকম চাটনী ও ৫ রকম সরবতের সমাবেশ দেখিয়াছি। মিষ্টানের ভিতরে এখন—খাজা, গজা, দরবেশ, জিল্পি, বঁদে, পাভুয়া, রসগোল্লা সন্দেশ প্রভৃতি শোভন সুন্দর বেশে স্থান লাভ করিয়াছে। অল্প দধি এখন আর ভাল লাগেনা, তাই তাহা শর্করা সংযোগে “চিনিপাতা দধিতে” দাঁড়াইয়াছে। শুধু ইহাই নহে—রসেন্দ্রিয়ের স্বাদশক্তির তীক্ষ্ণতার হ্রাস হওয়ায়—এখনকার ভোজে—পাপর, কচুরী, নিমকী, ডালমুট ভাজার সঙ্গে—নানাবিধ ফল মুলেরও আয়োজন স্থিরিত হইতেছে। এত উত্তেজিত—এক আয়োজন নহিলে মুহুর্তে মুহুর্তে ভোক্তার

মুখ বদলান হয় কি? আগেকার ভোক্তারা আহারে বসিয়া মুখ বদলাইবার আবশ্যকতা দেখিতেন না। আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি পূজার মহাষ্টমীর দিন তাঁহার পিতৃদেব রায় গঙ্গাচরণ সরকার—কতকগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে ছই চারিজনের বসনার শক্তি এতদূর তীক্ষ্ণ ছিল যে, তাঁহারা চল্লিশ টাকা মণের ও বিয়াল্লিশ টাকা মণের সন্দেশে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকিত, তাহাও ধরিতে পারিতেন। আমাদের জিহ্বায় আর পূর্বের মত আত্মাদান্ভব হয় না। আমাদের ক্ষুধা, পর্বপাক শক্তি দিন দিন কমিতেছে। আমাদের দেশে আর “একমুনে রবু” “আধমুনে কৈলাস” জন্ম গ্রহণ করে না। নবাসম্প্রদায় অধিক আহারকে অসম্ভার চিহ্ন বলেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র পূর্ণ আহারের পর—২৫টা গোলাপভোগ আম খাইতে পারিতেন। ভায়া অজয়চন্দ্র অক্ষয় চন্দ্রের পুত্র সে রসে বঞ্চিত। এখন নিমগ্ন খাইতে বসিয়া—আহার্যের উপকরণ কোনটা ছইতে হয়, কোনটা শু কিতে হয় কোনটা বা একটু মুখে দিতে হয়। অন্নরোগের তাড়নায়—মিষ্টান্নভক্ষণ এখন বিভীষিকাবৎ হইয়া উঠিয়াছে। বড়ভঃখই বঙ্গের বরণ্য ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় “সামাজিক প্রবন্ধে” লিখিয়াছিলেন—

“ভারতবাসীর খাদ্য-পরিমাণ নূন হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বে লোকে বত খাইতে পারিত এখন তত খাইতে পারেনা;—সকল লোকের এইরূপ বিশ্বাস। এখনকার ছই তিন পুরুষ পূর্বে যে সকল ভোজ্য দেশে হইত, যাহারা তাহার ছই। একটির হিসাব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে পূর্বে লোক-

খাওয়াইতে বত দ্রব্যের আহরণ করিতে হইত, এখন সেই পরিমাণ লোক-খাওয়াইতে তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয়না। প্রসিদ্ধ দেব-সেবা গুণির পূর্বকালের বেক্রপ ববান্দ ছিল, দেখিলেও অস্মিত হইতে পারে যে, এখন পূর্বের অপেক্ষা অল্পপরিমাণ দ্রব্যে অতিথিদিগের ভোজন নিরীহ হইয়া থাকে।”

২৫৪ পৃষ্ঠা।

আহারের অরতায় যে মানুষের শরীরত পেশী, অস্থি, শোণিতাদি উপাদানেব দিকৃতি ও অপকর্ষ ঘটিতেছে—ইহাতে সন্দেহ নাই। সারপদার্থের অপচয় ঘটিলে জীবনীশক্তিও কমিয়া যায়। হাঁকুয়ের অবনতিতে সমস্ত শরীরেরই অবনতি ব্যাঘ্য। আমাদের এখন ইন্দ্রিয়েরই অবনতি হইয়াছে, তখন যাপ্যই আমরা বিপন্ন। আমাদের পক্ষ কন্ডেন্সিয়েব, পক্ষ কন্ডেন্সিয়েব শক্তি দিন দিন ক্ষয় হইয়া পড়ায়,—ইন্দ্রিয়ের মনের শক্তিও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমাদের যুবদের মধ্যেও আব সে সাতস, স্তুতি, তেজঃ দেখিতে পাই না। এই ইন্দ্রিয়ের অবনতিতেই আমাদের এত দুর্দশ। আমাদের সাহিত্যে সৌন্দর্য্য নাই, সমাজে ঐক্য নাই, বাণিজ্যে উত্তম নাই,—আমরা জগতের কাছে করুণার পাত্র।

প্রাণের জ্বালায় আমি তো অনেক “হাবড় হাটা” বকিলাম, এক্ষণে আমাদের কর্তব্য কি? আমরা যে নৈহাটা হইতে ভাটিপাড়া পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে পারি। দশহাত দূরের বস্ত্র দেখিতে পাইনা, ছইমুঠা ভাত ও একহাটা ডাল খাইয়া পরিপাক করিতে পারি না,—এ অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—পূর্ণ জীবনীশক্তি লাভ। পূর্ণ

জীবনীশক্তি না পাইলে, পূর্ণ মনুষ্যর লাভ হয় নাই। তিনি যত সভা সমিতির, ক্রিকেট-মঠের খেলা, শিল্প প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা কর, দেশপ্রেমের ধরুরী হও মনে প্রাণে হিন্দু হইতে ন পড়িলে, তোমার মত বাঙ্গালীর আর চেন নাই। জীবনীশক্তি পুনর্লাভের জন্ত—তোমাকে “বাবুদের” শরণাগত হইতে হইবে। আশিষা ও অসঙ্গত হইলেও—“মৃত্যুর পরবংশতির” গল্পে একেবারে অগ্রসর করিও না। তোমার ইন্ডিয়ের শক্তি—নিম্ন নিম্ন হাঁস হইয়া পড়িতেছে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কক্ষক্ষেত্রে অবতরণ করিও। ঐ মন,—তোমাদের মতো একজন সর্বপ্রধান নীতি, পবিত্র বসনে দেশবাসীকে সন্তোষন দিয়া কি বসিতেছেন,—

“আমরা যে সাম্প্রতিক অবস্থার উপনীত হইয়াছি, তাহা নানা কারণে ঘটিয়াছে। আমরা আমাদের পক্ষে অজ্ঞান। তুমি আমরা আমাদের না করিয়া বিষয়ান করি। আমাদের মস্তিষ্ক প্রভৃতি আমাদের সমস্ত পুষ্টি কর জগৎ শোচনীয় অব্যব ঘটিয়াছে। আমরা পুষ্টি পট ভরিয়া থাইতে পাই না। উদ্ভিদাদি আমরা বিহ্বল, ব্যতিবাস্ত। উদ্ভিদাদি আমরা অভিভূত; আমাদের দেশের শ্রমিক দ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা স্ত্রীপুরুষ—মুটেমজুর—শিশু—সকলেই মজিয়া উঠিতেছি। গুলিয়াছি দেশী পান করিলে স্নায়ু দুর্বল হয়, বড় দেশী পান করিলে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইতে পারে। বচস্বে দেখিয়াছি অনেক চাপারীর

নিখিতে হাত কাঁপে, লেখা টেড়া বাঁকা হইয়া যায়। সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি অতি গুরুতর কার্যে আমরা শাস্ত্রের সমস্ত সূত্রানুযায়ী ভঙ্গ করিতেছি। এইরূপ নানাকারণ ঘটিতেছে। সেই সকল কারণ, যতদূর সম্ভব সন্নিবেশ করিতে হইবে। আমরা জীবন-মরণের সমস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অল্প সময় হাত দিলে, এ সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে না; আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হইতে পারে। ভরসার মধ্যে এই—আমরা বড় পবিত্র ঘরের সন্তান। আমাদের পিতৃপুরুষেরা বিশ্বনাথকে লইয়াই বিভোর হইয়া থাকিতেন। বিলাস-বৈভবে তাঁহাদের মনঃ ছিল না, পুণ্য ও পবিত্রতায় তাঁহারা পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইয়া ছিলেন। তাঁহারা এখন আবার পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইতেছেন। আজিকার ইউরোপ ও আমেরিকা, তাঁহাদের জ্ঞানালোক লাভ করিবার জন্ত লালিয়াত। ইহাতে বুঝিতে হয়, তাঁহাদের পুণ্যফল ফুরায় নাই। আমরা পতিত, কিন্তু তাঁহাদেরই পুত্র। পিতার পুণ্যফলে পুত্রের প্রথম ও অবিসংবাদী অধিকার। তাই মনে বড় আশা যে, বিশ্বনাথের নিকট ভক্তিভরে অবনত শিরে সর্কাস্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে তিনি সেই পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষ দিগের প্রতিষ্ঠিত পুরী রক্ষা করিবেন।”

বন্ধিমণ্ডলের ঋষির এই পবিত্র ঋক মন্ত্র—  
বাঙ্গালী ও বাঙ্গালীকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা  
করুক। উপসংহারে ইহাই আমার কামনা।

শ্রী ব্রজবল্লভ রায় কাব্যার্থী ।

## বিবিধ সংবাদ।

—:~:—

নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদ সভা।—আগামী জানুয়ারি মাসের শেষভাগে নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদ সভা দিল্লীতে হইবে স্থির হইয়াছে। সে সময় সেখানে এক প্রদর্শনীও বসিবে। প্রদর্শনীর জন্ত ঔষধাদি ও সম্মেলনের জন্ত প্রবন্ধাদি আগামী ২০শে জানুয়ারির মধ্যে পাঠাইবার সময় কর্তৃপক্ষগণ নির্ণয় করিয়াছেন।

বৈদ্যের পরলোক প্রাপ্তি।—আমরা শুনিয়া হৃৎখিত হইলাম—কলিকাতা প্রবাসী কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয় গত ১৮ই অগ্রহায়ণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার নিবাস ফরিদপুর-কোটালিপাড়ায়।

স্ত্রীজাতির মৃত্যু।—১৯১৭ সালের স্বাস্থ্য কমিটির মহাশয়ের রিপোর্টে প্রকাশ—কলিকাতা সহরে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৪০ জন অধিক। অস্ত্রপুর মহিলাদিগের অবরোধ প্রণয় এই মৃত্যুবৃদ্ধির কারণ বলিয়া স্বাস্থ্য কমিটির মহাশয় তাঁহার মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এ কথাই সমর্থন করিতে পারি না,—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অবরোধ প্রথা বরাবরই আছে কিন্তু আগেকার মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা বেশী মরিতেন না কেন? সহযোগী “সঞ্জীবনী” এ সম্বন্ধে বালাবিবাহের দোষ দিয়াছেন, আমরা তাহারও সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি। কারণ

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বালা বিবাহও আজ নতুন করিয়া প্রবর্তিত হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস,—আমরা এখন বিলাস জুয়াড়ে গা ঢালিয়া—দিয়া বাবুগিরির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজেরা তো অকর্মণ্য হইতেছি, সঙ্গে সঙ্গে পুরমহিলাদিগকেও শারীরিক শ্রমের হাত হইতে অব্যাহত রাখিয়া মূর্খিমতী বিলাসিনী করিয়া তুলিতেছি। ফলে সেই বিলাস-বাসনার আশ্বাদন পাইয়া আমাদের মত পুরমহিলারাও যে হিন্দুর ব্রহ্মচর্যা ভুলিয়াছে—পুরুষ অপেক্ষা রমণীজাতির মৃত্যুর অধিক্য তাহারই ফলসম্প্রদ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী।—ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রকোপটা কলিকাতায় কিছু কম পড়িয়াছে। এখন গড়ে প্রাত্যহিক মৃত্যু সংখ্যা ৫০ জনেরও কম। স্থানে স্থানে এখনো কিন্তু ইহার পূর্ণ প্রকোপ রহিয়াছে।

ছকপোকা নিবারণ কমিটি।—এই পোকার নিবারণ করে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। রাজসাহী সার্কেলের ডেপুটি সেনিটারি কমিশনার মহাশয় এই কমিটির পেশাদার অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতায় দুগ্ধসরবরাহ।—কলিকাতার অধিবাসীদিগকে খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্ত কলিকাতা কর্পোরেশন একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। ঐ কমিটিতে প্রস্তাব হইয়াছে—কলিকাতার অধিবাসীদিগকে বিত্তক দুগ্ধ সরবরাহ করিতে হইবে নিউ

নিম্নপাদিতক গোষ্ঠ স্থাপন করিতে হইবে ।  
কলিকাতা-মিউনিসিপ্যালিটি যদি এরূপ ব্যবস্থা  
করেন, তাহা হইলে সত্য সত্যই সহরবাসীর  
বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করা যায় ।

চিকিৎসকের পরলোক ।—  
গত ৪ঠা পৌষ বৈকালে বেলগেছিয়া মেডিকেল  
স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার আর, জি, কন্ন  
মহাশয়ের দেহান্তর ঘটিয়াছে । বেলগেছিয়ার  
মেডিকেল স্কুল স্থাপনে চিকিৎসা বিজ্ঞা শিক্ষার

যে সহজপন্থা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার  
জ্ঞাত ইনি ভারতে চিরস্মরণীয় থাকিবেন ।  
কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ প্রায় চারিশত চিকিৎসক  
ও ছাত্র শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত তাঁহার শবদেহের  
অনুগমন করিয়াছিলেন । আমরা এরূপ কৃতী  
বাস্কালী দেশহিতৈষীর মৃত্যুতে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব  
করিতেছি । ভগবান তাঁহার বিরোগবিধুর  
স্বজনের চিত্তে শান্তি দান করুন ।

বিগত ১৩ই পৌষ বেলা ১২ ঘটিকার সময় গোয়ালিয়ারের শ্রীশ্রীমহারাজ বাহাদুর  
“স্ট্রাঙ্গ আর্কর্সেদ বিদ্যালয়” পরিদর্শন করিয়াছেন । বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাসৌকর্য্যার্থ  
সংগৃহীত বিবিধ দ্রব্যসম্ভার, মহারাজা বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন । বিদ্যালয়ের  
কার্গনির্দাহক সমিতি মহারাজ বাহাদুরকে যে অভিনন্দন পত্র দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছিলেন  
নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

শ্রুতি বিবিধবিরুদ্ধাবলীবিবাজমানমানোন্নতমহারাজবর্ষ্য

শ্রীল-শ্রীযুক্ত-লেফ্টেনেন্ট জেনারেল্ হিজ্ হাইনেস্

মহারাজা সার মাধব রাও সিন্ধিয়া আলিজা বাহাদুর

জি-সি-এস্-আই, জি-সি-ভি-ও, জি-বি-ই, এ-ডি-সি,

ডি-সি-এল্, এল্-এল্-ডি মহোদয়ানাম্

নিখিলভারতীয়াফ্রাঙ্কায়ুর্বেদবিদ্যালয়ে স্বাগতপ্রশস্তিঃ ।

মহারাজ !

লোকে গজাপ্রসাদোদয়ইতি বিদিতঃ শক্তিমান্ শাস্ত্রমূর্তি

জ্ঞানজ্যোৎস্নাবিকাশক্ষপিত-জনমনোমোহ-গাঢ়াক্ষকারঃ ।

রাজেন্দ্রানন্দদায়ী প্রমথগণরতো ভূতিমানান্ততোষঃ

শব্দভবাং বিধভাং শরণগতস্বহৃদ বিশ্ববিদ্যালয়ায় ॥

এহেহি ভূগতিলকোজ্জলপুণ্যকীর্তি-

জ্যোৎস্নাবলীধবলিতাখিলভারতেন্দো !

বিদ্যালয়ে নিখিলভারতবৈষ্ণববিদ্যা-

সঞ্জীবনায় বিহিতে জয় জীব শব্দং ॥

মহারাজা জীজা জয়তি জননী তে জনকজা

পিতা জয়জীরাবোহভবদমিত্তেজা রঘুপতিঃ ।

তয়োঃ সাক্ষাদাত্মা ত্বমসি বরবীরঃ কুশমদঃ

কুপাপারাবারো ভূবি বিজয়সে ভারতমণে ! ॥

ত্বং সিন্ধিয়াকুলমহোদধিপূর্ণচন্দ্র-

ত্বং ভারতীয়বরভূষণগণাগ্রগণ্যঃ ।

ত্বঃ সর্বদাহভাদয়কুং কুপয়া প্রজানাং

ত্বং মাধবোভবসি মাধববাব-মূর্ত্যা ॥

ভূপাল স্বাগতং তে ভবতু বিজয়িনোদুগ্ধসানন্তমৌলি-

ব্রাহ্মদৈবদুর্গাহীরহ্যতিচয়বিলসংপাদপীঠামলাভেবু ।

রাজস্তী কল্লকোটাঃ সুরতরুজয়িনী ত্বংকুপাকল্পবল্লী

নবায়ুর্বেদবিজ্ঞাপুনরুদয়ফলায়োজ্জিহীতে সমস্তাং ॥

যাসীং কল্লতেব ভারতমহীসর্কার্যসিন্ধিপ্রদাং

যন্তাঃ সংশ্রয়ণাচ্চিকিৎসককুলং জাতং জগন্মণ্ডনম্ ।

সৌখ্যারোগ্যসুধাবিধানকুশলা যা সর্ববিজ্ঞাগ্রণী

গন্তা লব্ধজনির্কিরাজতি পরা ভৈষজ্য বিজ্ঞান্যতঃ ।

সাদ্যায়ুর্বেদবিজ্ঞাপচয়মুপগতা ভূমিপোৎসাহহীনী

দৌভার্গ্যাদম্মদীয়াং প্রতিদিশমপরৈর্ধিকৃতা তাকুলজৈঃ ।

ননং তদ্ভাগ্যসম্পৎ পুনরুদয়মিতা যন্নরেন্দ্রাগ্রায়িন্ !

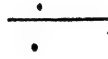
আয়ুর্বেদাস্তবিজ্ঞাজ্জনভবনমিদং ভূষয়মাগতোহসি ॥

প্রতীচ্যভৈষজ্যবিদ্যামবজ্জয়া ।

বিমানিতা ভারতবৈদ্যবিদ্যা ।

কুপাকটাক্ষৈস্তব চেদিয়ং স্ত্রা-

দুজ্জীবিতা তেন বয়ং কৃতার্থাঃ ॥



# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৩য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫—মাঘ ।

৫ম সংখ্যা

## কাজের কথা ।

—:~:—

চিত্তসংযম ।—চিত্তসংযমই যোগশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । ‘পাতঞ্জল-দর্শনের’ প্রথমেই নির্দিষ্ট হইয়াছে—‘যোগশ্চিন্ত্তবৃত্তি নিরোধঃ’ অর্থাৎ চিন্ত্তবৃত্তির নিরোধের নামই যোগ । এই চিন্ত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে শিখিলেই সকল বিষয়ে দমন করিবার যে শক্তি উপস্থিত হয়—এবং তাহার ফলে মানুষ যে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়—সকল শাস্ত্রের মূলতঃ উপদেশ ইহাই ।

\* \* \* \*

ব্রহ্মচর্য্য ।—ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে হইলে এই চিত্তসংযমের শিক্ষা করা সর্ব্বাশ্রেয়সকর । বাল্যে এ শিক্ষাটা অবশ্য আপনা হইতে আসে না; এজন্য সে কালে যে গুরুগৃহে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহারই ফলে এ ব্যবস্থা অতি সহজেই সম্পন্ন হইত । এখনকার ছাত্র মণ্ডলীর পক্ষে যেকোন বখেচ্ছাচারী হইবার ব্যবস্থা অপ্রতিহত, সেকালে তাহা হইবার উপায় ছিল না । সে কালের বালকমণ্ডলীর অভিভাবক-

গণ হাতেখড়ির পরই তাহার সকল শিক্ষার ভার গুরুর হাতে অর্পণ পূর্ব্বক বালকদিগকে গুরুবাসেই অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন । ছাত্র যত বড় অবস্থাপন্ন ঘরেরই হউক না কেন, গুরু তাহার প্রতি দৃকপাত না করিয়া, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে উন্নত হইতে পারে—তাহারই প্রয়াসে তাহাকে শ্রমশীল করিয়া তুলিতেন । সেই শ্রমশীলতাই তাহাকে ভবিষ্যৎ স্বর্ধের সকল সম্পদ দানে সমর্থ হইত । এখনকার আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল কিস্ত এখন গল্প বা উপকথায় পরিণত হইয়াছে ।

\* \* \* \*

সে কালের শিক্ষা ।—গুরুবাসে সেকালের শিক্ষার ব্যবস্থাটা বড় সহজ ছিল না,—ছাত্রগণকে কেবল অধ্যয়নে নিয়ত করিয়াই সে কালের গুরু বা অধ্যাপকগণ কর্তব্য পালন হইল বলিয়া মনে করিতেন না,—

গোপালন,—গোচারণ পর্য্যন্ত সেকালের ছাত্রদিগকে গুরুবাসে অবস্থিতির সময় করিতে হইত,—ভিক্ষালব্ধ অন্ন গুরুগৃহে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইত,—তাহার উপর সে ভিক্ষালব্ধ অন্নের যথেষ্ট ব্যবহার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহাদের থাকিত না, গুরু সেই অন্ন হইতে তাহাদিগের উদরপূর্তির জন্য যথোপযুক্ত অন্ন প্রদান করিতেন, তবে তাহারা আহাৰ করিতে পাইত। ফলে গুরুগৃহে অবস্থানের সময় এই সকল রীতির প্রবর্তনে চিন্তাসংঘের উপায় বাল্যকাল হইতে সহজেই হইয়া যাইত। এখনকার ছাত্রগণ এ সকল কথা ধারণায় আনিতে পারেন কি?

\* \* \* \*

দম, দয়া ও দান।—দম, দয়া ও দান—এই তিনটিই সর্বপ্রকাব স্থলান্তের উপায়। প্রত্যেক ইচ্ছাকে দমন করিতে পারিলে, সর্ব জীব দয়া করিতে শিখিলে এবং অবস্থা-মুদ্রপ দানে অভ্যস্ত হইলে তাহার তো আর কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় না। দান বলিলে যে কেবল অর্থদানই বুঝায়—একুপ নহে,—কায়িক ও মানসিক শক্তির বিনিময়েও অস্ত্রের শুভ ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহাও উৎকৃষ্ট দানের মধ্যে গণ্য। এখনকার দিনে অনেক ব্রাহ্মণের প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা হইয়াছে,—অর্থের মুখও ব্রাহ্মণজাতির ভিতর এখনকার দিনে অনেকে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু সেকালে ব্রাহ্মণেরা অর্থের মুখ বড় একটা দেখিতে পাইতেন না,—পর্ণকুটীরই সেকালের ব্রাহ্মণদিগের শীতবাস আতপের কষ্ট অপনয়ন করিত—কিন্তু এই দানের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণেরই মুখনিঃসৃত। ফলে সেকালের ব্রাহ্মণজাতি আশীর্ষচনে, অজ্ঞাত জাতিকে যে অমূল্য

সম্পদ দান করিতেন, তাহার নিকট ইন্দ্র ইন্দ্রও হারি মানিত। ফলে 'দম' 'দয়া' ও 'দানে' সে চিত্তশুদ্ধি হয়—শারীরিক স্বাস্থ্যান্তের ব্যবস্থা তাহার সহিত সুসংবদ্ধ। প্রত্যেক ইচ্ছাকে দমন করিতে পারিলেই জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়। জিতেন্দ্রিয় হওয়ার অতঃপন নামব্রহ্মচর্য্য পাশন এবং ব্রহ্মচর্য্যপালনে শিক্ষা করিলেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অল্প শিক্ষা প্রয়োজন করে না।

\* \* \* \*

বিন্দুরক্ষা।—শাস্ত্রকার বলিয়া প্রিয়হন—“মরণং বিন্দুগাতেনা” অর্থাৎ বীক্ষণই মরণের কারণ। ব্রহ্মচর্য্যপরাণ ব্যক্তি এই জন্য বীক্ষণরক্ষার প্রতি সর্বদা সজ্ঞ রাখিবে। সেকালে ইহারই জন্য পক্ষাধঃগতি বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে পুরুষজাতিব—স্ত্রীজাতিব সহিত মিলনের ব্যবস্থা ছিলনা। তাহার পূর্বপণিত বয়সেও যে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা হইত; তাহার মধ্যেও তথি-নক্ষত্র-পর্ব্বদিন—এ সকল বাহ্যিক ব্যবস্থা হইত। এখন সে পদ্ধতি একেবারেই উন্নিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর রোগপ্রবণতা তাহারই ফলসমূহ। কিন্তু দেশের আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে দেশ-বাসীর যেকোন রূচি বিপর্যয় ঘটয়াছে, তাহাতে আবার সে কালের বিধি-ব্যবস্থা বাঙ্গালা দেশে পুনঃ প্রবর্তিত হওয়াও কঠিন ব্যাপার।

\* \* \* \*

দেশরক্ষার উপায়।—দেশরক্ষার উপায় করিতে হইলে আগে দেশের বালকদিগকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালী বালকই—বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। সেই জন্য বালকরক্ষার চিন্তায়, সূত্রাগ্রে যেনো যোগ প্রদান প্রত্যেক অভিভাবকের করণীয় বিষয়। শুধু তাহা হইলেই বিদ্যাদিক্ষেপে প্রেরণ



করিয়া,—বাশি রাশি পাঠ্য পুস্তক কিনিয়া দিয়া  
—সন্দের অধিকাংশকাল সেই সকল পাঠ্য  
পুস্তকে তাহারা যাহাতে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে  
—তাহার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না—তাহাদের  
কম্ম কমল-দেহ যাহাতে অকালে কীটদংশ  
না হইয়া শরীর ক্ষয়ের কারণ না করিয়া তুলে  
—স্বরাগ্রে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে  
হইবে। আশা ইহার পূর্বে আরও একবার  
বলিয়াছিলাম—গণ্ডুলে ব্রণপ্রকাশ, গলাব  
হব বিকৃত হওয়া, চক্ষুপ্রান্তে কালিমা চিহ্ন  
প্রকাশ—পাণ পরিব্যাপ্তির প্রকট নিদর্শন।  
রক্ষকক্ষার চেষ্টা করিতে হইলে, প্রত্যেক  
অভিভাবকে ইহার প্রতি প্রথর দৃষ্টি রাখিতে  
হইবে,—বালকগণের নিকট যখনই ঐ সকল  
চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, তখনই তাহাদিগকে  
অধঃপতনের পথ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা  
করিতে হইবে। তাড়নায় অবশ্য ইহার  
প্রতীকণ হইবে না—তাড়নায় বরং কুফল  
দলিবারই অধিক সম্ভাবনা। বালকগণ কদর্য  
অভ্যাসে নিরত হইতেছে বুঝিতে পারিলে,  
অভিভাবকগণ তাহাদিগকে যদি নিজের সঙ্গে  
অধিকাংশ সময় রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন,  
তাহা হইলেই ইহার কতকটা প্রতীকারের  
আশা করা যায়, নতুবা ইহার উপায় বিধান  
একেবারেই অসম্ভব।

আর একটি উপায়।—যে সকল  
বালক বিশেষ উন্নয়নগামী হইয়া পড়িতেছে বুঝা  
গাইবে, তাহাদের রক্ষাক্ষে তাহাদিগকে বিবাহ  
বন্ধনে আবদ্ধ করাও কতকটা মন্দ ব্যবস্থা  
নহে। দীর্ঘকাল চিকিৎসা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া,  
পুরুষ এবং স্বপ্নবিকারগ্রস্ত বহুসংখ্যক  
হাত্ররোগীর আমরা চিকিৎসা করিয়াছি।

উল্লিখিত দুইটা রোগই অস্বাভাবিক উপায়ে  
শুক্লক্ষয়ের ফলসম্মত। আমাদের এ সম্বন্ধে  
যতটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এই  
অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয় হইতে বালক  
রক্ষার প্রধান উপায়ই বিবাহবন্ধনের ব্যবস্থা।  
বাল্যজীবনে শুক্রক্ষয় আদৌ ভাল নহে, কিন্তু  
উহা অস্বাভাবিক বা অনৈসর্গিক উপায়  
অপেক্ষা নৈসর্গিক উপায়ে অনেকটা ভাল।  
সেই জন্য যে সকল বালক একেবারেই অধঃ-  
পতনের চরমপন্থাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছে,  
তাহাদেব জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করিলে  
তাহারা কদর্য অভ্যাস হইতে প্রতি নিবৃত্ত  
হইতে পারে।

\* \* \* \*

#### অস্বাভাবিক শুক্রক্ষয়ের পরিণাম।

অস্বাভাবিক শুক্রক্ষয়ের পরিণাম বড় সহজ  
নহে—ধাতু এবং স্বপ্নবিকার ভিন্ন দারুণ  
অজীর্ণ রোগও ইহার ফলসম্মত। এই অভ্যাসে  
দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে, মস্তিষ্কের বিকার  
পর্যন্ত বাটয়া মানুষকে উন্মাদ করিয়াও তুলিতে  
পারে। তাহার পর, বিবাহ হইলেও ইহাদের  
বীৰ্য্য একরূপ তরল হইয়া যায় যে, তাহার  
ফলে অনেকেরই সন্তান উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট  
হওয়ায় পুত্রমুখ দেখিবার উপায় থাকে না।  
কখন বা একরূপ বীৰ্য্যে পুত্র উৎপাদনের ক্ষমতা  
জন্মিলেও যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে দুর্বল  
ও অস্বাস্থ্য হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের  
রোগপ্রবণতা এবং অকাল মৃত্যুর আধিক্যের  
ইহাও একটা প্রধান কারণ। প্রত্যেক  
অভিভাবক এ সকল কথা বিশেষভাবে গ্রহণ  
করুন এবং তাহার ফলে বালক রক্ষার জন্য  
সর্বতোভাবে যত্নশীল হউন—ইহাই আমাদের  
একান্ত অনুরোধ।

\* \* \* \*

## কলিকাতার ছাত্রাবাস।—

মফঃস্বলের অনেক অভিভাবকই কলিকাতার ছাত্রাবাস গুলিতে বালকদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা পূর্বক বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। আমাদের মনে হয়, এ ব্যবস্থাটাও সমীচীন নহে। নানা প্রকার বিলাস সত্ত্বেও স্মৃজিত কলিকাতা সহরে আত্মরক্ষা করা অনেক সময় জ্ঞানগর্ভ-পরিণত বয়স্ক পুরুষেরও পক্ষেও অসম্ভব হইয়া পড়ে—তা' চঞ্চলমতি বালকদিগের নিকট তো দূরের কথা। আমরা ছাত্রাবাসে অবস্থিত সকল বালকের কথা বলিতেছিলাম, কিন্তু অনেক বালকই যে এইরূপ অভিভাবক শূন্য অবস্থিতির ফলে নখেচ্ছারী ও বিপথগামী হইয়া থাকে, তাহা খাটাঁ সত্য কথা। অনেক ছাত্রাবাসেই দেখিতে পাওয়া যায়, তৈল মর্দনের ব্যবস্থা সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে, সাবান তাহাব স্থান পূর্ণ করিয়াছে—শুক ঘোঁদলের খোলা দিয়া তাহারা গাত্রমার্জন করিতে শিখিয়াছে, পরিচ্ছদ পারিপাট্যেও তাঁহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। ফলে এই বিলাসবাসনায় চিত্তপ্রবৃত্তি সহজেই সুপাশেষণের প্রয়াস পরায়ণ হয়। আমাদের মনে হয়, মফঃস্বল অপেক্ষা কলিকাতা প্রবাসী ছাত্র-মণ্ডলীর অধিক অধঃপতন এইরূপেই ঘটয়া থাকে।

\* \* \* \*

## নাটক, নবেল ও থিয়েটার।—

নাটক, নবেল পাঠ এবং থিয়েটার দেখার প্রবৃত্তিও এই বিলাসিতা হইতে জাগিয়া উঠে। সেবা নিপুণ 'আরেস'র স্মৃশ্যায় চরমস্থ উপলব্ধি করিয়া 'কুমার জগৎ সিংহ'র মত সেইরূপ রোগ

শয্যায় স্মৃশ্যা প্রাপ্তির জন্য কাহারও বাসনা জাগিয়া উঠে, কেহ 'কুন্দনন্দিনী'র মাতার আসন্নকালে 'নগেন্দ্রনাথের' মত সাহায্য নিবৃত্ত হইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন, কেহ 'গোবিন্দলালের' মত 'বাকুণী পুষ্করিণী' হইতে জলমগ্ন 'রোহিণীকে' উদ্ধার করিবার কল্পনা আনিয়া কুথার্থমনা হইয়া থাকেন, কেহবা কণ্টকে গঠিল বিবি মৃগাল অধমে, গুনিয়া 'হেমচন্দ্র' হইবার জন্য আকাজ্জা করিয়া থাকেন। 'প্রতাপ' হইবার সাপ অনেকেরই নাই, কিন্তু 'দেবেন্দ্রনাথের' মত 'হরিদাসী বৈষ্ণবী' হইবার শক্তি অনেকেরই আছে। ফলে নাটক-নবেল পাঠ বা থিয়েটার 'দেখায়' ছাত্রজীবন যে বাস্তবিকই কল্বিত হইয়া থাকে—ইহা স্মৃশ্যায়।

\* \* \* \*

## স্ত্রী-প্রসঙ্গ।—এক কথায় কোনোরূপ

স্ত্রী-প্রসঙ্গই ছাত্রজীবনে কঠব্য নহে। স্ত্রী-প্রসঙ্গের মত পাপের পথ প্রশস্ত করিবার ব্যবস্থা আর কিছুতেই নাই। এইজন্য নাটক-নবেল পাঠ বা থিয়েটার দেখার প্রবৃত্তি হইতে ছাত্রদিগকে রক্ষা করা একান্ত কঠব্য। অনেকে স্বধর্মভ্রষ্টও হইতেছে ইহারই ফলে। ছাত্রাবাসগুলি তুলিয়া দেওয়া হউক—এ কথা তো বলিলে চলিবে না—তবে ছাত্রাবাস গুলির কর্তৃপক্ষগণ যদি এ সম্বন্ধে কঠোর দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় ইহার অনেকটা প্রতীকার হইতে পারে। কিন্তু তাহার একটা উপায় করিবার জন্য আমাদের দেশের লোক মাথা ঝামাইবেন কি ?

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

## সমরজ্বর বা নবইনফুয়েঞ্জা ।

—:—:—

প্ৰাচ্য শ্রীভগবান বলিয়াছেন—“কালহয়ি লোকক্ষয়কং” আমিহি লোকক্ষয়কারী মহাকালা ।” যখন অস্তায় ও অবিচার, ব্যাভিচার ও অনাচার, হিংসা ও ঘেব সমাজের শিরোভূষণ হয়;—যখন, বিলাসিতা ও অলসতা, অথাস্ত ও কুখ্যস্ত মানবের শ্রেয় ও প্রেয় বস্ত্ত হয়, তখনই কালরূপী ভগবান মানবকে উদ্ভুদ্ধ কবিবার নিমিত্ত গর্ভিষ্ক ও মড়করূপে জনপদ ঙ্গস কবিত্ত থাকেন । পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলেই ইতা পষ্টপ্রতীয়মান হইবে ।

শরীর ও মন—আধার ও আধেয়;—উভয়েব সম্পর্ক অতীব নিকট, তাই একের কষ্টে অস্তের কষ্ট, একের পাপে ছ'য়ের শাস্তি—একের বোগে উভয়েরই রোগ ।

প্লেগ পলাইয়াছে, কলেরা হারি মানিয়াছে, ম্যালেরিয়া মানবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া যুত্ফাস্থা কমাইয়াছে । কিন্তু মানবের বিধিবিপি,—বিলাসিতা, অলসতা, অস্তায় ও অনিয়মের শাস্তি—মৃত্যু—তাই লোকক্ষয়কারী মহাকাল সমরজ্বর বা নব ইনফুয়েঞ্জারূপ মানবজাতির মধ্যে দেখা দিয়াছেন । এবাব মহাকালের পূর্ণাবতার—বসন্ত, কলেরা, প্লেগ ও ম্যালেরিয়ার ত্রায় একদেশব্যাপী জ্ঞাণবতার নহে,—সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন অবতার;—তাই এই সমরজ্বর বা নবইনফুয়েঞ্জারূপী মহামড়ক এক সময়ে পৃথিবীর সমগ্রদেশে, সমগ্রজাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশ

ও জাতিকে ধবংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে; বিংশ শতাব্দির ‘মহাকুরুক্ষেত্রে’ যাহা করিতে পারে নাই, বুকিবা সমরজ্বর বা নবইনফুয়েঞ্জা তাহাই সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন করিয়া দেয় ! আফরিকার বন্যজাতি হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সমূহের সুসভ্য জাতি অবধি—কেহই এই ভীষণব্যাদির করালকবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেননা । কত বৈজ্ঞানিক কত গবেষণা করিতেছেন, কত বড়বড় দেশের কত মহামহাননীযি এই ভীষণ মড়কের অবাধগতি প্রতিরোধ করিবার জন্ত কত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইহার অবাধ—অপ্রতিহতগতির প্রতিরোধ হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইতেছে । বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, আগামী বৎসরে এই রোগের মৃত্যুর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রভূত পণ্ডিত, কালনা মেডিক্যাল মিশনের প্রখ্যাত নামা চিকিৎসক স্নুহুধর ডাক্তার ভি, ই, গ্র্যাম্বেট ও রেভারেণ্ড ডাক্তার ই, মিউর, এম্, ডি, মহোদয় দ্বয়ের মুখে যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে ডাক্তারীমতে এই নব মড়কের বিশেষ কোন প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক ঔষধ অস্তাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই । তবে বিশেষ চেষ্টা, গবেষণা ও লেখালেখি চলিতেছে । Dr. Miur এখানকার হাসপাতালে ইনফুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া রোগীর কক্ষ হইতে

vaccine প্রস্তুত করিয়া Injection দিতেছেন।

তাহাতে তিনি আশা করেন, ভাল ফল হইতে পারে। বৈদেশিক জগতে এই নব রোগের চিকিৎসা লইয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে; নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে, বহু সাময়িক ও মাসিক পত্রিকা দিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে;—কিন্তু আমরা—সহস্র-বর্ষ-পূর্বের-স্বতসেবনগর্বী আমরা,—আমরা কি করিতেছি? ধনস্তরিশাঙ্গধরের বংশধর আমরা—চরক, সূত্রাত, অগ্নিবেশ, হারীতের-শিষ্য প্রশিষ্য আমরা;—আমরা কি করিতেছি? ঋষিযুগে, নবমড়ক—নবব্যাপির সৃষ্টি হইলে, হিমাচলের কেজুমূলে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের সভা হইয়া তাহার প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ঔষধ সকল আবিষ্কৃত হইয়া, জন সমাজের মঙ্গলের জন্ত প্রচারিত হইত। ঋষিযুগের আয়ুর্বেদ এখন শবে পরিণত হইয়াছে,—সেই গলিত শবের উপর বসিয়া আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইবে বলিয়া, হে নবযুগের কর্ম-সাধকগণ, তোমরা যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছ;—তোমরা কি করিতেছ?

কোন অতীতে স্বর্ণময়যুগে—কোন জ্ঞান ও গরিমায় প্রাদীপ্তমঙ্গলমধ্যাহ্নে ত্রিকালদর্শী মহামহর্ষি চরক দূর ভবিষ্যতে নব নব রোগ ও রোগসঙ্করের সৃষ্টি স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া, জ্ঞানগবেষণার স্বর্ণার্গল উন্মুক্ত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন;—

“নাস্তি রোগো বিনা দোষৈষ যথাং তন্না বিচক্ষণঃ।  
অমুক্তমপি দোষাণাং নিস্কৈব্যধিযুগাচরেং॥”

বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন ছাড়া দোষ নাই;—দোষ ছাড়া রোগ নাই, অতএব দোষ বা রোগ অমুক্ত (সঙ্কর, আগন্তুক বা নূতন) হইলেও, স্বধর্ম ও বৈধর্ম, দোষ ও দুষ্য বিচার ও গবেষণা করিয়া চিকিৎসা করিবে। কোন স্বদূর অতীতে অতিদূর ভবিষ্যতের কুফলিকা-বরণ ছিন্ন করিয়া নব নব রোগের চিকিৎসা প্রণালীর এত-জ্ঞান-গবেষণামূলকযুক্তি—এমন সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে এক আয়ুর্বেদ ছাড়া জগতের অন্য কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে কিনা জানিনা! এই যে নূতন নূতন রোগ সমূহের সৃষ্টি হইতেছে, ইহাতে কি মহামহর্ষি চরকের জ্ঞানগবেষণার স্কন্ধিত মানিয়া চিকিৎসা করিয়া দেখিতেছি কি? \*

“আয়ুর্বেদ” পত্রিকা বর্তমান বঙ্গীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর মুগ্ধপত্র; নব্য আয়ুর্বেদের প্রাণ, ভারতগৌরব বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাতত্ত্ববিদ চিকিৎসক মণ্ডলীদ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত। আমি আশা করিয়াছিলাম,—আমাদের নব জাগরণের মঙ্গল পাতি “আয়ুর্বেদে” এই নূতনরোগবিষয়ে অনেক স্রুতিস্তিত প্রবন্ধ ও চিকিৎসা প্রণালী দেখিতে পাইব, কিন্তু শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ সংখ্যা অবধি আমার আশা পূর্ণ হইল না। আমরা মফস্বলবাসী চিকিৎসক; আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অমার্জিত—পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অপরিমিত, তাই সহরের বাঁহারা চিকিৎসক, বাহ্য-দেয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অগাধ ও অপরিমেয়—

\* আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগের সকলেই যে ইনকুয়েস্টার সময় নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, তাহা লেখককে কে বলিল? অনেক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকই ইহার প্রতিকার কল্পে চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই সকল কথ্য সময় সময় কোনো কোনো সংবাদ পত্রের বাহির হইতেছে। আমাদের অগ্র্য আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের প্রত্যয় চিকিৎসালয় হইতে ‘চরক’ হইতে সংগ্রহ করিয়া “অয়ের চা” নামক এক প্রকার ঔষধ আবিষ্কার করা হইয়াছে এবং তাহার বহু সংখ্যক রোগীই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।—আমি সংগ্রহ

যাহাদের গোরবে আয়ুর্ষেদের গোরব, তাঁহাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ উপদেশ—বিশেষতঃ নূতন কোন রোগের অভ্যুত্থান হইলে তাহা আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়। বিন্দুর সমষ্টি সিদ্ধ; বিরাট আয়ুর্ষেদ সজ্জের তুলনায় যদিও আমরা বিন্দু, তথাপি আমাদের সমষ্টি না থাকিলে আয়ুর্ষেদ সজ্জের অস্তিত্ব বড় একটা থাকে না—আমরা সিদ্ধকাম না হইলে আয়ুর্ষেদের সম্মান থাকে না; সহরের ২৪ জন চিকিৎসক—বাক্তিত্ব হিসাবে যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, আয়ুর্ষেদের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে—আয়ুর্ষেদের লুপ্ত গোরবের দিন কিরাইয়া আনিতে হইলে, সমগ্র আয়ুর্ষেদ পল্লী চিকিৎসকগণকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লব্ধ উপদেশ দ্বারা পরিমার্জিত ও উন্নত করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে আয়ুর্ষেদের লুপ্ত গোরবের পুনরুদ্ধার অতি সহজ হইবে। সহরের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ষেদাচার্যগণ তাহাদের দরিদ্র পল্লী চিকিৎসক ভ্রাতাদের উন্নতি সাধনে কতদূর রূপাবান—তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আয়ুর্ষেদ পত্রিকার পৃষ্ঠা অব্ধেয়ণ করিলেই পাওয়া যাইবে !

যাহা হউক যাঁহারা শ্রেষ্ঠ—যাঁহারা নব-রোগ সম্বন্ধে উপযুক্ত আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসা-মূলক প্রবন্ধ লিখিবার অধিকারী, তাঁহারা যখন এ সম্বন্ধে কিছুই লিখিলেন না; তখন দুঃখভাগী আমি—আমার দরিদ্র ভ্রাতাদিগের অল্পবিধা স্বরণ করিয়া বিগত কয়েক মাসে “সমরজ্বর বা নবইনফুয়েঞ্জা চিকিৎসা” নামক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। তাহাই প্রবন্ধকারে সিপি বন্ধ করিতেছি। স্থলী পাঠক যদি আমার কোন ভ্রম বা বিচ্যুতি ঘটে, দেখাইয়া বাখিত করিবেন।

ইনফুয়েঞ্জার ইতিহাস।—ষোড়শ-

শতাব্দীতে প্রথম এই ব্যাধি লোকলোচন গোচরীভূত হয়, তৎপরে, ১৮৩০—৩৩, ১৮৩৬—৩৭, ১৮৪৭-৪৮, ১৮৮৯—৯০, এবং ১৯০৯ সালে এই পাঁচবার ইহার আক্রমণ ও সংক্রামকতা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৯ সালে যে আক্রমণ হইয়াছিল—তাহাতে আক্রমণের বেশ একটা বিধিবদ্ধ তালিকা দেখা যায়; ১৮৮৯ সালের মে মাসে বোখারাতে প্রথম আক্রমণ আরম্ভ হইয়া, সেপ্টেম্বর মাসে মস্কো, অক্টোবর মাসে সেণ্টাপিটার্সবার্গ (Petrograd) ও ককেস্‌স্‌, নভেম্বরের মধ্যভাগে বার্লিন, ডিসেম্বরের মধ্যভাগে লণ্ডন এবং শেষভাগে নিউইয়র্কে ইনফুয়েঞ্জার প্রকোপ প্রকাশ পায়; একবৎসরের মধ্যেই ইহা পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ সমাধা করে।

রোগের কারণ—পাশ্চাত্য মতে Pfeiffers bacillus এই রোগের বীজাণু। ইনফুয়েঞ্জা রোগীর মুখ ও নাসিকা নিঃসৃত স্লেষ্মায় ঐ বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মুখগহ্বর ও নাসারন্ধ্র দ্বারা রোগ-বীজাণু মানবশরীরে প্রবেশ করে। ইনফুয়েঞ্জা বীজাণু কেমন করিয়া কি থেকে জন্ম গ্রহণ করে এবং তাহার প্রকৃত কারণ কি; তাহার পুরা মিসামসা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে তাঁহারা এবং সাধারণ চিকিৎসকগণ—সকলেই অল্পমান করেন—অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগান, ডেজাল খাওয়া, সাধাতিরিক্ত পরিভ্রমণ করা, আহাৰ বিহারে ও পরিচ্ছদের অমিত আচরণ প্রভৃতি এই রোগ আক্রমণের প্রধান ও প্রথম কারণ।

## গতি বিস্তার ও পরিণতি ।—

সাধারণতঃ এক একটি স্থানে ইহার প্রকোপ বা অবস্থিতি কাল ৬ হইতে ৮ সপ্তাহ । বিশ হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন । বৃদ্ধ বয়সে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে রক্ষা পাইবার বিশেষ কোন আশা থাকে না । বাঁহারা স্নায়বিক দুর্বলতা, গলক্ষত, হাঁপানি, সর্দি, হৃদ্রোগ প্রভৃতি ব্যাধিপীড়িত । তাঁহাদের শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জা-বীজাণু অতি সহজে অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই প্রবেশ করিয়া স্থায়ী প্রভাব বিস্তারের অবসর ও সুযোগ পায় । বাটিতে একজন আক্রান্ত হইলেই বাটির অন্যান্য সকলেই আক্রান্ত হইতেছে দেখা যায় । প্লেগ, বসন্ত অপেক্ষাও ইহা সংক্রামক ও জনপদ ব্যাপক,—ইনফ্লুয়েঞ্জা-রোগী-সংস্পর্শে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে এ বিব সহজেই সংক্রামিত হইতে পারে । একবার এইরোগে আক্রান্ত হইলে পুনরায় এই রোগ আক্রমণের খুব বেশী সম্ভাবনা থাকে এবং এই রোগে পুনরাক্রান্ত হইলে প্রায়ই নিউমোনিয়া হইয়া মৃত্যু ঘটয়া থাকে । ১৮৮৯ সালে যে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ হইয়াছিল, তাহাতে জার্মান সৈন্যদের মধ্যে ৫৫২৬৩ জন আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ৬০ জনের মৃত্যু হয়, জার্মানের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে ২২৯৭২ জন আক্রান্ত হন, তন্মধ্যে ১৩৩ জনের মৃত্যু হয় ; অর্থাৎ সৈনিকদের মধ্যে হাজারকর ১টির কিছু বেশী এবং সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ১টির কিছু কম লোকের মৃত্যু হয় । পরন্তু এই যে মৃত্যু গুলি হইয়াছিল—তাহার অর্ধেকের উপর মৃত্যু ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া জনিত । ইনফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়া ভীষণ শারদ্রব্যাদি ; বিশেষতঃ

বর্তমান বর্ষে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়ার কোন প্রতিকারই হইতেছে না । ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথম যে আক্রমণ এবার দেখা গিয়াছিল, তাহাতে নিউমোনিয়া হইতে বড় দেখা যায় নাই বা নিউমোনিয়া হইলেও তাহার ২।১টি রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু অধুনা যাহা হইতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণের পরই তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে নিউমোনিয়া হইয়া পঞ্চম বা অষ্টম দিবসে মৃত্যু হইতেছে । শুনিতেছি স্থানীয় হাসপাতালে ১৫০টি ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিল, বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও তন্মধ্যে প্রায় সকল গুলিরই মৃত্যু হইয়াছে । এবারকার ইনফ্লুয়েঞ্জার গতি ও পরিণতির নির্দেশ বড়ই কঠিন । পূর্বের সর্দি জ্বরই ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রধান ও প্রথম লক্ষণ ছিল, এখন নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ ও বিভিন্ন পরিণতি দেখা যাইতেছে ;—কেহ উন্মাদ হইতেছে, কেহ প্রাণে মরিতেছে, অল্প সংখ্যক ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়ার আক্রান্ত ব্যক্তি অতি কষ্টে বাঁচিয়া উঠিতেছে । কাহারও বা ইনফ্লুয়েঞ্জার পরিণামে বক্ষা হইতেছে ।

## ‘ রোগের লক্ষণ ও নির্বাচন ।—

সাধারণতঃ নাসিকা হইতেই এই রোগের আক্রমণ আরম্ভ হয়, নাকে সর্দি দেখা যায়, মাথা ধরে, কুখামান্দ্য ঘটে, সর্দাদে—বিশেষতঃ কোমড়ে অত্যন্ত বেদনা হয়, চক্ষু অল্প লাল, জিহ্বা বেতবর্ণ ও চটচটে হয়, তিন বা চারি দিন প্রবল জ্বর থাকিয়া তৎপরে জ্বর ছাড়িয়া যায়, তবে দুর্বলতা অনেক দিন বাবৎ ভোগ করিতে হয়, কাহারও বা ইনফ্লুয়েঞ্জা আস্তে টের গিল (আলবার্ট) হয় ।

ভ্রূশনক উৎকাসী হয় বা কর্ণে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, ইহাই—ইনফুয়েঞ্জা জরের প্রধান লক্ষণ কিন্তু এবার অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, লক্ষণের কোন স্থিরতা দেখা যাইতেছে না । কাহারও প্রত্যহ ছাড়িয়া ছাড়িয়া জর আসিতে আসিতে তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে প্রবল গাত্রদাহ বা পিপাসা প্রকাশ পায়। নিউমোনিয়া বা টায়ফডের লক্ষণ দেখা দিতেছে,—কাহারও বা অসহ্য মাথাব্যথা, চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রবল জ্বর সত্ত্বে ভাব্য শব্দ, কোমড়, গলা ও বুকে ব্যথা—অথচ নারিকায় শ্লেষ্মা বা সর্দির লেশমাত্র নাই, সহসা ৩৫ দিনের দিন বুকে শ্লেষ্মা ও শ্বাস কষ্ট প্রকাশ পাইয়াই মৃত্যু হইতেছে । কেহ বা সামান্য সর্দি জরে আক্রান্ত হইয়াছে, কাজকর্ম করিতেছে বা গল্প করিতেছে—সহসা উন্মাদের স্থায় প্রলাপ বকিতে বা নৃত্য করিতে আবস্ত করিল । এই সকল দেখিয়া ণ্ণষ্টই প্রতীতি হয় যে, এই জ্বর নূতন ধরণের । পূর্বে বাহাকে ইনফুয়েঞ্জা বলিতাম—তাহা নহে । ইহা ইনফুয়েঞ্জা সম্পৃষ্ট নূতন প্রকারের রোগশঙ্কর ; —তাই ইহার নব ইনফুয়েঞ্জা নামকরণ করিলাম ।

নব ইনফুয়েঞ্জার সাধারণতঃ তিনটা শ্রেণী-বিভাগ চলে ;—ইহার প্রকোপ ও প্রাধান্য কেন্দ্র ও স্থানটা যথা ;—মস্তিষ্ক, ফুসফুস ও বৃহদন্ত্র । নব ইনফুয়েঞ্জা আক্রমণ করিলেই এই তিনটা স্থানের কিছু না কিছু ব্যতিক্রম হইবে । ইহা মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে বাতর্নৈমিক উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত হয় এবং দাক্ষিণ কোঠকাটিনা হয় তাহে থাকে ;—ফুসফুস আক্রান্ত হইলে নিউমোনিয়া প্রকাশ পায়, কফ আদৌ নিঃসৃত হয় না, নাস্তীর গতি যেতি মিনিটে ১০০—১১২ এবং শ্বাস ৩০—৪০

মাধ্যম—২

—৭২ হইয়া থাকে ; বৃহদন্ত্র আক্রান্ত হইলে বিহচিকা জ্বাতিসার বা টায়ফয়েডের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়, প্রচুর তরল দান্ত বা উদরস্থান, জরের অনিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধি, পেটজালা এবং দক্ষিণ তলপেট টিপিলে কঁকু কঁকু শব্দ ও নানারূপ উপদ্রব বৃদ্ধিতে পারা যায় ।

নব-ইনফুয়েঞ্জায় মস্তিষ্ক বা বৃহদন্ত্র আক্রান্ত হইলে, আয়ুর্কৌদীয় ঔষধে শীঘ্রই রোগী আরোগ্য কবিত্তে পাবা যায় ; কিন্তু ফুসফুস আক্রান্ত হইলে সকল প্রকার চিকিৎসাতেই খুব কম রোগীই রক্ষা পায় । এবার প্রায় শতাধিক ইনফুয়েঞ্জা-নিমোনিয়া রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই ১২ দিন চিকিৎসাধীনে থাকিয়াই জীবন্ত-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বা আসন্নকালে আসিয়াছিল, কেবল মাত্র আটটি ইনফুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া রোগীকে আমি চিকিৎসা করিবার সুযোগ ও অবসর পাইয়াছিলাম, তন্মধ্যে শ্রীভগবানের রূপায়—আয়ুর্কৌদেব মহিমায় তিনটির জীবনরক্ষা হইয়াছে ।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই “নব-ইনফুয়েঞ্জা” বাতর্নৈমিক প্রধান মধ্যাপিত সান্নিপাতিক লক্ষণাক্রান্ত জ্বর বলিয়া অনুমান হয়,—অন্ততঃ আমি তাহাই নির্বাচন করিয়া চিকিৎসা করিতেছি—এবং চিকিৎসার ফল অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসকদের তুলনায় যে মন্দ হইতেছে, তাহা আমার মনে হয় না, সাধারণতঃ অনুমান বরং কিছু ফল ভালই হইতেছে ।

চিকিৎসা ।—প্রথমাবস্থায় প্রবল জ্বর, মিনিটে নাড়ীগতি ১০৮—১১২, শ্বাস প্রায় ২৫—৩০ সর্বদা বেহুনা, মাথা ভার, কোঠকাটিনা থাকিলে প্রথমতঃ দশমূল কামে জ্বর

ছটাক এড়ুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া খাওয়াইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া, বাতগজাঙ্গুশ, স্বল্পলক্ষ্মী বিলাস ও বেতাল রস—আদার রস ও সৈন্দ্রব লবণ, পানেররস এবং আদার রস মধু অল্পপানে পর্যায়ক্রমে, তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য। অত্যন্ত দাহ এবং জল পিপাসা ও ঘর্ম্মনির্গম থাকিলে অন্ন প্রবাল ভঙ্গ মিশাইয়া যথেষ্ট পমিমাণে ইষড়্ঘ্র জল খাইতে দিলে, পিপাসা, দাহ ও ঘর্ম্মের শান্তি হয়। প্রথমাবস্থায় এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে এবং জর বন্ধ হইবার পর কিছুদিন নিয়মিত রূপে ১ রতি মকরধ্বজ এবং ১ রতি স্বল্পলক্ষ্মী বিলাস ও কর্পূর ১ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১ মাত্রা প্রত্যহ বৈকালে আদার রস ও মধুসহ সেবন করিলে এবং প্রাতে আদা ও মিছরি সিদ্ধ করিয়া তৎসহ অন্ন লেবুর রস মিশাইয়া চাঁএর ঠার গরম গরম পান করিলে পুনরাক্রমণের বা যে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ইনফুয়েঞ্জার পর উৎকাসিতে সোহাগার ষ্ঠে মধুসহ গলার ভিতর লাগাইলে বা চন্দ্রামৃত চুবিয়া খাইলে অন্ন সময়েই আরোগ্য হইয়া যায়। শৃঙ্গারাত্র আদা ও পান সহ চিবাইয়া খাইলেও বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। ইনফুয়েঞ্জা দ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে প্রত্যহ বা ১ দিন অন্তর দশমূল কাথ ও এড়ুতৈল দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার বিধেয় এবং নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস পানের রস মধুসহ, —চুতর্খু রস—ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধুসহ এবং সারস্বত চূর্ণ—উষ্ণ জল সহ সেবন এবং মহাদশমূল তৈল নস্ত্র ও শিরকরোটিতে মর্দন করিলে অচিরে রোগী আরোগ্য লাভ করে। ইনফুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়াতে কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি এবং ফুসফুসের ক্রিয়াকলাপের প্রতি সর্বাঙ্গে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে পুরোক্তরূপ এড়ুতৈল দ্বারা কোষ্ঠ

পরিষ্কার করাইয়া, মহালক্ষ্মীবিলাস রস, কস্তুরীভৈরব (বৃহৎ) ও শৃঙ্গাদিচূর্ণ—কর্পূরচূর্ণ, আদার রস ও মধু, রত্নাক্ষ ঘষা ও মধু এবং গরম জল অল্পপানে পর্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। শ্বাসকষ্ট এবং কফ আদৌ নিঃসৃত না হইলে অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর শৃঙ্গাদিচূর্ণ—বায়ুন হাটির উষ্ণ কাথ এবং ২ রতি সোহাগার ষ্ঠে অল্পপানে সেব্য। হাটফেলের সম্ভাবনা দেখিলে মকরধ্বজ ২ রতি, কর্পূর ২ রতি, যুগনাতি ১ রতি, ধুস্তরবীজচূর্ণ ১ রতি, মিশাইয়া লগ্না অবস্থা বিশেষ ২১৩ বার পানের রস বা তুলসী-পত্র রস সহ সেবন করাইলে বেশ ফল পাওয়া যায়। বক্ষস্থলে বেদনাদি নিবারণের জন্য মহাদশ-মূলতৈল বা মহাকনকতৈল মালিশে অসাধারণ ফল পাওয়া যায়। ইনফুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়াতে কর্পূর অসাধারণ ফলপ্রদ মহৌষধ; অনেক সুবিজ্ঞ এ্যালোপাথ চিকিৎসক ইহাতে কর্পূরের তৈল Hypodermic Injection দিয়া থাকেন। নিউমোনিয়া অবস্থায় কাসে বৃহৎশৃঙ্গারাত্র আদা ও পানসহ চিবাইয়া খাইলেও, কাসের শান্তি হয়। ইনফুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়াতে আমি যে ঔষধগুলি ব্যবস্থা করিলাম, ইহা যদি রোগের প্রারম্ভ হইতে উৎকৃষ্ট পথ্যের সহিত প্রযুক্ত হয় এবং চিকিৎসক ধীরভাবে ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, অনেক ইনফুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া রোগীর প্রাণ রক্ষা হয়। ইনফুয়েঞ্জা দ্বারা বৃহৎ আক্রান্ত হইলে যুথার রস অল্পপানে অমৃতারবরস, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর ও আনন্দভৈরব—যমানীভাজার গুঁড়া ও মধুসহ এবং সন্ন্যাসিযুথচূর্ণ, উষ্ণজল সহ ক্রিবেচনা পূর্বক নিয়মিত সেবন করাইতে পারিলে অচিরে রোগী আরোগ্য হইতে পারে।



পথাদি সম্বন্ধে অনেকে ইনফুয়েঞ্জা রোগে  
জ্বলীয় পথ্য দিতে নিষেধ করেন, তবে, ছদ্ম  
প্রচুর পরিমাণে দিতে বলেন, কিন্তু আমাদের  
মতে ছদ্ম আদৌ দেওয়া উচিত নহে, মুগ বা  
মসুরের মূগ, পানফল বা শঠীর পালো উৎকৃষ্ট  
পথ্য। ছদ্ম যদি একান্তই দিতে হয়—তাহা হইলে  
কুঁচ ও পিপুলের কন্ধসাধিত ছদ্ম দেওয়া  
কর্তব্য। ইনফুয়েঞ্জায় পথ্যে কোন নির্দিষ্ট  
নিয়ম নহে; চিকিৎসক রোগীর অবস্থান-  
মানে লবু ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করিবেন।

\* \* \*  
আয়ুর্বেদ অনন্ত ঔষধরত্নের আধার—  
অগাধ অভ্যাস-স্পর্শ-অমৃত সিদ্ধি, ভূত, বর্তমান ও  
ভবিষ্যৎ যে কোন প্রকারের ব্যাধি বা মড়ক

হইয়াছে—হইতেছে ও হইবে, তাহার সম্পূর্ণ-  
সর্ক্স-সম্পন্ন-চিকিৎসা এক আয়ুর্বেদেই  
আছে। প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া রক্ত  
চিনিয়া লইতে পারিলেই হইল। আয়ুর্বেদ  
আমাদের শুধু ব্যবসায় নহে—আয়ুর্বেদ  
আমাদের জন্মজন্মান্তরের সাধন—আমাদের  
জাতি ও ধর্মের গৌরব—আমাদের ইহকালের  
সর্ক্স ও পরকালের মোক্ষ, যদি আমাদের  
সামান্য ক্রটি-বিচ্যুতিতে সেই গৌরবের হ্রাস হয়,  
তাহা হইলে সেই মহাপাপের প্রারম্ভিত  
আমাদের সমস্ত জীবনেও হইবে না।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

( মল্লিক ) কবিরত্ন ।

## পঞ্চকর্ম ।

( পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর )

—:—

ক। ভালইতো। তা'তে আপনার চিকিৎসা  
কার্যে অতি বিজ্ঞতা বাড়বে বই কমবে না।

ডাঃ।—কিন্তু দীর্ঘকাল সময় লাগে যে।

ক।—আপনার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির  
বেশীদিন লাগবে না। তা' ছাড়া আমি  
সহায়তা করবো। আর একটু কষ্ট স্বীকার  
ক'রে পড়লে আপনার উপকার যথেষ্ট হবে।

ডাঃ।—আচ্ছা দেখি কি হয়। এখন  
আপনি বমন সম্বন্ধে সব কথা বলুন।

ক। বমনের চেষ্টা উপস্থিত হ'লে রোগী  
আপন হাতের ছটা আঙুল কিয়া উৎপলের  
মত কষ্ট বিবরে প্রবিষ্ট করিয়ে বমি করবে।

ডাঃ।—তা'র মানে কি ?

ক।—বমন বেগকে উত্তেজিত করা আর  
কি ! গলায় আঙুল দিয়ে বমি করার কথা  
শোনেননি কি ?

ডাঃ।—হাঁ ঠিক কথা। শুনিছি বৈকি।

ক।—বার বার বমনের বেগ ভাল নয়।  
মধ্যমরূপ বমন হলে প্রথমে ক'ক, পরে পিত্ত  
ও পরে বায়ু নিঃসারিত হয় এবং হৃদয়, পাখ  
মস্তক ও ইন্দ্রিয় বিত্তক এবং শরীর লঘু হয়।

ডাঃ।—আর অধিক বমন হ'লে কি হয় ?

ক। অধিক বমন হ'লে পিপাসা, বমি  
মূর্ছা বায়ুর প্রকোপ, নিদ্রা ও বলের হানি হয়।

ডাঃ।—এরূপ অবস্থায় কর্তব্য কি ?

ক। তা, হ'লে রোগীকে দ্রুত মাথাইয়া শীতল জলে অবগাহন করাতে হয়, আর চিনি মধু ও ছাতু জলে গুলে খাওয়াতে হয়।

ডাঃ। আর যদি বমন ভালরূপ না হয় ?

ক। 'বমন ভালরূপ না হোলে রোগীর কোষ্ঠ, কণ্ডু হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের অবিগুন্ধি এবং শরীরের শুষ্কতা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরূপ ঘটলে পুনরায় বমন করা'তে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা বমনের পর কিরূপে পথ্য দিবার নিয়ম ?

ক। সম্যক বমন হ'লে সেই দিন সন্ধ্যাকালে বা পবদিন প্রাতঃকালে সুখোষ্ণ জলে স্নান করিয়ে পুরাতন শালি তণ্ডুলের ঈষদুষ্ণ মণ্ড পান করা'তে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অন্নকালেও মণ্ড পথ্য। চতুর্থ ভোজনকালে ঐরূপ চাউলের বিলেদী—স্নেহ ও লবণ না দিয়ে অথবা অন্ন লবণ ও স্নেহ দিয়ে পান করা'তে হয় এবং গরম জল অল্পপান দিতে হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অন্নকালেও এইরূপ নিয়ম। সপ্তম অন্নকালে শালি তণ্ডুলের অন্ন অন্ন সৈন্ধব—স্নেহ ও সুগের ঘূষের সঙ্গে পথ্য দিতে হয়, গরম জল অল্পপান করাতে হয়। অষ্টম অন্ন ভোজন কালেও এইরূপ নিয়ম দশম একাদশ ও দ্বাদশ অন্নকালে লাব, গৌর তিত্তির প্রভৃতি কোন পক্ষীর মাংস রস উপযুক্ত স্নেহ ও লবণ সংযোগে অন্নের সঙ্গে ভোজন করা'তে হয় এবং উষ্ণ জল অল্পপান করা'তে হয়। এই রকম ভাবে সাত দিন থেকে —পরে স্বাভাবিক ভোজন করা নিয়ম।

ডাঃ। আর সব বুঝলাম, কিন্তু বারটা অন্নকালের কথা বলেন, তা'হলে ত সাতদিনের

বেশী হ'ল। আর অল্পপান মানে তো ওষুদেন সঙ্গে যা' থায়।

ক। অন্নকাল মানে—যে ব্যক্তি যে সময়ে খায়। তা'লোকেত একবার খায় না, প্রধানতঃ দু'বার খায়। কাজেই সাত দিনে চৌদ্দটা অন্নকাল পাওয়া যায়। আব আহ্বারের পরে বা ওষুধ খাবার পরে যাহা পান করা যায় —তাকে অল্পপান বলে। অল্প মানে পশ্চাতে—আর পান মানে পান করা। কিন্তু ওষুদের সঙ্গে যা'খাওয়া হয়, সেটাকেও অল্পপান কথা চলিত হয়ে গেছে।

ডাঃ। আচ্ছা সকল লোককেই কি বমন করান যেতে পারে ?

ক। কোন এক প্রকার ক্রিয়া সকল লোকের প্রতি প্রয়োগ করা যেতে পারে না। ক্ষতগ্রস্ত, ক্ষীণ ; অতি হুল, অতি ক্লশ, বালক, বৃদ্ধ, দুর্বল পরিশ্রান্ত, ক্ষুধিত, কর্ণভারবহন বা পথশ্রমে কাতর, উপবাসী, মৈথুন, অধ্যয়ন, ব্যায়াম ও চিন্তাকারী, ক্লশ, গর্ভবী, সুকুমার, মলবদ্ধ দ্বারা পীড়িত এবং উরুস্তম্ভ, অতিদার, গলরোগ উদররোগ, মুচ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ স্নেহ প্রয়োগের অযোগ্য। যে সকল স্ত্রী অকালে প্রসূত হয়, তাহারাও স্নেহ পানের অযোগ্য।

ডাঃ। স্নেহ পানের আর কি নিয়ম আছে বলুন ?

ক। বর্ষাকালে তৈল, শরৎকালে দ্রুত এবং বৈশাখ মাসে বসা ও মজা হিতকর। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির উষ্ণকালে, রক্তিতে এবং শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির শীতকালে স্নেহ রহিত দিববাতে স্নেহ পান করা উচিত।

ডাঃ। স্নেহের পরিমাণ কিরূপ ?

ক। অগ্নি প্রবল হইলে আট তোলা, মধ্যবান হইলে ছয় তোলা, আর হানবল হইলে চার তোলা মাত্রায় সেবন করিতে হয়।

ডাঃ। স্নেহ কি একদিন প্রয়োগ করিলেই হয় ?

ক। না। যুত্বকোষ্ট ব্যক্তিকে তিন দিন, মধ্যকোষ্ট ব্যক্তিকে চার দিন এবং ক্রুরকোষ্ট ব্যক্তিকে সাত দিন স্নেহ পান করাইলে শরীর শিথল হয়। ইহার পর আর পান করান উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে উহা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

ডাঃ। স্নেহ প্রয়োগ ঠিকমত হয়েছে কিনা—তা' জানবার উপায় কি ?

ক। বায়ুর অনুলোম ( অধোগমন ), অগ্নির দাপ্তি, মল শিথল ও অকঠিন হওয়া, স্নেহ পানে অনিচ্ছা এবং শরীরের শ্রানি—এই লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে যে, শরীর সম্যক শিথল হয়েছে। আর রক্ষতা ( স্নেহেব অন্ততা ) ঘটলে বায়ুর উর্দ্ধগতি হয়, অগ্নি মন্দ হয় এবং মল রক্ষ ও কঠিন হয়। আবার বেশী শিথল হলে শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা, তরল মলভেদ এবং নাক-মুখ দিয়া জন পড়া— উপসর্গ ঘটে।

ডাঃ। এ সকল ঘটলে কি করতে হয় ?

ক। স্নেহপ্রয়োগ ঠিক হ'লেত কথাই নেই। কম হ'লে তা'কে আবার স্নেহ পান করিতে হয়। আর বেশী হলে কান্দনী ধানের চাল, যবের ছাতু, তিল প্রভৃতি খাওয়াতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা আপনারা তো এত শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু পূর্বে আপনাদের তো এ রকম চালা ছিল না ?

ক। কিছুমাত্র না। আর্যবর্ষেদের স্রষ্টা যারা—তা'রা গাছের বাকল প'রতেন। তার

পর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যারা জীবের স্বাস্থ্যবিধান এবং প্রাণরক্ষারূপ মহাত্ম্যত অবলম্বন ক'রতেন, তাঁ'রা মোটা চামর-কাপড় আর চটা জুতো হ'লেই সন্তুষ্ট থাকিতেন।

এখনও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের যেমন দেখচেন—আগেকার কবিরাজেরা ঠিক সেই রকম একেবারে বিলাসিতা বর্জিত ছিলেন। তা' ছাড়া শাস্ত্রচর্চায় ও চিন্তায় তাঁ'রা এত নিমগ্ন থাকতেন যে, বিষয় বুদ্ধি তাঁদের কিছুমাত্র ছিল না। টাকা, মোহরের প্রভেদ জানতেন না।

ডাঃ। বলেন কি !

ক। বলি সত্য কথা। এই কিছু দিন পূর্বের ঘটনা শুনুন। 'দর্পনারায়ণ' ব'লে এক জন কবিরাজ ছিলেন, তিনি এক সময়ে মহিষাশুরের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার জন্ত আহৃত হ'ন। যা'বার সময় কবিরাজ মহাশয়ের স্ত্রী ব'লে দেন যে তিনি যেন হৃদয়ে টাকা চান। কবিরাজ মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, বিদায়ের সময় সময় তিনি রাজার নিকট হৃদয়ে টাকা চাহিলেন রাজাও দাওয়ানকে যথেষ্ট মোহর পুরস্কার দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু দাওয়ান দেখিলেন যে, কবিরাজ নিতান্ত বোকা। তিনি টাকায় হলুদ মাথাইয়া কবিরাজ মহাশয়কে দিলেন। রাজকীয় প্রহরী এবং কর্মচারী সঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং গৃহিণীকে টাকা-দিয়া মহা আনন্দে বলিলেন,— 'এই দেখ গৃহিণী, হলুদ টাকা এনেছি।' গৃহিণী দেখিয়া ভাবিলেন যে, উহা কখনই রাজার কার্য্য নহে। কোন চুষ্টবুদ্ধিকর্মচারী এরূপ করিয়াছে। তিনি সমাগত কর্মচারী ও প্রহরীদেরকে রাজার নিকটে একত্থানি পঠাইয়া যাইতে, অনুরোধ করিলেন। কিন্তু

তাহারা—ইহা উদ্ধতন কর্মচারীর কার্য এবং রাজার নিকট পত্র লইয়া গেলে তাহাদের চাকরী থাকিবে না—এইরূপ ভাবিয়া পত্র লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। কেবল একজন পালকীরেহারা কবিরাজ মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বলিল, আমি খাটিয়া খাই, চাকরী যায়—অন্ততঃ চাকরী কবিব আমি পত্র লইয়া যাইব। যাহা হউক তাহারই হস্তে পত্র দেওয়া হইল। পত্রে লেখা ছিল যে, মহারাজ, এরূপ লোককে আপনার ঠকান ভাল হয় নাই। রাজা পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই চুই কর্মচারীকে পদচ্যুত করিলেন এবং যথেষ্ট মোহর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন।

ডাঃ। একি গল্প না সত্য কবিরাজ মহাশয় ?  
ক। এখন গল্প বলিই মনে হয়, কিন্তু সত্য সে কালের কবিরাজদের বিষয়বুদ্ধি মোটেই ছিলনা। টাকা সম্বন্ধে আর একটা ঘটনার কথা বলি শুনুন। একবার জনৈক কবিরাজ কৃষ্ণনগরের রাজ-বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আহৃত হন। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, রাজা কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি চান? কবিরাজ মহাশয় পূর্বে হাতী দেখেন নাই। এখানে হাতী দেখিয়া খুব আনন্দ হইয়া ছিল, তিনি রাজাকে একটা হাতী দেখাইয়া বলিলেন—আমি এইটে নেব। রাজা—হাতী পুরস্কার দিয়া কবিরাজ মহাশয়কে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কবিরাজ-গৃহিণী ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি এনেছ? কবিরাজ সানন্দে হাতী দেখাইয়া বলিলেন, আমি এইটে চেয়ে এনেছি। তখন গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, আঃ আমার কপাল! কবিরাজ মহাশয় বিন্মিত

হইয়া বলিলেন—কেন, কি হল? কবিরাজ-গৃহিণী বলিলেন, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। এই বলিয়া প্রচুর ধান ও চাউল হাতীকে খাইতে দিলেন। গজরাজও মহা আনন্দে সেই ধান ও চাউলের স্তূপ উদরসাৎ করিল। গজ-রাজের আহার দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় অবাক। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে পত্র লিখিলেন যে, আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছেন। আমাকে একটা রাক্ষস দিয়াছেন। রাজা কবিরাজ মহাশয়ের শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং বিষয়-বুদ্ধির হীনতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া হস্তীর পরিবর্তে প্রচুর অর্থ দিয়া পাঠাইলেন।

ডাঃ। বাস্তবিক সেকালের কবিরাজগণ বিষয়বুদ্ধি হীনই ছিলেন বটে! যাক সে কথা, বমন করার পর কি রকম নিয়ম পালন করতে হয়, সে কথা বলুন।

ক। বমন করার পর উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, অধিক ভোজন, নিশ্চিন্ত হইয়া উপবেশন, অত্যন্ত ভ্রমণ, ক্রোধ, শোক, হিম, রোদ্র, শিশির, অতিরিক্ত বায়ুসেবন, অতিবিক্ত বানারোহণ, স্ত্রীসহবাস, রাজজাগরণ, দিবা নিদ্রা, বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ, অহিতকর দ্রব্য ভোজন, অকালে ভোজন বিষমভোজন, মলমূত্রের বেগধারণ বা বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্বক বেগদান প্রকৃতি পরিত্যাগ করা উচিত। ইহা ভিন্ন বমন করার পর রোগীর হস্ত, পদ, মুখ ষোড়শ করাইয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিবে এবং বৈদিক দোষ প্রশমক কোন প্রকার ধূপ পান করাইয়া পুনরায় হস্ত পদাদি ষোড়শ করাইবে এবং বায়ু প্রকাশ করিবে।

ডাঃ। ধূমপান বৃষ্টি, তামাক, সিগারেট, বিড়ি ?

ক। না, এ ধূমপান তামাক, সিগারেট, বিড়ি নয়। পঞ্চকর্ম বলার সঙ্গে সঙ্গে পরে ধূমপানের কথা বলতে হবে।

ডাঃ। আচ্ছা স্নেহ পানের পর কি রকম নিয়মে থাকা উচিত সে কথাত বললেননা।

ক। উষ্ণ জলে স্নান, পান ও শৌচাদি কাঁচা করিতে হয়। দিবানিদ্রা, মৈথুন, মল-মূত্র, উদগার ও অধোবায়ুর বেগ ধারণ ; ব্যায়াম, উচ্চঃস্বরে কথা কহা, ক্রোধ, শোক, হিম ও আতপ সেবন পরিত্যাগ করা উচিত এবং বায়ু প্রবাহ হীন স্থানে থাকা কর্তব্য।

ডাঃ। আচ্ছা বমনত হ'ল—পঞ্চকর্মের প্রথম কর্ম। তার পর কি ক'রতে হ'বে বলুন।

ক। বমনের পর বিরচন প্রয়োগ ক'রতে হয়। বমন করার পর পুনরায় রোগীকে পূর্ববৎ নিয়মে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রতে হবে। তার পর বিরচক ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে হয়। ঔষধের সঙ্গে যা খাওয়া হয়, সেটাকেও অম্লপান কথিত হয়ে থাকে ?

ডাঃ। তাতো হ'ল কিন্তু যে রকম বলেন তাতে ত কাউকে বমন করানই চলেনা দেখছি।

ক। কেন চলবে না ? এতেই কি সব শেষ হ'ল ? পানিস, কুষ্ঠ, নবজ্বর, রাজ্যক্ষা, কাস ; শ্বাশ, গলগ্রহ ( গলা নাড়িতে না পারা ), গলগণ্ড, মেহ, অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ ; বিসৃচিকা, অলসক ( বিসৃচিকা জেদ ) অধোগ বজপিত্ত ; মুখ দিয়া স্নেহা উঠা, অর্শঃ, পা বমি বমি করা, অরুচি, অপরিপাক, মগচী, অপমার, উন্মাদ, ক্ষতিসার, শোথ পাণ্ডুরোগ, মুখে কত হওয়া, হইল, অসিত

রোগ, শ্লেষ্মজনিতিরোগ, বিষপান, বিষধর সর্প কর্তৃক দংশন প্রভৃতি রোগে বমন করান হিতকর। শাস্ত্রে বলে যে ক্ষেতের আলি ভাঙ্গা গেলে যেমন ধান্যাদি শুষ্ক ও নষ্ট হয়, বমন দ্বারাই এই সকল রোগও সেইরূপ নষ্ট হইয়া থাকে।

ডাঃ। আচ্ছা বমনের পর স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করার কথা যা, বলছিলেন, সেটা আবার কি ?

ক। পঞ্চকর্ম দ্বারা শরীর শোধিত হয়, শোধিত অর্থে দোষ রহিত, আমরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, জ্ঞানে অজ্ঞানে শরীরের অনিষ্টকর অনেক রূপ ক্রিয়া করি, ফলে শরীরের নানা স্থানে দোষ সঞ্চিত হয়ে থাকে। সেই দোষ বা অনিষ্টকর পদার্থকে শরীর হ'তে নিঃসৃত করাই শোধন। এখন দেখুন শরীর থেকে দোষ নিঃসৃত করার পথ প্রধানতঃ দুইটী—মুখ এবং মলদ্বার। আমাশয়ে যে দোষ সঞ্চিত হয়, সে সমস্ত বমন দ্বারা মুখ দিয়া নির্গত হ'য়ে যায়, আর পক্কাসয়ে যে সমস্ত দোষ সঞ্চিত হয়, সে সমস্ত বিরচন দ্বারা মলদ্বার দিয়া নির্গত হ'য়ে যায়।

ডাঃ। আচ্ছা তা, যদি হয়, তবে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের স্বার্থকথা কি ?

ক। বলছি সে কথা। ছেলেবেলা কখন আম চুরি করে বেয়েছেন কি ?

ডাঃ। চুরি ক'রে খাওয়া জানি না ! তবে আম দেয়েছি আর চুবিকাঠার মত চুবেছি।

ক। তাতো চুবেছেন, কিন্তু তাতে কি চুরি ক'রে খাওয়া হয়নি ? শুধু বলছি, আমের পেছন দিকে অর্থাৎ বোটার বিপরীত দিকে একটা ফুটো করতে হয়, আর সেইখানে মুখ দিয়ে চুবে চুবে খেতে হয়। তাই

ডাঃ। তাতে কি হল ?

ক। হ'ল এই যে—সেখানে কেবল মুখ দিয়ে চুষলেই আমের রস টুকু পাওয়া যায় না। চোষবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আমটা টিপে টিপে সেই ছিদ্রের দিকে আমের রস সঞ্চালন ক'র নিয়ে খেতে হয়। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ঠিক সেই টেপার কাজ করে। দোষ কেবল আমাশয়ে ও পক্ষাশয়ে থাকেনা—তার নিকটবর্তী অনেক স্থানেও থাকে। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের ফলে সেই সমস্ত দোষ আমাশয়ে ও পক্ষাশয়ে এসে জন্মে এবং তখন বমন বা বিরেচন প্রয়োগ ক'রলে অতি সহজেই বা'র হ'য়ে যায়।

ডাঃ। তা'ত হল, কিন্তু ছ'বার করে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করা কেন ?

ক। এত সোজা কথা। প্রথমবার স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ ক'রলে দোষ সকল আমাশয়ে এসে সঞ্চিত হয়। আর বমন দ্বারা সেই সকল দোষ নির্গত হ'য়ে যায় ব'লে শরীরের উর্দ্ধভাগ বিগুহ্ন হয়। তা'র পরে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ ক'রলে দোষ সকল পক্ষাশয়ে এসে জন্মে, আর বিরেচন দ্বারা সেই দোষ নির্গত ক'রলে অধঃশরীর বিগুহ্ন হয়।

ডাঃ। সঙ্গত কথা বটে। এখন বিরেচনের বিষয় বলুন।

ক। পূর্বেই ব'লেছি যে, বিরেচন নানা প্রকার আছে। সংক্ষেপে তা'দের প্রয়োগের ক্ষেত্র ব'লেছি। জ্বর, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত ও উদাবর্তরোগে এবং বালক, বৃদ্ধ ; ক্ষতরোগ প্রভৃ, ক্রীণ ও শূকুমার ব্যক্তিরোগের পক্ষে সৌদাল ; পাণ্ডুরোগ, উদর, গুণ্ড, কুষ্ঠ, দুর্ঘাভবিষ, শোথ, মধুমেহ, উন্মাদ, অপম্মার প্রভৃতি রোগে মনসাসীজের আটা, গুণ্ড, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ,

শোথ, উদর এবং স্লেষ্মপ্রধান রোগে এবং পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগে দত্তী দ্বারা বিবেচন হিতকর। এতদ্বিন্ন তেউট্টা, লোধ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিরেচনের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ডাঃ। এখন বিরেচন প্রয়োগের নিয়ম বলুন ?

ক। পূর্বেই ব'লেছি যে বমনের পর পুনরায় স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রে বিরেচন করা'তে হয়। বালক, বৃদ্ধ, পরিশ্রান্ত ভীত নবজরী, মন্দাগ্নিবৃদ্ধ ব্যক্তি, অধোগরক্তপিত্ত রোগী, মলদ্বারে ক্ষতযুক্ত ব্যক্তি অতিমার রোগী, বাহ্যদেহ শরীরে শলা বিদ্ধ আছে এরূপ ব্যক্তি, ক্রুরকোষ্ঠ ব্যক্তি গভিনী তৃষ্ণার্ত এবং অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

ডাঃ। তবে কিরূপ ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ করা যায় ?

ক। কুষ্ঠ, জ্বর, মেহ, উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, ভগন্দর, উদর, অর্শ, ব্রণ, প্লীহা, গুণ্ড, অর্কুদ, বিহৃচিকা, অলসক, মূত্রাবাত, ক্রিমিকোষ্ঠ, বিসর্প, পাণ্ডুরোগ, শিরঃশূলঃ, পার্শ্বশূল, উদাবর্ত, নেত্রদাহ, মুখদাহ, হৃদ্রোগ, নেত্ররোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, কর্ণরোগ, মনদ্বারের পাক, লিঙ্গের পাক, হলীমক (পাণ্ডুরোগ বিশেষ) ঝাশ, কাস, কামলা, অপটী, অপম্মার উন্মাদ, বাতরক্ত, ঘোনিদোষ, গুহ্ন দোষ এবং পিত্তজ রোগে বিরেচন হিতকর।

ডাঃ। আচ্ছা যে রোগ বমনের অযোগ্য— তাহাকে কি বিরেচন করান যায় ?

ক। পক্ষাশয়ের উপধারিত স্নেহ এই যে, প্রথমে স্নেহ, পরে স্বেদ, পরে বমন প্রয়োগ করে তবে বিরেচন করিয়া ব'লে হয়।

গ্রন্থী দোষ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু সাধাবণ সূত্র একপেই হ'লেও ভিন্ন ভিন্ন রোগের চিকিৎসায় কখন বমন, কখন বিরচন, কখন উত্তরই প্রয়োগ করতে হয়, আবার হৃর্ল রোগীকে ঠ'য়েব কোনই প্রয়োগ করা উচিত নয়। উৎপত্তিপক্ষে বমন নিষেধ, কিন্তু বিরচন প্রয়োগ করা যায়। অধোগ রক্তপক্ষে বিরচন নিষেধ, কিন্তু বমন প্রয়োগ করা যায়।

ডাঃ। আচ্ছা বমন বিরচনের পূর্বে কি স্নেহ ও স্নেদ প্রয়োগ করা সর্বত্রই আবশ্যক ?

ক। বলবান রোগী এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহ শোধন ক'রতে হ'লে স্নেহ স্নেদ প্রয়োগ ক'রে যথার্থি পঞ্চকর্ম কর'তে হয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রোগেরই চিকিৎসার অনেক সময় স্নেহ আবশ্যক নয়, পরন্তু অপকারী। নবজব বমন কবা'বার বিধি আছে, কিন্তু নবজব মেহপান নিষিদ্ধ। আবার সন্নিপাত হবে স্নেদ দিবার বিধি আছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও স্নেহ দান নিষিদ্ধ।

ডাঃ। এ বড় জটিল ব্যাপার দেখছি ?

ক। বিষম জটিল। একটা উদাহরণ দিয়ে বল'ছি শুধুন। বিষয়টা আরও জটিল বলে বোধ হবে। ভগবন আত্রেয়ের নিকট অগ্নিবেশ মথন শিক্ষা করেন, তখন বমন বিরচন সম্বন্ধে উপদেশ দেবার সঙ্গে আত্রেয় বললেন, বমন বিরচন কার্যে রোগীর বিপদ উপস্থিত হ'লে তার প্রতিকারের জ্ঞাতও অনেক দ্রব্যের আবশ্যক, বিপদ সহসা উপস্থিত হ'লে ক্রমশঃ নিকটে থাকিলেও তখন তিনি আবশ্যক দ্রব্যের আয়োজন করা সম্ভবপন নহে, এই জ্ঞাত রোগীর যে সকল দ্রব্য আবশ্যক—সেগুলি পূর্বেই সংগ্রহ ক'রে রাখা উচিত।

মাঘ—৩

আত্রেয়ের কথা শুনে অগ্নিবেশ বললেন, ভগবান, জ্ঞানবান ব্যক্তির প্রথম হতেই একপ প্রতিবিধান করা উচিত—যাতে ঔষধ প্রয়োগে নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ হয়, অর্থাৎ কোনরূপ বিপত্তি না ঘটে। ঔষধ সম্যক রূপে প্রয়োগ কার্য সিদ্ধির এবং অসম্যক প্রয়োগ বিপত্তির কারণ, যদি একপ হয় যে সিদ্ধি ও বিপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম নাই অর্থাৎ জ্ঞান পূর্বক ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে ক্ষেত্র বিশেষে কার্য সিদ্ধি হয়, আবার কাহারও পক্ষে বিপত্তি ঘটে, তা'হলে জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুই সমান বলতে হ'বে।

ডাঃ। বাঃ অগ্নিবেশ তো বড় জবর কথা বলেছেন !

ক। আত্রেয় আরও জবর কথা বলেছেন। তিনি উত্তর ক'রলেন, অগ্নিবেশ, আমরা অথবা আমাদের মত ব্যক্তিরাই একপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে সমর্থ হই, আমাদের ঔষধের দ্বারা নিশ্চয় রোগ নিবারণ হয় কোনরূপ বিপত্তি ঘটে না। একপ প্রয়োগ সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিতেও কেবল আমাদেরই সামর্থ্য আছে। কিন্তু এমন লোক কেহ নাই যে, আমাদের মত উপদেশ দিতে এবং সেই উপদেশের মর্ম সম্যক অবধারণ ক'রতে সমর্থ। আমার উপদেশের মর্ম গ্রহণ ক'রে তদনুরূপ কার্য ক'রতে পারে—এমন লোকও কেহ নাই। দোষ ( বায়ু, পিত্ত, কফ ), ঔষধ দেশ, বল, শরীর আহার, সাত্ত্ব সন্ধ, প্রকৃতি এবং বয়স প্রভৃতির এত অবস্থান্তর এবং সেই সকল অবস্থান্তর ( ভিন্নতা ) এত সূক্ষ্ম যে, ইহাদের বিষয় সম্যক ভাবে চিন্তা করিতে বিশাল ও বিপুল বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরও বুদ্ধি আকুল হইয়া পড়ে, অল্প বুদ্ধিরত কথাই নাই।

ডাঃ। অতি সত্য কথা। কিন্তু আত্রেয়ের  
কি তেজোগর্ব উক্তি—আমি বা আমার মত  
ব্যক্তি কি পারে, আর কেউ পারে না।

ক। তাঁরা যৈঋষ্যশালী ত্রিকালদর্শী  
মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁরাই শুধু এরূপ কথা  
উচ্চারণ ক'রতে সাহস ক'রতে পারেন।  
সংহিতাকার অগ্নিবেশকে পর্যাস্ত বিপত্তির  
প্রতিকারের উপায় শিখতে হ'য়েছিল।

ডাঃ। তা আপনি যখন বিরচনের

কথা ব'লেছেন, তখন বিপত্তির প্রতিকারের  
কথাও বলতে হবে।

ক। দেখুন—সত্য কথা না ব'লেও  
বাচিনে, এ আপনাকে যা' বলছি সেটা পান্ডুর  
রাধাকৃষ্ণ বলাব মত, কথার মানেন না ব'লে  
বলা। যখন বিরচন আমরা সম্বন্ধে  
প্রয়োগও ক'রতে পারিনে, আর তার বিপত্তির  
প্রতিকার কন্তে জানিনে। তবে শাস্ত্রে যা  
লেখা আছে—তাই বলছি।

(ক্রমশঃ)

## স্বাস্থ্যরক্ষার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি।

—:—:—

আগ্নির “আয়ুর্বেদে” “হিন্দু স্বাস্থ্য নীতি”  
শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হয়। পরে  
কার্তিকের পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা  
পুরণোদ্দেশ্যে পরবর্তী প্রবন্ধ লেখক যে প্রবন্ধ  
লেখেন, তাহাতে শরীর রক্ষার জ্ঞান স্বাস্থ্যের  
সহিত ধর্মের সম্বন্ধ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।  
প্রথম প্রবন্ধটা বাস্তবিক মূলভাগ করিয়া কেবল  
আখ্যায়িকা মাত্র হইয়াছিল। এস্থলে দ্বিতীয়  
প্রবন্ধলেখকই প্রকৃত প্রশংসনীয়। বাহা  
হউক এক্ষণে বর্তমান স্বাস্থ্য-নীতি সম্বন্ধে  
কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি উপলক্ষ্য করিয়া  
দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, কলিকাতার স্থায়  
মহানগরীর স্বাস্থ্যরক্ষার কি ব্যবস্থা আছে।  
এক্ষণে অবশ্য পল্লীগ্রাম সমূহেও যথাসম্ভব একটু  
একটু করিয়া সহরের পদ্ধতিই অনুবর্তিত হইতে

দেখা যাইতেছে, স্মরণ্য সহরের বণ্য বহির্ভেদে  
অনেকটা মফঃস্বলের কথাও আসিয়া পড়িবে।  
কলিকাতা মহানগরীর স্বাস্থ্যরক্ষার চতু  
মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি। প্রজাবর্ষের প্রতি-  
নিধি স্বরূপ নির্ধারিত কমিশনগণ দ্বারা  
মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত। রাস্তা প্রস্তুত  
করণ, উহা মেরামত ও পরিষ্কার রাখা, রাত্রি-  
কালে রাস্তায় আলোক প্রদান, বাটীর ও পথের  
জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত, পুরীষ রাশি ও  
আবর্জনার স্থানান্তরের দূরীকরণ, পানীয়  
জল সরবরাহ, খাদ্য ও পানীয়ের অবিষাক্ততা  
নিবারণ, মহামারী ও সংক্রামক রোগসমূহের  
প্রতিকার সাধন প্রভৃতি দায়িত্ব কার্য  
মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা সমাধা হয়। এই সকল  
কার্যের ব্যয় নির্বাহার্থ মিউনিসিপ্যালিটি  
দ্বারা প্রজার নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে কর



সংগ্রহ করা হয়। ফলস্বরূপ মিউনিসিপ্যালিটি প্রজাপ্রাণ ও প্রজাদের নির্বাচিত কমিশন-গণ কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত।

বাটা নিষ্কাশন সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটির সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে, অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটির অধীনস্থ প্রিন্সিপাল ও বাটা নিষ্কাশন করিবার ক্ষমতা নাই। বাহাতে গৃহমধ্যে আলোক প্রবেশের ও বায়ুসঞ্চালনের উপায় থাকে, সে সম্বন্ধে কর্তৃকগুলি আইন বিধিবদ্ধও আছে। কলিকাতায় গ্রাম্য স্থানে যেখানে জমির মূল্য অত্যন্ত মহার্বা তা বশতঃ অনেককেই অতি সস্তায় স্থান মধ্যে বাসগৃহ নিষ্কাশন করিতে হয়, সেজন্য স্থানে স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে আইন বিধিবদ্ধ করিতে হয়, এজন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক প্রদত্ত ধন্যবাদার্থী। আইনের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণের গৃহনিষ্কাশন অধুমতি দিবার কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু কখনও কখনও এরূপও হয় যে, আইন বঙ্গীয় বাধ্যয় গৃহনিষ্কাশন করা সম্ভব হইয়া পড়ে, তবে আইনের সামান্য ব্যতিক্রম হইলেও স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হয় না। এজন্য কোন কোন স্থলে বাটা নিষ্কাশনকার্য দরখাস্ত করিলে, চেয়ার-ম্যান, হেলথ অফিসর, ও কমিশনরগণ মতগোষ্ঠীর আন্দোলন করিয়া, যদি স্বাস্থ্য-হানিকর হইবে না মনে করেন, তাহা হইলে বাটা নিষ্কাশনের অধুমতি দিয়া থাকেন। বঙ্গোবস্ত বাস্তবিকই খুব ভাল। তবে এরূপ অধুমতি লাভ কমিশনরের রূপাদৃষ্টি ভিন্ন ঘটে না। বাটার কমিশনরের প্রিয়পাত্র, তাহাদের জন্যে এরূপ সৌভাগ্য লাভ সহজেই ঘটে। যে সকল কমিশনর অপক্ষপাতী ও করদাতা-

গণের প্রকৃত শুভাঙ্কুরাণী কেবল তাহাদের ওয়ার্ডে সকলে সমভাবে এই সুবিচার লাভে অধিকারী হন। বাহা হউক এ দোষ মিউনিসিপ্যালিটির নহে, উহা করদাতৃগণের কমিশনর নির্বাচনের দোষ। বঙ্গদেশের গৃহনিষ্কাশনের যে প্রাচীন ব্যবস্থা ছিল, তাহা খুব ভাল হইলেও কলিকাতার গ্রাম্য বহু-জনাকীর্ণ মহানগরীর প্রতি প্রযোজ্য নহে, এবং সে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে অনেকের পক্ষেই বাসগৃহ নিষ্কাশন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এস্থলে মিউনিসিপ্যালিটির অবলম্বিত ব্যবস্থাই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পল্লীগামে যেখানে জমির মূল্য সুলভ, সেরূপ স্থলে প্রাচীন পদ্ধতিই ভাল, যথা,—“পূর্বে হাঁস। পশ্চিমে বাশ। উত্তর বেড়ে। দক্ষিণ ছেড়ে। ঘর কর রে ভেড়ের ভেড়ে॥” ইহার অর্থ এই যে, বাস-ভবনের পূর্বদিকে জানালা থাকা আবশ্যিক; কারণ নবোদিত তরুণ তপনের নাতিতীক্ষ্ণ রশ্মিরাজি গৃহমধ্যে স্বতঃপ্রবিষ্ট হইয়া এবং কোন কোন অগম্যস্থানেও জলাশয় হইতে প্রতিবিম্বিত কিরণমালা প্রবেশ করিয়া গৃহের ও গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশির আর্দ্রতা নিবারণ ও রোগের বীজাণু ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়। পশ্চিমে বাশঝাড় বা উচ্চ বৃক্ষরাজি থাকা আবশ্যিক; তাহা হইলে অন্তঃগমনোন্মুখ সূর্য্যের অসহ ও অস্বাস্থ্যকর কিরণরাশি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। উত্তর দিক বেটন বা প্রাচীর রুদ্ধ করিবার কারণ এই যে, উত্তর বায়ুর গতি রোধ হইয়া শৈত্য নিবারিত হইবে। বাহাতে দক্ষিণ মলয়ানিল অবাধে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে—তজ্জন্ত দক্ষিণ দিক খোলা থাকা আবশ্যিক। যেখানে জমির স্বচ্ছলতা আছে, সেখানে

এ প্রণালীতে গৃহনির্মাণ বেশ স্বাস্থ্যকর বটে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির জন্ত কলিকাতায় রাস্তা পরিষ্কারের বেশ স্ববন্দোবস্ত আছে। কিন্তু পল্লীগ্রামে—যেখানে মিউনিসিপালিটির স্থিতি হয় নাই—তথাকার রাস্তা পরিষ্কার ব্যাপারটা গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর করে। তবে জমির সচ্ছলতা প্রযুক্ত অনেক গ্রামের আবর্জনা রাশি রাস্তায় ফেলিতে দেখা যায় না। মধ্যে যে সকল পণ্ডিত জমি থাকে বা গৃহস্বামীর নিজের যে পতিত জমি থাকে, তাহাতেই পল্লীগ্রামের আবর্জনা নিষ্ক্ষেপ করা হয়—এরূপ ঐ আবর্জনা রাশি ক্রমে মৃত্তিকায় পরিণত হয়। ঐ সকল পতিত জমি প্রায় বাসগৃহ হইতে দূরেই অবস্থিত, স্ততরাং উহা দ্বারা গ্রাম অস্বাস্থ্যকর হয় না। কিন্তু যে সকল গ্রামের লোকসংখ্যা অধিক এবং বাস ভবনের অনতিদূরেই আবর্জনা রাশি পড়িতে থাকে, তথায় উহা পীড়া উৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি রাস্তা পরিষ্কারের জন্ত ছ'বেলা রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়া, ছবেলা জল সেচন করা, ছবেলা আবর্জনা রাশি গাড়ী করিয়া স্থানান্তরিত করা প্রভৃতি দ্বারা কলিকাতাবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে অর্থও প্রচুর ব্যয়িত করা হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটু স্ববন্দোবস্ত হইলে ভাল হয় বলিয়া আমরা মনে করি। নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আবর্জনা রাস্তায় ফেলিতে দেওয়া হয় না বা স্থানে স্থানে লৌহ নিষ্প্রিত যে আধার থাকে তন্মধ্যে ফেলিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহার একটু পরিবর্তন হইলে ভাল হয়। কারণ অনেক গৃহস্থের সর্বদা আবর্জনা

রাশি পথস্থিত লৌহাধারে নিষ্ক্ষেপ করিবার সুবিধা হয় না। যাহাদের গৃহকাগ্যের ভক্ত ঠিক লোক নিযুক্ত থাকে; সে লোক দিনান্তে একবার আসিয়া গৃহ প্রাঙ্গন পরিষ্কার করে ও আবর্জনা রাশি নির্দিষ্ট স্থানে নিষ্ক্ষেপ করে। কিন্তু সমস্ত দিব্যাত্রি ঐ সব আবর্জনারাশি গৃহমধ্যেই পড়িতে থাকে। কারণ অবরোধস্থ স্ত্রীলোকেরা রাস্তায় যাইয়া আধার মধ্যে আবর্জনা ফেলিয়া আসিতে পারে না। আবর্জনা রাশি পড়িয়া দূষিত হইতে থাকে। যে সকল বাটীর সন্নিকটে আবর্জনার আধার থাকে—তাহাদের আবর্জনা ফেলিবার সুবিধা হয় বটে; কিন্তু একস্থানে প্রচুর আবর্জনা রাশি থাকায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয়। ধান্ধড়ের সংখ্যা যদি বাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং সমস্ত দিন আবর্জনা রাস্তায় পড়িবারা যদি উঠাইয়া লইবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতীকার হইতে পারে। গুনিয়াছি চীনদেশের কোন কোন সহরে নাকি এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। মেঘর সমস্ত দিন ঝাড়ু হাতে রাস্তায় উপস্থিত থাকে, আবর্জনা পড়িবারাত্র তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করা হয়।

এইবার রাস্তা মেরামত সম্বন্ধেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। মিউনিসিপালিটির অগ্রগৃহে কলিকাতার রাস্তা সর্বদাই মেরামত হইতেছে। বড় রাস্তা ও ফুটপাথ সমূহে পাথর দেওয়াতে বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এমন কি অনেক গরীব লোক গ্রীষ্মকালে রাতে ফুটপাথে শয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ষার সময় পাথরের উপর বড় পা পিছলাইয়া যায় বলিয়া তাহারও প্রতিকার সাধন হইয়াছে। অর্থাৎ পাথরের উপরিভাগ বাহাতে মসৃণ ন হয়—সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গলি

রাস্তায় ইট বিছাইয়া পাকা করিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু অনেক রাস্তার উচ্চতা এত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে যে, অনেক বাটার প্রাঙ্গন বা গৃহতল যাহা পূর্বে রাস্তা হইতে উচ্চ ছিল, তাহা এক্ষণে রাস্তা অপেক্ষা নিম্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা নিম্নতলের গৃহগুলির আদ্রতা বর্দ্ধিত হইয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। এবিষয়ের প্রতি মিউনিসিপালিটির লক্ষ্য থাকা আবশ্যিক। কোন কোন স্থলে মিউনিসিপালি-টীৰ স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে নোটিশ দিয়া গৃহ-স্বামীকে নিজ প্রচায় গৃহ প্রাঙ্গন উচ্চ করান হইতেছে। কিন্তু নীচু হইলে না দিলে আর একপ নোটিশ দিবার প্রয়োজন হয় না। কোন কোনস্থলে উঠান উঁচু করিতে গিয়া শয়ন ঘরের মেজের সহিত প্রায় সমতল হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে ঘরের আদ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাতে রাস্তা উঁচু না হইয়া সমভাবে থাকে, সে বিষয় মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষগণের একটু কৃপাদৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়। যে সকল রাস্তা অনেক উঁচু হইয়াছে, যদি সেগুলিকে নামাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তাহারও চেষ্টা করা উচিত।

কলিকাতার অধিকাংশ বাটাই সন্ধীর্ণ স্থানে নির্মিত। তথায় অবিরুদ্ধ বায়ু সেবনের উপায় নাই। সে কারণ মুক্ত বায়ু সেবনার্থ কলিকাতা মিউনিসিপালিটি স্থানে স্থানে স্কোয়ার বা সরকারি বাগান নির্মাণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কলিকাতার ছায় অস্ত্রান্ত বড় বড় সহরেও এইরূপ স্কোয়ার ও পার্ক নির্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। এ বন্দোবস্ত যে খুব ভাল তাহার কোন সন্দেহ নাই। কলিকাতায় আবার অবরোধবাসিনীদের বায়ু সেবনার্থ পার্ক হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। এ সব সম্বন্ধে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির

কার্যকলাপ সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ইহাতে আমাদের প্রতিবাদ বা নূতন প্রস্তাব করিবার কিছুই নাই।

খাদ্য ও পানীয়ের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কলিকাতার মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষগণের বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁহার বেষ কৃতকার্যও হইতেছেন। বাজারে পচা মৎস্য বা মাংস, দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাদি বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় না। বিক্রয় করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া হয় ও বিক্রেতাকে দণ্ডভোগ করিতে হয়। পানীয় জলের বিশুদ্ধতাই কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির প্রথম সোপান। শুনা যায়, কলিকাতায় যখন প্রথম কলের জলের সৃষ্টি হয়, তখন তিন দিন নিম্নতলা শবদাহ ঘাটে শবদাহ হয় নাই, অর্থাৎ কলিকাতায় ৩ দিন লোক মরে নাই। সে সময় মহাত্মা হগ্‌ সাহেব চেয়ারম্যান ও ডাক্তার টনিয়ার হেলথ অফিসার ছিলেন। কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির সম্বন্ধে ইঁহারা সর্বাগ্রে ধন্তবাদার্ন। এই ডাক্তার টনিয়ার সাহেব হোমিওপ্যাথ ছিলেন। ইঁহার পর কোন হেলথ অফিসরের আমলে মৃত্যুসংখ্যা একদিনের জন্তও একেবারে শূন্য হইতে দেখা যায় নাই। যে কলের জল কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির মুখ্য কারণ, বর্তমানে সেই জল সরবরাহ করা সম্বন্ধে দুই এককথা বলিবার আছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি দ্বারা এক্ষণে দুই প্রকার জল সরবরাহ করা হয়। পান, স্নান এবং গৃহকর্ষের জন্য পরিশুদ্ধ জল, এবং পায়খানা পরিকারের জন্য অপরিষ্কৃত জল মাপিয়া দেওয়া হয়, তাহার অতিরিক্ত খরচ হইলে স্বতন্ত্র দাম দিতে হয়। সে কারণ বাঁহাদের বিস্তৃত কলের খরচ অধিক, তাঁহারা তৎপরিবর্তে অপরিষ্কৃত

জল ব্যবহার করেন। ইহা রোগোৎপত্তির একটা কারণ। এই জল খরচের পরিমাণ স্থির করিবার জন্ত মিউনিসিপালিটির খরচায় গৃহদ্বারে একটা মিটার বা পরিমাপক যন্ত্র স্থাপিত আছে। উহা পরিদর্শনের জন্ত অনেক ইন্সপেক্টর ও কুলি নিযুক্ত আছে। এবং মেরামতের জন্তও মিস্ত্রী আছে। এই সকল খরচা কমাইয়া যাহাতে বিশুদ্ধ জল অবাধে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে বন্দোবস্ত করিলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া জলের অপব্যয় করিতে দেওয়াও যুক্তি সঙ্গত নহে। তবে অল্প উপায়ে জলের অপব্যয় নিবারণ করা যাইতে পারে। দিবারাত্র যদি কলে জল থাকে, তাহা হইলে কতক পরিমাণে অপব্যয় নিবারণ হইতে পারে। কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যা। অধিক। খাণ্ড, পানীয়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে হিন্দুকে অনেক কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয়। দিবারাত্র জল না থাকার জন্ত জল চৌবাচ্ছার ও অগ্ৰাণ্ট আধারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। ফলে সামান্য কারণে এই জল হিন্দুর অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। হয়

ত বায়সাদি দ্বারা চৌবাচ্ছার জলে কোন অস্পৃশ্য দ্রব্য আসিয়া পড়িল, হয় ত হিন্দুরাদি দ্বারা কোন উচ্ছিষ্ট বা অস্পৃশ্য দ্রব্য জলের জালা বা কলসীর গাত্রে সংলগ্ন হইল। সেইজন্ত হিন্দুকে পূর্ব সংগৃহীত জল পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতন করিয়া জল সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু দিবারাত্র কলে জল থাকিলে জল সংগ্রহ করিয়া রাখিবার আবশ্যক হয় না। ফলে নানা কারণে কলিকাতায় জলের অপব্যয় হইয়া থাকে। এখন কলের মুখ যেরূপ আছে, তাহার পরিবর্তন করিয়া রেল ষ্টেশনের কলেব ত্রায় বা রাস্তার কলের ত্রায় মুখ প্রচলন করিলে অনেক সময় অপব্যয় নিবারণ করা যাইতে পারে অর্থাৎ ধরিয়া থাকিলে জল পড়িবে এবং ছাড়িয়া দিলেই জল বন্ধ হইবে—এরূপ করিলে জল যাহার যত আবশ্যক—অবাধে ব্যবহার করিতে পারিবেন, এবং জলের অপব্যয়ও নিবারণ হইবে।

আমরা আশা করি, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের কথাগুলি বিবেচনা করিবেন।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

## ওলাউঠার প্রতিষেধক।

(“নীহার” হইতে উদ্ধৃত)

ওলাউঠা ব্যাধি সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ নিয়ম আছে, যাহা ব্যক্তিগত ভাবে পালন করিলে ঐ ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া

যাইতে পারে। দেশের জনকয়েক শিক্ষিত লোক ছাড়া পল্লীবাসী জনগণ জনসম্মুখীন এ বিষয়ে সম্পূর্ণই অনজ্ঞ। বর্তমান ওলাউঠা

উষ্ণ প্রাচ্যভাষ্য কালে জনসাধারণের হিতার্থে  
নিম্নে কয়েকটি নিয়ম লিখা হইল।

(১) কলেরা ব্যারাম প্রায়ই শীতকালে দেখা  
যায়। দরিদ্র লোককে যাহাদের শীতবস্ত্রের  
অভাব তাহাদের বেশীর ভাগ লোককে এই  
ব্যাদিতে মরিতে দেখা যায়। শরীরে—বিশে-  
ষতঃ পেটে বাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে, সেদিকে  
সকলের বিশেষ দৃষ্টা রাখা উচিত। সামান্য  
পেটের অসুখ হইলেও স্নান করা একেবারে  
নিষিদ্ধ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস আছে—স্নান  
করিলেই পেট ঠাণ্ডা হইবে, উহা সম্পূর্ণ  
ভুল। পেটের অসুখ হইলে স্নান করা কোন  
রকমে উচিত নহে।

(২) প্রায়ই দেখা যায়,—কলেরা দূষিত  
জল ও দুগ্ধ পান করিলে হয়। এ সময়  
প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত—পানীয় জল উত্তমরূপে  
সিদ্ধ করিয়া তাহা পরিষ্কার নেকড়ার দ্বারা  
ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া পান করা। জল সিদ্ধ  
করিলে উহার সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। কাঁচা  
দুগ্ধও কখন পান করা উচিত নয়। আমি  
জানি—একজন বড় সাহেব কাঁচা দুগ্ধ পান  
করিয়া কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে  
পতিত হন। এখন ঐষ্টী দুগ্ধ পাইবার উপায়  
নাই। দুগ্ধ বিক্রেতারার অনেক সময় দূষিত  
খাল বিলের জল মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধকে  
বিক্রয় করে।

(৩) কলেরা রোগের বিষ রোগীর ভেদ  
ও বমির সহিত নিঃসৃত হয়। অতএব  
রোগীর মল-মূত্র ও বমি আদি যাহাতে পানীয়  
জলে না পড়িতে পারে এবং উহার উপর মাছি  
না বসে, সে বিষয়ে সকলের বিশেষ সতর্ক  
হওয়া উচিত। মাটির গামলা অথবা সরতে  
রোগীর মলমূত্র ও বমি ধরিয়া তাহার উপর তৎ-

ক্ষণাৎ মাটি অথবা বালি দিয়া ঢাকা দিলেই  
মাছি বসিতে পারে না এবং তাহার পর পাত্র  
সহিত রোগীর মল—মাটির নীচে পুঁতিয়া দেওয়া  
কর্তব্য। নচেৎ অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলা  
বিধেয়। রোগীর মল কখনও যেখানে সেখানে  
ছড়াইয়া ফেলা উচিত নয়। কলেরা একটি  
অতি সংক্রামক ব্যাদি, রোগীর ভেদ বমির  
উপর যদি মাছি বসিতে পায়, তবে উহার  
ঐ পীড়ার বিষ লইয়া খাণ্ডদ্রব্যের উপর বসিলে  
তাহাও বিযাক্ত করিয়া দেয় এবং সেই খাণ্ড  
দ্রব্য খাইয়া লোকে কলেরা ব্যারামে আক্রান্ত  
হইতে পারে। এই জন্য খাণ্ডদ্রব্য সমূহ এমন  
ভাবে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক, যাহাতে উহার  
উপর মাছি আদৌ বসিতে না পারে।

বাজারে অনেক খাবারের দোকান আছে,  
কিন্তু সমস্ত দোকানের খাবারগুলি রাস্তার ধূলয়  
ও মাটিতে ঢাকা থাকে। এইরূপ খাবার  
খাইলে লোকের অনিষ্ট ছাড়া উপকার হইতে  
পারে না।

কলি চূণ একটি বিষ প্রতিষেধক। কলেরা  
রোগীর মলে ইহা দিলে বিষ নষ্ট হয়। ইহা  
ছাড়া পারমান্ব্যানেট অব পটাশ দ্বারাও জলের  
দোষ নষ্ট করা যায়। ইহা একটা সাধারণ  
কুয়াতে অর্দ্ধ আউন্স পরিমাণে মিশ্রিত করি-  
লেই যথেষ্ট হয়, অথবা ক্লোরোজেন ১ আউন্স  
দিগেই জলের দোষ নষ্ট হয়। ফেনাইলও  
একটা উত্তম বিষপ্রতিষেধক। বাড়ীতে  
কলেরা হইলে ঘরের দেওয়াল ও মেজেয়  
ফেনাইল জলে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে  
ষর পরিষ্কার করা দরকার এবং ঘরের  
মেজেতে ঘুঁটিয়ার আগুন করিয়া দিলে সমস্ত  
দোষ নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত গন্ধক জ্বালাই  
লেও দূষিত হাওয়া পরিশোধিত হয়।

(৪) কলেরা রোগীর কাপড় কখনও পুকুর অথবা অন্য কোন জলাশয়ে ধোওয়া উচিত নহে। উহা হইতেই ব্যারাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। রোগীর কাপড়-হাঁড়ি অথবা টিনের ভিতর রাখিয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া যৌদ্ধে শুকাইয়া লওয়া উচিত। জলে ফিনাইল অথবা চূণ মিশাইয়া লওয়া বিধেয়।

(৫) কলেরার কীটাপু দেখিতে কমার তায়। সেই জন্ত ইহার নাম হইয়াছে, কমা ব্যাসিলাস্। কলেরার বিষ অগ্নে নষ্ট হয়। কলেরার সময় লেবু (পাতি, কাগজি, কমলা) খাওয়া ভাল এবং ঔষধ Sulphuric Acid Dilute ১০ ফোঁটা করিয়া আহারের পর হইবার খাওয়া ভাল।

শ্রীরমণীমোহন মুখোপাধ্যায়  
এসিষ্ট্যান্ট সার্জন।

## পিত্তশূল বা Gallstone.

—:—

[ ডাক্তার গ্লাইকোকোলেট বলেন,—  
সোডার চেয়ে কবিরাজী কুলেখাড়া—এ  
রোগের অব্যর্থ ঔষধ ]

আজকাল আর একটা রোগ বেশ ব্যাপক ভাবেই এ দেশে দেখা দিয়াছে। রোগটার নাম—“গলষ্টোন” [Gallstone.] শাস্ত্রীয় নাম—“পিত্তশূল”। পূর্বে এ রোগ কদাচ কাহারও হইত, এখন কিন্তু অনেককেই এ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখিতেছি। গত বৎসর—আমি গলষ্টোন রোগাক্রান্ত ১৭টা রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা—আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা নহে। কবিরাজ মহাশয়গণ—এই ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ রোগের পরিচয় বিলক্ষণই জানেন, কেননা তাঁহাদের শাস্ত্রে ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা বেশ নিপুণ ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের কাছে এ রোগের পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল নূতন শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে এতৎ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

পূর্বেই বলিয়াছি—গলষ্টোনের বাস্তব নাম “পিত্তশূল”। “পৈত্তিক শূল” পিত্ত প্রধান শূল। আর “পিত্ত, শূল ও পৈত্তিক শূল” এক নহে। “পিত্তশূল” পিত্তকোষের শূল। পাঠকগণ নামের এই পার্থক্যটুকু মনে রাখিবেন। আমার প্রিয়স্বহৃদ আয়ুর্বেদে অসাধারণ অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়—“বৈখ্যাজ্ঞান” নামক একখানি চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদে এ রোগের নাম লিখিয়াছেন, “পিত্ত শিলা”, নামটা খুব সঙ্গত। কেননা এ রোগে পিত্তকোষে শিলা অর্থাৎ পাথুরী জন্মে।

রোগটা এমন জটিল লক্ষণাক্রান্ত যে, প্রথমে ধরা বড় শক্ত। অনেক রোগের লক্ষণের সহিত ইহার একা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

নিদান। এ রোগের নিদান অর্থাৎ  
আদি কারণ—

অতিশয় পরিশ্রম, অশ্বাদি বানে ভ্রমণ,  
অতি মৈথুন, রাত্রি আগরণ, অপরিমিত পীতল

জল পান, কৃষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ, পূর্বের আহার  
জন্য না হইতে পুনর্ভোজন, পিষ্টকাদি এবং  
অধিক দ্রব্য মৃদাযুক্ত দ্রব্য আহার, চিন্তা,  
চিন্তা, ক্ষীর মৎস্যাদি সংযোগ  
বিকল্প দ্রব্য ভক্ষণ, মাদক সেবন, মাংসাশক্তি,  
হৃৎস্পন্দ, মন মূত্রাদির বেগধারণ, শোক,  
উপবাস, অতিভাষণ, ইত্যাদি কারণে  
এবং বা কুপিত হয়, পিত্ত নিঃসরণের  
ব্যয়ত জন্মে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ইহাই অভি-  
প্রেত। এই কাবণগুলি—আমাদের দেশে, আমা-  
সে মনোহা, দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে,  
তাই গুল্মটোমও ব্যাপক ভাবে দেখা দিতেছে।

**পূর্বরূপ।** যকৃতের নিকটে [Right  
Hypo chondrium] অল্প অল্প ভার বোধ,  
ক্ষণমন্দা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল-বিপাক, এবং  
শারীরিক দৌলতা—এইগুলি এ রোগের  
“পূর্বরূপ” রূপে প্রকাশ পায়। পরে শূলের  
লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই যন্ত্রণা দেখা দিলেই  
আমল রোগ বরা পড়ে।

ইহাব নবপ্রধান লক্ষণ—মাঝে মাঝে  
শ্বাসের নিকট অত্যন্ত বেদনামূলক। এই  
বেদনা নবন পঞ্জবাস্তুর কাটিলেজ হইতে  
অবশ্য করিয়া ঐ অস্থির লাইনে দক্ষিণ  
Scapular প্রদেশে যায়, কখনও আরও উদ্ধে  
দক্ষিণ স্বক্কের দিকে, কখনও বা বাম স্বক্কের  
দিকে, আবার কখনও বা নিম্নদিকে নাভি  
দেশ পর্যন্ত—গমন করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে  
বদন হয়। ইহাতে পিত্ত নিঃসরণ নালীর গাত্র  
প্রসারিত (Relaxed) হওয়ায়, পাথুরী  
Duodenum এ চলিয়া আসে। পুনঃ পুনঃ  
প্রসারিত রোগী কাতর হইয়া পড়ে। এমন  
কি—হিমাক্স (Collapse) হইয়া মারা যাইতে  
পারে।

**প্রবল আক্রমণ।** রোগের প্রবল  
আক্রমণে—রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে  
তাহার আর্তনাদে দর্শকের নেত্র সজল হইয়া  
উঠে। রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে থাকে,  
পীড়িত স্থান পুনঃ পুনঃ টিপিতে থাকে; তাহার  
শরীরে ম্যালেরিয়া রোগীর মত ‘কম্পন’  
উপস্থিত হয়। অরও দেখা দেয়—অরের  
উত্তাপ বিলম্বী মাপ কাটিতে মাপিলে,  
১০২।১০৩ কখনও ১০৪ পর্যন্ত উঠে।  
কাহারও কাহারও অতি দম্প্রসাব হয়, পেট  
ফাঁপে, প্রস্রাব বন্ধ বা মূত্রকৃচ্ছ উপস্থিত হয়।

যদি পাথুরীর আকার অতি বৃহৎ হয়, এবং  
উহা বায়ু কর্তক চাপিত হইয়া, পিত্তকোষ  
ও অস্ত্রের গাত্র ক্ষত বিক্ষত করিয়া, একেবারে  
অস্ত্রের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ভুক্ত-  
দ্রব্যের গমনাগমনের পথ পর্যাণ্ত রুদ্ধ হইয়া  
যায়। সেই সময় অস্ত্রাবরোধের লক্ষণ সমূহ  
প্রকাশ পায়। খুব প্রবল ভাবে অরও দেখা  
দেয়। একরূপ অবস্থার রোগীর জীবন সংশয়  
হইয়া পড়ে।

**উপসর্গ।** পিত্তকোষে পাথুরী জন্মিলে  
তাহার উপসর্গরূপে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি  
দেখা দেয়।

১। শূল বেদনা। ইহার কথা পূর্বেই  
বলিয়াছি। এই শূলের ডাক্তারী নাম  
Gullstone Colic. পিত্ত কোষের চতুর্দিকস্থ  
টিসুর সহিত সংযোগ হইলে এই যন্ত্রণা খুব  
বেশী হইয়া থাকে।

২। বমন। কখন কখন ক্রমাগত বমন  
হইতে থাকে, কখনও ১৫ মিনিট অন্তর,  
কখনও বা অর্ধ ঘণ্টা অন্তর। বমনে ভুক্ত-  
দ্রব্য উঠিয়া যায়, তাহার সহিত পিত্ত মিশ্রিত  
থাকে।

৩। পাণ্ডুতা। ইহার ডাক্তারী নাম জন্টিস্। যখন যকৃতের পিত্ত নিঃসরণ প্রণালী (common duct) রুদ্ধ হয়, তখনই ইহা প্রকাশ পায়। রোগীর দেহ পীতবর্ণ—রক্ত-শূন্য মনে হয়। কিন্তু crall bladder কিম্বা oytic 'cluct বা পিত্ত কোষ প্রণালীতে পাণ্ডুরী থাকিলে—প্রায়ই জন্টিস্ হয় না।

৪। অগ্নি বিপাক। বুক পেট, গলা—অগ্নি জ্বালা করে, ওষ্ঠ, মুখ অগ্নাস্বাদ যুক্ত হয়।

৫। অরুচি। কোন জিনিষ খাইতে ভাল লাগে না। ৬। জ্বর। জ্বরের কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই জ্বর—টিক্ urithral fever এর মত।

৭। বস্তি দেশের স্ফীততা। তলপেট ফাঁপা। ৮। কোষ্ঠ বদ্ধতা। ৯। মূত্ররুদ্ধ, অতি সুরু ধারে মূত্র বাহির হয়, কখনও ফোঁটা ফোঁটা। মূত্রের বর্ণ কখনও জলের মত স্বচ্ছ, কখনও পীত, কখনও গোমেদ মণির মত, কখনও আবিল, কখনও রক্ত নিশ্চিত। মূত্রের গন্ধ—ছাগ গন্ধী।

১০। অবসাদ। ১১। তৃষ্ণা। ১২। মূচ্ছা। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, হস্ত পদাদির আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ১৩। দাহ। ১৪। শিরোরোগ—মাথাধরা, মাথার রোগ। ১৫। শোথ। এ লক্ষণ—মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেই দেখা দেয়।

১৬। অজীর্ণ। কেবল মাত্র অজীর্ণতার জন্ম—গলষ্টোন রোগ জন্মিতে পারে।

এমন অনেকগুলি রোগ আছে—বাহাদেব' সহিত গলষ্টোন রোগের অনেক বিষয়ের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্মই গলষ্টোনের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বড় বড় চিকিৎসককেও

হারি মানিতে হয়। চলনশীল Right Kidney. Solid or cystic tumour of Kidney. ক্যানসার পাইলোরস্, ক্যানসার লিভার, দক্ষিণ সুপ্রাট্রিগেল ক্যাপসুলের টিউমার ওসেন্টোমেয় অর্কুদ, যকৃতের Hydatid. প্রভৃতি অনেকগুলি রোগে—গলষ্টোন বর্ণিত ভ্রম হয়। আবার গলষ্টোনের যন্ত্রণা বেকপ, —নিম্নলিখিত রোগগুলিতে ঠিক সেই ভাবে যন্ত্রণা হইতে পারে। যথা—Intestinal colic, Renal colic. পাকস্থলীর Pyloric endoy স্থলতা ও বেদনা, Lead colic. duodenal ulcer. লিভারের 'congestion. —প্রভৃতি।

পরীক্ষা। পিত্তকোষের বিবৃদ্ধি ও তাহার ভিতর গলষ্টোন আছে কিনা? ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে রোগীকে জাহুর উপর তাতের ভর দিয়া সম্মুখ দিকে বাকিয়া বসিতে বলিবে। চিকিৎসক রোগীর পিছনে বসিবেন এবং নিজের হস্ত সমতল ভাবে রোগীর পেটের উপর পিত্তকোষের কাছে লক্ষ্য করিয়া রাখিবেন, পরে রোগীকে দাঁধ নিশাস ফেলিতে বলিবেন। প্রতি প্রশ্বাসের সহিত রোগীর পেট কুঞ্চিত হইলে, চিকিৎসক নিজের হাতখানি রোগীর পেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহা ঘুরাইয়া রৈখিক ভাবে (Hori Zontally) যকৃতের নিম্নভাগে আনিবেন ইহার দ্বারা পিত্তকোষের বিবৃদ্ধি ও পাণ্ডুরী অস্তিত্ব—অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

গলষ্টোন সন্দেহে চিকিৎসককে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। এ রোগ প্রকৃত্যে চেষ্টে জীলোকদেরই বেশী হয়। আবার এ সকল জীলোকের ৩০ বৎসরের বেশী বয় হইয়াছে, তাহারাই এ রোগে আক্রান্ত হই



থাকেন। তাঁহার সন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাহারা আবার অধিকতর আক্রান্ত হইয়া থাকেন। পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব করায় ডায়াফ্রাম ঢুকল হইয়া পড়ে; যে সকল রমণী দিনব্যতী জামাজোড়া সেমিজ-সাঁরা আঁটিয়া—জুজুভী সাজিয়া থাকেন, ডায়াফ্রামিক শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে তাঁহাদের অল্পই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। কাজেই পিত্তকোষে পিণ্ড জমিয়া যায়—ছোরের সহিত বাহির হইয়া হস্তমধ্য প্রবেশ করে না। এই পিণ্ডই প্রত্যেকাব্যে প্রকাশ পায়। এ রোগ বৃদ্ধাদের মধ্যে আরও বেশী। বঙ্গ রমণীর চেয়ে কস্টেট ইঁটা বিবিন্দেব পিত্তকোষে প্রায়ই পাথুবীর উপস্থিতি হইয়া থাকে।

**চিকিৎসা।** ডাক্তারী মতে—অন্ত্র চিকিৎসাই ইহার মুখ্য চিকিৎসা। কিন্তু অনেক সময়ে ইহা বিপজ্জনক। রোগীর বল না থাকিলে, বয়সটা বেশী হইলে,—তাহাকে ছোবদর্ম-করা চলে না, অন্ত্রপ্রয়োগ করাও চলে না। বিশেষতঃ—যে স্থলে নিশ্চয় রূপে শোণ ধরা শক্ত, সে স্থলে অন্ত্র চিকিৎসা যুক্তি দৃষ্ট হইতে পারে না।

একবার একজন বড় ডাক্তারকে এজন্য সপ্রতিভ হইতে দেখিয়াছি! আমি তাঁহার মহাশয়কাবী ছিলাম। রোগিনী—বড় লোকের বাড়ীর বড়, বয়স ৩৫।৩৬, সন্তানাদি হয় নাই। ২ বৎসর বোগ-বন্ত্রণা ভোগ করিয়া, রোগিনী বড় ডাক্তারটাব চিকিৎসাধীন হ'ন। তাঁহার গলষ্টোনের বেদনাব মত বেদনা ধরিত, ঐ সময় কম্প উপস্থিত হইত, গা বমি বমি করিত, মাথা ঘুরিত, কিট ও হইত। অন্ত্র প্রয়োগে গলষ্টোন বাহির করিতে গিয়া দেখা গেল—রোগ ঠিক ধরা যায় নাই। তাঁহার রোগ গলষ্টোন নহে,

—Congestion of the ovary. আর একটা রোগিনীর গলষ্টোনের চিকিৎসা করিতে গিয়া পেট চিরিয়া দেখা গেল—ইরিটাসে টিউমার হইয়াছে!

আরও ২৩টা রোগী ও রোগিনীর গলষ্টোনের চিকিৎসা করিতে গিয়া শক্ত মলের চাপ, কাহারও ক্ষুদ্রান্তের বায়ুপূর্ণতা, কাহারও বা Membrunous Enteritis.—দেখা গিয়াছে!

**ডাক্তারী মতে।** সেডিয়ম গ্লাইকো-কোলেট এবং মাঝে মাঝে অলিভ অয়েল প্রয়োগ করিলে গলষ্টোনের যন্ত্রণা কমিয়া যায়। ৫ গ্রেন গ্লাইকোকোলেট অফ-সোডা—কিঞ্চিং ম্যাগনেসিয়াম সহিত মিশাইয়া, প্রত্যহ ২৩ বার সেব্য, আবশ্যক মত বিরেচক ঔষধের প্রয়োগ। কিন্তু এ ব্যবস্থায় আশান্তরূপ ফল দেখি নাই। তবে একথা সত্য—ডাক্তারী মতে গ্লাইকোকোলেট, ও অলিভ অয়েল—গলষ্টোনের একমাত্র-ফলপ্রসূ ঔষধ। বিশেষতঃ গ্লাইকোকোলেট পিত্তনিসরণের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

এ স্থলে গলষ্টোনের একটা অব্যর্থ ঔষধের উল্লেখ করিব। ঔষধটী—কবিরাজী ঔষধ। গলষ্টোনের এমন ঔষধ এ পর্যন্ত আমার আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই ঔষধটীর আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে।—

কর্মক্ষেত্র হইতে মাঝে মাঝে দেশের বাড়ীতে যাইতাম। সেখানে—একজন নগণ্য পাড়াগোঁয়ে হাতুড়িয়া—কবিরাজী চিকিৎসা করিতেন। দেশে গেলে তাঁহারই চণ্ডীমণ্ডপ আমার বসিবার আড্ডা হইত। এই ব্যক্তির কাছে—অনেক দরিদ্র এবং নীচ জাতীয় রোগী প্রায়ই চিকিৎসার জন্য আসিত। ইনি স্বয়ং

নাপিত জাতীয় ছিলেন। পল্লীগ্রামের নিম্ন-শ্রেণীর রোগী অধিকাংশেরই পেটজোড়া গ্লীহা বক্রং, ঘৃণ ঘৃণে অর, পায়ে শোথ, পেটের পীড়া। আমাদের গ্রামের আসে পাশে প্রায় ১৫১০ খানা গ্রামের লোকের বিশ্বাস ছিল—এই নাপিত-কবিবাজ গ্লীহা-যন্ত্রের সাফাৎ ধনস্তবি।

আশ্চর্যের বিষয়—ইহার হাতে অনেকে আরোগ্যও হইত। প্রায়ই দেখিতাম—এই নরসুন্দরবর তাঁহার রোগীগণকে এক রকম ক্ষার পদার্থ সেবন করিতে দিতেন। অনেক অমুসন্ধানেব পর্ব—তাঁহারই এক পুত্রের মুখে শুনিলাম—ঐ ক্ষার—কুলেথাড়া নামক গাছ হইতে প্রস্তুত।

আমিও জানিতাম—কুলেথাড়া বক্রতের একদিন নাপিতটার কাছে গিয়া পান্য প্রস্তুতের কৌশলটা শিখিয়া লইলাম। তাহার পর হইতে—স্বহস্তে ক্ষার প্রস্তুত করিয়া দিকৃত ও নিবৃদ্ধ বক্রং রোগীর উপর ইহা প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমি কুলেথাড়ার অপূর্ণ শক্তিব পরিচয় পাইলাম।

কুলেথাড়া—মাঠে, জলা জমির ধারে, পুষ্করিণীর পাড়ে প্রচুর জন্মে। গাছ—লম্বা, পাতাও লম্বা, পাতার কোণে—ভীক্কা কাঁটা থাকে, ফুল নীল বর্ণের। চাষা ভূষা সবাই চিনে। এই কুলেথাড়ার গাছ—তুলিয়া আনিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। পরে ঐ শুষ্ক গাছগুলিকে একটী মাটির হাঁড়িতে পুরিয়া,—হাঁড়ির মুখে সরাসরি ঢাকা এবং উভয়ের জোড়ের স্থানে কাদার প্রলেপ দিয়া,—উনানে বসাইয়া ১ ঘণ্টা জাল দিতে হয়। ইহাতে কুলেথাড়ার গাছ

পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইলে, সেই অঙ্গার-গুলি ওজন করিয়া, ৮ গুণ জলে গুলিয়া, মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া (বৈজ্ঞ মতে ২১ দাব ছাঁকিলে ভাল হয়, আমি ৪৫ দাব মাত্র ছাঁকিয়া লই) সেই পবিশ্রুত জল লোহ কটাহে রাখিয়া আবার জাল দিতে হয়। জল মরিয়া গেলে বেশ দানাদার একরকম ক্ষার পদার্থ কটাহেব গাত্রে লাগিয়া থাকে। ইহাট কুলেথাড়ার ক্ষার। এই ক্ষার ৬ গ্রেণ হইতে ১২ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ২ বার (আহারের পর্ব) খাইলে, গলষ্ট্রোনের বৃদ্ধি এবং পিত্ত-কোষের বিবৃদ্ধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। আমি বহুস্থলে এই ক্ষারের কার্যকারীশক্তি পরীক্ষা করিয়াছি। কাজটা একটু ‘ভেজকট’—কিন্তু যিনি ইহার গুণ বুঝিতে পারিবেন—তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে—অল্প ব্যয়ে একটী অমোঘ মহৌষধ পাইয়াছি।

কুলেথাড়ার ক্ষার সেবন করিলে, বক্রং কোষে উত্তেজনা উপস্থিত হয়; তাহাতে ক্ষয় জনিত সঞ্চিত পদার্থ বহির্গত হইয়া যায়—কেননা এই ক্ষার উদরস্থ হইবামাত্র পিত্ত নিঃসরণ অধিক হইয়া থাকে। সুতরাং বক্রতে বিলিকবিন সঞ্চিত থাকিতে পারে না। যে রোগীর দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ৰ, মূত্র প্রভৃতি পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, যে রোগী ১০১৫ দিন এই ক্ষার ব্যবহার করিলে—তাঁহার দেহের ও ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কুলেথাড়ার ক্ষার—গলষ্ট্রোনের একটী মহৌষধ। কিছুদিন ইহা নিয়মিত ব্যবহার করিলে আর বেদনা ধরিবার ভয় থাকে না। এই ঔষধের কোন বিষক্রিয়া নাই। বক্রং ইহাতে স্বাভাবিক রূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

এই ক্ষাব সেবনে প্রথম দুই একদিন কোন কোন বোগীৰ গা' বমি বমি করে, এ ভাব ৫৬ দিন পবেই তিবোহিত হয় ।

গলষ্টোনের যন্ত্রণায়, পিত্তকোষের বিরুদ্ধিতে এবং মালেরিয়া জরে—যকৃতের ক্রিয়া ভাল না থাকায় রোগীর শরীরে পাণ্ডুতা দেখা দিলে ও বর্ণ মলিন হইলে, এই ক্ষার প্রয়োগ করিবে। যে কোনও রোগে—শরীরে পাণ্ডুতা দেখা দিলে—এ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহার অত্যশ্রয়া শক্তিতে—কয়েক সপ্তাহেব মধ্যে—গলষ্টোন বা পিত্তশিলা গলিয়া যায়। অল্প প্রয়োগেব আর আবশ্যক থাকে না ।

যখন গলষ্টোন রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, অথচ ইহার ফলপ্রদ কোন ঔষধই দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন—আমার সম্বন্ধক অনুবোধ, চিকিৎসকগণ—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন ।

তবে—এই ঔষধ ব্যবহারের সময়—রোগীর পথের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগীকে এমন পথা দিবে—যেন তাহার যকৃত একটু বিশ্রাম করিবার অবকাশ পায়, অথচ শরীর পোষণেব ব্যাঘাত না ঘটে। দৈনিক ৬ ড্রাম নাইট্রোজেন হইলেই দেহ রক্ষা হয়। পোষণ কার্যে প্রোটাইড্ খাদ্য যথেষ্ট আবশ্যক বটে, কিন্তু উহাব জন্ত যকৃত এবং কিড্‌নীর কার্য অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। কার্বোহাইড্রেট্ পরিপাক করিতে যকৃতকে বেশী খাটিতে হয় না। মাংস, মাখন, উদ্ভিজ্জ তৈল, অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। উদ্ভিজ্জ পথাই সর্ব শ্রেষ্ঠ। তাহার সঙ্গে অল্প পরিমাণে ফলমূলও দেওয়া চলে। যথেষ্ট পরিমাণে জলপান—পিত্ত নিঃসরণের সাহায্য করে।

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়  
এল, এম, এস,

## গার্হস্থ্য মুক্তিযোগ ও টোটকা ।

—:~:—

রশ্চিক দংশনে ।—(১) খানিকট গাওয়া ঘি আগুনে গরম করিয়া একটু সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। (২) ছাগলের নাদি জলে গুলিয়া ঘসিয়া দিলে যন্ত্রণাব উপশম হয়। (৩) রাজা শাকের পাতা মুখে চিবাইয়া লাগাইলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

বোলতা, মোমাছি ও ভীম-কুলের কামড়ে ।—সৈন্ধব লবণের গুড়া ঘসিলে যন্ত্রণার শান্তি হয়।

চুলকণায় ।—(১) খেত চন্দন ঘসিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশাইয়া ২৩ দিন মাথিলে চুলকণা আরোগ্য হয়। (২) চাল মুগয়ার ফল ও হরিদ্রা সমান ভাগে বাটরা গায়ে মাথিলে চুলকণা ভাল হয়।

দস্ত শূলে ।—যদি ১ তোলা চূর্ণ চারি আনা, তুঁতে চারি আনা, গুড়া করিয়া এক পোয়া জলে গুলিয়া গরম করিবে, পরে সেইজল দ্বারা কুলকুচা করিবে। ইহাতে সমস্ত দস্তশূল আরোগ্য হইবে।

মাকড়সার গরলে।—কুড়চির ছাল ১ মাষা, গোলমরিচ চারিটা—একত্র লইয়া বাসিজল দিয়া বাটিয়া ১ সপ্তাহ সেবন করিবে এবং কুড়চির ছাল—বাসি ছাঁকার জল দিয়া বাটিয়া ১ সপ্তাহ গায়ে মাখিবে,—ইহাতে গরল ভাল হইবে।

পাঁকুইয়ের ঔষধ।—মেদিগাছের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে পাঁকুই আরোগ্য হয়।

খোস পাঁচড়ার ঔষধ।—বেগুণের পাতা ভষ্ম করিয়া, তাহার অর্দ্ধেক পাথরের চূণ লইয়া, নারিকেলের তেলে মিশাইয়া, নিম

পাতার জলে ক্ষতস্থান ধুইয়া ৩৪ দিন লাগাইলে খোস পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

কাণপাকায়।—সরিষার তৈল এক পোয়া, নিমপাতা, মিঠাবিষ, হিং ও সমুদ্র ফেণা প্রত্যেক ১০, গোমুত্র ১/১ সের একত্র পাক করিয়া ছাঁকিয়া লাগাইলে কাণপাকা আরোগ্য হয়।

উপদংশে।—মোম ১ তোলা, নারিকেল তৈল অর্দ্ধ ছটাক—একত্রে আগুনে গলাইবে, শীতল হইলে মুদ্রাশঙ্খ ও কজলী ১ তোলা হিসাবে মিশাইয়া দিবসে ২৩ বার প্রলেপ দিলে উপদংশের ক্ষত আরোগ্য হয়।

ত্রিশ্বাংশু ভূষণ সেন গুপ্ত কবিরত্ন।

## বনৌষধি।

—:~:—

অন্ত আমরা দুইট বনৌষধির কথা বলিব। গুলঞ্চ ও নিম। প্রথমে গুলঞ্চের কথা বলি।

গুলঞ্চ ( গুড়ুচী )—গুলঞ্চ সর্বত্রই সহজ প্রাপ্য, পল্লীগাম্বে ইহা প্রচুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুড়ুচী দ্বিবিধ, সাধারণ গুড়ুচী ও পদ্ম গুড়ুচী। নিম্ববৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যে গুড়ুচীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঔষধার্থে উহাই শ্রেষ্ঠ। কোন প্রকার অম্লবৃক্ষ যথা তেঁতুল, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষাশ্রিত গুড়ুচী ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় না। নিম্ব বৃক্ষাশ্রিত গুড়ুচীর অভাবে অম্ল বৃক্ষ ব্যতীত অন্যান্য বৃক্ষাশ্রিত গুড়ুচীও ব্যবহৃত হয়।

পদ্ম গুড়ুচীর গাত্রে অতি অল্প উন্নত কণ্টক উদ্ভূত হইয়া থাকে। উভয়বিধ

গুড়ুচীই ঔষধার্থে ব্যবহারযোগ্য।

গুড়ুচী অধিকাংশ স্থলে কাণ্ড দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। গুড়ুচী হইতে এক প্রকার সার বহির্গত করা যায়, তাহাকে গুড়ুচীর চিনি বা “পালো বলে। উহা চা খড়ির জায় যেতবর্ণ চূর্ণ, তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গুড়ুচীর পালো প্রস্তুতের প্রণালী উল্লেখ করা বাইতেছে। কাঁচা গুড়ুচীলতার উপরিস্থিত পাতলা খোসা ছাড়াইয়া লইবে, তৎপর উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া হামসিদ্ধি বা

চৌকিতে কুড়িত করিয়া একটা মৃত্তিকা গাত্রে (হাড়ী বা গামলায়) জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে কুড়িত গুড়ুচী ভিজাইয়া এক দিবস রাখিয়া দিবে। পর দিবস উক্ত গুড়ুচী গুলি উদ্ভব রূপে জলের সহিত মর্দন করিয়া সিটা গুলি পরিত্যাগ করিয়া পাত্ৰস্থ জল স্থিরভাবে রাখিয়া দিবে। ঐ জলের নিম্নে যে পদার্থ দৃষ্ট হইবে তাহাই গুড়ুচীর পালো। কিন্তু উহা পবিত্রত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জল দ্বারা ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইলে তবে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গুড়ুচীর পালো পিত্ত প্রশমক। রক্তপিত্ত বোগে মধুর সহিত সেবন করিলে স্ফুল ফলিয়া থাকে। গুড়ুচীর স্বরস, কঙ্ক, কাথ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

রসায়নে গুড়ুচী।—বাঁহারা রসায়ন কামী, তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে গুড়ুচীর স্বরস ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিবেন।

বিষম জ্বরে গুড়ুচী।—বিষমজ্বরে বা ম্যালেরিয়া জ্বরে গুড়ুচী একটা প্রধান ঔষধ। বাঁহারা নিত্য ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া বঙ্গদেশের হইতেছেন, তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে গুড়ুচীর কাথ পান করিলে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। ইহা হুইনাইনের তুল্য ফলদায়ক।

কামলায়।—(ছাবা) গুড়ুচী। কামলা রোগ (যাহাকে ছাবা বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে) প্রত্যহ প্রাতে গুড়ুচীর শীত কষায় মধু সহযোগে পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বাতরক্তে গুড়ুচী।—গুড়ুচীর রস ৫০ সহ তৈল পাকের বিধানানুসারে তিল তৈলে পাক করিয়া গাত্রে মর্দন করিলে বাত

রক্তের উপশম হয়। পিত্তপ্রধান বাতরক্তে গুড়ুচীর কাথ পান করিলে বিশেষ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্তন্য দুগ্ধ শোধনে গুড়ুচী।—প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধ বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে ঐ স্তন্য পানে স্তন্যপায়ী সন্তান রোগগ্রস্ত হয়। একরূপ অবস্থায় প্রসূতিকে সপ্তাহকাল গুড়ুচী ও ছাতিম ছালের কাথের কিঞ্চিৎ গুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঐ কাথ পান করাইলে স্তন্য দুগ্ধ বিশোধিত হইয়া থাকে।

বাত জ্বরে গুড়ুচী।—গুড়ুচীর কাথ সেবনে বায়ু প্রধান জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

প্রমেহ রোগে গুড়ুচী। পিত্ত প্রধান মেহ রোগী গুড়ুচীর কাথ শীতল করিয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্ত প্রধান মেহ নিরাময় হয়।

আমবাতে গুড়ুচী।—আমবাতগ্রস্ত রোগী গুড়ুচী পেষণ করিয়া (১ তোলা) কিঞ্চিৎ গুঁঠ চূর্ণ সহ সেবন করিলে উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

শ্লীপদে (গোদে) গুড়ুচী।—তিল তৈল বা সর্ষপ তৈল সহযোগে গুড়ুচীর কাথ পান করিলে গোদ প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠে গুড়ুচী।—গুড়ুচীর স্বরস প্রত্যহ প্রাতে পান করিয়া, কিঞ্চিৎ পরে গব্য ঘৃত অথবা মুগের যুগের সহিত অন্ন ভোজন করিলে গলিত কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

হৃদরোগে গুড়ুচী।—হৃদয়স্থিত বায়ুতে বৃক “ধড়ফড়” করিলে গুড়ুচী পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে, উহা উপশমিত হইয়া থাকে।

**ক্রিমিরোগে গুড়ুচী।**—ক্রিমিরোগে গুড়ুচীর কাথ কিঞ্চিৎ মধুসহযোগে পান করিলে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ডাক্তারি মতে যে স্থলে কলম্বা ব্যবহৃত হয়, আয়ুর্বেদ মতে তৎস্থলে গুড়ুচীর ব্যবহার হইয়া থাকে। গুড়ুচী শোণিত শোষক, পিত্ত প্রশমক, বয়ঃসংস্থাপক। শীতজ্বর, গুরুক্ষয় কৃত দুর্বলতা, মূত্রকৃচ্ছ্রে গুড়ুচী বিশেষ উপকারী।

**মেহ বা গণোরিয়ায় গুড়ুচী।**—পাষণ ভেদীর (পাথব কুচির) রস ও গুড়ুচীর রস সমাংশে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতে পান করিলে সপুষ্ট মেহ বা গণোরিয়া প্রশমিত হয়। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রেও বিশেষ ফলদায়ক।

গুড়ুচী বলকারক, জরনিবারক এবং মূত্র সরলকর, ইহা বিশেষ রূপে পরীক্ষিত হইয়াছে।

**নিম্ব।**

নিম্ব বৃক্ষ তিন প্রকার। নিম্ব, মহানিম্ব কৈডর্য। মহানিম্বকে ঘোড়ানিম্বও বলিয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধে আপাততঃ নিম্বের গুণ বর্ণনা করিব। ত্রিবিধ নিম্বের আকৃতি পার্থক্য রহিয়াছে।

**কুষ্ঠে নিম্ব।**—কুষ্ঠগ্রস্ত রোগীর নিম্ব মহৌষধ। নিম্ব তরুতলে বাস, নিম্বপত্রে ব্যঞ্জন, নিম্বপত্র ভক্ষণ - কুষ্ঠের ক্ষত স্থানে নিম্ব পত্রের প্রলেপ বিশেষ উপকারী। কুষ্ঠ রোগীর মান ও পানীয়জল নিম্ব পত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ব্যবহার করিবে। যে কুষ্ঠরোগীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে, তাহাকে নিম্বপত্র দ্বারা জল উত্তপ্ত করিয়া ক্ষত ধোত করাইবে। শয়নকালে কাঁচা নিম্ব পত্র শয্যায় বিছাইয়া তত্ক্ষণাৎ শয়ন

করাইবে। কুষ্ঠরোগীর বাসগৃহের চতুর্দিকে নিম্ব বৃক্ষ থাকিলে—উহার শীতল বায়ুতে রোগের উপশম হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগীর পক্ষে নিম্ব তৈল মহোপকারী।

**পাদিণী কণ্টক রোগে নিম্ব।**—

ইহা এক প্রকার চর্মরোগ বিশেষ। গাত্রে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকবৎ খসখসে দাগ দৃষ্ট হয়। ঐ রোগে নিম্বছাল ১ তোলা, সোণালু পত্র ১ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ এক চটাক দ্বারা প্রত্যহ ঐ স্থান ধোত করিবে।

**বাতরক্ত রোগে নিম্ব।**—নিম্বপত্র

ও তিক্তপটোল লতা—পূর্বোক্ত কাথ প্রস্তুতের নিয়মানুসারে প্রস্তুত করিয়া, কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে।

**সুরামেহ রোগে।**—নিম্বছালের কাথ বিশেষ উপকারী।

**দাহ জ্বরে নিম্ব।**—জ্বরের প্রদাহ হইলে নিম্বছালের কাথ পান করাইবে। নিম্বপত্র দ্বারা ব্যঞ্জন ও নিম্বপত্র শয্যা বিছাইয়া তত্ক্ষণাৎ শয়ন করিবে।

**কফজ তৃণায় নিম্ব।**—কফপ্রধান জ্বরে তৃণাধিক্য হইলে নিম্ব ফুলের উষ্ণ কাথ পান করাইবে। ইহাতে বমন হইয়া তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইবে।

**ব্রণক্ষেতে নিম্ব।**—নিম্বপত্র দ্বারা জল সিক্ত করিয়া ক্ষত ধোত করিলে ক্ষত স্থান পরিস্কৃত হয়। নিম্বপত্র গব্য ঘূতে ভাজিয়া শিলায় পেষন করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে, ঐ মলম যে কোন প্রকারের ক্ষত হউক তাহাতে প্রয়োগ করিলে অভ্যঙ্গ কাল মধ্যে ক্ষত পূরণ ও শুদ্ধ হইয়া থাকে।

**বিষনাশনে নিম্ব।**—কোন প্রকার হাবর, বিষাক্তক বস্তু হইলে নিম্ব কাথ খেলে

করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমনের দ্বারা বিষদোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

**কেশের অকালপকতায় নিম্ন ।**

বৃক্ষ্যাত্মক পূর্বক নাক জ্বারভোজী হইয়া এক মাস কাল নিম্ন তৈল কেশে মর্দন ও নিম্ন তৈলেব নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপকতা দূর হয়। খালিতা (টাক) বোণেও নিম্ন তৈল বিশেষ উপকারী।

**শীতপিত্ত, বিস্ফোটক, কোষ্ঠ, কণ্ঠ, ক্ষতরোগে নিম্ন ।**—শরীরে নানা রোগে চুলকাইয়া অত্যন্ত সময় মধ্যে যে চক্রবৎ গালবর্ণ দাগ ও সে স্থান ক্ষত হইয়া উঠে ও সমাপ্তেরে উঠার কিছুই থাকে না, —এতাকে শীতপিত্ত বলে। ঐ বোণে এক বিস্ফোটকাদি উল্লিখিত রোগ সমূহে শুষ্ক নিম্নপত্রচূর্ণ গব্যায়ুতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অথবা কাঁচা নিম্ন পত্র ও শুষ্ক আমলকী দ্বারা পেষণ দ্বারা পেষণ করিয়া গাড়ে মর্দন করিলে উন্নীত ব্যাধি নিরাময় হইয়া থাকে, ইহা পিত্তাক্ষেপ পক্ষে মহোপকারী।

**কামলা রোগে নিম্ন ।**—নিম্নছালের বা নিম্নপত্রের রস ২৪ ফোঁটা মধু সহযোগে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে কামলা রোগ নিবারণ হয়।

**হৃদ্রোগে নিম্ন ।**—কফজ হৃদ্রোগে

বচ ও নিম্ন ছালের কাথ পান করিলে বমন দ্বারা হৃদ্রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

**নেত্ররোগে নিম্ন ।**—নিম্নপত্র ও কিঞ্চিৎ ভুট, (আদা শুষ্ক) সামান্য জলের সহিত পেষণ করিলে, তৎপরে উষ্ণে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ ঠাণ্ডা করতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চক্ষের উপর ও নিম্ন পাতায় প্রলেপ দিলে, (সতর্ক থাকিতে হইবে যেন চক্ষু ভিতর ঈষৎ প্রবেশ না করে, অসাবধানতাবশতঃ কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইলেও কোন ক্ষতিব কাষণ নাই) দিবসে ২৩ বার এইরূপ প্রলেপ দিলে চক্ষুর কণ্ডু (চুলকান) ক্ষীণ ও বেদনা নিবারণিত হয়। কাঁচা নিম্ন পত্রের রস কিঞ্চিৎ কাঁচা হরিদ্রার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে ৩৪ ফোঁটা প্রদান করিলে, চক্ষু পিচুটী নষ্ট হয়, এবং চক্ষুর দীপ্তি উজ্জ্বল হয়।

**শিশুর জ্বরে নিম্ন ।**—মধু ও গব্য যুতের সহিত কাঁচা নিম্নপত্র নিম্ন অগ্নিতে (কাঠকয়লায়) দগ্ধ করিয়া ঐ ধূম শিশুর গাড়ে লাগাইলে জ্বর নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

**ক্রিমিরোগে নিম্ন ।**—ক্রিমিরোগে, প্রত্যহ প্রাতে নিম্নপত্র রস ২৩ ফোঁটা মধু সহ বোণে সেবন করাইলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

**রক্তপিতে নিম্ন ।**—রক্তপিত্ত রোগী নিম্নপত্রের ঝোল সেবন করিলে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়, কবিরত্ন।

**আয়ুর্বেদ সভায় পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে একখানি পত্র ।**

আয়ুর্বেদ সভায় আয়ুর্কীরী চিকিৎসা ও দুইটা পঠিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বাঙালী  
আয়ুর্বেদে—পণ্ডপ্রবন্ধ—জীর্বা যে প্রবন্ধ সাহিত্যে সুপরচিত, প্রথিতনামা লেখক  
মাঘ—৫

ঐযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ প্রবন্ধ দুইটির লেখককে যে পত্র প্রেরণ করিয়া ছিলেন, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্ত এইস্থলে উদ্ধৃত হইল। চণ্ডীবাবু আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ী না হউন, কিন্তু তিনি যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি কল্পে পত্র খানি লিখিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

চণ্ডীবাবুর লিখিত বিষয় এই—“আয়ুর্বেদ” পত্রিকায় তোমার দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। তুমি একজন আয়ুর্বেদ-ব্যবসায়ী হইয়াও আয়ুর্বেদের ক্রটি বিষয়ে যে ভাবে আলোচনা করিয়াছ, তাহাতে তোমার উদার মতের সনর্থন না করিয়া থাকা যায়না এবং সাধারণের বিশেষতঃ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের নিকট তুমি যথার্থই ধন্যবাদের পাত্র একথা অস্বীকার করা যায়না। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তোমার উদ্দেশ্য প্রাচীন আয়ুর্বেদকে বর্তমান কালোপযোগী করিয়া গ্রহণ করা; অবশ্য তাহা পুরাতনকে পরিত্যাগ করিয়া নহে, বরং পুরাতনের পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রচলন দ্বারা। কেননা আমাদের পুরাতনই বিদেশীয়দিগের নূতনের ভিত্তি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পুরাতনের স্মৃতি ব্যতীত অস্ত্র চিহ্ন কিছুই নাই। চিরকাল সেই গৌরব-স্মৃতি বৃকে করিয়া গর্ভ প্রকাশ করিলে জগতের সমুখে গৌরব লাভ তো হইবেই না, অধিকন্তু হাশাস্ত্র হইতে হইবেই। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকবৃন্দের পশ্চাতে সময় সময় ধিকারের যে করতালি প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা কি অযৌক্তিক? আমার তো বোধ হয় না।

“কেবল কায়চিকিৎসার জ্ঞান ও কায়তত্ত্ব হওয়া প্রয়োজন, ইহাই তো আমার বিশ্বাস।

তুমিও সেই কথাই বলিয়াছ, তবে তোমার প্রবন্ধের বিরুদ্ধ-সমালোচনা কেন হইয়াছে, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের আর্থ্য আয়ুর্বেদকে জগত সমক্ষে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সর্বপ্রকারই তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে হইবে। কেবল মুখের কথায় লোক ভুলিবেনা, কাজে দেখাইতে হইবে। পূর্বে যে সকল ব্যাধিতে লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, আজকাল অস্ত্রোপচার দ্বারা সেই সকল ব্যাধি কেন সফল ও সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইতেছে? এ সকল বিষয় নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও কি পুরাতনের বাধা বুলি আওড়াইয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং “মডার্নিটি” চিকিৎসকগণের নিন্দা করিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইবে?

“আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি মুসলমান রাজাদিগের স্বল্প ও কাল মাহাত্ম্যে বাধা হইবার তাহা তো হইয়াছেই, তদ্ব্যতীত স্বার্থপর ব্যবসায়ীদিগের কার্যাদোষেও ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। যখন দেশে ম্যালেরিয়া—মহামারীরূপে প্রবেশ লাভ করিল এবং নিত্য শত সহস্র লোককে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া, জনপূর্ণ গ্রামগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিতে উত্তত হইল, তখন কবিরাজ মহাশয়গণ চিকিৎসায় সাফল্য লাভ দূরের কথা, কেবল চুপ করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং এক্রূপ মহামারী দৈবের সীড়ন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহাদিগের কর্তব্য অর্থাৎ চিকিৎসকের কর্তব্য এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল। কিন্তু তখন এই নিদারুণ ব্যাধির সম্মুখে “কুইনাইন” লইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রাভিজ্ঞ ডাক্তারগণ দণ্ডায়মান হইলেন এবং এই কালব্যাবধির পত্তিরো



করিতেও কৃতকার্য হইলেন। দেশের সাধারণ লোক কবিবাজগণকে ফেলিয়া ডাক্তারগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমার বোধ হয়, এই সময় হইতেই দেশীয় আয়ুর্বেদ দূরে গড়িয়া রহিল; উচ্চস্থান ও সম্মানজনক আসন অধিকার করিল—বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও তরলু বড়ী ডাক্তারগণ। তখন,—বলিতে লজ্জাও করে—ছঃখও হয়—কিন্তু এটা খুব সত্য কথা—আয়ুর্বেদ বিশারদগণ বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ও সেই শাস্ত্রবাবসায়ী ডাক্তারগণের এবং ম্যালেরিয়ানাশক কুইনাইনের কুৎসা বটনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কুইনাইনের ম্যালেরিয়া দমনের অদ্ভুত শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আপনারাও কুইনাইনের বটিকা—নাম পরিবর্তন করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন! ইহাতে তাঁহাদের অর্থাগম হইতে লাগিল বটে, কিন্তু ফল কি হইল? পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী এদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল, কুইনাইন কবিরাজী ব্যবসায়ের অন্তর্গত হইয়া উঠিল। বাস্তবিক প্রকৃত কথা বলিতে গেলে বলা যায় যে, এই সমস্ত হিংসাপরায়ণ স্বার্থ সর্বস্ব কবিরাজকুলের কল্যাণেই হিন্দুর গৌরবের আয়ুর্বেদ,—জগতের আদি চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ—অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকারে গা' ঢাকা দিল। তাহাকে বাহির করিয়া বিশ্বের বাজারে প্রচার করিবার জন্ত কেহ যত্নও করিলেন না।

“তুমি আয়ুর্বেদের ক্রুটি পরিলক্ষিত করিয়া এই সমস্ত কবিরাজগণকে উদ্ধৃত্ত করিবার জন্ত লেখনী চালনা করায় উহারা তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত তোতাপাখীর মত শিক্ষকের বুলি আশ্রয় করিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিতে-

ছেন, তাঁহারা যত বড় বিজ্ঞ বিচক্ষণই হউন, নিজের শিরে নিজে অস্বাধাত করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ লোক যখন পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালীর, পাশ্চাত্য চিকিৎসকবৃন্দের নিন্দা করিতে থাকেন, তখন বাস্তবিকই হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে! কেননা যিনি যে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তিনি সেই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া পাণ্ডিত্য প্রচার করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাদিগের এই অনধিকার চর্চাই তাঁহাদিগের স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকে।

এখনকারদিনে আয়ুর্বেদের উন্নতি করিতে হইলে, তাহার একাঙ্গ লইয়া আন্দোলন করিলে চলিবে কেন? অষ্টাঙ্গেরই আন্দোলন চাই। যদি সক্ষম হও তবে আয়ুর্বেদ লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ ও ব্যবসায়—পরিত্যাগ কর। অষ্টাঙ্গের একাঙ্গ, (তাহারও বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে) অধ্যয়ন করিয়া অষ্টাঙ্গের পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা কেন? ইহারইনাম “ভাঁবের ঘরে চুরি!” বিশেষতঃ কায়চিকিৎসা বলিতে গেলেই ত শল্যাদি অস্ত্রাস্ত্র অঙ্গ তাহারই অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। শল্য শালক্যাদিতে পারদর্শী না হইলে কিরূপে কায়চিকিৎসায় দক্ষ হওয়া যাইবে? সূত্ররাজ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষা না করিলে তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক বলিব কেন?

“যে কুইনাইনের নিন্দায় কবিরাজ মহাশয় গণ চতুর্মুখ, সেই কুইনাইন জিনিষটা কি? উহা কি আয়ুর্বেদবহিত্ত কোন পদার্থ? আমার তো বোধ হয় না। গুলকের পালো, নাটার বীজ যে শ্রেণীর ঔষধ, কুইনাইনও তাহাই, উহা তো বৃক্ষ বিশেষের পালো মাত্র! তবে নামটা

বিদেশী বটে! এই কি তার অপরাধ! অতি মাত্রায় কুইনাইন দ্বারা কুফল ফলিতে পারে বলিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সফল ফলিবেনা কেন? কবিরাজগণের সেকো অতি মাত্রায় কুফল প্রদান করে বলিয়া, তাঁহারা কি উপযুক্ত মাত্রায় তাহার ব্যবহার করা পরিত্যাগ করিয়াছেন? তবে কেবল কুইনাইনকেই এত দ্বার চক্ষে দেখা কেন? এ কেবল অঙ্গের কাছে প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াস মাত্র।

“আর একটা সত্য কথা অনেকের অপ্রিয় হইলেও তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; কারণ তুমি আজ প্রকৃতপক্ষে গোড়ামি পরিত্যাগ করিয়া সত্যের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছ। আমার বিশ্বাস, আয়ুর্বেদের অবনতির আরও একটা খুব গুরুতর কারণ আছে। পূর্বে বিদ্রু ও বহুজ্ঞ ধনুস্তরিক্স চিকিৎসকগণ নিজ নিজ বাস ভূমিতে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করিয়া রাজা মহারাজ হইতে নিতান্ত দীনহীন ভিক্ষুকেরও চিকিৎসা করিতেন এবং এইরূপ দরিদ্রের উপকার করাতেই জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করিতেন। বড় লোকের জন্ত বহু ব্যয় করিয়া যে সমস্ত মূল্যবান ঔষধ প্রস্তুত হইত, কবিরাজ মহাশয়ের রূপায় দীনদরিদ্র জনসাধারণে সেই সকল মূল্যবান ঔষধের দ্বারা উপকৃত হইত। তখন তাঁহারা গরীবের জন্ত তিন পরসার ঔষধের মূল্য তিন টাকা ধার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন এবং এরূপ করাকে অর্থম্ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। গরীবের জন্ত তাঁহাদিগের ঔষধ বিতরণের কথা মনে হইলে মনে হয় যে, তখনকার এক এক জন “কবিরাজ বাড়ী”ই ছিল আজকালকার “দাতব্য চিকিৎসালয়!” আধুনিক প্রত্যেক কবিরাজ

মহাশয় যদি তাঁহাদিগের পিতামহ-প্রপিতামহ গুণ্ডতির কীর্তিকাহিনী মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমাকে আর এজন্ত পৃথক প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে না। কিন্তু এখন কি আর তেমনটি আছে? বিলাস বিহীন ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল কবিরাজ মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া পিতৃপিতামহের বাসভূমিতে সদা্য দিহেন এবং প্রতিবাসী দীন দরিদ্রের জীবনদানে অনন্ত পূণ্য অর্জন করিতেন, এখন তাঁহাদেরই বংশধরগণ মুখে পাশ্চাত্যচিকিৎসাপ্রণালীর অথ্যাতি রটনায় অভ্যস্ত হইয়া ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মগ্ন হইয়া, বিলাসের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া, জগাভূমি পল্লীর মায়া পরিত্যাগ পূর্বক নানারূপে কৃতার্থ হইতেছেন। তাঁহার বাণ্য সহচরের পরিবারবর্গ মালেকিরায় কষ্ট পাইতেছে,—নিত্য নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে,—যমের সহোদর পাড়ারগে হাতুড়ে-ডাক্তার কবিরাজের উপর নির্ভর করিয়া অদৃষ্টবাদী পল্লীবাসী তিল তিল করিয়া মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছে, আর তিনি নগরমাঝে হুদার্ব সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া,—মোটর জুড়ি হাঁকাইয়া—প্রভূত অর্থোপার্জনে নিজেকে কৃতার্থননা অনুভব করিতেছেন! তাঁহারই দীন প্রতিবাসী যে অসময়ে এক বিন্দু ঔষধের অভাবে শমন সদনে গমন করিতেছে, ইহা তাঁহার চিন্তারও অবসর নাই, কিন্তু তিনি বাবসায়ের খাতিরে—অর্থের উদ্দেশ্যে আয়ুর্বেদের উন্নতি জন্ত খেয়াল দেখিতেছেন! বলিতে কুক ফাটিয়া যায়—আধুনিক কবিরাজগণ অর্থের লোভে পল্লী ছাড়িয়াছেন, দেশ তুলিয়াছেন, আত্মীয় স্বজনের মায়া বিসর্জন দিয়াছেন, বিলাসে ডুবিয়াছেন; কিন্তু বাহ্যিক তাঁহাদের

পরিভ্রান্ত পল্লীবাসীর রোগের সময় ঔষধ দিয়া চিকিৎসাকার্যে ব্যাপৃত আছেন, দেশরক্ষায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা মড়াকাটা ডাক্তার বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছেন ! বিজ্ঞতার বাহাদুরী নহিয়া মরিণ্ডে ইচ্ছা হয়। দেশেরলোক আজ-কাল কবিরাজমহাশয়দের 'সর্বজরহরলোহ' যে কি পদার্থ তাহা জানেনা, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এক পরসাব চারি গ্রেন কুইনাইনের ট্যাবলেট খুঁচিনিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়গণ কুইনাইনের দত্তই নিন্দা করুন, লোকে তাঁহাদের কথা শুনিবে কেন? তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, এদেশেবই চিরপ্রবাদ "কেবল কথায় চিড়ে ভেঙ্গে না।"

"চতুর্থের সহিত আরও একটা কথা বলিতে

হয়,—আজকালকার কবিরাজ মহাশয়গণ পল্লী-গ্রামের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পাচন প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য বৃক্ষাদির পুঁথি গত পরিচয় তাঁহারা অবগত থাকিলেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গাছগাছড়াড সঙ্গ তঁাহাদের পরিচয় আছে বলিয়া বোধ হয় না। "অনন্তমূলের" সহিত "স্বক্ষফলা"র পার্থক্য নির্ণয় করা বোধ হয় অনেকেরই সাধ্যাতীত।

"আমার কথাগুলো অপ্রিয়; কিন্তু সত্য। হয় তো কিছু রুচও হইয়া থাকিবে। কি করিব ভাই, তোমার প্রকৃত কথার প্রতিধ্বনি স্বরূপেই এই অপ্রিয় কথার অবতারণা করিতে হইল।"

গুভানুধ্যায়ী—

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## সর্বনেশে ক্রিমি বা ছকপোকাকার প্রতিকার।

—:~:—

( বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশের বক্তৃতা )

সর্বনেশে ক্রিমি বা ছকপোকাকার প্রতিকার করে গত ২৮শে নভেম্বর সায়াংকালে কলিকাতা টাউনপ্রাসাদে সেনেটোরি বোর্ডের এক বিশেষ সভা বসিয়াছিল। সভার উদ্বোধনে বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম আমরা নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

ছকপোকায় রোগী এদেশে বিস্তৃত। সাধারণ উহার প্রকৃতি অবগত নহে, এমন কি, অনেক এই রোগোৎপাদক কীটের নামই অবগত নহে, সেইজন্ত এই বিষয়টি সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

ছকপোকা একরূপ পরগাছা, উহার দৈর্ঘ্য প্রায় আধ ইঞ্চি। মানুষের অন্ত্রের মধ্যে উহাদের বাস। অজীর্ণ এবং রক্তহীনতা—এই দুইটি রোগ ইহার উৎপাদন করিয়া থাকে। এই পীড়ার আক্রান্ত হইলে লোকের কাজকর্মে উৎসাহ থাকেনা এবং অলস হইতে হয়।

নাগ্ন্যবস্থার অন্ত্রে অবস্থান কালে ছকপোকা বহুসংখ্যক ডিম্ব প্রসব করে, ঐ ডিম্ব সফল মলের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে এবং উদ্ভাপ ও আর্জতা সহযোগে উহার অতি

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:—

### ধূমপান নিবারণ আইন।—

সংপ্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের জন্ত ধূমপান নিবারণ আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। ১৬ ঘণ্টার কম বয়সের কোনো বালক ধূমপান করিতেছে দেখিলেই এই আইনের বলে পুলিশ বা ক্ষমতা প্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক ও জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা বালকদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন। এই অপরাধে অপরাধী বালকদিগকে প্রথমবার সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে এবং ৫, ১০, টাকা, উক্ত সংখ্যা ২৫, অর্থদণ্ড হইতে পারে। আমরা এ আইন পাশে সুখী হইরাছি।

মেডিকেল কনফারেন্সে আয়ুর্বেদ।  
আমরা গুনিয়া সুখী হইলাম, দিল্লীতে যে মেডিকেল কনফারেন্স বসিয়াছিল, তাহাতে কথা হইয়াছে “ভারতের কোনো কোনো মেডিকেল কলেজে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশী চিকিৎসা বিজ্ঞানশিক্ষার সুবিধা করিয়া দিন।” সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণেও একথা সমর্থন করিয়া বলেন—“আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা অবিলম্বেই করিয়া ফেলা উচিত। আমাদের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে দেশী চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় সন্নিবিষ্ট করিলেই সহজে ইহা সাধিত হইতে পারে। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্ত স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিয়োগ করা উচিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে এদেশী

ঔষধ সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্ত এক ফার্মাকোপিয়াসমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক এবং সেই সমিতি ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার মত একখানি ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া সংকলন করুন।”

### ভেজাল ঘৃত বিক্রয়ে দণ্ড।—

ভেজাল ঘৃত বিক্রয় করিবার জন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ৩০।১১।১৮ তারিখে দণ্ডিত হইয়াছে

—(৬) চম্পরান—২০ এবং ২১নং বড়তলা স্ট্রিট, জরিমানা—১৪০ টাকা (২) রামলাল, ২৯নং বাশতলা স্ট্রিট, জরিমানা ১২৫ টাকা। (৩) শিউপ্রসাদ রাম ও তাহার দোকানের চাকর সখিচাঁদরাম, জরিমানা—যথাক্রমে ৩০০ ও ১০০ টাকা। (৪) পোপাতলাল ৮১ নং মল্লিক স্ট্রিট, জরিমানা ২০০ টাকা।

### বিজ্ঞ চিকিৎসক।—

ডাক্তার কার্তিক চন্দ্র দাস জনৈক বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। বহুদিন হইতে ইনি আমাদের পরিচিত। অনেকবার আমরা ইহার চিকিৎসায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইনি চিকিৎসাকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার সাধারণের অনুরোধে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইনি হোমিওপ্যাথ হইলেও আয়ুর্বেদের পক্ষপাতী। ইনি আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথির সম্মিলনে মাইক্রোপ্যাথি নামক নূতন চিকিৎসার উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা পুরাতন জটিল রোগসমূহ আরোগ্য করিতেছেন।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৩য় বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫— ফাল্গুন।

৬ষ্ঠ সংখ্যা।

## আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার বর্তমান অবস্থা ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির উপায়।

( নিখিল ভাবতবর্ষীয় দশম বৈদ্য সম্মেলনে দিল্লী নগরীতে হিন্দী ভাষায় পাঠিত। ) \*

—:০:—

বহু ভ্রমাদিত হইয়া থাকিলেও তাহার দৃষ্টিকোণ নষ্ট হয় না। সুগন্ধি পুষ্পভবক ভিন্ন ভিন্ন দলিত এবং পূর্ণাসিত হইয়া কক্ষ প্রাপ্ত এক তম দেশে রক্ষিত হইলেও তাহার স্বাভাবিক কক্ষমধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিগণের দুর্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। বহুল আয়াস দ্বারা রক্তশেষ পদ্যরাগ নিশীথকালের ঘোর তন্দ্রাচ্ছন্ন স্থানে রক্ষিত হইলেও দিব্য জ্যোতিঃ বিকীরণ পূর্বক সে স্থানকে আলোকময় করিয়া তুলে।

এখনকার দিনে আমাদের সনাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অবস্থাও সেইরূপ। শুভ-ক্ষেণ জগৎপ্রভা হিরণ্যগর্ভ ইহার আবিষ্কার

করিয়া দক্ষ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, ইন্দ্র এবং ত্রিকালদর্শী আর্য্যস্মিগণের ভিতর ইহার শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থায় পুণ্যভূমি ভারতজননীকে এক অপূর্ব সম্পদের অধিকারিণী করিয়া ছিলেন। সমগ্র বিশ্ববাসী সে সম্পদ দর্শনে শুধু যে বিমগ্ন হইয়াছিল, তাহা নহে;—সে সম্পদের রূপা-প্রসাদ পাইবার জন্তও সে সময় সমগ্র বিশ্ব উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। আরবীয়-গণ, গ্রীসবাসীগণ এবং গ্রীসদেশ হইতে সমগ্র বিশ্ববাসী এইরূপে ইহার কিয়ৎপরিমাণে প্রসাদ লাভ করিয়া একদা যে কৃতার্থমনা হইয়াছিল,—তাহারই ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজি সমুন্নত হইয়া প্রকাণ্ড মহীশয় মাঝে

\* হিন্দী অনুবাদের সময় পাঠিত প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে বলিয়া মূল বাঙ্গালা হইতে কতক কতক স্থান বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

শারীর তত্ত্বের চরমোৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হই-  
তেছে। আর আয়ুর্বেদ।—ব্রহ্মার কমণ্ডলু  
নিঃসৃত দিবৌবধি সকলের সমন্বয়ে সুসংবদ্ধ  
বেদ-বেদাঙ্গ-তন্ত্র-উপনিষদের সার সঙ্কলন—  
সমগ্র বিশ্বচিকিৎসার মূল গ্রন্থ—পুণা—পাঁচত্র  
জীব চিকিৎসার পরিসমাপ্ত গ্রন্থ—আনাদের  
আয়ুর্বেদ! রাষ্ট্রবিপ্লবে—কচিবিপর্ষায়ে—  
শিক্ষার ব্যতিক্রমে—নানাকারণে ছিন্ন ভিন্ন  
ও বিপর্যাস্ত হইয়া—ভ্রাম্মাচ্ছাদিত বহির জায়  
—দলিত এবং পর্যাসিত পুণ্ড্রবকের জায় ও  
নিশাথকালের তমসাচ্ছন্ন কক্ষে পদ্মরাগ মণির  
জ্বার অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

সত্য কথা—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা যদি  
সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত না হইত—চিকিৎসা বিজ্ঞা-  
নের সর্বোচ্চ বিষয়ের চিন্তা করিয়া যদি ইহা  
আবিস্কৃত না হইত—ইহার প্রচারিত ঔষধ  
সকলের কার্যকারী শক্তি যদি মনুষ্যজন্মের মত  
ফলপ্রদ না হইত—তাহা হইলে এ চিকিৎসা  
—জীবকুশলেচ্ছ আর্গাঞ্চনিগণের জানগভীর  
গবেষণা সমুদ্র ত সনাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা  
যে কোন্‌কালে কোন্‌ অতীত গগনের বিশ্বতির  
কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া ইহার অস্তিত্ব পর্যন্ত  
বিলয় প্রাপ্ত হইত, তাহার আর সন্দেহ মাত্র  
নাই। বাহা খাঁটি—বাহা সত্য—বাহা অভ্রান্ত  
—বাহা সংশয় রহিত—প্রকৃতই তুমুল সং-  
গ্রামের তাণ্ডব নৃত্যও তাহার অস্তিত্ব নষ্ট  
হয় না। ইন্দুনিভ কাক্ষণ পাবক শিখায় বর্ণ-  
হীন হইলেও তাহা খাঁটি বলিয়াই প্রমাণিত  
হইয়া থাকে। প্রারুটের ঘনঘটাচ্ছন্ন গগনে  
কিয়ংকালের জন্য হিমাংকুরিয়ণ লোক  
লোচনের অন্তরালে অবস্থিত থাকিলেও মেঘ  
মুক্ত নির্মল আকাশে আবার তাহার মনোমদ  
অংশুরাশি সুনন্দনে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত

হইয়া থাকে। রোগে ভোগ আছে, সে  
ভোগে অপূর্ণ সৌন্দর্যশালিনী বোড়শী হৃদয়ের  
স্বভাবস্বলভ চমৎকারিনী দৃশ্যগোচ্য নষ্ট  
হইয়া অস্থি কঙ্কাল সর্ব্বষ হইলেও সে রোগ  
ভোগের অন্তে আবার তাহার সম্পদ সত্তাব  
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সর্ব্বস্তান জড়িয়া পুষ্পাব  
আনিয়া থাকে। বিশ্বজগতে বিশ্ব নিরন্তর  
নিয়মই এইরূপ। ইহার প্রতিবেদ করিবার  
কিছুই নাই।

তাই বলিতেছিলাম,—আমাদের আয়ুর্বেদ  
—হিন্দু রাজত্বের অবসানে—মোগল-পাশতনের  
সৌভাগ্য লক্ষ্মী ভারত গগনে সন্নিবিষ্ট হওয়ার  
সঙ্গে সঙ্গে ইউনানি বা হাকিমি চিকিৎসা বাজ  
সাহায্য লাভে পরিপুষ্ট হইয়া তাহার শক্তি  
সামান্য প্রচার করিবার সুযোগ ও সুবিধা  
পাওয়ায়,—সমগ্র বিশ্ব সংসারবিজয়ী ভগবৎ  
সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসা গ্রন্থ আয়ুর্বেদ তাৎ-  
কালিক ভারত সম্রাটের প্রকৃতি পুঞ্জের নিকট  
একেবারে অনাদৃত না হউক, ক্রমশঃ উপেক্ষিত  
হইতে লাগিল। সেই উপেক্ষাই হইল—  
আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সর্ব্বনাশের মূচনা।  
ক্রমে মোগলের বিজয় লক্ষ্মী যখন সুসভা  
ইংরাজ রাজের করতলগত হইয়া ভারত  
বাদীর সংসার পরিচালনার অংশ স্বত্বসম্বন্ধি  
তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিল,—সেই  
সময় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অঙ্গ বিশেষ—  
ইউনানি বা হাকিমি চিকিৎসাও লুপ্ত প্রায়  
হইল এবং অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচার  
হওয়ায় ভারতবাসীর রোগ চিকিৎসার এক  
অভিনব ঐক্যজালিক দ্বার উন্মুক্ত হইয়া উঠিল।  
সনাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অভ্যন্তর প্রদেশে  
যে সকল অমূল্য রত্নরাজি নিহিত আছে,  
ভারতবাসী তাহা আর বহু পূর্ব্বক রক্ষা করি

বার চেষ্টা করিল না,—এখনকারদিনের পাকাতা বিজ্ঞান সুপাণ্ডিত, মাজিতবুদ্ধি চন্দ্রা সন্তান বেকুপ গলিতদন্ত - পবিত্রকেশ বকীরাণ—বখায়দী-জনকজ-ননার পরিচর্যায় কড়বাপানন অপেক্ষা হাবভাবশালিনী নবোদ্য পতীর প্রীত্যাংপাদনে আত্মতৃপ্তির পলকদ্বি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিকৃত বুদ্ধি চন্দ্রা সন্তানও সেইরূপ আয়ুর্বেদের অসাধারণ শক্তিময় পাতন মুষ্টিযোগ, চূর্ণ-বটিকা মৌদিক-অবশেষ, তৈল ঘৃত—সকলই বিসর্জন দিয়া পিন্‌মিশ্রিত, লেপন-অয়েন্টমেন্ট, এসেদিকট-মিকুইয়েডের দৃশ্যশোভা ও সহজ স্নেহ ব্যবহার প্রণালী নিরীক্ষণে বিমূঢ়—বিস্ময় হইয়া উঠিল।

ঠিক এমনই সময়ে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব নৃত্য বন্ধ হইয়া বিপর্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে—সে সময় আলোপাথিক চিকিৎসা দেশে মধ্যে অল্পে অল্পে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইতেছে—ঠিক সেই সময়ে বাঙ্গালার মুশিদাবাদ ও কাশিমবাজারে এই রোগের প্রথম প্রাচুর্য্য আরম্ভ হইল। কিন্তু এখনও আয়ুর্বেদের চিকিৎসার পাতন-মুষ্টিযোগ বা চূর্ণ-বটিকাকে উন্নয়ন করিয়া এই রোগ নিবারণের জন্য আলোপাথিক চিকিৎসার প্রাচুর্য্য হইবার প্রবৃত্তি দেশের সকল বোকেব ওষধি উঠে নাই। ম্যালেরিয়ার নব নৃত্য হইলেও ইহা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিবেচ্য ভিন্ন অজ্ঞ কিছুই নহে—সুতরাং বাঙ্গালার মুশিদাবাদ ও কাশিমবাজারের ম্যালেরিয়া-নিবারণে যাহাদের মনে তখনও আলোপাথিক চিকিৎসার অমুরাগ-বাসনা জাগিয়া উঠে নাই, তাহারা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকেরই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু

বিধাতার নিরীক্কে ইহার ২০ বৎসর পরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার যশোহর জেলার মহম্মদপুর গ্রামে ইহা প্রকট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যখন গ্রামখানি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল,—মহম্মদপুরের পঞ্চ সহস্র অধিবাসী যখন ঐ দাক্ষণ ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণে কালকবলিত হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রতাপের কথা সমগ্র দেশ-বাসীকে উপলব্ধি করাইয়া দিল, তাহার পর মহম্মদপুর ধ্বংস করিয়া যশোহর, নদীয়া, ২৪ পরগণা—এক কথায় বাঙ্গালার সকল স্থানেই যখন এই প্রচণ্ড মূর্ত্তি কালানল ছড়াইয়া পড়িল, তখনই সত্য সত্য আলোপ্যাথিক চিকিৎসা—কুইনাইনের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য সমগ্র বাঙ্গালায়—ক্রমে সমগ্র ভারতে একাধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইল। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার বতগুলি কারণে অবনতি ঘটয়াছে, আমাদের মনে হয় বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া তাহার একটি কারণ। এই ম্যালেরিয়া না হইলে আমাদের দেশে কুইনাইনের মহিমা বড় একটা প্রচারিত হইত না। কুইনাইন অপেক্ষা 'নাটা'র বেশী ফল হয় কিনা, হরিভালঘটিত ঔষধ প্রয়োগে ম্যালেরিয়াবিষ নষ্ট হয় কি না, কুইনাইনের সহিত প্রতিযোগিতায় আয়ুর্বেদীয় কোনো ঔষধ দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ কিনা—সে সব বিষয়ের আলোচনা আমি এক্ষেত্রে করিতেছিলাম,—আমি আয়ুর্বেদের ইতিহাস আলোচনায় যতটুকু দরকার—তাহাই বলিয়া' যাইতেছি মাত্র।

যাক তা'রপর। তা'র পর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিল কি কারণে সে কথাটা এইবার একটু বিশদ করিয়া বলিব। মোগল-পাঠানের অভ্যুদয়ে—যৎকালে ইউ

নানির প্রচলন আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ হইল, —সেই সময় পুরুষপবম্পণায়—আয়ুর্বেদের সেবা ভিন্ন যাহাদের গতান্তর ছিল না, তাঁহারাও অবস্থা বুঝিয়া কন্সাল্টরে মনোভি-নিবেশ ফরিলেন। ইংরাজের অভ্যুদয়ে সে মনোভিনিবেশটা আর একটু বেশী করিয়া হইল। তাহার ফল এইরূপ ফলিল যে, অষ্টাদশ আয়ুর্বেদের চর্চা ভিন্ন যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয় না —পক্ষান্তরে অষ্টাদশ আয়ুর্বেদের শল্য-শালাকা প্রভৃতি তত্ত্ব সকলের শিক্ষালাভ তো দূরের কথা,—কায়চিকিৎসারও সকল তথ্যেব শিক্ষা না করিয়া, নিত্যন্ত উদ্বাসের—সংস্থানের জন্ত অনেকে এই ব্যবসায় বতী হইয়া, শুধু অর্থোপার্জনের পথই সুপরিষ্কৃত করিতে সচেষ্ট হইলেন। রাজ আইনে আমাদেব শল্য চিকিৎসার এই সময় এক ভীষণ অন্তরায় ঘটিল বটে, কিন্তু যদি তখন আমাদের সনাতন শল্য চিকিৎসার পবিত্র সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত আমাদের মনে প্রগাঢ় বাসনা জাগিয়া উঠিত,—নরসুন্দরপুঙ্খবেব হস্তে অস্ত্র চিকিৎসার ভার অর্পণ পূর্বক যদি আমরা নিশ্চিন্ত না হইতাম, ভারতে নূতন কক্ষক্ষেত্রে প্রবিষ্ট শস্ত্রবিশারদ চিকিৎসকদিগের কাব্য-কলাপ সন্দর্শনে যদি আমরা চমৎকৃত হইয়া, শুধু তাঁহাদের পারদর্শীতার প্রশংসনা করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় রাজ আইনে ভারত বাসার শস্ত্র চিকিৎসার যে একটা বিধম অন্তরায় ঘটয়াছিল, সকলের মিলিত চেষ্টার ফলে সেই অন্তরায়ের অন্তরায় সংবটন ভারতবাসীর নিকট বড় কঠিন হইত না,—অস্ত্র চিকিৎসার অভাবে আমাদের আয়ুর্বেদের অঙ্গহানি হইতেছে—এ কথা যদি আমরা প্রাণ খুলিয়া

সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিজ্ঞাপন করিতাম, মহাবি স্মরণত প্রাণীত যন্ত্র ও উপকরণ বিবরণ, ক্রিয়া ও প্রতিকৃতির প্রকটন করিয়া, তদ্বিরচিত তাবৎ চিকিৎসা প্রণালী যদি আমরা তখন ত্রায়নিষ্ঠ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেব নিকট নিবেদন পূর্বক তাহা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক সমাজে অপ্রতিহত রাখিবার জন্ত তাঁহাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতাম, এক কথায় অস্ত্র চিকিৎসাই যে আয়ুর্বেদের সর্বপ্রধান চিকিৎসা—এ কথা যদি আমরা তাবৎ তাবৎ বৈজ্ঞ সন্মেলনে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, ইংরাজেব তুল্যদিগে কখনই আমাদেরকে অদ্ব্যহীন হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা কবিতো হইত না। আমরা তখন সে চেষ্টা করি নাই।

ধর্ম্মার্থী কীর্ত্তিনার্থ্যং সত্যংগ্রন্থম্ভগবৎ  
প্রাপ্তুয়ান্ স্বর্গবাসঞ্চ তিঃসারভা কক্ষণা।

এ কথা তখন আমরা ভূমিয়া গিরাতি।

“তথা বিব্রাতি কেবলো শরীরজ্ঞানে শরীরতি নিবৃত্তি জ্ঞানে প্রকৃতিবিব্রাতিজ্ঞানে চ নিঃসংশয়াঃ সুখসাধ্যা ক্লুচ্ছসাধ্যা বাপা প্রত্যা পোয়াগাঞ্চ বোগাণাং সমুত্থান পূর্ব্যরূপ লিঙ্গ বেদনোপশয় বিশেষ বিজ্ঞানে বাপগত সন্দেহাঃ” প্রভৃতি শ্লোকের অর্থ তখন আর আমাদের পারণায় আসিতে পারে না।

“কপিলো ক্রোড়ীদানান্নি যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম ফলং তৎ কোটীপুণিতমেকাতুরা চিকিৎসয়া।  
একথাও তখন বৈজ্ঞ ভুলিয়াছে।

ফলে তখন দেশের হৃদিনে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—শল্য চিকিৎসা রক্ষা করিবার লোক আর কেহই রহিল না। তা’ ছাড়া বৈজ্ঞচিকিৎসকগণই শারীরতত্ত্ববিদ চিকিৎসকদিগকে ‘মড়া’কাটা চিকিৎসক’ বলিয়া



দুগা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মধুসূদন গুপ্ত যখন প্রথম মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন ইংরাজজাতি চোপের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার সম্মান বাধিয়াছিলেন, কিন্তু শবব্যবচ্ছেদের ফলে সমাজ তাঁগকে পতিত করিতেও চেষ্টার ক্রটি করে নাই। ভারতীয় সমাজের তখন তো এইরূপ অবস্থা!

কলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির একটি প্রধান কারণ অল্প চিকিৎসার অঙ্গহানি। Practical জ্ঞান অর্জনে 'সে শস্ত্র চিকিৎসা-শিক্ষা প্রাপ্তি তো কাহারও নাই-ই, সুশ্রুত পাঠেও বিয়লগুণি বুরিবার প্রবৃত্তি বৈজ্ঞানিক মনোপাট্য আছে। যে শরীর লইয়া আমরা চিকিৎসা-সাধন করিতে হইতেছি, সেই শরীরবস্তুর প্রত্যেক বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুশীলন করা কর্তব্য নহে কি? আমরা বড় বড় গ্রন্থ পাঠেই জ্ঞান প্রাপ্তিপরায়ণ হইতেছি, কিন্তু আমাদের বর্ষপরিচয়েই জ্ঞান জন্মে নাই! অবস্থাটা কিরূপ ভাবুন দেখি! আমরা এ স্থলে ব্যাপ্তি-কক্ষে . দোহাই দিয়া কপাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি-কক্ষে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তো শরীরস্থানের শিক্ষালাভ সর্বপ্রথম কর্তব্য। কলে যে শিক্ষার অভাবেই আমাদের আর্ঘ্য চিকিৎসা-অবনতি ঘটয়াছে—ইহা নিভাঁজ মতা কথা, এ কথার প্রতিকূলে বলিবার কিছুই নাই।

আয়ুর্বেদের উন্নতি করিতে হইলে ঋত্বী বিদ্যাতেও আমাদের পাদদর্শী হইতে হইবে। এক কথায় শলা, শালাকা, কায় চিকিৎসা, ভূতবিজ্ঞা, কৌমারভূতা, অগ্নি ভূত, বদায়নতন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র—আয়ুর্বেদের

সকল অঙ্গ গুলিই আমাদের তন্ন তন্ন করিয়া অয়ত্ত করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিষয়ের সংমিশ্রণে ভারতের সকল স্থানেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক। দেখ হিংসা তুলিয়া এক মনে এক প্রাণে সেই সকল বিদ্যাপীঠেই সাধনায় সকলকে প্রাণপণ করিতে হইবে, কারচিকিৎসার যে সকল গলদ—যথা 'মকরধ্বজের' পর্বিবর্ত্তে 'রস সিন্দূরের' প্রচলন, সস্তাব প্রলোভন দেখাইয়া পিণ্ড চাবনপ্রাশের পরিবর্ত্তে আমলকী পিণ্ড প্রদান, সহস্রপুটিত লৌহ অস্ত্রের পর্বিবর্ত্তে এলামাটির গুঁড়া মিশ্রিত লৌহ অস্ত্র বাজার হইতে কিনিয়া ঔষধ ব্যবহার—এ সকল বৈদ্য চিকিৎসার ভিতর হইতে একেবারে পরিহার করিতে হইবে। আমরা যদি এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হইতে পারি, তবেই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পুনরুন্নতি সম্ভবপর হইবে, নতুবা ইহার অধঃপতন আরও যে অবশ্যম্ভাবী, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আয়ুর্বেদ অনন্ত রত্নের আধার। বেদব্যাস মহাভাবত-প্রসঙ্গে সেরূপ বলিয়াছেন,—বাহা মহাভারতে নাই, তাহা পৃথিবীর কোনো ইতিহাসেই নাই, আমরাও সেইরূপ দস্ত করিয়া বলিতে পারি,—যাহা আয়ুর্বেদে নাই, তাহা পৃথিবীর কোনো চিকিৎসা পুস্তকেই দৃষ্টিগোচর হইবে না। তুমি আমি এ কথা বুঝিতেছি না, কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক সমাজ এ কথা বিলক্ষণই বুঝিয়া থাকেন। তোমাদের রক্তাবলী হইতে মকরধ্বজ, মুগনাভি, অশোক, গুলঞ্চ, কালমেঘ, অম্বগন্ধা তাই তাঁহারা বাছিয়া লইয়া আদর করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। এই দিল্লীতেই গত ডিসেম্বর মাসে যে মেডিকেল কনফারেন্স হইয়াছিল, তাহাতে তাহার সভা-

পতি ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছেন—“দেশীয় ভৈষজ্য ও চিকিৎসা প্রণালীর অনুসন্ধানের জন্ত বিশেষ চেষ্টা আবশ্যিক। ভারতের মেডিকেল কলেজগুলিতে আয়ুর্বেদীয় অধ্যাপক নিয়োগের চেষ্টা করা আবশ্যিক এবং ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার মত ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া প্রস্তুত করা আবশ্যিক।”

আসল কথা, তোমাদের মহামহিম মহিমা দ্বিত বিশাল আয়ুর্বেদ সমগ্র চিকিৎসার মূল ভিত্তি সে তো পুরাতন কথা,—উপস্থিত অত্র চিকিৎসাবলম্বীগণ তোমাদের রত্নরাজি যে নূতনভাবে গ্রহণ করিতে মনস্থ করিতেছেন, ইহাতে তোমাদের গৌরব বাড়িবে কি কমিবে—তাহা ভাবিবার বিষয়। তোমাদের অঙ্গ চিকিৎসা তো এমনই করিয়াই বিলম্বপ্রাপ্ত হইয়াছে! শুধু বিলম্ব প্রাপ্ত নহে—উচ্চ অবস্থা এক্ষণে একরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তোমাদের পূর্ববর্তী চিকিৎসকগণ যে অস্ত্রবিশারদ ছিলেন, এ কথা তোমরাই এখন আর বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহ। ডাক্তারি চিকিৎসায় তোমাদের অস্ত্রাস্ত্র ঔষধাদি যদি গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে উহার অবস্থাও যে অস্ত্র চিকিৎসার মত দাঁড়াইবে না। তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু তোমরা যদি নিজেরা আয়ুর্বেদের প্রকৃত চর্চা পরিহার না কর, শল্য-শালাকা প্রভৃতি আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গের শিক্ষায় সত্য সত্য তোমরা যদি সুপণ্ডিত হইতে পার, প্রত্যেক দ্রব্য সন্দর্শন মাত্র যদি তাহার নাম ও গুণব্যখ্যায় তোমাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে না হয়, তাহা হইলে তোমাদের রত্ন অত্র চিকিৎসকগণ যতই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করুন,—তোমরাই যে তাহার প্রকৃত অধিকারী—সে পরিচর আর

জগতে কাহারও নিকট নূতন করিয়া দিতে হইবে না। মাইকেল ‘মেঘনাদ বধে’ নূতন ছন্দে বিন্যাস বাঙ্গালায় আবিষ্কার করিলেও উহা যে ইংরাজীর ছাঁচে ঢালা—তাহার জন্ত আর কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। তোমরা তোমাদের নিজের দ্রব্য রক্ষা করিতে পারিলে, অন্য তোমাদের অনুকরণ করিলেও মাইকেলের ‘মেঘনাদবধের’ অবস্থা যে প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

তোমরা নিজের ঘরের দিকে তাকাইয়া নিজের জিনিস রক্ষা করিবার জন্ত চেষ্টা কর, ভারতের নানাস্থানে বিদ্যাপীঠের সৃষ্টি করিয়া চরক সূত্রপুত্রের যুগ ফিরাইয়া আনিবার সংকল্পে কায় চিকিৎসার মত শল্য চিকিৎসার পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হও, ডাক্তারেরা যেমন তোমাদের ঔষধ গ্রহণে তাঁহাদের চিকিৎসার অঙ্গ পুষ্টি করিবার জন্ত উদগ্রীব—তোমরাও সেইরূপ তোমাদের লুপ্তপ্রায় বিস্ময়গুলি তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণপূর্বক তোমাদের পূর্বে চিকিৎসার গৌরব ফিরাইয়া আনিয়া, সেই ঋষিকল্প অর্থাৎ চিকিৎসার যুগের পুনঃ প্রবর্তনে সচেষ্ট হও—ইহাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, ইহা ভিন্ন আর আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

শেষ কথা—এতদিন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখনও বৈজ্ঞানিক সন্তান জাগরিত হও। চক্ষুরম্বিলিত করিয়া চাহিয়া দেখ—নিখিল বেদের সারাংশ সম্বলনে তোমাদের যে আয়ুর্বেদ রচিত, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্কর্ণ সম্পদলাভের একমাত্র উপায় যে আয়ুর্বেদের প্রত্যেক পৃষ্ঠার জলন্ত অক্ষরে ছুটিয়া উঠিতেছে, শুধু চিকিৎসার কথা নহে—দর্শন এবং বিজ্ঞানের পূর্ণপ্রতিভা যে আয়ুর্বেদের প্রত্যেক অক্ষরে প্রকটিত—

তোমাদের শিক্ষার অভাবে তাহা আজি ছন্ন ছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। তোমাদের অবস্থা দেখিয়া—তোমাদের বিবেকবুদ্ধির অভাব বোধিয়া—এক কথায় তোমাদিগকে অসার ও অকর্মণ্য উপলব্ধি করিয়া—তোমাদের ● অমূল্য বহু অস্ত্রে লুণ্ঠন করিবার জন্ত চেষ্টাশীল। এ সময় আব তোমাদের অপদার্থের মত নিশ্চিন্ত থাক। কোনোক্রমেই কর্তব্য নহে। দ্বিগুণ দেশের 'মানি'র অর্থ্য্য বহু সহস্র বৎসব ধরিয়া ঔষধবিশেষ রক্ষিত মৃতদেহের কথা শুনিয়াছ কি? আয়ুর্বেদের উৎকৃষ্ট ভেষজ গুলি বিজাতীয় চিকিৎসকের করতলগত হইলে আদ্যাদিগকে ও যে ক্রমে মিসরবাসীর অবস্থায় পড়িতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তাই বলি, বৈজ্ঞানিক, আর নিশ্চিন্ত থাকিও না, উঠ,—জাগ। জাগিয়া আবার প্রাচীন কালের শিক্ষালাভের জন্ত সচেষ্ট হও, —অষ্টাদশ আয়ুর্বেদের যথারীতি শিক্ষালাভ করিয়া,—শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন নহে—হাতে কলমে সে শিক্ষার সাফল্য লাভ করিয়া—সকল বিষয়ে পারদর্শী হইয়া, চিকিৎসার সকল অঙ্গের জ্ঞান-গর্ভে তুমি গব্যায়ান হইয়া উঠ, তোমার জাগরণে বিশ্বসংসার জাগরিত হউক,—দিগ্ধগুণ মুখ রিত হইয়া তোমার জয়কীর্তন করুক,—তুমি অস্ত্রের নিকট অপরাজের—অক্ষয়—অমর হইয়া ঋষিপ্রদর্শিত-পন্থায় সমগ্র বিশ্ববাসীর পূজা পাইতে চেষ্টা কর—আয়ুর্বেদের পুনরুন্নতির জন্ত ইহাই প্রত্যেক বৈদ্যসন্তানের নিকট আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ। ফল কথা, দেশের 'বড় ডাঈন'—এ ডাঈনে আশ্রয় রাখা করিতে হইলে আব আমাদের অচেতন প্রায় থাকিলে চলিবে না,—উঠিতে হইবে—জাগিতে হইবে—নিদ্রার অবসাদ একেবারে পরিহার করিতে হইবে।

তাই আবার বলি—বৈদ্য সন্তান, আর ঘুমাইও না—ঘুমের নেশা কাটাইয়া ফেল—উঠ—জাগো—জাগো—জাগো।

আর একটা কথা। এই কথাটা বলিয়াই আমাদের বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিব। অষ্টাদশ আয়ুর্বেদের পুনরুন্নতির জন্ত স্থানে স্থানে যে বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা কথার কথা বলিয়াছি, —সে কথাটার প্রত্যেক আয়ুর্বেদীয়চিকিৎসক কে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে—এ প্রস্তাবটা উপেক্ষার বিষয় নহে—উপেক্ষার হাফ্ফে আস্য বিকাশ পূর্বক ইহা উড়াইয়া দিলে আর্ঘ্য চিকিৎসা যে কিছুতেই পুনরুন্নতি ঘটিবে না—ইহা খাটি সত্য কথা। আর্ঘ্য চিকিৎসার অবনতির বহুগুলি কারণ দেখাইয়াছি, তা' ছাড়া আর একটি কারণ সকলে জানেন কিনা জানিনা—সেইজন্ত সে কথাটাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা আবশ্যিক মনে করি। মহামাত্ত ইংরাজ রাজের রূপায় যে সময় মেডিকেল কলেজের স্থাপনা হইল, সেই সময় মণ্ডুদন গুপ্তের দেখাদেখি অনেকে ডাক্তারি শিক্ষার জন্য কুকিয়া পড়িলেন। ইহার ফলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের ব্যবসায় পরিচালনায় বিঘ্ন তো ঘটিলই, তা' ছাড়া এই সময় আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থগুলির সমালোচনা ও অনেক আয়ুর্বেদীয় পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ পর্যন্ত হইয়া গেল। এই সমালোচনা ও অনুবাদ কারীদিগের মধ্যে কোনো একজন ডাক্তার তাঁহার প্রণীত হিন্দু মেটেরিয়া মেডিকার ভূমিকায় প্রকাশ করিলেন—“আয়ুর্বেদ অবৈজ্ঞানিক, ইহার ভিতর প্রত্যক্ষ ও পরিদর্শনযোগ্য কিছুই নাই।” সনাতন আয়ুর্বেদের পক্ষ ধর্য্য করিবার জন্ত এই সময় অনেকেই চেষ্টা করিতেছিলেন, এমনই সময়

ঐ ডাক্তার মহাশয়ের এই উক্তি তাহার বিলক্ষণ পোষকতা করিল—দেশ ব্যাপিয়া রাষ্ট্র হইল—“আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ভ্রমাত্মক, ঐ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা কার্যে একান্তই অধুপযোগী—উহারা হাতুড়ে বা কোয়াক” কিন্তু আয়ুর্বেদ বিরূপ বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা,— ডাক্তারদিগের মত আনাতোমী পড়িয়া, ফিজিও-লজি শিখিয়া, সার্জারিতে সুপাণ্ডিত হইয়া এ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা কার্যে, ত্রীতী হইতেন কিনা—তাহা সুবিখ্যাত ডাক্তার ওয়াইজ প্রভৃতি অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ডাক্তার ওয়াইজ তাঁহার প্রণীত হিন্দু সিস্টেম অব মেডিসিন নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, “রীতিমত শব্দচ্ছেদ করিয়া আয়ুর্বেদের শারীর স্থান লিখিত হইয়াছে।” কিন্তু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগের ভাগ্য বিপর্যয়ে দেশ-বাসীর রুচি এতই পরিবর্তিত যে, সে কথা শুনিবার আর প্রয়োজনই নাই। একজন ডাক্তারের কথায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ যে হাতুড়ে বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের চিকিৎসা গ্রন্থ তাহারই ফলে quackery ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বাস্তবিক আমাদের ছিল সব, কিন্তু এখন যে লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ‘ছিল’ বা আমাদের গ্রন্থ মধ্যে আছে এ কথা বলিয়া আর নির্দ্বাক থাকিলে চলিবে না, সেই অভাব পরিপূরণের জন্ত ভারতের নানাস্থানে আমাদের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক সত্যতা উদ্ঘাটন করিয়া বিদ্যাপীঠের সৃষ্টি একান্তই করিতে হইবে। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ইহার প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছে। যথারীতি আনাতোমী ও সার্জারির শিক্ষা দিয়া—আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ সকলকে সংক্ষেপ ও সহজ বোধ

ভাবে প্রণয়ন পূর্বক ছাত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এই বিদ্যালয়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। মাধবকরের নিদানে যে সকল কথার উল্লেখ নাই, অথচ যে সকল বিষয়ের অনুলেখ থাকিলে নিদান শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না—তাহা বিস্তার শ্রম স্বীকার পূর্বক সংগ্রহ করিয়া রোগ বিনিশ্চয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্বক এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে রোগনিদান বঝান হইতেছে। কুমারতন্ত্র, বিষতন্ত্র, শলা তন্ত্র, শালাকা তন্ত্র, দ্রব্যগুণ শিক্ষার পুস্তক এই বিদ্যালয় হইতে যেরূপ ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বর্তমানকালে আয়ুর্বেদ শিক্ষার পন্থা সুগম করিবে বলিয়া মনে হয়। তবে বাঙ্গালায় একটি কবিতা আছে—

“চাঁদেও কলঙ্ক আছে মৃগালে কণ্টক”

সেইজন্ম এ বিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থা যেরূপ অন্তর্ধান লইয়া গঠিত, তাহা হয় তো দোষশূন্য না হইতে পারে। কিন্তু আয়ুর্বেদের পুনরুন্নতির জন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞার সমন্বয় যে একান্তই আবশ্যক—সে পক্ষে যদি সন্দেহ না থাকে—তাহা হইলে কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় কর্তৃক সে উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। যাহা হউক আমাদের মনে হয় আয়ুর্বেদের পুনরুন্নতির জন্ত ভারতের সকল স্থানেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের যদি কোনো ভ্রম প্রমাদ ঘটয়া থাকে—প্রত্যেক বৈদ্য সন্তানের তাহা দেখাইয়া দেওয়া কর্তব্য। কলে আমাদের কথা হইতেছে—হে মহামহিম মহিমা—সর্বজনবরণ্য বৈদ্য চিকিৎসকগণ—সনাতন আয়ুর্বেদকে রক্ষা করিবার জন্ত বৈরী সমস্তদের প্রতিকার করিয়া

চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত নহে—এই মিথ্যা অপবাদ সমগ্র বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার জন্ত, জীব-কুশলা-কাজা ফলমূলশী সর্বত্যাগী আর্ঘ্যস্বাধি মণ্ডলীর বৈজ্ঞানিক মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত,—ভেদা-ভেদ ভূমিগা,—দ্বৈষ-হিংসা ত্যাগ করিয়া,—স্বার্থ-পরার্থ বিসর্জন-সলিলে নিমজ্জিত করিয়া—দাহ্য যতটুকু শক্তি আছে—বাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে—বাহার যতটুকু সামর্থ্য আছে—দৈবা চিকিৎসার পুনরুন্নতির বিরাট—বিশাল-বহুবল তেহার আহুতি সম্পাদনে বৈজ্ঞানিক নামের নুচিনা বক্ষ্যায় ধত্তমনা হইয়া—জাতীয়-গৌরব বক্ষ্যায় কৃতকৃতার্থ হও। তোমরা যে পুণ্যপূত কর্ম বাপি লইয়া লোকহিতার্থ জন্মগ্রহণে একদিন বিশ্বব্যবস্থা হইয়াছিলে,—ব্রহ্মার ছিন্নশিরঃ সংস্কারে তোমাদেরই পুণ্যকীর্তি পূর্বপুরুষ একদিন যে বজ্রাংশ গ্রহণের অধিকারী হইয়া-ছিলে তোমাদের চিকিৎসা গ্রন্থের প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক সত্যতা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া,

সমগ্র বিশ্ব যে তোমাদের গর্বে হিংসা-প্রবণতায় তোমাদিগকে খর্ব করিবার অধিকারী—এই খাটি সত্য কথা আর না বুঝিয়া নিশ্চিত থাকিলে কিছুতেই চলিবে না, সেইজন্ত অনুবোধ করিতেছি—তোমাদের অধঃপতিত অবস্থা সন্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া তোমাদের নিকট করবোড়ে নিবেদন করিতেছি,—সমাজের গৌরবস্থল—দেশের আশা ভরসা—সোদর প্রাতিম বৈজ্ঞানিকবাসীগণ,—আর নিশ্চিত থাকিও না,—উঠ,—নিদ্রার ঘোর পরিত্যাগ কর,—জাগো, জাগো জাগো। দেশের বড় দুর্দিন—তাহা মনে কর,—তোমরা কি ছিলে আর কি হইয়াছ—তাহা মনে কর,—যাহা ছিলে—তাহা ফিরাইয়া আনিবার জন্ত আবার বন্ধপরিকর হও—সময়ে তোমাদের, দুদিন আবার নিশ্চয়ই আসিবে—সময়ে তোমরা আবার নিশ্চয়ই যাহা ছিলে, তাহা হইবে। তাই আবার বলিতেছি—জাগো, জাগো, জাগো।

ত্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

## রোগ নিবারণ কিসে হয় ?

—:—

জগদ্ব্যাপী মহাসমরের প্রচণ্ড দাবানল নির্দোষিত হইতে না হইতেই “ইনুফ্লুয়েঞ্জা” নামক মহামারী ভীষণভাবে সংহার কার্য্য সাধন করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি ছাড়া অত্যাশ্চর্য্য ব্যাধিও এই সংহার কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। পূর্বে সংগ্রামে নিবৃত্ত সকল জাতিই চেষ্টা করিতেছিলেন যে, কিসে সেই ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়-দাষ্টন—২

কারী সমরানল নির্দোষিত হইয়া জগতে শান্তি স্থাপিত হয়। সেই চেষ্টায় যেমন আমেরিকা আসিয়া যোগ দিলেন, তেমনি সকলেরই চেষ্টা ফলবতী হইয়া মহাযুদ্ধে লোকক্ষয়কর ব্যাপার বন্ধ হইল। যুদ্ধে লোকক্ষয় বন্ধ হইল, কিন্তু রোগে লোকক্ষয় বন্ধ হইল কি ? যেমন যুদ্ধের ভীষণ সমস্তা লোকলোচনে নুতা করিতেছিল, তেমনি

ব্যাধির আরও ভীষণতর অথবা সর্কাপেক্ষা ভীষণতম সমস্তা মধ্যে মধ্যে আশার আশা দিয়া ঘোরান্ধকারে বিভ্রাচ্ছটার তায় অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করিতেছে। আবার সকল দেশের লোক বন্ধপরিষর হইয়া স্বাস্থ্যসমিতি গঠন প্রভৃতি কার্যের দ্বারা মহামারীর দাবদাহ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ভারত শুধুই নিশ্চেষ্ট। যুদ্ধের সময় আমাদের সম্রাটকে সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া ভারতের অতুলনীয় রাজভক্তি যুদ্ধ সাহায্যে জাগাইয়া ছিল। এখন সেই যুদ্ধ যেমনি বন্ধ হইয়াছে, ভাবত তেমনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঘুমাইলে আব চাপিতেছে না। মৃত্যু গভীর হস্তারে আমাদের গণকে তাহাৰ তাণ্ডবলীলা দেখাইতেছে। ইহাতেও যদি আমরা প্রতিকারের কোন উদ্যোগ না করি, তাহা হইলে পরিতাপের বিষয় নহে কি? দেশে চিকিৎসকের অভাব—বিশেষ সুর্চিকিৎসকের। যিনি নিলোভ হইয়া নিজের ভরণপোষণের আয়োজন ও পরোপকার উভয় কার্যই করিতে পারেন এরূপ চিকিৎসক ত অত্যন্তই বিরল। ইহার পূর্ক প্রবন্ধে এই মহামারীর কাবণ ও নিরাকরণের উপায় আমার যৎসামান্য জ্ঞানমতে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহার সমূলে উৎপাতনের ব্যবস্থা—যাহা শ্রীভগবান্ হৃদয়ে থাকিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিতে গিয়া যদি কিছু ভ্রমপ্রমাদের কথা লিখিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা ভাল করিয়া না দেখিয়া লেখনী চালনার ভ্রম মাত্র,—উহা পন্থার ভ্রম নয়। কিন্তু যাহাতে লোকে স্বস্থভাবে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়, কই এবিষয়ে নিষার্থ-ভাবে কে চেষ্টা করিতেছেন? যিনি দরিদ্র,

তিনি তাঁহার দারিদ্র্য কষ্টে কাতর হইয়া দিন-পাত করিতেছেন। যিনি মধ্যবিত্ত লোক—তিনি কোথাও কৃষিকার্য—কোথাও বাণিজ্য—কোথাও দান্তবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা এই ধাত্ত দ্রব্যাদির দুর্ন্যূলের দিনে কোনরূপে পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান করিয়া আর অল্প কার্যের সময় পাঠিতেছেন না। আর যাহারা ধনী—তাহারা অলসে, বিলাসে, খেলায়, নৃত্যগীতে, বাসনে এবং কেহ কেহ কতই কুক্ষিচূর্ণ কার্যে তাঁহাদের অগাধ ধন নিশ্চিন্ত মনে ব্যয় করিতেছেন। কেহ কাহাকেও বাধা দিতে নাই। কোথাও চালক নাই, সকলেই স্বাধীনভাবে যথেষ্ট চলিতেছেন। যিনি চিকিৎসক তাহাৰ দ্বারাই এই দুর্দিনে বেশী উপকারের সম্ভাবনা। কিন্তু তিনিও যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ দ্বারা নিজেকে ধনী করিবার জন্য “চরক” “সুশ্রুত” প্রভৃতি গ্রন্থ কথিত চিকিৎসকের গুণকে উপেক্ষা করিয়া মন্থন্য জীবনেব বহুমূল্য সময় অগথা ব্যয় করিতেছেন। অত্যাচ্ছ ব্যবসায়ীদের ত কথাই নাই। কিসে অত্যন্তে বঞ্চনা করিয়া নিজে প্রভূত ধনের অধিকারী হইব—অত্যাচ্ছ ব্যবসায়ীদের গুণ তাহাৰই চেষ্টা! পূর্বে লোকে এইরূপ ধন-লালসায় ব্যাকুল হইয়া কর্তব্য বিস্মৃত হইত না। বিষয়-বাসনা-বিষ লোককে এত জর্জরিত করিতে পারে নাই। রামায়ণে মহামুনি বাল্মিকী অযোধ্যাবাসীর বর্ণনাকালে অযোধ্যাবাসীর দুইট গুণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন—প্রথম কেহ কাহারও অপেক্ষা বেশী ধনী হইত না—সকলেই সমভাবে ধনী ছিল এবং ইহাতেই তাহারা সুখী ছিল; দ্বিতীয়—তাহারা কার্যক্ষেত্রে কর্তব্য নির্ধারণ তৎক্ষণাৎ করিতে পারিত। আমাদের এই দুইটিরই অভাব। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ অত্যন্ত লোভী,

“অসদ্বৃষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণ নষ্ট হওয়ায় অসত্য জাতিও নষ্ট হইয়াছে। ফলে পাশ্চাত্যামু-করণ আমাদের কেবল দোষভাগেবই হইয়াছে, গুণভাগেব হয় নাই। তাহাদের মত আমরা চন্দ্রকে ভুলিয়াছি, ধর্মকে ভুলিয়াছি এবং সব ছাড়িয়া এক সংসারকে চিনিয়াছি। কিন্তু ভ্রাতাদের মত কর্তব্যনিষ্ঠা, বিপদে কর্তব্যাবধারণ ও তদুপে চেষ্টা, একতা, পরোপকার, দয়া প্রভৃতি কোন সদগুণের অনুকরণ কবি না।

যিনি বাবহারজীবী, তিনি তাঁহাব উচ্চশিক্ষা ও পরিমার্জিত বুদ্ধি দ্বারা কি করিয়া বেশী অর্থ উপার্জন করিতে পাবেন, কি করিয়া অত্যধিক বক্ষণ করিয়া নিজে ধনবান হইতে পারেন, তাহাও চেষ্টা করিব। যিনি বাণিজ্য করিতে-ছেন—তিনি তাঁহাব সূতা দি পণ্যদ্রব্য লোকের প্রাথমিকক বিখ্যাত দ্রব্যাদি লোকের অজ্ঞাত-মাবে ও অজ্ঞানিতে মিশ্রিত করিয়া ধনী হইবার চেষ্টা দ্বিধা পোষ করিতেছেন না। চিকিৎসক মহোদয়গণও যিনি বিশেষ ও উচ্চশিক্ষা পাঠ্যা-ছেন, তিনিও অর্থেব দাস হইয়া কত অনর্থ সাধন করিতেছেন। যিনি দর্শনীতে চিকিৎসাব বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া নিজেব কৃত্তিত্বেব ঢাক বাজাইয়া, কত প্রকারে নানাবিধ বিজ্ঞাপনের জাল বিস্তার করিয়া রোগকাতর-জ্ঞানশূন্য রোগীকে—কুরঙ্গকে বংশীবাদন দ্বারা লুদ্ধ করার ছায় নিজের জালে ফেলিয়া অবোধে ঐশ্বর্য্যবান হইতে-ছেন। চিকিৎসকের মোটর গাড়ী, কলিকাতার প্রশস্ত বাজপথেব উপর বৃহদাটলিকা প্রভৃতি বহুবায়ুমাধ্য ব্যাপারেব আয়োজন না হইলে তাহাব ১৬ টাকা ৩০ টাকা বা তদূর্দ্ধ দর্শনীর উপায় হয় না। কিন্তু আমাদের এই দরিদ্র ভাবে কতদিন এইরূপ চলিবে! চিকিৎসক-গণও যদি এই ভীষণভাবে অর্থ সংগ্রহে তৎপর

হন, তবে তাঁহারা চিকিৎসা দ্বারা পরোপকার কি প্রকারে করিবেন? এখনকার দিনে পরোপকারের কথা বলিলে লোকে গাঞ্জে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে।

চিকিৎসকের এখন প্রথম দৃষ্টি অর্থে। সেই অর্থোপার্জনের পথ প্রসার করিতে যদি রোগীকে কষ্ট পাইতে হয়, রোগ বেশী দিন ভোগ করিতে হয় ও রোগীর জন্ত গৃহস্থানীকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়, তবে চিকিৎসকের কর্তব্য কি হইল? ফলকথা এখনকার অনেক চিকিৎসকই যে অর্থশোষণে তৎপর—একথা বলিলে অন্যায় হইবে না। পূর্বেকার চিকিৎসক-গণ কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি। ৬গয়ানথ কবিরাজ আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী মহ-কুমার অন্তর্গত পারুলিয়া গ্রামে একজন বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার গুরু স্বর্গীয় গঙ্গাধরবাব ছায়া তাঁহার পাচন চিকিৎসা-টাই বেশী ছিল। কাজেই চিকিৎসায় কম খরচ পড়িত ও বহুলোকে তাঁহাব দ্বারা চিকিৎ-সিত হইতে পারিত। আমার পিতা ৬বরদা প্রসাদ রায়কে তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে জীর্ণ জরের চিকিৎসা করেন। জীর্ণজরের সহিত শোথ-প্লীহা প্রভৃতি উপসর্গও জুটিয়াছিল। তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণের পূর্বে কবি-রাজ মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি ছয় মাস কাল বাঁচিবেন, যদি তাহার বেশী বাঁচেন, তবে আরোগ্যের সম্ভাব। চতুর্থ মাসে রোগ প্রায় চৌদ্দ আনা উপশম হইয়া আসে। কিন্তু একদিন আবার জ্বর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ পূর্বে লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইল এবং তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত করিল। এইরূপ কঠিন রোগের চিকিৎসায় ২ প্রকার

পাচন, ১টি অবলেহ, ১টি বড়ি ও পঞ্চামৃত লৌহ ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে মাসিক ৬ টাকাব বেশী ব্যয় পড়িত না। তাঁহাব যে মাসে মৃত্যু হয়, তাহার পূর্বের ১ মাসের ঔষধের দাম বাকী ছিল। আমি উহা আন্দাজ করিয়া ৪ টাকা পিতৃদেবের মৃত্যুব পর দিতে গেলে তিনি লইলেন না। যখন আমি বলিলাম,—“তবে আমার পিতৃদেব কি প্রকারে আপনাব ঋণমুক্ত হইবেন”? তখন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,—“উহা কাতাকেও দান করিয়া দেন, আমি মৃত ব্যক্তির ঔষধের দাম লই না।” সেই চিকিৎসক আর এখনকাব চিকিৎসক! এখনকাব চিকিৎসক রোগীর বাড়ী গিয়া দেখিলেন তাহার আগমনের পূর্বেই রোগী পঞ্চম প্রাণ হইয়াছে, তাহার আত্মীয় স্বজন কাঁদিতেছে, সেই সময় কিন্তু তিনি তাঁহার দর্শনীর টাকাটা আদায় না করিয়া যাইলেন না। ৬গয়ানাথ কবিরাজ মহাশয় বড়লোকেরা পাক্কী পাঠাইলে পাক্কীতে রোগী দেখিতে যাইতেন। পল্লীগ্রামে রাস্তা ভাল না থাকায় ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে না। তিনি জুড়ি গাড়ীও রাখেন নাই। নিকটে চিকিৎসা করিতে হইলে পদব্রজেই ঔষধের ব্যাগটি হাতে লইয়া যাইতেন। দূরে হইলে ‘ডুলি’ করিয়া যাইতেন, যদি কেহ বলিত আপনি পাক্কী করিয়া যান না কেন?—তাহাতে বলিতেন—“আমার রোগীর বেশী পয়সা খরচ হইবে, পাক্কী ভাড়া তো রোগীর নিকট হইতেই আদায় হয়। যদি আমি পাক্কীতে যাতায়াত করি, তাহা হইলে অনেক গরীব আমায় ডাকিতে পারিবে না।” চিকিৎসক সমাজের সেই এক দিন, আর আজকালকার মোটর গাড়ী চড়া জুড়ি গাড়ী চড়া, দীর্ঘদর্শনী গ্রহণ করা

চিকিৎসক সমাজের এই এক দিন! এসকল খরচ ছাড়া মহা আড়ম্বরযুক্ত বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিশেষ খরচ আছে, তাহাও কিন্তু ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা রোগীর উপরেই পড়ে। তা’ছাড়া বৃহদটোলিকার ব্যয় ভার। অবশ্যই চিকিৎসকের জীবিকা নির্বাহের কারণে অর্থ আবশ্যক, কিন্তু ঐ সকল নিয়ম অবলম্বনে ও কঠোর হইয়া অর্থ সংগ্রহকেই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং চিকিৎসা দ্বারা রোগীর যত্ন উপশমনকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলে কি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র কথিত চিকিৎসকের গুণ রক্ষিত হয়? প্রাতঃস্মরণীয় ৬গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় একবার একটা নিতান্ত শিরশূল একটা মৃষ্টিযোগ দ্বারা আবোগ্য কবেন, তজ্জন্ম তাঁহাকে কয়েক আনা পয়সা মাত্র খরচ করিতে হয়। এক ধনীর ঐ পাঁড়া হওয়ায় সেই কয় পয়সাব ঔষধেই সেই রোগ আরাম করিয়া তাঁহার নিকট ৫০০ টাকা লন। এখনকার কবিরাজ মহাশয়েরা আমাদের দেশের বিলাস-বাসন-তৎপব পরোপকার-পরাজুখ, জীষ্মের দরিদ্র মূর্খের সেবা-বিমুখ ও গর্বী ধনীর নিকট হইতে অজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করুন, তাহাতে কতি নাই, বরং ভালই কিন্তু সেই অর্থ নিজ ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করিয়া, দরিদ্রকে অকাতরে চিকিৎসা ও ঔষধাদি দান করুন। ৬গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়বে এক ব্যক্তি বলিলেন—“মহাশয় এই কয় পয়সা ঔষধে আপনি ধনীর নিকট অত টাকা কে লইলেন?” তাহাতে তিনি বলিলেন—“বাব আজকাল ধনীর চিকিৎসককে কোন প্রকারে সাহায্য করেন না, যদি উহার নিকট অত টাকা লইব—তবে জয়মঙ্গলরস, বসন্তকুসুমাকর স্বর্ণ পপটি প্রভৃতি বহুমূল্য ঔষধাদি দ্বারা কোথা বিনামূল্যে, কোথাও স্বল্পমূল্যে গরীবের ও না বিত্ত লোকের কি প্রকারে চিকিৎসা করিব



স্বর্গ্য সহস্র সহস্র কর বিস্তার পূর্বক  
পৃথিবী হইতে জলরূপ কর গ্রহণ করিয়া বর্ষা-  
কালে লোকের হিতসাধন জন্য নিজ আকাশে  
কিছু না রাখিয়া সমস্তই অর্পণ করেন “পরোপ-  
কার্য্য সত্য জীবনম”—এই কথা মনে করিয়া  
স্বর্গদেবকে সমস্ত আরোগ্যের নিদান জানিয়া,  
তাহাকে দ্রোণের প্রত্যক্ষ মূর্তি ধারণা করিয়া,  
তাঁহার উদাহরণ গ্রহণ পূর্বক চিকিৎসকগণ  
চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার ফলে  
ভারতবর্ষ বহু ছুঃখ মোচন করিতে পারিয়া  
ইহকালে ও পরকালে উভয় লোকেই সুখৈশ্বর্য্য  
ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন।

আমাব ভ্রাতা ৮শরং চন্দ্র রায়—স্বর্গীয়  
হেমচন্দ্র সেন এম. এ. এম. ডি. মহাশয়ের একটা  
উপযুক্ত ছাত্র ছিলেন। তিনি গরীবদের বিনা-  
পরদায় ঐশ্বর্য্য ত দিতেনই, তা’ ছাড়া বিনা মূল্যে  
ভাল সাপু বালি প্রভৃতি পথ্যের জবাব দিতেন।  
শীতকালে একটা প্রসূতির চিকিৎসায় নিজের  
স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম  
করায় নিউমোনিয়াগ্রস্ত হইয়া অকালে  
৩৬ বৎসর বয়সে স্বর্গধামে গমন করেন।  
তাঁহার পরোপকার বৃত্তি মৃত্যুর পরও কিরূপে  
তাঁহাকে চালিত করিয়াছিল—তাহা নিম্নের  
সত্য ঘটনায় প্রকাশ পাইবে।

আমাদের পুরোহিত শ্রীযুক্ত হুমিকেশ  
ভট্টাচার্য্য, ইনি আপনাদের আয়ুর্কর্মেদে এক-  
জন গৌরব। একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের  
প্রবল জ্বর হয়। তখন রাত্রি ৯টা, ছেলেটি  
জ্বরের ব্যতনায় ছটফট করিতে থাকে। পিতা  
পুত্রের অবস্থার কাতর হইয়া চিকিৎসক  
জন্মিতে পাঠান। তাঁহাকে পাওয়া গেল না।  
তখন তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে কাতর  
ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—“আজ যদি

শরৎ ডাক্তার থাকিত, তবে আমার ছেলেটির  
এই প্রবল ব্যাধিতে এইরূপ বিষম সঙ্কটে  
পড়িতে হইত না।” এইরূপ চিন্তা করিতে  
করিতে তিনি বসিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া  
একটু তন্দ্রাবেশে পড়িলেন এবং সেই সময়  
দেখিতে পাইলেন যে, ৮শরং তাঁহার সম্মুখে  
দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—“ভট্টাচার্য্য মহাশয়,  
আমাকে কেন ডাকিলেন? আমার আসিতে  
বড়ই কষ্ট হইল, দেখুন আমি আর এসংসারে  
নাই—তা’ আপনারা জানেন, তবুও আমাকে  
ডাকিলেন কেন? আর দেখুন, এখন আমি  
চিকিৎসা করি না, আমার কাছে ঔষধাদিও  
নাই যে আপনার ছেলেকে দিব। আচ্ছা  
যখন আসিয়াছি—তখন এক কাজ করুন—এই  
গৃহের কোণে একটা শিশি আছে, উহাতে এক-  
শিশি জল পূরুন ও উহার কতকটা তিনবার  
আপনার ছেলেকে খাওয়াইয়া দেন, জ্বর সারিয়া  
যাইবে।” বলিয়া সেই মূর্তি অন্তর্হিত হইল।  
ভট্টাচার্য্য মহাশয় জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার  
স্ত্রীকে সব কথা বলিলেন এবং একটা শিশিও  
ঘরের কোণে দেখিলেন। উহা জল পূর্ণ  
করিয়া সেই জল প্রথমবার দিবা মাত্র ছেলেটির  
ছটফটানি কমিয়া গেল। আর দুইবার  
দেওয়ার পর সে ঘুমাইয়া গেল। প্রাতে  
চিকিৎসক আসিয়া নাড়ীতে জ্বর নাই দেখি-  
লেন। তাহার পর সে দিন আর জ্বর আসিল  
না, তৃতীয় দিনে অন্নপথ্য দেওয়া হইল। এখন  
এই ঘটনাটি কি ভাবে হইল, তাহা চিন্তাশীল  
ব্যক্তির চিন্তা করিয়া দেখুন। যখন আমরা  
এই সংসার হইতে চলিয়া যাইব, তখন আমাদের  
সঙ্গে কিছুই যাইবে না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যাইবে—  
পাপ পুণ্য যাইবে। আমরা যখন সঙ্কটে  
স্থিত হইয়া করি, তখন পরকালের ফল উভয়

কেন করি না! বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, এই সংসারকে সার জানিয়া, কেবল অর্থ সংগ্রহ-তৎপর হইয়া অধর্মকে অবলম্বন করি ও ধর্মকে ত্যাগ করি। ধর্ম যে আমাদের পর-কালের পুণ্যপ্রদর্শক ও সুখের আবাস স্থল-নির্নয়কারী, —সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে কথিত আছে।

ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ঠে

নারী গৃহদ্বারে জনাঃ স্থানেন।

দেহশ্চিত্তায়াং পরলোকমার্গে

ধর্মীভূগো গচ্ছতি ভীষ একঃ ॥

ধন এই পৃথিবীতে পড়িয়া রহিবে। অশ্ব-গজ-গো—তাঁহা তাঁহাদের স্থানে রহিবে। প্রাণ প্রিয়া পত্নী গৃহদ্বার পর্য্যন্ত যাইবেন। এই যে এত সাধের দেহ তাঁহাও চিত্তায় দগ্ধ হইবে, —সঙ্গে কিছুই যাইবে না। এক ধর্ম জীবের পরলোক মার্গে অগ্রে অগ্রে যাইবে।

রোগের আদি কারণ অধর্ম। সেই রোগের যিনি চিকিৎসা করিenden—তিনি যদি ধর্মকে অবলম্বন না করেন, তবে কোন্ বলে তিনি রোগীর রোগ অপনয়ন করিবেন?

এইতো গেল চিকিৎসকের কর্তব্য। এখন বাহারা চিকিৎসিত হইতেছেন বা বাহাদের চিকিৎসিত হইবার আবশ্যক আছে, তাঁহাদের কর্তব্য কি? রোগ সকল প্রাকৃত্ত হইলে মানবদিগের তপস্বী, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত ও আয়ুর বিষয় উপস্থিত হয়। এই রোগ যাহাতে দেহে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাই প্রথমে চেষ্টা করা উচিত। এ সম্বন্ধে পৌষমাসের প্রবন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সেই সকল নিয়ম পালন করিলে রোগাক্রমণের আশঙ্কা খুব কম থাকে। রাজ নিয়মের ব্যবস্থা (আইন) অমান্য করিলে, উহার অজানতা,

অপরাধীর দণ্ড বিধান নিবারণ করিতে পারে না—Ignorance of Law is no excuse.

সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে রোগ অনিবার্য। তবে অল্প অল্প অনিয়মে রোগ হয় না। “প্রাপ্তে কালে গদো যথা—”

অনিয়ম করিতে করিতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও রোগ আক্রমণ করিয়া আয়ু হ্রাস করিয়া ফেলে। সেই জন্য আমাদের সকলকে প্রাকৃতিক নিয়মে চলা উচিত ও কিসে রোগ হয়, কি করিলে রোগের হাত হইতে রক্ষা

পাওয়া যায়—স্বাস্থ্যরক্ষার এসব নিয়মগুলি জানা চাই। রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা কবা

অপেক্ষা রোগ হইতে না দেওয়াই শ্রেয়ঃ। পূর্ন-কার লোকেরা নিয়মে থাকিতেন মিতাহার

কবিতেন পূর্বের আহার সম্পূর্ণ জীর্ণ না হইলে পুনরায় আহার কবিতেন না। অধিকাংশই

একাহার করিতেন, ব্রহ্মচর্য পালন অর্থাৎ বীৰ্যা ধারণ করিতেন, একাদশী, অমাবস্যা,

পূর্ণিমা প্রভৃতিতে উপবাস করিয়া পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতেন। অমেধ্য অথাত্ত আহার, বাহার

তাহারহাতে আহার—এ সব করিতেন না, দেব সেবা, ব্রাহ্মণে ও গুরুজনে ভক্তি, সার্বিক

ভোজন ও সর্বদা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া

নীরোগে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ইহকালের ও পরকালের উভয় কালের সুখ ভোগ করি-

তেন। চিকিৎসককে সম্মান করিতেন। এখন তাহার বিপরীত হইয়াছে। তাই জরা ব্যাধি প্রভৃতি আসিয়া অকালে লোককে কাল গ্রাসে পাতিত করিতেছে। এখন এ বিষয়ে

কর্তব্য কি? আগে সামান্য সামান্য রোগ বাড়ীর গৃহিণীরা নিজেরা জানিত-মুষ্টিযোগ দ্বারা আরাম করিতেন। এমন কি, কখনও কখনও চিকিৎসক না পাওয়া গেলে, তাঁহারা

কঠিন কঠিন রোগও আরাম করিতেন। কিন্তু এখন ছেলের সামান্য মাথা ধরিলেই ছেলের মা ডাক্তার ডাকিলেন, তিনি আসিয়া কতক গুলা উগ্রবীজ্য ঔষধ ব্যবহার করাইয়া শরীরকে আবণ্ড খারাপ করিয়া দিলেন। উপবাস তো এখন উঠিয়াই গিয়াছে। “জ্বরাদৌ লজ্জনাং গথাম্”—একথা বলিলে লোকে হাসে। আমরা একটু কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। এখনকার দিনে নবজ্বরে অবাধে দুগ্ধ পান করার ফলে আতিসারিক বিকার অর্থাৎ টাইফাইডকে আহ্বান করা হয় মাত্র। একবার আমার কোন বন্ধুর ছেলে কাসিতে বৎ কষ্ট পাইতেছিলেন, তাঁহাকে বলিলাম বাসক গাড়ে ছাল—মূলের ছাল ও পাতা—(বাগকে ব্রাবাসক বলে) জলে সিদ্ধ করিয়া ছেনোটকে পাওরান, তাহাতে তিনি বলিলেন,—“কে অত ঝাঙ্গাম করে? একটা সিরাপ অব বাসক কিনিয়া লইয়া খাওয়াই। ‘তিনি অবাধে ১০ আনা পয়সা খরচ করিলেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক উপকারী টাটকা বাসকের কাটি তৈয়ার করাইয়া খাওয়াইলেন না। আব এক বন্ধু উহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া সকলকে বলিলেন,—এখন আমার বাসক গাছে পাতা গজাইতে পায় না। আমার বাসক গাছটি দেখিলে মনে হয়—যেন পরোপকারার্থে সে জীর্ণশীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে। বাসক গাছটি এখন প্রমাণ করিতেছে যে—

বাসায়াং বিভ্রানান্নায়াং আশায়াং জীবিতস্ত চ।

রকুপিতৌ ক্ষয়া কাসৌ কিমর্থং মবসীদতি ॥ \*

ফলকথা, সকলকেই মোটামুটি রোগের চিকিৎসা জানিতে হইবে। গাছ গাছড়া কতকগুলি চিনিতে হইবে। নিজের ঘরের পাশে, আশ্রিনায় বা বাগানে কতকগুলি অত্যাবশ্যক ভেষজ বৃক্ষলতাদি লাগাইতে হইবে। রোগ নিবারণের জন্ত রসায়ন ব্যবহার করিতে হয়, ঋতু হরীতকী তন্মধ্যে সুলভ ও প্রশস্ত রসায়ন জানিয়া বাঁহারা রোগ প্রবণ, তাঁহারা উহা ব্যবহার করিতে যত্নবান হইবেন। কি পরিমাণে উহার ব্যবহার করিতে হয়। সম্পাদক মহাশয় এইখানে ফুট নোট তাহার প্রকাশ করিলে বড় ভাল হয়। \* ঋতুহরীতকী যে ঋতুতে যে দ্রব্যের সহিত সেব্য নিম্নের শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

সিদ্ধুথ-শর্করা-শুর্ভা-কণা মধু শুভৈঃ ক্রমাৎ।

বর্ষাদিস্বভয়া সেব্য রসায়নশুণৈবিণা ॥

বাড়ার নিকট নিষ, বেল, তুলসী, কণ্টকারী, বাসক, গুলঞ্চ, অম্বগন্ধা, ক্ষেতপাঁপড়া, দুর্লা, কালমেঘ, আমরুল, আমলকী প্রভৃতি যেন রোপণ করিয়া রাখা হয়। নিষের অশেষ গুণ। আমার বে গোয়ালা গাভী দোহন করে, সে বৃদ্ধ হইয়াছে—কিন্তু তাহার পিতার শরীর দেখিলে তাহাকে বুঝা বলিয়া মনে হইবে। তাহার পিতা বলে—তাহার কখন জ্বর হয় না। একদিন তাহার গামছার একটু কোন অংশে সবুজবর্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “ওরূপ কেন?” তাহাতে সে বলিল “চৈত্রমাসের প্রথম পনের দিন নিমপাতার রস খাই বলিয়া, ঐ রস নিঙড়াইতে এরূপ হইয়াছে। বেশী পাই না বলিয়া পোয়াটাক ধারোক্ষ গব্য দুগ্ধ ইহার

\* ঋতু হরীতকী সেবনাকাজিকরণ প্রথমে দুই বার হইতে আরম্ভ করিয়া ১ সপ্তাহ সেবনের পর প্রতি দিন এক আনা হিসাবে বাড়াইয়া অর্দ্ধতোলা পর্যন্ত ব্যবহার করিবেন। আং সং।

পর পান করি, তাহার ফলে আমি সমস্ত বৎসর বেশ ভাল থাকি।” এক সর্পবিষচিকিৎসক আমাকে বলেন যে, প্রত্যাহ কিছু কিছু নিষপাতা খাইয়া যখন গায়ে নিমের গন্ধ হইবে, তখন আর সর্পবিষ দেহে বিষক্রিয়া অত্যন্তই করিবে, তাহাতে প্রাণহানি হইবে না।

দেশের কবিরাজগণ সকলে মিলিয়া চরকোক্ত ভাবে এক বিরাট সভা করিয়া স্থির করুন যে, কি উপায়ে বর্তমান রোগ সকলের হাত হইতে ভারতবাসী রক্ষা পায়। তাহা তাঁহারা প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে প্রকাশ করুন। “আয়ুর্বেদের” মত মাসিক পত্রিকা আরও প্রকাশিত হউক, মূল্য যথা সম্ভব কম

করা হউক এবং তাহাতে যে বিষয় যিনি ভাল জানেন তাহা লিখুন। সকল গৃহস্থই “আয়ুর্বেদ” বা অথ কোন ভাল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা গ্রহণ করুন ও পরিবারের সকলে উহা পড়ুন ও তদনুযায়ী কার্য্য করুন। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরাজ মহাশয় যে প্রণালাতে সরল পণ্ডে নানারোগের সরল চিকিৎসা প্রণালী “আয়ুর্বেদে” প্রকাশ করিতেছেন, ঐরূপ অগ্রাভ্যাস করিবাজেরাও করুন এবং উহা বালকবালিকাদের কণ্ঠস্থ করান। বড়ই দুঃখের বিষয় যে “আয়ুর্বেদ” কাগজে সকলে লেখেন না বা তাহার বিস্তারের চেষ্টা করেন না।

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়। ( চট্টোপাধ্যায় ) বি, এল্।

## বাঙ্গালীর ভগ্নস্বাস্থ্য।

—:—

দেখা যাইতেছে, দিন দিন বাঙ্গালী, জীবন সংগ্রামে অধিকাংশ জাতি হইতেই অধঃপতিত হইয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যের বিষয়েও একথা সমীচীন হইয়া পড়িয়াছে। ‘আয়ুর্বেদ’ যখন স্বাস্থ্যালোচনার পত্র, তখন আমরা ইহাতে বাঙ্গালীর এই স্বাস্থ্যের অধঃপতনের বিষয়ই আলোচনা করিব।

যে জাতি একদিন মহারথ মহাবীরগণকে বক্ষে স্থান দিয়া ধন্য হইয়াছিল; কুরুক্ষেত্র সমরেতিহাস যে জাতির বীরত্বের চরম নিদর্শন; সে জাতি আজ কত নিম্নে ভাবিলে দুঃখে ত্রিয়মান হইতে হয়। আগেকার বাঙ্গালী-বীরগণের সহিত তুলনা করিলে আধুনিক শীর্ণকায়,

অস্থিচর্ম্মসার, সার্কি ত্রিহস্ত পরিমিত বাঙ্গালীকে দেখিয়া যুগপৎ হস্ত ও বিষাদের উদ্বেগ হয়। বৈষম্যধারণা হস্তের সৃষ্টি করে এবং অধঃপতনের স্থিতি-অশ্রু টানিয়া আনে।

বাঙ্গালীর এ অধঃপতন কেন হইল? আমার বিশ্বাস, পর-নির্ভরতা ইহার প্রধানতম কারণ। যে জাতি দুঃশত বৎসরেরও অধিক কাল পরমুখাপেক্ষী, তাহার জাতীয় প্রাণ যে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাউবে। ইহা খুব স্বাভাবিক। আত্মরক্ষার শক্তি তাহার কোথায়? একবার বাঙ্গালী জাতির দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি? ঐ দেখুন—কেরাগিকুল ২০ টাকার মাহিনার জন্য রেলের কলসী দিয়ার

মত কবির তাদ্ভাতাড়ি চটা বাজিতে না বাজিতে  
আহার কোন রকমে সারিয়া অন্ধাশনে ময়লা  
কোট গায়ে, ছেঁড়া জুতা পায়ে অফিসের পানে  
ছুটতেছে। তাহাদের পুঞ্জরগুলি গণনা করা  
অনায়াস সাধ্য, অকালে পক্কেশ তাহাদের  
মস্তক বিভূষিত কবে, তাহাদের যাবতীয় শক্তি  
কলম চালাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়।

আধিকাল আমরা খুব চাকরি ভক্ত বটে,  
তথাপি ভাবিতে গেলে চাকরি একটি নিরুপ্ত  
কাজ। তাই সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোকে ভিক্ষার  
অগ্রে ইহার স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু  
তথাপি মোটা মোটা চাকরিগুলি বাঙ্গালীর  
মতে। বিলাত প্রত্যাগত বা বিলাত সমুত্ত মহা  
পুরুষগণই তাহা উপভোগ করেন। বাঙ্গালীর  
সর্বোচ্চ আশা—হয় একটা ডেপুটী বা মুন্সেফ  
হওয়া—নয় বড় জ্বোর একটা হাইকোর্টের জজ  
হওয়া। হায়, হায়, যে নিজের ঘরে বন্দী,  
নিজেব অন্ন পবের হাতে খায়—তা'র কি  
মনেব তেজ, দেহের বল থাকিতে পারে!  
তা'র কেননা শীর্ণ দেহ, উৎসাহহীন মন, দমিত  
আশা—জীবনেব প্রধান উপকরণ হইবে? সে  
কেননা পরেব সেই Indrader এর এক  
বিন্দু রূপা পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিবে?

এই পরনির্ভরতা বাস্তবিকই বাঙ্গালীর মজ্জা  
একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমি ক্রমশঃ  
দেখাইতেছি যে, যত সব অনর্থ, যত কিছু  
শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা—তৎসমুদয়ই এই পর-  
নির্ভরতাব পৰিণাম। হায়, হায়, বাঙ্গালী  
কেন পরমুখাপেক্ষী হইল?

তা'র পব, বাঙ্গালীর রাজা বিভিন্ন জাতীয়ও  
বিভিন্ন দেশীয় হওয়ায় বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কম  
ক্ষতি হয় নাই। সে সর্বদা রাজার জাতির  
সহিত নিজেকে তফাৎ করিয়া দেখে, খাটো করিয়া

ফাস্তান—৩

দেখিতে শিখে। এই খাটো করিয়া দেখা,  
এই আত্মশক্তিতে অবিধাস, তাহার উন্নতির  
পথে অনতিক্রমণীয় বাধার সৃষ্টি করে। সে  
বুঝে, সে দেখে,—আমি ধরাধামে নগণ্য, ছোট,  
রাজার জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। রাজার  
জাতিব কাছে নমিত হওয়ায় রাজার জাতিরই  
ক্ষমতার প্রাবল্য স্বীকৃত হয় এবং নিজে ভগ্ন  
স্বাস্থ্যকে বরণ করিয়া বাঙ্গালী হীনতাকে আশ্রয়  
করে।

আধুনিক বাঙ্গালীব স্বাস্থ্যভঙ্গের আরম্ভ  
বালাকাল হইতে। আগেব দিনে যখন  
বাঙ্গালীর সব ছিল—হিন্দুর গৌরব ছিল,  
ব্রাহ্মণেব তপোবল ছিল, সেই দিনে বালককে  
কি সুন্দরভাবে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল!  
গুরুগৃহে প্রথমতঃই চরিত্র শিক্ষা, ব্রহ্মচর্যা পালন,  
পরে বিজ্ঞাপার্জন। ব্রহ্মচর্যা শিক্ষাটা বালা  
কালের একটা প্রকৃষ্ট শিক্ষা ছিল। কারণ  
বীৰ্য্যই উন্নত মনের শ্রষ্টা। সুতরাং বীৰ্য্যকে  
কিরূপে বক্ষা করা, যাইতে পারে তাহার, উপায়  
আগেই জানা আবশ্যক। কিন্তু যখন হইতে  
বাঙ্গালী পরমুখাপেক্ষী হইল; পরের ধর্ম, পরের  
আদর্শ ভয়াবহ হইয়া যখন বাঙ্গালীর ঘাড়  
চাপিয়া বসিল, তখন হইতে তাহার সব লোপ  
পাইতে থাকিল, ব্রহ্মচর্যা শিক্ষার স্বতন্ত্র  
বন্দোবস্ত একেবারে ভারতের বুক হইতে  
মুছিয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্তে পাশ্চাত্য  
আচার-ব্যবহার, পাশ্চাত্যের অম্লকরণে জী-  
জাতির সহিত আধ মিশ্রণ,—বিলাতি  
courtship, বাঙ্গালীর মজ্জাগত হইতেছে।  
ফলে বালাকাল হইতে বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্যব্রত  
ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। বীৰ্য্য ক্ষয়ে অপরিশীল  
বয়স্ক বালক যৌবনের প্রারম্ভেই শীর্ণ শরীর-  
বৃদ্ধ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। সুতরাং আত্ম-  
স্বাস্থ্য

যেন সর্বদা তাহাদের শিয়বে জাগিয়া আছে । যে জাতি ব্রহ্মচর্য্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল, অধুনা সেই জাতির মত ব্রহ্মচর্য্যহীন জাতি পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই । কি ভীষ, কি কঠোর, কি নিষ্ঠুর, কি মারাত্মক পরিবর্তন! আজকালকার বালকগণ কিরূপ অল্প-বয়সে উচ্ছৃঙ্খল, তাহা এষ্ট ‘আয়র্সেদ’ পত্রের ‘কাজের কথা’ যাহারা নিয়মিতরূপে পাঠ করেন, তাঁহাদিগের নিকট আর তাহার উল্লেখ করিতে হইবে না । বাস্তবিকই বালক-জগত আজ বীৰ্য্যক্ষয়ে শ্রিয়মাণ । বালাকালেব এষ্ট বীৰ্য্যক্ষয় যে কিরূপ সর্বনাশকর তাহা বলিয়া বর্ণাইবার জো নাই । বালাকালেই যখন পবিত্র বয়সের সূচনা হয়--বালকই যখন পবে প্রবীণ মানব হইয়া গড়িয়া উঠে--যখন the child is father of the man তখন বালককে বড় সাবধান হইয়া পালন করা উচিত । কারণ তা’র উচ্ছৃঙ্খল জীবন, হীনবল ও ছকল-মন মানব-সমাজের সৃষ্টি কবে, এবং তার সংসত সাধনা—ধাত্মিক, দীর্ঘকায় ও সৰল মনস্বীগণের দ্বারা ভূপৃষ্ঠ পূর্ণ করিয়া দেয় । মির্টনের বাণী সার্থক The child shows the man as morning shows the day.

অতএব বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যগতির বিধান করিতে হইলে প্রথমেই বালকের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে । তাহাদের শারীরিক উন্নতির জন্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও উপযুক্ত ব্যায়ামের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে । বালক যদি সুস্থকায় ও সবল হইয়া গড়িয়া উঠে, তবে বাঙ্গালীর পূর্বদিন আবার ফিরিয়া আসিবে । আমরা দেখিব বিস্তৃত রাজপথে শিবসৈন্তের মত প্রশস্ত ললাট, সমুচ্চবক্ষ, আজ্ঞাশূলম্বিতবাহ, মানসিক তেজ

ও শারীরিক ওজঃ লবণ্যে ভাস্ব—অসংখ্য বাঙ্গালী আদি স্বাধীন যুগের সূহৃদে হাসিয়া উঠিবে ।

বাঙ্গালীর ক্ষয় স্বাস্থ্যেব একটা উল্লেখযোগ্য কারণ এই যে, স্বাস্থ্যরক্ষা যে একটা অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম—এ কথা সে পরিপূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে । অথচ তাহাবই পূর্বা পুরুষ একদিন সেই বিজ্ঞান সম্মত বাণী উচ্চারণ কাঁবয়াছিল-- ‘শরীরমাংসং খন্দ্ ধর্ম্মসাধনং ।’ আজ সে কাণা কড়িকেই বড় কবিতা ধরিয়াছে। শক্তিকে যে উপেক্ষা করে, শক্তিমাত্রাকে সে একটা অনাবশ্যক সৃষ্টি, একটা অস্ত্র উপদ্রব, একটা ‘গুণ্ডা’ বলিয়া বিবেচনা কবে, শক্তির কাঙ্গ, সাহসেব কাজকে সে অভ্যস্তোচিত হঠকাবিতা বলিয়া উপহাস কবে । আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন অনেকে আছেন যাহাবা শাণিকায়, শক্তিমাত্রহীন, তাহাদের প্রধান প্রসাদ এই প্রমাণ কবা যে—শক্তিশালী মাত্রেই নিকৌষ ও তাঁহাদের ছাত্র শীর্ণকায় না হইলে বুদ্ধিমান হইবাব উপায় নাই । একি ভীষণ কুসংস্কারেব কথা ! ভাবিলেও যে আতঙ্ক উপস্থিত হয় ! হয় বাঙ্গালী ! আজ শরীরকে, বলকে এত খাট’ করিয়াছ ?

পরাদীন বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির অল্পতম কারণ—কেরানীগিরি ও চাকরির উপর তাহার একান্ত ভক্তি । সে বাণিজ্য করিবে না বা মূলধনের অভাবে করিতে পারে না । ভদ্রতার হানির জন্ত সে চাষ আবাদে মন দিবে না, কিন্তু ১৫২০ টাকার জন্ত জাতি নির্বিশেষ ভুলিয়া যাহার তাহার পদক্ষেপ করিতে পারিবে । অসময়ে খাওয়া, ব্যায়ামের অভাব, স্বপ্নকারে মাংসারিক খরচ নির্বাহ করার দারুণ চিন্তা, কড়াশাস্ত্র, কপোলের চোরা বাঙ্গালীর শরীর ও

মনকে একেবারে নিস্তেজ ও অকর্মণ্য করিয়া ফেলে।

বাস্তবালী বড় কদর্যা খায়। প্রথমতঃ তা'র বোজগার অল্প, তত্পরি একজনের ঘাড়ে ভর কবিত্ত দশজনে থাকে। এক পরসায় অল্প সংবাদ শোনা হয় না। অকীর্ষনে বা অল্প পায়ে পনের আনা বাস্তবালী কষ্ট পায়। বাস্তবালীকে স্বাবলম্বন শিখিতে হইবে। প্রত্যেককে নিজে নিজে উপার্জন করিতে শিখিতে হইবে। তাহা হইলে আয় বেশী হওয়া সকলে পছন্দ করিবে অথচ ভিক্ষা দাতাও হইবে।

আমি একটা সর্বনাশ কবিত্তেছি—খাদ্যাদির হ্রাস—‘ভেজাল’। আধুনিক যুগের দতাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন ‘ভেজাল’ আগমন কবিত্তেছে। কোন জিনিষই বিশুদ্ধ পাটবার উপায় নাই। যত, ‘ভেজাল,’ তেলে ‘ভেজাল’ সঙ্গে ‘ভেজাল’। মানুষ বাচিবে কি খাইয়া? বাস্তবালী গোটে দায়ে অল্প পরসায় ঐ সব অপবিত্র জিনিষ ক্রয় করিয়া মনে করে—পছন্দ পাওয়া লইতেছি, কিন্তু কি বিষ তাহারা খাবে গঠন করিতেছে, তাহা বারেকের তবও উপলব্ধি করে না। যতের ভেজালের যে প্রকার জনক কাকিনী শুনিয়াছি, তাহা লিখিয়া লেখনী কবিত্ত করিব না। বাস্তবালী এইরূপ নিয়ত কত বিষ ও অভক্ষ্য গ্রহণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলে নানারূপ আধি-ব্যধি বাস্তবালীকে বেড়িয়া ধরিতেছে। পরসায় কম,—কিন্তু উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা বলবতী, কাজেই রক্তিম জিনিষ ক্রয় ভিন্ন উপায় নাই। বাস্তবালীও কেবলী বাবুদের ইচ্ছা পূরণার্থে যত নারিকেল তৈল বা সাপের চর্বি মিশ্রিত

কবেন দুগ্ধে বাবো আনা জল শুধু তাহাই নহে, তাহাতে এরাকট ও চিনি মিশ্রিত করিয়া স্মিট করিয়া লয়।

তত্পরি রাজার জাতির অনুকরণে যে আমাদের স্বাস্থ্যের কম ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে। পাশ্চাত্য অনুকরণে চায়ের অপকারিতা আজি কালিকার দিনে বৃদ্ধিবার প্রধান বিষয় হইয়াছে। বাস্তবালীর পক্ষে হাট-কোট পরিধান বিশেষ স্বাস্থ্যহানিকর। এমন কি, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ফুটবল খেলা আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আনাদিগকে যে অনুকরণ করিতেই হইবে, সুরাং ছেলেদের সে খেলা না শিখাইয়া উপায় নাই।

এই যতদূর মনে পড়িল বাস্তবালীর স্বাস্থ্যের বিবরণ প্রদান করিলাম। খুঁজিয়া দেখিলে এমন শত সত্তর বিষয় বাহির করা যায়। যাহা হউক অধুনা এই বিষয় সমস্তার যুগে বাস্তবালী কেমন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে সে বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলা হউক।

বাস্তবালী আত্ম প্রাণকে স্বাধীন করিতে শিখুক। শরীর অস্ত্রের পরাধীন হইতে পারে, কিন্তু মনের উপর অস্ত্র কাহারও অধিকার নাই। মন স্বাধীন হইলে মনের প্রাফুল্লতায় তাহার স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। বাস্তবালী স্বাবলম্বন শিক্ষা করুক। প্রত্যেকেই নিজের পায়ে নিজে দণ্ডায়মান হউক। এক জনের ঘাড়ে ভর করিয়া যেন দশজন থাকিতে চেষ্টা না করে। তাহা হইলে উপার্জন বেশী হইবে ও স্বচ্ছলতা বাড়িবে। আমাদের উদ্দেশ্য হউক—আমরা আয় বৃদ্ধি। যত কমই হউক খাটি জিনিষ ব্যবহার করিব। অল্প পরসায় বেশী বা মূল্যবান জিনিষ আশ্রয় করিলে তাহা প্রায়শঃ

অসার ও অপরিণত হয়। নোভের জন্ত, সাময়িক রসনা তৃপ্তির জন্ত, আমরা যেন স্বাস্থ্য-ধন স্বাস্থ্যকে না হারাই।

বাঙ্গালীর চাকরির প্রতি পরম ভক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। গোলামীকে ছাড়িয়া আত্ম নির্ভরতাকে বরণ করিতে হইবে। স্বাধীন মনঃ প্রেরণি যে শবীরের স্বাস্থ্যবিধান কবে ইহা সর্ববাদিসম্মত। বাঙ্গালী আজি হইতে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া উপার্জন করিতে শিখুক। কুড়ি টাকার জন্ত একটা গাধার মত ভারবাহী না হইয়া, স্বাধীন মন লইয়া বানিজ্য করুক কৃষিকর্ম করুক। মূলধন কম? সবাই কি ধনী হইবে? বিনা ধনেও বাবসা করা চলে।

লোক দলে দলে বড় বড় ব্যবসায়ীর স্থানে apprentice ভাবে কাজ করুক। তাহাদের নিকট বিশ্বাসী হউক। তৎপরে সেই ব্যবসায়ীই মহাজন হইয়া তাহাকে ধার দিবে, তাহার ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া দিবে। চাই বিশ্বাস, চাই সত্য, চাই ধর্ম, সত্যের জয় ধর্মের জয় অবশ্যস্তাবী।

বঙ্গদেশের কৃষিক্ষেত্র গুলি সমস্তই অজ্ঞ-অশিক্ষিতের দ্বারা কর্ষিত হয়। ঐ সব ক্ষেত্র যদি বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে শিক্ষিত লোকের উপদেশেও তত্ত্ব বিধানে কর্ষিত হয়, তবে ক্ষেত্রে কত বেশী ফসল হয়? ছোট লোকও মজুরি খাটিয়া পয়সা পায়। শিক্ষিত বাঙ্গালীও কেরানীগিরি না করিয়া প্রভূত আয় করিতে পারে। প্রত্যেকের জমী না থাকিতে পারে, কিন্তু জমী সংগ্রহ করিতে সকলেই পারে। বাণিজ্যে বাস্তবিকই লক্ষ্মী বসতি করেন—ফলে যে বাণিজ্য করে, সে তো লাভবান হয়ই অধিকতর অপরেও কায়ক্ষেপে যা' উপার্জন

করে, তাহাতে তাহারা লাভবান হয়। এইরূপ ভাবে আত্ম নির্ভর করিয়া উপার্জন করিতে শিখিলে, মন পবিত্র থাকে, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

শেষ কথা আমাদের আদর্শ থাকিবে অতুল্য করণ নহে--কিন্তু সমীকরণ। পরের জিনিস আমরা গ্রহণ করিতে পারি এবং চিরকাল করিব কিন্তু নিজস্বকে ত্যাগ করিয়া নহে। আমার ধর্ম, আমার জাতীয়তা, আমার আদর্শ-চিরকালই আমার থাকিবে। অতুল্যবোধ দ্বারা তাহাদিগকে বলি দিব না। পরের কাছ হইতে যাহা আহরণ করিব, তাহাতে ঐ জাতীয়তা, ঐ আমার ধর্ম, ঐ আমার আদর্শ পুষ্টলাভ করিবে। যদি ইহা করিতে পাবি, তবে দেখিব আবার নবীনতর স্বাস্থ্য-সুখমা বাঙ্গালীব অঙ্গে অঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছে। আবার দেখিব বাঙ্গালী মনের স্বাধীনতার আনন্দে শিহরিত হইয়া উঠিতেছে,—আর বাঙ্গালী ভিক্ষুক নহে, আর বাঙ্গালী অম-করণশীল নহে; আর বাঙ্গালী পরাধীন নহে। জগতের অন্যান্য জাতির মত জাতীয় মহাসভা-স্থলে সেও তার আপন উচ্চাসন বাছিয়া লইবে। সেও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিবে—“ওগো আমি ছোট নহি। এককালে আমি কত বড় ছিলাম। আমার বিজ্ঞান, আমার চিকিৎসা শাস্ত্র, আমার জ্যোতিষ কত জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, কত জাতি আমারই পদাঙ্ক অমুসরণ করিয়া অর্জি ধরাধামে \*ধন্য ও বরণীয় হইয়াছে। আমি আবার অতীত সংস্কারকে মস্তকে করিয়া তোমাদেরই মাঝে আসন বাছিয়া লইবার জন্ত আসিয়াছি। আমার অতীত গৌরবের ধারণা করিয়া, তোমরা আমাদের যথা করিতে পার, না



তোমরা আজ আমাকে স্বীকার কর, বরণ কর। তাহা হইলেই আজ তোমাদের পক্ষ

হইতে আমাকে চরম কৃতজ্ঞতা দেখান হইবে।”

সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ ।

## পঞ্চকর্ম ।

—:—:—

ক। বমন, বিরেচন, শ্বেদ আর স্নেহ সপক্ষে আর একটু ব'লছি। উদ্ধভাগ দিয়ে দোষহরণ করার নাম বমন এবং অধোভাগ দিয়ে দোষ হরণ করার নাম বিরেচন। রেচন অর্থাৎ দোষ নিঃসরণ করে ব'লে উভয়কেই আবাব বিরেচন বলা যায়। স্ততরাং যেখানে অধোভাগ দিয়ে দোষ হরণ করায় অপকার ঘটে, সেখানে উদ্ধভাগ দিয়ে এবং যেখানে অধোভাগ দিয়ে দোষহরণ করায় বিপত্তি ঘটে, সেখানে উদ্ধভাগ দিয়ে দোষহরণ করা যেতে পারে। আর শাস্ত্রে বলে যে, যেমন স্নেহাক্ত পাত্রে মধু রাখলে যেমন মধু পাত্রে সংলগ্ন হয় না এবং পাত্র থেকে সমস্ত মধু অনায়াসে ফেলে দেওয়া যায়, সেইরূপ স্নেহাক্ত শরীরে বমন বিরেচন প্রয়োগ ক'রলে, সমস্ত দোষকে অনায়াসে বাহির ক'রে দেয়। আর শ্বেদত নানা কারণে আপনারাও দিয়ে থাকেন। নিমোনিয়ার শুষ্ক শ্রেণী বক্ষে আবদ্ধ হ'লে, তরল হ'য়ে যা'তে সহজে উঠে যায়--সে জন্তে শ্বেদ দেওয়া হয়। পঞ্চকর্মের পূর্বে শ্বেদ দিলেও তেমনি দোষ সকল উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখ হ'য়ে আমাশয়ে বা পকাশয়ে সঞ্চিত হয়। ডাঃ। এখন বেশ বুঝতে পারলাম। এখন

বিরেচনের পরে কি ক'রতে হয় বলুন ?

ক। বিরেচনের পর যতদিন না পূর্বের মত বল ও বর্ণ লাভ না হয় এবং মন ও শরীর সুস্থ এবং অন্নস্বজ্জীর্ণ না হয়--ততদিন বল, শরীর প্রকৃতি, বয়স, সাত্বা, দেশ কাল প্রভৃতি বিচার ক'রে, বমন করার পর যেরূপ নিয়মে আহার দেবার কথা বলা হ'য়েছে, সেইরূপ আহার দিতে হয়। তা'রপর বল বর্ণাদি হ'লে মাথা ধোওয়া, গাত্রে সদগন্ধ মাখা এবং উত্তম বস্ত্রাদি ধারণ করিয়ে জ্ঞাতি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে দেবে এবং ইচ্ছামত আহার বিহারাদি ক'রতে ব'লবে।

ডাঃ। কেন তার পূর্বে কি জ্ঞাতি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিষেধ নাকি ?

ক। রাজা রাজতুলা লোককে পঞ্চকর্ম প্রয়োগ ক'রতে হ'লে উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ ক'রে, তা'র ভিতরে সমস্ত উপকরণ রেখে তবে পঞ্চকর্ম ক'রতে হয়। চিকিৎসা শেষ হ'লে তবে রোগীকে ঘরের বাহির করে।

ডাঃ। কৈ সে কথা ত আগে বলেন নি।

ক। ব'লেও লাভ নেই, শুনেও লাভ নেই। আর রাজ রাজাড়া ছাড়া সে রকম কেউ ক'রতে পারে না।

ডাঃ। তবে কি দরিদ্রের পক্ষে পঞ্চকর্ষ বিহিত নয় ?

ক। অনেকটা সেই রকমই বটে। তবে শাস্ত্রকার বলেছেন যে, দরিদ্রের পক্ষে পূর্ব কথিত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করা সূকঠিন। অতএব দরিদ্রের ব্যাধি হ'লে তা'কে একরকম ক'রে বিরচন প্রয়োগ করবে। কেন না, সকল মনুষ্যের সমস্ত উপকরণ থাকে না, আবার দরিদ্রের দারুণ রোগ হ'য়ে থাকে। অতএব দরিদ্রের রোগ উপস্থিত হ'লে যে রকম ঔষধ সে সংগ্রহ ক'রতে পারে, আর যেরূপ অশন বসন জোটে, তা'র সাহায্যেই চিকিৎসা ক'রতে হ'বে।

ডাঃ। দরিদ্রের প্রতি সবাই বিমুখ দেখছি। এখন বড়লোক মশাইদের জন্তে কি রকম কি ক'রতে হয় বলুন শুন।

ক। শুধু তব' প্রথমেই একটা উপযুক্ত গৃহ নিশ্চয় ক'রতে হ'বে। গৃহটি দৃঢ় ও রাগুরহিত হ'বে, কেবল একস্থানে বায়ু চলাচলের পথ থাকবে। গৃহে বিচরণ ক'রতে যেন কোন কষ্ট না হয়। গৃহের পার্শ্বে যেন অশু উচ্চ গৃহ বা পর্কাদি না থাকে। গৃহের মধ্যে যেন ধূম, রোদ্র, ধূলা প্রবেশ করতে না পারে এবং গৃহটি যেন অনিষ্টকর শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধের অগম্য হয়। তা'র পর গৃহের মধ্যে চিকিৎসার জন্ত অবশ্যক মত যে সকল বিবিধ দ্রব্য রাখবার উপদেশ আছে, সংক্ষেপে ব'লছি। সকল কার্ষে স্নানপুণ এবং কিছুতেই বিরক্ত না হয় এরূপ গুণবানকারী, গীতবান ও মনোহর কথা নিপুণ পারিষদ, বিবিধ মনোহর পক্ষী, জীবিতবৎসা নীরোগ গাভী, জল পূর্ণ টব, হাঁড়ি, কপলী প্রভৃতি, তা'র পর রোগীর চিকিৎসার জন্ত বিবিধ দ্রব্য, পথ্যের জন্ত বিবিধ দ্রব্য,

শয়ন উপবেশনের শয্যাদি সমস্তই আবশ্যক। এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে সেই ঘরের মধ্যে থেকে চিকিৎসা ক'রতে হয়।

ডাঃ। এ যে আমাদের হাসপাতাল ছাড়িয়ে উঠল দেখছি। হাসপাতালে বাজারের দ্রব্য মাংস ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এখানে একেবারে তুচ্ছের জন্ত গাভী আর মাংসের জন্ত পশুপক্ষী সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা দেখছি।

ক। ব্যবস্থা কি ভাল নয় বলেন ?

ডাঃ। না ভাল গুণই, তবে বড় কঠিন ব্যাপার।

ক। কঠিন ব'লেইত রাজা রাজাদেব জন্তে এই রকম বন্দোবস্ত করার কথা বলা হ'য়েছে।

ডাঃ। শাক সে কথা। এখন বিরচনের কম বেশী বা সমান হওয়ার বিষয় বলুন।

ক। দশবার দান্ত হ'লে জঘন্ত, বিশবার দান্ত হ'লে মধ্যম এবং ত্রিশবার দান্ত হ'লে প্রধান শুদ্ধি বলা যায়। পরিমাণ অনুসারেও উত্তম এবং অধম বিরচন বুঝা যায়। তিন সের চক্কিশ তোলা পরিমাণে দান্ত হ'লে জঘন্ত। চার সের চার তোলা হ'লে মধ্যম এবং পাঁচ সের আট চল্লিশ তোলা হলে প্রধান শুদ্ধি বলা যায়।

ডাঃ। এষে মারাত্মক শোষণ কবিরাজ মশায়। একেবারে রোগ রোগী—ছই আরাম।

ক। এখন তাই হ'য়েছে, কিন্তু আগে যা' বলেছি, সেই পরিমাণ দান্তই করান হ'ত। সে সময়ে সে ঔষধটা আটতোলা মাত্রায় প্রয়োগ করা যেত; এখন তার মাত্রা—ছই তোলা; কাজেই আগে যা' জঘন্ত বিরচনছিল, এখন তা'কেই প্রধান বিরচন ব'লতে হ'বে।

ডাঃ। তা' হ'লে সঙ্গত হয় বটে, এখন সম্যক ও অসম্যক বিরচনের লক্ষণ কি বলুন।

ক। সম্যক বিরেচন হ'লে স্রোতঃ সমূহের বিশুদ্ধি, ইঞ্জিয় সকলের প্রসন্নতা, শরীরের লঘুত্ব ও বলাধান, অগ্নির দীপ্তি, রোগের নিবৃত্তি, এবং মল, পিত্ত, কফ ও বায়ুর ক্রমশঃ বহির্নিসরণ এই—সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে যথা রক্তপিত্ত, ক্ষণজনি ও বায়ুজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি, অশ্লীলতার অভাব, গা ভাঙ্গা, ক্লান্তি, কম্প, নিদ্রাহীনতা, দুর্বলতা, চক্ষু অন্ধকার দেখা, উন্মাদ, হিকা প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে ।

অসম্যক বিরেচন হ'লে শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ, ঘর্ম্ম নির্গম, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের শুকতা, তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও বায়ুর প্রতি-রোমতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

অসম্যক বিরেচন হ'লে, 'যে দিন বিরেচন প্রয়োগ করা হয়—সে দিন দিবাভাগে যবাণ্ড পান ক'রতে দিবে না । অল্প ক্ষুধা বোধ হ'লে দিবসান্তে আহার করিতে দিবে । কারণ অগ্নির অগ্ন উদ্বেকে অতি লঘুপাক দ্রব্য আহার করিতে দিলেও অল্প অগ্নিতে তৃণ ও শুষ্ক গোময়াদি দিলে যেমন ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ অন্তরাগ্নিও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে দিবসে বিরেচন ঔষধ পান করা যায়, সেই দিবস যদি সম্যক বিরেচন না হয়, তাহা হইলে সেইদিন আহার করিয়া পর দিন বিরেচন করাইবে ।

ডাঃ । অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে কি ক'রতে হয় ।

ক। অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে পিত্তনাশক ক্রিয়া অর্থাৎ শৈত্যাদি প্রয়োগ হিতকর । বিরেচন দ্বারা ক্ষীণ দেহ ব্যক্তির পক্ষে মাংস, রস, ঘৃত, দুগ্ধ এবং মনোজ্ঞ বলকারক দ্রব্য

স্বপথ্য । বিরেচনের অতিযোগবশতঃ শোণিত নির্গত হ'তে থাকিলে, মৃগ, নহিষ বা ছাগনের স্রোতঃ নিঃসৃত রক্ত পান ক'রতে দেবে । ঐ সকল জীবের রক্ত কুশল্যের কন্দের সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে বস্তি প্রয়োগ করাও চলে ।

ডাঃ । আচ্ছা বিরেচন সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে আর কি উপদেশ আছে বলুন ?

ক। উপদেশ অনেক, সব ব'লতে গেলে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ হ'য়ে পড়ে । সেই জন্তে বাদনাদ দিয়ে স্থলভাবে ব'লছি শুনুন ।

ডাঃ । বিরেচন ঔষধ সেবন ক'রে মলের বেগ উপস্থিত হ'লে যদি সে বেগ ধারণ করা যায়, তা'হ'লে দোষ কুপিত হয়ে হৃদয়ে গিয়ে উৎকট হ্রদ্রোগ এবং হিকা শ্বাস, পার্শ্ববেদনা, দীনতা, গালাশ্রাব ও দৃষ্টিবিভ্রম প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে । রোগী সংজ্ঞাহীন হ'য়ে জিহ্বা দংশন এবং দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে । এরূপ অবস্থা ঘটলে চিকিৎসক বিভ্রান্ত না হ'য়ে তৎক্ষণাৎ সেই রোগীকে বমন করা'বেন । পিত্তজ মুচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পেলে মধুর রসযুক্ত ঔষধ দ্বারা আর কফজ মুচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পেলে কটুরসযুক্ত ঔষধ দ্বারা বমন করা'তে হয় । তা'রপর দোষনাশক পাচন প্রয়োগ ক'রে ক্রমশঃ অগ্নির বল ও শারীরিক বল বৃদ্ধির চেষ্টা ক'রতে হয় ।

ডাঃ । পিত্তজ মুচ্ছা আর কফজ মুচ্ছা কিরূপ লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় ।

ক। এইজন্তেই তো ব'লছিলাম যে, সমস্ত কথা ব'লতে গেলে সমস্ত আয়ুর্বেদ ব'লতে হয় ।

ক। পিত্ত প্রধান ব্যক্তিকে বা পিত্তজ রোগে কবায় ও মধুর জ্বর দ্বারা ক

দ্রব্য দ্বারা এবং বায়ুতে। স্নিগ্ধ উষ্ণ ও স্নেহ দ্রব্য দ্বারা বিরচন করা'তে হয়। বিরচন না হ'লে উষ্ণ জল পান এবং হাত গরম ক'রে উদরে স্বেদ দেওয়া কর্তব্য।

দুর্বল ব্যক্তি, যাহাদের পূর্বে শোধন করা হ'য়েছে এরূপ ব্যক্তি, অল্প দোষযুক্ত ব্যক্তি, কুশ এবং যাহাদের কোষ্ঠ কঠিন নাই, তাদের মূত্র বিরচন প্রয়োগ করা উচিত। রুদ্ধ বায়ু প্রধান, ক্রুর কোষ্ঠ, বায়ামসেবী এবং দীপ্তায়ি ব্যক্তিকে বিরচন প্রয়োগ ক'রলে দান্ত না হ'য়ে ঔষধ জীর্ণ হয়ে যায়। সেই জন্ত এইরূপ ব্যক্তিকে বিরচন করাতে হ'লে প্রথমে বস্তি ক্রিয়া ক'রে পরে স্নেহ সংযুক্ত বিরচন প্রয়োগ ক'রাতে হয়। এতদ্বিন্ন অস্নিগ্ধ ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ ও স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে রুদ্ধ এবং যে সকল ব্যক্তি স্নেহ পানে অভ্যস্ত তাহাকে রুদ্ধ ক'রে স্নিগ্ধ বিরচন প্রয়োগ ক'রতে হয়। \*

ডাঃ। এই খানেইত গোলমাল হচ্ছে কবিরাজ মহাশয়। বমনের পর স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ ক'রে তবে বিরচন প্রয়োগ ক'রবার কথা বলা হ'য়েছে। এখন আবার অস্নিগ্ধ, রুদ্ধ, স্নেহ সাধ্যা প্রভৃতির কথা বলা হচ্ছে। স্মৃতরাং বিরোধ ঘটছে যে।

ক। কেন বিরোধ ঘটবে, পূর্বেই বলেছি যে, অনেক রোগে পঞ্চকর্ম না করে, এক, দুই বা তিন প্রকার কর্ম করবার আবশ্যক হয়। আবার এ সকল ক্ষেত্রে প্রায় কর্ম ও অর্থাৎ স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করবার আবশ্যক হয় না, স্মৃতরাং বিরোধ ঘটলো কি করে?

ডাঃ। হাঁ বুঝেছি এইবার। এখন বিরচন সম্বন্ধে আর কি জানবার আছে বলুন।

ক। মোটামুটি সবই এক রকম বলেছি। তবে বিরচন ঔষধ প্রয়োগের সম্বন্ধে যে একটু

বিশেষত্ব আছে, তার দুই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এই মনে করুন, রোগীকে একগাছা আক খেতে দিলে কিম্বা মুছকোষ্ঠি ব্যক্তি গলায় ফুলের মালা শুকলে তার বিরচন হবে।

ডাঃ। সে কি রকম?

ক। এক গাছা আক ছ' খণ্ড করে তাব অভ্যন্তর ভাগে তেউড়ী মূলের কক্ক বাটা মাখাতে হয়। আর সেই দুই খণ্ড আক একত্র ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে কুশ দিয়ে জড়িয়ে তার উপর মাটির লেপ দিতে হবে। তারপর পুট পাকে অর্থাৎ ঘুটের আগুনে পুড়িয়ে ঠাণ্ডা হলে রোগীকে খেতে দিতে হয়। এতে পিত্তজ রোগ পীড়িত ব্যক্তির সহজে দান্ত হয়।

ডাঃ। বাঃ এত বেশ মজার ওষুদ খাওয়ান। শুনেছি হাকিমেরা রোগীর ইচ্ছায় নিষ্ঠুর কাল এবং সূক্ষ্ম করে ওষুদ খেতে দেয়। সেটা বোধ হয় আয়ুর্বেদের এইরূপ ঔষধ প্রয়োগের অমুকরণে হ'য়ে থাকবে।

ক। খুব সম্ভব তাই। কেননা আয়ুর্বেদ থেকেই মুসলমানী চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। যাক সে কথা, এখন মালার কথা বলি শুনুন। তেউড়ী, সোঁদাল, দস্তী, শজিনী ও সপুলা—এই সকলের চূর্ণ সমান ভাগে নিয়ে রাত্রিতে গো-মূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে এবং দিবসে স্ব্যাতাপে উদ্ধার করিবে। এই নিয়মে শত ভাবনা দিতে হবে। আর মনসার আঠাও এই রকম নিয়মে সাত দিন ভাবনা দিতে হবে। তার পর সূগন্ধ ফুলের মালাতে এই সমস্ত ওষুদ মাখাবে। শরীর বজ্র দ্বারা আবৃত ক'রে এই মূলার আত্মা নিলে মুছকোষ্ঠি ব্যক্তির সূখে বিরচন হয়।

ডাঃ। চমৎকার ঔষধ প্রয়োগ বটে। আরও কি রকম প্রয়োগের নিয়ম আছে বলুন। শুনতে কৌতুহল হচ্ছে।

ক। রোগী যা'তে বিনা কষ্টে ওষুদ খেতে পারে, তা'র জন্তে নানাপ্রকার কল্পনা আছে।  
 দুগ্ধেব সঙ্গে, নাংসেব সঙ্গে, শুষ্ক মৎস্য ও শুষ্ক  
 মাংসেব সঙ্গে, সববতের সঙ্গে, সুরার সঙ্গে,  
 আদ্যেব সঙ্গে, অরিষ্টের সঙ্গে, আরও অনেক  
 দ্রব্যেব সঙ্গে প্রয়োগ করার নিয়ম আছে।

ডাঃ। আচ্ছা বমনকারক ওষুদের কি  
 এ বকম প্রয়োগ নাই?

ক। আছে বৈকি। বিরেচন ঔষধের  
 কল্পনাও যত রকম, বমনকারক ঔষধের  
 কল্পনাও প্রায় তত রকম। বমনকারক  
 ঔষধ ফুলেব মালা'র মাথিবে, সেই মালা  
 শুকিয়েও বমন করা'বার নিয়ম আছে।

ডাঃ। ঔষধ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে দ্বিতীয়  
 দেখছি।

ক। এইটুকু শুনেই সে কথা বলবেনা  
 না। বমন ও বিরেচনকারক ঔষধ সকলের  
 কথা বলে পবে শাস্ত্রকার বলেছেন :—

“এই যে ছয় শত ঔষধের কথা বলা  
 হইল, ইহা কেবল দিক্‌দর্শন মাত্র। চিকিৎসক  
 যীর যুক্তি বলে এইরূপ সহস্র বা কোটি যোগ  
 কল্পনা করিয়া লইবেন। দ্রব্যের কল্পনা  
 বহুবিধ বলিয়া যোগ সকলের সংখ্যা'র সীমা  
 নাই।

ডাঃ। তা' মশা'য়েরা নূতন কল্পনা করা দূরে  
 থাকুক, যে ছয় শত প্রকার কল্পনা শাস্ত্র  
 কাব্যের ক'বে গেছেন, সে গুলিও বোধ হয়  
 ভুলে গেছেন।

ক। ইঁা সে কতিপয় টুকু আমাদের ঘ'ন্টেছে  
 বৈকি?

ডাঃ। বড়ই দুঃখের বিষয় কবিরাজ  
 ম'শায়। তা' যাক, এখন বিরেচন সম্বন্ধে যদি  
 আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে ত বলুন।

কায়ন—৪

ক। পূর্বে বমন বিরেচনের হীনযোগ,  
 সম্যক যোগ ও অতি যোগেব কথা বলেছি।  
 তা' ছাড়া তীক্ষ্ণ, মধ্য ও মৃদু ভেদে বমন-বিরেচন  
 তিন প্রকার। যে বমন, বিরেচন বা নিরুহ  
 দ্রব্য প্রদত্ত হ'লে সম্বর তাহার ক্রিয়া প্রবর্তিত  
 হয়, যাহা অত্যন্ত গ্লানিকর নহে, যাহা গুহুদেশ  
 ও হৃদয়ে বেদনা জন্মায় না এবং যাহা অনাশয়  
 থেকে সমস্ত দোষকে নিকাশিত করে, সেই  
 হ'ল তীক্ষ্ণ।

যে সকল ঔষধ জল, অগ্নি ও কীট দ্বারা  
 দূষিত নয়, উপযুক্ত স্থান থেকে উপযুক্ত কালে  
 গৃহীত, তুল্যাবীর্ঘ্য ঔষধ দ্বারা ভাবিত এবং  
 অপেক্ষা কৃত অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত—সেই ঔষধ  
 স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে প্রয়োগ ক'রলে তীক্ষ্ণত্ব  
 প্রাপ্ত হয়।

যে সকল ঔষধ ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন  
 গুণ বিশিষ্ট এবং পূর্বাপেক্ষা হীন মাত্রায়  
 প্রযুক্ত, সেই সকল ঔষধ স্নিগ্ধগুণ ব্যক্তিকে  
 প্রয়োগ ক'রলে মধ্যতা প্রাপ্ত হয়। আর যে  
 ঔষধ মন্দাবীর্ঘ্য, অতুল্যাবীর্ঘ্য ঔষধ দ্বারা ভাবিত,  
 অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত, সেই ঔষধ রূক্ষ ব্যক্তিকে  
 প্রয়োগ করলে মৃদুতা প্রাপ্ত হয়।

মধ্য ও মৃদুাবীর্ঘ্য ঔষধ বলবান ব্যক্তিদের  
 সমস্ত দোষ হরণ ক'রতে পারে না ব'লে, তা'দের  
 সম্যক শোধন হয় না। এই জন্ত বলবান  
 ব্যক্তিদের তীক্ষ্ণ এবং মধ্যবান ও হীনবান  
 ব্যক্তিদের মধ্য ও মৃদু ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে হয়।

আবার যে সকল রোগে সমস্ত লক্ষণ  
 প্রকাশ পায়—তাহা তীক্ষ্ণ ব্যাধি, যাহাতে মধ্যম  
 লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা মধ্যব্যাধি, আর  
 যাহাতে অল্প লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা মৃদু  
 ব্যাধি। ব্যাধির বল বুঝিয়া তীক্ষ্ণব্যাধিতে  
 তীক্ষ্ণ ঔষধ, মধ্যম ব্যাধিতে মধ্যম ঔষধ

এবং মৃৎ ব্যাধিতে মৃৎ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

ডাঃ। ঔষধ সংগ্রহের উপযুক্ত দেশ সকল যাঁহা এর আগে ব'লছিলেন, সেটা আবাব কি? ক। যে ঋতুতে যে ঔষধিয যে অঙ্গ (যেমন ফল পুষ্প, আটা) সম্যক নীক্ষাশালী হয়, সেই ঋতুতে তাহা সংগ্রহ ক'রতে হয়। আবার বস্ত্রীক, ক্ষার, মৃত্তিকা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ঔষধ জন্মায়—সেগুলি পূর্ণবীণী হয় না ব'লে, সেই সকল ঔষধি গ্রাহ্য নয়।

ডাঃ। বুঝেছি, তা'র পর বলুন।

ক। বমন বা বিরচন জন্ত প্রদত্ত ঔষধ যদি দোষ সঞ্চয়কে পরিণত না ক'বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তা' হ'লে দ্বিগুণ চিকিৎসক পুনরায় ঐ ঔষধ সেবন ক'রাবেন।

যে ব্যক্তি দীপ্তাশি, বহু দোষাক্ত ও দৃঢ়, স্নেহ-গুণ বিশিষ্ট তাহাদেব ভ্রংশোধ্য। ইহা-দিগকে পূর্ব দিন দোষেব উৎক্রিয়কারক জ্ববাদি ভোজন করাইবাব পব দিন পুনরায় ঔষধ পান করাইবে। তাহাণা চূর্ণল ও বহু দোষাক্ত এবং যাহাদের দোষের পরিপাক হইয়া বিবেচন হয়, তাহাদেব ভোজ্য ও রসাদির সহিত ঔষধ সেবন করাইতে হয়?

চূর্ণল ও অল্প দোষায়িত রোগীকে এবং বাহাকে পূর্বে সংশোধন ঔষধ সেবন করান হ'য়েছে—এরূপ ব্যক্তিকে মৃৎ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। কেননা মৃৎ ঔষধ বারংবার প্রয়োগ ক'রলেও কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ ঔষধ সহসা প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ তাহাতে শীঘ্র প্রাণ সংশয় হ'য়ে উঠতে পারে।

দোষের বিবদ্ধতা হেতু বমন বা বিরচন ঔষধ দ্বারা যদি বিলম্বে অল্প দোষ নির্গত হয়—

তবে গরম জল পান করান উচিত। ইহাতে আগ্নান (পেট ফাঁপা), পিপাসা, বমি ও দোষের বিবদ্ধতা নষ্ট হয়।

বমন বা বিরচন ঔষধ যদি দোষ দ্বারা বদ্ধ হয়ে উদ্ধ বা অধঃ কোন দিক দিগে নির্গত না হয়, এবং উদগার ও উদরে শূলবৎ বেদনা হয়—তা' হ'লে স্বেদ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

বিরচন ঔষধ সেবন ক'রে যদি সম্যক বিবেচন হওয়ার পরেও সেই বিবেচন ঔষধেব গন্ধগুক্ত উদগার উঠতে থাকে তাহা হ'লে রোগীকে বমন ক'রাবে, তা' না হ'লে অতিবিক্ত বিরচন হ'বে। আর ঔষধ জীর্ণ হওয়ার পর যদি অতিরিক্ত বিরচন হয়, তা' হ'লে বিরচন বন্ধ ক'বাব জন্ত শীতল জল পান ক'রাবে।

ঔষধ কদাচিৎ স্নেহা দ্বারা বদ্ধ হইয়া বক্ষঃস্থলে অবস্থিত কবিত্তে পারে। পরে স্নেহােব ক্ষয় হলে সম্যাকালে বা রাতে আপনা হ'তে নির্গত হয়। বিরচন ঔষধ যথার্থ ভাবে প্রয়োগের পর যদি লালাত্রাব, গা বমি বমি বিষ্টভ, পেটভার হয়ে থাকা ও রোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বীণ্য কটু রসাদি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

স্বমিষ্ট ক্রুরকাষ্ট ব্যক্তির বিরচন ঔষধ সেবন ক'রে যদি বিরচন না হয়, তা' হ'লে লটবন ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাতে স্বেদ জনিত স্নেহাের বিবদ্ধতা নষ্ট হয়।

রক্ষভোজী, নিয়ত পরিশ্রমী ও দীপ্তাশি শক্তিদের সঞ্চিতদোষ সকল—শ্রমজনক কর্ম বয়স, আতপ ও অগ্নির দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। উহাদিগের বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যাশন (পূর্কাহার অজীর্ণ সম্বন্ধে ভোজন) ও অজীর্ণ জনিত দোষ সকলও পূর্কোক্ত কর্ম, বয়স প্রভৃতি দ্বারা ক্ষয়

প্রাপ্ত হয়। এই সকল ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ করিয়া কুপিত বায়ু হইতে রক্ষা করা উচিত। কারণ কক্ষ ভোজন, পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে ইহা-দিগের বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। ইহাদের কোন বিশেষ ব্যাধি না হইলে বিরচন করাইবে না।

ডাঃ। বিরচন সম্বন্ধে সমস্ত বলা হ'য়েচে ?

ক। মোটামুটি প্রায় সবই বলা হ'য়েচে। কেবল শিবোবিরচন বাঁকী রহিল। সেটা নস্ত প্রসঙ্গে বলা যাবে।

ডাঃ। তা' এই যদি আপনার মোটামুটি হয়, তা'হ'লে বিস্তারিত না জানি কি ব্যাপার !

ক। ব'লেছি ত সে বিস্তারিত ব'লতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হ'য়ে পড়ে। প্রথমতঃ সে সকল কথা আরও ভাল ক'বে বোঝাবার জন্যে অনেক কথা বলা আবশ্যক। যেমন দান্ত না হ'লে শ্বেদ দেবে। একথাটা ভাল ক'বে বোঝাতে হ'লে কি শ্বেদ দেবে, কোথায় দেবে, কতক্ষণ দেবে—এ সব কথা ব'লতে হয়। আর বমন বিরচনের নানা প্রকার যোগ, নানা প্রকার স্নেহের কল্পনা, যেট পাকের নিয়ম, ঔষধ সংগ্রহ বিধি, আরও কত বিষয় ব'লবার আবশ্যক হয়। কাজেই য'বললাম—তা' মোটামুটি বৈ কি।

ডাঃ। আচ্ছা বিরচন তো বলা হ'ল, এখন বস্তুর কথা বলুন।

ক। আপনি কি এক দিনেই সব শিখতে চান ?

ডাঃ। তা'তে ক্ষতি কি ?

ক। না, ক্ষতি কিছু নাই, তবে লোকে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হয়। আর আপনি কি এক-দিনেই হবেন ?

(জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ।)

আগন্তুক। এই যে কবিরাজ ম'শায়! আমি আপনার বাসায় খুঁজে এখানে আসছি।

ক। ব্যাপার কি ?

আগন্তুক। আমার ছোট ভাই জ্বোলপের ওন্মুথ পেয়েছিল। তা' দান্ত হয়নি, ভয়ানক যন্ত্রণা হ'চ্ছে। তা' আপনি চলুন, ডাক্তার বায়ুকেও যেতে হবে।

ক। (ডাক্তারের প্রতি) চলুন, আপনার পিচকারী দেবার সরঞ্জাম সঙ্গে নিন।

ডাঃ। য'আলোচনা করা হচ্ছিল, সেটা ছ'জনে একত্রে প্রত্যক্ষ ক'রবার বেশ সুযোগ ঘটেছে।

আগন্তুক। আজ্ঞে আপনাদের পক্ষে সুযোগ বটে, কিন্তু আমার পক্ষে বিষম গোলযোগ। এখন আহুন।

(ক্রমশঃ)

## ওয়ার ফিভার।

বিগত কার্তিক মাসের “আয়ুর্বেদ” পত্রে “ওয়ার ফিভার” নামক প্রবন্ধ লিখিয়া ৩৭-সংখ্যে জ্ঞাতব্য যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছি, স্মরণঃ

ইহাকে উহার দ্বিতীয় প্রবন্ধও বলা যায়। দেখা যাইতেছে, বর্তমানে ওয়ার ফিভারের দ্বারা, কার্য্য, সবই পরিবর্তিত হইয়া একবারে ইহা

সংহার মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। একটা বিষম প্রবল ঝড়ের মত দেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। প্রথমে যখন ওয়ার ফিভার আমাদের দেশে আসিয়াছিল, তখন আমাদের বড় বেশী শক্ততা করিত না, অধুনা জরটা একবারে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, আর রক্ত মূর্ত্তিতে আমাদের উপর লাফাইয়া পড়িতেছে। জরের প্রকারটা আগেকার অপেক্ষা বহু প্রকারে বিভিন্ন এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার হস্ত হইতে আয়ুর্গণ্য করিবার উপায় সামান্যই দেখা যায়।

প্রথমে যেমন করিয়া জর আসিত, এখনও তেমন করিয়াই আসে, তবে মূর্ত্তিটা মারাত্মক। আগেও কফ, কাস, গা বেদনাটাকে সঙ্গে লইয়া আসিত, এখনও তা'রাই তা'দের সহায়, বডি গার্ড; অধিকন্তু নিউমোনিয়া নামক উগ্র সিপাহী রোগীর দেহে আসিয়া উপস্থিত হয়। নিউমোনিয়া হইলে রোগী প্রায় বাঁচান যায় না। বাহাদের নিউমোনিয়া প্রথমে হয় নাই, সামান্য কারণেই তাহাদের নিউমোনিয়া হইবার সর্ব্বদাই সম্ভাবনা থাকে। তাহা হইলে রোগীকে বাঁচানর বড় সম্ভাবনা থাকে না। নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীকে এই সময় কোন চিকিৎসক ভাল করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। রোগীর বিলক্ষণ কফ থাকে এবং তাহা দুর্গন্ধময়। কোন প্রকার চিকিৎসা যে এ সম্বন্ধে কার্য্যকারী, তাহাও এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। আমি যে সকল রোগী দেখিয়াছি, তাহাদিগকে ঔষধ দিলে সাময়িক উপদ্রবগুলি কমিয়া থাকে, কিন্তু ব্যারামের শেষ করিতে কেহই সমর্থ নহেন। সব রোগীই যে মরিয়া যায় এমন নছে শতকরা অর্দ্ধেক ভাল হইয়াও থাকে। যে সকল রোগী সাবধানে থাকে—তাহাদেরই

অধিকাংশ ভাল হয়, আর যাহারা অসাবধান, শরীরে ঠাণ্ডা লাগায়, ভাত বা ঠাণ্ডা দ্রব্য খায় বা পান করে তাহাদের অবস্থাই গুরুতর হইয়া পড়ে। “সাবধানের মার নাই”—কথাটা এখানে অনেকটা খাটে। বাহাদের প্রথম অবস্থায়ই নিউমোনিয়া লইয়া জরটা আসে, তাহাদের রক্ষার উপায় প্রায় দেখা যায় না।

জর যখন হয়—তখন হইতেই সাবধানতা অবলম্বন দরকার। ঠাণ্ডা জল ও অন্ন পথা বন্ধন করিতে হইবে, ঠাণ্ডা বাতাস বাহাতে লাগিতে না পায় তাহার উপায় করিতে হইবে। বাহাদের জর হয় নাই তাহাদের সকলকেও জল ছুটাইয়া পরে ঠাণ্ডা করিয়া পান করা উচিত। জল ছুটাইয়া লইলে জলে সংক্রামিত হইবার রোগ-বীজাণুগুলি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে ভাল মাংসের রোগ হইবার আশঙ্কা অতি কম থাকে। আর প্রতিদিন গৃহে ধূপ ও গন্ধক পোড়ান উচিত, তাহাতে দূষিত বাষ্প পরিষ্কার হইয়া রোগের বীজাণু নষ্ট করিয়া দেয়। ওয়ার ফিভার যেখানে আরম্ভ হয়, তথাকার প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারেই এই রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে, স্ত্রতরাং সকলেরই সতর্ক থাকা বিধেয়।

প্রথমতঃ ওয়ার ফিভারকে আমরা বড় ভয় করিতাম না, কারণ তখন মৃত্যুসংখ্যা প্রায়ই হইত না, কেবল ভোগই ছিল, এখন তা'র অগ্ররূপ অবস্থা দেখিয়া দেশের লোক নিতান্ত আশঙ্কিত হইয়াছে। আমাদের দেশের পল্লী গ্রামের লোক সমূহ বড় দরিদ্র, তা'দের রোগী-গুলি মাটিতে বিছানা করিয়া শুইয়া থাকে, ঘরে রীতিমত বেড়া নাই, তা' দিয়া হিন আসে ও ঠাণ্ডা লাগে। ওয়ার ফিভারের চিকিৎসকগণ বর্ত্তমান নাম দিয়াছেন ইনফ্লুয়েন্স, যে নামই



ইউক, নামে কিছু আসিয়া যায় না। মারাত্মক অবস্থাটা এখনই খুবই। এই রোগে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রায়ই স্বর্ণ সিন্দূর বা মকরধ্বজের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সাময়িক উপদ্রব সমূহ তাহাতে সময় সময় অনেকটা কমিয়া থাকে।\* ইহাব্যতীত সংক্রামক অবস্থা, ততটা প্রবল প্রাকৃতিক ওলাউঠারও নাই। সেই জন্তই ইহাতে সর্বদা বেশী সতর্ক থাকা সকলেরই কর্তব্য। যাহাদের জ্বর হয় নাই, তাঁহারাও ঠাণ্ডা লাগাইবেন। এই জ্বরের জন্ত দেশের যুতুসংখ্যা বড় বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা কলিকাতার মৃত্যুর হার দেখিলেই অনুমান করা যাইতে পারে।

অচিকিৎসায় বা বিনা শুশ্রূষায় বহু রোগী মারা পড়িতেছে। রীতিমত শুশ্রূষা পথ্য ও ঔষধ গুলিতে অনেকেই রক্ষা পাইতে পারেন। কাসের উপদ্রবে বাসক পাতার রস জ্বাল দিয়া মিশ্রিত সঙ্গে খাইলে অনেক উপকার হয়। তাহার সঙ্গে আদা, গোলমরিচ, কাবাবচিনি প্রভৃতি দিলে ভাল হয়। এই জ্বরে মাথা গরম ও মাথা বেদনা হয়। সেইজন্ত সেই সকল উপদ্রবের প্রতি চিকিৎসকের দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক। বুকটাকে গরম রাখিতে পারিলে নিউমোনিয়া আক্রমণ হইতে প্রায়ই রোগীকে রক্ষা করা যাইতে পারে। এই জ্বরে প্রায়ই দেখা যায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, এমন কি ৩৪ দিনেও একবার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। তজ্জন্ত কোষ্ঠ

পরিষ্কারের ঔষধ দিয়া শরীরটাকে হাল্কা করা কর্তব্য; কিন্তু সাবধান, যেন তীক্ষ্ণবীৰ্য্য জ্বোলাপের ঔষধ দেওয়া না হয়। এখন শীতকাল, ঠাণ্ডার সময়, সুতরাং যে ঘরে রোগী থাকিবে সে ঘর গরম রাখিবার জন্ত ঘরে আগুণ করিয়া রাখা কর্তব্য। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া হাতে পায়ে সৈঁক দেওয়াও কর্তব্য। অবস্থা বুঝিয়া বলকারক পথ্য দেওয়াও উচিত। জ্বর নির্দোষ মারিয়া গেলে কয়দিন পর অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া অন্ন পথ্য দেওয়া ব্যবস্থা হইতে পারে। পূর্বে বাঙ্গালায় অনেক স্থানেই টিনের ঘর, শীতকালে টিনের ঘর বড় ঠাণ্ডা, সুতরাং সে গৃহে রোগীকে না রাখিলেই ভাল হয়। বাধ্য হ'য়ে ঐরূপ গৃহে রাখিতে হইলে ঘরটাকে গরম রাখিতে হইবে। এই জ্বরে ঔষধ অপেক্ষা শুশ্রূষাই অধিকতর কার্যকারী হয়। এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ঘরে ঘরেই রোগী, কে কা'র শুশ্রূষা করে? সুতরাং ইহারই মধ্যে যাহা করিয়া উঠিতে পারা যায়—তাহার প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই জরসমগ্র দেশে অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যমের নিকট হইতে যেন পাশ লইয়া আসিয়াছে, যা'কে ধরিবে— তা'কে আর ছাড়িবে না—এইরূপই অবস্থা। যে গ্রামে বা পাড়ায় এই জ্বর আসিয়াছে, সেখানকার সমস্ত লোককেই সাবধান হইতে হইবে। নতুবা আর রক্ষা নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ ।

\* মকরধ্বজে শুধু সাময়িক উপদ্রব নহে—উহার প্রয়োগে ঐ ব্যবস্থার বিলম্ব উপকারই হইয়া থাকে। আঃ সং।

## সমর জ্বরের প্রতিষেধক আদা।

—:—

আদার, সংস্কৃত নাম আর্দ্রক; বাঙ্গালা নাম আদা, সংস্কৃতের অপভ্রংশ। ডাক্তারী নাম *Ginger Officinale*, ইংরেজীতে *Ginger* এবং হিন্দিতে আদরক বলে। আদা উদ্ভিদ বিশেষ; ইহার কন্দের নাম আদা। ইহা বাঙ্গলাদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়। রোজ ও গাছের ছায়া—উত্তম স্থানেই ইহার আবাদ চলে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে জমী উত্তমরূপে খুঁড়িয়া দেড় হাত অন্তর শ্রেণী কাটিবে এবং প্রতি শ্রেণীতে আধহাত অন্তর আদা পুঁতিয়া দিবে। বেশ এক পসলা বৃষ্টির পর জমীতে আদা বসাইবে। গোড়ায় যাহাতে জল না দাঁড়ায়—সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ছাই ও খোল আদার পক্ষে উত্তম সার। দৌয়াশ মাটিই আদার উত্তম জমি। আশ্বিন কার্তিক মাসে আদার গোড়া হইতে কতক আদা ভাঙ্গিয়া লওয়া চলে এবং পরে মাটি চাপা দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। মাঘ মাসে পাতা শুকাইয়া গেলে সকল আদা মাটি হইতে উঠাইবে। আদা ইয়ুরোপে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে।

পরিপুষ্টক আর্দ্রককন্ড উত্তমরূপে দ্বৌত করিয়া বুড়িতে রাখিয়া ক্লয়কেরা ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া ছাল তুলিয়া ফেলে। ইহা রোদ্রে ক্রমশঃ শুক করিয়া লইলেই শুষ্ঠ প্রস্তুত হয়। উত্তম শুষ্ঠ দেখিতে শুভ্রবর্ণ এবং বহু দিন অবিকৃত থাকে। পাটনাতে বিস্তর আদা জন্মে এবং বঙ্গে পাটনাই শুষ্ঠই সাধারণতঃ বাজারে বিক্রীত হয়।

মাত্রা সরস অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা; চূর্ণ ১০ আনা হইতে ১০ আনা ঔষধার্থে ব্যবহার করিতে হয়।

এই বৎসর (১৩২৫ সন) কলিকাতা ও অগ্নাত্ত সহরে, এমন কি গ্রামে-ঘরেও এক-প্রকার বহুব্যাপক নাশক সংক্রামক সর্দি-জ্বর দেখা যায়। সাধারণতঃ এই জ্বর “সমর জ্বর” বলিয়া কথিত। ভারতবর্ষে প্রথমতঃ বোম্বে প্রদেশেই এই রোগ দেখা দেয়। রোগেব প্রথম অবস্থায় প্রবল সর্দিজ্বরের মত নাক ও গলা স্লেমা পূর্ণ হয়, অত্যন্ত মাথা ধরে, ক্ষুধা মাত্রও থাকে না, শরীর ম্যাজমাজে ও দুর্বল বোধ হয়। রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় জ্বর দেখা দেয়, মূত্র রক্তবর্ণ হয়, শেষে বুকে সর্দি বসিয়া স্থল বিশেষে ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বরের স্তায় বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত করে। এ রোগ কলিকাতায় সংক্রামক রূপে দেখা দিলে তথায় আমরা যে বাটীতে ছিলাম, ঐ বাটীর সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হন এবং ৩৪ দিন ভুগিয়া সকলে আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু কলিকাতার অগ্নাত্ত স্থলে এই বাধি এত সহজে আরোগ্য হয় নাই। এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা ভীতিপ্রদ।

এই রোগের গৌণ কারণ যাহা হউক, মুখ্যতঃ কোন আগন্তুক বিরাগ গলা ও নৈস্মিক ঝিলি এবং পাকস্থলী আক্রমণ করিয়া বায়ু, পিত্ত এবং কফকে দূষিত করে। কফের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আকর্ষ  
আদার রসের কুলি দিবসে ৩৪ বার এবং  
আদার রস ও মধু দিবসে ৩ বার এবং তুলসী  
পাতার রস মধু সন্ধ্যার পর ১ বার সেবন করা  
যায়, তাহা হইলে ব্যাধি নিশ্চয়ই প্রবল হইতে  
পারে না এবং ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া  
যায়। গ্লিজারেড ব্যবহার করাও মন্দ নহে,  
ইহাতে আদা আছে। গুরুতর আক্রমণেও  
এইরূপ চলিতে হইবে। আমি এ পর্য্যন্ত ৭৬  
জন রোগীকে এই ব্যাধি হইতে আরোগ্য  
করিয়াছি। ইহাতে কাহারও কোন ছুষ্ঠ উপ-  
সর্গ দেখা দেয় নাই। সকলকেই ইহা পরীক্ষা  
করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ  
জানাইতেছি। আদা খাণ্ডরূপে আমরা নিত্য  
ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা ব্যবহারে  
কাহারও কোন ভয়ের কারণ নাই। আদার  
রসের কুলি লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গলা বুক  
ও নাক হইতে সর্দি কাটিতে থাকে, বেদনার  
ধন হয় এবং সমর জ্বরের যাতনাও অনেকটা  
নিবৃত্ত হইয়া যায়, ক্রমে ক্ষুধা দেখা যায় ও  
সোগ আরোগ্য হয়। গ্রামবরে সমর জ্বর  
দেখা দিলেই আহারের পূর্বে আদা ও সৈন্ধব  
লবণ সেবা। এইরূপে চলিয়া সমর জ্বরে  
মাত্রান্ত হইতে আমরা কাহাকেও দেখি  
নাই। আদা ও তুলসী সমর জ্বরের প্রতিষেধক  
ও উত্তম ঔষধ। বতদূর পরীক্ষা করা হইয়াছে,  
তাহাতে এই সত্যই প্রতিপাদিত হয়।

আদা সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিস্তৃত  
অভিপ্রায় নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। •

চক্রদত্ত মতে (১) আদার রসে সৈন্ধব লবণ  
ও ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকর্ষ মুখে ধারণ  
করিবে এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিবে,  
পুনঃ পুনঃ খুঁখু ফেলিবে। ইহাতে লগ্নিপাত

জ্বরে বৃকের, গলার ও কণ্ঠের কফ বাহির  
হইয়া লঘুতা জন্মে। (জ্বর, চিঃ) (২)  
অতিসার রোগীর নাভির চতুর্দিকে পিষ্ট-  
আমলকীর আলবাল প্রস্তুত করিয়া মধ্যস্থল  
আদার রসে পূর্ণ করিবে; ইহা অতিসার  
রোগীর পক্ষে অতিশয় হিতকর। (অতিসার  
চিঃ) (৩) শুষ্ঠ কঙ্কের সহিত গব্যঘৃত পাক  
করিয়া গ্রহণী রোগে সেব্য; ইহা বায়ুর  
অনুলোমক (গ্রহণী চিঃ) (৪) ক্ষুধা বৃদ্ধির  
জন্য মধ্যাহ্নে আহারের পূর্বে আদা ও সৈন্ধব  
লবণ সেবা। (অগ্নিমান্য চিঃ) (৫) নূতন সর্দি  
ও শ্বাসকাশে আদার রস ও মধু সেব্য। (কাস  
চিঃ) (৬) আমবাত রোগী কঁাজির সহিত  
শুষ্ঠ চূর্ণ পান করিবে। (আমবাত চিঃ) (৭)  
হৃদরোগ ও কাস আদির পক্ষে শুষ্ঠের কাথ  
গরম গরম পান হিতকর। (হৃদরোগ চিঃ)  
(৮) তীব্র শিরোবেদনায় গব্যজ্বলের সহি শুষ্ঠ-  
চূর্ণ নস্ত্র লইবে। (শিরোরোগ চিঃ)।

শাস্ত্রধর মতে (১) শুষ্ঠচূর্ণে গব্যঘৃত মাখাইয়া  
এড়ুপত্র বেষ্টন পূর্বক মাটির প্রলেপ দিয়া মুহু  
অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এই চূর্ণ  
প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবনে আমাতি-  
সারের বেদনা দূর হয়। (হিঃ খঃ ১ অঃ)  
(২) শুষ্ঠচূর্ণ এড়ুপত্রের রসে সিক্ত করিয়া  
পিণ্ডাকার করতঃ এড়ুপত্র দ্বারা আবৃত ও  
মাটির প্রলেপ দিয়া পুটপাক করিবে। ইহার  
রস মধুসহ পান করিলে আমবাত প্রশমিত  
হয়। (হিঃ খঃ ১ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ মতে (১) পীতপুণ্ডবেড়লা  
মূলের ছাল ও শুষ্ঠ সমভাগে লইয়া কাথ  
প্রস্তুত করিবে। ২১০ দিন এই কাথ পান  
করিলে শীতকম্প-দাহযুক্ত বিষম-জ্বর নষ্ট  
হয়। (মঃ খঃ ২ ভাঃ) (২) সার্কিকাক্ষার ও

আদা সমভাগে গুআরোগে সেবা। (মঃ  
থঃ ওভাঃ)

চরক মতে (১) আদার রস ও হৃৎ সমভাগে  
উদর রোগে সেবা। (চিঃ ১৮ অঃ) (২)  
গরম জলের সহিত শুঁঠচূর্ণ পান করিলে আম  
বিনষ্ট হয়। (চিঃ ১৯ অঃ) (৩) পুরাণ শুড়  
ও আদা তুল্যভাগে ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ  
১ মাস সেবন করিবে, এই সময়ে হৃৎকের  
সহিত অন্ন পথ্য ব্যবস্থায়। শোথরোগে ও  
শ্বাসের পক্ষে এই ঔষধ হিতকর। (চিঃ)  
১৭ অঃ) (৪) ক্ষতক্ষীণ রোগী শুঁঠচূর্ণ সেবন  
করিবে। ঔষধ সেবনকালে অন্ন ত্যাগ করিয়া  
শুধু হৃৎ পান বলারোগ্যপ্রদ। (চিঃ ১৬ অঃ)  
(৫) বাল্য ও শুঁঠ সমভাগে কাথ প্রস্তুত

করিয়া অতিসারে সেবা। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও  
অতিসারহর।

দ্রব্যগুণ হিসাবে আদা—ভেদক, গুরু,  
উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিকারক, কটু, বিপাকে মধুর,  
কক্ষবাত ও কফনাশক। শুঁঠে যে সমস্ত গুণ,  
প্রায় সমস্তই আদাতে আছে। শুঁঠের গুণ  
যথা—রুচিকারক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ,  
উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ, বায়ু ও বিবন্ধ (মলাদির  
রোধ) নাশক, বলকারক এবং স্বরবদ্ধক।  
আগ্নেয় গুণ হেতু শুঁঠ আতান্তরীণ জলীয়ংশ  
শোষণ করতঃ মল পদার্থ সংগ্রহ করে এই  
হেতু শুঁঠ গ্রাহী।

‘ঢাকা প্রকাশ’—

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় কবিভূষণ।

## মকরধ্বজের অনুপান বিধি।

—:—:—

সর্বজন শুন শুন, মকরধ্বজের গুণ,  
যে রোগেতে যাহা অনুপান।  
আদা মধু সর্দি জরে, তুলসীর পত্র পরে,  
স্বল্পকাসি সারে দিলে পান ॥  
দাহ, পিপাসা কারণ, রোগী বাস্ত সর্বক্ষণ,  
—সে সময় পটোল বেদনা।  
মধু আর বেলপাতা, আশ্চর্য্য এর ক্ষমতা,  
শান্তি পায় অর ও বেদনা ॥  
মৌরী ও ঋত চন্দন, ইহাতে সারে বমন,  
শশা বীজ, কুল আঁটি শাঁসে।  
চাউল দোত জলে, অজীর্ণে সুফল ফলে,  
জাম ছালে অতিসার নাশে ॥

হইলে হে নাড়ীক্ষয়, দেখে সবে পায় ভয়,  
সে সময় করূরের জল।  
আর দিলে আদা তা’তে, মঙ্গলময় রূপাতে,  
অত্যাশ্চর্য্য জানিবেক ফল ॥  
ভয় ময়ূরের পুচ্ছ—হিকাকে করয়ে তুচ্ছ,  
পুনঃ পুনঃ ইহা ব্যবহারে।  
শিথিল হইলে গাত্র, মৃগনাভি একমাত্র,  
ঘোর শাস্তিপাতিক বিকারে ॥  
‘কদলী মূলের রস করিলে সেবন।  
হিকা ভয় দূর হয় শুন সর্ব জন ॥  
মকরধ্বজের সহ কতিতাল জল,  
মিশ্রা’য়ে সেবিলে হয় হিকা রোগে ফল ॥

ভিজান মূড়ির জল পরম সফল ।  
 ধোড়ের রস ও চিনি হরে ঠিকা রোগ ভয় ॥  
 গুণক সিউলি পাতা, মধু ও পলতা লতা,  
 পুরাতন অরু নিবারক ।  
 যদি কাঁর থাকে কাসি, তাহাকে কচি প্রকাশি  
 —উপকারী পিঁপুল বাসক ॥  
 থাকিলে উদবানয়, না করিহ কোন ভয়,  
 আলকুশী সহ ভদ্র মূল ;  
 অথবা বিট ধবণ, যমানী সহ সেবন,—  
 করিলে হে যায় আমশূল ॥  
 ষোণ পূর্ণবা রস, শোণ রোগী এর বশ,  
 ত্রয়ে থাকে পাবে পরিভ্রাণ ।  
 পটোয় আব বেদানা, ইহাদের গুণপণা,  
 শীঘ্র সারে উদর আধান ॥  
 ধাইল, মোচরস রক্ত আশায় ।  
 পরনোপকারী ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥  
 চিকিৎসার রস আমকুলি রসে ।  
 আনাশয় যার দূরে ছ' তিন দিবসে ॥  
 রক্তনাইদের ফল মৌরী ও চন্দন ।  
 বক্ত আনাশয় এতে হয় নিবারণ ॥  
 কুড়ুটি ও জায়ফা, রক্তজানে ফল,  
 বনমূল্য পাতা আয়াপান ।  
 মুখা ও কাঁচড়া দান, ব্যবহারে অবিরাম,  
 রক্তরোধে ইহাই বিধান ॥  
 ইহলে রক্তাভিসার, মুখা ও দাড়িম পাতার,—  
 বস সহ করিবে সেবন ।  
 আব অতি উপকারী, তণ্ডুল ধোত বারি,  
 গুন গুন ওহে বিচক্ষণ ॥  
 বেলগোড়া ইক্ষু চিনি, ইহাতে সারে গ্রহণী,

কিধা আমলকী ভিজা জলে ।  
 মুখা, কর্পূর, খদির, এই অনুপানে ধীর,  
 ভাষণ গ্রহণী যাব চলে ॥  
 আমলকী পদ্মমূল্য, মট্টমধু ধাইল,  
 ইহা শীঘ্র তৃষ্ণা নিবারক ।  
 যজ্ঞ দুম্বের রস, জাফা ও অন্নবেতস,  
 মৃগ শুষ্ক—পিপাসা নাশক ॥  
 মনকুচ্ছ, মৃত্তাবাত, প্রমেহ, ভাষণ বাত,  
 মকরধ্বজেতে উপকার ।  
 প্রমেহেতে পুঁজ পড়া, যজ্ঞ দুম্বের গুঁড়া,  
 ব্যবহারে হয় প্রতিকার ॥  
 গদ ও ইসবগুল প্রমেহ করে নিমূল,  
 কাঁচা হলুদ ও আমলকী ।  
 কাকুড় বীজের শাঁস, মূত্রকুচ্ছ করে নাশ,  
 মুহু বিরচনে হরীতকী ॥  
 কাবাব চিনির গুঁড়া শ্রেষ্ঠ স্বপ্নভঞ্জে ।  
 সেবিলে শয়ন কালে মধু দিয়ে সঙ্গে ॥  
 যৌবনে প্রধান রোগ শুক্রের তারল্য ।  
 তালমূল্য রসে যাম ইহার প্রাবল্য ॥  
 রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ভীতিপ্রদ কাসে,  
 সতত কাতর রোগী পড়ি মহা ভ্রাসে,  
 আলতা ভিজান জল মধু দিয়া তাতে ।  
 ফটকির গুঁড়া সহ সেবিবেক প্রাতে ॥  
 যজ্ঞদুম্বের রস এক তোলা ল'বে ।  
 মধু দিবে অর্দ্ধ তোলা সেবিবেক সবে ॥  
 কামিনী ফুলের পাতা লবে রস করি ।  
 সেবিবে মকরধ্বজ বিষ্ণু নামস্মরি ॥  
 বাসক পাতার রসে সারে রক্ত পিত্ত ।  
 ভগবান পাদ পদ্মে রেখো রোগীচিত্ত ॥

শ্রীতারিণীচরণ কবিভূষণ ভট্টাচার্য্য ।

## রক্ত মোক্ষণ ।

—:—

### Blood Letting.

রক্ত মোক্ষণ দুই প্রকার। (১) সার্বাস্থিক (general) এবং (২) স্থানিক (Local)।

সার্বাস্থিক রক্তমোক্ষণ দুই প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে,—(১) শিরচ্ছেদন (venesection) ও (২) কোন ধমনীচ্ছেদন (Arteriotomy)। প্রথমোক্ত প্রণালী ডাক্তারী মতে সচরাচর অবলম্বিত হইয়া থাকে। যতটুকু রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে, রোগীর বয়স, অবস্থা ও রোগের প্রকোপ অনুসারে তাহা স্থির করা আবশ্যিক। একরূপ অবস্থায় নাড়ীর অবস্থা আমাদের প্রধান নিদর্শন। নাড়ী যতক্ষণ কঠিন থাকে, ততক্ষণ রক্ত মোক্ষণ করা যাইতে পারে এবং তাহা কোমল হওয়া মাত্র নিবৃত্ত হওয়া উচিত। নতুবা শোণিত ক্ষয়ে মুচ্ছা হইবার সম্ভাবনা।

স্থানিক (Local) রক্ত মোক্ষণ ও দুই প্রকার (১) জৌক বসান (Leeching) এবং (২) বস্ত্র দ্বারা রক্ত চোষণ (cupping)।

১। জৌক বসান। প্রথমতঃ একটু পাত্রে একসের পরিমাণ জল রাখিয়া তাহাতে অন্ধ তোলা হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে জলৌকা নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলে উহা স্বয়ং লাল্য ত্যাগ করিতে থাকিবে। সেই লাল্যহীন জলৌকা রক্ত-মোক্ষণ কার্যে প্রশস্ত। যে স্থানে জৌক বসাইতে হইবে, সেই স্থান ধৌত করিয়া মুছিয়া রাখিবে। এবং শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা জলৌকা

ধরিয়া ঐ স্থানে লাগাইয়া দিবে। সহজে না ধরিলে কিঞ্চিৎ ছস্ক, মাখন বা রক্ত ঐ স্থানে লাগাইয়া দিবে। চিত্র জলৌকা সচরাচর এক হইতে দুই ড্রাম এবং দেশীয় জলৌকা এক হইতে তিন ড্রাম রক্ত শোষণ করে। প্রায়ই ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে জলৌকা পড়িয়া যায়। যদি শীঘ্র ছাড়াইবার প্রয়োজন হয়, তবে একটু তামাকের জল না লুণের জল দিলেই খুলিয়া পড়িবে। হাঁকার কটু জল অথবা চূণের জল দিলেও খুলিতে পারে। জৌক কোন মতেই টানিয়া খুলিবে না। টহার পর যদি আরও রক্ত মোক্ষণ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত দষ্ট স্থানে উষ্ণ জলের সেক দিবে এবং চোষণাদি করিবে। যদি জৌক ধরার স্থান হইতে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয়, তবে কিঞ্চিৎ তুলা ঐ স্থানে টপিয়া ধরিলেই রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। তাহাতেও রক্ত বন্ধ না হইলে অথবা অত্যন্ত রক্তস্রাব হইলে ফটিকরী চূর্ণ কিম্বা তাহার গাঢ় দ্রব লাগাইলে সহজেই রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। ডাক্তারী মতে acid tanic, nitrit of silver অথবা Tr. Steel প্রয়োগে সহজেই রক্ত বন্ধ হয় মলদ্বারে, গলমধ্যে ও জরায়ু, গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে রক্ত মোক্ষণের আবশ্যক হইলে উপযুক্ত বস্ত্র দ্বারা অতি সাবধানে জলৌকা প্রয়োগ করিতে হয়; কেননা, সামান্য কারণে ঐ সব গহবরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এরূপ হইলে লবণ জল কিম্বা হাঁকার কটু জল

প্রয়োজন মত পান করিতে দিবে অথবা পিচ্কারী দ্বারা অন্তঃক্ষেপ করিবে।

২। যন্ত্র দ্বারা রক্ত চোষণ (cupping) দুই প্রকার; (১) আর্দ্র (moist) ও (২) শুষ্ক (dry)। moist cupping ডাক্তারী মতে নিম্নোক্ত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। হার্বিকটের নামক যন্ত্র দ্বারা প্রদাহ স্থান কর্তন করিবে। এবং একটি কাঁচের বাটির অভ্যন্তর প্রদেশে তুলি দ্বারা স্পিরিট (Spirit) লাগাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া মাত্র ক্রান্তি স্থানে তাহা বসাইবে। ইহাতে বাটির অভ্যন্তর বায়ুশূন্য হইয়া যয় এবং তদ্বারা উক্ত স্থানের স্বক আকৃষ্ট ও দ্রুত হইয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে রক্ত নিঃসৃত হইয়া যায়।

Dry cupping অস্ত্র দ্বারা অথবা অন্তরূপে চর্ম না চিবিয়া ঐরূপে বাটি বসাইবে। ইহাতে শোণিত নিঃসৃত না হইলেও বাটির নিম্নস্থ স্বক প্রভাবের সঞ্চিত হয়; তাহাতে অভ্যন্তরীণ রক্তাধিক্য কমিয়া যায়।

আময়িক প্রয়োগ;—বলিষ্ঠ ও যুবকদিগের বদ্বন্দ্ব ও নষ্টিকাবরক্ ঝিল্লি, হৃৎপিণ্ডাবরক্ শরৎ ও মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ এবং সন্ধ্যাস, গাউট, স্থানিক চর্ম প্রদাহ প্রভৃতি অবস্থায় সার্জনিক ও স্থানিক রক্ত মোক্ষণ আবশ্যক।

কোন কারণে শরীর হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে অস্বাভাবিক পরিমাণে সর্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু কোন প্রদাহিত স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইলে তথাকার প্রদাহ কমিয়া আসে। প্রাচীন চিকিৎসকগণ প্রায়ই রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করিতেন। সুশ্রুতে রক্ত মোক্ষণ প্রণালী অতি সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। তথাপি কালের কুটিল চক্রে আজকাল

এই প্রথা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অত্যাধি আশীদেব ময়মনসিংহ জেলার স্থানে স্থানে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ইহার প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তাহারা বাশের চোঙ শিক্ষা, বিষ প্রভৃতির সাহায্যে আশ্চর্য্য উপায়ে রক্তমোক্ষণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বিষ দ্বারা রক্তমোক্ষণ প্রণালীই সহজ ও সুফল প্রদ। আমি অনেক স্থলে ইহার অসীম উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি। সাধারণের অবগতির জন্ত সহজ উপায়টিই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

একটি ছোট স্ফুগোল অথচ সুপক্ক বিষ—কপিথক হইলেই ভাল হয় সংগ্রহ করিয়া তাহার মুখ সামান্য পরিমাণে কাটিয়া ফেলিতে হইবে এবং সেই ক্রান্তি বিষকে জলে উত্তম রূপে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ ভাবে বিষের মধ্যস্থিত পদার্থ গলিয়া গেলে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। পরিষ্কৃত বিষটি রৌদ্রোত্তাপে শুষ্ক করিয়া এক খণ্ড ফ্লানেল অথবা অস্ত্র কোন গরম কাপড় দ্বারা বেষ্টন পূর্বক আলমারীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে—যেন তাহাতে ঠান্ডা বাতাস না লাগে।

কাকিলা মংস্তের চোঁট দ্বারা প্রদাহিত স্থান পাচিয়া লইতে হইবে। পরে উক্ত বিষের অভ্যন্তর ভাগে স্পিরিট লাগাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া মাত্র উহা প্রদাহিত স্থানে জোরে বসাইয়া দিবে হইবে, স্পিরিট না পাইলে কেরোসিন দ্বারা বিধের অভ্যন্তর প্রলিপ্ত করিলেও চলে। তবে স্পিরিট দিতে পারিলেই ভাল হয়। ইহাতে বিষের অভ্যন্তর ভাগ বায়ুশূন্য হইয়া স্বককে আকৃষ্ট করিয়া দূষিত রক্ত নির্গত করিয়া

কেলে। যে পর্যন্ত দূষিত রক্তে বিষের অভ্যস্তর পূর্ণ না হয়, সে পর্যন্ত বিষ পতিত হয় না। পরে পরিমাণ মত রক্ত নির্গত হইয়া গেলেই বিষ আগনাগনিই খাওয়া গড়িয়া যায়। তবে

প্রদাহ বেশী হইলে কদাচিৎ ২১ দিন পরেও পুনরায় উপরোক্ত নিয়মে রক্ত চোষন করিতে হয়।

ত্রীযোগেন্দ্র কিশোর লোহ।

## বসন্তে মুষ্টিযোগ।

— ৩০৩ —

বসন্তে বস প্রয়োগ। শোণিত গন্ধক দুই ভাগ ও শোণিত রস এক ভাগ লইয়া কছলী প্রস্তুত করিয়া, তাহা যথোপযুক্ত মাত্রায় পানের রস সহ সেবন করাইলে, বসন্তের প্রতীকার হইয়া থাকে।

বসন্তে দাঁড় নিবারণ। বসন্ত রোগ নিবন্ধন শরীরে দাঁড় উপস্থিত হইলে, বাসি জলের সহিত উপযুক্ত গুণিমাণে নু মুগ্ধিত করিয়া সেবন করাইলে, দাঁড়ের শাস্তি হইবে। অধিকন্তু এই নু মুগ্ধিত জল পান দ্বারা বসন্ত রোগেরও উপশম হইয়া থাকে।

কায় শোধন। চাণিতার ছাল দ্বারা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া লইয়া ঐ জল দ্বারা শরীর ধৌত করিলে বসন্তের ক্লেশ বিদূরিত হইবে। পাচন প্রস্তুতের নিয়মে পূর্ব দিন কষায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া পরদিনে উচ্চ ব্যবহার করাইতে হয়। এইরূপ কাথকেই আয়ুর্বেদে শীতকষায় বলা হইয়াছে। এ স্থলে ধৌত করিবার জন্ত বড়স্পানীয় বিধানই শীত কষায় প্রস্তুত করা বিহিত।

ধূপ। বচ, বাঁশের নেলি, যব, বাসক মূলের ছাল, কাঁপাস বীজ ব্রাহ্মী থাক, তুলসীপাতা,

আপাং বীজ, লক্ষা ও রত সংযোগে ধূপ প্রদান করিলে, সকল প্রকার বসন্ত ও অগ্নিবিশ্রম রোগেরও উপশম হইয়া থাকে। কাঁহাবও কাঁহারও মতে এ স্থলে ধূম জ্বোর সহিত বিষ প্রদান করাও কর্তব্য, কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, বসন্ত রোগের কোন অবস্থাতেই কোন প্রকারে বিষের সম্পর্ক রাখা, জীবনের পক্ষে হিতজনক নহে।

কষায় (পাচন) নিম্ভাঙ্গ। নিম্ভাঙ্গ, ক্ষেতপাঁপড়া, আকনাদি, কটকি, পলতা, বাসকমূলের ছাল, ছুরালতা, আমলা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, ও শ্বেতচন্দন;—এই দ্রব্যগুলি যথোপযুক্ত মাত্রায় সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া, উহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, জ্বর ও বিষপ্ৰবৃত্তি ত্রিদোষজাত বসন্ত রোগেরও শাস্তি হইয়া থাকে। বসন্তের গুণ্ট বসিয়া গেলে, এই পাচন ব্যবহারে তাহা পুঙ্খরায় বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পাচনটি সকল প্রকার বসন্তের বিশেষ ফলপ্রদ।

পটোলাদি। পলতা, গুলঞ্চ, মূতা, বাসক, ধনে, ছুরালতা, চিরাতা, নিম্ভাঙ্গ, কটকি ও ক্ষেতপাঁপড়া—এই সকলের মিশ্রিত কাথ, কষায়



অথবা কি পক্ষ, সকল প্রকার বসন্তেরই উপশম হইয়া থাকে ; অধিকন্তু অর ও-বিস্ফোট প্রভৃতি এই কদায় সেবনে নিবারণিত হয় ।

শীঘ্র পাকাইবার উপায় । টাবালেবুব ক্ষেপ, কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই বসন্তের গুটিকাগুলি পাকিয়া উঠে এবং দাচ নিবারণিত হয় ।

পাদদাচ নিবারণ । পাদদ্বয়ে উৎপন্ন বসন্তগুলি অত্যন্ত দাহ জন্মাইয়া থাকে, চেলেনি জলদ্বারা বাবংবা বা ধুইলে সেই দাচ নিবারণিত হয় ।

পক্ষাত্তায় ব্যাভা । বসন্তের পক্ষাত্তায় বাব অতিশয় প্রকোপ হইয়া থাকে, এইজন্য বসন্তের এক অবস্থাতে বিশেষণ অর্থাৎ কক্ষ ক্রিয়া কবা যেন অতঃপর বসন্তবোগ দীড়িত ব্যক্তির পক্ষে উভয়নক নহে, প্রত্যুত এইরূপ অবস্থাতে সংগ্রহ অর্থাৎ পৃষ্টিকাবক ক্রিয়ায় অন্তর্ধান করাই আত্মবের জীবন কামনায় স্ফটিকিংসকের কর্তব্য ।

পক্ষ অবস্থাতে—গুলফ, যষ্টিমধু, কিসমিস, ইক্ষ্মূল, ও দাড়িম ছালের কাথে উপযুক্তরূপে ইক্ষ্মু গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে শীঘ্র বসন্তের ফোটিকগুলি পাকিয়া উঠে এবং বায়ুরও শান্তি হইয়া থাকে ।

মাংসরস প্রয়োগ । বসন্তের পক্ষাত্তাতে কক্ষক্রিয়া নিবন্ধন বায়ুর প্রকোপ হইয়া পড়িলে, সেই আত্মবের শূল, আত্মান (পেট দাপা) ও কম্প প্রভৃতি বাতজাত উপদ্রব-গুলি জন্মিয়া থাকে । এই অবস্থাতে চাতক ও তিতিব প্রভৃতি পাখীর মাংসরস অল্প মাত্রায় সৈন্দ্র সহযোগে প্রদান করা কর্তব্য ।

অকচি । বসন্তবোগে অকচি হইলে অল্প দাড়িমের রসের সহিত যুষ পান করা উচিত ।

থয়ের এবং পীতশাল দ্বারা সাধিত শীতল কাণ পানেও অকচি বিদূরিত হয় ।

শৌচ । থয়েব কাষ্ঠ ও চালিতা ছালের দ্বারা যড়ঙ্গপানীয় বিধানে অর্দ্ধেক জন গুলু করিয়া প্রস্তুত কাণ, বসন্তবোগে শৌচ ক্রিয়ায় ব্যবস্থা করা কর্তব্য ।

মৃথ ও কঠবোগে । জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সূপারি, শমীকাঠ, আমলা ও যষ্টিমধু দ্বারা কাণ প্রস্তুত করিয়া, শীতল অবস্থায় তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া, মৃথ ও কঠবোগে গল্গন ধারণ কবিত্তে হইবে ।

চক্ষুবোগে । গুলফ ও যষ্টিমধু জন্মের সহিত বাটিয়া লইয়া বস্ত্র দ্বারা পুটুলি বাধিতে হইবে । ঐ পুটুলি ঈষৎ নিপীড়িত করিয়া চক্ষুতে সেক দেওয়া কর্তব্য ।

যষ্টিমধু, তরীতকী আমলা, বহেড়া, হৃচম্বনী, দারুহরিদ্রা নীলোৎপল (সুঁদি) বেণারমূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা—এই সকল দ্রব্য মিলিত ভাবে অথবা পৃথক ভাবে (এক একটির) যথাযথ গ্রহণ করিয়া প্রলেপ বা কাণ দ্বারা অভিষেক করিলে নয়নগত বসন্তের উপশম হয় এবং ফোড়া গলিয়া চক্ষুর অনিষ্ট ঘটিবার কোন আশঙ্কা থাকে না ।

পুষ্ট হইলে তাহাব প্রতিকার । বসন্তের ফোটকে পুষ্ট হইলে বট, অখথ, পাকুড় ষজ্জুন্মর ও বকুলের ছাল চূর্ণ তাহাতে ব্যবহার করা বিধেয় । ঘুটের ছাই অথবা গুলু গোবর চূর্ণ ও পূর্বোক্তরূপে স্লেদ নিবারণের জন্ত প্রয়োগ করা বিহিত ।

ক্রিমি নিবারণ । বসন্তের ফোটকে ক্রিমি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা নিবারণের জন্ত সরল, অগুরু ও গুলু প্রভৃতি

দ্বারা বেশ ধূম প্রদান করা কর্তব্য। কারণ এইরূপ ধূমের দ্বারা আতুরের বেদনা ও দাহের শাস্তি হয় এবং পুষ্ট নির্গত হইয়া ক্ষোটকগুলিও বিগত হয়; সুতরাং শীঘ্রই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

কণ্ঠশুদ্ধি। এই রোগে কণ্ঠশ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, পিপ্পল ও হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। কণ্ঠশুদ্ধির জন্ত অষ্টাঙ্গবলেহ অথবা আদার কবল করাও বিহিত।

স্নেহ প্রয়োগ। বসন্তরোগে পান, অভ্যঞ্জন ও ভোজ্য দ্রব্যের সহিত পঞ্চতিক্ত দ্রব্য ব্যবহার করা ব্যবস্থা। ব্রণরোগেব জন্ত যে সকল প্রয়োগ বিহিত হইয়াছে, ইহাতে সে সকলও বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার করা আবশ্যক। কিন্তু বসন্ত-রোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তৈল ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রাচীন ও প্রবীন বিচক্ষণ আয়ুর্বেদ আচার্য্যগণ সকলেই এক-বাক্যে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

‘পঞ্চতিক্তং প্রযুক্ত্বীত পানাত্যজ্ঞনভোজনৈঃ।

কুখ্যাত্রদগ্ধবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জয়েচ্চিরম্ ॥

অধিকন্তু,—

‘বাতঃ শ্বেদং শ্রমং তৈলং গুৰ্ব্বলং ক্রোধমাতপম্।

কটুং বেগরোধঞ্চ মন্থরিগদবাংস্ত্যজেৎ ॥”

মন্থরি পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি (বাহিরের) বাত বর্জন করিবে; কোনরূপ শ্বেদ (অগ্নির উত্তাপ) ও আতপ (রৌদ্র) গ্রহণ করিবে না; তৈল ব্যবহার করিবে না; গুরুপাক, কটু (ঝাল) বা অন্ন দ্রব্য আহার করিবে না; ক্রোধের বশাভূত হইবে না এবং মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবে না।

রক্তমোক্ষণ। বসন্তরোগে রক্তের বিকৃতি পরিলক্ষিত হইলে অবস্থা বিশেষে রক্তমোক্ষণ করাও বিহিত।

গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারণ। হরিদ্রা, দাক-হরিদ্রা, বেণারমূল শিরীয়পুষ্প, মুতা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর;—উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া বাটিয়া শরীরে মাখিলে বসন্তের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। এই প্রয়োগটিব দ্বারা বিস্ফোট, বিসর্প, কুষ্ঠ ও গাত্র দোর্গন্ধ প্রভৃতিও নিবারিত হইয়া থাকে।

পথ্য ও অপথ্য।

ভাবপ্রকাশ বলেন,—

‘মন্থবিকান্ন ভুক্ত্বীত শালীন মুদগমহরিকান্।

রসং মধুরমেবাচ্চাৎ সৈন্ধবং চারুমাত্রকম্ ॥

বসন্তরোগে হৈমন্তিক ধান্যের অন্ন, মুগ ও মন্থর ডাইল, মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য সমূহ এবং উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্ধব লবণ সেবন করিবে।

অধিকন্তু বাত, পিত্ত ও কফের সংশ্রব অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যাদিও পথ্য স্বরূপে ব্যবহৃত হইলে, বসন্ত রোগের উপশম হইয়া থাকে।

পুরাতন যেটে ধান, আমনধান ও যব; ছোলা, মুগ ও মন্থর ডাইল, প্রত্ন জাতীয় অর্থাৎ পায়রা, গুয়ু, চড়াই, জলকুন্ধুট ও ডাহক প্রভৃতির মাংস, করলা কাকরোল কাচকা সজিনা ও পটোল তরকারি, কিসমিস ও ডালিম এবং এতদ্ভিন্ন মেধাবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক অন্ন ও পানীয় অত্যন্ত দ্রব্য সমূহ, কুল ও মাংসরস, বসন্তরোগে সুপথ্য।

সংক্ষেপে বসন্তরোগের প্রতীকারকারক কতিপয় মুষ্টিযোগ এই প্রবন্ধে প্রকটত করার জন্ত হত্ব করা গিয়াছে। ইহা দ্বারা মানবের জীৱন রক্ষা হইলেই সেই প্রবন্ধের সার্থকতা হইবে। “হিতবানীপ্তে—

শ্রীমধুরানাথ মজুমদার কবিরাজ।

কাব্যতীর্থ কবিচিহ্নাঙ্গণি।

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

—:—

নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদ সম্মেলন । গত ২৬শে হইতে ২৯শে জাম্মারি পর্যন্ত দিল্লী নগরীতে নিখিল ভারত-বর্ষীয় দশম আয়ুর্বেদ সম্মেলন হইয়া গিয়াছে । সভাপতি হইয়াছিলেন—৬ কাশীধামের প্রবীণ কবিরাজ শ্রীযুক্ত উমাচরণ কবিরত্ন শাস্ত্রী । হাকিম আজমুন খাঁ সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত থাপাদি ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি বহুসংখ্যক আয়ুর্বেদাভিরাগী ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । ২৯শে জাম্মারি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলেন যে, তিনি কলিকাতার তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হইতে আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই টাকায় তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ স্বরূপে একটি আয়ুর্বেদীয় কলেজ ও একটি আয়ুর্বেদীয় গাছ গাছড়ার উদ্যান প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করিয়াছেন । আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় হইতে এই সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ ও কয়েকটি দ্রব্য প্রদর্শনের জন্ত দেওয়া হইয়াছিল । আগামী বৎসর এই সম্মেলন ইন্দোরে হইবে স্থির হইয়াছে ।

মারওয়ারি হাসপাতাল ।—শ্রীশ্রীবিগ্গানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলিকাতা আমহাট্ট ষ্ট্রীটে সংপ্রতি একটি মারওয়ারি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে । ইহার কার্যপ্রণালী ভাল ভাবে চলিতেছে দেখিলে আমরা সুখী হইব ।

কলিকাতার স্বাস্থ্য ।—কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা হ্রাস পাইলেও এখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই । হাম-বসন্ত এবং কলেরাও আরম্ভ হইয়াছে । এ সময় সহর-বাসীর বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য বিভাগ ।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য ঔষধালয়ে এবার ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী বহু সংখ্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছে । ‘জরের চা’ নামক এক প্রকার নূতন ঔষধ আবিষ্কারের ফলে এ রোগের চিকিৎসায় সাফল্য লাভ হইয়াছে । ইহা গরম জলে কিছুক্ষণ রাখিয়া সেবন করিতে হয় এবং ইহার কার্য-কারী শক্তি সত্যই বুঝা যায় ।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় বৈদ্যুতিক চিকিৎসা ।

—জোয়ারসন নামক একজন সুইডেন দেশীয় ডাক্তার তীব্র বৈদ্যুতিক তাপ সহযোগে স্পেন দেশীয় ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়িত বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন । এই তাপ প্রয়োগে প্রচুর পরিমাণে ঘর্মোদগম হয় এবং তাহাতেই না কি এ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে । এ চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই, আমরা উহা জানিবার জন্ত উৎসুক থাকিলাম ।

ম্যালেরিয়ার ঔষধ ।—লাহোরের সিভিল মিলাটারি গেজেটে প্রকাশ—ইটালির জনৈক ডাক্তার ম্যালেরিয়ার এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন । এ ঔষধে এক সপ্তাহেই না কি ম্যালেরিয়া জর সম্পূর্ণরূপে

আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রসিদ্ধিত বাঙ্গালা দেশে ইহার পরীক্ষা করিলে হয় না?

দোক্তায় মৃত্যু।—মেদিনীপুর-হিতৈষীতে প্রকাশ—“কাঁথি মহকুমার বাহিবী গ্রামের এক ব্যক্তি কয়েক দিন হইল কাঁথি হইতে গৃহে প্রত্যগমন কালে পথিমধ্যে পানের দোকান হইতে পান ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করে। পানে দোক্তা দেওয়া ছিল। লোকটা পান খাইয়া কিছু পথ চলিয়া যাওয়ার পর তাহার মাথা এবং শরীর হইতে খুব ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। সে তখন কাঁপিতে থাকে। সে পথিপার্শ্বে পড়িয়া যায় এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে, ইহার অলক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।” দোকানের চাঁবি থিলি পান এক পয়সায় কিনিয়া যাহারা চর্কণস্থ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এ ঘটনায় তাহারা কিছু শিখিবেন কি?

ইন্ফুলেঞ্জায় তামা।—২৪ পরগণা-গোবরডাঙ্গা হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত আন্তোয় ধনন্তরি পত্রাস্তরে লিখিয়াছেন, “ডাক্তার মান-জার, ওয়াটসন, হকিন্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য ডাক্তারগণ পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন যে তামার ব্যবহার দ্বাৰা কলেরা, ক্ষয়কাশ, অর্শ, পুরাতন উদরানয়, অতিসার মৃগা প্রভৃতি বোগ ভাল হয়! হোঁনিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি কুপ্রম এই তামা হইতে প্রস্তুত। আয়ুর্বেদে শোধিত তামার ব্যবহার খুব আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, যাহারা তামার খনিতে কাণ্ড করে, তাহারা অনেক বোগেব হাত হইতে রক্ষা পায়। বর্তমান ইন্ফুলেঞ্জা রোগ সেখানে সংক্রামক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানে সকলকে তামার তাগা পরাইয়া সফল পাওয়া গিয়াছে।”

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৩য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫—চৈত্র ।

৭ম সংখ্যা ।

আমাদের দেশের খাতি ও পথ্য ।

—:—

[ পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর ]

খাতি-জাত খাতি ।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের “আয়ুর্বেদ” পত্রে—“শিশুর খাতিবিচার” ইতি নামধেয় একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিবন্ধের মূখ্যে এ অধ্যমে প্রতি একটু কটাক্ষ করা হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় এম্ এ মহোদয়—বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ, সুতরাং তাঁহার কথা আমার শিরোধার্য্য। তাঁহার আক্ষেপ—আমি অনেক কাগজেই অনেক প্রবন্ধ লিখি, কিন্তু কোনটাই শেষ করিতে পারি না! অবশ্যই ইহা আমার দোষ, একথা ত অস্বীকার করা চলেনা। তিনি আমার অগ্ৰজতুল্য—ভক্তিজান, তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার শক্তি ত আমার নাই। আমার আত্মপক্ষসমর্থনের কেবল একটা মাত্র কৈফিয়ৎ আছে—আমি সারস্বত মন্দিরের পূজারি নহি, স্বৈচ্ছাসেবক মাত্র;

স্বৈচ্ছা সেবার দোষ—তাঁহার উপর বারমাস নির্ভর করা যায় না। আমার দুর্ভাগ্য—এমন সহজ সত্যটুকুও সতীশ বাবু ভুলিয়া গিয়াছেন!

কখনও স্বনামে পরিচয় দিয়া, কখনও বা ছদ্মনামের অন্তরালে থাকিয়া আমি ত আশৈশব মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এই “নভেলী” যুগে, নভেল ছাড়া কাজের কথা ত বিকাইতে দেখিলাম না! মশ্বব্যথার সহৃদয় শ্রোতাও পাইলাম না! যে দেশে আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের স্বাস্থ্যনীতি অনধিকারীর ধিকার-বাণে ক্ষত বিক্ষত হইতে পারে, সে দেশে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির রচনাকে কেহ কি অভিনন্দিত করিতে পারে? বহু বর্ষের অল্পরোধে অযোগ্য হইয়াও, কদাচিত্ সাদা কাগজে একটু কালীর আঁচড় দিয়া ফেলিয়াছি,—তাহা আমার প্রয়াসের পূর্বাভাস, তাহাকে পরিণতির পূর্ণ সৌষ্টব্য দিতে আমার

সাহসে কুলায় নাই। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালীর অতীত বিস্মৃতিময়, বর্তমান অগ্নিজ্বালাময়, ভবিষ্যৎ অন্ধ তমসাস্কর! তাই নিজের জাতির সব ভুলিয়া যে পাপাচরণ করিয়াছি, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতে—“পুরাতন”কে কখন কখন “নবরাগণ” দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমার চেষ্টার আশুভই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। চিতা চুল্লীর অঙ্গার ঘাঁটিয়া হাত কাল করিয়াছি, তথাপি সে “বিষ্ণুপঞ্জর” খুঁজিয়া পাই নাই। কেবল মনে হইয়াছে—এই সাহিত্যসেবাই আমার ভাগ্য-গগনের নষ্ট চন্দ্র, স্বর্গোত্তানের নিষিদ্ধকণ; এই জগতই আমার উত্তমের শেখভাগ শিখিল হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালী যদি কাজের কথা শুনিতে, গুণের আদর করিত, তাহা হইলে কবিরাজ সত্য চরণের “ভৈষজ্য নবিনাগকার” এতদিনে এটা সংস্করণ হইত। বিরজাচরণের “বনৌষধি দর্পণে” বহু সংসার প্রতিবিস্তৃত হইত! বহুবিশারদীর “জীবন চিত্র” গৃহে গৃহে বিরাজ করিত।

আমি সতীশ বাবুকে আশ্বাস দিতেছি—“জর” নামক প্রবন্ধটা পরিবর্তিত হইয়া মর্দচিত “আয়ুর্বেদের ইতিহাসের” অঙ্গীভূত হইয়াছে। “আমাদের দেশের খাণ্ড ও পথ্য” গ্রন্থাকারে পাঠকবর্গের সঙ্গে পুনঃ সন্মিলনের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। অতঃপর আর কোন প্রবন্ধই “ক্রমশঃ”—ভাবে এ অকিঞ্চনের নাম স্বাক্ষরের বিশেষত্ব লইয়া মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইবে না।

চিপটিচক বা চিঁড়া।

ধান হইতেই ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোধ হয় বৌদ্ধ যুগেই ইহার প্রথম আবিষ্কার।

বৈষ্ণবেরা ইহার বহুল প্রচলন করেন। ধাতুকে জলে ভিজাইতে হয়, তাহাব পর খোলায় ভাজিতে ভাজিতে ক্ষুদ্রীত হইলে, ঢেঁকিতে ফেলিয়া ধীরে ধীরে ‘পাড়’ দিতে হয়। ঢেঁকির মুখে—লৌহের বেঠনী থাকিলে চলবে না। বঙ্গদেশে হুত্রধর জাতীয়া স্ত্রীলোক-গণ—চিঁড়া প্রস্তুত করে।

চিঁড়া অত্যন্ত গুরুপাক, বিষ্টন্তী, বায়ু-নাশক, স্নেহাবর্ধক। অতিসার ও প্রবাহিকা রোগে—চিঁড়ার মণ্ড প্রয়োগ করিলে, বিরচকের কাষ্য করে অর্থাৎ মল নিঃসরণ হয়। এইজন্ত সাধারণের ধারণা—চিঁড়া ধারক, ইহাতে পেট আঁটিয়া যায়। চিঁড়া কিন্তু ধারক নহে। শরৎকালে চিঁড়া ও নারিকেল ভক্ষণ করিলে, পিত্ত নিঃসরণের সাহায্য হইয়া থাকে, পিত্তজ বিবাক্ততার আশঙ্কা থাকে না।

চিঁড়া ছুকে সিদ্ধ করিয়া, শর্করা সংযোগে পায়স প্রস্তুত করিতে হয়। এই পায়স—অত্যন্ত গুরুবৃদ্ধিকারক, কামোদ্দীপক এবং বলকর। ইহা ক্রুরকোষ্ঠে—জোলাপের কার্য্য করিতে পারে।

যদি উদরাময়পীড়িতব্যক্তিকে চিঁড়ার মণ্ড ব্যবহা কর,—তাহার রোগ বাড়িতে পারে। তবে—চিঁড়াকে ভাতের মত সিদ্ধ করিয়া, মাড় গালিয়া ফেলিয়া খাইতে দিলে, তাহা অপেক্ষাকৃত লঘুপাচ্য হয়।

চিঁড়াকে স্নাত সংযোগে ভাজিয়া কিঞ্চিং মরিচচূর্ণ ও লবণ সংযোগে ভক্ষণ করিলে, বহুমাত্র রোগীর উপকার হয়। নবগ্রন্থতা নারীকেও চিঁড়া ভাজা খাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতে জরায়ুর দোষ নষ্ট হয়। ভাজা চিঁড়া কফনাশক, সর্দী, কাসি ও গাত্র বেগনার উত্তম কলপ্রদ। অধিকন্তু ইহা পিপাসা নিবারণ

কবে, মুখ-গহ্বরের লাল নিঃসরণের সাহায্য করে, স্বাদগ্রহণের শক্তি বাড়াইয়া—অরুচি দূর করে।

**খণ্ড চিপিটক।**—আধপোয়া চিঁড়াকে শুক খোলায়, মুছ উত্তাপে, বেশ করিয়া ভাজিবে। যখন চিঁড়ার বর্ণ বাদামের মত হইবে, তখন ঐ চিঁড়াকে হামানদিতায় ফেলিয়া গুঁড়া করিয়া লইবে। আধপোয়া চিনীতে ১০ সের জল দিয়া আগুনে চড়াইবে। রস একটু চট্টটে হইলে তাহাতে চিঁড়াচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। ঘন হইলে নামাইয়া তাহাতে ৪ বতি এলাচ চূর্ণ, ৪ রতি মরিচ চূর্ণ এবং ১ রতি কপূর নিক্ষেপ করিবে। ইহা ক্ৰতি উপাদেয় খাত্ত। অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধিকর মংসবদ্ধক, ইন্দ্রিয়তর্পক। ক্ষয়রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

চিঁড়া সাধারণতঃ গুরুপাক—তাই ইহার নাম “পূপুক”। চরকের স্ত্র হ্রাস্থানে—ভাজা চিঁড়া ঘর পরিমাণে ভক্ষণ করিবার উপদেশ পাওয়া যায়।

### ভুফ তণ্ডুল বা মুড়ি।

ইক্ষুিকুকুকারের আবিষ্কার কর্তা অসাধারণ পণ্ডিত, প্রশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ইন্দুনাথ মল্লিক—বিলাতী বিষকুটের চেয়ে বাঙ্গালার মুড়ির প্রশংসা করিতেন। বাস্তবিক মুড়ি গৃহস্থের একটা সহজলভ্য স্বাস্থ্য খাত্ত।

স্বল ধাতুকে উত্তমরূপে বাড়িয়া ও বাছিয়া লইয়া, অতি পরিষ্কার জলে ৩৪ দিন ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ধাতুগুলিকে প্রয়োজনমত জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। এই সিদ্ধ ধান পরিষ্কার জলে একরাত্রি আবার ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন আবার তাহাকে সিদ্ধ করিবে। ঠাণ্ডি হইতে বাষ্প উথিত হইলে

ধানগুলি নামাইয়া লইবে। এই ধাতুর নাম “দোভাবা” ধান। দোভাবা ধানকে রোজে শুকাইবে—যেন বেশী শুকাইয়া ‘কটকটে’ না হয়। মধ্যম রূপ শুক হইলে, সেই ধাতু হইতে চাউল প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম “মুড়ির চাল”। মুড়ির চাল রসযুক্ত থাকায়—বেশী দিন ঘরে রাখা উচিত নহে। যে ধাতু হইতে মুড়ির চাউল প্রস্তুত করিবে, সে ধাতু যেন নূতন না হয়। পুরাতন ধাতুই মুড়ির চাউল প্রস্তুত করিবার পক্ষে প্রশস্ত।

এইবার “মুড়ির চাউল” হঠাৎ মুড়ি প্রস্তুত কর। মুড়ি ভাজিবার ৫৭ ঘণ্টা পূর্বে [ ১০১২ ঘণ্টা পূর্বে হইলেও ক্ৰতি নাই ] চাউল গুলি একবার বেশ করিয়া ধুইয়া লইবে এবং তাহাতে কিছু লবণ মাখাইয়া রাখিয়া দিবে। যদি চাউল গুলি বেশী শুকাইয়া গিয়াছে মনে হয়, তবে তাহাতে আর একটু জল মাখাইয়া লইবে। এই লবণাক্ত আর্দ্র চাউল—একথানা মাটির খোলায়, মুছতাপে কাঠের তাড়ু দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে—চালগুলি নীরস হইয়াছে—তু' একটা চাল ফুটিতেও আরম্ভ করিয়াছে—তখন আগুন হইতে চাল গুলি নামাইয়া রাখিবে। এইবার বালুকাপূর্ণ উত্তপ্ত খোলায়—কুঁচির সাহায্যে অল্পে অল্পে চাউল গুলিকে ভাজিয়া লইবে। তাহা হইলেই মুড়ি প্রস্তুত হইল। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার উৎকৃষ্ট মুড়ি প্রস্তুত হয়। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের হাউর ষ্টেশনে—আমি খুব বড় মুড়ি দেখিয়াছি। অমন মুড়ি বাঙ্গালার আর কোন অঞ্চলে জন্মায় না।

মুড়ি—অত্যন্ত লঘুপাক। মুড়ি ভিজাইয়া বা শুক মুড়ি উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইতে হয়। চিবাইবার সময় মুখগহ্বরে প্রচুর লালাশ্রাব হইতে থাকে। ইহাতেই মুড়ি অতি সহজে জীর্ণ হইয়া যায়। নারিকেল সংযোগে শুক মুড়ি চিবাইয়া খাইলে অন্নবিপাকের শাস্তি হইয়া থাকে। মুড়ি খাওয়ার পর জল কিম্বা অপর কোন তরল পদার্থ পান করা উচিত নহে, জল কিম্বা চন্দ্র পানের আবশ্যকতা হইলে, অন্ততঃ ১ ঘণ্টা পরে পান করা উচিত। মুড়িতে তৈল কিম্বা ঘৃত মাখিলে—তাহা গুরুপাক হইয়া থাকে। এক্রপ মুড়ি প্রবলগ্নির পক্ষেই ব্যবহার্য।

#### মুড়ির উপাদান—

আমিষ জাতীয় ...	...	৫.০
শালি-জাতীয় ...	...	৮২.৪
লবণ জাতীয় ...	...	১.০
মেহ ,, ...	...	০.১
জল ...	...	১০.১

মুড়িতে লবণ থাকায়—উচ্চ শোণযোগী এবং রক্তহীন বস্তুর খাওয়া উচিত নহে। যাহাদের বৃক্কের দোষ আছে (অর্থাৎ কিডনির দৌর্বল্য) তাহাদের পক্ষেও মুড়ি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

মুড়ি বা চাউল ভাজা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মৃদুতাপে অন্ন ঘূতে ভাজিবে। ভাজা হইলে, তাহাতে কিছু হুন্স চিনি এবং অন্ন পরিমাণে মৎস্যভার (মিছরী) চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লইয়া গরম থাকিতে থাকিতে লাড়ু পাকাইবে, এই লাড়ু খুব মুখপ্রিয়। জ্বদপিণ্ডের দৌর্বল্যে ইহা একটী সুপথ্য। লাড়ু পাকাইবার সময় কিছু মরিচ চূর্ণ, জীরা ভাজার চূর্ণ এবং অন্ন পরিমাণে

ভাজা কৃষ্ণ তিল মিশাইয়া লইলে ইহা আরও কচিকর হইয়া থাকে।

মুড়ি ভিজান' জল—হিষ্কা ও বমি নিবারণে ব্যবহৃত হয়।

#### লাজ বা থৈ।

স্বর্ণ বর্ণ খর্বাকৃতি “কণকচূর্ণ” নামক ধাতু হইতে সাধারণতঃ থৈ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধাতুকে বালুকাপূর্ণ উত্তপ্ত খোলায় কুঁচির সাহায্যে ক্ষিপ্ৰহস্তে ভাজিয়া লইলেই থৈ হইয়া থাকে। থৈ এর তুল্য দৃঢ় পদার্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক রোগেই থৈ পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। থৈ অনেকগুলি ঔষধের উপাদান স্বরূপেও গৃহীত হইয়াছে।

থৈ এর গুণ। অত্যন্ত লঘু, অগ্নি বৃদ্ধি কর, পাচক, মল ও মূত্র প্রবর্তক, কক্ষ, শীতল, মধুর রস, বমি, অতিসার, অজীর্ণ, কক্ষজ ও পিত্তজব্যাদিনাশক, রক্তদণ্ডি, বক্তারতা, রক্তপিত্ত, মেহ, দাহ ও পিপাসা নাশক। থৈ শরীরের মেদ কমাইয়া দেয়। বল বৃদ্ধি করে।

লাজমণ্ড। টাটকা ভাজা থৈ বেশ করিয়া বাছিয়া লইয়া,—গরম জলে আধ ঘণ্টা ভিজাইবে। পরে হুন্স বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। থৈকে জলে সিদ্ধ করিয়াও মাড় বাহির করা যায়। ইহা সমধিক গুণসম্পন্ন। পাকস্থলীর পীড়ার (গ্রহণ অতিসার প্রভৃতি) জরে, পিত্তজ ও কক্ষ রোগে, অতিবর্ষে, হিমাস্বে, সান্নিপাতিক বিকারে এই লাজমণ্ড বা থৈ এর মাড় উৎকৃষ্ট পথ্য। সাণ্ডবার্গির চেয়ে থৈ মণ্ড লঘু। অনেক শিক্ষিত ডাক্তারও বিদেশী কুড়ের পরিবর্তে থৈ-মণ্ড ব্যবহৃত



করিবার উপদেশ দেন। ঐএর উপকারিতায় মুগ্ধ হইয়াই হিন্দু সাকল মাঙ্গলিক অমুষ্ঠানে—থেকে সাদরে স্থান দিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈজ্ঞানিক-রোগীকে অন্ন পথ্য দিবার পূর্বে—মুগের ঘূষ মাখিয়া ঐ খাইতে দিতেন।

ঐ হইতে নানাবিধ সুখাত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধনেখালির “ঐচুর” কাঁচরাপাড়ার “চাপা” জয়নগরের মোয়া ; কৈচাঁরের “মুকুন্দ মোয়া”—এক সময় রাজ রাজেশ্বরের রসনাকেও বসন্তকৃত করিয়া তুলিত। এখন দেশের লোকের কচি ফিরিয়াছে—পথে পথে ফিরি করিয়া ফিরিলেও কেহ মোয়া কিনিতে চায় না!

ঐ ২ ভরি, গোলাপ জলে ভিজাইয়া লেবুর রস ও চিনীসহ খাইতে দিলে, অজস্র উত্তিত হিকার ও নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

মুগের ঘূষে—ঐ এবং চিনী প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

গরম দুগ্ধ ঐ, মিছরীর গুঁড়া একত্রে রাত্রিকালে ভক্ষণ করিলে, বায়ুর অনুলোম হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

ঐচূর্ণ মধুর সহিত চাটিয়া খাইলে হাঁপানীর টান কমে, হিক্কা নিবারিত হয় ও বমনোদ্বেগ দূর হয়।

শ্রীজয়বল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

## পঞ্চকর্ম ।

( ডাক্তার-কবিবরাজ সংবাদ ) .

—:—

( পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর )

ডাঃ। সে দিনকার সে রোগীর আর কোন সংবাদ পেয়েছিলেন ?

ক। হাঁ, পেয়েছিলাম বৈকি ? সে দিন বমি করা'তেই সে স্তম্ভ হ'য়েছিল আর কোন উপসর্গ ঘটেনি।

ডাঃ। লোকটা আর বোধ হয় যা'র—তা'র কথা শুনে কোন জোলাপের ওষুদ খাবে না।

ক। কথা তাই বটে। তবে লোকের মন বলা যায় না। আবাব কেউ হয়ত পরামর্শ দেবে, সে থাকতে পা'রবে না। আর এই রকম অশাচিতপরাশর্ষদাতারা হাতে স্বর্গ তুলে দেন। বলেন যে,—এই ওষুদ খেলেই একেবারে নিরাময়! লোকে স্বল্পবুদ্ধি, সহজেই তাই ক'রে বসে, পরিণামে যে বিপদ ঘটতে পারে—তা' বোঝে না।

\* “আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য” সাময়িক পত্রে শতাধিক প্রবন্ধও বিশেষ হইবার নহে। অতএব এ প্রবন্ধের এই স্থানেই উপসংহার করা হইল। “আমাদের দেশের খাদ্য ও পথ্য”—শ্রীজয়বল্লভ রায় প্রকাশিত হইবে।

ডাঃ। এই সব পরামর্শদাতার পরামর্শে অনেক সময় লোকের বিষম অনিষ্ট হয়।

ক। তা'ত নিশ্চয়ই হয়? কিন্তু অনেক পেটেন্ট ওষুদ আর অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ডাক্তারের চিকিৎসায়ও অনেক রোগীর অনিষ্ট হয়। পূর্বে মল্লু বা পশুর মিথ্যা-চিকিৎসা ক'রলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

ডাঃ। এখনও সে আইন আছে।

ক। আছে বটে, কিন্তু সে মিথ্যা চিকিৎসায় নয়, সত্যোমারায়ক চিকিৎসায়। একজন পাশ করা ডাক্তার যদি দুই তিন মাস মিথ্যা চিকিৎসা ক'রে কোন রোগীর মৃত্যুর কারণ হন, তা' হলে তাঁকে দণ্ডিত করা যায় না। সত্যোমারায়ক চিকিৎসায়ও প্রায় সেই রকম। তবে ধারা পাশ না দিয়ে চিকিৎসা করেন, তাঁ'রা সত্যোমারায়ক চিকিৎসা করলে দণ্ডিত হ'তে পারেন। কিন্তু যে অবস্থাব লোকের মধ্যে তা'রা চিকিৎসা করে, তা'র কয় জনই বা সেটা বুঝতে পারে? আর কয় জনই বা দণ্ডিত করবার জন্ত চেষ্টা করে?

ডাঃ। যাক, সে কথা। এখন বস্তি প্রয়োগের কথা বলুন।

ক। কেন হাতে রোগীপত্র নেই নাকি?

ডাঃ। জরুরী রোগী বড় নেই। একটা ছিল মাত্র।

ক। তবে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে বস্তি তিন প্রকার। প্রথম অনুবাসন অর্থাৎ স্নেহ দ্বারা বস্তি প্রয়োগ, দ্বিতীয় নিরুহ বা আস্থাপন-কষায়াদি দ্বারা বস্তিপ্রয়োগ, তৃতীয় উত্তর বস্তি অর্থাৎ লিঙ্গ বা ঘোনি মধ্যে বস্তি প্রয়োগ।

ডাঃ। আচ্ছা প্রথমে বলুন—বা'দের বস্তি দিতে হয়, আর বা'দের দিতে নেই।

ক। আস্থাপনের অযোগ্য ব্যক্তি, যথা অজীর্ণ রোগী—অতি শিথল, স্নেহপীত উৎক্লিষ্ট দোষ, বানাক্লাস্ত, অতি দুর্বল, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শ্রম পীড়িত, অতি ক্রুশ, বাহারী আহার বা জলপান করিয়াছে, যাহাদের বমন বা বিবেচন করান হইয়াছে, জ্বর, ভীত, মত্ত, মুচ্ছিত, যাহাদের প্রায়ই বমন হয়, এবং বাহারী মুখ দিয়া থুঁথু উঠা, শ্বাস, কাস, বন্ধোদর, ছিদোদর, আখ্যান, অলসক, বিস্ফটিকা, অতিসার, মধুমেহ বা কুষ্ঠরোগে আকান্ত। যে সকল স্ত্রীলোক আমগর্ভ প্রসব করে তাহাদেরও আস্থাপন কার্যের অনুপযুক্ত জানিবে।

ডাঃ। থামুন মশায়। বমন-বিরেচনের পরে ত বস্তিকর্ম্য ক'রতে হয়, তবে বমন-বিরেচনের পরে বস্তিকর্ম্য নিষেধ করা হ'ল কেন? আর বন্ধোদর ছিদোদর, এ সব কি?

ক। বমন-বিরেচন করা'বার কিছুদিন পরে বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়? এখানে বমন-বিরেচনের পর সঙ্গেই সঙ্গেই বস্তিকর্ম্য নিষেধ করা হ'য়েছে। আর ঐ যে উদর রোগের কথা বল্লেন, রোগ বিনিশ্চয়ে উদর রোগেব মধ্যে তা'দের পরিচয় পা'বেন।

ডাঃ। এখন কা'দের আস্থাপন ক'রতে হয়—বলুন।

ক। সর্কাস বাত ( অর্থাৎ বাদের সর্কাসে বায়ুর প্রকোপ ) একাক্ষবাত, কুক্ষিরোগ, বায়ু, মল, মূত্র ও শুক্রের বিবদ্ধতা, বল, বর্ণ, মাংস ও শুক্রকয়জনিত রোগ, উদরাখ্যান, অঙ্গের অসাড়তা, ক্রিমিকোষ্ঠ, উদাবত্‌ই, বেগধারণজনিত রোগ, অঙ্গের শুষ্কতা, অতিসার, প্লীহা, গুণ্ডা, হৃদ্রোগ, ভগন্দর, উন্মাদ, জ্বর, ত্রায়রোগী, শিরশূল, কর্ণশূল, হৃদয়, পাখ, পৃষ্ঠ ও কটাদেশের এই আড়ত

হওয়া বা ধরিয়া যাওয়া) কম্পন, আক্ষেপ, শবীরের অত্যন্ত উত্তেজ, বা লঘুত্ব, রক্তক্ষয়, বজ্রহীনতা, বিষমাসি, হিকা—জান্না, জজ্বা, উরু, গুত্র পায়ের গাঁট, পার্শ্ব (গোড়ালি) প্রদেশ (পায়ের পাতা) যোনিকচ্ছ, অঙ্গুলি, স্তনদেশ, দন্ত, নখ, পর্ব ও অন্তিসন্মূহে শূলবৎ বেদনা, শোথ; শুষ্কতা, অঙ্গকূজন (পেট ডাকা) পরিকর্ষিকা (উদরের মলদ্বারে কঠনবৎ পীড়া) উদরে অন্ন অন্ন শব্দ, এই সকল রোগে, বিশেষতঃ নানা প্রকার বাতব্যানিতে (Nervous deases) আস্থাপন বস্তু প্রধানতম চিকিৎসা। রূহৎ বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিলে তাহা যেমন একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, আস্থাপন প্রয়োগ দ্বারা বায়ুর প্রধান স্থান পক্ষাশয় স্থিত বায়ু প্রশমিত হয় বলিয়া অত্যন্ত স্থলগত বায়ুরও সেইরূপ প্রশমন হয়।

ডা। এখন অস্থাবসনের যোগ্যও অযোগ্য ব্যক্তির নির্দেশ করুন।

ক। যাঁরা আস্থাপনের অযোগ্য, তাঁরা অস্থাবসনেরও অযোগ্য, বিশেষতঃ নবজ্বর, পাণ্ডুরোগ, কামলা, প্রমেহ, অশঃ, প্রতিশ্রায় অরুচি, অগ্নিমান্দ্য দৌর্বল্য, প্লীহা, কফোদর, উরুশূল, পিত্ত ও কফজনিত অভিযান্দ (চোখ উঠা) শ্লীপদ, গলগণ্ড, অরুচী (আব বিশেষ) ও ক্রিমিকোষ্ঠ এই সকল ব্যক্তি এবং যাহারা ভোজন করে নাই, যাহাদের কোষ্ঠ গুরু যাহারা বিব বা শববিষ পান করিয়াছে, তাহাদিগকে অস্থাবসন প্রয়োগ কবিবেন।

ডা। এখন যাঁদের অস্থাবসন দেওয়া উচিত—বলুন।

ক। যাহাদের আস্থাপন প্রয়োগ করা যায়, তাঁদের অস্থাবসনও প্রয়োগ করা যায়।

বিশেষতঃ রক্ত, তীক্ষ্ণাশি ও বাতার্ভরোগিগণের পক্ষে অস্থাবসন প্রধানতঃ চিকিৎসা। মূলে জনসেক ক'রলে যেমন বৃক্ষের নূতন পল্লব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অস্থাবসন দ্বারা রোগনাশ হওয়ায় নূতন ধাতু সকল উৎপন্ন হোয়ে থাকে।

ডা। অস্থাবসন প্রয়োগের নিয়ম বলুন।

ক। ব'লছি, কিন্তু দেখুন—যে সকল রোগে যে যে কর্ম করা প্রশস্ত বলা হ'য়েছে, তাও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিতে হয়। এই মনে করুন—অতিসার রোগে আস্থাপন প্রয়োগ ক'রবার কথা বলা হোয়েছে, কিন্তু অতিসার হ'লেই আস্থাপন দিতে হয় না। অতিসারের পুরাতন, অবস্থাতেই আস্থাপন হিতকর।

ডাঃ। তবেইত গোলমালে ফেললেন।

কোন্ রোগের কোন্ অবস্থায় কোন্ কর্ম করতে হ'বে, তা' না জান'লে পঞ্চকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কি ক'রে হবে।

ক। এত জ্ঞান লাভ নয়, যত কর্ম আয়ুর্কোদে আছে, সেগুলি এই প্রকার, এই রূপে প্রয়োগ ক'রতে হয়, তা'রি একটা মোটা মুটি ধারণা হওয়া মাত্র।

ডা। তবে রোগের অবস্থাভেদে প্রয়োগ শিখব কি করে?

ক। সে সম্বন্ধে আমরাই বিশেষ কিছু বুঝিনে। তা' আপনাকে শেখাব কি করে! তবে রোগভেদে কোন্ রোগের কিরূপ অবস্থায় কিরূপ চিকিৎসা করা উচিত, সে বিষয় ক্রমশঃ আমরা আয়ুর্কোদে আলোচনা ক'রব, তাহাতে দেখতে পাবেন।

ডাঃ। আচ্ছা রোগনাশ ব্যতীত বস্তু দ্বারা আর কি, কি উপকার হয়?

ক। বস্তি প্রয়োগেব ফলে ক্ষীণশুক্র  
বাক্তির বাজীকরণ হয়, ক্লশ বাক্তি পুষ্ট হয়,  
স্থূল দেহ ক্লশ হয়, দৃষ্ট প্রসন্ন হয়, বলী পলিত  
নষ্ট হয়, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়, শরীর পুষ্ট  
হয়, বর্ণ উজ্জ্বল হয় বল বৃদ্ধি হয়, এবং পরমায়ু  
বৃদ্ধি হয়।

ডাঃ। 'বলী পলিত নষ্ট হয়—মানে কি ?  
বৃদ্ধ বাক্তিরও কি বলী পলিত নষ্ট হ'য়ে আবার  
যৌবন ফিরে আসে ?

ক। তাও কি কখন হ'তে পারে মশায় !  
আর আপনি নিতান্ত অমনোযোগী বা  
প্রতিভাহীন ছাত্র ব'লে এ প্রশ্ন উত্থাপন  
করলেন ? কেননা যখন পূর্বে বলা হ'য়েছে  
যে, বৃদ্ধ বাক্তিকে বস্তিপ্রয়োগ করা নিষেধ,  
তখনই ত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হ'য়ে গেছে।

ডাঃ। সত্যই অধ্যাপক মহাশয়, এটা  
এই অযোগ্য ছাত্রের বিশেষ ক্রটি। এক্ষণে  
ক্রটি মার্জনা ক'রে বস্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ  
প্রদান করুন।

ক। বৎস্র, এক্ষণে বস্তিপ্রয়োগ সম্বন্ধে  
উপদেশ দিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।  
বিরেচনের সাতদিন পরে রোগী সবেল হইলে  
অন্নবাসন প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমে রোগীর  
শরীরে তৈল মর্দন করিয়া উষ্ণ জল দ্বারা স্নিগ্ধ  
করিবে। পরে ভোজন করাইয়া অল্পক্ষণ পরে  
পাদচারণা করিতে বলিবে। অনন্তর মলমূত্র  
তাগ করাইয়া স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

বলা হইয়াছে—সেই সকল দোষ পরিহারের  
জন্ত শীত ও বসন্ত কালে দিবাভাগে এবং  
গ্রীষ্ম, প্রাবৃত্ত ও শরৎ কালে—দিনান্তে স্নেহ  
বস্তি প্রয়োগ করিবে। বায়ুর আধিক্য  
শ্বাক্ষিলে যে কোন সময়ে প্রয়োগ করা যাইতে  
পারে। তীব্র রোগে যে রোগীর আহার জীর্ণ

হইয়াছে, তাহাকে ভোজন করাইয়া অন্নবাসন  
প্রয়োগ করিবে। অল্পশুক্র বাক্তিকে কদাচ  
স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ তাহাতে  
কোষ্ঠশুদ্ধ ও শূন্য থাকে বলিয়া স্নেহ উদ্ধে  
গমন করে। অতএব ভোজনের পরেই  
স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা উচিত। ভুক্ত দ্রব্য  
বিদগ্ধ হইলে সেই অবস্থায় যদ্যপি স্নেহ বস্তি  
প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে অন্ন হইয়া  
থাকে। অত্যন্ত স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করাইয়া  
স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ তাহাতে  
ছই প্রকারে স্নেহ প্রয়োগ করা হয় বলিয়া  
মত্ততা ও মূর্ছা হইয়া থাকে। আবার ক্লশ  
অন্ন ভোজন করাইয়া স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিলে  
বল ও বর্ণ উৎপন্ন হয় না। স্তূতরাং অন্ন  
পরিমাণে স্নেহ সংযুক্ত দ্রব্য আহার কবাইয়া  
অন্নবাসন প্রয়োগ করিবে। অথবা রোগের  
অবস্থা বিবেচনায় কফ, পিত্ত ও বায়ুরোগীকে  
যথাক্রমে ক্লশ মুগের ঘূষ ছন্ধ বা মাংস রস  
পান করাইয়া অন্নবাসন প্রয়োগ করিবে।

ডাঃ। আচ্ছা পূর্বে বলা হয়েছে যে,  
ভুক্তবাক্তিকে বস্তি প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ।  
আবার এখন বলা হচ্ছে যে, আহার না করিয়ে  
বস্তি প্রয়োগ করবে না। এ যে বিষম মত  
বৈধ ঘ'টল দেখ'চি।

ক। মতবৈধ কিছু ষট্টেনি, একটু  
ব'লবার এবং বোঝবার এদিক ওদিক।  
অন্নবাসন প্রয়োগ ক'রতে হ'লে রোগী কে  
পরিমাণ আহার ক'রতে অভ্যস্ত, তা'র সিবি  
পরিমাণ কম থাওয়া আহার করাতে হয়  
আর নিরুন্ন প্রয়োগ ক'রতে হ'লে আহা  
না করিয়ে পূর্ক অন্ন জীর্ণ হ'লে প্রয়োগ করা  
উচিত।

ডাঃ। এবার বুঝতে পেরেছি।

ক। শুধু এইটুকু বুঝলে হ'বে না আরও একটু বুঝে রাখুন। অনেক সময় নিষিদ্ধ স্থানে বস্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। যেমন বমিতে, হৃদরোগে এবং গুল্ম রোগে বমন, এবং কৃষ্ঠাদি রোগে বস্তি কর্ম নিষিদ্ধ হলেও আবশ্যক স্থলে প্রয়োগ কর'তে বাধ্য হ'তে হয়। এইজন্ত বোগ্যাবোগ্য নির্দেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। কারণ দেশ কাল এবং বলের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিষিদ্ধ কার্যও সময়ে কর'তে হয়।

ডাঃ। এ বিষয় ব্যাপার দেখছি, মাথা গুলিয়ে যায়।

ক। চিকিৎসাই বিষয় ব্যাপার বৈকি। বিধাতা স্বষ্টির শ্রেষ্ঠতম অশেষ কৌশলময় নরনারীদের চিকিৎসা করা কি সোজা কথা। পূর্বে ত ব'লেছি যে মহর্ষি আত্রেয় বলেছেন যে, এলব ব্যাপারে বিশাল বিপুল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি চিত্তও আকুল হয়, তা' আমাদের মত অস্বাভিকি লোকের মাথা গুলিয়ে যা'বে তা'তে আর সন্দেহ কি।

ডাঃ আচ্ছা আমরা এখন যে রকম যন্ত্র দিয়ে পিচকারী দিই, আয়ুর্বেদের বস্তি কি সেই রকম ছিল।

ক। না, সে রকম ছিল না। আগে বস্তিনির্মাণ করবার কথাই বলি শুনুন। বস্তি (Mandor) দিয়েই বস্তি নির্মাণ করার নিয়ম ছিল। পূর্ববয়স্ক অথচ বৃদ্ধ নয়—এরূপ গো, মহিষ, শূকর, ছাগ বা মেঘের বস্তিই এ জন্ত ব্যবহৃত হ'ত। এই বস্তি কোমল, অত্যন্ত দীর্ঘ নয়, অত্যন্ত স্থূলও নয়, দৃঢ় এবং উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্য ধরে—এরূপ হওয়া উচিত। বস্তির অভাব হ'লে পাতলা চর্ম, বা পুরু বস্ত্র দিয়ে প্রস্তুত কর'তে হয়।

এই ত গেল বস্তি। তা'রপর বস্তির একটা নেত্র বা নল চাই। রোগীর বয়স এক বৎসর হ'লে নলের পরিমাণ চার আঙ্গুল, এক বৎসর থেকে আট বৎসর পর্যন্ত আট আঙ্গুল, এবং আট থেকে ষোল বৎসর পর্যন্ত দশ আঙ্গুল দীর্ঘ হওয়া উচিত। নলের বেধও বয়স ভেদে ক্রমশঃ কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির মত হ'বে। আর উহার পরিমাণ বয়স ভেদে ক্রমশঃ দেড় আঙ্গুল, দুই আঙ্গুল ও আড়াই আঙ্গুল হ'বে। নলের যে মুখ মলদ্বারে প্রবিষ্ট করাতে হ'বে, তা'র পরিমাণ বয়স ভেদে যথাক্রমে কাক, এবং ময়ূরের পাংকের নলের মত হবে। আর নলের ভিতরের ছিদ্র ক্রমশঃ মুগ, মাষকলায় বা মটর কলায়ের মত হবে। পঁচিশ বৎসরের অধিকবয়স হ'লে নলের পরিমাণ চার আঙ্গুল দীর্ঘ, মূলের বেধ অঙ্গুলির মধ্যভাগের হয়, অগ্রের বেধ কনিষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যভাগের ছায়, প্রবেশ মুখ শকুনের পাংকের নলের মত, ভিজা মটরের ছায় ছিদ্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। নলের নিয়ে বস্তি বন্ধনের জন্ত দুইটা কর্ণিকা (কোণ) রাখিতে হইবে। এই স্থলে জানা উচিত যে, অঙ্গুলি পরিমাণ অর্পরোগীর অঙ্গুলির পরিমাণ।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, পিতল, হস্তি-দন্ত, গোমহিষাদির শৃঙ্গ, ক্ষটিক বা সারকাঠ—এই সকল পদার্থ দ্বারা নল প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপ নলের অভাবে শর, বাঁশ বা অস্থি দ্বারা নল নির্মাণ করা উচিত। নল মৃণ্ম, দৃঢ়, গোপুচ্ছের ছায় আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ গোড়ার দিক মোটা, মুখের দিক সর, সরল ও অতীক্ষাণ (বাহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ নয়) হওয়া উচিত। পূর্বেক্ত বস্তির সহিত এই নলের মূলদেশ উত্তম লৌহ দ্বারা বাঁধিয়া তদ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। (ক্রমশঃ)

## যক্ষ্মারোগ ও তাহার চিকিৎসা।

—:—

( অগ্রহায়ণ ৩য় সংখ্যার পর )

পূর্বে যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথা বলিয়াছি। আরও অনেক বলিবার আছে। জন্মণ দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ককের প্রসাদে আমরা জানিতে পারিয়াছি, এ রোগেব ঐ জীবাণুর নাম—“বেসিলাস্ টিউবার কুলোসিস্।” ইহারা সর্বব্যাপী অর্থাৎ জগে, স্থলে শূণ্ডে, বাতাসে, জীবের খাদ্যে—বিচরণ করিয়া থাকে। এই ভয়ানক জীবাণু প্রতিসূহৃৎ আমাদেবদেহে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু সকল সময় সকল অবস্থায় ইহারা আমাদের অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় না। করুণাময় ঈশ্বর মানবদেহে এমন একটা মহাশক্তি দিয়াছেন, যে শক্তির প্রভাবে দৃষ্টজীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া সহসা অত্যাহিত ঘটাইতে পারে না। সে মহা-শক্তির নাম “ফ্যাগোসাইট”। ‘ফ্যাগোসাইট’ অণু বিশেষ,—শরীরমধ্যেই তাহার বাস। বাহির হইতে দৃষ্টজীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে এই “ফ্যাগোসাইট”ই জীবাণুগুলিকে খাইয়া ফেলে। অর্থাৎ ঋষিগণের অভিমত—মানুষের জীবনী শক্তি যতক্ষণ প্রবল থাকে, শরীরে ধাতু সাম্য অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ দৃষ্টজীবাণু শরীরের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। জীবনী শক্তি হ্রাস হইলে ধাতুর বিকৃতি ঘটিলে, [ শরীর রক্ষক “ফ্যাগোসাইটস্” সংখ্যায় হীন হইলে ] জীবাণু শরীরকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অনেক সময় জীবাণু

পিতৃবীৰ্য্য ও মাতৃরক্তের সহিত ও প্রবেশ করিতে পারে। এ সকল কথা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নিপুণ ভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

কি কি কারণে ধাতু বৈগম্যগা ঘটে? কারণ অনেকগুলি। যথা,—জনাকীর্ণ স্থানে বাস, বিস্তৃত বায়ু ও সূর্যালোকের অভাব, জলময় স্যাঁতানে স্থানে বাস, রুগ্ন পিতা মাতার গুঁরসে জন্ম, আবদ্ধ স্থানে উৎকট আসনে বসিয়া কাঁব করা, অতি মৈথুন, অতি ভোজন, অতি অন্নাহার, চিন্তা প্রভৃতি কারণে—ধাতুর বিকার ঘটয়া থাকে। ধাতুর বিকার ঘটিলে, রোগবীজাণু দেহে প্রবেশ করিয়া দেহকে নাশ করে।

যক্ষ্মাজীবাণু শরীরের নানাবিধে প্রবেশ করিয়া থাকে। আক্রান্ত যন্ত্রে প্রথমে স্থানে স্থানে গুটি প্রকাশ পায়। কালে সেগুলি হয় গলিয়া যায়,—ছোট বড় কোষে পরিণত হয়, কিম্বা শুল্ক হইয়া শুকাইয়া যায়। কোষমধ্যে পুণ্ড ও রক্তস্রাবের সহিত মিশ্রিত থাকে, ছোট বড় শিরা বাহির হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে শিরাগুলি ফুলিয়া রক্ত খনিতে পরিণত হয় এবং ফাটিয়া যায়। কাসির সহিত দূষিত স্রাব—ফুসফুসের এক স্থান হইতে অল্প স্থানে নীত হয়, কখনও মুখে থাকিয়া অঙ্গে প্রবেশ করে। কখনও বা রস ও রক্তের সহিত সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়ে। যক্ষ্মার লক্ষণ পূর্বেই বলিয়াছি। এখানে অতি সংক্ষেপে আর একবার উল্লেখ করিতেছি।

জ্বর । অগ্নাধিক, কখন সবিরাম কখনও বা স্বল্পবিরাম ।

দর্শন । অত্যন্ত, বিশেষতঃ ভোর রাঙে বেশী ।

কৃশতা । শরীরের গুরুত্ব দিন দিন কমিয়া যায় । সকল ধাতুই ক্ষীণ হইয়া পড়ে ।

কাস । হয় শুষ্ক না হয় আর্দ্র । রোগের আরম্ভে শুষ্ক কাসি, ফুস্ফুসে ক্ষত হইলে আর্দ্র কাসি । কাসি প্রথমে কিছুই গঠে না, পরে খুব উঠিতে থাকে ।

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায়— জীবাণু এবং ফুস্ফুসের তন্তু প্রভৃতি অণু দেখিতে পাওয়া যায় ।

রক্তোৎকাস । কখনও রক্তের ছিটা কাসির সঙ্গে থাকে, কখনও ভলকে-এক রক্ত উঠে ।

বক্ষ পরীক্ষা । বক্ষের বিকৃতি ঘটে । যথাঃ—বক নীকিয়া যায়, বসিয়া যায় । শ্বাস প্রাণসেব সময় বক্ষক্ষীতির ব্যাঘাত হয় ; অর্থাৎ কোন স্থান ওঠে, কোন স্থান ওঠে না । বোগীর কথা কহিবার সময় বুকের উপর হাত রাখিলে স্পর্শকম্পনের আধিক্য ! বজাইলে শব্দের স্তম্ভিত্য । যন্ত্রদ্বারা শুনিলে— নানারূপ অস্বাভাবিক শব্দজ্ঞান প্রথম অবস্থায়—যখন গুটি উঠিতেছে—তখন নিশ্বাস বায়ু শব্দ কখনও ক্ষীণতম,—প্রায় শোনা যায় না ; কখনও কর্কশ, কখনও তরঙ্গায়িত ; যখন ফুস্ফুস সংবৃত ও কঠিন হইতে আরম্ভ হয়— তখন নল শব্দ শোনা যায় । যখন গলিতে আরম্ভ হয়—তখন কটকট এবং ভুড় ভুড় শব্দ, যখন ক্ষত কোবে পরিণত হয়, তখন তড় তড় শব্দ এবং অন্তান্ত নানাবিধ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ।

আনুসঙ্গিক রোগ । যক্ষ্মার সঙ্গে প্রায়ই ফুস্ফুস নানা প্রকার পীড়িত হইয়া থাকে । যথা ফুস্ফুস নালী প্রদাহ, বায়ু কোষ প্রদাহ, বায়ু কোষের ক্ষীণতা, বায়ু নল-ক্ষীতি, প্লুরাদাহ—তরুণ ও জীর্ণ । বায়ু বক্ষ ; পৃথ-বায়ু বক্ষ । গণিত ফুস্ফুস, কণ্টকোষ প্রদাহ, পাক যন্ত্রে গুটিক্ষত, তজ্জনিত উদরাময়, অগ্নি-মান্দ্য ইত্যাদি, রক্তগুলী, স্নায়ুগুলী, যকৃতাদিবিষয় পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে ।

যক্ষ্মা-রোগ ভাল হয় কি না ? ইহাই আজকালকার গুরুতর প্রশ্ন । অধিকাংশ লোকের ধারণা—যক্ষ্মা রোগ ভাল হয় না । এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক । যক্ষ্মারোগ সাংঘাতিক বটে, কিন্তু সকল যক্ষ্মাই অসাধ্য নহে । বরং কোন কোন অবস্থায় নিশ্চয়ই ভাল হয় ।

যদি উৎপত্তিসময়ে রোগ ধরা পড়ে, রীতিমত চিকিৎসা অবলম্বিত হয়, রোগী চিকিৎসকের মতাবলম্বী হইয়া চলিতে পারে, তবে যক্ষ্মারোগ অনেক স্থানেই আরোগ্য হয় । আবার কোন কোন স্থলে—রোগের শাস্তি না হইলেও তাহার গতিরোধ করা যাইতে পারে । কিন্তু জীবাণুদোষ সংঘটন হইবার সময় যদি রোগ ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে রোগমুক্তির আশা করা যায় ।

সেই জন্তই যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে—যত অধিক আলোচনা করা যায়, ওতই ভাল । শীত প্রধান ইউরোপ ও আমেরিকায় যক্ষ্মারোগের প্রভাব—আমাদের দেশের চেয়ে বেশী । কেননা সেখানে ঘোরজীবন-সংগ্রাম চলিতেছে । উপার্জনের জন্ত, সভ্যতার অঙ্ক-রোধে, সেধানকার লোক—প্রাকৃতিক নিয়ম পদে পদে লঙ্ঘন করিতেছে, আর্ষা ধর্মবিগণ

বলিয়াছেন—“বেগরোধ, ক্ষয়, অতি সাহস, এবং বিষমাশন” এই চারিটি যক্ষ্মা রোগের কারণ। বাস্তবিক এগুলি পাকা লোকের পাকাকথা। এই কারণগুলি প্রত্যেক ভারতবাসীর জানা উচিত। এজন্ত কবিরাজ মহাশয়গণ রীতিমত চেষ্টা করুন।

যক্ষ্মারোগের প্রথম কারণটি সচরাচর ঘটন্য থাকে—বেগ অর্থাৎ মল মুত্রাদি ত্যাগের ইচ্ছা। সে ইচ্ছার পূরণ না করিলে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। সভ্যতার মস্ততায় জীবন সংগ্রামের তাড়নায়, মানুষ সময়ে মলমুত্র ত্যাগ করিতে পারেনা। সময়ে থাইতে পায় না, কখনও অন্নভোজনে তাহাকে দিন কাটাইতে হয়, কখনও অতি-ভোজনে পাকযন্ত্র ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইউরোপে নাতা ছেলেকে স্তম্ভ দেন না, কৃত্রিম খাদ্যে শিশু পালিত হইয়া থাকে। এদেশেও অনেক গৃহে কৃত্রিম খাদ্যের প্রচলন রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। ভাবিবার কথা বটে।

পল্লীগ্রামের চেয়ে সহরে যক্ষ্মারোগের প্রভাব অনেক বেশী। ইউরোপেও তাই, এদেশেও তাই। সহরের লোক ছোট একটি অক্ষুপে গোষ্ঠীশুদ্ধ বাস করে। বাতাস ও সূর্যালোক না পাইলে যক্ষ্মারোগ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পল্লীগ্রামে এ অসুবিধা নাই। তথাপি পল্লীগ্রামে যে যক্ষ্মারোগ হইতেছে, ইহা অনেকটা সহরের আমদানি।

অতি সাহস—ক্ষয়রোগের একটি কারণ বলিয়া স্ববিগণ নির্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক অতি সাহসে মানুষের তেজঃক্ষয় হইয়া থাকে।

যক্ষ্মা জীবাণুর হস্ত হইতে

মুক্তি লাভের উপায়।

একটি জীবাণু হইতে অভ্যন্তর কালে কোটি কোটি জীবাণু জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং এই জীবাণুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বিশেষ সাধনা করিতে হয়। প্রথমেই চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া স্থানলাভ করিতে না পারে। অর্থাৎ যাহাতে শারীর ধাতুর সমতারক্ষা হয়, শরীর রক্ষক ফ্যাগসাইট অণু দলে ভরি থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে—ফ্যাগসাইট দলের সহিত জীবাণুর ঘোরতর সংগ্রাম চলে। যাহার বল বেশী, শেষে তাহারই জয় হয়। ফ্যাগসাইটের দলপুষ্টির প্রধান উপায়—স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম গুলি মানিয়া চলা। নিয়মিত আহার বিহারে, নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক শ্রমে, আলোক-বাতাস উপভোগে,—জীবনী-শক্তি বা ফ্যাগসাইট দলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আর্য্য স্ববিগণ—যে দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যার নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পালন করিতে পারিলে, শুধু যক্ষ্মা রোগ কেন, কোন রোগই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আমার ইচ্ছা—কোন যোগ্যতম ব্যক্তি স্বাধিনির্দিষ্ট দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যার বিধি ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা সর্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্ত—এই আয়ুর্বেদ পত্রেরই একটু বিস্তৃত আলোচনা করেন। দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যার নিয়ম বর্তমান কালে পালন করা খুব কঠিন হইলেও, তাহার মধ্যে অনেকগুলি নিয়ম যে মানিয়া লইতে পারা যায়—তাহা আর অস্বীকার করা চলে না। অন্ততঃ লোকের তাহা জানিয়া রাখাও ভাল।



চিকিৎসকের চেষ্টায় জীবাণু ধ্বংস করা  
দ্রুততর। তাহাদিগকে পুড়াইয়া কিম্বা বিষ  
থাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিলে—আগে  
রোগীকে পুড়াইতে কিম্বা বিষ থাওয়াইতে  
হইবে। ইহার চলিত বাঙ্গা পূর্ণ নাম—“এক  
দাঙ্গ বোগ রুগী দুই আরাম !”

কিন্তু যদি শারীরধাতুর উন্নতি করিতে  
পারা যায়, তাহা হইলে জীবাণুর ধ্বংস  
অনিবার্য। দিনচর্যা ও ঋতুচর্যার নিয়ম পালন  
করিলে শারীর ধাতুর উন্নতি অবশ্যস্বাভাবী।

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রকুমার দে ।

( কাশ্মের হস্পিটালের ভূতপূর্ব হাউস সার্জন )

## অস্ত্রোপচার ।

—:—

মুখ নাসিকা ও গলকোষ ।

উপসর্গ । ১। পচন সংক্রমণ । ২।  
পচন জনিত নিউমোনিয়া । ৬। ডিপ্‌থিরিয়া  
জন্ম গলকোষের পচনদোষ । ৪। স্বক্  
কণ্ঠ । ৫। কর্ণভাস্তরের তরুণ প্রদাহ ।  
ইত্যাদি ।

নাসিকার এডিন্‌ইড্‌ অস্ত্রের সাহায্যে  
উচ্ছেদ করিলে পূর্কোক্ত উপসর্গগুলি দেখা  
দিতে পারে। অনেক স্থলে উহা মারাত্মকও  
হইতে পারে ।

এডিন্‌ইড্‌ উচ্ছেদের জন্ত অস্ত্রোপচার  
অতি সহজ। কিন্তু বাহ্যতে উপসর্গগুলি  
উপস্থিত হইতে না পারে—সেজন্ত সাবধান  
হইবে। অস্ত্রোপচারের পূর্কে দেখিবে—রোগীর  
গলার অবস্থা ভাল আছে কি না ? মুখ-গহবরে  
কোন ক্ষতবৃদ্ধ বা দূষিত দস্ত থাকিলে,  
অস্ত্রোপচারের পূর্কে—তাহা উৎপাটন করিবে ।  
পূর্বে ২১ দিন পর্য্যন্ত পচন নিরাক্রম  
প্রদাণ কবিবে। অস্ত্রোপচারের পূর্কে ইহাও

সন্ধান লইবে—রোগী সে সময়ে ডিপ্‌থিরিয়া  
বা অন্য কোন দূষিত জরের সংক্রমে আসিয়া-  
ছিল কি না ? অথবা রোগীর বাসস্থানের  
কাছে কাহারও ঐরূপ রোগ হইয়াছে কি  
না ?

এডিন্‌ইড্‌ কাটার পর রোগীকে পূর্ণ  
একদিন ও এক রাত্রি শয্যা শুইয়া থাকিতে  
বলিবে। নাক মুখ পরিষ্কার করিবার জন্ত—  
প্রত্যেকবার পরিষ্কার ছাঙ্কড়া ব্যবহার করিবে ।  
অস্ত্রোপচারের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে—রোগীর  
মুখ হইতে বমনের সঙ্গে রক্ত বাহির হইতে  
পারে। ইহাতে ভয় করিও না। রোগীকে  
এমন স্থানে শয়ন করাইবে—তাহার শরীরে  
বায়ু প্রবাহ না লাগে, অথচ দরজা-জানালা  
খোলা থাকিবে—যেন বায়ু চলাচলের কোন  
ব্যাঘাত না হয় ।

অস্ত্রোপচারের ২ ঘণ্টা পরে—যবাণু,  
মোহন ভোগ, শ্বশ্বের স্বাভাবিক লক্ষণ

রোগীকে খাইতে দিবে। পর দিবস পচন নিবারক ঔষধের স্ত্রে প্রয়োগ করিবে।

#### ডাক্তারী পচন নিবারক।

(১) সোডা সাল্‌ফ্‌ অর্ধ ড্রাম। হাইড্রাজ আইওডাইড রুর্কসাই ২ গ্রেণ। সোডি আইওডাইড ২ গ্রেণ। পরিষ্কৃত জল ১ পাইন্ট।

(২) সোডা সাল্‌ফ্‌ ১ ড্রাম, স্যানিটাস্‌ ১ ড্রাম, একোয়া ডিস্টিল ১ পাইন্ট।

(৫) সোডা সাল্‌ফ্‌ ২ ড্রাম, সোডাবাইকার্‌ ১০ গ্রেণ, মিসিরিনাই কার্বলিক এসিড ৪০ মিনিম, একোয়া ডিস্টিল ১ পাইন্ট।

(৪) লিটারিণ ৩ ড্রাম, একোয়া ডিস্টিল ১ পাইন্ট।

#### কবিরাজী মতে পচন নিবারক।

(১) হরীতকী, বহেড়া, আমলা, প্রত্যেকটা ১ ভরি ওজনে লইয়া একসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া লইবে।

(২) সর্জিকাঙ্কার ও যবক্ষার প্রত্যেক ১০ আনা, জল ১০০ সের।

(৩) জাতীপত্র, নীলঝাঁটা পত্র, প্রত্যেক ১ তোলা, ১০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে।

(৪) জাতীপত্র, ময়নাফল, বৈচিফল, কটকী প্রত্যেক আধ ভরি, একসের জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশেষ।

(৫) লোধছাল, খদির কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু প্রত্যেক আধতোলা, জল পূর্ববৎ।

(৬) নিমপত্র, নিসিন্দা পত্র, পলতা, গুলঞ্চ। পূর্ববৎ।

(৭) বিড়ঙ্গ, নিম্বকপত্র, দস্তীপত্র, দারু হরিদ্রা। ওজন ও জল পূর্ববৎ।

(৮) নিমছাল, বাসকছাল, কটিকারি, পলতা, গুলঞ্চ। প্রত্যেক ওজন ১০ তোলা। জল পূর্ববৎ।

(৯) নিম্বকা, ডাঙ্গা, জাতীপত্র, খদির। পূর্ববৎ।

(১০) বাবলা, গুলেবাবলা, যষ্টিমধু, অনন্ত মূল লাঙ্গা, বকুলছাল, বাবুই তুলসী। প্রত্যেক ওজন ১০, জল পূর্ববৎ।

(১১) যোগদান, লতাকন্তরী, অগুরু, অনন্ত মূল, জায়ফল, কাকলা—প্রত্যেক ওজন ১০, জল পূর্ববৎ।

ইহাদের মধ্যে যে কোনও একটা কাথ ঈষদ্বক্ষ অবস্থায় স্ত্রে প্রয়োগ করিবে।

স্ত্রের অভাবে পূর্বোক্ত কাথ গরগরা বা গারগল রূপে ব্যবহার করা যায়। ইহাতে মুখমধ্যস্থিত সঞ্চিত রক্ত ও ক্ষেদাদি বাতির হইয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত বাক্তি ভিন্ন গারগল—শিশুর পক্ষে—সুবিধাজনক নহে। স্ত্রীয়া স্ত্রে প্রয়োগই ঠিক। ৭ দিন উপর্ধ্যাপরি স্ত্রে বা গারগল দেওয়া উচিত। ইহাতে পচন দোষের আশঙ্কা তিরোহিত হইতে পারে।

নাসিকার পশ্চাৎ অংশে পিচকারী দেওয়ার প্রয়োজন হইলে, খুব জোরে পিচকারী দিবে না। পিচকারীর ভিতরের তরল পদার্থ বাহাতে নির্কিয়ে বাহির হইতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। নাসিকায় এমন পিচকারী প্রয়োগ করিবে,—বাহার মধ্যে ৫ ওঁজ তরল পদার্থ ধরিতে পারে। অথচ পিচকারীর নলের মুখে রবারের সরু নল লাগানো থাকে। নাসা গহবরের অস্ত্রোপচারের পর, নাসিকার ও গলায় ক্রিয়েসটআইওডিন এবং কার্বলিক এসিডের বাষ্পগ্রহণ করিলে বেশ উপকার হয়। শ্বেতচন্দন ও যোগদান সিদ্ধ করিয়া সেই

জলের বাষ্প গ্রহণ বিশেষ ফলপ্রদ। অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে সামান্য জোলাপ দেওয়া উচিত। ডাক্তারেরা লাবণিক বিরচক ব্যবস্থা করেন। বৈদ্যমতেও এমন বিরচক দিবে—বাহাতে লবণ থাকে। রোগীকে—অস্ত্রোপচার সামান্য হইলেও অন্ততঃ ২৩ দিন গৃহমধ্যে বিশ্রাম করিবার উপদেশ দিবে।

নাসাগহ্বর অবরুদ্ধ থাকিলে ছোট ছেলে মেয়েরা মুখপথে নিশ্বাস গ্রহণ করে। অস্ত্রোপচারের পর অবরোধ দূরীভূত হইলেও, তৈরিক ঝিলি ফুলিয়া উঠিয়া ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত নাসাগহ্বর পূর্ববৎ অবরুদ্ধ থাকে। এই ৬।৭ দিন অতীত হইয়া গেলে ছেলেদের নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে অভ্যাস করাইবে। মুখপথ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে বলিবে।

এডিনইড জন্তু নাসা গহ্বর অবরুদ্ধ থাকায় বালক বালিকারা অনুনাসিক স্বরে কথা কহিয়া থাকে। অস্ত্রচিকিৎসার পরও কিছুদিন এ অভ্যাস থাকিয়া যায়। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিস্তৃত ভাবে কথা কহাইবার চেষ্টা করিলে তবে এ দোষ সারিয়া যায়।

নাসিকার পশ্চাদংশে পচনচুষ্ট এবং দুর্গন্ধ বৃত্ত প্রদানবায়ুসহ অর অর্থাৎ দৈহিক উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে, নেসাল ড্রুস দিয়া প্রত্যহ ৩।৪ ধার নেজো ফেরিংজ ধুইয়া দিতে হয়। গরম জল সোডা মিশ্রিত করিয়া সেই জলের ড্রুস দেওয়া উচিত। ড্রুস দিবার সময় রোগীকে মুখপথে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে বলিবে। ড্রুস স্ততি ধীরে ধীরে দিবে। যেন এক নাসিকা দিয়া জল প্রবেশ করিয়া অপর নাসিকা দিয়া বাহির হইতে পারে।

মন্দলক্ষণ উপস্থিত হইলে ডাক্তারেরা জোলাপ দিয়া থাকেন, কুইনাইন ও আয়রন খাইতে দেন।

মধ্য কর্ণের প্রদাহের লক্ষণ উপস্থিত হইলে সেই কর্ণের পশ্চাদংশে জেঁক বসানো ভাল। অথবা বিষ্ঠার দেওয়া ভাল। কখন কখন উষ্ণ স্বেদ দিলেও উপকার হয়। এই সময় নাসিকার পশ্চাদংশে ইরিগেশন করা প্রয়োজন। পুঁথ হইয়াছে দেখিলে, সাধারণ কাণপাকার চিকিৎসা করিবে।

ডিপথিরিয়া প্রভৃতি উপসর্গ অত্যন্ত মারাত্মক, ইহার চিকিৎসা করিয়া ফললাভের আশা কম। বাহাতে এরূপ মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হইতে না পারে, সে জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

এডিনইড উচ্ছেদ করার পর ইনফুয়েঞ্জা হওয়ার সম্ভাবনা। বাটাতে কিস্বা পাড়ায় ইনফুয়েঞ্জার প্রকোপ হইয়াছে দেখিলে,—অস্ত্রোপচার না করাই সংপারামর্শ।

এডিনইড উচ্ছেদের পর রোগীর দেহে আর একটা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাহা—গাত্রের স্বকে কণ্ডু নির্গমন। অস্ত্রোপচারের দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবসে ইহা বাহির হয়। ৩৪ দিন থাকিয়া আপনাআপনি মিলাইয়া যায়। টনসিল উচ্ছেদের পরও ইহা ঘটতে পারে।

অস্ত্রোপচারের পর ৪র্থ বা ৫ম দিনে পলিজার ব্যাগদারা ইউষ্টেকিয়ান নলে বায়ুর পিচকারী দেওয়া খুব ভাল। ইহা ৩৪ দিন প্রয়োগ করিতে হয়। রোগীর বধিরতার লক্ষণ দেখিলে ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত বায়ুর পিচকারী প্রয়োগ করিবে।

টনসিল উচ্ছেদ করিলে—এডিনইড উচ্ছেদের সমস্ত উপসর্গই উপস্থিত হইতে

পারে। প্রভেদের মধ্যে এই;—এডিনইড উচ্ছেদে মধ্যকর্ণের প্রদাহ জন্মিতে পারে। টনসিল উচ্ছেদে ইহার সম্ভাবনা নাই। টনসিল উচ্ছেদের পর—পূর্বোক্ত পচন নিবারক ঔষধের স্প্রে গলার মধ্যে প্রত্যাহ ৩।৪ বার প্রয়োগ করিবে। টনসিল উচ্ছেদ করিলে গলায় যথেষ্ট বেদনা হয়—কাজেই রোগী গারগল বা কবল করিতে পারে না। ফলি কিউলারটন সিনাইটিস জনিত গলার অত্যন্ত বেদনা বোধ করিলে রোগীকে—পটাস ক্লোরেট ৫ গ্রেণ, একোয়া মিষ্টপিপ ১ উন্স; অথবা নিসিন্দা পত্রের কাথে গোলমরিচ ঘষিয়া, প্রত্যাহ ৩বার সেবন করিতে দিবে।

কচি নারিকেলের কড়কচি বাবলাছাল, চামেলীর পত্র এবং পেয়ারা পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে একটু ফটকির মিশাইয়া সেই জলে রোগীকে মুখ ধুইতে বলিবে। কিসা পটাস ক্লোরেট ৭ গ্রেণ, টিকুর ফেরি পরে ক্লো ১০ মিনিট, গ্লিসারিন ১ ড্রাম, একোয়া মিষ্ট পিপ ১ উন্স—একত্রে মিশাইয়া তদ্বারা মুখ ধুইবার পরামর্শ দিবে।

এডিনইড ও টনসিল যুক্ত রোগীর স্বাস্থ্য আদৌ ভাল হয় না। স্তবরাং অস্ত্রোপচারের পর—রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত—“চাবন-প্রাশ” খাইতে দিবে। সক্ষম হইলে, রোগীকে কিছুদিন বায়ুপরিবর্তনের জন্ত—ওয়াল-টার, পুরী প্রভৃতি স্থানে বাইবার পরামর্শ দিবে।

দ্ব্যন্তঃপাটনের পর ২।১ দিন পর্যন্ত রোগীকে পচননিবারক ঔষধের মুখদোষি প্রদান করিবে। নিম্নে ডাক্তারী ও কবিরাজী মতের ২।৪টা মুখদোষিতির নির্দেশ করিতেছি;

### ডাক্তারী মতে—

(১) জল ১ পাইন্ট, ফেবেট অফ সোডা ১ ড্রাম।

(২) আর্গিকা সলিউশন্স।

(৩) হাইড্রোজেন পার অক্সাইড।

(৪) গ্লাইকো থাইমলিন।

ইহারা মুখ গহ্বর পরিষ্কার ও বেদনা নিবারণ করিয়া থাকে।

### কবিরাজী মতে—[পচন

#### নিরারক মুখ দোষি]

(১) বট, অখথ, পাকুড়, বজ্রমূব, ইহাদের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া তাহা কাপ দিয়া মুখ ধুইবে।

(২) বচ, চৈ, সর্জিকাক্ষার, আকনাদি, লাক্ষা—ইহাদের চূর্ণ গরম জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জলে মুখ ধুইবে।

(৩) পলতা নিমছাল ও ত্রিফলাব কাথ দিয়া মুখ ধুইবে।

(৪) বেয়াকুড়, ভুইকদম, ভেরেণ্ডা ও কলিকারী সিদ্ধ জলে সরিষার তৈল নিক্ষেপ করিয়া—ইহার দ্বারা মুখ হইবে।

(৫) গরম জলে আকন্দর আটা ও ছাতিম গাছের আটা প্রক্ষেপ দিয়া সেইজলে মুখ ধুইবে।

(৬) মুণা, যষ্টিমধু, নিসিন্দা পাতা, খদিরকাষ্ঠ, বেণার মূল, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, বিড়ঙ্গ—ইহাদের কাথ দিয়া মুখ দোষি করিবে।

কাহারও দাঁত তুলিয়া দিলে, আঁি তাহাকে নিম্নলিখিত মুখদোষিতির ব্যবস্থা করি থাকি।

Re.

এলকোহল

টিংচার রেটানী

১০০ ভাগ

৪০ ভাগ

এসিড্, অক্সাইড্ ... ৮ ভাগ ।  
 প্রাকারিণ ... ৪ ভাগ ।  
 ওলিগাই মিথ্রাপিপ ... ২ ভাগ ।  
 ওলিগাই সিনামোমাই ... ২ ভাগ ।  
 এক দ মিশাইয়া রাখিবে । ইহার পঞ্চাশ  
 ফোটা গটয়া আধ পাউন্ট জলে মিশ্রিত করিয়া  
 তরায়া মুখ ধুইতে হইবে ।

### জিহ্বাদির অস্ত্রোপচার ।

উপসর্গ । বিগলন । শোণিত শ্রাব । পচন  
 জ্বর কক্ষস প্রদাহ । গলকোষের সেলু-  
 এটিটিস ।

এই শেদীর অস্ত্রোপচাবে—থুব সতর্ক  
 হইলেও—সামান্য পরিমাণ পচন দোষ সংশ্লিষ্ট  
 হইয়া থাকে । ইহা পরিহার করা অসাধ্য ।  
 জিহ্বার অস্ত্রোপচাব করিবার পূর্বে দেখিবে—  
 রোগীর কোন দন্তে ক্ষত বা অপব কোন দোষ  
 আছে কিনা ? থাকিলে, প্রথমেই সেই দন্তটিকে  
 দূরীভূত করা কর্তব্য । পরে, ২৪ দিন পচন  
 নির্বাক ঔষধ দিয়া মুখ ধৌত করিয়া অস্ত্রো-  
 পচাব করিবে ।

জিহ্বার অস্ত্রোপচার করার পর রোগীকে  
 দক্ষিণ পার্শ্ব শয়ন কবাটয়া দিলে, শ্রাব বাহির  
 হইয়া যায়, মুখ গহ্বরকে সক্ষিত থাকে না ।

এই অবস্থায় উচ্চ দোরাসিক দ্রব বা তদ্রূপ  
 অল্প কোন দ্রব দাবা মুখের মধ্যে ইরিগেসন  
 করিলে,—সমস্ত শ্রাবট ধৌত হইয়া যায় ।  
 ইরিগেটোরের নল কাচের হওয়া চাই । অতি  
 অল্প সঞ্চাপে ইরিগেসন প্রয়োগ করিতে হয় ।  
 ইরিগেটোরের অভাবে পিচকারীর দ্বাৰাও কাজ  
 চলিতে পারে ।

রোগীকে তাকিয়া ছেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িতা-  
 বস্থায় রাখিলে কক্ষসে রক্তাধিক্য হইতে পারে  
 না । জিহ্বা কর্তন করার পব তাহাব যে  
 অবশিষ্টাংশ থাকে, তাহা পশ্চাতে সরিয়া যাইয়া  
 শ্বাসবোধ উপস্থিত করিতে পারে না । কাসি  
 উপস্থিত ও হইতে পারে না ।

জিহ্বায় অস্ত্রোপচারের পর, রোগীকে  
 পথ্য দিবার সময়, একটা বাটীতে ৩৪ ইঞ্চি  
 দীর্ঘ ববারের নল সংলগ্ন করিবে, এবং বাটীতে  
 দুগ্ধাদি ভরল খাওয়া পূর্ণ করিয়া, নলটা গলার  
 অভ্যন্তরে দিয়া বাটী অল্প উচ্চ করিয়া ধরিবে ।  
 ইহাতে খাইবার সুবিধা হইবে ।

### খ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য ।

( অবসব প্রাপ্ত—এসিষ্টেণ্ট সার্জন )

## ওলাউঠা হইতে আত্মরক্ষার উপায় ।

—:—

ওলাউঠা অতি সাংঘাতিক পীড়া । ইহা  
 যেখানে সংজাবমূর্তিতে দেখা দেয়, তথাকার  
 অধিবাসীগণের এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত  
 চেষ্টা - ৩

হয় । দেখিতে দেখিতে একের পর একে  
 আক্রমণ করিতে থাকে, চিকিৎসার অভাবে—  
 অসাবধানতার শত শত লোক অকালে প্রাণ

বিসঙ্গীন করে। অনেক স্থলে মৃত্যুর সময় আত্মীয়স্বজনও কেহ উপস্থিত হননা।

এমন কি, সেবা-শুশ্রূষাদির জন্তুও লোকের একান্ত অভাব হইয়া উঠে। যদিও নিকটে ২।৪ জন চিকিৎসক থাকেন, তাঁহারাও ভয়ে জড়সড় হইয়া চিকিৎসা করিতে অস্বীকৃত হন। বাহাতে চিকিৎসা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও নিজ পরিবারের মধ্যে চিকিৎসা করিয়া এ ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্তু নিম্নে উহা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রতিষেধক ও মোটা-মুটি চিকিৎসা প্রদত্ত হইল।

ওলাউঠাদি চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক যেক্রপ খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। এমন কি, অনেকে স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে হোমিওপ্যাথিক ওলাউঠা ও রক্তমাশয় ইত্যাদিতে সর্বোৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যখন ওলাউঠা বহুব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়, তখন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ম্যাকলগলিন নিরপেক্ষভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে, “যদিও আমার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই এলোপ্যাথিক মতে, তথাপি আমি যদি ওলাউঠা দ্বারা আক্রান্ত হই, আমার চিকিৎসার ভার এলোপ্যাথের হাতে না দিয়া হোমিওপ্যাথের হাতেই দিব।

ইতিহাস—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নলডাঙ্গা নামক গ্রামে একটা মেলা উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হওয়াতে হঠাৎ এই পীড়ার উৎপত্তি হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভূমণ্ডলে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কেবল মাত্র অষ্ট্রেলিয়া ও আন্দামানবীপপুঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটা স্থান

ইহার ভীষণ আক্রমণ হইতে এ পর্য্যন্ত বক্ষা পাইয়াছে।

ওলাউঠা অর্থে ভেদ বমন বুঝায়। (ওলা—নামা অর্থাৎ ভেদ, উঠা—বমন) ওলাউঠা এক প্রকার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই জীবাণু দেখিতে নখচিহ্নবৎ অর্থাৎ (,) কমার আয়। এই জন্তু এই জীবাণুকে *Comma bacillus* বলে। উহা ১৮৬০ ইঞ্চি ও বিস্তার ১৮৬০০ ইঞ্চি। ওলাউঠা রোগীর ভেদ ও বমনে এই জীবাণু বর্তমান থাকে।

প্রতিষেধক—ইংবাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে Prevention is better than cure অর্থাৎ রোগ হইলে চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ জন্মিতে না দেওয়াই উচিত। এজন্ত কতগুলি নিয়ম পালন করিলে ইহা আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সেই নিয়মগুলি নিম্নে লিখিত হইল :—

১। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালে মনে সর্বদা স্ফূর্তি রাখা আবশ্যক। পীড়ার চিন্তা আদৌ মনোমধ্যে স্থান দিবে না। সর্বদা সংকার্য্যে লিপ্ত থাকিবে। এজন্ত দেশ প্রচলিত হরি সংকীর্ণনাধি এত সফলদায়ক হয়।

২। অধিকক্ষণ খালিপেটে থাকা উচিত নয়। নিয়মিত সময়ে লবু ও পরিমিত আহার করা উচিত। দিবানিত্রা ও রাত্রি জাগরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অপক ফলমূল, অন্ন বা পচা দ্রব্য (বিশেষতঃ পচা মাছ মাংস) ভোজন, মাদক দ্রব্য ও দূষিত বায়ু সেবন বর্জনীয়।

৩। পানীয় জল ও দুগ্ধাদি কুটাইয়া ব্যবহার করা উচিত, কারণ জল ও দুগ্ধাদি

দ্বারা এই বোগ বিশেষভাবে সংক্রামিত হয় ।  
আহাবাব দ্রব্যে মাছি আদি বসিতে না পারে  
—একপভাবে ঢাকাইয়া রাখা উচিত ।

৫। বাত্মি ১টার পর হইতে প্রাতে  
নির্দিষ্ট সময়ে মলতাগের পূর্ষ পর্য্যন্ত তৃক্ষায়  
কাত্ব হইলে ও কখন জলপান করিবে না ।

৬। একটি পরমা বা তাম্রখণ্ড কোমরে  
ঝুলাইয়া রাখা কর্তব্য । এজন্ত তাম্রখনিতে  
মহাবা ধনঃনব কার্য্য করে, তাগাদেব প্রায়  
কলো হয় না ।

৭। সুপসিদ্ধ ডাক্তার হেরিং বলেন,  
পর্বনের জ্ব ও মোজার অভ্যন্তরে অতি  
দক্ষ গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া সেই জ্বতা ও মোজা  
ব্যবহার করিলে কলো প্রায় আক্রমণ করিতে  
পারে না ।

৮। সংক্রামিত স্থানে কাহারও বাটীতে  
জলপান ও তাম্র ল গ্রহণ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ।

৯। কলো রোগীর ভেদ ও বমন  
যেখানে দেখানো না ফেলিয়া বাড়ীর সামান্য  
বাগিচা অগ্নিতে দগ্ধ করা উচিত । যেখানে ভেদ  
বনি করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা পরিকার করিয়া  
ফেনাইল ছড়া দিবে । সমস্ত গৃহ গন্ধকের  
এম বিশোধিত করিবে ।

১০। স্পষ্ট কাম্ফার বা সাধারণ কপূরের  
স্বাণ প্রত্যক্ষ মধ্যে মধ্যে লওয়া উচিত ।

১১। সংক্রামিত স্থানে স্বস্থ ব্যক্তির  
প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভিরেটোম এল্‌বাম ৬ষ্ঠ  
শক্তি বা কিউগ্রাম ৩০ শক্তি ১ ফোঁটা  
মাত্র ১ কাচা জলের সহিত সেবন করিলে  
ওলাউঠা আক্রমণ করিতে পারে না ।

চিকিৎসা :—

ওলাউঠা রোগের ৪টা অবস্থা ।

১। আক্রমণাবস্থা ;

২। পূর্ণবিকাশাবস্থা ।

৩। পতনাবস্থা ।

৪। প্রতিক্রিয়াবস্থা ।

আক্রমণাবস্থায় চিকিৎসা :—

প্রথম ভেদ হওয়ামাত্রই কবিনীর স্পষ্ট  
কাম্ফার সেবন করা আবশ্যিক । বতক্ষণ পর্য্যন্ত  
রোগীর দান্তে মল থাকে ও বমন ইপিপাসার  
উদ্রেক না হয়, ততক্ষণ ইহা ব্যবহৃত হয় ।  
প্রত্যেক দান্তের পর ১ মাত্রা করিয়া, এইরূপে  
২১৩ মাত্রা ঔষধ সেবনের পর যদি কোনও  
উপকার না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত  
ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে দিবে ।

উক্ত কাম্ফার বালকদিগের জন্ত ২১৩  
ফোঁটা মাত্রায় ও পূর্ণবয়স্কের জন্ত ৫ হইতে  
১০ ফোঁটা মাত্রায় চিনি কিম্বা বাতাসার  
সহিত সেব্য । ইহা কখনও জলের সহিত  
ব্যবহার করিবে না । কাম্ফার ঔষধটি  
হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহিত রাখিবে না ।  
তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সমুদ্র  
গুণ নষ্ট হইয়া যায় ।

কাম্ফারে কোনও উপকার না হইলে  
একোনাইট ১X ক্রম দিবে । তরল ভেদ,  
মৃত্যুভয়, অস্থিরতা, পিপাসা, পেটবেদনা  
ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয় । চতুর্দিকে কলোয়ায়  
মৃত্যু হইতে দেখিয়া ভয় জনিত দান্ত হইলে  
একোনাইট তাহার প্রধান ঔষধ । বমনের  
প্রধান ঔষধ ইপিপাক ; বমন হইয়া গেলেও  
বমনেচ্ছার নিবৃত্তি না হওয়া লক্ষণে ইহা  
উত্তম ঔষধ । কিন্তু বমন হইলেই বমনেচ্ছার  
নিবৃত্তি লক্ষণে এটিম টার্ট ৬ ।

পূর্ণবিকাশাবস্থায় চিকিৎসা ।

চাউলখোয়া জলের জায় ভেদ, অত্যন্ত  
বমন, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, নাকী স্ফীণ ও

অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণে ভিরেট্রাম্ এল্বাম ১২ উপযোগী। ভেদ ও বমনের পরিমাণ কম, দুর্নিবার পিপাসা, নাড়ী লুপ্তপ্রায়, অতিশয় অবসন্নতা, বমনের পব পাকাশয়ে অত্যন্ত জালা, মূত্রাবরোধ, ঘন ঘন কষ্টকব শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি লক্ষণে আর্সেনিক ৩০ ক্রম ব্যবস্থেয়। ভিরেট্রাম্ ও আর্সেনিকের পিপাসার পার্থক্য এই যে, ভিরেট্রামের রোগী একেবাবে বেশী পরিমাণ জলপান কবে ও আর্সেনিকের রোগী অতি অল্প অল্প বহবার জলপান কবে। ওলাউটার হস্ত ও পদদ্বয়ে অধিক মাত্রায় থিলধরা লক্ষণে কিউপ্রাম ৬ মহৌষধ। কিউপ্রামে থিলধরার কোনও উপকার না হইলে সীকেলী কর ৬ দিবে। পিত্তবৃদ্ধ তরল ভেদ, অল্প গন্ধ বিশিষ্ট বমন, পরে পিত্ত বমন, বমনের পব জালা, শেষ রাত্রিতে পীড়ার আক্রমণ প্রভৃতিতে আইরিস ডার্স ৩X ব্যবস্থেয়। পাকস্থলীতে অতিশয় যন্ত্রণা, জলপান কবিলে ব উঠিয়া পড়া, সহসা পিচকারীর ছায় বেগে তরল মলশ্রাব ইত্যাদি লক্ষণে ফ্রোটন টিং ৬। উদবেব মধ্যে গড়গড় কল্কল শব্দ, প্রথমে বমন, পরে ভেদ, হস্তপদের আক্ষেপ, সার্কাস্ট্রীন শীতলতা, মলধোয়া জলের পরিবর্তে আঠা আঠা ষ্ঠেতবর্ণের তবল ভেদ ইত্যাদিতে জ্যাকট্রোকা ৬ উপযোগী। ওলাউটা রোগীর রক্তদাস্ত হইলে, ইপিকাক ৩X ব্যবস্থেয়। বক্তভেদের সহিত স্লেগ্মা থাকিলে মার্কাবরাস কর ৬ প্রযুক্ত্য। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব না হইলে ক্যাথারিস ৬ দিবে। উহাতে উপকার না হইলে টেরিবিহ্না ৬ সেবন বিধি। মস্তষ্কের রক্তাধিক্য জ্ঞান প্রলাপ হইলে বেলেডোনা ৩০ ব্যবস্থেয়।

পতন অবস্থার চিকিৎসা।

হিমাক্র অবস্থায় কার্বভেজ ৩০ বিশেষ উপকারী ঔষধ। ভেদ বমন বন্ধ হইয়া উদব ক্ষীত, কপালে ও গলায় বিন্দু বিন্দু দগ্ধ, অতিশয় শ্বাসকষ্ট, অত্যন্ত গাত্রদাহ, নাড়া বিলুপ্ত, সর্কশরীর নীলবর্ণ ও ববক্ষেব ছায় শীতল লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী। পতনাবস্থায় এসিড হাইড্রো সায়োনিক ৬ একটী মহৌষধ। মৃতবৎ দেহ, শীতল দগ্ধ, ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ী লোপ, অচেতনাবস্থা ও গোস্ফান প্রভৃতি লক্ষণে ইহা উৎকৃষ্ট কাণ্য করে। পতনাবস্থায় এসিড হাইড্রোসায়োনিকের দ্বারা কাণ্য না হইলে কোরা বা ত্রাজ ৬ দিবে। বারম্বাঃ শ্বাসবোধ হইবার উপক্রম, উদবক্ষীত, সর্ব শরীর নীলবর্ণ ও ববক্ষেব ঠাণ্ডা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহায্য। ইহা পতনাবস্থার শেষ ঔষধ।

প্রতিক্রিয়াবস্থার চিকিৎসা।

এই অবস্থায় রোগী ক্রমশঃ আবোগোব দিকে ঘাইতে থাকে। এই অবস্থায় ঔষধ সেবন বন্ধ রাখা উচিত। কিম্বা লক্ষণানুসারে উপরোক্ত ঔষধ সমূহ দীর্ঘ সময় অন্তর অল্প মাত্রায় সেবন করান আবশ্যক।

মাত্রা—রোগের প্রবলতার সময় ১০।১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ ১ ফোঁটা মাত্রায় ও বালকের জ্ঞান অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায়। শিশুদিগের জ্ঞান সিকি ফোঁটা মাত্রায় সেবন আবশ্যক। ক্রমে দীর্ঘ সময় অন্তর ঔষধ সেবন করিবে।

পথ্য।

রোগের বর্ধিত অবস্থায় ঠাণ্ডা জলই একমাত্র পথ্য। প্রতিক্রিয়া অবস্থা আরম্ভ হইলে রোগীকে খুব পাতলা জল-এরাক্ট অল্প লবণসহ দিবে। ওলাউটার ভেদ বমন হইলে রক্তের



কোনোভাগ ও লবণাংশ বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং বক্ত গাঢ় হইয়া আসে। এজন্য জলসহ লবণ মিশাইয়া দিলে, উক্ত জল ও লবণাংশ বক্তমধ্যে সহজেই সঞ্চারিত হইয়া শারীরিক

যন্ত্রাদিতে বল আনয়ন করে ও রক্ত গাঢ় করিয়া ছৎপিণ্ডকে সহসা নিস্তেজ করিতে পারে না। কলেরায় এজন্য Saline Injection এত সুফলদায়ক হয়। \*

ডাক্তার শ্রীমহাদেব মণ্ডল।

## পিত্তজ-বিষাক্ততা।

—:০:—

আয়ুর্বেদজ্ঞ ঋষিগণ—পিত্তের শক্তি, কার্য, প্রদান ও অবস্থানাদির আলোচনা করিয়া, তাহার স্বরূপ বৈকল্প নিপুণ ভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। সেক্ষেপে যাব কোনও বিজ্ঞানে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঠক! আয়ুর্বেদের পঞ্চবিধ পিত্তের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন; দেখিবেন—ভারতের স্বাস্থ্য ভিন্ন পিত্ত-রহস্তের মীমাংসা করা যথেষ্ট অসাধ্য। আয়ুর্বেদের পিত্তরহস্ত বিনিবর্তিত পাবিবেন, জগতেব জীব-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবেই তাঁহার করায়ত্ত হইবে। পিত্ত-রহস্ত সংক্ষেপে আলোচিত হইবার নহে, বর্তমান প্রবন্ধে আমি সে চেষ্টাও করিব না। আমি কেবল নব্য তত্ত্বের “পিত্তজ বিষাক্ততা” বর্ণনা প্রয়াস পাইব।

পিত্ত-বিশেষজ্ঞাক্ত। পিত্তের মধ্যে নানা পদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি পিত্তের উপাদান। এই সকল উপাদানের মধ্যে কোনটির পরিমাণ কতটুকু?

তাহার বিয়ক্রিয়াই বা কিরূপ, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা—আধুনিক বিজ্ঞানের অতি অল্প। কিন্তু চিকিৎসকের তাহা জানা উচিত। পিত্তজ বিষাক্ততার সাধারণ নাম—“কোলিমিয়া”। পিত্তের বিষাক্ত পদার্থেব মধ্যে যেটা প্রধান—তাহার বিলাতী সংজ্ঞা—Bilirubin. এই বিলিক্রবিণের জন্যই পিত্তজ বিষাক্ততার অধিকাংশ লক্ষণ জীবদেহে প্রকাশ পায়।

বিলিক্রবিণের রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ— $C_{32}H_{30}N_4O_6$ .

ইহা অল্পের অল্পরূপ পটাশিয়াম শ্রেণীর ধাতব পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া অনেক রকম মিশ্র পদার্থ উৎপাদন করে। পিত্তস্থলীর ভিতরকার পিত্তেব মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ এই বিলিক্রবিণ বর্তমান থাকে। কিন্তু শোষণ হইতে নির্গত পিত্তে শতকরা ০.১ অংশ মাত্র বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কত পরিমাণ বিলিক্রবিণ উৎপন্ন হয়, অত্যাধি তাহা সঠিক রূপে স্থির করা যায় নাই।

\* আজকাল কলেরা রোগে অনেকেরই হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস বলিয়া এ প্রবন্ধ পত্রস্থ করিলাম। আশেপাশেও কিন্তু ওলাউঠা বা কলেরার অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা আছে। আমরা সে চিকিৎসা-প্রণালী ইহার সহ প্রকাশ করিব। আরংং।

কেবল এইটুকু জানা যায়—সুস্থব্যক্তির শরীরে ৫০৩ গ্রামের অধিক বিলিরুবিন জন্মায় না। রক্তের বর্ণজ পদার্থ অবস্থাবিশেষে বিল্লিভিত হইয়াই বিলিরুবিনের উৎপত্তি অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু কিরূপ রাসায়নিক পরিবর্তনে যে ইহার উৎপত্তি হয়, এখনও তাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

অস্ত্রের মধ্যে, রোগ-জীবাণু কভুক “হাইড্রোজেন” হইতে “হাইড্রোবিলিরুবিন” উৎপন্ন হয় এবং ইহাই ঠারকো বিলিনে পরিবর্তিত হইয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই হাইড্রোবিলিরুবিনের কিয়দংশ স্তন্য মধ্যে শোষিত হইয়া, পুনঃ পরিবর্তিত হইয়া “উরুবিলিন” রূপে মূত্রসহ নির্গত হইয়া থাকে। বিলিরুবিন হইতে “উরুবিলিনের” উৎপত্তি ইচ্ছাট বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

জীব দেহের গুরুত্বের সের প্রতি ৬০০০ পিণ্ড পিচকারি দ্বারা প্রয়োগ করিলে [বিধান মধ্যে]—আরুপ উপস্থিত হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেই পিণ্ডকে যদি জান্তব অঙ্গারের ভিতর দিয়া চালিত করিয়া তাহাব বর্ণক পদার্থ দূরীভূত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পিণ্ডের বিষাক্ততা দূরীভূত হইয়া প্রাণ প্রাপ্ত হয়।

বিষধর্মান্তান্ত বিলিরুবিন যদি দেহের মধ্যে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং তাহা মল-মূত্রাদিব সহিত নির্গত হইতে না পারে, তাহা হইলে সমগ্র শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠে, পৈশিক উত্তেজনার আধিক্য হয়। এই অবস্থার নামই—Nervousness অর্থাৎ স্নায়বীক হ্রস্বলতা।

বক্তৃতা দোষ—বিলিরুবিন পিণ্ডের সহিত বাহির হইয়া অস্ত্রের মধ্যে না গিয়া, তথা

হইতেই শোষিত হয়। পিত্তবহা সূক্ষ্ম নলের আবদ্ধতা, যকৃতের ক্ষয় (সঙ্কোচন—সিবোসিস) এবং কোষের দোষেই—ইহা হইয়া থাকে। স্বক্বে বর্ণ পিণ্ডের বর্ণে রঞ্জিত দেখিলে এই অবস্থাই ধরিয়া লইতে হইবে। পিত্তজ বিষাক্ততা ধরিবার সহজ উপায় বোগাঁব বক্তৃতা পরীক্ষা করা। কিন্তু আর্গা ঋষিগণ—তাহাব আবদ্ধকতা মনে করিতেন না। উদাহরণ বোগাঁব দেহের অগ্রাণ্ড লক্ষণ দেখিয়াই তাহা নিঃসন্দেহ বৃত্তিতে পারিতেন। নিম্নে পিত্তজ বিষাক্ততাব সাধাবণ লক্ষণ লিপিবদ্ধ হইল।

স্নায়বীক হ্রস্বলতা, অবসন্নতা, অমৃদগ, (কোন কার্যেই মন নিবিষ্ট হয় না) স্নায়বীক উত্তেজনা খিটখিটে স্বভাব, মানসিক বিকাব, অজীর্ণ (খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হয়না)। আত্ম রাস্তে পেটভার বোধ হয়, ইহার ১ কি ২ ঘণ্টা পরে পিপাসা বোধ, অম্লোদগা, আত্মবৈ পরই পাকস্থলীতে বেদনা বোধ, (এই বেদনা কয়েক মূর্ত্ত্ত পরে নিবৃত্তি হয়, ৩৪ ঘণ্টা পরে আবাব দেখা দেয়) আত্মা বস্ত্র যেন পাকস্থলী হইতে গলদেশে উঠিতেছে এইরূপ অনুমান; বিবমিনা (গা বমি বমি) কখনও বা বমন; কোষ্ঠগততা, মধ্যে মধ্যে অতিসার, মল স্নানান্ত, বাহিব হইবার সময় গুহুদার জ্বালা করে, মূলে যথেষ্ট পরিমাণে পিণ্ড মিশ্রিত থাকে, শ্লেষ্মাও শোণিত ও মিশ্রিত থাকিতে পাবে। কখন কখন—বমি ও অতিসার এক সঙ্গে উপস্থিত হয়। নাড়ী—কখনও স্বাভাবিক, কখনও হ্রস্বল, মৃদু, উত্তেজিত, এবং বিবন গতি বিশিষ্ট। মুখের লাল্য অম্লান্ত, মুখে তিজা স্বাদ, প্রশ্বাস বায়ু হ্রস্বকৃত, দৈহিক উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি—স্বাভাবিক নিয়নের বিপরীত (অর্থাৎ পূর্কালে ৭টার সময় সর্কোপেক্ষা উত্তাপ

বর্ণাঙ্গ অপরূপে উত্তাপ সর্বাঙ্গের (কম) বোধ্য মনে করে তাহার বর্ণি অর হইয়াছে। কখনও নাসিকা হইতে কখনও বা মুখ হইতে শোণিতস্রাব। বৃদ্ধ হইলে চক্ষু হইতে কখন কখন বক্তপ্রণ হইতে দেখা যায়। স্থূলোক হইলে অধিক আর্দ্রবস্ত্রাও দেখা যায়।

বৃদ্ধ অপরূপাব, পীতাত, (ঈমং লঘু হবিদ্রা বর্ণের আভাসিত) হস্তের পশ্চাতে ও পদের পৃষ্ঠে—এই বর্ণপরিবর্তন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গর্ভাঙ্গের সংযোগ স্থলের জ্বলে ব্রহ্মণ বর্ণ পরিবর্তন নাও দেখা যাইতে পারে। উভয় সন্ধি মধ্যবর্তী স্থলেই বর্ণপরিবর্তন অস্পষ্টকৃত সুস্পষ্ট দেখা যায়। হাতের তেলো, পাদের তলা, নখমণ্ডলের স্থানে স্থানে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানেও বিন্দু বিন্দু দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

বোগের প্রবলাবস্থায় সমস্ত শরীরের ত্বকট বিবর্ণ হইয়া যায়, স্থানে স্থানে গাঢ়বর্ণের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিক বিকারের নানা লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই সকল লক্ষণের দিকে চিকিৎসক কে তাঁকদষ্ট রাখিতে হইবে। কেননা, অনেক সময় ম্যালারিয়ার লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী বিমর্ষভাবে বসিয়া বা শুইয়া থাকে, সামান্য ক্রটিতে অত্যন্ত রাগিয়া ওঠে। অনিশ্চিত বিষয়ের ভাষণ করে। যত্নাকামনা করে। তবে আত্মহত্যা করে না। নানারকম শব্দ শুনিতে পায়। দৃষ্টিশক্তি, অনিদ্রা, শরীরক্ষয়, শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বা উদ্ভাদ হইয়া যায়।

দেহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়—যকৃত সামান্য একটু হ্রাস, স্নায়ু সামান্য একটু বৃদ্ধি, কিন্তু সকল রোগীর ইহা হয় না।

পিত্তজ-বিষাক্ততারোগগ্রস্ত ব্যক্তির পূর্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায়—পূর্বে অজীর্ণ (ডিসপেপসিয়া) ছিল, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত না। এই কোষ্ঠবদ্ধতার রোগী বহুদিন ধরিয়া কষ্ট পাইয়াছে, এই কোষ্ঠবদ্ধতার জন্তই শরীর বিষাক্ত হইয়াছে।

পাকস্থলীর মধ্যে জৈবিক অম্লের উৎপত্তি, তজ্জন্ত যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য, যক্ষ্ম পিত্তবাহ্য আক্রান্ত হওয়ার—পিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে বহির্গত হইতে পারে না,—লসিকার মধ্যে থাকিয়া যায়, পাকস্থলীর উৎসেচন ক্রিয়ায় ফলে যকৃতের সঙ্কোচন (সিরোসিস) হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, পিত্তনদীর প্রদাহ ইহা হইতেও হইতে পারে।

এইরোগে অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করা খুব কঠিন। ডাক্তারেরা অল্প মাত্রায় পারদ ঘটিত ঔষধ এবং ম্লাইকোকোনেট সোডিয়াম প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আর্টফিডাল সিরসের পিচকারীর ব্যবস্থা করেন। কেহবা ক্ষারাক্ত ঔষধ এবং সোডিয়াম স্যালাসিনেট প্রয়োগের উপদেশ দেন।

আমি অনেক রোগীকে কবিরাজী মতে চিকিৎসিত হইতে দেখিয়াছি। গুলঞ্চ এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমি বেঙ্গলের গুলঞ্চ লিকুইড প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। ২ তোলা গুলঞ্চ—আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া—৪ ওন্স শিশিতে পুরিয়া ৪ দাগ—৩ ঘণ্টান্তর করিয়া থাকিতে দিয়াছি। ইহাতেও বেশ উপকার পাইয়াছি। রোগের প্রথমাবস্থায়—গুলঞ্চ প্রয়োগ করিতে পারিলে, রোগ নিশ্চয়ই ভাল হইবে। অথচ গুলঞ্চ সর্বজন পরিচিত, সহজ প্রাপ্য, মূল্য মহোৎকৃষ্ট। কলকাতাদিপাঠনও পিত্তজ বিষাক্ততার একটা ফলপ্রসূ ঔষধ। হরীতকী,

বহেড়া, আমলা, গুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, চিরাতা ও নিমছাল—এই ৮টা জিনিষ প্রত্যেকটা ১০ আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, ৪ ওন্স শিশিতে পুরিয়া ৩ ঘণ্টাস্তর সেবন করিলে—পিত্তজ বিষাক্ততার বিশেষ উপকার হয়। এই পাচনটা যক্কের উত্তেজক। ইহাতে স্বকের বিবর্ণত্বের হাস হইয়া থাকে। স্বকের বিবর্ণত্ব

হাসপ্রাপ্ত হইলে বুঝিতে হইবে—দীড়ার লক্ষণও হাস হইয়াছে। গুনিয়াছি—মণ্ডব ভস্ম নাকি এ রোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু আমি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাই নাই।

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এল, এম, এস।

## বনৌষধি।

—:—

আদ্রক-আদা, হিং-আদরক।—বঙ্গদেশে আদার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে। কোন কোন গৃহস্থ-বাড়ীতেও ইহা যত্নে রক্ষিত হয়। হিন্দী ভাষায় আদাকে 'অদরক' বলে।

আদা কাঁচা ও শুষ্ক দুই রকমে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক আদাকে শুঠ বা শুঙ্গী বলে। কাঁচা ও শুষ্ক আদার পৃথক পৃথক গুণ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে ইহাতে বহু পরিমাণে আদা ইউরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহা হইতেই 'টিঞ্চার জিঞ্জার' ও 'সিরাপ জিঞ্জার' প্রস্তুত হয়।

আদ্রকের গুণ।—কাঁচা আদা অগ্নি বৃদ্ধিকারক, কফনাশক, বিরেচক, মুখরোচক। আদার স্বরস ঔষধের সহ পানার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকভাবে কাঁচা আদা অপেক্ষা শুঠের ব্যবহার অধিক দৃষ্ট হয়।

ভোজনের অব্যবহিত পূর্বে কাঁচা আদা কিঞ্চিৎ লবণের সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও মুখে রুচি হইয়া থাকে।

সন্নিপাত জ্বরে আদা।—আদার রসে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ ( শুঠ, পিপ্পল মরিচ ) মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিবে, এই প্রকার পুনঃ পুনঃ করিলে বক্ষের, গলার ও কণ্ঠের স্লেষ্মা নির্গত হইয়া শরীরের লঘুতা জন্মিবে। ইহা স্বরভঙ্গ ও বিশেষ উপকারী।

অতিসারে আদা।—অত্যন্ত প্রবল অতিসারে বাহার মল কোনপ্রকারেই রোধ করা যাইতেছে না, তাহার নাভীর চতুর্পার্শ্বে শুষ্ক আমলকী বাটরা আলিঙ্গন করিবে, তৎপরে ঐ আমলকী বেষ্টিত স্থানে (নাভি মূলে) কাঁচা আদার স্বরস পরিপূর্ণ করিয়া ২০ বিন্দু রুখিবে। ইহা অতিসার রোগে একটা শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোগ, ইহাতে প্রবল অতিসারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

এহাণী রোগে শুঠ।—শুঠ (আদা শুঠ) কব্জের সহিত গব্যরসে পাক করিয়া

রি আনা কিয়া ছয় আনা মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী উপশমিত হয়। ইহা বায়ুর মুলোমক।

**রক্তস্রাবে আদা।**—মূত্রমার্গ হইতে ক্রমাবহ হইলে শু'ঠ ২ তোলা, জল দেড় পোয়া বাতঞ্চ অর্দ্ধপোয়া—একত্রে জাল দিয়া ছন্ধ শব ব্যথিয়া এই ছন্ধ পান করিবে, ইহাতে রক্ত পান বন্ধ হইবে।

**অতিসারে শু'ঠ।**—শু'ঠ ১ তোলা, লা ১ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, টি কাথ পান করিলে অতিসারের নিবৃত্তি হয়। এ অতিশয় অম্লবদ্ধক।

**ক্ষত স্থানে শু'ঠ।**—ক্ষতস্থলীণ রোগী গাত শু'ঠ চূর্ণ ১০ চারি আনা পরিমাণ জলের সহিত সেবন করিবে, ঔষধ সেবনকাল পর্য্যন্ত রক্তপরিচয় করিয়া কেবল মাত্র ছন্ধ পান পিবে। ইহাতে ব্যাধির উপশম হইবে। ক পক্ষ কাল এইরূপ নিয়মে সেবন করিবে।

**উদরী রোগে আদা।**—উদরী রোগে প্রাতঃপ্রাতে আদার রস ১ তোলা ও ছন্ধ ১ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। দশগুণ আদার রসের সহিত তিল তৈল ক করিয়া সেই তৈল সেবন ও অঙ্গে লিখ করিবে। ইহাতে উদরী রোগের পশম হইবে।

**আমদোবে শু'ঠ।**—গরম জলের সহিত তাহ চাখি আনা পরিমাণ শু'ঠী চূর্ণ সেবন করিলে আম পরিপাক হয়, ইহা বিশেষ অগ্নি বৃদ্ধক।

**আনাতিসারে উদর বেদনায় শু'ঠ।**—শু'ঠী চূর্ণ কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া রওপত্র বেঠন করিয়া পরে মুক্তিকার লেপ দিয়া একটা মোষ প্রোক্ত করিবে।

এ মোষ ঘুটিবার অগ্নিতে মূত্ৰপাক করিবে, পাকশেষে শীতল হইলে অভ্যন্তরস্থ ঔষধের চূর্ণ ছই আনা পরিমাণ প্রাতঃপ্রাতঃকালে চিনির সহিত সামান্য জলসহ সেবন করিলে উদরের আমজনিত বেদনার উপশম হয়।

**কর্ণশূলে আদা।**—তিল তৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধব মিশ্রিত পূর্দক ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের আভ্যন্তরীণ বেদনার নিবৃত্তি হয়।

**কাসে আদা।**—খসখসে কাসিতে কাঁচা আদা খোলা ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে, পরে উহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মাখাইয়া একটা শলাকা দ্বারা আদার টুকরাগুলিকে বিদ্ধ করিয়া তৈলের প্রদীপের শিখায় সেকিয়া লইয়া ২১০ টুকরা করিয়া চিবাইয়া সেবন করিবে, ইহা সর্দি কাসির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

**গুল্মরোগে আদা।**—সর্জিকাঙ্কার (বেনের দোকানে পাওয়া যায়) ও আদা সমভাগে লইয়া, বাটীয়া ৪ রতি প্রমাণ বড়া করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে রক্তজ গুল্ম উপশমিত হয়।

**শীতপিত্তে আদা।**—রক্ত এবং পিত্ত উত্তপ্ত হইয়া শীতপিত্তরোগ জন্মে, ইহাতে সর্কাসে অথবা দেহের স্থানে স্থানে চাকা চাকা মণ্ডলাকৃতি বোলতার দংশনের ছায়া দৃষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ পুরাতন ইক্ষু শুড়ের সহিত আদার রস সেবন করিলে ইহা উপশমিত হইয়া থাকে।

**বিষম জ্বরে শু'ঠী।**—যেত বেড়েলার মূলের ছাল ও শু'ঠী সমভাগে প্রেঙ্ক করিয়া উহার কাষ করিবে। (১ তোলা বেড়েলা, ১ তোলা শু'ঠী, জল ১০ সের, দশক ১০ পোয়া)

প্রত্যহ প্রাতে এই কাথ পান করিলে শীতকম্প দাহযুক্ত বিষম জ্বর উপশমিত হয়।

**হিকায় শুষ্ঠ।**—ছাগী দুগ্ধ দ্বারা ক্ষীর পাকানুযায়ী শুষ্ঠের কাথ হিকা নাশক।

**শিরোরোগে শুষ্ঠী।**—শুষ্ঠি চূর্ণ গব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্যগ্রহণ করিলে শিরোরোগের উপশম হয়।

**শূলরোগে শুষ্ঠী।**—শূলরোগে ১০ আনা শুষ্ঠ, ১০ আনা বিট লবণ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ বেদনার উপশম হয়।

**শুষ্ঠ-বায়ুনাশক, বেদনা নিবারক,** ইহা গলরোগ নাশক, শ্লেষ্মা প্রশমক, অগ্নিমান্দি বিহটিকা, উদরাময়, পেট ফাঁপা, শোথ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী।

**বাতজনিত বেদনা স্থানে।**—শুষ্ঠিচূর্ণ, তর্পিত তৈল ও কপূর মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিলে বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, উহাতে কিঞ্চিৎ সজিনার ছালের রস ও ধুতুরা পাতার রস মিশ্রিত করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট বাতের মালিশ হয়।

শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন।

## ডাক্তারের ডায়েরি।

[ স্বর্গীয় মহাত্মা ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত ]

( ১৯০৫ )

—:—

**কার্বলিক অ্যাসিডের কুফল।**

অনেক ডাক্তারের বিশ্বাস—কার্বলিক অ্যাসিডের স্থানিক প্রয়োগে ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, কার্বলিক অ্যাসিডে বা পচিতে পারে। এরূপ দেখা গিয়াছে—শতকরা দুই অংশ শক্তির কার্বলিক দ্রব দিয়া কোন যোগীর আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গুলি আবৃত রাখা হইয়াছিল। পরদিন ঐ অঙ্গুলিতে গ্যানগ্রিন হইয়াছিল। কোনও বুকের আঙ্গুলে বেদনা হওয়ায়—কার্বলিক লোলন (মুহ প্রকৃতির) প্রয়োগ করা হয়। ৫৩ দিন পরে ঐ আঙ্গুলে গ্যানগ্রিন হইয়া অস্থি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। বালক

বালিকার শরীরে অল্প পরিমাণে কার্বলিক প্রয়োগ করিলেও স্থানিক পচন আরম্ভ হইতে পারে। কার্বলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিলে পীড়িত স্থান পীতাক পাটল রণ ধারণ করে; ক্রমে ঐ স্থানের বর্ণ কাল হইয়া যায়। আক্রান্ত স্থানের স্পর্শজ্ঞান লোপ পায়, কোমল হয়। শেষে পচিতে আরম্ভ করে। মাংস বিগলিত হইয়া পুথক হয়। অতএব ডাক্তার ভায়া এবং সাধারণ গৃহস্থেরা—কার্বলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করিবার পূর্বে সতর্ক হইবেন।

**আফিং পরিত্যাগের ঔষধ।**  
যদি কোন ব্যক্তি আফিং সেবনের কল্যাণ হইতে নিষ্কর্তি নাহকেন, তবে ডাক্তারের

শরণাগত হন, ডাক্তার তাঁহাকে “হায়সিন হাইড্রোবোমেড” ব্যবস্থা করিবেন। ইহা প্রয়োগ করিয়া আমি দিল্লীর কয়েকজন আফিংখোর ভদ্রলোককে আফিম ছাড়াইয়া দিয়াছি।

আফিম পরিত্যাগেচ্ছু ব্যক্তিকে ডাক্তার এমন স্থানে রাখিবেন, যেন সর্বদাই তাহাকে দেখা চলে। এমন একটা ঘর চাই, যে ঘরে ফোন ও দ্বাবাদি থাকিবে না, অথচ ঘরটি অন্ধকার হইবে। হায়সিন সেবনে রোগীর শরীরে উন্নততার লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। চক্ষু আনোক লাগিলে উদ্বেজনা আসিতে পারে। রোগীর কাছে একজন বিশ্বাসী—স্বগ্রন্থাকাবাকে রাখিতে হইবে।

হায়সিন প্রয়োগ করিবার পূর্বে আফিং খোবের ফংপিও, ফুসফুস এবং মূত্রযন্ত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। ঐ সমস্ত যন্ত্রের কোনও পীড়া থাকিলে, প্রথমে তাহারই চিকিৎসা করিবে।

যে দিন হায়সিন ব্যবহার করা হইবে, তাহার পূর্বদিনে—রোগীকে উষ্ণজলে স্নান করিতে বলিবে—গায়ে যেন ময়লা না থাকে। তা’রপর ট্রিশটিন সালফেট দুই ঘণ্টা অন্তর ৩ বার সেবন করাইবে। রাত্রে কালমেল, পডফিলিন এবং ইপিকাক সেবন করাইয়া ভোরের সময় লবণ ঘটিত জোসাপ দিবে।

ইহাতে ফংপিও সবল হইবে, যকৃতের কিণ্ডা ভাল হইবে, শরীরস্থ সঞ্চিত দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যাইবে। গা’র বমি, পেটবেদনা, পেটের পীড়া প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিবে না।

অতিজ্ঞ এবং সাহসী চিকিৎসক ভিন্ন—হায়সিন প্রয়োগ বড়ই শক্ত ব্যাপার। রোগীর মনস্তা বিনাম ১ গ্রেণ মাত্রায় হায়সিন প্রয়োগ

করিতে হয়। প্রত্যেক ঘণ্টায় ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। হায়সিনের ক্রিয়া রোগীর দেহে প্রকাশ পাইবা মাত্র বন্ধ রাখিবে। যখন দেখিবে—নাড়ীর গতি মুহূ (প্রতি মিনিটে ১৫ বার) হইয়াছে, মুখমণ্ডল উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে, কুনীনিকা প্রসারিত এবং জিহ্বা শুষ্ক হইয়াছে, রোগী সামান্য প্রলাপ বকিতেছে, অথবা ক্লান্ত বস্ত্র দর্শন করিয়া উন্মাদের মত তাহা ধরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে—তখনই বন্ধিবে। হায়সিনের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল লক্ষণ বাহাতে ৩০।৪০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে, সেজন্ত অতি অল্প মাত্রায় হায়সিন প্রয়োগ করিবে। ইহার পরই রোগী প্রকৃতিস্থ হইবে, অথচ আবার হায়সিন খাইতে চাহিবে। কিন্তু আর দিবে না। ইহার ২।১ দিন পরেই রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইবে। আফিমের অভ্যাস দূর হইবে, শরীরে উৎসাহ ও বল ফিরিয়া আসিবে।

রোগীর প্রলাপ ও অজ্ঞানাবস্থা দেখিয়া ভয় করিও না। রোগী যে পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ নিদ্রাভিত্ত হইয়া পড়ে, সে পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা হায়সিন প্রয়োগ করিবে।

**সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞাহারক ।**

অল্প চিকিৎসার পূর্বে রোগীকে সংজ্ঞা হারক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। আমার বিশ্বাস—সংজ্ঞাহারক ঔষধের মধ্যে ইথিল ক্লোরাইড খুব ভাল। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে কাজ হয়। রোগীকে পূর্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া লইবার সময় না পাইলে ইথিল ক্লোরাইড সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞাহারক। ইহাতে ৫।৬ মিনিটের মধ্যে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পুনরায় তাহার জ্ঞান হইতে ১০

মিনিটের অধিক সময় লাগেনা। ক্লোরফরম ও ইথরের পরিবর্তে—ইথিন ক্লোরাইডের বহুল প্রচলন আবশ্যিক।

### চাউল জলে অন্ন নিবারণ।

অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও দেখিয়াছি— অন্ন বা অজীর্ণ হইলে তাহারা আন্ত চাউল জল দিয়া গিলিয়া খায়। কেহ কেহ ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্তও এরূপ করিয়া থাকে।

এ নিয়মটা খুব ভাল। বাহাদের অজীর্ণ রোগ আছে, ক্ষুধা ভাল হয় না তাহারা প্রত্যহ আহারের ১ ঘণ্টা পূর্বে—৫৭টা আন্ত চাউল (না চিবাইয়া) জন দিয়া গিলিয়া থাইবেন। ইহাতে Stomach-এর (আমাশয়) অজীর্ণ জনিত বাণতীয় পদার্থ অতি শীঘ্র পক্ষাশয়ে নির্গত হইয়া যায়। আন্ত কাঁচা চাউল— অজীর্ণ রোগীর পেটে হজম হয় না ইহা সত্য, কিন্তু ঐ চাউল পক্ষাশয় ও আমাশয়কে উত্তেজিত করিয়া থাকে, তাহার ফলে রোগীর পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

### এম্পাইরিণের বিবক্রিয়া।

স্টালিসিলেট অফ সোডার মন্দ ফল দেখিয়া উহার পরিবর্তে আজকাল এম্পাইরিণ প্রয়োগ করা হইতেছে। কিন্তু এম্পাইরিণও নির্দোষ নহে—উহারও বিবক্রিয়া আছে। ধাতু ও প্রকৃতি বুঝিয়া সেই বিবক্রিয়া প্রকাশ পায়। এমন কি ১০ গ্রেণ মাত্রায় ২৩ বার এম্পাইরিণ ব্যবহার করিয়া অনেকের দেহে বিবক্রিয়া উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি।

কাহারও হৃদপিণ্ড, কাহারও পেশী কাহারও বা মস্তিষ্কের স্পর্শবোধক সমস্ত স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া বিবক্রিয়া উপস্থিত হয়। বিবক্রিয়ার পক্ষণও সর্বত্র এক নহে। কাহারও

কর্ণে প্রদাহ হয়, কাহারও মুখ ফোলে, কাহারও প্রস্রাব সবুজ বর্ণ হয়। কাহারও বা শ্বাসকৃচ্ছ উপস্থিত হয়। কেহ রা দৌরুলো অবসন্ন হইয়া পড়ে। কাহারও বা অনেক বার অধিক মাত্রায় প্রস্রাব হইতে থাকে।

অতএব এম্পাইরিণ অধিক মাত্রায় হঠাৎ প্রয়োগ করিওনা। অন্ন মাত্রায় দিবে। মাত্রা ৫ গ্রেণের বেশী না হয়।

### বহুমূত্র রোগে—বঙ্গ প্রয়োগ।

রাং নামক ধাতুকে কবিরাজী শাস্ত্রে 'বঙ্গ' বলে। রাঙের মধ্যে পদ্ম রাং উৎকৃষ্ট। ইহা ভস্ম করিয়া লইতে হয়। ভস্ম করা বাং বহুমূত্র রোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমি উবানিয়ম প্রয়োগে তিনটা বহুমূত্র রোগীর চিকিৎসা করি। বিশেষ কোন ফল পাই নাই, উরানিয়ম নাইটেট—অতি সাবধানে আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিতে হয়। আমি এই তিনটা রোগীকে আহারের পর ১ গ্রেণ উরানিয়ম যথেষ্ট পরিমাণ জলসহ মিশ্রিত করিয়া থাইতে দিতাম, প্রত্যহই ইহাদেব প্রস্রাব পরীক্ষা করিতাম। প্রস্রাবে অণু লাল প্রচণ্ড হইলে তৎক্ষণাৎ ঔষধ বন্ধ করিতাম। উরানিয়মের দোষ—ইহাতে অণু লাল বাড়ায়। কোষ্ঠবদ্ধতাও উপস্থিত করে।

অবশেষে—ইহাদিগকে বঙ্গভস্ম থাইতে দিই। ইহাতে বেশ সফল ফলিয়াছিল। প্রত্যেক রোগীর খুব উপকার হইয়াছিল।

“বঙ্গ”—রোগীর দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। ঔষধের মাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়াইলে, ঐ গুরুত্ব বহুদিন স্থায়ী হয়। “বঙ্গ” প্রস্রাবের শর্করা কমাইয়া দেয়। রোগীর উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি করে। দ্রাঘ্যবিক বেদনা নিবারণ করে।



“বঙ্গ” বঙ্গারোগীরও ক্ষয় নিবারণ করে,—  
দৈনিক গুরুত্ব বাড়াইয়া দেয়। কত সহস্র  
বঙ্গের পূর্বে—হিন্দুরা এই অপূর্ণ ঔষধের  
আবিষ্কার করিয়া ছিলেন!! বঙ্গের অপূর্ণ  
শক্তি দেখিয়া ঋষিগণের চরণে কোটি কোটি  
প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়।

বঙ্গের গুণ পরীক্ষা করিয়া আমি নিম্ন-  
লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি;—

বঙ্গ—ক্ষত শুষ্ক করে, রক্ত রোধ করে,  
অগুনাল সংবৎ করে, প্রস্রাবের চিনী কমায়,  
দৈনিক গুরুত্ব বাড়ায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে,  
ক্ষয় নিবারণ করে।

মুখের চূর্ণক্ষ দূর করিবার জন্য  
দেশী ও বিলাতী মুষ্টিযোগ।

কুড় নামক বণিক দ্রবোর গুঁড়া, জামের  
ধর্গাব গুঁড়া, তেজপাতার গুঁড়া ও পাণ্ডি  
ধরের একত্র মিশাইয়া দাত মাজিবে।

শাকারিণ ১৫ গ্রেণ, সোডাবাইকার্স  
১৫ গ্রেণ, অ্যাসিড শ্যালিসিনিক ৩০ গ্রেণ,  
এনকোহল ৩ উন্স। একত্র মিশাইয়া শিশির  
দ্রবো বাগিবে। ইহার কয়েক ফোঁটা ১ গ্রাস  
জলে দিয়া, সেই জলে কুলকুচা করিবে।

রোগ নির্ণয়ের ভ্রম।

আমাদের কক্ষক্ষেত্রে আর একটি বিভ্রাট  
সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। সন্ধিস্থলে বেদনা  
ইটলেক অনেক ডাক্তার তাহাকে “রিউ-  
মেটিজম” নামে অভিহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে  
“রিউমেটিজমের” অমোঘ ঔষধ শ্যালিসিলেট  
অক সোডা ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ডাক্তার  
যদি একটু ধীরভাবে রোগটী পরীক্ষা করিতেন  
তাহা হইলে হয় ত সে বেদনা অল্প পীড়া  
বিশিয়া ঘুরিতে পারিতেন। মাঝে খেকে

রোগীকে মিছামিছি শ্যালিসিলেট খাইয়া  
অনর্থক কষ্ট পাইতে হইত না। দুঃখের বিষয়  
ডাক্তার তাহা করিলেন না, তিনি সন্ধির  
বেদনা মাত্রকেই “রিউমেটিজম” স্থির করিয়া-  
ছেন। কাজেই রোগীকে শ্যালিসিলেটের  
ব্যবস্থা দিয়াছেন। ফলে - শ্যালিসিলেট খাইয়া  
রোগীর পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিল।  
কিডনীর কার্য বাড়িল, ক্ষুধা কমিল, পোষণ  
ক্রিয়ার বিঘ্ন হইতে লাগিল, জীবনীশক্তিও  
আংশিক নষ্ট হইয়া গেল।

অবশ্য অল্প মাত্রায় শ্যালিসিলেট প্রয়োগ  
করিলে এতদূর মন্দ ফল হয় না। কিন্তু  
ডাক্তার যখন দেখেন—ঔষধ প্রয়োগ ফল  
হইতেছে না, তখন তিনি অধিক মাত্রায় ইহা  
প্রয়োগ করেন। ঠিক রোগ ধরা পড়ে নাই  
—ইহা তাঁহার মনেই হয় না।

আমার চ'থের সম্মুখে আমি এইরূপ ৫৬টী  
রোগী দেখিয়াছি।—যাহাদের সন্ধিস্থলের বেদনা  
“রিউমেটিজম” আখ্যা পাইয়াছে। ডাক্তার  
রাশি রাশি শ্যালিসিলেট খাওয়াইতেছেন, অথচ  
রোগীর বেদনার তিলমাত্র উপশম হইতেছে  
না। শেষে রোগী ডাক্তারের উপর হতশ্রদ্ধ  
হইয়া কবিরাজের হাতে পড়িতেছে। ভালও  
হইতেছে। ডাক্তারের পক্ষে অবশ্যই ইহা  
লজ্জার কথা!

ষ্ট্রাকিলোকোকাস, গণোকোকাস টিউবার-  
কেল বাসিলাস এবং অন্যান্য বহুবিধ রোগের  
বীজাণু কর্তৃক সন্ধিস্থলে বেদনা হইতে পারে।  
এই সকল জীবাত্মের উপর শ্যালিসিলেটের কোনো  
প্রভাব নাই। সুতরাং শ্যালিসিলেট প্রয়োগে  
পূর্বোক্ত রোগ গুলিতে কোন উপকারের আশা  
করা যায় না। বরং অধিক মাত্রায় শ্যালিসিলেট  
সেবনে রোগীর সমুহ অপকার হইয়া থাকে।

সম্প্রতি আমি একটা রোগী পাইয়াছিলাম। সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক। তাঁহার সন্ধিতে বেদনা হওয়ায় উপযুক্ত ৩ জন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—তাঁহার বেদনা “নিউমোকোস্” জ্বর। সন্ধিতে পূষ হইয়াছে। ফুসফুস পরীক্ষায় প্রদাহের লক্ষণও পাওয়া গেল। সন্ধির আবরণ বিস্তীর্ণে সর্ব সন্ধিত হওয়ায় প্রদাহ এবং ক্ষীণতা দেখা দিয়াছিল। পচন দোষের লক্ষণও বর্তমান ছিল। অরু কমিত, বাড়িত।

এস্পিরেট করিয়া যে পূষ পাইলাম তাহার বর্ণ পীতাত সবুজ, গন্ধহীন, হ্রস্ববৎ পদার্থ মিশ্রিত। ইহাতে নিউমোকোকাউ বর্তমান ছিল।

পূষ বাহির করিয়া দিয়া লক্ষণানুযায়ী ঔষধাদি দিয়া—আমি তাঁহাকে অনেকটা সুস্থ করি। এখন তিনি সালসা খাইতেছেন। একজন বৃদ্ধ হাকিম চিকিৎসা করিতেছেন।

ডাঃ শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত।

এল্ এম্ এল্।

## ব্রহ্মচার্যো বালকসমাজ।

— ১০: —

বালক স্বাস্থ্য বিষয়ে ‘আয়ুর্কেদে’ ত অনেক প্রবন্ধই বাহির হইয়া গেল ও সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে আরও হইবে। কিন্তু ‘কাজের কথা’, ঔষধের কথা, বালক রক্ষার উপায়ের কথা এখনও ভালো করিয়া বলা হইল না। যথা বাহান্ন—তথা তিগ্নান্ন! এতই যখন লেখা হইয়াছে, তখন আমি আরও কতকটা এ বিষয় লিখিতে চাচ্ছি, ‘কাজের কথা’ হইবে কি না বলিতে পারি না, তবে ঔষধের কথাও যে হইবে না—এমন নহে।

সত্য সত্যই আধুনিক ভারতীয় বালক-সমাজের কথা খুব করিয়া ভাবিবার বিষয়। যে অঙ্গুরই ভবিষ্যতে ফলফুলসমন্বিত মহামহীকৃতে পরিণত হয়, সে অঙ্গুর বড় যত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত। যে বালক ভবিষ্যতের মানুষের খসড়া, তাকে সাবধানে রক্ষা না করিলে পরিণামের সমস্ত জাতিটা উচ্ছাদনতার অন্ত

উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা। আমরা যে আজ এত হীন, যুগা, দলিত, ক্রিষ্ট-ক্ষিণ,—তাঁহার কাবণ, আমাদের পূর্ব পুরুষের বালকরক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য ও আমাদের এখনকার ঔদাসীন্য ভবিষ্যতে একটা বীরাহীন ধ্বংসকায় অজ্ঞ জাতিব সূচনা করিতেছে। এ বক্তৃতার ভাবা নহে—এ কবিত্ব নহে; এ অতি বাস্তব—অতি সত্য কথা। ইহা আমাদের বিখ্যাস করিতেই হইবে। কেন করিতে হইবে বলিতেছি।

আপনারা একবার সেই ধ্বংসময় জাতি অতীত হিন্দুযুগের যাকে প্রবেশ করুন। সত্য বটে—সে মহিমোজ্জ্বল যুগের আজ বিশেষ কিছুই নাই—আছে বুকি অতীত মহিমার কীর্ণ কীর্ণমুখিতুলি—না, না; তাও বুকি বিলুপ্ত প্রায়। কিন্তু তাঁর যতটুকুই আছে—ততটুকুই বড় পবিত্র, বড় আশাব্যঞ্জক বড় সত্য।

—এত সত্য যে তাহা শুদ্ধ ভারতবাসী কেন সমগ্র নানবজাতির আদর্শ হইবার যোগ্য। আমরা সেই গুরুগভীর-ঋষিযুগ হইতে বালক শিক্ষার ক্ষীয়মান আদর্শটিকে বাছিয়া লইতেছি।

ঐ দেখুন, ঋষিকুল নদীর তীরে তীরে আশ্রম নিষ্কাশ করিয়া আছেন। তাঁহাদের জীবনের সাধনা, সমগ্র ইচ্ছা শিক্ষার কার্য্যে—বালক শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য গঠনের কার্য্যে-উৎসর্গীত। ঐ অসংখ্য কোমলমতি বালক সেই কুলপতির কর্তৃপাশীনে সমবেত। কুলপতির আহার-নিদ্রা নাই তাঁহার দিবাত্রা চোরা—বালকগুলি কিসে মানুষ্য হইয়া গড়িয়া উঠবে—তাঁহার নিয়ত লক্ষ্য—বালকের শরীর ও মন যুগপৎ উন্নত হইতেছে কিনা। তখনকার আদর্শ ছিল—বালককে চরিত্রবান হইতেই হইবে; শারীরিক বলশালী হইতেই হইবে, মনস্কী হইতেই হইবে। বালক এই আদর্শকে পোষণ করিয়া গুরুগৃহের বহু বর্ষের সাধনার পর মানুষ্য হইয়া আসিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিত এবং বিবাহিত ও সংগামী হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ উপার্জ্জনে মনোযোগী হইত। এই আশ্রমকে বলা হইত ব্রহ্মচর্য্য।

শ্রম—এই আচরণকে বলা হইত ব্রহ্মচর্য্য। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির মধ্যে এ চর্য্য। সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া ইহার ঐরূপ অর্থগত নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে অর্থের উপলক্ষ্য দ্বারা পরিবর্তনের ফলে যে কোন জাতির বাল্যের অধ্যয়ন, শরীর রক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি সংযত-শিক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হইত। কিন্তু আধুনিক যুগে এ অর্থের আরো পরিবর্তন ঘটয়াছে। এখন ব্রহ্মচর্য্য বলিলে আবালবৃদ্ধবৃদ্ধিতার পক্ষে স্বাভাবিক বীর্ষ্যরক্ষা বুঝায়। এইরূপ অর্থ-পরিবর্তনের ছইটি

কারণ—একটি ব্রহ্মচর্য্যশ্রমের আধুনিক সভ্যতায় সমূলে বিলুপ্তি; আর একটি হিন্দুর ক্রমশঃ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অভাব ও শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্তন। ব্রহ্মচর্য্যকে আগে বড় ভক্তির চক্ষে দেখা হইত, তাই ইহার শিক্ষার জন্ত চতুর্দ্বারমের একটি আশ্রম নির্দিষ্ট ছিল—ইহাকে ধর্ম্মের গোরবে গোরবান্বিত করিয়া, বালকজীবনের বিবিধ শিক্ষার সহিত একীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি সে শ্রদ্ধা—সে গোরব আজিকার জগতের আদর্শ নহে। বীর্ষ্যধারণশিক্ষা এখন স্ত্রীলতার বহির্ভূত বিষয়। স্কুল কলেজের শিক্ষা হইতে তাই ব্রহ্মচর্য্যকে নির্বাসিত করা হইয়াছে। তাই বিবাহিত জীবনে পুত্রকন্মার পিতা হইয়াও আধুনিক স্কুলকলেজে অধ্যয়ন সম্ভবপর হইয়াছে।

কিন্তু স্ত্রীলতার এ আদর্শ ত আমাদের পক্ষে মুখ্য করে না। দর্শন-বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া গাড়ীচালান শিক্ষা দিবার জন্ত পর্য্যন্ত আধুনিক যুগে বিদ্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে, কিন্তু এত বড় একটা শক্ত কার্য্য—বীর্ষ্যরক্ষা তাহা অস্ত্রীল বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এ শিক্ষার কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত দূরে থাকুক, আংশিক বন্দোবস্ত ও নাই। শিক্ষা ভিন্ন যদি গাড়ী থানা চালান মানুষ্যের পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে কোমলমতি, অজ্ঞ বালকের পক্ষে এত বড় একটা বিরাট যন্ত্র—একটা ধাঁধা যে এই মনুষ্য শরীর—তাহাকে চালান কত বেশী অসম্ভব। তাহার অকৃতকার্য্যতা যে কত স্বাভাবিক। বালক সমাজ যে আজ বীর্ষ্য ক্ষয়ে ভ্রীয়মাণ—আমি বলি, সেজন্য বালকের বিশুদ্ধমাত্র দোষ নাই। সে দোষ তাহাকে যে আদর্শ দিয়া আমরা শিক্ষা দিচ্ছি তাহার, সে দোষ

তাহার শিক্ষা-প্রণালীর, সে দোষ সর্বৈব আধুনিক প্রবণ মনুষ্য সমাজের সভ্যতার। বালককে কেন আমরা অমন স্বাধীনতার কোলে ছাড়িয়া দিই? কেন তাহাকে সাহেব সাজাইয়া তৃপ্ত হই? কেন তাহাকে উগ্র—অথাদা ও—কুখাণ্ড খাইতে দিই? কেন তাহাকে প্রতিপদে লক্ষ্য করি না। সে না বুঝিয়া যদি কোন কুকার্য্য করিয়া ফেলে, তবে অশ্লীলতার ভয়ে চক্ষু চাপিয়া না থাকিবা, কেন উপদেশ দ্বারা তাহার সর্বনাশ বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করি না? আজ আমরা সত্যসত্যই বড় এক নিষ্ঠুর সভ্যতাকে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। জীবনমরণের যাহা বিষয়ভূত—অশ্লীল বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, আমরা বালককে—তথা মনুষ্যসমাজকে বিপন্ন, শ্রীহীন, ক্ষণদেহ করিয়া দিতেছি।

আধুনিক বালক সমাজকে দেখিয়া চক্ষু ফাটিয়া জল আসে না কি? তাহার শীর্ণদেহ, বিকশিত দশন, প্রকটিত কণ্ঠা, নয়ন নিম্নে নীলিমা, তাহার ঘন্থা, তাহার অকালবার্দ্ধক্য প্রভৃতি দেখিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ কত অন্ধকারময় উপলব্ধি হইয়া বুক শুকাইয়া আসে না কি? চাংকাব করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় না কি, যে আধুনিক সভ্যতার আদর্শ আমাদের পক্ষে বড় উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার গরিমা, ইহার শৃঙ্খলা, ইহার শিক্ষা তপোবন-বাসী ফলমূলহারী সন্ন্যাসী হিন্দুর পুত্রের পক্ষে চলিবে না।

বাস্তবিকই বালকশিক্ষার কেতন উড়াইয়া পথে-ঘাটে বজ্রতা দিবার, পত্রে পুস্তকে লিখিবার দিন বহিয়া গিয়াছে। আমাদের বালক আজ আসন্ন মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দিতে

উপক্রম করিয়াছে। আর বিলম্ব না করিয়া আমাদেরও ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তাহাদিগকে আগুলিয়া রক্ষা করিতে হইবে। উপদেশে দিন কাটিয়া গিয়াছে। বালক শিক্ষার অভাবে যে অধঃপতনে গা ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাকে শাসাইয়া আজ আর তা'র প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিকই এ বিষয়ে তিরস্কার করিতে হইলে সর্বাপ্রাে তিরস্কার করিতে হয় আমাদের নিজেদিগকে, আমাদের অজ্ঞতাকে, আমাদেরই অজ্ঞিত শিক্ষাপ্রণালীকে, আর সর্বোপরি যে নিখিল ভারতে পরনির্ভরতারূপ নিদারুণ অনর্থকে আনিয়াছে—সেই চিরকালের অচেনা কিন্তু সর্বকাজের নেতা আমাদের অদৃষ্টকে।

যাহা আমাদের পক্ষে অতি গুরুতর। জীবন রক্ষার নিদান—তাহাকে লজ্জার আবরণে ঢাকিয়া রাখিলে আর আমাদের সৌভাগ্যের সম্ভাবনা নাই। তাই বালকরক্ষা বিষয়ে আজ সকলেই প্রকাশ্যভাবে কাজ করিতে থাকুন। ভাবিয়া দেখুন, পরের আদর্শ গ্রহণ, পরপদলেহন, পরের খাণ্ডে তৃপ্তি—এসব যদি শীলতা ও সভ্যতা হয়—তবে নিজের আদর্শকে পোষণ করা,—পুনরুদ্বাপিত স্বা, আমার অতীত গৌরবকে ফিরাইয়া আনা, আমার শুভকে ইচ্ছা করিয়া আমার জাতিকে বহুিত করা—নিশ্চয়ই অশ্লীলতা নহে, পরস্ব স্বর্ঘ্যাপেক্ষাও ভাষ্যর, গাঙ্গোদক অপেক্ষাও পবিত্র, স্বর্গ অপেক্ষাও ঈশিত।

এত দিনত পরের আদর্শকে বৃকে-মাথায় করিয়া রাখিলে, কিন্তু লাভ কি হইল? টাকার একমন চাউল ছিল, এখন পাচ সের বিক্রীত হইতেছে, হস্তীর মস্ত বলায়াম ছিলে, আজ দশ সের ভার উত্তোলন করিতে বা দশমাইল পথ হাঁটিতে পার না, ধর্ম্মের দীর্ঘা ছিলে, আজ

অথাত্ত কুখাছে তোমার তৃপ্তি, সজ্জা সফলা।  
গিরিনদী-স্নানস্থিতা-ভারতভূমি স্বাস্থ্য জগতের  
মধ্যে আদর্শ স্থানীয় ছিল, আজ ম্যালেরিয়া,  
কলেরা, প্রেগ-বসন্তের ঔঁতায় লক্ষ প্রাণ  
ধ্বংস হইতেছে, তুমি গৃহে অস্বাভাবে কাঁদিয়া  
নবিতত, তোমারই ধন দেশান্তরের সমৃদ্ধি  
সম্পাদন করিতেছে। যাহাদের আদর্শ লইয়া  
তুমি যুগে বীণাঙ্কয়ে অলস শক্তিহীন, তাহারাই  
বলিষ্ঠ দেহের ও মানসিক তেজের স্পর্শায়  
তোমাব সমুখ দিয়া বিচরণ করিতেছে।  
মহাব আদর্শ -তাঁহাবই পক্ষে ভাল—অস্ত্রের  
তাসা খাটে না। একটা বড় সভ্যতা একটা  
চঞ্চল জাতির পক্ষে মারাত্মক হইয়া পড়ে।  
সভ্যতাব পেষণে কত জাতি যে বিলুপ্ত  
হইয়াছে—ইতিহাসে তাঁহাব নিদর্শনের ইয়ত্তা  
নাই। ভারতবাসী আজ পূর্বাপেক্ষা ঢের দুর্বল  
হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক সভ্যতা তাঁহার  
পক্ষে বড় উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে কিছ-  
তেই ইহাকে হজম করিতে পারিতেছেন। তাই  
জগতের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার অধঃপতন অবশ্য-  
সাধী হইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসীর এখন  
কণ্ঠব্য—এ সভ্যতার গ্রাস হইতে দূরে সরিয়া

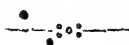
দাঁড়ান ও নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন ইহার  
আস্বাদনে বিরত থাকা। নিজেকে সে বদ্ধিত  
করুক—নিজস্বকে গ্রহণ করিতে যাইয়া যদি সে  
মরে—সে মরণও লোভনীয় ও বরণীয় হইবে।

ভারতবাসি ! আরো কি নবযুগ, নব আদর্শ,  
নব সভ্যতাকে বৃকে করিয়া মরিবে? একবার  
জাগো। দেখো তোমার নিজস্ব কত উজ্জল,  
কত মহার্ঘ, কত বরণীয়। নিজেকে নিজে  
চেন, নিজেকে নিজে প্রস্তুত কর, গড়িয়া তোলা।  
বালক তোমার পুত্র, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা,  
তোমার বৃদ্ধের বষ্টি, তোমার জাতির ভবিষ্যৎ  
আশা, তোমার গৌরবের অঙ্গুর। তাহাকে  
তুমি সুরক্ষা দেও, তাহাকে তুমি রক্ষা কর।  
তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে চলিবে না।  
তা'র কি দোষ? সে ত বালকই বটে, সে যে  
অজ্ঞ, সে যে দুর্বল, সে যে চঞ্চল। তাহার  
ভ্রম যে অবশ্যম্ভাবী। তাহাকে যদি জ্ঞানী,  
বীর, বলীমান, সূচরিত্র করিতে না পার, সে  
দোষ যে তোমারই। এ দোষের ভুল তুমি ত  
ভোগ করিবেই—এমন কি ভবিষ্যতের শত  
অমুশোচনা, অবিরল অশ্রুধারা—এ দোষকে  
প্রক্ষালিত করিয়া লইতে পারিবে না।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ ।

## গর্ভিণী রোগ-চিকিৎসা ।

( মহিলাদিগের জন্য ছড়ায় লিখিত )



খেতচন্দন, মদন ফল,

শুলাকা, চিনি, চাঁদের জল,

বেশ ক'রে বেটে—ছখে দিয়ে—

চেষ্টা—৫

গভিণীকে দাও খাওয়াইয়ে ।

প্রথম মাসের বেমনা হ'লে

এ মুষ্টিযোগে মুফল ফলে ।

নীলোৎপল, পাণিফল, কেশুর নিয়ে,

চাঁলের জলে নাও বাটিয়ে,

দ্বিতীয় মাসের ব্যথা হ'লে

শাস্ত্রে এ যোগ থেতে বলে ।

আমলকী, কঁকলা ক্ষীরকঁকলা

গরম জলে বেটে—খাও ছ'বেলা,

তৃতীয় মাসের ব্যথা যা'র

এ যোগে নিবারণ হয় তা'র ।

ঔষধ জীর্ণ হ'বে যখন,

শালি তড়ুলের অন্ন খেও তখন ।

কুড়, শালুক, পদ্ম, নীলোৎপলে

বেটে নাও চিনির জলে,

তৃতীয় মাসে ব্যথা বড়—

দ্রুধে মিশিয়ে পান কর ।

নীলোৎপল, শালুক, কণ্টকারী

আর দ্রুধ সহ বাট' গোক্ষুরী,

কিছা - গোক্ষুর, বালা, কণ্টকারী,

নীলোৎপল তা'র মিশাল করি'

দ্রুধে বেটে পান কর,

চতুর্থ মাসে যা'র ব্যথা বড় ;

ক্ষীরকঁকালী, নীলোৎপল—

সমান ক'রে বাট' কেবল,

দ্রুধ, ঘি আর মধু দিয়ে

পাঁচ মাসের ব্যথার দাও খাওয়াইয়ে ।

কিছা—নীলোৎপল, কঁকলা সমান নিয়ে—

শীতল জলে নাও বাটিয়ে—

হুখে মিশিয়ে পান কর,

পাঁচ মাসে যা'র ব্যথা বড় ।

টাবালেবুর বীজ নীলোৎপল,

প্রিয়ঙ্গু, চন্দন—সমান সকল

হুখে বেটে কর পান—

ছ'মাসে গর্ভিণী যদি ব্যথা পান

পিয়ালবীজ, কিস্মিস, খইয়ের চুড়

ছ'মাসের ব্যথা করে দূর ।

পদ্মমূল আর শতমূলী

হুখে বেটে খাওগে খালি,

সাত মাসের ব্যথা দূর হ'বে,

গর্ভস্থির ভাব হ'য়ে রবে ।

কদবেলের মূল, খই, চিনি

আর গুপারির মূল আনি,

জলে বেটে সেবন কর,

সাত মাসের ব্যথায় উপকার বড় ।

ধনে বেটে চা'লের জলে

আট মাসের ব্যথায় খাও—শাস্ত্রে বলে ।

কিছা—পলাশ পাতা বেটে নিয়ে

আট মাসের ব্যথায় খাও চুমুক দিয়ে ।

এরগুমূল আর কঁাকলা বেটে

ন'মাসের ব্যথায় খাওগে চেটে ।

পলাশবীজ, কঁাকলা, কাঁটিমূল

কঁজি সহ খাও—ন'মাসে যদি ব্যথার মূল

নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মৃগ আর চিনি  
দশ মাসের ব্যাধায় খাও—উপকার জানি।

পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, যষ্টিমধু,  
আর মৃণাল বাট' জলে শুধু।  
কিছা—বরাহক্রান্তামূল, ক্ষীরকাঁকোলী  
আর নীলোৎপল, কুড় জলে গুলি'।  
বেটে নিয়ে সেবন কর—  
এগার মাসে যা'র ব্যাধা বড়।

ভুঁইকুমড়া, কাকোলি, ক্ষীরকাঁকোলি  
চিনি সহ বাট'—জলে গুলি'।  
প্রথম মাসে বক্তশ্রাব হয় যা'র  
এই যোগ জেন ব্যবস্থা তা'র।

আমরুল, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূলী,  
কৃষ্ণভিল বাট—ছখে গুলি।  
বক্তশ্রাব যা'র দ্বিতীয় মাসে—  
থেতে ব্যবস্থা দাও তাহার পাশে।

পরগাছা, ক্ষীরকাঁকোলি, নীলোৎপল,  
অনন্তমূল বাট'—ছখে কেবল,  
তৃতীয় মাসে রক্ত শ্রাব হ'লে—  
এ যোগ খেলে সুফল ফলে।

গ্রামালতা, রাস্না, বামুনহাটী  
অনন্তমূল, যষ্টিমধু—ছখে বাটি'।—  
চতুর্থ মাসে রক্তশ্রাব যা'র  
এ যোগ সেবন ব্যবস্থা তা'রন।

বটাদি গাছের ছাল,—গুজ পারি'  
গাছারিফল, বৃহতী, কণ্টকারী,  
আর মৃণাল নাও সকল সমান,



হুধে বেটে করাও পান,  
পাঁচ মাসে রক্ত শ্রাব হয়,  
এ যোগে যায়—শাস্ত্রে কয় ।

চাকুলে, বেড়োলা, যষ্টিমধু,  
আর সজিনা, গোক্ষুর শুধু,  
হুধে বেটে কর সেবন,  
ছ' মাসে রক্তশ্রাব হয় নিবারণ ।

মৃণাল, পাণিকুল, কেশুর চিনি,  
কিস্মিস, যষ্টিমধু আনি'  
হুধে বেটে সেবন কর,  
সাত মাসে রক্তশ্রাব হ'লে বড় ।

বেল, কদবেল, আক, বৃহতী,  
সবার মূল আর কণ্টকারি, নতি,  
সমান ভাগে হুধের সহ—  
আট মাসের শ্রাবে খেতে কহ ।

গ্রামালতা, অনন্ত মূল, ক্ষীরকাকৌলী  
আর যষ্টিমধু—হুধে গুলি'  
ন'মাসের শ্রাবে খেতে দাঁও,  
হাতে হাতে ফল দেখতে চাঁও ।

আট গুণ হুধ, শু'ঠ হু'ভরি—  
জল নাও হুধের আট গুণ করি,  
হুধ যতটা—ততটা শেষ,  
দশ মাসের শূল এতে বিশেষ ।

শু'ঠ, দেবদারু যষ্টিমধু,  
সব গুলিতে হু' তোলা শুধু,  
হুধ বোল তোলা—আট গুণ জল,  
বোল তোলা র'লে খাও কৈবল,

দশম মাসে গর্ভ শূল যা'র

এতে উপকার সদ্যঃ তা'র ।

ভেরেণ্ডা, গোকুর, কুশ, কেশে,

শূল কেটে নাও—সবার ঘেসে,

এক একটি নাও আধ আধ ভরি,

দুধ—সব গুলির আট গুণ করি,

তা'র আট গুণ জল—দুধ শেষ,—

চিনি সহ খেলে গর্ভশূল বিশেষ ।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ।

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

—:—

স্বাস্থ্য-শিক্ষা ।—অনারবল মিঃ আই-  
ক্লগ গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক  
সভায় এই মর্মে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে “এ  
দেশের সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ও খাস সরকারী  
স্কুলকলেজ সমূহে ছাত্রগণকে স্বাস্থ্য বিষয়ের  
শিক্ষা দানের জন্য বজ্রটে ব্যবস্থা করা হউক ।”  
বাঙ্গালার শিক্ষাধ্যক্ষ মহাশয় ইহার উত্তরে  
বলিয়াছেন,—“স্বাস্থ্যবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক প্রায়  
সকল স্কুলেই পড়ান হইয়া থাকে । ফল কথা  
আপনি যাহা চাহিতেছেন, গবর্ণমেন্ট তাহার  
ব্যবস্থা পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছেন ।” আমরা  
বলি,—শুধু স্বাস্থ্যবিষয়ক পুস্তক পাঠে  
স্বভাবতঃ তরলমতি ছাত্রদিগের যতটা  
উপকারের সম্ভাবনা,—বাঙ্গালী বালকদিগের  
উপযোগী হাতেকলমে শিক্ষা দিলে তাহা অপেক্ষা  
বেশী উপকারের আশা করা যায় । চিকিৎসা-  
ও ব্রহ্মচর্যাঙ্গলনই যে স্বাস্থ্যরক্ষার মূল মন্ত্র—

সুকুমারমতি শিশুজীবনে ইহা উপলব্ধি  
করাইবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । সেরূপ  
ধরনের গ্রন্থ পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিলে এবং  
উপযুক্ত শিক্ষকের বক্তৃতায় সে সকল কথা  
বুঝাইবার বন্দোবস্ত করিলে, বাঙ্গালী শিশুর  
স্বাস্থ্যরক্ষা কতকাংশে সিদ্ধ হইতে পারে ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা কনফারেন্স ।—ইনফ্লু-  
য়েঞ্জার কারণ নির্ণয় ও উহার প্রতিষেধক  
আগামী মার্চ মাসে ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে  
এক বৈঠক বসিবে । ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে  
স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনার মেজর নরমান  
হোয়াইট সম্ভবতঃ ঐ বৈঠকে উপস্থিত  
থাকিবেন ।

আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী প্রদর্শনী ।  
—গত ২০শে ফেব্রুয়ারী করাচী নগরে আয়ু-  
র্বেদীয় ও ইউনানী প্রদর্শনী খুলিয়াছে । সহস্রা-  
ধিক নাপটিক ঐ উদ্বোধনসভায় উপস্থিত

হইরাহিলেন। দেশের লোকের দেশীয় চিকিৎসার প্রচার কল্পে যত মতিগতি বাড়িবে, ততই দেশের মঙ্গলের সম্ভাবনা।

**চিকিৎসকের অভাব।**—বাঙ্গালার লোক সংখ্যার তুলনায় এখনো চল্লিশ হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন। চিকিৎসা-বিজ্ঞা শিক্ষার জন্য বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে মাত্র ২টি সরকারি কলেজ ও ২টি স্কুল আছে। মহাশয় বঙ্গেশ্বর লর্ড রোপাল্ডশে বাহাদুর বর্ধমানের আর ১টি মেডিকেল স্কুল স্থাপনায় চিকিৎসকের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। সহযোগী হিতবাদী বলিতেছেন, “শুধু বর্ধমানে নহে, বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলাতেই চিকিৎসা বিজ্ঞা শিক্ষার স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা কর্তব্য।” সহযোগীর পরামর্শ যে সাধু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বলি, কলিকাতায় আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞালয় যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাঙ্গালার কুণের সমুদায় তাহাকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালার প্রধান প্রধান স্থানে সেইরূপ বিজ্ঞালয়ের প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগঠন করিতে চেষ্টা করুন না। বাঙ্গালার অর্থ-শাসীগণ উত্তোগী ইউন এবং গবর্ণমেন্টকে সাহায্যকারী করিতে চেষ্টা করুন, ইহাতে চিকিৎসকের সংখ্যাও বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদও আবার মাথা তুলিতে পাবিবে। সহযোগী আমাদের এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কি বলেন?

**শ্রমশিল্প-বিদ্যালয়।**—কাশীম-বাজারের মহারাজা বাহাদুরের ব্যয়ে বাঙ্গালার একটা শ্রম শিল্প বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কলিকাতায় এ বিষয়ের একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতা-করপোরেসনে আলোচনা

চলিতেছে। আলোচ্য বিষয় কার্যে পরিণত হইলে অনেক বাঙ্গালী—স্বাধীনভাবে অর্থো-পার্জনের ব্যবস্থা তো করিতে পারিবেই, তা' ছাড়া ইহার ফলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে বলিয়াও আমাদের মনে হয়।

**ইনফুয়েঞ্জায় মৃত্যু।**—সাবু শঙ্কর নেয়ার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন,—প্রায় ৫০ লক্ষ ভারতবাসী ইনফুয়েঞ্জা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সাধারণতঃ নিউমোনিয়া রোগে ভারতবাসী অধিক আক্রান্ত হয় বলিয়া ভারতবাসীর ইনফুয়েঞ্জায় এত মৃত্যু হইবার কারণও তিনি ঐ প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপক সভায় জানাইয়াছেন। ফলে এ সব আলোচনা যত হয়—ততই মঙ্গল। কিন্তু যাহাতে দেশবাসী ইহা হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কি?

**মাদক নিবারণ।**—আমেরিকা নিজ দেশে মদ্যের আমদানি রহিত করিয়াছেন। বিলাতেও মত্তপানসম্বন্ধে কঠোর বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারতবাসীর—বিশেষ বঙ্গবাসীর মাদকপ্রিয়তা কিন্তু ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালী এইজন্যই তো এত রোগজীর্ণ।

**দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।**—

‘সঞ্জীবনী’ লিখিয়াছেন—“১৮৩৮ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত মানুষের গড় আয়ু ৪০ বছর ধরা হইত। ১৯০৮ হইতে ১৯১৮ সালে ৫১ বৎসর ধরা হইতেছে।

সার নিউম্যান মানুষের এই অল্প আয়ুতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি বলেন ৫০।৬০ বছর বয়সেই মানুষ মরিবে কেন? মানুষ স্বভাবতঃই ১০০ বছর বা তাহারও বেশী কেন বাঁচিবে না?

বৈজ্ঞানিকেরা সকলে একমত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মানুষ যদি তাহার শরীর হইতে ক্ষয়কারী জিনিষ ও রোগের কারণ বাহির করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে সে ১০০ বছর কেন—পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক শক্তি লইয়া ৫ শত এমন কি ১০০০ বছর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।

শিরা প্রশিরা ও গ্রন্থিগুলির মধ্যে চূণ জাতীয় জিনিষ জমিয়া মানুষকে বৃদ্ধ করিয়া দেয়। ক্রমে দেহ কর্ণের অন্তর্গত হয়। পরিণামে মৃত্যু ঘটে। এই ক্ষয়কারী জিনিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলে বিজ্ঞানমতে দীর্ঘজীবন লাভে কোন বাধা থাকিবে না।

দধি, ঘোল এবং আপেলফলের মধ্যে এমন জিনিষ আছে, যাগাতে দেহের জমাট চূণ গলাইয়া বাহির করিয়া দিতে পারে। এইরূপ কথিত হয় যে, আদিম জনক জননী যে জীবনতরু ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ঐ বৃক্ষ আপেল গাছ। বৌদ্ধ ও হিন্দু সাধুরা এই ফল খাইয়াই দীর্ঘজীবী হন।”

এখনকার বাঙ্গালীরা এ সকল বোঝেনা। বলিয়াই তো বাঙ্গালীর এত দুঃখ।

মাড়োয়ারী হাসপাতাল।—মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে কলিকাতা সহরে

শ্রীশ্রীবিভুদানন্দ সরস্বতী মারওয়ারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা আমরা পূর্ব সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। হাসপাতালের জন্ত ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ২১৮ টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছে শুনিলাম। এরূপ সদহুষ্ঠানের জন্ত মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের দানস্পৃহা প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ঐ হাসপাতালের কার্য পরিচালনার জন্ত যে দুইজন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকে লওয়া হইয়াছে, তাঁহারা উভয়েই সুচিকিৎসক। হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন—লাহোর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার কাব্য-তীর্থ ও ২য় চিকিৎসক হইয়াছেন স্বর্গদেব মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের সুরোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত বিধু ভূষণ সেন গুপ্ত। আমরা এই হাসপাতালের ক্রনোমতি দেখিলে সুখী হইব।

মাদকতা নিবারণী বক্তৃতা।—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি অমরনসিংহের সুর্য্যকান্ত টাউনহলে সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানাজননিয়োগী মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এরূপ বক্তৃতায় দেশের উপকারের সম্ভাবনা।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৩য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—বৈশাখ ।

{ ৮ম সংখ্যা ।

নববর্ষ ।

—:—

আবার গাহিব গান,      আবার তুলিব তান,—  
তব শুভ আগমনে ওগো নববর্ষ,  
আবার আমার মুখে ফুটিয়াছে হর্ষ ।

হৃদয়ে নাহিক বল,      চক্ষু দু'টি ছল ছল,  
রোগে জীর্ণ তমু খানি—বদন মলিন,  
তবু প্রদানিছ সুখ, বরষ নবীন !

অতীত চলিয়া গেছে,      কিন্তু বড় ব্যথা দেছে,  
—কোটা কোটা বিশ্ববাসী করিয়াছে গ্রাস,—  
স্মরণে এখনো যেন উঠিতেছে ত্রাস ।

তোমারে পাইয়া তাই,      সব যেন ভুলে যাই,  
—তাই আজি ভাবিতেছি তব আগমনে—  
শাস্তি বুঝি উঠিবে গো এ বিশ্ব-ভবনে ।

অন্তরের দাগা গুলি      বল গো কেমনে ভুলি ?  
তুমিই বা কি করিবে—কে বলিতে পারে ?  
তবু আশা—তুমি বুঝি রাখিবে ধরারে ।

নিবেদন আজি তাই, শান্তি টুকু যা'তে পাই—

হে নূতন, কর তুমি তা'রি আয়োজন,

বিশ্বের ফুটায়ে দাও নূতন নয়ন।

ধরমে করিয়া ভর বিশ্ববাসী নিরন্তর

কর্মগতপ্রাণ হোক—এই অভিলাষ,

হে নূতন, তুমি কি গো পুরাইবে আশ ?

হিন্দুর হিন্দু রাখি' পাপের মূরতি আঁকি'—

যদি তুমি দেখাইতে পারগো আবার,

নির্ব্যাধি—দীর্ঘায়ু লাভ হইবে সবার।

পাপে তাপ—তাপে রোগ, আধিব্যাধি তা'রি ভোগ

—এই কথা বিশ্ববাসী বুঝিবে যখন

চির শান্তি বিশ্বমান্নে বহিবে তখন।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

## বালক রক্ষা।

সকল লোকই সর্বদুঃখ নিবৃতি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্ত ইচ্ছা করিয়া থাকে। দুঃখ কেহ চায় না, সকলেই সুখ চায়, সকলেই আনন্দে থাকিতে চায়। তবে দুঃখ আসে কেন ? দুঃখের কারণ পাপ, আর সুখের কারণ পুণ্য। পাপকে দুঃখের কারণ জানিয়াও লোকে পাপ হইতে বিরত হয় না। জগতের সকল উন্নতির মূলে লোকের দুঃখ-নিবৃতি ও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা নিহিত আছে। এই উন্নতি বাস্তবিক সাংসারিক উন্নতি নয়। সাধারণতঃ লোকে সাংসারিক উন্নতি কেই উন্নতি বলে, কিন্তু

তাহা অসার ও ক্ষণবিধ্বংসী। মহাযস্য লাভ করিয়া আমাদের স্মরণ লাভ করিতে হইবে। হুঁর হইতে পারিলে তবে আমরা সেই বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করিতে পাইব। সেই বিষ্ণুর পরমপদ দর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে এবং সদা সেই দর্শন ও আনন্দ হইতে মোক্ষানন্দ প্রাপ্ত হওয়া বাইবে। সেই পরমপদ বা পরমধামকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মরূপ প্রবাহোৎক্লিপ সংসার-সাগরে ভাসিয়া অসহ বহণা ভোগ করিতে হইবে না। যেমন মহা-দেহ সর্বদুঃখের মূল, তেমনি আবার এই দেহ

দ্বারা আমরা মুক্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হই। সেই জ্ঞাত এই দেহটা ক্ষুদ্র ও সৰল রাখিতে হইবে। শরীর নারোগ ও সৰল না হইলে সেই আত্মাকে জানিবার উপায় নাই। শ্রুতি বলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। এই বল—শাৰীরবল ও মানসবল—উভয়বিধ। শরীরে বল না থাকিলে আমরা সংসারে কত প্রকারে লঙ্ঘিত হই তাহা সকলে জানেন, সেইজন্ত সে সব কথার এখানে উল্লেখ করা নিম্প্রয়োজন।—এই সংসারের জীবন সংগ্রামে যেন শরীরের বলের আবশ্যক, তেমন মানসিক বলের আবশ্যক। আবার এই দুইপ্রকার বল পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ। শরীরে বল থাকিলে মনে বল হয়; মনের বল হইলে শরীরে বল হয়। প্রথম কার্য্য আমাদের শরীরকে নোবেগ রাখা তাহার পর শারীরিক ও মানসিক বল সংগ্রহ করা। আজকাল আমাদের ভারত-বাদীর যে অবনতি হইয়াছে ও আরও তীব্র গতিতে যে অবনতি হইতেছে, তাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ যৌর অন্ধকারময়। অনেক মহাপুরুষ, সাধু ও স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি আমাদের উন্নতিব জন্ত অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুই হইতেছে না। সমাজের সেই যথেষ্টাচারিতা, সেই বিলাস-ব্যাসন, সেই ঈশ্বর-পরায়ণতা, সেই ধর্ম্মকে ছাড়িয়া অধর্ম্মকে অবলম্বন, সেই দয়াধর্ম্ম ত্যাগ,—আর কত বলিব?—মাহুষের দেবত্ব লাভের চেষ্টা ত নাই-ই, তাহার উপর যেটুকু মহাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি—সেটুকুও হারাইতে বসিয়াছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা জানান্ধান হইতে আসিয়া মিলিত হইয়া বা বৃহৎ নদীতে মিলিত হইয়া তাহার জলের স্রোতঃ বৃদ্ধি পূরক যখন প্রবল বেগ ধারণ করে, তখন সে

বেগের গতি ফিরান অসম্ভব। আমাদের সমাজের অবস্থা তাহাই ঘটিয়াছে। অধঃপতনের মূল কারণসকল সমাজের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে ও যেরূপ অলকবিষ বর্তমান আছে কিনা বুঝা যায় না—কিন্তু যখন প্রসর্পিত হইয়া প্রকাশ পায়, তখন আর সে বিষ হইতে আশ্রয়ক্ষার উপায় থাকে না। আমাদেরও তাহাই ঘটায় সাধু মহাত্মাদের সকল উত্তম বার্থ হইয়া যাইতেছে। এখন এই প্রবল স্রোতের প্রতিচেষ্টা বিফল দেখিয়া নিরস্ত হইলে আরও সর্বনাশ। আর সময় নষ্ট করিলে আরও ভীষণ বিপদ। সেইজন্ত সকলেই জাগরিত হউন। সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারার দিকে দৃষ্টি করিয়া তাহার পবিত্রতা রক্ষণে যত্নবান হউন। আমাদের বালকেরা যাহাতে এখনও আশ্রয়ক্ষার উপায় করিতে পারে—আমাদিগকে সে চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্ত যেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহাদের রক্ষা সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই করিতেছি না। আমাদের বালকেরা যে প্রকার অবনতির মুখে চলিতেছে, তাহাতে কিন্তু আর রক্ষা না করিলে কোনো উপায় নাই। এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয় বিশেষ চেষ্টিত ও আয়ুর্বেদে এসম্বন্ধে বিশেষ তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া—আমাদের সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইতেছে বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গাইতে কেহই সক্ষম হইতেছেন না। এখন এই নিদ্রা ভাঙ্গার উপায় কবিরঞ্জন মহাশয় একটা কিছু স্থির করিয়া সে বিষয়ে লিপ্তন। সমাজের এই প্রকার উপেক্ষা ভাব দেখিয়া কিছু লিখিতে গেলে কৃতান্তের ঔষাদকার দৃষ্টি

শক্তিলোপ করে, কলম ধরিতে গেলে হাতে বল আসে না, কিন্তু কবিরঞ্জন মহাশয়ও ছাড়িবার লোক নন। আয়ুর্বেদে লিখিবার জন্ত তাঁহার বড়ই ইচ্ছা। সেই জন্ত আবার নিরাশার কিছু স্থির করিয়া তাঁহার অতিপ্রিয় বিষয়-বালক রক্ষা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লেখা হইল। বালকদের রক্ষা করিলে তবে আমাদের বংশরক্ষা হইবে, ভার্যাজাতি ভারতবর্ষে থাকিবে, আর্য্যধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা ভারত হইতে লোপ পাইবে না। নতুবা কি যে হইবে তাহা ভাবিয়া আর কূলকিনারা পাওয়া যায় না। বাহাদিগকে, বালকদের রক্ষা করিতে অনুরোধ করা যাইবে, তাঁহারা এইরূপভাবে শিক্ষিত যে, তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষা বা উদাহরণ দ্বারা যে কিছু করিতে পারিবেন, তাহার আশা আদৌ করা যায় না।

পূর্বে বলা হইয়াছে—মহুয্যমাত্রের চেষ্টা সর্ব্বজ্জংখ নিরুত্তি ও পরমানন্দ লাভ। এই লাভ কেবল নিজের হইলেই হইল না। পরিবারের সকলেই যাহাতে এই লাভে লাভবান হন—তাহার চেষ্টা করা সমানভাবে কর্তব্য। কারণ হয়ত আমি নিজেকে কোন প্রকারে সুখী করিলাম, নিজে সুস্থ ও রোগহীন হইলাম কিন্তু যদি আমার পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি কেহ দুঃখ পায় বা রোগগ্রস্ত হয়, তবে আমার শাস্তি কোথায়? তাঁহাদের রোগ-কষ্ট প্রভৃতি আমাকেও কাতর করিয়া ফেলিবে। আমরা সংসারে বড়ই স্বার্থপর। নিস্বার্থভাবে চলেন—এমন লোক খুবই বিরল।

“স্বাস্থ্যং সততং রক্ষৎ” আমরা তাহাও করি না। সামান্য সুখের লালসায় আমরা আত্মাকে চিনিতে, জানিতে চেষ্টা না করিয়া স্বার্থরূপে আত্মহত্যা হই। আমাদের যথার্থ

মঙ্গল কিসে হয়—তাহা আমরা একবারও ভাবি না। মানিয়া লইলাম যে, আমরা নিজের উন্নতি যাহাকে বলে—তাহার চেষ্টা করি, নিজ সুখের ইচ্ছা করি। কিন্তু কেবল তাহা করিলেই হইল না। পশু পক্ষীরও জ্ঞান আছে, তাহারাও মাতৃষের মত সন্তানাদি পালন করে। কিন্তু এবিষয়ে তাহার মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর। কেন না, তাহারা লোভ বা প্রত্যাপকারের আশায় সন্তান পালন করে না, মাতৃষ তাই করে। এ বিষয়ে পশুপক্ষী অপেক্ষা মনুষ্যকে নিম্নস্তরে দেখিয়া মেধস্ মুনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—

“জ্ঞানিনো মনুষ্যা সতাঃ কিন্তু তে নহি  
কেবলম্।

যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বৈ পশুপক্ষি মৃগাদয়ঃ ॥

জ্ঞানঞ্চ তন্নন্যায়ানং যৎ তেযাং মৃগপক্ষিণাম্।

মনুষ্যানাঞ্চ যৎ তেযাং তুল্যমন্ত্য তথোভয়োঃ ॥

জ্ঞানেহপি সতিপশ্চেত্তাম্ পতগঞ্জাবচ্চক্ষুঃ।

কণ মোক্ষাদৃতাং মোহাৎ পীড়্যমানানপি ক্ষুধা ॥

মানুষ্য মনুষ্যবান্ সাত্ত্বিলাষাঃ সূতান্ প্রতি।

লোভাৎ প্রত্যাপকারায় নম্বেতে কিং ন পশুসি ॥

তোমরা আপনাকে যে ভাবে জ্ঞানী বলিয়া

মনে করিতেছ, সেইভাবে জ্ঞানী অর্থাৎ বিষয়-

রাজ্যের জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্যমাত্রই হইয়া থাকে।

একথা সত্য—কেবল মনুষ্য কেন—পশু, পক্ষী,

মৃগ, প্রভৃতিরও বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে,

সুতরাং তাহাদিগকেও জ্ঞানী বলা যায়। এই-

রূপে মনুষ্যের যেরূপ জ্ঞান আছে, পশু পক্ষী-

দেরও সেই জ্ঞান আছে, আবার পশুপক্ষীদের

যে জ্ঞান আছে, মনুষ্যদেরও সেই জ্ঞান আছে

অর্থাৎ অহংকার বিহারাদি বাহ্য বিষয়ে মনুষ্য ও

পশুপক্ষী সকলেই একপ্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট।

তথাপি ঐ দেখ—জ্ঞানমধ্যেও পক্ষীর নিজে

ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া ও মোহবশতঃ আপনাকে



কাণ্ডে তৎপূর্ণাদির কথা সমস্ত শাবকদিগের চক্রে প্রদান করিতেছে। হে মনুজবান্দ্র! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না—মনুযাগণ ৫মকালে প্রতাপকারলুকে হইয়া পুত্রাদির প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া থাকে।”

যে কারণেই হউক, ফল কথা, আমরা স্নানোৎসব ও পুত্রোৎসব দ্বারা সংসারস্থ অস্ত্রোৎসব করি। আত্মাকে ভাল বাসি বলিয়া আত্মার সুখ পুত্রাদি দ্বারা হইবে ইহাই ভাবি, কিন্তু আমরা অভ্যাস সংসারে যেরূপ আচরণ করিতেছি—হঠাৎ আমবা আত্মাকে ও যথার্থ ভালবাসিনা, পুত্রাদিকেও যথার্থ ভাল বাসিনা, বিষয়-স্বার্থের লালসায় উদ্ভাস্ত হইয়া কেবল গরলভক্ষণ করিয়া আত্মা হইতেছি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পুত্র ও হইতেছি—এ বিষয় ওরিয়েন্টাল সেনিনাবিতে পারিতোষিক বিতরণ কালে হাই-কোর্টে মহামান্য জজ্ স্বযিতুল্য সার জন উইলক্‌ গাং বলিয়াছেন,—যাহা ৬ই মার্চ তারিখের অন্তত্বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সকলেরই পাঠ্য। তিনি দুঃখ কহিয়া বলিয়াছেন যে, যে পিতা পুত্রকে যথার্থ উন্নতি বিদ্যাক শিক্ষা দিবেন, তিনিই আধুনিক শিক্ষার বিকৃতমনা, সে অবস্থায় তিনি পুত্রের শিক্ষা কি প্রকারে প্রদান করিবেন? এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মনুসমানেবা এ বিষয়ে অনেক ভাল, কারণ তাহার ঠাণ্ডাদের সন্তানদিগকে বাল্যকালে গাছের ভাণ্ডা, নীতি ও ধর্ম শিক্ষা দেন, না ভারতবাসীরা সেইরূপ দেননা। বিশেষ প্রাচীনের বিষয়ে উদাসীনতাটা খুবই বেশী। আমি এ বিষয়ে পূর্বেই বলিয়াছি গরীবেরা মনচিত্তায় শাকুল, মধ্যবিত্তেরা আপিসের প্রকরী—বীষম প্রভৃতিতে বিপন্ন, আর

বড়লোকেরা কি করিয়া ধনের অপব্যয় করিয়া বিলাস-বাসনে সময় কাটাইবে—তাহারই চিন্তায় বিশেষরূপে নিমগ্ন। এ অবস্থায় আমাদের দেশে বালকদের শিক্ষা দিবার লোকের সময় কই? আমাদের রোগপ্রবণতার যে আমরাই একমাত্র কারণ, তাহা কি ইহাদ্বারা উপলব্ধ হয় না? সম্প্রতি গিড়িডিতে মদীয় বাটিতে এক মহাপুরুষ পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। আমি যে কয়টা প্রবন্ধ আয়ুর্কোদে লিখিয়াছি, তাহা তিনি পাঠ করিয়া বলিলেন,—যদি কেহ ইহার একটা প্রবন্ধও পাঠ করিয়া তদনুযায়ী চেষ্টাশীল হয়, তবে দেশের বহু উন্নতি হয়, কেহ শোনেনা আর লিখিয়া কি করিবেন! আমি তাই হতাশ হইয়া চুপ করিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয় বৈশাখের সংখ্যায় একটা জ্ঞানগভীর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া তাহার স্বদেশপ্রেম ও বালকরক্ষার পুনঃ পুনঃ উত্তম উৎসাহিত হইয়া এবার এই হতাশ মনে কিছু লিখিলাম, কিন্তু এবারকার প্রবন্ধ সেরূপ মনের জোরের সহিত লিখিত পারিলাম না; তাই মনে হইতেছে যে, এবার আয়ুর্কোদের পাঠকগণ আমার প্রবন্ধ পড়ায় সময় নষ্ট করা মনে করিবেন। কি করি—সেই হৃদবিহারী পরমাত্মা যাহাতে নিযুক্ত করিলেন, তাহাকে ধ্যান করিয়া তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। আশ্রয় ভারতবাসী ভাইবন্ধুগণ, আমরা নববর্ষের নবীন উৎসাহে আমাদের অধঃপতিত নষ্টপ্রায় বংশরক্ষা করিতে চেষ্টা করি,—বালকদের রক্ষাবিধান করি ও যাহাতে ব্রীক্ষাধারণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যপালন দ্বারা আমাদের বালকেরা হৃদয় অবস্থা সুস্থ হইয়া দেখে

পায়, মনে শাস্তি পায়, সর্বদা পবিত্র চিত্ত হইয়া  
সুস্থ থাকে—তাহারই উপায় অন্বেষণে বিশেষ  
ভাবে চেষ্টিত হই। আমি প্রথমেই বলিয়াছি—  
সকলেই সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত, এক্ষণ দেখা  
যাউক কিসে এই সুখ উপস্থিত হইতে  
পারে? ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণে সুখ  
নাই। সুখের লালসা ঐ পথেই চালায় বটে  
কিন্তু তাহা হুঃখের মূল। “সংসারের সুখ  
যত, নিশার স্বপন মত, যতক্ষণ উপভোগ, তত-  
ক্ষণ থাকে সুখ, দিনান্তে আঁধার মত পরিণামে  
ঘটে হুঃখ।”—কবির সহিত এবিষয়ে আমি এক-  
মত হইতে পারিলাম না। কারণ তিনি “যত-  
ক্ষণ উপভোগ, ততক্ষণ থাকে সুখ”—এই কথা  
বলিয়াছেন। কিন্তু এইটা সুখ নয়। চेतনাকে  
অভিভূত করিবার ঔষধ-ব্রাণ দ্বারা রোগীকে  
অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রোপচার করিলে সে কষ্টবোধ  
করিতে পারে না, কিছু আরাম প্রথম অবস্থায়  
বোধ করে, আমাদের সংসারের সুখ সেই  
প্রকার, হুঃখকে বিস্তৃতি করাইয়া হুঃখ মিশ্রিত  
সুখকে অর্থাৎ হুঃখকে সংসার হইতে ভূলাইবার  
মোহময়ী মদিরা পানের উন্নততাকে সাংসারিক  
সুখ বলা যায়। দেহ হইতে আত্মাকে বিভিন্ন  
করিয়া, সেই আত্মদর্শনে আত্মার স্বরূপ অবস্থানে  
যে আনন্দ—তাহাই যথার্থ সুখ। এখন সেই  
সুখ লাভের জন্ত জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা আত্মদর্শন  
আবশ্যক। সেই পরমাত্মাই সুখসাগর ও  
তিনিই “সত্যং জ্ঞানমনস্তম্।” সেই সত্যস্বরূপকে  
লাভ করা ও বারম্বার জন্ম মৃত্যু প্রবাহ হইতে  
রক্ষা পাওয়াই মোক্ষানন্দ বা মুক্তি ও ইহাই লাভ  
করা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীভগবানেরও  
ইহারই জন্ত আমাদের নরদেহ প্রদান, বিশেষ  
যাহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,  
তাহারা এ বিষয়ে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রিয়

হইয়া, তাহার শক্তির অধিকতর অধিকার  
লাভ পূর্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ফল  
কথা, সেই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া যদি  
তাহার সদব্যবহার না করিলাম, তবে  
আমরা নিজেরা আত্মঘাতী হইলাম ও সেই  
বিশ্বস্বামীর নিকট অকৃতজ্ঞ হইয়া গৌর নরকে  
স্থান পাইবার সরণী পরিষ্কার করিলাম। আমরা  
বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না—সে সুখ বা আনন্দ  
সেই ব্রহ্ম “সত্যং জ্ঞানমনস্তম্ যদানন্দং ব্রহ্ম  
কেবলম্।”

সংসারে আমাদের আত্মা পুরুষরূপে প্রকৃতিতে  
অবস্থান করিয়া, অন্তঃকরণের দ্বারা পরিবেষ্টিত  
হইয়া, যেমন রক্তপুষ্প সমীপে ক্ষটিক রক্তবর্ণ  
দেখায়,—বাস্তবিক তাহার রঞ্জনা নাই—সেইরূপ  
আত্মা আপনাকে সুখী বা হুঃখী মনে করেন।  
বাস্তবিক তাহার সুখ বা হুঃখ নাই। আমরা  
কি প্রকারে সেই সুখ-হুঃখের অতীত হইয়া  
যথার্থ সুখলাভে সমর্থ হই—তাহাই আমাদের  
চেষ্টা করা উচিত ও আমাদের সম্মত।  
যাহাতে সেই সুখ পায়—তাহাতে আমাদের  
যত্নবান হওয়া উচিত। এই প্রকৃতি হইতে  
তিনটা গুণ উৎপন্ন হইয়াছে, সত্ত্ব, রজ ও তমঃ।  
এই তমোগুণ আমাদের নীচমার্গে লইয়া  
যায়। রজগুণ মধ্যাবস্থায় রাখে ও সত্ত্ব গুণ  
উন্নতি-পথে লইয়া যায়। নিম্না, আলস্য প্রমাদ  
প্রভৃতি তমোগুণ হইতে হয়। তৃষ্ণা, অম্ময়োগ—  
আজ ইহা পাইলাম—কাল আর একটি পাইব—  
এইরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান ও বিষয়-বাদনা  
রজগুণের কার্য। সত্ত্বগুণের দ্বারা চিত্ত নির্মল  
হয় এবং উহা সুখের কারণ হইয়া সমস্ত দুঃখ  
নিহন্তা মোক্ষকে লাভ করাইয়া দেহ—এই বিদ্য  
“জ্ঞান যথার্থ সুখেই প্রাপ্তির বৈধি।  
প্রমাদে চিত্তেরোপায়া না। সত্ত্বগুণের দ্বারা

ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, আরোগ্য, অনালস্তাদি  
সদ্বিক ভাব। সেইজন্য প্রথমেই এই সত্ত্ব-  
গুণকে পাইতে হইলে যাহাতে আমাদের  
আহার ও আমাদের বালকের আহার সত্ত্ব-  
গুণাকরী হয়—তাহাই করা উচিত। আহার  
শুদ্ধি দ্বারা সংসারে সবই লাভ হয়। প্রতি  
বলিয়াছেন,—

আহার শুদ্ধো তু সত্ত্বশুদ্ধিঃ স্ববশুদ্ধো

ঋষা স্মৃতিঃ স্মৃতিলাভো সৰ্বগ্রহীনাং

বিপ্র মোক্ষা—ইত্যাদি—

আহার শুদ্ধি অর্থাৎ শুদ্ধদ্রব্য পান-ভোজনাদি  
দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ নিশ্চল হইয়া সেই শুদ্ধ  
অপপত্তি আত্মাকে জানিবার উপযুক্ত হয়।  
এই চিত্তশুদ্ধির দ্বারা স্মৃতিলাভ হয়। স্মৃতিলাভ  
হইলে আমি কে?—কোথা হইতে আসিয়াছি?  
—কোথায় যাইব?—ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান  
হইয়া আমি যে সেই অখণ্ড ব্রহ্মের অপরি-  
চ্ছিন্ন হইয়াও মায়োপাধিক যুক্ত হইয়া ঘটা-  
কাশের জায় মহাকাশের অনন্তস্বরূপ জীবাশ্মা  
রূপে বিরাজ করিতেছি—এইটা স্মরণ হয়।  
আমরা সংসারে অতিশয় মিশিয়া গিয়া তমঃ ও  
রজগুণে বদ্ধ হইয়া আত্মস্বরূপকে বিস্মৃত  
হইয়াছি। এই বিস্মৃতি অপনোদন করিয়া  
আত্মার স্বরূপকে স্মরণ করাইবার জন্ত চিত্ত-  
শুদ্ধি আবশ্যক, মহামনা অর্জুন কত সংশয়ে  
গড়িয়া কত কার্য্যকে অকার্য্য ও অকার্য্যকে  
কার্য্য মনে করিয়া নিজ ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মভ্যাগ  
লৌক পরধর্ম্ম স্থাবহ বলিয়া গ্রহণ করিতে  
গিয়াছিলেন। শ্রীভগবান যখন তাঁহাকে কত  
বাইলেন, তখন তাহাতেও অর্জুন বশিতে  
পারিতছিলেন না। তাহার পর ভগবান যখন  
মায়ার স্বরূপ নিজ বিধ্বংস দর্শন করাইলেন,  
তখন অর্জুন সেই বিরাটরূপ দর্শন করিতে

সক্ষম না হইয়া বলিলেন—“তে নৈব রূপেণ  
চতুর্ভূজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমুত্তম।” তাহার  
পর শ্রীভগবান্ ভক্তবাহ্যাকল্পতক মহাত্মা  
আবার সৌম্যবপু হইয়া মাল্লস্বরূপে অর্জুনকে  
উপদেশ দিতে লাগিলেন। আবার অর্জুন  
অবহিত, চিত্তে ভক্তির সহকারে শুনিতে  
লাগিলেন। দশ অধ্যায় গীতা শোনাইয়া  
নিজের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াও শ্রীভগবান যখন  
অর্জুনের শ্রায় জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তহৃদয়ে নিজের  
স্বরূপ ধারণা করাইতে পারিলেন না, তখন  
বিধ্বংস দেখাইয়া, অর্জুনকে সম্পূর্ণভাবে  
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া, তাঁহার চিত্তশুদ্ধির  
ব্যবস্থায় আবার তদগতচিত্ত অর্জুনকে আরও  
ছয় অধ্যায় গীতা শ্রবণ করাইলেন। অর্জুন  
শুদ্ধচিত্ত ছিলেন, জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, ভক্ত  
ছিলেন, এইজন্য শ্রীভগবানের উপদেশে জ্ঞান  
লাভ করিয়া আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া  
আপনাকে স্মরণ করিয়া শ্রীভগবান্কে বলিলেন

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লক্ষ্যং প্রসাদান্নম্যচ্যুতঃ ;

স্থিতোহস্থি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

এইখানে আত্মতত্ত্ব উদয় হওয়ায় অর্জুনের স্মৃতি  
লাভ হইল। শ্রীভগবান্ ইতিপূর্বে অর্জুনকে  
বলিয়াছিলেন যে, আমার ও তোমার বহুজন্ম  
গত হইয়াছে, অর্থাৎ আমি অজ হইয়াও নিজ  
মায়ার ধর্ম্মরক্ষার জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি,  
আমার সে সব মনে আছে—তোমার সে সব  
মনে নাই; কারণ জন্মজরামৃত্যু ও মৃত্যু—এই  
সকল ভুলাইয়া দেয়। কিন্তু যদি কেহ চিত্ত  
শুদ্ধি দ্বারা মোহযুক্ত হয়, তবে সে ভোলে না।  
আমি ভুলি নাই, তুমি ভুলিয়াছ। শ্রীভগবানের  
কৃপায় আজ অর্জুনের সেই স্মৃতি লাভ হইল।  
সেই স্মৃতি লাভের পূর্বেই মোহ নষ্ট হইয়াছিল,  
এখন তাঁহার হৃদয় অধি সকল ভিন্ন হইয়া গেল।

সেইজন্ত তিনি গতসন্দেহ হইলেন এবং  
 শ্রীভগবানের আদেশ পালনে তৎপর হইলেন,  
 অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা সর্বকর্ম স্বল্পে অর্পণ করিয়া  
 তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার অঙ্গুল কার্য  
 করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্বজন্মে কি  
 ছিলাম তাহা জানি না, তাহা জানিলে বিষয়ে  
 এত আসক্তি আসিতনা। আমাদের মন এত  
 চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হইতনা। এই স্মৃতি লাভের  
 প্রধান উপায় শুদ্ধমন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার  
 ও চিত্ত—এই চারিটাতে মনের নানা অবস্থার  
 সমষ্টি অন্তঃকরণ রূপে বর্তমান। এই শুদ্ধি  
 লাভ করিতে হইলে প্রথম আহারশুদ্ধি  
 আবশ্যক। অতএব দেখুন—যাহারা বলেন,  
 আহারের মধ্যে ধর্মের সংশ্রব কি? তাঁহাদের  
 সেটা ভ্রান্তি পূর্ণ কথা নহে কি? ধর্ম আর  
 কিছুই নয়—যাহা দ্বারা আমরা ধৃত হই অর্থাৎ  
 যে সংকল্পের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া বারংবার  
 জন্ম মরণ স্বরূপ সংসারে পুনঃ পুনঃ পতিত না  
 হই—তাহাই ধর্ম। সেই ধর্ম দেহের ও মনের;—  
 দুইএরই পবিত্রতার আধার। আমাদের আর  
 শুদ্ধ হইবার সময় নাই—এ আপত্তি করিয়া চূপ  
 করিয়া থাকিলে চলিবে না। যেমন করিয়া হউক  
 চিত্তশুদ্ধি আনয়নের চেষ্টা করিতে হইবে।  
 আমার গিড়িডি বাটাতে এক সাধু পুরুষ আমাকে  
 আসন শিক্ষা দিবার সময় আমার কণ্ঠ দেখিয়া  
 বলেন “বুড়ো হাড়ে আর কি হইবে”?—তখন  
 মনে বড় দুঃখ হইল যে জন্মটা বুঝা গেল।  
 তাই আমার বড় ছেলেকে তাহা শিখাইবার  
 জন্ত প্রবৃত্ত করাইলাম, তাহার খুব শীঘ্র শীঘ্র  
 সমস্ত সাধনা সম্পন্ন হইতে লাগিল, আমি  
 পারিলাম না। তাই সকলকে বলিতেছি,  
 আমাদের যাহা হইবার হইয়াছে—এখন  
 আমাদের ছেলের বাল্যকাল হইতে তৈয়ার

করিতে চেষ্টা করুন। তাহারা তৈয়ার হইলে  
 আমাদের অনেক ভরসা আছে। তাহাদিগকে  
 শিক্ষা দেওয়া হউক যে, ধর্মের প্রথম সোপান  
 সংযম শিক্ষা ও তন্মধ্যে প্রধান শুদ্ধ আহাৰ।  
 শুদ্ধ আহাৰ বলিতে যে আমরা যাহা খাই বা  
 পান করি তাহা নয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা  
 ভিতরে যাহা গ্রহণ করি তাহাই আহাৰ। এই  
 আহাৰ যাহাতে শুদ্ধ হয়, বালকদিগকে তাহাই  
 শিক্ষা দিতে হইবে। চক্ষুরা এমন রূপ গ্রহণ  
 করিতে বালককে শিক্ষা দিতে হইবে—যাহাতে  
 তাহার মনে কোন প্রকার কুভাব না আসে।  
 সেই রূপ গ্রহণে শুদ্ধ পবিত্রতা ছাড়া যেন আর  
 বালকের মনে অস্ত কিছু না আসে। কর্ণ  
 এমন প্রেমমাধা হরিনাম শ্রবণ করিবে—যেন  
 হৃদয় ভক্তি ও প্রেমে গদগদ হইয়া আনন্দের  
 কোয়ারা ছুটাইতে থাকে। কর্ণ যেন কোন  
 প্রকার কুভাব উত্তেজক শব্দ, সঙ্গীত বা  
 জীলোকের সঙ্গীত শ্রবণ না করে। চক্ষু-  
 তাহাদের নর্তন দর্শন না করে। এই  
 চক্ষু-কর্ণ দ্বারা কলিকাতা বা অস্ত্র সহরে  
 থিয়েটারাদি দর্শন করিয়া জীলোকের হাবভাব  
 পূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ বা তাহাদের নর্তন দর্শন  
 দ্বারা কত পবিত্র হৃদয় স্নানুস্মারমতি বালকগণ  
 নরকের ঘোরান্ধকারে পতিত হইতেছে তাহার  
 ইয়ত্তা করা যায়না। স্পর্শ কেবল বিবপত্র  
 ভুলসীদল, বানলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা, সা  
 মহাস্থার শ্রীচরণ, পিতামাতা প্রভৃতি শুদ্ধজনে  
 শ্রীচরণ-স্পর্শ ও অন্ত্যস্ত পবিত্র বস্ত্র স্পর্শ ছাড়া  
 অস্ত্র কিছু স্পর্শ না করে। মাসিকা যেন গবি  
 বস্ত্র জাপ ছাড়া অস্ত্র জাপ না লয়। জিহ্বা  
 যেন পবিত্র বস্ত্র ছাড়া অস্ত্র বস্ত্র রস গ্রহণ  
 না করে। সর্বাঙ্গের শিক্ষা যেন  
 শুদ্ধপন্থার পবিত্র সান্নিধ্যের দ্বারা

সে সর্বদা নিম্ন পাঁকে এবং পোলিস্তোর ছায়  
পাশে :—

হে জিহ্বে বস-সারঞ্জে মঙ্গদা মধুর প্রিয়ে ।

নাগাদপাখ্যং পৌষ্ পিব জিহ্বে নিরন্তরম্ ॥

হে জিহ্বে ! তুমি নানারস মধ্যে যাহা  
নব বস তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর এবং  
স্বাদা মধুর রস ভোগ্য কিস্ত এরসে আনন্দ  
হই। দেই আনন্দের আপার শ্রীনারায়ণের  
নামস্তুত মঙ্গদা পান কর । বালককে বাল্য-  
রাস হইতে জিহবার সংযম শিক্ষা দিতে  
হইবে । বালক যেন অসার সুখের লালসায়  
মগ্ন না—কুপাদা দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন না  
করা। আগার শরীর ও মনের ধর্মরক্ষার জন্ত—  
দেহ বক্ষ্যব জন্ত ;—জিহবার তৃপ্তির জন্ত নয় ।  
আগার সঙ্গে ধর্মের যুব সম্বন্ধ, একথা সকল-  
কেই বিলক্ষণ মনে রাখিতে হইবে । ধর্ম  
বিনেত সাধারণতঃ এই বুঝায়,—

ক্ষমাশৌচং দমঃ সত্যং দাননিমিত্ত্য নিগ্রহঃ ।

অর্জুনা গুণ গুণত্রয়া তথাত্মশরণং দয়া ॥

অর্জুনঃ গো ভ শূন্যস্থং দেব ব্রাহ্মণ পূজণম্

অনভ্যাস্য চ তথা ধম্ম সামান্য উচ্যতে ॥

বালাকাল হইতে বালককে ইহা অভ্যাস  
না করাইলে বয়স হইলে উহার কেবল  
পুণ্ডিত পদ্যা হইয়া থাকিবে । বালককে  
ক্ষমা শিক্ষা দিতে হইবে, বাহু এবং অন্তর  
শৌচ শিক্ষা দিতে হইবে, সত্যকে অবলম্বন  
করা আবশ্যক ইহার শিক্ষা বিশেষ করিয়া  
দিতে হইবে । সর্বদা সত্যবাক্য  
বলিতে অভ্যাস করাইতে হইবে । বাক্য  
সংযত করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । অনর্থক  
বাক্য বলিলে তাহার জন্য শাস্ত্রে বিষ্ণু স্মরণের  
ব্যবস্থা আছে—বালককে ইহা অভ্যাস  
করাইলে মধ্যে মধ্যে বিষ্ণু স্মরণ দ্বারা বাক্য  
বৈশাখ—২

সংযত হইবে ও সত্য বাক্য ভিন্ন অন্য বাক্য  
বলিতে তাহার মতি হইবেনা । বাক্যই ব্রহ্ম, সেই  
জন্ত বাক্যরূপী ব্রহ্মকে কখনও মিথ্যা বিষয়ে  
লিপ্ত কবা হইবে না শাস্ত্রে আছে “বাচং পবিত্রঃ  
পরমম্, বাচোহমৃতং বিবং বাচঃ” । বাক্যই অমৃত  
বাক্যই বিষ্ণু, বাক্যই পরম পবিত্র । স্বয়ং ব্রহ্ম—  
শব্দব্রহ্মবেদ রূপে সৃষ্টির আদিতে প্রকাশ হন ।  
সেইজন্ত বাক্য প্রয়োগ বিষয়ে বালককে বিশেষ  
সংযত হইতে শিক্ষা দিতে হইবে । কল্পনা  
প্রস্তুত অসত্য ঘটনাবলিযুক্ত নাটক-নভেল  
বালককে আদৌ পড়িতে বা শুনিতে দিবেন  
না । জীবন বেশী দিনের জন্ত নয়—সর্বদা  
মৃত্যুর সন্নিকট হইতেছে—এই ভাবিয়া  
ধর্ম অবলম্বনে বাসনকে দূরে ফেলিতে  
বালককে শিক্ষা দিতে হইবে । মহা-  
মাতা হাইকোর্টের জজ স্যার জন উড্রফ  
সাহেব ওরিএণ্টালসেমিনারিতে যাহা  
বলিয়াছেন, সেইমত আমাদের পূর্ব-পুরুষের  
মহিমা ও গৌরব বালককে দেখাইয়া দিতে  
হইবে ও ঋষিগণের প্রদর্শিত পথে বালকগণ  
কে চালিত করিতে হইবে । ঋষিরা এই কথা  
বলিয়াছেন বা কোন পণ্ডিত এই কথা  
বলিয়াছেন বলিলে কেহ তাহাতে অনাস্থা  
স্থাপন করিবেন না ; সেই জন্ত এই ঘোর  
কলিকালের বিকার নাশের জন্ত শ্রীভগবান্  
উড্রফ সাহেব, অলকট সাহেব, মাতা  
এনিবেসার্টকে ঋষি রূপে, গার্গী রূপে  
আমাদের নিকট তাঁহার বার্তা প্রচার করিতে  
নিয়োগ করিয়াছেন । সার জন উড্রফ  
সাহেব বলিয়াছেন, “যদি ভারতের উন্নতি চাও  
তবে বালকদিগকে তোমাদের পূর্ব-পুরুষের  
গৌরব সকল দেখাইয়া দাও । পাশ্চাত্য  
গুরু নিকট রত্ন লইলে সত্যতা শিক্ষা

হইবেনা”। যে সভ্যতা জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং যাহা এখনও করিতেছে—সেই সভ্যতা বনবাসী ফলমূলহারী সিদ্ধার্থ ঋষিগণ আমাদের হিতের জন্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে নিষেধ কবিরী সিন্ধাছেন, আমরা আজ তাহা ভুলিয়া

গিয়া অশেষ দুঃখ সাগরে ভাসিতেছি। এখন যাহাতে আমাদের বালকদিগকে আমাদের মত দুঃখ সাগরে না ভাসিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। অতীত ও ধর্ম সম্বন্ধে পর প্রবন্ধে বালক রক্ষা বিষয়ে লিখিত হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল,

## পঞ্চকর্য্য।

( ডাক্তার-কবিরাজ সংবাদ )

( পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর )

—:০:—

ডা। আচ্ছা বয়সভেদে ঔষধ প্রয়োগ করবাব নাত্রার তারতম্য কিরূপ ?

ক। আস্থাপন দ্রব্য পূর্ব্বে ঘোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত যেমন নলাদির বিভাগ করা—সেই অনুসারে ক্রমশঃ রোগীর চুই চার এবং আট অঞ্জলি পরিমাণ। তা’রপর রোগীর বয়স উত্তরোত্তর বত বেশী হবে, নল ও বস্তির পরিমাণ সেইরূপ বাড়িতে হ’বে। পঁচিশ বৎসরের অধিক বয়স হ’লে নলাদির পরিণাম যেরূপ হবে—তা’ বলা হ’য়েছে। ঔষধের পরিমাণ রোগীর অঞ্জলির বায় অঞ্জলি হবে। কিন্তু সত্তর বৎসরের উর্দ্ধে মলের পরিমাণ এবং আস্থাপন দ্রব্যের পরিমাণ ঘোড়শ বৎসর বয়সের ত্রায় হ’বে।

ডা। এই আবার আপনি সব গোলমাল ক’রে দিলেন! এই বললেন যে—বৃদ্ধকে বস্তি প্রয়োগ করা যখন নিষেধ, তখন বৃদ্ধের বলী পলিত নষ্ট হবে কিনা এ প্রশ্নই উঠতে পারে

না। আবার কখন বৃদ্ধকে বস্তি দেবাব কথা বলছেন!

ক। ধৈর্য্য ধারণ করুন। বাক্যার্থেব কদম্বয় করবেন না—সমস্বয় করুন। তা’হ’লেই উপদেশ বোধগম্য হবে।

ক। এর সমস্বয় আমার মাথায় কিছু আসছে না।

ক। ভবদীয় মস্তিকে কিঞ্চিৎ গোময়ের আধিক্য হ’য়েছে। ভাল, আমিই সমস্বয় ক’রে দিচ্ছি। প্রথম বলা হয়েছে যে, বৃদ্ধকে বস্তি দিতে নাই। তা’রপর বলা হ’য়েছে যে, বস্তি প্রয়োগ দ্বারা বলিপলিত নষ্ট হয়। সুতরাং এতদ্বারা বুঝা যায় যে, এ বলীপলিত বৃদ্ধের নর—অকাল বলীপলিত। কেমন সঙ্গত কথা ত ?

ডা। হী সঙ্গত।

ক। এত গোল মাথার কথা, তা’রপর বিশেষ কথা বলা হ’য়েছে যে, আয়ুর্বেদে

নিবন্ধ স্থলেও বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়। বুদ্ধ  
নিবন্ধ স্থল, স্ততরাং আবশ্যক হ'লে বুদ্ধকেও  
বস্তি দেওয়া যেতে পারে—এ কথা আসেত ?

ডা। হাঁ আসে।

ক। এখন বুদ্ধকে পূর্বমাত্রায় বস্তি দিয়ে  
পাছে তা'র অনিষ্ট করা হয় এবং পাছে বুদ্ধের  
উপবৃত্ত নল এবং ঔষধের পরিমাণ সম্বন্ধে  
চিকিৎসকেব ভ্রম হয় - সেই জন্তু এরূপ নির্দেশ  
করা হ'য়েছে। এখন সম্বয় হলো কি ?

ডা। হলো বটে, কিন্তু বড় ভাঙ্গামা।  
আমাদের শাস্ত্রে সকল বিষয় খোলসা ক'রে এক  
ঘরগার লেপা থাকে। তা'তে বুঝাবার খুব  
স্ববিধে হয়। আমাব বিবেচনায় এটা আয়ুর্কে  
দেব একটা প্রধান দোষ।

ক। আপনার চক্ষে বা প্রধান দোষ  
ব'লে বোধ চ'চ্ছে—আমার চক্ষে সেটা মহৎ-  
গুণ ব'লে বোধ হয়।

ডা। কি সে ?

ক। নয় কি সে ? দেখুন আপনারা  
যখন পনীক্ষা দেন, তখন কোথা থেকে একটু  
হাড় কি কোন যন্ত্রের একটু অতি সূক্ষ্ম অংশ  
এনে তাব পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কেন  
বলুন দেখি—নয়-কঙ্কালের ভিতর সেই হাতটা  
দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই হয়।

ডা। তা হ'লে আর তা'র পড়ানর  
পরিচয় কি হল ? যথাস্থানে থাকলেত  
অন্যায়সেই বোঝা যায়।

ক। এখন পথে আসুন। আয়ুর্কে  
শাস্ত্রে যে এই সকল একটু অস্পষ্ট ভাবে বলা  
আছে—সেটা বুদ্ধির উন্মেষ, এবং অজ্ঞানের  
পরিচয় সম্বন্ধে সাহায্য করে। বুদ্ধকে বস্তি দিবে  
না—অথচ বলিপলিত নষ্ট করে—ইহার  
সমাধান করতে গেলে, শিক্ষার্থীকে একটু চিন্তা

কর'তে হয়, আর চিন্তার ফলে তার বুদ্ধির  
উন্মেষ ঘটে। অধ্যাপক যদি দেখেন যে, ছাত্র  
এই সকল বিষয় সম্বয় ক'রতে পারছে, তখন  
তা'কে চিকিৎসক হবার যোগ্য বলে বিবেচনা  
করেন। আর যদি দেখেন যে, এই সকল  
রহস্য ভেদ ক'রবার ক্ষমতা আদৌ নেই, তখন  
তাহাকে বলেন যে বৎস্য, চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা  
করা অপেক্ষা হলচালনা শিক্ষা করাই তোমার  
পক্ষে শ্রেয়স্কর।

ডা। না, বাক্যে আপনারা অদ্বিতীয়  
বটে !

ক। আপনার শাস্ত্রে তো বলে যে,  
শরীরের একদিকের হ্রাস বুদ্ধির অত্যধিক দিয়ে  
পুরণ বা হ্রাস ঘটে। তা' আমরা কার্যে যত  
অপটু হই না কেন,—বাক্যে তো পটুতার বুদ্ধি  
হচ্ছে।

ডা। তা' এখন বাক্য থাক, কি ক'রে  
অনুবাসন প্রয়োগ ক'রতে হয় বলুন।

ক। প্রশস্ত এবং উপাধানহীন শয্যা  
রোগীকে বাম পার্শ্বে ( বা কাতে ) শয়ন  
করা'তে হয়। রোগী দক্ষিণ উরু সঙ্কুচিতভাবে  
ও বাম উরু প্রসারিতভাবে রাখবে এবং কথা  
বলবে না।

এদিকে চিকিৎসক বস্তি ঔষধ পূর্ণ করবেন।  
ঔষধ পূর্ণ ক'রবার সময় বস্তি যেন দীর্ঘ বা  
সঙ্কুচিত না হয়, ঔষধে বুঝ না জন্মে এবং  
বস্তিতে যেন বায়ু না থাকে। বস্তির এক  
দিকে নল বাঁধা থাকে আর একদিকে খোলা  
থাকে। সেই খোলা মুখ দিয়ে ঔষধ পূর্ণ  
ক'রে সেই মুখে দুই তিনটা মেঠনী দিয়ে বাঁধতে  
হয়। তা'রপর দক্ষিণ হস্ত ডিগ ক'রে তাম্রা  
বস্তিটা ধ'রতে হ'বে, আর বাম হস্তের প্রাথমিনী  
ও যথাস্থানী দ্বারা নলটা ধ'রে নলের মুখ

অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চেপে রেখে পরে ঘৃতাক্ত গুহ দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেবে। ঠিক পিঠের শিরডাঁটার সঙ্গে সোজা ভাবে বস্তির কাণ পর্যন্ত প্রবেশ করিয়ে বাম হাতে বস্তিটা ধরে দক্ষিণ হস্তের চাপ দিয়ে বস্তি প্রয়োগ করবে। একবার চাপ দিয়েই প্রয়োগ করা এবং খুব দ্রুতভাবে বা খুব আস্তে চাপ দেওয়া উচিত নয়। বস্তিতে স্নেহের কিছু শেষ থাকা উচিত।

অনন্তর এক শব্দ বাক্য বলিতে যতক্ষণ সময় লাগে—ততক্ষণ রোগীকে চিং হটয়া শয়ন করিতে বলিবে। কারণ সর্বগাত্র প্রসারিত হইলে স্নেহবীয়া প্রসারিত হইতে পারে। পরে রোগী হাত পা আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করবে। ইহার পর রোগীর হস্ত পদতলে তিনবার আঘাত করিবে এবং শয্যা তহিতে তিনবার নিতম্বদেশ জ্বলন্ত উষ্ণ উৎক্ষিপ্ত করিবে। ইহাতে স্নেহ উদ্ধ ভাগে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইহার পর বিস্তৃত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে এবং হিতকর দ্রব্য সেবন করিবে।

ডাঃ। আচ্ছা অম্বাসনের যে মাত্রা বলা হয়েছে, তাই কি সকলের পক্ষে প্রযুক্ত্য? সবল দুর্বল বিচার নেই?

ক। আছে বৈকি। চিকিৎসা সম্বন্ধে যে কোন বিষয় নানাদিক দিয়ে দেখতে হয় একদিক দিয়ে দেখলে হয় না। অম্বাসনের মাত্রা ত্রিবিধ, যথা শ্রেষ্ঠা, মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা। শ্রেষ্ঠা মাত্রা ৪৮ তোলা, শ্রেষ্ঠ বলবান ব্যক্তির প্রতি প্রয়োজ্য। মধ্যমা মাত্রা ২৪ তোলা মধ্য বল ব্যক্তির প্রতি প্রয়োজ্য। আর কনিষ্ঠা মাত্রা ১২ তোলা অল্প বয়স ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত্য।

ডাঃ। আচ্ছা বস্তি কি একদিন একবার মাত্র প্রয়োগ করলেই হয়।

ক। একবারত নয়ই, কতবার সেটা ক্রমশঃ শুনতে পারেন। শ্রেষ্ঠ বলবান ব্যক্তিকে যে ৪৮ তোলা স্নেহ প্রয়োগ করবার কথা বলা হয়েছে—সেটা একদিনে নয়। প্রথম দিন ১৬ তোলা, তারপর একদিন বাদ দিয়ে ২০ তোলা, তারপর একদিন বিশ্রাম করে ২৪ তোলা, এইরূপে একদিন অন্তর ৪ তোলা করে বাড়িয়ে নয় দিন স্নেহ প্রয়োগ করলে ৪৮ তোলা পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়। মধ্যবল ব্যক্তিকে স্নেহ প্রয়োগ করতে হলে প্রথম দিনে আট তোলা, তারপর একদিন অন্তর ২ তোলা করে বাড়িয়ে নয় দিন প্রয়োগ করলে ২৪ তোলা হয়। আর অল্পবল ব্যক্তিকে প্রথম দিনে ৪ তোলা স্নেহ প্রয়োগ করে একদিন অন্তর একতোলা বৃদ্ধি করে, নয় দিন স্নেহ প্রয়োগ করলে ১২ তোলা প্রয়োগ করা হয়।

ডাঃ। আচ্ছা স্নেহ—কোঁঠে থাকে কতক্ষণ?

ক। এ সম্বন্ধে এইবার যে সমস্ত কথা বলছি তাতেই বুঝতে পারবেন যে স্নেহ কতক্ষণ থাকে।

প্রযুক্ত স্নেহ কার্যকারী না হয়ে শীঘ্র নির্গত হয়ে পড়লে সত্ত্বর পুনরায় স্নেহ প্রয়োগ করতে হয়। বাহার স্নেহ তিন প্রহর কাল শরীরের মধ্যে থেকে বায়ু ও বিষ্ঠার সহিত বিনাক্রমে নির্গত হয়, তাহার সময়ের অম্বাসন হয়েছে বুঝতে হবে। অহোরাত্রের পরে স্নেহ নির্গত হলেও ঘোবের হয়না, বরং বস্তি গুণই প্রকাশ করে। বস্তিবাগে প্রাণী স্নেহ বায়ু কর্তৃক আবৃত হয়ে রুদ্ধতা বশত যদি সম্পূর্ণরূপে নির্গত না হয়, তাহা উহা বাহিরে বের করে দেওয়া কষ্টকর।



নয়। কারণ উহা দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। দিবা রাত্রির মধ্যে স্নেহ নির্গত না হলে যদি কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় তা হ'লে শোধনবস্তি প্রয়োগ করে তা' নিঃসারিত করতে হয়। কিন্তু স্নেহ নির্গত না হলেও কদাচ স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করবে না।

স্নেহবস্তি বা নিরুহ বস্তি একবারে অধিক পরিমাণে অভ্যাস করা কদাচ উচিত নয়। কাবণ স্নেহবস্তি নিম্নত অধিক মাত্রায় প্রয়োগ ক'রলে অগ্নিমান্দ্য ও দোষের উৎক্লেষ হয়। আবার নিরুহবস্তি অধিক পরিমাণে নিম্নত অভ্যাস ক'রলে বায়ু বৃদ্ধিত হয়। এই জন্ত ক্রমান্বয়ে স্নেহবস্তির পর নিরুহ বস্তি এবং নিরুহ বস্তির পর স্নেহ প্রয়োগ করা উচিত। ইহাতে পিত্ত বা কফের উৎক্লেষ কিম্বা বায়ু বৃদ্ধির ভয় থাকে না।

রুক্ষ দেহ ও অত্যন্ত বায়ুপ্রধান ব্যক্তিকে প্রতিদিন স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা যায়। অপর ব্যক্তিকে অগ্নিমান্দ্যের ভয়ে প্রতি তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ একদিন অন্তর স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা উচিত। আবার রুক্ষদেহ ব্যক্তিকে সকল সময়েই অল্প পরিমাণে স্নেহ বস্তি এবং স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে সকল সময়েই অল্প মাত্রায় নিরুহবস্তি প্রয়োগ করা যায়।

কেবল বায়ুদ্বারা পীড়িত ব্যক্তিকেই স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা যায়। নচেৎ বমন বিরচন দ্বারা দেহ শোধন না করিয়া স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ অবিপ্লব অবস্থায় স্নেহবস্তি প্রয়োগ ক'রলে তাহার কোন গুণই শরীরে প্রকাশ পায় না, পরন্তু উক্ত স্নেহ মলের সহিত মিশ্রিত হ'য়ে শরীরে বর্জনিত। আয়ান, শূল, বাস ও

পকাশয়ের গুরুতা উৎপন্ন করে। এরূপ অবস্থায় নিরুহ এবং তীক্ষ্ণ ঔষধ দ্বারা সিদ্ধ তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ করা উচিত।

ডাঃ। আচ্ছা শোধন বস্তি, তীক্ষ্ণ বস্তি—এসব আবার কি ?

ক। শ্রেষ্ঠা মাত্রায় বস্তি প্রয়োগ করা যায়—তাকে তীক্ষ্ণ বস্তি বলে। আর গুণ ভেদে বস্তির নানা নাম হয়। যেমন শোধন, (যেমন বিরচন কারক) দ্রবাসহ সিদ্ধ শোধন বস্তি, লেখন (দোষ চাটিয়া ফেলা) বস্তি; বৃংহণ (পুষ্টিকারক) বস্তি, বাজাকরণ বস্তি। পিচ্ছিল (অভিসারাদিতে প্রয়োজ্য) বস্তি, সংগ্রাহী মল বোধক) বস্তি, উৎক্লেষণবস্তি, দোষ হর বস্তি, দোষের প্রশমনকারক বস্তি, মাধুতৈলিক (মধু ও তৈল প্রধান) বস্তি, যুক্ত রথ নামক মাধুতৈলিক বস্তি, সিদ্ধবস্তি, মুস্তাদি বস্তি প্রভৃতি।

ডাঃ। বিরাট ব্যাপার দেখছি !

ক। এতেই বিরাট ব্যাপার দেখছেন, শাস্ত্রে আরও যে কত প্রকার তৈল প্রভৃতির বস্তি দেবার উপদেশ আছে, শুন'লে অবাক হবেন। বাহুগ্য ভয়ে সে সকলের উল্লেখ ক'রলাম না। বন্ধ্যানারীকে যে বলা তৈলের বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়, সেই তৈল এক শতবার পাক করা হয় ব'লে “শতপাকী বলা তৈল” বলে।

ডাঃ। আচ্ছা, বস্তি কতগুলি দেওয়া যেতে পারে ?

ক। প্রয়োগের পরিমাণ ভেদে বস্তি তিন প্রকার, যথা কৰ্ম্মবস্তি, কাপবস্তি ও যোগ বস্তি। প্রথমে একটা অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিয়া পরে পর্যায়ক্রমে অর্ধাং একটীর পর অপরটা এইরূপ ডাবে বাধ

নিরুহ বস্তি এবং দ্বাদশটি স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। পরে পাঁচটি স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে, এইরূপে ত্রিশটি বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহাকে কশ্ম বস্তি বলে। আর প্রথমে একটা স্নেহবস্তি দিয়া পরে একটা নিরুহবস্তি— এইরূপে পর্যায়ক্রমে দ্বাদশটি বস্তি দিবে। পরে তিনটি স্নেহবস্তি দিবে। এইরূপে উপর্যুপরি পনরটি বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহাকে কাল বস্তি বলে। আবার প্রথমে একটা স্নেহ বস্তি পরে একটা স্নেহ ও একটা নিরুহবস্তি— এইরূপে পর্যায়ক্রমে সাতটি বস্তি দিয়া শেষে একটা স্নেহ বস্তি দিতে হয়, তাকে দোগবস্তি বলে। রোগ ও রোগীর অবস্থা বুঝে এই তিনরকম বস্তির যে কোন একটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ডাঃ। আচ্ছা পূর্বে যে সংশোধন, বৃংহণ প্রভৃতি বস্তির কথা ব'লেছেন তাদের কি ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রয়োগের নিয়ম আছে।

ক। আছে বৈকি। ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়। সংক্ষেপে ছ' একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতি রোগে শোধনীয় বস্তি প্রয়োগ করা উচিত; বৃংহনীয়বস্তি প্রয়োগ ক'রতে নাই। মেদস্বী ব্যক্তিদের বৃংহনীয়বস্তি প্রয়োগ ক'রতে নেই, লেখন বস্তি প্রয়োগ করতে হয়। ক্ষতক্ষীণ, শোষ রোগী, অত্যন্ত দুর্বল প্রভৃতি রোগীকে শোষণীয় বস্তি প্রয়োগ ক'রতে নাই; অবস্থা-ভেদে বৃংহণ বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা বস্তি সম্বন্ধে আর কি জানবার আছে বলুন।

ক। বস্তিদ্রব্য অতি শীতল হইলে শরীরকে শুষ্ক করে। অত্যধিক হইলে দাহ ও মূর্ছা জন্মায়। অতিমিষ্ট বস্তি দ্বারা শরীরের

জড়তা, রুদ্ধ বস্তিতে বায়ুর প্রকোপ, পাউলা, মাত্রাহীন ও অল্প লবণযুক্ত বস্তি দ্বারা অযোগ এবং মাত্রাধিক বস্তি দ্বারা অতিযোগ হয়। অল্প ও গাঢ় বস্তি বিলম্বে প্রত্যাগত হয়। অতি লবণ মিশ্রিত বস্তি দ্বারা দাহ ও অতিসার জন্মায়। স্নতরাং বস্তি দ্রব্য ঐ সকল দোষ রহিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বস্তি অর্দ্রে ক পরিমাণ প্রদত্ত হইলে যদি মল ও অধোবায়ুর বেগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বস্তির মল বাহির করিয়া লইবে এবং মল ও বায়ু নির্গত হইলে পুনরায় অবশিষ্ট বস্তি প্রয়োগ করিবে।

ডাঃ। আর কি নিয়ম আছে বলুন?

ক। পূর্বে সাধারণ নিয়ম বলা হয়ছে যে বস্তি শীতল হ'লে অনিষ্টকর হয়। কিন্তু বিশেষ নিয়ম এই যে, উষ্ণাভিভূত ব্যক্তিকে শীতল এবং শীতাভিভূত ব্যক্তিকে স্নগোষ্ণ বস্তি দিতে হবে। আবার শীতাভিভূত ব্যক্তিকে উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্যের সঙ্গে, আর উষ্ণাভিভূত ব্যক্তিকে শীতবীৰ্য্যদ্রব্য দিয়ে বস্তি দিতে হ'বে।

ডাঃ। দুই রকম যখন বলা হ'ল, তখন শীতল বস্তি অনিষ্টকর বলার তাৎপর্য কি?

ক। এইত আপনি হাস্যামার ফেললেন। সাধে কি ব'লেছি যে, সব কথা জানতে হ'লে সমগ্র আয়ুর্বেদ জানতে হয়। আচ্ছা বলছি, শুভুন। বায়ু সাধারণতঃ শীতগুণ বিশিষ্ট আর বায়ু নাশের জন্তেই বস্তি দেওয়া হয়। স্নতরাং শীতগুণের বিপরীত উষ্ণই বায়ু নাশের জন্য প্রয়োজ্য। এই কারণে সাধারণতঃ উষ্ণবস্তি প্রয়োগ ক'রতে বলা হ'য়েছে। কিন্তু দেখুন পাখর রোগের অত্যন্ত শীতল হলেও উষ্ণ সাধারণতঃ উষ্ণ এবং শীত সাধারণতঃ

শীতল হ'য়ে পড়ে, তেমনি বায়ুও উষ্ণ সংযোগে উষ্ণ এবং শীত সংযোগে শীতল হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মের বায়ু এবং শীতের বায়ু ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাজেই মনে করুন, বায়ু নাশের জন্য সাধারণতঃ উষ্ণবস্তি প্রয়োগ হ'লেও পিত্ত সংসর্গে বায়ু যখন উষ্ণগুণ বিশিষ্ট হয় তখন শীতল এবং শ্লেষ্মা সংযোগে যখন অধিকতর শীতগুণ বিশিষ্ট, হয় তখন অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বস্তি প্রয়োগের আবশ্যিকতা ঘটে। এমন শীতের শীতল বায়ু ত'তে অব্যাহতি

পা'বার জন্তে আমরা গরম কাপড় পরি, অগ্নি সেবন করি। আর গ্রীষ্মের উষ্ণ বায়ু থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আমরা শীতল ব্যঞ্জন, শীতল অম্ললেপন ব্যবহার করি।

ডাঃ। অনেক লোকের ধারণা যে, ঠাণ্ডা ক'রলে বায়ু নাশ হয়।

ক। সেটা ভুল ধারণা। উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা বায়ুর উপশম হয়, আর শীতল ও রূক্ষ ক্রিয়া দ্বারা বায়ু বদ্ধিত হয়।

(ক্রমশঃ)

## স্বাস্থ্যরক্ষায় হিন্দুধর্মের বিধি-নিষেধ ।

—:—

স্বাস্থ্যরক্ষায় হিন্দুধর্মের বিধি নিষেধ অনেক বহিরাছে। অনেককাল পর্যন্ত তা মা'নিয়া আমরা ধর্ম-রক্ষা ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করিয়াছি, দেশে যখন পাশ্চাত্য-সভ্যতার চেউ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল তখন আমরা ধর্ম বিদ্রোহী হইলাম, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্য পালনে হীন ও অনাস্থাসম্পন্ন হইলাম, ইহা শুধু আমাদের শিক্ষার দোষ—অহংকরণের পরিণতি। পাশ্চাত্যশিক্ষা-সভ্যতা আমাদের দেশে প্রবল বড়ের মত বহিতে লাগিল, আমরাও সেই বাতাসের চেউ সহিতে না পারিয়া কাতর হইয়া পড়িলাম। ত্রিসংস্কারপুত্ৰ, স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া যখন শাস্ত্রদেশ বাহির হইয়াছিল—তখন স্বাস্থ্যরক্ষায় না হউক—ধর্মরক্ষার ভয়ে তাহা পালন করিল আসিতেছিল। বর্ধন আমরা ধর্মশাস্ত্রকে অবিশ্বাস করিতে শিখিলাম, তখন আমরা

তাহার বিধিনিষেধকেও অগ্রাহ্য করিতে লাগিলাম। আমাদের শাস্ত্রকারগণ যে সকল বিধিনিষেধ ধর্মের ভয় দেখাইয়া ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সে সকল আমরা ধর্মভয়ে ভীত হইয়া বেদ বাক্যের মত পালন করিতে লাগিলাম, হিন্দু সব করিতে পারে কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু এখন আমরা ধর্ম হীন। শাস্ত্রদেশ ত দূরের কথা,— তদীয় বিধি নিষেধও আমাদের এখন গ্রহণ যোগ্য নহে। আমরা চাই স্ব্থ, আমরা চাই বিলাসিতা। আপাতমধুর স্ব্থকে আমরা আলিঙ্গন করিয়া ধর্ম তো হারাইতে বসিয়াছি-ই, স্বাস্থ্যেরও হানি করিতেছি।

হিন্দুর ধর্ম প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃস্নান, প্রোক্তান্তের স্নান—স্বর্ঘ্যরসি লাগিবার আগে স্নান নির্মল ও স্বাস্থ্যোপযোগী থাকে বলিয়া জাহাজে অধঃগমন করিলেও দেহ মনের পাণ-দ্রবীভূত

হয়। স্বর্গীয় অপূর্ণ জ্যোতিঃ দেহ ও মনকে আনন্দিত করিয়া তোলে। তারপর পুষ্প চয়ন, পুষ্পের সুগন্ধ—নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া, মনকে আনন্দ ও সুখ প্রদান করে, ভ্রমর গুঞ্জন শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া মনকে নব-ভাবে মাত্মহীয়া তোলে। ভ্রমরবধু যেন আকুলি-বিকুলি করিয়া গুঞ্জরিয়া থাকে। তা'র পর আফ্রিক, এই সময় ভগবানের আরাধনা কত আনন্দদায়ক—তা' যা'রা ইহার সেবক—তাঁরাই বৃত্তিতে পারিয়াছেন। সাত্ত্বিক আহার হৃদয় মনের তৃপ্তি সাধন করিয়া দেহকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া তোলে। তাই সে কালের হিন্দু নিরোগী ও দীর্ঘায়ু ছিলেন। নানা পাপে লিপ্ত থাকিয়া আমরা এখন আর তাঁহাদের ভ্রায় নিরোগ দেহ, সুস্থ মন ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে সমর্থ হইনি। সাধারণ আমাদের হিন্দুর দক্ষ্যাবন্দনা ও রজনীযোগে সাত্ত্বিক আহার আয়ুরক্ষার অঙ্গকুল ছিল। এগুলি আমরা এখন আর রক্ষা করি না। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত আমরা কৃশিগ্রস্ত হইয়া মনে করি—ইহা আমাদের পূর্বে পুরুষগণের অসম্ভ্যতার লক্ষণ। এককালে এমন দিন ছিল, আমরা এইরূপ হিন্দুকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছি। এখন অনেক কারণে সে বাতাস কতকটা ফিরিয়াছে; মঙ্গলের লক্ষণ।

অধুনা প্রতারণা ও পাপ আমাদের হৃদয় দখল করিয়া বসিয়াছে, তাহার জ্ঞাত আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটতেছে। গ্রহ বিপাকে আগেকার কোনটাই আমাদের এখন আর ভাল লাগিতেছেন না। ধনস্তুতি সদৃশ শ্রমি গণের ঔষধে আমাদের বিশ্বাস নাই, আয়ুর্বেদে আস্থা নাই আমাদের দেশের উপযোগী, আমাদের দেহে যা' সহনীয়—আমরা

তা' গ্রহণ করিতে নারাজ। উষ্ণ প্রধান আমাদের দেশ, শীত প্রধান দেশের উগ্রবাণী ঔষধ পথ্য আমাদের সহিবে কেন? তাহাতে সুফলের অপেক্ষা কুফলই অধিক হইয়া থাকে। চাবন শ্রমি কৃত চাবনপ্রাশকে ছাড়িয়া আমরা নিত্য কড়লিভার ব্যবহার করি। স্বাস্থ্য চাবনপ্রাশের পরিবর্তে বিষাদ কড়লিভারকে আমরা কেন পছন্দ করি, তা' আমরাই বুঝ না। এইত একটা উদাহরণ দিলাম, আর কত রহিয়াছে, সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলা ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মাসিক পত্রে লিপি বন্ধ করা চলে না।

পূর্বে হিন্দুর প্রাতঃকৃত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, অধুনা যাহারা ব্রাহ্মমূর্ত্তে গাত্রো-  
থান করেন, তাঁহারা সেই শুভ মূর্ত্তেই চাক্ষের  
আয়োজনে বাস্তব হন। কাক বখন ডাকে কা,—  
বাবুরা তখন ডাকেন চা! একটু বিস্কট, এক  
পেয়ালা চা উদরস্থ করা চাই, তা' না হইলে ত  
সভ্যতাই হইলনা। বিদেশের আমদানাকরা  
শিক্ষা লাভ করিয়াই বা লাভ হইল কি?  
আগে দেশে চা ছিলনা, কেমন করিয়া চা  
আমাদের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিল,  
তা' অনেকেই অবগত আছেন। বিলাতি  
ব্যবসায়ীরা বিনামূল্যে চা পাওয়াইয়া  
‘আমাদিগকে নেশার বলে কারু করিয়া—  
তাঁহাদের ব্যবসায় বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছেন।  
পচিশ বৎসর পূর্বে কি কেহ কলিকাতায়  
এতগুলি চাক্ষের দোকান দেখিয়াছেন?  
তা'রপর অলিতে-গলিতে চা ফেরি করিয়া  
আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইতেছে, আমরা তা'  
না খাইয়া বাই, কোথা? জার্মান একবার  
পশ্চিমে বাইতেছিলো, বাগদাদেই পৌঁছে  
গাড়ি জলেকণ দাঁড়ায়, কোথায়

দিতোছে, — “ব্রাহ্মণ চা” বলিয়া যখন হাঁকিল—  
তখন বড় শীত বলিয়া তাঁকে ডাকিলাম, এক  
পেয়লা চা খাইয়া দাম দিতে চাহিলাম, সে  
কহিল, “আমরা লিপটর্ন সাহেবের চাকর  
বিনা দামে চা খাওয়াই।” আমি ভাবিলাম  
ব্যবসায়ী বটে! আমি যে কামরায় ছিলাম সেই  
কামরায় আরো ছইজন কলিকাতার সৌখিন বাবু  
ছিলেন—তাঁহারা বলিলেন “ছিঃ আপনি হিন্দুর  
চা খাইলেন কেন? হিন্দুরা কি চা তৈয়ার  
করিতে পারে? মুসলমানের চা খান, বেশ  
আরাম পাইবেন।” আমি তো ইহাদের  
বিকৃত শিক্ষা বুঝিয়া অবাক হইলাম।  
যাহা হউক আমাদের আর একটা মহৎ দোষ  
হইয়াছে—হিন্দুর সব তাতেই অগ্রাহ্য করা।  
হিন্দু অশুদ্ধ জাতি না রাখিলে আমাদের  
ভাল লাগেনা, তাহারা ছুইয়া না দিলে  
আমাদের রসনায়া সেটা যেন তৃপ্তিকর  
বসিয়াই উপলব্ধি হয় না। হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য  
জাতির পকাহারে এবং চায়ের মত উগ্রবীৰ্য্য  
দ্রব্য পানে আমাদের উদরের পীড়া হইবার কথা,  
কলে হইতেছেও তাহাই। চায়ের অপকারিতা  
যথেষ্ট, চা-খোরদের ডিসপেপসিয়া নামক  
রোগটি যেন একচেটিয়া। চা পানে সাময়িক  
একটা স্মৃতি হইতে পারে, কিন্তু অবসাদ হয়  
তার দ্বিগুণ। আমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা  
বেঙ্গল চিকিৎসকের উকীল, তাঁহার বিবাহের  
কাল আমাদের সমাজ ছাড়িয়া আমার কোন  
আত্মীয় কলিকাতা অঞ্চলে মেয়ে দেখিতে-  
ছিলেন। একটা মেয়ে ঠিক করিয়া পাত্র  
নির্বাচিলেন, কলিকাতায় গিয়া মেয়ে দেখিলাম।  
সে মেয়ে যেন একটা থিয়েটারের অভিনেত্রী  
বেশ আমার নিকট হাজির হইল। অবস্থা  
দেখিয়াই ত আমি অবাক। পরে জানিলাম,  
বৈশাখ—৩

মেয়ে প্রাতে উঠিয়া চা-বিস্কট খায়? সন্ধ্যায়  
বিকালে আবার চা চাই। সাবান এসেন্সের ত  
কথাই নাই। যাহা হউক সে মেয়েকে আর  
আমাদের গৃহে আনা হইল না। আমাদের  
কোন পুরুষেই—কি মেয়ে কি পুরুষের জন্ত  
চায়ের ব্যবস্থা নাই, কেবল দেশের অবস্থা  
বুঝিয়া অভাগতদের জন্য গৃহে চায়ের  
আয়োজন আছে মাত্র। যাহা হউক হিন্দুর  
প্রাতঃকৃত্যাদির পরিবর্তে ঐ সময় এই সকল  
বিজ্ঞাতীয় পান ভোজনের ব্যবস্থা আমাদের গৃহে  
এরূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইহা  
আমাদের অন্তঃপুর পর্যন্ত দখল করিয়া  
ফেলিয়াছে—ইহাই ভয়ের কথা। আমাদের  
দেশে অনেকেই স্বীয় পুত্র কন্যাকে স্বহস্তে এই  
বিষ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা আরো  
আশঙ্কার কথা। পূর্বে যে অবিবাহিতা মেয়ের  
কথা বলিলাম, তাহার পিতা মাতাই তাহাকে  
এই কুঅভ্যাসগুস্ত করিয়াছেন গুলিলাম।

শাস্ত্রকারেরা কতকগুলি তিথি বিশেষে  
কোন কোন বস্তু গ্রহণ ও ভক্ষণের ব্যবস্থা  
দেন নাই—উহার সহিত স্বাস্থ্যের অতি নিকট  
সম্বন্ধ। অমাবসায় জ্বী, তৈল, মৎস্য, মাংস-  
সম্ভাগ-নিষেধ-ব্যবস্থা আছে। আশ্বার কোন  
তিথিতে তাল, কোনটীতে অলাবু ও কোনটীতে  
বার্ত্তাকু ইত্যাদি রূপে তিথি বিশেষে, দ্রব্য  
বিশেষের ভক্ষণ নিষিদ্ধ; এখানেও শাস্ত্র-  
কারেরা ধর্ম্মহানি, বংশহানি প্রভৃতির ভয়  
দেখাইয়াছেন। ফলকথা, যে সকল নিষিদ্ধা-  
দেশ হইয়াছে তাহার সহিত স্বাস্থ্যের  
যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিহিত, তাহা আধুনিক  
বিজ্ঞানবিশারদেরাও অস্বীকার করিতে পারেন  
না। একাদশীতে উপবাস ও পক্ষান্তে  
নিশি পানির ব্যবস্থা আছে। একাদশী বাহারা

পালন করেন—আর একাদশী ঠাঁহারা পালন করেন না—তাঁহারা উভয় পক্ষ হইতেই এই সকল উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন। একাদশী জোয়ারের দিন, সে দিন উপবাস দিলে দেহটা খুব ঝরঝরে খরখরে হয়, সে দিন উপবাস দিলে বাতাদি রোগের বিশেষ উপকার দর্শে। সেই জন্য দেখা যায়, আমাদের বিধবাগণ প্রায় সকলেই নীরোগ। আবার পক্ষান্তরদিনেও জোয়ারের দিন। অমাবস্যা, পূর্ণিমায় নিশিপালন অর্থাৎ রাত্রিতে উপবাসদিলে বা অন্নাহার রহিত করিলে শরীরটা বেশ হাল্কা হয়। তাহাতেও বাতাদি রোগের উপকার দর্শে। বর্তমান-কালে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ডাক্তারেরাও পক্ষান্ত্রে রোগীকে অন্নাহার দেননা, একাদশীতেও তাঁহারা তদ্রূপ ব্যবস্থা করেন। ধর্মের দোহাই দিয়া ঐ সকল নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি—হিন্দু, ধর্মকে ছাড়িতে পারেনা, আর সব পারে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় বিজড়িত এই কথা আমাদের সকলেরই মনে করা উচিত। আমরা বৈষ্ণব অন্নায়ু ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি, তাহাতে আর ইহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করিয়াই আমরা মরিতে বসিয়াছি—ইহা আমাদের বিশেষরূপে মনে করিতে হইবে, নতুবা আমাদের আর আশ্বরক্ষার কোনো উপায়ই নাই।

কোন ইংরেজের মুখ দিয়া কথা বাহির না হইলে আমরা তাহা মানিতে চাই না। ইংরেজ যাহা বলেন, তাহা আমাদের ঋষি প্রণীত বেদ বাক্য অপেক্ষাও অধিকতর গ্রহণ করিয়া থাকি।

পথ্যাদি সম্বন্ধেও আমাদের এক্ষণে সেইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। রোগীর পথ্য দেশভেদে আমাদের রোগ ও দেহের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন, আমরা আমাদের আয়ুর্বেদ প্রচলিত পথ্যাদিতে তেমন আস্থা—বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছি না, ইহাও আমাদের দুর্লক্ষণ। তাহা না হইলে খই ও চিড়ার মণ্ড, মসুরের যুব প্রভৃতি অনেকদিন পূর্বে আমাদের বাস্তবতা হইতে নিরাসিত হইত না। এখন তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে—বিলাতি নানাবিধ কুপথ্য। তবে সংপ্রতি মসুরের যুবের আদর হইতে দেখিতেছি, কারণ আমেরিকার ডাক্তারগণ বা মেডিকেল বোর্ড বলিয়াছেন, যে মসুরের দালে মাংসের তুল্য উপাদান রহিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা তাহা পূর্বেই জানিতেন। তাই তাঁহারা রবিবার ও অমাবস্যা মংস্য, মাংসের নিষেধের সঙ্গে মসুরের দাঁইলেরও নিষেধব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কেমন কবিতা বলিব—আমাদের শাস্ত্রকারগণ কিছু বুঝিতেন না, অথবা তাঁহারা অবৈজ্ঞানিক ছিলেন?

ফলকথা; স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে ঋষি প্রণীত শাস্ত্র-দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলে আর আমাদেরিগকে নিত্য ডাক্তারের দাঁওয়াইথানায় দৌড়া দৌড়ি করিতে হইবে না—আজ ডিপেপসিয়া, কাল শিরঃপীড়া, পরদিন জ্বর—এ সকল নিত্য অসুখে ভুগিতে হইবে না। শাস্ত্রদেশ না মানিয়া আমরা এই সর্ব আধিব্যাধির বাধা নিমন্ত্রণ আনিয়া কেলিয়াছি ছেলে। জন্মিতেই সামান্য অসুখে ডাক্তার ওষধে তার পেটে চড়া পড়িয়া যায় আমাদের প্রাচীনাদের টোটকা ঐকান্তিক হুজি

ঘব হইতে বিদায় হইয়াছে, আমাদের স্মৃতিক।  
ঘরে শিশুর ক্রন্দনেও ডাক্তারের ডাক পড়ে !  
আর বাকী রহিল কি ? যদি নিজেকে নীরোগ,  
দীর্ঘজীবী ও পুত্র পৌত্রাদিকে স্নহদেহ

দেখিতে চাও—তবে আর বিলম্ব করিওনা,  
শাস্ত্রাদেশকে আলিঙ্গন কর, কৃতাপরাধের  
প্রায়শ্চিত্ত হউক ।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার ।

## দর্শনেন্দ্রিয়-বিবরণ ।\*

—:~:—

দর্শনেন্দ্রিয়ের আলোচনা করিতে হইলে  
তৎপূর্বে আমাদিগকে জ্ঞানের বিষয় কিঞ্চিৎ  
আলোচনা করিতে হয় । কারণ দর্শনেন্দ্রিয়  
ও জ্ঞানেরই কারণ বা দ্বার স্বরূপ । কোন পদার্থ  
শরীরের বাহিরে অথবা ভিতরে সংস্পৃষ্ট হইলে  
তথাকার স্রোতের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে,  
এবং সেই পরিবর্তিত অবস্থা মস্তিষ্কে  
উপনীত হইলে, মনকে যে সংজ্ঞা প্রদান করে,  
তাহাকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া থাকি ।

আমাদের এই দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই  
চৈতন্যময় । চৈতন্যময় হইলেও ইহাদের  
ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য স্রোতের দ্বারা মস্তকে নীত  
হইলে আমরা মনের দ্বারা তাহার উপলব্ধি  
করিয়া থাকি ।

যদিও আমাদিগের ধমনী অথবা স্রোত  
বস্তুর সকল ধর্মকে বহন করিতে পারে না,

তথাপি তাহারা যে পদার্থের বিশেষ বা ভেদক  
ধর্ম বহন করিতেছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা  
যাইতে পারে ।

বাহিরের পদার্থ ব্যতীত আভ্যন্তরিক কোন  
কারণে ধমনীর অবস্থা পরিবর্তিত হইলে, সেই  
পরিবর্তিত অবস্থা মস্তকে উপনীত হইলে  
চৈতন্যের উদয় হইতে পারে । যেমন বাহিরে

গন্ধদ্রব্য ব্যতীত সময়ে সময়ে নাসারন্ধ্রে  
গন্ধদ্রব্যের আত্মাণ পাওয়া যায় ; শৈল্পিক  
রোগে অনেক সময় ইহা প্রত্যক্ষ করা  
যায় । বাহিরের কোন উত্তেজনা ব্যতিরেকেও  
চক্ষুদ্বারা আলোক ও অন্ধকার দৃষ্ট হইয়া থাকে,  
অপস্মার রোগে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া  
থাকি ।

চৈতন্য নানা প্রকার ; তন্মধ্যে অসুস্থতা,  
দৌর্বল্য, শ্রানি বা অবসন্নতা প্রভৃতি চৈতন্য

\* আয়ুর্বেদ সভার সাধারণ অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল । প্রবন্ধের সমালোচনার জন্য  
আর একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল । আলোচনার সুবিধার জন্য ১০।১২ জন সভ্যের নিকট  
প্রবন্ধের প্রতিলিপি পাঠান হইয়াছিল । কতকগুলি সভ্য প্রবন্ধের বহুস্থলে আয়ুর্বেদোক্ত স্রমাণ ভিজানা  
করিয়াছিলেন । অধিবেশনান্তরে স্থির হয় যে প্রবন্ধ লেখক অসুস্থ হই পূর্বক তাহার সিদ্ধান্তের প্রমাণ  
উল্লেখ পূর্বক একটি পৃথক প্রবন্ধ লিখুন । আশাকরি প্রবন্ধ লেখক সভার অনুরোধ মত কার্য্য করিবেন,  
এবং করিলে সেই প্রবন্ধ সাধারণে আমরা স্মৃতিত করিব । আঃ সং।

শরীরের কোন্ স্থান হইতে উৎপন্ন হইতেছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু উহার যে শরীরস্থ দোষ বা রসরক্তাদি ধাতুর বিকৃতি বা অস্বাভাবিক অবস্থা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে তাহা বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুধা বোধ, ইহাকে আনাশয়িক চৈতন্ত, শিরা ধমনীর ক্রিয়া লোপ, ইহাদিগকে শিরা ধমনীর চৈতন্ত, গুরুত্ব লঘুত্ব বোধ, ইহাকে, পেশীর চৈতন্ত বলা যায়।

আবার সাধারণ উত্তেজনার দ্বারাই হউক, বা বিশিষ্ট উত্তেজক দ্রব্য দ্বারাই হউক, কোন বিশিষ্ট স্থান উত্তেজিত হইয়া যে চৈতন্ত উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান কহে, এবং তৎ স্থানকে তাহাদের স্ব স্ব ইন্দ্রিয় কহে। ইন্দ্রিয় পাঁচটা—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক।

৩। উত্তেজক কারণ দেহ মধ্যেই থাকুক অথবা বাহির হইতেই দেহে সম্পৃষ্ট হউক তাহা ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান উৎপাদন করে। যেমন চক্ষুতে বাতাদিদোষ দূষিত হইলে নানা প্রকার আলোক এবং অন্ধকার দৃষ্ট হয়, ঘ্রাণ দূষিত হইলে বিবিধ গন্ধ এবং কর্ণে নানা প্রকার শব্দ এবং জিহ্বায় বিবিধ আশ্বাদ এবং ত্বক দূষিত হইলে শীত উষ্ণ বেদনা প্রভৃতি নানা প্রকার স্পর্শ অনুভূত হয়।

উপরে যে জ্ঞানেব বিবরণ আলোচনা করা হইল, অনেক সময় তাহা ভ্রম পূর্ণও হইতে পারে, যেমন এক গাছি দড়ি দেখিয়া অনেক সময় সর্প ভ্রম হইতে পারে। বিস্মৃত ময়দানে স্থানু দেখিয়া ভূত ভ্রমে অচেতন হইতে পারে। এইরূপ দৈহিক কোন কারণ জনিত চৈতন্ত ও বাহ্য কারণ সম্বৃত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। যেমন চক্ষু পিত্তদূষিত হইলে বাহির হইতে আলোক পড়িতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। কর্ণ দূষিত হইলে শব্দ বাহির হইতে আসিতেছে

অথবা কিয়দূরে ঢাক ঢোল বাজাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

আবার দেখা যায় যে, এই সকল ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বিষয়ে, ইন্দ্রিয়ের উপর মন প্রভুত্ব করিয়া থাকে। কারণ দেখা যায় যে, এই সকল বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ সংযোগ থাকিলে তবে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে। মনঃ সংযোগ না থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না, যেমন কোন ব্যক্তি তাহার বন্ধুর সহিত কথা বলিতে বলিতে যদি তাহার মন অগ্নি কোন একটা গুরুতর বিষয়ে আক্রান্ত হয় তবে সে তাহার বন্ধুর কোন কথাই বুঝিতে পারে না, কারণ তাহার মন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত নহে। ঘোর নিদ্রার অবস্থায় মন ক্লান্ত হইয়া বিষয় গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইলে, অথবা নাগান্ন হইলে, তখন কোন জ্ঞানই মনোমধ্যে উদ্ভিত হয় না। আবার তীব্র মনঃ সংযোগে মানব একাত্মান বাদনের বিবিধ যন্ত্রের স্বর তান ও তাল স্বতন্ত্র করিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হয়।

উপরোক্ত জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, জ্ঞানোৎপত্তি স্থান যেখানেই হউক না কেন, সেই জ্ঞানের উপলব্ধি মস্তকেই হয়। জ্ঞান সাধারণতঃ অসংখ্য প্রকার হইলেও তাহারাই ছই শ্রেণীতে বিভক্ত; ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও মানস প্রত্যক্ষ। শরীরের ভিতর হইতেই হউক বা বাহির হইতেই হউক, যাহা কোন বহিরিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিবে—তাহাই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান; এবং যাহা কোন বহিরিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিবে না, কেবল মাত্র মনকে স্পর্শ করিবে, তাহাই মানস জ্ঞান। এই জ্ঞান আবার যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দ্বিবিধ। যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ প্রমাজ্ঞান এবং অযথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান। মানস জ্ঞানেই



দ্রুম জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি কালে মন অথ কোন বিষয়ে অভ্যস্ত থাকিলে হঠাৎ তাহা উপস্থিত হইয়া দ্রুম জ্ঞান উৎপাদন করে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রথমে চৈতন্য গ্রহণ করে, তৎপ রস্ব স্ব স্ব স্বেচ্ছা দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। বাহ্য হউক এক্ষণে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

যাহাদের চক্ষু আছে, তাহারা দেখিতে পায়, যাহাদের চক্ষু নাই তাহারা দেখিতে পায় না। অন্ধকারে চক্ষু পুলিয়া রাখিলেও যে ফল, আলোকে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলেও সেই ফল। ইহা দ্বাৰা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, চক্ষু দ্বারা আমরা দেখিতে পাই এবং আলোকের সাহায্যেই ঐ সকল বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; সুতরাং আলোক এবং চক্ষু সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যিক। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়গণ ষড়্ভাষী দ্বারা অভিভাব্ত হইয়াই স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন সন্দেহটা মুখে প্রকিপ্ত হইলেই বসনেন্দ্রিয় দ্বারা উহার মধুরতা অনুভূত হয় না, কিন্তু কর্ণগত শ্রেণী দ্বারা অভিভাব্ত হইলেই উহার স্বাদ অনুভূত হয়। সেইরূপ দর্শনেন্দ্রিয় রূপ দ্বারা উত্তেজিত হইলেই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। আলোকের ধর্ম এই যে, তাহা কোন পদার্থ হইতে নিঃসৃত হইয়া সর্বদা সর্বত্র অভিমুখে গমন করে। জল অথবা তৎতুল্য কোন দ্রব পদার্থ অথবা উজ্জ্বল ঘন কাচ বা তৎতুল্য কোন পদার্থের ভিতর দিয়া ঐ আলোক সর্বদা রেখাভিমুখে অতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে। চক্ষুর সম্মুখাংশ জলের স্থায় স্বচ্ছ এবং দ্রব পদার্থে পূর্ণ থাকে; সুতরাং চক্ষুর ভিতরে ঐ আলোক অনায়াসে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়; এবং ইহার দ্বারা দৃষ্টি

উত্তেজিত হইয়াই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। রূপ এবং দর্শনেন্দ্রিয় উভয়ই পঞ্চমহাভূতাত্মক হইলেও চক্ষুতে তেজো ধাতুর আধিক্য আছে বলিয়া আলোক দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইতে পারে।

চক্ষুর আকার গোল, কয়েকখানি অস্থি নির্মিত কোটরে অবস্থিত, ইহার বেষ নিজ অসুষ্ঠ পরিমাণের ছই অঙ্গুল। এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সার্কি দ্বাঙ্গুল। ইহার উপরি ভাগের গঠন অনেকটা গোস্তনের স্থায় ইহা কয়েকখানি মাংস পেশী দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং ইচ্ছামত ঘূরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। নয়ন গোলক কতক গুলি আবরণ. মাংসপেশী, কাচ সদৃশ পদার্থ ও উজ্জ্বল তেজোময় আলোচক পিত্তদ্বারা নির্মিত। ইহার চতুর্দিক জলময়, কিন্তু মধ্য প্রদেশটা তেজোময় পিত্ত দ্বারা নির্মিত হওয়ার চক্ষুর সমস্ত অভ্যন্তর প্রদেশই দেখিতে বেশ উজ্জল হয়। ঐ উজ্জলতা জলের দ্বারা নষ্ট হয় না। উহা হইতে সর্বদাই একটা জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে এবং তাহার ক্ষয় হয় না, বাহিরের আলোকের সংস্পর্শে উহা আরও উদ্দীপিত হয়। ইহার অক্ষরী জ্যোতিঃ অনেকটা খদ্যোতের আলোকের স্থায়। এই জ্যোতির্ময় পদার্থটি উষ্ণ, সুতরাং চক্ষু শীত সাহায্য অর্থাৎ শৈত্য দ্বারা উহা নিরাপদ থাকে এবং উৎস্পর্শে উহা উত্তেজিত হয়, এমন কি এতদূর উত্তেজিত হইতে পারে যে, তদ্বারা তাহার আশ্রয় স্থান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইতে পারে। বিদেহাধিপের মতে শূদ্রাটক সিয়া চক্ষুর পশ্চাৎ দেশ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক দৃষ্টিমণ্ডল নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রত্যেক পার্শ্বের সিয়া তাহাদের নিজ চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্বক এক পার্শ্বের কতকগুলি স্রোতঃ অপর

পার্শ্বে গমন করে, এজন্য প্রত্যেক চক্ষুে দুই সিরাই দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর বহির্দেশ দেখিতে শুভ্র, কিন্তু উহার সম্মুখাংশ উজ্জ্বল ও দেখিতে অতিশয় সূক্ষ্মর, এইস্থান দিয়াই চক্ষুর ভিতর আলোক প্রবেশ করে।

চক্ষুতে মণ্ডল পাঁচটা, তন্মধ্যে পশ্চিমমণ্ডল ও বস্মমণ্ডল পরিত্যাগ করিলে নেত্র গোলকে তিনটা মাত্র মণ্ডল দেখা যায়। এইস্থলে শুদ্ধ সেই তিনটা মণ্ডলের এবং নেত্রগোলকের সম্মুখ হইতে পশ্চাত্তাণ পর্য্যন্ত যে চারিটা পটল বা স্তর আছে, তাহারই বিবরণ করা যাইতেছে। মণ্ডল—ইহা সিরার মায়ু ব্যাপ্ত জরায়ু বিশেষ, সাধারণতঃ ভাষায় ইহাকে আমরা পর্দা বলিয়া থাকি। এই পর্দাগুলি শৃঙ্গাটিক সিরার সম্মুখ প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত নেত্রগোলককে মণ্ডলাকারে বেষ্টিত করিয়া আছে এই জন্তই ইহাদের নাম মণ্ডল রাখা হইয়াছে। নেত্রগোলকে মণ্ডল ৩টা, —শ্বেতমণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডল দৃষ্টিমণ্ডল। এই মণ্ডলগুলি উপর্যুপরি ব্যবহৃত অর্থাৎ প্রথম শ্বেত মণ্ডল তাহার মধ্যে কৃষ্ণমণ্ডল এবং তন্মধ্যে দৃষ্টিমণ্ডল। সর্ববহিস্থিত মণ্ডলের নাম শ্বেত মণ্ডল।

শ্বেতমণ্ডল—ইহা অতি কঠিন ও ঘন সূত্রে নির্মিত। ইহা চক্ষু মণ্ডলের প্রায় পাঁচভাগের ৪ ভাগ বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। সম্মুখস্থ অপর পঞ্চমাংশ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও নির্মল। এই সম্মুখস্থ গোস্তনাকার অংশের নাম গোস্তন। এই সর্ববহিস্থ স্তরের স্বকণ্ঠলি রসবাহিনী ধমনীদ্বারা নির্মিত; রক্তবাহিনী ধমনীও ইহাতে প্রবেশ করে একথা কেহ কেন বলেন। এবং ইহাতে যে দ্রব পদার্থ রহিয়াছে, তাহা স্বচ্ছ রস, এই রসের স্বাদ ক্ষীণ লবণাক্ত এই রস

স্বচ্ছ বলিয়াই গোস্তনটা ওরূপ সূক্ষ্মর দেখায়। যদিও এই স্বচ্ছরসের সহিত শোণিত মিশ্রিত নহে, তথাপি উহাকে কখন কখন রক্তবর্ণ হইতে দেখা যায়।

কৃষ্ণমণ্ডল—এই আবরণটা কৃষ্ণ বর্ণ পদার্থে পরিপূর্ণ, ইহা শোণিতে রই অংশ, অত্যন্ত আগ্নেয়, কারণ দেখা যায় যে, ইহা দ্বারা সমগ্র দৃষ্টিমণ্ডল উত্তপ্ত থাকে। কৃষ্ণ বর্ণের পদার্থ গুলি শোণিতের অংশ হইলেও উহাতে প্রচুর পরিমাণে বায়ু থাকায় তৎসংযোগে উহার বর্ণও কাল হইয়াছে। এই আবরণটা শ্বেতমণ্ডলে মূলদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া উদ্ভেদে মণ্ডল ও বাহ্য পটল এই উভয়ের সংযোগ স্থলে উপস্থিত হইয়াছে। এবং ইহারই একটা অংশ আরও অগ্রসর হইয়া মাংস পটলকে সর্বতোভাবে উদ্ভেদে ও নিম্নে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহা দ্বারা এই উদ্ভেদ সাধিত হয় যে, যে সকল ভীক্সরম্মি অতি-মাত্রায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নয়নাধিষ্টানকে অভিভূত করে, তাহাদিগকে শোষণ করে।

মাংসপটল—ইহা গোলাকার কুঞ্চলীল পেশী বিশেষ। ইহার মধ্যস্থলে গোলাকার একটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়, ইহার নাম দৈব ছিদ্র। মাংস পটল মেদঃ পটলের সম্মুখ গায়ে সংলগ্ন হইয়া অবস্থিত করে। ইহার বাহ্য ধার গোস্তন শ্বেতমণ্ডল ও কৃষ্ণমণ্ডলের আবরণটির সন্ধিস্থলে। ইহাতে কতকগুলি পিণ্ড শোণিত বাহী এবং মেদো বাহী স্রোত এবং কণ্ডার দৃষ্ট হয়। ইহার ভিতর দিয়া আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ ইহারই সম্মুখ ও পশ্চাত্তাণে কৃষ্ণবর্ণের একটা পর্দা সংলগ্ন রহিয়াছে। বাহিরের অতিরিক্ত আলোক গোস্তনের ভিতর প্রবেশ করিবারাত্র তাহার কতকাংশ এই কৃষ্ণবর্ণের পর্দা শোষণ

করিয়া লয়। সূত্রাং পরিমিত আলোকই দৈব ছিদ্র দ্বারা প্রবেশ করিয়া থাকে। এবং ইহা আলোকরশ্মিকে বিপথে গমন করিতে দেয় না। এই পটলটী নিম্নভাগে দূষিত হইলে সমোপস্থ বস্তু এবং উর্দ্ধভাগে দূষিত হইলে দূরস্থ বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্থাৎ দূরদর্শন বা নিকটদর্শন পক্ষে মাংস পটলই কারণ। এই মাংসপেশী কুক্ষিত হইলেই দৃষ্টিমণ্ডল কুক্ষিত হয় এবং ইহার প্রসারনই দৃষ্টিমণ্ডল প্রসারিত হয়। নানা-কাবণে দৃষ্টিমণ্ডল কুক্ষিত ও প্রসারিত হয়।

দৃষ্টিমণ্ডল—ইহা মেদোবাহি স্রোতঃ দ্বারা নির্মিত। শৃঙ্গাটকসিরা চক্ষুর পশ্চাদেশ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে বিস্তৃত হইয়া দৃষ্টিমণ্ডল এই সংজ্ঞা লাভ করে। ইহাতে মশক, মক্ষিকা, মণ্ডলাকার, পতাকা সদৃশ, নক্ষত্র সদৃশ, জালকের স্থায় নানাপ্রকার দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নেত্রগোলকের সমস্ত অভ্যন্তরপ্রদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। দেখা যায় যে, দৃষ্টিমণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডলের ক্রোড় দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া গুরু মণ্ডল ও কৃষ্ণ মণ্ডলের সন্ধি স্থলে মিলিত রহিয়াছে। এবং তথা হইতে মাংস পটলের নিম্নদেশে উপস্থিত হইয়া দৈবছিদ্র পর্যন্ত আসিয়াছে। এই অংশটীর নাম মেদঃ পটল। মেদঃ পটল মাংস পটলেরই নিম্নগাত্রে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এখান হইতে দৃষ্টিমণ্ডলের, সমস্ত নিম্নপ্রদেশই মেদোময়। কালকাস্থি, ইহাই দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান। যদিও সমস্ত নেত্রগোলকেই দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান বলা যাইতে পারে, তথাপি পূর্বোক্ত অভ্যন্তর হান অপেক্ষা এই পটলই প্রধান বলিয়া

ইহাকে দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান বলা যায়। কালকাস্থি একটা মেদঃ পূর্ণ কুপের উপরিভাগে অবস্থিত। ইহা ক্ষুদ্র এবং কিঞ্চিৎ ঘন স্থত্রাকার অস্থি পদার্থ হইতে নির্মিত। ইহার পরিমাণ মাংসপটলের এক সমুদায়। ইহার সমস্ত উপরিভাগ একখানি গাঢ় নীলবর্ণ পর্দা দ্বারা আবৃত। এই অস্থিখণ্ডের মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ চাপা হইতে পারে। ইহা হইতে অগ্নি শিখার স্থায় একটা আলোক রশ্মি নির্গত হয়, তদ্বারা নেত্রগোলকের সমস্ত অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র পল্লবের উপরিভাগ টিপিলে উহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অন্ধকারে পশুদিগের প্রশস্তচক্ষে অথবা বিড়ালের চক্ষে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এই দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে কোনরূপ আলোক পড়িবা-নাত ইহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এবং সেই সময় তারকা কুক্ষিত হয়। উপরোক্ত মাংস পটলের কৃষ্ণবর্ণ পর্দাখানা নিম্নদিকে ক্রমে ক্রমে আরও ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়া কালকাস্থিতে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের সারভাগ, বাহ্য মাংস পটলের নিম্নভাগের স্রোতের মধ্যে প্রসৃত হয় তাহাই কালকাস্থিতে প্রবেশ করিয়া তারকানামে অভিহিত হয়। এই উজ্জ্বল তারকাই বস্তুর সমস্ত রূপ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ধর্ম শৃঙ্গাটক শিরাদ্বারা মস্তকে প্রেরণ করে। এই কালকাস্থির গাঢ় নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আঘের, সূত্রাং অত্যন্ত উজ্জ্বল। এই নীল বর্ণ পদার্থ ব্যতীত নরন গোলাকে যে নানাবিধ রস দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বারা নেত্র বুদ্ধদের সমস্ত অভ্যন্তর প্রদেশ পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার সকলেই স্নেহধর্মী অর্থাৎ দীপ্ত। যদি

এইরূপ না হইত তবে কালকাস্থিগত ঐ পিত্ত নয়ন গোলককে দৃষ্ট করিয়া ফেলিত—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। রূপের আলোচন অর্থাৎ গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম আলোচক পিত্ত, এই আলোচক পিত্ত যদি একবার নির্বিক্রমে রূপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলেই সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়, অর্থাৎ দর্শনশক্তি ইহাতেই পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

বস্তুর রূপ গোস্তনের ভিতর দিয়া কাল কাস্থি এবং তথা হইতে কাল কাস্থি ভিতর দিয়া শৃঙ্গটিক শিরার অগ্রভাগ এবং শৃঙ্গটিক শিরাদ্বারা ঐ রূপের বহন কার্যে পথিমধ্যে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় না। দেখা যায় যে পরিষ্কার জল উজ্জলকায় অথবা তত্তুল্য পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক প্রবেশ করিলে যতক্ষণ না উহা বাধা প্রাপ্ত হইবে, ততক্ষণ উহা প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবেনা। যেমন বাধা প্রাপ্ত হইবে—অমনি উহা ঘুরিয়া দাঁড়াইবে, ইহার নাম প্রতিবিম্ব। প্রতি অর্থাৎ বিপরীত ভাবাপন্ন, বিম্ব অর্থাৎ প্রতিকৃতি, তাহাই প্রতিবিম্ব। চক্ষুতে আলোক প্রবেশ করিলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে উপস্থিত হইবার পূর্বে অথবা পরে কোন স্থানে উহা বাধা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং প্রতিবিম্ব গ্রহণের কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব আমরা যে সকল দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি, তাহা বিপরীত ভাবে দর্শন করি না। স্বাভাবিক অবস্থাই দর্শন করিয়া থাকি।

পূর্বে যে মাংস পটলের উপরিভাগে একখানি পর্দা বা জরায়ুর কথা বলা হইয়াছে, বাহার উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ, উহার নাম কৃষ্ণ বক। ঐ কৃষ্ণবক মাংস পটলের গায়ে

সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। উহাতে দুই প্রকার স্রোতঃ দেখা যায়—শ্লেষ্মাবাহি ও পিত্তবাহি। তন্মধ্যে কোন কারণে পিত্তবাহি স্রোতঃ উত্তেজিত হইলে চক্ষুর তারকা কুঞ্চিত হয়, এবং শ্লেষ্মাবাহি স্রোতে শ্লেষ্মিক অংশ বৃদ্ধি পাইলে চক্ষু প্রশস্ত হয়।

এস্থলে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রত্যেক চক্ষুর ভিতরে একটা বস্তুর স্বতন্ত্র রূপ প্রবেশ করায় আমরা একটা বস্তুকে দুইটা কেন দেখি না। উত্তর এই যে, শৃঙ্গটিক শিরা একটা, দুইটা অথবা তিনটাকিঞ্চ শস্যটাক চক্ষু দ্বারায় একই রূপ প্রবেশ করিলেও শৃঙ্গটিক শিরা একই রূপ দ্বারা অভিন্নরূপে ভাবিত হওয়ার একই ধর্মকে বহন করে। সুতরাং একটা বস্তুর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ দুইটা চক্ষুদ্বারা প্রবেশ করিলেও আমরা একটা বস্তুর দুইটা রূপ দেখি না। ইন্দ্রিয়বাহী ধমনীগণ যদিও পদার্থের রূপ বহন করিয়া মস্তিষ্ক মধ্যে লইয়া যায় না, কিন্তু রূপের দ্বারা তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে, এবং সেই পরিবর্তিত অবস্থা অভিন্ন রূপ হওয়ায় দুইটা চক্ষু দ্বারা অভিন্ন রূপ দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এই বুঝিলাম যে, পদার্থ হইতে আলোকরশ্মি নিঃসৃত হইয়া নির্মল গোস্তনের ভিতর দিয়া দৈবচ্ছিন্ন দ্বারা কালকাস্থিতে উপস্থিত হয়। এবং সেই মুহূর্ত্তেই কাল কাস্থির ভিতর দিয়া সরল রেখাভিমুখে আরও অগ্রসর হইয়া একেবারে শৃঙ্গটিক শিরার মুখে উপস্থিত হইয়া তত্তৎ পদার্থের বিশেষ ধর্মকে বস্তুকে প্রেরণ করে। সুতরাং প্রকৃত দর্শন জ্ঞান মস্তকেই হইয়া থাকে। পদার্থ হইতে আলোকরশ্মি নিঃসৃত হইয়া শৃঙ্গটিক শিরার দ্বারা মস্তিষ্ক বিদিত হওয়ায়

উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল তদ্বারা  
শৃঙ্গটিক শিরা ভাবিত হইতে পারে, সুতরাং

আমরা বস্তুর প্রকৃত রূপই দর্শন করিয়া থাকি,  
প্রতিবিম্ব নহে।

শ্রীহরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ,  
কবিভূষণ।

## স্বাস্থ্যতত্ত্বে বৈধব্য ধর্ম।

—:—

ভগবানের বিশাল বিরাট অবনীমণ্ডলে  
ভারতবর্ষের “বৈধব্য ধর্ম” স্বাস্থ্যরক্ষার  
পক্ষে অদ্বিতীয়। এমন গবেষণাপূর্ণ উচ্চ  
বৈজ্ঞানিক-স্বাবস্থা অত্র কোন দেশে কোন  
জাতির মধ্যে নাই। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে  
আধুনিক কি পুরুষ—কি স্ত্রীলোক—প্রায় সকলেই  
এহেন সুপ্রতিষ্ঠিত সাধুপ্রথার বিরুদ্ধে নানা  
প্রকার জুহুটভঙ্গী ও নিন্দাবাদ এবং ব্যঙ্গ-  
বিদ্রূপ করিতে মুক্তকণ্ঠ! নব্যশিক্ষিত পুরুষ  
গণের মধ্যে অধিকাংশই বৈধব্যধর্মকে নিতান্ত  
কষ্টকর এবং অবিচারজনিত কুপ্রথা বলিয়া ঘৃণা  
করতঃ তাঁহাদের উদার দয়ার-দ্বার উদ্ঘাটনে  
বাস্তব ন। সেজন্ত সনাতন যতি ধর্মাবলম্বিনী  
বিধবাদিগণের বিবাহ দিতেও বন্ধপরিকর।  
আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রমণী সমাজও  
ইহার স্বাস্থ্যজনকতা ও ধার্মিকতা এবং পরম  
বিক্রতা বৃদ্ধিতে না শিথিয়া নানা প্রকার  
বরজিভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ বৈধব্য  
যেন মহা পাপের ফল এবং বৈধব্য ধর্ম যেন  
নিতান্ত দুশিত কুকার্য ও কষ্টদায়ক;—কারণ  
প্রত্যহ মাজিত বস্ত্রনাম রান্না করিয়া এক  
স্নানাত্র স্নাপক আহার, স্নত সৈন্ধববৃত্তভোজনে  
দৈবদায়ণ, মংস্ত্র, মাংস ও পথ্য সিত দ্রব্য তিন  
বার আহার করিতে না পারা, একাদশী প্রভৃতি  
পূর্ণপ্রকার পক্ষে উপবাস করিতে বাধ্য থাকা,  
শয্যভোগ পরিত্যাগে সন্তানিনী মাজিতা জীবন যাপন,  
শ্রমোজ্ঞের চরিতার্থে বস্ত্রিত থাকা,—ইত্যাদি

বৈশাখ—৪

আচরণ নিতান্ত দুঃখজনক।—ইহার পরিবর্তে  
উচ্ছিষ্ট মুৎপাত্রে রান্না করিয়া বা পথ্য সিত  
রাখিয়া তিন চারিবার প্রেতাহার, পলাপু,  
পাঙ্গালবগাদি জাতিহুট কদাহার, মংস্ত্র, মাংস  
প্রভৃতি কদর্য্য বস্ত্র এবং পুতিগন্ধবৃত্ত  
ইত্যাদি রান্নাসাহার, অহুপবাস, অধোতপদ  
উড়িয়া প্রভৃতি যাহার তাহার আশ্রয়হুট আহাৰ্য্য  
গ্রহণ, আর সর্বদা অভরণ মণ্ডিতা ও ল্যাভেণ্ডার  
আপ্পুতা এবং তাহুলরঞ্জিতা বিলাসিনী সাজিয়া  
কামপূর্ণ অন্তঃকরণে জীবন যাপনই পরম সুখ-  
কর এবং ইহাই যেন জগতের সার সর্বস্ব মঙ্গল-  
জনক। এতাদৃশ ধারণাতেই যতিধর্মের মানিকর  
ব্যবহার দেশের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে।

আধুনিক পুরুষ এবং সধবা সম্প্রদায়ের  
প্রাণ্ডুররূপ ভ্রান্তধারণা বন্ধমূল থাকার সরলা  
বিধবা রমণীগণের স্ব স্ব জীবনের প্রতী নিতান্ত  
দুঃখ ও বিরক্তি এবং কদাচিত কোথাও বা  
স্বধবার আচরণ গোপন প্রবৃত্তি উপস্থিত হওয়ার  
সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। তা' ছাড়া যতিধর্ম  
যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং তদ্বারা যে স্বীয় স্বামী এমন  
কি ভগবানকে পর্য্যন্ত লাভ করিবার বিশেষ  
সম্ভাবনা, তাহা না বুঝিয়া নিতান্ত নিকৃৎসাহ-  
পূর্ণচিত্তে স্বীয়কর্তব্যে অনাহা উপস্থিত হওয়া  
বড়ই দুঃখের কথা। এই কারণে বৈধব্য ধর্ম  
সর্বদা কথঞ্চিৎ আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়া  
হিন্দুধর্মের সহমরণের স্বব্যবস্থা থাকিলেও  
সংসারের সর্ব স্বর্থ রক্ষার জন্যে স্বধবার আশ্রয়

সমৃদ্ধল রাখিবার জন্য, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকে উচ্চতর আসন প্রদান করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যকেই যতিধর্ম্ম বলে। এই ধর্ম্মে স্মরণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি অষ্টবিধ মৈথুনাভাব এত স্থির রাখিবার নিমিত্ত এবং স্বাস্থ্যকে অক্ষুন্ন রাখিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবার জন্ত ও দীর্ঘজীবন লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল আচার ব্যবহার, ব্রত উপবাসাদি করিবার বিধি হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা শাস্ত্রের সহৃদয়তা স্পন্দরূপেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ সহমৃত্যু রমণীর অপেক্ষা প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর আসন উচ্চতর, যেহেতু সহ-মৃত্যুর ধর্ম্ম সকাম আর ব্রহ্মচারিণীর ধর্ম্ম নিকাম। স্বামীবিয়োগে মরণোত্তর সত্ত্বীর দেহ ও মনের যে অবস্থা ঘটিবার কথা, প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর মনেরও ঠিক সেই অবস্থাই ঘটয়া থাকে। কিন্তু ইহার এতদূর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা যে, সম্ভান সন্ততি ও গুরুজনের মুখ চাহিয়া তাহাদের কষ্ট এবং সাংসারিক বিশৃঙ্খলতার চিন্তায় পাষাণে বুরু বাঁধিয়া ও তাহাদের উপকারে বিধবাগণ জীবনোৎসর্গ করেন।

হিন্দু বিধবার স্বামী বিরোধ, জনিত শোক  
 বাহা সাগর অপেক্ষা গভীর এবং হিমাত্রি  
 অপেক্ষা স্কন্ধতর এবং গগনাপেক্ষা বিস্তৃত—  
 তাহাই উপশমের কোশল স্বরূপে হিন্দু সমাজ  
 যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু বিধবার  
 বাহ্যোন্নতির ব্যবস্থা বিশেষরূপে জড়িত।  
 এবং তাহারই ফলে পরিবারবর্গের রোগপরি-  
 চ্ছায়া ঔষাদিগের অহার নিদ্রা পরিভ্যাগ,  
 সিব্যাবস্থা অক্লান্ত পরিশ্রম, সকলই লভ্যবপন  
 হইয়া থাকে। জিতেজিয়া ও নিকামী হিন্দু  
 বিধবা-জিহ্না সদা-রমণী বা পুরুষের শক্তি,  
 অধ্যবসায় এবং উৎসাহ সমান ভাবে জ্বলিতে

পারে না? ফল কথা জিকালদর্শী প্লাবিগণ  
বিধবাদিগের ধর্ম পালনে যে স্বাস্থ্যরক্ষার  
ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই  
চমৎকার। ইহা সমাজের কল্যাণকর এবং সহ-  
মরণোপেক্ষা অধিকতর উপকারী।

মানব সহস্র সহস্র জন্ম সাধনা করিয়া  
 নিষ্কামধর্ম লাভ করিতে পারে কিনা সন্দেহ।  
 সনাতন বৈধব্য ধর্ম নিবৃত্তিমূলক, ইহা প্রবৃত্তি  
 মূলক নহে এই ধর্ম পালনে পরার্থ স্বর্গীয় সুখ  
 শান্তি ও সুন্দর স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয়  
 এই ধর্ম পালনে যে তৃপ্তি, তাহা আনন্দ বা ভোগ  
 বিলাসের জন্ত নহে, সংযমের জন্ত। এ স্থলে  
 ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই নিবৃত্তি মাগ  
 বা সংযমের পথ কেবল মোক্ষ প্রাপ্তির হেতু  
 ভূত। আগে হিন্দু সমাজে প্রথম শিক্ষারস্ত্র ভিত্তি  
 হইতেই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন দ্বারা মহাব্যবের  
 সংস্থাপন করা হইত, তপস্বী ও যোগাভ্যাস  
 প্রভৃতি মানব জন্মের প্রকৃত কর্ম সকল স্ত্রী-  
 পুরুষ উভয়ের জন্তই ব্যবস্থা ছিল। সংযম,  
 কঠোরতার সহিত ইন্দ্রিয় নিগ্রহের ব্যবস্থা,  
 উহা সধবা, বিধবা, স্ত্রী, পুরুষ সকলের জন্তই  
 নির্দিষ্ট ছিল। আধুনিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি  
 হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজবন্ধনকে ছিন্ন করিতে  
 প্রয়াসী। কিন্তু তাঁহাদের বোঝা উচিত যে,  
 আমাদের ধর্মশাস্ত্র স্বাস্থ্য লইয়াই নিষিদ্ধ।  
 এ ধর্মের অপলাপ করা—অনভিজ্ঞতা।  
 বিবেক-বিহীনতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে।

যুগধর্মে, বিজাতীর অমুকরণ প্রভা  
 হিন্দু সমাজে বিলাস বাসনা ও ভোগ কাম  
 রাহুর-করাল এসে নির্ধন ব্রহ্মচর্যের বৈধ  
 যক্ষ ভূপ হস্তমথের হওনাতই হিন্দু সোণি  
 গালগার, মদ্যপান, দুনিয়াহ, কাম  
 অবজ্ঞারী হুগার কাম শেখারী

প্রকার ছরারোগ্য রোগ, শোক, তাপ, জ্বালায় হিন্দু জীবন অশান্তিময়, দেহ রোগের আধার, পরমাধু ক্ষয় এবং অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। কি যে বিষম দুর্লভ ও কি মৃত্যু এবং অপরিণামদর্শিতায় হিন্দু সমাজ অচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও বিভ্রান্ত হইতে হয়। দক্ষোন্মুখ গৃহে সুশীতল জল সেচনের পরিবর্তে কুস্তপূর্ণ দ্ব্যত চালিবার ব্যবস্থা চলিতেছে।

বর্তমান হিন্দুজাতি প্রায় সহস্র বৎসরের কুসংসর্গে অনেকেই পশুবৎ ইন্দ্রিয় পরায়ণ, উচ্ছৃঙ্খল এবং—অধঃপতিত। কাজেই ব্রহ্মচর্য্যেব সম্মান বুঝিবার শক্তি হারাইয়াছে। সেই ভীষণ পাপের ফলেই দেশব্যাপী রোগ, শোক, অকাল মৃত্যু ও ছঃখ দৈন্ত প্রভৃতি নানাবিধ সহনীয় ক্লেশের এতাদৃশ প্রাচুর্য্য।

যে দেশে একদিন শিবানী, সাবিত্রী, সীতা এবং দময়ন্তী প্রভৃতি বহু সতী, আর লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, অর্জুন এবং জরৎকার প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণ জন্মলাভ করিয়াছিলেন, আজকাল সেই দেশের ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় মাসিক পত্রিকায় আলোচনা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হয়—ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে ?

বর্তমান কালের পুরুষোচিত জী শিক্ষায় স্বর্গীয় ভাব বিনাশ করিতেছে। পুরুষ বর্গের হুশিক্ষার ফলে রমণীগণের আত্ম সুখাকাঙ্ক্ষা-জনিত স্বার্থপরতায় বাকালী সমাজকে ধ্বংস করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে। নাটক নভেলের পোকা এবং বিলাস ভোগের কুন্দি হইয়া আধুনিক অবিকাংশ রমণীগণ সম্ভ্রামপালিন বা ঘামীসেবা কিম্বা রোগী পরিচর্যা, অতিথি সেবা প্রভৃতি সংকর্য্যের অবসর পান না। প্রাচীন কালে গৃহিণীগণ—রোগী-অতি-

কার বিষয়ে কত সহজ ও সুন্দর মুষ্টিযোগ বা অস্ত্রাস্ত্র উপায় পরিজ্ঞাত ছিলেন, কত দ্রব্যগুণ জানিতেন বাহাতে গৃহাঙ্গনস্থিত গুল্মলতা দ্বারায়ই ডাক্তার খরচা বাঁচিয়া যাইত, এখন তাহার পরিবর্তে রমণীগণ—নাটক, নভেল, ইতিহাস, ভূগোল-পড়া, আর দেশ বিদেশে প্রত্যাহ পত্র লিখিয়া পোষ্টাফিস খরচার দায়ে কর্তাকে বিপন্ন করিতে অভ্যস্ত ! তাহাতে না হয় ইহকালের কাজ, না হয় পরকালের কাজ। পূর্বে দেখিয়াছি—কোন বাড়ীতে কোন বৃহৎ ব্যাপার হইলেও গ্রাম্য স্ত্রীলোকেই রন্ধনপরিবেশনাদি সম্পন্ন করিতেন, গৃহে ত কথাই নাই। এখন স্ত্রীলোকের রন্ধন অভ্যাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত কুলশীল অপবিত্র মলিন পাচক এখন পাকের ও পরিবেশনের কর্তা। সেই কদর্যা অন্নগ্রহণে দেহ ক্ষীণ ও রুগ্ন এবং ক্ষুধীহীন হইতেছে। বর্তমান জীশিক্ষায় এমনি কুফল প্রসব করিয়াছে। আর গৃহে গৃহে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা এককালেই নাই। সে সব স্থান এখন ইংরাজী ছাঁচেচালা নাটক-নভেল অধিকার করিয়াছে।

তাই বলি হে হিন্দু সম্ভ্রামগণ ! এখনও যদি অশেষ অকল্যাণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করতঃ স্বাস্থ্য ও সুখসম্পন্ন হইতে চাও, নিজে বাঁচিতে ও দেশকে বাঁচাইতে চাও, তবে আবার সেই সনাতন পথে প্রত্যাবর্তন কর ! হুপথের অনেক দূর চলিয়া গিয়াছ, এখনও স্ব স্ব পুত্র-কন্যাপুত্রকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও, প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী—সতী। রমণীদিগকে আবার সেই সতী ধর্মের শিক্ষা প্রদান কর। দেবর্জুন, গুহজল সেবা, রোগী-ভজনা, নীনে

দ্বারা, অন্নহীনকে অন্ন এবং বস্ত্র হীনকে বস্ত্র দান,  
নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান প্রভৃতি সং শিক্ষা  
দিতে সচেষ্ট হও। বৈধব্য ধর্মচারিণীর শ্রায়  
আদর্শ শিক্ষয়িত্রী জগতে আর কোন স্থানেই  
মিলিবে না। অপবিত্র মনকে পবিত্র করিবার,  
চিত্ত শুদ্ধি করিবার অব্যর্থ মহৌষধ যে ব্রহ্মচর্যা

পালন—ইহা প্রত্যেককে বুঝাইয়া দাও।  
 পুরুষকার, তেজ, বীৰ্য্য ও লাভণ্য—ব্রহ্মচর্য্য  
 হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ বংশধর না  
 জন্মিলে হিন্দুস্থানের কল্যাণ সাধন সংঘটিত  
 হইতে পারিবে না। যদি মঙ্গল কামনা কর,  
 তবে এখনো পথে এস।

শ্রীমলিনী নাথ মজুমদার ।

$$\frac{0}{0} \quad 0 \quad \frac{0}{0}$$

## সেকাল ও একাল ।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয় কিছুতেই আমাকে ছাড়িতেছেন না। আমি তাঁহাকে শতবার নিবেদন করিয়াছি যে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আমি একেবারে অনভিজ্ঞ; সাধারণ জ্ঞানও আমার নিতান্তই তুচ্ছ—যাহা বলিবার তাহা পূর্বেই বলিয়া ফেলিয়াছি, এখন যদি কিছু বলিতে হয়, তাহা হয় পুনরাবৃত্তি, না হয় কথিত বিষয়ের উদাহরণ। সাধারণতঃ মানুষ দুই একটা কথাই বলিতে আসে—সেই দুই একটা কথাকে যেষ্টন করিয়াই তাহার মৌলিকতা লতাইয়া উঠে। তা'রপরও যদি সে কিছু বলে—তবে তাহা ঐ মৌলিকতাকে পরিপোষণ করিবার অল্প নিদর্শন প্রদান মাত্র। কিন্তু কবিরঞ্জন মহাশয় তথাপি আমাকে দিয়া পত্রিকার পত্রাঙ্ক পূরণ করিতে চাহেন। তিনি নিজে বিজ্ঞ,—অভিজ্ঞ সম্পাদক, কিন্তু অজ্ঞের দৃঃখ বোধেন না।

“চির-স্থায়ী জ্ঞান, ভ্রমে কি কখন।

ব্যথিত বেদন বৃদ্ধিতে পারে ১০

তাঁহার মত মহীমানের এ আগ্রহে আমার মনে  
 একটু আনন্দ সঞ্চার হয়। আমার মনে হয়—  
 আমার জ্ঞান যতই তুচ্ছ হউক,—বলিবার শক্তি  
 যতই কম হউক,—আমার বক্তব্য, আমার  
 উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ। এ মহত্বের গৌরব আমার  
 নহে,—এ গৌরব তাঁ'র,—যিনি আমার মধ্য  
 দিয়া তাঁহার অভাব অভিযোগ ভারতবাসীকে  
 পাঠাইতেছেন—এ গৌরব সেই ভারতমাতার।  
 ভারতমাতা তাঁহার সম্মান মণ্ডলীকে কাদিয়া  
 বলিতেছেন,—“দেখরে দীন, দেখরে পতিত,  
 দেখরে শীর্ণমান; দেখে তোর উৎপত্তি, তোর  
 অতীত—কত সমুজল। এ অতীতকে পুনর-  
 দ্বাপিতকর। তোর দৈন্ত্য, আমার দুঃখ—ভরে  
 পলায়ন করিবে। ওরে আমার আদর্শ আমার  
 যত হিতকর, পরের আদর্শ কি তার শতাংশের  
 একাংশও হইতে পারে? আমার অতীত ত  
 হীন ছিল না? তবে কেন আধুনিকতা তাহাকে  
 মুছিয়া ফেলিতে চায়? অমায়িক রাখে? দুর্ভাগ্য  
 নতন তুচ্ছকে রাখুক তুচ্ছ। পাইরা পুরাতন  
 সমাজকে রাখি। গিরি : নতন বিপ্লবকে



প্রথম, চঞ্চল ও সমুখবর্তী। অজ্ঞানবৃত্তাবৃত্তঃ ভাবপ্রবণ, কাজেই সে এই চঞ্চলতা—এই প্রখরতাকেই আশ্রয় করে, এই সমুখবর্তীকেই বরণ করে। কিন্তু জ্ঞানী—পুরাতনকেই ভালবাসে, কারণ পুরাতন প্রায়শঃই সাম্য, গম্ভীর ও পরীক্ষিত বলিয়া বিস্তৃত,—অসত্যের চাঞ্চল্য তা’তে নাই, সত্যের স্থিরতা ও বিনয় তাহাকে মৌন করিয়া পশ্চাদমুখবর্তী করিয়া রাখিয়াছে। সময়ে সময়ে পুরাতনকে পরিবর্তন করিতে হইতে পারে, কিন্তু এ পরিবর্তন বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ হওয়া বিধেয়। কিন্তু ছুপের বিষয়, অনুকরণ ও চাঞ্চল্যের যুগে ভবিষ্যৎ অবসর নাই,—শুদ্ধ চলিবার, ধাইবার—মতিবার উৎসাহ আছে।

বলবীর্যের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ আজি যে রুগ্ন, শীর্ণ, খর্ব্ব—তাহার মধ্যেও এই আধুনিকতা, এই অনুকরণের ঘৃণা প্রবৃত্তি। জীবন-যাপন একটা মহাসংগ্রাম। এখানে বলীয়ানের জয়, মৌলিকতা ও প্রতিভার স্বায়ত্ত শাসন। ছুপিত, শ্রান অশক্তের এখানে স্থান নাই। মৌলিকতা এখানে রাজত্ব করে, অনুকরণ ভিক্ষা করিয়া মরে। এ জগতে চিরকালই দানের সম্মান, গ্রহণের নহে। এক সময়ে ভারতমাতা সমস্ত পৃথিবীকে তাঁ’র জ্ঞানসুত্ত দান করিয়াছিলেন; তাই সে সময়ে সম্মানে তিনি জগতে শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর তিনি কিছু দিতে পারেন না;—গ্রহণ করিয়াই তিনি তৃপ্ত; তাই তিনি আজ আহত, দগিত। আজও যদি কেহ এনিবেশান্তের মত ভারতভূমিকে গ্লানী কবেন, তবে তাঁহার অশেষ মাতৃভক্তি বলিতে হইবে। সন্তত্যাগের পরও মাতৃভক্তি অটুট থাকে, তিনি নিশ্চয়ই পঞ্চাদি

ইতর প্রাণী-সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নহেন, তিনি অতিমানুষ।

আমাদের অতীতের জন্ত এ ক্রন্দন কত যথার্থ তাহা একদিন আমাদের কি ছিল—আর আজ আমাদের কি নাই—ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারি। মাননীয় সম্পাদকের একান্ত ইচ্ছায় আজ আমি এই চিএটাই অঙ্কিত করিব। বাস্তবিক চিত্রের শক্তি অশেষ। এ কিছু বলে না, অথচ স্তম্ভরূপে সবটা বুঝাইয়া দেয়। শ্রেষ্ঠ কবিতার মত এ একেবারেই গিয়া মর্মে আঘাত করিয়া, আমাদের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে বহিমুখী করিয়া কর্মক্ষেত্রে নামাইয়া আনিতে চায়। উপদেশ অপেক্ষা যে উদাহরণ শ্রেয়ঃ—চিত্রই তাহার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

‘আমাদের সেকালে একটু মোটা, সোজা অথচ স্থায়ী জিনিসের বেশী আদর ছিল, কিন্তু একালে আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি—উজ্জল অথচ ক্ষণভঙ্গুরকে,—মিহি অথচ অস্থায়ীকে। এই চাকচিক্যের প্রতি সম্মান আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে। আগে এক কাশীন কিছু বেশী ব্যয়ে অনেক দিনের সুযোগ হইত, এখন বহুব্যয়ের স্বল্পব্যয়ে নিত্য নূতন জিনিসের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আগে সোনা-রূপা-পিতলকাঁসার জিনিসের দাম অবশ্য কিছু বেশী ছিল, কিন্তু এগুলি স্থায়ী হইত—অনেকদিন। আজকালের কাঁচের বাসন, বিড়কের বোতাম কম দামে পাওয়া যায়, কিন্তু নষ্ট হয় খুব সহজে। কাজেই মাসে মাসেই নূতনের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুশতঃ ব্যয়টা অস্থায়ী সামগ্রীতেই বেশী লাগে। খান-জমতেও ঐ কথা খাটে। আগে খাইতাম—মুগ্যান ও পুষ্টিকর স্বতঃ স্বতঃ, চক্কো, জোখা,

লেহা, পেয়, এখন খাই ছই পয়সার গরম চা, এক পয়সার আঠার'ভাজা। ফলে যত রকম বাজে ও নকল মাল, যত রকম জাল জুয়াচুরি ও শঠতার আবির্ভাব হইয়াছে। বিদেশী—আমাদের উপর আমাদের এই আপাতমনোরমের প্রতি অহরন্তর স্রবিতা লইতেছে; কৃত্রিম স্নাত, কুকুর, গাধা, শূকরের ছদ্ম, গিল্টি করা চক্চকে গহনা, হাওয়ায় ছিঁড়ে—এমন কুরকুরে পোষাক অল্পদামে সরবরাহ করিয়া আমাদেরকে রুগ্ন ও দুস্থ ও নিজেদিগকে ধন্য ও ধনী করিতেছে। বরিশালের গীতি কবি মুকুন্দ দাসের গান সার্থক :—

‘খেতে ভাত সোনার খালে,

now satisfied steelএর খালে,

তোমার মত মূর্থ কি আর দ্বিতীয়টি মিলে?’  
আমাদের আদি মোটা ও স্থায়ী জিনিস অনাদরের তাপে শুকাইয়া গিয়াছে। তাই এই মহাসমরের দুর্ঘটলার দিনে আমরা অনেকে যখন আমাদের সেই নিজস্বকে খুঁজিয়াছিলাম—তখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তা’র জীর্ণ কঙ্কাল ব্যতীত আর কিছুই পাই নাই। বাণিজ্যের এই হ্রাস আমাদের অর্থ কমাইয়া দিয়াছে। বিদেশীয় চাকচিক্যের প্রতি এই সমাদর, এই কামনা আমাদের ঐ ক্ষয়িত অর্থ বিদেশে পাঠাইতেছে। এই অশুদ্ধ ও অসারে ভৃষ্টি আমাদেরকে বাবু সাজাইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের বস্ত্র আর কিছুই রাখিতেছ না। কাজেই আমরা ক্ষীণকায়, দুর্বল ও নানারোগের আক্রমণ হইয়া পড়িয়াছি।

মঙ্গল চাহিতে হইলে আমাদের এই স্বকীয় বাণিজ্যকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে, নিজ বিশুদ্ধ বাজের আবার প্রবর্তন

করিতে হইবে। ঘরের জিনিস ঘরে পাইয়া স্বাধীনতার একটা অপূর্ণ আনন্দ ভারতবাসীর মানসিক দৈন্ত্য নিরাকৃত হইয়া যাইবে। পবিত্র আহার বিহারে শারীরিক স্বাস্থ্য আবার ফুটিয়া উঠিবে। আর চিরকালই বা আমাদের মোটা জিনিসে তৃপ্ত থাকিতে হইবে কেন? সর্ববিষয়েই জগতে ক্রোমান্তি ত আছেই। চেষ্টার ফলে আমাদের ঘরেই সুন্দর অথচ বিশুদ্ধ, চিকণ অথচ স্থায়ী, পুষ্টিকর অথচ স্বাস্থ্য জিনিস আমরা পাইতে পারিব। এ গেল সাধারণ জীবনের কথা।

এই অহুকরণ-প্রবৃত্তির ফলে আমাদের নৈতিক আদর্শও যথেষ্ট বদলাইয়া গিয়াছে। অহুকরণের একটা বিষম দোষ এই যে, এ নিজেকেও নষ্ট করে, পরকেও খর্ব করে। এ আপন গৌরবকে ত হারায়া ফেলেই, পরন্তু যে আদর্শের পশ্চাৎ ধাবিত হয়—তাহাকেও ‘খাস্ত’ করিয়া ঘরে আনে। আমাদের নৈতিক আদর্শেও আমরা বিলাতি নীতিকে প্রবর্তিত করিতে চাই, কিন্তু বাহার প্রবর্তন করি—তাহা কিছুই নহে—বিলাতিও নয়, স্বদেশীও নয়। পূর্বেপুরুষ ভিক্ষুকমাত্রকে ভিক্ষা দিতেন। বিলাতি আদর্শ ডাকিয়া করিল—“সমর্থকে ভিক্ষা দিবে না; কারণ উহা indiscriminate charity” ফলে আমরা একেবারেই ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি। বাড়ীর দ্বারে যোগ্য বা অযোগ্য—যে কোন প্রকারের প্রার্থী আসিলেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া, আমরা যেন পরম নৈতিক আনন্দ উপভোগ করি। কাজেই কত প্রকৃত গরীব অর্থাভাবে অনশনে মরিতেছে, কত দুঃখ-কর-রোগে ভুগিয়া পাইতেছে না। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের উৎসাহকে যে কোন শোষণে হারায়া ফেলিয়া

দুগা করিতেন। আমরা পাশ্চাত্য horserace, lottery প্রভৃতিতে টিকেট কিনিয়া বড় সুখী হই। এদিকে প্রতিবাদী হুংসী অনাহারে ওকাইয়া মরে, ওদিকে আমাদেরই অর্থে এক ধনকুবেরের অর্থাধার বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্যেরা হুইই বজায় রাখে; horserace এর যেমন টিকেট কিনে; orphanage এও তেমনই সাহায্য করে। আমরা অমুকরণ কবিত্তে গাইয়া কোন দিকই বজায় রাখিতে পাবি না। তাই আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, —যাঁ'র আদর্শ তা'র ভাল—কেননা তা'র সমাজে, তার দেশে ঐ আদর্শ বেশ খাপ খায়; কিন্তু বিভিন্ন সমাজে, সে আদর্শ সর্বনাশের মূচনা করব।

এবাব ধর্মজীবনের কথা বলিয়া আজিকার মত বিদ্যার লইব। এখানেও অমুকরণের আব হওয়া বহিয়া সব পর্যাসিত করিয়া দিয়াছে। অধুনা এমন অনেক ভারতবাসী আছে—যাহারা চার্চেও যায় না, কৃষ্ণ আন্নাত্ত ভজে না। তাহাদের পক্ষে ধর্ম একেবারে নির্কাসিত। ধর্মজ্ঞান যাহাদের নাই—তাহারা না করিতে পারে—এমন কাজই নাই। এরা না মানে—জড়বাদীর মত ভৌতিক বা প্রাকৃতিক শাসন, না মানে ধর্মের শাসন। বধা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্তও প্রাতঃস্থান করে না, বাসন্যাবন্দনাদির জন্তও না। সুতরাং প্রাতঃস্থানের মঙ্গল তাহার উপভোগ করিতে পারে না। খাণ্ডা-খাণ্ড বিবয়েও তাহাদের সহায়ত্ব সার্বজনীন। তাহার হুনিয়ার সব খায়। সর্বজাতির আদর্শ বহিতে তাহার আহারীয় সংগ্রহ করে। মূল-মান কুট্ট খায়, কিন্তু শূকর বর্জন করে। আবার সম্রাটের বিশেষ শূকর ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত রহে। তাহার কিন্তু কুট্টও খায়, শূকরকেও

অব্যাহতি দেয় না। দেশভেদে যে খাণ্ডা-খাণ্ডের ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা হওয়া উচিত; এটা তাহার বোঝেনা ও মানেনা। কিন্তু ফল যা' দাঁড়ায়—তা' নিতান্ত উভকর নহে। মানুষ-দোষ ক্ষমা করিতে জানে, কিন্তু প্রকৃতি কাহাকেও ক্ষমা করে না। নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ভিক্ষুক হইতে আরম্ভ করিয়া রাজাকে পর্যন্ত ব্যাধিভোগ করিতে হয়।

শেষকথা, একদিন যে আদর্শকে পোষণ করিয়া ভারতবাসী বরণ্য হইয়াছিল, মনে করিতে হইবে—সেই আদর্শই ভারতের পক্ষে হিতকর। সেই আদর্শকেই সর্বান্তঃকরণে গৃহীত করা আমাদের কর্তব্য। অত্বে দেশকাল পাত্রভেদে যে ভিন্ন আদর্শকে বরণ করিয়া উন্নত হইয়াছে, তাহার অমুকরণ করিয়া আমাদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই—কারণ তাহা আমাদের নিজস্ব নহে। নিজস্বকে বড় করিবার জন্তই মানুষ জন্মে—এ সর্বধর্মের কথা। অতএব সকলের নিজস্বকেই আশ্রয় করা উচিত। ইহা স্বার্থ নহে; পরন্তু ইহাই পরার্থপরতার নিদান। উপলব্ধি যেমন আগে নিজের শরীরেই বালুকা জড়াইতে জড়াইতে শেষে এক বিরাট চড়ার সৃষ্টি করে, মানুষও সেইরূপ নিজস্বকে বড় করিতে করিতে সমগ্র জগৎকে আধিগন করে। self-realisation সর্ব-শ্রেষ্ঠধর্ম। charity begins at home—বিশ্বপ্রেমের জন্ম—গৃহকোণেই হইয়া থাকে।

নিজস্বকে বড় করিতে থাকিলে আমরা দেখিব—আমর আমরা মসিত রূপ নহি, আমরা গোরবে, আমরা প্রসারে আত্মকর্তার রূপ আবার উজ্জ্বল হইয়া জগতে আমাদের এক নতুন যুগের প্রতিষ্ঠা করিয়া কুশিলাছে।

## চরকোক্ত পঞ্চকর্ম সাধন।

—:—

হৃক্লল, শোধিত কিংবা অঙ্গদোষ যা'র।  
 মুহু ঔষধ দিবে কোষ্ঠ অজ্ঞাত যাহার ॥  
 অন্নোষধ রারে বারে পীড়াকর নয়।  
 অতি তীক্ষ্ণ প্রয়োগিলে জীবন সংশয় ॥  
 • হৃক্ললীর বহু দোষে দিলে বিরচন।  
 অন্ন অন্ন বহুবারে করিবে অর্পণ ॥  
 ঔষধ মুহুতা হেতু দোষ বিনিঃসৃত।  
 না হইলে প্রাণহানি হইবে নিশ্চিত ॥  
 উর্দ্ধে কফাবৃত হ'য়ে অধোগামী হলে।  
 লজ্জন করিবে, তাহা নাশিয়া কবলে ॥  
 পূর্বাপেক্ষা কফ ক্ষীণ হইলে তৎপরে।  
 বমন প্রয়োগ পুনঃ বৈতগগণ করে ॥  
 বহু দোষ অল্পে অল্পে বিলম্বে স্রাবিত।  
 হ'লে বিরচনে, উষ্ণ জল পানে হিত ॥  
 তাহাতে আখ্যান, তৃষ্ণা, বিবন্ধ অপর।  
 বমি বিদূরিত হ'বে জানিবে সত্ত্বর ॥  
 শোধন ঔষধ যদি দোষে রুদ্ধ নয়।  
 উর্দ্ধ কিবা অধোদিকে নিঃসৃত না হয়,  
 উদগার বা অঙ্গশূল হয় যদি তায়।  
 স্বেদ প্রয়োগেত্র, বিধি জানিও তথায় ॥  
 ঔষধের সঙ্গে যদি উদগার সহিত।  
 বাহিরায় বিরচন হ'লেও বিহিত ॥  
 তবে সে ঔষধ বমি করিয়া ফেলিবে।  
 নহে অতি বিরচন তাহাতে হইবে ॥  
 অতিশয় বিরচন তাতে যদি হয়।  
 শীতল প্রক্রিয়া করি নিবে শুভ চয় ॥  
 কখন ঔষধ বকে কফে রুদ্ধ করে।  
 কফ ক্ষীণ হ'লে প্রাক্তে সন্ধ্যায় বা পরে ॥  
 রুদ্ধ অনাহারে জীর্ণ, ঔষধ হইলে।  
 অজীর্ণে বিষ্টভ্য বাতে উর্দ্ধগত হলে ॥

পুনর্কীর সে ঔষধ স্নেহ ও লবণ।  
 সংযোগে প্রয়োগ করে শ্রেষ্ঠ বৈতগগণ ॥  
 তৃষ্ণা, মোহ, ভ্রম, মুচ্ছা জীর্ণোষধে হয়।  
 পিত্তয়, শীতল স্বাদে ঔষধ দিতে হয় ॥  
 সে সব ঔষধ যদি কফাবৃত রয়।  
 বিষ্টভ্য, লালাছল্লাস লোমহর্ষ হয় ॥  
 তাহাতে তীক্ষ্ণোষ্ণ কটু কফ বিনাশক।  
 ঔষধ প্রয়োগ পুনঃ করিবে তিস্যক ॥  
 স্নিগ্ধ ও জ্বর কোষ্ঠে লজ্জনাদি দিবে।  
 স্নেহ জাত স্নেহা, তার বিবন্ধ নাশিবে ॥  
 রুদ্ধ, বহু কফ, জ্বর কোষ্ঠ দীপ্তানল।  
 বিরচন জীর্ণ করে ব্যাঘ্রামী সকল ॥  
 বস্তি দিয়া পরে এতে দিলে বিরচন।  
 দোষ হরি শীঘ্র তাহা হয় নিঃসরণ ॥  
 রুদ্ধ ভোজী পরিশ্রমী, দীপ্তায়ির দোষ।  
 পরিশ্রম বাতাতপ অনলে নির্দোষ ॥  
 বিরুদ্ধ অজীর্ণহার অধ্যাশন কৃত।  
 পীড়া হলে ঐ উপায়ে হয় প্রশমিত ॥  
 উহাদের স্নেহ বিধি বায়ু রুদ্ধ তরে।  
 বিরচন নাহি দিবে বিনা রোগান্তরে ॥  
 অতি স্নিগ্ধে নাহি দিবে স্নেহ বিরচন ॥  
 মেহোৎক্লিষ্ট দেহে দিবে রুদ্ধ বিরচন ॥  
 ইহা জ্ঞাত হ'য়ে জ্ঞানী দেশ কাল আর।  
 পরিমাণ অনুসারে করিয়া বিচার ॥  
 বিরচন যোগ্য জনে দিলে বিরচন।  
 অপরাধী নাহি হয় সে জন কখন ॥  
 স্ন. প্রয়োগে স্থানসম ভ্রমে বিবন্ধ।  
 কালে যত কফ, পান্ন করিবে ভাব ॥  
 মুহুকোষ্ঠে কিল দিনে সন্ধ্যায় অথবা।  
 লেহপান করি শীতল পান করিবে ॥

সপ্তাহের পরে তারে শ্বেদ দিতে হয় ।  
দেহসাত্বা সপ্তাহান্তে হইবে নিশ্চয় ॥  
দেহ বায়ুনাশ আর দেহ যুহু করে ।

মলের বিবন্ধ নাশ হয় তার পরে ॥  
দেহ প্রয়োগের পরে শ্বেদ দিলে তায় ।  
স্বপ্ন স্রোতে লীন দোষ দ্রব হয়ে বায় ॥  
শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ ।

## আয়ুর্বেদে ওলাউঠা ।

( চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ )

—:~:—

অনেকে বলেন, ম্যালেরিয়ার মত ওলাউঠা রোগও আমাদের দেশে নূতন । ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে এ রোগ আমাদের দেশে ছিল না, ভারত ইংরাজাধিকৃত হওয়ার পর ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা আমাদের দেশে নূতন প্রবেশ করিয়াছে এবং এই জন্তই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই দুইটি রোগের কোনো প্রকার চিকিৎসা নাই ।

যাহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের কথা যে ভ্রমপূর্ণ—তাঁহা আমরা গত বর্ষের “আয়ুর্বেদে” ম্যালেরিয়া বিবয়গী কয়েকটি প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছি । ম্যালেরিয়া নাম আমাদের দেশে—নূতন হইলেও উহা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিখ্যাতের অন্তর্গত—এবং সেই জন্ত আলোপাথিক চিকিৎসায় কুইনাইনের সহায়ত্ব ইহা যাপ্য ভাব অবলম্বন করিলেও আয়ুর্বেদের চিকিৎসায় ইহা সম্পূর্ণ আরোগ্যের ক্ষমতা আছে । ম্যালেরিয়ায় যাহারা নাট্য এবং চরিতাল ঘটিত ঔষধের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা আমাদের এ কথায় যথার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন । আমরা সে

বিশেষ—৫

সব কথার আলোচনা—গত বৎসর যথেষ্ট করিয়াছি ; সময়াত্তবে আরও করিব ।

আমাদের অঙ্ককার আলোচ্য বিষয়ে—ওলাউঠা বা বিস্ফটিকা চিকিৎসা—আয়ুর্বেদে কিরূপ ফলপ্রদ তাহাই দেখাইব । ওলাউঠার ইংরাজী নাম কলেরা । আয়ুর্বেদে ইহাকে বিস্ফটিকা বলে । বিস্ফটিকারই বাঙ্গালা নামকরণ হইয়াছে—ওলাউঠা ।

আয়ুর্বেদ বলেন—সাধারণতঃ অজীর্ণ হইতে বিস্ফটিকার উৎপত্তি এবং এই পীড়ায় অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অতিক্রান্ত হইয়া গাত্র সকলকে অত্যন্ত বেদনা অগেহা স্ফীতবেদন বেদনায় অধিকতর অস্থির করে বলিয়া বৈজ্ঞানিক ইহাকে বিস্ফটিকা নামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । যথা—  
“স্ফীতিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ট তেহনিলঃ ।  
যন্তাজীর্ণেন সা বৈজ্ঞে বিস্ফটীতি নিগন্ততে ॥”

যাহারা পরিমিতাহারী—তাহাদিগকে এই রোগ আক্রমণ করিতে পারেনা । আহার বিষয়ে অমিতাচারী, অজ্ঞিতেন্দ্রিয় ও যাহারা অশনলোলুপ—তাহারাই এই পীড়ায় সাধারণতঃ আক্রান্ত হইয়া থাকে । প্রতি বৎসর

পল্লীগামে যখন ওগাউঠা আরম্ভ হয়— তখন ইতর জাতীয়ের মধ্যেই এই জন্ত এই রোগের প্রথম আক্রমণ হইতে দেখা যায় এবং ভয়ে বা অন্ত কারণে ক্রমে ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হইলেও সংখ্যায় ইতর জাতীয়গণই অত্যধিক পরিমাণে এই রোগে কালকবলিত হইয়া থাকে।

ইতর সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রোগে মৃত্যুর আধিক্যের একটি বিশেষ কারণ,—সংখ্যায় তাহারাই তো এই রোগে অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয়ই, তা' ছাড়া রোগাক্রমণে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং সুশ্রাব্য ও তাহাদিগের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে না—কিন্তু যদি সুশ্রাব্য এবং উপযুক্ত চিকিৎসায় তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করা যায়—তাহা হইলে এই রোগের মৃত্যুর পরিমাণ বোধ হয় অনেক হ্রাস পাইতে পারে।

হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের চিকিৎসায় সাধারণের প্রগাঢ় বিশ্বাস। আজকাল ইন্-জেক্সনের প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেইজন্ত অনেকে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকেরও শরণাপন্ন হন, কিন্তু আয়ুর্বেদে ইহার যে সকল উৎকৃষ্ট ঔষধ ও ব্যবস্থা রহিয়াছে, সাধারণতঃ অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, সেইজন্ত অনেক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের ভাগ্যেই এ রোগের চিকিৎসা করা—বড় একটা ঘটনা উঠে না।

আমি যখন রাণাঘাটে ছিলাম—তখন পল্লীর মধ্যে কয়েকটি রোগীকে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়াছিলাম। সেই বিবরণ গুলি নিয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত—সকল বিষয়েই নদীয়া জেলার রাণাঘাট প্রধান আসন পাই-

বার উপযুক্ত। রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটি রাণাঘাটবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে আটত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পাকা ড্রেনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু ড্রেন নির্মাণের পর ঐ সকল রোগগুলি রাণাঘাটে যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

যাউক সে কথা। সে বৎসর রাণাঘাটে খুবই কলেরার প্রাদুর্ভাব। আমি একদিন দ্বিপ্রহরবেলায় রোগী দেখিয়া গৃহে প্রতাগত হইলে, প্রতিবারী একজন ভদ্রলোক আমার ডাকিতে আসিলেন। বলিলেন,—“তাহার বাটাতে একজনের কলেরা হইয়াছে, আমাকে বাইতে হইবে।” রাণাঘাটে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের অভাব নাই, হোমিওপ্যাথও ২০ জন রহিয়াছেন—সাধারণতঃ কলেরা রোগে রাণাঘাটে হোমিওপ্যাথেরই যথেষ্ট আদর—এ অবস্থার আমার ডাক পড়িল বলিয়া আমি একটু আশ্চর্য হইলাম। বাহা হউক বলিলাম—“আপনি অগ্রগামী হউন, আমি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে নানাহার সম্পন্ন করিয়া যাইতেছি।”

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। আমিও অতিশীঘ্র নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার বাটাতে উপস্থিত হইলাম।

রোগী—স্ত্রীলোক—যুবতী। প্রাতঃকাল হইতে রোগ—প্রকাশ পাইয়াছে, একটু ভাল করিয়া জানিলাম—ভোর রাত্রিতে নহে—প্রাতঃ কালেই রোগের সূচনা। ভোর রাত্রের কথাটা ভাল করিয়া জানিবার কারণ,—আমার হত কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসকের বিশ্বাস—ভোর রাত্রিতে কলেরা আরম্ভ হইলে স্বয়ং মহাদেবও তাহাকে কিরাইতে পারেননা।

বাহা হউক, গিয়া দেখিলাম—রোগী

দান্ত প্রাতঃকাল হইতে ১৫ বার হইয়াছে, দান্ত পাতলা—আঁসধোয়া জলের মত। বমিও কয়েকবার হইয়াছে। পিপাসা যথেষ্ট, তলপেটে শূলবৎ বেদনা, হাতে পায়ে থালি ধরা, গাত্রদাহ, মধ্যে মধ্যে কম্প, বক্ষোবেদনা—কোনো উপদ্রবেরই বড় একটা বাকী নাই। তবে মুছাঁ বা ভ্রমের চিহ্ন দেখিলাম না।

আয়ুর্বেদে বিস্থচিকা রোগের নিদানে উল্লিখিত হইয়াছে—

“মুছাঁতিসারো বমথুঃ পিপাসা

শূনো ভ্রমোদেষ্টেন জ্ঞপ্তদাহা।

বৈবর্ণ কম্পো হৃদয়ে রুজ্জশ্চ

ভ্রান্ত তন্মাত্রা শিরসশ্চ ভেদঃ।”

এ লক্ষণগুলির সহিত মিলাইলে রোগিণীর প্রায় সকল লক্ষণগুলিই যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে।

আমি ভিজ্ঞাসা করিলাম—“আর কাহাকেও ডাকা হইয়াছিল।”

শুনিলাম—না, রোগিণীর অম্মের পীড়া আছে, মধ্যে মধ্যে দম্কা দান্ত হয়—সেইজন্ত প্রথমতঃ অন্ন বলিয়াই উপেক্ষা করা হইয়াছিল।

রোগিণীর অম্মের পীড়া ছিল শুনিয়া আমার কিন্তু ইহার রোগনির্ণয়ের একটু হবিধা হইল। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যদিও ইহাকে কলেরা ভিন্ন এখন অল্প কিছুই বলা যায় না, কিন্তু ইহার মূল কারণ বুঝিলাম অন্ন। সেই জন্ত তাঁহাকে বিস্থচিকা অধিকারের কোনো ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া গ্রহণী অধিকারোক্ত “চিক্রকাদিশুড়ি”র ১ বুট শুদ্ধ শীতল জল সহ প্রয়োগ করিলাম। এই ঔষধটি গ্রহণী অধিকারোক্ত হইলেও আমি অল্পপিত্ত ও অজীর্ণ অবস্থায় খুব বেশী ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সকল স্থলেই বিশেষ ফল

পাই। কলেরার পূর্ণ প্রকট অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবার কারণ,—এই কলেরাক্রান্ত রোগিণীর অল্পপিত্ত ছিল এ পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছি—সুতরাং বর্তমানে ইহা কলেরা হইলেও ইহার মূল কারণ অল্পপিত্ত। সেইজন্ত “রোগমার্দো পরীক্ষতে তদনন্তর মৌষধম”

—এই ঔষধিক্য যদি মানিতে হয় তাহা হইলে আমি যে ঔষধ ব্যবহারে অল্পপিত্তে যথেষ্ট ফল পাইয়া থাকি—সেই অল্পপিত্তই যদি ইহার মূল রোগ হয়, তাহা হইলে বিস্থচিকা অধিকারের অহিকেন ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে উপকার না হইয়া বরং উগ্রবীৰ্য্য ঔষধে কুফলই ফলিবে, এ ঔষধ স্নিগ্ধবীৰ্য্য, পাচক ও আশ্বাসনাশক, সুতরাং ইহাতেই ফল হইবে।

যাহা হউক ঔষধের ১ মাত্রা প্রয়োগেই ঔষধের গুণ প্রকাশ পাইল। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আর কোনো ঔষধ দিলাম না, কিন্তু এই এক ঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর দান্ত আর আঁসধোয়া জলের মত হইল না, ১ বার মাত্র দান্ত হইল—কিন্তু তাহাতে মলের সঞ্চার হইয়াছে দেখা গেল। বমিও আর হইল না, কিন্তু বমনোদ্বোগ রহিল, তাহা নিবারণের জন্ত বড় এলাইচভিজানজল—পিপাসার সময় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, এক ঘণ্টার মধ্যে বমনোদ্বোগ কমিলনা দেখিয়া—ধনে, মোরি ও কপূর তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই জল দিবার ব্যবস্থা করিলাম।

এক ঘণ্টা পরে এক মাত্রা বজ্রক্ষারের ব্যবস্থা করিলাম। আর ১ বার দান্ত হইল, তাহাতেও সামান্য মল বুঝা গেল। আর একটি চিক্রকাদি শুড়ি এই সময় ব্যবস্থা করিলাম। ইহা ভিন্ন নাতির চতুর্দিকে ‘বায়ফল’

বাটিয়া প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। ফলে দান্ত ও বমন বা বম্মনেচ্ছা দুই-ই বন্ধ হইল। আমি ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলাম।

ঐ রোগীকে আর বড় বেশী ঔষধ দিতে হয় নাই,—ঐ চিত্রকাদিগুড়ি এবং এক আধ মাত্রা বজ্রকারেরই ব্যবস্থায় ৩ দিন রাখিয়া

ছিলাম—তাহাতেই রোগিনী নিরানয় হইয়া উঠিয়া ছিলেন। ২ দিনের পর রোগিনীর আর যখন কোনো উপসর্গ থাকিল না, তখন পথা দিলাম—জলবারি এবং চারি দিনের পর পথা দিলাম—গন্ধ ভাছল্যার ঝোল ও ভাত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

## আবার।

—\*—

( ১ )

কোকিল-কুজিত কুঞ্জে আবার  
ফুটেছে স্নহমা রাশি ;  
নবীন পুলক পরশি' মলয়  
ফুটায় ফুলের হাসি।  
নব চেতনার স্পন্দন ভরা  
বিশ্বের চারি ধার ;  
নবীন আলোকে ভুলোক ছালোক  
পুলকেতে একাকার।  
যেদিকে নব জাগরণে জাগে,  
স্বাস্থ্যের নব বল ;  
সৌন্দর্য শান্ত শোভা-সজ্জিত  
বঙ্গের সমতল।

( ২ )

স্ববণ অতীত যুগের এমনি  
প্রভাতী আলোকে জাগি' ;  
ভারতের ধ্বনি প্রচারিলা জ্ঞান—  
বিশ্ব হিতের লাগি'।  
ত্রিতাপ-তপ্ত মানবের তরে  
জ্ঞানের ত্রিধারা ঢালি' ;

দাড়াইলা আসি ব্রাহ্মণ ল'য়ে,  
বিজ্ঞান বেদ ডালি।  
অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিলা  
বিশ্বের যত জন,  
সম্মুখে নত মস্তকে সবে  
বন্দীলা সে চরণ।

( ৩ )

বিশ্বের গুরু নিঃস্ব হইয়া  
শিষ্যকে দিলা দান ;  
বরিয়া লইলা দৈন্ত আপনি ;  
অহা কি মহান প্রাণ !  
ত্যাগের মস্ত্রে লইলা দীক্ষা,  
বজ্রিয়া ভোগ-আশা ;  
রম্য হর্ষ তুচ্ছ করিয়া  
বনেতে বাঁধিলা বাসা।  
বিতরিতে জ্ঞান, গোত্রের মাঝে  
বন্ধের আয়োজন ;  
পরিচয়ে হই স্বস্তি আজিও,  
স্মরিয়া সে তপোবন !



( ৪ )

পুষ্ট হ'য়েছে ত্যাগের মন্ত্র,  
ভোগে ভরা ধরাধাম ;  
সুপ্ত কৰ্ম্মী, শুপ্ত পক্ষা,  
স্মৃতি মাঝে শুধু নাম ।  
আবার এ নব প্রভা-প্রদীপ্ত  
প্রভাতী আকাশে আজি ;  
ধনিনী উঠুক সে মহামন্ত্র—  
শঙ্খ উঠুক বাজি' ।  
কক্ষ ক্ষেত্রে কৰ্ম্মী আবার  
আম্রক সকলে ফিরে ;  
হাণ্ডক আবার ভারত জননী  
জ্ঞানের মুকুট শিরে ।

( ৫ )

আবার ভারত-সন্তান সব  
এ নব আলোকে জাগি' ;  
শিথিতে কক্ষ-কৌশল, হও  
নূতনের অমুরাগী ।  
পুণ্যতন সহ মিলাও নূতন,—  
মণি কাঞ্চন যোগ ;

হইবে ধন্য, দুচিবে দৈন্য,  
দূরে যা'বে রোগ শোক ।  
আয়ুর্কর্ষেদের বিজয় বাদ্য  
এ নব প্রভাতে আজি ;  
বিশ্বের মাঝে শুক গম্ভীরে  
আবার উঠুক বাজি' ।  
ব্যাধি মর্দিত শরীরে আবার  
করিতে স্বাস্থ্য দান ;  
আবার অমৃত কুণ্ডের ধারা,  
হউক প্রবহমান ।

আবার বঙ্গ পল্লীর মাঝে,  
দীনের কুটির দ্বারে ;  
বহন করিয়া স্বাস্থ্য তত্ত্ব,  
বিতরণ কর তা'রে ।  
আবার দীনের পীড়িত অঙ্গে,  
বুলাও স্নেহের কর ;  
করহ ধন্য জন্ম জীবন,  
হে ঋষি বংশধর ।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

—:—

আবগারি আয় ।—বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের  
অর্থ সচিব সার হেনরি হুইলার বলিয়াছেন,  
“আবগারি আয় অতিশ্রুত বৃদ্ধিত হইয়া  
আমাদের অর্থাগমের প্রধান উপায় ও নির্ভর  
স্থল হইতেছে । এবার আমাদের আবগারি  
আয় ২ লক্ষ বৃদ্ধিত হইয়া ১ কোটি ৮৪ লক্ষ

হইবে । হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরগণায়, দেশী  
মদের কাটতি বৃদ্ধিত হওয়ায় আমাদের আয়  
বৃদ্ধি হইয়াছে ।” কিন্তু এই আয় বৃদ্ধিতে দেশ  
বাসীর যে সর্বনাশ সাধিত হইতেছে—ইহাই  
বিশেষজ্ঞ দিগের চিন্তা করিবার বিষয় । এ  
দেশের লোকে হাড়ভাঙ্গা খাটিয়াও

উদরাদ্বয়ের সংস্থান করিতে পারে না, কিন্তু মদ্যপানে এত অধিক অর্থ বঙ্গবাসী প্রদান করিতেছে। লজ্জার কথা বটে। ক্লেশ ও দারিদ্র্য এই মদ্য পানের ফল। স্বাস্থ্যহানি তাহারই অলস্ত প্রতিমূর্তি।

**শিশু মৃত্যু।**—কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের বড় বড় সহরে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তাহার অর্ধেকগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হিসাবে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাঙ্গালায় ৩টি জন্মিলে এক বৎসরের মধ্যে উহার ১টি মরিয়া যাইবে। বিলাতে শিশুমৃত্যু নিবারণের জন্ত প্রত্যেক নগরে শিশু চিকিৎসার স্বতন্ত্র হাসপাতাল আছে ইহা ভিন্ন নানাবিধ উপায়ে সেখানে শিশুমৃত্যু, রোধের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষে কিন্তু এ সম্বন্ধে একেবারেই নিদ্রিত।

**যক্ষ্মারোগ।**—বাঙ্গালায় যক্ষ্মারোগীর সংখ্যাও দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ—বাঙ্গালার কোনো কোনো স্থানে মৃত ব্যক্তির দশমাংশ ব্যক্তি এই যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এক্ষণে খুব সম্ভব ৪ লক্ষ লোক এই ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত। কিন্তু বস্তুতাবীর উদ্যোগী বাঙ্গালীগণ এ সম্বন্ধে প্রতীকারের ভাবনা ভাবিতেছেন কি?

**যক্ষ্মার কারণ।**—স্বাস্থ্যকমিশনের ডাক্তার বেণ্টলী বলিয়াছেন,—“এ দেশের মিঠাইয়ের দোকানগুলিতে সর্বদাই মাছি ভন্ড ভন্ড করিয়া থাকে। মাছিগুলি পচা ও দুর্গন্ধময় স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের সর্কাসাই রোগবীজাপূর্ণ। এই এই সকল মাছি খাদ্যদ্রব্যের উপর রোগের বীজাণু নিক্ষেপ করে। এক বাটী দুধের উপর

ইহার একটি মাছি বসিয়াও মিনিটে ঐ দুধের মধ্যে ছই সহস্র রোগ বীজাণু এবং অর্ধ ঘণ্টা বসিয়া ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বীজাণু নিক্ষেপ করিয়া যায়। মাছির দ্বারা কলেরা টায়ফয়েড প্রভৃতি রোগবীজাণু তো ব্যাপ্ত হয়ই, যক্ষ্মারোগের প্রাবল্যও মাছি দ্বারা হইয়া থাকে। দোকানের খাবারগুলি যাহাতে অনাবৃত না থাকে, তাহার জন্ত কর্তৃপক্ষের কঠোর নজর থাকিলেই কিন্তু ইহার প্রতীকার হইতে পারে।

**যক্ষ্মায় আমাদের মত।**—ডাক্তার বেণ্টলী বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মারোগের বৃদ্ধির জন্ত যে কারণ দর্শাইয়াছেন, তাহা যে অমূলক তাহা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু ইহাপেক্ষাও ভীষণ কারণ—বাঙ্গালার দারিদ্র্য। বাঙ্গালী পুষ্টিকর খাদ্য পায়না—অথচ তাহাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। বাঙ্গালী সে পরিমাণ উপার্জন করে, বাঙ্গালীর পরিবার বর্গের ব্যয় তাহার দ্বারা সংকুলান হয় না, কাজেই তাহাকে যক্ষ্মা বা ক্ষয়ের প্রধান কারণ হুচিস্তা বিধে অনেক সময়ই জর্জরিত থাকিতে হয়। ইহা ভিন্ন এখনকার দিনে বাঙ্গালী কল্যাণে এতই বিরত যে, কিরূপ পাত্রে কত বয়সের পার্থক্য রাখিয়া কতক পাত্রস্থ করা উচিত—বাঙ্গালীর এখন আর সে চিন্তার অবকাশই নাই—তাহার ফলে বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে এখন অনেকস্থলে অসামঞ্জস্য দোষ ঘটিতেছে। ফলে ব্রহ্মচর্য্য হীন বাঙ্গালীর স্ত্রীপুরুষের মিলনে বম্বোবিচারও নাই, বিধি-নিষেধ-নিয়ম-পদ্ধতি—সকলই বর্জ্য সমাজ হইতে উঠিয়া গিছে। বাঙ্গালার যক্ষ্মা বৃদ্ধির ইহা একটি প্রধান কারণ।

**ব্যবস্থাপকসভার পল্লীচিন্তা।**  
—বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর প্রস্তাব

গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে মিঃ ওমেল জানাইয়াছেন,—“পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য গঠনের চেষ্টা করা হইতেছে।” আমরা এ সংবাদে সুখী হইলাম।

**আয়ুর্বেদের নিন্দা।**—ডাক্তার লেণ্টনস্ট কণ্ঠে সাদার ল্যাণ্ড—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে “আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা” প্রণালীর নিন্দা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার কথা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর মূলে অন্ধ কুসংস্কার নিহিত। আমরা বলি—এই নিন্দাকারী ডাক্তার সাদার ল্যাণ্ড আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা যে কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে রচিত—তাহার কিছুই বোঝেন না। যদি তিনি কোনো আয়ুর্বেদীয় অধ্যাপককে এক্ষণে বরণ করিয়া চরক এবং সুশ্রুতের সমস্ত পৃষ্ঠা গুলি অধ্যয়ন করিতে পারেন, তবেই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মূলে অন্ধ কুসংস্কার নিহিত কি ইহা সকল চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ—তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতে পারেন। সার পারডিলিউকিস্, নার্কিন যুক্ত রাজ্যের ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার ক্লার্ক প্রভৃতি মহাশ্রাগণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যে সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা তাহা বিলক্ষণই স্বদয়স্বয় করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ডাক্তার পারডিলিউকিস্ বলিয়াছিলেন “যত অধিক দিন আমি ভারতবর্ষে থাকিতেছি—এ দেশের সহিত আমার পরিচয় বৃত্ত বর্ধিত হইতেছে, এ দেশের বৈদ্য এবং হাকিমদের চিকিৎসার মূল্য আমি তত অধিক বুঝিতে সক্ষম হইতেছি।” ডাক্তার ক্লার্কও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—“যদি চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আধুনিক সমস্ত ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের নাম তুলিয়া দিয়া চরকের প্রণালীমতে

চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকের কার্য কমিবে এবং পৃথিবী হইতে পুরাতন ব্যাধি পীড়িতের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইতে পারিবে। “ডাক্তার সাদারল্যাণ্ড কি এ সকল অভিমতও পড়িয়া দেখেন নাই? যে চিকিৎসা সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাতেও যে চিকিৎসা-প্রণালী লোপ পায় নাই—যে চিকিৎসা শাস্ত্র—হইতে নরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ লইয়া অন্ত চিকিৎসকেরা কৃতিত্ব দেখাইতেও রাজি—সে চিকিৎসা সম্বন্ধে এক্রূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে ইহার সকল তথ্য অবগত হওয়া উচিত নহে কি?

**ঔষধের চাষ।**—যুদ্ধের সময় ইউরোপ হইতে ঔষধ আমদানি করার সুবিধা না হওয়ায় ভারতের নানা স্থানে ভেবেজ উৎপন্নের ব্যবস্থা করা হয়। সে চেষ্টার ফলে বেলে-ডোনা, ইপেকাকোহানা পডোফিলাম, নক্স-ডমিকার চাষ চলিতেছে। ভারতবাসীর এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ চেষ্টাশীল হওয়া কর্তব্য।

**সহরের স্বাস্থ্য**—কলিকাতার স্বাস্থ্য ক্রমশঃই শোচনীয় হইতেছে। ওলাউঠা, বসন্ত প্লেগ ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতাবাসীগণ ভো ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেনই, তাহার উপর প্লেগও আমদানি হইতেছে। সহরবাসীর এ সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর্তব্য।

**মাদকতা নিবারণ।**—কাঠিবার নগর রাজ্যের মহারাজা বাহাদুর তাঁহার জন্ম দিন উপলক্ষে তাঁহার রাজ্য হইতে সমস্ত মদের দোকান তুলিয়া দিবেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে এ ব্যবস্থা হয় না?

## সমালোচনা।

বৈজ্ঞানিক জাতির স্বরূপ নির্ণয়।—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত প্রণীত ও ৯ নং শ্রামাচরণ দের ষ্ট্রিট—কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৬/০ আনা। এই পুস্তকে বৈজ্ঞানিক জাতি অশ্বর্ষ এবং অশ্বর্ষ জাতির উৎপত্তি, অশ্বর্ষ শব্দের উৎপত্তি এবং অশ্বর্ষদিগের বৃত্তি, অল্পলোম জন্ম, বৈধবিবাহ বিধি, বিবাহ প্রণালী, কর্ত্তা ও ভাষ্যার একত্ব, অল্পলোম বিবাহে দ্বিজভার্য্যা পত্নীপদবাচ্যা, জন্ম বিষয়ে ক্ষেত্র অপেক্ষা বীজের প্রাধান্য, বৈজ্ঞের জন্ম গৌরব, বৈজ্ঞ ব্রাহ্মণ বর্ণ, বৈজ্ঞের কর্ম্মাধিকার অপসাদ বৈজ্ঞ, বৈজ্ঞ শব্দের অর্থ এবং বৈজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব, মূদ্ধাভিযুক্ত জাতিও বৈজ্ঞনামে অভিহিত, বৈজ্ঞের পূজ্য, আয়ুর্বেদ ও অপর বেদের প্রামাণিকতা, আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসাবৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব, কু বৈজ্ঞ পংক্তি দুষক ও পূজ্য নহে, সর্বৈজ্ঞ পংক্তি পাবন—এই সকল বিষয়ের আলোচনা শাস্ত্র প্রমাণ সহ অতি সুন্দররূপে মীমাংসিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রমাণ দেখাইতে গিয়া গ্রন্থকার প্রত্যেক শ্লোকার্থের পরই যে সকল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলি গ্রন্থকারের জ্ঞান গভীর গবেষণা সম্ভূত। যে সকল যুক্তি অবলম্বনে তাঁহার বক্তব্য লিখিত, তাহা পড়িয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এখনকার দিনে সংসার তাড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দেশের চিন্তা—সমাজের চিন্তা—স্বজাতির চিন্তা করিবার অবসর বড় একটা কাহারও নাই, সে প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি সাধারণের মধ্য হইতে লোপ পাইয়াছে। একাকারের প্রাচুর্য্য ইহারই ফলসম্ভূত এবং সেই একাকারের প্রবল

বাত্যায় আমাদের দেশ হইতে যে ধর্ম্মভাব নষ্ট হইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালার রোগপ্রবণতা তাহারই কারণ। এই বাত্যাধিক্য বঙ্গ জননীরা তুর্নীতিপরায়ণ সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে হইলে দেশের ধর্ম্মভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্ত আবার আমাদের সমাজের চিন্তা করিয়া সামাজিক রক্ষা সূদৃঢ় করিবার প্রয়োজন। উদরানের সংস্থানের জন্ত বর্তমান হাহাকারের যুগে যাহারা সে চিন্তা করিবার অবসর পান, তাঁহারা সত্য সত্যই দেশের আদর্শ পুরুষ। জ্ঞানেন্দ্র বাবু সেই জন্ত আমাদের ধন্যবাদে পাত্র। তাঁহার রচনা প্রণালী অতি সুন্দর, তাঁহার ভাষার ক্রটিও সূত্র গৌরবে সমুজ্জল। গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অশ্বর্ষ বা বৈজ্ঞজাতি সম্বন্ধে আমাদের একটা কথা বলিবার আছে। “অশ্বর্ষ = অশ্ব (পিতা) + ষ্ঠ (মিনি থাকেন)। অর্থাৎ মিনি রোগ সময়ে পিতার ত্রায় প্রীতি পূর্ব্বক অবস্থান করেন,”—এই অর্থে যে “অশ্বর্ষ” শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এখনকার অশ্বর্ষ বা বৈজ্ঞগণ সে কথা তো আদৌ উপলব্ধি করেন না! তাহা হইলে বৈজ্ঞজাতির অনেকে চিকিৎসা বৃত্তি ভুলিয়া চাকরিগত প্রাণ হইবেন কেন? এই গ্রন্থের গ্রন্থকার যদি স্বতন্ত্র পুস্তকে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বৈজ্ঞজাতির মতিগতি ফিরাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সে পুস্তক বৈজ্ঞজাতির আরও উপযোগী হইবে। আলোচ্য গ্রন্থখানি “বৈজ্ঞজাতির স্বরূপ নির্ণয়” আখ্যায় অভিহিত হইলেও আমাদের মনে হয়, ইহা শুধু বৈজ্ঞজাতির নহে—সকল জাতির ব্যক্তিগণেরই উপকারে লাগিবে। বাহ্যিক সমাজ রহিত আনিবার প্রয়াসী, আমরা তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পরামর্শ দিতে পারি।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৩য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—জ্যৈষ্ঠ ।

৯ম সংখ্যা ।

## কাজের কথা ।

—:—

বাঙ্গালীর রোগপ্রবণতা ।—

বাঙ্গালী অর্থ অর্থ করিয়া যেকোন ব্যতিব্যস্ত,—  
স্বাস্থ্যের কথা তো বাঙ্গালী সেরূপ চিন্তা  
করেনা। পরিবার-প্রতিপালনের জন্তই  
বল—মার আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের  
জন্তই বল,—সমগ্র বাঙ্গালীকে গড়ে এখন  
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘণ্টা এই ক্ষণের  
চিন্তায় বিভ্রত থাকিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা  
করো আগে আমাদের দেশে যে সকল বিধি-  
ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল—সে সকল বিধিব্যবস্থা  
প্রতিপালন করা বাঙ্গালী এখন একেবারেই  
হুলিয়া গিয়াছে। তাহার উপর এই দশ ঘণ্টা  
কাল অর্ধাঙ্গের গুরু চিন্তায় বাঙ্গালীর দেহ, যে  
কর প্রাপ্ত হইতেছে, বাঙ্গালীর রোগ-প্রবণতার  
সমস্ত কারণগুলির মধ্যে তাহা অন্ততম।

\* \* \*  
স্বাস্থ্যরক্ষায় দিনচর্যা ।—আগেকার  
বাঙ্গালী অতি প্রত্যবে শয্যাভ্যাগ করিত,

বাঙ্গালীর শয্যাবিলাসিনীগণ তাহারও অনেক  
পূর্বে শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক গৃহস্থালীর কর্মে  
মনোনিবেশ করিতেন। বাঙ্গালী-পুরুষ শয্যা  
ত্যাগের পর হস্তমুখাদি প্রক্ষালনান্তর প্রাতঃ  
স্নান করিতেন, বাঙ্গালীর মত গ্রীষ্মপ্রধান  
স্থানে সে প্রাতঃস্নানের ফলে তাহার দেহে বায়ু  
কুপিত হইতে পারিত না। প্রাতঃস্নানের পর  
পূজা আত্মিক সমাপন করিয়া, সেকালের  
গৃহস্থ-সংসারে যে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল,  
তাহার মধ্যে আদার কুচি ও ছোলা ভিজাও  
সংরক্ষিত হইত। ফলে সেরূপ ব্যবস্থায়  
সেকালের তাহারও পিত্তও কুপিত হইতে  
পারিত না,—শ্লেষ্মাও দমনে থাকিত। এক  
কথায় প্রাতঃস্নান, পূজা আত্মিক এবং প্রাতঃভিক  
জলযোগের ব্যবস্থায়—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত বায়ুপিত্ত  
কফ—ত্রিধাতুরই যে সাম্যতার প্রয়োজন,  
তাহা সেকালেরই সম্যক প্রকাবে দিক হইত।  
তাহার পর, কর্মকালের ব্যবস্থায় সেকালে

নির্দিষ্ট ছিল—প্রাতর্সান্নাহার। অর্থাৎগমের জন্ত সেই কর্মকালেও সেকালের বাঙ্গালীকে ৬ ঘণ্টার অধিক বিরত থাকিতে হইতনা। ফলে সেকালের লোকে সকল কর্মের মধ্যে “শরীরমাদ্যং”—এ কথাটি অগ্রে মনে রাখিত। আধিব্যাধিতে সেকালের বাঙ্গালী এই জন্তই এত ব্যতিব্যস্ত হইত না।

\* \* \* \*

আহারে স্বাস্থ্য বিধি।—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত যে আহারের নিয়ম প্রতিপালন একান্ত প্রয়োজন—এখনকার বাঙ্গালী এ কথা একেবারেই মনে করে না। আগে আমাদের দেশে সাত্বিক আহারের ব্যবস্থা ছিল। সেকালে আমাদের দেশের লোকে এমনই পবিত্র দ্রব্য আহার করিত যে, আহার করিবার সময় তাবৎ দ্রব্যই দেবতার উদ্দেশে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিত না। এখন বাঙ্গালীর আহারের ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে আহারীয় দ্রব্য সকল আর দেবোদ্দেশে নিবেদন করা সম্ভব নহে। আহারীয় দ্রব্য সকলের মধ্যে গব্য দুগ্ধজাত দ্রব্য গুলি শরীরপুষ্টির যেরূপ সহায়তা করে, এমন আর কোনো দ্রব্য নহে। বাঙ্গালী-সংসারে সেই জন্তই সেকালে দুগ্ধজাত দ্রব্য মিশ্রণে আহার—উৎকৃষ্ট আহার বলিয়া পরিগণিত হইত। দুগ্ধজাত দ্রব্য অনায়াস লভ্য হইবে বলিয়াই আমাদের দেশে গাভী মাতৃপদ বাচ্যা। সেকালে ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে কন্তারপিতা—পাত্রের সংসারে ‘গোয়াল ভরা গাই’—আছে কি না—এই জন্তই অহুস্কান করিতেন। ফলে আমাদের দেশে সেকালে যে গরুজাতদ্রব্য আহারে শরীর পুষ্টির ব্যবস্থা ছিল, যে কারণেই ইউরোপ, দেশ হইতে এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। তৎপরিবর্তে শীত

প্রধান দেশবাসীদের অনুকরণে বাঙ্গালীর এখন আহার-বিধি চলিয়াছে। ফলে ক্রমাগত উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য ভক্ষণে বাঙ্গালীর ধাতু সকল বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। এখনকার বাঙ্গালী—নানারূপ রোগে ভুগিতেছে ও সেই জন্ত।

\* \* \* \*

বঙ্গে সংক্রামক ব্যাধি।—

সংক্রামক ব্যাধির প্রাবল্যের কারণ, অধুনা দেশের জল বায়ু দূষিত হইয়াছে—এ কথা স্বীকার করিলেও—বাঙ্গালী নিজকর্মকৃত পাপে যে সেই সংক্রামক ব্যাধি কর্তৃক অধিক আক্রান্ত হইতেছে—একথাও অস্বীকার করিবার যো নাই। আহার বিহারের নিয়ম উল্লঙ্ঘনেই যে সকল প্রকার রোগে আক্রান্ত হইতে হয়—একথা চিকিৎসাশাস্ত্র বাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন,—তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন। সনাতন আয়ুর্বেদে শাস্ত্রে বিস্তৃতি রোগের পরিচয় আমরা পাই; মস্তুরী বা বসন্ত রোগের পরিচয়ও আয়ুর্বেদে রহিয়াছে, স্নাতরাং এ সকল রোগ যে আমাদের দেশে আগে হইত—একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু এত প্রবলভাবে—সময়ে অসময়ে, যখন তখন, বাহার তাহার যে হইত না—ইহা নির্ভাঙ্ক সত্য কথা। শাস্ত্রবিধিসম্মত আহার বিহারের উল্লঙ্ঘনের ফলেই অধুনা এ রোগ কিছু বাঙ্গালীর চিরব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল কথা চিন্তাশীল বাঙ্গালীগণ ভাবিতেছেন কি? আমাদের হোমকলের চিন্তা—বাঙ্গালীকে স্বাধীন করিবার চিন্তা অপেক্ষা এ চিন্তা যে সর্বোপরে কর্তব্য।

\* \* \* \*  
সংক্রামক রোগ নিরূপণ

স্বৈচ্ছিক বিধি ।—সংক্রামক রোগাক্রমণ হইতে বঙ্গবাসীদিগকে রক্ষা করিতে হইলে সকল প্রকার প্রতিষেধক বিধি অবলম্বনের পূর্বে বঙ্গবাসীকে আবার প্রাচীন পদ্ধতি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বনই বঙ্গবাসীর পক্ষে সকল প্রকার সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়—এ কথা বঙ্গবাসী আবার বুদ্ধ বিনতাকে মর্মে মর্মে অনুভব করিতে হইবে। আমরা ইহার পূর্বে অনেকবার বলিয়াছি—বাঙ্গালী অপরিণত বয়স হইতেই ইন্দ্রিয় পরিচালনাব্যবহারের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অভ্যস্ত। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কুপায় রাশি রাশি ঔষধায়নের ফলেও বোবন বিকাশোন্মুখের পূর্বেই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিতেছে। এক কথায় বাঙ্গালী যখন কৰ্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে—তখন বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য সম্যক প্রকারে কৰ্মক্ষম নহে,—কিন্তু উদারায়নের স্থানের জন্য প্রাপ্ত পরিশ্রম না করিলেও উপায় নাই। তাহার উপর শিক্ষার দোষে বালককাল হইতে বাঙ্গালী ভক্ষ্যভক্ষ্যের বিচারে স্পৃহাশূন্য। বাঙ্গালী সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগিবেনা তো ভুগিবে কাহার? সংপ্রতি কয়েকমাস হইতে কলিকাতার কলো ও বঙ্গের পূর্ণ প্রভাব। এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে প্রাতঃকাল হইতে, মধ্যাহ্ন—সন্ধ্যাহ্ন—রাত্রির প্রথম যাম পর্যন্ত চায়ের দোকানগুলির বিক্রয়াদিক্য নিরীক্ষণ করিয়াছেন কি? বাঙ্গালীর রোগ হইবে না তো হইবে কাহার? সকল প্রকার সংক্রামক রোগেই তো বাঙ্গালী সর্বাঙ্গাঙ্গ অধিক আক্রান্ত হয়,—আমাদের মনে হয়,—ঔষধে ইহার প্রতিষেধক ব্যবস্থা হইবে না—বাঙ্গালী যদি আবার সাবেক

পদ্ধতি অবলম্বনে আয়ুর্জ্ঞান করিতে সমর্থ হয়, —তবে তাহাই বাঙ্গালীর সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে আয়ুর্জ্ঞানের একমাত্র উপায় হইবে।

\* \* \*

রোগের কারণ ।—উদারায়নের সংস্থান করিবার জন্য আমাদের জননী জন্মভূমির মায়া পরিভাগ করিতে হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে ধান, বাগানের তরকারী,—পুকুরের মাছ,—গোয়াল ভরা গাভীর দুগ্ধ এখন আর আমাদের সহজলভ্য নহে। সে সাবেক পদ্ধতির পরিবর্তন হইয়াছে, এজন্য সংসার পোষণের জন্য আমাদের কৰ্মকালের নির্দিষ্ট সময়—মধ্যাহ্নকাল পরিশ্রমে অতিবাহিত করিতেই হইবে, কিন্তু ইহারই মধ্যে যতটা সম্ভব—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমরা সচেতন হই না কেন? প্রাতিভিক্তি মান—দেবোদ্দেশ্যে পূজা অর্চনা—উষ্ণ দ্রব্য চায়ের পরিবর্তে আদা, ছোলা ভিজা, মিছরির পানার ব্যবস্থা আমরা তো সহরে থাকিয়াও সহজে করিতে পারি। তৈল মর্দনে এবং স্নানাহার সমাপনে যে পরিমাণ সময় দেওয়া কর্তব্য—তাহার ব্যবস্থা না করিয়া, দশ পনের মিনিটের মধ্যেই ঐ সমস্ত কার্য আমরা সমাধা করিয়া কৰ্ম্মালয় উদ্দেশ্যে ধাবিত হই কেন? আমাদের এই সকল কৰ্ম্মকৃত ফলেই আমাদের মধ্যে সকলপ্রকার রোগই সংক্রামক ভাবে প্রবেশ করিতেছে। অন্ত্যন্ত রোগ সম্বন্ধে জল বাষ্প দোহাই দিয়া কাটা হইলেও, বাঙ্গালার যক্ষ্মাবৃদ্ধি যে ইহারই ফল সম্ভূত, সে পক্ষে আদৌ সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর দেহ নানারূপে ক্ষয়প্রাপ্ত—তাহার পয় এরূপ অত্যাচারে ক্ষয় বা যক্ষ্মারোগে যে একান্তই অবশ্যস্তাবী হইয়া পড়ে।

**শিশু মৃত্যু।**—বঙ্গালীশিশুও মরিতেছে পৃথিবীর সকল দেশের শিশু অপেক্ষা অধিক। ইহার প্রধানতঃ দুইটি কারণ আমরা নির্দেশ করিতে পারি। ১ম দুর্বল পিতামাতার শুক্র-শোণিতের ফলে উৎপত্তি—২য় তাহা-দিগের রক্ষাকল্পে তাহাদিগকে যেরূপ ভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যিক, আমরা তাহা করিতে পারি না। আমাদের অনুরাগেব অভাবে এবং আরও কতকগুলি কারণে শরীর রক্ষার এবং আয়ুর্বদ্ধনের সর্ব প্রধান দ্রব্য গোদুগ্ধ তো একরূপ দুশ্চাপ্য হইয়াই পড়িয়াছে, এজন্ত উপযুক্ত পরিমাণে গোদুগ্ধ পানের ব্যবস্থা অনেক শিশুর জন্ত করা হয় না, অল্পকরণ স্পৃহায় ছুঙ্কের পরিবর্তে নানাপ্রকার বিলাতী ফুডে অনেক স্থলে শিশু রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা একেবারেই সমীচীন নহে। তাহার পর ভূমিষ্ট কালের পর আপে যে প্রচুর তৈল মাথাইয়া মার্জিত করণে শিশু দেহ উত্তম পূর্বক স্নেহা প্রশমনেয় ব্যবস্থা ছিল—এখন অনেক ক্ষেত্রে তাহা লোপ পাইয়াছে। পুরুষ জাতির মত দেশের মহিলাগণও বিকৃত শিক্ষায় সাবেক পদ্ধতি ভুলিয়াছেন, তাহারই ফলে নানারূপ বৈশিষ্ট্যসে সর্বদা শিশু দেহ আবৃত করিয়া রাখিলেই যেন শিশুদিগকে রক্ষা করিবার প্রধান উপায় করা হইল—ইহাই এখনকার মা-লক্ষ্মীগণ মনে করেন। ইহা ভিন্ন সামান্য সামান্য রোগে শিশুদিগকে এখন টোটকা টাটকী ছাড়িয়া বড় বড় চিকিৎসকের শরণ গ্রহণে যে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়—ইহাও শিশুরক্ষার প্রধান অন্তরায়। সেকালে শিশুদিগের যে সামান্য অর হইত তাহার অভিধান ছিল—‘বালস’। সে বালসার সমস্ত মধু, তুসসীর রস,—বড় জোর

একটু ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম—এ সকল দেওয়ার যে রীতি ছিল,—এখন সে ব্যবস্থা দেশ হইতে বিলুপ্ত। ফলে শিশু প্রতিপালন যেরূপ ভাবে করা উচিত—আমরা এখন তাহা করিতে জানি না বলিয়াই বঙ্গালী-শিশুর মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া উঠিয়াছে।

\* \* \*

**শিশু মৃত্যুর সহিত শিশু জননীর স্বাস্থ্য।**—বঙ্গদেশ হইতে শিশু-মৃত্যুর হ্রাস করিতে হইলে বঙ্গমহিলাদিগেরও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া দেশের মহিলাগণও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন। তাহার উপর কলিকাতার মত স্থানে আগের তুলনায় স্বাস্থ্যক্ষার উপযোগী বাটী ভাড়া লইয়া অনেকেরই পক্ষে বাস করা সম্ভবপর নহে, সেই জন্যই অনেককে আলোক রোদ্ভ-বায়ু বিহীন সামান্য বাড়ী ভাড়া লইয়া বাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। পুরুষেরা কর্মস্থলে নানাস্থানে গমনাগমন করেন—সে জন্য সেরূপ বাটীতে অবস্থিতির ফলে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ অন্তরায় না ঘটিলেও ইহার জন্ত যে মহিলাদিগের স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিতেছে—তাহা সুনিশ্চিত। ফলকথা আমরা বলিতে চাহি—শিশু মৃত্যুর সহিত শিশু জননীর ভগ্নস্বাস্থ্য সুসংবদ্ধ।

\* \* \*

**বঙ্গালার ভবিষ্যৎ।**—যেরূপ আবু হাওয়া চলিয়াছে, তাহাতে বঙ্গালার ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারময়। প্রতি বৎসর অসংখ্য অসংখ্য শিশু অকালে কাগ্ন করিলিত হইতেছে, অসংখ্য অসংখ্য যুগ-প্রৌঢ় ইরলীলা সম্বরণ করিতেছে,—নানারূপ রোগের সহায় হুঁতু বঙ্গ জননীকে বিপর্যস্ত করিয়া ফুলিয়াছেন।



—কাহারও নিশ্চিন্ত থাকা কর্তব্য নহে, উপেক্ষার হাত্তে আসা বিকাশ পূর্বক এই যুগের আধিকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া আর আমাদিগের পক্ষে উড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য নহে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? আয়ুর্বেদ তো স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

“বর্জ্যাদারস্নেহযোগাদ্ যথা দীপস্ত সংস্থিতিঃ।  
বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণ সংক্ষয়ঃ॥”  
অর্থাৎ তৈলাধার বা প্রদীপে তৈল এবং বর্তিকা

সংস্থিত থাকিলেও বায়ু তাড়নে তাহা যখন নির্বাপিত হইতে পারে, সেইরূপ আবু থাকিতে অকালে প্রাণহানিও অসম্ভব নহে। আমরা নানারূপ অনিয়মে সেই অকালে প্রাণহানির কারণ করিয়া তুলিতেছি। অতঃপর আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আবাব সংযম শিক্ষা ও শাস্ত্রবিধি পালন একান্তই আবশ্যক। এই বাত্যা-বিক্ষুদ্র বঙ্গে ইহা ভিন্ন যে গতান্তর নাই—ইহা বঙ্গবাসী মাত্রেই চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের বিশিষ্ট অনুরোধ।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

## বালক রক্ষা।

(পূর্বানুবর্তি)

বাল্যকাল হইতে বালককে আমি কে— এই জ্ঞান পাইবার জন্য শিক্ষা দিতে বিশেষ চেষ্টা হইতে হইবে। সুখ দুঃখ কি? এবং দুঃখ দূর হইয়া বিমল সুখ অর্থাৎ আনন্দ লাভ কিসে হয়—সে বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে হইবে। বাল্যকাল হইতে বালক কেবল দুঃখনয় সংসারে ও সংসারের বিষয়ে মনকে আকৃষ্ট করিয়া আধুনিক শিক্ষার কুপারি সর্বদা স্মরণে রাখিবে। আপাতমধুর—পরিণামে বিষং বিষয় উপভোগকে সুখ বলিয়া গ্রহণ পূর্বক অল্পকালমাত্র দুঃখময়—রোগ শোকময় জীবন বাঁচন করিয়া অকালে কালুগ্রাসে পতিত হয়। এইরূপে অথবা বিষয়ভোগের স্পৃহা শরীরকে রোগ সঙ্কুল করিয়া অকাল মৃত্যু দ্বারা আত্মঘাতীর মহাপাতকে পতিত হয়। উহাদিগকে এই বিষয় হইতে রক্ষা করিতে হইলে, এই ধারণা করাইতে হইবে যে,

যাহাকে ‘আমি’ বলি—তাহা এই দেহের মধ্যে দেহী,— যন্ত্রের মধ্যে যন্ত্রী, গৃহের মধ্যে অখণ্ড মহাকাশের খণ্ড স্বরূপ আকাশ এবং সেই অখণ্ড পরমাত্মার খণ্ড স্বরূপ প্রতীয়মান আত্মা। আত্মা এই দেহের মধ্যে দ্রষ্টারূপে আছেন। আমরা মনে করি—ইনি সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছেন, কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তির সহিত যতক্ষণ মিলিত থাকেন, ততক্ষণ এইরূপ মনে হয়। বুদ্ধি বৃত্তির সহিত হইতে ভিন্ন দেখিলে তাঁহার স্বরূপ দেখা যায়, তখন আর তাঁহার মূখ দুঃখ থাকে না, নিজ নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কেবল আনন্দময় হইয়া যায়।

এখন এ বিষয়ে আমাদের কাছে নিজে বিশেষ জ্ঞানী হইয়া বালককে আত্মায় দ্বারা জ্ঞানী করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে। আত্মাকে জানিতে পারিলে লোকে আমার যুগা বিষয় স্মরণে চেষ্টা থাকিবে হইয়া দিলে আত্মাকে জানিবে।

পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিতে পারেনা। এই সংসারে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া আমাদের কর্তব্য এই যে, যাহাতে পূর্ণ জীবিত কাল কাহারও মতে ১২০ বৎসর, কাহারও মতে ১০০ বৎসর নীরোগ অবস্থায় জীবিত থাকিয়া কৰ্ম্ম দ্বারা পূৰ্ণজন্মের কৰ্ম্মক্ষয় পূৰ্ণক যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়া সেই “সত্যমনন্তং জ্ঞানম্”কে লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই পরম ধামে যাইতে পারি—যেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিয়া বারম্বার যাতায়াত ও গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ ও মৃত্যু যন্ত্রণাভোগ ও সংসারে থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। আমরা যে কিরূপ ভাবে যাতায়াত করিতেছি—তাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—“যাবজ্জননং যাবন্মরণং যাবজ্জননী জঠরে শয়নং” ইত্যাদি। কিন্তু এই দুঃখ প্রবাহ অতিক্রম করিয়া বাল্যকাল হইতে এইরূপ ভাবে চলিতে হইবে ও সাধনা করিতে হইবে যে, মৃত্যুকালে সেই পরব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে, তাঁহার ব্যঞ্জক পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, স্নগুয়া মার্গ দিয়া প্রাণ বায়ুকে ভ্রমধ্যে লইয়া গিয়া যেক্রপ ব্যবস্থা শ্রী গীতার ও কঠোপ-নিষদে আছে—সেইরূপে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে আমরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইব,—আর এ সংসারে আসিতে হইবে না, সেই ধামে যাইব—যেখান হইতে আর ফিরিতে হয় না “যদগত্বান নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।” তাঁহাকে না জানিতে পারিলে আমরা এই ভয়াবহ মৃত্যুর হাত হইতে এড়াইতে পারিব না। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পশ্য বিজ্ঞতে অয়নার” তাঁহাকে জানিলেই আমরা মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইব,—এই উপায় ছাড়া এই কঠোর দুঃখদায়ক সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অন্য কোন

উপায় নাই। সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা সব বিষয়ে সতর্ক হই—কিন্তু মৃত্যুকে যে এত ভয় করি—তাহার জন্য ত কোন প্রকার সতর্ক হই না। বাল্যকাল হইতে কেহ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই বলিয়া জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা ত বিস্মৃত হইয়া “সখাত সলিলে ডুবে মরি শ্রামা মারে” বলিয়া অসময়ে চিংকার করিতেছি। এখন বয়স হইয়াছে “স্বগাজানাপি ভারার” হইয়াছে। নিজের দেহটা ভার স্বরূপ হইয়াছে, ঈশ্বরকে ভজন করিবার—সাধনা করিবার আর ক্ষমতা নাই। এখন কেবল অল্পতাপ আসিয়াছে যে, “জীবনটা বৃথা গেল, কিছুই করিলাম না।” শুধু এ জীবন কেন, কত জীবন যে আমাদের এইরূপ বৃথা গিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। মায়ের আহ্বান বাণী আমাদের কাণে আসিতেছে না। অনাহৃত ধ্বনির কথা শুনিতে পাইবার চেষ্টা দূরে থাকুক উহার কথা বলিলে, লোকে বলে যে, পাগলে উন্নত অবস্থায় এইরূপ শোনে। তাই আমি সেই সকল বিজ্ঞান বেত্তাদের বলি “যে অনাহৃত ধ্বনি শুনিয়া আমি পাগল, না,—না শুনিয়া তুমি পাগল—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি!” ভক্ত-শিরোমণি স্বর্গীয় বিদ্যার্ণব মহাশয়ের কথাটি এখানে মনে পড়ে—

“স্মৃতিচক্রে পরন্তঃ পর উন্নত এই জীবকুলে।

ডাকেন না প্রশস্রি বাহ

—নেবেন বলে কোলে তুলে।

মায়ার মোহন মহাজ্ঞান জীব

নির্জিত তাঁকে কুলে।

আপন স্বপন-মাকৈলেশ্বর, শঙ্কর কণ কণ

আমরা এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন বুধায় কাটিহেতেছি। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ না করিলে এ পথের পরিচয় হয় না, এখানে চলা যায় না ও গন্তব্য স্থান পাওয়া যায় না। তাই বড় হুঃখে শ্রীমচ্ছক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াশক্তঃ—

তরুণ স্তাবৎ তরুণী রক্তঃ ।

বৃদ্ধস্তাবচ্ছিত্তা মথঃ

পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লয়ঃ ॥

পাঠক বলিবেন, এ কি—“বালক রক্ষা” বিষয় নিশ্চিত কি লেখা হইতেছে? আমাদের সাহসনয় করষোড়ে নিবেদন এই যে, অনেক কথা বলা হইয়াছে—অনেক বক্তৃতা করা হইয়াছে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে—কিন্তু বালকের মতিগতি আমাদের যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহাতে এখন সকলের দৃষ্টি সেই পরম করুণাধার শ্রীভগবানে আকৃষ্ট না করিতে পারিলে, এই সংসারের বিষয় বিষয়ান হইতে নিবারণ করিয়া অকাল বান্ধিয়া ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইবেনা। আমাদের জীবনটা বুধা গেল দেখিয়া, আমাদের প্রিয় পুত্রগণ বাহাতে পেরুপ না হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। “ধর্ম রক্ষিত রক্ষতি” আমাদেরকেই আমাদের বালকদিগকে ধর্ম রক্ষা না করিলে আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।—সেই জন্য ধর্মকে আগে রক্ষা করিতে হইবে এবং উহা হইতে অর্থ, কাম ও মোক্ষ পুরস্কার আসিতে থাকিবে। মহাত্মা পুণ্যমোক্ষ রামদাস কাঠেরা বাবা ছাদশ বৎসর বয়স্ক কালে ভিক্ষার্থ এক গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হন। গৃহস্থানী বলেন,—“এত অল্প বয়সে গৃহভাগী কেন?” তাহাতে তিনি উত্তর দেন,—“বাক্য

সেখানে যাইতে বহুদূর পথ অতিক্রম করিতে হয়, এখন হইতে আরম্ভ না করিলে কি শেষ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিব?” ফলকথা আমাদেরকে বাল্য হইতে ধর্মপথের অন্বেষণ করিতে হইবে।

মৃত্যু সকলেরই ভয়ের জিনিষ এবং অবশ্যজ্ঞাবী। মানুষ অনেক কলিত ভয়ের জন্ত কাতর হইয়া তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্ত চেষ্টা করে, কিন্তু যাহা স্থির নিশ্চয়—সেই মৃত্যুর জন্ত কেহ প্রস্তুত হয় না, তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় করে না। উপায় অবশ্য শক্ত বটে, তাই বলিয়া কি ছাড়িয়া দিতে হইবে? আমরা মৃত্যুকে কেহ ভয় করি? মৃত্যুর দ্বার দিয়া আবার আমাদেরকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, আবার সংসারের অনলে দগ্ধ হইতে হইবে, মরিতে হইবে।

পুনরপি জননং পুনরপি মরনং

পুনরপি জননী জঠরে—শয়নম্।

ইহ সংসারের খলুহস্তারে কুপয়াহপারে

শয়নম্ পাহিমুরারে।

গোবিন্দকে—মুরারিকে ডাকার মত ডাকিয়া তাঁহার মত না হইতে পারিলে এই দুস্তর সংসারে মৃত্যু মুখ হইতে অব্যাহতির উপায় নাই। মৃত্যুর পূর্বে জীবের বড়ই কষ্ট হয়। পৈতৃক উদ্যা অষ্ট মর্শস্থানকে যখন দগ্ধ করিতে থাকে, যখন প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু সমানবায়ুর অধীনে না থাকিয়া পরস্পর স্বাধীন হইয়া—দেহ ত্যাগের চেষ্টা করে, যখন নাতিশ্বাস হয়, তখন জীবের বড়ই কষ্ট হয়। যাহারা কাতর ও মৃত্যু শব্দার পাখে বসিয়াছেন, তাহারাই এই যন্ত্রণা দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা দেখিয়া তাঁহারও এইরূপ হইবে। তাহার সেই যন্ত্রণার হাত হইতে নিরুত্তি পাইবার কোন চেষ্টা

করিয়াছেন কি ? তাহার পর মৃত্যু আসিলে যখন আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন বায়ু যেমন কুম্ভাদি হইতে দক্ষ বিশিষ্ট অতি সূক্ষ্ম অণু সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেইরূপ পূর্ক শরীর হইতে আত্মা এই সকল প্রভৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ পূর্বক গমন করে।

শরীরং যদবাপ্নোতি মৃচ্চাপ্যাং ক্রমেতীশ্বরঃ।

গৃহী ত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধা নিরাশয়াৎ॥

এই মৃত্যুর পর জীব স্থল দেহ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সহিত ও পঞ্চতন্ত্রাত্মের সহিত বাসনা দেহ ধারণ করিয়া প্রেতলোকে (ভুবলোকে) বাসকরে।

আমাদের এই দেহে তিনটি দেহ আছে। প্রত্যেক দেহই যন্ত্রের জিনিষ, কোনটাকে তাচ্ছল্য করিবার উপায় নাই। এই তিনটি দেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণ দেহ। এই তিনটি দেহ ছয়টি কোষের মধ্যে আছে। যথাঃ— এই স্থল দেহ—অন্নময় কোষের মধ্যে। ইহা ক্ষিতি, অপ্ তেজ্ মরুৎ, ব্যোম পঙ্কীকৃত পঞ্চভূতাত্মাতে দেহে বর্তমান থাকে। ইহা আহারের দ্বারা ধার্য্য বলিয়া ইহার নাম অন্নময় কোষ।

সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ—প্রাণময় কোষ—পঞ্চবায়ু, দশ ইন্দ্রিয়ের তন্ত্রাত্ম, পঞ্চ প্রাণ বা বায়ুর প্রাণ, অগ্নি, সমান, উদান, বান; পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ত্বক্। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—বাক্ পাণি, পাদ পায়ু ও উপস্থ। মন, বুদ্ধি কামাদি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চবায়ু প্রাণ সংজ্ঞক হইয়াই বস্তু। কেননা তাঁহারাই পুরুষাদি সমস্ত প্রাণিগণকে বাস করান (রক্ষা করেন)। কারণদেহ মধ্যে প্রাণ সমস্ত বর্তমান থাকিলেই এই সমস্ত জগৎ বর্তমান

থাকে, নচেৎ নহে। যে ছেতু নিজেরাও বাস করেন এবং অন্তর্কেও বাস করান, এই জন্য ইহার বস্তু নামে অভিহিত। এই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ যাহার মধ্যে বাসনা ও ভাবনা দেহ আছে—তাহা প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় কোষে বিজ্ঞানময় অবস্থিত। তাহার পর কারণদেহ আনন্দময় কোষে বিরাজমান। কেহ কেহ যট্ কোষ বলেন, কেহ কেহ বিজ্ঞানময় কোষকে এক করিয়া জ্ঞানময় নাম দিয়া পঞ্চ কোষ বলেন। এই পঞ্চ কোষ মধ্যে (যঃ কাশতে শোভতে) বিনি শোভা পান তিনিই কাশী এবং তাঁহাতেই সেই ভগবতী তমু প্রকৃতি পুরুষ বিশ্বনাথঅন্নপূর্ণা যুগল হইয়া এক দেহে বিরাজমান, আর মা গঙ্গা সেই অন্নপূর্ণা যুক্ত বিশ্বস্বামীর চরণ ধৌত করিয়া বিরাজিত। এখানকার মা গঙ্গা—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী সহিত যুক্ত ত্রিবেণী হইতে আসিয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টিত করিয়া আছেন। আমাদের দেহেও তজ্জপ “ইড়া, ভগবতী—গঙ্গা, পিঙ্গলা—যমুনা নদী।

ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে স্মৃষাচ সরস্বতী।

ত্রিবেণী সঙ্গমো যত্র তীর্থরাজ স উচ্যতে।

তত্র মান প্রকৃর্তীত পুনর্জন্ম ন বিজ্ঞতে ॥

এই হইল আসল কাশী। পঞ্চ কোষ দ্বিগুণ কাশী প্রদক্ষিণ করায় কোন ফল নাই—যতক্ষণ না মনকে এই পঞ্চকোষী করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পাঁচটি কোষ হইতে আসিয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টিত কুণ্ডলিনী শক্তিতে না লাগান যায় এবং তথা হইতে সকলকে একত্র করিয়া সহস্রার নিরে ছাদশদল পরমোগনি বিরাজমান শক্তি প্রকাশ করে সেই পরমাত্মা নীন করিতে না পারি। যাহা হইল এই মনের স্বভাব। লক্ষ্যের সহিত মনকে বাস করান

নিশ্চিত সুখভোগ বা যাতায়াত, জনম মরণ  
জন্মনা জঠরে শয়ন আর সংসার শয্যা কণ্টকে  
কৃতবিকৃত হওয়া। মনকে সেই পরব্রহ্মে  
পূর্বোন্মেষে লয় করিতে পারিলেই সংসার নিবৃত্তি  
বা মুক্তি বা মোক্ষ বা পরমানন্দলাভ বা সেই  
পূর্বদান প্রাপ্তি হওয়া যায়, — যেখানে হইতে আর  
দ্বিবিতে হয় না, যেখানে গিয়া আমরা অমৃতের  
পুত্র হইবা অমৃতত্ব লাভ করি এবং সেই দেশে  
বাস করি — সেখানকার রক্ষা শ্রীভগবান্ নিজে  
দ্রুমপে গীতায় বলিয়াছেন।

ন বন্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ  
যদ্যহা দ নিবর্তন্তে তদ্ধান পবনঃ মম ।

আবার শক্তি কঠোপনিষদে বলিয়াছেন—

ন তত্র সূর্যো ভবতি, ন চন্দ্র তারকং  
নৈমা বিভ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নি ।

তমেব ভাস্ত মনুভাতি সর্বং—

তত্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

এখানে সেই আনন্দময় স্থান যেখানে নিরানন্দের  
লেশ নাই। সেই প্রকৃতি পুরুষ পার্শ্বতী  
পরমেশ্বর সত্ত্ব হইতে নিঃসৃষ্ট ব্রহ্মরূপে তথায়  
বিশেষ প্রকাশমান হইয়াছেন। যদিও তিনি  
সর্বজ্ঞ, সর্বদ বিরাট মহান ব্যাপক, তথাপি  
তিনি শরীরের জন্ত সেই ব্রহ্মলোকে বা পর  
বোনে অভূজল জ্যোতির্ময় ভাবে বিরাজমান।

পূর্বে স্থল দেহের ও সূক্ষ্মদেহের কথা বলা  
হইয়াছে, বাকী কারণ দেহ, ইহা আনন্দময়  
কোষে। আত্মা ইহার পরেও ভিন্ন। আনন্দ  
ময় কোষ ক্ষণিক, আর আমি (আত্মা) সর্বদা  
স্থিত বলিয়া নিত্য। এই জন্ত এই আনন্দময়  
কোষ আমি নহি আমারও নহে। ইহা কারণ  
রূপ দেহ। আমি ইহার জ্ঞাতা। ইহা আত্মা  
হইতে ভিন্ন। এই পঞ্চ কোষ অল্পভাব গ্রাহ্য।  
এই পঞ্চ কোষকে অল্পভাব রূপে যে চৈতন্য ভিত্তি

পঞ্চ কোন হইতে ভিন্ন আত্মা। তিনি সৎ,  
চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তাঁহার জন্ম মৃত্যু, স্থখ  
দুঃখ, শোক আনন্দ কিছুই নাই। তবে তিনি  
দ্রষ্টা বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে যুক্ত থাকিয়া স্থখী  
দুঃখী মনে করেন।

আত্মা স্বলিপ্ত মনঃ পরিগৃহ্য মহানতে ।

তৎকৃতান সংজুষণং কামান সংসারে বর্ততেহবশঃ ॥

বিশুদ্ধ ক্ষটিকে যদ্বদন্ত পুষ্প সমীপতঃ ।

তদ্বর্ণনং নৃতো ভাতি বস্ততো নাস্তি রঞ্জনা ।

বুদ্ধিঙ্গিরাদি সামীপ্যাদয়নোহপি তথাগতি ॥

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারো জীবন্য সহকারিণঃ ।

স্বকর্ম বশততাত ফল ভোক্তার এবতে ।

পঞ্চভূতায়কো দেহমুক্তো জীবো যতঃ স্বয়ম্ ।

তগবতী গীতা

দেহ পঞ্চ ভূতময়। কিন্তু তন্মধ্যে জীব স্বয়ং  
মুক্ত অর্থাৎ দেহ হইতে নির্গুণ।

আত্মা প্রথমতঃ নিজ লিপ্ত স্বরূপ মনকে  
গ্রহণ করে, পরে অস্তিত্ব ভাবে তৎকৃত  
কামনা উপভোগ সহযোগে পুনঃ পুনঃ সংসারে  
পরিভ্রমণ করে। বিশুদ্ধ ক্ষটিক যেরূপ  
রক্তবর্ণ পুষ্প সমীপে থাকিলে সেই বর্ণযুক্ত  
বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক উহা উহার বর্ণ নয়,  
তদ্রূপ আত্মা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সামীপ্যহেতু  
স্থখী ও দুঃখীরূপে প্রতীয়মান হয়।

উক্ত স্থল দেহের নাশকে আমরা মৃত্যু  
বলিয়া থাকি। আত্মা শেষ হইয়া আসিলেই  
মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থল দেহ বা  
অন্নময় কোষ হইতে আত্মা বিচ্যুত হইলে  
মৃত্যুবার দিয়া সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ বাসনাদেহ ও  
ভাবনা দেহ লইয়া ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান  
হইয়া পড়ি। এই অজ্ঞানের পরই যখন জ্ঞান  
হয়—তখন আমরা দেখি একটা নূতন ‘লোক’  
আসিয়াছি। তাহাকে ‘দেহ’ লোক বলে।

ইহার নিম্নস্থলে প্রেত বা কাম লোক। মৃত্যুর পূর্বে প্রায়ই অধিকাংশ লোকের মনে বহু কামনা থাকে, সেই সকল কামনা তৃপ্তি না হওয়ায় মানবকে দারুণ ব্যতন। সকল ভোগ করিতে হয়। তখন ভোগের চেষ্টার জন্ত এই অন্নময় কোষ অর্থাৎ পঞ্চভূতায়ক দেহ থাকে না, কিন্তু কামনাগুলি থাকিয়া যায়, তাহার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় এষ্ট প্রেতলোকে অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাহার পর যখন পাপক্ষয় হয়, যখন প্রেতলোকে কিছুকাল যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে কামনা সকল ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন কামনা দেহের কতকগুলি অণু কমিয়া যায়। এই ভোগকাল সমান নয়, কামনার গুরুত্ব অনুসারে ইহার দীর্ঘতা নির্ভর করে। সাধারণতঃ ইহাকে এক বৎসর ধরিয়া পুণ্যগণকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধ ভাবে শ্রদ্ধার সহিত মৃত্যুর পর প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতা মাতার জন্য তর্পণ জল অর্পণ ও মাসিক শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দান, ব্রাহ্মণ ভোজন আবশ্যক। এই প্রেত অবস্থায় সেই জীব নিজের ভ্রূণ মোচন করিতে সমর্থ হয় না। তাহাকে কামনার দাবানলে জলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়। পিপাসার কাতর হইলে জল নাই। ক্ষুধার কাতর হইলে আহার নাই। শীতে কাতর হইলে বস্ত্র নাই। প্রেত লোকের এই সকল যন্ত্রণা লাঘব করাইবার জন্ত ও অপেক্ষাকৃত সুখের স্থান পিতৃলোকে গমনের জন্ত ত্রিকালজ্ঞ আৰ্য্য ঋষিগণ যথার্থ ব্রাহ্মণের অভাবে এই কলিকালে শালগ্রাম শিলার সমুদ্রকুময় ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান করাইয়া তাহাতে বিষ্ণুর আরাধনা ও যন্ত্রাদি দ্বারা শুদ্ধভাবে প্রস্তুত অন্ন ভক্তিতে প্রদত্ত পিতৃদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শীতোষ্ণাদির ব্যতন। নিবারণের জন্ত ছত্র, পাছকা, বস্ত্র, মসারি, খাট প্রভৃতি শ্রদ্ধার সহিত সংপাণে দান করিয়া রাখা করিয়াছেন। কিন্তু

কি নোর কলিকাল আগত! এই পরম লোক-হিতকর শ্রাদ্ধাদি ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিতেছে। লোক দেখানি করিয়া আত্ম শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণ পর্য্যন্ত হয়, তাহার পর আব একোদ্বিষ্ট সপিণ্ডও হয় না। ইহার সম্বন্ধে বিশ্বাস ক্রমশঃ লোপ পাইয়া উঠিয়াছে—বিশেষ আধুনিক শিক্ষা একবারে আমাদেরকে শ্রদ্ধাশীল করাইয়াছে। অত্যাশ্রয় যুগের মত পূর্ণ আয়ুভোগ কিছু ঘটে। প্রায়ই অকাল মৃত্যু। পূর্বে লোকের মৃত্যু বান্ধক্যে জরগ্রস্ত পর হইত, তাহাতে তত মৃত্যু যন্ত্রণা হইত না। লোকে প্রস্তুত হইয়া ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে মরিতে পারিত এখন আর তাহা হয় না। অকালে হঠাৎ মৃত্যুর লক্ষণ আবির্ভাবের পূর্বেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়, সেই জন্ত মৃত্যুর পূর্বে অসহ যন্ত্রণা ও প্রেত দেহে অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমরা আরামে থাকিবার জন্ত ভাল ঘর ঘর তৈয়ার করাই, গাড়ি বোড়ার ব্যবস্থা করি, সুন্দর স্বকোমল শয্যার ব্যবস্থা করি, ভাল পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যবস্থা করি, কিন্তু যে অর্থ কেবল অভাব মাত্র মোচনের জন্ত, যাহা শাস্ত্রে কেবল ভরণ পোষণ মাত্র আবশ্যক মত উপার্জন করিয়া সঞ্চয়ের নিবেদন করিয়াছেন, সেই অর্থের অগাধ সঞ্চয় ব্যাপদেশে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়, বাকীটুকু অলসে বিলাসে, আমোদে প্রমোদে ও নিজের কাটিয়া যায়, কিন্তু আমরা এই ভীষণ মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইবামু কোনই উপায় করি না। কারণ বাল্যকাল হইতে এ বিষয়ে কেহ শিক্ষা দেয় নাই। আমরা যদি এখন আমাদের বাল্যকালকে বাল্যকাল হইতে এই সকল বিষয় না জানাইয়া এ না শিখাটুকু রাখি তবে কখন হঠাৎ মরিয়া

নাইব,—ইহ সংসারে ত কত কষ্টই পাইলাম ।  
 প্রেতলোকের কষ্ট নিবারণের জন্ত যে পুত্র  
 কামনা, সেই পুত্র ত কই আমার কষ্ট নিবারণ  
 করিতে পারিবে না । তর্পণ জল দিলে, পিণ্ডদান  
 করিলে, যে পরলোকে প্রেত দেহের তৃপ্তি হয়,  
 এই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে কয়জনের  
 আছে যে, আমাদের নিকট হইতে আমাদের  
 বালকগণ সে শিক্ষা পাইতে পারিবে? পিতৃ  
 পুরুষকে শ্রাদ্ধকালে বাহা দেওয়া হয়, তাহা  
 শুদ্ধ ও শুচিভাবে পবিত্র অন্তঃকরণে দিতে হইবে।  
 মন্ত্র সকল শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে ও  
 মন্ত্রার্থ বর্ণিমা, ভাবে-শ্রদ্ধাতে গন্দ গন্দ হইয়া উঠা  
 পিতৃ পুরুষকে অর্পণ করিতে হইবে। বাল্যকাল  
 হইতে বালককে এই পরলোকতত্ত্ব উপদেশ  
 দিয়া তাহাদের মনে এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা  
 জন্মাইতে হইবে। এইরূপে তাহাদের হৃদয়ে  
 শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে। মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস  
 জন্মাইরা দিতে হইবে। মন্ত্রের দ্বারা অনেক  
 অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদিত হয়। কেবল যে  
 উপাসনাদির দ্বারা প্রেত দেহের ছুংথের লাঘব  
 হয়—তাহা নহে, তর্পণ জল প্রদান ও শ্রাদ্ধাদি  
 কার্য ও পিণ্ডদান দ্বারা পরলোকগত  
 জীবের আহার পিপাসা প্রভৃতির কষ্টের  
 নিবারণ হয়, পুণিগণ দিবা দৃষ্টিতে এই সকল  
 দেখিয়া পনের মঙ্গল কামনায় শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থায়  
 ঈশ্বরোপাসনার সহিত মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি  
 কার্যের বিধি প্রদান পূর্বক উহা আরও কল-  
 দায়ক করিয়াছেন। প্রেতদেহ বিনোচনের জন্ত  
 তাহা বা আত্ম শ্রাদ্ধাদির এবং ভাবনা দ্বৈহ  
 বিনোচনের জন্ত সপিণ্ডকরণাদির ব্যবস্থা  
 করিয়াছেন। মানবের প্রেতলোকে যে সমস্ত  
 কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা স্মরণ থাকে না  
 বটে—কিন্তু ইহার দ্বারা পরমব্যাকরণিক পিতা

পরমেশ্বর জীবের শুদ্ধি ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য  
 করিতেছেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই কষ্ট  
 ভোগের দ্বারা চিত্তে বড়ই অল্পতাপ আইসে  
 এবং তদ্বারা কামনাদেহের অধুপরমাণু অনেক  
 ক্ষয় হইয়া যায়। তাহার দ্বারা জীব পিতৃ  
 লোকে উন্নত হয়। সেখানে কতক স্থল  
 ভোগ কতক ছুংথভোগ দ্বারা বাসনা ক্রমশঃ  
 ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন তাহার দ্বিতীয় মৃত্যু  
 হয়, তাহার পর ভাবনা দেহ লইয়া স্বর্গে গমন  
 করে। সেখানে স্থল কিন্তু একঘেষে; প্রথম  
 প্রথম ভাল লাগিলেও তাহার পর আর ভাল  
 লাগে না। এইরূপে কিছুকাল কাটিলে তাহার  
 ভাবনা দেহটিও বিচ্যুত হয়, তখন তাহার  
 তৃতীয়বার মৃত্যু হয়। তাহার পর বাহারা  
 বেশী পুণ্যবান হয়, তাহারা আরও উচ্চ  
 স্বর্গে গমন পূর্বক অতুল আনন্দ উপভোগ  
 করে। অতঃপর পূর্ব সঞ্চিত বাসনা অনুসারে  
 আবার একটা নূতন দেহ ধারণ পূর্বক কর্মফল  
 ভোগের জন্ত পৃথিবীতে নিজ কর্মের উপযুক্ত  
 পিতার গুণসে ও মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।  
 কি প্রকারে এই পৃথিবীতে জন্ম হয় তাহা শাস্ত্রে  
 যেরূপ আছে তাহা সংক্ষেপে বলি হইতেছে।

স্বকর্মবশতো জীবো নীহারকণা যুতঃ ।

পতিতো ধরণী পৃষ্ঠে ব্রীহিমধ্যগতো ভবেৎ ॥

স্থিত্বা তত্র চিরং ভুঞ্জ্য ভুজ্যাতে পুরুষৈ স্ততঃ ।

ততঃ প্রবিষ্টং তদভুজ্যং পুংসোদেহে প্রজায়তে ॥

রেতস্তেন স জীবোহপি ভবেদেহগতস্তদা ॥

ভগবতী গীতা ।

জীব স্বর্গলোক হইতে নিজ কর্মফলানু-  
 সারে আগত হইয়া কিছুকাল আকাশ মার্গে  
 ভাসমান থাকে। মৃত্যুর পর প্রেত অবস্থা  
 হইতে এই অবস্থায় আসিতে তাহার কত সময়  
 লাগে—তাহার স্থিরতা নাই। নিজ কর্ম





প্রকার পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়াছি ।  
পবিত্রন প্রতিপালনের জন্য কতই শুভাশুভ  
কর্ম করিয়াছি । কিন্তু সেই সকল কর্মের নিমিত্ত  
আমাকে একাকী দগ্ধ হইতে হইতেছে, তাহারা  
তো তাহার ফলভোগ করিতেছে না ! অহো !  
এই দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া উদ্ধারের কোন  
উপায় দেখিতেছি না । যদি একবার এই  
গর্ভ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অশুভ  
ক্ষমকানী মুক্তি ফলপ্রদায়ক সেই মহেশ্বরের  
শরণাপন্ন হইব । যদি একবার এই গর্ভবাস  
হইতে মুক্ত হইতে পারি—তবে সেই অশুভ  
ক্ষমকানী মুক্তি ফলদাতা নারায়ণের চরণে  
শরণ লইব । যদি একবার এই যোনি হইতে  
নির্গত হইতে পারি, তবে অশুভ বিনাশক সাংখ্য  
জ্ঞান এবং যোগের অভ্যাস কবিব । যদি  
একবার যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি—তবে  
সর্বদা সেই ব্রহ্মসনাতনকে ধ্যান করিব ।

অথ যোনিদ্বারং সম্প্রাপ্তো যন্তেণাপীতামাপে  
নহতা হুংখেন জাতমাত্রস্ত বৈষ্ণবেন বায়ুনা  
নংপৃষ্টে শুদান স্মরতি জন্মমরণানিচ কর্ম শুভা  
শুভং বিন্দতি । গর্ভোপনিষৎ ।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে গর্ভস্থ  
শিশু গর্ভদ্বারে আসিয়া—অস্থি যন্ত্র দ্বারা অতিশয়  
পীড়িত হইয়া, ঘোরতর দুঃখ প্রাপ্তির পরনরক  
হইতে নির্গত নারকীর ন্যায় গর্ভ হইতে নির্গত  
হইয়া জন্মলাভ করে । সেই সময় বৈষ্ণবী  
মায়া দ্বারা মুগ্ধ হইয়া জন্মমরণাদি বিস্মরণ হইয়া  
যাব এবং শুভাশুভ কর্মও আর জানিতে পারে  
না ।

আমরা এই বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা মুগ্ধ  
হইয়া সমস্ত বিস্মরণ হই বুলিয়া আবার আমরা  
সংসারী জীবরূপ সংসার-প্রবাহে বাতায়ত  
করিতে থাকি । যে ব্যক্তি সেই শ্রীভগবানের

শরণাপন্ন হন, মায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়  
এবং আহার শুদ্ধিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি আসিলে  
স্মৃতি পুনরায় উদয় হইলে যে যন্ত্রণার সংস্কার  
মাত্র থাকায় মৃত্যুর পর আবার সেই দুঃখে  
পড়িতে হইবে বলিয়া ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আইসে  
—সেই সংস্কারের স্থানে পূর্ণ স্মৃতি লাভ  
পূর্বক সংসার বাতায়াতের যন্ত্রণা—মনোমধ্যে  
উদিত হওয়ায় তাহার নিষ্কৃতির উপায় অল্পসংখ্যানে  
লিপ্ত হইয়া সেই ভয়েরও ভয়—অনন্তেরও অন্ত  
সেই অনন্তদেবের শরণাপন্ন হই । তাঁহার  
শরণাপন্ন হইলে মায়াও সরিয়া যায় । এই  
মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া বড়ই  
কঠিন । যে ব্যক্তি সেই মায়া যাঁহা হইতে  
উদ্ধৃত ও মায়া যাঁহার আশ্রয়—সেই  
শ্রীভগবানের শরণ লন, তিনিই সেই মায়ার হাত  
হইতে উদ্ধার পান, অন্যে পায় না ।

রেবী হেনা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥

আমরা স্বয়ং জানি না যে, কি প্রকারে আমাদের  
সংসারে গতাগতি হইতেছে, তাই আমরা সতর্ক  
হইতে পারি না । সর্বদা বিষয় লিপ্ত হইয়া  
সেই পরমধনকে ভুলিয়া যাই । আমাদের  
বালকেরাও আনাদের অগুরুকরণে দৈব  
বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে এবং সাধারণ বিদ্যা  
শিক্ষার সহিত ব্রহ্মবিজ্ঞা, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি  
শিক্ষা দেওয়া যাইতেছেন বলিয়া তাহারা  
এত শীঘ্র অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে ।  
সংসার আলা-যন্ত্রণার দিকে—শোক দুঃখের  
দিকে মনকে লইয়া গিয়া মনকে কাতর করিয়া  
ভুলিতেছে, যখন সংসারে বিষয় স্বপ্ন নাই, কেবল  
দুঃখময় দেখাইতে পারিবে, তখন প্রকৃত দুঃখ  
কোথায়—মন তাহার সংসার করিতে প্রবৃত্ত  
প্রবৃত্ত হইবে । সেই সময় যদি ভগবানকে

মনকে উপদেশ দেওয়া যায়, মনকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, সেই পতিতপাঁবন অধম-তারণ দীনবন্ধু দয়াময় হরি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই—তখনই মন সর্বদুঃখ নিবৃত্তির পর পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত সেই সচিদানন্দ শ্রীভগবানকে প্রেম ভক্তিপূর্ণ নয়নে দেখিবে।

এই সাধন—সংসারে শ্রেষ্ঠ এবং সার সাধন। এই সাধন জ্ঞাত শরীর ও মন—কষ্টের হেতু হইলেও আবার দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টারও একমাত্র উপায়। এখন এই শরীর ও মন বাহ্যতে বালকের স্নহ পবিত্র ও কর্মক্ষম হয়—তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল।

## পঞ্চকর্ম।

( পূর্বানুষ্ঠান )

—:~:—

ডাঃ। আচ্ছা বস্তি প্রয়োগের পর পথ্যাদির নিয়ম কি ?

ক। স্নেহবস্তি প্রয়োগের পর স্নেহ—শরীর থেকে নির্গত হ'য়ে গেলে, যদি পূর্বেই অন্ন জীর্ণ হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে সায়ংকালে লঘু অন্ন আহার ক'রাতে হয়। পরদিন প্রাতঃকালে খনে ও শু'ঠের সঙ্গে সিদ্ধ করা গরম জল পান করান উচিত। উহাতে অগ্নির দীপ্তি ও আহারে কৃতি হয়। বস্তি প্রয়োগের পর অতিভোজন, নিরন্তর একস্থানে থাকা, অধিক কথা বলা, ঘানে ভ্রমণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, শীত ক্রিয়া, আতপসেবন, শোক ক্রোধ প্রকাশ, অকালভোজন এবং অহিতকর দ্রব্য-ভোজন পরিত্যাগ করা উচিত।

ডাঃ। এইবার নিরুহ প্রয়োগের বিধি বলুন।

ক। স্নেহ বস্তি ও নিরুহ প্রয়োগের নিয়ম একই, তবে পূর্বেই বলেছি যে, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হ'লে তবে নিরুহ প্রয়োগ ক'রতে হয়, ভুক্ত ব্যক্তিকে নিরুহ দিতে নেই। নিরুহ প্রয়োগের পর ত্রিশ মাত্রা উচ্চারণ ক'রতে যতক্ষণ সময় লাগে,—ততক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রোগীকে উঠতে বলবে। নিরুহ প্রয়োগের পর উবু হয়ে ব'সতে হয় অর্থাৎ উপবেশন করতে হয়। নিরুহ এক মূহুর্তের মধ্যেই প্রত্যাগত হয়ে থাকে।

ডাঃ। বস্তি প্রয়োগ ক'রবার সময় কি রকম ভাবে প্রয়োগ ক'রতে হয়, আর ধারণ ভাবে প্রয়োগ ক'রলে কি দোষ হয়—সে সব কথা কিছু বলা হয় মি ?

ক। হয়েছে বৈকি? স্নেহ অনেক হয়, স্নেহ বস্তি দ্বারা—অন্যভাবে—স্নেহ বস্তি দ্বারা—

কথা শুনে পাবেন । এখন ছই একটা কথা বলছি । বস্তির নল সোজাভাবে প্রবেশ করাতে হয় । কেননা তির্ধ্যাকভাবে প্রবেশ করলে ঔষধের ধারা ভিতরে প্রবেশ করেনা । বস্তির নল ঢকল চ'লে গুহদেশে ক্ষত হয় । বস্তিপুট আস্তে আস্তে টিপলে বস্তির ঔষধ অশ্রয় প্যাপ্ত পুঁছছায় না । অত্যন্ত বল পূরক টিপলে বস্তির ঔষধ কঠ পূর্ণ্যস্ত যায় । এইজন্য বস্তির নল সরল ও স্থির ভাবে রাখবে এবং বস্তি খুব বেশী জোরেও নয় অথচ কম জোরেও নয়—এরূপ ভাবে টিপবে ।

ডাঃ । স্নেহ বস্তি আর নিরুহ বস্তি প্রয়োগের পর পথ্যের নিয়ম কি এক রকম ?

ক । তা' কি করে হ'বে ? স্নেহবস্তি অগার করিয়ে, আর নিরুহ বস্তি আহার জৌর্ণ হ'লে প্রয়োগ ক'রতে হয় । সুতরাং স্নেহ বস্তি প্রয়োগের পর স্নান ও ভোজন ক'রতে হয় । পিত্ত, কফ ও বায়ুজনিত রোগে যথাক্রমে হুঙ্ক, মৃগের স্ম ও মাংসরসের সঙ্গে আহার দেবে । অথবা সমস্ত রোগেই জাঙ্গল মাংস রসের সঙ্গে পথ্য দেওয়া যেতে পারে । রোগীর দোষ ও অগ্নিবল অনুসারে নিত্য যে পরিমাণ খাওয়া অভ্যাস—তা'র সিকি' অর্ধেক বা তিন ভাগ পরিমাণ খাদ্য দিতে হয় ।

ডাঃ । আচ্ছা নিরুহ ঔষধ যদি শরীর থেকে না বেরিয়ে না আসে, তা' হ'লে কি অনিষ্ট হয় ?

ক । হাঁ, খুব অনিষ্ট হয় । নিরুহ দ্রব্য অধিককাল শরীরের মধ্যে বদ্ধ থাকলে দানি, জ্বর—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হ'তে পারে । সেই জন্য নিরুহদ্রব্য অধিককাল শরীরের মধ্যে থাকলে ক্ষার, গৌমূত্র এবং অন্ন

সংযুক্ত তীক্ষ্ণ নিরুহ প্রয়োগ ক'রে সংশোধন ক'রবে ।

ডাঃ । সংশোধন করবেন কি ? কতকটা পেটের মধ্যে র'য়েছে, আবার কতকটা পেটে ঢুকিয়ে দেবেন ?

ক । হাঁ ঢুকিয়ে দেবেন—আগেকার দেওয়া নিরুহ শুদ্ধ বার ক'রবার জন্তে । যেমন বেনো জল ঢুকে সাবেক জল বা'র ক'রে নিয়ে যায়, সেই রকম, কিম্বা যেমন কানে জল দিয়ে জল বের করার নিয়ম আছে—সেই রকম ।

ডাঃ । আচ্ছা নিরুহ প্রয়োগ ভাল কি মন্দ হ'ল—বোঝবার লক্ষণ কি ?

ক । নিরুহ সম্যক রূপে প্রয়োগ করা হ'লে শরীর বেশ লঘু হয়, আর মল, পিত্ত, কফ ও বায়ু ক্রমান্বয়ে নির্গত হ'য়ে থাকে । নিরুহের অতি প্রয়োগ হইলে, অতিরিক্ত বিরচন হ'লে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেইরূপ ঘটে । আর অসম্যক প্রয়োগ হ'লে বেগ অন্ন হয়, মল ও বায়ু কম নির্গত হয় এবং মূত্ররোধ, অকচি ও শরীরের জড়তা জন্মায় ।

ডাঃ । নিরুহের মাত্রা সম্বন্ধে কি স্বতন্ত্র নিয়ম আছে, না স্নেহবস্তির মত মাত্রা দিতে হয় ?

ক । না, স্বতন্ত্র নিয়ম আছে । পিত্ত প্রধান রোগে কষায়ের মাত্রা পাঁচ ভাগ, স্নেহ এক ভাগ । পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকলেও এই রকম মাত্রা । বায়ু প্রধান রোগে কষায়ের মাত্রা আট ভাগ, আর স্নেহ এক ভাগ । এক বৎসর বয়স শিশুর নিরুহের মাত্রা আট তোলা । দ্বিতীয় বৎসর থেকে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর আট তোলা মাত্রা বৃদ্ধি ক'রতে হয়, অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর ১৬ তোলা, তৃতীয় বৎসর

২৪ তোলা, চতুর্থ বৎসর ৩২ তোলা এইরূপ। দ্বাদশ বৎসর থেকে অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ১৬ তোলা ক'রে মাত্রা বৃদ্ধি ক'রতে হয়। আঠার বৎসর থেকে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত এই নিয়মেই নিরুহ প্রয়োগ ক'রতে হয়। সত্তর বৎসরের পর ষোল বৎসর বয়সে যেরূপ মাত্রা আছে—সেই রকম মাত্রায় দিতে হয়। শিশু ও বৃদ্ধদিগের নিরুহের মাত্রা দুইপল এবং নিরুহ দ্রব্য মৃদুবার্ষ্য হওয়া উচিত।

ডাঃ। এ রকম মাত্রায় নিরুহ দিলে বোধ হয় এক নিরুহেই রোগীর দফা শেষ হয়। কেননা আঠার বৎসর বয়সে চার সের বক্রিশ তোলা নিরুহ দিতে হবে। তা'রপর শিশুদের নিরুহের মাত্রা একবার বলা হল যে প্রথম বৎসর ৮ তোলা- তা'রপর প্রতি বৎসর আট তোলা বাড়'তে হবে। তা'রপর বলা হল যে শিশুদের মাত্রা ষোল তোলা! এতে বুঝ কি?

ক। বুঝবেন সবই, কিন্তু ক্রমশঃ। শাস্ত্রে বলে যে “শৈনঃ পর্কত লজ্জনম” অর্থাৎ ধীরে ধীরে পর্কত লঙ্ঘন করতে হয়। তা' আপনি কি আয়ুর্বেদের পঞ্চকর্মরূপ এই মহাপর্কত একেবারেই লঙ্ঘন ক'রতে চান? সবুর করুন—সবুরে মেওয়া ফলে। আপনার আপত্তি আমি খণ্ডন ক'রছি। আপনার প্রথম কথা এই যে, মাত্রা বড় বেশী। পূর্বে ঔষধাদির মাত্রা যেরূপ ছিল, এখনকার লোকে যে সেরূপ মাত্রা সহ্য করতে পারে না—সে কথা পূর্বে বলেছি। খাবার ওষুদু সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম, বস্তি প্রয়োগের ঔষধেরও সেইরূপ নিয়ম। আরও একটা কথা,—দেখুন, শাস্ত্রকার বলেছেন যে, সত্তর বৎসর বয়সের পর ষোল

বৎসর বয়সের মত মাত্রা প্রয়োগ ক'রতে হ'বে। কিন্তু এখন সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত কম লোকেই বাঁচে। আগে লোকের একশত বা একশত কুড়িবৎসর পরমায়ু ছিল, আর সেই হিসাবে সত্তর বৎসরের পর লোকে প্রকৃত বৃদ্ধ হতো। বেশী দিনের কথা নহে—ঘনাব বচনেও “নর গজা বিশেষয়” অর্থাৎ নব ও গজ এতশত কুড়ি বৎসর বাঁচে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এখন লোকে যখন সত্তর বৎসরের বেশী বাঁচে না, তখন ৫০ বা ৬০ বৎসর বয়সের আগে বৃদ্ধ হয় এরূপ মীমাংসা করা উচিত। আর তা' ব'লে সত্তর বৎসর বয়সে যে পরিমাণ বস্তি দ্রব্য প্রয়োগ ক'রবার নিয়ম, এখন পঞ্চাশ বৎসরেই সেই রকম প্রয়োগ ক'রতে হ'বে,—তাও কম মাত্রায়, কেননা এখনকার লোক অল্পপ্রাণ। তারপর আপনার দ্বিতীয় কথা—শিশুদের মাত্রা সম্বন্ধে। এখন দেখুন শিশুকাল কত দিন? সকল শিশু সম্যক বলশালী হয় না, সকল শিশুর দেহ সমান ভাবে পুষিবদ্ধিত হয় না? এ সব বিষয় বিচার ক'রতে হ'লে অনেক পার্থক্য দেখতে পাবেন। কোনমতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শৈশব অবস্থা, তাই যদি হয়, তা'হলে ছই বৎসরের শিশুকে যে পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য, নয় বৎসরের শিশুকে কি সেই প্রমাণ ঔষধ প্রয়োগ করা সম্ভব? কাজেই শিশুদের একটা সাধারণ মাত্রা নির্দিষ্ট ক'রে তা'রপর বলা হয়েছে যে, শিশুর বয়স অগ্নিবল, দেহের, পরিমাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করে মাত্রায় হ্রাস বৃদ্ধি ক'রতে হ'বে।

ডাঃ। আচ্ছা আপনি পূর্বে বলেছিলেন যে, আয়ুর্বেদে রেক্টাল ফিডিং (Rectal feeding) আছে। যে ঔষধ ঔষধি দ্রব্য

ক। না আর কিছু নয়, এই বস্তিই বটে।

ডাঃ। তা বস্তিটা রেকফিডিং হ'ল কি করে?

ক। রেকট্যাল ফিডিং মানে মলদ্বার দিয়ে খাওয়ান বা পুষ্টিকর পদার্থ মলদ্বার দিয়ে শরীরে প্রবেশ করান। পূর্বে ব'লেছি যে, বৃহৎ বস্তি আছে। বৃহৎ মানে পুষ্টিজনক। যে বস্তি প্রয়োগে শরীরের পুষ্টি হয়, সে বস্তি কি মলদ্বার দিয়ে খাওয়ান নয়? একটা বস্তি দ্বারা প্রযুক্তা ঔষধের নমুনা দেখুন। ছাগমাংস ৩০ সওয়া ছয় সের, আট গুণ জলে সিদ্ধ ক'বে চতুর্থ ভাগ থাকতে নামাবে। তার পর এক পোয়া তৈল ও এক পোয়া ঘৃত দিয়ে স'তলে নেবে। এই মাংসরস, দধি ও দাঁড়িমের বসের দ্বারা অম্লাকৃত এবং সৈন্ধব লবণ ও মদন ফলের কক্ক মিশ্রিত করে তদ্বারা বস্তি প্রয়োগ করবে। এই বস্তি বল, বর্ণ, মাংস ও শুক্রবদ্ধক, অগ্নিদীপক এবং আক্কা ও শিরোরোগ নাশক। এখন বিবেচনা করে দেখুন, এই বস্তির উদ্দেশ্য মলদ্বার দিয়ে পুষ্টি-কর দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করান নহে কি?

ডাঃ। প্রকারান্তরে এটা রেকট্যাল ফিডিং বটে, কিন্তু আমরা যে রকম স্থলে রেকট্যাল ফিডিং করি, সে রকম নয়। এই মনে করুন, ডিক্কা রোগে রোগীকে মুখ দিয়ে খাওয়ানো যাচ্ছেনা, তাকে মলদ্বার দিয়ে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এ সে রকম নয়।

ক। না, সে রকম নয়। তবে সে রকম না তোলেও মলদ্বার দিয়ে যে পুষ্টিকর পদার্থ প্রবেশ করান যেতে পারে, এবং আয়ুর্বেদ কারিগণের যে সে সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল এর দ্বারা তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়? আর তাই যদি ছিল— তা' হ'লে যে সকল রোগীকে স্নান

দিয়ে খাওয়ান যায় না, অথচ আহারাভাবে মারা যাচ্ছে, তাঁদের যে মল দ্বার দিয়ে খাওয়ান হত না এমন কথা বলা যায় না; তবে এসম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ এখন দিতে পারছি নে।

ডাঃ। কথাটা বলেছেন মন্দ নয়। তবে যখন বিশিষ্ট প্রমাণ নেই, তখন জোর ক'রে কিছু বলা চলে না। এখন বস্তি সম্বন্ধে যদি সব কথা বলা হয়ে থাকে, তা' হ'লে তা'র পর কি করতে হয় বলুন।

ক। বস্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। তবে আর পুঁথি বাড়িয়ে কাজ নেই। কিন্তু বস্তির পর কি ক'রতে হয় তা' বল'বার আগে উত্তর বস্তির কথা বলে নেই।

ডাঃ। হাঁ তাই বলুন ওটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

ক। পুরুষকে উত্তর বস্তি দিতে হ'লে রোগীর আঙ্গুলের চৌদ্দ আঙ্গুল পরিমাণ নল প্রস্তুত ক'রতে হয়, মালতী ফুলের বোঁটার আগার মত সূক্ষ্ম এক একটি সর্ষপ নির্গত হ'তে পারে এরূপ ছিদ্র বিশিষ্ট হবে। কেহ কেহ বলেন যে, লিঙ্গের সমান পরিমাণ নল প্রস্তুত ক'রতে হ'বে। নল স্বর্ণ বা রৌপ্য নিষ্প্রিত এবং মশপ হওয়া আবশ্যক। বস্তি দ্বারা প্রযুক্তা স্নেহ পদার্থের পরিমাণ আট তোলা। কিন্তু আট তোলা পূর্ণ মাত্রা, পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা কম বয়স হ'লে বিবেচনাপূর্বক মাত্রা কম ক'রতে হ'বে।

উত্তর বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হ'লে রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ স্বেদ প্রদান করে ঘৃত ও দুধ সংযোগে বথা শক্তি যবাক্ত পান করাবে। পরে রোগীকে জাহ্ন তুল্য উচ্চ সমান আসরে বসিয়ে বস্তি ও মস্তকের তালুদেশ উক্ক তৈল দ্বারা অভিষেক করাবে। অনন্তর শলাকা দ্বারা

লিঙ্গেব ছিদ্র অধেষণ ক'রে পরে ঘৃত্যভ্যক্ত বস্তি নল ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ প্রবিষ্ট করাবে এবং বস্তি প্রয়োগ করে নলটা ধীরে ধীরে বার ক'রে নেবে।

বস্তি দ্বারা প্রযুক্ত স্নেহ প্রত্যাগত হোলে অপরাহ্ন কালে দুধ, মুগের ঘূষ, বা মাংসের ঘূষ আহার করতে দেবে। এই রূপ নিয়মে তিন চার বার বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়। তবে উপর্যুপরি না দিয়ে স্নেহ বস্তির ত্রায় এক দিন অন্তর দিতে হয়।

ডাঃ। স্ত্রীলোকদেরও কি এই নিয়মে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করতে হয়?

ক। স্ত্রীলোকদের অপত্য পথে চার অঙ্গুলি এবং মূত্রপথে দুই অঙ্গুলি বস্তি নল প্রয়োগ করতে হয়। বালিকাদের মূত্রপথে এক অঙ্গুলি পরিমাণ। স্নেহ পদার্থের মাত্রা রোগীর হাতের এক অঙ্গুলি পরিমাণ। স্ত্রীলোকদের উত্তর বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হ'লে উত্তান (চিং) ভাবে শুইয়ে জাহ্নুদেশ উদ্ধদিকে রেখে বস্তি প্রয়োগ করতে হয়। গর্ভাশয় শোধনের জন্ত স্নেহ পদার্থের মাত্রা দুই অঙ্গুলি। উত্তর বস্তি প্রয়োগ করলে যদি স্নেহপদার্থ নির্গত না হয়, 'তা' হ'লে পুনর্বার শোধনীয় ঔষধ সংযুক্ত বস্তি প্রয়োগ করবে, কিম্বা শোধনদ্রব্য সংযুক্ত বস্তি মলদ্বারে প্রয়োগ করবে। ইহাতে মলের বেগ উপস্থিত হ'লে স্নেহ নির্গত হতে পারে। অথবা বস্তি মার্গে এষণী নামক যন্ত্র প্রয়োগ করবে। কিম্বা মুষ্টি দ্বারা নাভির অধোভাগে পীড়ন ক'রবে। কিম্বা সোঁদাল পাতা, নিসিন্দার রস, গোমুত্র ও মৈন্ধব লবণ সংযোগে বয়স ভেদে মুগ, এলাচ, জীরা, সর্ষপের ন্যায় বেধ বিশিষ্ট বস্ত প্রস্তুত করে প্রয়োগ করবে। অপত্যমার্গে

চার অঙ্গুলি বস্তি প্রয়োগ করতে হয়।

বস্তিদেহে দাহ জন্মালে, যষ্টিমধুর শীতল কাথে মধু ও চিনি মিশ্রিত করে অথবা ক্ষীরী বৃক্ষের (যে সকল বৃক্ষের আটা আছে) বটাদি কাথ শীতল ছন্ধ সহ মিশ্রিত করে, তদ্বারা বস্তি প্রয়োগ করবে।

ডাঃ। উত্তর বস্তি কোন্ কোন্ রোগে প্রয়োগ করা হয়?

ক। আর্ত্বব দূষিত হ'লে কিম্বা অসময়ে আর্ত্বব দর্শন বা আর্ত্বব নাশ হলে, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ, যোনি রোগ, অপরা (ফুল) না পড়া, শুক্র নির্গমন, শর্করা, পাথরী, বস্তি, কুঁচকি বা লিঙ্গে শূলবদ্ বেদনা এবং মেহ ব্যতীত বস্তি জাত অত্যাগত যৌরতর রোগ সকল উত্তর বস্তি দ্বারা প্রশমিত হয়। এই উত্তর বস্তির সম্যক প্রয়োগের লক্ষণ; ব্যাপৎ এবং তাহার চিকিৎসা স্নেহ বস্তির ত্রায়।

ডাঃ। এইবার কি ব্যাপদের কথা বলবেন নাকি?

ক। না আগে পঞ্চকর্ম শেষ হোক তারপর ব্যাপদের কথা বলব।

ডাঃ। এইবার কোন্ কর্ম?

ক। এইবার নস্য। বমন-বিরেচন অহ-বাসন ও নিরুহ প্রয়োগ ক'রে শরীর শুদ্ধ হ'লে পর রোগীর মস্তকে স্নেহ ও স্নেহ প্রয়োগ ক'রবে। তা'রপর রোগের বল বিবেচনা ক'রে একবার, দুইবার বা তিনবার মস্ত প্রয়োগ ক'রে শিরো বিরেচন ক'রবে। শিরোবিরেচন সম্যকরূপে প্রযুক্ত হ'লে হৃদয়, মস্তক ও ইন্দ্রিয় সকল লঘু হয় এবং স্রোতসকল বিভক্ত হয়। আর মস্তক অতি বিরেচিত হলে মস্তক, চক্ষু, শ্রবণদেহ ও কর্ণে বিবিধ পীড়া হৃদীবেদন বেদনা এবং চক্ষুকে জ্বরাকার সেবা এই সকল

লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ ঘ'টলে রোগীকে  
স্নেহ পান করিয়ে মুহু তর্পণ প্রয়োগ করবে।

ডাঃ। আচ্ছা নশ্ত্রমাত্রকেই কি শিরো-  
বিরেচন বলে ?

ক। না, নস্যের কথা এইবার বলছি,  
যা ব'ললাম—এটা হ'ল বস্তি প্রয়োগের পর  
শিরোবিরেচনের নিয়ম।

নস্য কৰ্ম্ম, পাঁচ প্রকার, যথা, প্রতিমর্ষ,  
অবপীড়, নস্য, প্রশমন ও শিরোবিরেচন।  
তন্মধ্যে স্নেহ দ্রব্য নাসাপুটের দ্বারা উর্দ্ধে  
আকর্ষণ ক'রে গলদেশ দিগে বহির্গত ক'রলে  
তা'কে প্রতিমর্ষ নস্য বলে। প্রতিমর্ষ নস্য দুই  
অঙ্গুলীতে লইয়া সকল ঋতুতেই দিবারাত্রি  
সকল সময়ই নাসাপুটে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু  
উষ্ণমানে গ্রহণ করা কর্তব্য নয়। ইহা দ্বারা  
স্নহ ব্যক্তিদিগের দন্ত, শিরঃ, কপালাদি দৃঢ়  
হয়। প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে, আহারান্তে  
এবং নিদ্রা, পর্য্যটন, গরিপ্রম, মৈথুন, মন্তকে  
তৈলাদি মর্দন, গণ্ডুষ ধারণ, মূত্রতাগ, অঞ্জন  
ধারণ; দাতন করা এবং হাসি অন্তে দুই বিন্দু  
পরিমাণ প্রতিমর্ষ নস্য গ্রহণ করা কর্তব্য।  
অবপীড়নস্য দুই রকম, শোষণ ও স্তম্ভন।  
কোনো বস্ত অবপীড়ন ক'রে (টিপে) তা'থেকে  
রস নিয়ে যে নস্য লওয়া যায়, তা'কে অবপীড়  
নস্য বলে।

নস্য—স্নেহ শূন্য মন্তককে স্নিগ্ধ ক'রবার  
জন্ত এবং গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের বলাধানের  
জন্য নাসিকা দ্বারা যে স্নেহ প্রয়োগ করা যায়,  
তার নাম নস্য। এই নস্যের মাত্রা ত্রিবিধ,  
প্রথম মাত্রা আট বিন্দু, দ্বিতীয় মাত্রা ৩২ বিন্দু  
এবং তৃতীয় মাত্রা ৬৪ বিন্দু। বলাহুসারে ভিন্ন  
মাত্রায় প্রয়োগ ক'রতে হয়। বায়ু ও কফ  
তে, কেবল বায়ুতে চর্কি, শিথিল হস্ত এবং

বাতপিতে মজ্জার দ্বারা নস্য প্রয়োগ হিতকর।

ছয় অঙ্গুল পরিমিত দুই মুখ বিশিষ্ট নলের  
মধ্যে ঔষধ রেখে এক মুখে ফাঁদিয়ে মুখ দ্বারা  
নাসিকার মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করাকে প্রশমন  
নস্য বলে। প্রশমন নস্য সূক্ষ্মতা বশতঃ স্রোতঃ  
সমূহে প্রবেশ ক'রে বহু দোষের নিঃসরণ করে।  
আর শিরোবিরেচক দ্রব্য দ্বারা অথবা শিরো-  
বিরেচক দ্রব্য সাধিত স্নেহ দ্বারা যে নস্য  
প্রয়োগ করা যায়, তাকে শিরোবিরেচন বলে।  
আবার এই পাঁচ প্রকার নস্যকে স্নেহ এবং  
শিরোবিরেচন এই দুইভাগে বিভক্ত করা যেতে  
পারে। তন্মধ্যে নস্যের ভাগ প্রতিমর্ষ আর  
শিরোবিরেচনের অবপীড় ও প্রশমন।

নস্য যে জন্ত প্রয়োগ করিতে বলা হইয়াছে,  
সেই সকল কার্য্য এবং দৃষ্টি প্রসন্ন করিবার জন্ত  
মন্তক বায়ু কর্তৃক অভিভূত হইলে, দন্ত কেশ  
ও শ্মশ্রু পতিত হইতে থাকিলে কর্ণশূল ও  
ক্ষুদ্র রোগে, তিমির নামক চক্ষুঃ রোগে,  
স্বরভেদ; নাসারোগ, মুখ শোথ আমরাজ্জ্বা  
নামক বাতব্যাধি, অকাল বলিপণিত দক্ষণ  
বাতপৈতিক রোগ, মুখরোগ এবং অন্যান্য  
বিবিধ রোগে বাত পিত্ত নাশক দ্রব্যসহ স্নেহ  
পাক করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবে।

আর তালু কঠ ও মন্তক স্লেগ্না দ্বারা  
ব্যান্ধ হ'লে, অকচি, মাথাভার, মাথা কামড়ানী  
পীনস (নাসা রোগ বিশেষ), আধকপালে,  
ক্রিমি, প্রতিশ্যায় (নাকমুখ দিয়া জলজাব), স্নগী,  
উর্দ্ধগত রোগে শিরোবিরেচন নস্য প্রয়োগ  
করতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা নস্য কি সকলকেই প্রয়োগ  
ক'রতে পারা যায়।

ক। আহাের পর, উপবাসের পর,  
উষ্ণ প্রতিশ্যায়-রোগী, গর্ভবতী প্রী, হে

ব্যক্তি স্নেহ পান ক'রেছে, যে ব্যক্তি জল, মত বা দ্রবদ্রব্য পান করেছে, অজীর্ণ রোগী ষা'কে বস্তি প্রয়োগ করা হ'য়েছে, ক্রুদ্ধ, সংযোগে বিধাক্রান্ত, তৃষ্ণার্ত, শোকাভূত, পরিশ্রান্ত, বালক, বৃদ্ধ, যে ব্যক্তি মল মূত্রের বেগ ধাবণ ক'রেছে যে ব্যক্তি মস্তক খোঁত করেছে—এই সকল ব্যক্তিকে কদাচ নস্য প্রয়োগ ক'রবে না। আর অকালে মৈবোদয় হ'লে নস্য ও ধূম প্রয়োগ উভয়ই নিষিদ্ধ।

ডাঃ। এই বল্লেন বস্তি কার্যের পর নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়, আবার বলছেন যে, বস্তি দেওয়া হ'লে নস্য প্রয়োগ করবে না। আর যদি কেউ এক টোক জল কি দুধ খায়, তা'কে নস্য দিলেই বা কি দোষ হয়।

ক। বস্তিকার্যের পরেই নস্য দিতে হয়। কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে যে, যে দিন বস্তি দেওয়া হবে, সেইদিন নস্য প্রয়োগ করবে না। বস্তি প্রয়োগের রোগী সবল হ'লে নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়। আর এক টোক জল খাওয়া যে বল্লেন, ওটা এক তণ্ডুল ভ্রায় অগ্রাহ। অর্থাৎ একটা তণ্ডুল খেলে যেমন সে আগর ক'রেছে এ কথা বলা যায় না সেইরূপ একটু আধটু জল খেলে, সে জল খেয়েছে ও কথা বলা যায় না।

ডাঃ। আয়ুর্বেদ প'ড়তে হ'লে দর্শনশাস্ত্র জানার দরকার দেখছি। এখন কি নিয়মে নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয় বলুন।

ক। মলমূত্র পরিভাগ্য এবং মুখধোতাদি ক'রে মস্তকে স্নেহ-মালিষ ক'রে ও সৈঁক দিয়ে রোগীকে বায়ু প্রবাহহীন স্থলে শয়ন করাতে হ'বে। তার পর কণ্ঠার উর্দ্ধদেশে পুনরায় সৈঁক দিয়ে পা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে এবং মাধ্য কিছূ নীচ ক'রে রাখতে হবে। তারপর গুরু মল

বাষ্প দ্বারা নস্য উত্তপ্ত ক'রে এক নাসাপুট রুদ্ধ রেখে অত্র নাসা পুটে নল বা তুলি দ্বারা নস্য প্রয়োগ ক'রবে। পরে সেই নাসাপুট রুদ্ধ করে অত্র নাসায় প্রয়োগ ক'রবে। তার পর রোগীর পদতল, স্বক, হস্ত ও কর্ণ মর্দন ক'রবে। রোগী নাক দিয়ে উর্দ্ধদ্বায়ে নস্য টেনে মুখ দিয়ে বার ক'রে ফেলবে। বতক্ষণ সমস্ত ঔষধ বেরিয়া না যায়, ততক্ষণ এইরূপ ক'রতে হ'বে। এইরূপ ভাবে দুই তিনবার নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়।

নস্য অসম্যক প্রয়োগের ফলে যদি রোগী মূর্ছা যায়, তা'হলে মস্তক বাদ দিয়ে শরীরে শীতল জল সেচন করবে।

ডাঃ। নস্য কি নিত্য প্রয়োগ করতে হয়? আর কতদিনই বা প্রয়োগ করা উচিত?

ক। মৈহিক নস্য প্রতি তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ একদিন অন্তর প্রয়োগ ক'রতে হয়। এইরূপে সাত দিন পর্যন্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার শিরোবিরেচনও একদিন অন্তর প্রয়োগ ক'রতে হয়। একদিন স্নেহ নস্য তার পর দিন শিরোবিরেচন নস্য এইরূপ ভাবে প্রয়োগ ক'রতে হয়। আবার অথবা ভেদে দুদিন অন্তরও প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা পূর্বে বলা হয়েছে যে, এইরূপ ব্যক্তিকে মৈহিক নস্য এবং এইরূপ ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন প্রয়োগ করবে, কিন্তু এখন বলছেন যে, দুই রূপ ক'রতে হবে।

ক। সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করে। আবশ্যক না হ'লে ছ'রকম দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আবশ্যক হ'লে ছ'রকমও দেওয়া যায়। এই মনে করুন, মস্তক অতি বিন্দু হলে বিরেচন নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়। আবার শিরোবিরেচনে কখনও নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়।



মৈহিক নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা নস্য প্রয়োগের পর কি করতে হয় বলুন ?

ক। নস্য প্রয়োগের পর রোগীর মস্তকে পুনরায় শ্বেদ প্রদান ক'রতে হয়। তারপর নস্য স্নেহ বার ক'রে ফেলবার জন্যে রোগী বার বার শ্রেষ্মার সহিত স্নেহ আকর্ষণ ক'রে নাক ঝেড়ে ফেলবে। শিরোবিরেচনের পর মস্তক শুনা হয়ে যায়। রোগী এই অবস্থায় যে দোষ প্রকোপক খাদ্য আহার করে, যাঁহা সেই দোষ কুপিত হয়ে মস্তক আশ্রয় ক'রে বহু রোগ উৎপন্ন ক'রতে পারে। এই জন্য শিরো বিরেচনের পর সুপথ্য সেবন করা কর্তব্য। শিরোবিরেচন প্রয়োগ করবার সময় স্নেহ যেন চক্ষুতে না পড়ে, এরূপ ভাবে প্রয়োগ ক'রতে হয়, আর চক্ষু বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা ভাল।

ডাঃ। আচ্ছা নস্যের অবশেষে অতিযোগ হলে কি হয় ?

ক। সম্যক যোগ হ'লে মস্তকের লঘুতা, সুনিদ্রা, সুখ জাগরণ ; রোগের উপশম, ইন্দ্রিয় সমূহের বিশুদ্ধি এবং মনের সুখ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তক অতিশুদ্ধ হ'লে মস্তকের শুষ্কতা ও ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম এই সকল উপসর্গ ঘটে। আর অসম্যক যোগ হ'লে ইন্দ্রিয়গণের বিশৃঙ্খলতা, ক্রুদ্ধতা ও রোগের অপশম হয়। মস্তক অতিশুদ্ধ হ'লে ক্রুদ্ধ ক্রিয়া ক'রতে হয়, আর অসম্যক প্রয়োগ হ'লে পুনরবার আবশ্যক মত নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। এইবার ধূম পানের বিষয় বলুন।

ক। ধূম পাঁচ প্রকার, যথা প্রায়োগিক, মৈহিক, বৈরেচনিক, কাসহর ও বামন। নতাত্তরে প্রায়োগিক, মৈহিক ও বৈরেচনিক

ভেদে ধূম তিন প্রকার বলা হয়েছে। এই মতে কাসহর ধূম প্রায়োগিকের এবং বামনধূম বৈরেচনিকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রায়োগিক ধূম নিত্য ব্যবহার্য। এই ধূমপানের প্রথা পূর্বে যে প্রচলিত ছিল, সেটা কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ ক'রলে জানা যায়। এলাচ, গন্ধতুল, দারুচিনি, বালা, ধূনা, অশুষ্ক, কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্রব্য উত্তমরূপে বেটে একটা বার অঙ্কুলি প্রমাণ শরকাণ্ড আট অঙ্কুলি রেশমী কাপড় জড়িয়ে তার ওপর লেপ দেবে। লেপ যবের শ্রায় মধ্যে স্থল এবং অঙ্কুর প্রমাণ মোটা হওয়া উচিত। লেপ শুষ্ক হলে শরকাণ্ড বারকরে নিয়ে সেই বর্তির ধূম পান করাকে প্রায়োগিক বলে। আর বহুভাষ্য মজ্জা, মোম ধূনা প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত দ্ব্যতি স্নেহ মিশ্রিত ক'রে বর্তি প্রস্তুত ক'রলে তাকে স্নেহস ধূম বলে। আঁপাং, সজিনা বীজ, পিপুল প্রভৃতি শিরোবিরেচক দ্রব্যের দ্বারা বর্তি প্রস্তুত ক'রে ধূমপান ক'রলে তাকে বৈরেচন ধূম বলা যায়। বৃহতী, কটকারী, হিং, কাকড়াশুঙ্গী প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা বর্তি প্রস্তুত করে ধূমপান করলে তাকে কাসহর ধূম বলে। আর পশুর খুর, শিং, কঁাকড়ার খোলা, শুষ্ক মাংস প্রভৃতির দ্বারা বর্তি প্রস্তুত ক'রলে তাকে বামন অর্থাৎ বমনকারক ধূম বলে।

ডাঃ। ধূমপান ক'রতে হয় কি করে ?

ক। পাইপ চাই, তবে পাইপটি একটু দীর্ঘ। প্রায়োগিক ধূমপানের নল দেড় হাত, মৈহিক ধূমপানের নল বত্রিশ আঙ্কুল, বৈরেচনিক ধূমপানের নল মোল আঙ্কুল এবং বামন ধূম পানের নল দশ আঙ্কুল হওয়া উচিত। স্বর্ণ, রৌপ্য ভাষ্য প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য দ্বারা বর্তির নল প্রস্তুত করবার লক্ষ্য বলা হয়েছে

ধূমপানের নলও সেই সমস্ত দ্রব্য দিয়ে প্রস্তুত ক'রতে হয়। নলের অগ্রভাগে একটা কুলের আঁটি যেতে পারে, এমন ছিদ্রযুক্ত হবে, আর গোড়ার দিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ যোগ্য ছিদ্র থাকবে। নলটা ঋজু অথচ ত্রিভঙ্গ হবে।

ডাঃ। ঋজু অথচ ত্রিভঙ্গ কি ?

ক। ঋজু কিনা সোজা—আর ত্রিভঙ্গ কি না—তিন জায়গায় বাঁকা, যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি, অর্থাৎ নলের গঠন ত্রিকূক্ষের মত হবে।

ডাঃ। হেয়ালি ছাড়ুন মশায়, ঋজু অথচ ত্রিভঙ্গ কি—সেটা স্পষ্ট করে বলুন।

ক। স্পষ্ট করে বলতে পারছি নে বলেই এই হেয়ালী ধরেছি। যদি অপর লোক হ'ত তা'হলে যা হয় ক'রে বুঝিয়ে দিতাম। কিন্তু সত্য কথা ব'লতে হ'লে নিজেই যখন বুঝি নে তখন বোঝাব কি। অবশ্য আমি এই সত্য কথা বললাম ব'লে অনেক লম্বসাপটাবৃত্ত কবিরাজ জ্ঞানাকে গালি দেবেন এবং তাঁহাদের মতে এই সহজবোধ্য কথাটা আমি বুঝতে পারিনি ব'লে আশ্রয় লম্বকর্ণ ব'লে উপাধিও দিতে পারেন। আজকালকার দিনে এই রকমই ঘটেছে। যে যত মুখ, তার তত আশ্রয় লম্বকর্ণ। এই ফরফরায়মান সঙ্করীদের জালায় অস্থির হ'তে হয়েছে। আপনাদের কাছে একটা সত্য কথা ব'লে যতই গালাগালি খাই না কে'ন, কিন্তু একটা আশ্রয় প্রসাদ জন্মেছে।

কথাটা একটু স্পষ্ট করে আপনাকে বলছি, মূলে আছে “ঋজু ত্রিকোণ ফলিতঃ” অর্থাৎ নলটা তামাক খাবার পাইপে যেমন কোণ থাকে, সেই রকম তিনটে কোণ থাকবে। কিন্তু সবটা ঋজু যদি হয়, তবে তিনটে কোণ থাকার সার্থকতা কি? ধূমতো কোণে প্রবেশ

না করে বরাবর সোজা চলে যাবে।

ডাঃ। যাক মোটামুটি এক রকম বোঝা গেল, এখন ধূমপান করবার নিয়ম কি বলুন।

ক। রোগী প্রসন্নচিত্ত এবং সাবধান হয়ে নীচু দিকে দৃষ্টি সঞ্চর রেখে স্বচ্ছন্দভাবে উপবেশন ক'রে ধূমপান করবে। স্নেহাক্ত বস্ত্রের অগ্রভাগে আশ্রয় ধরিয়ে নলের ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে ধূমপান করতে হয়। প্রথম মুখ দিয়ে ধূমপান করে পরে নাক দিয়ে পান ক'রতে হয়। মুখ দিয়ে এবং নাক দিয়ে ধূমপান করে যথাক্রমে মুখ ও নাক দিয়েই ধূম পরিত্যাগ করা উচিত। মুখ দিয়ে ধূমপান করে কদাচ নাক দিয়ে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ তাতে দৃষ্টিশক্তির হানি হয়ে থাকে। প্রায়োগিক ধূম নাসিকা দ্বারা, স্নেহস ধূম মুখ ও নাসিকা দ্বারা বৈরেচন ধূম নাসিকা এবং কাসস্র ও বামনীয় ধূম মুখ দিয়ে পান করাই বিধি। আবার বক্ষ ও কণ্ঠগত রোগে মুখ দ্বারা এবং মস্তক, নাসিকা ও চক্ষুগত রোগে নাসিকা দ্বারা ধূমপান করা উচিত। প্রায়োগিক ধূমপানের বস্ত্র থেকে শরকাও ঘুচলে রৌদ্র ও বায়ু প্রবাহ হীন স্থানে শুষ্ক করতে হয়। তারপর আশ্রয় ধরিয়ে নলে বসিয়ে ধূমপান করতে হয়। স্নেহস এবং বৈরেচন ধূমপানের এইরূপ নিয়ম। আর কাসস্র ও বামনীয় ধূমপান করতে হলে একখানি শরার কাঠ করলার নিধুম্ম আশ্রয় রেখে তাইতে বস্ত্র দিতে হবে। সেই শরার ওপর আর এক ছিদ্রযুক্ত শরাকটা দিয়ে সেই ছিদ্রযুক্ত মাল সংলগ্ন করে ধূমপান করতে হবে। যজ্ঞদিন শরীর নিধোম না হয়, শুদ্ধ মিত্র ধূমপান করা উচিত।

ডাঃ। ধূম কি ধূমপান করা যায় না?

না নির্দিষ্ট সময় আছে ।

ক। সময় নির্দিষ্ট আছে বৈকি । মূত্র ভাগ, মলভাগ, হাঁচি শোষ, এবং মৈথুনের পবে মেরু ধূম, শ্বেদ, বমন ও দিবানিদ্রার পর বিরচন ধূম দস্ত প্রক্ষালন নস্য গ্রহণ, স্নান, ভোজন ও শস্ত্রকার্যের পর প্রায়োগিক ধূম পান করা উচিত ।

ডাঃ। আচ্ছা স্নানের পর বিরচন ধূম আবার প্রায়োগিক ধূম হই পান করবার কথা বলা হল কেন ?

ক। স্নানের পর ছই রকমই পান করা যেতে পারে ।

ডাঃ। অতঃ সময়ে ধূমপান করলে কি দোষ হয় ?

ক। অকালে ধূমপান করলে জ্বর, মুচ্ছা শিরোরোগ এবং কণ ও জিহ্বা প্রভৃতির অনিষ্ট হয়ে থাকে ।

ডাঃ। ধূম কি সকলেই পান করতে পারে ।

ক। না, শোক পরিশ্রম, ভয়, ক্রোধ, উষ্ণতা, বিষ, রক্তপিত্ত, মদরোগ, মুচ্ছা, দাহ, পিপাসা, পাণ্ডুরোগ, তালুশোষ, রমি, মস্তকে আঘাত, উদগার, উপবাস, তিমির (চক্ষু রোগ বিশেষ) মেহ, উদরাগ্ন্যান ও উর্দ্ধগতবাত রোগাক্রান্ত এবং বালক বৃদ্ধ দুর্বল, যাহাদের বিরচন প্রয়োগ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, গর্ভিণী রক্ষা ক্ষীণ, যাহার বক্ষস্থলে ক্ষত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মধু স্নাত দধি দুগ্ধ মৎস্য মদ্য ও যবাণ্ড প্রচুর পরিমাণে পান করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি অল্প কক্ষ বিশিষ্ট তাহাদের পক্ষে ধূম পান নিষিদ্ধ ।

(ক্রমশঃ)

## বাস্তালার যক্ষ্মা ।

বসন্তে যক্ষ্মা রোগ বেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আবশ্যিক । যক্ষ্মার অপর নাম ক্ষয় রোগ । রোগ মাজেই ক্ষয় কিন্তু যক্ষ্মার অতি শীঘ্র দেহের ক্ষয় করিয়া থাকে বলিয়া ইহার সাধারণ নাম ক্ষয় ।—যে জৈবিক যক্ষ্মা অতি

সারস্বক, উহার নাম রাজযক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা হইলে মাহুয হাজারদিন অর্থাৎ মোটের উপর তিন বৎসরের অধিক বাঁচেনা । রাজযক্ষ্মা ও সাধারণ যক্ষ্মায় তদ্যৎ অনেক, রাজযক্ষ্মার ক্ষয়কারী শক্তি যত অধিক, তেমন অপর যক্ষ্মার ক্ষয়কারী শক্তি তত অল্প ।—উহা অসামান্য পরিমাণে সংক্রামক

তাই মানুষ শত্রেই উহাকে ভয় করিয়া থাকে। রক্ত বমন ও জ্বর ইহার প্রধান ও সাধারণ লক্ষণ, তবে রক্ত বমন হইলেই যে ক্ষয় হইবে এমন কোন কথাই বলা যায়না বাঙ্গালী অল্প চিন্তায় জর্জরীত, প্রকল্প চিন্ততা বাঙ্গালীর নাই। তাই যক্ষ্মা বাঙ্গালীর এত বিস্তৃতি হইয়া পড়িয়াছে। সর্বদা কদর্যা স্থানে বাস, কদর্যাহার প্রভৃতি দ্বারা যক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি হয়। কখন কখন ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে যক্ষ্মার উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। কাস সংযুক্ত অল্প অল্প অরই যক্ষ্মার মূল চিনিবার উপায়। যাহারা অত্যধিক মৈথুনশক্ত তাহাদেরই যক্ষ্মারোগ হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। যক্ষ্মা রোগীর দিবা নিদ্রা বর্জনীয়। নিত্য মুক্তবায়ু সেবন ও সহ মত প্রাতঃদ্রবণ ও সান্ধ্যবায়ু সেবন কর্তব্য। রাত্রে আবদ্ধ গৃহে না থাকিয়া জানালা খুলিয়া সুবাতাস সেবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়া মুক্তবায়ু সর্বদা সেবন করে, তাহাদের দিকে যক্ষ্মা আর ঘেষিতে পারে না।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন উপদ্রব না থাকিলেও যক্ষ্মারোগী ক্রমে শীর্ণ হইতে থাকে। যক্ষ্মারোগ কতিপয় বৎসরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঋষি প্রণীত নিয়মাদি রক্ষা না করিয়া আমরা হীনবল হইতেছি, তাহার উপর উদরায়ের সংস্থানের জন্য আমাদের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও যথোপযুক্ত আহারের অভাব বাঙ্গালীর যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। যক্ষ্মা সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া লোকে ইহাকে বড় ভয় করে।

যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে মৈথুন সম্বন্ধে সতর্কতা বশত বা তাহাকে বর্জন করা একান্ত আবশ্যিক।

যাহারা এবিষয়ে অসতর্ক, তাহারা ই মৃত্যুকে অকালে ডাকিয়া আনে। বাসকগণের ও অতি বৃদ্ধের প্রায় এই রোগ হইতে দেখা যায় না। যক্ষ্মারোগীদের কাম বাসনার উদ্বেক অত্যধিক হইয়া থাকে। এবং সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ সে সর্বদাই খুঁজিতে থাকে। কেবল তাহাই নহে, অশান্ত কুপথা গ্রহণের জ্ঞাত সে অতি মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়ে। এই সকল বিষয়ে কেহ হিতোপদেশ দিলে সে তাহার কথা অগ্রাহ্য করিতে ব্যস্ত হয়।

যক্ষ্মা রোগীর অশান্ত নিয়ম প্রতিপালনেব মত দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ বর্জনীয়। কুপথ্যাভ্যাগ করিয়া অতিজনতা বা এক স্থলে বহু লোক একত্রে শয়ন করিবে না। বহু জন নিঃশ্বাসে গৃহের শুদ্ধ বায়ুও দূষিত হইয়া পড়ে। প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধির ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। সর্বদা মনকে প্রবৃত্ত রাখিতে হইবে। ক্রী বা মৈথুন বিষয়ে সর্ব প্রকার চিন্তা হইতে দূরে থাকিবে। কলহ ও ক্রোধ বর্জন করিবে। শোক দ্বারা চিত্ত চাক্ষু্য জন্মাইবেনা, অতি আহার বা অনাহার করিবে না। সর্বদা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দ্বিতল ও ত্রিতলে যাতায়াত সর্বথা পরিতাগ করিবে। শীত বা রৌদ্র লাগাইবেনা; দূষিত মৎস্য মাংস ভোজন ও অতি মসলা সংযুক্ত ছপাটা ব্যঞ্জনাহার এবং অধিক লক্ষা পেঁয়াজ রসুন ভক্ষন বর্জন করিতে হইবে, গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া পান করা কর্তব্য। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এই রোগের একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থা, জালা পোড়া দ্রব্যাহার নিষিদ্ধ। ২৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়স ব্যক্তিগণেরই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী। ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত রোগীর জন্মের কথা কল্পনা করা

বর্ষাকালে এই রোগ বেশী হইয়া থাকে । যাহাদের পুরাতন রোগ তাহারাও বর্ষাকালে বেশী ভুগিয়া থাকে । বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ইহার যাপ্যাবস্থা । শীতকালেও ইহার আক্রমণ কিছু কম । প্রাতঃস্থান দেখকে রোগ মুক্ত করে, যক্ষ্মারোগে প্রাতঃস্থান অবশ্য কর্তব্য, প্রাতঃদ্রবণও উত্তম ব্যবস্থা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় মুক্ত বায়ু সেবন বড় সুপথ্য, হিমালয় প্রদেশে ধরণধর নামক স্থানে গভরমেন্ট যক্ষ্মারোগীর বাস স্থান নির্দেশ করিয়া সেখানে একটি যক্ষ্মা আশ্রম করিয়াছেন, আর সংপ্রতি কলিকাতা মেডিকেল কলেজেও গভরমেন্ট একটি যক্ষ্মা চিকিৎসালয় নির্মান করিয়াছেন, উহা অতি উচ্চ, অতি উচ্চস্থানে বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যায়, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া রোগী প্রফুল্ল চিত্ত হয় । কলিকাতায় কলের ধূম চিমণী দিনা উপরে উঠিয়া যায় সত্য, কিন্তু সে ধূম উপরেব দিকে বেশী উঠিতে না পারিয়া কিছু বিশুদ্ধ হইয়া নীচেই নামিয়া আসে । মন্দো ভাল বলিতে হইবে । অগ্ন্যুত্তাপ, ধূনসেবা— যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অতি নিষিদ্ধ । পল্লীতে পল্লীতে যক্ষ্মারোগী দৃষ্ট হয়, পুত্রবাং বাহা বা যক্ষ্মারোগী দেখিবেন, তাঁহারা যেন যক্ষ্মারোগীকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া তাহার আয়ুর্জ্ঞান সহায়তা করেন । এবং বাহাতে সেই স্থানে আর যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধি হইতে না পারে, তাহারও উপায় করেন ।

বংশাঙ্কুরে যক্ষ্মারোগ সংক্রমিত হইতে দেখা যায়, তাই অনেকে যক্ষ্মারোগীর পুত্র কন্তার সহিত নিজ পুত্র কন্তার বিবাহ দিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন । বাহারা যক্ষ্মারোগীর শুক্রযা করে, তাহারাও এই রোগাক্রান্ত হইতে পারে । যক্ষ্মারোগীর পুত্রকন্তাপক্ষেও সাধারণতঃ

দুর্বল হইতে দেখা যায় । যক্ষ্মারোগীর স্বাস প্রশ্বাসে যক্ষ্মার বীজাণু বিচরণ করে, অধিকন্তু যক্ষ্মারোগীর শুক্র শোণিতেও যক্ষ্মার বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায় । কেবল যে পুরুষেরই যক্ষ্মা হয় এমন নয়, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও বহুতর যক্ষ্মারোগী দেখিতে পাওয়া যায় । স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাহাদের জরায়ু দূষিত ও বাহারা প্রদরাদি রোগে পীড়িত, তাহারা অতি সহজেই যক্ষ্মারোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে । তাহাদের স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া তাহাদের শিশুগণও যক্ষ্মারোগে গ্রস্ত হইতে পারে । তবে বাল্যকালে উহাদের রোগ প্রকাশ পায় না, উপযুক্ত বয়স হইলে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং কিছুকাল তাহা যাপ্য হইয়া থাকে ।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার অনেক প্রকার প্রণালী আছে । পুরাকালে আমাদের দেশে এখনকার মত যক্ষ্মার প্রাচুর্য্য না থাকিলেও হ্রদর্শী ঋষিগণ এই রোগের সর্বপ্রকারে আলোচনা করিয়াছিলেন । অধুনা ইউরোপীয় ডাক্তারগণ যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করিতেছেন । তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন, তাহার আলোচনা ভালই হইতেছে । শীত-প্রধান দেশেও যক্ষ্মারোগ যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে । তবে মরুময় প্রদেশে যক্ষ্মারোগ দুই রকম হইয়া থাকে । একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি—একদা আমি যোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার অল্প কলিকাতা যাইতেছিলাম, আমার মুখ দিয়া অধিক লালা পড়িত, আমি আমার পুত্রকে লইয়া রিতীর শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াছি, দুইদিন গাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি, মধ্য রাত্রে ও দুইদিন শ্রেণীতে আমার

অপর সঙ্গী লোক রহিয়াছে। কোন এক জংসনে গাড়ী বদল হইল—রাত্রি তখন দশটা। এই সময় একদল মাড়োয়ারি ধনী সেই গাড়ীতে উঠিলেন, তাঁহারা কলিকাতার যাত্রী, তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়া কহিলেন ‘রাবু তোমরা ক্যা-হুয়া।’ আমি বলিলাম ‘জরবি হ্যায়, লহবি গিড়তা।’ তাঁহারা সনস্বরে বলিয়া উঠিলেন—‘ক্যা বাবু, যথ হ্যায়।’ আমি কহিলাম ‘হাঁ যথ হ্যায়।’ তাহারা ‘বাঁপরে যথ।’ বলিয়া অগ্র কোন গাড়ীতে চলিয়া গেলেন। আমার গাড়ীতে একজন রাজভ্রাতা ও একটী তাঁহার একজন উচ্চ সহকারী ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই আমার পূর্ব পরিচিত। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কেন আপনার যক্ষ্মা হইয়াছে বলিলেন?’ আমি

বলিলাম ‘এই দেখুননা, ইহারা এ গাড়ীতে উঠিলে কথাবাত্তা কহিয়া রাত্রি ভোর করিয়া দিত, আমি তো পীড়িতই, আপনারা পর্যাপ্ত ঘুমাইতে পারিতেন না।’ রাজপুতানা প্রভৃতি মরুময় প্রদেশে যক্ষ্মারোগ নাই বলিলেই হয়, তাই ইহারা যক্ষ্মারোগকে যত ভয় করে, তত আর কোন রোগকে ভয় করে না। যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা সকলেরই মর্কাতোভাবে কর্তব্য। যক্ষ্মারোগকে বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে বাঙ্গালীর আর রক্ষা নাই, সেই জন্য দেশের চিন্তাশীল বাঙ্গালীগণ এই রোগের হস্ত হইতে যাহাতে বাঙ্গালা দেশ রক্ষা পাইতে পারে—তাহার জন্য চেষ্টাশীল হউন, ইহাই আমার বক্তব্য।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিণাভূষণ।

এম, আর, এ, এস।

## আয়ুর্বেদে ওলাউঠা।

—:—:—

[ চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ। ]

( পূর্বাভ্যুত্থি )

চিত্রকাদি গুড়িটি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও আমি সাধারণের সুবিধার জন্য উহার কর্দ্দটি এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চিতামূল, পিপুলমূল, ধবক্ষার, সাচিকার, পঞ্চলবণ, গুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হিং, বনযমানী ও চৈ—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোঁড়া লেবুর রসে বাটিয়া দুই আনা পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হয়। অল্পলনিত অস্তিসার—ইহা অর্থ্য ঔষধ।

আর একটি রোগীর পরিচয় দিই। সেটি পুরুষ, বয়স ৩০। সেটির জন্য যখন আমার ডাক পড়ে, তখন তাহার অবস্থা আরও সান্না-তিক।, নাড়ী দেখিলাম—নাড়ীর অবস্থা খুবই ধীরগ, হাতের পামে খাল ধরাটা খুবই বেশী। খুব অবস্থাপন্ন রোগী হইলে—বোধ হয় সান্নাট গুঁড় ভাঙ্গার কঠোরতায় একত্র কঠোর অবস্থা হইত, কিন্তু সেটির পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—সামান্য আয়—বয়স ৩০।

স্বভাবের,—আর বোধ হয় আমার উপর একটু বিশ্বাসও ছিল—সেইজন্ত আমারই হস্তে—একমাত্র পুত্রের জীবন-মরণের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।

পরিচয় লইয়া জানিলাম—আহারাদির এমন কোনো বিশেষ গোলযোগ ঘটে নাই—বাহার জন্ত তাঁহার এই ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। তখন স্থির করিলাম—সংক্রামক স্থানে অবস্থিতিই ইহার কারণ।

ইহার রোগও প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়—এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে।

রাণাবাটে থাকিতে ঔষধ তৈয়ার করাটা আমার একটা বিশেষ অভ্যাস ছিল। প্রয়োজন থাক আর নাই থাক—সকল অধিকারেরই নানাবিধ ঔষধ নিত্য তৈয়ার হইত। এক্ষেত্রে চিকিৎসাদি শুড়িতে কিছু হইবে না—বুঝিলাম, সেইজন্ত এ রোগীকে “বিস্ফটিকারি রসের” ব্যবস্থা করিলাম—হাতে পায়ে খাল নিবারণের জন্ত আঙুরের স্বেদ দিয়া মালিশ করার উপদেশও দিলাম। বমন নিবারণের জন্ত পূর্ব কথিত রোগীকে যেক্রপ ধনে, মোরি, কর্পূর ও বড়এলাচ ভিজান জলের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, ইহার জন্তও সেই ব্যবস্থা করিলাম। নতির চারিদিকে সেই—যায়ফলের প্রলেপ—সকল ব্যবস্থাই রাখিলাম, কিন্তু কিছুই উপকার দর্শিলাম না, রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। আমি বড়ই বিপন্ন হইলাম। ভাবিলাম—একরূপ রোগী লইয়া দুর্গাম কেনা অপেক্ষা অল্প চিকিৎসককে ডাকিতে পরামর্শ দিই। রোগীর পিতার এক আত্মীয়ের নিকট যনের কথা আভাস ইঙ্গিতে প্রকাশও করিলাম। রোগীর পিতা আত্মীয়ের মুখে সে

কথা শুনিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন,—আমার পুত্রের অবস্থা যাহা হয় ইউক—আমি অল্প কাহাকেও ডাকিব না—উঁহারই উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর—যাহা হয় উঁহারই হাতে হইবে।

রোগীর পিতার যখন এতটা আগ্রহ—তখন আমি অল্প চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রমে বোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিলাম।

যখন দেখিলাম দান্ত কিছুতেই কমিতেছে না, তখন অহিকেনবাটিত “কপূর বটী”—কপূর ভিজান জলের সহ ১ ঘণ্টা অন্তর ২টি প্রয়োগ করিলাম এবং প্রসাব করাইবার জন্ত ‘হিমসাগর’ বা ‘পাথর কুচির’ পাতা ও ‘সোরা’ একত্রে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। সেবনের জন্ত ‘কপূর বটী’ ভিন্ন হিমসাগরের পাতার রস সহ বজ্রকার ৩ রতি ও মকরধ্বজ ১ রতি—একত্র মিশাইয়া তাহাও সেবন করার ব্যবস্থা করিলাম। একরূপ ব্যবস্থার দেখিলাম—ক্রমশঃ উপকার হইতে লাগিল, সেইজন্ত ইহার পরিবর্তন না করিয়া ইহাই চালাইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ রোগী আরোগ্য হইল, আমার ভাগ্যে যশ ছিল, আমি অর্থের সহিত কিঞ্চিৎ যশোলাভও করিলাম।

শোধিত হিন্দুল ( হিন্দুল পাতি লেবুর রসে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ৩দিন ৩ রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলেই শোধিত হয় ) শোধিত অহিকেন ( অহিকেন দুই ভিজাইয়া শোধন করিতে হয় ) মুতা, ইন্দ্রবব ( কুড়তির ফুলকে ইন্দ্রবব বধে, ইহা বেণের মোকানে কিনিতে পাওয়া যায় ) জায়ফল, মোহাগার খই ও কর্পূর—এই সকল দ্রব্য সমানভায়ে লইয়া জলের সহিত মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিলেই কর্পূর বটী প্রস্তুত হয়। বিস্ফটিকা

ভিন্ন প্রবল অভিসার ও গ্রহণী রোগেও ইহা প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

জায়ফল, জৈত্রী, খোসাশুদ্ধ ছোট এলাইচ, খোসাশুদ্ধ বড় এলাইচ, জীরা, মরিচ, যমানী, মৌরি ও রাধুনি—প্রত্যেক দ্রব্য আধ তোলা পরিমাণে লইয়া ১০০ সিক্কির গুঁড়া উহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। তাহার পর আফিও ভিজান জলে বাটয়া কুলের আঁটির ছায় বটাকা করিগেই “বিস্ফটিকারি রস” প্রস্তুত হইল। আতপ চাউল ভিজান জল, জীরা ভাজার গুঁড়া ও মধু কিম্বা জীরা ভিজান জল ও মধু দিয়া বিস্ফটিকারি ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

আমি আরও কতকগুলি বিস্ফটিকারি চিকিৎসা করিয়াছিলাম, সমস্ত পরিচয় এ প্রবন্ধে লিখিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, সেইজন্ত সে সব পরিচয় পরে দিব। তবে আমার বিশ্বাস, যদি প্রথম হইতেই বিস্ফটিকারি রোগী পাওয়া যায়—তাহা হইলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় ইহার বিশেষ ফল দর্শিতে পারে—কিন্তু রোগের নিদান বুঝিয়া ও বিশেষ যত্ন লইয়া চিকিৎসা করা চাই। শুধু চিকিৎসকের ব্যবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে চলিবনা, বাড়ীর লোককেও সেবা সূক্ষ্মতার জন্ত বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

## প্রতিকার।

—:—

চপলা টুকটুকে অধরে বিজলী গেলিয়া কমলিনীর নিকট সরিয়া বসিল। চপলা কমলিনীর সহ। সে অনেক দিন খুত্তর বাড়ী কাটাইয়া এই সে দিন বাপের বাড়ী আসিয়াছে। কমলিনী শ্রাম স্তন্যের স্ত্রী। শ্রাম স্তন্যের বাড়ী—চপলাদের বাড়ীর অতি নিকটে, তাই চপলা ও কমলিনীর মধ্যে ভালবাসাটা বেশ গাঢ় হইয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া চপলা—সইকে দেখিতে আসিয়াছে। কমলিনীর মন আজ তত ভাল নয়, তাই মুখখানি খেন মেখে ঢাকা। হৃদয়ের বাতনা—মুখমণ্ডল যেমন প্রকাশ করে, আমাদের কৃত্রিম ডাক্তার ভেমন পারে না। কমলিনীর মুখ আজ বিবর্ণ।

কালীমার মাথা দেখিয়া চপলা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, কমলের বিরহ উপস্থিত। চপলার পক্ষে এক্ষণে সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক, কারণ চপলা যুবতী—রং-তামাসা, হাসি-ঠাট্টা ও আমোদ আফ্লাদেই যুবতীগণ অধিক সময় অতিবাহিত করে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ইহা তাহাদের পক্ষে নিষ্পত্তীয় নয়। কিন্তু এক্ষণে চপলার সিদ্ধান্ত খাটিল না। কমলিনীর বিরহ-বিধুরা নহে।

কমল। হই, ভগবান যাকে স্ত্রী করেন—সে সকল অবস্থাতেই স্ত্রী—তার দুঃখের আঁচড়টা পর্যন্ত রাখে না। হই, কুমিলেণ্ড আছে—বেশ ভালবাসে।



কাটিয়ে দিচ্ছ। যাই হোক সই, তোমাদের দেখেই আমরা স্তম্ভী। আমাদের কপালে ত বিধাতা স্থখ লেখেন নি! বুঝি এ জীবন এমনি দুঃখেই কাটিয়ে দিতে হ'বে! জীবনের প্রভাতেই যখন এমন আঁধার হ'ল, তখন সারা জীবনই বৃষ্টি আঁধারে কাটাতে হবে! বুঝলে বোন, আমার বিষয় বদন কেন?

চপলা। সই, তুমি যে এমন কবি হ'য়ে উঠছ, তাহা আমি জানিনি! খুব লম্বা চওড়া তো ব'লে গেলে আমি যে ওর কিছুই বুঝতে পাবলাম না। কবির সঙ্গে থেকে বুঝি কবি হ'য়েছ? তা, -আমাকেও তোমার চালা কর না। তবে আর কিছু বুঝতে পারি, না পারি, তো এই টুক বুঝলাম যে, আমার কমলকলির ভেতর কি একটা পোকা ঢুকেছে, আর সেই পোকাটাই তার এমন দশা ক'রেছে। সত্যি আমার মনটা কেমন ক'রেছে - কি হ'য়েছে - বলবনা?

কমল। আর ভাই!

কমল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। বোধ হইল—যেন কত নীরব-বেদনা বুকখানাকে পোড়াইয়া চাই করিয়া, একটা উত্তপ্ত বাষ্প হইয়া বাহির হইয়া গেল। কমল উদাস নয়নে আকাশের দিকে চাহিল। কমলের এইভাবে দেখিয়া চপলার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সই-এর এ ভাব সে কখনো দেখে নাই। এমন হাসি ভরা, চলচল বিকসিত পান্ন সঙ্গ মুখ—আজ শুকাইয়া স্তান হইয়া গিয়াছে। সখীর মর্মে যাতনা আপনি দদয়ে অনুভব করিয়া চপলা কাঁদিয়া ফেলিল। কমলের নীরব শোকের বীধ ভাঙ্গিয়া গেল— সে সইকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ কাদিল। ইহাতে তাহার হৃদয় যেন একটু শান্ত

হইল। শোকের অংশ ভাগী যদি পাওয়া যায় - যদি কেহ বাথার বাথী থাকে, তাহা হইলে তাহাতে শোকের কিছু লাঘব হয়। কমলেরও তাই হইল।

কিছুক্ষণ পরে কমল বলিল—“চপল, আমার কপাল বড়ই মন্দ, প্রভাত হ'তে না হ'তে সন্ধ্যা এল। প্রাণের কত সাধ, কত আত্মদা - সব যেন বন্যার জলে ভেসে গেল। চপল, ভেবেছিলাম, এ শোক তাপময় সংসারকে নন্দন কানন ক'রে তুলব—আমার স্বপ্ন দিয়ে গড়া রাজ্য যে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল! আমি কত আশায় বুক ভরিয়া রেখেছিলাম— আমার বুক ভেঙ্গে গেল, আশাও চ'লে গেল। চপল, এ আমি কি করলাম—আমি কি করি? এ যাতনা কার কাছে বলবো?—যিনি যাতনা দিচ্ছেন—তিনিই কেবল জানেন, আর ত কেউ জানে না—আর ত কেউ শুনে না। চপল, যদি বুকখানা দেখা'বার হ'ত, দেখা'তাম যে, এই নীরব বেদনায় আমার বুক খানাকে কত পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে! কি হ'য়েছে জান, ওঁর খুব শক্ত অসুখ ক'রেছে। সবাই ত যক্ষ্মা বলচে। ডাক্তার বলটেন (pthysis) থাইসিস্। পরসাত ত খুব থরচ করা হ'চ্ছে, কিছুতেই কিছু হ'চ্ছে না। কিছু দিন যায়—আবার হঠাৎ এক বলক রক্ত ওঠে। কাল আবার রক্ত উঠেছে—থানা, থানা রক্ত। কি করি চপল, আমার প্রাণ যে উড়ে যাচ্ছে! ভগবান, কি আমার ওপর এতই নির্দয় হ'বেন—আমার দিকে কি একটুও মৃদু তুলে চাইবেন না?

চপলা। ভাই, ভগবান দয়া না ক'রলে কি আমরা একদণ্ড বাঁচতাম? তাঁর অশ্রীম রক্ত। তাঁর দয়ায় সকল দুঃখই যেতে পারে।

তাঁর যদি দয়া হয় তো তোমার স্বামীর অস্থখ সেসে যা'বে। তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁকে ডাক, তাঁর দয়া হ'বে, তোমাব চোখের জল মুছে যা'বে। তোমার মত নিরীহ প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে তাঁ'র কি লাভ ?

কমল। তাই বল তাই— তাই বল। যেমন ক'রে ডাক্তে বল—তেমনি কোরে ডাকবো। শয়নে, স্বপনে সকল সময়েই ত তাঁকে ডাকছি। এর জন্য যদি আমার প্রাণ দিতে হয়— তাতেও ত আমি কুণ্ঠিত নই !

চপলা। দেখ তাই, আমার একটা কথা শুনবে ?

কমলা। তা শুনবো না কেন সহি, আমার যা'তে উপকার হবে—আমি তাই করবো ?

চপলা। দেখ, অনেক শক্ত ব্যারাম কবি রাজী চিকিৎসায় সারে। আমি একটা ঠিক এই রকম ঘটনা জানি। আমার শ্বশুর বাড়ীর কাছে বোসোদের একটা ছেলের ঠিক এই রকমই হ'য়েছিল। ডাক্তার দেখানর অভাব হয়নি। তা'রা খুব বড়লোক, পয়সাটা জল বৃষ্টির মত খরচ ক'রেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লনা। তাঁর বোয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল। সে রোগ আমাদের বাড়ী আসত ; স্বামীর অস্থখের কথা তুলে কতই যে কাঁদত— তা' আর কি ব'লব। তাঁর চোকের জল শুকোতনা। আর বোটার স্বামীগতপ্রাণ। তাঁর স্বামীও তাঁকে খুব ভালবাসত। যখন ডাক্তার কিছু ক'রতে পারল না, তখন সকলেই কবিরাজ দেখাতে ব'লল। বেশ নামজাদা একজন কবিরাজকে আনা হ'ল, তিনি দেখতে লাগলেন। তিনি পর পর ভিন্ন ভিন্ন ওষুধ দিতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর শরীর সবল হ'তে লাগল এবং রক্ত বহির্গত হ'ল।

দিন ক'মে আসতে লাগল। এমনি কবে ৩৪ মাস ওষুধ খাওয়ার পর রক্ত বহি বন্ধ হ'য়ে গেল। তারপরও এক বছর নাগাদ ওষুধ খেয়ে ছিল। এখন শুনতে পাই—তা'র অস্থখ একে-বারে সেসে গিয়েছে। এখন কেমন সুস্থী, সবল, স্নহ দেহ হয়েছে। তাঁর জ্ঞান—দুইটা মুষ্টিযোগ যা' দেওয়া হ'য়েছিল—আমি তা' লিখে নিয়েছি। তোমাকে কাল সে কাগজ খান এনে দেবো। তাই, বেলা গেল, এখন উঠলাম, কাল নিয়ে আসবো।

কমল। এস তাই, তবে। কবিরাজ দেখানর বন্দোবস্ত ক'রব।

পর দিন কমল শ্বাশুড়ীকে কবিরাজ আনিতে শ্বশুরকে বলিতে বলিলেন। শ্বশুর সেই দিন হইতে খুব ভাল একজন বৃদ্ধ কবিরাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কবিরাজীমতে চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

চপলা যে দুইটা মুষ্টিযোগ লিখিয়া রাখিয়া ছিল, তাহা আনিয়া দিল। তাহা এই—(১) ননীর সহিত মধু ও চিনি একত্র মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দেওয়া,—অথবা দুধ, ঘি ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করান, ইহাতে শরীর পুষ্ট হয়। (২) পায়রা, হরিণ, ছাগ বা বানর—ইহাদের মাংস ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ছাগলের দুধের সহিত খাইলে শরীরোগ ভাল হয়।

কবিরাজ, আয়ুর্বেদ মতে 'অশ্বখাদিঃ' 'ত্রয়োদশাঙ্গম', এবং আর কয়েকটা ব্যবস্থা পর পর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কবিরাজের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখা গেল—কবিরাজী মুষ্টিযোগের সহিত চপলা, উক্ত দুইটা মুষ্টিযোগ তিনি শরীর সবল হইতে লাগল এবং রক্ত বহির্গত হ'ল।

দেবন করিয়া শ্রামহন্দর নষ্ট স্বাস্থ্য পুনপ্রাপ্ত হইলেন। কমলিনীর হাসি ফুটিল,—কমল আবার বিকসিত হইল।

\* \* \* \*

কিসে শ্রামহন্দর নবজীবন লাভ করিল—কবিরাজী ঔষধে—কি কমলিনীর একাগ্র ভগবৎ আরাধনায়—তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। তবে আমাদের ঋষিকৃত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এখনো মরে নাই। যদি বল এখন কবিরাজী ঔষধে আর তেমন কাজ হয় না,—সে দোষ ঔষধের নয়, সে দোষ কবিরাজের এবং কতক আমাদেরও। কবিরাজ মহাশয়েরা সকল সময়ে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন না। মধু অভাবে গুড় দেন। ইহা হয় তাঁহারা গাছ গাছড়া চিনেন না, বেদিয়া যাহা আনিয়া দেয়—

তাহার উপর নির্ভর করেন, নয় উপযুক্ত পত্রসা পান না বলিয়া মধু অভাবে গুড় দেন। সেই জন্যই ঔষধ কার্য্যকরী হয় না। ইহাতে তাঁহাদের অপযশ ত আছেই, অধিকন্তু লোকের মনে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উপর একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। ইহার এক প্রতিকার আছে, যদি অশ্বদেশীয় ধনী ও রাজা মহারাজগণ কবিরাজ রাখিয়া স্বব্যয়ে আয়ুর্বেদ মতে যথাযথ ভেষজ সংগ্রহ পূর্ব্বক এবং নিয়মিত প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রস্তুত করান, তাহা হইলে আমার বোধ হয়, সেই ঔষধ মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ দান করিতে পারে। পূজ্যপাদ ঋষিগণ জগতের হিতের জন্য অকাতর পরিশ্রম করিয়া যে সকল ঔষধাদি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কি উর্ব্বর মস্তিষ্কের লক্ষ্যহীন প্রলাপ!

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র পাল বি, এ, ।

## আয়ুর্বেদের স্বপক্ষে একটা সত্য ।

—:—

বাহার আদর্শ যাহা, তাহা যে তাহার পক্ষে ভাল—এই মহাসত্যের একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন রাজ পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই নিদর্শনটা সম্ভবতঃ পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ ঘনোবেগ আকর্ষণ করিবে—কেননা এটা লোকপরিপরাগত কোন কিছদস্তী নহে। কোন আয়ুর্বেদভক্তের অমরাগ-প্রসূত কল্পনাও নহে, এটা এই ক্ষুদ্র লেখকের নিজ জীবনে প্রমাণিত একটা বাস্তব ঘটনা।

এবারের সমরস্র বা ইন্দু-রোগের কথা পাহারও অবদিত নাই। আরি পত্নীপুত্র

ছুটাতে বাড়ী যাইয়া ইংরাজী নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি দ্বিতীয় বারের ভয়াবহ ও মারাত্মক ইন্দু-রোগের আক্রান্ত হই। আক্রান্ত হইয়াই এ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম। কারণ ইতিপূর্বে আমাদের গ্রামে যে কয়েকটা ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই কালকবলিত হইয়াছিল। অধিকন্তু আমাদের গ্রামে অনেকগুলি হাতুড়ে ডাক্তার বৈদ্যের অঙ্গসংস্থানের ব্যবস্থা থাকিলেও সুচিকিৎসক সম্বন্ধে একরূপ নিঃশব্দ চলিলেই হয়। এইরূপ পার্শ্বদৃষ্টান্ত

দেশ প্রসিদ্ধ অনেক শাস্ত্রাভিজ্ঞ ধর্মপ্রাণ যে কবিরাজ ছিলেন, তিনিও আমাদের হুর্ভাগ্যবশতঃ রোগে, শোকে, জরাজীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর যাবৎ ৬কালী বানী হইয়াছেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা ডাক্তার এখনও এতবেশী হয় নাই যে, আজকালকার বি, এ, এম এর মত তাহারা গ্রামে গ্রামে ভিড় করিয়া বসিবে। জেলাগুলি চিকিৎসক বিষয়ে পূর্বাগেই অনেক সমৃদ্ধিশালী হইলেও গ্রাম গুলি প্রায়শঃই 'সংশ্রমারী'দের হস্তে সমর্পিত আছে। এই সমস্ত যমস্বরূপদের তীব্র ঔষধান্ত্র সকল সহ করিয়া প্রাণ রক্ষা পাওয়া নিতান্ত ঈশ্বরের অমুগ্ধের উপর নির্ভর করে। সত্য বলিতে কি, আমি নিজেই একেবারে স্বদেশে manufactured অথচ দস্তুরমত বিলাতি ডাক্তারগণকে একটু ভীতি মিশ্রিত সম্মানের চক্ষেই দেখিয়া থাকি। ইহারা ঔষধ বা যন্ত্রের ব্যবহার না জানিলেও প্রয়োগ করিতে ছাড়েন না! কাজেই সহজ ও সুন্দরভাবে চিকিৎসার যে ফলটুকু তাহাও ইহারা দেখাইতে পারেন না। ইহাদের চিকিৎসায় সুস্বাস্থ্য রোগও অনেক সময় দুঃস্বাস্থ্য হইয়া দাঁড়ায়। অনেক রোগী যে ঔষধের বলেই শীঘ্র শীঘ্র মুক্তিনার্শে উপস্থিত হয়—একথা ও একেবারে অমূলক নহে।

সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসার এই দুর্দিনেও আমাদের গ্রামে অন্ততঃ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাকেই আমার চিকিৎসার জন্ত আহ্বান করা হইল। ইনি আমার বাল্যবন্ধু। অল্পবয়স্ক হইলেও ডাক্তারী চিকিৎসা ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ইনি কিঞ্চিৎ বশস্বী হইরাছিলেন। আমাদের আশে পাশের গ্রাম দশবায়েটা গ্রাম সাধারণতঃ

ইহার চিকিৎসাভেদেই সমৃদ্ধ থাকে। আমার অল্প বয়সেই ইনি যেন কিঞ্চিৎ চিন্তাশীল হইলেন ও প্রাণপণে আমার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই জানেন, এবারকার ইন্সলুয়েঞ্জা—ডাক্তারী ঔষধকে দস্তুরমত পরীক্ষিত করিয়াছে। এই কলিকাতায় এত মহাবিজ্ঞ ডাক্তারগণের চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও কচিৎ ছই একটা রোগী কোনগতিকে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। এমনতাবস্থায় আমার বন্ধু যে চিকিৎসায় বিশেষ ফলোদয় করিতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহাকে দোষী করিবার কিছুই নাই। তিনি তাঁহার শাস্ত্রমত তিক্ততীর ঔষধাবলী—সমস্তই আমাকে ব্যবস্থা করিলেন। এমন কি, জর নিবারণের শেষ চিকিৎসা এক তরফা কুইনাইন ইন্জেক্শন পর্যন্ত আমার উপর দিয়া হইয়া গেল। কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসার বলপ্রয়োগের মূলে বোধ হয় একটা ভুল রহিয়া গিয়াছে। এ চিকিৎসা যদি বুঝিত যে রোগও তত দুর্বল নহে, যে জুলুমের বাধ্য হইবে, তাহা হইলে বোধ হয় এ চিকিৎসায় অনেক সময় অধিকতর ফলোদয় হইত। যাহা হউক বন্ধুদের শত চেষ্টা বিফল হইল। ইন্জেক্শনের পরে জ্বরটা যেন ক্ষেপিয়া গিয়া অধিকতর আক্রোশের সহিত আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল এবং রোগ নিউমনিয়ার দিকে যাইতে না পারিলেও দ্রুত বেগে টাইফয়েডে আসিয়া পৌছিল।—সেই কালো কালো গোবর গোলায় মত পিত্তরক্ত অজস্র মল নিঃসরণ, কখনও দস্তুরমত রক্ত ভেদ অথবা অতিদাহবৃত্ত, বিষমময়, সবুজ বিকৃতি, জিহ্বা, হস্তাদি অলপভায়ে কন্দ মোটের উপর নিরানোক ইত্যাদি রোগী লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

আব কি গেছি। বাড়ীর কথা দূরে থাকুক, গ্রামস্থ সকলে সম্ভ্রান্ত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল। বন্ধুবর ডাক্তার আরও কিছু দিন চিকিৎসা করিয়া নিতান্ত গর্বিতভাবে বাবাকে বলিলেন,—“মহাশয়, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, রোগী আমার বিশেষ বন্ধু, ইহার প্রাণরক্ষার জন্ত আমিও নিতান্ত ব্যস্ত। অতএব আপনি একবার জেলার ভাল একজন ডাক্তার দেখান। তাঁহার মতামত্বায়া আমি চিকিৎসা করিতে চাহি। একাকী চিকিৎসা করিতে আর আমার সাহস নাই।’ বাবা তাহাই বলিলেন। বরিশাল হইতে উপাধি প্রাপ্ত একজন ডাক্তার আহূত হইয়া আসিলেন ও সনাতন প্রথাভূসারে একখানি প্রেসক্রিপসন লিখিয়া বন্ধুবরকে সাময়িক পরামর্শ দিয়া কতক রক্ততঞ্চু আদায় করিয়া চলিয়া গেলেন।

নূতন প্রকারে আবার কয়েক দিন চিকিৎসা চলিল, কিন্তু ফল অগ্নিতে বৃতাভূতির মতই হইল। বন্ধুবর ডাক্তার এবার ভারী চিন্তিত হইয়া বলিলেন—“আমার বিছা বুদ্ধি শেষ হইয়াছে। বরিশালের ডাক্তারের পরামর্শও কার্যকারী হইল না। এখন সকলে পরামর্শ করিয়া কি করিবেন দেখুন।’ বাবার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি বলিলেন—“শেষ চেষ্টা একবার করিব, বরিশাল একবার লইয়া যাইব, তারপর অদৃষ্টে যা’ আছে—হইবে।” প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া কহিল, —‘রোগী বত্রিশ দিন পর্যন্ত ভুগিয়া এত দুর্বল হইয়া গিয়াছে যে, ইহাকে এখন বিশেষ নাড়াচাড়া করা উচিত নহে।’ কিন্তু পরে বাবার নিতান্ত অস্থিরতা দেখিয়া সকলে বরিশাল যাওয়ার মত দিল।

জ্যেষ্ঠ—৫

বরিশাল যাওয়ার সব ঠিক ঠাক—নৌকা প্রস্তুত, সঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোক যাইবেন, আর যাইবেন আমার বাবা নিজে ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এমন সময়ে দৈব আশীর্বাদের মত নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একজন ভাল কবিরাজ কার্যগতিকে আমাদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই শুনিলেন আমার অত্যন্ত ব্যারাম। চিকিৎসক সুলভ কোতুহলের বশবর্তী হইয়া তিনি আমাকে তখন দেখিতে আসিলেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া নাকি আমার নাড়ী, জিহ্বা, চক্ষু, উদর ইত্যাদি পরীক্ষা করিলেন। আমার তখন সন্ধ্যাক্তান ছিল না, কাজেই এ সময়ের কথা আমি বেরূপ শুনিয়াছি—বলিতেছি। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখখানি আনন্দে উৎক্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—‘রোগীকে আমি কিছুতেই বরিশাল লইয়া যাইতে দিব না। কুইনাইনের অপব্যবহারের ফলেই এই সর্বনাশ ঘটিয়াছে।’ আবার কুইনাইনের জল উদরস্থ হইলে রোগীর বাঁচা অসম্ভব হইবে।’ বাবাকে বলিলেন—‘ভয় নাই বন্দোপাধ্যায় মহাশয়, রোগী আরোগ্য না হইলে আমি দায়ী। তিন দিন মধ্যে ফল দেখাইব।’ বাবা কাঁদিয়া বলিলেন—‘আমার বুদ্ধিভুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, আপনারা যা’ ভাল মনে করেন—আমি তাতেই রাজী।’ কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—‘আবাগ্য এ গ্রামের ছুন খাইয়াছি। এ রোগীর প্রাণপণ চিকিৎসা করা আমার একান্ত কর্তব্যজ্ঞানে করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।’

কবিরাজ মহাশয় গ্রাম্য বৈদ্যকে কয়েকটা ঔষধ দিতে বলিয়া বরিশাল চলিয়া গেলেন। তারপর দিন চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কি

চমৎকার তাঁর চিকিৎসা, বিরূপ বিবেচনা-  
পূর্বক তাঁর পথ্যাপথ্য নির্ণয়, আর সর্বোপরি কি  
গভীর তাঁর স্নেহ, কি মধুর তাঁর যত্ন,—ভাবিলে  
চক্ষে জল আসে। শুদ্ধ কবিরাজ হিসাবে নয়,  
একটি মহাপুরুষ হিসাবেও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা  
করিতে ইচ্ছা হয়। এ মানবপ্রীতি যে ঋষিভুল্য  
ধর্মপ্রাণ চিকিৎসকচর্য্যেব নিকট হইতে তিনি  
পাইয়াছেন, তাহাতে অনুমান সন্দেহ নাই।

বাস্তবিকই তিন দিনে আমার রোগের  
অত্যন্ত পরিবর্তন হইল, মল অনেকটা গাঢ়  
হইয়া আসিল, জ্বর থার্মোমিটারে অনেক কম  
উঠিতে লাগিল, মাথা খুব পরিষ্কার হইয়া গেল।  
আমি সন্ধানেন যখন প্রথম চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম,  
কবিরাজ মহাশয়ের দেবোপম সাদা শুভমূর্তি  
দেখিয়া বেন অনেকটা উপশম বোধ করিলাম।  
সকলের আশার আনন্দে মুখ প্রসূর হইল,  
সাফল্য সম্ভাবনায় কবিরাজ মহাশয় বিনয় নম্র  
হইয়া রহিলেন।

রোগ ক্রমশঃই আরোগ্যের পানে ছুটিল।  
এই অত্যাগী জ্বর ক্রমে ক্রমে কনিতে কনিতে  
৪৫ দিনের দিন একেবারে ছাড়িয়া গেল।  
সকলে হাততালি দিয়া কবিরাজ মহাশয়ের  
প্রশংসা করিতে লাগিল। আনন্দাতিশয্যে  
আমার ডাক্তার বন্ধু নিজেই বলিলেন—  
“কবিরাজ মহাশয় আপনাই ধন্য। আপনি  
আজ আমাদের বেশ করিয়া দেখাইলেন যে,  
ভারতের নিজস্ব চিকিৎসা আয়ুর্বেদই ভারত  
বাসীর পক্ষে ব্রহ্মস্ব। বিলাতি চিকিৎসা বিলা-  
তের পক্ষে যতই মঙ্গলজনক হউক না কেন,  
তাহাতে অল্প শস্ত্র ব্যাণ্ডেজ ষ্টেথিসকোপের  
যতই প্রাবল্য থাকুক না কেন, আয়ুর্বেদীয়  
বটী পাচন মুষ্টিযোগই ভারতীয় লোকের পক্ষে  
একান্ত উপযুক্ত।”

আমি এ যাত্রা কবিরাজ মহাশয়ের কৃপার  
নীরোগ হইলাম। ৫৬ দিনে অন্নপথ্য  
করিলাম। সবল স্বস্থ হইয়া ৭২ দিনের দিন  
কলিকাতা ‘ল’ কলেজের থাউইয়ার ক্লাশে  
নবজীবনে পুনরায় উপস্থিত হইতে পারিলাম।

আমার রোগ আরোগ্যের জন্ত যে সকল  
ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছিল, আমি কবিরাজ  
মহাশয়ের নিকট হইতে তাহা জানিয়া লইয়া  
ছিলাম। নিম্নে সেই ঔষধ কয়টির কথা  
লিখিতেছি :—

জরের জন্ত—বিশেষ্বর রস, বৃহৎ জরকন্তুবি  
ভৈরব। মহামৃত্যুঞ্জয় ও মুষ্টিযোগ ইত্যাদি।

পেটকাঁপা ও হজমের জন্ত—সূর্য্যকান্ত  
রস, শঙ্করযোগ ও মুষ্টিযোগ ইত্যাদি।

মস্তিষ্কের জন্ত—মহালক্ষ্মীবিলাস, মহা  
নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস ও মুষ্টিযোগ ইত্যাদি।

আর কি বলিব? এবার অমুখে আমার দৃঢ়  
বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা অর্থাৎ  
ঋষিগণের ভারতবাসীর উপর চরম আশীর্বাদ!  
আজ অনাদরে, অবজ্ঞায় এ চিকিৎসা বিলুপ্ত  
প্রায়, কিন্তু সূর্যর অতীতে এই শাস্ত্র হইতেই  
ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্ম হইয়াছিল।  
এই অবসানের শেষ মুহূর্ত্তেও এইরূপ ক্ষুদ্র  
ক্ষুদ্র নিদর্শন আয়ুর্বেদের অদীম শক্তিরই  
পরিচয় দিয়া থাকে। এ শাস্ত্রকে অবমাননা  
করিলে আমাদের চলিবে না। আয়ুর্বেদকে  
পরিপোষণ করিতে পারিলে তবে ভারতবাসী  
আবার স্বাস্থ্যস্বখ লাভ করিতে পারিবে,  
নতুবা বিলাতি শত শত পেটেন্ট টনিক  
তাহাকে চিররোগের কবল হইতে কিছুতেই  
অব্যাহতি দিতে পারিবে না। বিদেশীয়  
চিকিৎসার আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে  
কণি শীর্ণ হইয়া উঠিবে।

নিরপেক্ষ বিচারে আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব যথেষ্ট হইবে।  
প্রমাণ করিতে বোধ হয় এই সত্য নিদর্শনটো শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।

## চরকোক্ত পঞ্চকর্ম সাধন ।

—:—

বমনের যোগ্যজনে পূর্বাহ্নে ভিষক ।  
ধার্ম্যের আয়ুপনাংস গ্রাণ্য ও ঔদক ॥  
নাংসরস দুগ্ধ আর করাইয়ে পান ।  
কক্ষের উৎক্লেষ হ'তে ক'র তারে ত্রাণ ॥  
বিষেক যোগ্যজনে স্নিগ্ধ করাইবে ।  
ঘূর ও লাল্ললমাংসে কক্ষ কমাইবে ॥  
গ্রামাংসে কক্ষাধিক্য তাহাতে বমন ।  
মন্দ কক্ষে সহজেই হয় বিরেচন ॥  
কক্ষায়ে বমনোবধি অধোদিগে ধায় ।  
কক্ষাধিক্যে বিরেচক তথা উর্দ্ধে যায় ॥  
স্নিগ্ধ কবি যথাবিধি করা'বে বমন ।  
পবে পেয়াদির ক্রম করিবে পালন ॥  
বিরেচনে যথাবৎ স্নিগ্ধ করি পরে ।  
ধিয় করি যোগ্যতম রেচন আচরে ॥  
পেয়া ও বিলেপীকৃত অকৃত অথবা ।  
ঘূর, নাংসরস ক্রমে সেবনার্থে দ্বিবা ॥  
প্রধান, মধ্যম আর অধম শোধন ।  
তিন, দুই, একবার করিলে সেবন ॥  
অহুশার অগ্নি যথা তৃণ ও গোময় ।  
ক্রমে দহি, মহাস্থির সর্বসহ হয় ॥  
ক্রমে শুদ্ধ ব্যক্তির অস্ত্ররাশি তথা ।  
পেয়াদি দহিয়া স্থির হইবে সর্বথা ॥  
নিকৃষ্ট, অধম আর উৎকৃষ্ট লক্ষণ ।  
চারি, ছয়, আটবার হইলে বমন ॥  
দশ, বিশ, ত্রিশবার বিরেচন হ'লে ।  
নিকৃষ্ট, অধম, শ্রেষ্ঠ বেগ তার বলে ॥

অর্দ্ধপ্রস্থ, পোনেএক, একপ্রস্থ আর ।  
বমনের দ্রব্যমান ক্রমশঃ তাহার ॥  
দুই, তিন, চারিপ্রস্থ নুপে বিরেচন ।  
নিকৃষ্ট, অধম, আর শ্রেষ্ঠের লক্ষণ ॥  
পিত্ত দরশন নাহি হয় যতক্ষণ ।  
বমন করান বিধি তাকে ততক্ষণ ॥  
কক্ষ দরশন নাহি যতক্ষণ হয় ।  
ততক্ষণ বিরেচন উচিত সময় ॥  
আদি দুই তিনবার মল নিঃসরণ ।  
বিরেচন সংখ্যামধ্যে না হয় গণন ॥  
পানীয় ঔষধ বেগে যতক্ষণ রয় ।  
বমন নিকৃষ্ট সংখ্যা মধ্যে তাহা নয় ॥  
ক্রমে কক্ষ পিত্ত বায়ু হইলে নির্গত ।  
সম্যক বমন তার হয় রীতিমত ॥  
হৃদি, পার্শ্ব, শির আর ইন্দ্রিয়নিচর ।  
শ্রোতের বিস্তৃতি, দেহ লঘুতাতে হয় ॥  
দেহে ফোট, কণ্ঠ, কোঠে আদি সমুদয় ।  
গাত্রগুরু, অবিগুচ্ছিত ইন্দ্রিয় হৃদয় ॥  
অতিশয় বমনেতে তৃষ্ণা, মুচ্ছা, মোহ ।  
বায়ুকুণ্ড, নিদ্রাহীন, বলনাশে দেহ ॥

### বিরেচন পরীক্ষা ।

বিরেচন হয় যদি সম্যক প্রকার ।  
ইন্দ্রিয় প্রসাদ হয়, স্রোতগুচ্ছি আর ॥  
দেহ লঘু, বলোদয়, অগ্নির উদ্রেক ।  
নিদ্রাময় বোধ হয় এক আনিদ্রবৎ ॥

বিষ্ঠা, পিত্ত, কফ, বায়ু ক্রমে নিঃসরণ ।  
 হয়ে থাকে এইরূপ তাহার লক্ষণ ॥  
 ভালভাবে বিরচন যদি নাহি হয় ।  
 শ্লেষ্মা, পিত্ত, বায়ুতে কুণ্ঠ হয়ে রয় ॥  
 অগ্নিমান্দ্য; দেহগুরু, তন্দ্রা, প্রতিশ্যায় ।  
 বমন, অরুচি, বায়ু-বিলোমন তায় ॥  
 অতিশয় বিরচন কা'রো যদি হয় ।  
 কফ, রক্ত, পিত্ত আর সুপ্ততা ও ক্ষয়,  
 অঙ্গমর্দ, ক্লান্তি আর কম্পন রহিবে ।  
 নিদ্রা, বলহানি, হিক্কা, উন্মাদ হইবে ॥  
 সম্যক বমন আর বিরচন পরে ।  
 নবম দিবসে ভাত ঘৃত পান ক'রে ।  
 অথবা অনুবাসন গ্রহণ করিয়া,  
 তিন দিন পরে দেহে তৈল মাখাইয়া ॥  
 পাতি' বৃদ্ধি কালে তাহাকে তখন ।  
 করাবে ত্রিকগণ নিরূহ গ্রহণ ॥

#### বমনের অযোগ্যপাত্র ।

ক্ষতক্ষীণ, অতি স্থূল, কৃশ শিশুগণ,  
 বৃদ্ধ, শ্রান্ত, পিপাসিত, দুর্বল যে জন ।  
 ক্ষুধিত ও শ্রমক্লান্ত, উপবাসরত ।  
 অধ্যয়ন-চিন্তা আর ব্যায়াম নিরত ॥  
 ক্ষাম, গর্ভবতী, কোষ্ঠ সংবৃত যাহার,  
 উর্দ্ধ রক্তপিত্তরোগগ্রস্ত, স্রুক্ষ্মার,  
 বমি সাহ্য, উর্দ্ধবাতগ্রস্ত, আস্থাপিত,  
 হৃদরোগ উদাবর্তগ্রস্থানুবাসিত,  
 মূত্রাঘাত-প্লীহা-গুণ্ডা-অষ্টীলা-উদর,  
 তিমির ও শির-শিরোগী, ভগ্নস্বর,  
 কর্ণরোগী, অক্ষি-পার্শ্বশূলরোগীগণ ।  
 ইহারা অযোগ্য হয় করাতে বমন ॥

#### অযোগ্যের হেতু ।

ঔরঃকতে ক্ষতবৃদ্ধি বমনেতে হয় ।  
 রক্তের উত্তম ভাবে হয় অতিশয় ॥

ক্ষীণ, অতি স্থূল-কৃশ-বাল বৃদ্ধ আর ।  
 দুর্বলে বমনাসহ প্রাণে হানি তার ॥  
 শ্রান্ত, পিপাসিত আর ক্ষুধাতুরজনে ।  
 বমন নিসিদ্ধ হয় এসব কারণে ॥  
 শ্রম ভারাক্রান্ত আর যে করে ভ্রমণ,  
 উপবাস, রতিক্রিয়া আর অধ্যয়ন,  
 ক্ষাম, চিন্তারত আর ব্যায়ানী যাহারা,  
 রক্ষ হেতু বাতরক্তে প্রকুপিত তারা ।  
 কর্ণনালী আদি স্থান ছিন্ন হয়ে যায়,  
 উরঃকত হতে পারে অরোগ্য তাহার ॥  
 গভীণীর গর্ভস্রাব, গর্ভব্যাপতাদি,  
 হৃদারুণ রোগ হয় তেঁই ত্যাজ্য বিধি ॥  
 স্রুক্ষ্মার হৃদয়ের বিকর্ষণ তরে ।  
 উর্দ্ধ অধোমার্গে রক্ত বিনিম্বিত করে ॥  
 দুর্বল্য, সংবৃতকোষ্ঠ করিলে কুহন ।  
 আমাশয়ে সমুৎক্লিষ্ট দোষ সে কারণ ॥  
 বীদর্প, স্তম্ভ ও জ্ঞান, চিন্তের বিকার,  
 মরণ পর্যন্ত করে কি কহিব আর ॥  
 উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত উৎক্ষেপে উদান ।  
 প্রাণ নাশ করে রক্ত হয়ে বলবান ॥  
 প্রশস্ত বমি ও উর্দ্ধবাত আস্থাপিত ।  
 অনুবাসিতে উর্দ্ধবায়ু হয় প্রধাবিত ॥  
 হৃদ্রোগে হৃদয়-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় ।  
 উদাবর্তে রোগ বৃদ্ধি প্রাণ নাশে তায় ॥  
 মূত্রাঘাত, প্লীহা, গুণ্ডা, অষ্টীলা, উদর,  
 স্বরভঙ্গ শূলে হয় তাতে তীব্রতর ॥  
 তিমিরে তিমির বৃদ্ধি শিরঃশূল আর,  
 শ্রদ্ধা-কর্ণ-অক্ষি শূলে বৃদ্ধি ত্যাজ্য আর ॥  
 যে সব ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ বমন ।  
 তার—বিষ-গরভাত, বিকল ভোজ্য,  
 কিম্বা অসিদ্ধ রোগ, বহন করিয়া  
 আশুকারী হেতু তাহার বমন ॥



## বমনের যোগ্যপাত্র।

গীনস ও কুষ্ঠ আর নবজ্বর, কাস,  
রাজবন্দা, গলগ্রহ, গণ্ডমালা, খাস,  
শীপদ, মন্দাগ্নি, মেহ, বিরুদ্ধ ভোজন,  
বিসৃচিকা, অলসক, অজীর্ণ অশন,  
বিব গরপান, দুষ্টদন্ধ-বিদ্ধমার,  
অধোগত রক্তপিত্ত, প্রসেক, অপর

অকুচি, হৃদ্যাসারুচি, অর্শ, অপস্মার;  
অবিপাক, শোথ পাণ্ডু উন্মাদাতিসার,  
মুখপাক, ধাতীরোগ, শ্লেষ্ম রোগ নানা।  
বমনের যোগ্য এরা থাকে যেন জানা ॥  
ক্ষেত্র আলি ভান্নি যথা শস্য করে নাশ।  
বমি তথা দোষ হরি করে রোগ নাশ ॥

শ্রীরামবিহারি রায় কবিকঙ্কন।

## মসূরিকা বা বসন্ত।

—:~:—

প্লেগ, কলেরা ও ইনফ্লুয়েঞ্জার মত মসূরিকা বা বসন্ত রোগও ভারতবাসীকে ধ্বংস করিতে খসিয়াছে। সরকারি মৃত্যুর হার পর্যবেক্ষণ করিলে, গত কয়েক বৎসর হইতে বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও বড় কম হইবেনা; এবং এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি বৎসরই যে বাড়িতেছে তাহাও ঐ তালিকা দৃষ্টে জানিতে পারা যায়, স্বতরাং এ রোগের হাত হইতে ভারতবাসী যাহাতে অনেকটা আশ্রয়লাভ করিতে সমর্থ হয়, প্রত্যেক চিকিৎসকেরই সে সম্বন্ধে চিন্তাশীল হওয়া কর্তব্য।

বসন্তরোগ দেশে যে আগে হইত না, তাহা নহে কিন্তু প্রায়শই এরূপ মারাত্মক মূর্তি ধারণ করিত না। চৈত্র মাসে—গরম ফুটিলে—এমনই সময় দেশের অন্ন সংখ্যক ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইত, কিন্তু সে আক্রমণ বৈরাগ্য ভাবে হইত তাহাতে তাহাকে জলবসন্ত বা পানিবসন্ত আখ্যা ভিন্ন আর কিছুই বলা হইত না এবং সামান্য কয়েক দিন কিছু কষ্ট পাওয়ার পর সে বসন্ত বিনা চিকিৎসার

আপনিই সারিয়া যাইত। মেথী ভিজান জল, কুড়ু ও বাবুইতুলসী সিদ্ধ, থোড়ের জল—এই সকল ব্যবস্থা সেরূপ অবস্থায় কদাচিত্ত করা হইত। ফল কথা বসন্ত হইলে সেকালে আমাদের দেশবাসী আদৌ চিন্তিত হইতনা; সামান্য ত্রণ বা ফোটকের মত আপনা আপনি সারিয়া যাইবে বলিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারিত।

কিন্তু এখন এ রোগের মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া লোকের মনে একটা বিষম বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে, লোককল্লও বথেষ্ট হইতেছে, এ অবস্থায় এ রোগের নিদান, প্রতিবেধক বিধি ও চিকিৎসার কথা আয়ুর্বেদবেত্তাগণ বাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের অভিজ্ঞতা মিশাইয়া এই প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে।

শাস্ত্রপাঠে আমরা অবগত হই,—কষ্ট, অন্ন, লবণ ও দ্বার কোষ, বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণ সবে ভোজন, হুই অন্ন, শিথী ও শ্যাবাদি আহার, সদোষবান্ধ সেবন ও সদোষ বসনাদি—এই রোগের আদি কারণ

দিগের কুদৃষ্টি—এই সকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত ও দুষ্ট রক্তের সহিত সঙ্গত হইয়া মন্সরিকা বা বসন্ত রোগ উৎপন্ন করে। এই রোগে মন্সর কলায়ের ত্রায় আকৃতি বিশিষ্ট পীড়কা সকল উৎপাদন করে বলিয়া এই রোগের নাম মন্সরিকা। তাহারই বাঙ্গালা হইয়াছে বসন্ত। বাতাদি দোষ বলিলে, বায়ু পিত্ত কফ বুঝায়, কিন্তু কফ ও বায়ু অপেক্ষা এই রোগে আমরা পিত্তেরই অধিক প্রকোপ হইয়া থাকে দেখিতে পাই। আমরা এখনকার দিনে শাস্ত্র মানিনা, ধর্ম মানিনা, স্বাস্থ্যের সহিত আমাদের ধর্মের বে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এবং দিন চর্যা, ঋতু চর্যা—ভক্ষ্যভক্ষ্য বিষয়ে শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা পালন যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির মূল এ সকল কথা আমরা কিছুই মানিতে চাহিনা, আমাদের নানারূপ রোগপ্রবণতা তাহার ফলই সম্ভূত। বসন্ত রোগ লইয়াই আমরা সে কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝাইতে চাই।

বসন্ত রোগের সূচনা হয় ফাল্গুনের শেষে এবং চৈত্র মাসে ইহার পূর্ণ প্রকোপ প্রকট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্তকাল। শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই—“শীত ঋতুতে সঞ্চিত কফ বসন্তকালে সূর্য্য কিরণে দ্রবীভূত হইয়া অগ্নিনাশ ও বিবিধ রোগ উৎপাদন করে অতএব, প্রত্যেক কালে কফ নাশক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তীক্ষ্ণ বমন তিক্ত্তে নস্ত্র, লঘু ও ক্রান্ত ভোজন, ব্যায়াম, গাত্রমার্জন ও পরম্পর পাদাঘাত দ্বারা প্রবৃদ্ধ কফকে জয় করিবে। স্নান, কর্পূর, চন্দন, অগুরু ও কুসুম, পুরাতন যব, গোধূম এবং শূলপত্র জাকিল মাংস ভোজন করিবে।

\* \* \* মণ্ডয় মাক্ত হিল্লোলে শূশীতল, চতুর্দিকে জনপ্রণালী পরিবেষ্টিত, মণি-বেদি বিরাজিত, কোকিল কাকণী মুখরিত, বিবিধ পুষ্প বৃক্ষ শোভিত, সৌগন্ধময় উপবনে অবস্থিতি করিয়া নানারূপ মনোহর বাক্যালাপে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিবে” ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কি এখনকার দিনে এই সকল ব্যবস্থা করিবার উপায় করিতে পারি?—পারিনা। কেন পারিনা—তাহার কারণ সংসার তাড়নে নিষ্পেষিত কর্মগতপ্রাণ ভারতবাসীর কোকিল কুজিত উপবনে মধ্যাহ্ন উপভোগের আদৌ অবসর নাই; প্রচণ্ড রোদ্রে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে সে সময় তাহাকে প্রভুর মনোরঞ্জে অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাজেই সে ব্যবস্থা ইচ্ছা সত্ত্বেও অসম্ভব। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত ঋতু চর্য্যার সকল ব্যবস্থা তো আমরা করিতে পারি;—তাহার প্রবৃত্তি যে আমাদের তিরোহিত হইয়াছে। অজীর্ণ এবং ডিসপেপসিয়ায় দেশের লোক জর্জরীত, যখন রোগ পীড়নে একান্ত ক্লিষ্ট হইতে হয়—তখনই অনেকে চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করেন। কিন্তু দিনচর্যা—ঋতুচর্যা—শাস্ত্রবিধি যদি দেশের লোক পালন করিত, তাহা হইলে ডিসপেপসিয়ায় নামও দেশ হইতে লোপ পাইত এবং চিকিৎসকের শরণ গ্রহণও করিতে হইত না। শাস্ত্র বলিতেছেন, ‘বসন্ত কালে তীক্ষ্ণ বমন, তীক্ষ্ণনস্য ব্যবহারে শরীর শোধন’ করিয়া লইবে—শাস্ত্রকার শুধু উপদেশ প্রদানেই ক্ষান্ত হন নাই, সে জন্ত বমন কার্য্যে বমনফল, নস্ত্রকার্য্যে কটকলা চিনাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন যেই বমন বা নস্ত্রের কথা বলিলে লোকজনই—বাস্তবিক করিতে পারেন, কিন্তু বমনফল কটকলা

আধিব্যাধি কম হইত, তখন দেশের সকল লোকই ঐ সকল কথা বুঝিত এবং পানন করিত। এখন দেশের রুচি পরিবর্তন হইয়াছে, আমরা ব্যাধি প্রবণ হইবনা কেন?

আমাদের আহারের ব্যবস্থা বারমাস এক ঘোরে। বাঁহারি মেসে, বোর্ডিয়ে, হোটেলে থাকিয়া প্রাত্যহিক আহারের ব্যবস্থা করেন, তাহাদেব তো কথাই নাই, অজ্ঞাত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও শাস্ত্রদেশ মানিয়া আহারের ব্যবস্থা নাই। সকল সংসারেই বারমাস এক ঘোরে আহার চলিয়াছে। কটু, অম্ল, লবণ ও দ্রব্য ভোজনে মন্থরিকা বা বসন্ত রোগ

উৎপন্ন হয়, সেই জন্ত বসন্ত রোগের হস্ত হইতে আশ্রয়দার জন্ত বসন্তকালে ইহার পরিহার করা কর্তব্য, কিন্তু দেশের লোক এ সকল কথা বুঝেন কি? ক্ষীর-মৎস্যাদি সংযোগ বিরুদ্ধ ভোজন—এ তো আমরা সকল সময়ই করিয়া থাকি। আমাদের আধিব্যাধির প্রবলতা এবং আলোচ্য বিষয় বসন্ত রোগ এই জন্ত দেশে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। বাহাইউক আমরা এসকল কথা ছাড়িয়া দিয়া আগামী বারে এই রোগের অজ্ঞাত কথায়ই আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কাবিরত্ন, এম এ, এম বি।

## বিবিধ প্রসঙ্গ

—:—

বশোহর জিলাবোর্ডে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়।—গত ২৯শে মার্চ বশোহর জিলা বোর্ডে আলোচনা হইয়াছে যে বশোহর জিলাবোর্ড হইতে বশোহরে একটি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহার জন্ত বোর্ডের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান মহাশয় গবর্ণমেন্টকে একথা জানাইয়াছেন। আমরা এ সংবাদে পরম সুখী হইয়াছি এবং ভরসা করি, গবর্ণমেন্ট বশোহর জেলা বোর্ডের এই সাধু প্রস্তাব নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। সরকারি সাহায্য পাওয়ার বর্তমান সময়ে আলোপ্যাথিক চিকিৎসা সর্বজন সমাদৃত হইলেও সনাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা খাটি ও অভ্যস্ত বলিয়া এখনো পর্যাপ্ত গৃহ্য হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য দেশে অনেক সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক ইহার চিকিৎসা প্রণালী

যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে যেখানে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হারি মানিয়াছে—সেখানে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে—এরূপ ঘটনা পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের অনেকেই দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট এত দিন যদি আলোপ্যাথিক চিকিৎসার মত আয়ুর্বেদের পৃষ্ঠপোষক হইতেন, তাহা হইলে আজ অনেক বৈদ্যসম্মান পুরুষপুরুষের ব্যবসায়—বৈদ্যবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না এবং এখনো ভারতবর্ষে ৪০ চল্লিশ হাজার চিকিৎসকের আবশ্যক বলিয়া চিকিৎসক প্রস্তুতের জন্ত গবর্ণমেন্টকে চিন্তা করিতে হইত না। আমাদের মনে হয়—সেইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ভারতবর্ষে বৈদ্য হারানারূপ রোগ পড়িলে আজ এত বিপী

যিকাও দেখিত না। যশোহর জিলা বোর্ডের এই সাধু প্রস্তাব শুনিয়া সেইজন্ত আমরা যথেষ্ট আনন্দ অমুভব করিয়াছি। দেশের লোকের মতিগতি পরিবর্তিত হউক, মহামায়া গবর্ণমেন্টবাহাদুর লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদের পুনরুন্নতির জন্ত সাহায্য করুন—ইহাই আমাদের প্রকৃত কামনা।

### দেশবাসীর আত্মরক্ষার উপায়।

—দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়ইয়াছে,—আধি ব্যাধিতে বঙ্গভূমি—তথা সমগ্র ভারতভূমি যেরূপ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে—তাহার সহিত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠভাবে নিহিত। আমাদের দেশ উচ্চপ্রধান, সেইজন্ত আমাদের দেশে শীতপ্রধান দেশের উগ্রবীৰ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা—কখনই সমীচীন নহে। তা' ছাড়া বাতব্যাধি, পরিণাম শূল, অরুপিত্ত, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, কৃষ্ঠ, বাতরক্ত প্রভৃতি এমন অনেকগুলি রোগ আছে, যেগুলির চিকিৎসায় অনেক বিজ্ঞ আয়োগ্যাপাথও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করাইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। সরকারী সাহায্য পাইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিলেও কতকগুলি রোগ আরোগ্যের বিশেষ শক্তির জন্ত আয়ুর্বেদের গর্ভে এখনো ধরু হয় নাই। ফলকথা, আমরা যদি সনাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাকে পুনরুন্নত করিতে পারি, গবর্ণমেন্ট যদি এই চিকিৎসাকে সাহায্য করেন—তাহা হইলে দেশের লোকের মতিগতিও ফিরিবে এবং তাহার ফলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ ইহার উন্নতির জন্ত আরও চেষ্টাশীল হইয়া দেশ রক্ষায় মনোভিনিবেশ করিতে সমর্থ হইবেন।

পরলোক।—রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, এম. এ. সি. আর. এচ. বিদ্যাসাগর

মহাশয় গত ২৬শে চৈত্র, ৯ই এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ইংরাজী বিজ্ঞায় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ উপাধিধারী ছিলেন। কর্মময় জীবনে ইনি বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের অমুবাদকের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা সাহিত্যশাখার একজন বিশিষ্ট সভ্যরূপেও ইনি বহুকাল কার্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা সাহিত্য-সভার ইনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আমরা ইহার বিয়োগে যথেষ্ট ব্যথা অমুভব করিয়াছি। ভগবান ইহার শোক-সম্পন্ন পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি সেন্ন করুন।

প্রাদেশিক ভাষায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা।—বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায়ের প্রমোত্তরে মিঃ ডোলান্ড জানাইয়াছেন, যে, প্রাদেশিক ভাষায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দানের প্রশ্ন গবর্ণমেন্ট চিন্তাই করেন নাই এবং ঐ জন্ত কোনো বিদ্যালয় স্থাপন অথবা স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে বাঙ্গালা শাখা খুলিয়া দেওয়ার কথা তাঁহার ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট চিন্তা করেন—ইহা আমাদের বিশেষ অমুয়োধ্য। যে দেশে এখনও ৪৫ হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন, সে দেশে প্রাদেশিক ভাষায় চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে অনেক ইংরাজী ভাষানিজ্ঞ ব্যকিই চিকিৎসা শিক্ষার জন্ত আগ্রহ হইতে পারে। দেশের অনেকে ইংরাজীকে মুখপার নহে বলিয়াই তো ইচ্ছা করে যে, অনেক এ রকম অবলম্বনের সুযোগ পাইতে পারেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এ সকল কথা চিন্তা করিলে আমাদের কল্যাণ সাধিত হইবে।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৩য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—আষাঢ় ।

{ ১০ম সংখ্যা ।

## দেশের কথা ।

—:—

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে ইংরাজী শিক্ষালব্ধ জ্ঞানার্জনে আমরা এখন এক একজন মহা মহা কণ্ঠবীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছি—ইহা সত্য হইলেও সেই সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে কি অবনতি হইয়াছে—সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা ।

ইংরাজী শিক্ষায় অল্পপ্রাপিত হইয়া এখনকার দিনে আমরা যে পরিমাণে অর্থের মুখ দেখিতে পাইতেছি, এ পরিমাণ অর্থ বঙ্গবাসী—তথা সমগ্র ভারতবাসী কখনো উপার্জন করিতে সক্ষম হন নাই । অধুনা B.A. M.A. পাশ করিয়াও অনেকের ইন্দ্রীত বাসনা অতৃপ্ত থাকে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এখনকার B.A. M.A. ন্যূনতমে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন, সেকালে বহু চেষ্টা করিয়াও প্রারম্ভে সেরূপ অর্থ কেহ উপার্জন করিতে সমর্থ হইতেন না; স্মৃতরাং বর্তমান যুগে

বিদেশীয় শিক্ষার চরম সাধনা করিতে পারিলে, দেশের লোকের অর্থোপার্জনের পন্থা আর কষ্টক্যবৃত থাকেনা,—একরূপে তাহার জীবন যাত্রা নিরীহার ব্যবস্থা হইতে পারে ।

কিন্তু সে অর্থ উপার্জনের ফলে আমরা করিতেছি কি ? বাঁহারা খুব বেশী টাকা রোজগার করেন—তাঁহাদের কথা বাদ দিয়া, বাঁহারা কেবাণী বৃত্তি করিয়া ছাড়ভান্ডা পরিশ্রমের ফলে মোটামুটি উপার্জন করেন—তাঁহাদের অবস্থান কতটা শাস্তি থাকিতে পারে, তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু বহুকাল চিকিৎসা ব্যবসায়ের ফলে এ কথাটি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা আদৌ করিতে পারেননা । তাহার কারণ, এখনকার দিনে আমরা নগদ অর্থের মুখ যেমন যথেষ্ট দেখিয়াছি, তেমনি সকল বিষয়েই অধুনা আমরা অকাতরে ব্যয়শীল হইয়া পড়িয়াছি । অর্থ উপার্জন করিয়া বেকুপভাবে উহার ব্যব-

হার করিতে হয়, এখনকার দিনে আমরা সে জ্ঞান আদৌ অর্জন করিতে শিখি নাই। এক কথায় এখনকার দিনে আমরা অর্থ আনিতে জানি, কিন্তু উহার ব্যবহার করিতে জানি না। তা' যদি জানিতাম, তাহা হইলে আজি কলিকাতা—শুধু কলিকাতা নহে, বাঙ্গালা দেশের সমস্ত সহরে—শুধু সহরে কেন—পল্লী-গ্রামে পর্যন্ত বিড়ি-দিগারেটের বিক্রয়াদিক্য দেখিতে হইতনা, দোকান খুলিয়া পতিতা রমণীকুলকে রাজপথগুলিতে পয়সায় চারি বিলি আনি বিক্রয় করিতে দেখিতে হইতনা, সোডা-লেমনেড-সরবতের দোকানের ভিড়ে বঙ্গবাসীকে বিপর্যস্ত হইতে হইতনা! আর আসাম-দারজিলিং ও জলপাইগুড়ির উদ্ভানজাত চায়ের কল্যাণেও প্রত্যেক সহরে পয়সা পেয়ালা চা বিক্রয়ে অনেককে জীবিকা নির্বাহের সংস্থান করিতে হইত না।

বাঙ্গালী কি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করে? কখনই করেনা। তা' যদি করিত—তাহা হইলে বর্তমান বৎসরে কলিকাতার বাজারে আজি দশটাকা শ'য়ের আম কিনিবার জন্ম আপন গুলিতে প্রাপ্তমধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন—সকল সময়েই প্রবল জনতা দৃষ্টিগোচর হইত না—সেমিজ-জ্যাকেট-বডির দোকান গুলিতেও এত ভিড়ের ব্যবস্থা হইত না।

তাই বলিতেছিলাম—বাঙ্গালী ইংরাজী পড়িয়া—ইংরাজী শিখিয়া—ইংরাজী সভ্যতাকে আদর্শ করিয়া, দেশের নিকট—দেশের নিকট—সমাজের নিকট—স্বাঅপরিজ্ঞানের নিকট জ্ঞান-গর্ভ-সুখ অন্বেষণ করিতে পারিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার বুদ্ধি-বিপর্যয়ের ফলে প্রকৃত সুখলাভের পথ সে যে একেবারে রুদ্ধ করিয়া

রাখিয়াছে—ইহা অবিসংবাদিত সত্য, এ কথাও প্রতিকূলে কিছুই বলিবার নাই।

রাজা আমাদের ইংরাজ, স্ততরাং এখন আর শুধু আমাদের দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবেনা, আমাদেরকে ইংরাজী পড়িতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ইংরাজের অনুকরণ করিব কেন? ইংরাজ তো আমাদের মাথার দিয়া দিয়া বলিয়া দেন নাই যে, তোমরা তাঁহাদের অনুকরণ কর। তাঁহারা তো সে কথা বলিয়া দেন নাইই, বরং তোমাদের জাতীর শিক্ষার বিস্তার কামনায় সংস্কৃত চর্চার জন্ম সংস্কৃতকলেজ খুলিয়া, টোলে বুদ্ধি দিয়া, তোমাদের বাঙ্গালা বিদ্যালয়গুলিতে সাহায্য করিয়া, তোমাদের নিজস্ব বজায় রাখিবার ব্যবস্থা যথেষ্ট করিয়াছেন। তোমরা সে সকল নিজে গ্রহণ করিবেনা। নিজেরা বিকৃত বুদ্ধিকে প্রণোদিত হইয়া যদি অন্তত উৎপাদনের ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে তাহার ফল যে তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে—ইহা প্রব সত্য এবং ইহারই জন্ম বাঙ্গালীর মনে সুখ নাই, শান্তি নাই, স্বাস্থ্যসম্পদে! বাঙ্গালী আজি আর সে কালের মত গরীবানও নহে।

প্রকৃত কথা, আমাদের দেশ—জ্ঞানে দেশ,—ইহা ভোগের দেশ নহে। এ দেশে লোকের কোনো কালে অর্থ ছিল না, কিং তাহার এমনই সামর্থ্য ছিল যে, সে সামর্থ্য একদা সমগ্র বিশ্ববাসী চমৎকৃত হইয়াছিল তাহার কারণ, স্থলকলেজের বিস্তা এখন যে অর্থকরী বিষয় হইয়াছে, এ দেশে সে ব্যবস্থার কাহারও প্রয়োজন ছিলনা। ইহা প্রধান কারণ, সেকালে উন্নতির ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিলনা। ইহা কাহাকেও বড় একটা অবিবেচন হইত না।

সকলেরই ছ' দশ বিঘা চাষের জমী ছিল—সেই  
জমীতে ধান্ধ এবং অন্যান্য ফসলাদি যাঁহা  
উৎপন্ন হইত, তদ্বারা প্রায় সকল সংসারেরই  
অন্নের সংস্থান হইত, সকলেরই গৃহ-সান্নিধ্যে  
অন্নবিস্তর পরিমাণের বাগান ছিল,—সে  
বাগানে যে পরিমাণ তরিতরকারি উৎপন্ন  
হইত, তদ্বারা আহারকালে দৈনন্দিন ব্যঞ্জনব  
ব্যবস্থা হইত। পল্লীবাসী মাত্রেই এক একটা  
ছোট বড়—বেকুপ ধরণেরই ইউক না কেন,  
দ্রাবিকা-পুষ্করিণী থাকিত, তাহার জন্ত মৎস্য  
কাগকেও কিনিতে হইত না। আর  
গাভীপালন—এটা সেকালে যে প্রত্যেক  
বাস্তাব্য করণীয় বিষয় ছিল, তাহার উল্লেখ  
না কবিলেও চণিতে পারে। ফলে সেকালের  
বাস্তাব্য প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ বা অমৃত পানে  
দীর্ঘায়ু ও বয়ঃসংস্থাপনের ব্যবস্থায় সক্ষম  
হইত। ফলে সেকালে অধিকাংশ বাঙ্গালীকেই  
জীবিকাক্ষণের ভাবনা বিশেষ ভাবিতে হইত  
না। সেইজন্য সেকালে বাঙ্গালী যে বিদ্যাশিক্ষা  
কবিত—তাহা জ্ঞানার্জন উদ্দেশ্যেই করিতে  
পারিত। এখন তো তাহা নাই। এখন বাঙ্গালী  
কৃষিকর্ম তুলিয়াছে, কারণ সে আর চাষ  
হইতে রাজি নহে, পিতৃপিতামহের বাস্তবতা  
পরাভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে—কুবুণ  
বহুকাল সহরের সর্ববিধ সুখ উপলব্ধি করিয়া  
সে আর নানা অসুবিধার মধ্যে ম্যালেরিয়াক্রিষ্ট  
হইতে ইচ্ছুক নহে। চোরের উপর রাগ  
কবিতা নাটীতে ভাত খাওয়ার মত, এখন  
বাস্তাব্য অবস্থা হইয়াছে,—পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া  
নিবারণের জন্ত তাহার চেষ্টা নাই,—  
পল্লীগুলি ম্যালেরিয়ার আক্রমণভূমি, সুতরাং সে  
খানে আর থাকি হইবে না, ইহাই  
হইয়াছে বাঙ্গালীর অবস্থা। এ অবস্থায়

বাস্তাব্যের ছববস্থা হইবে না তো হইবে  
কাহার?

ইংরাজী শিখিয়া চাকরিজীবী অধিকাংশ  
বাবুর দলই এখন সহরে বাস করিতে ইচ্ছুক,  
কিন্তু সহর বাসের দলে টাকায় চারি সের  
দুগ্ধ কিনিয়া স্বাস্থ্যসুখ লাভ করিবার ক্ষমতা  
অনেকেরই নাই। অন্যান্য খাদ্যও বাঙ্গালী  
যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পায় না। তাহার  
উপর আয়ের অবস্থায় বাসস্থানের ব্যবস্থাও  
বিবেচনা করিয়া করিতে হয়,—কাজেই  
অনেকের ভাগেই আলোক-রোজহীন বাড়ীতে  
অবস্থিত করা অনিবার্য হইয়া পড়ে। শিশু-  
মৃত্যুর আধিক্য—বাস্তাব্যের অকাল বাদ্ধকের  
বিস্মৃতি—বাস্তাব্যের যক্ষ্মারোগবৃদ্ধি—ইহারই  
ফলসম্প্রদ।

যক্ষ্মায় বাঙ্গলা দেশ তো সমগ্র বিশ্বকে  
ছাড়াইয়া ফেলিয়াছে,—আর কলিকাতা হই-  
তেছে—বাস্তাব্যের সকল স্থান অপেক্ষা যক্ষ্মাগ্রস্ত  
রোগীর প্রধান তীর্থ। বাঙ্গালী হোমরুল  
হোমরুল করিয়া চীৎকার করিতেছে, কিন্তু  
বাস্তাব্যের পক্ষে সে চিন্তার পূর্বে এই  
সকল বিষয়ের চিন্তা করা সর্বাগ্রে কর্তব্য  
নহে কি?

ধর্মের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ অতি নিকট  
বলিয়াই সে কালের বাঙ্গালী অতি ধর্মভীরু  
ছিলেন এবং সেই ধর্মরক্ষার জন্তই সেকালের  
বাস্তাব্য নীরোগ ও সুস্থদেহে দীর্ঘায়ুলাভ  
করিতে সক্ষম হইতেন।

এখনকার বাঙ্গালী সে সাবেক পদ্ধতি  
একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং  
সে ধর্মপালনও নাই—সে স্বাস্থ্যরক্ষার  
জন্ত কাহারও যত্নও নাই। সেকালের  
বাস্তাব্য বুকিত—শরীরমাধ্যম। একালের

বান্ধালী জানে—অর্থ সর্বস্বং। শুধু অর্থ সর্বস্ব  
নহে—বান্ধালী এখন যথেষ্ট অল্পকরণ প্রিয়  
হইয়াছে—বান্ধালীর বিলাস-বাসনা তাহার  
সহিত বিজড়িত। সেই বিলাসিতা হইতে  
বান্ধালী তৈলমর্দন ভুলিয়াছে, তাহার স্থলে  
সাবান মর্দন আরম্ভ করিয়াছে। বান্ধালী ধূম-  
পায়ী হুঁকা-গড়গড়ার সাহায্যে তামাক পরি-  
তাগ করিয়া বিড়ি-সিগারেটের সহজ হুলভ ধূম  
গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছে। কোন স্থানে  
যাইতে হইলে বান্ধালীর আর এক পোয়া পথ  
হাঁটিবার ক্ষমতা নাই—ট্রাম অথবা মোটর  
ভিন্ন বান্ধালী আর চলিতে পারিবে না—এত  
অত্যাচারেও যদি বান্ধালীর স্বাস্থ্য অটুট থাকে  
—তাহা হইলে তো আর বিশ্বনিয়ন্ত্রার কোনো  
নিয়মই প্রতিপালন করিবার আবশ্যক হয় না।  
শুধু পুরুষদিগের কথা নহে—আমাদের রমণী  
দিগকেও গৃহস্থালীর কর্ম সকল হইতে  
বিরত রাখিয়া আমরা তাঁহাদিগকেও এমনই  
অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছি যে, সেই  
অকর্মণ্যতার ফলে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের  
ও অপচয় ঘটিতেছে। দাস দাসীর নিয়োগ  
করিও না—পুরুষদ্বাদিগকে অনবরত খাটাইয়া-  
খাটাইয়া মারিয়া ফেল—এরূপ কথা অবশ্য  
আমরা বলিতেছি না, কিন্তু বাকুড়া-মেদিনী-  
পুরের বাগুন রাখিয়া, তাহাদের দ্বারা রন্ধনের  
ব্যবস্থা করিয়া, দেশের নারীদিগকে যে  
শুধু শয্যাবিলাসিনী করা উত্তম ব্যবস্থা নহে—  
এ কথা সহস্র বার বলিবে।

আমাদের অন্নপূর্ণার দেশে অন্নপূর্ণার অংশ  
সম্পূর্ণতা রমণীদিগকে অন্নবিতরণে ক্লিষ্ট হইতে

দেখিলে সমাজের কচিপরিবর্তনে বাধিত  
হইতে হয় বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম।  
ফল কথা, দেশের বড় ছদ্দিন। এ ছদ্দিনে  
আত্মরক্ষা করা বান্ধালীর পক্ষে যেরূপ অসম্ভব  
হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ যে  
বিশেষ অন্ধকারময়, সে বিষয়ে কিছুনা সন্দেহ  
নাই। তাই বলিতেছিলাম—ইংরাজী পড়,  
আপত্তি নাই—শুধু আপত্তি নাই-ই বা বলি  
কেন,—ইংরাজী তোমাকে পড়িতেই হইবে—  
কিন্তু প্রত্যেক বান্ধালীর নিকট করজোড়ে  
প্রার্থনা করিতেছি—অল্পকরণে মজিয়া যাইও  
না, পিতৃ পিতামহের আদেশ ভুলিও না—  
অল্পকরণ শ্রোতে হিন্দুর দীক্ষা ভাসাইয়া দিয়া  
বিজাতীয় বজ্রার প্রাবল্য ভাসমান হইও না।  
তাহাতে হইবে কি?—না—তাহাতে ছয়ের  
বাঁর হইবে। না পারিবে অল্পকরণে আসল টুকু  
আনিতে, না পারিবে হিন্দু বজ্রায় রাখিতে।  
ফলে একটা খিচুড়ির মিশ্রণে তুমি সহজেই স্বাস্থ্য  
হানি করিয়া বসিবে।

হিন্দু বজ্রায়ের সহিত যে আমাদের  
স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ বিজড়িত—সে কথা পূর্বেই  
উল্লেখ করিয়াছি; স্তত্রং বাহাতে স্বাস্থ্য  
বজ্রায় থাকে, নীরোগ হইতে পার, দীর্ঘায়ু  
লাভ করিতে পার, বৎসরের মধ্যে নয়  
মাস কাল চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করিতে  
না হয়—তোমার বীর্যোৎপন্ন সন্তান সন্ততি  
বাহাতে তোমারই দোষে অকালে কাল  
কবলিত না হয়—কারমনোপ্রাণে হিন্দু  
বজ্রায় রাখিয়া তাহারই ব্যবস্থা কর—ইহাই  
আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

শ্রীসত্যচরণ সেন ও গুণ কবিরঞ্জন।



## পঞ্চকর্ম ।

—:—

[ ডাক্তার-কবিরাজ সংবাদ । ]

( পূর্বানুষ্ঠান )

ডাঃ। এখন ধূম পানের দ্বারা কি উপ-  
কার হয় বলুন ।

ক। স্নেহন ধূম বায়ু নাস করে, বিরচন  
ধূম কফকে উৎকৃষ্ট ক'রে নির্গত করে ।  
প্রায়োগিক ধূম স্নেহন ও বিরচন এই উভয়  
ধূমই কার্যকারী । ধূমপান করিলে ইন্দ্রিয়,  
যব ও চিত্ত প্রশম হয়, কেশ, দন্ত ও শাশ্ব দৃঢ়  
হয় এবং মুখ সুগন্ধ ও পরিষ্কৃত হইয়া থাকে ।  
ইহা স্তন্যবস্থায় ধূম পানের গুণ । ইহা ভিন্ন  
কাস, খাস, অকুচি, মুখের উপলেপ ( যেন  
কিছু লেপা রহিয়াছে বোধ ), স্বরভেদ, মুখ  
হইতে লালাদি স্রাব, বমি, তন্দ্রা, হস্তস্তম্ভ,  
( চোয়াল ধরা ), মস্তাস্তম্ভ, পীনস, শিরোরোগ,  
কর্ণশূল, চক্ষু শূল এবং বায়ু ও কফজনিত  
মুখরোগ জন্মিতে পারে না ও জন্মিয়া থাকিলে  
প্রশমিত হয় ।

ডাঃ। ধূম পান বেণী হ'লে কি দোষ  
হয় ?

ক। অতিরিক্ত ধূমপান ক'রলে রোগের  
শক্তি হয় না এবং তালু ও গলদেশের  
উত্ততা, দাহ, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, ভ্রম ( ঘুরণী ) মস্ততা,  
কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, দৃষ্টির হীনতা, নাসারোগ ও  
দৌর্বল্য জন্মিয়া থাকে ।

ডাঃ। আচ্ছা ধূম কতক্ষণ পান ক'রতে  
হ'বে, তা'র কিছু নিয়ম আছে ।

ক। আছে বৈকি । প্রায়োগিক ধূম  
মুখ ও নাসিকা দ্বারা পর্যায়ক্রমে তিন তিন  
বার বা চার চার বার পান ক'রতে হয় ।  
যতক্ষণ চক্ষু দিয়ে অশ্রু নির্গত না হয়—ততক্ষণ  
স্নেহিক ধূমপান করতে হয় । এটা হ'ল  
সকলের পক্ষে ; দুর্বল ব্যক্তি এর চেয়ে কম  
পান করবে । বিরচন ধূম ৩৪ বার অথবা  
যতক্ষণ শ্লেষ্মা নির্গত না হয়—ততক্ষণ পান করা  
নিয়ম । কাসহরধূম আহারের পর তিন  
চার বার পান ক'রতে হয় । আর খোসা  
শুষ্ক তিলের যথাগু আকর্ষ পান ক'রে কফনীয়  
ধূমপান ক'রতে হয় । যতক্ষণ বমন হ'য়ে পিত্ত  
নির্গত না হয়—ততক্ষণ পান করা উচিত ।

ডাঃ। এই ত গেল আপনার চতুর্থ কর্ম ।  
পঞ্চম কর্ম কি ?

ক। পঞ্চম কর্ম করান—গণ্ড্ব ধারণ ।  
আর তা' ছাড়া আশ্চ্যাতন তর্পণ, পুটপাক  
ব'লে কিছু কর্ম আছে ।

ডাঃ। আচ্ছা আপনি সংক্ষেপে সব  
গুলোর কথাই বলুন । কর্মের বংশ একে-  
বারে নির্বংশ করা যাক ।

ক। আজতো সেটা আমি আরম্ভই  
করেছি, আপনার বলবার অপেক্ষা রাখিনি ।  
এখন সব গুলোর কথাই সংক্ষেপে বলি শুধুন ।  
কবল চার প্রকার, যথা, মেহী, প্রসাদী,

শোষণ ও রোপণ। বায়ু জন্ম রোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ গুণযুক্ত কবল, পিত্ত জন্ম রোগে মধুর ও শীত গুণযুক্ত কবল, কফ জনিত রোগে কটু, অম্ল, লবণ, ক্রক্ধ ও উষ্ণ কবল প্রযুক্ত। ইহাকে শোষণ বলে। আর বাতজ রোগে ও পিত্তজ রোগে যে দুই প্রকার কবল প্রয়োগ করবার কথা বলা হ'য়েছে, তা'দের যথাক্রমে মেহী ও প্রসাদী বলে। এতদ্বিন্ন মুখত্রণে কষায় স্বাছ ও তিক্ত দ্রব্যের যে কবল প্রয়োগ করার নিয়ম আছে, তা'কে রোপণ বলে।

ডাঃ। আচ্ছা কবল কি দিয়ে দিতে হয় ?

ক। রোগ ভেদে সেই সেই দ্রব্যানাশক ঔষধের সঙ্গে সিন্ধু ক'রে কাথ প্রস্তুত ক'রতে হয়। তারপর বায়ু রোগে রুতাদি মেহ, পিত্ত-রোগে কিসমিসের কাথ, চিনি প্রভৃতি মধুর দ্রব্য, আর কফরোগে শুঠ, পিপুল, মরিচ প্রভৃতি দ্রব্যের চূর্ণ মিশিয়ে কবল প্রয়োগ ক'রতে হয়। মুখের ক্ষতে ক্ষতনাশক দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত ক'রে প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। আচ্ছা কবল আর গণ্ডুষে প্রভেদ কি ?

ক। ওরা দুই ভাই—কবল ছোট আর গণ্ডুষ বড়। যে পরিমাণ দ্রব্য মুখে নিয়ে মুখের মধ্যে অনায়াসে সঞ্চালন ক'রতে পারা যায়, সেই পরিমাণ নিলে তা'কে কবল বলা যায়। কবল শব্দের অপভ্রংশ কুলি আর কুলকুচো। আর যে পরিমাণ দ্রব্য মুখে নিলে মুখ মধ্যে সঞ্চালন করা যায় না, মুখটা বুঁজে চুপটা ক'রে ব'সে থাকতে হয়, সেই পরিমাণ নিলে তাকে গণ্ডুষ বলে।

ডাঃ। পূর্বে ঋষিরা গণ্ডুষে সমুদ্র পর্যন্ত পান ক'রে ফেলতেন। তা' হলে তাঁদের শ্রীমুখে গহ্বরজের পরিমাণ কম ছিল না।

ক। সে ব্যাখ্যা পৌরাণিকেরা ক'রবেন। তবে আয়ুর্বেদের মতে যদি ব'লতে হয়—তা' হলে অগস্ত্য লবণ রসযুক্ত, স্তূতরাং শোষণ গণ্ডুষ ধারণ করেছিলেন ব'লে তাঁর কফরোগ আর পক্ষু মুশি মধুর রাস্কাঙ্কলের গণ্ডুষ ধারণ ক'রেছিলেন ব'লে তাঁর পিত্ত রোগ ছিল।

ডাঃ। ঠিক বলেছেন, কোনো বিলিতি এন্টিকোয়ারিয়েনকে (Antiquarian) লিখলে তাঁরা এটা আচ্ছাদ সহকারে গ্রহণ করবেন।

ক। তা করুন আপনি এখন শ্রবণ করুন। অনন্তরূপা হয়ে এবং শরীর উন্নত ভাবে রেখে অর্থাৎ সোজা হ'য়ে ব'সে কবল ও গণ্ডুষ ধারণ করতে হয়। যে পর্যন্ত দোষ গালের মধ্যে না আসে এবং নাসানোত ও চক্ষু জলপ্লুত না হয়—ততক্ষণ কবল ও গণ্ডুষ ধারণ ক'রতে হয়। তা'রপর মধু ঘৃতাদির করল ধারণ করতে হয়। কবল প্রয়োগ করবার পূর্বে শুঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, মধু ও হরীতকী বেটে তৈল, গোমূত্র বা মধুর সঙ্গে লবণ সংযোগে মিশ্রিত ও উষ্ণ ক'রে রোগীর গলায়, গালে ও ললাটে মাখিয়ে ঘেঁষে দিতে হয়।

ডাঃ। কবল গণ্ডুষেরও অযোগ্য অতি নোগ আছে নাকি ?

ক। আছে বৈকি ? কবলের হীনযোগ হ'লে মুখের জড়তা, কণ্ঠের উৎক্লেষ এবং রস-জ্ঞানের হানি হয়। অতিবোগ হ'লে মুখে ক্ষত, মুখের শুষ্কতা, তৃষ্ণা, অরুচি ও ক্লান্তি জন্মায়। আর সম্যক প্রয়োগ হ'লে ব্যাধির উপশন, মনের সন্তোষ, মুখের নির্মলতা ও লঘুতা এবং ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা ঘটে।

ডাঃ। আচ্ছা কবল গণ্ডুষ কোন কোন রোগে প্রয়োগ করা যায় ?

ক। নানা প্রকার মুখরোগ, নাসারোগ, কর্ণরোগ; দন্তরোগ প্রভৃতিতে কবল প্রয়োগ করা যায়। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে বদন্তকরণে কফ প্রশমনের জন্য কবল হিত কর। নিত্য তৈলের গণ্ডু ধারণ ক'রলে অকাল বনী পলিত হয় না, কেশ দন্ত প্রভৃতি ভাল থাকে, ইন্দ্রিয় সকল প্রশন্ন হয়, ও দৃষ্টি অব্যাহত থাকে।

ডাঃ। এইবার অঙ্গন, না কি ব'লবেন—ব'লেছিলেন ?

ক। হাঁ ব'লছি। তা'র আগে কবলের একটা বৈমাত্রের ভাইয়ের পরিচয় দিই—এ'র নাম প্রতিসারণ। কবলের জন্য যে সব ওষুদ প্রয়োগ ক'বতে হয়, সেই সব ওষুদ সেই সেই ক্ষেত্রে চূর্ণ ক'রে বা বেটে প্রয়োগ করাকে প্রতিসারণ বলে। এরদোষ গুণ—সব কবলের জায় এবং কবল প্রয়োগ দ্বারা যে সকল রোগ নষ্ট হয়, প্রতিসারণ দ্বারা সেই সকল রোগও নষ্ট হয়।

ডাঃ। এইবার অঙ্গনের কথা বলুন ?

ক। অঙ্গন স্নহ শরীরে ব্যবহার ক'রলে চক্ষু ভাল থাকে। পূর্বে অঙ্গন ব্যবহার ক'রবার বাতী ছিল। কজ্জলপূরিত লোচন গ্রীণো'কর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ক'রতো ব'লে শোনা যায়। এখন এই হিতকর প্রথাটা প্রায় লোপ পেয়েছে। কেবল শিশুদের জন্য ইহা এখন অনেক স্থলেই দেওয়া হয়। তবে সভ্যতার খাতিরে তাও বৃদ্ধি আর থাকে না।

ডাঃ। হাঁ হালি হিসাবে শিক্ষিত অনেক লোকের বাড়ী থেকে ছেলেদের কাজল পরাও উঠে গিয়েছে।

ক। তা' উঠবে বৈকি। নইলে চোখের চিকিৎসকেরা এখন মোটর হাঁকাবেন কি

করে! চশমার দোকান চ'লবে কি করে, আর চশমা চোখে দিয়ে সভ্যতার উৎকর্ষের পরিচয়ইবা দেওয়া হবে কি করে?

ডাঃ। আপনি কি বলতে চান যে, কেবল কাজল না পরাবার জন্যই এত চোখের দোষ আর চশমার ছড়াছড়ি?

ক। কেবল যে সেই জন্তে—তা' বলছি না; তবে কাজল পরার প্রথা লোপ পাওয়ায় চোখের রোগের এবং চশমা ব্যবহারের যে অনেকটা বাহুল্য ঘটেছে—সেটা বোধ হয় সত্য। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও অনেক স্থলে 'অঙ্গন (সুন্নাম) ব্যবহারের চলিত আছে, আর যারা অঙ্গন ব্যবহার ক'রে—তাদের মধ্যে চোখের রোগ এবং চশমার ব্যবহার খুব কম।

ডাঃ। সেটা কেবল আপনার অহুমান তো?

ক। কেবল অহুমান নয়, একটু সন্ধান নিয়েও দেখিছি। এখন একটা কথা এই যে, কাজল পরা উঠে গেল কেন? সভ্যতার খাতিরে কি? কিন্তু কাজল পরা অসভ্যতার পরিচায়ক হোক আর যাই হোক, কাজল পরলে চক্ষু ভাল থাকে এবং সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়। কোন কজ্জলপূরিতলোচনা-সুন্দরীকে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি, কিন্তু শিশুদের কাজল দিলে বড় সুন্দর দেখায় দেখেছি।

ডাঃ। সে বিষয়ে আমিও আপনার সঙ্গে এক মত। এখন অঙ্গন প্রয়োগের কথা বলুন।

ক। কফ বিরচন এবং শিরোবিরচন দ্বারা রোগীকে বিশুদ্ধ ক'রলেও যদি চক্ষুতে ও চক্ষুর নিকটে দোষ থাকে এবং শোথ বেদনা, বস্ত, পৈচ্ছিয়া, ফরফর করা, অঙ্গ নির্গম, রক্তিমাবর্ণ ও বনদ্রবিকা (পিচুটি) নির্গম প্রভৃতি ঘটে, তাহা হইলে চক্ষুতে অঙ্গন

প্রয়োগ করা কর্তব্য। অঙ্গন তিন প্রকার, যথা লেখন অর্থাৎ দোষ উঠাইয়া ফেলে; রোপণ অর্থাৎ যাহা ক্ষত শুষ্ক করে এবং দৃষ্টি-প্রসাদন-অর্থাৎ যাহা দৃষ্টি শক্তিকে নিশ্চল করে। কষায়, অম্ল, লবণ ও কটু-দ্রব্য দ্বারা লেখাঙ্গন, তিক্ত দ্রব্য দ্বারা রোপণাঙ্গন এবং স্বাদু ও শীতল দ্রব্য দ্বারা দৃষ্টি-প্রসাদন অঙ্গন প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

ডাঃ। অঙ্গন কি হাতে ক'রে দিতে হয়?

ক। না, শলায় ক'রে দিতে হয়। শলা দশ আঙ্গুল মধ্যভাগে স্থল্ল এবং শলাকার মুখ কুন্দ্র, জাতি বা মল্লিকা ফুলের কুঁড়ির মত হওয়া উচিত। লেখনকার্যের জন্ত তামার শলাকা, রোপণ কার্যে কৃষ্ণবর্ণ নৌহের শলাকা এবং দৃষ্টিপ্রসাদনের জন্ত স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত শলাকা কিম্বা অঙ্গুলি দ্বারা অঙ্গন প্রয়োগ ক'রতে হয়।

ডাঃ। অঙ্গনপ্রয়োগ ক'রবার নিয়ম কি?

ক। চক্ষু উন্মীলিত না ক'রে শলাকা দ্বারা চক্ষুতে এবং পরে চক্ষুর পাতার ভিতরে অঙ্গন প্রয়োগ ক'রতে হয়। কিছুক্ষণ পরে ব্যাধি দোষ এবং ঋতুর উপযোগী জলের দ্বারা চক্ষু ধৌত ক'রতে হয়। তা'র পর বাম চক্ষের উপরের পাতা উদ্ধে আকর্ষণ ক'রে নিশ্চল বস্ত্র—বেষ্টিত অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বাম চক্ষু এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু মার্জনা করে পরিতৃপ্ত ক'রতে হয়।

ডাঃ। অঙ্গন প্রয়োগ ক'রবার নিষেধ কিছ আছে?

ক। ক্রমশঃ ব'লছি। অঙ্গন প্রয়োগ ক'রলেও যদি কণ্ঠ ও জড়তা ভাল না হয়, তা' হলে তীক্ষ্ণ অঙ্গন ও ধূম প্রয়োগ করা কর্তব্য। কিন্তু তীক্ষ্ণ অঙ্গন প্রয়োগের ফলে চক্ষুতে জ্বালা

উপস্থিত হ'লে শীঘ্র শীতল অঙ্গন প্রয়োগ ক'রতে হ'বে। প্রাতঃকালে, অপরাহ্নে, মেঘাগমে এবং সূর্যের উত্তাপ প্রবল হ'লে অঙ্গন ব্যবহার করা উচিত। যাহাকে বমন করান হইয়াছে, যাহাকে বিরচন করান হইয়াছে, যাহার মল মুত্র দিয়া বেগ উপস্থিত হইয়াছে, আহারের পরে, জ্বর, ভীত ও পিপাসিত ব্যক্তিকে, স্থল্ল বা উজ্জ্বল বস্ত্র দর্শনের পরে, শিরোবেদনায়, শোষণে; রাত্রি জাগরণের পরে, মাথা ঘুইবার পরে, ধূম বা মদ্যপানের পরে, অজ্ঞানে, রোদ্র সেবনের পরে, দিবা নিদ্রার পরে, পিপাসিত ব্যক্তিকে এবং সূর্য প্রকাশ না পাইলে অঙ্গন প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ।

ডাঃ। আচ্ছা অঙ্গনের আগে আর একটা কি বলেছিলেন?—অচেতন—না কি?

ক। ঠিক অচেতন নয়, তবে কাছাকাছি বটে, আশ্চ্যাতন। যাকে আপনারা আই ড্রপ (Eye-drop) বলেন। বাম হস্ত দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত ক'রে তুলার বর্তি দ্বারা দুই আঙ্গুল অন্তর থেকে চক্ষুর কনোনিকার উপর দশ বা বার ফোঁটা ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। তা'রপর কোমল বস্ত্র দ্বারা চক্ষু মার্জনা ক'রে অপর একখানি কোমল বস্ত্র উষ্ণ জলে ভিজিয়ে চক্ষুতে মুহুর্ৎ স্বেদ দিতে হয়। বায়ু ও কফ-প্রধান চক্ষু রোগেই এই প্রণালী প্রশস্ত।

ডাঃ। আশ্চ্যাতনে কি উপকার হয়?

ক। ইহা দ্বারা চক্ষুর বেদনা, চুলকানি ফরফর করা, জলপড়া, জ্বালা ও লাল হওয়া ভাল হয়। রক্ত ও পিত্তজনিত শীতল এবং বায়ু ও কফরোগে উষ্ণ আশ্চ্যাতন প্রয়োগ ক'রলে—চক্ষু বেদনা, রক্তবর্ণতা এবং অবিরত জলশ্রাব হ'য়ে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়।

দ্বীপল আশোতন প্রয়োগ ক'রলে চক্ষুতে  
হৃদীবেধবৎ যাতনা। শুক্রতা ও নানা প্রকার  
বয়না হয়। আশোতন অধিক মাত্রায়  
প্রয়োগ ক'রলে চক্ষু ফরফর করা, চক্ষু কষ্টে  
উদ্ভীলন করিতে পারা, এবং চক্ষুর পাতায়  
রক্তবর্ণতা উপসর্গ ঘটে। আশোতন অল্প  
পরিমাণে ব্যবহার ক'রলে রোগ বৃদ্ধি পায়।  
আর অপরিবৃত্ত আশোতন ব্যবহার ক'রলে  
চক্ষুতে শোথ হয়।

ডাঃ। এ যে সর্ব্বনেশে চিকিৎসা কবি-  
রাজ নশায়! যা'তে চক্ষু নষ্ট হ'য়ে যায়—এমন  
চিকিৎসা না করাই ত ভাল।

ক। চক্ষুর হিত করবার জন্যই চিকিৎসা  
করা, নষ্ট ক'রবার জন্যে নয়। ভাল কন্ঠের  
অথবা প্রয়োগ হইলে চক্ষু নষ্ট হইয়া যেতে  
পারে—এই কথা বলা হ'য়েছে। তা' এটা যে  
ঔষু আশোতনেই হয়—তা' নয়, ঔষধ, শস্ত্র,  
বমন, বিরেচন, বস্তি প্রভৃতি সব গুলিরই অথবা  
প্রয়োগে রোগীর মহান অনিষ্ট হতে পারে।

ডাঃ। তা সত্য বটে। এখন আর যা'  
অবশিষ্ট আছে—সেটা ব'লে ফেলুন।

ক। প্রাতঃকাল বা সন্ধ্যাকালে তর্পণ  
প্রয়োগ করা উচিত। যব ও মাষকলায় বাটা  
দিয়ে চক্ষুর কোণের বাহিরে দুই আঙ্গুল উচ্চ  
সমান আল প্রস্তুত করতে হয়। তারপর  
দোষদ্বয়সারে দোষনাশক ঔষধ নিয়ে চক্ষুর  
পাতা পর্য্যন্ত পূরণ করতে হয়। কিন্তু  
রাতকাণা, বায়ুরোগ, তিনির ও রক্তজনিত  
চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে ঘুতের পরিবর্তে ঔষধ  
সিদ্ধ বস্তু প্রয়োগ হিতকর।

ডাঃ। তারপর কি করতে হয়?

ক। চক্ষু ঘন ঘন বন্ধ ক'রতে হয়, আর  
খুলতে হয়। চক্ষুর পাতার রোগে এক শত

আঘাত—২

লঘু অক্ষর উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত, চক্ষুর সন্ধিগত  
রোগে তিন শত মাত্রা (লঘু অক্ষর), গুরু মণ্ডল  
(ধেতবর্ণ অংশ) গত রোগে পাঁচ শত মাত্রা;  
কৃষ্ণমণ্ডল গত রোগে সাত শত মাত্রা,  
দৃষ্টিমণ্ডল গত রোগে অষ্ট শত মাত্রা, অগ্নিমহু  
নামক চক্ষুরোগে দশশত মাত্রা, বায়ুতে দশ  
শত মাত্রা, পিত্তে ছয় শত মাত্রা, কফে ও স্নায়ু  
ব্যক্তির দৃষ্টি প্রসাদন জন্য পাঁচ শত মাত্রা কাল  
তর্পণ রাখতে হয়; পরে অপাঙ্গের নীচে  
একটী ছিদ্র ক'রে স্নেহ বা'র করে দিতে হয়।  
ইহার পর রোগীকে ধূম পান করান উচিত  
আর আকাশ ও দীপ্তিশীল পদার্থ দেখতে  
দিতে হয়?

ডাঃ। এতে উপকার কি হয়?

ক। বায়ুজনিত রোগে প্রত্যহ, পিত্ত  
জনিত রোগে একদিন অন্তর, কফজনিত  
রোগে এবং স্নায়ু শরীরে দুইদিন অন্তর চক্ষুর  
তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তর্পণ ব্যবহার করলে  
দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়, চক্ষু নির্মল হয় এবং চক্ষু  
স্বস্থ হয়।

ডাঃ; এরও কি অযোগ্য অভিযোগ  
আছে?

ক। আছে বৈ কি। হীন তর্পণ হ'লে  
পূর্কোক্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়।  
আর অতি তৃপ্তি হ'লে চুলকানি, পিচ্ছিল, আব  
প্রভৃতি শেষজ রোগ প্রকাশ পায়।

ডাঃ। আর ঐকি রইল কি।

ক। এইবার পুটপাকের কথা ব'লেই  
শেষ হয়। বাতজনিত চক্ষুরোগে স্নেহন, বাত  
শ্লেষ্মরোগে লেখন; আর চক্ষুর দৌর্বল্য, বায়ু  
পিত্ত ও রক্তজনিত চক্ষুরোগে এবং স্নায়ু শরীরে  
প্রসাদন পুটপাক প্রয়োগ ক'রতে হয়। স্নেহন  
পুটপাক এরও পাত্র বৈচিত্র্য ও ব্রতিকা নিম্ন

ক'রে ধব কাঠের কয়লার আগুনে, লেখন পুটপাক বট পত্রে বেষ্টিত ও মৃত্তিকা লিপ্ত ক'রে ধনন কাঠের কয়লার আগুনে এবং প্রসাদন পদ্মপত্রে বেষ্টিত ও মৃত্তিকা লিপ্ত করে ঘুটের আগুনে পাক করতে হয়। লেপ রক্তবর্ণ হ'লে অগ্নি থেকে উদ্ধৃত ক'রে শীতল হ'লে তারপর তর্পণের মত প্রয়োগ করতে হয়। লেখন পুটপাক শত মাত্রা কাল স্নেহন পুটপাক দুই শত মাত্রা কাল এবং প্রসাদন পুটপাক সাত শত মাত্রা কাল ধারণ

ক'রতে হয়। লেখন ও স্নেহন পুটপাক ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রয়োগ করা কর্তব্য। পুটপাকের উপকারিতা এবং অযোগ্য অভিযোগ তর্পণের দ্বারা।

স্নেহন ও লেখন পুটপাক প্রয়োগের পর ধূম পান করা উচিত। যতদিন পর্যন্ত তর্পণ ও পুটপাক প্রয়োগ করা যায়, তার দিগ্ধ সময় পর্যন্ত হিতকর পথ্য সেবন করা উচিত। বাদে রনস্ত প্রয়োগ ক'রতে নেই, তাদের তর্পণ এবং পুটপাক প্রয়োগও ক'রতে নেই।

## মসূরিকা বা বসন্ত।

—:~:—

(পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

আয়ুর্বেদে বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও সন্নিপাত ভেদে পাঁচ প্রকার বসন্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্রাশ্রয় পূর্বক বায়ু পিত্ত ও কফ কর্তৃক বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে রসকে আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত উৎপন্ন হয়, চলিত কথায় তাহারই নাম পাণিবসন্ত বা জলবসন্ত। রক্তগত মসূরিকা ক্লৃষ্ণবর্ণ ও পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট। ইহা শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বিদীর্ণ হইলে ইহা ইহাতে রক্তস্রাব হয়। রক্ত যদি অধিক পরিমাণে দূষিত না হয়, তাহা হইলে এ বসন্তও সুস্থসাধ্য। মাংসগত মসূরিকা কঠিন, স্ফিদ্ধ ও পুরুচর্ম্ম বিশিষ্ট; ইহা পাকিতে বিলম্ব হয়। ইহাতে গাভ্রশূল, তৃষ্ণা, কণ্ঠ, জ্বর ও চিত্তচাঞ্চল্য বিস্তারিত থাকে। এই ভাবে বসন্তরোগ কষ্ট

সাধ্য। মেদোগত মসূরিকা মণ্ডলাকার, কোমল, কিঞ্চিৎ উন্নত, ঘোর জরোৎপাদক, স্থূল, চিক্ণ ও বেদনায়ুক্ত। ইহাতে মনোবিভ্রম, চিত্তচাঞ্চল্য ও সন্তাপ—এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য ব্যাধি। দৈবাৎ এইরূপ ভাবে বসন্ত হইতে কেহ অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে। অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকা ক্ষুদ্রাকৃতি, গাত্র সমবর্ণ, ক্লৃষ্ণ, চিপটক সদৃশ চেপটা ও কিঞ্চিৎ উন্নত। এইরূপ বসন্তে দোহ; বেদনা ও জ্বরতি হয়। এইরূপ বসন্তে মর্দনস্থল সকল স্থির হওয়ায় সর্ব্বোচ্চ ভ্রমর দংশনের দ্বারা বহুলা ইয়া থাকে। এরূপ বসন্ত আত্মপ্রাণনাশক। শুক্রগত মসূরিকা চিক্ণ, স্থূল ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত। ইহাতে চিত্তের অস্থিরতা, স্ফীতি, বাহ্যিক মত্ততা, আত্মবিকারাদি ভয়ানক

এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। ইহাও জ্ঞাত প্রাণনাশক।

ত্রিদোষজাত বসন্তও অসাধ্য ব্যাধি। ইহা দেহ কতকগুলি প্রবালের দ্বায় লোহিতবর্ণ, কতকগুলি জাম ফল তুল্য চিকণ, কৃষ্ণ, কতকগুলি লোহিতবর্ণ সদৃশ রক্ষ ও কৃষ্ণ, কতকগুলি তমাল ফলের তুল্য বর্ণ বিশিষ্ট হয়।

বায়ুর আধিক্য যুক্ত বসন্তে পীড়কা সকল দ্রাবণ বা অরুণ বর্ণ, কপ্প, তীব্র বেদনায়ুক্ত ও কঠিন হয় এবং এরূপ বসন্ত বিলম্বে পাকিয়া থাকে। এরূপ বসন্ত হইলে—সন্ধি, রাত্রি ও পরেস্থানে বিদারণব্যং বেদনা, কাস, ফুস, অনবস্থিত চিত্ত ও ক্রম, তালু, ওষ্ঠ চন্দ্রাব শোণ, ভূক্ষা এবং অকটি উপসর্গ ইয়া থাকে।

শৈথিল্য বসন্তের পীড়কা সকল খেতবর্ণ, চকণ, অতিশয় স্থূল ও কণ্ডু বিশিষ্ট, ইহাতেও মল বেদনানুভূতি হয়। ইহা দীর্ঘকালে পাকে। বৃক্শাব, তৈমিত্য, শিরোবেদনা, গাত্র গোরব, বমিমা, অকটি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য—এইগুলি ইহার উপসর্গ।

ইহা ভিন্ন চন্দ্রদল নামক একপ্রকার বসন্ত আছে। তাহাতে কণ্ডরোধ, অকটি, তন্ত্রিত-গাব, প্রলাপ ও অরতি উপস্থিত হয়। ইহা চিকিৎসা।

প্রায় সকলপ্রকার বসন্তের কথাই আমরা এখানে উল্লেখ করিলাম। এইবার ইহার চিকিৎসা ও প্রতিষেধক বিধি বলিব।

### প্রতিষেধক বিধি।

১। তেলাকুটার পাতা, মাধবীলতার পাতা, অশোক পাতা, পাকুড়পাতা ও বেতস পাতা—এই সকল দ্রব্যের এক একটা ১০/১০

ওজনে লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, একরাত্রি পথ্যুসিত অর্থাৎ বাসি করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা চৈত্রমাসে পান করিতে হয়।

২। হরীতকীর আঁটি বা স্ত্রী-শৃগালের অস্থি পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ধারণ করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩। রুদ্রাক্ষ হস্তে ধারণ করিলে বসন্ত-ভয় নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। ডাবের জলে আতপ চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া এক সপ্তাহ ভোজন করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

৫। কটকারীর শিকড় চারি আনা, ২১টি গোলমরিচের সহিত বাসি জল দিয়া বাটিয়া, বৎসরে ১ দিন মাত্র সেবন করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৬। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে গুরুবর্ণ কলসোপরি রক্তবস্ত্র নির্মিত পতাকাযুক্ত সিদ্ধ বৃক্ষের শাখা স্থাপন করিলে বসন্তের ভয় বিদূরিত হয়।

৭। উচ্ছের বীচি বসন্তের প্রতিষেধক। নিম্ন ভোজনও প্রতিষেধক হইয়া থাকে, এজন্য চৈত্রমাসে এ দুইটা দ্রব্য বিশেষভাবে ব্যবহার করা উচিত।

৮। মৎস্য, মাংস, উষ্ণবীৰ্য্য ও গুরুপাক দ্রব্য—এ সময় যত কম ব্যবহার করা যায়, বসন্তের আক্রমণ হইতে ততই আশ্রয়কার সম্ভাবনা।

### প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা।

১। কুমারিকা লতা ২ তোলা, জল ৪

সের শেষ আঁব পোয়া। ছই আনা পরিমিত হিং প্রক্ষেপ দিয়া ইহা আক্রমণের প্রথমাবস্থায় পান করিলে উপকার দর্শে।

২। শেয়ালকাঁটার মূল বাসি জল দ্বারা বাটীয়া পান করিলেও বসন্তের প্রতীকার হয়।

৩। হলুদের পাতা ও তেঁতুলপাতা চারি আনা হিসাবে এক একটি লইয়া শীতল জলের সহিত বাটীয়া সেবন করাইলে বসন্তের প্রথম আক্রমণে উপকার হয়।

৪। সুপারিস মূল, নাটাকরঞ্জের মূল, গোক্ষুর মূল অথবা অনন্তমূল—এক একটি দ্রব্য এক আনা পরিমিত লইয়া জলের সহিত বাটীয়া সেবন করাইবে।

৫। বাতজ মম্বরিকায় দশমূল, বাসক, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, ছুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা—এই কয়টি দ্রব্যের কাথ উপকারক।

৬। মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও বজ্রডুম্বরের ছাল—এইগুলি একত্র বাটীয়া প্রলেপ দিবে।

৭। শোধিত গন্ধক ছই ভাগ ও শোধিত রস একভাগ—লইয়া কচ্ছলী করিবে। বথোপযুক্ত মাত্রায় ইহা পানের রস সহ সেবন করিলে বসন্তের প্রতীকার হয়।

৮। টাবা গেবুর কেশর কাঁজি দ্বারা বাটীয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র বসন্ত পাকিয়া উঠে।

৯। পাদদ্বয়ের তলায় বসন্ত পীড়কা প্রকাশ পাইলে চাউল ধোয়া জল সহ বারবার ধোত করিলে দাহ প্রশমিত হয়।

১০। শরীরের অগ্নস্থানে দাহ নিবারণের জন্ত বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

### পক্কাবস্থায় ব্যবস্থা।

১। বসন্তের পক্কাবস্থায়—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিসমিস, ইক্ষুমূল ও দাড়িম ছালের কাথে উপযুক্ত রূপ ইক্ষু শুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

২। ড্রাক্সা, গাভারী, খজুর, পলতা, নিমছাল; ঐ, আমলকী, ছুরালভা ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ মম্বরিকা বিনষ্ট হয়।

৩। বাসক, মুতা, চিরাতা, জিফলা, ইন্দ্রযব, ছুরালভা, পলতা ও নিমছাল—ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ মম্বরিকা বিনষ্ট হয়।

৪। শিরীষ, যজ্ঞডুম্বরের ছাল, এবং খদির ও নিমের পাতা প্রলেপ দিলে কফজ ও পিত্তজ মম্বরিকা বিনষ্ট হয়।

৫। নিমছাল, ক্ষেংপাপড়া, আকনাদি, পটোল পত্র, কটকী, বাসক, ছুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন—ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বর ও বিসর্পজনিত এবং ত্রিদোষজাত মম্বরিকা বিনষ্ট হয়। যে সকল মম্বরিকা বহির্গত হইয়া অন্তর্গত হয়—তাহাও ইহাতে বহির্গত হইয়া থাকে।

৬। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রামা, স্বর্ণশঙ্খমূল, রক্তচন্দন, গাভারী ফল, বেডেলা মূল ও বৈটি মূল ইহাদের কাথ পান করিলে বাত-জন্ত পক্কাবস্থায় মম্বরিকার উপকার দর্শিয়া থাকে।

৭। পিত্তজ মম্বরিকা পাকিতে আরম্ভ করিলে, সটোল মূলের কাথ ও ইক্ষুমূলের রস প্রয়োগ করিবে।

৮। ছুরালভা, ক্ষেংপাপড়া, চিরাতা ও



কটকী—ইহাদের কাথ পৈতিক কিম্বা শৈথিল্যিক  
মসুরিকায় পান করিবে ।

৯। বাসক, মুতা, চিরাতা, ত্রিফলা,  
ইন্দ্রবব, ভুরালতা, পলতা ও নিম্ব—ইহাদের  
কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ  
মসুরিকা বিনষ্ট হয় ।

১০। খদির কাষ্ঠ, ছাতিমছাল, মুতা,  
বাসক, সৌদালপাতা, দেবদারু ও কৈবর্ত  
মুস্তক—এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া  
শ্লেষ্মজ মসুরিকায় প্রলেপের ব্যবস্থা করিলে  
বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে ।

১১। গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, মুতা,  
ছাতিম ছাল, খদির কাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত্র, নিম্বপত্র,  
হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা—ইহাদের কাথ সেবনে  
বসন্ত ও তৎসংক্রান্ত অরের শান্তি হইয়া  
থাকে ।

১২। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, শালপানি,  
চাকুলে, বৃহতী, কটকারী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন,  
গাছারীকন, বেড়েলামূল, বৈচির্মূল—ইহাদের  
কাথ বাতপ্রধান বসন্ত রোগের প্ৰকাবস্থায়  
বিশেষ উপকারক ।

বসন্তের দাহ নিবৃত্তির উপায় ।

১। পটোলমূল ও রক্ত কঁটানটের  
কাথে হরিদ্রা ও আমলকী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে ।  
ইহা সকল প্রকার বসন্তের দাহ অবস্থাতেই  
প্রযুক্ত ।

২। পটোল মূল, রক্তকঁটানটেরমূল,  
আমলকী ও খদির কাষ্ঠ—ইহাদের সুশীতল  
কাথে বসন্ত রোগের দাহ প্রশমিত হয় ।

৩। বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরি-  
মাণে মধু মিশাইয়া সেবনে বসন্ত রোগের দাহ  
নিবৃত্তি হয় ।

চক্ষুতে বসন্ত হইলে—

১। গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু—জলের সহিত বাটিয়া  
লইয়া বস্ত্র দ্বারা পুটলি বাধিতে হইবে । ঐ  
পুটলি দ্বিষৎ নিপীড়িত করিয়া চক্ষুতে সেক  
দেওয়া কর্তব্য ।

২। যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া  
ও হুঁচমুখী, দারুহরিদ্রা, নীলোৎপল (সুঁদি),  
বেণার মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা—এই সকল দ্রব্য  
মিলিতভাবে অথবা পৃথকভাবে যথাযথ গ্রহণ  
করিয়া প্রলেপ বা কাথ দ্বারা অভিষেক করিলে  
নেত্রগত বসন্তের উপশম হয় । ইহাতে  
স্ফোটক গলিয়া চক্ষুর অনিষ্ট ঘটবার শঙ্কা  
থাকে না ।

বসন্তের অরুচি নিবারণে—

বসন্তে অরুচি হইলে অন্ন দাড়িমের রসের  
সহিত মুগের ঘূষ পান করিলে মুখের রুচি হইয়া  
থাকে । খদির ও পীতশাল দ্বারা সাধিত  
শীতল কাথ পান করিলেও অরুচি বিদূরিত  
হয় ।

পুঁষ প্রতীকারের উপায়—

১। বট, অম্বথ, পাকুড়, যজ্ঞডুম্বর ও  
বকুলের ছাল একত্রে মিশাইয়া বসন্তের উপর  
লাগাইয়া দিলে বসন্তের পুঁষ নিঃসারিত হইয়া  
থাকে ।

২। ঘুঁটের ছাই অথবা শুষ্ক গোবর চূর্ণ  
পূর্কোক্তরূপে ছড়াইয়া দিলেও পুঁষ নিঃসারিত  
হয় ।

ক্রিমি নিবারণের জন্য ।

১। বসন্তের শুটাকা গুলিতে ক্রিমি না  
হয়—এই জন্ত সরলকাষ্ঠ, ধুমা, দেবদারু,  
চন্দন, অণ্ডক ও শুগুণ্ডলু প্রভৃতির ধূম প্রদান  
করিলে ।

২। ত্রিফলার ক্কাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও ত্রিমির আশঙ্কা থাকে না।

৩। খদিরকাষ্ঠ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, নিমছাল, পলতা, গুলঞ্চ ও বাসক—ইহাদের কাথ—গুগ্গুলু সহ সেবনে বসন্তে ত্রিমি জন্মবার সম্ভাবনা থাকেনা। অধিকন্তু ইহা দ্বারা বসন্ত রোগের সর্ববিধ উপদ্রব তিরোহিত হইয়া থাকে। ইহা বসন্তরোগের উৎকৃষ্ট পাতন।

### কণ্ঠ শুদ্ধির ব্যবস্থা।

বসন্ত রোগে কণ্ঠে শ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ—মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। “অষ্টাঙ্গ অবলহ” ব্যবহারেও এরূপ অবস্থায় ফল দর্শিয়া থাকে। কুষ্ঠরোগোক্ত “পঞ্চতিক্ত দ্রব” এ অবস্থায় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

### গাত্রের দুর্গন্ধ দূর করিবার উপায়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, শিরীষ পুষ্প, মৃত্তা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর—এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া বাটিয়া মাখিলে ‘গাত্র হইতে বসন্তের দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়।

### দুষ্ট বসন্তে।

দুষ্ট বসন্তে জলোকা অর্থাৎ জৌক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য।

### ঔষধ প্রয়োগের কথা।

বসন্ত নিবারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা বলা হইল—উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে ঐ সকল ব্যবস্থাতেই মন্থরিকা বা বসন্ত রোগ আরোগ্য হইতে পারে। এ সকল

ব্যবস্থা ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা বড় একটা ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। তবে যদি ঔষধের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় নিম্ন লিখিত ঔষধ কয়টিতে বসন্তে উপকার হইতে পারে।

### উষণাদি চূর্ণ।

মরিচ, পিপুল, কুড়, গজপিপুল, মৃত্তা, যষ্টিমধু, বুর্কা, বামনহাটি, মোচরস, বাংশ-লোচন, যবক্ষার, আতাইচ, বাসক ছাল, গোকুর, বৃহতী, কণ্টকারী—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। এই চূর্ণ ঔষধ ১ মাষা মাত্রায় প্রাতে ১ বার ও বৈকালে ১ বার জলের সহিত সেব্য।

### তুল্লভো রস।

শ্বেতবেড়োলা, পীতবেড়োলা, পিপুল, আম-লকী, রুদ্রাক্ষ, যত ও মধু—এই সকল দ্রব্যের সহিত রসসিন্দূর মর্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বসন্ত প্রশমিত হয়। শাস্ত্রকার বলেন—

“পাপঃ রোগান্তকো যোগঃ পৃথিব্যামেব তুল্লভঃ।”

অর্থাৎ এরূপ পাপরোগান্তক যোগ পৃথিবীতে তুল্লভ।

### ইন্দুকলা বটা।

শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। বাবুই তুলসী রসে মর্দন পূর্বক ১ রতি বটা করিয়া ছায়ায় শুক করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার বসন্ত আরোগ্য হয়।

### পথ্যাপথ্য।

প্রথমস্তঃ উপবাস, বমন, বিরেচন ও সংশোধনক্রিয়া এই রোগে কর্তব্য। মন্থরিকা হইলে সুগের দ্রব্য, জালদা, মায়ের দ্রব্য, পুষ্কল

শাক, ব্যবস্থা করিবে। ভাবপ্রকাশ বলেন,—

মসুরিকাস্ত্র ভূজীত শালীন্-

মুদগ মসুরিকান্ ।

রসং মধুর মেবাভ্যং সৈন্ধবং-

চাণ মাত্রকম্ ।

অর্থাৎ হৈমন্তিক ধাত্তের অন্ন, মুগ ও মধুর দান, মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্যসকল এবং অন্ন মাত্রায় সৈন্ধব লবণ—মসুরিকায় পথ্য স্বরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ।

পুরাতন বষ্টিকথাত্ত ও শালিধাত্ত, ছোলা, মুগ, মসুর, যব, পায়রা, চড়াই, ডাক, বক, চকোর, জলকুস্কুট ও ডাছক প্রভৃতির মাংস, কাকরোল, কাঁচা কলা, পটোল, সজিনা প্রভৃতির তরকারী উপকারী। দাড়িম এই বোগে পরম পুষ্টিকর। মাষকলায়ের ঝোল ও ইহাতে ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে ।

### অপথ্য ।

মৈথুন, শ্বেদক্রিয়া, গুরুদ্রব্য ভোজন, পরিশ্রম, দূষিত জল বায়ুর ব্যবহার, শিম, আন্, শাক ও লবণের ব্যবহার, অন্ন দ্রব্য ভোজন—এই রোগে অহিতকর ।

মলমূত্রাদির বেগ ধারণ বসন্ত রোগীর একান্ত পরিত্যাজ্য ।

বসন্তের গুটিকাগুলি শুষ্ক হইয়া আসিলে নিম্ন পত্র ও কাঁচা হরিদ্রা একত্র পিষিয়া লইয়া শরীরে লেপন করিবে ।

পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও

বসন্ত হইলে গৃহস্বামীর কর্তব্য ।

১। পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও বসন্ত রোগ হইলে সেই বাটার সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবেন ।

২। জপ, হোম, পূজা, শাস্তি-সন্তায়ন ও শীতলা স্তোত্রাদি পাঠের ব্যবস্থা বসন্ত-ক্রান্ত রোগীর বাটীতে হওয়া কর্তব্য ।

৩। বসন্ত রোগীর পরিধেয় বস্ত্র দুই বেলা বদলাইয়া দেওয়া হইবে এবং সংক্রমণ নিবারণের জন্ত সে বস্ত্র দীর্ঘিকা, পুঙ্করিণী প্রভৃতিতে ধোত না করিয়া বাটীতে প্রত্যহ সাবান দ্বারা ধোতের ব্যবস্থা করিবে ।

৪। চিকিৎসক ও পরিচর্যাশীল ব্যক্তি বাতীত অত্র কেহ সে গৃহে অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিবে না, বিশেষতঃ বাজিলাস একান্তই পরিহার করিবে ।

৫। পিতা, মাতা, স্বামী বা অগ্রপূজনীয় সম্পর্কের মধ্যে কাহারও বসন্ত হইলে—পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী প্রভৃতি সকলেই বসন্ত রোগীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে না ।

৬। যে গৃহে আলোকের সুব্যবস্থা আছে, বসন্ত রোগীকে এইরূপ গৃহে অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া দিবে ।

৭। বসন্ত রোগ জনিত জ্বর হইলে রোগী বাহাতে আদৌ জলস্পর্শ না করে—তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে ।

৮। নির্বাত স্থানে অবস্থিতি এই রোগ আরোগ্যের সহায়তা করিয়া থাকে ;

৯। সিঁড়ির চূর্ণ মালিশ এই রোগে হিতকর ।

১০। খদির কাষ্ঠ ও চালিতা গাছের ছালের দ্বারা ষড়ঙ্গ পানীয় বিধানে অর্দ্ধেক শুষ্ক করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে এবং বসন্ত রোগীর শোচের জন্ত সেই জল ব্যবস্থা করিবে ।

১১। এখন যেক্রপ দিন-সময় পড়িয়াছে, তাহাতে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হওয়া নাকি সূচিকিৎসকের শরণ গ্রহণ কর্তব্য । উপদেশ

করিয়া বিনা চিকিৎসায় রাখা কখনই কর্তব্য নহে।

যে বাটীতে বসন্ত হইবে, সে বাটীতে মৎস্ত আনা একেবারে বন্ধ করিবে। বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় মৎস্ত ও বাজারের দুগ্ধ ব্যবহার

করা একেবারেই কর্তব্য নহে। আমাদের যতটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এই মৎস্ত ও দুগ্ধ হইতেই বসন্তের সংক্রমণ হইয়া থাকে।

শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন

এম, এ, এম বি।

## হৃৎ ওয়াম বা বক্রাস্য ক্রিমি।

হৃৎ ওয়াম বা বক্রমুখ ক্রিমিকুল মানব-জাতির ভীষণ শত্রু। এই কীটের উপদ্রবে ভারতের বহু সহস্র নরনারী আক্রান্ত হইতেছেন। বাংলার মাননীয় গবর্ণর স্বাহাহুর প্রোক্ত রোগের আক্রমণ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্ত যত্ন করিতেছেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা সর্বতোভাবে সাধীয়নী, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের লোকসংখ্যার অনুরূপে তথাপি যত্নের ফলভোগ সর্বদা সকলের পক্ষে সুলভ নহে; যাহাতে দেশীয় ঔষধাদির প্রয়োগেও কথিত পীড়ার প্রতীকার হইতে পারে—তজ্জন্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা।

(২) খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন এই রোগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; তখন আর ইহাকে নিতান্ত অভিনব ও বলা যাইতে পারে না; তবে ভারতবর্ষে ইহার প্রাদুর্ভাব নূতন কিনা—সে কথা স্বতন্ত্র। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে “হৃৎ ওয়াম” বা তজ্জাতীয় কোন ক্রিমির উল্লেখ আছে কিনা—প্রথমতঃ ইহা দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে এই রোগ নূতন। দেশের জন-বায়ু প্রকৃতির

স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে নূতন রোগের লক্ষণেরও ত্বরিতম্য হইতে পারে। পাশ্চাত্য স্বাধীনজাতির বিজ্ঞান চর্চার ফলে তাঁহারা নানাবিধ বিষাক্তকর বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন, পক্ষান্তরে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানোপজীবগণ এক্ষেত্রে যে একেবারে নীরব থাকিবেন, তাহাও সমীচীন নহে; তবে যতদূর সম্ভব নূতন প্রাদুর্ভূত রোগ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত ও যাহা শাস্ত্রে লিখিত আছে—তাহারই আলোচনা—দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণের প্রথম কর্তব্য। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রক্তজ ক্রিমির আকৃতি প্রকৃতি, উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, আলোচ্য হৃৎওয়াম নামক ক্রিমির সহিত তাহার অনেক ঐক্য হয়।

বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রে বহুবিধ ক্রিমির উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি ভাব্যবর্ণ, কোন কোন ক্রিমি যেতাত, কতক নিতান্ত স্থল, নরোদভূত খাড়াফুর লম্বা, আবার কোন কোন ক্রিমি এতদূর স্থল যে চরিতকুর সাহায্যে তাহাদিগকে দেখিতে পারা যায় না।

হৃকওয়ার্ম নামক ক্রিমিকে আয়ুর্বেদোক্ত রক্তজ ক্রিমির সম শ্রেণীর জীব বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না।

ক্রিমি প্রধানতঃ বিবিধ ;— বাহ্য ক্রিমি ও অভ্যন্তর ক্রিমি। বাহ্য ক্রিমি শরীরের উপস্থিত চর্ম্মে, সংলগ্ন স্থলি প্রভৃতি পদার্থে উৎপন্ন হয়—ইহাদিগকে সাধারণতঃ উকুন বলে। অভ্যন্তর ক্রিমি অন্ত্রনাড়ীতে, মলে, রসে, কফে এবং রক্তবাহি শিরায় জন্মে এবং তথায় অবস্থান করে। ইহাদিগকে কিপ্লক বা কঁচে ক্রিমি (Tape worm) বলে। এতদতিরিক্ত আরও অনেক কথা লিখিত আছে, প্রসঙ্গতঃ অল্প মাত্র উপদ্রুত হইল।

হৃক ওয়ার্ম “চর্ম্মদ্বারা শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ তাহার রক্তবাহি শিরায় পৌঁছায় \* \* \* রক্ত ও রস ইত্যাদিতে পরিপুষ্ট ও সেইস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে” এই প্রকৃতি সহিত প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিকের প্রাণীকৃত ক্রিমি লক্ষণের সাদৃশ্য সম্যক পরিবর্তিত হয়—যথা, “রক্তবাহি শিরায় রক্তজা দ্রব্যবোহগবঃ”। রক্তজ ক্রিমি অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহার রক্তবাহি শিরায় বাস করে। গাশ্র বলেন ; সৌক্ষ্মাৎ কেচিদ্র্শনাঃ। কোন কোন ক্রিমি এত ক্ষুদ্র যে, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে। বর্তমান কালে অণুবীক্ষণের সাহায্যে যে রক্তজ ক্ষুদ্রতম ক্রিমি দৃষ্ট হয়, লোক বোচনের অবিষয়ীভূত সেই সকল ক্রিমি বা ক্ষুদ্রতম পদার্থ পুরাকালের ঋষিগণ যোগ্য বলে সম্যক অবগত ছিলেন। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল কিনা, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না। সুতরাং “সৌক্ষ্মাৎ কেচিদ্র্শনাঃ” এই বাক্যের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, রক্তজ ক্রিমি সকল

প্রাচীন ভারতীয় মণিবিগ্ণের অপরিজ্ঞাত ছিল না।

ক্রিমির সাধারণ লক্ষণ ;—মানব-শরীরে ক্রিমি উৎপন্ন হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ হয়—

অরো বিবর্ণতাশূলং হৃদরোগঃ সদনং ভ্রমঃ

ভক্তদেহোহতিসারশ্চ সজ্ঞাত ক্রিমিলক্ষণম্ ॥

অর, শরীরের বিবর্ণতা, শূল, হৃদরোগ (হৃদয়ে বদ্বর্ণা বিশেষ, স্পন্দনাধিক্য ইত্যাদি) অপ্রসন্নতা ভ্রান্তি, অগ্নে অকচি এবং অতিসার ইহা থাকে। আয়ুর্বেদে রক্তজ ক্রিমির যে সকল লক্ষণ ও চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, হৃকওয়ার্ম নামক ক্রিমির লক্ষণের সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। যথা ;—রক্তজ ক্রিমি সকল রক্তবাহি শিরায় অবস্থান করে, ইহারা অতিশয় ক্ষুদ্র, পাদবিহীন কতগুলি বৃত্ত, কতক তাম্রবর্ণ। আকার ও ক্রিয়াদি ভেদে ইহারা আবার ছয়প্রকার। তাহাদের নাম ;— কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমোদ্দীপ, উঁড়ুঘর সৌরস ও মাতৃসংজ্ঞক। ইহাদের সকল প্রকার ক্রিমিই যে হকেরোজায় বক্রমুখ, তাহা অণুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন (বর্তমান কালে) নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। এখন দেশীয় মতে এই রোগের ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

রক্তজ ক্রিমি সকল এতই ভীষণ যে, তাহার সকলেই কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

ভারতের অধিকাংশ লোক নিয়ম ও নিত্য দরিদ্র,—সুতরাং তাহার উত্তম বসন ও আহারীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেনা ; কাজেই তাহার অপবিত্র আহারীয় ও মলিন বস্ত্রাদির ব্যবহারে নানাবিধ হারারোগ রোগের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। তবে

কেবল দারিদ্র্যই ভারতবাসীর রোগের কারণ নহে, অনেক সময়ে আলস্যবশতঃও অনেক ব্যক্তি স্বাস্থ্যের অল্পকূল নিয়ম প্রতিপালন করে না, তজ্জগৎও তাঁহারা নিজ শরীরকে ব্যাধিমন্দির রূপে পরিণত করেন।

প্রোক্ত ক্রিমির অস্তিত্ব লক্ষণ সাধারণ ক্রিমি লক্ষণের ন্যায়, অতএব তাহার বিস্তৃতির আবশ্যক নাই। ইতঃপূর্বে “আয়ুর্বেদ” পত্রের ১১ সংখ্যায় ছকওয়ার্ম ক্রিমির প্রতীকার কল্পে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্য পালনীয়। রক্তজ ক্রিমির দেশীয় ঔষধ;—বিড়াস্কাদিঘত, ক্রিমিমুদগর ও ক্রিমি কুলাস্তক প্রভৃতি। আরও কয়েকটা যোগ কথিত হইতেছে;—(১) পলাশবীজ, যমানী, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রব, ইহা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিবে, উহা ১০ মাত্রায় সকালে ও ১০ আনা রাত্রি কালে সেবা, অল্পপান আনারসের পাতার রস, অভাবে জল। (২) ডালিমের শিকড়, ইন্দ্রব, পৌরমানীমানী ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ

সম পরিমাণ। ইহা হইতে ১০ মাত্রায় পূর্ণ অল্পপানে বা পালদে মাদারের পাতার রস অল্পপানে সেবা। (৩) শুদ্ধ কুচিলাচূর্ণ, হরিদ্রা সোমরাজী, নিমপাতা ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ১০ বা ১০ আনা মাত্রায় পূর্ববৎ পানের রস সহ সেবা। (৪) কেবুক, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, আপাণ্ড, বামনহাটী ও থানকুনী চূর্ণ ইহা পূর্ববৎ সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ ১০ মাত্রায় সেবা। ইহার অল্পপান পালিধা মাদারের পাতার রস, মধু, অভাবে জল। ‘ভাটের’ স্ক্রকোমল পত্র ১০ ওলে বাটিয়া ২ রতি বিটলষণ সহ প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে শয়নকালে জলসহ সেবা। বোগের অবস্থা এবং রোগীর বয়ঃক্রম প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রার ভ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। কথিত ঔষধের পরিমাণ পূর্ণ বয়স্কেব পক্ষে প্রযোজ্য। বালকদিগকে অল্প মাত্রায় ঔষধ দিতে হইবে। যেস্থলে সূচিকিংসকের অভাব, তথায় প্রোক্ত ঔষধের কোন একটা ব্যবহার করা উচিত।

শ্রীসারদাচরণ সেন কবিরত্ন।

## মদাতায়।

—:~:—

অস্তিত্ব চিকিৎসার জ্ঞান আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় মদ্যপান বিধি সমধিক প্রচলিত না থাকিলেও মদ্যপান বিরল বা একেবারে নিষিদ্ধ নহে। গুণগ্রাহি-মহাত্ম্যাগণ গুণেরই আদর করিতেন, ভ্রম্য অশ্রদ্ধা বা পাপ পুণ্য নাই।

সমাজকে বিচলিত করিতেন না, সেই জন্ত আৰ্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসারও কড়কগুলি ঘৃণাই দ্রব্য সত্তত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্য সে বিষয়ের মীমাংসার কোন প্রয়োজন নাই, তবে বলিতে হইবে মদ্যপান পাপ।

বিকল্প হইলেও আয়ুর্বেদ মতে নিষিদ্ধ নহে । কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যে সমুদায় রীতিতে মদ্যপান উল্লিখিত হইয়াছে, আধুনিক মত্তপানি-দিগের পক্ষে ঐ রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা অতীব দুর্লভ ব্যাপার । এমন সুখের বিনিময়ে ঘোর হুখে ভোগ মদ্যপায়ীর স্বতঃসিদ্ধ । যাঁহাদের হৃদয়ে বল আছে, চিত্তে সংযমের শক্তি আছে, তিনিই যেন সুখের আশায় মদ্যপান করেন । নচেৎ নিধন ধনবান, রোগী নীরোগ, ইতর ভজ-কাহারও পক্ষে মদ্যপান সঙ্গত নহে, পরন্তু সর্বতোভাবেই নিষিদ্ধ । এখন ধর্ম্মের জন্ত মদ্যপান নাই যোগসিদ্ধির জন্ত মদ্যপান নাই, ঔষধার্থ মদ্যপান নাই, আছে বিলাসিনীর কালকট পূর্ণ কটাক্ষরূপ কন্দর্পশরজজ্বরীত যুকের যন্ত্রণা নিবারণার্থ । তত্ত্বযুক্ত প্রভাবে ভাবতবর্ষে মদ্যপান প্রথা বহুকাল হইতে গুপ্ত ভাবে চলিতেছিল, কিন্তু এখনকারদিনে ভাবতে আর সে গুপ্তভাব নাই, প্রকাশ্যেই উহার দংশন হইতেছে, পক্ষান্তরে বাহাদিগকে আমরা শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রভাব শালী, ধনবান ও বিদ্বান বলিয়া মনে করি, তাহাদেরও অধিকাংশই ঐ ভয়ঙ্কর দোষে দূষিত । অল্পকরণ প্রিয় ভারতবাসী আবার উগাদের অল্পকরণ করিতে যাইয়া মজিতে বসিয়াছে । সুরারাক্ষসীর করাল দশন বিকাশ কে না দেখিয়াছে ? সর্বসংহারিণী হবার অদীম শক্তিতে কত শত অমরাবতী বিনিমিত্ত সুরম্যহর্ষ্য মরুভূমির ত্রায় ধু ধু করিতেছে ! সুরা সাহায্যে কত শত বাদ্যধ্বনি শ্রবক-শীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কালসার কলেবরে কাল কবলে কবলিত হইতেছে । মনুষ্য সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া গোহত্যা, নরহত্যা, জীহত্যা প্রভৃতি কোন নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে কুন্তিত হইতেছে ? বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ধর্ম্মশাসনের ত্রায়

সমাজপ্রাণের ত্রায়, পারিবারিক শাসনের ত্রায় ইহা বন্ধ করিবার শাসন সূত্র নহে । প্রাকালে ভারতবর্ষে মদ্যপান প্রথা ছিল বটে, কিন্তু তাহা বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির জন্ত নহে । যাহা হউক, অনেকে মনে করেন, ঈদৃশ অনিষ্টজনক মদ্যপান কিরূপে সার্বজনীন আয়ুর্বেদে বিধিবিহিত হইল ? আবার অনেক সময় আয়ুর্বেদের দোহাই দিয়া অনেকে সুরা পিপাসার শান্তিও করিয়া থাকেন । আজ আমরা সেই জন্ত কিরূপ সুরাপান আয়ুর্বেদানু-মোদিত ও সুরার দোষগুণ কি, তাহাই সাধারণের অবগতির জন্ত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ।

প্রোতা চেহ চ বচ্চেষঃ শ্রেয়ো মোক্ষশ্চ যৎপরম্ ।  
মনঃ সমাধৌ তৎ সর্বমারত্তং সর্বং দেহিনাম ॥  
মনুষ্যদিগের ইহকাল ও পরকাল যাহা শ্রেয়ঃ, মঙ্গল ও মোক্ষ উহা সম্পূর্ণভাবে চিত্তের একাগ্রতার আয়ত্ত অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত ইহ ও পরকালে শ্রেয়ঃ মোক্ষ, বা মঙ্গললাভ করা যায় না । মত্তপানে চিত্তের সংক্ষোভ উপস্থিত হয়, সুতরাং ইহ ও পরকালে মত্তপানীক কখনই শ্রেয়ঃ বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না ।

মত্তেন মনস্চাত্ত সংক্ষোভঃ ক্রিয়তে মহান্ ।

মহা মারুতবেগেন তটন্ত্রস্তেব শালিনঃ ॥

প্রবল বায়ুবেগে নদীতটস্থ বৃক্ষ যেরূপ আন্দোলিত হয়, সেইরূপ মদ্যপানে মনের যৎপরো নাস্তি সংক্ষোভ উপস্থিত হয় । মত্তপানে মনের স্থিরতা সম্পাদন অতীব দুর্লভ ব্যাপার ।

মত্তপ্রসঙ্গ মজ্জাষা মহাদোষঃ মহাগদম্ ।

সুখমিত্যাধি গচ্ছন্তি রূসে মোহ পরশিতাঃ ॥

রজঃ ও তমো গুণাভিভূত ব্যক্তিগণ মত্তপানের

রোগোৎপাদক মহাদোষ না জানিয়া সুখের

আশায় মদ্যপান করিয়া পড়েন ও চিরকাল

মত্তপান ছনিবার অপকার ভোগ করিতে থাকেন।

মত্তোপহত বিজ্ঞান্য বিষুক্তা সাত্বিকৈশ্চৈঃ।

শ্রেয়োভিবিপ্রযজ্ঞাস্তে মদান্ধাঃ মদলালসাঃ ॥

মত্তে মোহো ভয়ং শোকঃ ক্রোধো মৃত্যুশ্চ

সংশ্রিতাঃ।

মোহান্নাদ মদ মুচ্ছাদ্যাঃ সাপস্মারাপ তানকাঃ ॥

যত্রৈকঃ স্মৃতিব্রংশ স্তত্র সর্বমদাধুবৎ।

ইত্যেবং মত্ত দোষজ্ঞা মত্তং গর্হস্তু যদ্রতঃ ॥

মহুযাগণ মত্তপান করিয়া অজ্ঞানরূপ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পরে স্বাভাবিক সাত্বিকগুণ সমুদায় হীন হয়, স্মৃতিরাজ মদলালস মদান্ধ ব্যক্তিকে সত্ত্বর মঙ্গল সনুত হইতে বিষুক্ত হইয়া পড়িতে হয়। মত্ত হইতে মোহ, ভয়, শোক, কোপ, উন্মাদ, নশ্বল মুচ্ছা, অপস্মার ও অপতানক প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মত্ত হইতে মৃত্যু পর্য্যন্তও সংঘটিত হইয়া থাকে। পরন্তু যাহা হইতে একমাত্র স্মৃতিব্রংশ উপস্থিত হয়, এমন কোন অমঙ্গল নাই—যাহা তাহা হইতে সংঘটিত হইতে পারে না। মত্ত দোষজ ব্যক্তি এইরূপে সর্বদা মত্তের নিন্দা করিয়া থাকেন।

যে বিষয়্যগুণাঃ প্রোক্তা স্তেহপি মদ্যে

প্রতিষ্ঠিতাঃ।

বিষের যে সমুদায় গুণ আছে অর্থাৎ বিধে যে সমুদায় অনিষ্টকারিণী শক্তি আছে, মদ্যেরও তাদৃশী শক্তি।

সত্যানেত মহাদোষা মদস্যোক্তা ন সংশয়ঃ।

অহিতস্মারিত মাদ্রস্ত পীতস্য বিধি বর্জনম ॥

কিন্তু মত্তং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা ন্যুতম।

অনুক্তি যুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতম ॥

প্রাণাঃ প্রাণভূতামন্নং তদযুক্ত্য হিন্ত্যাম্নন ॥

বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম ॥

পূর্বে মদ্যের যে সমুদয় দোষ উল্লিখিত হইল, মত্তপান বিধি অতিক্রম করিলে বাস্তবিকই ঐ সমুদায় দোষ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বিধি বিহিত মত্তপানে অপকার না ঘটিয়া উপকারই ঘটিয়া থাকে। উহা ক্রমশঃ প্রদর্শন করা যাইতেছে। মত্ত স্বভাবতঃ অন্ন সদৃশ হিতকর দ্রব্য। অবৈধভাবে সেবিত হইলে নানাবিধ রোগের কারণ হয় বটে, কিন্তু বিধি অমুসারে পীতমত্ত অমৃত সদৃশ হিতকর বস্তু। যে অন্ন প্রাণি গণের প্রাণস্বরূপ তাহাও অব্যথারূপে সেবিত হইয়া প্রাণনাশক হয় এবং স্বভাবতঃ প্রাণনাশক গুণসম্পন্ন বিষও যুক্তি অমুসারে সেবিত হইয়া রসায়ন সদৃশ উপকার করে। মত্তও তদ্রূপ। যুক্তিপূর্বক মত্তপান করিলে হর্ষ, বল, পুষ্টি, আরোগ্য ও পৌরষ জন্মে। যে মত্তপানে মত্ততা জন্মে, ছুঃখ না হইয়া স্নেহ হয়, ঐ মত্ত কচিকারক, পাচকায়ির উদ্দীপক, হৃদয়ের সন্তোষ জনক, বলকারক, ভয়শোক এবং শ্রমনাশক, নিদ্রাজনক এবং বাকপটুতা জনক এবং অতিনিদ্র ব্যক্তির প্রবেধক, বলমূত্রের বিবন্ধনাশক, আঘাত প্রাপ্তি এবং বন্ধনাদি যয়ণা নিবর্তক। ইহা ভিন্ন মত্ত অনেক রোগের নিবর্তক, রতিবর্ধক, মনঃসংযোগকারক-গ্রীতি বর্ধক এবং অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির উৎসাহ ও আনন্দ জনক।

বহু ছুঃখ কৃতান্তাম্য শোকেনোপ ইত্য্য চ।

বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্য নিষেবিতং  
বহুবিধ ছুঃখ ও শোকাভিভূত ব্যক্তির যুক্তি পূর্বক নিষেবিত মদ্যই একরূপ বিশ্রাম স্ব অর্থাৎ ক্লেশ নিবারক।

অমুপান যস্যোবাধি বলা কাল ত্রিকারি হুট।

ত্রীণ দোষাঃ ত্রিবিধাঃ সৰ্ব্বাঃ কালা মদ্যং পিত্তে



ত্রিবিধ অন্ন, ত্রিবিধ পান, ত্রিবিধ বয়ঃক্রম, ত্রিবিধ ব্যাধি, ত্রিবিধ কাল, ত্রিবিধ বল, ত্রিবিধ দোষ ও ত্রিবিধ সত্ত্ব এই সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া মত্তপান করা কর্তব্য ।

তেমাং ত্রিকাণামৃষ্ঠানাং যোজনা যুক্তিরূচ্যতে ।

যথায়ুক্তা পিবেন মত্তং মত্তা দোষেন্বজ্যতে ॥

উল্লিখিত ত্রিবিধ অন্নাদির সম্যক যোজনার নাম যুক্তি, ঐ যুক্তি অনুসারে মদ্যপান করিলে কোন দোষই ঘটে না ।

অপানে সাত্ত্বিকান বুদ্ধা তথা রাজস

তামসান ।

জ্ঞানং সচায়াং যৈঃ পীত্বা সহ দোষানুপাশ্রুতে ॥  
মদ্যপান স্থলে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বিবেচনা করিয়া মত্তপান করা উচিত, যাহাদের সহিত মত্তপান করিলে দোষ ঘটবার সম্ভাবনা, তাহঁদের সহিত কখনই মত্তপান করা বিধেয় নহে । আজকাল এই সঙ্গদোষ বিবেচনা না করার জন্তই অনেক লোককে বিধম বিপদে পতিত হইতে হয় । যে সমুদায় ব্যক্তি সুশীল, মিষ্টভাষী, সুমুখ, সজ্জন, গীত বাগাদিকলাকুশল-বিশদবাক, বিষয়াদিতে অত্য-শক্তি রহিত, পরস্পর বশীভূত ও সৌহার্দ্যবৃত্ত, যাহারা সুমধুর হাস্য ও প্রীতিজনক বাক্য দ্বারা পান ভূমির উৎসব পূর্ণ করে, এবং বাহ্যিক পরস্পর দর্শনে সুখবোধ করে, তাহাদিগের সহিত মত্তপান করিলে মত্তপানী আনন্দ উপভোগ করিতে পারে ।

অনিচ্ছা সত্ত্বো মদ্যপানের কতিপয় ক্রম লিখিত হইল-অধিক লেখা আবশ্যক মনে করি না, কারণ আমাদের মতে মত্তপান বিশেষ গর্হিত কার্য্য এবং ইহার ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে ।

মত্তের পরিমাণ ও ভীততা ভেদে চারি

প্রকার মত্ততা উপস্থিত হয় । অতঃপর যথাক্রমে ঐ সকলের লক্ষণ লিখিত হইতেছে ।

বুদ্ধিমত্তি প্রীতিকরঃ সুখশ্চ পানাম নিদ্রা

রতি বর্জনশ্চ ।

সংপাঠ গীতশ্রবণবর্জনশ্চ প্রোক্তোক্তি রম্যঃ

প্রথমোমদো হি ॥

প্রথম মদ বুদ্ধি প্রকাশক, শ্রবণ শক্তিবর্দ্ধক, প্রীতিজনক, সুখোৎপাদক এবং পান ভোজন, রতিশক্তি ও কর্তব্য সংবর্দ্ধক, এইরূপ মদ্যবস্থা অতীব সুখকর । যাহাদের মদ্যপান নিতান্ত প্রয়োজন, তাঁহারা যেন এইরূপ ভাবে মত্তপান করেন; অর্থাৎ উল্লিখিত লক্ষণ সমুদায় হইতে অতিরিক্ত কোন লক্ষণ উপস্থিত না হয় । বাস্তবিক পক্ষে কেহই মত্তপানে স্থির থাকিতে পারে না, আকাজ্জক অপরিভূপ্তিই ইহার মূল কারণ অর্থাৎ প্রথম মত্তপানের পর সকলেই মনে করেন আরও একটু পান করিলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখোদয় হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত হইয়া পড়ে ।

অব্যক্ত বুদ্ধি স্ত্রি বায়িকচেষ্টঃ সোমন্তললাকৃতি  
রপ্রশান্তঃ ।

আলস্য নিদ্রাভিহতা মুহুশ্চ মধ্যেন মত্তঃ

পুরুষো মদেন ॥

দ্বিতীয় মদমত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি, শ্রবণশক্তি ও বাক্য সম্যক ব্যক্ত নহে অর্থাৎ জড়তায়ুক্ত, চেষ্টার বিরূতি আকৃতি ও কার্য্য উন্নতির স্থায় এবং মুহুর্হু আলস্য ও নিদ্রার আবির্ভাব—এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয় । জড়শ অবস্থা উপস্থিত হইলেই মত্তপান হইতে বিরত হওয়া অবশ্য কর্তব্য, নচেৎ অতীব ছরবছাগ্রস্ত হইতে হয়, ইহার নাম দ্বিতীয় মদ ।

গচ্ছেন্দগম্যা ন শুক্লশ্চ মত্তোৎথাৎদেদভ্যাদি

চ নষ্ট সংজ্ঞঃ ।

ক্রয়াক্ত গুহ্মাণি হৃদি স্থিতানি মদে তৃতীয়ে

পুরুষোহন্বতন্ত্রঃ ।

অপানে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা প্রবৃত্ত হয়না, আরও অধিক পান করিতে থাকে, ঐ সমুদায় ব্যক্তির নিম্নগীয় তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হইলে মনুষ্য অগম্য নারীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, গুরুজনের অবমাননা করে, এবং দায়িত্ব গুহ্ম বিষয় প্রকাশ করে ও অভক্ষ্য গ্রহণ করে। এতদবস্থ ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য ও মাপনার অনায়ত্ত্ব হইয়া পড়ে।

চতুর্থে তুমদে মূত্রে ভগ্নদার্ষিণি নিক্রিয়ঃ ।

কার্য্যাকার্য্য বিভাগস্তো মৃতদাপ্য পরো মৃতঃ ॥

কোমদং তাদৃশং গচ্ছেদ্রুদাদসিব চাপরম্ ।

বহুদোষনিবা মূত্ৰঃ কাস্তারং স্ববশঃ কৃতী ॥

মতঃপর চতুর্থ মদাবস্থায় মনুষ্য সর্বতোভাবে জ্ঞানশূন্য, ভগ্ন কাষ্ঠের স্থায় নিক্রিয় ও কর্তব্যাকর্তব্য বিকারশূন্য হইয়া পড়ে। চতুর্থ মদবস্থ ব্যক্তি অবিকল মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। অমূচ অর্থাৎ বিকার শক্তি সম্পন্ন আশ্রয়ান কোন কৃতী ব্যক্তি বহু দোষোৎপাদক বিবিধ হিংস্রজন্তুসংস্কুল দুর্গম পথের স্থায় চতুর্থ মদবস্থায় উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন না। মত্তপানে প্রবৃত্ত হইলে প্রায়শঃই সকলকে যুক্তিচ্যুত হইয়া পড়িতে হয় এবং অবশেষে নানাবিধ বিপদে পতিত হইতে হয়। তুলনা করিতে গেলে মত্তপানে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক। সুতরাং কাহারও পক্ষে মত্তপান যুক্তি ও শাস্ত্র সম্মত নহে।

নির্ভুক্তমেকান্তত এব মত্তং নিষেব্য মাণং

মহাজেন নিত্যং ।

আপানদয়ে কষ্ট তমান্ বিকারানাপাদয়ে

চাপি শরীর ভেদম্ ॥

নিত্য অধিক পরিমাণে অন্নাদি উপকরণ গ্রহণ মত্ত-পান করিলে, নানাবিধ ক্লেশনাশ্য কষ্ট-দায়ক রোগ জন্মে ও পরিশেষে তদ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে।

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন শোকাভিতপ্তেন  
বুভুক্ষিতেন ॥

ব্যায়াম ভারাদ্বয় পরিক্ষতেন, বেগাবরোধাভি-  
হতেন চাপি ॥

অত্যন্ত ভক্ষ্যবততোদরেষু সজীর্ণ ভুক্তেন

তথাবলেন ॥

উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্য মানং করোতি মত্তং

বিবিধান্ বিকারান্ ॥

ক্রোধ, ভয়, পিপাসা, শোক ও ক্ষুধার সময়, ব্যায়াম, ভার বহন বা পথ পর্য্যটন ক্লান্ত অবস্থায়, মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগরোধ করিয়া, অন্ন ভোজন বা জল পান দ্বারা উদরের পূর্ণাবস্থায় এবং উষ্ণাবস্থায় অর্থাৎ পরিশ্রমাদির দ্বারা শরীর উষ্ণতা হইলে মত্ত-পান করিলে না, উহাতে পানাত্যাদি কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়।

পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণমথাপি বা

পান বিভ্রমমুগ্রঞ্চ যক্ণং রোগং করোতি তৎ ॥

তৎ অবধি পীত মত্ত মিতার্থঃ ।

শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া মত্তপান করিলে, পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ, পান বিভ্রম ও দাক্ষণ যক্ণং রোগ উৎপন্ন হয়। পানাত্যয় ও মদাত্যয় এই দুইটা শব্দ একার্থ বাচক, সুতরাং মদাত্যয়াদিকার নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

হিক্কাখাস শিরঃ কম্প পার্শ্ব শূল প্রজাগরৈঃ ।

বিস্তাদ্ বহু প্রলাপন্ত বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্ ॥

বাতিক মদাত্যয় রোগে হিক্কা খাল, শিরঃ

কম্পন, পার্শ্ববেদনা, নিদ্রানাশ ও প্রলাপ

বাহুল্য—এই সকল লক্ষণ মদাত্যয় রোগের

তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর শ্বেদ-মোহাতিসার বিভ্রমৈঃ ।  
 বিভ্রান্তরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাতায়ম্ ॥  
 পৈত্তিক মদাতায় রোগে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর,  
 ঘর্ম্মনির্গম, মুচ্ছা, অতিসার, ভ্রম ও দেহের  
 হরিত বর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ।  
 চূর্ণদারোচক সল্লাস তন্না স্তৈমিত্য গোরবৈঃ ।  
 বিভ্রাচ্ছিত পরিতস্ত কফপ্রায়ং মদাতায়ম্ ॥  
 পৈয়িক মদাতায়ে বমি, অরুচি, বমনবেগ,  
 তন্দ্রা, গাত্রে আর্দ্রবদ্রাবৃত্তবৎ বোধ,—দেহের  
 শুষ্কতা ও অতিশয় শীত এই সমুদায় লক্ষণ  
 প্রকাশ পায় ।

উল্লিখিত বাতিকাদি ত্রিবিধ মদাতায়ের  
 লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সান্নিপাতিক মদাতায় জানিতে  
 হইবে । পরমদ প্রভৃতিতে মদাতায় লক্ষণের  
 অতিরিক্ত কতকগুলি লক্ষণ লক্ষিত হয় ।  
 পরমদ নামক রোগে শ্লেষ্মাপ্রাচুর্য্য, নাসাস্রাব,  
 দেহভাব, মুখবৈরস্য, মলমূত্র রোধ, তন্দ্রা,  
 অরুচি, তৃষ্ণা, শিরোবেদনা ও সন্ধি সমুদয়ে  
 ভ্রমবৎ বেদনা প্রভৃতি শ্লেষ্ম লক্ষণ সমুদয়  
 দেখিতে পাওয়া যায় ।

পীতমস্ত জীর্ণ না হইয়া পানাজীর্ণ রোগ  
 জন্মায় । ইহাতে অতি ক্লেশকর উদরাদ্ধান,  
 বমন, অথবা মত্তগন্ধবৃদ্ধ উদ্‌গার ও গাত্রদাহ  
 প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

পান বিভ্রমাথ্য রোগে সর্ক্সাঙ্গে বিশেষতঃ  
 বক্ষস্থলে হৃতিবেদনং বেদনা, কফস্রাব, কণ্ঠ  
 হইতে ধূম নির্গমবৎবোধ, মুচ্ছা, বমি,  
 শিরঃপীড়া, দাহ এবং গোড়ী (ধেনো)  
 কাদধরী (তাড়ি) প্রভৃতি মত্তে বিদ্রোহ উপস্থিত  
 হয় ।

মত্তানাং সততাভ্যাসাং তীত্র মত্ত নিবেবনাৎ ।  
 নিরন্মাদপি পানাজ বক্রজগো ভবন্তি হি ॥  
 যক্কদ্রোধিকারে তান্ সলক্ষণ চিকিৎসিতান্ ।  
 বিবিধ মত্তের নিরন্তর পান, তীত্র মত্তপান ও  
 খাত্ত রহিত মত্তপান প্রভৃতি কারণে যক্কৎ  
 রোগ উৎপন্ন হয় । যক্কতে যে সমস্ত লক্ষণ হইয়া  
 থাকে, ঐ সমুদায় এবং তাহার চিকিৎসা  
 গ্রীহা যক্কদধিকারে ক্রমশঃ প্রকাশ করা  
 হইবে ।

শ্রীহরিপদ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিভূষণ ।

## জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা ।

—:—

সাপারণের ধারণা যে রোগে বাহা খাওয়া  
 হিতকর, সেই রোগে তাহাই পথ্য । হিতকর  
 পাণ্ড ত পথ্য বটেই, কিন্তু যে রোগে বাহা  
 কিছু হিতকর; সেই রোগে তাহাই পথ্য ।  
 যেমন নবজরে উপবাস পথ্য ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে জ্বরের প্রথমেই উপবাস  
 দিতে বলা হইয়াছে । কেবল বলা নয়, জ্বরের  
 প্রথমে লক্ষ্যন অনুভবের কায় বলিয়া নির্দেশ  
 করা হইয়াছে । কেন  
 শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

(অপক্ক আহার রস) সংযুক্ত দোষ সকল (বায়ু, পিত্ত, কফ) অগ্নিকে নষ্ট করিয়া এবং মার্গ (ঘনাদি স্রোতঃ) সকলকে রুদ্ধ করিয়া জ্বর উৎপাদন করে বলিয়া জ্বরের প্রথমে লজ্জন দেওয়া উচিত।

সুস্থ শরীরে শারীরিক স্রোতঃ সকল প্রকৃতিস্থ থাকে এবং অগ্নি প্রবল পাকায় ক্ষুধা হয়। কিন্তু জ্বর হইলে অগ্নি নষ্ট হওয়ায় ক্ষুধা হয় না এবং ক্ষুধা না হইলে আহার দেওয়া কর্তব্য নহে।—ইহা একটা সাধারণ যুক্তি।

জ্বর একরূপ নহে, অতি সামান্য জ্বর হইতে সত্তোমারাত্মক প্রবল জ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত জ্বরেরই সাধারণ সংজ্ঞা জ্বর। জ্বর যত মূহ হয়, শরীরের এবং শারীরিক যন্ত্রাদির ততই অল্প বিকৃতি ঘটে, আর জ্বর যত প্রবল হয়, শরীরের ও শারীরিক যন্ত্রাদির ততই অধিক বিকৃতি ঘটে। সেই জন্ত মূহ জ্বরে অল্প এবং প্রবল জ্বরে অধিক উপবাস দেওয়া আবশ্যক।

জ্বরের প্রাবল্যের তারতম্য অনুসারে যেমন অল্প বা অধিক উপবাস দেওয়ার বিধি আছে, সেইরূপ যে সকল জ্বরে লজ্জন দিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা, সেই সকল জ্বরে লজ্জন নিষেধ করা হইয়াছে। যথা :—

“বায়ু জনিত জ্বর, ক্ষয়জনিত জ্বর, মানস দোষ জনিত জ্বর (যেমন কাম বা ক্রোধ জনিত জ্বর) এবং পূর্বে দ্বিত্রীয়াধ্যায়ে বাহাদিগকে উপবাসের অবোধ্য বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে লজ্জন দিবে না।”

দ্বিত্রীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে :—

“উর্দ্ধ বায়ু (হিকাদি), তৃষ্ণা, ক্ষুধা, মুখ শোথ এবং শ্রম (বিনা পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ—মতান্তরে ভ্রম) পীড়িত রোগীকে এবং

গর্ভিনী, বৃদ্ধ, বালক, দুর্বল ও ভীকৃ ব্যক্তিদিগকে উপবাস করাইবে না।

এই সকল ক্ষেত্রে উপবাস দিলে অনিষ্ট হয় বলিয়া শাস্ত্রকার এই সাধারণ সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে জ্বরের প্রাবল্য, বহু দোষের সহিত সঞ্চিত অগ্নির নাশ, বমনোদগে প্রভৃতি থাকিলে যুক্তি পূর্বক অল্প উপবাস দেওয়া আবশ্যক ও হিতকর—ইহা আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যথা সময়ে সে সম্বন্ধে বলা যাইবে।

পাঠকগণ ইহা মনে রাখিবেন যে, শাস্ত্র-কারগণ চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, রোগীর অবস্থা ভেদে যুক্তি পূর্বক সে সম্বন্ধে কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করিতে হয়। কেননা, জগতে একরূপ আকৃতি বিশিষ্ট দুইটা লোক যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ ঠিক এক প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট দুইটা লোক দেখা যায় না।

আয়ুর্বেদে জ্বরের প্রথম সাত দিন তরুণ জ্বর বলা হয়। চরকে কথিত হইয়াছে :—যথা

“প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ইন্দ্রন যুক্ত হইলেও যদি বায়ু কর্তৃক বহিঃ প্রেরিত হয়, তাহা হইলে যেমন স্থালী (হাড়ি) স্থিত অল্প পাক করিতে পারে না, সেইরূপ দোষ সকল অগ্নি স্থান হইতে উন্মাকে বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত করে, বলিয়া জ্বররোগী অল্প আহার করিলে অগ্নি তাহা পাক করিতে পারে না বা কষ্টে লঘু অল্প পাক করিতে পারে। এইজন্য বল রক্ষার্থ লজ্জনাদি আবশ্যক। প্রথমে লজ্জন পরে পেন্না ইত্যাদি হিতকর, এক সপ্তাহে সর্ব্ব দাছু গত মল (কুপিত বায়ু পিত্ত বর্ষা) পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সময়ের জ্বরের চরিত্র নির্ণয়

করিয়া সকল ক্ষেত্রে উপবাস দেওয়া চলে না। উপবাস পাছে অল্প বা অধিক হয় সেই ভুল শাস্ত্রে নিম্নলিখিত উপদেশ দেওয়া ছইয়াছে।

“বাপং কাল পর্য্যন্ত দোষ স্থির ভাবে অবস্থিত থাকায় শরীরের বদ্ধবৎ বোধ হয় তাবৎকাল উপবাস দিবে। পরে লঘু পথ্য দিবে।

আম বা তরুণ জরের লক্ষণ—লালা নিঃসরণ, বমনভাব, হৃদয়ের ভারবোধ, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, খাণ্ড অবিপাক, মুখের বিরসতা, শরীরের গুরুতা, ক্ষুধার নাশ, প্রচুর মূত্র নিঃসরণ এবং জরের স্তব্ধতা ও প্রাবল্য এই গুলি আমজরের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ থাকা পর্য্যন্ত উপবাস দেওয়া কতব্য।

দোষপাকের লক্ষণ—জরের মূহুতা, শরীরের গম্বুতা ও মল নিঃসরণ—এই গুলি দোষ পাকের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে লঘু পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

এই পথ্যস্ত বলিয়াই শাস্ত্রকার নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। সন্ধ্যা উপবাস দেওয়া হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। বথা, অধোবায়ু, মূত্র ও মল নির্গম, শরীরের লঘুতা, হৃদয়ে উদগার, কর্ণের ও মুখের বিগুহতা, তন্দ্রা ও ক্রান্তির নাশ, ঘর্ম্ম নিঃসরণ আহায়ে রুচি, ক্ষুধা ও পিপাসার উদয় এবং মন প্রসন্ন (মানি রহিত) হইলে সন্ধ্যা উপবাস দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

জরে উপবাস দিলে কি ফল হয়, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে, অনবস্থিত (যাহা স্থানে এবং উপযুক্ত পরিমাণে নাই) দোষ এবং অগ্নি বিশিষ্ট জর রোগী উপবাস করিলে তাহার

আষাঢ়—৪

দোষ পরিপাক পায়, অগ্নি দীপ্ত হয়, জর নষ্ট হয়, শরীর লঘু হয় এবং অন্ত্রে আকাজ্ঞা ও রুচি হয়।

নবজরে উপবাস অমৃতের স্থায় হিতকর বলায় উপরোক্ত উপদেশাদি সত্বেও পাছে রোগীকে অধিক উপবাস করান হয়—সেই আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

“লজ্বন প্রাণের (বলের) বিরোধী বলিয়া অর্থাৎ লজ্বন দ্বারা বলহানি ঘটে বলিয়া রোগীকে অতিরিক্ত লজ্বন করাইবে না। কারণ যে আরোগ্যের জন্ত চিকিৎসা করা যায়—বলই সেই আরোগ্যের অধিষ্ঠান অর্থাৎ বলকে আশ্রয় করিয়া আরোগ্য লাভ ঘটে।

অতিরিক্ত উপবাস দিলে রোগীব বলহানি হয় এবং বিবিধ উপসর্গ ঘটে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, অতিরিক্ত লজ্বনের ফলে পর্কসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, শরীর বেদনা, কাস, মুখের গুরুতা, ক্ষুধার নাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, চক্ষু ও কর্ণের তুর্জলতা, মনের ভ্রান্তি, প্রবল উর্দ্ধগত (হিকা, শ্বাস, কর্ণে শব্দ), হওয়া হাঁই উঠা, মোহ, এবং দেহ, অগ্নি ও বলের হানি ঘটয়া থাকে। এইজন্ত জর রোগীকে কদাচ অতিরিক্ত উপবাস দিবে না।

নবজরে উপবাস সম্বন্ধে এই সকল সুন্দর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সন্নিপাত জরে উপবাস সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। টাইফয়েড জর, নিউমানিয়া প্রভৃতি—সন্নিপাত জরের অন্তর্ভুক্ত। সন্নিপাতজরে চিন্তের বিকৃতি ঘটিলে তাহা অরবিকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সন্নিপাত জরে তিন দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন বা বতদিন রোগী আরোগ্য-পথে অগ্রসর না হয়, ততদিন লজ্বন দিবার উপদেশ

দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে অতিরিক্ত উপবাসের বিষয় অনিষ্টকারিতার বিষয় বলার পর এইরূপ দীর্ঘ উপবাসের ব্যবস্থা করায় শিক্ষার্থির মন সন্দেহাকুলিত হইতে পারে। তজ্জন্ত শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

লজ্জনে যে এইরূপ সহিষ্ণুতা অর্থাৎ এত দীর্ঘকাল লজ্জন সহ্য করিতে পারা—তাহা কেবল দোষের অর্থাৎ কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফের শক্তি বশতঃ ঘটয়া থাকে দোষের ক্ষয় হইলে কখনই লজ্জনা দি (লজ্জন ও স্বেদাদি) সহ্য করিতে পারে না।

আমরা বলিতেছি এই শাস্ত্রবাক্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখিয়াছি। সন্নিপাতজ্বরে উপবাস দিলে রোগী সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করে। বালকেরাও সন্নিপাত জ্বরে যথেষ্ট উপবাস সহ্য করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথম হইতে আহার দিলে তাহা রোগীর মৃত্যু বা দীর্ঘকাল রোগভোগের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয় এই, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও ক্রমশঃ এই তথ্য বুঝিতে পারিতেছেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক অস্কার সাহেব তাঁহার প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থে টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্বরের পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ এই রোগে একেবারে খাদ্য দিতে নিবেদন করেন।

পূর্বে নবজ্বরে সম্যক লজ্জনের যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে এবং যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পথ্য দিবার উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই লক্ষণ বিচার করিয়া সন্নিপাতজ্বরেও পথ্য প্রয়োগ করিতে হয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নবজ্বরে এক্ষণে এত অধিক উপবাস সহ্য হয় না। অনেক

স্থলেই ইহা সত্য। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, দুর্বল রোগীর পক্ষে উপবাস নিবিদ্ধ। এক্ষণে অধিকাংশ লোকেই দুর্বল। সুতরাং এখনকার দুর্বল লোকদিগকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া উপবাসের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। পুরোক্ত অতিরিক্ত উপবাসের কোন একটা উপসর্গ ঘটিলেই লঘু পথ্য প্রয়োগ করা উচিত। রোগী বলবান হইলে সপ্তাহ কাল পর্যন্ত উপবাস দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সন্নিপাত জ্বরে দোষের শক্তি বশতঃ লজ্জন সহ্য হয় বলিয়া যথোপযুক্ত লজ্জন হেতু কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

নবজ্বরে পিপাসা হইলে জল সংস্কৃত করিয়া পান করিতে দেওয়া উচিত।

চরকে লিখিত হইয়াছে—জ্বর আশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। আশ্রয় হ্রাস্ত রোগে বিরচন, বমন, উপবাস ও সংশমন হিতকর। উষ্ণ জল ঐ সকলের সাধক এবং পাচক বলিয়া জ্বরে হিতকর। ইহা দ্বারা বায়ুর অহ্বলোম হয়, অগ্নি প্রবাহ হয়, উষ্ণ জল শীঘ্র পরিপাক পায়, শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করে এবং পান করিলে তৃষ্ণা প্রশমিত করে।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে,—উষ্ণ জল অগ্ন্যদীপক, সংহত কফেরচ্ছেদকারক, বায়ু ও পিত্তের অহ্বলোমক, এবং তৃষ্ণানাশক, এই জন্ত বায়ুজনিত শ্লেষ্মাজনিত বা বাতশ্লেষ্মাজনিত জ্বরে হিতকর। অপিচ উষ্ণ জল পান করিলে দোষসকলের অন্নতা ঘটে এবং স্রোতোগ্রস্ত সকল বিশুদ্ধ হয়।

শীতল জল উষ্ণ জলের বিপরীত গুণ বিশিষ্ট বলিয়া শীতল জল পান করিলে জ্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পিত্ত জ্বর, শূলপানজনিত জ্বর এক

বিষজ্ঞ জরে তিক্ত দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান করিতে দিবে। এই প্রকারে সিদ্ধ করা জল এবং উষ্ণ জল অগ্নাদীপক, পাচক, অরুনাশক, শ্রোতঃ শোধক, বলকর রুচি জনক এবং ঘর্ষজনক।

ষড়ঙ্গ পানীয়—মূত্র, ক্ষেত পাঁপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও গুঁঠ প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি—মোট দুই তোলা লইয়া ধুইয়া থেতো করিবে। পরে চারি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া লইবে; এই জল শীতল করিয়া পান করিতে দিলে পিপাসা ও জর নষ্ট হইয়া থাকে। মজাঘরে গুঁঠ স্থলে পদ্মকাষ্ঠ লইবার বিধি আছে।

বাতপিত্ত জরে ষড়ঙ্গপানীয় অথবা উষ্ণ জল শীতল করিয়া এবং বাতশ্লেষ্মজরে ও ত্রিদোষজ জরে উষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া কর্তব্য। শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

সন্নিপাত জরে রোগী প্রলাপ বকিতে থাকিলেও পুষ্টিকর খাদ্য দিবে না এবং দাহ ও তৃষ্ণায় অভিভূত হইলেও শীতল জল পান করিতে দিবে না।

জরে উষ্ণ জল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। জল সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া, সেই জল সম্বন্ধে উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে দেওয়া উচিত।

লজ্জন এবং জল পানের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে কিরূপ নিয়মে পথ্য দিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে, শাস্ত্রকার সত্ত, পেয়া ও বিলেপী,—জররোগে পথ্যের ক্রম দিতে বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

মণ্ড, পেয়া, ও বিলেপী লঘু বলিয়া এবং ঔষধ সহ সংস্কৃত হওয়ায় অগ্নাদীপক এবং বায়ু, মূত্র, পূরীষ ও দোষের অম্ললোমক হইয়া থাকে, তরল ও উষ্ণ বলিয়া ঘর্ম্ম উৎপাদন করে, তরল বলিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, আহার বলিয়া বল জন্মায়, সাহস বলিয়া শরীরের লঘুতা সম্পাদন করে, জরে হিতকর বলিয়া জর নষ্ট করে,—এইজন্ত মণ্ডপান জনিত জর ব্যতীত অগ্র জরে যথাগু পথ্য দিবে। (ক্রমঃ)

শ্রী ——— বন্দ্যোপাধ্যায়।

## ✽ ওলাউঠা চিকিৎসা।

—:—

ওলাউঠা কাহাকে বলে? ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থই বা কি? এবং কোন্ ভাষা হইতেই বা এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে? ইত্যাদি বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। আয়ুর্বেদীয় কোনো গ্রন্থে এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল আলোচনা করিয়া

অনেকেই বলিয়া থাকেন, “ওলাউঠা আয়ুর্বেদে বহির্ভূত এক প্রকার নূতন রোগ। পাশ্চাত্য দেশের সমুদ্রত স্থান হইতে এই রোগ ভারতে আসিয়াছে, এই জন্যই ইহার চিকিৎসা বিধান আয়ুর্বেদে গ্রন্থে প্রিলক্ষিত হয় না। সুতরাং কবিরাজ দ্বারা এই পীড়ার চিকিৎসা হওয়া

সর্বথা অসম্ভব ।” কিন্তু সাধারণতঃ এ রোগের যে সকল লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে ইহাকে আমরা নূতন রোগ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এই রোগে আক্রান্ত হইলে, প্রথমতঃ রোগীর অত্যন্ত মলভেদ এবং সঙ্গে সঙ্গে মুহুমূর্ত্তঃ বমন হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পর স্বরভঙ্গ, হিকা, মূত্ররোধ, ঘর্ম্ম স্রবণ, উৎবেষ্টন, অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খালি ধরা প্রভৃতি লক্ষণ জুটিয়া রোগীকে সাতিশয় যন্ত্রণা দিতে থাকে। সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও দন্তদমূহ নীলবর্ণ হয়। কাহারও কাহারও বক্ষোদেশের তীব্র বেদনা ও শিরঃশূল উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ও কোটরগত হইতেও দেখা যায়। এবম্বিধ লক্ষণাক্রান্ত অথ কোন রোগ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে কিনা,—এক্ষণে আমাদের ইহাই আলোচ্য। সনাতনশাস্ত্রে ওলাউঠা শব্দের প্রয়োগ না থাকুক, কিন্তু তাহার লক্ষণের ছায় লক্ষণ বিশিষ্ট অপর কোন রোগের উল্লেখ থাকিলে তাহা অগ্রাহ করিব কেন? যদি শাস্ত্রবর্ণিত সেই রোগের চিকিৎসা দ্বারা ওলাউঠা রোগেরও সর্বতোভাবে প্রতিকার ঘটাইতে পারা যায়, তাহাতেই বা শিথিলচেষ্টে হইব কেন?

আয়ুঃ শাস্ত্রে বিস্ফটিকা রোগের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিস্ফটিকা রোগের নিদান ও লক্ষণের বিষয় অমূলীন করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন—আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ যাহাকে বিস্ফটিকা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,

তাহাই বর্ত্তমান কালে ওলাউঠা নাম ধারণ করিয়াছেন! ফলতঃ ইহা কোন নূতন রোগ নহে, কেবল নামটাই নূতন। নিদান সংগ্রহ কল্পা বীমান্ মাধবকর বলিয়াছেন :—

(১) যে পীড়ায় অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অতি কুপিত হইয়া গাত্র সকলকে অত্যন্ত বেদনা অপেক্ষা স্থচীবেধবৎ বেদনায় অধিকতর অন্ত্র করিয়া তুলে, বৈতগণ তাহাকে বিস্ফটিকা বলিয়া থাকেন। (২) এই রোগে মুচ্ছা, অতিদাৰ্ভ, বমন, পিপাসা, শূলবৎ বেদনা, হস্ত পদে খালি ধরা, জ্বস্তা (হাই); গাত্রদাহ, বিবর্ণতা, কম্প, বক্ষোবেদনা, ও শিরঃশূল উপস্থিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগে এতদ্ব্যতীত নূতন কোন লক্ষণ প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয় না। তবে দেখা যাইতেছে যে, আজকাল লোকে যাহাকে ওলাউঠা বলিয়া ঘোষণা করিতেছে আয়ুর্বেদ, শাস্ত্রে সেই রোগই বিস্ফটিকা বলিয়া বর্ণিত। এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি কারণে কেমন করিয়া এই বিস্ফটিকা রোগ জীবদিককে আক্রমণ করিয়া থাকে।

আয়ুর্বেদে শারীর স্থান এবং অন্ত্রবিপাক ক্রিয়াপদ্ধতি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, একমাত্র অজীর্ণ রোগই অধিকাংশ রোগের প্রসূতি। (৩) যাহারা লোভপরায়ণ, ঔদরিক, পণ্ডুর্জি ও হিতাহিত বোধশূন্য হইয়া অপরিমিত আহার করে, তাহারা ই নানারোগের মূল স্বরূপ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয়।

(১) স্থচীভিরিব গাত্রাণি \* ভূদন সন্তিষ্ঠতেহ নিলঃ। বস্ত্রা জীর্ণেন সা বৈদ্যাবিস্ফটিকিতি নিস্পাদ্যে।

(২) মুচ্ছান্তিসারো বমথঃ পিপাসা শূলো ব্রমোবেষ্টন জ্বস্তা দাহঃ। বৈকর্য্যাকম্পো হস্তপদে রক্তাভ্যঃ।

(৩) অনায়াসকৃতঃ পণ্ডুবভূতঃ যেহ প্রমাণতঃ। রোগানীকত তে পুনঃক্রিয়ায় যোগ্যতঃ।



(১) এই অজীর্ণ রোগ তিন প্রকার :—

(ক) অর্থাৎ আমাজীর্ণ, (খ) বিষ্টকাজীর্ণ  
(গ) বিদগ্ধাজীর্ণ। এবং ইহাদের—ইহাতেই  
বিহুচিকা, বিলম্বিকা, অলসিকা রোগ উৎপন্ন  
হইয়া থাকে। (২) শাস্ত্রদর্শী পরিমিতাহারী  
ব্যক্তিগণের এই রোগ হয় না। ভক্ষ্যভক্ষ্য  
সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, যাহারা  
আম্রসংযমে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং পেটক,  
তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।  
ইহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, একমাত্র  
অজীর্ণই এই রোগের নিদান। অগ্নিমান্দ্য  
হইতে অজীর্ণ এবং অজীর্ণ হইতে সকল রোগের  
উৎপত্তি হয়। তাই আমরা প্রথমতঃ অগ্নিমান্দ্য  
বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। অগ্নি  
বাহ্যকে বলে? সকলে সর্বদা যে অগ্নি প্রত্যক্ষ  
করিয়া থাকে, যাহার সহায়তায় আলাগীকাঠ  
সংযোগে লোকে অন্ন প্রাপ্ত করিয়া আহার  
করে, বাহ্যিক কণিকামাত্র সংস্পর্শে সরস  
নীল সর্ববিধ বস্তুই ভস্মীভূত হইয়া যায়,  
ইহাও কি ঠিক সেই প্রকার পদার্থ? অত্যাচ্চ  
দুর্গা মণ্ডল হইতে রসাতল পর্যন্ত সমস্তই  
একজাতীয় অগ্নি বিরাজমান। কাঠে কাঠে  
পরস্পর সংঘর্ষণ করিলে যে অগ্নির উদ্গম  
হয়, সেই অগ্নি পরিশেষে দেহের, গেহের—  
দর্শবিধ কার্যের সংসাধক হইয়া থাকে।  
প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় বহ্নিতে তাড়না ব্যতীত কখনও  
উষ্ণ উৎক্ষিপ্ত হয় না। কাঠখণ্ডের  
জায় জীবদেহও অগ্নিময়। কাঠ নিষ্ক্রিয়ভাবে  
পড়িয়া থাকে, স্তবরাং তাড়না না করিলে  
উদ্গম হয় না। জীবদেহ তজ্জন্ম নয়। দেহ

মধ্যে নিমিষে নিমিষে প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত  
হইতেছে। তাহাতে রসরক্তাদির অবিরত  
সঞ্চালন ঘটতেছে। শারীরিক যন্ত্রগুলিও  
নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া থাকে না। যান্ত্রিক  
বিষম তাড়না বশতঃ কাঠখণ্ড অপেক্ষা  
শরীরের উত্তাপ অনেক বেশী। এই দেহ  
গত বহ্নি পাছে দাবানলের স্রায় প্রচণ্ড হইয়া  
পরে, শরীরকে সম্পূর্ণরূপে রসশূন্য করিয়া  
ফেলে, মাংসাদির পূর্ণ পরিপাক সংসাধন  
করিয়া শরীরকে বিদ্ধান্ত করিয়া ফেলে, তাই  
ভয়ে ভয়ে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পানাহারের  
ব্যবস্থা করিতে হয়।

আয়ুর্বেদগুরু ভগবান পুনর্কল্প এবং  
ভদ্রকোষ প্রভৃতি ঋষি কহিয়াছেন :—“পিত্তই  
শরীরের অগ্নি” পিত্তকে সমভাবে রাখিতে  
পারিলেই শরীর সুস্থ থাকে। যে পিত্ত তীক্ষ্ণ,  
দ্রব্য, দুর্গন্ধ, নীল ও পীতবর্ণ বাহ্য উষ্ণ এবং  
যাহা কটুরস বিশিষ্ট, তাহাই স্বাভাবিক।  
পিত্তে অন্নরস জন্মিলে তাহা দূষিত হইয়া  
থাকে। কার্যভেদে পিত্ত পাঁচ শ্রেণীতে  
বিভক্ত :—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক,  
ভাজক।

পাচকপিত্ত অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিতি করিয়া  
ভুক্তবস্তুর পরিপাক সাধন করে, এবং মল  
মূত্রাদির নিঃসরণ করিয়া দেয়। অধিকন্তু  
ইহা দ্বারা অপরাপর পিত্তের বল বৃদ্ধি হয়।  
রঞ্জকপিত্ত বহুং ও মীহার অবস্থান করে,  
এবং ভুক্ত পদার্থের প্রথম পরিপাক হইবার  
পর—যে রস জন্মে, তাহাকে রসে পরিণত  
করে। সাধকপিত্ত হৃদয়ে অবস্থিত। ইহা

(১) অজীর্ণমাংস বিষ্টকঃ বিদগ্ধকঃ বদারিতম্।

(২) ন তাঃ পরিমিতা হারা লভন্তে বিদিতা গয়াঃ।

বিসৃঢ়ালসকৌ ভস্মান্তংকোপি বিলম্বিকা।

মূঢ়াস্তমজিতাজ্ঞানো লভন্তে হৃদয় লোকপাতি।

হইতে বুদ্ধি, স্মৃতি, এবং মেধার উৎপত্তি হয়। আলোচকপিত্ত নেত্রদ্বয়ে অবস্থান করে, ইহা হইতে দর্শন ক্রিয়ার সংসাধন হয়। ব্রাহ্মক পিত্ত গাত্রচর্মে অবস্থিত। ইহা অভ্যঙ্গ দ্রব্যের পরিপাচক এবং শরীরের অগ্নিবর্দ্ধক। পাচ-গাশ্চি চতুর্দ্বিধ অবস্থায় জঠরে অবস্থান করিয়া থাকে—যথা—মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম এবং সম। শরীরে কফাধিক্য হইলে মন্দাগ্নি উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা কিছু আহার করা যায়, তাহা সূচাক্রুরূপে পরিপাক হয়না। ইহাতে মাংসকনকনানি, উপকারবাহুলা, উদরস্ফীতি, উদরের গুরুত্ব, মলরোধ, এবং মূত্রাধিক্য প্রকাশ পায়। সাংঘাতিক সন্ধিতেও এই সকল লক্ষণ উপলক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু জঠরে কফ সঞ্চিত হইলেই এই অবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার অজীর্ণ। জঠরে পিত্তের আধিক্য হইলে তীক্ষ্ণাগ্নি জন্মে। তীক্ষ্ণাগ্নিবিশিষ্ট লোক যখন যাহা কিছু আহার করে, তখনই তাহা শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায়, আবার ক্ষুধার উদ্বেক হয়। ইহাতে শরীরের শোণ আরম্ভ হইলে পীড়া সাংঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করে। বায়ুর আধিক্য বশতঃ বিষমায়ির উৎপত্তি হয়। ইহাতে ভুক্ত পদার্থের কণনও বা শীঘ্র এবং কণনও বা বিলম্বে পরিপাক হইয়া থাকে। সর্কাপেক্ষা সমাগ্নি শরীরের পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যসম্পাদক। সমায়ির রক্ষণচেষ্টাই সকলের সর্বতোভাবে কর্তব্য। এতদ্ভিন্ন অগ্নির তিন প্রকার অবস্থাই অজীর্ণ রোগ বলিয়া সমাখ্যাত। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ রোগে কফদোষ থাকিলে তাহাকে আমাজীর্ণ, পিত্তদোষ থাকিলে তাহাকে বিদহাজীর্ণ এবং বায়ুর সংশ্রব থাকিলে তাহাকে বিষ্টকাজীর্ণ

কহে। প্রতিদিন যাহা কিছু আহার করা যায়, সেই সমস্ত ভুক্ত রসে অংশ বিশেষ জীর্ণ না হইয়া রসাবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাহাই সময়ান্তরে অজীর্ণ রোগ রূপে পরিণত হয়, শাস্ত্রে ইহার নাম রসশেষাজীর্ণ। উল্লিখিত সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ হইতে দেশ-বিদগ্ধশকর প্রাণনাশক, বিস্ফটিকা বা ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিদ শঙিতগণ ওলাউঠা রোগের বীজস্বরূপ স্বতন্ত্র কোন বিষের কথা নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে জলবায়ু দূষিত হইয়া এই রোগের বীজ জন্মাইয়া থাকে। পরে সে রোগবীজ জীব দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া, সন্তোমারাম্বক সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগের সৃষ্টি করে। এই সকল কথা সারবত্তা আয়ুর্বেদোচাৰ্য্যগণ স্বীকার করেননা। বাহু পদার্থ দূষিত হইয়া রোগের বীজস্বরূপ কোন বিষের উৎপত্তি হইতে পারে, তাঁহাদিগের মতে ইহা অসম্ভব। অযুক্ত আহার-বিহারদ্বারা আপনা হইতেই দেহমধ্যে নানাবিধ বিষের উদ্ভব হয়। আচাৰ্য্যগণ বলেন, তন্মধ্যগত অত্যন্তম বিষ হইতেই এই সাংঘাতিক রোগের উৎপত্তি। জলবায়ু প্রাণীদিগের সাধারণ সম্পত্তি। প্রাণীমাত্রেই এই ছুইটা বস্তু সৰ্বদা সমান ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের অভাবে বা বিস্বপ্ৰসবিনী ক্রিয়ার দোষে জগতের অস্তিত্ব ও অসম্ভব। বায়ু সঞ্চরণশীল। বাক্তি বিশেষের কদাচারের দোষে অথবা নৈসর্গিক দোষে যদি কোন স্থানের বায়ু দূষিত হয়, তবে তাহা অচিরে সমস্তদেশে অভিব্যপ্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং জীবমাত্রেই তাহা ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না।

জল সম্বন্ধেও নিয়ম ঠিক ঐ প্রকারই। উক্ত কারণে কোন স্থানের জল বিষাক্ত হইলে তাহা অচিরে বহু স্থানে সঞ্চালিত হয়। তবে স্থানের দূরত্বানুসারে বিষাক্ত অংশ কম হইতে পারে। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারোপযোগী জলবায়ু দূষিত হইয়া ওলাউঠা রোগের উৎপাদন করিত, তাহা হইলে ঐ রোগে কীট পতঙ্গ হইতে মানব পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীকে তুল্যভাবে আক্রান্ত হইতে হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয়না। এইজন্য আমরা দেহমধ্যে স্বয়মুৎপাদিত বিষের কথা স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা সত্যসত্যই সংক্রামক কিনা, — তাহাই একবার আমরা আলোচনা করিব। যে সকল রোগ এক শরীর হইতে অল্প শরীরে প্রবেশ করে তাহাকে সংক্রামক রোগ বলে। এই সংক্রামক রোগ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি রোগ আছে, তাহারা নিত্য সংক্রামক। আবার এমন কতকগুলি রোগ আছে যে, তাহারা কাল প্রভাবে কখনও কখনও সংক্রামক হয়।

নানা কারণে সংক্রামক রোগের বীজ উৎপন্ন হইরা থাকে। মিথ্যা আহার বিহার দ্বারা আপনা হইতে দেহাভ্যন্তরে এই বীজের উৎপত্তি ঘটে। পরে এক শরীর হইতে অল্প শরীরে সঞ্চালিত হয়। ব্যক্তি বিশেষের কদাচারিতায় কখনও কখনও প্রথমতঃ স্থানীয় জল দূষিত হইয়া পড়ে। পরে বায়ু কণ্টক সেই দোষ বহু স্থানে সঞ্চালিত হইতে থাকে। সাধারণের নিত্যব্যবহার্য জলবায়ু এইরূপে দূষিত হইলে প্রাণী মাত্রকেই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, সময় সময় জ্বর গ্রহের ফুটল দৃষ্টিপাতে পার্শ্বিক জলবায়ুও দূষিত হয়। যে কারণেই ইউক জলবায়ু দূষিত হইয়া

সংক্রামক পীড়ার উৎপত্তি হইলে তাহা ভীষণ আকার ধারণ করে। এতদ্বারা মহাদেশ মহাশ্মশানে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়! বর্তমান ওলাউঠা বা বিস্ফটিকা রোগ এ প্রকার সংক্রামক নহে। ইহা বসন্ত রোগের স্থায় এক শরীর হইতে অল্প শরীরে যে প্রবিষ্ট হয়, একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তবে ওলাউঠা রোগীর যে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করে, তাহার কোন অংশ যদি কীট, পতঙ্গ, মক্ষিকা প্রভৃতি দ্বারা খাওয়াবোর সহিত সংযুক্ত হয়, অথবা জলের সহিত উদরস্থ হয়, তাহা হইলে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা বসন্ত রোগের স্থায় সংক্রামক পীড়া নহে কিম্বা কুণ্ড অর্শ, বস্মা, ঔণসর্গিক মেহ এবং উপদংশ প্রভৃতির স্থায় ও ইহাকে সংক্রামক রোগ বলিয়া আমরা গণনা করি না। উক্ত রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির দূষিত শুক্র হইতে জাতসন্তানের শরীরেও ঐ সকল পীড়া জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ওলাউঠা রোগ এইরূপ ভাবে কাহাকেও — আক্রমণ করিতে দেখা যায় না। উন্মাদ গ্রস্তা জননীর সন্তানকেও উন্মাদ প্রভৃতি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। ইহা বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষীকৃত। ওলাউঠা পীড়ায় সেইরূপ সংক্রামকতা নাই, তবে এই পীড়া কালপ্রভাবে কখন কখনো কখনো সংক্রামক হয়, কখনো কখনো হয়ও না। এক্ষণে আমরা প্রাথমিক করিয়া দেখিব—কোন সময় এই পীড়া সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায় এবং কোন সময়ই বা সংক্রামক হয় না।

সর্বদাই দেখা যায়,—যে সকল ব্যক্তি ওলাউঠা রোগীর নিকট অবস্থান করিয়া অধরহঃ তাহার সেবা শুশ্রূষা করে,—নিম্ন

হস্তে মল মুত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দেয়, একটা বারও রোগীর কাছছাড়া হয় না, তাহাদিগকে কখন এই রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না। যাহারা ভয়ে ভয়ে অতি বড় সাবধানে থাকে, রোগীর পরিচর্যা করা দূরে থাকুক, যে বাড়ীতে রোগী বাস করে, তাহার ত্রিসীমানাতেও পদার্পণ করে না, তাহারাই এই পীড়াতে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলিত হয়। তবেই দেখা যাইতেছে—এই পীড়া সকল অবস্থায় সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায় না।

অজীর্ণ হইতে যে এই কাল ব্যাধির সমুৎপত্তি—ইহা সর্ববাদিসম্মত। যদি কোন ওলাউঠা রোগীকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি ছই তিন দিনের মধ্যে কোন অজীর্ণকর দ্রব্য আহার করিয়াছ কিনা, তখন সে মুক্ত কর্তে বলিয়া ফেলিবে—আমি ৫৭ দিনের মধ্যে কোন অপথ্য দ্রব্য ভোজন করি নাই। কিন্তু সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, রোগীর কথার সত্যতা বাস্তবিক কর্পরের গ্রাম উড়িয়া যায়। সূত্ররং রোগীর বা তাহার আত্মীয়

স্বজনের নিকট কোন কথা শুনিয়া রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা এক প্রকার দুষ্কর ব্যাপার। ওলাউঠা রোগ গ্রামের মধ্যে বখন প্রথম প্রবেশ করে, তখন দুই চারি জন স্বেচ্ছাচারী ঔদরিক লোকই ইহা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তাহার পর ক্রমশঃ মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এই পীড়া প্রবল বেগে সকলকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে পীড়ার আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল হইলে বখন চতুর্দিক হইতে ক্রন্দনের রোল কর্তৃকুহরে প্রবিষ্ট হয়, পক্ষীকুল থাকিয়া থাকিয়া এক একবার মর্ম্মভেদী কলরব করিয়া উঠে, শূণ্য কুকুরগণ বিকট শব্দে সতয়ে আর্তনাদ করিতে থাকে,—প্রাণসমনৈরাশ্বের ভাবী আতঙ্কে সকলে শিহরিয়া উঠে, তখন আর সদাচারী, কদাচারী, মিতাহারী, অমিতাহারী—এই রোগের বিভীষিকার ভীতি সম্বন্ধে কাহারও কিছুমাত্র প্রভেদ থাকেনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী, কবিরত্ন।

## শরীর ও স্বাস্থ্য।

—:০:—

কোন কার্যের ফলাফল বিচার করিতে যাইলে সর্বপ্রথমে কারণের অনুসন্ধান করিতে হয়। কারণ ব্যতীত কার্য হয়না—আবার কার্য করিলেই তাহার ফল অবশ্যস্বাভাবী। অগৎপ্রপঞ্চ কারণ সম্ভূত। উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়—কার্যাকারণের অবস্থান্তর। শৃঙ্খলবদ্ধ কার্যপরম্পরা অবলোকন করিলে বোধ হয় জগতের পশ্চাতে—নিয়ম অনন্ত কারণরূপে

প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের কথায় নৈসর্গিক নিয়মই ভগবানের নিয়ম।\* তবে ভগবান কি ? তাহা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। দার্শনিক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিভিন্ন আধার ভূষিত করিয়া গবেষণা পূর্ণ জটিল দর্শন লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহাই হউন, বাস্তব জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, এক অতি ক্ষুদ্র অনুপাতীয় হইলেও কারণ

করিয়া সমস্ত উদ্ভিদ জগৎ—সমস্ত প্রাণিজগৎ ও সমস্ত আলোক জগৎ একই নিয়মের অধীন। উত্থান, অবস্থান ও পতন সর্বব্যাপী নিয়মের অবস্থার পরিবর্তন। বিশ্ব যখন নিয়মে পরিচালিত, তখন বিশ্বের অন্তর্গত যাবতীয় পদার্থ সেই একই নিয়মাবলী। সেই নিয়মে ফল ফুটিতেছে,—সেই নিয়মে নদী ছুটিতেছে—সেই নিয়মে পাখী উড়িতেছে,—সেই নিয়মে পশু বিচরণ করিতেছে,—সেই নিয়মে তুমি হাসিতেছ, আমি কাঁদিতেছি, আবার তুমি কাঁদিতেছ, আমি হাসিতেছি ;—সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিয়মই আমাদের নিয়ন্তা।

স্বাস্থ্যকি?—স্বাস্থ্য, এই নিয়ম প্রতিপালন, আর এই নিয়মের ব্যতিক্রমই অস্বাস্থ্য। জগতে এত হাহাকার—এত হা-হতাশ কেন? এই নিয়মের অবহেলার জন্ত। প্রাণিজগতের মধ্যে মানব জাতিই প্রধান অত্যাচারী। মানবই সকল নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনৈসর্গিক অত্যাচারে—আপনাকে পীড়িত করিয়া ফেলে এবং রোগ শোকে জর্জরীত হইয়া মৃত্যুর পথ স্বগম করিয়া লয়। আমরা মরিবার জন্তই জন্মিয়া থাকি, তাই বলিয়া কি ভগবানের নিকট হইতে যে সন্ত লইয়া মর্তে আসিয়াছি, তাহা আরও করিবার আগেই আমরা মরিব? আমরা জানি যে, জন্মিলে মৃত্যু আছেই, তাই মৃত্যুকে সর্বদা নিকটস্থ জানিয়া ভগবানের নিয়ম প্রতিপালন পূর্বক আপন আপন কার্যে মগ্ন হওয়া কর্তব্য।

আমরা যে এখানে আসিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য আছে। আমরা দেখিতে পাই—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই এক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতেছে। ক্রমবিকাশ হইতে, পূর্ণবিকাশে পৌঁছাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এই আশা—

জীবন সংগ্রামে (Struggle for existence) প্রকৃত বীরের মত বীরসাজে সজ্জিত হইয়া নীরোগ ও বলিষ্ঠ দেহ লইয়া যে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলে, সেই জয়ী হইবে। তাই ইংরাজ কবি বলিয়াছেন :—

In the bevonac of life  
Be not dumb driven cattle  
Be a hero in the strife.”

বাস্তবিক এই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে গেলে আমাদের স্বাস্থ্য সর্বোপায়ে প্রয়োজন। বধিরের শ্রবণেচ্ছা যেমন বুঝা, মুকের বাক্য ক্ষুণ্ণির চেষ্টা যেমন বস্ত্রদায়ক, অন্ধের দর্শনেচ্ছা যেমন নিষ্ফল, স্বাস্থ্যহীনের সকল আশাই তেমন নিষ্ফল হয়,—ভবিষ্যৎ জীবন তেমনি তাহার মর্মভেদী শোকাক্রান্তারে আবৃত থাকে। এই আঁধারময় জীবন লইয়া সে কি করিবে? স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে তাহার কোন উদ্দেশ্যই তো সিদ্ধ হইবে না। “শরীরমাতং থলু ধর্ম সাধনম্।” স্বস্থ শরীর ব্যতীত ধর্ম ও অর্থ কিছুই আরম্ভ হয় না। বেদান্ত মতে জগৎ মিথ্যা, মায়াময় স্বপ্ন, সুতরাং জগৎ হইতে সৃষ্ট যে এই শরীর—ইহাও মিথ্যা ও স্বপ্ন মাত্র; ভগবান গীতার বলিয়াছেন :—

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণান্তি  
নরোহপর্যাপি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্তানি সংযান্তি  
নবানি দেহী ॥”

যাহা হউক যদিও এই দেহ কিছুই নয়, তথাপি ইহাই কিন্তু সব। এই দেহই দেবতার মন্দির (temple of God),—ইহারই ভিতর আত্মা বাস করেন। এই নব শরীরের সাহায্যে আমরা ভগবানের উপাসনা করিতে পারি। মানবজন্ম কেবল

আহার নিদ্রা ও মৈথুনের জন্ত নর, ইহার, উচ্চ লক্ষ্য আছে (the goal of life);—আত্ম-জ্ঞান মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আত্ম-জ্ঞানেই পূর্ণ বিকাশ। শরীর ব্যতীত ইহা অসম্ভব। আবার নাম মাত্র শরীর থাকিলে চলিবে না—শরীর কর্মক্ষম হওয়া চাই, শরীর সুস্থ ও সবল হওয়া চাই। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই দেহ—ইহা মিথ্যা হইলেও ইহার বতখানি সত্যতা আছে, তাহা আমরা-দিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে; স্বাস্থ্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

আমরা দেখিতে পাই—পশুরা আমাদের অপেক্ষা বলবান ও পূর্ণস্বাস্থ্য। তাহার কারণ, তাহারা স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করে না—প্রকৃতির মঙ্গলজনক নিয়ম তাহারা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে, কাজেই তাহাদের মধ্যে ডাক্তার বা বৈজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গৃহপালিত পশু-বস্ত্র পশু অপেক্ষা ক্ষীণ ও দুর্বল। গৃহপালিত পশু—স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে, তাই তাহারাও অত্যাচারী মানবের দ্বারা স্বাস্থ্যহীন। সুতরাং তাহাদেরও জন্ত ডাক্তার (Veterinary surgeon) হইয়াছে। বাহার যেমন স্বভাব, সে অপরকেও সেই ছাঁচে চালিতে চায়। গৃহপালিত পশুদিগকে আমরা আমাদের মতই করিয়া তুলিতে চাই, তাই তাহাদের দশাও আমাদের মতই হইয়াছে।

এ স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে সুন্দরভাবেই ছিল এবং তাহা প্রতিপালিতও হইত। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত আমাদের বহুপ্রকার নিয়ম পালন করিতে হইত। সেইসকল নিয়ম পালন করিয়া যে বিত্তীয় আশ্রমে উপনীত হইত, সে জীবনে কখনো দুঃখ পাইত না,—

বিদ্যা বুদ্ধি শৌর্য্যে ও বীৰ্য্যে মণ্ডিত হইয়া সুন্দর স্বাস্থ্য ভোগ করিত। তুমি মেধাবী, বুদ্ধিমান হইতে পার, কিন্তু তোমার যদি স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে, তবে তুমি মেধা ও বুদ্ধি লইয়া কি করিবে? তোমার জীবন বৃথা—জীবন তোমার পক্ষে ভার বহন বলিয়া বোধ হইবে। তোমার সুখ-শান্তি, আমোদ প্রমোদ দূরে,—বহুদূরে পলায়ন করিবে,—তুমি নিয়ত মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করিবে, তুমি জীবন্মৃত্যু (life-in-death) হইয়া থাকিবে। সে কষ্টের সে যন্ত্রণার—সে মর্মান্তিক বেদনার তুলনা—হয় না। স্বাস্থ্যহীন জীবন চিন্তা করিলে চোকে অন্ধকার দেখিতে হয়—মাথা ঘুরিয়া যায়। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্ত বিধম অন্তর্দাহে কেহ কেহ আত্ম-ঘাতীও হইয়াছে। কিন্তু ইহার মত পাপ বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

যখন ভাবি যে, এই স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষার জন্ত আমাদের শাস্ত্রকারগণ কতই পরিশ্রম করিয়াছেন, তখন আশ্চর্য্য হইয়া বাই। তাঁহারা কি স্বদেশ প্রেমিক। তাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতির বংশধরদিগের রক্ষার জন্ত কত ধর্মশাস্ত্র, কত যোগ শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ ও কামশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে আমাদের সকল শাস্ত্রেই শরীর রক্ষা ও শরীর পালন সম্বন্ধে লিখিত। আমার বোধ হয় শরীর বিজ্ঞান (hygiene) সম্বন্ধে ভারতবর্ষ সর্ব প্রাধান ও মৌলিক। আমরা এখন অত্যাচারী ও প্রবঞ্চক হইয়াছি, যদি কথিত শরীরপালনের নিয়ম অমূল্য করি না। সে সকল নিয়ম পালন করিতে গেলে আধুনিক সভ্যজগতের পারিপার্শ্বিক কলঙ্কগুলি সত্যায়িত—খার কথার বিন্দুও পোহে না।

পায়। অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ফল ভেদ হয়; এখন যেমন কাল উপস্থিত, আচার ব্যবহারও সেইরূপই হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া অনেকে চীৎকার করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য বলিলে যাশ বৃথা, সে রকম ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ প্রাচীন কালের মত ব্রহ্মচর্য্য এখন পালন করা বড়ই কঠিন। ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অর্থ বীর্ঘ্যধারণ। বীর্ঘ্যধারণই শারীরিক উন্নতির প্রধান সহায়। এই উদ্দেশ্যে: হইতে গেলে আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের সকল নিয়মই পালন করিতে হয়। এখন আর সে রকম গুরুতর আশ্রম নাই; আপন আপন গৃহকেই ব্রহ্মচারীর আশ্রম করিয়া লইতে হইবে। পঞ্চম বর্ষীয় বালককে ব্রহ্মচারীর ভ্রতে দীক্ষিত করিতে হইলে গৃহে গুরুর আবশ্যক। আমাদের কিন্তু তেমন গুরুর অভাব। গৃহে মাতা পিতাই গুরুর কাজ করা উচিত। কিন্তু যাহারা গুরু হইবেন, তাহারা ব্রহ্মচারী নহেন, সম্পূর্ণ ইঞ্জিয় পরায়ণ, স্বতরাং তাহাদের দ্বারা কাজ হইবার আশা বড়ই কম। সবল, স্বাস্থ্যসম্পন্ন সন্তান পাইতে ইচ্ছা করিলে মাতা-পিতারও সবল ও সুস্থকায় হওয়া উচিত। “পুত্রার্থে ক্রিয়তেভার্য্যা” এই কথা মনে করিয়া স্ত্রী সহবাস করিতে হইবে—ইঞ্জিয়কৃন্তির জন্ত পবিত্র বিবাহবন্ধন নহে। পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ নিজে নিজে সংযমী হইলে পুত্রকল্যাণাদিগকেও সংযমী করিতে পারেন। যেমন বৃদ্ধ তেমন তার ফল হইবে। সংযম-ব্যতীত স্বাস্থ্যবান হওয়া বড়ই কঠিন। সংযমই স্বাস্থ্যের ভিত্তি—(control over one's senses is the basis of perfect health)।

শিশু স্বাস্থ্য জননীদেব উপর নির্ভর করে। তাহারা যদি একটু বিলাসিতা বর্জন করিয়া সন্তানগনকে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে শিশু দৃষ্ট পুষ্ট হয় ও পরে বেশ স্বাস্থ্যবান পুরুষ হইয়া উঠে। এই সময়ে যেমন অভ্যাস করান যাইবে, সারাজীবন সেই অভ্যাস থাকিয়া যাইবে। পূর্বে জননীরা নবজাত শিশুকে সর্ষপ তৈলাক্ত করিয়া রোদ্রে রাখিয়া দিতেন, এখন তাহার পরিবর্তে তাহাকে জামা প্রভৃতি পরাইয়া দেওয়া হয়—পাছে শিশু রোদ্রে তাপে কাল, হইয়া যায় বা বাতাসে তাহার ঠাণ্ডা লাগে। ইহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিলে বোধ হয়, পূর্বে যেন রোজ ও জল বায়ু ছিল না। এইরূপে প্রকৃতির ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া জননীরা শিশুদিগকে স্বাস্থ্যহীন করিয়া রাখেন। এই শিশুই কালে মানুষ্য হইবে। এই রূপ সন্তানগণ ও তাহাদের বংশধরগণ কতদিন জীবিত থাকিবে—তাহা জনক জননীরা একবার ভাবিয়া দেখুন।

তারপর আহার। অধুনা যেরূপ খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখা বড় দুক্লহ ব্যাপার। খাঁটি দ্রব্য পাওয়া ভার হইয়াছে। সকল দ্রব্যই ভেজাল মিশ্রিত। স্বাস্থ্যসাধনকে বড়ই সতর্ক থাকিতে হইবে।

স্বাস্থ্যসাধকে এত কথা বলা যাইতে পারে যে, এক মাসের আয়ুর্বেদে একটা প্রবন্ধেই পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা করিলে তো চলিবে না। তাই প্রধান প্রধান কারণ উগরে দেখাইয়া আমি প্রবন্ধ আভিকার মত এইখানেই করিলাম।

ত্রিভীষণ চন্দ্র শাস্ত্রী।

## পঞ্চকর্ম সাধন।

—:—:—

( পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর )

অশোধিত পীতৌষধ জীর্ণ হ'লে পরে ।  
 পুনঃ পান বিধি নহে, অতিযোগ করে ॥  
 কোষ্ঠের গুরুতা, বল লঘুতা বুঝিয়া ।  
 অযোগে মুহু বা তীক্ষ্ণ দিবে বিচারিয়া ॥  
 বমি ক্রুদ্ধে, না বুঝিয়া বমি বিরচন ।  
 দিলে ক্রমে প্রাণ হানি হয় সেকারণ ॥  
 অম্লিগ্ন, অম্লিগ্ন আর কক্ষ যেই হয় ।  
 পুরাণ ঔষধে তার দোষোৎক্লিষ্ট রয় ॥  
 হরণ করিতে তাহা না পারি, তখন ।  
 নিম্নোক্ত বিবিধ রোগ করে উৎপাদন ॥  
 বিভ্রংশ প্রবল হিক্কা, অধার দর্শন  
 কণ্ঠঃ গুরুঃ অবসাদ, নিশ্চয় তখন ॥  
 সিদ্ধি সিন্ন হইলে 'ও' অন্ন মাত্রা তরে ।  
 কিম্বা দীপ্তাগ্নিতা হেতু ঔষধ জীর্ণ করে ॥  
 অথবা শীতভারে আমন্ত্রক হয় ।  
 দোষোৎক্লিষ্ট করে তবে ঔষধ নিচয় ॥  
 নিঃস্রাণিত কবিত্তে না পারিয়া তখন ।  
 উল্লিখিত রোগ সব করে উৎপাদন ॥  
 ঐরূপ অযোগ হ'লে বৈজ্ঞ বুদ্ধিমান ।  
 নিম্নোক্ত চিকিৎসা তরে করিবে বিধান ॥  
 লবণ মিশ্রিত তৈলে অভ্যঙ্গ করিবে ।  
 প্রস্তর-সঙ্কর স্বেদে শ্লিষ্য করি নিবে ॥  
 পুরোষধ খাণ্ড জীর্ণ হইবার পর ।  
 গৌমুত্রে নিরুহ দিতে হইবে তৎপর ॥  
 ধনা মাংস-রস সহ করাবে আহার ।  
 অহম্বসন, বস্তি তরে দিবে পুমর্কার ॥

তৈল মাত্রা-অনুযায়ী মদন, পিপ্পল,  
 দেবদারু কক্ষ কাথে পাকিবে নিভুল,  
 অনন্তর বাতহর তৈলে মিশ্র করে ।  
 স্নাতীক ঔষধ দান করিবে তাহারে ॥  
 ক্ষুধার্ত ও মুহু কোষ্ঠে তীক্ষ্ণ বিরচন ।  
 বিষ্ঠা, পিত্ত, কক্ষ আগে করিবে হরণ ॥  
 ধাতু দ্রবীভূতকারি নিম্নবে তৎপরে ।  
 তাহাতে উহার বল স্বর ক্ষয় করে ॥  
 দাহ, কণ্ঠশোথ আর ক্রান্তি, তৃষ্ণা হয় ।  
 তাকে মিষ্টৌষধে বমি করাবে নিশ্চয় ॥  
 বমনের অতিযোগে দিবে বিরচন ।  
 বিরচন-অতিযোগে মুহুল বমন ॥  
 পরে পরিষেক আদি শীতাবগাহন ।  
 করাবে ভিষক তারে করিবে স্তম্ভন ॥  
 অন্নপানৌষধ, বাহা মধুর কষায় ।  
 শীতল ও রক্তপিত্ত অতিসার যায় ॥  
 দাহ জ্বর বাহা হ'তে হয় নিবারণ ।  
 তাহাই এক্ষণ স্থানে হইবে স্তম্ভন ॥  
 রসাজ্জন, বেণামূল, লোহিত চন্দন ।  
 পেঁচি, ছাগরক্ত-চিনি করিয়া মিলন ॥  
 গুলিয়া করিলে পান লাজ চূর্ণ সহ ।  
 বিরচনে অতিযোগ নাশে নিঃসন্ধি ॥  
 বটাদি বৃক্ষের রক্ত শেয়ার সহিত,  
 সিদ্ধ করি শীতলিয়া মধুর গহিত,  
 কিম্বা মলসংগ্রাহক ঔষধ সহ  
 দ্রব লিখ করি, যাহা দান করিবে



দিরেচনে অতিযোগ হইলে তখন ।  
 জাঙ্গল রসের সহ করিবে ভোজন ॥  
 অতিমারে পিচ্ছাবন্তি করিবে প্রদান ।  
 দুগ্ধ ঘূতে সিদ্ধ স্বাহ্ অমুহাসন দান ॥  
 বমনের অতিযোগে-মুখে, আমাশয়ে ।  
 স্নানীতল জল দিবে তার ক্রমাগত ॥  
 নিম্বক ফলের রসে লাজ শত্ৰু আদি !  
 দূত মধু চিনি যোগে পান করা বিধি ॥  
 সোদাগার বমি ও মুচ্ছা হ'লে মধুসূত ।  
 ধনে, মূতা, যষ্টিমধু, রসাজ্ঞান দেহ ॥  
 বমি হেতু জিহ্বা অন্ত প্রবিষ্ট হইলে ।  
 তিতকর, সিদ্ধ অন্ন নোনা রস দিলে ॥  
 দদগাহী যুষপান, দুগ্ধমাংস রসে ।  
 কবল প্রয়োগ তারে করিবেক শেষে ॥  
 বমি বেগে জিহ্বা যদি বহির্গত হয় ।  
 পিষ্ট তিল কিস্মিস্ কন্ধ লেপে তয় ॥  
 বাগ্ কুপ্ত, বাগ্ রোধ হইলে তাহার ।  
 মেহ শ্বেদ, মাংস সিদ্ধ যবাগ্ আহার ॥  
 বমিত, বা বিরচিত মন্দ্যাদি লজ্জিত ।  
 অগ্নি বল বৃদ্ধি তরে পেয়াদি বিহিত ॥  
 বহু দোষ, ক্লম আর হীনাদি যে জন ।  
 কিম্বা উদাবর্ত্ত রোগে অন্ন বিরচন ॥  
 দোষোৎক্লিষ্ট করি তাতে মার্গ রোধ করে ।  
 অত্যন্ত আখ্যান হয় নাভির উপরে ॥  
 পৃষ্ট পার্শ্ব শিরঃশূল, বিষ্ঠা মূত্র আর ।  
 বায়ুর বিবন্ধ হয় তাহাতে আবার ॥  
 অভ্যঙ্গ, শ্বেদ ও বর্ত্তি তাহাতে বিহিত ।  
 নিরুহ, অমুহাসন, উদাবর্ত্তোচিত ॥  
 সিদ্ধ, গুরুকোষ্ঠ কিম্বা আমদোষে যেই, .  
 শোধন ঔষধ সেবে বলবৎ, সেই ।  
 কিম্বা ক্ষীণ, মূত্র কোষ্ঠ, ক্লান্ত, অন্ন বলে—  
 ঐরূপ ঔষধ পান করে যে সকলে,  
 তার সাম দোষ আশু পায় স্থানে যার ।

তীব্র শূল পিচ্ছারক্কে বেদনা জন্মায় ॥  
 তাহাতে লজ্বন আর পাচন তৎপরে ।  
 কক্ষোষ্ণ লঘু ভোজনে অতিহিত করে ॥  
 আর ক্ষীণ ব্যক্তির ঐ বিষয় হ'লে ।  
 বৃংহনীয়, জীবনীয় ঔষধ সে স্থলে ॥  
 আমাজীর্ণ হেতু যদি বিবন্ধ জন্মায় ।  
 ক্ষারায় লঘু ভোজন প্রশস্ত তাহায় ॥  
 বাতাত্মিক হ'লে পুষ্প কানী মিশ্রিত ।  
 লবণ-দাড়িম-ক্ষার ঘূতে হয় হিত ॥  
 বাতাত্মিকো পান কিম্বা করিবে ভোজন ।  
 দধানে দাড়িমত্বক করিয়া মিশ্রন ॥  
 দেবদারু তিলকন্ধ অথবা তেমন ।  
 উষ্ণ জল সহ পানে হয় প্রশমণ ॥  
 অশ্বথ, যজ্ঞভূমুর, কদম্ব, পাকুড়,  
 দুগ্ধ সিদ্ধ করি পানে হয় তাহা দূর ॥  
 কষায় মধুর দ্রব্যে, পিচ্ছাবন্তি কিবা,  
 যষ্টিমধু সিদ্ধ স্নেহ বস্তি তাকে দিবা ॥  
 বহুদোষে দিলে পরে অন্ন বিরচন ।  
 দোষোৎক্লিষ্ট করিকরে অন্ন নিঃস্রাবন ॥  
 তাতে কণ্ডু, শোথ কুষ্ঠ গুরুতা উদয় ।  
 অগ্নিনাশ উৎক্রেশ স্তৈমিত্য জন্মায় ॥  
 অরুচি, পাণ্ডুতা, শোষ পরিস্রাব হবে ।  
 ত্রিদোষ শমনোষধে প্রশমিত হবে ॥  
 তাতে যদি নহে শাস্তি করাবে বমন ।  
 তদন্তে করিয়া সিদ্ধ তীক্ষ্ণ বিরচন ॥  
 রোগী শুদ্ধ হ'লে পরে চূর্ণ ও আসব ।  
 অরিষ্ট সংস্কৃত যুষ, প্রদানিবে সব ॥  
 ঔষধ সেবিয়া রোগ করিলে ধারণ ।  
 ত্রিদোষ প্রকোপি, করে ছন্দয়ে গমন  
 ঘোরতর ছন্দগ্রহ তাহাতে জন্মায় ।  
 হিকা, খাস, পার্শ্বশূল, দৈন্ত হয় তার  
 দৃষ্টির বিভ্রম, নাসা, দশন দংশন ।  
 দন্ত কিডনিডি ভাব করে উৎপাদন ॥

তাহাতে ভীষক নাহি বিচলিত হবে।  
 রোগীকে তখন শীঘ্র বমন করাবে ॥  
 সিপত্তাপাধিক্য হলে মুচ্ছা ঔষধ মধুর।  
 কফাধিক্যে কটুযোগে করে তাহা দূর ॥  
 তাহাতেও দোষ যদি না হয় নিঃশেষ।  
 পাচক ঔষধে তবে নাশিবেক শেষ ॥  
 ক্ষুধা বজ্রক্লেমে তার করিয়া বর্জন।  
 চিকিৎসক করিবেক কার্য্য সমাপন ॥  
 বায়ু যদি করে তার হৃদয় পীড়ন।  
 স্নিগ্ধায় লবণৌষধে হবে তা শমন ॥  
 পীতৌষধে বমিবৈগ করিলে ধারণ।  
 কুপিত কফেতে বায়ু রোধিয়া তখন !  
 অঙ্গগ্রহ, স্তনু আর বেপথু জন্মায় ॥  
 নিস্তোদোবেষ্টন অতি মুচ্ছা হয় তায় ॥  
 এইরূপ হলে হয় বিবিধ প্রকার।  
 বাত হর ক্রিয়া স্নেহ স্বেদ ব্যবহার ॥  
 লঘুভোজী মুছকোষ্ঠে তীক্ষ্ণ বিরচন।  
 দোষ হরি মস্থিকরে শোণিত হরণ ॥  
 অগ্নে মিশাইয়া তাহা কাক বা কুকুরে,  
 খাওয়াইবে শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষার তরে ॥  
 বিগুদ্র জানিবে যদি করে তা ভক্ষণ ;  
 অভক্ষণে পিত্ত রক্ত বৃদ্ধিবে তখন ॥  
 কিম্বা গুরু বস্ত্রে মাখি লবে শুকাইয়া।  
 দেখিবে তৎপর তাহা জলে প্রক্ষালিয়া ॥  
 বিবর্ণ হইলে তাহা পিত্ত রক্ত হবে।  
 বিগুদ্র হইলে রক্ত বসনে না রবে ॥  
 অভিযোগে তৃষ্ণা মুচ্ছা মত্ততাদি হলে।  
 অম্লিরণ পিত্তহর ক্রিয়া সেই স্থলে ॥  
 মৃগ, গো, মহিষ কিম্বা ছাগল শোণিত  
 পীড়িতাবস্থায় তাহা করিয়া নিঃসৃত,  
 অতিশয় রক্তক্ষয়ে করিলে তা পান।

জীবন লভিবে তাহা জীবাতি সন্ধান ॥  
 কুশ মূল কক্ষে তাহা করিয়া মদিত।  
 বস্তি প্রয়োগেতে আর হয়ে থাকে হিত ॥  
 গাস্তারী, অনন্তমূল, দুর্কা, বীরা, কুল,  
 কক্ষে জলযুক্ত দুগ্ধ চতুর্গুণ তুল,  
 পাক করি তাতে যুত রসায়ন যোগে,  
 শীতলাবস্থায় বস্তি ইহাতে প্রয়োগে।  
 স্নগীতল পিচ্ছাবাস্থি অথবা প্রয়োগী।  
 অমুবাশন যুত মণ্ডে দিবে সেই রোগী ॥  
 অতিশয় বিরচনে গুদভ্রংশ হলে।  
 কষায় বসাবে স্তম্ভী বটানদি বদ্ধলে ॥  
 অতি স্নিগ্ধে সেবে যদি স্নেহ বিরচন।  
 দোষে তাহা বদ্ধ করে মুহূর্ত্তা করণ ॥  
 স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া তখন।  
 স্তনু হস্বে থাকে কিন্তু নহে নিঃসরণ ॥  
 ইহাতে বাত বিবদ্ধ, গুদস্তম্ভ শূল,  
 অন্ন অন্ন সরে মল, না হয় নির্মূল ॥  
 এইরূপে স্থলে তীক্ষ্ণ বস্তি, বিরচন।  
 অথবা প্রশস্ত হয় লজ্জন পান।  
 রুক্ষ অন্নবলে দিলে রুক্ষ বিরচন।  
 ঘোর উপদ্রব করে কুপিত পবন।  
 স্তনু শূল সর্বদেহে হয় ঘোরতর।  
 ইহাতে স্নেহ স্বেদাদি দিবে বাত হর।  
 স্নিগ্ধ গুরু কোষ্ঠে দিলে মুহূ বিরচন।  
 কফোৎক্লিষ্ট পিত্তবাত কথিয়া তখন,  
 তন্ত্রা ও গৌরব, ক্লাস্তি দৌরল্য জন্মায় ॥  
 অঙ্গ অবসাদ হবে নিশ্চয় তাহার ॥  
 পীতৌষধ শীঘ্র ফেলি করাবে বমন।  
 পরে দিবে ক্রমায়ের লজ্জন পাচক।  
 স্নিগ্ধ ও শুক কোষ্ঠতা দূর করি পরে।  
 তীক্ষ্ণ বিরচন দিবে দেহ বোধ করে।

শ্রীরাঙ্গবিহারী রায় কবিকর্তৃক।

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

—:—

ইংলেণ্ডে কবিরাজী ।—শ্রীযুক্ত এস, মিত্র বিলাতের বোরণ্‌মাউথ নগরে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য করিতেছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম । কামানব ভীষণ শব্দে সর্ব শরীর কম্পনের ফলে মাথামণ্ডলীতে বিকার উপস্থিত হইয়াছে— এমন কতকগুলি যোদ্ধাকে তিনি আরোগ্য কবিরায়ন করিয়াছেন । রক্তচাপ ও পারদ বিকৃতির কয়েকটি রোগীকেও তিনি নিরাময় কবিরায়ন করিয়াছেন ।

মাল্‌দাজে কুষ্ঠাশ্রম ।—মাল্‌দাজ প্রেসিডেন্সীর গবর্ণর বাহাদুর সেখানকার কুষ্ঠরোগীদের আশ্রম নির্মাণ ও সেবার ব্যবস্থা করিবার জন্ত উত্তোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম । এই কার্যের সাফল্যের জন্ত ৩০ হাজার টাকা চাঁদ সংগৃহীত হইবে । রামনাদের রাজা বাহাদুরের উপর এই চাঁদ সংগ্রহের ভার অর্পিত হইয়াছে । বাঙ্গালা দেশে এরূপ একটা ব্যবস্থা হয় না ?

বিদ্যৎসভার বিদ্যালয় ।—সহ-যোগী “ধর্মসুত্র” পত্রে প্রকাশ,—বিদ্যৎসভা হইতে এরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে, যে বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অধিক থাকিবে অর্থাৎ বিদ্যৎসভার matriculation পরীক্ষাদানোপযোগী ইংরাজী

ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইবে । এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য—বৈজ্ঞানিক ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইলে আয়ুর্বেদ শিক্ষার পথ তাঁহাদিগের পক্ষে সুগম হইবে । আমরা এই চেষ্টার সাফল্য কামনা করি ।

আয়ুর্বেদ কলেজ সম্বন্ধে “নায়ক” ।—আয়ুর্বেদ কলেজ সম্বন্ধে গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠের ‘নায়ক’ লিখিয়াছেন,—“কলিকাতা আয়ুর্বেদীয় কলেজটির ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে । এই কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে চারি বৎসরে ও সংস্কৃত বিভাগে পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হয়, সুতরাং আর এক বৎসর পরেই বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন । এই কলেজে শলা-শালাকা প্রভৃতি অষ্টাদশ আয়ুর্বেদের শিক্ষা দান করা হয়, সেইজন্য উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ভাক্তারী ও কবিরাজী—উভয় চিকিৎসাতেই কৃতিত্ব দেখাইয়া দেশে সুচিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায় । কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও এই কলেজ এক্ষণে রেজেন্টারিভুক্ত সাধারণের সম্পত্তি । ভারতের নানা প্রদেশের ছাত্র এখানে অধ্যয়নের জন্ত আসিতেছে । এই কলেজের কল্যাণে সুপ্রার্থ আয়ুর্বেদের হৃদয় আবার কিরিত আশা করা যায় ।”

কুষ্ঠরোগে চালমুগ্গরা।—কয়েক মাস পূর্বে কলিকাতা চৌরঙ্গী অঞ্চলে ‘ইয়ংমেন্স ক্রিস্চান অ্যাসোসিয়েশন’ সভার প্রাসাদে কুষ্ঠ-রোগীগণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে এক সভা বসিয়াছিল। ঐ সভায় বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশে সভাপতির আসন অধিকৃত করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বঙ্গেশ্বরের বক্তৃতা হয়। তাহার পর স্যার লিওনার্ড রঞ্জার্স এ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহার এক স্থলে তিনি বলেন, যে,— চাউল মুগ্গরার তৈল ইহাতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় একপ্রকার ঔষধ বাহির করিয়া তিনি কয়েকজন কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। এই ঔষধ প্রস্তুত ব্যাপারে রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর প্রমুখ কয়েকজন রসায়নবিদের কৃতিত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদবেত্তাগণ কিন্তু এই চালমুগ্গরার কুষ্ঠ নাশক গুণ বহুপূর্বেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ‘চাল মুগ্গরা’র অজ্ঞাতম নামই এইজন্ত “কুষ্ঠ বৈরী”। ইহার নামের পর্যায়ে ও গুণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এইরূপ আছে,—

“কুষ্ঠ বৈরী শৈলরোহী মহাগদ মহীকরঃ ॥  
বৈবশ্বতক্রমঃ সস্তাদ বলকুচ রসায়নঃ ॥  
পামা বিচর্জিকা কণ্ডু সিদ্ধোদর্দ বিপাদিকাঃ ।  
হস্তামবাতঃ বাতাস্তঃ কুষ্ঠানি চ বিশেষতঃ ॥  
অস্ত ফলস্ত বীজং তৈলকং, গ্রহণীয়ম্ । বীজস্ত  
মাত্রা ৬ রজ্জিকাঃ, তৈলস্ত ৪ বিন্দুঃ ।  
অর্থং “চালমুগ্গরা”র পর্যায় এইগুলি—কুষ্ঠবৈরী,  
মহাগদ, মহীকর ও বৈবশ্বতক্রম । ইহা বলকর ও  
রসায়ন। পামা, বিচর্জিকা, কণ্ডু, সিদ্ধ, উদর্দ  
বিপাদিকা, আনবাত, বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে,  
আরোজা। ইহার ফলের বীজ ও উহার তৈল ব্যবহার্য্য।  
বীজের মাত্রা ৬ রতি, তৈলের ৪ বিন্দু।

সর্পাঘাতে মুরসী—“জঙ্গীপুর সংবাদে”  
প্রকাশ, —“জঙ্গীপুরে উকীল থানার একজন  
কেরাণী সর্পদংশনে আক্রান্ত হন। একজন  
কাকী তাঁহার ক্ষত স্থানের নিকট দূর দূর

চিরিয়া মুরগী লাগাইতে আরম্ভ করেন।  
ইহাতেই ঐ কেরাণী আরোগ্য লাভ করিয়া-  
ছেন।” এরূপ চিকিৎসা কিন্তু আয়ুর্বেদ  
শাস্ত্রের বহির্ভূত বিষয় নহে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের  
নূতন ব্যবস্থা।—সংপ্রতি অষ্টাঙ্গ আয়ু-  
র্বেদ বিদ্যালয়ের যে নূতন ব্যবস্থা ইহাছে,  
তাহাতে বোর্ড অব ট্রাষ্টার প্রেসিডেন্ট হইয়া-  
ছেন,—আনরেবল সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়  
সরস্বতী এম, এ, ডি এল এবং কলেজ কাউ-  
ন্সিলের প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন—মহামহোপাধ্যায়  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ,  
এল. এম, এস। পাঠকগণ এ সংবাদে নিশ্চয়ই  
সুখী হইবেন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়  
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎ-  
সক সমাজে শল্য-শলাকা প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ আয়ু-  
র্বেদের প্রায় সকল অঙ্গেরই লোপ পাইয়া  
এখনকার দিনে কেবলমাত্র কায় চিকিৎসাই  
চলিয়া আসিতেছে। উহারই জন্ত কিন্তু বর্তমান  
যুগে আয়ুর্বেদ মাথা তুলিতে পারিতেছে না।  
সেইজন্ত সুপ্রপ্রায় আয়ুর্বেদের যুগ আবার  
ফিরাইয়া আনিবার জন্ত জগতের আদিচিকিৎসা  
আয়ুর্বেদের অতীত গৌরব আবার পুনরুদ্ধার  
করিবার জন্ত—ফলমূল্যাদি আর্ঘ্য ঋষিদিগের  
জ্ঞান গভীর গবেষণা যে সমস্ত বিশ্ববাসীকে  
নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করিবার জন্ত এই বিদ্যালয়ের  
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শরীর-স্বাস্থ্য চিকিৎসা  
করিতে হইলে আগেই শরীর-তত্ত্ব জ্ঞানকিন  
কর্তব্য। সেই জন্ত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থগুলি ভিন্ন  
অ্যানাটমী, সার্জারী, ফিজিওলজি, মিজার  
হাউসিগের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ জ্ঞান  
সম্পন্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৩য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—শ্রাবণ ।

১১শ সংখ্যা ।

## কাজের কথা ।

—:~:—

বাঙ্গালীর ব্যাধি ।—আমরা অনেক বাঘি বলিয়াছি সকল প্রকার আধিব্যাধিতে বাঙ্গালী যত ভুগিয়া থাকে, এমন আর কোনো দেশের লোককে ভুগিতে দেখা যায়না। বাঙ্গালীর অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হারও এইজন্ত পৃথিবীর সকল দেশের অপেক্ষা অধিক! ইহার প্রধান কারণ—বাঙ্গালীর মত সংযমবিহীন জাতি পৃথিবীর আর কোনো দেশে নাই। সুসভ্য ইংরাজজাতি—যে জাতির রীতি নীতির অনুকরণের সকলটুকু গ্রহণ করিবার জন্ত আমরা সর্বদা লালসিত হইয়া থাকি, সেই জাতির পঞ্চম বর্ষীয় শিশুটি পর্যন্ত একটা নিয়মের বন্ধনে চলিয়া থাকে। বাঙ্গালীর সেইটিরই অভাব। ইংরাজজাতির মধ্যে দরিদ্রই হউন, মহৎই হউন, সকলের পক্ষেই সকল বিষয়েরই যে নির্দিষ্ট সময় আছে, তাহা কেহ উল্লঙ্ঘন করেনা। ইংরাজ ঠিক সময়ে আহার করিয়া থাকে, ঠিক সময়ে কৰ্ম

করিয়া থাকে; ঠিক সময়ে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর অনেক সময় এই তিনটির মধ্যে কোনোটিরই নিয়ম ঠিক থাকে না। সকল চিকিৎসা শাস্ত্রেই আহার-বিহারের নিয়ম উল্লঙ্ঘন সকলপ্রকার রোগ-উৎপত্তির কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ফলে এখনকার নিয়মবিহীন বাঙ্গালীজাতি তাহারই ফলভোগ করিতেছে।

\* \* \*

নিয়ম লঙ্ঘনের হেতু ।—নিয়ম লঙ্ঘনের প্রধান হেতু এখনকার বাঙ্গালী যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে, তাহাতে তাহার সংকুলান হওয়া শক্ত, কাজেই তাহাকে পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইতে হয়। বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া—অগাধ বিদ্যা অর্জন পূর্বক অনেকে যেরূপ চাকরি করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহার কলিকাতার মত ব্যয়বহুল স্থানে অবস্থিতিপূর্বক সদস্যের প্রতিপালন করা সম্ভব

পর নহে, সেই জন্ত তাঁহাকে ছাত্র পড়াইয়া বা অন্ত কিছু করিয়া প্রাতে অপরাহ্নে—এখন কি রাত্রিতে পর্য্যন্ত অর্থ উপার্জনের পন্থা পরিত্যক্ত করিতে হয়, ফলে একরূপ পরিশ্রমে স্বাস্থ্যের অপচয় স্বভাবতঃই ঘটয়া থাকে। দরিদ্রতার নিম্পীড়নে অর্থ অর্থ করিয়া যাহা দিগকে ব্যক্তিবাস্ত হইতে হয়—তাহাদিগের ভাগ্যে পুষ্টিকর আহাৰ্য্যলাভ যে অসম্ভব—তাহা আর বলিতে হইবে না। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ও পুষ্টিকর আহাৰ্য্যের অভাব—বাস্তালী জাতির স্বাস্থ্যহানির একটা বিশেষ কারণ।

\* \* \*

#### বাস্তালী-ধনীর স্বাস্থ্যহানি।—

তাহার পর দেশের মধ্যে যাহারা বড় লোক—যাহাদিগকে পরিশ্রম করিয়া খাইতে হয় না—তাহাদের মধ্যে অনেকের যে অকাল বান্ধক্য উপস্থিত হইতে দেখা যায়—তাহার কারণও সংশয়ের অভাব। প্রভূত সম্পদের অধিকারী করিয়া দৃষ্টিস্তার হাত হইতে ভগবান তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিলে কি হইবে,—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত যে সকল নিয়ম পালনের আবশ্যক, অনেক সময়ই তাঁহারা তাহার বিধ ঘটাইয়া থাকেন। পুষ্টিকর আহাৰ্য্য—তাঁহাদের ভাগ্যে যথেষ্ট জুটিয়া থাকে—কিন্তু যেক্রম পরিশ্রম করিলে সেই আহাৰ্য্য পরিপাক প্রাপ্ত হয়—দেশের ধনকুবেরদিগের অনেকেরই তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই। ইংরাজ জাতি—যাহাদিগের অশ্রুতকরণ-স্রোতে আজি বঙ্গজননী মগ্নপ্রায়া হইয়া পড়িয়াছেন—কায়িক পরিশ্রম যে স্বাস্থ্যোন্নতির মূল, সে কথাটা তাঁহারা ভালরূপই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী-গরীবের সংসার প্রতি পালনের জন্ত কায়িক পরিশ্রমের অবসর নাই—

আর বাঙ্গালী কুবেরদিগের আলস্য পরতন্ত্রতাব জন্ত তাহার সুযোগ নাই। ইহার উপর বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির ফলেও অনেকে স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটাইয়া থাকেন। ফলে আলস্য পরতন্ত্রতা এবং বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তিব ফলই বাঙ্গালী ধনীর স্বাস্থ্যহানির কারণ।

\* \* \*

#### আগেকার বাঙ্গালী।—আগেকার

বাঙ্গালী তো একরূপ ছিল না, সেইজন্ত আগেকার বাঙ্গালীরা এত রোগেও ভুগিত না। ধনী দরিদ্রের স্থিতি যে দেশে শুধু এখনই হইয়াছে,—আগে ছিল না, তাহা নহে, সেকালেও দরিদ্রকে খাটিয়া খাইতে হইত—কিন্তু একরূপ ভাবে নহে। তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি—এখন সংসার প্রতিপালনের জন্ত অর্থের প্রয়োজন এত বেশী হইয়াছে যে, সমস্ত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম না করিলে উপায় নাই। আর বড়লোকদিগের কথা—সেকালে আমাদের দেশে একালের মত একরূপ ব্যসনবাত্যা উপস্থিত হয় নাই সুতরাং সেকালে দেশের বড়লোকদিগের মতিগতিও বিলাস-বাসনায় প্রবাহিত হইত না। সেকালে ধনী দরিদ্র সকলেই প্রত্যুষে শয্যাভ্যাগ করিতেন—সে শয্যাভ্যাগের পর এখনকার মত চায়ের বাটি তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত না, শয্যাভ্যাগের পর হস্তযুগ্মাদি প্রকালন করা হইলে, সকলেই আয়ুর্ভুক্তিকর তৈলের অভ্যঙ্গ করিয়া মানের ব্যবস্থা করিতেন। গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্গালা দেশে সে প্রাতঃমানে দেহ স্নিগ্ধের জন্ত অমৃত সেবনের ফল কলিত। তাহার পর পূজা অর্জনা শেষ করিয়া যে জলযোগের ব্যবস্থা হইত, তাহাতে স্নিগ্ধ—অথচ পুষ্টিকর দ্রব্যের ব্যবস্থা হইত। যাহার অল্প জলযোগ দ্রুতি না, সেও এক বাটি দারোয়ক হৃৎ পার করিত।

এখন সে ছুটু পান তো ছুটু প্রাপ্তির অভাবে একেবারেই অসম্ভব। ফলে বাঙ্গালীর এই পরিবর্তন স্রোতঃই বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্যহীন করিয়া তুলিয়াছে।

বাঙ্গালী মহিলা।—বাঙ্গালীমহিলারা ও সকালে যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, এখন তাহাবও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যে সংসারের অবস্থা উন্নত, সে সংসারের মহিলাদিগকে নটক নবেল পাঠ এবং সীবন-বনন কার্যাদি গৃহস্থলীর কোনো পরিশ্রমের কার্যাই কবিত হইয়া না—পাচকে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে, পুরুষদিগের মত মহিলাদিগকেও থালা ভারীয়া সাজাইয়া দিতেছে,—দাসদাসীতে গৃহস্থলীর অত্যন্ত কষ্ট নির্বাহ করিতেছে,—আব মালঙ্গাগণ আরাম-কেদারায় অধিষ্ঠান পূর্বক স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয় ঘটাইতেছেন। ফলে এই গৃহস্থলীর কষ্ট হইতে বিরত থাকিয়া পাকস্থলীর ক্রিয়ার যে ব্যতিক্রমের কারণ কবিত হইতেছেন—তাহারই ফল হইতেছে—কলিকাতায় বাঙ্গালী পুরুষ অপেক্ষা বাঙ্গালী মহিলায় যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধির কারণ। বাঙ্গালীর সগন্ধি সম্পন্ন গৃহে বঙ্গমহিলার যক্ষ্মারোগের প্রাবল্য এই কারণে, আর বাঙ্গালী-দর্শিত্রের মধ্যে যক্ষ্মারোগে বঙ্গ মহিলা কাল কবলিত হইতেছেন—আলোক রোজ-বায়ু হীন বাড়ীতে বাস করিয়া এবং তাঁহাদিগকে গৃহস্থলীর কষ্ট নির্বাহে যে পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হয়—তাহার উপযুক্ত আহাৰ্য্য না পাইয়া। অনেক পুরুষের আয় সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য আয়েও তাঁহারা সপরিবারে কলিকাতা বাসের জন্য যে সামান্য বাড়ীতে বাস করেন, তাহা অব্যাহার লীলাভূমি। ফলে নানা

কারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে সকল চিন্তা ফেলিয়া আগে এ সকল বিষয়ের চিন্তায় ননোনিবেশ করা কৰ্ত্তব্য।

চিন্তার সমাধান।—এ চিন্তার সমাধান করিবার উপায় কিন্তু এখনো যথেষ্ট আছে, তবে তাহার জন্য বাঙ্গালী পুরুষ যে মার্গ অনুসরণ করিয়াছেন; তাহা হইতে তাঁহাকে অন্য সরণী অবলম্বন করিতে হইবে, প্রবৃত্তিকে একটু দমন করিয়া কুটি পরিবর্তনে অভ্যস্ত হইতে হইবে,—বাঙ্গালীকে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাৰ্য্যোপলক্ষে যাহাদিগকে কলিকাতায় থাকিতে হয়, তাঁহাদিগকে আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুত্রকলত্রের জন্য আবার পিতৃপিতামহের ভিতায় শঙ্কস্বনি পূর্বক সন্ধ্যা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালী পুরুষকে তো পাটিতেই হইবে, তাহার পক্ষে তো আয়ের পরিমাণ সামান্য হইলেও সহরে বাস না করিয়া উপায় নাই, তা' ছাড়া একাকী থাকিলে সে নিজের বাসোপযোগী একটা মার্জ উৎকৃষ্ট ঘর ভাড়া লইয়াও বাস করিলে পারিবে। কিন্তু তাহা না করিয়া আপাতমধুর-সুখকামনায় সগোষ্ঠি একত্র থাকিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিয়ালাভ কি!

কর্তব্য নির্দেশ।—তাই বলিতেছি, দরিদ্র বঙ্গবাসী ভ্রাতৃবন্দ, এখনও সাবধান হও;—উপেক্ষার হাস্য আস্য বিকাশপূর্বক আর উড়াইয়া দিলে চলিবেনা—দেশের কথা স্মরণ পূর্বক বিশেষ-বাসের স্পৃহা পরিত্যাগ কর, জননী জন্মভূমি দর্শনের সঙ্কল্প করিয়া পরিবার-ধর্মের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত্নবান হও। পল্লীপ্রাণে

ম্যালেরিয়া, কিন্তু ম্যালেরিয়া কি কলিকাতায় নাই? গত অক্টোবর হইতে জালুয়ারি পর্যন্ত সরকারী রিপোর্টে সে কথা সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে; তা' ছাড়া গত বৎসর কলিকাতায় ইন্ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীটা কিরূপ হইয়াছিল, সে কথাটাও স্বরণ করিও। পল্লীজননী ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি—এ কথা সত্য, কিন্তু সেই ম্যালেরিয়ার নিবারণকল্পে

দীর্ঘিকা পুঙ্খনিপাতের সংস্কারের জন্ত প্রয়াস করিলে, বনজঙ্গলগুলি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিলে—পল্লীরক্ষার উপায় করা যাইতে পারে। ইহাতে তো স্বাস্থ্যরক্ষারও উপায় হয়ই,—তা' ছাড়া কিঞ্চিৎ সংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এসব কথা বাঙ্গালীর আর ভাল লাগিবে কি? রুচি-পরিবর্তনে বাঙ্গালী যে এখন হাবু ডুব খাইতেছে!

শ্রীসত্যচরণ মেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

## আয়ুর্বেদের কথা।

—:০:—

আয়ুর্বেদ বলিলে আমরা কি বুঝি? স্বাধিক বা স্বাধিকল্প মহাআগণের জ্ঞানগবেষণার ফল নানাবিধ হিন্দু-চিকিৎসা গ্রন্থকেই আমরা আয়ুর্বেদ সংজ্ঞাপ্রদান করি এবং তদ্বক্তৃ চিকিৎসাপদ্ধতিতেই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আয়ুর্বেদের এই অর্থ একদিন সার্থক ছিল,—যেদিন এই ভারতীয় আয়ুর্বেদ ব্যতীত অন্যত্র এ বিজ্ঞান অস্তিত্বই ছিলনা। এখন কিন্তু আর সে দিন নাই, এখন নানা দেশে, নানা ভাষায় আমাদেরই এই ভারতীয় হিন্দু-চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া চিকিৎসাসাশ্ত্র রচিত হইয়াছে। সুতরাং এখন আয়ুর্বেদ বলিলে কেবল হিন্দু চিকিৎসাপদ্ধতিকে বুঝিলে আয়ুর্বেদের অর্থ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করা হয়। সত্যতঃ আয়ুর্বেদের জ্ঞান অধিক—তাহাই

আয়ুর্বেদ,—তা' সে ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রবৃত্তি হউক—অথবা দেশান্তরের জ্ঞানানুমোদিত হউক! কিম্বা দেবভাষায় লিখিতই হউক বা দেশান্তরের মানবীয় ভাষাতেই বিরচিত হউক! যাহাতে দেখিব—শারীরতত্ত্বের আলোচনা আছে, ভৈষজ্যতত্ত্বের বীমাংসা আছে, রোগ ও আরোগ্যের বিররণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকেই আয়ুর্বেদ বলিয়া বুঝিব এবং তাহাকেই আয়ুর্বেদ বলিয়া মানিব; তা' সে স্বদেশী হউক বা বিদেশী হউক!

সকল দেশের আয়ুর্বেদবিদ্যাই আয়ুর্বেদ নামে পরিচিত হইলেও, অন্যান্য ধর্ম হইতে যেমন হিন্দুধর্মের কিছু বিশিষ্টতা আছে, তদ্রূপ আয়ুর্বেদেরও তেমনই কিছু বিশিষ্টতা পল্লী লক্ষিত হয়, এবং এইরূপ বিশিষ্টতার কারণেই হিন্দু ধর্মের মতই আয়ুর্বেদে বিশিষ্টতা পল্লী



করিয়াও, নিজে অপরের নিকট উপেক্ষিত ও নিম্নিত হইয়া বর্তমান আছে। ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দু বংশধরগণও কেহ কেহ বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্রহ্মবিজ্ঞাপূর্ণ ধর্মের মতই এই আয়ুর্বেদকে নিম্নাসন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। আবার কেহ কেহ ইহাকে এত উদ্ধে তুলিয়া ধরেন যে, সাধারণের দৃষ্টি-শক্তি তত উদ্ধে পৌঁছিতেই পারেনা!

যাহারা আয়ুর্বেদকে এইরূপ উদ্ধে তুলিয়া মূল গৌরব অর্জনের প্রয়াসী, তাহারা ইহাকে একেবারেই অপরিবর্তনীয় বলিয়া প্রচার করেন। তাহাদের যুক্তি এই যে, “অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন আর্ধ্যঋষিগণের সাধনার ফল এই আয়ুর্বেদ সর্বকালে সর্বদেশে সর্ব-জনের প্রতিই সমানভাবে প্রযজ্য। যে ইহাকে পরিবর্তনের প্রস্তাব করে, সে বাতুল ও মূর্খ। এই আর্ধ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়াছে—পরকে দান করিবার জন্ত,—পরের নিকট হইতে গ্রহণ করিবার জন্ত নয়। কারণ ইহার যাঁহা আঁচে, তদ্ব্যতীত অপরের এমন আর কিছুই নাই—যাঁহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ শাস্ত্র অনন্ত কালের জন্ত পূর্ণ।”

আর একদল লোক আছেন, যাহারা আর্ধ্য আয়ুর্বেদকে লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি উদ্ধে সংস্থাপিত না করিয়া, মানব সমাজের মধ্যেই সংস্থাপনপূর্বক যুগোপযোগী পরিবর্তন-পরিবর্তনাদি করিয়া মানবের ব্যবহারোপযোগী করিতে চাহেন। ইহারা বলেন, এমন কোন ব্যবহারিক বিজ্ঞান নাই, যাহা যুগে যুগে অপরিবর্তনীয়। এমন যে সনাতন ধর্ম, ইহার বিধিব্যবস্থাকে যুগোপযোগী পরিবর্তন করিয়া

লইবার জন্তই ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয়। সুদূর অতীতের বৈদিক যুগ হইতে এই সে দিনের চৈতন্য যুগ পর্যন্ত ধর্মের কত পরিবর্তনই হইয়া গিয়াছে! তাহাতে সনাতন ধর্মের গৌরব কি কিছু কমিয়াছে? ভেমনই এই আর্ধ্য আয়ুর্বেদকে যদি সময়োপ-যোগী করিয়া লইবার চেষ্টা করা যায়, তাহাতে আয়ুর্বেদের গৌরব কমিবেনা ত বটেই; বরং তাহার গৌরব বৃদ্ধিই হইবে। ঋষিপ্রোক্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঔষধাদির যৈরূপ মাত্রা লিখিত হইয়াছে, আজকাল ক্ষীণবীৰ্য্য মানবমণ্ডলীর জন্ত কি তদনুসারে মাত্রা লিখিত হইতে পারে? হইলে হয়ত অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত ফলের আশঙ্কা আছে। স্তত্রাং এরূপ স্থলে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রই ইচ্ছানুসারে এইরূপ পরিবর্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু অল্প কোনরূপ পরিবর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই, আয়ুর্বেদকে চির অপরিবর্তনীয় বলিয়া প্রচার করিতে বন্ধ করেন। পুরাতন আয়ুর্বেদাচার্যগণও “কিরঙ্গ রোগ” আয়ুর্বেদে গ্রহণ করিতে বিধাবোধ করেন নাই; কিন্তু সেই ঋষিপ্রতিম আচার্যগণের তুলনায় যাহারা নিতান্তই নগণ্য, তাহারাও এক্ষণে অন্তদেশের কোন বিষয় গ্রহণ করিতে নিতান্তই নারাজ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গোপনে গ্রহণ করিলেও প্রকাশে তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না! এ আশ্ববক্কা আর কত-দিন চলিবে জানি না এবং এই আশ্ববক্কার দ্বারা আয়ুর্বেদকে কতদূর গৌরবাহিত করা যাইবে তাহাও বুঝি না!

আমাদের চিকিৎসাপদ্ধতি আমাদের শরীরের আয়ুর্বেদ—বিশেষতঃ চিকিৎসাপদ্ধতির

অত্যাধিক এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকবৃন্দের অনন্যবোধে কিছুদিনের জন্ত নিতান্তই হীন-প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় আবার তাহার গৌরব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইবার শুভ সুযোগ উপস্থিত হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়। জানি না ভগবান ভারতবাসীর জন্ত ভারতবর্ষে কবে সে শুভদিন আনয়ন করিবেন।

ভারতবর্ষের গৌরব আয়ুর্বেদকে আবার আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে প্রচার করিতে হইলে, এক্ষণে প্রচলিত বৈদেশিক চিকিৎসা পদ্ধতির সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। কেবল মৌখিক প্রতিযোগিতা বা বিবিধ প্রকার বাকবিজ্ঞাসের দ্বারা আয়ুর্বেদের প্রচার হইবে না—হইতে পারে না। আয়ুর্বেদের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, প্রতিযোগিতায় অপরকে পরাজিত করিতে হইবে, কৰ্ম্মের সাফল্য দেখাইতে হইবে। বৈদেশিক চিকিৎসা পদ্ধতি এক্ষণে দেশের গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাকে স্থানচ্যুত করা কেবল মৌখিক উপদেশের দ্বারা হইতে পারে না, এ কথা সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে। অল্প চিকিৎসার আমাদের আয়ুর্বেদ বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে, ইহা তো আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই! শুনিয়াছি আয়ুর্বেদে এই অল্পচিকিৎসার বিধি ব্যবস্থা ভালরূপই ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার পঠন পাঠন, শিক্ষা দীক্ষা, সব বিলুপ্ত হইয়াছে। কৰ্ম্ম—কৰ্ম্মক্ষেত্রে হইতে লোপ পাইয়াছে, আছে কেবল অতীতের স্মৃতি। কিন্তু সেই পুরাতন স্মৃতি কি এই কৰ্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় আয়ুর্বেদের পূর্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে? আমাদের তো তাহা বোধ হয় না। শারীর বিজ্ঞানে এবং

অস্ত্রোপচারে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে কেবল স্বপ্নের শ্লোক আবৃত্তি করিলে প্রতিযোগিতায় পরাজয় অনিবার্য। হইতেছেও তাই। দিন দিন আয়ুর্বেদকে পশ্চাতে ফেলিয়া বৈদেশিক শল্যতন্ত্র অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন পূর্বক সগৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। আর ভৈষজ্য বিজ্ঞানে বা ঔষধ প্রকরণে হোমিওপ্যাথিক প্রণালী আয়ুর্বেদকে পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। তাহার গতি দেখিয়া বোধ হয় যে, স্বদূর ভবিষ্যতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি উভয় প্রণালীকেই পশ্চাতে ফেলিয়া হোমিওপ্যাথি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে। আমাদের এই আয়ুর্বেদকে তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে তাহার নতই সর্বপ্রকারে সুলভ হইতে হইবে। বিবিধপ্রকার পাচনের আয়োজন করণ এবং তিনবার ঔষধ সেবনের জন্ত ছয় প্রকার চূর্ণ ও নয় প্রকার স্বরসের সংগ্রহ করা বিশেষ আয়াস সাধ্য কার্য, দেশের লোক এরূপ আয়াস স্বীকার করিতে পারিত—যখন ইহার অপেক্ষা আর কোন সহজ সাধ্য উপায় ছিলনা, কিন্তু এখন অল্পাল্প চিকিৎসা প্রণালী বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথির সহজপন্থা পরিভ্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? এই আয়োজনের হিসাবেও হোমিওপ্যাথির ঝট্টাট কম, সুতরাং সুলভ, আর মূল্যে তা কতাই নাই। এত সুলভে ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে—ইহা বোধ হয় কল্পনাতেও আনা যায় না। কিন্তু উপকারিতার এ প্রণালী আমাদের অপেক্ষা কোন অংশেই নান্দে, বরং অনেক স্থলে অধিক বলিয়াই বোধ হয়। অতএব

আয়ুর্বেদের এই হোমিওপ্যাথির সহিত প্রতি  
যোগিতায় দাঁড়াইতে হইলে ঔষধ সেবনের  
আয়োজন কনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে,  
এবং প্রচার করিতে হইলে হোমিওপ্যাথিক-  
চিকিৎসা পুস্তকের মত সরল ভাষায় রোগের  
লক্ষণ অমুখ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে,  
যাহা দেখিয়া সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও  
বিপদের সময় আয়ুর্বেদীয় ঔষধ নির্বাচন  
করিতে পারে। আমি বতদূর জানি, মনে  
হয় যেন আয়ুর্বেদের সকল পুস্তকই পুরাতন  
প্রণালী ক্রমে লিখিত হইয়া থাকে। এক  
খণ্ডীয় কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের  
আয়ুর্বেদ সোপান কিছু নূতনভাবে লেখা ছিল  
বটে, কিন্তু তাহাও হোমিওপ্যাথির মত লক্ষণ  
অমুখ্য নহে। আর্ঘ্য আয়ুর্বেদের দ্বারা দেশকে  
নিয়মিত করিতে হইলে, যাহাদের লইয়া দেশ  
দেই চির দরিদ্র পল্লীবাসী কৃষককুলের পূর্ণ  
কুটরে ঔষধ পছন্দাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে  
হইবে। যখন কাল-কলারার কবলে পতিত  
হইয়া পল্লীগুলি ধ্বংস হইতে থাকে—যখন  
মার্গেরিয়ার জঠরায়িতে পল্লীবাসী দগ্ধ হইতে  
থাকে, তখন পল্লীগুলিকে রক্ষা করিয়া পল্লী-  
বাসী পীড়িতগণকে উদ্ধার করিবার জন্ত  
মহামতি ধর্মস্ত্রীর নাম স্মরণপূর্বক সেটু  
নিরন্ন ব্যাধিবিমুক্তজনগণের কুটির দ্বারে  
ঔষধ পথ্য লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা-

দিগকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা  
দিগের রোগ-প্রতীকারের আয়োজন করিতে  
হইবে। তবে আবার এই ভারতবর্ষে আর্ঘ্য  
আয়ুর্বেদের গৌরবমহিমা বাড়িয়া উঠিবে।  
নতুবা নগরে আড়ম্বরপূর্ণ ঔষধালয় স্থাপন  
করিয়া ধনবানের খেরালপূর্ণকরতঃ আপনার  
পকেটপূর্ণ করিলেই আর্ঘ্য আয়ুর্বেদের প্রচার  
ও গৌরববন্ধন হইবে না। বরং এই উপায়ে  
চিকিৎসকের সম্পদ সম্ভার বাড়িয়া উঠিলেও  
আর্ঘ্য আয়ুর্বেদকে ডুবাওয়া দেওয়া হইবে।

এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে—হিন্দুর দেশে,  
আমরা হিন্দু চিকিৎসা পদ্ধতিরই পক্ষপাতী,  
তাই আজ বিজ্ঞ ও বহুজ্ঞ কবিরাজ মণ্ডলীর  
নিকট এই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছি।  
ভরসা করি, তাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষ-  
গণের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক সর্বপ্রকার  
পীড়িতের সহায়, বিপন্নের উদ্ধার কর্তা ও  
দরিদ্রের বন্ধু রূপে আর্ঘ্য আয়ুর্বেদের আলো-  
চনায় প্রবৃত্ত হইবেন। কেবল অর্থের আকাঙ্ক্ষা-  
ও বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহের কামনা লইয়া  
কার্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে, বাসনা পূর্ণ হইতে  
পারে; কিন্তু আর্ঘ্য আয়ুর্বেদের উন্নতি হইবে  
বলিয়া বোধ করি না এবং দেশের কিছু উপ-  
কার হইবে বলিয়াও বিবেচনা করি না।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

## জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা ।

—:~:—

( পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর )

মণ্ড, পেয়া ও বিলেপীর সাধারণ নাম জ্বর আহারে অভ্যস্ত, তাহার দিক পরিমাণ  
যথাগুণ। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ চাউলের চাউল গুঁড়া করিয়া লইয়া যথাগুণ প্রস্তুত

করিতে হয়। উক্ত চাউলের চতুর্দশ গুণ জলের সহিত মণ্ড ছয়গুণ জলের সহিত পেয়া এবং তারগুণ জলের সহিত বিলেপী পাক করিতে হয়। মণ্ডে সিটা থাকে না, পেয়ার অল্প সিটা থাকে এবং বিলেপীতে প্রচুর সিটা ও অল্প তরল অংশ থাকে।

আজকাল জরে যে সাণ্ড, বালি সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহাও যবাগু। কেবল উপাদানের প্রভেদ মাত্র।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে জরের প্রথম সাত দিন তরুণাবস্থা। এই তরুণাবস্থার উপবাস দিবার বিধি আছে। কিন্তু উহা অবস্থা ভেদে। সন্নিপাত জরে যখন তিন রাত্রি বা পাঁচ রাত্রি উপবাস দিবার কথা বলা হইয়াছে, তখন উক্ত ব্যবস্থার পরে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে ইহা বুঝা যাইতেছে। ঋষি-বলিয়াছেন,—

লজ্বন, স্বেদ, যবাগু এবং তিক্ত রস—এই সমস্ত তরুণ জরে অপক দোষের পাচক।

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে তরুণ জরেও যবাগু হিতকর। সুতরাং তরুণ জরের কাল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সম্যক উপবাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই যবাগু পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। জরের আম বা তরুণাবস্থার বিচার প্রধানতঃ ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে। সে কথা পরে বলা যাইবে।

শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

অমুবাদ—জরের প্রথমে লজ্বণ, জরের মধ্যাবস্থায়, পাচন, জরের শেষ অবস্থায় ঔষধ এবং জ্বর স্তম্ভির পর বিরচন পথ্য।

অপিচ:—

জরের প্রথম সাতদিন তরুণ জর, আট হইতে বারদিন পর্য্যন্ত মধ্য জর এবং বার দিনের পর পুরাণ জর বলিয়া কথিত।

এই উভয় যুক্তি দ্বারা জরের প্রথম সাত দিন লজ্বণ ঋষিদিগের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে জরের তরুণাবস্থায় যবাগু প্রয়োগ শাস্ত্র সম্মত।

নবজরে একমাত্র যবাগুই পথ্য। দালৈব যুগ প্রভৃতি মধ্য জরে পথ্য দিতে হয়। কেননা তরুণ জরে বৈদ্যাল আমিষ প্রভৃতি নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখানেও বলিতেছি যে সাতদিন কাল সাধারণতঃ জরের তরুণ অবস্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও যদি এই কালের মধ্যে নিরাম জরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে দালৈব যুগ প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

যবাগু, জরে এবম্বিধ হিতকর হইলেও মদাতায়ে নিত্য মত্ত পায়ীর জরে, গ্রীষ্ম-কালীন জরে, পিত্ত ও কফ প্রধান জরে এবং উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে যবাগু নিষিদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রে প্রথমে তর্পণ প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ চূর্ণ জর নাশক ফলের রস বা কাথ এবং মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পথ্য দেওয়াকে তর্পণ বলে। ধর্জুব, কিসমিস, দাড়িম, পিয়ারা ও ফলসা প্রভৃতি জর নাশক ফলের দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিতে হয়। কিসমিসের দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিতে হইলে এক ছটাক কিসমিস দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইবে এবং কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে ঐ চূর্ণ চার তোলা, চিনি বা মিছরীর শুঁড়া এক তোলা এবং মধু এক তোলা মিশ্রিত করিয়া গইতে হয়। এইরূপে অন্ত্যন্ত ফলের কাথের সহিত এবং দাড়িমের রসের সহিত তর্পণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জর, উপবাস

এবং লজ্জন বায়ু জনিত জ্বরে নিষিদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রে দীপ্তায়িরোগীকে মাংসযুষ্মের সহিত অন্ন পথ্য দেওয়া হিতকর। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ঔষধ সহ সিদ্ধ যবাগু হিতকর। এইরূপে ঔষধ সহ সিদ্ধ যবাগু প্রয়োগে যে মহান উপকার হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জগতের আর কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে এরূপ স্বন্দর পথ্য প্রয়োগের প্রণালী দেখা যায় না, দুঃখের বিষয় এই সকল পথ্য অস্বাদু বলিয়া পরম হিতকর হইলেও এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর কখন এরূপ পথ্যের প্রচলন হইবে কিনা তাহাও সন্দেহ। আমরা আয়ুর্বেদানভিজ্ঞ পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত কয়েকটা এইরূপ পথ্যের বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

(১) পিপ্পল এবং গুঁঠ সহ খৈয়ের মণ্ড সহজই পরিপাক হয় বলিয়া ক্ষুধা থাকিলে অন্নায়ি বিশিষ্ট রোগীকেও দেওয়া যাইতে পারে। ইহা জ্বর নাশক।

২। মস্তক, পার্শ্বদেশ ও বস্তিতে বেদনা থাকিলে—গোকুর ও কণ্টকারীর সহিত সিদ্ধ রক্তশালি তণ্ডুলের পেয়া হিতকর।

(৩) কোষ্ঠবদ্ধতা ও কোষ্ঠে বেদনা থাকিলেও কিসমিস, পিপ্পলমূল চৈ, চিতামূল এবং গুঁঠ সহ সিদ্ধ পেয়া হিতকর।

(৪) স্বল্প পঞ্চমূল অর্থাৎ শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোকুর ইহাদিগের সহিত সিদ্ধ পেয়া বাতপিত্ত জ্বর নাশক।

(৫) মহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেলছাল, গাম্ভারী ছাল, শোণা ছাল, পাকুল ছাল ও গণিয়ারী ছাল—ইহাদিগের সহিত সিদ্ধ পেয়া বাতশ্লেষ্ম জ্বর নাশক।

প্রাণ—২

(৬) স্বল্প পঞ্চমূল ও মহৎ পঞ্চমূল সহ সিদ্ধ পেয়া ত্রিদোষজ জ্বর নাশক।

(৭) ধনে ও পিপ্পলের সহিত সিদ্ধ পেয়া পিত্ত শ্লেষ্ম জ্বর নাশক।

এই সকল দ্রব্যের সহিত মাংসের যুষ বা দালের যুষও পাক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বহুবিধ যোগের বিষয় আয়ুর্বেদে লিখিত আছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় উদ্ধৃত করা হইল না। যবাগু পাকের নিয়ম দুই প্রকার, যথা কাথসাধ্য ও কন্ধসাধ্য। কাথসাধ্য যবাগু প্রস্তুত করিতে হইলে যড়ঙ্গ পানীয়ের নিয়মে দুই তোলা ঔষধ চার সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া লইবে এবং সেই কাথের সহিত মণ্ডাদি পাক করিয়া লইবে।

কন্ধ সাধ্য যবাগু প্রস্তুত করিতে হইলে ঔষধ এক তোলা বা আধ তোলা পেষণ করিয়া বা চূর্ণ করিয়া আবশ্যক মত চাউল চূর্ণ এবং চাউল চূর্ণের চতুর্থ গুণ, ছয় গুণ (পেয়া) বা চারিগুণ (বিলেপী) জল সহ একত্র সিদ্ধ করিবে। পরে মণ্ড পেয়াদির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া লইবে।

ঔষধ দ্রব্য তিন প্রকার, যথা তীক্ষ্ণবীৰ্য্য (যেমন গুঁঠপিপ্পল প্রভৃতি), মধ্যবীৰ্য্য (যেমন বেলছাল, শোনা ছাল প্রভৃতি) এবং মৃদুবীৰ্য্য (যেমন আমলকী প্রভৃতি)। শাস্ত্রে তীক্ষ্ণ দ্রব্য দুই তোলা, মধ্যবীৰ্য্য দ্রব্য চার তোলা এবং মৃদুবীৰ্য্য দ্রব্য আট তোলা লইবার নিয়ম আছে। ইহা কন্ধসাধ্য যবাগু সম্বন্ধে, কাথ সাধ্য যবাগুতে ঔষধ আট তোলা হইতে রক্তিশ তোলা লইবার নিয়ম দেখা যায়। কিন্তু এখনকার স্বল্পপ্রাণ বোকেব পক্ষে পূর্বোক্ত কাথসাধ্য যবাগুর পরিমাণ সম্বন্ধে

দ্রব্য লইয়া কাণ সাধ্য যবাগু প্রস্তুত করা কর্তব্য। আর কবসাধ্য যবাগুর নির্দিষ্ট পরিমাণের চতুর্থাংশ পরিমাণ ঔষধ লইয়া কঙ্কসাধ্য যবাগু প্রস্তুত করা উচিত।

কেবল জ্বর বলিয়া নহে আয়ুর্বেদে প্রায় সকল রোগেই এইরূপ ঔষধ সিদ্ধ যবাগু প্রয়োগের বিধি আছে এবং এই সকল যবাগু সেই সকল রোগে মহোপকারী। কিন্তু এইরূপ পথ্য প্রয়োগের একটী দোষ যে অরুচি জন্মায়। “বৃন্দ”—ঔষধের মাত্রা কম ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তরুণ জরে যে একমাত্র যবাগুই প্রযোজ্য এবং দালের যুগ প্রভৃতি মধ্য জরে পথ্য তাহা চরকে বিশেষরূপে প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

“বতদিন জ্বর মুহূর্ত্তাবাপন্ন না হয় অথবা ছয় দিন পর্যন্ত—বিচক্ষণ ব্যক্তি মণ্ড পৈয়াদি পথ্য দিবেন। সমিধের দ্বারা যে অগ্নি দীপ্ত হয়, মণ্ডাদি সেবন দ্বারা জঠরাগ্নিও সেইরূপ দীপ্ত হইয়া থাকে।……অনন্তর সান্ন্য (অর্থাৎ যে ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ খাদ্য আহার করিতে অভ্যস্ত এবং বাহ্য তাহার পক্ষে হিতকর, এবং অগ্নি বলের প্রুতি লক্ষ্য রাখিয়া তর্পণ জীর্ণ হইলে পাতলা মুগের যুগ বা জাঙ্গলরসের সহিত পথ্য দিবে।

মুগ, মন্দুর, ছোলা, কুলথ কলায় ও মুগের যুগ নবজররোগীর পক্ষে হিতকর, বেগুন, সজিনার ডাঁটা, উচ্ছে, বেতের ডগা, পটোল, কাঁকরোল, পলতা, কচি মুলা, তিক্ত শাক, নটে শাক এবং গুজেরা শাক মধ্য জরে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। ফলের মধ্যে দাড়িম, কিসমিস ও বৈচি এবং পূর্ক কথিত খেজুর, ফলসা ফল প্রভৃতি সুপথ্য।

মধ্য জরে অন্ন (ভাত) পথ্য নহে। চরকে মধ্য জরে যুগাদি প্রয়োগের সঙ্গে বলা হইয়াছে যে, পুরাতন শালি ও যষ্টিক তণ্ডুলের যবাগু জ্বর নাশক বলিয়া জরিতব্যক্তিকে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু তরুণ জরে যে অতি লঘু মণ্ড প্রয়োগেব ব্যবস্থা আছে; মধ্য জরে তাহা না দিয়া পেয়া ও বিলেপী ক্রমশঃ দেওয়া উচিত।

পূর্কে বলা হইয়াছে যে, সান্ন্য ও অগ্নি বল লক্ষ্য করিয়া মধ্য জরে পথ্য দিবে। শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্য (দালের যুগ, শাক প্রভৃতি) পথ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এতদ্ব্যতীত গণের পক্ষে সান্ন্য হইলে মাংসভোজী যুরোপীর জাতির পক্ষে সান্ন্য নহে। সুতরাং একজন জরিত যুরোপীয়কে পথ্য দিতে হইলে মাংসের যুগ দেওয়া উচিত।

পূর্কে যে সকল রোগীকে যবাগু প্রয়োগ নিষেধ করিয়া তর্পণ পথ্য দিবার কথা বলা হইয়াছে, ঐ সকল রোগীকে দাড়িমানির রস দ্বারা মিশ্রিত জাঙ্গল মাংসের যুগ দিবার বিধি আছে।

সুশ্রুতের মতে মন্দাগ্নি বিশিষ্ট রোগীকে পুরাতন মত্ত এবং যবান্ন (যবকৃত খাদ্য) আহার করিতে দেওয়া হিতকর।

পুরাণ জরে অর্থাৎ জ্বর উৎপন্ন হইবার দ্বাদশ দিন পরে লাঘ, গৌর তিথির বৃক্ষবর্ণ হরিণ; চিত্র হরিণ ও চতুঃশৃঙ্গ বিশিষ্ট হরিণের মাংসের যুগ পথ্য দিবে। সারস, কুহুট ও ত্রিতিরের মাংস গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক ঐ সকল জ্বর রোগীকে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু লজ্জনের জ্বর অত্যন্ত হ্রাস হইলে তাহা ও মাত্রা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

মাংস বায়ুনাশক, বলবদ্ধক এবং পুষ্টিকর বলিয়া পুরাণ জরে মাংসের যুগ বিশেষ হিতকর। মধ্য জরে যে সকল পথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও পুরাণ জরে প্রয়োজ্য, তদ্ব্যতীত গোদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ এবং অবস্থা বিবেচনায় যত পুবাণ জরে পথ্য দিবার উপদেশ আছে।

পুবাণ জরে অন্ন (ভাত) পথ্য কি না? এক্ষণে দেখা যায় যে, কি আয়ুর্বেদীয়—কি ভিন্ন, সমগ্র দেশের চিকিৎসক রোগী সম্পূর্ণ জ্বর মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ন প্রয়োগ করেন না। বৎসর অবতারণার পর দুই এক দিন রুচী প্রভৃতি পথ্য দিয়া পরে অন্ন আহাৰ করিতে দেন। শাস্ত্রেও পুরাণ জরে অন্ন পথ্য দিবার কোন উপদেশ নাই। অতএব পুরাণ জরে চরক দ্ব্যত পান করিবার উপদেশ আছে।  
যথা:—

“কষায়, বমন, লজ্বন, এবং লঘুভোজন দ্বাৰা যে, রুক্ষ রোগীর জ্বর প্রশমিত না হয়, চিকিৎসক তাহাকে দ্ব্যত প্রয়োগ করিবেন।

কিন্তু এক্ষণে এইরূপ দ্ব্যত প্রয়োগের প্রথা নাই। ইহাৰ কারণ কি? প্রধানতঃ ইহার দুইটা কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ পূর্বে লোকে দ্ব্যতসামান্য ছিল এবং নিত্য প্রচুর দ্ব্যত সেবন করিত বলিয়া উহার প্রয়োগ সহ হইত। কিন্তু এক্ষণে লোকে দ্ব্যত সামান্য হইলেও নিত্য যথেষ্ট সেবন করিতে পার না এবং দ্ব্যত প্রয়োগ সহ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জাঙ্গল দেশে শরীরের বেরূপ শীঘ্র রুক্ষ হয় এবং কফের দোষ নষ্ট হয় বঙ্গের ছাত্র আনন্দ দেশে তাহা হয় না। আর এইরূপ না ঘটিলে দ্ব্যত প্রয়োগ করাও সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন:—

দশদিন অতীত হইলেও রোগীর শরীরে যদি সম্যক লজ্বনের লক্ষণ সকল প্রকাশ না পায় এবং কফের প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে দ্ব্যত পান না করিয়া দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

জীর্ণ জ্বর ও বিষম জ্বরের অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব কথিত পথ্য সকল প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বর প্রবল হইলে নবজ্বরের নিয়ম পালন করা কর্তব্য। জ্বর প্রবল হইলেই অগ্নিবল ক্ষীণ হয় এবং শারীরিক যন্ত্র সকলের ক্রিয়া সূচ্যরূপে সম্পন্ন হয়। জীর্ণ জ্বরে পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন:—

“দেহস্থ ধাতু সকলের (রসর জাদি) দৌর্বল্য বশতঃ জীর্ণ জ্বর হইয়া থাকে। সুতরাং জীর্ণ জ্বরগ্রস্ত রোগীকে পুষ্টিকর আহাৰ দিবে। অবশ্য এখানে পুষ্টিকর আহাৰ অর্থে পোলাও কালিয়া নহে, মাংসের যুগ, দালের যুগ, দুগ্ধ প্রভৃতি। জীর্ণ ও বিষম জ্বরে জ্বর প্রবল না হইলে অথবা কফের প্রকোপ না থাকিলে অন্নভোজী পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। এ স্থলে জানা উচিত যে, জীর্ণ জ্বর ও বিষম জ্বরে বিবিধ উপসর্গ ঘটিয়া থাকে? সেই সকল উপসর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পথ্য প্রয়োগ করা কর্তব্য।”

জ্বরে রোগীকে অধিক উপবাস দিয়া তাহার বলক্ষয় করা উচিত নহে—সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত বলিয়াই শাস্ত্রকার নিশ্চিত হইতে পারেন নাই; পুনরায় বলিয়াছেন:—

“জরিত ব্যক্তির অরুচি হইলেও হিতকর খাদ্য সেবন করা উচিত। কেননা, যখন সময়ে আহাৰ না করিলে রোগী ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অরোগী গুরুদ্রব্য অভিযান্দী দ্রব্য এবং অকালে ভোজন করিবে না। অহিতকর দ্রব্য ভোজন করিলে তাহা আয়ু ও সুখপ্রদ হয় না।

অহিতকর দ্রব্য যখন এইরূপ নিষেধ করা হইয়াছে, তখন অহিতকর দ্রব্য প্রয়োগ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু দারুণ অরুচির জন্ত রোগী যদি সুপথ্য সেবন করিতে না পারিয়া ক্ষীণ হইতে থাকে এবং সামান্য কুপথ্য সহিত যদি কিঞ্চিৎ সুপথ্য আহার করিতে পারে—এরূপ সামান্য কুপথ্য দেওয়া সম্ভব বলিয়াই আনন্দের মনে হয়।

অরিত ও অর মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অপরাহ্নে ভোজন করা প্রশস্ত। কেননা সেই সময়ে শৈশ্যার ক্ষয় হওয়ায় অগ্নিপ্রবল হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি যে সময়ে আহারে অভ্যস্ত, সেই সময়েই তাহার ক্ষুধা বোধ হয় এবং সেই সময় অতীত হইলে ক্ষুধা নষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্ত ভোজনকালে ক্ষুধার উদ্বেক হইলে সেই সময়েই আহার দেওয়া কর্তব্য।

নিত্য একপ্রকার খাদ্য আহার করায় এবং খাদ্য স্বাদ নহে বলিয়া যদি পথ্যের প্রতি বিরাগ জন্মে, তাহা হইলে বাহাতে রোগীর রুচি জন্মে এরূপ ভাবে পথ্য প্রস্তুত করিবে।

অরে পথ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত আয়ুর্বেদের একটা বিধম মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নবজরে বথেষ্ট দুগ্ধও পথ্য দিয়া থাকেন। কিন্তু আয়ুর্বেদ বলেন—

জীর্ণ অরে বলক্ষীণ হইলে দুগ্ধ অমৃতের ত্রায় হিতকর। কিন্তু উহা তরুণ অরে প্রযুক্ত হইলে মনুষ্যকে বিবেকহীন বিনষ্ট করিয়া থাকে।

দুগ্ধ মধুর, মিষ্ট, পিচ্ছিল ও প্রেম্যবর্ধক বলিয়া নবজরে দুগ্ধ প্রশস্ত নহে। দুগ্ধ নবজরে

প্রযুক্ত হইলে শরীরের অধিকতর শুকতা জন্মায়, স্বেদবাহী শ্রোতঃ সকলকে রুদ্ধ করে, অগ্নি দুর্বল থাকায় সূচ্যরূপে পরিপাক প্রাপ্ত না হওয়ায় আরও আমদোষের বৃদ্ধি করে। এইজন্ত বিবিধ রোগে সুপথ্য এবং মনুষ্যের জীবন স্বরূপ হইলেও দুগ্ধ নবজরে অপথ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

নবজরে দুগ্ধ প্রয়োগের অপকারিতা আমরা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একটা নাত্র রোগীর বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

রোগীর বয়স ২৫২৬ বৎসর। আদিয়া বলিল যে, অর হইয়াছে, ৪৫ দিন হইল, অর ছাড়ে না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এল, এস, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বিলাত হইতে ডাক্তারী উপাধি লইয়া প্রত্যগত হইয়া অল্প বয়স্ক ডাক্তার দেখিতেছে। অল্প পথ্য না দিয়া প্রত্যহ দেড় সের, দুই সের দুগ্ধ পথ্য দেওয়া হইতেছে। দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া এবং জলসাপু ও জল বালি খাইতে বলিয়া ঔষধ দিলাম। রোগী তিন দিন পরে আদিয়া বলিল যে, ঔষধ খাই নাই, অর ছাড়িয়া গিয়াছে।

এ ক্ষেত্রে দুগ্ধই যে অর আটকাইয়া রাখিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঠাহারা নবজবে দুগ্ধ প্রয়োগেব পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আমরা এ বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। দুইটা তুল্য অরবেগবিশিষ্ট রোগীর একটাকে দুগ্ধ এবং একটাকে অপর খাদ্য দিয়া দেখিলে সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদের বৃহৎ বিশ্বাস—যিনি এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনি কখনই অর নবজরে দুগ্ধ প্রয়োগ করিবেন না।

(বিশেষ)  
—পারস্যের পারস্যের



## মেদ রুদ্বি।

—:—:—

অনেক কুশকায় ব্যক্তির মোটা হইবার সাধ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের শরীরে কোন ব্যাধি নাই, বলও যথেষ্ট আছে, শরীর বেশ শ্রমক্ষম, কিন্তু গঠনের কুশতা বশতঃ তাহারা দুঃখিত। তাঁহাদের অতিপ্রায় যে, দেখানি বেশ নাড়স-মুড়স হইবে, গণেশের মত দু'ভিটা হইবে। এমন কি মোটা হইবার জন্য তাঁহারা ঔষধ খাইতে এবং মেদোৎপাদক পথ্য গ্রহণেও ক্রটি করেন না। এইরূপ কপিত গিয়া কাহারও কাহারও এত মেদাধিক্য হইয়া পড়ে যে, জীবনের আশঙ্কায় আবার মেদ কনাইবার জন্য চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ স্বভাবতঃই মোটা, ক্রমে এত মোটা হন যে, একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়েন। এমন কি নিজের শরীর বহনেও অক্ষম হইয়া পড়েন। মেদরুদ্বির সঙ্গে সঙ্গে রক্তের তারলা কমিয়া যায় ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। স্ততরাং রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া মূঢ় হইয়া আসে। এমন কি হৃৎপিণ্ড মেদোন্ময় হইয়া হঠাৎ উহার ক্রিয়া বন্ধ প্রযুক্ত আকস্মিক মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। ক্ষুদ্রমেদাধিক্য হইয়া শ্বাসরোধেও মৃত্যু হইতে পারে। স্ততরাং মোটা হওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর বই হিতকর নহে। শুধু স্বাস্থ্যগতিক নহে; একেবারে প্রাণসংশয়কর। কিন্তু ঘাঁহারা দুর্বল, (কোন রোগ বশতঃই হউক বা ধাতুগত কারণেই হউক) তাঁহারা বলপূর্বক ঔষধ সেবন করিতে

পারেন। বলবদ্ধন ও মেদোৎপাদন দুইটা পৃথক জিনিষ। কুশব্যক্তিও যথেষ্ট বলশালী হইতে পারেন এবং মোটা লোকও যৎপরো-নাতি দুর্বল হইতে পারেন। তবে দৌর্বল্য বশতঃ যদি শরীর কুশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বলবদ্ধক ঔষধ সেবন ও পুষ্টিকর পথ্য গ্রহণে বলসঞ্চার হইলেই ক্রমশঃ কুশতা নষ্ট হইয়া পূর্ব গঠন লাভ হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া মেদরুদ্বির চেষ্টা করা যুক্তি সঙ্গত নহে। অনেক সময় আহারাদির দোষে স্বভাবতঃই মেদাধিক্য ঘটয়া থাকে। মেদরুদ্বি স্থের জিনিষ নহে, ইহাও পীড়া বিশেষ। ইংরাজিতে এই পীড়াকে ওবেসিটি (obesity) বলে।

এই পীড়া সকল বয়সেই হয়। কিন্তু শৈশবাবস্থায় এবং চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়সে ইহার আধিক্য দেখা যায়। এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যেই ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ঋতু বদলের সময় অর্থাৎ ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে হইতে দেখা যায়।

এই রোগ নির্ণয়ের জন্য লক্ষণাবলী বর্ণনার আবশ্যক ক্রুরে না। রোগীকে দেখিবামাত্রই ইহার উপলব্ধি লইতে পারে। ইহার প্রথম চিহ্ন শরীরের আয়তন বৃদ্ধি। সেই সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন ধীর ও আয়াস-সাধ্য হয়। পদক্ষেপে মধুরগতি হয়। ক্রমে হৃৎপিণ্ডের ও শ্বাস-যন্ত্রের ক্রিয়াপাত্য্য মৃদু এবং শ্বাসকষ্টের লক্ষণ প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি

হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে উহার মধ্যে মেদসঞ্চয় হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, ধমনী সমূহের কাঠিন্য বৃদ্ধি হয়। মুত্র গ্রন্থির পীড়া কিম্বা বহুমূত্রও হইতে দেখা যায়, ঘর্ম্ম অতিরিক্ত হয়। অল্প পরিশ্রমেই শ্বাসকুচ্ছতা ও হৃৎকম্প হয়।

এই রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, ইহা কোলিক, অর্থাৎ পূর্ব পুরুষের মধ্যে কাহারও এই পীড়া থাকিলে তাঁহার সন্তান সন্ততিদের মধ্যে পুরুষাত্মকমে এই পীড়া হইতে দেখা যায়; এই মত কতদূর ভিত্তি মূলক বলিতে পারি না। তবে কোন কোন স্থলে নির্দিষ্ট বংশের মধ্যে পুরুষাত্মকমে কয়েক জনের এই পীড়া হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার কারণ কুলগত কি না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং অনুসন্ধান দ্বারা এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যে, বংশের এক জনের যে উত্তেজক কারণে (exciting cause) রোগোৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার বংশধরগণের মধ্যে অপর আক্রান্ত ব্যক্তিদের ও সেই কারণ বর্তমান। কারণ নিবারণ করিলে তাঁহারাও এই রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। এরূপ স্থলে ইহাকে ঠিক কুলগত বলা যায় না। এ রোগের প্রধান কারণ অতিভোজন ও শ্রমহীনতা। গঠনের স্থূলতা কতকটা কুলগত বটে। এই স্থূলতা মেদবৃদ্ধি জনিতও হইতে পারে, অথবা মাংসবৃদ্ধি জনিতও হইতে পারে। আহার ও শ্রমের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিলে মেদসঞ্চয় (fatty infiltration) না হইয়া মাংসবৃদ্ধি (muscular development) হইতে পারে।

সাধ্য তাহা নহে, বরং অধিকাংশ স্থলেই হ্রারোগা দেখা যায়। একবার মেদবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে, উহার বন্ধনশীলতা কমান বড়ই দুঃকর। তবে আহাৰাদিব দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অতিবন্ধন কিম্বা পরিমাণে দমন করা যাইতে পারে। বাঁহাদের বংশে এই বোগ বর্তমান, তাঁহারা প্রথম হইতে প্রতি-বেধক উপায়াবলী অবলম্বন করিয়া ইহার আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

এই বোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, নিম্নলিখিত ৪টা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(১ম) আহাৰ হাস, বিশেষতঃ মেদোৎপাদক খাদ্য না খাওয়া।

(২য়) মাংসপেশীর ক্রিয়া বৃদ্ধি।

(৩য়) রক্তকণিকার বর্দ্ধন সাধন।

(৪র্থ) দেহাভ্যন্তরে অধিক পরিমাণে অল্পজান উৎপাদন।

এই চারিটার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পরিলে প্রায়ই এ রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু এগুলি কার্যে পরিণত করা দুঃকর হয় বলিয়া এ রোগ হ্রারোগা বলিয়া বর্ণিত হয়।

আহার কমাতে হইলে বিশেষ সতর্কতার সন্ধি কমান আবশ্যক। বাহাতে রোগী দুর্বল ও রক্তহীন না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যদি রক্তহীনতা হয় অথচ মেদ না কমে, তাহা হইলে অত্যন্ত ভয়ের কারণ। আহার এরূপ ভাবে কমাতে হইবে—বাহাতে শরীরের বল ও গুরুত্ব না কমে অথচ মেদ বৃদ্ধি হইতে না পারে। উপবাস দ্বারা রোগ আরোগ্যের চেষ্টা করিবে না, তাহাতে আরও কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। আহারের পরিমাণ

এই রোগ সঙ্কল সময়েই যে আহার

না কমায়া তাহার দ্বারা

এ কাঁচা সফল হইতে পারে। যথা দ্রুত, ছানা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি মেদোৎপাদক খাদ্য ত্যাগ করিলে ক্রমশঃ স্থূলতা কমান যাইতে পারে। সর্বপ্রকারের হরিদ্রব তরকারি ও অল্প ফল বিশেষ উপযোগী। চাউল ও ময়দা অল্প পরিমাণে খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দ্রুত ও চিনি সংযুক্ত করিবেন না। কঠিন খাদ্যের পরিমাণ যত কমাইতে পারা যায় ও পান্যদ্রব্য বৃদ্ধি করা যায়, ততই ভাল।

কেবল আহারের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। মেদোৎপাদক খাদ্য না খাইলে মেদ জন্মিতে পারে না বটে, কিন্তু দক্ষিত মেদের অপচয় হওয়া আবশ্যক। তজ্জগৎ নাঃপেশীব ক্রিয়া বৃদ্ধি অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম নিত্য প্রয়োজন। তাহা বলিয়া অতিরিক্ত বা সাদাচাঁত পরিশ্রম করা উচিত নহে। কায়িক শ্রম বা ব্যায়াম প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতরূপে করিতে হইবে। প্রথমে অতি সংজ্ঞায়ে ব্যায়াম আরম্ভ করিতে হইবে। ক্রমে অল্প অল্প করিয়া উহার পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। যাহারা অতিরিক্ত মোটা—তাগদেব হৃৎপিণ্ড ও মেদসঞ্চয় বশতঃ উঠাব যান্ত্রিক ক্রিয়া বড়ই দুর্বল। সুতরাং একবারে অতিরিক্ত শ্রম আরম্ভ করিলে

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আকস্মিক মৃত্যু হইতে পারে। সেইজন্ত ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া ব্যায়াম সহ্য করান আবশ্যক। বেড়ান, নৌকা চালান, কাঠ কাটা, পাহাড়ে উঠা, বাইসিকাল চড়া প্রভৃতি ব্যায়াম মন্দ নহে।

রক্ত কণিকার বর্ধনসাধনের জন্ত তৃপ্তযুক্ত ঔষধাদি সেবন করা আবশ্যক। সাধারণতঃ লৌহ ঘটিত ঔষধ বিশেষ উপযোগী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করেন। এ বিষয় চিকিৎসকের নিজের বিবেচ্য।

দেহাভ্যন্তরে অল্পজান বৃদ্ধির জন্ত বিপুল বায়ু সেবন আবশ্যক। অনাবৃত স্থানে বিচরণ বা সাঁচাচা ব্যায়াম মন্দ নহে। গৃহ মধ্যে ব্যায়াম করিলে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। ব্যায়াম অনাবৃত স্থানে করা আবশ্যক। শ্বাস বস্তুর ব্যায়াম অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ বিশেষ উপযোগী। হিন্দুর প্রাণায়াম পদ্ধতি ইহার সুন্দর আদর্শ। যাহারা ইহাতে অনভ্যস্ত তাঁহারা বিশেষ সূতর্কতার সহিত এ ব্যায়াম অভ্যাস করিবেন।

এই সকল উপায়াবলম্বনে মেদসঞ্চয় কমাইতে পারা যায়। অতএব যাহারা দুর্বল বা অসুস্থ নহেন, অথচ কৃশ, তাঁহারা যেন কৃশতার জন্ত ক্ষোভ না করেন।

ডাঃ শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস।

## পঞ্চকর্ম ব্যাপদ।

[ডাক্তার কবিরাজ সংবাদ]

(পূর্বানুবৃত্তি)

ক। আচ্ছা পঞ্চকর্মের বিষয় যা' ত'নলেন, তা'তে আপনার কি মনে হয় ?

ডাঃ। সে কথা আমি এখন বলছি। ব্যাসের কথা তুমি জানো ?

ক। আচ্ছা তা' হলে ব্যাপদের কথা শুনুন। প্রথমে বমন ও বিরেচনের কথা বলছি। বমন বিরেচনের অত্যন্ত ব্যাপদ একই রকম, কেবল বমনের গতি উর্দ্ধ দিকে আর বিরেচনের গতি অধোদিকে এই—ব্যাপদের মাত্র প্রভেদ। সূত্রতঃ গ্রন্থে পনের রকম ব্যাপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ডাঃ। অতঃ প্রস্থে কম বেশী আছে নাকি ?

ক। কম-বেশী প্রকৃত পক্ষে নাই, কেবল বলবার রীতিগত প্রভেদ বলে মনে হয়। পূর্বে বলেছি যে সূত্রতঃ ধূমপানের বিধি পাঁচ রকম আর চরক তিন রকম বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু সূত্রতঃ যে ছ'রকম বেশী—সে ছোটো চরকের তিন প্রকার ধূমপানের অন্ত বিভাগ মাত্র। কাজেই কম বেশী হলেও ফলে এক।

ডাঃ। বুঝতে পেরেছি আপনি বলে যান।

ক। প্রথমে বমনকারক ঔষধ যদি অধোদিকে যায় এবং বিরেচন ঔষধ অধোগামী না হ'য়ে যদি উর্দ্ধগামী হয়—তা হলে কি করা উচিত তাই বলছি। অত্যন্ত ক্ষুধিত, অতি তীব্র অগ্নি বিশিষ্ট, মুহূ কোষ্ঠ বা দুর্বল ব্যক্তি বমন কারক ঔষধ সেবন ক'রলে যদি অধোদিকে গমন করে, এরূপ অবস্থায় বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির জন্ত রোগীকে প্রথমে স্নেহ প্রয়োগ ক'রে পরে তীব্রতর বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বমি করাবে। আবার যদি উৎক্লিষ্ট স্নেহের আধিক্য বশতঃ আমাশয় অশোষিত থাকে, কিংবা ভুক্ত্যন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হ'তে ব্যাকী থাকে, তা'হলে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করলে পরে অধোগতি না হয়ে উর্দ্ধ গতি হয়ে

থাকে। অগ্নির বিরেচক অধিক মাত্রায় সেবন করলেও এই দোষ ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে অবিগুদ্ধ আমাশয়যুক্ত এবং অধিক স্নেহযুক্ত রোগীকে বমন করিয়ে তীব্রতর বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করে বিরেচন করাবে। অগ্নির বিরেচক ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করার জন্ত এরূপ ঘটলে পুনরায় মুখপ্রিয় বিরেচক অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় বার যদি এইরূপ ঘটে, তা হলে আবার তৃতীয় বার বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করবে। মধু, যত এবং পাতলা আকের গুড় একত্রে লেহন করিয়ে বিরেচন করাবে।

অল্প মাত্র ঔষধ দোষের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যদি দেহের উর্দ্ধভাগে বা অধোভাগে থাকে এবং দোষকে স্থানচ্যুত ক'রতে না পারে, তা হলে পিপাসা, পার্শ্বদেশে শূলাদি, বমি, মুচ্ছা, শব্দ স্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা, গা বমি বমি করা, শরীরের শানি এবং ঔষধের গন্ধযুক্ত টেকুর উঠা এই সকল উপদ্রব উৎপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে উষ্ণ জল পান করিয়ে বমন করাবে।

ক্রুর কোষ্ঠ ব্যক্তির, অত্যন্ত তীব্রাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অল্পাংশ বিশিষ্ট ঔষধ স্নেহের ভাষ্য পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বদ্ধিত দোষ যথাকালে নির্গত হয় না এবং তজ্জন্ত ব্যাধির বৃদ্ধি ও বলহানি হয়ে থাকে এরূপ অবস্থায় প্রচুর এবং তীব্র ঔষধ সেবন বা বিরেচক প্রয়োগ করবে।

স্নেহ ও স্নেহ প্রয়োগ না করে অল্প ঔষধ প্রয়োগ করলে অরম্যক বোঝে নষ্ট হয়। বমন কারক ঔষধ এইভাবে প্রয়োগ করলে দোষের শেষ থাকে না, বমি করে বমি করে

বমন, ত্রাস, হৃদয়ের অশুদ্ধি এবং ব্যাধির বৃদ্ধি ঘটে। এরূপ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বমন ক'রাবে। আর বিরচন ঔষধ প্রয়োগ ক'রে দোষের শেষ থাকলে মলদ্বারের শূলুনি, পেটফোলা, নাখা ভার, অধোবায়ুর অনির্গম এবং ব্যাধির বৃদ্ধি হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ ক'রে, অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বিরচন করা'বে। এটা হ'ল হীন দোষের কারণ ব্যাপদ। এইবার বাতশূল-ব্যাপদের কথা বলছি।

স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ না ক'রে ক্রম ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে অথবা মৈথুনরত ব্যক্তিকে ক্রম ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে বায়ু কুপিত হয় এবং সেই কুপিত বায়ু পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, কটী, ঘাড়ের শিরা ও হৃদয়ে শূলবদ্ বেদনা, মূর্ছা, ভ্রম, ও সংজ্ঞানাশ উৎপন্ন ক'রে। এরূপ স্থলে রোগীকে স্নেহ দ্বারা অভ্যঙ্গ করে ধান্য-স্বেদ দিয়ে বস্ত্রদ্বন্দ্ব সহ পাক করা শীতল তৈলের অম্বাধান প্রয়োগ করা উচিত।

ডাঃ। বমন বিরচন উভয়ের বাতশূল ব্যাপদের কি এই একরূপ লক্ষণ এবং চিকিৎসা?

ক। হাঁ, যেখানে অন্তরূপ উল্লেখ না থাকে, সেখানে এক রকমই বুঝতে হ'বে, কেননা প্রথমেই বলা হ'য়েছে যে, উভয়ের ব্যাপদ উৎপত্তি অধোগতি ভিন্ন সমস্তই এক প্রকার।

এইবার আরোগ্যের কথা বলিতেছি। স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ না ক'রে অন্ন বা ক্রম ঔষধ বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে তাহা উর্দ্ধ বা অধোদিক দিয়ে নিঃসৃত হয় না এবং দোষ

সকলকে উৎক্লিষ্ট ক'রে ও তাহার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বলক্ষয় করে। ইহাতে পেটবেদনা তৃষ্ণা, মূর্ছা ও দাহ উপদর্গ ঘটে। এরূপ অবস্থায় লবণ মিশ্রিত মদন ফলের ক্কাথ দ্বারা বমন করা'বে এবং তীক্ষ্ণতর ক'র্পূর প্রয়োগ ক'রে বিরচন করা'বে। আবার যে ব্যক্তির সহজে বমন হয় না, যে ব্যক্তির বমনকারক ঔষধ সেবন করলে অল্প বমন হয় এবং সেই ঔষধ দোষ সকলকে উৎক্লিষ্ট ক'রে শরীরে কণ্ডু, শোথ, কুষ্ঠ, বেদনা উৎপন্ন করে, এরূপ স্থলে অবশিষ্ট দোষ তীক্ষ্ণ-ঔষধ প্রয়োগ না ক'রে বিরচন প্রয়োগ ক'রলে অল্প বিরচন হয়—এবং নাভির অধোভাগে উদরের পূর্ণতা ও স্তব্ধতা, বোধ হয় এবং মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি হয়। এইরূপ অবস্থায় আক্ষালন প্রয়োগ করে পুনরায় স্নেহস্বেদ এবং বিরচন করা'বে, তাহার পর তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করে বিরচন করা'বে। দোষ উপযুক্তরূপে নিঃসৃত না হলে এবং সংশোধন ঔষধ দ্রষ্ট ভাবে কোষ্ঠে থাকলে বিরচনের উদ্ভেজনার জন্ত ঔষধ—জল পান করা'বে এবং হাত গরম করে পার্শ্বদেশে ও উদরে স্বেদ দিবে। এরূপ করলে দোষ নির্গত হয়। বহু দোষযুক্ত ব্যক্তির অল্প বিরচন প্রয়োগে শরীরে মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি হয়। এরূপ অবস্থায় আত্মপান প্রয়োগ ক'রে পুনরায় মেহপান এবং তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ ক'রে বিরচন করতে দোষ উপযুক্ত রূপে নিঃসৃত না হলে এবং সংশোধন ঔষধ দ্রষ্ট ভাবে কোষ্ঠে থাকলে বিরচনের উদ্ভেজনার জন্ত উষ্ণজল পান করা'বে এবং হাত গরম করে পার্শ্বদেশে ও উদরে স্বেদ দিবে। এরূপ ক'রলে দোষ নির্গত হয়। বহু দোষযুক্ত

ব্যক্তির অন্ন বিরেচন হ'য়ে যদি ঔষধ জীর্ণ হয়ে যায়, তা'হলে দিবসের শেষভাগে রোগীর বলের প্রতি লক্ষ্য রেখে পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ ক'রবে। ইহাতেও যদি দোষের নিবৃত্তি না হয়, তা'হলে দশ দিন পরে স্নেহ ও শ্বেদ প্রয়োগ ক'রে পুনরায় বিরেচন ক'রাবে। রোগী দুর্বল ও বাহার সহজে বিরেচন হয় না—সেক্ষেপ হলে আত্মপান প্রয়োগ ক'রে, পুনরায় স্নেহপান করিয়ে বিরেচন ক'রাবে।

এইবার অতিযোগের বিষয় বলছি, অতিশয় স্নেহ ও শ্বেদ প্রয়োগের পর অথবা অত্যন্ত মুদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে অধিক মাত্রায় বা তাঁক্ষ ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে অতিযোগ হয়, বমনের অতিযোগ ঘটে, অত্যন্ত পিত্ত নিঃসরণ, বল ক্ষয় এবং অত্যন্ত বাবুর প্রকোপ হয়। এক্ষেপ অবস্থায় শরীরে দ্রুত মর্দন ক'রে শীতল জলে অবগাহন करावे এবং শর্করা ও চিনি মিশ্রিত হিতকর লেহ পথ্য দিবে। বিরেচনের অতিযোগ হ'লে অত্যন্ত কফনিঃসৃত হয় ও শেষে রক্ত ভেদ হয়, বলের হানি ঘটে এবং বায়ু অত্যন্ত কুপিত হয়। এক্ষেপ অবস্থায় রোগীকে অত্যন্ত শীতল জলে অবগাহন करावे বা রোগীর শরীরে শীতল জল সেচন करावे এবং শীতল চেলুনি জল মধু মিশ্রিত ক'রে পান করিয়ে বমন करावे। অনন্তর পিচ্ছাবন্তি প্রয়োগ করে হৃৎ স্রুত দ্বারা অনুवासन প্রয়োগ करावे। চেলুনি জল সহ প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি ঔষধ পান ক'রতে দেবে এবং হৃৎ বা মাংস রস পথ্য দেবে।

ডাক্তার। আচ্ছা অতিযোগে কি সমস্ত গুলোই ক'রতে হবে। যদি শীতল জল সেবন করলে আর বমন করলে অতিযোগের লক্ষণ দূর হয়, তা'হলেও কি

অনুवासন পিচ্ছাবন্তি প্রভৃতি প্রয়োগ ক'রতে হবে?

কবিরাজ। না, তা হ'বে কেন। যোগ গুলোই ওষুদ্ব দিতে হয়। যোগ না থাকলে ওষুদ্ব দেবার আবশ্যক কি, তবে ততক্ষণ ক্রমশঃ ঐ সকল ক্রিয়া ক'রতে হ'বে।

ডাঃ। ভাল আর একথা কথা,—পূর্বে বলা হয়েছে যে, বিরেচনের সাত দিন পরে বন্তিক্রিয়া করতে হয়, এ স্থলেও কি তাই করতে হবে? আর যোগবন্তি বেক্ষেপ অচিরাৎ প্রয়োগ করার নিয়ম, সেইরূপ করতে হবে?

ক। তাও কি কখন হয়? রোগী অতিরিক্ত বিরেচনের ফলে মাথা ঘেঁতে বসেছে সে স্থলে কি অপেক্ষা করা চলে? আর এক্ষেপ অবস্থায় দুর্বল রোগীর পক্ষে—তাই একটা বন্তি—তাও কম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। নইলে রোগী সহ ক'রতে পারবে কেন? পিচ্ছাবন্তি দিলে যদি উপসর্গ নষ্ট হয়, তবে দুটি দেবার আবশ্যক নেই।

ডাঃ। আচ্ছা বুঝেছি, এইবার অন্য কথা বলুন।

ক। বমনের অতিযোগ হেতু যদি ধূংস সন্ধে রক্ত উঠে বা রক্ত বমি হয়, জিহ্বা নির্গত হয়ে পড়ে বা ভিতরে প্রবেশ করে, চক্ষু বহির্গত হয়, চোয়াল ধরে যায়, পিপাসা, হিক্কা, জ্বর ও সংজ্ঞানাহার, তবে জীবদান ব্যাপদ বলে। এই অবস্থায় রোগীকে ছাগলের রক্ত, রক্ত চন্দন, বেগার মূল, রসায়ন ও ঐ—চিনি ও জলে গুলে পান ক'রতে হয়। আর রক্তপিত্তের বিধান অনুসারে চিকিৎসা করতে হয়। হৃৎ ও জাম্বল-মাংসের রস পথ্য দিতে হয়।

জিহ্বা অত্যন্ত নির্গত হয়ে প'ড়লে—উঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণের চূর্ণ দ্বারা ঘষণ করে কিম্বা তিল ও কিসমিস বাটা মাখিয়ে মদন ক'রে ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়ে দেবে। আর জিহ্বা ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে গেলে তাহার সম্মুখে লোভজনক অন্নদ্রব্য আত্মদান করাবে। ইহাতে জিহ্বা লালাশ্রাব হেতু মৃত হয়ে স্বস্থানে অবস্থিত হয়। চক্ষু বহির্গত হয়ে পড়লে ঘৃত মাখিয়ে শীতল ক'রে বধ্যস্থানে প্রবিষ্ট করাবে। চোয়াল ধরে গেলে বাতশ্লেষ্মানাশক নস্য এবং শ্বেদ প্রয়োগ কববে। তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রবে তৃষ্ণাদি প্রশমক প্রক্রিয়া করবে। রোগী সংজ্ঞাহীন হলে বাণী, বাণী ও সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ কববে।

ডাঃ। এটা কি রকম হল কবিরাজ মশায়? রোগী অজ্ঞান হলে গান শোনে কে?

ক। বিশেষ অজ্ঞায় কিছু হয় নি। এতে আর সন্মাস রোগের অচৈতন্য হওয়া নব, যে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করবার বিধান থাকবে। এতে অতিরিক্ত ঘমন হ'য়ে রোগী এবং রোগীর ইন্দ্রিয় শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এক্রপ স্থলে সঙ্গীতাদির ধ্বনি দ্বারা চেতনার উদ্বোধন হয়। এই মনে করুন—ঘুমের সময়েও মানুষের জ্ঞান থাকে, গীতবাদ্যধ্বনি দ্বারা কি নিদ্রিতের চেতনার উদ্বোধন হয় না?

ডাঃ। কারও কারও অঙ্গে হয়, কীরও কারও চাক রাজ্যে হয়।

ক। এও সেই রকম। এ স্থলে অঙ্গে হয় ব'লে বাণবেণুর ধ্বনিতেই চলে, আবার বিশেষ অচৈতন্য হলে শাস্ত্রে চাক বাজাবারও উপদেশ আছে।

ডাঃ। তাইত অচৈতন্য হওয়ার যেমন নানা রকম আছে, তার জন্ত প্রক্রিয়াও নানা রকম দেখছি। বেশ স্পষ্ট ধারণা করতে পারছেন, কিন্তু মনে হয়—এর ভিতর অবশ্যই কিছু সত্য আছে।

ক। সত্য না থাকলে ত্রিকালদশী মহাপুরুষেরা কি কতকগুলো প্রলাপ ব'কে গিয়াছেন মনে করেন?

ডাঃ। তা মনে ক'রলে কি আর এত যত্ন করে শুনতাম?

ক। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, শুনে বড় সুখী হলাম। কিন্তু আজ কাল অনেকেই নিজে যা বোঝেন না—সেটা কিছুই নয় ব'লে মনে করেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে অনন্তরহস্যজগতের কতটুকু রহস্য আমরা বুঝতে পারি? প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বা রোগ সম্বন্ধীয় একটা তুচ্ছ বিষয় মীমাংসা করবার জন্তেও কত সুখী ব্যক্তি জীবন পাতে করেও জানতে পারেন নি। আর আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে এক মুহূর্তে সকল বিষয়ের মীমাংসা করে ফেলি—ইহাই আশ্চর্য।

ডাঃ। খুব সত্য কথা। এখন আপনি তারপর বিরচনের অভিযোগের কথা বলুন। ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি পূর্বেও—ত অভিযোগ অভিযোগের কথা বলেছিলেন। সেও ত শাস্ত্রের কথা, তবে শাস্ত্রে আবার পৃথক ভাবে অভিযোগ অভিযোগের কথা বলা হয়েছে কেন?

ক। সেটা হ'ল সামান্য অভিযোগ অভিযোগ, আর এটা হচ্ছে বিপত্তি জনক অভিযোগ অভিযোগ। তবে ব্যাপদের হ' একটা কথাও পূর্বে বলা গেছে, সমগ্র ব্যাপদ আপনাকে শোনান যেটিনি।

ডাঃ। আচ্ছা বলুন এখন।

ক। বিরচনের অতিযোগ হ'লে মন্থর পুচ্ছের ন্যায় চাকচিক্য শালী জলবৎ ভেদ হয়। পরে মাংসদোয়া জলের ন্যায় ভেদ হয়, পরে জীবশোণিত নির্গত হয়, মলদ্বার নির্গত হয়ে পড়ে, কম্প এবং বমনের অতিযোগের কথিত উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় রক্তপিত্ত এবং রক্তাতিসারের বিধান অনুসারে চিকিৎসা ক'রতে হয়। মলদ্বার নির্গত হ'য়ে পড়লে তা'তে ঘূতাদি মেহ পদার্থ মাথিয়ে ষ্বেদ দিয়ে ভিতরে প্রবিষ্ট কর'বে অথবা ক্ষুদ্র রোগের চিকিৎসায় গুদভ্রংশের (হারিশ) যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হ'য়েছে সেইরূপ চিকিৎসা করবে। কম্প হ'লে বাতব্যাধিতে কম্পের যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হ'য়েছে, সেই রূপ চিকিৎসা করবে।

ডাঃ। এই যে সব অমুক রোগের মত চিকিৎসা ক'রবে ব'লে বরাত দেওয়া হয়েছে, এগুলো কি সুবিধা জনক ?

ক। সুবিধা জনক বৈকি! নইলে এক প্রকার চিকিৎসার কথা অনেক জায়গায় ব'লতে হয়, আর তা'তে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ছাড়া কোন লাভ নাই।

ডাঃ। কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে সুবিধা হয়।

ক। চিকিৎসকের পক্ষে সুবিধা হয়—এ কথাও বলা যায় না। কারণ সময়ে দরকার হলেও যদি সর্বদা পুঁথি খুলে চিকিৎসা ক'রতে হয়, তবে তাঁকে চিকিৎসক নামে অভিহিত করা যায় না। চিকিৎসা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়।

ডাঃ। আচ্ছা আপনি তারপর বলুন।

ক। জ্বিহা নির্গত হয়ে পড়লে পুঁথি যেমন বলা হয়েছে সেইরূপ চিকিৎসা ক'রতে

হয়। জীবশোণিত অতিরিক্ত পরিমাণে নির্গত হয়ে থাকলে গাভারী কল, কুল, হুঁকা ও বেণার মূল,—এই সকল দ্রব্যের সঙ্গে হৃৎ পাক ক'রে শীতল হ'লে তার সঙ্গে ঘৃত ও শ্রোতাঞ্জন, (সুরমা বিশেষ) মিশিয়ে আস্থাপন প্রয়োগ করবে। ত্রোগ্রোধাদিগণের (বট প্রভৃতি কতক গুলি বৃক্ষের ছালের) কাথ, দধি, ইক্ষুরস, ঘৃত ও রক্ত (ছাগাদির) একত্র মিশ্রিত ক'রে বস্তি প্রয়োগ করবে। মুখ দিয়ে রক্ত নির্গত হ'লে রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের ন্যায় চিকিৎসা ক'রবে।

মলদ্বার দিয়ে যে রক্ত নির্গত হয়, সেটা জীব রক্ত কি রক্তপিত্তের রক্ত তাহা পরীক্ষার জন্ত সেই রক্ত তুলা বা বস্ত্রে ঘৃত রাখিয়ে উষ্ণ জলে দৌত ক'রলে যদি দাগ উঠে না যায় তবে জীবশোণিত ব'লে জানবে। আর সেই রক্ত অন্ন বা ছাত্তুতে মাথিয়ে কুকুরকে খেতে দিলে, যদি খায়, তবে জীবশোণিত ব'লে জানবে। অন্তথায় অর্থাৎ যদি বস্ত্রের দাগ উঠে যায় এবং কুকুরে না খায় তবে রক্তপিত্তের রক্ত বলে জানবে।

ডাঃ। জীব শোণিতটা কি ?

ক। শরীরের যে বিশুদ্ধ রক্ত তাই জীব শোণিত, আর পিত্তদূষিত রক্তকেই এখানে রক্তপিত্তের রক্ত বলা হয়েছে। পিত্ত দূষিত রক্ত তিক্তাস্বাদ ব'লে কুকুরে খায় না। আর বিশুদ্ধ রক্ত তিক্ত-নয় বলে খেয়ে থাকে।

ডাঃ। আমাদের মতে আর্টারীর রক্ত বিশুদ্ধ এবং ভেনের রক্ত দূষিত। তা হলে কি এখানে আর্টারিয়েল ব্লাড আর ভেনস ব্লাডের কথা বলা হইয়াছে।

ক। তা কি করে বলবে? আর্টারির আর ভেনের রক্তের কথা আর্টারি ব্লাড, ভেন



এটা দিক তাই কি না বলতে পারিনে। তবে জীবরক্ত নামে বিশুদ্ধ রক্ত আর অল্পটা পিত্ত দূষিত রক্ত এটা বোঝা যায়।

ডা। আচ্ছা আমি একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবো। আপনি তার পর বলুন।

ক। এতক্ষণ অতিযোগের কথা বলা হয়েছে, এইবার আশ্বান-ব্যাপদের কথা বলব।

বহু দোষযুক্ত, রুক্ষ বা বায়ুকোষ্ঠ (যাহার উদরে কপিত বায়ু থাকে) ব্যক্তির ভুক্তার অবশিষ্ট থাকলে অর্থাৎ সম্পূর্ণ জীর্ণ না হলে যদি অম্লময় এবং অম্লিগ্ন ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তা হলে উদরাশ্বান, বায়ু মূত্র ও পুরীষের অপ্রবর্তি (নির্গত না হওয়া) আশ্বাসয় ক্ষীত হওয়া পার্শ্বদেশে ভঙ্গবৎ বেদনা, মলদ্বার ও বগিতে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা, অগ্নে অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পেলে আশ্বানব্যাপদ বলা যায়। একপ অবস্থায় স্বেদ দিয়ে আনাহ গোণে যে মলভেদক বর্জিত কথা বলা হ'য়েছে, সেই বর্জিত প্রয়োগ করবে, যা'তে অগ্নি বৃদ্ধি হয় এরূপ ক্রিয়া ক'রবে এবং প্রয়োগ ক'রবে।

ক্ষীণ দেহ, মুহূ কোষ্ঠ, রুক্ষ বা মন্দাগ্নি বিশিষ্ট বা রুক্ষ ব্যক্তিকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অত্যন্ত লবণ রসাত্মক কিংবা অত্যন্ত রুক্ষ ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে—বায়ু, পিত্ত, দূষিত হয়ে পবিকর্ষিকা ব্যাপদ উপস্থিত করে। ইহাতে মলদ্বার, নাভি, লিঙ্গ, বস্তি ও মস্তকে কাঁটার মত যন্ত্রণা হয়, বায়ু শুষ্ক হ'য়ে থাকে, এবং আহারে অরুচি হয়। এরূপ অবস্থায় ঋষ্টি মধু ও কৃষ্ণতিল বাটা এবং মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করে পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ ক'রবে।

ডা। পিচ্ছাবস্তিতে কি একটু ঘোটা মট বুলুন না?

ক। শিমূলের বোঁটা, শিমূল ফুল, বট, যজ্ঞ ডুমুর ও অশ্বখের কুঁড়ি প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা যে পিচ্ছিল গুণ বিশিষ্ট বস্তি প্রয়োগের ঔষধ প্রস্তুত হয় তাকে পিচ্ছাবস্তি বলে। পিচ্ছা বস্তি প্রয়োগের পর রোগীকে শরীরে শীতল জল সেচন করবে, ঘৃতমণ্ড ও দুগ্ধের সহিত অন্ন সেবন করবে এবং ষষ্টিমধু সিদ্ধ তৈল দ্বারা অম্বুভাসন প্রয়োগ করবে।

ডা। ঘৃতমণ্ড কি? অন্নমণ্ডের মত জলের সঙ্গে ঘৃত পাক ক'রে প্রস্তুত করতে হয় নাকি?

ক। ঘৃতের উপরের তরল অংশকে ঘৃতমণ্ড বলে। মণ্ড শব্দে সারে-মাতে যে সব জিনিষ থাকে তা'র মাতকে বোঝায়।

ডা। বুঝেছি। এইবার পরিশ্রাব ব্যাপদের কথা বলুন।

ক। ক্রুরকোষ্ঠ বা বহুদোষযুক্ত ব্যক্তিকে মুহূ ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে দোষ সকলকে উৎক্লিষ্ট (বহির্গমনোন্মুখ) করে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নির্গত করতে পারে না। সেই সকল দোষ পরিশ্রাব জন্মায় অর্থাৎ ক্রমাগত অন্ন অন্ন ক'রে নির্গত হ'তে থাকে এবং দুর্বলতা, উদরের শুষ্কতা, অরুচি, ও অঙ্গের অবসন্নতা জন্মায়। বেদনার সহিত পিত্ত ও মেহা অন্ন অন্ন ক'রে নির্গত হ'তে থাকে। ইহাকেই পরিশ্রাব ব্যাপদ বলে। এরূপ ব'টলে আশ্বাপান প্রয়োগ ক'রবে। তা'তে দোষের উপশম হ'লে রোগীকে পুনরায় মেহ প্রয়োগ ক'রে সংশোধন ক'রবে।

রোগীকে অত্যন্ত রুক্ষ বা স্নিগ্ধ ক'রে ঔষধ প্রয়োগ ক'রলে, বেগ উপস্থিত না হ'লে বল পূর্বক বেগ দিলে কিংবা বেগ উপস্থিত হ'লে সে বেগ ধারণ ক'রবে প্রাথমিক ব্যাপদ

উৎপন্ন হয়। এতে দাহ ও শূলবৎ যন্ত্রণার সঙ্গে বায়ু সংযুক্ত পিচ্ছিল খেতবর্ণ, অথবা কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ যুক্ত কফ নির্গত হ'তে থাকে এবং মলত্যাগ কালে রোগীকে অত্যন্ত প্রবাহন ক'রতে (কৌথাতে) হয়। এই রোগের চিকিৎসা পরিশ্রাব ব্যাপদের দ্বারা।

ডা। প্রবাহিকা মানে যাকে চলতি কথায় আমাশয় বলে এবং আমরা ডিসেন্ট্রী (Dysentery) বলি—তাইত ?

ক। হাঁ তাই বই কি ?

ডা। তা'হ'লে বাংলা করে বলুন যে, জ্বোলাপ দিলে কখন কখন আমাশয় হ'তে পারে, আর তার চিকিৎসা এই রকম।

ক। বাংলা করে বলিনি, তবে কি সংস্কৃত ক'রে বলিছি নাকি ? তবে আমাশা

না ব'লে প্রবাহিকা বলেছি। তা' আমাশয় রোগ নয় একটা যন্ত্র, যাকে আপনারা ঠিক ব'লে থাকেন।

ডা। আচ্ছা তা' হ'ক এখন তার পর কি বলুন।

ক। তারপর হৃদয়োগপসরণ। অজ্ঞতা বশতঃ বমন বা বিরেচনের বেগ ধারণ ক'রলে দোষ সকল হৃদয়ে উপসরণ অর্থাৎ গমন করে। প্রধান মর্শ হৃদয় সন্তপ্ত হলে অত্যন্ত বেদনা হয়, রোগী দাঁত কিড়মিড় করে, চক্ষু উর্দ্ধগত হয় জিহ্বা দংশন করে, অবসন্ন হয়, এবং অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে স্নেহাভ্যাস করে ও দীর্ঘ শ্বাস দিয়ে বস্তিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈলের অনুবাসন দিতে হয় এবং তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন প্রয়োগ করতে হয়।

(ক্রমশঃ)

## শিশুর খাত।

—:—

মাতৃদুগ্ধ শিশুর সম্পূর্ণ পোষণের পক্ষে নিত্য আবশ্যক। একশত ভাগ মাতৃ দুগ্ধে মোটামুটি বলিতে গেলে ৮৯ ভাগ জল, ৪ ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত বস্তু, ৩ ভাগ স্নেহ, ৩ ভাগ চিনি এবং এক ভাগের  $\frac{1}{4}$  অংশ ধাতব বস্তু আছে।

বয়োবৃদ্ধিসহকারে শিশুর খাতের আবশ্যকীয় উপাদানের ও মহৎ পরিবর্তন অবশ্যস্বাবী। প্রাপ্তবয়স্কের শরীরের ওজনের অনুপাতে বস্তু স্নেহ ও খেতসার জাতীয় পদার্থের আবশ্যক একটা দশমাসের শিশুর পক্ষে তাহার শরীরের

ওজনের অনুপাতে ঐ দুই জাতীয় পদার্থের তদপেক্ষা তিনগুণ অধিক আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। প্রাপ্ত-বয়স্কের আকৃতির সহিত শিশুর আকৃতি তুলনায় শিশুর পক্ষে যে পরিমাণ খাতের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয়; বস্তুতঃ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাত শিশুর জন্য আবশ্যক। শিশুর পরিবর্তন অতিদ্রুত নির্বাহ হইতে থাকে—শরীরের অস্থি, মাংসাদি ধাতু গঠিত হইতে থাকে এবং শ্বাস প্রেধাস দ্রুত নির্বাহ হয়; সুতরাং খাতাবশ্যকতার আবশ্যকতা হয়।

বয়োবৃদ্ধির সহিত এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, অতএব ভিন্নরূপ খাদ্যের আবশ্যক হয় । শিশুর মত একজন যুবা কদাপি কেবল দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকিতে পারে না । কেবল দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া বাঁচিতে হইলে একজন যুবককে ৪ সেরেরও অধিক দুগ্ধ পান করিতে হয় ; কিন্তু ইহাতে আহারে স্নেহের ভাগ অত্যধিক হইয়া পড়ে । প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে । শরীরোপাদানের এই ক্ষয় পূরণ ও শরীর-গঠন এবং শরীরের উত্তাপ রক্ষা এই দ্বিবিধ কার্য্য যে আহারের দ্বারা নির্বাহ হইয়া থাকে তাহাই শরীর রক্ষার উপযোগী আহার । প্রোটিন্ জাতীয় পদার্থ, জল এবং বিবিধ ধাতব পদার্থের দ্বারা প্রথম প্রকারের কার্য্য এবং নাইট্রোজেন্ ঘটিত এবং নাইট্রোজেন বর্জিত খাদ্যের দ্বারা দ্বিতীয় প্রকারের কার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে । যে খাদ্যে এই সকল অত্যাবশ্যক পদার্থের কোন একটী নাই, কিছুকাল যদি সেইরূপ আহার কোন প্রাণী গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার শরীর এতদূর ভগ্ন হইয়া পড়িবে যে, পরে তাহাকে গুণকরী আহার প্রদান করিয়াও তাহার প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইয়া থাকে । শিশুর পক্ষেও এইরূপ—যদি কোন শিশুকে ভেজাল ছদ্ম দেওয়া হয়, কিম্বা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত এমন কোন খাদ্য আহার করিতে দেওয়া যায়, যাহাতে শিশুর শরীর রক্ষার জন্য যে বস্তুর প্রয়োজন তাহা হয় অতি-মাত্রায় নচেৎ অতি অল্প মাত্রায় আছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিশুর স্বাস্থ্য-হানি হইবে ।

সমস্ত প্রাণি-দুগ্ধেই শিশুর শরীর রক্ষার আবশ্যক উপাদান বিস্তারিত থাকিলেও এই সকল উপাদানের পরিমাণের অবশ্যই পার্থক্য আছে । ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,

মহুষ্য, গো, মহিষ, ছাগ, প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাণীর শাবকেরা সকলেই দুগ্ধ পান করিলেও প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সমন্বিত বস্তু ভোজন করিতেছে । অতএব ইহা প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র বিবাদ কুরিতে হয় না যে, নরশিশুর পক্ষে গো বা ছাগ দুগ্ধ কদাচই—ঐখার্য উপযোগী খাদ্য নহে । গো দুগ্ধের সহিত নারীদুগ্ধের তুলনা করিলে দেখা যায় নারীদুগ্ধ অপেক্ষা গোদুগ্ধে জল কম কিন্তু কঠিন বস্তু (Solids) অত্যধিক মাত্রায় আছে—স্নেহ, লবণ পদার্থ ও নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ গোদুগ্ধে অধিক, কিন্তু শর্করা অল্প ।

গোদুগ্ধ কিরূপে নারীদুগ্ধের সদৃশ হয় ?—গোদুগ্ধে জল মিশাইলে উহার এলবুমেন ও লবণ ঘটিত পদার্থ নারীদুগ্ধের তুল্য হয় বটে কিন্তু শর্করার পরিমাণ আরও কমিয়া যায় এবং মেদের ভাগও অল্পতর হইয়া থাকে । অতএব যদি গোদুগ্ধে জল মিশাইয়া তাহাকে নারীদুগ্ধের সদৃশীকরণের প্রণালীই আমরা অবলম্বন করি, তাহা হইলে উহাতে শর্করা ও স্নেহ মিশ্রিত করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইতে পারে । কৃত পরিমাণ শর্করা ও স্নেহ মিলাইতে হইবে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন । কিন্তু পরে আমরা যে তালিকা দিব তদনুসারে কার্য্য করিলেই গোদুগ্ধ কার্য্যোপযোগিতায় নারী দুগ্ধের সদৃশ হইবে ।

কিন্তু আরও কতকগুলি বিষয়ে সমতা উৎপাদন করিতে না পারিলে গো দুগ্ধ তিক্ত নারীদুগ্ধের তুল্য হইবে না । কোন কোন বিষয়ে সমতা সম্পাদন আবশ্যক ? প্রথমতঃ নারী দুগ্ধের প্রতিক্রিয়া কার্য্যধর্ম্মী (Alkaline) কিন্তু গো-দুগ্ধ অম্লধর্ম্মী (Acid) । নারীদুগ্ধ

জীবাণু বর্জিত, গোহৃৎ জীবাণু পূর্ণ; গোহৃৎ শিশুর পাকস্থালীতে গিয়া হৃৎকর মোটা মোটা জমাট পদার্থে পরিণত হয়, পক্ষান্তরে নারীহৃৎ সহজে জীর্ণ হইবার উপযুক্ত দধিবৎ পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে।

এক্ষণে বুঝিতে পারাগেল যে গোহৃৎ দুধকে নারী হৃৎকর তুল্য গুণাধিত করিতে হইলৈ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—

(১) পাংলা করিতে হইবে।

(২) শর্করা এবং মেহ যোগ করিতে হইবে।

(৩) বড় বড় জমাট বাধা পদার্থে যাহাতে পরিণত হইতে না পারে এতদর্থে কোন পদার্থের সংযোগ করিতে হইবে।

(৪) ক্ষার গুণাধিত করিতে হইবে।

(৫) জীবাণু বর্জিত করিতে হইবে।

“চার” চামচের ৪ চামচ গোহৃৎ লইয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি মিশাইলে উপরিলিখিত মত সংস্কার সাধিত হইবে—

দুগ্ধ	...	চার চামচের ৪ চামচ
জল	...	” ” ৭ ”
চুণের জল	...	” ” ১ ”
সোডা সাইট্রেট	২	গ্রেণ অর্থাৎ ১ রতি
দুগ্ধজাত শর্করা	১০	গ্রেণ অর্থাৎ ৫ রতি
“ক্রীম” (cream)	১০	বিন্দু।

উপরি লিখিত কোন বস্তুর দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় জানা উচিত। চুণের জল যোগ করায় ১, ৩, ৪, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বটে— কিন্তু ইহাতে মলবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে করিতে অভিসার জন্মিতে পারে। এই দোষ দূরীকরণার্থ পাংলা বালির জল, অসেকৈ চুণের জলের পরিবর্তে পছন্দ করেন। বালির জলে ১, ৩, উদ্দেশ্য

সাধিত হয়। সোডা সাইট্রেট যোগ করিলে হৃৎকর ক্ষারত্ব সাধিত হইয়া থাকে। “ক্রীম” (cream) কর্তৃক অতিরিক্ত মেহ সংযোজিত হইয়া থাকে।

“ক্রীম” (cream) বাজার হইতে ভাল ক্রীম সংগ্রহ করা হৃৎকর, অতএব বাড়ীতে প্রস্তুত করাই ভাল। সাধারণতঃ লোকে ক্রীমকে দুগ্ধ হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানে, কিন্তু বস্তুতঃ “ক্রীম” অধিকতর মেহ সমন্বিত দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাল দুগ্ধ হইতেই ভাল “ক্রীম” পাওয়া যায়। ভাল দুগ্ধ হইতে “ক্রীম” উঠাইবার পূর্বে—যত অধিকক্ষণ সেই দুগ্ধকে স্থিরভাবে রাখা হয়, ক্রীম ততই অধিক পাওয়া যায়। উত্তম দুগ্ধ ১২ ঘণ্টা রাখিয়া ক্রীম উঠাইলে সেই ক্রীমে শতকরা ১৬ ভাগ মেহ থাকে। দুগ্ধ যত অল্পক্ষণ রাখিয়া ক্রীম উঠান হইবে—তাহাতে ততই অল্প মাত্রায় ক্রীম পাওয়া যাইবে। শিশুর জন্ম যে ক্রীম উপযোগী তাহাতে শতকরা ১০।১২ ভাগ মেহ থাকিলেই যথেষ্ট। দুগ্ধ হইতে ক্রীম পাইবার সহজ উপায়—

এক পাইট দুধ ধরে এমন একটা গোল লম্বা টানের পাত্র প্রস্তুত করাইবে, ইহার তলদেশ সমতল না হইয়া কিছু গড়ানে তাবের হইবে। একটা ঢাকনি আর নীচের দিকে পাশে একটা ছোট নল থাকিবে। এই পাত্রের ভিতর দিকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ঐট চিহ্ন থাকিবে। ছোট নলটির মুখে হইতে দুই ইঞ্চ লম্বা একটা রবারের নল থাকিবে, রবারের নলের দুখ একটা “সেক্‌টিপিঙ্গ” দিয়া বন্ধ থাকিবে।

বিগুণ দুগ্ধ ছাঁকিয়া ঐ টানের পাত্রে রাখিয়া ঢাকনী বন্ধ করিয়া পাত্রটিকে ঠান্ডা রাখা

বা গ্রীষ্মকালে বরফের বাস্কের ভিতর রাখিয়া ৫ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিবে। পরে রবারের নলের মুখ খুলিয়া দিলে দুধ বাহির হইতে থাকিবে। টানের পাত্রে পূর্বে যে সমভাগে চারিটা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, দুধ নির্গত হইতে হইতে যখন তিনটা চিহ্ন অতিক্রম করিয়া চতুর্থ চিহ্ন উপর আসিবে অর্থাৎ যখন দুধের ৪ অংশ পাত্রে থাকিবে, তখন আর দুধ বাহির হইতে দিবে না—নল বন্ধ করিবে। এই ৪ অংশ যাহা থাকিবে তাহা সমস্তই ক্রীম। এই ক্রীম শিশুর পানীয় দুধে মিশাইবার জন্য রাখিয়া দিবে। ইহাতে শত করা ১০ ভাগ মেহ আছে।

বার্লির জল প্রস্তুত প্রণালী—চার চামচের দুই চামচ পাল' বার্লি লইয়া পরিকার এনা-মেলের বা পিতলের পাত্রে রাখিয়া কিছু জল দিয়া জোর জালে আন্দাজ ৫ মিনিট কাগ ফুটাইয়া জল ফেলিয়া দিয়া আবার এক পাইট অর্থাৎ ৩০ তোলা পরিস্কৃত জল উহাতে ঢালিয়া ধীরে ধীরে ফুটাইবে ২০ তোলা আন্দাজ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং

মস্লিনের মত পাংলা একখণ্ড কাপড় ফুটন্ত জলে ভিজাইয়া নিঙ্ড়াইয়া লইয়া ঐ কাপড় দ্বারা ছাঁকিবে।

বার্লির জল প্রস্তুতের অন্য প্রণালী—চার চামচের দুই চামচ বন' লইয়া কুটিয়া একটা পাত্রে রাখিয়া এক পাইট ফুটন্ত জল উহাতে ঢালিয়া নাড়িতে থাক, পরে আগুনের নিকটে এই পাত্রটা এক ঘণ্টা রাখিয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হইবে—পরে মস্লিনের মত পাংলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া এক চিমটা লবণ মিশাইয়া লইবে। বার্লির জল প্রতিদিন নূতন প্রস্তুত করিতে হইবে। বাসি বার্লির জল কদাচ শিশুকে পান করিতে দিবে না—গ্রীষ্মকালে প্রয়োজন হইলে দৈনিক দুইবার ও বার্লির জল প্রস্তুত করিবে।

চুলের জল (Limewater) ডাক্তারী ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়, তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে।

এক্ষণে আমরা নারী দুধের সহিত অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর দুধের তুলনা করিব।

উপাদান	নারীদুধ	গোদুধ	গর্দভদুধ	ছাগদুধ
প্রোটিন {				
কেজিন ... ..	০.৬	৩.২৫	১.০	৩.০
ল্যাকটো এলবুমিন ...	১.৪	০.৭৫	০.৮	০.৭
স্নেহ ... ..	৩.০	৩.৫	১.০	৪.২
শর্করা ... ..	৭.০	৪.০	৫.৫	১.০
খাতব পদার্থ ... ..	০.২	০.৭	০.৪	০.৫

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে গর্দভের দুধ শিশুর জন্য উপকারী। গর্দভের দুধে অধিক পরিমাণে প্রায় নারী দুধের তুল্য বর্ডার ইয়া।

কম আছে। শর্করা এবং লবণ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। গর্দভীর দুগ্ধ সহজে পরিপাক পায় বলিয়া সে সকল শিশু গো দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে গর্দভীর দুগ্ধ বিশেষ উপযোগী। কিন্তু দোষ এই যে, ইহাতে অধিক মাত্রায় লবণ থাকায় অনেক সময় শিশুর উদরাময় হইয়া থাকে। ইহার বিরচন শক্তি আছে বলিয়া যে সকল শিশুর যকৃৎ দোষ ও কোষ্ঠ বদ্ধতা আছে তাহাদের পক্ষে উপকারী; কিন্তু সুস্থ শিশুর পক্ষে এত বিরচন শক্তি যুক্ত দুগ্ধ তাদৃশ ব্যবস্থায় নহে। আরও দোষ এই যে, যদি সুস্থ শিশুকে গর্দভীর দুগ্ধ পান করান হয় তাহা হইলে মাখম এবং এলবুমিন ঘটিত অভাব পূরণ জন্ম অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় দুগ্ধ পান করাইতে হইবে কিন্তু মাত্রাধিক্যের জন্ম আবার লবণ, শর্করার পরিমাণ অত্যধিক হইয়া পড়িবে। অতএব বুঝিতে পারা গেল যে গর্দভের দুগ্ধ সুস্থ শিশুর পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য নহে। গর্দভীর দুগ্ধে ক্রীম সংযুক্ত করিলে উহার অনেক দোষ দূরীভূত হইতে পারে বটে কিন্তু এদেশে ভাল ক্রীম সংগ্রহ করা তত সহজ ব্যাপার নহে। নারী দুগ্ধের সহিত তুলনায় গর্দভীর দুগ্ধের দোষ গুণ বিচার করা হইল। এক্ষণে গো দুগ্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যদিও গো দুগ্ধে প্রোটিন এবং লবণ অধিক মাত্রায় আছে তথাপি উহা অনেকটা নারী দুগ্ধের তুল্য। ছাগ দুগ্ধ সম্বন্ধে কথা এই যে, উহাতে ছানা এবং লবণের ভাগ অধিক থাকিলেও, যে সকল শিশুর পরিপাক শক্তি বলবতী তাহাদের প্রতিপালনের জন্ম ছাগ দুগ্ধ ব্যবহার করা বাইতে পারে। বলা বাহুল্য প্রাণীর আহারের উপর তাহাদের দুগ্ধের গুণাগুণ নির্ভর করে। এমন কি

সকলেই জানি যে, মাতা কোন বিবেচক ঔষধ সেবন করিলে তাহার দুগ্ধেও বিবেচন গুণ সঞ্চারিত হইয়া শিশুর অন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্ম আয়ুর্বেদে অতি শিশুকে ঔষধ পান করানর পরিবর্তে তাহার মাতা বা স্তন্যদাত্রীকে ঔষধ পান করানর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ছাগ বহুভুক প্রাণী অতএব ইহাকে যথেষ্ট বিচরণ পূর্বক বাহা তাহা ভোজন করিতে না দিয়া, যদি বাধিয়া রাখিয়া নির্দিষ্ট ভোজ্য দান করা যায়, তাহা হইলে ছাগশের দুগ্ধের হৃৎকরতা (বাহা হজম করা শক্ত) সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহা অমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে।

বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ অতি স্নেহ ও অম্লরস হইয়া থাকে—এই অম্ল স্ব জিহ্বায় অনুভব করা যায় না—কিন্তু যদি এক খণ্ড নীলবর্ণ ‘লিটমাস’ কাগজ লইয়া দুগ্ধে ডুবান যায় তাহা হইলে ঐ নীলবর্ণ কাগজ খণ্ড গোলাপী রঙ ধারণ করিবে। যদি লাল হয় তাহা হইলে দুগ্ধে অম্ল অধিক পরিমাণে আছে বুঝিতে হইবে। দুগ্ধে অতিরিক্ত অম্লরসাস্বিত হইলে বুঝিতে হইবে যে উহা পচিতে আরম্ভ করিয়াছে; অতএব এরূপ দুগ্ধ পরিহার করা উচিত। যদি গোদুগ্ধে রস খড়ির গুঁড়া মিশান থাকে তাহা হইলে উহা “লিটমাস” কাগজের বর্ণ পরিবর্তন করিতে পারিবে না। যদি রূপণ গোবর দুগ্ধ হয় তাহা হইলে উহাতে দুগ্ধের স্বাভাবিক অম্লত্ব থাকিবে না—উহা একবারে ক্ষারধর্মী (Alkaline) হইবে। আবার নারী দুগ্ধ ও ক্ষারধর্মী হয় সুতরাং ইহাও—“লিটমাস” কাগজের বর্ণ লাল করিতে পারে না। এই সকল কারণে শিশুর পানীয় গোদুগ্ধের লিখিত পরিমাণ হ্রাস করা উচিত।

সেবন করান ভাল। ইহাতে যে অল্পস্থ দূর হয় তাহা লিটমাস্ কাগজের দ্বারা পরীক্ষা করিলেই প্রতীত হইবে।

দুধ কাটিয়া যায় কেন?—

গ্রীষ্মকালে জাল দিতে বিলম্ব হইলে ঋতু স্বভাবজ উত্তাপের জন্তু কিম্বা দুগ্ধের পাত্রে বাসি টুকু দুধ থাকিলে দুধ কাটিয়া যায়—ছানা বাধে ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় দুধ বেশ আছে—কিন্তু জাল দিতে আরম্ভ করিলেই কাটিয়া গিয়া ছানা বাধে। ইহা দেখিয়া আমরা তখন বিস্মিত হই বটে—কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। ঐ দুধ ইতঃপূর্বেই গাঞ্জিতে আরম্ভ করিয়াছিল তবে যতটুকু ‘লাক্টিক এসিড’ সঞ্চিত হইলে বিনা অগ্নির উত্তাপে, অগ্নির উত্তাপ প্রদানানন্তর যাহা ঘটিল তাহা উৎপাদন করিতে পারিত, ততটুকু সঞ্চয় হয় নাই; সুতরাং দুগ্ধ অগ্নিতে চাপাইবামাত্র প্রচুর উত্তাপ পাইয়াই বিবৃত হইয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে ঐ দুগ্ধ হন্তত কোন পচা দুগ্ধ দ্রবিত পাত্রে ছিল কিম্বা জাল দিতে বিলম্ব হওয়ার কালধর্ম্মে উহার উদ্বেক (fermentation) আরম্ভ হইয়াছিল। এইরূপ কাটিয়া যাওয়া দুগ্ধ শিশুকে পান করান নিষেধ। শিশুকে লইয়া অল্প দূরস্থিত স্থানে যাইতে হইলে নির্মলগন্ধিত প্রণালীতে দুধ লইয়া গেলে বিকৃত হইবে না। দুধকে ফুটাইয়া উহাতে কিছু চিনি মিলাইয়া কিছু গরম থাকিতে থাকিতে অতি উত্তমরূপ পরিষ্কৃত কোন বোতলে পূর্ণ করিয়া (যেন কিছুও ফাঁক না থাকে) তৎক্ষণাৎ ছিপিবদ্ধ করিয়া গালা দিয়া মোহর করিয়া দিবে। যদি, অতি দূরবেশে যাইতে হয় তাহা হইলে বিলাতী ঘন টানের

দুগ্ধ তৎকালে কাজে লাগিতে পারে। শিশুর বয়স যদি এক মাসের অল্প হয় তাহা হইলে চার চামচের এক চামচ বিলাতী ঘন দুগ্ধে ১২ চামচ অথবা বড় চামচের তিন চামচ জল মিলাইয়া এবং অপেক্ষাকৃত বড় শিশুর জন্ত চার চামচের ১ চামচ দুগ্ধে ৮ চামচ বা বড় চামচের ২ চামচ জল মিলাইয়া পান করাইতে হয়।

নানা প্রকারে দুগ্ধ জীবাণুর সম্পর্ক ঘটিতে পারে সুতরাং পানের পূর্বে দুগ্ধ যাহাতে জীবাণু সম্পর্কবর্জিত হয় তাহা অবশ্যকরণীয়। পানের পূর্বে দুগ্ধ জাল দিয়া পান করিলেই ঐ দোষ দূর করা যাইতে পারে, কিন্তু কাঁচা দুগ্ধ শিশুর পক্ষে যেমন পোষক জাল দেওয়া দুধ ঠিক সেইরূপ পোষকগুণ বিশিষ্ট নহে। জাল দেওয়া দুধের জীবাণু নষ্ট হয় বটে কিন্তু কাঁচা দুধ অপেক্ষা ইহার উপকারিতা কিঞ্চিৎ অল্প। কিন্তু জীবাণুনাশে উহা ভীষণ ব্যাধি এবং এমন কি মৃত্যুর হস্ত হইতে আমাদের রক্ষা করে বলিয়া এই অল্প গুণ-হীনতা আমরা চিরদিন উপেক্ষা করিব। জাল না দিয়া দুধকে জীবাণুনাশ বর্জিত করিবার জন্ত এক প্রকার বিলাতী কল পাওয়া যায়। ইহার নাম “soxhlet's steriliser” মূল্য ২৬ টাকা। এই কলে দুধকে ঠিক ফুটান হয় না অথচ দুধ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হয় মাত্র। ফুটাইলে দুধের যে স্বাদ হয়, এই কলে উষ্ণ করিলে তাহাও হয় না, কিম্বা ফুটাইলে অত্যন্ত উত্তাপ সংযোগে দুধের যে অহিতকর পরিবর্তন জন্মায় তাহাও হইতে পারে না। এই কলে কৃত্রিম উপায়ে যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় ধারোক্ষ দুগ্ধে স্বভাবতঃই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। দোহন নাম্নে দুগ্ধের যে উষ্ণতা থাকে সেই উষ্ণতা দ্বিগুণ দুগ্ধে ধারোক্ষ দুধ বলে। ধারোক্ষ

হৃৎকের উষ্ণতা আছে কিন্তু এই উষ্ণতা অগ্নি-সংযোগ-কৃত নহে বলিয়া ইহাতে পুষ্টিকারিতা গুণের অল্পতা নাই এবং উষ্ণ বলিয় জীবাণু-দোষ-বর্জিত। আয়ুর্বেদে কাঁচা হৃৎকের বহু অপকারিতার যথেষ্ট উল্লেখ এবং জাল দেওয়া হৃৎকের উপকারিতা, অপকারিতা দুইয়েরই উল্লেখ আছে—কিন্তু ধারোষ্ণ-হৃৎকের নানা গুণের উল্লেখ পূর্বক উহাকে লঘু অর্থাৎ সহজ পাচ্য অগ্নিবর্ধনকারী এবং স্ন্যাসম বলা হইয়াছে। আয়ুর্বেদে হৃৎকে জীবাণুর প্রসঙ্গ না থাকিলেও কাঁচা হৃৎ, জাল দেওয়া হৃৎ এবং ধারোষ্ণ হৃৎকের যে গুণ বলা হইয়াছে তাহাতে সিদ্ধান্তের এমন অপূর্ণ একতা রহিয়াছে যে তদানুসন্ধিস্থ বিস্তৃত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

কোন বয়সের শিশুকে কত পরিমাণ

দুগ্ধ পান করান উচিত ?—

কোন বৈদেশিক গ্রন্থকারের মতে প্রসবের প্রথম এক বা দুই সপ্তাহকাল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাতৃস্তন হইতে তিন ছটাক হইতে একপোয়া দুগ্ধ পাইয়া থাকে। পরে দুগ্ধ স্রাব বন্ধিত হইয়া দৈনিক তিন পোয়া পর্য্যন্ত হয়। পরীক্ষকগণ, শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পানের পূর্বে ও পরে ওজন করিয়া এবং অত্যাশ্র পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে একটা তিনি মাসের সুষ্ম শিশু প্রতিবারে প্রায় তিন ছটাক দুগ্ধ পান করে। দৈনিক এইরূপ পাঁচবার স্তন্য পান করান উচিত ধরিয়া লইলে শিশুর দৈনিক পানীয় হৃৎকের পরিমাণ তিন পোয়া হইতে এক সেরের কিঞ্চিৎ অধিক হয়। সে সকল ছেলেকে ঢোকা দুধ খাওয়ান হয়, এই হিساب হইতে, তাহাদিগকে কত দুধ খাইতে দেওয়া উচিত তাহার একটা পরিমাণ জানিতে পারা

যায়। বহু বৈদেশিক অনুসন্ধান-কাবিগণ এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এস্থলে তাহাই লিখিত হইতেছে। জন্ম হইতে ২১৩ দিন পর্য্যন্ত আধ ছটাক করিয়া দৈনিক দশবার দুগ্ধপান করাইবে। ১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রায় দৈনিক আধসের। একমাস পর্য্যন্ত দৈনিক নয় ছটাক! দ্বিতীয় মাসে দৈনিক একসের ৮ বারে। তৃতীয় মাসে—দিনে ৩ ঘণ্টা অন্তর ৭ বার এবং রাত্রিতে ২ বার, মোট দুগ্ধের পরিমাণ—একসের এক ছটাক হইতে এক সের পাঁচ ছটাক পর্য্যন্ত। অতঃপর বয়োবৃদ্ধি সহকারে প্রতিবারে এক পোয়া করিয়া প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ৫ বার এবং রাত্রিতে আর একবার মোট দুগ্ধের পরিমাণ এক সের ১ পোয়া হইতে দেড় সের পর্য্যন্ত।

গর্ভাবস্থায় স্তন দুগ্ধের পরিবর্তন।

আয়ুর্বেদকারগণ বলিয়াছেন গর্ভধারণ করিলে নারীগণের দুগ্ধ আর সন্তানের পক্ষে হিতকর হয় না। গর্ভাধানের পর কোন মাসে স্তন দুগ্ধের কি পরিবর্তন ঘটয়া থাকে এক্ষণে তাহাই বলিতেছি—গর্ভাবস্থার প্রথম মাসে দুগ্ধের জলীয় ভাগ ও শর্করার অংশ হ্রাস পায়, দুগ্ধের কঠিন পদার্থ (solids) চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত বন্ধিত হয়। স্নেহ ভাগ ৬ মাস পর্য্যন্ত বন্ধিত হয়। লবণের ভাগ প্রথমে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইলেও পরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া গভিনীর স্তনপানের গুণিতা বিবেচনা করিবে।

দুগ্ধের শর্করা—শর্করা, চিনি বলিলে আমরা বাহা বুঝি দুগ্ধের শর্করা সেই পদার্থ নহে। দুগ্ধশর্করা প্রণে, স্নায়ুশর্করার তুল্য। স্নায়ুশর্করাকে ইংরেজি ভাষায় Glucose বলে।



বলে। ভক্ষিত দ্রাব্যশর্করা আমাশয়ে উপস্থিত হইলে স্বেদপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, দুগ্ধ শর্করা দ্রিক তদ্রূপ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে।

**বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ**—বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ দুই প্রকার শর্করায়ুক্ত ও শর্করা বিহীন। ইহার মধ্যে শর্করা বিহীনই শিশুর পক্ষে প্রশস্ত। যদি শর্করাহীন বিলাতী গাঢ় দুগ্ধে তিনভাগ জল মিশান যায় তাহা হইলে উহা গো দুগ্ধের প্রায় তুল্য হয়—গো দুগ্ধকে মাড় দুগ্ধের সন্মূলকবণের উপায় পূর্বে কথিত হইয়াছে।

### দুগ্ধ ভিন্ন অগ্ন্যাগ্ন খাওয়া ।

শিশুর প্রধান ও প্রকৃতি নির্দিষ্ট খাদ্য—দুগ্ধ সম্বন্ধে বলা হইল। এক্ষণে অগ্ন্যাগ্ন খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অগ্ন্যাগ্ন খাদ্য অর্থে খৈ, মড়ি, কটী, এরাকট, সাবু, বিস্কুট প্রভৃতি বর্ণিতে হইবে। এই সমস্ত খাদ্য সম্বন্ধে আমরা কন্যবতয়ের ২৮।১৯ পৃষ্ঠায়, পূর্বে সজ্ঞেপে বলি-  
মাছি। এক্ষণে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। প্রথমেই বলিতেছি এই সকল খাদ্য শিশুর দাঁত উদ্বিবার পূর্বে খাইতে দেওয়া হইবে না। এই সকল খাদ্যের প্রধান উপাদান খেতসার দুগ্ধে বিস্তারিত নাই এবং এই সকল খাদ্য পবিপাক করিবার জন্য পরিপাকের ইচ্ছিয় সকলের যেরূপ শক্তি ও যোগ্যতা আবশ্যক শিশুর তাহা নাই। বড় শিশুর পক্ষে এ সকল খাদ্যের পোষক গুণ আছে বটে কিন্তু শিশুর দাঁত বাহির হয় নাই তাহাদের পক্ষে উহার যে-অল্পপবৃত্ত ইহা সর্ববাদি সম্মত।

গরিব লোকেরা ছেলেদের দুগ্ধের পয়সা যোগাইতে না পারায় অতি শিশুকাল হইতে এরূপ কোন দ্রব্য শিশুকে খাওয়ার বটে কিন্তু এই সকল খাদ্য শিশু কেবল গন্নাধঃ-  
করণ করে মাত্র পরিপাক করিতে পারে না।

—সুতরাং একরূপ অনাহারে থাকে। ইহার ফলে তাহাদের শরীর ক্ষয় হয়, চন্দ্র লোল হইয়া যায়। যাহারা অপেক্ষাকৃত বলবান থাকে তাহারাও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়—শেষে অস্থি পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া পড়ে, অনাশ্রমে উদরাময় বা অন্ত্র কোন ক্ষয় রোগ আসিয়া তাহাদিগকে ধরাধাম হইতে বিদায় দেয়।

অপত্যহিতৈষী সমস্ত পিতা মাতার এই সার সত্য সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, দস্তা-বির্ভাবের পূর্বে দুগ্ধ ভিন্ন শিশুকে অন্ত্র কোনও খাদ্য কদাচ দেওয়া উচিত নহে। যদি অজ্ঞতা-বশাৎ তাড়াতাড়ি শিশুকে এই সকল খাদ্য আহার করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রকৃতি এ অজ্ঞতা কদাচ মাফ করিবেন না। পিতা মাতাকে ইহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। দাঁত বাহির হইবার পূর্বে দিলেত যোরতর অনিষ্ট পাতের আশঙ্কা হ্রব; কিন্তু দাঁত বাহির হইলেও হঠাৎ বা অধিক পরিমাণে এই সকল খাদ্য সেবন করাইলে নিশ্চিতই শিশু পীড়িত হইবে। স্বতু-দর্শন মাত্রই যেমন স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ যোগ্যতা জন্মে না—কিছুকাল পরে সেই যোগ্যতা আসে, শিশুর পক্ষেও সেইরূপ দাঁত বাহির হইবামাত্রই তাহার দুগ্ধ ভিন্ন অন্ত্র খাদ্য পরিপাকের শক্তি জন্মে না। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশঃ অন্ত্র খাদ্য অল্প অল্প খাওয়াইতে হয়। এবং দুগ্ধ প্রচুর দিতে হয় তবে এই সকল নবাত্যন্ত খাদ্য শিশুর পরিপাক করিবার শক্তি জন্মে; একবৎসর বয়সের পূর্বে কোন শিশুকে খেতসারযুক্ত কোন খাদ্য খাইতে দিবে না। আমরা এখানে আয়ুর্বেদকারের সার সত্য স্বরূপ উপদেশটী আর একবার স্মরণ করিতে বলি।  
আয়ুর্বেদে কথিত হইয়াছে—

“অথেনং জাতদশনং ক্রমশোহপনয়েৎ তনায়।

চরানিষেবমানো হনংবালো নাভূর্য্য মনুতে ॥”

নিষেধের হেতু কি? — দাঁতবাহির হইবার পূর্বে হৃৎ তিন্ন অস্থ খাওয়া নিষেধের কারণ? এ সময়ে শিশুর অস্থ পূর্ণ দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত না হইয়া হ্রস্ব থাকে। লালাগ্রন্থি হইতে প্রথম কয়েকমাস লালাস্রাব হয় না। তিন মাসে পূর্ণ হইবার পূর্বে স্বেতসারের উপর Pancreatic fluid কোন শক্তিই প্রকাশ পায় না। তগুল পাক করিবার পক্ষে অগ্নি যেরূপ আবশ্যক হৃৎ তিন্ন অস্থ খাওয়া পরিপাকের পক্ষে ঐ সকল রসেবাতাদৃশই প্রয়োজনীয়তা স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব কৃত্রিম খাওয়া অসময়ে সেবন করাইলে উহা শল্য স্বরূপ উদরে অবস্থিতি বলিয়া বিযজ্রিয়া করে দ্বিতীয়তঃ শিশুকে বস্তৃতঃ অনাহারে রাখে।

শিশুর প্যাটেন্ট খাওয়া।

আজকাল বাজারে বিদেশ হইতে আমদানী এমন কতকগুলি শিশুর খাওয়া বিক্রীত হয়, যেগুলি হৃৎ ও নহে,—রুটী, বিস্কুট, এরাকট ও নহে সুতরাং এগুলিকে ছইয়ের মধ্যবর্তী খাওয়া বলা যাইতে পারে। এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, এই সকল ফুড্ রুটী এরাকটের জাতীয় হইলেও প্রস্তুতপ্রণালীর কোশলে রুটী এরাকট জাতীয় খাওয়ার বিরুদ্ধে যে সকল দোষ আরোপ করা হইয়াছে তাহাদের কোনটাই এই সকল ফুডে নাই। যাহা হউক আমরা এই সকল ফুড্কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিব।

প্রথম শ্রেণীর খাওয়া—শুকীকৃত হৃৎ এবং তৎসহ আংশিক বা সর্বাঙ্গভাবে অকুরিত, শুকীকৃত, ভজিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহি-দলাদি (malted cereals) মিশ্রিত থাকে।

২য় শ্রেণীর খাওয়ার মধ্যে কতকগুলিতে সর্বাঙ্গভাবে অকুরিত শুকীকৃত ভজিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহি-দলাদি থাকে। স্বেতসার থাকে না। সর্কথাদ্রবনীয় (soluble) কার্বহাইড্রেট জাতীয় বস্তু এবং কিঞ্চিৎ প্রটিড থাকে। মেলিন্স ফুড এই জাতীয় খাওয়া। অন্যগুলিতে আংশিক অকুরিত, শুকীকৃত, ভজিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহি-দলাদি এবং স্বেতসার বেশ থাকে; কিন্তু এই সকল খাওয়া যেরূপে প্রস্তুত করিয়া শিশুকে খাওয়াইতে হয় সেই প্রস্তুত প্রণালীর গুণে এই স্বেতসার—পিচ্ছিল, গুণ-বিহীন ও শর্করায় পরিণত হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

৩য় শ্রেণীর খাওয়া কেবল অকুরিত, শুকীকৃত, ভজিত ও চূর্ণীকৃত ব্রীহি-দলাদি যথাবৎ বিদ্যমান থাকে—কোনরূপ গুণান্তরিত করা হয় না।

এক্ষণে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই ত্রিবিধ শ্রেণীর খাওয়া ব্যবহৃত হইবার উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে তাহাই কথিত হইতেছে।

প্রথম শ্রেণীর খাওয়া কেবল সেই ক্ষেত্রেই দেওয়া যায় যেখানে শিশু দুধের হানার ভাগ পরিপাক করিতে না পারে। কারণ এই জাতীয় খাওয়া হইতে অতি হৃৎ ভাগে দুধের হানার ভাগ নিষ্কাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় খাওয়া কদাচ ২১ সপ্তাহের অধিক সেবন করাইবে না। অতঃপর শিশুকে আবার মাতৃদুধ সহ করা হইবার চেষ্টা পাইতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর খাওয়া স্বেতসার নাই; সুতরাং ইহা বিজ্ঞান-তিনবাস রস হইতে অতি অল্প মাত্রায় হৃৎ সহ করা যাইতে পারে। অন্যরূপে যেমন কখনো কখনো

প্রয়োজন হইলে ক্রমশঃ মাত্রাবদ্ধিত করা যাইতে পারে। ইহার পুষ্টিকর খাদ্য এবং যেমন বালির জল ছুঁকের ছানার ভাগ পরিপাক্যেব সাহায্য করে ইহারাও সেইরূপ করিয়া থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্য অন্ততঃ এক বৎসর বয়সের পূর্বে শিশুকে সেবন করিতে দেওয়া যায় না। বরং একবৎসরের উপর ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত না দিলে আরও ভাল।

এই অধ্যায়ের শেষে আমরা কতকগুলি বিলাতী খাদ্যের উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। দুঃখের বিষয় এই সকল বিলাতী খাদ্যের বহু বিচিত্র আড়ম্বর পূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া সাধারণের বিশ্বাস হয় যে এই সকল খাদ্য বস্তুঃই “শিশুর খাদ্য” কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতেছি যে বস্তুতঃ তাহা নহে। এই সকল বিলাতী খাদ্য সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে আশা করি জনসাধারণ এবং পাঠকবর্গ ঐ সকল বিলাতী খাদ্যের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা অবধারণ করিতে এবং যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন। আনন্দ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি এবং বলিতেছি যে, এই সমস্ত খাদ্য বস্তুচ্ছভাবে যখন তখন ব্যবহারের কুফল স্মরণ রাখিতে হইবে এবং এই কথাটা বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, দুঃখভিন্ন অল্প কঠিন খাদ্য পরিপাকের যোগ্যতা না জন্মিলে ঐ সকল খাদ্য কদাচ শিশুকে দেওয়া যাইতে পারে না।

জল—শিশুর এই অত্যাবশ্যক পদ্য সম্বন্ধে সকলেরই কিছু জানিয়া থাকা ভাল। প্রাপ্ত বয়স্কের অপেক্ষা শিশুর জলের প্রয়োজন কম নহে, বরং তাহাদের আকারের তুলনায় অধিক। শিশুকে একবারে জলপান হইতে

বঞ্চিত করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা ও তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। অবশ্য অতিরিক্ত জলপান করিতে দেওয়া কদাচই হিতকর নহে, কিন্তু পরিমিত জল পান হইতে বঞ্চিত করিলে তাহার পোষণের বিষয় ঘটবে এবং তাহার শরীরের মল—বৃক্ক, বৃক্ক, কুসুম্ভ এবং অন্ত্র দ্বারা যথোচিত ভাবে নির্গত হইতে পারিবে না। কিন্তু শিশুকে জলপানে প্রশ্রয় দিলে সে হয়ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল প্রার্থনা করিতে পারে। এস্থলে তাহাকে বরং কিছু সতর্কতার সহিত জলপান করিতে দিবে। আচ্ছা শিশু যদি কিছু অতিরিক্ত জলই পান করে তাহাতে তাহার কি ক্ষতি হইতে পারে? ক্ষতি অতি সামান্য;—কিন্তু জল পান করিতে দেওয়া সম্বন্ধে কড়াকড়ি করিলে যে দোষ হয়, তাহা ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিতে পারে। সৌভাগ্য বশতঃ জল পানের পিপাসা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি এতই দুর্বল যে তাহাতে আমাদের পছন্দমত ব্যবস্থা চালান হইবে। অবস্থা বিশেষ কিছুকালের জন্য ছেলেদের জলপান প্রবৃত্তি রোধ করা আবশ্যক হয়। আহা করিতে বসিয়াই ছেলেরা যাহাতে অধিক জলপান না করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। ভোজনের প্রারম্ভেই অধিক মাত্রায় জলপান করিলে আশায়ের উত্তেজিত হ্রাস পাইয়া সুপরিপাকের ব্যাঘাত জন্মায়। ভোজনের কিছু পরে আশায় কার্যকর থাকিয়া উত্তেজিত লাভ করে সুতরাং তৎক্ষণ জলপান করিলে কোনই ক্ষতি হইতে পারে না। তুচ্ছ বস্তুকে স্নেহ ও জীর্ণ করিবার জন্য আশায়ে এক প্রকার স্রোত আছে। ইহার নাম ক্রেক জুস (gastric juice) অনেকের দ্বারা পরিচিত।

করিলে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ ক্লেদক প্লেগ্মা দ্রবীভূত ও ত্বর্কল হইয়া পড়িবে এই ভয়ে তাঁহারা জলপান সম্বন্ধে এতাদিক সতর্কতা অবলম্বন করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ভ্রম। আহার কালে জলপান করলে ক্লেদক প্লেগ্মাকে দ্রবীভূত করা হয় না; বরং পান করা জল শোষিত হইয়া ক্লেদক প্লেগ্মা শ্রাবের পক্ষে সহায়তা করে।

**বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা**—শিশুর পক্ষে পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা দেখান হইল বটে কিন্তু এই জল বিশুদ্ধ না হইলে হিতে বিপরীত ঘটে। দূষিত জল স্বাস্থ্যের পক্ষে কত অনিষ্ট কারী ও কত উৎকট রোগের জনক তাহা সংক্ষেপে কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের দেহের অধিকাংশই জল—প্রধানতঃ জলের দোষেই অজীর্ণ শূল, পাথরী প্রভৃতি উৎকট রোগ জন্মে। অশুদ্ধ জল পান করিয়াই যে দেশে কলেরা, রক্ত আমাশয়, নারায়ক সন্নিপাতজ্বর প্রাদুর্ভূত ও বিস্তৃত হইয়া জনপদ ধ্বংস করিতেছে এই বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। যে জল বিশুদ্ধ না হইলে এত অনিষ্টোৎপত্তি ঘটে পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে সেই জলের দোষ চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ—আমরা শুচিস্বভাব জাতি; সূত্ররং এদেশে যে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা অত্র দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক একথা সহজেই বুঝায়। যত-সমাজ-হিত কর অহুতান আছে তন্মধ্যে বিশুদ্ধ জল পাইবার সুব্যবস্থাকে যদি প্রোৎসাহ দান করা হয় তাহা হইলে বোধ হয় অত্যাশঙ্কিত হইবে না। প্রাচীন সমাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া দ্রবী সর্বোৎসাহ

প্রতিষ্ঠার পুণ্য করত ঘোষণা পুস্তক জন-সারারণকে তৎপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করিয়া ছিলেন। তাহার ফলে এ দেশে সুদীর্ঘ, প্রসারিত, অতিগভীর, সুস্বাদু জলপূর্ণ দ্রবী পুষ্করিণীর অভাব ছিল না। এখন অভিনব শিক্ষার প্রভাবে এবং অগ্রাশ্রয় নানা কারণে লোকের হৃদয় হইতে অনেক সুকুমার দেশ-হিতকরপ্রবৃত্তি অন্তর্হিত বা ক্ষীণ হইয়াছে। লোকে এখন পুণ্যজনক কৰ্ম্ম বলিয়া আর দ্রবী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করে না, অথচ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়াও বিশুদ্ধ জল যাহাতে সহজে সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহারও কোন ব্যবস্থা করিতেছে না। যাহা সহস্র সহস্র নরনারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহাকে পুণ্যকৰ্ম্ম বলিয়াই হউক বা লোকহিতকর বলিয়াই হউক অবশ্যই অন্তর্ধান করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব সঙ্কল্প গিয়াছে অথচ নূতন কিছু তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—সমাজের এই অবস্থা বড়ই পরিতাপ জনক ও অনিষ্টকর। দেশের লোকে বর্ষাকালে জলপ্রাবনে পরিত্রাণ চীৎকার করে এবং গ্রীষ্মকালে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া একঘণ্টা জলের জন্ত হাহাকার করে। বিশুদ্ধ জলের অভাবে শিশুকুল রূগ্ণ হইয়া জাতির যে সর্জনশ করিতেছে তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বিশুদ্ধ জলের অভাবে দেশে নানা সাংঘাতিক ব্যাধির অবাধ প্রসার হওয়ার বিরূপ অনিষ্ট সম্ভবিত হইতেছে তাহাও সংক্ষেপে বলিলাম। ইহা ত বিলাপ মাত্র, এখন কাজের কথা বলি।

**জল সংশোধনের উপায়**—বঙ্গের অধিকাংশ পানীয় পুষ্করিণী জলই দ্রবী সঙ্কল্পের অন্তর্গত এবং তাহা দ্রবী সঙ্কল্পের

উদ্ভবে অধিকতর দূষিত ইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর আধার যে পুষ্করিণীতে জল পান করা হয়—তাহাতেই শৌচ, প্রস্রাব; বস্ত্র-প্রক্ষালনাদি তাবৎ কায়াহ নির্বাহ করা হয়। যখন পুষ্করিণী ভুগভার ছিল বলিয়া জল বিশুদ্ধ থাকিত—তখন এই উভয় কার্য্য একটা পুষ্করিণীতে নিবাহ করায় যত ক্ষতি হইত, এখন পক্ষে পুষ্করিণী পূর্ণ—সুতরাং জলও মলিন হওয়ায় ক্ষতির ভাগ অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে। অতএব যেখানে বহুতা নদী আছে—সেখানে অন্ততঃ পানার্থে নদীর জল ব্যবহার করা উচিত। মন্দ হইলেও স্রোতের গল তত মন্দ হইতে পারে না, চোখা-ভাবারির জল কি মাঠের জমা জল পানার্থ কদাচ ব্যবহার করিবে না। জল ফুটাইয়া নাইলে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হয়। ইহা অপেক্ষা জল শোধনের সহজ উপায় আর নাই। ফিল্টার আজকাল অনেক রকম বাহির

হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সকল ফিল্টারকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ফিল্টারে জলশোধন করা অনেক স্থলেই মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। বর্ষাকালে অনেক নদীর জল ঘোলা হয়। এক কলসী ঘোলা জলে চার চামচের আধ চামচ ফুটকিরির গুঁড়া ঢালিয়া বেশ করিয়া গুলিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিলে জলের যত ময়লা তলায় পড়িয়া যাইবে। তখন আস্তে আস্তে উপরের জল গড়াইয়া গইয়া ফুটাইয়া নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যায়। তাহের জগশোধিনী শক্তি আছে—তুঁতেতে তামা আছে—এক জালা জলে ১ রতি তুঁতে দিলে জল বিশুদ্ধ এবং জীবাণু বর্জিত হয়। তাম্রময় জলপাত্র ব্যবহার করা ভাল—আয়ুর্বেদের উপদেশ—“তাম্রপাত্রে জনং পিবেৎ।”

(ক্রমঃ)

কুমারতন্তু-রচয়িতা।

## বায়ু।

—:—

আমকে জানিতে চাহিয়াই আয়ুর্বেদের উৎপত্তি। এই আয়ু আবার বায়ুকে আশ্রয় করিয়াই আপন অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। বায়ুকে ‘জীবন’ বলিয়া অভিহিত করা তাই সার্থক। আয়ুর্বেদের মূলীভূত বায়ুতত্ত্বের আজ যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রয়োজনীয়তা—পৃথিবীর চারি পার্শ্বে এক বিশাল বায়ুমণ্ডল আছে। এই মণ্ডলস্থ বায়ুকে সেবন করিয়াই পৃথিবীস্থ যাবতীয় প্রাণী জীবিত থাকে। জ্বপিত্তের স্বাস-প্রশ্বাস

দ্বারাই জীবন সূচিত হয়। বায়ু সাহায্যেই এই স্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া পরিচালিত হয়। খাড়াভাবে বসং আমরা কিছুদিন বাঁচিতে পারি, কিন্তু বায়ু ভিন্ন কয়েক মুহূর্তেই আমাদের জীবনলীলা সাক্ষ হয়। এই বায়ু যত বেশী বিশুদ্ধ, তত বেশী দীর্ঘ জীবনের পক্ষে উপযোগী। বায়ুকে শরীর মধ্যে স্থিরতা দান করিতে পারিলেও দীর্ঘ জীবন লাভ হইতে পারে।

প্রাচীন মনসী হিন্দু এই বায়ুর উপকারিতাকে যথাযথ ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, তাই

আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিশুদ্ধ বায়ুর গুণকীর্তনে মুখরিত, তাই হিন্দু যোগীর প্রাণায়াম-হঠযোগে বায়ু-সুশুদ্ধন করিয়া দীর্ঘজীবন লাভের বিজ্ঞান-মন্ত্রত ব্যবস্থা।

ক্ষয়কাস, ওলাউঠা হইতে আবদ্ধ করিয়া অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় কঠিন রোগই মূলতঃ বায়ুর অপচুর ব্যবহার বা অলিঙ্গক বায়ু সেবন দ্বারা সূচিত হয়। বায়ু যে জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহার একটি পঠিত প্রমাণ দিতেছি। এক বিখ্যাত ইউরোপীয় চিকিৎসক এক স্তূহৎ কাঁচপাত্রে একটি জীবিত পক্ষীকে আবদ্ধ করিয়া air-pump (এয়ার পাম্প) দ্বারা পাত্রস্থ যাবতীয় বায়ু বাহির করিয়া লন। মুহূর্ত্ত মধ্যে পক্ষীটি মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ পাত্রের মুখ খুলিয়া দেওয়া হইল, পর্যাপ্ত-বায়ু সেবনে পক্ষীটি অচিরে সজীব হইয়া উঠিল।

**বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান—**বিশুদ্ধ বায়ু যখন জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়, তখন ইহা কি কি উপাদানে গঠিত তাহা জানিতে অনেকের কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, প্রতি সহস্র ঘন ফুট স্বাভাবিক নির্মল বায়ুতে ৭১০০ ঘনফুট নাইট্রোজেন, ২০৯৬ ঘনফুট অক্সিজেন, ৮ ঘনফুট কার্বন ডায়কসাইড ও অবশিষ্টাংশ ওজোন জলীয়বাষ্প, গ্র্যামোনিয়া ইত্যাদি অল্পাধিক পরিমাণে বর্তমানে আছে। এই সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে অক্সিজেনই প্রাণধারণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই অক্সিজেন দ্বারাই জীব-শোণিতের নির্মলতা সম্পাদিত হয়। এই নির্মল শোণিতই সুগঠিত সূহ দেহ ও উৎসাহশীল মন প্রদান করিয়া মানবকে কৃশ্মে প্রবৃত্ত করে। পার্কডা

প্রদেশের ও সমুদ্রোপকূলবর্তী বায়ুতে এই অক্সিজেন অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়াই, তৎ তৎ স্থানের মানুষ অধিকতর নীরোগ দেহ ও কর্মী। এইজন্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ দেশীয় রোগীকে বায়ু পরিবর্তনের জন্ত দার্জিলিং বা পুরী যাইতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বাস্তবিকই বিশুদ্ধ বায়ুই অনেক রোগের একমাত্র ঔষধ। কোন ঔষধেই যে রোগ আরোগ্য হয় নাই, শুদ্ধ বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে তাহা অনেক সময় আরোগ্য হইয়াছে। ঔষধ ভিন্ন নির্মল বায়ু সেবন দ্বারা রোগারোগ্যে নিদর্শন যত বহুল, নির্মল বায়ু ভিন্ন শুদ্ধ ঔষধে রোগারোগ্যের নিদর্শন ততোধিক বিরল।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, বায়ুর মধ্যে অক্সিজেনই যদি সমধিক আবশ্যক, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুধু অক্সিজেনের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে অধিকতর সবল সূহ দেহ ও আয়ুস্মান হওয়া যায় কিনা? বাস্তবিকই বিধাতার বুদ্ধির উপর মানুষ কোনদিনই বাহাদুরি দেখাইতে পারে না। যেটি আমাদের ঠিক উপযোগী, বিধাতা ঠিক সেইটিই দিয়াছেন, তা'র উপর তুলি বুলাইতে গেলেই ঠকিতে হয়। বিধাতার জলের উপর কারসাজি করিতে যাইয়া মানুষ কলের জল তৈয়ার করিল, কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) জমনি আসিয়া হাজির হইল। ইলেকট্রিক আলোর বাহাহুরিতে নিত্য কত লোক মারা পড়ে, কত বালক বার বৎসরে চসমাধারী হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

Heber, Wilson, Notter, Firth, প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ রাসায়নিক চিকিৎসক বলেন যে, বায়ুতে যদি কেবলই অক্সিজেন থাকিত—তবে প্রাণিকগণ অত্যন্ত চকল ও

ধ্বংসপ্রায় হইলেও নিত্যন্ত অগ্নায়ু হইত। অক্সিজেনপূর্ণ একটা পাত্রের মধ্যে একটা জনন্ত অঙ্গার ধরিলে এ কথার যথার্থ্য উপলব্ধি হয়। অঙ্গার খণ্ড ক্ষণকাল অতীব দীপ্তিমান হইয়াই নির্দীপিত হইয়া যায়। অক্সিজেনসহ নাইট্রোজেন ও কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস মিশ্রিত থাকায় জীবের পক্ষে বায়ু অধিকতর সহনীয় ও হিতকর হইয়াছে। অধিকন্তু যে উদ্ভিজ্জ-জগৎ অধিকাংশ জীবের আহারীরের সংস্থান করে, কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস সেই উদ্ভিজ্জ জগতের পোষণ কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। উদ্ভিদগণ দিবাভাগে স্বর্যাকিরণ ও স্বীয় সূর্য্যবর্ণ বিশিষ্ট ক্লোরোফিল নামক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া-সাহায্যে বায়ুস্থিত কার্বনিক গ্যাস হইতে কার্বন গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি হয় এবং অক্সিজেন ত্যাগ করিয়া বায়ু-মণ্ডলকে পরিস্কৃত ও অধিকতর হিতকারী করে। নাইট্রোজেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কার্যকারী না হইলেও বায়ুকে পরোক্ষভাবে অধিকতর উপভোগ্য করিয়া আমাদের জীবন ধারণে সহায়তা করে। অতএব দেখা যাইতেছে—

—বায়ু প্রস্তুতকরণে বিধাতা কুম কৌশলের পরিচয় দেন নাই। বায়ুতে এই বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণে তিনি জীব-জগৎ ও উদ্ভিজ্জ জগতের যুগপৎ পরিবর্তনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কি সুন্দর সামঞ্জস্য! যে কার্বনিক গ্যাস মানুষ প্রশাসের সঙ্গে ত্যাগ করে—তাহাই বিভক্ত করিয়া উদ্ভিদ কার্বন গ্রহণ করে ও জীবজগতের শ্বাস-গ্রহণোপযোগী জীবনের পূর্ণ হিতকর অক্সিজেন দান করে। ঐ কার্বন ডায়কসাইড আবার অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া বায়ুকে জীবের সহনীয় ও অধিকতর উপভোগ্য করিয়া তুলে।

বিশুদ্ধ বায়ু—অতএব দেখা যাইতেছে, স্বাভাবিক বিশুদ্ধ বায়ুই জীবের পক্ষে প্রস্তুত হিতকর। কৃত্রিম উপায়ে মানুষ বায়ু প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু তাহা যে কলের জল ও বৈজ্যতিক আলোর মতই মানুষের সর্বনাশ করিবে না—তাহা বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক বায়ু এখনও এত সুলভ আছে যে, কৃত্রিমতা অবলম্বনের আদৌ আবশ্যকতা নাই। তবে এ কথাও সত্য যে, স্বাভাবিক বিশুদ্ধ বায়ু জীবের পক্ষে হিতকারী হইলেও সর্বত্র বিশুদ্ধ বায়ু সুলভ নহে। প্রকৃতি চিরকালই নগ্ন। তাই নানা কারণে স্বাভাবিক বায়ু দূষিত হইতে পারে, কিন্তু কিঞ্চিৎ সতর্ক ও চেষ্টাশীল হইলে আমরা এই দূষিত বায়ুকে সুসংশোধিত করিয়া লইতে পারি। বিশুদ্ধ বায়ু যখন দীর্ঘ জীবনের নিদান ও অবিশুদ্ধ বায়ু আয়ুর্হানিকর ও নানারোগের আকর, তখন বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ব্যবস্থা চিকিৎসার প্রথম ও সর্বোচ্চ সোপান হওয়া উচিত। আমি বিশুদ্ধ বায়ু-প্রাপ্তি সম্বন্ধে কয়েকটা উপদেশ দিয়াই অল্পকাল প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

বায়ু বিশুদ্ধ করিবার উপায়—

১। আবদ্ধ বায়ু শীঘ্রই দূষিত হইয়া পড়ে। অতএব বাড়ী এমন খোলা ও চতুর্দিকে প্রাঙ্গন বিশিষ্ট হওয়া উচিত, যাহাতে সর্বদা বায়ু কর্তৃক বিধৌত হইতে পারে। ঘরগুলি এমন জানালাবহুল হওয়া বিধেয় যে, বায়ু এক জানালা দিয়া আসিয়া অন্যায়সে অপর জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

২। পয়সিত ও গলিত পচনশীল জিনিস কিছুতেই বাসস্থানের চতুর্দিকে না জমিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। কারণ যত সব

রোগবীজাণু সাধারণত পচা জিনিসের মধ্যেই বদ্ধিত হয়। বাতাস এই বীজাণুগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া রোগের সংক্রামকতার বৃদ্ধি করে।

৩। রান্নাঘর যতদূর সম্ভব শয়ন গৃহের দূরবর্তী হওয়া প্রয়োজনীয়। রান্নাঘরেও বাহাতে ধূম জ্বলিতে না পারে—এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। বিলাতে রান্নাঘরের ধূমের অব্যাহত নিষেধের জন্য চিমনি রাখার প্রথা অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয়। মনে রাখিতে হইবে—রন্ধন-কাঠ বা কয়লা কার্বন পদার্থ। অক্সিজেন সাহায্যে দাহন-কার্য সম্পন্ন হয়। দাহনকালে কার্বন অক্সিজেনে মিশিয়া কার্বন ডায়ক্সাইড নামক গ্যাস প্রস্তুত হয়। এই কার্বন ডায়ক্সাইড শ্বাস গ্রহণের পক্ষে নিতান্ত অহিতকর। অতএব ঐ গ্যাস বাহাতে অব্যাহত হইয়া স্ববহু প্রাঙ্গণের প্রচুর বায়ুতে মিশিতে পারে—তাহা করা উচিত। এই জন্যই কলকারখানা যত দূর সম্ভব গ্রাম বা নগরের বাহিরে পরিচালিত হওয়া উচিত। একান্ত অসম্ভব হইলে ঐ ধূম বাহাতে কোনও জলাশয়ের জলের সহিত মিশিয়া বাইতে পারে—এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। একগুচ্ছ অধিক লোক শয়ন করা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। আমরা প্রাথমিককালে কার্বন ডায়ক্সাইড ভ্যাগ করি। শ্বাস গ্রহণের পক্ষে অহিতকর এই গ্যাস গৃহস্থ বায়ুকে নিতান্ত দূষিত করে। তারপর রাত্রিতে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করার যে অভ্যাস তাহাও অত্যন্ত গর্হিত। প্রস্থানে যে কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস বহির্গত হয়, তাহা গৃহে আবদ্ধ থাকিলে কিছুতেই বহির্গত হইতে পারে না। সুতরাং অনেক সময় প্রাণনাশও সম্ভবপর

হইয়া থাকে। 'ব্লাকহোল ট্রাজিডি' যে কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাসেরই কীর্তি সে বিষয়ে অণুমান সংশয় নাই।

মোটের উপর বায়ুর অনাবদ্ধতা বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। সর্ব প্রথমে বাহাতে বাসস্থানের চতুর্দিকে বায়ুর চলাচল অব্যাহত থাকে—তাহা করিতে হইবে। তাহার পর মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা নদী ও সমুদ্রের উপকূলে বেড়াইতে বাইতে পারিলে প্রায়শই রোগাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার উপায়—এ তো গেল বিশুদ্ধ বায়ুকে ঘরে আনিবার কথা। কিন্তু বায়ু যখন পুতুদোষ বা মহামারীর সংক্রামকতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—তখন কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? এই দূষিত বায়ুকে গ্রহণ করিতে থাকিলে রোগকবলিত হওয়া একদম নিশ্চিত। অতএব তখন বাহাতে এই দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করা বাইতে পারে—তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য।

১। আবদ্ধতা হেতু বায়ু দূষিত হইলে প্রথমতঃই বায়ু চলাচলের স্ববন্দোবস্ত করা উচিত। বাড়ীর চারিদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ থাকিলে তাহা যথাসম্ভব কাটিয়া ফেলা উচিত। দক্ষিণ দিক হইতেই ভাল বায়ু অধিকাংশ সময়ে আসিয়া থাকে; অতএব বাড়ীর দক্ষিণ দিক একেবারে খোলা রাখাই বিধেয়।

২। অনেক সময়ে বাড়ীর নিকটে পচা পানীয়, অবিষয় পচনশীল নানানদ্রব্য থাকে। এইরূপ বায়ু দূষিত হইয়া রোগের



নষ্ট করে। এই সমস্ত পুকুর নালা-নর্দামাদি পরিস্কৃত রাখা বায়ুবিগ্ৰহের প্রধান উপায়।

এই সমস্ত সাধারণ কারণ ভিন্ন বিশেষ বিশেষ কারণে বায়ু দূষিত হইলে অল্প কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে যায়।

৩। যখন মহামারী প্রভৃতি কারণে সর্বত্রই বায়ু দূষিত হইয়া পড়িয়াছে—তখন বায়ু অপাধ চলাচল রোধ করাই বরং অনেক ক্ষেত্রে সমীচীন। নতুবা বায়ু প্রবাহ দ্বারা অতি সহজে রোগ সংক্রামিত হয়।

৪। সংক্রামক ব্যাধি প্রসারের সময়ে বায়ু অপাধ গমনাগমনের জন্য বিশেষ চিন্তিত না হইয়া, নিজ বাসস্থানস্থ বায়ুকে যাহাতে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

৫। বাড়ীর উঠানে সূর্যহং অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা উচিত। ইহাতে বায়ুর লব্ধতা সম্পাদিত হওয়ায়, নিম্নস্তরের দূষিত বায়ু উর্দ্ধে উত্তীর্ণ গিয়া মহাবায়ু-সমুদ্রে মিশিয়া বিশুদ্ধ হয়, অধিকতর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে অনেক বীজাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

৬। অঙ্গার বা কয়লা—বায়ুশোধনের পক্ষে এক স্থূলত উপায়। শুদ্ধ পরিস্কৃত কয়লা গৃহ মধ্যে চারি পাচ হাত উর্দ্ধে কোন সচ্ছিন্ন পাত্র বাথিলে গৃহ মধ্যস্থ বায়ু অতি বিশুদ্ধ হয়। অঙ্গারের মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র আছে। অঙ্গার এক রাসায়নিক শক্তি বলে বায়ুর দূষিত অংশ নিজ ছিদ্র মধ্যে টানিয়া লয়। সপ্তাহান্তে একবার করিয়া ধুইয়া ব্লোয়ে শুকাইয়া লইলে একই কয়লা বহুদিন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৭। ‘ওজোন’ নামক এক রাসায়নিক পদার্থ বায়ু বিশুদ্ধ করিতে বিশেষ উপযোগী।

৮। গন্ধকের বাষ্প বীজাণু নষ্ট করিতে ধনস্তরি। ধূপ ধূনার ধূম ও বায়ু শোধিত হয়। হিন্দুর পূজায় ধূপধূনা প্রজ্জ্বলিত করা কত বিজ্ঞান-সম্মত—তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

৮। গন্ধকের বাষ্প বীজাণু নষ্ট করিতে ধনস্তরি। ধূপ ধূনার ধূম ও বায়ু শোধিত হয়। হিন্দুর পূজায় ধূপধূনা প্রজ্জ্বলিত করা কত বিজ্ঞান-সম্মত—তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

৯। গোময় ও মৃত্তিকা ছর্গন্ধ ও পচন নিবারণে একান্ত সমর্থ। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-বিদেরাও মৃত্তিকার ছর্গন্ধ-নাশিকা শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। পচনশীল দ্রব্যের উপর মৃত্তিকা ছড়াইয়া দিলে তাহার ছর্গন্ধ নষ্ট হয় ও তাহাতে আর রোগ-বীজাণু আশ্রয় লইয়া সঞ্চিত হইতে পারে না। গোময়ের প্রলেপে গৃহস্থিত-রোগ-বীজাণু মরিয়া যায়। আজিও বর্তমান হিন্দু-ভবনের গোবর ছড়া দেওয়া বা ঘরের মেঝেয় নিত্য নিত্য গোবর লেপন নিত্য নিত্য নিরর্থক নহে। গোময় ও বায়ু সংশোধন করিয়া থাকে।

১০। কার্বলিক গ্যাসিড ত্রিশ গুণ জলে মিশাইয়া গৃহমধ্যে ছড়াইয়া দিলে সকল ছর্গন্ধ দূর হয়, জৈবিক পদার্থের পচন শক্তি বিনষ্ট হয় ও উদ্ভিদ-বীজাণু প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। ফিনাইল জলে মিশাইয়া ছড়াইয়া দিলেও একই ফললাভ হয়।

আজি আর কিছু বলিব না। যতটা বলিলাম, তাহাতে বায়ু যে সত্য সত্যই জীবন এ কথা উপলব্ধি করাইতে চেষ্টা করিয়াছি। নির্মল বায়ুর অভাবেই যে আজি বাঙ্গালী এত জরাজীর্ণ একটু চিন্তা করিলেই তাহা হৃদয়দর্শন হয়। বঙ্গদেশের প্রায় রোগই মূলতঃ বায়ুর অসম্মান করার বিষয়। ফল। আশা

করি, বাঙ্গালী এবার চোখ খুলিয়া দেখিবে। | আজি উপস্থিত করিয়াছি, সে গুলি চূড়ান্ত না  
আনি বিগুরু-বায়ু-প্রাপ্তির যে যে পস্থা গুলি | হইলেও পর্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

## বাঙ্গালার লোকঙ্গণ।

—:~:—

সেনিটারী কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলী মিউনিসিপাল এলাকা ব্যতীত বাঙ্গালার জেলা সমূহে  
গত এপ্রিল মাসে কত লোকের জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।  
সে ভীষণ তালিকার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

জেলা	জন্ম	মৃত্যু	কলেরা	বসন্ত	জ্বর
বর্ধমান	৩৪০৪	৭৪৭৩	১২৭২	৪৭	৫৩৬৯
বীরভূম	২৩২৫	৪৪৭৪	৮৬৯	৫৩	৩২৫৩
বাঁকুড়া	৩৫৩৫	৪২৩৫	৩৩৪	৬৪	৩১১৩
মেদিনীপুর	৬৫০৯	১০৫৪৯	১৫২৮	১৪৪	৭৬৪৪
হুগলী ও শ্রীরামপুর	১৭২৭	৩০৭৫	৩৪৬	৯৩	২১৮১
হাওড়া	১৭৯২	২১৯৫	৩৭৫	১৪৬	১০০১
২৪ পরগণা	৩৮৭৯	৪৪২২	১২৯০	৭০	২৪৫৭
নদীয়া	৩৮৯৬	৭৮৩৪	১২২৩	৮৩	৫২৮৮
মুর্শিদাবাদ	৩৮২৬	৬৩০২	১৬৭২	২৮	৪০৪১
যশোহর	৩৭৩৯	৪৮২৩	৯৮১	২৮	৩৪৩৩
খুলনা	২৮৯৭	৩৩৩৩	৫৩৩	২	২০৩২
রাজসাহী	৪৫৩১	৫৭১৮	৭৩৬	৬৪	৪৫৩৩
দিনাজপুর	৫৭৫১	৫৭২৩	১৪৪	১০৫৬	৪০৬৮
জলপাইগুড়ি	২৪৫৫	৪১৪০	৯৯৭	১৪৪	২৬৯১
দারজিলিং	৬৪২	১১৬৫	১৬৯	৪৩	৭৬৯
রঙ্গপুর	৭০২১	৮৩৯৯	৯১৮	১২৩৭	৬১৫১
বগুড়া	২৫৮৩	২৩৬০	৩৫০	১৬৫	১৬০৮
পাবনা	৩৪৪৮	৬৫৭১	১৬২২	৬০০	৪১৩৭
মালদহ	২৭৫২	৩১৯৩	৭১২	৯৬	২১৭০
ঢাকা	৭৫৩৮	৮০৬৪	১৪৬৯	১৮৪	৪৫৭৯

ময়মনসিংহ	১০৯৪০	১০৮৬৮	১৮০৫	৩৩৮	৭৫৩৯
কবিদপুৰ	৫২৬১	৬৬৯২	১৩৮৮	৭৬	৪২৩৪
বাখলগঞ্জ	৭০১০	৮০৭৩	১২৬৭	২৪	৪৭৮৪
চট্টগ্রাম	৩৮২৪	৪৯৭৭	১২৯৫	১৬	৩৪৮২
নোয়াখালী	৩৩৩৪	৩৬৭৮	৫২৯	৬২,	২৫৮০
দিপুৰা	৫৬৫৯	৬১৬৫	১০৬০	৩৩৭	৩৫৭৮
সমস্ত বাঙ্গালা	১,১০, ৫২	১,৪৪৫০১	২৫৮৬৫	৫১৯৬	৯৭০১৫

গত এপ্রিল মাসে সমস্ত বঙ্গদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা ৩৪ হাজার বেশী হইয়াছে। কেবল দিনাজপুর, বগুড়া ও ময়মনসিংহে জন্ম সংখ্যা কিঞ্চিৎ কম, আর সর্বত্রই বেশী। কলেরা, বদন্ত ও ম্যাগেরিয়া নিবার্য ব্যাধি। চেষ্টা করিলেই উহা নিবারণ করা যাইতে পারে কিন্তু দর্শনতা, অজ্ঞানতা ও শিথিলতার জন্ত ঐ ৩ ব্যাধিতে একমাসে ১,২৮,০৭৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বাঙ্গালার যে সকল সহরে ১০ হাজার ও ততোধিক লোকের বাস, সেই সকল সহরে এপ্রিল মাসে ৩৭১০ জনের জন্ম ও ৯৬৫৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

রাজপুত্রদের মুখ চাহিয়া আর থাকা উচিত নয়। গ্রামগুলি স্বাস্থ্যকর করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, দরিদ্রতা দূরের উপায় করা আমাদেরই কাজ। যদি আমরা বাচিয়া থাকিতে চাই, তবে আয়শক্তির উপর নির্ভর কর' ব্যতীত গতান্তর নাই।

“সঞ্জীবনী”—২২শে শ্রাবণ ১৩২৬।

—:~:—

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:~:—

বসন্ত চিকিৎসা পুরস্কার।—  
বঙ্গের দেশীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে এ  
বৎসর যাঁহারা ময়মনসিংহে সন্তোষজনক ভাবে  
বসন্ত রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহাদের  
পুরস্কারের জন্ত গবর্ণমেন্ট ছই হাজার টাকা  
দণ্ড করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় বসন্তচিকিৎ-  
সকগণ উৎসাহ পাইবেন, সন্দেহ নাই।

আয়ুর্বেদের নিন্দা সম্বন্ধে সঞ্জী-  
বনী।—ডাক্তার লেপটেনান্ট কর্ণেল সাদার-  
ল্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে যে  
আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপ্রণালীর নিন্দা করিয়া

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সহযোগিনী  
সঞ্জীবনী প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

“যে চিকিৎসা প্রণালীর বয়স সহস্র সহস্র

বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, যাহার সার্থকতায়  
এত কাল কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই, এই  
বার লেপটেনান্ট কর্ণেল সাদার ল্যাণ্ড প্রকাশে  
উহার নিন্দা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই  
চিকিৎসা প্রণালী কিরূপ সুস্বাস্তি ও শ্রায়ের  
ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, তাহা তিনি কি করিয়া  
বুঝিবেন? সংকীর্ণ দলাদলীর ভাব হইতে  
কোন একটি বিষয় আলোচনা করিলে উহার

সত্য মূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায় না। তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকতার অভিমান লইয়া আবুর্সেদের প্রতি বৃক্ষিম কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কবিরাজদের রোগনির্ণয়পদ্ধতি তাঁহার আক্রমণের প্রধান বিষয়। অন্ধের হাতী দেখার মত লেপ্টেনান্ট কর্ণের সাদার ল্যাণ্ডের আবুর্সেদের বোধ জন্মিয়াছে। এমন বোধ হয় তো আরও কাহারও কাহারও পাকিতে পারে, কিন্তু ইনি আপনাব অদ্ভুত বোধ কাগজে বাক্ত কবিয়া অতি অনিষ্ঠ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমরা উহার প্রতিবাদ না করিয়া পারি না।

আমরা লেপ্টেনান্ট কর্ণকে ইহাই অরণ করাইতেছি যে, এই চিকিৎসা প্রণালী রাজাধিকুল্য বাতিরেকে কেবল স্বকীয় শ্রেষ্ঠতার জন্তই সহস্র সহস্র বর্ষ সগৌরবে জীবিত রহিয়াছে।”

**চিকিৎসকের পরলোক।**—রাজা রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ করুণা কুমার গুপ্ত মহাশয় কিছুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। ক্ষত চিকিৎসায় ইঁহার যথেষ্ট প্রদীক্ষি ছিল। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান্যের উন্নতি করে ইনি যথেষ্ট চেষ্টাবান ছিলেন। উপরোক্ত বিজ্ঞান্য সংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালয়ের শল্যবিভাগের ঔষধাবলী ইঁহারই ব্যবস্থায় নির্ণীত হইত। ইঁহার বিয়োগে বিদ্যালয়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। ইঁহার বিয়োগবান্ধা প্রচারমাত্র বিজ্ঞান্য এক দিনের জন্ত বন্ধ করা হইয়াছিল। আমরা ইঁহার অভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ভগবান ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি প্রদান করুন।

**রসায়নবিদ বাঙ্গালী বালক।**—

জব্বলপুর সহরের মিঃ পি, সি, দত্ত নামক জনৈক ব্যারিষ্টারের পুত্র মিঃ ই, দত্ত নামক একটি সতের বৎসর বয়সের বালক রসায়ন শাস্ত্রে নানা প্রকার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছেন। কয়লার খনিতে এক প্রকার বাষ্প জন্মে, সে দেখাইয়াছে যে, উহা অজ্ঞ স্থানেও জন্মান যাইতে পারে। এই বাষ্প ভিন্ন গন্ধক প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াও ঐ বালক সরকার হইতে পেটেন্ট প্রাপ্ত হইয়াছে। সোডা, কার্বনেট, আলুমিনা পটাশ প্রভৃতি আরও কতকগুলি দ্রব্যও ঐ বালক আবিষ্কার করিয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

**অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের নূতন ব্যবস্থা।**—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃই বদ্ধিত হইতেছে। এই শ্রাবণে এই কলেজ ৪র্থ বৎসরে পদার্পণ করিল। নূতন সেসনে অনেকগুলি graduate ও under graduate কৃতবিদ্য ছাত্র ভর্তি হইয়াছে। এই সকল ছাত্রের ভবিষ্যৎ উপায়ের জন্ত কলেজের কর্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়াছেন যে, চতুর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১ম ও দ্বিতীয় ছাত্রকে ভারতীয় রাজস্ববর্গের চিকিৎসকরূপে অথবা সরকারি চিকিৎসালয় সমূহের চিকিৎসকের কার্যে উপযুক্ত বেতন নিষ্কারে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। যাহারা চিকিৎসা বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে চাকরী করিবার প্রয়াসী, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা অপূর্ণ সুযোগ সন্দেহ নাই।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৩য় বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—ভাদ্র ।

১২শ সংখ্যা ।

“অশ্বিনী কুমার” ।

—:~:—

আদিম যুগের প্রাচীন গাথা বিঘোষিল বেদ সমন্বরে ।  
যাঁদের মহিমা যাঁদের গুরিমা উথলে আজিও ভুবন চরে ॥  
ত্রিদিবে যাঁদের অতুল প্রভায়, ছাইল অপার যশের রাশি ।  
শাস্ত করিল করুণা ধারায় মুগ্ধ এখনও জগত বাসী ॥  
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা ।  
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী স্নত স্ময়মা ভরা ॥  
জনক যাঁদের কণ্ঠগ স্নত ত্রিলোক পূজ্য দেবতা স্বর্য ।  
বিশ্বকর্মা-তনয়া- সংজ্ঞা-জ্ঞাননী, জামাতা অমৃতার্চ্য ॥  
উত্তর কুরু বর্ষে উদিল যুগল কুমার মধুর দৃশ্য ।  
বিরাট তীরে পুণ্য আলোক উজ্জলি' ছাপিল সারাটি বিশ্ব ॥  
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা ।  
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী স্নত স্ময়মা ভরা ॥  
দক্ষ-সকাশে শিক্ষা লভিলে শিষ্য হইল অমর ইন্দ্র ।  
অশেষ প্রেতিভা প্রকাশি' রচিতলে স্বনামে অশ্বিনীকুমার ভঙ্গ ॥  
ভৈরব-কোষ-ছিন্নদীর্ঘ যুক্ত করিলে ব্রহ্মদেবে ।  
যজ্ঞ-অংশ লভিলে সমস্তে অক্ষত করি' দেবতা সবে ॥

ধনু ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।

অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী স্নত স্মৃষা ভরা ॥

ভুজস্তু ব্যাধি বিমুক্ত তোমারি প্রভাবে, দেবতা ইন্দ্র।

ভগের নেত্র, তপনে দস্ত দানিলে ; যক্ষা মুক্ত চন্দ্র ॥

‘সুকন্তার’ ধর্ম রক্ষা করিলে হবির চাবনে ঘোবন দানি।

ব্রহ্মবাদিনী, ঘোষার কুষ্ঠ নীরোগি’ মুছা’লে কুমারী বাণী ॥

ধনু ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।

অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী স্নত স্মৃষা ভরা ॥

ইন্দ্র ছেদিত শীর্ষ যোজিলে দর্ঘাচি মুনির পুনর্বার।

অরি কর হ’তে রাজা বিনদের পত্নী করিলে সমুদ্রার ॥

তুণ্ড পূর্ব ভুজুর স্তবে বিশাল জলধি করিলে পার।

ঋত্নাশ্বেরে নয়নে পশিলে নাশিলে অসীম অন্ধকার ॥

ধনু ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।

অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী স্নত স্মৃষা ভরা ॥

খেল নৃপতির জায়া বিশবলা স্ততিতে লভিল করুণা তব।

সমর ক্ষেত্রে ছিন্ন চরণে লৌহ জঙ্গা ঘটিল নব ॥

বিজ্ঞানালোক বিকাশি নবীন রাখিলে নিখিল বিমল কীর্তি।

অমর ইন্দ্র বন্দিল পদ নীরোগ মানব স্মরিয়া মূর্তি ॥

ধনু ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা।

অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী স্নত স্মৃষা ভরা ॥

ত্রীসিদ্ধেশ্বর সামাধ্যায়ী ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ

এইচ, এল, এম, এস।

## প্রাচীন ভারতে কীটগু তত্ত্ব।

—:—

জাগ্রতিতে কীটগুত্বের আবিষ্কার সাহিত্যবিজ্ঞানে সূত্ররূপে প্রবর্তন করি  
হইয়া সমস্ত ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই রাখে। পূর্বে যক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি সংক্রামক  
কীটগুত্ব আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ও পীড়ার হেতু বলিয়া কীটগুত্বের বহু

এইক্ষণে আর তাহা নাই, কীটগুর জায় তাহার তত্ত্ব ও বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত রোগেরই বিভিন্ন নিদান বিভিন্ন প্রকারের কীটগু বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে। পণ্ডিতগণ আবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—কতকগুলি কীটগু শরীরের অপকারী, কতকগুলি কীটগু উপকারী। দৃষ্টে এই উপকারী কীটগু পাওয়া যায়—এইজ্ঞ দধিভোজীরা দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। আমাদিগের চিকিৎসাবিজ্ঞানে দধিকে দীর্ঘায়ু বলা বলাইছে কিনা জানি না, তবে অনাদি কাল হইতে আমাদিগের দেশে যে দধির ব্যবহার ছিল, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, ইহা দেশ হইতেই যে অলদিন পূর্বে ভিন্নদেশে দধির আমদানি হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি। ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে যাহারা দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখে নিম্নত যেমন দধির প্রশংসা শুনা যায়, তাঁহারা যেমন সকল রোগেই রোগীকে, দধি পথ্য দিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন আমাদের কবিরাজ মহাশয়দিগের মুখে সেরূপ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায় না এবং সেরূপ ব্যবস্থাও দিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন যাহার চক্ষুগ উঠে, তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ ইউরোপ যেমন নাচিয়া উঠে, আমাদের বৈজ্ঞানিকের আজও ততটা হয় নাই, তাঁহারা গডলিকা প্রবাহের একান্ত বিরোধী। ব্যাকরণে পর্য্যন্ত আছে—“স্থলং করণং দধি”। দধি যে উপকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে সকল সময়ে সকল অবস্থাতে সকল রোগে দধি যে উপকারী—যাহারা দধির আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ তাহা স্বীকার করিবেন না। এইরূপ সমস্ত রোগেরই কারণ কীটগু—এ কথাও সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে না।

দধির মতন কীটগুতত্ত্বেরও সর্বপ্রথমে ইউরোপে আবিষ্কার হয় নাই। ভারতেই কীটগু তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কার, এবিষয়ে সংস্কৃত কাব্য, নাটক, পুরাণ, তন্ত্র ইহিতে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইতে পারি। পৃথিবীর সর্বপ্রধান ও সর্ব প্রথম ধর্মগ্রন্থ—বেদে পর্য্যন্ত এই কীটগুতত্ত্বের উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও তদভাবে ভাবিত; তাঁহাদিগের ভারতীয় ছাত্রগণ বেদের মন্ত্রভাগ প্রথমে রচিত, তাহার অনেক পরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত, মন্ত্রভাগের মধ্যে আবার ঋকসংহিতার রচনা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন—এই স্বকপোলকল্পিত অভিনব মতের পক্ষপাতী। আমরা কিন্তু সেই মতের কোন ভিত্তি বেদে পাই না। আমরা সকল বেদকেই নিত্য অনাদিকালসিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করি। এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদিগের মতসিদ্ধ ঋকসংহিতা হইতেই এই কীটগুতত্ত্বের প্রমাণ স্বরূপ করেকটা মন্ত্রের আজ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি, পাঠক পাঠিকারী দেখিবেন, ইউরোপ আমাদিগকে আজ পর্য্যন্তও কোন নূতন কথা শুনাইতে পারিতেছেন না। আমরা ঋকসংহিতার সেই মন্ত্রগুলির উল্লেখ না করিয়া বা তাহার সাযন ভাষ্যের উল্লেখ না করিয়া মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত যে সেই মন্ত্রগুলির অনুবাদ করিয়াছেন, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তাহাতেই নবীনদণ্ড অধিক সন্তুষ্ট হইবেন।

১। “অন্নবিষ প্রাণী, মহাবিষ প্রাণী, জলচর, অন্নবিষ প্রাণী ছই প্রকার (জলচর ও স্থলচর), দাহকর প্রাণী, এবং অদৃশ্যরূপ প্রাণী, আমাকে (বিষ দ্বারা) সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত করিয়াছে।

২। যে ঋষি আসিতেছে তাহা অদৃশ্য

রূপ (বিষধর) প্রাণীকে নাশ করে ও প্রত্যাবর্তনকালে তাহাকে নাশ করে। বিনষ্ট হইবার সময় নাশ করে এবং পিষ্ট হইবার সময় পেষণ করে।

৩। শর, কুশর, দর্ভ, সৈর্য, মুঞ্জ, বীরণ প্রভৃতি (যাসে) অদৃষ্টরূপে অবস্থিত (বিষধরগণ) সকলে মিলিত হইয়া আমাকে লিপ্ত করিতেছে।

৪। যখন ধেমুগণ গোষ্ঠে উপবেশন করিয়া আছে, যখন \*মৃগগণ নিজ নিজ স্থানে বিশ্রাম করিতেছে, যখন মম্বষোর চৈতন্য অগগত হইয়াছে তখন অদৃষ্টরূপ (বিষধর) আমাকে লিপ্ত করিয়াছে।

৫। তরুরের স্তায় এই সকলকে রাত্রিকালে দেখা যায়। উহারা নিজে অদৃষ্ট হইলেও সমস্ত জগৎ দর্শন করে। অতএব মম্বষাগণ! সাবধান হও।

৬। স্বর্গ পিতা, পৃথিবী মাতা, সোম ভ্রাতা, অদিতি ভগিনী, অদৃষ্ট সর্বদর্শীগণ! তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত কর এবং যথা স্তখে গমন করণ।

৭। যাহারা স্বনবিশিষ্ট, যাহারা অঙ্গ-বিশিষ্ট, যাহারা শুচিবিশিষ্ট, যাহারা অত্যন্ত বিষবৃত্ত, অদৃষ্টগণ! তোমাদিগের এখানে কি আছে? তোমরা সকলে মিলিয়া আমাদিগের নিকট হইতে চলিয়া যাও।

৮। পূর্বাদিকে স্বর্গদেব উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত বিশ্ব দর্শন করেন এবং অদৃষ্টদিগকে বিনাশ করেন। তিনি সমস্ত অদৃষ্টদিগকে ও বাতুধানীদিগকে বিনাশ করেন।

৯। স্বর্গ প্রচুর পরিমাণে সমস্ত বিষ নাশ করতঃ উদয় হইতেছেন, সর্বদর্শী অদৃষ্ট-

দিগের বিনাশক, আদিত্য জীবলোকের মঙ্গলের জন্ত উদিত হইতেছেন।

১০। শৌণ্ডিক গৃহে চন্দ্রময় সুরাপাত্রের ত্রায়, আমি স্বর্গ্যমণ্ডলে বিষ নিক্ষেপ করিতেছি। পূজনীয় স্বর্গ্যদেব যেমন প্রাণত্যাগ করেন না, সেইরূপ আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। স্বর্গ্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধুবিষ্টা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে।

১১। ক্ষুদ্র শকুন্তিকা পক্ষী তোমার বিষ খাইয়া ফেলিয়াছিল, সে যেমন প্রাণত্যাগ করে নাই, আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। স্বর্গ্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হইয়া দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধুবিষ্টা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে।

(ঋক্বেদ সংহিতা—২য় অষ্টক, ৫ অধ্যায়,

১ মণ্ডল, ১১১ স্তক)

সর্বদেবশ্রেষ্ঠ সমস্ত দেবতার তিতকারী সর্বরোগনাশক ভিষক (যাহার স্মরণ করিলেও সমস্ত রোগের নাশ হয়) বাগ্মীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রুদ্র আমাকে সর্কাপেক্ষা অধিক উপদেশ দিউন। হে রুদ্র! সেই সমস্ত সর্ববায়াদিকে বিনাশ করিয়া ও অধরাটি (অধোধোগমনশীল অর্থাৎ চন্দ্র বাহিরে অবস্থিত) বাতুধানীদিগকে (রাক্ষসীদিগকে) বিনাশ করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে দূর করিয়া দেও। (শুক্লযজুর্বেদ—মধ্যোক্ত শাখা ১৭ অঃ ৫ কণ্ডিকা) (১)

বেদ সংহিতা হইতে যে কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইল, তাহা বারাতের প্রাচীন ভারতে যে কীর্তীপুত্র পরিজ্ঞাত ছিল

(১) এই স্তব্ধটির বাঙ্গালা বাখ্যা কেহ করেন নাই, বজ্রবেদে মধীধরব্রত ভাষ্যদ্বারা এই বঙ্গবাদ প্রদত্ত হইল।



তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে । তদ্ব, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্টতর প্রমাণ আছে, তাহা আর এবার উদ্ধৃত করা গেল না । আবশ্যক হইলে পাঠক পাঠিকার জিজ্ঞাস্তাভাব বুঝিতে পারিলে, বারাস্তরে প্রকাশিত হইবে । এই যে শাস্ত্র কাবগণ কুষ্ঠ, বক্ষী রোগী প্রভৃতির সহিত “হালাপাং গাত্র সংস্পর্শাং নিঃস্বাসাং সহ-ভোজনাং” প্রভৃতি বচন দ্বারা সংসর্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাদ্বারাতেও ত বুঝা যায় যে; তাহাদিগের কীটাত্তর অবদিত হইল না । কাহারও মৃত্যু হইলে কিয়-

দ্বিসের জন্ত ( অশৌচ কাল পর্য্যন্ত ) যে সেই গৃহ হইতে কেহ দান গ্রহণ করে না, সেই গৃহে কেহ আহার করে না—এমন কি ভিক্ষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা ও বিতরণ করা বন্ধ শবদাহী ও শববাহীর ভিন্নজলাশয়ে স্নান করিয়া গৃহে প্রবেশের বহির্ভাগে দাড়াইয়া হাতে, পায়ে, মুখে এবং বক্ষঃস্থলে নিষপত্র সংবৃত্ত ও অগ্নি স্পর্শ করিবার পদ্ধতি আছে, উত্তপ্ত লৌহ ও উত্তপ্ত শিলাবস্ত্র হাতে, পায়ে, বুকে ও মুখে স্পর্শ করিবার পদ্ধতি আছে, ইহার মূলেতেও আমরা কীটাত্তরের আভাস পাই ।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন ।

## পঞ্চকর্ম ব্যাপদ ।

—:—:—

( পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর । )

৬। এইবার বিবন্ধের কথা বলুন ।  
ক। দোষ উর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিবে নিঃসৃত হ'তে থাকলে যদি রোগী শীতল গৃহে অবস্থান, শীতল জল পান বা শীতল বায়ু শ্বেনন করে অথবা শীতল জব্য শরীরে পরিষেক করে তা' হলে দোষ সকল স্রোতঃ সমূহে দুর্বল এবং বনীভূতভাবে থেকে বায়ু, মূত্র ও পুরীষকে রোধ করে,—বিবন্ধ ব্যাপৎ উৎপন্ন করে । ইহাতে পেটে গুড় গুড় শব্দ, দাহ, অর এবং তীব্র বেদনা হয়ে থাকে ।  
এরূপ স্থলে রোগীকে সত্বর বমন করিয়ে অবস্থা বিবেচনার চিকিৎসা করবে । দোষ সকল

শরীরের অধোভাগে থাকলে সৈন্ধব লবণ ; কাঁজি ও গোমূত্র মিশ্রিত ক'রে বিরেচন প্রয়োগ করবে । দোষ অল্পসারে আস্থাপন ও অল্পবাসন প্রয়োগ করবে । আর দোষ ও উভয় মার্গের উপদ্রব লক্ষ্য করে দুগ্ধ, যুষ বা মাংস রস পথ্য দেবে ।

-৬। এই বিবন্ধ ব্যাপদে অধোদিকের কথা বলা হ'ল, কিন্তু উর্দ্ধদিকের কথা বলা হল না !

ক। বলা হ'য়েছে বৈ কি ।

৬। কৈ কখন বলা হ'ল ?

ক। ম'শায় যদি এতেও না বুঝে পেরে

থাকেন, তবে শাস্ত্রকার নাচার! প্রথমে বলা হ'য়েছে বমন বিরেচনের ব্যাপদ্ একই। তার পর বলা হ'ল—বিবন্ধ ব্যাপদে বমন করিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করাবে। তারপর অধোভাগের দোষের চিকিৎসা বলা হ'ল। সুতরাং প্রথমটা যে উর্দ্ধভাগের চিকিৎসা সেটা কি বুঝতে বাকী রইল! এতটুকু বিবেচনা শক্তি না থাকলে তার চিকিৎসা করাই বিড়ম্বনা।

ডা। এ দীনহীনের অত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নেই, বিশেষ আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে সব কথা স্পষ্ট করে বলা আছে।

ক। এও তো অস্পষ্ট কিছু নয়, বুদ্ধি থাকলে বেশ স্পষ্ট।

ডা। কিন্তু চিকিৎসার কথা আরও স্পষ্ট ক'রে বলা উচিত।

ক। আরও স্পষ্ট, সে কি রকম? বিভ্রাসাগর মহাশয়ের বোধোদয়ের মত? আমরা ইতঃসুত যে সকল দ্রব্য দেখিতে পাই তাহা-দিগকে পদার্থ বলে, পদার্থ তিন প্রকার। চেতন—”

ডা। মাপ করুন মশায়। এখন বস্তি ব্যাপদের কথা বলুন।

ক। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। কেননা বমন বিরেচন সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা বলবার আছে। আপনি হ'সিয়ার নন ব'লে এ আপত্তি উত্থাপন করেন নি। কিন্তু দেখুন বমন বিরেচন ব্যাপৎ এক সঙ্গে বলা হয়েছে—অথচ নাম বলা হয়েছে পরিকল্পিত বা গুদপরিষ্কার, পরিষ্কার এবং প্রবাহিকা। তা' বমন ব্যাপদে দেহের উর্দ্ধ ভাগে প্রবাহিকা প্রভৃতি কি ক'রে হ'বে।

ডা। তাও তো বটে, এখন এর সমস্যা কি বলুন।

ক। এজন্তে ভীত হবেন না, অবহিত চিন্তে শ্রবণ করুন। বিরেচনে বাহ্যিক পরিষ্কার বা গুদপরিষ্কার বলে, বমনের সেইরূপ ব্যাপৎ হ'লে তা'কে কণ্ঠক্ষণম (কণ্ঠদেশ ফুঁড়ে ফেলার মত যন্ত্রণা) বলা যায়। শরীরের অধোভাগে যাহার নাম পরিষ্কার, উর্দ্ধভাগে তাহার নাম শ্লেষ প্রকোপ (শ্লেষা নির্গত হওয়া)। অধোভাগে যাহার নাম প্রবাহিকা, শরীরের উর্দ্ধভাগে তাহার নাম শুকোকাগার।

ডা। এখন আপনার বমন বিরেচন ব্যাপদ শেষ হ'ল তো! এইবার বস্তি ব্যাপদের কথা বলুন।

ক। শেষ যে ঠিক হ'ল তা' নয়। কেননা ভালরূপে বোঝাতে গেলে এর চেয়ে আরও ভাল ক'রে ব'লতে হয় এবং আরও অনেক কথা ব'লতে হয়। সে রকম ভাবে কেন বলিনি সে কথা পরে বলব। এখন ঐখ্যাধারণ করে বস্তি ব্যাপদ শ্রবণ করুন। কারণ বস্তি ব্যাপদ শাস্ত্রে ছেষটি (৬৬) প্রকার ব'লে কথিত হয়েছে। তা' ছাড়া স্নেহ প্রত্যাবর্তন না করবার গুটি ছয়েক কারণ আছে।

ডা। আঃ সর্কনাশ!

ক। ভীত হবেন না। ভীত হ'বেন না, ন'শয় অবহিত চিন্তে শ্রবণ করুন। শাস্ত্রে বলে যে সর্কনাশ উপস্থিত হলে অর্ধেক পরি-তাগ করতে হয়। তা আপনি যখন সর্কনাশ বলছেন, তখন অর্ধেক পরিতাগ করে বলব। ডা। সে কি রকম হবে? ছেষটি ব্যাপদের মধ্যে তেত্রিশটির বিবরণ বলব তবে সংক্ষেপে অর্ধেক অর্ধেক পরিতাগ ক'রে।

ক। না ছেষটির বিবরণই বলব তবে

সংক্ষেপে অর্ধেক অর্ধেক পরিতাগ ক'রে।

ডা। আচ্ছা কবে এই বলুন।

ক। প্রথমে বস্তি ব্যাপদগুলির ভেদ ও নাম বর্ণনা। চলিত, বিবর্তিত, পার্শ্বাবপীড়িত, উৎক্ষিপ্ত, অবসন্ন ও ত্রিধাক্ষিপ্ত এই কয়টি বস্তি নাম বসাইবার দোষ। অতি স্থূল, কর্কশ, অবনত, অহু (ক্ষুদ্রাকার), ভিন্ন (বিদারিত) সন্ধিকষ্ট কর্ণিক, বিপ্রকষ্টকর্ণিক, স্থল (স্থল মুখ), অতিচ্ছিন্ন, অতি দীর্ঘ, ও অতি হ্রস্ব এই কয়টি বস্তির নলের দোষ। বহুলতা, ম্লানতা, সচ্ছিন্নতা, প্রস্তীর্ণতা, ও দুর্বলতা এই পাঁচটি বস্তির দোষ। অতি পীড়িততা, শিথিল পীড়িততা, ভ্রূয়োভ্রূয়ঃ অবপীড়ন, ও কালা-তিক্রম এই চারিটি পীড়নের (বস্তি টিপিয়া ঔষধ প্রয়োগের) দোষ। আমতা, হীনতা, অতিনাম্রতা, অতিশীততা, অত্যক্ষতা, অতি তীক্ষ্ণতা, অতি মৃদুতা, অতি সিদ্ধতা, অতি কক্ষতা, অতিসাম্রতা ও অতি দ্রবতা এই এগারটি ঔষধ দ্রব্যের দোষ। অথবা শীর্ষতা (মস্তক নত করিয়া শয়ন), উচ্ছীর্ণতা (মস্তক উন্নত করিয়া শয়ন), হ্রাসজতা, উত্তানতা, সঙ্কচিত দেহতা, স্থিততা ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন এই সাত প্রকার শয়ন দোষ। চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতা বশতঃ এই চুয়াল্লিশ প্রকার বস্তি ব্যাপদ ঘটিয়া থাকে। রোগীর নিমিত্ত যে পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপদ ঘটিয়া থাকে তাহা পরে বলা বাইবে। নেত্র ও বস্তি এই উভয়ের মনোগ্রাহ্য, পরিবর্তিকা, পরিম্রাব, প্রবাহিকা, হৃদয়োপকরণ, অঙ্গোপ্রগ্রহ, অভিযোগ ও জীবাদান এই নয় প্রকার উপসর্গও চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতা বশতঃ ঘটিয়া থাকে। ইংকপে এই সাতটি প্রকার ব্যাপদের বিবরণ লিখিত হইল।

ডা। সর্বনাশ এই সংক্ষেপে! তবে বস্তির কি ?

ক। আপনি বিজ্ঞ চিকিৎসক হ'য়ে এই কথাটা বলেন শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি। বিস্তার শাস্ত্রে নেই, চিকিৎসকের স্থির ক'রে নিতে হবে। সংসারে ছুটি মানুষের মূখ যেমন এক রকম দেখা যায় না, তেমনি রোগই থাকুক আর ঔষধ প্রয়োগই বলুন—ছুটি রোগীকে এক রকম দেখা যায় না,—যা ছ' জায়গায় ঔষধ প্রয়োগ ক'রে একরকম দেখা যায় না। সুতরাং শাস্ত্রে যে সাতটি প্রকার বস্তি ব্যাপদের কথা দিগদর্শন স্বরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা' ছাড়া যে আরও কত রকম ব্যাপদ ঘটতে পারে তার ইয়ত্তা সেই। সেইজন্তে শাস্ত্রে এরূপ বলা হয়েছে।

ডা। তা' যা' বলেছেন ঠিক। কেবল শাস্ত্রের—অবশ্য আমি আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা বলছি—উপদেশ শুনে চিকিৎসা করা চলে না। অবস্থা ভেদে নিজের বুদ্ধি বস্তির উপর নির্ভর ক'রতে হয়। এটা আবার আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যতটুকু দরকার, আপনাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে তার চেয়ে বেশী দেখছি।

ক। সে জন্তে আমরা শাস্ত্রকারদের নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁরা আমাদের উপর এতটা বিশ্বাস স্থাপন ক'রেছেন বলে আমাদের গৌরবান্বিত বোধ করি। কিন্তু বলতে হুংখ ও লজ্জায় মগ্ন হয়ে মরতে হয়, এখন ঠিক তার উলটো হয়েছে। এখন বাগ্গের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞাহীন, সেই কবিরাজী শেখে, আর বারা প্রতিভাশালী, তারা অজ্ঞাত অর্থকরী বিজ্ঞা শিক্ষা ক'রে থাকে।

ডা। হাঁ, চিকিৎসা বিজ্ঞাটা এমনই সোজা বটে। যাক সে জন্তে আর হুংখ ক'রে কি হবে? আপনি তারপর কি বলুন।

ক। পূর্বে সাতষষ্টি রকম দোষের কথা ব'লেছি, তার মধ্যে স্নেহ প্রত্যাগত অর্থাৎ বস্তি প্রয়োগ করলে ঔষধ ফিরে না আসবার আটটা কারণ আছে। (১) গতাদি ত্রিদোষ দ্বারা অভিভূত হওয়া (২) ভুক্তদ্রব্য দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া, (৩) মলের সহিত মিশ্রিত হওয়া (৪) দেহমধ্যে অধিক দূর প্রবিষ্ট হওয়া, (৫) স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ না করা ও অলুপ্ত ও অন্ন আহারকারী ব্যক্তিকে স্বেদ না দেওয়া।

বস্তির নল চলিত বা বিবর্তিত হ'লে গুহ্য দেশে ক্ষত ও বেদনা হয়। ইহাতে খাদ্যা-খাদ্যের স্রাব মধু ঘৃতাदि প্রয়োগ ক'রতে হয়। নল অত্যুৎক্ষিপ্ত (উচ্চদিকে প্রযুক্ত) এবং অবসন্ন (অধোদিকে প্রযুক্ত) হ'লে মলদ্বারে বেদনা হয়। ইহাতে পিত্তনাশকচিকিৎসা এবং স্নেহ পদার্থ সেচন করা উচিত। তির্গাকৃ ভাবে কিম্বা পার্শ্বভাগে নেত্রনল প্রযুক্ত হ'লে মুখ আবৃত থাকার ঔষধ সম্যকরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। নল অত্যন্ত স্থল কর্কশ বা অবনত হ'লে গুহ্যদেশে ক্ষত ও বেদনা হয় এবং পূর্বোক্ত ক্ষতের স্রাব চিকিৎসা ক'রতে হয়।

নলের কর্ণিকা বস্তির মুখের খুব নিকটে হলে, নল ভগ্ন হলে অথবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হ'লে বস্তির ঔষধ বাহির হইয়া পড়ে। নলের কর্ণিকা বৃহৎ এবং নিকটবর্তী হলে মলদ্বার আহত হইয়া রক্তপাত হয়। একরূপ স্থলে পিত্তনাশক কিম্বা এবং পিচ্ছা বস্তি হিতকর। নল দ্রব বা বালনের ছিদ্র সরু হ'লে বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়, ঔষধ দ্রব্য ফিরিয়া আইসে এবং বস্তি বিখ্যাত হেতুতে রোগ উৎপন্ন হয়। মল দীর্ঘ এবং খর ও বৃহৎ হিষ্ট বিশিষ্ট হলে অত্যন্ত অবপীড়ন বশতঃ বস্তি প্রয়োগ

বস্তি বিস্তীর্ণ এবং স্থল হ'লে যেকোন দোষ হয় সেইরূপ হয়; বস্তি ছোট হলে অল্প ঔষধ ধরে বলে গুণকারী হয় না। বস্তি উত্তমরূপে বাঁধা না হ'লে বা সামান্য ছিদ্রযুক্ত হ'লে, নল ভিন্ন হ'লে যেকোন দোষ ঘটে—সেইরূপ হয়।

বস্তি অত্যন্ত বল পূর্বক পীড়ন ক'রলে ঔষধ আমাশয়ে গমন করে এবং বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া নাক মুখ দিয়া নির্গত হয়। একরূপ ঘটলে সমস্ত গলদেশে পীড়ন, চুল ধরিয়া চালনা করা, তীক্ষ্ণ বিরচন, তীক্ষ্ণ শিরোবিরচন, শীতল দ্রব্যের পরিসেক করা কর্তব্য। বস্তি আস্তে আস্তে টিপলে ঔষধ পকাশয়ে যায় না এবং কোন ফলপ্রদ হয় না। বস্তি বার বার পীড়ন ক'রলে অভ্যন্তরস্থ বায়ু কুপিত হ'য়ে আখ্যান এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা উৎপন্ন করে। ইহাতে উপযুক্ত বস্তি প্রয়োগ করা কর্তব্য। কাল অতিক্রম করে অর্থাৎ দীর্ঘ কাল ধ'রে বস্তি প্রয়োগ ক'রলে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং রোগ বাড়িয়া যায়। ইহাতে পুনরায় ব্যাধিনাশক বস্তি প্রয়োগ করা উচিত।

আম অর্থাৎ অপক দ্রব্য দ্বারা বস্তি প্রয়োগ ক'রলে মলদ্বারের শোথ এবং উপলেপ হয়। ইহাতে সংশোধন বস্তি ও বিরচন হিতকর। ঔষধের মাত্রা কম হ'লে কোন বস্তিই কার্যকারী হয় না এবং মাত্রা অধিক হ'লে আনাহ (মল স্রব) এবং মাত্রা অতিরিক্ত হ'লে আনাহ (মল স্রব) উৎপন্ন হয়। এই সকল অবস্থায় বিপরীত কিম্বা দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অত্যন্ত শিথিল বস্তি জড়তা কারক এবং অত্যন্ত রক্ত এবং অতি রক্ত শিথিল বস্তি প্রয়োগ ক'রে প্রভাবিত করিতে হইবে।

রোগীর বস্তি প্রয়োগের সময়

কবলে বস্তি অতি পীড়ন করার ছায় দোষ হয়। মস্তক উন্নত রেখে বস্তি প্রয়োগ করলেও দোষ ঘটে। ইহাতে শ্বেদ প্রয়োগ ক'রে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করা কর্তব্য। রোগী স্নানভাবে থেকে বস্তি গ্রহণ ক'রলে ঔষধ পাকায় না গিয়া অশুদ্ধিকে যায়, তাহাতে হৃদয় ও মলদ্বারের বেদনা এবং কোষ্ঠে বায়ু কুপিত হয়। রোগী চিং হয়ে বস্তি লইলে পথ আবৃত থাকায় বস্তি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং অভ্যন্তরস্থিত বায়ু কুপিত হয়।

দেহ বা উরুদেশ সমুচিত থাকা অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করলে বায়ু কর্তৃক প্রতিহত হইয়া বস্তি প্রতাগত হইয়া থাকে। রোগী উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করিলে উহা মস্তক প্রতাগত হয় এবং আশয় সকল অর্পিত না হওয়ায় কোনই ফল হয় না। দক্ষিণ ভাগে শুইয়া বস্তি গ্রহণ করিলে তাহা পকাশয়ে প্রবেশ করে না। স্নানাদি অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যথাবিধি চিকিৎসা করিবে।

যেদে বস্তির ঔষধ অমৃষ ও অন্ন হ'লে তাহাতে বিষ্টস্ত আধান ও শূল উৎপন্ন করে। ইহাকে অযোগ ব্যাপদকর। এরূপ অবস্থায় তীক্ষ্ণ বস্তি ও তীক্ষ্ণ বিরেচক প্রয়োগ করা হিতকর। ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হ'লে, আহাৰেব পরে, দোষ থাকা সম্ভবে যদি অন্ন উষ্ণ ও প্রচুর ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, অথবা অমৃষ অতি লবণ সংযুক্ত প্রচুর মেহ প্রয়োগ করা যায়, কিংবা যদি উদরে বহু মল থাকা অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তা হলে আধান, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে শূলবদ বেদনা উৎপন্ন হয়, এরূপ অবস্থায় তীক্ষ্ণ বস্তি এবং অমৃ-

বাসন হিতকর। অতি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ লবণযুক্ত বা রুক্ষ বস্তি প্রয়োগ ক'রলে বায়ু ও পিত্ত কুপিত হয়ে পরিকর্ষিকা রোগ উৎপন্ন করে এবং নাভি, বস্তি ও মলদ্বারে ছেদন করার ছায় যন্ত্রণ হয়। এরূপ অবস্থায় পিচ্ছা বস্তি প্রয়োগ করা হিতকর। তীক্ষ্ণ বস্তি বহুবিধ রোগ উৎপন্ন করে এবং ইহাতে অঙ্গের অবসাদ, পিত্ত নির্গমন ও মল দ্বারে দাহ হয়। এরূপ অবস্থায় পিচ্ছা বস্তি এবং চক্ক ও ঘূতের বস্তি হিতকর। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, নিরুহ ও অনুবাসন প্রয়োগ করলে প্রবাহিকা উৎপন্ন হয় এবং দাহ ও শূল সহিত মল ও রক্ত নিঃসরণ হয়। এরূপ অবস্থায় পিচ্ছা বস্তি ঘূতের সহিত পথ্যে ভোজন করা, এবং মধুর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃত বা তৈলের অনুবাসন হিতকর। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা নিরুহ অনুবাসন প্রয়োগ ক'রলে হৃদয়োপসরণ ব্যাপদ্ ঘটে এবং অঙ্গের পীড়া, মত্ততা, শরীরের শুষ্কতা, এবং মূর্ছা প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে, ইহাতে সর্বদোষ নাশক শোষণ বস্তি প্রয়োগ করা উচিত। রুক্ষ বায়ুযুক্ত এবং অপ্রশস্ত ভাবে শায়িত ব্যক্তিকে রুক্ষ, মৃদু এবং অন্ন ঔষধ প্রয়োগ করলে অঙ্গের অবসন্নতা, শরীরের শুষ্কতা, হাঁই উঠা, বেঠনবৎ পীড়া, কম্প ও সন্ধি ও স্কন্ধ ভেদবৎ যন্ত্রণা হ'য়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় শ্বেদ অভ্যঙ্গ ও বস্তি ক্রিয়া হিতকর।

অত্যন্ত উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও বহু পরিমিত বস্তি অতি যেমিত বা অন্নদোষ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োগ ক'রলে বস্তির অতিযোগ হয়। এরূপ অবস্থায় বিরেচনের অভিযোগের ছায় চিকিৎসা করা কর্তব্য এবং শীতল পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ হিতকর। অতিযোগের ফলে জীবাণু নির্গত হ'লে বিরেচনোক্ত জীবাণুব্যাপদের ছায়

চিকিৎসা করবে এবং রক্ত মিশ্রিত পিচ্ছা বস্তি  
প্রয়োগ করবে।

ডা। এই কি আপনার ব্যাপদ বলা শেষ  
হল ?

ক। মোটামুটি সব বলা হ'য়েছে। কেবল  
যে পনের রকম ব্যাপদের কথা পূর্বে বলিয়াছি,  
তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনুন।

অত্যন্ত ক্রোধ হ'লে পিত্ত কুপিত হয়ে  
পিত্ততা রোগ উৎপন্ন করে। অতিরিক্ত পরিশ্রম  
ও শোক বশতঃ পিত্ত কুপিত হ'য়ে মত্ততা মূর্ছা  
প্রভৃতি উপদ্রব উৎপন্ন করে। মৈথুন সেবন  
ক'রলে আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, অঙ্গবেদনা, গুহ-  
দেশে শোথ, কাস ও রক্তমিশ্রিত শুক্রস্রাব  
উপসর্গ ঘটে। দিবসে নিদ্রা গেলে প্লীহা, প্রেতি-  
শ্রায়, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, মোহ, অবসাদ, অপরি-  
পাক প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে। তমোগুণ বৃদ্ধি  
হ'লে নিদ্রা অধিক হয়। উচ্চৈঃস্বরে কথা  
বলায় বায়ু কুপিত হ'লে সন্তকে বেদনা, দেহের  
জড়তা, ঘ্রাণশক্তির হ্রাস, বধিরতা, মুকতা,  
চোয়ালের শিথিলতা, অধিমহু নামক চক্ষুরোগ,  
অর্দিত রোগ, নেত্রস্তম্ভ, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস,  
নিদ্রানাশ, দন্ত চালন প্রভৃতি রোগ জন্মায়,  
যানে ভ্রমণ ক'রলে বমি, মূর্ছা, ভ্রম, অঙ্গবেদনা  
ইন্দ্রিয়বিভ্রম ও ক্রান্তি জন্মায়। অধিক  
সময় উপবিষ্ট থাকলে বা স্নান ক'রলে কটি-  
দেশে বেদনা হয়। অতিরিক্ত সংক্রমণ  
(পাইচারি করলে) বায়ু কুপিত হয়ে জজ্বায়  
বেদনা জন্মায়, অথবা শকথির শুষ্কতা, শোথ  
ও পাদ হর্ষ উৎপন্ন করে। শীতল দ্রব্য সন্তোষ  
বা শীতল জলে পানাদি ক'রলে বায়ু বদ্ধিত  
হয়ে অঙ্গ বেদনা, বিষ্টভ্র, শূল, আধান ও কপ্প  
জন্মায়। বায়ু ও আতপ সেবন ক'রলে শরী-

রের বিবর্ণতা ও জ্বর হয়। বিকৃত ভোজন বা  
পূর্কহার জীর্ণ না হ'তে ভোজন ক'রলে ঘোর  
ব্যাধি বা মৃত্যু হয়। অসাম্য দ্রব্য ভোজন  
ক'রলে বল ও বর্ণের হানি হয়। সেইজন্য বস্তি  
প্রয়োগের পর এই সমস্ত কার্য নিষিদ্ধ।

ডা। এইবার সব বলা হয়েছে ত ?

ক। সব আর ব'লেছি কৈ, মোটামুটি  
বলেছি। বমন, বিরেচন ও বস্তি প্রয়োগ  
সম্বন্ধে, প্রয়োগের পর আহারাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রে  
অনেক নিয়ম আছে। তা'রপর যোগ অর্থাৎ  
ওষুদ সম্বন্ধে ত কিছুই বলা হয়নি। ধূম  
নস্তাদির বিষয়ও সংক্ষেপে ব'লেছি। ব্যাপারটা  
কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আপনার যা'তে মোটা-  
মুটি একটা ধারণা হয় এই উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য-  
ভাবে পঞ্চকর্মের বিষয় বল'তে হ'লে একথানা  
প্রকাণ্ড গ্রন্থ হ'য়ে পড়ে। এখন পঞ্চকর্ম সম্বন্ধে  
আপনার মন্তব্য কি বলুন।

ডা। পঞ্চকর্ম যে একটা খুব ভাল  
জিনিষ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর  
বিরাট ব্যাপার। সমস্ত পঞ্চকর্ম যদি এক-  
জনের শরীরে করা যায়, তা হলে শরীর নূতন  
হ'য়ে বঠে। এর পর কুটী প্রবেশ ক'রে রসায়ন  
সেবন করলে সে লোক যে দীর্ঘজীবী হবে,  
নীরোগ হবে, মেধাবী হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ  
নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এখন চিত্রিত দীপের  
জ্বায় হয়ে পড়েছে। আলো নেই—অন্ধকার।

ক। সে কথা ত আপনাকে পুর্বেই  
ব'লেছি। আমাদের ধা' ছিল তার কিছুই  
নেই। আছে কেবল বৃথা অভিমান। পঞ্চ  
কর্মের আবার যদি কখন পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়,  
তা'হলে আয়ুর্বেদের নিকট অস্তিত্ব চিকিৎসা  
শাস্ত্র নিতান্ত হীন হয়ে পড়বে।

পঞ্চকর্ম সম্বন্ধে।

## জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা ।

—:~:—

( পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর । )

যাহাতে কালে আহারে রুচি হয় সেইজন্ত অন্নকালে রোগীকে দস্তধাবন করাইবে । রোগীর মুখে যেরূপ রস থাকে—তাহার বিপরীত রস যুক্ত দ্রব্য দ্বারা অথবা রোগীর প্রিয় বস্তুর দ্বারা দস্তধাবন করাইতে হয় । অথবা বৃক্ষ শাখার অগ্রভাগ ( দাঁতন ) দ্বারা দস্ত ধাবন করিয়া বার বার মুখ ধৌত করিবে । ইহাতে মুখের বিরসতা নষ্ট হয়, অন্ন পানে আকাজ্ঞা হয় এবং খাদ্যদ্রব্যের রসের আনন্দন পাওয়া যায় ।

এক্ষণে জ্বরের চিকিৎসার বিষয় বলা হইতেছে । কিন্তু জ্বরের বিস্তারিত চিকিৎসা এবং ঔষধের উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে । কেবল জ্বর চিকিৎসার মূল সূত্রগুলির আলোচনা করা যাইবে ।

অব ও আমাশয়ে বহু দোষের অবস্থান হেতু বমন থাকিলে প্রথমেই বমন করান কর্তব্য । কিন্তু বমন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যিক । চরকে কথিত হইয়াছে যে “আমাশয় রোগ কফ প্রধান ও বহির্গমনো-মুখের বমনেচ্ছা দ্বারা ইহা অনুমান করা যায় । দোষ সকল থাকিলে বমনের উপযুক্ত বস্তুকে যুক্তি পূর্বক বমন করাইবে । কিন্তু দোষসকল বহির্গমনোমুখ না হইলে যদুপি রোগীকে বমন করান যায়—তাহা হইলে জ্বরোদ্যোগ, শ্বাস, আনাহ, (মল মূত্রের বদ্ধতা) মোহ প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিয়া থাকে । বায়ুভট বলেন সমস্তর্ণ

(অতিরিক্ত আহার জনিত ) জ্বরে এবং আশায় করিবার পর জ্বর হইলে বমন করান হিতকর । কিন্তু সর্বত্রই দেখিতে হইবে যে, রোগী বমনের যোগ্য কি না ।

তিমির নামক চক্ষুঃরোগগ্রস্ত, গুণ্ডা, পাণ্ডু বা উদর রোগগ্রস্ত স্থূলব্যক্তি, ক্ষত, ক্ষীণ, অতিক্রম, অতিবৃদ্ধ, অর্শ, অর্দিত বা আক্ষেপক রোগগ্রস্ত কক্ষ ব্যক্তি, প্রমেহ রোগী, তরুণ-গর্ভা, উদ্বিগ্ন রক্তপিত্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তি, ক্রিমিকোষ্ঠি ব্যক্তি এবং অত্যন্ত মল বদ্ধতাব্যুক্ত ব্যক্তি বমনের অযোগ্য । কিন্তু ইহারা যদি অতিরিক্ত কফ পীড়িত হয় তাহা হইলে যষ্টিমধুর কাথ পান করাইয়া বমন করান যাইতে পারে ।

সাধারণতঃ নবজ্বরে বিরচন নিবিদ্ধ হলেও অবস্থা বিবেচনায় বিরচন করাইবার নিয়ম আছে । চরকে কোষ্ঠবদ্ধতা ও কোষ্ঠে বদ্বর্ণা থাকিলে পেয়ার সহিত কিসমিস, পিঁপুল, শুঠ প্রভৃতি সারক দ্রব্য পাক করিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে । ইহাতে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে । সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে :—

“কোষ্ঠগত পক্কমল স্রোতে বিবিদ্ধ থাকিলে যাহার অন্নকাল জ্বর হইয়াছে তাহাকেও বিরচন প্রদান করিবে । কারণ পক্কমল নিঃসরিত না হইয়া শরীরে থাকিলে মহান অনিষ্ট করিতে পারে, বিষম জ্বর জন্মাইতে পারে এবং বল ক্ষয় করে । বিরচন ব্যতীত

সুশ্রুতে বহু প্রয়োগ করিয়া নিঃসরিত করিবারও উপদেশ আছে।

সুশ্রুতের মতে দোষ নিঃসরণ জন্ত প্রথমে বমন, পরে আস্থাপন, পরে বিরেচন, পরে শিরোবিরেচন অর্থাৎ মস্তক হইতে দোষ নিঃসরণ নষ্ট দিবার বিধি আছে। শ্লেষ্ম জর গ্রস্ত বলবান রোগীকে বমন, পিত্তজরে বিরেচন এবং নল মূত্রের বিবদ্ধতায়ুক্ত বাতিক জরে নিক্রহ প্রশস্ত। মস্তকের গুরুতা ও যন্ত্রণা থাকিলে শিরোবিরেচন হিতকর।

জ্বরাল জর রোগীর উদরাধান, পেটফোলা এবং উদরে যন্ত্রণা থাকিলে, দেবদারু, বচ, কুড়, গুলফা, তিং ও সৈন্ধব বাটয়া উদরে প্রলেপ দিবে এবং ঐ সকল দ্রব্যের বত্তি প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে।

নবজরে এই সকল ক্রম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। পথ্য প্রয়োগের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পূর্বে আমজরের লক্ষণ বলা হইয়াছে। সেই সকল লক্ষণ বলার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

“আমজরে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। কারণ আমদোষ থাকিতে ঔষধ প্রয়োগ করিলে জর প্রবলতর হইয়া থাকে।

অপিচ—

তরুণ জরে—কথায় প্রয়োগ করিলে দোষ সকল পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া স্তম্ভিত হয় এবং সেই স্তম্ভিত দোষ বিবম জর উৎপন্ন করে।

এই সকল বচনের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বলেন যে, আয়ুর্বেদে রোগ জন্মিবামাত্র ঔষধ দেওয়া হয় না। আজকাল সাতদিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়া চলে না। ইতি মধ্যে অনেক রোগীরই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা—

ইত্যাদি। এই বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ আয়ুর্বেদ মতে নবজরে ঔষধ দেওয়া হয় না—একথা ঠিক নহে। কারণ তরুণ জরে মুখ্য ঔষধ দেওয়া নিষিদ্ধ হইলেও “ষড়ঙ্গ পানীয়” এবং পেয়াদির সহিত সিদ্ধ করিয়া ঔষধ দিবার বিধি আছে। ঐ সকল ঔষধ ও পথ্য জরনাশক, দোষপাচক, সারক, বর্ষ নিঃসরক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। সুতরাং সে জরে ঔষধ দিবার নিয়ম নাই, ইহা প্রকৃত নহে। সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

“কেহ কেহ বলেন যে সাত রাত্রি দিনের পর ঔষধ দেওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন যে দশ দিনের পর ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য। জর অল্প কালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও ঔষধ দেওয়া যায়। দোষের পরিপাক পাইলে যে রোগীর অল্পকাল জর হইয়াছে—তাহাকেও ঔষধ দেওয়া যায়।”

এই ত গেল বৈদিক ঔষধের কথা। তারপর বিবিধ ধাতু, উপধাতু, পায়দ ও অন্তত ঘটত তাত্ত্বিক ঔষধ নবজরে প্রয়োগ করার বিধি আছে। ডাক্তারেরা প্রথম অবস্থায় বেরুণ জরবিচ্ছেদকারক ঔষধ দেন, আয়ুর্বেদের ষড়ঙ্গ পানীয়, পেয়াসহ সিদ্ধ ঔষধ এবং তাত্ত্বিক ঔষধ গুলিও সেইরূপ। ডাক্তারী শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ জরবিচ্ছেদকারক একোনাইট—

তন্মোক্ত হিম্বুলেখর, মৃত্যুঞ্জয় রস, জয়াটী, জয়ন্তী, বুটী, স্বচ্ছন্দ ভৈরব প্রভৃতি। সুতরাং আয়ুর্বেদ মতে নবজরে ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিয়ম নাই একথা বলা যায় না।



দিনের পরে ঐ সকল ঔষধ দেওয়া যায়।  
সাত দিন ঔষধ দিবার নিয়ম নাই—একথা না  
বলিয়া বরং ২১৩ দিন বলিলে কতকটা সঙ্গত  
হইতে পারে। কারণ তাত্ত্বিক ঔষধ সকলও  
বিপদের আশঙ্কা না বুঝিলে কোন চিকিৎসকই  
২১৩ দিন পরে নহিলে প্রয়োগ করেন না।  
“কেবল ষড়ঙ্গ পানীয়” জরের প্রথম হইতে  
দিয়া থাকেন।

এক্ষেণে কথা হইতেছে এই যে,—দুই  
দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম  
আছে—ইহা হিতকর কি অহিত কর? অনেক  
সময় ২১৩ দিন না দেখিলে রোগের স্বরূপই  
নির্ণয় হয় না। বসন্ত রোগের প্রারম্ভে ২১৩  
দিন প্রবল জ্বর হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে ২১৩ দিন  
অপেক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে  
রোগীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।  
শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

রোগনাদৌ পরীক্ষতে ততোহনন্তরমৌষধম্ ।

ততঃ কৰ্ম্ম ভিষক পশ্চাৎ জ্ঞান পূৰ্ণঃ

সমাচরৎ ॥

অর্থাৎ—প্রথমে রোগ পরীক্ষা করিবে, পরে  
ঔষধ নিষ্কাশন করিবে, পরে বিবেচনা পূর্বক  
চিকিৎসার প্রবৃত্ত হইবে।

দুই তিন দিন রোগের গতি, বল এবং  
অগ্নিবল, রোগীর অবস্থা প্রভৃতি দেখিয়া  
রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধ দেওয়াই যে উৎকৃষ্ট  
চিকিৎসা—তাহা বিজ্ঞব্যক্তি মাঝেই স্বীকার  
করিবেন। রোগ—বুঝি জ্ঞান নাই বুঝি রোগী  
দেখিয়াই কতকগুলি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া  
আমরা অনেক সময় রোগীর অনিষ্ট করিয়া  
থাকি।

কেহ বলিতে পারেন যে, এই ২১৩ দিনেই  
জ্বর রোগী মৃত্যু হইতে পারে। যদি সেই

রূপ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, যদি দুই এক  
দিনেই রোগীর নাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে  
দেখি, তাহা হইলে কি আমরা সাত দিন  
অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব? না  
কোন চিকিৎসা শাস্ত্র এরূপ উপদেশ দিতে  
পারে? নাড়ী ছাড়িতে দেখিলে আমরা  
তখনই যুগনাভি-মকরধ্বজ প্রয়োগ করিতে  
বাধ্য। নবজ্বর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ী  
ছাড়ে না বলিয়া শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ  
হইয়াছে।

অপর কেহ বলিতে পারেন যে, ২১৩ দিন  
অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়ার ফলে হয়ত রোগ  
মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে। ২১৩ দিন  
অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দেওয়া যে ভাল, তাহা  
আমরা পূর্বেরই বলিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস যে,  
২১৩ দিন অপেক্ষা করিয়া ঔষধ দিলে যতগুলি  
রোগ মারাত্মক হইতে পারে, ২১৩ দিন অপেক্ষা  
না করিয়া ঔষধ দিলে তাহা অপেক্ষা অনেক  
বেশী রোগ মারাত্মক হইয়া উঠে। অপিচ  
প্রথম হইতেই যে সকল রোগের কঠিন উপসর্গ  
উপস্থিত হয়—আয়ুর্বেদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার  
প্রতিকারের উপায় বলা হইয়াছে। যেমন  
সন্নিপাত জ্বর। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

লজ্বণং বালুকাশ্বেদো নস্তং নিষ্টিবনস্তথা ।

অবলোহো অঞ্জনায় অযোগ্যাং ত্রিদোষজ্ঞে ॥

অনুবাদ :—সন্নিপাত জ্বরের প্রথমেরই  
লজ্বণ, বালুকা, শ্বেদ, নস্ত নিষ্টিবন, অবলোহ  
এবং অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

নিষ্টিবন :—শুঠ, পিপুল, বরিচ ও সৈন্ধ  
লবণ আদার রসে আদ্রুত করিয়া মুখে ধারণ  
করিবে এবং পুনঃ পুনঃ নিষ্টিবন ত্যাগ করিবে।  
ইহাতে হৃদয়, মস্তা (হাড়) পার্শ্ব, মস্তক ও  
পাদদেশের শুষ্ক রোগ আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া

যায়। শরীর লঘু হয় এবং পক্ষ সমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, গাত্র বেদনা, মূর্ছা, কাস, গলদেশের রোগ, মুখ ও চক্ষুর গুরুতা, জড়তা, ও বমন ভাব নষ্ট হয়। দোষের বলাবল বুঝিয়া দুই তিন বা চারি বার নিম্নীবন প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা সন্নিপাত অরে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নস্ত্র—(১) সৈন্ধবলবণ, সচলবণ ও বিট লবণ, আদার রস ও ছোলঙ্গ লেবুর রসে আদ্রুত এবং উষ্ণ করিয়া নস্ত্র প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সংহতলৈয়া ভিন্ন হইয়া উঠিয়া যায় এবং মস্তক, হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ, ও পান্থদেশের বস্ত্রণা নষ্ট হয়।

(২) মোলের সার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিঁপুল বাটিয়া উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া নস্ত্র প্রয়োগ করিলে অচৈতন্ত্য রোগী সংজ্ঞা লাভ করে।

(৩) সৈন্ধবলবণ, সজ্জিনাবীজ, সর্ষপ ও কুড় বাটিয়া ছাগমূলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্ত্র দিলে তন্ত্রা নিবারিত হয়।

অঞ্জন—শিরীষ বীজ, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, রসোন, মনঃশিলা ও বচ—গোমূত্র সহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে রোগী চৈতন্ত্য লাভ করে।

অবলেহ—কটফল, কুড়, কঁকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, পিঁপুল, গুঁঠ, ছয়ালতা ও সা জীরা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত অবলেহ করিতে দিবে। কিন্তু স্বেদাদি প্রয়োগ রূপ উষ্ণ ক্রিয়া করা হইলে মধুর পরিবর্তে আদার রস সহ অবলেহ প্রস্তুত করিতে হয়। কারণ মধু উষ্ণের বিরোধী। এই অবলেহ অষ্টাঙ্গাবলেহ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রয়োগে স্নানরূপ সন্নিপাত, হিকা, খাস ও কণ্ঠরোগ নিবৃত্তি পায়।

উপরোক্ত ঔষধ সকল দ্বারা সন্নিপাতের

প্রবল উপসর্গ সকল, যথা ফুসফুস কণ্ঠাদির শ্লেষ্মপূর্ণতা, সংজ্ঞা নাশ, তন্ত্রা, মূর্ছা প্রভৃতি নষ্ট হয়।

স্বেদ—সন্নিপাতে মনুষ্যের দেহ জলময় হয় বলিয়া অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকে তাহার শান্তি হয় না। এইজন্য সন্নিপাত অরে মুহূর্হ স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। সন্নিপাতজরে সবিধ এবং নির্বিধ নানাপ্রকার ঔষধ আছে বটে, কিন্তু অগ্নির তাপ ব্যতিরেকে তাহারা প্রায়ই স্ব স্ব বীৰ্য প্রকাশ করিতে পারে না।

সন্নিপাতের অগ্নাস্ত্র উপসর্গগুলির চিকিৎসা সম্বন্ধে শাস্ত্রে সুন্দর উপদেশ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের বিষয় লিখিত হইল না। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

মৃত্যুনা সহ যোদ্ধবং সন্নিপাত চিকিৎসতা।  
অর্থাৎ সন্নিপাত জরের চিকিৎসায় মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়।

অনেকের বিশ্বাস যে, সন্নিপাতজরে আয়ুর্কেদে কেবল উষ্ণ প্রয়োগেরই বিধি আছে, শৈত্য প্রয়োগের বিধি নাই। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। উষ্ণ অরে শৈত্য প্রয়োগ এবং শীত জরে উষ্ণ প্রয়োগের বিধি আছে। সুতরাং সহিত বলিতে হইতেছে যে, আয়ুর্কেদে যুদ্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্ত। কিন্তু আমরা স্থূলবুদ্ধি বলিয়া একেবারে “হাতে হেতেড়ে” বুঝাইয়া না দিলে বুঝিতে পারি না।

শাস্ত্রে যে তত্ত্ববুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বাক্যযোজন। এবং অর্থযোজনায় সহায়তা করিয়া থাকে বলা হইয়াছে যে, শরীর জলময় হইলে অগ্নিক্রিয়া ব্যতীত তাহার শান্তি হয় না। এই বাক্যের বিপরীতে বুঝাইতেছে যে, শরীর অগ্নিময় হইলে শৈত্য বা জল ব্যতীত তাহার শান্তি হয় না।

পিত্তপ্রধান বা দাহ জ্বরে অথবা যে জ্বরে রোগীর শরীরে উত্তাপের অধিক্য হয়, সেই সকল জ্বরে শৈত্য ক্রিয়া করিবার স্পষ্ট উপদেশ আছে ।

নবহর ও সন্নিপাত জ্বরে বমন বিরচন, লব্ধন, মণ্ডাদি প্রয়োগ, পানার্থ জল প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় বলা হইয়াছে । এক্ষণে জ্বরে অজ্ঞাত যে সকল সহপদেশ আছে, সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে ।

দাহ ও তৃষ্ণা উপসর্গযুক্ত বাতপিত্তপ্রধান জ্বরে বনিরাম অবস্থায় দোষসকল বন্ধই হউক বা স্থানচ্যুতই হউক, ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ প্রয়োগ করিয়া জ্বর নাশ করিবে । ইহাই সুশ্রুতের আদেশ ।

পূর্ব কথিত ক্রিয়া সকলের দ্বারা জ্বর নষ্ট না হইলে এবং বল মাংস ক্ষীণ না হইলে বিরচন প্রয়োগ করিয়া জ্বর প্রশমন করিবে । কিন্তু জ্বররোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে তাহার পক্ষে বমন বা বিরচন হিতকর নহে । এক্ষণে অবস্থায় ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইয়া অথবা নিরুহ (Enema) প্রয়োগ করিয়া মল নিঃসারিত করিবে ।

শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যাহার জ্বর প্রশমিত না হয়, তাহার জ্বর রক্তাশ্রয়ী বলিয়া জানিবে, এই অবস্থায় রক্ত মোক্ষণ দ্বারা জ্বরের শাস্তি হয় ।

নবজ্বরে দিবানিজা, স্নান, তৈলাদি মর্দন, গুরুপাক অন্ন, দ্রবী সৎবাস কোধ, শরীরে বাতাস লাগান, পরিশ্রম এবং কবায়য়স পরিত্যাগ করিবে । ইহা সাধারণ নিয়ম । কিন্তু সময়ে কুপথ্যও সুপথ্য হইয়া থাকে । মনে করুন কোন জ্বর রোগীর উপস্থাপরি ৩৪ দিন আদৌ -নিজা না হইবার পর চতুর্থ

বা পঞ্চম দিবসে যদি দিবাভাগে নিদ্রাকর্ষণ হয়, তাহা হইলে দিবানিজা নিষেধ করা চলে না ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে জীর্ণজ্বরে বলকর ও পুষ্টিকর পথ্য প্রয়োগ করিবে । পুরাতন জ্বরে কফ ও পিত্তের ক্ষীণতা ঘটিলে এবং অগ্নি প্রবল থাকিলে রুক্ষ ও বন্ধপূরীষ ব্যক্তিকে অন্নবাসন প্রয়োগ করিবে ।

মস্তকের যন্ত্রণা ও গুরুতা এবং ইন্দ্রিয় সকলের বিবন্ধতা থাকিলে শিরোবিরেচন নস্ত্র-বিশেষ প্রদান করিবে । ইহাতে অরুচিও নষ্ট হয় ।

সর্ব প্রকার জীর্ণ জ্বর দুগ্ধ দ্বারা প্রশমিত হয় । অতএব উপযুক্ত ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ উষ্ণ বা শীতল অবস্থায় পান করিতে দিবে ।

জীর্ণজ্বরে শীত এবং উষ্ণ বিভাগ করিয়া বিবেচনা পূর্বক উষ্ণ বা শীতল অভ্যঙ্গ, প্রলেপ বা স্নেহযুক্ত অঙ্গগাহন ব্যবস্থা করিবে ! ইহাতে বহির্মার্গতগত জ্বর শীঘ্র প্রশমিত হয় এবং অঙ্গস্থ বল ও বর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

যে সকল জীর্ণজ্বররোগীর চর্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে ধূপ ও অঞ্জন প্রয়োগ দ্বারা সেই সকল জ্বরের শাস্তি হয় ।

বাত প্রধান বিষম জ্বর ঔষধ সহ সিদ্ধ ঘৃতপান, বস্তি প্রয়োগ ও উষ্ণ অন্ন পান দ্বারা প্রশমিত হয় । পিত্ত প্রধান বিষম জ্বরে বিরচন ঔষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত পান, এবং তিক্ত ও শীত বীৰ্য্য দ্রব্য দ্বারা প্রশমিত হয় । কফ প্রধান বিষম জ্বরে বমন, পাচন রুক্ষ অন্নপান, লব্ধন এবং উষ্ণ বীৰ্য্য দ্রব্য প্রয়োগে প্রশমিত হয় ।

উদ্যাদ প্রভৃতি মানসিক রোগে যে সকল ধূপ, ধূপ নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবার বিধি

আছে, বিধম জরেও সেই সকল প্রয়োজ্য। দুই একটা উদাহরণ দেওয়া বাইতেছে। ব্যাঘ্রের বসা তিল এবং হিন্দু সম ভাগে লইয়া সৈন্ধব লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে অথবা গুরাতন স্নাত, সিংহের চর্কি ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে বিধম জর নষ্ট হয়। সৈন্ধব, পিপুলের দানা, ও মনঃশিলা তিল তৈলসহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে বিধম জর নষ্ট হয়। গুগগুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী ষ্ঠৈ সর্বপ, যব ও ঘৃত একত্র করিয়া ধূপ দিলে বিধমজর নষ্ট হয়। অভিঘাত জর অর্থাৎ পতন আঘাত প্রাপ্তি জনিত জরে ঘৃত পান ও ঘৃত মর্দন, আহত স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ এবং রুচিকর ও হিতকর মাংস বসা সেবন দ্বারা প্রশমিত হয়। অতিরিক্ত মত্ত পান বশতঃ মত্তসাম্ম ব্যক্তির জর হইলে উপযুক্ত মাত্রার মত্ত এবং সাম্ম রস সেবনে প্রশমিত হয়। ক্ষত ও ব্রণরোগে গ্রস্ত ব্যক্তির জর—ক্ষত ও ব্রণরোগের চিকিৎসার দ্বারা ভাল হয়।

জ্বর রসহ হইলে বমন ও উপবাস, রক্তহ  
হইলে সেক, প্রলেপ ও দোষনাশক ঔষধ,  
মাংস মেদস্থিত হইলে বিরেচন ও উপবাস এবং  
অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নিক্রহ ও অন্নবাসন  
প্রয়োগ করিবে ।

কাম, শৌক ও ভয় জনিত জ্বর আধ্বাস  
বাক্য, প্রার্থিত বস্তু লাভ, বায়ুর প্রশমন এবং  
হর্ষোৎপাদন দ্বারা প্রশমিত হয়। ক্রোধ জনিত  
জ্বর প্রার্থিত ও মনোজ্ঞ বস্তু, পিত্তনাশক  
চিকিৎসা এবং প্রিয় বাক্য দ্বারা প্রয়োগে এবং  
ক্রোধ জনিত জ্বরে এবং কাম ও ক্রোধ উৎপন্ন  
করিলে ভয় ও শৌক জনিত জ্বর প্রশমিত হয়।

মনের একটা বেগ যে অপর একটা বেগের  
দ্বারা আশ্চর্য্য ভাবে নিবৃত্ত হয় এ সম্বন্ধে বহু

প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। বিষ্ণুপুরের জনৈক রাজা একটা অত্যন্ত উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণ করেন। স্তম্ভ নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে— এমন সময়ে রাজা তাহা দেখিবার ইচ্ছায় রাজমিস্ত্রীরা যে বাঁশের সিঁড়ি দিয়া উঠিত— সেই সিঁড়ি দিয়া স্তম্ভের উপরে উঠেন। স্তম্ভের উপর হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা ভয়ে এত অভিভূত হইয়া পড়েন যে, কোনক্রমেই নামিতে পারেন না। অমাত্য বর্গ এবং অগ্রান্ত লোকের মতে আশ্বাস বাক্যও রাজার ভয় দূর হইল না। রাজাকে নামাইবার অস্ত্র কোন উপায়ও দেখা গেল না। তখন একজন রাজমিস্ত্রী বলিল, আমি রাজাকে নামাইতেছি, কিন্তু আপনার আমাকে রক্ষা করিবেন। এইরূপ বলিয়া রাজমিস্ত্রী স্তম্ভের উপরে উঠিয়া বলিল, মহারাজ! আমি যেমন করিয়া নামি, আপনিও তেমনি করিয়া নামুন। রাজা বলিলেন,—না, আমি নামিতে পারিব না। তখন রাজমিস্ত্রী বলিল—উঠেছিলেন কেন? এই কথা শুনিয়া রাজার' ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি পলায়নপর রাজমিস্ত্রীর পশ্চাৎহাসরণ করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। একেজে ক্রোধ উৎপাদন দ্বারা ভয়ের উপশম করা হইয়াছিল।

জন্মের বেগ কাল অর্থাৎ অমুক সময়ে  
আমার জন্ম আসিলে—এইরূপ চিন্তা করিয়া  
বাহ্যিক জর হয়, বিবিধ ইষ্ট বস্তু এবং বিভিন্ন  
বিষয় দ্বারা তাহার স্মৃতি নষ্ট করিলে অর্থাৎ সে  
বাহ্যিক জর আসিলে কথা না জানে অর্থাৎ  
ভুলাইয়া গরিবে।

[illegible]

অন্নপান, জীবাণুসংসর্গ অভ্যস্ত, স্নান ও অতিরিক্ত ভোজন পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ করিলে জ্বরের উপশম হয় এবং অরের পুনরাগমন হয় না। জ্বর প্রশমিত হইলেও যদি অরুচি, শরীরের অবসন্নতা, শরীর ও মনের বিবর্ণতা থাকে, তাহা হইলে জ্বর পুনরাগমনের ভয়ে শোথন ক্রিয়া—যেমন বিরেচনাদি করিবে। জ্বর দ্বারা কৃণ ব্যক্তিকে সহসা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য দিবে না, কেননা অগ্নি দূষিত হইয়া পুনরায় জ্বর হইতে পারে।

অন্নমুক্ত ব্যক্তি যতদিন বলবান না হয়—ততদিন বায়াম, মৈথুন, স্নান ও ভ্রমণ নিষিদ্ধ। কেননা বলবান না হইয়া ঐ সকল সেবন করিলে জ্বর পুনরাগমন করে। যে অরিত ব্যক্তি বহুকাল জ্বরভোগ করিয়া ক্লিষ্ট, দুর্বল ও দীন চিত্ত হয় সে ব্যক্তির পুনরায় জ্বর হইলে অন্নকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অথবা

বিনষ্ট না হইলেও ক্লান্ততা, শোথ, স্নান, পাণ্ডুতা অরুচি, উৎকোচ (গাত্রে চাকা চাকা দাগ) পিড়কা, অগ্নিদৌর্বল্য প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে।

পুনরাগত জ্বরে অভ্যঙ্গ, উদ্ভর্জন, স্নান, ধূপ, অঙ্জন এবং পপতিজ্ঞ দ্রব্য পান প্রশস্ত। শুষ্ক অভিব্যঙ্গা ও অসাদ্যভোজন হেতু জ্বর পুনরাবর্তন করিলে নবজ্বরের স্নায় লগ্নান ও উষ্ণ উপচার প্রভৃতির দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কিত ধাতুর অর্থ রোগোপনয়ন এবং এই ধাতু হইতে চিকিৎসা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্তত্রাঃ যদ্বারা রোগোপনয়ন হয়—তাহাকে চিকিৎসা বলে। এইজন্ত পথ্য ও চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আনন্দের পাঠকগণের বোধসৌকর্যার্থ পথ্য ও চিকিৎসা পৃথক বলিয়াছি।

আবার “পথি” হইতে পথ্য শব্দের উৎপত্তি। পথি—হিতম অর্থাৎ রোগীর পক্ষে যাহা কিছু হিতকর তাহাই পথ্য শব্দ বাচ্য।

সমাপ্ত।

শ্রী—বন্দ্যোপাধ্যায় ।

## ওলাউঠা চিকিৎসা ।

(পূর্বানুবর্তি)

তখন সকলেই মুখমণ্ডল শুষ্ক, কণ্ঠ নীরস হইয়া উঠে,—অতি বড় সাহসীরাও বুক মড়াস ড়াস করিতে থাকে। সেরূপ ক্ষেত্রে হুস্‌হুস্‌ প্রকারিত হইয়া যদি তাহার এক অংশ অর্পণ রোগের উপর উঠিয়া পড়ে, তাহা হইলে কাহারো মার জীবনের আশা থাকে না। চুই একবার তদ বনি হইতে না হইতেই জীবনের লীলা

শেষ হইয়া যায়। একমাত্র ভয় হইতেই এরূপ ঘটনার উপস্থিতি ঘটে। ফলতঃ জ্বর হইতে যে কোন রোগের উদ্ভব হউক না কেন, তাহা প্রাথমিকঃ সাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে।

আবার সমস্ত সময় এরূপও দেখা যায় যে, প্রাণের মধ্যে ওলাউঠা রোগের আভ্যন্তরীণ

হইলে যদি কোন ব্যক্তির কণ্ঠ শুষ্ক, গুষ্ঠ নীরস এবং মুখমণ্ডল জ্বাং নীলবর্ণযুক্ত হয়, তবে তাহাকে আর অধিক কাল ইহজগতে বাস

ত হয় না, অথচ সেই হতভাগ্য তখনো পর্য্যন্তও জানে না, অথবা তাহার আত্মীয় স্বজনও বুঝিতে পারে না যে, মূর্ত্ত মধোই তাহাকে কীদশ অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। এরূপ অবস্থায় ছই একবার ভেদ বমি হইতে না হইতে ছই তিন ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর সংসারের খেলার অবসান বটে। ওলাউঠার ঘোরতর আক্রমণকালে যখন পল্লীমধ্যে চলন্তল ব্যাপার আরম্ভ হইতে থাকে, তখন বায়ুর আধিক্য, মনের চাকলা এবং ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি বশতঃ প্রথমেই বমন আরম্ভ হয়। হয় তো সেই বমি হইতেই রোগীর আকস্মিক জীবনান্ত হইয়া থাকে। তাহার আর ভেদ হইবার অবসরের প্রতীক্ষা করিতে হয় না।

অজ্ঞানতা বশতঃ অনেকে অনেক সময় কাহারও অতিরিক্ত দান্ত হইতে দেখিলে অমনি অহিফেন বা অহিফেন সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বসেন। ইহা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। অহিফেনের পরিবর্তে যদি কর্পূর সম্পর্কিত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। অহিফেনে যে অনিষ্টের উৎপত্তি হয়, তাহার সংশোধনের কোন উপায়ই আর থাকে না। আমরা নিদানতঃ পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, বর্তমান ওলাউঠা বা বিষচিকা রোগের যে সকল লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে; অতিসার রোগেও তাহার অধিকাংশ রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে। কোনটি অতিসার, কোনটি বিষচিকা রোগের প্রথম আক্রমণ—ইহা নির্ণয় করা

একটু কঠিন ব্যাপার। চিকিৎসকদিগকেও এই রোগ নিরূপণ কালে অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

অহিফেন—মূত্রশোষক এবং ইহা দ্বারা মূত্র যন্ত্রও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। অতিসার রোগে অতিরিক্ত মল নিঃসরণ এবং শরীরস্থ জলীয়াংশের শোষণ হয় বলিয়াই মূত্ররোধ হয়। কিন্তু মূত্রযন্ত্র কখনও বিকার প্রাপ্ত হয় না। এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় অহিফেন প্রয়োগ করিলে দ্রব্যপ্রভাবে মূত্রযন্ত্রের আংশিক বিকৃতি বা অধিক পরিমাণে মূত্রশোষণ ঘটলেও ঔষধ দ্বারা তাহা আনয়ন করা বড় কঠিন হয় না। কিন্তু বিষচিকা রোগের ব্যাধিপ্রভাবেই মূত্র যন্ত্রের সঙ্কোচন এবং মূত্রের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পর অহিফেন প্রয়োগ করিলে মূত্রসঙ্কোচনের এবং মূত্রক্ষয়ের সহায়তাই হইতে থাকে, সুতরাং সে দোষ সংশোধন করিবার আর কোন উপায়ই হইতে পারে না। এ অবস্থায় মূত্ররোধ বা মূত্রক্ষয় বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটয়া থাকে। কিন্তু অতিসার বা বিষচিকা—যে রোগই হউক না কেন, প্রথমাবস্থায় যদি কর্পূর বা কর্পূর সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে এরূপ দৃষ্টিনা কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। অর্থাৎ মূত্ররোধ হইয়া কাহারও মৃত্যু হয় না। তাই বলিতেছি—বর্তমান ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থায় কিছুতেই অহিফেন প্রয়োগ করা উচিত নহে। তবে রোগের মধ্যমাবস্থায় অথবা প্রয়োজন হইলে শেযাবস্থায় অহিফেন সংযুক্ত ঔষধ বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অহিফেনের সন্ধিত অত্যন্ত মাত্রা সংযুক্ত হইলে, অহিফেনের প্রয়োগের প্রাথমিক প্রাপ্ত হয়—ইহা সর্বদা সর্বশেষে প্রকাশিত

একদোষোৎপন্ন উপদ্রব যেমন অনায়াসেই প্রতিকৃত হইতে পারে, বহু দোষোৎপন্ন উপদ্রব সেইরূপ অনায়াস সাধ্য নহে, এমন কি তাহা অসাধ্যরূপে পরিণত হইতে পারে ।

## ২য়—চিকিৎসা প্রকরণ ।

“অবিদ্যা হত্যাতে হস্তী হরিণেন কদাপি ন ।

জন্মকঃ পরিত্যক্তে স্বভিকরুণে স্বভৈ ন তি ॥”

পল্লীমধ্যে বিস্থচিকা রোগের প্রাচুর্য্যাবস্থায় সকলেরই কটিদেশে অলাবুয়ক্ (লাউয়েস থোলা) দাবণ এবং তাহার ধূমগ্রহণ করা উচিত । সর্দা কর্পূর-আরাণ এবং কর্পূর-সেবন এ রোগোৎপত্তি নিবারণের একটি প্রশস্ত কল্প । প্রথমে পেট-লাপিয়া তরল দাত্ত হইতে থাকিলে, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসারাদি রোগে কোনো কোনো ঔষধ বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিতে হয়—অল্পপান আদার রস ও চার, পাঁচ রতি সৈন্ধব লবণ । একরূপ ক্ষেত্রে কর্পূরবাসিত জল সহিত “মুস্তান্ত বটা” অথবা চিনির সহিত ‘কর্পূরাসব’ সেবন করাইয়াও ফল পাওয়া যায় । নিম্নে ঔষধ দুইটির প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইল । নানা কবিরাজী গ্রন্থে এক নামের অনেক ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায় । সুতরাং কোনো ঔষধ বলিয়া কোনোরূপ ঔষধ সেবন করিলে তাহারি কোনরূপ ফল পাওয়া যায় তাহা কে বলিতে পারে ?

### ১। মুস্তান্তবটা—

- ১। অর্ধাং পল্লবঃ কুরং কণা কর্পূর হিঙ্গুলঃ ।  
পলাং পলাং গৃহীত্ব তু মর্দয়িত্বা এতৎ চরেৎ ॥  
চতুঃ স্লামিতাং খাদেৎ কর্পূরানুবাসিতাং ।  
অতিসারমর্জ্যক বিস্থচীং বোর ক্লমিণীং  
যথোচিতং বহি মাল্য গ্রহণীয়মি দারুণাম্  
কাসং পকবিধং ১৮৬ দাশরথের বিকল্পতঃ ।

- ২। তুলাং প্রসন্নং পরিগৃহ্য শুদ্ধাং,  
পলাষ্টকং চোড়ু পতেঃ ক্ষিপেচ্চ ।  
এলা চ স্থগ্ধা ধনশৃঙ্গবেরে  
যমানিকা বেল্লম মত্র সর্বং ॥

মুতা ১৬ তোলা পিপ্পল, কর্পূর, শোধিত-হিঙ্গু প্রত্যেকে ৮ তোলা । প্রথম তিনটা ঔষধ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে । শোধিত হিঙ্গু, ছাঁকিয়া লইবার প্রয়োজন নাই । খলে উত্তম-রূপে পেষণ করিয়া লইলেই চলিতে পারে । পরে চারিটা দ্রব্যই জলের সহিত মর্দন করিয়া চারি রতি মাত্রায় বটা প্রস্তুত করিতে হইবে—অল্পপান কর্পূরোদক । এই ঔষধ সেবন করিলে বিস্থচিকা, অতিসার প্রভৃতি রোগের শান্তি হয় ।

### ২। কর্পূরাসবঃ—

পল্লবপ্রমাণে পিহিতে চ ভাণ্ডে মর্গেঃ নিদধ্যাদ্  
ভিৎগত্র যত্নাৎ । বিস্থচিকায়ঃ পথমৌষধং তন্নিহন্তি  
চাত্তান্ বিবিধান বিকারান্ ॥

(৩) কবিরাজী ওজন ৬৪ তোলার সের গণনা করিতে হইবে । এবং ৫ রতিতে আনা ধরিতে হইবে ।

মুতসঞ্জীবনী অথবা অল্প কোন প্রকার পরিষ্কৃত সুরা ১২৥ সের, কর্পূর ১ সের, ছোট এলাচ, মুতা, শুঁঠ যমানী, মরিচ—প্রত্যেক ৮ তোলা—মাত্রায় অর্ধ কুড়িত করিয়া লইতে হইবে । আর সমস্তগুলি দ্রব্য একত্র করিয়া ১ মাস কাল আবৃত ভাণ্ডে রাখিতে হইবে । ঔষধগুলি উত্তররূপে ছাঁকিয়া লইবে । ইহা বিস্থচিকা রোগের মহৌষধ । ইহা দ্বারা অপরা-পর নানাপ্রকার পীড়ারও প্রতিকার হইয়া থাকে । মাত্রা ১ মাষা । ওলাউঠা রোগের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত এই ঔষধ সেবন করিলে কোনও অপকার হয় না । প্রাথমিক-মধ্যে ওলাউঠা রোগের প্রবল আক্রমণ

লক্ষিত হইলে, অতিসার অথবা সাধারণ অজীর্ণ বলিয়া কাহারও তাহা উপক্ষা করা উচিত নহে। সকলেরই বেশ মনে রাখা উচিত যে, সাধারণ অজীর্ণ বা অতিসার রোগে তিন, চার বার ভেদ হইলেও কাহারও কব্জারও দস্ত বা সমস্ত মুখমণ্ডল শ্রামবর্ণ বা নীলবর্ণ হয় না। পুনঃপুনঃ অতিরিক্ত ভেদ হইতে হইতে রোগ যখন অতিশয় সাংঘাতিক আকার ধারণ করে, তখন দস্ত এবং মুখমণ্ডলের বর্ণ পূর্কোক্ত রূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে।

সত্য সত্যই ওলাউঠা বা বিহুচিকা রোগে আক্রমণ করিলে তুই একবার, ভেদ বনি তইয়া অমনি মুখশীর সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও দস্ত—শ্রামবর্ণ বা স্বেদন নীলবর্ণ হয়। দস্ত একেবারে নীরস তইয়া যায়। শরীরও অতি শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে। বিহুচিকা বিষ সমস্ত শরীরে অভিব্যাপ্ত হইলে যখন মর্ষগ্রস্তি সমুৎ একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে, শরীর হইতে শ্বেদা তরল হইয়া মলাকারে নির্গত হয় এবং সময় সময় রোগীর চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, যখন দোরতর মোচ আসিয়া উপস্থিত হয়, মধ্যে মধ্যে নেত্র উর্দ্ধগামী তইয়া উঠে, তখন নাড়ীস্পন্দন সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। কিন্তু বিশেষরূপ প্রণিধান করিয়া দেখিলে, অনেক বিশেষে থাকিয়া থাকিয়া এক একবার স্তম্ভতন্ত্র হ্রাস নাড়ীর স্পন্দন অন্তর্ভূত হয়।\* এইরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত গুণমণ্ডলি প্রয়োগ করিলে সবিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

একখানি কটরা মধ্যে টুকরা টুকরা হরিশ্র গুণ সংস্থাপন করিয়া আর একখানি কটরা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, পরে কন্দমলিশ্র গুণ

দ্বারা তাহা উত্তমরূপ বন্ধন ও কন্দম লেপন করিয়া রোদ্রে শুকাইয়া লইবে। তাহার পর ৬০।৭০ খানা বনঘুটে দ্বারা পূর্ণ হয়—একহস্ত পরিমাণ গভীর গোলাকার গর্ত করিবে। সেই গর্ত এক তৃতীয়াংশ বনঘুটে দিয়া পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে উল্লিখিত কন্দমলিশ্র কটরা স্থাপন করিবে। গর্তের অবশিষ্টাংশ আরো বনঘুটে দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরিশেষে উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিয়া মু্যাবদ্ধ হরিণ-শৃঙ্গ ভস্ম করিবে। ইহাকে সাধারণ পুট কহে। সাধারণ পুটে বনঘুটের বিশেষ কোন পরিমাণ নাই। ২০।২৫ খানা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রয়োজন মত ১০০ খানা পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্বিন্ন আরো অনেক প্রকার পুট আছে। যথাস্থানে তাহার বিষয় বর্ণনা করা যাইবে। সকল প্রকার পুটের কার্য রাশিতে সম্পাদন করা উচিত। পরদিন প্রাতঃকালে পুটস্থিত অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্লোপিত হইয়া মু্যাবদ্ধ গুণ যখন শীতল হইবে, তখন তাহা বাহির করিয়া লইবে এবং উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া কাচকুপীর মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই গুণ একরতি, অর্দ্ধ তোলা আপাঙমূলের রসের সহিত সেবনীয়। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিনী সকলেই নির্ভয়ে সেবন করিতে পারে। ইহা দ্বারা ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ঠিক থাকে, স্তত্রাং ব্যাধি শীঘ্র শাস্ত সাংঘাতিক হইতে পারে না। সর্ববিধ অজীর্ণ বা অন্নাজীর্ণ ইহা দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধযব পরিমিত হরিতালভস্ম পূর্বক আপাঙমূলের রসের সহিত সেবন করিলে কখনও নাড়ী স্পন্দন বিলুপ্ত হয় না। এবং সপ্ত ধাতুর ক্ষয়নিবন্ধন উৎপাদন প্রভৃতি

\* বিহুচিকা বিষ দৃষ্টান্তে বৈদ্য স্থানং বিমুক্তকৃত্যে



যে সকল গুরুতর উপসর্গ গুলি উপস্থিত হইয়া থাকে—তাহাও হইতে পারে না। এক্ষণে হরিতাল ভষ্মের প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইতেছে।  
বংশপত্র হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া সপ্তাহ কাল চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিলে অথবা পোটুলী বদ্ধ হরিতাল মৃৎভাণ্ডে দোলায়ন্তে ঝুলাইয়া দুই প্রহর কাল চূণের জলে পাক করিলে ইহার শোধন হয়। শোধনের পর কোন মৃৎভাণ্ডের তিন চতুর্থাংশ অম্বথ বৃক্ষের গুড় ছাল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরি শোষিত বংশপত্র হরিতাল স্থাপন করিবে। পরে তাহার উপর আরো অম্বথ ছাল রাখিয়া সেই ভাণ্ড পূর্ণ করিবে। দুই সের পরিমিত ছালে পাঁচ তোলা পরিমাণ হরিতাল প্রদান করিবে। এই অল্পপাতে অম্বথ স্বক ও হরিতাল দেওয়ার নিয়ম, কিন্তু হরিতাল আড়াই তোলার কম দেওয়া উচিত নহে। ভাণ্ড পূর্ণ হইলে ভাণ্ডের মুখ সরার সম্মুখে উত্তমরূপ আবদ্ধ করিয়া দুই প্রহর কাল তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। দুই প্রহর অন্তে অগ্নি নির্কাপিত হইলে যখন ভাণ্ড শীতল হইবে, তখন ভাণ্ডমধ্যস্থিত ভষ্ম গুলি হইতে, হরিতাল উঠাইয়া লইবে। ইহাই হরিতাল ভষ্ম। এই হরিতাল ভষ্ম ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ। ওলাউঠা রোগে এই হরিতাল ভষ্মের প্রয়োগ করিবার বিধান আছে। অত্যন্ত বৈকারিক অবস্থাতে ও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

### ✽ বিসর্পণ চূর্ণ।

ফটুকিরি ১, বংশপত্র হরিতাল ৩, স্বর্ণ ১০ উপরি লিখিত তিনখানি দ্রব্য দ্বারা এই

ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। ফটুকিরি শোধন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। পূর্বে যে হরিতাল শোধনের প্রকরণ বলা হইয়াছে, ঠিক সেই নিয়মানুসারে বংশপত্র হরিতাল শোধন করিয়া লইবে। এই ঔষধে জারিত হরিতালের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। স্বর্ণ, বিধিপূর্বক শোধন করিয়া ভষ্ম করিয়া লইবে। প্রথমতঃ একখানি কটরা মধ্যে কিঞ্চিৎ জারিত অন্ন স্থাপন করিবে। ইহার পূর্বেই প্রাপ্ত ফটুকিরি এবং বংশপত্র হরিতাল উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, আলতার জলে সাতবার ভিজাইয়া সাতবার রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া একটা গোলক প্রস্তুত করিবে।

এই গোলক উল্লিখিত মৃত্তিকাভাণ্ডস্থিত লৌহ ও অন্নের উপরিভাগে স্থাপন করিবে। তাহার পর আবার কিঞ্চিৎ লৌহ ও অন্ন দ্বারা ঐ গোলক বেশ করিয়া ঢাকিয়া আর একখানি কটরা দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত এবং কর্দমলিপ্ত রজু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন ও দুই অঙ্গুলি পুরু কর্দম লেপন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহাকে বজ্রমুখা কহে। এই মুখাবদ্ধ ঔষধ গোলক, স্বর্ণ সিন্দূর ও মকরধ্বজ পাকের নিয়মানুসারে বালুকা যন্ত্রে আট প্রহর পাক করিবে। পাকান্তে মুখা যখন শীতল হইবে, তখন তাহা উদ্ধৃত করিয়া সেই মৃত্তিকা নির্মিত ভাণ্ড সংলগ্ন পীতবর্ণ যে ঔষধ পাওয়া যাইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। অথবা পূর্কোক্ত লৌহ, অন্ন, এবং ঔষধ গোলক ঠিক পূর্কোক্ত নিয়মে কোন কর্দমলিপ্ত দৃঢ় কাচকুপীর মধ্যে সংস্থাপন করিয়া খড়িমাটি দিয়া কাচকুপীর

\* ফটুকিরি সমগ্রোহঃ হরিতালঃ এরোনতা। অলঙ্কৃত হ্রৈবর্তীযঃ গোলকঃ কারয়েৎ ভিষক্।  
মৃৎপাত্রো পরি লৌহে স্থাপয়েৎ গিরিজা মলম্। কৃতা চ বজ্রমুখাঃ সংস্থাপ্য দৃঢ় বর্পয়েৎ।  
বামাষ্টং বালুকা যন্ত্রে চাতি তীত্রাধিন পচেৎ। স্বাক্ষঃ শীতক বিজয়েৎ গৃহীতা ভোলকাষ্টকম্।  
পানমাত্রঃ স্বর্ণ দ্বা দ্বিগুণ্যাক্ষঃ প্রয়োজয়েৎ। বহুমাঃ স্ববাক্ষঃ অস্থানঃ বিধানতঃ।

মুখ আলগা ভাবে আটকাইয়া গজপুটে এক রাত্রি পাক করিলেও কাচকুপীর উদ্ধভাগে এক প্রকার পীতবর্ণ চটী পাওয়া যায়, তাহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই পীতবর্ণ ঔষধ একতোলা এবং জারিত স্বর্ণ সিক্তি তোলা একত্র মিশ্রিত করিলেই বিসর্পণ চূর্ণ প্রস্তুত হয়। বোতলের নিম্নদেশে অথবা কটরা দুইটির মধ্যভাগে অসংলগ্ন ঈষৎ ক্লষ্ণবর্ণ কঠিন যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা ২১ রতি মাত্রার উপযুক্ত অল্পপান সহ প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সর্কবিধ বৈকারিক ক্ষেত্রে এই ঔষধ ১ রতি ও কস্তুরী ১ রতি অল্পপান বিচার করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে বিষয়জনক ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

ওলাউঠা রোগে প্রথমতঃ পাতলা মল অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। তাহার পর স্ফুজল, কুমড়া পচা জ্বল অথবা জলের সহিত কুমড়া বাটার ছায় এক প্রকার ভেদ হইতে থাকে। বখন মর্ম্ম গ্রস্থি হইতে শ্লেষ্মা স্থলিত হইয়া মলাকারে নির্গত হইতে থাকে, তখনই কুমড়া বাটার ছায় পদার্থ পতিত হয়। কাহারও বা পূর্ণ হইতে বমন আরম্ভ হয়, কাহারও বা অনেক বিলম্বে বমনোদ্বেক হয়। যাহার যত শীঘ্র বমন আরম্ভ হয়, তাহার তত শীঘ্রই ধাতু বসিয়া যায়। পাড়াও নিতান্ত সাংঘাতিক আকার ধরিয়া থাকে। কিন্তু বিলম্বে বমনোদ্বেক হইলে চিকিৎসার সময় পাওয়া যায়। দান্ত, বমি, অঙ্গ বিশেষে খাইল ধরা, ঘর্ম্ম এবং শিরঃশূল প্রভৃতি যে প্রকার লক্ষণই উপস্থিত হউক না, তজ্জন্ত বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়া প্রথমতঃ ওলাউঠার দোষ শান্তির জন্ত চেষ্টা করিবে। মল নিঃসরণ

থাকিতে থাকিতে অর্থাৎ উৎবেষ্টন, ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ, শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্বে এবং মণিবক্ষে নাড়ী স্পন্দন বিদ্যমান থাকিতে যদি বিসর্পণ চূর্ণ সেবন করান যায়, তাহা হইলে কিছুতেই ধাতু বসিয়া যায় না। এবং উল্লিখিত উপদ্রব গুলি দ্বারাও রোগীকে কখনও আক্রান্ত হইতে হয় না। ঐ সকল উপদ্রব গুলির মধ্যে যদিও ২১টি আসিয়া আক্রমণ করে, তাহাও অনায়াসে নিবারিত হইয়া থাকে। ফল কথা পূর্বোক্ত অবস্থায় বিসর্পণ চূর্ণ একবার উদরে প্রবেশ করাইতে পারিলে রোগীর কিছুতেই মৃত্যু হইবে না— ইহা দ্রব সত্য কথা। চারি আনা ওজনে আপাণ্ড শিকড়ের ছাল উত্তমরূপে ধুইয়া শিলে পেঘণ করিবে; তাহার পর অল্পযব পরিমিত বিসর্পণ চূর্ণ তৎসঙ্গে মিশাইয়া শীতল জল সহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনের পরক্ষণেই প্রস্ফুটিত ধূতুরা ফুলের মধ্যে যে পাঁচটি শিস থাকে, তাহা লইয়া আড়াইটা মরিচের সহিত শীতল জলে বাটিয়া খাইতে দিবে। এক বৎসরের শিশুদিগের পক্ষে অর্দ্ধখণ্ড মরিচ ও একটি শিস, তিন বৎসরের বালকের পক্ষে একটি মরিচ ও দুইটি শিস, সাত বৎসরের বালকের সম্বন্ধে দেড়টি মরিচ ও তিনটা শিস, দশ বৎসর বালকের পক্ষে একটা মরিচ ও চারিটা শিস, এবং পূর্ণ বয়স্ক যুবক দিগের জন্ত আড়াইটা মরিচ এবং পাঁচটি শিস ব্যবহের। ইহাই ওলাউঠা রোগের প্রথম চিকিৎসা। এই বিসর্পণ চূর্ণ একবারের বেশী কাহাটকও সেবন করাইতে দেওয়া যায় না। এই ঔষধের পরমাণু সমূহ কঠিনালী হইতে আরম্ভ করিয়া আমাশয় পর্যন্ত প্রত্যেক স্থানেরই বাস, পেলী ও

ঝিল্লী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে । মুহূর্ত্ত বমি হইতে থাকিলেও এই ওষধ উঠিয়া পড়ে না । দ্রব্য শক্তি বা ওষধের প্রভাব বশতঃ এইরূপ ঘটনা থাকে । কিন্তু ধুতরা ফুলের শিশু ও মরিচের দ্বারা যে অনুপানের কল্পনা করা হইয়াছে, বমনের সহিত তাহা উঠিয়া পড়া অসম্ভব নহে ।

সেকপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি বমনের সহিত পুরোক্ত ধুতরা শিশু ও মরিচ উঠিয়াই পড়ে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তেলাপোকাকার একটু বিষ্ঠা জলে গুলিয়া খাইতে দিবে । তাহার পরেই আবার ধুতরার শিশু ও মরিচ পূর্ববৎ সেবন করাইতে দিবে । এবারেও যদি ধুতরার শিশু ও মরিচ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় তেলাপোকাকার বিষ্ঠা শীতল জলের সহিত সেবন করাইয়া ধুতরার শিশু ও মরিচ সেবন করাইবে । এইরূপ প্রণালীতে ধুতরা শিশু ও মরিচ একবার উদরের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিলে আর কোন ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না । পরে বমন যে কোন উপদ্রব আসিয়া জুটুক না কেন, তাহা নিবারণ করিতে আর কোনো বেগ পাইতে হইবে না । যে পর্যন্ত

ধুতরা শিশু ও মরিচ স্থিতিশীল হইয়া না বসে, সে পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে তেলাপোকাকার বিষ্ঠা সেবন করাইয়া ধুতরা শিশু ও মরিচ উদরস্থ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেই হইবে ।

তেলাপোকাকার বিষ্ঠা অতিশয় বমন নিবারক । ইহার অদ্বৃত্ত পরাক্রম পরিদর্শন করিলে সাতিশয় বিষয়াবিষ্ট হইতে হয় । সুস্থ শরীরে এই তেলাপোকাকার বিষ্ঠা গলাধঃকৃত হইলে অত্যন্ত বমন হইতে থাকে । কিন্তু বমন রোগে ইহা প্রযুক্ত হইলে বমন বেগ সর্কধা দূরীকৃত হয় । ইহা বহুক্ষেত্রে বহুবার পরীক্ষিত । পূর্বে যে হরিণশৃঙ্গ ভস্ম ও হরিণতাল ভস্মের কথা বলা হইয়াছে, যথাবিধি তাহা সেবন করাইবার পরও এই ধুতরাফুলের কেশর ও মরিচ সেবন করাইতে দেওয়া যায়, তাহাতে বিসর্পণ চূর্ণের স্নায় ফল দেখিতে পাওয়া যায় । গর্ভিনীকে কখনও হরিণতাল ভস্ম ও বিসর্পণ চূর্ণ সেবন করান উচিত নহে । গর্ভাবস্থায় পুরোক্ত নিয়মামুসারে হরিণ শৃঙ্গ ভস্ম সেবন করাইয়া পরে ধুতরা ফুলের শিশু ও মরিচ সেবন করাইলে গর্ভস্রাব বা অন্ত কোন আশঙ্কা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না ।

শ্রীদীননাথ করিরত্ন, শাস্ত্রী ।

## শিশুর খাওয়া ।

( কতকগুলি বিলাতী ফুড সম্বন্ধে আলোচনা । )

শিশুর ব্যবহারের জন্য বিদেশী ফুড বাছারে এত আছে যে লোকে কোনটা রাখিয়া কোনটা ব্যবহার করিবে ঠিক করিতে পারে

না । অতএব কতকগুলি অতি পরিচিত বিলাতী ফুড সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিষ । পূর্বে বিলাতী ফুড গুলিকে আমরা তিন

শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর উপাদান কি স্থূলতঃ তাহাও বলিয়াছি, কোন শিশুর পক্ষে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাও বলা হইয়াছে। এক্ষণে তিনটি শ্রেণীর প্রত্যেকের কতকগুলি সুপরিচিত বিলাতী খাদ্যের নাম এবং উপাদানের পরিমাণ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রস্তুত প্রণালী বলিব।

প্রথম শ্রেণীর ফুডের মধ্যে হলিক্স মল্টেড মিল্ক এবং মিলোফুডের নাম করা বাইতে পারে।

হলিক্স মল্টেড মিল্ক (Horlick's Malted Milk)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল শতকরা ৩৭, প্রটিন ১৩.৮, মেহ ১.০, কার্বহাইড্রেট ৭০.৮, ধাতবপদার্থ ২.৭০। শুক্কীকৃত দুগ্ধ (শতকরা ৫০) গোধুমচূর্ণ (শতকরা ২৬), বালিমল্ট (শতকরা ২৩) এবং বাইকার্বনেট অফ সোডার (শতকরা ৬) মিশ্রণে প্রস্তুত। মিশ্রণ কালে অপরিবর্তিত স্টেচার (Unaltered Starch) থাকে না। ৪ ভোজ অর্থাৎ আধপোয়া জলে চার চামচের তিন চামচ মিলাইয়া তিনমাসের শিশুর জন্য ব্যবস্থা।

মিলো ফুড (Milo food)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল ১.৫৬, প্রটিন ১১.০৩, মেহ ৩.২২, কার্বহাইড্রেট ৮১.৩৮, ধাতব পদার্থ ২.১১। শুক্কীকৃত সুইস দেশীয় দুগ্ধ, ভাজা গোধুমচূর্ণ এবং ইক্ষু শর্করা (শতকরা ৩০)। শতকরা ৬২ ভাগ দ্রবনীয় এবং ১২ ভাগ অদ্রবনীয় কার্বহাইড্রেট আছে। কেবল জল সংযোগে প্রস্তুত করিতে হয়।

মন্তব্য—এই দুইটি ভিন্ন কার্ণরিক্স সলিউবেল ফুড (Carnrick's soluble food) এবং এলেনবুরি (Allenbury) প্রভৃতি আরও কয়েকটি ফুড এই শ্রেণীভুক্ত। এই

শ্রেণীর খাদ্যকে স্থূলতঃ শুক্কীকৃত দুগ্ধ বলা যায়। ইহার মাতৃদুগ্ধের প্রতিনিধি স্বরূপ কল্পিত হয়। ইহাদের দোষ এই—দীর্ঘকাল শিশুর ইহাই আহার স্বরূপ হইলে যদি কয়েক মাসের পর ইহার সহিত কোন তাজা ফলের রস মিশ্রিত না করা যায়, তাহা হইলে শিশুর রক্ত বিকৃতি, (Scurvy) জন্মে। অধিকন্তু মেহের ভাগও অল্প থাকে। এসকল দোষ ভিন্ন এক প্রধান দোষ, ইহাদের মূল্য এত বেশী যে, তাজা দুগ্ধের দাম তাহার তুলনায় অনেক অল্প।

দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে ক বর্ণে মেলিন্স ফুড (Mellin's food) এবং খ বর্ণে বেঞ্জার্স ফুডের (Benger's food) নাম করা বাইতে পারে।

মেলিন্স ফুড (Mellin's food)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল শতকরা ৬৩, প্রটিন ৭.২, মেহ অতি ক্ষুদ্রাংশ, কার্বহাইড্রেট ৮২.০, ধাতব পদার্থ ৩.৮। ইহা সর্বতোভাবে মল্টেড দুগ্ধ। ইহার সমস্ত কার্বহাইড্রেট দ্রবনীয় অবস্থায় স্থিত। ইহাকে শুক্কীকৃত মল্টের সার বলা (Malt extract) যায়। এক পাইট জল এবং এক পাইটের ১/৪ খাংশ দুগ্ধের সহিত বড় চামচের এক চামচ মিলাইয়া তিন মাসের কর্ম বয়স্ক শিশুর জন্য ব্যবস্থা।

বেঞ্জার্স ফুড—(Benger's food)—উপাদান বিশ্লেষণ—জল শতকরা ৮৩, প্রটিন ১০.২, মেহ ১.২, কার্বহাইড্রেট ৭৯.৫, ধাতব পদার্থ ৩.৮। গোধুমচূর্ণ এবং Pancreatic extract অর্থাৎ জীবশরীরে পরিপাককারী রসজীবী Pancreas নামের আশ্রয় আছে, তাহার নির্যাসের মিশ্রণে প্রস্তুত। উপর্যুক্ত প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত করিলে একটি

না হটক অধিকাংশ খেতসার দ্রবনায় অবস্থায় পরিণত হয়। প্রস্তুত প্রণালীর গুণে খাদ্যের প্রচিড ভাগের এবং প্রস্তুতার্থ ব্যবহৃত দুধের আংশিক পরিপাক হইয়া যায়। প্রস্তুত প্রণালী—বড় চামচের এক চামচ খাদ্য এবং বড় চারি চামচ শীতল গোদুগ্ধ মিশাইয়া তাহাতে আদ পাউচ ফুটন্ত জল মিশাইয়া কোন উষ্ণ স্থানে ১৫ মিনিট কাল রাখিবে পরে সামান্য ফুটাইয়া লইবে।

মন্তব্য—Cheltine Maltose food, Horis Baby's food, Savary and Moor's food, Comb's Malted food, Worth's Perfect food এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর খাদ্যে প্রায় খেতসার আছে—ছয় মাসের পূর্বে শিশু খেতসার পরিপাক করিতে পারে না—এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ এই শ্রেণীর খাদ্যে দ্রব্যান্তর সংযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহার ফলে প্রস্তুত কালে খাদ্যগত খেতসার Dextrine ও Sugar পরিণত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। যদি এট শ্রেণীর ফুড ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে একথা বেশ স্মরণ রাখা উচিত যে এই সকল ফুড কেবল দুধের সহকারীরূপে সেবা হইতে পারে, কদাচ একাকী ব্যবহৃত হইতে পারে না। প্রয়োজন হইলে কোনটী ব্যবহার করা উচিত এই প্রশ্নের যদি আমাকে উত্তর দিতে হয় তাহা হইলে আমি এই বলিব, যে, প্রস্তুত কর্তা যেখানে খেতসারের শর্করার পরিণত হইবার প্রকৃষ্ট এবং নিশ্চিত উপায় আবিষ্কারে সমর্থ বলিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান পিয়াছে সেই খাদ্যই ব্যবস্থা করা উচিত। মেলিন ফুড ব্যবহার করা যাহা কিন্তু ইহাতে সেহের ভাগ এত অল্প আছে যে শিশুর যদি অধামৃত্যু

ইহাই ভোজন করাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে তাহার পথ্য মেদসঞ্চারের পক্ষে যে হানিকর হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মেলিন ফুডের প্রচারকগণ উহাদের খাদ্যে পালিত বহু স্থূল শিশুর চিত্র আমাদের সম্মুখে ধারণ করিলেও আমরা এই সত্যের অন্তর্থা করিতে পারিব না।

তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে রবিন্সন বাল্লির নাম উল্লেখযোগ্য। উপাদান বিশেষ—জল শতকরা ১০.১, প্রচিড ৫.১, মেহ ০.৯, কার্বহাইড্রেট ৮.০, হাতব পদার্থ ১.৯। ইহা পাল বাল্লির স্তন্য চূর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মন্তব্য—Ridges food, Neaves food, Frame food diet, Bananina ompus food, Falona, Scotts oat flour প্রভৃতি এই শ্রেণীর খাদ্য। এই শ্রেণীর খাদ্যগুলির আবিষ্কারী স্পষ্টই বলিয়াছেন ইহাতে মটের সম্পর্কও নাই—এগুলি সম্পূর্ণ খেতসারমূলক খাদ্য। যে সকল শিশু খেতসার পরিপাক করিতে পারে তাহাদের পক্ষে এই শ্রেণীর খাদ্যের অধিকাংশই হানিজনক না হইলেও ভাজা গমের ময়দা কিম্বা ভাজা কলায়ের ছাত্ত অপেক্ষা এই সকল খাদ্যের কোন বিশেষ উপযোগিতা নাই। যে শিশুর বয়স অন্ততঃ ৬মাস পূর্ণ হয় নাই তাহার পক্ষে এসকল খাদ্য পথ্য নহে—সর্বথা বর্জনীয়।

এতদেশীয় চিকিৎসকগণ যাহারা উপরি-লিখিত খাদ্যের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন তাহারা অবশ্যই উহাদের গুণদোষ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমি উপসংহারে এই বলিতে পারি যে ভারতীয় স্তন্য শিশুগণের পক্ষে এই সকল খাদ্যের কিছুই আবশ্যিকতা নাই। পীড়িত শিশুর ওষধ মূলক পথ্য স্বরূপ যদি কোন সময় এ সকল খাদ্য ব্যবস্থা করিবার

প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কোন্টী ভাল বিবেচনার সুবিধার জন্ত যৎকিঞ্চিৎ কথিত হইল।

### মাতৃস্তন্য-অম্পপরিবর্তন-অনুগ্রহে

#### পালন-কৃত্রিম-আহার।

শিশু কতদিন মাতৃস্তন্য বা ধাত্রীস্তন্য পান করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যদি প্রসূতির স্তন্য প্রচুর ও স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে তাহা হইলে শিশু এক বৎসর পর্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করিবে। বৎসরের পর স্তন্য প্রচুর এবং প্রসূতির স্বাস্থ্য উত্তম থাকিলেও আর শিশুকে স্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। বৎসরাধিককাল স্তন্য পান করাইলে শিশু এবং প্রসূতি উভয়েরই স্বাস্থ্য হানি হইবে।

বৎসরাধিককাল স্তন্য পান করাইলে প্রসূতির ক্ষুধা কমিয়া যায়, পরিপাকের দুর্বলতা ঘটে, মানসিক অবসাদ, শিরঃপীড়া ও মাংসক্ষয়, স্পষ্ট লক্ষণ রূপে প্রকাশ পায়। এতদ্ভিন্ন, কাশেশ্ব, মুচ্ছা, বুকধড়ফড় করা, বৃক্ বেদনা দেখা দিলে কদাচ উপেক্ষা করা উচিত নহে। বৎসরাধিক কাল স্তন্য পানে শিশু-শরীরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাও অবগত হওয়া উচিত। দীর্ঘকাল স্তন্য পানে শিশুর শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও গাত্রজঙ্ঘ্রণ হয়। ভিতরের বল (Stamina) এমন কমিয়া যায় যে পরে আহারাদির অতি সুব্যবস্থা করিয়াও তাহা সহজে পুনরানয়ন করা কঠিন হইয়া পড়ে। আমাশয় বড় হইয়া যায়, ঘিনঘিনে হয়—নাকিস্থরে অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ করে—ইহার প্রায়ই অস্থিবিদ্ধতি (Rickets) বা ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। অতএব বর্জিত

পারা গেল, মাতৃস্তন্য শিশুর পক্ষে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত বিশেষ হিতকর হইলেও কালক্রমে উহাই আবার বিষম অনর্থের কারণ হইয়া থাকে।

#### অম্পপরিবর্তন।

দ্বাদশ মাসের পর শিশুর মাতার স্তন্য প্রচুর থাকিলেও উভয়ের হিতার্থে শিশুকে স্তন্য-ত্যাগ করাইয়া অন্য আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্তন্য-ত্যাগ হঠাৎ একদিনে করাইবে না। ঠিক দ্বাদশ মাসেই স্তন্য-ত্যাগ করাইতেই হইবে এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—যদি এই সময় দাঁত উঠিবার জন্ত শিশুর পেটের পীড়া, জ্বর হইতে থাকে তাহা হইলে স্তন্য-ত্যাগ স্থগিত রাখিতে হইবে। পরে সুস্থ হইলে আন্তে আন্তে অন্য খাদ্য অভ্যাগ করাইতে হইবে। প্রথমে মাত্রা রাত্রিতে স্তন্য-দান বন্ধ করিবেন। তারপর কিয়দিনে দিবসে দুইবার মাত্র স্তন্য দান করিবেন। মাতৃস্তন্যের পরিমাণ কম হইলেই ক্ষুধার তাড়নায় শিশু অন্য আহারের প্রতি আগ্রহ দেখাইবে। এই অন্য আহার কি? তাহা আমরা কৃত্রিম আহার বর্ণনা কালে বলিব।

অতঃপর আমরা মাতৃ স্তন্যে পালিত এবং অন্য প্রকার খাদ্যে পালিত শিশুর স্বাস্থ্যের ও পোষণের তুলনা করিয়া দেখিব।

যে সকল শিশু মাতার অনিচ্ছা, দুর্বলতা পীড়া বা মৃত্যু হেতু অন্য হইতেই তাহার প্রকৃতি-নির্দিষ্ট খাদ্য স্তন্য হইতে বঞ্চিত হয়; তাহার প্রায়ই অতি দ্রুত কিংবা কাল জীবিত থাকিয়া মৃত্যু মুখে পড়িত হইয়া থাকে। এই সকল দুর্ভাগ্য শিশুগণের শরীরে দেখা

থাকায় হাত পা সরু সরু হয়, রক্তে লোহিতবর্ণ কণিকা না থাকায় কিছুমাত্র কাস্তি, শ্রী লক্ষিত হয় না। মুখে শিশুজনোচিত কোমলতার পরিবর্তে বার্কিয়া-সুলাভ লোল চর্মতা আবির্ভূত হয়, তাহাদের কণ্ঠস্বর নিরবচ্ছিন্ন বিলাপ ধ্বনি বলিয়া মনে হয়, অধিক কি এই সকল শিশুকে যেন মূর্ত্তিমান হুংথ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতি এই সকল শিশুর জন্য যে খাতি নির্দিষ্ট করিয়াছেন, ইহাদিগকে সময় থাকিতে যদি তাহা সেবন করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখিবে,—তাহাদের মুখে আর ক্রন্দন নাই, তৎপরিবর্তে সন্তোষের স্পষ্ট চিহ্ন বিরাজমান রহিয়াছে, ক্রমশঃ শিশুজনোচিত কমনীয়তা আবার ফিরিয়া আসিবে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও বর্ণ উজ্জ্বল হইবে। অবশেষে বালোচিত হাস্য আনন্দের কোলাহলে তোমার গৃহ পরিপূর্ণ হইবে, অধিক কি কিছুদিন পূর্বে বাহাদিগের আহ্বারের প্রণালী।

১। কেবল মাতৃস্তন্য ৯মাস বা তদধিককাল।

২। মাতৃস্তন্য তাদৃশ প্রচুর নহে; অতএব পরবর্তী কালে স্তন্যের সহকারী ভাবে অন্য খাদ্যের আবশ্যকতা ছিল।

৩। স্তন্য নিতান্ত অল্প; অতএব অন্য হইতেই অন্যান্য খাদ্যের আবশ্যকতা ছিল।

৩। স্তন্যহৃৎ একবারে বঞ্চিত হুতরাং জন্ম হইতেই হাতে-পালা।

উপরি উক্ত বিষয়গুলির ১ দফার সহিত ৪র্থ দফার তুলনা করিলে দেখা যায় যে প্রকৃতি

হুংথ দেখিলে অঙ্গ সঞ্চরণ কষ্ট সাধ্য হইত এখন তাহাদিগকে আনন্দের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি স্বর্ণ-ভ্রষ্ট দেব-শিশু বলিয়া মনে হইবে। কেহ কেহ হয়ত আপত্তি করিয়া বলিলেন মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত সমস্ত শিশুরই যে এইরূপ ছদ্মশা হয় ইহা কদাচ স্বীকার করা যায় না; কারণ আমরা দেখিয়াছি সময়ে প্রতাপালিত মাতৃহীন বা দৈবহৃৎটনায় মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত অনেক শিশু বেশ সুস্থ থাকিয়া পুষ্ট ও বদ্ধিত হইয়াছে। আমরা সামান্য ভাবে এই সকল বিষয় আলোচনা করিলাম এক্ষণে প্রত্যক্ষ ঘটনার সাক্ষ্য লইব। কোন্ ভাবে প্রতাপালিত হইলে শিশুর স্বাস্থ্য কিরূপ হয়, বৈদেশিক চিকিৎসক-গণ অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রতিষ্ঠিত-শিশুতে যেরূপ ফল দেখা গিয়াছে।

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| { | ৬৩ জন সুপরিবদ্ধিত।         |
|   | ২৩ জন মধ্যমরূপ বদ্ধিত।     |
|   | ১৪ জন নিকৃষ্ট ভাবে বদ্ধিত। |
| { | ৫৭২ জন সুপরিবদ্ধিত।        |
|   | ২৫২ জন মধ্যমরূপ।           |
|   | ১৬ জন নিকৃষ্ট ভাবে।        |
| { | ২৭ জন সুপরিবদ্ধিত।         |
|   | ২৬ জন মধ্যমরূপ।            |
|   | ৪৬ জন নিকৃষ্ট রূপ।         |
| { | ১৬ জন সুপরিবদ্ধিত।         |
|   | ২৬ জন মধ্যমরূপ।            |
|   | ৬৪ জন নিকৃষ্টরূপ।          |

নির্দিষ্ট খাদ্যে অর্থাৎ মাতৃস্তন্যে পালিত ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৬৩ জন সুপুষ্ট ও সুপরিবদ্ধিত

হয় কিন্তু হাতে পালা ( Handfed ) শিশুর শতকরা ১৬ জন মাত্র সুপুষ্ট হইয়া থাকে।

যে সকল শিশু হাতে-পালা এবং যাহা-দিগকে নিয়ম পূর্বক আহাৰ দেওয়া হয় না, তাহারা অতি ধীরে মৃত্যু মুখে অগ্রসর হয়। যদি জন্ম হইতেই ঐরূপ আহাৰের অনিয়ম হয় তাহা হইলে শিশু প্রায় ২১৩ মাসের অধিক কাল জীবিত থাকে না। পক্ষান্তরে যদি কিছুকাল স্তন্য পান করাইয়া পরে হাতেপালা হয়, তাহা হইলে তাহার রোগের আক্রমণ হইতে আশ্রয় রক্ষার শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক-তর দেখা যায়। মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইয়া নূতন খাদ্যে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইলে যদি ৫ প্রথম প্রথম কিছুকাল তাহাকে পাণ্ডুবর্ণ বিমর্ষ এবং শিথিলান্ধ দেখা যায় তথাপি তাহার দেহ ও শক্তির উপর নূতন পথ্যের প্রভাব কিঞ্চিৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে প্রায়ই শিশুর অস্থি সমূহ—কোনল ও বক্র হওয়ায় সে অসমর্থ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শিশুর এই রোগ কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক কম দেখা যায়। শিশুর রীতিমত পোষণ না হইলে এবং বাসস্থলীতে আলোক ও বায়ুর সম্যক ব্যবস্থা না থাকিলে প্রায়ই শিশু রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। দেড় হইতে দুই বৎসরের মধ্যেই প্রায় এই রোগ দেখা দেয়। ইহার বিশেষ লক্ষণ রাত্রিতে ছটকট করা, মাথায়া ও ঘাড়ে অতিরিক্ত ঘর্ষ, অতিসার, বিলম্বে দাঁত উঠা, শিশুকে তুলিলে সে অত্যন্ত কষ্ট পায়, পেশী সমস্ত শিথিল, বিবর্ণ এবং শোথযুক্তের মত, ক্রমে অস্থি নরম হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি জন্মায়।

কারণ—দীর্ঘকাল স্তন্যপান, কেবল নানাপ্রকার ক্ষুদ্র বা গাঢ় দুধের (Condensed

Milk) দ্বারা পালন, বিবিধ ছুঃখের আগার স্বরূপ এই রোগের কারণ।

চিকিৎসা—স্বাস্থ্যরক্ষার ও পথ্যের নিয়মানুবর্তন করিবে এবং ছাগলাত্ত, ঘৃত তুল্য খাদ্যোষধ সেবন করিতে দিবে।

মাতৃদুগ্ধে পালিত শিশুর অপেক্ষা 'হাতে-পালা' শিশুগণের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা যে অধিক তর ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পাঠ্যকর ধৈর্য পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না। বৈদেশিক ডাক্তার মেরম্যান সম্বন্ধকৃত বহু অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে সকল শিশু 'হাতেপালা' হয় তাহাদের ৮ জনের মধ্যে ৭ জন বিবিধ ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। বিলাতের অনেক শিশু হাসপাতালের বিবরণ পাঠ করিলেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আমাদের এই বিশাল দেশে শিশুর মৃত্যু-সংখ্যার কোনই হিসাব নাই—কোন কোন বড় সহরের কিঞ্চিৎ আছে মাত্র। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে কলিকাতায় শিশুমৃত্যু পূর্বাপেক্ষী অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পরিবৃদ্ধির কারণ—জননীর স্বাস্থ্যহানি, স্তন-দুগ্ধের অল্পতা, অনেক স্থলে জননীর স্তন্যদানে অপ্রবৃত্তি, বস্তুক গোচরদুগ্ধের (Condensed Milk) প্রচুর ও ব্যবহার।

যে মাতৃদুগ্ধের অভাবে শিশুর এতাদৃশ জীবন অবস্থা আপত্তি হয় কোন মাতা ইচ্ছা-পূর্বক বা সামান্য কারণে স্তন্য সন্ধানকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলেন? স্তন্যদানে সন্ধানের অনন্ত বিলম্ব থাকিলে ইহাও স্তন্যের বিরোধ উত্থাপিত হইতে পারে।



একথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি (কুমারতন্ত্রের ২১ পৃঃ দেখ)। স্তন্যদানে মাতার স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি না হইলে যত দূর পারা যায় ততটুকু মাতৃদুগ্ধ হইতেও সন্তানকে বঞ্চিত করিবে না “স্বল্পমপ্যস্ত ধর্মস্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ” এই মহাবাক্য তুলা, যে যৎসামান্য স্তন্যদুগ্ধ মাতা সন্তানকে দান করিবেন তাহাতেই শিশু অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে।

### হাতে-পালা শিশুর খাত ।

মাতা শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থ হইলে ধাত্রী নিযুক্ত করা উচিত। কিরূপ ধাত্রীর দুগ্ধ-পান শিশুর পক্ষে হিতকর তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি (কুমারতন্ত্র প্রথম অধ্যায়)। যদি ধাত্রী সংগ্রহ না হয় তাহা হইলে অবশুই শিশুকে হাতেপালা ভিন্ন উপায় নাই। শিশুর মাতার যেমন অবস্থাই হউক না কেন দুগ্ধদানে সম্পূর্ণ অসমর্থতা কচিংঘটিয়া থাকে। শিশুকে স্বীয় দুগ্ধপান করান মাতার অবশ্য কর্তব্য কর্ম। এই অবশ্য-কর্তব্যতা যিনি যতটুকু নির্বাহ করিতে পারেন তাহাতেই শিশুর প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। যদি মাতার অবস্থা এতাদৃশ নষ্ট হয় তথাপি তিনি অবস্থা ভাল না হওয়া পর্যন্ত দিনে ২ বার করিয়া যদি স্তন্যদান করেন তাহা হইলে বাকিটুকুর জন্ত কৃত্রিম খাদ্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। যতই সামান্য হউক স্তন্যদুগ্ধ পানের সহিত বাকি কৃত্রিম খাদ্য প্রদান করা যায় তাহা হইলে কেবল কৃত্রিম খাদ্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়।

শিশুকে হাতেপালা বড় কঠিন ব্যাপার। এই কাণ্ড যথাবৎ নির্বাহ করিতে হইলে শিশুর পরিচারিকার এত অধিক যত্ন এবং

শিশুর পরিপাক শক্তি ও আহারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এত সূক্ষ্ম বিবেচনার আবশ্যক হয় যে সাধারণ পরিচারিকার দ্বারা তাহা সম্যকনির্বাহ হওয়া কঠিন; সুতরাং সাধারণতঃ হাতেপালার ফল প্রায়ই সন্তোষজনক হইতে দেখা যাক্‌না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ ও অভিজ্ঞতা যদি একান্তভাবে প্রতিপালিত হয় তাহা হইলে হাতেপালা শিশু তেমনই সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান হইতে পারে।

গোদুগ্ধ—যদি শিশুকে হাতে পালিতে হয় তাহা হইলে পিতামাতাকে বুঝাইবার জন্ত আমরা বারবার এই কথা বলিতেছি যে শিশুর জন্ম হইতে দন্ত না উঠা পর্যন্ত প্রায় বৎসর-ধিক কাল পৃথিবীতে দুগ্ধ, কেবল দুগ্ধ ভিন্ন এমন কোন হিতকর খাদ্য নাই, বাহা আহার করিয়া শিশু সুস্থ শরীরে বাঁচিতে পারে। পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে অত্যন্ত তরল বস্তু এবং দুগ্ধজাত শর্করার যোগে গোদুগ্ধকে প্রায় নারীদুগ্ধের সূদৃশ করা যায়—কিছু ক্রীম—(ইহা শিশুগণ বেশ সহজে পরিপাক করিতে পারে) যোগ করিলেও কথাই নাই। গোদুগ্ধের কি কি দোষ থাওয়ার জন্ত উহাতে চুণের জল, বালির জল যোগ করিতে হয় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ষ্ঠেতসার মূলক খাদ্য দ্রব্য উঠার পূর্বে শিশু পরিপাক করিতে পারে না, অথচ শিশুর দুগ্ধে বালির জল মিশাইতে বলা হইতেছে কেন? উত্তরে বস্তুতঃ এই বালিভে অতি অল্প পরিমাণ ষ্ঠেতসার আছে, বাহা সামান্য পরিমাণ আছে তাহাও আবার অতি সূক্ষ্ম কণার আকারে থাকে; সুতরাং ইহার ব্যবহারে আপত্তি থাকা উচিত নহে। বালি, কেবল বালি ভিন্ন আর এমন কোন ক্রীম-বিদ্যমান মূলক খাদ্য (Renouncing articles) নাই

যাহার দ্বারা বালির কার্য নির্বাহ হয়। গোরুর দুধের অল্পতা দোষ দূরীকরণার্থ এক পাইট দুধে বড় চার চামচের দুই চামচ চুণের জল মিশ্রিত করিলেই যথেষ্ট। মোট কথা চুণের জলের মাত্রা অধিক না হয়, অবশ্য শিশুর উন্নয়নময় থাকিলে উহার মাত্রা বেশী হইলেও দোষ নাই।

#### সন্তোজাত শিশুর পক্ষে—বড় চাম

চের এক চামচ গোহুধে পরিষ্কৃত স্নেহ জল বড় তিন চামচ এবং চার চামচের একচামচ চুণের জল মিশাইয়া কিম্বা গরম জলের পরিবর্তে বালির জল মিশাইয়া পান করাইবে। ইহাতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধজাত-শর্করা কিম্বা ইক্ষু-শর্করা মিশাইলে আর কোন ফ্রুট থাকিবে না। Brown sugar মিশাইবে না। ইহা মিশাইলে দুগ্ধ পরিপাক কালে উদ্ভিক্ত হইয়া বিদাহপাক (acidity) হইবে।

পূর্বে বলিয়াছি স্তনদুগ্ধ যদি অপ্রচুর হয় এবং তজ্জন্ত আহারভাবে যদি শিশুর মাংসকর হইতে থাকে তাহা হইলে অল্প খাদ্য দানের আবশ্যকতা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিব শিশুকে কতক্ষণ অন্তর কতটুকু সংস্কৃত (diluted) দুগ্ধপান করিতে দিব এবং শিশুর পক্ষে সমস্ত দিনে কতটুকু দুধের প্রয়োজন।

প্রত্যেক হাতেপালা শিশুকে অল্প খাদ্য সেবন করাইবার পূর্বে সর্বাগ্রে গোহুধ সেবন করাইবে অর্থাৎ হাতেপালা শিশুর গোহুধই প্রথম খাদ্য হওয়া উচিত। যদি বিস্কট গো-দুধের অভাব হয় তাহা হইলে ছাগদুগ্ধ দিতে হইবে। মাতৃদুধের সদৃশ করিবার জন্য ছাগ-দুধের সংস্কার কিরূপ হইবে শিশুর হিতাধিগণ এই বিষয় চিন্তা করিবেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমি একটা বিবরণী লিখিতেছি।

বয়স	তরল বস্তু মিশ্রণ	২৪ ঘণ্টার মধ্যে যত স্নেহ-খণ্ড-রাইতে হইবে	প্রতিবারের পরিমাণ	২৪ ঘণ্টার জন্য যতটুকু সংস্কৃত দুগ্ধ আবশ্যক	যতটুকু দুগ্ধ-জাত শর্করা যোগ করা আবশ্যক	যতটুকু ক্রীম যোগ করা আবশ্যক
২-৭ দিন	১ ভাগে ৩ ভাগ	১০	আধ ছটাক	পাঁচ ছটাক	৫ চার চামচ	৫ চার চামচ
১ মাস	১ ভাগে ২ ভাগ	১০	এক ছটাক	আড়াই পোয়া	৫ চার চামচ	৫ চার চামচ
২ মাস	১ ভাগে ১½ ভাগ	৯	দেড় ছটাক	চৌদ্দ ছটাক	১ চার চামচ	১ চার চামচ
৩ মাস	১ ভাগে ১ ভাগ	৮	আধ পোয়া	এক সের	১½ চার চামচ	১½ চার চামচ
৪-৫ মাস	১ ভাগে ½ ভাগ	৭	আড়াই ছটাক	একসের দেড় ছটাক	১½ চার চামচ	১ চার চামচ
৬-৭ মাস	১ ভাগে ¼ ভাগ	৬	সাত্বে তিন ছটাক	একসের পাঁচ ছটাক	১½ চার চামচ	১ চার চামচ
৮-৯ মাস	অমিশ্রিত	৬	এ	এ	১ চার চামচ	১ চার চামচ

‘ক্রীম’ করূপে প্রস্তুত করিতে হয় পূর্বে বলা হইয়াছে। যদি ক্রীম না পাওয়া যায় দুধের সর বাটিয়া প্রস্তুত করা গব্যাত দৈনিক ১০-২০ বিন্দু দিবে। দুধের ছানার ভাগ পরিপাক না হইয়া যদি শিশুকে কষ্ট দেয় তাহা হইলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিকিৎসকেরা বলেন এস্থলে প্রাতি আধ ছটাক দুধের সহিত অর্দ্ধরতি ‘সোডিয়াম সাইট্রেট’ মিশাইয়া দিলে দুধের ছানা সহজে পরিপাক পাইবে।

পূর্নলিখিত প্রণালী যত্নসহকারে অবলম্বিত হইলেও যদি শিশুর পোষণ ও পরিবর্ধন না হয়, যদি দুধ সম্যক্ সহ পাইতেছে না বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে কি কর্তব্য? আমার বোধ হয় কিছুদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে কোন গাঢ় বিলাতী দুধ খাওয়ান ভাল। পচাং লিখিত প্রণালীতে গাঢ় বিলাতী দুধকে তরল করিয়া স্নেহের ‘অন্নতা পরিপূর্ণার্থ ক্রীম বোগ করিয়া পান করাইবে। গাঢ় বিলাতী দুধের মধ্যে নেসলের যে গাঢ় দুধ মধুরীকৃত নহে তাহাই ভাল। ইহা যদি না পাওয়া যায় মধুরীকৃতই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

**বিলাতী গাঢ় দুধের সংস্কার।—**

১ ভাগ গাঢ় বিলাতী দুধে ১৫ কি ২০ ভাগ ঝল মিশাইয়া উহার দেড় ছটাকে চার চামচের একচামচ ক্রীম মিশাইবে। এইরূপ সংস্কৃত গাঢ় দুধ একমাস, প্রয়োজন হইলে ৬ মাস পর্যন্ত ব্যবহার করাইবে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে সফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে দীর্ঘকাল গাঢ় দুধ সেবন করাইলে শিশুর রক্তবিকার (Scurvy) বা তাহার অস্থি কোমল ও বক্র হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই দোষের সংশোধন জন্য লেবুর রস মিশাইতে হয়।

হাতেপালা শিশুর আহার সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল যত্নপূর্বক দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালিত হইলে, শিশু প্রায় দন্তোদগম কাল পর্যন্ত কোন প্রকারে কাটাইয়া দিতে পারে। কিন্তু এস্থলে একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত, যে খাদ্যে শিশুকে হাতেপালা আরম্ভ করিবে তাহার ~~ফল~~ বিশেষ করিয়া বুঝিয়া তবে তাহা বর্জন বা অনুবর্তন করিবে। অন্ততঃ একপক্ষকাল না দেখিয়া কোন খাদ্য বর্জন করিবে না।

**ছাগদুগ্ধ—**ছাগদুগ্ধে প্রোটিন্ এবং স্নেহ অধিক আছে। যদি বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ সহজে সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, এবং শিশুর পরিপাক শক্তি বলবতী থাকে তবে ছাগদুগ্ধ ব্যবহারে কোন বাধা নাই। ছাগদুগ্ধে ছানার ভাগ অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া গোদুগ্ধ অপেক্ষা সহজে পরিপাক পাইয়া থাকে। গোদুগ্ধ যে প্রকার সংস্কৃত করিবার কথা বলা হইয়াছে ছাগদুগ্ধও সেইরূপে সংস্কৃত করিলে ছাগদুগ্ধের যে একপ্রকার বিশ্লেী গন্ধ আছে তাহা অমৃভূত হইবে না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, যেখানে গোদুগ্ধের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইবে সেস্থলে অজ্ঞাত খাদ্য প্রদান করিবার পূর্বে ছাগদুগ্ধ ব্যবহার করিয়া দেখিবে। যদি কোন স্থলে নিতান্ত পক্ষে কোন ফুড ব্যবহার করাই আবশ্যক হয় তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে বিজ্ঞাপনদাতারা যাহাই বলুন না কেন নারীদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ ভিন্ন পৃথিবীতে এমন কোন খাদ্য অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা দীর্ঘকাল নিরাপদে মাতৃদুগ্ধ বা গোদুগ্ধের প্রতিনিমিত্তরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। গোদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐকল ফুডের কোনটা ব্যবহার করিলে হয়ত

কিছুদিন অস্বাস্থ্যভাবে উহা মাতৃদুগ্ধ বা গোদুগ্ধের প্রতিনিধিস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু উহাদের ব্যবহারে যে বিপদের সম্ভাবনা তাহাত পূর্বেই বলিয়াছি।

২ মাস বা একবৎসর পর্যন্ত উপরি লিখিত দুগ্ধের আহার দিয়া ততঃপর একবৎসর কাল অর্থাৎ শিশুর দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত ছোট মাগুর মাছ সিদ্ধ ঈষৎ লবণাক্ত করিয়া দিনে একবার দিবে। অল্প খাদ্যের প্রতি শিশুর আগ্রহ এবং তাহা পরিপাকের শক্তি থাকিলে আলু সিদ্ধ, পোরের ভাত, সন্দেশ অতি অল্প ধরান যাইতে পারে। এখন পর্যন্ত কিন্তু গোদুগ্ধ প্রচুর দিতে হইবে—এ সকল সহকারী মাত্র। তিন হইতে ৪ চারি বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু পোরের ভাত, রুটীর ছিঁকা, কাঁচা পেঁপের তরকারী, কাঁচ বেগুন সিদ্ধ, যে কালের যে ফল হিতকর হইবে তাহা খাইতে দিবে। ক্রমে এই সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে দিয়া দুগ্ধের আধাংশ হ্রাস করাইতে হইবে।

শিশুকে প্রথম হইতে উত্তমরূপ চর্কা করিয়া ভোজন করিতে অভ্যস্ত করিবে। ঘন ঘন খাওয়ার অভ্যাস ভাল নহে। একবার খাইয়া ভুক্তবস্ত্র সম্যক পরিপাক পাইবার পূর্বে পুনরায় ভোজন করিলে কখনই কেহ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে না।

শিশুকে লবণ, তিক্ত বস্ত্র খাওয়ান অভ্যাস করাইবে। এদেশের লোকের মত কোনও জাতি ইচ্ছা করিয়া তিক্তবস্ত্র ভোজন করে না—কিন্তু ভারত গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, তিক্তের প্রতি আমাদের স্বভাবতঃ একটা স্পৃহা আছে। আমাদের দেশে অনেক তিক্ত শাকসবজিও পাওয়া যায়, সেইগুলির কোনটা প্রত্যহ ঋতু অনুসারে নির্বাচন করিয়া ভোজন করিলে বহুহিত সাধিত হয়। এই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে আলুই ব্যবহৃত হইত। মিষ্ট বস্ত্র শর্করাদি ভোজনে শিশুর স্বাভাবিক লোভ থাকে সুতরাং ইহাকে প্রসন্ন না দিয়া সংযত করিবার জন্যই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

কুমারতন্ত্র রচয়িতা।

## অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও ধ্বস্তুরি।

গত আষাঢ় মাসের “ধ্বস্তুরি” পক্ষে অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি মন্তব্য পূর্ণ সম্ভব প্রকাশিত হইয়াছে। ধ্বস্তুরি সম্পাদক মহাশয় এই বিদ্যালয়ের কল্যাণ কামনার চিন্তাশীল হইয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁহার এই সম্বন্ধে কয়েকটি ভুল কথা বাহির হইয়াছে।

তাঁহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি ঐ প্রবন্ধের এক স্থলে বলিয়াছেন—“(১) সাধারণতঃ যে সকল আয়ুর্বেদী চিকিৎসক চিকিৎসা কৌশলে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—অম্বিকারী, তাঁহাদের সকলেরই সর্বাঙ্গকৃতি প্রকৃতিগত পান্য পান্য নাই। সুতরাং আয়ুর্বেদ পান্যের পরিচয়

যে যে অঙ্গে যিনি পারদর্শী, অধ্যাপনায় তাঁহাদের সহায়তা লাভের আশা অতি অল্প।” চিকিৎসাকুশল ও দেশবাসীর নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকমণ্ডলীর সহায়ত্ব লাভের প্রয়াস যে ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ করেন নাই—একথা ধনস্তুরি সম্পাদক মহাশয় কাহার নিকট জ্ঞানিরাছেন বলিতে পারি না,—কিন্তু উহার মূলে যে আদৌ সত্যতা নাই—এ কথা আমরা জোর করিয়াই বলিব। ‘অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেশের চিকিৎসাকুশল ও সুপ্রতিষ্ঠিত কবিরাজ মহাশয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থী বহুসময়ে তো’ হইয়াছেনই, তা’ ছাড়া কি কলিকাতায় কি মফঃস্বলে যাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত বদিশা এখনো পরিগণিত হন নাই (অবশ্য চিকিৎসাকুশল নহেন—এ কথা আমরা বলিতে পারি না—কারণ সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলেও অনেকে যে চিকিৎসাকুশল হইয়া থাকেন, ইহা অনাস্ত সত্য) তাঁহাদের নিকটও ইহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া, স্বতঃপত্র: চেষ্টা করিয়া, তাঁহা দিগকে বিভাগে লইয়া গিয়া, যাহার যেরূপ শক্তি—তিনি সেইরূপে ইহার সাহায্যকারী হউন—এরূপ অনুরোধ—প্রতিষ্ঠাতৃগণ অনেক সময়ই করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন।

ধনস্তুরি-সম্পাদক মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া একদিন অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে ভ্রমণমন . পূর্বক ইহার পরিদর্শকমণ্ডলীর পুস্তক গুলি পর্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে বসিতে পারিবেন যে, দেশের ছোট বড় সকল শ্রেণীর চিকিৎসক,—শুধু চিকিৎসক নহেন—অন্ত সম্প্রদায়ের বহু লোককেও উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্ত এবং সাহায্য লাভের জন্ত বিভাগে আনা হইয়াছে এবং এখনো তাহার

জন্ত বিধিনত চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকতার মুখপত্র ধনস্তুরিতে ওরূপ ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় আমরা বিশেষ জঃখিত হইয়াছি।

এই বিভাগে যে বৈজ্ঞানিক ছাত্র শিক্ষা দেওয়া হয়—এজন্ত ধনস্তুরি সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন—“ইহা জনসাধারণের নানা আকর্ষণ করিবার পরিপন্থী হইবে।” টান্সাইল আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে কিছুকাল পূর্বে যখন ধনস্তুরিতে অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—তখনই আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। জানি, অর্থ লইয়া আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেওয়ার রীতি কোনোকালে ছিল না, স্বীকার করি—এখনো কলিকাতার কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের নিকট কতকগুলি ছাত্র অষ্টাদশ আয়ুর্বেদের শিক্ষা পায় কিনা জানি না—কিন্তু হান পাইয়া থাকে, তবে অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে শুধু মামুলী শাস্ত্রীয় শ্লোক মুখস্থ করাইলেই চলিবার উপায় নাই—অষ্টাদশ আয়ুর্বেদের শিক্ষাদানের জন্ত এখানে শিক্ষা ব্যাপদেশেই যে বহুল অর্থ ব্যয় করিতে হয়। শল্য চিকিৎসার জন্ত তো অর্থব্যয় স্বতঃসিদ্ধ কথা, তা’ ছাড়া দ্রব্যগুণের শিক্ষা পর্য্যন্তও এই বিভাগে শুধু শ্লোক মুখস্থ করাইলেই চলিতে পারে না—দ্রব্যগুণ শিক্ষা দানের সময়েও প্রত্যেক দ্রব্যটি ছাত্রদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্তও বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বিভাগের সংলগ্ন দাতব্য ঔষধালয়ের আয়ুর্বেদীয় ও শল্য চিকিৎসার বিভাগ দুইটিও ছাত্রশিক্ষার জন্ত প্রতিষ্ঠিত। এ সকল ব্যাপারে যে পরিমাণে ব্যয় করিতে হয়, তাহাতে কিছু কিছু

বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা না করিলে উপায় কি ?

মেডিকেল কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির অনুকরণেই এই বিদ্যালয়ে অ্যানাটমী, সার্জারি, ফিজিওলজির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মেডিকেল কলেজে শুধু ডাক্তারি শিক্ষা প্রদত্ত হয়, কিন্তু অষ্ট্রাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে অষ্ট্রাঙ্গ আয়ুর্বেদের মূলাঙ্গী শিক্ষা প্রদান করা হয়, অর্থাৎ ডাক্তারি ও কবিরাজীর সমন্বয়ে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। জানি, বৈদ্য জাতির পক্ষে প্রথম প্রথম বেতন দিয়া চিকিৎসা শিক্ষার জন্ত অনেকেই অগ্রসর হইবেন না, কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অভিভাবকগণ যদি মেডিকেল কলেজে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন,—তাহা হইলে সামান্য বেতন ও কলিকাতায় অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইতে রাজি হইবেন না কেন ? তবে ধনন্তরি-সম্পাদক মহাশয়ের ইহাও জানিয়া রাখা কর্তব্য, আমরা বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেও বহুসংখ্যক অবৈতনিক ছাত্রও এখানে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এবার অবৈতনিকের আবেদন এত বেশী পাওয়া গিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের পরিচালক বর্গকে তত্ত্ব চিন্তিত হইতে হইয়াছে।

“ধনন্তরি”র ৩য় মন্তব্য “বিদ্যালয়ের সংশ্লেবে একটি ছাত্রাবাস থাকা একান্ত প্রয়োজন, আমাদের ধারণা এ পর্যন্ত তাহার ব্যবস্থা হয় নাই, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।”

ধনন্তরি সম্পাদকের মত একজন সকল বিষয়ের তথ্যসম্পন্ন সম্পাদক এরূপ ভুল ধারণা কেন যে করিলেন, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ বিদ্যালয়

সংলগ্ন ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের ২য় বর্ষ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই করা হইয়াছিল। ৪১১ নং মোহন বাগান লেনে সে ছাত্রাবাস বহুকাল অবস্থিত থাকার পর কলেজের সিলোনি ছাত্রেরা নানা অসুবিধার জন্ত ঐ বাটা হইতে গত পূজার পর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে উঠিয়া যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিনের জন্ত কলেজ সংলগ্ন ছাত্রাবাসও লোপ পায়। কিন্তু তাহার পর ২৭১১এ বলরাম ঘোষের স্ট্রীটে একখানি ত্রিতল বাটা, উচ্চ ভাড়ায় এবং বহুদিনের জন্ত বন্দোবস্ত করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এবার ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে অনেকগুলি কৃতবিদ্য ছাত্র ভর্তি হইয়াছে এবং তাহারা ঐ ছাত্রাবাসেই অবস্থিতি করিতেছে।

ধনন্তরি সম্পাদক মহাশয়ের ৪র্থ মন্তব্যের উত্তরে আমরা জানাইতেছি যে, এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের কথা তিনি ঘাড়া বলিয়াছেন—তাহা অতি যুক্তি পূর্ণ। সৌভাগ্যক্রমে এই বিদ্যালয়ে ভারতের নানাস্থান হইতে নানা শ্রেণীর ছাত্র ভর্তি হইতেছে—এ অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সকল শ্রেণীর ছাত্রগণেরই যে অধ্যয়ন-সৌকর্য্য হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ সে কথা বিলক্ষণই বুঝিয়াছেন এবং তাহারই ফলে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের জন্ত ২টি “স্পেশাল ক্লাস”ও খোলা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছাত্রগণকে ইংরাজীতে অভিজ্ঞ করিয়া লইলে চিকিৎসাবিজ্ঞা শিক্ষা দিবার বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

• আর একটি বিষয় ভুলের সংবাদ ধনন্তরিত বাহির হইয়াছে। ধনন্তরি সম্পাদক কলিকাতার কয়েক জন ব্যক্তিনা করিমাবাদের দিকে

বলিয়াছেন,—তাঁহাদিগের নিকট যতগুলি শিক্ষার্থী আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন, গত চারি বৎসরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে সে পরিমাণ ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। কিন্তু ইহার উত্তরে ধ্বস্তরি সম্পাদকের নিকট আমরা নিবেদন করিতেছি—গত চারি বৎসরের সমগ্র ছাত্রের হিসাবে প্রয়োজন নাই, বর্তমান বর্ষে এক প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতেই যতগুলি ছাত্র ভর্তি হইয়াছে,—তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিলেই তাঁহার অসুমান অমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য—ভুল ভ্রান্তি সকলেরই

আছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ যেকোন ভাবে এই বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যে ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য নহে—একথা কখনই বলা যায় না। তাঁহাদের ব্যবস্থায় দোষ থাকিতে পারে, তাঁহাদের বন্দোবস্তে ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া, ধ্বস্তরি সম্পাদকের মত প্রবীণ, বিচক্ষণ, ~~সম্মত~~ সেবক, স্বজাতিবৎসল ও সৎসদয় ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করুন—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

(সুপারিন্টেন্ডেন্ট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়)

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:—

সিন্ধিয়ার রাজমাতা।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক মহামান্য জীল শ্রীযুক্ত মহারাজা সিন্ধিয়ার (গোয়ালিয়ারের) ~~স্বাভাবিক~~ গুত ২৩শে ভাদ্র প্রত্যুষে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। এই উপলক্ষে ২৬শে ভাদ্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় বন্ধ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

চিকিৎসকের পরলোক।—গত ১৯শে ভাদ্র রাজা প্রায় ২০টির সময় স্বপ্রসিদ্ধ কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় স্বজ্যোৎস্না লোকান্তরিত হইয়াছেন। ~~স্বজ্যোৎস্না~~ তাঁহার

বয়সক্রম ৫৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষ কষ্ট অহুভব করিয়াছি। তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ের স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ ছিলেন। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করুন।

চিকিৎসকের অভাব।—বাঙ্গাল দেশে রোগ বৃদ্ধির তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা যে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হওয়া উচিত—একথা বঙ্গদেশের লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুরের মুখে আমরা অনেক সময় শুনিয়া আশ্রিত হইতেছি। ইহার জন্য ঢাকা সহরের মত বর্দ্ধমানও মেডিকেল স্কুল স্থাপনার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু শুধু বর্দ্ধমান উহা স্থাপন করিলেই যে চিকিৎসকের অভাব

পূর্ণ হইবে না—ইহা সুনিশ্চিত,—বাঙ্গালা দেশে চিকিৎসকের অভাব পূরণ করিতে হইলে, শুধু বর্দ্ধমানে নহে বাঙ্গালা দেশের তাবৎ প্রধান প্রধান স্থানেই ঐরূপ স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আগে যেমন কাম্পবেল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহার পুনঃ প্রচলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংপ্রতি বঙ্গেশ্বর চাকার মেডিকেল স্কুলে এই প্রসঙ্গ লইয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন—“নানা কারণে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারি শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।” আমরা কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবে একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের বিশ্বাস, আধিব্যাধির লীলানিকেতন বাঙ্গালাদেশে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে, বাঙ্গালীর মাতৃ ভাষায় উহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে অনেক ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা শিক্ষা করিয়া দেশের উপকারে সমর্থ হইবে।

শ্রীমতী বেসান্ত ও দেশীয় চিকিৎসা।—১৯১৭ খৃঃ অব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে শ্রীমতী বেসান্ত দেশীয় চিকিৎসার উন্নতিকল্পে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম এইরূপ,—“যখন ডাক্তারি চিকিৎসার প্রচলনে দেশের অভাব পূর্ণ

হইতেছে না, এবং বহু শতাব্দীর পরীক্ষিত প্রাচীন কবিরাজি ও হাকিমী চিকিৎসায় অত্যাশিষ্ট সুফল পাওয়া যাইতেছে, তখন সরকার হইতে এ চিকিৎসার সহায়ত্ব প্রদর্শন না করায় একদেশদর্শিতার কার্য করা হইতেছে। ডাক্তারি চিকিৎসায় অল্প চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ, কিন্তু কবিরাজী ও হাকিমি চিকিৎসার ঔষধ প্রকরণ ডাক্তারি অপেক্ষা ফোনো অংশে নিকৃষ্ট নহে। অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়াও এ চিকিৎসা এখনও সম্যকরূপে জীবিত আছে, দেশের অনেকের এখনও এ চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা আছে।” শ্রীমতী এনি বেসান্ত—দেশের অনেকেই যে এ চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন বলিয়াছেন,—অনেক ক্ষেত্রে তাহা না হইয়া যে উপায় নাই, কারণ এমন অনেকগুলি রোগ আছে, যাহা ডাক্তারির অল্প চিকিৎসায় মত কবিরাজীতে ‘একচেটিয়া’ বলিলেও অভ্যুত্তী হইবে না। ফলকথা গবর্ণমেন্ট হইতে এতদিন আয়ুর্বেদ ও ইউনানিকে সাহায্য লাভে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেও এখনও এ দুইটি মৃতকর প্রাচীন চিকিৎসাকে পুনর্জীবিত করিবার ব্যবস্থা করা যাউক—ইহার জন্য আমরা কর্তৃগুরুগণের সাক্ষর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্লেগে মৃত্যু।—প্লেগ রোগে এ পর্যন্ত দুই কোটি ভারতবাসী কলিগ্রাসে পতিত হইয়াছে।



# আয়ুর্বেদ

আর্য্যচিকিৎসাবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক  
মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ পেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এম,  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম, বি,  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ,  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রী হরচন্দ্র কবিরত্ন  
মহাশয়গণের বসবাস্থানে

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন কর্তৃক  
সম্পাদিত ।

চতুর্থ বর্ষ

( সন ১৩২৬ আখিন হইতে ১৩২৭ ভাদ্র পর্ষদ )

কলিকাতা

২৯নং ফাড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

অষ্টম আয়ুর্বেদ বিভাগ হইতে

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত ও

২০২নং গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে

প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত ।

বাবিঃ দুলা ডাকঘরসংখ্যা ৩৮০

# চতুর্থ বর্ষের প্রবন্ধ সূচী

( বর্ণমানানুসারে )

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অনুক্রমে আমাদের স্বাস্থ্য ...	সম্পাদক	২৭৩
অস্ত্রোপচার ...	ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যজীবন ভট্টাচার্য এল,এম,এস	২৯৯
আকন্দ ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন	৩৮৮
আঠারো ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কান্যাতীর্থ	৩৯২
আমাদের কথা ...	সম্পাদক	২
আয়ুর্বেদ অনুশীলন ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন	৪৮৮
আয়ুর্বেদের ইতিহাস ...	মহানহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন	
	সরস্বতী এম.এ, এল, এম, এস ৬,৪৩,১০৩,১৫০	
আয়ুর্বেদের উন্নতির অন্তর্ধার ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন	৪৪২
আয়ুর্বেদে ক্ষার ও অম্লপ্রয়োগ ...		২৪
আয়ুর্বেদে রক্তমোক্ষণ ...	শ্রী	১২৮,১৬১
ভলাউটা চিকিৎসা ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন ৮০,১০৭,৩৮৫	
কহু ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যশঙ্কর রায় এম.এ	৩২৩,৩৬৫
কবিরাজীর কৃতকাৰ্য্যতা ...	ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু এল, এম, এস	১০৮
কণিকাতা আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজে বার্ষিক পরীক্ষার ফল ...		৫০৭
কলেরা কি বিস্মৃতি ? ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোজ্ঞনারায়ণ সেন	২১৯
কাজের কথা ...	সম্পাদক	৫০,৯৮,৪৬৯,৪৭৪
কাশী আয়ুর্বেদে সপ্তিগলীর পরীক্ষার ফল ...		৪৭২
কুলের কথা ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন	৪২৫
কোছিক ? ...	ডাঃ শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার	২১১
খাণ্ড ও বাহ্য ...	রায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীলাল বসু বাহাজর এম্-ডি	২২৯
জীবনপ্রাণের পুরাবৃত্ত ...	সম্পাদক	১১০
জাকারের ডায়েরী ...	কবিরাজ ডাঃ বেধচন্দ্র সেন এম, ডি	২৬৫
জুখকাণ্ডি তৈল ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর সেন	১৭৯
বন্দ সঙ্কীর্ণতা ...		৩৪
ববব ( কবিতা ) ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কান্যাতীর্থ	৩৯২
বাকীচক ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কান্যাতীর্থ	৩৯২
নিরাধিকার ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কান্যাতীর্থ	৩৯২

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
পদ্ম	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরি প্রসন্ন বায় কবিরাজ	৪৬৪
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোটকা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত স্বধাভূষণ সেনগুপ্ত	৫০৮
পদ্মগ্রাম ও মালেশিয়া	... সম্পাদক	৪২৭
পদ্মগ্রাম ও স্বাস্থ্যবিধান	... শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১৩
পদ্মী প্রসঙ্গ	... সম্পাদক ৩৫০, ৩৭২, ৪২৬, ৪২৮	
পদ্মাবতীৰ পদ্য নিবেদন	... বায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাগ্‌চীর হেম-ডি,	১৮১, ৩৮, ৩৭১
পদ্মাবতী	... সম্পাদক	১৪১
পান দোষ	... শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী	৪৪
প্রাচীন চিকিৎসকের টোটকা ও মুষ্টিযোগ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ	১৪১, ১৮৮, ২৫৮, ৩৮৪	
ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ও টোটকা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ	৩১১
বঙ্গ জর্ণোৎসব	... সম্পাদক	৪
বঙ্গ বিজয়া (কবিতা)	... শ্রীযুক্ত ইন্দু ভূষণ সেনগুপ্ত	৪২
বঙ্গ শিশুযুত	... সম্পাদক	২০৮
বঙ্গের প্রতিবেদকবিধি	... সম্পাদক	২২১
বঙ্গবঙ্গের চিকিৎসা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র কণ্ঠাভরণ	১৮৪
বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য	... সম্পাদক	৪৬১
বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য	... সম্পাদক ২২৩, ২৫২	
বালক রক্ষা	... শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় চট্টোপাধ্যায় বি, এল	৩০
বিবিধ প্রসঙ্গ	... সম্পাদক ৪৮, ৯৫, ১৪২, ১৯০, ২৭০, ৩২২, ৪৩২, ৫০৫	
বিবজা বিরোগ	... সম্পাদক	২৭১
বিষচিকিৎসা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতৃষণ	৯২
ব্যায়াম প্রসঙ্গ	... হিন্দুস্থান	৩৯১
মকরম্বরের ব্যবহার প্রণালী	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ভিষাগচর্চ	৩৮
মঙ্গলচরণ (কবিতা)	... শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত	
মস্তিষ্ক কাহিনী	... হিন্দুস্থান	৩৪১
মুষ্টিযোগ ও টোটকা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত স্বধাভূষণ সেনগুপ্ত	৪১, ৯১
মুষ্টিযোগ ও টোটকা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ভিষাগচর্চ	২২১
মালেশিয়ার মুষ্টিযোগ	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সেন	৪৪

ବିଷୟ	ଲେଖକଙ୍କ ନାମ	ପୃଷ୍ଠା
ସ୍ବଚ୍ଛେଦ ସଂକଳିତ ...	ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ	୧୭୦
ରଜଃସ୍ଥଳା ନାରୀର ଶାଢ଼ୀ ...	ଡା: ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ	୧୬
ବସ ବିଜ୍ଞାନ ...	କବିବାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜବରଦ ବାସ କାବାତୀର୍ଥ	୧୧୫
ରୋଗ ଆବୋଧୋ ଆୟୁର୍ବେଦର ଶକ୍ତି	ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଞ୍ଛେନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ	୫୫୧
ନାରୀର ବିଦ୍ୟା ...	ନହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ କବିବାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମଥନାଥ ସେନ	
	ସଂସ୍କୃତୀ ଏମ-ଏ, ଏଲ, ଏସ, ଏମ ୧୯୦୭, ୧୯୦୮, ୧୯୧୧	
	୧୯୧୨, ୧୯୧୩, ୧୯୧୪, ୧୯୧୫, ୧୯୧୬	
ଶିଳ୍ପଚିତ୍ରିତ୍ବସାର ସହଜ ବାସ୍ୟା	କବିବାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମିନୀଭୂଷଣ ବାସ କବିବନ୍ଦୁ	
	ଏମ-ଏ, ଏମ, ବି	୫୨, ୧୨
ଶିଳ୍ପ ଚିତ୍ରିତ୍ବସାର ସହଜ ବ୍ୟବହାର ...	କବିବାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଞ୍ଛେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କବିବନ୍ଦୁ	
		୧୧୮, ୧୫୫
ଶିଳ୍ପ ମନ୍ଦଳ ...	ସମ୍ପାଦକ	୭୧୧
ଶିଳ୍ପପାଳନ ...	ଶ୍ରୀମତୀ କୁନ୍ଦୁନୀ ଦେବୀ ବି-ଏ ମରହଟ୍ଟା	୧୮, ୫୫, ୧୧୫
	୧୯୦୭, ୧୯୦୮, ୧୯୦୯, ୧୯୧୦, ୧୯୧୧, ୧୯୧୨, ୧୯୧୩, ୧୯୧୪	
ଶିଳ୍ପର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ...	କବିବାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୃତଲୀଳା ଶ୍ରୀ କାବାତୀର୍ଥ	
	କବିଭୂଷଣ	୫୫୫
ଶୋକ କାର୍ପାସ ...	ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମଥନାଥ ଦତ୍ତଶ୍ରୀ	୧୭
ସଂକଳ ଚିତ୍ରିତ୍ବସାର ...	ସମ୍ପାଦକ	୧୧
ସମାଲୋଚନା ...	ସମ୍ପାଦକ	୧୫୦, ୧୫୧, ୧୫୨, ୧୫୩
ସ୍ବର୍ଗୀୟ କବିବାଜ ବିବରଣୀ ୧୯୧୧ ଶ୍ରୀ ...	ସମ୍ପାଦକ	୧୦୧
ସାହ୍ୟାବିଜ୍ଞାନ ...	ଡା: ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଲିନୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏହିଟି, ଏଲ, ଏମ, ଏମ	
	୧୯୦୭, ୧୯୦୮, ୧୯୦୯, ୧୯୧୦, ୧୯୧୧	
ସ୍ବପ୍ନ (କବିତା) ...	ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିତେଶ୍ବର ରାୟ ବାକରପତୀର୍ଥ ବିଜ୍ଞାବିନୋଦ	୧୧
ସ୍ବପ୍ନଦେହେ ମାନବ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା		
ଆରେ କିନା ? ...	ଶ୍ରୀ	୧୧୫, ୧୧୬, ୧୧୭, ୧୧୮
ସ୍ବର୍ଗ୍ୟ ରାଶିର ସହିତ ନାରୀନିକ ସମ୍ବନ୍ଧ	ଡା: ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ	୧୫୦
ଜ୍ୟୋତିଷର ଉପହାସ ...	ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ	୧୫୦

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৪র্থ বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—আশ্বিন ।

১ম সংখ্যা ।

মঙ্গলাচরণ ।

—:~:—

( শ্রীহৃদ্ভূষণ সেন গুপ্ত )

দ্রালোক হইতে ভুলোকে চিকিৎসা প্রথম শিক্ষা যাঁ'র,  
দীক্ষা যাঁহারি পীড়িতের তরে নাশিতে বোগের ভার ।  
ব্যাধি-প্রপীড়িত সমগ্র বিশ্ব দেখিয়া ব্যথিত প্রাণে,  
শিক্ষা যাঁহারি আয়ুর্বেদ ইন্দ্র-সন্নিধানে,—  
তঁাহার চরণে-স্মরণ লইতেছি নববর্ষে,  
এস ভরদ্বাজ ! কর আশীর্বাদ, বিশ্ব মাতৃক হর্ষে ।

এস আত্রেয়, এস ঋগ্বেদে রক্ষিতে নিখিলবানী,  
এস অগ্নিবিশ, ভেল, জতুকর্ণ—লইয়া আশীষ রাশি ।  
এস পরাশর, এস গো হারীত, এস ঋষি ক্ষারপাণি,  
অনন্তদেব, এসগো আবাস লইয়া “চরক” থানি ।  
এস ধনন্তরি—দিবোদাস রূপে লইয়া সহস্র শিষ্য,  
বিশ্ব মাকারের ফুটিয়া উঠুক আবার মধুর দৃশ্য ।

“অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা” লইয়া সৌম্য মুরতি ধরি,  
এস গো ‘বাতক’ চরণে কোটী নমস্কার করি ।

এস গো স্মৃতি—শারীর বিদ্যা প্রথম প্রচার যঁ'র,  
তোমার চরণে গললগ্নী হ'য়ে প্রণিপাত বারবার।  
প্রাচীন কাহিনী নূতন করিয়া শুনাইব নববর্ষে,  
(ওগো) কর আশীর্বাদ সকলে মিলিয়া—বিশ্ব মাতৃক হর্ষে।

## আমাদের কথা।

( কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন )

দিনের পর দিন বাইল, মাসের পর মাস কাটিল, এমনই করিয়া আবার একটি বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমাদের বড় আশার—বড় আকাঙ্ক্ষার—বড় সাধের—বড় আদরের “আয়ুর্বেদে”রও এমনই কবিয়া আর একটি বৎসর কাটিয়া গেল,—“আয়ুর্বেদ” তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল।

আয়ুর্বেদের উন্নতি কামনায় আয়ুর্বেদীয় মাসিক পত্র ইতঃপূর্বে কয়েকখান বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার প্রায় সকল গুলিই অকালে কাল-কবলিত হইয়াছে। “চিকিৎসাসম্মিলনী”র অস্তিত্ব নাই,—“সমীরণ” বন্ধ হইয়া গিয়াছে, “আয়ুর্বেদ পত্রিকা” বিলুপ্ত, বৈদ্যসঙ্ঘাবনী” ও জীবন ধারা। কিন্তু ইহার কারণ অসুসন্ধান করিলে, ২টি কারণ স্বভাবতঃই উপলব্ধি হয়। ১ম—দেশবাসী চিকিৎসক মণ্ডলী চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রের নিকট যে ধরণের সম্বর্ভাদির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, এ মাসিক পত্রগুলি হয় সেভাবে পরিচালিত হয় নাই;

না হয় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার উন্নতি কামনায় জ্ঞান গভীরগবেষণা সম্বৃত্ত প্রবন্ধাদির প্রচার করে বৈজ্ঞানিক আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ প্রদানে অনভ্যস্ত। আমাদের অসুমানের দুইটি কারণই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। বিশেষতঃ শেষোক্ত কারণটি যে “আয়ুর্বেদে”র অদৃষ্টেও খাটিতেছেন, তাহা নহে, আমরা সেটুকু উপলব্ধি করিয়াই আয়ুর্বেদের নীরস কথাগুলিকে সরস করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ভিন্ন অনেক ডাক্তার, ব্যবহারজীবী এবং দেশের অন্যান্য ব্যক্তি এইজন্যই “আয়ুর্বেদের” গ্রাহক থাকিয়া ইহা যথারীতি পাঠ করিয়া থাকেন। গত তিন বৎসর কাল “আয়ুর্বেদ” এই ভাবেই পরিচালিত হইয়াছে।

বাস্তবিক আয়ুর্বেদীয় প্রসঙ্গ করিতে হইলে শুধু যে চিকিৎসার কথাই বলিতে হইবে, ব্যাধির নিদান বলিতে হইবে, রোগ-প্রশমনের উপায় বিধিই বলিতে হইবে,—ব্যাধি প্রণীড়িত আর্ন্তগণের কিরূপ ভাবে—কিরূপ নিয়মে

কিরূপ পথো চলা উচিত—এই সকল কথাই আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহা করিলেই এ সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইবে, এমন ধারণা ঠিক নহে,—আয়ুর্বেদের কথা সাধারণকে বুঝাইতে হইলে, রোগ প্রতিকারের উপায়-বিধি মত বাহ্যতে লোকে ব্যাপি প্রসিদ্ধিত না হয়, যদি প্রদর্শিত নিয়ম সকল পালন করিয়া—অবহিত চিত্তে শাস্ত্রোপদেশ রক্ষা করিয়া—মদ্যোত্র ও সঙ্ঘটিপপায়ণ হইয়া বাহ্যতে দেশবাসী আশ্রয়ক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, এক কথায় রোগাক্রমণের প্রতিষেধক বিধি সকলই সর্বোপযোগী আলোচনা করিতে হইবে। আয়ুর্বেদের সেবা করিতে গিয়া আমরা সেই বিষয়টির উপরই সর্বোপযোগী রক্ষা রাখিয়া থাকি।

দেশের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, অসুখ বঙ্গজননীর অধিকাংশ সম্বন্ধেই বোগেব মরণায় কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, নিত্য নূতন নূতন বোগোন্নয়নের তাণ্ডব লীলায় বঙ্গজননী কিরূপ ভীতা কম্পিতা—সে কথা তো আর কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। মালেকবিয়ার বাঙ্গালা শ্রমশান ইহা আছে, ওলা-দেবীর রূপায় প্রতি বৎসর বঙ্গমাতার অসংখ্য অসংখ্য সন্তান অকালে কালকবচিতে হইতেছে, —ইনফ্লুয়েন্সা, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, বাঙ্গালায় সন্তান মৃত্যি ধারণ করিয়াছে—ইহার জন্ত তো প্রতিকারের চিন্তা করিতেই হইবে, কিন্তু

সেই সঙ্গে সেই সকল রোগের আক্রমণ হইতে বাঙ্গালী বাহ্যতে অব্যাহত থাকিতে পারে, তাহার চেষ্টা যে সর্বোপযোগী আবশ্যক। ঘরে আশ্রয় লাগিলে জ্বর ঢালিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা আশ্রয় লাগিবার পূর্বে সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য নহে কি? আমরা সে কথাটা আগে ভাবি নাই, সেই জন্তই তো আজি বাঙ্গালার এই অবস্থা।

আমরা দেশের এই দুর্দিনে আধি-বাধির লীলা নিকেতন বঙ্গমাতার সন্তানদিগকে আশ্রয়ক্ষার উপায় করিতে হইলে সংসার পরিচালনা বিষয়ে আবাব তাহাদিগকে সাবধক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, সাবধক সরলীর অনুসরণ ভিন্ন তাহাব যে আর গত্যন্তর নাই—এ কথাটি তাহাকে সর্বপ্রকারে বুঝিতে হইবে।

—গত তিন বৎসরে—আমরা সেই উদ্দেশ্য লইয়াই আয়ুর্বেদ পরিচালন করিয়াছি—এবং এখনও তাহাই করিব। আমাদের পুরাতন পাঠকগণ আমাদের সঙ্কল্প অবগত আছেন,—নূতন পাঠকদিগকে আমাদের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলিবার জন্ত আমাদের সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া—আয়ুর্বেদের আবিষ্কার কর্তা দেবতাদিগকে ও ও প্রচার কর্তা আর্ষা ঋষিমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য প্রণাম করিয়া, আবার কাব্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম, দেবতা ও ঋষিমণ্ডলী আমাদের সহায় হউন—ইহাই গুরুজনের নিকট আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

## বঙ্গে দুর্গোৎসব

( কবিরাজ শ্রীমত্যাচরণ সেন ওপু কবিরঞ্জন )

আবার মহা ঈজাব মাড়া পড়িল। জগ-  
জ্ঞানী অনিন্দনীর আগমনের বার্তা বঙ্গ-  
বাসীকে জানাইবার জন্য ললিত-বিভাসের  
আলাপে আবার নহনতেন বাস্তব বাস্তব উঠিল।  
মায়ের শ্রীচরণ-সমোজে স্থান পাইবে বলিয়া  
রক্তজবা গর্ভভবে আবার কটিয়া উঠিল।  
কুমুদ-কল্লারও রক্তজবার মত কৃতকৃতার্থ  
হইবার বন্ধ সংসারে মধুর হাসো অস্ত্র বিকাশ  
করিতে লাগিল।

না আসিতেছেন—এ হেন মধুর দিনে  
বাস্তবীর আর আনন্দ রাগিবাব স্থান নাই।  
চিরকর্ম্মক্লান্ত-বাস্তবী কয়দিনের জন্ত বিশাম-  
সুখ উপভোগ করিবেন—প্রিয়জন সন্দর্শনে  
বহুদিনের অদর্শন জনিত কত আবেগ উচ্ছ্বাস—  
কত মধুরাধা—কত পুরাতন কাহিনী প্রকাশ  
করিয়া, কত মধুর আনন্দ—কত অনিচ্চনীয়  
তৃপ্তি অল্পভব করিবে, পতি, পত্নীর সহিত, পিতা,  
পুত্রের সহিত, ভ্রাতা, ভগ্নীর সহিত, সখা,  
সুজন্মের সহিত, মিত্র, বান্ধবের সহিত, প্রবাসী,  
স্বদেশীর সহিত মিলিত হইবে,—কত কথা—  
কত কাহিনী—কত গল্প—কত পরামর্শ—  
কত আকাঙ্ক্ষা—কত কামনা—পরস্পরের  
মধ্যে আদান-প্রদানে পরস্পরে পরম সুখ—  
চরম স্তুতি—প্রাণভরা তৃপ্তি উপলব্ধি করিবে।  
কত হাসি ছুটিবে, কত আবেগ উঠিবে,  
কত উচ্ছ্বাস বহিবে। না এই রঙ্গ দেখাইবার  
জন্তই বর্ষে বর্ষে বঙ্গ আগমন করিয়া থাকেন।  
এবারও আসিতেছেন। তাই তাহার আগমনের

মাড়া পাইয়া বঙ্গবাসী আবার জাগিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু অন্যত  
বার্ষের মত এবার যে আর হর্ষভরে মাতিয়া  
উঠিতেছে না। সে আনন্দের আবেগ, সে  
সুখের স্তুতি, সে প্রাণভরা তৃপ্তি—এবার  
যে দৈর্ঘ্য-দারিদ্র্য তাহার নিকট হইতে অস্ত্রহিত  
হইয়াছে। বাঙ্গালী উদরপূর্তির উপযুক্ত  
অশন পাইতেছে না,—লজ্জা রক্ষার মত  
তথা ভদ্রতা রক্ষার উপযোগী বসন পাইতেছে  
না,—অশন-বসনের সকল সামগ্রীই সম্মুখে  
রহিয়াছে,—কিন্তু ছন্দ্যু-ল্যাতানিবন্ধন ক্রম করিয়া  
সাদ পূর্ণ পরিবার সক্ষমতা নাই,—তাহার  
উপর ম্যালেরিয়া কলেরা ইনফ্লুয়েঞ্জার তাণ্ডব  
নৃত্যে বাঙ্গালী গত বৎসর যেরূপ চক্ষে অন্ধকার  
দেখিয়াছে, তাহাতে জগজ্ঞানী আনন্দ-  
ময়ীর আগমনের সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিলেও  
প্রাণিস্থলিয়া এবার যে আর বাঙ্গালী আনন্দে  
মাতিতে পারিতেছে না।

রোগের জালা—শোকের জালা, তাহার  
উপকরণবিধে পিটের জালা যে বড় জালা।  
ভুক্তিক-রাক্ষসীর করাল বদন বাদানে সমগ্র  
বঙ্গ যে এবার ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে।  
বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য তণ্ডুল হইতে সমস্ত  
দ্রব্যই যে ছন্দ্যু-ল্য। বাঙ্গালী পেটের ভাত—  
পরনের কাপড় সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না।  
পুজার আনন্দে বাঙ্গালী মাতিবে কি করিয়া!  
সেইজন্ত আনন্দময়ীর আগমনে এবার অনেকই  
আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ উপভোগ করি-



তেছে। বাসুদেব-চাপল্যের আকাঙ্ক্ষা—ধনী-  
দরিদ্র বিচার করিতে পারে না, অবস্থা-  
হীন দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গালীর সন্তান-সন্ততি  
মহামায়া পূজার সময় নূতন বেশ বিভাসের  
আকাঙ্ক্ষায় যে সারা বৎসর উৎফুল্ল হইয়া  
বহিয়াছে এবার দরিদ্র বাঙ্গালী-জনকেব পক্ষে  
তাহাদেব সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সামর্থ্য  
নাই। কিয়দ্বিবস পূর্বে সংসার-সমুদ্রে নানা-  
বজ্রবাতের মধ্য দিয়াও কতক কষ্টোপার্জিত  
অর্থ ব্যয় এবং কতক ঋণ করিয়াও যাহারা  
কল্যাণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন ঘটাপূর্ণ তন্ময়ের  
ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তাহাদেব সন্ততিগণ  
তাঁহাদেব কোপপ্রবণা স্বশ ঠাকুরাণীর কোপ  
নয়নে পতিতা হইবেন, কিন্তু অবস্থার  
ব্যবস্থায় তাঁহাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা  
কবিবার উপায় নাই। জমিদারের খাজনা,  
উত্তরাধাব ঋণের সুদ, বিপণীর মহাজন-  
নিগেহ প্রাপ্য—মহাপূজার সাড়া পড়ার সঙ্গে  
সঙ্গে সকলই পরিশোধ কবিবার ব্যবস্থা বঙ্গের  
চিরম্ন রীতি। কিন্তু এবার এই দুর্কালে  
বাঙ্গালী ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া সে ব্যবস্থা  
কবিরে কি করিয়া! কাজেই ঋণের আগমনে  
বাঙ্গালী এবার সত্য সত্যই আকুল হইয়া  
পড়িয়াছে।

যে সকল ভক্ত সাধক সারা বৎসর প্রাণান্ত  
পরিশ্রম পূর্বক সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়াও  
অতি কষ্টে বর্ষে বর্ষে জনজ্ঞানীকে জীর্ণ-আট-  
চালায় আনিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকেন,  
যাহাদের কল্যাণে কত পল্লীবাসী আবাল বৃদ্ধ  
বনিতা আত্মশক্তির স্বরূপ দর্শনে অপার আনন্দ  
অভুভব করিতে পারেন,—তাঁহাদিগের মধ্যে  
এবার অনেকেরই পুণ্য আটচালার শূণ্য বেদিকা  
পূর্ণহুতি জাগাইয়া দিতেছে যাত্রা। ফলে বিশ্ব-

মাতার আরাধনা করিতে না পারিয়া,—জ্বা  
বিশ্বদলে জগন্মাতার পূজা করিতে না পারিয়া,—  
পরমায়ত—বিশ্ব জননীর চরণাঙ্কত ভক্তিভরে  
পান করিতে না পারিয়া, এবার যে কত  
ভক্তের প্রাণ আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা  
আর ইয়ত্তা নাই।

কত নবোঢ়া পত্নী—পতি সন্দর্শন কামনায়  
আশাপথ চাহিয়াছিল, অনেকের সে আশা  
এবার অপূর্ণই থাকিল, দারুণ অর্থ কষ্টে নব  
বিবাহিত স্বামী এবার যুবতী বনিতার আকাঙ্ক্ষা  
পূর্ণ করিতে পারিলেন না, শুধু প্রীতিপূর্ণ পত্র  
লিখিয়াই নিরুতি পাইলেন। কত পতিগত  
প্রাণা পত্নী—স্বামী সন্দর্শন জনিত অপার সুখ  
উপভোগে ধন্যমান হইলেন বটে, কিন্তু পূজা  
উপলক্ষ্যে তাঁহাদিগের প্রার্থিত দ্রব্য সন্ডার  
প্রাপ্তির অভাবে যথেষ্ট ক্ষণমনাও হইলেন। কত  
যুবতী অন্নদিন পূর্বে তাঁহার এক সমবয়স্কা  
প্রতিবেশিনীর সাহিত “সখি” সম্পর্কে কুঁচিঁতা  
পাতাইয়াছিলেন, যাহার সহিত সে সম্পর্ক  
পাতান হইয়াছিল, তিনি জানিতেন, সখীর স্বামী  
দূর প্রবাসের একজন গণ্যমান্ত চাকরে পুরুষ,—  
বঙ্গে মাঘের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান উপ-  
চৌকন পাইয়া তিনি কিছু লাভবতী হইবেন,  
কিন্তু তাঁহার সে কামনা এবার অপূর্ণই  
থাকিল, সখীর স্বামী এবার ব্যয় বাহুল্যে এরূপ  
ক্লিষ্ট যে, পত্নীর মনস্তাত্ত্ব্য করিতে তাঁহার নূতন  
উপকুটস্থিনীর জন্ত একখানি বস্ত্র পর্য্যন্তও  
আনিতে পারেন নাই।

ফলে এবার দেশের বড়ই দুর্দিন। আনন্দ-  
ময়ী আগমনে বাঙ্গালী এবার প্রতিকার্যে—  
প্রতি বিষয়েই নিরানন্দ উপলব্ধি করিতেছে।  
বাঙ্গালীর মনে সুখ নাই, হৃদয়ে বল নাই,  
প্রাণে শক্তি নাই, চিত্তে শান্তি নাই,—অশান্ত

হৃদয়ে বঙ্গ জননীর অনেক সন্তানই এবার  
আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। “মুজলা সুফলা  
মলয়ঙ্গ শীতলা শস্ত্র গ্রামলা”—বঙ্গ জননী  
সন্তানগণ এবার অগ্ন্যভাবে যে ক্রিষ্ট হইয়া  
পড়িয়াছেন, এই নিরানন্দের কারণই তাহাই।

কিন্তু মা বিশ্বরূপিনী! তোমার আগমনে  
বিশ্ববাসীর হৃৎকণ্ঠ—দৈত্য-দারিদ্র্য—সবই  
যে অপনোদিত হইবার কথা মা! তুমি যে মা  
অন্নপূর্ণা! হৃগতি দূর করিবার জন্তই ‘দুর্গা’—  
নাম ধরিয়াছ। দেশের এই ভীষণ দুর্গতি দূর  
করিয়া, অন্নপূর্ণা মূর্তিতে বাঙ্গালায় আগমন  
করিয়া, তোমার অকৃতি সন্তানগণের সকল  
কষ্ট—সর্ব প্রধান অন্নকষ্ট অপনয়ন কর না  
মা! অথবা রক্তময়ী—তুমি রক্ত দেখিতেছ,—  
তোমার সন্তানগণ তোমাকে ভুলিয়া, তোমার  
শাস্ত্রাদেশ ভুলিয়া,—অথাগ্ন-কুথাগ্ন—অমিত-  
অহিত দ্রব্যসকল ভক্ষণ করিয়া—আর্য্য সন্তান  
অনেক বিষয়েই অনাথের মত’ আচরণ  
অবলম্বনে এতদিন যে পাপ পণ্য অর্জন  
করিয়াছে, তাহারই ফলভোগের জন্ত—আজি  
তাহার এই ভীষণ অবস্থা, সেইজন্য ভীষণ  
অবস্থা সন্দর্শন করিয়াও তুমি তাহার  
প্রতিকারকরে চেষ্টাবতী না হইয়া রক্ত

দেখিতেছ। কিন্তু সক্রিয় হৃদয়া দয়াবতী  
জননী আমার! আর যে তোমার রক্ত দেখি-  
বার সময় নাই, বাঙ্গালা যে ছারখারে যাইবাব  
উপক্রম হইয়া পড়িল,—আর রক্ত দেখিলে  
চলিবে না,—রোগ হইয়াছে—ঔষধ প্রয়োগ  
করিতে হইবে—ঔষধই রোগের প্রতীকারের  
উপায়। জননী আমার! রক্ত ছাড়িয়া,  
রোগ বুঝিয়া, বাঙ্গালীকে ইহা তাহার  
কৃতকর্মের ফল উপলব্ধি করাইয়া—তাহার  
প্রাণে অনুশোচনার বীজমন্ত্র প্রয়োগ কর—  
অন্নতাপে প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয় জ্বলিত  
হউক—সেকালের সদাচার-নিরত গুহস্বতা  
বাঙ্গালীর মত এ কালের বাঙ্গালী আবার  
পূর্ব অভ্যাসে অভ্যস্ত হউক—স্বধর্ম ত্যাগী—  
স্বকর্ম ত্যাগী বাঙ্গালী সন্তান আবার সনাতন  
ধর্মে—স্বজাতির কর্মে অভিনিবিষ্ট হউক—  
বাঙ্গালা হইতে ছুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী হৃদয় ছাড়িয়া  
পলায়ন করিবে,—বাঙ্গালার দুঃখ-দারিদ্র্য  
অপনোদিত হইবে,—অধুনা অস্থিকঙ্কাল সর্ব-  
দৈত্য-কণ্ঠের আকর স্থল বঙ্গভূমি—আবার  
সোনার বাঙ্গালা নাম ধারণ করিয়া—মাহু  
পূজায়—আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে  
বিমলানন্দ লাভে সমর্থ হইবে।

## আয়ুর্বেদের ইতিহাস।

( মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণমাথ সেন, সরস্বতী এম-এ, এল, এম-এস )

আয়ুর্বেদের ইতিহাস আলোচনা করিতে পৰ্য্যন্ত কালকে চারিটা ভাগে বিভক্ত কর  
হইলে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি হইতে বর্তমান যুগ যাইতে পারে। প্রথমতঃ—দৈবকাল; দ্বিতীয়তঃ

—আধিকাল বা সংহিতা কাল ; তৃতীয়তঃ—  
সংগ্রহ কাল, চতুর্থতঃ—অবনতি কাল ।  
বর্তমান সময়কে আয়ুর্বেদের পুনরুদয়ের  
আরম্ভকাল ও বলা যাইতে পারে ।

**দৈবকাল**—প্রথমে ভগবান ব্রহ্ম  
নিখিল জীবের আরোগ্যপ্রদ শাস্ত্র আয়ুর্বেদ  
দ্রবণ করিয়া লক্ষশ্লোকময়ী “ব্রহ্ম সংহিতা”  
রচনা করেন । ব্রহ্মাইতে প্রজাপতি দক্ষ,  
দক্ষইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়  
ইতে দেববাজ ইন্দ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন ।  
ইহাব দলে “এক্ষ সংহিতা”র পরে “প্রজাপতি  
সংহিতা” “অশ্বি সংহিতা” ও “বলভিৎ  
সংহিতা” বা “ঐন্দ্র সংহিতা” রচিত হইয়া-  
ছিল ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা  
শুক, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ দেখিয়া আয়ুর্বেদ  
নামক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেন । ব্রহ্মা ইহাতে  
পুণ্য আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া “স্ব্যাসংহিতা”  
নামক আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন । স্ব্যোর  
বহু শিষ্য আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথক পৃথক  
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে ভগবান  
ধাত্যে “চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞান,” দিবোদাস \*  
“চিকিৎসা দর্শন,” কাশীরাজ “চিকিৎসা  
কৌমুদী,” অশ্বিনীকুমারদ্বয় “চিকিৎসাসার তত্ত্ব  
ও ভ্রমর,” নকুল “বৈষ্ণব সর্কস,” সহদেব  
“ব্যাদিসিদ্ধি বিমর্দন,” বমরাজ “জ্ঞানার্ণব”  
চান ঋষি “জীবদান,” জনক “বৈষ্ণব-সন্দেহ  
ভঞ্জন,” চন্দ্রসুত “সর্কসার,” জাবাল “তুস্ত-  
সা,” জাজলি “বেদাঙ্গ সার,” পৈল “নিদান,”  
করণ “সর্ক-ধরতত্ত্ব” ও অগস্ত্য “ঔষধনির্ণয়  
তত্ত্ব” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।

অতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মত আয়ুর্বেদের  
প্রচলিত মত হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ।

**আর্যকাল**—(১) কথিত আছে ভগবান  
ধনন্তরি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া  
কাশীরাজ দিবোদাস রূপে ভূতলে অবতীর্ণ  
হইয়াছিলেন এবং ঔপধেনবঃ, বৈতরণী, ঔরঙ্গ,  
পৌষ্কলাবত, করবীৰ্য্য, গোপুররক্ষিত, সুশ্রুত  
প্রভৃতি ঋষিদিগকে শল্যতত্ত্বপ্রধান আয়ুর্বেদ  
শিক্ষা দিয়াছিলেন । দিবোদাসের শিষ্য এবং  
এবং অনুশিষ্যগণ শল্যতত্ত্ব প্রধান বিবিধ  
আয়ুর্বেদ গ্রন্থ স্ব স্ব নামে রচনা করিয়া  
গিয়াছেন । যে সকল চিকিৎসক ধনন্তরির  
মতানুসারে চিকিৎসা করিতেন এবং  
করেন, তাঁহারা ধনন্তরি সম্প্রদায় নামে  
খ্যাত ।

(২) কায়তত্ত্বপ্রধান চিকিৎসা ব্রহ্মর্ষি ভর-  
দ্বাজ কর্তৃক প্রচারিত হয় । কোন সময়ে  
প্রাণীদিগের রোগ যন্ত্রণা দর্শনে, ব্যথিত হইয়া  
করুণহৃদয় ঋষিগণ তাহার প্রতিকারের উপায়  
চিন্তার জন্ত হিমাচলের সাহুদেশে সমবেত  
হইয়াছিলেন । সেই মহাসম্মেলনে তাঁহারা  
চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, আয়ুর্বেদজ ইন্দ্রের  
শরণ গ্রহণ করাই ইহার ঐকমাত্র উপায় ।  
অনন্তর সকলের সম্মতি ক্রমে ভরদ্বাজ ঋষি  
ইন্দ্রের নিকট গিয়া আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন ।  
ভরদ্বাজ ঋষি আত্রেয়কে এবং আত্রেয় অম্লিবেশ,  
ভেল, জতুর্কর্ণ, পরাশর, হারীত এবং ক্যারপাণি  
নামক ছয়জন শিষ্যকে কায়চিকিৎসা প্রধান  
আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন । আত্রেয় ঋষির  
এই ছয় জন শিষ্য স্ব স্ব নামে সংহিতা রচনা  
করিয়াছিলেন । ভরদ্বাজ ও আত্রেয় ঋষির

\* দিবোদাস ও ধনন্তরি ব্রহ্মত মতে একই ব্যক্তি । পুরাণের মত মতঃ ।

মতামুসারী চিকিৎসকগণ ভরদ্বাজ সম্প্রদায় বা  
আত্রেয় সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশেও এইরূপ দুইটী  
সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার  
কায়চিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Physi-  
cians—স্কুল অফ ফিজিসিয়ানস্) এবং শল্য  
চিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Surgeons)  
স্কুল অফ সার্জনস্) নামে অভিহিত।

কিন্তু প্রথমে এইরূপ দুইটী সম্প্রদায় গঠিত  
হইলেও কালক্রমে আয়ুর্বেদেদ্র অষ্টাঙ্গের পৃথক  
ভাবেই পঠন পাঠন প্রচলিত হইয়াছিল।  
এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের ভিন্ন  
ভিন্ন অংশের যেমন বিশেষজ্ঞ (Specialist)  
আছেন, পূর্বে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের ভিন্ন ভিন্ন  
অংশেরও সেইরূপ বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন।  
সংহিতা ও সংগ্রহকারদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে  
পাঠক তাহাদের বিষয় বিস্তৃতভাবে অবগত  
হইতে পারিবেন।

এই দুই সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত আর একটী  
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই সম্প্রদায়ের  
চিকিৎসকগণ রসবৈদ্য সম্প্রদায় নামে অভিহিত।  
চরক সূত্রাদি গ্রন্থে বিবিধ খনিজ দ্রব্যের  
অল্পবিস্তর উল্লেখ থাকিলেও ব্যবহার নিতান্ত কম  
দেখা যায়। তাত্ত্বিক চিকিৎসায় পারদ এবং  
বিবিধ ধাতু উপধাতু যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।  
কথিত আছে যে, তন্ত্রের বক্তা মহাদেব। আদিম,  
নিত্যনাথ, চন্দ্রসেন, সোমদেব, গোবিন্দ,  
নাগার্জুন প্রভৃতি রসশাস্ত্রাচার্যগণ পারদের পরম  
রোগনাশকতা শক্তি দেখিয়া বিবিধ রসতন্ত্র  
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাস  
আলোচনা করিলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে,

বৌদ্ধযুগেই রসতন্ত্রের বিশেষ উন্নতি ও প্রচলন  
ঘটিয়াছিল।

এক্ষণে আমরা আর্ষযুগের সংহিতা গ্রন্থের  
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। এই সকল  
সংহিতা অথুনা প্রায় পাওয়া যায় না। কিন্তু  
টীকাকারদিগের উদ্ধৃত পাঠ দ্বারা প্রমাণিত  
হয় \* যে, এই সকল গ্রন্থ টীকাকারদিগের সময়ে  
—কয়েক শত বৎসর পূর্বেও—বর্তমান ছিল।  
সম্ভবতঃ ভারতবাসীরা অনেক হইলে এখনও  
অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে। যে  
সকল বিলুপ্ত গ্রন্থ গ্রন্থের সংবাদ আমরা  
টীকাকারদিগের মুখে পাইয়া থাকি, তাহাদের  
মধ্যে কয়েক খানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে  
প্রদত্ত হইল।

## ১। কায়চিকিৎসা তন্ত্র—

(WORKS ON THE PRACTICE  
OF MEDICINE)

### ১। অগ্নিবেশ সংহিতা। মহর্ষি

আত্রেয়ের শ্রেষ্ঠ শিষ্য অগ্নিবেশ এই সংহিতার  
প্রণেতা। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।  
এক্ষণে যে গ্রন্থ চরক সংহিতা নামে পরিচিত,  
তাহাই অগ্নিবেশ সংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া  
থাকে। চরক উহার প্রতिसংস্কর্তা। কিন্তু  
বিজয়রক্ষিত, শ্রীকর্ণ প্রভৃতি টীকাকারগণ  
অগ্নিবেশের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন  
তন্মধ্যে অনেকগুলি বর্তমান কালে চরক সং-  
হিতায় পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট  
প্রমাণিত হয় যে, চরক সংহিতা অগ্নিবেশ সং-  
হিতা নহে অথবা প্রতिसংস্কৃত হইয়া অগ্নিবে-  
শ সংহিতায় এত রূপান্তর ঘটিয়াছে যে, সু

\* এই সকল পদ্য রচয়িতা “প্রত্যাক্ষশাস্ত্রী” নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থেব সহিত অনেক স্থলে পাঠের সামঞ্জস্য নাই। মূল অগ্নিবেশ সংহিতা চরক ঋষির আবির্ভাবের পূর্বেই জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল; সেইজন্যই তখন তাহার প্রতিসংস্কার আবশ্যক হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, অঞ্জন নিদান নামক গ্রন্থ অগ্নিবেশের রচিত। কিন্তু চক্রপাণি, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত প্রভৃতি কোন টীকাকারই অঞ্জননিদান হইতে পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই এবং উহার ভাষাও ঠিক প্রাচীন সংস্কৃতের গায় নহে। এইজন্য উহা অক্ষাচীন কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অগ্নিবেশ প্রণীত না হইলেও অঞ্জন নিদানে এক্রপ সংক্ষেপে এবং সুন্দররূপে রোগের নিদান লিপিত হইয়াছে, যে, অন্নমতি ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ।

২। ভেল-সংহিতা। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় সংহিতা। বিজয়রক্ষিত, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকার ভেল-সংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনও তাম্রজোর নগরীর রাজকীয় গ্রন্থাগারে খণ্ডিতাকারে বর্তমান আছে। প্রথমে উহার প্রতিলিপি ও পরে মূলগ্রন্থ দর্শনের দৌভাগ্য প্রবন্ধ লেখকের ঘটয়াছিল। উক্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচীকার বার্ণেল নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে বাগভট প্রধানতঃ ভেল সংহিতা অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। এই মতের সার্থকতা বুঝা কঠিন।

কেহ কেহ বলেন যে, ভেলসংহিতা এবং ভালুকি-সংহিতা একই গ্রন্থ। কিন্তু সেন্সমত সমীচীন নহে। ডল্লনাচার্য্য সুশ্রুতের টীকায় “ভেল-ভালুকি” উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভালুকি-সংহিতা শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থ। শল্যতন্ত্র

প্রধান গ্রন্থের পরিচয় পসঙ্গে উহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৩ জতুকর্ণ-সংহিতা—আত্রেয় সম্প্রদায়ের আদৃত এই গ্রন্থ এক্ষণে নিতান্ত দুর্লভ। চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় জতুকর্ণ-সংহিতা হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

### ৪—৫। পরাশর সংহিতা ও ক্ষারপাণি-সংহিতা।

কেবল বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত নহে—পরশ্ব শিবদাসও এই গ্রন্থদ্বয় হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, শিবদাসের সময়েও উক্ত গ্রন্থদ্বয় সুলভ ছিল।

৬। হারীত-সংহিতা—চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠদত্ত এবং শিবদাসের সময়েও এই গ্রন্থ সুলভ ছিল, কিন্তু এক্ষণে দুর্লভ। হারীত-সংহিতা বলিয়া অধুনা যে মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা মূল হারীত-সংহিতা নহে। কারণ পূর্বোক্ত টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় হারীতসংহিতা হইতে যে সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ পাঠই মুদ্রিত হারীত-সংহিতায় পাওয়া যায় না, অধিকন্তু মুদ্রিত গ্রন্থ বহুস্থলেই লিপিকর প্রমাদে পূর্ণ।

৭ খরনাদ-সংহিতা। বিজয়রক্ষিত হেমাদ্রি, অকণ্ঠদত্ত প্রভৃতি টীকাকারগণ খরনাদ সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমাদ্রি খরনাদি নাম দিয়া যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা খরনাদের অথবা খরনাদের পুত্রের বা অপার কাহার, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

৮ বিশ্বামিত্র-সংহিতা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। চরক ও সুশ্রুতের টীকায় চক্রপাণি বিশ্বামিত্র-সংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শিবদাসকৃত চক্রদত্তের টীকাতেও বিশ্বামিত্র সংহিতার বচন দেখা যায়।

৯ অত্রি-সংহিতা। কাহারও মতে অত্রিসংহিতা অতি প্রাচীন, কাহারও মতে আধুনিক। প্রাচীনদিগের টীকায় অত্রিসংহিতা হইতে উদ্ধৃত পাঠ দেখা যায় না বলিয়া উহার প্রাচীনত্ব সন্দেহ হয়। পঞ্চনদে অত্রিসংহিতা নামে বৃহৎ পুস্তক আছে, এইরূপ শুনা যায়।

১০—১১ কপিল তন্ত্র ও গৌতম তন্ত্র \*—এই উভয় সংহিতার পাঠ সুশ্রুতের টীকায় ও নিদানের টীকায় উদ্ধৃত দেখা যায়।

## ২। শল্যতন্ত্র।

(WORKS ON SURGERY.)

১২—১৩ ঔপধেনবতন্ত্র ও ঔরভ্র-তন্ত্র। এই তন্ত্র দুইখানির কেবল নাম মাত্র দেখা যায়। উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ নিতান্ত বিরল। ডল্লন সুশ্রুতের ব্যাখ্যায় ঔপধেনবতন্ত্র মত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। উহাদের সস্তা কেবল সুশ্রুতাকৃত পাঠ দ্বারাই অনুমিত হয়।

১৪ মৌশ্রীত তন্ত্র বা বৃদ্ধ সুশ্রুত। বৃদ্ধ সুশ্রুত বর্তমান সুশ্রুত সংহিতার মূলীভূত। কেহ কেহ উভয় সুশ্রুতকে অভিন্ন বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যুক্তি যুক্ত নহে। কারণ বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত হইতে কোন কোন পাঠ প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতায় দেখা যায় না। টীকা কার শিবদাসও বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতে পাঠ উদ্ধৃত

করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, যে, শিবদাসের সময়েও বৃদ্ধ সুশ্রুত সুলভ ছিল।

১৫। পৌক্ষলাবত তন্ত্র। চক্রপাণি সুশ্রুতের টীকায় পৌক্ষলাবত তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৬। বৈতরণ তন্ত্র। ডল্লন ও চক্রপাণি স্ব স্ব টীকায় বৈতরণ তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শব্দচিকিৎসা সম্বন্ধে সুশ্রুতে অনুরক্ত বহু বিষয়ের পাঠ টীকাকারেরা এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়, যে, সুশ্রুত অপেক্ষা উক্ত তন্ত্র বৃহত্তর ছিল।

১৭। ভোজতন্ত্র বা ভোজসংহিতা। টীকা কারগণ ভোজতন্ত্র হইতে অনেক নূতন বিষয়ের প্রচুর পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেজন্য অনুমান হয়, যে, ভোজতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ ছিল। ডল্লন সুশ্রুতের টীকায় মহর্ষি ভোজ সুশ্রুতাদির সতীর্থ ছিলেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইজন্য ভোজতন্ত্র ধারেশ্বর ভোজরাজের রচিত নহে বলিয়াই প্রতীতি হয়। ভোজরাজের রচিত রাজমার্ত্তণ্ডাদি যে সকল সংগ্রহ গ্রন্থ আছে, সেগুলি ভোজসংহিতার অনেক পরবর্ত্তিকালে রচিত। 'ভোজরাজ অপেক্ষা ভোজশ্রুনি বহু প্রাচীন, তজ্জন্তু কেহ কেহ ইহাকে বৃদ্ধ ভোজও বলিয়া থাকেন।

১৮। করবীৰ্য্যতন্ত্র। টীকা কারগণ এই তন্ত্র হইতে কদাচিত্ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই জন্ত টীকা কারদিগের সময়ে করবীৰ্য্যতন্ত্র বহু প্রসিদ্ধ ছিল না বলিয়া প্রতীতি হয়।

১৯। গোপূররক্ষিত তন্ত্র। এই তন্ত্র আছে শুনা যায় মাত্র, তদ্বৎ পাঠ প্রায়

\* যদি কপিল আয়ুর্বেদীও এই সমূহ তন্ত্র এবং সংহিতা উভয় নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্বৎ নামে বাহা প্রসিদ্ধ তাহা সত্য।

কোথায়ও দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন—  
গোপুব ও রক্ষিত দুই জন ব্যক্তি এবং দুই-  
জনের রচিত দুই খানি তন্ত্র ছিল।

২০। ভালুকি তন্ত্র। পূর্বেই  
বলা হইয়াছে, ভেলসংহিতা হইতে ভালুকিতন্ত্র  
স্বতন্ত্র। উল্লন, বিজয় রক্ষিত ও ত্রীকর্ণ  
ভালুকি তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।  
চক্রপাণির উদ্ধৃত বঙ্গশাস্ত্রাদির লক্ষণ সমন্বিত  
অনেক বচন দেখিয়া বোধ হয় যে, এই তন্ত্র  
শলাতন্ত্রের একখানি প্রধান গ্রন্থ।

### ৩। শালাক্যতন্ত্র।

(WORKS ON DISEASES OF EYE,  
EAR, NOSE, THROAT &c.)

২১। বিদেহতন্ত্র। বিদেহাধি-  
পতি নির্মিত এই তন্ত্র শালাক্যাদিগের প্রধান  
গ্রন্থ। ইহা বর্তমান সুশ্রুত গ্রন্থের শালাক্য  
তন্ত্রাংশের মূলভূত—একথা সুশ্রুতেই আছে।  
উল্লন, বিজয়রক্ষিত, ত্রীকর্ণ প্রভৃতি টীকাকার  
এই তন্ত্র হইতে যথেষ্ট পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।  
বিজয় রক্ষিত অর, অরোচক এবং পাণ্ডু প্রভৃতি  
রোগেও বিদেহতন্ত্র হইতে কোন কোন পাঠ  
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় শালাক্য-  
তন্ত্র প্রধান হইলেও এই গ্রন্থ সুশ্রুতাদি গ্রন্থের  
জায় সর্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, নিমি এবং বিদেহাধি-  
পতি একই ব্যক্তি। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে।  
কাণে উল্লন ও ত্রীকর্ণদত্ত স্ব স্ব টীকায় নিমি  
ও বিদেহ উভয়েরই পাঠ একই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত  
করিয়াছেন। চরকে “জনকো বৈদেহঃ” পাঠ  
টীকায় বুঝা যায় যে, পুণ্যলোক জগবান জনক  
গজর্ষি এই তন্ত্র নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন।

২২। নিমিতন্ত্র। পূর্বেই বলা  
হইয়াছে যে, এই তন্ত্র বিদেহ তন্ত্র হইতে পৃথক।  
ত্রীকর্ণ এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন,  
সুতরাং তাঁহার সময়েও বিদেহতন্ত্র স্মরণ  
ছিল।

২৩। কাঙ্ক্ষায়ন তন্ত্র। চরকে  
এবং উল্লনের টীকায় কাঙ্ক্ষায়নের পরিচয় পাওয়া  
যায়। কিন্তু এই তন্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণ অত্যাধি  
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

২৪—২৫। গার্গ্যতন্ত্র ও গালব-  
তন্ত্র। উল্লনের টীকায় শালাক্যতন্ত্র প্রসঙ্গে  
গার্গ্য ও গালবতন্ত্রের উল্লেখ আছে মাত্র।  
উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত কোন পাঠের  
পরিচয় আমরা পাই নাই।

২৬। সাত্যকি তন্ত্র। ইহা  
প্রাচীন শালাক্যতন্ত্র। উল্লন এবং ত্রীকর্ণদত্ত  
এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২৭। শৌনক তন্ত্র। উল্লন ও  
চক্রপাণি শৌনক তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত  
করিয়াছেন। চরক এবং সুশ্রুতেও শৌনক  
মতের উল্লেখ আছে। কিন্তু গর্ভের অঙ্গ-  
প্রত্যঙ্গনিষ্পত্তি বিষয়ে চরকোদ্ধৃত শৌনক  
মতের সহিত সুশ্রুতোদ্ধৃত শৌনক মতের  
স্পষ্ট বিরোধ দেখিয়া অনুমান হয়, যে, চরকোক্ত  
শৌনক সুশ্রুতোক্ত শৌনক হইতে বিভিন্ন।  
সম্ভবতঃ এই বিরোধ পরিহারের জন্ত চরক  
মদ্রশৌনক অর্থাৎ মদ্রদেশীয় শৌনক এই পদ  
প্রয়োগ করিয়াছেন। উল্লনের টীকায়ও মদ্র-  
শৌনকের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। উল্লন এবং  
চক্রপাণির উদ্ধৃত পাঠ হইতে জানা যায় যে,  
শৌনকতন্ত্র কেবল শালাক্যতন্ত্র মাত্র ছিল না,  
পরন্তু শারীর ও ভেষজ কল্যনাদির বর্ণনাও  
ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, অথর্ব বেদের শৌনক-সংহিতাকার শৌনকই শৌনকতন্ত্র প্রণেতা। কিন্তু আথর্ব-সংহিতাকার অতি প্রাচীন, শৌনকতন্ত্রকার তদপেক্ষা নবীন। পূর্বে এক নামের অনেক আচার্য্য, তন্ত্রকার ছিলেন; কেবল নামের সাদৃশ্য দেখিয়া পরস্পরের অভেদ নির্দেশ করা সম্ভব নহে।

২৮। করালতন্ত্র। এই তন্ত্রকার করালকে ডল্লন করালভট্ট আপ্যাদিয়াছেন। ইনি ঋষি ছিলেন কি না স্পষ্ট বুঝা যায় না, কারণ কোন ঋষিবংশ উক্ত পদবী দৃষ্ট হয় না। তথাপি ডল্লন-শ্রীকণ্ঠাদির নির্দেশ দ্বারা জানা যায় যে, এই তন্ত্রকারও বহু প্রাচীন কালের।

২৯। চক্ষুয্যতন্ত্র। কেহ কেহ ইহাকে “চক্ষুশ্চেন তন্ত্র” সংজ্ঞাও দিয়া থাকেন। শ্রীকণ্ঠদত্তের টীকায় এই গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০। কৃষ্ণাত্রেয় তন্ত্র। কেহ কেহ বলেন, এই তন্ত্র পুনর্নবমু আত্রেয় নির্মিত। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণের উক্ত পাঠ হইতে জানা যায় যে, শালাক্যতন্ত্রকার কৃষ্ণাত্রেয় কায়তন্ত্রকার আত্রেয় হইতে পৃথক ব্যক্তি।

## ৪। ভূতবিজ্ঞাতন্ত্র।

(WORKS ON MENTAL DISEASES.)

আয়ুর্বেদের ভূতবিজ্ঞা নামক অঙ্গ পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ থাকিলেও এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভূতবিজ্ঞা তন্ত্রের গ্রন্থ পাওয়া দূরে থাকুক,

তন্ত্রের নাম পর্যন্ত টীকাকারেরাও উদ্ধৃত করেন নাই।

বর্তমানে আয়ুর্বেদে ভূতবিজ্ঞার বীজস্বরূপ নিয়মিত কয়টা প্রসঙ্গ দেখা যায়। যথা—

(১) সূক্ষ্মতে অমাহুষ প্রতিবেদ্যাদ্যম্ (উত্তরতন্ত্র, ৬ অঃ)।

(২) চরকে উন্মাদ চিকিৎসাধ্যায় (চিঃ স্থা, ৯ অঃ)।

(৩) বাগ্ভটে ভূতবিজ্ঞানীয় ও ভূত-প্রতিবেদ অধ্যায় (উত্তর, ৪৫ অঃ)।

সূক্ষ্মত ও বাগ্ভটে ভূতবিজ্ঞা পৃথকভাবে লিখিত হইলেও চরকে উহা উন্মাদাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সহস্র বর্ষের পূর্বতন বাখ্যাকারগণও ভূতবিজ্ঞাতন্ত্রের কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই! সেইজন্য অনুমান করা যায় যে, ভূতবিজ্ঞা বহুকাল পূর্বে হইতেই লোপ পাইয়াছে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অগ্নিপুরণ ও গরুড় পুরাণাদিতে বর্ণিত ভূতবিজ্ঞা প্রসঙ্গ থাকায় মনে হয় যে, পৌরাণিক যুগেও ভূতবিজ্ঞা বিলুপ্ত হয় নাই।

চরক যে ভূতাবেশকে শুধু উন্মাদ রোগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, বাতোর্মাদ চিকিৎসা এবং ভূতাবেশ চিকিৎসা প্রায় একই প্রকার বলিয়াছেন। আমাদের ধারণা, অতি প্রাচীনকালে মানস রোগাধিকারই ভূতবিজ্ঞা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মাহুষ উন্মাদাদি রোগে ভূতবিজ্ঞার জ্ঞান নানা প্রকার বিকৃত অমাহুযিক আচরণ করে, অথচ অনেক স্থলেই উপযুক্ত ঔষধ তৈলাদি ব্যবহারে আরোগ্য হয়, ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেবগ্রন্থাদি সম্বন্ধে সূক্ষ্মত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে “নভে মনুষ্যোঃ সহ সংবিশন্তি”—তাহারা মাহুষের সহিত থাকে না। মাহুষের স্বর্গে চাপে না।



কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্যে ভূত চাপার এবং বলিহোমাদির কথাও বর্তমান সময়ের অনেক আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে দেখা যায়। এইজন্য মনে হয়, শাস্ত্রের অবনতির সহিত অনেক কুসংস্কার এই ভূতবিজ্ঞায় প্রবেশ করিয়াছে। এই ধারণার জন্য আমরা ভূত-বিজ্ঞাকে মানস রোগাধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলিতে ইচ্ছুক।

## ৫। কোমারভূতা তন্ত্র ।

(WORKS ON DISEASES OF CHILDREN).

৩১।৩২।৩৩। জীবক তন্ত্র, পার্ক-তকতন্ত্র ও বন্ধক তন্ত্র।—কোমারভূতা তন্ত্রেও বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি নিম্নে লিখিত হইল।

স্বশ্রুতের উত্তর তন্ত্রের ব্যাখ্যায় উল্লন জীবক, পার্কিতক ও বন্ধক নামক কোমারভূতা তন্ত্রকারদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদেব গ্রন্থ পূর্বে প্রসিদ্ধ ছিল এইরূপ অনুমান করা যায়।

জীবক প্রভৃতি তন্ত্রকার বোদ্ধাচার্য্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তন্মধ্যে জীবক নামক বোদ্ধভিত্তিক জীবক “কোমারভূতা” (কোমারভূতা?) সংজ্ঞায় বোদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি ভিক্ষু আত্মজের শিষ্য এবং ভগবান বুদ্ধদেবের ও বোদ্ধ রাজা বিশ্বিনারের চিকিৎসক ছিলেন।

বোদ্ধ ভিক্ষু আত্মজেরই চরকোক্ত ভিক্ষু আত্মজ—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু চরকে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, আত্মজ প্রভৃতি ঋষির সহিত ভিক্ষু আত্মজের হিমাশ্রম

সামুহ্যে মিলিত হইয়াছিলেন—এইরূপ লিখিত আছে। ঐ সকল ঋষি বৌদ্ধযুগের অনেক পূর্বকালীন। সুতরাং চরকোক্ত ভিক্ষু আত্মজ এবং বোদ্ধ ভিক্ষু আত্মজ এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে।

চক্রপাণি স্বশ্রুতের, ভাস্কর্য্য টীকায় কোমারভূতা তন্ত্র হইতে যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কাহার রচিত নির্ণয় করা যায় না।

৩৪। হিরণ্যাক্ষ তন্ত্র। ত্রীকণ্ঠ দত্তের উদ্ধৃত পাঠ দেখিয়া ইহা কুমারতন্ত্র প্রধান ছিল বলিয়াই মনে হয়।

স্বশ্রুতের উত্তর তন্ত্রে দ্বাদশটি অধ্যায়ে কোমারভূতা তন্ত্র প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য বোধ হয় যে, আয়ুর্বেদের এই অঙ্গ পূর্বকালে সমৃদ্ধ ছিল, এক্ষণে নষ্টপ্রায় হইয়াছে।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে গর্ভিণীচর্যাদি বিষয় কোমারভূতা তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক শারীরের অন্তর্ভুক্ত এবং মূঢ়গর্ভ (Difficult labour) চিকিৎসা শাস্ত্র তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রসূতিতন্ত্র (Midwifery) কোমারভূতা তন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু স্বশ্রুতে যৌনিব্যাপৎ-প্রতিষেধ অধ্যায়ের শেষে “ইতি স্বশ্রুতাচার্য্য বিরচিতৈ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উত্তর তন্ত্রে কোমারভূতাঃ সমাপ্তম্”—এইরূপ পাঠ আছে। সেইজন্য বোধ হয়, প্রাচীনকালে জ্বরোগ কোমারভূতা তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

## ৬। অগদতন্ত্র ।

(WORKS ON TOXICOLOGY).

বাক্তীয় হাবন ও জলক বিধের পরিজ্ঞান

এবং চিকিৎসা অগদ তন্ত্র নামে খ্যাত, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে অগদ তন্ত্র এবং তদ্বিষয়ক প্রাচীন সংহিতাগুলি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। কেবল সূশ্রুতের কল্পস্থানে এবং চরকের চিকিৎসা স্থানে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অগদতন্ত্রমূলক প্রসঙ্গ আছে। আমরা অগদতন্ত্র বিষয়ক নিম্নলিখিত কয়েক খানি সংহিতার পরিচয় পাইয়াছি।

৩৫। কাশ্যপ সংহিতা। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, কাশ্যপ নামক ঋষি মহারাজ পরীক্ষিতের চিকিৎসার জন্ত আসিতে ছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তক্ষক কর্তৃক নিবারিত হইলেন। উল্লন, চক্রপাণি এবং শ্রীকণ্ঠ কাশ্যপতন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ কেহ কাশ্যপতন্ত্রকে কায়চিকিৎসা প্রধান, অপরে শল্যতন্ত্র প্রধান বলিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারতের কথিত সংবাদ, টীকাকার দিগের বিচারিকিৎসা সম্বন্ধীয় পাঠোদ্ধার এবং বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের প্রসিদ্ধি তেহু আমরা কাশ্যপ সংহিতাকে অগদতন্ত্র প্রধান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

৩৬। অলম্বায়ন সংহিতা। শ্রীকণ্ঠদত্ত বিশনিদানের টীকায় অলম্বায়ন সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩৭। উশনঃ সংহিতা। উশনঃ কৃত এই সংহিতা অগদতন্ত্রমূলক বলিয়া বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের নিকট পরিচয় পাওয়া যায়। উশনার পথ অনুসরণ করিয়া কোটিল্য স্বকৃত অর্থশাস্ত্রে বিনাদির প্রতীকার এবং আশ্বিনুতের পরীক্ষা \* সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তদ্বারা এই সংহিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৮। সনক সংহিতা (বা শৌনক সংহিতা)। এই অগদতন্ত্রমূলক প্রাচীন গ্রন্থ পূর্বে যবনগণ কর্তৃক স্বভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহা জাম্ব্বান পণ্ডিত মূলার কৃত্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অম্বসন্ধিৎসু পাঠক ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কৃত রসশাস্ত্রের ইতিহাসের (Dr. P. C. Roy's History of Hindu Chemistry ; Vol. I. (Introduction) ex II.) ভূমিকা পাঠ করিলে ইহা প্রমাণ পাইবেন।

৩৯। লাট্যায়ন সংহিতা। উল্লন স্বীয় টীকায় লাট্যায়ন সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

## ৭। রসায়ন তন্ত্র।—

(WORKS ON METHODS OF GAINING HEALTH AND LONGEVITY).

জরাব্যাধি বিনাশের জন্ত ঔষধ প্রয়োগ আয়ুর্বেদের রসায়ন তন্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না। আয়ুর্বেদের আর্ষযুগে এবং বৌদ্ধযুগে এই তন্ত্রের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ঋষিগণ রসায়নের জন্ত প্রায় বনোবধি প্রয়োগেরই উপদেশ দিয়াছেন, লৌহাদি প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং রসতন্ত্র আয়ুর্বেদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এই মত সমীচীন নহে। রসায়ন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের একটি প্রধান অঙ্গ। সূশ্রুতে

\* আশ্বিনুতক পরীক্ষার ইংরাজী নাম Post Mortem Examination, অথবা বাহা Medical Jurisprudence বলিয়া খ্যাত, তাহা বোধ হইলে পূর্বে ব্যবহারায়ুর্বেদ নামে পরিচিত ছিল। এই সকল বিষয় উশনঃ সংহিতার অন্তর্ভুক্ত। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে “কণ্টম শোধন” প্রকরণ উল্লেখ আছে।

লৌহ, শিলাজতু, মাক্ষিক প্রভৃতির এবং চরকে পারদ লৌহাদি ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে আর্ষাযুগে লৌহাদির কিছু কিছু প্রয়োগ থাকিলেও বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে পারদাদি খনিজ পদার্থ বহুলরূপে ঔষধার্থে এবং রসায়নের জ্ঞান ব্যবহৃত হইয়াছিল। উহা “রসশাস্ত্র” নামে পৃথক্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ রসশাস্ত্র আয়ুর্বেদ হইতে পৃথক্ নহে। আর্ষ ও অনাৰ্ষ ভেদে রসায়ন তন্ত্র দুই প্রকাৰ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমরা আর্ষ রসায়ন তন্ত্রের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির পরিচয় পাইয়াছি।

৪০। পাতঞ্জল তন্ত্র। টীকাকার-গণ এই তন্ত্র হইতে বহু পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি এই তন্ত্র হইতে লৌহ-প্রয়োগবিধি স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪১। ৪২। ৪৩। ব্যাড়ি তন্ত্র, বশিষ্ঠ-তন্ত্র ও মাণ্ডব্যতন্ত্র। এই তিন খানি অতি প্রাচীন তন্ত্র রসতান্ত্রিকদিগের আশ্রয়ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রসরত্নসমুচ্চয়ে লিখিত বস্যাচার্যগণের সূচীর মধ্যে ব্যাড়ি ও মাণ্ডব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নাগার্জুনকৃত ‘রস-বহাকরে বশিষ্ঠ ও মাণ্ডব্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৪৪। নাগার্জুন তন্ত্র। কেহ কেহ বলেন যে, এই তন্ত্র নাগার্জুন নামক মুনির রচিত, অপরে বলেন ইহা সিদ্ধ নাগার্জুন নামক বৌদ্ধাচার্যের রচিত। চক্রপাণিকৃত সংগ্রহ গ্রন্থে নাগার্জুন মুনির এবং পাটলিপুত্রের স্তম্ভে আচার্য নাগার্জুনের উল্লেখ আছে। পাটলিপুত্র বৌদ্ধগণের বিহারক্ষেত্র ছিল বলিয়া শেখোক্ত নাগার্জুনকে বৌদ্ধাচার্য বলিয়াই মনে হয়। নাগার্জুন নামধারী

অনেক আয়ুর্বেদবিদ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কক্ষপুট তন্ত্র এবং আরোগ্য-মঞ্জরী নামক গ্রন্থদ্বয়ও নাগার্জুনের রচিত। বিষয় রক্ষিত নিদানের টীকায় আরোগ্যমঞ্জরী হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

## ৮। বাজীকরণ তন্ত্র—

(WORKS ON SEXUAL  
INVIGORATION.)

বাজীকরণ তন্ত্রের প্রাচীন সংহিতাসমূহের বিশেষ পরিচয় এক্ষণে পাওয়া যায় না। প্রাচীন টীকাকারগণ এতদ্বিষয়ক কোন সংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই বলিয়া মনে হয় যে, সহস্র বৎসর পূর্বেই বাজীকরণ তন্ত্রের আর্ষ-সংহিতাগুলি লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও বাজীকরণ তন্ত্র দুই সহস্র বৎসর পূর্বে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বাৎস্তায়নের কামহৃত্রে “ঔপনিষদিক” অধিকারে নানাবিধ বাজীকরণ যোগের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে মহাদেবের অমুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়যুক্ত কামহৃত্রের বর্ণনা করিয়াছিলেন। উদ্দালকের পুত্র শ্বেত-কেতু উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচশত অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। অনন্তর বক্রর পুত্র পাঞ্চাল উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সাত ভাগে বিভক্ত করেন। পরে দত্তক, চারায়ণ, সুবর্ণনাভ, ঘোটকমুখ, গোনন্দ, গোণিকাপুত্র এবং কুচুমার এই সাতজন সাতটি বিভাগ পৃথকরূপে প্রচার করেন। এতদ্বারায় অমুখান হয় যে, পূর্বে কামহৃত্রকার ঋষিদিগের প্রণীত ঔপনিষদিক

নামক বিভাগ আয়ুর্বেদে বাজীকরণ তন্ত্র নামে পৃথকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

৪৫। কুচুমার তন্ত্র। বাজীকরণ বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ইহা একখানি প্রধান গ্রন্থ। বাৎস্তায়নের কামমুত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই প্রাচীন বাজীকরণ তন্ত্র এককালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। উদালকের পুত্র শ্বেতকেতু এবং বন্ধুর পুত্র পাঞ্চালের প্রণীত অতি বৃহৎ কামশাস্ত্রের ঔপনিষদিক অধিকার-দ্বয়ও দুইটি পুরাতন বাজীকরণ তন্ত্র ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও চাণক্য বা আচার্য্য কোটিল্যই বাৎস্তায়ন, অপরে ইহাকে মুনি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। যে মতই গ্রহণ করা যাউক বাৎস্যায়ন দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন-কালের। সুতরাং বাৎস্তায়ন কথিত ঔদ্ধালকি, বাল্মক্য এবং কুচুমার রচিত তন্ত্র যে আরও প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

## রজঃস্বলানারীর স্বাস্থ্য।

—:—

(ডাঃ ত্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস।)

আমাদের কাছে আদর কিসের? স্বদেশের না বিদেশের? একটু বিবেচনা পূর্বক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বিদেশেরই আদর। আমরা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত। সুতরাং আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সবই বৈদেশিক। আবার ব্যবহারও ক্রমশঃ বৈদেশিক হইয়া গাইতেছে। একথাও হয়ত আপনারা বলিবেন, সে কি, আত্মকাল অনেকেরই স্বদেশ-পুত্রাগ দেখিতে পাওয়া যায়! এ কথাও উত্তরে বলিতেছি যে, এই স্বদেশপুত্রাগও বৈদেশিক! অনেকেই হাসিবেন; বলিবেন এ যে মোশার পাখর বাটা।

আমাদের রত্নগর্ভা ভারতে সবই ছিল—সবই আছে। আর্ঘ্য বর্ষ ও আর্ঘ্যশাক্রে সবই আছে; কেবল আমরাই অন্ধ। আমরা অন্ধুনা

একটু একটু বাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাও বিদেশীর চক্ষে। ছ' পাতা ইংরাজি পড়িয়া যে সকল তত্ত্ব আমরা—ভ্রাম্যক, গৌড়ামি বা ভণ্ডামি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, সেই সকল তত্ত্বের কোনটা যদি কোন ইউরোপীয় বা আমেরিকান সাহেব অভ্রান্ত ও বুদ্ধিযুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ করেন, তখন আমরা যাহা ভ্রাম্যক বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আবার আদরে গ্রহণ করিব ও স্বদেশ গৌরবে মাজিয়া বুক ধাক্কাইব। আমাদের ঘরের জিনিষেরও আদর বিদেশীর চক্ষে। তাই বলিতেছি যে, ঐরূপ স্বদেশপুত্রাগও কি বৈদেশিক বলা যায় না! আমাদের কোন প্রাচীন বর্ষের রীতি যদি বিদেশীর মতে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমরাও উন্নত হইব।

বলিয়া মনে করি, নচেৎ উহা ভ্রমসঙ্কুল ও বর্জ্যতা পূর্ণ বলিয়া পরিত্যজ্য। সুতরাং এক্ষণে স্ত্রীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে একটা সামান্য কথা উল্লেখ করিব—উহাতে বিদেশীর মতামত নথ্যই করিব।

বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, অভ্যাস জীলোকদের মধ্যে রজঃকৃচ্ছ্র, স্বল্পবস্ত্র বা অতিরঞ্জ প্রভৃতি ঋতুবিপর্যয়ের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।—ইহার প্রধান কারণ—আমাদের চির প্রচলিত প্রাচীন নৈতিক উন্নয়ন। হিন্দু প্রথাষায়ী রজঃস্বলা নারী অশুচি ও অস্পৃশ্য। এই অশুচি অবস্থায় ইহার স্পর্শিত খাদ্যাদি তো দূরের কথা, তৎকালে তৈজসাদি পর্যন্ত তাহাদের স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। সে সময় তাঁহাদের স্পর্শিত বস্ত্রাদি অপরের—অপরিধেয়; তাহাদের স্পর্শিত জল ব্যবহার্য্য। এই সময় রজঃস্বলা নারীকে একান্ত নিম্নত কক্ষে বাস করিতে হয় এবং যাবতীয় গৃহকর্ম্য হইতে বিরত থাকিতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে আহারীয় নিয়মও পালন কবিত্তে হয়। ফলমূলাদি সাত্বিক আহার, চন্দ্র, অন্ন এবং কোন কোন উদ্ভিজ্জ শিক্ত রজঃস্বলা দ্বার আহার্য্য। অস্ত্রাঙ্ক খাদ্য অর্থাৎ উগ্র ও হৃস্পাচ্য খাদ্য ভক্ষণ অসম্ভব। রজঃস্বলা নারীর পক্ষে পুরুষের মুখদর্শন পর্যন্ত নিষিদ্ধ। এ নিয়ম কেবল আত্ম ঋতুর সময় অনেকে পালন করেন; বটে, কিন্তু তাহার পর এ সমুদয় একেবারেই উপেক্ষিত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান চিকিৎসকগণ বলেন যে রজঃস্বলা স্ত্রীর পূর্ণ বিরাম প্রাপ্তি আবশ্যিক, এমন কি পুস্তকাদি পাঠও নিষিদ্ধ। অসুপািত ও অমৃতোজক খাদ্য তাহার পক্ষে উপযোগী। হৃৎ তৈল ভর্জিত বা মসলা সংযুক্ত উগ্র খাদ্যদি আশ্রিত—৩

ভোজন তাহাদের পক্ষে একান্তই নিষিদ্ধ। শীতল বায়ু সেবন, জলে ভিজা, নানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি পরিবর্জনীয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, এক্ষণ করিলে কেবল যে ঋতুরোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়—তাহা নহে; গতিলীপ স্থতপ্রসব হয়। এমন কি প্রসব বেদনা আদৌ অহুভূত হয় না। হিন্দুব পদ্ধতি অনুসারে রজঃস্বলা রমণীকে অশুচি মনে করিয়া পূর্ণ বিরাম দেওয়া হইত। এই সকল নিয়ম আজকালকার শিক্ষিত সভ্য সমাজ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল কোন কোন অশিক্ষিত ধর্ম্মভীরুদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, শিক্ষিত দলের মধ্যে সময়ে সময়ে ঋতুকালেও স্ত্রী-পুং মিলনের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়,—কিন্তু ইহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অস্বাস্থ্যকর। এই জন্তই বোধ হয় স্বল্পদর্শী শাস্ত্রকারেরা ঋতুকালে একেবারে পুরুষের মুখদর্শন পর্যন্ত জীলোকদিগের পক্ষে নিষেধ করিয়া ছেন। আবার ইহাও পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের কথা যে, রোগ আরোগ্য অপেক্ষা প্রতিবেশক ভাল। তাই বলি, একবার প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিয়া দেখুন। তাহা হইলে আর ঘরে ঘরে Aletris cordial এলেট্রিস কর্ডিয়ালের প্রাচুর্য করিতে হইবে না।

আবার ডাক্তার প্লিনি বলেন যে, রজঃস্বলা নারীর হস্ত কিছুক্ষণ সুর্য্যমধ্যে নিমজ্জিত রাখিয়া পরে ঐ সুর্য্য পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উহা স্নায়ু প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার ঐ নারীর দ্বারা অন্তঃসময়ে পরীক্ষা করায় সুর্য্য কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। সুতরাং সুর্য্য হইতে বহিঃপ্রেরণ পরিবর্তন ঘটে, অস্ত্রাঙ্ক খাদ্য ও পানীয় যে পরিবর্তন

ঘটিবে—তাহার আর বৈচিত্র্য কি। কার্পেন্টার তাঁহার ফিজিওলজি বা শারীরতত্ত্ব গ্রন্থে একটি রমণীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামী পারদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, স্বামীর সহিত এক শয্যায় নিদ্রা যাইবার পব.

স্ত্রীরও 'মুখ' আসিয়াছিল অর্থাৎ প্রচুর লাল নিঃসরিত হইয়াছিল। যদি একরূপ হয়, তাহা হইলে রজঃস্রাব নারীর সহিত একত্র বাসও যে অস্বাস্থ্যকর তাহার আর সন্দেহ কি?

## শিশুপালন।

— ৩৩ —

[ উপক্রমণিকাংশ ]

( শ্রীমতী কুমুদিনী বহু বি-এ, সরস্বতী )

মানবের ঘরে একটি শিশুর জন্ম কত আনন্দ, উল্লাস এবং আশার বাবুতা আনিয়া দেয়। নবজাত শিশুটি যখন অফুটন্ত গোলাপের মত মাতার কোল আলো করিয়া শুইয়া থাকে, তখন, তেমনি আয়ীষস্বজনের প্রাণে যেমন আনন্দ হয় সেই মুহূর্ত্তেই শিশুর ভবিষ্যৎ চিন্তারও তাঁহাদের চিত্ত আন্দোলিত হইতে থাকে। শিশুর ভাবী গৌরবপূর্ণ জীবনের চিত্র কল্পনা চক্ষে দেখিয়া পিতামাতার বক্ষ কত আশার আনন্দে এবং উৎসাহে ফুলিয়া উঠে। শিশুর স্বর্গীয় স্নেহমা-মণ্ডিত মুখখানি দেখিয়া তাঁহাদের অন্তর কি অপার্থিব স্নেহ ও আনন্দের তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আবার শিশু যখন মাতার চক্ষের দিকে চাহিয়া মধুর হাসি ছড়ায়, মধুর আধ আধ ভাবের শব্দ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করে, তখন জনকের প্রেম ও আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হয়। কিন্তু শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা তাঁহাদের দায়িত্ব ভারের গুরুত্ব ক্রমশঃই

উপলব্ধি করেন। বিধাতা যে নির্মল শুভ পবিত্র ফুলটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করা—তাহাকে ফুলেরই মত স্নেহ করিয়া গড়িয়া তোলা,—তাহাকে মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত করা, একমাত্র তাঁহাদেরই উপর নির্ভর করে। বিধাতার বাগানের এই শুভ ফুলটি যদি ধরণীর ধূলয় কলঙ্কিত হয়, তবে তাহার জন্ম পিতামাতাই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী। শিশুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পিতামাতার চিত্তই এইরূপ গুরুতর চিন্তার আলোড়িত হয়। শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভার বিধাতা তাঁহাদেরই হস্তে রাখিয়াছেন।

শিশুর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে শারীরিক উন্নতির উপরই নির্ভর করে। সুতরাং সর্বপ্রথম শিশুর শারীরিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক পিতামাতারই কর্তব্য। কারণ শিশু স্বাস্থ্য, বলবান হইয়া

বাচ্চি উঠিলে তাকে তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভাবনা তাবিবার সময় আসে। অজ্ঞানতা বশতঃ উপযুক্ত বস্ত্রের অভাবে অন্ধুরেই জীবন নষ্ট হইলে, সকল আশাই বিফল হইয়া যায়। সুতরাং শিশু জন্মিবাব পূর্বে হইতেই তাহার মাতাকে কত নিয়মোৎসাহিত হইয়া এবং জন্মগ্রহণের পর শিশুকে কত বুদ্ধি বিবেচনার সহিত লালন পালন করিতে হয়—তাহা প্রত্যেক রমণীর জানা অবগত কর্তব্য। সন্তান জন্মগ্রহণ করিবারাত্র তাহারই ক্ষুদ্র জীবনটির সহিত মাতার সকল স্বথ-দুঃখ—আশা-নিরাশা অটুট বন্ধনে জড়িত হইয়া যায়। শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম না জানায় অকালে কত গৃহ শূন্য হইয়া যায়, কত নারীর জীবন হাহাকারময় হয়—তাহার সংখ্যা করা যায় না।

বহুস্থলে শুধু একটু জ্ঞানের অভাবে এই ভীষণ দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। নারীদিগের এ সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকিলে আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে নারীগণের মূর্খতা বশতঃ কত শিশু অকালে জীবন বিসর্জন করে। সুতরাং প্রত্যেক নারীর জ্ঞান লাভ করা উচিত। আমাদের দেশের অনেক লোক নারীর শিক্ষা লাভ সম্বন্ধে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন, যে, তাহারা ত আর চাকরী করিবে না, যে অধিক লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজন! লেখাপড়া যে শুধু চাকরীর জন্তই প্রয়োজন তাহা নহে। নারীদিগকে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন রক্ষাাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিতে হয়—তাহা স্ফটিকরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে সমুচিত জ্ঞান লাভের

একান্তই প্রয়োজন। সামান্য চিঠিপত্র লিখিতে এবং ধোপার ও বাজার হিসাব রাখিতে যতটুকু জ্ঞানের আবশ্যিক, এই গুরুতর দায়িত্ব ভার উপযুক্তরূপে নির্বাহ করিতে হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

একে আনাদের দেশের নারীদিগের জ্ঞান-ভাব, তত্পরি বাণ্যবিবাহ বশতঃ নারীগণ এত অল্প বয়সে শিশুর জন্ম নী হন যে তখন তাহা-দিগের নিজেদের ভার লইতেই তাঁহারা অক্ষম। একটি ক্ষুদ্র শিশুর জীবনের ভার লওয়া তাহাদের সাধ্যাতীত। তাহাকে উপযুক্ত রূপে লালন পালন করিতে হইলে যে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন—তাহা তাঁহাদের মোটেই থাকে না।

কেবল সন্তানকে জন্ম দিলেই জননীর কাজ সম্পন্ন হয় না,—তাহাকে স্বস্থ, সবল, কর্মঠ, বীৰ্যশালী মানুষ করিয়া গঠন করাই জননীর কর্তব্য কর্ম। নারী যতদিন না সেই উচ্চ জ্ঞান লাভ করেন, শিশু পালনের গুরুতর দায়িত্বের মর্ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হন, ততদিন তাঁহাদিগকে শিশুর জন্ম পদ লাভের অধিকার প্রদান করা ঘোরতর নিরীক্ষিতার কাজ। জ্ঞানহীন নারীদিগকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া ঘরে ঘরে আমরা যে কি সর্বনাশের বীজ রোপণ করিতেছি, তাহা যদি উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তবে বহু পূর্বে হইতে এ কুপ্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম। তাহা হইলে আজ দেশের মুখশ্রীও ফিরিয়া যাইত। স্বাস্থ্যসম্পন্ন সুদৃঢ় মাংসপেশীবিশিষ্ট, উৎসাহী, তেজস্বী, জিভেন্দ্রিয়-কর্মী সন্তান দেশকে প্রদান করিবার সময় আসিয়াছে। লম্বা বৈশ্ব-দর্শন, কষ্ট,

ক্ষীণজীবা, শ্রীহীন, উৎসাহহীন, ভীক্ৰ অমায়ুষে ভরিয়া গিয়াছে!

পরিণত বয়সে কোনো কারণ বশতঃ, অসময়ে অপুষ্টি-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা যত অধিক, অপরিণত বয়সের সন্তানের তেমন নহে। পরিণত বয়স্কা শিক্ষিতা নারী অদম্যে প্রসূত, অপুষ্টি সন্তানকে বাঁচাইবার জন্ত যত নিয়ম প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন, সর্ব প্রকার শিক্ষাবিজ্ঞতা একটি জ্ঞানহীনা অল্পবয়স্কা বালিকার পক্ষে তাহা অসম্ভব। স্বাস্থ্য, বলশালী সন্তান গড়িয়া তোলা বর্তমান সময়ে নানা কারণে এক কদিন সমস্তার পরিণত হইয়াছে। দেশের নারীজাতির মধ্যে যদি স্ত্রীজনের প্রচার থাকিত, তবে এই সমস্তা বহু পরিমাণে নীমাংসিত হইতে পারিত। স্ত্রীরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও স্ত্রীশিক্ষার বিষয় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র দেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হইলে, দেশের শিশু মৃত্যুর হার অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। এমন অনেক পীড়ায় আমাদের দেশের শিশুদের মৃত্যু হয়—যাহা শিক্ষিতা জননী হইলে অনেক স্থলেই নিবারণ করিতে সক্ষম হন।

কলিকাতা সহরে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অতি ভয়ানক। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, কলিকাতায় এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক প্রতি চারিটি শিশুর মধ্যে একটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দশ বার, বৎসর পূর্বে ইহা অপেক্ষাও অবস্থা শোচনীয় ছিল। তখন প্রতি চারিজনদের মধ্যে দুইজনেরই মৃত্যু হইত। কলিকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডের শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, যে সকল ওয়ার্ডে ঘন বসতি এবং গৃহগুলি অপরিষ্কার আবর্জনাপূর্ণ,

আলো বাতাসশূন্য সেই সকল ওয়ার্ডেই শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অধিক।

১৯১৪—১৯১৫ সনে জোড়াবাগান বড় বাজার এবং কলিঙ্গাতে প্রতি হাজারে ৪৪ জন, কুমারটুলী, বড়টোলা, স্কিকিয়া ষ্ট্রীট, পদ্মপুকুরে ২৪ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু ভবানীপুরে প্রতি হাজারে ১৯ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৮ সনের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, জোড়াবাগানে হাজার করা ৫৮১, বড় বাজারে ৪৭৬, বহুবাজারে ৪০৮, কলিঙ্গায় ৩৬৬, খিদিরপুরে ৩৫১, মুচিপাড়ায় ৩৪৫ ও ফেনিক বাজারে ৩২৫ জন শিশু মারা গিয়াছে। পৃথিবীর স্রষ্টা দেশ সমুদ্রে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাউতেছে। আর আমাদের এই ভূভাগ্য দেশে শিশু মৃত্যু ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। জোড়া বাগান, বড় বাজার প্রভৃতি স্থানেই মৃত্যু সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। এই সকল স্থানে ঘন বসতি, গৃহগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং আবাস্যকর। বাড়ী গুলি সব ছোট ছোট অসংখ্য কুঠুরীতে বিভক্ত। প্রত্যেক কুঠুরীতে এক এক পরিবারে বাস করে। অধিকাংশ কুঠুরীই সম্পূর্ণরূপে আলো ও বাতাস বর্জিত। সহরের এই অংশে বহু সংখ্যক মূর্খ, কুসংস্কার প্রিয় এবং অত্যন্ত রক্ষণশীল লোক সর্বদা বাস করে। ইহাদিগের চির পুরাতন নীতি-নীতি এবং আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে ইহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে। ইহাদের গৃহে কোন প্রকার সংস্কার সাধন করা হইত না। ভবানীপুরের কলিঙ্গা-ওয়ার্ডেও দেখা যায় যে, যে সকল ওয়ার্ডে ঘন বসতি এবং গৃহগুলি অপরিষ্কার আবর্জনাপূর্ণ,

১৯১৪—১৯১৫ সনে বড় শিশু-অল্পগ্রহণ



করে, তাহার তিন ভাগের একভাগ জন্মবার প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মৃত্যুর প্রধান কারণ—অপুষ্ট অবস্থায়, অসময়ে জন্ম এবং ধনুষ্ঠকার। শেষোক্ত কারণে মৃত্যু সচরাচর অজ্ঞানতাবশতঃ এবং মূর্খ ধাত্রীদিগের জন্তই ঘটয়া থাকে। প্রথমোক্ত দুইটি কারণে মৃত্যু—লোকের আর্থিক এবং সামাজিক কারণে ঘটে। দাবিদা, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, বাণ্য বিবাহ এবং অবরোধ প্রথাই প্রধানতঃ এই সকল মৃত্যুর কারণ। এই কারণগুলির এক একটাই এত গুরুতর যে, বাছির হইতে তাহার সংস্কার সাধন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। শিক্ষা প্রচারই এই সকল গুরুতর কারণ দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায়। জনসাধারণ এবং নারীগণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারিত হইলে উপরোক্ত কারণগুলি তাঁহারা নিজেদেরই সংশোধন করিতে পারিবেন।

প্রথম সপ্তাহ : কাটিয়া গেলে মৃত্যু সংখ্যা বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। প্রথম সপ্তাহে যত মৃত্যু হয়, প্রথম মাসের শেষে মৃত্যু সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেক হয়। প্রথম মাসে ধনুষ্ঠকারেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয়, তা'রপর ওক্কাইটিস। শিশুদের শারীরিক যন্ত্রাদি এত কোমল থাকে যে, ইঠাৎ শীতাতপের পরিবর্তন তা'হারা সহ্য করিতে পারে না। দীর্ঘতাবশতঃ আমাদের দেশের লোকেরা উপযুক্ত বস্ত্রদ্বারা শিশুকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে 'অসমর্থ'। এই কারণে ইঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশুদের ওক্কাইটিস এবং নিউমোনিয়া হয়।

নিম্নলিখিত তালিকায় দেখিলে ১৯১৪-১৫ শিশুগণের কোন পীড়াক্রমিক সনে হারে মৃত্যু হইয়াছে তা'হা উপলব্ধি হইবে।

১। বসন্ত	হাম	জ্বর	ম্যালেরিয়া	শতকরা ৮.১
২। পেটের অসুখ	এন্টেরাইটিস	কলেরা	আমাশয়	শতকরা ৩.৮
৩। অসময়ে জন্ম	অপুষ্ট অবস্থায় জন্ম	(Debility at Birth)	ক্ষয়রোগ (Marasmus)	শতকরা ৩.২
৪। ব্রঙ্কাইটিস	নিউমোনিয়া	৫। ধনুষ্ঠকার (Tetanus neonatorum)	তড়কা	৬। লিডার
				অজ্ঞান কারণ

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে শতকরা ৮.১ শিশুর মৃত্যু তিনটি প্রধান কারণে ঘটয়াছে। যেমন অকালে এবং দুর্বল অবস্থায় জন্ম, ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া এবং ধনুষ্ঠকার ও তড়কা।

আমাদের দেশের নারীজাতি যদি শিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান আধুনিক চিকিৎসা-এজন অনেক নিয়ম-প্রণালী-কৌশল-সকল অবগত থাকিতেন, যদ্বারা তা'হারা দুর্বল অকালে প্রসূত শিশু-শিশুগণ অধিকাংশকেই রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু জননীগণ স্বর্গ-প্রিয়া এ সকল

ক্ষীর্ণ প্রণালীর কিছুই জানেন না, স্তত্রাং কত শিশু শুধু মাতার অজ্ঞতা বশতঃ প্রাণত্যাগ করে! আমাদের গ্রীষ্মাধিকা দেশে উপযুক্ত যত্ন লইলে, ব্রুকাইটিস ও নিউমোনিয়ার জন্ম শিশু-দিগের মৃত্যু সংখ্যা সহজেই হ্রাস করা যাইতে পারে। মাতা শিক্ষিতা হইলে ধনুষ্ঠকারে শিশুদিগের মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে পারেন। এই সুসভ্য যুগে আমাদের দেশে মূর্খ ধাইদিগের হস্তে শিশুর জন্মকালের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া ধনুষ্ঠকারে তাহার মৃত্যু ঘটান আর চলিতে দেওয়া উচিত নহে। মূর্খ ধাইদিগের পক্ষে এই কার্যের ভার লওয়া আইন বিরুদ্ধ বলিয়া দণ্ডনীয় হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে মাতার জ্ঞান থাকিলে তিনি ধাত্রী-দিগকে মানা বিষয়ে সতর্ক করিতে এবং উপদেশ দিতে পারেন। নারীজাতি শিক্ষা-লাভ করিলে, শারীর তত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বর্তমান যুগের বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিশুপালন প্রণালী অবগত হইয়া সুস্থ, সবল, বুদ্ধিমান, তেজস্বী সন্তান গঠন করিতে পারিবেন।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে শিশুশিক্ষা প্রণালীর আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল দেখা যাইতেছে। অতি অল্প বয়সেই বালক বালিকাগণের বুদ্ধিবৃত্তি আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইতেছে এবং তাহারানানো ভাষার এবং অনেক বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যালয় সমূহে এখনো সেই মাক্কাতার আমলে “ক, আ- ক, খ” এবং A B C মুখস্ত করা হইয়া পাঠশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের নারীগণ যদি শিক্ষিতা হইতেন, তবে কোমল বয়সেই সন্তানদিগকে অল্প বয়সেই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া ও এক্ষণে শিক্ষার মধ্যে কলিষা

না দিয়া, নিজেরাই বর্তমান চিত্তাকর্ষক ও উন্নত প্রণালীতে তাহাদিগকে স্কুলরূপে শিক্ষা দিতে পারিতেন। মাতার নিকট যে শিক্ষা শিশু কোমল বয়সে পায়, তাহা যেমন তাহার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। স্তত্রাং মাতার হস্তে যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা নির্ভর করে, তেমনি তাহার মানসিক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষও তাঁহার হস্তে শ্রুত। স্তত্রাং দেখা যাইতেছে যে, নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচারই দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রধান উপায়।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কলিকাতার অন্তঃপুর পরিদর্শন করিবার জন্ম একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—“যতই দেশে শিক্ষার প্রচার হইতেছে, নারীদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়োজন ততই উপলব্ধি হইতেছে। মূর্খ এবং অন্ধ শিক্ষিতাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও শিক্ষিতা-দিগের মধ্যেও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানভাব দেখা যায়। আমি এক বৎসরের মধ্যে ৩৬৩৬টি বাড়ী পরিদর্শন করিয়াছি। ইহাতে ৬৭৪০টি পুথক পরিবারকে বাস করিতে দেখিয়াছি। ৬৭৪০ জন স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্তা বলিয়া সন্তান পালন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছি। ৫৪৫টি নবজাত শিশু দেখিয়া যথাযথ সাহায্য এবং তাহা-দিগকে পালন করা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছি। শিশুর জন্মগ্রহণের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই যদি উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয়, তবে বিপদ অনেকটা কাটিয়া যায়। ২৪০টি বিনা টিকা দেওয়া শিশু দেখিয়া তখনই কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিয়া দিয়াছি। ইহাে নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখিয়া তাহা দূর করিবার

জন্ম হেল্‌থ অফিসারকে জানাইয়াছি। কলিকাতার মত বৃহৎ সহরে আমার মত আরো অনেক পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইলে, তবে কিছু কাজের আশা করা যাইতে পারে।” ইনি শিক্ষিতা ধাইদিগকে লইয়া ক্লাস করিয়া তাহাদিগকে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন এবং প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি প্রদান করিয়াছেন। সমস্ত সহরের জন্ম এইরূপ পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইলে প্রকৃতই দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে।

শিশুপালন, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম এবং খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা জনিতই এত অমূল্য জীবনের অপচয় হয়। তাহা নিবারণ করিতে হইলে প্রত্যেক নারীরই শিক্ষা লাভ করা এবং এই গুরুতর কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা কর্তব্য। আমাদের নারীগণ বাহ্যতে শিশুপালনের এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ প্রণালী, শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য নিয়ম অবগত হইয়া শিশুপালনে সাহায্য লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিলে—উপযুক্ত বস্ত্র পরাইলে এবং খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর নিয়ম পালন করিলে, মোটামুটি শিশুকে সুস্থ রাখা যায়। সাধারণ ভাবে শিশুদিগের অসুস্থ-তাব কারণ জানা থাকিলে জননীর সেই সব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক তাহাদিগকে সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করিতে পারেন। গুপ্তিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর নিয়ম ও শারীরতত্ত্ব জানা থাকিলে জননীগণ দুর্বল এবং ক্রম শিশুকেন্দ্রিত সুস্থ, সবল ও ডেজারী সম্বন্ধে পরিণত করিতে

সক্ষম হন। কিন্তু এ সব বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলে নানা প্রকার ঝগড়া ও বাতনা ভোগ করিতে হয়, এমন কি শিশুর প্রাণ পর্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে।

আমাদের দেশের প্রাচীনগণ বৃহদর্শিতার ফলে শিশুপালন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন সাধারণতঃ শিশুদিগের যে সকল পীড়া হয়, তাহার সুন্দর মুষ্টিযোগ তাহাদের জানা ছিল। তদ্বারা তাহারা অধিকাংশ স্থলেই শিশুদিগের রোগ আরাম করিতেন। বর্তমান সময়ে সেই সব প্রাচীন মহিলাদিগের অধিকাংশই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কন্যা ও বধূগণের সে অভিজ্ঞতা নাই এবং অনেক মুষ্টিযোগ ও তাহাদের সহিত লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে নানা কারণে একাদিক্রমে পারিবার প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় বর্তমান সময়ে নারীদিগকে অধিকাংশ স্থলে একাকী সংসার করিতে হয়। সুতরাং বয়োবৃদ্ধা অভিভাবিকা সঙ্গে না থাকায় নিজেদেরই শিশু পালনের সমস্ত ভার লইতে হয়। সুতরাং মূর্খ হইয়া থাকিলে শিশুপালন লইয়া অত্যন্ত বিপদের মধ্যে পড়িতে হয়। কিন্তু শিক্ষা থাকিলে এ সম্বন্ধে সকল বিষয়ই জানা থাকে এবং একাকী হইলেও সুচারুরূপে বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রণালীতে শিশু পালন করিতে সমর্থ হন।

শিশু পালনের বিষয় বুঝাইতে হইলে সর্ব প্রথমে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত বিশ্লেষণায় আমরা আগামীবারে উহারই আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

## আয়ুর্বেদে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ।

—:—

পূর্বে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ দ্বারা বহু রোগের চিকিৎসা হইত। এক্ষণে আয়ুর্বেদোক্ত ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ লুপ্তপ্রায়। অর্শ প্রভৃতি রোগে সম্প্রদায় বিশেষকে ক্ষার প্রয়োগ করিতে দেখা যায় মাত্র। ক্ষারের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। আমবা এই প্রবন্ধে পাঠকগণের অবগতির জন্ত ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ বিষয়ের আলোচনা করিব।

ক্ষার, অগ্নি, জলোকা প্রভৃতি শাস্ত্রে অমূল্য নামে আখ্যাত। ইহারা হীনশত্রু বা শত্রুর হ্রাস কার্যকারী বলিয়া ইহাদিগকে অমূল্য বলা যায়। শত্রু এবং অমূল্যের মধ্যে ক্ষারই প্রধানতম। কারণ ইহা দ্বারা ছেদন (কাটিয়া ফেলা—যেমন অর্শের বলি কণ্ডরখুন্ড স্ত্রের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে—কাটিয়া যায়) ভেদন (যেমন ফোড়ায় ক্ষার লাগাইলে বিদীর্ণ হয়) লেখন (চাঁচিয়া ফেলা—যেমন ক্ষত প্রভৃতির দূষিত অংশ পরিষ্কার করা) এই ত্রিবিধ কার্যই হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নি বা জলোকা দ্বারা ছেদন কার্য হয় না। আবার ইহা ত্রিদোষ নাশক এবং বিশেষ বিশেষ কার্যে (যেমন পিত্তজ অর্শ নাশক জন্ত) উপযোগী।

দূষিত ত্বক মাংসাদি ক্ষরণ অর্থাৎ পাতন অর্থাৎ নাশ করে বলিয়া ইহাকে ক্ষার বলা যায়। ক্ষার—বিবিধ ঔষধ সংযোগে ত্রিদোষনাশক এবং খেতবর্ণ বলিয়া সৌম্য অর্থাৎ শীতল গুণ বিশিষ্ট। কিন্তু ক্ষার শীতল গুণ বিশিষ্ট হইলেও উহাতে দহন (দগ্ধ করা) পচন (পাকাইয়া ফেলা) দারণ (বিদীর্ণ

করা) শক্তি থাকা অবিকল্প। ক্ষার—প্রচুর আগ্নেয় ঔষধ সংযুক্ত হওয়ায় কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, পাচন, বিলম্বন (মিলাইয়া দেওয়া—যেমন বাত-কফ প্রধান শোথ ক্ষার সেবনে মিলাইয়া যায়) শোধান (ক্ষতাদি বিশুদ্ধ করে), শুষ্কন (রক্তপাত বন্ধ করে) লেখন গুণ বিশিষ্ট এবং ক্রিমি, আম, কুষ্ঠ, বিধ, মেদ প্রভৃতি ও অতিসেবিত হইলে পুরুষায় নষ্ট করে।

প্রতিসারণীয় (লাগাইবার) এবং পানীয় (খাইবার) ভেদে ক্ষার দুই প্রকার। কুষ্ঠ, ক্রিমি, (কুষ্ঠ বিশেষ), দগ্ধ, বিলাস (অরুণ বর্ণ ধবল রোগ), মণ্ডল নামক কুষ্ঠ, ভগন্দর, দূষিত ক্ষত, নালীবা, আঁচিল, তিল, ছুলী, মেচেতা, আঁচিলভেদ, বাহু বিদ্রুপি (বড় ফোড়া) বাহু ক্রিমি (উকুন), বাহুবিধ (বিসাক্ত ক্ষত প্রভৃতি) অর্শ এবং উপজিহ্বা, অধিজিহ্বা, উপকুশ, দন্ত বৈয়র্ড এবং তিন প্রকার রোহিণী—এই সকল রোগে প্রতিসারণীয় ক্ষার প্রয়োজ্য।

পানীয় ক্ষার কৃত্রিম বিধ বা দূষিবিধ, শুষ্ক, উদর, অগ্নিমান্য, অজীর্ণ, অকটি, আনাহ, শর্করা (ক্ষুধা—পাথরী) পাথরী, অভ্যন্তর বিদ্রুপি, ক্রিমি ও বিধ এবং অর্শ রোগে প্রয়োজ্য। রক্তপিত্ত, জ্বর, পিত্ত, প্রকৃতি, বালক, বৃদ্ধ, দুর্বল, ব্রহ্মরোগগ্রস্ত, মদরোগগ্রস্ত, মূর্খা রোগগ্রস্ত, ভিসির নামক চক্ষু রোগগ্রস্ত এবং এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিকে পানীয় ক্ষার প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রতিসারণীয় ক্ষার প্রস্তুত করিতে হয়। বিবিধ রোগ প্রসঙ্গে পানীয় ক্ষারের

বিষয় উল্লিখিত হইবে বলিয়া এ স্থানে বলা হইল না।

প্রতিসারনীয় ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে, শরৎকালে প্রশস্ত দিনে পর্বতের সামুদ্রিক-জাত, মধ্যবয়স্ক, বৃহদাকার এবং দাবাগ্নি বিবের দ্বারা অদূষিত ঘণ্টাপারুল গাছকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে। অনন্তর বায়ুশূন্য স্থানে রাখিয়া, উহার সহিত সূক্ষ্ম-একরা (চূণ প্রস্তুত কপিবীর পাথর) মিশ্রিত করিয়া তিলের ভাট্টার দ্বারা দণ্ড করিবে। অনন্তর অগ্নি নির্বাপিত হইলে ঘণ্টাপারুলের ভস্ম এবং গাষণ ভস্ম পৃথক পৃথক গ্রহণ করিবে।

অনন্তর কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণ (লতাশাক), পালতে মাদার (মস্তান্তরে দেবদারু) বহেড়া, সৌদান, ডহরকরঞ্জ, বাসক, কদলী, পটিয়া, লোধ, আকন্দ, মনসাদীজ, আপাং, পারুল, রক্তচিটা, নাটাকরঞ্জ, ইন্দ্র বৃক্ষ (কুড়চি ভেদ) অনন্তমূল, হাপরমালি, 'করবী, ছাঁতিখ, গণিয়ারী, কুঁচ এবং চারি প্রকার খোনা (বৃহৎ ফলা, অল্প ফলা, পীতপুষ্প ও খেতপুষ্প) ইহাদিগের ফল, মূল, পত্র ও শাখা পূর্বোক্ত রূপে অগ্নি দ্বারা দণ্ড করিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে।

পরে ঘণ্টাপারুলের ভস্ম দুই ভাগ এবং কুড়চি প্রভতির ভস্ম একভাগ করিয়া—সমুদ্রের বজ্রিণ সের লইবে এবং ১২২ সের জল বা গোমূত্রে গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা একতৃণবার ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর সিটে বাদ দিয়া ক্ষারজল বৃহৎ কটাহে রাখিয়া অগ্নিতে পাক করিবে এবং হাতা দিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকিবে। পাক করিতে করিতে যখন বেশ নিষ্ফল, রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ এবং পিচ্ছিল হইবে,

আখিন-৪

তখন নামাইয়া বৃহৎ বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া পুনরায় শিটে বাদ দিবে। অনন্তর দেড় সের ক্ষারজল পৃথক রাখিয়া, অবশিষ্ট অংশ পুনরায় পাক করিবে এবং নাটা, পূর্বোক্ত পাথর ভস্ম, রিম্বক এবং শঙ্খনাভি প্রত্যেকে এক সের—নোট চার সের; লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া অগ্নিবর্ণ হইলে নামাইয়া স্বতন্ত্র রক্ষিত দেড় সের জলে ভিজাইয়া ও বাটিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। সাবধানতার সহিত নাড়িতে নাড়িতে যখন এমন হইবে যে, অত্যন্ত ঘন বা তরল নহে—তখন নামাইয়া একটি লৌহ-কলসের মধ্যে রাখিবে এবং মুখ বন্ধ করিয়া নির্জন স্থানে রক্ষা করিবে।

তীক্ষ্ণ বীৰ্য্য, মধ্য বীৰ্য্য এবং মুহূর্বীৰ্য্য ভেদে ক্ষার তিন প্রকার। উপরে যে ক্ষার প্রস্তুতের কথা বলা হইল—উহা মধ্যবীৰ্য্য ক্ষার। উক্ত ক্ষারে যতপি নাটা প্রভতি দ্রব্য চতুষ্টিয় না দেওয়া হয়, তবে তাহাকে মুহূর্বীৰ্য্য ক্ষার বলে। আবার উক্ত ক্ষারে যদি দন্তী, দ্রবন্তী (দন্তীভেদ), রক্ত চিটা, গণিয়ারী, নাটাকরঞ্জের পত্র, তালমূলী, বিটলবর্ণ, সাচি-ক্ষার, স্বর্ণক্ষারী (সোনামুখী, মতান্তরে কঙ্কুট নামক মণ্ডিকা) হিং, বচ, ও মিঠা বিষ—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পাক করা হয়, তবে তাহাকে তীক্ষ্ণ ক্ষার বলে।

ক্ষার দীর্ঘকাল প্রস্তুত থাকার জন্য অথবা হীনবীৰ্য্য ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হওয়ার জন্য বীৰ্য্য হীন হইলে পূর্বোক্ত ক্ষার জলের সহিত পুনরায় পাক করিয়া লইলে বীৰ্য্যবান হয়।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা মুহূ নয়—অত্যন্ত শুষ্ক বর্ণ নয়—ব্লন্ধ অর্থাৎ করকরে নয়, পিচ্ছিল, অভিশ্যন্দী নয় অর্থাৎ প্রয়োগ করিলে ছড়াইয়া পড়ে

না, অত্যন্ত তরল বা ঘন নয় এবং শীঘ্রকার্য-  
কারী—এই আটটা গুণ বিশিষ্ট ক্ষারই উত্তম।  
অত্যন্ত মৃদু, অত্যন্ত ষেতবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত  
তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত পিচ্ছিল, অত্যন্ত প্রসর্পণকারী  
(ছড়াইয়া পড়ে) অত্যন্ত গাঢ়, সম্পূর্ণরূপে  
পাক করানয় এবং হীনদ্রবতা অর্থাৎ কথিত  
দ্রব্য সমস্ত না দেওয়া—এই নয়টা ক্ষারের  
দোষ।

ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে—রোগীকে  
বায়ু ও আতপ শূন্য প্রশস্ত স্থানে উপবেশন  
করাইয়া ব্যাধিস্থান উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া,  
পিত্তহৃষ্ট হইলে সেই স্থান ঘর্ষণ করিয়া, বাতহৃষ্ট  
হইলে কঠিন অসাড় চর্মের অন্ন ছাল তুলিয়া  
এবং ককড়ষ্ট ও শোথযুক্ত স্থানে অন্ন অন্ন  
চিরিয়া, শলাকা দ্বারা ক্ষার প্রয়োগ করিবে।  
অনন্তর একশত বায়ু অক্ষর উচ্চারণ করিতে  
যতক্ষণ সময় লাগে—ততক্ষণ অপেক্ষা করিয়া  
ক্ষার তুলিয়া ফেলিবে। ক্ষার প্রয়োগের পর  
পীড়িত স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইলে—সম্যকরূপে দক্ষ  
করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ক্ষারদক্ষ স্থানে আলা উপস্থিত হইলে—  
ঘৃত, মধু এবং কাঁজি প্রভৃতি অন্নদ্রব্য একত্র  
মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে আলা নষ্ট হয়।

ক্ষার দক্ষ স্থানের ক্ষত পূরণ করিবার জন্ত  
তিল ও যষ্টিমধু—তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য অন্নরসে  
বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।  
ইহাতে শীঘ্রই ক্ষতস্থান পুরিয়া উঠে।

এখানে দ্বিষ্টান্ত হইতে পারে যে, ক্ষারের  
তেজ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য, সুতরাং অগ্নিগুণ  
বিশিষ্ট কাক্ষিকাদি দ্বারা কি করিয়া যন্ত্রণা প্রশ-  
মিত হইতে পারে? কিন্তু ক্ষারে অন্নরস  
বাতীত অন্তান্ত সমস্ত রসই আছে। আবার  
তন্মধ্যে কটু ও লবণ রসই প্রচুর রূপে বর্তমান।

এইজন্ত অন্নরসের সহিত সংযুক্ত সেই তীক্ষ্ণ  
লবণ রস—তীক্ষ্ণ ভাব পরিভ্যাগ করিয়া মৃদুতা  
প্রাপ্ত হয় এবং সেই হেতু ক্ষার জনিত  
আলারও হ্রাস হয়।

ব্যাধি স্থান ক্ষার দ্বারা সামক রূপে দক্ষ  
হইলে—রোগের উপশম, ব্যাধি স্থানের লঘুতা  
এবং দক্ষ স্থান হইতে শ্রাব নির্গম বোধ হয়। যদি  
সম্যক দক্ষ না হইয়া কম দক্ষ হয়, তাহা হইলে  
ব্যাধি স্থানে বেদনা, কণ্ঠ ও জড়তা হয় এবং  
রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর অতিরিক্ত  
দক্ষ হইলে আলা, রক্তবর্ণতা, পাকিয়া যাওয়া,  
অঙ্গবেদনা, ঘ্রানি, পিপাসা, মুচ্ছা—এমন কি  
মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

দুর্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীক, সর্বাঙ্গ শোথ  
বিশিষ্ট রোগী, উদর রোদ্ধী, রক্তপিত্ত রোগী,  
গভির্ণা নারী, ঋতুমতী স্ত্রী, জ্বররোগী, প্রমেহ  
রোগী, উরঃক্ষত বশতঃ ক্ষীণ রোগী, তৃষ্ণা ও  
মূচ্ছাপীড়িত ব্যক্তি, ক্ষীণশুক্লবাক্তি, যে  
সকল রোগীর অণু বা যে সকল স্ত্রীলোকের  
গভাশয় উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত বা নিম্নদিকে প্রপ্ত  
হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদিগের পক্ষে উভয়বিধ  
ক্ষারপ্রয়োগ নিষিদ্ধ। মন্ত্র, শিরা, হৃদয়, সন্ধি  
সকল, তরুণাঙ্ঘ্রি (cartilage) সিবন (সেলাই)  
করার মত, ধমনী (Nerve) গলদেশ, নাভি,  
লিঙ্গ নালস্তোভঃ, অন্ন মাংস বিশিষ্ট স্থান,  
এবং বর্জ্যগত চক্ষুরোগ ভিন্ন ক্ষার প্রয়োগ  
নিষিদ্ধ। পূর্বে যে সকল ক্ষারসাধ্য ব্যাধির  
বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যাধি-  
গ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে শোথ থাকিলে, অস্থি  
শূণ্য থাকিলে, অন্নপানে ঘেষ থাকিলে  
এবং হৃদয় ও সন্ধি স্থানের পীড়া থাকিলে, ক্ষার  
প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

অন্ন বৃদ্ধি ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হইলে, ক্ষার

বিষ, অগ্নি, শস্ত্র এবং বজ্রের ছায় প্রাণনাশক হইয়া থাকে, আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হইলে সত্তরেই ঘোরতর রোগ সকল বিনষ্ট করে ।

### অগ্নিকর্ম্ম বিধি ।

জ্ঞানে ক্ষার শ্রেষ্ঠ হইলেও, কার্যাতঃ ক্ষার হইতে অগ্নি শ্রেষ্ঠ । কারণ অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা রোগ প্রশমিত হইলে আর তাহাদের পুনরুৎপত্তি হয় না এবং যে সকল বোগ ঔষধ, শস্ত্র ও ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা নিবাসিত হয় না, তাহারা অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে ।

অগ্নি কর্ম্মের জন্ত নিম্নলিখিত দ্রব্যসকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে । বথা, পিপ্পল, ছাগবিঠা, গরুর দাঁত, শর, শলাকা, জাম্ববোষ্ঠ (জামের জার মুখাগ্র) বিশিষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তর নিষ্পিত বহ্নি), লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, মধু, গুড় ও শ্বেদ দ্রব্যাদি (দ্রুত তৈলাদি) তন্মধ্যে পিপ্পল, ছাগলনাদী, গোদন্ত, শর ও শলাকা চর্ম্মাশ্রিত রোগে, জাম্ববোষ্ঠ ও লৌহ তাগ্রাদি মাংসগত রোগে এবং মধু ও স্নেহ পদার্থ শিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিগত ও অগ্নিগত রোগে অগ্নি কর্ম্মের জন্ত প্রয়োগ করিতে হয় ।

শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অগ্র সকল ঋতুতেই অগ্নিকর্ম্ম করা যাইতে পারে । কিন্তু শরৎ এবং গ্রীষ্মকালে যদি অগ্নিসাধা ব্যাধি প্রাণ নাশক হইয়া উঠে, তাহা হইলে উক্ত কালের বিপরীত বিধান । অর্থাৎ শীতল আচ্ছাদন, ভোজন, প্রসেপ অবলম্বন করিয়া উক্ত দুই ঋতুতেই অগ্নি কর্ম্ম করিতে পারা যায় । সকল রোগে এবং সকল ঋতুতেই পিচ্ছিল (দধি প্রভৃতি যুক্ত) অন্ন ভোজন

করাইয়া অগ্নি কার্য্য করিবে । কিন্তু মৃঢ়গর্ভ (Difficult labour), পাণ্ডুরী, ভগন্দর, অর্শ ও মুখরোগে রোগীকে ভোজন না করাইয়া অগ্নিকর্ম্ম করা কর্তব্য ।

কেহ কেহ বলেন যে, স্বকৃ দধি ও মাংস দধি ভেদে অগ্নিকর্ম্ম দুই প্রকার । কিন্তু ধনন্তরীব মতে শিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থিতেও অগ্নিকর্ম্ম করা নিষিদ্ধ নহে ।

অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা স্বকৃ দধি হইলে শব্দ, হর্গন্ধ ও চর্ম্মের সঙ্কোচ হয় । মাংস দধি হইলে কপোত বর্ণতা (মলিন শ্বেতবর্ণ) অন্ন ফোলা এবং শুষ্ক ও সঙ্কুচিত ক্ষত হয় । শিরা ও স্নায়ু দধি হইলে কৃষ্ণবর্ণ ও উন্নত ক্ষত হয় এবং রক্তাদির স্রাব বন্ধ হয় । সন্ধি এবং অস্থি দধি হইলে কৃষ্ণ, অক্লম বর্ণ, এবং কর্কশ ও স্থির (ব্যাগ্ধিশীল নহে) ক্ষত হয় ।

শিরোরোগ ও অধিমহ নামক চক্ষুরোগে দ্রুত, কপাল ও শজ্জ দেশে, বস্ত্র অর্থাৎ চক্ষুর পাতার রোগে দৃষ্টি স্থান আত্র আলতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বস্ত্র দেশের রোমকূপ দধি করিতে হয় । স্বকৃ, মাংস, শিরা ও স্নায়ুতে বায়ু প্রকোপ বশতঃ অত্যন্ত বেদনা হইলে, উন্নত ও অসাড় কঠিন মাংসে, ব্রণে, গ্রন্থি, অর্শ, অর্ধদ, ভগন্দর, অপচী, গোদ, আঁচিল তিল, অন্নবৃদ্ধি (Harnia), সন্ধিহীন ও শিরোচ্ছিন্ন হইলে, নালী বা প্রভৃতি রোগে এবং অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে অগ্নিকর্ম্ম করিতে হয় । রোগের স্থানভেদে অগ্নিকর্ম্ম চার প্রকার । বথা, বলয়, বিন্দু, বিলম্বন ও প্রতিসারণ । আঁক, গলগণ্ড প্রভৃতি দৃঢ়মূল রোগে বালায় ছায় আকারে দধি করাকে বলয়, তিল, আঁচিল প্রভৃতি রোগে বিন্দুর আকারে দধি করাকে বিন্দু, তিথ্যাক, সরস

ও বক্রাদিভেদে নানা আকারে দগ্ধ করাকে বিলেখন এবং উত্তপ্ত লৌহ শলাকাদি দ্বারা ঘর্ষণ করাকে প্রতিসাধন বলে। অগ্নিকন্ম এই চারি প্রকার বলা হইল। রোগের সংস্থান অর্থাৎ আয়তনাদি, মর্শস্থান (পরিহারের জ্ঞাত) বোগীর বলাবল, ব্যাধি (বাতকফ জনিত ব্যাধিতে অগ্নিকন্ম কর্তব্য এবং রক্তপিত্তে নিষিদ্ধ), ইহা ভিন্ন ঋতুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্নিকন্ম করিতে হয়।

অগ্নিদ্বারা সমাকৃ দগ্ধ হইলে মধু ও ঘৃত সেই স্থানে মন্দন বা লেপন করিবে।

পিত্ত প্রকৃতি, অস্তঃ শোণিত (বাহাদের শরীরের অভ্যন্তরে কোন স্থানে রক্তস্রাব হয়), ভিন্ন কোষ্ঠ (বাহাদের কোষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, বাহাদের শরীরে শায়া বিদ্ধ আছে, দুর্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীক, অনেক ক্ষতযুক্ত এবং পাণ্ডু রোগী, মেহ রোগী, রক্তপিত্ত রোগী তৃষ্ণার্ত প্রভৃতি বাহাদিগকে শ্বেদের অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে অগ্নি কন্ম নিষিদ্ধ।

এক্ষণে চিকিৎসক কর্তৃক দগ্ধ করা ব্যতীত অন্য প্রকারে অর্থাৎ প্রমাদ বশতঃ দগ্ধের লক্ষণ বলা বাইতেছে। অগ্নি—ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য এবং কাষ্ঠাদি রূক্ষ দ্রব্য আশ্রয় করিয়া দগ্ধ করিয়া থাকে। অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত ঘৃত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ সহজে স্ফঙ্গ শিরা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া ত্বক্ মাংসাদিকে আশু দগ্ধ করিয়া ফেলে। এই জ্ঞাত স্নেহ পদার্থ দ্বারা দগ্ধ হইলে অত্যন্ত অধিক খয়না হইয়া থাকে।

চিকিৎসকের দোষে বা প্রমাদ বশতঃ চারি প্রকার অগ্নিদগ্ধের লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—পুষ্টি, দুর্দগ্ধ, সনাক্ দগ্ধ ও অতি দগ্ধ।

দগ্ধ স্থান বিবর্ণ, (পাণ্ডুবর্ণ), অত্যন্ত দাহযুক্ত হইলে এবং ফোট (ফোসকা) উৎপন্ন না হইলে তাহাকে পুষ্টি দগ্ধ বলা যায়। দগ্ধ স্থানে ফোট উৎপন্ন হইলে, চোষ (চূষণ বৎ পীড়া, দাহ, বক্তবর্ণতা, বেদনা ও পাক বিশিষ্ট হইলে এবং দীর্ঘকালে ভাল হইলে তাহাকে দুর্দগ্ধ বলে। দগ্ধস্থান অগভীর ভাবে দগ্ধ, পাকা তালের ত্রায় বর্ণ বিশিষ্ট, অত্যন্ত উন্নত বা অবনতরূপ দোষ বর্জিত এবং পূর্বে ত্বক্ মাংসাদি দগ্ধের যেরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে সেইরূপ লক্ষণ যুক্ত হইলে সমাকৃ দগ্ধ বলা যায়। আর দগ্ধ স্থানের মাংস ফুলিয়া পড়িলে, গাত্র বিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ কাটিয়া গেলে, সিরি, ঝায়, সন্ধি, অস্থি নষ্ট হইলে, জ্বর, দাহ, পিপাসা, মুচ্ছা ঘটিলে তাহাকে অতিদগ্ধ বলে। ইহাতে ক্ষত স্থান বিলম্বে পূর্ণ হয় এবং ভাল হইলেও বিবর্ণ থাকে।

প্রাণিদিগের রক্ত অগ্নি সংযোগে অত্যন্ত কুপিত হইয়া এবং অগ্নি ও কুপিত রক্তের জ্ঞাত পিত্ত রুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ অগ্নি ও পিত্ত রস, ও বীৰ্য্যে তুল্য। উভয়ের প্রকোপ বশতঃ তীব্র বেদনা হয়, বিদাহ জন্মায়, শীঘ্র ফোট উৎপন্ন হয় এবং জ্বর ও তৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে।

এক্ষণে, অগ্নিদগ্ধের চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে, উষ্ণ দগ্ধে অগ্নিতাপ (শ্বেদ), উষ্ণ প্রেলেপাদি এবং উষ্ণ অন্ন পান প্রয়োগ করিবে। কারণ শরীরে অধিক পরিমাণে শ্বেদ দিলে রক্ত স্থির হয় বলিয়া জমাট বাধিতে পারেনা। কিন্তু জল শীতল বলিয়া জল প্রয়োগ করিলে রক্ত জমাট হইয়া যায় এবং তজ্জন্ম রক্তমার্গ বায়ু, শূল, শোথ ইত্যাদি উপস্থাপিত করে। সেইজন্য পুষ্টি দগ্ধ স্থানে উষ্ণ



ক্রিয়া করাই হিতকর। দগ্ধ স্থানে শীত ক্রিয়া করিলে তাহা কখনই স্ব্থকর হয় না।

দুর্দগ্ধে দাহ গভীর হইলে শ্বিন্ন (স্বেদ প্রাপ্ত) বস্তুর উষ্ণতা দূর করিবার জন্ত ক্রিয়া এবং অগভীর হইলে যাহাতে জমাট বাঁধিয়া না যায় তজ্জন্ত উষ্ণ ক্রিয়া করিবে। পরে দ্রুত লেপন এবং শীতল দ্রব্য সেবন করিবে।

সমাক্ষেপে বংশলোচন, পাকুড় ছাল, রক্ত চন্দন, গেরীমাটী ও গুলঞ্চ সমান ভাগে লইয়া পেয়ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে পিত্ত জনিত দাহাদি নিবারিত হয়। গো, অশ্ব প্রভৃতি গ্রামা, বরাহ, মহিষ প্রভৃতি আনুপ এবং কচ্ছপাদি উদ্ভিদক মাংস বাটিয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে বায়ুজনিত যন্ত্রণার উপশম হয়। অপিচ, পিত্তজ বিদ্রুধি যোগে যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে, সমাক্ষেপে সেইরূপ চিকিৎসা করিবে।

অতিদগ্ধে যেসকল মাংস খুলিয়া পড়িয়াছে—সেইগুলি ফেলিয়া দিয়া শীতল ক্রিয়া করিবে। পরে সেই স্থানে শালি তণ্ডুলের চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। ক্ষতস্থান গুলঞ্চের পাতা বা পদ্ম প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অপিচ, পিত্ত বিসর্পে যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে, অতিদগ্ধেও সেইরূপ চিকিৎসা করিবে।

মোম, বষ্টিমধু, লোধ, ধূনা, মাঙ্গষ্ঠা, রক্ত চন্দন এবং স্থতীমুখী—সমান ভাগে বাটিয়া তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সর্বাঙ্গকার দগ্ধ ক্ষতের উত্তম ঔষধ।

সর্বাঙ্গকার সেই দগ্ধ জনিত ক্ষত অর্থাৎ উত্তপ্ত ঘৃত তৈলাদি দ্বারা ক্ষতস্থানে রক্ষা ক্রিয়া করিবে। অর্থাৎ সেই ব্যতীত রক্ষা চূর্ণ, প্রলেপ পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে।

কণ্ঠনাসিকাদি স্থানে অগ্নি কৰ্ম করিবার সময় ধূম লাগিয়া রোগীর কতকগুলি উপদ্রব জন্মিতে পারে। ইহাকে ধূমোপহত বলে। অগ্নি কৰ্ম ব্যতীতও ধূম লাগিয়া পীড়া উপস্থিত হইলে তাহাকেও ধূমোপহত বলা যায়। শ্বাস হিকা, আত্মান (পেট ফোলা), কাস, চক্ষুর দাহ ও রক্তবর্ণতা, নিঃশ্বাসের সহিত ধূম নির্গম, ধূম ব্যতীত অগ্নি দ্রব্যের ঘ্রাণ না পাওয়া, সমস্ত থাকে ধূমের আবাদ (ধোঁয়াটে) পাওয়া, শ্রবণ শক্তির লোপ, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, অবসন্নতা ও মুছা—ধূমোপহত ব্যক্তির এই সমস্ত উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

ধূমোপহত ব্যক্তিকে ঘৃত ও ইক্ষুরস, অথবা কিসমিসের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। এইরূপ বমন দ্বারা আমাশয়াদি বিগুহ হইলে ধূমগন্ধ নষ্ট হয় এবং শরীরের অবসন্নতা, হাঁচি জ্বর, দাহ, মুছা, তৃষ্ণা, আত্মান, শ্বাস, কাস প্রভৃতি প্রশমিত হয়। মধুর, অন্ন, কটু ও লবণ দ্রব্যের কবল ধারণ (কুল কুচা) করিলে ধূমোপহত ব্যক্তির মন প্রশম হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল সমাক্ষেপ প্রকারে রসাদি গ্রহণ করিতে পারে। উপযুক্তরূপ শিরো-বিরেচন নস্ত প্রয়োগ করিলে ধূমোপহত ব্যক্তিকে অবিদাহী (যাহা থাইলে গলা বুক জালা করে না), লঘু এবং স্নেহযুক্ত আহার প্রদান করিবে।

অতিতেজ অর্থাৎ বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে প্রায়ই কোন ঔষধে প্রতিকারের আশা থাকে না, দগ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কিন্তু যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে যতাদি স্নেহ পদার্থ তাহার সর্বাঙ্গে লেপন করিবে এবং স্নেহ দ্রব্য পরিষেক ও স্নেহযুক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

প্রসঙ্গ ক্রমে উক্ত বাতাদি দগ্ধের চিকিৎসা

কথিত হইতেছে। উষ্ণ বায়ু বা রৌদ্র কর্তৃক দগ্ধ হইলে, শীতল দ্রব্য পরিষেক, শীতল প্রলেপ এবং শীতল অন্নপান প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। শীত (হিম তুষার) কর্তৃক দগ্ধ

হইলে (হিম দগ্ধে দাহ সাদৃশ্য থাকে বলিয়া লোকে তুষার দগ্ধ বলে) অথবা জল সংযুক্ত কর্তৃক পীড়িত হইলে উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিবে।

## বালক রক্ষা।

—\*—

(প্রাণায়ামের আবশ্যকতা ও উপকারিতা)।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি.এল।

মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া জীবিত কালে ভুক্তি ও অস্তে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হইল। সর্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে সকলেই চায়। কিন্তু ইহার জন্ত শ্রেয়ের অমুসরণ না করিয়া, আপাতঃ বিবোধম পরিণামে অমৃতোপম সাত্ত্বিক স্মৃথের চেষ্টা,—না করিয়া বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে স্মৃথের চেষ্টা, রাজসিক স্মৃথ—বাহ্য অগ্রে অমৃতোপম পরিণামে বিবোধম এবং তামসিক স্মৃথ বাহ্য অগ্রে এবং পশ্চাতে উভয় অবস্থায় কষ্ট দায়ক তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা করে। জন্মিলে মরিতে হইবে এবং মরিলে জন্মিতে হইবে ইহা অবশ্যসত্তাবী এবং এই জন্মমৃত্যু প্রবাহ বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। এই কষ্ট কিরূপ ভয়ানক তাহা দেখাইবার জন্ত গত বর্ষের আয়ুর্বেদে আমরা কিরূপে সংসারে যাতায়াত করি—তাহাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত মনে করিয়া পাঠক মহোদয়গণ লেখকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু জানিয়া গুনিয়াই

লেখককে পাঠকের বিরক্তির কারণ হইতে হইয়াছে। যদি মৃত্যু কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক, জন্ম কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক এবং জন্ম মৃত্যুর অন্তরাল কিরূপ কষ্টকর দেখান না যায়, এবং বালককে তদ্বিনয়ে শিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে বালক ও বালকের অভিভাবকগণ শ্রেয়োলভের চেষ্টায় সাত্ত্বিক স্মৃথ লাভের জন্ত তৎপর হইবেন না। কোন বিষয়ে সতর্ক করিতে হইলে তাহার বিচার করিয়া তাহার মন্দাংশ না দেখাইলে সে বিষয় হইতে কেহ বিরত হয় না। এই দেহ ও মন আমাদের সংসারের কারণ, আবার এই দেহ ও মন মুক্তির কারণ—

দেহ মূলো মনস্তাপো দেহ সংসার তারণম্।

দেহঃ কৰ্ম্ম সমুৎপন্নঃ কৰ্ম্ম চ বিবিধং মতম্॥

দেহ হইতে মনস্তাপ জন্মে, দেহ জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, সেই দেহ কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন এবং কৰ্ম্ম পাপপুণ্যানুসারে বিবিধ।

দুঃখত্ব কারণং দেহঃ পঞ্চভূতাত্মক শিবে।

ততস্তদ্বিরহে দেহী ন দুঃখঃ পরিক্রমতে,

সোহাগ সজায়তে মাতঃ কণ্ঠে দেহো মহেশ্বরী।

হিমালয় কহিলেন হে শিবে! পঞ্চভূতাত্মক দেহই হুঃখের হেতু। সুতরাং দেহ অভাবে দেহীর কখনও হুঃখ বোধ সম্ভবেনা, কিন্তু হে মহেশ্বরী! আমার প্রতি যদি অগ্নুগ্রহ থাকে, তবে বিস্তারিতরূপে বলুন, সেই দেহ কিরূপে উৎপন্ন হয়?

(ভগবতী গীতা।)

আবার চরক কি বলেন শুনুন।

জীবন্ হি পুরুষস্বিষ্টং কৰ্মণ্যঃফলমশ্রুতে (৭)

(৪ষ্ঠ অধ্যায় নিদানস্থানম্)

কারণ পুরুষ বাঁচিয়া থাকিলেই কৰ্মের ইষ্ট ফল ভোগ করিতে পাবেন। পুনশ্চ—

সঙ্গমস্তং পবিত্রাজ্য শরীরমমুপালায়েৎ

তদভাবে তি ভাবানাং সৰ্বভাবঃ শরীরিণামিতি।

অতঃ সমস্ত ফেলিয়া আগে শরীর রক্ষা করিবে। কারণ তদভাবে শরীরীদিগের সৰ্বভাবই অভাব হয়। এই দুই ভাবকে প্রথমতঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। মুক্তি শাস্ত্র ভগবতী গীতা কি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে লজ্বন করিতেছে? তাহা নয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও মুক্তি শাস্ত্র। শরীর রাখিয়া, শরীর ও মন দ্বারা মুক্তি অর্জন করাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শরীর ও মন সৰ্ব সাধনের মূল! সেই জন্তই বলা “শরীরমাত্তং খলু ধৰ্ম সাধনম্।” শরীর ভাল থাকিলে মন ভাল থাকে ও মন ভাল থাকিলে শরীর ভাল থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলেও যদি শোকাদি কোন কারণে মন ধারাপ থাকে, তাহা হইলে অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ আনিয়া শরীরকে ক্ষয় করে। আবার যদি মন বেশ ভাল থাকে, তখন যদি উৎকট শিরঃ পীড়াদি হয়, তখন মনও ধারাপ হইয়া পড়ে, আমরা বাহ্যতে বেশ সুস্থ ও সবল

থাকিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারি, তাহাই সৰ্বতোভাবে কর্তব্য। কারণ দীর্ঘকাল জীবিত না থাকিলে ভোগার্জন দ্বারা মুক্তি মার্গের অনুসন্ধান করিয়া তাহার সাধন ও সিদ্ধি অসম্ভব। অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু ও জন্ম লইতে হইলে কেএল মাতারাত্তেই সময় কাটিয়া যায়, সংসারে থাকিয়া জ্ঞানার্জনের আর সময় পাওয়া যায় না। আমার একবার খুব কঠিন পীড়া হইয়াছিল। যখন প্রবল অর সেই সময় অন্ধ জ্ঞান আছে—এমন অবস্থায় মনে হইল, আমি পৃথিবীর একপার্শ্বে আসিয়া একটা জ্যোৎস্না আলোকিত স্থান দূর হইতে দেখিতেছি। সেই স্থানে যাইতে আমার মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইতেছে ও মনে হইতেছে যে মরিয়া উচ্চ স্থানে যাইব। কিন্তু একটা বড় হুঃখ সেই সময় মনে উপস্থিত হইল যে, বাল্যকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আমি কে, কোথায় যাইব, কোথা হইতে আসিয়াছি ও সেই ভীষণবানের পাদপদ্ম আশ্রয় লওয়া ভিন্ন সংসারে জন্মমরণ কষ্টের বিরাম নাই তাহা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু তাহার ত্রীচরণে আশ্রয় লইবার পূর্বেই চলিলাম; এই জ্ঞানটুকু লইয়া আবার যখন আসিয়া জন্মিব, তখন হারাইব। এই হুঃখে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলাম। জগদীশ্বরের বড়ই কৃপা যে, তিনি আমার হুঃখের কথা শুনিয়া তাহার ত্রীচরণে আশ্রয় লইবার আর একটা সময় দিলেন, কিন্তু কই সে বিষয় তো কিছুই করিতে পারিতেছি না। বাল্যকাল হইতে বালককে জানাইয়া দিতে হইবে যে, সংসারের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। এটা একটা খেলার যন্ত্রণা। দিন কয়েকের জন্ত এই সংসার বিদেশে আসিয়াছি আবার নিজ

দেশে চলিয়া যাইব। কিন্তু এই শরীর ও মন—যাহা আমার কষ্টের হেতু, তাহা যাহাতে আর গ্রহণ করিতে না হয়—তাহার জন্ত সেই ত্রিভুবানের ত্রিপাদপদ্ম লাভ করিবার উপায় করিয়া যাই—যাহাতে সেই স্বদেশে গেলে যেন তাঁহার ত্রীচরণে স্থান পাইয়া—আর এই সংসার নিদেশে আসিতে হয় না। আমরা যে এই জ্ঞানটুকু মৃত্যু ও জন্মদ্বার দিয়া আসিতে আসিতে ভুলিয়া যাই—তাহা আমাদের সাধনার অভাবে। আমাদের শ্রুতি আমরা অনেক প্রকারে হারাই। প্রথমতঃ আহার শুদ্ধি। “আহার শুদ্ধোহু” সম্বশুদ্ধি—“সম্বশুদ্ধোহুবা শ্রুতিঃ শ্রুতিভো সর্ব-গ্রহানাং বিপ্রমোক্ষঃ” এই শ্রুতির প্রধান সহায় শুদ্ধ আহার। আহার মানে যে খাদ্য—দ্রব্য তাহা নয়। আমরা বাহিরের যে কোন জিনিষ ভিতরে লইয়া বাই তাহাই আহার। কতক শরীরের আহার, —যেমন অন্নাদি ভোজন, দুগ্ধাদি পান। আবার চক্ষু কণ নাসিকা জিহ্বা, ত্রু, এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিতরের বিষয় গ্রহণ,— ইহা মনের আহার। যাহাতে এই উভয় বিধ শরীরের ও মনের আহার শুদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বালকদের বাল্যকাল হইতে শুদ্ধতা ও শৌচ রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নপর হইতে হইবে। আমাদের শরীর রক্ষার জন্ত যাহা বাহির হইতে শরীরের মধ্যে গ্রহণ করা যায়—তাহাই আহার। বায়ুভুক্ত বলিয়া একটা কথা আছে। বায়ুই আমাদের সর্ব প্রধান জীবন রক্ষার হেতু। বায়ু ব্যতীত আমরা বেশী ক্ষণ বাঁচিতে পারি না। আবার শুদ্ধ বায়ু না হইলে বাঁচিবার উপায় নাই। এই বায়ুই আমাদের প্রাণ। পঞ্চবায়ুই আমাদের প্রাণ। এই পঞ্চ বায়ু আবার উনপঞ্চাশ প্রকার

বলিয়া কথিত আছে। বায়ু একই,—কেবল ক্রিয়ার ভেদে নানা নাম যুক্ত। পঞ্চ অন্তর্বায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। আমরা যাহাকে প্রাণময় কোষ বলিয়া থাকি তাহা এই এই পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু ও পঞ্চ কন্ডেন্সিয়। বাক্য, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু। প্রাণ বায়ুর স্থান হৃদয়। ইহা প্রতি দিব্যারাত্রিতে ২১৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস রূপ কার্য্য করিতেছে ইহাকে অজপা জপ করা বলে। ইহারই উপর আমাদের জীবন বা আয়ু। ইহারই গতি ইত্যাদি স্থির করিতে পারিলেই আমরা দীর্ঘায়ু হইতে পারি। অবশ্য অস্ত্রায় বায়ু ও এ বিষয়ে সহায়ক, কিন্তু এই প্রাণ বায়ুর উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে উহা অস্ত্রায় বায়ুকে নিজ স্থানে রাখিয়া কার্য্য করায় ও আমাদিগকে দীর্ঘায়ু করায়। প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি নিয়মিত করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণ বায়ু উর্দ্ধ গমনশীল। অপান বায়ুর স্থান নাভির নিম্নে—শুষ্ক দেশ পর্য্যন্ত। ইহা অধোগমনশীল ও ইহার দ্বারা নল মূত্র ত্যাগ হয়। সমান বায়ুর স্থান নাভিদেশ। আমরা যাহা কিছু আহার করি—সেই আহারের পরিপক রস নির্গত করিয়া নানাপ্রকার নাড়ী দ্বারা সর্ব শরীরে লইয়া যাওয়া ইহার কার্য্য। আহার্য্য বস্তু পরিপাক করিয়া তাহা হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস মজ্জা স্তত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করায়, ইহাই বায়ুর কার্য্য। সকলকে সমান ভাবে রাখিয়া শরীরের কার্য্য সম্পন্ন করে ও প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া নিজ মধ্যে থাকিয়া স্তত্রায় সময় যখন প্রাণ ও অপান পরস্পর মিলিত হইতে চেষ্টা করে, সেই সময় সরিয়া যায়, প্রক্রিয়াহীন হয়, কিন্তু অল্প

যে প্রাণ ও অপানকে নিজ নিজ স্থানে রাখা নিজে মধ্যে থাকে এই জ্ঞান ইহার নাম জ্ঞান। উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠ। আমরা যখন কিছু পান করি বা ভক্ষণ করি—তাহাকে ভেগ করিয়া দেওয়াই ইহার কার্য। বান বায়ুর স্থান সর্কাস্ত্র। সর্কাস্ত্রের সন্ধিস্থানের কার্য সর্কানাভী—গমনশীল—সর্ব শরীর স্থায়ী—এই বায়ুর কার্য। ক্ষয় ও পূরণ এই বায়ুর ক্রিয়া। এই পঞ্চ অস্ত্র বায়ু ও পঞ্চবহি বায়ু দ্বারা আমাদের শরীরের যত কিছু কার্য হইতেছে। ইহারা নাগ, কূর্ম, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই বায়ুর ক্রিয়া শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—যথা,—প্রাণাত্ম বহির্গমনম্ অপানজ্ঞাধোগমনং বালন্ত্য ব্যবসমাকৃষ্ণর প্রসাবপানানি সমাসজ্ঞাশিত পীতাদীনাং সমুন্নয়নম্ উদানন্যোদ্ধ নয়নম্।

উদারো নাগ আখাতঃ কূর্ম উন্নীলনে স্রুতঃ।  
কুকব কুকরো জ্ঞেয় দেবদত্তো বিজ্ঞন্তনে।  
ন ভ্রাতী মৃতকপি সর্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥

শ্রীধর গীতা।

বায়ু পঞ্চভূতের এক ভূত। কিন্তু ইহার সহিত অগ্নি চারি ভূত মিলিত আছে, তাহাদের গুণ এই প্রকার। যথা—বায়ুর মধ্যে যে আকাশ আছে তাহার গুণ প্রসারণ,—বায়ুর নিজ গুণ ধাবণ, তেজেস গুণ বমন, জহলর গুণ স্রবণ, পৃথিবীর গুণ আকৃষ্টন।

এই পঞ্চ বায়ুকেই প্রাণ বলা যায়।

এখন দেখা যাইতেছে যে বায়ুকে স্থির ও নিয়মিত করিতে পারিলেই আমরা সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী হইতে পারি। মন আমাদের বড়ই চঞ্চল। বিশেষ বালকদের মন বড়ই চঞ্চল। এই চঞ্চল মনকে যতই স্থির করিতে পারা যায়, ততই শান্তি আসে ও হৃৎকের লাভ

আধিন—৫

হইয়া যুগ আসে। চঞ্চল মন যখন স্থির হয়, তখন তাহা বুদ্ধিরূপে পরিণমিত হয়। যেমন তরঙ্গায়িত জলে চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব ঠিক দেখা যায় না, বহু খণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ আমরা এই চঞ্চল মনে সকল আনন্দের আধার জ্ঞান স্বরূপ সেই ভগবানকে তাহার ছায়াৰূপে দেখিতে পাওয়া চঞ্চল মনে কোন কাঙ্গ হয় না। মনকে স্থির করিয়া একাগ্র করিতে পারিলেই ইহা দ্বারা কার্য এমন কি অসাধ্য সাধনও হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্যোব কিরণ যখন সাধারণ ভাবে থাকে, তখন তাহার উদ্ভাপ কাহাকেও দগ্ধ করিতে পারে না। এমন কি সেই বিচ্ছিন্ন সূর্য্য কিরণ সমূহে উদ্ভাপ আছে বলিয়া বিশেষ বোধ হয় না। কিন্তু যদি কৌশল ক্রমে সেই বিচ্ছিন্ন কিরণ সমূহকে একমুখী করিতে পারা যায়, তবে তাহার কি প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি উপস্থিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। একখণ্ড কাচ ঘাঁহার উভয় পৃষ্ঠই মধ্যস্থল ক্রমে উচ্চ, তাহার যদি সূর্য্যের দিকে একখণ্ড কাগজ বা অগ্নি পদার্থ আনা যায়, তবে উহা উপরে ও নীচে লইয়া যাইতে যাইতে একটা এমন স্থানে আসিবে—যাহা ঐ কাচখণ্ডে পতিত কতকগুলি কিরণ এক পুঞ্জীকৃত করিয়াছে, সেইখানেই আসিবামাত্রই ঐ কাগজ খণ্ডটা পুড়িয়া যাইবে। যদি কতকগুলি কিরণ সমষ্টির এই শক্তি হয়, তবে আরও বেশী কিরণ সমষ্টির যে প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি—তাহা সহজেই অস্বাভাবিক করিতে পারা যায়। সেইরূপ আমাদের বিক্ষিপ্ত মনকে যতই পুঞ্জীকৃত করিতে পারিব, ততই তাহার শক্তি বৃদ্ধি হইবে। অন্যান্য মনোবৃত্তি রুদ্ধ হইয়া বুদ্ধি বৃত্তিটা পুঞ্জীকৃত হইলে, তাহার অন্যান্য দুখ রুদ্ধ হইয়া গিয়া একটা মাত্র সুখ

নির্মিকার পরমাত্মা সৰ্বভূত গুণেন্দ্রিয়ৈঃ।

চৈতন্ত্যে কারণং নিত্যো দ্রষ্টা পশুতি হি ক্রিয়াঃ ॥

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চাক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।

মানসঃ পুনরুদিতৌ রজশ্চ তম এব চ ॥

প্রেশামাতেষ্যনৈঃ পূর্বো দৈববক্তি ব্যাপাশ্রয়ৈঃ।

মানসো জ্ঞান বিজ্ঞান যৈষ্য স্মৃতি সমাবিভিঃ ॥

চবক সংহিতা।

শরীর ও মন ব্যাধিগ্ণেব আধার, আর কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বধ্যযোগ আরোহণের কারণ। পরমাত্মা নির্মিকার এবং ইহার চৈতন্ত্য সম্বন্ধে মন, ভূতগণ ও ইন্দ্রিয় সকল কারণ স্বকণ। পদমাতা নিত্য, দ্রষ্টা এবং সাক্ষী স্বকণ। বায়ু, পিত্ত ও কফ শরীরের দোষ এবং রজ, রক্ত ও তমঃ মনের দোষ। যাতা বিকারপ্রাপ্ত হইলে রোগ হয়, তাহাকে রোগ বলা। শারীরিক দোষ—নৈব ব্যক্তির দ্বারা শাস্ত হয়, আর মনের দোষ—জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রেম, স্মৃতি ও সমাদি দ্বারা শাস্ত হয়।

বায়ু পিত্ত ৩০ কফের সামান্যতম শরীর নিবেগ থাকে ও এক ছুট বা তিনের রক্তিতে ব্যাধি উৎপন্ন হয়। মনের মধ্যেও তিনগুণ থাকা কথিত আছে, যখন ত্রিগুণের বাহিরে আসা বায়ু, তখনই পরমানন্দ লাভ হয়, আর যখন তমঃ গুণের মধ্যে থাকে বায়ু—তখন মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা, প্রমত্ত, আনন্দের অন্ধকার দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন রাখে হয়, আর তমকে দমন করিয়া—রজকে আশ্রয় কবিলে, সর্বদা উৎসাহ লাভ—এ কার্য হইতে অজ্ঞ কার্য করে, আনন্দ সংসারে খুব বাহ্যিক করি—ইত্যাদি চেষ্টা হয়, ইহারও জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু লব্ধ নির্মল ও প্রকাশক বলিয়া জ্ঞানকে প্রকাশ করেনা এবং যখন জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকার হয়—তখন সব সন্নিহিত যান এবং তখন মনে লয় হইয়া

গুণাতীত বা মুক্ত অবস্থা আইসে। শরীরের সহিত মনের খুব সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়গণ উভয়কে সাহায্য করে। শরীরকে ও মনকে ভাল দেখিতে হইলে, ইন্দ্রিয়গণকে বিপথে বাইতে না দিয়া সুপথে সৰল রাখিতে পারিলেই উন্নতির পথে অগ্রগামী হওয়া যায়। কফ শরীরকে আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, পিত্তের ও বায়ুর ক্রিয়া বুদ্ধি কবিলে জীবন নষ্ট করে। মৃত্যুকালে কফেই এই কার্য। তমঃগুণ সেইরূপ মনকে আবিষ্ট অথবা সংসারে স্থখ কদাচিৎ, পুনঃ পুনঃ বাতাসারের কষ্টের কারণ হয়, এমন কি, মৃত্যুকালে তমঃ গুণকে মন অবলম্বন কবিলে, পশাদি—বৃক্ষাদিনীচ যোনিও প্রাপ্ত হয়। রজঃ গুণকে অবলম্বন করিয়া মরিলে এই সংসারেই থাকিতে হয়, আর সব গুণকে অবলম্বন করিয়া মরিলে স্বর্গাদি সুখের নোক ভোগ হয়। মনের সব গুণে স্থিতি কদাচিৎ সুখের কাল। পিত্ত দ্বারা নানাপ্রকার কার্য হয়; ইহা রজোগুণের জ্ঞান। আর বায়ু শরীর সামান্যতম থাকিলেই সুখ, এবং বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রোগ হয় বটে—কিন্তু বায়ু সুপথে চালিত হইলে শরীরকে ও মনকে সুস্থ রাখে ও দীর্ঘজীবনের সহায়তা করে। প্রথমে কফকে, পরে পিত্তকে শাস্ত করিয়া আমাদের বায়ু লইয়া ক্রিয়াদি করিলেই সর্ব রোগ নষ্ট ও দীর্ঘজীবন লাভ ও মৃত্যুকালে এই বায়ুকেই সুষুমা মার্গ দিয়া লইয়া গিয়া ব্রহ্মরূপ প্রাপ্যাপী এই বায়ুকে বহির্গত করিতে পারিলেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এই বায়ুই আমাদের শ্রোণ বা পঞ্চপ্রাণরূপে শরীরে নানা কার্য করিতেছে। এই বায়ু আমাদের নিঃশ্বাস শ্রোণ রূপে জীবনকে রক্ষা করিতেছে, এই বায়ু বাহ্যতে নির্মল ও পরিষ্কৃত হয় এবং আশ্রয়

সর্বদা দুর্গন্ধ বিহীন নির্মল ও পবিত্র বায়ু শ্বাস গ্রহণ দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি—তাহার চেষ্টা করি ও বালকগণকে সেইরূপ ভাবে শিক্ষা দিয়া তত্ত্বাবে রাখি। পূর্বে লেখা হইয়াছে যে, আমরা দিবারাত্রি ২১৬০০ বায়ু শ্বাস গ্রহণ করি। ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন, ৬০ মিনিটে

$$\frac{21600}{24 \times 60} = 15$$

একঘণ্টা—অর্থাৎ প্রতি মিনিটে আমরা ১৫ বার শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি। প্রকৃতির আলোচনা কবিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জীব একই সময়ে যত কম শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে সে—তত দীর্ঘজীবী হয়। আর যাহার বেশী ত্যাগ ও গ্রহণ করে—তাহারা অমায়ু হয়। কেবল যে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে শ্বাস সংখ্যা কম হইলে প্রাণী দীর্ঘজীবী হয় তাহা নয়, উহা আবার অন্নায়ত অর্থাৎ হ্রাস হওয়া আবশ্যক। শ্বাস দীর্ঘ হইলে আয়ু কম হয়। পূর্বে যে ২১৬০০ শ্বাসের কথা বলা হইয়াছে, ইহা অন্নায়ু কলির জীবের। পূর্বে লোক দীর্ঘজীবী ছিল, সেই জন্ত তাঁহাদের শ্বাস সংখ্যা প্রতি মিনিটে—১১১২ ছিল, এখন আয়ু অন্ন হইয়া পড়ায় উহা ১৫১৬ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিতে পাই—কুকুর, ছাগল প্রভৃতি প্রাণী খুব ঘন ঘন ও দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে ও খুব অন্নায়ু হয়। সর্প, ব্যাং, কচ্ছপ খুব কম ও অন্নায়ত শ্বাস গ্রহণ ত্যাগ ও গ্রহণ করে, সেই জন্ত তাহারা সব জীব অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হয়। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশুক্ত কালীদাস বেদান্ত বাগীশ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি ও তাঁহার লিখিত তালিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, কোন জীব শ্বাস

সংখ্যা ও শ্বাস-আয়তনের অন্নতা হেতু কি প্রকার দীর্ঘজীবী হয়।

প্রাণী প্রতি মিনিটের প্রায়িক প্রায়িক পরমাণু

	শ্বাস সংখ্যা	বৎসর
শশ	৩৮৩৯	৮
কপোত	৩৬৩৭	৮৯
বনির	৩১৩২	২০২১
কুকুর	২৮১২	১৩১৪
ছাগল	২৩১৪	১২১৩
বিড়াল	২৪২৫	১২১৩
ঘোড়া	১৮১৯	৪৮৫০
মহুয়া	১২১৩	১০০
চিল্লী	১১১২	১০০
সর্প	৭৮	১২০১২২
কচ্ছপ	৪৫	১৫০৫৫

যাহাদের প্রতি মিনিটে শ্বাস সংখ্যা যত বেশী হয়, তাহাদের রক্ত সঞ্চালন ও কুসুমের ক্রিয়া তত বেশী হয় এবং শরীর বলবান, সুদৃঢ় ও বৃহৎ হইলেও আয়ু কম হইয়া পড়ে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, আমরা যতই শ্বাস সংখ্যা প্রতি মিনিটে কম ও অন্নায়ত করিতে পারি—ততই দীর্ঘজীবী হইব ও তদ্বিপরীতে অন্নায়ু হইব। আমাদের শ্বাস সংখ্যা যে প্রতি মিনিটে বেশী হয়—কেবল—বেশী হয় তাহা নয়—উহা আরও দীর্ঘ হইয়া আমাদের আয়ু হ্রাস করে। সেই জন্ত বালকদের বেশী দৌড়াদৌড়ি খেলা করিতে দেওয়া উচিত নয়। কুটবল প্রভৃতি খেলা আমাদের দেশে আমাদের বালকের সর্বনাশ করিতেছে—তাহা এই বায়ু তত্ত্বই পর্যালোচনার জানা যাইতেছে। ইংলণ্ডের জায় শীত প্রধান দেশের উহা উপযোগী ও উহা সেখানকার মজা মাংস খাদক সাহেবদের উপকারী বলিয়া উহা আমাদের দেশের

শাক-চচ্চড়ি-ভাত খাওয়া ও গ্রীষ্ম প্রধানদেশে বাস করা ও ক্রমশঃ হীনবীৰ্য্যি বালকের পক্ষে কি উপযুক্ত হইবে? কলির ভীম শ্রীযুক্ত রামমুন্সি বলেন যে, যে ব্যায়াম দ্বারা বেশী শ্বাস ক্ষয় হয়—তাঁহা শরীরকে বলবান করিলেও তাহা আয়ুকে হ্রাস করে। আমাদের দেশে যে ভাবে বালকেরা ফুটবল-ক্রিকেট প্রভৃতি দৌড়াউড়াড়ি খেলা করে—তিনি তাহা আমাদের সম্পূর্ণ হানিকর বলেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের দেশের পালোয়ানেরা যাতায়াত কেবল ব্যায়াম দ্বারা ও আহার দ্বারা শরীরকে বলবান করিগাছে—স্বাস রক্ষা বিষয় কিছুই চেষ্টা করা নাই—তাহারা ৩০।৩২ বৎসরের বেশী জীবিত থাকেন নাই। ফুটবল অপেক্ষা ডন বৈঠক, বাণ-একসারসাইজ, মুণ্ডরভাঁজা, ডবল ভাঁজা, সেগোর মতে ব্যায়াম করা—অনেক ভাল, কিন্তু যাহাতে শ্বাস রোধ করিয়া ব্যায়াম করিতে হয় ও শ্বাস দীর্ঘ ও ঘন না হয়—তদ্বিমূলে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রফেসর রান-মুন্সি বক্ষের উপর হস্তী দণ্ডায়মান করাইবার পূর্বে একটা বস্তু রাখেন, তাহাতে বলেন যে, উহা পশু বলের দ্বারা সাধিত হয়। উহাতে পবনের বলের আবশ্যক। আমাদের দেশে বলবানের আদর্শ ভীম ও হনুমান। উভয়কেই পবন পুত্র বলা হয়। তাহারা পবনকে আগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা সংসারে বহু হস্তীর বল ধারণ করিতেন। তিনি আরও বলিলেন যে, উহা বায়ু ধারণ ও চিত্ত বৃত্তি নিয়োগ দ্বারা সমাহিত হয়। হস্তী বক্ষে চড়াইবার পূর্বে আশি তাঁহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি দেখন সমভাবে একটা অপ্রশস্ত গম্বীর উপর শুইলেন, তখন স্থিরভাবে সর্গ শরীর বাধিলেন, কেবল দুই পা নাড়িতে লাগিলেন।

তখন তাঁহার বক্ষ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার পর যখন পায়ের নাড়া স্থির হইল, অমনি তাঁহার লোক তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তক্তাটা একটা গোদি দিয়া বুকের উপর দিল এবং সতর্ক ভাবে হস্তীকে বুকের উপর তক্তার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দিল। হস্তী যাই-বাণ সময় যখন তক্তার চারি পা দিল, তখন উহা বক্ষের উপর সমতল হইল, তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল। হস্তী নামিয়া যাইবামাত্রই তাহার অম্লচরণ তাহাকে যেন জোর করিয়া হাত যাহা বৃক্ক উপর স্থাপিত ছিন্ন খুলিয়া সমাটনা দিল এবং উহাকে যেন ক্ষণিক অজ্ঞান অবস্থা হইতে উঠাইল। যেন তিনি ক্ষণিক সংজ্ঞাহীন ছিলেন এইরূপ বোধ হইল আমা-দের, বলের স্থান বক্ষ ও বায়ুই বল। বায়ুই আয়ু, বায়ুই জীৱন বায়ুই সব। বায়ু স্থির হইলে মন স্থির হয়। চঞ্চল মন স্থির হইলে একাগ্র হইতে পারে। মন এবং একাগ্র মনের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির করিয়া সংসারে সকল বস্তুই লাভ করিতে পারা যায়। সকলেরই মূলে বায়ু। এই বায়ুকে সংযত করাই ভক্তি ও মুক্তির প্রধান উপায় ও উহা কেবল প্রাণায়াম দ্বারা হইতে পারে। প্রাণায়াম দ্বারা দীর্ঘ শ্বাস তাগ কম হয় উহা ক্রমশঃ অস্বাস্ত হয় এবং চিত্তকে স্থির করে। এই বায়ুই দুই নামে ইড়া পিঙ্গলায় চলিতেছে। কখন কোন নাড়ীতে চলিতেছে—ইহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক কারণ কোন সময় কোন কার্য করিলে উপকার হইবে, কোন সময় অনিষ্ট হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যখন ইড়াতে বায়ু বহে তখন ভোজন করিলে উহা জীর্ণ হয় না, কিন্তু পিঙ্গলা বহন কালে ভোজন করিলে জীর্ণ হয়। প্রাণায়ামের বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আসে



তাহা জানা আবশ্যক। উহা যত বেশী পরিমাণ বাহিরে আইসে -ততই আমাদের শরীরের ক্ষয় সম্পাদন করে। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে কেবল যে সাহায্যে শরীরের উৎকর্ষতা লাভ হয়—এমন খাদ্যাদি ভোজন করিলে চলিবে না। উহার নকপ্রকার ক্ষয় বধাসম্ভব নিবারণ করিতে হইবে। শুক্রক্ষয়ে শরীর যে শীঘ্রই পতনোন্মুখ হয়—তাহা কে না জানে? কিন্তু কই তাহা হইতে কে নিবারিত হয়? লোকে জানে যে, শুক্র ক্ষয়ে দেহ নাশ হয়, কিন্তু তাহা হঠাতে বিরত হয় না। এই জন্যই অজ্ঞান শ্রীভগবানকে ভিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন—

“অথ কেন প্রযুক্তেহয়ঃ পাপং রচিত পুরুষ।

অনিচ্ছন্নপি বাসেদ্য বলাদিব নিয়োজিত ॥”

হে বাসুক পাপ করিতে হচ্ছা না করিলেও লোকে কাহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপ আচরণ করে?

শ্রীভগবানুবাচ। :

‘‘দাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপমা বিদ্বেন মিহ জৈরিগন্ ॥

শ্রীভগবানু কহিলেন, ইহা রজোগুণ জাত হুপূরণীয় ও অত্যাশ্রয়্য কাম। সৰ্বগুণের বৃদ্ধি দ্বারা রজোগুণের ক্ষয় হইলে কাম জন্মে না এবং কোন কারণে বাধা পাইলে ক্রোধ রূপে পরিণত হয়। কাম মুক্তি मार्গের প্রধান শত্রু জানিও। তাহার পরে শ্রীভগবানু কিরূপে কামকে দমন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেই উপদেশ মত চলিতে পারিলে কাম দমিত হয় ও পাপাচরণ নিবৃত্ত হয়। প্রাণায়াম কামদনের প্রধান মূল্য।

শুক্র সর্বদাত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার ক্ষয়ে যে শরীরে ভীষণ ক্ষয় হয় তাহা বলা নিম্প্রয়োজন। ইহা সকল সময়ে ক্ষয় করিবার সুযোগ ও সময় হয় না, যখন হয় তখন ভীষণ ভাবে হয়। কিন্তু বায়ু অসংযমতায় যে ক্ষয় হইতেছে—তাহা অহরহঃ হইতেছে। আমরা কেহই ক্ষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখি না। কোন বিষয় বিচার করিয়া তাহার ভিতরে কি আছে না দেখিয়া সকলে বাহ্য ভুল বলে তাহাই বলি। আমি একদিন উকীল মহলে বলিলাম যে, আধুনিক হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেলা আমাদের ছেলেরদের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। অমনি সকলেই আমাকে ঠাট্টা করিলেন ও বলিলেন “ছেলেদের স্বাস্থ্য না খেলিলে কিসে ভাল হইবে? আমি নিজ পক্ষ সমর্থন জন্য দুই একটা কথা বলিতে চাহিলাম, কিন্তু উপহাসের অট্টহাসে আমাকে মৌন থাকিতে হইল। একে ছেলেরদের মন সবদা চঞ্চল, তাহার উপর বালস্তাবৎ জাঁড়াশক্ত স্তরুণস্তাবৎ তরুণীলয়ঃ। বৃদ্ধ স্তাবচ্ছিত্তাময়ঃ পরমে—ক্ষপি কোহপিনলয়ঃ সেই খেলায় বালকদিগকে উত্তেজিত করিলে তাহাদের মন সংযত করার ব্যবহার একবারে ভলাঞ্জলি দেয়। একদা একটা উকীলের দুইটি পুত্রের হৃদরোগ হইয়া পীড়া কঠিন হইয়া পড়িল। ডাক্তার দেখান হইল, কিছু ফল হইল বটে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ থাকিল। আজকাল ডাক্তারেরাও ভাল হার্টিনিক বলিয়া মকরধ্বজ ব্যবহার করেন, সেই মতে বহুবিজ্ঞ ডাক্তার ত্রিশবাবু অর্জুনছালের রস দিয়া মকরধ্বজ ব্যবহারের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তারি ঔষধ ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিছুদিন পরে বেশ উপকার বোধ হইল। বালক দুইটি এখন

নবাবের, তবে বৈশ্যদিবস সূচিক্রমে সাব সন্নিয়মে  
ও সন্নিয়মে না পারিলে এ বোগ আরাম হইবে  
না। বাগের প্রবলাবস্থায় মানকরের বিখ্যাত  
কংগার শ্রীব্রজ শৈলজানন্দ গুপ্ত মহাশয়কে  
একদিকে দেখান হইলে তিনি বলিলেন যে,  
অবিক্রমিত দোড়াদোড়ি ও হকি খেলাই উহার  
কারণ। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর বালকদ্বয়  
পিপাসায় থাকিতে না পারিয়া নীতল জল  
পান করিয়া এই কঠিন জন্মদোগে আক্রান্ত  
হইয়াছে। কবিবাজ মহাশয়র ঐ কথা  
শুনিয়া উক্ত উকীল বাবু আমাকে তৎপর দিন  
বলিলেন যে, “আপনি ঠিক বলিয়াছিলেন,  
বালকদের কুটবন, হকি প্রভৃতি খেলা বড়ই  
অনিষ্টকর। কবিবাজ মহাশয় আমাব ছেলে-  
দের দেখিতে আসিয়া প্রথমে ‘চিহ্নাস’ করেন,  
ছেলেরা হকি কি কুটবন খেলে কি না?  
বড়ই আশ্চর্যের বিষয় তিনি কি করিয়া জানি-  
লেন যে, আমার ছেলেরা কী কুটবন খেলে।  
অতঃপর আর ছেলেরা বরুণ খেলিতে দিন  
না। আশা করি কখনও উকীল বাবুর ভায়র  
বালকদের অশান্ত অভিব্যক্তির চৈতন্য  
হইবে। তাঁহারা নিম্নলিখিত দ্বোক কর্তৃক  
পড়িয়া ভাবিবেন।

বেশ্যদিগেরো বায়ুঃ স্বভাবানুসঙ্গঃ।

গায়নে মোড়শাস্ত্রো ভোজনে বিংশতি স্থা ॥

চতুর্বিংশতুলিঃ পাস্থে নিদ্রাঃ বিংশদঙ্গুলিঃ।

মৈথুনে বটুপ্রাণভুক্তঃ ব্যায়ামে চ ততোধিকম্ ॥

স্বভাবেন্দ্র গতোমলে পরমায়ুঃ প্রবর্ততে চাস্ত-

রোদগতে।

আয়ুঃক্রমোদ্ধিকে প্রোক্তো মাকতে চাস্ত-

রোদগতি ॥

পবন বিজয়স্বরোদয় ॥

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রায়ঃ

১২ অঙ্গুলি বাতির গাওয়াই স্বাভাবিক।

গান গাহিবার সময় ১৬ অঙ্গুলি, ভোজনে

সময় ২০ অঙ্গুলি, দোড়াইয়া গেলে বা বেচ-

পথ চলিলে ২৪ অঙ্গুলি, নিদ্রাকালে ৩০ অঙ্গুলি

মৈথুনে (ইহাতে অষ্ট প্রকার মৈথুন বধা

মাইতে পারে) ৩৬ অঙ্গুলি, এবং ব্যায়ামকালে

তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে প্রাণবায়ু বহির্গত

হয়। যে ব্যক্তি যত স্বাভাবিক অর্থাৎ ১২

অঙ্গুলি বহির্গতি ঠিক রাখিতে পারেন, তিনিই

পরায়াস বৃদ্ধি করিতে পারেন। আর যদি প্রাণ

বায়ুর বহির্গতি অর্থাৎ পরায়াস দীর্ঘ হয়, তবে

উচ্চ বহুই দীর্ঘ হইবে ততই আমাদের প্রাণ

নাশ শীঘ্র হইবে। এই জন্য প্রাণসের প্রতি

সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোন

কারণে উচ্চ অস্বাভাবিক অর্থাৎ দ্বাদশাঙ্গুলি

বেশ্য হয়, তবে প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা ঐ

দ্বাদশাঙ্গুলিকে ৩ হাস ও খাস প্রাণসের মাত্রা

কমাইয়া দিয়া সেই ক্ষয় পূরণ করিতে হইবে।

আমাদের প্রাণায়াম হওয়ার আবশ্যক নাই

যে ব্যক্তি দ্বারা শরীরকে ক্ষয় করিয়া শরীরকে

বৃদ্ধি করিতে হইবে। প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা

শরীর অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইবে, শরীরের

ক্ষয়কে নিবৃত্তি করিবে, মনের চাক্ষুশ্য দূর করিয়া

মনকে একাগ্র কুবিবে, বুদ্ধি বৃত্তিকে সতেজ

তীক্ষ্ণ ও একাগ্র ও শুদ্ধ করিবে, শরীরকে

নীরোগ রাখিবে, কামকে দমন করিবে, আশা-

দিগকে দীর্ঘজীবী করিবে, শরীরে শীঘ্র কোনো

রোগ থাকিতে দিবে না,—যদি আসে শীঘ্র দূর

করিয়া দিবে এবং ইহকালে আনন্দ দান

করিয়া পরকালে সেই পরম রমণীয়কে দর্শন

বা তাহার সহিত মিলিত করিবে। (ক্রমশঃ)

## মুক্তিযোগ ও টোটকা।

( কবিরাজ শ্রীসুধা-শু ভূষণ সেনগুপ্ত )

পূরাতনস্বর।—(১) নিমপাতা, উচ্ছেপাতা, কালতুপসীব পাতা ও গোল মরিচ—সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে বাটিয়া ছোলাব মত বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে ইহার একটি করিয়া টেকা চোনার সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিলে কয়েকদিন মধ্যে বিষম জ্বর প্রশমিত হয়। (২) গোলমরিচ, নাটাব শাঁস ও গুলঞ্চ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা ও চিতামূল চূর্ণ ৩ তোলা, একত্র মিশাইয়া ছুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়। (৩) চিরতা, গুলঞ্চ ও পিপ্পল—প্রত্যেক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, সমান ভাগে মিশাইয়া লইবে। প্রাতঃকালে ইহা ছুই আনা হইতে চারি আনা পর্যন্ত মাত্রায় বিষম জ্বরে সেবন করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। (৪) ক্ষেপাঁপড়ার রস ১ তোলা ও শিউলির পাতার রস ১ তোলা—গরম করিয়া মধুর সহিত সেবনে বিষম জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। (৫) আনার রস, গুলঞ্চর রস, সিউলিপাতার রস, ক্ষেপাঁপড়ার রস—প্রত্যেকটি অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় লইয়া গরম করিয়া, প্রাতে ও বৈকালে ১ বার করিয়া সেবন করিলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। (৬) গুলঞ্চ, ক্ষেপাঁপড়া, বেলপাতা ও শিউলিপাতা—প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ ১ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র কুটিয়া আঙুনে গরম করিয়া যে রস বাহির হইবে, তাহা মধুর সহিত মিশাইয়া সেবনে জীর্ণ জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। (৭) আপাংয়ের রস

আখিন-৬

অথবা অপরাজিতার রসেব নদা লইলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। (৮) কণ্টকারী তেউড়ী, কেশুরিয়া, ক্ষেপাঁপড়া ও মুখা—প্রত্যেক দ্রব্য ১৭/১০ আনা ওজনে লইয়া, আধসেব ভলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া কয়েকদিন পান করিলে, পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

৪৩১মারে। (১) আম, জাম ও আমলকীর পাতার রস প্রত্যেকটি ১৭/১০ ওজনে লইয়া কিঞ্চিৎ মধু বা চিনির সহিত মিশাইয়া কয়েকদিন সেবনে রক্তাভীসার প্রশমিত হয়। (২) কুড়চির ছাল, দাড়িম ফলের খোসা, মুখা, বেলগুঁঠ ও ধাইফুল—প্রত্যেক দ্রব্য ১৭/১০ ওজনে লইয়া, আধসেব ভলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথে সেবনে রক্তাভীসার প্রশমিত হয়। (৩) জায়ফলের গুঁড়া, লবঙ্গের গুঁড়া, জীরাভাজার গুঁড়া ও সোহাগার খই—ইহাদের চূর্ণ সমানভাগে মিশাইয়া, প্রাতঃকালে চারি আনা পরিমিত এই ওষধে অল্প মধু দিয়া সেবন করিলে প্রবল আমাভীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (৪) কেবল মাত্র কুড়চির ছাল ২ তোলা, জল আধসেব, শেষ ৮০ পোয়া—এই কাথে একটু মধু মিশাইয়া কয়েকদিন পান করিলেও প্রবল আমাভীসার আরোগ্য হইয়া থাকে।

৪৩২মারে। (১) জায়ফল বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে অতি প্রবল অভীসারও আরোগ্য

হইয়া থাকে। (২) বেলগুঠি ও আমের আঁটির শাঁস—সমান ভাগে গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া অন্ন চিনির সহিত সেবনে অতীসার প্রশমিত হইয়া থাকে। (৩) বাবলা গাছের কচি পাতার রস ১ তোলা করিয়া, কয়েকদিন সেবনে অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (৪) কপূর, সাজিমাসী ও গোলমরিচ—প্রত্যেকটি অর্দ্ধ আনা, এই দ্রব্য কয়টি নীতল জল সহ বাটিয়া সেবন করিলে অতীসার রোগীর শূদ্র বেদনা আরোগ্য হইয়া থাকে।

আমাশয় রোগে। (১) পেয়ারাব কচি পাতার রস চারি আনা পরিমাণে দিবসে ১ বার করিয়া সেবনে আমাশয় রোগ নিবারিত হয়। (২) গন্ধ ভাঙ্গলার রস ২ তোলা অন্ন মধুর সহিত পান করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৩) আমরুল পাতার রস অর্দ্ধছটাক প্রাতে এবং বৈকালে পান করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৪) কুক্ষিম পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক একটু চিনির সহিত সেবনে আমাশয় রোগ সন্ধ্যা আরোগ্য হইয়া থাকে। (৫) কচি বনমূলা পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক করিয়া কয়েকদিন চিনির সহিত প্রাতঃকালে পান করিলেও আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়।

রক্তাশায় রোগে। (১) বাবলা গাছের কচি কুঁড়ি ১০ আনা—চিনির সহিত বাটিয়া প্রাতে ও বৈকালে একবার করিয়া সেবন করিলে রক্তাশায় রোগে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে। (২) আমরুলের শিকড় চারি আনা—গোল মরিচ আড়াইটা, জীরা আড়াইটা—একত্র বাসি

জলের সহিত বাটিয়া ৩৪ দিন সেবন করিলে রক্তাশায় রোগ প্রশমিত হয়। (৩) দুর্জার রস ১ তোলা করিয়া কয়েকদিন সেবন করিলে রক্তাশায় রোগ প্রশমিত হয়। (৪) কচি দাড়িমের পাতার রস ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্যন্ত কয়েকদিন সেবন করিলে রক্তাশায় রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণী রোগে। (১) পাকা কয়েদ বেলের পাতা-মিছুরির সহিত মিশাইয়া সমস্তদিনে ২৩ বার সেবনে গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয়। (২) শ্বেত চন্দন ও কপূর—একত্র পিষিয়া লইয়া নাভিমূলে প্রলেপ দিলে গ্রহণী রোগে উপকার দর্শিয়া থাকে। (৩) মুখা ও লবঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য ১০ আনা লইয়া উত্তমরূপে পিষিয়া লইবে। তাহার পর উহা অগ্নি সন্তাপে গরম করিয়া মধুর সহিত সেবন কবিলে গ্রহণী রোগের শাস্তি হইয়া থাকে।

অশ রোগে। (১) হরীতকীর গুঁড়া ১০ তোলা ও চিনি ১০ তোলা জলের সহিত শয়নকালে সেবনে অশরোগ নিবারিত হয়। (২) মাখন ও মিছুরি প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা, নাগেশ্বর ফুলের রেণু ১০ তোলা একত্র মিশাইয়া কয়েকদিন সেবনে অশ উপশমিত হয়। (৩) উচ্ছে পাতার রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবনে অশ রোগের শাস্তি হইয়া থাকে। (৪) বনআদা ও আদা সমান ভাগে বাটিয়া সেবনে অশরোগের শাস্তি হইয়া থাকে।

(ক্রমঃ)

## শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

—১০—

(কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরর এম-এ, এম বি)

বাসের কষ্টে।—খাসের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য আমড়া পোড়াইয়া তাহার খোসার পরেই খোসার পদার্থ থাকে, তাহা ও প্রবাতন যত একত্র মিশাইয়া বক্ষস্থলে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। শিশুদিগের বৃকে সর্দি বসিলে ইহার প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সমস্ত দিনে ৩ বার মালিশ করিতে হইবে। শুক স্লেমা সরল করিবার পক্ষে ইহা অমোঘ ঔষধ।

ঘৃষ্মিতে।—শিশুদিগের বৃকে সর্দি বসিয়া বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া উঠিলে, আদার রস ও মধু—সমান ভাগে লইয়া অগ্নি সন্তাপে আদার রস শুকাইয়া, শুধু মধু মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। ইহা সমস্ত দিনে ২৩ বার অন্ন অন্ন করিয়া সেবন করাইলে প্রবল শুল্কি বোগে মন্ত্রশক্তির মত ফল পাওয়া যায়। শিশুদিগের ব্রঙ্কোনিটমোনিয়া বা ব্রঙ্কোইটিসে—যেখানে অনেক ঔষধ ব্যর্থ হইয়া থাকে, সেখানেও এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

সর্দিতে।—শিশুর সর্দিতে খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া দুই পায়ের তলার রাত্রিতে উত্তম-রূপে মালিশ করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। শিশুর গুঁড়া ও মধু, তুলসীর রস ও মধু, আদার রস ও মধু—এইরূপ অবস্থার বিশেষ উপকারী।

ক্রিমিতে।—পালিধামাদারের পাতার রসে অন্ন মধু বা চিনি মিশাইয়া প্রাতঃকালে একবার

করিয়া সেবনের ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রসের পরিমাণ ১ বৎসরের শিশুর পক্ষে ১ বিল্লুর এক অষ্টমাংশ;—ঐ হিসাবে মাত্রা বাড়াইয়া ১০।১২ বৎসরের বালককে এক বিল্লুর পর্য্যন্ত সেবন করান চলে। ১ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর পক্ষে বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও মধু উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। মাত্রা ১ বৎসর পর্য্যন্ত এক রতি বা দুই ত্রৈণের এক চতুর্থাংশ। ক্রিমির সহিত পেটের দোষ থাকিলে টাটকা কালমেঘের রস ও মধু ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। একট্রাট্ট কালমেঘ অপেক্ষা কাঁচা কালমেঘে সত্ত্ব উপকার দর্শে। কালমেঘের বীড়ি করিয়া সেবন করাইলেও কাঁচা কালমেঘের মত ফল পাওয়া যায়।

অতীসারে।—সোহাগার খই শিশুর অতীসার নিবারণের মহৌষধ। বাজার হইতে সোহাগা কিনিয়া আগুনে পোড়াইয়া লটুলেই খই প্রস্তুত হইবে। ১ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে এই খই অর্দ্ধ রতি, একটু চিনি কিম্বা মধুর সহিত মিশাইয়া প্রাতে একবার করিয়া সেবন করাইতে হয়। অতীসার দোষ অধিক থাকিলে প্রাতে ও বৈকালে ২ বার করিয়াও সেবন করান চলে। ১ বৎসরের পর ৩ বৎসর বয়স্ক শিশুকে ইহা ১ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। তাহার পর বয়স বিবেচনার মাত্রা নির্ণয় করিতে হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধতার।—যষ্টিমধুর গুঁড়া গরম তুণ্ডের সহিত সেবন করাইলে শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতার

উপকার দর্শে। ১ বৎসর বয়স্ক শিশুর জ্বর ১ বতি, ঐ হিসাবে মাত্রা বাড়াইতে হয়।

অজীর্ণে—শিশুর অজীর্ণ দোষ নিবারণের জন্য এক মাত্র চূর্ণের জলই মহোষধ। অজীর্ণ নিবন্ধন শিশুর যখন দুধ তোলা রোগ উপস্থিত হয়, তখন ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শিশুর দুধ তোলা রোগে এ ব্যবস্থায় ফল পাওয়া না যাইলে, আন্নকে শী, পট ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে হইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া অন্ন অন্ন লেহন করাইলে উপকার দর্শিয়া থাকে।

চক্ষু উঠা রোগে—সেওড়ার আটায় কাজল পাতিয়া চক্ষুতে সেই কাজলের অঞ্জন দিলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

হৃৎকায়। শিশুর হৃৎকায় চেষ্টনা সম্পাদনের জন্য একখানি হরিদ্রা আঙুন উত্তপ্ত করিয়া কপালে অন্ন তাপ দিলে চেষ্টনা সম্পাদিত হয়। যদি ইহাতে চেষ্টনা সফল না হয়, তাহা হইলে নিশাদল ও চূর্ণ একত্র মিশাইয়া শিশুর নাসিকার নিকট ধরিলে চেষ্টনা সফলিত হয়। শিশুর হৃৎকায় অনেক কারণে উপস্থিত হয়। অন্ন বেশী হওয়ায় জন্য হৃৎকায় হইলে, চোখে মুখে ও মাথায় ঠাণ্ডা জলের ছাটি দিবে। হৃৎকায়ের জন্য হৃৎকায় হইলে কিছু বেশী পরিমাণে রাষ্টসরিষবে গুড়া গরম জলের সহিত মিশাইয়া, ঐ জলে একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া, তাহাতে হাঁটু পর্যন্ত শিশুর পা ডুবাইয়া রাখিবে। এইভাবে কিয়ৎকাল রাখার পর ময়দা ও রাই সরিষার গুড়া একত্র জলে মিশাইয়া লইয়া—শিশুর দুই পায়ের ভিমে উহার পট বসাইয়া দিবে এবং হাতে, পায়ে ও বগলে আঙনের দোক দিবে, হাতে, পায়ে ও বগে গুঠের

গুড়া মালিশ করিবে। ক্রিমি জন্য তড়কায গরম জল পূর্ণ একটি পাত্রে শিশুর গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখা উপকারী। একপ করিয়া আধ হাত উচ্চ স্থান হইতে মস্তকে শীতল জল ঢালিতে হয়। \* এইরূপ ব্যবস্থায় শিশু যখন সুস্থ হইবে, তখন দুধের সহিত এরগু তৈল সেবন করাইয়া—দান্ত করান উপকারী। সকল প্রকার তড়কাতেই দান্ত পরিকারের প্রতিকার রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ধনুষ্কায়।—তড়কা নিবারণের জন্য যে সকল উপায় বিধি বলা হইল, সেই সকল উপায় বিধি অবলম্বনে ধনুষ্কায়েরও ফল পাওয়া যায়। ইহার পর মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত। যে পর্যন্ত স্তন্যপানের শক্তি না জন্মায়, সে পর্যন্ত স্তন্যদুগ্ধ গালিয়া লইয়া কিছুকৈ পূর্ণ করিয়া পান করান কর্তব্য। এই অবস্থায় উদরে শীতল জল সেচন এবং তর্পিন তৈল ও এরগু তৈল একত্র মিশাইয়া উদরে মালিশ করিলে ফল পাওয়া যায়।

মুখে ঘায়ে।—সোহাগার খই—মধুর সহিত মিশাইয়া মুখে লাগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ভেড়ার দুগ্ধ লাগান এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

কাণপাকায়।—শিশুর কাণ পাকিয়া পূর্ব নির্ণত হইতে থাকিলে গরম জল কিম্বা কাঁচা দুগ্ধ ও জলসহ পিচ্কারির সাহায্যে কর্ণ ধৌত করিয়া তাহার পর উত্তমরূপে উহা মুছাইয়া দিয়া ২১৩ কোটা আভর কর্ণ মধ্যে ঢালিয়া দিলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। ফটুকির জলের ফুট দিলে কিম্বা আলতা গরম করিয়া তাহার ফুট দিলেও কাণপাকায় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

## পান দোষ ।

—:~:—

( ত্রিযোগেশ্চন্দ্র চক্রবর্তী । )

যে সকল কারণে আমাদের দেশের স্বাস্থ্য  
 ৩ আর্থিক অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইতেছে,  
 যদিকাংশ লোকের অস্বাস্থ্যিক পরিমাণে মত্ত-  
 পানে অভ্যস্ততা তৎসমুদয়ের অন্ততম। কত  
 চাল ঘাটত যে এ দেশ সুরাকুহকিনীর কুহক  
 হালে সমাচ্ছন্ন, বিশেষজ্ঞগণই তাহা বলিতে  
 পারেন। যাহার মায়ায় ভুলিয়া শতসহস্র  
 লোক অহরহঃ অজ্ঞান অর্থ অনায়াসে অপব্যয়  
 করিতেছে,—নানারোগে আক্রান্ত হইয়া  
 অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছে, ধর্ম কৰ্মে  
 বনাসক্ত হইতেছে, সেই সুরা-মায়াসুপীয়া মায়া  
 পাশ যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইলে  
 দেশোন্নতির আশা কিছুতেই করা যাইতে  
 পারেনা।

মানবমাত্রেরই কোন না কোন ধর্মাবলম্বী  
 এবং প্রায় সকল ধর্মশাস্ত্রেই মত্তপান মহাপাপ  
 বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাসংহিতায় লিখিত  
 হইয়াছে।—

“ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেরং গুরুতরপাপমঃ ।

মহাস্তি পাতকাত্মকঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃসহ ॥”

মহাসংহিতা ১১শ অঃ ৫৫ শ্লোক ।

“ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য, গুরুপত্নী-  
 গমন এবং তাদৃশ দোষীদের সহিত সংসর্গ এই  
 পাঁচটি মহাপাতক বলিয়া কথিত হইয়াছে।”

ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির জ্ঞান সুরা-  
 পানও মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে বটে,  
 কিন্তু তাহের বিষয় এই যে, শিক্ষিত অশিক্ষিত  
 শতসহস্র হিন্দু জানিয়া শুনিয়া সেই মহাপাপ  
 পতন ঘণ্টা করিয়া আসিতেছেন ।

ধর্মপুস্তকে মত্তপানের বিধি না থাকিলেও  
 অত্যন্ত ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যেও অনেকেই  
 অনেক দিন হইতে স্বধাত্মে সুরা-বিষ গলাধঃ-  
 করণ করিয়া আসিতেছে। যাহারা ধর্মমত  
 মানেন না, মত্তপানরূপ ঘৃণাকর্ম করিতে ভ্রমেও  
 যাহারা বিরত হয় না, উচ্চ-শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত  
 কুলোদ্ভব, ধনবান হইলেও তাহারা কিছুতেই  
 সজ্ঞানের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না। যাহারা  
 ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম করিতে পশ্চাৎপদ হয় না,  
 কিছুতেই তাহারা প্রকৃত স্বথের অধিকারী  
 হইয়া সময় ব্যাপন করিতে পারে না।—কখনও  
 তাহাদের—মন, ভয়, সংশয় ও বিবাদশূন্য  
 হয় না।

সজ্ঞান মাত্রেরই সুরাপানের অপকৃপাতী।

কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, চিকিৎসক  
 গণ রোগবিশেষেও অবস্থান্তরে পরিমিত মাত্রায়  
 সুরাপানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এ কথা  
 সত্য হইলেও ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে  
 যে, কেহ কোন একটি অভ্যাসের বশবর্তী  
 হইলে, উহা পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে  
 অসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ সকলেই অভ্যাসের  
 দাস। যদি কেহ পরিমিত মাত্রায় পানাত্যস্ত  
 হয়, তবে সে কন্ঠিনকালেও উহা ত্যাগ  
 করিতে পারে না। বরঞ্চ ঐ অভ্যাস দিন  
 দিন বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। যাহারা  
 পানাসক্ত নহেন, এমন কি সুরা স্পর্শও করেন  
 না এবং যাহারা ব্যবস্থামত পরিমিত ভাবে  
 উহা পানে অভ্যস্ত হন, তাহাদের মধ্যে  
 শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য ইহাই লক্ষিত

হয় যে, প্রথোমোক্ত ব্যক্তিগণ চিরকাল স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করেন এবং শেষোক্ত লোকেরা ক্রমে পরিমিত হইতে অপরিমিত মাত্রায় পানাস্ত হইয়া স্বাস্থ্য, সন্ধান, অর্থ ইত্যাদি নষ্ট করিয়া থাকেন। ইহা বুঝিয়াই অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সকলকেই পানাসক্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন। চরক সংহিতায় লিখিত হইয়াছে :—

‘নিবৃত্তঃ সর্ক্সমদোভো নরো যঃ স্তাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।  
শারীরৈর্মর্মানসৈ ধীমান বিকারৈর্গ সংযুক্তো।’

চরক সংহিতা।

“যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ক্সপ্রকার মত্ত হইতে নিবৃত্ত থাকেন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি কখন শারীরিক বা মানসিক রোগগ্রস্ত হন না।”

সুরাপানের জন্য সুরাদান ও গ্রহণও অত্যায়। কারণ উহা দান করিলে গ্রহীতাকে এবং গ্রহণ করিলে নিজেকে কিংবা অপরকে পানে প্রলোভিত করাষ্ট। ইহার ফলে সকলকেই রোগ হাতনা ভোগ করিতে হয়।

দ্বীতপ্রধান দেশের লোকগণ মত্তপানে বিশেষভাবে অন্তর্য বটে, কিন্তু সেই দেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকবৃন্দ ইহার যোর অনিষ্টকারিতা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। চিকিৎসকপ্রবর শ্রীযুক্ত সুনরীমোহন দাস এম, বি, মহাশয় তাঁহার ‘স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে’ বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের যে সকল সূক্ষ্মপূর্ণ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে দুই চারিটা নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল।—

‘সুরা মানুষকে প্রথমতঃ বালকরূপে এবং অবশেষে পশুরূপে পরিণত করে।’

‘পরিমিত মত্তপান পরিণাক কিয়ার সাহায্য না করিয়া বরং বিয় জন্মায়।’

‘কোন মানুষ বলিতে পারে না—কখন সে সীমা অতিক্রম করে। সে আপনাকে পরিমিত পানী মনে করিতে পারে, অথচ যে পরিমাণ তাহার দেহ সস্থ করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক প্রতিদিন পান করিতেছে এবং তাহার দক্ষিণ দেহের কোন অংশ ধীরে ধীরে রোগগ্রস্ত হইতেছে। পরিমিত পানীর আপাততঃ বিপদ না হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ সম্পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। (স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ৮৫ পৃঃ)।

আমাদের দেশের বর্তমান সময়ে অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তার-কবিরাই মত্ত বিবৎ বলিয়া মত প্রকার করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া দেশ বিদেশের নীতি শাস্ত্রজ্ঞগণও ইহার অনিষ্টকারিতা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাবু জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘হরিদাসী’ উপন্যাস, এদেশে আরও অনেক লেখকের, ও Mr. Hal Cane, Mrs. Henry Wood প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক-লেখিকার উপন্যাস ও Mr. Todd প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায়।

দেশ বিদেশের সজ্ঞানমাজেই সুরাপানের বিধময় ফল প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশ লোক জানিয়া শুনিয়াও কেন যে সেই সুরা অমৃতস্রোত পান করিয়া প্রকৃত স্বখে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা জগদ্বন্দ্ব কল্পা মনসদূশ ক্ষুদ্রবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সাধ্যাতীত।

এই হুজিৎনেও মদ্যপানীর সংখ্যা কিছুমান হ্রাস পায় নাই। গত ১৮১৮ সালে একমাত্র কলিকাতা নগরে যে পরিমাণ মদ্য বিক্রীত হইয়াছে, তাহার দ্বিগুণ হিসাব নবাব পুত্র



হইতে উদ্ধৃত হইল;—জাহ্নয়ারী—১ লক্ষ ৯ হাজার ৪০ সের; ফেব্রুয়ারি—১ লক্ষ ১২ হাজার ১৩০ সের, মার্চ—১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৩৫ সের, এপ্রিল—৮৮ হাজার ৪২৫ সের, মে—১ লক্ষ ৮ হাজার ৮১৫ সের; জুন—১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৮০ সের; জুলাই—১ লক্ষ ১২ হাজার ২৫ সের; আগষ্ট—১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫২৫ সের; সেপ্টেম্বর—১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৩৫ সের; অক্টোবর—১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৩৫ সের; নবেম্বর—১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৫৫ সের; ডিসেম্বর—১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৬৫ সের। এই হিসাব পাঠ করিয়া অন্তান্ত স্থানের বিক্রীত মদের পরিমাণ এবং দেশের কত লোক কু অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া কত অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনেও যদি লোকের চৈতন্যোদয় না হয়, তবে আর কখন হইবে?

আমেরিকার প্রায় সকল অঞ্চল সুরা-রান্সসীর করাল কবল হইতে চিরমুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে সে সকল স্থানের গরীব অধিবাসীরা (যাহারা "পূর্বে মদ্যপানে মত্ত থাকিত) অন্নদিনের মধ্যেই বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। সাধু নিহাল সিং লিখিয়াছেন। 'Wherever alcohol has been banished in America, poverty and dependence upon charity has been reduced. homes shows signs of affluence, the deposits in banks especially saving banks have risen and facilities for education have increased.' (Modern Review, May 1919).

আমেরিকাবাসী যদি বিষবৎ মদ্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তবে আনাদের দেশের

লোকেরা তাহা পারিবেনা কেন? সমাজের নেতাদের মধ্যে অনেকেই অনেক কারণে অকারণে সামাজিক শাসনে শাসিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কি মদ্যপানীকে ধর্ম ও নীতি বিরুদ্ধাচরণকারীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারেন না? পানদোষ প্রভৃতির বিলোপ সাধন করিতে না করিলে যে সমাজের উন্নতি কিছুতেই হইতে পারে না, তাহা কি ভ্রমেও চিন্তা করেন না? পানদোষ নিবারণে যদি তাঁহারা বিশেষ যত্নবান না হন, তবে তাঁহাদের সমাজপতি বলিয়া গর্বান্বিত করা বৃথা। পানদোষহুই লোকদিগকে সামাজিক শাসনে শাসিত করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করা তাঁহাদের একান্ত কর্তব্য।

ত্রিকালজ্ঞ অধিগণ বাহা অদেয়, অপেয় ও অগ্রাহ্য বলিয়াছেন, দেশ বিদেশের অভিব্যক্তিগত ও নীতিপরায়ে লোকগণ বাহা অপকারিতা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন বাহা পানে ধর্ম, অর্থ, স্বাস্থ্য সকলই লুপ্ত হয় আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী কর্তৃক যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা—এই সুরা বাহা যে দেশ হইতে চিরকালের নিমিত্ত বর্জিত হইয়া তাহা করা, দেশকল্যাণকামী সকলেরই প্রাথমিক কর্তব্য।

সুরা-কুহকিনীর কুহকজাল সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে, দেশ বিদেবীন্দ্রের এমিষয়ে সংবাদে হুই এক শক্তি লিখিলে কিরা অসম সময়ে সভা সমিতিতে বৎসামাত্র বক্তৃতা প্রদান করিলে চলিবে না। খোস মেসার্স সাহিত্যে উলাসকগণ একাল ও সেকালের কষিবে দলোচনায়, ভাষা-সংস্কারকগণ বানান সম্র

প্রভৃতি বিষয়ে এবং দেশনায়কবৃন্দ স্বায়ত্ত শাননের দাবীরূপে আলোচনায় সময় ব্যয় করিলে মদ্যপগণের পানাত্যাস অপনীত হইবে না, দেশবাসী রোগ, দৈন্ত্যনির হাত

হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না। ইহা নিবারণার্থ তাঁহারা সবিশেষ ব্রতবান হন, ইহাই আমাব প্রার্থনা।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:—:—

মহীশূরে আয়ুর্বেদ শিক্ষা।—

মহীশূরে আয়ুর্বেদ কলেজের উন্নতি ও সংস্কার কল্পে মহীশূর গবর্ণমেন্ট ত্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা ঐ কলেজের আয়তন বৃদ্ধির জন্ত ৭০ হাজার টাকা এবং প্রাথমিক খরচে জন্ত ১২ হাজার ১ শত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় আমরা সুখী হইয়াছি।

নৃতন চিকিৎসা প্রণালী।—

“ত্রিপুরা ত্রিভবীতে” প্রকাশ, মেদিনীপুর জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমিনাথ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। সম্প্রতি তিনি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী পরিত্যাগ পূর্বক নৃতন প্রণালীতে রোগ, চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন না। তিনি মানসিক ক্রিয়া দ্বারা রোগীর মনে এক প্রকার শক্তি সঞ্চার করেন। তিনি এই চিকিৎসা প্রণালীর সাহায্যে—ত্রিপুরা, দিল্লী, আগ্রা অনেক রোগীকে যোগমুক্ত করিয়াছেন। বাঁহারা আয়ুর্বেদ পাঠ করিয়াছেন; তাঁহারা এ সংবাদে কিছু আশ্চর্য্য হইবেন না।

রোগ ও ছুর্ভিক্ষ।—ভারতে যেমন ভূভিক্ষ বাড়িয়াছে, সকল প্রকার রোগও তেমনই সমগ্র ভারত জুড়িয়া বলিয়াছে।

ফলতঃ খাদ্য দ্রব্যের দুর্লভ্যতা নিবন্ধন ভারতবাসী যথোপযুক্ত আহাৰ্য্য না পাওয়াই ভারতবাসীর রোগ বৃদ্ধির কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। সহযোগী “হিন্দুস্থান” গত ২৯শে শ্রাবণের সংখ্যায় “কি ছিল, কি হইয়াছে!” শীর্ষক প্রবন্ধে একশত বৎসর পূর্বে, ৬৬ বৎসর পূর্বে এবং ৩০১৩ বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল, নজীরসহ যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, একশত বৎসর পূর্বে বালাম চাউলের মৌন ১১৮/০ ছিল, উত্তম গব্য ঘৃত ২০/ ছিল, মাঝারি গব্য ঘৃত ১৬/ টাকার বিক্রীত হইত, ভয়েসা ঘৃতের মৌন ছিল ১৬/। ৬৬ বৎসর পূর্বে চাউলের মৌন ছিল ১০/০, কলাইয়ের মৌন ছিল ১০/ আনা, ৩০১৩ বৎসর পূর্বে চাউলের মূল্য ছিল টাকায় অর্ধ মৌন, খাঁটি সরিষার তৈলের মূল্য ছিল চারি আনা সের। গব্য ঘৃত তখনও টাকায় পাঁচ পোয়া দরে এবং খাঁটি দুগ্ধ টাকায় বোল সের দরে বিক্রীত হইত। এখন লোকে আগের অপেক্ষা অর্থ উপার্জন অনেক বেশী করিতেছে বটে, কিছু দুর্লভ্যতা নিবন্ধন পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশের রোগ বৃদ্ধির সকল কারণগুলির মধ্যে ইহাই যে সর্বপ্রধান—ইহা নিশ্চিত রূপে বলা হইতে পারে।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১র্থ বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—কার্তিক।

২য় সংখ্যা।

বঙ্গ বিজয়া।

—:—:—

( শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত )

থেমে গেল কোলাহল, শাস্ত পল্লীগুণি,  
নগরী মুখরী পুনঃ তুলি' শত বুলি।  
কর্ম্মগত জীব পুনঃ করমে মগন,  
বিশ্ববাসী পুনঃ যেন আগেরি মতন।  
ক্ষীণ কণ্ঠে আলাপন তাই 'সাহানাব'—  
জানাইছে দিন ওগো আজি বিজয়ার।

(কিস্তি) কে বিজিত—কে বিজেতা? বঙ্গে তা' তো নাই,  
কিসের আনন্দ তবে আজি মোরা পাই?  
'রামের' বিজয়োৎসব 'রাবণ' নিধনে,—  
মোদের বিজয়োৎসব 'রোগে'র পীড়ণে!  
জেলিহান লোল জিহ্বা বিস্তারি' রসনা—  
গ্রাসিতেছে 'ম্যালেয়িয়া' বিকট বদনা।  
'ইনকুয়েঞ্জা' ভয়ঙ্করী নাশিতেছে বঙ্গ,  
'কলেরা বসন্ত' জ্বালি' করিতেছে রক্ত!

কত শিশু অকালেতে ছাড়িছে ধরণী,  
 'যক্ষ্মা'য় মরিছে কত যুবতী ঘরণী।  
 বঙ্গবাসী মরে যত—এমন মরণ,  
 কোনো দেশে কোনো কালে হয়না কখন।

রোগের বিষম জ্বালা দৈত্য অবতংস,  
 কেবা আগুয়ান বল করিবারে ধ্বংস ?  
 তবে কেন বিজয়ার বাজিবে বাজনা ?  
 বিজয়া নাটক বঙ্গে—কেবল বেদনা !  
 বিজয়া উৎসবে মত্ত হইব তখন,  
 বোগাস্ত্রব দেশ ত'তে মাড়িবে যখন।

## কাজের কথা।

বাস্তালায় ব্যাধি—সোণাল বাঙ্গালা  
 অংশে হইতে পড়িয়াছে। পল্লীগানে মাঝে  
 রিয়ার অংশে লোক মরিতেছে, সতরে দশবার  
 মপেঠ লোকক্ষয় ঘটিতেছে। ইহা ছাড়া প্লেগ,  
 কলেরা, বনগু, প্রভৃতি সাময়িক ব্যাধিতে  
 লোকক্ষয় তো আছেই! তাহার উপর গত  
 বৎসর ইনফ্লুয়েন্সা-নিউমোনিয়া নামক হ্রস্ব  
 ব্যাধি করাল-বদনবাদ্যানে যেরূপ অগণিত  
 লোকক্ষয় করিয়াছে, তাহাতে উহার পুনরাক্রমণ  
 ঘটিলে সত্য সত্যই বাঙ্গালা দেশ যে অশান  
 সদৃশ হইয়া পড়িবে, ইতা সুনিশ্চিত। কল  
 কথা বঙ্গভূমি যেরূপ ব্যাধিগ্রবণ হইয়া  
 পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের সকল চিন্তা  
 অপেক্ষা সর্বাগ্রে আত্মরক্ষার চিন্তা করা প্রধান  
 কর্তব্য। দেশ রক্ষার অধিনায়ক—সরকারী  
 বাহ্য কর্মচারিগণ অবশ্য একত্রে বিশেষ চিন্তা

করিতেছেন, কিন্তু শুধু তাহাদের চিন্তায়  
 নির্ভর করিলে চলিবে না,—প্রত্যেক দেশ-  
 বাসীকেই ইহার প্রতীকারকরে সচেষ্ট হইতে  
 হইবে।

উপায় চিন্তন—প্রতীকারকরে সচেষ্ট  
 হইতে হইলে বাঙ্গালীকে সর্ব প্রথম  
 সংযমব্রত শিক্ষা করিতে হইবে। সেই সংযম  
 ব্রত শিক্ষায় অভাবেই তো বাঙ্গালার সর্বনাশ  
 ঘটিতেছে, ইহা নির্ভাল সত্য কথা। বাঙ্গালীর  
 ছেলেকে হাতে খড়ি দেওয়ার পর হইতে  
 তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিকরণে  
 ভূষিত করিবার জন্য বাঙ্গালীজনক যেরূপ  
 চেষ্টাশীল হইয়া থাকেন, তাহাকে সংযমব্রত  
 শিক্ষা দিবার জন্য সেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন  
 কি? কল কয়েকটি বেরপ শিক্ষা দিবার

ব্যবস্থা, তাহাতে সেখানেও সেরূপ কোনো শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত নাই! কাজেই বাঙ্গালী সংযমী হইবে কেমন করিয়া! বাঙ্গালী বিদ্যো-পার্জন করে—অর্থ উপার্জনের জন্য,—জ্ঞান-পার্জনের কামিনায় বা সংযমী হইবার আকাঙ্ক্ষায় বাঙ্গালী বিদ্যা শিক্ষা কবে না,—কাজেই স্বাস্থ্য বক্ষার মূল যে ধর্ম প্রবণতা—বাঙ্গালী তাহা মানিতে পারে না, বাঙ্গালীর রোগবাহুল্যের কারণট ইহাই ।

অনু করণে অনিষ্ট — বাঙ্গালী-বালক প্রাথমিক শিক্ষাকাল হইতে কোনো ধর্মমূলক শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ তো প্রাপ্ত হয়ই না, তা' ছাড়া অনু করণে অনিষ্ট উৎপাদন করিবার শিক্ষাটি বাঙ্গালী-বালক নানা প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বাঙ্গালী পিতা প্রাতে মানসিক কর্তব্যের পূর্বেই গরম গরম চায়ের পেয়ালা লইয়া নিস্তেজ দেহখানিকে অণেকের জন্য যবন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালী-শিশুও তাহার প্রসাদলাভে বঞ্চিত হয় না । চায়ের মত উগ্র দ্রব্য ব্যবহারে ইংলও প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে উপকার হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশ যে গ্রীষ্মের উর্ধ্ব ভূমি,—এদেশের লোকের পক্ষে চায়ের মত উগ্র দ্রব্য ব্যবহারে পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যত্যয় স্বভাবতঃই হইবার কথা । বাঙ্গালী-পিতা বহুকালজাত মোতাতে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, আনিয়া উনিয়া ও তাহার পক্ষে আর এ নেশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই—বাঙ্গালী-শিশুও কিন্তু সে কথা শুনিল না,—তাহাকে সে কথা কেহ বুঝাইলও না,—কলে সাহেবদের অনু করণে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে চায়ের মত দ্রব্য প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীর যে কি সর্বনাশই

করিতেছে তাহা বুঝাইতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া পড়ে !

\* \* \*

আহারে স্বাস্থ্যপালন—আহারের সহিত স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধ যে সুসংবদ্ধ, সে কথা আমরা অনেক বারই বলিয়াছি । বাঙ্গালী যখন সে কথা মানিত, তখন বঙ্গভূমি বোগের আকরভূমি হয় নাই । আধাশস্ত্রে যে স্বস্থবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, বাঙ্গালী আগে তাহার প্রত্যেক বিষয় পালন করিত । প্রাভাতিক মান পূজা আঙ্গিকের ব্যবস্থায় যে স্বতঃই স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া থাকে, এ কথা কি এখনকার বাঙ্গালী মানিতে চাহেন? আগেকার বাঙ্গালী কিছু মানসিক দেহ ও চিত্তশুদ্ধি না করিয়া কোনো দ্রব্য আহার করিতেন না । প্রাভাতিক মান ও পূজা আঙ্গিক সমাপনের পর বাঙ্গালীর যে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান দ্রব্য থাকিত—আদা ও ছোলা ভিজা,—এ কথা আমরা অনেকবারই বলিয়াছি । ফল আদায় ক্ষুধা বৃদ্ধির কার্য করিত, পাকস্থলীর ক্রিয়া সুপরিষ্কৃত হইত; আর ছোলাভিজা ভক্ষণে পিত্ত প্রশমনের কার্য করিত । তাহার পর মাধ্যাহ্নিক আহারেও বাঙ্গালী যে সকল দ্রব্য আহার করিত, তাহার মধ্যে দুগ্ধ দ্রব্যাদি পুষ্টিকর খাদ্যসকলের ব্যবস্থা থাকিত । এখন সে দুগ্ধ দ্রব্যাদি একরূপ হস্তাপাই হইয়া পড়িয়াছে অনেকের ঐ দুইটি দ্রব্য খাইবার প্রবৃত্তিও নষ্ট হইয়াছে । বাঙ্গালী এখন সর্বোদয় হইতে না হইতেই শয্যা ত্যাগের পূর্বেই চায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত, মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় দুগ্ধ দ্রব্যের পরিবর্তে কতকগুলি অসার দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত । তাহার উপর বাঙ্গালী ধর্ম শিক্ষা বঞ্চিত,

কাজেই চিত্তসংযমেও তাহার শিক্ষা নাই, সকল দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালী অধিক রোগ-প্রবণ হইবে না তো হইবে কাহার? সকল দেশের লোকের অপেক্ষা বাঙ্গালীর মৃত্যুও তো এই জন্য অধিক।

ব্রহ্মচর্য্য পালন—ইহার উপর বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যপালনের শিক্ষা একেবারেই নাই। চিত্ত সংযমের শিক্ষা বাঙ্গালী প্রাপ্ত হয় নাই, কাজেই ব্রহ্মচর্য্যপালনের শিক্ষা সে পাইবে কোথা হইতে? ফলে ব্রহ্মচর্য্যপালনের শিক্ষা না থাকায় “মরণ বিন্দুপাতন”—এ কথা বাঙ্গালী এখন আর মানিতে চাহে না। পূর্বে বালাজীবনে তো ব্রহ্মচর্য্যপালনের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবেই পালন করা হইত, তা'ছাড়া পরিণত বয়সেও তিথি-নক্ষত্র দেখিয়া, পক্ষদিন বাছিয়া তবে স্ত্রী-পুংমিঃনের ব্যবস্থা হইত। এখন সে ব্যবস্থা একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যে ফুসফুসেব পীড়ায় সকল পীড়া অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে, ইহার একমাত্র কারণই সংযমের অভাব। একে পুষ্টিকর আহাৰ্য্য বাঙ্গালী আহ্বার করিতে পায় না, তাহার উপর শুক্রকর জনিত অসংযমী বাঙ্গালীর পাকস্থলীর ক্রিয়া সহজেই বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। সেই পাকস্থলীর ক্রিয়ার বিকৃতির ফলেই বাঙ্গালীর হৃদপিণ্ড দুর্বল হইয়া বাঙ্গালীর দেহ নানা রোগের আকারে ভূমি হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী যতদিন এ সকল কথা না বুঝিবে, ততদিন যে বাঙ্গালীর মঙ্গল নাই—ইহা স্থানিষ্ঠিত।

### বাঙ্গালী রমণী—বাঙ্গালী-রমণীদিগের

স্বাস্থ্যও নানা কারণে ভয়প্রবণ হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী-পুরুষের চিত্তসংযমের শিক্ষা নাই, কুসুম কোমল প্রাণা মহিলা জাতি সে শিক্ষা পাইবে কোথা হইতে? তাহার উপর এখনকার বাঙ্গালী-পুরুষ নিজেদের বাবুয়ানীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে গিয়া তাঁহাদের অঙ্কলক্ষ্মীদিগকেও এক একটি আদর্শ বিলাসিনী গড়িয়া তুলিতেছেন! তাহারই ফলে বাঙ্গালী-মহিলাগণ একেবারে শ্রম-বিমুখা হইয়া পড়িতেছেন। পূর্বেকার বাঙ্গালী-রমণীগণ শ্রমবিমুখা ছিলেন না, তাঁহারা অতি প্রভাষে শয্যা পরিত্যাগের পরেই গৃহস্থলীর কর্ম সকলে মনোতিনিবেশ করিতেন। সেই গৃহস্থলীর কর্ম সম্পাদনেই তাঁহাদের পরিশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন হইত। এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী-রমণীকেই গৃহস্থলীর কর্ম নির্বাহ করিতে হয় না,—দাস-দাসীতে সে সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহার উপর নাটক নবেলের মত আদিরস ঘটিত পুস্তকগুলি পাঠে চিত্ত সংযমের প্রবৃত্তি তাঁহাদের একেবারেই তিরোহিত হইয়া থাকে। ফলে আলস্ত-পরতন্ত্রতাই এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী-রমণীর যে স্বাস্থ্যহানির কারণ—ইহা অবিসংবাদিত—সত্য কথা। কিন্তু বাঙ্গালী-পুরুষ এ সকল কথা না বুঝিলে বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করিবার উপায় কিছুতেই হইবে না।

## আয়ুর্বেদের ইতিহাস।

নং. ১২১

—:—

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম এ, এল, এম্. এস)

(পূর্বস্বত্তি)

(ক) অগস্ত্য সংহিতা—মহর্ষি অগস্ত্য ইচার প্রণেতা বলিয়া কথিত। বঙ্গসেন বলেন, এই গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি তাঁহার সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ প্রচার প্রসঙ্গেও অগস্ত্য সংহিতার বিষয় লিখিত হইবে।

(খ) কোপালিক তন্ত্র—ইহা কোপালিকের রচিত শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থ।

অশ্ব, গজ ও গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন সংহিতা ছিল। তন্মধ্যে তিন ধানি পরিচয় লিখিত হইতেছে।

(১) শালিহোত্র সংহিতা। ইহা অশ্ব চিকিৎসার গ্রন্থ এবং এক্ষণে দুর্লভ হইলেও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বে আরবেরা এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া “শালাটোর” নাম দিয়াছিল। এই সংহিতা অবলম্বনে লিখিত নৃগুণকৃত এবং জয়দত্তস্বরিকৃত “অশ্ববৈজ্ঞানিক” এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) পালকাপ্য সংহিতা। ইহা হস্তি চিকিৎসা বিষয়ক সুমহান গ্রন্থ। ইহা পুণ্যপতনের আনন্দাশ্রমের অধ্যক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। ভগবান পালকাপ্য মুনি অজ্ঞাধিপ গোমপাদ নৃপতিকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন।

(৩) গোতম সংহিতা—ইহা গো-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ ছিল। এক্ষণে দুর্লভ হইয়াছে।

বৃক্ষায়ুর্বেদ—বৃক্ষায়ুর্বেদ সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ এখন কিছুই পাওয়া যায় না। শাক্ষধর কৃত সংগ্রহের “উপবন বিনোদ” নামক অংশ বৃক্ষায়ুর্বেদ বিষয়ক। তদ্ব্যতীত অগ্নিপুরণ, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বৃক্ষায়ুর্বেদের অতি অসম্পূর্ণ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ প্রচার—আর্য্যগণের বিহার ক্ষেত্র আর্য্যাবর্তে আয়ুর্বেদের এইরূপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাপথেও আর্য্যগণ কর্তৃক আয়ুর্বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের অনুমান হয়, তরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া মর্ত্যে প্রচার করিবার পর আত্রেয় আর্য্যাবর্তে এবং অগস্ত্য দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ প্রচার করেন। মতান্তরে অগস্ত্য ধনন্তরির শিষ্য বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। অগস্ত্যপ্রণীত অগস্ত্য সংহিতা এবং তদানুসারী ‘অগস্ত্যসম্প্রদায়’ নামক চিকিৎসকগণ এক সময়ে দক্ষিণাপথে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্য্য কোন মতে ১৮ জন, কোন মতে ২২ জন এবং কোন মতে ৪৪ জন। ইহার সংস্কৃত এবং ত্রিবিড় ভাষার বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেক গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে এখনও পাওয়া যায়। পরে গ্রন্থ পরিচয় প্রসঙ্গে উহাদের বিষয় লিখিত হইবে।

মহর্ষি অগস্ত্য কৃতকাল পূর্বে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন ইতিহাসিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কেহ

কেই ইহাঁকে রামায়ণে কথিত অগস্ত্য বলিয়া নির্দেশ করেন\* ।

এই আৰ্যযুগ বা সংহিতা যুগকে আয়ুর্বেদের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। এই সময়ে অজ্ঞানতমসচ্ছন্ন অত্যাশ্রু দেশ ভারতীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে আৰোহিত হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়েই আৰ্য্যাবর্ত বহিস্কৃত অনেক ব্রাত্য ক্ষত্রিয় নানা দেশে গিয়া ভারতীয় জ্ঞানালোক ছুটা উদ্বেষিত করিয়াছিলেন—বিষ্ণুপুরাণাদিতে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংগ্রহকাল — কালক্রমে আৰ্য্যজ্যোতিঃ ক্ষীণ হইতে আৰ্য্যজ্ঞানাদিকারী নবাবাদিত বৌদ্ধাচার্য্যগণ নুতন ধর্মপ্রচারের সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাদেশের নানা দূরদূরান্তর প্রদেশে ভারতীয় জ্ঞান সম্পদ বিতরণ করেন। এইরূপে আরবদেশ, মিশ্রদেশ (ইজিপ্ট), গ্রীস, রোম, চীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশ ক্রমে ভারতীয় জ্ঞানালোককে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতগণ যে যুরোপের গুরুত্বানায় তাহা পাশ্চাত্যগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণ যে সাংখ্য সম্বন্ধে বা পরম্পরাক্রমে ভারতের শিষ্য—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কি পরিতাপের বিষয় যে যুরোপের গুরু গুরু সেই ভারতবর্ষ আজ ভাগ্যবিপর্গায় নানা বিষয়ে যুরোপের নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছে! কিন্তু আমরা পরে ইহাও দেখাইব যে, আয়ুর্বেদের অনেক তত্ত্ব আজও পাশ্চাত্যগণের অবিদিত ও শিক্ষণীয়।

আরবদেশীয়গণ যে ভারতবর্ষীয়দিগের

নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, “অগবক্ষণ প্রণীত আরবদেশীয় ইতিহাসে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ সম্রাট “হরুণ-উল-রসিদেব” রাজত্বকালে ‘শরক’ (চরক), ‘সমুদ’ (সুশ্রুত), ‘নেদান’ (নিদান) এবং অগদত্ত ও কোমারভূতাদি বিষয়ক অত্যাশ্রু গ্রন্থ আরব ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ‘মশ্ব’ নামক জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক উক্ত যবন সম্রাটকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আয়ুর্বেদের অল্পগ্রহেই সৌক্ৰত মতাহুযারী বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত বর্ণনা, সিরাবেধ প্রণালী, সিরাবেধের বহুল প্রচার, মরিচ, যষ্টিমধু, লাক্ষা, শুণ্ণগুলু প্রভৃতি ভারতীয় ঔষধের বহুশঃ প্রয়োগ এখনও যাবনিক বা য়ুনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চীনদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেও আয়ুর্বেদের বাঁজ পরিপঙ্কিত হইয়া থাকে। ‘ইৎসিঙ্গ’ নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক বলেন, আয়ুর্বেদের বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত বর্ণনা চীনদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায়, ভারতীয় বহু ভেষজও চীনদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

এইরূপে আয়ুর্বেদের বহুল প্রচার ইহবার পরে, সংগ্রহকালে কিরূপে আয়ুর্বেদের অবনতি ঘটয়াছিল এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্তা, সংগ্রহকার ও টীকাকারদিগের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া পরে উহাদিগের বিস্তৃত পরিচয় লিখিত হইবে।

\* দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ প্রচার সম্বন্ধে মাজ্জিম নিবাসী আয়ুর্বেদাচার্য্য হস্তবর বৈদ্যর পণ্ডিত ডিঃ পোপালচাঁপু মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিষয়ে অনেকসংবাদ পাইয়াছি, সেজন্য তাহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।



কালক্রম ভূদৈববশে চিরন্তন বৈদিক  
আচাব গোরব হীমমান হইলে ভারতপ্রভাকর  
বৌদ্ধ ভূদিনাচ্ছন্ন হইয়া ক্ষীণজ্যোতিঃ হইয়াছিল।  
সেই সময়ে অকালবত্ৰনির্ধাতের ত্রায় জ্ঞানা-  
জ্ঞানবদ্রুত শক, হুণ এবং যবনাদি জাতির  
উৎপাত আরম্ভ হয়। খ্রীষ্ট জন্মের ৩২৭ বৎসর  
পূর্বে গ্রীসদেশীয় সম্রাট “অলিকসন্দর” ভারত  
আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে  
দেশে মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়। হুর্ভিক্ষ এবং  
গৃহ দাহবশতঃ অসংখ্য প্রজা ও বহু গ্রন্থ নষ্ট  
হইয়া যায়। “অলিকসন্দর” স্বদেশে প্রত্যাগমন  
কালে “সেলুকস্” নামক গ্রীকবীরকে বিজিত  
দেশ শাসন করিবার জন্ত রাখিয়া যান।  
সেলুকস্ ভারত হইতে বিবিধ গ্রন্থ, বিশেষতঃ  
বহু চিকিৎসাগ্রন্থ স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।  
কথিত আছে, তিনি ও তাঁহার প্রভু অলিক-  
সন্দর উভয়েই ভাবভারী চিকিৎসানৈপুণ্য দর্শনে  
মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেলুকস্ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত  
কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে  
“মিগস্টিনিদস” নামক গ্রীকচিকিৎসককে ভারতীয়  
বিদ্যাশিক্ষার জন্ত চন্দ্রগুপ্তের সভায় রাখিয়া  
যান। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, গ্রীকগণ  
ভারত হইতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া-  
ছিলেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং তৎপুত্র বিন্দুসারের  
মৃত্যুর পরে তদানীং ক্রুরপ্রকৃতি অশোক বহু  
রাজপুত্র এবং রাজবংশীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়া  
সিংহাসন-অধিকার করেন (২৬৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)  
অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি কাল হইতে তিনবৎসর  
পর্যন্ত ভীষণ অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়াছিল এবং  
তাহাতে লক্ষ লক্ষ প্রজা বিনষ্ট হইয়াছিল।  
এই সময়ে শত শত অমূল্য গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছিল  
বলিয়া মনে হয়। অনন্তর উপগুপ্ত নামক

বৌদ্ধাচার্য্য কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া  
অশোক পরম ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই সময়ে  
তিনি চীন গ্রীসাদি বহু দূরদেশে বৌদ্ধ শ্রমণ-  
গণকে প্রেরণ করিয়া সেই সকল দেশে ধর্ম্ম  
ও জ্ঞানালোক বিতরণ করেন ৯ চিকিৎসা  
বৌদ্ধগণের একটি প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। অতএব  
সে সময়ে আয়ুর্বেদ কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হইলেও;  
উহা যে পরহিতব্রত শ্রমণগণ কর্তৃক যবনাদি  
দেশে বহনভাবে প্রচারিত হইয়াছিল সে বিষয়  
সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে এই সময়ে রাজাজায়  
শবব্যবচ্ছেদাদি নিবিদ্ধ হওয়ায় শারীরশাস্ত্রেরও  
বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল।

অনন্তর মৌর্য্যবংশ হীন পরাক্রম হইলে  
(১৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে) ‘পার্শি’ নামক গ্রীক জাতি  
এবং শক নামক বর্ব্বর জাতি পুনঃ পুনঃ ভারত  
আক্রমণ করিয়া সিন্ধু নদ হইতে সাকেতপুর  
পর্যন্ত দেশে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়া  
ছিল। •এই সময়ে ‘মিলিন্দ’ নামক জনৈক  
গ্রীক পঞ্চদশ প্রদেশ জয় করিয়াছিল। মগধ  
দেশে মুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র মৌর্য্যবংশীয় বৃহদ্রথ  
কে বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিয়া  
ছিল। নিরন্তর এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ায় সে  
সময়ে সমস্ত আর্য্য শাস্ত্রের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে  
আয়ুর্বেদেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল।

পুষ্পমিত্র রাজা হইবার পরে কিছু দিনের  
জন্ত দেশব্যাপী বিপ্লব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া  
ছিল। এই সময়ে ভগবান পদ্মজলি বীর্ণী  
প্রায় অয়িবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়া  
ছিলেন। আমরা পরে দেখাইব যে এই  
পদ্মজলিই চরক নামে বিখ্যাত। বৌদ্ধাচার্য্য  
নাগার্জুনও এই সময়ে মুক্ততঃ সংহিতার প্রতি-  
সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল সংস্কার  
প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল।

শকজাতি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া ভারতীয় রাজগণ হানবল হইলে কুশাবংশীয় কনিষ্ক নামক মহা প্রতাপ শকনরপতি হিমাচল হইতে বিদ্বাগরি পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত উত্তর পশ্চিমার্দ্ধ জয় করেন। ইহার পর তিন শত বৎসর দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই চরকসংহিতার অঙ্গহানি ঘটয়াছিল এবং কাশ্মীর দেশীয় দৃঢ়বলাচার্য্য তাহার পূরণ করেন।

ইহার পর পঞ্চপালের ভ্রায় বহু সংখ্যক হুণ ও শক সৈন্য ভারত আক্রমণ করিয়া বিঘন বিপ্লব উপস্থিত করে। ইহার কিছুকাল পরে খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৭ অব্দে মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য শকদিগকে জয় করিয়া উজ্জয়িনী হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন। এই সময় হইতে প্রায় পঞ্চ শত বর্ষকাল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এবং তৎপুত্রীয়া নরপতি দিগের শাসন কালে বিপ্লব-বিশীর্ণ ভারতীয় জ্ঞান পুনরায় কথঞ্চিৎ পুষ্টলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে কালিদাস প্রমুখ কবিগণ ও আর্য্যভট্ট প্রমুখ জ্যোতির্বিদগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ইহার পরে পঞ্চশত বৎসরের মধ্যে বাগ্‌ভট্টাচার্য্য, বৃন্দ ও মাধব নামক আয়ুর্বেদ গ্রন্থের সংগ্রহকারগণ এবং জৈয়ট, গয়দাস, ভাস্কর ব্রহ্মদেব প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে চরকসূত্রের টীকাকার ও সংগ্রহকার চক্রপাণি এই সময়ের মধ্যে (খ্রীষ্টাব্দ ১০৪০—১০৫০) প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং চক্রপাণি ভারতীয় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের পুনরুত্থানের কালের শেষ সময়ের আচার্য্য। মালবের নানাশাক্ষিদি ভোজ নামক প্রসিদ্ধ রাজা ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রণীত ‘রাজমার্কণ্ড’ প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ এবং ‘পাতঞ্জলবৃত্তি’ নামক দার্শনিক গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

ইহার পর ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ মুসলমানদিগের ঘোর আক্রমণ প্রবাহ চলিতে থাকে। পূর্ব্বে মহম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা স্থায়ী বা অধিক ক্ষতিকর হয় নাই। একাদশ শতাব্দীতে বহু সহস্র সৈন্য লইয়া মহম্মদ গজনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাহার ফলে সোমনাথ পত্তনাদি স্থানের অমূল্য সম্পদ লুপ্তিত, তীর্থস্থান সমূহের দেবমূর্ত্তি বিচূর্ণিত ও সহস্র সহস্র প্রজার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। গজনীর সৈন্যগণ এই সময়ে প্রতিদিন শত শত গৃহ ও সেই সঙ্গে বহু প্রাচীন সংহিতাদি ভস্মীভূত করিয়াছিল। লোকে ধন-প্রাণধন্য রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া জ্ঞানার্জনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মহম্মদ গজনী লুণ্ঠন কার্য্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার অন্তর দিন পরেই স্বদেশদ্রোহী জয়চন্দ্র কর্তৃক আহৃত হইয়া মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষত্রকুলবর্ষ্য দেহলীপতি মহারাজ পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। ইহার পর দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানদিগের করায়ত্ত হয়। পরবর্ত্তী কালে আলতামাশ্ এবং আলতীউন্ মালব ও দাক্ষিণাত্যের কিরলংশ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের আক্রমণ স্থান হইতে দূরে থাকায় বঙ্গদেশ এই সময়ে বিধেয় বিপর্য্যত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে নিদানসংগ্রহকার মাধব বরুণ প্রমুখ

শতাব্দীতে চক্রপাণি প্রাভুত্ব হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে দাদশ জয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান বিপ্লব আরম্ভ হইলেও টীকাকার বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ আয়ুর্বেদের ক্ষীণ জ্যোতিঃ আবার উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের সময়েও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যাইত। ইহার পরে বঙ্গদেশও মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ বিজিত ও বিবস্ত্র হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'মধ্যভাগে চেন্সিস্ খাঁ নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়া হিচামল হইতে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন এবং বহু প্রজার প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন। চেন্সিস্ খাঁ প্রতি-নিরত হইলেও পুনঃ পুনঃ সমাগত মোগল-দিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। ইতি-মধ্যে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তৈমুরলঙ্গ নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়া-ছিল। তৈমুরলঙ্গ দুই মাস ব্যাপিয়া ভারত-বর্ষে ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং অসংখ্য প্রজার গৃহদাহ ও প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মহাবিক্রান্ত বীরবৃদ্ধ বা বুদ্ধ নামক রাজা বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সভাসদ সাধারণ-চার্য ও মাধবাচার্য দ্বারা বেদের উদ্ধার ও ভাষ্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শাস্ত্রধর নামক আয়ুর্বেদীয় সংহিতাকার এই সময়ে (১৪২০ সনতে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল নরপতি বাবর পাঠানদিগকে জয় করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে বাবরের পুত্র হুমায়ূনের দিখিজয় উপলক্ষে দেশে বিঘ্ন বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। অনন্তর হুমায়ূন শেরশা নামক পাঠানরাজ কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে

কান্তিক—২

ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত মোগল ও পাঠান জাতির মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহার ফলে ভারতের ধন, প্রাণ ও বিদ্যার যথেষ্ট হানি হইয়াছিল।

ষোড়শ বর্ষ পরে হুমায়ূন পুনরায় যুদ্ধ করিয়া রাজ্য লাভ করেন। তাহার পুত্র আকবর শাহ স্বীয় বাহুবলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রথমে বহু প্রজা ও দেশ ধ্বংস হইলেও শেষে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। আকবর শাহ ভারতীয় শাস্ত্র ও পণ্ডিতগণের সমাদর করিতেন। এই সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে প্রসিদ্ধ সংগ্রহকার ভাবমিশ্র কাণ্ডকুজ প্রাভুত্ব হইয়াছিলেন।

আকবরের গোত্র ঔরঙ্গজেব রাজ্য লাভ করিবার পর দেশে বিঘ্ন বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। হিন্দুধর্মী ঔরঙ্গজেব শত শত দেব মন্দির চূর্ণ করিয়া সহস্র সহস্র গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া এবং অসংখ্য স্বধর্মনিষ্ঠ প্রজার প্রাণবধ করিয়া ভারতের বিঘ্ন অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং নষ্টপ্রায় ভারতীয় বিদ্যা ইতিপূর্বে কথঞ্চিৎ উজ্জীবিত হইলেও এই সময়ে পুনরায় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আয়ুর্বেদও এই সময় হইতে যবন চিকিৎসকগণ কর্তৃক হতসর্বশ্ব হইয়া কোন রূপে জীবন ধারণ করিয়াছিল।

ইহার পর ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে আমের সা আবদালী কর্তৃক ভারতবর্ষে উপহুগরি চারিবার আক্রান্ত হয়। এই সকল আক্রমণের ফলেও অসংখ্য প্রজার প্রাণ নষ্ট হয় এবং বহুজনগণ লম্বান্নে পরিণত ও বহু ধর্মরক্ষা ও গ্রন্থের অপহৃত ও নষ্ট হইয়াছিল।

আয়ুর্গের পরবর্তী সময় হইতে ভাষ্য-মিশ্রের সময় পর্যন্ত কালকে সংগ্রহকাল বলা যাইতে পারে। ইহা আয়ুর্বেদের অথবা ভারতের সমস্ত বিদ্যার অপরাহ্ন কাল। এই সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা, অল্পাধিক খণ্ডিত আকারে পাওয়া যাইত এবং সেই সকল গ্রন্থের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পুনর্যোজনা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

**অবনতি কাল—**সংগ্রহকালে আয়ুর্বেদের অনেক অবনতি ঘটিলেও প্রতিসংস্কারক, সংগ্রহকারক এবং টীকারদিগের চেষ্টা বশতঃ সম্পূর্ণ অবনতি ঘটে নাই। অপিচ টীকারদিগের সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা স্ফুলভ ছিল, সে কথা বলা হইয়াছে। এই জন্ত সংগ্রহকালের পরবর্তী কালকেই আমরা অবনতিকাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।

অবনতিকালে প্রাচীন সংহিতা সকল দুর্লভ হইয়া পড়ে এবং যে সকল সংগ্রহ অবশিষ্ট থাকে সেগুলি বহু ভ্রম প্রমাদের আকর হইয়া উঠে। অপিচ, সংস্কৃত ভাষার পঠন পাঠন হ্রাস পাওয়ায় আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যাও কম হইতে থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্র-বিপ্লব বশতঃ লোকে স্বস্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে যে সকল চিকিৎসাগ্রন্থ পূর্বে পুঙ্খবগণের পরম আদরের ধন ছিল, তাঁহাদের সম্মান সন্ততির নিকট সেই সকল গ্রন্থ আবর্জনার মধ্যে পরিগণিত হয়। এইরূপ অনাদরেও কত গ্রন্থ রহ যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ক্রমে অশুচিত ধর্ম্মাভিমান বশতঃ চিকিৎসকগণ রোগীর মলমূত্র-পুণ-রক্তাদিকে স্পর্শ করিতে আশঙ্কিত হইতেন এবং তাহার ফলে

বস্তিক্রিয়া লোপ পায়, শত্রুচিকিৎসা ক্ষৌরকারিগের বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় ও প্রমত্ত-বিদ্যা নীচ জাতীয়া জীলোকের হস্তে সমপিত হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধবৃগ হইতেই রাজাজ্ঞায় শবব্যবচ্ছেদ প্রথা রহিত হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বশতঃই হউক অথবা পরবর্তী কালে নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহ হেতু দেশে মহান্ বিপ্লব ঘটবার কালেই হউক, ভারতীয় রাজগণ বা জনসাধারণ শব ব্যবচ্ছেদ প্রথা পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্ত চেষ্টা করেন নাই। ষ্টিভেন্সন মুসলমান রাজগণেরও এ বিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল না। ফলে শবব্যবচ্ছেদ একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক শারীর তত্ত্বে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়া পড়েন। এইরূপে শারীর জ্ঞান বর্জিত চিকিৎসকের সংখ্যার আধিক্য বশতঃ আয়ুর্বেদের যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

পূর্বেই হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে দেশে দেশে আরোগ্যশালা (Hospital) প্রতিষ্ঠিত ছিল বৌদ্ধযুগের পরবর্তী সময়ে মুসলমান বিপ্লবের কালে সেই সকল আরোগ্যশালা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যায়। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরোগ্যশালায় কর্ম্মভ্যাস ব্যতীত চিকিৎসাবিদ্যায় সম্যক পারদর্শিতা জন্মে না। কোন চিকিৎসক বিশেষের নিকট থাকিয়া কর্ম্মভ্যাস করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাতে সেই চিকিৎসকের আয়ত্ত বিদ্যা ব্যতীত, আয়ুর্বেদের সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ কর্ম্মা যায় না। এই কারণেও ইদানীং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সংগ্রহকালেই বায়বিক

চিকিৎসার প্রাধান্য ঘটে। আয়ুর্বেদের অবনতিকালে মুসলমান রাজার আদরাতিশয়ে যাবনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অত্যন্ত প্রসার ঘটে এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন অত্যন্ত কমিয়া যায়। এমন কি স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ আয়ুর্বেদের পরিবর্তে রাজকীয় য়ুনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন। সেই ভুল উত্তর ভারতে এখনও য়ুনানী চিকিৎসা বহুমান্যত।

একপে ক্রমে গ্রন্থ লোপ, ভিন্ন ভিন্ন অংশের অপ্রচার, পঞ্চকর্মাদির বিলোপ, সংস্কৃত ভাষা আলোচনার নানতা প্রভৃতি নানা কারণে আয়ুর্বেদ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বর্তমান সময়কে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনের সূচনাকালও বলা যাইতে পারে। বহুকালব্যাপী বিপ্লবের পরে দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। নষ্টপ্রায় ভারতীয় বিদ্যার এবং বিপ্লবপীড়িত প্রজাব উদ্ধারের জন্তই যেন বিধাতা রূপা করিয়া উদারহৃদয় ইংরাজ জাতিকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের শাসন শুণে এক্ষণে প্রজাব ধন-মান-প্রাণ নিরাপদ এবং জ্ঞান অর্জনের পথ বিস্তৃত। এখন ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যা ও কীর্তির রক্ষার্থে ও উন্নতি কল্পে ব্রিটিশরাজ মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতেছেন। বিষম হৃদ্বিনের পর ভারতে আবার স্বাধীন ফিরিয়া আসিয়াছে। বছদিনের পর ভারতের নানা স্থানে আয়ুর্বেদের একটা নতুন জাগরণ দেখা যাইতেছে।

### গ্রন্থকার ও গ্রন্থপরিচয় ।

পূর্বে অনেকগুলি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বিশিষ্ট

গ্রন্থকারদিগের এবং গ্রন্থ সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইতেছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্ত প্রথমে বর্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের পরিচয়—(ক) প্রতীসংস্কারক (খ) সংগ্রহকারক ও (গ) টীকাকার—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লিখিত হইবে। (সংহিতাকারগণের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।) পরে গ্রন্থ পরিচয়—(ক) সংহিতাগ্রন্থ (খ) সংগ্রহ গ্রন্থ, (গ) রস গ্রন্থ, (ঘ) নিঘণ্ট গ্রন্থ (ঙ) বিবিধ সংগ্রহ—এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া প্রদত্ত হইবে। অপ্রধান গ্রন্থকারদিগের পরিচয় গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইবে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, মূল সংহিতার পরে আব কোন নতুন গ্রন্থ রচিত হয় না। কেহ প্রাচীন সংহিতার প্রতীসংস্কার করিয়াছেন, কেহ বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগ্ৰহ করিয়া বিবিধ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ টীকা করিয়াছেন। অতএব গ্রন্থ ও গ্রন্থকার শব্দ এখানে গৌণ ভাবেই গ্রন্থক হইল বুঝিতে হইবে। সুতরাং গ্রন্থকার পরিচয় প্রসঙ্গে প্রতীসংস্কারী প্রকৃতির এবং গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে প্রতীসংস্কৃত ও সংগ্রহ গ্রন্থাদির পরিচয় লিখিত হইতেছে। তবে বৌদ্ধযুগে অনেক নতুন রসগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

### গ্রন্থকার পরিচয় ।

#### (ক) প্রতীসংস্কারকগণ ।

চরক—ইহা অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতি-সংস্কারক। প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ-সংহিতার বা চরক-সংহিতার যে মূল-অগ্নিবেশ-সংহিতার সন্নিহিত অনেক পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই চরক-ক-সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

পাণিনির “কঠচরকাঙ্ক”—এই সূত্র দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে চরক পাণিনির পূর্বতন। কিন্তু এই মত বিচারসহ নহে। কারণ, পাণিনির কথিত কঠ ও চরক যজুর্বেদের শাখা বিশেষের প্রবক্তা ছইজন খণ্ডি। সেই চরক শুধু প্রতিসংস্কর্তা চরকের কেন,—আত্রেয় অগ্নি-বেশাদিরও অনেক পূর্ববর্তী।

কেহ কেহ বলেন যে, চরক কাশ্মীর দেশীয় কনিষ্ক রাজার চিকিৎসক ছিলেন। এই মতের মূল ত্রিপিটকাখ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু এই চরকই যে বর্তমান চরক সংহিতার লেখক তাহা বোধ হয় না; কেননা তাহা হইলে কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনী নামক ইতিহাস কনিষ্ক প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্তা চরক-সংহিতা উল্লিখিত হইত।

আমাদের মতে ভগবান্ পতঞ্জলিই চরক-সংহিতার প্রতিসংস্কর্তা চরক মুনি। বিজ্ঞান-ভিক্ষু, ভোজরাজ, নাগেশভট্ট, রামভদ্র দীক্ষিত ভাবমিশ্র প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থলিখিত বচন দ্বারাও এইরূপই প্রমাণ পাওয়া যায় \*। পতঞ্জলি কেবল অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতি-সংস্কর্তা নহেন, রসশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার কথিত অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, শেবাবতার পতঞ্জলি মনুষ্যের মনের দোষ দূর করিবার জন্য পাতঞ্জল দর্শন, বাক্যের দোষ নিবারণার্থ বৈয়াকরণ মহাভাষ্য এবং শরীরের দোষ নিবারণের জন্য চরকসংহিতা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই পতঞ্জলি যে ছই সহস্র বৎসর বা আরও কিছু পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ঐতিহাসিকগণ

অথবুণীয় যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

**দৃঢ়বল**—কালে চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ সংহিতার বা চরক-সংহিতার অঙ্কহানি ঘটলে দৃঢ়বল তাহার পুনঃ প্রতিসংস্কার করেন। দৃঢ়বল কাশ্মীরে কিংবা পাঞ্জাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই সম্বন্ধে উভয় প্রকার মতই প্রচলিত আছে। প্রথমটা ডাক্তার হর্শলির মত ও দ্বিতীয়টা সাধারণ মত। দৃঢ়বল-সংস্কৃত চরকের অনেক পাঠ বাগ্‌ভট স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, দৃঢ়বল বাগ্‌ভটের পুঙ্খ এবং পতঞ্জলির পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান চরক-সংহিতার কোন্ কোন্ অংশ ঠিক চরকের লেখা সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। বাগ্‌ভটের পরবর্তী কোন কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও চরক-সংহিতার পাঠ যোজনা করিয়াছেন, এরূপ মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিলাম না।

**নাগার্জুন**—লভ্যমান সূক্ষ্তসংহিতার প্রতিসংস্কর্তা কে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। উন্নত সূক্ষ্তের টীকার নাগার্জুনকেই সূক্ষ্তের প্রতিসংস্কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার ভাবে † বোধ হয়, নাগার্জুন ভিন্ন অপর প্রতিসংস্কর্তারও পূর্বে প্রসিদ্ধি ছিল। নাগার্জুনকে সূক্ষ্তের প্রতিসংস্কর্তা বলিয়া স্বীকার করিলেও এই নাগার্জুন কে, তাহা স্থির করা দুঃসহ। প্রাচীন ইতিহাসে নাগার্জুন নামে প্রসিদ্ধ অনেক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লোহশাস্ত্রপ্রবক্তা রসজ্ঞানপ্রবক্তা এক

\* এই সম্বন্ধে যে সকল লেখা হইয়াছে, তাহার এমাপাদি “অজ্ঞানকামার” গ্রন্থে ছদ্মকথিত হইয়া এবং বাহুল্যভয়ে কোন স্থলেই সেসকল এমাপ উদ্ধৃত করা হয় নাই। অতএব উক্ত পাঠক প্রয়োজন হইলে সেই সকল এমাপ দেখিয়া আমাদের মতের বিচার করিবেন।

† “প্রতিসংস্কর্তাগৌহ নাগার্জুন এবং—উন্নত সূক্ষ্ত টীকা।

জন নাগার্জুন ছিলেন। ইনি কক্ষপুটস্ত্র ও রসরত্নাকর \* প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং সিদ্ধ নাগার্জুন নামে প্রসিদ্ধ।

নেপাল রাজ্যের প্রান্তভাগে তাঁহার আশ্রম ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই নাগার্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা হইলে, পারদের জরা-ব্যাধিনাশকতা গুণ বোধ হয় সুশ্রুতে উল্লিখিত হইত। কিন্তু সেরূপ কোন উল্লেখ নাই বলিয়া সিদ্ধ নাগার্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা—একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।

নাগার্জুন নামক বৌদ্ধ নরপতি সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা বলিয়া কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাধ্যমিক স্মৃতিাদিকার নাগার্জুন নামক অপর বৌদ্ধাচার্য্যকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা বলিবার হেতুও কোন বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় না। সুতরাং বৌদ্ধ নাগার্জুন যে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা ইহা প্রতিপন্ন করা কঠিন। তবে সুশ্রুতের মধ্যে “স্মৃতি গৌতমব” উল্লেখ প্রভৃতি দুই একটা এমন কথা আছে যাহাতে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কার যে বৌদ্ধযুগে হইয়াছিল, একথা বলা অসম্ভব হয় না।

বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জুনকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ প্রতিসংস্কার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে হইয়াছিল বলিতে হইবে; কারণ, নাগার্জুন নামক প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য দুই সহস্র বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ইহাই সর্ববাদিসম্মত। পুঙ্খানুপুঙ্খ চরিত্রের ক্ষয়জকাস প্রভৃতির পাঠ সুশ্রুত-সংহিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া বুঝা যায় যে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা চরিত্রের পরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

### (খ) সংগ্রহকার ।

বাগ্‌ভট—ইনি প্রথমে অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ বা ‘বৃদ্ধ বাগ্‌ভট’ এবং পরে অষ্টাঙ্গহৃদয় বা ‘বাগ্‌ভট’ রচনা করিয়াছিলেন। ইংসিং নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক তাঁহাব রচিত গ্রন্থে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদসংগ্রহকার নবীন আচার্য্য বলিয়া বাগ্‌ভটকে নির্দেশ করিয়াছেন। ইংসিং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং বোধ হয় বাগ্‌ভট ঐ সময়ের কিছু পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগ্‌ভট সিদ্ধ (Sind) দেশের অধিবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, অষ্টাঙ্গসংগ্রহকার বাগ্‌ভট এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু এই মত নিতান্ত ভিত্তিহীন; কারণ উভয় গ্রন্থের ভাষা একরূপ, কৃত্তাপি মতভেদ নাই এবং উভয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের পিতার নাম, পর্য্যন্ত এক। সংগ্রহগ্রন্থের মধ্যে বাগ্‌ভটের নাম উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর নাই।

রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগ্‌ভট সংগ্রহকার বাগ্‌ভট হইতে পৃথক ব্যক্তি এবং বহু পরবর্তী। কারণ বিস্তৃত অষ্টাঙ্গসংগ্রহ রসরত্নোক্ত বিবরের সামগন্ধ্য নাই। এছাড়াই সোমদেব-শ্রোতৃবিন্দু প্রভৃতি পরবর্তী কালের গ্রন্থকারদিগের বচন রসরত্নসমুচ্চয়ের উদ্ধৃত হইয়াছে।

মাধব কর—মাধবনিদান নামে প্রসিদ্ধ ‘কথিমিশ্র’ গ্রন্থের রচয়িতা মাধবকর খন্ড-দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে রাশি রাশি বাগ্‌ভটের বচন উদ্ধৃত

\* রসরত্নাকর নামে দুইখানি রসগ্রন্থ আছে—একখানি নাগার্জুন দ্বারা ও অপরখানি নিতীশ দ্বারা। রসগ্রন্থ একই গ্রন্থের দুইখানি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ।

করায় বুঝা যায় যে, মাধবকর বাগভটের পরবর্তী। আবার বৃন্দ ও চক্রপাণি স্ব স্ব গ্রন্থে মাধবের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাঁহার লিখিত ক্রম অনুসারে চিকিৎসা লিখিয়াছেন; সুতরাং মাধব, বৃন্দ ও চক্রপাণির পূর্ববর্তী। অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের প্রসিদ্ধ সম্রাট ‘হরুণ-উল-রসীদের’ রাজত্বকালে মাধবনিদান পারস্ত ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—ইহা ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, মাধবকর সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিদান বাতীত মাধবকর “রত্নমালা” নামক দ্রব্যগুণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। ডল্লনের কথিত সূত্রতে টিপ্পনীকার ‘শ্রীমাধব’ মাধবকর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কারণ শ্রীমাধব কুত্রাপি মাধবকর নামে অভিহিত হয়েন নাই।

বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য নিদানকার মাধবকর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ তিনিও কুত্রাপি মাধবকর বলিয়া উল্লিখিত হয়েন নাই। অপিচ, মাধবাচার্য্য মাধবকরের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে দক্ষিণাপথে বিজয়নগর রাজ্যে প্রোহত হইয়াছিলেন—ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

সোঢ়ল—ইনি গদনিগ্রহ ও সোঢ়ল-নিঘণ্ট নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। সোঢ়লকৃত গদনিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আয়ুর্বেদমার্গও পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমলী আচার্য্য কর্তৃক বহু হইতে “আয়ুর্বেদীর গ্রন্থ-মালার” মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সোঢ়ল-নিঘণ্ট নামক গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে অবশ্য হওয়া যায় যে, সোঢ়ল গুজর দেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ভেল, হারীত, কৃষ্ণাজেয়, অগ্নিবেশ, বৈশেদ প্রভৃতির অনেক পাত্রে

গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবনিদানের সহিত ইহার গ্রন্থের অনেক পাঠের সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ ইনি মাধবকরের কিছু পূর্বে বা পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগভট হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া ইনি যে বাগভটের পরে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৃন্দ—সিদ্ধযোগ নামক সংগ্রহকার বৃন্দ, মাধবের পরে এবং চক্রপাণির পূর্বে—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃন্দকৃত সংগ্রহ অবলম্বন করিয়াই চক্রপাণি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

চক্রপাণি—পূর্বে বলা হইয়াছে চক্রপাণি ডল্লনের সমকালীন বা সমীপ কালীন। ইহার পিতা গোড়াধিপ নয়পালদেবের চিকিৎসক ছিলেন। চক্রপাণি চরক ও সূত্রভেদে টাকা, “চক্রদত্ত” নামে প্রসিদ্ধ চিকিৎসাসংগ্রহ এবং দ্রব্যগুণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, নয়পালদেব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব চক্রপাণির সময় একাদশ শতাব্দী বলিয়া স্থির করা যায়।

শাস্ত্রধর—ইনি শাস্ত্রধর পদ্ধতি, শাস্ত্রধর সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, কবি ও আয়ুর্বেদ সংগ্রহকার। শাস্ত্রধরপদ্ধতির প্রস্তাবনার জামা যায় যে, ইনি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বঙ্গসেন—ইহার রচিত চিকিৎসাসার-সংগ্রহ নামক গ্রন্থ “বঙ্গসেন” নামেই পরিচিত। বঙ্গসেন বলিয়াছেন, সুপ্তপ্রায় অগত্যসংহিতার প্রতिसংস্কার করিয়া তিনি “বঙ্গসেন” নামক এই গ্রন্থ প্রচার করিলেন। বঙ্গসেন শাস্ত্রধরের পরে এবং ভাষ্যসিদ্ধের পূর্বে আবির্ভূত হইনি।



ছিলেন। ইহার বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নাম দেখিয়াও সেইরূপ অনুমান হয়।

**ভাবমিশ্র**—ভাবমিশ্র স্বকৃত সংগ্রহে শার্ঙ্গধর ও বঙ্গসেনের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গ রোগের এবং অনেক যাবনিক দ্রব্যের উল্লেখ আছে। ফিরঙ্গ রোগ প্রথমে পোটুগিজদিগের দ্বারা ভারতীয় পণ্যস্বনাগণের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল। পোটুগিজগণ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ভারত-বর্ষে আগমন করে। এই হেতু অনুমান হয় যে, ভাবমিশ্র ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কাঙ্কুক দেশে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন।

### (গ) টীকাকারগণ।

**ডল্লন**—স্বশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনচাধ্য আপনাকে সহনপালদেব নামক রাজার বল্লভ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। “পাল দেব” নামযুক্ত নরপতিগণ খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মগধ, গোড় ও অজ্ঞাত দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ডল্লন ও চক্রপাণি উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারও নাম করেন নাই—এজ্ঞাত উভয়েই প্রায় সমান সময়ের বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, ডল্লন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন।

**চক্রপাণি**—চিকিৎসাসংগ্রহকার চক্রপাণি স্বশ্রুতের “ভাস্করভট্ট” এবং চরকের “আয়ুর্বেদ দীপিকা” টীকা রচনা করিয়া ছিলেন। ইহার বিষয় সংগ্রহকার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

**অরুণদত্ত**—বাণ ভট্ট, প্রথিত জ্ঞানী

হৃদয়ের টীকাকার অরুণদত্ত সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে আবিস্কৃত ছিলেন।

**বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত**—মাধবনিদানের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিজয়রক্ষিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিস্কৃত হইয়া ছিলেন। “আতঙ্কদর্পণ” নামক নিদানটীকাকারও এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। বিজয়রক্ষিত গুণাকর প্রণীত “বোগরত্নমালা” হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, তিনি গুণাকরের পরবর্তী। গুণাকর ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে প্রাভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠদত্ত বিজয়রক্ষিতের শিষ্য। তিনি গুরুর আদেশে শ্রমেহনিদান হইতে মাধবনিদানের অবশিষ্টাংশের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

**শিবদাস**—চরকসংহিতা ও চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস গোড়রাজের চিকিৎসকের পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন।

**চরকের অন্যান্য টীকাকার**—ঈশান দেব, হরিসন্দ্র, বাপ্যচন্দ্র, বকুল, ভামদত্ত, ঈশ্বর সেন, নরদত্ত, জিনদাস, জৈয়ট বা জেজ্জড ও গুণাকর প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের টীকা এখন হ্রস্ব।

মুর্শিদাবাদের অপ্রসিদ্ধ কবিরাজমুকুটমণি গঙ্গাধর ও চরকের “জলকরভঙ্গ” টীকা এবং কয়েকখানি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

**স্বশ্রুতের অন্যান্য টীকাকার**—জৈয়ট বা জেজ্জড, কান্তিক, গোম্বী, গঙ্গাধর ও গম্বী বা গঙ্গদাস প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তথাকার ভাস্কর স্বশ্রুতের পক্ষি বা একাদশ শতাব্দীর

সোম টিগ্ননী রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ  
প্রমাণও পাওয়া যায়।

বাগ্ভটের অন্যান্য টীকাকার—  
অরুণ দত্ত বাতীত চন্দ্রনন্দন ও হেমাদ্রি  
অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার বলিয়া প্রমাণ পাওয়া

যায়। ইন্দু প্রণীত অষ্টাঙ্গসংগ্রহের টীকা  
সম্প্রতি আবিস্কৃত হইয়াছে ও বোম্বাই প্রদেশে  
মুদ্রিত হইতেছে। হেমাদ্রিকৃত টীকার কিয়দংশ  
প্রবন্ধ লেখকের নিকট বর্তমান।

(ক্রমঃ।)

## দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা।

—:~:—

ঝড় হইতে বাঁশ কাটিয়া আনিয়া কুটার  
রচনা করিলে কিছুদিনের মধ্যেই সেই বাঁশ  
ঘুণের কবলে কাঁকরা হইয়া পড়ে। আর  
যদি সেই বাঁশ জলে ভিজাইয়া রৌদ্রে ভাতাইয়া  
দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু করা যায়, তবে সেটি বহু দিন স্থায়ী  
হয়। ঘুণ তাহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে  
পারে না। জে চাষার ছেলে মাঠের মাঝে  
আকাশের বারিধারা ও সূর্য্যদেবের প্রচণ্ড  
কিরণ মালা বরণ করিয়া আপনাকে গড়িয়া  
তোলে, ঘুণের মত রোগ-বীজাণুও তাহাকে  
সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না, জরাও কোন  
নির্দিষ্ট বয়সে তাহার দেহ-মষ্টিকে আক্রমণ করে  
না, এজন্ত যুবা বয়সে অকাল বৃদ্ধ অথবা পরিণত  
বয়সে শিং ভাঙ্গিয়া বাজুরের দলে মিশিবার  
মত লোক অনেক দেখা যায়। রোগ ও  
জরার প্রবল প্রতাপ থরু করিতে হইলে  
আমাদিগকে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইতে হইবে। দুইটি  
বিপরীত ধর্ম্ম বিশিষ্ট প্রাকৃতিক বাস্পরে  
আমরা কষ্ট পাইয়া থাকি। একটি তাপ,  
অপরটি শৈত্য। এই দুটি ক্রমে ক্রমে  
সহাইতে পারিলে, বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইতে

পারে। পূর্বে এই বাঙ্গালা দেশে নবজাত  
শিশুকে তৈল মাগাইয়া রৌদ্রে দৈওয়ার প্রথা  
ছিল। উহাব উদ্দেশ্য মানব শিশুটিকে ক্রমে  
ক্রমে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু করা। আমরা উদ্দেশ্য  
বুঝিতে না পারিয়া অনেক ভাল প্রথা তাগ  
করিতেছি, আবার অনেক মন্দ প্রথা ক্রমে  
ক্রমে আমদানী করিতেছি। বিচার বুদ্ধিতে  
তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বিশেষরূপ পরীক্ষা  
করিয়া তবে সামাজিক প্রথা বদলাইতে  
কিবা নূতন কিছু প্রবর্তন করিতে অগ্রসর হওয়া  
উচিত।

একদা কোন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ কলি-  
কান্তার কোন ধনী ভূস্বামীর বাড়ীতে তাহার  
পুত্র ও জামাতার জ্বররোগের চিকিৎসার তত্ত্বী  
হন। দুই জনের জ্বরই একদিনে বিচ্ছেদ  
হয়। জ্বর বিচ্ছেদের পরদিন জমিদারের  
পুত্রটিকে জ্বরির কষ্টে কচি পাঠায় কোল  
এবং জামাতাটিকে খৈ ও বেণ্ডণ গোড়ার  
ব্যবহা করেন। তাঁর পরদিন কবিরাজ  
মহাশয় আসিয়া পোনেন, জামাতা খাবারী  
তাঁহার একল ব্যবহা-কর্ম্মেই কিবা রোগের

হইয়াছেন। তিনি আর হাত দেখাইবেন না। ইহা শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় জামাতার কাছে গিয়া মেহগর্ভস্বরে তাহার গায়ে হাত ব্লাইয়া বলিতে লাগিলেন, বাবাজী, রাগ করিও না শোন; তুমি, আমি, (কর্মচারীদের লক্ষ্য করিয়া) এঁরা সব ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, শুক্কো, ডালনা, একটু দুধ খাইয়াই পুরুষানুক্রমে মাহুব। আমাদের পক্ষে জবাস্তে লঘু ভোজন, গৈ আর বেগুন পোড়াই ঠিক। আর উনি পুরুষানুক্রমে বড় মাহুঘের রক্ত বহন করিয়া আসিতেছেন; পোলোয়া, কলিয়া, কোরমা, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি খাইয়া মাহুব। উহার পক্ষে সুজির কুটা ও কচি পাতার ঝোলই লঘু পথ্য। ধাতু বৈধম্য ত আশ্রয় কারণে হয় না। শুনিয়া বাবাজীবন অধোবদনে রহিলেন, আর সকলে হাসিয়া উঠিলেন। স্বাস্থ্য দৃষ্টির প্রভাবে উল্লিখিত কবিরাজ মহাশয় অনেক ছুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারিতেন। এই স্বাস্থ্য দৃষ্টি সকলের নাই, এজন্ত চিকিৎসকে চিকিৎসকে এত প্রভেদ। এই স্বাস্থ্য দৃষ্টির অভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা একান্ত রক্ষণশীল এবং বিলাত প্রত্যাগতেরা একান্ত অমুক্তরক্ষণশীল হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় আচার ও অনাচার উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া প্রথা ও 'কেশন' রূপে সমাজের মধ্যে চলিতেছে।

আমাদের মুখোপাধায় মহাশয় এই ৭০ বৎসর বয়সে অভি প্রত্যয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া শুভ্র পদে নামাবলী হাজ গাজে গম্ভীর করিতে যান এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই বাড়ীতে প্রত্যাগত হইয়া বিষয় কার্যোন্নয়ননিবেশ করেন। আর তাঁহার যুবক পুত্র বাতায়ন পথে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিলে

শয্যা ত্যাগ করেন, তৎপর চা খাইয়া গরম কাপড়ের কোট, পোষাকে আপাদ মস্তক মণ্ডিত করিয়া প্রাতঃক্রমণে বহির্গত হন।

বুদ্ধ মুখোপাধ্যায়ের সর্দি কিম্বা অস্ত্র অস্থখ দেখাই যাম না, কিন্তু তাঁহার পুত্র মুখার্জি সাহেবের সর্দি ত লাগিয়াই 'আছে, তা' ছাড়া মধ্যে মধ্যে কঠিন রোগে ভুগিয়া থাকেন। ভারতের অস্ত্র প্রদেশ ছাড়িয়া আশুরা শুধু এই বাঙ্গালা দেশের জল বায়ুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তান জিনিটা প্রকৃতির চোখে বড় ভয়ানক। তানে সর্বনাশ অনিবার্য। আমি নির্ধন, ধনীরা তানে চলিলে পথের কান্দাল হইতে আমার বিলম্ব হইবে না। শীত নাই যেখানে, সেখানে শীত প্রধান দেশের সাজে চলিলে প্রকৃতির বিচারে স্বাস্থ্যের কান্দাল হইতে মিলম্ব হয় না। এই বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থলে ৩৪ মাস একটু শীত বাড়ে, বাকী ৮৯ মাস গ্রীষ্ম। এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীত প্রধান দেশের অনুকরণে সাজ পোষাক কি আহাঙ্গাদি কিম্বা ভেজবাদি গ্রহণ করিলে ফল বিষম হইবেই। চিন্তাশক্তির অভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশই গড়লিকা শ্রোতে চলিয়া থাকেন। মাথার চুল কাটার ব্যাপারটি লক্ষ্য করিলে দেশের বিচার শক্তির বহর বুঝিতে পারা যায়। মাথার মর্শ্বহানের চুল কাটিয়া ছাটিয়া শূন্য প্রায় করা হয়, অথচ যাহারা টুপি ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের এই স্থানটি কেশদামে উত্তমরূপ ঢাকিয়া রাখা কর্তব্য। হ্যাট ধারীদের সুবিধার অনুকরণে চুল কাটানই টুপীহীন জাতির ক্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিভাশালী অনুকরণশীল জাতির পক্ষে বিষয়ক্ষেত্র জ্ঞানরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

## শিশু পালন।

—:~:—

[ শিশুর খাদ্য ]

( পূর্বাভ্যুত্থি )

[ শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী । ]

শিশুকে কি নিয়মে খাওয়াইতে হইবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে শিশুর জন্মকালীন অবস্থা এবং প্রথম কয়েকমাসে তাহার দেহের গঠন ও বৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করা যাক।

পরিপূর্ণ সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে একটি সুস্থ শিশুর ওজন প্রায় ৩½ সের থাকে। ১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়। প্রথম ৩৪ দিনের মধ্যে শিশুর ওজন প্রায় একপোয়া কমিয়া যায়। তারপর উপযুক্ত খাদ্য পাইতে থাকিলে হাড়, মাংস, স্নায়ু এবং দেহের অন্যান্য যন্ত্রাদির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ওজনও বৃদ্ধি হয়। এইরূপে বাড়িতে থাকিলে একবৎসরের পর শিশুর ওজন ৯ সের হইতে ১১ সের পর্যন্ত হয়। এই সময়ের মধ্যে শিশুর ওজন দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ বৃদ্ধি হয়। জীবনের আর কোনো সময়ে মানব দেহ এত শীঘ্র বাড়েনা। সুতরাং স্পষ্টই যুক্তি যার যে, এই সময় শিশুর উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের কত প্রয়োজন। দেহ বৃদ্ধি এবং গঠনের জন্য খাদ্য কি অসীম কাজ করে, আমরা ইহা হইতে তাহার ধারণা করিতে পারি। খাদ্য দ্রব্য শিশুকে জড় পিণ্ড হইতে একটি জীবন্ত শিশুতে পরিণত করে। সুতরাং শিশুর জন্মের সময় খাদ্য নির্বাচন করিবে—যাহা দেহের পুষ্টিসাধন করে এবং সহজে হজম হয়। এই

সময়ে হাড়, মস্তিষ্ক, মাংসপেশী, ফুসফুস এবং অন্যান্য যন্ত্র এত শীঘ্র বাড়িতে থাকে যে, প্রত্যেকের সবল গঠন এবং বৃদ্ধির জন্ত বহু পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। এই সময়ে কেবল ঘুম এবং আহার গ্রহণ করা বাতীত শিশুর দৈহিক কিংবা মানসিক কোন কার্যই হয় না। মাতৃদুগ্ধই শিশুর স্নায়ু, মাংস হাড়, চর্বি প্রভৃতি গঠন এবং বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপাদান। মাতৃদুগ্ধই তাহার দৈহিক সমস্ত যন্ত্র গঠন এবং বৃদ্ধির একমাত্র সহায়। সুস্থ, সবল দেহ গঠন করিতে শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধই একমাত্র খাদ্য। মাতৃদুগ্ধই শিশুর দেহ গঠনের সমস্ত উপাদানই আছে। স্বাস্থ্যবতী মাতার দুগ্ধই শিশুর প্রাণ। ইহাতেই শিশুর যেমন দৈহিক সমস্ত যন্ত্র গঠিত হয়, মস্তিষ্ক পুষ্টি লাভ করে, তেমনি মানসিক উৎকর্ষও সাধিত হয়। ধর্মপ্রাণা, ভেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী রমণী আপনার ধর্ম, তেজ, মেধার অঙ্কুর বন্দের দুগ্ধ ধারা দ্বারাই সন্তানের মনের মধ্যে উগ্ধ করিয়া দেন। মাতা মহীরসী গরীরসী হইলে সন্তানও মহৎ এবং গরীমান হইবেই। কারণ সে যে মাতৃদুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে মহত্বের বীজ লাভ করিয়াছে। তাহার কল ও বৃদ্ধি বাইবার নয়। মাতার অন্তরে তেজ, মেধা প্রেম, সাধুতা থাকিলে সন্তানও ধীর, স্নেহ

প্রেমিক ও সাধু হইবেই। মাতা সুশিক্ষিতা হইলে সন্তানও মেধাবী হইবে। ইহাই ভগবানের রাজ্যের সাধারণ নিয়ম। ছই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেলে তাহা অল্প কোনো কারণে হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিফলতার ছই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহাই যে সাধারণ নিয়ম এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিকোঁধের কাজ। আমাদের দেশের শিক্ষিত পুরুষগণ এইরূপ ছই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াই কুটতর্ক জালে নারীর শিক্ষার পথে কাটা দিতে সর্বদাই উন্মুখ। মাতৃদুগ্ধই শিশুর ভবিষ্যৎ সমস্ত উন্নতির একমাত্র ভিত্তি। মাতা সাধু, মহৎ, উন্নতভাবে পূর্ণ হইয়া শিশুকে দুগ্ধপান করাইবেন। আপনার অস্ত্রের সমস্ত মহৎ চিন্তা একত্র করিয়া একাগ্রমনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া একনিষ্ঠ হইয়া শিশুর মুখে আপনার বক্ষের অমৃত ধারা ঢালিয়া দিবেন। চিত্ত যেন তখন চঞ্চল না থাকে, মন যেন পার্থিব নানা বিষয়ে ঘুরিয়া না বেড়ায়। চিত্ত যেন কোন প্রকার বিক্ষোভের আন্দোলনে আন্দোলিত না হয়। চিত্ত যেন শান্ত প্রফুল্ল এবং সংযত থাকে। চিত্ত বধন ছাথে, ক্রোধে, ক্ষোভে অশান্ত থাকিবে, তখন শিশুকে কখনও দুগ্ধ পান কবাইবেন না। তাহা হইলেই সব দোষ শিশুর মধ্যে সংক্রামিত হইবে। মাতা শিশুকে বতবার দুগ্ধপান করাইবেন, ততবারই শান্ত সমাধিতচিত্তে তাহা করিবেন। কিন্তু এইরূপ সংযমের সহিত শিশুকে দুগ্ধদান করিতে গেলে নারীর সর্বোচ্চ শিক্ষা চাই, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া দরকার। নতুবা এইরূপে উন্নতভাবে পূর্ণ হইয়া শিশুকে দুগ্ধদানের মর্মেই তাঁহাদের বোধগম্য হইবে

না। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, মাতা শিশুকে বক্ষে লইয়া দুগ্ধ দান করিতেছেন, এমন সময় হয় ত আর একটি শিশু আসিয়া কোন কারণে তাঁহাকে বিরক্ত করিল, আর তিনি ক্রোধে ভরে তাহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। এই যে মনের বিকৃতি ঘটিল, তাহা বক্ষের দুগ্ধ ধারার সহিত সন্তানের প্রাণে গিয়া মূজিত হইয়া গেল। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রাণে যখন শোক কিংবা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন সন্তানকে কখনো স্তম্ভদান করা কর্তব্য নহে।

যে সকল মেরুদণ্ড বিহীন, ভণ্ডাচারী, অমাহুযে দেশ ভরিয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে হইলে দেশের নারীজাতি বাহাতে সর্বোৎকৃষ্ট শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন, তাহার সমস্ত পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। নারীকে সর্বোচ্চ শিক্ষা দিতে হইবে, আত্মার স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে, সর্ব-বিষয়ে নারী যতদূর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, যতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন সে দিকে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই সাধু, বীর, ধর্মপ্রাণ সন্তানের আগমন হইবে। জনক যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, রাজা রামমোহন ও বিজ্ঞা-সাগরের আগমন বর্তমান অবনতির যুগে এদেশে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। নারীকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যে তাঁহার এই সব বাহা পুরুষ এবং মনস্বিনী নারীর উপযুক্ত জননী হইয়া তাহারিগকে অমনি করিয়া গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন। নারী তাঁহার বক্ষের অমৃতধারা পান করাইবার সঙ্গে সঙ্গে

মহত্বের বীজ সন্তানের প্রাণে অঙ্কুরিত করিয়া দিবেন। কবি তাই বলিয়াছেন :—

স্তনদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী.

বীর গর্ষে তার নাকচু ধমনী।

যে শিশু শৈশবে মাতৃদুগ্ধ পান করিতে পায় না, তাহার মত দুর্ভাগা এবং যে রমণীর বক্ষে উহার অভাব হয় তাহাব মত দুর্ভাগিনী আর নাই। মাতৃদুগ্ধের অভাবে কত শিশু বিকলাঙ্গ চির রুগ্ন, দুর্বল, বুদ্ধিহীন হইয়া সমাজের হেয় হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যবতী মাতার দুগ্ধই শিশুর প্রাণ, স্নাতরাং তাহা হইতে শিশুকে বঞ্চিত করা কখনো কর্তব্য নহে। তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ ঘটিলে শিশুকে মাতার দুগ্ধ ব্যতীত কৃত্রিম দুগ্ধ (গরু, ছাগল, গাধার দুগ্ধ) দিতে হইবে।

(১) মাতৃদুগ্ধের অন্নতা হইলে অর্থাৎ শিশুর ক্ষুদ্রিত্বের পক্ষে তাহা যথেষ্ট না হইলে শিশুকে কৃত্রিম দুগ্ধ প্রদান করিতে হইবে। এ সব স্থলে শিশু পরিপূর্ণ আগ্রহের সহিত স্তন গ্রহণ লয়, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ক্ষুদ্রিত্ব করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাদিতে থাকে। শিশুকে এরূপ করিতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, মাতার দুগ্ধ তাহার ক্ষুধা বাইতেছে না, আরো খাওয়ার প্রয়োজন। কিছুদিন এইরূপে ঘাটতে দিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শিশু রুমশ: মিটমিটে, বিবর্ণ এবং রোগা হইয়া যাইতেছে। পুষ্টি এবং খাওয়ার অভাবে এইরূপ হয়। এরূপ অবস্থায় স্তন্যপাণ উপযুক্ত পুষ্টিকর খাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা শিশুর গুরুস্তর পীড়ার আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। স্নাতরাং এমন স্থলে মাতার দুগ্ধ ব্যতীত মাতৃদুগ্ধের সমগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য দিতে হইবে।

দুধ অল্প বলিয়া শিশুকে তাহা দেওয়া বন্ধ করিবে না। যতটুকু মাতৃদুগ্ধ শিশু পান করে তাহাই তাহার পক্ষে অমৃতসম হয়।

(২) মাতার দুগ্ধের বিকৃতি ঘটিলে কিংবা দুগ্ধে অল্প দোষ অথবা অন্য কোন কারণে দুগ্ধের গুণ নষ্ট হইলে, তাহা শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। এরূপ দুগ্ধ পান করিলে শিশুর পুষ্টি না হইয়া যৌনত্ব অনিষ্ট হয়। এরূপ দুগ্ধ পানের ফলে শিশুর মাংসপেশী শিথিল এবং নরম হইয়া যায় এবং পেটের অস্বস্তি, কোষ্ঠি কঠিনা রোগে শিশু অসুস্থ হয়। মাতার দুগ্ধ ঠিক অবস্থায় আছে কি না—এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত।

(৩) মাতা ক্ষয়, যক্ষ্মা, হৃৎকুসের অসুখে আক্রান্ত হইলে কিংবা এই ভীষণ অসুখ পিতামার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া থাকিলে, তাহার দুগ্ধ শিশুকে কখনো দিবে না। এইরূপ অবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা গিয়াছে যে, মাতৃ দুগ্ধের দ্বারা শিশুর দেহে এই রোগের বীজ রোপিত হইয়াছে।

(৪) মাতা অল্প কোন অসুখে কিংবা রুগ্ন, দুর্বল দেহ বশত: কোন প্রকার ঔষধ সেবন করিতে থাকিলে, তাহার দুগ্ধ শিশুকে দিবে না। কারণ এইরূপ অবস্থায় মাতার দুগ্ধের গুণ নষ্ট হয়, স্নাতরাং শিশুর পক্ষে তাহা একেবারে অমুণ্যবোধী।

(৫) বেধানে মাতার সামাজিক অবস্থা এরূপ যে, অধিকাংশ সময়ই তাহাকে গৃহের বাহিরে থাকিতে হয়, অর্থাৎ কারিক শ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হয়, স্নাতরাং শিশুকে নিয়মিত দুগ্ধপান করিতে

পারেন না, সে সব স্থলেও মাতার দুধের গুণ  
টিক থাকে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায়  
শিশুর মাতৃস্তনা পান করা কর্তব্য নহে।

(৬) মাতার মৃত্যু হইলে কিংবা  
মাতৃস্তনে কোন পীড়া হইলে শিশুর কৃত্রিম  
খাদ্য বাতীত আর উপায় থাকে না।

উপরোক্ত কারণগুলি বশতঃ শিশু মাতৃদুধ  
পান করিতে না পাইলে অনেক স্থলে স্তনদুধ  
দিবার জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই  
প্রথা ঘোরতর আপত্তি জনক। ইহাতে শিশুর  
শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও রুতর  
অনিষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ  
যে শ্রেণী হইতে এই সকল ধাত্রী নিযুক্ত হয়,  
তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ  
সাধনের কোন সুযোগ হয় না। তাহাদের  
স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক  
বিষয়ে তাহারা বড় হীন। তাহাদের প্ররতি,  
মানসিক ভাব এবং নৈতিক আদর্শ ও অত্যন্ত  
নিকৃষ্ট প্রকৃতির। আবার বংশপরম্পরা গত  
তাহাদের রুদয়ে এমন কোন নীচ ভাব নৈতিক  
হীনতা, বা বুদ্ধি হীনতা বদ্ধমূল থাকিতে  
পারে—যাহা উচ্চবংশের ধর্মপরায়ণ পিতামাতার  
সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হইলে তাহার ঘোরতর  
অনিষ্ট হইবে। সুতরাং যে শিশু এইরূপ ধাত্রীর  
দুধে বর্জিত হয়, তাহার শারীরিক, মানসিক  
ও আধ্যাত্মিক হীনতা প্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা  
অধিক। অবশ্য কৃত্রিম দুধ পান করান  
অপেক্ষা উচ্চবংশ সন্তান, সুশিক্ষিতা, ধর্ম-  
পরায়ণা স্বাস্থ্যসম্পন্ন ধাত্রীর স্তন্যপান

করানই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এরূপ ধাত্রী পাওয়া  
কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। শিশুর  
আত্মার মধ্যে কেহ ধাত্রীর উপযুক্ত থাকিলে  
তাহার দুধ পান করানই সর্বোৎকৃষ্ট উত্তম।  
তাহা না হইলে হীন বংশের, হীন আদর্শে  
বর্জিতা ধাত্রীর দুধ অপেক্ষা গরু, ছাগল,  
গাধার দুধে শিশুকে পালন করা উচিত।  
বর্তমান সময়ে বিলাতি যে সকল কৃত্রিম দুধ  
আমাদের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার  
উপর শিশুকে বর্জিত করা ঘোর নিকৃদ্ধিতার  
কাজ। কেবল এই সকল দুধের উপর  
শিশুকে পালন করিলে শিশুর মাংসপেশী  
নরম-খলখলে হয়, হাড় দৃঢ় হয় না, কোন  
কোন স্থলে হাড় এমন নরম হয়, যে, পাবিকিয়া  
যায়। মস্তিষ্কের যথেষ্ট পুষ্টি হয় না। সুতরাং  
শিশু বুদ্ধিহীন হয়। মাতার যতটুকু দুধ  
থাকে—ততটুকু পান করান কর্তব্য, তাহাই  
শিশুর পক্ষে জীবন। মাতার দুধ শিশুর  
ক্ষমিত্বের পক্ষে কম হইলে গরু, ছাগল এবং  
গাধার দুধে তাহা পূরণ করিতে হইবে।  
প্রত্যবে কিংবা রাত্রিতে এই সকল দুধ পাওয়া  
না গেলে, দুই একবারের জন্য শিশুকে বিলাতি  
কৃত্রিম দুধ দেওয়া যাইতে পারে।

মাতার দুধে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জল  
আছে। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি জিনিস  
আছে। যথা—প্রোটিন, দেহজাতীয় পদার্থ,  
শর্করা এবং লবণ। এই দ্রব্যগুলি নিম্নলিখিত  
হারে মাতার দুধে দেখিতে পাওয়া যায়।

জল	শতকরা	৮৭.২৪	হইতে	৯০.৫৮
কার্বোহাইড্রেটস (শ্যাক্টোজ)	৩.১৫	৩.১৫	৩.১৫	৩.১৫
ফ্যাট বা শর্করা (ল্যাক্টোজ)	২.৬৭	২.৬৭	২.৬৭	২.৬৭
প্রোটিন (ছানা)	২.২১	২.২১	২.২১	২.২১
লবণ	০.১৪	০.১৪	০.১৪	০.১৪

মাতৃদুগ্ধে প্রোটিন নামক যে পদার্থ আছে, তাহা দ্বারা দেহের অঙ্গগুলি গঠিত হয়। দুধ নষ্ট হইয়া গেলে তাহাতে যে ছানার মত পদার্থ ভাসিতে দেখা যায়—তাহাই প্রোটিন। মানবের আহাৰ্য্যের মধ্যে প্রোটিন না থাকিলে জীবন রক্ষা হয় না। যে সকল উপাদান দ্বারা দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি বহিত ও পুষ্ট হয়, প্রোটিন—রক্তে সেই সকল উপাদান দান করে। শিশুর থাক্তে প্রোটিনের অভাব হইলে শীঘ্রই তাহার কুফল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রোটিনহীন খাদ্য খাইলে শিশুর দৈহিক গঠন এবং বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়, দেহ দুর্বল এবং বিবর্ণ হয়, মাংস থলথলে হয় এবং পীড়া রোধ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং দেহের অন্যান্য অংশ গঠন করিবার উপাদান, দুগ্ধের মাখন (ফ্যাট) রক্তের মধ্যে প্রদান করে। দেহের মধ্যে কতক ফ্যাটের রাসায়নিক পরিবর্তন হয় এবং তাহা দেহের তাপ উৎপাদন করে। ফ্যাট দেহকে গরম রাখে।

আমরা যে শর্করার সহিত সাধারণতঃ পরিচিত, মাতৃ দুগ্ধের শর্করার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিলেও উহা একই জিনিস নহে। দেহের তাপ রক্ষা করা এবং মাখন (ফ্যাট) তৈয়ারী করা এই শর্করার কাজ। ইহার রাসায়নিক নাম কার্বোহাইড্রেটস।

দুগ্ধে যে লবণ আছে, তাহা দেহের হাড় গঠন করে। দেহের অন্যান্য যন্ত্র গঠন করিতে এবং রক্ষা করিতে যে নানাপ্রকার লবণাক্ত পদার্থের প্রয়োজন হয়, তাহা এই লবণ—রক্তের মধ্যে দান করে। দুগ্ধের সমস্ত জল, প্রোটিন, ফ্যাট (মাখন) এবং শর্করা ফুটাইয়া নিঃশেষ করিলে পর একপ্রকার ছাইয়ের স্তর জন্ম

পতিত থাকিতে দেখা যায়, তাহাই দুগ্ধের লবণ। দুগ্ধ পান করিয়া হজম হইয়া যাইবার পর দুগ্ধের প্রোটিন, ফ্যাট (মাখন) শর্করা এবং লবণ—দুগ্ধের জল দ্বারা ই রক্তের মধ্যে নীত হয়। তারপর দেহ গঠনের কার্য্য চলিতে থাকে।

শিশুকে কোন কৃত্রিম দুগ্ধে পালন করিতে হইলে মাতার দুগ্ধে যে পরিমাণে উপরোক্ত পদার্থগুলি আছে, শিশুর খাদ্যেও সেই পরিমাণে উহা থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে একটি পদার্থের অভাবে কিংবা অন্যতর শিশু রীতিমত খাদ্য গ্রহণ করিলেও তাহার দেহ পুষ্ট হয় না, অধিকন্তু ক্রমশঃই শীর্ণ হইয়া যায়। মাতার দুগ্ধের পর গাভীর দুগ্ধই শিশুর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য। ছাগল এবং গাধার দুগ্ধের গুণও মাতৃ দুগ্ধের প্রায় সম গুণ বিশিষ্ট। গাধার দুগ্ধ শিশুকে ৩৪ মাস বয়স পর্য্যন্ত খাওয়ান যাইতে পারে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়, গাধার দুগ্ধে যেরূপ পুষ্টিকর পদার্থ নাই, কারণ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা গাধার দুগ্ধে মাখনের অংশ অনেক কম। মাতৃ দুগ্ধে শতকরা তিনভাগ মাখন আছে, কিন্তু গাধার দুগ্ধে শতকরা একভাগের কিছু বেশী মাখন আছে। সুতরাং গাধার দুগ্ধ শিশুকে বেশী দিন খাওয়ান চলে না। সাধারণতঃ গাধা দিগকে এত অপরিষ্কার স্থানে ও অপরিষ্কার অবস্থায় রাখা হয় এবং জলজ খাদ্য খাইতে দেওয়া হয় যে, ইহাদের দুধ শিশুকে খাওয়াইলে পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু গাধার দুগ্ধ মর্দা এবং সচরাচর বেশী পাওয়া যায় না। ছাগলের দুগ্ধ গাধার মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা মাখনের অংশ বেশী। এই কারণে প্রথম কয়েকমাস শিশুকে এই দুধ



দেওয়া যাইতে পারে না। শিশুর হজম শক্তির পক্ষে ছাগলের দুগ্ধ ভারী। ৮।৯ মাস হইলে শিশুকে ছাগলের দুগ্ধ দেওয়া যায়। বর্তমান সময়ে সহরে খাঁটি গাভীর দুগ্ধ চন্দ্রাপ্য। সহরের বাটীতে স্থানান্তর বশতঃ গাভী রাখাও অতিশয় কঠিন। এই কারণে ছাগল পুখিলে শিশুকে তবু খাঁটি দুগ্ধ দেওয়া যায়। বাটীতে ছাগল পুখিয়া তাহাকে

পরিকার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিয়া উত্তম খাদ্য আহার করাইলে তাহার যে দুগ্ধ হয়, তাহা শিশুর পক্ষে উপকারী ও পুষ্টিকর। সকল প্রাণীর দুগ্ধে একই পদার্থ সমূহ বিদ্যমান আছে। তবে তাহাদের পরিমাণে কম-বেশী আছে। মাতৃ দুগ্ধ, গাভী, ছাগল এবং গাধার দুগ্ধে কোন পদার্থ কি পরিমাণে আছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

(১০০ শত ভাগে)	জল।	ছানা।	মাখন।	শর্করা	লবণ।
মাতৃদুগ্ধ—	৮৮.৯০	৩.৪২	৩.৩৩	৪.৫৫	০.০২১
গাধা—	৮৯.০১	৩.৫৭	১.৮৫	৪.৫০	০.৫৫
গাভী—	৮৭.০৫	৪.২১	৩.৮২	৩.৬৭	০.৭১
ছাগল—	৮৬.৮৫	৩.৭৯	৪.৩৪	৩.৭৮	০.৬৫
মহিষ—	৮৪.১০	৪.০০	৭.১০	৪.০০	০.৮০

মাতৃদুগ্ধে যে পরিমাণ ছানা আছে, গাভীর দুগ্ধে তাহার পরিমাণ অধিক এবং শর্করার পরিমাণ কম। এই কারণে গাভীর দুগ্ধে জল এবং শর্করা মিশাইয়া শিশুকে পান করাইলে তাহা অনেকটা মাতৃদুগ্ধের সমান হয়। ২।১ মাসের শিশুর দুগ্ধে যতটা জল মিশান দরকার, শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। শিশুর দাঁত উঠিবার পূর্বে কোন প্রকার (Starchy) কঠিন শস্য বা খেতসার খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। দাঁত উঠিলে শিশুকে শস্যজাত খেতসার খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। দাঁত উঠিবার পূর্বে শিশুকে স্যারাকট, কুটি, সান্ড, ময়দা, আলু প্রভৃতি খেতসার খেওয়া একেবারে

নিষিদ্ধ। তখন এইরূপ খাদ্য খাইলে শিশুর অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। শিশু এরূপ খাদ্য তখন হজম করিতে পারে না। সময় সময় চারি মাসেও দাঁত উঠে, কিন্তু সাধারণতঃ ছয় মাস হইলেই শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ হয়। সুতরাং ছয় মাসের পূর্বে কোন প্রকার খেতসার বিশিষ্ট খাদ্য কখনো দিবে না। ছয় মাসের পর উহা অল্প পরিমাণে দেওয়া যায়। কিন্তু দুই বৎসরের পূর্বে খাদ্য ভাল করিয়া হজম করিবার শক্তি জন্মে না। শিশুদের জন্য যে সকল বিলাতি কৃত্রিম দুগ্ধ বাজারে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা কর্তব্য। কারণ এইরূপ কোন কোন দুগ্ধের ভিতর ময়দা প্রভৃতি খেতসার জাতীয়

জিনিস আছে। আহারের সময় জিহ্বা হইতে যে লালারস নির্গত হয়, তাহাই শত জাতীয় খাদ্য হজম করে। সাধারণতঃ চারি মাসের পূর্বে শিশুর জিহ্বা হইতে লালারস নির্গত হয় না। এই কারণে চারি মাসের পূর্বে শিশুকে starchy খাদ্য দিলে শিশু তাহা হজম করিতে পারে না।

বেশী পরিমাণে খাইলেই যে শিশুর দেহ পুষ্টিলাভ করে এরূপ বিবেচনা করা নির্বুদ্ধিতা। যতটুকু খাদ্য শিশু সহজে হজম করিতে পারে, তাহাই তাহার দেহের পুষ্টিসাধন করে। খুব খাইলেই যে শিশুর দেহ সবল ও স্বাস্থ্যবান হইবে এমন কোন কথা নাই। পুষ্টিকর, সহজে হজম হয়—এরূপ খাদ্য শিশুকে দিতে হইবে। শিশু খুব খাইতেছে—অথচ শরীর জীর্ণ, দুর্বলই রহিয়াছে—এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশু যাহা আহার করিতেছে তাহা জীর্ণ করিতে পারিতেছে না। যে শিশু মাতৃদুগ্ধ পায় না তাহাকে কৃত্রিম খাদ্য দিতে হয়। এইরূপ শিশুর সর্বাঙ্গের পুষ্টি সাধনের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রকারের খাদ্যই সর্বোৎকৃষ্ট।

(১) যে খাদ্যে মাতৃদুগ্ধের সম পরিমাণ উপাদান সমূহ আছে।

(২) এই উপাদানগুলি মাতৃদুগ্ধে যে পরিমাণে আছে ঠিক সেই পরিমাণ থাকিবে।

(৩) যে খাদ্য শিশু সহজে হজম করিতে পারে।

(৪) খাদ্য টাটকা হইবে। তাহাতে কোনো ময়লা ঘেন না থাকে এবং বিষাদ যুক্ত না হয়।

(৫) শিশুকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যতটা খাদ্য দিবে তাহার পুষ্টিকারিতা গুণ ঘেন দশ ছটাক হইতে ত্রিশ ছটাক মাতৃদুগ্ধের তুল্য হয়।

উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হয়, তবে তাহাতেই শিশুর দেহের পুষ্টিসাধন হইবে। একবৎসরের নিম্নবয়স্ক যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার চারিভাগের তিন ভাগ শিশুই কৃত্রিম খাদ্য আহার করে। অল্পমৃত্যু, অপুষ্টিকর খাদ্যই এই মৃত্যুর কারণ।

## শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

—:—

( কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি, )

বুকে সর্দি বাসিলে।—(১) মধুরপুচ্ছ ভক্ষণ—মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। মধুর পুচ্ছ ভক্ষণ করিতে হইলে একখানি হাতায় কতকগুলি মধুরপুচ্ছ রাখিয়া একটি ছোট বাটি দ্বারা উহা চাপা দিয়া কিয়ৎকণ অগ্নি সত্তাপে রাখিলেই উহা ভক্ষণ হইয়া থাকে। এক বৎসরের শিশুর জন্য এই মধুর পুচ্ছ ভক্ষণের পরিমাণ ১ রতি। এই

হিসাবে মাত্রা ঠিক করিয়া লইতে হয়। অবস্থা বিবেচনায় ইহা প্রাতে ও বৈকালে ২ বার করিয়াও সেবন কল্পন চলে। ইহার সহিত ১ রতি পিপুলের জল মিশাইয়া সেবন করাইলে আরও অফল দর্শি থাকে। (২) জাদার কল ও গুরাতন দ্রব্য একত্র মিশাইয়া কুচ ও গরুর মলিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পিপুল হইলে কল, কুচ ও গরুর মলিশ করিয়া

মধু, মিছরি, বড় এলাইচ ও হরীতকী—ইহাদের প্রত্যেকটি চারি আনা, সমস্ত দ্রব্য অগ্নি উত্তাপে দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক বিম্বক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দুই তিন বারে সেবন করাইলে শিশুর সর্দি-কাশীতে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

এঁড়ে লাগায়।—(১) ছপ্পের সহিত চুণের জল সেবন করাইলে এঁড়ে লাগা বা পারিগর্ভিক জনিত অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) ছাতিমফুল, মরিচ ও গোরোচনা প্রত্যেকটি ১ রতি মাত্রায় লইয়া জলসহ শিলায় পিষিয়া কয়েক দিন সেবন করাইলে এঁড়ে লাগা বা পারিগর্ভিক রোগের উপশম হয়।

জুরে।—(১) তুলসীর রস ও মধু শিশুর জ্বর নিবারক। (২) আতইচের গুঁড়া মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর সাধারণ জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। আতইচ বেণের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। আতইচের গুঁড়ার মাত্রা ১ বৎসরের শিশুর পক্ষে অর্দ্ধ রতি প্রাতে ও অর্দ্ধ রতি বৈকালে। জ্বরের সহিত কাশী ও বমির উপদ্রব থাকিলে ও এইরূপ ব্যবস্থায় উপকার হইয়া থাকে।

(৩) মূতা, হরীতকী (আঁটাবাদ), নতি, বহীমধু নিমছাল—প্রত্যেক দ্রব্য সাড়ে আট কুঁচ ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া শিশুর সাধারণ জ্বরে এক বিম্বক মাত্র পাওয়াইবে, বাকী কাথ ফেলিয়া দিবে। এরূপ ব্যবস্থায় শিশুর সাধারণ জ্বরে স্বফল দর্শিয়া থাকে। (৪) নতি, নিমছাল, হরীতকী (আঁটাবাদ), বহীমধু (আঁটাবাদ), হরিত্রা আমলকী (আঁটাবাদ)—প্রত্যেক দ্রব্য বত্রিশ কুঁচ ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সমস্ত কাথ

কার্তিক—১

ফেলিয়া দিয়া মাত্র একবিম্বক বালককে কয়েকদিন সেবন করাইলে বালকের সাধারণ জ্বরে উপকার হইয়া থাকে। ৩ এবং ৪নং যোগ দুইটি অন্ততঃ ৩ বৎসর বয়স্ক শিশু ভিন্ন সেবন করান ঠিক নহে।

বমন রোগে।—(১) কন্টকারী ও বৃহতী ফলের রস সমান ভাগে সিদ্ধি বিম্বক মাত্র লইয়া সেবন করাইলে শিশুর বমন প্রশমিত হয়। স্তন-দুগ্ধ পান মাত্র যে সব শিশু বমন করিয়া থাকে—তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। (২) আম্রকেশী, সৈন্ধব লবণ ও খই চূর্ণ একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর বমন রোগে উপকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক দ্রব্যের মাত্রা ১ বৎসরের শিশুর জন্ত ১ রতি। (৩) পিপুলের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া ও কাশীর চিনি প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ রতি করিয়া লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া লেবুর রস সহ সেবন করাইলে শিশুর বমন রোগের উপশম হইয়া থাকে। শিশুর হিকা রোগেও এ যোগটিতে উপকার হয়।

মূত্র রোধে।—পিপুল, মরিচ, ছোট এলাইচের গুঁড়া, চিনি, সৈন্ধব লবণ—সমান ভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া অবলেহ করাইলে শিশুর মূত্ররোধে উপকার দর্শিয়া থাকে।

মুখ পাকিলে।—অর্থ গাছের ছাল ও পত্র—উত্তমরূপে বাটয়া মধুর সহিত মিশাইয়া মুখে প্রলেপ দিলে শিশুর মুখপাকিলে উপকার হইয়া থাকে। এই প্রলেপ দিবার সময় সাবধানে ইহার প্রয়োগ করিবে, খেন চকে না লাগে।

দন্তোদ্বেদ রোগে।—শিশুর দাঁত উঠিবার সময় জ্বর, অকীর্ণের প্রকৃতি নানা

প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। বিশেষ কোনো ঔষধ এই অবস্থায় প্রয়োগ করা ঠিক নহে, কারণ দাঁত উঠিলে ঐ সকল রোগ আপনা আপনিই সারিয়া যায়। এই সময় আমলকীর রস দাঁতেয় মাড়িতে ঘসিতে থাকিলে শীঘ্র শীঘ্র দাঁত উঠিয়া থাকে। খাইফুল ও পিপুলের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া দাঁতের মাড়িতে ঘসিলেও শীঘ্র শীঘ্র দাঁত উঠিয়া থাকে। যদি এ সকল ব্যবস্থা করিলেও দাঁত উঠিতে বিলম্ব হয় এবং তজ্জন্ত বিশেষ কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে স্ন্যবোগ্য চিকিৎসকের সাহায্যে ঐ স্থান চিরিয়া দেওয়া কর্তব্য।

#### দূষিত স্তন্যপান জনিত-রোগে।

—দূষিত স্তন্যপানে শিশুর নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় শিশুর পেট ফাঁপা উপদ্রব ঘটিলে এক ছটাক ছুন্ধের সহিত ১ তোলা ধনে বা মৌরী ভিজান জল মিশ্রিত করিয়া পান করানর ব্যবস্থা করিবে। গব্য ছুন্ধের সহিত সপর্শমিত চুণের জলও এইরূপ অবস্থায় উপকারী। ধাতীর স্তন দূষিত হইলে সেই স্তন্যদুহ্য শিশুকে কখন পান করিতে দিবে না, ছাগ দুহ্য কিম্বা জল ও মিছরি মিশ্রিত গব্য দুহ্য পান করান এই অবস্থায় ফলপ্রসূ।

ভেদ বসিতে।—(১) কুল, আমকুল, কাকমাচী ও কয়েদবেল এই সকল দ্রব্যের পাতা পিষিয়া লইয়া মাথায় প্রলেপ দিলে শিশুর ভেদ বসি নিবারিত হয়। (২) বেল তুঁঠ ও আমের আটির শাঁসের কাথের সহিত

খইয়ের গুঁড়া ও চিনি মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর ভেদ বসি নিবারিত হয়।

অতিসারে।—আমড়া ছাল, আম ছাল ও জাম ছালের গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া চিনি বা মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (২) খাইফুলের গুঁড়া কিম্বা বেলতুঁঠের গুঁড়া—চিনি কিম্বা মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। ১ বৎসরের শিশুর জন্ত ঐ ২টি দ্রব্যের প্রত্যেকটির মাত্রা ১ রতি। (৩) ছাগ দুহ্য ও জামছালের রস কিম্বা জাম গাছের পাতায় সিদ্ধ করা ছাগ দুহ্য শিশুর অতীসার নাশক। (৪) বেলতুঁঠ, ইন্দ্রযব (কুড়চির ফল), বালা, মোচরস ও মুখা—প্রত্যেক দ্রব্য ১০/১০ আনা, ছাগ দুহ্য এক পোয়া ও জল একসের—একত্র সিদ্ধ করিয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শিশুকে ২৩ বারে উহা পান করাইলে শিশুর অতীসার প্রশমিত হয়।

আমাশয়ে।—(১) সাদা জীয়ার গুঁড়া ও সাদা ধুনার গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া চিনি বা মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর প্রবাহিকা বা আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। মাত্রা—১ বৎসরের শিশুর জন্ত প্রত্যেক দ্রব্যের মাত্রা অর্দ্ধ রতি। (২) খইয়ের গুঁড়া, বহীমধুর গুঁড়া, চিনি ও মধু—সমান ভাগে লইয়া সেবন করাইলে শিশুর প্রবাহিকা বা আমাশয় আরোগ্য হয়। মাত্রা পূর্ববৎ।

## সফল চিকিৎসা।

—:~:—

( বাতাজীর্ণে লাল চতুর্মুখ । )

অজীর্ণ রোগে সাধারণতঃ কবিরাজী চিকিৎসার ভাস্কর লবণ, মহাশঙ্খ বটী, হিষ্টঙ্ক চূর্ণ, বজ্রক্ষার প্রভৃতি ঔষধই ব্যবহার করা হয়, অনেক সময় সে সকল ঔষধে স্ফুলও হইয়া থাকে, কিন্তু অনেক সময় ঐ সকলের ব্যবহার রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় না। ইহার কারণ অল্প কিছুই নহে, রোগের মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ত এইজন্যই বলিয়া গিয়াছেন,—

“রোগমাদৌ পরীক্ষতে ততোহনন্তর মৌষধম্।

ততঃ কৰ্ম্মভিষক পশ্চাজ্জ্ঞান পূৰ্ণং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ অগ্রে রোগ পরীক্ষা করিয়া তাহার পর ভিষক জ্ঞানপূর্বক যথা বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

অনেক সময় কিন্তু রোগের মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, এইজন্যই চিকিৎসক স্ফুল প্রদর্শনে ‘সমর্থ’ হন না, কিন্তু যদি রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া যথাশাস্ত্র ঔষধ প্রয়োগ করা যায়—তাহা হইলে তদ্বারা যে স্ফুল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহা স্থানিষ্ঠিত।

আমি রাণাবাটে থাকিতে একটি মৃত্তকর অজীর্ণ রোগীর চিকিৎসার “লাল চতুর্মুখ” সেবন করাইয়া অতি আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার কথাই জ্ঞানি বলিব।

রোগীর নিবাস রাণাবাটেই, রোগী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. উপাধিকারী এক কলিকাতা পোষ্ট অফিসের একজন কর্মচারী।

নাম শ্রীযুক্ত জ্যোতিষেন্দ্র বসু। বয়স ৩৫-৩৬ বৎসর। পূর্বে ইনি যথেষ্ট ব্যায়াম করিতেন, তখন তাঁহার শারীরিক গঠন খুব দৃঢ় ছিল। ডাকঘরের চাকরি লইয়া পদোন্নতি কামনায় ইনি প্রাণান্ত পরিশ্রম পূর্বক অনিয়মিত পরিশ্রম করিতেন। অনিয়মিত পরিশ্রম করিতেন—অথচ উপযুক্ত আহার ছিল না, ফলে তিনি কিছুকাল কর্ম করার পরেই দারুণ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইলেন। অজীর্ণ বায়ু জনিত। সর্কদাই পেট ফাঁপিত, কোষ্ঠি শুষ্ক হইত না, আহার করিতে পারিতেন না, শিরঃপীড়া বোধ হইত, বুক ধড়ফড় করিত, রাগ্রে ভাস্করপ নিদ্রা হইত না, স্বপ্ন ভঙ্গ হইত, কোনো কার্যে উৎসাহ ছিল না, ক্রমে কার্য করিবার সামর্থ্য একেবারে লুপ্ত হইল, যাহা খাইতেন, তাহাই অজীর্ণ হইতে লাগিল, ক্রমে অর্শ আসিয়াও উপস্থিত হইল।

রোগীর কর্মস্থান কলিকাতায়, বিশেষতঃ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. উপাধিকারী—শিক্ষিত ব্যক্তি, কাজেই তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রথমতঃ কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার দিগের হাতেই পড়িল। কয়েকজন আলোচনা দেখিলেন, কয়েকজন হোমিওপ্যাথ দেখিলেন, শেষে কলিকাতার কয়েকজন প্রখ্যাতনাма কবিরাজও তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। কলি কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। অনেকে Change বাওরা বা হাওয়া পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন, তিনি

সেই পরামর্শ শিরোধার্য করিয়া “কৈলোয়ারে” পর্য্যন্ত কয়েকমাস কাটাইয়া আসিলেন।

কৈলোয়ারে গিয়া তাঁহার রোগের শান্তি ত হইলই না, বরং রোগ আরও ভীষণ ভাব ধারণ করিল, তিনি অস্থিরকাল সর্বস্ব হইলেন। সত্য কথা বলিতে কি, তখন একরূপ তাঁহার হাড় কয়খানি মাত্রই অবশিষ্ট। একরূপ অবস্থায় তাঁহার আত্মীয়গণ আর তাঁহাকে কৈলোয়ারে রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাঁহার আবাস ভূমি রাণাঘাটে লইয়া আসিলেন। কিন্তু “যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্মাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্য৷ কালস্য কুটলাগতিঃ।”

একান্ত রাণাঘাটে মৃতকর অবস্থায় তাঁহাকে লইয়া আসা হইলেও রাণাঘাটের কয়েকজন প্রসিদ্ধ অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসকের দ্বারা তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু সকল চিকিৎসকই এক বাক্যে বলিলেন,—এ রোগীর জীবনের আশা নাই, চিকিৎসা করান বৃথা।

এই সময় রোগীর মাতুল গবর্ণমেন্টের পেনশন প্রাপ্ত বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষ মহাশয় রোগীকে আমার নিকট লইয়া আসিলেন। দুইজন দুই দিকে ধরিয়াছে, রোগী অতি কষ্টে হাঁটরা আসিতেছে—এইরূপ ভাবে রোগী আমার চিকিৎসালয়ে আগমন করিলেন। আমার সহিত তখন তাঁহার পরিচয় ছিল না, আমি রোগীর অবস্থা দেখিয়া বলিলাম—“ইহাকে কষ্ট দিয়া কেন লইয়া আসিলেন? আমাকে লইয়া গেলেই তো ভাল হইত।” রোগীর মাতুল বলিলেন,—“ইহার আর কোনো চিকিৎসায় বিশ্বাস নাই, সেইজন্য আর অধিক অর্থ ব্যয়ে ইচ্ছুক নহেন। আমি একরূপ আপনাকে শেব দেখান দেখাইব বলিয়া জোর করিয়াই লইয়া আসিয়াছি।”

আমি স্থির ভাবে তাঁহার সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিলাম। নাড়ী পরীক্ষা করিলাম—নাড়ী বাতশ্রবণ এবং অতিশয় দুর্বল। রোগী আমাকে তাঁহার রোগের আত্মোপাস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। রোগ-পরিচয়ে তিনি এত ভাল করিয়া বুঝাইলেন যে, আমি তাহার পূর্বে কোনো রোগীর নিকট সেরূপ পক্ষিকার ভাবে রোগের অবস্থা বিবৃতি করিতে দেখি নাই। রোগী যারপরনাই দুর্বল, সেই দুর্বলতা নিবন্ধন তখন তাঁহার কথা কহিতেও যেন কষ্ট হইতেছিল। তিনি খুব কষ্ট করিয়াই তাঁহার রোগের সকল কথা আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই রোগের অবস্থা বিবৃতি করিতে তাঁহার প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন, “দেখুন, আমার আর চিকিৎসা করানর ঐশ্বর্য নাই, আপনি ত রাণাঘাটে পড়িয়া আছেন, কলিকাতার বড় বড় অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ এবং কবিরাজের আমি শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, কেহই কিছু করিতে পারেন নাই, রাণাঘাটেরও বে করজন বড় ডাক্তার আছেন—সকলকেই দেখাইয়াছি।

—এক কথায় আমার মত গৃহস্থের পক্ষে যতদূর সাধ্য চিকিৎসা করান হইতে পারে, তাহা আমি করিয়াছি। এখন সকলেই জবাব দিয়াছেন। আমি এখন মরিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছি। আমার নিত্যই অনুরোধে আপনার নিকট আসিয়াছি যদি, কিন্তু আমি সপ্ত দিন আপনার চিকিৎসায় অপেক্ষা করিতে পারিব না, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো রূপ উপকার প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে এক সপ্তাহেই আপনার দ্বারা চিকিৎসা করান

সাধ আমার মিটিয়া যাইবে। আপনি এই সকল বিবেচনা করিয়া যদি এরূপ কোনো ঔষধ থাকে—যাহাতে মস্তশক্তির মত কার্য্য করিতে পারে,—তবে তাহাই আমাকে প্রদান করুন। নতুবা কোনো ঔষধ দিবেন না।”

কোনো রোগী আমার নিকট এরূপ কথা ঠিতপূর্বে বলে নাই, কোনো চিকিৎসকের নিকট আর কোনো রোগীও এরূপ কথা বলিয়াছে কি না তাহাও আমি জানি না। ফলে রোগীর মুখে এরূপ কথা শুনিলে সাধারণতঃ সে রোগীর চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্তিই হয় না। আয়ুর্বেদশাস্ত্রও সেরূপ রোগীর চিকিৎসা করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

আয়ুর্বেদ সে সম্বন্ধে তো বলিয়াছেন,—  
বৈরা বৈতথবিদগ্ধশ্চ শ্রদ্ধাহীনঞ্চ শঙ্কিতঃ ।

ভিষজাম্ বধেয়াশ্চ নোপক্রম্যা ভিষগ বিধাঃ ॥

অর্থাৎ শত্রুতা ভাব সম্পন্ন বৈদ্যদুর্ভ, বিশ্বাসহীন, শঙ্কিত, চিকিৎসকের অবাধা ও চিকিৎসক কল্প—এই সকল ব্যক্তির চিকিৎসা করিবেনা।

কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম,—রোগে ইহাকে এইরূপ চিকিৎসায় বিশ্বাসহীন করিয়াছে, নতুবা ইনি যে রূপভাবে আত্মরোগ বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে ‘চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী ইনিই ত সর্বপ্রথম চিকিৎসার উপযুক্ত পাত্র। কারণ চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“নিজ প্রকৃতি বর্ণভ্যাং যুক্তঃ সন্তেন চক্ষুঃ।

চিকিৎসো ভিষজা রোগী বৈতথ ততো দ্বিতঃ ॥

উপরোক্ত শ্লোকের মধ্যে আমাদের লিখিত রোগীর সমস্ত গুণ না থাকিলেও নিজ রোগ বিবরণ ইনি যে রূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইনিই তো চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী সর্ব প্রথম চিকিৎসার যোগ্য।

যাহা হউক আমি তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলাম। ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম—অজীর্ণের বাধাধরা নিয়মে নছে,—একটু রকমারি করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিলাম। তাহাকে প্রথম সপ্তাহে যে কয়টি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

প্রাতে—লাল চতুর্ন্থধ ।

রস সিন্দূর, লৌহ ও অত্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং স্বর্ণ ভস্ম এক চতুর্থাংশ। দ্ব্যত কুমারীর রসে মাড়িয়া, এরও পত্র দ্বারা বেটন পূর্বক ধাতুরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া ২ রতি বটা—যাহা বাতব্যাধি অধিকারে লিখিত আছে—সেই ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। অল্পপান দিলাম—বায়ু রোগ শাস্তির বাধা নিয়মে ত্রিকলা ভিজান জল ও মধু।

দিবসে আহারান্তে

ভাস্কর লবণ—

ইহাঙ্গ মাত্রা\* দিলাম এক আনা মাত্র। অল্পপানের ব্যবস্থা করিলাম—টট্টকা ঘোল।

সন্ধ্যায়—বজ্রকার ।

মাত্রা এক আনা। অল্পপান—মৌরী ভিজান জল।

আমার নিকট আসিবার পূর্বে জীর্ণ হইত না বলিয়া রোগী একেবারে ভাত খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—“তাহা হইবে না, একবেলা ভাত ও একবেলা সাপ্ত খাইবেন। ভাত কিন্তু বাহা খাইবেন, তাহাতে উদরপূর্তি সম্যকরূপে করিতে পারিবেননা, অর্ধেক হিসাবে খাইবেন। প্রাতে এবং বৈকালে পাকা পেসে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। দিবসে যে ভাত খাইবেন, তাহা যেম ঘোলা ১১টার পর না খাই এবং ১১টার পূর্বেও না খাই।

ঠিক একই সময়ে আহারকাল ঠিক রাখিবেন। খুব প্রচুরে সামর্থ্য মত একটু একটু হাঁচিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিবেন। বৈকালেও ঐরূপ ষতটুকু সঙ্ক করিতে পারেন, করিবেন। দিবসে একেবারেই শয়ন করা চলিবে না, রাত্রিতে ৯টার পর কিস্তি নিদ্রা না আসিলেও শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে। ভাতের সঙ্গে বেশী ব্যঞ্জন খাইতে পাইবেননা, জীবিত মৎস্তের ঝোল এবং ভাত। মৎস্তের ঝোল বাহা রন্ধন করা হইবে—তাহাতে লব্ধা মরিচের কাল একেবারে দেওয়া হইবে না।\*

রোগীকে যেরূপ বলিয়াছিলাম, ঠিক সেই ভাবে তিনি এক সপ্তাহ আমার ব্যবস্থায় থাকিলেন, এরূপ চমৎকার ফল হইল যে, তাহাতে আমি তো আশ্চর্য্য হইলামই, রাণাঘাটের যে বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁহাকে চিকিৎসার অসাধ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া ছিলেন, তাঁহারাও এক সপ্তাহ পরে তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। রাণাঘাটের ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্র নাথ গুপ্ত এল, এম, এস মহাশয় আমার দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা হইবার পূর্বে তাঁহার ওজন লইয়াছিলেন, এই সময় আবার ওজন লইয়া দেখিলেন—ওজনে তিনি একসের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রোগীরও ক্ষুধা হইল। দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগী অতি আত্মারদের সহিত আমার নিকট আগমন করিয়া সকল কথা বলিলেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহেও আমি তাঁহার প্রথম সপ্তাহের ব্যবস্থাই বজায় রাখিলাম। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহ। ব্যবস্থার আর পরিবর্তন করিলাম না, একই ব্যবস্থা চালানিতে লাগিলাম। কয়েক সপ্তাহের পরে তাঁহার উদরাময় বেগু দিল, আমি এই সময় তাঁহার

ঔষধি বদলাইয়া দিয়া তাহার স্থলে “চিৎকাদি গুড়ি”র এক একটি গুড়িকা শীতল জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিলাম। এই চিৎকাদি গুড়ির ব্যবস্থার সময় রোগী বলিলেন, “মহাশয় ঐ ঔষধিটি দিবেন না, উহা আমি কলিকাতায় \* \* কবিরাজ মহাশয়ের নিকট অনেক খাইয়াছি, কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। ঐ ঔষধি আমার ভক্তি নাই।” আমি বলিলাম—“তখন উপযুক্ত কাল হয় নাই বলিয়া আপনি তখন ফল পান নাই, এখন ইহা ব্যবহার করিলে ফল পাইবেন।”

ফলে এইরূপ ভাবে তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দিন দিনই তাঁহার বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। রাণাঘাটের অধিবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন।

আহারের ব্যবস্থাও আমি ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ এক বেলা ভাত ও এক বেলা গরম গরম খোলা হইতে গব্য যুঁতে ভাজা টাটকা লুচি খাওয়ার ব্যবস্থা দিলাম, রোগীর এই সময় ক্ষুধা খুব, বাহা খান তাহাই অতি শীঘ্র জীর্ণ হইতে লাগিল। এই সময় তিনি একদিন বলিলেন, “কবিরাজ মহাশয় বহুকাল সন্দেশ খাই নাই, উহা খাইতে ইচ্ছা করিতেছে, একটি খাইব কি?” আমি খাইবার ব্যবস্থা দিলাম, কিন্তু রোগীর এতই সংযম শিক্ষা যে, আমি ব্যবস্থা দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে তবে তিনি উহার একটি মাত্র খাইয়াছিলেন তাহারই মধ্যে গুলিয়াছি।

শারীরিক বল বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে প্রাতঃস্নানকে ক্রমশঃ ব্যবস্থা খুব বেশী করিয়া দিলাম। ক্রমশঃ তিনি প্রাতে এক কোশ খাইয়া এক কোশ রান্ধা রাগুণ্ডা প্রভৃতি খাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রোগীর



এইরূপ ভাবে ৬ মাস কাল তাঁহার চিকিৎসা করা হয়। শেষে তাঁহাকে বায়ু সকল সতেজ করিবার জন্ত একবার করিয়া ‘স্বর্ণবঙ্গ’ সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছিলাম। নিত্য দান্ত পরিকার রাখিবার জন্ত কখন কখন ‘প্রাণদা গুড়িকা’ সেবন করিতে দিতাম। এই প্রাণদা গুড়িকা গুণের পরিবর্তে হরীতকী দিয়া প্রস্তুত। বায়ু শান্তির জন্ত কখন কখন বিষ্ণু তৈল মর্দনের ব্যবস্থা করিতাম। বাহা হউক ৬ মাস পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে আবেগ্য লাভ করিলেন কিন্তু তখন কার্যে join না করিয়া আরও কিছু দিন পরে কার্য্য ভর গ্রহণ করিলেন।

রোগের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইলেও তিনি কিন্তু চতুর্দ্বৈধ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেন নাই। সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হওয়ার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তিনি ১ বার করিয়া লাল চতুর্দ্বৈধ সেবন করিতেন। আমিও বুঝিয়াছিলাম অজ্ঞাত যে সকল ঔষধেরই ব্যবস্থা করিয়া কেন,—একমাত্র ‘লাল চতুর্দ্বৈধ’ এইরূপ শুভফল প্রদান করিয়াছে, রোগীও বুঝিয়া ছিলেন,—ঐ ঔষধই তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন রোগী এরূপ হঠাৎ পৃষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছেন যে, কখন যে তাঁহার এরূপ অবস্থা ঘটয়াছিল—একদা তাঁহাকে দেখিয়া আর তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এখন তিনি কলিকাতা পোষ্ট অফিস সমূহের জেনারেল কম্পাউন্ডে বিভাগের হেড ক্লার্কের কার্য্য করিতেছেন। কলিকাতায় সকল পোষ্টপিসের কার্য্যচারিতাই তাঁহার ক্রমে সময়ের অবস্থা অবগত আছেন।

কবিরাজী ঔষধের শক্তির সৌক দেখিয়া

অনেকে কবিরাজী ঔষধে ‘গুরু হারাঁইলে গুরু পাওয়া যায়’ বলিয়া যে পরিহাস করিয়া থাকেন, বাস্তবিক পক্ষে তাহা ঠিক নহে। ফল-মূল্যশী আর্ধ্য ঋষিগণ জ্ঞান গভীর গবেষণা দ্বারা যে সকল ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ফলশ্রুতি উপলক্ষে সেই সকল ঔষধ নানাবিধ রোগ নিবারক বলিয়া বাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য কথা। রোগ বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে কবিরাজীর প্রত্যেক ঔষধটিই নানাবিধ রোগ আরোগ্যে সমর্থ। আমি যে লিখিত রোগীটির জন্ত চতুর্দ্বৈধ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম,—তাঁহার কারণ, ঐ রোগীটির রোগ তখন যে আকারই ধারণ করুক, উহার মূল কারণ বায়ুর বৈষম্য। চতুর্দ্বৈধে যে সকল উপাদান আছে, তাহার মধ্যে লৌহ—তিক্ত, সারক, শীতল, কষায়, মধুর, গুরু, কন্দ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুষ্য, লেখন, বায়ুবর্দ্ধক, কক্ষ-প্রিত্তনাশক ও বিষয়।

অত্র—কষায়, মধুর, শীত বীর্ধ্য, আয়ুর্জর, ধাতুবর্দ্ধক, ত্রিদোষ প্রশমক, ক্রিমিনাশক ও বিষয়।

স্বর্ণ—কষায়, তিক্ত, মধুর, গুরু, লেখন, হৃদ্য, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুষ্য, কান্তিপ্রদায়ক বিষয় ও পবিত্র।

রস সিন্দূর—ক্রিমিনাশক, কুষ্ঠের, স্বাচ্ছন্দ্য প্রদ, দৃষ্টির বলবর্দ্ধক, সারক, অকাল মৃত্যু নিবারক, বীর্ধ্যবান, জরয়, ব্রূষ্য, পাণ্ডুরোগ প্রশমক এবং উপযুক্ত কাথাদির সহিত সেবনে সর্বব্যাপি দ্রাব্যক।

ঐ এক গুণের মিশ্রণে তাঁহার পূর্ব বৃত্ত কুমারীর রূপ, বয়ঃ, মনোবৃত্তি ও মনোরম গুণ রাশির সমস্ত ক্রিয়াদি স্থাপনে উহার ঐ পদ্ধতি

সঞ্চারিত হয়, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

এতদ্রসায়ন বরং ত্রিফলামধুযোজিতম।

তদ যথায়ি বলং খাদেদ বলীপলিত নাশনম্ ॥

কমলেকাদৃশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রম্নেহকম্।

কাসং শূলঞ্চ মন্দাধিং হিকাঞ্চৈবান্নপিত্তকম্ ॥

ত্রণান্ সর্কানাতা বাতঃ বিসর্পঃ বিদ্রুগিং তথা।

অপস্মারং মহোন্মাদং সর্কশাংসি ত্ৰণামস্মান্ ॥

ক্রমেন শীলিতং হস্তি বৃক্ষমিষ্টাংশি যথা।

পৌষ্টিকং বল্যামায়াং ত্রীণাং প্রসব কারণম্ ॥

অর্থাৎ ত্রিফলা ও মধুরসহিত এই ঔষধ সেবনে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়নের কার্য্য করিয়া থাকে।

ইহা সেবনে বলীপলিত নষ্ট হয়, একাদশ প্রকার ক্ষয়জ ব্যাধি প্রশমিত হয়, পাণ্ডুরোগ, প্রমেহরোগ, কাস, শূল, মন্দাধি, হিকা, অন্নপিত্ত, ত্রণ, সর্কপ্রকার বাত, বিসর্প, বিদ্রুগি অপস্মার, উন্মাদ ও অর্শ রোগ আরোগ্য ইহা থাকে।

আমি অনেক রোগেই যেখানে রোগের মূল কারণ বায়ুর বিকৃতি বিবেচনা করিয়া থাকি, সেই স্থানেই চতুর্ধুখের ব্যবহারে এরূপ অদ্ভুত ফল পাইয়া থাকি যে, অনেক সময় অনেক ঔষধে সেরূপ ফল দেখিতে পাইনা।

## ওলাউঠা চিকিৎসা।

( পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর )

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন)

১। কালীত্বক রস।\*

অর্ণব ১ হরিতাল ১ হিজুল ১ লোহ ১  
বন্ধ ১ সোহাগা ১ জীরা ১ বিব ১  
দারম্ভ ১ অহিফেন ১

এই দশখানি দ্রব্য প্রত্যেক সমান ভাগ ওজন করিয়া লইবে। ইহার মধ্যে অর্ণব ও লোহ এবং বন্ধ এই তিনখানি দ্রব্য শোধন ও মারণ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিধি পূর্বক তত্ত্ব করিয়া

এই ঔষধে প্রযুক্ত। হরিতাল শব্দে বংশপত্রী হরিতালই প্রযুক্ত। হরিতাল ভস্ম করিয়া লইলেও হয়, অথবা জলে শোধন করিয়া লইলেও চলিতে পারে। অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি যথাবিধি শোধন করিয়া লইতে হইবে। সকল প্রকার শোধন ও মারণ প্রক্রিয়ার বিবরণ আমরা ইহার পর বিশেষরূপে বর্ণন করিব।

প্রথমতঃ শোধিত হিজুল, হরিতাল, দার-

দ্রুর্ণণঃ তালকং রক্তং তীক্ষ্ণ বজ্রং সটম্বনং।  
এতৎ সর্বং সমং ব্রাহ্ম হুস্ত চূর্ণাণি কারয়েৎ।  
কেশরাজ রসেনাপি জ্ঞাতা স্মীরেণ বর্জয়েৎ।  
সর্বং ব্যাধি হরয়েৎ ব্যাধি-বারণ-কেশরী।  
অরম্ভে বিধং হস্তি নান্য যোবোদ্ধবং তথা।  
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ বরং ওজঃ বিনাশয়েৎ।  
রসো কালীত্বকো নাম সূনিদা পরিনির্দিষ্টঃ।

জীরকাকৃতং দারু বণি কেশং ভবেৎ চ।  
হিজুলী বরলৈতাব্যং ভূকরাজ রসঃ-সুবাঃ।  
ওজাঃ বটিকাং কুর্বাৎ বাণয়েৎ কুল্লুরো ভিৎসু।  
সংগ্রহ এতপীং হস্তি চিরকালিহু বর্জয়িতু।  
কালীসারং বিহত্যাং শোধ্য সূনিদা একীকৃত্য।  
অধিক ভূকরাজীভূৎ বরমুদৌ কুল্লুরসে।  
উৎকট প্রসাদেব অকালে মরণং ভবেৎ।

মুখ, জ্বারা এবং বিষ—প্রত্যেক দ্রব্য পৃথক পৃথক ভাবে স্বল্প চূর্ণ করিয়া রাখিবে। এমন ভাবে চূর্ণ করা চাই, যাঁহাতে কিছুমাত্র কুচি না থাকে। সোহাগা খোলায় ভাজিয়া খই করিয়া দিবে। গাঢ় পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। ঔষধের প্রত্যেকটি উপকরণ সংগ্রহ হইলে, তারপর একটা পরিমাণ স্থির করিবে। সিকি তোলা, অর্দ্ধ তোলা, এক তোলা অথবা বাঁহাণ যেরূপ স্তবিধা ও প্রয়োজন সেইরূপ মাত্রায় প্রত্যেকটি দ্রব্য ওজন করিয়া একত্র মর্দন করিবে। তবে কথা এই—সকলগুলি দ্রব্যই ভাগে সমান হওয়া চাই। এইরূপে সমস্তগুলি উপকরণ মর্দিত ও মিশ্রিত হইলে কৃষ্ণবর্ণ বার্তাকী অর্থাৎ কালো রঙ্গের বেগুণের রস বাহির করিয়া তদ্বারা ঐ মিশ্রিত ঔষধ কিছুকাল মর্দন করিবে; এবং প্রথর রোদ্রে শুকাইয়া লইবে। রাত্রিতে শিশিরসিক্ত করিবে। এইরূপে দিবাভাগে তরল পদার্থ মর্দন ও শুষ্কীকরণ এবং রাত্রিকালে শিশির সেচন করানকে ঔষধের ভাবনা দেওয়া কহে। প্রতিদিন এক একটা করিয়া ভাবনা দেওয়া বিধান। কৃষ্ণবর্ণ বার্তাকীর স্বরসে 'সাতদিন সাতবার ভাবনা দেওয়া হইলে তাহার পর আবার \* কুশরাজ পত্রের স্বরসে ঐরূপ সাতদিনে সাতবার ভাবনা দিবে। পরিশেষে কেশরাজ অর্থাৎ কেশুরের স্বরসে ঐ প্রকার সাতটা ভাবনা দিতে হইবে। এই তিন দ্রব্যের স্বরসে ভাবনা সম্পন্ন হইলে শেষ দিন উপযুক্ত পরিমাণ ছাগ দুধের সহিত অর্দ্ধ প্রহর পর্যন্ত মর্দন করিয়া অর্দ্ধ রাত্রি মাত্রায় এক একটা বটি প্রস্তুত করিবে। তাহার পর বটিগুলি

প্রথর রোদ্রে শুকাইয়া কাচকুপী মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহাকে কালান্তক রস কহে। এই কালান্তক রস বিবিধ রোগে প্রযুক্ত। তৎ সমুদয় উল্লেখ করিবার এখানে কোনও প্রয়োজন নাই। ওলাউঠা রোগের যে অবস্থায় যে নিয়মে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়—এস্থলে তাহাই লিখিত হইতেছে।

পূর্বেক্ত বিসর্পণ চূর্ণদ্বারা নাড়ীস্পন্দন অবিকৃত থাকে\* এবং শরীরস্থ সপ্ত ধাতুক্ষয় নিবারিত হয়। এই কালান্তক রসের অচিস্ত-নীয় প্রভাবে যাবতীয় বৈকারিক লক্ষণ, অতিরিক্ত মল নিঃসরণ ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে থাকে। পূর্বে অহিফেনের প্রয়োগ সর্বথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহা রোগের প্রথমাবস্থাতেই বুঝিতে হইবে। মধ্য বা পরিণত অবস্থায় অহিফেন প্রয়োগ দুঃস্বপ্ন নহে। এই ঔষধে অহিফেনের প্রয়োগ-বিধান লিখিত হইয়াছে। অস্ত্রাশ্র উপকরণের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় অহিফেন এমনভাবে গুণান্তর প্রাপ্ত হয় যে, তদ্বারা মূত্রথল্লের ক্রিমারোধ হইতে পারে না। অহিফেনের নৈসর্গিক শক্তির বলে যদিও মূত্রথল্লের আংশিক ক্রিমারোধ হয় সত্য, তথাপি তাহা সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া সহসা প্রাণনাশের কারণ হয় না। ঔষধের প্রয়োগে অন্তরায় হইয়া উপশমিত হইয়া থাকে। অবিরত অতিরিক্ত মল নিঃসরণ হইতে থাকিলে অচিরেই ঋতু ক্ষয় ঘটে। স্নতরাং রোগীর প্রাণ বিমোহ হইতে বড় বিলুপ্ত থাকে না। এই অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষরূপে প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধের প্রয়োগে মল নিঃসরণ রোধ হইয়া আইসে এবং শারীরিক বস্তুগুলি অবিকৃত ভাবে অবস্থিতি

করে। অধিকন্তু মূত্রের বোধ জন্ম এরূপ অবস্থায় কাহাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না। এই কালান্তক রসের অনির্কচনীয় ফলোপধারিণী শক্তি সর্বতোভাবে বহু ক্ষেত্রে বহু বার পরীক্ষিত হইয়াছে। অনেকে ইহাকে ওলাউঠা রোগের ক্ষার্য মহৌষধ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। চিকিৎসা বিশেষের দ্বারা রোগীর প্রথমাবস্থা অতীত হইয়া যদি দ্বিতীয় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ নারী-স্পন্দনের একেবারে বিলুপ্তি ঘটে—নানাবিধ বৈকারিক লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে, এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয় ক্রমে শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব ধারণ করে—দেখিতে দেখিতে রোগী চৈতন্ত হারা হয়—তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশাহুয়ারী ফল পাওয়া যায় না। প্রথমাবস্থায় পূর্কোক্ত নিয়মানুসারে বিসর্পণ চূর্ণ অম্লপান সহ রোগীকে সেবন করাইয়া শেষে যদি এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কাহাকেও কালকবলে পতিত হইতে হয় না। প্রতি দাঁক্টের পর এই ঔষধের প্রয়োগ চলিতে পারে। দুই তিনবার ঔষধ সেবন করিলে যদি মল পীতবর্ণ হইতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে আর অধিক সেবন করান উচিত নহে। সাধারণতঃ প্রয়োজনানুসারে দান্ত বন্ধের অল্প দিনের মধ্যে একবার অথবা দিবরাত্রির মধ্যে দুইবার এই ঔষধ সেবন করান উচিত। মলের পাতবর্ণতা লক্ষিত হইলেই বন্ধিতে হইবে—

• রোগীর জীবন রক্ষা পাইল। তখন আর মূত্র নিঃসরণের জন্ত বিশেষ কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। অগ্নায়াসেই অগ্না বা অপনা হইতেই মূত্র নির্গত হইতে থাকে। মূত্রাশয়ে মূত্র সঞ্চিত না থাকিলে চারি প্রহর বা আট প্রহর পর্যন্ত কাহারও কাহারও মূত্র নিঃসরণ হইয়া

থাকে। মূত্র নিঃসরণের কথা পরে যথাস্থানে আমরা বিবৃত করিব। এক্ষণে কালান্তক রসের সহপান ও অম্লপানের বিষয়ই উল্লিখিতব্য। যাহার সহিত ঔষধ মাড়িয়া পান করিতে দেওয়া হয়—তাহাকে সহপান এবং ঔষধ সেবনের পর বাহা পান করিতে দেওয়া হয়—তাহাকে অম্লপান বলে।

রোগীর উদরে যদি বেদনা থাকে, তাহা হইলে আপান্সমূলের রস অর্দ্ধ তোলা অথবা ক্ষেত্র বিশেষে এক তোলা সহ একটা মাত্র কালান্তক রস উত্তমরূপে মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। এইরূপ যতবার প্রয়োজন হয়—ততবার সেবন করাইবে।

কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া উক্ত মূল কুটিয়া লইবে। এবং পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। এই রসের সহিতই ঔষধ সেব্য। উদরে বেদনা না থাকিলে কালো জামের কচি কচি পাতা অথবা কচি কচি বট পাতা পাথরে কুটিয়া রস বাহির করিবে। সেই রসের অর্দ্ধ বা এক তোলা সহিত এই কালান্তক রস সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দান্ত ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসে। নাভিস্থলে বেদনা থাকিলে অথবা আমের সঞ্চায় বৃষিলে পাথর কুচি পাতার রসের সহিত এই ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে মূত্র নিঃসরণেরও সহায়তা হইয়া থাকে।

বিকার নাশের জন্ত ঝাঁপিটেপারির রসের সহিত এই ঔষধ প্রযুক্ত। ইহা অম্লিবর্দ্ধক। উল্লিখিত রসগুলি কিঞ্চিৎ গরম করিয়া লইলেই ভাল হয়। অথবা দান্ত সৌহ এই রস মধ্যে নিবদ্ধ করিলে চলিতে পারে।

এতাবৎ যে সমস্ত ঔষধের প্রয়োগ বিধান কথিত হইল,—তৎসমস্ত উল্লিখিত অবস্থান

ও অনুপানের সহিত নিয়মিত রূপে সেবন করাইলে যখন রোগীর চক্ষু চঞ্চল ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, এবং থাকিয়া থাকিয়া চক্ষুর তারা উদ্বলিত হইতে থাকে, তখন সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক—নির্ভয়ে রোগীর মস্তকে শীতল জলের পটী দিবে এবং মুহূর্মুহ মাথায় শীতল জল সেচনের ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ অবস্থায় মস্তকে শীতল জল সেচন না করিলেই বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা। মস্তক ঠাণ্ডা না থাকিলে নাড়ী অবিলম্বে চঞ্চলা হইয়া উঠে এবং চক্ষু দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া পড়ে,—এমন কি, অবশেষে ঘোরতর মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়। ওলাউঠা রোগের ঠিক এইরূপ চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত কোনও আয়ুর্বেদ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই চিকিৎসা-প্রকরণের অধিকাংশ ঔষধই “সাদিত্য সংহিতা” নামক বিলুপ্তগ্রন্থ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আনাদিগের বহুদর্শিতাজনিত জ্ঞানলব্ধ ক্রিয়া-পদ্ধতিও বথান্যস্থানে সন্নিবেশিত হইতেছে। অনুনা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রোক্ত কতিপয় দৃষ্ট ফল মন্তব্য উল্লিখিত হইতেছে। এই সকল ঔষধ রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় প্রযোজ্য। এতদ্বারা সকলেরই যে নিশ্চয়রূপে জীবন বঁচা হইবে, তাহা অবশ্যই স্থির সিদ্ধান্ত নহে। যখন রোগীর দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি এবং বাকশক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, রোগীর কিছুমাত্র সংজ্ঞা থাকে না, নাড়ী একেবারে বসিয়া যায়, তখন আর কোনরূপ বিচার না করিয়া শীতল-জল “বিসূচী বিধ্বংসী

রস” অথবা “বৃহৎ সূচিকা ভরণ রস” প্রয়োগ করিবে। এক বৎসরের শিশুদিগকে অর্দ্ধ বটী, তদুর্দ্ধ বয়সের বালক দিগকে এক বটী এবং বলবান যুবক দিগকে একত্র দুই বটী করিয়া সেবন করাইবার বিধি। ঝাঁপিটেপারীর মূলের রস সহ বটী সেবন করিতে দিয়া পরে কিঞ্চিৎ ডাবের জল সেবন করান কর্তব্য। অথবা কেবল ডাবের জল সহও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত দুইটা ঔষধই এক-বিধ সহপান ও অনুপানের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই দুইটা ঔষধই তিন বারের বেশী কাহাকেও সেবন করাইতে হয় না। ঔষধ সেবনান্তে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ এবং নাড়ী স্পন্দনবতী হইয়া উঠিলে নির্ভয়ে বোগীর মস্তকে শীতল-জল-সেচন ও তরুাদি সেবন করাইবে। ক্রমে ক্রমে বৈকারিক লক্ষণ বিদূরিত হইলে যথেষ্ট শীতল জলে স্নান এবং শরীরের, অবস্থা অনুসারে ক্ষুদ্মনুযায়ী পথ্য প্রদান করিবে। কিন্তু ডাবের জল, জৈকু রস, দাড়িম রস, দধি, কাজি, এই সকল দ্রব্য দিতেই হইবে। ঔষধ সেবনের পর যদি নাড়ীতে স্পন্দন এবং চক্ষুতে রক্তবর্ণতা না আইসে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই ঔষধে কোন উপকার হইল না। তাদৃশী অবস্থায় শীতল ক্রিয়াদিও করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে “বিসূচী বিধ্বংস রস” ও “বৃহৎ সূচিকাভরণ রস” কি কি উপকরণে, কিরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়— তাহাই লিখিত হইতে হইতেছে।

বিসূচী বিধ্বংস রস।\*

\* টঙ্গুর মাকিকং শুষ্ঠী পারিদং পক্ষকং বিং।  
মর্দয়েৎ ওষীর জ্রাবৈ ধীতি কার্ণা প্রযত্নতঃ।  
বিহতঃ নাসর্যত্যন্ত দধ্যায় পথ্যমাত্রং।

পরলং সমভাষেন সর্বেষাং হিঙ্গুলং সমঃ।

যেত সর্গপ জুলাচ বৃত্ত সজীবনী ওষা।

হিস্রোদ্যমবতীসারং সর্বোপজব সংযতম্।

ইতি রসেজ বৈদ্যক্যে।

সোহাগার খই ১ ভাগ।	
স্বর্ণ মাক্ষিক (শোধিত ও জারিত) ১ ভাগ।	
শুঠ ... ১ ভাগ	
{ পারদ (শোধিত ও কঙ্কলীকৃত) ২ ”	
কাষ্ট বিষ (শোধিত) ... ১ ”	
কৃষ্ণসর্প বিষ (শোধিত) ... ১ ”	
হিঙ্গুল (শোধিত) ... ১ ”	

এই আটখানি দ্রব্য উপরের লিখিত মত ওজন করিয়া লইবে। পরে কিকিৎ গোড়া লেবুর রসে কাষ্টবিষ ভিজাইয়া রাখিবে। বিষগুলি যখন কোমল হইয়া আসিবে—তখন তাহা শিলার উত্তমরূপে পেয়ণ করিবে এবং ইহাতে সর্কবিষও মিশাইয়া লইবে। পূর্বোক্ত শোধিত হিঙ্গুলখানি ওজন করিয়া যক্ষ্ম চূর্ণ করতঃ বাহা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেই চূর্ণীকৃত হিঙ্গুল এই বিষ মিশ্রণে মিশ্রিত করিয়া এমন ভাবে মর্দন করিবে—যেন তাহা সর্কতো-ভাবে মিশিয়া যায়। তদন্তর কঙ্কলী, শুঠ, স্বর্ণমাক্ষিক এবং সোহাগার খই ইহাতে মিশাইয়া রৌদ্রে শুকাইবে এবং রাত্রিতে শিশিরসিক্ত করিবে। এইরূপে সাতদিনে সাতবার জানীর রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপ পরিমিত এক একটা বটা প্রস্তুত করিবে। খুব সতর্কতার সত্বে এই ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত। নখ-মধ্যগত অথবা লোমকূপে প্রবিষ্ট হইয়া এই ঔষধ শরীরে বিশেষ ব্যস্ততা প্রদান করিতে পারে।

সূচিকা ভরণ রস।\*

কাষ্ট বিষ (শোধিত) ... ১ ভাগ	
সর্প বিষ (শোধিত) ... ১ ”	
দারুমুজ (শোধিত) ... ১ ”	
হিঙ্গুল (শোধিত) ... ১ ”	

এই চারিখানি দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উপরি লিখিত ভাগে ওজন করিয়া এমন ভাবে একত্র মর্দন করিবে যে, প্রত্যেকটা দ্রব্যই যেন সুন্দররূপে মিশিয়া যায়। তারপর পঞ্চ পিষ্টের প্রত্যেকটা দ্বারা এক এক দিন এক এক বার ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ এক একটা বটা প্রস্তুত করিবে।—রোগিত মংস্ত্র, মহিশ, ময়ূর, ছাগ ও বন্যহর পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে। পূর্বেই এই সকল পিত্ত সংগ্রহ করিয়া পরিশিষ্টাধ্যায়ে লিখিত বিধি অনুসারে শোধন ও শুদ্ধিকরণ করিয়া রাখিবে, পরে প্রয়োজন মত ইহার কিয়দংশ জলে গুলিয়া তদ্বারা ভাবনা প্রদান করিবে। ইহার অনুপান “বিহুচী বিকংস রস”র দ্বারা জানিবে। ইহাও দুই তিন বারের অধিক কাতাকেও সেবন করিতে দেওয়া হয় না। ঔষধ সেবন করাইয়া নাড়ীর স্পন্দন অল্পভূত হইলে, রোগীর গাত্রে তিল তৈলাদি মর্দন ও অপরাপর শীতল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। ঔষধের অমোঘ প্রভাবে মৃত প্রায় ব্যক্তিও উজ্জীবিত হইয়া উঠে। যদি ঔষধ গলাধঃকরণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, ক্ষুর দিয়া ত্রদ্বারকে ক্ষত করিলে যদি রক্তের কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থানে সর্ষপ প্রমাণ (অর্থাৎ সূচিকার অগ্রভাগে যে

\* অমৃতং পরলং দারু সর্কতুল্যং হিঙ্গুলং।  
সূচিকা সূচিকাগ্রেন সন্নিপাত কুলান্তকং।  
সহস্রশো দৃষ্ট কলেয়ং বটিকা ॥

পঞ্চ পিষ্টেন সংযোজ্য সর্ষপোহাং বজ্রং চরেৎ।  
তিলক তিলতৈলক ভোজনম্ দধি ভজ্যত।

পরিমাণ ঔষধ সংলগ্ন থাকে) 'হৃচিকা ভরণ' অথবা ব্রহ্মরক্ষ রস মর্দন করিতে থাকিবে। ইহা দ্বারা শরীরে উষ্ণতা এবং নাড়ীতে স্পন্দন উপলব্ধি হইলে শীতল, ক্রিয়াদির অমুষ্ঠান কর্তব্য। নতুবা জীবনের আশা বৃথা। নিম্নে বৃহৎ হৃচিকা ভরণের বিষয় লেখা যাইতেছে। যাহার শক্তি এতদপেক্ষা বহু গুণেই গরীয়সী।

### বৃহৎ হৃচিকা ভরণ রস।\*

পারদ } (শোধিত ও কঙ্কালীকৃত) ... ২ ভাগ  
গন্ধক }  
দিবা (শোধিত ও জারিত) ... ১ ,,  
অত্র (শোধিত ও জারিত) ... ১ ,,  
কাষ্ঠ বিষ (শোধিত) ... ১ ,,  
রুক্ষ সর্প বিষ (শোধিত) ... ১ ,,

পূর্বোক্ত ছয়খানি দ্রব্য যথাযথরূপে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। পরে রোহিত মংস্ত্র, মহিষ, ময়ূর ও ছাগলের পিত্তে চারদিনে চার বার ভাবনা দিবে। বরাহ পিত্তে ইহার ভাবনা দিবার নিয়ম নাই। চারিপ্রকার পিত্তের ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্পের ছায় এক একটা বটী প্রস্তুত করিবে। কেবল নারিকেল জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত; বিষহৃচিকা, ও অতিসার প্রভৃতি রোগ উপসংহিত হয়। যখন রোগীর অবস্থা

নিভান্ত মন্দ হইয়া আইসে এবং বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করাইবার পর, যোগীর গাত্রে তিল তৈল ও চন্দনাদি লেপন প্রভৃতি শীতল ক্রিয়া এবং নারিকেলজল পান ও দধি প্রভৃতি ভোজন করিতে দেওয়া কর্তব্য।

### ব্রহ্মরক্ষ রস। †

পারদ } (শোধিত ও কঙ্কালীকৃত) .. ২ ভাগ  
গন্ধক }  
অত্র (জারিত) ... ১ ,,  
হরিতাল (শোধিত) ... ১ ,,  
হিঙ্গুল (শোধিত) ... ১ ,,  
মরিচ ... ১ ,,  
সোহাগার খই ... ১ ,,  
সৈন্ধব লবণ ... ১ ,,  
বিষ (শোধিত) ... ৮ ,,

এই নয়খানি দ্রব্য উপরে লিখিত ভাগে একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিবে। যখন ঔষধ-গুলি সর্বতোভাবে মিশিয়া যাইবে তখন শোধিত মহিষী পিত্তের জলে আবার অবিরত মর্দন করিতে থাকিবে। ঔষধের দ্রব্য সমষ্টি পরিমাণ যত হইবে, তাহার চতুর্থাংশ 'মহিষী পিত্ত' কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া লওয়াই শাস্ত্রের বিধান। ঔষধগুলি ভিজিতে পারে, জলের পরিমাণ এইরূপ হইলেই চলিবে। কথিত

\* রস গন্ধক নাগাজিং বিষং হাবর জলমম্।  
হৃচিকা ভরণো নাম তৈরবেণ প্রীকীর্তিতঃ।  
ত্রয়োদশ সন্নিপাতে বিষদ্যোমভীসারকে।  
পরঃ পেটী শতং দধ্যাং ভোজনং দধি ভক্তকম্।  
রোগিণো যৎ প্রিয়ং ত্রয়াং তন্মৈ তক্তং অধাপয়েৎ।

† রসজিং গন্ধকং তালং হিঙ্গুলং মরিচং তথা।  
সপ্ত পাদ সমোপেতং মহিষী পিত্ত মর্দিতং।  
একবাক্রে প্রয়োক্তব্যং সন্নিপাদ জলৈ সঙ্গমো।

মাংস্ত-মহিষ-মায়ূর-ছাগ পিষ্টে বিতারয়েৎ।  
নাভব্যঃ হৃচিকাগ্রেণ পরঃ পেটী জলেন চ।  
ত্রিঘোষজে তথা কাসে দানয়েৎ কুললো ভিষক্।  
তথা স্তম্ভজিতং মাংস লেপনং তিল চন্দনৈঃ।

রসেন্দ্র কোদুদী।

সহস্র কলমৈঃ স্থানং লেপনং চন্দনাদিভিঃ।  
চন্দনং সৈন্ধবোপেতং সর্বাংশ ময়ূতং তথা।  
ইতু দুলাং রসং ভোজ্যং তত্র তক্তং বধৈলিতাং।  
(রসেন্দ্র কোদুদী)

পিত্ত দ্বারা ঔষধগুলি সুন্দররূপে মর্দিত হইলে রোদ্রে শুকাইয়া চূর্ণাবস্থাতেই রাখা যাইতে পারে। অথবা বটা প্রস্তুত করিয়া রোদ্রে শুকাইয়া রাখিলে চলে। আমাদিগের বিবেচনায় বটা প্রস্তুত করিয়া রাখিলেই ভাল হয়। তাহা হইলে ঔষধস্থিত পিত্তগুলির বীৰ্য্য অধিক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে।

যখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, ঔষধ সেবন করিবার কিছু মাত্র ক্ষমতা থাকে না, তখন ব্রহ্মরন্ধ্র ক্ষত করিয়া সেই ক্ষত স্থানে এই ঔষধ লাগাইয়া দিতে হয়। ঔষধ লাগাইবার পর মৃদু হস্তে মর্দন করা উচিত। যদি রক্তের সহিত ঔষধ সংলগ্ন হইতে পারে তবেই উপকার হইবার সম্ভাবনা। এত দাবা রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়া সূচিত হইলে এবং শরীর গরম হইয়া উঠিলে রোগীকে শীতল জলে স্নান করাইবে ও মস্তকে শীতল জলের দ্বারা দিবে। শরীরে চন্দনাদি লেপন, ইক্ষু রস, মৃগের ঘৃষ ও তক্রাদির যথেষ্ট পানের ব্যবস্থা করিবে। ঔষধ প্রয়োগে শরীর গরম না হইলে জীবনের আশা করা যায় না।

ওলাউঠা রোগের মূত্র নিঃসরণ ও পীত-

বর্ণ-মল নির্গমন হইতে থাকিলে কখনও কখনও কোনও কোনও রোগীর ঘোরতর বৈকারিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পানের রস অথবা দোষানুযায়ী অল্প কোনও অম্লপানের সহিত মকরধ্বজ, মৃগনাতি ও কর্পূর—প্রত্যেকটি দুই এক রতি মাত্রায় দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে প্রভূত উপকার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে বৈকারিক লক্ষণ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

উপযুক্ত অম্লপানের সহিত “বৃহৎ কন্তুরী ভৈরব” সেবন করিতে দিলেও এক্ষণে অবস্থায় সবিশেষ সফল দেখা যায়। এস্থলে মকরধ্বজ ও বৃহৎ কন্তুরী ভৈরব প্রস্তুতের নিয়মাবলী উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। এই দুই ঔষধের প্রস্তুতের বিশদ প্রণালী আয়ুর্বেদীয় প্রচলিত সকল গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। এক্ষণে উপসর্গ-চিকিৎসার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলা নিতান্তই প্রয়োজন।

ওলাউঠা রোগের পরিণামে সকল রোগীরই চক্ষুঃ কোটরগত হইয়া থাকে। তেলাপোকার বিষ্ঠা জলের সহিত মাড়িয়া চক্ষুর পাতায় প্রলেপ দিলে এই উপসর্গের সবিশেষ উপকার হয়।

## নিরামিষ খাদ্য।

—:~:—

(ত্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল)

নিরামিষ আহার অর্থাৎ উদ্ভিদ হইতে সংগৃহীত আহাৰ্য্য দ্রব্যের মধ্যে কার্বো-হাইড্রেট (carbo-hydrate) প্রধান, কিন্তু প্রাণিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রোটিন এবং চর্বি

প্রধান। কার্বো-হাইড্রেট উদ্ভিদ দ্রব্যের মধ্যে চিনি ও খেতসারের আকারে অবস্থান করে। নিরামিষ খাদ্য যে একেবারে প্রোটিন হীন তাহা নহে—যাহা প্রকৃতিতে উচ্চ পদার্থ



অধিক মাত্রায় বিদ্যমান কিন্তু বাদাম, নারিকেল প্রভৃতিতে চর্কিই অধিক পরিমাণে থাকে।

উদ্ভিজ্জ আহারের ভিতর পুষ্টিকর পদার্থ যথা, প্রোটিন, চর্কি ও কার্বোহাইড্রেট।

অল্প সোডিয়াম ক্লোরাইড (sodium chloride) মিশ্রিত জলে উদ্ভিদ প্রোটিন (vegetable-proteid) সহজেই দ্রব হইয়া যায়। উদ্ভিদ প্রোটিন বা প্রাণী প্রোটিন সিদ্ধ করিলে ছুপরিপাচ্য হয়। ইহা হইতে বেশ উপলব্ধি হয় যে, মাংস বেশী সিদ্ধ করিলে ছুপাচ্য হয়, কারণ তাহাতে প্রোটিন অধিক মাত্রায় বর্তমান; আর উদ্ভিদ সিদ্ধ করিলে সুপাচ্য হয় কারণ

তাহাতে কার্বো হাইড্রেট অংশ অধিক।

আমরা দেখিতে পাই যে, শস্তের বীজ সর্বত্র অধিক পরিমাণে প্রচলিত। রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical analysis) দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রবিশস্তের বীজে অনেক প্রকার খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যথা ফসফেট অব ক্যালসিয়াম (phosphates of calcium) ম্যাগনেসিয়াম (magnesium) পটাশ (potash) লৌহ (iron) এবং সিলিকা (silica) প্রধান প্রধান রবিশস্তের ভিতর কোন কোন খনিজ পদার্থের কত পরিমাণ নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

নাম	চর্কি	কার্বো হাইড্রেট	প্রোটিন	খনিজ পদার্থ	জল
গম	২'১৮'	৭০'২২	১২'২৪	২'২৪	১১'৮৩
যব চূর্ণ	৭'৩	৬২'৪	১৪'২	১'২	৭'২
বাঁলি	২'২	৭৩'৩	১০'০	২'৬	১১'২
চাউল	০'৮	৭৮'৮	৬'৮৬	১'৩২	১১'৫
ভুট্টা	৫'৪	৭০'২	২'৭	১'৫	১২'৫

অত্র সকল রবিশস্তের তুলনায় ভুট্টাতে চর্কি ভাগ বেশী এবং লবণ ভাগ কম। চাউল খেতদারে পূর্ণ কিন্তু তাহাতে যবকার অনিত কোন দ্রব্য, চর্কি এবং খনিজ পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান। যবচূর্ণ, চর্কি ও প্রোটিন পরিপূর্ণ এবং সকল রবিশস্তের মধ্যে ইহাই পুষ্টিকর।

গম পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত। গম হইতে

আমরা তিন প্রকার জিনিস প্রাপ্ত হই। ময়দা তরল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়, স্বল্প পদার্থের অপেক্ষাকৃত মোটা আবরণ হইতে আটা তৈয়ার হয়, আর অপেক্ষাকৃত মোটা তৃতীয় আবরণ হইতে স্ত্রজি প্রস্তুত হয়, ইহা অভিশয় পুষ্টিকর।

বঙ্গদেশে চাউল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইহা আমাদের প্রধান খাদ্য।

প্রকারের চাউল এখানে জন্মিয়া থাকে। আমাদের এখানে যে সকল চাউল পাওয়া যায় তাহাকে আমরা ‘দেশী’ চাউল বলিয়া থাকি এবং তাহা ‘বর্ষা চাউল’ হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মদেশের চাউল ভাল হয় না, তাহা একেবারে কলে প্রস্তুত হইয়া বাহির হয়, সুতরাং তাহাদের দুইটা আবরণ বাহির হইয়া যায়। তাই দেশী চাউল অপেক্ষা বর্ষা চাউল কিছু আকারে ছোট। কিন্তু চাউলে বীজকোষ বর্তমান থাকে, কিন্তু বর্ষা চাউলে তাহা থাকেনা, সেইজন্য বর্ষা চাউল প্রোটীড ও খনিজ পদার্থ বিশেষ কনসেন্ট্রাস শূন্য।

সমস্ত বীজ খাতের মধ্যে তগুলো প্রোটীড (protied), চর্বি (fat) ও খনিজ পদার্থ অতি অল্প মাত্রায় থাকে। তগুলো অধিক মাত্রায়

শ্বেতসার (starch) থাকে বলিয়া ইহা বিরল। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যবক্ষার জনিত দ্রব্য যথা দাল, মাছ, ঘৃত, প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। তগুল পুরাতন হওয়া আবশ্যক, নূতন চাউলে পেটের পীড়া হয় এবং ইহা দুপ্পাচ্য।

যব খুব পুষ্টিকর ও খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। ইহাতে যবক্ষার জনিত পদার্থ ডিমের খেতাংশের আকারে বর্তমান।

নিরামিষ খাতের মধ্যে দাল যবক্ষারবহুল পদার্থ। দাল প্রোটীডবহুল বলিয়া ইহা শ্বেতসার বহুল দ্রব্যের সহিত অর্থাৎ চাউলের সহিত খাইতে হয়। দালে পটাস লবণ (salt of potash) চূর্ণ ও গন্ধক থাকে। দালের উপাদান :—

নাম	প্রোটীড	কার্বোহাই	চর্বি	জল	খনিজ পদার্থ
মটর	২১.০	৬১.৪	১.৮	১৩.০	২.৬০
কলাই	২২.৫৮	৫৮.০২	১.১০	১০.৮৭	৩.৬১
মুগ	২৩.৬২	৫৩.৪৫	১.৬২	১০.৮৭	৩.৫৭
ছোলা	১৯.৯৪	৫১.১৩	৪.৩১	১০.০৭	৩.৭২
অরहर	২১.৬৭	৫৪.২৭	৩.৩৩	১০.০৮	৫.৫০
মহুর	২৫.৪৭	৫৫.০৩	৩.০০	১০.২৩	৩.৩৩

আলু অধুনা সর্বত্র প্রচলিত। আলু আমাদের খাতের প্রধান উপকরণ, আলু বাতীত আয়ুর্বেদের একমাত্র চলে না।

না থাকিলে আমরা ব্যঙ্গম্ব কিংবলে পাইতাম তাহা বলা যায় না, কারণ ভবিষ্যৎকারী বড়ই দুর্লভ হইয়াছে।

থাকে, তৎক্ষণাৎ ইহা কতকগুলি রোগীর পক্ষে উপকারী। যবক্ষার জনিত দ্রবোর সহিত আলু ব্যবহারে শরীর বেশ সুস্থ ও সবল থাকে। ইহাতে নাইট্রেড অব পটাস থাকে। নূতন আলু অপেক্ষা পুরাতন আলু আশু পাচ্য।

কাঁচা শাকসব্জিতে শতকরা ৯০ ভাগ জল ও যবক্ষার ১ হইতে ৪ পর্যন্ত থাকে। চর্বি হঠাৎ বড়ই কম, সুতরাং ঘি বা তৈল পক করিয়া ইহা খাইতে হয়।

কার্বোহাইড্রেট বহুমাত্র রোগে অপকারী, উপরিউক্ত দ্রব্য গুলিতে উক্ত পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে আছে, সুতরাং বহুমাত্র রোগীর পক্ষে উপকারী। ফুলকপি সব চেয়ে সুপাচ্য এবং হৃদরোগীর পক্ষে উপকারী। শসা ছস্পাচ্য, বেল বড় উপকারী। পেটের ব্যারামে বেলের সরবৎ ও বেলের মোরকা খুব উপকারী, ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

শরীর পুষ্টিসাধনে আঙ্গুর অতি উপকারী,

নাম	প্রোটিন	চর্বি	জল	কার্বোহাই	খনিজ-পদার্থ
বাথাকফি	১.৮	০.৪	৮৯.৬	৬.৯	১.৩
দুগাকফি	২.২	০.৪	৯০.৭	৫.৯	০.৮
শসা	০.৮	০.২	৯৫.৪	৩.১	০.৫
বেগুন	০.৮৯	০.৯৪	৯৩.৯৮	৩.৪৮	০.০২৬
কলা	১.৩	০.৬	৭৫.৩	২২.০	০.৮
বিলাতী কুমড়া	০.৯০	১.০	৯৩.৪০	৩.৯৬	০.৭

আঙ্গুরের রসে চিনি, বাইট্রেট অব পটাস (btrate of potash) টার ট্রেট অব লাইম (titrate of lime) ম্যালিক ম্যাসিড (malic acid) এবং জল থাকে, বৃদ্ধের পক্ষে আঙ্গুর খুব উপকারী। শুষ্ক আঙ্গুরকে কিসমিস বলে, তাহা আঙ্গুর অপেক্ষা ছস্পাচ্য।

আম অতিশয় পুষ্টিকর ফল। উদরের

থারাপ অবস্থায় থাকিলে কঠিন উদরায় রোগ জন্মায়।

নারিকেল, বাদাম প্রভৃতি ফলে কার্বোহাইড্রেট অংশ অতিশয় কম আছে, বহুমাত্র রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহারা খুব পুষ্টিকর ফল, কিন্তু সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

## মুক্তিযোগ ও টোটকা।

(কবিরাজ শ্রীহৃদাংশুভূষণ সেন গুপ্ত)।

**কোষ্ঠবদ্ধতায়।**—(১) ঘন হৃৎকের সহিত ২ তোলা পরিমিত ছানা মিশাইয়া থাকিলে ১ বার উত্তমরূপে কোষ্ঠগুদ্ধি হইয়া থাকে। (২) এক তোলা মৌরী বাটা এক গ্ৰাস মিছরির সরবতের সহিত পান করিলে কোষ্ঠগুদ্ধি হইয়া থাকে। (৩) হরীতকীর গুঁড়া, আমলকীর গুঁড়া, সোণামুখীর গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণ—এই কয়েটি দ্রব্য ১০ সাড়ে তিন আনা ওজনে লইয়া গরম জলের সহিত রাত্রিতে শয়নের পূর্বে সেবন করিলে প্রাতে উত্তমরূপে কোষ্ঠ গুদ্ধি হইয়া থাকে। (৪) হরীতকীর গুঁড়া চারি আনা, মৌরীর গুঁড়া চারি আনা, সোণামুখীর গুঁড়া চারি আনা, একত্র মিশাইয়া লইয়া তাহার চারি ভাগের এক ভাগ এবং মিছরির গুঁড়া ১ ভাগ শীতল জলের সহিত রাত্রিতে শয়নকালে সেবন করিলে প্রাতঃকালে তিনবার ভেদ হইয়া থাকে। (৫) সোণামুখী ৥- তোলা, রেউ চিনি ৥- তোলা, জাদী হরীতকী ৥- তোলা ও সোঁদাল ফলের আটা আধ তোলা—আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহার অর্ধেক ফেলিয়া দিয়া বাকী অর্ধেকটি কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া পান করিলে জ্বালাপের কার্য্য করিয়া থাকে।

**শিরঃপীড়ায়।**—(১) অপরাধিতা ফুলের পাতার রসের নস্ত লইলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (২) আকুশের আটার ফুটের ছাই

মিশাইয়া কাদার মত করিয়া শুকাইয়া নস্ত লইলে অনেক গুলি হাঁচি হইয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। (৩) নিশাদল—কলি চূণের সহিত মিশাইয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। (৪) কপূর—শ্বেতচন্দনের সহিত ঘসিয়া লইয়া কপালে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (৫) কুলের পাতার উন্টা পিঠে কলিচূণ মাখাইয়া রগে বসাইলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (৬) কদম্বের নূতন পাতা মাথায় মর্দন করিলে শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

**দন্তরোগে।**—(১) আকনের আটা ও সৈন্ধব লবণ সমান ভাগে মিশাইয়া শুকাইয়া লইয়া তদ্বারা দন্ত মার্জনা করিলে দন্তশূল প্রশমিত হয়। (২) পাঁপড়ি খদির ১ ভাগ, তুঁতে পোড়া ১ ভাগ, কাঁচা শুপারির শাঁস পোড়ান ১ ভাগ, হরীতকীর গুঁড়া ১ ভাগ, বহেড়ার গুঁড়া ১ ভাগ, ও আমলকীর গুঁড়া ১ ভাগ—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া দন্ত মার্জনা করিলে দন্ত রোগ প্রশমিত হয়। (৩) পাঁপড়ি খদির এবং তাহার সিকি পরিমাণ কপূর মিশাইয়া জল দিয়া কাদার মত করিয়া তদ্বারা দন্ত মাজিলে দন্তশূল ও দন্ত বেদনা প্রশমিত হয়। (৪) নাগেশ্বরের মূল ১ ভাগ ও আদা ১ ভাগ একত্র মিশাইয়া দন্ত ধাবন করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয়। (৫) লাজী ফুলের পাতা ১ ভাগ, পুনর্বা ১ ভাগ, গজ শিশূল ১ ভাগ, ভেঁকড়ার শিকড় ১ ভাগ,

কুড় ১ ভাগ, শতমূলী ১ ভাগ—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্ত রোগ আরোগ্য হয় এবং দন্ত বজ্রের মত শক্ত হয়। (৬) বটের কুঁড়ি চিবাইয়া দাঁতের গোড়ায় বেদনার স্থানে রাখিলে বেদনা প্রশমিত হয় এবং নড়া দাঁত শক্ত হইয়া থাকে। (৭) সিউলীর মূল বাটিয়া দস্তে লাগাইলে দস্তশূল নিবারিত হয়।

পোড়াঘায়ে।—জালা নীপ শিলে ঘঁসিয়া ঐ মাটি দিয়া প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র পোড়া ঘা আরোগ্য হয়।

অগ্নিমান্দ্য।—(১) আহারের পূর্বে আদার কুচি সৈন্ধব লবণের সহিত মিশাইয়া নিত্য সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। (২) প্রাতঃকালে শুঠের শুঁড়া এক আনা হইতে ছট আনা পর্য্যন্ত কিকিং গব্যঘূতের সহিত মিশাইয়া লেহন করিয়া একটু গরম জল পান করিলে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। (৩) যদি প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হয় তাহা হইলে হরীতকীর শুঁড়া, শুঠের শুঁড়া ও সৈন্ধব লবণের শুঁড়া প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা পরিমাণে লইয়া শীতল জলের সন্ধিত প্রত্যুষে সেবন করিলে অজীর্ণ প্রশমিত হইবে।

অজীর্ণে।—দ্ব্যত খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে লেবুর রস খাইলে উহা প্রশমিত হয়। কাঁঠাল খাইলে যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে কলা খাইলে উহা আরোগ্য হয়। কলা খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে দ্ব্যত

খাইলে আরোগ্য হয়। নারিকেল এবং তাল শাঁস খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে চাউল ভক্ষণে আরোগ্য হয়। আত্র খাইয়া অজীর্ণ হইলে ছদ্ম পানে প্রশমিত হয়। ময়দা খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে শসা ভক্ষণে আরোগ্য হয়। খেজুর এবং কয়েদবেষ খাইয়া অজীর্ণ হইলে নিম্ববীজ খাইলে প্রশমিত হয়। তণ্ডুল খাইয়া অজীর্ণে গরম জল পান হিতকর। মটর খাইয়া অজীর্ণ হইলে হরীতকী সেবনে প্রশমিত হয়। লবণ ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে চাউলধোয়া জল হিতকর। জল পান করিয়া অজীর্ণ হইলে মধু সেবনে উপকার হয়। পিষ্টক আহারে অজীর্ণ হইলে গরম জল পান করিবে। জাম খাইয়া অজীর্ণ হইলে শুঠ সেবনে প্রশমিত হইবে। মালপুয়া এবং বড়া ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে যমানি সেবন হিতকর। বেগুন এবং মূলা ভক্ষণে অজীর্ণ রোগে হৃহতীর কাণ্ড পান করিলে প্রশমিত হয়। শাক খাইয়া অজীর্ণ হইলে সরিষা বাটা সেবনে আরোগ্য হয়। ওল খাইয়া অজীর্ণ হইলে শুড় ভক্ষণে ভাল হয়। তরকারী খাইয়া অজীর্ণ নাশের জন্য তিলের গাছ পোড়াইয়া উহা জলের সহিত মিশাইয়া সেবনে আরোগ্য হয়। ছদ্ম পানে অজীর্ণে কুহুম, চিঁড়া ভক্ষণে অজীর্ণ নিবারণে পিপুলের শুঁড়া ও কুহুম এবং ষষ্টিক তণ্ডুল পরিপাকের জন্য দধিমধু প্রশস্ত। বিচুড়ি—সৈন্ধব লবণে, মাংস—লেবুতে এবং মুগের ঘূষে গায়স পরিপাক করে।

## বিষ চিকিৎসা।

—:—:—

( কবিরাজ শ্রীঅতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিত্বষণ )

**সর্প দংশনে।**—সর্প দংশন করিবামাত্র দৃষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলী উপরে দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বাধিয়া ফেলিবে। তাহার পর দংশিত স্থান চিরিয়া একটি ছোট গেলাসের মধ্যে স্পিরিট জালিয়া ক্ষত মুখে সেই গেলাসটি চাপিয়া ধরিয়া রক্ত নির্গমন করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহার পর এক খণ্ড লৌহ অগ্নি সন্তাপে রক্তবর্ণ করিয়া ক্ষত স্থান দধ্ব করিবে। দংশিত স্থান যদি বাধিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলেও চিরিয়া দিয়া পূরোক্ত ব্যবস্থার রক্তমোক্ষণের চেষ্টা করিবে এবং উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দধ্ব করিবে। যদি বিষ সর্প দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ত্বকের জল বা অল্প বমন কারক ঔষধ সেবনে বমন করাইতে চেষ্টা করিবে।

**ঔষধের কথা।**—(১) ৮।১০টি গোল-মরিচের সহিত চুড়ুজুড়ের মূল জলে পিষিয়া সেবন করান হিতকর। (২) অপরাজিতা ও হাপরমানীর কাথ পান করান সর্পবিষে উপকারক। (৩) মঞ্জিষ্ঠা, মধু, যষ্টিমধু, জীবক, ঋষভক, চিনি, গাম্ভারী ও বটের জ্বার কাথ পান করান সর্পবিষে প্রশস্ত ব্যবস্থা। (৪) মরিচ, পিপুল, শুঠ, আতাইচ, কুড়, বুল, রেণুকা, মিউলি ছোপ ও কটকী—এই সকল জব্যের সমষ্টির পরিমাণ ২ তোলা, জল ৮।১০ আধ সের, শেষ আধ পোরা,—এই কাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সর্প বিধাক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করান ব্যবস্থা করা যাইতে

পারে। (৫) হাতীতুঁড়ার মূল ও ভূই চাপার মূল সেবনে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

**নস্য প্রয়োগ।**—(১) ঈশলাঙ্গলার মূল জলে পিষিয়া লইয়া নস্য প্রয়োগ সর্প বিধাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যবহৃত হয়। (২) বিধাক্রান্ত ব্যক্তির নাসিকা, চক্ষু, কণ্ঠ, জিহ্বা ও কর্ণনালীর রোধ হইলে বাতাকু, হোলঙ্গ লেবু এবং কটকী পেষণ করিয়া নস্য প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে।

**বৃশ্চিক দংশনে।**—দংশিত স্থানে তার্পিণ তৈলের মালিশ উত্তমরূপে করিতে থাকিবে এবং তালপাতার আগুন করিয়া বারবার সেক দিবে। গাওয়া বি ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া দংশিত স্থানে মাখাইয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়। গোময় গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে। কাল কচুর আটা মর্দন করিলে এ অবস্থায় বিশেষ উপকার দর্শে। চুণ গরম করিয়া দিলেও বৃশ্চিক-বিষে উপকার হয়। চিটে গুড়ের প্রলেপও বৃশ্চিক বিষ প্রশমনে উপকারক।

**মৃষিক বিষে।**—সর্প বিধাক্রান্ত ব্যক্তির মত প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করান আবশ্যক। তাহার পর বুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিত্রা ও সৈন্ধব লবণ সমানভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দেওয়া হিতকর। আকনের মূল পিষিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে। দাক্তিচিনি ও শুঠের শুঁড়া প্রত্যেক জব্য ১০ আনা মাত্রায় লইয়া গরম কলের সহিত সেবন করানও অবস্থায় উপকার দর্শে।

মাকড়সার বিষে।—(১) অপরাজিতা  
অর্জুন ছাল, কুড়, শেলু অশ্বথ, বট, পাকুড়,  
বজ্র ধূম্র ও বেতস ছাল—সমভাগে মিলিত  
২ তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া,—  
এই কাথ পান করাইলে মাকড়সার বিষ নষ্ট  
হয়। (২) রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা  
মুগ পাকল, নিসিন্দা, স্বর্ণক্ষীরি, সিউলিছোপ  
শিবী, বালা ও অনন্ত মূল—এই সমস্ত দ্রব্য  
সমানভাগ এবং কুড় ৩ ভাগ—একত্র শেলু  
২৫৫৫ পেসের সত্তি পিষিয়া প্রলেপ দিলে  
মাকড়সার বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

শৃগাল ও কুকুরের বিষে।—  
শৃগাল বা কুকুরে দংশন করিবারাত্র দংশিত  
স্থান চিরিয়া রক্ত নির্গমনের ব্যবস্থা করিবে  
এবং উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা সেই স্থান  
দগ্ধ করিবে এবং তৎক্ষণাৎ ধুতুরার মূল ১ রতি  
অথবা কুঁচিলার মূল ১ রতি ও খানিকটা  
গব্য ঘৃত পানের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।  
সীজের আটায় শিরীষ বীজ ঘসিয়া দংশিত  
স্থানে প্রলেপ দিলে এ অবস্থায় উপকার দর্শিয়া  
থাকে। সীজের আটায় শিরীষ বীজ ঘসিয়া  
তাহার মধ্যে ভেড়ার লোম পুরিয়া সেবন  
করানও এ অবস্থায় হিতকর।

## শোষক কার্পাস।

(The Absorbent Cotton)

[ অভিনব প্রণালীতে হস্ত দ্বারা প্রস্তুত করিয়া নিখিল ভারতবর্ষীয় দশম বৈদ্য

সম্মেলন-প্রদর্শনী উপলক্ষে দিল্লীতে প্রদর্শিত]

—:~:—

( শ্রী প্রমথ নাথ দত্ত গুপ্ত )

চিকিৎসা শাস্ত্রে ‘কার্পাস’ এবং তজ্জাত  
বস্ত্রাদির অনেকস্থলে ব্যবহার দেখিতে পাই।  
মহায়া ধ্বস্তুরি স্ত্রুশ্রুতোক অগ্নোপহরণীয়  
অধ্যায়ে অষ্টপ্রকার অস্ত্র ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার  
পূর্বে তৎকার্যোপযোগী যন্ত্রাদি সহ পিচু  
(তুণ) প্রোত স্ত্র ও পটু ইত্যাদি সংগ্রহ  
করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ছিন্ননাসা, ছিন্ন  
ভেদী যাবতীয় শল্য চিকিৎসায়ও কার্পাসের  
ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এই কার্পাস কিরূপ  
এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হইত, তাহা শাস্ত্রীয়  
ব্যবহার বিধিগুলির আলোচনা করিলে সহজেই  
বুঝিতে পারা যায়।

অস্ত্র ক্রিয়ার পশ্চাতে ক্ষতের আত্মতা  
পরিশোধন, কষায়াদি বস্ত্র ও বিকেশিকা  
প্রস্তুতার্থ প্রতীসারণীয়—কারকর্মে ক্ষত রক্ত  
পূষাদি শোধন করণার্থ এবং ত্রণ বন্ধনে যাহাতে  
বন্ধন শিথিল বা সঙ্কুচিত না হয়—অথচ  
তাহার কোমলতা বিস্তারিত থাকে, বন্যক্ষিকা  
মশা ত্রণ, প্রস্তর খণ্ড, ধূলি এবং শীত, বাত,  
জ্বাতপ প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা ক্ষতস্থান  
কোন প্রকারে দূষিত না হইতে পারে—  
অপিচ অগ্নি চূর্ণিত, মধিত, তৈল বা অতি  
পাতিজারবার ক্রিয়া শিরা, দায় প্রভৃতি  
দ্বারা ক্ষতস্থান হিতকর।

শল্যাত্তোক্ত কাপীসের ব্যবহার বহুপ্রকারেই দেখিতে পাই।

উপরি লিখিত কাপীসের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ দৃষ্টে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ কাপীস বিশেষ উপাদানে শৌষকগুণ বিশিষ্ট রূপে প্রস্তুত। স্বাভাবিক কাপীসে যে পরিমাণে শৌষক শক্তি বিদ্যমান আছে—তাহাতে ক্ষতাদির বন্ধন পক্ষে উহা সম্যক উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যেহেতু উপযুক্তভাবে শৌষণ গুণ যুক্ত না হইলে উহা কদাপি লেপাদি ঔষধ ক্ষতাদ্রতা ও রক্ত পূরাদির শৌষণ কার্য্য করিতে অথবা কোমল হইতে পারে না।

অতএব শৌষণ গুণযুক্ত শৌষক কাপীসই শল্য চিকিৎসার একটি প্রধান উপাদান। ইহা দ্বারা ধাত্রী চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ও ত্রণাদির প্রতিকারার্থ যাবতীয় বর্জি, পিচু, বিকেশিয়া, হুতুল, ও ত্রণবধনী বস্তাদি প্রস্তুত হয় এবং তৎ সমস্তই শৌষণ গুণ যুক্ত ও উত্তম আবরক হইয়া থাকে।

ত্রণ হইতে রক্তপূরাদি আকর্ষণ করিয়া, অভ্যন্তরে পুরোদপাদক বীজাণু প্রসারের হ্রাস করা এবং বহির্দর্শন হইতে শীত, বাত, আতপ, বীজাণু ও ধূলি ইত্যাদি আগন্তুক উপদ্রব হইতে রক্ষা করাই ইহার প্রধান কার্য্য। এই জন্য ইহা প্রদাহে অগ্নি কর্ম্মে, ক্ষারকর্ম্মে, বিসর্পে অজ্ঞাত ক্ষতাদি স্থানে, বীজাণুগুস্ত এবং বীজাণু নাশক কষায় সিক্ত করিয়া আবরণার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত অপত্যন্ত, হুস্তরূপাদি বস্ত্রের প্রদাহে, উরঃকতে, শীত, বাত, এবং

আতপ হইতে রক্ষাকরণার্থ বক্ষ ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি পীড়িত স্থান ইহার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হয়।

অধুনা প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহাকে দ্রব করিয়া তদ্বারা ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য, এষ্য, আহাৰ্য্য ও সিব্য ক্রিয়োগুপন্ন ক্ষত উত্তমরূপে আচ্ছাদন করা যাইতেছে।

এই শৌষণ গুণযুক্ত কাপীস প্রাকৃতিক কি বৈকৃতিক তাহা আমরা সামান্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি। বৃক্ষজাত বীজ রহিত কাপীস জলে নিমজ্জিত করিলে দেখিতে পাই, কাপীস খণ্ডে জলে ভাসিতে থাকে জল শৌষণ করে না। অতএব ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, স্বভাব জাত কাপীসে শৌষণ শক্তি উপযুক্ত ভাবে বর্তমান নাই। কিন্তু অভিনব প্রণালীতে প্রস্তুত 'শৌষক কাপীস, জলে স্থাপন করিলামাত্র দেখা যায় যে, তন্মুহূর্ত্তে জল কাপীসের প্রত্যেক স্তরে স্তরে এবং উর্দ্ধস্থিত স্তম্ভ তন্ত পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া অতি সম্বরই উহাকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে।

এই কারণে প্রমাণ হয় যে,—আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ মহাত্মারা শল্য চিকিৎসায় যে কাপীসাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা শৌষণ গুণ বিশিষ্ট ও যে বস্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহাও উক্ত কাপীস দ্বারা প্রস্তুত হইত এবং কাপীসকে শৌষকরূপে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া তাঁহাদের বিশেষ ভাবে জ্ঞাত ছিল, অথচ সেই তত্ত্ব আজ আমাদের নিকটে অজ্ঞাত।

'আমরা অষ্টাল আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে

\* এই প্রবন্ধের লেখক অষ্টাল আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের ৯র্থ বার্ষিক জ্যেষ্ঠ ছাত্র। দ্বিতীয় সম্বন্ধেই প্রবর্ণনীয় যে, শৌষক কাপীস প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা এই ছাত্রেরই উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। এই "শৌষক কাপীস" অষ্টাল আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের ইতিহাস চিকিৎসার প্রয়োজনকে পূরণ করাই বিশেষ বল পাওয়া যাইতেছে।



অধ্যয়ন করিয়া পদার্থ বিশ্লেষণ শাস্ত্রে (chemistry) সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, কার্পাসে স্নেহযুক্ত এমন একটা পদার্থ বিদ্যমান আছে—যাহার দ্বারা কার্পাসে জল শোষিত হইতে পারে না, কিন্তু প্রক্রিয়ার

দ্বারা সেই তৈলাক্ত পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিলে কার্পাস শোষকশক্তিবিশিষ্ট এবং কোমল ও শক্ত ক্রিয়াদির সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া থাকে ।

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

—:—

মহিলাদিগের মৃত্যু ।—কলিকাতার মহিলাদিগের মৃত্যু সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ—গত বৎসর কলিকাতার পুরুষদিগের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৩১৬ এবং মহিলাদিগের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৪৪ । ইহার মধ্যে বসন্ত রোগে পুরুষ মরিয়াছে—হাজার করা ৫৪, মহিলা মরিয়াছে ৭৪ ; হামে পুরুষ ১১, মহিলা ২৪ ; ইনফ্লুয়েঞ্জায় পুরুষ ৪৩, মহিলা ৫ ; ম্যালেরিয়ার পুরুষ ২৭, মহিলা ১৯ ; আমাশয়ে পুরুষ ২৫, মহিলা ৪৯ ; যক্ষ্মারোগে পুরুষ ১৬, মহিলা ২৯ ; ফুসফুস রোগে পুরুষ ৭৭, মহিলা ৯ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । এই হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায় মহিলাদিগের মধ্যে যক্ষ্মা ও ফুসফুসের পীড়াই প্রবল ভাব ধারণ করায় গত বৎসর অধিক সংখ্যক মহিলা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে । কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক মহাশয় ইহার যে কয়টা কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আলোক-রোদ্রহীন-ঘরগুলিতে অস্তঃপুরচারিণীদিগের অবস্থিতির কথা বাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সঙ্গত । আমরা অনেক ঘরই বলিয়াছি—অনেক প্রবাসী চাকরের পুরুষের আয়ের

পরিমাণ অল্প হইলেও পুত্র কলত্র লইয়া কলিকাতা বাসের সাধ মিটাইতে গিয়া সামান্য কদর্যা বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন । ফলে কর্মস্থলে তাঁহাদিগকে অনেক সময় বাহিরে থাকিতে হয়, কিন্তু তাঁহাদের পুরস্কৃতগণের জন্ত আলোক-রোদ্র উপভোগের ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই । বঙ্গালী মহিলার স্বাস্থ্য এইরূপেই ক্ষয়িত হইতেছে । অল্প আয়ের বঙ্গালী পুরুষ এসব কণ্ঠা যে বৃথেন না—ইহাই তো ছঃখ ।

শিশু মৃত্যুর হিসাব ।—মহিলাদিগের মত কলিকাতায় শিশুর মৃত্যুর সংখ্যাও ভীষণ বর্দ্ধিত হইতেছে । গত বৎসর কলিকাতায় যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার এক তৃতীয়াংশ শিশু এক বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছে । গত বৎসর কলিকাতায় মোট ৫০৯৬টি শিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে । ইহাদিগের মধ্যে জন্মের এক লক্ষাহের মধ্যে ১৭২২টি মৃত্যুর কবলে পড়িত হইয়াছে । গত বৎসর যতগুলি শিশু ভূমি হইয়াছিল তাহার তিনভাগের ১ ভাগ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, কয়েক দিনের মধ্যে বা ১২ সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুবরণ করিয়াছে । এই কালের

মৃত শিশুর মোট সংখ্যা ১৭৯১, ইহাদিগের মধ্যে ৫৯৫টি শিশু অপূর্ণাবস্থায় ভূমিষ্ট হইয়াছিল, ৭৬৯টি শিশু দুর্বল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ৩৯৫টি শিশুর খাদ্যের দোষে ধনুষ্কারে মৃত্যুর কারণ ঘটিয়াছিল।

### শিশু মৃত্যুর হিসাবের বিশ্লেষণ।

শিশু মৃত্যুর হিসাবের বিশ্লেষণে আমরা আরও জানিতে পারি যে, জন্মের ৭ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কলিকাতায় ৮৩২টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। এক কথায় কলিকাতায় যত শিশু ভূমিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অর্ধাংশ এক মাসের মধ্যেই কাল কবলিত হইয়া থাকে। ৭ দিনের মধ্যে যত শিশুর মৃত্যু হয় তাহার শতকরা ২৫ ভাগ এবং ৭ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে যত শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার শতকরা ৫০ ভাগ ধনুষ্কারে মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। গত বৎসর যত শিশু ভূমিষ্ট হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৩৮৫টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে দ্বিতীয় মাসে। এই ৩৮৫টির মধ্যে ২৬৫টির ব্রঙ্কাইটিসে মৃত্যু হইয়াছে। গত বৎসর জন্মগ্রহণের পর ২৬৫টি শিশু তৃতীয় মাসে ব্রঙ্কাইটিসে এবং ৩ হইতে ৬ মাস বয়সের মধ্যে ২১২টি শিশু এই রোগে মারা গিয়াছে। এই হিসাবে ব্রঙ্কাইটিস রোগে শিশুর মাসিক মৃত্যু সংখ্যা ১১৬। গত বৎসর ভূমিষ্ট হওয়ার পর ৬ হইতে ১২ মাসের প্রতি মাসে গড়পড়তা ২০১টি শিশু কাল কবলিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ব্রঙ্কাইটিসে মৃত্যু ঘটিয়াছে প্রতি মাসে ৯০টি। গত বৎসর ৯৮৭টি শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হইয়াছিল।

### শিশু মৃত্যুর কারণ।—কলকথা

শিশু মৃত্যুর অবস্থা ক্রমশঃ যেরূপ বর্ধিত হইতেছে, তাহাতে ইহার উপায় চিন্তন অসম্ভব কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। যে কারণে কলিকাতায় মহিলা মৃত্যু বাড়িয়া উঠিয়াছে, শিশু মৃত্যুর কারণও তাহার সহিত বিজড়িত। বাঙ্গালীকে উদরারের সংস্থানের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়,—তাহার অল্পপাতে বাঙ্গালী পেট ভরিয়া থাইতে পার না, বাঙ্গালী-মহিলাই অবস্থা আরও শোচনীয়, একে অসম্মানিত

হীন কক্ষ মধ্যে দিবারাত্রি অবস্থিতি, তাহার উপর চিরন্তন রীতামুসার বাঙ্গালী পুরুষকে যথাযথ আহার করাইয়া ভুক্তাবশেষ ভোজনে আত্মতৃপ্তি অল্পভূতির ফলে অনেক মহিলাই উপযুক্ত ভোজনের দিকে লক্ষ্য রাখেন না! ফলে বাঙ্গালী-পুরুষও যেরূপ দুর্বল ও ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন, বাঙ্গালী মহিলা ভায়া পেশাও স্বাস্থ্যহানির কারণ করিয়া তুলিতেছেন। কাজেই দুর্বল পিতামাতার শুক্র-শোণিতের সংমিলনে যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা যে একপ ভাবে অকালে কাল কবলিত হইবে—তাহাতে আর বিচিৎ কি?

### শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা।—সহযোগী

“হিন্দুস্থান” হইতে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমরা নিম্নলিখিত খোকা খুকার কথা উদ্ধৃত করিলাম।

১। শিশুর ঠোঁটে ঠোঁট রাখিয়া কখনো চুমো খাইবেন না—বা আর কাছাকাছি থাইতে দিবেন না।

২। বাজার হইতে কিনিয়া আনা কৃত্রিম স্তনবৃত্ত শিশুদের মুখে দিয়া কখনো তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিবেন না। শিশুদের বাড়ি ইহাতে কমিয়া যায়; গঠনও ধারাপ হইবার ভয় আছে।

৩। কি দিনে, কি রাতে, একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া ঠিক নিয়ম করিয়া শিশু দিগকে দুধ খাওয়াইয়া দিবেন।

৪। প্রতিবারের আহ্বারের পরেই বোরিক অ্যাসিড দিয়া শিশুদের মুখ ধুইয়া দেওয়া দরকার।

৫। দোল দিয়া শিশুকে ঘুম পাড়াইবেন না।

৬। শিশুর পিছনে এক ছাত না রাখিয়া কখনো তাহাকে কোলে করিবেন না।

৭। বডকান পারেন,—শিশুকে ভালো আঁকিয়া খোলাইয়া রাখিবেন। খোলা রাখিলে শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৪র্থ বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—অগ্রহায়ণ ।

৩য় সংখ্যা ।

সুশ্রুত ।

—:—

( শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণতীর্থ-বিদ্যাভিনোদ । )

( ১ )

নিখিল ভূবন আবৃত যখন নিবিড় মোহের তমসা স্পর্শে ।  
তখন উজ্জল জ্ঞানের আলোক ছাইল সারাটা ভারতবর্ষে ॥  
তাহার মাঝারে সুশ্রুত দেব ! দানিলে বিশাল ভিষকস্তম্ভ ।  
প্রতিভা প্রকাশি' অস্ত্রবাসীরে বিতরি শতেক শলা যন্ত্র ॥  
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পুজিল মূর্তি ।  
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্তি ॥

( ২ )

জনক তোমার অতি তেজস্বী তপোধন মুনি বিশ্বামিত্র ।  
কৈশোরে তব জ্ঞানের আলোকে-উজ্জলি হৃদে সে শালিহোত্র ।  
জনক আদেশে জ্ঞানের প্রয়াসে বারণসী ধামে পুণ্যক্ষেত্রে ।  
বরিলে নৃমনি দ্বেষ দিবোদাসে আচার্য্য পদে সুদেব পুত্রে ॥  
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পুজিল মূর্তি ।  
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্তি ॥

( ৩ )

বিতরিল গুরু শতেক শিষ্যে সমান বিদ্যা সমান জ্ঞান ।  
উচ্চে উঠিলে সবার মাঝারে গুণ গৌরবে লভিলে মান ॥

ব্রহ্মা রচিত আয়ুর শাস্ত্র তোমাতে লভিল সমুৎকর্ষ ।  
 রচিলে স্বনামে গ্রন্থরত্ন শিষ্য সমাজে ফুটিলে হর্ষ ॥  
 তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্তি ।  
 জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্তি ॥

( ৪ )

শবচ্ছেদি দিলে শারীরের জ্ঞান শিখা'লে সকলে যন্ত্র শস্ত্র ।  
 এষণ সীবন লেখনাহরণ ছেদন ভেদন বেধন অন্ত্র ॥  
 তিব্বতে তব ঘোষিল কীর্তি মিশরে উঠিল যশের মন্ত্র ।  
 আরব বোম্বিল অতুল মহিমা তবানুসরণে রচিল তন্ত্র ॥  
 তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্তি ।  
 জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্তি ॥

## কাজের কথা ।

—:~:—

বাস্তবালীর কথা ।—এখনকার দিনে  
 বাস্তবালীর পরমায়ু গড়পরতা পঞ্চাশ । ত্রিশ  
 বৎসরের পরই বাস্তবালীর শক্তি-সামর্থ্য হ্রাস  
 পাইতে আরম্ভ হয় এবং চল্লিশ বৎসরের পর  
 অনেক বাস্তবালীরই অধিকাংশ ইন্দ্রিয় পূর্ণভাবে  
 কার্য্য করিতে পারে না । বাস্তবালীর মধ্যে  
 যেক্ষণ উপচক্ষুর বিস্তৃতি লক্ষিত হয়, তাহাতে  
 যৌবনের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতে  
 অনেক বাস্তবালীরই যে চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ের  
 দোষ ঘটয়া থাকে—ইহা তা স্বীকার করিতেই  
 হইবে । সেই চক্ষুর দোষ ঘটায় প্রধান কারণ  
 বাস্তবালীর শরীর ক্ষয় । চক্ষুর দোষ ঘটিলেই  
 বুঝিতে হইবে যে, যে কোনো কারণেই হউক  
 অল্পদৃষ্টি-বাস্তবালীর শারীরিক ক্ষয় ঘটতেছে ।  
 আলো বা যৌবনে বাহ্যদৃষ্টির উপচক্ষু ধারণ

করিবার কারণ ঘটে, আমাদের মনে হয়, নিম্নত  
 পুস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরগুলির প্রতি চক্ষুর  
 দৃষ্টি অসমংকল্প থাকাই তাহার প্রধান কারণ ।  
 বাস্তবালী বালক মূৰ্খ হউক—তাহার অধ্যয়ন  
 করিয়া কাজ নাই—এ কথা অবশ্য আমরা  
 বলিতেছিলাম, কিন্তু ইদানিস্থল কালের অর্থকরী  
 বিদ্যাশিক্ষার জন্য দিব্যরাত্রি রাশি রাশি গ্রন্থ  
 অধ্যয়নের ব্যবস্থায় সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সর্ব  
 প্রধান কার্য্যকরী ইন্দ্রিয় চক্ষুর দোষ জন্মাইবার  
 কারণ উপস্থিত করাও সমীচীন কিনা—তাহাই  
 চিন্তার বিষয় ।

\* \* \* \* \*  
 উপচক্ষু বিস্তৃতির হেতু ।—

শিক্ষার ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন একটি কারণে  
 বাস্তবালী বালক ও যুবক সমাজে উপচক্ষু

বিস্তৃতির আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে—সে টি ব্রহ্মচর্যের অভাব। যতগুলি কারণে চক্ষুর দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহার মধ্যে অতিমৈথুন—চক্ষুর দোষ উৎপন্ন করিবার একটি প্রধান কারণ। ব্রহ্মচর্য শিক্ষার অভাবে বাঙ্গালী-বালক ও যুবকদিগের মধ্যে ইহার গতি কিন্তু রোধ করিবার উপায় নাই। তাহার উপর বেকপমৈথুনে চিরদিনের জন্য অন্তঃসারশূন্য হইতে হয়, সেই অস্বাভাবিক মৈথুনের ব্যবস্থাই উহাদিগের মধ্যে অপ্রতিহত। ইহার ফলে বাঙ্গালী বালকের চক্ষুর দোষ তো বটতেছেই, ভদ্রির প্রায়বিক দৌর্যলোর ভীষণ পীড়নে কন্ময়র জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্বেই বাঙ্গালীকে বিপর্যাস্ত করিয়া তুলিতেছে।

\* \* \* \*

### ব্রহ্মচর্যের অভাবে সর্বনাশ ।—

সাংগাহিক সংবাদ পত্রগুলিতে যত বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহার চারিভাগের তিন ভাগ ধাতু ও দ্রাব্যিক দৌর্যল নিবারণের ঔষধে পূর্ণ। বাঙ্গালীর শোচনীয় অরস্থা ঐ সকল বিজ্ঞাপনের অবস্থা দেখিয়াই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। রোগের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা বুঝিয়া দেশে যে ঐ শ্রেণীর ঔষধের আবিকর্ত্তারাও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা তো বলাই বাহুল্য। ফলে এইনকার দিনে বাঙ্গালী-বালকের নিকট যে ব্রহ্মচর্য শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, তাহার প্রতীকার কি? সে কালের শিক্ষাকাল গুরুগৃহে অতিবাহিত করায় ব্যবস্থা তো অধুনা লুপ্ত হইয়াছে,—বেকপ শিক্ষার শ্রোত এখন—বাল্যলয় প্রবাহিত, তাহারই মধ্যে কর্তৃপক্ষগণ কি ব্রহ্মচর্য শিক্ষাদানের কোনো একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন না? ইহার বন্দোবস্ত কিরূপভাবে হইতে

পারে—শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা সে বিষয়ের চিন্তা করিবেন, তবে আমাদের মনে হয়,—স্বাস্থ্য পালনের শিক্ষাদানের জন্য সাহিত্য-গণিতের মত যদি একটু কড়া কড়ির ব্যবস্থা করা হয় এবং স্বাস্থ্যপালনের সেই সকল পুস্তকে ব্রহ্মচর্য পালনের বিধি সকল লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে কতকটা শুভ ফল ফলিতে পারে।

### অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য ।—

এখন-কার বাঙ্গালী বালককে যে একেবারেই চিত্ত সংযমের শিক্ষা দেওয়া হয় না—ইহা অতি সত্য কথা। বাঙ্গালী-বালকের অধ্যয়ন ব্যাপারে তাহার পিতামাতা যেরূপ কঠোর দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন, তাহাকে সংযমী করিবার জন্য যদি তাহার কতকটা দৃষ্টিও নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজি বঙ্গজননীর অনেক কৃত্তীপুরুষকে অকালে কাল কবলিত হইতে হইত না। অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যও এখনকার দিনে পনের অধুনা বাঙ্গালী ভূগিয়া থাকেন। অধিক জলপান, বিষম ভোজন (অন্ন ভোজন, বহু ভোজন বা অসময়ে ভোজন), মলমূত্রাদির বেগধারণ ও রাত্রি জাগরণ—সাধারণতঃ এই কয়টি কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। বাঙ্গালার পল্লীগুলি অপেক্ষা সহর গুলিতেই অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের প্রাদুর্ভাব অধিক, আবার বাঙ্গালার সকল সহর অপেক্ষা সর্বপ্রধান সহর কলিকাতাতেই ইহার বিস্তৃতি অত্যধিক। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে চা-দোডা-লেমোনেড-সরবতের দোকান নাই, ফিরিওয়ালার “চাই বরফ” বলিয়া দেখানে সর্বত্র হাকিয়া রাখা না, ফুলপানি বরফ দেখানে সর্বত্র পয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা নাই; তাহারই ফলে

পল্লীমাতার সন্তানগণ নাগরিকগণের মত এত অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যপ্রবণ হইয়া ভয়স্বাস্থ্য হইতে পারেন না। সহরে বাঙ্গালী পিতা নিজেই এইরূপ অধিক জলপানে অজীর্ণগ্রস্থ হইবার কারণ করিয়া থাকেন, এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালী-বালককে সে বিষয়ে চিন্তা সংযম করিবার শিক্ষা কে প্রদান করিবে? ফলে বাঙ্গালী প্রতি নিয়ত ব্লোগের তাড়নায় ক্রমেই যে মুহূর্ত্তান হইয়া পড়িতেছে, সে সম্বন্ধে কবি রামপ্রসাদের কথার বলিতে গেলে বলিতে হয় :—

“কারো দোষ নয় গো মা,  
আমি স্বখাদ মলিলে ডুবে মরি শ্রামা।”

\* \* \*

বাঙ্গালীর পরমায়ু।—অনেক বাঙ্গালীই যে এখন পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বাঁচেনা এবং পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতিক্রম করার পর হইতেই তাহার ‘যে জীবনের’ আশঙ্কা প্রতি মুহূর্ত্তেই হইয়া থাকে—ইহা পৃথিবীর সকল জাতির লোকেই একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। বিলাত ও আমেরিকার জীবন-বীমা কোম্পানী গুলি তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রসার করে বাঙ্গালী জাতির বীমা গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী যদি মৃত্যুর পর টাকা প্রদানের সর্ত্তে বীমা করিবার জন্য আবেদন করে, তাহা হইলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, সেরূপ বয়সে দশ কি উর্দ্ধ সংখ্যা পনের বৎসর পরে জীবদ্দশায় টাকা গ্রহণের সর্ত্তে অধিক টাংগা দিয়া বীমা করিতে হয়। আর পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর বীমা গ্রহণের আবেদন করিলে তাহা তো গ্রহণ করার ব্যবস্থাই নাই। কবে বাঙ্গালী জাতির পরমায়ু এখনকার দিকে

পরতা যে পঞ্চাশ,—ইহা পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই একরূপ স্থির করিয়া লইয়াছেন।

\* \* \*

সেকালের বাঙ্গালী।—সেকালের বাঙ্গালী আশী-নব্বই-পঁচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত তো বাঁচিতেই—একশত এবং তদুর্দ্ধ বয়সেও বাঁচিয়া থাকার লোকও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সমাজের নিয়মে বান্ধক্যো পদার্পণ করিলেও পত্নী বিষয়ে বাঙ্গালীর নূতন কবিতার পরিগ্রহে বাধা নাই। অনেক অশীতিপর স্থবিরকেও সেই নীতির মর্যাদা পালন করিতে দেখা যায় এবং দারাস্তর গ্রহণের ফলে তাঁহা-দিগকে প্রজাবুদ্ধি করিতেও দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ সেকালের বাঙ্গালী যেরূপ অধিক দিন জীবিত থাকিবার ক্ষমতা লাভ করতেন, সেইরূপ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বাস্থ্যস্বথে বঞ্চিত হইতেন না। বাল্যে ব্রহ্মচর্যা পালন—তথা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনই তাহার এক মাত্র কারণ। অজীর্ণ অগ্নিমান্দের নাম সে কালে বাঙ্গালী একেবারে জানিত না। এখনকার সৌখিন-বাঙ্গালী আহার করিতে পারে না—ভোজ-নিমগ্নে আহৃত বাঙ্গালীর মধ্যে যিনি যত অন্নাহারী—তিনি তত ধন্যমনা বলিয়া মনে মনে গর্ক-মুখ অহুতব করিয়া থাকেন, আগেকার বাঙ্গালী তো সেরূপ ছিল না। আগেকার বাঙ্গালীকে মাধ্যাহিক আহারের সময় যে অন্ন প্রদান করা হইত, তাহার পরিচরে বসিতে গেলে বলিতে হয়—ঐ অন্নত্রয় মার্জার বা বিড়ালে ডিঙ্গাইতে পারিত না। সেকালের আহারপটু বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা সিদ্ধার করা ছিলনা, বাঙ্গালীর আহারপটুতা সে কালের একটা গৌরবের বিষয়ই ছিল। সেকালের

মিনি তত বেশী আহাৰ কৰিতে পাবিতেন, তিনি তত বেশী প্ৰসিদ্ধি অৰ্জন কৰিতেন। বাঙ্গালীৰ ‘মুনকে রঘু’—এই আহাৰপটুতাৰ ফলে আজিও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ফলে সেকালের বাঙ্গালী বাল্যে ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কৰিত, যৌবনে স্বভাবতঃ শৰীৰ ক্ষয়ের কাৰণ ঘটিলেও তাহাৰ পূৰণ কামনায় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আহাৰ কৰিত,—স্বাস্থ্যৰক্ষাৰ জন্ত শাস্ত্ৰেৰ বিধিনিষেধ-ব্যবস্থাও সৰ্ব্বপ্ৰকাৰে মানিয়া চলিত। সেকালের বাঙ্গালীৰ নৌৰোগ, দীৰ্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান থাকিবাব তাহাই একমাত্র কাৰণ।

\* \* \*

এ কালের বাঙ্গালী।—এ কালের বাঙ্গালী ব্ৰহ্মচৰ্য্য শিখে নাই, সদাচাৰ কৰিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সধুতি সে পাইবে কোথা হইতে? যে সকল আহাৰ্য্যে শৰীৰেৰ পুষ্টি ও মনের তৃপ্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে সেই দুহু ঘৃত তো দেশে একরূপ ছুপ্তাপা হইয়াছে, তা'ছাড়া সে সকল দ্রব্য আহাৰেৰ জন্তও বাঙ্গালী এখন আর উদ্গ্ৰীব নহে। বাঙ্গালীৰ বল সঞ্চয় হইবে কোথা হইতে? বলসঞ্চয় ভিন্ন দীৰ্ঘজীবন লাভ তো একেবারেই অসম্ভব। এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালীৰ ভাগ্যে যে সকল আহাৰ্য্য জুটিয়া থাকে, তাহাৰ মধ্যে না থাকে দুহু, না থাকে ঘৃত, না থাকে যথেষ্ট পৰিমাণে মৎস্য! ছাত্রজীবনে অনেক বাঙ্গালী কেট মেষ বা বোর্ডিংয়ে থাকিতে হয়, ইহা-দিগেৰ ভাগ্যে বিশেষ পুষ্টিকাৰ আহাৰ্য্য লাভ সম্ভবপর নহে, যে সকল অন্ন বেতনের চাকুৰে বাঙ্গালী সপরিবারে সহরে অবস্থিতি করেন, তাহাদিগেৰ ভাগ্যেও এই একই ব্যবস্থা। গ্ৰামীণ বা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীৰ আহাৰ তো এইরূপ:

দেশেৰ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণও এখনকার দিনে প্রচুর আহাৰ কৰিতে পাবেন না। তাহাৰ প্রধান কাৰণ তাহাৰ অতিশয় শ্রমবিমুক্ত। পৰিশ্রম না কৰিলে তো ক্ষুধাকালে যথেষ্টরূপে ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ কৰিবাব শক্তি জন্মিতে পারে না। ফলে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী প্ৰাপ্যন্ত পৰিশ্রম কৰিয়া যথেষ্টভাবে উদরপূৰ্ত্তিৰ অভাবে অজীৰ্ণ রোগগ্ৰস্ত হইয়া স্বাস্থ্যক্ষয়েৰ কাৰণ কৰিয়া তুলিতেছেন, আর দেশেৰ ধনবান্ৰা আশ্রয়-পৰতন্ত্ৰতাৰ ফলে বয়সোচিত আহাৰেৰ অভাবে ঐ বোগেৰ কাৰণ ঘটাইতেছেন।

\* \* \*

পরিণাম।—ফলে নানাকারণে বাঙ্গালীৰ অবস্থা যেকূপ শোচনীয় হইতেছে, তাহাতে ইহাৰ পরিণাম যে কি হইবে—তাহা ভাবিবাব বিষয়। বাঙ্গালীৰ বুদ্ধি আছে, কিন্তু বল নাই, বল না থাকিলে সে বুদ্ধিৰ ক্ষুণ্ণ হওয়া কখন সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালীৰ প্ৰাণ আছে, কিন্তু উৎসাহ নাই, উৎসাহ না থাকিলে সে শুক প্ৰাণ লইয়া কোনো বিরাট ব্যাপারে একাগ্ৰ-তাৰ অভিনিবেশেৰ আশা করা যায় না। বাঙ্গালীৰ হৃদয় আছে, কিন্তু তাহা অশান্তিপূৰ্ণ, অশান্তিপূৰ্ণ হৃদয়েৰ চেষ্টা কখনো সকলকাম হইতে পারে না। বলবুদ্ধি, প্ৰাণেৰ উৎসাহ এবং হৃদয়েৰ শান্তি—এই কয়টি জিনিসেৰ অভাবে মানুষেৰ মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। বাঙ্গালীৰ এখন সেই মনুষ্যত্ব নষ্টেৰ উপক্রম ঘটাইছে। ইহাৰেই ফলে বঙ্গজননী আর “প্ৰতাপাদিত্যেৰ” মত সম্ভানপ্ৰস্থ নহেন, “আশানন্দ-বৈদ্যানাথ-বিশ্বনাথের” মত প্ৰখিত নামা সম্ভানকে আর বঙ্গজননীৰ অঙ্গে ধারণ কৰিতে হয় না। স্বাস্থ্য হীনতাৰ তীষণ ফলে সে “রামপ্ৰসাদেৰ” মত সায়ক, “কীৰ্ত্তিবান কানীৰাম” তারত, “চণ্ডী

দাসের' মত কবিশ্ব লইয়াও বাঙ্গালা দেশে কেহ জন্ম গ্রহণ করে না, 'টেকচাঁদ' 'বন্ধিম' 'দীনবন্ধুর' স্থানও পূরণ করিবার শক্তি এইজন্ত বাঙ্গালা হইতে তিরোহিত হইয়াছে।

\* \* \*  
ব্যবস্থার কথা।—আর্য্য ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ মাথার দিবা দিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন—“স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।” এখনকার দিনের অর্থসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী সে কথা বোঝেনা বলিয়াই তো আজি তাহার এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ফলে নষ্টস্বাস্থ্য প্রায় বাঙ্গালার পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাকে সেকালের মত আবার সাবেক রীতি নীতি মানিয়া চলিতে হইবে। বাল্যে গুরুগৃহে অবস্থিতির ব্যবস্থা না হইলেও ছাত্র-গণ বাল্য-জীবনেই বাহাতে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের শিক্ষা প্রাপ্ত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধনবানদিগকে শ্রমবিমুখ হইলে চলিবে না,—শারীরিক শ্রমের জন্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বভোভাবে সঁচেষ্ট হইতে হইবে। সাধারণ অন্ন বেতনের চাকুরিগণ জননী জন্মভূমির মায়ী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে যে সহরে অবস্থিতি করেন, সে সংকল্প পরিহার করিতে হইবে। চাকরির নেশা পরিত্যাগ করিয়া যদি পল্লীজননীর প্রান্তর ভূমিতে কৃষিকর্ম্মের ব্যবস্থায় জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে তো কোনো কথাই নাই, তাহা না হইলেও সপরিবারে কর্ম্মস্থানে থাকিয়া সকলেই অধ্যাপনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার সুলভ ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে আর চলিবে না। সকল পাণ্ড অপেক্ষা দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পুষ্তিকর আহার্য্যের ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গে করিতে হইবে। দরিদ্র বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির সর্ব্বপ্রধান কারণ

দুশ্চিন্তা। দরিদ্র-বাঙ্গালী যদি অবস্থা মত ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে এই দুশ্চিন্তা-রাফসী বাঙ্গালীর নিকট হইতে অতিদূরে পলায়ন করিবে, ফলে বাঙ্গালী আবার সেকালের মত নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইবে।

\* \* \*  
দুশ্চিন্তার কারণ।—বাঙ্গালীর দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ—বাঙ্গালীর সর্ব্ব বিষয়ে অভাব, সেই অভাবটা যেন বাঙ্গালীর নিকট ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, কারণ চাউলের মূল্য দশ টাকা, বাঙ্গালী শীত-গ্রীষ্মে উপযোগী বসন পরিতে পায় না, কারণ সাধারণ কাপড় একজোড়ার মূল্য অন্ততঃ পাঁচ-টাকা। ইহার উপর দরিদ্র বাঙ্গালীর উপর মা-বড়ীর রূপা পূর্ণ মাত্রায়। কাজেই বাঙ্গালী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সারাদিনে যে অর্থ উপার্জন করে, ভদ্রারা নিজের এবং পরিবারবর্গের সুখস্বচ্ছন্দে অশন বসনের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে, কাজেই দুর্ব্বল মস্তিকে তাহাকে দুশ্চিন্তা-রাফসীকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকা চলে না। ইহার উপর সমাজের কঠোর ব্যবস্থায় কতাদায়ে সকল বাঙ্গালীই জর্জরীত। একে উদরায় সংস্থানের চিন্তা, তাহার উপর কতাদায়ের ভয়ঙ্করী চিন্তা! বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য হানি হইবে না—তথা বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু ঘটবেনা তো ঘটবে কাহার? হায়! অর্থ উপার্জনের অসচ্ছলতার এই দারুণ দর্দিনে বাঙ্গালী-পিতা সঙ্গতিহীন-পুত্রের বিবাহ সংঘটনের পূর্বে যদি এই কথা চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ তো এক্ষণ ঘোর তমসচ্ছন্ন হইত না। কিন্তু কোনো বাঙ্গালীই এ কথা বুঝেন না, সেই জন্তই তো বাঙ্গালার এই অবস্থা।



## আয়ুর্বেদের ইতিহাস।

—:—:—  
এস্থ পরিচয়।

(পূর্বস্মৃতি)

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম্, এ, এল্, এম্ এম্)

চরক সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা প্রধান প্রাণিক সংহিতা সমস্ত কায়চিকিৎসা ভ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি আত্রেয় ইহার বক্তা এবং অগ্নিবেশ শ্রোতা। অগ্নিবেশ ইহা গ্রন্থাকারে প্রচার করেন বলিয়া এই গ্রন্থ অগ্নিবেশ সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আত্রেয় অগ্নিবেশ, ভেল, জতুর্কর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও ধাবাত—এই ছয় জন শিষ্যকে আয়ুর্বেদ যথাক্রমে সমান ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধির উৎকর্ষ বশতঃ অগ্নিবেশ প্রথমেই গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেই গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ হয়।

কালে মূল অগ্নিবেশ-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে চরক ঋষি উহার প্রতिसংস্কার করেন। এই ক্ষুদ্র উহা চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্তী কালে চরক-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে দৃঢ়বল তাহার পূরণ করেন। কলহান, সিদ্ধিহান এবং চিকিৎসাস্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় দৃঢ়বল কর্তৃক লিখিত বলিয়া চরকে উক্ত হইয়াছে। চক্রপাণি রচিত “মহাশ্রবণ দীপিকা” নারী চরকটাকার ত্রৈলোচনাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র টীকা বায়াই প্রদেশে মুদ্রিত হইতেছে। বঙ্গভূমি-রূপ ৬গদাধর কবিরাজ রচিত “জলকলস্কর” নারী সমগ্র টীকা মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে উহাও সুলভ নহে।

ভেল বা ভেড় সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ আত্রেয়ের

অন্ততম শিষ্য ভেল কর্তৃক রচিত। ভেল সংহিতা পূর্বে দক্ষিণাপথে সুপ্রচলিত ছিল। এক্ষণে উহা তাম্রোরেব রাজকীয় পুস্তকালয়ে খণ্ডিতাকারে বর্তমান আছে।

হারীত সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা-প্রধান গ্রন্থ আত্রেয়শিষ্য হারীত কর্তৃক রচিত। বর্তমানে হারীত-সংহিতা নামে বাহা প্রচলিত, তাহা মূল হারীতসংহিতা নহে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বর্তমান হারীতসংহিতার রচনা দেবিয়া বোধ হয়, উহাতে কোন অজ্ঞাত-নামা অল্পবিদ্য ব্যক্তির রচনা যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত আছে।

সুশ্রুত সংহিতা—এই শল্যতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থ, বর্তমানে যে সকল শল্যতন্ত্রপ্রধান গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের বিষয় কাশীরাজ দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ ধনন্তরি কর্তৃক শিষ্য সুশ্রুতাদিকে উপদিষ্ট হইয়াছিল। সুশ্রুত ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন বলিয়া ইহা সুশ্রুত-সংহিতা নামে খ্যাত হইয়াছে। পরবর্তী কালে সুশ্রুতের অঙ্গহানি ঘটিলে নাগার্জুন নামক বৌদ্ধাচার্য্য উহার প্রতিসংস্কার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

সুশ্রুত-সংহিতা—হৃদহান, নিদানহান, শারীরহান, ক্রিকিৎসাহান, কলহান এবং উত্তরতন্ত্র—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। নিদান-হানে প্রধানতঃ শল্যসাধা (Surgical) ব্যাধি সমূহের নিদান এবং চিকিৎসা-বানে এই সকল

রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে।  
কলস্থান ও উত্তরতন্ত্রে অস্ত্রাশ্রু সাতটা তন্ত্রের  
বিষয়ীভূত রোগ সমূহের নিদান ও চিকিৎসাদি  
বর্ণিত হইয়াছে। স্বস্থবৃত্ত (Hygiene) এবং  
পঞ্চকর্ষ বিষয়ক উপদেশও উত্তরতন্ত্রের  
অন্তর্ভুক্ত। উত্তরতন্ত্রে বিদেহ প্রভৃতি গ্রন্থ-  
কারের মত, এমন কি চরকের পাঠ পর্য্যন্ত  
উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইজন্য এই অংশ  
অপরের রচিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ  
মূলসংহিতা হইলে বোধ হয় এক্ষেপে বিদেহ  
প্রভৃতির মত ও পাঠ উদ্ধৃত হইত না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অধুনা যাহা  
সুশ্রুতসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ, তাহা মূল সুশ্রুত-  
সংহিতা নহে। উহা নাগার্জুন কর্তৃক প্রাতি-  
সংস্কৃত সুশ্রুত। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য  
টীকাকারগণ মূল সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত  
বচন “বৃদ্ধ সুশ্রুতের” বলিয়া নির্দেশ করিয়া-  
ছেন।

সুশ্রুতের উল্লিখিত “নিবদ্ধ সংগ্রহ”  
নান্নীসমগ্র টীকা এবং চক্রপাণি কর্তৃক “ভাষ্ক-  
মতী” টীকার সূত্রস্থানাংশ মাত্র মুদ্রিত  
হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে দুল্লভ এক্ষণ অস্ত্রাশ্রু মূল  
সংহিতার বিষয় পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

### (খ) সংগ্রহ গ্রন্থ।

সংগ্রহগ্রন্থ বলিতে আয়ুর্বেদের সমগ্র  
অংশের সংগ্রহ এবং আংশিক সংগ্রহ উভয়ই  
বুঝায়। কিন্তু আমরা এই পর্য্যায়ের কেবল  
সম্পূর্ণ সংগ্রহেরই পরিচয় প্রদান করিব।  
আংশিক সংগ্রহগ্রন্থের নামাদি ৪বিবিধ সংগ্রহ—  
তালিকার মধ্যে লিখিত হইবে।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ বা বাগ্ভট—অষ্টাঙ্গ  
ইহা বাগ্ভট কর্তৃক উৎকৃষ্ট এবং সুবৃহৎ সংগ্রহ

গ্রন্থ। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ সূত্রস্থান, শারীরস্থান,  
নিদানস্থান, চিকিৎসা স্থান, কলস্থান ও উত্তর  
স্থান—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। আয়ুর্বেদের  
আটটা তন্ত্রোক্ত চিকিৎসার সকল বিষয়ই  
ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থের ভাষা সরল এবং  
গম্যপম্যময়। এই গ্রন্থ এক্ষেপে বম্বে প্রদেশে  
মুদ্রিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ বা বাগ্ভট—অষ্টাঙ্গ  
সংগ্রহ রচনার পরে বাগ্ভট ইহা রচনা করিয়া-  
ছিলেন। সম্ভবতঃ অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ অত্যন্ত  
বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বাগ্ভট এই নাতি-  
সংক্ষেপবিস্তৃত গ্রন্থ স্মরণধারণসুখকর পণ্ডে  
রচনা করেন। কিন্তু অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ অপেক্ষা  
অষ্টাঙ্গ সূত্রের ভাষা কঠিন। দক্ষিণাংশে ও  
উত্তরপশ্চিম ভারতে এই গ্রন্থেরই অধ্যয়ন  
অধ্যাপনা অধিক প্রচলিত। অষ্টাঙ্গসংগ্রহকে  
সংহিতাও বলা হইয়া থাকে।

শাক্ষধর সংগ্রহ—ইহা শাক্ষধর  
কর্তৃক রচিত নাতিবিস্তৃত সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহার  
রচনা অতি প্রাঞ্জল, বিষয় বিভাগ রমণীয় ও  
বিশিষ্ট প্রকার। শাক্ষধর প্রণীত শাক্ষধর  
পদ্ধতি নামক সাহিত্য সংগ্রহ ও বৃক্ষায়ুর্বেদ  
(উপবন বিনোদ) মুদ্রিত হইয়াছে। শাক্ষধর  
সংগ্রহেরও প্রচার উত্তরপশ্চিম ভারতে অধিক-  
তর দেখা যায়। শাক্ষধরের সময় পূর্বে  
নিরূপিত হইয়াছে।

গদানিগ্রহ—এই বৃহৎ গ্রন্থ সৌন্দর্য  
কর্তৃক রচিত। ইহাতে প্রথমে প্ররোগ খণ্ডে  
ঔষধাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরিভাষা  
ও ঔষধ সংগ্রহ লিখিয়া পরে কারতন্ত্র, শল্যতন্ত্র  
প্রভৃতি আটটা তন্ত্রের উপদেশ স্বতন্ত্র ভাবে  
লিখিত হইয়াছে। গদানিগ্রহে অনেক প্রাচীন  
সংহিতার বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। গদান

নিদানের অনেক পাঠের সহিত এই গ্রন্থের পাঠের সাদৃশ্য আছে কিন্তু মাধবনিদানই প্রথম নিদানসংগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জন্ত গদ-নিগ্রহ—মাধবনিদানের কিছু পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

**বঙ্গসেন বা চিকিৎসাংগ্রহ—**এই বৃহৎ গ্রন্থ বঙ্গসেন কর্তৃক রচিত। এবং বঙ্গসেন নামেই সুপ্রসিদ্ধ। অগস্ত্যসংহিতা অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে—গ্রন্থসমাপ্তিতে গ্রন্থকার নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা বা বিভাগ-প্রণালী সংহিতা গ্রন্থের অনুরূপ নহে। সুতরাং অগস্ত্যসংহিতার অনেক উপদেশ ইহাতে থাকিলেও, এই গ্রন্থ অগস্ত্যসংহিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলাই বোধ হয়। বঙ্গসেনের অন্ত্যায় পরচর পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

**দোগরত্নাকর—**ইহা কোন অজ্ঞাত-নামা সুবিদ্বৎ বৈজ্ঞানিক রচিত বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। দাঁকাপথে এই গ্রন্থ সুপ্রচলিত এবং বিশেষ-পরিমাদৃত। এই গ্রন্থে লিখিত জারণ-মারণ পদ্ধতি ও ঔষধাবলী অতি উত্তম, এজন্য ইহা বঙ্গদেশে সমাদৃত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

**ভাবপ্রকাশ—**ভাবমিশ্র রচিত বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। এই গ্রন্থ ধর্মোপনিষদগণের ভারত-বর্ষে আগমনের পরে রচিত। বলিয়া ফিরঙ্গ (Syphilis) রোগের নিদান ও চিকিৎসাদি ইচ্ছাতে লিখিত হইয়াছে। অহিকেন, তোপ চিনি প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধের প্রয়োগ-সংহিতা এবং প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থ নাই, কিন্তু ভাবপ্রকাশে আছে। যুনানী চিকিৎসা

শাস্ত্রেরও দুই একটা ঔষধ ভাবপ্রকাশে দেখা যায়। ভাবমিশ্রের পরিচয়াদি পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

## (গ) রসগ্রন্থ।

**রসরত্নাকর—**(১) নাগার্জুন রচিত অমূল্য গ্রন্থ। এই নাগার্জুন যে সুশ্রুত-প্রতিসংস্কর্তা নাগার্জুন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি—তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

**রসরত্নাকর—**(২) নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত পঞ্চখণ্ডীয়ক সুবৃহৎ রসগ্রন্থ। পঞ্চ খণ্ড যথা,—রসখণ্ড, রসেন্দ্রখণ্ড, বাদখণ্ড, রসায়ন-খণ্ড এবং সন্ন্যাসখণ্ড। তন্মধ্যে রসখণ্ড ও রসেন্দ্র-খণ্ড কলিকাতায় এবং রসায়নখণ্ড সহ উক্ত দুই খণ্ড বোম্বাই নগরে আয়ুর্বেদগ্রন্থমালায় \* মুদ্রিত হইয়াছে। রসরত্নাকর প্রণেতা নিত্যনাথ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

**রসরত্নসমুচ্চয়—**বাগ্ভট প্রণীত প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ। এক্ষণে বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থানেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের রসতন্ত্র বিষয়ক প্রায় সকল বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। এই বাগ্ভট যে অষ্টাঙ্গ-স্বয়ংকার বাগ্ভট হইতে ভিন্ন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

**আয়ুর্বেদ প্রকাশ—**শ্রীমাধব কৃত রসতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রীমাধব—মাধবকর এবং সায়ণ মাধব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। শ্রীমাধব রসতন্ত্রকার আদিনিথ, নিত্য-নাথ প্রভৃতি বোগী চিকিৎসকদিগের পরবর্তী,

\* বর্তমান সময়ে দুলাল অনেক রসগ্রন্থ ও সংগ্রহগ্রন্থ সম্প্রতি আয়ুর্বেদমার্গে পণ্ডিত মাধবকর চিকিৎসক আচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া যথেষ্ট নগরে আয়ুর্বেদ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। এজন্য বৈদ্যমাতেই ইহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু অত্যাশ্চর্য রসতত্ত্ব সংগ্রহকারদিগের পূর্ব-বর্তী । আয়ুর্বেদ প্রকাশে রসের এবং অত্যাশ্চর্য খনিজ ভেষজের সংস্কার, শোধন ও জারণাদি অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।

**রসেন্দ্রচূড়ামণি**—সোমদেবকৃত প্রাচীন গ্রন্থ । ইহার পরিভাষা প্রকরণ অতি প্রামাণিক বহিঃস্মরণীয় রসরহস্যমুচ্চয়কার বাগ্‌ভট নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন । এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই, সংগৃহীত হইয়াছে । সম্ভবতঃ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থমালায় শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে ।

**রসহৃদয়তত্ত্ব**—শঙ্করাচার্যের ভিক্ষু গোবিন্দ ভাগবত পাদাচার্য্য বিরচিত । এই উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ এক্ষণে বঙ্গে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ-মালায় চতুর্ভূজ প্রণীত টীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে । রসসংস্কারাদি বিষয় এই গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে ।

**রসার্ণবতত্ত্ব**—লেখকের নাম অজ্ঞাত । প্রাচীন রসগ্রন্থ ।

**রসেন্দ্র কল্পদ্রুম**—নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্ট বিরচিত রসগ্রন্থ । অমুদ্রিত ।

**রসেন্দ্র চিন্তামণি**—এই স্বগ্রন্থ ও প্রামাণিক প্রাচীন রসগ্রন্থ কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে ।

**রসেন্দ্রসার সংগ্রহ**—গোপালকৃষ্ণ প্রণীত এই সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত । অত্র দেশে ইহার প্রচার নাই । ইহাতে ধাতুদির জারণ-মারণ বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে কিন্তু ঔষধাবলী সবিস্তর বর্ণিত আছে ।

**রসপ্রকাশ স্তোত্র**—ইহা বশো-ধর নামক গোড় দেশবাসী ব্রাহ্মণ কর্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত নাতি বৃহৎ রস-গ্রন্থ । ইহাতে অষ্টাদশবিধ রসসংস্কার ও

রসবন্ধ এবং সর্কধাতু জারণ মারণ ব্যতীত হেম রৌপ্যাদি-করণ বিধিও বর্ণিত আছে ।

**রসফলক**—রুদ্রধামলের অন্তর্গত । এই গ্রন্থে ধাতুদির শোধনজারণাদি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে ।

**রসকৌমুদী**—ভিষক মাধব প্রণীত । ইহাতে রসঘটিত বিবিধ ঔষধ নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে । এই মাধব—নিদানকার মাধবের পরবর্তী বলিয়া বোধ হয় ।

**রস চন্দ্রিকা**—নীলাশ্বর কৃত সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ ।

**রস চিন্তামণি**—অনন্তদেব স্মৃতি বিরচিত রসগ্রন্থ । বঙ্গে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে ।

**রস নক্ষত্র মালিকা**—মথন সিংহ বিরচিত রসগ্রন্থ ।

**রস পদ্ধতি**—শ্রীবিষ্ণু পণ্ডিত বিরচিত রসগ্রন্থ ।

**রস মঞ্জরী**—শালিনাথ কৃত রসতত্ত্ব-প্রধান গ্রন্থ । বঙ্গে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে ।

**রস প্রদীপ**—উত্তম রসগ্রন্থ । তাব-মিশ্র এই গ্রন্থ হইতে অনেক ঔষধ স্বীয় সংগ্রহে নিবদ্ধ করিয়াছেন । ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই ।

**রসযোগ্য মুক্তাবলী**—নরহরিভট্ট কৃত রসগ্রন্থ । অমুদ্রিত ।

**রসরত্নমালা**—নিত্যানাথকৃত রসগ্রন্থ । অমুদ্রিত ।

**রসরাজ মহোদধি**—রসতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ । বঙ্গে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে ।

**রস রাজলক্ষী**—বিষ্ণুদেব বিরচিত রসগ্রন্থ ।

রসরাজ সুন্দর—রসতন্ত্র বিবয়ক  
অষ্টাচীন গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস সংক্ষেপ কলিকা—চানুও কারস্থ  
বিরচিত ক্ষুদ্র রসগ্রন্থ। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থমালায়  
মুদ্রিত।

রসসার—গোবিন্দাচার্য্য বিরচিত রস-  
গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধাতুপাদ (Alchemy)  
বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার  
গোবিন্দাচার্য্য গুজর দেশবাসী এবং শঙ্করা-  
চার্য্যের গুরু গোবিন্দাচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

রস সারামৃত—রামসেন কৃত রসতন্ত্র  
বিবয়ক আধুনিক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

স্বর্ণ তন্ত্র—অত্র ধাতু হইতে কিরূপে  
স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে হয় তাবিবয়ক গ্রন্থ। লেখ-  
কের নাম অজ্ঞাত।

কাকচণ্ডীখরী মত তন্ত্র—রসতন্ত্র  
বিবয়ক গ্রন্থ। কাকচণ্ডীখরী ও ভৈরবের  
কথোপকথনরূপে লিখিত। গ্রন্থকারের নাম  
জানা যায় না।

বৈগ্ণ বৃন্দ—নারায়ণ কৃত রস গ্রন্থ।  
অমুদ্রিত।

বৈজ্ঞামৃত—নারায়ণ কৃত রসগ্রন্থ।  
অমুদ্রিত।

## (ঘ) নিষণ্টু গ্রন্থ।

নিষণ্টুর অত্র নাম দ্রব্যগুণ। সংহিতা  
সময়ে দ্রব্যগুণ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত বলিয়া  
বিস্তৃত নিষণ্টু চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত  
আবশ্যক। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নিষণ্টুর পরিচয়  
নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ধনুস্তুরি নিষণ্টু—কাশ্মিরাজ ধনুস্তুরি  
ইহার বলা। তাঁহার কোন শিষ্য ইহা সংগ্রহ  
করিয়া প্রচার করেন জ্ঞানী জানা যায় না।

সংগ্রহকার এই নিষণ্টুকে দ্রব্যাবলি নামে  
অভিহিত করিয়াছেন।

মদনবিনোদ বা মদনপাল নিষণ্টু  
—কচ্ছদেশের রাজা মদনপাল এই নিষণ্টুর  
রচয়িতা। মদনপাল নিজ গ্রন্থে ক্ষুদ্র বৃহৎ  
অনেক নিষণ্টুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু  
সেই সকল নিষণ্টু এখন পাওয়া যায় না। মদন  
পালনিষণ্টু মধ্যমাকারের উত্তম নিষণ্টু গ্রন্থ।

রাজ নিষণ্টু—এই উৎকৃষ্ট নিষণ্টু  
নরহরি পণ্ডিত প্রণীত। নরহরি আপনাকে  
কাশ্মীর দেশীয় বলিয়াছেন আর কর্ণাটক ও  
মহারাত্রি ভাষায় দ্রব্যের নাম নির্দেশ করিয়া-  
ছেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি গ্রন্থরচনা  
কালে কর্ণাট বা মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসী  
ছিলেন। ইনি ধনুস্তুরি-নিষণ্টু, মদনপাল  
নিষণ্টু, হলায়ুধ নিষণ্টু, বিশ্বপ্রকাশ নিষণ্টু,  
অমরকোষ এবং শেখরাজনিষণ্টু প্রভৃতি হইতে  
গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন—এইরূপ বলিয়াছেন।  
অতএব ইনি উক্ত গ্রন্থকারের পরবর্তী, কিন্তু  
চক্রপাণির পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়।

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ—চক্রপাণি এই  
সংক্ষিপ্ত নিষণ্টুর প্রণেতা। ইহাতে কয়েকটা  
মাত্র পথ্য ও ভেষজদ্রব্যের গুণ লিখিত  
হইয়াছে।

রাজবল্লভ নিষণ্টু—এই নিষণ্টু  
রাজবল্লভ বৈষ্ণব রচিত। ইহাতে অনেক  
প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ লিখিত হয় নাই।

সোড়ল নিষণ্টু—সোড়ল কৃত বিষ্ণু  
নিষণ্টু-গ্রন্থ। বম্বে নগরে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ-  
মালার মধ্যে মুদ্রিত হইতেছে। সোড়লকৃত  
গদনিগ্রহের বিবরণ পূর্বে বলা হইয়াছে।

রত্নমালা—মাধব প্রণীত সংক্ষিপ্ত  
নিষণ্টু-গ্রন্থ।

এই সকল নিষণ্টু বাতীত চন্দ্রনন্দনকৃত  
গণনিষণ্টু, বোপদেব কৃত হৃদয়প্রদীপ, মুদ্রাল-  
কৃত দ্রব্যরত্নাকরনিষণ্টু, কেশবদেব কৃত কেশ-  
দেব রত্নাকর নিষণ্টু, কেশব কৃত সিন্ধুময়  
প্রভৃতি বহু নিষণ্টু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া

যায়। অষ্টাদশশতাব্দীকালে বহু দেশীয় এবং অনেক  
ভারতীয় যুরোপীয় চিকিৎসক ভারতীয়  
ভেষজ দ্রব্যের গুণনির্ণায়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন  
করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)।

## কবিরাজীর কৃতকার্যতা।

—:—

পক্ষাঘাতে—গুড়ুচাদি তৈল।

( ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, এল, এম, এস )

মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাস  
করিয়া কলকাতায় জীবনে বহু কাল হইতে আমি  
ডাক্তারী চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি।  
সত্য কথা বলিতে হইলে, এই ব্যবসায় অবলম্বন  
করার পর হইতে কবিরাজী চিকিৎসার উপর  
আমার ততটা আস্থা ছিল না। অনেক  
সময় ভাবিতাম, প্রাচীনকাল কবিরাজেরা শারীর-  
বিশ্বা শিক্ষা করেন না, এতদ্বারা শারীরস্থানের  
কোনো ধরনের জ্ঞানই হয় নাই, একমাত্র  
নাড়ী দেখিয়াই তাঁহাদের কৃতিত্ব। তাঁহারা  
বলেন, “বায়ু, পিত্ত, কফের বিষয়ে অভিজ্ঞতা  
অর্জন করিতে পারিলেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে  
সুখী হইতে পারা যায়।” আমি ডাক্তার, বায়ু-  
পিত্ত-কফের ধরন রাখি না, কাজেই বক্ষঃস্থল  
পরীক্ষা না করিয়া, অথবা টেম্পারেচারের গতি  
না বুঝিয়া, কেবল বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই  
দিয়া ক্রমে চিকিৎসা ক্ষেত্রে জয় অর্জন  
করিতে পারা যায়—তাঁহা আমি ধারণা করিতে

পারিতাম না। অনেক কবিরাজকে অনেক  
সময় তাড়ুড় বা quack জ্ঞানে এতদ্বারা বিশেষ  
শ্রদ্ধা চক্ষেও দেখিতে পারিতাম না।

সংগতি একটি বিশেষ ঘটনায় আমার  
সে বন্ধ ধারণা যেরূপে অপনোদিত হইয়াছে,  
তাঁহারা পরিচয় দিবার জন্তই এই প্রবন্ধের  
অবতারণা।

আমার ছোটসহোদর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত  
যতীন্দ্রনাথ বসু ই, বি, রেলের একজিকিউটিভ  
ইঞ্জিনিয়ার। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেসময়ে  
তাঁহাকে সিলংয়ে কর্মভার লইয়া গমন করিতে  
হইল। পূর্বে হইতে একটু বিশেষ অসুখে ভুগিয়া  
তাঁহার স্বাস্থ্য সে সময় তত ভাল ছিল না।  
যাহা হউক সিলংয়ে গমন করিবার কিছুকাল  
পরেই টেলিগ্রাম পাইলাম, তিনি পক্ষাঘাত  
রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। আমি সংবাদ  
প্রাপ্তি মাত্র তাঁহার কর্মস্থানে গমন করিবার  
এবং ৩ মাসের জন্য চিকিৎসা করিবার

চিকিৎসার্বী তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আনয়নের পর আমার স্বামীর বন্ধুদিগের অনেকে পরামর্শ দিলেন—“এ সব রোগে কবিরাজী চিকিৎসাই বিশেষ ফলপ্রদ, অতএব তাঁহার চিকিৎসার ভার কোনো উপযুক্ত কবিরাজের হস্তে অর্পণ করা হউক।” আমি কিন্তু সে কথা মানিতে পারিলাম না,—বহুকাল হইতে হাসপাতালের চাকরির কল্যাণে নানা প্রকারের অসংখ্য রোগীকে আরোগ্য করিয়া আমার এমনই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ডাক্তারী অপেক্ষা কবিরাজী চিকিৎসা কখনই অশু ফলপ্রদ হইতে পারে না। ফলে দাদার চিকিৎসা আলোপাথিক চিকিৎসকের হস্তেই গ্রস্ত করা হইবে সাব্যস্ত হইল এবং শ্রীযুক্ত আর, এল, দত্ত ন্যায়কে ডাকিয়া অনিয়া তাঁহারই হস্তে তাহার চিকিৎসার ভার দেওয়া হইল।

দাদার তখন রোগের অবস্থা শুধু পক্ষাঘাত নহে, তাহার সহিত জ্বরও হইতেছিল। একেবারে উত্থান শক্তি রহিত, তাহার উপর বড় দুর্দশ।

দত্ত সাহেব কিন্তু তাঁহার রোগ পরীক্ষা করিয়া যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহা আধা-কবিরাজী আধা-ডাক্তারী। কোষ্ঠজ্বরের জন্য একটি সেবনের ঔষধ দিলেন,—সেটি আলোপাথিক সম্মত এবং মালিশের জন্য ব্যবস্থা করিলেন—কবিরাজী সম্মত “গুড়ুচ্যাঙ্গি তৈল।” আমি এরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম, কিন্তু এ ব্যবস্থা তো যে সে লোকের নহে, এখনকার দিনের একজন প্রাচীন ও বহুদর্শী আলোপাথিক চিকিৎসক স্বয়ং দত্ত সাহেবের,—কর ব্যবস্থা উদ্ভাবিত

বার সাধ্য আমার নাই। ফলে দত্ত সাহেবের ব্যবস্থা শিরোধার্য করিয়া লইয়া কলিকাতা আয়ুর্বেদ কলেজের বিশেষ সংস্থষ্ট আমাদের একজন বন্ধু কবিরাজকে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

কবিরাজ আগমন করিলেন, আমি তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “গুড়ুচ্যাঙ্গি তৈল আছে?” তিনি বলিলেন,—“আছে।” আমি আপাততঃ এক পোয়া তৈল পাঠাইয়া দিতে বলিলাম, তিনি উহা পাঠাইয়া দিলেন।

সংখ্য কথা বলিতে কি—চারি পাঁচ দিন ঐ তৈল ব্যবহার করানর পরই দাদার জ্বর বন্ধ হইয়া গেল, পক্ষাঘাতের অসহ্য কষ্টও যেন অতি অল্প মাত্রায় কমিয়া আসিতে লাগিল বলিয়া উপলব্ধি হইল। আবার দত্ত সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলাম, তিনিও রোগীর অবস্থা সন্দর্শনে প্রীত হইলেন।

ঐ ব্যবস্থাই চলিতে লাগিল। উপকারও প্রতিদিনই প্রকাশ পাইতে লাগিল, এমনই করিয়া ঠিক এক মাসে দাদা নিরাময় হইলেন।

ব্যাপ্ত দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। কবিরাজীর উপর আমার যে অশ্রদ্ধার ভাব ছিল এই সময় হইতে তাহা বিদূরিত হইল। আমি এখন আর কোনো চিকিৎসারই বিপক্ষ নহি।

ইহার কিছুকাল পরে কবিরাজী পুস্তকে “গুড়ুচ্যাঙ্গি তৈলে”র প্রস্তুত প্রণালী ও গুণ-পরিচয় দেখিতে ইচ্ছা হইল। উহার গুণ-পরিচয়ে অবগত হইলাম, বাতরক্ত, উদাবর্ত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, হৃৎকুষ্ঠ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডুতা, বিষ্ণোট, বিসর্গ, নাড়ীভ্রম, ভগদর, বিলচিকা, পাণ্ডক, পান্দার প্রভৃতি ব্যাধিতে ঐ তৈল বিশেষ কার্যকারী। এই

তৈল ব্যবহারে বলীপলিত নষ্ট হয় এবং বল বৃদ্ধি ও বর্ণের উজ্জ্বল্য সম্পাদিত হয়। মহর্ষি আত্রেয় এই তৈলের আবিষ্কর্তা।

এই তৈলের গুণ-বাখ্যায় শাস্ত্রকার যে সকল রোগ নিবারণের কথা বলিয়া গিয়াছেন, দাদার রোগ তো সে ধরণের হয় নাই। দাদার রোগ হইয়াছিল পক্ষাঘাত, কিন্তু গুড়ুচাদি তৈলের গুণ-পরিচয়ে জানিতে পারা যায়, ইহাতে সাধারণতঃ বাতরক্ত নষ্ট করিবার শক্তিই সঞ্চারিত। তবে “হনুস্তম্ভ” নামক বাতব্যাধিও ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পক্ষাঘাত বলিলে তো শুধু হনুস্তম্ভই বুঝায় না। এজ্ঞা ইহার প্রভাবে এত বড় একটা রোগ কেন্দ্র করিয়া সারিয়া গেল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

একজন বিজ্ঞ কবিরাজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—“বায়ু—পিত্তযুক্ত হইয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপাদন করে,—এরূপ অবস্থায় গুল্ফে ‘বে পিত্তনাশিনী’ শক্তি যথেষ্ট রূপে বর্তমান, তাহা হইতে তো শুভ ফলেরই আশা করা যায়। তাহার উপর তৈল মাত্রাই বাতনাশক, বিশেষতঃ তিল

তৈলের বাতনাশকতা শক্তি অধিক। তুষ্টি বায়ু দেহের অর্ধেক ভাগকে আক্রমণ ও তত্তাগস্থ শিরা ও স্নায়ু সকলকে বিশেষণ করিয়া সন্ধিবদ্ধ বিশেষ পূরক বাম বা দক্ষিণ একতর পক্ষকে বিনষ্ট করে, স্ততরাং সেই পক্ষ অকর্মণ্য ও বিচেতন প্রায় হইয়া থাকে। এই ব্যাধিরই নাম তো একান্ত রোগ বা পক্ষাঘাত। এরূপ অবস্থায় তৈলে সাধারণতঃ বায়ু নষ্ট করিবার শক্তি যথেষ্ট বর্তমান, তাহার উপর গুড়ুচির সংমিশ্রণে তুষ্টি বায়ু ও কুপিত পিত্ত উভাতে প্রশমিত হইয়াই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্যের শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ফলে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, গুড়ুচাদি তৈল আগ-র্ষেদে বাতরক্ত অধিকারোক্ত তৈল বলিয়া উল্লিখিত হইলেও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে উহাতে অনেক রোগই আরোগ্য হইয়া থাকে।”

আমি জ্ঞানবুদ্ধ-কবিরাজ মহাশয়ের এই যুক্তি শ্রবণে আশ্চর্য্য হইলাম এবং ত্রিকালদর্শী আয্যঋষিদিগের জ্ঞান-গভীর-গবেষণার ফল সম্ভূত এই সকল-মহোষধ আবিষ্কারের জন্ত উহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম।

## চ্যবন প্রাশের পুরাতত্ত্ব।

—:—

এখনকার বিজ্ঞাপন মাহাত্ম্যে এবং জ্ঞানতত্ত্বের কৃপায় যে “চ্যবন প্রাশ” ভারতবাসী মাত্রেয়ই পরিচিত, যাহাদের পাঠকসংখ্যাই

তাহার একটি পুরাতত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যাহাদের জ্ঞান-গভীর-গবেষণার ফল সম্ভূত এই সকল-মহোষধ আবিষ্কারের জন্ত উহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম।



পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ‘সুকন্যা’ নামী তাঁহার এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সেকালে রাজকুমারীদিগের বিবাহ একটু বেশী বয়সেই হইত, সেইজন্ত ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করিলে তখনও সুকন্তার অনুঢ়াকাল উত্তীর্ণ হয় নাই।

রাজা শর্যাতি অনুঢ়া ষোড়শী কন্যাকে দ্বন্দ্ব লইয়া একদা যুগয়ার গমন করিয়াছিলেন। এক নিবিড় অরণ্যাগার মধ্যে রাজা যখন যুগয়ার বাস্ত, সেই সময় সুকন্তা দেখিলেন, বন-বিস্তার একতম দেশে একটি বন্দীকাচ্ছাদিত স্থানে মধ্যে দুইটি তিমির পটলাবৃত নেত্র তারা শোভা পাইতেছে। রাজকুমারী এই অদৃতপূর্ণ দৃশ্য সন্দর্শনে কোতুলপরবশা হইয়া ঐ নেত্র তারা দুইটির মধ্যে একটি কাষ্ঠ শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

মহানু ‘চ্যবন’ যোগ সমাহিত হইয়া বরকাল অতিক্রম করায় একরূপ মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বন্দীক কর্তৃক তাঁহার সমস্ত দেহ সমাজের হইয়া পড়িয়াছিল এবং কেবল চক্ষু দুইটি মাত্র বর্হিপ্রদেশে প্রকাশ পাইতেছিল। সুকন্তা তাহাতেই শলাকা বিদ্ধ করিলেন, ফলে “চ্যবন”র ধ্যান ভগ্ন হইল এবং উগ্রতপা ঋষি সুকন্তাকে অভিসম্পাত প্রদানে উগ্রত হইলেন। রাজা এই ঘটনা অবগত হইয়া ভগ্নবিহ্বলচিত্তে ঋষির ক্রোধ শাস্তির অন্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ঋষির ক্রোধ প্রশমিত হইল না।

সেকালে কন্যাদান একটি প্রধান দান বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখনকার মত সেকালে কন্যাদানকালে পণ-পীড়ণে কাহাকেও খণগ্রস্ত হইয়া চিন্তাসর্বস্ব হইতে হইত না। কন্যাদান প্রাপ্তি ঘটিলে গৃহীতা ধন্যমান হইত।

রাজা শর্যাতি ঋষি-ক্রোধ-প্রশমনের যখন কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলেন না, তখন সুকন্তাকে চ্যবনের হাতে সম্প্রদান করিয়া তাঁহার কোপানল হইতে কন্যাকে নিরাপদ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজা দান করিলেন, চ্যবন গ্রহণ করিলেন। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র মণ্ডলী সাক্ষী হইলেন, পবন উল্লসিত হইয়া সে বারতা সমগ্র রাজ্যে জানাইয়া দিল, পুলকে বিহগকূল কাকলীর তানে দিগন্তে ছুটাইয়া মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। এমনই ভাবে অনীতপির বৃদ্ধ চ্যবনের গলায় এক ষোড়শী অলোকসামান্য সুন্দরী রাজকন্যা বরমাল্য প্রদান করিলেন। রাজা কন্যাকে বনে রাখিয়া নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

রাজকন্যা বৃদ্ধ স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্ত সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চ্যবন ঋষি হইয়াও আব্যুর গার্হস্থ ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এমনই করিয়া উভয়ের দিন কাটিতে লাগিল, সুকন্তা অলৌকসামান্য সুন্দরী ছিলেন। পূর্ণ যৌবনে সে সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিল। স্বর্গ-বৈভব অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই রূপরাশি সন্দর্শনে সুকন্তার সৌন্দর্য্য স্মৃতি পানের জন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

একদা তাঁহার সুকন্তাকে একাকী পাইয়া মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। অসহায় দুর্কলা রমণী সেই কুপ্রসঙ্গ উত্থাপনে শিহরিয়া উঠিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাদিগের সামর্থ্য প্রকাশের প্রয়াস পাইলেন, সুকন্তা ভীতি কম্পিতা হইয়া পিতৃসম্বোধনে তাঁহাদের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। ফলে সুকন্তার স্তব স্তুতিতে স্বর্গবৈভবের দ্বন্দ্বের কল্যাণ সঞ্চার হইল। তাঁহার চিন্তাসংঘে সমর্থ

হইলেন এবং স্নকতাকে মাতৃ সোধোদনে অভয় দান পূর্বক ‘বর’ গ্রহণের অমুমতি প্রদান করিলেন।

স্নকতা জানিতেন, পতিই তাঁহার জীবনের সর্বস্ব, স্মৃতরাং পতির জীবন স্বাস্থ্যবান দেখিলেই তিনি সর্ব স্বখী হইবেন। তাই স্বর্গ বৈষ্ণবকে বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহার স্বামী অশীতি বর্ষ বয়স্ক ঋষি চাবনকে নব যৌবন প্রদানের ব্যবস্থা করুন। স্নকতা ইহা ভিন্ন অত্ৰ বর ‘আমনা’ করেন না।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, তাহাই হইবে, এই বলিয়া “আমলকী রসায়ন” প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া স্নকতাকে নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে বলিয়া শুদ্ধিভাবে সেই “আমলকী রসায়ন” চাবনকে সেবন করাইতে অমুজ্ঞা করিলেন। সেই ব্যবস্থায় অশীতি বৎসর বয়স্ক মুনিপুঙ্গব চাবন নব যৌবনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় হইতে এই “আমলকী রসায়ন”র নাম করণ হইল “চাবনপ্রাশ” এবং সেই চাবন প্রাশই চর্কল ইন্দ্রিয় সবল করিতে, নিস্তেজ ইন্দ্রিয় কার্যক্ষম করিতে, শরীরের সর্বপ্রকার চর্কলতা নষ্ট করিয়া পুষ্টি লাভ করিতে অল্পত ক্ষমতা সম্পন্ন মহৌষধ বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

‘চাবন প্রাশ’র পুরাবৃত্ত বলা হইল। এই বার এই চাবনপ্রাশের ফলাফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

শাস্ত্রকারগণ এষ্ট ঔষধের ফলশ্রুতি উপলক্ষে ইহাকে প্রথমেই ‘রসায়ন’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহার পর নানারূপ গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্য

বিষয় না বলিয়া কেবল মাত্র ইহাকে শ্রেষ্ঠ রসায়ন বলিলেও ইহাকে নানাবিধ গুণ সম্পন্ন মহৌষধ স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ শাস্ত্রবেত্তারা ইহা বলিয়া গিয়াছেন, রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে—

“দীর্ঘমায়ু স্মৃতিং মেধামারোগাং তপৎ বয়ঃ।

দেহেন্দ্রিয় বলং কাস্তি নর বিবেকদায়কং ॥”

অর্থাৎ রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়, স্মৃতি ও মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয়, আরোগ্য তাহার নিত্য সহচর হয়, তাহাকে তরুণ বয়স্ক পুরুষ বলিয়া অমুমিত হয় এবং তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, বল এবং কাস্তি যথেষ্ট রূপে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একরূপ অবস্থায় ‘চাবন প্রাশ’ সেবনে মানব যে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে তাহা অনিশ্চয়।

কিন্তু আমরা অনেকের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি বহুকাল এই শাস্ত্রীয় ‘চাবন প্রাশ’কে মহৌষধ জ্ঞানে সেবন করিয়াছিলেন, তৎপরে বিষয় কোনো কণাই প্রাপ্ত হন নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—সেই স্বর্গ বৈষ্ণব অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের কল্পিত “চাবন প্রাশ” সস্তার প্রলোভনে অধুনা বিব্রত আকার ধারণ করিয়াছে। এখনকার দিনে বিজ্ঞাপনের বাজারে চারি টাকা, তিন টাকা—এমন কি আড়াই টাকা মূল্যেও ইহা বিক্রীত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহারা চাবন প্রাশ সেবনে কোনো ফল নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা ঐ শ্রেণীর সস্তার “চাবন প্রাশের”ই খরিদদার। সস্তার দ্রব্য বস্তুর প্রসিদ্ধি চিরদিনই চলিয়া বাইতেছে। স্বর্গ বৈষ্ণবের আবিষ্কৃত “চাবন প্রাশ”ও সেইরূপ আজি ব্যর্থগুণসম্পন্ন।

আমরা এই প্রসঙ্গে “চাবন প্রাশ”

উপাদানগুলির উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ সেই সমস্ত উপাদানে সমস্ত প্রস্তুত “চ্যবন প্রাশ” অতি সস্তায় কেমন করিয়া বিক্রয় করা সম্ভব—সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বেল ছাল, গনিয়ারি ছাল, শোনা ছাল, গাছাদি ছাল, পাকুল ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহত্তী, কণ্টকারী, গোক্ষুব, মুগাবী, মাধণ, পিপুল, কাঁকড়াশুঙ্গী, ভুঁই আমলা, দিগমিস, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুণধ, ঞ্জি, জীবক, ঞ্জভক, শঠা, মুখা, পুনর্বা, মেদ, ছোট এলাইচ, রক্ত চন্দন, নীনাংপল, ভূমি কুয়াণ্ড, বাসকের মূল, কাকোনা, কাকনাসা—এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকটি ১ পল অর্থাৎ ৮ তোলা করিয়া লভবে। সমুদয় দ্রব্য একমণ চব্বিশসের জমে সিদ্ধ হইবে। আমলকী ৫০০ শত গাইবে। ঔষধের রস জলের সহিত উত্তম-রূপে মিশিয়া গেলে আমলকীগুলি তুলিয়া আট ফেলিয়া দিবে। পরে সেই আমলকী দ্বাদশ পল পরিমিত হৃত ও তিল তৈলে ভাজিয়া সেই পাত্রে পূর্বোক্ত বেল ছাল প্রভৃতির কাথ একত্র করিয়া ছয়সের মিছুরির সহিত পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া শীতল করিয়া তাহাতে ৬ পল মধু, চারি পল বংশ গোচন, পিপুলের গুঁড়া ২ পল এবং দারু-চিনি, ছোট এলাইচ, তেজপাতা ও নাগকেশর—ইহাদিগের গুঁড়া এক পল করিয়া নিক্ষেপ করিবে।

যাহারা সস্তায় ‘চ্যবন প্রাশ’ বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের যুক্তি এই ঔষধ প্রস্তুতে সামান্য ব্যয় হইয়া থাকে। তাহারা সেই হিসাবে প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্যের খতিয়ানও দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রকার ঔষধ

প্রস্তুত বিবয়ে দ্রব্যের উপাদান সংগ্রহে বলিয়া গিয়াছেন,—

প্রশস্ত দেশে সঞ্চুতং প্রশস্তেহনি চৌদ্ধতম্।

অন্নোন্নতঃ মহাবীৰ্য্য গন্ধবর্ণ রসায়িতম্॥

ঔদ্ভিদভঃ পরিষ্কৃতঃ শুদ্ধঃ ধাতাদিকঃ তথা।

সর্দীক্ষা কালে দত্তঞ্চ ভেবজং পরমং মতম্॥

অর্থাৎ প্রশস্ত দেশে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, অন্ন পরিমিত, মহাবীৰ্য্য সম্পন্ন এবং গন্ধবর্ণ ও রস বিশিষ্ট অর্থাৎ কীটাদি কণ্টক অক্ষুণ্ণ উদ্ভিজ্জ এবং শোধিত ধাতুপ্ৰভৃতি যথা সময়ে প্রয়োগ করিলে তাহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যায়।

এ অবস্থায় প্রশস্ত দেশ হইতে প্রশস্ত ভেষজ দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া যদি বিদগ্ধ চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে কেমন করিয়া অতি সস্তায় ইহা বিক্রয় করা যাইতে পারে—তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। যাহারা মাটির দমে ইহা বিক্রয় করিবার জন্ত বিজ্ঞাপন-সাহায্যে ঢাকা নিনাদে কর্ণপটাহ বালাপালা করিয়া তুলিতেছেন,—প্রশস্ত দিনে প্রশস্ত স্থান হইতে উপাদান সকল সংগ্রহ করিবার জন্ত তো তাঁহাদের প্রয়োজন হয় না, ‘চ্যবন প্রাশ’ সেবনের উপযুক্ত কাল কিনা, তাহাও তাঁহাদিগের বিচার করিবার বড় দরকার হয় না, বিক্রয় করিয়া অর্থাগমের বাবস্থা করিলেই তাঁহাদের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন হইল।

ইহার উপর ‘চ্যবন প্রাশ’ের প্রধান উপাদান সকল সময়ে স্থলভ নহে। কার্তিকের প্রারম্ভ হইতে বৈশাখের প্রথম ভাগ পর্যন্ত আমলকী পাওয়া যায়। এ অবস্থায় যাহারা অতি সস্তায় ‘চ্যবন প্রাশ’ বিক্রয় করিয়া থাকেন এবং বার মাস সন্ধান ভাবে প্রচুর পরিমাণে

বিক্রয় করিয়াও যাহারা খরিদদার ফেরান না, তাঁহারা যে অনেক সময় শুদ্ধ আমলকীর গুড়ার সাহায্যে ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন না—তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যাইবে! একে চাবনপ্রাশের কয়েকটি দ্রব্য বহু আয়াস করিয়াও অধুনা কোনো চিকিৎসকই সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাহার উপরও যদি ইহাকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে সে চাবন প্রাশ সফল প্রদ হইবে কোথা হইতে?

চাবন প্রাশে ঘৃত ও তিল তৈল প্রয়োগ করিতে হয়। ঘৃত শীত গব্য দ্বারা প্রস্তুত হইবে, কিন্তু সেই গব্যদ্বারা এখনকার দিনে কিরূপ ভুল হইয়াছে, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তিল তৈলের দরও আগের মত সুলভ নহে। এ অবস্থায় যাহারা কেবল ঔষধ বিক্রয় নামে অভি

হিত নহেন, যাহারা প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে সস্তার চাবন প্রাশ বিক্রয়াদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যে ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহাই কি হিক নহে? চাবন প্রাশের গুণ ও বীৰ্য্য একবৎসর পরেই নষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা প্রকৃত চিকিৎসা ব্যবসায়ী, তাঁহারা একবৎসর উত্তীর্ণ হইলেই বীৰ্য্যহীন ‘চাবন প্রাশ’ ক্ষেদিয়া দিয়া থাকেন। এজন্যও ইহা অল্প মূল্যে বিক্রীত হওয়া কখনই সম্ভব পর নহেন।

বিজাতা “কডলিভার অয়েল” অপেক্ষা আর্য চিকিৎসার গোঁরবের ঔষধ ‘চাবন প্রাশ’ যে অধিক কাৰ্য্যকারী—এ কথা এখনকার দিনে অনেক বড় বড় ডাক্তারেরাও স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু সস্তার আড়ম্বরে সেই প্রত্যক্ষ ফল প্রদ ঔষধের গুণ অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়াই এত কথা বলিলাম।

## রস বিজ্ঞান।

### ভূমিকা।

( ভারতে তাত্ত্বিক যুগ, পারদের আবিষ্কার )

—:—:—

( কবিরাজ শ্রী ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ )

সে অনেক দিনের কথা।

মহা ভারতের মহাবুদ্ধ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে; “নারী পক্ষের” অশ্রু ধারায় দিল্লী হইয়া, বীর বৃন্দের চিতাচুল্লী—দীপাধিতার আলোক মালার মত, নিশ্চেষ্টে নির্দোষ লাভ করিয়াছে!

বিপ্লবের আতঙ্কিত শূন্যতা, ক্ষত্রিয় বীর আর অগ্রসর হয় না। আর্য-সমাজ বিশৃঙ্খল। বর্ণ-দৃষ্টা বীর-ধাত্রী ভাঙত ভূমি—বহু শতাব্দী ধরিয়া মুক্তবৎ নিশ্চেষ্ট। বর্ণের শুদ্ধ ব্রাহ্মণের মোহময়ী বিশ্বাস। বজ্রক্ষেত্র—বৃদ্ধক্ষেত্র পরিণত। ছিন্নকণ্ঠ অসহায় পক্ষের পক্ষের

আত্মনাদে, ভুলোক ছালোক গোলক পর্যন্ত বিচলিত। হিংসাময়ী ধরণীর রক্তসিক্ত ধূমিকণাব উপর পরম পূজ্য বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। জাতি বিচারের তিরোধান।

তাহার পর, মানবের ক্ষুদ্র অহমিকা দেবদেব পদপূরি করিয়া, “এসিয়ার আলোক”—সাধক সিদ্ধার্থের মহা নির্দোষ। সমাজ আবার উচ্ছৃঙ্খল! বোপিসম্ব—তাহার মহাসাধনার শীল-ধর্ম হইতে “ঈশ্বরকে” নিরাকৃত করিয়া ছিলেন,—প্রেম-প্রতিমা রমণীকে মুক্তি-পথের জয়দ্বার ভাবিয়াছিলেন;—এইবার সেই সুদার-কণ কণোবতার ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বেদ-পন্থার চিব বিরোধী—উদার মনো “সত্য” ধীরে ধীরে বিকৃত হইয়া পড়িল। রাজা মন্দির হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া মন্দির পদক্ষেপে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। যশ রাজোপদ্রবী, অলঙ্কৃত রাগ-রঞ্জিত বামচরণের পেলদাপর্শে—রক্তাশোক বীথির প্রাণ সঞ্চার করিল। “প্রমোদ বনে” পুষ্প শব্দা বিছাইয়া, অগ্নি বিজয়ীকে ক্ষিপ্ত আনন্দে বাধিয়া ফেলিলেন। ঘরে ঘরে “মদনোৎসব” কুসুমায়ু-ধের পূজা চলিতে লাগিল। বার-বনিতা বধূ’ সম্মান পাইয়া মুখে অবশুষ্ঠন টানিয়া, শুদ্ধান্তের শোভা বর্ধন করিল। বাকলী ও তরুণীর সেবার—সংযমা শ্রমণ উন্নত হইয়া উঠিল।

এরূপে, উদার-ইঞ্জিরের মরুময়ী বুভুক্ষায়—দেশ যখন মরীচিকার নিষ্ঠুর ছলনায় বিড়-বিড়, তখন আবার নূতন অন্ধের পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। কুমারিল, অলঙ্ক, শঙ্কর, যামুন, —মহোদনীলমার মাঝে ভাস্বর শুকতারার মত একে একে ফুটয়া উঠিলেন। মহেশ্বরের মহা-শয়ানে, মহেশ্বরের আশীষভোলিত কল্যাণ-কর হইতে, দিগন্ত বাপী জড়ের অঙ্গে প্রাণ

স্পন্দন করিয়া পড়িল। নূতনত্বের গুলক-বাকুলতা বক্ষে লইয়া, হোম হবি সুরভি ব্রাহ্মণ্য—ঋত-তন্ত্রায় জাগিয়া উঠিয়া বজ্রকণ্ঠে ওদ্যাব উচ্চারণ করিলেন! বহু বৌদ্ধিচ্ছ অঙ্গে ধাবণ করিয়া, কামিনী কাঞ্চন কাদম্বরীর বিজয় ঘোষণাব জন্ত—জিহ্বাংসানয়ী তান্ত্রিকতা—অতিশয় শাস্ত তপোবনে আপনার আসন পাতিয়া লইল।

বিজেতা ব্রাহ্মণ্য ক্ষমাশীল ছিলেন না। প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে—তিনি সঠ ভাঙ্গিলেন, চৈত্যা ভস্মীভূত করিলেন; বুদ্ধ ও গোপার সমাস-মুষ্টি—“শিব জুগায়” রূপান্তরিত হইল। “নার” এর সহোদর গোষ্ঠী—প্রেত পিশাচের আকার ধারণ করিল। পঞ্চ ‘ম’ কারের প্রবল তাড়নায়—সত্যভট্ট “সংঘ” নির্দোষের পথ দেখিল! বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশ—“যদি প্রকৃ-তির হাত এড়াইতে চাও—তবে রমণী পরিত্যাগ কর”। তত্ত্ব বলিলেন—“জীবনের দুইটি কেন্দ্র—একটি পুরুষ, অপরটি প্রকৃতি, একটি উদাসীন—অন্যটি প্রবর্তক। পুরুষ চিদাধার—স্ত্রী বিশ্ব প্রকৃতি; অতএব রমণীকে জননীত্ব পরিণত কর; তোমার প্রাকৃতিক পিপাসা মিটিয়া যাইবে।” নির্দোষের দার্শনিকতা ও জড়ো-পসনার চেয়ে এ যুক্তি—অনেকেরই ভোগাবলি জীবনে সার্থক বলিয়া মনে হইল। নাগভট্ট প্রমুখ প্রবুদ্ধাচার্যের দল—কিছুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, অবশেষে—উদয়ন রামাহুজের অলম্ব প্রতিভার প্রভাব হত সর্বশেষ ও পরাজিত হইয়া ঈজ্ঞা-কুণ্ঠিত মুখে গোপন অপরাধের তত্ত্ববাস ফেলিলেন। রক্ষকের অভাবে—বীচি-বিক্ষোভ-চঞ্চল সিদ্ধগর্ভে—প্রাণহীন, বায়ু-হীন, আলোক হীন, অতলে, ক্ষীণপুণ্য-বৌদ্ধ দর্শন চিরদিনের জন্ত সমাহিত হইল।

এইবার তাত্ত্বিক মঠে জড়াত্মিক বিজ্ঞানের পূর্ণ অনুসন্ধান চলিল। রসায়ন-তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কারে—“রক্ত বামলের এক একটা অখ্যায় হিরণ্ময় হইয়া উঠিল। কল-মুখরা কেদার বাহিনী তাড়ি—রক্তাধর পরিহিত, ভঙ্গ-পূনর তাত্ত্বিক, তিমির কুটীলা রজনীর গাঢ় অন্ধকারে—প্রকৃতির আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। স্তব্ধ ধানের আসন্ সন্মুখে—জলন্ত কুণ্ডে “বজ্র মুখা” স্থাপিত হইল। অপরাধ্মুখ অনুসন্ধানে তাত্ত্বিক নারী রহস্যের মন্ম ব্যুৎপন্নেন। পুরুষ অল্প প্রাণমিতা, নারী—বশবত্তিনী শক্তি, পুরুষ সম্মান—নারী সজল কারিণী :—পিতৃ অংশে পুরুষ কেবল জীবনের উন্মেষক, নারী কিন্তু সে জীবনের সঞ্চয়িকা, জীব নারী হইতে জন্মগ্রহণ করে, নারী লইয়া সংসারী হয়, নারী সংসারে—মৃত্যু কারিণীয়া মাটিতে নিশিরা যায়। পুরুষ ও নারী—এই উভয় কেন্দ্রের দৈনন্দিন কার্য—শারীরিক দাতু সর্বদাই ক্ষয় ও পরিবর্তন লীল। সেই দাতু ক্ষয় নিবারণের অমোঘ উপায়—রসাদি দাতুর রহস্য নির্ণয়। নৈশ সাধনার ফলে তাত্ত্বিক সপ্তদাতুর বীচ্য পরীক্ষা করিলেন। ভারতে রস-চিকিৎসা প্রবর্তিত হইল। বিজ্ঞানের ভীম-কান্ত প্রভাব, ক্ষুরকান বিচ্যন্ত রসের মত নরপোকেব লোম-হর্ষ উৎপাদন করিল। “হৃৎক্লারের বায়ো কেমিকেল রেমিডি” ভূমিষ্ঠ হইবার বছরুগ পূর্বে—ভারতে বর্বাদি দাতুর স্বপ্না বিবেচন আরম্ভ হইল। বিজ্ঞান ও লক্ষ্যজ্ঞান এক হইয়া গেল। পারদের জ্যোতির্ষ্ময় সৃষ্টি-পানে, সাধন-হুম্ম ভ দিব্য দৃষ্টিতে চাহিয়া, নজ্জ্বল তাত্ত্বিক বিশ্ব দেবতাকে প্রণাম করিবেন :—

“দরা পোইল্লি মরুখ্যোম মথেন্দ্রক মূর্ত্তীম।

সর্পা ভূতান্তরহায় পারদায় নমো নমঃ

পারদ ও তন্ত্রের ইহাই অতি-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তন্ত্র পারদকে জগৎস্রষ্টার স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়াছেন—ইহার পূর্বে পারদকে এত বড় করিয়া আর কোন জীবন্ত বিজ্ঞান ভাবিতে পার নাই। তন্ত্রের মহোজ্জ্বল মহি-মায়—রমণী বা প্রকৃতির ভিতর দিয়া, মাজ আমরা “রস-বিজ্ঞান” বুঝিবার চেষ্টা করিব।

“পারদ”—বর্তমান আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সর্ব-প্রধান উপকরণ। সংস্কৃত অভিধানে ইহার অনেকগুলি পর্যায় আছে। তন্মধ্যে—সূত “চপল” “রস” “হরবীৰ্য্য”—এই নামগুলিই রস-গ্রন্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক “হরবীৰ্য্য”। পারদের সার্বক সংজ্ঞা। যিনি পারদ-রহস্য বুঝিতে পারেন, সৃষ্টি ও বিনাশের প্রাহেলিকা কখনও তাঁহার কাছে ছুর্বোধ্য হইতে পারে না।

একদিকে ছাতি রাত বিজুতি, অগ্ন দিকে নৃত্তি তাম্রসা সংকতি—ইহাই পারদের ক্রিয়া। তাই পারদ “হরবীৰ্য্য”;—হর তমোগুণ, সং-হার মূর্ত্ত্য—বৈশ্লেষিক পাক (Destructive metabolism)—অতএব পারদ এক রকম মরণেরই স্তব্ধ কীটাপু। পারদের অবৈধ প্রয়োগে বা আয়ুর্ষিক শক্তির (Pathogenic property) প্রভাবে—জীব দেহস্থ দাতু উপাদান ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে হর—আদি পুরুষ, জগৎ-পিতা; মূল প্রকৃতির দামী। পারদ তাঁহার বীৰ্য্য—সুতরাং জীবনের উন্মেষক, জীবনী শক্তির নিত্যস্ত সাধ্য।

পার্কর্তী—মূল প্রকৃতি—শারীর ক্ষেত্রে বৃংহনী শক্তি (Constructive metabolism) পিতৃ অংশে প্রাণ, মাতৃ অংশে দেহ। পিতৃ অংশ বৈশ্লেষিক, মাতৃ অংশ সন্তোষক। পিতৃ অংশ প্রণয়কারী, মাতৃ অংশ সন্তোষকারী।

—“হরিতালের” নাম পার্কভীর তেজ। অবৈধ পারদ যখন শরীর ধ্বংস করে, হরিতালে তাহা পুনর্গঠিত হইতে পারে। পারদ মৃত্যু শুক্র—ধ্বংসকারী,—একথা যদি সত্য হয়, তবে আবার সেই পারদকে জীবনের বা জৈবী-শক্তির প্রধান সহায় বল কেন? তবুই এ রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তন্ত্র বলিয়াছেন,—জীবন, মরণের সহায়; মরণ জীবনের সৃষ্টি কর্তা। “দুইটা মীমান্ত মরণের ব্যবধানের নাম “জীবন”। এই ব্যবধান দিয়াই মৃত্যু জন্ম। “জীবনের” আর একটা অর্থ চিন্তন; “জীবন”—অনুভূতি রূপে অনাস্বাদিত বিষয়ের আশ্বাদনে প্রমত্ত, তাই ‘জীবন’ এক হইতে বহুতে বিসর্পিত হইবার ইচ্ছা করে। আপনাকে নিত্য নূতন ভাবে সৃষ্টি করিয়া, সেই সৃষ্টির নবীনতায় আত্মাকে বিলাইয়া দিবার চেষ্টা ‘জীবনের প্রথম কার্য্য।’” পর্যাণ্ত পরিমাণে ভূয়োদর্শন লাভ করিতে করিতে “জীবনের” বেগ-মহুর হইয়া পড়ে। যিনি তত্ত্বদর্শী—তিনি অনায়াসেই বুঝেন ব্যাপ্তি জীবন জাতিতে পরিণত হইয়া থাকে। যে জাতি ‘জীবন’ কি জানেনা, সে জাতি সর্বদাই জরা-মরণ ভয়ে ভীত ও চকিত। অতএব তন্ত্রের উপদেশ—জীবনকে অক্ষুর ও অপচিত রাখিতে হইবে। এ সকল কথা—রস বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কার “মকরধ্বজের ব্যাখ্যায় পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিব। আমরা ‘আয়ুর্কোদের উপাসক—“আয়ুর্কোদ” আনাদের “জীবন মরণের “বর্ষ পরিচয়”। ইহার প্রণেতা—সর্ব জীবের প্রণম্য স্বয়ং—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা-সাগর। আয়ুর্কোদের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ—“তন্ত্র।” যিনি প্রকৃত “বৈজ্ঞ” তিনি মনে জানেন “ভাবিক” না

হইয়া থাকিতে পারেন না। বৈজ্ঞ, বিধাতার মতই সৃষ্টি-কুশলী। বৈজ্ঞের কর্মক্ষেত্র—এক বিরাট পুরুষকারের দৃশ্য! পারদের আময়িক প্রয়োগ কালে, কথা শুলা কাজে লাগিবে বলিয়াই, প্রবন্ধের অবতরণিকায় ইহা বলিয়া রাখিলাম। উপেক্ষিত অবমানিত অতীতকে আমি যে রাজাধিরাজের মণি মুকুটে নাজাইতে গাইতেছি—হইতে পারে ইহা আমার খুঁটতা। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন—চতুর ভক্তের মত, “হাটের কলায়” নৈবেদ্যের কলনা না করিয়া, আমি কেবল বৈকুণ্ঠনাথকেই তুষ্ট করিতে অগ্রসর! আমি ক্ষুদ্র, স্তম্ভরাং আজ আমি যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাহার উপলব্ধি করিবার পক্ষে—আমার এই ক্ষুদ্রতাই মহৎ অন্তরায়। যে স্বাধি পারদের গুণ প্রথমেই পরিকল্পনা করিয়া ছিলেন—তাহার পবিত্র পদ ধূলি আমার কর্তব্য-পথের অমূল্য পাথের হউক। তিনি আশীর্বাদ করুন—পারদ তত্ত্ব প্রকাশ করিতে বৃসিয়া—মূহুর্তের প্রমাদে আমি যেন প্রভাতনের ও পবিত্রের অবমাননা না করি।

এইবার দেখা যাউক, প্রদেশে ঔষধ-রূপে পারদের প্রয়োগ কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে? আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র তদীয় হিন্দু রসায়নে এ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা করিয়াছেন। আমি তাহার অজীর্ণোদগার করিয়া—এ দীন প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিব না। আমি কেবল নিজের কথাই বলিব।

বর্তমানে, “সুশ্রুত সংহিতা”—আয়ুর্কোদের অত্যন্ত প্রতিনিধি। এই সুশ্রুত সংহিতার ছই চারি স্থলে পারদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পারদ যে সর্ব

ব্যাধি নিবারক মহৌষধ—সুশ্রুতের যুগে ইহা প্রচারিত হয় নাই।

সুশ্রুতের পর বাগভটের যুগ। বাগভটের সময়েও পারদ ঔষধের প্রধান উপকরণরূপে—গৃহীত হয় নাই। অষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক গ্রন্থে পারদ অর্থে রস শব্দের ব্যবহার থাকিলেও, একটা ভিন্ন রসের কোন রাসায়নিক প্রকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অষ্টাঙ্গ হৃদয়—বৌদ্ধ যুগের সংহিতা। বৌদ্ধ বৈজ্ঞানিক—রস অর্থে রক্তের পূর্বভাব বুঝিতেন। “রসক্রিয়া” তখন ঘনীভূত উদ্ভিদ রসকেই বুঝাইত।

বৌদ্ধ যুগের পর পৌরাণিক যুগ। পৌরাণিক যুগের ইতিহাস—বৌদ্ধনত খণ্ডন করিয়া ভারতে বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। বেদের “পরমাশ্রা” বৌদ্ধের হাতে পড়িয়া “আদিবুদ্ধ” হন। “প্রজাপতি সৃষ্টির উপাখ্যানগুলিও বৌদ্ধদের অপার মহিমায়—“বুদ্ধ” “দম্ব” ও “সত্য” এই ত্রিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়। পুরাণকারগণ ইহার প্রতিশোধ লইতে ভুলেন নাই। বৌদ্ধ জাতকের—ত্রিমূর্তি, সৃষ্টি কর্তা, পালন কর্তা এবং সংহার কর্তা সৃষ্টিয়া—পুরণে “ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর” নামে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। এই রাসায়নিক সংযোগ পাছে নূতন বলিয়া জনমানবের পরিবর্তে অনাদর লাভ করে,—সেই ভুল শাস্ত্রকার—নূতন গ্রন্থকে “পুরাণ” আখ্যা প্রদান করেন। “পুরাণ”—পুরাতন শব্দেরই অপভ্রংশ। এহেন পুরাণের যুগেও পারদের ভাগ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে নাই। “অগ্নি পুরাণে” বা “গুরুত পুরাণে”—যে সকল চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে, তাহাতে পারদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না।

সংগ্রহকার, যুগের মধ্যে—চক্রপাণি

একজন অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। মানব দেহের মারাপুরীতে প্রবেশ করিয়া,—অমৃতত্ব-সম্পাদনে একদা তিনি অমৃতভয় হইয়াছিলেন। মহাশ্রা চক্রপাণিই—প্রথম পারদ ব্যবহার করেন। এ কথা প্রত্নতাত্ত্বিকের কথা। চক্রপাণি পিতা “নারায়ণ” গৌড়ধিপতি নয়নপাল দেবের “মহানস রক্ষী” ছিলেন। স্মরণ্য ১০৫০ খৃষ্টাব্দকে—তাহার প্রাদুর্ভাব কাল বলিয়া ধরা যায়। অবশ্য ইহা অনুমানবই কথা। অমৃতমানে—ভ্রান্তি থাকারও বিচিত্র নহে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা—বিচিত্র এই—অনেক ঐতিহাসিক পারদের প্রয়োগ দেখিয়াই তন্ত্রের বয়স ঠিক করিয়া কেহিয়াছেন, ইহাদের মতে—যখন নাগার্জুন প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুত সংহিতায় রস প্রয়োগের আড়ম্বর নাই, বৌদ্ধ বাগভটের গ্রন্থেও পারদের উল্লেখ নাই;—তখন বৌদ্ধ যুগের বৈদ্যাগণ পারদ প্রয়োগের কৌশল জানিতেন না। পারদের ব্যবহার কেবল তন্মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়—চক্রপাণি দত্তের পরেই এদেশে তন্ত্রের সৃষ্টি।

এ শুষ্ক গম্ভীর গবেষণাময়ী বিলাতী যুক্তি কিন্তু বাত-সহ নহে। আমরা—চক্রপাণির পূর্ববর্তী বুদ্ধ সংহিতায় পারদের উল্লেখ দেখিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস বৌদ্ধযুগের বহু পূর্বে—ভারতে তাত্ত্বিকতা বর্তমান ছিল। অথর্বের উপচারই একদিন তাত্ত্বিকতার জন্মদান করিয়া ছিল। অথর্ব বেদকে পরন্তন ঋষিরা বড় একটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। কাজেই অথর্ববেদের সহোদর তন্ত্রকেও তাঁহারা, কখনও সম্মান করিতেন না। তাত্ত্বিকতার প্রতিবেশ প্রত্যাহাই আশ্চর্যের অধঃপতন ঘটাইয়াছিল। তখন



ও তথ্য এবং তত্ত্বোক্ত মন্তব্য—একেবারে  
নিকটীন হইয়া পড়ে নাই। বৌদ্ধধর্মকে  
দুঃসংসার হতগৌরব করিয়া বিজয়া তন্ত্র  
সংগোপনে দণ্ডায়মান হইলে, বৌদ্ধ দার্শনিক  
গণ সে আততায়িতা ভুলিতে পারেন নাই।  
তাহারা তন্ত্র ও তান্ত্রিক ঔষধকে অত্যন্ত ঘৃণা  
করিতেন। জগতে—অসাম্প্রদায়িক ভাবে  
বুদ্ধজনের সত্যের আদর করিতে পারে?  
বুদ্যান যাজক গ্রীক দর্শন ও গ্রীক বিজ্ঞানকে  
প্রদলিত করিয়াছিলেন। মহামনসী গ্যালি  
লিওকেও নিদারুণ নিগ্রহ ভোগ করিতে  
হইয়াছিল। ইতিহাস ইহার জীবন্ত-সাক্ষী।  
আদল ঈশ্বরকে লইয়া কখনও বিরোধ  
উপস্থিত হয় না; বিবাদ কেবল তোমার  
“দিশা মূষা” আর আমার “ছুর্গা” “হরি”  
লইয়া। নাগার্জুন, বাগভট, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক  
—বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। চক্রপাণিও  
বৌদ্ধপালিত চিকিৎসক। পাছে—তান্ত্রিক  
ঔষধ বলিলে বৌদ্ধ প্রভু বিরক্ত হন, বৌদ্ধ  
মতাবলম্বী রোগিগণ—ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধা  
হার্য্য, বোধ হয় সেই ভয়েই যেন চরক-  
চতুরানন চতুর চক্রপাণি—“রস পপ্প’টি—  
আমারই প্রস্তুত বলিয়া জনসমাজে প্রচার  
করিয়াছিলেন! নতুবা, সাধামত—বৌদ্ধ বৈজ্ঞা-  
নিক তান্ত্রিক ঔষধকে স্বরচিত গ্রন্থে স্থানদান  
করিতে সম্মত হন নাই। চক্রপাণি—রস  
বিজ্ঞানের উজ্জল রত্ন—রসপপ্প’টিকে স্বগ্রন্থের  
অধ্যায় ভুক্ত করিয়াছেন,—অথচ এমন ভাব  
সেখাইয়াছেন—উহা যেন তান্ত্রিক যোগ নহে,  
যেন তাহারই মৌলিক উদ্ভাবনায়, স্বাধীন  
চিন্তায়, আর দুঃলভ সাধনায়—মহৌষধ রূপে  
উহা পরিকল্পিত হইয়াছে। “স্বপ্রস্তুত”—প্রতি  
সংস্কার কর্তা নাগার্জুন, অষ্টক ছন্দ-সকলসিঁতা

বাগভট যে কাজ করিতে ইতঃসুতঃ করিয়া-  
ছেন, দায়ে পড়িয়া চক্রপাণিকে সেই কার্য্যে  
হাত দিতে হইয়াছে। তাই “রস পপ্প’টি প্রস্তুত  
করিয়া, লোকলজ্জায় খাতারে তাঁহাকে  
বণিতে হইয়াছে—

“রস পপ্প’টিকা খাতা নিবদ্ধা চক্রপাণি না।”

বৈদিক যুগে “মধু বিজ্ঞা” নামে স্বতন্ত্র  
বিজ্ঞার অস্তিত্ব ছিল। দদীচি ঋষি দেবরাজের  
নিকট এই মহতী বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছিলেন।  
এই মধু বিজ্ঞাই অনেক “হাত ফের” হইয়া,  
বৃহদারণ্যকে “মধু-ব্রাহ্মণ” নামে পরিচিত  
হইয়াছিল। মদ খাতু হইতে যে “মধু” শব্দের  
উৎপত্তি, সে মধু আর “মদন” একই। রসজ্ঞ  
পাঠক পাচকড়ি দাদার “মদন তত্ত্ব” শীর্ষক  
দিব্যোচ্ছল উপদেশ প্রবন্ধে ইহার সুন্দর  
মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। বেশী কথা বলিবার  
আমার সময় ও শক্তি নাই। আমি কেবল  
ঋগ্বেদেই সেই মহামহত্ত্বা উদ্ধৃত করিব—

“কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ

প্রথমং বদাসীৎ।

ইহার অর্থ—জীবের পূর্ব্ব কল্প কৃত কর্ম্ম থাকায়  
ভগবানের মনে সৃষ্টির কামনা জাগ্রত হইয়া-  
ছিল। সৃষ্টি ও সংহারের পরস্পর অনন্ত;  
কল্লাস্তরের কর্ম্ম-শৃঙ্খলাও অনন্ত। অতএব  
ভগবানে কাম বা মদন চির বিরাজমান।  
সংহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলেই, স্রষ্টার মনে  
সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি কামনাও জাগিয়া উঠে।  
তখন ভোগের জন্ত ভগবান এক হইয়াও বহু  
হন। ভগবানের সৃষ্ট জীব আমরা—আমরাও  
শক্তি গ্রহণের কালে, বিবাহের সময়—“কামঃ  
কামায়াদাঙ্ক। কামেন য্ভাং প্রতি গৃহ্যামি  
কামৈতত্ত্বে।” বলিয়া ভাবী পত্নীকে আমন্ত্রণ  
করিয়া থাকি।

বিজ্ঞান বলেন—পূর্ণের ধর্ম অংশেও বর্তমান থাকে। পরমাণু যেমন এক হইয়াও বহু হইতে চাহেন, জীবাণুও তেমনি বহুতে বিস্তৃত হইবার ইচ্ছা করে। এই “একোহুং বহুভামঃ” কাননা—তাত্ত্বিকতার স্মৃতিকা গৃহ। “মদন” সৃষ্টিকর্তার নিত্য সহচর। জীবাণু পরমাণুর অংশ, সূত্রাং মদন যেমন পরমাণুর নিত্য সঙ্গী, তেমনি জীবাণুরও নিত্য সঙ্গী। তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে ইহার আভাষ দিয়াছেন। তত্ত্বের মতে শিব ও জীব এক। শিবের “মদন” সৃষ্টির বিকাশে ও বিস্তারে পরিস্ফুট; জীবের “মদন” দেহ বদ্ধ রিরংসায় পর্য্যবসিত। কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—বহুতে পরিণতি, অংশে অংশে বিস্তৃতি।

এই বহুতে পরিণতির জন্য যে আনন্দের আদান প্রদান—তাহার নাম “যৌবন।” তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন—যৌবনের অরুণ রাগে লোহিতাত হইয়া পুরুষ প্রকৃতি বিকাশের হিল্লোলে মুহু মুহু কাঁপিতেছেন! সে কম্পনে মিলনের আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হইতেছে। ইহার পরই উভয়ের “একী করণ”—অর্ধনারীশ্বরের চিত্র—তাহার তত্ত্বময় রূপক। পৃথিবীতে, স্বাবর জঙ্গম, স্থল স্থল, জড়, শক্তি বাহা কিছুই অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—সমস্ত পদার্থই এক হইতে বহু হইতে চাহে। “মদন” এই আত্ম বিসর্পণের নেতা, সেই মদনের যে অধিনায়ক—তাহারই নাম “যৌবন”। সৃষ্টির সনাতন ধারা রক্ষা করিতে হইলে—“যৌবনকে” অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। “যৌবন”—আত্ম বিকাশের একমাত্র অবলম্বন। বহু হইবার যে সাধ—তাহার নাম “রস”। তাই আত্ম স্বাধি “ভবনমি” বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করিয়াছেন—“রসো বৈ সঃ”; তিনি “রস”

স্বরূপ। “রস” ভিন্ন বহুতে পরিণতি ঘটে না। “রস” নহিলে “হুই” ‘এক’ হইতে পারে না; ‘রস’ ছাড়া আমার আশ্বিনকে বহু বিসর্পিত করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। “রসের” আধার—“যৌবন”। “রসের” ইংরাজী প্রতি শব্দ স্থির করিবার মত প্রতিভা আমার নাই। তবে আমার অনুমান—“Emotions” কথাটির “রস” বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। বাহার দ্বারা আমার ‘আশ্বিনের’ বিসর্পণ ও সংহরণ সম্ভব পর হয়—তাহাই “রস”। এই “রসেরই” এক একটা তরঙ্গ—রতি, আসক্তি, অনুভূতি। রসের আধার “যৌবন,” যৌবনের বেদী—“রূপ।” জগতে সকলেই চায়—তৃপ্তি; এই তৃপ্তির পথের বাহা অন্তরায়, তাহার নাম “দুঃখ”; এ দুঃখের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান লাভের যে বিরাট প্রয়াস—তাহাই জীবের “সাধনা”। তাত্ত্বিক সাধক নৈশ “সাধনায়” আত্ম নিয়োগ করিয়া বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন সৃষ্টি দ্বারা বজায় রাখিতে গেলে—স্বাস্থ্য সামর্থ্যে সমুজ্জ্বল শরীর চাই; তেমন শরীর না হইলে “যৌবন” স্থির থাকিতে পারে না, —“রস”ও পরিস্ফুট হয় না। যে ইচ্ছায় “মদনের” উদ্ভব, সেই ইচ্ছায় “রসের”ও বিকাশ; তাত্ত্বিক তাই অনন্ত দুঃখের উপশান্তি কাশনার—তৃষাণ্ণাম কণ্ঠে “রসের সাগরে” ডুব দিলেন। আত্মার মোদিনী ও রঞ্জিনী বৃত্তিকে “রস” সিক্ত করিয়া লইলেন। শেষে—পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, বাসনা ব্যাণ্ড যৌবন এবং আনন্দময় দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার জন্য, ধরণীর অন্ধ-তামস গর্ত হইতে ক্ষুদ্রমূর্তি “রসের” আবিষ্কার করিয়া, তাত্ত্বিক নিঃশব্দ হইলেন, আশ্বিনকে বহু বহু করিলেন। বলা বাহুল্য এই রস বিকাশের বিভিন্ন ধারা

বুঝিবার নিমিত্ত তাত্ত্বিককে “বিলাস” ছাড়িয়া “বিকাশ”কে আশ্রয় করিতে হইয়াছিল।

মানুষকে কোন ভাষা শিখাইতে হইলে, ভগবানকেও মানুষ সাজিতে হয়, মানব-ভাষায় কথা কহিতে হয়। যে দেশ দশ দশ বার ভগবানের পদরেণু স্পর্শে পবিত্র হইয়াছে—সে দেশের লোক ভিন্ন—অন্য দেশের লোক আমার এই কথা গুলিকে হাছাপদ বাচালতা মনে করিত পারেন। কেমনা ভয়ের কথা আমাদের চেয়ে কেহই বোধ হয় ভাল বুঝিবে না। ভগবানের বিজ্ঞান ছাড়া—পারদের এই বিরাট বিশেষ তত্ত্ব পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য জাতির বিজ্ঞানে আছে কিনা জানি না। তত্ত্ব—শিব নাম। হাজার অন্য সংজ্ঞা—“আগম”। তত্ত্ব যিনিই লিখুন বা যাহারাই লিখুন—তাঁহারা যে মানাদের চেয়ে জানে গরিষ্ঠ, প্রতিভায় অতি মানুষ, অধ্যবসায়ে অক্লান্ত কর্ম্মী—কর্ম্ম দাব ছিলেন—ইহা আমাদের বলিতেই হইবে। আমরা মানুষ, আমাদের জীবন অনন্তে “মুহূর্ত্ত” মাত্র। এই মুহূর্ত্ত পরিমিত কাল—যে ভাগ্য-বাণ—দেবতার সঙ্গে, দেবতার কার্য্যে, দেবতার রূপায় যাপন করিতে পারেন; যিনি ধরণীর চক্ষে প্রেম হারাইয়া, সত্যের চ’ক্ষে অমর হইতে পারেন, তিনিই “রসশালায়” প্রবেশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। অন্তের সে ক্ষমিকার নাই। অতএব দূর হইতেই “তত্ত্ব রসায়ন ননঃ” বলিয়া আমরা পারদের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

“রসের” নাম “পারদ” হইল কেন? তত্ত্ব ছাড়া অন্য কোথাও এ প্রেমের উত্তর মিলিবে না। যে ধাতু মানুষকে অমরমৃত্যুর পরপারে লইয়া যায়—“পারদ”ই তাহার সার্থক সংজ্ঞা। পারদ সেবনে মানুষ জীবমুক্ত হইতে পারে—তাই পারদের একটা বিশেষণ—“মৃত”।

অগ্রহায়ণ—৪

পারদের মহিমা কীৰ্ত্তন করিবার জন্ত—“রসেশ্বর দর্শন” সর্ব দর্শন সংগ্রহের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। সেই রসেশ্বর দর্শনের সূচনা এইরূপ—

উর্দ্ধে মুক্ত উদার বিপুল নীলিমা, নিম্নে গ্রামল তৃণ প্রান্তর; সম্মুখে—আবেগ চঞ্চলা কলনাদিনী নির্ঝরিনী, পশ্চাতে লতার শ্রাম বেষ্টনে—গগনস্পর্শি নমরু তরু; মধ্যে—মায়ালোক মধুর শৈল শিখর। চারিদিকে অসীম মৌনতা। তন্ম্রা-ময় নিশীথে—বিষ কুঞ্জের মর্ম্মর বেদীতে—মহাযোগী মহাদেব। তাঁহার বামে—সাধনার সহচরী মহামায়া। পার্শ্বতী পশুপতিকে প্রণম করিলেন—“প্রভো! কি উপায়ে মানুষ খেচরী গতি লাভ করিতে পারে?” শঙ্কর-সহস্র মুখে উত্তর দিলেন—“রসের প্রয়োগে।” পাঠক! দেবতার কথা দেবতার ভাষাতেই শুধু;—

“যথা লোহে তথা দেহে কর্তব্যং মৃতকঃ সত্য। সমানং কুকতে দেবি। প্রত্যয়ং দেহ লোহায়াঃ। পূর্ণং লোহে পরীক্ষেতে পুষ্পাদেহে প্রয়োজয়েৎ।” লোকনাথ লোকধাত্বীকে বুঝাইয়া দিলেন—“প্রথমে ধাতুর উপর, পরে দেহের উপর—পারদের প্রভাব পরীক্ষা করা উচিত। পারদ ব্যবহারে জীব জীবমুক্ত হইয়া থাকে।” বরাহ মিহিরের সময়েও—ব্যাধি বিনাশের জন্ত—“নাফিক ধাতু মধু পারদ চূর্ণ” সেবনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তাত্ত্বিকগণ পারদের নিক্ষেপ সহিতে পারিতেন না। তাত্ত্বিকের প্রাণের কথা—

পতিতো দরদে দেশে গৌরবাবধি বস্তুতঃ। সরসো ভূতলে লীন স্তম্ভদেশ নিবাসিনঃ। যশ নিশ্চিতে স্তম্ভেস্তম্ভঃ শঙ্কোস্তম্ভঃ পরাধপরঃ। স পাতেররকে খোদে খাবৎ কল্প বিকল্পনা।

রস রত্ন সমুচ্চয়ঃ ১ম অঃ।

হরবীৰ্য্য পারদ বহি দেবতার মুখ হইতে দরদ দেশে পতিত হইয়াছিল; এ হেন সূত্রে একে যে অধম নিন্দা করে, সে দেব নিন্দা রূপ মহাপাপে কলুষিত হইয়া কলান্তর কাল-নরকে বাস করে। বাস্তবিক পারদের উপ-কারিতা দেখিলে “পারদকে” দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। “পারদ”—ভাব প্রধান ভারতবর্ষের চিরন্তনী সম্পত্তি। মনীষা ও প্রতিভার সমন্বয় সাধনে—পারদ এই জন্ম স্থাপের ভূগর্ভ হইতে উথিত হইয়াছিল। পার-দের গুণ, বীৰ্য্য, বিপাক ও প্রভাব—যুরোপের বৈজ্ঞানিক মান-দণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। পারদ প্রকৃতির পরম ও চরম প্রমাদ। মানবের দেহ-ধাতু সকলটি-পরিবর্তনশীল, স্বতঃই ক্ষয়-প্রবণ। কেবল মাত্র—পারদের সায়-সামগ্ৰী দিয়াই বৈজ্ঞানিক সে ক্ষতির পূরণ করিতে পারেন। পারদের প্রকৃত প্রয়োগ করিতে পারিলে, পৃথিবী হইতে অকাল মৃত্যু অকাল বার্দ্ধক্য, অস্বাভাবিক রোগ শোক,—বিলুপ্ত হইয়া যায়। সত্য-মিথ্যার সমুদ্র-মন্তনে,—পারদের উত্থান; হিন্দু একদিন এই পার-দের অমৃত আশ্বাদ উপভোগ করিয়াছিল। এখনও হিন্দুর নির্জীব-বিজ্ঞানে শাস্ত্র কোড়ে—শিবকর্ণের মৃত্যু নীলিমার মত পারদের কল্যাণকর চিহ্ন বর্তমান। বৈজ্ঞানিক—এখনও পারদের সাহায্যে—অসাধ্য-ব্যাধি জয় করিয়া থাকেন। পারদের প্রভাবেই এখনও জীর্ণ-জটিল রোগে—বৈজ্ঞানিকের মত সকল চিকিৎসা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও পারদ হিন্দুর স্বাতি সর্বত্র অতীতের স্মারক,—বর্তমানের গৰ্ব্ব ভূষির উপাদান, ভবিষ্যৎের স্বর্ণ মণ্ডিত বিজয় তত্ত্ব। প্রকৃত সাধকের অশুশীলনের জুড়াবে—আলোক বিহীন হাদেশ

উদ্ভিদের মত, পারদের মহিয়সী শক্তি—এখন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে! তন্ময়ের “তৈরবী চক্র” কামনায় কলুষিত হইয়াছে! বৈজ্ঞ-সমাজে আর অল্পসন্ধানতৎপরতা দেখিতে পাই না! রসামুভাবকতার অলস মূষা—ইন্ধনের অভাবে নিভিয়া গিয়াছে! তান্ত্রিকের বংশধর নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠা ভুলিয়াছে। এ পাপাচারের প্রায়শ্চিত্তও এইবার আবৃত্ত হইয়াছে! হাটে মাঠে ঘাটে বাটে—মুদীর দোকানে, পশারীর টাটে—শঠতার জয়চিহ্ন সস্তায় “চাবন প্রাশ” বিক্রয় হইতেছে। বৈজ্ঞের “বজ্রিংশিংহাসনে” বসিয়া—“ভোজের” মত নগণ্য বাক্তিও সুখার দোহাই দিয়া, জবজ্ব বিব প্রয়োগে অগণ্য নরনারীকে প্রতারণা করিতেছে! “মকরধ্বজের” নামে—পারা গন্ধক ও মনছালের সংযোগ—নারীর লোককে ব্যাপন্ন করিয়া ভুলিয়াছে! আজ যে “তামাক ওয়ালা”—কাল সে “কবিরাজ” সাধিতেছে! “পাচনের” পবিত্র উপাধি লইয়া হাতুড়ের হাতধোয়া জল—দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রতিবেশক হইয়াছে! নিজের জাতিকে ইঞ্জির লালসার অন্ধ উন্মাদনায়—আতুল করিবার জন্ত—“পানের দোকানে” দুই পয়-সার ‘মদনানন্দ মোদকের’ নমুনা বিকাইতেছে।

অতীতের স্নেহ ও অমর্যাদায় ক্ষুব্ধ হইয়া প্রাণের আবেগে অনেক কথাই বলিয়া ফেলি-লাম! আমি “আয়ুর্বেদের” একজন লেখক, কিন্তু বহুদিন ধরিয়া আমার কোন নিবন্ধ আয়ুর্বেদের পদপ্রান্তে স্থান পায় নাই। এজন্য আয়ুর্বেদেই আমার কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন। কেহ কেহ আমার রচনা অতিরিক্ত সদ-দৃষ্টিতে দেখিয়া,—আমি আর মিথিলা কেন! —পত্র লিখিয়া আমাকেও লিখিয়াছেন। এক

দিন আমি কাহাকেও পত্রের উত্তর দিতে পারি না। কেবল—আমার ছুংখের সন্দ্বন্দয় শ্রোতা—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়কে আমার মর্শ্ব বেদনা কথঞ্চিৎ নিবেদন করিয়াছি। আয়ুর্কর্ষেদের কথা আমার “কৃষ্ণ কথা,” কিন্তু সে কথা কাহাকে শুনাইব? আমি যে—“ধুঁয়ার চলনা ক’রে কাঁদি”—কে ইহা বুঝিবে? বেদ তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আমি যে কেবল আশান ভাঙ্গে সোণার কমণ্ডলু ভরিয়াছি। তবে আর লিখিব কি? আয়ুর্কর্ষেদের মন্ত্রগুণে—আজ মহানন্দোপাধায় গণনাথ প্রবেশ কবিয়াছেন; আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। তাই অবগো হইয়াও—আজ আবার পুঙ্ক ময় উচ্চারণে সাহসী হইয়াছি। আমার অক্লান্ত কঠোর একাগ্র প্রার্থনা—এতদিন মনশ্চক্রে বিনীত হইয়াছে। তথাপি আবার প্রিয়তমা করিতেছি—হে বৈষ্ণব গণনাথ! হে কবিরাজ-কুল ভূষণ ধামিনী ভূষণ! বলিতে পার—তোমরা থাকিতে, এখনও ৩৫ খানি সংগীতা থাকিতে, বাঙ্গালীর “গুড় খেগো মিঠ মখ”—কুইনাইনে এমন ‘তিত’ হইয়া গেল কেন? যে দেশের মাটিতে এখনও পলতা ক্ষেপাপড়া প্রমুখ শত তিরু জন্ম গ্রহণ করিতেছে, সে দেশে কে কুইনাইনের “কলতরু” পোষণ করিল? “আয়ুর্কর্ষকে” পরিণতির পূর্ণ সৌষ্ঠব প্রদান করিবার জন্ত দেশে কি আব একজনও “বৈষ্ণব” দেখিতে পাইব না? যে দেশে হারীত, অগ্নিবৈশ, চরক, সূত্রভেদে সন্ধ্যা বিরাজ করিত সে দেশে কি আর দ্বিতীয় “গঙ্গাধর” জন্মগ্রহণ করিবে না? কে’ সে “নবনারায়ণ”—যিনি প্রলয়পয়োধি জলে—“আয়ুর্কর্ষকে”—পৃষ্ঠে বহন করিতেন?

সভ্যতার জীবন্ত কেন্দ্র কলিকাতা সহরে—আজকাল “কবিরাজের” অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই গুরু নাই, সতীর্থ নাই! যিনি “আয়ুর্কর্ষদ” শাস্ত্রের প্রবর্তক তিনি “ব্রহ্ম”—তাঁহার একটা বিশেষণ “স্বয়ম্ভু”; এই সকল “কবিরাজ”ও স্বয়ম্ভু (অর্থাৎ আপনি ইহাতে জন্মিয়াছেন—বাংলা ভাষায় থাকাকে ভূই কোঁড় বলে)—ইহাই কি বৈষ্ণব বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ? মোহপ্রাপ্ত মাতৃদেহ ইহার যে আশানে টানিয়া আনিয়াছে;—ভজা মনের কড়ী বরণা চেলাইয়া চিতা সাঁজাইয়াছে,—তাহাতে মাতৃদেহ তুলিয়া দিয়া, বিলাতী দেশ-লাই ধরাইয়া আগুণ জালিতেছে; সে আগুণে মৃত্যুগন্ধি ধূম ও রক্তনাগিনী শিখা উঠিতেছে! ক্রবাদ-বহির প্রেতালোক দেখিয়া, যম্যষ্টকের সান্নিপাতিক সম্ভাপে উন্নত হইয়া, দেশের লোক কঙ্কালের করতালি বাজাইয়া—চতুর্দিকে নৃত্য করিতেছে। পার যদি—ইহার প্রতিকার কর। অমঙ্গলের চিত্তাচুরী হইতে মাতৃমূর্তি নাশাইয়া লও। তাঁহাকে গঙ্গাজলে নান করাইয়া—কালী-ধূম মুছাইয়া ‘অষ্টাদ আয়ুর্কর্ষ বিজ্ঞান্যের’ মর্শ্ব বেদিকায় বস। তাঁহার সর্কাজ—নিপুণ বৈষ্ণব-হস্তের হরি চন্দনে লিপ্ত কর। জীবন্ত আয়ুর্কর্ষেদের জীবনীর মেহে—সে দাহকোট শীতল হউক।

তন্ত্রের মহিমা ও পারদের কথা বলিতে গিয়া—অনেক বাজে কথাই বলিলাম। আমার ভয় কঠোর কর্কশ কাহ্ন—অনেকের পক্ষেই বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এই থানেই—আজ এই “ঢাকের ব্যাগি” বন্ধ করিলাম।

## শিশুপালন।

( পরিপাক ক্রিয়া। )

পূর্বানুভূতি।

—\*—

[ শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ সরস্বতী। ]

খাত্তের কার্য কি কি ?

খাত্ত (১) আনাদের দেহেব পুষ্টি সাধন করে; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলশালী এবং গঠন করিবার পক্ষে খাত্তই প্রধান উপায়। দেহের বৃদ্ধির পক্ষে খাত্ত প্রদান উপাদান। (২) সমগ্র জীবন ভরিতা ক্রমাগত আমাদের দেহ যে ক্ষয় হইতেছে খাত্ত তাহা পূরণ করে। (৩) দেহে উত্তাপ এবং শক্তিসঞ্চয় করিতে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয়—খাত্ত তাহা প্রদান করে।

এই কাজগুলি করিতে গেলে খাত্তকে রক্তের সহিত মিশিয়া বাইতে হয়। কিরূপে খাত্ত—রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, এখানে সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইবে। শিশু যে খাত্ত গ্রহণ করে, এমন কি যে নাচুত্থ পান করে তাহা কিরূপে রক্তে পরিণত হয় এবং তাহা দ্বারা শিশুর হাড়, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতিইবা কিরূপে গঠিত হয় তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক জননীই উৎসুক হইতে পারেন।

আহার্য্য দ্রব্য কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা

পরিপাক হইয়া এমন সব দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয় যে, তাহা সহজেই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে।

শিশু শুধু দুগ্ধ পান করে বহিরা তাত্রাব পরিপাক প্রণালী সহজ ও সরল এবং দ্রবপাক যন্ত্রও অত্যন্ত কোমল থাকে। এই কারণে শিশুর খাত্তের কোনরূপ গোপনতা হইবে সহজেই পরিপাক যন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে এবং নানারূপ অসুস্থ হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্য দ্রব্যের জটিলতা যেমন বৃদ্ধি পায়, পরিপাক যন্ত্রও তেমনি দৃঢ় হইতে থাকে এবং পরিপাক করিবার ক্ষমতাও বাড়ে।

আহার্য্য দ্রব্য মুখে যাইবামাত্র আমরা তাহা জিহ্বা এবং দাঁত দিয়া চর্ব্বণ করি। তারপর আমাদের আহার্য্যে যে খেতসার পদার্থ আছে—(প্রধানতঃ, ভাত, আদু, শাকসব্জী প্রভৃতিতেই বেশী পরিমাণে খেতসার পদার্থ থাকে)—তাহা লাল রস দ্বারা maltose নামক একপ্রকার দ্রবণীয় পদার্থে (শর্করায়) পরিণত হয়।\* খেতসার পদার্থ জলে মিশ্রিত করা যায় না,

\* আমাদের মুখের ভিতর প্রধানতঃ তিন জোড়া লালারগ্রন্থি আছে, তাহা হইতেই লালারস নিঃসৃত হয়। এক জোড়া গ্রন্থি কানের ঠিক নীচে এবং সম্মুখে অবস্থিত করিতেছে, আর দুই জোড়া মুখের ভিতরে রহিয়াছে। এতোক লালারগ্রন্থি হইতে একটি ছোট নল বাহির হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই নল দিয়া লালারস প্রবাহিত হইয়া মুখের মধ্যে আসে। এতদ্বার্তীত আমাদের মুখের মধ্যে আরো ছোট ছোট লালার গ্রন্থি আছে। লালারস alkaline। ইহাতে জল খনিজ পদার্থ, মেঘনর পদার্থ এবং মুখের ত্বক হইতে নিঃসৃত আরো কয়েক প্রকার পদার্থ আছে। ইহাতে দেহের অত্যন্ত সমস্ত রস হইতে পৃথক একটি বিশেষ পদার্থ আছে, তাহার নাম Islyalin। লালারসের ইহাই প্রধান উপকরণ এই Islyalinই খেতসার পদার্থকে শর্করায় পরিণত করে। শিশুদের ছয় মাস বয়সের পূর্বে তাহার লালারসে এই পদার্থ উপযুক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকেনা বলিয়া তাহারা খেতসার বিশুদ্ধিহীন শর্করায় পরিণত করিতে অধ্যর্থ জীর্ণ করিতে পারে না।

সুতরাং রক্তের সহিত কিরূপে মিশিবে? কিন্তু লালারস দ্বারা ইহা যে দ্রবণীয় শর্করা পদার্থে পরিণত হয় তাহা সহজেই রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার পূর্বে যে লালারস নির্গত হয় তাহাতে খেতসার পদার্থ জীর্ণ করিয়া শর্করায় পরিণত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। মাতার দুগ্ধে খেতসার কিংবা তদনুরূপ কোনো পদার্থ বিद्यমান নাই।

আতর্গা দ্রব্য মুখে চর্ষিত এবং তাহার খেতসার পদার্থ লালারস দ্বারা শর্করায় পরিণত হইবার পর তাহা গলনালী দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

পাকস্থলীর ভিতরের গতি একপ্রকার হজম কর দ্বারা আবৃত। এই বক হইতে রক্ত হইতে জাত এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়, তাহার নাম পাচক রস। খাদ্য দ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে পর ইহার পেশী নিশ্চিত গাঢ় খাদ্য দ্রব্যকে ক্রমাগত আলোড়ন করিতে থাকে। সুতরাং পাকস্থলীর বক হইতে নিঃসৃত পাচক রসের সহিত খাদ্য দ্রব্য এক-বর্ণে নিশ্চিত হইয়া যায়। (ক) মুখের লালারস আমাদের খাদ্যদ্রব্যের খেতসারকে শর্করায় পরিণত করিয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী করে। এই সমুদয় পদার্থ পাকস্থলীর রস দ্বারা Protein matters পেপটোন নামক এক দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হইয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী হয়। শিশুর দুগ্ধপানের পর তাহা এই পাকস্থলীতে আসিয়া অগ্নি বিশিষ্ট পাচকরসের সহিত মিশিয়া দুগ্ধের ছানার অংশ পৃথক হইয়া পড়ে। এই ছানাই দুগ্ধের

nitrogenous পদার্থ। পাচকরস তখন এই ছানাকে জীর্ণ করে। মাতৃদুগ্ধের ছানা খুব ছোট ছোট হয়, সুতরাং পাচক রস তাহা সহজেই হজম করিয়া দেয় কিন্তু গরু ও ছাগলের দুগ্ধের ছানার ভারি এবং গাঢ় হয়, এই জন্য হজম হইতে দেয়ী হয়। গাধার দুগ্ধ অনেকটা মাতৃদুগ্ধের তুল্য, সুতরাং হজমও শীঘ্র হয়। খাদ্যের ছানার অংশ পাকস্থলীর পাচক রস দ্বারা পেপটোন নামক দ্রবণীয় পদার্থে পরিবর্তিত হইয়া পাকস্থলীর গাত্রে যে অসংখ্য স্থানরক্তবহা নালী Blood vessels আছে তাহাতে চলিয়া যায়। খাদ্যের অবশিষ্ট যে সব অংশ (যেমন মেদময় পদার্থ, খেতসার পদার্থ) পাকস্থলীতে দ্রবণীয় পদার্থে পরিবর্তিত হয় না, তাহা পাকস্থলী হইতে বাহির হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে। এইস্থলে যকৃৎ হইতে পিত্তরস এবং ক্রোমগ্রন্থি হইতে ক্রোমরস (Pancreatic Juice) আসিয়া খাদ্যের উপর কার্য করে। যকৃৎ হইতে পিত্তরস এবং ক্রোমগ্রন্থি হইতে (Pancreas) ক্রোমরস আসিবার Jotyalin যেমন লালারসের প্রধান উপকরণ, Joepsin তেমনি পাচক রসের প্রধান উপকরণ। পাচক রস মেদময় পদার্থ এবং খেতসার পদার্থ জীর্ণ করিতে পারে না। ক্রোমরস ইহাদিগকে জীর্ণ করে। পাচক রস nitrogenous খাদ্যকে জীর্ণ করে। মাংসের albumen, ডিমের খাদ্য অংশ, দুগ্ধের ছানা (casein) ময়দার gluten প্রভৃতি পাকস্থলীতে পাচক রস জীর্ণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র অন্ত্রের সহিত দুইটি নালিযুক্ত পাকস্থলীতে পাচক রসের কার্যের পরও খাদ্যের যে সব উপাদান অপরিবর্তিত

(ক) পাচক রসের গুণ acid। ইহাতে জল বিন্ধ পদার্থ free hydrochloric acid এবং pepsin আছে।

অবস্থায় ক্ষুদ্র অস্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে, ক্রোম-  
রস সেই উপাদান সমূহকে দ্রবণীয় পদার্থে  
পরিণত করে। ক্রোমরসের কার্য্য শক্তি  
অনেক। ক্রোমরস দুগ্ধকে দধির আকারে  
পরিণত করে, পাচক রসের স্তায় খাত্তের  
nitrogenous অংশকে Peptone নামক  
পদার্থে দ্রব করে, খাত্তের খেতসার পদার্থের  
বাহা লালারস এবং পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত  
হয় না, তাহাকে শর্করায় পরিণত করে এবং  
খাত্তের মাখনের অংশকে অতি সূক্ষ্ম ভাগে  
বিভক্ত করে। যকৃত হইতে যে পিত্তরস  
ক্ষুদ্র অস্ত্রে প্রবাহিত হয় তাহা সাধারণতঃ  
পরিপাক কার্য্যে ক্রোমরসকে সাহায্য করে।  
পিত্তরসের গুণ alkaline ইহার রঙ সবুজ।  
ইহাতে জল খনিজ পদার্থ, রঙ করিবার  
জিনিস, bile acids, cholesterin এবং মেদ  
আছে। বয়স্কেরা যে খাত্ত আহাৰ করে—  
তাহার যে অংশ মুখের লালারস এবং  
পাকস্থলীর পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হয় না  
তাহা এইরূপে ক্ষুদ্র অস্ত্রে ক্রোমরস দ্বারা  
দ্রবীভূত হইয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী হয়।  
খাদ্য এইরূপে লালারস, পাচক রস, পিত্তরস  
এবং ক্রোমরস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া দুগ্ধের স্তায়  
এক প্রকার তরল পদার্থে পরিণত হইয়া রক্তে  
মিশিয়া যায়। এই পদার্থকে Chyle বলে।  
যে গুণে ক্রোমরস খেতসার পদার্থকে শর্করায়  
পরিণত করিয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী  
করে, শিশুর ক্রোমরসে সে গুণ জন্মের প্রথম  
কয়েক মাসে বিদ্যমান থাকে না। এই  
কারণে শিশুকে খেতসার বিশিষ্ট খাদ্য দিলে  
তাহা তাহার মুখেও দ্রবীভূত হয় না এবং  
অস্ত্রের মধ্যেও জীর্ণ হয় না; শিশু নানারূপ  
পীড়ার আক্রান্ত হয়।

আমাদের খাত্তদ্রব্য নানাপ্রকার রসের  
দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া যে তরল আকার ধারণ  
করে তাহা পাকস্থলী এবং অস্ত্রের গাত্রাবৃত  
দ্বকে যে সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী সকল আছে,  
তাহাতেই প্রধানতঃ প্রবেশ করে। খাত্ত  
গ্রহণের পর আমাদের পাকস্থলী অস্ত্রে প্রবাহিত  
রক্ত খাত্তের সার অংশের দ্বারা উপরোক্ত  
ভাবে পুষ্ট হইয়া পাকস্থলী ও অস্ত্র হইতে  
বাহির হইয়া একটি শিরা দিয়া যকৃতে প্রবেশ  
করে। যে দ্বার দিয়া পাকস্থলী ও অস্ত্র হইতে  
পরিপুষ্ট রক্ত যকৃতে প্রবেশ করে তাহাকে  
ইংরাজিতে Portal Vein বলে। এই রক্ত  
যকৃতে প্রবেশ করিলে পর যকৃত তাহাকে  
পরিবর্তিত করে অর্থাৎ রক্তের যে উপাদান-  
বর্জন করিবার তাহা বর্জন করিয়া দিয়া সার  
অংশ গ্রহণ করে। এই পরিত্যক্ত জিনিসটি  
পিত্ত। ইহা যকৃত হইতে বাহির হইয়া পিত্ত-  
কোষে গিয়া সঞ্চিত হয়। এতরূপে রক্ত যকৃত  
কর্তৃক পরিবর্তিত হইয়া দেহের রক্ত স্রোতের  
সহিত মিশিবার উপযুক্ত হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, খাত্তের মাখনের  
অংশ ক্রোমরস দ্বারা অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত  
হয়। ক্ষুদ্র অস্ত্রের ভিতরের গাত্রে যেমন বহুসংখ্য  
বহা নালী সকল আছে, তেমনই ইহা একপ্রকার  
সূক্ষ্ম স্তরা দ্বারা আবৃত। ইহাকে ইংরাজিতে  
'ভিলি' (Villi) বলে। প্রত্যেক ভিলাসের ভিতর  
বহু সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী আছে এবং ২১টি  
করিয়া এক প্রকারের নালী আছে, তাহাকে  
ল্যাকটিয়ালস্ (lacteals) বলে। খাত্তের  
মেদময় পদার্থ সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইলে পর  
ক্ষুদ্র অস্ত্রের গাত্রে ভিতর দিয়া চোয়াইয়া  
ভিলির অভ্যন্তরস্থ ল্যাকটিয়ালে প্রবেশ করে।  
কারণ এই ল্যাকটিয়ালস্ সূক্ষ্ম হইতে



থাকে এবং আমাদের বুকের পশ্চাদ্ধিক দিয়া যে একটি লম্বা নালী গিয়াছে তাহার মধ্যে এই ল্যাকটিয়াল গুলি তাহাদের অভ্যন্তরস্থ খাণ্ডের মেদময় পদার্থ চালিয়া দেয়। এই নালীকে বক্ষঃনালী thoracic duct বলে। এই নালী গলার বাম দিকের বৃহৎ শিরার সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে। খাণ্ডের মেদময় পদার্থ thoracic duct দিয়া এই বৃহৎ শিরার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খাণ্ডের অধিকাংশ উপাদান দ্রবীভূত হইয়া সাধারণতঃ পাকস্থলী এবং অস্ত্রের দ্বকে স্থিত রক্তবহা নালীতে প্রবেশ করে এবং খাণ্ডের মেদময় পদার্থ উপরোক্ত ল্যাকটিয়াল দিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। উপরোক্ত প্রণালী হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, খাণ্ডদ্রব্য জাৰ্ণ করিবার জন্য চারিটি রসের আবশ্যক হয়।

(১) লাল রস (২) পাচক রস, (৩) পিত্ত রস এবং (৪) ক্রোম রস।

খাণ্ড দ্রব্য মুখে যাইবা মাত্র লালারস খাদ্যের খেতসার পদার্থের উপর কার্য করে এবং ইহাকে শর্করায় পরিণত করে। খাদ্য দ্রব্য এইরূপে পরিবর্তিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র পাচক রস ঐ খাদ্যের উপর কার্য করে। তখন খাদ্যের নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে।

(১) লালারস দ্বারা খাদ্যের খেতসার উপাদানের কঠক অংশ শর্করায় পরিণত হইয়াছে। (২) মাংসের ছায় পদার্থের কিয়দংশ পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়াছে। এই দু'টি পদার্থ এবং যে পানীয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা পাকস্থলীর রক্তবহা নালী দ্বারা লইয়া লইয়াছে।

তারপর (১) খেতসার এবং উদ্ভিদ পদার্থ পাকস্থলীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া অস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। (২) মাংসের ছায় পদার্থের অবশিষ্টাংশ নরম এবং টুকরা টুকরা হইয়া অস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। (৩) খাদ্যের মেদময় পদার্থ হৃদয় অংশে বিভক্ত হইয়া তৈলের গুলির আকারে অস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে।

পাকস্থলীর পাচকরস দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া খাণ্ডের কেবল অংশ অস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে—তাহা টক। এই টক খাণ্ডাংশ অস্ত্রে প্রবেশ করিবামাত্র পিত্ত রস এবং ক্রোম রস ইহার সহিত মিশ্রিত হয়। এই দু'টি রসের গুণ, লালারসের ছায়, টকের বিপরীত। সুতরাং তাহারা—বিশেষতঃ পিত্তরস পাচক রসের টক গুণ নষ্ট করে। পিত্ত রসের প্রধান গুণই এই যে, ইহা পাচকরসের টক গুণ নষ্ট করে। পিত্ত রস পাচক রসের টক গুণ নষ্ট করিলে পর তবে ক্রোম রস খাণ্ডের উপর কার্য করিতে পারে, সামান্য টক থাকিলেও ক্রোমরস কার্য করিতে পারে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্রোমরস খাণ্ডের সমস্ত উপাদানই জীর্ণ করে। লালারস, পাচক রস এবং পিত্তরস খাণ্ডের উপর কার্য করিয়া যে সকল উপাদান জীর্ণ করিতে পারে না, ক্রোমরস তাহা সবই জীর্ণ করে। এই তিন রসের ক্রিয়া শেষ হইবার পরও খাণ্ডের যে খেতসার পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, ক্রোমরস তাহাকে জীর্ণ করিয়া শর্করায় পরিণত করে, যে মাংসময় উপাদান অবশিষ্ট থাকে—তাহা দ্রবীভূত করে এবং পিত্তরসের সাহায্যে মেদময় পদার্থকে হৃদয় অংশে বিভক্ত করে। আমাদের আহাৰ্য্য দ্রব্য যখন সমস্ত ক্ষুদ্র অস্ত্রের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, তখন ক্রোমরস ধীরে ধীরে কার্য করিতে

থাকে। ক্রোমরস দ্বারা জীর্ণ হইবার পর খাত্তের উপাদান গুলিকে ভিলি (villi) চুষিয়া লয়। শর্করা ও মাংসের রসকে রক্ত বহা নালী এবং মেদনয় উপাদানকে ল্যাকটিয়া-লস্ চুষিয়া লয়। জীর্ণ করা খাত্তের অধিকাংশই ক্ষুদ্র অস্ত্রের ভিলি চুষিয়া লয়।

এইরূপে খাত্ত জীর্ণ হইয়া বৃহদয়ে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে খাত্তের অসার অংশ মল রূপে বহির্গত হইয়া যায়।

(ক্রমঃ)

## আয়ুর্বেদে রক্ত মোক্ষণ।

—:—:—

রক্ত মোক্ষণ দ্বারা অনেক রোগের প্রতি-কার হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদে রক্তমোক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ আছে। আমরা এই প্রবন্ধে সাধারণের অবগতির জন্ত রক্ত মোক্ষণের বিষয় আলোচনা করিব। রক্ত মোক্ষণ এক সময়ে ডাক্তারী চিকিৎসার বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ক্রমে উহা উঠিয়া যায়। এদেশে রক্ত মোক্ষণের জন্ত জলোকা, শূঙ্গ, অলাবু এবং শূঙ্গ-প্রভৃতির প্রয়োগ করা হইত। ক্রমঃ প্রত্যেকের বিষয় বলা যাইতেছে।

রাজা, ধনী, বালক, বৃদ্ধ, ভীক, দুর্বল, স্ত্রী ও শূকুমার ব্যক্তির রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে জলোকার প্রয়োগই অত্যাৎমক উপায়। জলোকা, অলাবু এবং শূঙ্গ এই ত্রিবিধ পদার্থ দ্বারা রক্তমোক্ষণের মধ্যে জলোকা প্রয়োগই প্রধানতম।

অপিচ, বাতহৃষ্টরক্ত—শূঙ্গ দ্বারা, পিত্ত হৃষ্ট রক্ত—জলোকা দ্বারা এবং কফ হৃষ্ট রক্ত অলাবু দ্বারা মোক্ষণ করা যায়। কারণ শূঙ্গ স্নিগ্ধ বলিয়া বায়ুতে হিতকর, জলোকা শীতল বলিয়া পিত্তে হিতকর এবং অলাবু কফ বলিয়া কফ

হিতকর। আবার ত্রিদোষ দূষিত রক্ত মোক্ষণের জন্ত উক্ত ত্রিবিধ দ্রব্যই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শূঙ্গ দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে, যে স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে—সেই স্থান অন্ন অন্ন চিরিয়া শূঙ্গ বস্ত্র সংযোগে শূঙ্গের হুল মুখ তথায় এমন ভাবে বসাইবে—যেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। পরে ছিদ্রের অংশে মুখ দিয়া জোরে চুষিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে।

অলাবু দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে দীড়িত স্থান অন্ন অন্ন চিরিয়া মধ্য স্থলে প্রক্ষলিত দীপবর্তি সংযুক্ত অলাবু যন্ত্র তথায় স্থাপিত করিবে। ইহাতে রক্ত মোক্ষণ হইয়া থাকে।

● জলোকা প্রয়োগ :—জল ইহাদিগের আয়ু, এতদন্ত ইহাদিগকে জলোকা বলে। আবার জল ইহাদিগের ওকা অর্থাৎ বাক্য স্থান এই জন্ত ইহাদিগকে জলায়ুকা বলে। জলোকা দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে ছয় প্রকার নির্বিষ এবং ছয় প্রকার সবিষ।

কৃষ্ণা, কর্করু, আলগর্ভা, ইজাবুবা, সামুজিকা ও পোচন্দলা এই ছয় প্রকার

জলৌকা সবিষ । অল্পন চূর্ণের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ এবং স্থূল মস্তক বিশিষ্ট জলৌকাকে কৃষ্ণা বলে । বাহীন মাছের ত্রায় অগ্নিত এবং উদরের কোথাও উন্নত ও কোথাও ছিন্নবৎ—একপ জলৌকাকে কার্পুরী বলে । কৃষ্ণিত অঙ্গ পোষ্যমুক্তবৎ বিস্তৃত পার্শ্ব বিশিষ্ট ও কৃষ্ণা মুখ জলৌকাকে অলগদী বলে । ইন্দ্র-পন্থর ত্রায় উদ্ধ বোখা বাণা চিত্রিত জলৌকাকে ইন্দ্রায়ুধ বলে । দ্বৈব কৃষ্ণ গীত বর্ণ বিচিত্র পুষ্পের আকৃতির ত্রায় চিত্র বিচিত্র অঙ্গ জলৌকাকে সামদ্রিকা বলে । যে সকল জলৌকার অপোভাগে বাহুর কোষের ত্রায়, দুই ভাগে বিভক্ত এবং মুখ স্খা তাহাদিগকে গোচন্দনা বলে ।

সবিষ জলৌকা দংশন করিলে দষ্ট স্থানে অগ্নি শোণ ও চুলকণা হয় এবং মূর্ছা জর, দাহ, বমি, মত্ততা ও অবসন্নতা—এই সকল উপদ্রব দটে । ইন্দ্রায়ুধ নামক জলৌকার দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় । সবিষ জলৌকার দংশন করিলে বিষ চিকিৎসায় যে দ্রবণ ঔষধের উল্লেখ আছে, সেই ঔষধ পান, বেপন ও নস্তাদি কার্যে প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয় ।

কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্ক মুখী, মুষিকা, গুহ্ব-বাক মুখী ও সাররিকা এই ছয় প্রকার জলৌকা নিষ্কিষ । ইহাদের মধ্যে যে সকল জলৌকার দুই পার্শ্ব মনঃশিলার ত্রায় বর্ণে বর্ণিত এবং পৃষ্ঠদেশ স্নিগ্ধ মুগের ত্রায় বর্ণ বিশিষ্ট তাহাদিগের নাম কপিলা । বাহারা অম বক্তবর্ণ বিশিষ্ট, গোলাকার, পিঙ্গল বর্ণ এবং শীঘ্র গামিনী তাহাদের নাম পিঙ্গলা । বাহারা বক্রতের ত্রায় নীল-লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট, শীঘ্র বক্তপায়ী, এবং দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ মুখ বিশিষ্ট তাহাদিগকে শঙ্ক মুখী বলে । বাহারা ইন্দ্রয়ের

ত্রায় আকৃতি ও বর্ণ বিশিষ্ট এবং ভ্রগ্নক যুক্ত তাহাদিগকে মুষিকা বলে । বাহারা মুগের ত্রায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং বক্ত পদ্মের ত্রায় মুখ যুক্ত তাহাদের নাম গুহ্বরীক মুখী । আর যে সকল জলৌকা স্নিগ্ধ, পদ্ম পদ্মের ত্রায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং দণ্ড অনুলি প্রমাণ দীর্ঘ তাহাদিগের নাম সাররিকা । এই সাররিকা জলৌকা তন্ত্রী, অগ্নাদি পশুদিগের চিকিৎসা কার্যে ব্যবহার করিতে হয় । মনুষ্যদিগের চিকিৎসা কার্যে কদাচ এই জলৌকা প্রয়োগ করা উচিত নহে ।

যবন বা তুরক দেশ, পাণ্ডু ( কাষোজের দক্ষিণ এবং পুর্বাতন দিল্লীর পশ্চিমে অবস্থিত ) দেশ, সহ নন্দী নদীর তীরবর্তী সহ নামক পাকিস্তান দেশ এবং মথুরা দেশে দীর্ঘকায়, অষ্ট পুষ্ট ও অধিক রক্তপায়ী জলৌকা দেখিতে পাওয়া যায় । সবিষ নন্দ্য, কীট, ভেক, মূত্র ও পুরীষ দ্বারা পুতি ভাবাপন্ন কলুষিত জলে সবিষ জলৌকা উৎপন্ন হইয়া থাকে । আর পদ্ম উৎপল, কুমুদ, শৈবাল প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন নির্ম্মল জলে নির্জিষ জলৌকা উৎপন্ন হইয়া থাকে । বিশেষতঃ নির্জিষ জলৌকা সকল ক্ষেত্রে ও স্নগন্ধি জলে বিচরণ করে, বিযাত্ত্রব্য আহার করে না এবং পক্ষে বিচরণ করে না ।

শরৎকালে কাঁচা চামড়া বা সত্তাহত জন্তুর অন্ধাবয়ব দ্বারা জলৌকা ধরিতে হয় । তৎপরে একটা বৃহৎ নূতন ঘটে সরোবর বা দীঘির জল এবং পক্ষ রাখিয়া তাক্ষ ছাড়িয়া দিতে হয় । উহাদের আহারের জন্ত শুক মাংস, শৈবাল এবং পদ্ম ও উৎপলাদির কন্দ চূর্ণ করিয়া দিতে হয় এবং থাকিবার জন্ত তৃণ জলজ পত্র দিতে হয় । দুই তিন দিন অন্তর জল বদলাইয়া দিতে হয় এবং নূতন করিয়া খাওয়া দিতে হয় । সাত দিনে অন্তর অল্প ঘটে স্থাপন করিতে হয় ।

যে সকল জলৌকার দেহের মধ্যভাগ স্থূল বাহারা ক্লিষ্ট; অত্যন্ত দীর্ঘ ধীরে ধীরে গমন করে, পীড়িত স্থানে সহজে সংলগ্ন হয় না, অল্প রক্তপান করে এবং বাহারা সবিধ এই জলৌকা রক্ত মোক্ষণ কার্যে প্রশস্ত নহে।

ব্যাধি—জলৌকা প্রয়োগ-সাধ্য হইলে রোগীকে শয়ন করাইয়া বা উপবেশন করাইয়া ব্যাধি স্থানে ক্ষত না থাকিলে শুষ্ক মৃত্তিকা ও গোময় চূর্ণ দ্বারা বর্ষণ করিবে। ক্ষত থাকিলে জলৌকা সহজেই সেই স্থান গ্রহণ করে বলিয়া ইরূপ বর্ষণ করিবার আবশ্যক হয় না। অনন্তর পাত্র হইতে জলৌকা ধরিয়া তাহার গাত্রে সর্ষপ ও তরিদ্রা বাটা লেপন করিবে। এবং গ্রহণ করার জন্য ক্রান্তিনাশ হেতু মুহূর্ত্তকাল জল পূর্ণ পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিবে। পরে মূত্র, শুক্র এবং আর্দ্র তুলা বা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা মুখ বাতীত সর্দাস আচ্ছাদিত করিয়া ব্যাধি স্থানে সংলগ্ন করিবে। যত্নপি জলৌকা রক্ত স্থান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে একবিন্দু তুলা বা রক্ত সেট স্থানে প্রদান করিবে অথবা সেই স্থানে একটু ক্ষত করিয়া দিবে। ইহাতেও যদি জলৌকা রক্তস্থান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সেই জলৌকা পরিত্যাগ করিয়া অন্য জলৌকা গ্রহণ করিবে।

জলৌকা অশ্বের পুরের তায় মুখ নাটু ও শুক্র উন্নত করিলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাধি স্থান গ্রহণ করিয়াছে। জলৌকা ব্যাধি স্থান গ্রহণ করিলে উহার শরীর আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং তত্বপরি জলসেচন করিবে। ইহাতে জলৌকা গাত্র শীতল হয় বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র রক্তপান করে।

জলৌকা সংলগ্ন স্থানে বেদনা ও কণ্ডু হইলে বুঝিতে হইবে যে, জলৌকা বিতুল রক্ত

পান করিতেছে। তখন তাহাকে অপসারিত করিবে। যত্নপি জলৌকা সহজে পীড়িত স্থান ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহার মুখে একটু সৈন্ধব লবণ চূর্ণ দিবে। ইহাতে জলৌকা নিশ্চয়ই ব্যাধি স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

জলৌকা রক্তপান পরিত্যাগ পূর্বক পতিত হইলে, উহার গাত্রে চাউলের গুঁড়া মাখাইয়া এবং মুখ লবণ ও তৈল দ্বারা লিপ্ত করিবে। অনন্তর বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা পৃচ্ছ দেশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা ধীরে ধীরে মুখ পর্যন্ত নিক্ষেপ করিয়া বমন করাইবে। জলৌকা সমাক প্রকারে মোক্ষণ করিলে যদি উহাকে জলের মধ্যে ডাঙিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে আহারের চেষ্টায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে। কিন্তু জলে ফেলিলে যদি জলৌকা অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণ না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার সমাক প্রকার কার্য করা হয় নাই। ইরূপ অবস্থায় পুনরায় মোক্ষণ করান কর্তব্য। কেননা সমাক প্রকারে মোক্ষণ করান না হইলে উহাদের ইন্দ্র নদ নামক ছঃসাধ্য ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সমাক প্রকারে মোক্ষণ করান হইলে জলৌকাকে পূর্ববৎ নিয়মে যথাস্থানে রাখিয়া উপযুক্ত খাদ্যাদি দিয়া পালন করিবে।

জলৌকা প্রয়োগ হেতু সমাক যোগ বাতীত রক্তস্রাবের হীন, মিথ্যা এবং অভিযোগ হইতে পারে। সমাক যোগ হইলে ক্ষত স্থানে শত ধৌত ঘৃত মর্দন বা শত ধৌত ঘৃতযুক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড সংলগ্ন করিবে। হীন-যোগ হইলে রক্তস্রাবের জন্য ক্ষতস্থান মধু দ্বারা বর্ষণ করিবে। অভিযোগ হইলে শীতল জল সেচন করিবে অথবা শীতল জল

দ্বারা বন্ধন করিবে। মিথ্যাব্যবহার হইলে মধুর  
দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

জ্বলোকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইতে হইলে  
রোগীকে বল, শরীরের আয়তন, দোষের বল,  
দোষের প্রমাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া উপযুক্ত  
মাত্রায় রক্তমোক্ষণ করান কর্তব্য। ব্যাধি স্থান  
অন্ন হইলে অন্ন রক্ত এবং বৃহৎ হইলে অধিক  
রক্ত মোক্ষণ করান কর্তব্য।

শাস্ত্রে কি পরিমাণ রক্তমোক্ষণ করান উচিত  
যে সময়ে উপদেশ আছে। কিম্ব বর্তমান  
সময়ে সেক্ষণ মাত্রায় রক্তস্রাব করান যায় না  
বহিরা পরিমাণ লিখিত হইল না।

শস্ত্র দ্বারা রক্ত মোক্ষণ।

ত্রিদোষজ ব্যাধীত পদবিধি বিদ্রুপি (বড়-  
ফোড়া), কুষ্ঠ, বেদনায়ুক্ত বাতব্যাধি  
(Nervous disease), শরীরের একদেশ  
আশ্রিত শোথ, কর্ণপালি বাতবোগ সকল,  
গোদ, বিবাক্ত রক্ত, আব, বিদর্প, বাতজ গ্রন্থি,  
পিপ্পা গ্রন্থি, কক্ষজ, গ্রন্থি, বাতজ উপদংশ,  
পিত্তজ উপদংশ, কফজ উপদংশ, স্তনরোগ  
সম্ভে বিদারিকা, ক্রিমি দস্তক, দস্তবেষ্ট;  
উপকুণ, শীতাদ, পিত্তজ ওষ্ঠ ব্যাধি, রক্তজ  
ওষ্ঠ ব্যাধি, কফজ ওষ্ঠ ব্যাধি এবং অধিকাংশ  
ক্ষয় রোগে রক্ত মোক্ষণ কার্য্য প্রশস্ত। ক্ষীণ  
বাক্তির শোথ হইলে এবং পাণ্ডু, অর্ধ,  
উদর শোথ রোগী ও গর্ভিণী দ্বার শোথ হইলে  
রক্ত মোক্ষণ নিষিদ্ধ।

বায়ু দূষিত রক্ত ফণায়ুক্ত স্বেদ রক্তবর্ণ,  
কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ, পাতলা, শীঘ্র প্রসূর্য  
শীঘ্র হয় এবং সহজে জ্বরিতা যায় না। পিত্ত  
দূষিত রক্ত নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিত বর্ণ, শ্রাম-  
বর্ণ (হরিত কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণ) কাচা মাংসের  
আয় গন্ধযুক্ত, পিপীলিকা ও মক্ষিকাদির

অনভিলষিত (অর্থাৎ মক্ষিকাদি পিত্ত দূষিত  
রক্ত খায় না) সহজে জ্বরিতা যায়  
না। কফ দূষিত রক্ত গেরিমাটা মিশ্রিত  
জলের আয় পাণ্ডু লোহিত মিশ্রিত বর্ণ, শিথল,  
শীতল, লন, পিচ্ছিল, মাংস পেশীর আয়  
আকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং বিলম্বে স্রাব হইয়া  
থাকে। ত্রিদোষ কতৃক দূষিত রক্ত ভিন্ন ভিন্ন  
দোষ দূষিত রক্তের লক্ষণ যুক্ত কাঁজির আয়  
আভা বিশিষ্ট এবং চূর্ণকায় হইয়া থাকে।  
বিদোষ দ্বারা দূষিত হইলে দুই দোষের লক্ষণ  
বিশিষ্ট হইয়া থাকে। রক্তদোষজনক কারণে  
দূষিত রক্ত—পিত্ত দুষ্ট রক্তের লক্ষণ যুক্ত এবং  
কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

যে রক্ত ইন্দ্রগোপ নামক কীটের আয়  
উজ্জল রক্তবর্ণ বিশিষ্ট, অতি তরল বা অত্যন্ত  
ঘন নহে, এবং আলতা, কুঁচ প্রভৃতির আয়  
বর্ণ বিশিষ্ট—সেই রক্ত বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

অষ্ট দ্বারা দুই প্রকারে রক্তমোক্ষণ করান  
যাইতে পারে। অসময়ে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে,  
কিছা চিকিৎসকের দোষে ভাল রূপ অস্ত্র প্রযুক্ত  
না হইলে, অথবা অত্যন্ত শীতাদিক্য কিছা  
বাতাদিক্য কালে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে,  
ভোজনোর পূর্বে বা অব্যবহিত পরেই  
শস্ত্র প্রয়োগ করিলে এবং রক্ত গাঢ় হইলে  
রক্তস্রাব হয় না অথবা স্রাব হইলেও অন্ন  
মাত্রায় হইয়া থাকে।

যাহারা মত্তপান বা বিষ পান করিয়াছে,  
যাহারা মূর্ছগ্রস্থ, যাহাদের বায়ু, কৃষ্ণ ও  
ও পুরীষের অবরোধ ঘটিয়াছে এবং যাহারা  
নিজাভিভূত বা ভীত,—শস্ত্রপ্রয়োগে তাহাদের  
রক্তস্রাব হয় না।

এই সকল কারণে রক্তস্রাব না হইলে, সেই  
দুষ্ট শোণিত শরীরে থাকিয়া কণ্ডু, শোথ,

দাহ, পাক ও বেদনা জন্মায়; অনভিজ্ঞ চিকিৎসক-সত্ত্বক, অত্যন্ত উষ্ণ কালে, বর্ষাক্ত অবস্থায়, অতিরিক্ত শ্বেদ দেওয়ার পরে রক্ত মোক্ষনার্থ শস্ত্রপাত করিলে অথবা অতিরিক্ত বিদ্ধ হইলে অত্যধিক রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অতএব নাতিশীতোষ্ণকালে, বোগীকে অধিক শ্বেদ না দিয়া অথবা সূর্য্য বা অগ্নিতাপে অধিক তাপিত না করিয়া প্রথমে তিলের যথাগু পান করাইয়া পরে রক্তমোক্ষণ করিবে।

অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে শিরঃ শূল, অন্ধতা, অসিদ্ধ নামক চক্ষুরোগ, তিমির বোগ, ধাতুকল, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, একাঙ্গ রোগ, তৃষ্ণা দাহ, হিরা, পাকদাহ ও পাণ্ডুরোগ জন্মিতে পারে— এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটয়া থাকে।

রক্তস্রাব হইতে হইতে যখন দেখিবে যে, রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ রক্তস্রাব হইতেছে অথবা রক্তস্রাব আপনা হইতে বন্ধ হইয়াছে, কিম্বা দেহের বস্তুতা, বেদনার উপশম, রোগের হ্রাস এবং চিত্তের প্রকল্পতা উন্মিয়াছে, তখন সম্যক রক্তস্রাব হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। রক্তমোক্ষণশীল ব্যক্তিদিগের কুষ্ঠনৌলিকাদি স্বকদোব, গ্রন্থি রোগ, শোথ এবং রক্তদোষ জন্মিত ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইতে পারে না।

যতপি রক্তস্রাবনা হয়— তাহা হইলে, এলাচ, কর্পূর, কুঁড়, তগরপাতকা, আকনাদী, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, চিতা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গৃহপুষ্ক (বুল), হরিদ্রা, আকন্দের আটা ও ডহর করঞ্জের ফল এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে ঔষধি পাওয়া যায়— তিনটা চারটা বা সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তিলতৈল ও সৈন্ধব, লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, গেরিমাটা, ধুনা, রসায়ন, শিমুল, ফুল, শঙ্খ, বিষ্ণুক, মাস কলায়, যব ও গোধূম—এই সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা ধীরে ধীরে ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবে। অথবা শাল, সর্জ (শাল ভেদ), অজ্জুন, অরিসেদ (শুয়ে-বাবলা), কাকড়াশুদী ও ধানন রক্ষের ছাল চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। কিম্বা কার্পাসান্বিত বস্ত্র দগ্ধ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে অথবা সমুদ্রফেন ও (লাক্ষা) চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। পাট বা কার্পাসদ্বারা ক্ষতস্থানে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিলেও রক্তস্রাব নিবারণিত হয়। ক্ষতস্থানে শীতল বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে, রোগীকে শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে দিলে, শীতল গৃহে রাখিলে ক্ষতস্থানে শীতল দ্রব্য পার্ষেপ করিলে বা শীতল দ্রব্য প্রলেপ দিলে, ফার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শিরা পুষ্পে যেখানে বিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহার নিম্নে সেই শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্তস্রাব নিবারণিত হয়। অপিচ, রোগীকে কাকোলাদি মধুর গণোক্ত দ্রব্যের কাথে ইক্ষু চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। কৃষ্ণসার মুগ, হরিণ, মেঘ, শশক, মহিষ, বরাহ প্রভৃতির রক্তপান করিতে দিবে। ছগ্ন, স্বত, সংস্কৃত তৃণের ঘূষ ও মাংস রস সহ অগ্নিগ্ন অন্ন আহার করিতে দিবে। রোগীর অঙ্গ কোন উপসর্গ ঘটিলে নিম্নলিখিত নিয়মে যোষাহ্বারে তাহার চিকিৎসা করিবে।

অত্যধিক মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে, ধাতুকল বণতা অসিদ্ধা হয় এবং বাহ্য-অত্যধিক রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ক্ষতস্থানে একপাশে অন্নদ্রব্য

নাতি শীতল, লক্ষু স্নিগ্ধ ও রক্তবর্দ্ধক পথ্য, দ্রব গুল্ম সূক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

রক্তশ্রাব নিবারণ করিবার উপায় চারি প্রকার। যথা, সন্ধান, স্বন্দন, দহন ও পাচন। তন্মধ্যে কষায় দ্রব্য দ্বারা ক্ষতস্থানের সন্ধান বা সঙ্কেচন, শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্তের স্বন্দন, কাপাস নিষ্প্রিত বস্ত্র ভঙ্গ প্রয়োগ দ্বারা পাচন এবং দাহ বা দহন দ্বারা শিথি সঙ্কেচন ক্রিয়া করিতে হয়। শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্ত ঘনীভূত হইয়া রক্তশ্রাব বন্ধ না হইলে সন্ধান ক্রিয়া করিবে। সন্ধান ক্রিয়া দ্বারা রক্তশ্রাব বন্ধ না হইলে পাচন ক্রিয়া করিবে। এই তিন প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা রক্তশ্রাব বন্ধ না হইলে দহন ক্রিয়া করিবে। এই ক্ষেত্রে রক্তের দোষ নিঃশেষিত রূপে দূর হইয়া-

রক্তশ্রাব বন্ধ হইলে ব্যাধি পুনর্বার উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। দোষ থাকিতে রক্তশ্রাব বন্ধ হইলে পুনরায় আর রক্তশ্রাব না করিয়া সংশমন অর্থাৎ দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অবশিষ্ট দোষের প্রতিকার করিবে। কারণ রক্তই শরীরের মূল ও রক্ত দ্বারাই শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে। সেইজন্য রক্তকে যতপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত। রক্তকেই জীবন বলিয়া জানিবে।

রক্তশ্রাবের পর শীতল পরিষেবাদির জন্য বায়ু কুপিত হইলে ক্ষতস্থানে শোধ ও শুচীবেধবৎ যত্নগা হয়। একরূপ অবস্থায় ঈষৎস্বত ক্ষতস্থানে সেচন করিলে প্রতি-কার হইয়া থাকে।

## স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

—:—:—

(ডাঃ শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার এইচ, এল, এম, এস)

যে সকল সত্বপায়ে দেহ মনকে পরিচালন করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকিয়া সুখশান্তিময় সুস্থভাবে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়—সেই বচন সত্বপায়েই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কহে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রথম এবং প্রধান উপায় ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ কি? এই শব্দটির বিশেষণে দুইটি বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, একটি মতিবানন্দময় আত্মা, অর্থাৎ ব্রহ্ম; অপরটির

‘চর’ধাতু অর্থাৎ গমন। সুতরাং যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মসন্নিধান গমন করা যায়—তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আত্মদর্শন বা ব্রহ্ম-দর্শন ঘটে বলিয়াই আত্মদর্শনে অমরত্ব লাভ, পঞ্চাঙ্গের আত্মদর্শনেই মৃত্যু হওয়া বেদশাস্ত্র সম্মত মহাবাক্য\*। তাহা হইলে চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণান্তর সুহৃৎত বে মামব-জন্ম, বাহা কেবল ব্রহ্মদর্শন জন্মই অবধারিত

\* বেদাহমে তৎ পূর্ব্বং মহাস্তনাদিত্য বর্ণিতমঃ পরমাত্মং ।  
হয়নার।

বেদার্থ প্রতিপাদ্য আদিভাবগুণাতীত, পূর্ব্বকৈ তত্ত্বের সূত্র নিবারণের জন্য কোন উপায়ই থাকিতে অবশ্যপ্রাপ্য।

তবেই বিদিত্য ইতি মৃত্যুবেতি নাস্তঃ পশ্য বিদ্যাতে  
কবেই পূর্ব্বকৈ  
অবগত হইলে মৃত্যুকে অভিক্রম করিতে পারে বাহা  
হয়নার। সেই আত্মদর্শন অভাবে মৃত্যু

হইয়াছে, তাহার সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে মানবজাতি মীত্রেই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন অবশ্য কর্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনের প্রকৃত পন্থাই শ্রবণমননাদি অষ্ট প্রকার মৈথুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুক্রধারণ। এইজন্ত শাস্ত্র বলেন—

“মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধাবণাৎ ॥”

যে পুরুষ যে পরিমাণে শুক্রধারণ করে, তাহার জীবন সেই পরিমাণে দীর্ঘ ও সুখ সেই রূপ হয়, আর যে পুরুষ যে পরিমাণে বিন্দুপাত করে তাহার মৃত্যু সেই পরিমাণে অকালে এবং দুঃখজনকভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শুক্রধারণ অর্থে যে কেবল পুরুষ জাতিরই কর্তব্য তাহা নহে। উহা স্ত্রীজাতিরও অবশ্য কর্তব্য। কারণ স্ত্রীজাতিও শুক্র ধারণ রূপ ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ না হইলে উৎকৃষ্ট আঠবলাতে সমর্থ হন না বলিয়া সুসন্তান লাভ করিতে বা দীর্ঘায়ু ও বীৰ্য্যবতী হইতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রীজাতির শুক্র হয় না। ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক বাক্য। এজন্ত সূত্রত বলেন,—

“এবং মাসেন রসঃ শুক্রীভবতি স্ত্রীণাঞ্চাৰ্দ্ধমিতি। স্ত্রীণাঞ্চৈতি চকারঃ স্ত্রীণামপি শুক্রং ভবতি ॥”

একমাসে রস পরিপাকান্তে পুরুষের শুক্র রূপে এবং স্ত্রীদিগের শুক্র আঠবরূপে পরিণত হয়। “স্ত্রীণাঞ্চ” এই “চ” কার দ্বারা স্ত্রীদিগের শুক্র সম্বন্ধিত করা যায়। ইহার প্রমাণও সূত্রতেই উক্ত হইয়াছে; যথা, স্ত্রীলোকেরও পুরুষ সঙ্গের শুক্রপ্রাণিত হয়; কিন্তু সেই শুক্র গর্ভোৎপত্তির কোনই সহায়তা করে না। ঐ শুক্র শুক্রগর্ভের কারণ হয় না। তবে বিকৃত গর্ভের কারণ হইতে পারে।

শুক্র শব্দে শুক্র বলিলে কোন দোষ দেখা যায় না। কেন না শুক্র বাতবিকই নির্মল,

নির্মল বস্তু মাজেই শুক্র। আবার ‘র’ কার ও ‘ল’ কারে সমানতা থাকা হেতুও বহুবাহু সুবিধার জন্য শুক্র বলা যায়। ঋষিগণ কতক বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পরিপাকের রস চটতে মজ্জা পর্য্যন্ত ছয়টি ধাতুতেই মল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু স্বর্ণ যেমন সহস্রবার দ্রব করিলে স্তনির্মল হয়, তদ্রূপ রস বারবার পরিপক হওয়া প্রযুক্ত নির্মল অবস্থায় শুক্র প্রাপ্ত হয়। সেই শুক্র আবার পকিপাক হইয়া তাহার সার অংশ স্থল ও স্থল ভেদে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। স্নেহযুক্ত স্থলাংশ শুক্রে পরিণত থাকে আর স্নেহময় স্নেহাংশ ওজো ধাতু রূপে পরিণত হয়। এই ওজো ধাতু সমস্ত শরীরেই অবস্থিত করে। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল স্থির, স্নেহবর্ণ এবং শরীরের বল ও পুষ্টি কারক। মহামতি সূত্রত বলিয়াছেন যে, রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে পরম তেজোভাগ তাহাকেই ওজু কহে। সেট ওজো ধাতুই বল নামে অভিহিত হয়। এগুলে অভিপ্রায় এই যে, যে রস হইতে ওজু উৎপন্ন হয়, সেই রস ক্রমাগত সমস্ত ধাতুর স্থান প্রাপ্ত হইতে হইতে অবশেষে ওজো ধাতুতে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব রস যখন যে ধাতুতে উপনীত হয়, তখন উহা সে ধাতুরই তুল্য বলিয়া গৃহীত হয়, সুতরাং ওজো ধাতু যে সমস্ত ধাতুরই স্নেহভাগ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছদ্মের মধ্যে যেমন বৃত থাকে, ওজো ধাতুতে সেইরূপ বল অবস্থিত করে। অতএব ওজোধাতুই ‘বল’ নামে অভিহিত। ওজো ধাতু দশপ্রকার ঋণ বিশিষ্ট, যথা,— শুক্র, শীতল, কোমল, স্নিগ্ধ, বল, মধুর রস, স্থির, নির্মল, সিস্থিল ও স্থল।

দেহে শুক্র সঞ্চিত হইলেই রসের



বদ্ধিত হয়। ওজো ধাতু বদ্ধিত হইলেই দেহের তুষ্টি, পুষ্ট ও বন্যবীণ্য লাভ হইয়া দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, এবং জীবিত কাল পর্য্যন্ত উৎসাহ, দেহের শোভা, কমনীয় কাস্তি, দীর্ঘতা, লাভণ্য ও সৌক্যমার্গ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভুক্ত দ্রব্যের রস সম্বন্ধ পুনঃ পুনঃ পরিপক্বতা লাভ করিতে বলিতে একমাস কালে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীদিগের অর্ন্তব ও শুক্র রূপে পরিণত হয়। চপকে উক্ত আছে যে, ওজো ধাতু অষ্টবিন্দু প্রমাণ, সুতরাং অল্পমান হয় যে, উহা বড়জোর বহিঃ বিন্দু শুক্রের স্বজ্ঞাংশই হইবে। এদিকে এক মাসে স্ত্রীসন্তোকে যে শুক্র নির্গত হয়, তাহা নিশ্চয়ই বহিঃ বিন্দু অপেক্ষা নিতান্ত কমনহে। তবে দেখা যায় যে, খাদ্যাদির রস পরিপাকে এক মাসের পরিপ্রশমে যে শুক্র টুকু প্রস্তুত হইল, অতি বৎ সানাত্ত ক্ষণ সুস্থের লাগিয়ায় এমন একবস্তুরূপে অনাগ্রাসে অপব্যয় করা যথেষ্ট মূর্থতা আর কি হইতে পারে? সুতরাং কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক—সকলেরই বিশেষ সাবধানতার সহিত শুক্র ধারণ করা অত্র কর্তব্য। কামিনীগণের প্রতি আসক্তিতে বিবিক্ত উৎপাদন জন্ত দত্তাজেয় প্রভৃতি ঋণিগণ অবধূত গীতাদি শাস্ত্রে অনেক ঘণাজনক ব্যাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মাতৃস্বরূপা মহিলাগণের মনে আঘাত লাগিবার কথা, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, পুরুষ-দেহই যখন প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ের সংমিশ্রণে প্রস্তুত, তখন প্রকৃতি পরি-তাগের উপায় কি? আমরা একথা বুঝিতে পারি যে—

নৈব ব্রীণ পুনানেষ ন চৈবায়ং ন পুংসকঃ।

যদ যচ্ছবীরমাদন্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে।

৫ অঃ স্বৈতাশ্চতরোপনিষৎ।

অতএব হি যোগীকঃ স্ত্রীপুং ভেদং ন মজ্ঞতে।

সর্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ পরং পশুতি নারদঃ॥

১ অঃ প্রকৃতিগুণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।

সুতরাং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনরূপ ভেদ করিয়া কাহারো প্রতি ঘৃণামোক্তি সমীচীন বোধ করি না।

কিন্তু এই ব্রহ্মচর্যা অর্থাৎ শুক্রধারণ ব্যাপার কার্য্যতঃ অত্যন্ত কঠিন। একজ্ঞ ইহার অনুষ্ঠানকালে যে যে নিয়মাবলী থাকার অভাব করার নিতান্ত প্রয়োজন, তাহার বিরুদ্ধিকালে আমরা চরক গ্রন্থের শারীর স্থানের ৫ম অধ্যায় গ্রন্থে উক্ত করিতেছি। যথা— (১১ শ্লোক) “পুরুষ অহংকারাদি দোষে ভ্রাম্য-মান থাকে বলিয়া প্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে না। প্রবৃত্তিই পাপের মূল। নিবৃত্তিই অপবর্গ, ইহাই শাস্তি, অক্ষয়, ব্রহ্ম এবং মোক্ষ। এক্ষণে মমুকুর উপযোগী উপায় সকল ব্যাখ্যা করিব। • লোকদোষদর্শী মমুকু ব্যক্তি আচার্য্যের নিকট গমন পূর্বক উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য। অগ্নিসেবা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসরণ, ধর্ম্মশাস্ত্রার্থবোধ, ধর্ম্মশাস্ত্ররূপান্তরে আশ্রয় করণ, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকরণ, সাধুদিগের উপাসন, অসাধু পরিবর্জন, ছর্জনের সহিত অসঙ্গতি, সত্য, সর্বভূতহিতকর বচন, অপকৃষ বচন, অনতিকালে পরীক্ষাপূর্বক বচন, সর্বপ্রাণীতে আশ্রয় দর্শন, স্ত্রীদিগের অশ্রবণ, \* স্ত্রীদিগের অসঙ্কলন, স্ত্রীদিগের অপ্রার্থনা, স্ত্রীদিগের অনভিভাষণ, স্ত্রীদিগের সহিত সর্বসম্বন্ধ ত্যাগ প্রচ্ছাদনার্থ কোপীন, (গৃহস্তের পক্ষে অত্যন্ত

\* আকাশাদি পক্ষভূত এবং চৈতন্য এই ছয় ধাতুর সম্বন্ধকেই যখন পুরুষ কহে তখন পুরুষ চৈতন্য ধাতুর ও পুরুষ সংজ্ঞা হয়, সম ও মর্ষজিহ্ম একত্ব জট প্রকার প্রকৃতির চতুর্বিধি বস্তুই যখন পুরুষের সঙ্গি

মূল্যের সামান্য বস্তু) গৈরিক বসন, কন্বা সীবন  
 হেতু সূচী ও বস্ত্র খণ্ড, শৌচাধান হেতু জল-  
 কুণ্ডিকা, দাঁড় ধারণ ভিক্ষাচর্যার্থ পাত্র,  
 (এ গুলি সম্ভবতঃ সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা,  
 কিন্তু গৃহাশ্রমক্ষে ইহার মধ্যে নিরতি মার্গীয়  
 সম্ভবপর উপায় সকল গ্রহণীয়।) প্রাণ ধারণার্থ  
 বস্ত্র ফলমূলাদি যথাপ্রাপ্তি আহার, শ্রমাপ-  
 নয়নার্থ শীর্ণ শুষ্কপত্র তুণের আন্তরণ ও  
 উপাধান, ধ্যান হেতু যোগপট, কনে বৃক্ষাদিতলে  
 বাস, তন্ত্রা, নিদ্রা ও আনন্দাদি বিসর্জন,  
 কর্মত্যাগ, বিষয়ে রাগ-দ্বেষ না রাখা, নিদ্রা,  
 স্থিতি, গতি, দৃষ্টি, আহার, বিহার ও অঙ্গ চেষ্টা  
 দির আরম্ভে স্মরণপূর্বক প্রবৃত্ত হওয়া, সংকার  
 জ্ঞতি, নিন্দা ও অপনানে ওদাসীত্ব, শ্রম, শীত,  
 উষ্ণ, বাত বর্ষা স্নেহ ও দুঃখের সহিষ্ণুতা;  
 শোক, দৈন্ত, দেব, মদ, মান, লোভ, রাগ  
 জীর্বা ভয় ও ক্রোধানি দ্বারা বিচলিত না  
 হওয়া, অহঙ্কার প্রভৃতিকে উপদ্রব জ্ঞান করা,  
 বাহ্যজগতের সহিত পুরুষের সমানতা পূনঃ  
 পুনঃ আলোচন, করা; মোক্ষার্থ কার্যকালের  
 অতিক্রম না করা, যোগ্যে সর্বদা অনি-  
 র্বেদ, সন্তোষসাহ ও অপবর্গের উদ্দেশে সর্বদা  
 ধী, ধৃতি ও হৃদির বলাধান, ইন্দ্রিয়বর্গের  
 শাসন, চিত্তে চিত্তস্থাপন, আত্মাতে আত্ম  
 স্থাপন, ধাতুভেদে শরীরাবয়বের অবধারণ,  
 সমস্ত কারণবৎ দ্রব্যকেই দুঃখময়, অনাশ্রয়,  
 অনিত্য এইরূপ বোধ করা, সর্বপ্রকার  
 প্রবৃত্তিকেই দুঃখবোধ এবং সর্ব প্রকার  
 সত্তাসেই স্নেহবোধ করিয়া অভিনিবেশ, অপ-

বর্গের অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির বাধা দাঁড়া  
 থাকে। এইরূপে নিবৃত্তি মার্গের উপায় সকল  
 ব্যাখ্যা করা হইল॥ (২৩ শরীর স্থান ৫ম  
 অঃ, চরক।)

এই সকল সুখকর শুদ্ধির উপায় দ্বারা সূক্ষ্ম  
 বিত্ত হইয়া তৈলবহ্নাদিকরণ দ্বায়ে নাক্ষিত  
 দর্পণেব ত্রায় নির্মল হয় এবং গ্রহ, দেব, পুনি  
 ও নীহার দ্বারা আচ্ছাদিত স্থানগুলোর আর  
 শোভা পায়। দীপাশয়ের (জগনের) দ্বার  
 বন্ধ করিয়া দিলে তন্মধ্যে নির্মল শিখাবিশিষ্ট  
 দীপ যেমন স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ  
 ইন্দ্রিয়গণ সংবৃত হইলে আত্মাতে শুদ্ধ সত্ত্ব স্থির  
 ভাবে প্রকাশ পায়। (২৪ ঐ) শুদ্ধ সত্ত্ব  
 হইতে যে শুদ্ধ সত্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহার  
 বলে অতিবল মহানোহময় তমঃ ভেদ করা  
 যায়, যদ্বারা নিষ্পৃহ ব্যক্তি সর্বভাবে সত্যাব  
 অবগত হইয়া থাকেন, যদ্বারা যোগসাধন করা  
 যায়, যদ্বারা সাংখ্য (সাংখ্যাত্মক) হওয়া  
 যায়, যাহা প্রাপ্ত হইলে অহংকার থাকে না  
 এবং স্নেহ দুঃখের কাষণ অবগতি হয়; যাহা  
 থাকিলে অল্প কোন অবলম্বন আর আবশ্যক  
 হয় না; যাহা থাকিলে সর্বত্যাগ করা যায়;  
 যাহা থাকিলে নিত্য, অজর, শান্ত ও অক্ষয়  
 স্বরূপ পরব্রহ্মে গমন করা যায়, সেই শুদ্ধ সত্ত্ব-  
 বুদ্ধিই বিজ্ঞা; সিদ্ধি, মতি, মেধা, প্রজ্ঞা ও  
 জ্ঞানস্বরূপ। (২৫ ঐ) যিনি বাহ্যজগতের  
 বড় ধাতুনয় আত্মা এবং বড় ধাতুময় আত্মাকে  
 বাহ্যজগৎ দেখিতে পান, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ও লোকজ্ঞ  
 মহাত্মার জ্ঞান-মূল্য শাস্তি কখনই বিনষ্ট হইতে

(৬ লোক শরীর ১ম অঃ) তখন এই হিসাবে জীপুষ্ণ ভেদ নাই। সুতরাং জীঅন্নর পুরুষের এবং পুরুষ  
 অন্নর পুষ্ণর সমান কর্তব্য। কিন্তু পুষ্ণর উভয়ের মাঝামাঝিভাবে বাস অনিবার্য। কেবল  
 সংবদ অত্যাশ্রয় পরম্পর অবশ্যক থাকিতে হইবে।

পারে না। তিনি সর্বদা জাগরণ, স্বপ্ন ও স্মৃতি অবস্থায় সমুদয় ভূতকেই সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন, তিনি পরিণামে ব্রহ্মভূত হন এবং পুনর্জন্মের কারণ সকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (২৬ ঐ)

প্রাণ্ডক্ত চরক শাস্ত্রোক্ত উপায়গুলি গৃহী ও সন্ধ্যা উভয় আশ্রমী ব্যক্তির জন্মই নির্দিষ্ট হইয়াছে, উভার মধ্য হইতে সন্ধ্যাসীর কর্তব্য-গুলি বাদ দিয়া লইলেই গৃহীর কর্তব্য সহজে অবধারিত হইতে পারে। ফলতঃ শুক্রধারণ কবিয়া উদ্ধেরতা হইতে না পারিলে এবং সঙ্গপ্রকার প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ অভ্যাস করিতে পৰায় হইলে কখনই মানব আয়োগ্রতি বা বলবান্য লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান হইতে পারে না। যে কোন কারণে শুক্র নষ্ট হইলেই আয়ুষ্কর হয়, একজ্ঞ জীসংসর্গ পুরুষের সর্বদা পৰিচাল্য করা কর্তব্য।

যদি সঙ্গ করতোব বিন্দুস্তম্ব বিনশ্চতি।

আয়ুক্ষ্যো বিন্দুহীনাদসামর্থঞ্চ জায়তে ॥

দত্তাত্রেয়।

যদি জীসঙ্গ তরে তবে বিন্দু নাশ হয়। বিন্দু নষ্ট হইলে আয়ুক্ষ্য ও সামর্থ্যহীন হইয়া থাকে।

দীর্ঘাট ব্রহ্মতেজ বলিয়া বিখ্যাত। বিধেয়র অভাব হইলে মনুষ্যগণের তেজঃ কীর্ণ্য, সৌন্দর্য্য, শারীরিক বল, ইন্দ্রিয়গণের 'ক্ষুধি, স্মরণশক্তি, ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমস্ত মনুষ্যত্বই নষ্ট হইয়া দেহটি অর বাহ, যক্ষ্মা, প্রমেহ, শ্বাস, রক্তাক্ততা শক্তিহীনতা প্রভৃতি অশেষ রোগের আকর-ভূমি হয়, তজ্জন্মই দেশে অধুনান্ন রোগ সকলের সৃষ্টি হইয়া লোককে চিরক্লম্ব এবং অকাল মরণের দিকে অগ্রসর করিতেছে ফলকথা— কি স্বী আর কি পুরুষ—সকলেরই সম্বন্ধে শুক্ররক্ষা করা নিতান্ত কর্তব্য। বর্তমান সময়ে দেশের অধিকাংশ লোকই বেরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে এ সকল কথা প্রত্যেকেরই ভাবিবার বিষয়।

## ওলাউঠা চিকিৎসা।

—:—

(পূর্নামুত্তি।)

(হিকা)

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন।)

হিকা একটা প্রধান উপসর্গ। ইহা শীঘ্রই জীবনকে হিংসা করে, অথবা কষ্ট হইতে পুনঃ পুনঃ হিক শব্দ উথিত হয়। এই জন্মই ইহাকে হিকা বলিয়া থাকে। স্ততরাং হিকা নিবারণের জন্ম সর্বতোভাবে যত্ন করা উচিত। পূর্বে

যে সমস্ত অঙ্গম বিষবৃক্ত ঔষধ উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঔষধ গুলিই সদ্যঃ স্নেহ প্রশমক এবং সাতিশয় বায়ুবদ্ধক। যে প্রকার তাপ দ্বারা সরল বস্তু হইতে প্রথমতঃ রস, সিরিজ হইয়া পরিশেষে অম্ল, তখন তাহাই ওলাউঠার

অগ্রহায়ণ—৬

সেই রস ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে, সেই প্রকার ব্যাধি প্রভাবে, দেহমধ্যে আপনা হইতেই একপ্রকার তীক্ষ্ণ বিষ উৎপাদিত হইয়া প্রথমতঃ শরীরের স্নেহ বা স্নেহাংশকে তরল করিয়া স্রোতাবাহী পথগুলিকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। পরিণামে সেই বিষ দ্বারাই যখন শরীরস্থ বায়ু সমধিক প্রবল হইয়া উঠে, কিন্তু তরলীকৃত স্নেহ বা স্নেহাংশকে সহসা সঞ্চালিত করিয়া দিতে পারে না এবং আপনিও শরীর মধ্যে সর্বথা সঞ্চরগণীল হয় না, তখনই হিকা বা উদ্ধ্বাস আসিয়া জোটে। দেখিতে দেখিতে অনতি বিলম্বেই শরীর মধ্যে বায়ুর সর্বথা গতিরোধ হইয়া যায়। সুতরাং রোগিও নিত্যস্থ বিপন্ন হইয়া পড়ে; জীবনান্ত হইবার বড় বেশী বিলম্ব থাকে না। এই সময়ে বিহিত বিধানের রোগীর অবস্থা প্রণিধান করিয়া যদি জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই শরীরস্থ প্রাণ নাশক বিষের তেজ হীন-বল হইয়া পড়ে এবং তরলীকৃত স্নেহ বা স্নেহাংশও ক্রমশঃ বিস্তৃত ও সঞ্চালিত হইতে থাকে। তৎকালে বাহ্য-বিষ-প্রভাবে দৈহিক বায়ু শক্তিনান্ ও প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং বাতাদিক্য বশতঃ নাড়ীর গতিতে ক্রমশঃ চঞ্চল্য অন্তর্ভূত হইতে থাকে। নাড়ীর স্পন্দনে চঞ্চলতা উপলব্ধি করিলেই বুঝিতে হইবে যে, দৈহিক বিষের তেজ কমিয়া আসিতেছে। তখন শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিয়া বায়ুর সঞ্চিত সঞ্চিত সঞ্চিত করা উচিত। জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিবার পর যদি নাড়ী ধীরে ধীরে চঞ্চল না হইয়া অকস্মাৎ প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অল্পপঙ্ক্ত সময়ে বাহ্য বিষ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রযুক্ত বিষের অত্যাধিক্য দীর্ঘমতিবিশিষ্ট হইয়া যাইবে।

মধ্যেই শরীরস্থ বিষ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ঐ প্রযুক্ত বিষের দ্বারাই রোগীর জীবনী শক্তি ক্ষীণ, হীন ও নির্বাণ প্রায় হইয়া আসিতেছে। বিষ-প্রয়োগের পূর্বেই সর্বিশেষ ধীরভাবে আলোচনা করিয়া রোগীর মুখস্থ অবস্থার জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করা আবশ্যিক। উপযুক্ত সময়ে জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিলে যদি সেই বিষের ক্রিয়া ফলিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উপদ্রব নিবারণের জন্ত আর দ্বিতীয় উপদ্রব ব্যবস্থা করিতে হয় না। প্রযুক্ত জঙ্গমের দ্বারা জীবন বিনাশের মূলভূত দৈহিক বিষ বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই প্রযুক্ত বিষের পোষকতায় অর্থাৎ শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলে আপনা হইতে সকল প্রকার উপদ্রব তিরোহিত হইয়া যায়। এস্থলে হিকা প্রকৃতির উপদ্রব প্রথমক গতগুলি ঐযথ উল্লিখিত হইতেছে, তৎসমুদয় জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিবার পূর্বেই প্রয়োক্তব্য। হিকা নিবারণের জন্ত নিম্ন অঙ্গারায়িতে মাষকলাই, হিঙ্গুল অথবা গোলমরিচ দ্রব্য করিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে সেই ঔষধ প্রদান করিতে হইবে। হিঙ্গুল ও গোলমরিচ গব্য ঘূতে পেষণ করিয়া একখানি সাদা কাগজে চূরকের মত শূণ্যগর্ভ নল প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার একদিকে আগুণ জ্বালাইয়া অল্প দিব্ নাকের কাছে ধরিলে হিকা নিবারণ হয়। রজনীগন্ধা ফুলের একতোলা রসে ৫৬ রতি সোরা গুলিয়া পান করিতে দিলেও তৎক্ষণাৎ হিকা থামিয়া যায়। মুড়ি ভিজানো জলের সহিত সাদা চন্দন বসিয়া ৩০১০ ফোটা স্তন্যধ্বজের সহিত উহা গুলিয়া পান করাইলে পনের মিনিটের মধ্যে হিকা-বেগ উপশমিত হয়। নাতির উপরে কাসার বাটা মাখিয়া ক্রোবার মধ্যে তাহা ভাল চালিতে থাকিলে একবার একবার স্তন্যধ্বজের

হিক্রাব তিরোধান ঘটে। কস্তুরী ২৩ মাত্রায়  
হইয়া নখুর সহিত মাড়িয়া ডালিমের অথবা  
বেদনীর রস মিশ্রিত করিয়া ২১০ বার খাইতে  
দিলে আশান্তি ফল দেখিতে পাওয়া যায়।  
এ ক্ষেত্রে আমানিও একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।  
ইহা বাহু এবং অভ্যন্তর উভয় প্রকারেই  
প্রয়োগ করা যায়। বাহু প্রয়োগের প্রণালী  
বহু পণ্ড আমানিতে সিক্ত করিয়া শিরোদেশে  
পট্টা দেওয়ার নিয়ম। বস্ত্রখণ্ড সর্বদাই যেন  
সসিক্ত থাকে। অভ্যন্তর প্রয়োগের মাত্রা ২৩  
তোলা। আমকুলের রস—গব্য ঘূতে মিশাইয়া  
হবিগেব চন্দ্রে জল মাখাইয়া—নিধূন  
মুচ অঙ্গাবয়িতে কর্ণে, পার্শ্বে, নাভিদেশে  
স্বেদ প্রদান করিলে তিক্তা বিলীন হইয়া যায়।

### ( বমি )।

হিক্রার স্থায় বমিও একটা প্রধান উপদ্রব।  
ইহা দ্বারা শীঘ্রই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং  
ধাতু বসিয়া যায়। ইহা স্বরভঙ্গেরও অন্ততম  
কারণ। অতিরিক্ত দ্রব পদার্থ পান, অতি  
মিষ্ট ভোজন, অস্বস্তি আহার, অধিক লবণ  
ভক্ষণ, অকালে ভোজন, অপরিমিত ভোজন,  
অদায়া ভোজন, দ্রুত ভোজন এবং শ্রম-ভয়-  
উদ্বেগ-অজীর্ণ-ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা ও অপরাপর  
নানাবিধ বাত্বস কারণ বশতঃ বাতাদি দোষ-  
এবং শব্দ উৎক্লিষ্ট ও রেগে ধাবিত হইয়া মুখকে  
পীড়িত ও আচ্ছাদিত এবং অঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া  
উৎপাদন করিয়া নির্গত হয়। ইহাকেই  
( চর্দি ) বমি কহে। বমি হইবার পূর্বে  
সকলেরই জ্ঞানস, উল্কার, মুখ হইতে লবণাক্ত  
পাতলা জলস্রাব এবং পানাহারে নিরতিশয়  
বিষেব উপস্থিত থাকে। নাদা জীর্ণ,  
হৃদয় শিকর, আত্ম চ্যুতল, ষটমধু ও জল

বিচিত্র শাঁস—ঠাণ্ডা জলে অথবা বরফ জলে  
রগড়াইয়া, ছাঁকিয়া লইয়া, একটু একটু করিয়া  
পান করিতে দিলে বমির উদ্বেগ থামিয়া যায়।  
স্তনদুগ্ধে স্বেতচন্দন ঘষিয়া খাওয়াইলেও যথেষ্ট  
উপকার হয়। বরফের ছোট, ছোট টুকরা  
মুখে রাখিতে দিলেও বমির বেগের উপশম  
ঘটে।

স্বেতসর্ষে, বচ এবং লোধ বাটিয়া নাভির  
নীচে ষকুৎহানে প্রলেপ দিলে বমন বেগ বন্ধ  
হয়। আলতা, বাবলা ছাল, আমলা, মউরী,  
ছোলা, মিশ্রি একসঙ্গে ভিজাইয়া বেশ করিয়া  
রগড়াইয়া তাহাতে ২৪ কোটা লেবুর রস  
মিশাইয়া ২১০ চামচ করিয়া পান করিতে দিলে  
পিপাসা ও বমন বেগ উভয়েরই শান্তি হয়।

### শূল।

ওলাউঠা রোগে পেটে, তলপেটে এবং  
নাভিদেশে অত্যন্ত বেদন হইয়া থাকে।  
প্রথমত তত্ত্ব স্থানে চাপ ধরিয়া সেই চাপ  
অবিরত সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন  
বোধ হয়—যেন কেহ এক যোগে সহস্র সহস্র  
সূচাগ্র মুহমূর্ত্তঃ ঐ সকল স্থান পীড়ন  
করিতেছে এবং বক্ষ, পার্শ্ব, বস্তি প্রভৃতি স্থান  
যেন একেবারে তান্দিয়া যাইতেছে। ইহা  
বিবম যন্ত্রণাপ্রদ। শরীরস্থ স্লেখা জলিত  
হইয়া মলাশয়ে বাইবার সময় এবং ক্রিমিদোষ  
জন্ত এইরূপ বেদনার উপস্থিতি ঘটে। ইহাকে  
শূল কহে। পূর্বে কথিত বিসর্পণ চূর্ণ যন্ত্রণাময়  
যথাবিধি সেবন করাইতে পারিলে কাহাকেও  
এই রোগে ষড়্ বেদী আক্রান্ত হইতে হয় না।  
পূর্বে সঞ্চিত দোষের প্রাকোপ কল্প বদিক্ত  
কখনও কখনও এই বেদনার স্ফূর্ত্ত ঘটে, তাহা  
হইলেও তাহার উপশমের জন্য বিশেষ কোন

চেষ্টা করিতে হয় না। প্রায়শঃ আপন-  
হইতেই ইহা তিরোহিত হইয়া যায়। ঈদৃশ  
বেদনা দূর করিবার জন্য অর্দ্ধ তোলা স্বৈত  
অপামর্গের মূলের রস (আপাদ) সহ স্ব স্ব  
পরিমিত হরিণ্ডাল তণ্ডু বা বিশোধিত, শঙ্খবিষ  
সেবন করিতে দিবে। ২৩ বার, সেবন  
করাইলেই বেদনা নিবারিত হয়। শোধিত  
কুঁচিলা ২ রতি এবং কমলাগুড়ি ১ আনা—  
একত্র পেষণ করিয়া এক ছটাক চুণের জলে  
ভিজাইয়া রাখিবে। কিছুকাল পরে সেই  
জল ছাঁকিয়া মধ্যো মধ্যে সেবন করাইলে  
ক্রিমিদোষজনিত বেদনার শান্তি হয়। কচি  
মুলার রসের সচিত উক্ত ঔষধ সেবন করিতে  
দিলেও বেদনা দূরীভূত হয়। স্তম্ভ, শ্বেত  
সর্ষপ, সজিনাছান বাটিয়া প্রলেপ দিলেও  
এক্ষেত্রে বিশেষ ফল দেখিতে পাওয়া যায়।  
তারপিন তৈল মর্দনেও উপকার হইয়া থাকে।

ସନ୍ତାନ ଓ ଭ୍ରମଣ ।

রস রক্তাদি সপ্ত ধাতু একত্রিত হুত দ্রবোর  
সাধারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সপ্ত  
ধাতু যথাক্রমে পরিশুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া দুই ভাগে  
বিভক্ত হয়। তাহার মধ্যে অসার ভাগকে  
মল এবং সার ভাগকে শরীর পোষক উপাদান  
কহে। মেদের যে অসার ভাগ, তাহাকে মেধ-  
মল অথবা ঘর্ম্ম কহে। ইহা রোমকূপ দ্বারাই  
নির্গত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শরীরস্থ যে  
~~সকল~~ স্রাবীয়াংশ রোমকূপদ্বারা নির্গত হয়,  
অনয়া তাহাকেই ঘর্ম্ম বলিয়া থাকি।  
ওলাউঠা রোগে মলদ্বার দিয়াও এই সকল  
স্রাবীয়াংশ নির্গত হয়। কিন্তু তাহা ঘর্ম্ম বলিয়া  
কথিত হয় না। যে কোন প্রকারেই হউন  
না কেন, শরীর হইতে মল নিসারণ হইলে

থাকিলেই প্রথমত: অত্যন্ত পিপাসা হয়, শেবে  
অঙ্গ সমূহ ক্রমশ: শীতল ও শিথিল হইতে  
থাকে। আয়ুর্ষেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে,  
শ্রম বা বলক্ষয়াদি—বাত প্রকোপ হেতু  
দ্বারা অথবা কটু অম্ল, ক্রোধ ও উপবাসাদি—  
পিত্তবর্দ্ধক কারণ বশত: স্বস্থান সঞ্চিত কুপিত  
পিত্ত, বায়ুর সহায়তায় উর্দ্ধপ্রস্থত তালু ও  
ক্লোম (পিপাসাস্থান) স্থানে গমন করিয়া  
তৃণা উৎপাদন করে। জলবাহী স্রোত:  
সমূহ বাতাদি দোষ কর্তৃক দূষিত হইলে  
পিপাসা জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক ঘর্ম্ম ও  
পিপাসা—এই দুইটি উপদ্রব বড়ই ভয়াবহ।  
ইহাদিগের দ্বারা শীঘ্রই মোহ উপস্থিত হইয়া  
জীবনান্ত হইতে পারে। এ অবস্থার কখনও  
জল পান করিতে নিষেধ করা উচিত নহে।  
যদিও অতিরিক্ত মাত্রায় জল পান করিলে  
প্রকৃত পক্ষে পাঁড়ার কোন উপকার না হইয়া  
অপকারই ঘটে স্বাকার করি, কিন্তু তাহা  
হইলেও আশু জীবন রক্ষার জন্ত মধ্যে মধ্যে  
কপূর বাসিত পরিস্কৃত শীতল জল অথবা  
বরফ জল দেওয়া সম্ভব। সেই সঙ্গে হেতু  
প্রমোদক ঔষধও প্রয়োগ করাও কর্তব্য।  
যাদৃশী শক্তি প্রভাবে শরীর হইতে যে জাতীয়  
বস্তু নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়, তাদৃশী শক্তি  
বিশিষ্ট অল্প জাতীয় বস্তু প্রয়োগ না করিলে  
কখনও সেই নিঃসরণ-ক্রিয়ার রোধ হইতে  
পারে না।

অপক নীরস সুপারি স্বস্বরূপে চূর্ণ করিয়া  
অধিক রসিত মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ নীতল জলের  
সহিত সেবন করাইলে, 'দর্প', 'তৃষ্ণা' এবং 'মোহ'  
প্রভৃতি দূরীভূত হয়। অথবা "বড়ল পানিরে"র  
বিধানানুসারে সুপারির কাথ প্রস্তুত করিয়া  
মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে বিশেষ উপকার হয়।

দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্রবর্ণ অর্থাৎ কচি কচি আমের পাতা ও কাল জামের পাতার কাথ সেবন করিতে দিলেও পিপাসা উপশমিত হয়। স্নহ শরীরে অধিক মাত্রায় সুপারি ভক্ষণ করিলে যে তৃষ্ণা, মূর্ছা, ঘর্ম্ম, শরীরে অস্থিভা, বৃকে পেটে খালি ধরা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, ইহা সর্বজন বিদিত, কিন্তু যাহাতে যে রোগের উৎপত্তি বেশ প্রাধান্য পূর্বক সমীচীনতার সহিত প্রয়োগ করিতে

পারিলে সেই সেই দ্রব্যে সেই সেই রোগের তিরোধান ঘটে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ওলা-উঠা রোগ সংক্রামক হইলে অনেকে একটি গোটা সুপারি হাতে বাঁধিয়া দিয়া থাকেন, স্নতরাং ইহা দ্বারাও সুপারিতে বিশ্বচিকিৎসা। দমনের শক্তি অমুখ্যানযোগ্য। অনেক দ্রব্যই বাহ্য এবং অভ্যন্তর প্রয়োগে যুগপৎ বিশ্বদ্রব্যবহ স্রবণের উৎপাদন করিয়া থাকে।

## প্রাচীন চিকিৎসকের টোটকা ও মুষ্টিযোগ । \*

(শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র লাহিড়ী)

মৃতবৎসার মাছুলী।— অপামার্গের শিকড় ভাবিজে ভরিয়া শনি অথবা মজলবারে শুদ্ধ হইয়া ধারণ করিলে মৃতবৎসাদোষ দূর হয়।

রক্ত আমাশয়ে।—বুনো পুঁইপাতা ৪-৫টা গব্য ঘূতে ভাজিয়া খাইলে যে প্রকার রক্ত আমাশয়ই হউক না কেন—নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

শ্বাসে।—আছলা স্রোণপুষ্পের (গল-ঘসিয়া), শিকড় ১০টা, মরিচ ২১টা প্রাতঃস্নান করতঃ যথাশক্তি গরম জলসহ উক্ত ঔষধ খাইতে হইবে এবং তৎপর গরম কাপড় দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করতঃ ৩ ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে ৭ দিন করিলে প্রবল শ্বাস দূর হয়।

উপদংশে।—ষেত করবির মূল ঘসা

ববেত্রভূমিতে বর্গীর ধ্বংসকর কবিরাজ ৬জয়রাম লাহিড়ী মহাশয়ের নাম সর্বজন বিদিত। তাঁহার চিকিৎসা প্রত্যেক সাক্ষাৎকার লোক এখনও অনেকেই জীবিত আছেন। কীর্তিমান কুশলী কবিরাজ অনেকটাই ছিলেন, এখনও অনেকেই আছেন। বর্গীর মহাত্মা কবিরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করে এর মুষ্টিযোগ লইয়া লোকে যাহাকে বলে “শুধু হাতে বাব মারা”, বাহার অন্যথা সাধারণ কার্য প্রণালী দ্রিক তদ্রূপ ছিল। চিকিৎসার্থে যেখানেই আহুত হইতেন না কেন, তাঁহার অযোজ্য ঔষধের কুত্রাপি অভাব হইত না। তাই আজ আমরা তাঁহার অমোঘ মুষ্টিযোগ ও ঔষধাবলী ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বারান্তরে বর্গীর কবিরাজ মহাশয়ের বিচিত্রতাপূর্ণ শিকাগ্রন্থ অলোকসামান্য জীবন-আখ্যায়িকা লিখিতেও প্রয়াসী হইব। ইতি শুধু প্রাতঃস্নানের কবিরাজ ছিলেন না, যোগের মুষ্টিমান অদ্বৈত বলিগাও অনেকের ধারণা ইহাও উপর্য উপর অধিক মাত্রায় ছিল।—লেখক।

১ তোলা রক্তচন্দন ঘসা ১ তোলা, একত্র  
মিশাইয়া ৩টা বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।  
ঐ বটিকা ১টা করিয়া প্রত্যহ প্রাতে নিষপত্র  
ও শুল্কের রস সহ সেব্য।

নাসা শু রক্তপিত্তে।—ছাগদুগ্ধ ১০  
পোয়া, (একপোয়া) রক্তচন্দন ঘসা, মধু, গব্য-  
ঘৃত ও চিনি প্রত্যেক ১ তোলা একত্র মিশ্রিত  
করিয়া যজ্ঞডুম্বরের রস সহ সেব্য।

স্বপ্নদোষে।—আফিং ১০ আনা (এক  
আনা) রসসিন্দূর ১০ আনা (চারি আনা) শীতল  
জল সহ উক্ত ঔষধ মর্দন করিয়া একটি সর্ষপ  
অপেক্ষা সামান্য নাত্র একটু বড় করিয়া বটি  
প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ বটি রাত্রে গরম দুগ্ধ  
২ তোলা সহ সেব্য।

প্রমেহে।—কচি শিমুল মূলের ছায় ১০  
পোয়া, কলমী সোরা ১০ ছটাক, চন্দনের বাঁজ  
১ তোলা শ্বেতচন্দন ঘসা ২ তোলা একত্র মর্দন  
করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিতে  
হইবে। কচি শিমুল মূলের রস ২ তোলা মধু  
ও কাবাব চিনির চূর্ণ সহ প্রাতে ও বৈকালে  
এক এক বটিকা সেব্য।

ঘায়ে।—ঘাসে—তিল তৈল ১০ পোয়া,  
বিভক্ত মোম ১০ ছটাক কুচিলা অঙ্গ তোলা,  
নিমপাতা বাটা ১ তোলা, শ্বেতধূনা অঙ্গ তোলা  
একত্রে মিশাইয়া একটি মৃতপাত্রে বাঁধিতে  
হইবে। এই ঔষধ যে প্রকার ক্ষত হউক না  
কেন, ময়ের দ্বারা কার্য্যকরী হইবে।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:—

দান।—গয়ার গোস্থামী রামধন পুরী  
মহাশয় কিছুদিন হটল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞা-  
লয় পরিদর্শনে প্রীতিলভ করিয়া ইহার  
উন্নতি করে ৫০ টাকা দান করিয়াছেন, এ  
জন্ত আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ইনকুয়েঞ্জার সংবাদ।—ইনকুয়েঞ্জার  
প্রকোপ বাঙ্গালা দেশে ক্রমশঃ কমিয়া  
বাইতেছে। যুক্ত-প্রদেশেও ইনকুয়েঞ্জার  
আক্রমণ পূর্ব কম দাঁড়াইয়াছে। করাচী ও  
মাক্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোনো কোনো স্থানে  
ইহার আক্রমণের প্রতি কিছু ক্রটি পাইয়াছে।

কলিকাতার মৃত্যু-হিসাব।—

কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা গত বৎসর যেরূপ  
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ১৯০৭ সালের  
পর হইতে আর যেরূপ দেখা যায় নাই। গত  
বৎসর কলিকাতা সহরে মোট মৃত্যুসংখ্যা ৩১,  
৩৭১। এই মৃত্যুর হারের হাকার করা হিসাব  
৩৫.০। উহার পূর্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯০৭  
সালে কলিকাতার লোক মরিয়াছিল মোট  
২১,৩৬০ জন এবং ঐ মৃত্যুর হারের হাকার  
করা হিসাব হইয়াছিল ২৩.৮। এই হিসাবে  
বুঝা যায় ১৯০৭ সাল আগের ১৯০৬ বৎসর



মোট মৃত্যু সংখ্যা দশ হাজার এবং হাজার করা ১১০ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি কিরূপ ঘটিতেছে, তাহা এই মৃত্যুর হিঁসাব হইতেই উপলব্ধি হইতে পারে।

দিল্লীর হাকিম।—কয়েকদিন হইল দিল্লীর স্বনামখ্যাত হাকিম হাজিমুদ্দ আহমদ খান এবং সুলতান সিং রায় বাহাদুর এবং ডাক্তার বি. কে. মিঃ অর্থাৎ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শনে প্রাতিলাভ করিয়া প্রত্যেকে ১০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। হাকিম সাহেব এবং সুলতান সিং রায় বাহাদুর দিল্লীর আয়ুর্বেদ কলেজের জন্ত টাকা ভুলিতে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন এবং সেখানে আড়াই লক্ষ টাকা ভূমি দিয়া ফরিবার সময় কলিকাতার পথে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দিল্লীর এই আয়ুর্বেদ কলেজ হাকিম বাহাদুরেরই প্রহৃত চেপ্তার ফলপ্রসূত। লর্ড হার্ডিংজের যত্নে একলক্ষ টাকা পাঠিয়া হাকিম বাহাদুর এই কলেজের উন্নতিকল্পে বন্ধ পরিকর হন। ব্রহ্মদেশের লোকে দিল্লীর আয়ুর্বেদ কলেজের কণ্যা-কামনার চাঁদা দিয়া অবশ্যই ধন্যবাদার্থ কিন্তু কলিকাতার আয়ুর্বেদ কলেজটির উন্নতির জন্ত ব্রহ্মদেশের অধিবাসীগণ কি করিতেছেন?

সদনুষ্ঠান।—গত ১৩ই ও ১৪ই

ডিসেম্বর জেলা দাতব্য সমিতি হইতে জোড়াসাঁকো রাজবাটিতে তের শত দরিদ্র ও পীড়িত লোককে বস্ত্রদান করা হইয়াছিল। এতদ্-পক্ষে শীতবস্ত্র বিতরণের জন্ত বাবু কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তিন শত টাকা সমিতির হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

চিকিৎসালয়ে দান।—মেদিনীপুরের 'নীহারে' প্রকাশ-কাথির প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার মহাশয় সেখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের মহিলা বিভাগের উন্নতি করণে শতকরা ৩ টাকা স্বদের ৩০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন ইহার পূর্বে ঐ উকীল মহাশয় ঐ উদ্দেশ্যে ৪০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন।

শিশু মৃত্যু।—বিহার ও উড়িষ্যায় বৎশিশু জন্মে, উহার তৃতীয়াংশ জন্মের অন্তর্কাল মধ্যেই মরিয়া থাকে। সমগ্র ব্রহ্মদেশে শিশু মৃত্যুর মরণের হিঁসাব হাজার করা ১৮৫ এবং সমগ্র ভারতে উহার হাজার করা হিসাব ২০৬। বিহার ও উড়িষ্যার হাজার করা হিসাব ১০৮। ইংলণ্ডে হাজার করা ২১ জন শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

## সমালোচনা ।

—\*—

রোগ নির্ণয় সংগ্রহঃ। প্রথমঃ ভাগঃ। কবিরাজ শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীতঃ প্রকাশিতঃ। ৬৪নং সিমলা ষ্ট্রিট, কলিকাতাঃ

গ্রন্থকারের নিকট পওয়া যায়। মূল্য ১২ টাকা। রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি অতীব ভাবে নিখিত হইয়াছে। এক একটি

প্রধান লক্ষণ কতকগুলি রোগে দেখা যায়, তাহার তুলনিকা লিপিবদ্ধ করিয়া রোগ নির্ণয় প্রণালীর সূচনা ভালই করা হইয়াছে, কিন্তু যথার্থ রোগনির্ণয় ইহা দ্বারা হইবে কিনা বুঝা গেল না, তবে গ্রন্থকারের উত্তম প্রশংসনীয়। ২য় ভাগে রোগনির্ণয়-প্রণালী প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে না।

দ্রব্যগুণ দর্পণম্। প্রথম ভাগঃ। কবিরাজ শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জনেন প্রণীতঃ প্রকাশিতঃ। মূল্য ১।০ টাকা। দ্রব্যগুণ শিক্ষার ইহা একখানি উৎকৃষ্ট প্রাথমিক গ্রন্থ। দ্রব্যগুণে জ্ঞান না থাকিলে সূচিকিংসক হওয়া যায় না। চিকিৎসা বিষয়ের প্রথম শিক্ষার্থীগণ যদি এই পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে চিকিৎসার কর্মক্ষেত্রে তাঁহার উপকৃত হইবেন। তবে ২য় ভাগ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাও অসম্পূর্ণ গ্রন্থ।

সন্ধি বোধনম্। দাঁকুড়াস্তবতি বিষ্ণুপুর বাস্তব বৈদ্য শ্রীভোলানাথ দাঁশ শর্ম্মা প্রণীতঃ প্রকাশিতঃ। মূল্য ১।০ আনা। গ্রন্থকার ব্যাকরণের সন্ধিগুলিকে কবিতা করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস সফল হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিলাম না। ব্যাকরণের মত নীরস জিনিষকে সরল কবিতার আবুদ করিতে যওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কেবল রাঘব ভট্টাচার্য্যের এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। তিনি পদ্যো শিত্দিগকে ব্যাকরণের সূত্রগুলি অতি সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি সূত্র এইরূপ—

“স্বকার স্বকার স্বকার পরে ন কার যদি থাকে।

কচ্ করি তার কাটি মাথা—কোন বাপে তার রাখে।”

এই শ্লোকটির অনুসরণে আলাচো গ্রন্থের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

স্বকার স্বকার স্বকারের পরে ন কার থাকে যদি, মাত্রাটি তার কেটে ফেলে মাথাটা তুলে দি।

রাঘব ভট্টাচার্য্যের—এরূপ অনুসরণ তো এ গ্রন্থে যথেষ্ট আছেই, তা’ ছাড়া যেখানে গ্রন্থকারের নিজস্ব সূত্র রচিত হইয়াছে—সেই স্থানেই সেই সূত্র গুলি দুর্বোধ্য হইয়াছে। ইহার নিজস্ব একটি কবিতারও নমুনা দেওয়া গেল,—

অক শব্দ থাকলে’ পরে জানালা বুঝালে, গোএরও অব হয়,—না হয় প্রাগম্ভ হোলে।

তবে এই গ্রন্থ মধ্যে যে স্তোত্রাবলী লিখিত হইয়াছে, সে গুলি উৎকৃষ্ট। স্তোত্রগুলি যেরূপ সুমধুর ছন্দে লিখিত, সেইরূপ সত্যাব প্রবণ।

গান। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস। শ্রীবিহারি লাল সরকার কর্তৃক প্রণীত। মূল্য ১।০ আনা। আদ্যাশক্তি জগন্মাতার আশ্রমী ও বিজয়া প্রসঙ্গে এই গান বিরচিত, ইহা ভিন্ন শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশ্রীশ্যামার উদ্দেশ্যেও কয়েকটি গান রচিত হইয়াছে। এই গান গুলির রচয়িতা বিহারি বাবু এখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ সম্পাদক। তাহার ছটায় এবং ভাবের সম্পদে “বঙ্গবাসী”র এত যে গৌরব—তাহা এখন বিহারি বাবুরই প্রত্নদে। “গান” সেই বিহারি বাবুর পরিপক্ব হস্তের অঙ্কিতকীর্তি। শুধু ভাব ও ভাষার কথা নহে, এই গান গুলিতে বিহারি বাবুর অন্তর্নিহিত আবেগ ধারা যেন আকুল হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই গান গুলির প্রত্যেক কথাটি যেন তক্ত সাধকের প্রাণের উচ্ছ্বাস। বাল্যলীল ঘরে ঘরে এই গান গুলি গীত হউক, কুর্কর্ণ-নিয়ত বাল্যলীল সন্তান আবার মায়ের নামে আগিয়া উঠুক, বাল্যলীল ঘরে ঘরে আগমনী ও বিজয়ার গানে সে কালের ধর্ম্মভাব আবার ফিরিয়া আসুক—ইহাই আমরা কামনা করিতেছি।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—পৌষ।

৪র্থ সংখ্যা।

## পল্লী-স্বাস্থ্য।\*

—:—

এমন একদিন ছিল—যে দিন বাঙ্গালার পল্লীতে কিছুই অভাব ছিল না, দেহ ধারণের সকল সামগ্রীই বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে প্রকৃতি দেবী সমস্তে সাজাইয়া রাখিতেন। নদী বহন বলিয়া পল্লীভূমির যে প্রসিদ্ধি ছিল, তাহা হইতে পল্লীবাসীর বিশুদ্ধ জলের অভাব হইত না। দেহধারণের জন্ত জল, বায়ু ও আলোক—যে তিনটি দ্রব্যের একান্ত অপেক্ষা, বাঙ্গালার সকল পল্লীবাসীই সে তিনটি দ্রব্য বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হইত। এখন বাঙ্গালার অনেক নদী হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে, পুকুর-দীর্ঘিকা সকল বহুকালাবধি শুষ্কতার-অভাবে পঙ্কিল হইয়াছে, কাজেই অনেক পল্লীতেই এখন জলকষ্ট হইয়াছে। আর বায়ু ও আলোক—নিদাঘ সমুদ্র-পল্লী-কূষকের সঙ্গে শাল তমাল পত্রের মর্শ্বের বায়ু এখনও

প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু পল্লীভূমির চতুঃপার্শ্বস্থ নালাডোবা নিষ্কৃতির ফলে সে বায়ুও যেন এখন কতকটা বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতিরাজী পল্লীমাতার উদ্দেশে এখনও মার্জিত ময়ূখ এবং হিমাংশু কিরণ বিকীরণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অবিশুদ্ধ জল বায়ুর নিকট সে কিরণ সম্ভার বিশেষ কার্য্য করিতে পারে না। পল্লী গ্রামে এইজন্যই রোগের আলা এবং তাহা হইতেই বাঙ্গালার পল্লীগুলি অশান হইতে বসিয়াছে।

কিন্তু এমনটা হইল কেন? কাহার অভি-সম্পাতে পল্লীভূমির একরূপ হ্রগতি হইল? ইহার উত্তর দিতে হইলে পল্লীবাসীকেই ইহা ~~হিসাব~~ <sup>কারণ</sup> বলিয়া আমরা নির্দেশ করিব। যে জল—দেহ ধারণের প্রধান জিনিষ,—সে জলের হ্রগতি পল্লীবাসী নিজ হইতেই উপস্থিত করিয়াছে।

\* কলিকাতা আয়ুর্বেদ সমিতির ১ম বার্ষিক ৩য় সাধারণ অধিবেশনে প্রস্তুত।

স্বীকার করিলাম,—বাঙ্গালার অনেকগুলি নদীর  
 হ্রগতি নানা কারণে হইয়াছে এবং পল্লীভূমির  
 স্থানে স্থানের বায়ুও তজ্জন্তু অবিভক্ত হইয়াছে, -  
 কিন্তু সে সেকালের দীঘিকা-পুষ্করিণীগুলির  
 পক্ষোদ্ধারের জন্ত একালের পল্লীবাসিগণ কি  
 কোনোরূপ চেষ্টাশীল হইয়াছেন? জল দেহ  
 ধারণের প্রধান সামগ্রী বলিয়া জলের অত  
 নাম জ্ঞান। এই জন্তই আমাদের দেশে  
 পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থার পাননের  
 জন্ত নূতন নূতন জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা হো  
 দুরের কথা, পূর্বপুরুষ দিগেব প্রাচীত  
 দীঘিকা-পুষ্করিণীর সংরক্ষণের জন্ত ও এখন কর্মজন  
 চেষ্টাশীল? আগে পল্লী-জননীকৃত সাহায্যগণ  
 স্বকীয় শ্রীবুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রো জন্মভূমির  
 শ্রীবুদ্ধির জন্ত মনোভিন্দন করিতেন।  
 তখনকার দিনে গ্রামে একজন শ্রীমান পুরুষ  
 জন্মগ্রহণ করিলে, সে গ্রামবাসি শ্রীসম্পন্ন হইয়া  
 উঠিত। তখনকার দিনে অনেক গ্রামেই  
 দেল হইত, ভগোৎসব হইত, রথ হইত,  
 রান হইত—এক কথায় বাঙ্গালার হিন্দুর  
 পল্লীগুলিতে বারমাসে তের পাক্ষ হইত।  
 অনেকগুলি সমৃদ্ধি সম্পন্ন পল্লীতে বর্ষে বর্ষে  
 বারইয়ারি পূজাও হইত। ইহার ফলে ধর্ম  
 কর্ম অত বাধা হয় হউক,—তা' ছাড়া প্রতিমা  
 বাহির করিবার জন্ত গ্রামের রাস্তাঘাট গুলি  
 পরিষ্কার করা হইত, ফলে প্রতি বর্ষেই  
 ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, গ্রামের বন-  
 জঙ্গলগুলি কাটির ফেলা হইত। ধর্ম কর্মের  
 কথা ছাড়িয়া দিলেও—সাহায্যকারক দিয়াও  
 ইহাতে যে পল্লীগুলির বিশেষ উপকার  
 হইত—তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ম্যালেয়িয়ার তাড়নে পল্লীমাতার সুসন্ধান  
 গণ অধুনা বিদেশবাসী। কিন্তু সেই ম্যালেয়িয়া

বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কিরূপভাবে প্রবেশ  
 করিবার সুযোগ পাইল—সে কথাটি একটু  
 ভাবিয়া দেখুন দেখি! ম্যালেয়িয়া কবে  
 আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছে তাহা  
 সঠিক ইতিবৃত্ত নাই, কিন্তু ১৮০৪ খৃঃ অব্দে  
 মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের কয়েকজন  
 ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা  
 একটু পরিচয় পাওয়া যায়। এই ১৮০৪ খৃঃ  
 অব্দ ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল। ভারতীয়  
 বৃত্তি নিরত-বাঙ্গালার চাকরি করিবার স্পৃহা  
 এই সময় অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিতেছিল এবং  
 তাহারই ফলে দেশ নাহকার ব্রহ্মনিগম  
 জননী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ পুরুষ  
 সপরিবারে কম্বলে আবাস হান নিগমের  
 ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তখনও বাঙ্গালার  
 জলকষ্ট সম্পূর্ণরূপে হয় নাই, কিন্তু অনেক  
 পল্লীভূমিই জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল,  
 তবে তখনও সে সকলের পরিণতি গুব বেশী  
 রূপ হয় নাই বলিয়া সে আক্রমণের প্রতিও  
 অধিক হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহার বিশ  
 বৎসর পরে রাজা মীতারাং রায় প্রতিষ্ঠিত  
 মহম্মদপুর ধ্বংস করিয়া এই দুরন্ত ব্যাধি যখন  
 চিত্রানদীর উভয় পার্শ্ব দিয়া গ্রামের পর গ্রাম,  
 জনপদের পর জনপদ উচ্ছেদ করিতে লাগিল,  
 যখন নন্দাঙ্গার মত গ্রাম, গদাখালির মত  
 বাণিজ্য বহন বন্দর,—তা'রপর নদীয়ার  
 কাঁচড়াপাড়া, চাকদহ, বীরনগর প্রভৃতি  
 গ্রামগুলি বিধস্ত করিয়া তুলিল,—তখন  
 পল্লীবাসিগণেরও সে কালের চাকচলন  
 অনেক বদলাইয়া আসিয়াছে। তখন অনেক  
 পল্লীরই জলাশয়গুলি হাজিয়া হাজিয়া উঠিয়াছে,  
 অনেকের নাট মন্দির ও চতীমণ্ডপে অথবা  
 বটের শিকড় গাছাইরাছে অনেক পণ্ডিত

গ্রামাদের গ্রীষ্মত ইষ্টক ভেদ করিয়া কতক  
গুলি বিটাপ শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে।  
অনেক পল্লীবাসীই স্বজাতির মারা পরিত্যাগ  
কারণ, —আত্মীয় স্বজনের প্রীতি-সখাতা  
বিসর্জন দিয়া, —দরিদ্র প্রতিবাদীর আগ্রহ  
আকাঙ্ক্ষা ভুলিয়া গিয়া, —পল্লীমাতার অন্ধ  
ছাড়িয়া সহরবাসী হইয়া গড়িয়াছেন। কলে  
অনেক পল্লীতেই জলকষ্ট হইল, পুষ্টিসকলময়  
স্বলংগে পক্ষিল ডোবার মধ্যে ম্যালেরিয়ার  
সজাব জাবাণবাসীদল পুষ্টি পাইতে লাগিল,  
জলস্রাব স্থানগুলি তাহাদের বিহারভূমি  
হইল, কলে যাহারা পল্লীজননীর অন্ধ পরিত্যাগ  
করিল না, তাহারা ঐ সকল মশকাক্রমণে  
সহজেই ম্যালেরিয়ার কালকবলে পতিত  
হইতে লাগিল, —এমনই করিয়া বাঙ্গালার  
পশাণ্ডনি ধ্বংস হইতে বসিল।

পশাণ্ডনি ধ্বংস হইতে বসিল, —কি শু পল্লীর  
কুপকৃৎসন সহরে আবাসস্থান নির্ণয় করিয়াই  
বা ৭ স্থ পাইলেন ৭ সহরে আসিয়া সহর  
প্রাসঙ্গ্য কলের জল পাইলেন, গ্যাস  
বিহীন আলোক পাইলেন, সাধ মিটাইবার,  
স্ব পূরণ করিবার —সত্য হইবার সকল  
উপকরণই পাইলেন, কিন্তু সহরের জনসংখ্যা  
সহরের বাষ্প রাশি বদ্ধ হইয়া পড়িল,  
একটির পর আর একটি সৌধ, তাহার পার্শ্বে  
আর একটি সৌধ, সেই ধবল শুভ্র সৌধপ্রান্তে  
আবার সৌধ, —পার্শ্বে সৌধ, পশ্চাতে সৌধ,  
সম্মুখে সৌধ, —কাজেই সহরের সেই সৌধ  
শিখর ভেদ করিয়া মার্ভণ্ড দেব আর  
মহাপ্রাণ বিস্তারে সমর্থ হইলেন না, —পুণিবার  
চন্দ্র দূরে —অতি দূরে —অন্তরালে থাকিয়াই  
হাস্যরাশি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন, —বাহু  
বদ্ধ —আলোকের অভাব —কাজেই সহরের

মহাজ জলভ কলের জলে ম্যালেরিয়ার  
প্রকোপ পোড়িত পল্লী পরিত্যক্ত সহর প্রবাসীর  
স্বাস্থ্য উপলব্ধির সুযোগ ঘটিল না, ফলে  
চিত্ত প্রবৃত্তির দপ্তরে সহরের মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃ  
বাড়িয়াই উঠিল, —কলেরা-রাকসী তাণ্ডবদীপ্য  
করিতে লাগিল, —ক্রমে প্লেগ ছুটিল, —ফুস  
ফুসের পীড়া রুদ্ধ পাইল, —নিউনসিপ্যাটিটির  
রূপায় সহর প্রবাসীর স্বথ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা যত  
উদ্যমকণ্ঠেই করা হউক, সহরপ্রবাসী কিন্তু  
রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইল না,  
কাজেই ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী ছাড়িলেও পল্লী  
ভূমির চাকরিগত আঁণ কষ্ট পুরুষগণ সহরে  
আসিয়াও সুখী হইতে পারিল না।

সুখী হইতে পারিবে কিসে? সুখী  
হইতে হইলে সকল বিষয় অপেক্ষা সর্বপ্রায়ে  
স্বাস্থ্য সুখ অবেষণ করিতে হইবে। স্বাস্থ্য  
সুখ অবেষণ করিতে হইলে যে সকল  
পুষ্টিকর আহার্যের প্রয়োজন, পল্লীবাসীকে যে  
সে সকল বিসর্জন দিয়া আসিতে হইয়াছে!  
দুগ্ধের মত বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর দ্রব্য আর  
কিছুই নাই, সেইজন্ত পল্লীবাসীর ঘরে ঘরে  
গাভীপালনের যে ব্যবস্থা ছিল, সহরে আসিয়া  
নানা কারণে সে ব্যবস্থা রহিত করিতে হইল।  
দুগ্ধ ঘৃত বিসর্জন দিয়া, অখাদ —কুখাদ —  
অমিত —অহিত সহরপ্রবাসী পল্লী পরিত্যক্ত  
পুরুষগণ স্বচ্ছন্দ মনে ক্রমশঃ উদরস্থ করিতে  
অভ্যস্ত হইলেন। শরীর শুদ্ধির জন্ত —  
সাধারণতঃ বায়ু ও পিত্ত প্রধান বাতাসীর ঐ  
দুইটি ধাতুর সাম্যভাবে রক্ষার জন্ত পল্লী পরি-  
ভ্রমের পূর্বে যে প্রাতঃস্নানের প্রথা ছিল,  
সহরে আসার পর হইতে সে প্রথা লুপ্ত হইল।  
তাহার পর —পূজা আহুতি চিত্তশুদ্ধির পর,  
আদা, ছোলাভিজা, শুড়, চিনি, —মুড়ি—

নারিকেল—ঝাঁহা যাঁহা জুটিত তিনি তাহাই খাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের যে প্রার্থনা করিতেন, তাহারও পরিবর্তন হইল,—এক কথায় আহার বিহার—বেশ-বিন্যাস—চাল-চলন—সকল বিষয়েই বাঙ্গালী-পল্লীবাসীর সহরে আসিয়া সকলই নতন হইল। ফলে বাঙ্গালীর ধাতুতে এ পরিবর্তন সহ হইল না, সেইজন্য ম্যালেরিয়ার আক্রমণভূমি-পল্লী পরিত্যাগেও বাঙ্গালী স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করিতে পারিল না।

বর্তমান সময়ে সকল দ্রব্যই যেকপ চমুলা—হুপরি কলিকাতার বাড়ী ভাড়া হার যেকপ অভিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে অনেক স্বল্প আয়ের বাঙ্গালী প্রমত্তাবির কলিকাতা বাসের স্পৃহাও যেরূপ বশবর্তী হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর নিকট স্বাস্থ্য সুখের আশা যে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া—থাকিবে, এ কথাও ছোর করিয়া বলা যাইতে পারে। কারণ আমরা বরাবরই বলিতেছি, আলোক, রৌদ্র এবং বাতী মনুষ্যের স্বাস্থ্য সুখের প্রধান উপকরণ। স্বল্প আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতায় প্রাসাদ হইয়া বাস করা চলে না, কাজেই অধিকাংশ পল্লী-বাসী যেরূপ বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন, আলোক-রৌদ্র-বায়ু তাহাদের ত্রিসোমান্য প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। কাজেই একে ছদ্ম ঘূতের মত পৃষ্টকর থাক্তের অভাব, তাহার উপর কদর্যা স্থানে বাসের জন্য বাঙ্গালীর পরমাশু যে ক্রমশঃই স্বল্প হইয়া আসিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি।

সেই জন্য আমাদের মনে হয়, আমাদের পূর্ব পুরুষ গণের পতিত ভিটা গুলির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া—সেই সকল ভিটার সাক্ষ্য প্রদান জালিয়া—পল্লীর সৌন্দর্য-কিম্বদন্তী

অন্ধে আবার স্থান লাভের ব্যবস্থা করিলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-সুখ বৃদ্ধি আবার কিরিয়া আসিতে পারে। পল্লী-ভূমি ম্যালেরিয়া দীড়িতা, কিন্তু দেশ মাতৃকাকে সে ম্যালেরিয়াব আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি কেন ব্যবস্থা হইতে পারে না? আমরা সকল বিষয়েই সুব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেন্টের মুখ চাহিয়া বাসিয়া থাকি, কিন্তু অত পরনিভরতা কেন? আমরা নিজেদের কি সামর্থ্য অনুধায়ী কিছুই করতে পারি না! গবর্ণমেন্ট—পল্লীবাসীর সুখ-সুবিধার ব্যবস্থার জন্য—আমরা না বলিলেও চেষ্টা করিয়া থাকেন, ম্যালেরিয়া পাড়িত পল্লী সম্বন্ধে দিগকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের যথেষ্ট প্রয়াস আছে। কিন্তু সেই প্রয়াসের সহিত আমাদের প্রয়াস যদি একত্র হয়,—তাহা হইলে পল্লী হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও অনেক কমিতে পারে এবং সেই সঙ্গে সহরের লোক সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় সহরের রোগবাহুল্যও হ্রাস পাইতে পারে।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে পল্লীরক্ষা করিতে হইলে, পল্লীবাসী মাত্রেরই স্ব স্ব বসত বাড়ীর পার্শ্ব বন জঙ্গল গুলি কাটাইতে হইবে, নালা ডোবা গুলি বুজাইয়া ফেলিতে হইবে এবং গ্রামের মধ্যে এমন একটা জলাশয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে—যে জলাশয়ের জল পার্শ্ব ভিন্ন অন্য কার্যে ব্যবহৃত না হয়। যে গ্রামে জলাশয় গুলি হাজিরা মজিরা আসিয়াছে, সে গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া সাধ্যমত সামর্থ্য—মত টাকা তুলিয়া—সেই চান্দার উদ্ধৃত অর্থ স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে অর্পণ পূর্বক তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সেই গ্রামের জলসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক গ্রামের মিলিত চেষ্টায়

প্রত্যেক পল্লীবাসী যদি ঐ কয়টির ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে পল্লী হইতে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর তিরোধান অসম্ভব হয় না।

পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া 'ও' কলেরা—ছ'টি প্রবল ব্যাধিরই প্রকোপ দেখা যায় বর্ষায় অস্তে। এই বর্ষায় অস্তে অনেক পল্লীর একমাত্র ভলাশয়েই আমরা জানি—পাট পচান হইয়া থাকে। ফলে এই দূষিত জল পান করিয়া অনেক পল্লীর অধিবাসীই ঐ 'ছ'টি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, পল্লীরক্ষার জন্ত প্রত্যেক পল্লীর অধিবাসীকে ইহার উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং গ্রাম হইতে ইহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু শুধু বচন কার্য্য হইবে না, পল্লীর কৃতি পুরুষগণ—যাঁহারা সহরে থাকিয়া সহরের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদিগকে পল্লী-ভিটার ফিরিয়া গিয়া এই সকল কার্য্যের জন্ত অগ্রণী হইতে হইবে—তবে বচন—কার্য্যে পরিণত হইবে।

অবশ্য সহর ছাড়িয়া—সহরের অর্থাগমের পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়া—একেবারে পরী ভূমিতে অবস্থিতির ব্যবস্থা করুন—এরূপ কথা আমি বলিতেছি। আমার বক্তব্য—পল্লীর কৃতি সম্ভানগণ একেবারে স্বদেশ পরি-ভাগ না করিয়া বৎসরের মধ্যে ২৩ বারও গ্রামে ফিবিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করুন, যে সময় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পল্লী হইতে হাস পাইয়া থাকে, সেই সময় কয়েক মাসের জন্তও পুত্র কন্যাদিগকে বাস্তভিটার সন্ধ্যা দানের জন্ত ব্যবস্থা করিয়া দিন,—এরূপ করিতে পারিলেই অসংপতিত পল্লী ত্রি আবার কিরিয়া আসিবে,

পল্লীর দুর্গতি নিবারণের জন্ত আপনা হইতেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে, রোগে শোণে জর্জরিত হইয়াও যাঁহারা বাস্তভিটার মায়া বিসর্জন দিতে পারে নাই—তাঁহাদের মহত্বপূর্ণ সাধন করা হইবে এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের অমোঘ আশীর্বাদে দেবনির্ম্মালা লাভ করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জননের পথও পরিষ্কার করা হইবে।

আমার আজি আর বেশী কিছু বলিবার নাই। সমবেত সভ্যমণ্ডলীর অনেকেই আজি লক্ষ্মীর বর পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অনেকে সহরে আবাস স্থান নির্দেশ করিয়া লইয়াছেন,—কিন্তু লোক সমাজে বাসস্থানের পরিচয় দিতে হইলে—সকলেই পৈত্রিক পল্লী-ভূমিরই নামোলেখে গর্ব্ব স্মৃথ অম্লভব করিয়া থাকেন,—কিন্তু সেই গৌরবের স্থল জন্মভূমি যে আজি সর্ব্ব প্রকারে দীন ভাবাপন্ন,—সেই পল্লীজননীর আমাদের যে সকল ভ্রাতৃবন্দ এখনও, পল্লী রক্ষা করিতেছে,—তাঁহাদের রোগজীর্ণ শরীর, কঙ্কালসার আকৃতি কোটার-গত চক্ষু—পল্লী ভূমির স্বাস্থ্য-দৈন্তের জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে,—যে পল্লীভূমির সম্ভান দিগের একদা মনে স্মৃথ ছিল, জন্মের বল ছিল, কার্য্যে উৎসাহ ছিল,—যে পল্লী-প্রান্তে একদিন সেকরার দোকান, কামারের কারখানা, ছুতারের কারুকার্য্যের আলয়—তাঁতীর বস্ত্র বয়নের কক্ষ—সকলই নির্দিষ্ট ছিল,—যে পল্লীপ্রান্তরে একদিন গোচারণের মাঠ ছিল, সহজ স্থলভ শ্রামল শুল্কসম্বন্ধে গোকুল আকুল হইয়া ক্ষুরিক্তির ব্যবস্থা করিতে পারিত—তাঁহার ফলে এখনকার মত গাভীর দল জীর্ণ জীর্ণ হইত না, ছোটপুট বুঝ মিথুন এবং পরশ্বিনী গাভীর দল সাক্ষ্য শরীরী ভগবতী বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হইত,

যে পল্লীবাসীর ঘরে ঘরে গোলাভরা ধাতু থাকিত, মরাই ভরা শত্রু থাকিত, ক্ষেত্র ভরা ফসল থাকিত, যে পল্লীভূমির ঘরে ঘরে একদিন বার মাসে তের পার্বণ হইত, দোল হইত, দুর্গোৎসব হইত, কালীপূজা হইত, জগদ্ধাত্রী পূজা হইত, পৌষ শার্বণ হইত, রথের ঘটা হইত,—সকলই হইত, মহিলা কুলের কলহাস্ত ও অলঙ্কার সিঞ্জন যে পল্লী পুরুষগণের সোপান তলে একদা মধুর স্বরে ধ্বনিত হইত, উচ্চ নীচ সম্বন্ধ ভুলিয়া—নাপিত খুড়া ধোপা মামা, তাতি কাকা প্রভৃতি লব্ধে একদিন যে পল্লীমাতার সম্মানগণের মধ্যে আয়ত্ততা ও সহজভূতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যাইত, কালীসদ্বার, ভুলু কাহাব প্রভৃতি খেলোয়াড় ও নাট্যশিল্পের দলের বিভিন্ন ব্যায়ামে যে পল্লীবাসী একদিন অপার আনন্দ অমুভব করিত,—পল্লিপরিভ্রাতা

সমবেত সত্যমণ্ডলি! সেই জননী জন্মভূমি পল্লার প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থা একবার চিন্তা করুন! চিন্তা করুন—আমরা সহরে আসিয়া স্থবী হইয়াছি,—কিন্তু তখনও বড় কম স্থখা ছিলাম না। সে “আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু” আমরা পল্লী ছাড়িয়াই যে বিসম্ভজন দিয়াছি, ইহা স্মৃশ্চয়। সেইজন্ত আবার বলিতেছি—পল্লীর ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্ত পল্লার প্রত্যেক ক্রতী সম্মানই বন্ধপরিষ্কার হউন,—সারাজীবন সহরের কুইকে ভুলিয়া না থাকিয়া, মধ্যে মধ্যে নিজ নিজ পল্লীভিত্তিক শাস্ত্রনিব বাবস্থা করুন—সহরের স্বোপাঞ্জিত ডিস্-পেন্সিয়াব নাম দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে,—অকৃত স্বাস্থ্যে বাঙ্গালীর বনোদীপ্ত প্রতিভা আবার ফুটিয়া উঠিবে।

## আয়ুর্বেদের ইতিহাস।

—:—

বিবিধ সংগ্রহ।

(অকারাদি বর্ণক্রমে)

(পূর্বাভ্যুতী)

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী, এম-এ, এল, এম, এস)

অজীর্ণ মঞ্জুরী—কোন দ্রব্য সেবন জনিত অজীর্ণ কোন দ্রব্য সেবনে প্রশমিত হয়, এই গ্রন্থে তাহা উত্তমরূপে লিখিত হইয়াছে। বহু বেকটেক্স প্রেসে মুদ্রিত।

অজ্ঞাননিদান—অধিবেশ

সংক্ষিপ্ত নিদান সংগ্রহ। অল্পকল্পে বিশ্র অজ্ঞান নিদানের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অজ্ঞান নিদান চরকবক্তা অধিবেশ কর্তৃক প্রণীত নহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অমুপান সংগ্রহ—এই গ্রন্থে



দ্রুত ঔষধ সমূহের প্রস্তুত প্রণালী এবং রোগ-ভেদে ঔষধের অম্বপান সমূহ লিখিত হইয়াছে । বস্বে বেক্টেখর প্রেসে মুদ্রিত ।

**অম্বপানমঞ্জরী**—অম্বপান-দর্পণের মদ্রশ আধুনিক গ্রন্থ । কাশীতে মুদ্রিত ।

**অনুভূত যোগাবলী**—এই গ্রন্থে উত্তম উত্তম পরীক্ষিত যোগ সকলের বিবয় লিখিত হইয়াছে ।

**অভিনব চিন্তামণি**—চক্রপাণি দত্ত কৃত চিকিৎসাসংগ্রহ । অমুদ্রিত ।

**অর্ক প্রকাশ**—রাবণ-কৃত । ইহাতে ঋক ( আরক ) প্রস্তুতের নিয়ম এবং রোগ ভেদে প্রয়োগের নিয়ম লিখিত হইয়াছে । রাবণকৃত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও ইহা বৌদ্ধ-ধর্মের পরবর্তিকালে রচিত ।

**আতঙ্ক দর্পণ**—বাচস্পতি কৃত মাদ্বন নিবানের টীকা, গ্রন্থবিশেষ নহে । 'কেহ কেহ সমগ্রমে ইহাকে সংগ্রহ বলিয়াছেন' এইজন্ত এখানে উল্লিখিত হইল \* । বস্বে নগরে মুদ্রিত ।

**আদিশাস্ত্র**—ইহাতে স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, ক্রিয় পুষ্কণ্ডের বিবাহ হওয়া উচিত এবং পিণ্ড রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে । বস্বে বেক্টেখর প্রেসে মুদ্রিত ।

**আনন্দ কন্দ**—এই গ্রন্থ রমানন্দ কন্দ নামেও প্রসিদ্ধ । মহানভৈরব ইহার রচয়িতা । ( দ )

**আয়ুর্বেদ-সুধানিধি**—সায়নাচার্যের

অম্বরোধে একামনাথ অবধান সরস্বতীর পুত্র শৈলনাথ কর্তৃক রচিত সংগ্রহ গ্রন্থ ।

**আয়ুর্বেদ স্রব্ধেণ শংহিতা**—

ইহাতে সানাত্ত ওষধিবর্গ, ধাতুবর্গ, জলবর্গ ইত্যাদিব দোষগুণ লিখিত হইয়াছে । বস্বে বেক্টেখর প্রেসে মুদ্রিত ।

**আয়ুর্বেদ সূত্র**—বাকরণের যেমন এক একটি সূত্র থাকে, এই গ্রন্থ সেইরূপ সূত্রাত্মক ; সূত্রী যথা “আমং হি সর্বরোগাণাম” “অনামপালনং কার্যম্” ইত্যাদি । আয়ুর্বেদ-সূত্রের অগন্ত্য বিরচিত টীকা আছে : শুনা যায় এবং নিত্যানন্দ নাথ বিরচিত প্রশ্নপঞ্চকের টীকা পাওয়া যায় । মূল গ্রন্থের সপ্তদশ প্রশ্নাত্মক অংশ বিদ্যমান । ( দ )

**আয়ুর্বেদাঙ্গমণি**—ইহা আয়ুর্বেদের ইতিহাস । ব্রহ্মা হইতে গ্রন্থকার পর্য্যন্ত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারগণের নাম ইহাতে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ দ্রলভ ।

**আরোগ্য চিন্তামণি**—চিকিৎসা সংগ্রহ । গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত ।

**ইন্দ্রকোষ**—প্রতাকরপুত্র ভট্ট রামচন্দ্র গোড়ের রাজা ইন্দ্রসিংহের আদেশ অনুসারে নানা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই কোষ রচনা করিয়াছিলেন । ইহার অল্প নাম “রাজেন্দ্র কোষ” ।

**উপবন বিনোদ**—শার্ঙ্গধর-সংগ্রহের বৃক্ষায়ুর্বেদ বিষয়াত্মক অংশ । বর্তমান গ্রন্থ-কার কর্তৃক বহু পূর্বে স্বতন্ত্র ভাবে অনুবাদিত হইয়াছিল । কি নিয়মে বৃক্ষ রোপণ

\* টীকা গ্রন্থ অসংখ্য—তাহাদের উল্লেখ বিশেষ কারণ না থাকিলে করা হইবে না ।

( দ ) 'দ' চিহ্নিত গ্রন্থগুলি দক্ষিণাংশে প্রসিদ্ধ বৃত্তিতে হইবে ।

করিতে হয়, কি উপায়ে বৃক্ষ সকল বৃহৎ এবং প্রচুর ফল ধারণ করে, কোন বৃক্ষে কিরূপ সার দিতে হয়, কি করিয়া বৃক্ষাটিকা নির্মাণ করিতে হয়, এই গ্রন্থে সেই সকল বিষয় ও কুপার্ব ভূমি পরীক্ষা, বৃক্ষচিকিৎসা প্রভৃতি লিখিত আছে।

**ওষধি কল্প**—এই গ্রন্থে বিবিধ ঔষধের গুণ, কেশরঞ্জন বিধি ও ধাতু জারণমারণের বিধি লিখিত হইয়াছে। এক্ষণের নাম জানা যায় না।

**কল্প পঞ্চক প্রয়োগ**—এই গ্রন্থে চোপচিনি কল্প, রুদ্রবস্তী কল্প, রাগদমনী কল্প, শিবলিঙ্গী কল্প এবং পলাশ কল্প—এই কয়টা বিষয় লিখিত হইয়াছে। বসে বেকটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

**কল্যাণ কারক**—শ্রীমদ্ জিন মগধ ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরে রাষ্ট্রকূট বংশজ মহারাজ নৃপতুঙ্গ মহীকবলের চিকিৎসক উগ্রাদিত্যাচাৰ্য্য উহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। 'উগ্রাদিত্যাচাৰ্য্য পুষ্টিয় ৮১৪ বৎসরে নৃপতুঙ্গের সভাসদ ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। (দ)

**কাম কুতূহল**—টহাতে ধাতুকীর্ণ-তাদির প্রশমক উত্তম বাজীকরণ ঔষধ সকল লিপিত আছে। বসে বেকটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

**কামরত্ন**—নিত্যনাথ কৃত বাজীকরণ-সংগ্রহ। বেকটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

**কার্পণ্যমু**—এই গ্রন্থে ওষধি সমূহের গুণ, কল, মূল, বৃক ও পত্র এই পঞ্চাজের গুণ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। এক্ষণের নাম জানা যায় না। কিন্তু গ্রন্থকার

গ্রন্থে বহুল পরিমাণে আকুদেশীয় ভেষজের গুণ লিপিবদ্ধ করায় তিনি আকুদেশবাসী ছিলেন বলিয়া বলিয়া বোধ হয়। (দ)

**কালজ্ঞান**—শম্ভুনাথ কট্টক রচিত। এই গ্রন্থে মৃত্যুবোধক লক্ষণ, রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

**কুট মুদগার**—এই গ্রন্থে অর্জুণ বোগের চিকিৎসা ও পথ্য লিখিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

**ক্ষেমকুতূহল**—কৃষ্ণশর্মাবিরচিত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

**গুটবোধক**—হেরথ সেন কৃত। এই গ্রন্থে কতকগুলি রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা আছে। অমুদ্রিত।

**গৌরী কাঞ্চলিকা তন্ত্র**—ইহা তান্ত্রিক চিকিৎসা-সংগ্রহ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

**চক্রদত্ত**—চরক ও সুশ্রুতের চীকাকার চক্রপাণিদত্ত কৃত নানাস্থানে মুদ্রিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। চক্রদত্ত নামেই সুপরিচিত এই উৎকৃষ্ট সংগ্রহ সর্বত্রই—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ইহা চিকিৎসাসার-সংগ্রহ নামেও প্রসিদ্ধ। এই সংগ্রহের অনেক অংশ বৃন্দ কৃত সিদ্ধযোগ হইতে গৃহীত। চক্রপাণির সমগ্রাদি পূর্বে নিরূপিত হইয়াছে।

**চর্যাচন্দ্রোদয়**—ইহাতে অন্নব্রজানাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। বসে বেকটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

**চারুচর্য্যা**—ভোজরাজ কৃত। স্বস্থত্ব বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

**চিকিৎসা কলিকা**—দ্রিসটাচাৰ্য্য কৃত চিকিৎসা-সংগ্রহ। বিষয়বস্তুক নিদান চীকার

ত্রিসটাচার্যের রচনা উদ্ধৃত করায় জানা যায় যে, ইনি একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য্য ছিলেন। চক্ষুর বিষয় তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। চিকিৎসাকলিকা মুদ্রিত হয় নাই।

**চিকিৎসা-কল্ললতিকা**— ইহাও ত্রিসটাচার্য্য প্রণীত বৃহত্তর চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

**চিকিৎসাজ্ঞান**—ইহাতে জ্বর, শ্বাস, কৃষ্ণ, ভগন্দর প্রভৃতি অনেকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। বঙ্গ বেঙ্গল টেম্পার প্রেসে মুদ্রিত।

**চিকিৎসা দীপিকা**—হরানন্দ কৃত। ইহা লিপিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

**চিকিৎসামৃত**—গণেশ কৃত। অমুদ্রিত।

**চিকিৎসা রত্ন**—জগন্নাথ দত্ত কৃত। ইহা লিপিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

**চিকিৎসা-রত্নভরণ**—সদানন্দ দাধীচ প্রণীত হুপসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ।

**চিকিৎসা সার**—হরিভারতী কৃত। অমুদ্রিত।

**চিকিৎসামণি**—বলভদ্র এই গ্রন্থের রচয়িতা, ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে নাড়া ও মূত্রাদি পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় এবং রোগ সমূহের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। কন্দবিপাক-জাত রোগ সকল এবং তাহাদের শাস্তির উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। চরকাদি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিষয়নির্ণয়, সন্নিপাত-জরাদির ভেদ, সাধ্যাসাধ্য অবস্থা প্রভৃতি এবং রোগের সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

পোষ—২

**জ্বরতিমির নাশক**—সর্বপ্রকার জ্বর ঔষধ সংগ্রহ। বঙ্গ বেঙ্গল টেম্পার প্রেসে মুদ্রিত।

**জ্বরনির্ণয়**—নারায়ণ কৃত। অমুদ্রিত।

**ত্রিশতী**—রাওল শাস্ত্রধর কৃত জ্বর-চিকিৎসা সংগ্রহ। এই শাস্ত্রধর সংহিতা-প্রণেতা—শাস্ত্রধর ইহাতে ভিন্ন ব্যক্তি।

**ধারাকল্প**—জল ও কাথাদি পরিষেক দ্বারা চিকিৎসাপদ্ধতি মূলক গ্রন্থ। হাইড্রোপ্যাথি (Hydrophy) নামক চিকিৎসায় যেমন জল প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, এই গ্রন্থেও সেইরূপ জল এবং কাথের প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসার উপদেশ আছে।

**নপুংসকায়ুতর্গব**—এই গ্রন্থে নপুংসক-দিগের জন্ম নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, লেপ, বাজীকরণ ঔষধ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বঙ্গ বেঙ্গল টেম্পার প্রেসে মুদ্রিত।

**নাড়ীজ্ঞান তরঙ্গিনী**—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ। বঙ্গ বেঙ্গল টেম্পার প্রেসে মুদ্রিত।

**নাড়ীজ্ঞান দীপ্তি**—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

**নাড়ীদর্পণ**—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

**নাড়ী পরীক্ষা**—রাবণ কৃত উত্তম সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বঙ্গ নগরে নির্মলাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

**নাড়ী পরীক্ষাদি চিকিৎসা কথন**—সজীবেশ্বর শর্ম্মার পুত্র রত্নপাণি শর্ম্মার রচিত নাড়ীজ্ঞান ও তত্ত্বমূলক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নাড়ীপ্রকাশ—বঙ্গদেশীয় শঙ্কর সেন  
কৃত নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

নাড়ীবিজ্ঞান—কণাদ কৃত। এই কণাদ-  
বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ বলিয়া অনেকের  
ধারণা, কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। মহর্ষি কণাদ  
চরকের (সম্ভবতঃ অগ্নিবৈশেষিক) পুঙ্খবত্তী,  
কেননা চরকে বৈশেষিকদর্শনের পদার্থবাদ  
গৃহীত হইয়াছে। কণাদ কৃত নাড়ীবিজ্ঞান  
চরকের সময়ে প্রসিদ্ধ থাকিলে চরকের আয়  
সর্কার্থসংগ্রাহক মহাগ্রন্থে নাড়ীবিজ্ঞানের উল্লেখ  
থাকিত \*। ত্রাহা যখন নাই এবং রচনাও  
যখন আধুনিক রচনার মত, তখন নাড়ীবিজ্ঞান  
মহর্ষি কণাদকৃত—একথা স্বীকার করা যায়  
না।

নাবনীতক—ইহা অজ্ঞাতনামা কোন  
বৌদ্ধ ভিক্ষু কৃত সিদ্ধযোগ-সংগ্রহ। কর্ণেল  
বাউগার কর্তৃক চীনদেশে মুদ্রিত। স্তূপের মধ্যে  
আবিষ্কৃত।

নামসাগর—কেশবদেব কৃত চিকিৎসা  
গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নিদান প্রদীপ—ইহা নাগনাথ বিরচিত  
রোগ-পরিচায়ক গ্রন্থ। (দ)

নৃসিংহোদয়—বীরসিংহ কৃত চিকিৎসা  
গ্রন্থ।

পথ্যাপথ্য—কেশবপ্রসাদ মিশ্র সং-  
গৃহীত। ইহাতে রোগ ভেদে পথ্যাপথ্যের

বিষয় লিখিত আছে। বম্বে বেকটেশ্বর প্রেসে  
মুদ্রিত।

পথ্যাপথ্য-বিনিশ্চয়—বিশ্বনাথ সেন  
রচিত পথ্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। এই বিশ্বনাথ  
উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র গঙ্গপতির  
চিকিৎসক ছিলেন।

পথ্যাপথ্য বিবোধক—কেয়দেব কৃত  
নিঘণ্ট গ্রন্থ। (যা)।

পরহিত সংহিতা—শ্রীনাথ পণ্ডিত  
বিরচিত এই গ্রন্থে কৌমারভৃত্য তত্ত্ব হইতে  
আরম্ভ করিয়া আয়ুর্কৌদের শলাশালাকাদি  
আটটি তত্ত্ব—হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা সহ  
স্ববিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। (দ)

পাক প্রদীপ—খাণ্ডপাক বিষয়ক মুদ্রিত  
গ্রন্থ।

পাকরত্নাকর—খাণ্ডপাক বিষয়ক  
মুদ্রিত গ্রন্থ।

পূজ্যপাদীয়—আচার্য্য পূজ্যপাদ এই  
সংগ্রহ গ্রন্থের রচয়িতা। পার্শ্ব পণ্ডিতের  
লিখিত পূজ্যপাদ চরিত হইতে জানা যায় যে,  
তিনি ৪৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়া-  
ছিলেন। (দ)

প্রয়োগ চিস্তামণি—রামমাণিক্য সেন  
রচিত চিকিৎসা গ্রন্থ।

প্রয়োগ-পারিজাত—অসংখ্য প্রয়োগ-

\* বৈদিক-গ্রন্থে নাড়ীজ্ঞান বা নাড়ীপরীক্ষা সম্বন্ধে কোন বিবরণের উল্লেখ দেখা যায় না। এইজন্য  
বৈদিকযুগে নাড়ী পরিচয় বিদ্যা ছিল না বলিয়াই অনুমান করা যায়। তান্ত্রিকযুগে নাড়ী লইয়া বিশেষ  
আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু নাড়ীপরীক্ষার নাড়ী অর্থে ধমনী (Artery) বুঝিতে হয়—যোগশাস্ত্রের  
নাড়ী (Nerve) নহে। সম্ভবতঃ বৈদ্যকের নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা তান্ত্রিকযুগের শেষভাগে প্রচলিত  
হইয়াছিল। আমরা অবশ্যতে নাড়ীপরিচয় বিদ্যার প্রাদুর্ভাব কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইব। লেখক।

† (যা) এইরূপ চিহ্নিত গ্রন্থগুলি বম্বে আয়ুর্কৌদের গ্রন্থমালার সম্পাদক পণ্ডিত বামবর্জী মিত্রস্বামী কর্তৃক  
সংগৃহীত হইয়াছে, অত্যাধি মুদ্রিত হয় নাই।

সম্বিত প্রাচীন ও প্রামাণিক চিকিৎসা গ্রন্থ ।  
অমুদ্রিত ।

**বসবরাজীয়**—আন্ধ্রদেশের শৈব ব্রাহ্মণ-  
কুলে জাত বসবরাজ এই গ্রন্থের রচয়িতা ।  
এই গ্রন্থে নাড়ী ও মূত্রাদি পরীক্ষা দ্বারা রোগ  
নির্ণয়, অর কাসাদি রোগের নিদান, লক্ষণ ও  
চিকিৎসা এবং অল্পভবসিক উৎকৃষ্ট যোগ  
সকলের বিষয় লিখিত হইয়াছে । 'রেউচিনি,  
অহিনেন প্রভৃতি জীবপ্রকাশ পরিগৃহীত  
ঔষধের উল্লেখও এই গ্রন্থে দেখা যায় । (দ)

**বাণীকরী**—বাণীকরী রচিত । ইহাতে  
রোগ সমূহের পৃথক্ করণ (Diagnosis)  
সংক্ষেপে উপদেশ আছে । অমুদ্রিত ।

**বালচিকিৎসা পটল**—অজ্ঞাতনামা  
গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত শিশুচিকিৎসা বিষয়ক  
গ্রন্থ । অমুদ্রিত ।

**বালতন্ত্র**—মহীধরের পুত্র কল্যাণ বৈদ্য  
কর্তৃক রচিত শিশু-চিকিৎসা গ্রন্থ । বম্বেনগরে  
মুদ্রিত হইয়াছে ।

**বালবোধ**—বামাচার্য্য কৃত সরল  
চিকিৎসাগ্রন্থ । অমুদ্রিত ।

**বিশ্বকোষ**—মহেশ্বর রচিত বৈদ্যক  
অভিধান । মুদ্রিত হয় নাই ।

**বিষোদ্ধার**—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের  
লিখিত বিষ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ । অমুদ্রিত ।

**বীরসিংহাবলোকন**—বীরসিংহ রচিত  
চিকিৎসা-সংগ্রহ । বম্বেনগরে মুদ্রিত ।

**বৈদ্যক রহস্য**—বংশীধরের পুত্র বিজ্ঞা-  
পতি এই গ্রন্থের রচয়িতা । গ্রন্থকার গৌড়বর্ষা  
তানতি (৭) রায়ের অন্ত্যস্তি অনুসারে ১৭৩৮  
সংবতে গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন । গ্রন্থে  
অর প্রভৃতি রোগ সমূহের চিকিৎসার বিষয়  
লিখিত হইয়াছে । গ্রন্থখণ্ডে ফিরঙ্গ স্নোথের

উল্লেখ থাকায় জানা যায় যে, বিজ্ঞাপতির সময়ে  
ফিরঙ্গ রোগ দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ।

**বৈদ্য কল্পদ্রুম**—শুকদেব সংগৃহীত  
চিকিৎসাগ্রন্থ । বম্বেনগরে মুদ্রিত হইয়াছে ।

**বৈদ্যকসংগ্রহ**—গ্রন্থকারের নাম মহেন্দ্র  
—এই নাম পরিচয় পাওয়া যায় । নানা  
প্রকার চূর্ণ, কাথ, তৈল, দ্রব এবং পারদঘটিত  
ঔষধ সমূহের প্রয়োগ-বিধি লিখিত আছে ।  
গ্রন্থে আত্রেয়, চরক, ক্রীবৎস, অমৃতমালা  
রসার্ণব, রসরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের  
নাম পাওয়া যায় ।

**বৈদ্যজীবন**—দিবাকরসু ও লোলিহরাজ  
রচিত । ইহাতে কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যশাস্ত্র  
বিষয়ক উপদেশ-দম্পতির কথোপকথনচ্ছলে  
আদিরসাত্মক পদ্যে লিখিত হইয়াছে ।

**বৈদ্যবল্লভ**—হিতকৃতির পুত্র হস্তিকৃতি  
এই অর চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা । এই গ্রন্থ  
বম্বেনগরে মুদ্রিত হইয়াছে ।

**বৈদ্যবিনোদ**—শঙ্কর সেন বিরচিত  
চিকিৎসাগ্রন্থ । অমুদ্রিত ।

**বৈদ্যবিলাস**—রাঘব কৃত । অমুদ্রিত ।

**বৈদ্যমন-উৎসব**—বম্বেনগরে মুদ্রিত  
যোগ-সংগ্রহ ।

**বৈদ্য মনোরমা**—কেরল দেশবাসী  
ত্রীকালিদাস বৈদ্য রচিত সংগ্রহগ্রন্থ ।

**বৈদ্যরত্ন**—বম্বেনগরে মুদ্রিত চিকিৎসা-  
গ্রন্থ । গোস্থানী শিবানন্দ ভট্ট এই চিকিৎসা  
গ্রন্থের রচয়িতা ।

**বৈদ্য সঞ্জীবনী**—বম্বেনগরে মুদ্রিত  
হইয়াছে ।

**বৈদ্য সর্বস্ব**—অমুদ্রিত চিকিৎসা  
সংগ্রহ ।

**বৈद्य সংক্ষিপ্তসার**—সোমনাথ মহা-  
পাত্র রূত। অমুদ্রিত।

**বৈद्य ঈশ্বর**—গোপাল দাস রূত।  
অমুদ্রিত।

**বৈদ্যামৃত**—বৈদ্য ক্রীমাণিক্য ভট্টের  
পুত্র ভিষক মোরেশ্বর রচিত। ইহার বাসস্থান  
মহম্মদ নগরে ছিল। ১৫০৫ সংবৎসরে গ্রন্থ  
রচিত হইয়াছিল—এহে এইরূপ লিখিত  
আছে। চারিটা অলঙ্কার বা অধ্যায়ে সংক্ষেপে  
রোগ সমূহের চিকিৎসা দিহিত হইয়াছে।

**বৈদ্যামৃত লহরী**—মণুবান্য শুর  
রূত জর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ।

**ভাকুরোদয়**—৬গঙ্গাধর কবিরাজ বির-  
চিত সংক্ষিপ্ত রোগ-বিজ্ঞান বিষয়ক বিচার  
গ্রন্থ। মুদ্রিত হইয়াছে।

**ভীমবিনোদ**—দামোদর রূত সংগ্রহ  
গ্রন্থ। ইহা চিকিৎসা ও উত্তর—এই দুই  
খণ্ডে বিভক্ত। সকল বোগের নিদান ও  
ও চিকিৎসা এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্বন্ধে কন্ম-  
বিপাক ও রোগ সমূহের উৎপত্তির কারণ ইহাতে  
লিখিত হইয়াছে। রসবটিক এবং উদ্ভিদঘটিক  
উত্তরবিধ ঔষধেরই প্রয়োগবিধি এত্রে লিখিত  
আছে।

**ভৈষজ্য রত্নাবলী**—গোবিন্দ দাস রূত  
প্রসিদ্ধ চিকিৎসা সংগ্রহ। বঙ্গদেশে আয়ু-  
র্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইহা অত্যন্ত  
সমাদৃত।

**ভৈষজ্য সারামৃত সংহিতা**—  
উপেন্দ্র সিংহ প্রণীত রসচিকিৎসা বিষয়ক  
গ্রন্থ। (বা)

**ভোজন কুতূহল**—রঘুনাথ রূত খাদ্য  
পাক বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

**মধুমতী**—ইহা নরসিংহ কবিরাজ রচিত

দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা সংগ্রহ। নরসিংহ জাবিড়-  
নিবাসী নীলকান্ত ভট্টের পুত্র এবং রামকৃষ্ণ  
ভট্টের শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই।  
প্রবন্ধ লেখকের নিকট অতি প্রাচীন পুণি  
বর্তমান।

**মনোরমা**—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার  
লিখিত জরচিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

**মাধবনিদান**—বঙ্গের বৈদ্য শিরোমণি  
মাধবকর সংগৃহীত এই “রুথিনিশ্চয়” নামক  
গ্রন্থ নিদান বা মাধবনিদান নামে প্রসিদ্ধ।  
মাধবনিদান সমস্ত নিদানের পূর্ববর্তী বলিয়া  
প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ভারতের সকল দেশেই  
সমাদৃত। ইহার উপর বিজয় রক্ষিত প্রণীত  
“ব্যাখ্যা মধুকোষ” এবং বাচস্পতি রূত “আতঙ্ক  
দর্পণ” নামক টীকাগ্রন্থের পাওয়া যায়।  
মাধবকরের আবির্ভাবের সময় পুস্তকে নির্দেশ  
করা হইয়াছে।

**মাধব সংহিতা**—গ্রন্থ মধ্যে “মাধব  
বিরচিত” এই পরিচয় ব্যতীত গ্রন্থকারের আর  
কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই মাধব  
এবং মাধবকর যে একই ব্যক্তি তাহা নিশ্চয়  
করিয়া বলা যায় না। গ্রন্থে প্রথমে রোগের  
লক্ষণ এবং পরে চিকিৎসাবিধি লিখিত  
হইয়াছে। রোগের লক্ষণ মাধবনিদানের ঠিক  
অনুরূপ—কচিং রোগের লক্ষণ কিছু অধিক  
আছে মাত্র। মাধবনিদানের ক্রম অনুসারে  
জর হইতে বিবিনিদান পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে,  
পরে রসায়ন, বাজীকরণ, পঞ্চকর্ম ও পরিভাষা  
লিখিত হইয়াছে।

**মুত্র পরীক্ষা**—অজ্ঞাতনামা লেখক  
রচিত মুত্র পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ।  
অমুদ্রিত।

**মোমহর**—বিলাস—কবিরাজ রচিত

মোমহন প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। মোমহন পিরোজখাঁর পুত্র মহমুদ সাহের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন এবং ১৪৬৭ শকাব্দে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া স্বগ্রন্থে পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে চরক, সুশ্রুত, অত্রি, বাগ্‌ভট, উড্ডীশ, পুরুষতজাল, সন্দ্যোগিনী মতবৃন্দ, বঙ্গ, বঙ্গার্ণব, চক্র, অখিনীকুমার সংহিতা, নাগার্জুন, রসযোগ মুক্তাবলী, তবকণিকা, রাজমার্ভণ্ড, অংগমরত্নাবলী, যোগমালা, যোগরত্নাবলী, বদরত্নাকর, যোগনিধান ও ক্রিয়াকালগুণোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

যোগচন্দ্রিকা—লক্ষণাচার্য্যপ্রণীত বৃহৎ চিকিৎসা গ্রন্থ।

যোগচিন্তামণি—শ্রীচন্দ্রকীর্তির শিষ্য হর্ষদীপ্তি স্বরি নামক জৈন পণ্ডিত বিরচিত প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থ মধ্যে আত্রেয়, চরক, বাগ্‌ভট, সুশ্রুত, অখিনীকুমারস্বয়ং, হারীত কুণ্ড, ভেলা, বৃন্দ, মাধব কর প্রভৃতির গ্রন্থের উল্লেখ দেওয়া যায়।

যোগতরঙ্গিনী—দক্ষিণাপথ নিবাসী বৈষ্ণব ত্রিমল ভট্ট রচিত। গ্রন্থকারের পিতার নাম বল্লভ, পিতামহের নাম শিঙ্গন ভট্ট এবং পুত্রের নাম শঙ্করভট্ট। এই শঙ্করভট্ট রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ত্রিমলভট্ট এই গ্রন্থ ব্যতীত শতশ্লোকী, বৃহৎ যোগতরঙ্গিনী, ব্রহ্মমণিকামালা ও বৈদ্যচন্দ্রোদয় নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং অলঙ্কার মঞ্জরী নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থ মধ্যে অখিনীকুমার সংহিতা, চরকাচার্য্য, চপ্‌টি, আরোগ্যদর্পণ, রুপগাত্রেয়, কলিকা, গোরক্ষমাখ, চিকিৎসামণি, চক্রদত্ত, চিকিৎসা কলিকা, চিকিৎসাদীপ, ত্রিমলচার্য্য, নারায়ণ, প্রয়োগপারিজিত, বৃহদা-ত্রেয়, বৃদ্ধহারীত, বৌদ্ধমত, বৌদ্ধসর্বস্ব, ভদ্র

শোনক, ভালুকি তন্ত্র, ভৈরব তন্ত্র মদনপাল, মতিকুমার, যোগরত্নাবলী, যোগশত, যোগ-প্রদীপ, রসরত্নপ্রদীপ, রুদ্রচন্দ্র, রত্নপ্রদীপ, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রুগ্মিনিশ্চয়, রসরত্ন, রসপ্রদীপ, রাজমার্ভণ্ড, রসরত্নাবলী, বৈদ্যালঙ্কার, বৃন্দ, বীরসিংহাবলোকন, বসবরাজ, বৈদ্যাদর্শ, বাগ্‌ভট, শাঙ্গধর, সারসংগ্রহ ও সুশ্রুত এই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থে ৭৭টা তরঙ্গ বা অধ্যায়ে আয়ুর্বেদের সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

যোগদীপিকা—চিকিৎসা-সংগ্রহ। রণ-কেশরী প্রণীত।

যোগরত্নাবলী—শ্রীকৃষ্ণ বিরচিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

যোগশতক—শ্রীকৃষ্ণ দাস রুত জরা-ব্যাধিনাশক শতসংখ্যক যোগ সংগ্রহ। মুদ্রিত হয় নাই।

যোগসমুচ্চয়—দাশগুণপতি প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ।

যোগ সংগ্রহ—গ্রন্থকার অজ্ঞাত। উত্তম উত্তম প্রয়োগ সমূহের সংগ্রহাত্মক গ্রন্থ।

যোগ সুধানিধি—জগদীশের পুত্র বল্লভ মিশ্র প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থের বোড়শ প্রকরণের মধ্যে একটি প্রকরণ মাত্র পাওয়া যায়। এই প্রকরণ পাঠে বুঝা যায় যে, মহা-চিকিৎসা শেষ করিয়া জী পণ্ডর চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। জী-পণ্ডনিগের বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিষয় এই প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

রসদীপিকা—আনন্দাশ্রমের রুত। রস চিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। (বা)

রসমুক্তাবলী—রস শোধন সারসংগ্রহ ও

চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকর্তার নাম অজ্ঞাত। (বা)

রসরত্নদীপিকা—রামরাজ প্রণীত সংক্ষিপ্ত রসচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। (বা)

রসরাজ শঙ্কর—রস চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। রামকৃষ্ণ প্রণীত। (বা)

রসাবতার—(১) গ্রন্থকর্তা অজ্ঞাত। রস চিকিৎসা বিষয়ক বিপুল গ্রন্থ। (বা)

রসাবতার—(২) মার্গিকাচন্দ্র জৈন প্রণীত রসচিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। (বা) \*

রাজমার্গ—ভোজরাজ কৃত উত্তম প্রয়োগ সংগ্রহ। এই গ্রন্থ বর্ষে “আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থমালায়” মুদ্রিত হইয়াছে।

শতশ্লোকী—বোপদেব কৃত শতশ্লোক-ময় ঔষধ সংগ্রহ। বর্ষে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

শরীর নিশ্চয়াধিকার—রামদাস কৃত। গর্ভাবস্থার রমণীগণের পক্ষে যেরূপ নিয়ম পালন হিতকর এই গ্রন্থে তদ্বিষয়ক উপদেশ আছে। অমুদ্রিত।

শালিহোত্রসার সমুচ্চয়—কল্লন প্রণীত অষ্ট চিকিৎসা গ্রন্থ।

শ্রীকণ্ঠ নিদান—এই গ্রন্থ জীবরক্ষামৃত নামেও প্রসিদ্ধ। ইহাতে প্রথমে নাড়ী প্রভৃতি অষ্ট স্থান পরীক্ষা দ্বারা রোগ নির্ণয়ের উপদেশ দিয়া পরে প্রত্যেক রোগের নিদান লক্ষণাদির বিবরণ বলা হইয়াছে। সন্নিপাতাদি কতকগুলি রোগের বিজ্ঞানোপায় এই গ্রন্থে মাধবনিদান অপেক্ষা বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে এবং মাধবনিদান অপেক্ষা অধিকতর লংঘ্যক রোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

লক্ষণামৃত—কেরল দেশে প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত বিষ চিকিৎসা-গ্রন্থ। সুন্দর ভট্টপাদ প্রণীত।

সন্নিপাত মঞ্জরী—ভবদেব কৃত সন্নিপাত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সদৈশ্চতাবাবলী—জগন্নাথ গুপ্ত কৃত সংগ্রহ গ্রন্থ।

সংজ্ঞা সমুচ্চয়—চতুর্ভূজের পুত্র শিবদত্ত মিশ্র প্রণীত। গ্রন্থে ছাদশটি প্রকরণ আছে। যথা—১। দোষ, ধাতু, মন্দ প্রভৃতি। ২। রোগ সমূহের হেতু প্রভৃতি। ৩। দ্রব্য সমূহের গুণ ও বীৰ্যাদি। ৪। লব্ধন প্রভৃতি। ৫। ত্রিফলাদি পারিভাষিক সংজ্ঞা। ৬। দ্রব্য-দ্রব্য বিনির্দেশ। ৭। কৃতান্নবর্গ। ৮। অহিত দ্রব্য। ৯। স্বরসাদি সংজ্ঞা। ১০। পরিমাণ নির্দেশ। ১১। মেহ, বেদ, ধূম, গণ্ডূস, কবল, মুখলেপ, মুর্দ্ধলেপ, নেত্রাজন, পুটপাক প্রভৃতি। ১২। মিশ্রসংজ্ঞা প্রকরণ। ইহা উত্তম সংগ্রহ গ্রন্থ কিন্তু অমুদ্রিত।

সাধ্যরোগরত্নাবলী—শ্রীমলাল কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সিদ্ধভেষজ মণিমালা—জয়পুর-বাসী ভট্ট শ্রীকৃষ্ণরাম প্রণীত উত্তম আধুনিক গ্রন্থ।

সিদ্ধাস্ত মঞ্জরী—বোপদেব কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

শ্রীচিকিৎসা—বর্ষে বেকটের প্রেসে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ।

শ্রীবিলাস—দেবেশ্বর উপাধ্যায় প্রণীত শ্রী-চিকিৎসা বিষয়ক নাতিবৃহৎ গ্রন্থ।

\* “বা” চিহ্নিত রসগ্রন্থগুলির বিবরণ পরে জানিতে পারার রসগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া বিবিধ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।



হংসরাজ নিদান—হংসরাজ কৃত নিদানসংগ্রহ। এই গ্রন্থ পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। বঙ্গে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

হিতোপদেশ (১)—শ্রীকান্ত দাশ কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। ইহাতে শিশু, স্ত্রী ও বিষ চিকিৎসার বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অমুদ্রিত।

হিতোপদেশ (২)—শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত। (দ)

দক্ষিণাপথের আয়ুর্বেদ গ্রন্থ  
ও গ্রন্থকারগণ।

দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ প্রচারের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন বশতঃ আয়ুর্বেদের পঠন পাঠন সংস্কৃত ভাষাতেই অধিক প্রচলিত ছিল, কিন্তু দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষার স্থায় দ্রাবিড় আকৃষ্ট প্রভৃতি ভাষার ও সমধিক উন্নতি হওয়ায় বহু আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ ঐ সকল ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। যাহারা দক্ষিণাপথে সংস্কৃত গ্রন্থ সমুদ্র বচনা করিয়াছিলেন, তাহারা “বড়-সম্প্রদায়” এবং যাহারা দ্রাবিড়াদি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহারা “তেনু সম্প্রদায়” নামে প্রসিদ্ধ। আকৃষ্ট দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত ও রচিত কোন কোন গ্রন্থ ছই সহস্র বৎসর বা তদুর্দ্ধ কালের প্রাচীন। অবশ্য দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষাতে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, অনেক স্থলে সেই সকল গ্রন্থ যে ভাষাগ্রন্থগুলির মূলীভূত—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক মৌলিক ভাষাগ্রন্থও বর্ত্তমান। আমরা দক্ষিণাপথের যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাদের

মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় বিবিধ সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ ভাবে তদদেশীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামের তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার।

পুলস্ত্য	জেবিমুহু
তেরম্যার	পেরাঁতোমুহু
পুহমুনি	তেকাটুমুহু
ভোগর	আলতু কুনখি
পুলিগ্নানি	উগ্রাদিত্যাচার্য্য
বৈথরিমুহু	মঙ্গরাজ
শিরট্টনমুহু	অভিনব চন্দ্র
তিরুবানু কুরু	পূজ্যপাদ
হস্তচারি	বসবরাজ
বিশাল	বিজ্ঞানেশ্বর
বিভণ্ডক	গঙ্গাধর
বৈদর্ভনর	মহান ভৈরব
বাথলি	মঙ্গলগিরি স্বরী
মৃগশর্শ্ব	• শ্রীনাথ পণ্ডিত
সুরেন্দ্র	ত্রিমল ভট্ট
দেবেন্দ্র মুনি	শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিত
নংজরাজ	শ্রীকণ্ঠ শিব পণ্ডিত
নৃসিংহভট্ট	নাগনাথ
বলভেন্দ্র	

গ্রন্থ।

কাশ্যপম্	উমামহেশ্বর সংবাদ
অভিধান রত্নমালা	চিন্তামণি
দ্রব্যগুণ রত্নাবলি	বসবরাজী
দ্রব্যগুণ করবলী	হিতোপদেশ
আয়ুর্বেদ মহোদধি	যোগরত্নাবলি
পদার্থ চক্রিকা	মৌলিকবিদ্যা

জবাগুণ চতুঃশ্লোকী বৃহৎ যোগতরঙ্গিনী  
 শ্রীকর্ণ নিদান পরহিত সংহিতা  
 নিদান প্রদীপী রস প্রদীপিকা (আঃ)\*  
 নাড়ীজ্ঞান বিনির্গয় শিবভক্ত রত্নাকর  
 বড়বিধ নাড়ী তন্ত্র আনন্দ কন্দ  
 নাড়ী নক্ষত্র মালা রুগ-হৃদয়  
 নাড়ী জ্ঞান রুগ-বিলাস  
 ভেষজ সর্কষ রুগ-হৃদয় সাব  
 ধনুস্তর বিলাস আয়ুর্বেদ সূত্র  
 যোগ শতক ভেষজ-কল্প (আঃ)  
 সরিষাপাত চক্ষিকু নবনাথ সিদ্ধ দীপিকা (আঃ)  
 রাজমৃগাঙ্ক আকু বৈথ চিন্তামণি (আঃ)  
 প্রমোত্তর রত্নমালা শতশ্লোকী (আঃ)  
 ধনুস্তর সারনিধি আয়ুর্বেদার্থ সংগ্রহ (আঃ)  
 বীরভট্টীয় ধনুস্তর বিজয় (আঃ)  
 গদ সঞ্জীবনী ভিষগরাজন (আঃ)  
 বুধরাজীয় (আঃ) ঋগেন্দ্রমণি দর্পণ (আঃ)  
 দূতধায় (আঃ) সাহিত্য বৈজ্ঞানিক জলনিধি  
 মদন কামরত্ন (আঃ) ভিষগর তিলক  
 বালগ্রহ চিকিৎসা কবিজ্ঞানৈক মিত্র  
 সর্করোগ চিকিৎসা রত্ন পূজা পাদায়  
 চিকিৎসা নলু (?) কল্যাণকারক  
 বাগু ভট্ট চিন্তামণি সহস্র যোগ  
 বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ হরমেখলা  
 চিকিৎসা সার আরোগ্য কল্পদ্রুম  
 আকু, জাবিড় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত  
 আরও কতকগুলি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত চিকিৎসা  
 গ্রন্থের তালিকা নিম্নে লিখিত হইল। এই  
 সকল গ্রন্থের নাম পর্যাঙ্ক জাবিড় ভাষায় রচিত।  
 অগস্ত্যর গেরুন্দকিরিট সরকুবেশ

অগস্ত্যর ভাস্কর্যৈর রামদেবেন পেরিনল  
 অগস্ত্যর আয়ুর্বেদ ভাষ্যম্ গোরকব বৈজ্ঞ  
 অগস্ত্যর নাড়িমূল মন্তুমুনি এমর  
 অগস্ত্যর আশ্রিতেননুর করুববার ত্রিপুর  
 অগস্ত্যর তোলকাপাং তেরবাম্ করণীল মুরুর  
 অগস্ত্যর পরিপূর্ণঃ  
 পুলিঙ্গাণি ঐনুর অগস্ত্য গিললৈতমিস্  
 ভোগর এমর শিবজালাং  
 উত্তমুনি আয়িরং মনুখ জালাং  
 রোনাম্বি ঐনুর কোংকণর নিদান

### সিংহলে আয়ুর্বেদ প্রচার—

দক্ষিণাপথ হইতে সিংহলদ্বীপে আয়ুর্বেদ প্রচারিত  
 হইয়াছিল। আনন্দকন্দ নামক গ্রন্থপ্রণেতা  
 মন্তনভৈরব সিদ্ধসিংহলদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ  
 আয়ুর্বেদাচার্য্য ছিলেন। সারথিসংগ্রহ, ভেষজ-  
 মঞ্জুসা, সারসংক্ষেপক, ভেষজকল্প, যোগশতক  
 সারস্বত নিষট্ট, সিদ্ধোদধি নিষট্ট এবং যোগ-  
 রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ সিংহলে এখনও প্রচলিত  
 আছে। তন্মধ্যে যোগরত্নাকর ছয় শত বৎসরের  
 ও অধিক কাল পূর্বে ময়ুরপাদ ভিক্ষু নামক  
 নৌকাচাৰ্য্য কর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল।\*

আমরা বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণ যতদূর সংগ্রহ  
 করিতে পারিয়াছি তাহা এস্থলে লিখিত হইল।  
 বর্তমান কালের গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের পরিচয়  
 বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। লিখিত গ্রন্থ  
 সকল ব্যতীত ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে বহু  
 গ্রন্থরত্ন অপ্ৰকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, সে  
 বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত আয়ুর্বেদীয়  
 গ্রন্থের উদ্ধার কল্পে সমগ্র ভারতবাসী যথোচিত

\* “আঃ” চিহ্নিত পুস্তকগুলি আকু ভাষায় রচিত।

\* দক্ষিণাপথ ও সিংহলে আয়ুর্বেদ গ্রন্থের লবণাক্ত অধিকাংশ বিষয় সারথিসংগ্রহ, ভেষজ-  
 মঞ্জুসা, সারসংক্ষেপক, ভেষজকল্প, যোগশতক, সারস্বত নিষট্ট, সিদ্ধোদধি নিষট্ট  
 বৈদ্যরত্ন গোপালচন্দ্র বংশীর সংগ্রহে সংলগ্ন হইয়াছে।

প্রদত্ত হয় নাই। যাহাতে দেশের সমস্ত চিকিৎসক ও পণ্ডিতগণের যত্নে ভারতবাসী বিশেষ প্রযত্ন হয় তাহার আয়োজন সম্পত্তি হইতেছে। এইরূপ চেষ্টার ফলে আয়ুর্বেদের যৌবনোন্মেষ অঙ্গপুষ্ট হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক “নিখিল ভারতবর্ষীয়

আয়ুর্বেদ সম্মেলন” নামে যে মহাসভা স্থাপিত হইয়াছে, প্রতিবৎসর ভারতবর্ষের কোন একটি নগরে সেই মহাসভার অধিবেশন হইয়া থাকে। সেই অধিবেশনের সহিত যে প্রদর্শনী খোলা হয়, তাহাতে প্রতি বৎসর বহু নতন গ্রন্থ দেখান হয়। সম্মেলনের স্থায়ীসমিতি দ্বারা প্রচারিত বিবরণীতে সেই সকল গ্রন্থের পরিচয় লিখিত হইয়া থাকে।

## আয়ুর্বেদে রক্তমোক্ষণ।

—:—:—

(পূর্বাভাস)

(কবিরাজ শ্রী.....বন্দ্যোপাধ্যায়।)

অসম্পূর্ণ ধাতু বলিয়া বালকদিগের, ক্ষীণ ধাতু বলিয়া স্ত্রীলোকদিগের, বায়ুরোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কায় ও উরঃকৃত বশতঃ ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের, তমোবহুল প্রকৃতি বলিয়া রক্ত দর্শনে মুচ্ছা জন্মাইবার আশঙ্কায় ভীকুব্যক্তিদিগের, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কায় পরিশ্রান্ত ব্যক্তিদিগের, বায়ু প্রকুপিত হইবার ভয়ে স্ত্রীসহবাস হেতু ক্রুশ ব্যক্তিদিগের, অতিরিক্ত মুচ্ছা হইবার ভয়ে মদ্যপানী ব্যক্তিদিগের, বায়ু প্রকুপিত হইবার ভয়ে পথভ্রমণ হেতু ক্রুশ ব্যক্তিদিগের, অধিক বায়ু কুপিত হইবার ভয়ে যাহাদের বমনকরান হইয়াছে তাহাদের ও যাহাদের বিরেচন করান হইয়াছে তাহাদের, বায়ু প্রকোপের ভয়ে আত্মপিত (যাহাদের আত্মপান দেওয়া হইয়াছে) ও জাগরণশীল ব্যক্তিদিগের, মন্দ অগ্নি অধিক তর মন্দ হইবার ভয়ে অজ্ববাসিত (যাহাদের দেহবস্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে) ব্যক্তিদিগের,

পৌষ—৩

প্রধান ধাতুক্ক্ষয় হইয়া প্রাণনষ্ট হইবার ভয়ে অলসপ্রাণ ব্যক্তিদিগের, ক্ষীণধাতু বলিয়া দেহ নাশেব ভয়ে ক্ষীণ ও গতিশীলদিগের, কাস, শ্বাস ও শোথ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের, ধাতুপুষ্টি হয় না বলিয়া রক্তুক্কয় বশতঃ প্রাণনাশের ভয়ে তাহাদিগের, প্রলাপাদি জন্মিবার ভয়ে জীর্ণ অর রোগীর, অত্যধিক বায়ুপ্রকোপের ভয়ে আক্ষেপক রোগীর, পক্ষাঘাত রোগীর ও উপবাসীদিগের এবং প্রাণনাশের আশঙ্কায় মুচ্ছিত ও পিপাসিত ব্যক্তিদিগের শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে। বিদ্ধ করিলে যে সকল উপদ্রবের আশঙ্কায় বিদ্ধ করা উচিত নহে বলা হইয়াছে, সেই সকল উপদ্রব ঘটয়া থাকে।

শিরা অবৈধ্য হইলে, অথবা শিরা বিদ্ধ করিবার যোগ্য তাহা দেখা না বাইলে, দেখা গেলেও যদি যন্ত্র দ্বারা বন্ধন করা না যায়, বন্ধন করিলেও যদি শিরা উন্নত না হয়, তাহা হইলেও শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে।

পূর্বে সে সমস্ত ব্যাধিতে রক্তমোক্ষণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—সেই সমস্ত ব্যাধিতে এইরূপে সকল ব্যাধির বিষয় পূর্বে কথিত হয় নাই অর্থাৎ অপক ত্রণ প্রভৃতি ব্যাধিতে স্নেহ স্বেদাদি প্রয়োগ করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে।

কিন্তু যাহাদের শিরা বিদ্ধ করা নিষিদ্ধ, তাহাদের বিব জনিত উপসর্গে অর্থাৎ সর্পাদি, কর্কটক দষ্ট হইলে এবং বিদ্রুহ প্রভৃতি অগ্নি উপরে অসাধ্য ব্যাধিতে প্রাণনাশের আশঙ্কা ঘটিলে শিরা বিদ্ধ করা যাইতে পারে।

রোগীকে স্নেহ পান দ্বারা সিদ্ধ এবং স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া রক্তের উৎকৃষ্ট জন্মাইবার জন্য তরল খাদ্য বা যবাগু পান করাইবে। অনন্তর যথাকালে (অর্থাৎ যে ক্ষত্রে এবং বেক্রপ সময়ে শিরা বিদ্ধ করা হিতকর) রোগীকে উপবেশন করাইয়া, বয়, পাট, চর্ম, গাছের ছাল, লতা দ্বারা যে শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে সেই শিরা 'মস্তকে' অত্যন্ত গাঢ় না হয়—একপক্ষে এবং হস্ত পদে অত্যন্ত শিথিল না হয়—একপক্ষে বদ্ধ করিয়া উপযুক্ত শস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিবে।

অত্যন্ত শীতের সময়, অত্যন্ত গরমের সময়, প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে। রোগ না থাকিলে কদাচ শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে।

যে রোগীর শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহাকে সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া কনিষ্ঠাস্থলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক হস্ত প্রমাণ উচ্চ আসনে উপবেশন করাইবে। অনন্তর পদদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া জাহ্নুমুদ্রার উপরে দুই হস্তের দুই কনুই রাখিতে হইবে এবং দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ষাড়ের পিছন দিকে সংলগ্ন

করিবে। বন্ধন রজ্জুর অর্থাৎ যে রজ্জু দ্বারা শিরা বন্ধন করা হয়—তাহার দুই মুখ গ্রীবাঙ্গস্থ মুষ্টিদ্বয়ের উপর দিয়া পশ্চাৎভাগ হইতে অগ্নি ব্যক্তি উত্তান বামহস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিবে এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেধ্য শিরা উত্থাপিত করিবে। এই সময় রোগী মুখ বায়ুপূর্ণ করিয়া থাকিবে এবং যাহাতে সমাক রক্তস্রাব হয় তজ্জন্য পশ্চাৎভাগস্থ ব্যক্তি রজ্জু ধরিয়া টানিবে ও রোগীর পৃষ্ঠদেশ মর্দন করিবে। মুখ ব্যতীত মস্তকের শিরা বিদ্ধ করিবার প্রণালী এইরূপ।

পায়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে—যে পায়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে—সেই পাসম-তল স্থানে স্থিরভাবে রাখিতে হইবে এবং অগ্নি পা খানি ঈষৎ সঙ্কুচিত ও উচ্চ করিয়া রাখিবে। অনন্তর বেধ্য পা খানি হাটুর নীচে রজ্জু দ্বারা বেঠন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা পায়ের গুলফদেশ পাড়ন করিবে এবং বিদ্ধ করিবার স্থান হইতে চারি অঙ্গুলি উপরে বস্ত্র বন্ধনাদি দ্বারা বন্ধন করিয়া পদের শিরা বিদ্ধ করিবে। হস্তের উপরিভাগে শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, চারি অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিবে এবং সূত্বকর ভাবে উপবেশন করাইয়া বিদ্ধ করিবার ভায় যন্ত্রিত অর্থাৎ বদ্ধ করিয়া হস্তের শিরা বিদ্ধ করিবে।

গৃধ্রসী (Sciatica) রোগে জাহ্নু সঙ্কুচিত করিয়া শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। শ্রোণি (পাছ) পৃষ্ঠ ও বক্ষদেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে পৃষ্ঠদেশ উন্নত ও বিস্তৃত করিয়া এবং মস্তক নীচু করিয়া রাখিতে হয়। উদর ও বক্ষস্থলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে বক্ষস্থল বিস্তারিত, মস্তক উন্নত এবং শরীর প্রসারিত রাখিতে হয়। পার্শ্বদেশের শিরা

বিদ্ধ করিতে হইলে দুই হস্ত দ্বারা শরীর জড়াইয়া ধরিতে হয়। লিঙ্গের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে লিঙ্গ অবনত করিয়া রাখিতে হয়, জিহবার অধোভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে জিহবার অগ্রভাগ উন্নত করিয়া উপরের দন্তপাটিতে ঠেকাইয়া রাখিতে হয়। তালু এবং দন্তমূলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে মৃণ পূর্ব হইয়া রাখিতে হয়। এইরূপে রোগ বিশেষে এবং স্থান বিশেষে নৃক্তিপূর্বক বাধাতে বেধা শিরা উন্নত হইয়া উঠে—একপ ভাবে অবস্থান করাইয়া বা যন্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে।

মাংসল স্থানে শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে এক ঘব প্রমাণ শস্ত্র প্রবিষ্ট করাইবে। অত্যাশ্রয়নে অরুঘব প্রমাণ বা ত্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা এক ত্রীহি অর্থাৎ ধাতু পরিমাণ বিদ্ধ করিবে। অস্থি উপর কুঠারিকা নামক শস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধ ঘব পরিমাণ বিদ্ধ করিতে হয়।

বর্ষাকালে মেঘ শূন্য দিবসে, গ্রীষ্মকালে শীতল সময়ে \* এবং শীতকালে মধ্যাহ্নে অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত।

স্নানক প্রকারে শস্ত্র প্রয়োগ করা হইলে রক্ত মুহূর্তকাল ( ৪৮ মিনিট ) ধারাকারে স্রাব হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। কুস্তম্ব ফুল পীড়ন করিলে প্রথমে যেমন শীতবর্ণ স্রাব হয় সেই রূপ শিরা বিদ্ধ করিলে প্রথমে দুষ্ট রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। মুচ্ছিত, ভীত, পরিশ্রান্ত ও তৃপ্তার্ভ ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্তস্রাব হয় না। আবার রোগীকে যন্ত্রিত করিলেও যে সকল শিরা উন্নত হয় না, সেই সকল শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্ত স্রাব হয় না।

বহুদোষ বিশিষ্ট ক্ষীণ ব্যক্তির এবং মূর্ছা পীড়িত অক্ষীণ ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলে যদি রক্ত স্রাব না হয় এবং রক্তমোক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপরাহ্নে পর দিবসে বা তৃতীয় দিবসে পুনর্বার শিরা বিদ্ধ করা উচিত।

ক্ষীণ ব্যক্তির শরীর হইতে সমস্ত দূষিত রক্ত নির্গত করিবে না। কারণ অতিরিক্ত রক্ত মোক্ষণ করাইলে বিপত্তি ঘটতে পারে। অবশিষ্ট দোষ—দোষ নাশক ঔষধ দ্বারা প্রশমন করা উচিত। বলবান, বহু দোষ যুক্ত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত (বালক বা বৃদ্ধ নহে) ব্যক্তির শরীর হইতে ১০৮ তোলা রক্তস্রাব করান যাইতে পারে।

পাদ-দাহ, পাদহর্ষ, অববাহক, বিদর্প, বাতরক্ত, বাত-কণ্টক, বিচর্জিকা ও পাদদারী প্রভৃতি রোগে ক্ষিপ্র মর্শ্বের (অজুষ্ঠ ও তৎপার্শ্বস্থ অঙ্গুলির মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ মর্শ্বস্থলে) দুই অঙ্গুলি উপরে ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। শ্লীপদ রোগে ক্ষিপ্র মর্শ্বের চারি অঙ্গুলি উপরে বিদ্ধ উচিত। ক্রোষ্ট্র কশীর্ষ, খঞ্জ ও পঙ্কু রোগে—গুলফ দেশের চারি অঙ্গুলি উপরে জজ্বা দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। অপচী রোগে ইন্দ্রবন্তি নামক মর্শ্বের (জজ্বার মধ্যে পশ্চাৎ দিকে পায়ের গোড়ালি হইতে তের অঙ্গুলি উপরে ইন্দ্রবন্তি মর্শ্ব) দুই অঙ্গুলি নিম্নে শিরা বিদ্ধ করা কর্তব্য। গৃধ্রনী রোগে জাহ্ন সন্ধির চারি আঙ্গুল উপরে বা নীচে শিরা বিদ্ধ করিবে। গলগণ্ড রোগে উরু দেশের মূল ভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। এই পর্য্যন্ত এক সকথির (সমস্ত

\* 'গ্রীষ্মকালে শীতলে' এই পাঠের উল্লিখিত 'তৃতীয় প্রহারানন্তরম্' এই বাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তৃতীয় প্রহারের পর শীতল কাল নয়। বিশেষতঃ পুনরায় বিদ্ধ করিতে হইলে অপরাহ্নে বিদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং গ্রীষ্মকালে আহারে বিদ্ধ করা উচিত বলিয়া বোধ হয়।—লেখক।

পায়ের) শিরা বিদ্ধ করিবার যেরূপ নিয়ম বলা হইল—অপর সকথির এবং বাহ্যর শিরাও এইরূপ নিয়মে বিদ্ধ করিবে।

বিশেষতঃ গ্ৰীহাঙ্কি রোগে বাম বাহ্যর কূর্পর সন্ধির কঙ্করের অভ্যন্তরস্থ শিরা বা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থিত শিরা বিদ্ধ করিবে এবং যকৃৎবৃদ্ধি রোগে ও দক্ষিণ বাহ্যর ঐরূপ স্থলের শিরা বিদ্ধ করিবে। কাস ও শ্বাস রোগেও এইরূপ নিয়মে বিদ্ধ করা উচিত। বিষচী রোগে গৃধসীর ছায় অর্থাৎ কঙ্করের চারি অঙ্গুলি উপরে বা নিম্নে শিরা বিদ্ধ করিবে। শূলযুক্ত প্রণাহিকা রোগে কটাদেশের দুই অঙ্গুলির মধ্যস্থ স্থানের শিরা বিদ্ধ কবা উচিত। পরিকণ্টিকা (কণ্ঠন-বৎ দীড়া) ও উপদংশ, শূকদোষ ও শুক্রজ রোগে ক্লিষ্টমধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। মূত্রবৃদ্ধি রোগে কোবেব পার্শ্বস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। ভলোদনে নাভির অধোভাগে সেবনার চারি অঙ্গুলি বানদিকের শিরা বিদ্ধ করিবে। অর্ধসিঁদ্রি ও পার্শ্ব শূল রোগ বাম পার্শ্বে হইলে—বাম পার্শ্বের বগল ও স্তনের মধ্যবর্তী স্থলে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে দক্ষিণ পার্শ্বের ঐরূপ স্থলের শিরা বিদ্ধ করিবে। কেহ কেহ বলেন যে, বাহ্য শোষ এবং অববাহক রোগে কঙ্করের মধ্যস্থিত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। তৃতীয়ক অরে সন্ধির সন্ধির (গীবা ও মধ্য শবীরের সন্ধি) অংশ নামক মর্ম্মরর বাদ দিয়া তৎসমীপবর্তী শিরা বিদ্ধ করা উচিত। চাতুর্থক অরে সন্ধি-সন্ধির অধোভাগে বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। অপস্মার রোগে তদ্রূপ সন্ধির (চোয়ালের সন্ধি) মধ্য গত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। উন্মাদ এবং অপস্মার রোগে বন্ধ-স্থল, গুণাটি এবং অপস্মার রোগের

সন্ধিস্থলে শিরা বিদ্ধ করিবে। জিহ্বা রোগে ও দন্ত রোগে জিহ্বার অধোভাগস্থ এবং তালু রোগে তালুগত শিরা বিদ্ধ করা উচিত। কর্ণশূলে ও কর্ণ রোগে কর্ণস্থলের উপরিভাগে চারিদিকে বিদ্ধ করা যাইতে পারে। নাসারোগে এবং ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইলে—নাসাগ্রে শিরা বিদ্ধ করা উচিত। তিমির নামক চক্ষুরোগে, চক্ষুর পাক শিরোরোগে, অধিমস্থ প্রভৃতি রোগে নাসিকার সমীপস্থ ললাট স্থিত এবং অপান্নদেশে ক্রপুচ্ছ মধ্যবর্তী শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

শিরা বিদ্ধ করিবার দোষ বিংশতি প্রকার, যথা—দুর্সিদ্ধ, অতিবিদ্ধ, কুঞ্চিত, পিচ্ছিত, কুটিত, অপ্ৰস্কৃত, অত্যাধিক, অস্ত্র অতিহিত, পরিণত, কুণ্ঠিত, ব্যাপিত, অমু-ষ্টিত, বিদ্ধ, শব্দহত, ত্রিঘ্যগবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, অব্যাধা, বিদ্ধত, ধেগুকা, পুনঃপুনঃ বিদ্ধ এবং শিবা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি ও মস্তিষ্কানে বিদ্ধ। প্রত্যেকের লক্ষণ পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

হস্ত অঙ্গদ্বারা বিদ্ধ করিলে যতপরিমিত সম্যক প্রকারে স্কৃত না হয় এবং বেদনা ও শোথ জন্মে তবে তাহাকে দুর্সিদ্ধ বলা যায়। উপস্কৃত প্রমাণের অতিরিক্ত বিদ্ধ করিলে যদি শোণিত দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অথবা অধিক পরিমাণে শোণিত প্রাব হয়, তবে তাহাকে অতিবিদ্ধ বলে। কুঞ্চিত অর্থাৎ বিদ্ধ স্থান কুটিলীভূত হইলেও এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ধারহীন (ভোঁতা) অঙ্গদ্বারা বিদ্ধ করিলে যদি বিদ্ধস্থান মথিত হইয়া ফুলিয়া উঠে তবে তাহাকে পিচ্ছিত বলা যায়। শব্দ যদি সম্যক প্রমাণ অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে এবং তৎকর্তৃক পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে কুটিত বলা যায়। শীত, ভর এবং মৃদুতা ইত্যাদি লক্ষণ বিদ্ধস্থানে

হয়, তবে অপ্ৰসূত বলা যায়। তীক্ষ্ণ ও  
বৃহৎ মুখ বিশিষ্ট শস্ত্র দ্বারা অধিক পরিমাণে  
বিদ্ধ করিলে তাহাকে অম্লদীর্ণ বলে। অন্ন  
রক্তস্রাব হইলে অস্ত্রে অভিহত বলা যায়।  
অন্ন রক্ত বিশিষ্ট শক্তির বিদ্ধ স্থান বায়ু পূর্ণ  
হইলে তাহাকে পরিপুষ্ট বলে। উপযুক্ত  
প্রমাণের চতুর্থাংশ মাত্র বিদ্ধ হইয়া অন্ন  
রক্তস্রাব হইলে তাহাকে কুণ্ঠিত বলে। কম্প-  
বান ব্যক্তির অল্পপুষ্ট স্থানে বন্ধন হেতু  
শোণিত স্রাব না হইলে তাহাকে ব্যাপিত  
বলে। বেধ্য শিরা উখিত হইলে যদি বিদ্ধ  
করা যায় তাহা হইলে রক্তস্রাব হয় না।  
ইহাকে অম্লুত্বিত বলে। শিরা ছিন্ন হইয়া  
যদি অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় এবং গমন ও  
গ্রহণাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, তবে তাহাকে  
শঙ্কত বলে। তিথ্যাকভাবে শস্ত্র প্রয়োগ  
কণায় যদি সম্যাকরূপ বিদ্ধ না হয় তবে  
তাহাকে তিথ্যাকবিদ্ধ বলে। হীন শাস্ত্র  
প্রয়োগ হেতু অধিক ক্ষত হইলে অপবিদ্ধ  
বলা যায়। শস্ত্র প্রয়োগের অযোগ্য স্থানে  
বা অযোগ্য ব্যক্তিকে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে  
তাহাকে অবাধ্য বলে। অব্যবস্থিত (তাড়া-  
তাড়ি বা কম্পিত হস্তে) ভাবে বিদ্ধ করিলে  
তাহাকে বিদ্ধত বলে। উপযুক্ত শস্ত্র প্রয়োগ  
করিলে মুহুর্মুহু শোণিত স্রাব হইতে থাকে,

ইহাকে ধেনুক বলা যায়। সূক্ষ্ম শস্ত্র দ্বারা  
এক স্থানে বহুবার বিদ্ধ করা হইলে পুনঃ  
পুনঃ বিদ্ধ বলে। স্নায়ু, অস্থি, শিরা, সন্ধি  
ও মর্শ্বস্থান বিদ্ধ হইলে অত্যন্ত বেদনা, শোষ,  
এমন কি মূচ্ছা পর্য্যন্ত ঘটতে পারে।  
এইজন্য অত্যন্ত সাবধানতার সহিত শিরা বিদ্ধ  
করিতে হয়। কেননা অজ্ঞানতা বশতঃ শিরা  
ব্রব্ধের দোষ ঘটলে নানাপ্রকার বিপত্তি  
ঘটিতে পারে।\*

শিরা বিদ্ধ করিলে যত শীঘ্র ব্যাধি প্রশমিত  
হয়, স্নেহ প্রয়োগাদি এবং লেণুনাদি ক্রিয়া দ্বারা  
তত শীঘ্র প্রশমিত হয় না। কায় চিকিৎসা  
মধ্যে যে বস্ত্তি ক্রিয়াকে অর্দ্ধেক চিকিৎসা বলা  
হইয়াছে, শল্য তন্ত্রে সেইরূপ শিরাবেধকে  
অর্দ্ধেক চিকিৎসা বলা হইয়াছে।

মিথু, মিশ্র, বাস্ত, বিরিক্ত, আচ্ছাদিত,  
অমুবাসিত ও শিরা বিদ্ধ ব্যক্তিগণ শরীর সবল  
না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রোধ, গরিশ্রম, মৈথুন,  
দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত কথা বলা, ব্যায়াম, যানে  
ভ্রমণ, অধিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া থা বসিয়া থাকা,  
ভ্রমণ, শীত, বায়ু ও রোদ্র সেবন, বিরুদ্ধ, অসামান্য  
ও অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে।  
কেহ কেহ কেহ বলেন। ঐক মাস কাল এই-  
রূপ নিয়ম পালন করা উচিত ;

## স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

প্রাতর্কথান।

—:—

(ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার এইচ এল, এস, এস)।

স্বাস্থ্য কামী ব্যক্তি অতি প্রত্যুষে শয্যা-  
তাগ করিবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তই গাত্রোথানের  
উপযুক্ত কাল। স্বর্গোদয়ের দেড় ঘণ্টা বা  
অর্দ্ধ প্রহর কালের মধ্যে দুইটি মুহূর্ত্ত আছে,  
তাহার প্রথম মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয়  
মুহূর্ত্তের নাম রৌদ্র। এতদ্রূপে গ্রীষ্মকালে  
বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ভোর ৪ ঘটিকায়, বর্ষা-  
কালে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ৪ ঘটিকা ৪৫  
মিনিটে বা ৪। সোয়া চারিটায়, ভাদ্র আশ্বিন  
মাসে ৪। টায়, কাঠিক অগ্রহায়ণ পৌষে পাঁচ-  
টায়, পৌষ মাঘ মাসে ৫ ঘটিকায় এবং ফাল্গুন  
ও চৈত্র মাসে ৫। সোয়া পাঁচ ঘটিকায় সময়  
শয্যাভ্যাগ করা সকল সুস্থ ব্যক্তিরই নিত্য  
প্রয়োজন। তবে অস্থির ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র।  
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের এই সুন্দর সময় শাস্ত্রে “মধুময়  
সময়” বলে। এ সময় মধুর বায়ু প্রবাহিত  
হয়, সাগর ও নদীগণ মধু ক্ষরণ করে, বৃক্ষলতা-  
গণ মধুর ভাব ধারণ করে, এমন কি পার্থিব  
ধূলিকণা পর্যন্ত মধুবৎ হইয়া থাকে। এ স্থলে  
মধু শব্দের অর্থ কল্যাণকর বা স্বাস্থ্যপ্রদ।  
ফলতঃ প্রত্যুষে গাত্রোথান যে সর্বথা কর্তব্য  
সে বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্রে বহু উপদেশ উক্ত  
আছে। শাস্ত্রকারগণ সে কালের বর্ণন অতি  
সুন্দরভাবে করিয়াছেন।—

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও প্রাতর্কথানের উপ-  
কারিতা বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াই প্রাতঃ-  
কালীন ভ্রমণ বা (morning walk) ব্যবস্থা

করেন। এসময়ে তাঁহারা একরূপ একটি গৃহ ও  
ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন যে,—

“The early bed and early-rise  
Makes the man healthy wealthy  
and wise.”

অর্থাৎ

সকালে শয়ন আর প্রত্যুষে উত্থান—

বৃদ্ধি করে মানবের স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান।

কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুশাস্ত্র প্রাতঃকালীন ভ্রমণের  
পূর্বে অর্থাৎ জাগ্রত হইবামাত্রই সর্বপ্রথমে  
পরম কারুণিক পরমেশ্বরের এবং দেবতা ও সাধু  
গণের নাম স্মরণ এবং শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ  
পূর্বক প্রণাম করিয়া গত রাত্রের কৃতাপরাধ  
সমূহের মার্জনা এবং অজ্ঞতার শুভদিন প্রার্থনা  
করিয়া গইয়া শয্যাভ্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন।  
সেরূপ আচরণ করিলে মঙ্গলময় পরম পিতার  
করুণায় সমস্ত দিন মঙ্গল ভাবে নিরাপদে  
কাটিয়া যায়। পাশ্চাত্য শাস্ত্রে সেরূপ কোন  
ব্যবস্থা নাই বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তি উপেক্ষা  
করা উচিত নহে। হিন্দুর বাবতীয় কার্যেই  
ভগবানেন্দ্র নাম স্মরণ করিবার ব্যবস্থা আছে।  
অতঃপর শয্যাভ্যাগকালে “জানামি ধর্ম্যং নচ  
মে প্রযুক্তি, জানাম্য ধর্ম্যং নচমে নিবৃদ্ধিঃ। যদ্য  
হৃদিকেশু হৃদিস্থিতেন বধা নিযুক্তোহপি তথা  
করোমি ॥” গীতোক্ত এই স্মার শ্লোকটি পাঠ  
করতঃ “প্রিয় বর্ত্তার জুবে নমঃ” এই মন্ত্রো-  
চ্চারণ পূর্বক পৃথিবীকে সন্মান করিয়া



প্রথমতঃ দক্ষিণপদ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া গাজোথান করিবে।

### বিষ্ঠামূত্রাৎসর্গ।

উপিত হইয়া চক্ষু ও মুখে জল দিয়া মুখ প্রক্ষালনান্তে বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন পূর্বক মল মূত্র বিহীন শুচি স্থানে অবস্থিতির স্থান হইতে নৈশ্বত কোনে বান বিক্ষেপ যোগ্য স্থানের বাহিরে অর্থাৎ সান্দ্র শত-হস্তের বাহ্য-দেশে যত্নে গমন ও উচ্ছ্বাস বর্জিত মৌনী এবং সমাপ্তি চিন্তে উভয় পাটির দস্তে দস্তে দৃঢ় লম্বভাবে অবিলম্ব করতঃ মলমূত্র ত্যাগ করিবে। সেস্থানে অধিককাল অবস্থান করিবে না এবং ব্যাংকাচ্ছারণ করিবে না। দিবাভাগে উত্তর মুখ প্রাপ্তিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। রুদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহই দক্ষ্যাকালে মলাদি ত্যাগ করিবে না।

উক্তরূপ ব্যবহার আধুনিক পায়খানায় মল মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে। কাবণ তাহাতে উক্ত কোন নিয়মই স্থির রাখিবার উপায় নাই। প্রাতঃকালে পুষ্পাদির মনোরম সুগন্ধের পরিবর্তে পায়খানার দুর্গন্ধ গ্রহণ যে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন কালমাহাত্ম্য যে, আজ কাল বিশেষতঃ সহরবাসিগণের পক্ষে সেই বিষমর অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ প্রত্যহ— এমনকি দৈনিক দুই তিন বারও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে কিরূপে, এই নিমিত্তই সহরপেক্ষা পঞ্জাবাদী এ পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

বিষ্ঠামূত্র ত্যাগকালে বিজ্ঞাপ্তি গৃহী যজ্ঞো-পনীত্যক পৃষ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ বর্জিত হস্তবৎ কণ্ঠ লিখিত, অথবা মস্তক অবগুষ্ঠন পূর্বক দক্ষিণ

কর্ণে ধারণ করিবেন। তবে যদি প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা থাকে কিম্বা কোন কারণে ভীতির সঞ্চার হয়, তবে দ্বিজ সর্বল ছায়াতে কি অন্ধকারে দিবাতে কি রাত্রিতে নিজের সুবিধানত যে কোন মুখে উপবিষ্ট হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। সূর্য্য, জল, গো ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সম্মুখবর্তী করিয়া এবং পশু, ভ্রম্ম, গোষ্ঠে, হালকর্ষিত ভূমিতে, জলে, শ্মশানে, ইষ্টকতরূপ, পর্ব্বতে, জীর্ণ দেবায়তনে বস্মীক প্রাণী বিশিষ্ট গর্ভে, গমন করিতে করিতে, দণ্ডায়মানাবস্থায়, নদীতীরে, পর্ব্বত মস্তকে এবং বায়ু অগ্নি ও ব্রাহ্মণ এবং জল, সূর্য্য ইহা দিগকে দর্শন করিতে করিতে কদাচ বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিবে না। এতাদৃশ অহিতাচার করিলে সে ব্যক্তি চির রুদ্ধ ও অন্নাশু হইয়া থাকে। আহার বিহার এবং মূত্র পুরীষোৎসর্গ সর্বদা অতি গোপনীয় স্থানে করিতে হইবে। এরূপ সদাচরণ করিলে মানব শ্রীযুক্ত হয় নচেৎ শ্রীহীনতা অবশস্তাবী। পাছকা পায়ে দিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। (এখন অনেকেই এরূপ করেন) জলপাত্র হস্তে করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিলে পাত্রস্থিত জল মূত্র তুল্য হয়। অতএব উহা দূরে নিক্ষেপ করিবে।

### শৌচ ।

স্বাস্থ্যকামী ও ধর্ম্মবিদ ব্যক্তি অধঃ শৌচে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করিবে না। পক্ষান্তরে বাম হস্ত দ্বারা নাভির উর্দ্ধ স্থান শোধন করিবে না। সুস্বাবস্থায় উক্তরূপ আচরণ এবং প্রত্যেকবার মল বা মূত্র ত্যাগান্তে পদ ধৌত করিবে। পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি ইহার ব্যতি ক্রম করিতে পারিবেন।

মল ত্যাগান্তে স্থলর পবিত্র স্থানে বাগ্‌যত  
হইয়া উদ্ধৃত জল এবং মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্বক  
প্রথমে মৃত্তিকা বাম হস্তে লেপন করতঃ মর্দন  
করিবে, পরে যাবৎ মৃত্তিকা সম্পূর্ণ ধৌত না  
হয়—সে পর্য্যন্ত বারম্বার জল প্রয়োগ করিবে।  
এইরূপে হস্ত হইতে মলগন্ধ বিদূরিত হইলেই  
শৌচ কার্য সম্পন্ন হইবে।

বল্মীক, মুষিকোৎখাত, জলমধ্যস্থিত  
শৌচাবশিষ্ট, গৃহ হইতে, লেপঃ সম্ভব, সর্দর্ম  
এই সকল মৃত্তিকা শৌচ কার্যে কদাচ ব্যবহার  
করিবে না।

বিষ্ণু পূরণ, দক্ষ সংহিতা ও যম সংহিতা  
প্রভৃতিতে মৃত্তিকা প্রদানের নানাপ্রকার  
ব্যবস্থা আছে; ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে  
পর্য্যন্ত অঙ্গ সকল মল-গন্ধ-শূন্য না হয় সে  
পর্য্যন্ত বারম্বার মৃত্তিকা সংযোগ এবং জলদ্বারা  
ধৌত করিবে। বর্তমানকালে এপ্রকার শৌচা-  
চার বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। একাধা কিছ-  
মাত্র কঠিন নহে, কিন্তু বর্জ্যকালের অভ্যাস  
বশতঃ প্রথমাভ্যাসে দ্বিগতকত আলস্ত আসিতে  
পারে। কিন্তু তাহা কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে।  
আলস্ত বা উদাসীন পরিত্যাগ পূর্বক উক্ত রূপ  
অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্য সুখ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

### মূত্র শৌচ।

একাধাটি আধুনিক সভ্যতায় এক কালেই  
বিলুপ্ত হইয়াছে। একালের শিক্ষিত সম্প্রদায়

এসকল উপদেশের বিন্দুমাত্রও প্রাপ্ত হন না  
বা আদর্শ কোন গুচি ব্যক্তিকেও দেখিতে  
পান না। স্বতরাং এ বিষয়ের প্রচলন আর  
লক্ষিত হয় না। ফলে মূত্র ত্যাগের পর জল  
না লওয়ায় একালে নানাপ্রকার মূত্রব্রণের  
পীড়ায় আধিক্য ঘটিয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতির পরিচ্ছদানুরোধে দণ্ডায়-  
মানাবস্থায় যথায় তথায় মূত্র ত্যাগের আদর্শ  
কতিপয় হিন্দু সন্তানকেও উক্ত অনাচার  
অনুকরণে বাধ্য করিয়াছে। বহুদিন এতদূশ  
কদাচার করিবার পর এখন পাশ্চাত্য সভ্য  
জাতির মধ্যে অধিক লোকের মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ  
উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন ঠাহারা উক্ত  
প্রকারে মূত্র ত্যাগকেই তাহার কারণ মনে  
করিয়া উহা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু অনু-  
করণ প্রিয় হিন্দুসন্তান মধ্যে অদ্যাপি অসদাচরণ  
পরিভ্রান্ত হয় নাই। ফলতঃ উক্তপ্রকারে মল  
ত্যাগ কেবল মূত্রকৃচ্ছ্র কেন, বহু কঠিনরোগেরও  
কারণ হইতে পারে। সকল প্রকার শৌচাচার  
অতি যত্নের সহিত অভ্যাস করা নিতান্ত  
আবশ্যক, যাঁহারা শৌচাচারে উদাসীন তাহাদের  
শরীর চিরক্ষয় হইয়া যাবতীয় সদমুঠান নিফল  
হইয়া থাকে। সদাচার পালনের ফলেই হিন্দু  
জাতি যে একদিন অতুল স্বাস্থ্যের অধীশ্বর  
হইয়াছিল ইহা অবিসংবাদিত।

## শিশু-পালন।

—:~:—

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া।

(পূর্বানুভূতি)

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী।)

আমাদের আহার্য্য, অথবা পূর্বকথিত প্রণালী অনুসারে জীবন হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপে আমরা যতবার খাদ্য গ্রহণ করি, ততবারই রক্ত পরিপুষ্ট হয়। আমরা যদি পুষ্টিকর বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের রক্তও বিশুদ্ধ ও পুষ্ট হয় এবং দেহও বদ্ধিত ও পুষ্ট হইতে থাকে।

রক্ত কি? রক্ত একপ্রকার বর্ণহীন তরল পদার্থ। ইহাতে অসংখ্য অমুকোষ (corpuscles) ভাসিয়া বেড়ায়। অমুকোষ দুই প্রকারের—এক রকম লাল, এক রকম সাদা। রক্ত সাধারণতঃ দেখিতে লাল বর্ণের। রক্তে যে লাল অমুকোষ ভাসিয়া বেড়ায়, তাহারই জন্য রক্তের রঙ লাল। এই অমুকোষ হইতে পৃথক করিলে রক্ত দেখিতে ঠিক ডিমের সাদা তরলাংশের স্থায় দেখায়। রক্তে লাল অমুকোষের সংখ্যাই অধিক; সাদা অমুকোষ তদপেক্ষা অনেক কম আছে। রক্তের এই অমুকোষগুলি শুধু চক্ষে দেখা যায় না। আমরা তাই শুধু লাল কর্ণের একটি তরল পদার্থ দেখি। এক কোঁটা রক্ত যদি অমুবীক্ষণের নীচে রাখা যায়, তাহা হইলে রক্তের এই লাল ও সাদা অমুকোষগুলি দেখা যায়। লাল অমুকোষগুলি এত ছোট যে, ৩৫০০ লাল অমুকোষ যদি পাশাপাশি রাখা

যায় তবে এক ইঞ্চি পরিমাণ ভূমি আবৃত করে, আর যদি ১০ হাজার অমুকোষ উপরি উপরি করিয়া থাক করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উচ্চতায় এক ইঞ্চি হইবে। সাদা অমুকোষগুলি ইহার অপেক্ষা কিছু বড়। ইহাদের আকার মটরের স্থায় এবং অল্প অসমান আকারেরও আছে।

রক্তের এই তিনটি অংশের কার্য্য এই :—

(১) ডিমের স্থায় তরলাংশ দেহের কোষগুলির পুষ্টিসাধন করে এবং খাদ্যের জীর্ণ করা শর্করা ও মেদময় অংশ মস্তিকে ও মাংসপেশীতে বহন করিয়া লইয়া যায়।

(২) লাল অমুকোষগুলি ফুসফুস হইতে বিশুদ্ধ বাতাস লইয়া Tissueতে এবং Tissue হইতে দূষিত বাতাস ফুসফুসে লইয়া যায়। ইহারা বাতাস বহনের কার্য্য করে।

(৩) সাদা অমুকোষগুলি সমস্ত আঘাত জুড়িয়া দেয়। যত ঘা—কাটা ঘা, ভগ্ন হাড় এই সাদা অমুকোষই জুড়িয়া দেয়। ইহারা রোগের বীজাণু নষ্ট করে।

আমাদের দেহে অসংখ্য রক্তবহা নালী আছে। এই অসংখ্য রক্তবহা নালীর মধ্যে একটি প্রধান নালী আছে। এই নালী ছৎগিঙের বামদিকে অবস্থিত করিতেছে ইহা হইতেই সর্বত্র সর্বত্র এবং লক্ষ লক্ষ রক্ত

বহা নালী বাহির হইয়া সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া আছে। এই অসংখ্য রক্তবহা নালী দিয়াই আমাদের দেহের রক্ত চলাচল করিতেছে। এই নালীগুলির গাত্র এত পাতলা যে, আমরা মের মস্তক মাংসপেশী ও গ্রন্থি glands গুলির মধ্য দিয়া রক্ত চলিবার কালে তাহারা রক্ত হইতে তাহাদের পুষ্টিকর খাদ্য টানিয়া লয়। রক্তবহা নালীর মধ্য দিয়া রক্ত নিয়তই চলিতেছে, এক মুহূর্তের জন্তও থামে না। হৃৎপিণ্ডই রক্তকে রক্তবহা নালী দিয়া ক্রমাগত চালিত করিতেছে। প্রত্যেক স্পন্দনে রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তবহা নালী দিয়া কিছুদূরে ছুটিয়া বাতির হইয়া পড়ে এবং প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড ৬০৭০ বার স্পন্দিত হয় বলিয়া রক্তের প্রবাহ অবিরাম চলিতে থাকে।

রক্ত একটি গোলাকার আকৃতির ভায় আমাদের দেহে অনবরত ঘুরিতেছে। হৃৎপিণ্ড একটি নালী দ্বারা রক্তকে বাতির করিয়া দেয় এবং অন্য একটি নালী দ্বারা রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে আগমন করে। এইরূপে রক্ত ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

আমাদের দেহের সমুদয় অংশ পুষ্টিকর খাদ্য এবং বাতাস যোগাইবার জন্তই রক্ত এইরূপ গোলাকার ভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

পুষ্টিকর খাদ্য এবং বিত্তক বাতাসে পূর্ণ হইয়া রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া সমগ্র দেহের প্রত্যেক অংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবিশুদ্ধ অবস্থায় পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। আসিবার পথে খাদ্যের সারাংশ বহন করিয়া আসে। এই অবিশুদ্ধ রক্ত পুনরায় সমগ্র দেহে চালিত হইবার পূর্বে কুসকুস হইতে বিত্তক বাতাস

এবং পরিপাক যন্ত্র হইতে পুষ্টিকর খাদ্যে পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কিরূপে এই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া চলিতেছে তাহা চিত্র দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য চিত্র দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু “আয়ুর্বেদ” পত্রের পরিচালকবর্গের অন্ত্রবিধার জন্ত উপস্থিত তাহা হইয়া উঠিলনা, ভবিষ্যতে এই প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তাহা প্রদর্শিত হইবে।

হৃৎপিণ্ড কুসকুসঘরের মধ্যে অবস্থিত করিতেছে। হৃৎপিণ্ডের চারিটি ঘর আছে। উপরে দুইটি এবং নীচে দুইটি। উপরে বামদিকে একটি ইহাকে বাম auricle এবং নীচে বাম দিকে একটি ইহাকে বাম Ventricle বলে এবং উপরে ডানদিকে একটি ইহাকে right auricle এবং তাহার নীচে ডান দিকে একটি ইহাকে right ventricle বলে। উপরে বামদিকের ঘর হইতে উপরের ডানদিকে ঘরে যাইবার ঘর নাই, কিন্তু উপরের বামদিকের ঘর হইতে নীচের বামদিকের ঘরে যাইবার একটি ঘর আছে। তেমনি উপরের ডানদিকের ঘর হইতে নীচের ডানদিকের ঘরে যাইবার একটি ঘর আছে। ডানদিকের দুইটি ঘরে অবিশুদ্ধ রক্ত এবং বামদিকের ঘর দুইটিতে বিত্তক রক্ত থাকে। হৃৎপিণ্ডের বামদিক, বিত্তক রক্ত দেহের প্রধান রক্ত বহা নালীতে চালিত করিয়া দেয়, এই নালী দেহের সর্বত্র বিত্তক রক্ত লইয়া যায়। এই নালী দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য কুসকুস রক্তবহা নালী দিয়া চালিত হইয়া দেহের প্রত্যেক tissueতে রক্ত যোগান দেয়। আসিবার পুনরায়

প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া চলিয়া আসিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণে প্রবেশ করে। আসিবার কালে পথে ইহা একটি শিরার সহিত মিলিত হয়। এই শিরা পরিপাক ক্রিয়া শেষ হইবার পর খাওয়ার দ্বারাশ লিভারের মধ্যে দিয়া বহন করিয়া আনিয়া এই প্রধান রক্তবহা নালীর সহিত মিলিত হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিক হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। তথায় বিস্তৃত বায়ু দ্বারা পরিকৃত হইয়া পুনরায় প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া ফুসফুস হইতে হৃৎপিণ্ডের বামদিকে প্রবেশ করে। এইরূপে ফুসফুস এবং সমগ্র দেহে রক্ত নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে। আমাদের দেহের রক্ত এইরূপে প্রাতি মিনিটে দুইবার করিয়া দেহের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরা আসিতেছে।

ধমনী (arteries)।—হৃৎপিণ্ড হইতে ফুসফুসে এবং দেহের সর্বত্র রক্ত বহন করিয়া লইয়া যাওয়াই ধমনীর কার্য। আমাদের দেহের সর্বত্রই অসংখ্য ধমনী ছাইয়া রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে ধমনী সকলও কম্পিত হয়। আমাদের হাতের কব্জিতে যাহাকে নাড়ী বলি, তাহাও একটি ছোট ধমনী। ইহা আমাদের হাতে রক্ত যোগাইতেছে।

বিস্তৃত লাল রক্ত—ধমনী দিয়া প্রবাহিত হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড হইতে যে ধমনী ফুসফুসে গিয়াছে—তাহা অপরিষ্কৃত কালচে রঙের রক্ত ফুসফুসে পরিকৃত হইবার জন্য লইয়া যায়।

শিরা (veins)। ধমনীর পাশাপাশি শিরাগুলি রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ড হইতে বিস্তৃত রক্ত বাহির হইয়া সমগ্র দেহে কাৰ্য্য করিতে

দেহের ময়লার সহিত যুক্ত হইয়া অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। শিরাগুলি এই অপরিষ্কৃত রক্ত বহন করিয়া হৃৎপিণ্ডে লইয়া আসে। হৃৎপিণ্ড হইতে এই অপরিষ্কৃত রক্ত একটি ধমনী দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই ধমনীর নাম Pulmonary artery। সেখানে শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা এই দূষিত রক্ত পরিকৃত ও নির্মল হইয়া আর একটি শিরা দিয়া বাম দিগের হৃৎপিণ্ডে যায় এবং সেখান হইতে সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয়। আমরা শ্বাস গ্রহণের সময় যে বায়ু নাক দিয়া টানিয়া লই, তাহাতে যে অক্সিজেন বাষ্প (oxygen) থাকে তাহাই ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দূষিত ও অবিস্তৃত রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে Pulmonary artery দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে তাহাকে বিস্তৃত ও নির্মল করে। এই জন্য আমাদের দেহ রক্তের জন্য বিস্তৃত ও নির্মল বায়ুর প্রয়োজন।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা আমাদের শ্বাস রক্তে পরিণত হইয়া দেহের সর্বত্রই নিরন্তর পরিচালিত হইয়া আমাদের জীবিত রাখিয়াছে। শিশুর দেহও এইরূপে পুষ্টিকর শ্বাস দ্বারা পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইতেছে।

শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া।

আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য চারটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। (১) নাক, (২) শ্বাস নালী, (৩) ফুসফুস, (৪) বক্ষ।

শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য নাকই আমাদের প্রধান, স্বাভাবিক উপায়। আমরা প্রধানতঃ নাক দিয়াই শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি। মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস কেলা অস্বাভাবিক। নিশ্বাস নাক দিয়া বাইতে বাইতে গরম হইয়া উঠে এবং এই গরম অবস্থাতেই ফুসফুসে প্রবেশ করে। ব্রত্নাং বাহিরের বায়ুর শৈত্য ফুস

ফুসে লাগিতে পারে না। আমাদের নাকের ভিতরে লোম আছে। বাহিরের বায়ুতে যে ধূলা এবং মংলা থাকে, তাহা এই লোমে আটকাইয়া যায়, সুতরাং নিশ্বাস দ্বারা ফুস-ফুসের মধ্যে যে বায়ু যায়—তাহা ধূলিশূন্য নির্মল করিবার ব্যবস্থা ভগবান করিয়া রাখিয়াছেন। নাক দিয়া যে বায়ু আমরা টানিয়া লই—তাহা গরম এবং নির্মল হইয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। মুখ দিয়া নিশ্বাস লইলে ঠাণ্ডা, ধূলিপূর্ণ বায়ু আমাদের ফুস ফুসে প্রবেশ করে এবং নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা হয়।

নিশ্বাস দ্বারা আমরা যে বায়ু টানিয়া লই তাহাতে যে অক্সিজেন বাষ্প থাকে তাহাই জ্বপিশু হইতে যে দূষিত রক্ত ফুস ফুসে প্রবেশ করে তাহাকে পরিশুদ্ধ ও নির্মল করে। বিশুদ্ধ বায়ুতে শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন এবং ৭-৯ যবক্ষরজান আছে। এতদ্ব্যতীত কিছু অজার দ্রাবক (carbonic acid) জলীয় বাষ্প এবং অজ্ঞাত পদার্থবায়ুতে বিদ্যমান আছে। এইরূপে অক্সিজেন নিশ্বাসের সহিত ফুস ফুসে প্রবেশ করিয়া দূষিত রক্ত নির্মল করে। যে বায়ু আমরা প্রশ্বাস দ্বারা ফেলিয়া দিই, তাহাতে ৪ কি ৫ ভাগ অক্সিজেন কম থাকে এবং অজার দ্রাবকের ভাগ বাড়ে। সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, যে বায়ু আমরা শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে টানিয়া লই, তাহা প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু ফেলিয়া দিই তাহার অপেক্ষা বিশুদ্ধ। কারণ এই প্রশ্বাসের বায়ুতে অক্সিজেনের ভাগ কম থাকে। শ্বাস নলী। ফুস ফুসে বায়ু হাইবার প্রাণী পথই শ্বাস নলী। ইহা গলনালীর সমুখ ভাগে প্রায় ইহার পাশ্বে পাশি হইয়া অবস্থিত করিতেছে।

নলীর ভিতরেও এক রকম গুঁয়া আছে, তাহা বায়ুর ময়লা ধরিয়া শ্বাসের সহিত মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

ফুস ফুস।—জ্বপিশুের দুই পাশে দুইটি ফুস ফুস অবস্থিত থাকিয়া বক্ষোগহ্বর জুড়িয়া আছে। জ্বপিশুের ডানদিকে একটি এবং বামদিকে একটি ফুসফুস রহিয়াছে। বাতাস শ্বাসনলী এবং বায়ু নলী (brouchial tubes) দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুস ফুসের মধ্যেই বায়ু—রক্তের সম্পর্কে আসে। শ্বাসনলী বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি ডান ফুসফুসে এবং অপরটা বাম ফুসফুসে গিয়াছে। এই দুইটি শাখার নাম বায়ু নলী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউব। প্রত্যেক বায়ুনলী ফুসফুসের ভিতর গিয়া অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আবার বায়ু নলী গুলি ফুসফুস কোষে (lung sac) গিয়া ঠেকিয়াছে। ফুসফুস কোষে অসংখ্য বায়ুকোষ (air-cells) আছে। এক একটি ফুস ফুস কোষে প্রায় ১৭০০ বায়ুকোষ আছে। বায়ুনলী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউবেই ব্রঙ্কাইটিস অস্থ হয়। এই পীড়া খুব বেশী হয় এবং ইহাতে মৃত্যুর সংখ্যাও অধিক হয়।

আমাদের নিশ্বাসের সতিত ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করিলেই সেখানে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধিত হয়।

(১) বাতাসের অক্সিজেন বাষ্প (oxygen) রক্তের মধ্যে যায়।

(২) অজারজান বাষ্প (অবিভক্ত বাষ্প) উষ্ণতা এবং জলীয় বাষ্প রক্ত হইতে বাহির হইয়া যায়।

সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের নিশ্বাস গ্রহণের সহিত বিশুদ্ধ বায়ু

জান বাষ্প রক্তের মধ্যে যায় এবং প্রেধাস কেলিবার সঙ্গে অবিশুদ্ধ বাষ্প, উষ্ণতা এবং জলীয় বাষ্প রক্ত হইতে বাহির হইয়া যায়। এইরূপে আমাদের দেহের রক্ত নিরন্তর বিশুদ্ধ হইয়া আমাদের গায়ে জীবিত রাখিয়াছে। এই ক্রিয়ার বিশুদ্ধতা ব্যাঘাত ঘটিলেই মৃত্যু সম্ভাবনা।

বক্ষ ।—বক্ষ একটি বায়ু চলাচল শূন্য

বাক্স বিশেষ। ইহার আকার একটি কোণের স্থায়। ইহার দুই পার্শ্বে পাজরার-হাড় অবস্থিত রহিয়াছে এবং তাহার উপরে চামড়া ও মাংসপেশী সমূহ আছে। বক্ষের নিম্নদেশে বক্ষ এবং পেটের মধ্যস্থলে একটি চওড়া মাংসপেশী আছে, তাহাকে মিড্রিক\* বলে। বক্ষোগর্হবরে ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ড পূর্ণ করিয়া আছে।

• (ক্রমশঃ)

## যকৃতের যৎকিঞ্চিৎ ।

—::—

(“হিন্দুস্থান” হইতে উদ্ধৃত)

কত লোকই যে যকৃতের নানারকম বোগে ভুগিয়া কষ্ট পাইতেছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। নর দেহের যকৃত নামে এই যে একটি প্রধান গ্রন্থি-সমষ্টি, ইহার কল-কজা এত সহজে কেন বিকল হইয়া বিগড়াইয়া যায়? লিভার বা যকৃতের কর্তব্য কার্য কি, আগে যদি আমরা সেটা জানিতে পারি, তাহা হইলেই এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া অনেকটা সহজ হইবে।

যকৃতের প্রধান কার্য হইতেছে, দেহের শৃংখলা রক্ষা করা। পুষ্টিকর খাদ্য এবং পানীয়ের সঙ্গে যে সকল অনিষ্টকর উপাদান বর্তমান থাকে, যকৃত সেগুলিকে রক্তের সহিত মিশিতে বা তিষ্ঠিতে বাহিতে দেয় না।

আমরা যাহা-কিছু—আহার-বা পান করি, পাকস্থলী ও হৃদয়-নলীর ভিতরে গিয়া আগে তাহা জীর্ণ হইয়া যায়। তাহার পর সেই

জীর্ণাবশিষ্ট খাবারের শাঁসগুলি লিভারকে পার হইয়া, ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করে। যকৃত কিন্তু সেই প্রবেশ-পথের মুখে চালাক দরোয়ানের মত বসিয়া, কড়া পাহারায় নিযুক্ত থাকে। শিষ্টদের পথ ছাড়িয়া দিয়া, সে তখন দুই উপাদানগুলিকে দূরদূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

কিন্তু যকৃত যখন খারাপ হইয়া যায়, তখন কি হয় বলুন দেখি? তখন উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট, ইষ্টকর এবং বিষাক্ত সকল রকমেরই খাদ্য-পানীয় যুক্ত বা আধ-যুক্ত যকৃত-বার-বানকে এড়াইয়া, দেহের মধ্যে ডাকাডাকের মত প্রবেশ করে এবং রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়। যাকৃতের দেহের মধ্যে যে কোন ভদ্রানক ব্যাপার ঘটিতে পারে।

উপরের কথাগুলি গুড়িগা আশনি বুঝিতে পারিলে, যে, লিভারের প্রধান কর্তব্য হই-

\* মিড্রিক যাহা আমরা প্রাচীনতঃ বাস-হৃৎ বলি।—দেখিব।

তেছে, ভুক্ত খাদ্য দ্রব্যগুলিকে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়া দেহ ও রক্তের মধ্যে যাইতে দেওয়া। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খাদ্যগুলি দেহের ভিতরে গিয়া, এক জটিল রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যে পড়িয়া, পুরাতন রক্তের অভাব মোচন করে এবং নূতন রক্তের যোগান দেয়। এই যে রক্ত,—ইহারই অম্ল নাম, মানুষের জীবনী শক্তি। কেননা, ইহার অভাবে আমরা কেহই বাঁচিতে পারি না।

কাল যে মাংস ছাগলের দেহে ছিল, আজ সেই মাংসই যকৃতের দ্বারা পবীকৃত হইয়া, মানুষের দেহে মিশিয়া মানুষেরই দেহের নিজস্ব পদার্থে পরিণত হইল।

কিন্তু লিভার যখন পরীক্ষা করে না, তখন কোন-কিছুই নয়-দেহের উপকারী উপাদানে পরিণত হইতে পারে না। পরন্তু, সেক্ষেত্রে মানুষের জীবন একান্ত ভারবহ হইয়া ওঠে। স্নেহের সমস্ত বস্তু তখন খাপছাড়া হইয়া পড়ে এবং বস্তু-কিছু অসার পদার্থ ভিতরে ঢুকিয়া শরীর ও মনকে বিব্রত করিয়া তোলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পিত্তরসের কথা ধরা যাক। এই পিত্তরস যখন সোজা উদরগর্ভে গিয়া পড়ে, তখন তাহার সাহায্যে শরীর যথেষ্ট উপকৃত হয়। কিন্তু যকৃত যখন অকেজো, তথাকথিত পিত্তরস তখন বিপথগামী হইয়া পাকাশয়ের ভিতরে প্রবেশ করে। সেখানে থেকে তাহা আবার—খুব সম্ভব—উল্টে উৎক্ষিপ্ত হয়। ফলে বিবের তেজে আপনার ভয়ানক মাথা ধরিবে, মন ভ্রান্তিহীন ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িবে, সুখের আনন্দ তিক্ত হইয়া উঠিবে, স্মৃতি নষ্ট হইয়া যাইবে, জ্বরের উপরে একটা প্রলেপ পড়িবে এবং হয় কোষ্ঠবদ্ধ, নয় উদরাময় হইবে।

অতঃপর যকৃত অকেজো হইয়া পড়িয়া

কারণ কি, তাহা বলা আবশ্যক। ইহার প্রধান কারণ, যকৃতকে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বাধ্য করা। পেটে ঠাসিয়া মাংস বা মদ খাওয়ার অভ্যাস করিলে বা বেশী মিষ্ট ও মশলাদার ছপ্পাচা খাদ্য নিয়মিত রূপে ভক্ষণ করিলে, যকৃত অত্যধিক পরিশ্রম করে এবং পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে।

লিভার খারাপ হইবার দ্বিতীয় কারণ, উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়ামের অভাব। আপনি যত বেশী পেট ভরিয়া খাইবেন, তত কম নড়া চড়া করিতে পারিবেন। আবার, কেহ কেহ যেমন পেটুক হইয়া সে অভ্যাস আর ছাড়িতে পারে না, তেমনি অনেকে আবার এমন বিষম আলস্যে অভিভূত হয় যে, দেহকে ক্রমেই তাহার একটা অসার জড়পদার্থে পরিণত করিয়া ফেলে।

সাদানিধে, সুস্বাদু ও গোষ্ঠাই জিনিষ খাইবেন,—কিন্তু পেট ঠাসিয়া নয়। প্রত্যহ ডাইবেল নিয়মিত ভোজনের পর, মাঝে মাঝে যখন তখন টুকিটাকি খাবার খাওয়ার বদ অভ্যাস ছাড়িয়া দিবেন। তাহা হইলে আর যকৃত খারাপ হইবার ভয় থাকিবে না।

উপরন্তু, প্রত্যহ অন্ততঃ পনেরো মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা (বাহার যতক্ষণ সম্ভব হয়) কাল পর্যন্ত নিয়মিত ব্যায়াম করিবেন। প্রাত্যহিক প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে আমরা যদি ব্যায়ামকেও ধরিয়া লই, তাহা হইলে শুধু যকৃতের পীড়া কেন, অধিকাংশ দুর্বলতা এবং অনস্বস্তাই মানব সমাজ হইতে অন্তর্য হইয়া যাক। জীবমৃত ও বাহ্যমীন হইয়া পৃথিবীর কোন আনন্দই লাভোপকর্য্য হইবে না। এই আনন্দের জন্য একটু বস্তু ব্যয় করিতে



## সুস্থদেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যকতা আছে কিনা ?

বিবিধ মাদক দ্রব্য জগতের শৈশবকাল হইতে সমাজে প্রচলিত আছে। বহু বর্ষের জাতি হইতে অসভ্য উন্নতজাতি পর্যন্ত মাদক দ্রব্যের প্রভাব হইতে কেহই অব্যাহতি পায় নাই। ধনীয় টেবিলে মাদক দ্রব্য “শাম্পেন” “হাইস্কি” রূপে এবং বহু দরিদ্রের কুটীরে মৃৎপাত্র “হাঁড়িয়া” “মহুয়া”রূপে বিরাজিত। মাদক দ্রব্য ধনীর গৃহে বহুমূল্য সিগারেট সিগার বা অমুরি তামাকরূপে, কৃষকের কুটীরে গুড়ুরূপে, সহিস, কোচমান ও দরিদ্র ভদ্র লোকের মুখে সস্তার সিগারেট বা বিড়ি রূপে এবং মুটে কুলি ও দরওয়ানদিগের মুখে ‘গুথা’ বা ‘খইনি’ রূপে বিরাজিত। মাদক দ্রব্য দরিদ্রের অন্তঃপুরে গুল বা তামাক পোড়া রূপে এবং আঢ্য ব্যক্তির অন্তঃপুরে মৃগনাভি শৃঙ্খলি জর্দা রূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইতর জাতীয় জীলোকদিগের মধ্যে গুড়ু-বিড়িও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আবার অনেক সভ্য মহিলার বিবাহ-চুখনের স্থখ সিগারেটের ভাগ্যে ঘটয়া থাকে কিনা জানি না! মাদক দ্রব্য কি মোহিনী শক্তি বলে সভ্য অসভ্য, ধনবান, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ভোগী, ত্যাগী, নর, নারী, সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সকলেই যে ইহার প্রভাবে মুগ্ধ ইহা নিশ্চিত। আমাদের দেশের ত্যাগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মাদক দ্রব্য ব্যবহারের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু বহু প্রয়োগে নানারূপের তৃপ্তি সাধন করিতে পশ্চাদপন্থা গ্রহণ করেন।

স্তর ওয়ালটার রালের সঙ্গীগণ আমেরিকা বাসী অসভ্য জাতিদিগকে ধূমপান করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহার দানবের ন্যায় মুগ্ধ দিয়া ধূম-বাহির করে। কিন্তু এই কিঞ্চিদধিক সঙ্গী শতাব্দী কাল মধ্যে সেই দানবোচিত কার্যে পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেণীর লোকেই ব্যাপ্ত হইয়াছে।

যে কারণেই মাদক দ্রব্যের এইরূপ বহুল প্রচলন হউক, শরীরের সহিত উহার একটা সম্বন্ধ আছে। দ্রব্য মাত্রেই ত্রিবিধ কারণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথম রোগশাস্তির জন্য, দ্বিতীয় দীর্ঘায়ু লাভের জন্য এবং তৃতীয় সুস্থবাস্তির শরীর রক্ষার জন্য। রোগ শাস্তির জন্য বিবিধ মাদকদ্রব্য প্রয়োগের সাধকতা দেখা যায়। সুস্থ শরীরে শরীর রক্ষার জন্য মাদক দ্রব্য উপযোগী কি না, তাহাই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে এবং এই প্রসঙ্গেই মাদক দ্রব্য পরমাণু বৃদ্ধি করে কি না—তাহা স্বতঃই আসিয়া পড়িবে।

মাদক দ্রব্য নানা প্রকার, যথা মদ, অহিফেন, গাঁজা, চরস, সিদ্ধি এবং তামাক। আমরা প্রথমতঃ মদ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

### মদ।

মদ ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। কেবল মহুয়া সমাজে মদে, বহু সমাজেও মদের ব্যবহার দেখে—ইহার পক্ষিত প্রমাণ পাঠে জানা যায় এমন কি, সবচেয়ে

মত্তের অংশ লইয়া বিষম বিবাদ বিসংবাদ ঘটিত একুপ প্রমাণও পাওয়া যায়। চ্যাবন ঋষি রাজার যজ্ঞে অধিনীকুমার ঘরের অস্ত্র সোম রস গ্রহণ করিতে উত্তত হওয়ার দেবরাজ ইন্ড্রের সহিত তাঁহার কলহ হইয়াছিল। এই যে মনুষ্য এবং দেবতার (হস্তী প্রভৃতি পশুরও ষটে) আদরের ধন মত্ত—ইহা কি সুস্থ শরীরে সেবন করা হিতকর না আবশ্যক? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে শাস্ত্র কি বলেন তাহা দেখা আবশ্যক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে ভারতে মত্তের বিশেষ আদর ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে মত্তপান অত্যন্ত দূষনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ধর্মশাস্ত্রে মত্তকে অদেয়, অপের এবং অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম শাস্ত্রে মত্তের প্রতি এই যে বিধেয়, ইহা শরীরের হিতাহিতত্ব বিচার করিয়া নহে। মত্ত অন্ন মাত্রায় পান করিলে আরও অধিক পান করিতে ইচ্ছা হয়, মত্তপানী দ্বারা বিবিধ পাপ-কার্য্য সংঘটিত হয়, মত্ত পানের ফলে পরিবার-বর্গের এবং সমাজের অশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐকুপ নিবেদন করা হইয়াছে। মত্তপানীবহুল পাশ্চাত্য দেশেও মত্ত পান দ্বারা ব্যক্তিগত, পরিবার গত এবং সমাজ গত অশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় বলিয়া তদেদেশীয় ব্যক্তিগণ এক্ষণে অদেদেশীয় শাস্ত্রকারদিগের ন্যায় মত্ত অদেয়, অপের ও অগ্রাহ্য (Touch not, taste not, handle not) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জর্নৈক পাশ্চাত্য কোবিদ মত্তকে অভাবের জননী এবং পাপের ধাত্রী (Mother of want and nurse of crime) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। সুতরাং বীতি হিমাংসে যে মত্তপান প্রত্যাখ্যাত

দোষাবহ তাহা সর্ববাদী সম্মত। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য মত্তের সুস্থ শরীরে উপযোগিতা আছে কিনা তাহা স্থির করা। সুতরাং ঐ সকল মতবাদ এই প্রবন্ধের পরিপোষক হইবে।

মত্ত পানের হিতাহিতত্ব নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে দেখা বাড়ুক—এ সম্বন্ধে আত্মবোধ কি বলেন? নিম্নে মত্তের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যে সকল কথা আত্মবোধে আছে তাহার মর্ম্মাহুবাদ লিখিত হইতেছে।

চরকের চিকিৎসা স্থানে মদাত্মক চিকিৎসার প্রথমতঃ লিখিত আছে:—“দেবগণ ইন্ড্রের সহিত যে সুরার পূজা করিয়াছিলেন, যে সুরা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়, যে সুরা বৈদিক কর্ম্মদ্বারা প্রতিষ্ঠিত, বাহা ইন্ড্রের যজ্ঞোৎসাহিত, সমুদ্র মন্থনে নীর হইতে উৎখিত, যে সুরা যজ্ঞেও হিতকারিণী বলিয়া যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য বেদ বিহিত বিধি সমূহ সহকারে যজ্ঞমান-মহাযাগণ কর্তৃক দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট হইয়া থাকে, যে সুরা—উপাদান, সংস্কার ও নামাঙ্কনসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বহু প্রকার হইলেও সাধারণতঃ মত্ততা জন্মায় বলিয়া এক প্রকার, যে সুরা অমৃতরূপে দেবতা-দিগের, সুধারূপে পিতৃদিগের ও সোমরূপে ঋষিদিগের উৎকৃষ্ট প্রেরঃ সম্পাদন করে, যে সুরা অধিনী কুমারঘরের মন্থ তেজঃস্বরূপ, সন্ন্যস্তীর বীর্ঘ্য স্বরূপ, ইন্ড্রের বল স্বরূপ, যে সুরা সাক্ষীত্ব প্রীতি স্বরূপ, রতি স্বরূপ, বাক্য স্বরূপ, গুণিত স্বরূপ ও সুখ স্বরূপ, যে সুরা শোক চঃস্বাদ ও উবেগ সঞ্চারক, যে সুরা দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্য কর্তৃক হৃদয়গত হইয়া থাকে, সেই সুরা বিধি পূর্ব্বক পান করিতে নাই।”

মত্ত সম্বন্ধে এইরূপ বলার পর মত্ত পানের বিধি কি তাহা বলা হইয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা লিখিত হইল না। মত্তের অপকারিতা চরকে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা পরে বলা যাইবে।

নদ্যের শোষণের কথা বলিবার পর চরক পুনরায় বলিয়াছেন,—কিন্তু মদ্য স্বভাবতঃ অম্লের স্থায়, অযুক্তিযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে রোগ উৎপন্ন করে, কিন্তু যুক্তিযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে অম্লের স্থায় উপকাণ্ড করে। অম্ল—প্রাণি-গণের প্রাণ স্বরূপ, কিন্তু অস্বথারূপে দেবিত হইলে প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে। মদ্যও অস্বথারূপে প্রযুক্ত হইলে প্রাণহর বিষের স্থায় হয় এবং যুক্তিযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইলে রসায়নের স্থায় কাগ্যকারী হইয়া থাকে।

মদ্য যুক্তি পূর্বক পান করিলে হর্ষ, দেহ, পুষ্টি, আরোগ্য, পুরুষত্ব বৃদ্ধি এবং মত্ততা, জন্মিয়া থাকে। মত্ত রুচিকর, অধুদীপক, তৃপ্তজনক, স্বর ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধক, প্রীতিকর, পুষ্টিকর, বলকর, ভয় শোক ও শ্রমনাশক, যাহাদের নিদ্রা হয় না তাহাদের পক্ষে নিদ্রাজনক, যাহারা লোকের কাছে ভাল কথা কহিতে পারে না তাহাদিগের বাকশক্তি বৃদ্ধক, যাহাদের অধিক নিদ্রা হয় তাহাদের নিদ্রার অম্লতাকারক, যাহাদের মল মুত্রের বিবন্ধ আছে অর্থাৎ মল মুত্র ভালরূপে নির্গত হয় না, তাহাদের বিবন্ধ নাশক এবং আঘাত বন্ধন, এবং অস্ত্রাঘাত রূপে প্রযুক্ত হুৎ নাশক।

অস্থদেহে বলিয়াছেন যে, স্নিগ্ধ অম্ল এবং মাংসের সহিত মত্ত সেবন করিলে পরমাদু ও বল বৃদ্ধি হয়, কমণীয়তা, মনোর, সন্তুষ্টি, ধৈর্য, তেজ এবং অত্যন্ত বিক্রম জন্মিয়া থাকে।

শাস্ত্রে মত্তপানের চারিটা অবস্থা কথিত

হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থায় মত্তদ্রব্যের কিরূপ স্থপজনক তাহা নিম্নে লিখিত হইয়াছে। অপর তিনটা অবস্থা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঐরূপ অবস্থা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ঘটিয়া থাকে।

প্রথম মদে বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রীতি ও সুখ জন্মে, যথেষ্ট পানাহার কবিত পারা যায়, প্রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়, পাঠ ও গান করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, স্বরোচ্চ উৎকর্ষ ঘটে। এই প্রথম মদ অর্থাৎ অল্প মদ্যপান জনিত যে মত্ততা তাহা অত্যন্ত রমণীয়। চরক বলিয়াছেন যে, প্রথম মদে যুবক বা বৃদ্ধদিগের রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ার্থে যে প্রীতি জন্মে পৃথিবীতে তাহার উপমা নাই। যুক্তি পূর্বক পীত মদ্য বহু হুৎ ধারাক্রান্ত এবং শোক গ্রস্ত ব্যক্তিগণের একমাত্র বিশ্রাম স্থান। চরক ও অস্থদেহে প্রথম মদের এইরূপ স্থপাতি থাকিলেও বাগ্‌ভট উহার সমর্থন করেন নাই, টীকাকার অরুণ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা সংগ্রহ কারের উদ্দেশ্যে ব্রিগরীত স্বর্থ করিয়াছেন বলিয়া পাঠকগণের বিচারের জন্য শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হইল।

আদ্যো মদে দ্বিতীয়েচ প্রমাদায়তনে স্থিতঃ ।  
হর্ষিকর হতো মুচঃ স্ববিক্রাধি মুহুর্তে ॥  
প্রথম এবং দ্বিতীয় মদে প্রমাদ বশতঃ ছুট করনা বশে মদ্যাপ সুখ বলিয়া মনে হয়—উপ-  
রোক্ত শ্লোকের মর্মার্থ এইরূপ। কিন্তু অরুণ দত্ত উহাকে দ্বিতীয় মদের লক্ষণ বলিয়া আদ্য মদে প্রকৃত সুখ ইহা উহা ধরিয়া লইয়াছেন, কঠিন দেখাইয়াছেন যে ভক্তান্তরে এইরূপ আছে। ভ্রাতৃত্বাভ্যাস স্বর্গীয়বর্গ বিচার করিবেন।

মদ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল দোষের কথা বলা হইয়াছে তাহা বলিবার পূর্বে সন্দেহজনক

সকল গুণ বণা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা মদ্যের দোষ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা পাইব।

মদ্যপান বশতঃ মদ্যপায়ীরা যে সাময়িক ক্ষুধা, বল, রতি শক্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হয় উহা কি মদ্য সৃষ্টি করিয়া থাকে?—না শাস্ত্র অথকে কষাঘাত করিলে সে যেমন ক্রতবেগে ধাবিত হয়, মদ্যজনিত উত্তেজনার ক্ষুধা, রতি এবং বলেরও সেইরূপ বৃদ্ধি হয়? সম্যক রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে শৈবাস্ত্র কারণেই এইরূপ ঘটে বলিয়া বোধ হয়। পরে দেখান যাইবে মদ্য বলের বিপরীত গুণযুক্ত এবং বিপরীত গুণ যুক্ত মদ্য বলের অপচয়ই করিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে যে সাময়িক বলের বিকাশ—তাহাকে অথকে কষাঘাত করার ভার মদ্যাহতুক উত্তেজনা ও সেইরূপ ঘটয়া থাকে। যখন মদ্য জনিত মত্ততা ছাড়িয়া যায়। সেই সময়ে ইহার প্রতিক্রিয়ায় ফলে মদ্যের উত্তেজনা বশতঃ সাময়িক যে বলের বৃদ্ধি ঘটয়ছিল, উত্তেজনা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বল চলিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, বিগত মদ্য মদ্যপায়ীরা দেহ বহন করাকে ভার বলিয়া মনে করে। সুতরাং মদ্য বলজনক এ কথা বলা যাইতে পারে না, বলের সাময়িক উত্তেজক বীজ—ইহাই বলা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শাস্ত্রকারগণ যে মদ্যকে বলবর্ধক বলিয়াছেন তাহা—কি ভ্রমাস্থক? তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, না ভ্রমাস্থক নহে? মদ্য শরীরকে উত্তেজিত করিয়া সাময়িক বল বৃদ্ধি করে ইহা লক্ষ্য করিয়াই তাহার এইরূপ বলিয়াছেন। কেননা তাহা না হইলে অন্ততঃ মদ্যকে বলের বিরোধী বলিতেন না। আবার এই উত্তেজনা হেতু বলের বিকাশের, সুতরাং কবের পূরণের

বলিয়াছেন যে, পুষ্টিকর স্নিগ্ধ অন্ন মাংস প্রভৃতি খাদ্য ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাহার কষ্টতম রোগ সকল উৎপন্ন হয় অথবা মৃত্যু ঘটে।

মদ্যকে যে রতি বর্ধক বলা হইয়াছে তাহাও এইরূপ। কারণ মদ্য শুক্রনাশক। শুক্রনাশক দ্রব্য কখনই রতি বর্ধক হইতে পারে না। মদ্য ক্ষণেক সাময়িক উত্তেজনা জন্মাইয়া বলের ভার রতি শক্তির বৃদ্ধি করে মাত্র।

মদ্যপানে ক্ষুধা বৃদ্ধির পক্ষেও এইরূপ ঘটয়া থাকে। মদ্য পরিপাক যন্ত্র সমূহকে উত্তেজিত করিয়া ক্ষুধা জন্মায় এবং অগ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া (ডাক্তারি মতে পাচক রস সমূহকে অধিক ক্ষরণ করিয়া) পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে।

মদ্যপান বশতঃ মনের যে সাময়িক হর্ষ হয়—তাহাও চিত্তের উত্তেজনা বশতঃ ঘটয়া থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, চিত্তের উত্তেজনা বশতঃ হর্ষই হয় কেন? দুঃখ শোকাদি হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, সাধারণতঃ লোকে হর্ষ উদ্বেগ করিয়া মদ্য পান করে বলিয়া চিত্তের হর্ষই হইয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে লোকে মদ্যপান করিয়া ভয়ানক ক্রন্দন করে, শোক করে, বা ক্রোধ প্রকাশ করে। ফলতঃ মদ্যপানের ফলে যে সময়ে চিত্তের যে কোন ভাবই ঘটুক, মদ্যের উত্তেজনার তাহা প্রবল হইয়া থাকে। চিত্তের এইরূপ অবস্থা উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া মত্ততা ছুটিয়া যাইবার সময় ঘটয়া থাকে। সে সময়ের সাময়িক অবলাদের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবলাদ, মানি, অস্থিরতা, বিব্রততা প্রভৃতি ঘটয়া থাকে। চলিত ভাষায় ইহাকে বোয়ালি ভাবা বলে।

শাস্ত্রকারদিগের স্বল্প উপদেশ বিপুল বুদ্ধি ব্যক্তিকেও আকুল করিয়া থাকে । সুতরাং আমাদের স্থায় অন্নবুদ্ধি ব্যক্তির যে তাহাতে বিদ্রূপ ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে মদ্য ভয়, শোক ও প্রমাণশক বলিয়া কথিত হইতেছে, কিন্তু সেই শাস্ত্রকারই আবার বলিয়াছেন :—

“মদ্যো মোহো ভয়ঃ শোকঃ ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতাঃ” অর্থাৎ মদ্যো মোহঃ, ভয়, শোক, ক্রোধ ও মৃত্যু সংশ্রিত রহিয়াছে । যাহা ভয় শোক উৎপাদক, তাহা কি প্রকারে ভয় শোক নাশক হইতে পারে । অপিচ, সুশ্রুতে ক্রুদ্ধ, ভীত শোকগ্রস্ত, ব্যায়াম, ভারবহন ও গৃহশ্রম বশতঃ ক্লান্ত ব্যক্তি মদ্য পান করিলে পানাত্ম্যাদি বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে বলিয়া কথিত হইয়াছে ।

শাস্ত্রকারগণ কোন বিষয়ে পক্ষপাত না করিয়া সকল দ্রব্যেরই দোষ গুণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । অবস্থা ভেদে, বৃত্তি বা অযুক্তি পূর্বক পান করার জন্য মদ্য উপকার বা অপকার বিচার করিয়া উপরোক্ত বিভিন্ন মতের সমাবেশ করা হইয়াছে । চরকে মদ্যের দোষ প্রদর্শন কালে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে মদ্য দোষক ব্যক্তিগণ এইরূপে বয় পূর্বক মত্তের নিন্দা করিয়া থাকেন ।\*

এক্ষণে শাস্ত্রে মদ্যের যে দোষের বিষয়

উল্লিখিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । বাগভট প্রথম ও দ্বিতীয় মনকে যেরূপ নিন্দা করিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, মদ্য উষ্ণ গুণ বিশিষ্ট বলিয়া শরীরের শৈত্য গুণ নষ্ট করিয়া পিত্তকে ক্রম্পিত করে, তীক্ষ্ণতা, প্রযুক্ত মনের গতি নষ্ট করে অর্থাৎ বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক কার্যে বাধা জন্মায়, স্বল্প শরীরে (অর্থাৎ হৃদয়াদিতে) প্রবেশ করে, বিশদ গুণ (পিচ্ছিলের বিপরীত) বলিয়া বল ও শুক্রকে নষ্ট করে, ক্লম্ব বলিয়া বায়ুকে ক্লিপিত করে আন্তকারিতা প্রযুক্ত হটকারিতা (হটাৎ কোন কাজ করা) জন্মায়, ব্যবসয় বলিয়া রতি প্রশক্তি জন্মায় এবং বিকাশী বলিয়া শীঘ্রই সমান ধাতুতে মিশ্রিত হয় ।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে :—

বিবে যে সকল গুণ আছে মদ্যোঃ সেই সকল বর্তমান । প্রভেদ এই যে, বিবে অধিকতর প্রবলভাবে বিদ্যমান আছে । বিষের গুণ সকল যেমন ত্রিদোষ প্রকৃপিত করে, মদ্যের গুণ সকলও সেইরূপ ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ) ক্লিপিত করে । কোন কোন বিষ সত্ত্বর প্রাণ নাশ করে এবং কোন কোন বিষ রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে । মদ্যপান জনিত মদাত্ম্য রোগ ও বিষের স্থায় ।

(ক্রমশঃ)

## তুথকাদি তৈল ।

—:—

( কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর লোহ ) ।

এই তৈলের ফর্মট একজন প্রাচীন করিয়াছিল। কতরোগে এরূপ আশ্চর্য চিকিৎসকের নিকট হইতে জ্ঞাপিত কষ্টে সংগ্রহ করিয়া ওষধ জন্মি বিবল । কিন্তু এজন্য

ইহা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। কেননা আমরা অধিকাংশ ক্ষতের চিকিৎসাই ডাক্তারী মতে করিয়া থাকি। কাজেই এতদিন ইহার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বর্তমান সময়ে যুদ্ধের হাঙ্গামে ডাক্তারী ঔষধের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়ায় আমাদের বাধা হইয়া একটি ক্ষতরোগীকে এই তৈল প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। ইহার উপকারিতা দর্শনে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। যাহারা ক্ষতচিকিৎসার আয়ুর্বেদকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা অপেক্ষা হীনপ্রভ বলিয়া মনে করেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার ইহা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। Oil catholic যে যে অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, এই তুথকাদি তৈলও সেই অবস্থায় ব্যবহার্য। সাধারণের অবগতির জন্য ঔষধটি প্রকাশ করিয়া দিলাম।

হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, খয়ের, দারু হরিদ্রা, বট ছাল, পাকুড় ছাল, বজ্র ডুমুর ছাল, অখণ্ড ছাল, কদম্ব ছাল, বাবলার ছাল, অন্নবেতস ছাল, করদী মূলের ছাল, আকন্দ মূলের ছাল, কুড়ি ছাল, নিম পাতা,

এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে ধোত করিয়া প্রত্যেকটি আড়াই আনী ওজনে গ্রহণ করিবে। পরে চল্লিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া পানাবশেষ (৮শ তোলা) থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে।

নারিকেল তৈল ২০ তোলা

পূর্বোক্ত কাথ ১০ তোলা

উভয়ে একত্র পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য সমূহ উহাতে মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে।

জলীয়মাংশ-দৃষ্ট না হইলে পাক সমাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মনসা সীজের পাতার রস ১০ তোলা

অপামার্গ পাতার রস ১০ তোলা

মুদ্রাশাখ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা

শোধিত গন্ধক চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা

পাক কালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, বাহাতে থর অথবা মুগ্ধ পাক না হয়। থর ও মুগ্ধ পাকের ঔষধ ক্ষত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পাক সমাপ্ত হইলে উহাতে তুঁতে ভয় মিশ্রিত করিতে হয়। ক্ষতে বেশী পচা থাকিলে তুঁতে ভয় অধিক তোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিবে। পরে ক্ষত ক্রমশঃ যতই বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে তুঁতের মাত্রাও ততই কমাইতে হইবে। তবে কোন সময়েই এক সিকির কম ব্যবহার করিবে না। ইহার নাম তুথকাদি তৈল।

নিম পাতা সিদ্ধ জলে ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ধোত করিয়া উক্ত তুথকাদি তৈল দ্বারা প্রত্যাহ পলিতা ভরিতে হইবে। সে স্থানখানা থাকিলে এক খণ্ড পরিষ্কার ভাড়া তৈলে ভিজাইয়া লাগাইয়া দিলেও চলিতে পারে। একটি পেগাজ ও দুই তোলা ময়না একত্র বাটিয়া গরম করতঃ পুলটিশ প্রস্তুত করিতে হইবে। ক্ষতের আকার বুঝিয়া পুলটিশ ছোট বা বড় করিবে। ক্ষতের উপর একখণ্ড কটি কলার পাতা দিয়া তদুপরি উক্ত পুলটিশ প্রদান করতঃ ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। এইরূপ ৬৭ দিন ধোত করণান্তর (Dressing) ক্ষতে পচা না থাকিলে অর্থাৎ ক্ষত বিশুদ্ধ হইলে গাঢ়াৎ নিষ্পন্ন প্রয়োগ করিবে। বিশুদ্ধ ক্ষতের নিষ্পন্ন প্রয়োগ করিলে ক্ষত সমস্ত ক্ষত তৈল হইয়া পাক

কেবল মাত্র এই তুথকাদি তৈল প্রয়োগে ও  
কৃত শুদ্ধ হইয়া যায় ।

উক্ত প্রাচীন চিকিৎসক মহাশয় নানা  
প্রকার পলিতা ও নানা প্রকার তুলা ব্যবহার

করিতেন । কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা  
করিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই ।  
তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহা চিরতরে বিলুপ্ত  
হইয়া গিয়াছে ।

## পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন ।

—:~:—

( রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর ) ।

যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহারা  
যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনোযোগের সহিত  
প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেহ  
সুস্থ ও সবল রাখিতে সক্ষম হইবেন এবং  
ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা  
প্রভৃতি কতিপয় ভয়ানক সংক্রামক রোগের  
আক্রমণ হইতে সপরিবারে রক্ষা পাইতে  
পারিবেন ।

নিয়মগুলি অতি সংক্ষেপে লেখা হইল ।  
স্থানের অস্বাভাবিকতা বশতঃ নিয়মপালনের কারণ-  
গুলি বিস্তৃতভাবে এ স্থানে বর্ণিত হইল না ।  
স্বাস্থ্যরক্ষার যে কোন ভাঙ্গা পুস্তক পাঠ করি-  
লেই তাহা জানিতে পারা যাইবে ।

আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশুদ্ধ বায়ু  
সেবন, নির্মূল জলপান, পুষ্টিকর নির্দোষ খাদ্য  
গ্রহণ, যথোচিত ব্যায়াম, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ  
পরিধান এবং আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ  
বাসগৃহে অবস্থান, এই কয়টির একান্ত  
প্রয়োজন । ইহাদের যে কোনটির অভাবে  
স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ।

### বিশুদ্ধ বায়ু সেবনঃ

বায়ু আমাদের জীবনরক্ষণ । বায়ু জী  
থাকিলে আমরা এক বস্তুই হইতাম ।

না । স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বায়ু বিশুদ্ধ হওয়া  
একান্ত প্রয়োজন । বাহিরের নির্মূল বায়ু  
আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি  
কিন্তু যে বায়ু প্রাথমিকরূপে আমরা পরিভ্রমণ  
করি, তাহা অত্যন্ত বিষাক্ত, কারণ উহার  
সহিত শরীরের নানাবিধ দূষিত পদার্থ মিশ্রিত  
থাকে । কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা  
সর্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার সুবিধা  
পাই, তৎসম্বন্ধে দু'একটি কথা নিম্নে লিখিত  
হইল ।

১। বাসগৃহে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে  
বায়ু ও আলো আসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে ।  
বাড়ীর চারি পাশে খানিকটা খোলা জায়গা  
থাকিলে এবং প্রত্যেক গৃহে অন্ততঃ চারিটি  
খজু খজু জানালা এবং দরজা রাখিলে বায়ু ও  
আলোক প্রবেশের বিশেষ সুবিধা হয় ।

২। গৃহের পোতা উঁচু করিবে । অব-  
স্থায় কুলাইলে ঘরের মেঝে পাকা করিয়া  
নইবে । মেঝে ভাঁড়ভাঁড়ে থাকিলে সর্দি,  
কাশি প্রভৃতি অনেক রোগের প্রসূতক হয় ।

৩। বাসগৃহের অতি নিকটে বড় গাছ-  
পালা বা বাঁশের বাড় অথবা ঘোপ জল  
থাকিতে দিবে না ।

৪। গৃহের দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া।  
• তন্মধ্যে কখনই বাস করিবে না। শীতকালেও শয়নগৃহের ক্ষুদ্রতঃ দুইটি বায়ুপথ খোলা রাখিবে।

৫। অনেক লোক একত্রে এক গৃহে বা এক মশারির ভিতরে শয়ন করিবে না কারণ বহুলোকের বাসক্রিয়াদ্বারা গৃহের বায়ু অতি শীঘ্র বিষাক্ত হইয়া পড়ে।

৬। গ্রামের জল যাহাতে নিকশ হইয়া যায়, সকলে সমবেত চেষ্টা করিয়া যতদূর সম্ভব, তাহার সুব্যবস্থা করিবে। গ্রামবাসীদিগের এই বিষয়ে ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে সহজেই সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে যথাপ্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পাইতে পারিবেন।

৭। বাড়ীর নিকট ছোট খানা ডোবা ইত্যাদি থাকিলে মাটি দ্বারা ভরাট করিয়া দিবে। খানা ডোবার পাতা ইত্যাদি পড়িয়া পড়িয়া বায়ু দূষিত করে এবং ঐ সকল স্থানে নশক জন্মিয়া গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের সহায়তা করে।

৭। গ্রামের পথে ঘাটে, পুষ্করিণীর পাড়ে বা নদীর ধারে কখনও মলমূত্রাগ করিবে না। এই কদর্য অভ্যাসের ফলে গ্রামের জল ও বায়ু অতি শীঘ্র অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে।

২। বাড়ীর আশে পাশে নলা থাকিলে বায়ু শীঘ্র দূষিত ও দূষিত হইয়া পড়ে। এই জন্য বাসগৃহ হইতে কিয়ৎ দূরে গোশালা ও মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিবার স্থান নির্ধারণ করিবে। পরিত্যক্ত মল ও আবর্জনা দি যাহাতে শীঘ্র স্থানান্তরিত হয়, তাহা বিবেচনা করিবে। সে ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইলে উহার উপর তৎক্ষণাৎ ওক মাটি বা ছাই চাপা দিবে।

১০। যদি প্রত্যেক গ্রামবাসী নিজ নিজ গৃহ ও তাহার আশ পাশ এইরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাহা হইলে গ্রামের বায়ু সর্বদা নির্মল থাকিবে।

“নিজ গৃহ আশ পাশ রাখ পরিষ্কার।

গ্রামখানি ছবি সম দেখাবে আবার ॥”

নির্মল জল পান।

জলের আর একটা নাম জীবন। আমরা যে জল পান করি, তাহা নির্মল হওয়া একান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমাদের কতকগুলি কদম্যাসফলে পল্লীগ্রামের জলাশয়ের জল এরূপ দূষিত হইয়া পড়ে যে, উহা পান করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। জলাশয়ের নিকটে মলমূত্রতাগ, পুষ্করিণীর মধ্যে মূষা ও পশুদিগের মূত্র, ময়লা ও সংক্রামক রোগদুই কাপড় ও বিছানা কাচা সূঁড়ি বাসন মাজা, জলশৌচ ও মূত্রতাগ ইত্যাদি নানা অপবিত্র কার্যাদ্বারা জলাশয়ের জল সর্বদা দূষিত হইয়া থাকে।

১। প্রতি গ্রামে একটা বা দুইটা ভাল পুষ্করিণী কেবল পানীর জল সংগ্রহের জন্য পৃথক করিয়া রাখা উচিত। ইহাতে কেহই মূত্র মল করিতে, কাপড় কাচিতে, এমন কি মুখ ধুইতেও পারিবে না। যদি একটা পাম্প (pump) দ্বারা জল উত্তোলন করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে পুষ্করিণীর জল কোন দূষণেই দূষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

২। পুষ্করিণীর পাড়ে বড় গাছ বা বেশী জঙ্গল জন্মিতে দিবে না। পাতা পড়িয়া জল নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা যথেষ্ট রোগ প্রদায়ক।

৩। রোগজীবাণু প্রাণের জল পান করা কখনও নিরাপদ নহে। যে ক্রমশঃ জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়, সেই ক্রমশঃ



ভিতর দিক পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া উচিত এবং চারিপাশের জল যাহাতে কূপের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিতে না পারে, কূপের উপরের জমি কিছু দূর পাকা ও ঢালু করিয়া দিয়া তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সাধারণ কূপের জল প্রায় নিখল হয় না, এজন্য আজকাল অনেক দেশে লোহার নলের কূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ কূপের জল সর্বদা নিখল থাকে এবং কোন সংক্রামক রোগের বীজ ইহার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

৫। যদি কোন প্রকারে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে ঐ জল যিনি পান করিবেন, তাঁহারই ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা। অতএব কি উপায়ে পানীয় জল সহজে বিমুক্ত করা যাইতে পারে, তাহা জানা অবশ্য কর্তব্য। আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে ইহার একমাত্র সহজ উপায়—জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া শীতল করিয়া পান করা। এই উপায় দ্বারা জলের মধ্যে যে কোন সংক্রামক রোগের বীজ থাকুক না কেন, তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এরূপ সিদ্ধ জল পান করাই সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই উপায়ে অতি সামান্য চেষ্টায় ও বিনা ব্যয়ে অনেক সাংঘাতিক রোগের আক্রমণ হইতে আমরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। ফিল্টারের দ্বারা জল পরিষ্কার করা যায় বটে কিন্তু খুব দামী ফিল্টার না হইলে তাহা দ্বারা রোগের বীজ জল হইতে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় না। সুতরাং কোন সংক্রামক রোগের আক্রমণের সময়ে সাধারণ ফিল্টারের উপায়

নির্ভর করিয়া আমরা একেবারে নিরাপদ হইতে পারি না। এরূপ স্থলে জল বিমুক্ত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—জল ফুটাইয়া পান করা। পারমানানেন্ট অব্ পটাস্ প্রভৃতি দুই একটি ঔষধের দ্বারা জল শুদ্ধ করা যায় বটে কিন্তু ঐ সকল ঔষধ সাধারণ পল্লীগ্ৰাম-বাসীর পক্ষে সংগ্রহ বা ঠিক ব্যবহার করা সহজসাধ্য নহে।

অতএব সর্বদা মনে রাখিবে যে জল ফুটাইয়া পান করিলে আমরা অনেক রোগের হাত হইতে বাচিতে পারি।

### আহার ও পানীয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম পালনের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে পুষ্টিকর নির্দোষ আহাৰ্য্য গ্রহণ ও পরিমিত ভোজনই সর্ব প্রধান।

১। সহরে নির্দোষ খাদ্য পাওয়া সুকঠিন, কিন্তু পল্লীগ্ৰামে এখনও ঐ বিষয়ে অনেক সুবিধা আছে। চাল, ডাল, মাছ, তরকারি, তেল, দুধ ও নারিকেলের মিষ্টান্ন পল্লীগ্ৰামে বিমুক্ত অবস্থায় পাইতে অসুবিধা হয় না। এই সকল খাদ্য সহজ পরিপাচ্য, পুষ্টিকর, অথচ দামেও সস্তা।

২। বাহারি মনে করেন যে, মাংস না খাইলে শরীর সবল হয় না, তাঁহাদের ধারণা ভুল। মাংসের মধ্যে যে বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থ আছে, ডাল, মাছ, দুধ প্রভৃতি খাদ্য ব্যবহার মধ্যেও সেই সারবান্ধ সন্নিবিষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। মাছ বদলেপের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহা বাঙ্গালীজাতির একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

৩। বাহারি কোনরূপ আদিব জব্য

ভক্ষণ করেন না, তাঁহারা ডাল, ভাত, কুটি, তরকারি, ঘি, দুধ, ছানা খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করিতে পারেন।

৪। ভাত অপেক্ষা কুটি দারবান খাদ্য। আমাদের দেশে একবেলা কুটির প্রচলন হইলে আমাদের দেহ আরও সবল হইবার সম্ভাবনা। ভাতের ফেন ফেলিয়া খাওয়া কখনই উচিত নহে; উহাতে চালের সারাংশ কতক পরিমাণে পরিত্যক্ত হয়। খিচুড়ি অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশে প্রত্যেক পরিবারে ইহার অধিক প্রচলন হইলে ভাল হয়।

৫। বাঁহারা ঘি ব্যবহার করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা খাঁটি সরিষার তৈল তৎপরিবর্তে ব্যবহার করিলে প্রায় একই ফল পাটবেন।

৬। আমিষ বা নিরামিষ যে কোন পদার্থই ভোজন করা যাউক না কেন, গুরু ভোজন প্রভূত অনিষ্টের কারণ। পেট সম্পূর্ণ ভর্তি করিয়া না খাওয়াই সর্বদা কর্তব্য। মিতাহার—স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের এক প্রধান উপায়।

৭। প্রত্যহ এক সময়ে ভোজন করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অস্বকূল। রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পাহার প্রশস্ত।

৮। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্কণ না করিয়া তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। ইহার দ্বারা খাদ্য যে কেবল হজম না হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে, খাদ্যের অধিকীকরণ সারভাগ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

৯। হাত সুব উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আহার করিতে বসিবে। যে হাতে খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং যেখানে আহার করা যায়,

তাহা অতিশয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

১০। মাছি—ময়লা দ্রব্য ও রোগের বীজ পায়ের দ্বারা বহন করিয়া আনিয়া খাদ্য দ্রব্যের উপর বসিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। সুতরাং রান্নাখরের মধ্যে এবং আহার করিবার স্থানে বাহাতে মাছি আসিতে না পারে এবং খাদ্যদ্রব্যে বাহাতে মাছি না বসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর মধ্যে আবজ্জনা সঞ্চিত থাকিলে মাছির উপদ্রব বেশী হইয়া থাকে, সুতরাং এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে বাড়ীর মধ্যে মাছির উপদ্রব কমিয়া যাইবে। খাদ্যদ্রব্য সর্বদা ঢাকা দিয়া রাখিবে।

১১। বাজারের খাবার যে দূষিত তাহার কারণ এই যে, উহা যে ভাবে রাখা হয়, তাহাতে উহার উপর সর্বদা পথের ধূলা পড়ে এবং মাছি বসে। ওছুরি বাজারের খাবার প্রায়ই ভেজাল তেল, ঘি, ময়দা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। জলখাবারের জন্ত বাজারের খাবারের ব্যবস্থা না করিয়া আমাদের দেশের পূর্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারে চিড়া, মুড়ি, ছোলা বা মটরভাঙ্গা, রুনা নারিকেল কিম্বা নারিকেলের মন্দেশ ইত্যাদি ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ নির্দোষ অথচ সবিশেষ পুষ্টিকর জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়। খরচের দিক হইতে দেখিলেও ইহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

১২। আহারের সময়ে বা অব্যবহিত পরেই অধিক জলপান বা বরফজল পান না করাই উচিত। উহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়।

১৩। সবল শরীরে চা, কোফি বা

কফি পান করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে নিয়মিত পরিমাণে পান করিলে ইহাদের মধ্যে কোনটাই অনিষ্ট উৎপাদন করে না, বরং পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে। অধিক চা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও অত্যন্ত রোগ উপস্থিত হয়।

১৪। সুস্থ শরীরে সূরা বা অত্যন্ত মাদক দ্রব্যের ব্যবহার একান্ত বর্জনীয়।

### শরীর চালনা।

প্রত্যহ কোন না কোনরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ ব্যায়াম না করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করা যায় না। মুক্তস্থানে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত। যে কোন প্রকার ব্যায়াম প্রতিদিন অন্ততঃ পনের মিনিট কাল অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বয়স অধিক হইলে অথবা অল্প কারণে শ্রমসাধ্য ব্যায়াম নিষিদ্ধ হইলে, পদ-ব্রজে ভ্রমণ বিশেষ উপকারী। সুস্থ শরীরে দুই বেলায় অন্ততঃ দুই কোশ পথ ভ্রমণ করা উচিত।

শরীর বা মনের অতিরিক্ত পরিশ্রম হইলে

স্বাস্থ্যহানি হয় এবং মনও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএব এ বিষয়ে ছাত্রদিগের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

### বিশ্রাম\*।

শরীরের পক্ষে পরিশ্রম ও ব্যায়াম যেমন প্রয়োজনীয়, নিয়মিত বিশ্রাম গ্রহণ করাও তদ্রূপ আবশ্যক। অধিক রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিলে বা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিলে শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নিদ্রাই শরীর ও মনকে পূর্ণ বিশ্রাম প্রদান করে। রাত্রি কালই নিদ্রার প্রশস্ত সময়। দিবানিদ্রা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের অমুকূল নহে। রাত্রি কালে স্বপ্নাহার সুনিদ্রার পক্ষে প্রশস্ত।

### পরিচ্ছদ।

আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুব সাদাসিধে অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। পরিচ্ছদ আড়ম্বরহীন হইবে কিন্তু কচিবিরুদ্ধ বা ময়লা হইবে না। ঘর্মাক্ত বা ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহারে শরীরের অনিষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)।

## বসন্তরোগের চিকিৎসা।

— :: —

### ( কবিরাজ শ্রীকিরণচন্দ্র কণ্ঠাভরণ )

সকল বসন্তেই প্রথমে বমন করাইয়া পরে বিরচন দিবে। দুর্জলের পক্ষে বমন ও বিরচনের ব্যবস্থা নাই, কেবল বৈদ্যনাথক দ্রব্যের পাচন দিবে।

বমনের কাথ ও স্বরস প্রভৃতি।

পলতা, নিমছাল, বাসকমলের ছাল, প্রত্যেকে ২ তোলা, পাঁচ মাষা, ত্রিন যতি, কাথার্ঘ জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা।

\* শরীর হারাণের নিমিত্ত কবিরাজ কণ্ঠক লিখিত।

প্রক্ষেপ \* বচ, ইন্দ্রধব, বষ্টিমধু, ময়না ফল, প্রত্যেকে চূর্ণ ৥০ অর্দ্ধতোলা, ঐ কাথে মিলিত করিয়া ঈষদ্বক্ষ্যাকিলে পান করিবেক।

স্বরস। ব্রাহ্মী শাকের রস ৪ চারি তোলা, প্রক্ষেপ মধু ৥০ অর্দ্ধতোলা; হেলঞ্চা শাকের রস ৪ চারি তোলা, প্রক্ষেপ মধু ৥০ অর্দ্ধতোলা; নিমছালের রস ৪ চারি তোলা প্রক্ষেপ মধু ৥০ অর্দ্ধতোলা।

বিরেচনের স্বরস। উচ্ছে পত্রের রস ৪ তোলা, প্রক্ষেপ হরিদ্রা চূর্ণ ৥০ অর্দ্ধতোলা।

এইরূপ বমন বিরেচনের দ্বারা রোগীর শরীর পরিষ্কৃত হইলে সুবাসন্ত উথিত হয়।

### বসন্ত আরম্ভে মুষ্টিযোগ।

জরন্তী বীজ ২৫টা ঘূতে বাটিয়া ৮ তোলা বাসি জলের সহিত পান করিবেক।

দোনার মূল ১ তোলা, মরিচ ২৫টা, আট তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

এইরূপ খাটাসী ১ তোলা উক্ত পরিমাণ মরিচ ও জলের সহিত সেবন করিবে।

হরালতার মূল ২ তোলা—৮ তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

ঐ প্রকার শিয়াল কাঁটার মূল, শিকটান কাঁটার মূল, অনন্তমূল ও বরাসমূলের + চারিটা মুষ্টিযোগ করিবে।

হরিদ্রা পত্র ১ তোলা, তেঁতুল পত্র ১ তোলা, ৮ তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

২ তোলা মধু ৮ তোলা বাসি জলের সহিত সেবন করিবে।

শোধিত পারা ৥০ অর্দ্ধতোলা, শোধিত গন্ধক ১ তোলা, কজ্জলী করিয়া লইয়া পপ্পটি প্রস্তুত করিবে, ইহার ৪ চারি মাষকলাই পরিমাণে পানের সহিত সেবন করিবে।

### বসন্ত আরম্ভের পাঁচন।

কুমাড়ু লতার মূল পশ্চাৎ বক্তব্য বিধানানুসারে প্রস্তুত করিয়া ১০ কুঁচ হিন্দু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

পাচন প্রস্তুত করিবার দ্রব্যের ও জলের পরিমাণ :--

পাচন দ্রব্য, এক খানিই হউক অথবা অধিকই হউক, ২ তোলা পরিমাণ। জলের পরিমাণ ৩২ বর্জিণ তোলা। মন্দ মন্দ জলে সিদ্ধ করিবে, ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া, সেই জল পান করিতে দিবে।

বসন্ত আরম্ভে জলসেক। বহুবায় বৃক্ষের + ছাল ৮ তোলা—৪৮ তোলা শীতল জলে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে, সেই জল রোগীর শরীরে সেচন করিবে।

### বাতজ বসন্তের পাঁচন—বিবাদি।

বেলছাল, শ্রোণাছাল, গাঙ্গারী ছাল, পারুল ছাল, গণিরারী ছাল, শালগানী, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, রাসা, দাক্ষহরিদ্রা, তরালতা, বৈশামূল, শুক্লক, ধন্তা, মূতা, প্রত্যেকে ৯০ কুঁচ লইয়া বিধানানুসারে পাঁচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।

\* কোন কাথ অথবা পাচন পান করিবার সময় যে চূর্ণ দ্রব্য অথবা ঘূত, মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয় তাহার নাম প্রক্ষেপ।

কাথ দ্রব্যের ও জলের এবং প্রক্ষেপ দ্রব্যের পরিমাণ পোষিকার সময় পরিচয় করিতে হইবে।

† বাতির ভেদ, বৃক্ষ ভেদকী বৃক্ষ।

২. ছাল ছা।

### বাতজ বসন্তের পাককালের

পাচন—শুড়চাঁদি । গুলঞ্চ, ষটিমধু, রান্না শালপানী, চাকুলিয়া, বৃহতী, কটকারী, গোকুরী, রক্তচন্দন, গাভারীফল, খেত বেড়েলার মূল, বঁইচী মূল, প্রত্যেকে ১৩। কুঁচ ।

### পিত্তজ বসন্তের পাচন—দ্রাক্ষাদি ।

কিসমিস, পিণ্ডীখাজুর, গাভারী ফল, পলতা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, খই, আমলা, ছুরালভা, প্রত্যেকে ১৭৫০ পোনে আঠার কুঁচ ।

### শ্লেষ্মাজ বসন্তের পাচন—ছুরাল-

ভাদি । ছুরালভা, ক্ষেপাঁপড়া, চিরতা, কটকী, প্রত্যেকে ৪০ কুঁচ । এই পাচনটা পিত্তজ বসন্তেও ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

ত্রিদোষজ বসন্তের পাচন, নিষাদি । নিম-ছাল ক্ষেপাঁপড়া, আকনাদি মূল, পলতা, কটকী, বাসকমূলের ছাল, ছুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, খেতচন্দন, রক্তচন্দন, প্রত্যেকে ১৪০ কুঁচ, প্রক্ষেপ ১০ অর্দ্ধতোলা ।

### পটোলমূলাদি পাচন ।

পটোলমূল, রান্না নট্টিয়া শাক, আমলকী, খদির সার, প্রত্যেক ৪০ রতি ।

### পটোলপত্রাদি পাচন ।

পলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকমূলের ছাল, পত্রা, ছুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কটকী, ক্ষেপাঁপড়া, প্রত্যেক ১৬ কুঁচ ।

### কাঞ্চন ছালের পাচন ।

কাঞ্চন বৃক্ষের ছাল ২ তোলা । প্রক্ষেপ শোধিত অর্ধদ্রাক্ষা ১০ অর্দ্ধতোলা ।

### দ্বিতীয় পটোলমূলাদি পাচন ।

পটোলমূল ও রান্নানট্টিয়া শাক, প্রত্যেকে ৮০ কুঁচ । প্রক্ষেপ হরিদ্রা চূর্ণ ৫০ কুঁচ, আমলা চূর্ণ ২০ কুঁচ । এই পাচন বিস্ফোটক হাম রোগেও ব্যবহার করা যায় ।

### খদিরার্ষ্টক ।

খদির সার, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মিমছাল, পলতা, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, প্রত্যেকে ২০ কুঁচ । এই পাচনটাও বিসর্প, হাম, বিস্ফোটক রোগেও ব্যবহার করা যায় ।

### কফ-পিত্তজ বসন্তের পাচন—

অমৃতাদি ।

গুলঞ্চ, বাসক মূলের ছাল, পলতা, মুতা, ছাতিম ছাল, খদির সার, কেলেকড়া, নিম পত্র হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেকে ১৬ কুঁচ ।

### বিষাদি চূর্ণ ।

বিষকণ্টক, মরিচ, সমভাগ চূর্ণ করিয়া, ১০ কুঁচ পরিমাণে বাসি জলের সহিত সেবন ।

### রুদ্রাক্ষাদি চূর্ণ ।

রুদ্রাক্ষ, মরিচ, সমানভাগ চূর্ণ ১০ কুঁচ পরিমাণে সেবন, অস্থপান জল ।

### পাপ রোগান্তক রস ।

ষড়্গুণবলিজারিত মৃচ্ছিত রস, বচ, পিপ্পল রুদ্রাক্ষ, মরিচ, সমানভাগ চূর্ণ করিয়া, তিন কুঁচ পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিবে ।

### পিত্তজ বসন্তের দাহাদিনাশক

প্রলেপ ।

শিরীষ বীজ, খজুরমূলের ছাল, বাহরার মূলের ছাল, অর্ধতোলা, রক্তে ছাল, সমান

ভাগ দ্বিত দিয়া নেকড়ার উপর প্রলেপ দিয়া,  
তাহা শরীরে বসাইয়া দিবে।

**বসন্ত পক্ষাইবার ও দাহ নষ্ট  
করিবার প্রলেপ।**

টাবালেবুর দানা—যবের কাঙ্কি দিয়া  
বাটিয়া ঐরূপ প্রলেপ দিবে।

কেবল পদে দাহ হইলে চেলুনী জলে  
সর্ষদা পাদধৌত করিবেক।

**বসন্ত পাকাইবার অবলৈহ।**

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুশূল, অম্ল-  
দাড়িষের বীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে  
৩২ কুঁচ লইয়া, চারি তোলা পুরাতন গুড়ের  
সহিত অবলৈহ করিবে।

এইরূপ কুলচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত অবলৈহ

**বসন্ত পাককালের পথ্যাপথ্য।**

মাংসবর্জক দ্রব্য যতাদি আহার করিবে।  
শরীর শুষ্ক হয় এমত দ্রব্য কদাচ ব্যবহার  
করিবে না।

**বাতজ বসন্তের আরম্ভকালের পথ্য।**

খই চূর্ণ সমান ভাগ চিনির সহিত শীতল  
জল দিয়া সেবন করিবে।

পলতা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্যের যুষের সহিত  
ও কপোতের মাংসের যুষের সহিত ভোজন  
করিবে।

**পিত্তজ বসন্তের পথ্য।**

নিম, পলতা, মুগ, তিক্ত দ্রব্যের যুষ,  
পুরাতন তুণ্ড, যব এবং লঘু ভোজন করিবে।

**বসন্তরোগের অপথ্য।**

স্ত্রীসেবা, শ্বেদ, শ্রম, গুরুদ্রব্য ভোজন,  
তৈল, রোদ্র, কটুদ্রব্য, অম্ল, কোদধাত্তের  
অম্ল, হৃষ্ট জল, হৃষ্ট বায়ু, ক্রোধ, বিরুদ্ধ ভোজন\*  
বিষমাশন + এবং সীম, বসন্তরোগী পরিত্যাগ  
করিবেক।

**উদরে বেদনা, আধান # ও কম্প  
হইলে পথ্য।**

হরিণাদি মাংসের যুষ অল্প সৈন্ধব লবণের  
সহিত অথবা অল্প দাড়িষের সহিত পান  
করিবেক।

পীতলর্ণ শাল বৃক্ষের ছাল ১ তোলা, খদির-  
সার ১ তোলা—৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২  
সের থাকিতে নামাইয়া, সেই জল পান  
করিবে, অল্প জল পান করিবে না। (ক্রমশঃ)

## প্রাচীন চিকিৎসকের টোটকা ও মুক্তিযোগ। \*

( পূর্বাঙ্কুরতি )

( শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র লাহিড়ী )

পোড়া ঘায়ে—হরিদ্রা পত্র অথবা তুলসী  
পত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে সস্ত্রের চার কাছ  
করে।

হাড়মোড়ায়—খুই শাক অথবা  
শোনালুর পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেশ  
উপকার হয়।

\* দুহের সহিত বসন্ত প্রভৃতি ভোজন।

‡ পেটকাঁপা।

\* প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র লাহিড়ী কর্তৃক প্রণীত।

**সর্বপ্রকার বেদনায়—** জয়পালের পাতা, ফল ও ছাল একত্র মিলিত ২ তোলা, সরিষার তৈল ১০ এক পোয়া একত্র তাজিয়া নইবে, এই তৈল সর্বপ্রকার বেদনায় প্রয়োগ করা যায় ।

**প্রস্রাব বন্ধে—**চাঁপাকুলের পাতার রস ২ তোলা খাইলে বেশ ফল পাওয়া যায় ।

**প্রদরে—**অশোক ছাল ৫ তোলা, লালী গুড় ১ তোলা—/১ সের জল দিয়া জাল দিয়া /১০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া দুইবেলা সেবা ।

**উপদংশে মলম—**ভেড়ার লোম ভস্ম ১০ আনা, শামুকের টাটকা চূর্ণ ১০ আনা, তুতিয়া ভস্ম ১০ আনা, শত ধোত গব্য ঘৃত ১ গোলা—একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার হয় ।

**রুশিক দংশনে—**আমড়া পাতার রস ও আমড়া উত্তমরূপে বাটিয়া দংশিত স্থলে প্রলেপ দিলে উত্তম ফল দৃষ্ট হয় ।

**বহু মূত্রে—**পুরাতন কুল বীজ শাঁস ২টী ও ষেতচন্দন ১ তোলা—একত্র বাটিয়া

খাইলে বহুমূত্রে বেশ ফল হয় ।

**হিক্কায়—**হিং ঘূতে তাজিয়া এক টুকরা কাপড়ে পুট্টনী বাধিয়া ঘন ঘন ভ্রাণ নইলে প্রবল হিক্কা বন্ধ হয় । অথবা হিক্কাগ্রস্থ রোগীর জিহ্বা টানিয়া বাহির করতঃ পুনরায় ছাড়িয়া দিলেও প্রবল হিক্কা বন্ধ হয় ।

**প্লীহা রোগে—**ঘু পানীর ডিম ১টা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই খাইলে প্লীহা রোগে বেশ কাঁজ করে ।

**রক্তাতিসারে—**বেলছাল /১০ ছটাক, জায়ফল /১০ আনা, চিনি ১০ তোলা—একত্র বাটিয়া প্রাতঃকালে ও বৈকালে কুটরাজের ছাল সিদ্ধ জল ২ তোলা—মধু ও জিরাভাজার চূর্ণ সহ সেবা ।

**পাঁচড়ায়—**কটু তৈল /১০ পোয়া, রাই সর্ষপ /১০ ছটাক, পচা নানকচুর ডাঁটা /১০ ছটাক, গাজা /১০ আনা,—একত্র তাজিয়া ঐ তৈল ব্যবহারে খোস পাঁচড়া প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

( ক্রমশঃ )

## সমালোচনা ।

**বসন্ত রোগের নিদান ও চিকিৎসা**  
—ষণ্ময় হারাধন বিশ্বকর্ষ কবিরাজ কর্তৃক  
সঙ্কলিত । সম্পাদক—কবিরাজ ত্রীকৈরিক  
চক্র কণ্ঠাতরণ । কলিকাতা-বৎসর হইতে প্রকাশ  
যেদ্বারা বসন্ত রোগের প্রাক্কর্ষ দেখা দিয়াছে,  
তাহাতে এরূপ পুস্তকের প্রকাশ বহু প্রযুক্ত  
হয় ততই মঙ্গলের কথা । এই গ্রন্থের প্রকাশ  
কর অনেকগুলি প্রায়শঃ ও আশাশ্রিত্যের

গ্রন্থ অবলম্বনে ইহার লক্ষণ লক্ষণ করিয়াছেন ।  
বসন্ত রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা-বিধিসকল  
এই গ্রন্থে সুন্দর ভাবে বর্ণিত কইয়াছে ।  
এরূপ গ্রন্থ পাঠে দেশবাসীর উপকার হইবে ।  
আমরা স্বানামস্তরে এই গ্রন্থ হইতে “বসন্তরোগের  
চিকিৎসা” উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।

**শিল্প পাঠ্য**—ঐরাবত কল্যাণ  
প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত ।

ষ্ট্রট হইতে গ্রীষ্মপদ বন্দোপাধার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১১০ টাকা। গ্রন্থকারের শিল্প ভ্রমণ উৎসর্গে গল্পচ্ছলে এই পুস্তকখানি লিখিত। এ পুস্তক পাঠে অনেক দেশের নূতন ভাষা এবং অনেক পুরাতত্ত্ব জানিতে পারা যায়। গ্রন্থখানির ভাষা বেশ প্রাক্কল। কাগজ উৎকৃষ্ট, ছাপা সুন্দর এবং বাঁধান বেশ পরিপাটি। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

**সত্য গ্রন্থ।**—নন্দিনী সম্পাদক শ্রীঅণু তোষ দাস গুপ্ত মহানবিশ্রুত। মূল্য এক আনা। ভারতবাসী সত্যগ্রহীর দলকে উদ্দেশ্য করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত। গ্রন্থকার সত্যগ্রহীর দলগুটির প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন ইহা ভারত সন্তানের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা,—না ইহা সময়োচিত

হজুগের জুয়ার মাত্র। বাস্তবিক সমগ্র ভারতবাসীর ইহা যে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নহে, ইহা তো সত্য কথা। বাহ্য মর্মস্থল হইতে প্রকাশিত নহে তাহার জন্ত বৃথা হজুগে আত্মহার্য হইয়া অশান্তিকে আলিঙ্গন করিবার কারণ কি? ভারতবাসীর প্রাণ চিরদিনই ধ্বংস বিজড়িত, সেইজন্য এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের মত আমরাও বলি ধর্মোন্নতি দ্বারা শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় আমরা যতটা শ্রমশ্রম হইব, এই সত্য গ্রন্থের গড়লিকা প্রবাহে প্রধাবিত হইলে সেরূপ কখনই হইতে পারিব না। ইহার ভবিষ্যৎ ফলও যে শুভ নহে, তাহাও সুনিশ্চিত। এ গ্রন্থে ভারতবাসীর যথেষ্ট আছে। এ গ্রন্থের ভাবরাশি গ্রহণেও অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

**শিশু মৃত্যুর হিসাব।**—ইংলণ্ডে হাজার করা ৯১টি, বিহার ও উড়িষ্যায় হাজার করা ১৮০টি ও বঙ্গদেশে হাজার করা ১৮৫টি, শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সমগ্র ভারতের হিসাব করিলে উহার হার ২০৬। আমেরিকায় শিশু মৃত্যুর হার ইংলণ্ড অপেক্ষাও কম। ফল কথা ভারতে ক্রমশঃ বেশী শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, অস্তিত্ব সভ্য দেশে সেইরূপ ইহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

**শিশুর মৃত্যুর কারণ।**—ভারতীয় মহিলাদিগের স্বাস্থ্যকালের অভাবই প্রধান

শিশু মৃত্যুর আধিক্যের কারণ বলিয়া অনেকে নির্দেশ করেন। ভারতে মৃত্যুগৃহের জঘন্য অবস্থাও ইহার একটা কারণ অনেকে বলেন কিন্তু মৃত্যুগৃহের জঘন্য অবস্থা আগেও ছিল, এখনও আছে, তবে সেই মৃত্যুগৃহের জঘন্য অবস্থার তীব্রতরও আগে যে প্রসূতি ও শিশুরিগের সৎকর্তব্য এইসব ব্যবস্থা ছিল, এখন সেটা অনেক স্থলে উন্নীত গিয়াছে। অনেকে 'পার্টুসারি'র মনত করিয়া সৎকর্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন, অনেকে বা ইংরাজী সৎকর্তব্য এ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজী সৎকর্তব্য



গৃহের ব্যবস্থা যে ভারতীয়দিগের অপেক্ষা  
অন্তরূপ—এটা আমরা ভাবিয়া দেখি না। ফলে  
যে সব সংসারে সেকতাপ গ্রহণের ব্যবস্থা  
এখনও উঠিয়া যায় নাই, সে সব সংসারে  
শিশুমৃত্যুর পরিমাণ অনেকটা কম বলিয়াই  
আমাদের বিশ্বাস।

### শিশুমৃত্যুর আরও কারণ।—

ভারতে বিশুদ্ধ গোছের অভাব শিশু-  
মৃত্যুর আর একটি কারণ। ভারতবাসী  
আগের মত এখন আর দুগ্ধ প্রিয় নহেন,  
শিশুপালন সম্বন্ধেও অনেক স্থলে ভারতবাসী  
এখন অনেকটা সেই ব্যবস্থা পালন করিয়া  
থাকেন। বিলাতী জমাট দুগ্ধ, মেলিস্‌ফুড  
প্রভৃতি এখন অনেক শিশুরই প্রধান খাদ্য।  
এই খাদ্যে শিশুর প্রাণ রক্ষা দুর্বল হইয়া পড়ে।  
আগে গাভীপালন ভারতের প্রত্যেক ঘরে  
ঘরে প্রচলিত ছিল, তখন গাভী দুগ্ধের অভাব  
ছিল না, ভারতে শিশুমৃত্যুর আধিক্য তখন  
একটু ছিল না। আমেরিকাবাসী এখন  
একথা বুঝিয়াছেন, আমেরিকায় গো পালন  
সম্বন্ধে বহু বিদ্যালয় আছে, সেইজন্য আমে-  
রিকায় শিশুমৃত্যুর হার ইংলণ্ড অপেক্ষাও  
কম।

### শিশুমৃত্যুর আরও কারণ নির্দেশ।

—শিশুমৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ,  
স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অপরিণত বয়সে  
বিবাহের ব্যবস্থা। কিন্তু সমাজের গতিব্রোতে  
এ ব্যবস্থা রুদ্ধ করিবার যো নাই। শিশু  
মৃত্যুর হিসাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল স্থান  
অপেক্ষা বাঙ্গালদেশে রক্ত শিশু মৃত্যুমুখে  
পতিত হয়, এমন আর কোনো দেশে নহে।  
বাঙ্গালী সমাজ বৈদ্য কলিকাতার পিতৃ-  
তাহার ফলে উপযুক্ত-পাত্র-পাত্রীর মিলন হওয়া  
প্রায়ই সম্ভবপর হয় না। কলিকাতার পিতৃ-  
স্বাস্থ্য হইয়া বি-এ, এম এ, বি-এস, সি, এম-এস,  
সি পাত্রের কল্যাণ সম্প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু  
পাত্র স্বাস্থ্যবান কি না, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের  
পাঠের পীড়নে আয়ুষ্কাল স্বল্প ভোগের  
কারণ করিয়া তুলিয়াছেন কি না এবং  
তাহার স্বাস্থ্যহীন দেহে যে সন্তান সন্ততি  
জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা সবল, সুস্থ ও  
দীর্ঘজীবী হইবে কি না—এ সকল বিষয়  
বিচার করিবার অবসর পাইলেন না। ফলে  
বাঙ্গালী সমাজে এখনকার দিনে অনেক  
ক্ষেত্রেই যে স্ত্রী পুরুষের মিলন সংঘটিত হয়—  
তাহা স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া দেখিলে উপযুক্ত  
হয় না। কাজেই দুর্বল পিতৃবীর্যে স্বাস্থ্যবান  
ও দীর্ঘজীবী সন্তান লাভের আশা কেমন  
করিয়া যায়? সকল দেশ অপেক্ষা বাঙ্গালীর  
শিশুমৃত্যুর আধিক্য এইজন্য।

### কলিকাতায় বসন্ত।—

কলিকাতায় বসন্ত রোগ প্রবল ভাবে প্রবেশ করিয়াছে।  
প্রতি সপ্তাহেই এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি  
দেখা যাইতেছে। সহর বাসীর এ সময় বিশেষ  
সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

### স্বাস্থ্য কর্মচারীর ঘোষণা।—

কলিকাতার স্বাস্থ্য কর্মচারী এই বসন্ত রোগ  
সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন যে,—“এইবার এই  
রোগে মহামারী হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।  
সহরের উত্তরাংশেই এখন ইহার আক্রোশ দেখা  
যাইতেছে, কিন্তু আশার মনে হয়, এই মহামারী  
১৯১৫ সালের মহামারী হইতেও ভীষণতর  
হইবে।”

### স্বাস্থ্য কর্মচারীর আরও বক্তব্য।

—বসন্ত সপ্তকে স্বাস্থ্য কর্মচারী মহাশয় আরও বলিয়াছেন,—“১৯১৫ সালে কলিকাতা সহরের দশ হাজার ঋক্তি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়, উহাদের মধ্যে আড়াই হাজার লোক মারা গিয়াছিল। এবার যদি সেই বৎসরের মতই ইহা ভীষণ ভাবধারণ করে, তাহা হইলে ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হইবে এবং উহাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক লোকই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্ত স্থান পাইবে। এই রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত সহর-বাসীর সকলেই টীকা গ্রহণ করুন। ষাঁহার একবার টীকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারও পুনরায় টীকা গ্রহণ করুন। টীকা লইবার পরে ক্রমশঃ উহার শক্তি কমিয়া আসে, একজন্ত ষাঁহার ৫ বৎসর পূর্বে টীকা লইয়াছেন, তাহার আবার অবশ্য টীকা গ্রহণ করিবেন।” স্বাস্থ্য কর্মচারী মহাশয়ের প্রস্তাবমত সকলেরই টীকা গ্রহণ করা কর্তব্য।

বিজ্ঞানকংগ্রেস।—সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নাগপুরে বিজ্ঞান-কংগ্রেস আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে শতাধিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধপঠিত হইবার কথা।

### ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিবেদ।—

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিবেদের উপায় নির্ণয়ের জন্ত গত ১৯১৯ সালে পারিস সহরের চিকিৎসক গণের সম্মিলনে এক মহা সভার অধিবেশন হয়, কিন্তু সে অধিবেশনে ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, এই ব্যাধি সম্বন্ধে প্রয়োজন মত তথ্য সকল পাওয়া বাইতেছে না। ইহার এক বৎসর পরে এখন লর্ড সেকান্ডার চিকিৎসা

সকগণ গবেষণা করিবার অবসর পাইয়াছেন। সেই জন্ত স্থির হইয়াছে, শীঘ্রই আর একটা মহা সভার অধিবেশন হইবে এবং সে অধিবেশনে ভারতবর্ষ হইতেও প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিবে।

সম্পাদক-কবিরাজ।—আমরা এক জন সাহিত্য সেবীকে এত দিন সংবাদ পত্রের সম্পাদক রূপেই দেখিয়া আসিতেছিলাম, সংগ্রতি কয়েক খানি সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিতেছি, তিনি কবিরাজী ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। শুভ!

সহরে মৃত্যুর হিসাব।—গত ১০ই জাম্বারি যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে মোট ৮৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে বসন্তে মৃত্যুই সর্বাপেক্ষা অধিক। ঐ সপ্তাহে বসন্তে মরিয়াছে ১২৪ জন।

### নোয়াখালিতে ইনফ্লুয়েঞ্জা।—

নোয়াখালির সংবাদ পত্রে প্রকাশ, নোয়াখালি জেলার অনেক স্থানেই নাকি বহু লোক ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিতেছে। বাকলা দেশে ক্রমে সকল রোগের আক্রমণ হইতে চলিল।

### শোক সংবাদ।—

ভট্টপল্লীর অলঙ্কার, বরগীষ অধ্যাপক, আয়ুর্বেদের পরম ভক্ত মহাশয় ৮শিষ্য চন্দ্র সার্ক ভৌম মহাশয় গত ২রা পৌষ বুলা ৮টার সময় সাম্মান্য করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। অতি দুঃখ, অতি বাহ্যবীর মরল। এতদিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আটান দ্বারা শুকাইয়া গেল। ইনি জীবনে কখনও ভাঙ্গারী ভাব সেন্স করেন নাই। চিরদিন আয়ুর্বেদের উপাসক ছিলেন।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৪র্থ বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—মাঘ।

৫ম সংখ্যা।

## শারীর বিজ্ঞা।

—:—

[ শারীর পরিচয় ]

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সঁরস্বতী এম-এ, এল,এম,এস)

শারীর ও মানস উভয়বিধ রোগ প্রধানতঃ শরীরকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন বা প্রকাশিত হয় এবং উভয়বিধ রোগে শরীরই চিকিৎসার প্রধান ক্ষেত্র। সুতরাং চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা কালেই হউনো শরীরের উপাদান, গঠন পৰ্যায়, শরীরস্থ বিভিন্ন যন্ত্রের আকৃতি-প্রকৃতি এবং ক্রিয়াদির বিষয় সমাক্রমে অবগত হওয়া কর্তব্য। একটি ঘড়ি মেরামত করিতে হইলে যেমন ঘড়ি কি উপায়ে চলে, উহাতে কিরূপ কতগুলি চাকা আছে, কোন্ চাকা কাহার সহিত সংলগ্ন, কোন্ চাকা কিরূপে কোন্ দিকে কার্গা করে, কি কারণে ঘড়ি দ্রুতভাবে বা মন্দভাবে চলে—ইত্যাদি সমস্ত যন্ত্র বিষয়ে জ্ঞান পাকা প্রয়োজন; সেইরূপ শরীরের

চিকিৎসা করিতে হইলে শরীরের গঠন ও আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সমস্ত যন্ত্র তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যিক। শরীর সমস্ত যন্ত্র অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে যেমন তাহার যেখানে যে বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং বুঝিয়া আবশ্যিক মত মেরামত করিতে পারা যায়, সেইরূপ শরীরের সমস্ত আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে অসুস্থ শরীরে কোথায় কি বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা বুঝিয়া চিকিৎসা করিতে পারা যায়।

প্রাণিমাণ্ডেরই প্রাণ শরীরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত করে। শরীর ও শারীরিক যন্ত্রাদির সহিত প্রাণের আধার আধেয় সম্বন্ধ। উহাদের উৎপত্তি, বার্তাবিক্রিয়া



দুইটা বাহ্যদ্বারা গ্রহণধারণাদি কার্য্য এবং দুইটি সন্ধি দ্বারা গমন ও শরীরের ধারণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। মধ্যশরীরে রক্তসঞ্চালন, শ্বাস গ্রহণ, অন্নপরিপাক, মলমূত্র বিসর্জন প্রভৃতি কার্য্যকর অশয় বা যন্ত্র সমূহ অবস্থিত করে। যুগ্মের কাণ্ড যেমন মূল ও শাখা সমূহের আশ্রয় স্বরূপ, মধ্যশরীরও সেইরূপ চারটি শাখা ও মস্তকের আশ্রয় স্বরূপ। মস্তকে শ্বাস গ্রহণের দ্বার নাসা, মুখ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ অবস্থিত করে। সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টাবহ নাড়ী সকলের মূল এবং বৃক্কীন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ভূমি মস্তক ও মস্তকের মধ্যেই অবস্থিত। জ্ঞানের অধিষ্ঠান ভূমি মস্তক মস্তকের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া উহা উত্তনাস্ক নামে কথিত হইয়া থাকে। যত্ন শরীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে বোঝরূপে প্রদত্ত হইল। পরে ইহাই বিস্তৃতভাবে লিপিত হইবে।

শারীরতত্ত্ব শিক্ষার আবশ্যিকতা, সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ \* যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে:

“এ চিকিৎসক সর্বদা সর্বপ্রকারে সমগ্র শরীরের তত্ত্ব সমূহ অবগত আছেন, তিনিই সমগ্র আয়ুর্বেদ বুঝিতে সক্ষম।” (চরক)

“শাস্ত্রলিপিত শারীরতত্ত্ব পাঠ করিয়া এবং যত্ন সমগ্র শরীরতত্ত্ব দর্শন করিয়া শারীর-

বিজ্ঞায় ব্যাপন হইবে। প্রত্যক্ষ দর্শন এবং শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সন্দেহ দূর করিয়া ‘চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। চক্ষুঃ দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখা এবং শাস্ত্রপাঠ দ্বারা অবগত হওয়া—এই উভয়ের সমন্বয় ঘটিলেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে।” (সুশ্রুত)

### শারীর পরিভাষা।

শারীরতত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই শারীর পরিভাষা অর্থাৎ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের এবং শরীরের উপাদান সমূহের শাস্ত্রীয় নাম অবগত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ পূর্ববর্তী ভ্রান্তসংস্কার থাকায় নানারূপ গোলযোগ হইতে পারে। সেইজন্য প্রথমেই শারীরপরিভাষা লিপিত হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শরীরের প্রধান অঙ্গ ছয়টি। এক্ষণে উহাদের অবয়ব সমূহের বর্ণনা করা যাইতেছে। রাজহর সহিত মধ্য-শরীরের সন্ধির নিম্নভাগকে কক্ষ (বগল) এবং উর্দ্ধভাগকে অংস বা ভুজশিরঃ বলে। অংস হইতে কনুই পর্য্যন্ত স্থানকে প্রাণ্ড (উপরের হাত) বলে। বাহ্যর মধ্যসন্ধিকে কফোণি বলে। কফোণির পশ্চাদ্ভাগ চলিত কথায় কনুই নামে প্রসিদ্ধ। কফোণি হইতে মণিবন্ধ বা কর-সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে

“শরীরঃ সর্বদা সর্বং সর্বথা বেদ যো ভিষক।

আয়ুর্বেদং স কাংক্ষোঁন বেদলোঁক যুগ্মদম ॥”

চরক, শারীরস্থান, ৬ অধ্যায়।

“শরীরে চৈব শাঙ্কৈচ দুর্ভার্যঃ স্যাৎশিয়ারদঃ।

দুষ্টজ্যাত্যাং সন্দেহমবাপোহাচিরেৎ ক্রিয়াঃ।

এতাকন্তো হি বদ্যুটং শাস্ত্রদৃষ্টক বদ্যবেৎ।

সমাসতত্ত্বদ্বয়ং জ্ঞয়ো জ্ঞান বিবর্জনদ।

সুশ্রুত, শারীরস্থান ৬ অধ্যায়।

প্রকোষ্ঠ ( নীচের হাত ) বলে । প্রকোষ্ঠ ও করের সন্ধিস্থলকে মণিবন্ধ বলে । মণিবন্ধ হইতে করাস্থলি সমূহের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অংশ কর বা পাণি নামে খ্যাত । করের রেখাঙ্কিত ভাগকে করতল এবং বিপরীত ভাগকে করপৃষ্ঠ বলে । অঙ্গুষ্ঠ, তচ্ছ্রনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা— পাঁচটা অঙ্গুলির এই পাঁচটা নাম । সন্ধিখর অর্থাৎ সমস্ত পা'খানির সহিত মধ্যশরীরের যে স্থলে সংযোগ হইয়াছে উহার সম্মুখের অংশকে বজ্রকণ (কুর্চাক) এবং পশ্চাদ্ভাগকে নিত্যম্ব বা স্ফিক্ ( পাছা ) বলে । বজ্রকণ হইতে জাহ্ম পর্য্যন্ত স্থানকে উরু বলে । উরু ও জঙ্ঘার ( নীচের পায়ের ) মধ্যস্থ সন্ধিকে জাহ্ম ( হাঁটু ) বলে । জাহ্ম হইতে পদের সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে জঙ্ঘা ( নীচের পা ) বলে । জঙ্ঘার নিম্নভাগে দুইদিকের দুইটা অগ্রিময় উন্নত প্রদেশকে গুল্ফ\* ( পায়ের পাঁচি ) বলে । গুল্ফ এবং পদের সন্ধিস্থানকে পাদসন্ধি বা গুল্ফসন্ধি বলে । ইহার নিম্নভাগকে পদ বা পাদ বলা যায় । পদের অগ্রভাগকে প্রপদ এবং পশ্চাদ্ভাগকে পার্শ্বি ( গোড়ালি ) বলে । পদের রেখাঙ্কিত ভাগকে পাদতল বা পদতল এবং তাহার বিপরীত ভাগকে পাদপৃষ্ঠ বলা যায় ।

জলাট, দুইটা ক, দুই শব্দ ( রঙ্গ ), দুই গণ্ড ( গাল ), উর্দ্ধ হৃদমণ্ডল ( উপরের

চোয়াল ), অধো হৃদমণ্ডল ( নীচের চোয়াল ), ষষ্ঠ, অধর, চিবুক ( খুঁনি ), তালু ( মুখের অভ্যন্তর ভাগের উচ্চাংশ ), উপজিহ্বা ( আলজিব ), অধিজিহ্বা ( গলার ভিতরে আলজিবের দুইপাশের দুইটা গ্রন্থি বা টনাসিল —Tonsil ) ও কণ্ঠ এইগুলি মস্তক ও গ্রন্থি প্রাথমিক উপাঙ্গ । চক্ষুঃ কণাদির বিষয় পৃথক্ ভাবে বলা যাইবে ।

শুনদ্বয়, বক্ষঃ, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, নাভি বস্তুদেশ, কটি ( কোমর ), ও ত্রিক—এই কর্ণা মধ্যশরীরের উপাঙ্গ । দুই সন্ধি এবং মধ্যশরীরের সন্ধিস্থলকে ত্রিক ( মাছা ) বলে । নাভির অধোভাগকে বস্তুদেশ বলে ।

হৃৎ, কলা, পেশী, স্নায়ু, ধমনী, শিরা, রসায়নী, নাড়ী, রসরক্তাদি ধাতু শরীরের উপাদান স্বরূপ । শ্বাসগ্রহণ, অন্নপরিপাক প্রভৃতি কাযানিষ্ঠাঙ্ক অনেক গুলি যন্ত্র বা আশয় শরীরের মধ্যে অবস্থিত । জানে দ্বির পাঁচটা, কয়েল্লিয় পাঁচটা এবং শরীরের ছিদ্র বা দ্বার নয়টা । প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্ ভাবে লিপিত হইতেছে ।

ত্বক্—বা চর্ম ( Skin—স্কিন ) ইহা সর্বদেহের আবরণ স্বরূপ, স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূমি এবং শ্বৈদবহ স্রোতঃ সকল ও সরোম রোমকূপ সমূহের আশ্রয় স্থান । স্থূল দৃষ্টিতে ইহা বহিঃত্বক্ ও অন্তত্বক্ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত । তন্মধ্যে বহিঃত্বক্ পাতলা ও কৃষ্ণ গৌর প্রভৃতি শারীরিক বর্ণের আধার স্বরূপ । এই ত্বক্ অগ্নির সংস্পর্শে কোমল রূপে পরিণত হয় । অন্তত্বক্ স্থূল, শরীরের রক্তা-

\* অনেক স্থলেই অর্থে গোড়ালি বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ভ্রান্ত্যক ।

কারক এবং শরীরলিপ্ত স্নেহাদির আকষণ কারক । ইহাই স্পন্দজ্ঞানের এবং স্বেদবৎ স্রোতঃ সমূহের আশ্রয় স্থান ।

স্বপ্নদশী শাস্ত্রকারগণ--ভ্রূণের উপর যেমন স্তরে স্তরে সর পড়ে, ত্বকেরও সেইরূপ ছয়টা বা সাতটা স্তর নির্দেশ করিয়াছেন \* । তন্মধ্যে প্রথম ত্বকের নাম অবভাসিনী, ইহাই পূর্বোক্ত বাল ত্বক্ । অপর পাঁচটা বা ছয়টা ত্বক স্তরত্বকের অন্তর্ভুক্ত ।

কলা—(Membrane) কলা সকল সাধারণতঃ স্বক্স রেশমী-বস্ত্রের ত্যায়, কিন্তু পদোজন অন্তসারে নানারূপ হইয়া থাকে । ইহা বা মাংস, অস্তি ও আশয় সমূহের ভিতর দিক্ ও বাহ্যিক আবৃত করিয়া অবস্থিতি করে । স্থান ও কার্য ভেদে কলা সকল ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কলার দৃষ্টান্ত যথা—মাংসের উপরের আবরণ ঝিল্লী (ফেসো) অথবা মাছের পটকা বা পটপটীর উপাদান । উপযুক্ত স্থানে নানাবিধ কলার বিদ্য বলা যাইবে ।

পেশী—(Muscle—মস্) —পেশী সকল মাংসময়, প্রায়শঃ স্থূল রক্তরূপ ত্যায়, কদাচিত্ মোটা চাদরের ত্যায় আকৃতি বিশিষ্ট । চালিত কথায় বাতাকে মাংস বলা হয়, তাহা পেশী বা পেশীর উপাদান মাত্র । \*পেশী সকল দুই প্রকার, যথা—ইচ্ছাধীন ও স্বতন্ত্র । ইচ্ছাধীন পেশীগুলি আমাদের ইচ্ছা অনুসারে চালিত হইয়া থাকে । কিন্তু স্বতন্ত্র পেশীগুলির চালনা করিতে আমাদের ইচ্ছা আবশ্যক হয় না—উহারা স্বভাবতঃই ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে ।

পেশী সকলের বিষয় পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে ।

কণ্ডুরা—(Tendon—টেণ্ডন) পেশী

সকলের রক্তরূপ ত্যায় আকারবিশিষ্ট শুভ্র মসৃণ এবং দৃঢ় প্রান্তভাগকে কণ্ডুরা বলা যায় । ইহারা স্নায়ু দ্বারা নিশ্চিত এবং বগেষ্ট ভার সহনে সমর্থ ।

স্নায়ু (Nagaments and Tendons + —লিগামেন্ট এবং টেণ্ডন)—স্নেতবর্ণ, মসৃণ, দৃঢ় এবং শর্ল শুচ্ছ সদ্দশ । স্নায়ু শব্দ আয়ুর্বেদে

প্রধানতঃ দুই অর্থে ব্যৱহৃত হয় । যথা—

(১) স্নায়ু অর্থাৎ স্নায়ুরজ্জ্ব বা কণ্ডুরা । (২) স্নায়ু অর্থাৎ স্বক্স স্নায়ু বা স্নায়ু-স্থত্র । বহুস্থত্র সংযোগে প্রস্তুত রক্তরূপ এবং স্বক্স স্থত্রের যেকোন প্রভেদ, এই দুই অর্থের প্রভেদও সেইরূপ । স্থূল স্নায়ু প্রধানতঃ অস্থি সমূহের পরস্পর ও অস্থির সহিত পেশীর বন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে এবং স্বক্স স্নায়ু কলা সমূহে, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের চওড়া পেশী সকলের শেষভাগে এবং আমাশয়, পকাশয় ও বস্তির কোন কোন প্রদেশে থাকিয়া উহাদের দৃঢ়তা সম্পাদন করে ।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে—

“স্নায়ু চার প্রকার, যথা, প্রতানবতী (শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট), বৃত্ত বা রক্তরূপ ত্যায়, পৃথু বা চওড়া এবং ছিদ্রযুক্ত । প্রতানবতী স্নায়ু চারিটা শাখায় ও সন্ধিসমূহে আছে । কণ্ডুরা-গুলি বৃত্তস্নায়ু । আমাশয় ও পকাশয়ের শেষে এবং বস্তিতে ছিদ্রযুক্ত স্নায়ু আছে । পার্শ্ব, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও মস্তকে পৃথু বা চওড়া

চরকের মতে ত্বক্ ছয়টা এবং ত্বক্কতের মতে সাতটা ।

\* ইংরাজি (Sinew) ‘সিনিউ’ শব্দ স্নায়ু শব্দ হইতেই উৎপন্ন । অর্থাৎ অনেকটা একই ভাব । বর্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় ‘স্নায়ু’ বা ‘স্নায়ু’ শব্দই স্নায়ুর প্রাচীন বিভাজ্য প্রকাশক ।

স্নায়ু আছে। নৌকার কাষ্ঠ ফলক সকল  
যে রূপ বহুবর্জনযুক্ত ও গ্রথিত হইয়া জলে বহু  
ভার বহন করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ মনুষ্য-  
শরীরে যতগুলি সন্ধি আছে, তাহারা বহু স্নায়ু  
দ্বারা বদ্ধ বলিয়া মনুষ্যদেহ ভারসহ 'হইয়া  
থাকে।\*

ধমনী—(Artery)—আটারি—সর্বদেহ  
ব্যাপ্ত বিপুল রক্তবাহিনী প্রণালী বা স্রোতঃ  
সকলকে ধমনী বলে। হৃদযন্ত্রচালিত বিপুল  
রক্ত প্রথমে মূল ধমনী, পরে তাহার সূক্ষ্ম-  
সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা সমূহের ভিতর দিয়া সর্ব  
শরীরে প্রবাহিত হয়। ধমনী সকল বিপুল  
রক্ত বহন করে বটে, কিন্তু দুসফসগামিনী  
ধমনী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া হৃদযন্ত্র হইতে  
কুসকুসে দূষিত রক্ত বহন করিয়া লইয়া যায়।

সিরা ( Vein—ভেন )—সর্বদেহব্যাপী  
দূষিত রক্ত বহনকারী স্রোতঃ সকলকে সিরা  
বলে। ইহারা অতি সূক্ষ্ম আকারে দেহের  
সর্বত্র অবস্থিতি করে এবং ক্রমশঃ পরস্পরে  
মিলিত হইয়া বৃহৎ সিরাসমূহে পরিণত হয়।  
সর্বদেহের দূষিত রক্ত বহন করিয়া হৃদয়ে  
লইয়া যাওয়াই ইহাদের কার্য। সিরা সকল  
দূষিত রক্ত বহন করে বটে, কিন্তু চারিটা সিরা

কুসকুসদ্বয় হইতে বিপুল রক্ত বহন করিয়া  
হৃদয়ে লইয়া যায়।

রসায়নী (Lymphatic—লিম্ফাটিক)—  
লসীকা নামক পাতলা ও স্বচ্ছ রসবাহিনী  
প্রণালীকে রসায়নী বলে; রসায়নী প্রণালী  
সকল সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত আছে। কক্ষ,  
বক্ষণ ও গলদেশ প্রভৃতি স্থানে রসায়নী প্রণালী  
গুলির মধ্যে মধ্যে কুঁচ বা নিমকণের দ্বারা  
রসগ্রন্থসমূহে অবস্থিত।

নাড়ী—(Nerve—নার্ভ)—নাড়ী সকল  
কামল সূক্ষ্ম, পীতবর্ণ এবং রক্তহীন তারের মত।  
স্থান ও প্রয়োজন ভেদে উহারা কোথাও সূক্ষ্ম  
কত্রের দ্বারা কোণায় বা হৃৎকণ্ডের দ্বারা  
আকারে অবস্থিত। মস্তিষ্ক ( Brain ) এবং  
স্নায়ুনা কাণ্ড নামক বৃহৎ নাড়ীগুলি ( Spinal  
cord ) অত্যন্ত অধিকাংশ নাড়ীর মূল। কার্য  
ভেদে নাড়ী সকল দুই ভাগে বিভক্ত।  
কতকগুলি নাড়ী চেষ্টা শক্তি বহন করে  
এবং কতকগুলি নাড়ী ইন্দ্রিয় সকলের বোধ  
বা সংজ্ঞা বহন করে। টেলিগ্রাফের প্রধান কেন্দ্র  
হইতে টেলিগ্রাফের তার সকল যেমন চতুর্দিকে  
বিস্তৃত থাকে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুনা নাড়ী হইতে  
নাড়ী সকলও সেইরূপ শরীরের সর্বত্র বিস্তৃত

স্নায়ুতত্ত্ববিদ্যা বিদ্যাত্তম্য সন্ধ্যা নিবোধ মে।

প্রতানবতো বৃদ্ধান্ত পুণ্যন্ত গুণিরত্বাৎ।

প্রতানবত্যঃ শাখাস্থ সর্বসন্ধি চাপাথ।

বৃদ্ধান্ত কণ্ডরাঃ সন্ধা বিজেরাঃ কুণলৈরিহ।

আমপকাশরাস্তেবু বতো চ গুণিরাঃ থলু।

পার্শ্বারসি তথা পুঠে পুণ্যলান্ত শিরস্তথ।

নৌথথা ফলকাষ্ঠীরা বন্ধনৈব হতিবুতা।

ভারকরা ভবেদন্তু বৃহত্তা হৃদমাহিতা।

এবমেব শরীরেহ স্নায়ু বাবন্তঃ সন্ধরাঃ বৃহতা।

স্নায়ুতত্ত্ববিদ্যাবিশেষঃ ভারসহা সন্ধাঃ।

স্বকৃত, সারীরস্বকৃত, ও স্বকৃত।



আছে। টেলিগ্রাফের কেন্দ্রস্থল হইতে তার দ্বারা যেমন অত্যাশ্রয় স্থানে আদেশ পাঠান যায়, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমা নাড়ী হইতেও সেইরূপ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে কার্য্য করিবার আদেশ পাঠান হয়। আবার অত্যাশ্রয় স্থান হইতে টেলিগ্রাফের কেন্দ্রস্থলে যেমন সংবাদ দেওয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিনয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিলে সে সংবাদ নাড়া পথেই মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং তাহার ফলে ইন্দ্রিয়ের বোধ উৎপন্ন হয়। স্নাতরাং চেষ্টাবহা (Motor) ও সংজ্ঞাবহা (Sensory) ভেদে নাড়া সকল দুই প্রকার যথাস্থানে নাড়া সকলের বিষয় বিস্তৃত ভাবে বলা যাইবে।

স্রোতঃ—শরীরে যে সমস্ত নল বা পথ আছে, সেই সকলের সাধারণ নাম স্রোতঃ। চরকে কথিত হইয়াছে,—স্রোতঃ সকল পরিণত পাতৃ সমূহ বহনকারী পথ। ইহা দিগ্‌দর্শন নায়। কারণ অন্ন, মূত্র, মল, ঘর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল প্রণালীর ভিতর দিয়া বাহিত হয়, তাহা-দিগকেও স্রোতঃ বলা যায়।

ধাতু—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটিকে ধাতু বলে :—

(১) রস—সর্বপ্রকার ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যে সৌম্য অর্থাৎ শৈত্যগুণ-বৃত্ত জলীয় সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রস বলা যায়; “রস” ধাতুর অর্থ—গতি। শরীরের সর্বত্র অহরহঃ গমন করে বলিয়া “রস” নাম হইয়াছে। আয়ুর্বেদ মতে রস—যকৃত ও মৌত্রিক গমন করিয়া রক্তক পিত্ত দ্বারা যুক্ত হইলে রক্ত নামে অভিহিত হয়। স্নাতরাং

কথিত হইয়াছে যে, দেহীদিগের শরীরস্থ বিপুল রস রক্তকপিত কর্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।\*

(২) রক্ত—(Blood—রক্ত)—সকল ধাতুর পোষক বলিয়া রক্ত জীবনে রক্ষার প্রধান উপায় স্বরূপ। রক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শরীরের অত্যাশ্রয় ধাতুও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

লসীকা—(Lymph—লিম্ফ)—রক্তের পাতলা স্বচ্ছ জলীয়াংশ লসীকা নামে খ্যাত। ইহা রসায়নী প্রণালী সমূহের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। লসীকা রক্ত বা রসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পৃথক ধাতুরূপে উহার গণনা করা হয় না।

(৩) মাংস—(Muscular tissue) পেশী সমূহের উপাদান স্বরূপ কোমল রক্তবর্ণ এবং তন্তুময়।

(৪) মেদ—(Fat) যত্নের জ্ঞায় ঘন শরীরের স্নেহময় ধাতু। ইহা প্রধানতঃ উদরের মধ্যস্থ বিস্তীর্ণ বিশেষের এবং অঙ্গের নিম্নে অবস্থিত করে। মাংসের স্নেহভাগকে বসা বলে। ইহা মেদের জ্ঞায় উপাদান বিশিষ্ট এবং মেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(৫) অস্থি—(Bone—বোন)—শরীরের অবলম্বন স্বরূপ দৃঢ় কঠিন ধাতু; চলিত কথায় হাড়।

(৬) মজ্জা—(Bone marrow—বোন ম্যারো) অস্থির মধ্যস্থিত ধাতুকে মজ্জা বলে।

\* রক্ততান্ত্রিকতা তাপে শরীরেই দেহিন্দ্রিয়।

অব্যয়পত্রাঃ প্রসঙ্গের রক্তবিভাগীয়তেঃ।

রক্তক, বহনকারী, ১৫ অধ্যায়।

ইহা কতকটা মেদের জায় উপাদানবিশিষ্ট হইলেও কার্য্য ভেদে পৃথক ধাতু বলিয়ঃ গণ্য হইয়া থাকে।

(৭) শুক্র—ফটিকের জায় শুক্রবর্ণ, তরল, মিষ্ট, মধুর এবং মধুর জায় গন্ধবিশিষ্ট ধাতু। ইহার মধ্যে গর্ভোৎপাদক জীবন সমুহ থাকে। গর্ভোৎপাদক পুরুষের দেহের শুক্র অতি ক্ষুদ্র এবং স্ত্রীর ক্ষুদ্র। অস্থি স্বীকার করিয়াছেন।

রক্তঃ—রক্ত হইতে স্রাবলোকে বহু বা অর্ধব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে স্রাবলোকে গর্ভোৎপাদক ধাতু বীজাণু বহুমান। সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়সে রক্তঃপ্রবৃতি এবং পক্ষাণ বৎসরে রক্তো নিবৃত্তি হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থার বয়ঃ উর্দ্ধগামী হইয়া স্তম্ভরূপে পরিণত হয়। রক্তঃ ও স্তম্ভরস বহু ধাতুর অন্তর্ভুক্ত।

আশয়—শরীরে তিনটি গুহা বা গহবর আছে এবং এই তিনটি গুহার মধ্যে শরীরের বিবিধ আশয় বা বস্তু অবস্থিত। তিনটি গুহা, মণা—শিরো গুহা, উরো গুহা এবং উদর গুহা। প্রত্যেক গুহা অবস্থিত আশয় সকলের বিষয় পৃথক ভাবে বল দিতেছি।

শিরোগুহা—এই গুহার মধ্যে মস্তিষ্ক, অনুমস্তিষ্ক এবং স্নুস্না কাণ্ডেব শার্বদেব অবস্থিত।

উরোগুহা—এই গুহার ফসফুস নামক দুইটি শ্বাস গ্রন্থ বহু এবং রক্ত সঞ্চালন বহু হৃদয় অবস্থিত।

উদরগুহা—এই গুহার মধ্যে আমাশয়,

পাকায়, গ্রহণী, যকৃৎ, প্লীহা, অগ্ন্যাশয়, প্রকৃৎ বস্তু, স্রাবলোকদিগেব গভাশয় ও দুইটি বীজ কোষ আছে।

আমাশয়—(Stomach—টম্যাক)—আমাশয়েব আকাশ ক্ষুদ্র দৃতিব (ভিত্তিব ব. মশকৈব) হারা। ইহা সমস্ত ভুক্ত জীবের আশয়।

পাকায়—Intestine—কায় ও বহুভুক্ত জীবের উপাদানপাকায় বস্তু। আশয় আশয় কায়—অগ্নি পাক, উপাদান হারা। অন্ন পাক হইলেও প্রধানতঃ অন্ন মধ্যে আসিয়াই পাক বা পরিণতি সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য আমাশয় ও পাকায় এই দুইটি সংজ্ঞা হইয়াছে।

গ্রহণী—(Duodenum—ডিওডিনাম)—আমাশয় ও পাকায়ের মধ্যবর্তী দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানকে গ্রহণী বলা। গ্রহণী শব্দ অনেকস্থলে আমাশয় ও পাকায়ের ভিতরের আবরণ ঝিল্লী বা কলা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যকৃৎ—(Liver—লিভার)—উদরের উপরি ভাগের দক্ষিণদিকে পঞ্জরের মধ্যে যকৃৎ অবস্থিত। ইহা পাঁচক ও রক্তক পিত্তের উৎপাদ স্থান। পিত্তকোষ (Gall-Bladder—গলব্লাডার) নামক একটি থলী যকৃতে সংলগ্ন আছে।

প্লীহা—(Spleen—স্প্লীন)—রক্তক পিত্তের অত্যন্ত উৎপত্তি স্থান। প্লীহা উদরের উপরি ভাগে বামদিকে পঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত।

অগ্ন্যাশয়—(Pancreas—প্যানক্রিয়াস)—আমাশয়ের পশ্চাভাগে অগ্ন্যাশয় অবস্থিত। মর্ক-

\* "অগ্ন্যাশয়"—সংজ্ঞাটি প্রকৃত লেখক কৃত হইলেও ইহাকে "হোম" বলেন, কিন্তু সে মত গ্রহণীয় নহে। তাহার কারণ যথার্থানে লক্ষ্য হইবে।

অন্ন পরিপাকের সমর্থ প্রধান আশ্রয় রস ইহা হইতেই পরিস্কৃত হয়। ইহার দক্ষিণপ্রান্ত বিস্তৃত এবং বামপ্রান্ত ক্রমে সরু।

**বৃক্ক**—( Kidney—কিড্‌নি ) - কটিদেশে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে শিমের বাঁজের আয়ত আকৃতি বিশিষ্ট দুইটি বৃক্ক আছে। বৃক্কদ্বয় রক্ত হইতে মূত্র নিষ্কাশন করে।

**বস্তি**—( Bladder—ব্লাডার )—ইহা নাভির অধোভাগে মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং বৃক্ক দ্বারা উৎপন্ন মূত্রের আধার স্বরূপ। পেন

কলমের আয়ত দুইটি স্বল্প নল দ্বারা মূত্র বৃক্ক হইতে বস্তিতে নীত হয়। উহাদিগকে গর্ভাশয় বা মূত্রাশয়তঃ (Uterus—ইউটরাস)—বলে।

**গর্ভাশয়**—( Uterus—ইউটরাস )—স্ত্রীলোকদিগের যোনির উর্দ্ধমুখের সহিত সংলগ্ন ক্ষুদ্র কলসেব আয়ত আকৃতি বিশিষ্ট। গর্ভাবস্থায় গর্ভের বৃদ্ধির সহিত গর্ভাশয়ও বৃদ্ধিত হইয়া থাকে। এবং প্রসবাস্তে পুনরায় ছোট হইয়া যায়।

## শিশুপালন ।

— :: —

খাদ্য ।

(পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর)

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী)

খাদ্যের কার্য কি তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন কোন্ প্রকার খাদ্যে আমাদের দেহের বৃদ্ধি হয়, গঠন হয় এবং রক্ষা হয় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দুই প্রকার গুণ বিশিষ্ট খাদ্য আমাদের দেহ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়। এক প্রকার খাদ্যে আমাদের দেহের ক্ষয় নিবারণ, গঠন এবং বৃদ্ধি হয়। আর এক প্রকার খাদ্যে আমাদের জীবনী শক্তি জন্মে। সুতরাং আমাদের খাদ্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা :—

( ১ ) মাংসের আয়ত গুণ বিশিষ্ট খাদ্য। (flesh like substances) ইহা হইতে আমাদেব দেহে যন্ত্র নিৰ্মিত হয়।

( ২ ) তাপ উৎপাদক খাদ্য (combustible substance) ইহা আমাদের জীবন রক্ষা করে।

( ১ ) মাংস বর্জক খাদ্য কি? বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই প্রকার খাদ্যে চারটি জিনিস আছে। তাহাদের নাম যবক্ষার বাষ্প (nitrogen), অক্সিজেন (carbon), হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন বাষ্প।

(oxygen)। এই শ্রেণীর খাদ্য ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যে যবক্ষারজান বাষ্প (nitrogen) নাই। এই যবক্ষার জান বাষ্পের অস্তিত্বই মাংসের জায় খাদ্যের বিশেষত্ব। এই কারণে এই খাদ্যকে যবক্ষার বাষ্পাশ্মক খাদ্য (nitrogenous food) বলে। এই খাদ্য খাইলে দেহে মাংস হয়। প্রধানতঃ পশু মাংসে এই যবক্ষারজান আছে। এতদ্ব্যতীত ছাগ, ডিম, সকল রকল শস্য (corn), ডাল, সীম বা মটর জাতীয় শস্ত (peas and beans) এবং টাটকা সব্জিতে কিয়ৎ পরিমাণে এই nitrogen আছে। যবক্ষার বাষ্প (nitrogen) মাংসের মধ্যে যেমন, শাক সব্জিতেও তেমন বিদ্যমান আছে। তবে মাংসের মধ্যে ইহা অবিকৃত ভাবে পাওয়া যায়।

(২) তাপ উৎপাদক খাদ্যে অক্সিজেন (carbon) হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন বাষ্প (oxygen) আছে। এই খাদ্যে দুই প্রকারের।

(ক) খেতসার বিশিষ্ট খাদ্য (starches) এবং (খ) মেদময় (fats) খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে সকল খাদ্যে খেতসার এবং চিনি আছে, সে সকল খাদ্যই প্রথম শ্রেণীর (ক) অন্তর্ভুক্ত। ইহাকে carbohydrates বলে। যে সকল খাদ্যে মাখন, চর্কি ক্রিম এবং তৈল আছে সে সমুদয়ই দ্বিতীয় শ্রেণীর (খ) অন্তর্গত। ইহাকে hydrocarbons বলে। খেতসার বিশিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা মেদময় খাদ্যে carbon (অক্সিজেন) অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই কারণে মেদময় খাদ্য খেতসার বিশিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাপ উৎপাদন করে এবং জীবনী শক্তি প্রদান করে।

খনিজ পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য। আমাদের

দেহরক্ষার জন্ত খনিজ পদার্থঃ বিশিষ্ট খাদ্যের প্রয়োজন। জল এবং কয়েক প্রকার লবণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন সাধারণ লবণ, phosphate of lime, এবং আরো কয়েক প্রকার লবণ। সমুদয় জীবন্ত দৈহিক সূত্রের (tissues) গঠন এবং কার্য ক্ষমতা লাভের জন্ত জল এবং লবণের প্রয়োজন হয়। পরিপাক ক্রিয়ার জন্ত যে চারিটি রসের আবশ্যক হয় তাহার কার্য চালাইবার জন্ত, রক্ত সঞ্চালনের জন্ত এবং দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সরস এবং ভিজা রাখিবার জন্ত জলের আবশ্যক। রক্তে, মাংসপেশিতে এবং দেহের সমুদয় নরম স্থানে লবণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু লবণ হাড় এবং দাঁতের জন্তই অধিক পরিমাণে কাজে লাগে। যে দাঁতে যত বেশী (lime salt) চূণের ভাগ থাকিবে, সে দাঁত তত দৃঢ় হইবে। তাহা হইলে ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেহের গঠন, বৃদ্ধি, কার্য ক্ষমতা, এবং জীবনী শক্তির জন্ত নিম্নলিখিত চারি প্রকার খাদ্যের আবশ্যক। যথা—

(১) যবক্ষার বাষ্পাশ্মক খাদ্য (nitrogenous substances)। মাংসের গুণ বিশিষ্ট খাদ্য। এই খাদ্য দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষর পূরণের জন্ত প্রয়োজন হয়।

(২) খেতসার বিশিষ্ট খাদ্য (starchy substances) তাপ উৎপাদক খাদ্য। ইহা দেহে তাপ এবং জীবনী শক্তি (vital force) জন্মায়।

(৩) মেদময় খাদ্য। ইহাও তাপ উৎপাদক কিন্তু খেতসার খাদ্য অপেক্ষা ইহা অধিক পরিমাণে তাপ এবং জীবনী শক্তি উৎপন্ন করে।

(৪) খনিজ পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য।

(mineral substances), জল এবং লবণ-দেহ গঠন এবং কার্য্য করিবার ক্ষমতা সঞ্চার করে।

সবল. কার্য্যক্ষম, সুস্থ জীবন ধারণের জন্য আমাদের এই চারি প্রকার খাদ্যের আবশ্যক। শিশুর খাদ্যও এই চারি প্রকার গুণ বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মাতৃদুগ্ধে শিশুর দেহ গঠনোপযোগী এই চারিটি জিনিস উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পশুর দুগ্ধে এই চারিটি জিনিস কম বেশী পরিমাণে আছে। এই কারণে সে সকল দুগ্ধ কিছু পরিবর্তন করিয়া শিশুকে দিতে হয়। যেমন গাভীর দুগ্ধে যবক্ষার বাস্পায়ক (nitrogen) পদার্থ বা ছানা মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে এবং শর্করার অংশ কম আছে। এই কারণে গাভীর দুগ্ধে জল কিংবা বালি মিশাইয়া এবং একটু চিনি দিয়া শিশুকে দিলে কতকটা মাতৃদুগ্ধের স্থায় হয়।

আমাদের আহাৰ্য্য দ্রব্য দুই প্রকারের।

(১) উদ্ভিজ্জ। চাল, ডাল, ময়দা, শাক, সবুজ তরকারি প্রভৃতি (vegetable food) উদ্ভিজ্জ খাদ্য। (ক) নানাপ্রকারের শস্য (cereals) গম, ওট, বালি, রাই, চাল, ভুট্টা (খ) নানাপ্রকারের ডাল (গ) টাটকা সজ্জি, আলু, কপি প্রভৃতি (ঘ) নানাপ্রকার ফল।

(২) প্রাণীজ খাদ্য। (ক) নানাপ্রকার পশু মাংস যেমন গরু, ভেড়া, পাটা ইত্যাদি (খ) poultry & game যেমন মুরগি, হাঁস, টার্কি, খরগোঁস ইত্যাদি (গ) নানাপ্রকার মাছ (ঘ) shell fish যেমন কঁকড়া, oysters, shrimps। (ঙ) দুধ, পনির, মাখন এবং ক্রিম (চ) ডিম।

উপরে খাদ্যের দুই চারিটি উপাদানের

উল্লেখ করা হইয়াছে, আমাদের আহাৰ্য্য দ্রব্যের প্রত্যেকটিতে ঐ উপাদানের দুই তিনটি করিয়া সন্নিবেশিত হইয়া আছে। কিন্তু কোনটিতে একটি উপাদান বেশী আছে, কোনটিতে কম, আবার কোনটিতে বা কোন উপাদান একেবারেই নাই, যেমন ডিম একটি সর্বাঙ্গপেক্ষা পুষ্টিকর এবং পূর্ণখাদ্য হইলেও তাহাতে শ্বেতসার পদার্থ একেবারেই নাই। এই জন্য শুধু ডিম খাইয়া মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। ইহার সহিত অন্য খাদ্যের ও প্রয়োজন হয়। এই কারণে দুই তিন প্রকারের খাদ্য মিলাইয়া বাহাতে আমাদের খাদ্যের মধ্যে উপরোক্ত চারিটি পদার্থ উপযুক্ত ভাবে থাকে সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য। তাহা হইলেই আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি।

সাধারণতঃ আমরা প্রত্যহ বাহা আহাৰ্য্য করি তাহাতে উপরোক্ত চারিটি পদার্থই সন্নিবেশিত হইয়া আছে। আমরা অজ্ঞাত সারেই খাদ্যের গুণাগুণ না জানিয়াই শরীর ধারণোপযোগী আহাৰ্য্য গ্রহণ করি। তবে এসম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে আমাদের খাদ্য দ্রব্যের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারি এবং অনর্থক কতকগুলি মসলাযুক্ত গরম ও হুপ্পাচা খাদ্য না খাইয়া পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারি।

শিশুদিগের জন্যও তাহাদের দেহ গঠনোপযোগী উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারি। তাহাদের দেহ ও মস্তিষ্ক বৃদ্ধির সময় তত্বযুক্ত খাদ্য বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া জানিয়া শুনিয়া জ্ঞানের সহিত গ্রহণ করিয়ে পারি। শিশুর খাদ্য সব্বদে মাতার পরিচালনা থাকিলে উহার শিশু স্বাস্থ্য, সুখ

কর্ম্ম জীবন ধারণ করিয়া এবং মেদাবী হইয়া তাঁহাকে এবং মানব সমাজ ও দেশকে সুখী করিবে। এ বিষয়ে মাতার দায়িত্ব কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং, মাতৃজাতিকে জ্ঞানালোকের মধ্যে বদ্ধিত করিতে প্রত্যেক দেশ হিতৈষী দায়ী। শিশুর শারিরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের ভার প্রত্যেক মাতার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। মাতাকে পবিপূর্ণ জ্ঞানের সহিত এই গুরুত্বার সম্পাদন করিতে হইবে। অজ্ঞানতায় সহিত, গতানুগতিকের ন্যায় শিশু পালন করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন আমরা বীর, ধর্ম্মপ্রাণ, বুদ্ধিমান মহৎ-হৃদয়শালী সন্তান আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। সমগ্র সভ্য জগতের সহিত সংগ্রামে তাঁহাদিগকেই স্বদেশ রক্ষা করিতে হইবে। মূর্খ মাতার সন্তান দ্বারা এই মহৎ কার্য্য কখনো সাধিত হইবে না।

### দুগ্ধ ।

দুগ্ধই অধিকাংশ প্রাণীর শৈশবের একমাত্র আহার। দুগ্ধ পান করিয়াই অধিকাংশ প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়। একটি সুস্থ শিশু কেবল দুগ্ধ-পান করিয়াই যদি বদ্ধিত হয় তবে তাহার এক বৎসর বয়সের সময়ের ওজন তাহার জন্মকালীন ওজনের তিন গুণ বেশী হইবে। দুগ্ধে শিশুর দেহ গঠনের সমুদয় উপাদান বিস্তারিত আছে। ইহাতে দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় নিবারণ হয়। দেহে তাপ উৎপন্ন হয় এবং জীবনী শক্তি (Vital force) জন্মে। ইহাকে একটি পূর্ণ খাদ্য (Complete Food) বলা যায়, কারণ খাদ্যের সমস্ত গুণই ইহাতে বিদ্যমান আছে।

দুগ্ধে (১) বন্যকার বাষ্পায়ক (nitrogen-

ous) পদার্থ ছানা বা casein আছে। (২) মেদময় পদার্থ (Fat) ক্রিম আছে। (৩) শর্করা এবং (৪) লবণ ও জল আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের খাদ্যে যে চারিটি উপাদান থাকিলে তাহা দ্বারা জীবন রক্ষা হয় তাহার সকল দুগ্ধের মধ্যে আছে।

ছানা (casein)। দুগ্ধে যে বন্যকার বাষ্পায়ক পদার্থ (nitrogenous matter) আছে তাহাকে দুগ্ধের casein বা প্রোটিন বা ছানা বলে। ইহা মাংসের ত্রায় গুণ বিশিষ্ট (flesh like substance) পদার্থ। দুগ্ধের ছানাই দুগ্ধের বন্যকার বাষ্পায়ক পদার্থ। পাকস্থলীতে পাচক রস প্রথমে দুগ্ধকে ছানায় পরিণত করে তারপর ঐ ছানাকে জীর্ণ করে।

জীর্ণ করা ছানা শিশুর দেহের বৃদ্ধি সাধন করে এবং ক্ষয় নিবারণ করে।

ক্রিম। দুগ্ধের ক্রিমই দুগ্ধের মেদময় পদার্থ বা Fat। মেদের গোলকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা গুলি দুগ্ধে ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া দুগ্ধের রঙ সাদা। অন্ত্রবীক্ষণের নীচে এক কোঁটা দুধ রাখিলে এই গোলক দেখা যায়। তাহাদের ওজন দুগ্ধ অপেক্ষা হালকা, এই কারণে তাহারা উপরে ভাসিয়া উঠে। ইহাই দুগ্ধের ক্রিম। ঘোল করিবার যন্ত্রে দুধ মছন করিলে সমস্ত ক্রিম একত্র হইয়া মাখন হয়।

দুগ্ধের শর্করা। দুগ্ধকে ছানা করিয়া ছানা তুলিয়া লইলে যে জলটা পড়িয়া থাকে তাহাতে এই চিনির অস্তিত্ব বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। Cane sugarর মত এই চিনি অত্যন্ত মিষ্ট নয়। এই চিনি খেতসার পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহার একটু ভাষ অপেক্ষা তির। এই চিনি জীর্ণ করা বেশ

সার পদার্থ স্তূতরাং ইহা আর পরিপাক করিবার প্রয়োজন হয় না। মাতৃদুগ্ধের চিনি খেত-সার পদার্থের অন্তর্গত হইলেও এই কারণে শিশুকে ইহা আর পরিপাক করিতে হয় না। ইহা পূর্ব হইতেই পরিপাক করা থাকে। শিশুর তখন খেতসার পদার্থ পরিপাক করিবার শক্তি জন্মে না বলিয়া ভগবান মাতৃদুগ্ধে খেত সার পদার্থকে পূর্ব হইতেই পরিপাক করিয়া চিনিরূপে রাখিয়াছেন। অর্থাৎ দুগ্ধে চিনি না থাকিলে শিশুর দেহে তাপ উৎপন্ন হইত না। দুগ্ধের ক্রিম এবং চিনি অঙ্গার বাস্পায়ক পদার্থ (carbonaceous)। ইহার দেহে তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

লবণ। দুগ্ধে যে লবণ আছে তাহা শিশুর দেহের দৈহিক সূত্রগুলি (tissues) গঠন করে। হাড় এবং দাঁতের জন্য যে phosphate of lime প্রয়োজন দুগ্ধে তাহা লবণ রূপে আছে।

জল। দুগ্ধে যে জল আছে তাহা শিশুর দেহের পক্ষে যথেষ্ট। বয়স্কদের যতটা জলের প্রয়োজন, দুগ্ধের অত্যন্ত উপাদান অপেক্ষা দুগ্ধে জল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে। বয়স্ক লোকদিগের আকারের তুলনায় তাহাদের যতটা জলের আবশ্যক শিশুর তদপেক্ষা অধিক জন্মে প্রয়োজন।

মাতৃ দুগ্ধই শিশুর একমাত্র স্বাভাবিক আহার। তাহা না পাওয়া গেলে অল্প প্রাণীর দুগ্ধ শিশুকে দিতে হয়। সেই দুধ যতটা মাতৃ দুগ্ধের সমগুণ করা যায় ততই শিশুর দেহরক্ষার পক্ষে উপযোগী হয়। দুগ্ধের মধ্যে যে সকল উপাদান আছে তদ্ব্যতীত দুগ্ধের ছানাই পরিপাক করা কষ্ট। অত্যন্ত উপাদান অতি সহজে পরিপাক হয়। এই

কারণে অল্প প্রাণীর দুগ্ধের ছানার পরিমাণ যাহাতে মাতৃদুগ্ধের ছানার সমান হয় সেইরূপ করিতে হইবে। যেমন গাভীর দুগ্ধে মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক ছানা আছে বলিয়া গাভীর দুগ্ধে জল কিংবা বালি এবং একটু চিনি মিশাইলে তাহা কতকটা মাতৃদুগ্ধের তুল্য হয়। শিশুর জন্মের প্রথম কয়েকমাস যতটা দুধ তাহার তিন গুণ জল কিংবা বালির জল মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। প্রথম মাসে এইরূপ জল ও চিনি মিশান দুগ্ধ সমস্ত দিনে দশ ছটাক যেন শিশুকে পান করান হয়। ক্রমে ক্রমে জলের পরিমাণ কমাইয়া এবং দুধের পরিমাণ বাড়াইয়া ছয় মাস বয়সের সময় প্রতিদিন ৩০ ছটাক দুধ শিশুকে দিবে। এ সময় দুধ ও জল সমান ভাগে মিশাইতে হইবে ছয়মাস বয়স হইতে শিশুর খেতসার পদার্থ পরিপাক করিবার ক্ষমতা জন্মে। স্তূতরাং এই সময় হইতে সামান্য পরিমাণে কোন খেতসার পদার্থ দুগ্ধের সহিত অথবা পৃথকভাবে দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় হইতে খেত-সার পরিপাক করিবার শক্তি জন্মিলেও তাহা অত্যন্ত দুর্বল থাকে। দুই বৎসরের পূর্বে এ শক্তি ভাল করিয়া জন্মে না। শিশুকে এক বৎসর পর্যন্ত জল মিশান দুধ দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর জলের পরিমাণ ক্রমে কমাইয়া আনিয়া দুই বৎসর বয়সের সময় ষাট দুধ দেওয়া যাইতে পারে।

শিশুকে যে খাদ্যই দেওয়া যাক না কেন, তাহার দেহ গঠন ও রক্ষার জন্য টাটকা বিত্ত দুগ্ধ ব্যতীত উপযোগী খাদ্য আর নাই। শিশুর খাদ্য কেবল উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিত রূপে খাওয়ানের উপর নির্ভর করে। পুষ্টিকর খাদ্য ও নিয়মিতভাবে খাওয়াইলে শিশুর

স্বাস্থ্যহানি হয়। শিশুর দেহ অতি দ্রুতভাবে বৃদ্ধি হয় এবং ক্ষয়ও বেশী হয়। সুতরাং তাহার দেহরক্ষার জন্য অধিক পরিমাণে যব ক্ষারবাস্পায়ক খাদ্য (nitrogenous food) প্রয়োজন।

শিশুর দুইবার আহারের সময়ের মাঝখানে কোন খাদ্য দিবেনা। রাত্রে শুইবার পূর্বের আহার যেন লঘু হয়। শিশুকে কোন উত্তেজক দ্রব্য কখনো খাইতে দিবেনা, ইহাতে তাহার ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হয়। শিশুকে বয়স্কদের অপেক্ষা অধিক মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দিবে।

মাতৃ দুগ্ধের অভাব হইলে সাধারণত গাভীর দুগ্ধই শিশুকে দেওয়া হয়। সহরের বাড়ির গাভী সকল উন্নত প্রাণীর চরিত্র বেড়ায় এবং সতেজ শ্যামল রূপ খাইয়া থাকে। এই কারণে পল্লীগ্রামের গাভীর দুগ্ধ খাটতে স্নিগ্ধ স্নান্ড এবং অধিক পুষ্টিকর। পল্লীগ্রামের গাভীর দুগ্ধের গুণ ক্ষারজ alkaline, মাতৃদুগ্ধ ও ক্ষারজ। কিন্তু সহরের গাভী সকল গোয়ালে বদ্ধ গাভীর সহিত একত্রে বঁধা থাকে এবং চব্বিরা কিরিয়া বেড়াইয়া বাস খাইতে পায় না বলিয়া তাহাদের দুগ্ধে অম্ল আছে। এই কারণে সহরের গাভীর দুগ্ধ শিশুর পক্ষে তেমন উপযোগী হয় না। দুগ্ধে অম্ল আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে একটুকরা নীল রঙের litmus paper দুগ্ধে ডুবাইয়া দেখিতে হয়। যদি দুগ্ধ অম্ল সংযুক্ত হয় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ লাল রঙে পরিবর্তিত হইবে। একটু চুনের জল কিংবা একটু Bi-carbonate of soda ঐ দুগ্ধে মিশাইলে তাহা আবার দূর হইবে। এই চুনের জল মিশান দুগ্ধে ঐ লাল রঙের

litmus paper ডুবাইলে দেখা যাইবে যে ইহার রঙ তখন পুনরায় নীল হইয়াছে। দুগ্ধ বেশ ভাল করিয়া ফুটাইয়া লইলে সকল রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। টার্টারেল, কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু যদি দুগ্ধে প্রবেশ করিয়া থাকে তবে তাহা ফুটাইয়া লইলেই নষ্ট হইয়া যাইবে। দুগ্ধ ফুটাইয়া অল্প ঠাণ্ডা করিয়া বেশ পরিষ্কার একটা কাচের, পোর্সিলেন কিংবা চিনা মাটির পাত্রে কাচের রিকাবি দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। শিশুর দুগ্ধ কখনো কোন খাতুর পাত্রে অধিকক্ষণ রাখিবেনা তাহা হইলে দুগ্ধের গুণ নষ্ট হয়।

### শিশুর আহার।

মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে, মাতার কোন পীড়া হইলে কিংবা শিশু মাতৃ দুগ্ধ ছাড়িলে অল্প প্রাণীর দুগ্ধ শিশুকে দিতে হয়। সাধারণত গাভীর দুগ্ধই এ সব ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট এবং তাহাই শিশুকে খাওয়ান হয়।

(১) মাতার হ্রাসরোগ্য সংক্রামক ব্যাধি কিংবা অল্প কোন সাময়িক কারণ এবং দুগ্ধের অল্পতাবশতঃ অথবা দুগ্ধ একেবারেই না থাকিলে শিশুকে জন্মের প্রথমদিন হইতেই অল্প প্রাণীর দুগ্ধ পালন করিতে হয়।

(২) মাতার শারীরিক দৌর্বল্য কিংবা অল্প কোন কারণবশতঃ কোন কোন শিশুকে অকালেই মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইতে হয়।

(৩) অধিকাংশ শিশু ঠিক সময়েই অর্থাৎ দশমাস বয়সে মাতার দুগ্ধ ছাড়ে। এই তিন শ্রেণীর শিশুর জন্মই গাভীর দুগ্ধের প্রয়োজন হয়।

বর্তমান সময়ে বাজারে বিক্রীত দুগ্ধ দুই প্রকারের পাওয়া যায়।



ছকের মধ্যে Mellin's food, Glako এবং Allenbury's milk food শিশুর পক্ষে উপযোগী। এই সকল খাদ্যে শিশুর পক্ষে অনিষ্টকারী খেতসার পদার্থ (starch) নাই। Horlick's malted milk শিশুর ৮।১০ মাস বয়স হইলে দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল প্রকার কৃত্রিম দুধই ২।১ বারের বেশী স্নাত্ত শিশুকে খাওয়ান যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে কখন মাতার রক্ত শিশুকে এই সব কৃত্রিম দুধেই বদিত করিতে হয়। allenburys milk food তিন প্রকারের আছে। প্রথম দুইপ্রকার ৬প শিশুর ছয় মাস বয়স পর্য্যন্ত দিব্যার নিয়ম তাবপর ৩নং দুধ দিতে হয়। তিন নম্বরের ৬পে খেতসার পদার্থ আছে বলিয়া ইহা ছয় মাসের পূর্বে শিশুকে খাওয়াইলে অনিষ্ট হয়।

প্রথম হইতেই শিশুকে চামচে বা কিছুকে করিয়া দুধ দেওয়া সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম। এইরূপে দুধ খাওয়াইলে শিশুর কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দুধ খাওয়া হইলে বাটি ও চামচ মাজিয়া ফেলিলেই হইল। কিন্তু অনেক সময় বোতলে করিয়া দুধ দিতে হয়। পূর্বে লম্বা 'নল' সংযুক্ত বোতলে দুধ খাওয়ান হইত। ঐ নলের ভিতর ভাল করিয়া পরিষ্কার করা যাইত না বলিয়া ঐরূপ বোতলে দুধ খাওয়ান ভয়ানক অনিষ্টকার ছিল এবং তাহাতে কত শিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। এখন কালে mellins bottle allenbury feeding bottle এবং glascobottle বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। এই সব বোতলের দুধ মুখই খোলা। বড় মুখে দুধ খাইবার জন্য একটি ছোট 'টিট' আছে এবং ছোট মুখে একটি 'ভালভ' আছে। দুধ খাইবার সময় বাতাস ঢালাইবার জন্য

পশ্চাদিকের ভালভএ একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। যে বোতলের কেবল একদিক খোলা, অল্প দিক বন্ধ সেরূপ বোতলে শিশুকে দুধ খাওয়াইলে শিশুর পেটে বায়ু জন্মিতে পারে অথবা পেট ব্যথা হইবার সম্ভাবনা।

এই বোতলও তাহার 'টিট' ও 'ভালভ' সর্বদা খুব পরিষ্কার করিয়া রাখা কর্তব্য। নতুবা শিশুর গুরুতর পীড়া যেমন পেটের অসুখ, কলেরা, টাইফয়েড, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা। বাজার হইতে বোতল টিট ভালভ কিনিয়া একটি পরিষ্কার পাত্র শীতল জলে পূর্ণ করিয়া একটু bi-carbonate of soda দিয়া পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ বোতল, টিট, ভালভ রাখিয়া দিবে; তারপর ঐ পাত্র আগুনে চড়াইয়া দিবে। ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া রাখিবে। পাত্রের জল ঠাণ্ডা হইয়া গেলে তবে জল হইতে বোতল, টিট এবং ভালভ উঠাইয়া রাখিবে। বাজার হইতে বোতল কিনিবার পর তাহা এইরূপে সিদ্ধ ন করিয়া কখনো শিশুকে তাহাতে দুধ খাইবে দিবে না, ইহাতে নানারূপ অসুখে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। শিশুর দুধ পা হইলে অবশিষ্ট দুধ থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিবে কিংবা গৃহের আর কেহ তাহা ব্যবহার করিতে চাহিলে তাহাকে দিবে কিন্তু তাহা কখনো শিশুর দ্বিতীয়বার আহারের জা রাখিয়া দিবে না। শিশুর দুধ খাওয়ান শেষ হইলে গরম জলে সোডা দিয়া তদ্বারা টিট ভালভ এবং বোতল পরিষ্কার করিবে। বোতল দুইবার ত্রাস দিয়া বোতলের ভিতর খুব ভাল করিয়া ধুইবে। যেন কোন কোণে দুধ থাকে কি কোন দাগ না থাকে। টিট

ও ভালভ ধুইবার ছোট ত্রাস দিয়া উহাদের ভিতর বাহির বেশ করিয়া ঘসিয়া ধুইবে। তারপর বোতলটিকে পরিষ্কার পাत्रে ঠাণ্ডা জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে রাখিয়া দিবে এবং টিট ও ভালভ একটি কাচের বাটিতে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিবে। প্রতিবার দুধ পানের পরই এইরূপে বোতল টিট ভালভ সোডা মিশ্রিত গরম জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইবে তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইবে। মনে রাখা উচিত যে পরিচ্ছন্নতাই শিশুর জীবন। শিশুর আহাৰ, পরিচ্ছদ, শয্যা, আহাৰের পাত্র প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিলে শিশুকে অনেক রোগের হাতে হইতে রক্ষা করা যায়। অপরিচ্ছন্নতাই শিশুর পেটের অসুখের কারণ। পরিচ্ছন্ন হইলে শিশুকে এই অসুখ হইতে বাঁচান যায়। যে সব স্থানে কলের জল নাই সেসব স্থানের জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে দেওয়া উচিত।

প্রথম ছয় মাস শিশুকে দুই ঘণ্টা পর পর খাইতে দিবে। প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত এইরূপে দুই ঘণ্টা পর পর খাইতে দিবে। কিন্তু রাত্রি ১০টা হইতে ভোর ৫টা

পর্যন্ত শিশুর পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া কর্তব্য, এই সময়ের মধ্যে শিশুকে কিছুই খাইতে দিবে না। প্রথমতঃ শিশুকে এইরূপে অভ্যাস করান সম্ভবতঃ কষ্টকর হইতে পারে কিন্তু ক্রমে শিশু এই স্বাভাবিক অভ্যাসে অভ্যস্ত হইবে। শিশুকে যত সদভাবে অভ্যস্ত করান যায় ততই শিশুর এবং শিশুর মাতার পক্ষে মঙ্গল। প্রথম প্রথম শিশু রাত্রি কাঁদিলে তাহাকে ২১ চামচ জল দিয়া একটু চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইলেই শিশু ঘুমাইয়া পড়িবে। অনেকে মনে করেন যে সব শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের আহাৰের কোন নিয়ম রাখিবার প্রয়োজন নাই। যখন তখন খাওয়াইলেই চলিবে। বস্তুতঃ একরূপ সর্বদাই দেখা যায় যে শিশু কাঁদিলেই অমনি মাতা তাহাকে দুগ্ধ পান করাইতে আরম্ভ করেন। একরূপ করা শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর। ইহাতে শিশুর অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, পেটের অসুখ হইতে পারে। ক্রমাগত খাইতে থাকিলে পাকস্থলী আহাৰ পরিপাক করিবার জন্য মোটেই সময় পায় না। ইহাতে শিশুর পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

## বঙ্গে শিশু মৃত্যু।

—৫০—

বাংলা দেশে বালিক। অপেক্ষা বালকের জন্ম হয় বেশী। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বাংলা দেশে মোট শিশু জন্মিয়াছিল ১৪,৮২,১৩৫। ইহার মধ্যে বালকের সংখ্যা ৭৭,১৩,১৩ এবং বালিকার সংখ্যা ৭১৭,৮২২। অন্দের মত

বালকও কিন্তু মরিয়া থাকে বেশী। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে যত বালক জন্মিয়াছিল, তাহার মধ্যে ১,৮১,৫৪৭ এবং যত বালিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহার মধ্যে ১,৫৮,১০২টি এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই মৃত্যুবরণ পাইয়া

হইয়াছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বালক ও বালিকা উভয়ে মিলাইয়া এক বৎসরের কম বয়স্ক মোট শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ৩৩৯,৬৪৯। লোক সংখ্যা গণনায় ঐ হিসাবে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার দেশে বর্তমান শিশু জন্মিয়াছিল তাহার চারিজনকে একজন করিয়া ১ বৎসরের কম বয়সেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ জেগার কত শিশু মারা গিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা প্রদর্শন করিতেছি :—

জেলা	বালক	বালিকা
বর্ধমান	৭২৮৮	৬৩৯২
বীরভূম	৫২৫১	৪৪৯৩
বাঁকুড়া	৫২২৯	৪৭৮০
মেদিনীপুর	৯৪২৪	৮৯৪০
হুগলী	৪০৭৯	৩৪৪৭
হাওড়া	৩১৮৬	২৬৮৭
২৪ পরগণা	৬৬১৩	৫৬০৩
কলিকাতা	১৮১১	২২৮৪
নদীয়া	৭৩৮৪	৭৩৪৭
মুর্শিদাবাদ	৭৩৫৪	৬৮৬২
শশোহর	৪৫২৪	৪১১২
গুলনা	৬৪৯৪	৫৬৪৪
রাজশাহী	৬৪৬৫	৫৮১২
দিনাজপুর	৮৩১২	৬৮৮৭
জলপাইগুড়ি	৪২১৯	৩৭১৯
দারজিলিং	১১৪৩	৯২৭
বঙ্গপুর	১১১৯২	৯৪৫৮
বগুড়া	৩৫৯৮	২৯৯২
পাবনা	৪৬১৫	৪০৩৭
মাগদহ	৩৬৬৯	৩৪৮৩
টাকা	১২২৭৮	১০৩০৬
ময়মনসিংহ	১৭০৩৩	১৪৭১১
ফরিদপুর	৮৪৪৮	৭১৯১

বাকবগঞ্জ	১১৭০২	৯৫৪৬
চট্টগ্রাম	৫৪৯৯	৪৭৮৮
নোয়াখালি	৫১৩০	৪৭৪৩
ত্রিপুরা	৮৫৮০	৬৯৯৯

এই মৃত্যু তালিকায় বুঝা যায়, পশ্চিম বাঙ্গালাতেই এই মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়াছে। বর্ধমানে শতকরা ৩০.৭ বীরভূম ৩০.১, নদীয়ায় ২৯.৬ মুর্শিদাবাদে ২৮.৩ এবং কলিকাতায় ২৮.১টি করিয়া শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।

এখন এই শিশু মৃত্যু যে দেশে ভীষণ ভাষ ধারণ করিয়াছে ইহার কারণ কি? যে সকল নিয়মে শিশুর জীবন রক্ষা করা উচিত এখনকার প্রস্তুতিগণ সে সকল নিয়মে অনভিজ্ঞতা থাকাই ইহার প্রধান কারণ। শিশুরক্ষা করিবার জ্ঞান প্রত্যেক প্রস্তুতিরই শিশুপালন করিবার প্রণালী সকল অবগত থাকা কর্তব্য। অতীতবুগে আমাদের দেশের মহিলারা সকলেই বিদূষী হইতেন না,—বিদূষী হওয়া তো দূরের কথা, লেখাপড়া শিক্ষাটাও সেকালে মহিলা সমাজে বড় একটা প্রচলিত ছিলনা, কিন্তু সেকালের বয়স্ক মহিলা-গণ যে এক একজন পাকা গৃহিণী হইতেন এবং তাহারই ফলে শিশুপালনে তাঁহার বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, সে কথা তো সর্ববাদী সম্মত। এখন শিশুর একটু সামান্য বালসা হইলেই চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তখনকার গৃহিণীগণ শিশুর সাধারণতঃ অন্তর্থে চিকিৎসকের শরণ গ্রহণের আবশ্যকত মনেই করিতেন না। আলুইয়ের বড়ী ছিল কুলসীর রস ছিল ময়ূরপুঙ্খ ভস্ম ছিল বিড়র টাটকা মধু ছিল সোহাগার বীজ ছিল

মুক্তবর্ষীর পাতা ছিল,—এই সকল দিয়াই সেকালের গৃহিণীরা আপন আপন পরিবারের শিশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু তখন তো দেশে শিশু মৃত্যু এত অধিক ছিল না।

এখন ব্যয়বাহুল্যে দেশের অবস্থা শোচনীয় হইলেও দেশে অর্থ স্থলভ হইয়াছে, নোকেব অর্থ খরচ করিবার প্রবৃত্তিও বাড়িয়াছে সেই সঙ্গে সে কালের শিক্ষা দীক্ষা দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, শিক্ষার অভাবে সেকালের ঠানদিদির মত গৃহিণী বাঙ্গালী সমাজে আর নাই, কাজেই শিশুর সামান্য বাল্যস্নাতও এখন চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ না করিলে উপায় নাই। ফলে অনেক উন্নত অবস্থার পরিবারের মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যাতেও অনেক শিশু অকালে পঞ্চা পাইয়া থাকে।

তাহার পর যে সকল নিয়মে আমাদের দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করিলে আমরা স্বাস্থ্যবান হইতে পারি, দীর্ঘজীবী হইতে পারি—বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ কাহারও সে চেষ্টা নাই। আমরা এখন বুদ্ধিগাঢ়ি বিলাসিতা। অনেক দরিদ্র বাঙ্গালী প্রাণপাত পরিশ্রমে যে অর্থ উপার্জন করে তাহাতে কুলাইতে পাবেনা। কাজেই স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত আহাৰ্য্য লাভও অনেকের ভাগ্যে ছুটে না। ফলে নানাকারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের এখন যথেষ্ট অপচয় ঘটতেছে। কাজেই চর্কল পিতৃমাতৃ শুক্রশোণিত হইতে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবী স্থাননাভের কামনা কেমন করিয়া করা যাইতে পারে? শিশু মৃত্যুর আধিক্য এজন্যও আমাদের দেশে ভীষণভাবে ধারণ করিয়াছে।

দেশে দুগ্ধ দুর্লভ,—দুগ্ধাণ্য বদিলেও চলিতে পারে। পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে দুগ্ধ আরও দুর্লভ হইয়াছে। কলে পুষ্টি বর্ধক

অভাবে যেকোন দুগ্ধ অধিকাংশস্থলে শিশুদিগকে এখনকার দিনে পান করান হয়, যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি সংঘটন তাহারই পরিণতি। এই যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতির জন্তই অনেক স্থলে শিশু মৃত্যু সংঘটিত হয়। আমরা ‘হোম-কল’ ‘হোমকল’ করিয়া ব্যস্ত, কিন্তু দেশে গাভী পালনের ব্যবস্থা করিয়া খাটি দুগ্ধ স্থলভে প্রাপ্তির কি উপায় করিতেছি? যে পর্যন্ত আমরা সে উপায় না করিব, সে পর্যন্ত দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাইবেনা—ইহা স্তনিশ্চিত।

পূর্ব বাঙ্গালা অপেক্ষা পশ্চিম বাঙ্গালার শিশু মৃত্যুর সংখ্যা যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার আর একটি কারণ, পূর্ব বাঙ্গালা অপেক্ষা পশ্চিম বাঙ্গালার বিলাসিতার প্রসার বৃদ্ধি। পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলা সমাজেও এই বিলাসিতা অধিক মাত্রায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার পুরুষগণ সভাতার খাতিরে ‘বাবু’ সাজিয়াছেন, পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলা গণও সৰ্ব্বপ্রকারে বিবিধানার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নৃত্যমতী বিলাসিনী হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের অনেক সংসারেই এখন পাচকে অন্ন বাঞ্ছন প্রস্তুত করে, দাসদাসীতে গৃহস্থালীর কর্ম সকল নির্বাহ করে, আর মালমালী-গণ আরামকোয়ার অবস্থিতি পূর্বক নাটক নবেল পাঠেই সম্যক প্রকারে মনোবোগ দিয়া থাকেন। ফলে পরিশ্রমের প্রথাটা পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলা সমাজ হইতে অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাদিগের অজীর্ণ, অরপিত ফুলফুল ও ক্ষয়ব্রণের পীড়ার উৎপত্তির ইহাই কারণ। ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাগণ সর্ব প্রকারে যতটা সম্ভব পূর্ব বাঙ্গালার মহিলাদের মত স্বাস্থ্যবান হইতে পারেন।

বাঙ্গালার পুরুষেরাও পশ্চিম বাঙ্গালার পুরুষ-  
দিগের অপেক্ষা কন্দর্প, কাজেই স্বাস্থ্যবান।  
পশ্চিম বাঙ্গালার পিতৃমাতৃ গুরুশোণিতের  
ফল সম্ভূত শিশুগণের মৃত্যু এই জন্তই অধিক  
হইয়া থাকে।

ইহার উপর কন্যার বিবাহে যৌতুক  
প্রদানে উৎপীড়নের ব্যবস্থা পশ্চিম-বাঙ্গালার  
সকল জাতির মধ্যেই ঘেরাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, পূর্ব  
বাঙ্গালার এখনও সেরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। সেই  
পণ পীড়নের ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসী  
দিগকে অনেক সময় সকল দিক চিন্তা করিবার  
অবসর না রাখিয়াই কন্যা সম্প্রদান করিতে  
হয়। পাত্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্য যতটা  
বাঞ্ছিত বিবাহ দেওয়া কর্তব্য, অনেক সময়  
পশ্চিম বাঙ্গালার কন্যার পিতা অবস্থার ব্যবস্থার  
তাহা রক্ষা করিতে পারেন না, পাত্রের পিতার  
পক্ষেও পণ পাইলেই হইল, তিনিও অতটা  
বিচার করিতে চাহেন না; কাজেই পরিণয়  
ঘাপারে বাঙ্গালার পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে অধি-  
কাংশ স্থলে উপযুক্ত মিলন অসম্ভব হইয়াপড়ে।  
এই বয়ঃবিচার রক্ষা না করিয়া স্ত্রী পুরুষের  
মিলন করিয়া দেওয়ার জন্তও দেশে শিশু মৃত্যুর  
পরিমাণ আমরা বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছি।

হিন্দু সমাজে বাংলা বিবাহ দিবার প্রথা  
বরাবরই আছে, এখন কন্যাপুণের জন্ত তাহা  
অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে।  
যাহা হউক হিন্দু শাস্ত্রে বাংলাবিবাহ চির  
প্রচলিত হইলেও পূর্বের মতন তখন স্ত্রী  
পুরুষের মিলন কাল নির্দিষ্ট ছিল না। পুর-  
হিন্দীগণ স্বামীর মুখ তো দিবাভাগে দেখিতেই  
পাইতেন না, সুকল নিশাও তাহাদের আরা-  
মের কাল হইত না। এক কথায় তিথি  
নক্ষত্র দেখিয়া, পূর্বদিন বাছিয়া সকালে স্ত্রী  
পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা ছিল, এখন সে  
ব্যবস্থাও যে উঠিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালার শিশু  
মৃত্যুর আধিক্যের ইহাও একটা কারণ।

কলে দেশের এই ভীষণ দুর্দিনে বাঙ্গালার  
ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল শিশু জীবন  
রক্ষার জন্ত দেশের সকল মনোবীগণেরই চিন্তা  
করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দেশে  
আবার পাকা গৃহিণী তৈয়ার করিবার  
আবশ্যক। শিশু জীবন রক্ষা করিবার  
জন্ত দেশের পুরুষদিগেরও রুচি পরিবর্তন  
যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতেও সন্দেহ  
নাই।

## কোহরুক ?

—:—

(ডঃ শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার)

ক:—অরুক ? কে রোগ ভোগ করে না ?

অর্থঃ কাহার শরীর নীরোগ ?

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র

মমোহরকর এবং হিতোপদেশ মূলক একটি

গ্রন্থ আছে। সে গ্রন্থটি এইরূপ কথা—

রোগ এক নির্জন রজনীতে ঘনি

স্বীয় আশ্রম তরুতলে নিবিষ্ট চিত্তে ভগবৎ ধ্যানস্তিমিত লোচনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটি সুন্দর বন বিহঙ্গ উড়িয়া আসিয়া আশ্রমতরুর একটি ক্ষুদ্র শাখার উপরে ঠিক সেই ঋষির সম্মুখবর্তী স্থানে বসিয়া মধুরধরে গাহিল—

কোহরুক ?

পাখী স্বীয় স্বাভাবিক গান গাহিল, সে গানের অর্থ কি তাহা পাখী বুঝিল না। কিন্তু ঋষির কর্ণ ঐ সুশব্দে চকিত হইল। ঋষি বুঝিলেন যে, স্বভাবের অল্পপালিত বন বিহঙ্গের এই “কোহরুক” শব্দটির উত্তরে জাগতিক জীব সমূহের কি গুরুতর সম্বন্ধ নিহিত আছে। ঋষি বিহঙ্গের দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক চিন্তা করিলেন—মরি! মরি! কি সারগর্ভ সুন্দর প্রশ্ন! কোন নহায়া আজ জীবজগৎে দুঃখী হইয়া জগতের মঙ্গল কামনায় বিহঙ্গরূপে আসিয়া আমাকে এই মহান প্রশ্ন করিতেছেন? তা’ ইনি যিনিই হউন তাঁহার এই মহৎ পবিত্র প্রশ্নের সহজতর দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। ঋষি মহানন্দিত চিত্তে প্রত্যুত্তর করিলেন,—

জীর্ণে হিতভুক্।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি পূর্বাভার জীর্ণ হইলে শারীরিক ও মানসিক হিতকর আহার বিহারের সেবা করে—সেই নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবিত হয়। বন বিহঙ্গ ঋষির সেকথা বুঝিল না বা তাহাতে দৃকপাতও করিল না; সে আপন স্বাভাবিক স্বরে আবার গাহিল—

“কোহরুক ?”

সেই স্বর শ্রবণে ঋষিপ্রবর বিস্মিত হইয়া আবার নিশ্চিত করিলেন এবং বলিলেন—

যে প্রশ্নের উত্তর সমাপ্ত হয় নাই। কেননা, হিতকর আহাৰ্য্য পরিমিত মাত্রায় না হইলেই তো রোগজনক হইবে। স্তত্রাং হিতকর দ্রব্য আহাৰ্য্যে মাত্রাশী হওয়া আবশ্যক। তাই মহর্ষি আবার উত্তর দিলেন—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্।

অর্থাৎ জীর্ণে হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই দেহ নীরোগ থাকিতে পারিবে।

স্বভাবে চালিত পক্ষী আবার স্বভাব বশে স্বাধীনমনে গাহিল।

“কোহরুক ?”

মুনি ঠাকুর এবারও চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, প্রশ্নের উত্তর সম্যক দেওয়া হয় নাই। কেন না কেবল পরিমিত হিতাহারেই জীব রোগহীন থাকিতে পারে না। ভুক্তবস্তু পরিপাকের জন্ত তাহার যথোপযুক্ত পরিশ্রম করা প্রয়োজন। তাই তিনি আবার পাখীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ অমোপভুক্।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীর্ণে হিতবস্তু পরিমিত মাত্রায় আহাৰ্য্য করে এবং তাহার সহিত যথা সময়ে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমে রত থাকে, সে নিশ্চয়ই নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘ জীবন লাভে সমর্থ হয়।

বনচারী পক্ষী আপন মনে স্বাধীন ভাবে নিজ স্বাভাবিক সঙ্গীতে রত হইয়া আসলে মৃত্যু করিতেছে—সে তো আর তাঁহার বুলির অর্থ জানে না যে, ঋষির সহজতর লাভে নিরত হইবে, সে আমাকে আবার জিজ্ঞাসা—

“কোহরুক ? কোহরুক ?”

ঋষি তখন বিজ্ঞান গবেষণায় মনোনিবেশ করতঃ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে, বাস্তবিকই প্রেমের উত্তর এখানেই হয় নাই। কেননা স্বপ্নাশ্বে আছে;—

ভুক্ত নাভ্রো মন্দ্যার্থে \* \* \*।

শরণ স্বর্ধ্য বাহেন কর্তব্যস্ত সদা বুধেঃ ॥

(স্বরোদয়)।

আহারের পরবর্তী মন্দ্যার্থের প্রতীকারার্থ দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাসবহন কর্তব্য। এই রূপ শ্বাস বহাইবার কৌশল বামপার্শ্বে শয়ন। আবার আহা করার পর শয়ন করা নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতেও পরিপাক শক্তির লোপ হয়, একজন্ম শতপদ ভ্রমণান্তে বামপার্শ্বে শয়নই স্মৃতি পরিপাকের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ঋষি বলিয়া উঠিলেন—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্।

শত পদ গামী বাম শারীচ ॥

অর্থাৎ জীর্ণে হিতকর বস্তু পরিমিত গেজী ও শ্রমশীল ব্যক্তি যদি আহারান্তে শত পদ ভ্রমণের পর বামপার্শ্বে শয়ন করিতে জানে, তবে সে নীরোগ থাকিবে।

বনের পাখী এসকল কিছুই বুঝিল না সে আবার আপন স্বরে ডাকিল,—কোইরুক্।

তখন ঋষির অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, হাঁ বাস্তবিকই একটি কথা এখনও বলিতে বাকি আছে—তাই তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন।—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্।

শত পদগামী বাম শারীচ ॥

অবিজ্ঞাত মূঢ় পূরীষী খগেন্দ্র।

সোহরুক্ সোহরুক্ সোহরুক্ ॥

অর্থাৎ হে খগেন্দ্র! যে ব্যক্তি জীর্ণান্তে হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করতঃ পরিশ্রমশীল ভাবে জীবন কাটায় এবং আহারান্তে শতপদ ভ্রমণান্তর বামপার্শ্বে শয়ন করে, আর কদাচ মলমূত্রের বেগ ধারণ না করে, সে নিশ্চয় নিরোগী হয়, নিরোগী হয়, নিরোগী হয়।

তখন বিহঙ্গমটি স্বাভাবিক চাক্ষুষ্য নিবন্ধন অজ্ঞাত উড়িয়া প্রস্থান করিল। তাহাতে ঋষিবরও প্রেমের উত্তর শেষ হইয়াছে জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। \*

\* উক্ত “কোইরুক” বিষয়ে কেহ কেহ এরূপও ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে, একদা দের বৈদ্য দ্ব্যধরী পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন, তৎকালে এক অরণ্য মধ্যে উচ্চতরুতে বসিয়া একটা পক্ষীর স্বর করিতেছিল, “কোইরুক্ কোইরুক্” তাহা শুনিয়া দ্ব্যধরী বনে করিলেন যে, পক্ষী আমাকেই লক্ষ্য করিয়া অগ্নি করিতেছে যে, “কে আরোগী? ক্রাহার রোগ হয় না?” তদুত্তরে দ্ব্যধরী কহিলেন,—

জীর্ণে হিতমিত ভোজী শতপদগামী বামশারী।

অবিজ্ঞাত মূঢ় পূরীষী খগেন্দ্র সোহরুক্ সোহরুক্ সোহরুক্ ॥

অর্থ—ভুক্তাশ্র জীর্ণ হইলে যে ব্যক্তি শরীরের হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করে আর আহারান্তে শত পদ ধীর ভাবে ভ্রমণ করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করে এবং মলমূত্রের বেগ ধারণ না করে, হে খগেন্দ্র! সেই আরোগী, সেই আরোগী, সেই আরোগী জানিবে।

উক্ত বচনে “শ্রমোপভুক্” শব্দটি নাই। বাস্তবিক শ্রমোপভুক্ শব্দ না থাকিলেও উক্ত বচনের পূর্বোক্ত সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না। এই সিদ্ধি আবার পূর্বোক্তভাবে উহাকে উল্লেখ করিয়াছি।

এখনকার দিনে আমরা যে স্বাস্থ্য হারা-  
ইয়াছি, তাহার কারণ আমরা “কোহকক”  
শব্দের অর্থ জানিনা।

চরক’ সংহিতাতেও স্বাস্থ্য পালন সম্বন্ধে  
লিখিত আছে,—

মাত্রাশীত্যাং \* \* \* আহার দ্রব্যানি

প্রকৃতি লঘুন্যপি মাত্রাপেক্ষীণি ভবন্তি।

মাত্রাহুসারে আহার করাই নিত্য  
প্রয়োজন। আহাৰ্য্য দ্রব্য একান্ত হিতকর  
অথবা স্বাভাবিক লঘু হইলেও, তাহা নিশ্চয়ই  
মাত্রাকে অপেক্ষা করে। সহস্র হিতকর  
আহাৰ্য্য বস্তুও পরিমিত মাত্রায় সেবিত না  
হইলে নীরোগ ভাব রক্ষা কবিতো সম্ভব হয়  
না। সুতরাং হিতকর আহাৰ্য্যের পরিমিত  
মাত্রার বিশেষ প্রয়োজন।

চরকের স্থানান্তরে শ্রমশীলতা বা ব্যায়াম  
সম্বন্ধেও বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্যায়ামে যে শরীরের লঘুতা, কার্যো উৎসাহ,  
দেহের দৃঢ়তা, পাকায়িত্ব উদ্দীপনা, কোষ্ঠের  
অগ্ন্যুত্তাপ প্রভৃতি অশেষ মঙ্গল সাধিত  
হয়, তাহা চরক সংহিতায় স্পষ্টাক্ষরেই উক্ত  
হইয়াছে।

অবুনা নব-বিলাসিতার স্রোত দেশে  
আসিয়া মানুষগণকে নিত্যই শ্রম বিমুখ  
করিয়া তুলিয়াছে। এখন ছই এক মাইল  
পথও বিনাঘানে পর্য্যটন সাধ্যায়ত্ত নাই। কি  
স্ট্রীলোক কি পুরুষ সকলেই সমভাবে শ্রম-  
বিহীনতা-শিক্ষায় পরিপক হইয়াছেন। নব্য  
সভা সমাজে পরিশ্রম কার্য্যটা নিত্যই  
অসম্ভবতা জ্ঞাপক বলিয়া নিদ্রিষ্ট হইয়া ভার-  
তীয় নরনারীকে নবভাবে অসমর্থ আশ্রয়  
প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছে। দেশের শোচনীয়  
অবস্থা ইহারই ফলসম্প্রসূত। দেশের লোক  
এ সকল কথা বুঝিবেন কি ?

## সুস্থ দেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যতা আছে কি না।

পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর

( কবিরাজ শ্রী.....বন্দ্যোপাধ্যায় )

চরকে মস্তকে বিয়ের সহিত উপমা করা হই-  
য়াছে। বিব্র সমন্বিত সুস্থ দেহে হিতকর নহে,  
পরন্তু সমূহ অহিতকর, মস্তও সেইরূপ সুস্থ  
দেহে হিতকর নহে, বরং অহিতকর বা ইহাই  
চরকের কথা।

বিয়ের জায় মস্তের দশটি গুণ ও আমরা শায়ে  
দেখিতে পাই, যথা লঘুতা, উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা,  
সূক্ষ্মতা, অমৃততা, ব্যায়ামিতা, আত্মগামিতা

কক্ষতা, বিবাহিতা (বাহ্য ধাতুসম্বন্ধ শিথিল করে)  
ও বিশদত্তা (শিথিলের বিপরীত) আবার  
শরীরে বাহ্য ওজঃ থাকে তাহার গুণ ও দশটি,  
যথা, শুষ্কতা, শৈত্য, মৃদুতা, লক্ষণ, মনস্ব, মাধুর্য,  
স্থিরতা, নির্মলতা, শিথিলতা এবং দৃঢ়তা। মস্তের  
দশটি গুণ দশটি গুণের বিরোধী বলিয়া বলের  
সাধ করিয়া থাকে। মস্তের লঘুতা, ব্যায়াম  
বলের শুষ্কতা, উষ্ণতা, মনস্ব, মাধুর্য



দ্বারা মাধুর্য্য, আশুগামিত্ব দ্বারা প্রসাদ গুণ, ক্রুদ্ধতা দ্বারা স্নিগ্ধতা, ব্যাবিগ্ন গুণ দ্বারা স্থিরতা বিবাহিতা গুণ দ্বারা লক্ষ্যতা, বিষদ গুণ দ্বারা পিচ্ছিলতা এবং স্কন্ধতা বশতঃ বনহ গুণ নষ্ট করিয়া থাকে। বাহ্য শরীরের সার পদার্থ ও দেহের বল নষ্ট করিয়া থাকে তাহা কি প্রকারে সুস্থ শরীরে হিতকর হইতে পারে ?

মত্তের গুণ ও দোষের আলোচনা করিয়া সুস্থ শরীরে মত্ত হিতকর নহে বলিয়া শাস্ত্র কারগণ মত্ত পান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বাগডট সদাচার প্রসঙ্গে সুরাপান এবং মত্তাতি শক্তি নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সুরাপান যখন নিষেধ করা হইল, তখন মত্তাতিশক্তি নিষেধ করিবার সার্বকতা কি ? সুরাপান নিষিদ্ধ কিন্তু যদিই কদাচ কব তবে অতিরিক্ত আসক্ত হইও না। গ্রীষ্মকালে মত্ত পান করা উচিত নহে, কিন্তু যদিই খাও, তবে আসল মদ্য প্রচুর জল মিশাইয়া খাইবে। সুরাপান নিষিদ্ধ, কিন্তু যদিই সুরাপান কর, প্রচুর পুষ্টিকর দ্রব্য সহ খাইবে। সাধারণের হিতার্থ শাস্ত্রকারগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

চরক সূত্রস্থানে সদাচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে মদ্য, দ্যুত (জুয়া) ও বেঞ্চা সম্বন্ধে আলোচনা করিবে না।

চরক এবং বাগডট উভয় গ্রন্থেই মদ্যের সুস্থ শরীরের অনুপযোগীতা সম্বন্ধে বিস্তারিত প্ৰমাণ পাওয়া যায় যথা :—

উভয় গ্রন্থেই এইরূপ নির্দিষ্ট যে, মদ্য যে ব্যক্তি পান না করে, সে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় এবং সে ব্যক্তি এই সম্বন্ধে

বিবেচনা পূর্বক কার্য্য করে; তাহাকে শারীরিক ও মানসিক রোগ সকল স্পর্শ করিতে পারে না।

এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে অল্প মাত্রায়ই হউক আর অধিক মাত্রায়ই হউক মদ্য পান করিলে শারীরিক ও মানসিক বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। বাহ্য রোগ জনক তাহা কখনই সুস্থ শরীরের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দীর্ঘ আয়ু স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য বর্ণ স্বর, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা প্রভৃতি লাভের জন্ত রসায়ন ঔষধ সেবনের বিধি আছে। রসায়ন প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, সত্যবাদী ক্রোধহীন, মদ্য ও মৈথুন হইতে বিরত প্রভৃতি গুণগুরু পুরুষেরা রসায়নের ফল লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ঔষধ সেবন ব্যতীত তাঁহারা দীর্ঘ আয়ু ও আরোগ্য প্রভৃতি লাভ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে মত্ত দীর্ঘ আয়ু ও আরোগ্য প্রভৃতি লাভের অন্তরায় স্বরূপ। সুতরাং স্বাস্থ্য আরোগ্য এবং দীর্ঘ আয়ু লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে মদ্য কখনই হিতকর হইতে পারে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল শাস্ত্রীয় অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মত্ত মনের ও শরীরের সাময়িক উত্তেজনা ঘটাইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বল, স্বথ, রক্তি শক্তি প্রভৃতির বর্ধক নহে এবং উহা পরস্পর বা আরোগ্যের অন্তরায় স্বরূপ। কেহ কেহ বলিবে পারেন, তবে কি অল্প সুস্থায়িকারে অর্থাৎ উহা ব্যক্তির আহার বিহারাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে মদ্যপানের ব্যবস্থা যে করা হইয়াছে ?

সুস্থ শরীরে অহিতকরই হইল, তবে সুস্থ ব্যক্তিকে পান করিবার উপদেশ দেওয়া হইল কেন? —

ফল কথা মত্ত ব্যবহারে একটা সাময়িক সুখ হয় মাত্র কিন্তু ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে রোগ ভোগ—হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্ন সুখে বিমুক্ত মানব সেই সুখের প্রত্যাশায় মত্ত পান হইতে বিরত থাকে না। অপকারী জানিয়াও কত লোক যে মাদক দ্রব্যে অমুরক্ত হইয়া নিজের এবং অপরের জীবনের সুখ শাস্তি নষ্ট করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অহিতকর মাদক দ্রব্য সেবনে প্রথা প্রচলিত আছে। ভগবান মত্ত বলিয়াছেন :—

প্রবৃত্তিরেব ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলাঃ।

অর্থাৎ মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি এইরূপ—মত্ত পানাদিতে ইচ্ছুক, কিন্তু নিবৃত্তি মত্ত পানাদি পরিত্যাগ মহা ফলপ্রদ।

যদি এইরূপই হয় তবে কি সেই সকল প্রবৃত্তির দাস মনুষ্যগণের হিতার্থে শাস্ত্র কারগণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন? এই জন্তই সর্বভূতে সমদর্শী অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন আয়ুর্বেদ বক্তা ঋষিগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গুণভুক্তে বিবিধ পূর্বক মত্ত পান করিলে শরীর সহজে ধ্বংস হইবে না। পরন্তু সুস্থ শরীরে হিতকর হইবে বলিয়া এরূপও বলা হয় নাই। ইহার একটা সুন্দর উপমা দেওয়া যাইতেছে। চৌরকার্য্য সকল দেশে সকল সমাজে চিরদিন দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। অথচ শাস্ত্রকারেরা চৌর্য্য শাস্ত্র (অর্থাৎ কি করিয়া চুরি করিতে হয়,

কোথায় কিরূপ সিঁদ কাটিতে হয়) সে সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাব উদ্দেশ্য কি চৌরকার্যের প্রশংসা করা? তাহা নহে। কিন্তু তত্ত্বর পৃথিবীতে চিরদিন ছিল, আছে এবং থাকিবে। তাহারা যতই অধম হউক, তাহাদের একটা উপায় চাই তো। সেইজন্ত, অধমতার গন্ধিগণ তত্ত্বদিগের কার্য্যসাধক উপদেশ দিতেও ক্রটি করেন নাই। মত্ত পান সম্বন্ধে উপদেশও এইরূপ, মত্ত পান হিতকর বলিয়া নহে।

সুস্থ শরীরে মত্ত পান যে হিতকর নহে, তাহা শাস্ত্রীয় বচন হইতে প্রমাণ করা হইল। এক্ষণে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এ সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তৎপূর্বে মত্ত কাহাকে বলে এবং আয়ুর্বেদীয় ও যুরোপীয় মত্তে কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহা দেখা উচিত।

যে দ্রব্য পান করিলে মত্ততা জন্মায় তাহাকে মত্ত বলে। আর শালি ও বাটিক ধান্যের চাউল প্রভৃতি হইতে যে মত্ত উৎপন্ন হয়, তাহাকে সুরা-বিলে। সুরা শব্দের ভাস্করী নাম স্পিরিট (spirit)। আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি মত্তকে ইংরাজীতে লিকার (liquor) বলে। বারানী (তাড়ী, সীম্ব ভিনিগার—Vinegar) প্রভৃতি মত্ত শব্দ বাচ্য। • যুরোপীয় মত্ত বস্তু সুরাসার (Alcohol) বহুল, আয়ুর্বেদীয় মত্ত তাহা অপেক্ষা অন্ন। কলতঃ আয়ুর্বেদে সর্বপ্রকার মত্তই যুরোপীয় মত্ত অপেক্ষা কম তীব্র (strong)।

এক্ষণে মত্ত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাইবে।

যুরোপীয় চিকিৎসক সকল মত্ত পান

যলে মত্ত শরীরে খাওয়ার জায় কার্য্য করিয়া থাকে ইহাই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর তাঁহাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মত্ত শরীরের খাওয়ার জায় পুষ্ট সাধন করে না, বরং বিবিধ শারীরবস্ত্রের অনিষ্ট সাধনই করিয়া থাকে এবং বতটুকু মত্ত পান করা যায় তাহা অবিকৃত অবস্থায় শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। প্রসিদ্ধ ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, ক্লোরোফর্ম (Chloroform) বা ইথারকে (Ether) যেমন খাওয়া বলিয়া স্বীকার করা যায় না, মত্তকেও সেইরূপ খাদ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

মত্ত পানের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ মত্তের কতকগুলি হিতকর গুণ আঁছে বলিয়া নির্দেশও করেন। তাহা না বলেন যে, মত্ত শরীরকে অনেক রোগের আক্রমণ হইতে বক্ষা করে, অত্যন্ত শীত বা উত্তাপ হইতে শরীরকে রক্ষা করে, আহার পরিপাকের সহায়তা করে, শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে, পেশী সমূহকে স বল করে, ইত্যাদি। কিন্তু পান্ঠাতা চিকিৎসকগণের বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহু পরীক্ষার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, মত্ত কোন অবস্থায় কোন ব্যক্তির পক্ষেই হিতকর নয়, বরং অত্যন্ত অহিতকর। কেবল মনুষ্য বলিয়া নহে, সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই মদ্য বিষতুল্য অনিষ্টকর। মত্তম্যের প্রাণনাশক অনেক প্রকার বিষের প্রভাব যে সকল প্রাণ অনায়াসে সহ করিতে পারে, মত্তের প্রভাবে তাহাও সহ করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, এমন কোন জন্তু নাই, যে মত্ত মদ্য দ্বারা অতিশূভ

হয় না। একটী প্যারাবত—যাহাতে অনেকগুলি মাকুষ্যের প্রাণ নাশ হয়—একরূপ পরিমাণ অহি-ফেন অনায়াসেই সেবন করিতে পারে। একটী ভাগল—যাহাতে অনেকগুলি মনুষ্যের প্রাণনাশ হয় একরূপ পরিমাণ তামাক অনায়াসেই সেবন করিতে পারে। একটী খরগোশ—যাহাতে অনেকগুলি মনুষ্যের প্রাণনাশ হয়, একরূপ বেলেডোনা (Belladonna) অনায়াসে সেবন করিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল বিধ সেবন করিয়া অভিজ্ঞ না হইলেও, মত্ত পান করিলে উহারা মনুষ্যের জায় অভিজ্ঞ হইয়া পড়ে।

নিউ ইয়র্কের অধ্যাপক উইলোর্ড প্রক্টর (Prof Willord Proctor M. D.) বলিয়াছেন যে, মদ্য পান করিলে শরীরের উদ্ভাপ কমিয়া যায়, বলের হ্রাস হয় এবং শতকরা ত্রিশ ভাগ পরমাণু কমিয়া যায়।

ডাক্তার পার্কস তাঁহার রচিত প্রাক্টি-ক্যাল হাইজিন (Practical Hygiene) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে মত্তের যদি অভাব থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অর্ধেক পাপ ও জুংথ রোগ ভোগ প্রভৃতি কম হইত।

আমেরিকার চিকাগো মহানগরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার জে, কে, রসি ও চেলার এবং এফ, এফ, রসি ও চেলার বলিয়াছেন যে, অনেকে ইচ্ছা পূর্বক এই বিষ পান করিয়া যে কেবল শারীরিক বস্ত্র সমূহের বাতাবিক কার্যের বির ঘটায় তাহা নহে, পান করিয়া শীঘ্রই মৃত্যুকে আহ্বানও করিয়া থাকে। আবার, ইহা কেবল যে শরীরকে নষ্ট করে—তাহাও নহে, পরন্তু মৃত্যু হইতেও অধিক বস্ত্রপাদায়ক হইয়া মনের ক্ষান্তিকে নষ্ট করে, হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে, পরিবার

বর্গকে দারিদ্র্য ও হুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করে এবং তাহাদিগকে জীবনের কর্তব্য পথ হইতে লুপ্ত করে। যতদিন মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিয়া না দেয়, ততদিন পর্যন্ত রোগ-যন্ত্রণা মদ্যপায়ীর নিত্য সহনীয় হইয়া থাকে।

বিটিশ মেডিকেল জর্ণাল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মদ্য ব্যবহারে জীবনী শক্তি (vitality) বদ্ধিত হয় না, পরন্তু কমিয়া যায়।

মত্ত যে কেবল মত্তপায়ীরই অনিষ্ট করে তাহা নহে। পিতৃ মাতার পাপের ফল পুত্র কন্যাও ভোগ করিয়া থাকে। ডাক্তার হাউয়ে (Mr. Howey) প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড, সুইডেন এবং যুরোপের অধিক জড় (Idiot) ব্যক্তি মত্তপায়ী পিতামাতার সম্মান।

লর্ড শ্যাফটস্ বরী (Lord Shaftesbury) ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট মহাসভায় যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে দশ জন উন্নতের মধ্যে ছয়জন মত্তপানের ফলে পাগল হইয়া থাকে। ডাক্তার উইলার্ড পার্কার, ডাক্তার বেঞ্জামিন রস, ডাক্তার হাউয়ি প্রভৃতি চিকিৎসকগণও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

ডাক্তার এড মণ্ডস, পার্কার, চার্কট (Mr. Charkot of Paris) এবং ডাক্তার হল্ প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মত্তপানের প্রকৃতি পিতা অপেক্ষা পুত্রের অধিকতর প্রবল হয়। মত্ত পায়ীর পুত্র পিতা অপেক্ষাও অধিকতর মত্তপায়ী এবং রোগগ্রস্ত হয়। ক্রমশঃ বংশের বিষম অধঃপতন ঘটে।

ডাক্তার এণ্ডারসন, এম হিউবার, ষ্ট্যানলি,

ডাক্তার কার্পেন্টার (Dr. W. B. Carpen-

ter) প্রমুখ চিকিৎসকগণ একবাক্যে বলেন যে, মত্ত পানের ফলে শরীর সহজেই রোগ গ্রস্ত হইয়া পড়ে। মহামারীর (Epidemic) সময় মত্তপানরত ব্যক্তিগণই অধিক সংখ্যায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যাহারা মত্তপান করে না তাহাদের রোগ মত্তপায়ী অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে হয়।

ডাক্তার শ্বিথ চেম্বারস, জেমস্ মিলার, কার্পেন্টার প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকগণ বলেন যে, অপরিমিত মত্তপানে যেরূপ অনিষ্ট হয়, পবিত্র মত্তপানেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

মত্তপানে কেবল শরীরেরই অনিষ্ট হয় না, পবিত্র মনেরও অনিষ্ট হয়, চরিত্রও অত্যন্ত দূষিত করিয়া থাকে, ডাক্তার ফাথার জিল (Dr. Futhergill) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বলেন যে, মত্তপান দ্বারা চরিত্র যে কত দূর দূষিত হয় তাহার সীমা নাই। জগতে এমন কোনো পাপ নাই—যাহা মত্তপায়ী দিগের দ্বারা কৃত না হইতে পারে। ডাক্তার নট (Dr. Nott) ডাক্তার এলিসা হারিস (Dr. Elisha Harris) প্রভৃতি চিকিৎসকগণ এবং বিখ্যাত বিচারকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অধিকাংশ অপকর্ম্যই মত্তপায়ীদিগের দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে।

মত্তের অপকারিতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মত উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মত্ত সূহ শরীরে অল্পপোষী, পরন্তু বিষবৎ অহিতকর। মত্ত যে বিষ—তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে।

সূহ শরীরে মাদক দ্রব্যের উপযোগিতা আর

কিনা এ প্রবন্ধে তাহাই আমাদের আলোচ্য। সুতরাং রোগ সম্বন্ধে মস্তুর উপযোগিতা কিরূপ তাহা বলা অনধিকারচর্চা মাত্র। তবে পদঙ্গ ক্রমে বলিতে হইতেছে যে, মস্তুর যোগনাশকতা শক্তিও পাশ্চাত্য চিকিৎসক গণ স্বীকার করেন না। অধ্যাপক মিলার (Prof. Miller M. D. of Scotland) বলিয়াছেন, সুরা দ্বারা কোন রোগ ভাল হয় না (Alcohol cures nothing)। ডাক্তার হিগিনবটম (Dr. Higginbottom) বলেন যে, আমি সুরা প্রয়োগ করিয়া কোন রোগ

ভাল হইতে দেখি নাই। ডাক্তার জনসন বলেন যে, ঔষধ হিসাবে সুরার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কিছুকাল পূর্বে দুই সহস্র ইংরাজ ডাক্তার একমত হইয়া প্রচার করেন যে, ঔষধ হিসাবে সুরা প্রয়োগ করা উচিত নহে।

নশ্তপান হেতু হৃদযন্ত্রের বিবিধ রোগা-ক্রান্ত হইয়া থাকে। শরীরে এমন কোন বস্তু নাই যাহা নশ্ত পান বশতঃ দুর্বল ও পীড়িত হয় না। অতএব সূত্রেদেহে নশ্ত ব্যবহার কখনই কর্তব্য নহে।

(ক্রমশঃ)

## কলেরা কি বিসূচিকা?

—: \* :—

(কবিবরাজ শ্রীমণীন্দ্র নারায়ণ সেন)

কলেরা বা ওলাউঠাকে সর্ব সাধারণে কেন, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণও নিঃসঙ্কোচে বিসূচিকা নামে অভিহিত করেন। কিন্তু কলেরাকে বিসূচিকা না বলিয়া, অতিসারের পণ্য্য ভুক্ত করিলে কি সঠিক আয়ুর্বেদোক্ত নাম দেওয়া হয় না? অতিসারের ডাক্তারী নাম “ডাইরিয়া”। ডাইরিয়ারই অবস্থা ভেদ কলেরা, তদুপ অতিসারের অবস্থান্তরের নাম কলেরা।

এই রোগ চেনা অতি সহজ। অন্ত কোন বোগে এরূপ লক্ষণ সমূহ হয় না। চাল ধোয়া জলের মত স্বচ্ছ ভেদই ইহাই প্রধান বিনিশ্চয়ক লক্ষণ; এবং রোগীর এরূপ লক্ষণ থাকিলেই আমরা কলেরা বলিতে পারি। প্রথমে অতি প্রচুর পরিমাণে ভেদ; তৎপরে ভেদের উপর

বমি, খালিদরা, পিপাসা, দাহ, ভ্রম, বলহানি খাস, নাড়ী বসিয়া যাওয়া, অঙ্গের শীতলতা অত্যন্ত অবসাদ, স্বরভঙ্গ ও স্বরক্ষীণ হওয়া, মুত্রহীনতা, বিবর্ণতা, চক্ষু কোটরগত, এবং পরবর্তী কালে অর, — এই বোগে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। এই বোগে রোগীর প্রায়ই মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত জ্ঞান লোপ পায় না। গন্ধ বর্ণহীন ভেদ ও বমন দ্বারা রোগীর সর্বশরীরস্থ বহু অলীয়াংশ বাহির হইতে থাকে। ধাতুকর হেতু রোগী প্রতি ভেদের পরই অধিক অবসর হইতে থাকে; স্বপ্ন ইহার কোনো প্রতিবেদ না হইলে, অবশেষে মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে।

আয়ুর্বেদে অতিসার শব্দের অর্থ অতি

সরণ, “গুদেন বহু দ্রব সরণং অতিসারঃ”  
রসাদি দ্রব ধাতু—সকল, স্বভাবকে অতিক্রম  
করিয়া, গুহ্য মার্গ দ্বারা অতিশয় নিঃসরণ  
হইলে, তাহাকে অতিসার বলে। এই রোগের  
সংক্রান্তি যথা :—

সংশয়াপাং ধাতুরগ্নিঃ প্রবুদ্ধো

সকৃন্নিশ্রো বায়ুনাথঃ প্রণয়ঃ।

সরতাভীবাতিসারং তনাহ

ব্যাধিং ঘোরং ষড়বিধস্তং বনস্তি।”

শরীরস্থ বহু জলীয় ধাতু—(অর্থাৎ রস, রক্ত,  
শ্বেদ মেদ, মজ্জা, কফ, পিত্ত, মূত্র, জল প্রভৃতি  
ধাতু) প্রভৃষ্ট হইয়া কোষ্ঠাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া  
মলের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং বায়ু কর্তৃক  
অধোদেশে প্রেরিত হইয়া গুহ্যমার্গ দ্বারা  
অত্যন্ত নিঃসারিত হয়, ইহাকেই অতিসার  
কহে। অতিসারের বহু দ্রবসরণ বিশিষ্ট  
লক্ষণ ঘটয়া থাকে, তুচ্ছ ইহা গ্রন্থী প্রভৃতি  
রোগ হইতে পৃথক রূপে আয়ুর্বেদে লিখিত  
হইয়াছে। কলেরার বিশিষ্টতা বহুদ্রব ভেদ ;  
বমি, খালধরা, অঙ্গের শীতলতা, তৃষ্ণা, স্বর  
ভঙ্গ প্রভৃতি তজ্জনিত উপসর্গ।

এই রোগে প্রথম ২১২ ভেদে শরীরস্থ—  
পূরীষের ক্ষয় হয়। পূরীষের ক্রিয়া শবীরের  
উপগুপ্ত (ধারণ) এবং বায়ু ও অগ্নিকে ধারণ।  
প্রচুর ভেদ দ্বারা ক্ষয় হওয়াতে, রোগী শরীর  
ধারণ করিতে পারে না, এবং বায়ু আধার  
হীন হয় এবং শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিবিধ  
বাত বেদনা, খালধরা, অরতি, শ্বাস, বমি,  
প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিয়া থাকে। অগ্নি  
নষ্ট হওয়ায় বিবর্ণতা, উন্মহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ  
প্রকাশ পায়। স্নেহক্ষয়ে রুক্ষতা, অন্তর্দাহ,  
আশয়দিগের বিশেষতঃ আমাশয়ের শূন্যতা,  
সন্ধিস্থান সমূহের শৈথিল্য, তৃষ্ণা, দৌর্বল্য,

নিদ্রানাশ হয়। বলক্ষয়ের ফলে হৃদ-পন্দা,  
কম্প, ও তৃষ্ণার প্রবলতা হয়; রক্তক্ষয়ে শব্দ  
কর্কশতা, শীতানুভূতি ও শিরা শৈথিল্য হয়।  
মাংসক্ষয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের শুষ্কতা, রুক্ষতা,  
তোদ (স্থতী বেদন্য বেদনা) গাত্র সমূহের  
অবসাদ ও ধমনীদিগের শৈথিল্য হয়। মেদ-  
ক্ষয়ে সন্ধি সমূহের শূন্যতা, রুক্ষতা প্রভৃতি,  
মজ্জাক্ষয়ে পর্কভেদ, অস্থিতোদ ও অস্থি সমূহের  
শূন্যতা, শুক্রক্ষয়ে অধিক, বলহানি ও মূত্রা;  
শ্বেদক্ষয়ে, ত্বকশোথ, স্পর্শ-বৈগুণ্য ও রোম-  
কূপের শুষ্কতা উপস্থিত হয়। মূত্রক্ষয়ে বতি-  
তোদ ও মূত্রহীনতা হয়। ওজঃ বা বলক্ষয়ে,  
মূর্ছা, মোহ, প্রলাপ অজ্ঞান, ক্রিয়া সমূহের  
হীনতা, ও অবসাদপ্রাপ্তি, দোষের নির্গম,  
ঘ্রানি, অঙ্গের শুষ্কতা ও বিবর্ণতা, তজ্জা ও  
মূত্রা হয়। রোগীর যতই ভেদ ও বমি অধিক  
হইতে থাকে, ততই ধাতু সমূহ অধিক ক্ষয়িত  
হয়, ক্রমে উপরোক্ত ক্ষয়জনিত লক্ষণ  
সকল প্রবলতর হয়। ধাতু ক্ষয় হেতু বায়ুর  
উপদ্রব দ্বারা রোগী অধিক কাতর হয়।  
অবশেষে বায়ু স্বয়ং ক্ষয়, প্রাপ্ত হইলে, রোগী  
বাক্যহীন ও চেষ্টাহীন হয় ও মৃত সংজ্ঞা হইয়া  
মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কলেরায় শরীরের আর আর ধাতু (জলীয়াংশ)  
ক্ষয় হেতু মৃত্যু হয়। ডাক্তারিতে saline  
injection (সোলাইন ইন্জেকশন) চিকিৎসা  
প্রণালী দ্বারা অনেক সময় ঔষধা বিশেষ  
সুফল পান। তদ্বারা কতকগুলি বিপুল সংস্থিত  
শরীরোপযোগী জল, শরীরের মধ্যে প্রবেশ  
করাইয়া শরীরের জলীয়াংশ বৃদ্ধির চেষ্টা করা  
হয়।

কলেরা রোগ আয়ুর্বেদোক্ত ত্রিদোষজ  
অতিসার—ইহা কক্ষ সাধ্য বা অসাধ্য ব্যাধি।

ইহা কোন স্থলেই সুখসাধ্য নহে। বিশেষতঃ “দোরং যড়বিধং তং বদন্তি”—ছয় প্রকার অতিসারই ‘দোরং’ এই বিশেষণ দ্বারা রোগের ভয়ঙ্কর প্রকাশ করিতেছে।... ভৈরবং। দাঁড়বং ভীষণং তীক্ষ্ণং দোরং ভীষং ভয়ানকং ভয়ঙ্করং প্রতিভয়ং”—ইত্যমরঃ। কলেরা নামক ত্রিদোষজ অতিসারের বিশেষত্ব এই যে, ইহার উৎপত্তি মাত্রেই অতিসারের অরিষ্ট (সর্বার্থ জ্ঞাপক উপসর্গ) লক্ষণ সমূহ দেখা দেয়, যথা বমি, স্বরভঙ্গ, উদ্রাহীনতা, শ্বাস, চক্ষু, দাহ, স্বচ্ছভেদ এবং স্তীবেধবৎ বেদনা, অঙ্গে খাল দরা প্রভৃতি ধাতুক্ষয়জ্ঞাপক উপসর্গ সকলও প্রকাশ পায়।

“ন জীবৎ ধাতু সংক্ষয়ং ইতি,” ধাতু ক্ষয় হইলে মানুষ বাচে না। এইজন্যই কলেরায় ধাতুক্ষয় হেতু মৃত্যু হয়।

ত্রিদোষজ অর যেমন অনেক প্রকার এবং বিটবানিক প্লেগ—অর ব্যতীত অল্প কিছু নয়, ত্রিদোষজ অতিসারও সেইরূপ অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কলেরা একটি অরিষ্ট লক্ষণ সংযুক্ত প্রাণাত্যকর ত্রিদোষজ অতিসার।

দোষাবস্থা স্তম্ভ নৈকপ্রকার।

কালে কালে বাধিতস্তোদ্রবন্তি।

কলেরা যখন মহামারীরূপে উপস্থিত হয়, তখন চুপে জল, বিষ বা ঝুঁড়ি বিপর্যয় ইহার প্রদান কারণ হয়, তথা অতিসারে অল্প হেতু সকলও অনেক সময় কারণ হয়।

কলেরাকে বিসৃচিকা বলার বিশেষ আপত্তি এই :—

নগাঃ পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাশ্রমাঃ।

মৃগাঃ স্তানজি তাঅনো লভন্তে শনলোলুপাঃ।

কিন্তু কলেরার পক্ষে এ কথা আদৌ খাটে না। দ্বিত্যঙ্গ, পরিমিতাহারী হই-

লেই কলেরার সংক্রামকতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। কিন্তু বিসৃচিকা পরিমিতাহারী হইবে না, ইহা হইল আয়ুর্কেন্দ্রের বৈশেষিক সূত্র।

বিসৃচিকা—অজীর্ণায় হইতে উৎপন্ন হয়। অজীর্ণ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া ‘সূচি’ সহযোগে সর্বগাত্রে পীড়ন করিতে করিতে অবস্থান করে, এইজন্য এই রোগের নাম বিসৃচিকা। কিন্তু কলেরা—অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হইতেও পারে, না হইতেও পারে, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। কিন্তু বিসৃচিকা—অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহাই আয়ুর্কেন্দ্রের মত। কারণ বিষ্টক, বিদগ্ধ বা আমাজীর্ণ হইতে বিসৃচিকা উৎপন্ন হয়। কলেরায় প্রথমে ভেদ, তৎপরে ধাতুক্ষয় জনিত অস্বাভা উপসর্গ দেখা দেয়। বিসৃচিকায় পূর্বে অজীর্ণ জনিত বেদনা তৎপরে অতিসার ঘটে। বিসৃচিকা—অতিসারের নিমিত্ত হয় মাত্র।

“স্নেহাজীর্ণ নিমিত্তস্ত বহুল প্রবাহিকা। বিসৃচিকা নিমিত্তস্ত চান্যোহজীর্ণ নিমিত্তজ। বিষাংশ ক্রিমি সম্ভূত যথাসং দোষ লক্ষণঃ।”

আম পক্ষঃ ক্রমঃ হিত্বা নাতিসারে ত্রিদোষতঃ

অতঃ সর্বাতি সারাস্ত জ্ঞেয়া আমপক্ষ লক্ষণৈঃ

(সূঃ—উ ৪০. অঃ)

উক্ত বচন হইতে প্রমাণ হয়—অজীর্ণ, ক্রিমি, অর্শ প্রভৃতির জ্বায় বিসৃচিকা অতি সারের নিমিত্ত মাত্র—ইহা স্বয়ং অতিসার জাতীয় কোন ব্যাধি নয়, সূত্রময় কলেরা নয়,— হয়ত কোন কোন স্থলে বিসৃচিকা অতিসার বা কলেরায় নিদানার্থকারী হইতে পারে।

বিসৃচিকা চিকিৎসার ক্রমশাঙ্কে এইরূপ নির্দেশ হইয়াছে,—

সাধ্যাঃ সূক্ষ্মার্জ্যাদিহনং প্রশস্ত

ময়িপ্রত্যাপনং বয়নঞ্চ ভীক্ষং।

পকে ততোহরে তু বিলজ্বনং শ্রাং

সম্পাচনকৃণি বিরেচনং বা।

কলেরায় বিরেচন ঔষধ কোন চিকিৎসক  
প্রয়োগ করিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু  
বিশ্চিকায়

কটুত্রিকং বা লবনৈরুপেতং পিবেৎ

মুখীক্ষীর বিনিশ্রিত ও।

মনসীক্ষীরের শ্রায় অতি তীক্ষ্ণ বিরেচন ও  
বিশ্চিকার চিকিৎসায় উক্ত আছে। কলেরায়  
মুখীক্ষীরের শ্রায় বিরেচন ঔষধ কখনও  
কোন অবস্থায় চলে না। তৎপরে “বমনক  
তীক্ষ্ণঃ”—ইহাও কুত্রাপি কলেরায় প্রয়োগ  
হয় না।

“বিশুদ্ধ দেহস্ত হি সদা এব

মুচ্ছাতিসারাদি রূপেতি শাস্তিঃ।”

বিশ্চিকায় রোগের বমন বিরেচন দ্বারা  
দেহ শুদ্ধ হইলে, মুচ্ছা অতিসার প্রভৃতি  
উপসর্গের শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু কলেরায় তৎ বিপরীত রোগের  
স্বভাব বা প্রভাব বমন ও বিরেচনই এই  
রোগের সর্ব প্রধান আতঙ্ক।

বিশ্চিকা অজীর্ণায় হইতে উৎপন্ন হয়।  
কুপিত অন্ন শল্যরূপে দেহে অবস্থান করে,  
বমন-বিরেচন দ্বারা দোষের শুদ্ধ হইলে,  
রোগী শাস্তি পায়। কিন্তু কলেরায় বত ভেদ  
বেশী হয়, রোগীও তত অধিক অবসন্ন হয়,  
উপসর্গেরাও ক্রমে অধিক ভাবে প্রকাশ পায়।  
কলেরায় যে বশি দেখা যায়, তাহা অতিসারের  
অরিষ্ট লক্ষণসমূহের অগ্রতম—ইহা অজীর্ণ  
জনিত নহে, বান ও উদান বায়ুর হেতু-  
বিশেষ ইহাতে প্রকাশ পায়।

কলেরায় শীতলতা ও উন্মাহীনতা  
একটি প্রধান অবশস্তাবী লক্ষণ রূপে দেখা

দেয়, কিন্তু, বিশ্চিকার লক্ষণ সমূহ মধ্যে  
উক্ত লক্ষণদ্বয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই।  
অতিসারে অরিষ্ট লক্ষণ সমূহ আয়ুর্বেদে লিখিত  
হইয়াছে।

যে জটাই অতিসার উৎপন্ন হউক না কেন,  
অতিসারে আম ও পক ভেদে দুইরূপ চিকি-  
ৎসা ভিন্ন অন্তরূপ চিকিৎসা নাই। আমে  
পাচন, পকে শুভ্রন। কিন্তু কলেরায়  
শ্রায় আশুপাণাস্তকারী অতিসারের চিকিৎসা  
সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ বিধি আয়ুর্বেদে উক্ত  
হইয়াছে :—

ক্ষীণদাতৃবলাতস্য বত দোষাতিনিয়তঃ।

আমেহপি শুভ্রনীয় সাং পাচনাস্থরণং ভবেৎ।

দাহার ধাতু ও বল ক্ষীণ হইয়াছে এবং  
ভেদ দ্বারা বহু দোষ নিঃসৃত হইয়াছে,  
এইরূপ অতিসারের রোগকে আম অবস্থাতে  
ও শুভ্রন ঔষধ দিবে। কেবল পাচন ঔষধ  
দিলে রোগীও মৃত্যু হইবে। এই অবস্থায়  
পাচন, শুভ্রন ঔষধই ব্যবস্থা। কলেরায়  
অক্ষেপ “আমে”পি শুভ্রনীয় সাং”, নচেৎ  
দোষ অতিনিঃসৃত হইয়া স্রবণ হইবে।

উপসংহারে বাক্যব্য এই যে, কলেরায়  
নামক রোগকে আয়ুর্বেদের ভাষায় বিশ্চিকা  
না বলিয়া অতিসার বলিলে অধিক শোভন  
হয় এবং আয়ুর্বেদসম্মত নাম হয়। যখন  
প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, কলেরা চিকিৎসায়  
আয়ুর্বেদে অতিসার চিকিৎসায় ক্রম  
অনুসরণীয়, তখন ইহাকে বিশ্চিকা বলার  
তাৎপর্য কি? আয়ুর্বেদজগণের নিকট আমার  
ইহাই নিবেদন এবং আচার্য্যগণের নিকট  
আমার জিজ্ঞাস্তা, আয়ুর্বেদের মতে কলেরা  
বিশ্চিকা কিনা তাঁহারা এ সম্বন্ধে আলোচনা  
করিয়া আমার মীমাংসা তত্ত্বন করিয়া দিল।



## বাঙ্গালার স্বাস্থ্য ।

—:—:—

বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইতেছে তাহা ১৯১৮ সালের সরকারি বিবরণী দৃষ্টে বিশেষ রূপে অবগত হওয়া যায়। ১৯১৮ খৃঃঅন্দ্রে একমাত্র অরে ও ইনফ্লুয়েন্সারোগেই বাঙ্গালা দেশেব লোকক্ষয় হইয়াছে ৪,৭৫,১৩৫ জন। ইহার মধ্যে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার রোগের মৃত্যুই অধিক হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃঅন্দ্রে সমগ্র বঙ্গদেশে জন্ম সংখ্যা ১৪,৮৯,১৩৫। ১৯১৭ খৃঃঅন্দ্রে সমগ্র বঙ্গদেশে জন্ম সংখ্যা হইয়াছিল ১৬,২৭,৮৭৩ অর্থাৎ ১৯১৭ খৃঃঅন্দ্রে অপেক্ষা ১৯১৮ খৃঃঅন্দ্রে জন্ম সংখ্যা ১,৩৮,৭৩৮ পরিমাণে কম হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃঅন্দ্রে মৃত্যুসংখ্যা ১৭,২৭,৩৩১। ১৯১৭ খৃঃঅন্দ্রে মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছিল ১১,৮৭,৫০৯। এই হিসাবে মৃত্যু সংখ্যা ও ১৯১৭ খৃঃঅন্দ্রে অপেক্ষা ৫,৩৯,৮২২ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

একদিকে জন্ম সংখ্যা কমিয়া গাইতেছে, অল্প দিকে মৃত্যু সংখ্যা বাড়িতেছে। বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা চিন্তাশীলগণ বিবেচনা করিবেন।

১৯১৮ খৃঃঅন্দ্রে যে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জ্বর ও ইনফ্লুয়েন্সায় ৪,৭৫,১৩৮ ও কলেরায় ৩৭,৩৫৮ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। কলেরা রোগে সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার লোকই অধিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃঅন্দ্রে শিশুমৃত্যুর পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। শিশু ভিন্ন, বালক-বালিকা, যুবক যুবতীও বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণে কালকবলিত হইয়াছে, তাহাও চিন্তাবিষয়। ১৯১৮ খৃঃঅন্দ্রে ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ৪৫,০২৭ এবং ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখ্যা ৩৭,৪৫৯। ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ৫১,০১৫ ও ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা ৬১,৯৭৩। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ১,১০,৪৮৫ এবং ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা ১,২৮,০৩২। ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স স্ত্রীলোকের মৃত্যুই বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফল কথা, শিশুমৃত্যুর মত যুবতী-মৃত্যুও দেশে যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কখনই আশাপ্রদ নহে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ অল্প বয়সেই যে সন্তানের জননী হইয়া থাকেন, শিশু এবং যুবতী-মৃত্যুর অনেকটা কারণ তাহাই। অনেক মহিলা অকালে গর্ভবতী হইয়া প্রসব করিবার পূর্বে কালগ্রাসে পতিতা হন, অনেকে উহারই ফলে রক্তান্তরা নিবন্ধন প্রসবের পরই অকালে মৃত্যুকে অমূলঙ্গন করিয়া থাকেন। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি, বাঙ্গালী বিবাহ বঙ্গদেশে চির প্রচলিত, কিন্তু বিবাহ হইল বলিয়াই অকালে বাধন তখন স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে ছিল না। হিন্দুর গর্ভাধান পুংস্বন প্রভৃতি কার্যের

অনুষ্ঠান তাহার সাফ্য প্রদান করিতেছে। এখন সে গর্ভাধান-পংসবনের ব্যবস্থা কয়জন রক্ষা করিয়া চলেন? সে তিথি-নক্ষত্র বাছিয়া স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থাও দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সে কালে ঋতুমতী দ্বার ঋতু কালে স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখিবার অধিকার ছিল না, এখন সে বাছ বিচারই বা কয়জনের সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়? বালিকা ও শুবতী মৃত্যুর আধিক্যের ইহাই প্রধান কারণ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যানেরিয়া, বসন্ত এবং কলেরা রোগ বাঙ্গালা দেশে ক্রমশঃই বাড়িতেছে। স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনার ডাঃ বেটলী ইহার কারণ নির্দেশে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর আহার ও পরিচ্ছদের অনটনের কথা বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, সামান্য খাদ্য এবং বস্ত্রাদি ব্যবহারের ফলে লোকের জীবনী শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অরোগের মৃত্যুর সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে বাড়িয়া গিয়াছে।” আমরা বলি, অন্নবস্ত্রের কষ্টে বাঙ্গালা দেশে এক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগই বাড়ে নাই; এই দুইটি বিনয়ের অভাবে বাঙ্গালীর সকল রোগই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখনকার দিনে যক্ষা বোগের যে এত প্রাবল্য, ইহার কারণও বাঙ্গালীর দারুণ অস্বচ্ছলতা। বাঙ্গালী আগের অপেক্ষা এখন অর্ধের মুখ বেশী দেখিতে পাউতেছে সত্য, কিন্তু সে অর্থে সকল দিক বজায় রাখিতে হইলে বাঙ্গালীর যে কুলাইবার উপায় নাই। দারুণ অভাব-গ্রস্ত বাঙ্গালীর মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ইহারই অঙ্গ।

স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, দার্জি-

লিংয়ে যক্ষারোগে মৃত্যু সংখ্যা বাঙ্গালীর সকল স্থান অপেক্ষা ১৯১৮ সালে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্জিলিং তো স্বাস্থ্য-গৌরবে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে প্রধান, সেখানে যে যক্ষারোগে এত বেশী মৃত্যু হইয়াছে, ইহা কি বাঙ্গালীর অর্থ কৃচ্ছতার পরিচায়ক নহে? দার্জিলিংয়ে থাকিতে হইলে বাঙ্গালীর সকল স্থান অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় হইয়া থাকে, অথচ চাকরি সূত্রে অনেক বাঙ্গালীর সেখানে অবস্থিতি না করিলে নয়। ফলে দার্জিলিং প্রবাসী অনেক বাঙ্গালীই উপার্জনের তুলনায় ব্যয়ের সংকুলান করিতে পারেন না। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশীর পরিণাম নিদারুণ হুশিষ্ঠা। দার্জিলিংয়ে যক্ষারোগের প্রাবল্য সেই নিদারুণ হুশিষ্ঠারই ফলসমুত্ত।

ঢাকা ও খুলনা জেলায় আয়হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যেও যে ঢাকা ও খুলনা জেলার আয়হত্যার ব্যাপারে অভাবের কারণ নাই, এমন কথাও বলা যায় না।

নদীয়া, বীৰভূম ও বাঁকুড়া জেলায় নিউ-মোনিয়া বোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জলপাইগুড়ি, রাজশাহি, ঢাকা, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া বর্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও যক্ষারোগে মৃত্যু-সংখ্যা কম নহে।

মফঃস্বলের সহরগুলিতে মৃত্যু সংখ্যা কিছু কম বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ডাঃ বেটলী বলিয়াছেন,—“মফঃস্বলের সহরগুলিতে যে মৃত্যুর সংখ্যা কম বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে, ঐ সমস্ত স্থানে মৃত্যু-সংখ্যা রেজেষ্টারি করার উপযুক্ত উপায় অবলম্বিত হয় না। মফঃস্বলের সহরগুলিতে

কলিকাতা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক  
মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

মফঃস্বলে কলের রুদ্ধ উপলক্ষে ডাঃ  
বেণ্টনী মফঃস্বলে পানীয় জলের অভাবের  
উল্লেখ করিয়াছেন । মাদারিপুর এবং নোয়া-  
খালির কথা এই প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করিয়া-  
ছেন । কিন্তু মাদারিপুর ও নোয়াখালি  
কেন, বাঙ্গালার অনেক পল্লীতেই এখন জল  
কষ্ট । সেকালের দীর্ঘিকা-পুঙ্খবর্ণী সকল  
সংস্রাবাভাবে তাজিয়া মজিয়া গিয়াছে, পশ্চিম  
বঙ্গ ভাগীরথির তীরে অবস্থিত হইলেও অনেক  
স্থানেই গ্রামের সান্নিধ্য হইতে ভাগীরথি বহু-  
দূরে সরিয়া গিয়াছেন । নদীয়ার শাস্তিপুরের  
কথা এই প্রসঙ্গে আমরা উপাধন করিতে  
পারি । বর্ত্তমান সময়ে শাস্তিপুরের জন-  
সাধারণ যেখানে বাস করিয়া থাকেন, সেখান  
হইতে বহুদূরে গঙ্গার ঘাট অবস্থিত । শাস্তি-

পুরে সকল অধিবাসীই আর এই কারণে  
প্রতাহ, গঙ্গায়ান করিবদ্ধ অবসর পান না,  
অনেকেই গঙ্গাহীন স্থানের মত কপের জলে  
মানস্বৰ্ণ উপভোগ করিয়া থাকেন ।

ফল কথা পল্লীগামে জলকষ্ট যে নানা-  
রূপ রোগের কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।  
কলেরার কথা কেন, কলেরা, ম্যালেরিয়া,  
বসন্ত—অনেক রোগই পল্লীর জলকছুতা  
হইতে সংক্রামক হইয়া থাকে । কিন্তু ইহার  
জন্ত পল্লীবাসী জনসাধারণের চেষ্টাশীলতা  
কৈ ? সরকার বাহাদুর আমাদের জন্ত চিন্তা  
করিতেছেন বটে—কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা প্রসূত  
চেষ্টার সচিৎ যদি আমাদের সমবেত চেষ্টা  
মিলিত হয়, তাহা হইলে ইহার ফল যে  
শুভপ্রদ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।  
কিন্তু চেষ্টা করিবে কে ? আমরা যে নিদ্রিত ।

## বসন্তের প্রতিষেধক বিধি ।

—:~:—

সংপতি বাঙ্গালার অতুনেক স্থানেই বসন্ত  
রোগ দেখা দিয়াছে । কলিকাতায় ইহার  
প্রকোপ তো ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ।  
এ সময় দেশের লোক যদি নিম্নলিখিত নিয়ম-  
গুলি পালন করেন, তাহা হইলে বসন্তের  
আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিবেন ।

১। বসন্তের টীকা গ্রহণ যাহারা পূর্বে  
করিয়াছেন, তাহারা অবশ্য করিয়া আবারও  
লইবেন ।

২। প্রত্যহ পাঁচ সরিষার তৈল সর্সাদে  
উত্তমরূপে মর্দন করিবেন ।

৩। সর্সাদ শুচিতাবে থাকিবেন । বাড়ীর  
সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন ।  
প্রতাহ সকালে ও সন্ধ্যায় সকল ঘরে ধুলা  
দিবার ব্যবস্থা করিবেন । কখনো ময়লা  
পরিচ্ছন্ন ব্যবহার করিবেন না ।

৪। প্রতাহ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত  
একটি উচ্ছে এবং উহার বীচি তাজিয়া খাওয়ার

ব্যবস্থা করিবেন। পলতা এবং নিমপাতা ভাজা খাওয়া এ সময় বিশেষ উপকারী। উচ্চের স্থলে করোল উচ্চে হইলে আরও ভাল হয়।

৫। পটা এবং বাসি মাছ তো একে-বারেই খাইবেন না, তা' ছাড়া এ সময় মাছ খাওয়াটা তুলিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। কই, শিঙ্গা, মাগুর এবং জ্যোৎস্না মাছ এ সময় একেবারেই ত্যাগ করিবেন।

৬। মাংস বা ডিম খাওয়া একেবারে বন্ধ করিবেন। যাঁহা প্রত্যহ খাইয়া থাকেন, তাহা ভিন্ন গোলাও বা ঐরূপ গুরুপাক কোনো দ্রব্য এ সময় খাইবেন না।

৭। দোকান হইতে দ্রব্য কিনিয়া পান করা এ সময় কর্তব্য নহে। মংস্ত এবং দ্রুত হইতে ইহার উৎপত্তি আরম্ভ হয়, এজন্য দ্রুত খাঁটি ও বিশুদ্ধ কিনা, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া ব্যবহার করিবেন।

৮। দোকান হইতে তৈয়ারি চা কিনিয়া খাওয়া যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা অবশ্য করিয়া এ সময় উহা পরিত্যাগ করিবেন। ঐরূপ 'চা' হইতেও ইহার সংক্রমকতা আসিতে পারে।

৯। বাজারের খাবার সম্বন্ধেও যতটা পরিহার করিতে পারা যায়, ততটা মঙ্গল। খিয়েটার ও বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখার ক্ষমতা এ সময় একদিনও রাত্রি জাগরণ করিবেন না।

১০। হরীতকীর আঁটি ফুটা করিয়া অন্তর সাহায্যে পুত্রবোঁ দক্ষিণ হস্তে এবং মহিলাগণ বাম হস্তে ধারণ করিবেন। ইহা বসন্তের বিশেষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

১১। কাঁচা কটিকারীর মূল চারি আনা ও গোল মরিচ ৫টা একত্র শীতল জল সহ বাটিয়া সপ্তাহে ২দিন করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবেন। এ মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের। শিশুদের মাত্রা ঐ অনুযায়ী বিবেচনা করিয়া লইবেন।

১২। বৈকাল বেলা মোচার রস দ্বারা খেত চন্দন পেষণ করিয়া কিম্বা বাসকের রস অথবা মধুদ্বারা যষ্টিমধু পেষণ করিয়া সপ্তাহে ঐরূপ ২দিন করিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

১৩। খেত পুনর্বার মূল চূর্ণ এক আনা ও গোল মরিচের খুঁড়া এক আনা শীতল জল সহ মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালে সেবন করিলে বসন্ত পীড়া হইতে পারে না।

১৪। তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস—এই কয়টি দ্রব্যের পাতার ওজন ১/১০, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া—এই কাথ অতি সপ্তাহে ১দিন করিয়া পান করিলে কখনই বসন্ত হইবে না।

১৫। হিফেশাকের রস মধ্যে মধ্যে পান করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা খেত চন্দন দ্বারা সহিত মিশাইয়া—সেবনে কখনই বসন্তের আক্রমণ হইতে পারে না।

১৬। নিম্ব ও বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা—শীতল জলে পেষণ করিয়া অতি সপ্তাহে পান করিলেও বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করিতে পারি।

## মুষ্টিযোগ ও টোটকা ঔষধ ।

—:—

কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠ বিহারী গোস্বামী, ভিষগাচার্য ।

**অম্লজনিত শূল রোগের মর্হো—**  
মুখ ।—(১) ফুলখড়িচূর্ণ ২০ তোলা, ফট-  
কির চূর্ণ ৪ তোলা, সোরা চূর্ণ ৪ তোলা  
মৌরী চূর্ণ ২ তোলা, কাবাব চিনি চূর্ণ ২  
তোলা, সারিকার চূর্ণ ২ তোলা ও কর্পূর চূর্ণ  
১ তোলা—এই সমস্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া  
বহুক্ষণ মাড়িয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে।  
ইহার দুই আনা বা তিন আনা মাত্রায় শীতল  
জল সহ সেবন করিলে অম্লজনিত শূল রোগ  
নিবারিত হয়। (২) পরিকার সোরা ৮ তোলা  
ও পরিকার ফটকির ২ তোলা পৃথক পৃথক  
চূর্ণ করিয়া পরে মিশ্রিত করিবে ১ তংপর  
আগুন গলাইয়া চটি প্রস্তুত করিয়া লইবে।  
ঐ চটি ৫ তোলা চূর্ণ করিয়া তাহাতে সৈন্ধব  
লবণ চূর্ণ ২১০ ফোলা ও জোয়ান চূর্ণ ২১০  
তোলা দিয়া একত্র মিশাইয়া রাখিবে। ইহার  
তিন আনা বা চারি আনা মাত্রায় শীতল জল  
সহ সেবন করিলে অতি কঠিন অম্লশূল নিশ্চয়  
ভাল হয়।

**অজীর্ণ নিবারণের উপায় ।—**

(১) জোয়ান চূর্ণ ১০ আনা সৈন্ধব লবণ ১০  
আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল জল সহ  
সেবন করিলে অজীর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। (২)  
দুই তোলা পরিকার মৌরী আধ পোয়া জলে  
২ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে  
২ তোলা পরিকার চুণের জল ও আধ তোলা

কাগজী লেবুর রস মিশাইয়া ৩৪ বারে পান  
করিলে অতিসত্ত্ব উপশমিত হয়। (৩) মুখা,  
আমরুল শাক ও পাথরকুটির পাতা একত্র  
ছেঁচিয়া পোড়াইয়া রস নিংড়াইয়া লইবে, এই  
রস এক কাচ্চা মাত্রায় একটু সৈন্ধব লবণের  
সহিত ২১৩ বার সেবন করিলে অজীর্ণ দোষ  
নিবারিত হয়। (৪) হিং, শুঠ, পিপ্পল,  
মরিচ ও সৈন্ধব একত্র বাটীয়া পেটে প্রলেপ  
দিয়া নিদ্রা গেলে সকল প্রকার অজীর্ণ প্রশ-  
মিত হয়।

**আমাশয় রোগে ব্যবস্থা ।—**

আমরুলের পাতার রস সকালে আধ ছটাক  
ও সন্ধ্যায় অর্ধ ছটাক কিঞ্চিৎ মধু সহ পান  
করিলে আমাশয় রোগ ভাল হয়। (২) পাকা  
ঠেঁতুল পাতা, বুড়ীপানের পাতা, খনকুড়ির  
পাতা, কয়েদবেলের পাতা ও দাড়িম পাতা  
একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া রস নিংড়াইয়া সেই  
রস আধ ছটাক পরিমাণে খাইলে নিশ্চয়  
আমাশয় রোগ ভাল হয়। (৩) কাঁটানটের  
শিকড় আধ তোলা, জলের সঙ্গে বাটীয়া শীতল  
জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ৩ ছুট পরি-  
মাণ মরিচের শুঁড়া মিশাইয়া দিবলে ৩৪  
বার সেবন করিলে শীঘ্র আমাশয় রোগে  
আরোগ্য হয়।

**একশিরার মর্হোষধ ।—**

ফেদার লোম ১ কাপাল তুলার বীজ—সন্ধ্যায়

ভাগে লইয়া একত্র হামামদিস্তায় কুটিতে কুটিতে রুটীর মত লইয়া আসিলে তদ্বারা রক্তিত কোষ জড়াইয়া উপরের দিকে টানিয়া রাখিয়া রাখিতে হইবে। ৪।৫ দিন বাধিলেই একশিরার টম্টনানি বা যন্ত্রণা এবং ফুলার শাস্তি হইবে। (২) হরীতকী চূর্ণ ১২ রতি, মৈন্ধব লবণ চূর্ণ ৬ রতি ও পিপ্পল চূর্ণ ৩ রতি একত্রে মিশাইয়া গরম জল সহ প্রতিদিন রাত্রিতে শয়নকালে খাইলে সকল প্রকার কোষ বৃদ্ধি করিয়া যায়।

দাঁত ভাল রাখিবার উপায়।— হরীতকী চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ, কর্পূর চূর্ণ, ফটিকরি চূর্ণ, দারুচিনি চূর্ণ, দোস্তা তামাক চূর্ণ, জগারি চূর্ণ ও তুঁতে ভয় প্রত্যেক ১ তোলা এবং ফুলখড়ি চূর্ণ ৮ তোলা এই সমস্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া রাখিয়া দিবে। এই চূর্ণ দিয়া প্রত্যহ দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইলে দাঁতের সমস্ত রোগ আরোগ্য হইয়া দন্তমূল দিন দিন দৃঢ় হইতে থাকে।

## শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন।

প্লীহা ও বন্ধুতরোগে।—(১) গুলঞ্চ ও খাঁড়িলবণ সমানভাগে লইয়া গোমুত্রে পেষণ করিয়া শিশুর প্লীহা ও বন্ধুত রোগে প্রলেপ দিলে উপকার হইয়া থাকে। (২) নীল ও আমের আঁটির শাস সমানভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া গথম করিয়া অন্ন অন্ন গরম থাকিতে বন্ধুতের উপর প্রলেপ দিলে প্লীহা ও বন্ধুতে উপকার দর্শে। (৩) পটোলের মূল পেষণ করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও প্লীহা ও বন্ধুত রোগে সফল পাওয়া যায়। (৪) পিপ্পল ও যবক্ষার প্রত্যেকটি ১ রতি মাত্রায় গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ কালমেঘের রস ও মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করাইলে শিশুদিগের প্লীহা ও বন্ধুত সংযুক্ত রোগ ও

শেথ রোগ আরোগ্য হয়। (৫) ক্ষেত্বেপাণ্ডার রস এক ঝিলুক ও মধু ৩।৪ কোঁটা—একত্র মিশাইয়া প্লীহা ও বন্ধুত সংযুক্ত রোগে শিশুদিগকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। (৬) নিশাদল চূর্ণ ১ রতি ও ফটিকরি চূর্ণ সিকি রতি—দুই ঝিলুক পটোল পাতার রস ও কিঞ্চিৎ মিছরি—একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ ২ বার করিয়া সেবন করাইলে শিশুদিগের বন্ধুত ভজ চক্ষু ও পদাদির হরিস্রাবণ প্রাপ্তি ও হাত পা ফুলা আরোগ্য হয়।

রক্তমাশয়ে।—(১) গরু ভাহুলিয়ার পাতার রস ১ ঝিলুক, লোখকাঠি \* চূর্ণ ১ রতি ও মধু ২।৪ কোঁটা—একত্র মিশাইয়া

\* লোখ কাঠি বাছারে বেণের লোখালে পাওয়া যায়।

তিন দিবস পান করাইলে শিশুদিগের প্রবল রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। (২) ছাগী দুধ এক ছটাক, জল অর্দ্ধসের, মুখা ৪টি ও বেল গুঠ এক টুকরা—একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে রক্তা-নাশর জনিত বেদনা দূরীভূত হয়। (৩) মাকাপূনার গুড়া অর্দ্ধ রতি ও গুড় এক অনা—কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে বাগকদিগের আমরক্ত জনিত বেদনা নিবারিত হয়।

**আমাতিসারে।**—(১) বিড়ঙ্গ, ঘোমান ও পিপূল—প্রত্যেকটি ১ রতি লইয়া গরম জলে সহিত সেবন করাইলে শিশুর আমাতি-সার নষ্ট হয়। (২) বটের মূল পেষণ করিয়া ১০০ পোয়া জল সহ পান করাইলে শিশু-দিগের প্রবল মতিসার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

**স্তুত্বপান জনিত বমন ও হিক্কায়।**

(১) চিনি, মধু ও টাবালেবুর রস একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে উপকার দর্শে।

(২) বেলগুঠ ও জামের আঁটির শাঁস প্রত্যেকটি আধতোলা হিসাবে লইয়া এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া, তাহাতে চিনি ও খই চূর্ণ মিশাইয়া—একু বিহুক এক বিহুক করিয়া ৩৪ বার পান করাইলে সত্ত্বর উপকার পাওয়া যায়। (৩) পিপুলের গুড়া, মরিচের গুড়া, চিনি ও মধু—এই কয়টি দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় টাবা-লেবুর রসের সহিত সেবন করাইলেও শিশু-দিগের স্তুত্বপানের পর বমন ও হিক্কা হইলে ফল পাওয়া যায়।

**অজীর্ণে।**—(১) ইসবগুল ৪ রতি ও মিছরি ২ রতি কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত ভিজাইয়া প্রাতে অর্দ্ধেকটা ও বৈকালে অর্দ্ধেকটা সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিলে শিশুদিগের নাভিমূলের অত্যন্ত বয়নাগর সহিত পুনঃ পুনঃ অন্ন পরিমিত মল নিঃসৃত হওয়া বন্ধ হয়। বেলগুঠ—জলের সহিত ঘসিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশু-দিগের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

## \* খাদ্য ও স্বাস্থ্য।

(ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু)

“আমাদের খাদ্যের মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ আছে। (১) ছানা জাতীয়, (২) মাংসপদার্থ থাকা আবশ্যিক। দুধ প্রকৃতিসত্ত্বে মাখন জাতীয়, (৩) শর্করা জাতীয়, (৪) লবণ পূর্ণ আদর্শ খাদ্য—দুধের মধ্যে পাঁচ জাতীয়, জাতীয়, (৫) জলীয়। সুতরাং দুধের মধ্যে

শাণ্ডিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব সভার বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় “খাদ্য ও স্বাস্থ্য” সন্ধানে যে উপদেশ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, “শাণ্ডিনিকেতন” পত্রিকা হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল।

যে সব সার পদার্থ আছে, শরীর পোষণের জন্ত তাহাদেরই প্রয়োজন ।

কিন্তু দুধ সুলভ নহে ও ক্রমাগত থাকিলে একবেয়ে হইয়া উঠে, সুতরাং আমাদের ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, তরিতরকারী, ফলমূল প্রভৃতি নানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য হইতে এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় । সকল খাদ্যে এই পাঁচ জাতীয় পদার্থ একত্রে বা উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না । এই ভিন্ন জাতীয় সার পদার্থগুলির ক্রিয়া একরূপ নহে, ছানা জাতীয় খাদ্য দ্বারা শরীরের গঠন-কার্য হয় মাখন বা শর্করা জাতীয় পদার্থ শরীর গঠন সম্বন্ধে কোনও সহায়তা করে না । এই শেফাল্য পদার্থ দুইটা দ্বারা আমরা তাপ ও কার্য করিবার শক্তি আহরণ করিয়া থাকি ।

বাংলা দেশে আগে মাছ ও দুধ প্রচুর পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন আর তেমন পাওয়া যায় না । সম্প্রতি, বাঙালী জাতির খাদ্যে ছানা জাতীয় পদার্থ খুব কম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । সেই জন্ত ছাত্রদের মধ্যে যথোচিত শারীরিক বিকাশ ও পূর্ণতা লক্ষিত হয় না ।

দেশের অবস্থা ভাল নহে, দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি দুখুলা, সুতরাং ছানা জাতীয় পদার্থ থাকিতে হইলে ডাল আমাদের প্রধান খাদ্য করিতে হইবে । মাছ মাংস অপেক্ষা ডালে ছানা জাতীয় পদার্থ অধিক,—সারবান এবং উপরন্তু সত্তা । ডাল সহজে পরিপাক হয় না, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা । ডাল রীতিমত সুস্বাদু হইলে, তাহার মধ্যে একটাও বীটি থাকিবে না, কীরের মত ঘন হইবে, উহার জলীয় ভাগ আলাদা হইয়া থাকিবে না ।

ডাল একটু বেশী পরিমাণে থাকিলে আমাদের

খাদ্যে ছানা জাতীয়ের যে অভাব আছে, তাহা পূরণ হইয়া যায় । ডাল ভাত অপেক্ষা ডাল রুটি অধিক পুষ্টিকর খাদ্য । একবেলা ভাত ও একবেলা রুটি খাইলেও ছানা জাতীয় খাদ্যের অভাব অনেকটা দূর হয়, কেননা, ভাত অপেক্ষা রুটিতে দ্বিগুণ ছানা জাতীয় পদার্থ বেশী । ( শতকরা ৮০ ভাগ ), ছানা জাতীয় পদার্থ মোটে ৬ ভাগ, এবং মাখন জাতীয় পদার্থ ১ ভাগের অধিক থাকে না, সুতরাং চাউল যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য নয় । চাউলে একে ত সার পদার্থ এত কম, তাব উপর আবার ফেন ফেলিয়া দিলে ইহা আরো অসার হইয়া পড়ে । আমাদের এই গরীব দেশে এরূপ অপচয় একান্ত দোষাবহ । দুই একদিন অভ্যাস করিলেই যে পরিমাণ জল চাউল সুস্বাদু করিবার জন্ত প্রয়োজন, তাহা আমরা স্থির করিয়া লইতে পারি এবং সেই পরিমাণ জল দিয়া ভাত প্রস্তুত হইলে ফেন ভাতের মধ্যেই থাকিয়া যায় । আমাদের দেশের মেয়েরা এই দিকে দৃষ্টি দিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হয় ।

ভাত অপেক্ষা খিচুড়ি অধিক সারবান । ইহা ডাল ও ঘি সহযোগে রান্না হয় বলিয়া ইহার মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থই যথোচিত পরিমাণে থাকে । ভাতের বদলে মাঝে মাঝে খিচুড়ি খাওয়া উচিত ।

ভাত—চালে শরীর-পোষণোপযোগী সার পদার্থ আছে, কিন্তু গম প্রভৃতি অপেক্ষা কম । ইহা হজমের পক্ষে উৎকৃষ্ট । আমরা দৌল-তার-বশে নাজা ধ্বংসে পরিহার্য চালের পক্ষপাতী, কিন্তু যাদের ত্বকের নীচের আচ্ছাদনের ভিতর যে একটা সার পদার্থ থাকে ( vitamin ) ছাড়া চালে তাহা কম থাকে ।



ইহা স্বাস্থ্যরক্ষার অন্তরায়। বেরিবেরি প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব কালে ইতর প্রাণীকে এই ছাপ্রকারের চাল দিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাঁটা চাল খাওয়ার তাহাদিগকে রোগে ধরিয়াছে। সুতরাং ধ্বংসে পরিষ্কার চাল খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। চাল থেকে প্রস্তুত জলখাবার যথা—খৈ, চিড়ে, মুড়ি। এই তিনটাই বেশ সুপাচ্য। মুড়ি শ্রমজীবীদের দুবেলাকার খাদ্য—ইহা সুপাচ্য ও ভাতের চেয়ে সারিবান্, অথচ অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সব রকমের সার পদার্থ নাই, তাই ইহার সঙ্গে ছোলা বা মটর এবং নারিকেল মিলাইয়া খাইবে। এই তিনের সমন্বয়ে অতি উত্তম খাদ্য হয়। ছোলা বা মটর, ডালের কাজ করে অর্থাৎ ছানা জাতীয় জিনিসের অভাব পূর্ণ করে। নারিকেল অতিশয় মেহযুক্ত জিনিস, ইহা মাখন জাতীয় জিনিসের কাজ করে।

ময়দা—ময়দার কটা ভাতের ত্রিগুণ সারিবান্, কারণ নাইট্রোজেন ময়দায় শতকরা ১০ ভাগ আর ভাতে ৫ ভাগ। কলে পেচা ময়দা ময়দার ছানা ও ভুবি বাদ যাওয়াতে ইহার সাবভাগ কমিয়া যায়। তাই আটার কটা খাইবে। জঁতা-ভাঙা খাঁটি আটা কিনিবে—অনেক সময়ে ভুবি মিশানো ময়দা আটা বলিয়া চালানো হয়। আটার কটা স্বাদু ও উপকারী এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। হাতে গড়া কটা ভাবরূপে তৈরী না হইলে তাহার যেতসার পদার্থ ভালরূপে অম্লিগুণ হয় না, ইহাতে হজমের ব্যাঘাত করে। ভাল সেক নেওয়া পাউরুটিতে এবং নুটিতে এই দোষ থাকিয়া থাকিবার ভয় নাই, সুতরাং এ দুটিও ভাল খাদ্য এবং সুপাচ্য। কিন্তু নুটি বেশী দ্রব্যত্ব হইলে বেহজমী হয়, ইহা হুলসেব লোকদের অসুপাচ্য।

ডাল—ময়ুরীর ডাল সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে ছানা শতকরা ২৫ ভাগ আছে। মুগ ও ও ছোলায় ইহা অপেক্ষা সার ভাগ অল্প। মুগের ডাল অতি উত্তম। অড়হর ডালের ব্যবহার পশ্চিমে খুব চলিত আছে। ইহাতে ছানা জাতীয় অংশ অপেক্ষাকৃত কম আছে বটে, কিন্তু তেমনি তাহা উদর অগ্ন্যায়সে আশ্বাসাৎ কঠিতে পারে।

দুধ—ডাল দুধ প্রকৃতিদত্ত আদর্শ খাদ্য কিন্তু ইহা খাঁটি অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া দুস্কর। ভেজাল শর্ধাও অনেক সময় মিশ্রিত হয়। সজল দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব খাঁটি দুধের সমান করিবার জন্য তাহাতে কিছু চিনি ফেলিয়া ব্যবসায়ী লোকে ক্রেতার চোখে ধূলা দেয়।

দই—ইহা দুধের বিকার হইলেও দুধের অল্প সকল উপাদান ইহাতে আছে, কেবল চিনি নাই। দইয়ের মধ্যে যে কীটোত্তর ক্রিয়ার দুধ হইতে দই প্রস্তুত হয়, তাহারাই জঠরের অনিষ্টকর বীজাণু মারিয়া ফেলে। অতঃপর এই সকল বীজাণুই রক্ত বিধাক্ত করে ও অকাল-বার্দ্ধক্যের হেতু হয়। বাহীদের বাড়ীতে দুধের অভাব নাই তাদের দুধের কিছু অংশ দইয়ের আকারে খাওয়া ভাল। ঘোল বিশেষ উপকারী। ইহা সরবতের স্থায় পানীয়। সকালে খাবারের পর খাইলে বিশেষ উপকার হয়। আজকাল রোগীকে ঘোল খাওয়ানো হয়।

ছানা—ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট সারিবান্ খাদ্য। মাছ ও মাংসে যে ছানা জাতীয় পদার্থ থাকে, অনেক সময়ে তাহা দ্রবীভূত হয়। কিন্তু ছানায় এই দোষ ঘটে না।

মাংস—ইহা সুপাচ্য ও পুষ্টিকর বটে, কিন্তু বিকৃত হইলে পরম অনিষ্টকর। খাদ্য

পশুটির নীরোগ হওয়া দরকার, বড় বড় সহরে  
• ইহা পরীক্ষা করিবায় ব্যবস্থা আছে। বেশী  
মাংস খাইলে শরীরে ইয়ুরিক এসিড জন্মাইয়া  
বাত প্রকৃতি রোগ ঘটে। তাই যুরোপীয়দের  
এই রোগ অতি প্রবল। তা ছাড়া “টোমেন”  
নামক এক প্রকার তীব্র বিষ অনেক সময়ে  
অন্ন পচা মাংসেও জন্মে। এই প্রকার মাংস  
আহার করা ভয়ানক বিপজ্জনক।

ডিম—অতি সারবান খাদ্য। ইহাতে  
ছানা প্রায় ১৪ ভাগ, মাখন ১৮ ভাগ আছে।  
ইহা পূর্বা সিন্ধু করিয়া খাইলে হজম হইতে  
প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। অল্পসিন্ধু ডিম দেড়  
ঘণ্টায় হজম হয়।

মাছ—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু বেশী  
তৈলযুক্ত মাছ হজমের পক্ষে বিঘ্নকর ও উত্তে-  
জনাঞ্জনক হয়। পচিবীর উপক্রম হইলে সে  
মাছ পরিত্যজ্য।

দুগ্ধ, তৈল—এই দুটা দেহের অত্যন্ত  
আবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী। কিন্তু যত্নে অনেক  
বীভৎস ও অপথ্য পদার্থের ভেজাল থাকে  
এবং তাহা মহার্ঘ। যত্নের অভাব খাটা  
তেলে পূরণ করা যায়। মাস্তাজ তিল তৈল  
এবং নারিকেল তৈল ঘিয়ের বদলে ব্যবহৃত  
হয়। ইহা ছাড়া চিনি বাদামের তৈলও  
ব্যবহার করা গাইতে পারে। এই সব তৈল  
অনিষ্টকর নহে এবং ঘিয়ের চেয়ে অন্ন একটু  
নিকৃষ্ট হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য।

তরিতরকারী—উহার মধ্যে আলু  
সর্বোৎকৃষ্ট ও সুখরোচক তরকারী। ইহাতে  
জল ৮০ ভাগ আর খেতসার ২০ ভাগ। খোসা  
ছাড়াইয়া খাইলে ইহার সার ভাগ অনেকটা

কমিয়া যায়। আলু সিন্ধু হইবার পর তাহার  
খোসা তুলিয়া লইলে সারভাগ এত নষ্ট না।  
অধিকাংশ তরিতরকারীতেই জল-ভাগ খুব  
বেশী। কিন্তু তরকারী শরীর পোষণের জন্য  
প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে যে লাবণিক পদার্থ  
আছে, তাহা রক্ত পরিষ্কার করে। ফলেও  
সেই উপকার হয়। তরিতরকারী কেঁচু-  
তার নিবারক। রান্দা আলুতে চিনি জাতীয়  
পদার্থ ও খেতসার থাকিতে বেশ উপকারী  
খাদ্য। কড়াইসুটি, বরবটি, সিম প্রভৃতি  
সুটিজাতীয় তরকারী ডালের মতই উপকারী।  
কাঠালের বীজে ছানা জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট  
আছে—এই হিসাবে ইহা গমের চেয়েও  
সারবান।

চিনাবাদাম—এখানে চিনাবাদামের চাষ  
হইতেছে গুনিয়া সুখী হইলাম। ইহার চাষ  
আরও বেশী পরিমাণে করিলে ছেলের  
জলখাবুরের জন্য ইহার ব্যবহার হইতে পারে।  
চিনাবাদাম অধিক খাইলে ইহার তৈল জাতীয়  
জিনিষটা অপকার করে। ইহাতে ছানা  
পদার্থ শতকরা ২৬ ভাগ ও তৈল পদার্থ ৪৩  
ভাগ আছে।

উপসংহারে বক্তব্য—আহার্য্য ধীরে  
ধীরে উত্তমরূপে চর্কণ করিয়া খাইবে।  
পরিপাক যন্ত্রের কাজ সুখ হইতে আরম্ভ হয়।  
দাঁতকে তাহার কর্তব্য সাধন করিতে দেওয়া  
চাই—খাবার অতি সুন্দর হইয়া উদরে যাওয়া  
প্রয়োজন এবং মুখের লালতা উহার সহিত  
মিশ্রিত হওয়া দরকার। এই লালতা খাবার  
খেতপারকে চিনিতে পরিণত করে।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৪র্থ বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—ফাল্গুন ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

শাস্ত্রীয় বিদ্যা ।

অস্থি পরিচয় ।

(পূর্বায়ত্তি)

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এস, এম, এম ।

অস্থি ও অস্থির কার্য ।

শরীরভুক্ত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমে অস্থির বিবরণ অবগত হওয়া আবশ্যক । —কেননা অস্থি সমূহকে অবলম্বন করিয়াই শরীর অবস্থিত আছে । শাস্ত্রে কথিত হই-  
য়াছে যে, “বৃক্ষ ধ্বংস অত্যন্তরূপে সারকে  
আশ্রয় করিয়া অবস্থিত করে, দেহীদিগের  
দেহও সেইরূপ অস্থিসারকে আশ্রয় করিয়া  
অবস্থিত । এই অস্ত্র দেহীদিগের শব্দ, মাংস  
প্রভৃতি নীচ বিনষ্ট হইলেও গায় স্বরূপ অস্থি  
সকল সহজে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ।”\*

\* “অত্যন্তরূপে গঠিত শরীরেও ভিত্তি ভূমিতে ।

অস্থিরেত্তথা দেহা ত্রিরূপে দেহিনাঃ প্রবৃ ।

তদাচ্চিরবিনষ্টেবু স্বদ্যাসেবু শরীরিণাম্ ।

অরানি ন বিনশন্তি সারগ্যক্রান্তি হেহিরাম্ ।”

হৃদয়, শরীরস্থান, ও অস্থির ।

অগিচ, অস্থি সকল যত্নতরূপে বোধোচিত  
আকার বিশিষ্ট করে । অস্থি না থাকিলে  
বহুস্তর আকারে গ্রহণ হইত না, একটা কদা-  
কার মাংসপিণ্ড হইয়া ভূমিতে গড়াইয়া বেড়া-  
ইত । শরীরাত্তরূপে হৃদয়বল বহুগুলিও  
অস্থির আবরণে সজ্জিত হয় । বলা, যত্নতরূপে  
অস্থি সকল শরীরের নিত্যই প্রয়োজনীয় অংশ  
যত্নতরূপে এবং বক্ষঃস্থলের অস্থি সকল হৃদয়,  
হৃৎস্পন্দ প্রভৃতি যত্নতরূপে রক্ষা করে । হৃৎস্পন্দ  
শরীরের প্রধান যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করে অস্থির  
অন্ততরূপে কার্য । তন্নিমিত্ত অস্থি সমূহ হইয়াই  
পেশী সমূহ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের নানা  
প্রকার গতি উৎপন্ন করে ।

অস্থির উপাদান । অস্থি দুই

প্রকার উপাদানে নিৰ্মিত—পার্শ্বিক ও অভ্যন্তর ।

পার্শ্বিক উপাদানের প্রায় সমস্ত অংশই হৃৎস্পন্দ

জাতব উপাদানের অধিকাংশ শণের দ্বারা সূক্ষ্ম তন্তু বা স্নায়ু। স্নায়ু নির্মিত কাটাঘোর মধ্যে পার্শ্ব উপাদান সংহত হইয়া অস্থি সমূহ গঠিত হয়।

**উপাদানের বিবিধ সংযোগ।** অস্থির উপাদানের সংযোগ দুই প্রকার, যথা ঘনসংযোগ এবং সচ্ছিন্ন (কোঁপরা) সংযোগ\*। সমস্ত অস্থির বিশেষতঃ নলকাস্থির কাণ্ডের বহির্ভাগে ঘনসংযোগ দেখা যায়। ক্ষুদ্র অস্থি সমূহের ও কপালস্থির অভ্যন্তর ভাগে এবং নলকাস্থির প্রান্তভাগে সচ্ছিন্ন সংযোগ দৃষ্ট হয়।

**বয়স ভেদে উপাদানের তারতম্য।** বয়স ভেদে অস্থির উপাদানের যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। কম বয়সে অস্থিতে জাতব উপাদান অধিক থাকে। জাতব উপাদান কোমল এবং সহজে ভাঙে না। এইজন্য বালাকালে অস্থিতে আঘাত লাগিলে উহা শীঘ্র ভাঙিয়া যায় না, নষ্ট হইয়া যায়। ভাঙিলেও কাঁচা গাছের ডালের মত অংশতঃ ভাঙে এবং সহজে জোড়া লাগে। বয়স যত অধিক হয়, অস্থির জাতব উপাদান ততই কমিয়া যায় এবং পার্শ্ব উপাদান বাড়িতে থাকে। ক্রমে বৃদ্ধবয়সে পার্শ্ব উপাদান অত্যন্ত অধিক এবং জাতব উপাদান অত্যন্ত কম হইয়া যায়। পার্শ্ব উপাদান কঠিন, কিন্তু ভঙ্গ প্রবণ। এইজন্য বৃদ্ধ বয়সে অস্থিতে আঘাত লাগিলে উহা সহজেই ভাঙিয়া যায় এবং ভাঙিলে শীঘ্র জোড়া লাগে না।

\* ঘন সংযোগ—Compact tissue—(কম্প্যাকট টিস্যু)। সচ্ছিন্ন সংযোগ—Cancellous tissue—(ক্যান্সেলস টিস্যু)।

পরে যে তরুণাস্থির বিষয় কথিত হইবে, তাহাতে জাতব উপাদানই অধিক থাকে। তরুণাস্থির অস্থিসমূহ প্রথমে তরুণাস্থিরূপে উৎপন্ন হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত পার্শ্ব উপাদানের সন্ধানে উহা ক্রমে কঠিন অস্থিতে পরিণত হয়।

**অস্থির আবরণ।** বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে অস্থির আবরণ দুই প্রকার। তন্মধ্যে যে আবরণ অস্থির বহির্ভাগ আবৃত করিয়া থাকে, তাহাকে অস্থির কলা+ বলা যায়। উহা অস্থির জীবন স্বরূপ; কারণ, এই কলা বা পর্দা অচল হইলে সেই অস্থি বা অস্থির সেই অংশ নষ্ট হইয়া যায়। আব অস্থির যে আবরণ অস্থির ভিতরে মধ্যবর্তী ছিদ্রপথকে বেঠেন করিয়া অবস্থিত করে, তাহাকে অভ্যন্তর আবরণ বলা যায়। অস্থির ছিদ্রমধ্যে মজ্জা থাকে বলিয়া উক্ত আবরণের নাম মজ্জাকলা।

অস্থির মধ্যে যে মজ্জা থাকে তাহা দুই প্রকার,—এক প্রকার রক্তবর্ণ, অল্প প্রকার পীতবর্ণ। দীর্ঘ অস্থিসমূহের নলকাংশের মধ্যে পীতবর্ণ মজ্জা থাকে। দীর্ঘ অস্থির উভয় প্রান্তে, ক্ষুদ্র অস্থির ভিতরে এবং অভ্যন্তর অস্থির স্পঞ্জের দ্বারা বহুচ্ছিন্ন বিশিষ্ট অংশে রক্তবর্ণ মজ্জা থাকে।

**অস্থির প্রকার ভেদ।** শরীরের যেখানে যেরূপ আবৃত্তক, অস্থি সকল সেইস্থানে সেইরূপ আকারে অবস্থিত। সুস্পষ্ট মতে—আকার ভেদে অস্থি সকল পাঁচ ভাগে

+ অস্থির কলা—Periosteum—(পেরিস্টেটিয়াম)।

বিভক্ত; যথা—কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় এবং নলক। কপালের (খাপরার) ভ্রায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া মস্তকের অস্থিগুলিকে **কপালাস্থি** বলে। রুচক অর্থাৎ চির-দীর্ঘ দাঁতের ভ্রায় বলিয়া দন্তগুলিকে **রুচকাস্থি** বলে। অস্থির তরুণ অবস্থার ভ্রায় (দুশশরীরে ধেরূপ থাকে সেইরূপ) আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি স্থানের কোমল অস্থিকে **তরুণাস্থি** বলে। বলয় অর্থাৎ প্রায় বালায় ভ্রায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া পাখ, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের অস্থিকে **বলয়স্বাস্থি** বলে। নলের ভ্রায় দীর্ঘাকৃতি বলিয়া বাহু, সন্ধি ও অঙ্গুলির অস্থিগুলিকে **নলকাস্থি** বলে।

এই সকল অস্থি ব্যতীত এরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র অস্থি আছে যে গুলিকে এই পাঁচ প্রকার অস্থির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ইহাদিগকে **বিশ্বমাস্থি** বলিতে পারা যায়\*। হস্ত, পদাদির সন্ধিস্থলে এইরূপ কয়েকটি অস্থি আছে।

**অস্থির সংখ্যা**—চরক, রাজবন্দ্য প্রভৃতি বেদবাদীদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিনশত বাট। সুশ্রুত, ভেল প্রভৃতি শল্য-তান্ত্রিকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিন শত। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা দুই শত বা দুই শত ছয়।

অস্থিসংখ্যা সম্বন্ধে পরস্পরের মত এইরূপ ভিন্ন বা বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত

পক্ষে সকল মতই সমীচীন; কেন না এইরূপ মতভেদ দুইটি কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম কারণ—গণনার প্রকার ভেদ। তরুণ অস্থি, নথ ও দন্ত সমূহকে চরকাদির মতে অস্থি বলিয়া গণনা করা হয়। সুশ্রুতাদি শল্য-তান্ত্রিকগণ তরুণ অস্থি এবং দন্ত সকলকে অস্থি বলিয়া গণনা করেন, কিন্তু নথের গণনা করেন না। পাশ্চাত্যগণ তরুণাস্থি, নথ ও দন্ত সমূহকে অস্থি বলিয়া গণনা করেন না।

দ্বিতীয় কারণ—পৃথক্ বয়সে অস্থি গণনা। এই ক্ষেত্রে অনেকটা মতভেদ ঘটে। এক-দেবীয় শাস্ত্রকারগণ যৌবনের আরম্ভে অস্থির গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পাশ্চাত্যগণ পচিশ বৎসর বয়স্ক অথবা প্রৌঢ় ব্যক্তির শরীরের অস্থি গণনা করিয়া থাকেন। বাল্যকালে বা যৌবনের আরম্ভে কতকগুলি অস্থির অবয়ব পৃথক্ থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে সেইগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া এক একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রে সংখ্যার পার্থক্য ঘটে।

আমরা প্রৌঢ় শরীরে প্রত্যেকটি অস্থির সংখ্যা ধরিয়া অস্থির বর্ণনা করিব। তরুণাস্থি, দন্ত ও নথের সংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হইবে না, কারণ তরুণাস্থি সমূহের সংখ্যা কণ্ঠনালী (খাসপথ) প্রকৃতি অনেক স্থানে অনিশ্চিত এবং উৎপত্তিক্রম ধরিয়া বিচার করিলে নথ ও দন্ত সকল যেকোন কঠিন পরিণতি লাভ।

## অস্থি গণনা।

**শাল্যাস্থি**—প্রত্যেক গুহের এক এক অস্থিতে তিন তিন খানি এবং পাদ্যাস্থি

\*. নলকাস্থি—Long bones (জং বোন্স)।

কপালাস্থি—Flat bones (ফ্লাট বোন্স)।

পাখি—Cartilage (কার্টিলাজ)। বিশ্বমাস্থি—

Irregular bones—(ইরেগুলার বোন্স)।

হুইখানি—এইরূপে পদাঙ্গুলি সমূহে মোট চৌদ্দখানি এবং পাঁচটা পদাঙ্গুলির মূলে পাঁচখানি অস্থি আছে। পদের পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ জন্বা ও পদের সন্ধির নিম্নে সাতখানি ছোট ছোট অস্থি আছে। জন্বায় দুই খানি, উরুতে একখানি এবং উরু ও জন্বাব সন্ধিস্থলে আঙ্গুতে একখানি অস্থি আছে। এইরূপে প্রত্যেক সন্ধিতে ত্রিশখানি করিয়া দুই সন্ধিতে মোট বাটখানি অস্থি আছে।

পদাঙ্গুলির ভ্রায় হস্তের অঙ্গুলি সমূহে চৌদ্দখানি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলির মূলে একখানি করিয়া পাঁচখানি শলাকা-অস্থি আছে। উদারের পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ মণিবন্ধসন্ধির নিম্নে কুজাকার আট খানি, এবং প্রকোষ্ঠে (নীচে হাতে) দুইখানি ও প্রগণ্ডে (উপর হাতে) একখানি দীর্ঘাকার অস্থি আছে। এইরূপে প্রত্যেক বাহতে ত্রিশ খানি করিয়া দুই বাহতে মোট বাটখানি অস্থি আছে।

অধ্যাশরীরের অস্থি—কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কটদেশ পর্যন্ত পৃষ্ঠবংশে (মেরুদেশে) চব্বিশ খানি অস্থি আছে এবং তাহার নিম্নে অর্থাৎ কটীর পশ্চাদ্ভাগে একখানি বৃহত্তর অস্থি আছে। এই বৃহত্তর অস্থির নিম্নে একখানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে; হস্তের পৃষ্ঠবংশের অস্থির সংখ্যা মোট দ্বাবিশ খানি।

কটীর সমুখ ও পার্শ্বভাগ—দুই দিক জুড়িয়া দুই খানি, বৃহৎ কপালাস্থি আছে।

বক্ষঃস্থলের অস্থি—একখানি, কণ্ঠের দুই দিকে দুই খানি, হৃৎকের পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠের উপর দুই দিকে দুই খানি এক পার্শ্বদেশে (পাঁজরায়) প্রত্যেক দিকে বার খানি

করিয়া দুই দিকে চব্বিশ খানি অস্থি আছে। এইরূপে মধ্য শরীরে আটায় খানি অস্থি গণনা করা যায়।

মস্তকের অস্থি—নীচের চোয়ালে একখানি, উপরের চোয়ালে দুইখানি, দুইগণ্ডে দুইখানি, তালুতে দুইখানি, দুই নাসিকার দুইখানি, নাসিকাধরের মধ্যস্থলে একখানি, দুই নাসিকার ভিত্তরে দুই পার্শ্বে দুইখানি, দুই চকুর দুই পার্শ্বে দুইখানি—এইরূপে চৌদ্দখানি অস্থি মস্তকের নিয়োগ বা মুখমণ্ডল নির্মাণ করে। মস্তকের উপরিভাগে সমুখ একখানি, পশ্চাতে একখানি, দুই পার্শ্বে দুইখানি, দুই শব্দদেশে (মগে) দুইখানি—এইরূপে ৪ খানি কপালাস্থি এবং নাসিকাধরের উর্দ্ধদেশে মধ্যস্থলে একখানি এবং এই সব অস্থিগুলির মধ্যস্থলে গলার ছাদ জুড়িয়া একখানি অস্থি আছে। এইরূপে মস্তকের অস্থির সংখ্যা বাইশখানি।

এইগুলির কর্ণের ছিন্নের মধ্যে প্রত্যেক কর্ণে তিনখানি করিয়া দুই কর্ণে ছয়খানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে। এই ছয়খানি অস্থি গণনা করিলে মস্তকের অস্থির সংখ্যা আটাত্তাখানি হয়। হস্তের এই হিসাবে সমগ্র শরীরের অস্থির সংখ্যা দুই শত ছয়খানি। কর্ণমধ্যস্থ ছয়খানি অস্থি গণনা না করিলে সমগ্র শরীরের অস্থির সংখ্যা দুই শত বহিরা নির্দেশ করা যায়।

অনেকের হস্তপাদায় কণ্ডার শেবভাগে ছোটসর ভ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি দেখা যায়। কিন্তু এই সকল অস্থির অস্তিত্ব অনিশ্চিত বলিয়া উদারের (সংখ্যা) গণনা করা হয় নাই।

ভ্রাতৃগণা—(Cartilage) কণ্ঠ

লক্ষ্য) — পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে তরুণ অস্থির সংখ্যা অস্থিগণনার মধ্যে ধরা হইবে না । দিগ্‌দর্শনের জন্য সংক্ষেপে তরুণ অস্থির বিষয় কথিত হইতেছে । হস্ত দ্বারা কর্ণপালি বা নাসিকার অগ্রভাগ টিপিলে ভিতরে যে একটা নাতিকঠিন পদার্থ অনুভব করা যায়, উহাই তরুণাস্থি । পৃষ্ঠবংশের অস্থিগুলির সংযোগ স্থলে, সচল সন্ধি সমূহের ভিতরে, পশ্চাদ্ভাগের সমুখভাগে, নাসিকার দুই-পার্শ্বে ও মধ্যস্থলে, কর্ণপালীতে, খাঁসনলীতে এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহে তরুণাস্থি দেখা যায় । চলিত কথায় তরুণাস্থিকে কুচ-কুচে হাড় বলে । তরুণাস্থিতে আবুভাগ অধিক এবং চুণের ভাগ অল্প থাকে । কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে অনেক তরুণাস্থি চুণের ভাগ অধিক হওয়ায় কঠিন হইয়া যায় ।

**অস্থিপ্রোক্ষেপ** — প্রত্যেক অস্থির বহির্ভাগে একটা বা একাধিক ছিদ্র দেখা যায় । ধমনী সকল ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া অস্থির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বহু হৃদয় শাখাপ্রাশাখাবিশিষ্ট হইয়া অস্থির হৃদয়স্থ হৃদয় প্রদেশে বিস্তৃত হয় । এই সকল ধমনী দ্বারা বিস্তৃত রক্ত আসিয়া সমগ্র অস্থির পোষণ করে । সারা সকলও হৃদয় শাখাপ্রাশাখায় বিভক্ত থাকিয়া অস্থির ভিতরে বিস্তৃত থাকে, ক্রমশঃ পরস্পর-মিশ্রিত হইয়া মূলভক্ত সিরাক্রমে অস্থির ছিদ্র দিয়া ‘বহির্গত’ হইয়া যায় । এই সকল সিয়া দ্বারা অবিস্তৃত রক্ত নির্গত হয় । ধমনীর রক্ত কোথা হইতকালে এসে এবং সিরাক্রম রক্ত কোথায় যায় — তাহা পরে বলা থাকিবে ।

### অস্থি বর্ণনা ।

ভিন্ন ভিন্ন অস্থির আকৃতি, সন্ধি, কার্য

এবং পেশীর সহিত সংযোগ প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে । অথচ এইরূপ বিস্তৃত বর্ণনা সাধারণ পাঠক এবং কায়-চিকিৎসক-দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে না । এইজন্য আমরা এস্থলে সংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন অস্থির বিষয় বর্ণনা করিব । প্রাচীন মতের অনুসরণ করিয়া প্রথমে পারের দিক হইতেই অস্থির বর্ণনা করা যাইতেছে ।

বর্ণনা বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ রাখা আবশ্যক ।

একটি নরকঙ্কাল দুইট হাত চিৎ করিয়া সোজা দাঁড়াইয়া আছে — ধরিয়া লইতে হইবে । উক্ত কঙ্কালের নাসিকাগ্র হইতে নাভির অগ্রভাগে নীচে উপরে বিস্তৃত একটা সরল রেখা টানিলে, সেই রেখা মধ্যরেখা নামে অভিহিত হয় । শরীরের যে অংশ এই মধ্যরেখার সমীপবর্তী তাহা অন্তঃসীমা এবং যে অংশ দূরবর্তী তাহা বহিঃসীমা বলিয়া কথিত হইবে । উক্ত ভাগ বলিলে পদ হইতে মস্তকের দিকে এবং অধোভাগ বলিলে মস্তক হইতে পদের দিকে বুঝিতে হইবে । সমুখ-ভাগ বলিলে বর্ণিত নরকঙ্কালের সমুখ ভাগ (যেমন করের সমুখ ভাগ) বলিলে রেখাঙ্কিত ভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ বলিলে তাহার বিপরীত ভাগ বুঝাইবে ।

### শাখাস্থি ।

**পাদাঙ্গুলির অস্থি** — পূর্বেই বলা হইয়াছে — যে, প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে কিক-খানি করিয়া এবং পাদাঙ্গুলিতে দুইখানি করিয়া অস্থি আছে । এই সকল অস্থিকে অঙ্গুলির-অঙ্গুলির বর্ণা বার । অঙ্গুলির সকল

স্থানভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—অগ্রিম, মধ্যম এবং পশ্চিম শ্রেণী। অগ্রিম শ্রেণী অর্থাৎ সমুখভাগে নপদংবুল যে সকল অস্থি আছে উহার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং উহাদের অগ্রভাগ নপধারণের জন্য আরও। উহাদের পশ্চাদ্ভাগ মধ্যম শ্রেণীর অস্থির সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু অঙ্গুষ্ঠে মধ্যম শ্রেণীর অস্থি না থাকায় উহার অগ্রিম অস্থির পশ্চাদ্ভাগ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির অগ্রভাগেব সহিত সম্বন্ধ। মধ্যম শ্রেণীর চারিখানি অস্থির সমুখভাগ অগ্রিম শ্রেণীর অস্থির পশ্চাদ্ভাগের সহিত সম্বন্ধ এবং পশ্চাদ্ভাগ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির অগ্রভাগের সহিত সম্বন্ধ। এইরূপ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির সমুখভাগ মধ্যম শ্রেণীর অস্থির পশ্চাদ্ভাগের সহিত এবং পশ্চাদ্ভাগ মূলশলাকাগুলির সহিত সম্বন্ধ।

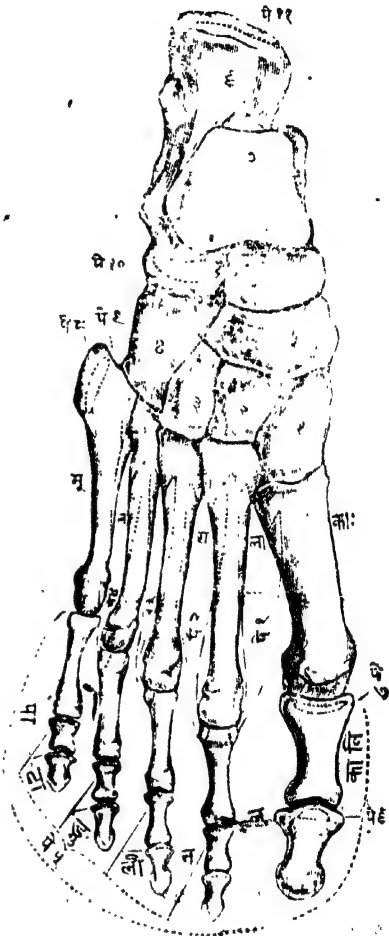
পাদাঙ্গুলিনলকের পশ্চাতে পাঁচ খানি **মূলশলাকা\*** নামক নলকাহি আছে। ইহার বর্ণনাক্রমে পাদাঙ্গুলশলাকা, তর্জনী-মূলশলাকা, মধ্যমামূলশলাকা, অনামিকামূলশলাকা ও কনিষ্ঠামূলশলাকা নামে অভিহিত। তন্মধ্যে তর্জনীমূলশলাকা সর্বাংগে দীর্ঘ এবং অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকা সর্বাংগে ক্ষুদ্র ও হ্রস্ব। ইহাদের সমুখভাগ পশ্চিম অঙ্গুলি নলকের সহিত সংহিত। মূলশলাকাগুলির পশ্চাতে সাতখানি বিষমাকার **কূর্চাস্থি†** আছে। সেই অস্থিগুলি পদের পশ্চাদ্ভাগ নির্মাণ করে এবং কূর্চাস্থি নামে অভিহিত। সাতখানি কূর্চাস্থির নাম যথা, **কূর্চাস্থি, পামি, মৌমি, অন, বাহি**

\* ইং—Metatarsals—মেটাটারসালস।

† ইং—Tarsals—টারসালস।

[ দ্বিতীয় চিত্র ]।

পাদাঙ্গুলি।



মিমে অর্ধ চন্দ্রাকার রেখার মধ্যে অঙ্গুলি নলক, তদুপরি মূলশলাকা, এবং তদুপরি সাতখানি কূর্চাস্থি জটব্য। কূর্চাস্থি যথা—

- (১) ১—অন্তঃকোণক। (২) ২—মধ্য কোণক। (৩) ৩—বহিঃ কোণক। (৪) ৪—হৃৎ। (৫) ৫—মৌমিক। (৬) ৬—পামি। (৭) ৭—কূর্চা শির।

“৮” (৮) চিত্রিত স্থান পেরারি বিশেষ স্থল বুঝিতে হইবে।



**কোণক, মধ্যকোণক ও অন্তঃকোণক।** ইহাদের মধ্যে শেষের চাবিখানি অস্থির সমুখভাগের সহিত মূল-শলাকাগুলির পশ্চাদ্ভাগ সংহিত হইয়া থাকে।

**কুর্চশির—**নামক অস্থি সমস্ত কুর্চাস্থির দীর্ঘদেশে অবস্থিত। ইহার গোলাকার মুণ্ড ও পার্শ্বীয় জজ্বার অস্থিরের অধোভাগের সহিত এবং নিম্নভাগ সমুখদিকে নোনিত নামক অস্থির সহিত ও পশ্চাদ্ভাগে পাক্ষি নামক অস্থির সহিত সম্বন্ধ।

**পাক্ষি—**নামক অস্থি কুর্চাস্থি সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই অস্থি দ্বারা পাক্ষি বা গোড়ালি নির্মিত হয় এবং ইহার উপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ে। পাক্ষির উর্দ্ধভাগ কুর্চশির নামক অস্থির সহিত এবং সমুখভাগ ঘন জামক অস্থির সহিত সম্বন্ধ।

**নোনিত—**নামক অস্থি অনেকটা নোকার ভায় আকার বিশিষ্ট। ইহার সমুখভাগ কোণক নামক তিনখানি কুর্চাস্থির সহিত, পশ্চাদ্ভাগ কুর্চশির নামক অস্থির সমুখের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব ঘন নামক অস্থির সহিত সম্বন্ধ।

**ঘন—**নামক কুর্চাস্থি পদের বহিঃসীমার অবস্থিত। এই অস্থির সমুখভাগ কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলশলাকার পশ্চাদ্ভাগের সহিত সম্বন্ধ।

**অন্তঃকোণক—**নামক কুর্চাস্থি ত্রিকোণ প্রায় এবং ইহার সমুখভাগ অন্তঃমূলশলাকার পশ্চাদ্ভাগের সহিত সম্বন্ধ।

**মধ্যকোণক—**নামক কুর্চাস্থি প্রায় ত্রিকোণাকার এবং ক্ষুদ্রতম। ইহার সমুখ-

ভাগ তর্জনীমূলশলাকার পশ্চাদ্ভাগের সহিত সম্বন্ধ।

**বহিঃকোণক—**নামক কুর্চাস্থি প্রায় ত্রিকোণ। ইহার সমুখভাগ মধ্যমূল-শলাকার পশ্চাদ্ভাগের সহিত সম্বন্ধ।

**অন্তঃকোণক, মধ্যকোণক এবং বহিঃকোণক** এই তিন খানি অস্থি কোণত্রয় নামে অভিহিত। কুর্চাস্থিগুলি সমুখে, পশ্চাতে এবং পার্শ্বে পরস্পর দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ। বাহ্যিক ভাবে উহাদের সন্ধির বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইল না। দ্বিতীয় চিত্র দেখিলে উহাদের সংস্থান বোধগম্য হইবে।

**জজ্বাস্থি (তৃতীয় চিত্র)\***—জজ্বার দুইখানি অস্থির মধ্যে মূলতর অস্থিখানিকে জজ্বাস্থি বলে। ইহা উরুর অস্থি বাতীত শরীরের অগ্রাভ্য নলকাস্থি অপেক্ষা দীর্ঘ ও স্থূল। দুই প্রান্ত এবং মধ্যনলক ভেদে সকল নলকাস্থির ত্রায় ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ইহার উর্দ্ধপ্রান্ত উপরিভাগে উর্দ্ধস্থির অধঃপ্রান্ত কন্দরয়ের সহিত এবং সমুখে জাবস্থির সহিত সংহিত হয়। ইহারই পশ্চাদ্ভাগে বহির্দিকে অমুজজ্বাস্থির উর্দ্ধ-প্রান্ত সংলগ্ন হইয়া থাকে। উর্দ্ধ প্রান্তের দুইদিকে দুইটা উৎসেধ এবং উহাদের মধ্যস্থলে একটা দ্বিমুখ কণ্টক আছে।

**জজ্বাস্থির অধঃপ্রান্ত—**উর্দ্ধ প্রান্ত অপেক্ষা ছোট। ইহার পার্শ্বভাগের ত্রিকোণাকার অংশের সহিত অমুজজ্বাস্থির অধঃপ্রান্ত এবং নিম্নভাগের অংশের সহিত কুর্চশির অস্থি সংহিত থাকে। অধঃপ্রান্তের ভিতরদিকে যে উরুর প্রবেশ আছে তাহাকে অমুজলক বা ভিতরদিকে গাঁট বলে। ইহার সহিত

\* ইং—Tibia—টিবিয়া।

[ ଦୃତୀୟ ଚିତ୍ର ]

ଜଞ୍ଜାହି ଓ ଅନୁଜଞ୍ଜାହି ।



পে  
পে  
পে

পে

পে

इति आदि

अथः ॥

কুর্কশীর নানক জম্বুজির বহিঃসীমা সংযুক্ত হয়  
জম্বুজির মধ্যনালক বা কাণ্ড দ্বৈত বক্রাকার  
ইহার সহিত কোন জম্বুজির সন্ধি নাই, কিন্তু  
ইহাতে অনেক পেশী ও জম্বুজিরশালা কলা  
সম্বন্ধ থাকে। পেশীর বিষয় পরে বিস্তারিত  
ভাবে বলা যাইবে।

অনুজ্ঞাপ্রাপ্তি ( তৃতীয় চিত্র ) :-

ইহা দেখিতে দীর্ঘ বস্তির মত এবং জঙ্গলিহর  
 কায় উর্দ্ধ প্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক—  
 এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার উর্দ্ধপ্রান্ত  
 জঙ্গলিস্থিতের পৃষ্ঠাদ্ব্যয়ের সহিত এবং  
 অধঃপ্রান্তের ভিতর দিক জঙ্গলিহর অধঃ  
 প্রান্তের পাখী ভাগের সহিত ও কুর্দশিব  
 নামক অস্থির সহিত সংহিত। এই প্রান্ত উৎ-  
 সেধ বিশিষ্ট এবং সেই উৎসেধ বহির্ভ্রমক  
 (গাতি) নামে অভিহিত। ইহার মধ্যনলকের  
 সহিত আটটি পেশী সংযুক্ত থাকে।

[ চতুর্থ চিত্র ]

आवह्नि ।



(১-২) ২—দুইটী উৎসব। (৩, ৪) ২—  
সং—উৎসবের অর্থপ্রাপ্তের সহিত সজির হান। (ক)  
ক—সমিতির সভ্য। জিন্দু কণ্টক। (২) ৩—জাহা-  
কপাল বন্ধন পেশীর সংযোগস্থল। (৪) ৪—জন্ম-  
কালানির উৎসবের অর্থ প্রাপ্তের সহিত সজির হান। (৫) ৫—  
জন্মদিনের অর্থপ্রাপ্তের সহিত সজির হান। (৬) ৬—  
জন্মদিনের অর্থপ্রাপ্তের সহিত সজির হান। (৭) ৭—কৃষ্ণ-  
বিজয়ের অর্থপ্রাপ্তের সহিত সজির হান।

অনুমোদিত—(৪) ৪—অনুমোদিত হইয়াছে।  
সহিত সহিত হইবে। (৫) ৫—অনুমোদিত হইবে।  
অনুমোদিত হইবে।

(২) '৫৭' চিহ্নিত হানকনি পেশীর সংশোধন।

\* 3: - Fibula - Figure 1

(স) সং—সন্ধিচিহ্ন। এই চিহ্নের উদ্ভূতায়  
উর্ধ্বহির নিম্ন প্রান্তের সম্মুখভাগের সহিত সংহিত হয়।

(৮) 'পে' চিহ্নিত হানগুলি পেশী সংযোগ স্থল।

**জাম্বাহি** (মাণ্ডুইচাকি)—ইহা প্রায়  
গোলাকার কপালাস্থি। ইহার পশ্চাদ্ভাগের  
উদ্ধাংশ উর্ধ্বর অস্থির সহিত এবং নিম্নাংশ  
জম্বার সহিত সংহিত হয়। (চতুর্থ চিত্র)

**উর্ধ্বপ্রান্ত**—(পঞ্চম চিত্র) 'ইহা' সমস্ত  
নলকাস্থি অপেক্ষা বৃহৎ, দৃঢ়, বহুভারসহ,  
এবং মধ্যস্থলে বাঁশের স্তায় গোলাকার ও  
ঈষৎ বক্র। ইহাও উর্ধ্বপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং  
মধ্যনলক এই তিন ভাগে বিভক্ত।

ইহার উর্ধ্বপ্রান্তে গোলাকার মুণ্ড, মুণ্ডের  
নিম্নে গ্রীবা এবং তন্নিম্নে একদিকে মহাশিখরক  
ও অন্যদিকে লঘুশিখরক নামক দুইটি উৎসেধ  
আছে। তন্মধ্যে মুণ্ড শ্রেণিকলক নামক  
অস্থির গভীর কোটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া  
উঠাব সহিত সন্ধিস্থিত হয়। ইহার গ্রীবা  
সাধারণতঃ তিষ্ঠাকৃতাবে অবস্থিত, কিন্তু বৃদ্ধ  
বয়সে মধ্যনলকের সহিত প্রায় সমকোণ হইয়া  
যায় এবং ভঙ্গপ্রবণ হয়। মহাশিখরক এবং  
লঘুশিখরক নামক অংশদ্বয়ের সহিত বহুপেশী  
সংযুক্ত থাকে।

উর্ধ্বহির অধঃপ্রান্তে বে দুইটি কল বা  
মহাশিখর আছে, ইহার অত্যাস্থির সহিত এবং  
উভয় কলের মধ্যবর্তী ত্রিকোণাকার সম্মুখের  
অংশ জাম্বাহির সহিত সংহিত হয়।

এক সন্ধির জিম্বাখানি অস্থির সংক্ষিপ্ত  
বর্ণনা করা হইল। অপর সন্ধিতেও অস্থির  
এইরূপ সন্নিবেশ আছে।

\* টে—Patella—ক্যাটেল্লা।

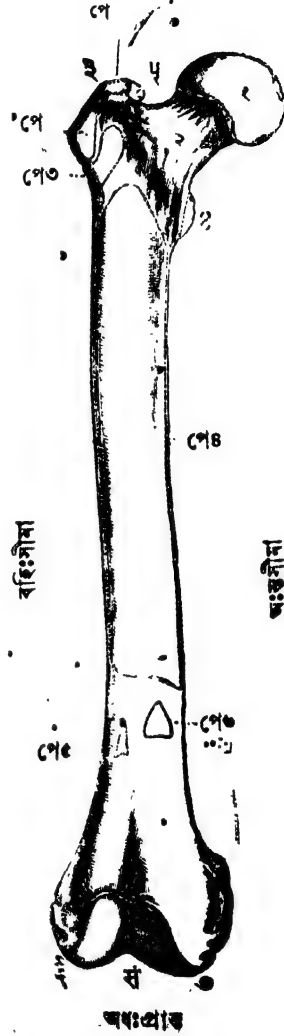
† টে—Femur—ফিমর।

কাভল—২

[পঞ্চম চিত্র]

উর্ধ্বপ্রান্ত।

উর্ধ্বপ্রান্ত।

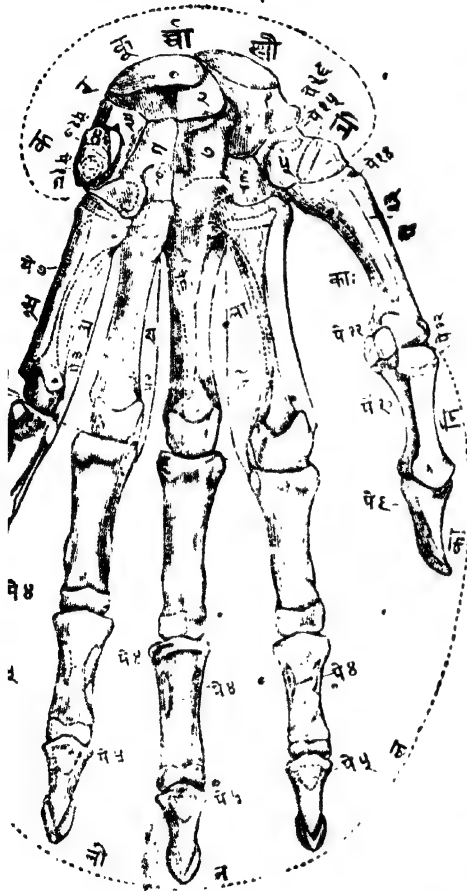


(১) ১—মুণ্ড। (২) ২—গ্রীবা। (৩) ৩—  
মহাশিখরক। (৪) ৪—লঘুশিখরক। (৫) ৫—  
বহাশিখরাস্থিত কোটি। (৬, ৭) ৬, ৭—দুইটি  
কল বা মহাশিখর।

(৮) সং—জাম্বা কপালের সহিত সন্ধিহীন।  
'পে' চিহ্নিত হানগুলি পেশীর সংযোগ স্থল।

[ বর্ষ চিত্র ]

কুরাঙ্গি।



নিম্নে অঙ্গুলিনলক, তরুণির মূলশলাকা এবং তরুণির  
কুরাঙ্গি। সাতখানি কুরাঙ্গি যথা,—(১) ১—নৌনি-  
তিক। (২) ২—অঙ্গুলিনলক। (৩) ৩—উপকুর। (৪) ৪—  
বর্জলক। (৫) ৫—পর্মাণক। (৬) ৬—কুটক। (৭) ৭—  
বর্জকুট। (৮) ৮—খণ্ডক। (৯) ৯—পে—চিকিত  
হাদ্যঙ্গি পেশীসংযোগস্থল।

কুরাঙ্গি—পাদাঙ্গুলির জ্ঞায় করা-  
স্থিতিতেও চৌদখানি অস্থি এবং তাদের  
পশ্চাদভাগে পাঁচখানি মূলশলাকা আছে।  
তাদের সরিবেশও পাদাঙ্গুলির জ্ঞায়, কেবল  
সংজ্ঞার কিক্রঃ পার্থক্য এই যে, ইহাদিগকে  
কুরাঙ্গুলিনলক ও কুরাঙ্গুলি-  
মূলশলাকা বলে। ( বর্ষ চিত্র )

অণিবক প্রদেশে আটখানি ক্ষুদ্র বিহনাতি  
আছে, ইহাদিগকে 'করকুচ্চাঙ্গি'  
বলে। ইহাবাণ্ডা পশ্চিম ও পশ্চিম (বা দক্ষিণ  
ও উত্তর) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পশ্চিম  
শ্রেণীর চারিখানি অস্থি যথাক্রমে পর্যায়-  
নক, কুটক, অধ্যকুট ও ফল-  
দ্বারা নামে এবং পশ্চিম শ্রেণীর চারিখানি  
নৌনিতক, অক্ষিত্তক, উপ-  
নক ও বর্জলক নামে অভিহিত  
হইয়া থাকে। পশ্চিম শ্রেণীর চারিখানি  
অস্থি মধ্যো তিনখানি অস্থি অণিবক সন্ধিব  
মধ্যে প্রবিষ্ট; বর্জলক নামক কুরাঙ্গি  
অণিবকসন্ধির মধ্যে প্রবেশ করে না। এই  
বস্তুকে কেহ কেহ কণ্ডরামখাং চণকাস্থি  
এলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সেজন্য  
তাদের হিসাবে পদের জ্ঞায় করেও সাত  
খানি মাত্র কুরাঙ্গি আছে।

পর্যায়ক—তহার সমুখভাগ অঙ্গুলি-  
শলাকার সহিত এবং অস্ত্রপার্শ্ব ও পশ্চাৎ-  
ভাগ নৌনিতক, কুটক ও তরুণী-মূলশলাকার  
সহিত সংযুক্ত।

কুটক—কুট ( মেহাই ) মূল আকার  
কিন্তু এই অস্থিটা কণ্ডরামখাং তরুণী-মূল-

\* ইং—Carpals—কার্পালস্।

মধ্যকার সহিত, উর্দ্ধসীমায় নৌনিভক অস্থির সহিত, বহিঃসীমায় পর্য্যাপক অস্থির সহিত এবং অন্তঃসীমায় মধ্যকূট অস্থির সহিত সংহিত ।

মধ্যকূট—ইহা কবেব কূটস্থিগুলিবিশেষো বৃত্তম । ইহার উর্দ্ধস্থ মুক্ত অর্দ্ধচন্দ্র অস্থির সহিত, অধোভাগে তজ্জনা, মধ্যমা ও অনান্নিকা বৃগশলাকাব সহিত, বহিঃপার্শ্ব নৌনিভক ও কূটক নামক অস্থিরের সহিত এবং অধঃপার্শ্ব কণধর নামক অস্থির সহিত সংযুক্ত ।

কণধর—এই সর্পগণাকাব প্রবর্দ্ধনমুক্ত অস্থিটা অধোভাগে কনিষ্ঠা ও অনান্নিকার মূলশলাকাবিয়েব সহিত এবং অধঃপার্শ্বে উপলক ও অল্পপার্শ্বে মধ্যকূট নামক অস্থির সহিত সংহিত ।

নৌনিভক—ইহাব আকার নৌকার আয়, কিম্ব নৌনিভ নামক পানকূটস্থি অপেক্ষা অনেক ছোট । ইহার পশ্চাদ্ভাগ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত, একপার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্র ও মধ্যকূটনামক অস্থিরের সহিত, এবং অধঃপার্শ্ব সমুখভাগ পর্য্যাপক ও কূটক নামক অস্থিরের সহিত সংহিত ।

অর্দ্ধচন্দ্র—ইহার বহিঃভাগ নৌনিভকস্থির সহিত, উর্দ্ধভাগ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত এবং সমুখভাগ উপলক, কণধর ও মধ্যকূট নামক অস্থি তিনখানির সহিত সংযুক্ত ।

উপলক—ইহার উর্দ্ধসীমায় সন্ধিচিহ্ন মণিবন্ধসন্ধিব মধ্যবর্তী ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সংহিত । ইহার অন্তর তিনদিকে কণধর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বর্তূলক নামক অস্থির সহিত সংযুক্ত ।

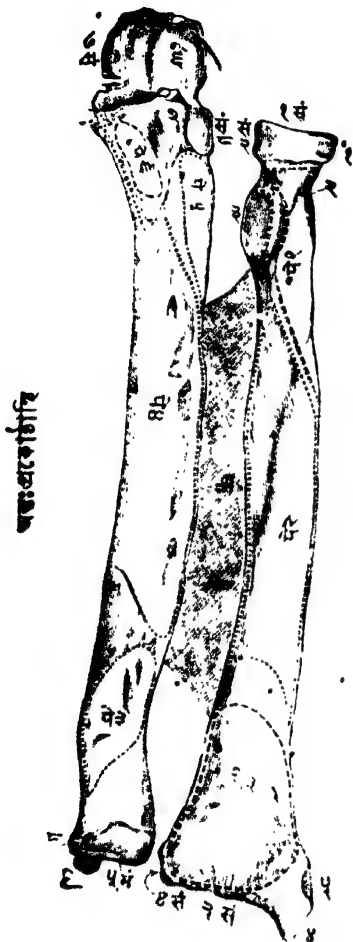
বর্তূলক—ইহা বর্তূলাকার ও ক্ষুদ্রতম কূটস্থি । ইহার পশ্চাদ্ভাগ এবং অন্তঃপার্শ্ব উপলকের সহিত সংহিত ।

কণ ও পদেব কূটস্থি সকলের সমুখ, পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ বলিয়া যাচা নির্দেশ করা হইল তাহা দৃশ্যদর্শন মাত্র । এই সকল অস্থি বিব্রমাকার বলিয়া উহাদের আকার ও সম্মি-বেশ মধ্যাঞ্চল্যে বুদ্ধিতে হইলে স্বহস্তে অস্থি লইয়া বারংবার পরীক্ষা করা আবশ্যিক ।

প্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র] পূর্বেই বলিরাছি—বাহুর নিম্নাঙ্গ (কর বাদে) প্রকোষ্ঠ নামে অভিহিত । এই প্রকোষ্ঠে দুইখানি নলকাস্থি আছে । তন্মধ্যে যেখানি বহিঃসীমায় থাকে, সেখানিকে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি এবং যেখানি অন্তঃসীমায় থাকে সেখানিকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি বলে । বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্ত স্থল—ইহা দ্বারা প্রধানতঃ মণিবন্ধ-সন্ধি নির্মিত হয় । অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধ-প্রান্ত স্থল—ইহা দ্বারা প্রধানতঃ কূপরসন্ধি নির্মিত হয় ।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র] ইহা নলকাস্থি, অতএব উর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত ও মধ্যানলক ভেদে তিনভাগে বিভক্ত । উর্দ্ধ-প্রান্ত চক্রাকার এবং প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তের বহিঃসীমায় সংযুক্ত । উক্ত চক্রাকার অংশের ভিতরের দিকের অর্দ্ধচক্রাকার সন্ধিচিহ্ন প্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধ প্রান্তে বহিঃপার্শ্বের সহিত সংলগ্ন হয় ।

[ সপ্তম চিত্র ] অস্ত্রপ্রকোষ্ঠাঙ্গি বস্ত্র।  
উৎপত্তি।



অধঃপ্রান্ত।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাঙ্গি (১) ১—চক্রমুখ। (২) ২—গ্রীবা।  
(১ ভ) ১ সং—এগুটির কল্লীর সহিত সজ্জিত  
কোর। (২ ভ) ২ সং—অস্ত্র প্রকোষ্ঠাঙ্গির উর্দ্ধভাগের  
সহিত সজ্জিত হান। (৩) ৩—পেশী নিবেশিত অস্ত্র উৎ-  
সেধ। (৪) ৪—বহিঃপার্শ্ব। (৫ ভ) অস্ত্র প্রকোষ্ঠা-  
ঙ্গির অধোভাগের সহিত সজ্জিত হান। (৬ ভ) ৬ সং—  
মণিকরসজ্জিত হান। (৭) ৭—কণ্ঠা বিবর্তন অস্ত্র  
পাঁজ। অস্ত্রপ্রকোষ্ঠাঙ্গি (৩) ১—চক্র আবর্জনক।  
(৮) ৮—মণিমুখ। (৯) ৯—অস্ত্রমণিক (৫ ভ) ৫  
সং—বহিঃপ্রকোষ্ঠাঙ্গির সহিত সজ্জিত হান। (১০ ভ) ১০  
সং—চক্রবিশিষ্টাঙ্গিত সজ্জিত হান। (১১ ভ) ১১ সং—  
অঙ্গাঙ্গির চক্র আবর্জনের সহিত সজ্জিত হান।  
(৬) 'পে' চিহ্নিত হানজলি পেশীর নিবেশ হান।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাঙ্গির নিয়ন্তাগ ত্রিকোণাকার  
এবং অর্দ্ধচন্দ্র ও নোনিতক নামক কুর্চাঙ্গি-  
ঘরের সহিত সজ্জিত। এই ত্রিকোণাকার  
অংশের অস্ত্রসৌমা অস্ত্রপ্রকোষ্ঠাঙ্গির নিয়-  
ন্তাগের বহিঃপার্শ্বে সংলগ্ন থাকে। মধ্যনলকে  
অনেক পেশীর সংযোগ আছে, কিন্তু কোন  
অঙ্গির সংযোগ নাই। উহা জৈবদ্ বক্র এবং  
ত্রিধার বিশিষ্ট। ইহা হইতে ভিতরের দিকের  
ধারার সহিত "প্রকোষ্ঠাঙ্গরাণা" কলা সংযুক্ত  
থাকে।

অস্ত্রপ্রকোষ্ঠাঙ্গি— [ সপ্তম  
চিত্র ] \* এই নলকাঙ্গি উৎপত্তি, অস্ত্রপ্রান্ত  
ও মধ্য-নল ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার  
উর্দ্ধপ্রান্ত উপরে প্রগুণ্ডাঙ্গির অধঃপ্রান্তের  
সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব বহিঃপ্রকোষ্ঠাঙ্গিব  
চক্রাকার উর্দ্ধপ্রান্তের অস্ত্রপার্শ্বে সংহিত হয়।  
এই প্রান্তের পশ্চাদ্ভাগে যে উৎসেধ আছে,  
তাহাকে কুর্পর (কমুই) বলে। বালাকালে  
ইহা আমুর্সেদপালের হ্রাস পৃথক ভাবেই থাকে,  
কিন্তু যৌবনে অস্ত্রপ্রকোষ্ঠাঙ্গির উর্দ্ধপ্রান্তের  
সহিত দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া যায়। প্রাচীন শারীর-  
তত্ত্ববিদগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কুর্পর-  
কপাল নামক পৃথক অঙ্গি বলিয়া গণনা করিয়া-  
ছেন। উর্দ্ধপ্রান্তের সমুদ্রস্থ অবস্থানক চকু-  
প্রবর্তন নামে খ্যাত।

অস্ত্রপ্রকোষ্ঠাঙ্গির নিয়ন্তাগ প্রায়  
গোলাকার এবং ইহার বহিঃপার্শ্ব বহিঃ-  
প্রকোষ্ঠাঙ্গির নিয়ন্তাগের সহিত সজ্জিত।  
ইহা নিয়ন্তাগে মণিবন্ধসজ্জিত মধ্যস্থ ত্রিকোণা-  
কার তরুণাঙ্গি সংযুক্ত থাকে। মধ্যনলকে

\* ইং—Ulna—আলনা।

† ইং—Humerus—হিউমারাস।

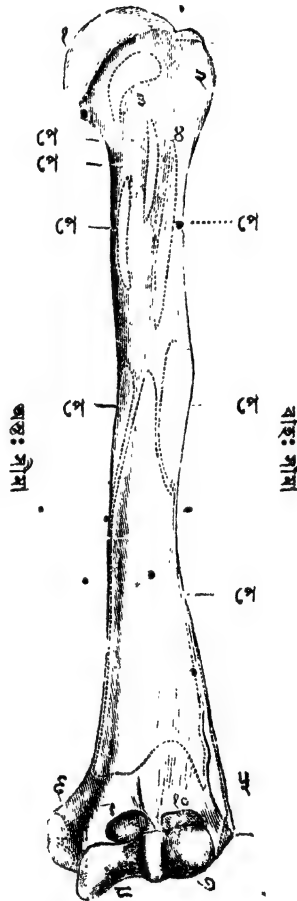
অনেক গুলি পেশীর সংযোগ আছে, কিন্তু কোন অস্থির সংযোগ নাই। ইহাও ত্রিধার বিশিষ্ট এবং ইহার বহির্ধারায় "প্রকোষ্ঠাঙ্ক-বালা" কলা সংলগ্ন থাকে।

**প্রগণ্ডাস্থি**—[ অষ্টম চিত্র ] + খাড়র মধ্যে ইহাট স্থূলতম নলকাস্থি। উর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যানলক ভেদে ইহাও তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাের উর্দ্ধপ্রান্তের অর্দ্ধ গোলাকার অংশ অংগফলকাস্থির অংগসপীঠ নামক অংশের সহিত সংহিত হইয়া অংগসন্ধির সৃষ্টি করে। ইহার অধঃপ্রান্তের সহিত প্রকোষ্ঠাঙ্কস্থির উর্দ্ধপ্রান্ত দুইটির সন্ধি হইয়া কূর্পসন্ধি নিম্পন্ন হয়। এই অধঃপ্রান্তের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে এক একটা খাত আছে। বাহ প্রসারিত করিলে পশ্চা-ত্তের খাতে কূর্পর বা কনুই প্রবিষ্ট হইয়া যায়। বাহ সঙ্কুচিত করিলে অস্থঃপ্রকোষ্ঠাঙ্কস্থির উর্দ্ধ-প্রান্তের অগ্রভাগ (চকুপ্রবর্ধনক) সম্মুখের খাতে প্রবিষ্ট হয়। প্রগণ্ডাস্থি মধ্যানলকে বহু পেশীর সংযোগ আছে।

[ অষ্টম চিত্র ]

প্রগণ্ডাস্থি।

উর্দ্ধপ্রান্ত।



- (১) ১—মূর্ত। (২) ২—মহাপিণ্ডক। (৩) ৩—  
লঘুপিণ্ডক। (৪) ৪—পিণ্ডকর মধ্যমত পরিখা। (৫) ৫—  
৫—বাহ্যাবর্ধ। (৬) ৬—১০—হৃদয় আক।

এক বাহুর ত্রিশ থানি অস্থির বর্ণনা করা সমূহের ক্রিয়া কতকটা বুঝা যাউলে চিকিৎসার হইল। অথবা বাহুতেও অস্থির সন্নিবেশ এট- অনেক সুবিধা হইতে পারে। কোন অস্থি- রূপ। অস্থির আকৃতি সন্নিবেশ প্রভৃতি স্থানচ্যুত বা ভগ্ন হইলে এই জ্ঞানের সঙ্ক্ষে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা প্রত্যক্ষ দর্শন সাধ্যাযো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনেক সময়ে সাপেক্ষ। তথাপি এইরূপ স্থল বর্ণনা দ্বারা তাহার পক্ষিকার কঠিনতা পাবিবেন। বাহু ও সন্ধির অস্থি সঙ্ক্ষে সামান্য জ্ঞান ভগ্নচিকিৎসায় এ সঙ্ক্ষে বিস্তৃত উপদেশ ভগ্নচিকিৎসায় এ সঙ্ক্ষে বিস্তৃত উপদেশ (কমলাঃ)

## শিশু পালন।

(পূর্বস্মৃতি)

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী।

—x ১০২০০

শিশু কাদিলে যে তাকে খাওয়াতে হইবে এমন কোনে কথা নাই। শিশুকে একরূপ অভ্যাস করান অসম্ভব অনিষ্টকর। অনেক সময় শিশু তৃষ্ণাজ্ঞ জিহ্বা পেট ব্যাথা অথবা অন্ত কোন শারীরিক কঠোর জ্ঞ কাদে, মাতা ভ্রাতা বুঝিয়া চকিবেন। শিশুর সকল ক্রন্দনই যে ক্ষুধার জ্ঞ তাহা নহে।

শিশুকে ঘড়ি ধরিয়া খাওয়াইলে আর তাহার অতিরিক্ত আহারের ভয় থাকে না। ঘড়ি ধরিয়া প্রত্যহ একই সময়ে শিশুকে আহার করান কর্তব্য। শিশুর খাওয়ার-কালের মত একই সময়ে চুপা প্রয়োজন। তাহা হইলে প্রত্যেক আহাৰীত ভালরূপে হজম হইবার সময় পাইবে। শিশুকে ধীরে ধীরে আহার করাইবে। তাড়াতাড়ি করিবে না।

একবার আহার করিলে যেন দশ হইতে কুড়ি মিনিট সময় লাগে। শিশু তাড়াতাড়ি আহার করিতে চাহিলেও একটু খাওয়াইয়াই বোতল যত্ন হইতে বাহির করিয়া কিছুকণ বিশ্রাম করিতে দিবে, তাঁরপর আবার খাওয়াইবে। শিশুকে খুব বেশী পরম কিংবা বেশী ঠাণ্ডা দ্রব্য দিবে না। কখনো তাকে খালি বোতলের টিট চুষিতে দিবে না, তাহা হইলে পেটে বাতাস যাউবে, পেট ফাঁপিবে।

শিশুর প্রত্যেক আহারের পরই তাকে একটু তুলিয়া ধরিয়া তাহার গিট আঙুলে আঙুলে চাপড়াইবে, যে পর্যন্ত না টেকুর তুলে। আহারের পর টেকুর তুলিলে শিশুর সুনিদ্রা হইবে। শিশুকে কোলো শোয়াইয়া যেমন করিয়া হাত-দুই পান করাইতে হয়, বোতলে করিয়া দ্রব্য খাওয়াইবার সময়ও ঐরূপে



শিশুকে কোলে শোয়াইয়া খাওয়াটিবে। কখনও শিশুর পাখেরে দুধের বোতল রাখিয়া কায়াস্বরে ঝাটবে না। শিশুকে ৫ খাওয়াইয়া তবে অল্প কাজে যাইবে।

প্রথম দশ বৎসর শিশুর শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সর্বাপেক্ষা মনোযোগ দিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে শিশুর দেহ খুব তড়ুতড়ুতি বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই উপরোক্ত ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাস্থ্য, কার্যক্ষমতা ও পর্বিশেষে নির্ভর করিতেছে এবং এই কাল মধ্যে শিশুর নৈতিক শিক্ষা যেরূপ হইবে, তাহা দ্বারা সে সেইরূপ মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। সুতরাং প্রথম দশ বৎসর শিশুর পুষ্টি এবং খাওয়ার প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখিবে, যেমন তাহার চরিত্র গঠনের দিকেও সর্বাপেক্ষা মনোযোগী হইতে হইবে। তাহা হইলে প্রকৃতিতে স্বাস্থ্য, সবল, কস্মট, মাধু-সজ্জান লাভ করিয়া জননী ও জনপুত্র কৃতার্থমান হইবেন।

মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে শিশুকে গাভী-দুগ্ধ কিংবা অন্য কোন কৃত্রিম দুগ্ধে বর্দ্ধিত করিতে হয়। তাহা হইলে টহার সহিত কমলা লেবু, আঙ্গুর, বেদানার রস শিশুকে দেওয়া উচিত। *Keplar's Codliver oil with malt water* *bury's Codliver oil* এই দুটি ঔষধি দুর্বল শিশুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। কৃত্রিম দুগ্ধ খাইয়া যে সব শিশু বাড়িয়া উঠে, তাহারা স্বভাবতঃই তেমন সবল হইতে পারে না। তাহাদের পক্ষে এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। দুইবার আহারের পর এক চা-চামচ ঔষধ লইয়া দুধে মিশ্রিত করিয়া শিশুকে খাওয়ান উচিত।

শিশুর আহার্য্য এক ঘেয়ে হইবে না, মাঝে মাঝে পরিবর্তন করিয়া দিবে, তাহা হইলে আহারে কচি এবং ক্ষুধাও হইবে। শিশুকে কখনও গুরুপাক খাওয়া দিবে না, সর্বদা লঘু, সহজপাচ্য, পুষ্টিকর আহার্য্য দিবে। শিশু ও বালকবালিকাদিগকে কখনও *hard boiled* ডিম, বাজাবের মিঠান, মসলাযুক্ত তবকারি, মাংস ও মাছ, নোনান্ন, মাংস, কেক, পুডিং, নান্দীরকম ফল খাইতে দিবে না। বালকবালিকাকে মিঠায়ের মধ্যে সন্দেশ, বসগোলা এবং ফলের মধ্যে মিষ্ট আম, কমলা লেবু, আঙ্গুর, বেদানা দেওয়া যাইতে পারে। ৫-৬ মাসের হইলেই শিশুদিগকে এই সব ফলের রস দিলে বেশ উপকার দেখা যায়। তাহাদিগকে কখনও চা, কফি কিংবা কোন বকম উত্তেজক পানীয় দিবে না, ইহা তাহাদের পক্ষে বিষতুল্য।

শিশুর বোতলে দুধ খাওয়া অভ্যাস হইয়া থাকিলে—তের মাস কি পনের মাসের হইলে বোতল ছাড়াইয়া বসিট কিংবা গ্রাস হইতে দুধ খাওয়ান অভ্যাস করিবে। শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দশমাস বয়স পর্য্যন্ত দিবে। তারপর ক্রমে ক্রমে ছাড়াইয়া লইবে। মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময়ও একবার বোতলে কিংবা বাটী বা গ্রাসে করিয়া গাভীর দুগ্ধ খাওয়ান অভ্যাস করান ভাল। তাহা হইলে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ সহজেই ছাড়াইতে পারা যাইবে।

শিশুর তিন প্রকারে দুধ খাওয়ান হয়।

(১) অধিকাংশ শিশুই মাতৃদুগ্ধ পান করে।

(২) মাতার দুগ্ধ—পরিমাণে কম কিংবা তেমন পুষ্টিকর হয় না বলিয়া অনেক সময়

শিশুকে মাতার দুগ্ধ এবং গাভী কিংবা অজ কোন কৃত্রিম দুগ্ধ দিতে হয়।

(৩) কোন কোন শিশুকে দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল কৃত্রিম দুগ্ধেই বাঁচাইতে হয়। কৃত্রিম দুগ্ধে যে সব শিশুকে পালন করিতে হয়, তাহাদিগকে অতি সাবধানে, যত্নের সহিত, সর্বদা চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া, অতিশয় পরিচ্ছন্নতা পূর্বক পালন করিতে হয়। নিয়মের একটুকু বাহিরে হইলেই এই সব শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, নতুবা চিররুগ্ন ও দুর্বল হইয়া বাড়িয়া উঠে। এই সব শিশুকে কৃত্রিম দুগ্ধের সহিত ফলের রস, বলকারক ঔষধ, পুষ্টিকারক খাদ্য দিতে হয়। সাধারণতঃ হইলে ইহাদিগকে স্বাস্থ্যকর দেশে কয়েক বৎসর রাখা উচিত। সত্তর হইতে অধিক দিন দূরে থাকাই এমন সব শিশুদের পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ সহবের বাহিরে পরিষ্কার নিশ্চল বাতাস এবং খাট তক্ত পাওয়া যায়।

এক বৎসর হইলেই শিশুদিগকে solid খাদ্য দেওয়া দরকার। ১০ দিনের মধ্যে এক বার দুগ্ধের সহিত এতরূপ খাদ্য দিবে। অল্প কিছু ডিম, কুটি, মাখন দেওয়া যাইতে পারে। দুই বৎসর হইলে তাত, পাওয়া যি, ময়ুর ডাল এবং আলু খাইতে দিবে। ইহা বেশ পুষ্টির আবহাওয়া। এট আহার্যের মধ্যে আবাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে চারিটা উপকরণ প্রয়োজন—তাহার সকলট বিদ্যমান আছে। তাত ও আলুর মধ্যে যেতসার এবং বিতে মেল আছে। যেতসার ও মেল মেহের তাপ উৎপন্ন এবং শক্তি সঞ্চয় করে। তালের মধ্যে nitrogen আছে, তাহা আবাদের মেহের ক্ষয়পূরণ করে এবং কংস পুষ্ট

করে। ময়ুর ডালে মাংস অপেক্ষা নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী আছে। সুতরাং শিশুদিগকে মাংস না দিয়া ময়ুর ডাল-বি দিয়া দিলেই মাংসের কার্য সম্পূর্ণরূপেই সাধিত হয়। সকলপ্রকার ডালট নাইট্রোজেন বিশিষ্ট খাদ্য। দুর্বল শিশুকে মুগ ও ময়ুর ডালের ঝোল দিলে উপকাব হয়।

### স্নান।

শিশুকে প্রত্যহ সন্ধ্যার ঠিক এক ঘণ্টা ধরিয়া সন্ধ্যাবেলায় স্নান করিয়া পরম জল ও ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া স্নান করাইবে। হৃৎ শিশুও প্রত্যহ স্নান আবশ্যক। দুর্বল ও রুগ্ন শিশুকেও ক্রমে ক্রমে স্নান অভ্যাস করান কঠিন। এইরূপ শিশুর স্নান অভ্যাস হইলে ক্রমে সুস্থ হইবে। আশ্বিনে জল গরম করা অপেক্ষা রৌদ্রে জল গরম করিয়া শিশুকে স্নান করাইলে উপকার হয়। নবজাত দুর্বল ও রুগ্ন শিশুকে স্নানের জলে একটু বিটলবল, এক আউল ত্র্যাক্সি কিংবা এক আউল টরলেট তিনগার দিয়া স্নান করাইলে তাহার মেহের বল হয়। স্নান অভ্যাস হইলে দুর্বল শিশু ক্রমে বল পাইবে। অতএব বৈরকমে হটক শিশুকে স্নান করান অভ্যাস করাইবে। দুর্বল শিশুকে স্নান করাইবার পূর্বে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া বন্ধ করিয়া স্নান করা হইবে। স্নান করাইবার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে শিশুর নিউমোনিয়া হইবার সম্ভাবনা। শিশুর স্নান অতি শীঘ্র শেষ করিয়া তখন গামছা খসড়া খুব ভাল করিয়া গা মুছাইয়া একটা জামা দ্বারা ঢাকা দিবে। সাবান বত কম ব্যবহার করা যায়—ততই

ভাগ। সাবান ব্যবহার করিলে শিশুর জন্ম গুরুত্বপূর্ণ উৎকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করিবে। Castile, Cuticura সাবান শিশুর পক্ষে উপযোগী। শিশুর মুখে কখনও সাবান দিবে না। তবে দেহ ও মাথা ময়লা হইলে সপ্তাহে একদিন সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। সাবান দিয়া পরিষ্কার কবিবাব পর Fuller's Gárrh, Talc Powder পাউডার শিশুর গায়ে অল্প অল্প ছড়াইয়া দিবে, তাহা হইলে শীঘ্র জল শুষ্কিয়া গইবে, আর গরমেব দিনে বামাচি ছটলেও ইহাতে উপকার হয়। তৈল মাখিয়া স্নানের পর কখনো পাউডার দিবে না। উহাতে লোমকূপ বন্ধ হইয়া যাইবে। শিশুর মুখ তুখের সর দিয়া পরিষ্কার করিবে। বড় হইলেও মুখে সব দিবে, তাহা হইলে মুখ কোমল ও মসৃণ থাকিবে। স্নান করাইবার সময় শিশুর দাঁত, মুখের ভিতর, জিহ্বা, চোখ, নাক বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। আহারের এক ঘণ্টাব মধ্যে শিশুকে কখনও স্নান করাইবে না, অনন্তর দেড় ঘণ্টার পর স্নান করাইবে। দুর্বল শিশুকে প্রথম প্রথম গরম জলে গামছা ভিজাইয়া খুব তাড়াতাড়ি গা মুছাইয়া তখনই আর একখানি শুক গামছা দিয়া মুছাইয়া দিবে। এইরূপ করিতে করিতে শিশুর স্নান অভ্যাস হইবে।

### নিদ্রা ।

নবজাত শিশু আহার এবং স্নানের সময় খাতী ও জন্ম সব সময় নিদ্রা বাটবে। শিশু ৩ ঘণ্টা ঘুমায়ে তত তাহার ক্ষুদ্র দেহ শীঘ্র গড়িয়া উঠিবে। শিশুর ঘুম কম হইলেই বুঝিতে হইবে—তাহার কোনো পীড়া হইয়াছে,

তখন উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে। শিশু এক মাসের হইলে রাতে ঘুমাওয়ার সময়ের পূর্বে একঘণ্টা জাগাইয়া রাখা ভাল, তাহা হইলে রাতে তাহার নিদ্রা হইবে এবং মাতাকেও রাতিতে সে বিরক্ত কবিবে না। দুই মাসের হইলে দিনে কয়েক বার এক একঘণ্টা করিয়া জাগিতে পারে। এক মাস বয়স হইলেই মাতা শিশুকে জাগ্রত অবস্থায় নিজের শয্যায় চুপ করিয়া থাকিতে শিক্ষা দিবেন। শিশু জাগিলেই যে তাহাকে বিছানা হইতে তুলিয়া কোলে করিয়া বেড়াইতে হইবে কিংবা যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে ততক্ষণ তাহাকে কোন রকম খেলা অথবা আমোদ দিবে হইবে—এরূপ অভ্যাস করান অত্যন্ত অন্তায়। ইহার ফলভোগ মাতাকেই করিতে হয়। এরূপ মল্ল অভ্যাসে অত্যন্ত হইলে প্রত্যেক কর্মব্যস্ত মাতাকে কত অন্বিধা ভোগ করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং জন্মের পর হইতেই মাতা শিশুকে জাগ্রত অবস্থায় আপন শয্যায় চুপ করিয়া শোয়াইয়া থেলা করিতে অভ্যাস কবাইবেন।

ছয় মাসের হইলে শিশু দিনে ৩৪ ঘণ্টা ঘুমায়ে এবং সন্ধ্যা ৬ টা হইতে প্রাতঃকাল ৬টা কিংবা ৭টা পর্যন্ত ঘুমায়ে, মধ্যে রাত্রি ১০ টায় একবার আহারের জন্ম তাহাকে উঠান হইবে। ইহার কম নিদ্রা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কোনো পীড়া হইয়াছে। এক বৎসরের হইলে শিশু দিবাতাগে দুই ঘণ্টা ঘুমায়ে। ১৬ বৎসর পর্যন্ত শিশুকে দিনে দুই ঘণ্টা করিয়া ঘুমাতে দিবে। এই দিবাতাগের নিদ্রা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী। আর সন্ধ্যার প্রারম্ভেই শিশু

যাতে নিদ্রা যায়—সেদিকে বিশেষ করিয়া মনোযোগ দিবে। শিশুকে কখনো অধিক রাত্রি পর্যন্ত জাগিতে দিবে না। সুনিদ্রা এবং সুন্দররূপে গঠিত মন এক সঙ্গে চলে। একটি আব একটর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। মাতার এইটি বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, বিজালয়ের বালক বালিকারা যেন কখনো দেবীতে নিদ্রা না যায়। দেহের জ্বর মস্তিষ্কও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্কের বিশ্রাম চাই। সুতরাং এটি জানা উচিত যে, ঘুমের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় মস্তিষ্ক যেন বিশ্রাম না করে।

শিশুকে কখনো মাতার সহিত এক শযায় শোয়াইবে না। প্রথম চটতেই তাহার জন্য পৃথক একটি বেলিং দেওয়া খাটে তাহাকে শয়ন করাটবে। কারণ মাতার সহিত একত্রে শুইলে,—

(১) মাতা ঘুমের অবস্থায় তাহার উপর আঁসিয়া পড়িলে শিশুর বাস, রোগ চটতে পারে। এত প্রসঙ্গে নীচকালে মাতার গায়ের লেপ শিশুর উপর পড়িয়া শিশুর স্বাস্থ্যে মৃত্যু ঘটতে পারে।

(২) মাতার হৃদস্পন্দন হইতে যে বিবাক বায়ু (কার্বনিক এনিড গ্যাস) প্রকাশ রূপে বর্গিত হয় তাহা শিশু নিশ্বাস দ্বারা টানিয়া লয়।

(৩) মাতার গায়ের কাঁপু শিশুর ঘুমের উপর ঢাকা পড়িতে পারে। শিশু তাহা হইলে কাপড়ের নীচের দ্বিগুণ বা ততোধিক বেশি কাঁপু গ্রহণ করিতে থাকে।

(৪) গরমেব দিনে মাতার গবম দেহের সংস্পর্শে শিশুর দেহ গরম হইয়া উঠিয়া ঘর্মাক্ত হইতে পারে। ঘর্মাক্ত দেহে ঠাণ্ডা লাগিবার অধিকতর সম্ভাবনা।

(৫) রাত্রিতে মাতার সহিত শুইলে, দিনে কখনো নিজের শযায় শিশু শুইতে চাহিবে না।

শিশুকে কখনও কোলে করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া ঘুম পাড়ান অভ্যাস করিবে না। নিদ্রার সময় হইলে শিশুকে তাহার খাটে শোয়াইয়া দিবে এবং সে ঘাটতে নিজের শযায় শুইয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়ে, এইরূপ অভ্যাস করাটবে। প্রথম প্রথম এইরূপে ঘুমাইবার সময় খুব কঁাদিলেও তাহা গাছ করিবে না। দিন করেক কঁাদিয়া যখন সে দেখিবে যে কঁাদিলেও কেহ তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়না, তখন আপনা চটতেই সে চুপ করিয়া যাইবে এবং নিজের শয্যাহতেই ঘুমাইয়া পড়িবে।

### পরিচ্ছদ।

আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শিশুর পরিচ্ছদের প্রতি তত মনোযোগ দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ সূর্য্যোদয়ের একমাসকাল শিশুকে সামান্য ছেঁচা জাকড়া দিয়া মুড়িয়া রাখা হয়। সুস্থ, সবল, শিশুর পক্ষে এরূপ ব্যবহার প্রায় কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু দুর্বল, ক্রয় শিশুকে তথু জাকড়ায় মুড়িয়া রাখিলে তাহার পক্ষে নানারূপ হৃদস্পন্দনের পীড়ার আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময় সবল শিশুও অসুস্থ হইয়া বয়সের অন্ত প্রকাইটিগ, নিউমোনিয়া প্রভৃতি হৃদস্পন্দনের দোষে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ

পতিত হয়। আবার অধিক বস্ত্রে সর্বদা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও শিশু বাড়িতে পারে না এবং দেহ দুর্বল হয় সুতরাং কখনো অন্ন বস্ত্র গায়ে থাকিলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। দুর্বল শিশুর দৈহিক যন্ত্রাদিও দুর্বল থাকে, এই জন্য অতি সহজে ঠাণ্ডা লাগিয়া অস্থির হইয়া পড়ে। প্রথম মাস দুর্বল শিশুর দেহে প্রথমে একটি সাদা বেনিয়ান, তাহার উপর একটি ফ্র্যান্সেলের বেনিয়ান পবাইয়া রাখা ভাল। তা'রপর ক্রমে ঠাণ্ডা সহ হইলে শুধু সুতা'র জামা গায়ে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম কালে খালি গায়েই শিশুদের রাখা ভাল। শিশুদিগকে বহু লীতাঁতপ সহ্য করান নাটবে ততট ভবিষ্যতে তাহাদের দেহ দৃঢ় এবং কষ্টসহিষ্ণু হইবে। অতি যত্নে, সর্বদা কেবল পোষাক পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া রাখিলে শিশুর মঙ্গল না হইয়া ঘোর-র অনিষ্ট সাধিত হয়। একপ শিশু ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামে একেবারেই অগুট হয়। দুর্বল শিশুকেও ক্রমে ক্রমে লীতাঁতপ সহ্য করাইয়া দৃঢ় ও বলশালী করা প্রত্যেক পিতামাতার কর্তব্য। দেহ বলশালী ও দৃঢ় হইলে মনও তেজস্বী ও মহৎ হয়। সুতরাং শিশুকে সাজ-পোষাক পরাইয়া কেবল কুলেব মত করিয়া তুলিলে তাহার দ্বারা পৃথিবীতে কোন কাজই হইবে না। শিশুকে দেখকের ও সমাজের গণ্য "মানুষ" করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রত্যেক পিতামাতাই দায়ী।

আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শিশুর গায়ে উপরেই কখনো ফ্র্যান্সেল দেওয়া উচিত নহে। সর্বদা সুতার কাপড় দেওয়া

উচিত। শিশুর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয় গুলি মনে রাখিলেই যথেষ্ট।

- (১) হাল্কা ও ঢিলা।
- (২) শীতকালে গুরু বস্ত্র চাট।
- (৩) সমুদ্র ( Porus ) ।
- (৪) আরাম দায়ক।
- (৫) সার্জা অতি সহজেই পবাইয়া দেওয়া যায়।

শিশুর জন্মের প্রথম কয়েক মাস সুখ ব্যতীত তাহার সর্বত্র ঢাকিয়া রাখা নিরাপদ জনক এবং প্রথম বৎসর তাহার বুক, পিঠ বেশ করিয়া আবৃত করিয়া রাখা উচিত। তা'রপর ক্রমে বাতাস ও শৈত্য সহ্য হইলে গরমেব সময় খালি গায়ে রাখা যায়। তবে শীতকালে ও শীতপ্রধান দেশে উপযুক্ত বস্ত্র দ্বারা শিশুকে আবৃত করা কর্তব্য, বিশেষতঃ শিশুর হুসুহুসে বাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে—সেদিকে প্রত্যেক মাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। হুসুহুসে কেবল বক্ষঃস্থলেই অবস্থিত তাহা নহে, উপরে collar bone এবং পার্শ্বে armgird পর্য্যন্ত হুসুহুসে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই সব স্থানও ভাল করিয়া আবৃত করিয়া রাখা কর্তব্য। নীচু গলা এবং ছোট হাতের গাঝাবরণ শিশুর হুসুহুসের কিরদংশ অনাবৃত করিয়া রাখা, সুতরাং একপ পরিচ্ছদ শিশুর পক্ষে অল্প-যোগ্য। শিশুর পেটও উপযুক্তরূপে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। শিশুর পাকস্থলী, বস্ত্র প্রভৃতি জ্বরাদি এত delicate যে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহাদের কার্যের বিকৃতি ঘটে। পেটে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই পেটের অস্থির কিংবা কোটরক হইতে পারে। আচ্ছ-

দেব দেশে শীতের সময় অতি শিশুদের পেটে একটি ক্লানেলের কিংবা পণমের বেন্ট বাধিয়া রাখা ভাল; অল্প সময়ে নহে । বেন্টট আলগা তবে বাধিয়া রাখা উচিত । শত্রু কবিতা বাধিলে খাদ্য পরিণাক কবিত্তে পারে না । অতঃপর জামা, সজ্জেক্ট ঘামে ভিজিয়া যায় । ঘামে ভিজিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া দেওয়া কর্তব্য, নতুবা তাহার উপর বাতাস লাগিলেই শিশুর ব্রঙ্কাইটিস, 'নউমোনিয়া প্রভৃতি পীড়া হইবার সম্ভাবনা । গ্রীষ্মকালে বয়ঃ শিশুকে খালি গায়ে বাগিতে অভ্যাস করান উচিত । তাহা হইলে জামা ঘামে ভিজিবার সম্ভাবনা থাকে না । আমাদের

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকাল বাতীত অল্প সব সময়েই শিশুদের মাথা ও গা খালি রাখা ভাল । মাথায় টুপী ও পায়ে সর্বদা মোজা পবাটয়া বাখিলে শিশুর দেহ সবল হইয়া উঠিতে পারে না । শীতকালে "এবং অল্প ঋতুতে পুষ্টি ঠাণ্ডা পড়িলে পায়ে মোজা দেওয়া উচিত, কিন্তু অল্প সময়ে খালি পায়েই বেড়াইতে অভ্যাস করান কর্তব্য । এদেশে শিশু দেব টুপী প্রয়োজন প্রায়ই হয় না । শিশুকে যত ধুলা মাটিতে খেলা করিতে, চলিয়া কিরিয়া বেড়াইতে অভ্যাস করাইবে ততই তাহার দেহ দৃঢ় হইবে এবং মাথা ও শিশুর তবিস্থ্য মঙ্গল জনক হইবে । (ক্রমশঃ)

## বাক্সালার স্বাস্থ্য ।

(২)

গত বারে আমরা "বাক্সালার স্বাস্থ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে সরকারি রিপোর্ট হইতে ১৯১৮ খৃঃ অব্দের অবস্থার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহাতে দেখাইয়াছি যে, বাক্সালা দেশে জন্ম সংখ্যা যেমন কমিয়া গিয়াছে তদুপাংখ্যা তেমনি বৃদ্ধি পাইয়াছে । এই বৃদ্ধির মধ্যে আগার শিশু ও যুবাী বৃদ্ধাই অধিক । আলোচ্য বর্ষে বাক্সালাদেশে যত লোক মরিয়াছে, তাহার মধ্যে ৯৮০ লোক মরিয়াছে ১৭০০ লোকের উপর, কলেরার মরিয়াছে ৮২০ জনার উপর এবং আমশর ২০ জন পাকার মরিয়াছে ২২ জনার উপর ।

১৯১৮ খৃঃ অব্দে সর্বসমেত বাক্সালাদেশে সকল প্রকারে লোক মরিয়াছে ১৫ লক্ষ ।

দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ রহিয়াছে । বলা বাহুল্য বাক্সালা দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয়ভার বাক্সালা দেশের প্রকৃতিপুঞ্জই বহন করিয়া থাকে, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে বাক্সালা দেশের প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য আলোচ্য বর্ষে যে ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্য মাত্র ।

আলোচ্য বর্ষে হাওড়া, বহরমপুর, উত্তর-পাড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সাতক্ষীরা, নাটোর এবং রাজবাড়ী—এই স্থান কর্তৃক পরিষ্কৃত জল ব্যবহারের ব্যবস্থা—স্বাস্থ্যবিভাগ

হইতে করা হইয়াছিল। হাওড়ার অর্থাভাবে কার্যের উন্নতি করা সম্ভবপর হয় নাই। নাটোর ও বহরমপুরের বৃষ্টির জন্য কার্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই, ঢাকাও এবং রাজবাড়ীর কার্যও শেষ করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। ময়মনসিংহ এবং সাতক্ষীরার কার্য প্রায় শেষ হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে কার্য সম্পন্ন হওয়ার কথা বলিতে হইলে আলাোচ্য বর্ষে কেবলমাত্র উত্তর পাড়ার কার্যটিই সম্পূর্ণ হইয়াছে। যাহা হউক বাঙ্গালাদেশে প্রতি জল স্রবরাহ ব্যাপারে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ৩,০৬,৮৮৬ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন পথঃপ্রণালী-নির্মাণ-ব্যপদেশে ৭১,০৯৮ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সর্বসম্মত জল স্রবরাহ ও পথঃপ্রণালী নির্মাণ—এই উত্তর কার্য ১৯১৮ খৃঃ অব্দে মোট ৩,৭৭,৯৮৪ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। যে দেশে এক বৎসরে মৃত্যু সংখ্যা ১৫ লক্ষ, সে দেশে চারি লক্ষেরও কম টাকা পাত্র্য বিভাগ হইতে ব্যয় করা কতদূর উপযুক্ত, তাহার মীমাংসা দেশের চিন্তাশীলগণ করিবেন।

হাওড়ার অর্থাভাবে কার্যের উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই, অর্থাৎ মেডিকেল কলেজের স্বাস্থ্য-দিগের আবাসস্থান নির্মাণ করিবার জন্য ৬ লক্ষ টাকা বজেটে মঞ্জুর করা হইয়াছে। বেলায়ে বিভাগ ও সৈলন্তবর্ত্তাগের খরচের তালিকাও অন্যান্য বাবের মত বাড়িয়া গিয়াছে।

আলাোচ্য বর্ষে একমাত্র ইনস্পেক্টর বোর্ডে সমগ্র বৎসর ৩০০ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে—ইহা বাঙ্গালী জনমানব মনোময়ের রিপোর্টেই প্রকাশ,

কিন্তু এই ভীষণ মাণাস্বক রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার বিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহারি রিপোর্টে নাই। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এ বিষয়ে যত্ন লইয়াছিলেন সত্য, মনঃস্থলের উদ্ভিষ্ট বোর্ডগুলিও একত্রে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতেও ইহার কিছু ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল বলিয়া আমবা মনে করি।

দেশের মৃত্যুবৃদ্ধির কারণ উপলক্ষ করিয়া ডাঃ বেণ্টলী যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, খাদ্য-ভাবেই দেশের মৃত্যু সংখ্যা একদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। শিশু মৃত্যুর কারণ নির্দেশেও তিনি শিশু-জননীদিগের খাদ্যভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তো এক কথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। লোকের পরিশ্রমের যাত্রা বাড়িয়াছে, সাধারণ গৃহস্থকে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তবে সংসার যাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহার উপর অধুনা দেশে সকল জিনিসই বেক্রয় দ্রুতল্য এবং নানারূপে বাবের যাত্রা বেক্রয় বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে সাবাদিনের প্রাণপাত পরিশ্রমলব্ধ অর্থও লোকের স্বচ্ছলতায় সহিত সংকুলান হওয়া কঠিন ব্যাপার। কাজেই বাঙ্গালার দারিদ্র্য ক্রমশঃই ভীষণভাবে ধারণ করিতেছে। বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। উপযুক্ত পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণে সমর্থ হয় না, দুই মৃত্যুদি পুষ্টিকর জীবের অভাবে বাঙ্গালীকে আর বল বৃদ্ধির উপায় নাই, তাহার উপর বাঙ্গালীর যেটুকু শক্তিসামর্থ্য আছে, নান্য কারণে তাহারও অপচয় ঘটতেছে—ইহারই ফলে বাঙ্গালী-জাতির সকল প্রকার রোগের

অতি সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে এবং তাহার পবিণতিট চটতেছে—বান্দালীর অকাল মৃত্যু।

বান্দালার ম্যাট্রিবিম্বায় প্রতিবৎসর বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয় সত্য, কিন্তু সেট অমুণ্ডে শিশু, মৃত্যু এবং যক্ষ্মার মৃত্যু ও তো বড় কম নহে। ইনফ্লুয়েঞ্জা বোগে যে সমগ্র বর্ষে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ৩০ লক্ষ চটতে ৪ লক্ষ শাশতাগ কবিল—উদাহরিত বা কাবণ কি? মানবের অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত পৃথী বোগমুক্ত হইতে পারে না, জন্মগ্রহণ কবিলেই মানবকে রোগের জালা সহ কবিলে চটবে, কিন্তু বাধি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেই মামুষ মরিবে কেন? অজ্ঞান দেশেও তো রোগ হয়, কিন্তু অজ্ঞান দেশের লোক বান্দালাদেশের অধিবাসীদিগের মত এত মরে না কেন? অজ্ঞান দেশের লোকের রোগ-হয়, ডিকিৎসা হয়, ডাক্তার আরোগ্য লাভ করে। বাহার নিয়তি কুরাটয়া থাকে, সেট কেবল মৃত্যুমুখে পড়িলে চটয়া থাকে, কিন্তু বান্দালাদেশে বহু লোক বোগগ্রস্ত হয়, তাহার অধিকাংশট মৃত্যুকে যে অলিঙ্গন করিয়া থাকে, উহার প্রধান কারণট চটতেছে, পুষ্টি কর আচরণের অভাবে এবং নানাক্রম অত্যাচারে, তাহার উপর একটি ন' একটি ব্যাধিতে ক্রমাগত ভুগিয়া বান্দালীর জীবনী-শক্তি এরূপ কমিয়া গিয়াছে যে, সেট ক্ষয়-প্রাপ্ত জীবনীশক্তি রোগের আক্রমণ মোটেই সহ্য করিতে পারে না, কাজেই অতি সহজেই ধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত করে। বান্দালীজাতির ধ্বংস হইতেছে এইকপে।

বান্দালাদেশের অধিবাসীদিগকে মৃত্যুর আধিক্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য

ডাঃ বেটলী সাহেব গ্রামা স্বাস্থ্যের উন্নতিব জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন কবিয়া ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার ও কয়েকজন করিয়া তাঁহাঃ সহকারী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব কবিয়াছেন। প্রস্তাব ভাল শ্রবণে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐদপ নিযুক্তির ফলে কয়েকজন ডাক্তার নিযুক্ত কবিয়া গ্রামে গ্রামে ঘাণেরিয়াব সমস্ত কুইনাইন বিতরণেব মাতা বুদ্ধি করিলেইহো চলিবে না, পল্লীর পল্লীর জলের ব্যবস্থা সঙ্গীয়ে করিতে, হইবে। যে সব গ্রামে বিশেষ জনকটে, সে সব গ্রামে সঙ্গীয়ে পুকুরি বা ইলাবা কাটানব ব্যবস্থা করিতে চটবে। অনেক গ্রামে হয় তো ডাক্তারটি পুকুর মাকীয়াব আমলে কাটান হইয়াছিল, বচ-কালাবধি সংস্কারের অভাবে সেগুলি বুদ্ধিয়া বাইবার মত হইয়াছে, সেগুলিব সংস্কারে ব্যবস্থা করিতে চটবে। আমরা জানি, এইদপ সংস্কারের প্রয়োজন হইলে পুকুরিণীব অধিকারিকে বা গ্রামের অধিবাসীদিগকে চান্দা তুলিয়া কতক টাকা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে হস্তে প্রদান করিতে হয়, তবে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড তাহার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু দারিদ্র্যই যখন বান্দালার বেশি বুদ্ধি—তথা মৃত্যু বুদ্ধির কারণ, তখন দরিদ্র পল্লীবাসীর দ্বারা চান্দা সংগ্রহ হওয়া এ সময় সহজ ব্যাপার হইবে না। কাজেই গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষিত করিতে হইলে মহামন্ত্র সরকার বাহাদুরকে এ বিষয়ের ভার অনেকদূরে নিজেই লইতে হইবে। পল্লীর কুতী সজ্ঞানদিগেরও অবদান এ বিষয়ে সাধ্যমত সহায়তা করা কর্তব্য। কলকণা পল্লীগ্রামের কল সংস্কারের ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত পল্লী সরকার খে উপায় হইবে না—ইহা স্মরণীয়।



৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।] সুস্থ দেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যক কি না। ২৫৫

## সুস্থ দেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যকতা আছে কি না ?

পূর্ণাঙ্গুরতি।

### তামাক।

তামাক মাদক দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত।  
বাহ্যিক তামাক খাটতে অভ্যস্ত তামাকের  
ধূমপান করিলে তাহাদের মত্ততা জন্মে না  
বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি কখন তামাক খায় নাট,  
তাঁহার মত্ততা জন্মিয়া থাকে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে তামাক  
সভ্যজগতে প্রচলিত ছিল না। ১৩৯২ খ্রীস্টাব্দে  
কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার কালে তাঁহার  
সঙ্গে সান্স ওয়ালটার র্যাগে দুইটা দ্রব্য আমে-  
রিকা হইতে যুরোপে লইয়া আসেন, একটা  
গোল আলু, অপরটা তামাক।

কোন কোন লেখক তামাক পূর্বে এদেশে  
ছিল এইরূপ প্রমাণ করিতে রথা চেষ্টা  
করিয়াছেন। আনুসন্দের যে ধূমপানের  
উল্লেখ আছে তাহা তামাকের ধূম নহে।  
বিবিধ ঔষধ একত্র করিয়া তাহার ধূম পান  
করিতে হয় এবং এইরূপ ধূমপান বিবিধ  
বোগনাশক ইত্যাদি আনুসন্দের কথা।  
তামাক সম্বন্ধীয় কয়েকটি শ্লোক অল্পদিন হইল  
বচিত এবং গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। তামাক সম্বন্ধে  
একশ্রেণী লোকই শুনা যায়, সমস্ত লোক  
আধুনিক রচিত।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, তামাক  
খনি, দরিদ্র পণ্ডিত, মূর্খ, ত্যাগী, ভোগী  
নবনারী সকলেরই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে।  
কিন্তু এক সময়ে এই সর্বজন সমাপ্ত তামাক

সেবনের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কঠোর  
দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কসিয়ার দেশে তামাক  
সেবনের প্রথম অপরাধে ভীষণ বেত্রাঘাত,  
দ্বিতীয় অপরাধে নাসিকা ছেদন এবং তৃতীয়  
অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু অবশেষে  
মস্তিষ্কের মাদক দ্রব্য সেবনের কু প্রভুত্বই  
কমকাজ করায় সে সব ব্যবস্থা সে দেশ হইতে  
উঠিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক এখনকার দিনে মত্ত খাওয়া  
স্থানীয় কি না—এ প্রশ্ন বরং উত্থাপিত করা  
যাইতে পারে, কিন্তু তামাক সম্বন্ধে এরূপ  
প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। এখনকার দিনে  
সাধারণতঃ অনেক লোকেই তামাকের ধূমই  
পান করে। যাহারা দোস্তা, সুগা, নস্ত  
প্রভৃতি ব্যবহার করে, তামাকের বীজ মাত্র  
তাহাদের শরীরে প্রবেশ করে, সুতরাং  
তামাক খাওয়া নহে।

তামাক যে সুস্থ শরীরে বিষের ভায় অপকারী  
তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে ব্যক্তি কখন  
তামাক খায় নাট তাহাকে তামাক খাটতে  
দিলে তাহার মাথার যন্ত্রণা, বমনভাব বা বমি,  
মত্ততা এবং শরীর যেন ঘুরিতে থাকে এই  
সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়। যে দ্রব্য মুহূর্ত  
মধ্যে এরূপ বিকার উৎপাদন করিতে সক্ষম,  
সেই দ্রব্য দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে শরীরের  
যে বিষয় অনিষ্ট করিবে তাহাতে আর  
বিচিত্র কি ?

আমাদের দেশে লাউ কুমড়া প্রভৃতির চারা গাছের পোকা মারিবার জন্য হাঁকার জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। তামাকের ধূম হাঁকার জলের ভিতর দিয়া যায় বলিয়া তামাকের কতকটা বিষ জলের মধ্যে থাকিয়া যায়। সেই বিবেচনায় প্রভাবে ছোট ছোট পোকা মরিয়া যায়।

ধূম, নস, দোস্তা, জরদা প্রভৃতি বেরপেট ব্যবহৃত হউক তামাক শরীরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। তবে ব্যবহারের পার্থক্যে অনেকের তারতম্য ঘটে মাত্র। যেমন সিগারেটেব পরিবর্তে হাঁকার তামাক খাইলে হাঁকার জলে কতকটা বিষ থাকিয়া যায় বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্ট হইয়া থাকে।

তামাকের অপকারিতা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ পরীক্ষা দ্বারা যে সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন, নিম্নে তাহার সারমর্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

দীর্ঘকাল তামাকের ধূম পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠে বায়ু সঞ্চয়, নিবিধ বায়ু রোগ, শিবোরোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অধ্যাপক ডে, রসিডয়েলার বলেন যে,— তামাকে নানাপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে। এখানে নিকোটিন নামক মারাত্মক বিষ প্রধান। নিকোটিন শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। উহা ধমনী (Nerve) সকলকে চর্জিত করে এবং ক্রমে অকর্মণ্য করিয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপন্ন করে। নিকোটিন—জননবস্ত্রের ক্রিয়ার বিকৃতি, হৃদয়ের স্পন্দন (Palpitation) পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যাঘাত, অকর্ষ রোগ এবং কন্মন রোগ অদ্বার, উহার

দ্বারা চক্ষুর তারা বিস্তৃত হয়, দৃষ্টিশক্তির অন্নতা ঘটে এবং কর্ণে নানাবিধ বস্তুগা প্রদ শব্দ উৎপন্ন হয়।

ডাক্তার আরচার্ডসন বলিয়াছেন যে, ক্রমাগত তামাক ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক রক্তশূণ্য ও ফেকাশে হয়, পাকস্থলীতে রক্তবর্ণ অক্লব সকল উৎপন্ন হয়, রক্ত অত্যন্ত তরল হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেকাশে হয় এবং হৃদযন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে।

ডাক্তার জে, এচ, কোসগ এম, ডি, বলিয়াছেন যে, প্রসিক প্রসিকো বাতীত এমন কোন বিষ নাই, যাঁহা যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ৩৪ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। আশ্চর্যের তামাকে এত অধিক বিষ আছে, যে, যদি সেই সমস্ত বিষ প্রয়োগ করা যায়, তাঁহা তইলে তিন শত মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। একটা চুকের বিষে দুইজন মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। পক্ষী, ভেক এবং ক্ষুদ্র জীবদিগের তামাকের ধূম পূর্ণ দ্রব স্থানে রাখিলে শীঘ্রই মরিয়া যায়। সুতরাং তামাক যে ওষধিক বিষ তাঁহা ব সন্দেহ নাই।

ডাক্তার আলি, এক, আর, এম বলেন যে, অবাস্তবিক এবং ম্যালেরিয়া দীড়িত স্থানের অধিবাসিদিগের মুখ পাংশুবর্ণ হয়, শরীর সম্যক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না এবং মাংস পেশী লব্ধ চর্জিত হইয়া থাকে। উহার বাঁজিয়া থাকে বটে, কিন্তু মনুষ্যোচিত জীবনী শক্তির (Vitality) অর্জ্য মাত্র লইয়া। তামাক ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যক্তিদিগেরও শরীরের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে।

ডাক্তার জে, এচ, কোসগ এম, ডি, বলেন,—

৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। ] হৃদ দেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যক কি না। ২৫৭

তামাক ব্যবহারে রক্ত যে কেবল খারাপ হয় তাহা নহে, পরন্তু রক্ত বিযাক্ত হয় এবং রক্ত-স্থিত রক্তবর্ণ অণু সকল কমিয়া যায়।

অধ্যাপক রসিওনোনার বলেন যে, চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অত্যধিক পরিমাণে তামাক ব্যবহার করিলে কণ্ঠদেশে একপ্রকার ক্ষত হয় এবং উক্ত ক্ষত প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে।

লণ্ডনস্থ মেটপলিটন ফ্রি হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার সি, আর ডাইস-ডেল "পবলিক হেলথ" নামক পত্রে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, অল্প বয়সে তামাক খাওয়ার ফলে অনেক সময় ক্রুরোগ হইয়া থাকে।

তামাক ব্যবহার করিলে গ্যাস্ট্রিক দুসের ক্ষয় কমিয়া যায় এবং পাকস্থলীর কার্য কারিতা শক্তির হ্রাস হয়। নশ্ত ব্যবহারের ফলেও অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে।

তামাক ব্যবহারের ফলে একপ্রকার পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। তামাকে বৈষে ধমনী বিতানের (Nervous system) অত্যন্ত বিকৃতি ঘটে। তাহার জন্য তামাক-সেবী নিগের কেহ সত্যজ চমকিয়া উঠে, কেহ অত্যন্ত বিচিটে হয়, কাহারও হাত কাঁপিতে থাকে, কাহারও রাজিতে নিদ্রা হয় না। এইরূপ আরও আরও উপসর্গ ঘটে। বিশেষতঃ নেত্র ধমনী (Optic nerve) একেবারে অক্ষয় হইয়া পড়ে। আজ কাল লোকের যে অনেক বয়সেই দৃষ্টিকোণতা ঘটতেছে, তামাক ব্যবহার তাহার একটী প্রধান কারণ।

তামাক ব্যবহারে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার

ব্যাঘাত ঘটে এবং হৃদয়ের স্পন্দন (Palpitation), নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি উপসর্গ হয়। তামাকসেবীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, নাড়ীর গতি এবং বল হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, হৃদয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

তামাকের ধূমে ফুসফুসের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। তামাক ব্যবহারকারীর শরীর সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। ডাক্তার এচ, বি টিকানী বলেন যে, ইহা দ্বারা বৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, মন নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়া পড়ে, হিতাহিত জ্ঞান কমিয়া যায় এবং চরিত্র দূষিত হইয়া থাকে। ডাক্তার এল, জি, আলেকজান্ডার বলেন যে, তামাক ব্যবহারকারীর সম্ভাবনগণ তামাকে অত্যন্ত আশক্ত হইয়া থাকে এবং উহার দুর্বল শরীর, চরিত্র হীন এবং বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তামাক হৃদ শরীরে বিষবৎ অনিষ্টকারী, সুতরাং হৃদ শরীরের পক্ষে তামাক ব্যবহার করা উচিত নহে। অনেক তামাক সেবী কিন্তু ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, একদিকে রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান যেমন তামাককে বিষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, অপরদিকে লল লল তামাকসেবী হৃদ শরীরে জীবিত থাকিয়া তামাকের নিষেধিতা প্রমাণ করিতেছে। তামাকে যদি প্রকৃত পুষ্করিত রূপে অনিষ্ট হইত, তাহা হইলে কখনই এত লোক হৃদ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিত না।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই কিন্তু সত্যোমারাত্মকও আছে, আবার বহুকালে তামাকসেবীদিগের এই যুক্তির অসারত্ব প্রাণ নষ্ট করে এমন বিষও আছে। তামাক স্পষ্ট প্রতীকমান হয়। মনুষ্য শরীর এরূপ সেবন না করিলে যে ব্যক্তি সুস্থ, সবল ও সুকোশলে নির্মিষ্ট—যে কোন বিষই শরীরে নীরোগ শরীরে সত্তর বা আশী বৎসর প্রবেশ করুক সহজে শরীরের কোন বাঁচিতে পারিত, সে ব্যক্তি তামাক সেবনের অনিষ্ট করিতে পারে না এবং অভ্যাস ফলে তঁর দেহে বোগ ভোগ কবির পঞ্চাশ করিলে মারাত্মক বিষও সহ্য হইতে পারে। কি ষাট বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—অনেক লোক এত আশ্রয় খায়, যে তাহাতে এই অকালমৃত্যু তামাক বিষের ফলেই হইতে পারে। কেবল তামাক বলিয়া বলা হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া নহে—সকলপ্রকার মাদক দ্রব্যসেবীদিগের অধিকেন যে মারাত্মক বিষ নয় এরূপ বলা অধিকেন যে মারাত্মক বিষ নয় এরূপ বলা হইতে পারে না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিষ সিক অবনতি সেই মাদক দ্রব্যেরই কাণ্ড।

( ক্রমশঃ )

## প্রাচীন চিকিৎসকের টোটকা ও মুষ্টিযোগ। \*

( পূর্বাভাস )

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাহিড়ী।

**বমন নিবারণে**—এক ছটাক চিনির সরসতে দশ বারটা কচি আমের পাতা বাটরা সেই রস ঐ সরসতের সহিত মিশাটয়া পান করিলে বমন নিবারণ হয়।

**হিষ্কাহীন**—দ্রোণপুণ্ডের (গলধ'সহা ফুল) কচি শিকড় ১টা, আনা ৩ খণ্ড—একত্র বাটরা ৩টা বজকা প্রস্তুত করতঃ দিনে ৩ বার ঠাণ্ডা জলসহ সেবা।

**প্রবল হিষ্কাহীন**—পেঁপের আঠা ৩টা কোঁটা—১০ ছটাক নীতল জলের সহিত

খাটিলে প্রবল হিকা বন্ধ হয়। অথবা বর্ষা ঋতুতে যে সমস্ত বাঁশের খুঁটার জল আঁবক অবশ্যই থাকে, সেই জল হিকাগ্রস্ত রোগীকে পান করাইলে যে কোনপ্রকার হিকা হটুক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

**বায়ীশে**—ভেলার কাঠার নেকড়া হিষ্কাহী তাহার উপর অল্প পরিমাণে কলিচূর্ণ মিশাধরা বায়ীর উপর পাঁচ দিনে বায়ী বসিয়া বাইবে। অথবা পালিশা মাদারের আঠা বায়ীর উপর প্রয়োগ করিলেও বায়ী বসিয়া বাইবে।

**টোটকা**—টোটক উপর বহিঃস্থ পানি

\* প্রাচীন চিকিৎসক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাহিড়ী রচনা

৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।] প্রাচীন চিকিৎসকের টোটকা ও মুষ্টিযোগ। ২০৯

চুল থাকে তাহা কামাইয়া সেটাহানে পরিকার চিনি ও ছোট পৈয়াজ, অথবা লাগ জ্বাকুল কিম্বা লাল লঙ্কা মরিচ প্রতিদিন ভাবাব ঘর্ষণ করিলে আবার চুল উঠে।

**ফোড়াহ—**ন'টের মূল, রক্তচন্দন, গব্যমূত্র এবং শিমুলের কাঁটা সমান অংশে লইয়া বাটিয়া লাগাইলে ফোড়া আপনা হইতেই পাকিবে ও ফাটিয়া যাইবে। অথবা, মধু, ন'টের মূল বাটিয়া ফোড়ীর উপর স্থাপন করতঃ সেই মূল বাটার উপর একটা মটরের দাইল বসাইয়া দিলেও ফোড়া পাকিবে। অথবা গরু বস্ত্র ঘষিয়া লাগালেই ফল হইবে।

**আমাশহ—**পুরাতন তেঁতুল ১০ টোকা, এক পোয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল লবণ-সংযুক্ত করিয়া ১০ আনা খদির প্রক্ষেপ করতঃ সেবন করিলে ফল হয়। অথবা কাঁচা মিঠা আমেব ছাল ও কাল জামের ছাল সম পরিমাণে লইয়া তাহার রস ২ তোলা (গরম) মধু ও জিরাতাজার চূর্ণসহ সেবন করিলে প্রবল আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

**অর্শে—**মনসা সীজের আঠা ও হরিজ্ঞা চূর্ণ সমান অংশে লইয়া প্রলেপ দিলে বলি ধসিয়া পড়ে কতও আঁবেগা হয়। তিল, ভেণা, হরীতকী ও ইক্ষু গুড় সমভাগে লইয়া সেবন করিলে অন্তর্কলী নিরাস হয়।

**পোড়া আঁহে—**দগ্ধ হইবামাত্র চূণের জল, লঙ্কা গাছের পাতা ও নারিকেল তৈল সমপরিমাণে লইয়া দগ্ধ স্থানে লাগাইলে দগ্ধ স্থানের আঁলা বহুলা দূর হয় এবং কতও আরোগ্য হয়। অথবা বেগুন গাছের পাতা পাতা অগ্নিতে ভস্ম করিয়া মধুসহ কতস্থানে দিলে কত আরোগ্য হয়। অথবা জাত

পোড়াইয়া চূর্ণকরতঃ কতস্থানে প্রয়োগ করিলে কত নিরাস হয়, অথবা খড়ের ঘরের পচা গড় অগ্নিতে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম কতে প্রয়োগ করিলে দগ্ধ আরোগ্য হয়। দগ্ধস্থানে গোলা আলু বাটিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বহুলাব অবসান হইবে। দগ্ধস্থানে তৎক্ষণাৎ চূণ দিলে বেশ উপকার হয়। ডাবের শাঁসও মাখন একত্র বাটিয়া কতস্থানে লাগাইলে কত শুকাইয়া যায়।

**প্রদর—**(অত্যন্ত রক্তশ্রাবে) রসাজন ও লাল ন'টের শিকড় সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া মস্তুর দাইল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করতঃ মুর্খা মূলের শিকড়ের রস ও চিনি সহ সেব্য।

**প্লীহাহ—**হিরাকস ১ তোলা, মুলার বীজ ১ তোলা—গরম জল দ্বারা মর্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটি প্রাতে ও সন্ধ্যায় গুলফের বল ও চিনি সহ সেব্য।

**পাঁচড়াহ—**মাখন ও গন্ধক সম-পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

**পুরাতন জ্বরে—**কেতপাপড়া ২ তোলা, গুলফ ২ তোলা—কলার পাতে বেইন করিয়া রাজে পোড়াইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে ঐ রস মধুসহ সেবন করিলে পুরাতন জ্বরে উপকার হয়।

**উন্মাদে—**১ তোলা কর্পূর—পাথরের বাটিতে মজিস শূণ্য দ্বারা ১ ঘণ্টাকাল বাটিয়া ঐ কর্পূর রোগীর মস্তকে প্রলেপ দিতে হইবে। ওষধ মাখার দলে রোগীর বেশ নিশা হইবে।

**সর্বপ্রকার ক্ষতে**—শতখোত  
গব্যস্বত ১০ পোয়া, তুতে ভস্ম ১০ আনা—একত্র  
বর্ধন করিয়া মটর প্রমাণ ঔষধ কলা অথবা  
মাখনের সঙ্গে খাইলে হইবে। ঔষধ সেবন-  
কালে ঔষধ ঘেন দন্তে না স্পর্শিত হয়।

**বাতের বেদনায় এবৎ**  
**ফুলাস্ন**—আলা, লঙ্কা মরিচ, সজিনা ছাল,  
রহুন, ও ওকড়া শাক সমভাগে জল দিয়া  
বাটিয়া গরম করতঃ বেদনার ও ফুলার স্থানে  
প্রয়োগ করিতে হইবে।

**সর্দিতে**—ছোট পেরাজ, আতপ  
চাউল, ও লোরা সমভাগে লইয়া একত্রে জল  
দিয়া বাটিয়া সামান্য গরম করতঃ বকে পালপ  
দিলে সর্দি উঠিয়া যাইবে।

**প্রমেহে**—ছোট আমগাছের ছালের  
রস ১০ ছটাক—চূণের জল ১০ ছটাক এত  
মিশাইয়া সেবন করিতে হইবে। ঔষধ মিশা-  
ইয়াই সেবন করা দরকার, নতুবা ক্রিয়া  
হইবে। ২১০ দিন সেবা।

**প্রসঙ্গে**—ওলটকখলের শিকড়ের ছাল  
১০ আনা হইতে ১২ আনা পর্যন্ত এটা  
গোলমরিচ দ্বারা বাটিয়া সেবন করিলে অতি-  
শ্রাব বন্ধ হয়। ৩৪ দিন ব্যবহার করিতে  
হইবে।

**রক্তশ্রাবে**—বেতাককের মূলের  
ছাল ২টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন করিতে  
হইবে।

**মলমূত্র বন্ধে**—মলমূত্র বন্ধ হইয়া  
পেট ফুলিয়া গেলে একটী জারকল জল দিয়া

বসিয়া পুরাতন মূত্র মিশ্রিত করিয়া নাড়ীর  
চারদিকে প্রলেপ দিতে হইবে। \*

**স্বপ্নদোষে**—হরীতকী, আমলকী,  
বিষপত্র, কালজিরা সমভাগে লইয়া কাঁচা  
দুগ্ধ সহ সন্ধ্যার পর সেবা।

**হিস্কাক্রোণে**—সোমরাজী বীজ চূর্ণ  
ও হরিত্রা চূর্ণ সমভাগে চূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে  
সেবন করিতে হইবে।

**মূত্রস্রবের উপায়**—হার্জী-  
ভড়ার মূল গাভীর বামদিকের কোমরে  
বাধিয়া দিলে মূত্র প্রসব হইবে। প্রসবান্তে  
মূত্রটি খুলিয়া দিতে হইবে।

**পারদ জন্ম ক্ষতে**—তুলসী  
পাতা ও তোলা পরিমাণ চই সপ্তাহ চর্চণ  
করিয়া খাইলে ক্ষত নিরাময় হয়।

**ঋতুবন্ধ হইয়া গর্ভ সদৃশ  
হইলে**—চামেণী ফুলের পাতা ১০ পোয়া,  
জল ৮ সের শেষ ২ সের থাকিতে নামাইয়া  
ঐ জল ১০ ছটাক করিয়া প্রত্যহ ২ বার  
সেবা। ৩৪ দিন খাইলে পেটের জল বাহির  
হইবে।

**ধ্বজভঞ্জে**—একখানা ছোট নেক-  
ড়ার পালিখা মাদারের আঠা ৭ আর মাখাইয়া

\* এই মৃষ্টযোগটি কিন্তু আমাদের মতে কেমন  
কেমন ঠেকিতেছে, কারণ জারকলের গুণ মলের  
বিবন্ধতার সংঘটন, এইজন্য এমন অভিসারে নাড়ির  
চারি পাশে জারকল বসিয়া প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা  
আছে। মল বন্ধ হওয়ার জন্য বাহ্যিকের পেট ফুলিয়া  
উঠিয়াছে তাহাদিগের ইহাতে কি করিয়া বল হইবে?  
আমাদের যোগ হয় উহাতে আতঃ বিপরীত হইয়া  
পারে। তবে ইহা একজন প্রাচীন চিকিৎসকের পাতার  
লিখিত বসিয়া আমরা রাখিয়াছি। (অঃ সঃ)

৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।] প্রাচীন চিকিৎসকের টোটকা ও মুষ্টিযোগ । ২৬১

তৃণাইতে হইবে পড়ে আয়কল চূর্ণ ও লবঙ্গ চূর্ণ  
মাখাইয়া সন্ধ্যার সময় পুরুবাঙ্গে পটা বাঁধিতে  
হইবে এবং সমস্ত রাগিই বাঁধিয়া রাখিতে  
হইবে ।

**রক্ত-প্রদরো**—বাসকের ছাল  
২ তোলা, জল ৮০ সেব ঝাঝ জাল করতঃ  
৮০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ফটকাগী,  
প্রাণদু, লোণ, বসন্তিন, পদ্মকেশব, ও অশো-  
কের ছাল চূর্ণ, প্রত্যেক ৫ রতি সহ ২ বেলা  
সেবা । ৭ দিন ব্যবহারে রক্ত, প্রদব আরোগ্য  
হয় ।

**শোথে**—সোবা ১ তোলা, শোবিত  
গন্ধক ১ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া এক-  
লোহাব হাতার অগ্নিতে জাল দিতে হইবে ।  
যখন ঔষধ হাতার উপর অগ্নি উঠিবে তখন  
তাহা একটি মাটির পাত্রে ঢালিয়া রাখিতে  
হইবে এবং ঠাণ্ডা হইলে চূর্ণ করিয়া লইতে  
হইবে । সেই চূর্ণ ১ রতি পুনর্বার রস সহ  
সেবা ।

**রক্তপিত্তে**—চুকাশকের মূল ৩  
তোলা, মোরী ১ পোয়া, চিনি ২ তোলা,  
মোরী বাটিয়া চুকাশকের মূলের রসে চিনি  
সহ সন্ধ্যায় ঔষধ সেবন করিলে বৃকের  
ভার ও রক্তপিত্ত আরোগ্য হয় ।

**দ্রুতরোগে**—কপূর্ব ১ তোলা,  
গন্ধক ৪ তোলা, সোহাগুর ষে ২ তোলা,  
গর্জন তৈল ১ পোয়া, একত্র মর্দন করতঃ  
দ্রুত রোগে প্রযুক্ত ।

**রক্তপ্রদরো**—কাঁচা আধা ৮০  
আনা, বেগছাল চূর্ণ ১ পোয়া—একত্র বাটিয়া  
অশোকের ছালের রস সহ খাটতে হইবে ।

**অগ্নিক প্রসাবে**—কাঁচা ডুহুর

১৫টা ছুঁটিয়া সেই রস, চিনি ২ তোলা, জল  
৮০ পোয়া—সন্ধ্যায় করতঃ সেবন করিতে  
হইবে ।

**পেট ফাঁপানো**—গোলমরিচ ৬ ৭টা  
চূর্ণ করিয়া মিছরির সন্ধ্যায় সহ সেবা ।

**ত্রিমিরোগে**—পলাশবীজ, বিড়ঙ্গ,  
যমানী ও কুমড়ার বীজ (মিষ্ট) প্রত্যেক  
৮০ তোলা, জল ৮০ পের দিয়া সিদ্ধ করিয়া  
৮০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ ২  
তোলা বিড়ঙ্গের চূর্ণ সহ ২ বার দিনে সেবা ।

**অরুচিতে**—পাকা জামের রস ৮০  
সের, মিছরি ৮০ পোয়া—একটা মাটির পাত্রে  
জাল দিয়া মিছরি গলিগা গেলে গোলাপ জল  
২ তোলা মিশাইতে হইবে । প্রত্যহ আধা-  
বের পূর্বে ১ তোলা সেবা ।

**সর্বপ্রকার ক্ষতে**—শতধৌত  
গব্যস্বত ৮০ পোয়া মুত্ৰা শঙ্খ ৮০ ছটাক,  
সফেদা ৮০ ছটাক, ১ প্রহর খলে মাড়িয়া  
কপূর্ব ৩ তোলা মিশাইয়া ক্ষতে লাগাইতে  
হইবে ।

**পিত্তজন্য হাত পা জ্বালা**  
**করিলে**—বিটলবণ, গোণমরিচ, সোহাগুর  
ষে প্রত্যেক ৩ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া  
২৩ রতি মুখে দিয়া মিছরির সন্ধ্যায় খাইতে  
হইবে ।

**উপদংশে ও সর্বপ্রকার**  
**ক্ষতে**—গব্যস্বত ৮০ সের লইয়া নিম্নের  
পাগ ও নিসিন্দার পাতা ও অপা-  
মার্গের মূল ১০টা ঐ স্বতে ভাজিয়া স্বত হাঁকিয়া  
লইয়া মিটকিরি ষে ৮০ তোলা, তুতে তৈল  
৮০ টরি জালা মিশাইতে হইবে । ক্ষতে ঐ স্বত  
প্রয়োগ করিবে ।

**বিশ্ব ভক্ষণে**—কলমী শাকের ডাটা ও পাতার বস ১/১০ পোয়া বোগীকে খাওয়াইতে হইবে, তাহা হটলে বোগীর বমি হটয়া বিষ উঠিয়া যাইবে ।

**হিষ্কাশ**—আনাবসের পাতার বস ১/১০ পোয়া, মিহরি ১ তোলা সহ সেবা ।

**আমশাশ**—বাবলা গাছের পাতা, থানকুনী শাকের পাতা ও সামান্ত অর্ধফল একত্র বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে আমাশয়ের অন্ত পেট ব্যথার উপকার হয় ।

**রাত্রিতে চক্ষুতে না দেখাশ**—পানের বস ২১৩ ফোঁটা চক্ষে দিতে হটবে । পরে ৫৬ মিনিট চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিব পর ঠাণ্ডা জল দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিতে হটবে । একদিনেই উপকার হয় । ষোড়শের বিষ্ঠা (সত্ত) এক থানা পরিষ্কার নেকড়ার পুটুলী করিয়া চক্ষুতে সেই বিষ্ঠার রস ১ ফোঁটা করিয়া দিলেও বেশ ফল হয় । শনি মঙ্গলবারে একটা জোনাকী পোকা একটা কলার ভিতর ভরিয়া যে স্থানে ওটা রাস্তা মিলিয়াছে সেইরূপ স্থানে বোগীকে সন্ধ্যার পর সেই জোনাকী ভরা কলা খাইতে দিতে হটবে, রোগী কলা খাইয়াই চক্ষুতে দেখিতে পাইবে ।

**রক্তপ্রদরে**—ষেত আকন্দের মূল ২ তোলা, গোলমরিচ ১০ তোলা—বাসি জলে বাটিয়া সেবনে ফল পাওয়া যায় ।

\* শনি মঙ্গল বারে এবং বেহায়ে তিথি রাত্রি মিলিয়াছে, সেতপ ব্যবহার জোনাকী খাওয়ার কল আনরা জািনা, তবে জোনাকী—কলার ভিতরে পুড়িয়া খাইলে যে একপ অবস্থার ফল পাওয়া যায়, তাহা আনরাও করেক স্থানে প্রত্যাক করিয়াছি । আঃ সঃ ।

**ক্ষতে**—ষেত কাকড়ি মূল ১০ টী, নিম-পাতা বাটা ২ তোলা—একত্র বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ ।

**শিশুর উদ্ব্যামসে**—লবঙ্গ, জাফল, ও মোহাগার ঐ প্রত্যেকটি সমভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া মাতৃদুগ্ধ সহ সেবন করাইলে ফল পাওয়া যায় ।

**বাষী বসান**—হিরাকস ভিজান ফলের পটা দিলে বাষী বসিয়া যায় । (২) কালকুটুর ডিম ১টা কাঁসার খালে তালিয়া চূর্ণ সামান্ত দিয়া উত্তমরূপে ডিমের লালাব স্তমিত মিশাইতে হইবে, এট প্রথম দিনসে ৩.৪ বার প্রয়োগে ফল পাওয়া যায় ।

**অল্পব্রোণে**—প্রতিদিন গুঁড়া চা পড়ি ১০.১২ বার—১ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে । বোগ উপশমিত হটলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা কমাইতে হইবে ।

**প্রমেহে**—রানকলে সাত খণ্ড আদা ও এক খণ্ড আসাওড়ার (বাধা সকলে দৃষ্ট ধাবনার্য ব্যবহার করে) মূল একত্রে মুখের মধ্যে দিয়া জলে ডুব দিয়া চিবাইয়া খাইতে হটতে হটবে । পরিশেষে রানাকে দধি, কদলী সহ অন্ন ভোজন । এই প্রক্রিয়া করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয় । (২) ককতুলসীর পাতার রস বিনা জলে বাতির করিতে হটবে । সেই তুলসীর রস ১ তোলা—টাইকা মধু ১ তোলা, খাঁটি গব্য দুধ ১ তোলা—একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সেবন করিলে যেমন কঠিন শ্যামি হটুক না কেন নিশ্চয়ই ফল হইবে । প্রমেহ অধিক দিনের হটিলে এক পক্ষকাল অবধা ৩ সপ্তাহ



সেবন করিতে হইবে । (৩) একটি পুঁই শাকের মূল ১/১ পোয়া অলের সহিত বাটিয়া স্নানান্ত্রে খাইতে হইবে । পরে ভিজান কাঁচা কলাট-য়েব দাইল চিনির সহিত সেবন করিতে হইবে । এই প্রকার ৩ দিন করিলে রোগ আরোগ্য হইবে ।

#### সহজ হিকা নিবারনে—

একটি পাতি অথবা কাগজী লেবুব একদিক কাটিয়া তাহা স্বঁচ দ্বারা বাব বার বিন্দু করিয়া তাহাতে মিছরির গুঁড়া দিতে হইবে । স্বঁচ একপা ভাবে বিন্দু করিতে হইবে যে, সেই দুটা বিন্দু কালে ছিষ্ট পথে যেন মিছরি প্রবেশ

করে । এইরূপে লেবুটা প্রস্তুত করিয়া রোগীকে লেবু চুষিতে হইবে । হিকা কালে রোগী সেই লেবুটার কঠিত মুখে মুখ দিয়া অল্পে অল্পে চুষিতে থাকিবে । এইরূপ করিলে হিকা নিবরিত হয় ।

পালা জ্বরে—হাতিগুড়োর পাচার রসে একখানি ছিন্ন বস্ত্র সিক্ত করিয়া ছোবড়া গুলি সেই বস্ত্রের এক প্রান্তে বাধিয়া বাধিতে হইবে । পবে সেই পুঁটুলীর জ্বাণ পুনঃ পুনঃ লইতে হইবে, পালার ২৩ দিন এই ঔষধের জ্বাণ লইলে পালা নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে ।

## হুংপিণ্ডের হাঁপছাড়া ।

[ “হিন্দুস্থান হইতে সংগৃহীত” ]

মাস্তুরের দেহের মধ্যে হুংপিণ্ড হইতেছে সর্ব-চেয়ে বড় গ্রন্থি ; কিন্তু তাহার সঠিক বৃত্তান্ত আমরা একরকম জানি না বলিলেও চলে ।

দেহের বাক্য সর্বপ্রথমে হুংপিণ্ডের চারিটি কুঠরী ; তারপর পরীরের ছোট-বড় সমস্ত ভিতরে ঘুরিয়া, একবার কুসকুলের মধ্যে গমন করে । তৎপরে আবার হুংপিণ্ডের মধ্যে ফিরিয়া আসে । আমাদের দেহের ভিতরে ক্রমাগত এমন চক্রের আসা যাওয়া চলিতেছে । দেখা গিয়াছে, এমন করিয়া প্রত্যেকবার সারা দেহটা ঘুরিয়া আসিতে রক্তের পক্ষে আব-মিহিটর বৈশী সময় লাগে না ।

হাম্বা বখন দাঁড়াইয়া থাকে তখন তাহার হুংপিণ্ড বতবার স্পন্দিত হয়, বখন সে শুইয়া থাকে তখন তাহার হুংপিণ্ড তার চেয়ে দশবার কম স্পন্দিত হয় । হাম্বা বখন হাঁচে, হুংপিণ্ডের গতি তখন বন্ধ হইয়া হইয়া । একজন বিশেষজ্ঞের মতে, হুংপিণ্ডের কাজের হের-ফেরের দরুণই হাম্বার মুখ কণিকের জন্ত পাত্তবর্ণ বা লজ্জার সময়ে লাল হইয়া উঠে । চোকাভগা আত্মা হুংপিণ্ডের দোষ-নির্দেশক । হাম্বার উদরের পরিপাক-কারী বস্তুগুলি ও কুসকুলের সঙ্গে হুংপিণ্ডের আকারও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়, সে হাঁচ-কীবন লাভ করিয়া থাকে । হুংপিণ্ড সবচেয়ে এনি দারুণ অনেক জানিবার কথা আছে,

সাধারণতঃ সকলের ঘাফা জানা নাই। আপন আপন দেহ সম্বন্ধে সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান-সঞ্চয় করা উচিত। তাই এখানে আমরা জ্বংপিও সম্বন্ধে আরও কতকগুলি জ্ঞান বা তথ্য লিপিবদ্ধ করিব।

প্রাণ্ডি কহাকে বলে, আপনাবা সকলেই তাহা জানেন। দেহের মাংসপেশীগুলিকে বেশীক্ষণ কার্যে নিযুক্ত রাখিলেই মানুষের শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়ে। মাংসপেশীর মধ্যে শ্রম-বিষ সঞ্চারিত হইলে মানুষের মনে যে শ্রান্তির ভাব আসে, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলেই সে তাবটা চলিয়া যায়। কার্যেব সময়ে মাংসপেশী যে সার পদার্থ ব্যয় করে, বিশ্রামের সময়ে সে আবার সেটা পরিপূরণ করিয়া নেয়।

এই শ্রান্তির ভাবটা বেশ আরামের না হইলেও, এটা না থাকিলে আমরা কিছুতেই বাঁচিলাম না। কারণ, তাহা ছইলে আমরা এমন ভীষণ পরিশ্রম করিতাম যে, আমাদের সমস্ত মাংসপেশী একেবারে নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইত। কিন্তু তাগো শ্রান্তি আসিয়া আমাদিগকে আগেই সাবধান করিয়া দেয়।

দেহের সমস্ত মাংস মাংসপেশীর একটি এক,—কেবল জ্বংপিও ছাড়া। এখানে বলিয়া রাখা ভালো, আসলে জ্বংপিও মাংসপেশী ভিন্ন আর কিছুই নহে। দিনে-রাত্রে জ্বংপিও যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াও সন্তোষ-সবল থাকে, অল্প যে কোন মাংসপেশীর পক্ষে সে পরিশ্রমটা নিশ্চিত বরষের রতট সাংঘাতিক।

কিন্তু আপনাদিগকে অনেকট বোঝ কর আশেন না যে, জ্বংপিও তাহার কার্যের কীক

কীক নিয়মিত ভাবে বিশ্রাম করিয়া নেয়। জ্বংপিওের বিশ্রামেব নামান্তর মৃত্যু—এই কথাই আমরা জানি। কিন্তু জ্বংপিওের বিশ্রামের মধ্যে বেশ একটু নিপুণতা আছে এবং সেট অল্পই সে বিশ্রাম করিলে আমরাও চির-বিশ্রাম লাভ করি না।

নহিলে জ্বংপিওের তপ্তপুনি-বদি অল্পক্ষণের জ্ঞাও বন্ধ হয়, তবে আমাদের পক্ষে সন্তো-সতাট বাঁচিয়া থাকি অসম্ভব।

গড়পড়তার হিসাবে, উপবিষ্ট অবস্থায় প্রত্যেক পুরুষের জ্বংপিও মিনিটে বাহাত্তর বাব এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোকের জ্বংপিও মিনিটে আশী বাব করিয়া স্পন্দিত হয়। এমন মানুষ দেখা যায়, বাহার জ্বংপিও মিনিটে পঞ্চাশ বায়েও বেশী স্পন্দিত হয় না। এখন তাহারা দেখুন, দিন-রাত্রে অশ্রান্তভাবে এই বিষয় পরিশ্রমটা করিতে হইলে কতখানি শক্তি-সামর্থ্যের দরকার। এত বেশী পরিশ্রম করিতে হইলে, যে শক্তি ব্যয় হয়, সেট শক্তিবলে প্রতিদিন পৃথিবীর পতীরতম খনি হইতে একখানি চাঁর সেব ওঘনের পাথরকে অনায়াসে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের চূড়ার একবার করিয়া তুলিয়া ফেলা যায়।

সুতরাং জ্বংপিওেরও বিশ্রাম দরকার। কিন্তু সে কি করিয়া বিশ্রাম নেয়, জানেন? আপনি যদি কোন গোলের বকের উপরে কাণ রাখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, জ্বংপিও একবার হুপ্ হুপ্ শব্দ করিতেছে; আর একবার ধামিতেছে। এই যে ধামা ইহাই জ্বংপিওের কঠোরজিত বিশ্রাম। শরীরের মধ্যে একমাত্র জ্বংপিও ছাড়া আর কোন মাংসপেশীই এমনভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে

পারে না। তাহার এই বিশ্রাম অনেকটা চক্ষিণ ঘণ্টার মধ্যে জ্বংপিণ্ডের ক্ষেপিত একচৌথ মুদিয়া ঘুমানোর মতন বটে, তবু এই বিশ্রামের পরিমাণও বড় অল্প হয় না। এবং এই বিশ্রাম না থাকিলে, অল্পদিনেই জ্বংপিণ্ড অচল হইয়া যাউত।

## ডাক্তারের ডায়েরী ।

স্বর্গীয় ডাঃ হেমচন্দ্র সেন মহোদয় কর্তৃক লিখিত ও

ডাঃ শ্রীভগবৎকৃষ্ণ গুপ্ত এল, এম, এস, কর্তৃক সংগৃহীত ।

আম এক অদ্ভুত রোগী পাইয়াছিলাম। লোকটার বয়স ৩০-৩২ হইবে, সর্বাঙ্গ ক্ষত-পূর্ণ। সে গরমীর ব্যায়ামে অনেকদিন হঠতে ভুগিতেছে। প্রথমেই আসিয়া আমাকে বলিল—তাহার এক শত্রু তাটাকে পানের ভিতর করিয়া কাঁচা পারা খাওয়াইয়াছিল,—সেই প্রকট তাহার “পারার বা” হইয়াছে। কথাটা শুনিয়া আমার হাসি আসিল। আমি একজন ডাক্তার, লোকটা আমার সঙ্গেই প্রতারণা করিল। “পারার বা” কথাটাই নিরর্থক। অনেক লোক আছে—বাহার নিজের পাপকে গোপন করিবার জন্য “পারার বা” কথাটার স্মৃতি করিয়াছে। আবার এমন শুণ্ধর পুরুষ আছেন, যিনি অমানবদনে বলিয়া কেঁদেন—“অনেক ডাক্তারী ঔষধ খাইয়াছি—হয়ত তাহাতেই আমার মতে পারা ফুটিয়াছে।” হায়! এই সকল যবৎকরা হয় ত জানে না—বিশুদ্ধ পারা

শরীরে এক কণাও গৃহীত হয় না, পারার শরীরের কোনও অপকারই হয় না। বরং পারদ খটিত লবণ (Salt of mercury) দেহান্তরে গৃহীত হইয়া স্বয়ং ধর্ম্মাহ্বারী লক্ষণ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু তাহাও কখনও ‘বা’ রূপে প্রকাশ পায় না। ‘অধিকন্তু—পারার চরে গরমীর ব্যায়ামের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। গরমীর ব্যায়াম আরাম করিবার জন্য সরল প্রকৃতির ডাক্তার-গণ প্রকৃত্তে এবং চতুর ডাক্তারেরা গোপনে ঔষধরূপে পারাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মূর্থ লোকে গরমীকে “পারার বা” বন্ধ, কিন্তু শিক্ত ডাক্তারেরাও যে (Mercurial Eruption) বলিয়া কথাটার ব্যবহার করেন, ইহা আশ্চর্য্যজনক।

বন্ধ্যারোগে—ছাপল।

চাপল বন্ধ্যারোগের প্রতিকারক। আমা-

দের পূর্বপুরুষগণ—এ তথা জানিতেন। চরক  
কহি বলেন—“ছাগ মাংস ভক্ষণ, ছাগছত্ৰ  
পান, ছাগলের সেবা, ছাগলের মধ্যে শয়ন—  
নিশ্চয় বক্ষারোগ নষ্ট করে।” আমি টা  
পরীক্ষা করিয়া দেখিগাছি। আমাব ঔষধা-  
লয়ের ১ ক্রোশ দূরে এক মুসলমান যুগ  
বাস করিত। এ ব্যক্তি ধনী এবং উদ্বিগ্ন  
পরায়ণ ছিল। তাহার বক্ষাবোগ হয়। আমি  
চিকিৎসা কবি। ডাক্তারী কোন ঔষধে  
বিশেষ ফল না পাওয়ার, আমি তাহাকে ছাগ-  
মাংস ভক্ষণ ও ছাগছত্ৰ পান করিতে বলি  
লাম। তাহার শয্যা চতুর্দিকে ৪৫টা  
ছাগল রাখিয়া রাবিবার উপদেশ দিলাম।  
রোগী আমার আদেশ পালন করিল। ৪  
মাসের পরে তাহার বক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখা  
গেল—কর রোগের চিহ্ন অন্তর্হিত হইরাছে।  
১ বৎসর রোগী আমার আদেশ পালন  
করিয়াছিল। তাহার পর ১১ বৎসর কাল  
আমি তাহার আর রোগ হইতে দেখি নাই।  
সেই অবধি চরকের উপর আমার বড়ই  
ভক্তি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে “চরক সংহিতা”  
একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, তারতেরও  
সৌরবের জিনিষ। ইউরোপের একজন বড়  
ডাক্তার বলিয়াছেন,—“চরকের মতের  
চিকিৎসা প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবী হইতে  
অকাল মৃত্যু দূর হইত।” আমরা কিন্তু  
আজও চরকের আদর বুঝিলাম না।

সোডার চেয়ে “ডাক্তার লবণ”

অনেক ভাল।

পাকস্থলীর কষ্ট এবং অস্বাভিক্য পূর্বে  
আমি বাইকার্বেনেট সোডা—বর্ষে পরিমাণে

অল মিশাইয়া রোগীকে খাটতে দিগাম।  
পীড়ার প্রবল অবস্থার তাহাতে সাময়িক কিছু  
উপকাব দর্শিত। কিন্তু এমন দুই চাবিজন  
বোগী পাউগাডি—মাহাদেব সোডার কোন  
ফল হয় নাই। তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা ছিল।  
প্রচুর মাত্রায় পাউট ম্যাগনেসিয়া ব্যবস্থা  
করিয়া ১০।১১ দিন তাহাদিগকে সুস্থ রাখিয়া  
ছিলাম। পাকস্থলীর গাইড্রোক্লোরিক  
আসিডের অম্লত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা—অধিক  
মাত্রায় ম্যাগনেসিয়া উপকাবী। তবে  
কাচাব ও কাচাব ও সে উপকাব বেশী দিন স্থায়ী  
হয় নাই। একপ বোগীকে—সবনাইটেব অ-  
বিষমণ ১ ড্রাম মাত্রায় দিয়াছি। বিষমণ  
পাকস্থলীর রৈম্মক ক্রিয়ীর উপর আবরক  
হইয়া থাকে, সে জন্য খাদ্য জবা কোনরূপ  
উত্তেজনা প্রকাশ করিবার অবকাশ পায় না,  
পেপটিক গ্রন্থির আর্দ্র এবং কার্যকাবিতা হ্রাস  
হয়। যখন দেহিলাব বিষমণের ক্রিয়াও  
বেশীদিন স্থায়ী হইল না, তখন কবিরাজী—  
“ডাক্তার লবণ” ব্যবস্থা কবিলাম। রোগী  
বেশ ভাল হইয়া গেল। “ডাক্তার লবণ” একটা  
মধ্যেব। তাতে পাকস্থলীর রক্তস্রাব বন্ধ  
হয়, অম্লের ক্রিয় দূর হয়, গ্রন্থির আর্দ্র কবিতা  
যায়।

বেশিত আয়িক সলীর্ণ রোগীকে—  
তাহার সর্ব প্রধান চিকিৎসা—কোন প্রকার  
উত্তেজনার কারণ না থাকে। তাহাকে  
আমোদ আমোদ নাতি প্রকৃতির সর্ব প্রকার  
উত্তেজনা হইতে দূরে রাখিলে।

নিম্নিতাবস্থায় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলে, অবসাদক [ এটিপাইরিন, সেনাসিটিন প্রভৃতি ] বিশেষ উপকারী ।

যে বালক অধিক বয়স পর্যন্ত শয্যাযুক্ত থাকিয়া ফেলে, তাকে বেলেডোনা উপযুক্ত মাত্রায় খাওয়াইবে। প্রথমে খুব অল্পমাত্রায় দিবে, পরে সম্ভবত মাত্রা বাড়াইবে।

বেলেডোনার ঘন্থা রোগীর নিশিঘর্ষ নিবারণিত হয়।

প্রদাহ—শরীরেব অনিষ্টকারী নহে। বয়স উপকারী। প্রদাহ—প্রকৃতির ক্ষমতার পরিচায়ক, শারীরিক অনিষ্ট নিবারণের ক্ষমতা—তাহা প্রতিবাদ। অতএব প্রদাহ ক্রিয়াকে শরীর রক্ষার্থ সাহায্য করিতে হইবে।

কবিরাজী ঔষধে কুষ্ঠরোগ আরোপ্য।

পাশ্চাত্য মতে কুষ্ঠ রোগের একটি মাত্র কারণ—Bacillus Lepra. ল্যাবরেন্স মতে কুষ্ঠ রোগের কারণ অনেকগুলি—তন্মধ্যে ষাণ্ডের দোষ সর্বপ্রধান। মংস্ত ও মাংসের বহুল ব্যবহারে কুষ্ঠরোগ জন্মিতে পারে—ইহা স্বাধ-বাক্য। এই জন্তই বোধ হয় তিন্দু-গানী বৈজ্ঞগণ কুষ্ঠরোগীকে নিবাসিত খাইতে এবং সাম্বিক নিরম্নে থাকিতে উপদেশ দেন।

আমি ৩টা কুষ্ঠ রোগী পাইয়াছিলাম। হইজন মুসলমান, একজন হিন্দু মাড়োরারী। এট মাড়োরারী—কুষ্ঠরোগীর অনেক দিন ধরিয় পরিচর্যা করিয়া, কুষ্ঠাক্রান্ত হইয়াছিল। এট তিন জনের কুষ্ঠই—Cubercular leprosyর অন্তর্গত। তিন জনকে প্রায়

একই সময়ে আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। কিন্তু মুসলমান হইজন ভাল হয় নাই, মাড়োরারী ভাল হইয়াছিল। মুসলমান বয়স ও পলাণ্ড ব্যবহার ছাড়ে নাই। মাড়োরারী—সাম্বিক আহার করিত। মাড়োরারীর—মস্তকের চুল খসিয়া পড়িয়াছিল, মুখগহ্বরের ঝিল্লী ফুলিয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠের অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানদেরই অবস্থা এতদূর, ভীষণ হয় নাই। চিকিৎসা প্রারম্ভে আমি তিনজনকেই ঘোলাপ দিই। তাব পর চালমুগরার বিকৃত তৈল (anti-leprol) মাংসপেশীতে পিচকারীর সাহায্যে প্রয়োগ করি। ৫, C. C. তৈল ৩ দিন অন্তর injection দিই। ৭ মাস পরে মাড়োরারীট ভাল হইয়া গেল। কিন্তু ১ বৎসরেরও অধিক কাল মুসলমানদ্বয়কে চাল-মুগরার capsule (১৪০ ফোঁটা পর্যন্ত) খাওয়াইয়াও কোনও উপকার দেখাইতে পারিলাম না। আমার চিকিৎসাবীন হইয়াও মাড়োরারী—বৈজ্ঞের ঔষধ পরিচয়গ করে না। সে প্রতাহ—নিম্ন ছালের গুঁড়া স্তরের সহিত সেবন করিত। নিম্নের বীজ স্তরে তাজিয়া গারে মাষিত, নিরশাখার দাঁতন করিত। আমার বিশ্বাস—মাড়োরারী যে ভাল হইল—নিম্নের প্রতাবও তাহার একটি কারণ। নিরাসিত ভোজনও একটি কারণ।

আয়ুর্বেদে কুষ্ঠরোগের অসংখ্য ঔষধ করিত হইয়াছে। কত চূর্ণ, কত বটিকা, কত তৈল, কত গুল্ল, প্রলেপ !! এই সকল ঔষধের উপাদানের বৈজ্ঞানিক অজ্ঞান হওয়া উচিত।

## শিশুচিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা ।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন

—১৯০০—

**কাস ও শ্বাসে।**—(১) কটকারী, বালতী, নভী ও নাগকেশর চূর্ণ সমভাগে ২।৩ রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুর কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়। (২) ধনের শুঁড়া ও চিনি—চাউল খোয়া জল সহ পান করাইলে শিশুর কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়। (৩) ড্রাক্স ( কিসমিস ), বাসক, চরীতকী, পিপ্পল, হের শুঁড়া—মধু ও ঘূতের সহিত লেহন করাইলে শিশুর শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। (৪) দুবালতা, হরীতকী, পিপ্পল, কিসমিস—টহাদের চূর্ণ ঘূত ও মধুর সহিত সেবন করাইলে শ্বাস, কাস ও হিকা নষ্ট হয়। মাত্রা প্রত্যেক দ্রব্য ১ বৎসরের শিশুর জন্য সিকি রতি। (৫) কুড়, আতাইচ, কীকড়াশুকী, পিপ্পল ও দুবালতা—ইহাদের চূর্ণ সিকি রতি মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুদিগের সমস্ত বিধ কাস রোগ আরোগ্য হয়।

**বমন রোগে।**—(১) পুষ্টি, কটকারী ও বেগুন.কলের রস মধুর সহিত অল্প মাত্রায় লেহন করাইলে শিশুদিগের বমি বন্ধ হয়। (২) প্রিয়ঙ্গু, কুলের জ্যৈষ্ঠের শাস, মূর্ণা ও রসাকন—একত্রে ১ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের বমন নিবারিত হয়। (৩) কটকী চূর্ণ—মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের অতি প্রবল বমন ও হিকা নিবারিত হয়। (৪) সেরিষাটি চূর্ণ

মধুর সহিত লেহন করাইলে বমন ও হিকা নির্মিত্বাবলক অতি সম্ভব সহজতায় লাভ করে।

**রক্তশাতিসান্নে।**—(১) জাম-ছালের রস—কিকিং ছাগছুরের সহিত মিশাইয়া পান করিলে শিশুদিগের রক্তাতিসারের বিশেষ উপকার হয়। (২) কুড়ির ছাগ চূর্ণ ১ রতি, গেরিমাটি অর্ধ রতি—কিকিং চাউল খোয়া জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে শিশুদিগের রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। (৩) কাঁচা বেল পোড়াইয়া তাহার শাস চারি আনা, ইক্ষুগুড় দুই আনা—জলের সহিত পাটলা করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসাবে উপকার দশে।

**শোথে।**—(১) বৎসর ১ রতি, মিছরি এক আনা, যেত পুনর্বার রসের সহিত দুই তিন বার করিয়া সমস্ত দিনে সেবন করাইলে শিশুদিগের হাত পায়ের ফুলা বিনষ্ট হয়। (২) যেত পুনর্বার রস ১ বিম্বক—কিকিং মিছরির সহিত প্রত্যহ ১০ বার পান করাইলে বালকদিগের শোথ আরোগ্য হয়। (৩) পুনর্বা, নিমছাল, নতি, তুঁঠ, কটকী, বিটলবণ, দেবদারু, হরীতকী—ইহাদের কাথ দুই বিম্বক করিয়া কিকিং মধুর সহিত পান করাইলে শিশুদিগের শোথ বিনষ্ট হয়। এই সকল ত্রব্যের মাত্রা প্রত্যেকটি দুই আনা। এই কাথ কিম্বা পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে দেওয়া বিবেক।

## সমালোচনা ।

অব্যর্থ সিদ্ধান্ত সুউত্তমোক্ত।

কবিগণ আঁরাঙ্ক নথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন  
কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১০/০  
আনা। মুষ্টিযোগের পুস্তক বাজারে অনেকগুলি  
বাহির হইয়াছে, এখানি তাহাদিগের অন্ততম।  
এই পুস্তকে গ্রন্থকারের কতকগুলি বাবল্লু দৃষ্ট-  
কণ মুষ্টিযোগের সহিত শাস্ত্রীয় মুষ্টিযোগগুলি  
সিপিলক হইয়াছে, কাজেই এ গ্রন্থে কয়েক  
নতন মুষ্টিযোগ শিখিতে পারা যাইবে। আগে  
মুষ্টিযোগ ও টোটকার ব্যবহার দেশে খুবই  
প্রচলিত ছিল, অনেক পাকা গৃহিণী পর্যন্ত  
সে সকল মুষ্টিযোগ ও টোটকার অনেক কঠিন  
কঠিন রোগ আরাম করিতেন। এখন সে  
গৃহিণীও নাই, সে মুষ্টিযোগও নাই—এ  
অবস্থায় মুষ্টিযোগ ও টোটকার গ্রন্থ লইয়া  
যিনিই আমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন,  
তিনিই খল্লবাদী; তার উপর সেই, ফকির  
পুস্তকে যদি দৃষ্ট কণ ওষধ থাকে, তাহা হইলে  
এ গ্রন্থের গ্রন্থকারের নিকট তা দেশের  
শোণ কল্যাণতা স্বীকার করিতে বাধ্য।  
আমরা এ গ্রন্থখানি দেখিয়া আনন্দিত  
হইয়াছি।

সতুরমা। “দমরুণী কথ” রচয়িত্রী  
শ্রীমতী চাকুলা সরস্বতী প্রণীত। মূল্য ১০/০

“সতুরমা”, “বিশেষর ‘দর্শনে’, “বন্ধু”

“অলঙ্কার”, “হালির ধুমকেতু” “মিলন”

ও “বীণার বিবাহ” — এই কয়টি গল্প লইয়া

“সতুরমা” বিবচিত। গল্পগুলি নভেলের

ধরণে লিখিত হইলেও “মলয় পবন” “হা

হতোহস্মি” ব্য বিকট বিরহে প্রেমিক-

প্রেমিকার উৎকৃষ্ট চিত্রবিকৃতির ছায়া মাত্র

ইহাতে নাই। সাদা কপার সোজাভাবে বুদ্ধির

পেশমাত্র ঘাঘাতে স্পর্শ করিতে না পারে—

একপভাবে সকল গল্পগুলিই লিখিত হইয়াছে।

এখনকার দিনে যে সকল নভেল বাহির

হইতেছে, তাহার অধিকাংশই পিতা-পুত্র,

স্বাভা-ভগ্নীতে, গুরুজন-অনুজনে একত্র

বসিয়া পাঠ করিবার উপায় নাই, বিস্ত

আমরা ‘সতুরমা’র বিশেষর দেখিলাম যে,

ইহাতে ‘সে আশঙ্কা একেবারেই নাই, গুরু

লবু বিচার না রাখিয়া ইহা সকলের নিকটেই

পড়িয়া শুভান যায়। অথচ ইহার জন্ম গল্পের

সজ্জা-সম্পদের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

আমরা এই নভেলিগুণে একপ একখানি

সকলদুন্দর পুস্তক পড়িয়া বিশেষ সুখ

হইয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী এই ধরণের আরও

কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া যশোরাশি অর্জন

করুন—ইহাই আমাদের কামনা।

## বিরজা-বিয়োগ।

অষ্টাদশ আশ্বর্ষেদ বিভাগের একনিষ্ট সংখক কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কাবিভূষণ মহাশয় আর এ সংসারে নাই। গত ২৬শে মাঘ রাত্রি সন্ধ্যা একাদশ ঘটিকার সময় তিনি অষ্টাদশ আশ্বর্ষেদ বিভাগেব সমস্ত মাঘাঙ্গাল বিভিন্ন কবিতা অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বিভাগে অধ্যাপনা করিয়া বাটা গিয়া আহার সমাপনান্তে নিজামুখ উপলব্ধি কারতেছিলেন, রাত্রি ১১টার পর নিজামুখ বসিলেন,—বুকের মধ্যে কি একরূপ যন্ত্রণা হইতেছে,—কেন সেই যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, একটু জল চাটিয়া পান করিলেন, জল পানান্তে আবার শরম করিলেন, সেই শরমই তাঁহার চির শমন হইল, আর তিনি শয্যাভাগ করিলেন না, নিমেষের মধ্যে চির নিদ্রায় অন্তর্ভূত হইলেন। বিনা মেঘে বজ্রপাত, শিব শাস্ত্র প্রকৃতির একে প্রলয়কর ঝটিকাৎ আবির্ভাব আমরা যখন এই নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম, তখন কিছুতেই বিশ্বাস কবিত্তে পারিলাম না, লজাব পথ গিয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই প্রোগাঢ় পণ্ডিত বিরজাচরণ আমাদেরকে চির দিনেব জ্ঞান পাব্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। একপ মৃত্যু ইতঃপূর্বে আমরা আর কখনও দেখি নাই, প্রতি দশ হাজার মধ্যে ১ জনের করিয়া একপ মৃত্যু সংঘটন হয় কিনা তাহাও সন্দেহ।

আগামীবারে আমরা আশ্বর্ষেদের এই চির উপাসকের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিব।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

**নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সংমেলন।**—আগামী ৩১শে মার্চ টম্বোরে নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সংমেলনের অধিবেশন হইবে। মহারহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীমুক্ত গণনাথ সেন সর্বস্বী-এম্-এ, এল্-এম্, এল্, মহাশয় সভাপতি ন্যায় হইতেছেন।

**স্বাস্থ্য বিভাগ—**ইতিয়া গবর্ণমেন্ট একটি সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ নিৰ্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন করনা হইতেছে।

**বাঙ্গালার পল্লীস্বাস্থ্য।**—বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিপাগের কমিশনার পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নীতকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ৫০টি

মাসিক লঠনে স্বাস্থ্য বিষয়ক চিত্র প্রদর্শন করান হইতেছে। ইহাতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারের সুবিধা হইবে। বৈদ্যের লঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। বেটলি সাহেব ১১১৮ খৃঃ অব্দের বৈরিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ঢাকা, বাগেরিমা, কলগা, বসন্ত ও হর্নফুলের প্রকোপে বাঙ্গালার পল্লীগুলি অশান হইতে বসিয়াছে এবং ম্যাগে-রিয়াই ইহারিপের মধ্যে প্রধান। এই ম্যাগে-রিয়ার প্রতিবেদ-পরীক্ষা বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কোথাও আনন্দিক তাহে, কোথাও



সম্পূর্ণভাবে আবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু ইনফ্রা-  
য়েজার ক্ষত্র পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ  
করিতে পারা যায় নাই। বাগা চটক বাজা-  
লাব স্বাভা-কমিথনাব মঙ্গলম বাজালাব পল্লী-  
গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ উদ্যোগ  
আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে উহাব ভূমিমাং  
ফল শুভ হইবে বিনিয়া অনেকটা আশা করা  
যাইতে পারে। পল্লাব ক্রতীপুকরণ যদি এ  
সময় একটু চেটাইল হইত, তাহা হইলে উহাব  
ফল আরও শুভ হইতে পারে।

**জন্ম মৃত্যুর হিসাব।**—১৯১৮  
সালে বাঙ্গালার বর্ধমান জেলার মোট লোক  
জন্মরা ছিল ২২২ জন এবং মরিয়াছিল ৬৯০  
জন। বীরভূমে জন্ম ১৫২২ ও মৃত্যু ৩৭১৯,  
বাকুড়ায় জন্ম ১৭১৫ ও মৃত্যু ২৫২২; যেদিনী-  
পুবে জন্ম ৫৪১৮, মৃত্যু ১৫৮৮, হুগলি ও  
শ্রীবাসপুরে জন্ম ২১২৬, মৃত্যু ৩৫২০, হাওড়ায়  
জন্ম ১৭৯১, মৃত্যু ২১৭২, ২৪ পরগণায় জন্ম  
৪০১০, মৃত্যু ৬৭৩৭, নদীয়ার জন্ম ৪৬৬৯,  
মৃত্যু ৫৭৩৭, মুর্শিদাবাদে জন্ম ৩৫১৮, মৃত্যু  
৫৭২৪, যশোরের জন্ম ৩৬১৮, মৃত্যু ৫৪১৮,  
খুলনায় জন্ম ৪২৮২, মৃত্যু ৯৪১৫, দিনাজপুরে  
জন্ম ৪৪৮০, মৃত্যু ৭৮১৬, জলপাইগুড়িতে জন্ম  
২৭০১, মৃত্যু ২৬৬৬, দার্জিলিংয়ে জন্ম ৬৯১  
মৃত্যু ৬৬৭, রংপুরে জন্ম ৮৩৭১, মৃত্যু ৬৩২২,  
বগুড়ায় জন্ম ৩০১৬, মৃত্যু ২৪০৭, পাবনায়  
জন্ম ৪২৫২, মৃত্যু ২৭৭৩, মালদহে জন্ম ৩১২৭,  
মৃত্যু ৪০৫২, ঢাকায় জন্ম ১১২২৬, মৃত্যু  
৭৪০০, ময়মনসিংহে জন্ম ১২৬৭২, মৃত্যু ৯২২৬,  
রাখিবগঞ্জে জন্ম ৭২২৭, মৃত্যু ৭৪১৪, করিম-  
পুরে জন্ম ৮৫৩০, মৃত্যু ৫৭৬৬, চট্টগ্রামে জন্ম  
৩৭০৭, মৃত্যু ৪৪৫২, মোকামখালিতে জন্ম

৪২২৭, মৃত্যু ৩৩২১ এবং ত্রিপুরায় জন্ম  
৭৮২২ মৃত্যু ৫০০৩। ১৯১৮ সালের নভেম্বর  
মাসে মোট উপরোক্ত ২৬টি জেলার জন্ম সংখ্যা  
১২৫,০১০ ও মৃত্যু সংখ্যা ২,৫০,২৮০।  
১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে বাঙ্গালার মৃত্যু  
সংখ্যা ১ লক্ষ ১২ হাজার হইয়াছে। এরসার  
কথা।

### ইনফ্রা-য়েজার ইতিহাস।—

১৯১৮ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে চীন ও জাপানে  
ইনফ্রা-য়েজার প্রথম আক্রমণ হয়। চীন  
হইতে আমেরিকায় এবং সেখানে হইতে  
ইউরোপে উহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যুদ্ধ  
জাহাজসমূহে এবং দৈনন্দিনেব মধ্যে উহা  
প্রথম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ১৯১৮ খৃঃ  
অব্দে মে মাসে এই রোগ গ্যাসগে সহরে  
ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর এই দ্রুত ব্যাধি  
ভারত আক্রমণে যেরূপ সাজসজ্জা আরম্ভ  
করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

### বর্ধমান চিকিৎসা বিভাগ- লেন্স।—

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালার  
গবর্ণর বাহাদুর চিকিৎসা বিভাগের ভিবি  
স্থাপন করিয়াছেন। দেশে রোগ বাহুল্যের  
তুলায় এখনও যে পরিমাণ চিকিৎসকের  
আয়োজন, তাহাতে এই নূতন বিভাগের  
প্রতিষ্ঠায় সে অভাব কতকটা পূর্ণ হইবে,  
সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু বর্ধমানে নহে, বাঙ্গালার  
অন্যান্য সহরগুলিতেও যে এইরূপ বিভাগের  
আয়োজন তাহা নিশ্চিত।

### পল্লী প্রজ্ঞা—

ম্যাকোয়িরা, কলোরা  
বসন্ত প্রভৃতির প্রকোপে বাঙ্গালার পল্লীগুলি  
যে পরিমাণে বিপর্যস্ত, তাহা দৃষ্ট করিলে  
করিবার জন্য অনেক পল্লীতেই যে পরিমাণ

দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা নাই। পল্লীর সকল প্রকার উন্নতি সাধনই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য, কিন্তু অজ্ঞাত কার্য অশেষ। এই বিষয়েব উন্নতিকল্পে তাঁহাদিগকে অধিক মনোযোগী দেখিলে ক্ষমতা আশার সঞ্চার হয়। মেদিনীপুরের সহযোগী "নীহার" সংবাদ দিয়াছেন,—

"মাননীয় কমিশনার বাহাদুরের সম্মুখে দেখা গেল যে এ জেলার জেলাবোর্ডের অধীনে ডিপেন্সারীর সংখ্যা খুব কম। বাহাতে এ জেলাবাসীর চিকিৎসার সুবিধা হ্রাসকরণে হইতে পারে, তৎক্ষণ কমিশনার বাহাদুর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডকে উপায় নির্ধারণ করিতে বলিয়াছেন। যে যে স্থলে গ্রাম্য স্বাস্থ্য-শাসনের প্রচলন হইবে, তথায় ইউনিয়ন বোর্ডের তথ্যবথানে ডিপেন্সারী থাকিবে। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড কেবল একটা বিশেষ মঞ্জুরী টাকা ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে প্রদান করিবেন। কমিশনার বাহাদুরের এ সম্বন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে যে, অচিরে এই ম্যালেরিয়া-ইনফেক্শন-ওলাট্টা-বিস্ময় পীড়িত আমাদের জেলার সর্বত্র চিকিৎসার বিধান হইবে।"

মেদিনীপুরের মত সকল স্থানের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডটাই এইরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়ে বৃদ্ধির অল্প মনোযোগী হইলে দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে।

**গান্ধী চালায়।**—আমেরিকা হইতে কয়েকজন সুাবসায়ী ভারতে আসিয়া বহু সংখ্যক গান্ধী ক্রয় করিয়া স্বদেশে চালান দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ অব্দে ৩০ হাজার গান্ধী এইরূপ ভাবে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গুজরাট অঞ্চল হইতে এত সকল গান্ধী চালান দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই ব্যবসায়িক সভার সভাপতি আলি আল-একবাল এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে প্রবল উপদেশ করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে সন্মত করিবেন। রাজা হুটক

ভারতে নানাকারণে ভেঁ গান্ধীকুল নির্গল হইতে বসিয়াছে, সে গোচারণের মাঠ নাট, সে গান্ধী পালনের স্পৃহাও ভারতবাসীর নষ্ট হইয়াছে। দেশে দুখ রক্ত ইত্যাদি ফলে দুর্দৃশ্য—দুশ্রাব্য বলিলেও অত্যাচার হয় না। তাহাব উপর যদি এতরূপ ভাবে বিদেশে গান্ধী চালান বন্ধ না হয়, তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ যে আরো শোচনীয় হইবে সে—বিষয়ে সন্দেহ নাই, গুজরাটের শিক্ষিত অধিবাস-গণ এ সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হউন।

**আহারের উপদেশ।**—আহারে বসিবার পূর্বে মেজাজ খুসি রাখিবার চেষ্টা করিবেন,—নাহিলে আপনার উচিতমত ক্ষুধার উদ্বেগ হইবে না। ফলে ক্ষুধা না থাকিলেও আচাব করিয়া বদ-চক্ষুতে জ্বলিতে চেষ্টা। আহারের সময়ে তর্ক-বিতর্ক করাও নিষিদ্ধ; কাণ্ড তাহাতেও ফলকালে। (হিন্দুধান)

**নূতন রোগ।**—১৯১৮ খৃঃ অব্দের স্বাস্থ্য বিভাগের বিপোর্টে বাঙ্গালাদেশে হৃৎ-ওয়ার বা সর্কনেসে ক্রিমি নামক একটি নূতন রোগের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা ৮০ জন হিসাবে মোট প্রায় ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগে অল্প পরিমাণে আক্রান্ত হইলেই জীবনোপক্রিয় হ্রাস, রক্তাশ্রিত ও লব্ধি ইত্যাদি উপদ্রব জুটয়া থাকে। এই রোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

**কুষ্ঠাশ্রম।**—৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে কলিকাতার একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা চলিতেছে। আমাদের বহাভাগ বড়বাড়ি মহাবী মেডী রোপাকর্মে মহোদয় ইহার প্রথম সাধারণের নিকট টাকা আর্থনা করিয়াছেন।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—চৈত্র।

{ ৭ম সংখ্যা

## অনুকরণে আমাদের স্বাস্থ্য।\*

\*\*\*

অনুকরণে বাঙ্গালী সেরূপ অভ্যস্ত এরূপ ভার পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো জাতি নহে। অনুকরণে বাঙ্গালীর বেরূপ সর্বনাশ হইয়াছে, এমন সর্বনাশও বুঝি পৃথিবীর মধ্যে কোনো দেশের কোনো জাতির কখনো হয় নাই। আজি যে দেশে সকল জিনিসই দুখীলা, বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ঋতু উপযোগী পরিচ্ছদে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র পায় না, পল্লীবাসী-বাঙ্গালীর চালে খড় জুটে না, পুষ্কেকার অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীর পতিত প্রাসাদ সংযোগভাবে আর মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না, এক কথাই অশন বসন, লোক লোকিকতা—সকল বিষয়েই বাঙ্গালী বাহিরে যতটাই বড়াই করুক, ভিতরে যে ঐ সকল বিষয় রক্ষার জন্য বাঙ্গালীকে বিবম বিপণ্য হইতে হইয়াছে—ইহার প্রধান কারণই হইতেছে বাঙ্গালীর অনুকরণপ্রিয়তা। মাতৃগর্ভ হইতে

ভূনিষ্ঠ হওয়ার পর, রূপ রস-গন্ধাদির বিচার শক্তি লাভের সহিত মরণ কাল পর্যন্ত বাঙ্গালী সাংসারিক সকল বিষয়েই এই অনুকরণ গুহ্মা জীবন মাপন করিতেছে। ফলে অনুকরণ-প্রিয়তায় বাঙ্গালী এখনকার দিনে অর্থের মুখ আগের অপেক্ষা বেশী দেখিতে পাইতেছে সত্য, কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বা ভদ্রতা বজায় রাখিতে গিয়া সে অর্থে কুলাইতে পারিতেছে না। অনুকরণে বাঙ্গালীর অনিষ্ট সাধন ইহারই ফল সম্ভূত।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই অনুকরণ-প্রিয়তায় আমাদের কম অনিষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালী-শিশু যে আগের অপেক্ষা এখন মরিতেছে বেশী ইহা তো সর্ববাদী সম্মত। বাঙ্গালীর পরমায়ু কমিয়া গিয়াছে,—অকাল বার্দ্ধক্য বাঙ্গালীকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে,—নানারূপ রোগ-পীড়নে বাঙ্গালীসমাজ মৃত্যুর

\* কলিকাতা আয়ুর্বেদ সভার ১ম বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

ভীষণ মৃত্তিকে যখন তখন—অসময়ে—আয়ুর্কাল  
পূর্ণ হইতে না হইতে আলিঙ্গন করিয়া বসি-  
তেছে,—এসকল বিষয়ের মুখ্য কারণও আমরা  
বাঙ্গালীর অল্পকরণপ্রিয়তা বর্ণিয়া মনে করি।

বাঙ্গালী তো এরূপ ছিল না,—বাঙ্গালীর  
বল ছিল, বিক্রম ছিল, শৌধ্য ছিল, বীৰ্য্য  
ছিল, শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল। বাঙ্গালী  
শিশুর মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার  
পরই চিত্রগুপ্তের খতিয়ানে নাম লিখাইবার  
আবশ্যক হইত না। ভূরি ভোজনে বাঙ্গালী  
যশস্বী হইত, ভোজ-নিমন্ত্রণে আয়োজনকারী  
ভোক্তাকে পর্যাপ্ত ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্তি  
লাভ করিত। ভাত-কাপড়ের জন্ত প্রায়  
কোনো বাঙ্গালীকেই গোলামি করিতে হইত  
না, সকল বাঙ্গালীরই ক্ষেত্রে ধাত্ত হইত,  
সহস্রের খরচ করিয়াও সে ধাত্ত হুরাইত না।  
কোনো কালে অল্পস্বল্প জন্ত যদি বেশে অভিয-  
হয়—এই আশঙ্কায় উদ্ভূত ধাত্ত গোলাপূর্ণ  
হইয়া সজ্জিত থাকিত। সকল বাঙ্গালীর  
বাগানেই পরিবার পরিপোষণের উপযোগী  
তরকারী উৎপন্ন হইত, সে তরকারি বাগানের  
মালিক নিজে ভোগ করিয়াও প্রতিবাদী  
পরিজন বর্গকে বিতরণ পূর্বক আনন্দ  
উপভোগ করিত। পুকুরে মাছ যথেষ্ট  
হইত,—কোনো আত্মীয় কৃতিব অসময়ে  
অতিথি হইলেও ইহার ফলে পরি-  
চর্য্যার ব্যাঘাত ঘটত না। ধরে ধরে গাভী  
পালনের ব্যবস্থা ছিল, সে ব্যবস্থার বাঙ্গালী  
পরিবারবর্গের সকলেই ভোজনের প্রারম্ভে  
অল্প বিস্তর দ্বত এবং ভোজনের পরিসমাপ্তি  
কালে অন্ততঃ ছ'চার হাতাও দুধদানভোজনের  
অপূর্ব সুখ উপলব্ধি করিত। ফলে শরীর  
রক্ষার উপযোগী অনায়াসলভ্য ঐ সকল

আহাৰ্য্য প্রাপ্তির জন্ত সেকালের সকল বাঙ্গালীই  
স্বাস্থ্যসুখ অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইতেন,—কলির  
নিষ্টিষ্ট পরমায়ু লাভ সকলের অদৃষ্টে না  
ঘটিলেও আশী নব্বই পঁচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত  
পরমায়ু লাভ যে অধিকাংশ বাঙ্গালীরই অদৃষ্টে  
ঘটিত হইয়া স্মৃতিশীত।

এখন বাঙ্গালীর পরমায়ু হইয়াছে উক্ত  
সংখ্যা পঞ্চাশ। ত্রিশ বৎসরের পবন বাঙ্গালীর  
স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়—এবং চল্লিশ  
বৎসরের পরই সকল বিষয়ের কাৰ্য্যকারী শক্তি  
কমিয়া আসিয়া বাঙ্গালীর আয়ুর্কাল দুরাইবার  
চিহ্ন সকল যেন প্রকাশ করিতে থাকে।  
বাঙ্গালী-শিশু দ্বত অল্পগ্রহণ করে, তাহার হাজার  
করা ১৮৫টি জন্মের পরই কালগ্রাসে পতিত  
হয়। পল্লীগ্রামে মালেরিমার যথেষ্ট লোক  
ক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু অন্ত্যস্ত রাগেও বাঙ্গালীর  
মৃত্যু কম হয় না। সহরে যন্ত্রা রোগের প্রাবল্য  
কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত  
আছেন। স্নায়বিক দৌৰ্ব্বল্য এবং অজীর্ণের  
রোগী এখন শতকরা ৯৯টি বলিলেও অতুষ্টি  
হয় না। অধিকাংশ বাঙ্গালীরই শীর্ণ দেহ, শুষ্ক  
বদন, কোটরাগত চক্ষু বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-দৈন্তের  
যেন অলপ্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আগে  
বাঙ্গালী পৃথিবীর অন্ত্যস্ত জাতির মত একটা  
আদর্শ জাতি বলিয়া যেমন পরিগণিত ছিল,  
এখন আর তাহা নাই, অনেকে এখনকার  
বাঙ্গালী জাতিকে ইঙ্গবঙ্গ বলিয়া যে পরিহাস  
করিয়া থাকেন, বাঙ্গালীর পক্ষে সেই অভিধানেই  
উপযুক্ত বলা বাইতে পারে। রাজভাষা বা  
ইংরাজী ভাষা না শিখিলে এখনকার দিনে  
চলিবার উপায় নাই, সুতরাং বাঙ্গালী তাহা  
শিখুক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু  
সেই ইংরাজী ভাষা শিখিতে গিয়া বাঙ্গালী যে

নিজস্বের পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে—ইহাইতো চতুর্থে বাঙ্গালীর অনিষ্টের মূল। ইংরাজ যে সময় আমাদের দেশে রাজা হইলেন, সে সময় জনকতক বাঙ্গালী যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া মোটা মোটা মাছিয়ানার চাকরি পাইলেন, বলিয়া বর্তমান বাকুড়াব কৃষিপ্রাণ বাঙ্গালী সে অনুরোধে আত্মহার্য্য হইলেন কেন? দেশে জনকতক লোক ওকালতী পাস করিয়া অর্থ উপায়ের পথ স্ফলভ করিয়া তুলিলেন বলিয়া অনেক বাঙ্গালীকেই ওকালতী পাস না করিলে চলিল না কেন? কয়েকজন ডাক্তার হইলেন বলিয়া অনেক বাঙ্গালীর মস্তিষ্কই ডাক্তারি শিক্ষার জগৎ বিচলিত হইয়া উঠিল কেন? উঠিল উঠিল—সকল বাঙ্গালীবই উপার্জন ক্ষেত্র সর্ব্বের নির্ণীত হইয়া পক্ষীর সহজ স্ফলভ উপার্জনের ক্ষেত্র বিসর্জন দিবার কুমতি ঘটাইল কেন? ইহাই তো হইল বাঙ্গালীর অনিষ্টের মূল, এবং সে মূল এখন এমনভাবে গাড়িয়া বসিয়াছে যে, বাঙ্গালী-সমাজকে তাহা হইতে উৎপাটন করা সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে। যাক,—এ সব প্রসঙ্গ অতদিন করা যাউবে, আজ যাঁহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি।

বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিল, কিন্তু শুধু বিজ্ঞা শিক্ষার জন্য ইংরাজী শিখিল না, ইংরাজের সকল আদর্শ গুলিরই অনুরোধ করিতে বাঙ্গালী তন্ময় হইয়া পড়িল। ইংরাজ শ্রমভাতে উঠিয়া চা পান করেন, বাঙ্গালী প্রাতঃস্নান চা পান, সন্ধ্যা গায়ত্রী সব ভুলিল, শয্যা পবিত্রাঙ্গ করিতে না করিতেই চায়ের পেয়ালা তুলিয়া রসনোন্মেষের পরিভূষিত সাধন করিতে লাগিল,—কিন্তু এটুকু বুঝিল না ইংরাজ জাতির

অস্থিমজ্জা শীতপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়া গঠিত, এজন্য সে শরীরে প্রাতঃকালে শ্রেষ্ঠা বৃদ্ধির সময় 'চা' এর মত উষ্ণকর দ্রব্যের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, আমাদের উষ্ণ প্রধান দেশে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা তেমনি বিষবৎ, অনিষ্টকারী। তাহার উপর ইংরাজ কখনও খালি পেটে চা পান করেন না, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে অবস্থায় বাবস্থায় তাহা ভিন্ন অন্য কিছু জুটিবে কি করিয়া? ফলে বাঙ্গালী ইংরাজের চা পানের অনুরোধ করিল বটে—কিন্তু তাহাতেও ইংরাজের আদর্শ টুকু বজায় করিতে পারিল না, কাজেই খালি পেটে চা পানের অবশ্যস্বাভাবী ফল যে যকৃতের ক্রিয়ার বিরুদ্ধিত প্রাপ্তি বাঙ্গালীকে তাহা ভোগ করিতে হইল। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে না তো ঘটিবে কাহার?

তাহার পর বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিয়া—B, A, MA, পাশ করিয়া, —বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া, উকীল হইল, ডাক্তার হইল বটে, কিন্তু সে রোজগারের ক্ষেত্র নির্ণীত হইল কলিকাতায় বা এমন সব সহরে—যে সব স্থানে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী পল্লীর সহজ স্ফলভ উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নহে। কতকটা এই কারণে—কতকটা বা ইংরাজী শিখিতে গিয়া বাঙ্গালীর চিত্ত বৃত্তির বিপর্য্যায় বশতঃ আমাদের শরীরের উপযোগী পুষ্টিকর আহারীয় হইতে বাঙ্গালী বঞ্চিত হইল। সহরে গাড়ীপালন হুকুম ব্যাপার, বহুবায় সাধ্য, কাজেই সে মতি প্রবৃত্তি বাঙ্গালীকে ছাড়িয়া দিতে হইল, যথেষ্ট পরিমাণে বিদগ্ধ হৃদয় কিনিয়া খাইবারও উদ্যম উপার্জনের তুচ্ছনাথ থাকিল না। ইংরাজ হৃদয় স্তু ও মৎস্য যথেষ্টরূপে আহার করুন আর না

করুন মাংস তাহাদের প্রাতিহিক খাদ্য। পক্ষান্তরে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী ইংরাজের পক্ষে মাংস ভক্ষণ বেক্ষণ ফলদায়ক ? বাঙ্গালী দেশের প্রোকের পক্ষে তাহা নহে, তা' ছাড়া প্রত্যহ বর্ধেষ্ট পরিমাণে মাংস ভোজনের শক্তিও বাঙ্গালীর পাকস্থলীতে নাই, আর প্রত্যহ মাংস, কিনিয়া ভোজন করাও বাঙ্গালীর অবস্থায় কুলাইবার কথা নহে, বাঙ্গালী প্রত্যহ অল্প পোয়া হিসাবে মৎস্যই ভক্ষণ করিতে পার না, তা' মাংস তো দূরের কথা। ফলে ইঙ্গবঙ্গ বাঙ্গালী—ইংরেজের অনুকরণ সর্ব বিষয়ে করিতে চেষ্টা করিলেও আহারকালে আর সে অনুকরণ বজায় রাখিতে পারিল না। এই জন্যই আদর্শ হারাইয়া বাঙ্গালী মরিতে বসিল।

আগেকার বাঙ্গালী অতি প্রত্যয়ে শব্দ্য পরিত্যাগ করিত। হস্ত সুখাদি প্রকাশনের পর প্রাতঃস্নান করিত, ভগবানের নাম গাইত, তাহার পর, আদা-ছোলাভিজা, মুড়ি নারিকেল, গুড়-চিনি—অবস্থাপন্ন হইলে ভ'একটি উপাদেয় সন্দেশ-বাহার-বাহা জুটিত।—বাঙ্গালী তাহা জলযোগ করিত। তাহার পর শিশুরা প্রাতঃকালেই পাঠাভ্যাসে নিরত হইত, যুবা এবং প্রৌঢ়গণ বাহা বাহা কথ্য থাকিত, প্রাতঃকালেই তাহা সম্পন্ন করিত। দ্বিপ্রহরে বাঙ্গালীর আহারকাল নির্দিষ্ট ছিল, আহারান্তে শিশু-বৃদ্ধ সুবা-শ্রোত সকলেই কিয়ৎকাল বিশ্রামসুখ উপভোগ করিত। বৈকালে মার্ভওমগুথ হীনপ্রভ হইয়া আসিলে বাঙ্গালী শিশু আবার পাঠাভ্যাস করিত, কর্দ্দিগণ আবার কর্মে মনোনিবেশ করিত। সন্ধ্যার পর আর কাহারও কোনো চিন্তা থাকিত না, সকল পল্লীতেই এক একটি বৈঠক বা মজলিস

বসিত, সে মজলিসে যথেষ্ট তামাক পুড়িত, তামুকুটের ধূমে বিভোর হইয়া কথপ্রাণ্ত বাঙ্গালী গল্পগুজব, গানবাজানা, তামপাশা—এই সব লইয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া দিত। রাত্রি এক প্রহরের পর বাঙ্গালী আবার আহায় করিত, ভগবানের নাম গাইয়া মুনদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিত। ইংরাজী শিখিয়া অনুকরণ স্রোতে আমাদের সে সকল ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটয়ছে। প্রভাতে আদা ছোলা ভিজার পরিবর্তে চা পান—বেশা ৯টার পূর্বেই মাধ্যমিক আহারের পবিত্রমাণ্ডি; বিশ্রামের সময় অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, সন্ধ্যাপূর্ব ক্রান্ত দেহে অফিস হইতে আসিয়া নানাক্রম হুশিচিন্তা এবং নিদ্রাকালে হুশিচিন্তার স্বপ্নডালে নিদ্রার বাণীত—এইরূপে আমাদের এখন জীবন যাপন চলিতেছে। ইংরাজী শিখিয়া সভ্যতার খাতিরে পল্লীগ্রামে ফিরিয়া গিয়া আমরা আর কৃষিকর্মে বা ব্যবসায় বিস্তারে মনঃসংযোগ করিতে পারিনা। লোকে তাহাতে, চায়া বলিবে বা ব্যবসাদার বলিয়া ঘৃণা করিবে, কাজেই লোকলজ্জার খাতিরে আমরা চাকরি করিব,—গোলামি করিব—কাজেই সেই গোলামি বজায় রাখিবার জন্ত আমাদের কর্মকাল দ্বিপ্রহরে না করিলে উপায় নাই, আমাদের আর বিশ্রাম করিবার সময় কোথায় ?

ইংরাজ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করেন না—ইংরাজের কর্মকাল দ্বিপ্রহরে নির্দিষ্ট, ইহার কারণও তো পূর্বেই বলিয়াছি—ইংরাজের অস্বহান শীত প্রধান দেশে—ইংরাজের জন্ম ভূমি ৭৫ দিন স্বর্ষ্যের সুখ দেখিতে পান সে দিন ধন্তমনা হইয়া থাকেন, কাজেই সে দেশের কর্মকাল দ্বিপ্রহরকালেই উপযুক্ত।

আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সে সময় আমাদের পরিশ্রম করা সহিবে কেন ? আমাদের স্বাস্থ্য দৈত্যের ইহাও একটা কারণ ।

তাহার পর পোষাক পরিচ্ছদের কথা । ইংরাজের অনু করণে আমরা এখন যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করি—একপ পোষাক পরিচ্ছদ আমাদের সেকালে ছিল না । সর্কদা জামা জুতা ঐটিয়া—দেহ ঝানিকে আলোক বোধ বায়ুর হাত হইতে অব্যাহত রাখিয়া—ভদ্রতা বজায় রাখিবার জন্য সে কালের লোককে কখন চলিতে হইত না । শিশুর পক্ষেও ভূমিষ্টকালের পরই তাহার সর্কশরীর আবৃত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না, হাতাকে উৎকৃষ্ট খাট সরিষার তৈল মাখাইয়া স্বেদ্যকরণে শয়ন করাইয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল, শিশু বয়সীর তাহাতে দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ হইত । এখন ইংরাজী অনু করণে সে প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে । মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওয়ার পর হইতেই এখন আমাদের দেহ সর্কপ্রকারে আবৃত করিয়া না রাখিলে আর ভদ্রতা রক্ষা চলে না । বয়স্হেরাও সেকালে যথেষ্ট তৈল মর্দন করিতেন, সম্ভ্রাতা বজায় রাখিতে গিয়া আমরা সে প্রথাও তুলিয়া দিয়াছি । সর্বদা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে । দ্রুত ছন্দ-পান ঘুচিয়া গিয়াছে, তৈলমর্দন প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে,—বাঙ্গালীর দেহ পুষ্টির আর তাহা হইলে রহিল কি ? বাঙ্গালী মরিবেনা তো মরিবে কে ?

এইবার ধূমপানের কথা । তাম্বাকুট কবে আমাদের দেশে আগমন করিয়াছে তাহার সঠিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না । কেহ কেহ বলেন—মুসলমান রাজত্বের অভ্যুদয়কালে ইহা আমাদের দেশে মুসলমানদিগের অনু করণে

প্রবেশলাভ করিয়াছে । যাউক অত বিচার করিবার এ ক্ষেত্রে আবশ্যিকতা নাই ? কিন্তু জনপূর্ণ গুড়গুড়ি বা ছাঁকার সাহায্যে তাম্বাকুটের দ্রুত গ্রহণে আমাদের তত অনিষ্ট হয় না—বতটা অনিষ্ট হয় 'সহজস্বলত সিগারেটের ধূমপানে । এ অনু করণটা আমরা ইংরাজদিগের নিকট যে শিক্ষা করিয়াছি ইহা খাঁটি সত্যকথা । ইংরাজই আমাদেরই দেশে এ নেশা আনিয়া দিয়াছেন । এখন বালক বৃদ্ধ যুবা—সকলেই এই সিগারেটের ধূমপানে উন্মত্ত । বাঙ্গালী প্রতিবর্ষে অসংখ্য পরিমিত অর্থ সিগারেটের ধূমপানে ব্যয় করিতেছে । তামাক সেবনে গল ক্ষত, বক্ষা, হৃদপিণ্ডের নানারূপ পীড়া, অজীর্ণ, ক্ষয়মান্দ্য প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে । সিগারেটে সে অনিষ্ট আরও বেশী সাধিত হয় । কিন্তু অনু করণ স্রোতটা দেশে এমনই ভাবে প্রবেশলাভ করিয়াছে যে,—সহজস্বলত সিগারেটের হাত হইতে আর বালকদিগকেও রক্ষা করিবার উপায় নাই । তাহার পর, প্রকাশ্য হোটেলের বসিয়া আহার করা—জাতিধর্ম নিক্সিশেবে প্রস্তুত কিনা বিচার না করিয়া—বাজার হইতে অখাদ্য-কুখাদ্য অমিত অহিত সকল প্রকার খাদ্য কিনিয়া খাওয়া—ছত্রিশ জাতির এবং সকল প্রকার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট গাত্রে চা সোডা সরবত পানে কৃত-কৃতার্থ হওয়া—এটাও আমাদের সভ্যযুগে অনু করণে আনিয়া দিয়াছে । ফলে এই সকল অনু করণে একদিকে আমাদের অর্থের অপব্যয়, তো' হইতেছেই—স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্নও যে ইহাতে যথেষ্ট ঘটিতেছে—তাহা কেহ ভাবিতেছেন কি ?

বাঙ্গালী-মেয়েদের মধ্যেও অনু করণ স্রোতটা এখন পূর্ণভাবে প্রবাহিত । মা-লাঙ্গীগণও সে

কালের রাত্রি নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী ভদ্রতা বজায় রাখিবার জন্য বাবু সাজিয়াছেন, তাঁহাদেরও 'বিবি' না সাজিলে উপায় কি? কাজেই সে 'ছড়া ঝাঁট' দেওয়া, বাসন মাজা, ঘর ঘর পরিষ্কার করা—এ সকল তো মা-লক্ষ্মীগণ এখনকার দিনে পারিয়াই উঠেন না,—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মূর্তি লইয়া রন্ধন কার্যেও তাঁহারা এখন অনভ্যস্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর হৌসেলে ইহারই ফলে অনুকরণ বজায় রাখিতে গিয়া 'মেদিনীপুর-বাকুড়ার 'বামুন' ঢুকিয়াছে, দাস দাসীতে গৃহস্থালীর কন্ম সকল নির্বাহ করিতেছে, মন্ত্ৰত্যাগী আচার ভটে—পৈতাগলার বামুনের দল রন্ধন করিতেছে,—আর আমাদের মতিলাগণ আরাম কেশদারায়শয়ন করিয়া দিবারাত্রি আলস্ত এবং অকর্ষণ্যতাব সহচারিণী হইয়া দিবসের মধ্যে তিনবার করিয়া 'হিস্টরিক ফিটে' অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন!

এখন এ সকলের উপায় কি? এ সকলের উপায়ের কথা বলিতে হইলে—মুক্তকণ্ঠে বলিতে হয়—দেখবাসি, আবার সাবেক পদ্ধতি অবলম্বন কর। ইংরাজী পড়—ইংরাজী না পড়িলে, চলিবে না—তুমি যে কোনো কর্মই কর—ইংরাজী তোমাকে শিখিতেই হইবে—ইংরাজী না শিপিলে তোমার আর কোনোদিকেই উপায় থাকিবে না—কিন্তু যতটা পার অনুকরণ প্রপাটা পরিহার করিয়া আত্মরক্ষার জন্য মনোযোগী হও। পল্লী ছাড়িয়াছ, কৃষিকর্ম তুলিয়াছ, ব্যবসায় 'কলনার তোমার মতি নাই, চাকুরি করিয়া—গোলামি করিয়া—এতদিন উদরারের সংস্থান করিয়া আসিয়াছ, সুতরাং সহসা তাহা ছাড়িয়া দিয়া পল্লী ভিটার সন্ধ্যা আলিয়া আবার

তুমি প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বনে আয়ুর্কর্ম পরিগ্রহ কর—এরূপ কথাও সহসা বলিলে চলিবেনা, তবে এ কথা বলিলে অসম্ভব হইবে না যে, নিজে যাঁহা হইয়াছ তাঁহা থাক, নিজে যাঁহা করিতেছ, তাঁহা কর, কিন্তু বংশধরদিগকে আর সে শিক্ষায় অবসন্ন করিওনা। শিক্ষার জন্য সকলেই পুত্রকে স্কুলে দেন, কলেজে পড়ান,—পুত্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটা ডিগ্রি লইয়া বাহির হয়, তখন আক্সাদে আটখানা হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই পুত্র কি করিয়া নিজে থাকিবে—পরিবার পোষণ কুরিবে—সে কথাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখেন কি? তাহা দেখেন না, পড়াইতে হয়, পড়াইয়া যান, পত্রও পড়িতে হয়, পড়িয়া যার! কিন্তু রাশি রাশি পুস্তক পাঠে দৃষ্টিশক্তির অবসন্নতার ফলে উপচক্ষ ধারণ করিয়া এবং এক একজন মুক্তিমান ডিসপেন্টিক হইয়া যখন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তখন চাকরি বা গোলামি করা ভিন্ন তাহার তো আর কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং শিক্ষাকালেও তাহার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, কন্মকালেও সে খাটুনির মাত্রা আরও অধিক। সেইজন্য আমার বক্তব্য, আমরা যাঁহা করিতেছি, তাঁহা করিয়া থাকি, কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে আর উৎসর্গ দিয়া কাজ নাই, শিক্ষা কালেই তাঁহাদিগকে একট ব্যবসায়ের পন্থা দেখাইয়া দিয়া তাঁহারা যাঁহাতে অগতঃ স্বাস্থ্য জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থার প্রবৃত্ত হই। পল্লী মায়া বিসর্জন দিলে চলিবে না,—দেশের যেকোন অবস্থা আসিতেছে তাহাতে পল্লীর অঙ্কে স্থান লইবার আবার প্রয়োজন হইবে,—দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল আমাদের বংশধরদিগের কল্যাণের জন্য এই বহাসুল্য কথাটা তাঁহাদের



মনে ধারণা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক পল্লীর কনি আবার জাগিয়া উঠুক,—পল্লীর ব্যবসায় আবার বিস্তৃত হউক—বাঙ্গালী সন্তান ইংরাজী পড়িলেও পল্লীজনোচিত শিক্ষাই তাহার আদর্শ হউক,—সেই অসভ্য জনোচিত শিক্ষাই ভাণ্ডার অতুন্নীয় গর্বেস্বর স্থান হউক—সভ্যতার আদর্শ চা চুকট সিগারেটের প্রচলন দেশ হইতে উঠিয়া যাউক,—বরফ মোড়া লেমোনেডের পরিবর্তে সেই অসভ্য যুগের ডাব মিছারির পান্য তিনি সরবতে বাঙ্গালী ছেলের রুচি বৃদ্ধি হউক,—দারুণ ঘৃণাব্যঞ্জক ভাবে হোটেলের বহুদূরে বাঙ্গালী বালক আবার

অবস্থিতি করুক—বাঙ্গালী জননী নাটক নবেল ছাড়িয়া স্বামীপুত্রকে স্বহস্তে পঞ্চ বাজ্ঞন সমন্বিত অন্নবিতরণের জন্ত ব্যগ্রস্বত্বা হউন,—এক কথায় অনুকরণট। আমরা পরিহার করি,—একটা আদর্শজাতি বলিয়া আমরা আগে যে গর্ব করিতে পারিতাম—সেই গর্ব আবার গরীয়ান হই—সেই প্রাতিমান, সেই পূজাপদ্ধতি,—সেই খাদ্যাখাদ্যের বিচার বাঙ্গালী সমাজে আবার ফিরিয়া আসুক—ইহাই আমার বক্তব্য । ইহা ভিন্ন আজি আমার অণু কিছু বলিবার নাই ।

## শারীর বিজ্ঞা ।

অস্থি বর্ণনা ।

( পূর্নানুস্মৃতি )

—:~:—

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী, এম-এ, এল, এম, এস)

মধ্য-শরীরের অস্থি ।

পৃষ্ঠবংশ—পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড মধ্য-শরীরের অবলম্বন স্বরূপ । চারিটা খাণ্ডা এবং মস্তক পৃষ্ঠবংশ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে । ইহা সরল নহে, ধনুর ছায় বক্রাবিশিষ্ট । সেই বক্রতাও উপরে, মধ্যে ও নিম্নে বিভিন্ন প্রকার । (নবম চিত্র দেখ) ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃষ্ঠবংশে ছাব্বিশ খানি অস্থি আছে । তন্মধ্যে সর্কনিম্নের দুই-খানি ত্রিকোণ এবং অষ্টত্ৰিকোণ নামে অভিহিত । অপর চব্বিশখানি অস্থিকে কশেরুকা বলে । স্থানভেদে কশেরুকা সকল তিনভাগে বিভক্ত । সাতখানি গ্রীবাংশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে গ্রীবাকশেরুকা বলে ; বারখানি পৃষ্ঠদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে পৃষ্ঠকশেরুকা এবং পাঁচখানি কটদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে কটকশেরুকা বলা হয় ।

কশেরুকাগুলি বলহান্নি অর্থাৎ মধ্যে দুই

ছিদ্রবিশিষ্ট । গ্রীবা হইতে কশেরুকাগুলি নিম্নদিকে ক্রমশঃ স্থলতর । উহারা উপরে ও নীচে পরস্পরের সহিত সন্ধিবদ্ধ ।

প্রত্যেক কশেরুকার একটা কশেরুপিণ্ড ও একটা কশেরুচক্র আছে, প্রত্যেক কশেরুচক্রের দুইদিকে দুইটি মূল আছে, উহারা কশেরুপিণ্ডে সংযুক্ত । প্রত্যেক কশেরুপিণ্ডের স্ন্যুতী প্রবন্ধন (বন্ধিত অংশ) আছে, যথা—উপরে দুইটা ও নীচে দুইটা সন্ধি প্রবন্ধন, দুইটা বাহ ও একটা পৃষ্ঠকণ্টক । প্রত্যেক কশেরুচক্রমূলের উপরে ও নিম্নে এক একটা করিয়া ছিদ্র আছে । দুইখানি কশেরুকাহি মিলিত হইলে সংযোগস্থলে ছিদ্রটা পূর্ণ হয় । প্রত্যেক কশেরুকার দুইদিকের এইরূপ দুইটা ছিদ্রের ভিতর দিয়া সুষুম্না কাণ্ড হইতে স্থল নাড়ীসকল নির্গত হইয়া যায় । সুষুম্নাকাণ্ড কশেরুকাগুলির অভ্যন্তরস্থ বৃহৎ ছিদ্র বা সুষুম্নাবিবর মধ্যে থাকে ।

নবন চিত্র—পৃষ্ঠ বংশ।\*

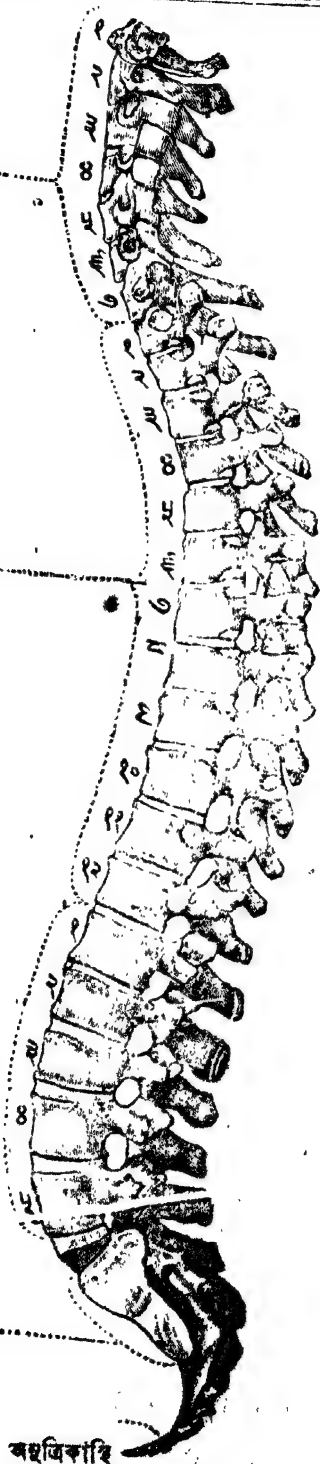
পৃষ্ঠকোষক

সংখ্য

সংখ্য

ত্রিকাধি

অস্থিত্রিকাধি



\* ইং—Vertebral column

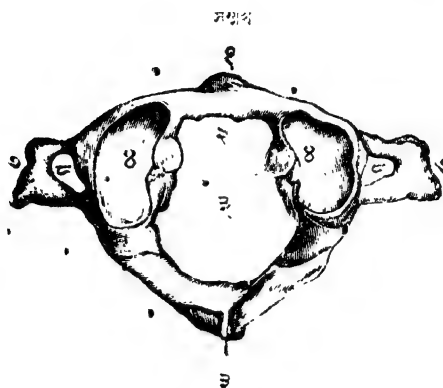
- ভারিট্রাল কলম বা Spine -

সাইন। কণেকক। Vertebra

- ভারিট্রা।

গ্রীবাকশেরুকা—প্রথম গ্রীবা কশেককার নাম 'চূড়াবলয়া'। উহার উৎকৃষ্টাংশ মস্তকেব পশ্চাৎ-কপালেব সহিত এবং নিম্নভাগ দ্বিতীয় কশেককার সহিত সন্ধিস্থত।

[ দশম চিত্রে—প্রথম গ্রীবাকশেরুকা—চূড়াবলয়া ]



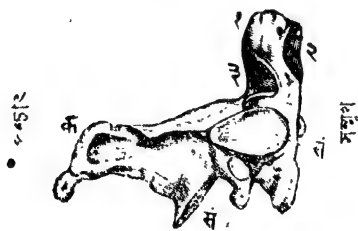
পশ্চাৎ

১—কশেকপিণ্ড। ২—দন্তপ্রবর্দ্ধনকেব নিবেশিত তৎসহ সন্ধির স্থান। ৩—‘মধ্যরজ্জ্ব-বন্ধন’ নামের নিবেশ স্থান। ৪—পশ্চাৎ কপালেব দ্ব্যকোটিদ্বয়ের সহিত সন্ধিব স্থান। ৫—অস্থিবিবব। ৬—পৃষ্ঠকণ্টক। ৭, ৭—বাতিপ্রবর্দ্ধনকদ্বয়। ৮—বাতিকাছিদ্বয়।

দ্বিতীয়া কশেককার নাম 'দন্তচূড়া'। উহার চূড়াকাব পিণ্ডভাগ প্রথম কশেককার অস্থি-বিববের সম্মুখে যে ছিদ্র আছে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। যদি উরুন্ধন বা আঘাতাদি বশতঃ

[ একাদশ চিত্রে—দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকা—দন্তচূড়া ]

উর্দ্ধ



অধঃ

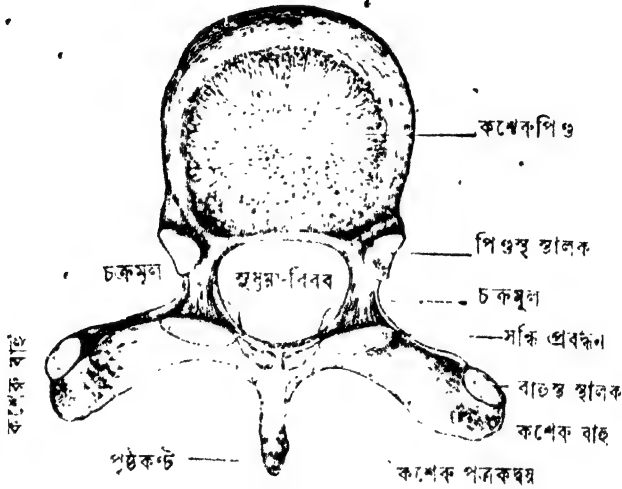
১—দন্তপ্রবর্দ্ধনক। ২—চূড়াবলয়ার পিণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের সহিত সন্ধির স্থান। ৩—‘মধ্যরজ্জ্ব-বন্ধন’ নামের নিবেশ স্থান। ৪—পৃষ্ঠকণ্টক। ৫—উর্দ্ধতন সন্ধি-প্রবর্দ্ধন। ৬—অধঃতন সন্ধি-প্রবর্দ্ধন।

দন্তচূড়ার দন্তাকার অংশ ভগ্ন বা চূড়াবলয়ার ছিদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে

তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। সপ্তমী গৌবাকশেককার নাম 'মহাকণ্টকিনী'। ইহার মহাকণ্টক অন্তঃস্থ গৌবাকশেককার ছায়া দ্বিধা ভিন্ন নত এবং এত কণ্টক 'গৌবাক্ষরা' স্বায়ুগুজ্জু সঞ্চল থাকে। গৌবাকশেককাগুলির দুই পাশ্বে 'মাতৃকা ছিদ্র' নামক ধমনী প্রবেশের ছিদ্র আছে।

### • [ দ্বাদশ চিত্র—পৃষ্ঠ কশেরুকা ]

সম্মুখ



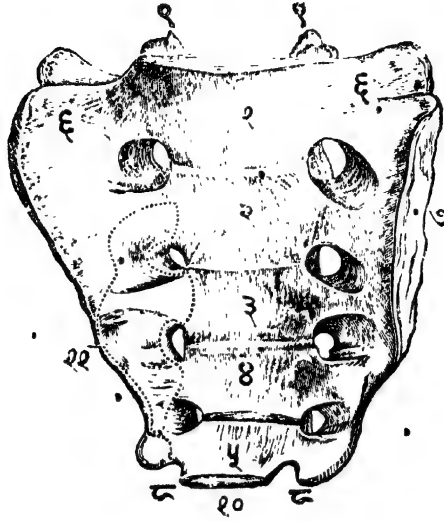
পশ্চাৎ

**পৃষ্ঠ কশেরুকা**—এই সকল কশেরুকার চটনিকে, পৃষ্ঠকা সংযোগের জন্য দুইটি করিয়া স্থালক যুক্ত বৃহৎ বাহ আছে। ইহাদের পৃষ্ঠকণ্টকগুলি দীর্ঘ ও বহুলোকার।

**কটি-কশেরুকা**—এই কশেরুকাগুলি সন্ধ্যাপেক্ষা বৃহৎ এবং পাশ্বে আয়ত। ইহাদের বাহপ্রবন্ধনগুলি ছোট ও সূক্ষ্ম। পৃষ্ঠকণ্টকগুলি ছোট, স্থল এবং কুঠারাক।

**ত্রিকোণাক্ষর**—ইহা দুতসংযুক্ত পাঁচখানি কশেরুকা দ্বারা নিষ্পন্ন, প্রায় ত্রিকোণাকার এবং বৃহৎ বিষ্ময়ের দ্বারা আকার বিশিষ্ট অস্থি। ইহাও নিম্নোক্ত পাঁচখানি অস্থি বালাকালে পৃথক থাকে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক হইয়া যায়। পাঁচখানি অস্থির সংযোগস্থলে চারিটা রেখাচিহ্ন থাকে এবং প্রত্যেক রেখাচিহ্নের সম্মুখে দুইটি এবং পশ্চাতে দুই দিকে দুইটি করিয়া ষাট মোলগী ছিদ্র থাকে। এই সকল ছিদ্র দ্বারা ষগ নাড়ী গুলি সকল ত্রিকোণাক্ষর সম্মুখভাগে এবং পশ্চাদ্ ভাগে নির্গত হইয়া যায়, ত্রিকোণাক্ষর উর্দ্ধভাগ পঞ্চমী কটি-কশেরুকার সহিত, উত্তর পার্শ্ব শ্রোণিকলক নামক অস্থির সহিত এবং নিম্নভাগ অমৃত্রিকোণাক্ষর সহিত সংযুক্ত। ইহাদের অবয়বগুলির নাম চিত্রে দ্রষ্টব্য।

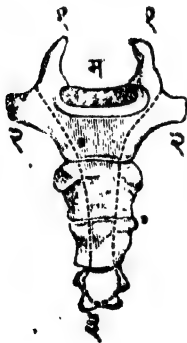
[ ত্রয়োদশ চিত্র—ত্রিকাস্থি ]



১, ২, ৩, ৪, ৫—ত্রিকাস্থি নিম্নোপক কশেরুকাগুলির হৃৎক। ৬, ৭—ত্রিকপক্ষ্ময়। ৮, ৯—শোণিসন্ধির চিহ্ন। ১০, ১১—অনুত্রিকাস্থির সহিত সন্ধির স্থান। ১২, ১৩—ত্রিকশৃঙ্গা সন্ধি-প্রবন্ধনক, পক্ষ্ম কট কশেরুকা সহিত সন্ধির স্থান। ১৪—ত্রিকমূণ। ১৫—শুভ্রিকাখ্য পেশীর নিবেশ স্থান।

অনুত্রিকাস্থিঃ—এই ক্ষুদ্র অস্থি-সংঘাতটী ত্রিকাস্থির নিম্নে অবস্থিত এবং

[ চতুর্দশ চিত্র—অনুত্রিকাস্থি ]



১, ২—শৃঙ্গধর। ৩—অনুত্রিকপিণ্ড। ৪, ৫—স্নায়ুরজ্জ্ব, সংযোগের জন্য দুইটি প্রবন্ধনক। ৬—অনুত্রিকাস্থি।

কতকটা শুকচক্ষুর ত্রায় বক্রাণ। ত্রিকাস্থির ত্রায় ইহাও চারখানি, কখন বা পাঁচখানি কশেরুকা অস্থির সংযোগে নির্মিত হয়। ইহার উর্দ্ধভাগ ত্রিকাস্থির সহিত সংযুক্ত। ত্রিকাস্থির প্রথমা কশেরুকা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। অপর খণ্ডগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া অনুত্রিকাস্থির শেষ ভাগে লাস্থুলের ত্রায় হইয়াছে। ইহা ই বহু ক্ষুদ্রকশেরুকাময় অস্থিমালা স্বরূপে গবাদি পশুর পুচ্ছাস্থি নিমাণ করে।

শ্রোণিফলকঃ—এই দুইখানি বৃহৎ

\* ইং—Coccyx—কক্সিস।

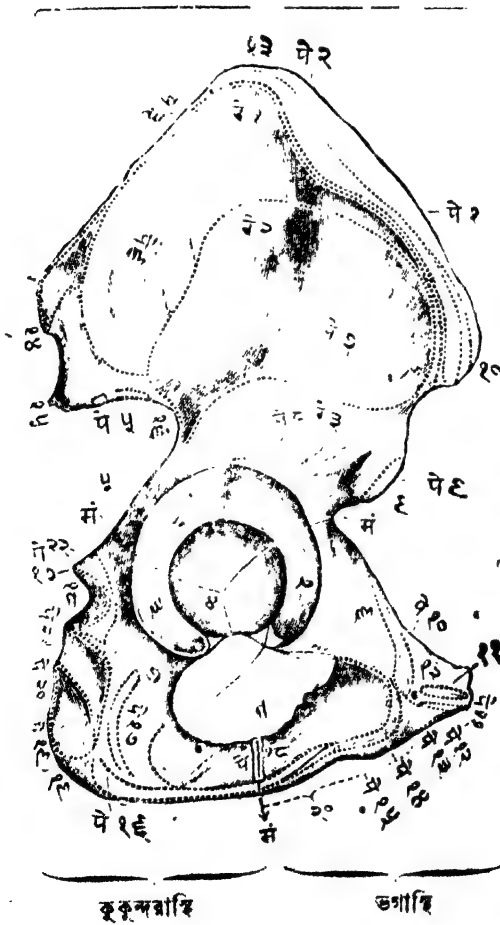
। ইং—Os Innominate—অস ইনোমিনেট।

কপালাস্থি মথো ত্রিকোণি ও নিয়ে দুইটা উকাহর সহিত সংযুক্ত। বানাকালে প্রোচ শ্রোণিকলক তিনভাগে বিভক্ত থাকে, কিন্তু প্রোচ বৌবনে পরস্পর মিলিত হইয়া একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। বৌবনে তিনখানি অস্থির সংযোগহল প্রেখাদিত থাকে, কিন্তু প্রোচ বয়সে ই রেখাগুলি মিলাইয়া যায়। এইখানি প্রোণিকদক পক্ষাতে ত্রিকোণিসমু এবং দুইখানি ভাগে পরস্পর মিলিত হইয়া একটা গম্বীরের সৃষ্টি করে। উক্ত গম্বীর বস্ত্রগম্বীর নামে আখ্যাত। পুরুষের বস্ত্রগম্বীর গভীর এবং স্নান আরত, কিন্তু স্ত্রীলোকের বস্ত্রগম্বীর অগভীর এবং গভীরগম্বীর ভয় বৃহৎ ও আশ্রিত।

### [ পঞ্চদশ চিত্র—শ্রোণিকলক ]

উক

জদন কপাল



অর্থ:

১, ২, ৩, ৪ বংগোদুখল। তন্মধ্যে ১—ভগ্নস্থির অংশ, ২—জঘনকপালাংশ, ৩—কুকুন্দরাস্থির অংশ, ৪—তিনখানি অস্থির সংযোগকেষ্ট। সাং সং সং—তিনটি রেখা অস্থিরের দক্ষিণকূটক। ৫—জঘনকপালের সীমা। ৬ ভগ্নস্থির উত্তরশৃঙ্গ। ৭—কুকুন্দরাস্থি। ৮—কোণিকপালাংশ। ৯, ১০ জঘন কপালের অধস্তন ও উদ্ধতন অগ্রকূট। ১১, ১২—ভগ্নস্থি মূণ্ড বা ভগ্নপীঠ। ১৩ চিল্ল হইতে উদ্ধ দিক দিয়া ১৫ পর্যন্ত অংশ—জঘনপক্ষ এবং উহার ধার জঘনধার। ১৬—জঘনচূড়া। ১৭, ১৮—জঘনকপালের উদ্ধতন ও অধস্তন পশ্চিমকূট। ১৯—গৃধ্রদীঘার। ২০—কুকুন্দর কণ্টক। ২১—কুকুন্দর দ্বার। ২২—কুকুন্দর পিণ্ড। ২৩—ভগ্নস্থির অধর শৃঙ্গ। ‘পে’ চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী সমূহের নিবেশ স্থান। পেশী বর্ণনায় বর্ণনীয়।

শার্বিকফলের প্রদান অংশ তিনটি— (১) জঘন কপাল, (২) কুকুন্দরাস্থি, (৩) ভগ্নস্থি। ইহাদের অবয়ব সমূহের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

(১) জঘনকপাল—ইহা জঘনপক্ষ এবং বংগোদুখল—এই দুইভাগে বিভক্ত। পক্ষবৎ প্রাপ্ত উপবিভাগকে ‘জঘনপক্ষ’ বলে। জঘন-পক্ষের দুইটি তল, বাহ্যতল এবং অভ্যন্তরতল। জঘনপক্ষের বাহ্যতলে ‘ব’ জঘনপৃষ্ঠে ‘নিতম্ব পিণ্ডিকা’ নামে তিনটি পেশী সংযুক্ত থাকিয়া নিতম্ব(পোছ) নিষ্কাশন করে। অভ্যন্তর তল বা জঘনোদর জঘন খাতগর্ভ। ইহাতে ‘কোষ্ঠ-চক্ষিকা’ পেশী সংযুক্ত থাকে। জঘনকপালের উভয় তলের মধ্যবর্তী উন্নত পরিধিকে ‘জঘন-ধার’ বলে। উহার উদ্ধতন প্রদেশ ‘জঘন চূড়া’ নামে আখ্যাত। জঘনচূড়ার সম্মুখে হইতে ৫ পঞ্চাতে দুইটি উন্নত কূট আছে, উহার প্রত্যেককে উদ্ধতন অগ্রকূট ও অধস্তন অগ্রকূট এবং উদ্ধতন পশ্চিমকূট ও অধস্তন পশ্চিমকূট নামে অভিহিত হয়। জঘনোদরের অধোভাগে বস্তুগত্বের উচ্চ সীমাত্ত ‘বস্ত্র-কটিকা’ নামে হুল ও উন্নত রেখা আছে। ইহার পঞ্চাতে ‘কর্ণপালির ছায় আকার বিশিষ্ট ‘ত্রিকস্থালক’ নামক ত্রিকসন্ধিস্থান। ইহার পঞ্চাভাগে ‘পৃষ্ঠবংশধারিণী’ পেশীসকল সংবদ্ধ থাকে।

জঘনপক্ষের পঞ্চাৎ ‘দিকের তোরণাকার দ্বারকে ‘গৃধ্রদীঘার’ বলে। এই দ্বার দিয়া ‘প্রবলী’ নাড়ী ও তদনুবর্তিনী সিরি ধমনী এবং ‘শুণ্ডিকা’ পেশী নির্গত হয়।

জঘনকপালের বহির্দিকে নিম্নভাগে ‘বংগোদুখল’ নামক যে উদুখলাকার গহ্বর আছে, তন্মধ্যে উরুস্থির মূণ্ড প্রবেশ করিয়া সংহিত হইয়া থাকে।

(২) কুকুন্দরাস্থি—ইহা শ্রোণি ফলের অধস্তন অংশ এবং প্রায় অষ্টচতুর্ভুজ। বর্ণনাসৌকর্য্যার্থ ইহাকে বংগোদুখলাংশ, কুকুন্দরপিণ্ড এবং কুকুন্দরকূট—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

বংগোদুখলাংশ—বংগোদুখলাংশের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার ত্রিকোণাকার নিম্নাংশ মাত্র কুকুন্দরাস্থি দ্বারা নির্মিত। ইহার নিয়ে ৫ পঞ্চাতে যে ত্রিকোণপ্রায় প্রবর্তনক

আছে তাহাকে 'কুকুন্দর কণ্টক' বলে। ইহার নিম্নভাগে যে ক্ষুদ্র তোরণাকার খাত আছে, তাহা 'কুকুন্দরবার' নামে অভিহিত। এই কুকুন্দরবারের ভিতর দিয়া 'অন্তঃস্থা শ্রোণি-গবাঙ্কিণী' পেশী এবং তদনুবর্তিনী সিরামননী ও নাড়ী সকল বস্তুগল্বরে প্রবেশ করে।

কুকুন্দর পিণ্ড—ইহা শ্রোণিকলকের নিম্ন তল অংশ। মধুবা উপবেশন করিলে এই অংশের উপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ে।

কুকুন্দরকূট—ইহা কুকুন্দরপিণ্ডের উচ্চ অবস্থিত। ইহার সমুখবর্তী শৃঙ্গ ভগান্তির নিম্নমুখ শৃঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া শ্রোণি-গবাঙ্কের সমুখ সীমা নিয়োগ করে।

(৩) ভগান্তি—শ্রোণিকলকের সমুখ বর্তী অংশকে ভগান্তি বলে। ইহা যোনি বা লিঙ্গের অধিষ্ঠানভূত। মুণ্ড, উত্তরশৃঙ্গ এবং অধরশৃঙ্গ ভেদে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। ভগান্তির ন্যায়স্থিত মুণ্ডবৎ অংশকে ভগদণ্ড, ভগপীঠ বা লিঙ্গপীঠ বলে। ইহার অন্তঃসীমা অপব ভগান্তির সহিত সংহিত হয়। ভগদণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের উত্তর অংশকে উত্তরশৃঙ্গ বলে।

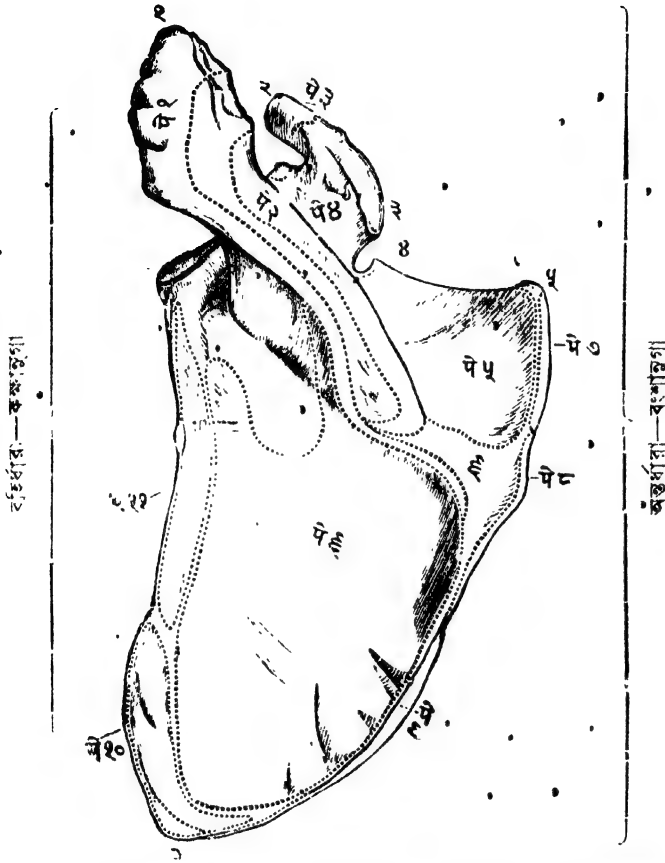
ইহা শ্রোণিগবাঙ্কের উচ্চ পরিমিত এবং উহার উচ্চসীমা অভ্যন্তরস্থ 'বস্তিকটিকা' বেখা-ঙ্কিত ও বস্তিগুহার উচ্চ সীমাত্ত। এই শৃঙ্গের শেষ প্রান্ত দ্বারা দংক্ষগোদথলের ত্রিকোণাকার উচ্চাংশ নির্মিত হয়। অধরশৃঙ্গ ভগান্তিমুণ্ডের নিম্ন দিয়া বহিঃগত হইয়া কুকুন্দরকূটের সহিত সম্মত এবং শ্রোণি-গবাঙ্কের সমুখের পরিমিত। ইহার সমুখ দ্বারায় শিশ্নের মূলবন্ধন সংলগ্ন থাকে।

অসফলক\*—স্কন্ধপৃষ্ঠের দুইদিকে হই-  
য়া ত্রিকোণপ্রায় পক্ষবৎ বিস্তৃত কপালান্তি  
আছে, উহাদের নান অসফলক। অসফলক-  
বৎ অসংস্কির পশ্চাভাগ হইতে নিম্ন সম্ম  
পশ্চকার মূল পর্যাণ্ত ত্রিগাঙ্ক ভাবে অবস্থিত।  
উহাদের বহিঃসীমার উচ্চ ও সমুখভাগ অক্ষক  
ও প্রগণ্ডান্তির সহিত সংস্কৃত এবং অন্তঃ-  
সীমা ও অন্তঃস্থ পদেণ কেবল পেশী দ্বারা  
অবদ্ধ। চারিদিকে পেশী দ্বারা আবদ্ধ  
থাকায় অসফলক সহজেই চারিদিকে বিবর্তিত  
হইতে পারে।

\* ইং—Scapula—স্কাপুলা।



## [ সোড়শ চিত্র—বাম অংসফলক ]



১ চিত্রে ৬—পর্যন্ত অঙ্গপ্রাচীর। ১—অঙ্গকূট ২—অঙ্গতুণ্ড। ৩—অঙ্গাককসংযোজনী ও ৪—অঙ্গক সংযোজনী স্নায়ুর নিবেশ স্থল। ৪—অঙ্গশিরকোটর। ৫—অঙ্গকোট। ৬—অঙ্গপ্রাচীরের মূলদেশ। এই স্থানে ‘পৃষ্ঠপ্রচ্ছদাখ্যা’ পেশী স্নেহদ্বারা কলার ব্যবধানে বিবর্তিত হয়। ৮—বহিঃকোটিল অঙ্গসন্ধি নামক স্থানক। ‘পে’ চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

অঙ্গকাস্থির সহিত সংহিত অঙ্গফলক অঙ্গসচক্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইটি অঙ্গক পেশী ও স্নায়ু সংযুক্ত হইয়া অঙ্গসন্ধির উপরে সন্ধিরক্ষক বন্ধের দ্বারা অবস্থিত।

এক একটি অঙ্গফলক চারিভাগে বিভক্ত, যথা,—অঙ্গপ্রাচীর, অঙ্গতুণ্ড, অঙ্গসন্ধি এবং অঙ্গকপালিকা।

অঙ্গপ্রাচীর—ইহা অঙ্গকপালের পশ্চাতে তির্ঘাক ভাবে অবস্থিত এবং ঋতুগণের দ্বারা আকার বিশিষ্ট। এই অংশ ঋতুগণের অধোভাগে স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়। ইহা দ্বারা

অঙ্গপৃষ্ঠ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা,—‘উত্তর’ বা উপরের অঙ্গপৃষ্ঠ এবং ‘অধর’ বা নিম্নের অঙ্গপৃষ্ঠ।

অঙ্গপ্রাচীরের সর্পিফণার গায় এবং উচ্চাঘট সমুখ ভাগকে ‘অঙ্গকূট’ বলে। ইহার অগ্রে ভাগে ‘অঙ্গতুণ্ড সংযোজনী’ নাম এবং পশ্চাতে ‘অঙ্গচ্ছদা’ ও ‘পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা’ পেশী সংবদ্ধ থাকে।

অঙ্গতুণ্ড—অঙ্গফলকের চূড়ায় অবস্থিত কাকতুণ্ডাকার বহিমুখ প্রবর্ধনকে ‘অঙ্গতুণ্ড’ বলে। ইহাতে ‘তুণ্ডাঙ্গক সংযোজনী’ এবং ‘তুণ্ডাঙ্গক সংযোজনী’ নাম সংবদ্ধ থাকে।

অঙ্গপীঠ—অঙ্গকূটের অধোভাগে অঙ্গফলকের বহিঃকোটিভিত্তি স্থানকে বলা হয় ‘অঙ্গপীঠ’। ইহার পরিধিতে সন্নিবিষ্ট মাংসকোষের মধ্যে প্রগণ্ডাশ্চিহ্ন মুণ্ড এবং বহুস্থিত হয়।

অঙ্গকপালিকা—ইহা অঙ্গফলকের প্রধান অংশ এবং ত্রিকোণ কপালাকার। ইহার দুইটি তল—সমুখতল এবং পশ্চিমতল। সমুখভাগ খর্পরাকার, ইহাতে ‘অঙ্গাস্ত্রিকা’ পেশী সংলগ্ন থাকে। পশ্চিমতল অঙ্গ প্রাচীরের দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। এই দুইভাগে ‘উত্তর’ ও ‘অধর’ ‘অঙ্গপৃষ্ঠিকা’ পেশী সংলগ্ন হয়।

অঙ্গকপালিকার তিনটি ধারা—উদ্ধাধা, অস্থধা এবং বহির্ধা। ইহারা যথাক্রমে উচ্চ, অস্থ ও বহিঃসীমাক্রমে অবস্থিত। উদ্ধাধা বহিঃকোণ, অস্থকোণ এবং অধরকোণ নামে ইহার তিনটি প্রত্যেক কোণ আছে। তন্মধ্যে বহিঃকোণ অঙ্গপীঠ পরিধার। অত্র দুইটি কোণ স্বকের নিয়ে অনুভব করা যায়।

অঙ্গকপালিকার উদ্ধাধারায় অঙ্গতুণ্ডমূলে যে কোটন আছে, তাহাকে ‘অঙ্গকোটন’ বলে। এই কোটনের ভিতর দিয়া ‘অঙ্গসোত্রিণী’ নার্ভী, সিনা ও ধমনী পৃথক দিকে নির্গত হয়। বহির্ধা কক্ষের (বগলের) সীমাবৃত বলিয়া ‘কক্ষাঙ্গাধা’ নামে অভিহিত। অস্থধার ধনুকের দ্বারা বক্রাকার এবং পৃষ্ঠবংশের সমীপস্থ বলিয়া ‘বংশাঙ্গাধা’ বলিয়া কথিত। অত্রাত্ত পেশীনিবেশ পেশ্যধায়ে বর্ণনীয়।

অঙ্গকান্তিঃ—অঙ্গমূল হইতে উৎকলকে সংস্কৃত ধনু্র দ্বারা স্রব্দ বক্রাকার নল-কান্তির নাম অঙ্গকান্তি বা কান্তি। কান্তির দুইদিকে দুইখানি অঙ্গকান্তি স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়। সাধারণে ইহার ‘কণ্ঠার ছাড’ নামে পরিচিত। ইহাদের অন্তঃসীমা উরঃফলকের সন্ধিত এবং বহিঃসীমা অঙ্গফলকের অঙ্গকূটের সন্ধিত সন্ধিবিন্দু হইয়া থাকে।

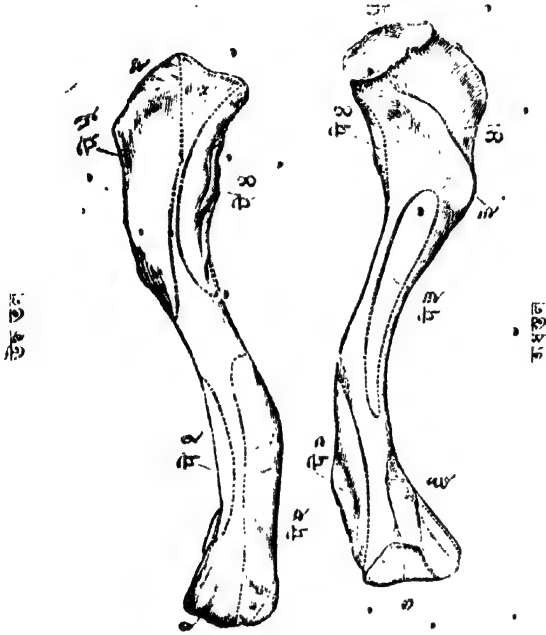
অত্রাত্ত নলকান্তির দ্বারা ‘অঙ্গকান্তি’ ও ‘উত্পাঙ্গ’ (অস্থঃপ্রান্ত ও বহিঃপ্রান্ত) এবং মধ্যনলক—এই ‘এন’ ভাগে বিভক্ত।

অস্থঃপ্রান্ত—অঙ্গকান্তির অস্থঃপ্রান্তে দুইটি সন্ধিচিহ্ন দেখা যায়। তন্মধ্যে উপরের চিহ্ন উরঃফলকের পার্শ্বদেশের সন্ধিত এবং নিম্নের চিহ্ন প্রথম উপপর্শ্বকার সন্ধিত সন্ধির অত্র। ইহার নিম্নভাগে যে বক্র স্থান আছে, তাহা ‘পৃষ্ঠকাককসংযোজনী’ নামের নিবেশ স্থান।

[ সপ্তদশ চিত্র—বাম অঙ্গকাণ্ড ]

( সম্মুখ দৃষ্টে )

বহিঃপ্রান্ত



অন্তঃপ্রান্ত

- ১—অস্ত্রঃপ্রান্ত (উরঃফলাভিমুখ)।  
 ২—বহিঃপ্রান্ত (অংসঃভিমুখ)। ৩—‘ত্রিকোণিকা’ নাম্নী সংযোগের জন্ত অর্কুদ। ৪—  
 ‘চতুর্ভুজিকা’ নাম্নী সংযোগের জন্ত ত্রিভুজীনা রেখা। ৫—অংসকূটের সহিত সন্ধির স্থান।  
 ৬—পশ্চাৎকাঙ্কসংযোজনী নাম্নী সংযোগের জন্ত বন্ধ স্থান। ৭—প্রথম পশ্চাৎকার উপরি-  
 হাগের সহিত সন্ধির চিহ্ন। ৮—‘পে’ চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

বহিঃপ্রান্ত—অঙ্গকাণ্ডের বহিঃপ্রান্ত অংসকূটের সহিত ‘অংসাক্ক সংযোজনী’ নাম্নী দ্বারা  
 পতিবদ্ধ।

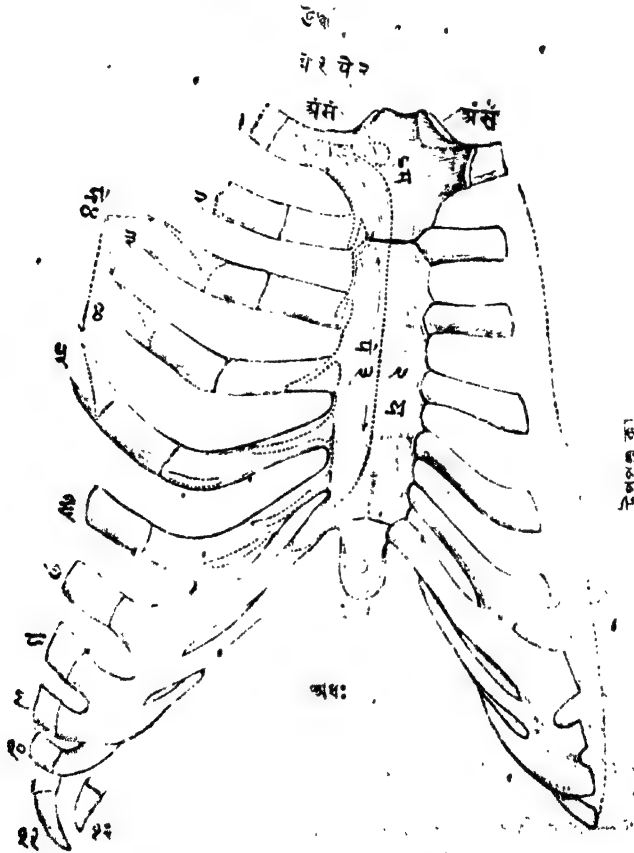
স্থানলক—ইহা দুই স্থানে বহুরক্তার বক্রাকার, বহিরর্দে উত্তান এবং অন্তরর্দে কূজ।  
 অস্থবন্ধের পরিধি দণ্ডবৎ গোলা, কিন্তু বহিরর্দে চ্যাপ্টা। বহিরর্দে অধোভাগে যে অর্কুদবৎ  
 উৎসদ আছে তাহাতে ‘ত্রিকোণিক নাম্নী এবং উক্ত অর্কুদ তাইতে উদনত তির্যকরেখার  
 ‘চতুর্ভুজিকা’ নাম্নী সংবদ্ধ থাকে। পেশীনিবেশগুলি যথাস্থানে বর্ণনীয়।

চৈত্র—৩

উরঃফলকঃ—এই ফলকাকার অস্থি বক্ষঃস্থলের মধ্যে অবস্থিত। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত—শিখরস্থ প্রথম খণ্ড ‘গৈবেয়ক’ নামে, মধ্যস্থ দ্বিতীয় খণ্ড ‘মধ্যফলক’ নামে এবং অধঃস্থ তৃতীয় খণ্ড ‘অগ্রপত্র’ নামে অভিহিত। তৃতীয় খণ্ড প্রথম বয়সে তরুণাশ্রময় থাকে। এই তিনখণ্ডে সংস্থিত অস্থি উভয়পাশে উপপত্রিকা নামক পশ্চুকাশংযোজক তরুণাশ্রময় সকল সম্বন্ধ থাকে।

### [ জ্ঞানদশ চিত্র ]

উরঃফলক ও উপপত্রিকা



১ম, ২য়, ৩য়—উরঃফলক। উল্লম্বো ১ম গৈবেয়ক নামক প্রথম খণ্ড ২য় মধ্যফলক নামে দ্বিতীয় খণ্ড। ৩য় অগ্রপত্র নামে তৃতীয় খণ্ড। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২,—উপপত্রিকা সংস্থিত পশ্চুকাশ্রী। দক্ষিণ দিকে কেবল উপপত্রিকা সূত্রক দেখান।

\* ৪ঃ—Sternum—স্টারনাম্।

হইয়াছে। অং, সং,--অক্ষক সন্ধি চিহ্ন। ক—কণ্ঠকূপ। 'পে' চিহ্নিত স্থান গুলি পেশীনিবেশ  
হয়। যথাস্থানে বর্ণনী

গ্রৈবেয়ক—ইহা কণ্ঠমূলে অবস্থিত উরঃফলকের ষট্‌কোণ প্রথম খণ্ড। ইহাতে ছয়টি  
স্থালক আছে; তন্মধ্যে দুইটি স্থালক অক্ষকস্থিধরের সহিত, দুইটি প্রথম উপপশ্চ'কারের  
সহিত এবং অপর দুইটি দ্বিতীয়া উপপশ্চ'কারের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার শীর্ষ-  
দেশে যে খাত আছে তাহা 'কণ্ঠকূপ' নামে খ্যাত। ইহার নিম্নভাগ দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত  
সন্ধিবদ্ধ, উভয়খণ্ড মিলিত হইয়া প্রায় একই অস্থিতে পরিণত হয়।

মধ্যফলক—উপবিভাগে প্রথম খণ্ডের সহিত এবং অধোভাগে তৃতীয় খণ্ডের সহিত সংযুক্ত।  
এই চারিখণ্ড অস্থির সংঘাত দ্বারা নিম্নিত, ঐ চারিখণ্ড অস্থিস্থল্যকালে পৃথক থাকে। ইহার  
এক এক পার্শ্বে উপপশ্চ'কা সংযোগের জন্য ছয়টি করিয়া স্থালক আছে।

অগ্রপত্র -উরঃফলকের ক্ষুদ্রতম নিম্নস্থ খণ্ড। ইহা তকণাস্থিবহুল, কিন্তু বাক্কো, সম্পূর্ণ  
কঠিন হইয়া যায়। বক্রতের বুদ্ধি বশতঃ ইহার অগ্রভাগ উন্নত হইলে লোকে 'অগ্রমাংস'  
হইয়াছে বলিয়া থাকে। ইহার উচ্চপ্রাপ্ত মধ্যফলকের সহিত সংবদ্ধ এবং ইহার সম্মুখ ভাগে  
'উরঃপ্রচ্ছদা' পেশীর মধ্যকণ্ডা ও পশ্চাতে উদরাভ্যন্তরস্থ 'মহা প্রাচীর' পেশীর অগ্রভাগ  
সংযুক্ত হইয়া থাকে।

পশ্চ'কা \* —উরঃপত্রের বেঠেনভূত পশ্চ'কাগুলি ধরুর ত্রায় বক্রাকার এবং স্থিতিস্থাপক  
রূপে আবদ্ধ। এক পার্শ্বে বাবধানি করিয়া দুই পার্শ্বে চব্বিশখানি 'পশ্চ'কা' বা 'পার্শ্বক'  
(পার্শ্বক) আছে। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগ পৃষ্ঠকশেষ্ককাগুলির পিণ্ডের সহিত এবং প্রথম দশ-  
খানির সম্মুখভাগ উপপশ্চ'কা নামক ত্রুণাস্থি সমূহের সহিত সংবদ্ধ। বাবধানি পশ্চ'কার  
মধ্যে প্রথম সাতখানি উপর হইতে নিম্নদিকে ক্রমশঃ দীর্ঘতর এবং এই সাতখানির দ্বারা  
প্রদত্তঃ উরঃপত্রের নিম্নিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'মুখ্যপশ্চ'কা' বলে। এই সাতখানি  
পশ্চ'কা স্ব স্ব অগ্রভাগস্থিত উপপশ্চ'কার সাহায্যে উরঃফলকাস্থির সহিত সংযুক্ত। অধঃস্থিত  
অপর পাঁচখানি পশ্চ'কা ক্রমশঃ স্বতন্ত্র এবং উরঃফলকের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত নহে।  
এইজন্য ইহারা 'গৌণ পশ্চ'কা' নামে অভিহিত। অষ্টমী, নবমী ও দশমী পশ্চ'কা স্ব স্ব অগ্র-  
ভাগস্থিত উপপশ্চ'কা দ্বারা পূর্ব পূর্ববর্তী পশ্চ'কার সহিত সংযুক্ত। একাদশী ও দ্বাদশী  
পশ্চ'কার অগ্রভাগ বিমুক্ত অর্থাৎ কাঙ্ক্ষার সহিত সংযুক্ত নহে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক পশ্চ'কার ছয়টি অঙ্গ আছে। বহা, মুণ্ড, অর্ধমুণ্ড, জীবা, কোণ, কাণ্ড,  
এবং অগ্রকোটি।

মুণ্ড—পশ্চ'কার পশ্চাদ্ভাগ প্রান্তকে মুণ্ড বলে। মুণ্ড দুইটি গোলাকার স্থালক আছে এবং  
এই দুইটি স্থালক সাধারণতঃ দুইটি পৃষ্ঠকশেষ্ককাপিণ্ডের উপরের ও দীর্ঘের অঙ্গ স্থানকের  
সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে।

\* ইং—Ribs শব্দ।

অর্কুদ—মুণ্ডের নিকটবর্তী স্থানকাক্সিত পিণ্ডের নাম অর্কুদ। কশেরুকার বাহ্যিক স্থানকের সহিত অর্কুদের সন্ধি হইয়া থাকে।

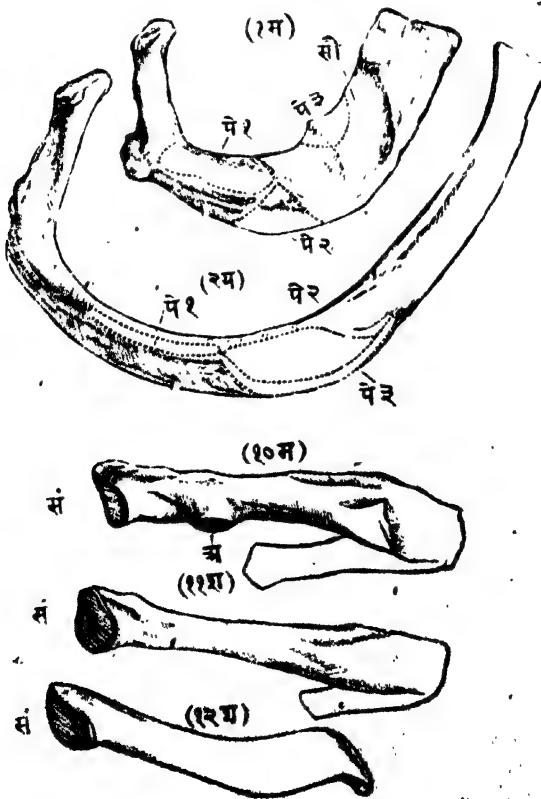
গ্রীবা—মুণ্ড এবং অর্কুদের মধ্যবর্তী স্থানের নাম গ্রীবা।

কোণ—গ্রীবার সম্মুখস্থ কোণাকার অংশের নাম কোণ। এই স্থানের আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন ভগ্ন স্থান জোড়া দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ বাল্যকালে অস্থিখণ্ডগুলি পৃথক থাকে, এই স্থানেই যৌবনে জুড়িয়া যায়।

কাণ্ড—পশুর কার ধরুর ত্রায় বক্রাকার মধ্যভাগকে কাণ্ড বলে। উহার দুইটা ধাব আছে—অধোধারা এবং উদ্ধাধারা। অধোধারার একটা পরিধা বা খাঁজ আছে এবং সেট পরিধায় 'পশুকাহুগা' সিরী, ধমনী ও নাড়ী অবস্থিত করে।

অগ্রকোট—পশুর সম্মুখপ্রান্তের নাম অগ্রকোট। এই স্থান উচ্চাঘট এবং উপপশুর সহিত সন্ধিবদ্ধ।

[ উনবিংশ চিত্র—বিশিষ্ট পশুরকা ]



১ম—প্রথমা পশ্চ'কা । ২য়—দ্বিতীয়া । ১০ম দশমী । ১১শ—একাদশী । ১২শ—দ্বাদশী ।  
৩য়—তৃতীয়া । ক—কোণ । সং—মুণ্ডস্থ স্থানক । প্রথমা পশ্চ'কায় ১, ২—‘অক্ষকাধরিকা’  
সিরা ও ধমনী ধারণের খাত । পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল । (পেশ্যধায়ে বর্ণনীয়)

তৃতীয় হইতে নবমী পশ্চ'কার আকৃতি বর্ণিত হইল । প্রথমা, দ্বিতীয়া, দশমী, একাদশী ও  
দ্বাদশী পশ্চ'কার যে বিশিষ্ট লক্ষণ আছে তাহা নিম্নে লিপিত হইতেছে—

প্রথমা পশ্চ'কা—ইহা হৃৎতম এবং কাণ্ডের গ্রায় আকার বিশিষ্ট । ইহার মুণ্ড ও স্থানক  
ক্ষুদ্রতম এবং কোণ বিশিষ্ট । কাণ্ড আয়ত, কাণ্ডের উদ্ধতলে ‘অক্ষকাধরিকা’ সিরা ও ধমনী  
ধারণের জন্য দুইটি খাঁজ আছে এবং নিম্নতলে বহু পেশী সন্নিবিষ্ট ।

দ্বিতীয়া পশ্চ'কা—ইহা প্রথমা পশ্চ'কা অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং ইহার উদ্ধতলে দুইটি পেশী  
সন্নিবিষ্ট ।

দশমী পশ্চ'কা—ইহা হৃৎ এবং কতকটা বড়িশের গ্রায় আকার বিশিষ্ট । ইহার মুণ্ডে  
একটি স্থানক আছে এবং কোণটি কাণ্ডের মধ্যগত ।

একাদশী পশ্চ'কা—ইহাতে অক্ষ'দ নাই, কোণ আছে ।

দ্বাদশী পশ্চ'কা—একাদশী পশ্চ'কার গ্রায় । অধিকন্তু ইহাতে কোণও নাই ।

উপপশ্চ'কাঃ—ইহাদের সংখ্যা পশ্চ'কার গ্রায় এবং ইহার এক প্রান্তে পশ্চ'কা ও  
অপর প্রান্তে উরঃফলকের সহিত সন্ধিস্কৃত । প্রাচ্যমতে উপপশ্চ'কাগুলি তরুণাঙ্ঘ্রি বলিয়া  
অস্থিসংখ্যায় গণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাতিচ্য মতে ইহাদের অস্থি বলিয়া গণনা করা হয় না ।

### উরঃপঞ্জর ।\*

আমরা পূর্বে যে উরোগ্রহার কথা বলিয়াছি তাহা উরঃপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত । উরঃ-  
পঞ্জরের পশ্চাৎভাগে পৃষ্ঠবংশ, দুই পাখে পশ্চ'কাগুলি এবং সম্মুখে উপপশ্চ'কা ও উরঃফলক  
অবস্থিত । ইহা উপর হইতে নিম্নদিকে ক্রমশঃ আয়ত এবং নিম্নদিকে ‘মহাপ্রাচীর’ পেশী  
দ্বারা সীমাবদ্ধ । প্রধানতঃ খাসনলীর সহিত দুইটি ফুস্ফুস, অন্ননলী এবং স্থূল মহাসিরাস্বর ও  
মধ্যমণী প্রভৃতি সংযুক্ত হৃৎতম উরঃপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত ।

( ক্রমশঃ )

\* ইং—False Ribs—ফাল্স রিব্‌স

• ইং—Thorax—থোরাক্স

## শিশু পালন।

(পুষ্কার্হতি)

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি, এ, সরস্বতী।

শিশুর পক্ষে বাহা অত্যাবশ্যক। বিশুদ্ধ বায়ু। শিশু যে ঘরে সর্বদা থাকে সে ঘরের জানালা-দরজা দিবাভাগে, সব সময়ই উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে। রাত্রিতেও শিশুর গায়ে বাতাস না লাগে অগতঃ ঘরে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু আসে—এরূপ ভাবে জানালা কিংবা দরজা খুলিয়া রাখিবে। জানালা কিংবা দরজা কিছু খুলিয়া 'ও কিছু বন্ধ করিয়া রাখিবে না। সেই অল্প কাক দিয়া বাতাস জোরে ঘরের ভিতর ঢুকিলে তাহা শিশুর গায়ে লাগিলে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। বিশুদ্ধ বায়ুই জীবন, শিশু যেন সর্বদা উহার মধ্যে থাকে।

রৌদ্র। বাড়ীর মধ্যে সব ঘরে সন্ধ্যাপক্ষ বেনী রৌদ্র আসে, সেই ঘরে শিশুকে রাখিবে। কোন রোগের বীজাণু রৌদ্রে নাশিত হইতে পারে না, রৌদ্র সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট করে।

উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার। শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য মাতৃদুগ্ধ। তাহার অভাবে বিবেচনা পূর্বক গোখাদ্য, গোভার কিংবা ছাগ দুগ্ধ অথবা অল্প কোন কৃত্রিম তদ্রূপে উচিত। বয়স্ক শিশুর সতিত দেহ গঠনোপযোগী উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য শিশুকে দিবে।

নিয়ম মত আহার। বড়ি কাটা বয়সী শিশুকে আহার করাইবে। দুইবার আহারের মধ্যে অল্প কিছুই শিশুকে কখনো খাইতে দিবে না। প্রতিদিন ঠিক নিয়ম মত

সময়ে বাহাতে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া দেখিবে। প্রতিদিন যথা সময়ে শিশু বাহাতে নিদ্রা যায় একপ' অভ্যাস করাইবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাহাতে নিদ্রা হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। শিশুর আহার, নিদ্রা, কোষ্ঠপরিষ্কার নিয়মবদ্ধ করিতে পারিলে শিশু এবং তাহার মাতা উভয়েই আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।

স্নান। শিশুর স্নান অতি সদরতার সহিত সম্পাদন করিবে। স্নানের পূর্বে গরম জল, বদ্যাদি সমস্তই শুছাইয়া তবে স্নান আশ্রয় করিবে।

উপযুক্ত বস্ত্র। শিশুর বস্ত্রাদি হালকা চীনা, অগ্নিপ্রতিরোধক, সাজু এবং বাতাস সহজে পোলা এবং পরান যায় একপ হইবে।

পরিচ্ছন্নতা। শিশুর সম্পর্কিত সমস্ত দ্রব্য হুইবে যেমন, খাড়া, বস্ত্র, শয্যা, খট, আহার্য দ্রব্যের বাসন পত্র, বোতল-প্রভৃতি যথাযথ পরিষ্কার রাখিবে। শিশু এত দুর্বল যে কোন রোগের বীজাণু আক্রমণ হইতে আশ্রয়লা করিবার শক্তি তাহার দেহে নাই। সুতরাং মায়া দেখিবেন যে, কোন প্রকার অপরিচ্ছন্নতা যেন শিশুর নিকটে না আসে, কারণ অপরিচ্ছন্নতার মধ্যেই রোগের বীজাণু থাকে।

ফুটিল জল (Boiled Water)।

যে সব স্থানের জল অপরিস্কার নষ্ট, তাহার জল



কুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে পাঠিতে দিবে।  
মানব জলও কুটাই উচিত।

**নিদ্রা।** শিশুকে মাতাব সত্বে এক  
শয্যা কখনো শোয়াইবে না। তাহাকে  
প্রথম চইতেই পৃথক শয্যা শুইতে অভ্যাস  
করাইবে। কেবল আহারের সময় শিশুকে  
জাগাইবে।

### শিশুর বাসগৃহ। (Nursery),

বাড়ীর মধ্যে যে ঘরে সর্বপেক্ষা বেশী  
রৌদ্র আসে এবং বায়ু চম্কাচল করে সেই  
ঘরে শিশুকে রাখিবে। শিশুর জন্য একটি  
পৃথক ঘর রাখিবার সুবিধা না হইলে বাড়ীর  
এ ঘরে বেশী রৌদ্র ও বায়ু আসে সেই  
ঘরেই শিশুকে বেশীক্ষণ রাখিবে। শিশুর  
সুখ-সুবিধা সর্বপ্রায়ে, তা'রপর পরিবারের অন্ত  
সকলের সুখ সুবিধা দেগিবে। শিশু যাচাতে  
দিন থাকে সেই দিকে পরিবারের সকলেই  
সর্বপ্রায়ে দৃষ্টি রাখিবেন। একটি চারাগাছকে  
অঙ্গকানে রাখিলে তাহা সেরূপ শুকাইয়া  
যায়, শিশুকেও অঙ্গকাব ও বয়ুচম্কাচলতীন  
স্থানে রাখিলে সে সেইরূপ অকালে শুকাইতে  
থাকে। আমাদের দেশে রৌদ্রের অভাব  
নাই। কিন্তু সহরের জনাকীর্ণ পল্লীর অঙ্গ-  
কাব-বাড়ীগুলির মধ্যে এমন অনেক ঘর  
আছে, যে, সেই ঘরে কখনো রৌদ্র প্রবেশ  
করে না। এত কারণে মালেরিয়া পুণা  
পল্লীগ্রামের রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে শিশু  
এমন বেশ সুন্দররূপে বর্ধিত হইতে পারে,  
যতদূর তেমন ইতিবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞ  
চিকিৎসকেরা দুর্বল ও রুগ শিশুকে পল্লী-  
গ্রামের রৌদ্র ও বিজ্ঞ বায়ুর মধ্যে রাখিতেই  
পরামর্শ দেন।

শিশুর ঘরে যে সমস্ত জরুরি থাকিবে

তাহা যেন বেশ পরিষ্কার করিয়া ধৌত করা  
যায়। এমন কোন জিনিস রাখিবে না যাহা  
ধৌত করিলে নষ্ট হইতে পারে। ঘরে  
শিশুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাতীত অল্প কোন  
বাহুল্য জিনিস বা অধিক গৃহসজ্জার দ্রব্য  
রাখিবে না। তাহা হইলে অধিক ধূলা জমিয়া  
তাহাতে রোগের বীজাণু স্থান পাইতে পারে।  
ঘরে শিশুর আনন্দদায়ক এবং চক্ষের তৃপ্তিকর  
বর্ণে বর্ণিত নানা প্রকার পশুপক্ষীর ছবি  
বাখিলে শিশু আমোদ পাইতে পারে এবং  
শিক্ষাও হয়। শিশুকে যে খেলনা দিবে  
তাহা যেন বেশ নরম হয় এবং ময়লা হইলে  
ধৌত করা যায়। কোন প্রকার রঙ মাখান  
খেলনা শিশুকে কখনো দিবে না। শিশুকে  
এমন খেলনা দিবে যাহা তাহার পক্ষে  
শিক্ষাপ্রদ হয়। যাহা পায় তাহাই মুখে দেয়।  
বড় মুখে গেলে শিশুর ঘোরতর অনিষ্ট হইতে  
পারে।

দিব্রাতাগে শিশুর ঘরের জানালা-দরজা  
সর্বদা খুলিয়া রাখিবে। রাত্রিতেও একটি  
দরজা বা জানালা খুলিয়া রাখিবে, বাহ্যতে  
বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের মধ্যে আসিতে  
পারে। শিশুর ঘরে অধিক লোক শুইবে  
না। অনেক লোকের স্বাস প্রাশাসে ঘরের  
বায়ু শীঘ্রই বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং সেই বায়ু  
শিশুও টানিয়া লয়। ইহাতে তাহার স্বাস্থ্য  
শীঘ্রই ভাবিয়া যায়। শিশুর ঘরে কেবল  
শিশু এবং তাহার মাতা পৃথক শয্যা শুইলেই  
সর্বাপেক্ষা উত্তম হয়।

### শিশুর ওজন।

সুস্থ সবল শিশুর ওজন কত হওয়া উচিত  
তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে প্রত্যেক  
মাতা বুঝিতে পারিবেন।

বয়স	ওজন	ওজন যদি না বাড়ে তাহা হইলে তাহার
জন্মকালে	৩ ১/২ সের	খাদ্যের পরিবর্তন করিতে হইবে। শিশু যদি
এক মাস	৪ ১/২ "	মাত্র দুগ্ধই খায়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে,
দুই মাস	৫ ১/২ "	মাতার দুগ্ধ ভাল নহে, সুতরাং মাতার দুগ্ধ
তিন মাস	৬ "	উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইতে হইবে কিংবা
চারি মাস	৬ ১/২ "	বুঝিতে হইবে যে, মাতার দুগ্ধ শিশু তেমন
ছয় মাস	৮ "	উপযুক্ত রূপে পাইতেছে না। অথবা অল্প
এক বৎসর	১১ ১/২ "	কোন কারণ থাকিলে তাহা বুঝিয়া কাণ্ড

( জন্মকালীন ওজনের তিন গুণ )

জন্মবার প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনে শিশুর ওজন জন্মকালের ওজন অপেক্ষা কমিয়া যায় কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার বাড়িয়া উঠে। উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল সাধারণতঃ শিশুর ওজন গড়ে ঐরূপ হয়। অকাল-প্রসূত শিশুর ওজন এবং আকার ইত্যাদি অপেক্ষা অনেক কম হয়। ৭।৮ মাসে প্রসূত শিশুর ওজন কখন কখন ১ ১/২ সের হইতে দেখা যায়।

এরূপ শিশু প্রায়ই দাঁচে না! কিন্তু ১ সের ওজনের শিশুকে কোন কোন মাতা সুষ্ট সর্বল করিয়া দাঁচাইয়া তুলিয়াছেন এরূপ দেখা গিয়াছে। এরূপ মাতা মর্শিমের প্রশংসার্তা। সুষ্ট শিশুর ছয় বৎসর বয়সের সময় তাহার ওজন জন্মকালীন ওজন অপেক্ষা ছয়গুণ অধিক হইবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে, কেবল ওজনের আধিক্যই শিশুর সর্বলতা ও সুষ্টতার পরিচায়ক নহে। অল্প বৃত্ত খেতমার বিশিষ্ট পদার্থ পাইলেও শিশু মোটা ও ভারি হইতে পারে, কিন্তু তাহার মাংস পেশী ও হাড় দৃঢ় না হইলে তাহা সুষ্টতার পরিচয় দৈব না। অতএব মাতা দেখিবেন যে, শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার মাংসপেশী ও হাড় দৃঢ় হইতেছে কিনা।

জন্মের প্রথম ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে শিশুর

ওজন টানিয়া পাইতে পারি না বলিয়া অনেক সময় দেহবন্ধনোপযোগী খাদ্য পায় না। এইরূপ শিশুদিগকে মাতার দুগ্ধের সহিত অল্প দুগ্ধ দিতে হইবে।

শিশুর দেহ সন্তোষজনকরূপে বাড়িতেছে এবং দৃঢ় হইতেছে কিনা তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

- (১) শিশুর ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে
- (২) ধলধলে না হইয়া দৃঢ় হইবে এবং চর্মের রঙ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজনক হইবে।
- (৩) শিশু সর্বদা সন্তুষ্টচিত্ত থাকিবে।
- (৪) তাহার স্ননিদ্রা হইবে।
- (৫) নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।
- (৬) উপযুক্ত সময়ে দস্তোন্দাম হইবে।
- (৭) দ্বিতীয় বর্ষের শেষ ভাগে মস্তকের দুই ভাগ জুড়িয়া যাইবে।

(৮) নবম মাসের শেষে শিশু বসিতে পারিবে। শৈশু নিজের বসিতে পারিবার পূর্বে তাহাকে কখনো বসাইবে না, বসাইলে সর্বদা ঠেস দিয়া বসাইবে।

(৯) একাদশ মাসে শিশু হামাগুড়ি দিবে।

(১০) দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভেই হাঁটতে

পারিবে। শিশু নিজের হাঁটুবার পূর্বে তাহাকে  
জোব করিয়া হাঁটাইবে না।

বল পাইলে সে নিজেই হাঁটিবে। অনেক  
শিশুকে জোর করিয়া হাঁটাইতে গিয়া চিব-  
জীবনের মত বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

(১১) দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি কণা  
বলিবে।

সুস্থ শিশুর সম্বন্ধে এই নিয়মগুলি সাধারণতঃ  
থাকে। ওরুল, রুগ্ন, অকালপ্রসূত শিশুদেব  
কথা স্বতন্ত্র, তাহাদের সম্বন্ধে কোন নিয়মই  
নাই। ৭৮ মাসে প্রাপ্ত শিশু সাধারণ শিশু  
অপেক্ষা অনেক দেরীতে কথা বলে ও হাঁটে।

### শিশুর কোষ্ঠ কাঠিন্য।

শিশুর শারীরিক অবস্থা শিশুর কোষ্ঠ  
পরিষ্কার আছে কিনা দেখিলেই বুঝিতে পাওয়া  
যায়। দান্ত অনিয়মিত হইলে কিংবা দান্তে  
ওয়েব ছানার সাদা সাদা অংশ থাকিলে  
শিশুর খাদ্যের পরিবর্তন করিতে হইবে।  
একপ হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর খাদ্য  
পরিপাক হইতেছে না, বন্ধতের ক্রিয়া ভাল-  
রূপে হইতেছে না।

চবিশ বর্ষটার মধ্যে শিশুর অন্ততঃ একবার  
দান্ত হওয়া উচিত, চারি পাঁচবার হইলেও ক্ষতি  
নাই। দান্তের প্রকৃতি (character) ও রং  
যেমন হইবে—তদনুসারেই শিশুর সুস্থতা ও  
দুস্থতা বুঝিতে হইবে। বারে, অধিক হইলেও  
দান্ত যদি ভাল হয় তবে ক্ষতি নাই।

শিশুর জন্মের পর কয়েকদিন পর্যন্ত এক  
পক্ষের কাল, গুরুত্ব, আলকাতরার ছায়া  
পদার্থ বাহির হয়। ইহাই শিশুর প্রথম দান্ত।  
এইরূপ দান্ত দিনে তিনবার হইতে ছয়বার  
হয়। ইহার ইংরাজি নাম maconium এই

পদার্থ দ্বারা বিধাতা শিশুর জন্মবার পূর্বে  
তাহার পাকস্থলীর delicate lining আচ্ছা-

দিত করিয়া রাখেন। ইহা বাহির করিবার

জ্ঞ কখনো কোম জোলাপ দিবে না এবং

তাহার প্রয়োজনও হয় না। শিশুর জন্মের

পরই মাতার দুগ্ধ আঠার মত থাকে, দুগ্ধের

মত তরল হয় না। এইরূপ দুগ্ধ পান করিলেই

শিশুর পেটে বহু কাল পদার্থ থাকে সব

বাহির হইয়া যায়। ইহা সব বাহির হইয়া

গেলে সুস্থ শিশুর দান্তের বহু হবিদ্রাবর্ণের

এবং নরম হয়। এইরূপ দান্ত হইলে বুঝিতে

হইবে যে, শিশুর কোন অসুখ নাই।

কঠিন, শুষ্ক, crumely দান্ত হইলে বুঝায়

যে, শিশুর মেদময় খাদ্যের আবশ্যক। সবুজ

বর্ণের দান্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশু

যে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে তাহা তাহার পক্ষে

অনুপযোগী অপবা তাহাব পেটে ঠাণ্ডা

লাগিয়াছে।

Slimy দান্ত হইলে বুঝায় যে, তলপেটে

inflammation কিংবা কোন গোলমাল

হইয়াছে। সাবান জলের পিচকারী দিলেও

এইরূপ দান্ত হয়। জ্বলের মত দান্ত হইলে

পেটের অসুখ বুঝায়।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হইট

হইতে পারে।

(১) শিশুর bowels দুর্বল হইতে পারে।

(২) শিশুর খাঞ্চে উপযুক্ত পরিমাণে

মেদময় পদার্থ (fat) নাই।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য (constipation)

কখনো থাকিতে পারে না। পনের দিনের

হইলেই প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে শিশুর কোষ্ঠ

যাহাতে পরিষ্কার হয়—এরূপ অভ্যাস করাইবে।  
প্রতিদিন কয়েকমিনিট ধরিয়া শিশুর পেটের

উপর হাত দিয়া ঘর্ষণ করিলে কোষ্ঠকাঠিন্যের উপকার হয়। মাতা—শিশুকে কোলের উপর শোয়াইয়া পেটের দক্ষিণদিকের নিম্নদেশ হইতে উপর দিকে নাভির উপর দিয়া বাম দিকের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ঘর্ষণ করিবেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এইরূপ দশমিনিট ধরিয়া করিলে বেশ উপকার দেখা যায়। বয়স্ক বালক বালিকাদিগেরও এই প্রথাতে বেশ উপকার হয়।

মাতৃত্বক্কে পালিত শিশুকে কোষ্ঠকাঠিন্য মাতার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্ত হয়। মাতার খাঞ্চে মেদময় পদার্থের অভাব—তাঁহার কোষ্ঠ কাঠিন্যের কারণ। সুতরাং মাতা বিশেষ ভাবে তাঁহার খাঞ্চার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং যাহাতে তাঁহার দান্ত নিয়মিত হয় তিনি তাহা দেখিবেন। তাহা হইলেই শিশুরও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইবে। মাতা অনাবশ্যক রূপে জোলাপ লইবেন না। যদি কখনো তাহার প্রয়োজন হয়, তবে যুদ্ধ জোলাপ লইবেন, যাহাতে শিশুর কোন অনিষ্ট না হইতে পারে।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে তাহাকে—

(১) কডলিভার অয়েল  $\frac{1}{2}$  চামচ দিনে তিনবার দেওয়া। প্রয়োজন হইলে মাত্রা বাকান যাইতে পারে।

(২) গরম জল কিংবা ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা করিয়া বড় চামচের এক চামচ তাহারের মাঝখানে দিনে তিনবার দিলে উপকার হয়। প্রাতঃকালের আহারের আগ ঘণ্টা পূর্বে গরম জল পান করাইলে শিশুর দান্ত পরিষ্কার হয়।

(৩) ফলের রস শিশুর পক্ষে খুব উপকারী। আঙ্গুর, কমলালেবু, ফিগ সিদ্ধ করিয়া তাহার রস এক চা চামচ শিশুকে দিবে।

(৪) কালমেবের পাতার রস ২০ ফোটা হইতে ৩০ ফোটা কিংবা পাতা বাটিয়া বড় করিয়া একটা বড় খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

(৫) আমাদের দেশে শিশুকে প্রথম মাস হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত আলুইয়ের বড়ি খাওয়ান হয়। ইহা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহাতে তাহার যকৃতের কার্য ভাল হয়।

সময় সময় পিচকারি দিয়া দান্ত করাইবার প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিক উপায়ে এবং ঔষধ দিয়া দান্ত না হইলে তবে পিচকারি দিবে। লবণ জলের পিচকারি দেওয়া সর্বাপেক্ষা উত্তম। মিনারিণ এবং সাবান জলের পিচকারি দিলে পেটে irritation হয়। কখনো glycerine এবং সাবান জলের পিচকারি শিশুকে দিবে না। এক পাইন্ট অল্প গরম জলে এক চা-চামচ লবণ মিশাইয়া সেই জলের এক চা-চামচ হইতে আট চা-চামচ লইয়া পিচকারি দিবে। লবণ জল bowelsকে tone করে এবং কখনো irritate করে না। শিশুকে কখনো castoroil দিবে না। ইহা পেটের মাংসপেশীকে শক্ত করে বলিয়া শিশুর আরো কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। শিশুকে পিচকারি দিয়া দান্ত করাইবার অত্যাঙ্গ করাইবে না। যখন অল্প কোন উপায় দ্বারা থাকিবে তখনই কেবল পিচকারি দিবে।

(ক্রমশঃ)

## অস্ত্রোপচার।

—: \*:—

ডাঃ শ্রীমত্যাঙ্গীজন ভট্টাচার্য্য—এল্, এম্, এন্স।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

## মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। হাণিয়া সেরিব্রাই, মস্তিষ্কের শোথ।

হাণিয়া সেরিব্রাই অর্থাৎ মস্তিষ্ক বাহির

হওয়ার কারণ—

অত্যন্তরিক সঞ্চাপ দূরীভূত না হওয়া।  
পচন দোষেব জন্ম প্রায়ই ইহা হইয়া থাকে।  
এইরূপ উপসর্গ উপস্থিত হইলে, অভ্যন্তরে  
কোথায় সঞ্চাপ রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান  
সম্পাদিত করিবে। কেননা সেই কারণ দূরীভূত  
করিতে পারিলেই মস্তিষ্ক আপনা হইতে প্রবিষ্ট  
হইয়া যাইবে।

মস্তিষ্কের যে অংশ বাহির হইয়া পড়ে,  
প্রায়ই দেখা যায়, তাহার ভিতরে পুষ্প সঞ্চিত  
থাকে, কখনও বা ছোট ফুসফুড়ের মতও  
দেখিতে পাওয়া যায়। সে পুষ্প বাহির করিয়া  
দিলেই কারণ দূরীভূত হয়।

মস্তিষ্কের হাণিয়ার অধিকাংশই গ্রাহুলেশন  
বিধান দ্বারা গঠিত হয়, মস্তিষ্কের বিধান খুব  
কমই থাকে, সুতরাং তাহা ছেদ করা চলে।  
ছেদের পর সেইস্থানে কার্বলিক অ্যাসিড  
প্রয়োগ করা যায়। একজন্ম রোগীকে 'ক্লোর-  
ফর্ম' করিবার প্রয়োজন হয় না। কেননা  
মস্তিষ্কের বহির্গত অংশ নিজেই সংজাহীম।

মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে  
একট আলোক বিহীন কক্ষে স্থির ভাবে

শোয়াইয়া রাখিবে। রোগীকে কথা কহিতে  
দিবে না, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ  
করিতেও দিবে না।

অল্প পরিকারের জন্ম—তেউড়ী মূল বা  
হরীতকী মূলের জোলাপ দিবে। ডাক্তারী  
মতে ক্যালোমেলে দিব্য ব্যবস্থা।

কিন্তু, ডিউরামেটারের, রক্তশ্রাব জন্ম  
ট্রিকাইনি, করিলে, এত সাবধান হইবার  
দরকার করে না, এরূপ অস্ত্রোপচারের পরই  
রোগী উঠিয়া বসিতে পারে। বা শুকাইলেই  
রোগী আরোগ্য হইল—ইহাও মনে করা  
চলে।

অস্ত্রোপচারের পর প্রদাহ উপস্থিত হইলে,  
দেহের উত্তাপও খুব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরূপ  
ঘটনা প্রায় তৃতীয় দিবসে ঘটিয়া থাকে।

মস্তিষ্ক বিধানের যে কোন অস্ত্রোপচার  
হউক না কেন, অস্ত্রোপচারের পর ৫৬ মাস  
মস্তিষ্ক পরিচালনার কার্য হইতে বিরত থাকা  
উচিত। অন্ততঃ ২৩ মাস পড়া শুনা করা  
একেবারেই ছাড়িতে হয়।

## হেয়ারলিপ অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। ব্রুকাইটস্, নিউমোনিয়া, ডায়-  
রিয়া, পচন, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসরোধ।

এইরূপ অস্ত্রোপচারের পর, যে স্থলে—

অস্থি সংশ্লিষ্ট হয় সেই স্থলে—কখনও সামান্য পচন দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ রোগীর বলরক্ষার জন্য পথোর বিধি মত ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। রোগীর মুখ গহ্বর পরিষ্কার রাখাও দরকার।

শ্বাস ক্রুদ্ধের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগীর অধর নিম্ন দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে। এইরূপ মাঝে মাঝে করিলে, সহজে শ্বাসের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে।

হেয়ার পিন প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে অস্ত্রোপচারের দ্বিতীয় দিনে উহা বাহির করিয়া লইবে। যদি রোপ্যতার (ফিস্‌গাট) দিয়া সেলাই করা হইয়া থাকে, তবে তাহার একটা তৃতীয় দিবসে, অপরটি পঞ্চম দিবসে গুলিয়া দিবে। ‘কদ্বিত’ স্থানের উভয় পার্শ্ব পরস্পর সম্মিলনের উদ্দেশ্যে যে স্থল সেলাই করা হইয়া থাকে,—এক সপ্তাহের পর তাহা দূর করা উচিত, তবে ইতিমধ্যে যদি সেলাই জনিত ফোটকের উৎপত্তি হয়, তবে তৎক্ষণাত্‌ই গুলিয়া ফেলিবে। ইহাতে ‘কদ্বিত’ স্থান ফাক হইয়া বাইতে পারে। তজ্জন্ত, একথাও অবিলম্বে প্রাণ্ডার এরূপ ভাবে কাটিয়া লইবে, যে, তাহার সংকীর্ণ অংশ নাসারন্ধ্রের নিম্নে এবং প্রশস্ত অংশ ধর গণ্ডে সংলগ্ন করিয়া রাখা চলে। ইহাতে ক্ষতস্থান বিস্তৃত হইবার ভয় থাকে না।

সেলাই করার সূত্র গুলিবার সময়—খুব সাবধান হইবে, যেন টান লাগিয়া ক্ষত স্থান বিস্তৃত না হয়।

### ক্রেপ্ট প্যানেন্ট।

উপসর্গ। হৃপিং কফ, জ্বর অতিসার।  
কিন্তু, এ সকল উপসর্গ দ্বাৰাতে না

উপস্থিত হয়—সে জন্ত খুব সতর্ক থাকিবে।  
হইবে। কাসি উপস্থিত হইলে, অস্ত্রোপচার  
নিষ্ফল হইয়া যায়।

### গ্রীবার অস্ত্রোপচার।

ট্রেকিওটমী ও গেরিডোটমী।  
উপসর্গ। এম্ফাইসিমা, ট্রেকিয়ান্ন ক্ষত,  
ক্ষত বিগলন।

অনেক সময় অস্ত্রোপচারের দোষে অধর ট্রেকিয়াব মধ্যে নল সংস্থাপিত না হওয়ার এম্ফাইসিমা উপস্থিত হয়। অতএব যদি এম্ফাইসিমা হয়—তবে নল বাহির করিয়া লইয়া আবার তাহা ভাল করিয়া প্রবেশ করা ইবে। দাতব নল—বেশী দিন রাখিলে ট্রেকিয়ার মধ্যে গা হইতে পারে। সুতরাং তাহা মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন করিবে। এক সপ্তাহের বেশী কখনও দাঁত নিশ্চিত নল রাখিবে না। যদি সপ্তাহের অধিক কাল নল রাখার আবশ্যক হয়, রবারের নল ব্যবহার করিবে, এক এক ব্যক্তির গ্রীবার গঠন এক এক প্রকৃতির, তজ্জন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির গঠনের নল নির্বাচন করিয়া লইবে।

ড্রিফথিরিয়া বা সঞ্চাপ জন্ত ট্রেকিয়ার ক্ষত হইলে, ফিটা শিথিল করিয়া দিয়া বর্গ বিশিষ্ট মলম বা গজ দ্বারা ক্ষত চিকিৎসা করিবে। যদি বিগলন বিস্তৃত হইতেছে দেখে, তবে কার্বলিক অ্যাসিড বা লাইট্রেট অফ সিল্ভার—প্রয়োগ করিবে।

### লেরিংস প্রসারণ—

প্রথমে রোগিকে ক্লোরফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ট্রেকিয়ার ক্ষত প্রসারিত করতঃ সেই পথে খুব নরম রবারের ক্যাথিটার লেরিংসের

মধ্য দিয়া মুখের ভিতর চালিত করিবে। মুখের মধ্যে একটু আসিলে, ক্রিপ দিয়া তাহা ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া আনিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটু একটু বড় ক্যাথিটার প্রবেশ করাইয়া উপযুক্ত পরিমাণে প্রসারিত করিয়া লইবে। কিঞ্চিৎ এইরূপ ক্যাথিটারের ভিতর দিয়া টেকিচার ক্ষত পথে রেশম সূত্র প্রবেশ করাইয়া সূত্রের নীচের দিকে একখণ্ড কোমল প্পন্ন বাধিয়া সূত্রের অপর দিক মুখের ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইবে। ইহাতে লেরিং ধোব ময়লা সমস্তই পরিকার হইয়া যায়। মাকে ওলের টিউব—এ কার্যের উপযোগী।

### ইসোফেজিওটমী।

এই অস্ত্রোপচারের পর—রোগীকে কিছু খাওয়ান বড় কঠিন সমস্যা। ডাক্তারেরা প্রথম ৩ দিন মলদ্বার দিয়া পথ্য প্রয়োগ করেন। ইহারই বাংলা সংজ্ঞা—“সরলাস্ত্র পথে পথ্য প্রয়োগ।” এরূপ ভাল পথ্য প্রয়োগ অসম্ভব ব্যাপার। আমি কোথায়ও সফলকাম হই নাই। বরং যথ পথে বা নাসিকা পথে একটি কোমল রবার নল ইসোফেজিয়া মধ্যে ঢালাইয়া তাহার মধ্য দিয়া পথ্য প্রয়োগ করিয়াছি। এইরূপ নল সকালে ঢালাইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখিয়াছি, তাহার মধ্য দিয়া ৫৬ বার জলীয় পথ্য রোগীকে পাওয়াইয়াছি।

১ সপ্তাহ পরে মুখপথ দিয়া তরল পথ্য প্রয়োগ করা যায়।

কতের নিয়ন্ত্রণ হইতে যাহাতে শ্রাব নিগত হইতে পারে, সেজন্য ড্রেনেজের ব্যবস্থা করিতে হয়। নভুবা ক্ষত হইতে রোগ-চিকিৎসা সংক্রমিত হইতে পারে, কেননা

এরূপ ক্ষত প্রায়ই পচন দোষযুক্ত হইয়া থাকে।

### থাই রইড্ গ্রন্থির অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। বাকরোধ, গ্রীবার সেলুলাইটিস্, থাইরইডিজম্।

১। রেকারেন্ট লেরিঞ্জিয়াল, স্নায়ু অস্ত্রোপচার জগৎ আহত অথবা ২। ক্ষত গুলি বিধানের সঙ্গে জড়িত হইলে, বাকরোধ উপসর্গ উপস্থিত করে। প্রথম কারণে—অস্ত্রোপচারের সঙ্গে সঙ্গেই বাকরোধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণে কিছু বিলম্বে বাক-রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

গ্রীবার সেলুলাইটিস্—অতি ভয়ানক উপসর্গ। ইহাতে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। এ উপসর্গ উপস্থিত হইবামাত্র—ক্ষত উন্মুক্ত করিয়া দিবে—যেন শ্রাব বন্ধ হইয়া না থাকে, বাহির হইয়া যায়।

‘থাইরই ডিজম্’ উপস্থিত হইলে এক্স অফ থানমিক্, গাইটারের লক্ষণ—অস্ত্রোপচারের ২১ দিন পরেই দেখা দেয়। জ্বর খুব প্রবল হয়—১০৩, ১০৫ পর্যন্ত। এত উত্তাপ—গায়ে হাত দেওয়া যায় না। হৃদপিণ্ডের কার্য অতি দ্রুত হইয়া থাকে, মুখ মণ্ডল রক্তোজ্জ্বল, নাড়ী স্থূল—পূর্ণ বেগবতী, রোগী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে।

অনেক সময়—ক্ষত পচনদোষ সংশ্লিষ্ট হইলেও পূর্বোক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। তবে, পচন দোষে হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয় না। ২১ দিন থাকিয়া ক্রমশঃ এই সকল লক্ষণ তিরোহিত হইয়া যায়, তখন আর ভয়ের কারণ থাকে না।

পূর্বোক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইবামাত্র—

ক্ষত উন্মুক্ত করিয়া দিবে, জল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে, পরে গজ দ্বারা একরূপ ভাবে পরিপূর্ণ করিবে—যেন গ্রন্থির স্রাব ক্ষত মধ্যে সঞ্চিত হইয়া লিম্ফ্যাটিক কর্তৃক শোষিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন রোগীর পক্ষে ট্রান্স ফিউসন প্রয়োজন হইতে পারে। এইজন্য কখন কখন রোগীর মৃত্যুও হইয়া থাকে।

### বক্ষঃ বিবরের অস্ত্রোপচার।

স্তন উচ্ছেদ।

উপসর্গ। কুস্কুসের রোগ, হকের পচন, পচন সংক্রমণ।

ক্ষত মধ্যে ড্রেনেজ টিউব প্রভৃতি না দেওয়া হইলে, ক্ষতের ভিতরে শিথিল কৈশিক বিধান মধ্যে রক্ত সঞ্চিত হয়। ইহার প্রতি-কারক জন্ম—রোগিণীকে ২৪ ঘণ্টাকাল, তাহার স্তন পার্শ্বের দিকে শুইয়া থাকিতে বলিবে। কিন্তু স্রাব নির্গত হইবার ব্যবস্থা থাকিলে,—একরূপ শুইয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। অস্ত্রোপচারের পর অত্যন্ত বেদনা লইলে,  $\frac{1}{4}$  গ্রেন মর্ফিন অথবা অ্যানথ্রিক প্রণালীতে প্রয়োগ করিবে।

প্রথম ২৪ ঘণ্টা অতি অল্প বস্ত্র নির্গত হইয়া ক্ষতের পটী সিক্ত হইয়া থাকে। এ দিকে বিশেষ নৃষ্টি রাখিবে। পটীর আর্দ্র স্থানে তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে।

অস্ত্রোপচারের পর—রোগিণীকে তাকিয়া হেলান দিয়া ২ দিন পর্যন্ত বসাইয়া রাখিলে, তাহার কুস্কুসের কোন রোগ লড় একটা হয় না।

স্তন উচ্ছেদের পর—কুস্কুসের রোগ—প্রায়ই হইয়া থাকে। বেশী বয়সে স্তনের

কাসিনোমা পীড়া বেশী হয়। এই পীড়ার স্তন উচ্ছেদ না করিলে চলে না। ব্যাণ্ডেজ দ্বারা কষিয়া বাঁধা থাকায়, বক্ষঃস্থল যথোপযুক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে না। অধিকন্তু বক্ষঃস্থলে বৃহৎ ক্ষত থাকায় রোগিণী নিশ্বাস গ্রহণের সময় ব্যয়ণা অসুভব করে। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণেও ব্যাধাত ঘটে। কাজেই কুস্কুসের রোগ হওয়া অনিবার্য। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি—অস্ত্রোপচার সন্তোষজনক হইয়াছে,—রোগিণী কিছু ব্রসাইটিসের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

অস্ত্রোপচারের পরই বাহু সেদ্ধ পাখে আবদ্ধ করিয়া দিয়া হস্ত ব্যাণ্ডেজের কোভারচ দ্বারা গ্রীবা বেঁধেন স্থির রাখা আবশ্যক। যদি শ্লিং দ্বারা হস্ত স্থির রাখার ব্যবস্থা করা যায় তবে তাহা স্বক্ৰম না করিলে দেশ পর্যন্ত টানিয়া রাখা কখনই উচিত নহে। কারণ তাহাতে টান পড়িয়া ক্ষতের সেলাই ছিড়িয়া যাইতে পারে।

স্রাব নির্গত হইবার জন্ম ড্রেনেজ টিউবের ব্যবস্থা করিলে, দ্বিতীয় দিবসেই তাহা খুলিয়া লইবে, পটীর পরিবর্তন করিবে। অস্ত্রোপচারের ৩৪ দিন পরে—বাহু ওপাশে ওপাশে একটু একটু সঞ্চালিত করিতে হইবে। ১৫ দিন পর্যন্ত অতি সাবধানে একাধা করিতে হয়, ক্রমে অধিক পরিমাণে সঞ্চালিত করিতে হয়। সেলাইয়ের ক্রিয়দংশ অস্ত্রোপচারের সপ্তাহ পরে এবং বাকি অংশ পক্ষকাল পরে কাটিয়া দিবে। খা' শুকাইলে গভীর স্তরস্থিত বিধান বাহাতে পরিচালিত হইতে পারে, সে দিকে নৃষ্টি রাখিলে কর্তৃক বয়স পর্যন্ত রোগিণীর দিকে নৃষ্টি রাখিবে, কেননা পীড়ার লক্ষণ পুনরায় দেখা দিতে পারে।



স্তনের সহিত অনেকটা স্বক্ উচ্ছেদ  
করিয়া, অবশিষ্ট স্বক্ খুব টানিয়া সেলাই  
করিয়া দিলে, কর্তনের পার্শ্বদেশের স্বক  
পাচিয়া গলিয়া যাইতে পারে। একপ ঘটনা  
উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেলাই কাটিয়া  
দিবে। তাহাতে ক্ষত মুখ ফাঁক হইয়া  
যাইবে। বরং সেই 'ক্ষত' দ্বিন্ গ্রাপ্টিং দিয়া  
পূর্ণ করিবে।

পচন সংক্রমণ স্তন-উচ্ছেদের বিপজ্জনক  
উপসর্গ। ক্ষত রহৎ এবং দ্রুতর লসিকাবহ।  
উন্নত থাকায় সহজেই রক্ত দূষিত হইয়া

পড়ে। কৃন্দুস্ আবরক ঝিল্লীর মধ্যে রস  
সঞ্চিত হইয়া তাহা পুণ্যে পরিণত হইতে  
পারে।

এম্পাইমার অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। কৃন্দুসের প্রসারণের অভাব,  
চিরস্থায়ী শোষ (নালীষা) অপর পার্শ্ব পুয়োৎ-  
পত্তি। মস্তিষ্কের স্ফোটক। মেরুদণ্ডের  
বক্রতা।

(ক্রমশঃ)

## সুস্থদেহে মাদকদ্রব্যের আবশ্যকতা আছে কি না ?

— :: —

(পূর্বামুগতি)

অহিফেন।

অহিফেন প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ছিল না।  
বা ব্যবহৃত হইত না, কেননা প্রাচীন চিকিৎসা  
ওঁহে অহিফেনের নাম বা ব্যবহার নাই।  
অনেকে বলেন যে, প্রাচীনগ্রন্থে যে সকল নির্ঘাস  
ও ক্ষার (আঠা) বিবের উল্লেখ, আছে, তন্মধ্যে  
কোনটি অহিফেন হইলেও হইতে পারে।  
কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ অহিফেন  
প্রাচীন কালে যদিও অল্প নামে অভিহিত  
হইয়া থাকিত, তাহা হইলে উদরাময়াদি রোগে  
অর্ধশতাংশ তাহা ব্যবহৃত হইত কিন্তু ঐ সকল  
রোগের চিকিৎসায় অহিফেনের ভ্রায় কোনো  
মর্যাদা ব্যবহার দেখা যায় না। "ভাবপ্রকাশ।"  
"বসেন্দ্রসার সংগ্রহ" প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রাচীন

কালের গ্রন্থে অহিফেনের ব্যবহার দেখা যায়।

অহিফেন পূর্বে ছিল না বলিয়া অহিফেন  
সম্বন্ধে প্রাচীন মতও লভ্য নহে। সুতরাং অহি-  
ফেন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কি বলিয়াছেন  
নিম্নে তাহার সারমর্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

অহিফেনের একটি প্রধান গুণ এই যে, উহা  
উত্তেজিত ধমনী-বিতানকে (Nervous sys-  
tem) প্রকৃতিস্থ করিয়া সর্ব প্রকার বাতনার  
সত্ত্ব প্রশমিত করে, এইজন্য লোকে প্রথমে  
কোন কষ্টকর বেদনা নিবারণের জন্য অহিফেন  
ব্যবহার করিয়া ক্রমে উহাতে অভ্যস্ত হইয়া  
পড়ে। ইহার পর আর অহিফেন পরিত্যাগ  
করিবার উপায় থাকে না।

অহিফেন সেবনে অত্যন্ত হঠাৎ ইন্দ্রিয় সকল, দেহ ও মন ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়ে। কার্যে উৎসাহ থাকে না, কেবল বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, সুনিদ্রা হয় না, কোষ্ঠ শুষ্ক হয় না, উদরে বায়ু সঞ্চার হয়, ক্ষুধা কমিয়া যায়, পুরুষত্ব নষ্ট হয়, শরীর চর্কল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত জড়তা হয়।

ডাক্তার কেলনা এম, ডি. বলিয়াছেন যে, চা কফি, তামাক বা মদ্য দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে যেরূপ অপকার হয়—দীর্ঘকাল অহিফেন ব্যবহার করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণেই অপকার হইয়া থাকে।

অধ্যাপক রসিয়েলার বলেন যে, অহিফেন বিপজ্জনক নার্কটিক নামক বিষ, যে ব্যক্তি অহিফেন সেবন করে সে চিবিদিন অহিফেনের দাস হইয়া থাকে। ই কপ দাস হইতে মুক্তি লাভ করা একদণ্ড অসম্ভব। এইজন্য অহিফেন সেবন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অনেক বলেন যে, একটু বয়স হইলে কোন এক প্রকার মাদক দ্রব্য—বিশেষতঃ অহিফেন সেবন করা ভাল, কিন্তু যে বয়স হইতে যুগ্ম শরীরে অহিফেন বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ উহাতে শরীরের অনিষ্ট বাতীত উপকারের কোন সম্ভাবনা নাই।

অহিফেন যে কিরূপ অনিষ্টকর পদার্থ তাহা চীন দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সুন্দর রূপে উপলব্ধি হইবে। অহিফেন ব্যবহার করিয়া প্রাচীন পরাক্রান্ত চীন জাতি অধঃপতনের চরম নীচায় উপনীত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা অহিফেনের অনিষ্টকারিতার প্রমাণ নিম্নরূপে জন।

অহিফেন হইতে গুলি এবং মর্দাকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা বা সাধারণ অহিফেন অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর। গুলি থাইলে শরীর জীর্ণ শীর্ণ এবং কুৎসিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য গুলিখোরের মত চোখা আমাদেব দেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত।

গাঁজা, চরম ও সিদ্ধি।

এই সকল মাদক দ্রব্য সেবন করিলে অজীর্ণ, উদরে বায়ু সঞ্চয়, মস্তিষ্ক দৌর্বল্য, শিরো ঘূর্ণন, কোষ্ঠবদ্ধতা, সুনিদ্রার অভাব, মেজাজ খিট খিটে হওয়া, জোবাধিকা, অগ্নি মান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। গাঁজা খাইলে লোকের উৎসাহ ও কর্ম পটুতা অত্যন্ত হ্রাস হয় বলিয়া আমাদের দেশে লোকে বলে যে, 'গাঁজা খেলে লকী ছাড়ে।' আর গাঁজা খাইলে জীর্ণ শীর্ণ ও কদাকার হয় বলিয়া গাঁজা খোরের মত চোখা ও বলা হয়। তামাক সম্বন্ধে আমবা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। গাঁজা ও চরম—তামাক অপেক্ষা অনিষ্টকারী। সুতরাং তামাকের অপকারিতাকে আর একটু গুরুতর ভাবে ধরিয়া লইলে গাঁজা ও চরমের অপকারিতা বুঝা যাইবে। গাঁজা থাইয়া অনেক লোকে পাগল হইয়া যায়, সিদ্ধি—গাঁজা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম অপকারী।

মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বাহা আলোচনা করা হইল—তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনেই শরীরের কোনরূপ উপকার হয় না, পরা সমূহ অপকার হইয়া থাকে। সুতরাংই শরীরে মাদক দ্রব্যের উপযোগীতা কিছু হইবে নাই। কিন্তু অগ্নিক মত্ততার গোতে যোবে অর্থব্যয় করিয়া মাদক দ্রব্য সেবন করে এর

তাহার ফলে ভয়ঙ্কর ও বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। বদ্যপি সর্ব প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার পৃথিবী হইতে উঠিয়া যায়, জীবন সংখ্যা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

## ব্যায়াম-প্রসঙ্গ ।

( "হিন্দুস্থান হইতে উদ্ধৃত )

ব্যায়ামের প্রধান গুণ তাহা মাংসপেশীকে পরিপুষ্ট করে। মাংসপেশী কি? অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য সমষ্টি। এই তন্তুগুলি আপনা-আপনি সংযুক্ত হইয়া যাইতে পারে।

যে মাংসপেশী ব্যবহৃত হয় না, তাহার ভিতরের তন্তুগুলি বিবর্ণ ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এবং তাহাদের আকর্ষণ ক্ষমতাও অনেকটা কমিয়া আসে।

কোন দুর্বল ও ক্লান্ত মাংসপেশী আকৃষ্ট হইলে তাহার বিবর্ণতা শীঘ্রই দূর হইয়া যায়, তাহার মধ্যে উজ্জ্বলিত রক্তধারা ছুটিয়া আসিয়া তাৎক্ষণিক রাঙা করিয়া তোলে। সেই নূতন রক্তের মধ্যে যে শোণিত পদার্থ থাকে, তাহার দ্বারা মাংসপেশীর তন্তুগুলি বর্ধিত উপকার লাভ করে। এইভাবে নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম বা মাংসপেশীকে আকৃষ্ট করিলে ক্রমেই তাহার আকার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ফলে সেই সঙ্গে দেহেরও বলবৃদ্ধি হয়।

আপনারা সকলেই বিখ্যাত বলবান জাতি নাম গুলিয়াছেন। বাল্যকালে জাতি-এত বেশী রোগা ছিলেন যে তাহার ব্যায়াম

ভেলের জীবনেব আশা বাধিতেন না। কিন্তু সেই জাতিই নিয়মিত ব্যায়ামের গুণে কয়েক বৎসরের মধ্যেই গায়ের জোরের জলসারা পৃথিবীতে নাম কিনিয়াছিলেন। শুধু গায়ের জোর নয়,—তাঁহার মতন সুগঠিত ও পরিপুষ্ট দেহও আর কাহারও দেখা যায় নাই।

বিলাতের বিখ্যাত ডাক্তার উইনসিগ মাংসপেশীর নিয়মিত পরিচর্যা সাধন করিয়া এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পূর্ণ সাঁইক্রিশ মণ ফুড়ি সের ওজনের ভারি মাল কাঁধে করিয়া তিনি অনায়াসে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। খুব বলবান ভারবাহী অথচ এত ভারি মালের চাপ একেবারেই সহ করিতে পারিবে না। অথচ ডাক্তার উইনসিগও যৌবনে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। যার-তার হাতে অসহায় ভাবে মার খাইয়া শেষটা তিনি উঠিয়া পড়িয়া ব্যায়াম চর্চায় লাগিয়া যান।

বলবান ও সুগঠন মাংসপেশীর মত যৌবনের উপযোগী সৌন্দর্য আর কিছুই নাই। দেহের বলে মানুষের মনের বলও বাড়ে,

এবং স্বাস্থ্য অটুট হইয়া মানুষকে সকল কাজেই সাহায্য করে। গাঁহারা মস্তিষ্ক-সংক্রান্ত কাজ করেন, তাঁহাদের পক্ষেও ব্যায়াম অত্যন্ত দরকার। কীরণ, মস্তিষ্ক ও মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক যতদূর ঘনিষ্ঠ হইতে হয়। দেহকে অবহেলা করিলে মস্তিষ্ক মানুষকে বাচাইতে পারিবে না।

ব্যায়াম মানুষকে সুন্দর করে। কুঁজো, বৈকপড়া দেহ, সঙ্কীর্ণ বক্ষ, বিকৃত চলন-ভঙ্গী, ব্যায়ামের গুণে এসব অপূর্ণতা দূর হয়। মানুষের বক্ষস্থলের কাঠামো হইতেছে পার্শ্বাংশুলি। ব্যায়ামেব অভাবে সেগুলি বাহিরদিকে না আসিয়া, ভিতরদিকে ঢমড়াইয়া যায়। কাজেই বক্ষস্থল সমতল হইয়া আনন্দে, নিঃশ্বাস-স্বর ফুসফুসকে চাপিয়া ধরে। গাঁহারা কুড়ি-বাঁশ বৎসর বয়সের ভিতরে ব্যায়াম শুরু করেন, তাঁহাদের দেহেব এ সমস্ত দোষ একেবারেই থাকে না। বেশী বয়সে ব্যায়াম আরম্ভ করিলে, অল্পটা না হোক, দেহের গড়ন অন্ততঃ কিছু কিছু বদলাইয়া ফেলা যায়।

ব্যায়ামের গুণে জংপিণ্ড ও ফুসফুসের অবস্থা অতিশয় উন্নত হয়। অল্প ব্যায়ামের কথা দূরে থাক, একবার মাত্র দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া আসিলে জংপিণ্ডের কার্যকারিতা চক্ষুণ ও ফুসফুসের কার্যকারিতা চক্ষুণের চেয়েও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। জংপিণ্ড দেহের সমস্ত তন্ত্রের মধ্যে রক্তসঞ্চার করে। জংপিণ্ড যদি অধিক দ্রুত-ভাবে চলে, তবে রক্তের যোগানও বেশী করিয়া দিতে পারিবে। সেই

রক্তের ধারায় যেমন পোষ্টাই পদার্থ থাকে, তেমনি তাহার দ্বারা দেহের ভিতরের ব্যবহৃত পদার্থের একেকজো কণিকাগুলি, ঠিক সেই সেই যন্ত্রের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়,—যে-সব যন্ত্রের কর্তব্য হইতেছে, দেহের ময়লা সাদা করা। ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়িলে দেহের সমস্ত ধমনী শোণিতের মধ্যে অধিক পরিমাণে মহা-উপকারী ‘অক্সিজেন’ বা অক্সিজেনের যোগদান প্রাপ্ত হয়। অক্সিজেন দেহের বক্ত ও তন্ত্রগুলির মধ্যে নতুন তেজ ও শক্তির সঞ্চার করে। ফলে সমস্ত দেহ নব-জীবনের উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মস্তিষ্কের চিন্মাশক্তি, মনের ধারণা-শক্তি, উদরের হ্রদ্র শক্তি বাড়িয়া যায় এবং সমস্ত অবসাদ, নিশ্চেষ্টতা ও কষ্ট-বিরাগ একেবারে দূর হইয়া যায়। একালকার বাস্তবতা ও কষ্ট জীবনের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, জংপিণ্ড সতেজ ও নিরুদ্ধ এবং ফুসফুস রক্ত ও স্রুত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আগেই বলিয়াছি, ব্যায়ামেব দ্বারা মাংসপেশী পরিপুষ্ট হয় এবং সেইজন্যই ব্যায়ামের ফলে জংপিণ্ড ও ফুসফুসের কোনো রকম অপূর্ণতাই থাকিতে পারে না। গাঁহারা ব্যায়াম করেন, তাঁহারা বক্ষস্থলকে চুকা করিলেই অসম্ভব রকম বাড়িয়া তুলিতে পারেন। দৃষ্টান্তরূপ ত্রাণের নাম কুরা যায়। সহজ অবস্থায় তাঁহার বুকের মাংস আটচলিশ ইঞ্চি। কিন্তু ছাতি ফুলাইলে তাঁহার বুকের মাংস ছয় বাষট্টি ইঞ্চি।

## স্বর্গীয় কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত ।

দুর্গল জেলার অন্তর্গত তাবকেশ্বর রেল-  
স্টেশনের ২ ক্রোশ ব্যবধানে দামোদর নদের  
পশ্চিম তীরবর্তী ভান্সামোড়া গ্রামে সন ১১৭৫  
সালের ৬ই ফাল্গুন, বিরজাচরণ জন্মগ্রহণ  
করেন। ইহার পিতার নাম মাধব চন্দ্র গুপ্ত।  
বিরজাচরণ তাঁহার তৃতীয় পুত্র। বিরজা  
চরণের পিতা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী  
ছিলেন এবং ভান্সামোড়া ও তৎসম্মিকটস্থ  
গ্রাম সমূহে সূচিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ  
করিয়াছিলেন। বিরজাচরণের বাল্যজীবন  
এই জন্ত পল্লীগ্রামের আড়ম্বর বিহীন অবস্থায়  
অতিবাহিত হইয়াছিল। পল্লীগ্রামের সেই  
সরলতা, অকপটতা ও আড়ম্বরহীনতা—সহরে  
আসিয়াও বিরজাচরণের জীবনে অন্তরূপ ধারণ  
করে নাই।

পল্লীগ্রামের পাঠশালায় তাঁহার প্রথম  
শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর তিনি  
গ্রাম্য-মধ্যাহ্নরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন।  
তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে  
অপরিচিত লেখক ও অধিকা চরণ গুপ্ত মহাশয়  
৩৭কালে পুলিশ বিভাগে চাকরী করিতেন।  
বিরজাচরণ ও তাঁহার অজ্ঞাত সহোদরেরা  
জ্যেষ্ঠের কর্মস্থল হাওড়া শিবপুর ও উলু-  
বেড়িয়ায় অবস্থিতি পূর্বক ঐ সকল স্থানের  
ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রাপ্ত হন।

বিরজাচরণ এইরূপে ইংরাজী বিদ্যালয়ে  
প্রবেশিকা শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার পর তাঁহার  
পিতৃদেব তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত

করিবার অভিপ্রায়ে আবার প্রাচীন পল্লী  
ভান্সামোড়ায় লইয়া নান্ন এবং সংক্ষিপ্তসার  
ব্যাকরণ পড়াইবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু নানা  
কারণে ভান্সামোড়ায় থাকিয়া অধ্যয়নের  
অসুবিধা হওয়ায় তারকেশ্বরের নিকটবর্তী  
কেটেড়া গ্রামে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চূড়ামণি  
মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ইহার অধ্যয়নের ব্যবস্থা  
করা হয়। কঠোর পরিশ্রমী-মেধাবী-বিরজা-  
চরণ ৩ বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি  
লাভ করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল  
বিভাগে কাব্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন এবং এক  
বৎসরের মধ্যেই কাব্যার্থ উপাধি লাভ পূর্বক  
তাঁহার কুলগুরু ভক্তি ভাজন মহামহোপাধ্যায়  
পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের  
নিকট কিছুদিন গ্রামশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহা-  
মহোপাধ্যায় কবিরাজ স্বর্গীয় বিজয়রত্ন সেন  
কবিবর মহাশয়ের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা  
করেন। ইনি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ  
মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার  
ফলে ইহার আয়ুর্বেদ শিক্ষা সমাপ্তির পর  
কোচবিহার নিবাসী জনৈক জমিদার পত্নীর  
চিকিৎসার্থ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়  
তাঁহাকে কোচবিহারে প্রেরণ করেন। সেই  
সময় কোচবিহার স্টেটের কবিরাজের পদ  
শূন্য হয়, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের  
চেষ্টায় বিরজাচরণ ঐ পদ লাভ করেন।  
কোচবিহার স্টেটে সে সময় আয়ুর্বেদীয়  
চিকিৎসক রাখা হইত ষাট, কিন্তু সমগ্র কোচ

বিহার রাজ্যে আয়ুর্বেদের প্রচার একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিরজা চরণের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখিয়া কোচবিহার রাজ্যের তদানিন্তন দেওয়ান রায় কালিকা দাস দত্ত সি, আই, ই বাহাদুর তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং বাহাতে য. প্র. কোচবিহার রাজ্যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে কোচ-বিহারে দাতব্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বিরজাচরণ এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৯০২ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি এই ভার রক্ষার পর কলিকাতায় আসিয়া স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

বিরজাচরণের প্রধান কীর্তি “বনৌষধি দর্পণ।” এই গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে তিনি কোচ-বিহারে চেষ্টা করিয়া বনৌষধি উদ্ভাবন ও স্থাপনা করেন। প্রথমে ইহা ক্ষুদ্রভাবে আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ ইহার প্রসার বৃদ্ধি হয়। বনৌষধি দর্পণের উপাদান সকল এই উদ্ভান হইতে কতক কতক সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে বনৌষধি দর্পণের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কোচবিহারের মহারাজা বাহাদুর ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশে সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। বিরজাচরণ কলিকাতায় আসার পর ১৯১২ খৃঃ অব্দে বনৌষধি দর্পণের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

“বনৌষধি দর্পণ” ত্রিভু বিরজাচরণ আরও কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে “বনৌষধি দর্পণ” নামে একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের

কিয়দংশ পাণ্ডুলিপি লিখিয়া তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিভাগের তিনি একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন গণের মধ্যে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের সকল বিষয়ের অধ্যাপনার শক্তি তাঁহার মধ্যে এক সঙ্গে বর্তমান ছিল। বর্তমান সাধের ১লা মাঘ হইতে বিভাগের উন্নতি করে তাঁহাকে ভাইস প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু ২৬ দিন কার্য করার পরই আর তাঁহাকে একাধী করিতে হইল না, গত ২৬শে মাঘ রাত্রি ১১১০ টার সময় তিনি সন্মানযোগে অননুধ্যমে গমন করিলেন। তাঁহার বিরোধে তাঁহার আত্মীয় স্বজনদের বৈরূপ ক্ষতি হইয়াছে, সেইরূপ প্রকৃত আয়ুর্বেদীয় সাধক সন্তোষ ও বিষম ক্ষতি হইয়াছে। কালে হয় তো তাঁহার অভাব আবার পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দাক্ষণ সংঘর্ষ কাণ্ডে বিরজাচরণের মত আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব—কম ক্ষতির কথা নহে। তাঁহার সৌম্য মূর্তি,—প্রশান্ত বদন,—মধুর স্বিধ হাস্য—চিরকাল আমাদের মনে জাগরুক থাকিবে। মুক্তকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। পত্নী, পাঁচটি পুত্র ও একটা বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিরোধ-ব্যাধী আমাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়াছে, ঐকি বলিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আশ্বস্ত করি, ভারিয়া পাইতেছি না।

গত ৩রা ফাভন আয়ুর্বেদের সাধকপ্রবর বিরজাচরণের জন্ম অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিভাগের এক শোক সভায় আয়োজন হইয়া

ছিল। তাহাতে সভাপতি হইয়াছিলেন  
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ  
তর্কভূষণ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত গ্রামাদাস বাচ-  
স্পতি, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত  
গণনাথ শেন সরস্বতী এম-এ, এল, এস, এস,  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন  
এম-এ, এম-বি প্রভৃতি বিরজাচরণের অনেক  
গুণ-পরিচয় সভায় প্রকাশ করেন। কবিরাজ  
শ্রীযুক্ত সত্য চরণ শেন গুপ্ত কবিরঞ্জন রচিত  
একখানি শোক গীতি সভায় প্রথমে ছাত্রগণ  
কণ্ঠে গীত হইয়াছিল; সে গীত খানি নিয়ে  
দওয়া হইল।  
এসেছিলে তুমি পুণ্য লগনে ধন্য প্রতিভা ল'য়ে।  
এনেছিলে শান্তি সুখার সলিল কত না ক্লান্তি  
স'য়ে কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত কবি-  
হ'রেছিলে মঞ্চ কি যেন মঞ্চে,  
বজ্রেছিল গান সকল বজ্রে,

উঠেছিল নেচে হৃদয় তরী সে গানে মোহিত  
হ'য়ে।  
বেসেছিলে ভাল প্রাণ ভরিয়া -  
মান মুখানি সবারি চাহিয়া,  
দৃষ্টাইতে হাসি শুধু অধরে আশার কথাটি  
ক'য়ে।  
কি জানি কি এক শক্তি মানিয়া  
দিয়েছিলে ওগো তুমি যে চালিয়া,  
সে শক্তি সাধনা ক'রে ছিল সবে তোমারি  
ভাবেতে র'য়ে।  
এত দয়ারাশি সকলি ভুলিয়া  
নিমেবের মাঝে গেলে গো চলিয়া ?  
(কিন্তু) কীর্তি তোমারি দীপ্ত রহিবে মঞ্চ  
ভিতরে ব'য়ে।  
কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত কবি-  
ভূষণ মহাশয় এই উপলক্ষে স্বরচিত একটি সংস্কৃত  
শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা এই -

হা হস্তাশ্বকাল অয়করজগতাং কালবোধানভিজ্ঞ।  
কিং ক্রোধাৎ হঃসহঃ প্রকটিতমধুনা ভোজ্যমাশ্বপীড়ি।  
সংসারানামশোভাকরমতিপবিতং কীর্তিসৌরভাহুং  
লোকালোকং জনৈষ্ঠং নরবরকুসুমং কাঞ্চ গোপায়সে তৎ ॥  
সংসর্গঃ খলু যন্ত কাক্ষিতসুখেদ্ব্যস্তমাপ্তশিরং  
মুর্তিগন্ত প্রতিষ্ঠিতা শিবময়ী হৃদয়নিরে চিন্ময়ী।  
ধানং যস্য চ চিত্তশর্যকরণং কস্মাস্তরোচ্ছেদকং  
তং প্রীতিপ্রদমদ্য নো বিরহয়ন্ কালোহসি মায়াবান্ ॥  
• ত্যক্তস্বার্থোজগদ্রপকৃতা বর্ণিতায়া মহাত্মা -  
সুর্বেদাম্বিঃ নিখিলসুতরং সংবাধাৎ সংস্কৃতৈর্ঘঃ।  
বিশ্বত্ৰং তং কইহ সহসা স্যাৎকমঃ সর্বভজং  
বাহোন্যপি ক্ষণমপিবয়ং কেপন নিত্যসঙ্গাঃ  
যত্পাদ্যাদি চিরমতিমুত্তি বাহবিত্তে সদীনঃ  
জ্ঞানার্থানাং পুনরাধিগমাৎ বসন্তোহস্ত্র স্নাহাতাঃ।  
বিভাভাবাদপিপরিগতঃ ক্রেশমর্থোপলাভে  
নার্যসিদ্ধি ক্ষণমপিকৃতী প্রেক্ষ্যকর্তব্যবিয়ং ॥

অকৃতমলিনকর্ম্মা নিত্যশর্ম্মাঅর্থ—

প্রবণকৃদমরুতিঃ কর্ম্মবীরঃ সুধীরঃ।

তনুজবদমুবোধী ছাত্রবর্গে স্বভাবাৎ

সুহৃদি সুহৃদিনাসৌন্দর্যচমৎভিন্নবোধঃ ॥

আয়াস্তি যান্তি কতিকেপরিমাস্তিলোক

লোকান্ বৃথাত্তজ্জন্মঃ ক্রিতিভারতৃতান্।

কিস্ত প্রিয়োত্তম ভবাদৃশ মর্ত্তরত্ন—

মায়ান্তি যাতিনসদা চিরত্বর্জতং তৎ ॥

লোকান্তরং যদিভবান্ বিধিসম্মিযোগাৎ

প্রাপ্তেহন্তি সম্প্রতি সমজিতমায়পুণ্যোঃ।

গাঢ়াসুরজনদৃশাং নমু নোহসমক্ষং

ন তং তথাপ্যসি সূহৃৎ সুহৃদাং কদাপি ॥

সুখেবা থভাং স্ববাসে প্রবাসে

বয়ং যত্র তত্রস্থিতা যদ্বিধা বা।

চিবং দ্বাং নিচরং অরস্তোহক্লানঃ

কথঞ্চিদ পরাবাসসংস্থান্চতুঃস্থ্যঃ ॥

অষ্টাঙ্গায়ুর্বেদ বিভাগমোহম্

যন্তে সম্পদং প্রাপ্তবাসদাম্যং।

তস্তাত্মসৌহৃদিক্রোধানভাতি

জ্যৈষ্ঠঃ সর্গঃ শৌকসংকল্পচিহ্নঃ ১০

বহুকরমং প্রিযমায়সমুভবঃ

বহুতমং স্বাং পরিহায় চুঃস্থিতা।

নিজাভিধানস্য ইত্যর্থতাক্ষিতা

নরাজতে প্রাগিব সম্প্রতি প্রিয় ॥

ততৎ সমুদ্রপূর্ণাপি ত্রায়তে কেবলং সূহৃৎ।

পুত্রায়তে ধরমং নঃ ধন্য প্রভাবিত্তত্বব ॥

পণ্যায়ন্ কৃতপুণ্যেন বা ত্রয়াজিতসদৃগতিঃ।

দদাতু স্য চিবং শান্তিং তুতামিত্যর্থমহে ॥

বিরজাচরণধর্ম্মবংশদীপ মতোদয়।

অমরলোককর্ম্মপন্নঃ লোকাতিরিক্তশক্তিকঃ ॥

দেবভাষেন সন্দীপ্তঃ শান্তিত্ত্বকর্ত্তেঃ কৃতী।

প্রভুরাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্তিঃ প্রাগিবাস্যত্রীতনাম্



মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ  
সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস—মহাশয়  
নিম্নের শ্লোকটি সভাস্থলে রচনা করিয়া পাঠ  
করেন,—

বিরজা বিরজন্তমা হু বা  
সুচরিত্ত বিতবেমু নিঃস্পৃহতঃ  
ব্রতমেবং দধাদ্যুরাগমং ।  
কহু হন্ত গন্তঃসথে ভবান ॥

কয়েকজন ছাত্রও এই উপলক্ষে শোক-  
স্থচক কয়েকটি গাথা পাঠ করিয়াছিল, বাছল্য  
ভয়ে তাহা আর আমরা প্রকাশ করিলাম না ।

ফলকথা বিরজাচরণের জগু ইদানীন্তন  
কালের রীত্যনুসারে সভাধিবেশনই হউক  
আর গীতি বা শ্লোকই বিরচিত হউক, ইহার  
অভাবৈ আয়ুর্কেন্দ্রীয় চিকিৎসক সমাজের যে  
বিশেষ ক্ষতি হইল—তাহাঁ অবিসম্বাদিত ।

## ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ও টোটকা ।

(কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন)

প্রমেহে । (১) রক্তচন্দন ১ তোলা ও  
মঞ্জিষ্ঠা ১ তোলা—জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ  
পোয়া—এই কাথ মধুর সহিত পান করিলে  
প্রমেহ পীড়া আরোগ্য হয় । (২) কাঁচা  
হরিদ্রার রস অর্দ্ধ ছটাক—কিঞ্চিৎ মধুর  
সহিত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় সেবনে প্রমেহ  
নষ্ট হয় । (৩) দুর্বা, কেচুর, মুখা, পানার মূল  
ডহরকবল্লা ও সেওলা—প্রত্যেক দ্রব্য ১/১০  
সাড়ে পাঁচ আনা, জল ১/১০ সের, শেষ ৮০  
পোয়া—এই কাথ পান করিলে শুক্রমেহ  
নষ্ট হয় । (৪) আমলকীর রস দুই তোলা,  
মিছরি ১০ আনা—একত্র কয়েক দিন পান  
করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয় । (৫) গাঁদা  
পাতার রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মিছরি সহ  
পান করিলে প্রস্রাব সরল হয় ও আলা বস্তুর  
বিদূরিত হয় ।

দ্রুত রোগ ।—(১) বর্ষ এলাইচ,  
সোহাগার খই ও নারিকেল তৈল একত্র  
মিলাইয়া মলমলে মত করিয়া লাগাইলে  
বেত্রপ দ্রুতই হউক না কেন—২৪ ঘণ্টার মধ্যে  
আরোগ্য হয় । (২) ভুলসী পাতা ও লবণ  
—একত্র গিবিয়া রক্ত স্থানে লাগাইলে রক্ত  
ভাল হয় । (৩) কলক কুড়ার রস ও শেফা-  
লিকা পাতা—কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে

বা হরিদ্রা, হরিতাল, মুর্কা ও সৈন্ধব—গোমূত্র  
দ্বারা বাটিয়া দ্রুতস্থানে লাগাইলে দ্রুত  
আরোগ্য হয় । (৪) সোহাগার খই, খেত  
চন্দন সহ মিলাইয়া ঘুঁটের ছাই অথবা করবী  
রুক্ষের কস লাগাইলেও দ্রুত আরোগ্য হয় ।  
(৫) খেতধূনা, সোহাগা, কটকিরি ও গন্ধক  
সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া কেরোসিন তৈল সহ  
মিলাইয়া ব্যৱহার করিলে সকল প্রকার দ্রুত  
আরোগ্য হয় । (৬) সোহাগার খই ও কর্পূর  
—ঘৃতসহ পাক করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে ।  
এই মলম ব্যবহারে কৌচদাদ শীঘ্র আরোগ্য  
হয় ।

কর্ণ রোগে ।—(১) রত্নন, আদা,  
সজিনার রস ঈষৎক্ষ করতঃ কর্ণবিবরে  
প্রদানে কর্ণ বেদনা আরোগ্য হয় । (২)  
আকন্দের পীতবর্ণ পাকা পাতার ঘৃত বাষ্পের  
অগ্নিতে ঝলসাইবে এবং ঐ রস নিঙকিয়া  
অল্প উষ্ণ থাকিতে কর্ণপূরণ করিবে । ইহারে  
কর্ণশূল ও কর্ণ বেদনা নষ্ট হইবে । (৩)  
মালতী পত্রের রস—মধু সংযুক্ত করিয়া পূরণ  
করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কনি পাক  
আরোগ্য হয় ।

চক্ষুর জ্বামিতে ।—(১) খেতধূনা  
রস ও লবণ ঘৃত—সমপরিমাণে মিশ্র

বেশ করিয়া মিশাইয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে ছানি কাটিয়া যায়। (২) আমকল পাতার রস ও কর্পূর মিশাইয়া চক্ষুতে দিলে চক্ষু পবিত্রাব হয় ও ছানি পড়া ভাল হয়।

**চক্ষু উঠায়।**—(১) কববী ফুলের পাতা ছিড়িলে যে ত্বকের ন্যায় কম বাহির হয়, এই কম চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে চোখ উঠা আরোগ্য হয়। (২) ডাবের জল ফটকিরি জল অথবা শামুকের পিঠ ভাঙ্গিলে যে জল বাহির হয়—এ জলে চক্ষু ধুইলে জ্বালা বয়না কমিয়া গিয়া চক্ষু উঠা আরোগ্য হয়। (৩) কাঁচা হবিদ্রার রসে বড় কবাকড় দিয়া সর্বদা চক্ষু মুছিলে চোখ উঠা আরোগ্য হয়।

**রাত কাণায়।**—(১) পানের রস প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ৩৫ ফোটা করিয়া দিলে রাতকাণা, রোগের প্রতীক্য দূর্যে। (২) দধির সহিত গোল মরিচ দমিয়া অন্ন মাত্রায় চক্ষুতে দিলে রাতকাণা রোগ অব্যবহা হয়।

(৩) পানের সহিত জোনাকী পোকা সন্ধ্যা বেলা সেবনেও উপকার হয়।

**শিরোরোগে।**—বিড়ঙ্গ ও কুঙ্ক তিল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শিরোরোগে উপকার দর্শে।

**আধকপালে রোগে।**—গুলঞ্চ রাসা বেড়লা রত ও অশুর একত্রে পেষণ করিয়া কপালে দিলে উপকার দর্শে।

**রক্ত প্রদরে।**—(১) দুই তোলা পরিমাণে তরকারি বসের সহিত ৩৭ রতি পরিমাণ বসায়ন ও ৮১০ ফোটা মধু মিশাইয়া পান করিলে প্রথম বক্তার তৎক্ষণাত নিবারিত হয়। (২) বেড়লার মূল বাটিয়া দুই ম্যান মাত্রায় কিঞ্চিৎ ছাগ দুগ্ধ ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তপ্রদর আরোগ্য হয়। (৩) বসায়ন ও নটে শাকের মূল এক আনা পরিমাণে প্রত্যেকট লইয়া চাউল খোয়া জল সহ মিশ্রিত করিবে। উহা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে রক্ত প্রদর বিশেষ উপকার দর্শে।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

**বেরিবেরি।**—বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয়ের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ,—স্থানে স্থানে বেরিবেরি, এপিডেমিক ড্রামি ও প্রবল উদ্ভিদা ব্যাধির সংবাদ পাওয়া গাইতেছে।

সে সকল রেজিষ্টার ডাক্তার এই রোগের সংবাদ পাতিবেন, তাঁহারা যেন স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয়কে সেই সংবাদ প্রদান করেন। এই রোগ করতল কারণ নির্ণয়ের জন্য ও তাহার বিভাগ চইতে চেষ্টা চলিতেছে।

অধিকতর সরিষার তৈল ব্যবহার ইহার কারণ কি—সে সম্বন্ধেও তদন্ত চলিতেছে।

**শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী।**—কলিকাতা মহলে শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার জন্য এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। রক্তের স্বাস্থ্য কমিশনার ডাক্তার বেটলী

ইহার সেক্রেটারী। কলে স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয় এই উপলক্ষে শিশু মৃত্যু সংখ্যা বাহাতে বঙ্গদেশ চইতে হাস্য পায়, তাহার উপায় প্রদর্শন করিবেন আশা করি।

**হাসপাতালে ধর্ম্মঘট।**—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ইন্ডেন হাসপাতাল, এজরা হাসপাতাল এবং প্রিন্স ওব ওয়েলস হাসপাতালের কুলি এবং মেধরগণ বেতন বৃদ্ধির জন্য গত ২ই মার্চ ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য বন্ধ করিয়াছিল। ব্রিটিশ প্যাস কর্ণেল ডিয়ার সাহেব ইহাদিগকে শাস্ত করার পর ইহারা আবার কার্যে যোগদান করিয়াছে। ধর্ম্মঘটের সময় হাসপাতালের দান দণ্ড ইহারিগণের কার্য করিয়াছিল। দান দণ্ডকে ধর্ম্মঘট

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৪র্থ বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৭—বৈশাখ ।

৮ম সংখ্যা ।

## শারীর বিজ্ঞা ।

মস্তকের অস্থি ।

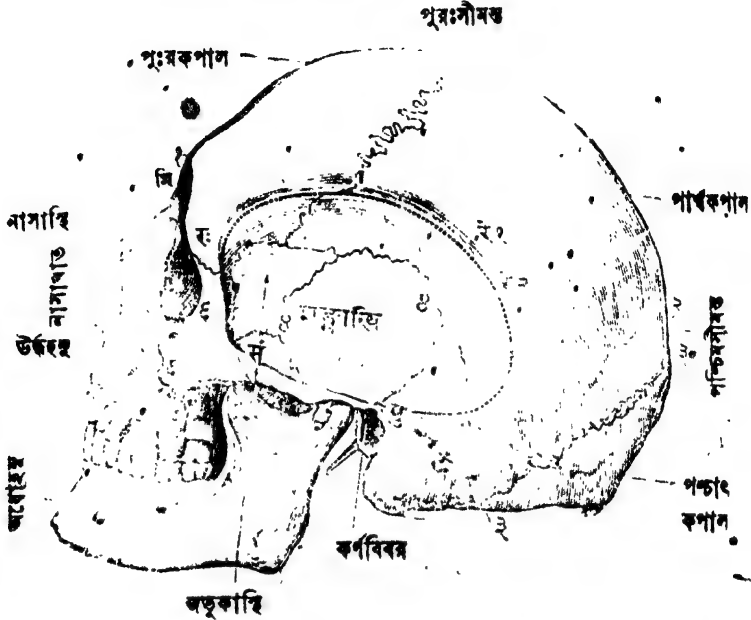
(পূর্বাভাস) ।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী, এম, এ, এল, এম, এস



মস্তকে মোট বাইশখানি অস্থি আছে । তন্মধ্যে আটখানি অস্থি দ্বারা ক্রোটি বা শিরঃ-  
সম্পৃষ্ট • নির্মিত হইয়া থাকে । এই সম্পৃষ্টের মধ্যে জ্ঞানের প্রধান আধার মস্তিষ্ক অবস্থিতি  
করে । অবশিষ্ট চৌদ্দখানি অস্থি দ্বারা মুখমণ্ডল নির্মিত হয় ।

[ বিংশ চিত্র—সমগ্র করোটি ]



(১, ১) ১, ১—পুরঃকপাল। (২, ২) ২, ২—পার্শ্বকপাল। (৩, ৩) ৩, ৩—পশ্চাৎ কপাল  
(৪, ৪) ৪, ৪—নাসাহি (দুই সীমা নির্দেশের জন্য)। (৫) ৫—নাসাহির সোতনাশ। (৬, ৬  
৬, ৬—গণ্ঠাহি। (৭, ৭) ৭, ৭—উত্তর পশ্চাত্তরনিকা রেখা। (৮, ৮) ৮, ৮—অধর পশ্চাত্তরনিকা  
রেখা নাসাহি পেশীর উৎপত্তি স্থান।

হুইত্র জুড়িয়া উত্তরদিকে পশ্চাদতিস্থে  
কর্ণমূলের উপর দিগে কেন্দ্রভাগ পর্যন্ত হুইত্র  
রেখা সংযুক্ত করিলে উহাদের উর্দ্ধাংশকে  
শিরঃসম্পৃষ্ট বলা যায়। শিরঃসম্পৃষ্ট নির্ধাণ  
কারক আট খানি অতির নাম, যথা—পুরঃ  
কপাল একখানি, পশ্চাৎ কপাল একখানি, পার্শ্ব  
কপাল দুইখানি, কণ্ঠমূলে পশ্চাহি দুইখানি  
এবং শিরঃসম্পৃষ্ট ভূমিত্ত অতুকাহি ও কণ্ঠক  
নামক অহি দুইখানি। এই আটখানি অতির  
মধ্যে পুরঃখানি কপালের বাহির হইতে স্পষ্ট  
দেখা যায়। কেবল অতুকাহি ও কণ্ঠক নামক  
অহি দুইখানি স্পষ্ট দেখা যায় না। যে

অতুকাহির অংশমাত্র দেখা যায় ( চি  
দেখ )।

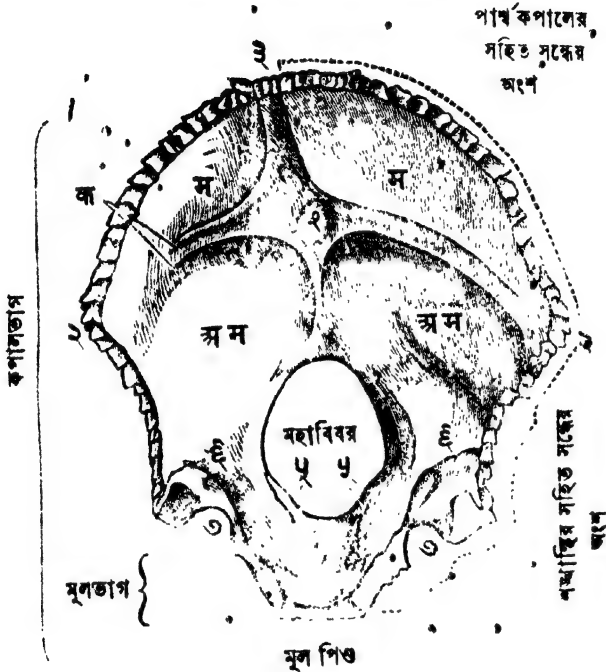
**পশ্চাৎ কপাল**—চারিখা  
শিরঃকপালের মধ্যে পশ্চিম কপাল পৃষ্ঠবৎ  
চূড়ার সহিত সংহিত হইয়া মস্তকের মূলভাগ  
স্বরূপ অবস্থিত। ইহা হুইত্রাগে বিভক্ত, ১  
—কপালভাগ এবং মূলভাগ। কপালভাগ  
উর্ধ্বে পশ্চাতে হেলিয়া অবস্থিত এবং সর্পক  
স্তায় আকৃত। মূলভাগ নিম্নদিকে মূলে  
হেলিয়া অবস্থিত এবং সর্পগ্রীবা মূদূর্ণ।  
উক্ত ভাগের সংযোগে যে ‘কণ্ঠবিবর’ নি

ইহা—Occipital Bone—কণ্ঠবিবর

হয় তাহার ভিতর দিরা সর্পির্ষ স্রুয়াকাও নিয়ে পৃষ্ঠবংশের মধ্যে প্রবেশ করে। বাহু এবং আভ্যন্তর ভেদে পশ্চিম কপালের দুইটা ঠল আছে। তন্মধ্যে আভ্যন্তর তলের কপালভাগ

মস্তিষ্কেব পশ্চাৎ ও অঙ্গুষ্ঠিক ধারপার্শ্ব বাতো দর। ইহাতে দিরা ধারণের অল্প চারিটা পরিখা স্বস্তিকাকারে অবস্থিত।

[ ২১শ চিত্র—পশ্চাৎ কপাল ( সম্মুখতল ) ]



( অঙ্গুষ্ঠিকার সহিত সংক্রমণ )

(১) ১—মহাবিবর। (২-২) ২, ২—পার্শ্ব কপাল। (২-২-২) ২-৩-২—পার্শ্ব কপালির পূর্ণিখা। (৩) ৩—সম্মুখভাগের মধ্যবিন্দু। (২-২-৩) ৩-১-৩—বীর্ষি কাণা দিরাপরিখা। (৪, ৪) ৪, ৪—স্রুয়াবোগের অল্প দুইটা কলা। (৫, ৫) ৫, ৫—মস্তিষ্কবিন্দু। (৬, ৬) ৬—অঙ্গুষ্ঠিকার দর। (ক) ক—কলাবোগের দর পরিখাতটনয়।

এই দিরাপরিখা চতুর্ভুজের মধ্যবিন্দু কেন্দ্রে 'মহাবিবর' বলে, প্রত্যেক দিরাপরিখার উত্তর তটে 'মস্তিকাবিন্দু' কলা অংশ বিশেষ সংলগ্ন থাকে। আভ্যন্তর তলের মূলভাগেও সামান্য খাত আছে, উহা স্রুয়াসর্পির্ষ ধারণের

অল্প। কপালভাগ ও মূলভাগের সংযোগ স্থলের বহিসীমার দুইদিকে দুইটা অর্ধচন্দ্রাকার স্রুয়া গভীর খাত আছে। উক্ত খাতকে 'অঙ্গুষ্ঠিক' নামক মূল দিরাপরিখা-অবস্থিতি করে কলা উহার 'অঙ্গুষ্ঠিকার দর' নামক অতিহিত।

উক্ত ষাট-বরের পার্শ্ববর্তী বহিত অংশবসকে  
“মজা প্রবর্তনক” বলে ।

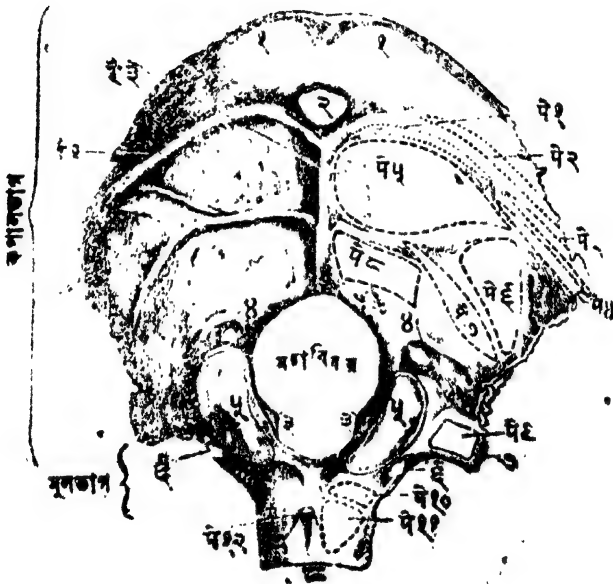
কপাল ভাগের দ্বারা অভ্যন্তর বস্তুর এবং উত্তর  
দিকের দ্বারা দুই পক্ষে দুইটা কোণ আছে,  
ইহারা ‘পার্শ্বকোণ’ নামে অভিহিত ।

পার্শ্বকোণবস্তুর উত্তর দ্বারাক পার্শ্ব-  
কপালের পশ্চিম দ্বারার সহিত এবং অধস্তন  
অংশের পার্শ্ববর্তী দুইখানি পশ্চিম দ্বারার সহিত  
সম্মিলিত হইয়া থাকে । পশ্চাৎ কপালের মূল

ভাগের দ্বারা ‘মূলপিণ্ড’ নামক অংশ কটুক  
হিস সহিত সম্মিলিত হয় ।

পশ্চাৎ কপালের বহিতলের উত্তরদিকের  
কপালংশ কৃষ্ণপৃষ্ঠের দ্বারা আকৃতি বিশিষ্ট  
এবং ‘শিরশ্ছদা’ পেশী দ্বারা আবৃত । ইহার  
মধ্যস্থলে ‘পশ্চিমার্জু’ নামে একটি উৎসেদ  
আছে এবং তাহার নিম্নে অধোমুখে বিস্তৃত  
‘পশ্চিমালিকা’ নামে একটি সমুদ্রত রেখা  
আছে । এই উৎসেদ ৩৩ রেখার ‘ঐবাধরা  
দ্বারাজ্জ’ সংলগ্ন থাকে । পশ্চিমালিকার উত্তর-

[ ২২শ চিত্র—পশ্চাৎ কপাল ( পৃষ্ঠতল ) ]



( ১, ২ ) ১, ২—পৃষ্ঠতলের দ্বারা কপাল ভাগ, ইহা পিত্ত্বা পেশীদ্বারা আবৃত  
থাকে । ( ২ ) ২—পশ্চিমার্জু । ( ২, ২ ) ৩, ৪—মস্তক সংযোগের বন্ধ কলসিক-  
বস্ত । ( ৩, ৪ )—মূলকোটর পশ্চাতের দ্বার । ( ২, ২ ) ৫, ৬—মূলকোটর  
( ২, ২ ) ৭, ৮—মূলকোটর সমুদ্রত বন্ধ । ( ৩, ৩ ) ১, ২—মজা প্রবর্তনক ।  
( ৩ ) ৩—মূলপিণ্ড । ( ২১ ) যে ১—উত্তরভাগিকা । ( ২২ ) যে ২—দক্ষিণ  
ভাগিকা । ( ২ ) ৩—উত্তর দ্বারাক পেশীদ্বারা আবৃত । পেশীদ্বারা আবৃত ।

দিকে দুইটা করিয়া চারিটা তোরণাকার রেখা আছে । ইহাদের উপরের দুইটাকে 'উত্তরতোরণিকা' এবং নিম্নের দুইটাকে 'অধরতোরণিকা' বলে । পশ্চাৎ কপালের মূলভাগের উপরিস্থ অংশে বহিস্তলে শিম-ধ্বজের ভ্রূর যে দুইটা উৎসেধ আছে, উহা-দিককে 'মূলকোটি' বলে । 'চূড়াবল্লরা' তলেক কার উপরিস্থিত তালকধরের সহিত মূলকোটি-ধরের সন্ধি হইয়া থাকে । মূলকোটিধরের অন্তঃপার্শ্বে 'কলারক' নামক উৎসেধ দুইটার সহিত 'মধ্যরজ্জ্ব' নামক রাস্তা সংবদ্ধ থাকে । মূলকোটিধরের সমুখে ও পশ্চাতে দুই দুইটা করিয়া চারিটা "রজ্জ্বমার্গ" আছে । এইরূপ-মার্গের ভিতর দিয়া নাকী প্রবেশ করিয়া থাকে ।

সন্ধি—পশ্চাৎকপাল ছয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত । ষাণ, উর্দ্ধ দিকের অর্ধভাগ দুই পার্শ্বে দুই খানি পার্শ্ব কপালের সহিত, অধোদিকের অর্ধভাগ দুই পার্শ্বে দুই খানি শঙ্খাঙ্কির সহিত, মূলের অগ্রভাগ জতুকাঙ্কির সহিত এবং মূলকোটিধর চূড়াবল্লরার সহিত সংহিত হইয়া থাকে ।

পেশী—পশ্চাৎ কপালে বারো জোড়া পেশী সংযুক্ত থাকে ; উত্তর তোরণিকার উপ-কণ্ঠে তিন জোড়া, উত্তর তোরণিকার অন্ত-রালে তিন জোড়া, অধর তোরণিকার নিম্ন-ভাগে তিন জোড়া এবং মূলভাগে তিন জোড়া ।

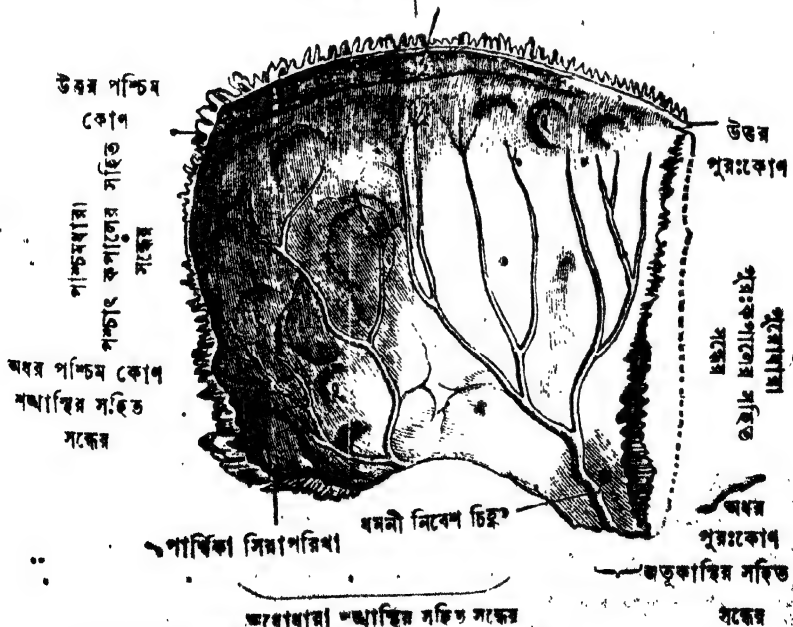
পার্শ্বকপাল \*—( ২৩শ চিত্র )

পূরঃকপাল এবং পশ্চিমকপালের মধ্যে দুই-

[ ২৩শ চিত্র—পার্শ্বকপাল ( অভ্যন্তর তল ) ]

উদ্ধাধার—অপর পার্শ্বকপালের সহিত সন্ধের ।

দীর্ঘিকা সিরাপরিধা



( ১. ১. ১ ) ১. ১. ১ কলার প্রস্থিভাষ । ( ২ ) — বহনীনিবেশ চিত্র ।

\* Parietal Bones প্যারিটাল বোন্স ।

দিকে দুই খানি পার্শ্বকপাল আছে। ইহাদের চারিটা ধারা, চারিটা কোণ এবং বাহু ও আভ্যন্তর ভেদে দুটো তল আছে।

ইহাদের বহিস্তল কূর্ণপৃষ্ঠের স্তায় আকার বিশিষ্ট এবং বহিস্তলে 'পার্শ্বকূন্ত' নামে পিত্তাকার দুইটা উৎসেধ এবং 'উত্তরশত্বেদোরণিকা' ও 'অধরশত্বেদোরণিকা' নামে শুল্কের স্তায় বক্রাকার দুইটা রেখা আছে। অধর শত্বেদোরণিকা রেখার ক্রোধ দেশ হইতে 'শত্বেদোক্ষমা' পেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পার্শ্বকপালদ্বয়ের আভ্যন্তর তল খাতোদর এবং উজ্জবাচ। উক্ত খাতের মধ্যে মস্তিষ্ক-কলাগোবলী মধ্যমা ধমনীর শাখাগ্রশাখা-জালের এবং কলাগ্রহি সমুদ্রের নিবেশ চিহ্ন দেখা যায়।

পার্শ্বকপালের চারিটা ধারা দস্তর এবং বধাক্রমে উর্দ্ধ ধারা, অর্ধোধারা, সমুখধারা নামে অভিহিত। তদ্ব্যতীত উর্দ্ধধারা অপর পার্শ্বকপালের উর্দ্ধ ধারার সহিত, অর্ধোধারা শল্যাহি ও ভ্রূকাহির সহিত, সমুখধারা পুরঃকপালের সহিত এবং পশ্চিম ধারা পশ্চাত্তকপালের সহিত সন্ধিযুক্ত।

পার্শ্বকপালের সমুখভাগের উর্দ্ধতন কোণ 'সমুখ উত্তর কোণ' এবং অধস্তন কোণ 'সমুখ অধর কোণ' নামে অভিহিত। পশ্চাদ্ভাগের কোণ দুইটির নামও এইরূপ অর্থাৎ 'পশ্চিম উত্তর কোণ' ও 'পশ্চিম অধর কোণ'। তদন্তরে সমুখ ও পশ্চাদ্ভাগের উত্তর কোণ দুইটা জন্ম হইতে এক বহুসর পর্য্যন্ত কলাধার থাকে। এই জন্ম স্তম্ভপাতী পিত্তদিগের মস্তকের মধ্যস্থলে সমুখ ও পশ্চাদ্ভাগে কোবল হার (চলিত কথায় 'ভালু') দেখা যায়। সমুখের অধরকোণ ধমনী-ধারণের জন্য বাঁজবিশিষ্ট

এবং ভ্রূকাহির সহিত সন্ধিযুক্ত। পশ্চাদ্ভাগের অধরকোণ পার্শ্বকপাথ্য সিরী ধারণের জন্য বাঁজবিশিষ্ট এবং শল্যাহির সহিত সন্ধিযুক্ত।

সন্ধি—পাঁচটা অস্থির সহিত (চিত্র দেখ)।

### পুরঃকপাল বা অগ্রকপাল

—(২৪শ চিত্র) ইহা শিরঃসমুদ্রের সমুখভাগ নির্মাণক, বৃহৎ, ত্রিমুকের স্তায়, আকার বিশিষ্ট কপালাহি। ইহার দুইটা 'অংশ বধা', 'ললাট ভাগ' এবং 'নেত্রজলি ভাগ'। তদ্ব্যতীত ললাট ভাগ—তিন খানি কলক ধারা নির্মিত—তদ্ব্যতীত ললাটকলক এবং উত্তর পার্শ্ব দুইখানি পার্শ্বকলক। ললাটকলকের বহিস্তল কূর্ণপৃষ্ঠের স্তায় আকার বিশিষ্ট এবং উত্তর দুই পার্শ্ব 'অগ্রকূন্ত' নামে দুইটা উৎসেধ আছে। এই অগ্রকূন্তদ্বয় মেধাবীদিগের অত্যন্ত এবং অন্ন মেধাবীদিগের অন্ন উন্নত হইয়া থাকে। অগ্রকূন্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী নাসানুগত স্থানকে 'কূর্কক' বা জন্মধা বলে। কূর্ককের উপরে যে উর্দ্ধগত নাতিপরিষ্কৃত রেখা আছে, তাহাকে 'গৃঢ়নীমস্তিকা' বলে। উক্তা বাল্যকালে পৃথক্ভাবে অবস্থিত পুরঃকপাল দুইখানির সংযোগ চিহ্ন। এই রেখার নিম্নভাগের উত্তর পার্শ্বের অল্পকমে 'জ্যেদোরণিকা' নামে দুই দিকে দুইটা তোরণাকার উৎসেধ আছে। প্রত্যেক জ্যেদোরণিকার বাহু ও আভ্যন্তর ভেদে দুইটা কোটি এবং মধ্যস্থলে 'অধিক্রব' নামে দুই দিক বা কোটির আছে। বাহু-কোটির অগাধ দেশে গভ্রাহির সহিত এবং অস্ত্রকোটির নাসানুগে 'নীলসিঁহ' সহিত সন্ধিযুক্ত। অধিক্রব নামক ছিদ্রের তিত্তর

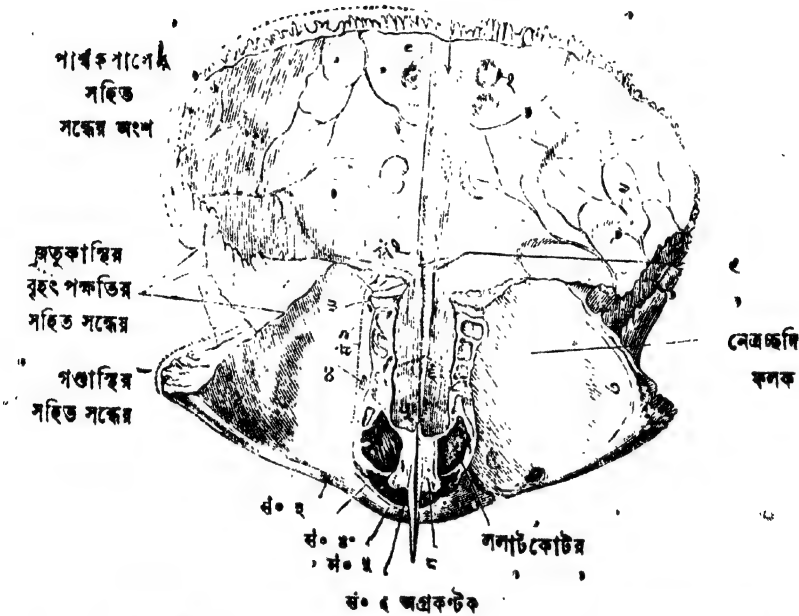


[ ২৪শ চিত্র—পুরঃকপাল ]

অন্তঃস্থল

( বৃষিবার স্থবিধার জন্য উত্থান অধোমুখ )

দীর্ঘকাণ্ড সিরাপরিধা



- (১) ১—কলাগ্রহিণী। (২) ২—ধমনী প্রতানাক। (৩, ৪) ৩, ৪—বর্জকোটর। (৫) ৫—সিরাপরিধা। (৬) ৬—সিরাপরিধাতট্বর। (৭) ৭—অগ্রগ্রহিণী। (৮) ৮—নাসাভহার ছাৎ নির্গত কলক। (৯) ৯—সিরা পরিধাতট। (সং ১) সং ১—মস্তৃকাস্থির লম্বপক্ষত্বির সহিত সন্ধের অংশ। (সং ২) সং ২—মস্তৃকাস্থির পাশের সহিত সন্ধের অংশ। (সং ৩) সং ৩—অগ্রপীঠস্থির সহিত সন্ধের অংশ। (সং ৪) সং ৪—উপবৃহৎস্থির সহিত সন্ধের অংশ। (সং ৫) সং ৫—নাসাস্থির সহিত সন্ধের অংশ। (সং ৬) সং ৬—বর্জকোটর সহিত সন্ধের অংশ।

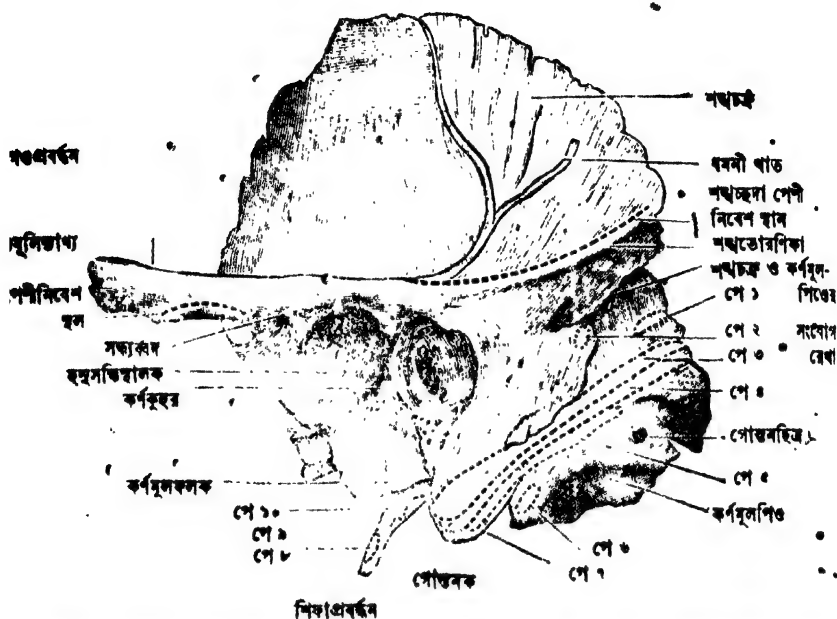
সিরা ঐ নামের সিরা ধমনী ও নাকী নির্গত হইয়া থাকে। ক্রোড়ের পিচ্ছিকারের পশ্চাতে মস্তৃকস্থির অত্যন্তই ক্ষুদ্রভাবে অবস্থিত 'ললাট কোটর' নামে দুই দিকে দুইটি কোটর আছে, উহার নাসাভহার সহিত সংযুক্ত।

ললাট কলকের পশ্চাদ্ভাগে এক

এই খাত কলাগ্রহি ও ধমনীপ্রতান সমূহের ধারণকৃত চিহ্নবিশিষ্ট। অন্তঃস্থলের মধ্যভাগে সিরাপরিধা আছে এবং এই পরিধার ভেত্রে মস্তৃকস্থির কলার "দ্বিভিক" নামক মধ্যভাগ সংযুক্ত থাকে।

পার্শ্বপাশের কলার পেশী ধারণের জন্য

[ ২৫শ চিত্র—শঙ্খাঙ্গি (বহিস্তল) ]



ঈষৎ খাতোদর। উভয়ের উর্দ্ধ সীমান ধনু কের জ্ঞার বক্রাকার “শঙ্খতোরনিকা” নামে যে রেখা আছে, উহা পশ্চিমপাশ্চাত্যের “শঙ্খ তোরনিকা” রেখার সহিত সংযুক্ত। এই দুটী রেখার পাশে পাশে বহু পেশী সংলগ্ন থাকে।

পুরঃসরালের নেত্রজ্জ্বলিতাগ দুইটা চক্ষুর উপর ছাদের জ্ঞার অবস্থিত। এট অংশ— ‘নেত্রজ্জ্বলিতক’ নামক পার্শ্বস্থিত অংশবহুরে বিস্তৃত। দুটী নেত্রজ্জ্বলিতক কলকের মধ্যস্থানে ‘মহাপরিধা’ নামে খাত আছে। নেত্রজ্জ্বলিতক দুটির প্রার ত্রিকোণ, বক্র এবং ঈষৎ খাতোদর। প্রত্যেক কলকের ‘বহিঃসীমান’ অংশেই ধারণের ক্ষমতা অগতির কোটর আছে।

মহাপরিধার দুই তটের মধ্যবর্তী পৃষ্ঠস্থানে

ধারী পূর্ণ চহরী থাকে। উত্তর তটস্থিত কোটর গুলি বহু রাহির কোটরবহুরের সহিত মিলিত। মহাপরিধার সমুখ ভাগে যে দুই ধানি ক্রুর অস্থিকলক আছে তাহার নাসাগুহার আচ্ছাদন স্বরূপ হইয়া থাকে। এই দুই ধানি কলকের মধ্যে ‘অগ্রকণ্টক’ নামে যে ইঙ্গ কণ্টকাকার অংশ আছে, উহা সমুখভাগে নাসাহি-বহুরের সহিত এবং পশ্চাত্ভাগে বহু রাহির মধ্যকলকের সহিত সন্নিবিষ্ট। উক্ত অস্থিকলক দুইধানির দুই পার্শ্বে দুটী ললাট কোটরের দ্বার আছে।

সন্ধি—পুরঃসরালের এক এক বর্ধ ভাগ সাতধানি অস্থির সহিত সন্নিবিষ্ট। বধা—মহাপরিধার বহিঃসীমান চারিটির সহিত অর্থাৎ সমুখ ভাগে নাসাহি, উর্ধ্বে বহু ও অগ্রসীমানের সহিত এবং পশ্চাৎ

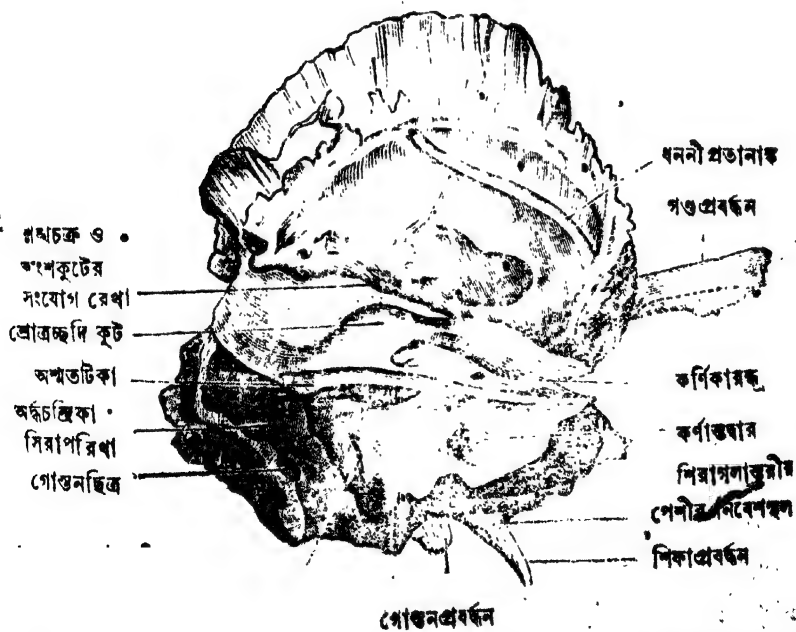
ভাগে বাক্সারাস্থির সহিত; নেরুচ্ছদিকলকের বহিঃসীমায় সম্মুখার্কে গণ্ডাস্থির সহিত এবং পশ্চার্কে জতুকাস্থির সহিত; ললাটফলকের পশ্চিম ধারায় পাশ্বকপালের সহিত। তন্মধ্যে জতুকাস্থি ও বাক্সারাস্থি এই দুইখানি একত্র অস্থি এবং নাসা'স্থি, অশ্রুপীঠা'স্থি, শঙ্খা'স্থি, উর্দ্ধ হৃদস্থি ও পাশ্বকপালাস্থি এইগুলি যুগ্ম অস্থি। সুতরাং ঐক এক দিকে, সাতখানি অস্থির সহিত সন্ধি হইলৈও উভয় দিকে মোটের উপর বারখানি অস্থির সহিত সন্ধি হয়।

পেলী—পূরঃকপালে তিন জোড়া পেশা সংলগ্ন থাকে উভয় দিকের ক্রমধ্যে দুই জোড়া এবং শঙ্খ হোরণিকার এক জোড়া।

শঙ্খা'স্থি—\* পাশ্বকপালদ্বয়ের নিয়ে দুই রণে দুইখানি শঙ্খা'স্থি অবস্থিত। প্রত্যেক শঙ্খা'স্থির তিনটি ভাগ যথা,—শঙ্খচক্র, কর্ণ মূলপিণ্ড এবং অশ্রুকূট।

(১) শঙ্খচক্র—ইহা শঙ্খদেশনির্ধারণ-কারক প্রায় চক্রাকার অস্থিকলক। ইহার বহিস্তল মন্থণ এবং ধমনী ধারণের চিহ্নে অঙ্কিত। শঙ্খচক্রের দীর্ঘ ও সম্মুখদিকে বদ্ধিত অংশ গণ্ডাস্থির সহিত সন্ধিবদ্ধ বলিয়া 'গণ্ডাপ্রবর্দ্ধনক' নামে খ্যাত। এই প্রবর্দ্ধনকের উর্দ্ধ ও অধোভেদে দুইটি ধারা। তন্মধ্যে উর্দ্ধ ধারায় 'শঙ্খাবরণী কলা' সংযুক্ত থাকে। অধোধারার নিম্নদিকে সমুখ ভাগে বে অর্ধদ আছে, উহা 'সন্ধ্যার্দ্র' নামে অভিহিত এবং

[ ২৬শ চিত্র—শঙ্খা'স্থি (অন্তস্তল) ]



ই—Temporal Bones—টম্পোরালি বোনস্ ।

হুসন্ধির সম্মুখভাগে অবস্থিত। সন্ধার্কের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত 'হুসন্ধিহালক' নামক কোটর অধোহুসুণ্ড ধারণ করিয়া থাকে। হুসন্ধিহালকের পশ্চাতে 'কর্ণকুহর' অবস্থিত। কর্ণকুহরের পরিধিতে 'কর্ণমূলী' নির্মাণকারক তরুণীগুলি সংযুক্ত থাকে। কর্ণকুহর ও হুসন্ধিহালকের মধ্যবর্তী অস্থিকলক 'কর্ণমূলকলক' নামে অভিহিত এবং উহা কর্ণমূলীয় লালগ্রন্থির আশ্রয় স্থান। গণ্ডপবর্ধনের পশ্চাদ্ভাগে 'শ্মশ্রোতরিকা' একটি সমুন্নত রেখা আছে, উহা পূর্বোক্ত শ্মশ্রোতরিকা রেখার সহিত মিলিত। এই রেখার অধোভাগে আর একটি রেখা আছে, উহা পশ্চাৎক্বেব সহিত কর্ণমূলপিণ্ডের সংযোগের চক্ষুরূপ।

শ্মশ্রোতর অস্তত্বল মস্তকপিণ্ড ধারণের জন্য ককিং খাতোদর, ধমনী ধারণের জন্য ঝাঁকবিশিষ্ট এবং সংস্তের আঁসের জায় ধারাবৃত্ত।

(২) কর্ণমূলপিণ্ড—এই অস্তি'প'ও কর্ণমূলে অবস্থিত এবং 'গোস্তনক' নামক প্রবর্ধনবৃত্ত। এই প্রবর্ধনটী অধোমুখ ও ভিতরে কোটর বিশিষ্ট,—কাটরগুলি কর্ণস্রোতের মধ্যপথের অগ্রবর্তী। কাণ পাকিলে কখন কখন এই কোটরগুলি পর্যাপ্ত পূর্ণ হয়। কর্ণমূলপিণ্ডের অন্তত্বলে 'অর্ধচক্রিকা' নামে একটি সিরাপরিখা আছে, উহা পার্শ্বিকাণ্য সিম্প্রেরিয়ার সহিত মিলিত। উক্ত পরিখার মধ্যে একটি ছিদ্র আছে, তাহা 'গোস্তনছিদ্র' নামে অভিহিত এবং সিরাপরিখা প্রবেশিনী সিরার ধারণকৃত।

(৩) অশ্মকুট—পশ্চাদ্ভাগে এই অংশ প্রত্যয়ের ভাষ্য ধনসজ্জাত, চারিটি ধারাবৃত্ত

এবং শিরঃসম্পৃষ্টকৃমির মধ্যে ত্রিধাক্রম প্রবিষ্ট। ইহার উর্দ্ধদেশ শিরঃসম্পৃষ্ট নির্মাপক এবং মস্তককৃমির অংশভূত। উহার অধোদেশ কর্ণপীঠ নির্মাপক এবং কঠকুহরব্রহ্মদেব অংশভূত। অশ্মকুটের অভ্যন্তরে ঐশ্বানি যক্ষ কণাঙ্ঘ্রি এবং স্রষ্টব্যধি নিগুত ভাবে অস্থিত। নিম্নে অশ্মকুটের বিশেষ লক্ষণের বিবরণ লিপিত হইতেছে :—

(ক) উর্দ্ধসীমার, শ্মশ্রোতর সহিত সংযোগক রেখা এবং ইহার উপকণ্ঠে কুণ্ডলভাগের নিকট তটীত রক্তমার্গ আছে। উক্ত দিকের বন্ধমার্গ 'পটহোস্তমিনী' পেশীর প্রবেশের দ্বার এবং অধোদিকের বন্ধমার্গ কর্ণস্রোতের মধ্যপথের সহিত মিলিত ও 'পটহপুরিকা' নামী ক্ষুদ্র নলিকার দ্বারা বন্ধ।

(খ) শ্রোত্রপথের আচ্ছাদনকৃত 'শ্রোত্রচ্ছদিকুট' নামক উৎসেধ এবং তাহার পশ্চাতে 'অস্ততটিকা' নামে বেধা।

(গ) 'কর্ণাস্তবর্ধার'—ইহা 'শ্রোতনাড়ী' ও 'বন্ধনাড়ী' নামে নাড়ীরূপের পবেশ পথ।

(ঘ) কর্ণভূমিগামিনী ক্ষুদ্র নাড়ী ও ধমনী প্রবেশের জন্য 'কর্ণিকারক'।

(ঙ) পেশী ও স্নায়ু সংযোগের জন্য শিকড়ের জায় আকার বিশিষ্ট অধোমুখ 'শিক্রা প্রবর্ধনক'। ইহার সূত্রে বন্ধনাড়ী প্রবেশের জন্য 'শিক্রাগোস্তনান্তরী' নামে ছিদ্র আছে।

(চ) মস্তকধমনী ধারণের জন্য 'মস্তকধমনী' নামক রক্তমার্গ।

সন্ধি—প্রত্যেক পশ্চাদ্ভাগে পাঁচখানি অস্থির সন্ধি লক্ষিত হয়। পশ্চাদ্ভাগের দ্বারা পশ্চাদ্ভাগের সহিত, পশ্চাদ্ভাগের পশ্চাদ্ভাগের

পধ্যস্ত অংশে পার্শ্বকপালের সহিত, গণ্ড-  
প্রবর্তন হইতে অশ্রুটীগ্র পধ্যস্ত ধারায় পশ্চিম  
কপালের সহিত, অশ্রুটীর অগ্রভাগ হইতে  
গণ্ড প্রবর্তনের উৎকর্ষ পধ্যস্ত জড়কাস্থির সহিত

এবং হৃদসন্ধিস্থানকে অধোহৃদস্থির মুণ্ডের  
সহিত ।

পেশী—থ্যোক শাস্থিতে পনেরটী  
করিয়া পেশী সংযুক্ত থাকে । বিবরণ যথা  
স্থানে বর্ণনায় । ( ক্রমশঃ )

## কচু ।

[ অধ্যাপক—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ ]

১১৭৬ সনে যে দৈব তর্জিপাক 'তর্জিক'  
রূপে এদেশে দেখা দিয়াছিল—তাহাব নাম  
"ভয়াভরে মণ্ডকচু" । এষ্ট সময় অনেককে  
"লম্বকচু" খাইয়া জীৱন ধারণ করিতে হইয়া-  
ছিল । বোধ হয় সেট সময় হইতেই "কচু  
পোড়া খাও"—বাক্যলীর বড় গালাগালি ।  
যেখানে অকৃতকার্যতা, সেতথানেই বিজ্ঞানের  
মুখে বিজ্ঞান বা উপহাস—এই অকিঞ্চিৎকর  
"কচুপোড়ার" স্মৃতি । কচু এতট অবহেলার  
সামগ্রী !

এ তখন কচুর মান রাখিয়াছিলেন কেবল  
বৈজ্ঞ কবি বেবেছনাথ । তিনি "রাঙাদিদির  
মধ্যাহ্নভার, "ভারতীর" পল্পপজে "দম্বকচু"  
পরিবেশন করিয়াছিলেন । তাহা নাকি  
অনেকেরই ভাল লাগিয়াছিল । ভরসা পাইয়া  
বন্ধ আমার সেট কচু আচার্য্য অক্ষরচন্দ্রের  
পবিত্র নামে নিবেদন করিয়াছিলেন । সাহিত্য  
ওকর যোগা অর্জন যটে ।

আজ আমিও তুমি 'কচুর' পুরা রাখায়  
কচু পাঠকদের পক্ষে উপস্থিত হইলাম ।

আমাব ত 'রাঙাদিদি' সভায় নাই—তাই ভয়  
হইতেছে—পাছে ইহা পাঠক মহাশয়দের ভাল  
না লাগে । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, কচুকে লোকে  
বড় অবজ্ঞা করে, কচু কি তত তাকিল্যের  
জিনিষ ? কচু দরিজের সঞ্চল । এখনও  
অনেক স্থলে দেখিয়াছি কচুর সাচাঘো বহু  
ব্রাহ্মণের দিন গুজরণ হইয়া থাকে । হিন্দুর  
জীবন্ত বিজ্ঞান "আয়ুর্বেদ" কচুকে কখনও  
উপেক্ষা করেন নাই । কচুর ভেদবিশেষ  
আছে, কচু বড় পুষ্টিকর খাদ্য । সাধারণে  
ইহা ভানেনা । বর্তমান প্রবন্ধে আমি সেই  
কথাবই আলোচনা করিব । আমি স্বয়ং  
২৮ রংম কচুর গুণ পরীক্ষা করিয়াছি,  
সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিব ।

কচুর সংস্কৃত নাম "কচ্চি," হিন্দী নাম  
"কচ্চু" । যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক নাম Arum.  
দেশ ভেদে কচুর আরও অনেক নাম আছে—  
যথা টাট্টা অজ্জা, টেনিরা, জড়, এডইক  
জু, কিয়ম, কচ আলু, টেরাস সালুসা, টেলো,  
টেজাস, এবং Scratch co co ইত্যাদি ।  
সংস্কৃতভাষার কচুর গাতাকে "পেটুকা" এবং

উঁটাকে “কৈচুকা” বলে। কচুর সুখীর নাম—“বিতণ্ডা”।

### কচুর গুণ।

পিচ্ছিল, শুকপাক, তীব্র (Sstringent) ভেদক, কফ, পিত্ত, আনি ও বলবর্ধক, কণ্ডু জনক এবং শুক্রকর।

### নানা জাতীয় কচু।

(ক) বন্ত কচু।

(Arnom Colocasja)

এই কচু বঙ্গদেশের সর্বত্র আছে। পথের ধারে, পরঃপ্রণালীর পাশে, সিক্তভূমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কেতই ইহার চাব করে না। এই কচুর পাতা হৃদ-পিণ্ডাকার (‘Hert shuped’)। পাতার উপরিভাগ সবুজবর্ণ, নিম্নদেশ ক্রিকে সবুজবর্ণ; কাণ্ড ক্ষুদ্র ও অন্তর্ভোম। পত্রবৃত্ত মলিন সবুজ বর্ণ, পুষ্প শীতবর্ণ। বৃন্তের নিম্নভাগ দ্বিগুণিত। ইহার মূল অতিশয় তীব্র, খাইলে গলা ধরে। ইহার কচিপাতা খাওয়া যায়। কচিপাতা সংগ্রহ করিয়া কলার পাতার উপর স্তরে স্তরে সাজাইয়া, বেদ্য করিয়া জড়াইয়া—অগ্নিদণ্ড করিতে হয়। পরে তাহাতে সর্বপ তৈল, লবণ ও লঙ্কা মাখিরা—শাকের মত খাটে হইতে হয়। পুরুষদের গৃহস্থগণ ইহা ব্যবহার করেন। দরিদ্র কৃষকগণ—ইহার পাতাও অমূল রাখিয়া যায়। অমূল রাখিতে হইলে পাতাকে কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, পরে পাকা তেঁতুল তৈল সংযোগে ইহা রাখিতে হয়। খাইতে অনেকটা চুকা পালনের অবশ্যই হয়।

### (খ) গুঁড়িকচু।

কাম্বোজের সর্বত্র ইহা জন্মিয়া থাকে।

কি শুক কি সিক্ত উভয়বিধ ভূমিকাতেই—গুঁড়িকচু উৎপন্ন হইতে পারে। এমন কি পাশ্চাত্য প্রদেশে ৮০০০ ফিট উচ্চ স্থানেও—এই কচুর চাব হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ বস্তা বস্তবর্গ কণ্টার, পেটন প্রভৃতি মনোবীণার এই কচু সম্বন্ধে গাহাদেব গ্রন্থে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। গুঁড়িকচুর মধ্যে কতকগুলি বৈষ এবং কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ডাক্তার নিকোলস—সবুজ ও বেগুণে বর্ণের কচুরও উল্লেখ করিয়াছেন। এই কচু খতাস্ত মুখ প্রিয় সুখাত্মক।

### (গ) ম্যানাকচু।

ইহার মূল প্রচুর পরিমাণে যেতনীর পাওয়া যায়। ইহার আদর নানাবিধ। এই কচু খতাস্ত পুষ্টিকর। বেশ করিয়া ছাড়াইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া, ঘুচে বা তৈলে ভাজিয়া খাইলে—বেশ লাগে। নিউগনির লোকেরা এই কচু হইতে এক রকম মদ্য প্রস্তুত করে। সেই ময়দার কচী ও বিষকূট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার কাণ্ডকে সিদ্ধ করিয়া হরিদ্রা ও সর্বপ চূর্ণ, লঙ্কা, লবণ এবং তৈল মাখিলে একটা সুস্বাদু বাঞ্ছন হইয়া থাকে।

### (ঘ) এরকাকচু।

ইহার পাতা, ডাঁটা, মূল—সমস্ত অংশই তীব্র রস মূল—খাইলে গলা ধরিয়া যায়। চূর্ণের জলে কিম্বা জলযোগে ইহাকে অন্তঃস্রাবণী কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে রন্ধন করিতে হয়।

### (ঙ) ওয়াকচু।

ইহাকেও ময়দা প্রস্তুত জিজাইয়া পরে রন্ধন করিতে হয়। Hydrochloric

Nitric. ও Acetic অ্যাসিড দ্বারা—ইহার কচু বা বিষদোষ নষ্ট হইয়া থাকে ।

### (চ) শোলাকচু ।

এই কচু কেবল পূর্ববঙ্গেই জন্মিয়া থাকে, অন্তর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না । ইহার রীতিমত চাষও হইয়া থাকে । চাকও বেশ লাভজনক । ইহার তিনটি জাতি । ১। খেত শোলাকচু । ২। কৃষ্ণ শোলা কচু । ৩। নারিকেলী কচু ।

১। খেত শোলাকচুর পত্র গাঢ় সবুজ-বর্ণ, শিরা পাতাভ, ডাঁটা ফিকে সবুজ এবং গোলাকার । নিম্নদেশে দ্বিখণ্ডিত, এই খণ্ডিত অংশে বেগুণে বর্ণের ডোরা কাটা । মূল ধূসর বর্ণ—গোলাকার এবং দীর্ঘ । নদীর চরে ইহার ফলন খুব ভাল হয় । গোবরের দ্বারা গোড়ায় দিলে—এ কচুর আবাদ বেশ মিষ্ট হয় । ঝোল, চড়চড়ি ছেঁচকী প্রভৃতি সকল তরকারীতেই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অনেকে ডালের সহিতও ইহা সিদ্ধ করিয়া খান ।

২। কৃষ্ণ শোলা কচু । ইহা খেত শোলা কচুবই মত । কেবল পত্র ও বৃন্ত কৃষ্ণবর্ণ । মূলের স্বকণ্ড ক্রান্ত । গাছ গুলি দেখিতে বড় সুন্দর ।

৩। নারিকেলী কচু । পত্র পাতাভ সবুজ, কণ্ঠপাতাকার, অত্যন্ত দীর্ঘ । বৃন্ত স্থল । নিম্নভাগ দ্বিখণ্ডিত, মূল প্রায় ২ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে । ইহার ডাঁটা, পাতা, মূল, সমস্তই খাওয়া যায় । মূল সিদ্ধ করিলে খুব গুলিয়া যায় লবণ-কচুকচ্ করে, কিন্তু গলা খসে না, খাইতেও খুব সুস্বাদু । নারিকেলের শাঁসের মত চিবাইয়া খাওয়া চলে বলিয়াই ইহার নাম নারিকেলী কচু ।

### (ছ) ব্যাঙাকচু ।

ইহা অনেকটা নারিকেলী কচুরই মত । নোয়াখালি, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, ময়মন সিং ও ঢাকা জেলায়—এই কচু চাষ হইয়া থাকে ।

### (জ) জলকচু ।

উত্তাও ট্রিক পূর্বোক্ত কচুর মত । জলের সময় অর্থাৎ বর্ষা কালে—এই কচুর সাহায্যে পূর্ববঙ্গের অধিবাসিগণের তরকারীর আয়োজন হইয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানেও এই কচু জন্মিয়া থাকে ।

### (ঝ) শূয়া কচু ।

মতান্তর পুষ্টিকর—সুখাত । ইহার পত্র-বৃন্ত—আলকুশীর মত শূয়া দেখিতে পাওয়া যায় । উল্ল হাতে লাগিলে হাত কুট কুট কবে । এই কচু গভীর জললে আপনা হইতে জমে । ইহা অম্লের সহিত সিদ্ধ করিয়া, তৈল ও লবণ সংযোগে ভক্ষণ করিতে হয় ।

### (ঞ) ঢোলাকচু ।

ইহা পাক্কা প্রদেশে জমে । ইহার পাতা অতি ক্ষুদ্র, পাতার শিরায় এক রকম তুল পদার্থ লাগিয়া থাকে । গাছ গুলি মৃত্তিকা হইতে ৪ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হয় না । মূল গোলাকার, অত্যন্ত ভারি । এই কচু খাইতে বড়ই সুমিষ্ট । পাহাড়ী জাতিরা বলে—এই কচু সিদ্ধ করিয়া খাইলে জ্বালাপের কাঁবা কমে ।

### (ট) বিদ্রীকচু ।

(Arum kheshianum var.)

ইহা এক প্রকার পাহাড়ী কচু ; ইহার কন্দ দীর্ঘাকার—এক একটা কন্দ দৈর্ঘ্যে ১ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে । কন্দের স্থলতা প্রায় ৪ ইঞ্চি । কন্দ ধূসরবর্ণের আঁইসে আবৃত

থাকে। ইহা অতি উপাদেয়, পাহাড়িয়াগণ  
আফ্রিকার সহিত ইহার চাষ করিয়া থাকে।

### (ঠ) বোয়া কচু।

উহার পত্র সমুদ্র প্রাচীর—ঠিক পত্র  
পাতার মত। জন্মে ধীরে জন্মে। এই  
কচুর কন্দ চূর্ণ করিয়া শর্করা সহ সেবন  
করিলে, উদারাময়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

### (ড) আঁকুড়ীকচু।

উহার জন্মান—সাঁওতালদিগের দেশ।  
গাছ ছোট, কিন্তু কন্দ খুব বড় এবং অল্পজু ও  
দীর্ঘাকাব। সাঁওতালগণ ইহা সিদ্ধ করিয়া  
ভক্ষণ করে। এই কচু সমস্ত পুষ্টিকর।

### (ঢ) মুখীকচু।

(Arum Ægypticum of Dr.  
Roxburgh.)

গাছ সাধারণ কচু গাছের মত। অত্যন্ত  
ধর্মীকৃতি, পত্র ক্ষুদ্র, পত্রবৃত্ত বৃত্ত। ইহার  
কন্দ, পত্র ও বৃত্ত অখাদ্য। কন্দ হইতে  
এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীর ন্যস্ত হইয়া  
থাকে—উঃ ঠিক শকবক্ক আলুর মত।  
এই গুলিই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই  
মুখী গুলি উদ্ভবরূপে সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয়।  
অল্প উত্তাপে এই মুখী গুলি গলিয়া যায়,  
তাহার পর লব, টেল ও সলন সংযোগে—ইহা  
পলানকরণ ক্রিতে হয়। এই কচুর রসে—  
অল্প দ্রবিত কতও শুষ্ক হইয়া থাকে।

উক্তার রক্তবর্ণ নলেন—এই কচুর জন্ম  
স্থান ইজিপ্ট দেশ। আমি কিন্তু একথা  
বিশ্বাস করিনা। অতি প্রাচীন কাল হইতেই  
এখানে মুখী কচু প্রচলিত। পূর্ববঙ্গে ইহার  
চাষ হইয়া থাকে।

### (ণ) আলুকচু।

ইহা প্রায় মুখী কচুরই মত। ইহার

বৃহৎ মূল অখাদ্য। মূল হইতে বহির্গত মুখী  
গুলিই বাজানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।  
পার্থক্যের মধ্যে—ইহার মুখীগুলি গোল-  
আলুর মত পিণ্ডাকাব। পশ্চিম বঙ্গে ইহা  
প্রচুর পাওয়া যায়।

### (ত) পঞ্চমুখীকচু।

এই কচুর জন্মান নগা ও গাঝো,  
পাহাড়। ইহার আসল কন্দ হইতে চন্দ্র-  
পাঁচটা উপকন্দ বাহির হইয়া থাকে। আবার  
কোন কোন কন্দ হইতে ৩টা, ৪টা, এমন কি  
সাতটা পর্যন্ত উপকন্দ বাহির হইয়া থাকে।  
ইহার কন্দ অতি বৃহৎ—এক একটীর ওজন  
৬৭ পের পর্যন্ত হইতে পারে। ইহা উচ্চ  
শুষ্ক ভূমিতে জন্মে। জলা জমিতে কন্দ পচিয়া  
যায়। এই কচু—কচুর রাজা। খাইতে  
অত্যন্ত সুখাদ, ইহাতে গলা ধরিবার আদৌ  
আপত্তা নাই। কন্দে প্রচুর পরিমাণে খেত  
সার আছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর।  
ইহা চর্চিতে একপ্রকার মরলা প্রাপ্ত হয়, সেট  
মরলার চাপাটী—অতি সুখাদ।

### (থ) পেচা কচু।

জন্মান খাসিয়া পর্বত। মূল অত্যন্ত  
বৃহৎ—চুপড়ী আলুর মত। খাইতে সুখাদ।  
এই কন্দ চূর্ণ করিয়া, সূত ও চিনি সহযোগে  
হালুয়ার মত পাক করিয়া খাটিলে অত্যন্ত  
শুষ্ক বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

### (দ) জারা কচু।

জন্মান জাতিয়া পাহাড়। কন্দ বৃহৎ  
উপরের দিক সিদ্ধান্ত করিলে, আলতার  
মত রক্তবর্ণ বাহির হইয়া থাকে। ইহাও  
অত্যন্ত শুষ্কবৃদ্ধিকারক।



(ধ) শর কচু বা সাপলা কচু।

(Arum Nymrafolium of  
Dr. Rosburgh.)

এই কচুর পাতা ঠিক কুম্ভ (হেলা, শালুক) পত্র সদৃশ। ইহা প্রায় ও স্থলে উত্তর স্থানেই জন্মে। জলে গাছগুলি খুব রাড়ে। ইহার পত্র ও বৃন্ত—অকণাভ। এই কচুর সকল অংশই খাওয়া যায়, তবে গাখা ধরা দোষ বিলক্ষণই আছে। এট কচু, কচু জাতির মধ্যে বৃহত্তর। ইহা রক্তবর্দ্ধক, বলকারক—প্রীতী, বহুত্ব ও শোথনাশক, সূত্র-কারক ও তেজক।

(ন) চোখাড কচু।

ইহার কন্দ ঠিক আতা কলের মত গণ্ড পাত্র এবং পিণ্ডাকার। হিমালয়ের স্থানে স্থানে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সামান্য অগ্নিতাপে দগ্ধ করিয়া খাইতে হয়। দগ্ধ করিলে—ঠিক ডেলা কীরের মত সুগন্ধি ও সুস্বাদু হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত রসকারক।

এই কচু খাইলে, হ্রেকদিন উপবাসে পরার নিষেধ হইয়া পড়ে না। হৃৎকেন্দ্র বিষয় ইহা বড়ই দুর্লভ, অনেক অসুস্থজানে ইহা চারিটা পাওয়া যায়।

(প) গোঁদো কচু।

(Arum. fragrantissimum.)

ঘনিয়া, নাগা ও গারো পাহাড়ে—এই কচু জন্মিয়া থাকে। ইহার কন্দ এক রকম সুগন্ধ পাওয়া যায়। কাণ্ড ধূসরবর্ণ—দৈর্ঘ্যে ৩৪ ইঞ্চি, স্থলতা ২১ ইঞ্চি। ইহার পত্র—বড় পিণ্ডাকার, পত্রের বর্ণ খেঁচাত সবুজ—দেখিলে মনে হয় যেন বোপোব মত স্বকমক করিতেছে। পত্রের বৃন্ত শীর্ণ—এবং ঘাপ কাটা। কন্দ ছাড়াইলে রক্তাভ, খেঁচবর্ণের শাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই কন্দই খাইতে হয়। ইহা ওতদূর সুগন্ধী যে—এই কচুর দ্বারা যে বাজন পাক করা যায়, তাহাও সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

এই কচু ভক্ষণ করিলে—অসম্ভবরূপে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, ইহা পাচক, সারক, শোণিত-বর্দ্ধক এবং অত্যন্ত পুষ্টিকর। উক্ত বিজ্ঞ বিশারদ শ্রীযুক্ত ঐশ্বরচন্দ্র গুহ—এই কচুর চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। গারোপাহাড় হইতে চারা আনিয়া আমার পাঠক মহাশয় ও ইহার চাষ করিতে পারেন। ঐশ্বর বাবুর দেয়া দধি, আমিও ইহার চাষে প্রবৃত্ত হই-রাছি।\* ফলাফল—পরীক্ষাধীন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

## পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন।

( পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর )

( রায় শ্রীচুণীলাল বসু আই এস ও এম বি, এফ্‌ সি এস বাহাদুর। )

### সংক্রামক রোগ নিবারণ।

কি উপায় অবলম্বন করিলে কত্টিপয় সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং উহার বিধৃত্তি নিবারণ করা যাউতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

#### কলেরা বা ওলাউঠা।

১। একপ্রকার বীজাণু, খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই ভয়ঙ্কর রোগ উৎপন্ন হয়। এই বীজাণু অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং কলেরার সময়ে কোন পাশ্চাত্য কাঁচা বা শীতল অবস্থায় ভক্ষণ করা উচিত নহে। সকল জবাই রন্ধন করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে খাইবে।

২। পানীয় জল ও দুগ্ধ উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইবে।

৩। খাদ্য জলের উপর বাহাতে মাছি বসিতে না পারে, তাহা দ্বারা বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে।

৪। কলেরা রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি নদী বা কোন পুষ্করিণীতে কিবা কোন কূপের নিকট ফাটিবে না। বস্ত্রাদি কেনাইলে ( Phenyle ) ভিজাইয়া, জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে, সংক্রামক দোষ নষ্ট হইয়া

যায়। এক ভাগ ফেনাইন্—বিশ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে।

৫। কলেরা রোগীর বিছানা এবং মল ও বমনাদি খড়ের উপর ঢালিয়া কেরোসিন সাহায্যে পুড়াইয়া দেওয়া উচিত, তাহা না হইলে বাতী হইতে দূরে গর্ত খুঁড়িয়া পুত্রা ফেলিবে।

৬। বাহারা রোগীকে পরিচর্যা করিবেন, তাহার কেনাইলের উপযোগে জাবন এবং সাবান ও জল দ্বারা তাত উত্তমরূপে না ধুইয়া কোনরূপে ভক্ষ্যজবাব বা পানীয় ল্পণ করিবেন না।

৭। কলেরার সময়ে কেহ খালি পেটে থাকিবে না এবং অধিক রাত্রি আগিবে না।

৮। বাসগৃহ ও তাহার চতুঃপার্শ্ব পরিষ্কার রাখিবে, তাহা না হইলে বাহির উপজব হইয়া বাতীতে এবং গ্রামের মধ্যে কলেরা ছড়াইয়া পড়িবে।

#### রক্তমাশময়।

এই রোগের বীজ অনেক স্থলে দ্রুত পানীয় জলের সহিত শরীরে প্রবেশ করিয়া বালক বালিকাদের রক্তমাশময় রোগ হইলে উহাদিগের মল দ্বারা তথাকথিত নিকিষ্ট হইয়া থাকে; ইহার কলে মাছি ধারা না এক উপায়ে বাত

দ্রব্য ও পানীয় জল ঐ রোগের বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হয় এবং এইরূপে স্নহ লোকের শরীরে ঐ রোগ প্রবেশ লাভ করে। সুতরাং বোগীর মল সঞ্চকে সাবধান হওয়া একান্ত কর্তব্য। বোগীর মল ও মলহুই বস্তাদি পুড়াইয়া ফেলিবে অথবা দূরে মাটির মধ্যে পুত্ৰিয়া ফেলিবে। জল ফুটাইয়া পান করিলে এ রোগের হাত হইতে অনেকাংশে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

### যক্ষ্মারোগ।

১। পরিবাসস্থ কাহারও এষ্ট রোগ হইলে দেখে গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রোগীকে সর্বদা খোলাস্থানে রাখিবে। দালান, বারান্দা, দাওয়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মুক্তস্থানে রোগীর শয়নের ব্যবস্থা করিবে।

২। যক্ষ্মার বীজ রোগীর কক্ষের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। বোগী বথাতথা কক্ষ ফেলিলে উহা শুকাইয়া তন্মধ্যস্থিত বীজাণুগুলি ধুলির সহিত মিশ্রিত হয় এবং বায়ু সহায়্যে ঐখাসেব সহিত স্নহ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ লাভ করে এবং তদ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয়। সেইজন্ত একটি ফেনাইল মিশ্রিত জলপূর্ণ নির্দিষ্ট পাত্রে বোগীর কক্ষ পবিত্র্যাগ করা উচিত। পরে উহা পুড়াইয়া ফেলিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

৩। যক্ষ্মাক্ত রোগীর সহিত স্নহ ব্যক্তি কখনও এক পাত্রে পান ভোজন করিবে না, এক গামছা, তোয়ালে বা বস্তাদি ব্যবহার করিবে না এবং এক বিছানায় শুইবে না।

৪। কখনও কখনও গরুর যক্ষ্মা হইতে মানুষের যক্ষ্মা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যখন

সহিত গরুর যক্ষ্মার বীজ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। দুধ উত্তমরূপে ফুটাইয়া খাইলে এই রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৫। যক্ষ্মা-পীড়িত মাতা সন্তানকে স্তন্যপান করাইবেন না।

৬। পুরুষ বা স্ত্রীলোকের যক্ষ্মার স্তন্যপাত হইলে তাহার কোন মতেই বিবাহ করা উচিত নহে।

### বসন্ত।

১। বাতীতে বা গ্রামে এই রোগ দেখা দিলে প্রত্যেক পরিবারের ছোট বড় সবলেরই ইংরেজী “টীকা” লওয়া অত্যন্ত কর্তব্য। বাদালা “টীকা” থাকিলেও মহামারীর সময়ে ইংরেজী “টীকা” লইতে দেয়ী করিবে না। “টীকা” না লইয়া যেন কোন ব্যক্তি রোগীর পরিচর্যা না করেন এবং তিনি বথাসম্ভব অল্প লোকের সহিত কম মেলা মেশা করিবেন।

২। রোগীর বস্তাদি জলে উত্তমরূপে না ফুটাইয়া ধোঁবা বাড়ী কখনই পাঠাইবে না।

৩। বসন্ত রোগীর গায়ে কখনও মাছি বসিতে দিবে না; তাহাৎ সর্বদা মশারির ভিতরে রাখিবে।

৪। বাড়ীতে বসন্ত বা যে কোনরূপ সংক্রামক রোগ হইলে বালক বালিকাদিগকে কিছুদিনের জন্ত বিতালয়ে প্রেরণ করা বন্ধ রাখিবে।

৫। বসন্তের “ছাল” বতদিনের সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া যায়, ততদিন রোগী স্নহ ব্যক্তির সহিত কিছুতেই মিশিবেন না। এই ছালে বসন্তের বীজাণু থাকে। ইহা বথাতথা ফেলিবে

না, কেনাইল পূর্ণ পাত্রে সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

### ম্যালেরিয়া।

১। আজকাল নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, একজাতির মশকের দংশনেব দ্বারা ই ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বীজ বাস করে। মশক ঐ রোগীকে দংশন করিয়া উহার রক্তশোষণকালে রোগের বীজ গ্রহণ করে এবং পরে নূতন ব্যক্তিকে দংশন করিয়া তাহার শরীর মধ্যে ঐ বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে ঐ ব্যক্তি ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। সুতরাং মশার উপদ্রব নিবারিত হইলে ম্যালেরিয়া রোগ কমিয়া যায়।

২। নালা ডোবা উত্থারিতে জল জমিলে তখায় মশা ডিম পাড়ে এবং অনাথ্য মশক উৎপন্ন হইয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়া রোগ বিস্তার করে। এতজন্য বাড়ীর নিকটস্থ বানা ডোবাগুলি শুষ্ক করিলে মশার উপদ্রব কম হয়। ভরাট করা সম্ভব না হইলে কিছু পরিমাণ জালানি কেবোদিন তেল হুমুয়া ঢালিয়া দিলে মশকশাবকগুলি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। গ্রামের বড় পুকুরিগীর মধ্যে কট, বর্লশা, তেচোকো, পাঁচচোকো, পুঁটি প্রভৃতি মাছ জম্মাইলে তাহারা অতি নীচ মশকশাবকদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। মশকের ডিম ও শাবক ইহাদিগের প্রধান আহার।

৩। বাড়ীর মধ্যে বা চতুঃপার্শ্বে ঝোপ বা দল্লল থাকিতে দিবে না। দিবাভাগে ম্যালেরিয়াবাহী মশকের উপদ্রব থাকে না,

তখন তাহারা এই সকল ঝোপ জল্ললের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় হইতেই তাহারা দেখা দেয় এবং বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি লোককে দংশন করে।

৪। যে চারি মাস ম্যালেরিয়ার প্রাচুর্য থাকে, সেই সময়ে বরজোড়া মশারি প্রস্তুত করিয়া পরিবাস্ত সন্ধ্যার সময় হইতে সমস্ত রাত্রি তন্মধ্যে বাস করা উচিত। বরজোড়া মশারি হইলে তন্মধ্যে রন্ধন বাতীত অজ্ঞাত সাংসারিক কাৰ্য্য করিবার বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না, অথচ মশার আক্রমণ হইতে একেবারে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পাওয়া যাইবে। পল্লীগ্রামে মশারি না খাটাইয়া কেহ কখনও নিদ্রা যাইবে না। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে প্রতিগৃহে ধূপধূনা দেওয়া উচিত।

৫। হাতে পায়ে খাঁটি সরিষার তেল মাখাইয়া রাখিলে মশার আক্রমণ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

৬। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার রোগের একমাত্র মহৌষধ। কুইনাইন ব্যবহার করিলে রক্তবিত্ত ঐ রোগের বীজ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। কুইনাইনে ম্যালেরিয়ার রোগ যেমন আরোগ্য হয়, যেমন ম্যালেরিয়ার রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে নূরু ব্যক্তি যদি সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিন পাঁচ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন সেবন করেন, তাহা হইলেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবেন—ইহা বহু পরীক্ষাধারা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ম্যালেরিয়ার চাৰি মাস গ্রামবাসী আবাগলবুজবনিরা প্রভেদকরই অন্ন পরিমাণ

যথার্থীতি কুইনাইন সেবন করা একান্ত কর্তব্য।

### প্লেগ্‌।

প্লেগরোগ ভারতবর্ষের অনেক স্থানে মহামারীরূপে আবির্ভূত হইয়া লক্ষ লোকের জীবন নাশ করিতেছে। অত্যন্ত দেশ অপেক্ষা বায়ুগামী দেশে ইহার অত্যাচার কম, বিশেষঃ পূর্ব আংলার অনেক প্রদেশে এই রোগ এখন পর্য্যন্তও দেখা দেয় নাই। বৈহার অঞ্চলে এই রোগের খুব প্রাচুর্য্য। এই রোগ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় আমাদের জানিয়া রাখা উচিত।

১। এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকের দংশন দ্বারা প্লেগ্‌ বোগ উপস্থিত হয়।

২। মাহিষের প্লেগ্‌ হইবার পূর্বে ইহ-রের প্লেগ্‌ হইতে দেখা যায়। প্লেগ্‌গ্রস্ত ইহরের গায়ে প্লেগের পোকা থাকে। ইহর মবিলে ঐ পোকা তাহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া মাটিতে আশ্রয় লয় এবং তথা হইতে নূর ব্যক্তির গায়ে উঠিয়া দংশন করিয়া প্লেগ্‌ রোগের বীজ তাহার শরীরে সংক্রামিত করিয়া দেয়। বাড়ীতে বাহাতে ইহরের উপ-এব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

৩। যখন দেখিবে অকারণে বাটীতে অনেক ইহর মরিতেছে, তখনই জানিবে যে তাহার প্লেগ্‌ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই লক্ষণ দেখিলে বাড়ী ছাড়িয়া তাঁকা জাগরায় ঘর বাধিয়া কয়েকদিন বাস করিবে এবং বাটী, ঘর, ছন্নর, কেনাইল বা অস্ত্র কোনরূপ বিশোধক ঔষধ দ্বারা সৌত করিয়া দিবারান্তি থলিয়া রাখিয়া দিবে।

৪। মৃত ইহর কখনই হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে না। চিম্টার দ্বারা উহাকে উঠাইয়া ফাঁকা জাগরায় খড়ের উপর কেরোসিন তেল ঢালিয়া পুড়াইয়া ফেলিবে।

৫। বাটীর সমুদয় স্থান পরিষ্কার পরি-চ্ছন্ন রাখিবে এবং বাহাতে যথেষ্ট রোজ ও বায়ু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। যে বাটীতে বেনী রোজ ও বায়ু যায়, তথায় প্লেগবোগ প্রায় হয় না। প্লেগ-রোগের বীজ রোজ সংস্পর্শে শীঘ্র মরিয়া যায়।

৬। প্লেগ্‌ রোগীকে স্পর্শ করিলে বা উহার দেহা স্পর্শ করিলে উক্ত রোগ হয় না। তবে শরীরের মধ্যে বা থাকিলে প্লেগ্‌ রোগীকে স্পর্শ করা উচিত নহে। প্লেগ্‌ রোগীর থুথু বা কক বাহাতে অহ ব্যক্তির চোখে মুখে না লাগে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

৭। প্লেগ্‌ রোগীর বস্ত্র ও শয্যাাদি পুড়াইয়া ফেলা উচিত। নতুবা বস্ত্রাদি বিশোধক ঔষধ দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া, জলে ফুটাইয়া, পথের দোড়ে রাখিয়া দিলে উহার পুনর্ব্যবহারে কোন ভয় থাকে না।

৮। প্লেগের প্রাচুর্য্যব সময়ে খালি পায়ে থাকা উচিত নহে। বাহাদের ক্ষমতার কুলাইবে, তাহারাই এই সময়ে মোজা জুতা সর্কাদা পরিয়া থাকিবেন। গরীব লোকে পূরণ কাপড়ের পটী দ্বারা পদব্বর হাঁটু পর্য্যন্ত জড়াইয়া রাখিলে প্লেগেব পোকের দংশন হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাইতে পারিবে।

৯। প্লেগের "টাকা" শব্দে কিছুদিনের জন্য ঐ রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

## নব-বর্ষ।

( সন ১৩২৭ সাল )

[ কবিরাজ শ্রী ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ ]

( ১ )

পরিধানে চম্পকের চারু পীতাম্বর,  
শিরে শোভে অশোকের কিরীট সুন্দর,  
বকুলের বীরবোলি শ্রবণ যুগলে,  
নব মল্লিকার হার ছলিতেছে গলে,  
ভালে বালাকের ফোঁটা—ভাস্কর উজ্জ্বল  
ফুল কোকনদ জিনি রাস্তা পদতল ;  
ওজ্জ্বলে কি নির্মল হাসির লহর,  
তরুণ যুবক ! তুমি কৈগো যাদুকর ?

( ২ )

এক হস্তে “নীলাপন্ন” গঠনে নিরত,  
অন্য করে—সংহারের উপাদান কত !  
কিবা দিব্য সৌম মূর্তি—উদার গম্ভীর—  
নিরখি’ সন্ত্রমে সবে নত করে শির,  
স্বজনের বীজ মগ্ন উচ্চারণ করি’,  
কৈগো তুমি দেখা দিলে রাজনেশ ধরি ?  
এক চক্ষুে অশ্রুজল, অন্য নেত্রে প্রীতি,  
তুমিই কি ‘শব্দ-ব্রহ্ম’, নবীন অতিথি ?

( ৩ )

তোমার আসার আগে, এসেছিল যা’রা,  
বিশ্বাসঘাতক, শঠ প্রবঞ্চক, তা’রা ।  
পূজা খেয়ে—ক’রে গেছে বন্ধে পদাঘাত,  
দেখে গেছে নয়নের নিত্য অশ্রুপাত ;  
শ্মশানের দ্বিত্য মধ্যে ব’সে আঁচি মোরা,  
“নূতনে” ডাকিতে, তবে কে বাজাবে হোরা ?  
উজ্জম উৎসাহ—নাই কারো প্রাণে আর—  
বর্ষরাজ ! অভ্যর্থনা হ’বে না তোমার ।

( ৪ )

“হর প্রীতি প্রিয় ভাষে স্থান পার্বতী  
বৎসরের ফলাফল—কহ পশুপতি !”  
যুগযুগ ধরি—ইহা লেখি পঞ্জিকাতে,  
এবার সে ভার মোরা ধব নিজ হাতে ।  
জিজ্ঞাসি তোমায়, রাজা ! বল দেখি তুমি—  
সুখে কি অসুখে রবে এই বঙ্গভূমি ?  
বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ আলো কি আঁধার !  
ভাগ্যের “বজ্রোট” খোল দেখি একবার !

( ৫ )

সেই নিশি, সেই দিবা, সেই ফুল ফল,  
সেই শশী, সেই রবি, বায়ু, বহ্নি, জল,  
সেই পাখী, সেই শাখী, সেই কান্না হাসি,  
সেই জন্ম, সেই মৃত্যু—আছে পাশাপাশি,  
সেই সৃষ্টি, সেই লয়, সবই পুরাতন,  
তোমার খাসনে—রাজা ! কি হ’ল নূতন ?  
কোন গুণে “নববর্ষ” নাম তবে পেলে ?  
কি পরিবর্তন তরে, বল তুমি এলে ?

( ৬ )

কাহার ‘দায়াদ সূত্রে’ নিলে রাজ্য-ভার ?  
কোন ষড়যন্ত্রী—মন্ত্রী হইল তোমার ?  
শুককণ্ঠ পদ্মাবাসী,—পিপাসায় মরে—  
জল মাগিবার ভার দিলে কার করে ?  
“মেঘ ফল” রৌদ্র ফল প্রকাশিয়া কহ—  
বায়ুর অধিপ হ’ল কোন্ ছুঁই গ্রহ ?  
কার প্রতি কোন কর্ম, ক’রে দিলে ভাগ ?  
বুঝাবে কি সে রহস্য ওহে মহাভাগ !

( ৭ )

শস্ত্রাধিপ হ'ল বুঝি “তুর্ভিক্ষ আপনি ?  
সন্তানে চিবায়ে থাকে ক্ষুধার্ত জননী ?  
গৃহে গৃহে “ম্যালেরিয়া” ধ্বংস হ'ল দেশ,  
যমরাজ নিজে বৈজ্ঞ—“বৈজ্ঞফল”-বশ !!  
ক্ষুধার মহাদস্ত, পাপের প্রসার,  
তুমি কি করিতে রাজা ! এর প্রতিকার ?  
ভুলোকে পুলকে আমি' দ্যুলোক বিজ্ঞান  
পারিবে কি করিতে এ জাতির কল্যাণ ?

( ৮ )

কুমারীর আত্মহত্যা, ঘৃণ্য বর পণ,  
চৌর্য্য, দ্রোহ, ব্যভিচার, অকাল-মরণ,  
বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, মহামারী ভয়,  
দেব ভোগ—ভেজালে হ'তেছে বিষময়,  
স্বাস্থ্যহীন, ক্ষয়ক্ষীণ, দীন নারী নর,  
গেছে ভুলে—“আয়ুর্বেদ” শাস্ত্রের আদর,  
পার যদি—ঘুচাইতে এসব প্রমাদ—  
বিদায়ের কালে দিব শত ধন্যবাদ ।

## শিশু পালন ।

( পুরস্কৃত )

[ শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি, এ, সরস্বতী ]

—:—

শিশুর দেহ উপযুক্তরূপে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত  
হইলেই তাহার মস্তিষ্কও পুষ্ট হইয়া উঠিবে ।  
শিশুর প্রথম বৎসরে তাহার মস্তিষ্ক পুষ্ট ও  
গঠিত করিবার জন্য বাহির হইতে কোন  
আয়োজনের প্রয়োজন নাই । প্রথম বৎসরটি  
শিশুর দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই মস্তিষ্কের  
গঠন হইবে । প্রত্যেক মাতাই এই কথাটি  
বিশেষ ভাবে মনে রাখিবেন । আমরা  
অনেক নবীন মাতাকে শিশুর চক্ষুর সমুখে  
গালকুল, রঙীন খেলনা, চক্কেল জিনিস  
খুলাইয়া কিংবা কোনরূপ শব্দ করিয়া তাহার  
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে দেখি-  
য়াছি । এরূপ জোর করিয়া শিশুর মনো-  
যোগ আকর্ষণ করা অত্যন্ত অনিষ্টকর ।

ইহাতে শিশুর মস্তিষ্ক অনাবশ্যকরূপে উত্তে-  
জিত হয় । জন্ম গ্রহণের পর কয়েক মাস  
ধরিয়া শিশুর মস্তিষ্ক বহু কার্যে ব্যাপৃত  
থাকে । তখন এ পৃথিবীর সকলি তাহার  
নিকট নূতন । এ পৃথিবীর সমুদয় চেতন,  
অচেতন পদার্থের দাগ তাহার মস্তিষ্কে প্রতি  
মুহূর্ত্তে পড়িতেছে । সুতরাং বাহির হইতে  
জোর করিয়া তাহার কার্য বাড়াইলে মস্তি-  
ষ্কের পুষ্টি না হইয়া ষোরতর অনিষ্ট সাধিত  
হয় । মস্তিষ্কের developmentর কাঙ্ক্ষা  
বিধাতাই করিতেছে । দোলারমান খাট বা  
চোর-দোলার শিশুকে কখনো শোয়াইবে  
না । অনবরত স্পন্দন শিশুর মস্তিষ্কের পক্ষে  
অত্যন্ত অহিতকারী ।

শিশুকে হাতে তুলিয়া লোকালুফি করিবে না।

তাহার চক্ষুর সম্মুখে কোন জিনিস অন-  
বরত নাড়াইবে না।

শিশুকে কোলে করিয়া ছলিবে না।

আগন্তুকদিগকে দেখাইবার জন্য শিশুর  
ঘুম ভাঙাইবে না, তাহাকে বিরক্ত করিবে না।

শিশুর সম্মুখে শিব দিবে না, অনবরত  
বকবক করিবে না।

সর্বদা তাহাকে হাসাইতে চেষ্টা করিবে না।

এই সমুদয় কাণ্ডাই শিশুর মস্তিষ্কে  
অস্বাভাবিক উপায়ে এবং অতিরিক্ত রূপে  
উত্তেজিত করে। ইহাতে তাহার মাখনগুলের  
পীড়া হইবার সম্ভাবনা। কাহাকেও শিশুকে  
চুষন করিতে দিবে না। যে সে লোককে চুষন  
করিতে দিলে নানা রোগের বীজ শিশুকে  
আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা।

### অকাল প্রসূত শিশু।

অকাল প্রসূত শিশুকে অতিশয় যত্নের  
সহিত লালন পালন করিতে হয়। তাহার  
জীবনী শক্তি অত্যন্ত কম থাকে। এই জন্য  
মেহের স্বাভাবিক তাপ রক্ষা করাই কঠিন  
হয় এবং খাদ্য পরিপাক ও assimilate  
করিবার শক্তিও কম হয়। শিশু অকালে  
জন্মিলে তাহার সমস্ত দেহে তুলার জড়াইয়া,  
তুলার মধ্যে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিবে।  
এক মাস পর্যন্ত তাহাকে যত্নের সম্ভব গরমে  
রাখিবে। তুলার বিছানার নীচে গরম জলের  
বাগ রাখিবে, জল ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় গরম  
জল ভরিয়া দিবে। এইরূপে একমাস রাখি-

বার পর অল্প অল্প করিয়া গরম কমাইয়া  
দিবে। এইরূপ শিশু এত দুর্বল হয় যে, মাতৃ  
দুগ্ধ চুষিয়া খাইবার শক্তিও থাকে না।  
মাতার দুগ্ধ গালিয়া একটি বাটিতে রাখিয়া  
চামচে করিয়া খাওয়াইবে। কিংবা চামচের  
সহিত পলিতা দিবে, শিশু চুষিয়া খাইবে।  
মাতার দুগ্ধ যত খাটিতে পারিবে ততই তাহাব  
পক্ষে মঙ্গল। মাতার দুগ্ধ চুষিয়া খাইতে না  
পারিলে শিশুর উচিৎ ঈত স্তন্যবৃত্তি হয় না,  
সুতরাং যেকোন পুষ্টি লাভের দরকার তাহা না  
পাইয়া শিশু ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যায়। এতদূর  
স্থলে স্থতিকাগারে মাতার দুগ্ধের সহিত গাধার  
দুগ্ধ দিলে সর্বোৎকৃষ্ট হয়। গাধার দুগ্ধ - মাতৃ  
দুগ্ধের প্রায় সমগুণবিশিষ্ট। গাধার দুগ্ধ পাওয়া  
না গেলে allentury's milk Food no. ১  
প্রথম তিন মাস পর্যন্ত, পরে ছয় মাস পর্যন্ত  
no ২ এবং mellin's Food, Glasco  
শিশুকে দিলে মাতৃ দুগ্ধের অভাব দূর হইবে।  
বিশুদ্ধ গাভীর দুগ্ধ সহ্য হইলে এই সকল  
বিলাতি দুগ্ধ না দেওয়াই ভাল।

অকাল প্রসূত শিশুকে এক ঘণ্টা কিংবা  
দেড় ঘণ্টা পর পর খাইতে দিবে। ক্রমে বল  
পাইলে দুই ঘণ্টা পরে দিবে। যত শিশুর  
বয়স ২১ বারের বেশী আহারের আবশ্যক  
হয় না। কিন্তু অপূর্ণ সময়ে প্রসূত দুর্বল  
শিশুর প্রথম ২৫ মাস বয়সে ৩৪ বার  
আহারের আবশ্যক হয়। ক্রমে বল পাইলে  
বয়সের আহার কমাইয়া দিয়া একবার  
খাওয়ান অত্যন্ত করা প্রয়োজন। প্রাতে  
৫টা হইতে রাজি ১০ টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা পর  
পর দুধ খাওয়াইয়া রাজি ১০ হইতে প্রায়  
৫ টা পর্যন্ত পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিবে, ইহা



শিশুর আহার, পক্ষে যেমন দরকার তাহার দ্বাভার পক্ষেও তেমনি প্রয়োজন। সুস্থ শিশুকে প্রথম হইতেই এইরূপ অভ্যাস কবাইবে, কিন্তু অপূর্ণ শিশুর ৩৪ মাস বয়স হইলে বগা পাইলে এইরূপে খাওয়াইবে। অপূর্ণ শিশুর অধিক আহারের আশংকা।

আহারের পরিমাণ বয়স অনুসারে ক্রমে বাড়াইবে। প্রথম হইতে অধিক জাহার দিলে শিশু পরিপাক করিতে পারিবে না, পরিপাক শক্তি নষ্ট হইতে পাবে। অপূর্ণ শিশুকে কেবলী নাড়াচাড়া করিবে না। সুস্থ শিশুকে বেক্রমে স্নান করান হয়, পরিক্রম পরান হয় অকাল প্রসূত শিশুকে সেক্রমে করিবে না, তাহাকে অতি সাবধানে স্নান কবাইবে, কাপড় পরাইবে। তাহার হাত, পা, বুক, পিঠে প্রত্যহ সরিবার তৈল এক বণ্টা ধিয়া মালিস করিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ় ও বল-শালী হইবে এবং সহজে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় দূর হইবে। এইরূপ শিশুর পক্ষে সরি-বার তৈল অত্যন্ত উপকারী। অকালে প্রসূত হইল শিশুর নিদ্রা খুব বেশী হয়। চব্বিশ বণ্টার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই সে নিদ্রিত থাকে, এমন কি তাহাকে বধাসময়ে খাওয়ানই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু আহারের সময় তাহাকে বেক্রমেই হটক জাগান উচিত। নিদ্রা এবং আহার দুইই তাহার পক্ষে তুল্য-রূপে আবশ্যক। অপূর্ণ শিশুর পুষ্টির জন্য আহারের পক্ষে তাহাকে মাখনের ছোট ছোট গুলি চুষিতে দিলে খুব উপকার হয়। সুস্থ হইলে এক ঝিকবারে ৩৪টি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ঘটরের আকারে মাখনের ছোট ছোট গুলি করিয়া তাহাকে milk

sugar মাখাইয়া লইলেই মাখনের গুলি প্রস্তুত হইল। milk sugar ডাক্তারখানার পাওয়া যায়। অল্প অল্প করিয়া দ্রুত করান উচিত। অকাল প্রসূত শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্বল থাকে। জন্মাব্যাপার আগ্রহ, নিদ্রা প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে সর্বদা উপযুক্তরূপে যত্ন না লইলে বুদ্ধিহীন এবং বিকলাঙ্গ হইবার খুব সম্ভাবনা। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত তাহার সকল শক্তি বর্ধিত ও পুষ্ট কবিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন লইতে হইবে। তবে শিশু মানুষ হইবে। নতুবা বুদ্ধিহীন ও বিকলাঙ্গ হইয়া সংসারের ও সমাজের হুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কাবণেই তাহার জীবন নাশের আশংকা থাকে। কারণ তাহার দৈহিক শক্তি ও যন্ত্রাদি দুর্বল থাকে বলিয়া সামান্য কারণেই অসুস্থ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। যে রোগের আক্রমণ হইতে সুস্থ শিশু ২১ দিনেই আরোগ্য লাভ করে, অকাল প্রসূত শিশুর তাহাতে জীবন বাইতে পারে। তাহার রোগের আক্রমণ হইতে আশ্রয়ক্ষা (Resistance Power) করিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং এইরূপ শিশুকে অতি যত্নের সহিত লালনপালন করিতে হয়। দন্তোদগমেব সময়, টিকা লইবার সময় বিশেষ সাংধানতার সহিত তাহাকে রাখিতে হইবে। আনন্স একটি সাত মাসে প্রসূত শিশুর কথা জানি। তাহার প্রত্যেকটি দাঁত উঠিবার সময় ত্রয়ো নিউমোনিয়ার আক্রান্ত হইয়া জীবন হানির আশংকা হইত। সাধারণতঃ দুই মাসের মধ্যে সুস্থ শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। কিন্তু অপূর্ণ শিশুকে অত দীর্ঘ টিকা দিলে

বিপদের সম্ভাবনা। শিশু বল পাইলে ২। ৩ দিবে। অপূর্ণ শিশুর লালনপালনে সর্বদা চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া চলিলে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ শিশুকে টিকা অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না।

সাধারণতঃ শিশু শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার নিয়ম এইঃ—

	শিশুর বয়স।					
	১ সপ্তাহ	২ হইতে ৩ সপ্তাহ	৪ হইতে ৫ সপ্তাহ	৬ হইতে ১২ সপ্তাহ	৩ মাস	৫ হইতে ৬ মাস
২৪ ঘণ্টার মধ্যে কয়বার দুগ্ধ খাওয়াইতে হইবে।	১০	৮	৭	৬	৬	৫
দিনে কতক্ষণ পরে খাওয়াইতে হইবে।	২ ঘণ্টা পর পর	২ ১/২ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	৪ ঘণ্টা
রাতে কতবার খাওয়াইতে হইবে।	১	১	১	১	১	১

অকাল প্রসূত শিশুর শরীরে এই নিয়ম খাটে না। প্রথম ৪ ৫ মাস তাহাকে টেফেলো অধিকবার খাওয়াইতে হয়। একটি সাতমাসে প্রসূত শিশুকে প্রথম চারি, পাঁচ মাস প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা পর পর খাইতে দিতে হইত, অল্পকালের ভুল মাত্র পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতে পারা যায়ত। সে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০।১১ বার খাইত। এত শিশু এত দুর্বল হইয়া জন্মিয়াছিল যে মাতৃপুত্র টানিয়া খাইতে পারিত না। মাতৃ দুগ্ধ অতি সামান্য খাইত বলিয়া তাহার ক্ষুধিবৃদ্ধি হইত না, এত কারণে তাহাকে কৃত্রিম দুগ্ধ হুই বটল পর পর দিতে হইত। ১০।১১ বার আহারের কমে তাহার ক্ষুধিবৃদ্ধি হইত না। সপ্তম অষ্টম মাস হইতে তাহার রাজির আহার ক্রমে ক্রমে কবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ক্রমে

১০।১১ মাসে একটু বল পাইলে তিন ঘণ্টা পর পর খাওয়াইবার অভ্যাস করান হইয়াছিল এবং রাজি ১০ টার পর আর আহার দেওয়া হইত না। স্তন্যদান ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত নিয়ম সাধারণতঃই খাটে। বিশেষ স্থলে বিশেষ নিয়মে খাওয়াইতে হয়। মাতা প্রত্যেক শিশুর অবস্থা বুঝিয়া সেইরূপে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন।

### দস্তোদার।

“খোকরু ঠাট উঠেছে।”—প্রত্যেক নবীন মাতাই কি আনন্দোপূর্ণ পূর্বের সহিত এত শুভ সংবাদটি পরিবারের সকলের নিকট জ্ঞাপন করেন। খোকরু শিশু প্রসঙ্গে থাকিলে তিনি এই সংবাদটি শুনিয়া বহু

আনন্দিত হন। নরম মাড়ি চটতে সাদা মুক্তার মত দাঁত বাহির হইতে আরম্ভ হইলে মাতার হৃদয় কি অনমৃত আনন্দে উল্লসিত হয়। কিন্তু ইহার সহিত যে বিপদও জড়িত আছে তাহা অনেক নবীন মাতাই জ্ঞাত নহেন। দাঁত উঠিবার সঙ্গে শিশুর পালন সম্বন্ধে মাতার কাজ কত বাড়িয়া যায়। শিশুর জ্বাহারের পরিবর্তন করিতে হয়, প্রত্যহ দাঁত মাজিয়া পরিষ্কার বাখিতে হয়। আবার দুর্বল শিশু হইলে প্রত্যেকটি দাঁত উঠিবার সময়ই শিশু পীড়িত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং দাঁত উঠিতে আরম্ভ হইলেই মাতাকে সতর্ক হইতে হইবে।

দাঁত উঠিবার পূর্বে মাড়ি ফুলিয়া শক্ত হয়। তা'রপর দাঁত বাহির হয়। শিশুর দাঁত সচরাচর ৬/৭/৮ মাসে উঠিতে আরম্ভ হয়, কখনও কখনও ৪র্থ কি ৫ম মাসে উঠিয়া থাকে। (১) অকালে প্রসূত শিশুর দাঁত ১১ম মাসে প্রথম উঠিতে দেখা গিয়াছে। তইটি করিয়া দাঁত এক সঙ্গে উঠে। সচরাচর নীচের সমুখের দুইটি বাহির হয়, ক্রমে কিছু দিন পর পর অল্প দাঁত গুলি বাহির হইয়া তই কিংবা আড়াই বৎসরের মধ্যে কুড়িটি দাঁত উঠিয়া দাঁত উঠা শেষ হইয়া যায়। দাঁত উঠা স্বাভাবিক অবস্থা। সুতরাং সুস্থ শিশুর দাঁত উঠিতে বিশেষ কোনই অসুখ হয় না। শিশু যদি পূর্বে হইতেই মাড়ি দুগ্ধে কিংবা উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যে, বিশুদ্ধ বাতাসের মধ্যে যত্নের সহিত লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে তবে তাহার দাঁত উঠিতে কোন বড়ই প্রায় হয় না। সামান্য অসুখ বাহা হয় তাহা শীঘ্রই সাবিত্য যায়। কিন্তু অকাল প্রসূত, দুর্বল

রুগ্ন এবং অস্বস্তে পালিত শিশুর দাঁত উঠিবার সময় জীবন সংশয় পীড়া হয়। এ সময়ে সচরাচর সুস্থ শিশুদের পেটের অসুখ, সর্দি, জ্বর, কাসি, আমাশয়, পিপাসা প্রভৃতি পীড়া হয়। প্রথম হইতেই এটা সকল পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে, নতুবা প্রথমে অবহেলা করিলে পরে পীড়া বৃদ্ধি হইয়া বিপদ ঘটতে পারে। (২) দাঁত উঠিবার সময় নিকটবর্তী হইলে শিশুর মুখ-গহ্বরের বিশেষ যত্ন লইবে। মাড়ি ফুলিয়া ব্যথা হইলে ঘোরে ঘোরে মাড়ি ঘসিলে শিশুর আরাম বোধ হইতে পারে এবং দাঁত উঠিবার পক্ষে সাহায্যও হয়। মুখের ভিতর ফুলিয়া উঠিলে ঠাণ্ডা জল একটু একটু করিয়া পান করিতে দিলে শিশু আরাম পায়। এই সময় শিশুর কোষ্ঠ বাহাতে নিয়মিত রূপে পরিষ্কার হয় তাহা দেখিবে, নিয়মিত সময়ে তাহাকে আহার করাইবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাহার ঘুম বাহাতে হয় তাহা করিবে।

শিশুকে চিকিৎসকের অমুমতি ব্যতীত কখনও দাঁত উঠিবার কোন টোটকা ঔষধ কিংবা teething powder দিবে না। এই সময়ে তাহার বাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে দিকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যদি তা'র মুখ দিয়া ক্রমাগত লাল নিগর্ত হইতে থাকে তাহা হইলে বুকের কাপড় সর্বদা ভিজা থাকে বলিয়া ব্রুকাইটিস হইবার সম্ভাবনা। বাহাতে শিশুর কাপড় ভিজা না থাকে—সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

শিশুর দাঁত প্রতিদিন পরিষ্কার করিবে। দুগ্ধ দাঁত ভাল হইলে তবে স্থায়ী দাঁত ভাল হইবে। দাঁতে একটু ময়লা বসিলেই তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবে। দাঁতে পোকা বাসিবার

সজ্জাবনা কিংবা ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিলে তৎক্ষণাৎ দত্ত চিকিৎসককে দেখাইবে। প্রত্যেক মাতৃষ্ট মনে রাখিবেন যে, দাঁত খারাপ হইলে শিশুর স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়া যায়। এক বৎসরের হইলেই শিশুর দাঁত প্রত্যন্ত মাজিয়া দিবে এবং সেই বয়সের উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে। শিশুর দাঁত ভাল করিবার রক্ষা করিতে হইলে :—

(১) তাহার স্বাস্থ্য ভাল রাখিবে।

(২) দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্দ্ধন ও পুষ্টির জন্য শিশুর জল গ্রহণের পর কয়েক মাস এবং বয়োরুদ্ধি সহিত উপযুক্ত পুষ্টিকর ও বলকারক পদ্য দিবে।

(৩) শিশুকে কখনো dummy দিবে না।

(৪) শিশুকে একপাখা দিবে—যাহাতে তাহার চোখাল এবং মুখ মাড়িয়া খাইতে হয়। ভাল করিয়া চিবাটয়া খাওয়া শিশুকে অভ্যাস করাউবে। শিশুকালের অভ্যাস কখনও জুলিবার নয়।

(৫) শিশুকে কখনো লম্বা নল সংযুক্ত বোতলে খাওয়াইবে না। বোতলে মাতৃ-স্তনের বোটার তায় বোটা থাকিবে। শিশু মাতৃস্তন্থ সেমন টানিয়া চুষিয়া পায়, বোতলের বোটাও তেমনি করিয়া টানিয়া চুষিয়া পাইবে। দাঁত ও চোখাল—ব্যবহারের ভজ্জট প্রদত্ত হইয়াছে। বাতিন্দ ব্যবহার করিলে তবে তাহার দূত ও কার্যক্ষম হইবে।

(৬) শিশুকে তাহার খাদ্য ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে শিখাইবে। দেখিবে—শিশু যেন অতি তড়াতাড়ি কিংবা অতি মোস্তে না খায়। দাঁত উঠিলে তাহাকে এমন খাদ্য দিবে—যেটা খুব ভাল করিয়া দাঁত দিয়া চিবান দরকার। দাঁতের ব্যবহারের জন্য শিশুকে

কঠিন খাদ্য—যেমন কুটি টোট, শুষ্ক বিস্কুট দিবে। কঠিন খাদ্য ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইলে দাঁতের ময়লা দূর হয়, দাঁতের ক্ষয় হয় না, দাঁত বেশ সমান হইয়া বাহির হয়।

(৭) নরম খাদ্যের টুকরা দাঁতে লাগিয়া থাকিলে দাঁতের ক্ষয় হয়। দাঁতের উপর হইতেই ক্ষয় আরম্ভ হয়, ডিঙির হইতে নহে। হুইটি দাঁতের মাঝখানে কিংবা দাঁতের উপরি ভাগ হইতে ক্ষয়ের স্রষ্টপাত হইয়াছে দেখা যায়।

(৮) পরাত একবার দাঁত পক্ষাব করিয়া দিবে। উইবার দিতে পারিলে আরো ভাল হয়। হুই দাঁত ভাল হইলে পোকা না পাইলে স্বাস্থ্য দাঁত ভাল হইবে। বাজিতে এমন কোন খাদ্য শিশুকে দিবে না—যাহার অংশ দাঁতের দাঁতে লাগিয়া থাকিবে পারে। খাদ্যাংশ সমস্ত বাহির দাঁতে লাগিয়া থাকিবার প্চয়া যায়। হঠাৎ দাঁতের ষোর-তর অনিষ্ট হয়, দাঁতে পোকা লাগিয়া পড়িয়া যায়।

(৯) শীঘ্র দাঁত উঠিলে সে দাঁত তত মজবুত হয় না। কারণ বিলম্বে উঠিলে শিশুর দেহ ততদূর পুষ্ট হইতে থাকিবে। শিশুর দেহ পুষ্ট হইবার পর দাঁত উঠিলে সে দাঁত অধিকতর দৃঢ় হয়।

(১০) তাড়াতাড়ি দাঁত উঠিলে শিশু পাড়িত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পায়। দাঁত উঠিবার সময় উইরূপ শিশুদের পুষ্টিকর অথচ লঘু খাদ্য দিবে। হুইয়ে জল মিশাইয়া দিবে, তারি হুই এ সময় হজম করিতে পারিবে না। দাঁত উঠিবার সময় যে পেটের অস্থির হয় তাহা ভালট। তাৎ পরাত হইলে কোন

ভয় নাই। তাহার অধিক হইলেই বন্ধ করিয়া দিবে। দাঁত উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে, মাড়ি ফুলিয়া লাল এবং শক্ত হইয়াছে অথচ দাঁত বাহির হইতেছে না এরূপ হইলে চিকিৎসক দ্বারা মাড়ি চিরিয়া দিলে অনেক সময় উপকার হয়। নিজেরা কখনো চিবিয়া দিবে না, তাহাতে বিপদ ঘটতে পাবে। দাঁত উঠিবার সময় অনেক শিশুর তড়কা হয়। তড়কা হইলে তৎক্ষণাত্ চিকিৎসক ডাকিবে। যতক্ষণ চিকিৎসক না আসেন ততক্ষণ শিশুর মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়া স্পর্শ করিয়া হাতে সহ্য প্রদম্ব জলে শিশুর গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া তৎক্ষণাত্ গা শুষ্ক কাপড়ে মুছিয়া গরম কাপড়ে সম্প্রাপ্ত ঢাকিয়া রাখিবে, মাথাটি কিন্তু সর্বদা ঠাণ্ডা রাখিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে পলক জলের পিচকারী দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া দিবে। দাঁত উঠিবার সময় শক্ত ব্রিনিস, যেমন টোট রুটির টুকরা, আকের টুকরা প্রভৃতি চিবাইতে দিলে দাঁত শীঘ্র উঠিবার সাহায্য হয়। সাধারণতঃ যে শিশুর দাঁত উঠিবার সময় যত dribble করে, তার তত কম কষ্ট হয়। এ সময়ে অনেক শিশুর মাথার অধাংশে একরকম scurf হয়, তাহা শুধু চিরুনি দিয়া কখনো আঁচড়াইবে না, বেশ করিয়া তেল দিয়া নরম করিয়া স্ক্যানেল দিয়া ঘষিয়া উঠাইয়া দিবে।

### টিকা।

সাধারণতঃ সুস্থ শিশুর এক মাস বয়স হইলেই তাহাকে টিকা দেওয়া হয়। সচরাচর ত্রয় মাসের মধ্যে টিকা দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু ডরুল, রুখ, অকাল প্রভৃতি শিশুদের কখনো

এত অল্প বয়সে টিকা দিবে না। তাহারা বল পাইলে চিকিৎসকের দ্বারা দেহ পরীক্ষা করা ইয়া তবে টিকা দিবে। এইরূপ শিশুর দেহ টিকা লইবার উপযুক্ত হইয়াছে—চিকিৎসক বলিলে তবে তাহাকে টিকা দিবে।

টিকা দিবার পর সুস্থ শিশুর বেশী কোন কষ্ট না। ৫ম হইতে ৯ম দিনে টিকা ফুলিয়া উঠে, ২১ দিন পর্যন্ত টিকা ফোলা, ব্যথা, যন্ত্রণা থাকে। তাহার পর হইতে ক্রমিতে থাকে। টিকার স্থানটি সর্বদা ঢাকিয়া রাখিবে, যেন কোন ময়লা বসিতে না পারে কিংবা আঘাত না লাগে। টিকা, ঢাকিয়া রাখিবার জন্য Vaccinating Guard কিনিয়া কিংবা তৈয়ার করিয়া টিকা ঢাকিয়া রাখিবে। কলিকাতার Smith Stanistreet, Frank Ross প্রভৃতির দোকানে ইহা Guard বিক্রয়ার্থ থাকে। ইহা শিশুর পক্ষে নিরাপদজনক এবং আরামদায়ক। ইহা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে শিশুর টিকার হাত দিবার অথবা আঁচড়াইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা থাকে না, টিকা বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। টিকার স্থানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিবে। টিকাতে ময়লা ধূলা লাগিলে লাল হইয়া ফুলিয়া অত্যন্ত কষ্ট দেয়। সুতরাং ইহা খুব পরিষ্কার রাখিবে। টিকাতে কখন কোন মলম, কি কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ লাগাইবে না। প্রথম আট দিন টিকার স্থানটি বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, যেন শিশু তাহা নখ দিয়া আঁচড়াইয়া না দিতে পারে কিংবা কোন আঘাত না লাগে। টিকা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিলে কিংবা খুব কষ্টদায়ক হইলে জলে কয়েক ফোঁটা

Condy's fluid দিয়া তাহাতে একটি পরি-  
ষ্কার ক্রমাগৎ কিংবা ত্রাকড়া ভিজাইয়া তাঁজ  
করিয়া টিকার স্থানে বসাইয়া রাখিলে আরাম  
পায়। ত্রাকড়াটি সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিবে।  
বেশী ফুলিয়া উঠিলে, লাল হইলে, খুব অর  
হইলে, দেহের বিভিন্ন স্থানে বসন্ত বাহির  
হইলে চিকিৎসক ডাকিবে। একপ হওয়া  
অস্বাভাবিক না হইলেও প্রায়ই টিকা দিলে  
শিশু এতটা অসুস্থ হয় না। শিশুবাং এ  
অবস্থা কখনও অবহেলা করিবে না। শিশুর  
টিকার বীজ—জানিত স্থান হইতে আনিবে এবং  
চিকিৎসক দ্বারা টিকা দেওয়াইবে। যে সে  
লোক দ্বারা যে সে স্থান হইতে টিকার বীজ

আনিবে না। পূর্বে মাহুষ এবং গরু—বাড়ীতে  
আনিয়া তাহাদের বীজ লইয়া টিকা দেওয়া  
হইত। এখন টিকার বীজ মেডিক্যাল কলেজ  
ইনসপাতাল প্রভৃতি বিখ্যাত ইনসপাতাল  
হইতে কিনিতে পাওয়া যায়। সেই বীজ  
আনিয়া চিকিৎসককে দিয়া টিকা দেওয়াই  
সর্ব্বোৎকৃষ্ট। টিকা দিবার পর দেখিবে যে  
স্থানের সমস্ত সে স্থানটি কেবল যেন ধুইয়া না  
দেয়। শীতকালই টিকা দিবার প্রশস্ত সময়,  
বর্ষা কিংবা গ্রীষ্মকালে কখনও টিকা দিবে না,  
কারণ এ সময়ে বা শীত শুকাই না।

(ক্রমঃ)

## সূর্য-রশ্মির সহিত শারীরিক সম্বন্ধ।

[ ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস ]

বর্তমান শিক্ষার প্রভাবে আমাদের আচার  
ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিরও ব্যত্যয়  
হইয়াছে। আধা রবিসংগের ঔষধপ্রয়োগ  
পদ্ধতি অনেক সময় ঔষধি শিক্ত কোন  
কোন করিবাজ অথবা শিক্ত রোগী বা  
তাহার তত্ত্বাবধায়ক নিজেকে বুদ্ধি প্রাণের  
অবলম্বনে সহজসাধ্য করিয়া ফেলেন। তাহাতে  
যে ঔষধের গুণের কেবল তার ভ্রম হয়—তাহা  
নহে, একেবারে গুণচ্যুত হইয়া গিয়াছে—  
অর্থাৎ সে ঔষধের উপকারিতা শক্তি একে  
বারে বিলুপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে  
একটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিব। এই

প্রক্রিয়াটি আমাদের বাহ্যের জন্ত, আত্ম  
বুদ্ধির জন্ত, যোগ আরোগ্যের জন্ত ও  
নির্বাণি হইবার জন্ত বিশেষ উপকারী। ইহা  
অতি সহজসাধ্য হইলেও অনেকে ইহা উপেক্ষা  
করেন। আয়ুর্বেদীয় কোন কোন ঔষধ  
স্বর্ণাংক করিবার বিধি আছে। উহা ব্যয়-  
সাধ্য নহে, কিন্তু একটু সময় সাধ্য বলিয়া  
অনেকে স্বর্ণাংক হইলে অধিক করিয়া কাজ  
সারেন। তাহারা মনে করেন যে, তাপ হইলেই  
হইল। স্বর্ণাংক ও অনলাভের প্রভেদ  
তাহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে স্থান পায় না।  
তাহারা মনে করেন যে, কতকগুলি ধরিয়া নোহে

উত্তপ্ত করিব?—তদুপেক্ষা অভ্যন্তরীণ মধ্য  
অগ্নিতে অতি সহজে উত্তপ্ত হইবে। কিন্তু  
তাহাদের একটু বিবেচনা করা উচিত যে,  
যদি কেবল তাপেরই প্রয়োজন হইত তাহা  
হইলে মহান বীজসম্পন্ন সূর্য্যরশ্মি আধা-  
রশ্মিগণের বিশাল গবেষণাপূর্ণ ও চিন্তাসাগরো-  
দ্ভূত শাস্ত্রসমূহে সূর্য্যগণের পরিবর্তে কেবল  
উত্তপ্ত করিবার বায়ুই উল্লেখ থাকিত।  
এ স্থলে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে  
যতটুকু সম্ভব প্রাচীন পদ্ধতির সমর্থন করিয়া  
একটু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।  
বাঙা বুঝিয়াছি—তাহারই উল্লেখ করিতেছি,  
ক্ষুদ্র মস্তকে বাঙা প্রবেশ করিয়াছে—তাহাই  
প্রকাশ করিতে উদ্ভূত হইয়াছি। তবে  
কথাটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবে কি না  
বলিতে পারি না।

যে সকল উপকরণে ঔষধ প্রস্তুত হয়  
তাহাদের কোনটা ঔষধ ও কোনটা অঙ্গপান  
বা Medium। ঔষধ আরোগ্যকারী এবং  
অঙ্গপান উহার শক্তিবহক। এস্থলে অবশ্য  
উল্লেখ করা উচিত যে, কেবল অঙ্গপান শক্তি-  
বহক নহে অঙ্গপান সম্মিলনে বর্জন ও  
আপোড়নই প্রকৃত শক্তিবহক। যেস্থলে  
সূর্য্যগণের ব্যবস্থা আছে সেস্থলে তাপালোক  
সম্বিত সূর্য্যরশ্মিই (কেবল উত্তাপ নহে)  
ঔষধ এবং সূত বা তৈল বা অল্প কোন পদার্থ  
বাহ্যাকে আমরা ঔষধ মনে করি সেটা অঙ্গপান  
বা Medium.—কেহ হয়ত বলিবেন, অগ্নিরও  
তাপ ও আলোক আছে। সত্য বটে, কিন্তু  
অগ্নির আলোক ও সূর্যালোক পীত ও  
লোহিত মিশ্রিত এবং সূর্যালোক বেত অর্থাৎ  
সপ্তবর্ণ সম্বিত। এই সপ্তবর্ণের রশ্মির দ্বারা

ইথরের (Ether) যে প্রকম্পন হয় উহাও  
একরূপ নহে, উহাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।  
ইথর সপ্তবর্ণাপী, এই প্রকম্পনও সপ্তবর্ণাপী।  
এই প্রকম্পনের বোণানীশিকা শক্তি আছে।  
লোহিত রশ্মি-মস্তিকের ও স্নায়ুগুণীর পক্ষে  
অহিতকর। সপ্তবর্ণ সম্বিত সূর্য্যরশ্মির মধ্যে  
যে লোহিত রশ্মি আছে উহাও মস্তিকের  
পক্ষে অহিতকর। তবে আর ছয়প্রকার  
রশ্মিব সহিত মিলিত থাকার উহার অনিষ্ট  
করিবাব ক্ষমতা কিছু লাভ হয়। সেইজন্য বোধ  
হয় স্ট্রিক্টা আমাদের মস্তক কেশগুচ্ছ দ্বারা  
আবৃত করিয়াছেন। সূর্যালোকের অন্ত্যন্ত  
গুণমধ্যে ব্যাধিবীজবিনাশিনী (Germicide)  
ও শক্তিবহিনী গুণের আমাদের স্বাস্থ্যের  
শক্তে ও রোগ আরোগ্যের পক্ষে বিশেষ  
হিতকর। ডায়োজিনিন (Deogines)  
তাহার বার্কিকো শক্তিবহিনী প্রত্যাহ কিয়ৎ-  
ক্ষণ ধরিয়া অনাবৃত গাত্রে সূর্য্যাতপে অবস্থান  
করিতেন। গ্রীক পণ্ডিত হিপোক্রেটস্  
শরীর অসুস্থ ও নীরোগ রাখিবার জন্য সূর্য্য  
আহারের পর এক ঘণ্টা কাল সূর্য্যাতপে  
অবস্থানের ব্যবস্থা দিতেন। বৃদ্ধ প্লিনি ও  
তাহার পুত্র উভয়েই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার  
জন্য সূর্য্যাতপে থাকিতেন। জনৈক ফরাসী  
চিকিৎসক তাহার এক শিশু রোগীর মাতাকে  
বলিয়াছিলেন যে, শিশুকে পল্লীগ্রামে লইয়া  
বাও এবং রৌদ্রে দণ্ড কর। আহারের পর  
সূর্য্যাতপ গ্রহণ আমাদের দেশেও বহুপ্রচলিত।  
এখনও পল্লীগ্রামে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা আহারের  
পর রৌদ্রে পোহাইয়া থাকেন। সূর্য্যাতপ  
গ্রহণকালে মস্তক ও বেলুদও আবৃত থাকা  
আবশ্যক, এবং শরীর অনাবৃত বা পাংশা

উড়ান দ্বারা আবৃত রাখিতে হয়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার শরীর সর্বদাই আবৃত থাকে এবং মস্তক আবৃত থাকে। এ অবস্থায় সূর্যাতপ অহিতকর বই হিতকর নহে। আবার দেখুন ম্যালেরিয়া, বিস্ফটিকা, বসন্ত, প্লেগ, ইনফ্লুয়েন্জা প্রভৃতি দেশব্যাপক রোগ সমূহ, বাহাদের কোনটা না কোনটা প্রায় প্রতি বৎসরই দেখা যায়, সেগুলি সূর্যের দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় এবং ৯৮ বা ১০২ চৈত্রের পর হইতে অর্থাৎ যখন সূর্য বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে কক্ষটু ক্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন উক্ত দেশব্যাপক বা epidemic পাঁড়া সমূহ অগ্রহস্ত হয়। আবার ভাদ্রপদের ১১ম

বা দশম দিবসের পর হইতে অর্থাৎ যখন সূর্য আবার বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে মকরক্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে সেইকালে নানাপ্রকার ব্যাধির অভ্যুদয় দেখা যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে সময়ে সূর্য আমাদের সরিকটে থাকে সে সময় রোগের প্রাচুর্য্য কমিয়া যায় এবং যে ক্ষত্রে সূর্য দূরবর্তিত থাকে সে সময় নানাপ্রকার রোগের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। আরও একটা কথা প্রচলিত আছে যে, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি ও দিবসে উপশম হয়। ইহা দ্বারাও অস্বীকৃত হয় যে, দিবালোকে রোগের উপশম ও উত্তার অভাবেই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

## আঠারো।

( ১৮ )

[ 'কবিরাজ শ্রী ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ' ]

—:—

দশের ( ১০ ) পর, আট ( ৮ ) আরও, বোধ হয় একপেট সংখ্যাবাচক আঠার ( ১৮ ) শব্দের উৎপত্তি। ক্রমে একটু মহা-প্রাণ উচ্চারণে পেরে "আঠারো" শব্দট, "আঠারো"র পরিণত হইয়াছে। এই আঠারো সংখ্যাটির উপর আশ্চর্য্য ব্যক্তিদের বোঁকটুকিছু বেশী ছিল। বর্তমান প্রেক্ষে সেই কথাটা আমি অতি সংক্ষেপে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

পাঠকগণ মনে করিতে পারেন—একপ প্রবন্ধ "আয়ুর্বেদ" স্থান পাইল কেন? আমার উত্তর—আয়ুর্বেদে আঠারোকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হিন্দুর সকল শাস্ত্রই "আঠারো" লইয়া অধিক দাবী নাড়াচাড়া করিয়াছেন। প্রথমেই দেখুন—হিন্দুর প্রথম ধর্মশাস্ত্রের, "শ্রীচীন ইতিহাসের নাম "পুরাণ"। বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতাপে বৈদিকধর্ম যখন লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল



ধর্মের আদুল সংস্কার করানায়—তখনই “পুৰাণ” শাস্ত্রের স্রষ্টি । নতুন মতকে পাছে “নতন” বলিয়া শিক্ত হইতে হয়, সেই জন্তই সেই নতন শাস্ত্রের “পুৰাণ” নাম রাখা হইয়াছিল । “পুৰাণ” পুরাতন শব্দেবই অপভ্রংশ । “পুৰাণ” রৌদ্র-বিপ্লব হইতে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করিয়াছিল । বহু দেবদেবীর অবতারণা করিয়া, বহু বংশের ইতি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া, “পুৰাণ” ভারতে নবযুগের সূচনা করিয়াছিল । পুৰাণের উপদেশে, গাথা-গোশলে, রচনা গোবৎসে, সমাজের গতি করিয়াছিল । এ তেন মহাশাস্ত্র “পুৰাণ”—তার সংখ্যা মাত্র আঠারো খানি ।

তাহার পর ধনু—শালগ্রাম । হিন্দুবাবাহ বলুন, উপনয়ন বলুন, শ্রাদ্ধ বলুন, ব্রত, পূজা বলুন, সকল কাজেই শালগ্রাম শিলার পরোজন । হিন্দু গৃহস্থের একমাত্র আরাধ্য এই শালগ্রাম শিলাও সংখ্যায় আঠারোটি ।

পানীকে পাপ পথ হইতে ফিরাইবার জন্ত—সকল জাতির মহাকবিট প্রকৃতির বিশাল চিত্রপটে নরকের ক্রতমূর্ধি অঙ্কিত করিয়াছেন, হিন্দুমতে সেই নরকের সংখ্যাও আঠারোটি ।

শট জ্ঞান ও কর্মের বিবটি কেন্দ্র ভারত-বর্ষে যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাদের সংখ্যাও আঠারোটি । যথা ;—১। সংস্কৃত । ২। প্রাকৃত । ৩। উর্দাচী । ৪। মহা-বঙ্গী, ৫। মাগধী, ৬। অর্দ্ধ মাগধী, ৭। শল্য-ভাষা, ৮। শ্রবস্তী, ৯। দ্রাবিড়ী, ১০। উৎকলী, ১১। পাশ্চাত্য, ১২। প্রাচ্য, ১৩। বাল্লিক, ১৪। আবৃত্তিক, ১৫। দাক্ষিণাত্য, ১৬। পৈশাচী, ১৭। কুর্জী (আবস্তী) ১৮। শৌরসেনী । যিনি এট সকল ভাষায় গৃহ রহস্য অংগত

ছিলেন, সেই “সাহিত্য দর্পণ”কার বিশ্বনাথের গোববময় বিশেষণ—“অষ্টাদশ ভাষা বার বিগাসিনী ভুজঙ্গ” ।

হিন্দু চিরদিন মুক্তি-পিপাসু । মুক্তি তাহার জীবনের লক্ষ্য । ত্রিবিধ ভ্রম হইতে মুক্তি লাভের জন্তই—তাহার জপ, ওপ, সাধনা । কিন্তু সেই মুক্তিপথের বিস্তৃত পুত্র কলত্রাদি লইয়া ১৮টি । “পুঙ্খবোত্তম”—ভারতের পুণ্য তীর্থ, এই পুঙ্খবোত্তমে গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দেখিতে হইলে, ভক্তকে ১৮টি নালা পার হইতে হয় ।

প্রবল শত্রু কর্তৃক উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সান্ত্বনায় সগায়ভূতি জানাইয়া লোকে বলিয়া থাকে—“বাধে ছুঁলে আঠারো বাঁ ।”

দীর্ঘ সূত্রির কলঙ্কে কটাক্ষ করিয়া, লোকে বলে—“তোমার আঠারো মাসে বহব !”

হিন্দুব মহাকাব্য “মহাভারত ।” এই অপূর্ণ ইতিহাসের রচয়িতা—স্বয়ং ব্যাসদেব । ব্যাসদেবের সঙ্গে ১৮ সংখ্যার বড় বনিত সপক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা ;—

১। মহাভারতের পর্ব ১৮টি ।

২। মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের যে যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে, সে যুদ্ধের ব্যাপ্তি-কাল ১৮ দিন ।

৩। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে যে সকল সৈন্তের সমাবেশ হইয়াছিল—তাহাদের সংখ্যা ১৮ অক্ষোহিনী ।

৪। কৌরব কুল নিমূল হইলেও যুভরাজ বাচিয়াছিলেন—১৮ বৎসর ।

৫। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অবসানে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিয়াছিলেন—  
১৮ × ২ = ৩৬ বৎসর ।

৬। মহাত্মারতের অন্তর্গত "শ্রীমদভাগবদ্  
গীতা"—১৮ অধ্যায়ে বিতক্ত ।

৭। মহাত্মারতের আর একটি নাম—  
"জয়" । \* এই 'জয়' প্রত্যেক পর্বের  
প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ দেখা যায়—

সারাবর্ণ নবসূতা নরকৈব নরোত্তমং ।  
দেবীং সবস্বতীকৈব ততোজয় সুদীরয়েৎ ॥

লক্ষ্মী আর্ঘ্য সিদ্ধান্তের মতে—"ক" হইতে  
"ঞ" পর্যন্ত অক্ষর গুলি, বধাক্রমে—১, ২,  
৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০—এই কয়টি সংখ্যা  
বাচক । "ট" হইতে "ন" পর্যন্ত বর্ণগুলিও  
বধাক্রমে দশটি সংখ্যার বোধক । য, ব, ল,  
ব প্রভৃতি অক্ষর গুলির দ্বারা—বধাক্রমে ১,  
২, ৩, ৪, প্রভৃতি সংখ্যা স্থিরীকৃত হইয়া  
থাকে । এই নিয়ম অনুসারে, "জ" ও "য়"  
এই দুইটি বর্ণ ৮ ও ১ সংখ্যার স্রোতক ।  
এক্ষণে "অস্তানাং বামতো গতিঃ" এষ্ট বিধান  
"জয়" শব্দটি (১৮) আঠারো সংখ্যার বোধক  
হইতেছে ! অতএব দেখা যাইতেছে,—মহা-  
কাব্য মহাত্মারতের কৈবল "সার্থারোহ"ই  
লীলা !

তরত শব্দের মতে—৬ বাগের, প্রত্যেকের  
ওটি মহাশক্তি, এষ্ট হিসাবে প্রথমে ১৮  
রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল । পরে কলাবিজ্ঞার  
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক একটী রাগিণীর  
এক একটী সখী কল্পিত হয় । মূল রাগিণী ও  
সখী লইয়া—ক্রমে ৩৬ রাগিণীর উৎপত্তি ।  
এখন রাগিণী-সকলই 'দেবে'—অনেক  
জাতিতে পরিণত হইয়াছে ।

তন্মধ্যে ১৮র আধিপত্য দেখিতে পাওয়া  
যায় । বধা—তারিণী তন্মধ্যে—

"প্রতিমাষ্টাদশাঙ্গা নানাধিকায় ন কারয়েৎ ।  
অস্ত্রানেনাপি যোহেন যদি কুর্ধ্যামস্যাধমঃ ।

প্রতিষ্ঠা বিকলা তস্ত পুঞ্জনামকলং ভবেৎ ॥"

যুক্তিকা নির্দিষ্ট লিঙ্গ প্রতিমা—১৮  
অঙ্গুলি প্রমাণ করা উচিত । ইচ্ছা ব কম  
কিবা—বেশী করিলে প্রতিষ্ঠার ফল পাওয়া  
যায় না ।

যাতৃকা যজ্ঞের অক্ষর ১৮টি ।

"অপেক্ষ্যন্তী যাতৃকাঃ যত্রৈবৈদিশাকরীং ।"

"তাং তং ।

সিদ্ধি লিপ্য ব মন্ত্রস্থান ১৮টি । বর্ণা—

১। গোষ্ঠ, ২। দেবালয়, ৩। অশ্বান,  
৪। কান্ডার, ৫। পক্ষত, ৬। চতুশ্লথ,  
৭। নদীতট, ৮। গোগৃহ, ৯। গুহা ।  
১০। মহাপীঠ, ১১। তীর্থ, ১২। মঙ্গল  
কুটক, ১৩। শূত্র, ১৪। কুশাবর্ত, ১৫।  
ব্রহ্মাবর্ত, ১৬। বিধমূল, ১৭। নির্জন,  
১৮। মরু ।

পূজার প্রিয়-পুশ ১৮টি,—১। কোকনদ  
২। পুণ্ডরীক, ৩। অর্ক, ৪। অপরাধিতা,  
৫। বন্ধক, ৬। কর্ণিকার, ৭। করবীর,  
৮। বক, ৯। জাতী, ১০। বকুল,  
১১। ক্ষৌরগুলা, ১২। নাগকেশর, ১৩।  
কন্দল, ১৪। যুক্তিকা, ১৫। জয়ন্তিকা,  
১৬। কুঙ্কমক, ১৭। মল্লিকা, ১৮।  
ভেড় (জবা) ।

দান পদার্থও ১৮টি । ১। অন্ন, ২।  
জল, ৩। মণ্য, ৪। গৃহ, ৫। ভূমি,  
৬। ক্ষৌর, ৭। বস্ত্র, ৮। তেজ, ৯। মধু,  
১০। কল, ১১। স্বর্ণ, ১২। ধৌর, ১৩। কুলু,  
১৪। আসন, ১৫। ভজ, ১৬। পরিচা,  
১৭। ঐক্য, ১৮। বিদ্যা ।

মন্ত্র স্থাপনের পত্র ১৮টি । ১। পর্বা, ২। বিব, ৩। তুলসী, ৪। মান, ৫। বট, ৬। অশ্বখ, ৭। প্রক্ষ, ৮। উড়ুঘর, ৯। চবিদ্রা, ১০। কদলী, ১১। তুর্জ, ১২। তাল, ১৩। হিম্মাল, ১৪। কচ্চী, ১৫। শাল, ১৬। পলাশ, ১৭। তমাল, ১৮। পদ্ম ।

সিদ্ধির উপায় ১৮টি । ১। ভাগ, ২। শৌচ, ৩। আচার, ৪। প্রক্ষালন, ৫। স্নান, ৬। গজ, ৭। আচমন, ৮। পূজা, ৯। শ্রবণ, ১০। বলি, ১১। ভক্তি, ১২। রূপ, ১৩। স্তোত্র, ১৪। তর্পণ, ১৫। সত্য, ১৬। দৈত্য, ১৭। বিশ্বাস, ১৮। শ্রবণ ।

মহাপাতক ১৮টি । ১। অত্যাচার, ২। পরদাস্তিগমন, ৩। প্রতারণা, ৪। দস্যুতা, ৫। হত্যা, ৬। বিশ্বাসঘাতকতা, ৭। সুবাপন, ৮। অসত্য, ৯। লোভ, ১০। গুরুনিন্দা, ১১। হিংসা, ১২। কুৎসা, ১৩। কাকু, ১৪। ধর্মশ্রানি, ১৫। আস্বহা, ১৬। অবমাননা, ১৭। পৌড়ন, ১৮। গুরু বক্র ।

মহাশক্তি ১৮টি, দশমহাবিদ্যা ও অষ্ট নাগিকা । ব্যাধি—যমের অমুচর । সেই ব্যাধির সংখ্যা—১৮ কোটি । বথা—  
“অষ্টাদশ কোটিব্যাধি অমুচর বা’র,  
সেই যম—হের বংশ । সমুখে তোমার ।”

আমাদের আয়ুর্কেন্দ্রে ১৮র প্রভাব বড় ব্রহ্ম নহে ।

রোগের উপসর্গ ১৮টি । ১। বাঁহ, ২। কাম্প, ৩। বমন, ৪। প্রলাপ, ৫। মূর্ছা,

৬। হিকা, ৭। শ্বাস, ৮। কাস, ৯। অতিসার, ১০। তন্দ্রা, ১১। অরুচি, ১২। শ্বেদ, ১৩। তৃষ্ণা, ১৪। শ্রুততা, ১৫। বিবন্ধ, ১৬। আধান, ১৭। দ্রব, ১৮। আক্ষেপ ।

ক্ষয় রোগ ১৮ প্রকার ।

কুষ্ঠ রোগ ১৮ প্রকার ।

স্মৃতিকা গুণে—শিষ্ট মাতৃকা কর্তৃক গৃহীত হইলে—১৮ দিনেই প্রায় তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । \*

ষ্টিক ১৮ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের গর্ভ হইলে—তাহার এবং শিশুর মৃত্যু অবশ্যস্বাবী ।

ভবেন্তু যা গর্ভবতী কুমারী

কুমারিহষ্টাদশ বর্ষকালে ।

সা মৃত্যু মায়াতি ততশ্চ ধামঃ •

উবাচ মুখে ! জতুর্কণ ইখং ॥

হরি চন্দ্র ।

### ভূনিম্বাতৃচন্দ্রদশাঙ্গ ।

ভূনিম্ব দার দশমূল মহৌষধাধ

তিক্তেজ-বীজ ধনিকৈভকণা কবাঃ ।

তজ্জা প্রলাপ কসনারুচি দাহ মোহ

খাসাদি যুক্ত মথিলং জর মাত্ত হস্তি ॥

১। চিরাতা, ২। দেবদারু, ৩। বেল-ছাল, ৪। শোনাছালী, ৫। পাকুল ছাল, ৬। গাভারী ছাল, ৭। গণিয়ারী ছাল, ৮। শালপাণি, ৯। চাকুলে, ১০। কটি-কারী, ১১। বৃহতী, ১২। গোকুর, ১৩। তুর্জ, ১৪। মুখা, ১৫। কটুকী, ১৬। ইন্দ্র-বব, ১৭। ধনে, ১৮। গজপিপুলঃ—এই ১৮ খাঙ্গি জ্বোর কাথ পান করিলে—তজ্জা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও খাসাদি যুক্ত সমস্ত জর শীঘ্র প্রশমিত হয় ।

\* দাম-ভর দেখ ।

—দৈবদ্য ।

### অষ্টাদশাঙ্গঃ ।

দশমূল শতী শূদ্রী পৌষ্করং স হুবালাং ।  
ভাগী কুটজ বীজক পটোলঃ কটুবোহিণী ।  
অষ্টাদশাঙ্গ ইতোষ সন্নিপাত্ত জরাপহঃ ।  
কাস-হৃৎ গ্রহ-পার্শ্বাঙ্গি শ্বাস-হিক্কা বনী হরঃ ।

১। বেল, ২। শোনা, ৩। পারুল,  
৪। গান্তারী, ৫। গণিয়ারী, ৬। শালপানি,  
৭। চাকুলে, ৮। গোক্ষুর, ৯। বৃহতী,  
১০। কটিকারী, ১১। শতী, ১২। কাকড়া-  
শূদ্রী, ১৩। কুড়, ১৪। হুবালাভ, ১৫।  
বামন হাতি, ১৬। ইলুঘন, ১৭। পলতা,  
১৮। কটুকী;—এই ১৮ দ্রব্যের কাথ,  
পার্শ্ব-শূল, শ্বাস, হিক্কা এবং বমি নষ্ট হইয়া  
থাকে ।

### মুস্তাগ্রাষ্টাদশাঙ্গঃ ।

মুস্ত-পল্লটকেশরী দেবদারু মহৌষধঃ ।  
ত্রিফলা ধন্ব্যাসক নৌলি কম্পিল্লকং ত্রিরং ।  
কিবাভ তিক্তকং পাঠী বলা কটুক বোহিণী ।  
মপুং পিল্ললী মূলঃ মুস্তাগ্রাষ্টাঙ্গ উচ্যতে ॥  
অষ্টাদশাঙ্গ মুদিত মেতরা সন্নিপাত্তম্ ॥  
পিত্তোত্তরে সন্নিপাতে হিতকোক্তং মনোবিভিঃ ॥  
মস্তান্তস্তে উরোবাতে উরঃ পার্শ্ব-শিঃবাগাত ॥

১। মুগা, ২। কেম্পাশড়া, ৩। বেদার-  
মূল, ৪। দেবদারু, ৫। শুঠ, ৬। ভবীতকী  
৭। বহেড়া, ৮। আমলা, ৯। নীল, ১০।  
কমলাগুড়ি, ১১। তেউড়ীমূল, ১২। চিবাভা,  
১৩। আকনাদি, ১৪। বেড়েল, ১৫। কটুকী,  
১৬। ষষ্টিমধু, ১৭। হুবালাভ, ১৮। পিপ্পল  
মূল;—ইত্যর নাম মুস্তাগ্রাষ্টাঙ্গ অথবা অষ্টা-  
দশাঙ্গ । এই আঠারো খানি দ্রব্যের কাথ

পান করিলে, সন্নিপাত নষ্ট হয় । পিত্তোত্তর  
সন্নিপাতে ইহা হিতকর এবং মস্তান্তস্ত, উরু-  
শ্বাস, হৃৎশূল, পার্শ্ব-শূল শিরঃশূল প্রভৃতি  
বোগেও ইহা উপকারী ।

### দ্রাক্ষাগ্রাষ্টাদশাঙ্গঃ ।

দ্রাক্ষা-ভিক্তামৃগাশুদ্রী মুস্ত ভূনিষ-চন্দনং ।  
ভৃঙ্গশোশরী বজ্রাক পদ্মকারিষু পুষ্করং ॥  
কুদ্রাভুগ্নী শতী পাঠী বালকৈঃ কুথিতং জলং ।  
জীর্ণ জরাকচি শ্বাস কাস শ্বশ্ব নাশনং ॥

১। দ্রাক্ষা, ২। কটুকী, ৩। শুলক,  
৪। কাঁড়ড়া শূদ্রী, ৫। মুগা, ৬। চিবাভা,  
৭। বজ্রচন্দন, ৮। হুবালাভ, ৯। বেণা-  
মূল, ১০। ধনে, ১১। পদ্মকাঠ, ১২। নিম-  
ছাল, ১৩। কুড়, ১৪। কটিকাণী, ১৬। শুঠ,  
১৬। শতী, ১৭। আকনাদি, ১৮। বালী;—  
এই ১৮ দ্রব্যের কাথ পান করিলে জীর্ণজর,  
অরুচি, শ্বাস, কাস এবং শোণ আরোগ্য  
হইয়া থাকে ।

### অষ্টাদশাঙ্গ চূর্ণং ।

বাসা লাক্ষাশগন্ধাচ শতী শুভ্রী পুনর্ব্বাঃ ।  
জগেলা কেশরং কৃষ্ণা তালীশং চব্যা কটুকলং ॥  
১৫। শূদ্রী শুভ্রা পার্থং নিদিষ্টিকা তথৈ বচ ।  
এতানি সম ভাগানি প্লব্ধ চূর্ণানি কারয়েৎ ॥  
তচ্চূর্ণং মধুনা লিঙ্গান্নাসদেকং নিরস্তরং ।  
নিঃশ্বি রক্তপিত্তক শ্বাস কাস ক্ষয়ং তথা ।  
ভাষিতং মূল দেবেন্দ্রাষ্টাদশাঙ্গ সংজ্ঞিতং ॥

১। বাসকমূল, ২। লাক্ষা, ৩। অশ-  
গন্ধা, ৪। শতী, ৫। শুঠ, ৬। পুনর্ব্বা,  
৭। দারুচিনি, ৮। এলাচ, ৯। নাগেশ্বর,  
১০। পিপ্পল, ১১। তালীশগন্ধ, ১২। চই,  
১৩। কটুকল, ১৪। বচ, ১৫। কাঁড়ড়াশূদ্রী,

১৬। বংশলোচন, ১৭। অর্জুন ছাল, ১৮।  
কটিকারী,—এই ১৮টা দ্রব্যের চূর্ণ মধুর  
সহিত ১ মাস লেহন করিলে, রক্তপিত্ত, বাস,  
কাশ এবং ক্ষয় রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ।

আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার  
আবশ্যকতা দেখি না—প্রবন্ধ ক্রমে দ্রব্য হইয়া  
পড়িতেছে । অম্লসন্ধিস্থ পাঠক—একটু কষ্ট  
করিলেই দেখিতে পাইবেন—আয়ুর্বেদে এমন  
অনেক ঔষধ আছে, যাহা ১৮ খানি উপাদানে  
প্রস্তুত হয় । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি—  
আম্রবাত ও শীতপিত্তাদি রোগে—“অষ্টা-  
দশাঙ্গ গুগ্গুলু”; মহাকুষ্ঠে—“অষ্টাদশাঙ্গ লেপ”  
গাঠা বহুদধিকারে—“অষ্টাদশ পিঙ্গলী” বাত-  
বায়ির “অষ্টাদশ শতিক প্রসারণী তৈল”—  
প্রভৃতি সিদ্ধযোগ গুলি—(১৮) আঠারোর  
মহিমাই ঘোষণা করিতেছে ।

পূর্বে প্রসবাস্তে প্রসূতিকে হৃতিকাগৃহে  
কাল বাওয়াইবার ব্যবস্থা ছিল । বাহিরে  
“তাপ” (স্বৈদ দেওয়া) ভিতরে “ঝাল,”—  
এই “তাপ ঝাল” প্রসূতির শরীরে নূতন  
জীবনী শক্তি আনিয়া দিত । সে ঝালের  
মসলা ছিল ১৮ খানি । যথা :—

১। মরিচ, ২। পিপুল, ৩। শুঠ, ৪।  
এবঙ্গ, ৫। জয়ন্তী, ৬। ছোট এলাচ, ৭। শটী,  
৮। দারুচিনি, ৯। কৃষ্ণজীরা, ১০। বোয়ান,  
১১। মেথী, ১২। বচ, ১৩। গিলা, ১৪।  
জায়ফল, ১৫। মৌরী, ১৬। চৈ, ১৭। রাধুনী,  
১৮। তেজপত্র । এই “ঝাল মসলা” চূর্ণ  
করিয়া, উষ্ণ বস্তুর সহিত শিশু জননীকে  
খাওয়ান হইত । এখন এ বালাই উঠিয়া  
গিয়াছে । ‘চা’ ‘ব্রাভী’—এখন “ঝালের”  
আসন গ্রহণ করিয়াছে । পাছে অগ্নি তাপে

ও ধূমের কালিমায় বিলাসিনীর কাঞ্চন তন্তু  
বিবর্ণ হইয়া যায়,—তাই আতুর গৃহে “হরির  
লুটের” মৌলিক মৌরসী স্থাপিত হইয়াছে !!

আগেকার গৃহলীগণ—শিশুকে সুস্থ  
রাখিবার জন্ত, মাঝে মাঝে “আলুই” খাও-  
য়াইতেন । “আলুই”—প্রসাদে শিশুর সহসা  
রোগ হইত না । নবাবঈ কামিনী, আলুই  
প্রস্তুত ভুলিয়া গিয়াছেন । “আলুই” ১৮  
খানি মসলায় প্রস্তুত হইত । ১। কালমেঘ,  
২। নিসিন্দাপাতা, ৩। বেলপাতা, ৪।  
যোয়ান, ৫। রাধুনী, ৬। বড়এলাচ, ৭।  
বচেড়ার শাঁস, ৮। তুলসী মঞ্জরী, ৯। সজীনা  
বীজ, ১০। আদা, ১১। নাগদোনা, ১২।  
পানের বোঁটা, ১৩। জায়ফল, ১৪। মৌরী,  
১৫। মরিচ, ১৬। আকরকোরা, ১৭। আমের  
কেশী, ১৮। বেলশুঠ ।

বসন্তোত্তর কালে শিশুদের অনেক রোগ  
হইয়া থাকে—উদরাময়, আক্ষেপ (রস তড়কা)  
ইত্যাদি । এই সকল বিষয় নিবারণের জন্ত  
সেকালের গৃহলীগণ শিশুর কটিদেশে ১৮টা  
নিম্ববৃক্ষের ফল—সুত্রে গাঁথিয়া পরাইয়া  
দিতেন । এ প্রথা এক্ষণে রূপান্তরিত হই-  
য়াছে ;—এখন ঐখনি প্রকাশের জন্ত—শিশুর  
কটিদেশে সোণাব নিমফল পরান হইয়া  
থাকে ।

যখন কেশ তৈলের এত ছড়াছড়ি ছিল  
না, তখন নারীগণ—“মাথাঘসা”র স্মৃতি  
দিয়া কেশ সংস্কার করিতেন । ঐ মাথ  
ঘসার মসলাও ছিল ১৮ খানি । ১। একাদী  
২। বেতচন্দন, ৩। অশুর, ৪। কালীয়ক,  
৫। জটামাংসী, ৬। মুরামাংসী, ৭। কাকুল  
৮। শৈলজ, ৯। দনা, ১০। তামুল, ১১।

মেথী, ১২। আমলা, ১৩। লতাকল্পরী, ১৪।  
ষোড়ষট, ১৫। গোলাপফুল, ১৬। রেণুক,  
১৭। বেণারমূল, ১৮। নাগেশ্বর।

বিষ কল্পার বয়ঃ যখন ১৮ বৎসর হয়,  
তখন তাহার দেহে—পূর্ণ বিষ বিকাশ লাভ  
করিয়া থাকে।

মানুষের বিপদ ১৮ প্রকার;—১। ঋণ,  
২। রোগ, ৩। হৃৎক, ৪। অনাবৃষ্টি, ৫।  
জিহ্বা, ৬। বিবাদ, ৭। চোর্য, ৮। কুগ্রহ,  
৯। প্রভূকোপ, ১০। জাতিনাশ, ১১। শোক  
১২। বৃত্তিহানি, ১৩। অকৌত্তি, ১৪। কুলক্ষয়,  
১৫। গৃহদাহ, ১৬। অভিচার, ১৭। প্রবাস,  
১৮। রাজ-বোধ।

আসব বিধান মতে—সন্ধান ১৮ প্রকার।  
১। কোহল, ২। অরিষ্ট, ৩। আসব, ৪। সুরা  
৫। প্রসরা, ৬। শাঁধু, ৭। কাকোলী, ৮।  
বারুণী, ৯। মৈমেরয়, ১০। সৌবীর, ১১।  
কাজিক, ১২। শুক্র, ১৩। চুক্র, ১৪। শিখ-  
রিনী, ১৫। মধুলিকা, ১৬। বঙ্গলী, ১৭।  
গোড়ী, ১৮। শীতরস।

নির্ঘণ্ট মতে—দ্রব্যের প্রণী ১৮ প্রকার,  
১। দীপন, ২। পাচন, ৩। শমন, ৪। অন্ন-  
লোমন, ৫। স্রংসন, ৬। ভেদন, ৭। রেচন,  
৮। বমন, ৯। শোধন, ১০। ছেদন, ১১।  
লেখন, ১২। সংগ্রাহী, ১৩। স্তম্ভন, ১৪।  
বসায়ন, ১৫। বাজীকর, ১৬। প্রবর্তক, ১৭।  
ক্ষয়কর, ১৮। বদকর।

কল্পের মতে বিষনাশক অগদ ১৮টি।  
১। পুনর্বা, ২। কালাকড়া, ৩। কাটা  
শিরীষ, ৪। গৃহধূম, ৫। দারুচরিত্রা, ৬।  
সিদ্ধার্থ, ৭। তাম্র, ৮। তগর পাছকা, ৯। বক্ষা  
কর্কট, ১০। মূত্র, ১১। অর্কমূল, ১২।

তুলসী, ১৩। গোরোচনা, ১৪। মদন ফল,  
১৫। হিং, ১৬। আকনাদি, ১৭। আতাইচ,  
১৮। জলৌকা।

রাবণোক্ত শিব নির্মালা যুগের উপাদান  
১৮ খনি। ১। সর্জরস, ২। শিলারস, ৩।  
দেবদারু, ৪। রক্তচন্দন, ৫। শ্বেতচন্দন, ৬।  
গাঁঠিঘালা, ৭। নিষপত, ৮। কর্পূর, ৯। জয়ত্রী,  
১০। কুচুম, ১১। শিখীপুচ্ছ, ১২। কদ্রাক,  
১৩। সরল, ১৪। জটামাংসা, ১৫। পদ্মকাঠ,  
১৬। গুগ্গলু, ১৭। সর্ষপ, ১৮। যুত। এই  
যুগে গ্রহ ও অলম্বী নিবারিত হইয়া থাকে।

অপমুমুর্ষুর প্রতিকাব ১৮ প্রকার;—১।  
নম্র, ২। বমন, ৩। পাণ্ড পীড়ন, ৪। দাঁত, ৫।  
বন্ধন, ৬। ছেদন, ৭। আকর্ষণ, ৮। সস্তাড়ন,  
৯। শ্বেদ, ১০। মর্দন, ১১। প্রলেপ, ১২।  
শোষণ, ১৩। বিবেচন, ১৪। কুৎকার, ১৫।  
দর্ষণ, ১৬। সমবল, ১৭। বাস প্রবর্তন, ১৮।  
মস্ত।

বিষ বৈষ্মদের মতে—সর্প দংশনের  
চিকিৎসাও ১৮ প্রকার। ১। উত্তর্জন, ২।  
আচুষণ, ৩। দহন, ৪। ছেদন, ৫। বন্ধন, ৬।  
মস্ত, ৭। রক্ত, ৮। শিরাবোধ, ৯। রক্তমোক্ষণ,  
১০। লেখন, ১১। অগদ, ১২। বমন, ১৩।  
অঞ্জন, ১৪। সেচন, ১৫। বিরেচন, ১৬। প্র-  
মন, ১৭। ছন্দুভি বাস্ত, ১৮। নির্হরণ।

চৈত্যা বৃক্ষ (দেবাধিষ্ঠিত বৃক্ষ) ১৮টি।  
১। বট, ২। অশ্বথ, ৩। প্লক্ষ, ৪। নিষ, ৫।  
বিষ, ৬। উড়ুয়, ৭। শিশুপা, ৮। ধব, ৯।  
তুলসী, ১০। শরী, ১১। শাখলী, ১২। তাল,  
১৩। নারিকেল, ১৪। দেবদারু, ১৫। কাঙ্ক-  
নাম, ১৬। শাঘোট, ১৭। বিজীতক, ১৮।  
তিস্তিকী।

গর্ভপাতের কারণ ১৮টি । ১। ব্যায়াম, ২। উপবাস, ৩। মৈথুন, ৪। যানারোহণ, ৫। রক্ত মৌক্ষণ, ৬। উচ্চভাব, ৭। উৎকটাসন, ৮। পতন, ৯। কঠিন শয্যা, ১০। উত্তর্জন, ১১। রাজি জারণণ, ১২। শোক, ১৩। বেগ-ধাবণ, ১৪। ক্রোধ, ১৫। ভয়, ১৬। নির্জন-বাস, ১৭। ক্ষত ধাবন, ১৮। ভারোত্তোলন ।

সুস্থ ব্যক্তির শিথিল—মিনিটে ১৮ বার ।

১৮ দিন, ১৮ মাস, ১৮ বছর, অতীত না হইলে নাকি শৃংগল কুকুর দই ব্যক্তির “জলা-গন্ধের” ফুড়া কাটে না ।

স্বর্ণ বেস্তার সংখ্যা ১৮টি । রজা, নিশ-কেশা ততাদি ।

সম্পদের চিহ্ন ১৮টি । হস্ত, হস্তী, প্রভৃতি ।

মালদহের কছাই জাতি—পূর্বে ১৮ প্রকার তুলার চাব করিত ।

বৈষ্ণব যুগে ১৮ জন পদকর্তা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।

ভারতের উপাসক সম্প্রদায় ১৮ ভাগে বিভক্ত ।

বতি-বন্ধ ১৮ প্রকার ।

নীতামুশাসন ১৮টি । চিত্তবিকার ১৮ প্রকার । বাত যন্ত্র ১৮ প্রকার । বাত যন্ত্রের তালও ১৮ প্রকার,—১। চোতাল, ২। কল্প-গল, ৩। পটতাল, ৪। ব্রহ্মতাল, ৫। ধর্মতাল (ধানার) ৬। ঝল্লতাল (ঝাপতাল) ৮।

ত্রিতালী (কাওয়ালী, তেতালী) ৯। যতি (যৎ) ১০। দেবতাল (কোরদন্ত) ১১। তিওট, ১২। রূপক, ১৩। সুরফাঁক্কা, ১৪। একতালী, ১৫। কাহারবা, ১৬। দাদরা, ১৭। দশকোশী, ১৮। তেওরা ।

শিল্প শাস্ত্রের মতে—বস্ত্র ১৮ প্রকার ।

১। কোম, ২। শাণ, ৩। কাপাস, ৪। উর্ণ, ৫। অস্তপট্ট, ৬। কোশেয়, ৭। কুতপ, ৮। কঞ্চল, ৯। সুস্থল, ১০। কুশাগ্রীয়, ১১। চীনাত্তক, ১২। পুস্তরক্ত, ১৩। আর্বিচ, ১৪। বাদর, ১৫। রাঙ্কব, ১৬। হুগুন, ১৭। আতসী, ১৮। পার্জতী ।

প্রাচীন মতে—প্রধান রাজকর্মচারীর

সংখ্যাও ১৮ । ১। মহাবাহুপতি, ২। মহাসন্ধি বিগ্রহিক, ৩। মহাসর্বাধিকৃত, ৪। মহাপ্রতী-হার, ৫। কোট্টপাল (ভূগ্নরক্ষক) ৬। দো-মাধসামনিক (গ্রাম পরিদর্শক) ৭। চৌরৌদ্ধ-বণিক (পুলিশ কর্মচারী বিশেষ) ৮। নৌবল-ব্যাপ্তক, ৯। হস্তি ব্যাপ্তক, ১০। অশ্বা-ধ্যক্ষ, ১১। গর্বাধ্যক্ষ, ১২। গোম্বিক, ১৩। শৌক্ষিক (স্তম্ভ সংগ্রহকারী) ১৪। দাতা পালিক, ১৫। মহাক্ষপাটলিক, ১৬। বিহর পতি, ১৭। মহামানিক ।

বৈদিক যুগে—স্রোচনী (নথ) সূর্য খাদী (খাড়), প্রবর্ত (কণ্ঠ) প্রভৃতি অষ্টাদশ বিধ অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত ।

## পল্লী-প্রসঙ্গ।

—:—

এবার কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ  
কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত  
আছেন। মকঃশ্বলের স্থানে স্থানেও, ইহার  
প্রকোপ কম নহে। মেদিনীপুরের সহযোগী  
“নীহারে” প্রকাশ,—

বসন্তের প্রকোপ—কাঁধি সহরের উপর ৫ উহার  
পার্বত্য দাক্ষিণ্য, খাগড়াবনী ও ভূপবানপুর প্রভৃতি  
গ্রামে সম্ভ্রুতি বসন্তের ভীষণ প্রকোপ চলিয়াছে।  
বহুলোকে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত  
রহিয়াছে এবং অনেকের মারা গাইতেছে। ইতিমধ্যে  
ঐ সকল স্থানে অনেকগুলি লোক বসন্তে আক্রান্ত হইয়া  
প্রাণ হারাইয়াছে এবং এখনও উহাতে লোক মারা  
গাইতেছে। বসন্ত এক্ষণে বারানসীতে সংক্রামিত  
হওয়ার পল্লীবাসীদের একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

এই রোগের সংক্রামকতার সময় যে  
টাকা লওয়ার প্রয়োজন, তাহাতে আর সন্দেহ  
নাই। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ইহা  
অন্ত যে ব্যবস্থা করিয়াছেন মকঃশ্বলে সেরূপ  
নাই। মেদিনীপুরের “নীহার” বসন্তের  
প্রকোপের সংবাদ দানের পরই লিখিতে-  
ছেন,—

সকলে টাকা লইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত  
হইয়াছে যে, কমিটির নিযুক্ত টাকাদার অবিস্মৃত পরিশ্রম  
করিয়াও সকলকে টাকা দিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।  
কমিটি একজন টাকাদার নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাকেই  
প্রাণে প্রাণে দিয়া টাকা দিতে হইতেছে। এইরূপ ব্যবহার  
এখন এখানে বহুলোকেরই টাকা হইয়া গাইতেছে বটে,  
কিন্তু সর্বত্রই তাহাতে এখন বিনামূল্যে সকলকে টাকা  
দিবার ব্যবস্থা হয়, তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য  
আমরা আমাদের জেলা-বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সর্ববিধ  
অনুরোধ করিতেছি।

“নীহারে”র লেখায় বুঝা গেল, সেখানে  
যাহোক একজনও টাকাদার নিয়োগের ব্যবস্থা  
হইয়াছে, তবে লোক সংখ্যার তুলনায় মাত্র  
একজন টাকাদার যথেষ্ট নহে। কিন্তু ২৪শ  
পরগণার স্থানে স্থানে টাকাদার নিয়োগের  
কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নাই জানিয়া  
আমরা চঃখিত হইতেছি। “ডায়মণ্ড হারবার  
হিঠেয়া”তে প্রকাশ,—

টাকাদার চাই।—ডায়মণ্ডহারবার নগরপ্রাঙ্গণে  
সেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বসন্তের আতঙ্ক প্রচুর।  
\* \* \* কিন্তু টাকাদারের সঙ্গে কয়েক বৎসর ব্যবসা  
দেখা সাক্ষ্য নাই।

ঐ সংখ্যার “ডায়মণ্ডহারবার  
হিঠেয়া”তে আরও প্রকাশ,—

ডায়মণ্ডহারবার সহকুমার অন্তর্গত হুন্সী থানায়  
অন্তর্গতী শাসনবহুর চক্ৰ প্রাঙ্গণের কোন কোন বাড়িতে  
সম্ভ্রুতি বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। হুন্সী থানা বণ্ডে  
এখানে টাকা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। আশা  
করি, শাসন পর্বশেষে শিল্প ইহার প্রতিবিধান করিয়া  
দ্রুত প্রজাধিপত্যকে বাধিত করিবেন।

অবিলম্বে সেনেটারি বিভাগ হইতে ইহার  
ব্যবস্থা করা হউক,—ইহার জন্য আমরা কর্তৃ-  
পক্ষকে অনুরোধ করিতেছি।

বসন্তের প্রাচুর্য্যে তো বঙ্গের অনেক  
স্থানেই বিপদাত্ত, ইহার উপরে বাঙ্গালার  
কোনো কোনো পল্লী হইতে আমরা ইন-  
ফ্লুয়েঞ্জার সংবাদও পাইতেছি। সহযোগী  
“ঢাকা প্রকাশ” চট্টগ্রামের সংবাদে জানাই-  
তেছেন—

হুম্মার ইনফ্লুয়েঞ্জা—হুম্মার সহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা



বোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। গত এক সপ্তাহ এই রোগে ৮ জন লোক মারা গিয়াছে। কোন কোন বাসায় সমস্ত লোকই এই ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইয়াছেন।

জলকষ্টই যে পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতিব গুরু-  
বায় সে বিষয়ে মতভেদ নাই। আধিব্যাধির  
লীনাটিকে তখন বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে রক্ষা  
করিতে হইলে পল্লী জলকষ্ট দূর করিবার  
ক্রম সর্বাগ্রে মনোনিবেশ হইতে হইবে।  
মফঃস্বলের জেলা বোর্ডগুলি অবশ্য এ জুতা  
প্রতিবৎসবই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বাটে, কিন্তু  
সে ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নহে। সহযোগী “হিত-  
বাদীকে” ঢাকাব পিকজালি হইতে একজন  
পত্র প্রেরক নিযুক্তিছেন,—

ঢাকা—পিকজালি। পিকজালি গ্রামটিতে অনেক  
লোকের বাস, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রামে জলকষ্ট  
বৃদ্ধি অধিক। লোকালবোর্ড কতকগুলি ইন্দ্রা  
ধনন করিয়া দিয়াছেন সভ্য, কিন্তু তাহাতে গ্রামবাসীর  
ফলাভাব দূর হয় নাই। গ্রামের ৪৫ মাইল দক্ষিণে  
একটা নদী আছে, সে নদী হইতে জল আনিয়া ব্যবহার  
করা গৃহস্থগণেরপক্ষে অসম্ভব। গ্রামে প্রায় প্রত্যেক  
বাটিতেই কূপ আছে, বয়াকালে সেই কূপ জলে পরিপূর্ণ  
হয় বাটে, কিন্তু ক্রান্তিক মাসে অধিকাংশ কূপই জলশূন্য  
হয়। ইন্দ্রাগুলিও অনেক দূরে অবস্থিত। এই  
গ্রামে অন্ততঃ আর চার পাঁচটা ইন্দ্রা না হইলে বলকষ্ট  
দূর হইবার সম্ভবনা নাই।

আবার বর্ধমান পূর্বস্থলী—নগাড়া হইতে  
একজন সংবাদ দাতা ঐ হিতবাদীতেই জল-  
কষ্টের ফলে সেখানকার দুর্দশার পরিচয়  
দিরাছেন দেখুন,—

কলোয়া, বসন্ত, ইন্দ্র রেঞ্জার এই সমস্ত স্থান অসং-  
খ্যেই পরিণত হইয়াছে। বিগত পানীর জল ও  
চিকিৎসকের অভাব এ অঞ্চলকে চকল করিয়া তুলিয়াছে।  
দুর্ভিক্ষ জল জল ব্যবহার করিয়া লোক রোগাক্রান্ত হইয়া

পড়িতেছে, তাহার উপর তিন জোশের মধ্যে ডাক্তার  
নাই, বিনা চিকিৎসায় ভুগিয়া ভুগিয়া হতভাগ্যগণ  
মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। শমজীবী ও কৃষক  
সম্প্রদায়ই এ অঞ্চলে অধিক। ইচ্ছাদিগকে রক্ষা করিতে  
হইলে সপাণে অন্ন ব্যয়ে চিকিৎসার উপায় বিধান এবং  
জলাভাব দুরীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সংবাদ দাতা ঐ সকল কথা বলিয়া এ  
বিষয়ের প্রতীকার করলে গভর্ণমেন্টের করুণা-  
ভিক্ষা করিয়াছেন। আমরাও সংবাদ দাতার  
প্রতিধ্বনি করিতেছি।

শুধু বসন্ত ও ইন্দ্র রেঞ্জা নহে, মফঃস্বলের  
স্থানে স্থানে কলোয়াও আরম্ভ হইয়াছে।  
“বীৰভূমবাসীতে” প্রকাশ,—

নাগর থানার সংবাদ—পাবুরীগ্রামে ভয়ানক জ্বরের  
হইতেছে। ইতিমধ্যে ১০১২ জন মরিয়াছে।

বাঙ্গালার চিরবাপী জ্বর রোগও ইহারই  
মধ্যে স্থানে স্থানে দেখা দিয়াছে। মেদিনী-  
পুরের “নীহার” এ সংবাদ আমাদিগকে  
সর্বাগ্রে প্রদান করিতেছেন,—

বগম্ভব আক্রমণে অনেকের মারা গিয়াছে।  
আপাততঃ উহার আক্রমণ কতকটা হ্রাস পাইয়াছে।  
জরে ও পেটের পীড়ায় অনেকের আক্রান্ত হইতেছে।

আধিব্যাধির লীলা নিকেতন বঙ্গদেশে  
দাতব্য ঔষধালয়ের সংখ্যা যত বর্দ্ধিত হয় ততই  
মঙ্গলের কথা। রাজসাহীর “হিন্দুজিকা”  
সংবাদ দিতেছেন,—

মোহনপুর থানার একটি সরকারী ডাক্তারখানা  
স্থাপন করিবার জন্ত আয়োজন হইতেছে। স্থানীয়  
সাহায্যে বহিঃপাটন টাকা সংগ্রহ হয় তবে  
রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড তথায় ডাক্তারখানা স্থাপন  
করিতে পারেন।

শুধু তাহাই নহে, রাজসাহী জেলার  
পীড়ার প্রকোপ—বাহুল্য বেরূপ, সে পরিমাণ

চিকিৎসক নাই। এট অভাব দূরীকরণের জন্য রাজসাহী ছাত্রবৃন্দ বাঁহাতে চিকিৎসা শিক্ষার সুবিধা পাইতে পারে, তাহার জন্য কেত কেত উদ্যোগী হইয়াছেন জাশিয়া আমবা আরও সুখা হইয়াছি। 'হিন্দু বক্তৃকা'ই আমাদিগকে সে শুভ সংবাদ জানাইয়াছেন,—

“রাজসাহী টাউনে রাতব্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয় স্থাপনের চেষ্টা”—

অনারবল শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী এম, এ, বিল, মহোদয় রাজসাহী টাউনে একটি “রাতব্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়” স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। রাজসাহী আয়ুর্বেদ সভা তাহার একটি এক্সপেট করিয়াছেন যে উক্ত ঔষধালয়টি স্থাপন করিতে আশা ততঃ এককালীন ৩০০০ তিন হাজার টাকা নগদ ও মাসিক ২০০ ছই শত টাকা খরচ দরকার। বিদ্যমান হুজুর অবগত হওয়া যায় যে গুটিয়ার পাঁচ আনীর রাণী হেমন্তকুমারী দেবী ও কালীমহাজারের মহারাজা বাহাদুর এ বিষয়ে আর্থিক সাহায্য করিতে স্বীকৃত আছেন ও টাউনের মাড়্যারী মহাজন জ্ঞানীরাষ বাবু এককালীন ১০০০ এক হাজার টাকা দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন।

বসন্ত, ওলাউঠা ও ইনফ্লুয়েন্সা তিনটি ব্যাধিই বাঙ্গালা দেশকে বৈরূপ বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ দল যে কি হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়। ২১শে চৈত্রের ঢাকা প্রকাশ সংবাদ নিতে—

সহরের বাহ্য—

সহরের বাহ্যের অবস্থা ভাল নহে। বিপত ছই-প্তাহি বাবত এসহবে ইনফ্লুয়েন্সা রোগ দেখা দিয়াছে। ইনফ্লুয়েন্সার সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়ার আক্রমণও বেশ

আছে। সহরতলী করিয়াবাদ অকলে ওলাউঠাও প্রকট হইয়াছে।

বিজয়পুরের বাহ্য ও শস্ত সংবাদ—

সংবাদভার পক্ষে প্রকাশ যে, বিজয়পুরের অনেক স্থানে ইনফ্লুয়েন্সার আক্রমণ আছে। লোহজঙ্গল গায়ে বনস্তম্ভ দেখা দিয়াছে। শ্রীনগরের নিকটবর্তী হুগাবী-পাড়া ও তংপাশবর্তী কয়েকখানি গ্রামে বনস্তম্ভের প্রকোপ একটু হ্রাস পাইয়াছে।

শিশু মৃত্যু নিবারণের জন্য কলিকাতায় স্বাস্থ্য বিভাগ চূড়ান্তে ‘বেজাপ চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে টহার ফল যে শুভ হইবে তাহা আশা করা যায়। মকঃবলেও এইরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত। নদীয়ার ‘বঙ্গবন্ধু’ প্রকাশ,—

সম্পত্তি নদীয়ার সিবিল সার্জেন মহোদয়ের সভাপতিত্বে কুলনগরে স্থানীয় শিশুদের অকাল মৃত্যু নিবারণ কল্পে এখানে একটি সমিতি গঠিত করিয়াছেন। আগামী এপ্রিল মাস হইতে এই সমিতির কার্য করিবাকল্প এক জন শিক্ষিতা খাত্তী স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে। এই খাত্তী প্রত্যেক গরীব লোকের বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে প্রসবকালে সাহায্য করিবেন এবং শিশু রক্ষা বিষয়ে উপদেশ দিবেন কেবল মাত্র তাহার গাড়ী ভাড়া দিলেই হইবে। অতি গরীব হইলে ঐ গাড়ীভাড়া পর্যন্ত সমিতি বহন করিবে। গরীব ভিন্ন অন্তলোকের জন্য এই সমিতিতে দুই কক্ষে ৫ টাকা জমা দিলেই ঐ খাত্তী সন্তান প্রসব হইতে ছয় দিন পর্যন্ত প্রত্যাহ একবার করিয়া প্রত্যহ প্রসূতিকে দেখিরা আসিবেন। গাড়ীভাড়া আলাহি দিতে হইবে।

ছহর এবং সিংসহায় নগরবর্তী স্ত্রীলোকদের বহু সম্ভব প্রসবের সময় এবং ছয় দিন পর্যন্ত পথি বিরা সাহায্য করিবেন।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৭—জ্যৈষ্ঠ।

৯ম সংখ্যা।

## শারীর বিজ্ঞা।

(পূর্বস্বয়ংক্রিয়)

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস।

### জতুকাঙ্ঘ্রি। \*

জতুকাঙ্ঘ্রি • (২৭৭ চিত্র)—জতুকাঙ্ঘ্রি শিরঃসম্পূর্কের মধ্যস্থিত নির্ধাণকায়ক, জতুকার (চর্মচকের) দ্বারা আকৃতি বিশিষ্ট এবং সমস্ত শিরঃকপালের কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ। ইহার চারিটা অংশ যথা,—মধ্যে জতুকাশরীর উভয় পার্শ্বে বৃহৎ পক্ষিত্বর ও নিয়ে ক্ষুদ্র পক্ষিত্বর এবং সর্বনিম্নে চরণদ্বয়। তদ্বাধ্যে—

(১) 'জতুকাশরীর' নামক মধ্যস্থ পিণ্ড উচ্চাঘট এবং শুল্কগর্ভ। ইহার গর্ভস্থিত কোটিরগুলি 'জতুকাণ্ডকোটর' নামে অভিহিত এবং বর্ষারাহির কোটির সকলের সহিত সংমিলিত।

জতুকা শরীরের চারিটা তল, যথা—

\* ইং—Sphenoid Bone—খিলকোট বোনা।

সম্মুখ তল, পশ্চাৎ তল, উর্দ্ধ তল এবং অবন্তল। তদ্বাধ্যে—

(ক) সম্মুখ তল বর্ষারাহির উভয়দিকের পার্শ্বপিণ্ডের সহিত সন্ধিযুক্ত এবং উহার মধ্যদেশের সম্মুখত রেখা বর্ষারাহির মধ্যকলকের সহিত সংযুক্ত। সম্মুখের উর্দ্ধভাগে 'জিকোণকটক' নামক একটি চূড়াকার প্রবর্তন আছে, উহা বর্ষারাহির ছাদের দ্বারা কলকের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে।

(খ) পশ্চাৎ তল চতুর্কোণ এবং পশ্চাৎকপালের মূলভাগের সহিত সন্ধিযুক্ত।

(গ) উর্দ্ধতলে জিকোণকটকের পশ্চাৎ 'দৃষ্টিনাড়ীপরিধা' নামে একটি পরিধা আছে এবং উক্ত পরিধায় দুইপ্রান্তে 'দৃষ্টিনাড়ী রন্ধ্র' নামে দুইটি ছিদ্র আছে। এই পরিধা 'দৃষ্টিনাড়ী' ধারনের জল এবং স্বাস্থ্য



(৬) জতুকাশরীরের অধঃস্থল নাসাগুহা নকশাবিবরের আচ্ছাদন' হৃত। উহাতে যে অধঃস্থল ও উন্নতাগ্র রেখা আছে, উহা 'বদ-নিকা' নামে অভিহিত। এই বেখা নাসিকার মধ্যপ্রাচীরভূত সৌরিকাস্থির পশ্চিম প্রান্তের দ্বারের সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

(৭) বৃহৎ পক্ষতিবর্ষ জতুকাশ্রীর উত্তর দিকে লম্বাংশে পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রায় ত্রিকোণাকার। এক এক পক্ষের তিনটি তল, যথা—উর্দ্ধতল, সম্মুখতল এবং বহিস্তল।

(ক) উর্দ্ধতলের নাম 'পক্ষতিপৃষ্ঠ'। ইহা মস্তিস্কের মধ্যভূমিভূত এবং উহাতে 'বৃহৎবিবর' ও 'জাঘববিবর' নামে দুইটি বিবর আছে। এই দুইটি বিবরের ভিতর দিয়া পক্ষম নাড়ীর মধ্য ও পশ্চিম শাখা যথাক্রমে নির্গত হইয়া থাকে। ইহার মূলে কোণ বিবর' নামে যে ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া 'কলাপোষণী' ধমনী প্রবেশ করিয়া থাকে।

(খ) সম্মুখতল চতুর্ভুজ এবং নেত্রকূটের স্ফিঃপ্রাচীর স্বরূপ।

(গ) বহিস্তল বিশেষ উচ্চাবচ এবং 'লম্বা-ধরিকা' রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। বেখার উর্দ্ধভাগ লম্বাংশে নির্মাণকারক ও লম্বাচ্ছদা পেশীর প্রভুকল; অধোভাগ গণ্ড-মূলের খাতে সংস্থিত।

(৩) লম্বপক্ষতিবর্ষ জতুকাশরীরের সম্মুখে উত্তর দিকে অবস্থিত এবং পুরুকপালাস্থির

'নেত্রচ্ছদিক'বর্ষের সহিত সন্ধিস্থ। ইহাদের মধ্যে উভয়ের সংযোজক 'ত্রিকোণ-বর্টক' এবং তদ্ব্যতীত দুইটি নাড়ী রক্তদ্বয়েব বিবর পূর্বেই বলা হইয়াছে।

লম্ব ও বৃহৎ পক্ষতিবর্ষের মধ্যে এক এক দিকে য়ে ত্রিকোণপ্রায় স্বয়ংবল আছে, উহারা 'পক্ষাস্তরাল' নামে অভিহিত। এই দুইটি অস্ত্রমালের ভিতর দিয়া তৃতীয়া, চতুর্থী ও ষষ্ঠী নাড়ী, পক্ষমী নাড়ীর নেত্রগামিনী প্রথম শাখা এবং নেত্রগামিনী শিরা ও ধমনী নির্গত হইয়া থাকে।

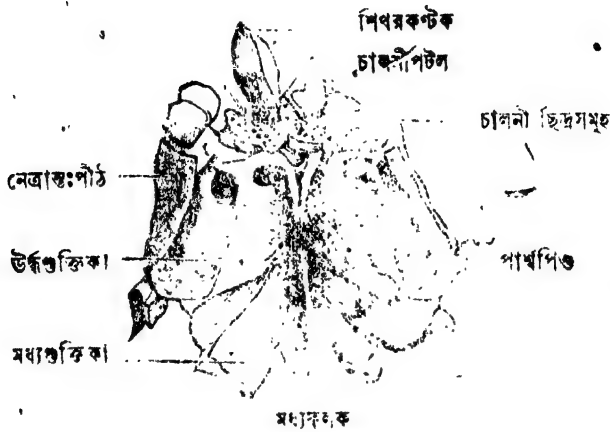
(৪) চরণবর্ষ জতুকাশ্রীর পশ্চাৎ প্রান্তের উভয় দিক হইতে নিম্ন দিকে বিস্তৃত। এক এক চরণে দুইটি করিয়া অস্থিকণ্ডক আছে। তদ্ব্যতীত সম্মুখতল কলক আয়তপৃষ্ঠ এবং পশ্চাত্তের কলক অস্থিশাখা। এই অস্থিকে আশ্রয় করিয়া 'তালুতংগনী পেশী' বিবর্তিত হইয়া থাকে। উত্তরচরণের মধ্যে যে সুবাক্ত অস্ত্রমাল আছে, তথায় তাবস্থি সংহিত হইয়া থাকে।

সন্ধি—জতুকাশ্রীর আটখানি শিরঃ-সম্পূট নির্মাণক অস্থির সহিত এবং গণ্ডাঙ্কি-বর্ষ, তাবস্থিষ্ণু ও সৌরিকা—এই পাঁচখানি মুখমণ্ডলের অস্থির সহিত সন্ধিস্থ। সন্ধান প্রকার চিত্রে জটিল।

পেশী—জতুকাশ্রিতে এক এক দিকে এগারটি করিয়া পেশী সংযুক্ত থাকে। যথা—বৃহৎ পক্ষতির বহিস্তলে দুইটি, লম্বপক্ষতির সম্মুখভাগে অক্ষিকূটগ ছয়টি, এবং চরণ কলকে তিনটি পেশীর সংযোগ আছে।

[ ২৮শ চিত্র—ঝরঝরি ]

( পশ্চাৎ চাইতে দৃষ্ট - স্বাভাবিক আয়তন )



**ঝরঝরি**—ঝরঝরি নামক নাসা-  
মূলগত শিঙাকার অস্থি ছিদ্রবহুল এবং অক্ষি-  
কোটরবয়ের অন্তরালে গৃহীতাবে অবস্থিত।  
ইহার তিনটা অংশ বধা,—মধ্যকলক, চালনী-  
পটল এবং পার্শ্বপিণ্ডবয়। অর্থো—

(১) মধ্যকলক—নাসামূলের মধ্য প্রাচীর  
নির্মিণের সহায়ত্ব পাঠ্য কলকের জায়।  
ইহার অগ্রধাংশ পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক  
এবং নাসাস্থিরদের পরস্পর সংযোগ ধারা  
সংস্থিত তটর থাকে। পশ্চাৎ স্বাভাবিক জড়-  
কান্তির পুরঃসংস্থিত বদনিকাথা মধ্যরেখা  
এবং নামক সীমিক: অস্থি সংস্থিত হয়।  
অধোধারা নাসাগ্রভাগের মধ্যপ্রাচীরত্ব  
ত্রিকোণাখ্য তরুণান্তির সহিত সন্ধিস্থক।

(২) চালনীপটল—নাসামূলের ছাদস্বরূপ,  
চালনীর জায় স্বল্প ছিদ্রবহুল এবং মধ্য-  
কলকের মস্তকে সংলগ্ন। ইহার চূড়ার

'শিখরকণ্টক' নামে যে প্রবর্তন আছে তাহা  
'দ্বিত্রিকা' কলাভাগ সংযুক্ত থাকে এবং ইহার  
যে সকল স্বল্প স্বল্প ছিদ্রপথ আছে তাহাব  
ভিতর দিয়া গজগ্রাণ্ধিবা নাড়ীব প্রতানসমূহ  
নাসামধ্যে বিস্তৃত হয়।

(৩) পার্শ্বপিণ্ডবয় মস্তকের জায়  
ছিদ্রগত এবং পূর্ব পার্শ্বা পত্রবধে অস্থি দ্বারা  
নির্মিত। প্রত্যেক পার্শ্বপিণ্ডের চরিত্র তল  
অর্থো উর্দ্ধ তল কোটরবহুল এবং পুরঃ-  
কপালের মধ্যপ্রাচীর পরিধির সহিত  
সংস্থিত। পুরঃকল অগ্রপীঠবয় ও উর্দ্ধ হৃদয়-  
বয়ের সহিত সন্ধিস্থক এবং উহার অধঃস্থিত  
কোটরপটল নাসাগ্রহার সহিত সংমিলিত।  
পশ্চাৎ তলও 'ছিদ্রবহুল এবং অজ্ঞকান্তির  
কোটরসুত পুরঃকলের সহিত সন্ধিস্থক।  
গজন্তন নাসাগ্রহার পার্শ্বপ্রাচীর স্বল্প এবং  
হৃদয়ানি স্বল্প শক্তিকার অস্থিকলক  
বিশিষ্ট। উক্ত শক্তিকার অস্থি হৃদয়ানি

যথাক্রমে উর্দ্ধভুক্তিকা এবং মধ্যভুক্তিকা নামে অভিহিত। উর্দ্ধভুক্তিকা নাসাগুহার উর্দ্ধ প্রান্তের \* এবং মধ্য ভুক্তিকা মধ্যপ্রান্তের চূড়ার স্বরূপ। মধ্যভুক্তিকার কিঞ্চিৎ নিম্নে অংশভুক্তিকাহির সন্ধিস্থান। হিন্তুল শূচিকণ চতুষ্পাশ্বে ফলকনির্মিত এবং নেত্রকোটের অন্তঃপাঠনির্মাপক বলিয়া 'নেত্রান্তঃপাঠ' নামে অভিহিত।

সন্ধি—ঝরুয়াস্থি মস্তকের তেরখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা—পূরঃকপাল, চূড়াকৃষ্টি, সৌরিকা এই তিনখানি একক অস্থির সহিত এবং নাসাস্থি, উর্দ্ধহৃদস্থি, ক্রান্তস্থি, অক্ষপাঠাষ্টি ও ভক্তিকৃষ্টি—এই পাঁচটা যুগ্ম অস্থির সহিত।

এই অস্থির সহিত কোন পেশীর সংযোগ নাই।

কপাল চক্রক। + মস্তকের কপালাস্থি সমূহের সীমস্তে দৃষ্ট্য ধারার মধ্যে কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার অস্থি সমূহ দেখা যায়। ঐরূপ অস্থি প্রায়ই পূর্বা কপাল বয়ের সন্ধিহলে—বিশেষতঃ ব্রহ্মরক্ষ এবং শিবরক্ষের নিকটে দেখা যায়। উদ্ভাদের অস্থিহেব কোন নিম্নস্থ নাট বলিয়া পূর্ণক ভাবে গণনা করা হয় না।

মুখমণ্ডলের অস্থি।

মুখমণ্ডল চতুর্দশ খানি অস্থির দ্বারা নির্মিত, যথা—হুইখানি নাসাস্থি, হুইখানি উর্দ্ধহৃদস্থি, হুইখানি অক্ষপাঠাষ্টি, হুইখানি

\* প্রত্যেক নাসাগুহা ত্রিভঙ্গ এবং তিনটা শ্রেত বা হ্রদপথযুক্ত। হ্রদপথগুলির যিহেব স্রবী পথে বিখিত হইবে।

+ ইং—Wormian Bones ওয়র্মিয়ান বোনস

গুণ্ঠাষ্টি, হুইখানি ক্রান্তস্থি, হুইখানি ভক্তিকৃষ্টি; একখানি সৌরিকাষ্টি, এবং এক খানি অধোহৃদস্থি। তন্মধ্যে হৃদস্থির তরুণ চরুণাদি কাণ্ডা স্থান এবং অত্যাচ্ছ অস্থি গুলি চক্ষু নাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠান নির্মাণ ও অত্যাচ্ছ কাণ্ডা করিয়া থাকে।

নাসাস্থি\*—নাসাস্থি হুইখানি নাসা-মূলে অবস্থিত বহিঃপৃষ্ঠে মাজ এবং অন্তর্ভাগে কোরোবর। ইহারা মধ্যরেখার পরস্পর সংহিত নাসাস্থিদের উর্দ্ধপ্রান্ত পূরঃকপালাস্থির নাসামূলধাতের সন্ধিত এবং বহিঃপার্শ্ব উর্দ্ধহৃদস্থির নাসাকূটের সন্ধিত সন্ধিযুক্ত। ইহাদের অধঃপ্রান্ত নাসাপার্শ্বিক নামক তরুণাস্থিদের সহিত সংহিত। পশ্চাত্-ভাগে পরস্পরের সন্ধান রেখায় পূরঃকপালের অগ্রকণ্ঠক এবং ঝরুয়াস্থির মধ্যকলক সংহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নাসাস্থির বহিস্থলের মধ্যে দিরা প্রবেশের জন্য যুগ্ম ছিদ্র আছে এবং তদাত্তর ভাগে নাসানাড়ী ধারণের জন্য পরিধা দৃষ্ট হয়।

[ ২৯শ চিত্র—নাসাস্থিবয় ]

(দৃশ্য দৃষ্ট)

উর্দ্ধপ্রান্ত



অধঃপ্রান্ত

সিরাঙ্কিত্র—  
পরস্পর  
সন্ধান রেখা

বহিঃপার্শ্ব

\* ইং—Nasal Bones—নাসাল বোনস

**সন্ধি**—প্রত্যেক নাসাহি পূর্বোক্তরূপে চারিখানি অস্থির সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

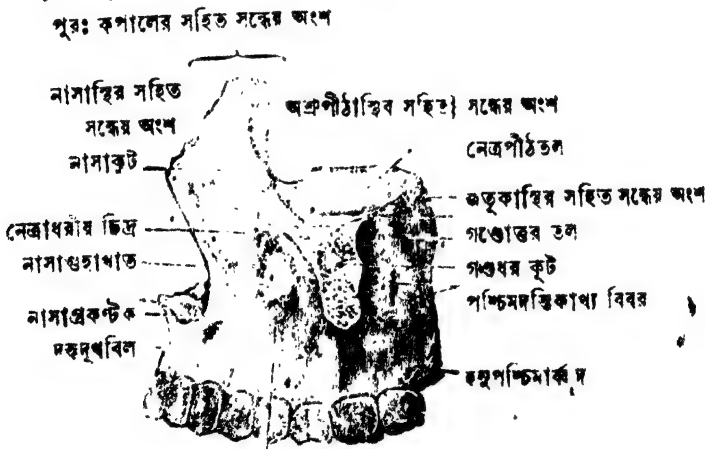
**উর্দ্ধহস্থি\***—এইখানি উর্দ্ধহস্থি পরস্পর সংহিত হইয়া তালুপটল ও দন্তোদ্বল সহিত উর্দ্ধ হস্তমণ্ডল নিশাণ করিয়া থাকে। নাসাকোটেরদ্বয়, নেত্রপীঠের এবং মুখমণ্ডলের সমুখ ও পাশ্চ ভাগ প্রধানতঃ ছইটি উর্দ্ধহস্থি দ্বারা নিশ্চিত। আকারে বড় হইলেও এই অস্থির শূন্যগর্ভ বলিয়া হালকা।

প্রত্যেক হস্থির পাঁচটি অংশ, যথা মধ্যস্থলে হস্থপিণ্ড এবং চতুঃপার্শ্বে চারিটা প্রবর্জন।

উপরের প্রবর্জন নাসাকূট, বহিঃপার্শ্বের প্রবর্জন গণ্ডধরকূট, অন্তঃসীমার প্রবর্জন তালুপটল এবং অধঃসীমার প্রবর্জন দন্তোদ্বল নামে অভিহিত। তদ্বাখ্যে—

(১) হস্থপিণ্ড—হস্থির শূন্যগর্ভ মধ্যপিণ্ড। ইহা চারিটা ভাগে বিভক্ত। তদ্বাখ্যে ‘মৌখিকতল’ বহিমুখমণ্ডলে পরিদৃষ্টবান, ‘গণ্ডোত্তর’ তল গণ্ডধরকূটের পশ্চাতে অবস্থিত, ‘নেত্রপীঠতল’ নেত্রকোটের ভূমিস্বরূপ এবং ‘মাস্তুরতল’ নাসাবিপর ও মুখবিবর্ধের প্রাচীর স্বরূপ। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। যথা—

[ ৩০শ চিত্র—উর্দ্ধহস্থি ( বহিস্তল ) ]



হস্থপিণ্ড—মৌখিকতল

(ক) মৌখিকতলে—নেত্রকোটের নিম্ন প্রান্তে নেত্রধরীর নামে ছিদ্র আছে। উক্ত ছিদ্রপথ দিয়া নেত্রধরীর নাকী ও ধমনী নির্গত হইয়া থাকে।

(খ) গণ্ডোত্তরতলে—এই নারীর খাতের প্রাচীর স্বরূপ এবং অক্ষাংশ পেশী দ্বারা আবৃত। গণ্ডোত্তরতলে ‘পশ্চিম দিক্কাখা নাকী’ ও ধমনী প্রবেশের কত যে সকল ছিদ্র আছে, তাহার ‘পশ্চিমদিক্কাখা’ নামে অভিহিত। ইহার পশ্চাদ্ভাগে হস্থপিণ্ডমার্গ নামে

\* ই—Superior Maxillary Bones—  
হস্থির ব্যারিলাসি বোঝে।



যে উচ্চাবচ উৎসেধ আছে, তাহা তাবস্থির সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া থাকে ।

(গ) নেত্রপীঠতল—নেত্রকোটরের ভূমির সম্মুখভাগ নির্মাণ করিয়া থাকে । ইহার অঙ্গ-সীমায় ‘অশ্রুপীঠখাত’ নামে যে খাত আছে, তথায় অশ্রুপীঠাঙ্গি সংস্থিত হয় । বহির্ধারা বর্ষারক ও জীবস্থির সহিত সন্ধিবদ্ধ । বহিঃপ্রান্তে নেত্রবিস্ময় পেশী ও ধমনী ধারনের জন্ত স্থান খাত এবং ‘অগ্রনস্তিক’ নাকী প্রবেশের ছিদ্র আছে ।

(ঘ) আন্তরতল—নাসাবিবর ও মুখবিবরের বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত । ইহার পুরঃসীমায় ‘নাসাখাত’ নামে যে মহৎ খাত আছে, তাহা তালুককের দ্বারা মধ্যদেশে দুইভাগে বিভক্ত—উর্দ্ধভাগ নাসাগুহার অংশ ও অধোভাগ মুখবিবরের অংশ । ইহার পার্শ্বে ‘হৃৎগর্ভকোটর’ নামে যে বৃহৎ কোটর আছে, তাহা নাসাগুহার মধ্যস্থলের সহিত সংমিলিত । জীবিত ব্যক্তির শরীরে এই কোটর-বর্ষারক, শুক্রিকা ও তাবস্থি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও উহারে একটি স্থল শলাকা প্রবেশের উপযুক্ত দ্বার থাকে এবং উহার অভ্যন্তরভাগ কলাবিশেষের দ্বারা আবৃত থাকে । পৌনস রোগে কখন কখন এট হৃৎগর্ভকোটরে পুরস্কার হইয়া বিভ্রাট উৎপন্ন হয় ।

(২) নাসাকূট—নাসামূলের পার্শ্বগত প্রবন্ধন । ইহা উর্দ্ধে পুরঃসীমার সহিত মধ্যরেখার নাসিকান্তির সহিত ও বহিঃসীমায় অশ্রুপীঠাঙ্গির সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া থাকে । ইহার অন্ততল নাসিকার মধ্যস্থল নির্মাণের জন্ত খাতোদর এবং দুইটি রেখাঙ্ক ; রেখা-বহের একটির সহিত বর্ষারস্থির দ্বার শুক্রিকা

ভাগ ও অপরটির সহিত অধঃশুক্ৰিকাঙ্গি সন্ধিবদ্ধ হইয়া থাকে । ইহার পশ্চাদ্ভাগে যে পরিধা আছে, তাহা ‘অশ্রুবাহিকা’ স্রোতঃ ধারণ করিয়া থাকে । এই অশ্রুবাহিকা স্রোতঃপথে বোধনকালে অশ্রুজল নাসিকার প্রবেশ করে ।

(৩) গণ্ডধরকূট—ইহা বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত ত্রিকোণাকার উৎসেধ—ইহা গণ্ডাঙ্গির সহিত সন্ধিবদ্ধ ।

(৪) তালুকলক—তালুর সম্মুখভাগ নির্মাণকারক ও হৃৎপিণ্ডের অন্ততল হইতে উৎপত্ত । ইহার উর্দ্ধতল নানাত্বনি এবং তালুর ছাদ স্বরূপ । মধ্যরেখার ইহা অপর উর্দ্ধহৃৎস্থির তালুকলকের সহিত সংসক্ত থাকে এবং এইরূপে সংস্থিত কলকের মধ্যরেখার অধঃতল সম্মুখভাগে অধঃতলে ‘অগ্রতালুখাত’ নামে একটি খাত দেখা যায় । উক্ত খাতে যে চারিটি ছিদ্র আছে তাহাদের ভিতর দিয়া নাসা ও তালুগামিনী নাকী ও ধমনী সকল তালুতে প্রবেশ করিয়া থাকে । উক্ত সন্ধি-রেখার উর্দ্ধতলে সম্মুখ দিকে যে সমুদ্রত রেখা আছে, তথায় সৌরিকান্তির সহিত হয় । তালুকলকের পশ্চিম দ্বারার সহিত তাবস্থির হৃৎ-পত্রক নামক অংশ সন্ধিবদ্ধ হইয়া থাকে ।

(৫) দন্তোদ্বলিক—দন্তোদ্বলধারক অর্ধঃস্রোতার অধোমুখ প্রবন্ধনের নাম ‘দন্তোদ্বলিক’ । ইহাতে বামো পাটী ও বোবনে আটটি দন্তোদ্বল থাকে এবং ঐ সকল উদ্বল বা কোটরে সমসংখ্যক দন্ত নিবিষ্ট থাকে ।

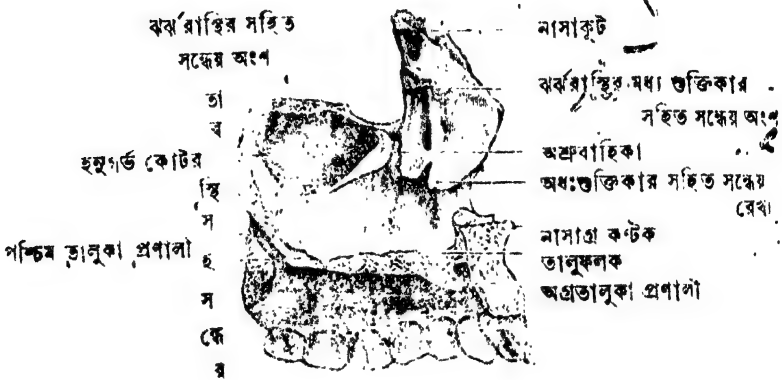
সন্ধি—প্রত্যেক উর্দ্ধহৃৎস্থির অপর উর্দ্ধহৃৎস্থি, বর্ষারক, পুরঃসীমার, পশ্চাদ্ভাগ

নাসাহি, অশ্রুপীঠাহি, সৌরিকাহি, ভাবহি ও  
তক্তিকাহি—এই নয়খানি অস্থির সহিত  
সন্ধিস্থক ।

পেশী—প্রত্যেক উর্দ্ধ হৃদস্থিতে এগারটি

করিয় পেশীর সংযোগ আছে । এই সকল  
পেশী নেত্রের উন্নীলন ও নিম্নীলন, নাসা ও  
অধরের সঙ্কোচন ও বিস্তারণ এবং চর্মণাদি  
কার্য করিয়া থাকে ।

[ ৩১শ চিত্র—উর্দ্ধহৃদস্থি ( অন্তস্তল ) ]

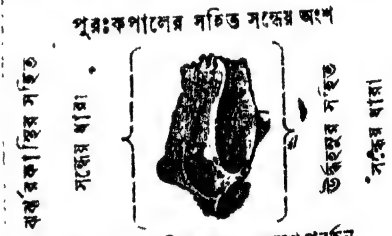


অশ্রুপীঠাহি—অশ্রুপীঠ নামক

কূড়াহি নাসাহির ও উর্দ্ধহৃদস্থির নাসাকূটের  
পশ্চাতে অক্ষিকোটরপার্শ্বে দুইদিকে দুইখানি  
গূঢ় ভাবে অবস্থিত । উভারা পাতলা পত্রবৎ  
অস্থি দ্বারা নির্মিত এবং দেখিতে কতকটা  
অর্ধপাত্র বা কোণারি ভায় । 'অশ্রুবাহিকা'  
প্রণালী ধারণ করে বলিয়া উভারা অশ্রুপীঠ  
নামে অভিহিত ।

প্রত্যেক অশ্রুপীঠের দুইটি তল—বহিস্তল  
ও অন্তস্তল । বহিস্তলে অশ্রুপীঠের ধারপের  
কত অশ্রুবাহিকা প্রণালীর খাঁক দেখা যায় ।  
অন্তস্তল বর্ধরাস্থির কোটরদ্বারের অক্ষাংশ  
বক্রপ ।

[ ৩২শ চিত্র—অশ্রুপীঠাহি(বহিস্তল) ]



তক্তিকার সহিত সন্ধের অস্থি প্রবর্তন  
প্রত্যেক অশ্রুপীঠের চারিটি ধারা ।  
তন্মধ্যে উর্দ্ধ ধারার সহিত পুরুকপালাহি,  
অধোধারার অগ্রভাগস্থিত কূড়াধারার প্রবর্ত-  
নকের সহিত তক্তিকাহি, সমুখ ধারার উর্দ্ধ  
হৃদস্থির নাসাকূট এবং পশ্চিম ধারার বর্ধরা-  
স্থির নেত্রাভ্যন্তরে সংস্থিত হইয়া থাকে ।

অশ্রুপীঠাহি—নাসাগ্রকণ্টকের

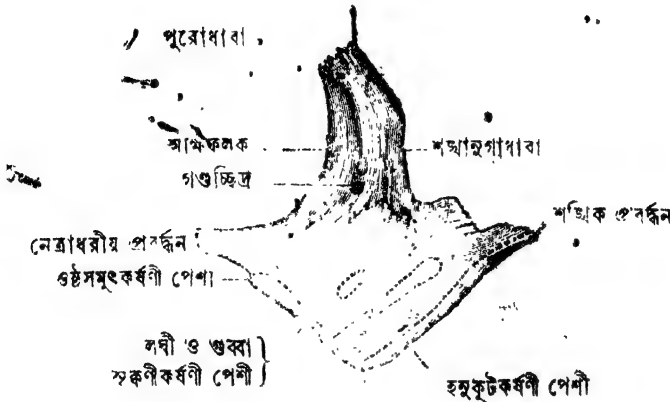
\* ই—Lachrymal Bones—ল্যাক্রিমাল

\* ই—Malar Bones—মেলার বোব ।

স্বাক্ষিত, বিশিষ্ট হই পানি গণ্ডাহি গণ্ডদেশে হয়। যাত্যক গণ্ডাহির দুইটা তল—বহি-  
মবহিঃ। উহাদের দ্বারা গণ্ডদেশের উৎসেধ-স্থল ও অন্তস্থল। তন্মধ্যে—  
৪য় ও নেত্রকোটরভূমির কিয়দংশ নিশ্চিত।

[ ৩৩শ চিত্র—বামগণ্ডাহি (বহিস্তল) ] .

অপাঙ্গ প্রবর্দ্ধন .



গণ্ডকূটের অধঃকোটি

বহিস্তল—মাত্রপৃষ্ঠ এবং নাকী ধমনী  
নির্গমের অস্ত্র 'গণ্ডচ্ছিত্র' নামক ছিত্র বিশিষ্ট।  
ইহা দ্বারা 'গণ্ডকূট' বা গালের উরঠ প্রদেশ  
নিশ্চিত হয়।  
অন্তস্থল—কোরোদর। ইহার বহুর  
ত্রিকোণাকার অংশে উর্দ্ধ হৃৎস্থির গণ্ডধরকূট  
সংহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক গণ্ডাহির চারিটা প্রবর্দ্ধন আছে।  
তন্মধ্যে তিনটী স্বাধীন সমুখ, পশ্চাৎ ও উর্দ্ধ  
কোটরূপে অবস্থিত এবং একটা ত্র্যক্ষিকোটর  
ভূমিতে প্রবিষ্ট। তন্মধ্যে—

(১) 'নেত্রাধারীয়' নামক সমুখ প্রবর্দ্ধন  
হৃৎস্থি ও উর্দ্ধ হৃৎস্থির সহিত নেত্রের নিম্ন-  
ভাগে সংহিত।

(২) 'শঙ্খিক' নামক পশ্চাৎ প্রবর্দ্ধন  
শঙ্খাহির গণ্ডপ্রবর্দ্ধনের সহিত সংহিত।

(৩) উর্দ্ধ প্রবর্দ্ধন অপাঙ্গাতিমুখ বলিয়া  
'অপাঙ্গ প্রবর্দ্ধন' নামে খ্যাত। ইহা পুরঃ-  
কপালের বাহু কোণের সহিত সংহিত হয়।

(৪) নেত্রভূমিগত প্রবর্দ্ধন উর্দ্ধ প্রবর্দ্ধন  
ও পুরঃপ্রবর্দ্ধনের মধ্যস্থিত এবং অক্ষিকোটর  
ভূমির অংশ ভূত। ইহা 'অক্ষিকলক' নামে  
খ্যাত ও 'ঈষৎ' খাতোদর। ইহাতে নাকী  
প্রবেশের অস্ত্র 'শঙ্খগণ্ডিক' নামক একটা কৃষ্ণ  
মার্গ আছে, উহা গণ্ডচ্ছিত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।  
অক্ষিকলকের দ্বারা পশ্চীতে জটুকাহির  
সহিত সংহিত হয়।

গণ্ডাহির অধঃকোটি কোন অস্থির সহিত

সংহিত হয় না—ইহা গণ্ডকূটে অকের নিয়ে  
অমৃতব করা যায়।

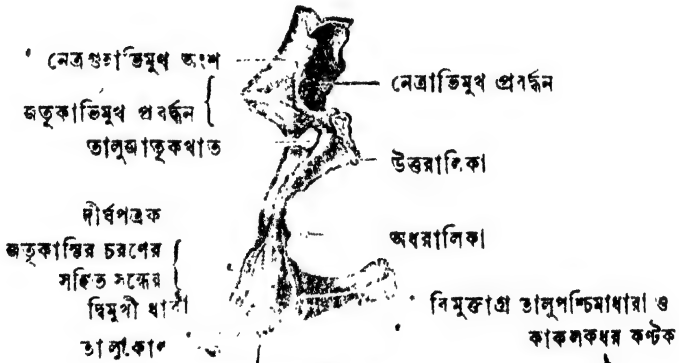
সন্ধি—প্রত্যেক গণ্ডাঙ্গি শঙ্খাঙ্গি,  
পূবঃকপাল উর্দ্ধহৃদি ও জতুকাঙ্গি—এই  
চাবিধানি অঙ্গির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

পেশী—প্রত্যেক গণ্ডাঙ্গিতে পাঁচটা  
করিয়া পেশী সংস্কৃত। যথা, বহিস্তলে ওষ্ঠ  
সমুৎকর্ষণণী, এবং লবু ও গুরু স্কন্ধনীকর্ষণী;  
অন্তস্তলে শঙ্খাঙ্গনা এবং হস্তকূটকর্ষণী।

ভাঙ্গাঙ্গি\*—নেত্র ও নাসাকূহের  
পশ্চাতে খনিজ বা কোদালের জায় আকাধি  
বিশিষ্ট পাতলা পত্রবৎ অঙ্গি নির্মিত হইখানি  
তাবঙ্গি অবস্থিত। ইহারা নেত্রকোটরভূমি,  
নাসাত্ত্বিকপার্শ্বের এবং তালুগটল নির্মণের  
সহায়তা করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভাঙ্গাঙ্গির  
পাতলা পত্রময় দুই অংশ—দীর্ঘপত্রক এবং  
ক্রুপপত্রক। \* তদ্বাখ্যে—

[ ৩৪শ চিত্র—ভাঙ্গাঙ্গি ( বাম ) ]

( পশ্চাৎ হইতে দৃষ্ট )



অধরালিকাকূট করণী পেশী

(১) দীর্ঘপত্রক—নেত্রকোটরের তিত্তর  
দিক হইতে তালুপল্ল পর্ষায় আলম্বিত। ইহার  
সমুখধারা উর্দ্ধহৃদির পিণ্ডভাগের পশ্চাতে  
সংহিত। পশ্চিম ধারা চুই মুখ বিশিষ্ট এবং  
জতুকাঙ্গির চরণকলকধরের মধ্যে সংহিত।  
ইহার অন্তস্তল মসৃণ এবং সমুন্নত দুইটা বেখা  
বা আলি দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। 'উত্তরা-  
লিকা' নামক উর্দ্ধভিত্ত আলির সহিত জতু-  
কাঙ্গি মধ্যভাগিকা নামক অংশ সংহিত হইয়া

থাকে। 'অধরালিকা' নামক অধঃস্থিত  
আলির সহিত অধঃস্তম্বিকাঙ্গি সংহিত হয়।  
উক্ত আলি-দ্বয়ের মধ্যদেশ নাসিকার মধ্য  
স্থত্বের সহিত মিলিত এবং ইহার উর্দ্ধ ও  
অধোভাগ নাসিকার উর্দ্ধ ও অধঃ স্থত্বের  
সহিত সংলগ্ন।

দীর্ঘপত্রকের বহিস্তল উর্দ্ধহৃদির আজ-  
স্তর ত্বলের সহিত সংহিত হইয়া থাকে।  
উহাতে 'পল্লিমতালুকা' নামক দুই প্রণালী  
আছে।

দীর্ঘপত্রকের চূড়ায় সমুখ ও পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত দুইটি প্রবর্দ্ধনক আছে। তন্মধ্যে সমুখ দিকে বিস্তৃত প্রবর্দ্ধনক নেত্রকোটর-ভূমিতে প্রবেশ করে এবং জতুকা, ঝরঝরক ও উর্দ্ধহৃৎস্থির নেত্রপীঠকলকের সহিত সন্ধিস্থিত হইয়া থাকে। পশ্চাৎদিকে বিস্তৃত প্রবর্দ্ধনকের সহিত জতুকাস্থি সহিত হয়। উভয় প্রব-  
র্দ্ধনকের সন্ধিস্থলে 'অন্তস্তল' নামে যে খাঁজ আছে, তাহার ভিতর দিম্বা, নাড়ী ও ধমনী নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করে।

(২) হৃৎপত্রক দীর্ঘপত্রকের মূল হইতে ত্রিগুণভাবে উন্নত ও অন্তমুখ। ইহার উর্দ্ধতল নাসাভূমির এবং অধস্তল তালুপটলের পশ্চাদ্ভাগে নির্মাণ করিয়া থাকে। ইহার সমুখী ধারা উর্দ্ধহৃৎস্থির তালুকলকের সহিত সন্ধিস্থিত; পশ্চাৎ ধারা মুক, ইহা কোমল তালুর কিয়দংশ ও কাকলক (আলজিব) ধারণ করে।

প্রত্যেক হৃৎপত্রকের অগ্রভাগে অপর তাবস্থির হৃৎপত্রকের সহিত সন্ধিস্থিত হয় এবং উভয় সন্ধিরেখার উপর পৃষ্ঠে সীরিকাস্থি সংহিত হইয়া থাকে। হৃৎ ও দীর্ঘ পত্রকদ্বয়ের সন্ধিকোণ 'তালুকোণ' নামে অভিহিত।

সন্ধি—প্রত্যেক তাবস্থি নিম্নলিখিত ত্রয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিস্থিত। যথা, ঝরঝরক, জতুকা, শুক্তিকা, সীরিকা উর্দ্ধহৃৎস্থি এবং অপর তাবস্থি।

পেনী—প্রত্যেক তাবস্থিতে চারিটি করিয়া পেনী সংস্কৃত থাকে। যথা উর্দ্ধরী কঠমোচনী, অধরা হৃৎকঠকর্ণনী, কাকলক-ধরা এবং তালুকঠকর্ণনী।

শুক্তিকাস্থি—(২৯শ চিত্রে দেখ) শুক্তিকাস্থি বা অধঃশুক্তিকাস্থি পাতলা ও ছিদ্রযুক্ত পত্রময় এবং দেখিতে ক্ষুদ্র দীর্ঘ শুক্তিকা বা ঝরঝরকের স্থায় আকার বিশিষ্ট। দুইখানি শুক্তিকাস্থি দুই নাসাগুহার নিম্ন ও মধ্য মুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থিত। ইহার ঝরঝরকাস্থির শুক্তিকাকলকদ্বয় অপেক্ষা নিম্নদিকে অবস্থিত বলিয়া কখন কখন অধঃশুক্তিকা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক শুক্তিকার দুইটা ওল—অন্তস্তল ও বহিস্তল। তন্মধ্যে অন্তস্তল কোরোদর ও নাসাপথের নিম্ন মুড়ঙ্গ নির্মাণকারক। বহিস্তল হৃৎপৃষ্ঠ এবং নাসিকার মধ্য প্রাচীরের অভিমুখ।

শুক্তিকাস্থির উর্দ্ধধারা সমুখভাগে উর্দ্ধহৃৎস্থির সহিত এবং পশ্চাদ্ভাগে তাবস্থির সহিত সন্ধিস্থিত। শুক্তিকাস্থির 'অশ্রুকূটক' ও 'ঝরঝরকুটক' নামে দুইটি প্রবর্দ্ধন আছে। তন্মধ্যে অশ্রুকূটক অশ্রুপীঠস্থির সহিত এবং ঝরঝরকুটক ঝরঝরকস্থির সহিত সংহিত। শুক্তিকাস্থির অধোধারা যিমুক্তাগ্র অর্থাৎ কাহারও সহিত সহিত সন্ধিস্থিত নহে।

সন্ধি—শুক্তিকাস্থি নিম্নলিখিত চারিখানি অস্থির সহিত কেবল উপরদিকে সন্ধিস্থিত যথা, ঝরঝরকাস্থি উর্দ্ধহৃৎস্থি, তাবস্থি এবং অশ্রুপীঠাস্থি।

সীরিকাস্থি—সীরিকা বা সীরা-গ্রিকা নামক ক্ষুদ্র দীর্ঘ অস্থি যৎ সীর বা

\* ই—Inferior Turbinate Bones—ইনফিরিয়র টারবাইনেটেড বোনস্।

ইং—Inferior Maxillary Bones—ইনফিরিয়র ম্যাক্সিলারি বোনস্।

লাঙ্গলের অগ্রসদৃশ ও পত্রবৎ পাতলা। ইহা  
নাসিকাধরের মধ্যে পশ্চাদ্ ভাগে মধ্যপ্রাচীর  
রূপে অবস্থিত। ইহার অগ্রধারার ঝরঝর-  
কাহির নাসাগ্রপ্রাচীরভূত মধ্যফলক এবং

ত্রিকোণ তরুণাঙ্গি সংস্কৃত থাকে। পশ্চিম  
ধারা গলবিবরাভিমুখী এবং বিমুক্তাগ্র।  
অধোধারা উদ্ধাহস্থিধরের তালুফলক যুগ্মের  
এবং তাবস্থিধরের পরস্পর সন্ধান দেখায়  
[ ৩৫শ চিত্র—সীরিকাস্থি ]

সংস্কৃত রাহিব সহিত  
সন্ধের অগ্রধারংশ  
নাসাগ্রালুক নাড়ী পরিধা—  
ত্রিকোণ তরুণাঙ্গি  
সহিত সন্ধের অগ্রধারংশ



উদ্ধাহস্থির রসনিকার  
সহিত সন্ধের পরিধা  
ত্রিকোণ পশ্চিমধারা

সংহিত অর্থাৎ—এইখানে চাবিধানি অস্থির  
সহিত ইহার সন্ধি হয়। উদ্ধধারা দুইটি  
তটযুক্ত পরিধা বিশিষ্ট, অতুকাঙ্গি নিম্নতলত  
রসনিকাথা উন্নত আলি এই পরিধার সংহিত  
হয়।

সীরিকাস্থির পার্শ্বে 'নাসাগ্রালুক' নাড়ী  
ধারনের জন্য দুইটি স্থান পরিধা আছে।

সন্ধি—সীরিকাস্থি ভিন্ন থানি অস্থির  
সহিত সন্ধিস্থত যথা উদ্ধাহস্থিধর, ঝরঝর  
এবং অতুকাঙ্গি।

অধোহস্থি\*—অধোহস্থি এক-  
থানি মূপমণ্ডলের সমস্ত অস্থি অংশে বিভক্ত ৭  
দৃঢ় এবং অধোদন্তপাক্ষির আশ্রয় স্বরূপ।  
ইহার দুইটি অংশ—অধস্থিধরের দ্বার আকৃতি-  
বিশিষ্ট 'হৃদমণ্ডল' এবং উভয়দিকে হৃদমণ্ডল  
মধ্যে প্রবিষ্ট উদ্ধস্থ 'হৃদকটুধর'। তদ্রূপে—

(১) হৃদমণ্ডল—মূপমণ্ডলের অধঃসীমা  
নির্ধারক এবং অধোদিকে দন্তোদ্বল  
ধারক। বাল্যাবস্থার হৃদমণ্ডল বারো ও

সন্ধি অন্ধাঙ্কভাবে পূর্বক অবস্থিত থাকে।  
পরে যৌবনে চিবুকদেশে সংহত হইয়া এক  
হয়। ইহার দুইটি তল—বাহ্যতল ও অন্ততল  
এবং দুইটি ধারা—উদ্ধধারা ও অধোধারা।  
বাহ্যতলের চিবুকদেশে 'চিবুকপিণ্ড' নামে  
উৎসেধ আছে, তাহার উভয় দিকে 'অধবোৎসেধ  
ক্ষেপণী' পেশীর সংস্কৃত থাকে। চিবুক-  
পিণ্ডে সন্ধির যে রেখা আছে তাহাকে  
'চিবুকসন্ধানিকা' বলে। চিবুকপিণ্ডের পশ্চাতে  
উভয়দিকে 'অধুচিবুক' নামে যে দুইটি বিবর  
আছে, উহাদের ভিত্তির দিগা 'অধুচিবুক'  
সংস্কৃত নাড়ী, সিবা ও ধমনী প্রবেশ করিয়া  
থাকে। উক্ত বিবর দুইটির মূল হইতে  
পশ্চাৎমুখী হিযাক রেখা দুইটিকে 'বাহ্য  
তির্যচ্চীনা' বলে। এই রেখা দুইটির উপ-  
কণ্ঠে 'অধরাবনমনী' ও 'স্বকনীনমনী' পেশীর  
এবং নিম্নভাগে অধোধারার নিকটে 'গল-  
পাক্ষিকা' পেশী সংলগ্ন থাকে।

অন্ততল সন্ধি এবং ঝরঝর এবং  
উহার মধ্যরেখার উভয় দিকে 'রসনিকাসন্ধি'  
নামে দুইটি কলাসন্ধির উৎসেধ আছে।

## কচু।

(পূর্বাশ্রুতি)

[ অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ ]

(ক) মানকচু।

(Alocasia Indica).

বাঙ্গালী পাঠকের কাছে মানকচু ব  
সংস্কৃত দেওয়া বুঝা। এ কচু যিনি না চিনেন,  
তিনি নিশ্চয়ই “কচু পোড়া” খাইয়াছেন।

মানকচুর সংস্কৃত নাম মানক, স্থলপদ্ম, মহা-

পত্র। মহারাষ্ট্রী নাম কচু, আলু, কর্ণাট

ভাষা ইহাকে ভোগনামা বলে। ভারতবর্ষে

অনেক শ্রেণীর মানকচু দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। মানের

অনেক গুণ,—মান মৃদুবেচক, মূত্রকারক,

ঘর্মকারক, শোণিতকারক, পিত্তনাশক, রক্ত-

বর্ধক শীতবীৰ্য্য এবং লঘু। মানের কন্দ,

কাণ্ড প্রভৃতি সমস্ত অংশই ঔষধার্থে ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। কবিরাজ মহাশয়দের “মান-

মণ্ড” একটি মহৌষধ, এবং উৎকৃষ্ট পথ্য।

“মানমণ্ড” খাইয়া—আমি অনেক শোথ

রোগী, প্রীহারোগী ও উদর বোগীকে আসন্ন

মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে দেখিয়াছি।

অনেক বিচক্ষণ ডাক্তার এই সকল রোগীর

জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে-

কালের প্রাচীন ডাক্তারগণ—বাহার্য্য ব্যব-

হার্য্যের খাতির) মুখে আয়ুর্বেদের নীতি

করিতেন—বাহার্য্য আয়ুর্বেদের “মানমণ্ড”

রোগীকে ব্যবহৃত করিতেন। বাস্তবিক রক্তা-

ন্নতায়, যক্ষ্ম বিকৃতিতে মানমণ্ডের মত উৎকৃষ্ট

পথ্য দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। ২ভাগ

মানকচুর গুঁড়া, ১ ভাগ আতপ চাউলের

গুঁড়া উপযুক্ত হুগ্ধ এবং চিনির সহিত

পায়েসের মত পাক করিলে মানমণ্ড প্রস্তুত

হইয়া থাকে।

“মানকচু” ষণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া শুকা-

ইয়া চিনির রসে পাক করিলে এক রকম

“মুড়কী” প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মুড়কী

রোগীর পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট পথ্য। খাইতেও

সুস্বাদু। “মানাদি গুড়িকা” গ্রীষ্ম যক্ষ্ম,

শেখি এবং পুরাতন গ্রহবীর ফলপ্রদ ঔষধ।

মানের পত্রদ্বয়ের রস কাণে দিনে—কর্ণশূল

ও পুতিকর্ণ রোগী ভাল হয়। মান কচু হইতে

মৃত্যুর মত একপ্রকার শিকড় বাহির হইয়া

থাকে, এই শিকড় শুকাইয়া ভস্ম করিয়া

মধুর সহিত নিশাইয়া লাগাইলে—অতি ভীষণ

মুখকত ও ২৩ দিনে ভাল হইতে পারে।

মানকন্দের রস গড়ার মত করিয়া চতুর্দিকে

প্রলেপ দিলে ইরিসিপ্লাস রোগের বিশপণ

বদ্ধ হইয়া যায়। ডাক্তার অগবন্ধ বহু

মহাশয়কে ইহা আমি ব্যবস্থ করিতে দেখি-

য়াছি। কেবলমাত্র মানকচু চূর্ণ আধতোলা

পরিমাণ লইয়া,—এক ছটাক গমম অলেশ

সহিত প্রত্যহ খালি পেটে খাইলে—প্রীহা

আর বাড়িতে পায় না। মানকচু অন্তর্ভুক্ত  
দধি করিয়া সেই ভস্ম তৈল ও লবণ সহ  
জিহ্বার ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট  
হয়। মানের পত্রবৃন্তের রস স্ফোটক এবং রক্ত  
রোধক। ডাঁটাটি অগ্নিতে সেকিয়া রস  
বাহির করিতে হয়। মানের দণ্ড পচিয়া  
গেলে—তাহার রস ঘুটেব ছাই সহ প্রলেপ  
দিলে পাদশোথ ভাল হয়। মানকচু ক্ষুদ্র  
ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া, উহা কাপড়ে পুটলী  
বাধিয়া অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তদ্বারা বেদ  
দিলে বাতরোগের বেদনা ও ঘ্রাণা দূর হয়।

আমাদের দেশে প্রচলিত আছে 'বিজয়া  
দশমীর' পর সার্বিক দুই দিবস পর্যন্ত শিবরাণী  
দুর্গা নাকি মানতলায় বাস করিয়া থাকেন।  
এই জন্ত অনেক গৃহস্থ বাড়ীর সামনে, খিড়-  
কীর দ্বারে মানগাছ পুতিয়া রাখেন। পূর্বে  
বঙ্গের অনেক স্থানেই দেখিয়াছি প্রবীণা  
গৃহিণীগণ বিজয়ার পথট আশ্রিত্য মানগাছ  
ও হরিদ্রা গাছ রোপন করেন। মহাদেব  
ভগবতীকে মর্ত্যধামে আসিতে দিতে সম্মত  
ছিলেন না, দুর্গা স্রোব করিয়া চকিয়া আসেন।  
দশমীর পর যখন দেবী স্বামীসত কৈলাসে  
প্রত্যাবর্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন,—  
শিব তখন বাধা দেন। তাই দেবী মান  
করিয়া মানতলার আড়াই দিন বসিয়া ছিলেন।  
তার পর দাম্পত্য কলহের নিবৃত্তি হয়। শিব-  
দুর্গা কৈলাস যাত্রা করেন। এই প্রবাদটী অরণ  
করিয়া বৈষ্ণব গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মীগণ মান গাছকে  
অতি পবিত্র ভাবিয়া থাকেন। চর্গোৎসবের  
“নব পত্রিকার” মান ও কচুব গাছ গৃহীত  
হইয়া থাকে।

মানের চাষ বেশ লাভজনক ব্যবসার।

এক একটা মান ১০।১২ সের হইতে একমণ  
পর্যন্ত ওজনের হইতে দেখা যায়।

### (ব) কৃষ্ণকচু।

ইহাও একপ্রকার বন্য কচু। শিক্ত  
ভূমিতে আপনা হইতে জন্মে। ইহার পাতা,  
বৃন্ত সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ। কন্দ অত্যন্ত ক্ষুদ্র,  
কিন্তু তাহার চতুর্দিকে বহুসংখ্যক প্রতান  
বহির্গত হইয়া থাকে। ইহা বৃন্ত শাকের  
মত রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। এই কচুর  
আঠার প্রলেপ বিশেষ শিশুদের নাড়িপাকড়া  
ভাল হয়, নাখা বা শুকায়, বাবা বসিয়া যায়।  
নথ দিয়া মূণ ছেদন করিলে, দুগ্ধবৎ আঠা  
বাহির হয়।

### (ভ) চড়কচু।

এক জাতীয় বন্য কচু। ইহার পত্র ও  
পত্রবৃন্ত নীলাভ কৃষ্ণ। গুণ পুরোঁক কচুর  
মত। ইহার বৃন্ত শাকের মত খাওয়া চলে।

### (ম) বড়িয়াকচু।

ইহার আর একটি নাম—দস্তুর কচু।  
পত্র গোলাকাব, পত্রের ব্যাস দেড় ফুট হইতে  
২ ফুট। বৃন্ত অগ্রান্ত মূল। ইহার কণ্ড নাই  
বলিলেই হয়,—ইহার ডাঁটা খাওয়া চলে।

### (য) বিষকচু।

#### (Arum Fomicaturn)

এই কচু বাঙ্গালার সর্বত্র বনে-জঙ্গলে  
জন্মিয়া থাকে। পত্র গাঢ় সবুজ বর্ণ, মূল  
জাইস বৃক্ক—অনেক সময় মূল—মৃত্তিকার  
উপরেই বিহতি লাভ করে।

এই কচু একেবারেই বিষাক্ত। ইহার রস  
গায়ে লাগিলে গা চুলকায় ও ফুলিয়া উঠে।  
কিন্তু ইহার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে—ইহার



বাত ভাল হয়। কোড়া বসিয়া যায়। এই কচু তৈলো ভাজিয়া সেই তৈল ক্ষতে দিলে ক্ষত শুকাই। বিষকচুর অনেক জাতি আছে। যথা—চোড়া কচু, সাপ কচু, ডা। কচু, আড়াই কচু, ইত্যাদি। কোন কোন দেশে—ইহাকে বেঁচু বসিয়া থাকে। বেঁচু জাতীয় বিষকচুর ফুল সত্যতঃ হর্ষাঙ্গ। পরীক্ষায়ে বর্ষাকালের সন্ধ্যায়—এই ফুলের হর্ষাঙ্গ বেশ নিকটে পায়। যার। ফুল রক্তবর্ণ—দীর্ঘাকব, স্বস্নিগ্ধ,—এই ফুলের রস গ্রন্থি এবং পাতবর্ণ। ইহাব নাম বেটফুল।

### (২) রঞ্জনকচু।

(Caladium)

প্রায় ৩০ প্রকার রঞ্জন কচু আমি দেখি-  
সিছি। এই জাতীয় কচুর পত্রগুলি—খেত,  
রক্ত, পীত, ক্রম, প্রভৃতি বর্ণদ্বারা সুরঞ্জিত।  
দেখিতে সুন্দর ও শোভন বলিয়া বিলাসী  
বাবুদের বাগানে সুরক্ষিত হয়। ইহার কোন  
কোন জাতীয় গাছ ১৫ টাকা মূল্যেও বিক্রীত  
হইয়া থাকে। এই সকল কচু—কতক  
ভারতব, কতক জাপান প্রভৃতি ভিন্ন দেশ  
হইতেও আসিয়াছে। এই কচু কেহই খায়  
না। কেবল শোভার জন্য—ইহাব আদর।  
পারিত পরে ইহাদের পৃথক পরিচয় দিব।

### ওলকচু।

(Anerphallus Campanulatum

Syn. Colocasia campatanulata.

Telunga Potato.)

ইরোপের বৈজ্ঞানিকগণ ওলকচু কচু

\* এসবের পর গ্রীষ্মকালে বেটফুলের ফুল  
খাওয়াইলে জন্মের মোহ ঘটে ইহা থাকে—এইরূপ  
ওলকচু। আঃ, নঃ।

শ্রমীর মধ্যে ধরিয়াছেন। ওল দ্বিবিধ। খেত  
ও রক্ত। যে ওল কচু ছেদন করিলে রক্তাভ  
ধবল বর্ণ শত দেখা যায়, তাহার নাম রক্ত  
ওল। খেত ওল ছেদন করিলে পীতভ  
স্বেচ্ছা বর্ণ শত দেখিতে পাওয়া যায়। খেত  
ওল সুখাত—তত গলা ধরেনা। রক্ত ওল  
প্রায় ১০ টুকুটে হইয়া থাকে। চাষের গুণে  
কোন কোন রক্তওল খাতোপযোগী হইতে  
পারে। ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে  
বিনা চাষে অল্প সজ্জ ওল জন্মিয়া থাকে।

পাঠকগণের কাছে ওলবৃক্ষের পরিচয়  
দেওয়া গুটী, কেননা ওলগাছ দেখেন নাই,  
এমন বাক্যগী আছেন বলিয়া মনে হয় না।  
ওলকচু স্বভাবতঃ গোলাকার। এই কচু  
হইতে বহু সংখ্যক ক্ষীণ গুটিকাৎ মুখী  
বাহির হয়। ইহার ইংরাজী নাম Eye or  
tuber এই গুটীগুলি—ওলের বীজ স্বরূপ  
অর্থাৎ ইহা হইতেই নতুন গাছের উৎপত্তি  
হইয়া থাকে। ওলের ফুল খুব বড়, বর্ণ  
সবুজ ও বেগুনে মিশ্রিত, দেখিতে অতি  
সুন্দর।

ওলের সংস্কৃত নাম—শূরণ, ফুলকন্দক  
কন্দ, অশোণ, কণ্ডুল ইত্যাদি। ইহাকে  
সিংহলবাসীরা—কিডারণ, হিন্দুস্থানীরা শূরণ,  
আসামীরা ওলকচু, তৈলঙ্গীরা মঞ্চাকান্দা,  
মহারাজীরা পোড়াশূণ, তামিলগণ, শূর্ণা,  
গুজরাটবাসীরা শূরণ এবং পারস্যবাসীগণ  
ওলকন্দ বলিয়া থাকেন।

গ্রাম্য এবং বস্ত্র তৈরিতে ওল আবার দুই  
প্রকার। যে ওলের চায় করা হয়, তাহাই  
গ্রাম্য—যে ওল আপনা হইতে জন্মে তাহার  
নাম বস্ত্র।

ওল—অগ্নিদীপক, কক্ষ, কণ্ঠ কারক, বিষ্টভী, কটিকারক—কক্ষ, অর্শ, শ্ৰীহা ও শ্বাস্রোগে—হিতকাৰী। বস্ত্রওল—ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শোবোগে—ওল সুপথ্য এবং একটী মর্চোষদ। শূর্য পণ্ড, শূর্য পিণ্ড—প্রভৃতি ঔষধের ওল একটী প্রধান উপাদান। ওল দ্রব্য করিয়া লবণসহ ভক্ষণ করিলে—অর্শের রক্তশ্রাব ও ঘরুয়া নিবারিত হইয়া থাকে। তৈল, লব্ধ, সর্বপ প্রভৃতি সংযোগে—ওল পিত্তবদ্ধক হয়, ইহার উপকাৰিতাও নষ্ট হয়।

ওল অত্যন্ত বলকারক, এবং পাচক, ইহা হারী স্রীপদ, অর্শদ, শূল, দশ রোগ এবং গ্রন্থীবোগ—ভাল হইয়া থাকে, কুচরিত্রা নারীগণ ওলেবঙ্গল ও চিতামূল বাটিয়া খাইয়া গর্ভপাত করিয়া থাকে। গর্ভপাত করিতে পিয়া অনেক সময় গর্ভিনী বও পক্ষান্তে।

পূর্ববঙ্গে একবর্ষ ওল পাওয়া যায়, তাহার নাম 'বাক্'। ইহার ইংরাজী নাম—Telinga potato—এই ওল টেলিঙ্গা পোটোটা নামক উদ্ভিদের মূলের অন্তরঙ্গ। ইহারই সংস্কৃত নাম 'দ্যাকঙ্ক'। এই ওল সিদ্ধ করিয়া খাটলে অগ্নিবান্ধা সাবে।

ওলের ডাটা—কোমল অবস্থার অর্ধাৎ পঞ্চ পঞ্চদশ বরাবরে বিস্তৃত হয় নাই—অতি সুবাস্ত। ইহা সিদ্ধ করিয়া লবণ বাটা ও কিছু জল মাখিয়া, লবিয়ার তৈলে রুচিয়া কোকন দিয়া ভাজাতে ই ওলের কোক ভাজিয়া লইতে হয়। ইহা বহু সুখপ্রিয়। ওলেব কক্ষ—ভালনা করিয়া ভাজে দিয়া,

কখনও বা সিদ্ধ করিয়া মুল্লা মাখিয়া বড়ার মত ভাজিয়া খাওয়া যায়।

অতিশায়ে কাষ্ঠিক মাসে ওল ভক্ষণেব নিবেশ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কাষণ কি, জানি না। এদেশ প্রচলিত একটী ছড়ায় কিন্তু কাষ্ঠিক মাসেই ওল খাটবার ব্যবস্থা আছে। বঁধা—ভাজমাংসে তাণের পিঠা, আদিনি শণা মিঠে। কাষ্ঠিকে খাইবে ওল, অর্শে খলিসাব যোগ। পৌষেকাঙ্কি, মাংসে তৈল, কায়নে শুভ্র আদা বেতু, চৈত্রে নিয় গিমা তিতা, বৈশাখে রত নাতি। জ্যৈষ্ঠে খট, আবারে দই।

প্রাচ্যেণেণেণে চালাতা, তবে হয় শরীরেব কাঙ্ক।

বনে জললে আর এক প্রকার ওল পাওয়া যায়, তাহার কাণ্ড (ডাটা) বিচিন্ন বর্ণ। এই ওল আদৌ পাণ্ডুরূপে ব্যবহার করা চলে না। ইহা ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া, অন্নরস দিয়া,—অতিরিক্ত লজ্জা মাখিয়াও দেখা গিয়াছে—আবাদ মাজি ভোজার মুখ দিয়া 'গে টানান' ভাঙিয়া থাকে। ইহার কিন্তু একটী গুণ আছে—এই ওল চু করিয়া তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে—ব্রুক দংশন জনিত অসহ্য ব্যথার তৎক্ষণাৎ উপশম চটয়া থাকে।

যে ওল ছায়ামূল নামে আছে—তাঁহাতে অত্যন্ত সুখ চুলকায়। খনির বচনেও আছে "ভায়ার ওলে চুলকার মুখ।" কিন্তু ছায়ার ওল অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া থাকে।

এদেশে আরও দুই বৃক্ষ, কঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। ১। "অমর্তমান"। ২। "কাটক"। অমর্তমানের ডাটা সুখপ্রিয়। কাটকের গুল্ল কষ্টকর। ইহা লবণাঙ্কি,

## শিশুপালন।

(পূর্বাহ্ন)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বহু বি-এ স্নাতক]

নিজা ও আহারের স্ত্রী বর্ষায়ও শিশুর জীবনের পুষ্ট অত্যন্তক'। ক্ষুদ্র শিশু তাহার ক্ষুদ্র শরীরে তাইরা কেমন আনন্দে হুকু পা ছড়িয়া খেলা করে। ক্ষুদ্র শিশু ব্যাধিরে কিছুই জানেনা, কিন্তু বিধাতা তাহার দেহরক্ষার জন্য তাহাকে এই ব্যায়াম করাইতেছেন। সেই অসহায় অবস্থায় বিধাতা তাহার দ্বারা এইরূপ ব্যায়াম না করাইলে শিশুর দেহ কখনো বর্ধিত ও পুষ্ট হইত না। শিশুর জীবনের অন্য ব্যায়াম কত আবশ্যক এতদ্বারা বিধাতা আমাদেরকে তাহা দেখাইয়া দেন। আমরা অনেক সময় এ শিক্ষা ভুলিয়া যাই। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তাও যে বাড়ীতে থাকে সে কথা আমাদের স্মরণ থাকে না। পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ ব্যায়ামের গুণ বিলক্ষণ অবগত আছেন বলিয়াই পনের দিনের শিশু হইতে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধকে পর্যন্তও ব্যায়াম করিতে দেখা যায়। আমাদের নিজস্ব স্ত্রীর ব্যায়ামও তাহাদের জীবনের নিয়ন্ত্রকের মধ্যে একটি প্রধান কর্ম বলিয়া তাহা যত্নের সহিত পালন করেন। তাই তাহার শৌখিন্যের জন্য আজ ভ্রবন বিধাতা। তাই তাহাদের দীর্ঘ ও উন্নত দেহ, বিশিষ্ট বস, চর ও বংশগত বাহুগুণ দেখিয়া তাহাদের ক্ষেত্র এক উন্নত লোকের জীবন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

শক্তি দেবী যেন তাহাদের দাসী। দেহ বলশালী হইলে মনও তেজস্বী ও মহৎ হয়, প্রাণ অগ্নিময় হয়। নাহয় তখন অসাধ্য সাধন করিতে ছুটিয়া চলে। উদ্দেশ্য সাধন করিবার পথে কোন অন্তরায়কেই তাহার গ্রাহ্য করেন না। আর দুর্বল, মেরুদণ্ড বাঁকা, শীর্ণকায়, রোগক্রিষ্ট হইলে মনও ভীক, কাপুরুষ হয়, কোন কার্যে উৎসাহ থাকে না, কার্য করিবার পথে সামান্য বাধা উপস্থিত হইলেই মন দমিয়া যায়। এরূপ মানুষের দ্বারা সংসার, সমাজ, দেশের কোন কাজই হয় না, অপদার্থ জীবন ধারণ করিয়া পশুর জায় দিন শেষ করে।

যে কোন স্থানেই বাই না কেন, সে বর্তমানে জনাকীর্ণ, দুর্গন্ধময় সহর হউক না কেন, আমরা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাই যে, সহরের বহুতল উন্মুক্ত স্থান আছে, তাহা ইউরোপীয় ইংরাজ শিশু ও বালক বালিকার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পনের দিনের শিশু হইতে এক বৎসরের শিশুরা পাকীতে তাইরা বায়ু শ্বসন করিতেছে। বয়স্ক বালক বালিকাগণ ছুটছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, কিংবা কোনও ব্যায়াম করিতেছে। এইরূপ ব্যায়ামের ফলে তাহাদের কি অসংখ্য সুগঠিত স্বাস্থ্যের কোষ সঞ্চার দেহ। দেখিলে চমকিত হইয়া কলিকাতার ইতেন উভা

সন্ধ্যাকালে যখন বাজনা বাজিতে থাকে, তখন শত শত পাশ্চাত্য শিশু কেমন তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। তাহারা প্রত্যেকে যেন এক একটি গোলাপ ফুল। শত শত ফুলে বাগান যেন আলোকিত করিয়া রাখে। অন্য গ্রন্থের পর হইতেই পাশ্চাত্য পিতামাতা তাহাদের শিশু সন্তানের দৈহিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ মনোযোগী হন। তাহারা জানেন যে, মুগ্ধ মেহের মধ্যে সবল মন বাস করে। তাই তবিশ্রুতে এই শিশুগণই এ পৃথিবীতে অনাধ্য সাধন করে। আর আমরা ব্যায়ামের গুণ অবগত থাকিলেও তাহা কার্যে লাগাই না। সহরের দুর্গন্ধময় পল্লিতে অন্ধকার জাঁতসেতে গৃহে আমাদের অধিকাংশ লোকেরই বাস। শিশুদিগকেও আমরা তাহার মধ্যে দিবারাত্রি ভরিয়া রাখি। কখনো একটু উত্তম স্থানে নির্মল বায়ু সেবন করিতে পাঠাই না। আমাদের শিশুদের শৈশবাবস্থা ত এইরূপে কাটিয়া যায়। তারপরে, বয়স্কদের সঙ্গে সঙ্গে পড়ার চাপে তাহাদের অগুপ্ত দেহ শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়ে, মেরুও বাকিয়া যায়, চক্ষের জ্যোতিঃ কমিয়া আসে। 'মানসিক পরিশ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রম সমান তাবেন না করিলে এই অবস্থার আসিয়া পড়িতে হয়। বর্তমান সময়ের যুবকদের বীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, বাকান পৃষ্ঠদেশ, পাতুর মুখ দেখিলে দেশের তবিশ্রুত ভাবিয়া লক্ষিত হইতে হয়। 'বে দেশ চিরকালই শৌখিনদের লজ্জা বিখ্যাত ছিল, কি পরিতাপের বিষয়, — আজ সেই দেশের ভাবীবংশধরদিগের অবস্থা দেখিলে চক্ষু কাটিয়া অল বাহির হয়।

বৎসরের পূর্বেও এদেশে ব্যায়ামের চর্চা প্রভূত পরিমাণে হইত। বাড়ীতে বাড়ীতে কুস্তির আড্ডা, অম্বারোহণ, সস্তরণ, বাচখেলা লাঠি ও তরবারি খেলা, ধলুর্সিন্দা এবং অন্যান্য নানারূপ ব্যায়াম চর্চা হইত। ধনীরা বাড়ীর ছেলেদের ব্যায়াম শিখাইবার জন্য পালোয়ান দিগকে বাড়ীতে রাখিতেন।

— বর্তমান কালের যুবকদের শৌচনীর শারীরিক অবস্থার পরিণতি ভাবিয়া সকলেরই ব্যায়ামের প্রতি এক্ষণে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমাদের শৈশবে বতকা ব্যায়াম চর্চা না হইতে দেখিয়াছি, এখন বালক ও যুবকদের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক ব্যায়াম চর্চা হইতে দেখিয়া এই আশার সঞ্চার হইতেছে যে, আবার বেশে দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ, বিশাল বস্ত, দৃঢ় ভূজবল বিশিষ্ট বীরের আবির্ভাব হইবে।

বারবৎসর পর্যন্ত বালকবালিকা দিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যার উত্তম স্থানে বিত্তম বায়ু সেবনের জন্য পাঠাইয়া দিবে। সেখানে তাহারা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিবে, দোড়া ইবে এবং বেড়াইবে। এই বয়সের বালক বালিকাদের পক্ষে Skipping একটি উত্তম ব্যায়াম। বাহারা হাটিতে পারে না—তাহাঁদিকে গাড়ী করিয়া কিংবা ভ্রাতার কোঁড়ে বিত্তম বায়ু সেবন করিতে পাঠাইবে। শিশুকে বচ কম কোলে রাখিবে। ততই তাহার দেহ ভাল থাকিবে। নিত্যমাত্র প্রয়োজন হইলে তবে শিশুকে কোলে করিবে, নতুবা নহে। যে কোলে করে তাহার দেহের গরমে শিশু হ্রাস হয়। ভ্রাতার সুবিধা না থাকিলে মাতী নিজে লগায়েই অল্প সময় কাল করিয়া শিশুকে লইয়া গৃহের ছাদের উপরে প্রাতে ও

সন্ধ্যায় বেড়াইবেন। শিশু হাঁটিতে পারিলে তাহাকে হাঁটাইবেন। প্রতি দিন অস্থতঃ তিন ঘণ্টা শিশুকে উদ্ভুক্ত স্থানে বাধিবেন। উদ্ভুক্ত স্থানে ঘুরে পাঠাইবার সুবিধা না হইলে বালিক বালিকাদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ছাদে খেলা করিতে দিবে। বার বৎসর পর্যন্ত বালিক বালিকাদিগের পক্ষে খেলা, দোড়াদোড়ি, ছুটোছুটি, ভ্রমণ, Skipping উত্তম ব্যায়াম। তাহার পর ডায়েল, ডনবৈঠক, যুগের ভাঁজা অন্ন অন্ন করিয়া বয়স অনুসারে করিলে বেশ উপকার হয়। কৈশোর ও যৌবনে Sandow's Combined Developer দ্বারা তাহার প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে ব্যায়াম করিলে দেহের গঠন সুন্দর হয়, মাংস পেশী দৃঢ় হয়, বক্ষ প্রশস্ত হয়। বালিকাদিগের অল্প অল্প নানা প্রকার ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে। Y. M. C. A. University Institute প্রভৃতি স্থানে যুবকদিগের নানা প্রকার ব্যায়ামের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

বার বৎসর পর্যন্ত বালিক ও বালিকা-দিগের ব্যায়াম একই প্রকারের হওয়া প্রয়োজন। তাহার পর বালিকাদিগের ব্যায়ামের প্রণালী অন্তরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু Sandow's Developer বয়স্ক বালিকা-দিগের পক্ষেও অত্যন্ত উপযোগী ও উপকারী। প্রাথমিক বিবরণ আমাদের দেশে বালিকাদিগের অল্প কোন ব্যায়াম প্রণালী নির্দিষ্ট নাই। গৃহ কর্ণে রত থাকিলে বালিকাদিগের পক্ষে সুন্দর ব্যায়াম হয়। যত কষ্ট দেওয়া, তত ভালো; মসলা বাঁটাতে মজা প্রত্যয়ের সুন্দর ব্যায়াম হয়। কষ্ট দিবার অভ্যাস করিলে চাঁতের গঠন সুন্দর হয়। এই ব্যায়াম দুই প্রকার

সাম্রাজ্যী পরমা সুন্দরী ছিলেন। তিনি প্রত্যাহ এক কলসী জল মাথায় লইয়া প্রাসাদের ছাদে বেড়াইতেন। এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার দেহের গঠন সুন্দর হইয়াছিল। নিয়মিত ভ্রমণও বালিকা-দিগের উত্তম ব্যায়াম। বর্তমান সময়ে আমাদের নারীগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যািতেছে বলিয়া একদল নারী-হিষ্ট্রো-নারী উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া থাকেন। কাহারো কাহারো স্বাস্থ্য যদি ভাঙ্গিয়া গিয়াই থাকে, তবে তাহা উচ্চ শিক্ষার অপরাধ নহে, তাহা তাহাদের গৃহ শিক্ষার অপরাধ, পিতামহতার দোষ। পিতামহতা যদি তাহাদের কন্ডাদের মানসিক প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা করিতেন তবে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদী দিগকে বলিবার এ কাকটুকু রাখিবার অবসর দিতেন না। কন্ডাদিগকে যেমন মানসিক প্রেম করিতে দিবেন ঠিক তেমনি শারীরিক প্রেমও রত রাখিবেন, এবং তছপযোগী পুষ্টি-কর আহারের ব্যবস্থা করিবেন। তাহা হইলে উচ্চশিক্ষাও নারীদিগের স্বাস্থ্য ভাঙিতে সক্ষম হইবে না। বালিকাগণ যেমন লেখা পড়া করিতে থাকিবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহ কর্ণে রত থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। বীহাদের গৃহকর্ণ নিয়মিত ভাবে করিবার জেমন আবশ্যক হয় না তাহাদের ভ্রমণ, ছাড়ের সিঁড়িতে উঠা নামা, তাহাদের developer কিংবা ই-সংঘাত দেয় ওজনের ডায়েল লইয়া ব্যায়াম করা অত্যাশংক্য। যেটি কথা এই যে, মানসিক শিক্ষার পরিচালনার সহিত বাহ্যিক প্রত্যেক অবস্থা

জের মাংস পেশীরও পরিচালনা হয়, প্রত্যাহ  
এরূপ কষ্টে নিযুক্ত থাকে সুস্থ জীবন ধারণের  
পক্ষে অত্যাৱশ্যক। অবশ্য ইহার সঙ্গে শারী-  
রিক ও মানসিক পবিত্রমে, দেহের ও মস্তিষ্কের  
ক্ষয় নিবারণের উপযোগী পুষ্টিকর ও বলকারক  
খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে; নতুবা অকালে  
মৃত্যু হওয়া অথবা রুগ হইয়া পড়া অবশ্য-  
সম্ভাবী। আমরা এমন অনেক উচ্চ শিক্ষিতা  
মহিলাকে জানি তাঁহাদের স্বাস্থ্য ঋতু আছে,  
চক্ষের জ্যোতিঃ হ্রাস হয় নাই। তাঁহাদের  
পিতৃমাতা তাঁহাদের পাঠ্যাবস্থায় মানসিক  
শ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা  
রাখিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের স্বাস্থ্যও  
সুন্দর আছে।

পল্লীগ্ৰামে পালিত ও বর্দ্ধিত শিশুগণ  
সাধারণতঃ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। তাহারা  
দিবাবাত্রি উন্মুক্ত স্থানে বাস করে বলিয়া  
বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার সুবিধা পায় এবং  
পল্লীগ্ৰামের ঋতু দ্রুত, বি ঋতুয়া বেশ বলিষ্ঠ  
হয়। পল্লীগ্ৰামের বালক বালিকাগণ পথে  
প্রান্তরে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, পুঙ্করিণীতে  
সাঁতার দেয়, আম পাড়িবার জন্ত গাছে  
চড়ে। ইহাতে তাহাদের বেশ ব্যায়াম হয়,  
দেহ সুগঠিত হয়। উন্মুক্ত স্থানের রোজ ও  
বাতাসের মধ্যে অহর্নিশ থাকিয়া তাহারা  
সুস্থ ও বলপূর্ণ হইয়া বাড়িয়া উঠে। দুর্ভিক্ষ,  
কষ্ট এবং অকাল প্রযুক্ত শিশুদিগকে পাঁচ  
বৎসর পর্যন্ত সুস্থ হইতে দূরে বাহ্যিকর স্থানে  
রাখিলে বিশেষ উপকার দেখা যায়।

ব্যায়ামই জীবন। দেহ ও মনের সুস্থতা  
ব্যায়ামের উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত  
ব্যায়ামের অভাবে দেহের বাসগণের

tendons দুর্বল ও থলথলে হইয়া পড়ে এবং  
সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া যে শত শত শিরা উপ-  
শিরা রহিয়াছে তাহারা Sluggish ও মল-  
ক্ষয় হইয়া পড়ে। আমাদের দেহের প্রাণি  
নিমেষে ক্ষয় হইতেছে। বাহির হইতে পুষ্-  
কর খাদ্য গ্রহণ করিয়া এই ক্ষয় পূরণ কবিতে  
হয়। কিন্তু ব্যায়াম না করিলে দৈহিক বস্তু  
দির কাঁচাশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে, বলিয়া  
পুষ্টিকর খাদ্য যথোপযুক্তরূপে assimilate  
করিবার শক্তি ভালরূপ থাকে না। সুতরাং  
আমাদের দেহের ক্ষয় বতটা হয় পূরণ ততটা  
হয় না, কাজেই দেহ ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িতে  
থাকে। ব্যায়াম অভাবে আমাদের দেহ  
যদি দুর্বল হইয়া পড়ে বলিয়া আমাদের  
খাদ্যের অসার অংশ দেহ হইতে সবটা বাহির  
করিবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং এই সকল  
অসার অংশ দেহের মধ্যে জমািয়া নানা রোগ-  
বীজাণুর আকর হইয়া দাঁড়ায়।

সকলেই জানেন যে বস্ত্রাদি ফেলিয়া  
রাখিলে মরিচা ধরিয়া শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।  
কিন্তু কাজে লাগিলে অনবরত ক্ষয় হইলে ও  
তাহাপেক্ষা অধিক দিন টেকে। আমাদের  
দেহ যন্ত্র ও ঠিক এইরূপ। শারীরিক ও  
মানসিক শ্রমে আমাদের দেহের যত না ক্ষয়  
হয়, অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে মরিচা ধরিয়া  
তদপেক্ষা দেহের অধিক ক্ষয় হয়। কিন্তু ইহা  
ও মনে রাখা উচিত যে আমাদের শ্রম যেন  
অতিরিক্ত না হয়।

উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার, বিশুদ্ধ বাতাস,  
নিয়মিত ব্যায়াম, নিয়মিত কোঠ পরিষ্কার  
আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়ান।

What a baby should do.

শুভ শিশু সাধারণতঃ দুইমাস বয়সে আলো এবং বিভিন্ন রঙের প্রতি মনোযোগ দিবে এবং হাসিতে চেষ্টা করিবে।

তিন মাস বয়সে তাহার ক্ষুদ্র দেহটি একটু একটু তুলিয়া ধরিতে আরম্ভ করিবে এবং তাহা তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহা ধরিতে চেষ্টা করিবে।

ছয় মাসের সময় বাগিচা, ঠেস দিয়া বসিতে পারিবে।

আট মাসে যে শব্দ শুনিবে এবং যে গতি দেখিবে তাহার অনুকরণ করিবে।

দশ মাসে বিনা সাহায্যেই বসিতে পারিবে এবং হামা শুড়ি দিতে চেষ্টা করিবে।

পনের মাসের সময় দৌড়াইতে এবং ঘোর টেলিয়া দিতে পারিবে।

আঠার মাসে সিঁড়ি দিয়া উঠা নামা করিতে পারিবে।

দুই বৎসর বয়সে ছোট ছোট বাক্য sentence বলিতে পারিবে।

শুভ শিশুর পক্ষে সাধারণতঃ এই নিয়মই থাকে, কিন্তু অনেক স্থলে বহু শিশুর বিলম্বে সমস্ত কাজ হয়। তাইরা বিলম্বে বসিতে পারে, হাঁটে এবং কথা বলে। এইরূপ শিশুদের জোর কুরিয়া কিছু করাইবেন। তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। তাহাদের উপযুক্ত সময় আসিলে তাহারা নিজেরাই সব করিবে। বিধাতা সমস্ত মত তাহাদের কার্য তাহাদের ঘরাই করাইবেন। তবে দুর্বলতা ও অসুস্থতাবশতঃ এই বিলম্ব ঘটিলে তাহার প্রতিকার তখন করা কর্তব্য। (ক্রমশঃ)

## পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন।

(পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[ রায় চীচুনীলাল বসু আই, এস, ও এম, বি, এক, সি, এস বাহাদুর ]

ইন্সপেক্টর জেনারেল

—:—

আজ কাল এই রোগ পৃথিবীর নানা স্থানে মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের সর্বত্রই এই রোগের প্রকোপে অনেক লোক মৃত্যুশয্যা পতিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এই রোগ ১৮৯০ সালে একবার দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সেবার অনেক লোক রোগে

আক্রান্ত হইলেও মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হয় নাই। এবারে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, মুক্তগদেশ, বঙ্গ ও বিহারের অনেকাংশে স্থানে এই রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। কলিকাতার এক সময়ে এই রোগে প্রতিদিন ৫০৬ জন মরিতেছিল; দক্ষিণবঙ্গের অনেক স্থানের

মৃত্যুসংখ্যা কলিকাতা অপেক্ষা অনেক অধিক।

ইহা একটি সংক্রমক বোগ অর্থাৎ হাম, বসন্তের ত্রায় একজনের হঠলে পাঁচজনের হইবার সম্ভাবনা। বাহাদেব এই রোগ হইয়াছে, তাহাদের প্রবাস, হাঁচি ও কফের সহিত এই রোগের বীজ দেহ হইতে বাহির হইয়া বায়ুর সহিত নিশ্চিত হইয়া থাকে এবং নিঃশ্বাসের সহিত উহা স্তন্য ব্যক্তির দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ রোগ উৎপাদন করে। নাক ও মুখের গহ্বরই রোগ-বীজের প্রবেশ পথ।

রোগের লক্ষণ কি কি, এই রোগ উপস্থিত হইলে কোন কোন বিষয়ে সাবধানতার আবশ্যক এবং যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোন স্থানে ইনফ্লুয়েন্জা দেখা দিলে যদি কাহারো সর্দি হয়, নাক দিয়া কাঁচা মূল বহরে বা খুব হাঁচি হয়, মাথা ধরে, গা গতরে বেদনা হয় এবং জ্বর ও কাশি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, খুব সম্ভব, তাহার ঐ রোগ হইয়াছে। অনেক সময়ে রোগ আর অধিক বাড়ে না, রোগী ৩৪ দিন একই ভাবে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু কিছুদিন পরান্ত তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল থাকে।

রোগ বেশী হইলে জ্বর ও কাশি বাড়ে, শুকনো কাশিতে রোগী অত্যন্ত কষ্ট পায়, বুক সর্দি (Bronchitis) বসে, অনেক সময়ে নিউমোনিয়া (Pneumonia—ফুস-ফুসের প্রদাহ) দেখা দেয় এবং উহা হইতেই

অনেক রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোন কোন রোগী শিরোবেদনার অস্থির হয়, কেহ জ্বরের বৃদ্ধির সময় প্রস্রাব বন্ধ হইতে থাকে, সর্বদা ঝাঁকিয়া উঠে এবং কাহাকেও চিনিতে পারে না। তখন তাহাকে শ্রবণ ও পথ্য সেবন করান হ্রস্ব হইয়া পড়ে। ক্রমে হৃৎপিণ্ড (Heart) অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, নান্দী অতি দ্রুত চলিতে থাকে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে জ্বর কমিয়া গিয়া অত্যধিক বাম হয় এবং রোগী এইরূপ অবস্থায় অবস্থায় (Collapsed state) মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোন কোন রোগীর পেটের অস্থির হয়, কাহারো বা রক্ত বমি বা রক্ত দান্ত হইতে দেখা যায়, কাহারো বা কাশির সহিত রক্ত উঠে অথবা নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

বাহাদেবের রোগ খুব কঠিন হয়, তাহার প্রায় ৫ হইতে ১০ দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১। থিরেটাব, বায়োট্রোপ, প্রভৃতি যে সকল স্থানে লোকের ভিড় হয়, তথায় গমন করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। রোগের প্রারম্ভিকাবস্থার সময় জনতাপূর্ণ স্থানে বাওয়া নিষিদ্ধ এবং এইজন্য স্কুল কলেজ প্রভৃতি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা উচিত।

২। কাহারো এই রোগ হইলে তাহাকে পাঁচজনের সহিত বেশীমিলি করিতে দিবে না। রোগীকে পৃথক ঘরে রাখিবে এবং বাহাদেব তাহার দৈবা শুশ্রূষা করিবে, তাহার ব্যতীত অপর কোন লোককে সে ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না।

৩। যতদিন রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ না করে, ততদিন তাহাকে পৃথক পরি-



তাগ করিতে দিবে না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে এই রোগে ছুৎপিণ্ড অত্যন্ত চরম হইয়া পড়ে। হঠাৎ উঠিতে বাইরা অথবা চলাফেরা করিবার সময় রোগীকে মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে, এমন কি সময়ে সময়ে এই কারণে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটয়া থাকে। রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও কিছু দিন তাহার চলাফেরা কণা উচিত নহে।

৩। রোগ দেখা দিলেই ইউক্যালিপটস তেল (Oil Eucalyptus) তিন চারি ফোটা কমালে ঢালিয়া রোগী উহা সর্বদা শ্বসিতে থাকিবে। সুস্থ ব্যক্তিও (বিশেষতঃ যে বাচীতে রোগ দেখা গিয়াছে, তথাকার ভ্রাতৃকে) বোগের প্রাতিভাবের সময় এই তেল সর্বদা শ্বসিলে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা।

৫। বাহাতে রোগীর গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া তাহার ঘরের দরজা জানালা সর্বদা উন্মুক্ত রাখিবে। বোগীর দেহ সর্বদা গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিবে; তাহার বুক পিট ক্রানেল বা তুলা দিরা বাধিয়া দিবে।

৬। রোগী বাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। হৃৎকট এই রোগের উৎকৃষ্ট পথ্য—পেটের অস্থখ না থাকিলে রোগীকে যথোচিত পরিমাণে হুগ্গ, বালি বা সাগর সহিত মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিতে দিবে এবং গরম জল দা-মোড়া ওয়াটার রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে দিবে।

৭। রোগের বৃদ্ধি হইতেছে বুঝিলে তৎ

কথাং ডাক্তার ডাকিয়া রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি বিনামূল্যে চিকিৎসক ও ঔষধ পাইবার একরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, রোগের সূত্রপাত মাত্রেই চিকিৎসককে সংবাদ দিলে রোগীর চিকিৎসার তৎক্ষণাৎ সুবন্দোবস্ত করা হয়। বিলম্ব করিলে বিশেষ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।

৮। রোগ সামান্য হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিয়া উপকার পাইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি এইরূপ ঔষধ সর্বসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। এই ঔষধ বড়ি বা চাকির আকারে প্রস্তুত করা বাইতে পারে। যে কোন ভাল ডাক্তারখানায় এই ঔষধ তৈয়ারি করাইয়া লওয়া বাইতে পারে :—

এমোনিয়া কার্বনেট—২ গ্রেণ।

সোডি বেঞ্জোয়েট—২২ গ্রেণ।

কুইনিন সলফেট—১২ গ্রেণ।

থাইমল—১ গ্রেণ।

অল্প পরিমাণ গদের সহিত মিশাইয়া একটি বড়ি বা চাকি প্রস্তুত করা হয়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি একখানি চাকি দিবসে তিনবার সেবন করিলে উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বাগকদিগের পক্ষে আখখানি এবং শিশুদিগের পক্ষে সিকি চাকি একমাত্র ঔষধ।

৯। রোগীর বিছানা ও বস্ত্রাদি প্রত্যহ ২১০ ঘটার অন্তর রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। সুস্থ ব্যক্তিকে রোগীর বিছানা বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে দিবে না। রোগ আরোগ্য হইলে বস্ত্র ও শয্যা দি জলে সুতাইয়া সাবান দিয়া

পরিষ্কার করিয়া লইলে উহা পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে।

১০। থাইমল (Thymol) বা পার্ম্যাংগেট অব পটাশ (Permanganate of Potash) নামক ঔষধ জলে অল্প পরিমাণে (১ গ্রেণ ঔষধ আধ সের গরম জলে) দ্রব করিয়া উহা দ্বারা দুইবেলা কুলকুচা করিয়া মুখ ও গলার ভিতর ধুইয়া ফেলিবে এবং উহা হাতে লইয়া উহার “নাস” লইবে। নাকের ও মুখের মধ্যে এই রোগের বীজ প্রবেশ করিয়া তথায় লাগিয়া থাকে; উপরোক্ত ঔষধের সাহায্যে নাক মুখ ও গলা ধোত করিলে রোগের বীজ নষ্ট হইয়া যায়। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি থাইমলের দ্রাবণ এইরূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১১। ছইকেটা ইউক্যালিপটুস তেল বা ডালচিনির তেল (Oil of Cinnamon) অল্প চিনির সহিত মিশাইয়া দিবে চুট বার সেবন করিলে এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা।

**বাটীতে সংক্রামক রোগ হইলে**

**উহা নির্দোষ করিবার**

**ব্যবস্থা।**

বাটীতে একজনের কোন সংক্রামক রোগ হইলে অপর পাঁচজনেরও ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং রোগীর আরোগ্যলাভ বা মৃত্যুর পর বাটীর ঘর ছয়টি একরূপভাবে পরিষ্কার করা উচিত, বাহ্যতে অপর কেহ ঐ ঘোগে আক্রান্ত না হয়।

নিম্নলিখিত উপায়ে বাসগৃহ সহজে নির্দোষ করিতে পারা যায় :—

১। এক পোয়া ফিনাইল (Phenyle) পাঁচসের জলের সহিত মিশাইয়া ঐ জল “জাতি” ডুবাইয়া বাটীর সমস্ত ঘরের মধ্যে, দেয়াল, দরজা, জানালা প্রভৃতি এবং তক্তা, পোশু, সিল্ক, বাস, আলনা প্রভৃতি কাঠের আসবাব দুই দিন উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিবে।

২। বাটীর উঠান, নর্দমা, পাইখানা, খাঁড়াকুড় প্রভৃতি স্থানে উপরোক্ত ফিনাইল দ্রাবণ ঢালিয়া দিয়া ধুইয়া ফেলিবে।

৩। রোগীর দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া তাহার ভিতর অন্ততঃ ২ ঘণ্টাকাল ব্যাণিয়া গন্ধক আলোইয়া রাখিবে।

৪। বাটীর সমস্ত অংশ (অন্ততঃ রোগীর গৃহ) ভাল করিয়া “চুনাম” কব্বিয়া দিবে।

৫। রোগীর গৃহের দরজা জানালা ৩,৪ দিবস সর্বদা খুলিয়া রাখিবে।

উপরোক্ত উপায়ে পরিতৃপ্ত হইবার পর ঐ গৃহে অল্প লোক বাস করিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।

**উপসংহার।**

উপসংহারে বলব্য এই যে, পল্লীবাসীদিগের মধ্যে গাঁহারা শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন, তাঁহারা দয়া করিয়া নিজ নিজ গ্রাম ছাড়িয়া গিয়া আসিবেন না। তাঁহারা গ্রামে না থাকিলে গ্রামের কোনরূপ উন্নতি হওয়া অসম্ভব। বাহ্যতে গ্রামের বাহ্যের উন্নতি হয়, গ্রামের মধ্যে বাহ্যতে অশিক্ষিত বিতার লাভ করে, অজ্ঞানতাশূন্য লোকীতা দূরীভূত হইয়া, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দবন্ধন বাহ্যতে দূরীভূত হয়, কো-অপারেটিভ প্রণালী অসাধারণ কার্য করিয়া বাহ্যতে গ্রামবাসী কল্যাণ

ও প্রমোদবিধানের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি  
দাখিত হয়, আপাততঃ অসুবিধা ভোগ  
করিয়াও তাঁহারা গ্রামে থাকিয়া সকলের  
সমবেত চেষ্টা দ্বারা, প্রয়োজনমত সরকার

বাহ্যহরের সাহায্য লইয়া, তৎসম্পাদনে বন্ধ-  
পরিকর হইল। ভগবানের আশীর্বাদে ও  
রূপার তাঁহাদের এই মহতী চেষ্টা শীঘ্রই সম্পূর্ণ  
সাফল্য লাভ করিবে।

## শিশুমঙ্গল।

বাক্সালা দেশে যতশিশু মরে, এমন আর  
পৃথিবীর কোনো দেশে নহে। এই মৃত্যুব-  
সংখ্যা সংপ্রতি একরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে,  
কর্তৃপক্ষকেও তাহার কৃত্রিম চিত্তিত হইতে  
হইয়াছে। বাক্সালার স্বাস্থ্য কমিশনের ডাঃ  
বেণ্টলী এই জন্তই চৈত্র মাসের শেষে কলি-  
শতা সহরে স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া  
শিশুমৃত্যুর নিবারণ করে নানাক্রম উপায়  
নির্দেশ করিয়াছিলেন।

কর্তৃপক্ষের এবিধ উদ্যোগ আয়োজন যে  
বিশেষ প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ  
নাই। বেণ্টলী সাহেবের শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী  
বঙ্গবাসীর সকলের দেখিবার সুযোগ না হইলে  
কবে কখন কলিকাতাবাসী বা প্রবাসীর উহা  
দেখিবার সুযোগ ঘটাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে  
জনকয়েকের নিকট হইতেও এ সম্বন্ধে সফ-  
ল্যে আশা করা না যায়। কারণ প্রদর্শনীর  
প্রদর্শিত বিষয়গুলি ভাঙ্গা করিয়া পর্যবেক্ষণ  
করার ফলে স্বভাবতঃই স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক  
তথ্য সহজেই অবগতি হইবার কথা।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যে সকল উপায়ে  
শিশুমৃত্যু হ্রাস পাইয়াছে, আমাদের বাক্সালা  
দেশে শুধু তাহাই প্রচলিত করিলে সম্যক  
ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়

না। আমাদের দেশেও মহিলাগণ অশিক্ষিতা,  
অতরাং পাশ্চাত্য দেশের অধুনা দেশে তাঁহা-  
দিগকে শিক্ষিতা না করিলে যে বাক্সালাদেশে  
শিশু রক্ষার আদৌ সম্ভাবনা নাই এই যুক্তিতে  
আমাদের সম্পূর্ণ মতভেদ আছে। বাক্সালী  
মহিলাগণের অনেকে এখন বেক্রম স্কুলে  
পড়িয়া কলেজে পড়িয়া বিদ্যায় হইতেছেন,  
আগে দেখা ছিল না। সরকারী রিপোর্টেই  
প্রকাশ, সমগ্র ভারতবর্ষে গত পূর্ব বৎসর  
অপেক্ষা গত বৎসর পঞ্চাশ হাজার ছাত্রী  
সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বীকার করি,  
ভারতবর্ষে স্বাী শিক্ষার পরিমাণ পাশ্চাত্য  
দেশের তুলনায় যৎসামান্য মাত্র, কিন্তু এমন  
দিনও যখন ভারতের খুটিয়া ছিল যে খনা।  
মৌলবতীর যুগ পরিবর্তনের পর ভারতীয়  
মহিলার দশ হাজারের মধ্যে এক জন মাত্রও  
বিজ্ঞা চর্চা করিতেন কি না সন্দেহ, অথচ তখন  
আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর কথা সামান্যই  
শুনা যাইত। এই জন্ত আমরা বলিতে বাধ্য—  
বাক্সালা দেশের শিশুদিগকে অকাল মৃত্যুর  
হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে দেশে শুধু জ্ঞা  
শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত করিলেই চলিবেনা,  
তাহা তিন্ন করিবার বিষয় অনেক রহিয়াছে।

সেকালের মহিলাদি স্কুল কলেজের লেখা

পড়ার খার কমই পারিতেন বটে কিন্তু গৃহ-  
স্থালীর সকল কার্যে তাঁহারা যেরূপ অভিজ্ঞতা  
লাভ করিতেন, সেখানে শিশুমৃত্যু কম হইত  
তাঁহারই ফলে ।

সে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁহাদিগকে  
স্কুল কলেজে পড়িবার আবশ্যক হইত না,  
বাল্যে মাতার নিকট, কৈশোরে স্বশ্রু-ঠান-  
রাণীর নিকট গৃহস্থালীর কার্য শিক্ষাও সঙ্গে  
সঙ্গেই সে সকল শিক্ষা আপনা হইতেই অর্জ-  
নের সুবিধা হইত ।

টহাৰ ফলে সেকালে যে এখনকার তুণনার  
দেখে শিশুমৃত্যু কম হইত তাহা নহে, সেকা-  
লেও শিশুগণ দুট, সবল ও বিলক্ষণ বণিষ্ট  
হইত, সেকালের লোকের দীর্ঘায়ু লাভ  
তাঁহারই ফল সম্ভূত ।

ঐত্ব বয়সের কর্মধ্য ব্যবস্থা সেকালে যে  
ছিলনা তাহাও নহে কিন্তু সেকালের 'ঐত্ব  
বয়সে শিশু ও প্রযুক্তিকে 'সেক তাপ দেওয়া',  
'স্নান মসলা' খাওয়ান প্রভৃতিতে যে পদ্ধতি  
ছিল, একালে তাহা অনেক দূরে উন্নতি  
গিয়াছে । বেণ্টলী সাহেবের প্রদর্শিত হস্তিকা  
গৃহের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার প্রদর্শনের সমর্থন  
আমরা সমান্তরালে করিতেছি, কিন্তু শুধু  
তাহা করিলেই চলিবেনা, সেকালের মত  
আবার সেক তাপের ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিকে  
আলমসলা খাওয়ান ও বন্দোবস্ত ও করিতে  
হইবে ।

অত্যাশ্রয় স্কুলে বাগাই বসুন আমরা শিশু-  
মৃত্যুর আলোকের কারণ নির্দেশে মুক্তকণ্ঠে  
বলিব, বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবই বাঙ্গালী শিশুর  
মৃত্যু বাহ্যিকের সর্বপ্রধান কারণ । বাঙ্গালী  
এ পরিমাণ পরিভ্রম করে, সে পরিমাণ

খাইতে পার না । দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি পুষ্টিকর  
আগাধ লাভ এখনকার দিনে অতি অল্প  
বাঙ্গালীর ভাগ্যেই ঘটয়া থাকে । সুতরাং  
পুষ্টিকর আহাৰ্য্যের অভাবে বাঙ্গালী জাতির  
জীবনী শক্তি কমিয়া আসিয়াছে । কাজেই  
সেই ক্ষয়মান জীবনী বাঙ্গালী জাতির  
যে সকল সম্মান সম্ভূতি জন্মিবে, তাহাও যে  
সম্ভাব্য হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ।  
প্রকৃত কথা, বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবই বাঙ্গালী  
জাতিকে দুর্বল করিয়া তুলিতেছে । এই  
দুর্বল পিতামহিতাব শুদ্ধ-শোণিতের মিশ্রনে  
সবল, স্তম্ভ ও দীর্ঘায়ু সম্মান লাভের আশা  
আনো কথা যায় না । একজন যদি বাঙ্গালী  
দেখ হইতে শিশুমৃত্যু নিবারণের চেষ্টা করিতে  
হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির জন্য আগে  
পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাঙ্গা-  
লীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনের মাত্রা কমাইতে  
হইবে, বাঙ্গালীর ভক্ষিত্যের প্রাণকাবে সেটে  
হইতে হইবে, মূল ধরিয়া চিকিৎসা করিলে  
তবে বোগের প্রত্যাহার হইবে, নতুবা এখন  
সংক্রামক বোগে শুধু মানুষী—বাঙ্গালী ওষধের  
ব্যবস্থা করিলে কোনও ফল হইবে না, তাহা  
অনিশ্চিত ।

বেণ্টলী সাহেবের পদন্যায় বক্তৃতা  
প্রদক্ষে আর একটি কথা উঠিয়াছিল যে,  
Early marriage বাঙ্গালী জাতির মধ্যে  
শিশুমৃত্যুর আর একটি কারণ । আমরা  
এ কারণও সমর্থন করি না । কারণ Early  
marriage বহুকাল হইতে বাঙ্গালী জাতির  
মধ্যে প্রচলিত । তাহার কোন পূর্বে তো অর্ন্ত  
কথা যায় নাই । আমাদের এক পুরুষ পূর্বে  
যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে

অনেকেই অষ্টম বর্ষে গোবীন্দানের ব্যবস্থা করিছেন। সে গোবীন্দানের ক্ষণে কাস্তি-কের মত কাস্তিমান ও দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে ভাড়াই বটত। Early marriage এবং এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখন সব পাড়নে সেট মন্তুগেব বোড়শ বমীয়া কথা না চট্টাই আব অনেকের পক্ষেই বিবাহ দেওয়া বটরা উঠে না। ফলে কত পক্ষে Early marriage এখনকার দিনে আর পড় একটা বটরা উঠে না, তবে পাস কথা পুত্রের বিবাহে অনেকটাই প্রলোভন চাড়িতে না পরিচা পাঠ

পার্বী বয়সের পার্থক্য বজায় রাখিতে পারেন না। ইচ্ছাতে অনেক সময় কুফল ফলি-তে, ইহা সত্য। পুত্র হিন্দু জাতীর মধ্যে বংশাবিলাহ প্রচলিত থাকিলেও তখন যে এখনকার মত বন্ধন তখন জী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা ছিল না এ কথা আমবা অনেকবার বলিয়াছি। তথাপি নক্ষত্র দেখিয়া, পক্ষী দল বাছিয়া, অতীত বিচার করিয়া তবে সেকালে স্থাপুরুষের মিলন কাণে নির্দিষ্ট হইত। এখন যে এক সকল ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে, বংশাবিলাহ শিশুমৃত্যু লাভের ইহাও একটি কারণ।

## পল্লী-প্রসঙ্গ।

১৯২৭

বঙ্গদেশের প্রত্যেক প্রদেশে বাঙ্গালার অনেক স্থলে পূর্ণভাবে বিবাহিত। তাহার উপর আরের আল বাঙ্গালার অনেক পল্লীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। গত মাসে মেদিনীপুরের “নীহার” আমাদের প্রকাশিত প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহা আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলাম। ঐ “নীহার” পুনরায় আমাদের প্রকাশিত দিচ্ছেন,—

আমাদের প্রকাশিত সর্বত্র আবার বাড়িতেছে। আর ৭৫ বর্ষেই লোকের জন্ম লাগত। বঙ্গদেশের প্রাচুর্যবও সম্পূর্ণ কমে নাই।

শুধু মেদিনীপুর নহে, ২৪ পরগণা হইতেও আমরা আরের সংবাদ পাইতেছি। “ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি” প্রকাশ,— “হিন্দু জাতির হিন্দুজাতি”—এ সংবাদের মধ্যে হই এক পদালা বট হইয়াছে। বঙ্গ-জাতির পূর্ব প্রকাশিত দেখা বাইতেছে।

ইনফ্রায়েন্সিও কোনো কোনো স্থলে ভীষণ মূর্তিতে দেখা দিয়াছে। অনেক হুঃস্থ পরিবার ঐ বোগে আক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত ঔষধাদির অভাবেও আরপর নাই কষ্ট পাইতেছে। শিশুদের “হুঃস্থ” জানাইতেছেন,—

মৌলবীজার সবভিত্তিসনের অন্তর্গত কমলগঞ্জ থানার এলাকাধীন মুলীজার ও তদ্রিকটবর্তী বত গ্রামে ইনফ্রায়েন্সিও রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন অনেক পরিবার আছে যে সমস্ত পরিবারে সকলেই পীড়িত, যত শুক্রা করিবার কেহ নাই। আবস্তক খাদ্য ও বস্ত্রভাবে এই রোগ এমন প্রবল হইয়াছে বহিরা লোকের বিবাস। এ বিবাস অমূলক নহে। শ্রীহট্ট জেলার হুঃস্থ শিউর সার্জন সাহেব বাহাদুরও অনেকের খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে এই রোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জানা যায়, রোগীর সংখ্যার তুলনায় মুলী-জার ডিসপেনসারিতে ঔষধের পরিমাণ অগ্রহণ। অবস্থা বিবেচনায় নীর উপযুক্ত ঔষধের সংস্থা করা

একাত্ত প্রয়োজন। গর্ভমেষ্টের অমুগ্রহে বোগীরা  
নাতব্য চিকিৎসায় হইতে উত্তম পাইতেছে ও গাইবে,  
কিন্তু অনেক রোগীই গণ্যের লজ্জা, মিথ্যে ও বালি  
ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ বলিবা পঞ্চাভাবে কষ্ট  
পাইতেছে। ১/০—১/৬ অংশ বনের মিশ্রিত দেব  
১০০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। অনেকই দ্বয়ের  
সময় গারে কাপড় দিতে পারিতেছে না।

বাক্সালার পল্লীগুলি হে মাদেনবিচার  
পীড়নে ধ্বংসোদ্ভব। তাহার উপর অনেক  
ক্লান্তি সৃষ্টিকিংসকব অভাব। ইত্যাব কাল  
বাক্সালা দেশে যে পরিমাণ বোগ্য বাচনা,  
বাক্সালা দেশে সে পরিমাণ চিকিৎসক নাই।  
মেনিনীপুরের "তিউতু" এ সম্বন্ধে বলিবে  
ছেন,—

ইনফুয়েন্সিয়া, মিউমোনিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি  
ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র ম্যালেরিয়া বিধে মেনিনী  
পুরের পল্লীগাম সমূহ জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন  
পল্লীগ্রামে চিকিৎসার অভাবে বিনা চিকিৎসায় কত  
লোকের যে জীবননাশ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বাক্সালাব বাবভূম জেলা বোঙ্গা-পীড়নে  
কিকপ বিপর্যাস্ত ভাঙা "বাবভূমবাসী" নিম্ন  
লিখিত সংবাদে অবগত হওয়া যায়।

বাবভূমে রোগে।—হরেক বরকম রোগ বাবভূমে  
ছড়িয়া পড়িয়াছে। মিউভীতে বহুলোক মিউমোনিয়ায়  
মরিল। রামপুরহাটে সময়ে ও মকঃবলে ঐ রোগে  
মরিতেছে। বসন্তও এখানে ওখানে আছে। মেনিনী  
নামের ধানার কোপাও কোপাও কলেরা দেখা  
দিয়াছে। সাইবিগাংসে একঘোটে বেগিবেগি হইয়া  
গেল। তপননের মতলবটা ভাল বলিয়া যোব না।

## মকরধ্বজের ব্যবহার প্রণালী।

[ ক বিরাজ শ্রীগোষ্ঠসিয়ারী সোমসামী ভিষগাচার্য্য। ]

একত্রে—আদ্যাবস, ১ মধুসহ, পানব  
বস ও মধুসহ অথবা তৃণসীপাতাব রস ও  
মধুসহ।

সান্নিপাতিক ঘোর বিকার অবস্থায়—  
মৃগনাতি ১ রতি, কর্পূর ২ রতি, আদ্যাব রস  
১ তোলা ও মধুসহ।

হামজ্বরে—উষ্ণে পাতার রস ১ তোলা,  
চরিতা চূর্ণ ২ রতি ও মধুসহ।

বসন্তরোগে—কটাক বস ১ তোলা ও মধুসহ

অথবা নিম্বকাল, কৈতপাপড়া, আকনাদির  
মূল, পলতা, কটকী, বাসকছাল, হরালতা,  
আমলকী, বেণারমূল, রক্তচন্দন ও খেতচন্দন।  
প্রতি দ্রব্য ১২ রতি ওজনে লইয়া আধসের

জলে দ্রব করিয়া আধপোরা থাকিতে নামা-  
ইয়া ছাঁকিয়া এই কাণ ও মধুসহ।

পুণাতন অবস্থে—আদ্যাব রস, মিউলী  
পাতার রস ও মধুসহ। মূলতানি ছিঃ ২ রতি,  
পিপুল চূর্ণ ২ রতি, মৈকর লবণ ২ রতি ও  
পানের রস ২ তোলা সহ অথবা আদ্য ও লঙ্কা  
কুশোমড়া ও নাটার কুড়ি, প্রভৃতি সমান  
ভাগে লইয়া একত্র ছেঁচিয়া কলার পাতার  
বাধিয়া পেটাইয়া তাহার রস ২ তোলা ও  
মধুসহ।

স্রোহার—হালজটা ভস ১ রতি ও পুণাতন  
ইক্ষুগুড় ১ তোলা সহ, মনদাপাতা সেঁচিয়া  
তাহার রস ১ তোলা ও মধুসহ, অথবা পিপুল  
চূর্ণ ১ রতি ও পুণাতন ইক্ষুগুড় ১ তোলা সহ।

যকৎরোগে—দাক্ষিণ্য নামক কাঠ  
জলের সঙ্গে শিলায় ঘর্ষিয়া সেই ঘসা ২ তোলা  
ও মধু ৫ তোলা সহ ।

অরতিদারে—মথার রস ও মধুসহ বা  
বেলুষ্ঠ চূর্ণ ২ রতি, জীরা চূর্ণ ১ রতি, চাউল  
দোয়া জুগে ও মধুসহ ।

অতিদাবে—বাগপাতার রস ও মধুসহ  
অথবা সোনাছাল বা কুড়চিহ্নি ছেঁচিয়া  
পোড়িয়া তাহার রস ১ তোলা ও মধুসহ ।

আমাশয়ে—মবিচ চূর্ণ ২ রতি ও কাঁটা-  
নষ্টমূল্যের রস ২ তোলা সহ অথবা তেঁতুল  
বা বুড়ীপানের পাতা, খুঁকুড়ির পাতা  
বা শরৎবেলের পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়া-  
ইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ ।

বন্ধু আমাশয়ে—কুসুমার রস ও মধুসহ  
দাড়িম পাতার রস ও মধুসহ, আরাপানের  
পাতার রস ও মধুসহ অথবা কামছালের রস,  
ছাগছত্র ও মধুসহ ।

অর্শে—নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ ৬ রতি,  
মিছুরা আধতোলা ও মাখন ২ তোলা সহ,  
অথবা এলকুচ চূর্ণ ৩ রতি ও মধুসহ ।

অগ্নিমালো—জোয়ান চূর্ণ ৬ রতি, সৈন্ধব  
লবণ ৩ রতি ও কাগজী লেবুর রস সহ অথবা  
আদার রস ও সৈন্ধবলবণ সহ ।

ক্রিমিতে—কটুকী ১০ তোলা, দাড়িম-  
মূলের ছাল ১০ তোলা, বিড়ঙ্গ ১০ তোলা,  
আগাধের দাউ ১০ তোলা ও দাক্তিনি ১০  
তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক  
ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ  
ও মধুসহ পালিখানাদারের ছাল চূর্ণের  
জলে ছেঁচিয়া তাহার রস ও মধুসহ অথবা  
পালিখানাদারের পাতার রস ও মধুসহ ।

পাণ্ডু, কামলারোগে—হরীতকী, বহেড়া,  
খামলকী, গুণ্ডক, বাসকছাল, কটুকী, চিরতা  
ও নিমছাল প্রতি দ্রব্য ২০ রতি, আধসের  
জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে  
নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ অথবা  
হরীতকী চূর্ণ ১০ আনা, পুরাতন ইক্ষুগুড় ১০  
আনা ও কুলেপাড়াব বস ২ তোলা সহ ।

বন্ধুপিত্তে—আলতা ১৫ আনা, পাকা  
যজ্ঞডুম্বর চটা ও ছাগছত্র আধপোয়া একত্র  
মর্দন করিয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধু। ছুঁকা  
ও যজ্ঞডুম্বর একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ও  
মধু, আরাপানের পাতার রস ও মধু, অথবা  
বাসকপাতার রস ও মধু ।

ঘন্মাকাসে—আরাপানের পাতা, পাকা  
যজ্ঞডুম্বর, কণ্টকারী ও বাসকপাতা একত্র  
ছেঁচিয়া ও পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা,  
৩ রতি বংশলোচন চূর্ণ ও মধুসহ অথবা  
বাসকছাল ১ তোলা, অনন্তমূল ১০ তোলা,  
তেজপাতা ১০ তোলা, বটমধু ১০ তোলা ও  
কিসমিস ১৭ তোলা আধদের জলে সিদ্ধ  
করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া  
এই কাথ ও মধুসহ ।

কাসে—আদা, তুলসীপাতা ও ব্যাকুড়ের  
পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস  
২ তোলা ও মধুসহ, পিপ্পল চূর্ণ ২ রতি,  
পানের রস ২ তোলা ও মধুসহ অথবা বাসক  
পাতার রস ও মধুসহ ।

শ্বাসে—বহেড়া বীজের শাস ১০ আনা,  
পিপ্পলচূর্ণ ৩ রতি ও মধুসহ, বহেড়া চূর্ণ ৩  
রতি ও মধুসহ, অথবা কণ্টকারীর রস ২  
তোলা ও মধুসহ ।

হিকাশ—ময়ূরপুচ্ছ ৬ রতি, পিপ্পলচূর্ণ ৩

রতি ও মধুসহ, কদলী মূলের রস ২ তোলা ও মধুসহ অথবা কচি তালের জল মধুসহ।

সরভেদে—বস্ত্রমধু চূর্ণ ও মধুসহ, বচের চূর্ণ ও মধুসহ অথবা ব্রাহ্মী শাকের রস ও মধুসহ।

অবোচকে—আমলকীর রস ও মধুসহ ও বা কুলভিজান জল ও মধুসহ।

বমন রোগে—স্তন ৩৬ ১/২ তোলা লউয়া কাঠাতে ২৩ থানা খালতাব পাতা দিয়া মর্দন করিবে, আলতার রং গুলিয়া গেলে ছাঁকিয়া পাঠাব ও তোলা, কর্পূর ৩ রতি, শসা বোজের শাঁস ১২ রতি, ও মধুসহ বা খেত চন্দন ঘসা ১ তোলা, আমলকীর রস ১ তোলা ও মধুসহ।

তক্ষ্ম—ক্ষেতপীপড়ার রস ও মধুসহ, বেদনার রস ও মধুসহ, মৌরি ভিজান জল ও মিছরী চূর্ণ সহ অথবা পটোলের রস ও মধুসহ।

মূচ্ছার—ত্রিকলার জল ও মধুসহ, বড় এলাচের কানী চূর্ণ ও মধুসহ অথবা বহেড়া বোজের শাঁস ও মধুসহ।

দাহ রোগে—পলতার রস ও মধুসহ, ধনে পলতার কাথ ও মধুসহ, ক্ষেতপীপড়া ও বালা পাতা একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ বা রক্তচন্দন ঘসা ২ তোলা ও মধুসহ।

উদ্বাদ রোগে—শতমূীর রস ও মধুসহ, ত্রিকলার জল ও মধুসহ অথবা মৃতকুমারীর রস ও মধুসহ।

অপম্মার রোগে—বচের চূর্ণ ও মধুসহ, কুরাক জল ও মধুসহ, ব্রাহ্মী শাকের রস ও

মধুসহ অথবা তিল তৈল ১ তোলা ও রঘন আধ তোলা সহ।

পাত রোগে—নিসিকার পাতা, বেগ পাতা, গাঁদালের পাতা ও আদা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা, সৈন্ধব ১১৭ ও রতি ও মধুসহ, আনুশীব নীজ চূর্ণ ৬ রতি, পুরাতন গুঁড়া ১০ আনা মধু ৮০ আনা ও রঘনের রস ১ তোলা সহ অথবা আদা ও এবণ্ডুল চুঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

বাতরক্ত ও কুষ্ঠে—অনন্তমূল্যের কুষ্ঠে ও মধুসহ অথবা অনন্তমূল্য, বেতের মূল, ছাতিম ছাল, কটকী সোণামুখী, দাক্ষরিন্দা মজিষ্টা ও ত্রোপচিনি প্রত্যেক ১০ আনা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

শূল ও অঙ্গপিতে—ফটকির চূর্ণ ৮০ আনা কুকশিমার রস ২ তোলা ও মধুসহ, গুঁঠ ৫৩ বতি, এরওমূল ৫৩ রতি ও ববের চাউল ৫৩ রতি আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ অথবা ধনে ১০ তোলা, মৌরী ১০ তোলা ও কাকী ক্ষুরীতকী ১ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

জন্মে—জোয়ান চূর্ণ ৮০ আনা, বিট লবণ ৮০ আনা ও পরিষ্কার বোল ৬৬ শিরি সহ।

মৃতকৃষ্ণ ও অশ্মরী রোগে—বকল ছালের রস ও মধুসহ, পাথরকুটির পাতার রস ও মধুসহ অথবা গোক্ষুরকী চূর্ণ ৮০ আনা চিনি ১০ জোলা ও তেলাকুটার পাতার রস ২ তোলা সহ।



জালাযুক্ত মেহে—কাবাবচিনি চূর্ণ ১০ আনা, কপূর ৬ রতি, খেত চন্দন ঘসা ১ তোলা ও মসিনা তিজান জল সহ অথবা কাঁচা হলুদের ঘসা ১ তোলা, খেতচন্দন ঘসা ১ তোলা ও বাবলার আটা চূর্ণ ও রতি সহ ।

শুক্র মেহে—কাবাবচিনি চূর্ণ ১০ আনা, কপূর ৬ রতি, শুক্লকর রস ২ তোলা ও মধু সহ ।

ধাতুদৌর্বল্য ও ধ্বজভঞ্জে—শিমূল মূলের রস ২ তোলা, চিনি আধ তোলা ও বলকা দধ ১ ছটাক সহ, আলকুনী বীজ চূর্ণ ও রতি হালিমূলা চূর্ণ ও রতি, চিনি ১০ তোলা ও মাখন ২ তোলা সহ অথবা ভূমিকুয়াণ্ডের রস ২ তোলা চিনি ১০ তোলা ও বলকা দধ ১ ছটাক সহ ।

শোথ রোগে—খেত পুনর্বীর রস ও মধু সহ, বেলপাতার রস ২ তোলা ও মরিচ চূর্ণ ও রতি সহ অথবা শুক্র মূলা ১ তোলা কাঁচা বেলপাতা ১০ তোলা, শুঠ ১০ তোলা ও পাশেব শিকড় ১০ তোলা, আধমের জলে দিঙ্ক করিয়া একছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধু সহ ।

বৃদ্ধি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ও দ্রীপদে—দজিন মূলের রস ও মধু সহ, হরীতকী চূর্ণ ও রতি, মৈত্রবালী চূর্ণ ও রতি, পিপ্পল চূর্ণ ও রতি ও গরম জল সহ অথবা বেলপাতা, আনা ও নিম্বন্ধার পাতা একত্র ছেঁচিয়া গোড়াইয়া

তাকার রস ২ তোলা, মৈত্রব লবণ ২ রতি ও মধু সহ ।

নেত্র রোগে—ত্রিফলার জল ও মধু সহ অথবা ভীমরাজের রস ও মধু সহ ।

নাসা রোগে—দাড়িম ফুলের রস ও মধু সহ বা অনন্তমূলের কাথ ও মধু সহ ।

শিরোরোগে—জটাংগী তিজান জল ও মধু সহ, ত্রিফলার জল ও মধু সহ বা এরণ্ড-মূলের রস ও মধু সহ ।

রক্তকৃচ্ছে—বেণুকা চূর্ণ ও রতি ও মধু সহ, তিলের কাথ ও মধু সহ অথবা এরণ্ডমূল, বেড়োলা মূল, রক্তকম্বলের মূল ও ওলটকম্বলের মূল প্রতি দ্রব্য ১০ তোলা—আধমের জলে সিদ্ধ করিয়া একছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধু সহ ।

খেত প্রদরে—রুত ১০ তোলা, মধু ১০ তোলা, চিনি ১০ তোলা ও লাল জবা ফুলের কুড়ি—চাউল ধোয়া জলে ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা সহ অথবা বাবলার পাতার রস ২ তোলা ও মধু সহ ।

রক্তপ্রদরে—হরী, বজ্রমূর ও কাঁটানটের মূল একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধু সহ, বাবলার পাতা ও রক্তকম্বলের কন্দ একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধু সহ অথবা অশোক ছালের কাথ ও মধু সহ ।

সুহাবস্থায়—বেদানার রস ও মধু সহ অথবা মধু ২ তোলা ও মিহিরী চূর্ণ আধ-তোলা সহ ।

## প্রাচীন চিকিৎসকের টোটকা ও মুষ্টিযোগ।

( পুরাণমুত্ত )

[ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী কর্তৃক সংগৃহীত। ]

—:—:—

শিরোগে—একটি পাতিলেবু গোব-  
রের ( গোময় ) চূর্ণিতে পুরিয়া তামা ঘুটেব  
অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। লৈবুর উপরি-  
স্থিত গোময় আবরণ পুড়িয়া গেলে পেরুনি  
এক রাত্রি শিশিবে রাখিতে হইবে, পারিশোব  
এক তোলা সোরা' ও অর্দ্ধতোলা গগাবৃত্ত  
তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই ঔষধ মস্তকে  
ও কপালে প্রলেপ দিলে যে কোন প্রকার  
শিরোরোগ হইক না কেন আরোগ্য হইবে।

প্রস্তাব বন্ধে—কুমড়াব ( জলকুমড়া )  
বৃকের ক্ষার ও সোরা সমভাগে মিশাইয়া  
১০ আনা অথবা ৮০ আনা পরিমাণে ঠাণ্ডা-  
জল সহ সেবন করিতে হইবে।

নাণীক্বে—শরভানুগীর পাতার রস ও  
তামাক পাতার রস একত্র মিশাইয়া কিছু  
তুলিতে লাগাটরা ন্যূনীর ওতর প্রবেশ কবা-  
ইয়া দিতে হইবে। দিনে ৩৪ বার প্রয়োগ্য।

আমাশয় জন্ত উদরের বেদনাক—আম-  
কলের পাতার রস গরম মধু সহ খাইলে উপ-  
কার হয়।

বিবিধ ক্বে—যেত কাকন জুল—জল  
দ্বারা বাটিয়া ক্বে প্রলেপ দিতে হইবে।

রক্তমূত্রে—নিম্বজালের রস এবং আলতা  
ধোওয়া জল সমপরিমাণে খাইতে হইবে।

প্রস্তাব বন্ধে—পুই পাকের ডাটা, যেটে  
কলনের উপরের দানি, চিলের খোসা, সোরা,

'কাঁচা' ধানের উপরের ছাল একত্র সমভাগে  
গাউয়া চূর্ণম করিয়া বাউট্টা পরে জয়ন্তী পুষ্পের  
পাতা ২ তোলা বাটিয়া উক্ত ঔষধের সহিত  
মিশাইয়া বস্ত্রির্মেণে প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই  
উপকার্য হইবে।

কাণ পাকায়—মান মচুব কচি পাতার  
রস কর্ণে দিলে বেশ ফল হয়। রস প্রয়োগ-  
ের পর তুলা দ্বারা কাণটা কিছুক্ষণ বন্ধ  
করিয়া রাখিতে হইবে।

আধকপালে মাথার বেদনাক—উননের  
পোড়া মাটি এবং লক্ষা সমভাগে চূর্ণ করতঃ  
নস্ত গ্রাচণ করিলে প্রত্যক্ষ কল পাওয়া যায়।

উদগরণে—একটি গোধ পাত্রে পুঁপু দিয়া  
একটি আঙ্গা হরীতকী ঘষিতে হইবে। পরে  
কিছু খদির তাহাতে পুনরায় মিশাইতে  
হইবে। যখন শুষ্ক বেশ ঘন হইবে তখন তুটা  
কাঁটা নুটের শিকড় ঘষিলে মলম হইবে, সেই  
মলম উদগরণ ক্বে প্রয়োগ করিলে অর  
দিয়েই ক্বে নিশ্চয়ই শুদ্ধ হইবে। ঔষধে  
যেন জল না লাগে।

গোষ্ঠা ঘারে—হরিদ্রা পাতা অথবা তুলসী  
পাতা বাটিয়া প্রয়োগ করিলে বেগ ক্ষয় হয়।

ছদ্দি মোগে—(১) বেগের বীজের কাঁচা  
২ রতি যেত চন্দন বা আধ আনা—একত্র  
সেবন করিতে হইবে।

বাধী বসান—কলিচূর্ণ, চিংড়ামাজ, খেত-  
চিটা মূল সমপরিমাণে একত্র বাটিয়া প্রলেপ  
দিতে হইবে।

প্লাগা রোগে—আমড়া পাতার বস দ্বারা  
আমড়া বাটিয়া প্লাগা স্থানে প্রলেপ দিতে হইবে।

একশিরা রোগে—তামাক পাতার উপরে  
ভুট্টার চূর্ণ কিছু জড়াইয়া দিয়া এক  
শিরার উপর বাধিয়া রাখিতে হইবে।  
বেশাফল রাখিলে বমি হইতে পারে।

## ওলাউঠা চিকিৎসা।

(পূর্বসূচক)

[ কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী ]

উদ্বেষ্টন।

এখন শরীবে রক্তের অল্পতা হইতে আ-স্ত  
হয় এবং মর্ষগ্ৰাসি হইতে শয়নবাশি ক্রমশঃ  
হেরন হইয়া স্থলিত হইতে থাকে সেই সময়  
এক এক স্থানে এক এক বার ভঙ্গবৎ বেদনা  
উপস্থিত হইয়া বোগীকে সাতিশয় যন্ত্রণা  
প্রদান করে। ভবিষ্যৎ যন্ত্রণার অতীব অর্থাৎ  
হইয়া বোগী সর্বদাই আত্মনাশ করিতে  
থাকে। এইরূপ বেদনাকে উদ্বেষ্টন বলে।  
চলিত ভাষায় ইহাকে খালধরা বলা যায়।  
যে প্রকার বীজাণু দ্বারা শরীরের রক্ত ও শ্লেষ্মা  
অপাঙ্করিত হইয়া স্থানান্তরিত হয়, কোন উপায়ে  
সেই বীজাণু বিনষ্ট হইলেই এই উপদ্রব  
নিবারিত হইতে পারে। পূর্বে কথিত বিষয়  
চূর্ণের স্বরূপ যে পুস্তক পুস্তকের কেশর ও  
গোলমরিচ সেবনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে  
তাহা প্রত্যেকের উপরে স্থিতিশীল হইলে  
ওলাউঠা রোগে কোন প্রকার উপদ্রবই  
হইতে পারে না। উদ্বেষ্টন প্রভৃতি কোনো  
কোনো উপদ্রব যত্নভাবে আক্রমণ করিলেও

তাঁহা দূর করিয়াই জগৎ আর বিশেষ কোনরূপ  
চেষ্টা করিতে হয় না। আপনা হইতেই উপ-  
শান্তি হইয়া থাকে। কুড়, মৈকর লবণ কাঁজি  
সহিত বাটিয়া প্রলেপ অথবা যখন যে স্থানে  
খাল ধরিতে থাকে সেই স্থানে মর্দন করিলে  
উচ্চা দ্বীকৃত হয়। শুভ্রত্ব, তেজপত্র, রাসা,  
অঙ্কুর, সজিনা, ডাল, কুড়, বচ ও শুষ্কা—  
এই সমুদয় সমভাবে হইয়া কাঁজির সহিত  
বাটিয়া খল্লীস্থলে (খাল) মর্দন করিলে  
সুমনহান উপকার হইয়া থাকে। আদা এক  
ভাগ, সোরা এক ভাগ, ত্রিবি দুইভাগ, মাষ-  
কড়াইচার ভাগ—একত্র জলে বাটিয়া কাপ-  
ড়ের পুটুলিতে অন্ন অন্ন গরম করিয়া হাতে  
পায়ে বেদ দিলে খাল ধরা আরাম হয়।  
ভ্যারেণ্ডার বীজ, ভ্যারেণ্ডার মূল, ভ্যারেণ্ডার  
পাতা ও হিং প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে হইয়া  
সকলের তুল্য পরিমাণ চিনির সহিত নিশাইয়া  
এক সঙ্গে বাটিয়া পূর্ববৎ বেদ দিলে খালধরা  
ছাড়িয়া যায়। মহালতা (কৈল) গোটাটুক

(পরিমাণ ১ ছটাক) অঙ্কুরের পরিমাণ  
টাকা সর্ষেব তেলে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইয়া  
খলীস্থলে মালিশ করিলে আশাতীত ফল  
দেখিতে পাওয়া যায়।

### শিরঃশূল।

রক্ত উর্দ্ধগামী হইলে মস্তকে অতিশয়  
বেদনা হয় ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। চীন  
বল শ্লেষ্মা ও প্রবল বায়ু প্রকোপ বশতঃও  
মস্তকে বেদনা হইতে পারে। এতদপক্ষে  
মস্তকে শীতল জল সেচন, অল্পক চন্দনাদি  
লেপন করিলে সবিশেষ ফল দর্শ। বর্তমান  
সময়ে মস্তকে Ice-Bag বাপা সর্বোৎকৃষ্ট  
অবিদ্যাজনক ও কলপ্রদ। সোবা, চাপা  
কচি নিমপান্য একত্রে কাজার সত্তি বাটিয়া  
মাথার প্রাণে দিলে প্রায়ই বরফের গার  
কাগী কবিয়া থাকে। পুণাতন ঘৃত, কর্ণা,  
বড় এলাচের দানা—একত্র মিশ্রিত করিয়া  
শিরোরোধে মর্দন করিলে শিবঃশূল নিবারিত  
হয়। টাবালেবু গোবরের ঠুলিতে অংক  
করিয়া ঘুটের আগুনে গোড়াইয়া রস স্বেদন  
করতঃ মস্তকে লাগাইলে শিবঃশূল অনেক  
ক্ষেত্রে ত্বরোচিত হইয়া থাকে।

### মূত্রাবরোধ।

টহা ওলাউঠা রোগের একটা প্রধান  
লক্ষণ। যে পর্য্যন্ত মূত্র নিঃসরণ না হয়  
সে পর্য্যন্ত কিছুতেই রোগীর জীবনের আশা  
করা যায় না। রক্ত হইতেই মূত্রের উৎপত্তি।  
ওলাউঠা বেগে সেই রক্ত প্রথমে অপাঙ্করিত  
হইয়া আইসে। সুতরাং মূত্র বিগঠিত হইতে  
পারে না। আবার মূত্রাশয়ের পথ সংকুচিত  
বা অবরুদ্ধ হইলেও মূত্র নিরোধ উপস্থিত হয়।

বরফ, মোরা 'তানান জ', কম্পুং বাসি..  
শীতলজল উৎকৃষ্ট মূত্রকাষক। ডাণের জগে  
মূত্র সংকলন ও মূত্র নিঃসরণ হইয়া থাকে।  
নীলমাটি, সোবা, জলা"র নিপতিত পলিত  
আম্রপত্র একত্র বাটিয়া নাতি জ্বলিতদেয়ে  
পলেপ দিলে মূত্রস্রাব হয়। ইলপদ্রের  
গাণা অথবা গাণা ফুলের গাণা বাটিয়া নাতি  
চতুর্দিকে পলেপ দিলে মূত্রাবরোধ দূরীভূত  
হয়। মূত্রসংকলন ও মূত্র নিঃসরণ পক্ষে নিম্ন  
নিপতিত ঔষধটা বশতঃভাবে প্রয়োগ।

গ্রীষ্মকালীন বস।

গাবদ	}	(শোধিত ও কজ্জলীকৃত) ১ ভাগ
গন্ধক		
লৌহ	}	(শোধিত ও জারিত) ১ ভাগ
কাস্তুরাণ		
সংকার	}	"
সাঁচকার		
সোবা	}	"

এই সাওধানি দ্রব্য উত্তমরূপে মর্দন  
করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তারপর  
জলকাত পাত্রে নবপত্রের স্বরস প্রদান করিয়া  
ঐ মিশ্রিত ঔষধ মর্দন করিবে (ভাবনা দিবে)।  
যখন বটিকা বিবাক উপযুক্ত হইবে, তখন দুই  
রতি প্রমাণ এক একটা বটী করিয়া ছায়ার  
তরকারী রাখিবে। ইলপদ্রের কচিপাতার  
রস এক ভোগা ওটনি দুই আনা সহ এক  
একটা বটী দুই তিন ঘণ্টা জলদ্বারা সেবন করা-

\* পারদ গন্ধক লৌহ কাস্তুরাণসম্বন্ধ।  
শ্রীরাম সোরক মলিনী পত্রিকা-মলিনী  
বিভাগ বটিকা ভাবেরে ফল পায়।  
শিলা মূত্র মূত্রমূত্র বায়ু মূত্রাশয়ের।

—আয়ুর্বেদবিদ্যা

টলে মূত্র সঞ্চিত ও নিঃসৃত হয়। স্বপ্নপদ্মের অভাবে পাথরকুচি পাথর রস ৥০ তোলা ও বেগুন, রসিসচ এই ঔষধ সেবন করাইবার বিধান আছে। উল্লিখিত ঔষধটী প্রচলিত কোন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে দৃষ্টগোচর হয় না। আনাদিগের পূর্ব্ব কথিত সন্ধ্যায় প্রদত্ত আদিত্য সন্ধ্যায় চাইতে গৃহীত হইল। এই ঔষধমধ্যে যে কাস্তপাষণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তীব্রকফা দীর্ঘ এক প্রকার মূল্যবান পদার্থ। কেহ কেহ কাস্তপাষণ ঔষধ চুষক পাথর গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক, তাহা নহে। কাস্তপাষণের কথা স্থানান্তরে আমবা বিশেষরূপে বর্ণন করিব।

### উদরক্ষতি।

বোগের প্রায় শেষ অবস্থায় এই লক্ষণ সঞ্চিত হয়। উদরক্ষীত হইতে আরম্ভ হইলে কদাচিৎ কাহারও জীবন রক্ষিত হয়। এই সময় ঔষধ বা পথ্য কিছুমাত্র পরিপাক কবিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং সেবনীয় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোনরূপ উপকারেব প্রত্যাশাও বড় করা যায় না। মল মূত্রাদি সম্পূর্ণ নিরোধ এবং শারীরিক যন্ত্রগুলির সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়তা অথবা উল্লিখ্যবর্ণের গ্রন্থী শক্তির বিলুপ্তি হইতেই এই লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। কেহ কেহ ঔষধের বশে কেহ কেহ বাচিয়াও যায়। বাস্তবিক উদরক্ষতিতে স্নেহ-শ্বেদ অর্থাৎ পুষ্করী সূত বা তরপিন তৈল মর্জিত করিয়া গরম জলে নেকড়া সিজা-ইয়া পেটে স্নেহ দেওয়া কর্তব্য। ইহাতে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

মলমূত্র নিরোধলত উদরক্ষীত হইলে

নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। ইহাতে কল ও দর্শিয়া থাকে।

### ত্রিকটাদি বস্তি\*।

পিপূল ১০, মরিচা ১০, শুঠা ১০, যেতদর্শণ ১০, গুণ্ডল ১০, কুড় ১০, মদনফল ১০। এই ঔষধগুলি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কাগজে ছাঁকিয়া সম পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। পবে আট তোলা মধু বা গুড়ের সহিত কল্লু পবিত্রিত বস্তি প্রস্তুত করিবে। এই বস্তি প্রয়ুক্ত করিয়া অল্পে অল্পে মলবারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাব অভিস্রবীয় প্রভাবে মল মূত্রাদি নিঃসরণ হয়। সুতরাং অল্প ও পবিত্রিত হইয়া উঠে। মল মূত্রের নিঃসরণ ঘটিলে উদর ক্ষীণ উপদ্রবেরও অবসান হয়। আমবা চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সূত্রে যেরূপ উপায়ে সফলকাম হইয়াছি, অকপটে সরাসর করণে অনাবিল ভাষায় তাহাই প্রকাশিত কবিলাম। কচি বা তুখা কথিত বিজ্ঞানের দিকে আদৌ দৃষ্টি পাত করি নাই। যথ্যের আলোর যেমন স্বভঃ প্রকাশ,—কুসুমের সুধ-মার যেমন নৈসর্গিক বিকাশ, বালকগণের কম-নীর মধুরূচি যেমন সত্যলজ মনোমদ; প্রত্যক্ষ ফল প্রদ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের শক্তি-প্রভাব তেমনি প্রত্যক্ষীকৃত সমুদ্ভাসিত সত্যসম্ম। আমা-দিগের সনির্ব্বন্ধ অমুরোধ,—“আয়ুর্বেদের” সুধীর সুধী পাঠক বৃন্দ এই অকিঞ্চনের স্মৃতি-

\* বস্তি ত্রিকটক সৈক্যব সর্গণ-গুণ্ডল-কুটমদন কলৈঃ।  
মধুনি শুভবা পক্য পথ্যবিত্তান্ত পরিমাণা।  
বস্তিবিদ্যে দৃষ্টকল শনৈঃ শনৈঃ ব্রহ্মতা-মৃত্যুভাঙ্গা।  
আনাহো বর্ষ প্রশমনী লঠর শুভ নিবাসিনী চ।  
—প্রয়োগ মালার।

কিংকর প্রবন্ধ এবং গুণবিধান পূর্বক আলোচনা করিবেন। মনোযোগী হইয়া চেষ্টাশীল হইলে নিশ্চয়ই ওলাউঠা রোগে সার্বজনীন বিভীষিতায় আতঙ্কিত হইবেন না। আর-দিশের বিখ্যাত ঔষধার্নব প্রয়োগ-পণী '৩' বিশেষ কিছু ভয়ঙ্কর নহে। ইহার উপস্থাপন

না উপকরণ পল্লীগামের সর্বত্রই অনায়াসে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 'উগবান্দে' আশীর্বাদ, প্রাচীন বর্গের প্রসাদে, ভয় ও ক্রোধ দ্বারা আকর্ষিত বা পানি পাইলে পরিশুদ্ধায়ায় ওলাউঠা চিকৎসার ভীতি-মিচুতি সনাশিত করিব।

## আকন্দ।

( কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন )

—সংস্কৃত—

আকন্দের গাছ বঙ্গদেশের পায় দক্ষিণে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো গৃহস্থের বাড়ীতে ও উচা বৃক্ষে বসিত হইয়া থাকে। বাহাদিগের বাটীতে এই গাছটী মাটি বাহাদিগের বেন প্রাক্কনের এক পাশে এই বনৌষধিতে একটু স্থান প্রদান করেন। মহাশয় সনাতন অপেক্ষা একটা আকন্দের গাছে মত উপকার সাধিত কবিরাজ থাকে।

এই আকন্দের সংস্কৃতনাম অর্ক—আকন্দ, অকর্ক, বেতপুশ, বকপুশ ইত্যাদি।

এইরূপ আমরা উচা বৃক্ষ-পরিচয় প্রদান করিব।

আকন্দের পত্র, মূল, আঠা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খেত ও বন ভেবে চুট পকার আকন্দ। উভয়েই গুণ প্রায় তুল্য।

শ্লেষ্মাধিকা রোগে—অর্কপত্র।

বৃকে সর্দি বসিলে আকন্দের পাতার উপর দিকে প্রস্রাব প্রস্রাব পাইয়া কয়েক করতঃ বৃকে বসাইয়া দিবে, তৎপরে পাতিলো-

বক মেন্ডা উচ্চ করিয়া শব্দ দিবে, উচ্চতঃ উচ্চতঃ শব্দ সবল হইয়া উঠিয়া যাইবে। নিউমোনিয়া রোগে এই শব্দ বিশেষ ফলপ্রসূ। আর অগ্রে চুলা বাসি বৃক্ষ বাধিয়া রাখিলে। যে কোন রোগে বৃকে সর্দি (কফ) বসিয়া যাই, তাহা হইতে এই বৃক্ষে উপকার মর্মে।

বাতজ্ব আর্শে—অর্কপত্র।

আকন্দের ফোল পত্র যে পরিমাণ লইবে, মিশ্রিত পঞ্চাঙ্গন হাঁহাব এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে, পরে অর্কিত তিন তৈল ও আমরুলের পত্রের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া অস্ত্রধূসি ভয় করিয়া কাব পত্র করিবে, এই কাব মিকি পরিমাণে উফোমকের সহিত পান করলে বাতজ্ব অর্শ রোগ হু্যায় হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মা রোগে—অর্কপত্র।

আকন্দের পত্র যে পরিমাণ গ্রহণ করিবে, সেইরূপ সবল হাঁহাব এক চতুর্থাংশ লইবে। একটা বাটিল হাঁহাব মধ্যে একটা

একটা করিয়া আকন্দের পাশ বিছাটা দিবে, তাহার উপর সৈকর চূর্ণ চড়াইয়া দিবে। পুনরায় আর এক প্রস্থ পান্য পাড়াইবে, তদুপরি পুনরায় সৈকর চূর্ণ চড়াইয়া দিবে, এইরূপে পত্রগুলি ও সৈকর চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে একত্রানি করা যাবে। তাঁড়ীটাব মধ্য বুদ্ধিমাক্ত বস্ত্রখণ্ডে তাহার লম্বা কনিষ্ঠা সন্যাসে তাঁড়ীর সংযোগস্থান দ্বারা তাহার কনিষ্ঠা, এক ঘণ্টা পরিমাণ সমন্য রাখিয়া এই তাঁড়ীটী মৃদুত্ব অগ্নির উপরে রাখিয়া নামাইবে। এই কাপে অল্পধর্ম্মে জ্বার প্রসূত হইবে। তাহা হইলে তাঁড়ীটাব সব গুলিষ্টা কান গ্রহন করিবে। এই জ্বাব সিন্ধি পরিমাণ প্রত্যহ দক্ষিণমুখে মণ্ডন সেবন করিতে অতি প্রযুক্ত নীতি নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে অর্ক লবণ বলে।

### উরুস্তম্ভে—অর্কপত্র ।

উরুস্তম্ভ বোগীকে লবণ বর্জিত তৈলাক্ত অর্কপত্র চলে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করাষ্টবে।

### শ্বাস রোগে—অর্কপত্র ও পুষ্প ।

আকন্দের পত্র ও পুষ্প সমানভাগে তেল গুরিস কাপ প্রস্তুত করিবে, এই কাপে যবেব চাউল ৭ বাব ভাণনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণিত যবতণ্ডুল ছোট আনা মাত্রায় লইয়া মধু সহিত সেবন করাইলে শ্বাস রোগ উপশান্ত হয়।

আকন্দের মূলের ছাল চূর্ণ আকন্দের আঠা-ভাণনা দিয়া রোদ্রে শুষ্ক করিবে, এই চূর্ণ দ্বারা ভাষাকের পাতা বেটন করিয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া অগ্নি সংযোগে ধূম পান করিলে শ্বাস রোগ নিবৃত্তি হয়।

### উদরাধানে—অর্কপত্র ।

দ্রব্যাগান হইলে আকন্দের পত্রে তৈল না রাখিয়া উদর বেটনপূর্বক বাঁধিয়া রাখিলে পত্র ক্ষাণ্ড উপশান্ত হয়।

আকন্দ পান্য পলিপে বেদনা ও কুশার পক্ষে বিশেষ কল প্রদ।

### কোমরক্লি বা কুরণ্ড রোগে ।

আকন্দ মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া পত্র ও প্রলেপ দিলে অতি বড় কুরণ্ডও বিনষ্ট হয়। উক্ত প্রলেপ গোদে ব্যবহার করিলে গোদ নষ্ট হয়। একশিরা বোগে আকন্দের পত্র বাবা কোব বেটন করিয়া, বন্ধন করিয়া রাখিলে একশিরা আরোগ্য হয়।

মুখে মেচেতা ( কালো কালো দাগ ) পড়িলে আকন্দের আঠার সহিত হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে মেচেতা আরোগ্য হয়।

### চোক উঠায়—আকন্দমূলের ছাল ।

আকন্দমূলের ছাল ১ তোলা কুটিত করিয়া এক পোরা জলে সিদ্ধ করিবে, ১৫ মিনিট সিদ্ধ হইলে উজা শীতল করিয়া দিবসে ২৩ বার ৪-৫ ফোঁটা করিয়া চক্ষে প্রদান করিবে। চক্ষু চুলকানি, লাল হওয়া বেদনা ও ভাব বোধ ও চক্ষুর পিচুটীভ ভায় হইয়া চোক ওঠা আরোগ্য হয়।

### কর্ণশূলে—আকন্দ ।

আকন্দ পত্র উত্তপ্ত করিয়া নিশীড়ন করঃ রস বাহির করিবে, এই তৈল রস কর্ণাত্তরে ২৩ ফোঁটা নিক্ষেপ করিলে কর্ণ শূল ( কণ্ঠের মধ্যে বেদনা ) নিবৃত্তি হয়।





স্বায়-কেন্দ্র হস্ত চালনা এবং চাক্ষুষ স্মৃতি-কেন্দ্র নিয়মিত কবে, সেগুলি মস্তিষ্কের সুস্থ অংশে অবস্থিত ।

মস্তিষ্কের মধ্যে হের-ফেব ঘটলে, আরো অনেক অপূর্ণ ব্যাপ্য দেখা যায় । সময়ে সময়ে একজন মানুষ অত্যন্ত সমস্ত শব্দ, গান ও গোলমাল শ্রুতিতে পায়, কিন্তু কথিত বাক্য কিছুতেই তাহার কর্ণকূলেরে প্রবেশ করে না ! সে লিখিতও পারে, পড়িতেও পারে, কিন্তু তাহার মাতৃভাষায় কথিত বাক্য শ্রুতিগেও সে মনে করিবে বনমূম্ব বা বাদবের অর্থহীন ‘কিচির মিচির’ মনে হইবে ! সে একেবারে “word-deaf” বা “কথা-কান” হয় বলিয়া তাহার দ্বারা প্রতি-লিখনও কাজে চলে না । মস্তিষ্কের শ্রুতি-কেন্দ্রে গোলমাল হইলে মানুষের এমনি শোচনীয় দশা হয় ।

“চাক্ষুষ-স্মৃতি-কেন্দ্র” (visual memory centre) মস্তিষ্কের ঠিক পিছনদিকে থাকে । এই অংশে আঘাত লাগিতে বা খাড়া উপস্থিত হইতেই মানুষ “বাক্যহীন” হইয়া পড়ে ।

অর্থাৎ অনেকদিনের অভ্যস্ত বাক্যমূলক শ্রুতি তাহার মনে হইতে মুহূর্ত্তা যায় । কিংবা সে বিশেষ এক একটি অক্ষর দেখিয়া একেবারেই চিনিতে পারে না ।

কোন কোন লোক তত্ত্বক্ষণ পর্যন্ত কথা বানান করিতে পারে না, যতক্ষণ না তাহা কালি-কলমে কাগজের উপরে লিখিয়া দেখে । যতক্ষণ না লিখিতে পারে, ততক্ষণ তাহা দেখে সন্দেহ থাকিয়া যায়, কথাগুলির বানান শুদ্ধ হইল কিনা ! এখানে মস্তিষ্কের স্মৃতির চের হাতের মাংসপেশীর স্মৃতি প্রথর হইয়া

পাকে । ইউরোপের অনেক বিখ্যাত গিরানো বাদকেরই এই দশা ! তাহারা “মাংসপেশী-স্মৃতি”র (muscle memory) উপরেই বেশী নির্ভর করিয়া থাকেন ; কারণ, অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে, যে সমস্ত অনেক-দিনের পুরাতন সুর কিছুতেই তাহাদের মাপার আসে না, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই পিঙ্গানোর ভিতরে সেই সব বিস্তৃত সুর বাজিয়া ওঠে ।

বিশাষ্টী ডাক্তারদেব কেতাবে কতক-গুলি আশ্চর্য ও কৌতুককর বোগীর কাহিনী পাঠ করা যায় । সে সব রোগে মানুষের অত্যন্ত কোনরকম বস্তু দেখা যায় না বটে, কিন্তু বেচারী বোগীদের পক্ষে আব পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া পৃথিবীতে বাস করা দস্তুরমত শক্ত হইয়া পড়ে । তখন মরার কষ্টের চেয়ে বাঁচার কষ্টই বেশী হইয়া দাঁড়ায় । আমরা এই রকম একটি বিচিত্র বোগের বর্ণনা করিব ?

এমন যখনেক লোক আছে, বাহা বা সমস্ত জিমিষ উন্টা দেখে । অর্থাৎ উপরি-দিকটা নীচের দিকে এবং নীচের দিকটা দেখে উপরিদিকে ! এ সব রোগী যদি ঠিক সোজা-সুজি দেখিতে চান, তবে “পা’ছটো সব উপর করে রাখা দিবে” হাঁটিতে হয় এবং সে অবস্থাতা কাহারও পক্ষে বিশেষ আরাম-প্রদ বলিয়া মনে হইতেছে না । অবশ্য বিশ্বের সমস্ত দৃষ্টই মানুষেরা দৃষ্টি-পটের উপরে আগে উন্টাভাবে দৃষ্ট হয় ওঠে । চোখের “retina” বা ছায়াপটের সেই উন্টা প্রতিচ্ছবি আবার সোজা হয়, মস্তিষ্কের “চাক্ষুষ স্মৃতি কেন্দ্র”র দ্বারা । বাহাদেয়

মস্তিষ্কের ঐ অংশটি বিকল হইয়া যায়, তাহার কারণে সমস্ত দৃশ্যই উল্টাভাবে দেখিয়া থাকে ।

বাহ্যকে বলে "optic nerve" বা "দৃষ্টি-স্নায়ু" তাহা স্নায়ু । এই স্নায়ু উক্ত "দৃষ্টি-স্নায়ু" যেখানে চোখের মধ্যে প্রবেশ করে, বৈজ্ঞানিকেরা সেই স্থানটিকে "blind spot" বলিয়া থাকেন । "দৃষ্টি-স্নায়ু"র দর্শন ক্ষমতা নাই, দর্শনের শক্তি আছে চোখের ঐ "হোপসট"ব ।

যদি উল্টাভাবে দেখা যায় ; কেহ কেহ সেই সঙ্গে গান গাইবার সময়ে কড়া পর্দা কোমলে এবং কোমলকে কড়ি করিয়া উচ্চারণ করে । আর একটি বালিকা সমস্ত ব্যাপারেই পিছন বা শেষ হইতে সুরু করিত । এত সব রোগীর সংশ্লিষ্ট যথাস্থানেই আছে, কিন্তু তাদের দেহের অন্তর্ভুক্ত যন্ত্র এবং মস্তিষ্ক অন্তর্ভুক্ত অবস্থান তাহা তাহা সমস্তই উল্টাভাবে দেখিয়া থাকে ।

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

গবর্ণমেন্টের সাহায্য ।—তৎকালে "আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য কবিয়াছেন । অনাবদল লাল সুধবীর সিং ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেন্টের নতুন বাঙ্গালী গবর্ণমেন্টের সরকার দৃষ্টি করিয়া এই অষ্টম আয়ুর্বেদ কলেজ উপর পতি হইলে এই কলেজকে সমুদায় করিতে অধিক দিন লাগে না । আমরা এতদ্বারা বাঙ্গালী গবর্ণমেন্টের করণা বিক্ষা করিতেছি ।

আয়ুর্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় ।—যশোহর জেলা হোষ্টে গবর্ণমেন্টের অধস্তি পাটনা যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেট উপলক্ষে গবর্ণমেন্টের অর্থাৎ সেক্রেটারী মিঃ জ্যাকসন কমিশনার বাচাভবকে জানাইয়াছেন যে, "এই অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসালয় স্থাপন সম্বন্ধে যে বিধান প্রচলিত আছে, তাহার

সমস্ত নিয়ম আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না । ইহাও পরিচালনার জন্য যে সমিতি থাকিবে, তাহাতে সিবিল সার্জনকেও সব ডিবিজানাল মেডিকেল অফিসারকে সমস্ত পদে মনোনীত বা নিযুক্ত হইবে না, কিন্তু নিভাগীয় কমিশনার বাচাভবকে সমস্ত লইয়া সমস্ত নিয়ম কবিতে হইবে । আমরা এই ব্যবস্থার যেরূপ প্রদী হইয়াছি, সেইরূপ ইহাতে আশা করি মনে এমন আশাও সকার হইয়াছে যে, মহামন্ত্রী গবর্ণমেন্টের রূপার সুপ্রচার আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা আবার মাথা তুলিতে সমর্থ হইবে । মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের বেডেস্তীকৃত ডাক্তার ভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আগে ছিল না, কিন্তু যশোহরের এই চিকিৎসালয়ের সমস্ত রূপে বেডেস্তী বহির্ভূত চিকিৎসকগণও স্থান পাইবেন । আমরা বাঙ্গালী গবর্ণমেন্টের এই নূতন ব্যবস্থার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৪র্থ বর্ষ ।

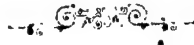
বঙ্গাব্দ ১৩২৭—আষাঢ় ।

১০ম সংখ্যা ।

## শারীর বিজ্ঞা ।

(পূর্বানুবৃত্তি)

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস।]



অস্ত্রস্তলে চারিটা পেশী সংলগ্ন থাকে। এই কলারকণ্ডের মূল হইতে উর্দ্ধ ও তিষ্ঠাক্রমে দুইটা রেখা পশ্চাদ্ধিক গিয়াছে, উহাদ্বিককে 'অস্ত্রস্তরশ্চীনা' বলে। উহাতে 'মুখভূমি-কটিকা' পেশী সংলগ্ন থাকে। এই রেখার উপরিভাগে সমুদ্বিককে 'জিহ্বাধরীয়' লাল-গ্রন্থি ধারণের জন্য তন্মাসক খাত এবং অধো-দিকে 'পশ্চাদ্ধি' ভাগে 'হৃৎধরী'র লালগ্রন্থি ধারণের জন্য তন্মাসক খাত আছে।

অধোহৃৎধরীর উর্দ্ধধারা দন্তোদ্বল-দণ্ড ধারণ করিয়া থাকে। হৃৎধরীর প্রত্যেক অর্দ্ধভাগে বাল্যে পাঁচটা করিয়া এবং যৌবনে আটটা করিয়া দন্তোদ্বল থাকে। বয়সে ঐগুলি ক্লেবে প্রসন্ন বিন্যাস হইয়া

যায়। উর্দ্ধ উর্দ্ধধারার পশ্চাদ্ধিকবে 'কপো-লিকা' নামে পেশী সংলগ্ন হয়। দন্তগুলির বিষয় সমগ্র করোটিবর্ণনে বলা যাইবে।

অধোধারা দুলাগ্র এবং কেবল স্বকেন্দ্র দ্বারা আবৃত। ইহার পশ্চাতের দুই প্রান্তের নিকটে বন্ধ ধমনী ধারণের জন্য 'বন্ধ ধমনী-পরিধা' নামে দুইটা পরিধা আছে।

(২) হৃৎকূটধর—হৃৎধরীর পশ্চাৎ প্রান্তের দুইতে উপস্থিত চতুর্কোণবিশিষ্ট দুইটা প্রাচীর। চরকসংহিতায় উহাদ্বিককে 'হৃৎধর-বন্ধন' বলা হইয়াছে।

প্রত্যেক হৃৎকূটের দুইটা শিখর—সমুখের হৃৎকূট ও পশ্চাতে হৃৎকূট; দুইটা তল—বাহ্যতল ও অভ্যন্তরতল; এবং চারিটা ধারা

হৃদয়বলনী প্রাণ  
হৃদয় সংযোগ্য ঋতু হৃদয়  
হৃদয়কর্ষণী

[ ৩১ম চিত্র—অধোহৃদয় ]

( বাহ্যিক )

শরীরের নিম্নস্থ হৃদয় উক্ত হৃদয়কর্ষণী পেশী

কণ্ঠিকা পেশী

হৃদয়

হৃদয়

হৃদয় পেশী

বাহ্যিক পেশী

হৃদয় পেশী

উভয়

হৃদয়কর্ষণী

অধোহৃদয়

অধোহৃদয় পেশী

অধোহৃদয় পেশী

অধোহৃদয় পেশী

—নয়ন পেশী, পশ্চিম পেশী, উত্তর পেশী ও  
অধর পেশী।

হৃদয়—প্রায় গোলাকার, ইহা শরীরের  
হৃদয়কর্ষণীর মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়। ইহার  
মূলের চারিদিকে প্রাণকোষ সংলগ্ন থাকে  
এবং আত্মস্বরূপের মূলদেশে 'উত্তরাহৃদয়-  
কর্ষণী' পেশী সংসক্ত হয়।

হৃদয়—প্রায় ত্রিকোণ এবং কুণ্ডল

মূল। উত্তর বাহু ও আত্মস্বরূপের তলে 'অধ-  
র' পেশী সংসক্ত হইয়া থাকে।

হৃদয়ের বহিস্তলে 'হৃদয়কর্ষণী' এবং  
অধস্তলে 'অধর হৃদয়কর্ষণী' পেশী সংসক্ত  
হয়। অধস্তলের মধ্যদেশে 'অধর হৃদয়-  
কর্ষণী' প্রাণকোষের দ্বারা বৈবিধ্য আছে,  
আহার ভিত্তর দিয়া 'অধরহৃদয়কর্ষণী'  
সিদ্ধাধরনী ও নাকী দ্বারা হৃদয়কর্ষণীর মূলদেশে

প্রবেশ করিয়া থাকে। হৃৎকূটের উর্দ্ধধারা পর্য্যন্ত লম্বা, ইচ্ছাব ভি-ব দ্বারা 'হৃৎকূট পেশী' পেশীর চতুর্দিকে নাড়ী দ্বারা ধমনী দ্বারা প্রবেশ করিয়া থাকে। হৃৎকূটের অধোধারা হৃৎমণ্ডলের অধোধারার সহিত সমযোজ্য অবস্থিত। অধোধারার পশ্চাদ্ ভাগে 'হৃৎকোণ' নামে কোণ আছে এবং উচ্চাঙ্গে 'হৃৎকোণিকা', বায়ু আদ্র থাকে। হৃৎকূটের সমুখধারা প্লাহী ও পেশীর মধ্যে গড়িয়া অবস্থিত; পশ্চাদ্ ধারা প্রস ও 'কর্ণ-মণ্ডিকা' প্রদান করে।

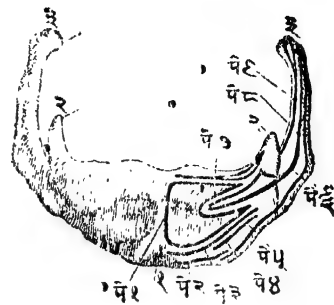
সন্ধি—অধোহৃৎকূটের মণ্ডল উভয় শাখায় হৃৎসন্ধিখাতের সহিত সন্ধিযুক্ত।

পেশী—অধোহৃৎকূটে পনেরো গোড়া পেশী সংস্কৃত হইয়া থাকে। বিবরণ পবে বর্ণনীয়।

অধোহৃৎকূট সন্ধি একটা বিশেষ কথা এটি যে বালাকালে হৃৎকূটের হৃৎমণ্ডলের উপর দৃষ্টভাবে নিবিষ্ট থাকে, যৌবনে সম-কোণভাবে নিবিষ্ট হয় এবং বার্দ্ধক্যে দৃষ্ট পড়িয়া যাওয়ার দস্তাদুলগুলি বিলীন হয় ও হৃৎকূট অধোহৃৎকূটের এক এক দিক নোফার ভায় বক্রতা প্রাপ্ত হয়।

কণ্ঠিকা—কণ্ঠিক বা জিহ্বামূলিক নামক অস্থিরাকার ও নানা পেশীসংযুক্ত অস্থিখণ্ড, খামপথের সমুখে ও জিহ্বার মূলদেশে অবস্থিত। ইহা মূলাধারায় বায়ুজ্বারায় শাখা-ধার 'মূলশিফা' ধরে প্রতিবন্ধ হইয়া শূন্য গঠিত ভাবে থাকে। ইহার তিনটা অংশ—কণ্ঠিকপিণ্ড, মহাশূলধর ও লঘুশূলধর।

[ ৩৭শ চিত্র -- কণ্ঠিকা বাহ্যিক ]



(১) — কণ্ঠিকপিণ্ড। (২, ২) ২, ২—লঘুশূলধর। (৩, ৩) ৩, ৩—মহাশূলধর। (৪) 'শে' চিত্রিত হানগুলি পেশী নিবেশ, প্রল।

(১) মধ্যস্থিত পিণ্ডাকার অংশকে 'কণ্ঠিকপিণ্ড' বলে। উচ্চাধার সমুখতলে এক এক দিকে ছয়টি করিয়া দ্বাদশটি পেশীসংস্কৃত থাকে। যথা—চিবুককণ্ঠিকা, উরঃকণ্ঠিকা, চিবুকজিহ্বাকণ্ঠিকা, মুখহৃৎকণ্ঠিকা, শিফা-কণ্ঠিকা এবং অংসকণ্ঠিকা। কণ্ঠিকপিণ্ডের পৃষ্ঠ-তল ময়ূর এবং 'গোজিহ্বা' নামে কলার সহিত সন্ধিযুক্ত।

(২) মহাশূলধর—মধ্যপিণ্ডের উত্তর দিকে পশ্চাদ্ ভাগে প্রস্থারিত। উচ্চাধার অগ্রকোটদ্বয়ে বায়ুজ্বার সংযোগের জন্ত দুইটা কর্ণ দ আছে। প্রত্যেক শূন্যে তিনটি করিয়া পেশী সন্ধিযুক্ত থাকে। যথা—মধ্যমা কণ্ঠ-সংকোচনী, জিহ্বাকণ্ঠিকা এবং অবটুকণ্ঠিকা।

(৩) লঘুশূলধর—মহাশূলধরের ক্রোড়ে অবস্থিত। ইহাদের অগ্রকোটদ্বয় বায়ুজ্বারায় শাখাধার শিফাধরের সহিত প্রতিবন্ধ থাকে।

### সমগ্র কণ্ঠোতি বর্ণনা।

মস্তকের সমস্ত অস্থি সংহিত হইয়া কণ্ঠোতি নির্মিত হয়। তন্মধ্যে অধোহৃৎকূট ব্যতীত

\* ইং—Hyoid—হয়ডে।

অজ্ঞাত সন্ধিগুলি অচল। করোটির অস্থি সকলের সন্ধির বিবরণ প্রকৃতি বলা হইয়াছে।

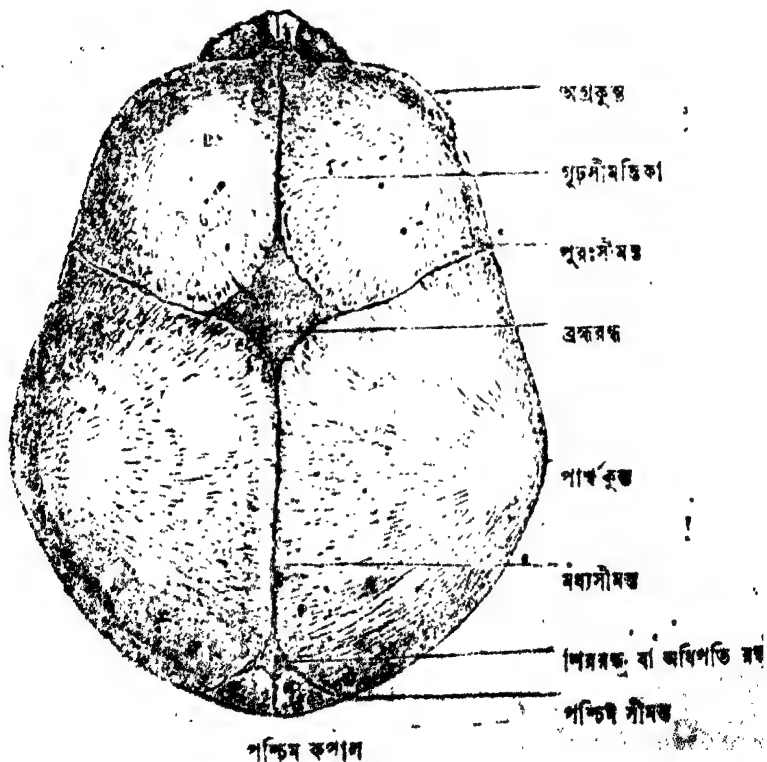
করোটির পাঁচটি অংশ, যথা—করোটি পিটিল নামক উর্দ্ধপ্রদেশ, করোটি ভূমি নামক অধোদেশ, করোটি পক্ষ নামে দুই পার্শ্ব এবং মূখমণ্ডল নামে সমুখভাগ।

করোটিপিটিল—শিরঃস্পষ্টের ছাদের ভায়া। উহা সমুখে পুরঃকপালের গলাটফলক, দুই পাশে দুই পার্শ্বকপালাস্থি এবং পশ্চাতে পশ্চিমকপালের উর্দ্ধভাগ দ্বারা নিম্নিত। ইহার দুইটি হল, যথা—বাহ্যহল ও অভ্যন্তরহল। উন্মথ বহুহল—কূর্ণসৃষ্ট।

কার এবং তাহাতে পাঁচটি 'সীমন্ত' বা সন্ধি রেখা আছে, যথা—সমুখ সীমন্ত, পশ্চিম সীমন্ত ও দুইটি পার্শ্ব সীমন্ত (৩৮শ চিত্র দেখ)। তন্মধ্যে করোটিপিটিলের দুই পাশে অবস্থিত সন্ধিরেখা দুইটিকে পার্শ্বসীমন্ত বলে। এই স্থানে উর্দ্ধস্থিত তিন খানি অস্থির (যথা পুরঃপার্শ্ব-পশ্চিম-কপালের) সহিত অংশস্থিত তিন খানি অস্থির (গড়াস্থি-জতুকাস্থি-শায়াস্থির) সন্ধি হইয়া থাকে।

এই কয়টি সন্ধি বাতীত সমুখকপালের উভয়ার্ধের মধ্যে যে স্থান 'গূঢ়সীমন্ত' আছে, উহা বাল্যকালে দেবা যায়, কচিং প্রোট-বয়সেও থাকে।

[ ৩৮শ চিত্র—করোটিপিটিল (স্থূপারী শিশুর) ]



পূর্বসীমস্ত ও মধ্যসীমস্তের সন্ধিস্থানকে 'রুক্লুক' বা 'রুক্লু' এবং পশ্চিমসীমস্ত ও মধ্যসীমস্তের সন্ধিস্থানকে 'শিবরুক' বলে। অধিপতি নামক দন্তের আবার বাক্সা উহা 'অধিপতি রুক্লু' নামেও কথিত। বক্ষবন্ধ প্রায় চতুর্ভুজ ও অধিপতি রুক্লু ত্রিকোণ। এট উত্তর স্থলই দৈর্ঘ্যে কোমল থাকে।

করোটিপটলেব আভ্যন্তরতল বাহ্যন্তর। মস্তিষ্কফলা কলা ও তাহার গহ্বিনমুখ এবং উরু কলাপোষণী ধমনী, শাখা প্রশাখা ইহা সহিত সংলগ্ন থাকে। ইহার মধ্য-বেশ্য 'দীর্ঘিকা নিরাপরিখা' নামে খাত আছে, উহা মধ্যসীমস্তের সন্ধিত সমন্বয়ে তিতরে অবস্থিত।

করোটি ভূমি—ইহা বহু অস্থি সংঘাতে নির্মিত এবং বিশেষ উচ্চাবত। ইহার দুইটা তল। শিরোগুহাব মধ্যে গুঢ় ভাবে অবস্থিত উর্দ্ধ তলট 'করোটিপাঠ' বা 'মস্তিষ্ক-পাঠ' নামে খ্যাত। অধস্তল মৃণ্মির ও গুহাব আচ্ছাদন স্বরূপ, উহা করোটিভূমিতল বা করোটিতল নামে অভিহিত।

দশ ধানি অস্থিসংযোগে করোটিভূমি নির্মিত হইয়া থাকে। যথা—সম্মুখে উর্দ্ধ-বহুস্থিঘর ও তাবস্থিঘর, পশ্চাতে পশ্চিমকপাল, মধ্যভাগে বক্ষরুক, জত্বা ও সীরিকা এবং দুই পাশে লম্বাঅস্থিঘর।

করোটি পাঠ ও করোটিতল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা এখানে বলা হই-তেছে। বিশেষ বিবরণ অস্থিগুলির বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

করোটিপাঠ বা মস্তিষ্কপাঠ—ইহা করোটি-ভূমির তিনটা মহাখাতবিশিষ্ট উর্দ্ধতল।

তন্মধ্যে সম্মুখের খাতে মস্তিকের পূর্বপাণ্ড, মধ্যখাতে উহার মধ্যপাণ্ড এবং পশ্চাত্ত খাতে উহার পশ্চিমপাণ্ড, অস্থিবৃত্তিক ও মৃণ্মরানীর্ঘক থাকে।

করোটিতল বা করোটিভূমিতল মুখগলাদি-নিবহের আচ্ছাদন স্বরূপ এবং অত্যন্ত উচ্চাবত। ইহার তিনটা ভাগ, যথা—পূর্বোভাগ, মধ্যভাগ এবং পশ্চাত্তভাগ। পূর্বোভাগে উর্দ্ধ দন্তো-দুখলমণ্ডল ও তালুপটল (তালুর ছাদ) বিশেষ দর্শনীয়। মধ্যভাগে কণ্ঠপটল বা গলার ছাদ অবস্থিত। পশ্চাত্তভাগে হৃৎপাশে অধোহস্তর সহিত সন্ধির স্থানকল্প এবং কর্ণ-কুহরদয় দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে এখানে দন্তোদুখলমণ্ডলের বিষয় বিশেষভাবে বলা হইতেছে।

দন্তোদুখল মণ্ডল—উপরের হস্তমণ্ডলে ষোলটা ও অধোহস্তমণ্ডলে ষোলটা দন্তোদুখল বা বস্তধারণের গর্ত থাকে। এখানে করোটি-তল প্রসঙ্গে উপরের ষোলটা বর্ণনীয় (নিম্নের ষোলটাও এইরূপ, তাহাদের বিষয় অধোহস্ত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে)। প্রতি অর্দ্ধভাগে আটটা করিয়া দন্ত থাকে, তন্মধ্যে মধ্যবেশ্য পাশের দুইটা 'কর্তনক' \*, তাহাদের পশ্চাত্তের একটা 'রদনক' †, তাহাদের পশ্চাত্তের দুইটা 'অগ্রচর্কণক' ‡ এবং শেষের দিকের তিনটা 'পশ্চিম চর্কণক' § নামে অভিহিত। অষ্টম বা শেষের চর্কণক

\* ইং—Incisors—ইনসাইজার্স।

† ইং—Canine—ক্যানাইন।

‡ ইং—Pre-Molars—প্রি-মোলার্স।

§ ইং—Molars—মোলার্স।

দত্ত "অনিদন্ত" (আকেশ দীত) নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণি বা প্রৌঢ় বয়সে উদ্ভূত হয়।

উর্দ্ধমূলমণ্ডলে 'মদ্য'রখাব শুভে পাশ্বেই উইটী দক্কে প্রাচীনরা 'বাজদন্ত' নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা গেল যে প্রৌঢ় বয়সে উর্দ্ধমূলমণ্ডলে এবং অধোতলমূলমণ্ডলে যোদী কবিতা বহিষ্কৃত দত্ত থাকে। কিন্তু বাল্যকালে প্রত্যেক হুমমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ পাঁচটি কবিতা — সমগ্র হুমমণ্ডলে মোট কুড়িটি বিনয়ব দত্ত থাকে। বাল্যাবস্থায় পঞ্চাদ ভাগের চন্দ্রক দত্তগুলি থাকে না।

শৈশবে 'সাধারণতঃ ৬৭ মাস হইতে প্রায়ই ছোড়া ছোড়া করিয়া দত্ত উদ্ভূত হইতে থাকে। কখন কখন ইহার পূর্বে—কিঞ্চিৎ জগাবস্থাতেও দত্ত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

প্রাপ্তবয়স্কের দন্তের ভায়ে বাল্যাবস্থার দন্তের সুদীর্ঘ মূল থাকে না। প্রায়ই পাঁচ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ই সকল দন্ত পড়িয়া যায় এবং নূন প্রায় দত্ত উদ্ভূত হইতে থাকে।

করোটিহলের প্রত্যেক অর্দ্ধাংশে বহুপেশী সংযুক্ত থাকে। তাহাদেব বিষয় পেশীবর্গন প্রসঙ্গে বলা হইবে।

**করোটি পক্ষদ্বারা—**(বিংশ চিত্র দেখ) করোটিপক্ষ বা করোটির পার্শ্বদেশ দুইটি। প্রত্যেকটি প্রায় ত্রিকোণাকার—কতকটা আকৃষ্ট ধরুর দ্বার আকৃতি বিশিষ্ট। ইহার উর্দ্ধসীমা 'শব্দোৎপাদিকা', রেখার অনুগামিনী ও অপাদ হইতে পশ্চিমসীমায়

পর্যায় বিস্তৃত। অধঃসীমা অধোদন্ত কোণ।

প্রত্যেক করোটিপক্ষের প্রচীতি অংশে হস্তসন্ধিগোলের অংশ অবস্থিত বহুপেশী এবং উচ্চাব দক্কাতে স্থাপিত পশ্চিমভাগ। সমগ্রভাগে দর্শনায় তিনটি বাত আছে, যথা—শব্দোৎপাদিকা, গণ্ডোদবৎসী এবং হুমজাতিক বাত।

প্রথমোক্ত দুইটি বাত এক হইলেও গণ্ডোৎপাদিকার উর্দ্ধ ও নিম্নাংশ ভেদে তিন অংশে প্রাপ্ত হয়। উভয় বাতে শব্দোৎপাদিকা পেশী এবং নিম্নস্থ বাতে গন্ধন নাড়ীর হামবা শাখা ও দিরা ধমনী থাকে।

তৃতীয় বাত বা হুমজাতিক বাত উর্দ্ধস্থিত ও জড়কাস্থির বৃহৎ পক্ষতির সন্ধানস্থলে অবস্থিত। ইহা ত্রিকোণাকার ও নেত্রগুহার পশ্চাতে থাকে। ইহার পূর্বসীমায় উর্দ্ধস্থ ব পশ্চিমার্ধদ এবং পশ্চিম সীমায় জড়কাস্থির চরমফলকস্থ অবস্থিত। ইহা হুমজাতিক, হুমচবৎসী এবং পক্ষাংগনা নামে তিনটি গুণ পরিবার কেন্দ্র স্বরূপ। নেত্রগুহা, নাসাগুহা, মূণসংলব, মস্তিষ্কগুহা এবং গণ্ডোদবৎসী বাতের দ্বিতীয় সন্ধি আছে। সমগ্রিক উর্দ্ধহামবা নাড়ী এবং আন্তরহামবা ধমনী এই বাতে অবস্থিত। এই বাতটীর প্রসঙ্গ ধমনী ও নাড়ীবর্গনে বিশেষ আবশ্যক হইবে।

**করোটির সম্মুখভাগ—**করোটির সম্মুখভাগ প্রায় গোলা, ইহারূপে মণ্ডল নির্মাণ করিয়া থাকে। ইহার উর্দ্ধসীমা জঘন্য ও জড়োৎপাদিকা; অধঃসীমা অধো



হৃদয় : এবং ছোট পার্শ্বের সীমা উভয়  
গুণ্ডাহি ও অধোহৃৎকূট ।

“ইহার মধ্যভাগে জনক ও হার উভয়  
পার্শ্বে জ্যোতির্গণিকা রেখার, সংহিত নাসা-  
হি বা ‘নাসাসেহু’ ত্রিকোণ নাসাগহ্বর বা  
‘নাসাপুর্বোদার,’ আটটি কর্তনক দন্ত (উর্ধ্বে  
চারিটি ও নীচে চারিটি) এবং চিবুকপিণ্ড  
বিশেষভাবে দর্শনীয়। উভয় পার্শ্বে এক  
এক দিকে নেত্রগুহা, দন্তকূট ও বাবটী দন্ত  
(উপরে নিম্নে একটি করিয়া রবনক দন্ত ও  
পাঁচটি করিয়া চর্কণক দন্ত) এবং বক্রনাড়ী  
৫ মসনীর পার্শ্বা বিশেষভাবে গণ্যায়।  
এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক দিকে ষোলটি করিয়া পেশী  
আছে—তাহাদের বিষয় যথাস্থানে বর্ণনীয়।

### নেত্রগুহা ।

নেত্রগুহা বা নেত্রকোটর বুতুরা ফুলের  
সার সমুখে আয়ত ও পশ্চাতে সঙ্কুচিত।  
উর্ধ্বা ও হৃৎদৈর্ঘ্যে দুইটি নেত্রগোলক ধারণ  
করে। প্রত্যেক নেত্রকোটরের চারিদিকের  
প্রাচীর সাতখানি অস্থির সংযোগে নির্মিত।  
ওমধ্যে চারিখানি দ্বারা গুহাঘরের পরিধি  
নির্মিত হয় এবং তিনখানি গুহামূলের চতুর্দিক  
ব্যাপিয়া অবস্থিত করে। সাতখানি অস্থি  
যথা—

- (১) অশ্রুপীঠ—ইহা, ‘অশ্রু-বাহিকা’  
ধারক ও অন্তঃপরিবাহিত। (২) পূর-  
কপালের নেত্রচ্ছদিকলক—উর্দ্ধপরিবাহিত।
- (৩) উর্দ্ধহৃৎস্থির নেত্রপীঠকলক—ইহা  
নেত্রভূমিনিপাদক ও অয়ঃপরিবাহিত। (৪)  
গুণ্ডাহির অধিকলক—বহিঃপরিবাহিত। (৫)  
জুকাহির পক্ষাধিকলক : (৬) ভাবস্থির চূড়া

অধিকলক ; (৭) বর্ষারস্থির নেত্রাস্তঃপীঠ ;  
পেশ্যক তিনখানি নেত্রগুহামূলের নির্মাপক।

ইহাদের মধ্যে জুকা, বর্ষারক ও অশ্রু-  
কপাল—এই তিনখানি অস্থি উভয় নেত্র-  
গুহার নিপাদক—এতদ্ভিন্ন উভয় নেত্রগুহায়  
মোট অস্থিসংখ্যা—১৪খানি না হইয়া ১১খানি  
হইয়াছে।

প্রত্যেক নেত্রগুহার ছয়টি অংশ, যথা—

(ক) নেত্রগুহাদার ইহা বৃহত্তর ও  
বৃত্তপ্রায়।

(খ) নেত্রগুহামূল—ইহা বুতুরাফুলের  
গোড়ার দিকের মত সঙ্কুচিত। এখানে  
‘দৃষ্টিনাড়ীরকু’ এবং ‘পক্ষাস্থিরাল’ নামক খাত  
দৃশ্যমান, ইহাদের মধ্য দিয়া দৃষ্টিনাড়ী, তৃতীয়  
নাড়ী ও নেত্রব সিরামনীগুণি নেত্রগোলকে  
প্রবেশ করে।

(গ) নেত্রগুহাচ্ছদ (ছাদ)—ইহা অশ্রু-  
কপালের নেত্রচ্ছদিকলক এবং জুকাহির  
লম্বপক্ষের সংযোগে নির্মিত। ইহার  
বহিঃকোণে ‘অশ্রুগ্রহি’ ধারণের জন্য একটি  
ক্ষুদ্র খাত এবং অন্তঃকোণে ‘বক্রোদ্ধর্শনী’  
নেত্রপেশীর নিবেশ স্থান।

(ঘ) নেত্রগুহাভূমি—এই অংশ সমতল-  
প্রায়। ইহার অধিকাংশ উর্দ্ধহৃৎস্থির নেত্র-  
পীঠকলকের দ্বারা এবং কিয়দংশ গুণ্ডাহি ও  
ভাবস্থি দ্বারা নির্মিত।

(ঙ) অন্তঃপ্রাচীর—ইহা উর্দ্ধহৃৎস্থির নাসা-  
কূটপার্শ্ব, অশ্রুপীঠ, বর্ষারস্থির নেত্রাস্তঃফলক,  
এবং জুকাহির শরীরের অভ্যন্তর অংশ দ্বারা  
নির্মিত। এইস্থানে নাসাতিমুরী ‘অশ্রুবাহিকা’  
প্রণালী আছে। অধিক অশ্রুপাত হইলে  
এই গুণ্ডে নাসিকার মধ্যে অশ্রু প্রবেশ করে।

(৮) বহিঃপ্রাচীর—উহা পূর্বাঙ্গে গণ্ডাস্থির  
অক্ষিকণকের দ্বাৰা এবং পশ্চাঙ্গে জড়কাস্থির  
বৃহৎ পক্ষিত্তি দ্বারা নির্মিত। এই অংশে  
‘শল্যগণ্ডিকরূপ’ নামে একটি বা দুইটা  
বিবর আছে :

ভিন্ন ভিন্ন অস্থিৰ সন্ধানুযায়ী কঠিন  
নাসাগুহাৰ মধ্যে স্পষ্টভাবে দৰ্শনীয়।

নেত্রগুহাৰ ভিতরে নয়টি বিবর আছে,  
যথা—মূলে দৃষ্টিনাড়া রক্ত; ইহার বহির্ভাগে  
পক্ষাস্থরণ ও মৃগাচক্ষু খাঁচ; অকঃগানার

# [ ৩৯ চিত্র—নাসাগুহা ( বাম ) ]

বহিঃপ্রাচীরের দৃষ্ট।

পৃষ্ঠকাল

অকঃগানার উৎসাহিত

জড়ক কোটিল দ্বারা

জড়ক কোটিল

দৃষ্টনাড়ী শিথ

জড়ক

নাসাগুহাৰ উৎসাহিত

অকঃগানার তাল

জড়ক বিবর

জড়কাস্থির বহাভিত্তিকা

জড়কাস্থির অংশ

জড়কাস্থির অংশ

জড়কাস্থির অংশ

জড়কাস্থির অংশ

উৎসাহিত

অকঃগানার  
জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

জড়ক কোটিল

ঝরঝরকারি হস্ত বিববদয়; অন্তকোণে অশ্রুবাহিকা; উর্দ্ধ পরিধিতে অধিক্রব ও অধঃপরিধিতে নেত্রাধরীয় বিবব; বহিঃকোণে শ্মশ্রুগুণিকাখ্য রক্তমার্গ ।

**পেশী**—প্রত্যেক নেত্রগুহার প্রাচীরে চারিদিকে সাতটি পেশী সংবদ্ধ থাকে । তন্মধ্যে ছয়টি দ্বারা নেত্রগোলককে নানাদিকে ঘূর্ণান ফিরান যায়—সমুদ্রী অশ্রুদিসর্জন কার্যে সহায়তা করে, ইহাদের বিবরণ পরে বলা যাইবে ।

∴

### নাসাগুহা ।

নাসাগুহা দুইটা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান এবং বাসবায়ু গ্রহণের দ্বারস্বরূপ । ইহাদের মধ্যে পাতলা অস্থিময় প্রাচীর আছে । প্রধানতঃ গলবিবরের সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ । চৌদ্দপানি অস্থিদ্বারা নাসাগুহা নির্মিত, যথা—ঝরঝরক, জতুকা, অগ্রকপাল, উর্দ্ধহৃদস্থি—এই তিনখানি কবোটির অস্থি এবং অধো-হৃদস্থি ও গণ্ডাধিষ্ণু ব্যতীত মুখমণ্ডল নির্মাপক জন্ত এগার খানি অস্থি ।

প্রত্যেক নাসাগুহার ছয়টা অংশ যথা—গুহাজ্জি, গুহাতুমি, অন্তঃপ্রাচীর, বহিঃপ্রাচীর, নাসাপুরোদ্বার, ও নাসাপশ্চিম-দ্বার ।

প্রত্যেক নাসাগুহার তিনটি করিয়া হাড় আছে—উর্দ্ধহাড়, মধ্যহাড় এবং অধঃহাড় । বহিঃপ্রাচীর বর্ণনা করিলে ইহাদের বিবরণ বলা যাইবে ।

**নাসাগুহাজ্জি (ছাদ)**—ইহা অগ্রভাগে নাসাধিষ্ণু ও পুরঃকপালের অগ্রকণ্ঠক দ্বারা,

২—স্রাবাঢ় ।

মধ্যে ঝরঝরকারি চালনীপটল দ্বারা এবং পশ্চাতে জতুকাস্থি শরীরের পিণ্ড দ্বারা নির্মিত । ইহাতে নাসাস্থি দুইটির নিম্নে নাসানাড়ীধরের এবং চালনীপটলস্থ ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া গন্ধগ্রাহি নাড়ীর শাখাপ্রাশাখা সমূহ অবস্থিত ।

**নাসাগুহাতুমি বা নাসাতুমি**—ইহা ঈষৎ কোরোদর এবং সমুখে উর্দ্ধহৃদস্থির তালু-ফলক ও পশ্চাতে তারস্থির হৃদযন্ত্র দ্বারা নির্মিত । নাসাগুহাধরের মধ্যভাগে সৌরিকাস্থি মধ্যপ্রাচীরভূত হইয়া নাসাতুমিতে সংহিত হয় ।

**অন্তঃপ্রাচীর**—ইহা উত্তর নাসাতুমির মধ্যে একটা মাত্র । এই অংশ তির্য্যাক্তভাবে সংহিত ঝরঝরকারি মধ্যফলক ও সৌরিকাস্থির দ্বারা নির্মিত, এজন্ত ইহা প্রায়ই একদিকে আনত দেখা যায় । উক্ত অস্থির অগ্রভাগে ত্রিকোণ তরুণাধির সহিত সংহিত এবং পশ্চাতে 'জতুকাস্থির 'রসনিকা'র সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে । বাম ও দক্ষিণ ভেদে অন্তঃপ্রাচীরের দুইটা পাখ । উত্তর পাখে 'নাসাতালুকাখ্য নাড়ীধর ধারণের জন্ত দুইটা খাত এবং নাড়ী ধমনী-প্রধান ধারণের জন্ত বহু হস্ত ছিদ্র আছে ।

**বহিঃপ্রাচীর**—প্রত্যেক নাসাগুহার বহিঃ-সীমায় একটা করিয়া পৃথক প্রাচীর আছে । এই বহিঃপ্রাচীর সমুখে উর্দ্ধহৃদস্থির নাসাকূট ও অশ্রুগীঠাস্থি দ্বারা; মধ্যে ঝরঝরকের পাখ-পিণ্ড ও স্তম্ভিকাস্থি দ্বারা; এবং পশ্চাতে তারস্থির দীর্ঘপত্রক ও জতুকাস্থির চরণফলকের দ্বারা নির্মিত ।

শক্তিকাপজ্ঞাকারে অবস্থিত তিনটি অস্থি বহিঃপ্রাচীরে সংলগ্ন থাকে, সেগুলি প্রত্যেক দিকের নাসাপথ তিনটি হুড়ঙ্গ বিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে—

(১) উর্দ্ধহুড়ঙ্গ—উর্দ্ধতম ও বৃহৎ।

এই অংশ নাসাপথের পশ্চাদ্বর্ত্তে বর্ত্তমান এবং ঝরঝরির উর্দ্ধ ও মধ্য শক্তিকাভাগের অন্তরালে অবস্থিত। ইহাতে তিনটি বিবব আছে, যথা—পশ্চাতে ‘তালুভাতুক’—ইহা ভগাধা নাড়ী ধমনী প্রবেশের অন্তঃস্থ; সম্মুখে ‘ঝরঝরির’—ইহা ঝরঝরির পশ্চিম-কোটরের অমুবন্ধী; চূড়ার ‘জতুকাধার’—ইহা জতুকাপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কোটরের অমুবন্ধী। দারুণ পীনস রোগে এই সকল বিবরণে পূর্ব্বাধি প্রবেশ করিয়া অস্থিগুলি জর্জরিত হয় এবং মস্তিষ্কের পর্্যায় পিকৃতি ঘটে।

(২) মধ্যহুড়ঙ্গ—ইহা ঝরঝরির মধ্য-শক্তিকা ও অধঃশক্তিকার অমুবন্ধী মধ্য-মাকার হুড়ঙ্গ। ইহাতে উর্দ্ধদিকে একটি ছিদ্র দেখা যায়, উহা ঝরঝরির কোটরের দ্বারা ললাটকোটরের সহিত অমুবন্ধী। উর্দ্ধহুড়ঙ্গ পিণ্ড অপর ছিদ্রটি উর্দ্ধহুড়ঙ্গ হুগুর্ভকোটরের দ্বারা অমুবন্ধ। নাসাবাগে ললাটকোটর ও হুগুর্ভকোটর—উভয় কোটরের মধ্যে পূর্ব্বাধি সঞ্চিত হইতে পারে।

(৩) অধঃহুড়ঙ্গ—অধঃশক্তিকার নিম্ন এই দীর্ঘতম মার্গ নাসিকার বহিঃপ্রাচীরের সমগ্র অংশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অতিপ্রবৃত্ত অংশের ‘নাসাগুহার’ প্রবেশের অন্তঃস্থ ‘অশ্বাধিকা’ প্রাণালীর দ্বারা থাকে।

নাসাগুহার বা নাসাগুহার সমুখদ্বার—কতকটা ক্ষুদ্র তালুপথের দ্বারা আকার-বিশিষ্ট। ইহা নাসাগুহারের মধ্যস্থ ত্রিকোণী তরুণাধি ও মধ্যপ্রাচীর নির্ধাপক অস্থিগুলির দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত।

নাসাপশ্চিমদ্বার—নাসাগুহারের পশ্চা-তের দ্বার গণবিবরের দিকে উন্মুক্ত ও প্রাচ গোলাকায। ইহার পশ্চাতে ও উর্দ্ধদ্বার ‘গলবিবরের’ আচ্ছাদন স্বরূপ পশ্চিম কণ-লের মূলপিণ্ড ও জতুকাধার, অধঃদ্বার তালুধির হুগুর্ভকোটর এবং উভয়পার্শ্বে উর্দ্ধ-কাধির চব্বদ্বার অবস্থিত। ইহা গোলাকায দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত।

সমগ্র কেরোটির ভ্রূচ ভাগ।

হকের নিম্নস্থ অস্থির অংশকে ভ্রূচভাগ বলে। কেরোটির ও মুখমণ্ডলের সাতাশটি ভ্রূচ ভাগ বিশেষভাবে দর্শনীয়, যথা—দুইটি ভ্রূচভাগিক (ভ্রূচের নিম্নে), দুইটি গণ্ডকোট ও দুইটি গণ্ডকোট, কণ্ঠের পশ্চাতে দুইটি গণ্ডকোট-প্রবর্ত্তন, মাথার পশ্চাতে দুইটি উভরভ্রূচ-গণিক ও একটি পশ্চিমার্দ্ধ, দুইপার্শ্বে দুইটি পার্শ্বকোট ও তদ্বিষয়ে কণ্ঠের উপর দুইটি শ্রু-ভ্রূচগণিক, সম্মুখে দুইটি অগ্রকোট, নাসামূলে দুইটি নাসাধি, দুইটি নেত্রগুহের পরিধির, অধোহুড়ঙ্গ দুইদিকে দুইটি হুগুর্ভকোট ও মধ্য অধঃস্থ দ্বারা এবং সম্মুখে একটি চিবুকপিণ্ড। ভবিষ্যতে বৃদ্ধিবার সুবিধার অন্তঃস্থ এই সকল অংশ ‘দরশন’ দ্বারা আবৃত্ত।

“কীকলে যদি কার্দ্ধকৃত্ত তথাপাদীরতামিদ্ং।  
জানগদ্যাসুসজ্জা দিব্যা তদ্রতভাবতঃ ॥”

অমুবাদ—এই অস্থিগু কৰ্ণক হইলেও  
সাদরে গ্রহণীয়। কারণ জ্ঞান গঙ্গাজল  
সম্পর্ক ইত্যাদিতে দিব্যতম হইবে।  
৪র্থ ব—অস্থি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলে

তাহা হইতে যেমন দিব্যতম উৎপন্ন হয়,  
সেইরূপ এই অস্থিগুতে সম্যক জ্ঞান হইলে  
শরীরের বাবতীর অংশ সুখবোধ্য হইয়া  
থাকে।

## নাড়ী-চক্র।

[লেখক—শ্রী ব্রজবল্লভ রায় কান্যতীর্ণ।]

“ত্রিধাকু কুর্শো দেহিনাং নাভিদেশে  
বামে বক্তুং তস্ত পুচ্ছক বামো  
উর্দ্ধে ভাগে হস্ত পাদৌ চ বামৌ  
‘হস্তাধস্তাং সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ ॥’

বিকৃত কণ্ঠে, শিথিল উচ্চারণে,—শ্লোকটি  
স্মরণ করিতে করিতে, ডাক্তার বলিয়া  
ফেলিলেন—“কি ভ্রমাত্মক ধারণা!” এখন  
বেশ বুঝা গেল ঋষিদের শারীর বিজ্ঞানে  
প্রত্যক জ্ঞান একেবারেই ছিল না! নাভিদেশে  
কক্ষপের মত বস্তু থাকা—অসম্ভব!

এইখানে ডাক্তারের একটু পরিচয় দিয়া  
রাখি। ইনি আমার পরম বন্ধুর পুত্র।  
মেডিকেল কলেজের এম. বি. পরীক্ষার উত্তীর্ণ  
হইয়া বিলাত বাত্মা করিয়াছিলেন। সেখানে  
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের গৌরবোজ্জ্বল  
উপাধি লাভ করিয়া, দেশে ফিরিয়া আসিয়া-  
ছেন। ডাক্তারের সুস্থিধানি বেশ একটু  
অসুস্থল সৌন্দর্য-মিষ্ট গভীরতার সুপ্রকাশ।

তাঁহার “ক্যাপ্টেন” বিশেষণটি আত্মীয় স্বজনদের  
গর্ভে তৃপ্তির উপাদান।

ডাক্তার তুনিয়াছিলেন—বৈত্তগণ নাড়ী  
দেখিয়া রোগ ধরিতে পারেন। তাঁহার নাড়ী  
বিজ্ঞান পড়িবার আগ্রহ জন্মিয়াছিল। পক্ষ-  
কাল পূর্বে আমার নিকট হইতে তিনি  
একখানি মুদ্রিত “নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা” লইয়া  
গিয়াছিলেন। কিন্তু, প্রথমেই নাভিদেশে  
কুর্শের অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়াই—নাড়ী-  
বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার ভুক্তি চটিয়া যায়।  
বাহারী নিপুণ হস্তে শত শত শব্দেই ছেদন  
করিয়াছে—তাঁহার নাভিদেশে কুর্শের  
অস্তিত্ব স্বীকার করিবে কেন? তাই ডাক্তারের  
বিশ্বাস হইয়াছিল—অনেক উচ্ছ্বাস করনা,  
অপ্রত্যাশিত প্রবল বাত্মার মত—ঋষি পরি-  
ষদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে  
“আয়ুর্কোদের” প্রত্যক্ষ শারীর কলুষিত হই-  
য়াছে। বৈত্ত চিকিৎসাও শিক্ষিত সমাজের  
প্রজ্ঞা হারা হইয়াছে।

\* প্রত্যক্ষ শারীর হইবে উক্ত।

ডাক্তার আমাকে “নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা” কেবল দিতে আসিয়াছিলেন। যে পুস্তকে বহু শতাব্দীর পুণ্যকৃত অদ্বৈতানিক তত্ত্ব স্পষ্ট তর হইয়া উঠিয়াছে—এই বিংশ শতাব্দীর বৃকে বসিয়া, সে পুস্তক তিনি পড়িতে পারিবেন না। “আমার বৈঠকখানায় তখন অনেক গুলি ভক্তলোক বসিয়াছিলেন। স্মৃতবাং ডাক্তারের অন্ধ উগ্রতার সমালোচনার আমি যেন কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।

বঙ্গ-সাহিত্যে আমার পরমাব্যর্থ আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সুখে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম—একটা নব্য বঙ্গ কামিনীর সংস্কৃত শিখিবাব ইচ্ছা হইয়াছিল—সেজন্ম তিনি “চিতোপদেশ” নামক গ্রন্থ কিনিয়াছিলেন। একদা তাঁহার এক সঙ্গিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“সপি! তোমার সংস্কৃত শিক্ষা কতদূর হইল?” স্তম্ভী উত্তর দিলেন—শিখিব বলিয়া বই পর্য্যন্ত কিনিয়াছিলাম। কিন্তু পুস্তকের প্রথম পাতাতেই দেখি—“কস্মিংশিৎ বনে” পরই “ভাট্টরের” নাম—কাজেই পড়া হইল না।”

সহস্রা গল্পটা আমার মনে পড়িয়া গেল। প্রথমে “বড় ঠাকুরের” নাম দেখিয়া বিহ্বীর সংস্কৃত শিক্ষা যেমন অগ্রসর হয় নাই, কুর্শের কথা—তেননি ডাক্তারেরও বুদ্ধি নাড়ী-বিজ্ঞান পাঠের প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়াছে।

বহু নয়নাঙ্গণের অতি-মত্তপ্রতিভা, যে বিজ্ঞানকে একদা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল—তাঁহার প্রতি এতদূর উপেক্ষা আমার সহ্য হইল না। আমি ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—অন্ধকার গর্ভের অন্ধ সন্ন্যাস আপনাদের ললাটস্থিত “রত্নপ্রদীপের” নহিনা

বুঝিতে পারে না। ডাক্তার। নাড়ী-বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে—আবার তোমাকে হিন্দু হইতে হইবে। কোরব লাক্তি পাঞ্চালীর বসনের মত—হিন্দুশায়েব স্তরে স্তরে প্রহেলিকার জটিল জাল জড়াইয়া আছে,—দাস্তিক চ্যাপসনের শক্তিতে তাহার স্বরূপ মোচন—অসাধ্য ব্যাপার।

‘অলস ময়ূর পদক্ষেপে—লজ্জা-ললিত মুখে গোখুরি হিরণ্যদীপ্তি-বাখিয়া, ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তাঁহার পদশব্দ অসুট মূর্ত্তমান হইয়া রহিল। আমি “নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা” তুলিয়া রাখিলাম।

### তত্ত্বের সিকান্ত।

যে শ্লোকটা লইয়া সেদিন ডাক্তার আমার আয়ুর্বেদের উপর স্নেহময় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—বাস্তবিক সে শ্লোকটা আকাশের মত বিরাট, তরুকারার মত বৃহত্তম—জল-কল্লোলের মত জ্বলোঁধ্য। উহা তত্ত্বের শ্লোক—শব্দব সেনের নিপি কোশলে “নাড়ী প্রকাশে” উদ্ধৃত হইয়াছে। যিনি “ভারিক” নহেন,—তিনি নাড়ী বিজ্ঞানের রহস্য কখনই বুঝিতে পারিবেন না।

ইতোবধ্যে—সুদৃঢ় সত্যচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য “অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান” গিয়াছিলাম। তখন কবিরাজ ত্রীশুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়—ছাত্রগণকে নাড়ী বিজ্ঞানের উপদেশ দিতে ছিলেন। সে উপদেশ শুনিবার আমার সময় ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়—নাড়ী-বিজ্ঞান বুঝিবার পূর্বে—ছাত্রগণকে তত্ত্ব সঞ্চক্ষে বিদ্র

উপদেশ দিল ভাল হয়। আশা করি—  
অধ্যাপকগণ এ অধর্মের কথাটা একটু ভাবিয়া  
দেখিবেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমি তত্ত্বের  
“নাড়ীচক্র” লইয়াই আলোচনা করিব।

তত্ত্ব—অনেকটা বিজ্ঞান, অনেকটা  
ইতিহাস। বিশ্বকাহিনী ও মানব কাহিনীর  
বিচিত্র সংমিশ্রণে তত্ত্বের উৎপত্তি। তত্ত্বের  
সিদ্ধান্ত—দেহের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের সমতা  
সাধন। বাহিরের লীলা হইতেছে—জীবের  
দেহের ভিতরও অহরহঃ সেই লীলা চলি-  
তেছে। যিনি এত ভিতর-বাহির এক  
করিতে পারেন—তিনিই “যোগী”। তত্ত্ব  
বলিয়াছেন—

“ব্রহ্মাণ্ডে যে স্থগাঃ সন্তি তে

তিষ্ঠন্তি কলবরে।”

চলিত কথায় ইহার অর্থ—“বাহ্য আছে  
ব্রহ্মাণ্ডে তাই পাবে ব্হে ভাণ্ডে”। সৃষ্টি-  
তত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্বের এই সমঞ্জসীকরণ  
—তত্ত্বের অপূর্ণ শক্তি। তত্ত্বের মতে—  
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণজ্ঞান একমাত্র দেহ হইতেই  
লাভ করা যায়। যিনি বৈশ্ব—তিনি তাত্ত্বিক,  
তিনি মহাযোগী। দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে—  
তত্ত্বের সাধনা করিতে হইবে।

তত্ত্বের কথাতেই আমি “নাড়ীচক্র” ব্যা-  
খ্যার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার অক্ষম  
হস্তের রচনা হয় তেঁ পদে পদে ভ্রান্ত হইয়া  
পড়িবে। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

খাস-সংক্ষেপণ ।

“উত্তরায়ণ” ও “দক্ষিণায়ণ” বহিঃগন্তের  
এই দুই গতি। মানবদেহেও—খাসের “ঈড়া”  
ও “পিল্লা” নামে দুইটি গতি আছে। উত্ত-

রায়ণে—ধরিত্রীর আগের শক্তি বৃদ্ধি হয়,—  
সূর্যের উত্তাপদায়িনী শক্তি প্রবল হইয়া  
পড়ে; দক্ষিণায়নে—পোষক শক্তি বা চন্দ্রের  
শৈত্যগুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া  
থাকে। চন্দ্রের এই শৈত্যগুণ সূর্যের অমা-  
কলা হইতে উৎপন্ন; শতিকা কথায় ইহার  
প্রমাণ;—

“রবিরম্যো স্থিতঃ সোমঃ সোমরম্যো হৃত্যশনঃ”।

\* \* \* \* \*

অমানাম কলামেষা সূর্য্যস্ত্যামৃতরূপিণী।

অমাখাবিকৃতিচন্দ্রঃ চন্দ্রস্ত্যবিকৃতিজগৎ ॥

অমা—সূর্যের অমৃতরূপিণী কলা। অমার  
বিকৃতি হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্রের বিকৃতি হইতে  
জগতের উৎপত্তি। যে তিথিতে সূর্য্য চন্দ্রের  
সহিত এক রাশিতে অবস্থিতি করেন, সেই  
তিথি “অমাবস্তা” নামে পরিচিত।

একটা বৎসবের মধ্যে যেমন “উত্তরায়ণ”  
ও “দক্ষিণায়ন”—একটি দিনের মধ্যেও  
তেমনি “দিবা” ও “রাত্রি”। উত্তরায়ণ—  
দিবা, দক্ষিণায়ন—রাত্রি। উত্তরায়ণে—বসন্ত,  
গ্রীষ্ম ও বর্ষা—এই তিন ঋতু; দিব্যরাত্রে তেমনি  
প্রাতঃকালে বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম এবং অপ-  
রাহ্নে বর্ষা। দক্ষিণায়নেও—শরৎ, হেমন্ত  
ও শীত এই তিনটি ঋতু; তজ্জন রাত্রিরও  
তিনটি ঋতু, যথা—রাত্রির প্রথম ভাগের  
নাম শরৎ, মধ্যম অবস্থার নাম হেমন্ত ও  
শেষ ভাগের নাম শীত।

মানবদেহে যে সময় দক্ষিণ নাগারাক্ষে খাস  
বহিতে থাকে—তাহাকে সূর্য্যমাড়ী বা পিল্লা  
বলে। আবার যখন বাম নাগিকার খাস  
বহে—তখন তাহার নাম চন্দ্রমাড়ী অর্থাৎ  
ঈড়া। বহিঃগন্তে—উত্তরায়ণে অথবা দিবা-

ভাগে স্বর্ষের আদান শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; দেহ-অঙ্গভেদে—দক্ষিণ নাসায় শ্বাস-সংক্রমণের সময়—দেহের আগের শক্তি বাড়িয়া থাকে। দক্ষিণায়নে বা বাহ্যিকাগে—চন্দ্রের শৈত্যগুণ (পৌষক শক্তি) বৃদ্ধিত হয়; বায়ু-নাসিকায় শ্বাস প্রবাহের সময়—শব্দবোধ পোষণ শক্তি বাড়ে।

যে সময় এই নাসিকাত্তেই শ্বাস-প্রবাহ সমান থাকে—তদ্র মতে তাহার নাম সুষুম্না নাড়ী। ইংরাজী ভাষায় “নাড়ী” অর্থে বাহ্যিক বৃদ্ধি, কিন্তু মতে নাড়ী বলিলে তাহা বৃদ্ধি ন। ইংরাজী ভাষায় বৃদ্ধির নাম Aorta—আয়ুর্বেদে মতে তাহার নাম মহাশ্রোত। তদ্র সুষুম্নাকেই সর্বপ্রধান নাড়ী বলেন। দেহের মধ্যস্থল মেরুদণ্ড—সুষুম্নার আশ্রয় স্থান। দৈর্ঘ্য নাসী নাড়ী—এই সুষুম্নার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের Sympathetic nerve দিয়া বাম নাসিকায় বিকসিত; পিঙ্গলা নাড়ী—দেহের বাম মধ্যস্থ Sympathetic nerve দিয়া সুষুম্নার প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় প্রকাশিত।

চিকিৎসকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—শরীরের দক্ষিণ অঙ্গে পক্ষাঘাত হইলে মস্তিষ্কের বাম দিকে রোগ নিরূপিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে—বামদিকে পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইলে—দক্ষিণ দিকে রোগ নিরূপিত হইয়া থাকে। যে দিকের অঙ্গ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়, সে দিকের অঙ্গ, অজ দিকের অঙ্গের চেয়ে শীতল স্পর্শ হয়—সে অঙ্গ শীর্ণ হইয়াও পড়ে। এই যে শৈত্য ও কৃশতা—তাহা কেবল পোষণ শক্তির অভাবেই ঘটয়া থাকে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের বিপরীত দিকের মস্তিষ্কে

বা কশেরুকা মস্ত্যায় স্নেহপ দোষ হয়—Sympathetic nerve হও টিক সেই দোষ ঘটে। শোণিতবহা শিরার অধিক প্রদাবণের জন্য সেই শিবাঙ্গাল হইতে রক্তের উদ্বাপ অধিক পরিমাণেই নির্গত হইয়া যায়—সুতরাং পক্ষাঘাত আক্রান্ত অঙ্গ—অপেক্ষাকৃত শীতল স্পর্শ হয়।

আমাদের নাসিকায় সুসূত্রে যেমন দুইটি ছিদ্র আছে—নাসিকাগর্ভের অভ্যন্তরে—পশ্চাৎ দিকেও তেমনি দুইটি ছিদ্র আছে। বায়ু সুসূত্রে ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া পশ্চাত্তের ছিদ্র দিয়া বায়ুনলীতে গমন করে। কখনও এক ঘণ্টা, কখনও বা ত্রিঘণ্টা অন্তর, নাসিকান্তরনের পশ্চাৎ দিকের ছিদ্র—বন্ধ হইয়া যায়। এ ব্যাপার—পর্যায়ক্রমে ঘটয়া থাকে, অর্থাৎ একবার বাম নাসিকায়, একবার দক্ষিণ নাসিকায়, পশ্চাৎ ভাগের ছিদ্র আবদ্ধ হইয়া থাকে। যে দিকের ছিদ্র বন্ধ হয়—সেই দিকের প্লেগ্মটিক স্রাবী স্রাবী উঠে এবং তাহা ঊষ্মস্পর্শ বলিয়া মনে হয়। যে দিকের প্লেগ্মটিক স্রাবী স্রাবী স্রাবী হয়, তাহার বিপরীত দিক দিয়াই শ্বাস বহিয়া থাকে।

যদি কোন কারণে বাম নাসিকা বহুদিন আবদ্ধ থাকে—তাহা হইলে দেহে পৈত্তিক রোগের আবির্ভাব ঘটয়া থাকে, আবার দক্ষিণ নাসিকা বহুদিন বন্ধ থাকিলে—শরীরে কফ রোগ জন্মে।

বামপার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিলে দক্ষিণ নাসিকায়, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলে বাম নাসিকায়,—বাসেই সঞ্চার ঘটতে দেখা যায়। এই শ্বাস-সংক্রমণের ব্যাপার বিনি বেনী জানিতে চাহেন,—



তিনি তত্ত্ব পাঠ করিবেন। প্রত্যেকের অতি বিস্তার আশঙ্কার—আমি এই স্থানেই নিরস্ত হইলাম। তত্ত্ব বলেন—এইরূপ খাঁস সংক্রমণের নির্দেশ দ্বারা—শরীরের শুভাশুভ, ভাগের উন্নতি অবনতি, জীবনের বর্তমান ভবিষ্যৎ—প্রভৃতি বহু বিষয় অবধারিত হইতে পারে।

প্রধান নাড়ীগণের নাম ।

শরীরের প্রধান নাড়ী তিনটা;—ঈড়া, শিঙ্গলা ও সুষুমা। এই তিনটার মধ্যে আবার সুষুমাই সর্বপ্রধান। কেননা—দেহের সমস্ত নাড়ীই এই সুষুমা চেষ্টে জাত এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই কর্তৃশীল। সুষুমার অবস্থান ঈড়া শিঙ্গলার মধ্যে—এই জন্তই তাত্ত্বিক মতে সুষুমার আর একটি বিশেষণ “ত্রিগুণা-য়িকা”। সুষুমার যে শক্তি রজঃগুণ স্বরূপিনী—তাহার নাম “বজা,” যে শক্তি সৎগুণ-সম্পন্ন তাহার নাম “চিত্রিণী,” যে শক্তি তমোময়ী—তাহার নাম “ব্রহ্মনাড়ী”। ঈড়া;—বজোগুণা চ বজ্রাখ্যা চিত্রিণী সন্তনয়ন্তা। তমোগুণী ব্রহ্মনাড়ী কার্যভেদ ক্রমেন চ ॥

ঈড়া-নাড়ী—বাম মুক (Prostatic Plexus) হইতে সুষুমাকে অবলম্বন করিয়া—ধনুস মত বাকিয়া—স্বয়ং আসে, অঙ্গের পামভাগস্থিত বহু সমূহের ভিতর দিয়া দক্ষিণ নাসিকায় গমন করে। শিঙ্গলা দক্ষিণ মুক হইতে উদ্ভূত হইয়া—বক্রভাবে, বাম নাসিকায় উপস্থিত হয়। বাম নাসিকায় খাঁস সংক্রমণের কাল “ঈড়া-প্রবাহ” নামে এবং দক্ষিণ নাসিকায় খাঁস বহন কাল “শিঙ্গলা-প্রবাহ” নামে অভিহিত। যখন

উভয় নাসিকায় সমানভাবে খাঁস বহে—তাহার নাম—“সুষুমা” প্রবাহ। এই সুষুমা প্রবাহের সময় “হ” (চক্র নাড়ী) এবং “ঠ” (সূর্য নাড়ী) এক হইয়া যায়। হঠযোগিগণ এট রহস্ত অগতঃ আছেন। পাঠকগণ! “প্রাণাপানো সমোকৃত্য” ইত্যাদি শ্লোকে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

মানবের বাম নেত্রে “গাঙ্কারী” নাড়ী, দক্ষিণ নেত্রে “হস্তা জিহ্বা” নাড়ী, বাম কর্ণে “যশস্বিনী” নাড়ী এবং দক্ষিণ কর্ণে “পূষা” নাড়ী অবস্থিত। দ্বিহস্তাভিত নাড়ীর নাম—“অলম্বুযা”—ইহার কার্য আশ্রয়ন করা। জননেন্দ্রিয়স্থিত নাড়ী “কুহু নামে এবং যন্তক স্থিত নাড়ী “শঙ্খিনী” নামে অভিহিত। \*

প্রধান নাড়ীগুলি ব টেহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি! তত্ত্ব হুল ও হৃদয় ভেদে—এই সকল নাড়ীকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। পারিভাষ্যে সে পরিচয় পরে দিব।

নাড়ীর উৎপত্তি স্থান।

তত্ত্বের মতে সমস্ত নাড়ীর উৎপত্তি স্থান “নাভি”। “নাভি কন্দ নিবদ্ধা স্তাস্তিৰ্যা গৃহ্মমধঃস্থিতাঃ।” এই স্থলেই প্রাচ্য মতের সহিত পাশ্চাত্য মতের বিরোধ। এই নাভি কন্দই “কুহু” নামে অভিহিত হইয়াছে। যুরোপের বিজ্ঞান কূর্শের অস্তিত্ব একেবারেই

\* গাঙ্কারী—Left Optic Nerve.

হস্তি জিহ্বা—Right Optic Nerve.

পূষা—Right Auditory.

যশস্বিনী—Left Auditory.

অলম্বুযা—Gustatory nerve.

কুহু—Pudic nerve.

জীকার করিবে না। কিন্তু এই 'নাতি' বা 'কুর্শের' কথা একটু তলাইয়া বুঝিলেই—সমস্ত গোল মিটিয়া যায়। এখন সেট চেষ্টাই আমরা করিব। এখানেও আমাদেরকে ভয়ের মত অত্মসরণ করিতে হইবে।

শিব সংহিতায় দেখিতে পাই গুহ্যধারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং মেট্র স্থানের দুই অঙ্গুলি নিম্নে—চারি অঙ্গুলি পরিমিত বিস্তৃত স্থানে "মূলধার পদ্ম" বিরাজিত। এই পদ্মের কর্ণিকারের মধ্যে—"ত্রিকোণ মণ্ডল" অবস্থিত। বোগিগণ ইহাকে "বোনি মণ্ডল" বলিয়া থাকেন। "বোনি মণ্ডলে"র মধ্যস্থলে বিদ্যামলতার ত্রায় আকার সম্পন্ন সার্কি ত্রিবলয়কারী ছুটলা কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মপথ সংরক্ষ করিয়া রাখিয়াছেন। সেট ত্রিকোণ মণ্ডল হইতেই ঈড়া পিকলা ও সুবুরার উৎপত্তি। বুলাধার পদ্ম হইতে আরও বহু নাড়ী উৎপত্তি হইয়া জিহ্বা, মেট্র, বুধণ, পাদাস্থ্য, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, পায়ু, কৃক্ষি প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গমন পূর্বক স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবার নিজ নিজ জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অত্যা বাহুধারা নাডা মূলধারায় সমুৎপত্তাঃ।

রসনা মেট্র বুধণ পাদাস্থ্যক নাসিকাঃ।

কক্ষ নেত্রাস্থ্য কর্ণ সর্কাসং পায়ু কৃক্ষিকং।

ললা ত্য বৈ নিবর্তন্তে বধ্যাংশে সমুৎপত্তাঃ ॥

—মূলধার চক্রবর্ণনঃ।

'ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে—শরীরের নাড়ী সমূহ মূলধার পদ্মের মধ্যস্থিত কুলকুণ্ডলিনী হইতে উৎপন্ন, অতএব উৎস-প্রাচীরস্থিত চন্দ্রনির্মিত নাতি—কখনই নাড়ী-গণের জন্মস্থান নহে।

সংস্কৃত ভাষায় যে কোন পদার্থের মধ্যস্থলকেই "নাতি" বোলে। বধ্যা—চাকার মধ্যস্থলের নাম "চক্রনাতি"। স্বর্গা—সৌর জগতেব মধ্যস্থলে আছেন, তাই তাঁহার নাম "জগন্নাতি"। চুষকের দুই সীমার লোহাকর্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু তাহার ঠিক মধ্যস্থলে সে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ শক্তিবাহীন মধ্যস্থল না থাকিলে,—চুষকের টিউব প্রান্ত লোহকে আকর্ষণ করিতে পারিত না। এট দৃষ্টান্ত জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। 'হিষ্ট মধ্যস্থল' না পাইলে কোন শক্তিই কার্য্য করিতে পারে না। মানব দেহেও—চুষকের ত্রায় মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়া জীবনীশক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। হিরমধ্যস্থল না থাকিলে—জীবদেহেও জীবনী শক্তির বিকাশ ঘটিত না। এই হির মধ্যস্থলের নাম—  
"অনন্ত" "বাহুধারকো"।

এইবার আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব মানবদেহের সেই হির মধ্যস্থল কোথায়?

বাহারী জ্যোতিব শাস্ত্র লইয়া অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহার 'অবশ্যই' জানেন তুলা রাশি—রাশিচক্রের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। দিরাট বেহের যেমন দাদশ রাশি, মানব দেহেও সেইরূপ দাদশ রাশি আছে, যথা—

মেঘা শিরো বুধো বক্রং মিশুনং বাহুধারকং।

কর্কটো জঘন্যকৈব সিংহশ্চোদর নেকট।

করা কটা তুলা বতি বৃশ্চিকো শুভ্রমেঘট।

ধনু উরা মৃগো জাঘ কুন্তো অশ্ব্য প্রকীর্টিতঃ।

মীনো পাদধারকৈব কালাদে মিরস্ত্য ক্রবাৎ ॥

অর্থাৎ 'মানবের' মস্তক—মেঘ রাশি,

মুখ—বৃষ রাশি, বাহুর—মিথুন রাশি;  
হৃদয়—কর্কট রাশি, \* উদর—সিংহ রাশি,  
(১) কটা—কন্টা রাশি; বস্তি—তুলা রাশি;  
(২) শুষ্কদেশ—বৃশ্চিক রাশি; উরুদয়—ধনু  
রাশি, হাটু—মকর রাশি, জন্বা—কুম্ভ রাশি,  
গাদর—মীন রাশি। মানব দেহ এই দ্বাদশ  
রাশিতে বিভক্ত।

তুলা রাশি যেনন রাশিচক্রের মধ্যস্থল,  
সেইরূপদেহের পশ্চাৎভাগে যেখানে ত্রিকাহি  
(Sacrum) আছে—সেই স্থান দেহের মধ্য-  
বর্তী। বস্তি ও লিঙ্গমূল সম্মুখদিকে, ত্রিকাহি  
পশ্চাৎদিকে—এই অংশের নামই 'নাড়ী'।

তাত্ত্বিকের স্বপ্ন দৃষ্টি—মানব দেহে চতু-  
র্দশ ভুবন আবিষ্কার করিয়াছিল। শরীরকে  
চতুর্দশ ভুবনে বিভক্ত করিলে—ভূঃভুবঃ  
প্রভৃতি সপ্ত স্বর্গ এবং অতল বিতল প্রভৃতি  
সপ্ত পাতাল—এই চতুর্দশ ভুবনের ত্রিকাহি  
যুক্ত স্থানই দেহের মধ্যস্থল বুঝায়।

তত্ত্ব শাস্ত্রে আগোচর্য্যের আরও জানিতে  
পারা যায়—

মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নাড়ী স্থাহি স্বরূপিনী।  
এতা দশোক্তিগা নাড়্যা দশশ্চাধোগতাস্থা।  
তির্য্যগ্ গতে তথা নাড়্যা চতুর্বিংশতি সংখ্যার  
অহি স্বরূপিনী মহাশক্তি কুণ্ডলিনী হইতে  
চতুর্বিংশতি সংখ্যক প্রধান নাড়ী উৎপন্ন হই-  
য়াছে। তাহাদের মধ্যে দশটা নাড়ী উর্দ্ধ  
গামিনী, দশটা অধোগামিনী, বামে দুইটা  
দক্ষিণে দুইটা—এই পাঁচটা তির্য্যক্ গামিনী।

\* স্বরূপ (মনের ত্রিকাহী দেবতা যন্ত্রের ত্রিকাহান।

(১) উদর (পুণ্ডর্য্যংগ্রহ)।

(২) বস্তি (এই স্থানে পশ্চাতে ত্রিকাহি)।

৩-আবাহু।

এইবার স্বশ্রুতসংহিতার সহিত তত্ত্বের  
এই সিদ্ধান্ত মিলাইয়া দেখা যাউক। শারীর  
স্থানের নবম অধ্যায়ে স্বশ্রুত বলিতেছেন—  
“চতুর্বিংশতি ধর্ম্মতো নাড়ি প্রভবা অভিহিতাঃ।  
তাসাং তু নাড়ি প্রভবানাং ধর্ম্মনী না মূর্ত্তিগা  
দশ দশশ্চাধোগামিনাঃ চতুর্বিংশতিগাঃ”।  
সুতরাং তত্ত্ব ও স্বশ্রুতে কোন মতবৈধ দেখিতে  
পাওয়া যায়তোছে না : “শিব স্বরোদর” নামক  
আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থেও এই মত  
সমর্থিত হইয়াছে বলা :—

নাড়ীয়া কুণ্ডলি শক্তি তুর্দ্ধাকার শারিনী।  
ততো দশোক্তিগা নাড়্যা দশাধঃ গা প্রতিষ্ঠিতাঃ।  
যে যে তির্য্যগ্ গতে নাড়ী চতুর্বিংশতি সংখ্যার।

নাড়িহিত সর্পাকারশারিনী, কুণ্ডলিনীশক্তি  
হইতে ১০টা উর্দ্ধগামিনী, ১০টা অধোগামিনী,  
এবং ৪টা তির্য্যগ্ গত—এই ২৪টা নাড়ী বহি-  
র্গত হইয়াছে। এই মূলধারায় ত্রিকোণ  
ধোনিমণ্ডলেরই নাম “কুর্ধ্ব”। ভগবান দত্তা-  
ত্রের রূপকহলে এই কুর্ধ্বের কথাই উপাধন  
করিয়াছেন—

তির্য্যক্ কুর্ধ্বো দেক্ষিণাং নাড়িদেধে

বামে বক্তুঃ তত্ত্ব পুঙ্খক মামো।

উর্দ্ধে ভাগে হস্ত পাদৌ চ বামৌ

তত্ত্বাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ ॥

বক্তুঃ নাড়ীধরঃ তত্ত্ব পুঙ্খ নাড়ীধরঃ তথা।

পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণ ভাগায়াঃ ॥

দেহিগণের নাড়িদেধে তির্য্যগ্ ভাবে একটা  
কুর্ধ্ব আছে। তাহার মুখ নাড়ির বামদিক্কে,  
এবং পুঙ্খ দক্ষিণ দিকে। বাম হস্ত ও বাম  
পদ—উর্দ্ধভাগে, দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদ—  
অধোভাগে। তাহার মুখে ২টা নাড়ী, পুঙ্খ-  
দেধে ২টা নাড়ী—পদবর্ধে ও হস্তবর্ধে পাঁচটা

পাঁচটা করিয়া ২০টা নাড়ী, সর্বশুদ্ধ এই ২৪টা নাড়ী আছে।

তদ্ব্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—“ত্রিকোণ বোনিমণ্ডলং কূর্ম্মবিদ্যাতিবিহতে।” ত্রিকোণ বোনিমণ্ডলের নামই কূর্ম্ম। সেই কূর্ম্ম হইতে ২৪টা ধমনীর উৎপত্তি।

মর্ষ নির্দেশ অধ্যায়ে সূক্ষ্মত বলিয়াছেন—পকাশ্য ও আমাশয়ের মধ্যে—সমস্ত শিরাজালের উৎপত্তিগতান নাতি নামক মর্ষ অবস্থিত; এই মর্ষ আহত বা আঘাত প্রাপ্ত হইলে মানবের সত্ত্বই মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

এই সকল প্রমাণের দ্বারা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি,—নাড়ী বিজ্ঞানে যে নাড়িকে নাড়ী সমূহের উৎপত্তি স্থান বলা হইয়াছে, সে নাতি উদরপ্রাচীরস্থিত চর্ম্ম নির্ম্মিত নাতি নহে। অল্প চিকিৎসার প্রয়োজনে—ডাক্তারগণ অনেক সময় চর্ম্মনির্ম্মিত নাতি ভ্রমেন করিয়া থাকেন,—তাহাতে যোগির মৃত্যু ঘটে না। সুতরাং সূক্ষ্মতোক নাতি মর্ষ ও চর্ম্মনির্ম্মিত নাতি—এক হইতে পারে না। উদরপ্রাচীরস্থিত আমাশয় ও পকাশ্য—বেদান হইতে যন্ত্র যন্ত্র রসবহা শিরা উৎপন্ন হইয়াছে,—সেই স্থানের নামই “নাতি”। সেই নাতি মর্ষ আহত হইলে মানুষের সত্ত্বই জীবনাশ ঘটে।

তদ্ব্য ও আয়ুর্বেদ উভয় শাস্ত্রই “নাতিক” একব্যাক্যে প্রাণের আধার বলিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। জ্ঞানের দেহ নির্ম্মিত হইবার পূর্বে—জননী, গর্ভস্থিত অণ্ডের (ovum) মধ্যস্থল হইতে জীবনীশক্তির ক্রিয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে মস্তিষ্ক, হাত, পা প্রভৃতি ক্রমশঃ গঠিত হইয়া থাকে।

অতএব দেহের “নাতি” অর্থাৎ মধ্যস্থল—প্রাণ বা জীবনী শক্তির প্রধান স্থান। নাতিস্থ প্রাণই মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জায় (Spinal cord) সৃষ্টি করে। এই জীবনীশক্তিকে—এই প্রাণকে—উপনিষৎ “অগ্নোরবীজান্ মহতঃ মহীমান্” বলিয়া অভিনিলিত করিয়াছেন। এই জীবনীশক্তি, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত—সর্বত্রই বিস্তৃত থাকে।\*

মানব দেহের প্রত্যেক জীবাণু—দ্বীবেপ মত শরীরের রসে ভাসমান। তাহার আকর্ষণী-শক্তির দ্বারা রস হইতে আবশ্যক পদার্থ কেন্দ্রে দিকে টানিয়া লয়, অনাবশ্যক পদার্থ কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে বাহির করিয়া দেয়। এই আকর্ষণী শক্তির নাম “প্রাণ” বিকর্ষণী শক্তির নাম “অপান”। এষ্ট উভয় শক্তি জীবাণুব মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়াই কার্য্য করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই মধ্যস্থল চুষকের মধ্যস্থলের জায় ক্রিয়াহীন। জীবাণুব Nucleus, চুষকের মধ্যস্থান, মানব দেহের মধ্যস্থল—এট তিনটা এক জাতীয় কেন্দ্র—ইহার নামই নাতি। বিজ্ঞান যাহাকে

\* ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরস্পর বোণ রাখিবার জন্য বহির্ভাগে যখন ডেলিগ্রাকের তার লাগা হয়, তদ্রূপ আমাদের জীবনীশক্তি প্রাণের নাতি অর্থাৎ দেহের মধ্যস্থল হইতে Sympathetic ধমনীমণ্ডল সমস্ত শিরাজালের আঁতের আঁতের বর্ধমান ধর্ম্মিক দেহকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

ক্রমের মধ্যস্থল হইতে Amnion Chorion এবং Allunlois অস্থিরিত হইয়া মূল হ্রদ Umbilical Vesicleএর সহিত ক্রমের সৃষ্টিগত সর্বত্র ও উভয় দেহের মধ্যস্থল হইতে প্রথম পরিচালিত হয়।

ডাঃ ব্রহ্মচন্দ্র সেন, এম্. ডি।

Centripetal force বলে—তত্ত্ব মতে তাহাই “প্রাণ”, বিজ্ঞানের Centrifugal force, বলের “অপান”—এই প্রাণ ও অপানের কার্য পরস্পরকে আকর্ষণ করা। ইহার দেহের মধ্যস্থল বা নাভিদেশে নিবন। তত্ত্ব ইত্যাদির প্রকৃতির একটা স্থলর উপমা লিপি-দ্রুত করিয়াছেন—

“অপানঃ কণ্ঠতি প্রাণঃ প্রাণোহপানঞ্চ কণ্ঠতি  
রজ্জ্বদ্বন্দ্বো যথা জ্ঞানঃ গাতোহপানশ্যতে পুনঃ॥”

যে স্থির শক্তির প্রভাবে প্রাণ ও অপান কার্য করিতে সক্ষম হয়—সেই শক্তিই তত্ত্বের হৃদয় নাড়ী। প্রাণ ও অপান, ইড়া ও পিঙ্গলা—যে স্থানে নিশিত হয়, সেই স্থানের নাম “অমৃত্যু”। ইহার ইংরাজী নাম—Neutral.

শিব স্ববোধের গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—  
“নাভিকন্দ হইতে অঙ্গুরের ত্রায় ৭২০০০ সহস্র  
সমনী বহির্গত হইরাছে।”

নাড়্যের শবীবে ষট শক্তি কার্য করে,—  
সেই সকল শক্তি যে যে স্থান হইতে বহির্গত  
হয়,—বৈজ্ঞানিক শক্তির ত্রায় ৭২০০০ কার্য  
নির্বাহ করিয়া তাহার আবার নিজ স্থানে  
ফিরিয়া আসে। তত্ত্বও বলিয়াছেন—“লব্ধা  
হা বৈ নিকন্তন্তে যথাদেশ সমুত্তবাঃ।”

মুলাধারে হৃদয় শক্তি ভূগাংকার রূপিনী।

তন্দ্রাবর্ত্তবা তোরণ প্রাণ ইত্যুচ্যতে বৃথৈঃ ॥

মুলাধারে যে ভূজরূপিনী মহাশক্তি  
আছেন, তাহারই আবর্ত্তে ঋষ প্রবাসের  
কার্য চলিতেছে।—এই মহাশক্তি নিদ্রিতা—  
অর্থাৎ এই স্থানে চুষক-কেন্দ্রের মত কোন  
শক্তির চাকলাই গরিলক্ষিত হয় না। সমস্ত  
শক্তিই এখানে অস্থিত (১) তাই তত্ত্ব বলিয়া-

ছেন—মুখে নিবেশ সা পুচ্ছঃ স্ফুটয়া বিবরে  
স্থিত। স্তম্ভা নাগোপমা জোষা—” কুর্শ  
হস্ত, পদ, মূখ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ নস্তুচিত করিয়া  
ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকে, প্রয়োজন মত শক্তি-  
বলে—আবার প্রত্যঙ্গ গুলি প্রসারিতও  
করে, মুলাধারে কুর্শের এই ধর্ম নিরীক্ষণ  
করিয়াই—তাত্ত্বিকগণ ইহাকে কুর্শ নামেই  
অভিহিত করিয়াছেন।

আয়ুর্বেদ যেমন “নাভিকে” সমস্ত ধমনীর  
উৎপত্তি স্থান বলিয়াছেন, তেমনি সমস্ত  
শিরারও উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দেশ  
করিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তকেও অমূলক বলা  
চলে না। কণাটা একটু ধীরভাবে আলো-  
চনা করা যাউক;—

ভুক্ত দ্রব্য সম্যক পরিপাক হইলে তাহার  
সারাংশের নাম—“রস”। পাশ্চাত্য মতে  
এই রসের নাম—chyle. এই রস ষড়্ভুজ  
ও গ্লান্ডের গিয়া রক্তে পরিণত হইয়া থাকে।  
সমান রাস্য কর্তৃক ইহা হৃদয়ে প্রেরিত হইয়া  
থাকে। যে শক্তি solarplexusএ কার্য  
করে—তাহাই সমরন বায়ু। এই বায়ু  
কার্য—অন্ন পরিপাক করা। জীবনীশক্তি  
প্রভাবে—মানবের আশায় ও পকাশয়  
হইতে—রস দুইটা মার্গ দিয়া হৃদয়ে গিয়া  
হৃদয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। তাহার দ্বারাই  
শরীর পোষণ হইয়া থাকে। হৃদয়ের মত ষেত  
বর্ণের রস—অদগ্ধা হৃদয় শিরা (Lactial)  
দিয়া, দেহের বামদিকস্থ ‘রস বহন  
(Thoracic duct) সাহায্যে বক্ষঃপ্রদেশের  
ভিতরে শোণিতের সহিত মিশিয়া—হৃদয়ে  
উপস্থিত হয়। ভুক্ত বিপাকের সারাংশের  
কিয়ংশ আশায় ও পকাশয় হইতে হৃদয় হৃদয়

শিরা দিয়া—“মহাশিরা”র ( Portal vein ) প্রবাহিত হয়। ইহাই উন্নততম রস প্রবাহের “মাকিনী”। মহাশিরা হইতে রস বহুতে গমন করে, তথায় বিস্তৃত হইয়া ফলস্বে চলিয়া যায়। ইহার দ্বারা দিকান্ত হইতেছে—আর্থাৎ বিজ্ঞানের নজরে রস আমাশয় ও পাকশয় হইতে ফলস্বে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই উভয় আমাশয়ের প্রাচীরে যে সকল “সোভাগ্র” ( Luctial ও Portal vein-এর, স্ফীকরণ ) আছে, তাহারাই রস ও রক্ত বহা শিরার জগদ্বূমি। তাই প্রসূত বলিয়াছেন,—“তাসাং ( শিরাগণ ) নাভিমূলং” নাভিই শিরাগণের মূল। নাভি হইতেই শিরাগুলি উঠে, অধঃ এবং তিষ্ঠাকৃতিতে প্রসারিত হইয়া—সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি—এ নাভি চর্ম-নাভি নহে। এ নাভি প্রাণের আধার। শিরা, ধমনী ও প্রাণের সহিত চর্ম-নাভির কোন সম্বন্ধই নাই। তন্ময় স্নায়ুধার চক্ষের কুণ্ডলিনী,—আয়ুর্বেদের নাভিকল্প—একই পদার্থ। ডাক্তারী বিজ্ঞানের Solar plexus-এর ক্রিয়, আয়ুর্বেদের নাভিকল্পের কার্য, তন্ময় কুণ্ডলিনী প্রভাব—তিনই সমান এই কুণ্ডলিনীর প্রভাব বুঝাটবার চক্রে তত্ত্ব বলিয়াছেন,—

নাভিঃ প্রাণ-পবনঃ স্পৃষ্টা স্বদেহকমলাস্তরং ।  
কণ্ঠাঘটিবিনিষ্ঠাতি পা তুং বিকৃ পদামৃতং ॥ .  
পীত্বা যাব্যর পৌষ্যং পুনরাগতি বেগচঃ ।  
প্রীনয়ন্ দেহ মখিলং কৌবয়ন্ স্বঠরানশং ।

‘নাভিস্থিত প্রাণবায়ু স্বদেহকমলাস্তব ( Chese ) স্পর্শ করিয়া বিকৃ পদামৃত ( বায়ু বায়ু ) পান করিবার জন্য কণ্ঠ হইতে বহির্গত হয় এবং স্বদেহ পৌষ্য পান করিয়া সমস্ত দেহের পরিতপন ও জঠরানশের বর্ধন করিয়া, আবার নাসারন্ধ্র দিয়া নিঃসৃত হইয়া ফিরিয়া আসে।

এতক্ষণে বোধ হয় পাঠকগণও বুঝিতে পারিয়াছেন—পাচীন বৈজ্ঞানিক কেবল কল্পনা-বলেই বিজ্ঞানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গড়িয়া তুলেন নাই। তাহার শব্দে প্রমাণ করিয়া মানব দেহের প্রতি অণু পরমাণুব প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া ছিলেন। শক্তিশালী অণুবীক্ষণে শরীরের যে রহস্য, আধুনিক বিজ্ঞান অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারে নাই, যোগ-বিক্ষণে তাহার চক্ষে—তাহাও দূর পড়িয়াছিল। আমাদের ক্ষুণ্ণ জ্ঞান—অধি-রচিত রূপক দ্বারা ভেদ করিতে জানে না, তাই গদ্যে গদ্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

## পল্লীগ্ৰাম ও স্বাস্থ্যবিধান ।

( শ্ৰীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ) ।

—::—

দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া ভয় হয় । মনে হয়, বাংলাদেশ মানবশূন্য স্থানে পরিণত হইবে ; “ইহাই বৃদ্ধি তাহার নিমিত্ত বিধান ! দেশে বার মাসই নানাপ্রকার, সংক্রামক ও সংছাৎক ব্যাধি লাগিয়াই আছে । কোনপ্রকারেই বাঙ্গালাবাসী মানবের আঁই স্বস্তি নাই, স্বপ্ন নাট শান্তি নাট ! বাঙ্গালা কি চিরদিনই এমন অশান্তি উপভোগ করিয়া আসিয়াছে ? না, ইতিহাস সে কথা বলে না । বরং আমরা তাহার বিপরীত প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়া থাকি । এখনকার এই প্ৰীহা-অগ্রমাসে শ্মীতোদর তোটরগত চক্ষু কঙ্কালমুষ্টিমণির পিতৃপিতামহগণের নশ্বকে যে গল্প শ্রবণ করা যায় অথবা ৭০৮০ বৎসব পূর্বের যে সকল বাঙ্গালীর দেহ প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতে বোধ হয় বাস্তবিকই বাঙ্গালা স্বাস্থ্য-সম্পদে এমন দীন হীন ছিল না ; বরং সে বিষয়ে সে সৌভাগ্যবানই ছিল । আমরা বাংলাদেশ বলিতে বাঙ্গালার পল্লীগ্ৰাম-গুলিকেই বুঝি । এখন এই পল্লীগ্ৰাম ভাঙ্গিয়াই নগরের গোরব বাড়িতেছে । দেশের বাতারা ধনী লোক, বঁহার আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত ও আধুনিক সভ্যতার দীক্ষিত লোক, তাঁহারা অ্যালেরিয়ায় ভয়ে পিতৃপুরুষের স্মৃতিনিকেতন পরম রমণীয় শ্মীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগরে বাইরা বাস করিতেছেন, বুঝা জননীর মেহ-নীতল শান্তি-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, নব্যা বিলাসিনীর

দিলান-কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন । বোধ হয় তাঁহারা ভাবিয়াছেন, পল্লীগ্ৰাম পরিত্যাগ করিলেই, নীরোগ শরীরে চারিষগ বাঁচিয়া থাকিয়া নিশ্চিন্তন অনাবশ্যকীয় ক্ষুদ্র বহৎ কত অভাবের সৃষ্টজনিত সুখ লাভ করা যাইবে । তাই তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে পল্লীবিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে । ক্রমে এই ধনী ও তথা কণ্ঠিত জ্ঞানীদিগের বিদেষ-জনিত অবহেলায় বাঙ্গালার পল্লীগ্ৰামগুলি ধ্বংসপথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । বাস্তবিকই পূর্বে পল্লীগ্ৰামের এ শোচনীয় অবস্থা ছিল না । বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত আবু চক্কনাথ বহু লিখিয়াছেন,—“ছগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ভাগিরথীর পশ্চিমকূলস্থিত জেলা সকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল । কলিকাতায় নীড়া হইলে আমরা গ্রামে চলিয়া আইতাম, বিনা চিকিৎসায় তথায় পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতাম এবং মহোল্লাসে আইয়া খেলাইয়া বেড়াইতাম । সুগ কলেক্টর ছুটি হইলেই দেশে বাইতাম, সেখান হইতে আর কিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না । ছুটি ফুরাইলে একমাস দেড়মাস পরে কলিকাতায় আসিতাম—তাঁও একরকম, কাদিতে কাদিতে । আমার পুত্র পৌত্রাদি সে গ্রামে দেখিল না, সে গ্রামস্বপ্নের আবাদও পাইল না । তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ ও অসহন

হইল। সে গ্রামাই জীবন যাহাদের হইল না, বঙ্গদেশ কি খিনিস তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা যথার্থই হুতভাণ্ডা।" তারপর চন্দ্রাবুই জ্বাবার বিপিয়াছেন,— "কৈকালী আজ ম্যালেরিয়ায় প্রায় জনশূন্য— গত ৪০ বৎসরে বোধ হয় শতকরা ৪৫জন চলিয়া গিয়াছে—গ্রামে গৃহ অল্পট আছে, পথের দু'ধারে কেবল কাঁতাড়া বাড়িয়া রহিয়াছে। \* \* \* গ্রামে জঙ্গল বাড়িয়াছে, বহুশুকরাদি হিংস্রজন্তু দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর সোণার কৈকালিতে বসি নাই।" চন্দ্রনাথ বাবু এই কথা, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মর্মভেদী স্বীকা-রোক্তি স্বল্পে গৃহীত হইবে। পল্লীবাসী চিরকাল মনে রাখিলে, চন্দ্রনাথ বাবু মত শিক্ষিত ও সম্মান ব্যক্তিও স্বীয় জন্মভূমি কৈকালীকে ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেখিয়া কাপুরুষের মত রণে তঙ্গ দিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর সহিত যুদ্ধ কবিত্তে উপযুক্ত অস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন নাট। তাহারা এ দৌরলোকের জন্তই, তাহারা "সোণার কৈকালী" শতকরা ৭৫জনকে চারাইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু এই কুট স্বীকার—পরিণত বয়সে সোণার কৈকালীর তথ্যে মহাশুদ্ধতি প্রকাশ, তাঁহার মহত্বেরই পরিচায়ক। পল্লীভূমির এমন কুলাকারও আছে, যিনি পল্লীমাতার সম্বন্ধ স্বীকার কবিত্তেও কুঠাবোধ করেন। নগরে নিত্যই নগণ্য ভাবে জীবন যাপন করায় যেন, পল্লীজননীর অনেক ভাগ্যবান পুত্রের অন্তাগা বংশধরের পক্ষে প্রার্থনার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এতকণে ম্যালেরিয়ার ভয়েও বটে এবং

কতকটা অজ্ঞাত কারণেও বটে—ধনী ও তথা কথিত শিক্ষিতগণ পল্লীগ্রামগুলিকে পরিত্যাগ করার পল্লীগ্রাম দকল সমগ্রকারেই শ্রীমান হইয়া পরিয়াছে। যাহারা এই শ্রীমান পল্লী-গ্রামে বাস করে, তাহারাও কিছু দেশের মর্স্বশ—দেশের সম্পদ—দেশের প্রাণ। তাহাদিগকে বাঁচাইতে না পারিলে দেশ রক্ষা হইবে না। দেশের বাহ্যিক সামরাজ্য বাড়াই-বার পূর্বে, বাহাতে দেশের প্রাণটুকু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টাই মর্স্বশের প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালার এই প্রায় ষোল কবিত্তে হইলে—পল্লীবাসী জনগণকে বাঁচাইয়া বাধিতে হইলে পল্লীগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলে চলিবে না; বাঙ্গালার পল্লীগ্রামেই বাস করিতে হইবে, পল্লীবাসীর স্বপ্ন ভ্রমের ভাগী হইয়া তাহাদিগের চাপ দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, পল্লীবাসী নিরক্ষর জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, আয়বক্ষার উপযোগী জ্ঞান বিতরণ কবিত্তে হইবে; তবে ত পল্লীবাসী বাঁচিবে—তবে ত দেশ রক্ষা হইবে।

স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া নীরোগ দেশে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, পুষ্টিকর খাদ্য বি-শুদ্ধ পানীয়, নির্মল বায়ু ও শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষার উপযোগী পরিচ্ছদাদির প্রয়ো-জন। কিন্তু আমরা এখন এই করণ্যেই বঞ্চিত! সুতরাং আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ না হইবে কেন? ম্যালেরিয়ার ভয়ে জন্মভূমি পল্লীগ্রামকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে বাস, কলিকতা, আমরা পূর্বকথিত আবশ্যকীয় ব্যবস্থার করণ্যে সংগ্রাম করিতে পারি? এক শ্রেণীর লোক



আছে, বাহাদেব সকল গুলিরই অভাব। দেশে দুই একটা কোন সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে এই শ্রেণীর লোকেরাই অধিক মরে। বাহারী সোভাগ্যশালী—বাহারা মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু দ্বাভের আশায় পল্লীগ্রাম পরি-  
তাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও আজকালের বাজারে স্বাস্থ্যের ক্ষুদ্রকূল উপরোক্ত দ্রব্যের সকলগুলিই সংগ্রহ করিতে পারেন না। বরং, তাঁহাদের অভাব কোন কোন বিষয়ে পল্লীবাসী অপেক্ষাও অধিক। আমরা একে একে আমাদের এই অভাবগুলির আলোচনা করিব।

১। **পুষ্তিকর খাদ্য।**—বান্দালার প্রধান খাদ্য চাল, দাল, মাছ, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি। বর্তমান সময়ে এই সকল দ্রব্যের কতকগুলি দুর্লভ এবং কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য। বিপুল মৃত দুগ্ধ অধিক মূল্য দিয়াও সংগ্রহ করা অসম্ভব। এখন ঘূতের নামে নানাবিধ ঘৃত জন্তুর চর্বি ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অনেক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ বাজারে প্রচলিত হইয়াছে। আমরা ঘূতের লোভে, কতকটা মোহেও বটে, ঐ সকল অযোগ্য ও অস্বাস্থ্য দ্রব্য চতুর্দশ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছি। দুগ্ধে কেবল দুগ্ধের বর্ণ রক্ষিত হয়, তাই উচ্চ মূল্যে ক্রয় করি; সময় সময় বিদেশের আমদানি “গোয়ালিনী মার্ক” গাঢ় দুগ্ধের ব্যবহার করিতে বাধ্য হই। চাল দালের দুর্লভতা অবগতীয়া ৬ বান্দালার এই প্রধান খাদ্যের যে পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই অনুপাতে আর বৃদ্ধি হইয়াছে কয়জননের? সুতরাং অর্দ্ধাশন বা অনশন যে অনিবার্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। মৎস্ত-

মাংসের কথা আর না বলিলেও চলে। কুড়ি হইতে চল্লিশ টাকা দরের মৎস্ত কিনিয়া কয়জন বান্দালী স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী প্রয়োজনীয় মৎস্ত আহার করিতে পারে? এখন বান্দালার বান্দালী জাতি নামে নাত্র মৎস্তাশী, সুতরাং বান্দালীর প্রধান খাদ্য সমূহই একেতো ভেজালে ভরা, তায় আবার ভয়ানক দুর্লভ, এ অবস্থার শরীর রক্ষণোপযোগী পুষ্টি-  
কর খাদ্য সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই বিশেষ অসম্ভব সাধ্য, এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাহারী ধনবান তাঁহারাও বিপুল ও পুষ্টি-  
কর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারেন না। কারণ লোকের প্রকৃতি ও প্ররক্তি পরিবর্তন হেতু, অধিকাংশ খাদ্যই ভেজাল ভরা। তাই অনেক সময় মনে হয় বান্দালী কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

২। **বিশুদ্ধ পানীয়।**—দুগ্ধ পানীয় হইলেও ইহাকে আমরা খাদ্যের মধ্যে গ্রহণ করিয়া পূর্বেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি; সুতরাং এখন দুগ্ধের কথা রাখিয়া অন্ততম প্রধান পানীয় জলের কথাই বলি। জল ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না, তাই জলের নাম “জীবন”। জানিনা ক’র পাশে বান্দালার এই “জীবন” শুক হইয়া বাইতেছে। নদনদী মজিয়া গিয়াছে, পুকুর নদী বৃজিয়া গিয়াছে, খালবিল হাজিয়া গিয়াছে; সরস বান্দা এখন নিরস হইয়া তৃষ্ণাতক কষ্টে ত্রাণি ত্রাণি ডাক ছাড়িতেছে। বিশুদ্ধ জল ঘরে বাড়িক, অনেক স্থলে পঙ্কিল জলও দুষ্প্রাপ্য। কেন একপ হইল? কতকটা প্রাকৃতিক পরিবর্তনেও বটে, আর কতকটা আমাদের প্রকৃতি পরিবর্তনেও

বটে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ জলদানকে মহৎ পুণ্যজনক কার্য বিবেচনা করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা শ্রেণীর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতেন, ওদ্বারা গ্রামের জলনষ্ট নিবারণ হইত। এখন আমরা আর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাকে পুণ্যজনক মনে করিনা, ভূষিত জনগণকে জলদান করা কর্তব্য বলিয়াও বোধ করি না, তাই এখন দেশ হইতে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা উঠিয়া গিয়াছে—তাই এখন পূর্বপুরুষের কীর্তি বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এখন শিক্ষা দাও করিতেছি, সভ্য হইয়াছি; তাই আমরা পূর্বপুরুষের অর্জিত অর্থ, বিলাস বাসনে ব্যয় করিতেছি, পূর্বপুরুষের অর্জিত জমিদারী বা আরে নগরে বাসিরা কত অকার্য্যে কুকাণ্ডে অর্থব্যয় করিতেছি; কিন্তু পূর্বপুরুষের কীর্তি কোপ করিতে সমুচিত হইতেছি না। পল্লীগ্রামে জল সংস্থানের উপায় এখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রূপায় উপর নির্ভর করিতেছে। এখানেও বাবুদের খোরালের বাহাজবী দেখি। হাঙ্গ সংবরণ করা যায় না। অনেক স্থলে দেখিতে পাইয়া যায়, নদীর চড়ার জলের ধারেও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রূপায় কূপ খনিত হইতেছে; আর যেখানে জল নাই, সেখানকার অধিবাসীগণ বার বার আবেদন করিয়াও বিফল মনোরণ হইতেছে। কিন্তু “ও কথায় কাজ নাই আর।”

যেখানে জল আছে, সেখানেও দেশের জনসাধারণ তাহাদেব নিত্য ব্যবহার্য্য “জীবন” বরূপ জলটুকুকে বিতৃষ্ণভাবে রক্ষা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করে না। বিষ্ঠামূত্রমূত্র বর্জাদি দৌত করিয়া, ফারে কাপড় কাচিয়া এবং পখাতির গাত্র ধোত করাইরা পানীর

জল নষ্ট করা হইয়া থাকে। তাহারাজানেন ইহাতে তাহারাই তাহাদের কী সন্মানার্থে পথ পঙ্কত করিতেছে। পল্লীগ্রামের অধিবাসী এই সকল লোকেরা পূর্বে ধর্মবিধানে বিশ্বাসী ছিল, শাস্ত্রশাসনে শাসিত ছিল। তাহারাজানি জল নারায়ণ; সুতরাং জল অপরিহর্য্য, এমন কোন কার্য্য তাহাদের দ্বারা হইত না। একেবারে হইত না একুপ না হইলেও পানটো পূব বিরল ছিল এবং বাতারা করিত, তাহারাজানি বিজ্ঞদিগের দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান হইত। এখন ধর্মবিশ্বাস অনেকরই শিথিল হইয়াছে, কেহই আর শাস্ত্রশাসন মানিয়া চলে না। বিজ্ঞের উপদেশও আর বড় গ্রাহ্য হয় না, কেননা এখন কেচ তাহারও নিকট উপদেশ প্রার্থি নহে, সকলেই উপদেশাতা। লোকের মতি প্রকৃতি এইরূপে পরিবর্তিত হওয়াতেই দেশের অনেক পুরাতন প্রথাটি “ওলটপালট” হইয়া গিয়াছে। ফলে দেশের জলাশয় সমূহ শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে এবং দেশের লোকের আর বিত্তজাল রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে না। ফল স্বরূপ হইবার তাহা হইতেছে।

৩। নিম্নলিখিত বাক্য।—১ম ধূলিপূর্ণ ঘন বসতি বহুল সহরের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বনের পল্লী অঞ্চলেও এখন সময় সময় বিত্তজাল বাবুর অভাব অনুভব হইয়া থাকে। ভগবানের মেহের দান এবং প্রচুর দান প্রাণীজগতের অত্যাশঙ্ককীয় এই বিত্তজাল বাবু পল্লীপ্রদেশে বর্ষাকালে দূষিত হইয়া থাকে এবং বোধ হয় সেইজন্যই পল্লীগ্রামসমূহে কৃষীর সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া-বিষ বিস্তারিত হইয়া পড়ে। ঠিক যেন বর্ষাভারার সঙ্গেই সে বিষ আকাশ হইতে

নামিয়া আসে। পল্লীশ্রমশেখর পূর্বের প্রতি-  
 ষ্টিত, অধুন বিলুপ্ত গ্রাম শুক পুকুরিণী সকল  
 বর্ষার জলে পূর্ণ হইলে এবং গৃহস্থের বাড়ীর  
 সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবাগুলিতে জল সঞ্চিত  
 চইলে, উহাতে নানাবিধ উদ্ভিদও গোবর  
 প্রভৃতি পচিয়া পল্লীগ্রামের বায়ুর বিশুদ্ধতা  
 নষ্ট করিয়া থাকে। অভ্যাসবশতঃ পল্লীবাসী  
 জন সাধারণ সে বিষয় অশুভবও করেনা, বরং  
 জলকষ্টের পর গৃহের অনতিদূরে জলপ্রাপ্ত  
 হইয়া কিছু স্থবিধা বোধ করিয়া থাকে। এমন  
 কি অনেক গৃহস্থের ঘেরে ছেলেরা ঐ সকল  
 জলাশয়ের ঘাটে বাসন মাজা, কাপড় কাচা  
 প্রভৃতি কার্যের জন্য অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়  
 নিশ্বাসের সহিত ঐ পচাগন্ধযুক্ত বায়ু গ্রহণ  
 করিয়া শরীরে পীড়ার বীজ সংগ্রহ করে  
 এবং সমস্ত বর্ষাকালটা রোগভোগ করিয়া  
 হয় মরে, নয় মৃতবৎ বাঁচিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত  
 পূর্বাশেখা দেশের বায়ু দূষিত করিবার আর  
 একটা উপায় আদিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং  
 পল্লীবাসী কৃষকগণ অর্থের লোভে ঐ উপায়-  
 টাকে সাঙ্গরে বরণ করিয়া লইয়াছে। দেশে  
 পাটের চাষবৃদ্ধি হওয়ায়, ঐ সকল পাটগাছ  
 জলে পচায়ের জন্য বর্ষার সময় দেশময় একটি  
 বিকট দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। সে দুর্গন্ধটা  
 কিরূপ উগ্র ও অশান্তিদায়ক তাহা ঐ সময়ে  
 বাঁহারী রেলপথে গমনাগমন করিয়া থাকেন,  
 তাঁহার। বিশেষরূপ অবগত আছেন, তাঁহাদের  
 কাছে আর নূতন পরিচয় দিতে হইবে না।  
 ক্রমে ঐরূপ অসহ্য গন্ধ সহ্য করিবার অভ্যাস  
 হইলেও, তাহার অপকারিতার হস্ত হইতে  
 উদ্ধার পাওয়া যায় না। ঐকি ঐ সময়েই আজ-  
 কাল ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার মৌসী রোগ-

যন্ত্রণার অস্থির হইয়া পড়ে। যখন পীড়িত ব্যক্তি  
 মনের যন্ত্রণার অস্থির হইয়া শুক কণ্ঠে জল  
 প্রার্থনা করে, তখন তাহারই আত্মীয়স্বজন,  
 তাহার তৃণাত্মক কণ্ঠে, ঐ পাটপটা জলই  
 প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। হায়! দেশের  
 কি দশাচলীর পরিণাম !

৪। পরিচ্ছন্নতা।—দেশের আশা-  
ত্বের, পল্লীপ্রদেশে পূর্বে পরিচ্ছন্দের পারিপাট্য  
ছিল না। মোটামুটি ধুতিচামড়েরই সপ্তম  
রক্ষা হইত এবং তাহা এই ত্রিপ্রধান দেশের  
সম্পূর্ণ উপযোগীই ছিল। এখন কিন্তু আর  
সেদিন নাই। এখন সহর হইতে পরিচ্ছন্দ  
পারিপাট্যের বিকট ঘাট পল্লীপ্রদেশেও প্রবেশ  
করিয়াছে। বাহাদিগকে ১০১২ বৎসর বয়স  
হইতেই রৌদ্রবৃষ্টি, শীতাতপ সহ্য করিয়া মাঠে  
মাঠে কষ্টসাধ্য কৰ্ম করিতে হইবে, শিশুবয়স  
হইতে তাহাদিগের শরীর সেইরূপ ভাবেই  
গঠিত হওয়া উচিত। পূর্বে ওজ্রপ ব্যবস্থাই  
ছিল। শিশুদিগকে সৰ্বপ তৈল মাখাইয়া  
রৌদ্রে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইত, শিশুও  
অকাতরে নিজা বাইত। বর্ষাবাদলের দিনেও  
শিশুকে স্নান করাইবার নিষেধ ছিল না।  
ফলে সেই শিশুর শরীর দেশের শীতাতপ  
সহ্য করিবার উপযোগী হইয়াই গঠিত হইত।  
এখন কিন্তু ঠিক একরূপভাবে আর শিশুপালন  
হয় না। এখন স্নাতিকাঘর হইতেই শিশুর  
শরীরে নানাবিধ বস্ত্র দেওয়া হয়। রৌদ্রের  
সুখতো শিশুগণ দেখিতেই পার না। অনা-  
বস্ত্রকীর আম্র, জুতা, মোজা টুপিতে শরীর  
ঢাকিয়া ঢাকার ছেলে বাশ্ব বাবু বসিয়া উঠে।  
তায়শর সেই সমস্তগঠিত শরীর লইয়া সে  
স্বখন মাঠে বাহির হয়, তখন তাহার শরীরের

পরিণাম অবশ্যই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।  
বাস্তবিকই পোষাক পরিচ্ছদের অনাবশ্যক  
ব্যবহারের ফলেই আমরা আমাদের শরীর-  
টাকে নিত্যস্থায়ী অকর্মণ্য ও রোগপ্রবণ করিয়া  
তুলিতেছি।

পরিচ্ছদের কণায় আর একটা বিষয়ে সন্ধান-  
রণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এখন দেশের  
ইতর ভদ্র সকলেই বড়লোকের মেয়েদের ব্যব-  
হার্য্য মিহি কাপড়ের অমুকরণে, তাহাদিগের  
মেয়েদের পরিধানের জন্ত বিলাতী মিহি  
কাপড় ক্রয় করিয়া থাকেন। বোঝেন না  
যে, তাঁহারা বাহাদের অমুকরণ করিয়া বাবু  
হইতে বাইতেছেন—বড় হইতে বাইতেছেন,  
তাঁহাদের মেয়েরা বাড়ীর বাহির হ'ন না,  
তাঁহারা মিহি কাপড় পরিধান করিয়া বাড়ী-  
বন্দো আবদ্ধ থাকেন। আর অমুকরণকাবী-  
দের মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে আর কোথাও  
না হটুক, গ্রামের ঘাটেও বাইয়া থাকেন,  
তা' সে ঘাট নতদৃষ্ট হটুক। নানান্দ্রে-সিক্ত-  
বস্ত্র পরিধান করিয়া যখন মেয়েরা প্রত্যাগমন  
করিতে থাকেন, তখনকার সে দৃশ্য কি  
লজ্জাকর। তা' দেখিয়াও চৈতন্য নাই।  
এমনি বাবুদের মেহি!—মনি সভ্যতার  
বিকট আকাক্ষ। দেশের সকলেই আপন  
আপন মেয়েছেলেদিগকে মিহি কাপড় পরা-  
ইয়া তাহাদিগের লজ্জা-সরমেয় যে ধোরব  
ছিল, তাহা নষ্ট করিয়া দিতেছেন—নিজেরই  
নিজের মেয়েছেলেদিগকে উলঙ্গ করিয়া  
জলের ঘাটে, বাহির করিতেছেন। ধক এ  
দিকার! ধক এ সভ্যতার! আমাদের  
দেশে ৫০৬০ বৎসর পূর্বেও মোটাকাপড়ের  
প্রচলন ছিল। তখন চরকা-কাটা মোটা-

মুতার কাপড়ে লজ্জানিবারণ তইত বদিয়া  
জলের ঘাটে মেয়েদের এ দুর্দশা দেখিতে  
হইত না। এখন সভ্যতার খাঁতিরে, বিলা-  
সিতার মোহে মোটার পরিবর্তে মিহিতে  
মজিয়া আমাদের এই নৈতিক দুর্বলতা  
উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয় এখনই সতর্ক  
হইয়া মেয়েছেলেদের জন্ত লজ্জানিবারণের  
জন্ত উপযুক্ত মোটাকাপড়ের ব্যবস্থা করা  
উচিত।

সর্ববিষয়েই আমাদের এই যে পরিবর্তন,  
ইহা আমাদের ধাতুর উপযোগী কিনা, তাহা  
আমরা চিন্তা করি না বা চিন্তা করিবার অব-  
সরও পাই না। গ্রামের ধনী লোকদিগের  
অবকাশ মত কখন কখন নগর হইতে সপের  
স্রমে পৈতৃক ভিটায় পদার্পণ করেন। তাঁহা-  
দের আগমনে গ্রামে একটা চাক্ষুশ উপস্থি-  
ত হয়। দিব্যভাগে মাঠে মাঠে বাগানে বাগানে  
বন্দুকের শব্দ, রাতে গ্রামোফোন—হারমো-  
নিয়ামের মধুর সুর, পল্লীবাসী যুবকবৃন্দের  
উদ্ভাস্কুরিয়া তোলে। নাগরিক বিলা-  
সিতার মোহে অনেকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।  
তাই তাহাদিগের বেশবিজ্ঞাসের পারিপাট্যে  
মুগ্ধ হইয়া, চাষার ছেগেও খালা বাবু সাজিতে  
ব্যগ্র হয়। এষ্ট বাবুমানার বিকটত্ব এখন  
সংক্রামকরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিত্য  
পাড়াগাঁয়ের মুঠে মজুরের ছেলেরাও পরমা  
থরচ করিয়া ছোট বড় করিয়া ফুল কাটে,  
বিড়ি-সিগারেট খায়। নগরের বিলাস-  
বস্ত্র প্রথল উজ্জ্বল পাড়াগাঁকেও ভাসাইতে  
ছুটিয়াছে। আমাদের বোধ হয় নব সভ্য-  
তার লব্ধ চাক্ষুশকাই পাড়াগাঁয়ের বাহ্য-  
সম্পদ একেবারেই হরণ করিতে প্রবলদেবে

অগ্রসর হইয়াছে। পূর্বের অভাবের উপর,  
• পল্লীবাসী আবার নূন নূতন নানা অভাবের  
সৃষ্টি করিয়া ধ্বংসের পথ পবিস্কার করিতেছে।  
চা, চুস্ট, সিগারেট, বিড়ি এখন বাবুজের  
পরিচায়ক,—তার উপর নতুন নূতন উপসর্গ  
অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের প্রসার আবও বাড়িয়া  
তুলিয়াছে। • নানাবিধ নৃত জন্তব চক্ষিপক  
প্রস্তবচূর্ণ মিশ্রিত ময়দা ব প্রস্তুত লুচি, কচুরী,  
দিয়েড়া প্রভৃতি এখন বাবুর জলধাণার!  
সহরের বর্জিত বাসিপচা নানারূপ নিকৃষ্ট  
খাদ্য এখন ফেরিওয়ালার কল্যাণে পল্লী-  
বাসী নব্য সন্ত্যগণের রসনা তৃপ্তিকর  
ভোজ্য! ফল, অজীর্ণ অন্ন-অতিসার, তারপর  
অকালমৃত্যু।

• সহরের অভাব দূব করিবার জন্ত চেষ্টা  
আছে, যত আছে, আয়োজন আছে; কিন্তু  
পল্লীগ্ৰামের অভাব দূব করিবার আশা  
কোথায়? পরীজননীর কৃতীপুত্রগণই নগরের  
কর্মক্ষেত্রে কর্ম করিয়া নাগরিক নামের  
মোহে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং জননীকৃত্যমুখে  
জন্মের ষ্টুত তুলিয়াছেন! কিন্তু তাহারা এত  
• করিয়াও রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া-  
ছেন কি? নগরেই রোগের নানামুষ্টি ক্ষুষ্টি  
সহকারে বিরাজ করিতেছে,—বাস্তালীর  
ভাবী বংশধর খোকা-খুকীগুলি নগরেই  
অধিক মরিতেছে। মগরের ভায় পল্লীগ্ৰাম-  
গুলিকে রক্ষা করিবার জন্ত যদি যুগোপযোগী  
আয়োজন করা যায়, তাহা হইলে বন্ধের পল্লী-  
প্রদেশ আবার তাহার পূর্ব স্বথ, পূর্ব স্বাস্থ্য  
• ফিরিয়া পাইতে পারে। আমরাগিকেও আর  
বারমাস রোগ-যন্ত্রণার অস্থির হইতে হয় না।  
এখন প্রশ্ন এই, কি উপায় অবলম্বন করিলে

পল্লীগ্ৰামস্থতিকে পূর্বের ভায় স্বাস্থ্যপূর্ণ করা  
যাইতে পারে?

এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় এই দেওয়া  
যাইতে পারে যে, পল্লীগ্ৰামগুলির অভাব দূব  
কবিতে পারিলেই পল্লী রক্ষার উপায় হইতে  
পাখে। সে অর্থাৎ কি তাহা পূর্বের আলোচিত  
হইয়াছে। এত অভ্যাসমুহ দূব করিতে  
হইলে, পল্লীবাসিনগণকে তাহাদের পৈতৃক  
ধর্মের বিধি-নিষেধের ভিতর দিয়া যুগোপযোগী  
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সর্বাগ্রেই করিতে হইবে।  
তাৎপর্য শিক্ষিত না হইলে, নিজেদের অভাব  
নিজেরা না বুঝিলে, উত্তোগ আয়োজন বুধা,  
পরিগ্রহ বুধা এবং অর্থব্যয় ও বুধা। কিন্তু  
এই শিক্ষায় নামে বাবুজের ও বিলাসিতার  
প্রসার না বাড়ি, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান  
হইতে হইবে। শিক্ষাটা দেশের ধাতুর  
উপযোগী না হইলে, সে আবার একটা নূতন  
উপসর্গ আনিয়া আবির্ভূত হইবে। আচার  
ব্যবহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, খাদ্য পানীয়,  
সর্ববিষয়ে সর্বপ্রকার সংযমী হওয়াই বাহা-  
দিগের শিক্ষার সনাতন পন্থা, তাহাদিগকে  
শিক্ষার নামে খেচ্ছাচারী করিয়া তুলিলে  
সুফল ফলিবে না। মুষ্টিকর খাদ্যের নামে,  
তাহাদের চতুর্দিশ পুরুষের পাকস্থলী যে সকল  
খাদ্য গ্রহণ করে নাই—তাহাদিগের পূর্ব-  
পুরুষগণ অখাদ্য কুখাদ্য জানে যে সকল খাদ্য  
বর্জন করিয়াও পূর্ণ স্বাস্থ্য-সুখ উপভোগ  
করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল যেন প্রচলিত  
করিবার চেষ্টা করিয়া সমাজে একটা নূতন  
উপসর্গ আনয়ন করা না হয়। এ শিক্ষার  
স্বাধীনতার নামে খেচ্ছাচারিতার প্রভাব না  
দিয়া, শাস্ত শাসনের অধীন থাকিয়া খাদ্য

পানীয় প্রভৃতি গ্রহণ বর্জনের ব্যবস্থা এবং  
সেগুলিকে বিপুলভাবে রক্ষা করিবার উপায়-  
শিক্ষা দেওয়াই উচিত।

পল্লীপ্রদেশে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারের জন্য  
বক্তা নিযুক্ত করিতে পারিলে, সফল পাওয়া  
যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন শিক্ষার  
প্রসার বৃদ্ধি এবং নিম্ন শিক্ষার ব্যবস্থার পরি-  
বর্তন ও বাঞ্ছনীয়। এক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষার  
যে বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহাতে এক বর্ণ-  
বোজনা ভিন্ন আর কিছু যে শিক্ষা দেওয়া  
হয় না, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত কথা।  
এই বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া তাহা,  
অল্প ও সুস্থ্যাতর একটু ভালরকম শিখাইতে  
পারিলে সফলের আশা করা যাইতে পারে।

যাহা হউক উপসংহারে বক্তব্য এই যে,  
দেশের বিষয় বাহারা চিন্তা করেন, তাঁহাদের  
প্রথম কর্তব্য এই যে, পল্লীগ্রামগুলি কিসে  
রক্ষা পাইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তাকেই  
প্রাধান্য স্থান প্রদান করা। মুমূর্ষু পল্লীজননী  
এখন তাঁহাদেরই মুখ চাহিয়া আছেন—  
বাহারা দেশের ও দেশের প্রতিনিধি বলিয়া  
আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই  
সকল শক্তিশালী ব্যক্তি বঙ্গের পল্লী রক্ষার  
মনোযোগী হউন, তবে তাঁহাদের কার্যের  
সফলতা—তবে তাঁহাদের কার্যের সাফ-  
ল্য। কর্তৃক্ষেত্রে সর্বদা স্রবণ রাখিতে  
হইবে, পল্লী রক্ষা না হইলে দেশ রক্ষা  
হইবে না।

## শিশু-পালন ।

শিশু-পালন

( পূর্বাভাস )

[ শ্রীমতী কুমুদিনী বসু—বি-এ, সরস্বতী ]

### শিশুর চরিত্র গঠন ।

শিশুকে মানুষ করিতে চেষ্টা শুধু তাহার  
শারীরিক উন্নতির প্রতি মনোযোগ রাখিলে  
চলিবে না, তাহার চরিত্রের দিকে বিশেষ  
দৃষ্টি দিতে হইবে। শিশু জন্মিষ্ট হইবারাত্র  
তাহার চরিত্র গঠনের দিকে প্রত্যেক মাতার  
মন দিতে হইবে। এক সময়ে একটি ইংরেজ  
রমণী তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশু বালককে  
এক পাজীর নিকট লইয়া গিয়া বলেন যে,

এই শিশুকে কত বৎসর হইতে নীতি শিক্ষা  
দিতে আরম্ভ করিবেন। পাজী বিষয়  
প্রকাশ করিয়া বলেন, “কি, এখনও আপনি  
ইহার চরিত্র গঠনের দিকে মন দেন নাই?  
শীঘ্র আরম্ভ করুন, বড় দেরী হইয়া গিয়াছে।  
ইহার জন্মের মশ মাস পূর্ণ হইতেই যে ইহার  
নীতি শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে।” রমণী  
অপ্রতীক হইয়া কিরিয়া গেলেন। শিশু

মাতার জঠরে থাকিতে থাকিতেই তাহার মানসিক শিক্ষার আরম্ভ হয়। মাতা সর্বদা যেমন চিন্তা করিবেন, যেমন মনের ভাব হইবে শিশুর সেইরূপ হইবে। মাতা ধর্ম-পরায়ণা, সংকল্পে অমুরাগিণী, তেজস্বিনী, ব্রহ্মদেশ প্রেমিকা ও অশিক্ষিতা হইলে সন্তানের প্রাণেও সেই মহৎ ভাবসমূহ সুদৃঢ় হইবে। শিশু ভ্রমিষ্ট হইবার পর, হইতেই সহ ও মহৎ ভাবসমূহ অমুশীলন দ্বারা তাহার চরিত্রে দৃঢ়তা তৈরি তোলা প্রত্যেক মাতার কর্তব্য। মাতা সর্ববিষয়ে গুণবতী হইলে সন্তানের প্রাণে সদগুণের অঙ্কুর থাকিবেই। তাহা অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে প্রত্যেক মাতা বিধাতার নিকট দাসী। নতুবা তিনি মাতা হইবার অযোগ্য।

সন্তানকে সাধু দেখিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব প্রথমে মাতা তাহাকে বাধ্যতা ও সত্যবাদী শিক্ষা দিবেন। সন্তান বাধ্য ও সত্যবাদী হইলে অল্প সম গুণ শিক্ষা দিতে কোনই কষ্ট হইবে না। দোষায় থাকিতেই শিশুকে বাধ্যতা শিক্ষা দিবে। বড় হইলে বাধ্য ও সত্যবাদী হইবে, ছেলেবেলায় যেমন দোষ থাকে থাকুক, একপ মনে করা আবশ্যিক দায়িত্ব। কথার বলে, “কাঁচার না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাস ট্যাস।” শৈশবে সমস্ত বদগুণের তাব অন্তরে বদ্ধমূল না করিয়া দিলে, বড় হইলে আর তাহা মুদ্রিত হইবে না। সুতরাং সন্তানকে বাধ্যতা শিক্ষা দিতে হইলে শৈশবেই তাহা করিবে। যে শিশু পিতামাতার ইচ্ছানুসারে না চলিয়া আপনার ইচ্ছানুসারেই চলে অথবা চলিতে দেওয়া হয়, সে কবিদ্যতে কখনই আপনাকে

শাসনে রাখিতে পারিবে না। অনেক পিতামাতা স্নেহের বশবর্তী হইয়া সন্তানকে আবদার করে এড়া বড়ই অসঙ্গত হটক না কেন, পূর্ণ করবেন। ইহাতে তাহার সন্তানের কি ঘোর অনিষ্টসাধন করবেন তাহা ভবিষ্যতে তাহার ফল ভোগ করিলে তবৈ বুঝিতে পারেন। পিতামাতার জায় সন্তানের চিত্তেই আর কেহ নাট। কিন্তু এতদ্বারা তাহার সন্তানের শরৎকাল কাটা করেন। ভাল-বাসা দ্বারা সন্তানকে বাধ্য করিবে, ভয় দেখাইয়া নয়। কারণ একবার ভয় ভাগিয়া গেলে আর সন্তান বাধ্য থাকিবে না। সন্তানের অসঙ্গত আবদারে কখনও কর্তৃত্ব করিবে না, কিন্তু তাহাকে কখনও কোন অসঙ্গত আদেশও পালন করিতে বলিবে না। একবার একটা আদেশ দিলে দেখিবে যেন সে আদেশ পালিত হয়। মাতা একটা আদেশ দিলেন অথচ তাহা শিশু পালন করিল কিনা তাহা দেখিলেন না—ইহাতে অত্যন্ত কুশিক্ষা হয়। শিশুর মনে মাতার আদেশের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না, সে জানিতে শেখে যে “মা অমন কত কুখাই বলেন কিন্তু তা’ শুনি বা’না শুনি তা’তে বড় আসে যায় না। শিশু মাতার ইচ্ছা মানিয়া চলিবে বলিয়া এমন যেন না হয় যে তাহার সঙ্গত প্রার্থনাও পূর্ণ হইবে না। শিশুর সঙ্গত ও জ্ঞাত প্রার্থনা সর্বদা পূর্ণ করিবে। তাহার সমস্ত ইচ্ছাই মনন করিতে গেলে তাহার স্বভাব ভীত হইয়া যাইবে, মনের স্বাধীনতার ভাব লোপ পাইবে, আপনার প্রতি বিশ্বাস হারাইবে। একপ হইলে তাহার সমস্ত শরৎকাল বিকাশ হইবে না, মনের ক্ষতি থাকিবে না,

নিজে কিছু কবিবাণ শক্তি গারাইবে। শিশুকে উঠাই জানিতে দিবে যে, তাহার সঙ্গত ও ভাষা প্রার্থনা সর্বদা পূর্ণ হইবে কিন্তু তাহার অসঙ্গত ও তত্রায় আবদার কখনই পূর্ণ হইবে না। সে জানুক যে, যদি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়াও যার তপাপি তাহার অসঙ্গত আন্দার পিতামাতা তুনিবেন না। তাহা হইলে একদিকে বাধাতা অপর-দিকে স্বাধীনতা শিক্ষা হইবে। শিশু দোলায় থাকিতেই এট শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবে। শিশু আজ ঘুমাইবার সময় নিজেব শয্যায় শুইবে না বলিয়া কাঁদিতে থাকিলে তুমি যদি শ্রদ্ধাকে কোলে লও, কলা ও শিশু ঐ সময় কাঁদিবে এবং আশা করিবে তুমি তাহাকে কোলে লইবে। একদিকে বড় হইলেও সে বখন যে জিনিস চাচিবে তাহা দিতে না পারিলে কাঁদিয়া অশান্তি ব সৃষ্টি করিবে এবং যখন আর কাঁদিবার বয়স থাকিবে না তখন নিজের উচ্ছাসত সব না হইলে সর্বদা বিবস্ত হইয়া থাকিবে, অত্রেব, সৰ্বদে অভিযোগ করিবে কিংবা বকাবকি করিয়া সংসারে অশান্তি আনিবে। সুতরাং বাধাতা যেন শিশু গৃহের প্রথম নিয়ম হয়। শৈশবকাল হইতে যে শিশু পিতামাতার বাধা হইয়া বাড়িয়া উঠে, ভবিষ্যতে সে তাহাদের গৌরবধ্বংস হইবেই। মনে বাধাও, যে শিশু গুরুজনের আদেশ সর্বাঙ্গেক্ষা উত্তমরূপে পালন করিতে শিক্ষা করিবে, বড় হইলে সেই মানুষই সর্বা-পেক্ষা উত্তমরূপে অপরকে আদেশ দিতে পারিবে। একটি বাধ্য শিশুর জননায়ক হইবার যেমন সম্ভাবনা তেমন যে শিশু সর্বদা আদেশ পালনে অস্বীকার করে তাহার ভাল নাই।

শিশুকে সম্ভদা সত্য কথা বলিতে, সত্য আচরণ করিতে শিক্ষা দিবে। শুধু "মুখে বলিলে হইবে না মাতাকে বাক্যে, আচরণে, ব্যবহারে ভাবে সত্য হইতে হইবে। শত শত বাক্য ও উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক শিক্ষাপ্রদ। মাতা সন্তানকে যৌবনভাবে গড়িয়া তুলিতে উচ্চা করিবেন অগ্রে নিজে সেরূপ হইয়া তাহাকে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, শিশুর নিকট তাহার মতাই তাহার আদর্শ। শিশু মাতাকেই সর্বাঙ্গেক্ষা অধিক অনুকরণ করে। মাতা নিজে সত্য কথা বলিবেন, বাড়ীৰ সমুদয় শবিকনবর্গ দাসদাসী প্রত্যেক-কেই অন্ততঃ শিশুব সমুখে সত্য কথা বলিতে অনুরোধ করিবেন। মাতা শিশুব প্রাণে মিথ্যার প্রতি ভীত হুগা ভয়াইয়া দিবেন। যে কেহ মিথ্যা বলিবে শিশু তাহাকে ব্লগা কবিলে, সুতরাং শিশুর ব্লগা পাইবার ভয়ে তাহার নিকট মিথ্যা বলিবে না। ঘরপ্রাণ বামহস্ত লাহিড়ীর একটি শিশুকে তাহার ক্রন্দন থামাইবার জন্য গভীর রাতিতে দাসী এট বলিয়া তাহাকে সাহসনা দিতছিল যে, "চুপ কর, বসগোলা দিবা।" শিশু তাহা শুনিয়া চুপ করিল। লাহিড়ী মহাশয় দাসীর কথা শুনিয়া তখন উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি যখন বলেছ যে, একে বসগোলা দেবে, তখন এখনি যাও, বসগোলা এনে দাও।" এই বলিয়া দাসীকে সেই রাত্ৰিতে দোকানে পাঠাইয়া "বসগোলা আনিয়া শিশুর হাতে দিয়া তবে আস্ত হইলেন। এই একটি কাহা যারা তিনি দাসীকে, যেমন শিক্ষা দিলেন শিশুর নিকট সত্যরক্ষাও তেমনি করিলেন। এই মহাআদর্শ এই সত্যপরাধিতার এই



একটি দৃষ্টান্ত সমগ্র মাতৃ সমাজের সম্মুখে শিশুপালনের একটি আদর্শ হইয়া রহিয়াছে শুধু নিজের ভাল হইলে হইবে না, বাটীর সকল পরিজনকে, পাড়াপ্রতিবাদী সকলেরই সং-স্বভাবের হওয়া আবশ্যিক নতুবা সমাজকে সাধু করিয়া গড়িয়া তোলা উক্ত ব্যাপার। পিতা মাতা নিজে সত্যবাদী হইবেন, সত্যকে কবিরেন, সত্য আচরণ করিবেন এবং যে সংসর্গে শিশুকে রাখিবেন, তাহাও সং হইবে এবং সমাজের জন্য কোন ভয় নাট। অনেক সময়ে শিশু কোতুলক বশতঃ এমন অনেক বিষয়ের কাণে জানিতে চায় বাহার প্রকৃত কারণ মাত্র জানেন না। এক্ষণে স্থলে প্রায়ই মাতা একটা কল্পিত কারণ হইয়ার করিয়া শিশুর কোতুলক নিবারণ করেন কিংবা ধমক দিয়া শিশুকে তাহাকে বিরক্ত করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। প্রথম কার্য শিশুর নিকট মিথ্যা বলা এবং দ্বিতীয় কার্য দ্বারা শিশুর স্বাভাবিক জ্ঞানবাস আকাজ্ঞা ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং মাতা শিশুর জিজ্ঞাস্ত বিষয়টির কারণ জানিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন এবং প্রকৃত কারণটি তাহাকে বলিবেন। শিশু জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে “আমি এখন জানিনা, পরে জানিয়া তোমাকে বলিব”।

শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা রাখা গিতামাতার কর্তব্য। শিশুর সদাকাজ্ঞা, সাধুতাব উৎসাহ দিয়া আরো সুটাইয়া তুলিবে। শিশু ধর্মের কোন কথা বলিলে বা জানিতে চাহিলে তাহা জেঠামি বলিয়া উপহার করিবে না। ধর্ম-ভাবের বীজ শৈশবে হঠতেই বপন করিবে তবে তাহা এমন দৃঢ় হইয়া বসিবে যে কখনো

তাহা নষ্ট হইবে না। আমেরিকার বিখ্যাত রাজনৈতিক জন ব্যাণ্ডলফ বলিয়াছেন, “শৈশবে আমার মা যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আমার ছোট হাত ছুটি ধোড় করিয়া তাঁহার হাতের মধ্যে লইয়া, ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন তাহারই স্মৃতি, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের শত প্রলোভন, সংগ্রাম, বিপদ, কষ্টের মধ্যেও আমাকে স্থির রাখিয়াছে; নতুবা আমি নাস্তিক হইয়া যাইতাম।” জগতের কত শত বিখ্যাত লোকের মত জীবনী তাঁহাদের মাতার এই ধর্ম শিক্ষার প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। শৈশবে মানুষের মন সাদা থাকে, তখন যে ভাবে বোধ অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইবে তাহাই দৃঢ় হইয়া বসিবে, তাহা কখনো মুছিয়া যাইবার নহে। শিশুর কোমল প্রাণে সর্বদা এই ভাব দৃঢ় করিয়া দিবে যে, আধারে আলোকে—সন্মানে নির্জনে—বখন যেখানে থাকিবে, যাহা করিবে মানুষ না দেখিলেও ভগবান তাহা তোমার সঙ্গে থাকিয়া দেখিতেছেন। ইহার দৃষ্টান্ত শিশুর শক্তির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখিবে। বালকবালিকার কবিতা শিখিবার, বক্তৃতা দিবার, অঙ্কন করিবার শক্তি দেখিলে তাহা উৎসাহ দিয়া বাড়াইয়া তুলিবে; কখনো অবহেলা করিবে না। ৩৭ বৎসরের হইলে বালকবালিকাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়া তাহার কার্য-ক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ জন্মাইয়া দিবে। যেমন একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বালকবালিকাকে একটি বাগ্নী তাহাদের মনোমত জবাদিতে পূর্ণ করিয়া তাহার চাবি তাহাদের হস্তে দিয়া মাতা বলিবেন, এই বাগ্নী সাজাইয়া গুছাইয়া

রাখা জিনিস পত্র সাবধানে রাখা তোমাদের হাতে। আমি মাঝে মাঝে দেখিব—তোমরা কে কেমন স্মরণ করিয়া তোমাদের এই কাজ কর"। মাতার এই বাক্যে তাহারা আনন্দের সহিত এটু কাজ করিবে। ইহাতে তাহাদের দায়িত্ববোধ, জিনিস পত্রের বহু লগুণ ও একটা কর্তব্য জ্ঞান জন্মিবে এবং এই জ্ঞানগুলি আনন্দ ও খেদাখুলাস মধ্য দিগাই হইবে। মধ্যে মধ্যে কোন দিন কিছু পরস্য হাতে দিয়া তাহাদের বলিতে পার যে দেখি তোমরা এই পরস্য ছুটি কেমন করিয়া খরচ কর এবং যে খরচ করিবে তাহার একটা হিসাব রাখিবে, যদি সম্বাহার কর তবে এই পুরস্কার পাইবে। তারপর নির্দিষ্টদিনে তাহাদের হিসাব দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে কে কি ভাবে খরচ করিয়াছে, কে কোন কাজে খরচ করিয়া পরস্য সম্বাহার করিয়াছে বলিয়া মনে করে। যদি কেহ বুঝা কাজে পরস্য নষ্ট করিয়া থাকে, তবে তাহার কাজটি বুঝা কেন, একগু কাজে পরস্য ব্যয় করা উচিত হয় নাই ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ দিবে। কবি দরাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁর পিতা বাঁধা করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। শিশুর প্রাণে সর্বদা এই

ভাব আগ্রত করিয়া রাখিবে যে তাহার ভিতর অনেক শক্তি আছে, চেষ্টা করিলে সে অগতির মহৎ লোকদিগের মধ্যে আসন পাইতে পারিবে। আমেরিকার প্রত্যেক শিশু মনে করে যে কালে সে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করিবে। এইরূপে শিশুর প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আগ্রত করিয়া দিবে। শর্শনা অগতির সাধু-সংগো, জ্ঞানী-শ্রমি, স্বদেশ প্রেমিক মহাপুরুষদের আশ্রয়-ভাগের, বীরবীর, পাণ্ডিত্যের, অধ্যবসায়ের, পরিশ্রমশীলতার, দয়ার গল্প বলিবে এবং তাঁহাদের জীবনী পড়িতে দিবে। শৈশব হইতে তাহাদিগকে মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে। তাহা হইলে তাহাদের মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি ক্রমে ক্রমে আগ্রত হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালী জাতি আবার মানুষ হইয়া অগতির মাঝখানে দাঁড়াইবে। বাংলার প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক বালক বালিকা বাংলার জাতীর সম্পদ। এই সম্পদকে প্রাণপণ বহু রক্ষা করা, শ্রীবুদ্ধি সাধন করার তার বাংলার প্রত্যেক নবীন মাতার হস্তে ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করিলে বঙ্গ জননীর সুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন অথবা বলিহীন করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

## কুলের কথা।

[ কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন ]

“কুল” সকলেই খাইয়া থাকেন, কিন্তু ‘কুলের’ যে সকল রোগনাশিনী শক্তি আছে তাহা সাধারণ পাঠক অবগত হইলেন, এজন্য আমরা অত্র ‘কুলের’ কথা বলিব। কুলের সংস্কৃত নাম বদর, কুল ও বরই। হিন্দী নাম—বের।

হিকা রোগে কুলের বীজ।—কুলবীজ ভাজিয়া তাম্বাখর বে শাঁস পাওয়া যায়, ঐ শাঁস স্তন দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে হিকা রোগের উপশম হইয়া থাকে। বাবং হিকা থাকিবে তাবং কাল মধ্যে মধ্যে সেবন করাইবে।

কাস রোগে—কুল বীজের শাঁস দধির মাতের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে কাস রোগ উপশমিত হয়।

ব্রণভেদ ও কাসে—কচি কুলের পাতা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ গব্যদুগ্ধে ভাজিয়া সেবন করিলে ব্রণভেদ ও কাস প্রশমিত হয়।

অভিসারে—কুল গাছের মূলের ছাল চূর্ণ হই আনা একটু মধু সহিত সেবন করিলে অভিসার নিবৃত্তি হয়।

গ্রীহাদরে কুলের পাতা।—গ্রীহা অতি বৃদ্ধিশক্ত: উদরী রোগে পরিণত হয়, ইহাতে জ্বলাদরী রোগীর অন্তর পেটের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুলের পাতা তিল তৈলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গ্রীহার স্থানে

মর্দন করিবে, তৎপর হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে গ্রীহার স্থান টিগিতে থাকিবে, এইরূপ প্রত্যহ করিবে। রোগী কেবল দুগ্ধ সেবন করিবে। অন্নাদি ভোজন নিষেধ। এই নিরমাবীনে থাকিলে গ্রীহা ক্রমশঃ ছোট হইয়া উদর স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইবে।

রক্তাতিসারে—চারি আনা পরিমিত কুল গাছের মূলের ছাল ছাগী দুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধু সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি হয়।

শ্রমেরে—বীজ রহিত কুল চূর্ণ চারি আনা, ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তশ্রমের উপশমিত হইয়া থাকে।

হুলকায়ে কুলের পাতা—অতি হুল ব্যক্তি প্রত্যহ অর্দ্ধ ভৌলা পরিমাণ কুলের পত্র কাঁজিতে পেষণ করিয়া সেবন করিলে দেহ ক্লশ হইল।

আমাশয়ে কুলের পাতা—চারি আনা পরিমাণ কুলের পাতা দধির সহিত পেষণ করিয়া, পুনরায় দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে রক্ত আমাশয় ও শালা আমাশয় নিবৃত্তি হয়।

ফোড়া পাকায়—কুলের পত্র বজ্র ডুমুরের পত্রের দ্বারা পুলাটান দিলে অগ্নক ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

বসন্ত রোগে কুল—বীজহীন কুলচূর্ণ

ইক্ষুওক সহ সেবন করিলে বাত-পিত্ত-কফজ  
বসন্ত শীঘ্র থাকিয়া উঠে।

মল্যগ্নিতে কুলের বীজ—বাহাদিগের ক্ষুধা  
মান্য হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় কুলের বীজের  
শাঁস জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন  
করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

রক্তপিত্তে কুলের পত্র—মুখ দ্বারা রক্ত  
নির্গত হইলে কচি কুলের পত্র চারি আনা,  
মধুর সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্ত  
বমন নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

## পল্লী-প্রসঙ্গ।

ময়ুরিকা বা বসন্ত বোধ হয় বাঙ্গালার  
চির-সঙ্গী হইল। কলিকাতার ইহার প্রকোপ  
করিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু মকঃবলের স্থানে  
স্থানে এখনও ইহার আক্রমণের কথা শুনা  
বাইতেছে। মেদিনীপুর-কাঞ্চির সহযোগী  
“নীহার” জানাইতেছেন,—

হাম ও বসন্ত এখনও স্থানে স্থানে লাগিয়া রহি-  
য়াছে। অরেও লোক আক্রান্ত হইতেছে।

সহযোগী “মেদিনীপুর চিঠিখো” ও ইহার  
সমর্থন করিয়া বলিতেছেন,—

মেদিনীপুর জেলার ‘সঙ্গরই’ এখনও ভীষণ  
জ্বর, বসন্ত, কলেরা ও আতশখানির প্রাদুর্ভাব দেখা  
বাইতেছে। এই দারুণ গ্রীষ্মে নিউমোনিয়াতেও বহু  
লোক মরিতেছে।

ইন্দু-রক্তজার সংবাদও অনেক স্থান হইতে  
পাওয়া বাইতেছে। গুলনার সহযোগী  
“গুলনাবাসী”তে প্রকাশ,—

ইন্দু-রক্তজার প্রভাব।—ভূমিরিখা থানা ও তরিকট-  
বর্তী গ্রাম সমূহে ইন্দু-রক্তজার প্রভাব বিশেষভাবে  
বাড়িয়াছে। ভূমিরিখা নাতবা তিকৎসালরের ডাক্তার  
বাণু বতীজনারায়ণ মহাশয় গত সপ্তাহে এই রোগে

মৃত্যুস্থলে গতিত হইয়াছেন। তাঁহার বাসায় অরুণ  
করেকরন ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণ তো বাঙ্গালীর পক্ষে  
চির-সঙ্গিনীল। বাঙ্গালার টেহার আক্রমণ বার-  
বাসই অল্প বিস্তার আছে বলিলে অত্যুক্তি হয়  
না। বর্ষায় অস্ত্রে ইহার বিশেষভাবে প্রকোপ  
হইয়া থাকে। এবার বাঙ্গালার বর্ষায় পূর্বেই  
ইহার আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। “ঢাকা-  
প্রকাশ” সংবাদ দিতেছেন,—

এবারকার জ্বরের প্রবল আক্রমণে চাঁদপ্রভাপুর  
অধিকাংশ অধিবাসী দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত  
হইয়াছে। বতই দিন বাইতেছে, ততই জ্বর-রোগীর  
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন বাড়ীর প্রায়  
সকলেই শয্যাপারী; বাহার উত্থানশক্তি রহিত হয়  
নাই, তাহাকেই অল্প যোগীদের পথ্যাদি কোনমতে  
দিতে হইতেছে। ঐ সকল বাড়ী জ্বরিলে ক্ষুদ্র হাঙ্গ-  
পাতাল বলিয়া মনে হয়। দরিদ্র গৃহস্থের অনেক  
অর্থের অজাবে ঔষধ ও পথ্যের ঘোড়াড় করিতে  
পারিতেছে না। এই জ্বরের লক্ষণও অতি অকৃত;  
অধিকাংশ জ্বরের পূর্বভাবে কিছুই বুঝিতে পারে না।  
এখন দিন সামান্য জ্বর হয়, এবং অল্পকাল মধ্যেই কঠোর  
বার; তৎপরে দ্রুত শরীর জালই বোধ হইয়া থাকে।

কিছু তার পর দিনই রোগী শরীর প্রবল আক্রমণে  
অস্থির হইয়া পড়ে। এই জটিল শিশু পূর্ব বৃদ্ধি পায়,  
এবং তদনুসারে শরীরে বিশেষতঃ মাংসের অতিমাত্রায়  
প্রবাহ হইয়া থাকে। চিকিৎসাদির ক্রটিতে অনেকেরই  
জ্বরের গতি মন্দর দিকে বাইতেছে। জ্বরের বিষয়, এ  
অবস্থায় অনেক কাল হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের  
অভাব।

বাঙ্গালাদেশের শ্রেষ্ঠ রোগ-প্রবণ, বাঙ্গালা-  
দেশে সে পৰিমাণ চিকিৎসকের কিছু একান্তই  
অভাব। সরকারি হিসাবেই প্রকাশ,  
ভারতবর্ষের লোক সংখ্যার তুলনায় এখনও  
চলিশ হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন।  
আধিভাষির লীলালিকেনন বাঙ্গালাদেশকে  
বন্ধ করিতে চাইলে বাঙ্গালী ছাত্র বাহাতে  
চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে  
পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ময়মন-  
সিংহের "চারুসিঙ্গ" বলিতেছেন,—

এই নগরে একটা মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করার  
প্রস্তাব হইয়াছে। ঐ প্রস্তাব কর্তব্য পরিণত করার  
অন্ত গন্ত পূর্ণ শুক্রবার বিসম্বাদী টাউনহলে জন-  
সাধারণের যে সভা হইয়াছিল সেই সভায় ঐরম্যসিংহ  
ডিক্টেটবোর্ডের সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান বাবু শশধর  
খোঁসু সেটেলমেন্টের উদ্ভূত টাকা এই জেলার  
মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনোদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার কথা  
উত্থাপন করেন এবং তৎক্ষণ গবর্ণমেন্টের নিকট  
আবেদন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মেডিক্যাল  
স্কুল স্থাপন বিষয়ে এই স্থানে যে কার্যকরী সমিতি  
গঠিত হইয়াছে ঐ সমিতির প্রতি শশধর বাবুর প্রস্তাব  
সম্বন্ধে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবার ভারার্ণণ করা  
হইয়াছে। আমরা আশা করি, গবর্ণমেন্ট জনসাধারণ  
হইতে গৃহীত এই টাকা দ্বারা মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন  
সম্ভবতা করিবেন।

কলিকাতার মেডিকেল কলেজে আসাম  
হইতে প্রতিবৎসর মাত্র ৬জন করিয়া ছাত্র

গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। শিলচরের "সুরমা" এই  
উপলক্ষে বলিতেছেন,—

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রতিবৎসর আসাম  
হইতে ৬ জন ছাত্র লওয়া হয়। এই ছয় জনের তিন  
জন ব্রহ্মপুত্র তেলির এবং বাকী তিন জন আগাধ  
তেলির। আসামের লোকসংখ্যায় প্রতি দৃষ্টিপাত  
করিলে বলিতে হয়—আসাম বিশেষতঃ শ্রীহট্ট কাছাড়  
হইতে আরো অধিক সংখ্যক ছাত্র লইবার ব্যবস্থা করা  
উচিত। এ বিষয়ে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষ  
ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

জল কষ্ট যে বাঙ্গালার রোগপ্রবণতার  
কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালার  
ম্যালেরিয়া বাঙ্গালীর জল কষ্টেই ফলসমুৎ।  
বাঙ্গালার কলেরা বাঙ্গালীর জলকষ্টের সর্ব-  
বৃদ্ধী সমস্ত ভীষণ ফল। কিন্তু এ জলকষ্ট  
দূর করিবার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা কি  
করিচ্ছি? জেলাবোর্ড এবং লোকালবোর্ড  
প্রভৃতি হইতে প্রতিবৎসর এই জলকষ্ট  
নিবারণ করে কিছু কিছু অর্থব্যয় করা  
হয় বটে কিন্তু তাহা পর্যাপ্ত নহে। নদীরা  
জেলার দৌলতপুর অঞ্চলের জলকষ্টের  
পরিচয় প্রসঙ্গে "কুফনগরের "বঙ্গবন্ধু"  
বলিতেছেন,—

নদীরা জেলার থানা দৌলতপুরের অন্তর্গত পান-  
ডিয়া ও মহিবকুড়া গ্রামের নিকটবর্তী ৩৪ মাইল মধ্যে  
কোন নদী বা পানীর কলের উপযুক্ত ইন্দ্রা বা পুষ্করিণী  
না থাকায় পল্লীবাসীর ভীষণ জলকষ্ট হইয়াছে।  
একেই অস্বাভাব, তাহার উপর জলকষ্ট। গ্রীষ্ম ক্রম-  
বর্ধন কালে উপায় বিহীন হইয়া বাধা হইয়া অশ্রি-  
কার জল পান করিয়া মানবিক সংক্রামক পীড়ার  
আক্রান্ত হইতেছে। আশা করি নদীরা জেলাবোর্ডের  
ও কুইরা লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মেম্বর  
সহায়ত্ব তত্ত্ব করিয়া গ্রীষ্ম পল্লীবাসীদের জলকষ্ট  
নিবারণ করতঃ তাহাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

এই জলকষ্ট উপলক্ষ কবিরাজ যশোহরের  
মুখপত্র “যশোহর” কি বলিতেছেন তাহাও  
তখন,—

বাঙ্গালার সর্বত্র নিত্যা নৈমিত্তিক জিনিসের হুলা  
হ হ করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। মাগুয়া চাটলের মণ  
১২ টাকা। কাপড় কাপড়ের কথা ত না বলিলেও  
চলে। তদুপরি ভীষণ জলকষ্ট। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমের  
সুজলা বসন্তমি যেন পৃথিবী হইতে অব্যক্ত হইয়াছে।  
মাঘ মাসের প্রথম হইতেই বসের পানিতে পানিতে  
পিপাসিতের আর্তনাদ শ্রুত হয়, ঘণ্টাহর আবার  
সকলকে পরিত্রা করিয়াছে। পিচ্-পিতাশহর প্রতি-  
ষ্ঠিত পুষ্করিণী ও নীধিতলির কতকগুলি শুকাইয়া  
গিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি পৈবালদানে আচ্ছন্ন হই-  
য়াছে। বয়সের মধ্যে চরমাই গ্রামবাসীগণকে কর্দ-  
মর্ত্তি পান করিয়া কোনমতে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে  
হয়, কলে পৌষ মাঘ মাসের প্রারম্ভেই গ্রামে গ্রামে  
আমাশয়ের তাণ্ডবনৃত্য, আর সহস্র সহস্র লোকের  
মৃত্যু। এই জলকষ্টের বিষয় বল জননী ভগিনীগণকেই  
বেশী ভোগ করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি, অনেক  
গ্রামের কুললক্ষ্মীদিগকে পিতামাতা, জাভা, ভগিনী ও  
আত্মীয় স্বজনদের পিপাসার একবিন্দু বারি প্রদানের

জন্য এক মাইল বেড় “মাইল পথ হাঁটিয়া কাপড়ের  
সংগ্রহ করিতে হয়।—অর্চির এই জলকষ্ট দূর করিবার  
জন্য লোকদের চেষ্টা করা কর্তব্য নহে কি?

আমরা শুনিয়া হুঃখিত হইলাম যে খুলনার  
উডবর্ণ হাসপাতালটিকে অর্থাভাবে অচল  
হইবার মত হইয়া পড়িয়াছে। খুলনার সচ-  
যোগী “খুলনাবাসী”ই এ সংবাদ জ্ঞাপন  
করিতেছেন।

হানীর উডবর্ণ হাসপাতালটি অর্থাভাবে অচল  
হইবার মত হইয়াছে। নীতিমত চাহা আদায় হয় না,  
অথচ বৈদ্যনিব বার বাড়িতেছে, কাজেই অনাটন  
ক্রমণ বাড়িতেছে। আমরা শুনিলাম, হানীর মিলনরা  
মিঃ মিলনে সাহেবের পত্নী হাসপাতালের চান আদায়  
করিবার জন্য অতিশ্রুত হইয়াছেন। মিলনে মিলনে  
কৃতকাণ্ড হইলে খুলনাবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইবেন।

খুলনার গণ্যমান্য অধিবাসীদিগেবও একজন  
চেইনম্যান হওয়া কর্তব্য। আমরা খুলনার  
স্বদেশ-সেবকদিগকে সর্বকর্ম ফেলিয়া সর্বোচ্চ  
এ বিষয়ের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

## স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

### মুক্ত শৌচ।

[ ডাঃ শ্রীমলিনীনাথ মজুমদার। ]

(১৩২৬ পৌষ সংখ্যার ১৩৮ পৃষ্ঠার পর।)

রক্তের যে সকল বিষাক্ত অংশ মুত্র রূপে  
মোহ হইতে নির্গত হয় তাহার ত্রৈবিক বিকল্প  
এতই অধিক যে, দশ দিনকাল কোন একটা  
নির্দিষ্ট স্থানে মুত্র পরিত্যক্ত হইলে তৎ স্থানের

যতাব জাত কৃণ্ড জন্তাদির জনন শক্তি বাবীজ  
নষ্ট হইয়া যায় এবং পূর্বজাত হইয়া প্রকৃতিকৃত  
গুলি যে সত্ত্ব সত্ত্বই মৃত্তক হয় তাহা কে না  
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? অতঃপর মুত্র পরিত্যক্ত

তীব্র বিষাক্ত তাহাতে অহুমান্তও সন্দেহ নাই। সেই বিষাক্ত পদার্থ দেহের কোন অংশে অথবা বস্ত্রাদিতে লাগিলে সেই সকল স্থানও যে বিষাক্ত হয় তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হইবার কথা। উক্ত বিষাক্ত পদার্থ বাহ্যতে দেহের কোনো অংশে বা বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হইয়া তাহা কোন অনিষ্ট উৎপাদন করিতে না পারে সেই নিমিত্তই মূত্র শোচের ব্যবস্থা। "শরীর-মাতঃ থলুধর্ম সাধনম্।" এই সার বচনটিতে মূত্রই উক্তকণ্ঠে বলা হইয়াছে যে শরীর রক্ষা বা স্বাস্থ্যরক্ষাই ধর্ম রক্ষা। একালে স্বাস্থ্য-রক্ষাট ধর্মরক্ষা বিষয়ক বহু পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াও যে শিক্ষকগণকে মূত্র শোচে-পরানুগ দেখা যায়, সেই দুঃখেই নানা কথার উল্লেখ করিতে হয়। ফলতঃ বাহ্য-স্বাস্থ্যকর তাহাকেই অপবিত্র এবং অধর্ম জনক বা অশৌচকারক ইত্যাদি শব্দে প্রোচ্য-শাস্ত্রে অভিযুক্ত হইয়াছে। বাহ্যের সদাচার, ধর্ম বা পবিত্রতা ইত্যাদি শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ব্যাধ পূরক কুটল কটাক্ষপাত করেন ওদিকে স্বাস্থ্য অবস্থানে দেশ দেশান্তরে ছুটা-ছুট করেন, তাহাদের বৃন্বিবার জন্তই এতগুলি কথার অবতারণা করিতে হইল। নতুবা শাস্ত্র-বাক্য অবশ্য পালনীয় বলিয়া ব্যবস্থাগুলি লিখিলেই যথেষ্ট হইতে পারিত। এক্ষণে নিয়ে আমরা বধ্য শাস্ত্র মূত্রশোচের ব্যবস্থাদিতে কাল ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বধ্যসম্ভব সমুচিত ভাবেই ব্যাখ্যা করিলাম। একান্ত সদাচার পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিতগণ আমা-দের জ্ঞাতি স্বাক্ষর করিবেন।

মূত্র ত্যাগান্তে জীপুরুষ সকলেরই মূত্রদ্বারে একবার মৃত্তিকা লেপন করতঃ জলধারা দ্বারা ধৌত

করিয়া ফেলিবে, অনন্তর হস্তদ্বয়ও মৃত্তিকা-দ্বারা লেপন করিয়া পরিকার ভাবে ধুইয়া ফেলিবে, তৎপরে পাদদ্বয় ধৌত করিয়া পবিত্র হইয়া জ্ঞানে ভগবানকে, অরণ পূরক শুদ্ধ হইবে। মৃত্তিকা লেপন পূরক জল দ্বারা ধৌত করিলে কোনরূপ রোগবীজ দোহ বা বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হইবার ভয় এককালে বিনষ্ট হয় বলিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা। দিবসের শৌচ পিণ্ডি যোগ ব্যবস্থা আছে রাজ্যে তদপেক্ষা অধিক করিলেই ভাল। আবার আজকাল বেল বা ধীরামনিতে উহার মৃত্তিকা প্রয়োগ চলে না বলিয়া যে সকল অপবিত্রতার কারণ উপস্থিত হয়; তাহার সংশোধন করে যথাস্থানে উপনীত হইবার পর বস্ত্রাদি পরিত্যাগ এবং মৃত্তিকা শৌচ ও যথাসাধ্য প্রক্ষালন বা স্নানাদি দ্বারা শৌচ হইয়া পবিত্র চিত্তে যিস্মরণ করিলেই পবিত্র হওয়া যায়। কোন অনিবার্য কারণে বা পথ পর্যটন প্রভৃতি কালে জল দ্রুতপা হইলেও কদাচ মূত্রাদির বেগ ধারণ না করিয়া বিনা শৌচেই পরিত্যাগ করিবে কিন্তু পরবর্তী কালেই যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্তরূপ শৌচ ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগীর পক্ষে পূরক রাত্রিকালের শৌচের অধিক ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। নিত্যন্ত অক্ষম রোগীর পক্ষে সূক্ষ্ম-কারীগণ কর্তৃক যথাসম্ভব শৌচের ব্যবস্থা কর্তব্য। কারণ শৌচ কার্যে রোগ আরোগ্য পক্ষেও সাহায্য হয়। শৌচাচার বিহীন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ক্ষুব্ধতা ধারণ হয় বলিয়া সকল কার্যই নিষ্ফল হয়। এই নিমিত্ত স্বাস্থ্যকারিগণ বস্ত্রের সহিত শৌচাচার প্রতিপালন করিবেন। বাহ ও অভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুইপ্রকার।

মৃত্তিকা এবং জলদ্বারা বাহ্য শৌচ আর মনো-  
ভাব শুদ্ধি দ্বারা অন্তর শৌচ সম্পন্ন হয়।  
পর্যন্তপ্রমাণ মৃত্তিকা বা বহু পবিত্রাণ গন্ধার  
দ্বারা মৃত্যুকাল পর্যন্ত, বারবার স্নাত হইলেও  
মনোভাবহুইবাঞ্ছিত শুদ্ধ হয় না। এক্ষণে  
মনোভাব শুদ্ধির অত্যন্ত আবশ্যক। বাহ্য  
শৌচাদি দ্বারা নিশ্চয় ও পবিত্র হইয়াছি  
জ্ঞানকরতঃ শ্রীবিষ্ণু পবনগদ স্রবণ করিলেই  
মনোভাব শুদ্ধি হইয়া থাকে। এক্ষণে শৌচাদির  
পরে আচমনপূর্বক শুদ্ধ হইলাম জ্ঞানে বিষ্ণু  
স্রবণ করিবে। যেখানে শৌচকৃত হইবে  
পরিমিত জলদ্বারা সে স্থানে শোধন  
করিবে। নতুবা শৌচকৃত অপবিত্র স্থানে  
রৌপ্যবর্ণ জমিগা ভাবী অমঙ্গলের কারণ হয়।  
একত্র যে ব্যক্তি এইস্থান শোধন না করে তাহার  
শৌচ সিদ্ধি হয় না।

শৌচানন্তর গোময় বা মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ  
জন্ত পাত্র মার্জন করিয়া পূর্ববৎ আচমনপূর্বক  
সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নিকে যথাসম্ভব দর্শন করিবে।  
এবং পূর্ববৎ বিষ্ণু স্রবণ করিবে। অনন্তর  
আবার জলপাত্র পবিত্র জল গ্রহণপূর্বক  
পশ্চিমাভিমুখ হইয়া প্রথমে বাম পবে দক্ষিণ  
পাদ প্রক্ষালন করিবে। দৈবকার্যে পূর্ব  
অথবা উত্তর মুখে আর পিতৃকার্যে দক্ষিণ মুখ  
হইয়া উত্তরপে পাদ প্রক্ষালন করা কর্তব্য।  
ইহার প্রত্যেক বাপারের সহিতই শুদ্ধম  
বৈজ্ঞানিক রচনা নিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক্ষণে  
ইহা কেন করিব? উহা কেন করিব না?  
এরূপ 'কেন', উত্তর অন্বেষণ করিয়া এই  
ব্রহ্মচর্যবিহীন বিকৃত মস্তিষ্কে সে সকল  
বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবধারণে অধিকার চক্কো না  
করাই আধুনিক জীবনব্যাপ্য ব্যক্তিগণের

একান্ত কর্তব্য। ত্রিকালদশী স্বাধিগণ লোক  
কল্যাণকর হিন্দুশাস্ত্রে যে অবৈজ্ঞানিক  
নিষ্প্রয়োজনীয় চতুস্তমি বাগে কথা লিখিয়া  
শাস্ত্রের কলবব বৃদ্ধি করেন নাট, এই  
রূপ দৃঢ় বিশ্বাসে আশ্রয় লোকো ভক্তি স্থাপন  
পূর্বক বাহ্য শাস্ত্র শৌচাদির পরে সতদ্র বর্জন  
করাহুসাবে সম্ভবপর তাহা অবশ্য করণীয়।

উক্তক্রমে প্রথমে পাদদ্বয় ও পবে হস্তদ্বয়  
প্রক্ষালনপূর্বক পবিত্র চিহ্নে বিষ্ণু স্রবণ  
করিয়া দম্ভধাবন আরম্ভ করা কর্তব্য।

### দম্ভধাবন।

স্বধবির পূর্ণাঘিহ থাকিলে মানব নিঃশী  
বোগগ্রস্ত হয়। অতএব সমস্ত দম্ভকাঠ চর্ষণ-  
পূর্বক এক একটি করিয়া দম্ভ বিশিষ্টভাবে  
পরিষ্কার করিতে হইবে। যে ব্যক্তির  
পূর্ণাঘিহ চর্ষণকৃত মুখবির, সে পূর্ণ শৌচিত  
এবং কফপিত্ত সমন্বিত কলুষিত হয়। এ  
নিমিত্ত দম্ভধাবন অবশ্য কর্তব্য। বর্তমানকালে  
দম্ভধাবনজন্ত যতপ্রকার ঔষধ বা যুক্তি চূর্ণ  
আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইতেছে, তদপেক্ষা  
সুহৃদ শ্রমের পক্ষে দম্ভকাঠই সর্বোৎকৃষ্ট।  
অবিগণ বহুবিধ দম্ভকাঠের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া-  
ছেন। তাবৎপ্রকাশে উক্ত আছে যে বাদশাস্ত্রী  
দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের দ্বারা সূর্য, সরল  
এতিবিহীন ও অক্ষত দম্ভকাঠ দ্বারা দম্ভধাবন  
করা কর্তব্য। দম্ভকাঠের অগ্রভাগটি কোমল  
কূর্জকাকার (ত্রাসের মত) প্রস্তুত করিয়া  
তদ্বারা দম্ভযেষ্ঠিত বাসে আষাঢ় মাসে  
এমত ভাবে একটি একটি দম্ভ রীতিবোধে বর্ষণ  
পূর্বক পরিষ্কার করিবে।

মধু, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, লবঙ্গ, তৈল,



সৈকবলবণ ও তেজবন্ধ, চূর্ণ দ্বারা দন্তকাঠের  
অশ্রুতাগ অবচূর্ণিত করিয়া প্রত্যহ দন্ত শোধন  
করিবে। তজ্জন্তু নিম্নলিখিত দণ্ডকাঠ সকল  
প্রসিদ্ধ।

মধুর-রস কাঠের মধ্যে মৌগকাঠ প্রশস্ত,  
কটু রসযুক্ত কাঠের মধ্যে করঞ্জ, তিক্ত রস-  
যুক্ত কাঠের মধ্যে নিম্ব ও কষায় রসযুক্ত  
কাঠের মধ্যে খদির কাঠ প্রশস্ত। একত্বিন্ন  
কাল ও দোষ এবং প্রকৃতি অনুসারে যেহলে  
যে রূপ রসবীৰ্য্য হিতকর তৎস্থলে সেইরূপ  
ঔষধিবিধি কাঠ দ্বারা দস্তধাবন করিবে।  
এইরূপে দস্তধাবন করিলে মুখের বিরসতা, দস্ত  
বা জিহ্বার বোগসমূহ অথবা যে কোন মুখ-  
রোগ উৎপন্ন হইতে পারিবে না, এতদ্বিন্ন মুখের  
কুচি, নির্মলতা এবং লঘুতা উৎপন্ন হইবে।

আকন্দ কাঠ দ্বারা দস্তধাবন করিলে  
বীৰ্য্যবান হয়, বট কাঠ দ্বারা দস্তধাবনে দেহের  
কান্তি, করঞ্জ কাঠের দস্তধাবনে জলভা,  
পাকুর কাঠ দ্বারা দস্তধাবনে অৰ্থ সম্পত্তি  
বর্দ্ধন, বদরী কাঠ দ্বারা দস্তধাবনে মধুর স্বাদ,  
খদিরকাঠ দ্বারা দস্তধাবনে মুখের স্বগন্ধি,  
বিল্বকাঠের দস্তধাবনে অতুল ধনবান, যজ্ঞ  
ডুমুরের দস্তধাবনে বাক্‌সিকি, আত্মকাঠের  
দস্তধাবনে নিরোগী, কদম্ব কাঠের দস্তধাবনে  
ধারণশক্তি ও মেধা, চম্পক বৃক্ষের দস্তধাবনে  
দৃঢ়বর্তি, শিরীষ বৃক্ষের দস্তধাবনে বীৰ্ত্তি,  
সৌভাগ্য ও পরমায়ু বৃদ্ধি ও আরোগ্যদেহ,  
আপাঙ্গ দ্বারা দস্তধাবনে ধারণশক্তি মেধা ও  
বুদ্ধি এবং সুস্বরলাভ, দাড়িম্ব, অর্জুন ও কুটজ  
বৃক্ষের দস্তধাবনে সেই সৌন্দর্য্য, স্নাতীপুল্প  
তগরপুল্প ও মান্দারপুল্পের কাঠের দস্তধাবনে  
দুঃখপন্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে।

### নিষিদ্ধ দস্তকাঠ।

গুবাক, তাল, হেতাল, কেতকী, বৃহত্ত্বর্ণ,  
খজ্ব ও নারিকেল এই সাত প্রকার বৃক্ষকে  
তৃণরাজ বলে। ইহাদের যে কোনটির দ্বারা  
দস্তধাবনে চণ্ডাল-বোনি প্রাপ্ত হইতে হয়।

### দস্তধাবনের অযোগ্য ব্যক্তি।

গলরোগী, তালু রোগী, ওষ্ঠ বা জিহ্বা-  
রোগী, দস্ত ও মুখফত রোগী, এবং মুখশোধ  
রোগী দস্তধাবন করিবে না। এতদ্বিন্ন যে  
ব্যক্তি হৃর্ষল, ও বাহার ভুক্তদ্রব্য পরিপাক  
হয় নাট, তাহাদের পক্ষে আর শাস, কাশ,  
বমি, হিকা ও মূর্চ্ছা এই সকল রোগাক্রান্ত  
ব্যক্তির পক্ষে এবং মদরোগ, গিরোরোগী এবং  
পিপাসিত ও শ্রান্ত, এবং মস্তপানে ক্রান্ত  
ব্যক্তির পক্ষেও অর্দিত রোগে, কর্ণশূল,  
নেত্ররোগে, নবজরে এবং ক্রোধে কদাচ  
দস্তকাঠ ব্যবহার করিবে না।

কেবল সুস্থব্যক্তি উক্তপ্রকারে যে কোন  
হিতকর কাঠদ্বারা দস্তগুলি পরিষ্কার করিয়া  
লইয়া জলদ্বারা মুখ ধৌতকরতঃ জিহ্বা নির্লেখন  
করিবে।

### • জিহ্বা নির্লেখন

সুবর্ণ, রোপ্য বা তাম্র নির্মিত অথবা  
দস্তধাবন যোগ্য কোমলতর কাঠ চিরিয়া  
তদ্বারা কিবা কোন কোমল, নিক্ত জিব ছোলা  
প্রস্তুত করিয়া ওদ্বারা ধীরে ধীরে জিহ্বা  
নির্লেখন করিলে জিহ্বার মল, বিরসতা,  
দুর্গন্ধ ও লজ্জতা বিনষ্ট হয়।

দস্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখনান্তর শীতল  
ও পরিষ্কার জল দ্বারা বারংবার গণ্ডু ধারণ  
ও কুলকুচা করিয়া মুখবিবর সুন্দর রূপে

পরিষ্কার করিলে, কফ, তৃষ্ণা ও মুখগত মল নিবারিত হইয়া মুখবিবর বিশোধিত হওয়ায় দেহ স্বাস্থ্যবান হইয়া থাকে। ঈষৎ জলের গুণ্য ধারণ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলে কফ, অকটি, মুখগত মল ও জিহ্বা এবং দন্তের জড়তা বিনষ্ট এবং মুখের গুণ্য সম্পাদন হয়। কিন্তু বিষ, মূর্ছা ও মদাত্মক রাজস্বা এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি যে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি গুণ্য ধারণ করিবে না। উৎকৃষ্ট চক্ষু বা কুপিত মলমুক্ত, ক্ষীণ, এবং রক্ত ব্যক্তির পক্ষেও উচ্চ জলের গুণ্য ধারণ প্রশস্ত নহে।

উক্তরূপে মুখ প্রক্ষালন করিয়া পরে যথাসাধ্য মুখপূর্ণ করিয়া জল গ্রহণ করিতঃ মুখবন্ধ করিয়া চক্ষুতে কুড়ি বার জলের ঝাঁপটা দিতে হয়। ইছা দ্বারা চক্ষুর জ্যোতিঃ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইছাই যোগীগণের অভিপ্রায়, তাঁহারা আবার একপঙ বেলিয়া থাকেন যেন মল বা মূত্রত্যাগকালীন যদি উভয় পাট দস্ত দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া দাঁতে দাঁতে সংযুক্ত অবস্থায় ত্যাগ শেষ করা যায়, তাহাতে অমূল্য কাল পর্যন্ত দস্ত স্থায়ী ও নীরোপ থাকে।

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদ সম্মেলন।— আগামী বর্ষে নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদ সম্মেলনের আধিবেশন বোম্বে নগরীতে হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

আয়ুর্বেদ কলেজ।—সামান্যের পাঠকগণ জানিয়া সুখী হইবেন যে অষ্টম আয়ুর্বেদ বিভাগ বা আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজটি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এবার এই কলেজের ৫ম বর্ষ আরম্ভ হইবে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্বেদের পুনরুন্নতি কমেই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত কতগুলি আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সকলেই ইহার শিক্ষা প্রণালীর প্রাণপ্রাণ করিতেছেন। প্রকৃত চিকিৎসক হইতে হইলে শল্য চিকিৎসার অভিজ্ঞতা অর্জন যে একান্ত কর্তব্য এই কলেজের পরিচালকগণ তাহারই প্রতি সর্বপ্রথম

শল্য রাখিয়া এই কলেজের শিল্পী প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উৎসাহ প্রদান।—এই কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশেষ সম্ভট হইয়া ছাত্রস্বনকে উৎসাহ প্রদানের জন্য মাননীয় কর্ণেল ব্রাউন পূর্ণ এক বৎসর কালের জন্য একটি টাকার ফলারসিপ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীমামপুরের মিঃ ডিক্রুজ এই কলেজের প্রথম ছাত্রকে একটি সুবর্ণ পদক দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা তিন আরও অনেকগুলি ফলারসিপ এবং মেডেল এই কলেজের কর্তৃপক্ষগণ প্রদান করিবেন। যে সকল মহোদয় এই কলেজের উন্নতি কমে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের সকল অধিবাসীরই নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্থ, কারণ এই অষ্টম আয়ুর্বেদ বিভাগ বা আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজটিই একমাত্র বাঙ্গালাদেশে আয়ুর্বেদের যুগ আবার ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৪র্থ বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৭—শ্রাবণ।

১১শ সংখ্যা।

## শিশুপালন।

(পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[ শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী ]

—::—

শিশু বয়স, পবিত্রতা সম্বন্ধে রক্ষা করিবে। তাহাদের সম্বন্ধে কখনো কাহারো নিন্দা করিবে না। অনেক সময় পিতামাতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠেরা বালকবালিকাদের সম্বন্ধে সমাজের অথবা দেশের নেতাদের নিন্দাবাদ করেন। ইহাতে তাহাদের প্রাণে প্রত্যাশিত আশা এবং সর্বদাই বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সমালোচনাতে ও পরচর্চাতে সময় ব্যয় করে। ইহাতে তাহাদের চরিত্র বিকৃত হইয়া যায়। কেবল অপরের দোষের সমালোচনা করিতে করিতে নিজের চরিত্রের উন্নতি সাধনের দিক্‌ মন থাকে না, চরিত্রের অবনতি ঘটে এবং যে দোষের সমালোচনা করে—সেই দোষ নিজের চরিত্রে আসে। স্বতাব্দে “নিষুকে”

হইয়া যায়। প্রত্যাশিত চরিত্রের অবনতির মূল। অতএব মাতৃপিতা সতর্ক হইবেন যেন সন্তানদের প্রাণে প্রত্যাশিততা না আসে। প্রজা চরিত্রের উন্নতির মূল। প্রজাভাজনের প্রতি সন্তানদের পরিপূর্ণ প্রজা বাহাতে থাকে, পিতামাতা সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সন্তানগণ কেবল অপরের গুণ দেখিতে বাহাতে অভ্যস্ত হয় সেই বস্তু হইবে। পরের গুণ দেখিতে দেখিতে চরিত্র উন্নত হয়, প্রাণ মহৎ হয়। সন্তানগণকে এই শিক্ষা দিবে যে প্রত্যেক মানুষেরই কোন না কোন গুণ আছে। তাহা হইলে তাহাদের দৃষ্টি উন্নত হইবে, প্রত্যেক মানুষের নিজের গুণ দেখিতে দেখিতে মানুষের কল্যাণ হইবে।

সন্তানকে শিক্ষা দিবে। বর্তমানকালের যুবকদের উচ্চ স্বভাব, বয়োপ্রাপ্তদের শিক্ষা এবং গুরুজনকে অশ্রদ্ধা দেখিয়া প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-প্রধান যুগে সন্তানদের ভক্তিপ্রবণ কৰা কঠিন। কিন্তু বর্তমান যুগের নবীন মাতাকে স্বাধীনতা ও শ্রদ্ধার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া সন্তানকে শিক্ষা দিতে হইবে।

শিশুকে কখনো মিথ্যা ভয় দেখাইবে না।

“ঐ জুজু আসছে, ঐ ভূতে খেলে।”—বলিয়া

শিশুকে মিথ্যা ভয় দেখাইলে শিশুর অন্তঃ

অনিষ্ট সাধিত হয়। ‘শিশুর স্বভাব তীর,

কাঁপুক তর; স্নেহ হঠাৎ ভয় পাঠায় মস্তিষ্কের

বিকৃতি ঘটে। কিংবা চিরজীবনের জন্ম

স্নায়বিকদোষের রোগ জন্মিতে পারে। আমা-

দের দেশে সর্বদাষ্ট দেখিতে পাউ যে, শিশু

হয়ত দুধ খাটিতেছে না কিংবা কোন অস্বাস্থ্য

আবস্থায় ধরিতাছে অথবা মাতার অস্বাস্থ্য হইয়া

হুটামি করিতেছে, তখন মা তাহাকে এই

বলিয়া নিরস্ত করেন ‘ঐ জুজু এসে’ অথবা

‘অন্ধকারে বাসনে, ভূতে পড়েন’। এই

অবস্থা ভয় দেখান দ্বারা শিশুর চরিত্র গঠনের

মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। এক সময়ে একটি

শিশুর বালাকালে সে হুটামি করিলে তাহার

মাতা তাহাকে নিকটস্থ একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ

দেখাইয়া এই বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে ‘ঐ

বৃক্ষে ভূত আছে, হুটামি করিলেই তোমাকে

ধরিয়ে’। শিশু কখনো ঐ বৃক্ষের নিকটে

জান্ন বাইত না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ

বৃক্ষের গতি তাহার একটা ভীষণভাব মনে

পকয় হইয়া যায়। যৌবনে এই শিশু একজন

বৃদ্ধ বোকা হয় এবং প্রৌঢ়কালে পেনাপতির

পদ লাভ করেন। বহু যুদ্ধ জয়ের পর, বোবের

যোগ্য প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া তিনি এক

দিন মাতৃ সন্দর্শনের জন্ত গৃহে যাত্রা করিলেন।

বহুদিনের পর, বহু বিপদ কাটাইয়া পুত্র গৃহে

আসিতেছে বলিয়া বৃদ্ধা মাতা আকুল প্রাণে

তাহার আগ-ন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এব

পুত্র গৃহেবৈ নিকটে আসিয়া সেই বৃক্ষ গায়ে

উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যার আঁধার

চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে। আর চুট

পা অগ্নসর হঠাৎই পুত্র মাতার কপোলে

ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হঠাৎ তাহার ঐ বৃক্ষের

উপবে নগর পড়িল। আর অমনি বাল্যের

সেই ভয় মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি যের

দেখিলেন যে, বৃক্ষের বন শাখা প্রশাখা ভিতর

হইতে একটি প্রকাণ্ড বিঘটিকার মত্বয় দুই

খালান করিয়া দুই বিশাল বাহু প্রসারিত

পূর্বেক তাহাকে ধরিতে আসিতেছেন। আর

অমনি তিনি মুক্তি হইয়া পড়িয়া গেলেন।

সে মুক্তি আর ভাঙ্গিল না। এত বড় বীর

হইয়াও তিনি বাল্য শিক্ষার প্রভাব হইতে

আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহা

শিক্ষার প্রভাব এইরূপ। সংরক্ষা নাও

কিংবা অসৎ শিক্ষা দাও, যে ভাবেবৈ শিক্ষা

দাও না কেন, তাহা একবারে পাথরে খোদাই

হইয়া যাইবে। প্রত্যেক মাতা ইহা উত্তমরূপে

উপলব্ধি করিয়া সন্তানের প্রাণে স্নেহ, মহৎ,

উন্নত, উদার, ধর্মপূর্ণ, সাহস ও বীর্য পূর্ণ

ভাব মুদ্রিত করিয়া দিবেন।

সন্তান অপরাধ করিলে তাহার শাস্তি

বরূপ তাহাকে কখনো তাহার হইতে বঞ্চিত

করিয়া রাখিবে না কিংবা কোন অন্ধকার

মরে বন্ধ করিয়া রাখিবে না। ইহাতে শিশু

অগ্রহু হইয়া পড়িতে পারে, কিংবা অন্ধকারে  
ইঠাৎ ভয় পাইয়া আত্মদৌর্বল্য রোগে আক্রান্ত  
হইতে পারে। তোমার নিম্নের temper  
উপর যেন সজ্ঞানেব শাস্তি নির্ভর না করে।  
আজ যে দোষ করিয়া শিশু কোন শাস্তি  
পাইল না, কারণ তোমার চিত্ত আজ প্রসন্ন,  
ফলে তোমার 'চিত্ত' কোন কারণে অগ্রসর  
বকিয়া শিশু সেই দোষের জন্য যদি শাস্তি পায়  
তবে তাহাতে তাকে কুশিক্ষা হইবে। শিশু  
বুদ্ধিতে পারিবে না যে, সে কখন অজ্ঞায়  
করিতেছে আর কখন কবিতাহে না। বিশেষ  
কোন গুরুতর অপরাধ ব্যতীত সন্তানকে  
কখনো প্রহার করিবে না। অপরাধ কবিলে  
তাকে ধমক দিয়া কিংবা তাহার প্রিয় বস্তু  
কাড়িয়া লইয়া শাস্তি দিলেই যথেষ্ট শাসন  
করা হয়। কথায় কথায় প্রহার করিলে শিশু  
আর প্রহারকে গ্রাহ্য করিবে না, তখন আর  
সে কোন শাস্তিকেই ভয় করিবে না।

শৈশবে যে অভ্যাস হয়, আজীবন তাহা  
ধারিয়া যায়। অতএব মাতা শৈশব হইতেই  
শিশুকে সুন্দর সদ অভ্যাসে অভ্যস্ত করাইবেন  
'Habit is second nature' সদ অভ্যাস  
হইলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কর্তব্য  
গুলিও অতি সহজেই সম্পাদন করিতে  
পারিবে। তাহাকে ভাল করিতে কোনট  
ক্লেশ পাইতে হইবে না।

মাতা তাঁহার পুত্রকে শৈশব হইতেই  
তাহার ভয়ীকে ভালবাসিতে ও সন্মান করিতে  
শিখাইবেন। বড় ভয়ী হইলে সন্মান ও শ্রদ্ধা  
করিবে, ছোট ভয়ীরা গারে কখনো হাত  
তুলিবে না, তাহাকে বজ্র করিবে ও ভাল-  
বাসিবে। ছোট ভয়ী হয়ত তাহারি কোন

একটি জিনিস লইবার জন্য কিংবা তাহার  
হাতের খাবার খাইবার জন্য কাঁদিতেছে,  
মননো তখন পুত্র বলিবেন, "তোমার  
ছোট পোন কাঁদছে, ওকে দাও। বোনকে  
আদর করবে হয়"। পুত্র সে আদেশ পালন  
করিল কিনা দেখিবেন। গৃহে পুত্র যেন  
সর্বদা দেখে যে, মাতাই সেই গৃহের একমাত্র  
রাণী, পিতাও তাঁহার ইচ্ছা মানিয়া চলেন।  
তাহার যেমন আদর ভয়ীদিগেরও ঠিক তেমনি  
আদর। সে যেমন শিক্ষা পাইতেছে ভয়ীরাও  
ঠিক তেমনি শিক্ষা পাইতেছে। সে যেমন  
গৃহে ব্যবহার পাইতেছে, ভয়ীরাও তেমনি  
ব্যবহার পাইতেছে। শৈশবে গৃহের এইরূপ  
শিক্ষা হইতেই বয়োবৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সে  
বাহিরের সমগ্র মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে  
শিখিবে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে  
যুবকগণের মধ্যে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার  
অভাব দেখিয়া মর্মান্বিত হইতে হয়। ইহা  
তাহাদের গৃহশিক্ষার ত্রুটি। গৃহে নারী  
জাতির অসন্মান দেখিয়া দেখিয়া তাহার  
নারীর প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। বর্তমান যুগের  
নবীন মাতার উপর তাঁহার পুত্রদিগকে  
নারীজাতির শ্রদ্ধাশীল করিবার গুরুভার  
পড়িয়াছে। তাহারাই এই কর্তব্য পালন  
করিয়া দেশের কলঙ্ক দূর করুন।

গৃহই চরিত্র গঠনের সর্বপ্রধান এবং  
একমাত্র স্থল। মাতা সেই গৃহের সর্বমন্ত্রী  
কর্তা ও শিক্ষয়িত্রী। তিনি যেমন ভাবে গৃহ  
গড়িবেন, সন্তান সতত তেমনি হইবে। যে  
গৃহ পেম ও কর্তব্যপালনে পূর্ণ, সেখানে জ্বর  
ও মতিভ্রম—বিচার পূর্বক কার্য করে, যেখানে  
প্রাতিহিক জীবন ধর্মতাব ও সাধুতার পূর্ণ,

বেশানকার শাসন সদয়তাপূর্ণ, প্রেমময় ও  
জ্ঞানসম্বল, সেই গৃহ হইতে যে সব সুস্থ, সবল,  
কর্মঠ, ধর্মভীক পুরুষ ও নারী উদ্ভূত  
হইবে, তাহারা নির্ভেঁরা জীবন ক্ষেত্রে সোজা  
সরল পথে চকিয়া আপনাকে সংযত রাখিয়া  
যেমন সুখী হইবে, তেমনি সমাজের ও  
দেশেরও মঙ্গল সাধন করিবে।

শৈশব হইতে সন্তান সন্ততিদিগকে সর্বদা  
সুন্দর চিত্র, তানলয় সমন্বিত সুমিষ্ট সঙ্গীত,  
সুন্দর পুষ্প, মহৎ লোকের ধর্মভাব পূর্ণ  
প্রাকৃতি, গৃহের পবিত্র বাতাসের মধ্যে  
রাখিবে। তাহা হইলে একদিকে তাহাদের  
দৌর্দর্ঘ্য জ্ঞান প্রাক্টিত হইবে এবং মনও  
উন্নত, পবিত্র, এবং মহৎভাবে পূর্ণ হইবে।

## শিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্য।

[ কবিরাজ শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত কাকতীর্থ-কবিভূষণ ]

আমরা পরম কাল্পনিক প্রমোদ্যের অবাব-  
কৃপায় তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ মান হুল্লভ মানব জনম  
লাভ করিয়াছি। জানিনা, কত যুগযুগান্তর,  
কত সন্তান জনস্রোত করিয়া কত কৃচ্ছ্রতম  
সাধনার ফলে সর্বাঙ্গজিত, সমস্ত ব্যক্তি  
কলদায়ী এই জীবনকে অধিকার করিতে  
সক্ষম হইয়াছি, এই জীবনেই মনঃকণ্ঠে অমরত্ব  
লাভ করতঃ জীব অক্ষয় অসীম ব্রহ্মানন্দ সুখা-  
পান করিতে অধিকাংশী চয়। অপরাপর  
জীবগণ আহাৰ বিহার নিদ্রা প্রভৃতি জীবন  
ব্যতীর উপযোগী স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার সমা-  
ধানের জীবন পর্যাবসিত কবে এবং ঐ সকল  
নির্দিষ্ট বৃত্তি সম্পাদন করিতে পারিলেই  
নিজেকে কৃতার্থ মনে করতঃ তৃপ্তিপূর্ণ করে।  
কিন্তু মানব উচ্চাঙ্গে পরিতৃপ্ত নহে। প্রাণ-  
রক্ষার জন্য অশ্রু করণীয় বলিয়াই আমরা  
ঐ সমস্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকি এবং ঐ  
প্রবৃত্তিও নির্দিষ্ট সাময়িক মাত্র। জ্ঞান ও  
বিজ্ঞানের পরিণামে আত্মোৎকর্ষলাভই  
মানব জীবনের সার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সম্পাদন

বিষয় যিনি যত্নপূর অগ্রসর হইতে পারেন  
তিনিই সেই পরিমাণে প্রকৃত মনুষ্যত্বের  
গৌরব অর্জন করিতে সমর্থ হন। বড়তঃ পোত  
কবি বর্ণিয়াছেন—

“কন্মেদং একাংগং নীতাং ভবভোগোপলিপ্সা।  
কাতমুশোন বিজীতো হস্তচিত্তানবিশ্রয়া” ॥

সাংসারিক ভোগবিশ্রাসে মত্ত থাকিয়া  
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মোৎকর্ষ লাভ  
করিতে না পারিলে মনুষ্যের পক্ষে এতদপেক্ষা  
অধিক অহুতাপের বিষয় আর কিছুই হইতে  
পারে না। অমুণ্য রত্ন বিনিময়ে কাঁচের  
বেগুন কোন মূর্থ কিনিতে ইচ্ছা করে? যে  
জীবন রত্নের সমাহারে বাহুব অবরুদ্ধ প্রাপ্ত  
হইয়া অনন্ত তৃপ্তিময় ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত লাভ  
করিতে পারেন অথবা জড় জগতের বিচিত্র  
ভৌতিক ক্রিয়া কলাপের বিষয়কর কার্য্য-  
কারণ নির্ণয় ও নানাবিধ রহস্যের নব নব  
তথ্যের উদ্ভাবন করতঃ অনির্লভনীয় ঐতি-  
পীযুষপানে বিভোর হইয়া কলকল করিয়া জীবনকে

চিরস্থায়ী চিরকল্যাণকর রূপে পরিণত  
করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বহু জন্মাত্মীয় ভলভ  
সাধনার ফল স্বরূপ মানব জন্ম লাভ করিয়া  
কোন মূৰ্খ তাহাকে বার্ষ ভোগবিলাস চরি-  
ত্রার্থতার জন্য অপব্যয়িত করিতে ইচ্ছাকরে ?

সাধারণতঃ জীবনাত্মই দুঃখের শাস্তি ও  
সুখপ্রাপ্তির উত্তীর্ণ লালসাবিন্দ, বস্তুরঃ এতদুভয়  
ব্যতীত কাহারও ক্রোধান লক্ষ্য 'আছে' বলিয়া  
অসুমান করা যায় না; তবে কতি অথবা বোধ  
শক্তির তারতম্য অনুসারে সুখ বা দুঃখ সম্বন্ধে  
সত্যমত থাকিতে পারে। যাহা ব্যক্তি বিশেষে  
সুখকর, হয় ত তাহা অপরের পক্ষে ক্লেশ বা  
বিরক্তিকরক। কিন্তু এ দুক্তির অনুসরণ  
দ্বারা সুখ বা দুঃখের স্বরূপ নির্ণয় হইতে পারে  
না। তুমি আমি বা অপর কোন ব্যক্তি কু  
আসক্তির দোষে অসদাচরণে ফণিক সুখ বোধ  
করিলেই উহা সুখ শব্দের প্রকৃত প্রাপ্যতা  
হইতে পারে না। যদি তাদৃশ সুখ সম্বোধন  
ফলে উত্তরকালে কোন দুঃখ অথবা কার্য্যহানি  
ঘটে ( অর্থাৎ জীবনের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য সাধনের  
পক্ষে কল্যাণি অন্তরায় স্বরূপ হয় ) তবে  
এতদৃশ সুখ—সুখ নহে, প্রত্যুত দুঃখ বলিয়াই  
পরিগণিত। ফলতঃ দুঃখ সম্পর্ক শূন্য জন্মের  
তৃপ্তিকেই সুখ নামে অতর্হিত করা বাইতে  
পারে। এই সুখই প্রকৃত পুরুষার্থ। ইহার  
জন্মই মানব সংসারযাত্রার ফলে কত ধর্ম্ম, কর্ম্ম,  
জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেছেন। নিজ  
কৃতকর্ম্ম সাহায্যে আত্মতৃপ্ত পূর্ব্বই লগ্নে  
ধন্যবাদী, সর্ব্বজন প্রশংসিত ও সমাদৃত হইয়া  
থাকেন।

এই প্রকার আত্মতৃপ্তিতে বার্ষপরতার  
লেশও থাকিতে পারে না, কেননা উহা নিজের

অপেক্ষা দেশের ও সমাজেবই অধিক কল্যাণ-  
কর। একজন আদর্শ স্থানীয় মহাপুরুষের  
আবির্ভাবে একটা সমগ্র দেশ কত উন্নতি ও  
গৌরব প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত  
ভাবতে বিবল নহে। পরিতাপের বিষয়  
আমরা বহুদিন হইতে সদাচার-পথচ্যুত হইয়া  
ক্রেমেই অধঃপতিত হইতেছি। কর্তব্যবিধি-  
অকর্তব্য বিধানের রত হইয়া তক্ষণিত বিষময়-  
পরিণাম ফলাভোগ করিতেছি। শিক্ষাক্রমে  
কুশিক্ষা সম্বৃতমোহে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিশ্বাস  
হইতেছি। গম্ভব্যপথক্রমে কটেকাকৌর্ণ  
বিপথে চলিত হইয়া বিপন্ন হইতেছি। আমাদের  
যাচা কিছু গৌরবের, সুখের, গর্ব্বের, ভয়-  
ছিল, অজ্ঞতাংশে সে সমস্ত পদদলিত করিয়া  
পর্ব্বপদেহন বৃত্তিকেই জীবনের সার ও  
চরম লক্ষ্য স্থিতি করিয়াছি।

আমাদের বর্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা  
করিলে সমগ্র সভ্যজগতই অধঃপাতের  
চরমসীমা ও মনুষ্যজন্মের অস্বাভাবিক বিপর্য্য  
দেখিয়া বিশ্ববশে ক্লান্ত হইবেন। আমরা  
পরের সত্যের সম্ভাবন, পর্ব্বব শক্তিতে  
শক্তিমান, পরের কর্তব্য সম্পাদনে কর্তব্য  
পরায়ণ, এক কথায় আমাদের নিজস্ব বা  
নিজস্ব বলিয়া গৌরব দেখাইবার কিছুই নাই।  
কলের পুতুলের জায় বস্তু চালিত হইয়া  
চালকের অভিপ্রায় অনুসারে কখন হাসিতেছি,  
কখন নাচিতেছি, কখন কাঁদিতেছি। আবার  
চালকের ইচ্ছাক্রমে কখনও বা নিজের নিস্পন্দ-  
ভাবে অকর্ম্মণ্য হর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া  
জীবন সার্থক করিতেছি! অধিক কি বলিব,  
মান, আহা, বেষ, ভূষা, চলন, হস্ত, ভাষ্য  
উপবেশনাদি ব্যাপারেও আমাদের স্বাভাবিক

দ্বীভূত হইয়াছে। জানিনা, এত জীষণ কাল-  
প্রবাহ আমাদেরকে আবণ্ড কতকাল কত  
অধঃপাতেব দিকে চালিত করিবে? অথবা  
কোনও অলৌকিক প্রভাব সম্পন্ন মহাপুরুষের  
হস্তবশীত আদেশে গোপন হইয়া আমরা  
পুনর্বার নির্জীব নিভৃত বুদ্ধিতে সমর্থ হইব।

এই সাধজনীন অবনতি মস্তান্তর যুক্তি  
ক্রমশঃই আমাদেরকে অধঃপাতিত করিতেছে  
অথচ আমরা এতট মৌহাক্ষর 'যে নিজের  
চূর্ণকিত্ব জন্ম পদে পরে লাভিত হইয়াও  
নিজেকে শিক্ষিত ও উন্নত বলিয়া স্পর্ধা  
কবিত্তে দ্বিধা বোধ করিতেছি না। বিগত  
~~হইয়া~~ মত সমবের জন্ম আজ আমরা  
কি উদ্দেশ্যপূর্ণ তাহা সর্বসাধারণের মস্ত  
মস্ত্রে অনুভব করিতেছেন। এই সমব যদি  
আর কিছুকাল থাকিত তাহা হইলে বোধ  
হয় অচিৎকালে সমগ্র ভারতবাসী হাটাকাব  
উপস্থিত হইত। অথচ এই বুদ্ধ উপলক্ষেই  
আজ জাপান ব্যবসা বাণিজ্যের নাশকরণ  
প্রাপ্ত হইয়া নানা উপায়ে লুপ্ত অর্থ সঞ্চয়  
করিয়া দেশকে ধনশালী এবং সর্বাংশে  
শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে। যে স্ববোগ আজ  
জাপান পাইয়াছে আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত  
কেন? কে আমাদেরকে নিজদেহেব—নিজ-  
সমাজের স্বপনাক্ষিতা বিধানের গণে বাধা  
দিতেছে? পাঠক! একটু চিন্তা করিলেই এই  
প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজেই করিতে পারেন।  
আমরা নিজজাতীয়তার গোবর পদদলিত  
করিয়া পরকীয় সামান্যিকতা স্রোতে গাত্র  
ভাসাইয়া দিয়াছি। যাহা নিজস্ব ছিল তাহা  
পরিহায়া করিয়াছি, অথচ যাহা বাঁচ বলিয়া  
চরশা করিয়াছিলাম তাহাও পাইতেছিলাম,

সুতরাং এ উদ্দেশ্য আমাদের স্বরূতবাদি।  
নীতিবিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়াছেন "যেপ্রবাসি পঠি-  
তাজ্য অপ্রবাসি নিষেধেত প্রবাসি তজ্ঞ নম্রাণ্ড  
অপ্রবাস্তমেবহি"। তাই এখন আমরা আমা-  
দের নিশ্চিত অনিশ্চিত যা কিছু সম্পত্তি ছিল  
সমস্তই হারাতিয়া এখন অতীত বিষয়েব বৃথা  
অনুশোচনায় অমৃতপ্ত হইতেছি। কিন্তু এই  
অনুতাপ যদি আন্তরিক হইত, যদি আমরা  
অমৃতপ্ত আত্মাকে স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত  
স্বরূপে গ্রহণ কবিতাম, তবে বোধ হয় উদ্ধার  
বৃথা হইত না। অতীত এইদিনে কোন একটা  
প্রতিবিধানের পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ  
হইতাম। অভাবের তাড়নায় মর্ধ্যাহ্ন হইয়া  
দেশেব, সমাজেব, আত্মীয়-স্বজনেব উদ্দেশ্য  
প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা সময়ে সময়ে চপলার  
চমকের মত প্রতিবিধানকল্পে উদ্ভুদ্ধ হই বটে,  
কিন্তু যোগ্যতার অভাবে সে উদ্দেশ্যন উন্নতের  
প্রলাপবৎ কার্যকারী হয় না। শিক্ষাবিপর্ষায়ে  
আমরা দৈনিক আচাৰ, ব্যবহাৰ, রীতি,  
নীতি, সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছি, চিবপ্রচলিত  
কঠব্যপথ ভ্রষ্ট হইয়া অপথে দিগ্ভ্রাস্ত ব্যক্তির  
জায় গুরিতেছি, অথচ আয়ত্তাভি দ্বিষ্টে  
পারিতেছি না। পান্চাত্য উন্নত প্রণালীর  
শিক্ষায় আমরা নিজেকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত  
মনে করিতেছি, কেহ বৈজ্ঞানিক হইয়া  
রহস্তমর অভিনব প্রাকৃতিক-তত্ত্বের আবিষ্কার  
দ্বারা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করিতেছি, কেহ বা  
ব্যবহারাজীবীভাবে স্বকীয় প্রতিভার  
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বণিক ও অগণিত  
ধনশালী হইতেছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন,  
গণিত, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা শাস্ত্রেই  
আমাদের দিন দিন অধিকার বাড়িতেছে,



এবং তাহাতে অর্থ সমাগমেও সুযোগ ঘটিতেছে। কিন্তু এই শিক্ষাগোবব বা ধন-সমাগমে আমাদের দেশের অথবা সমাজের প্রকৃত উপকার অথবা অপকার সাধিত হইতেছে তাহাই এখন পর্যালোচনার বিষয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধিত প্রসারে দিন দিন আমাদের প্রকৃতকমে সঞ্চিত অর্থায়ন-ভাষ্য লোপ পাইতেছে। সমানতম সর্বসম্পত্তি মণ্ডি সংস্কৃত ভাষা আজ কতদূর হইয়া মৃতপ্রায় নীমিত্তে অবশিষ্ট আছে। সেই সিক্ত মণ্ডি মনুষ্যগণের, সিদ্ধান্ত জ্ঞান, ভক্তি, পেম, ক্রিয়াকলাপের শিক্ষাপ্রদানে সমগ্র বিশ্ববাসীর আদর্শ স্থল, বেদ, বেদান্ত, যুগ্ম, পুৰাণ, ভায়, সাংখ্য, পাণ্ডুল্ল, নীমাংসা, জ্যোতিষ, গণিত, কাব্য, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি পবিত্র শাস্ত্রনিচয় আজ আলোচনাভাবে নিপাতোত্তম। আজ আমরা সেক্সপিয়র, মিল্টন রচিত কাব্য অধ্যয়নকবতঃ কালিদাস-ভট্টভূতি প্রভৃতি মহাকাব্যগণের কাব্য সমালোচনা করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আত্মাবমানন দ্বারা কি হইতে পারে? বিজাতীয় শিক্ষা বর্তম উন্নত হইক তাহা কখনই অজ্ঞ জাতির পক্ষে দেশ ও সমাজের গৌরব বর্দ্ধক হয় না। তাহাকে আদর্শ করিয়া শিক্ষিত হওয়া অপ্রাণীয় নহে, কিন্তু তাহার মোহে মগ্ন হইয়া তন্ময় হওয়া নিতান্তই কাপুরুষের লক্ষণ। শিক্ষিত হইয়া নিজেকে ও নিজের সমাজকে, নিজের দেশকে উন্নত কর, অহম্মান দ্বারা আমাদের অগাধ শাস্ত্রসিদ্ধ ইহঁত জ্ঞান বিজ্ঞান রথে ভূষিত হইয়া নিজেকে ও দেশকে সমৃদ্ধ কর, —দেখিবে,

যে শিক্ষার জন্য পরের দ্বারা ভিখারীর মত

ঘুরিতেছে তদপেক্ষা অনেক উন্নত শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের শাস্ত্রে ওপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনার ভাষ্যগতব অনেক চমকপ্রদ ব্যাপার আবিষ্কৃত হইতেছে সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখ এই গবেষণায় যথার্থরূপে দেশের বা সমাজের কি উপকার সাধিত হইতেছে? যদি কিছু হইয়া থাকে তাহাতেই বা আবিষ্কারগণের কোন স্বাধীনতা আছে কি না? ভাবতীয় উপাদান সম্ভার সাহায্যে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া যদি এই আবিষ্কার হইত তবে চিবদিনেই জগৎ ইহা আমাদের একটা সম্পত্তিরূপে উপযোগী হইয়া থাকিত। পবিত্রতার বিষয় আমরা বুদ্ধিমোহে পরকে আপন করিয়া আপনাকে পর করিতেছি। পরের সাহায্য লাভে উত্থান করিব বলিয়া স্বইচ্ছায় খজ সাঞ্জিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু কোন দেশেই কাহারও পরের দ্বারা উদ্ধার হয় না। যদি বাস্তবিক মাতৃভূমির প্রতি অমুরাগ থাকে,—স্বার্থই নিজে, দেশকে, সমাজকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে জাতীয়ভাবে দেশের সেবা করিতে হইবে। তজ্জন্ত পবের ভাষা, রীতি, নীতি প্রভৃতি শিক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু স্বরণ রাখিতে হইবে—তাহা আত্মশিক্ষার উপকরণ মাত্র,—প্রাণ নহে। আমরা বুদ্ধি ব্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষাশ্রোতে অবশ্যভাবে গা ঢালিয়া দিচ্ছি,—পরিণামে কোন্ দশায় উপনীত হইব তাহা চিন্তা করি নাই, সুতরাং অবৈকীর বাহা প্রায়শ তাহাই ভোগ করিতেছি।

ইংরেজ আমাদের রাজা, সুতরাং নানু

কারণে আমরা রাজভাষা শিক্ষায় বাধা।  
 বিচার বিভাগ, ডাক বিভাগ, ব্যবসায় বিভাগ,  
 বাণিজ্য-বিভাগ ভাষাতত্ত্ব বিভাগ প্রভৃতি যে সমস্ত  
 অবলম্বনে দেশীয় সহস্র সহস্র লোকের জীবিকা  
 সম্পন্ন হইতেছে সে সমুদয় স্থলেই ইংরাজী  
 ভাষা প্রচলিত। ইংরাজীভাষা আজ ভাবত-  
 বাসীদের পরস্পর পরিচয়ের সাধারণ  
 ভাষা যতদূর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেও  
 অত্যুক্তি হয় না। এভাবে পরস্পর  
 পরিচয়ের সুবিধা আমরা পূর্বকালে কখনও  
 প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং ইংবেলী শিক্ষা যে  
 দেশবাসীর একান্ত আবশ্যিক তাহা কে  
 অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইংবেলী ভাষা  
 শিখিতে হইলেই যে ইংরেজ হইতে হইবে,  
 দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি পদনশিত করিতে  
 হইবে, এ শিক্ষা অতি দূষণীয়—এই দোষট  
 আজ আমরা সমগ্র পৃথিবীমধ্যে অধ্যাপিত ও  
 পোষণমান বলিয়া অবজ্ঞাত।

তাঁহা বর্জিত হইয়া দেশী ভাষা গণ্য।  
 একবার অগ্রসন্ধানে সেট নিত্যা শাস্ত্রময়  
 সনাতন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নিজেকে ও  
 দেশকে উন্নত করিতে সমর্থ হইত। কিসে  
 এট নিত্যা দাবিদ্রোহ করণ কবল হইতে  
 দ্রবীভূত-পীড়িত দেশকে উদ্ধার করিতে সক্ষম  
 হইত। একদম ঐশানীয়া অবলম্বন করিয়া  
 অথবা সর্দনাশ সাধন করিও না। দেশের  
 জন্ত, সমাজের জন্ত বন্ধপরিকর হও, উন্নত  
 লোকের অগ্রসরণ, পূর্বক জর্জরকে  
 স্বাচ্ছন্দ্য করতঃ কর্তব্যপথে অগ্রসর হও,  
 নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান সময়ে ব্রহ্ম-

চর্যাবলম্বনের বিধি চিরকালই ব্যবস্থিত ছিল,  
 মানস ক্ষেত্র হইতে কণ্টকবৃক্ষরূপ বিষয়ানু-  
 বের উচ্ছেদ করাই ঈদৃশ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।  
 জমীকে উর্বর করিয়া অধিক শস্তোৎপাদক  
 করিতে হইলে যেমন তন্মধ্যস্থ আঁকুনিদি  
 উৎপাদন করিতে হয়, তদনুরূপেও সুপ্রশস্ত ও  
 বিজ্ঞাসম্পন্ন করিতে হইলে তেমনি সংযম-  
 প্রভাবে তন্মধ্যস্থ হইতে বিষয়াস্তর চিত্তা দ্ব  
 করিয়া দিতে হয়। সংযমট শিক্ষার নিদান।  
 ইহা ব্যতীত কোন শিক্ষাই পূর্ণতা প্রাপ্ত  
 হইতে পারে না। সংযম জন্মের একাগ্রতা  
 আনিয়ন করে এবং একনিষ্ঠতায় সত্য ও  
 সম্পূর্ণভাবে শিক্ষণীয় বিষয় অধিকার করিতে  
 সক্ষম হয়।

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে এই সংযমকে  
 সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মগীতের  
 কথা, আজকাল শিক্ষাকালে বরং তাহা  
 বিপরীত ভাবে অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ পায়।  
 রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মসম্বন্ধ, দৈনিক  
 রীতিনীতি দোষগুণের সমালোচনা, ব্যক্তি-  
 গণন-গণনাবণা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি  
 আজকাল ছাত্রদের মানসক্ষেত্রে অটল  
 আসন সংস্থাপন করিয়াছে। প্রাচীনকালে  
 অধ্যয়ন পরিসমাপ্তি পর্যন্ত গুরুগৃহে  
 অবস্থান করিতে হইত। অনন্তমনা হইয়া  
 আচার্য্যের উপদেশ ও আদেশের অগ্রবর্তন  
 করাট শিক্ষার্থীর জীবনযাত্র ছিল, শিষ্যগণ  
 শিক্ষণীয় বিষয় ব্যতিরিক্ত বিষয়াস্তর চিত্তার  
 সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হইত না, কারণ  
 অবশিষ্ট সময়ে আচার্য্যদেবের নিকট বা  
 পরস্পরে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার  
 অতিবাহিত করিতে হইত। কিন্তু এখন

আর ছাত্রদের সে বাধ্যবাধি নিয়ম নাট।  
মাত্র ক্রোড় ভাগ কবিত্তে পারিলেই বালক  
স্বাধীন হইল। সম্পূর্ণ শিক্ষা কালটী যদুচ্ছা-  
ক্রমে সাপন করা বস্ত্র পরিণামে একটা  
বিস্তৃত ক্রিমাকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, ই  
বালক কক্ষক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সে  
হাকিমই হউক, আর বাবিষ্টাবটী হউক বা  
পদগৌরবে বহু বড় শটুদ্বাসনেই আবেশ  
করুক, কিন্তু তাহার শিক্ষার ক্ষেত্রের ক্ষয়  
পূর্বাঞ্চলবর অভাব এ জীবনে আর পূর্ণ  
হইবার নহে। চিত্তের স্থিরতা, সঙ্গের  
দৃঢ়তা, মধ্যার্থ কর্তব্যাবধারণতা তাহার  
নিকট ভুল। অসংযতভাবে উচ্ছাল  
অন্তঃকরণে যে শিক্ষাবীজ বপন করা হইয়াছে  
তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে। যদি কদাপি  
কোনস্থলে ইহার বিপবীত ভাব দৃষ্টিগোচর  
হয়, তবে সে জন্মান্তরবাস্তবিক বিশেষ স্মৃতির  
ফলেই হইয়াছে বৃত্তিতে হইবে। কিন্তু তাৎশ  
স্থল অতি বিরল। ছাত্রজীবন স্বভাবতঃই  
চাপলা পূর্ণ, বাধ্যতামূলক শাসনের বহির্ভূত  
থাকিলে কখনই অভিনিবেশ সহকারে  
বিজ্ঞানে নিযুক্ত থাকিতে চায় না। সময়ে  
সময়ে কেহ কেহ প্রবল প্রতিভা বলে এই  
সমস্ত বাধ্যবাধিত্তি অতিক্রম করিয়া, শিক্ষালভ  
করিতে সমর্থ হইলেও শিক্ষাকালীন অসংযত-  
ভাবে অবস্থানের ক্ষয় প্রাকৃতিক উন্নতিলাভে  
বঞ্চিত হয়, সুতরাং তাৎশ শিক্ষার কোনই

গৌরব নাট। যে বিজ্ঞানে মানব মনন,  
গোচরিত্বিগা, নিবর্তমানতা অর্জন করিতে  
অক্ষম তাগ মুখ্যকল বর্জিত, অসার। এই  
ক্ষয় এপন আমবা যবে যবে প্রচুর কৃতবিদ্যা  
দেবিত্তে পাট, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত বিদ্বান্  
অতি অল্পই দেখা যায়। বিদ্যা শিক্ষার প্রধান  
উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রসার। জ্ঞানের প্রসারে  
মানব আত্মবোধ লাভ করতঃ যথার্থ মনুষ্য  
পাইতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশে অতি  
পুণ্যতন কাল হইতে জ্ঞানোন্মুখী বিদ্যাই  
আদিত্য হইয়া আসিতেছিল। অথচ তাহাতে  
কর্ম শিক্ষা বা জীবিকার্জন স্বতঃসিদ্ধরূপে  
সম্পাদিত হইত। জ্ঞানমার্গে, আবেশ  
করিতে হইলেই তাহাকে কর্মের পথে অগ্রসর  
হইতে হইবে, আবার আর্থিক সাহায্য ব্যতীত  
কেহই কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেনা।  
সুতরাং এখন যে কর্ম ও অর্থ বিজ্ঞানের  
মুখ্য কল বলিয়া পরিগৃহীত, প্রাচীনকালে  
তাগ শিক্ষার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র ছিল।  
অথচ এই অগার ফলটির ক্ষয় কেহই বিজ্ঞান  
উপাসনা করিত না। আবার সেইভাবে  
শিক্ষার গতি পরিবর্তিত করিতে না পারিলে  
আমরা কখনই কোন প্রকারে উন্নত হইতে  
পারিব না। সেই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য  
অবলম্বন ব্যতীত উন্নত বিজ্ঞানের আশা  
অসম্ভব।

## আয়ুর্বেদের উন্নতির অন্তরায়।

[ প্রাপ্ত ]

( শ্রীরমেশচন্দ্র বিহারী )।

ভাবিয়া পাই না যে, হিন্দুসকল আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার কেন উন্নতি হয় না। অনেক দিন চেষ্টাই ভাবি, কিন্তু কিছুতেই মোমাংসা টিফ করিতে পারি না। অনেক বিখ্যাত কবিরাজ মহোদয়গণের প্রবন্ধ পাঠ করি, চিকিৎসক মহোদয়গণের চিকিৎসা অর্থাৎ ব্যবস্থা দেখি, 'রোগ পৰীক্ষা দেখি, ঔষধ নির্ধারণ দেখি, চিকিৎসা বা রোগ নির্ধারণের সাফল্য দেখিরা কিন্তু তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। অনেক সময়ে নিজেরই "ইন্ডেমব তবঃ"—এই জগুট আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি হয় না ভাবিয়া বসি, কিন্তু পরক্ষণেই "ন জাতু কামং কানা না ত্বা-ভোগেন শান্ততি" এই ভগবদ্ বাহ্যেব যাপার্থ উপলব্ধি হওয়ায় আকাঙ্ক্ষা বন্দনতী তইয়া পড়ায়। আজ অনেক দিনকার চেষ্টার ফাটনো—উন্নতির দ্বির বিচ্ছাদ, চিন্তাস্রবের অপেক্ষা না করিয়াই লিখিয়া ফেলিলাম।

আয়ুর্বেদের উন্নতি চিকিৎসার সাফল্যে, "তেষাং হৃদৈলিলাং রোগোপশমনার্থঃ আয়ুর্বেদঃ প্রোক্তিমচ্ছায়াঃ।" ব্যাধির তত্ত্বজ্ঞান, এবং রোগোপশমনে আয়ুর্বেদের উন্নতি। নানাবিধ উপাদি প্রাপ্ত হইয়া, খেত কৃষক অক্ষয়নে অর্থাভোগ, করুন বা প্রাসাদি শিখর-বাসী হইউন বা মোটর বিহারী হইউন আয়ুর্বেদের উন্নতি তাহাতে নির্ভর করে না—ইহাই আমার ধারণা।

অনেক ভাবিয়া আমি ইহাট টিফ করিয়াছি যে, আমাদের দেশে যখন দেখিছ 'আয়ুর্বেদ' শব্দ, শাল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, ভূতা, অগদতন্ত্র প্রভৃতিব চিকিৎসার পাবনশী আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের অপ্রতুল; সন্ত, তখনই 'বুনিব আয়ুর্বেদেব উন্নতির অন্তরায়' হিবেহিঁত হইয়াছে।

এমন বহু চিকিৎসক বঙ্গদেশে আছেন—যাঁহা বা শাস্ত্রের ধাবেন না, শাবীরতত্ত্ব, শিরা, শ্রায়ু মর্ষ, অস্তি স্থিতিব জ্ঞানলাভ করেন নাই; অথচ শলা চিকিৎসায় কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন, যাঁরা এমনও বহু আছেন, যাঁহা বা, কাশীনাথ সঙ্গুণ বিদ্যান, শাস্ত্রজ, রোগ নির্ধারণে অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন, কিন্তু সামান্য একটা বিফোটস হইলেই তখন পাঁচাত্তা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন কিবা একটা অবের রোগী চিকিৎসা করিতেছেন তাহা একটা পক্ষাপক শোণ চিকিৎসা করিতে হইলেই অত্র চিকিৎসার আশ্রয় লইতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার যে উন্নতি হইবে না ইহা সুনিশ্চিত। এখন অনেক চিকিৎসকও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা পাণ্ডিত্যে সুসিদ্ধাচার্যকর, কিন্তু মেহপাক—এমন কি তৈল, স্তনের মুচ্ছাপোকাটি পর্ঘ্যন্ত জানেন না, সামান্য রস, 'গন্ধক শেখনি' করিবার সময়েও কর্ণচ্যুরীর উপদেশ অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা যে আয়ুর্বেদ

কুদ্যোগ চিকিৎসার উন্নতি হইবে না ইহাও  
কন সত্য কথা। যখন দেখিব এক সমস্ত  
অভাব দূরীভূত হইয়া আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত  
চিকিৎসক যন্ত্র, শস্ত্র, ফার্মাসি প্রাণিয়ানে যের  
যেদা দি কার্যো সম্যাসাচী তুল্য কন্মী হইতেছেন  
তখনই বুঝিব আয়ুর্বেদের উন্নতিব অন্তরায়  
দূর হইতেছে।

“এতকাবশ্য মধেয় মধীত্য্য কন্ম প্যাম্শ্য  
মুপাসি ন্যায়।

কন্ম কেবল শাস্ত্রজ্ঞঃ কন্মর পরিমিষ্টিঃ।

সমুদ্র আত্মং প্রাপ্য প্রাপ্যভীকবিশীহবং ॥

“যন্ত্র কন্মর নিম্নাভো ধাট্টোৎশাস্ত্র-

বন্দিহঃ।

স সংস্কৃত পূজাং নাপ্রোচি বধকাইহি

রাব্রবঃ ॥

উভাবোঃ বনিপুণা বসমর্থোয় কন্মনি

অর্জবৈদ ধরাবোচারেকপক্ষা বিব দ্বিতো ॥

সেহাদিহনভিজোয়শ্চেতাদিষু চ কন্মহ।

স নিহিহননং লোভাং কুটবোহো

নূর্ণবোষতঃ ॥

কুদ্যোগ পাঠকমাত্রেরই অধি বাক্যের অমু-  
শাসন ফল প্রতীয়মান হইতেছে। তাই  
বলি, যখন দেখিব অমরতৈত্ত্ব অশ্বিনীকুমার,  
মরতৈত্ত্ব চণক পুত্রত্ব আদর্শে, প্রাচ্য-  
প্রাচ্য পণ্ডিতের নিকট অবিরুদ্ধ জ্ঞানে  
শিক্ষা লাভ করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের  
চিকিৎসক নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে  
বিরাজ করিতেছেন, তখনই বুঝিব আয়ুর্বেদের  
উন্নতির অন্তরায় অস্তিত্ব হইয়াছে।

যখন দেখিব ঋষি বাক্যের ফলশ্রুতি,

অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতেছে প্রত্যেক

ঔষধের বা বনৌষধের ক্রিয়া প্রাচ্যকীভূত

হইয়া শিক্ষার্থীগণকে আনন্দিত করিতেছেন,  
তখনই বুঝিব—ইহার উন্নতিব অন্তরায় দূর  
হইতেছে।

কোন একটা ঔষধের ফলশ্রুতি আছে,—

“অবমৃষ্টবিধং হস্তি কাসখাপ হগৌমকনা  
থযথুং পাণ্ডুবোগক প্রীহগুয়াদিকানি”

ঋষি বলিয়াছেন,—এই ঔষধ উক্ত ব্যাধি

সমূহ বিনষ্ট হইবে। শিকাগী, দিকাগী, গুরুপ-

দেশে বাহাই শিশুন, সেকথা পবে বলিতেছি,—

কিন্তু অহুবাণের উপর নির্ভব করিয়া, বাহার

ইহাও জীবিকাজনন কবেন, তাহাচাট কি

বুঝেন তাহাই কিন্ত প্রথম বিবেচনার বিষয়।

এই ঔষধটী অরামিকাবে আছে, কিন্ত “যে

কেবল গুয়বোগী তাহাকে এই ঔষধের ফল-

শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা কবিবেন

কি না? অথবা অর, কাস, খাস, হগৌমক,

শেখ, পাণ্ডুবোগ, প্রীহ, গুয় এ সকলেব

একত্র সমাবেশ থাকিলে প্রত্যেকটির অর

পূর্ণক পূর্ণক ঔষধ নির্ধারন না করিয়া যদি

এই একটা ঔষধের উপর নির্ভব করেন,

তাহাওই সুব্যবস্থা হইবে কিনা? অথবা উক্ত

ব্যাধি সমষ্টির ব্যাপ্তিক্ষেত্রেও ঐরূপ হইবে

কিনা? না হইলে ঋষি কি বিজ্ঞান

বহিষ্ঠত অজ্ঞেব মত কতগুলি ফলশ্রুতি

দিয়া “পক্ষমীর ত্রুতের সপ্তদ্বীপেধের

পল্লীভলাভের (“পিবনিধং প্রদাত্তানি বালতে

থণ্ড লজ্জুকান”) বত প্রলোভন দেখাইয়া-

ছেন। যখন বুঝিব, এই সমস্ত আর্ষবাক্যের

বাখার্থী ঔপলব্ধি করিয়া হিতমিত ঔষধের

দ্বারা, পল্লীতে পল্লীতে অচিকিৎসক বিরাজ

করিতেছেন, তখনই বুঝিব আয়ুর্বেদের

উন্নতির অন্তরায় দূর হইতেছে।

সংগৃহীত পুস্তকের অধিকারের লক্ষ্য-  
বিলাসে লেখা আছে “অথ প্রসাদাৎ তগবান্  
লক্ষণাবীষুব্রীডঃ ।” বাস্তবিক লক্ষ্যবিলাসের  
উপাদান মধ্যে বেঁটলা, গোরক্ষ চাকুলে,  
শতমূল, ভূমিকুয়াণ্ড, বৃন্দারক প্রভৃতি  
বাজীকারক ও রসায়ন জীব্য সমষ্টি মিশ্রিত ।  
—এরূপ অদ্বৈত ইহাতে অর্থ নিবৃত্তি করিয়া  
ইহা যে শ্রেষ্ঠ বাজীকারক ঔষধ হইবে এবং  
বরং সংস্থাপন, মেধা ও বলবৃদ্ধি হইবে তাহাতে  
আর সন্দেহ কি ? কিন্তু বুন ত ? কোনও  
চিকিৎসক মহোদয় কি ইহা দ্বারা ঐরূপ একটি  
রোগ আরোগ্য করিয়া, সম্পূর্ণ বা আংশিক  
ফললাভ করিয়াছেন ? অসুস্থান করি কেহই  
করেন নাই । করিলেই বা কোনও শিক্ষার্থিকে  
উপদ্রষ্ট বা যোগ্য করিয়াছেন কি ? অধিক কি  
অনেকে হয় ত বংশপরম্পরা প্রচলিত কোন  
কোন বনৌষধি দ্বারা অনেকে রোগ বিশেষে যে  
ফল লাভ করিয়াছেন বা নিজেদের গবেষণা  
দ্বারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ফললাভ করিয়াছেন  
তাহাব গলিতাংশও কি কাঠাকে দান  
করিয়াছেন ? বরং এমনই গোপনে, উচ্চ  
রক্ষা করিয়াছেন, যাতে নিজেব পুত্রও  
পরিণামে পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হয় । ইহার  
উদাহরণ আমি বহু জানি, সময়ে প্রকাশও  
করিব । এই অল্পট অতি উৎসেব সচিত্র বলিতে  
হয় যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাব উন্নতির যে  
সকল অন্তরায় আছে তাহাব মধ্যে ইহাই  
বিশিষ্ট কারণ ।

ভারতের এমনট দুর্দিন উপস্থিত যে,  
আয়ুর্বেদজ্ঞ অগভতঃস্বৈব বিব চিকিৎসা দেশ  
গিরাছে । হইতে উঠিয়া এই বিব বৈজ্ঞের

লোপ ও আয়ুর্বেদের উন্নতির একটি বিশেষ  
অন্তরায় ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ  
দূর্ব হিমালয়ের উপত্যকা অধিত্যকার পবীক্ষা-  
বদ্ধ কোন একটি বনৌষধি লিপিবদ্ধ করিয়া  
যাতে সমগ্র পৃথিবাসীর উপকার হয়,  
তৎক্ষণা ভায়া হইতে ভাষাভিন্নে ইহার  
পরিচয় প্রকাশ এবং তাহার প্রযুক্তা অংশ  
তরল বা চূর্ণ বা বটী প্রকৃতি নানারূপে প্রস্তুত  
করিয়া বিতরণ এবং বিক্রয় দ্বারা “পুষ্টিঃ  
স্বর্গং যন্তা মাযুয্যঃ বৃদ্ধিকরক্কেতি”—বাক্যে  
স্বার্থকতা প্রত্যক্ষ করাইতেছেন । এমন কি,  
আমাদের দেশীয় পদমলিত, দূবীকৃত জঞ্জাল  
বাশ হইতেও সংগৃহীত বনৌষধি বিশেষেব  
বাহ্যিক চাকচিক্যে ভূষিত হইয়া আমাদেরই  
পত্নী-বিপদীয় শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, আর  
আমি আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসক হইয়া, পাড়ায়  
মাঝার হাতঘণ, প্যাতি প্রতিপত্তির পদাব  
অক্ষয় রাণিয়াও আমার গৃহিণীর পীড়ার  
সহর পাশ্চাত্যদেশাগত সেই চাকচিক্য  
সম্ভার অশোকের দ্বারা শোক নিবারণেব  
চেষ্টা করিতেছি । উন্নতির অন্তরায় আর  
কাঠাকে বলে ?

আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা জীবনে  
যে সব কঠিন কঠিন ব্যাধি আরোগ্য  
করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার ত্রৈনিক  
ঔষধ প্রয়োগ, বা কোন ঔষধে কি  
পরিণামে কি কি ক্ষেত্রে কি উপগর্মে  
ফললাভ করিলেন, বা বিফল হইলেন  
তাচা অল্প যে কাঠাকে জানিতে দেন না  
বরং বাহাতে অল্প না জানিতে পারেন  
তৎক্ষণা বধাসক্ত “গলাধর চূর্ণকে, চক্ষুচূর্ণ চূর্ণ

নাম দিয়া বা চক্রপ্রভৃতি স্বধাতু বটী ইত্যাদি করিয়া সাধারণ চিকিৎসকগণ যাহাতে ভ্রমে পড়েন তাহার জন্য চেষ্টা করেন আনুর্বেদীয় চিকিৎসার ইহাই উন্নতির অন্তরায় ।

কোমি মহাত্মা হরত আমাতীসার যোগে, অর্যধিকারের একটি ঔষধে সফল প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তিনি বৌদ্ধের নিকট ব্যবস্থাপণে যে নাম লিখিলেন সেটা আমাতীসারেরই ঔষধ । কেননা অস্ত্র চিকিৎসক দেখিলে কি বকিবেন, এই ভয় এবং দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্মীবিলাসে যে অতিসার আরোগ্য করিলেন ইহা ফপরকে কেন শিখাইবেন, বরং যাহাতে লক্ষ্মীবিলাসের যে অতিসার নাশক ক্রিয়া আছে এবং তাহা প্রত্যক্ষ সত্য, সেটি যাহাতে অস্ত্র শিক্ষা প্রাপ্ত না হয় বা অনিতে না পারে তত্ত্ব শাস্ত্র-বাক্যকে প্রলোভন বাক্য বা মিথ্যা কলঙ্কিত ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন । ইহা হইবে বলি ইহাই আমাদের উন্নতির অন্তরায় । প্রত্যেক চিকিৎসকগণ যদি ঔষধের ক্রিয়ার সাক্ষালাভ করিয়া চিকিৎসা জগতে ব্যক্ত করেন তাহা হইলেই চিকিৎসাব যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে ।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার এই অস্ত্রই এত উন্নতি । যদি এই সমস্ত কারণ কূট দূর হইয়া, অষ্টাদ্ধ আনুর্বেদের সর্বোচ্চ শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করে শল্য, শালাক্য প্রভৃতি চিকিৎসার আমরা অনুরাগী হইতে পারি তবেই আবার আনুর্বেদের উন্নতি সম্ভবপর হইবে ।

তবে ঔষধের বিষয় সংগ্রহিত এই অন্তরায় অতিক্রমণে পথও সুগম হইতেছে ।  
(বয়, শত্র, ক্ষার, অগ্নিপ্ররোগ, জলোকা

নিয়োগ, পক্ষকর্ম দ্বারা অর্য বাধিনাশের উপায়, প্রাচ্য পাশ্চাত্য সময়ে ঔষধের বীর্ঘ্য রক্ষা প্রভৃতির সহজে শিক্ষার উপায় হইয়াছে । কলিকাতাব অষ্টাদ্ধ আনুর্বেদ বিভাগের তাহার আদর্শ । এই আদর্শে অল্পপ্রাণিত হইয়া অর্য গোবর পুনরুদ্ধার কবিত্তে, অর্ধগাংকোর বাণার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে, এই উদ্ভ্রমণে, শুভ কার্যে সহবাসী, মক্ষবলবাসী মহিমাবিত চিকিৎসক মহোদয়গণের সাক্ষাঙ্গীন সহায়ত্ব আশ্রয় । সমগ্র দেশবাসী, ভারতবাসী একনিষ্ট হইয়া এই পৈতৃক সম্পত্তি আনুর্বেদের উন্নতি কামনার কায়মনো-বাক্য দ্বারা ত বটেই কিছু কিছু যথুসাধ্য । অর্থ দ্বারাও এত আনুর্বেদ বিভাগকে চিরস্থায়ী যদি করিবার চেষ্টা করেন, তবেই ভারতে পুনরীর শল্য, শালাক্য, কারচিকিৎসা প্রভৃতি অষ্টাদ্ধ বিভূষিত চিকিৎসকগণ আবির্ভূত হইয়া উন্নতির অন্তরায়কে দূরীভূত করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই ।

কিন্তু শুধু এত বিভাগের উপরও নির্ভর করিলে চলিবে না । ভবিষ্যতে এই বিভাগের আদর্শে মক্ষবলগণও বাহাতে শিক্ষালাভ হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । এই আশাও হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ রাখিতে হইবে । এই বিভাগের পরিচালনার অস্ত্র যদি ভারতবাসীর মুষ্টিভিক্ষালক অর্থদাণ্য্য করা আবশ্যক হয়, তাহাও করিতে হইবে । রাজদ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনায় কাতরকর্ত্তে বোদন করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে, স্বার্থহানি করিয়া একনিষ্ট ভাবে বিভাগের সেবা করিতে হইবে, তবেই এই বিভাগটির অঙ্গ বৈকল্য দোষ অপগত হইয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে

পারিবে। তবেই সর্বত্র শিক্ষা বিস্তার করিতে পারিবে, কেবল একদিন আয়ুর্কেদেব উন্নতির অন্তরায় দূর হইবার ব্যবস্থা।

বাঙ্গালায় একটা কবিতা আছে,

“যেখানে দেখিবে ছাউ, উড়াইয়া দেখ তাই

মিলিলে মিলিত, পাবে অমূল্য রতন।

এখন যেকণ অর্থ পাড়াইয়াছে তাহাতে আমাদের মতো মতবৈধ হইলে চলিবে না, তাহাতে আয়ুর্গৌরব বর্ধিত হইবে। বাহ্যিক ধারণা আধা চিকিৎসা দে অনভিজ্ঞতার স্বভাব বিষয়, আমাদের মতবৈধ ঘটিলে তাহাদের সে ধারণা দূরীভূত হইবে। নিজের, পাশে নিজেই কুঠাবাত্ত করা হইবে। অনেক মহাত্মা তবত ধারণা থাকিতে পাবে যে কবিবাক্তি শিক্ষা করিতে শিরা আয়ুর্কেদেব অত্র চিকিৎসা শিক্ষা করিতে যদি ডাক্তারবৈদ্য সাহায্য লইতে হয়, তাহা হইলে আয়ুর্বেদ বিভাগের সার্থকতা কি থাকিল। কিন্তু একথা আদৌ সঙ্গত নহে, কারণ বর্তমান যুগে আয়ুর্বেদজ্ঞ, চিকিৎসা যুবসাহী মহোদয়গণ, শিক্ষার অভাবে যত্ন, শস্ত্রাদির শিক্ষা দিতে অক্ষম, কাজেই পাক্ষাত্য চিকিৎসায় শিক্ষিত মহোদয়গণের সাহায্যে শলাস্ত্র সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাতে দোষ কি? তাহাতে ভবিষ্যতে আয়ুর্গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পূর্ব সমৃদ্ধি বজায় থাকিবে।

শলাস্ত্র বস্ত্রাধস্ত্র উদ্দেশ্যে দিয়াছেন,

“অস্ত্রশাস্ত্র বিষয়োগপদানাকার্য্যনাকার্য্যনি  
মিহোপ নিপতিতানামগ্ৰবশান্তেবাং তদ্বিদেভা  
এব ব্যাখ্যা মহু শ্রোতব্য। কস্মাৎ ন  
বস্মিন শাস্ত্রে শক্যঃ সর্ব শাস্ত্রানামববোধঃ  
কর্তব্যঃ॥

এই চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রয়োজকশতঃ অস্ত্র শাস্ত্রের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও তত্ত্ব প্রতিবেদন নিকট ব্যাখ্যা শ্রবণ কবিবে। তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে তবদ্যে আয়ুর্জ্ঞানসম্পন্ন, স্বয়ংগ সর্বিজ্ঞ সঙ্গশাস্ত্রজ চিকিৎসা অত্র একট উপদেশ গ্রহণ করিতে, ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে অর্থাৎ শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের যদি কিছু না পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত চিকিৎসক মহোদয়গণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহাৎ স্বয়ংমতের অবমাননা হইবে না, বরং তাহাদের স্তিমিত উজ্জল আলোকে দিগ বিভাষিত করিবে সন্দেহ নাই—

একশাস্ত্র মধীগানো ন বিভাহ্যস্ত

নিশ্চয়ঃ।

অস্মাদ্ বহুশতঃ শাস্ত্রঃ বিজ্ঞানীয়া

চিকিৎসকঃ॥

শাস্ত্রঃ গুহমুখোদ্ গোর্মাদাদ্যে

পাশ্চ চামরুৎ।

যঃ কণ্ঠ কুণ্ডতে বৈতঃ

সর্পিহো হন্তেতু তক্রোঃ॥





ডাক্তারও ডাক্তারী ঔষধের নিন্দা করিতেন। ডাক্তার আসিলে তিনি বাহির বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন ও ঔষধ গ্রহণ করিতেন। রোগীর আশা ছাড়িয়া একদিন মা, কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন—“কবিরাজ রোগীর আশা—  
—ছাড়িয়াছি, এখন তুমি একবার শেষ দেখা দেখা।” কবিরাজ মহাশয় বলিলেন “এখন শেষ সময় তোমাকে কেন? আগে বলিলে হয়ত রোগীর এমন দশা হইত না। আমি বলিয়াছি কেহ আমার কথা গ্রাহ্য করে না। যদি টেঁহাব আয়ু থাকে তবে আমার ঔষধ ভাল হইবে, বিশ্বাস করি।” সকলেই তাঁহার চিকিৎসাদীন হইতে মত প্রকাশ করিলেন। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দেওয়া অবস্তু করিলেন। পথ্য একবারে বদলাইয়া গেল। তিনি বলকব ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন না, সমস্ত শরীবে ছাতি মাথাটা পাকার ব্যবস্থা হইল। ঔষধ ক্রম শোধ কমিশা আসিতে লাগিল, উরুরেব পীড়াও সাংগি আসিল, অতি অল্প রিনেট এইরূপ অভিনব পরিবর্তন দেখিয়া সকলে বিস্ময় হইলেন। কিছুদিন পরে অব সারিয়া গেল। রোগী যখন টাটিতে আরম্ভ করিল, তখন সকলের মনেই আশঙ্কায় সঞ্চার হইল, সকলে আয়ুর্বেদের শক্তি দেখিয়া কবিরাজ ও ডাক্তার ঔষধের শত সুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমার সেই ভ্রাতা, এখন যেরূন চিকিৎকোটের উকীল। যদি তাকে ডাক্তারের হাতেই রাখা গাইত তবে আর তাঁহারক পঠিতাম না। আমাদের কবিরাজ মহাশয় ডাক্তারের সঙ্গে মিলিয়া মিলিয়া কখনো চিকিৎসা করিতেন না।

তিনি ডাক্তারদিগকে, যমকিন্দর বলিতেন। বাস্তবিক ডাক্তারী চিকিৎসা যে কোন কালের নহে এ কথা আমরা বলিতে পারি না, সকল অবস্থায়, সব সময়, সব রোগীতে ডাক্তারী ঔষধে কাজ হয় না—বরং কোন কোন স্থলে বিষবৎ ক্রিয়া করে।

একবার আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি হইতে, সেই সময় আমি পড়া ত্যাগ করি। ময়মনসিংহের সিবিলাসার্জন ও তাঁহার অধীনে একজন ডাক্তার আমার চিকিৎসা করে, ফলের বেলার যখন অশক্ত বস্তু—তখন ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ কবিরাজের হাতে পড়িল, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে একজন হাতুড়িয়া গোছ কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জেদ করিয়া কহিলেন আমাকে ভাল কবিবেন। তিনি নিশ্চিৎ খ্যাতিসম্পন্ন কবি-  
বাস ৬গঙ্গাপ্রদায় পেন মহাশয়ের কাছে কবিরাজী পড়িয়াছেন বলিলেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করিলাম না, তাপনি তাঁহার হাতেই আনিব চিকিৎসার ভার পড়িল। ডাক্তারেরূপ পথ্যক উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, তিনি তাহা উল্টাইয়া দিলেন। ডাক্তার আরবিক তরুলতা বলিয়া মাথার শৈত্য ক্রিয়াও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কবিরাজ তাহা উল্টাইয়া মাথার গরম অর্থাৎ মল্লকলাইয়ের বেদ ও সাধারণ পথ্যের সঙ্গে মাখন, খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। মাথায় হ'বেলা আয়ুর্বেদীয় তৈল ও বৃত্তীর ব্যবস্থা করিলেন। আমি অচিরেই ভাল হইয়া-গেলায়। আমার পূর্ণ জ্ঞান আসিল পড়িল, আমি তখন লোকুচিন্তিতে পারিতাম। বোধ হয় মাথায় স্বেদা কবিরাজী প্রয়োগ হইয়া

ধাক্কাবে। কবিরাজ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—  
কফ-বায়ুর বিকার।

আমার একজন হিন্দু প্রজার পুত্রের  
অসুবিধার হয়, গ্রাম্য ডাক্তার আনা হইল।  
তাহার বাড়ী আমার বাড়ী হইতে একমাইল।  
ডাক্তার বলিলেন,—রোগী অচিরেই মারা  
যাইবে, ধ্বস্তরির ও অসাধ্য রোগী। ডাক্তার  
আসিয়াছিলেন আমারই হাতীতে, গেলেনও  
তাহাতেই। ডাক্তার চলিয়া গেলে রোগীর  
শিষ্ঠা আমার বাড়ী কবিরাজের নিকট  
দৌড়িয়া আসিয়া কাদিতে কাদিতে কঁহিল—  
“কবিরাজ মহাশয় ইহাকে বাঁচাইয়া দিন, যেমন  
করিয়া পারি আপনারকে খুদী করিব। আমি  
গরীব, যে কিছু টাকা ছিল সহরের ডাক্তারকে  
দিয়া বিদায় করিয়াছি।” কলে অনেক স্থলেই  
দেখা যায়, ডাক্তারকে টাকা কড়ি দিয়া ফোত  
হইয়া এখন সামান্য পয়সায় কবিরাজ-দেবার ও  
সে গরীব সাজে। যাহাহউক আমিও প্রজাটির  
অসুখোখে কবিরাজ সহ তাহার বাড়ীতে  
গেলাম। রোগী দেখিয়া কবিরাজ মহাশয়  
কহিলেন—“যমের সাধ্য নাই এ রোগী নিতে  
পারে, তবে ঔষধ ও শুষ্কতা যদি সীতিমত হয়।”  
এই সময় তাহার দুব সাহস পাইয়া কবিরাজী  
ঔষধ দিতে প্রস্তুত হইল। কবিরাজ মহাশয়  
সর্বপ্রথমেই সূচিকাতরণের ব্যবস্থা করিলেন।  
মাথার চুল কাটিয়া মাথার তালুতে রক্ত  
বাহির করিয়া ঔষধ বসাইয়া দিয়া শুষ্কতার  
কথা বলিয়া দিলেন। পুষ্ণোর ব্যবস্থা কর্তৃত্ব।  
দধি-রোল আর ভাজের মাড়। ক্রমে রোগী  
ভাল হইয়া উঠিল, সে কবিরাজ ও রোগী  
এখনও বাঁজিয়া আছে।

বিলাতি বা বৈদেশিক ঔষধ ও পথ্য  
আমাদের সহ্য হইবার নহে। ইহা সে  
দেশীয় লোকের জন্ত সে দেশের ঔষধ।  
শ্রীতপ্রধান দেশের উগ্র ঔষধে আমাদের  
উপকৃত্য না করিয়া অপকারই করে। তবে  
কোন কোন অবস্থায় ডাক্তারী ঔষধ যে ফলপ্রসূ  
সে কথা অস্বীকার করি না। সালসার  
আমাদের যে কাজ না করে, তোপচিনী  
তদপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া থাকে ইহা  
অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তোপচিনীর  
রোগীও অনেক আমি দেখিয়াছি, সালসার  
রোগীও বহুতর দেখিয়াছি। সালসার অপেক্ষা  
তোপচিনীতে খরচও কিছু, কম পড়ে।  
কবিরাজী চ্যবন প্রাশ—ডাক্তারী কডলিতার  
অয়েল অপেক্ষা অনেক কার্যকারী। আমরা  
এমনই হইয়া পড়িয়াছি যে, চ্যবন প্রাশকে  
দূরে রাখিয়া কডলিতার অয়েলেরই আদর  
করিয়া থাকি। এক মকরধ্বজের মত কোন  
ঔষধই কোন চিকিৎসাপ্রাজ্ঞ বাহির করিতে  
পারিল না। আর কত কহিব, আয়ুর্বেদের  
সকল ঔষধই যে ফলপ্রসূ তাহা বলা বাহুল্য।  
আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলি আমাদের দেহের  
উপযোগী ও শরীরের পক্ষে হিতকর।  
আমাদের বিকৃত বুদ্ধি দূর হইলে আয়ুর্বেদের  
আদর আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। দেশে যেমন  
হাওয়া বহিষ্কৃত তাহাতে মনে হয় অচিরেই  
আয়ুর্বেদ পূর্বের জায় বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে।  
উল্লিখিত প্রকারের দুষ্টতার দ্বারা অনেক কথা  
বলা বাইতে পারে, কিন্তু তাহা অন্য ও প্রবন্ধ  
বিহীন কাশকার তাহা লিখিতে বিরত  
রহিলাম।

## শারীর বিজ্ঞা ।

### সন্ধি ও স্নায়ু ।

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল,এম,এস)

— সন্ধিঃ—অস্থির সহিত অস্থির সংযোগকে সন্ধি বলে। এই সংযোগে অস্থিগুলি সম্পূর্ণ পৃথক থাকে, জুড়িয়া এক হইয়া যায় না। শরীরে কেবল যে অস্থির সন্ধিই আছে তাহা নহে—পেশী, স্নায়ু, প্রভৃতিরও সন্ধি আছে। কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সন্ধি বলিতে কেবল অস্থিসন্ধিই বুঝায়। পেশী, স্নায়ু প্রভৃতির সন্ধি অসংখ্য। এই ক্ষেত্রে সেগুলির পৃথক বর্ণনা করা হয় না।

সন্ধি প্রধানতঃ দুই প্রকার—চেঁটাবান বা সচল এবং স্থির বা অচল। যে সন্ধির অস্থিগুলি চালনা করিতে পারা যায়, তাহাকে চেঁটাবান বা সচল সন্ধি বলে—যেমন হস্তপদাদির সন্ধি। আর যেসকল সন্ধি ঘটিলে অস্থিগুলির চালনা করিতে পারা যায় না, তাহাকে স্থির বা অচল সন্ধি বলে—যেমন মস্তকীয় কপালাস্থিগুলির সন্ধি।

সচল সন্ধি আবার দুই প্রকার—বহুচল, যেমন হস্তপদাদির সন্ধি এবং অল্পচল—যেমন পৃষ্ঠবংশের সন্ধি। সুতরাং সন্ধিগুলিকে বহুচল, অল্পচল এবং অচল এই তিন শ্রেণীতেও

বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে শাখা সমূহে ও অর্ধোহস্থকোণীতে বহুচল, পৃষ্ঠবংশাদিতে অল্পচল এবং অগ্রাঙ্গুলে অচল সন্ধি আছে।

সচল সন্ধিহলে দুই বা তিন খানি অস্থি ঘন ও মসৃণ শরীরজুড়িয়া স্নায়ু দ্বারা বা কোষাকার স্নায়ু দ্বারা পরস্পর অবদ্ধ থাকে। অস্থি সকলের সন্ধের অংশ তরুণাঙ্গি দ্বারা আবৃত এবং স্নেহধরাকলাসমাক্রম থাকে। একজন্ম অস্থিগুলি সন্ধির মধ্যে ঘষিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং সুচারুরূপে খেলিতে পারে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, চক্রের অক্ষ বা চক্রমধ্যস্থ দণ্ড তৈলাত্যক্ত থাকিলে চক্র যেমন সুচারুরূপে ঘুরিতে পারে, সন্ধিসকল সেইরূপ স্নেহযুক্ত থাকায় সুচারুরূপে চালিত হইয়া থাকে\*।

অচল সন্ধিসমূহ কোথাও স্নায়ুজাল দ্বারা আবদ্ধ, কোথাওবা দুইখানি অস্থির সন্ধি দ্বারা ধারাবাহিক সন্ধিলেনে মিশ্রিত। অপ্রয়োজন হেতু এই সকল সন্ধিতে তরুণাঙ্গি বা স্নেহধরা কলা কলা থাকে না।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—“আকৃতি ভেদে সন্ধি সকল আট প্রকার, যথা—কোর, তরুণ,

\* ইং—Joint, Articulation—জয়েন্ট, আর্টিকুলেশন।

† অস্থি সমূহের ভেঁতে কেবলঃ পরিকল্পিতঃ।

পেশী-স্নায়ু-সিরাপাত সন্ধিসংখ্যা ব বিভক্তে।

সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৬ অঃ।

১। স্নায়ু অর্থে Nerve নহে, Ligaments এবং Tendons—ইহা পুঙ্খবিলি বলা হইয়াছে।

\* যেরূপকালে যথা যত্নে স্নায়ু অববর্ততে।

সুশ্রুতঃ স্নায়ু বর্ত্তন্তে সন্ধিষ্ঠাঃ স্নেহাঃ তথা।

সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৬ অঃ।

সামুদ্র, প্রত্যর, তুরসবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল ও শখাবর্ত। তন্মধ্যে অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুলক, কক্ষ ও কুর্পরে কোর; কক্ষ, বজ্রকণ ও দন্ত মূলে উদুখল, বন্ধ, যোনি ও নিতম্বে সামুদ্র; গৌবা ও পৃষ্ঠাংশে প্রত্যর; মন্তক, কটী ও কপালে তুরসবনী; চোঁরাল ও উরুতে বায়স-তুণ্ড; কঠিনলীতে মণ্ডল এবং কর্ণে শখাবর্ত সন্ধি আছে।\* প্রত্যেকের বিবরণ পৃথকভাবে লিখিত হইতেছে।†

১০. কোর—নামক সন্ধিগুলি বহুচল অর্থাৎ খুব খেল। একখানি অস্থির কোর অর্থাৎ গর্তের ভায় আকার বিশিষ্ট খাতের মধ্যে অপর একখানি অস্থির উন্নতভাগ প্রবিষ্ট হইয়া এই সকল সন্ধি নির্মিত হয়। ঞ্জকোর, পরস্পরকোর, চক্রকোর এবং সন্ধ্যকোর ভেদে কোরসন্ধি চতুর্বিধ দেখা যায়। (ক) একখানি অস্থির খেলের ভায় গভীর খাতের মধ্যে অপর একখানি বা ততোধিক অস্থির অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হইয়া এইরূপ সন্ধি নির্মিত হয়। খেলের মধ্যে নোড়ার ভায় এই সন্ধির অস্থিগুলি প্রধানতঃ অগ্রগন্ডাং দুইদিকে মাত্র খেলে; মণিবন্ধ এবং গুলকে ঞ্জকোর† সন্ধি আছে। (খ) দুইখানি অস্থির বোড়ার জিনের ভায় সন্ধের অংশবয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে তাহাকে ‘পরস্পরকোর’‡ বলে। অঙ্গুষ্ঠমূলে এইরূপ সন্ধি আছে। (গ) যে সন্ধিতে এক অস্থির, গোলাকার গর্তের মধ্যে অপর অস্থির উন্নত কীলাকার অংশ প্রবিষ্ট হইয়া

ঘুরিতে পারে, তাহাকে ‘চক্রকোর’\* বলে। প্রথম গ্রীবাংশেককার সহিত দ্বিতীয় গ্রীবাংশেককার এইরূপে সন্ধি আছে সেই ঞ্জ আমরা বাড় ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। (ঘ) যে সন্ধিতে সাঁড়ার ভায় মুখ বিশিষ্ট অস্থির মধ্যে অপর অস্থির অংশ প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিতে পারে তাহাকে ‘সন্ধ্যকোর’+ বলে। কনুইয়ের সন্ধি এইরূপ।

উদুখল সন্ধি ‡—কোন অস্থির উদুখলের ভায় গভীর খাত মধ্যে ঞ্জ অস্থির মুণ্ড প্রবিষ্ট হইয়া যে সন্ধি নির্মিত হয় তাহাকে ‘উদুখল সন্ধি’ বলে। কক্ষ এবং বজ্রকণের সন্ধি এইরূপ। দন্ত সকলের অগ্রভাগ হব-স্থির গভীর খাতে প্রবিষ্ট বলিয়া ঐ সকল সন্ধিকেও উদুখল সন্ধি বলা যায়। কিন্তু ঐ সকল উদুখল সন্ধি অচল।

সামুদ্র—দুই বা ততোধিক অস্থির দৃঢ়সংযোগে একটি সমুদ্র বা সম্পূট (কোটা বা বাটির মত) নির্মিত হইলে সেই সন্ধিকে ‘সামুদ্র’ বলা যায়। শ্রেণিতচক্র প্রভৃতিতে এইরূপ সন্ধি আছে। এই সকল সন্ধি অল্পচল অর্থাৎ কম খেলে।

প্রত্যর §—দুইখানি অস্থির সমতল অংশ পাশাপাশি ভাবে বা উপস্থাপারি সংহিত হইলে তাহাকে ‘প্রত্যরসন্ধি’ বলে। চলপ্রত্যর যুক্তপ্রত্যর এবং দৃঢ়প্রত্যর ভেদে ইহা তিন প্রকার। তন্মধ্যে চলপ্রত্যর সন্ধির মধ্যে স্লেয়াধরা কলার ব্যবধান থাকে। করণদের কুর্জাঙ্গিসমূহের পরস্পরসন্ধি এইরূপ। দুইখানি অস্থি দ্বাধ্যলে দ্বাদ্রমজ্ঞ বা দৃঢ় কলার দ্বারা ‘সংযুক্ত হইলে তাহাকে ‘যুক্তপ্রত্যর’ বলে। ঞ্জদ্বাধ্যবয়ের মধ্যে ও প্রকোষ্ঠের

\* ইং—Pivot Joint—পিভট জয়েন্ট।

† ইং—Gynglymus—গিংগলিমাস।

‡ ইং—Enarthrosis (Ball and socket joint) এনারথ্রোসিস।

§ ইং—Arthrodia—আর্থ্রোডিয়া।

+ ইং—Condylloid—কন্ডাইলয়েড।

ঃ ইং—Saddle—স্যাডল।

হুইথানি অস্থির মধ্যে এইরূপ সন্ধি আছে। সমজাতীয় অস্থিগুলি মধ্যবর্তী তরুণাঙ্গি দ্বারা পরস্পর দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইলে তাহাকে দৃঢ় প্রত্যর বলে। পৃষ্ঠাংশের কশেরকাগুলি এইরূপে সন্ধিযুক্ত।

**ভ্রুঙ্গসেবনী\***—করাতির দাঁতের জ্ঞান দ্বারা বিশিষ্ট শ্রান্তদ্বারা হুইথানি অস্থি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সেলাই করা বস্ত্রের দোষাইলে উক্ত সন্ধিকে 'ভ্রুঙ্গসেবনী' বলে। সীমন্তসেবনী এবং গ্রন্থসেবনী ভেদে ইহা দুই প্রকার দেখা যায়। তন্মধ্যে মস্তকের কপালাঙ্গি সমূহে 'সীমন্তসেবনী' এবং সৌরিকা ও জতুকাঙ্গি স্থির সংযোগ স্থলে 'গ্রন্থসেবনী' সন্ধি আছে। যৌবনের পূর্বে শ্রোণিকলকের তিনটি অংশের মধ্যে ভ্রুঙ্গসেবনী সন্ধি থাকে। আয়ুর্কেন্দ্রে সীমন্তসেবনী 'সীমন্ত' নামে অভিহিত।

**বায়সতুণ্ড**—কোন অস্থির কাক-চক্ষু এবং অংশের মধ্যে অপর অস্থির অংশবিশেষ শিথিলভাবে সংহিত হইলে তাহাকে 'বায়স-তুণ্ড' বলে। শল্যাঙ্গি সহিত অধোহস্তর সন্ধি এইরূপ। এই সন্ধি এক প্রকার কোষ-সন্ধি হইলেও উচা চেঁচাইয়া বলিয়া আয়ুর্কেন্দ্রে পৃথক বর্ণিত হইয়াছে।

**অণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত**—বাস-পথের তরুণাঙ্গি সমূহে 'অণ্ডল' এবং কর্ণ-শঙ্খানির্মাণকারী তরুণাঙ্গি সমূহে 'শঙ্খাবর্ত' সন্ধি দেখা যায়। কিন্তু উহারা তরুণাঙ্গির সন্ধি বলিয়া পাশ্চাত্যগণ উহাদিগকে অস্থি-সন্ধি মন্থো গণনা করেন না।

সচল সন্ধিসমূহে চারিটি পদার্থ বিশেষ উল্লেখ্য, যথা—অস্থির সন্ধের অংশ, সন্ধির বধ্য-

হিত তরুণাঙ্গি, দ্বায় এবং স্নেহধরা কলা।

তন্মধ্যে—

(১) অস্থির সন্ধের অংশ দৃঢ় ও চিকন অস্থিময় এবং সকান স্থলে স্নেহশূন্য তরুণাঙ্গি-পত্র দ্বারা আবৃত।

(২) সন্ধিস্থলে অবস্থিত তরুণাঙ্গি-সকল দুই প্রকার—'সন্ধিবেষ্টক' এবং 'সন্ধান্তরাল'। তন্মধ্যে সন্ধিবেষ্টক তরুণাঙ্গিগুলি অস্থির সন্ধের অংশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং সন্ধান্তরাল-গুলি হুইথানি অস্থির সন্ধের অংশের মধ্যস্থলে পৃথক ভাবে থাকে।

(৩) দ্বায়সমূহ তিন প্রকার—রজ্জ্বরূপ কোষরূপ, এবং কলারূপ। তন্মধ্যে রজ্জ্বরূপ দ্বায়সকল সন্ধির মধ্যে ও চারিদিকে পৃথক ভাবে অবস্থিত করে। কোষরূপ দ্বায়সকল কোষের দ্বায় সমগ্র সন্ধিটিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। অনেক পেশীর কণ্ডুরা সন্ধি-সংযোগজনী দ্বায়ের সহিত অভিন্নভাবে মিশিয়া যায়। কলারূপ দ্বায়সকল কলা বা ঝিল্লীর দ্বায় হুইথানি অস্থির অন্তরালে বিদ্যুত থাকে, যথা—জন্তান্তরাল কলা।

পূর্বে আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত চারিপ্রকার দ্বায়ের বিষয় বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রত্যানবর্তী দ্বায়ই অস্থির বন্ধন স্বরূপ বলিয়া এই অধ্যায়ে উহাদের বিষয়ই উল্লেখ করা বাইবে। অন্তান্ত দ্বায় পেশী ও আশ্রয়বর্ধক প্রসঙ্গে বর্ণনীয়।

দ্বায় বেষ্ঠ ও গীত এই দুই প্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট দেখা যায়। তন্মধ্যে কশেরকাঙ্গির মধ্যবর্তী দ্বায়সমূহ ও প্রীবাধরা দ্বায় পৌরুষ এবং অন্তান্ত হিতদ্বাপকত্ববিশিষ্ট। অকাল-হানের দ্বায় তত্ত্ব।

\* ইং—Schindyllosis—শিন্ডিলোসিস।

(৪) শ্লেষ্মধরা কলা\*—সচল সন্ধি-  
সমূহের অস্থিস্থের মধ্যে এক একটা তরল  
শিল্পিল পদার্থ ('শ্লেষ্মক স্রোতা') পূর্ণ কলা-  
ময় কোষ থাকে। ঐ কোষের উভয় দিক  
অস্থিস্থের সন্ধের অংশগুলিকে সম্পূর্ণভাবে  
আবৃত করিয়া রাখে। শ্লেষ্মধরা কলা হইতে  
নিযুক্ত, 'শ্লেষ্মক' স্রোতা নির্গত হইয়া সন্ধিস্থানকে  
আর্দ্র রাখে বলিয়া সন্ধিস্থান বেশ খেলিতে,  
পারে এবং ঘর্ষিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

শ্লেষ্মধরা কলা তিন প্রকার—সন্ধাস্তরীয়,  
কণ্ডরামুগা এবং ডকের নিয়ন্ত। সন্ধাস্তরীয়  
কলা অস্থিসন্ধির মধ্যে থাকে। কণ্ডরামুগা  
কলা চলনশীল কণ্ডরাসমূহকে বেঁধে রাখিয়া  
থাকে। ডক্ত নিয়ন্ত কলা কেবল ডকের দ্বারা  
জাবৃত অস্থিসমূহের উপরে—অস্থি ও ডকের  
মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহাদের বিষয় পেশী  
ও অস্থিবর্ণনে দ্রষ্টব্য। সন্ধিপ্রসঙ্গে কেবল  
সন্ধাস্তরীয় কলার বিষয় বর্ণিত হইবে।

অচল সন্ধিসমূহে প্রয়োজনানুভাব হেতু  
শ্লেষ্মধরা কলা থাকে না—তাহা পূর্বেই বলা  
হইয়াছে।

### সন্ধিবর্ণনা।

সন্ধি সকলের স্থান, সংস্থান ও চেষ্টাদি  
সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্ত এবং বিশিষ্ট সন্ধির  
প্রতীকারের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন সন্ধিসমূহের বিষয়  
অবগত হওয়া কর্তব্য। তজ্জন্ত সংক্ষেপে সন্ধি  
সকলের ক্রিয় কথিত হইতেছে। উভয় দিকের  
অস্থির বা অস্থির অবস্থার সংযোজন করে  
বলিয়া সন্ধিবন্ধনী স্নায়ুগুলির নামও সেই অস্থি-  
গুলির নামানুসারে ক্রমিত হয়। কখন কখন  
কাকিছিসারেও সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বাহ্যল্য

\* ই—Synovial membrane—সাইনোভিয়াল  
মেমব্রেন।

† ই—Synovia—সাইনোভিয়া।

ভয়ে সকল স্থলে স্নায়ুগুলির নাম লেখা  
হইবে না।

### মস্তকের সন্ধি।

বর্ণনার সুবিধার জন্ত প্রথমে মস্তকের সন্ধি  
হইতে আরম্ভ করা যাইতেছে। শিরঃসন্ধির  
অন্তর্গত অচল সন্ধিগুলির বিষয় সমগ্র কয়েটি  
বর্ণনাকালে বলা হইয়াছেন। এইস্থলে কেবল  
'অধোহস্তসন্ধান' 'শিরোগ্রীব সন্ধান' নামে  
দুইটা সন্ধির বিষয় বলা হইবে।

অধোহস্তসন্ধান—অধোহস্তর  
দুই মুণ্ড দুইটা শাখাশির স্থালকণ্ডের সহিত  
সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সন্ধিযুক্তকে আশ্রয়  
করিয়া অধোহস্ত নীচে ও উপরের দিকে  
বথেষ্ট পরিমাণে খেলিতে পারেন। এই সন্ধিকে  
প্রাচীনরা 'স্নায়সতৃণ্ড' সন্ধি বলিয়াছেন।  
এই সন্ধিযুগের প্রত্যেকটা স্নায়কোষ দ্বারা  
আবৃত এবং বহিঃসীমায়, অন্তঃসীমায় ও  
পশ্চাতে এক একটা স্নায়রজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত।  
সন্ধির উভয় দিকে দৃঢ়পেশী নিবেশ থাকিতেও  
এই সন্ধির দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়; কিন্তু পেশীর  
ক্রিয়ার ব্যাটিক্রম খটলে এই সন্ধিযুগ সহজেই  
বিগলিত হইতে পারে। হস্তসন্ধির চঠাৎ বিশেষ  
খটলে মস্তক যুগ খুলিয়াই থাকে, যুগ খুলিতে  
পারে না।

### শিরোগ্রীব সন্ধি—মস্তক ও পৃষ্ঠ-

বংশের সন্ধিকে শিরোগ্রীবসন্ধি বলে। এই  
স্থানে তিনটা অস্থির মধ্যে পরস্পর সংযোগ  
হওয়ার ত্রিবিধ সন্ধির সৃষ্টি হয়। যথা—

(ক) পশ্চিম কপাল ও চূড়াবলয়ার সন্ধি  
—পশ্চিমকপালের মূলকাটিবংশের সহিত  
কোরসন্ধি এবং অবশিষ্টাংশের প্রত্যন্তসন্ধি হয়।  
হয়। তদ্ব্যতীত কোরসন্ধির দুইটা স্নায়কোষে

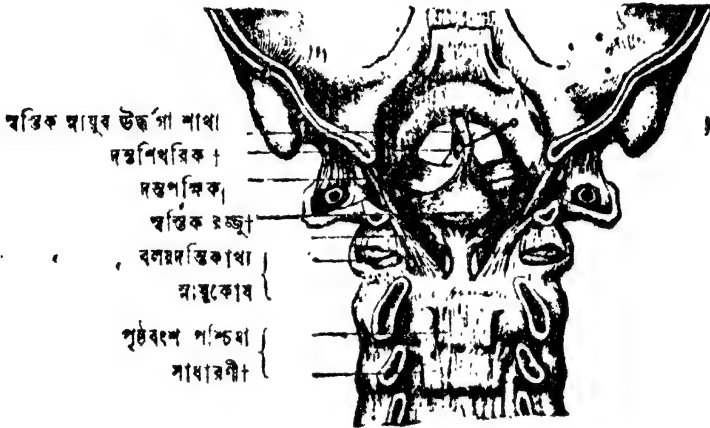
আচ্ছাদিত ও মধ্যে স্নেহধরা কলাযুক্ত। প্রত্যেক  
সন্ধিটী চারিদিকে চারিটি স্নায়ুরাজ্য দ্বারা  
প্রতিবদ্ধ।

(খ) চূড়াবলয় ও দন্তচূড়ার সন্ধি—এই  
সন্ধিতে দ্বিতীয় গ্রীবাংশের সন্ধি দন্তচূড়ার  
দন্তপ্রবর্তন নামক কৌলবৎ অংশ চূড়াবলয়

৭ [ ৪০শ চিত্র—শিরোগ্রীব সন্ধি ( পৃষ্ঠভঙ্গ ) ]

(পশ্চিম কপালের উপরের ও গ্রীবাংশের কাণ্ডালি চক্রাংশ অপসারিত করিয়া দেখান হইয়াছে)

পশ্চিম কপাল



[ ৮ এইরূপ চিত্র স্নায়ুবোধক ]

বিবর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহার সমুখ-  
ভাগ বলয়সন্ধির ভিতর দিকে সংস্কৃত থাকে।  
এইরূপ সংযোগ থাকায় চূড়াবলয়যুক্ত মস্তক  
পৃষ্ঠবংশের উপর সহজে ঘুরিতে ফিরিতে পারে।  
অতএব সমুখভাগে এইরূপ চক্রাকার সন্ধি  
এবং অবশিষ্ট অংশে প্রত্যেক সন্ধি দেখা যায়।  
পাঁচটি স্নায়ু এই স্থানের সন্ধিবন্ধন কাটা  
করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত সমুখের স্নায়ু উভয়  
অস্থির কণেকপিণ্ডের সমুখভাগ বন্ধন করিয়া  
রাখে। পশ্চাতের স্নায়ু দুই অস্থির কণেক-  
চক্রের পশ্চাতীয়া বন্ধন করিয়া থাকে। দুইটি  
স্নায়ু কোষ উভয় অস্থির দুই দিকের দুইটি সন্ধি  
প্রবর্তনক যুগলের সংযোগ করে। 'অস্থিক-

রাজ্য' স্নায়ু চওড়াদিকে চূড়াবলয়ের ভিতরের  
পরিধির উভয়দিকের কলায় বৎ অংশধরে  
সংস্কৃত এবং লম্বালম্বিতাবে উর্দ্ধ দিকে পশ্চাৎ  
কপালমূলের পিছনে স্নায়ুপ্রাণ ও অধোদিকে  
দন্তচূড়ার অগ্রভাগের সহিত সংযুক্ত। ইহা  
সমুখ হইতে দন্তপ্রবর্তনকে চূড়াবলয়ের হিঙ্গ  
যথো যথাস্থানে ধারণ করিয়া রাখে। দন্ত-  
প্রবর্তন স্থানচ্যুত হইলে জ্বরশীর্ণ অহত হইয়া  
তৎকপাৎ মৃত্যু হয়। সমুখকে কাঁসি দিলে  
স্নায়ুরোধের পূর্বেই অনেক সময়ে এই কারণে  
মৃত্যু হইয়া থাকে।

(গ) পশ্চিম কপাল ও দন্তচূড়ার সন্ধি  
—এই দুইখানি অস্থির পরস্পর সংস্পর্শ না



ঘটিলেও স্নায়ুবিধিরে গুড়ভাবে অবস্থিত চারিটা স্নায়ু দ্বারা ইহার পরস্পর সংবদ্ধ থাকে।

শিবোগ্রীব সন্ধির এই সকল স্নায়ু ব্যতীত 'গ্রীবাবধরা' নামে মহতী স্নায়ুবজ্জ পশ্চিম কপালের পশ্চিমার্কদ ও পশ্চিমালিকা হইতে সপ্তমী গ্রীবাকশেরকার পৃষ্ঠকণ্টকে সংলগ্ন হইয়া থাকে। এই স্নায়ু স্থিতিস্থাপক এবং গ্রীবাকে স্বজ্ঞভাবে ধারণ করিয়া রাখে। মনুষ্যের মস্তক সোজা ভাবে থাকে বলিয়া মনুষ্যদেহে এই স্নায়ু তত পুষ্ট নহে। কিন্তু পশুর মস্তক আড়াভাবে থাকে বলিয়া তাহাদের মস্তক ধারণের জন্য এই স্নায়ু অত্যন্ত দৃঢ় ও স্থূল হইয়া থাকে।

মধ্য শরীরের সন্ধি।

**পৃষ্ঠবংশসন্ধি**—পৃষ্ঠবংশ উপস্থাপিত স্থাপিত কশেরকা সমূহের দ্বারা নিশ্চিত। প্রত্যেক কশেরকা উদ্ধৃহিত ও অধঃস্থিত অপর দুইটি কশেরকার সহিত পাঁচটি করিয়া সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ। যথা—

(১) কশেরকাপিণ্ডগুলির পরস্পর-সংযোজনী স্নায়ু। ইহার তিনভাগে বিভক্ত।

(ক) কশেরকপূরঃস্থা সাধারণী, স্নায়ু দৃঢ়, স্থূল ও দীর্ঘ পট্টাকার (ফালির) মত। ইহা সমস্ত কশেরকাপিণ্ডের সমুখ ভাগে সংসক্ত থাকিয়া সমগ্র পৃষ্ঠবংশের সাধারণ বন্ধন স্বরূপে অবস্থিত। (খ) 'কশেরকপশ্চিমা সাধারণী'—উপরোক্ত স্নায়ুর ভার কশেরকাসমূহের পশ্চাৎ ভাগের সাধারণ বন্ধন স্বরূপ। (গ) 'কশেরকপিণ্ডান্তরাল' স্নায়ুগুলি কোমল, স্থিতিস্থাপক ও কশেরকপিণ্ডমধ্যস্থ তরুণাঙ্কি চক্রে সংসক্ত।

(২) কশেরকচক্রের পরস্পর সংযোজনী স্নায়ু সকল কশেরকচক্রগুলির মধ্যে মধ্যে অবস্থিত, স্থিতিস্থাপক ও দীর্ঘতর। ইহার 'কশেরকচক্রান্তরাল' নামে অভিহিত।

(৩) প্রত্যেক কশেরকার দুইটি নিম্নাভিমুখ সন্ধিপ্রবন্ধনের সহিত নিম্নস্থিত কশেরকাব উর্দ্ধাভিমুখ সন্ধিপ্রবন্ধনদ্বয়ের সন্ধি হয়। ক্রমশঃ পরে পরে এইরূপ সন্ধি হইয়া থাকে। এত সন্ধিগুলি স্নায়ুকোষের দ্বারা আবৃত ও ভিতরে শ্লেষ্মধরা কলাযুক্ত।

(৪) পৃষ্ঠকণ্টকগুলির সন্ধানকারক স্নায়ুসমূহ দুই প্রকার, তন্মধ্যে—

(ক) 'পৃষ্ঠকণ্টকধরা সাধারণী' স্নায়ু দৃঢ় রজ্জ্বব্রত সমস্ত পৃষ্ঠকণ্টকগুলির সংযোজন করে এবং পশ্চিম কপালের পৃষ্ঠস্থিত অর্ধদ হইতে ত্রিকোণীয় পৃষ্ঠকণ্টক পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উর্দ্ধ ভাগই 'গ্রীবাবধরা' স্নায়ু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(খ) 'কটিকান্তরাল' স্নায়ু সকল পৃষ্ঠকণ্টকগুলির অন্তরালে অবস্থিত এবং পাতলা কলা দ্বারা নিশ্চিত। এই সকল স্নায়ু পৃষ্ঠকশেরকা ও কটিকশেরকাগুলিতে বিশেষ ভাবে পরিণত দেখা যায়।

(৫) 'বাহপ্রবন্ধনান্তরাল' স্নায়ুগুলি বাহপ্রবন্ধন সকলের অন্তরালে থাকিয়া পরস্পরকে বন্ধন করে। ইহার গ্রীবাকশেরকা ও কটিকশেরকাগুলিতে পাতলা কলার আকারে এবং পৃষ্ঠকশেরকা সমূহে রজ্জুর আকারে দৃষ্ট হয়।

কশেরকপিণ্ড সকলের পরস্পর সন্ধি প্রায় অচল। কশেরকচক্র সকলের পরস্পর সন্ধি অচল। গ্রীবা ও কটিকশেরকার সন্ধিগুলি

অপেক্ষাকৃত অধিক চল। পৃষ্ঠবংশের চেষ্টা বা চল স্বাভাবিক, যথা—সমুখে নমন বা অন্তরায়, পশ্চাতে নমন বা বহিরায়া এবং উভয় পাশ্বে নমন। পার্শ্ববিবর্তন এই তিন প্রকার চেষ্টার মিশ্রণে হইয়া থাকে।

— **পৃষ্ঠপশ্চাৎকাসন্ধি**—পশ্চাৎকাসন্ধি সহিত পৃষ্ঠবংশের কশেরকার সন্ধিকে পৃষ্ঠ-পশ্চাৎকাসন্ধি বলে। এই সন্ধি দুই প্রকার যথা—

(১) পশ্চাৎকাসন্ধির সহিত কশেরকা-পিণ্ডের চলপ্রভব জাতীয় সন্ধি। তন্মধ্যে প্রথম, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী—এই পশ্চাৎকাসন্ধির প্রত্যেকটি এক একটি কশেরকাপিণ্ডের পূর্ণহালকের সহিত পৃথক্ ভাবে সংহিত হয়। অপরগুলির প্রত্যেকটি দুইটি কশেরকাপিণ্ডের অর্দ্ধহালকবয়ের সন্ধিযুক্ত হয়। ইহা প্রধানতঃ ত্রিশূলকার দ্বারা বা উপর নীচের কশেরকাপিণ্ডবয়ের ও তন্মধ্যস্থ উরুগা-চক্রের সহিত সংযুক্ত। এখানে পশ্চাৎকাসন্ধির যেইনভূত একটি কোষাকার দ্বারা ও তন্মধ্যে সত্যতরীয় দ্বারাও থাকে।

(২) পশ্চাৎকাসন্ধির সহিত কশেরকার বাহ্যপ্রবর্তনের যুক্তপ্রভব সন্ধি। ইহা সমুখে, পাশ্বে ও পশ্চাতে বন্ধুৎ দ্বারা এবং মধ্যে কোষবৎ দ্বারা প্রতিবদ্ধ।

**পূর্বপশ্চাৎকাসন্ধি**—পশ্চাৎকাসন্ধি এবং উপপশ্চাৎকাসন্ধির সন্ধিসমূহ এই নামে খ্যাত। এই সন্ধি চারি প্রকার যথা—

(১) পশ্চাৎকাসন্ধির সহিত উপপশ্চাৎকাসন্ধির সন্ধি—বারাণসি পশ্চাৎকাসন্ধির অগ্রভাগস্থ হালকের সহিত বারাণসি উপপশ্চাৎকাসন্ধির মূলের দৃঢ় ও অচল সন্ধি হইয়া থাকে।

(২) উপপশ্চাৎকাসন্ধির সহিত উরুঃকলকের সন্ধি—এক একদিকের প্রথম সাতবারি করিয়া উপপশ্চাৎকাসন্ধির সহিত উরুঃকলকের পার্শ্বস্থ হালকগুলির সন্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম পশ্চাৎকাসন্ধির সন্ধি অচল, অবশিষ্ট-গুলি যুক্তপ্রভব। অগ্রিষ্ঠা, পশ্চিমা, কোষাকারী এবং সত্যতরীয়—এই চারি প্রকার দ্বারা উপপশ্চাৎকাসন্ধি ও উরুঃকলকের সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে।

(৩) উপপশ্চাৎকাসন্ধির পরস্পর সন্ধি—পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী উপপশ্চাৎকাসন্ধির অগ্রভাগস্থ উরুঃকলকে সংযুক্ত হইলেও উহাদের সমুখের কোণ উত্তরোত্তর পশ্চাৎকাসন্ধির কোণের সহিত কতকগুলি দ্বারা সংযুক্ত। অষ্টমী, নবমী ও দশমী উপপশ্চাৎকাসন্ধির অগ্রভাগ কেবল পূর্ব পূর্ব উপপশ্চাৎকাসন্ধির কোণের সহিত ঐরূপে প্রতিবদ্ধ—উহাদের উরুঃকলকের সহিত সন্ধি নাই। একাদশী ও দ্বাদশী উপপশ্চাৎকাসন্ধির অগ্রভাগ বিমুক্ত—অর্থাৎ কাহারও সহিত সন্ধিযুক্ত নহে।

(৪) উরুঃকলকের খণ্ডগুলির পরস্পর সন্ধি—অন্য বরসে উরুঃকলকের গ্রৈবেরক, মধ্যকলক এবং অগ্রপত্র নামক খণ্ডত্রয় পরস্পর সন্ধিযুক্ত ও দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে। প্রৌঢ় বরসে এই খণ্ডত্রয় ভুজিয়া-বার।

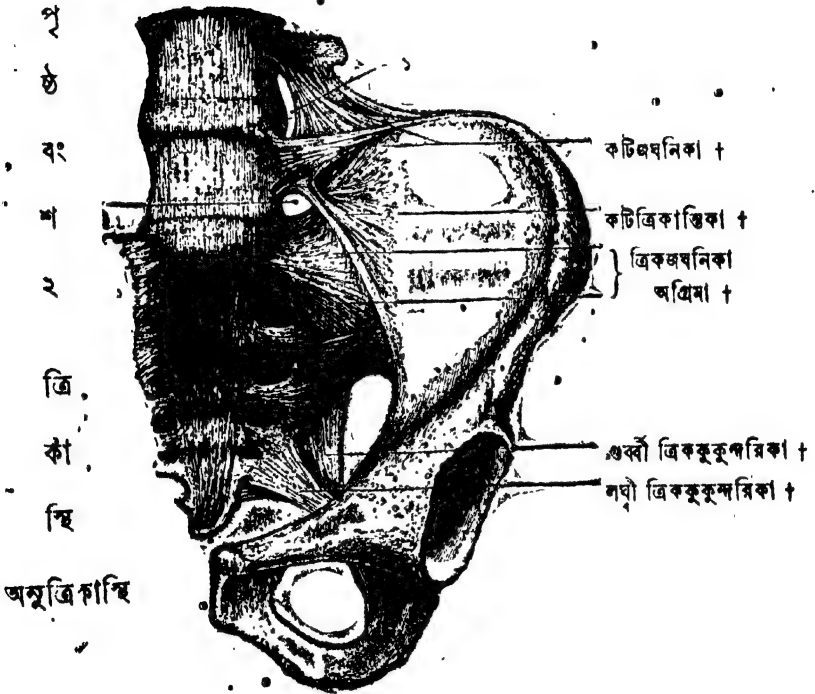
**অক্ষকোষের সন্ধি**—উরুঃকলকের উর্দ্ধভাগের দুইপার্শ্বে দুইখানি অক্ষকোষের অগ্রভাগ দ্বারা কোষাকারী সন্ধিযুক্ত ও দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে। এই সন্ধি দৃঢ় করিবার জন্য অক্ষকোষের প্রথম পশ্চাৎকাসন্ধির সহিত ও দ্বারা সংযুক্ত থাকে। অক্ষকোষের পরস্পর সন্ধি সাধারণ সন্ধি সাধারণেও এক দ্বারা উরুঃ

ফলকের শিখরদেশের উপর দিয়া উহাদের  
• লম্বু প্রান্তদ্বয়কে সংবদ্ধ করিয়া রাখে।  
অংসসন্ধি বর্ণন প্রসঙ্গে অক্ষকাঙ্কির সহিত  
অংসের সন্ধানের বিষয় বলা বাইবে।

**শ্রোণিচক্রসন্ধি** — শ্রোণিচক্র-  
সন্ধি দুই ভাগে বর্ণনীয়। শ্রোণিফলকদ্বয়ের  
পৃষ্ঠবংশের সহিত সন্ধি এবং পরস্পরের সন্ধি।

শ্রোণিফলকদ্বয়ের সহিত পৃষ্ঠবংশের দৃঢ়প্রত্যয়  
সন্ধি হয়। ইহা পক্ষমী কটিকশেপককার সহিত  
ত্রিকাঙ্কির সন্ধি আশ্রয় করিয়া থাকে। পৃষ্ঠ-  
বংশের সন্ধারণী যে পাঁচ প্রকার স্নায়ুর বিষয়  
পূর্বে বলা হইয়াছে, সেই পাঁচ প্রকার স্নায়ু  
দ্বারা এই স্থলেরও সন্ধিবন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন  
হয়। কেবল এক এক ঋদিকে দুইটি করিয়া  
স্নায়ু বেশী থাকে। যথা—

[ ৪১শ চিত্র—শ্রোণিচক্র সন্ধি ]



শ্রোণিফলক

[ + এইরূপ চিত্র দান্যবোধক। ১, ২ কটিনাড়ী নির্গমের বিবরণ। এই চিত্রের বামার্ধে  
বক্রণ স্নায়ু দেখান হইয়াছে দক্ষিণার্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ]

০—প্রাণ।

‘কটিকখনিকা’ নামে দুইটা মায়ু চতুর্থা ও পঞ্চমী কটিকশেককার বাহুপ্রবর্তনকগুলির সহিত উভয়দিকে জঘনধারার পশ্চিম প্রান্ত-ভাগকে সংবদ্ধ করে। ‘কটিক্রিকান্ধিকা’ মায়ু দৃঢ় ও ত্রিকোণ কালির দ্বারা, ইহা পঞ্চমী কটিকশেককারে ত্রিকোণের ও শ্রোণিকলকের দিক স্থালকের পশ্চিমের সহিত সংবদ্ধ করে।

শ্রোণিকলকাঙ্কিত্রয়ের পর-স্পন্ন সন্ধি চারি প্রকারে নিম্ন হইবে—

(১) ত্রিকোণের সহিত জঘনাস্থির সন্ধি—ত্রিকোণের উভয় দিকে জঘনকপালয়ের সহিত ‘দৃঢ় প্রত্য’ সন্ধি হয়। এই সন্ধি জঘন-কপালের তরুণস্থিপ্রত্যাবৃত ত্রিকল্লানকের সহিত ত্রিকোণের পার্শ্বদেশে হইয়া থাকে। এখানে প্রায় স্নেহধরা কলা দেখা যায় না, কিন্তু গভীরী জীলোকের গভীরুই হেতু শ্রোণিকলক যখন সঙ্গ হয়, তখন স্নেহধরা কলাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ‘অগ্রিমা ত্রিকজনিকা’ ও পশ্চিমা ত্রিকজনিকা নামে এক এক দিকে দুইটা করিয়া দৃঢ়পট্টকার মত মায়ু ত্রিকজনসন্ধির বন্ধন কার্য করিয়া থাকে।

(২) ত্রিকোণের সহিত কুকুম্বের সন্ধি—ত্রিককুকুম্বরাহিসংযোজনী লম্বা ও শুক্ল নামে নামে এক একদিকে সমুদ্রে ও পশ্চাতে দুইটা করিয়া মোট চারিটা মায়ু দ্বারা নিম্ন হইবে। এই সকল মায়ু বধ্যস্থানে সংসক্ত হইয়া ‘গুঞ্জদৌবিবর’ ও ‘কুকুম্বার’ নামে দুইটা বিবর নির্মাণ করে। তদাধো গুঞ্জদৌ নাকী এবং তদনুবর্তিনী সিরী ধমনী ও তদুপাধা পেশী নির্গত হইয়া থাকে। আর কুকুম্ব-বিবরের তিতর দিয়া ‘শ্রোণিগব্যাকনী’ পেশী

এবং তদনুবর্তিনী সিরী ধমনী ও নাকী বস্তি-গুহায় প্রবেশ করিয়া থাকে।

(৩) ত্রিকামুত্রিকসন্ধি—অগ্রিমা, পশ্চিমা এবং দুইটা পার্শ্বগা—এই চারিটা মায়ু ত্রিকোণ ও অমুত্রিকোণের সন্ধি বন্ধন কার্য নিম্পন্ন করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অমুত্রিকোণ চারিখানি ক্ষুদ্র কশেককাপণের সংযোগে নির্মিত, কিন্তু প্রথমকালে শ্রোণি-ধারের বিস্তারের সুবিধার জন্য নারীদিগের দেহে স্বভাবতঃ ঐ খণ্ড চতুষ্টয় পৃথক্ ভাবে থাকে।

(৪) ভগাঙ্কিত্রয়ের সন্ধিত্রিগাঙ্কিত্রয় মধ্য-ধেবার ব ব মুণ্ডদ্বারা পরস্পর সংহিত হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা সংহিত ভগাঙ্কিত্রয়কে একখানি পৃথক্ অস্থি বলিয়া গণনা করেন। এই সন্ধি দৃঢ়প্রত্য হইলেও গভীরীদিগের দেহে কিঞ্চিৎ বিফারিত হইতে পারে। উক্তবা, অধরা, অগ্রিমা ও পশ্চিমা এই চারিটা ‘ভগ-সংযোজনী’ মায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য নিম্পন্ন করে। উক্ত সন্ধিরমধ্যে তরুণস্থি-চক্র থাকে, কিন্তু স্নেহধরা কলা থাকে না।

### শাখাসন্ধি।

প্রত্যেক বাহুতে ও সন্ধিতে সাতটা স্থানে সন্ধি আছে। বাহুতে যথা—অঙ্গ, কূর্ণের, প্রেকোষ্ঠান্তরালে, মণিবন্ধে, কঙ্ককূর্ভাঙ্কিত্রয় করতলে এবং কাম্বালিসন্ধি। সন্ধিতে যথা—অঙ্গ, কাহুতে, জঘাতরালে, পদসন্ধিতে, পাদকূর্ভাঙ্কিত্রয় মধ্য, পদতলে এবং পদালুলি সন্ধি। প্রত্যেকের বিবর পৃথক্ লিখিত হইবে।

## উদ্ভিগ্ণাংসসন্ধি।

**অংসসন্ধি**—অক্ষক, অংসফলক ও প্রগণ্ডাহি—এই তিনটি অস্থির যোগে এই সন্ধি নির্মিত। অক্ষক ও অংসফলকের সন্ধিকে অংসচক্র, সন্ধান এবং প্রগণ্ড ও অংসফলকের সন্ধানকে অংসাদুখল সন্ধি বা কক্ষা-সন্ধি বলে।

**অংসচক্র সন্ধান**—অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্ত এবং অংস কূটগ্রের সংযোগে এই ‘চলপ্রান্ত’ সন্ধিটি নির্মিত হয়। এই সন্ধিবন্ধনী চারিটি স্নায়ুর মধ্যে ‘অংসাককবন্ধনী’ উত্তরা ও অধরা নামে দুইটি উর্দ্ধ ও অধোদিকে অংস এবং অক্ষকাস্থির বন্ধন কার্য নিষ্পন্ন করে। ‘তুণ্ড-অক্ষকবন্ধনী’ ত্রিকোণিকা ও চতুরস্রিকা নামে দুইটি স্নায়ু অংসতুণ্ডের পশ্চাদ্ধের সহিত অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্তের উর্দ্ধাধস্তলকে সংবদ্ধ করিয়া থাকে। অংসফলকের তুণ্ড ও কূট নামক অবয়বদ্বয়ের মধ্যে ‘তুণ্ডমূলিকা’ নামে দুইটি স্নায়ু আছে।

**অংসাদুখলক সন্ধি বা কক্ষাসন্ধি**—অংস পীঠের ‘নাতিগভীর উদুখলাকার স্থানকটি পরিধিতে তরুণাশ্বিচক্রের সংযোগে গভীর কোটারাকার হয়। উহার মধ্যে প্রগণ্ডাহির মুণ্ড সংসক্ত হইয়া এই সন্ধি নির্মিত হয়। দুইটি স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটি ‘অংসাদুখলিক’ নামক দীর্ঘ শিথিল স্নায়ুকোষ। ইহা উর্দ্ধে অংসাদুখলের চারিদিকে এবং নিম্নে প্রগণ্ডাহির ঐবা বেঁটন করিয়া অবস্থিত। ইহার মধ্যে বৃহৎ স্নেহধরা কলা বর্তমান। স্নায়ুকোষের তিনটি ছিদ্র দিয়া এই কুলার তিনটি কণ্ডারামুণ্ড

শাখা বাহির হইয়া কণ্ডারামুণ্ডের ক্রিয়ার সহায়তা করে। কণ্ডারামুণ্ড ‘অংসান্তরিকা’ অধরা, ‘অংসপৃষ্ঠিকা’ এবং ‘বিশিরঙ্কা’ পেশীর দীর্ঘশিখা নামে প্রসিদ্ধ। শেথোক্ত কণ্ডারামুণ্ডের ভিতর পর্যন্ত প্রবিষ্ট। দ্বিতীয় স্নায়ুটি ‘তুণ্ডপ্রগণ্ডিকা’ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অংস-তুণ্ড এবং প্রগণ্ডাহির মহাপিণ্ডের সংযোগন করে এবং স্নায়ুকোষের গাজে প্রতিবদ্ধ।

**শৈশী**—নিম্নলিখিত পেশীগুলি অংস-সন্ধিকে বেঁটন করিয়া অবস্থিত বখা—উর্দ্ধে উত্তরা অংসপৃষ্ঠিকা, নিম্নে বিশিরঙ্কাপেশীর দীর্ঘশিখা, অন্তঃপার্শ্বে ‘অংসান্তরিকা’, বহিঃপার্শ্বে অধরা অংসপৃষ্ঠিকা ও স্নায়ু অংসান্তরিকা, স্নায়ুকোষের অভ্যন্তরে বিশিরঙ্কা পেশীর দীর্ঘশিখা এবং সমগ্র অংসসন্ধি ও অংসচক্র আচ্ছাদন করিল অংসজ্ঞা।

**চেষ্ঠা**—এই সন্ধিকে আশ্রয় করিয়া সন্মুখ, পশ্চাৎ, ভিতর ও বাহির দিকে নানা প্রকার আকর্ষণাদি চেষ্ঠা হইয়া থাকে। এই সন্ধিতে প্রগণ্ডাহির মুণ্ড বখেষ্টে বিবর্তিত হয় বলিয়া ইহাকে সমস্ত সচল সন্ধির প্রধান বলা যায়।

**কূটপন্ন সন্ধি**—প্রগণ্ডাহির অধঃপ্রান্ত এবং প্রকোষ্ঠাশ্বিচক্রের উর্দ্ধপ্রান্ত সংযোগে এই সন্ধি নির্মিত হয়। অধঃপ্রকোষ্ঠাশ্বির সন্মুখাংশের কূটপন্নের মধ্যস্থলে প্রগণ্ডাহির ডমরুবৎ অংশ সংহিত বলিয়া ইহাকে ‘সন্মুখাংশকোর’ সন্ধি বলে। বহিঃপ্রকোষ্ঠাশ্বির কোরমধ্য মুণ্ড এই স্থানে প্রগণ্ডাহির কলসীর সহিত সংহিত হইয়া থাকে এবং উক্ত মুণ্ডের পার্শ্বদেশ এই সন্ধির মধ্যেই ‘মুণ্ডবেষ্টনিকা’ স্নায়ু দ্বারা অন্তঃপ্রকোষ্ঠির পার্শ্বে সংহিত হয়।

[ ৪৩শ চিত্র—কূপের সন্ধি ( আন্তর তল )

..



[ + এইরূপ চিত্র প্রায়বোধক ]

কূপেরসন্ধিবন্ধনী দ্বারা চারিটা—অগ্রিমা, পশ্চিমা, বহিঃপার্শ্বিকা ও অন্তঃপার্শ্বিকা।  
উল্লেখ্য—

অগ্রিমা বা সমুদ্রস্থ দ্বার এক প্রান্ত প্রগণ্ডাহির অন্তরকর্মে দের সমুদ্রতলে সম্বন্ধ এবং অপর প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাহির চকুপ্রবর্তনের পরিধিতে ও মুণ্ডবেটনিকা দ্বার সহিত সম্বন্ধ। পশ্চিমা দ্বার এক প্রান্ত কূপেরখাতের উপকণ্ঠে এবং অন্তঃপ্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাহির কূপেরকূটের পরিধির সহিত সংস্কৃত। বহিঃপার্শ্বিকার এক প্রান্ত প্রগণ্ডাহির বাহ্যকর্মে এবং অন্তঃপ্রান্ত মুণ্ডবেটনিকা দ্বার সহিত সংস্কৃত। অন্তঃপার্শ্বিকা দ্বার এক প্রান্ত প্রগণ্ডাহির

অন্তরকর্মে এবং অন্তঃপ্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাহির কূটের পরিধির অন্তঃসীমার সংস্কৃত।

চেষ্টা—কূপেরসন্ধির চেষ্টা, চারি প্রকার—সকোচ, প্রসার, অন্তর্নিবর্তন ও বহির্নিবর্তন। উল্লেখ্য—প্রসার দ্বারা বাহিঃ দণ্ডবৎ হইতে পারে, বিপরীত দিকে নত হয় না।

প্রসারকলা—এই সন্ধির অধঃস্থিত স্নেহধরা কলার দ্বারা প্রকোষ্ঠাহিরের উর্দ্ধগতি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

প্রকোষ্ঠাস্তরীয়া সন্ধি—প্রকোষ্ঠাহিরের উর্দ্ধ ও অধঃপ্রান্তে কোয়-সন্ধি এবং অধঃস্থলে প্রান্তর সন্ধি হইয়া থাকে। এই সকল সন্ধি অরুণে। উর্দ্ধপ্রান্তে বহিঃ

প্রকোষ্ঠাঙ্গির যুগু অস্ত্রঃপ্রকোষ্ঠাঙ্গির চক্র-  
নির্মিতথে সংহিত হয় এবং বহিঃপ্রকোষ্ঠাঙ্গির  
যুগের বিবর্তনগ্রন্থ 'যুগবেষ্টনিকা' দ্বাযু এই  
সম্মিলন কার্য করিয়া থাকে । 'প্রকোষ্ঠা-  
তিরশ্চনা' নামে অপর একটি দ্বাযুও এই  
স্থানের অধোদেশের বন্ধনবন্ধনে তিষ্ঠাগুভাবে  
অবস্থিত । প্রকোষ্ঠাঙ্গির যুগুও বহিঃপ্রকোষ্ঠাঙ্গির

অধঃপ্রান্তের পার্শ্বে সংহিত হইয়া থাকে ।  
সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটা দ্বাযু এবং মণিবন্ধ-  
সন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট ত্রিকোণ তরুণাঙ্গি দ্বাযা  
এই সন্ধির বন্ধন কার্য সম্পন্ন হয় । মধ্য-  
নলকণ্ঠের সন্ধানে অস্থিযুগের পরস্পর  
সংস্পর্শ হয় না, পরন্তু 'প্রকোষ্ঠাস্থালা' নামে  
দৃঢ় কলা দ্বাযা ইহার পরস্পর আবিদ্ধ  
থাকে ।

( ক্রমশঃ )

## বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ।



বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যেরূপ দিন দিন অকুশল  
হইয়া পড়িতেছে, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালা-  
দেশে যুত্থা সংখ্যা বেরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত  
হইয়া উঠিতেছে তাহা ভাবিবার কথা । এক  
সময়ে বাঙ্গালার অবস্থা একরূপ ছিল না । তখন-  
কার বাঙ্গালী এখনকার অপেক্ষা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন  
ছিলেন কি না—সে বিচার আমরা করিব না,  
তবে তখন অপেক্ষা এখনকার বাঙ্গালী হয় তো  
অনেক বিষয়ে পরিমার্জিত বুদ্ধি লইয়া  
সত্যতার চরমসীমার উপনীত হইয়াছেন এবং  
সেই সঙ্গে অর্থোপার্জনের পন্থাও পূর্ণাঙ্গপেক্ষা  
শুলভ করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু শারীরিক  
সামর্থ্য—তথা পরবায়ু লাভ বিষয়ে এখনকার  
বাঙ্গালী যে সেকালের বাঙ্গালীর অনেক  
নিম্নতরে পতিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে আদৌ  
সন্দেহ নাই ।

তখনকার বাঙ্গালীর সকলেই লেখাপড়া  
শিখিত না, তাহার কারণ সেকালে চাকরি  
ক' অর্থে কৃত্রিম নির্কাহের কল্যাণ এখনকার

মত বাঙ্গালী যাহেই প্রথম হইতে করিয়া  
রাখিতেন না । সেকালের গোয়াল-বাঙ্গালী  
জানিত—দুগ্ধ বিক্রয়ের অর্থেই তাহার সংসার  
যাত্রা নির্বাহ হইবে, মালাকার জাতীয় বাঙ্গালী  
জানিত—পূজা-পার্বণে দেবী প্রতিমার সজ্জা  
বিত্তাসে—তথা বরবধূর মিলন জনিত কতক-  
গুলি কার্যে তাহার জীবিকা নির্বাহ হইবে ।  
বাঙ্গালী-তিলি জানিত কিছু না করিতে  
পারিলে সে বুদ্ধিমানের দোকান করিয়া  
উদ্যোগের সংস্থান করিবে । বাঙ্গালী-তত্ত্বাব  
সকল বাঙ্গালীর বস্ত্র ধোগাইত, কাজেই  
তাহাকে অল্প উপারে জীবিকানির্বাহের চিন্তা  
করিতে হইত না । বাঙ্গালী-বোদক মিষ্টান্ন  
প্রস্তুতকরিত । বাকুইজাতীয় বাঙ্গালী সকলকে  
তাহুল ভোগাইত, কুস্তকার ঘট নির্মাণ করিত,  
কর্মকার—বাঙ্গালীর প্রয়োজনীয় কুঠারাদি  
অল্প প্রস্তুত করিত, নাগিত কোরকার্য  
করিত,—কাজেই বাঙ্গালীর নবশাক  
জাতীয়ের মনে সেকালে চাকরি করিবার

করনা আদৌ উপস্থিত হইত না। সেকালের নবশাক জাতীয় বাঙ্গালীর এইজন্য লেখাপড়া শিখিবাব আবশ্যকও হইত না।

সেকালে বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত লেখাপড়া শিখিত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবগণ। বাঙ্গালী কারুশিল্প লেখাপড়া শিখিত বটে, কিন্তু সে বিজ্ঞার পরিসমাপ্তি প্রায়ই শিশুবোধক এবং স্তম্ভকরী পাঠেই হইয়া বাইত, কেহ কেহ একটু আরবী, একটু পারসী একটু উর্দু শিক্ষা করিতেন, তাহার ফলে নবাব সরকারে চাকরির একটু সুবিধা হইত। ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবজাতির বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইতেন, কিন্তু তাহা চাকরি কবাবার উদ্দেশ্যে নহে। ব্রাহ্মণেরা 'টোল' খুলিয়া অধীত বিজ্ঞার অধ্যাপনার আরও বিভাগান্তের পন্থা পরিচালনা করিতেন, বৈষ্ণব চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রশিক্ষার ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণেরই মত জ্ঞানার্জন্যের উপায় করিতেন।

এখন সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন বাঙ্গালীর সকল জাতিতেই পণ্ডিত হউক না হউক—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভের জন্য ব্যগ্র হইতেছে। উদ্দেশ্য—সহজে চাকরিপ্রাপ্তির উপায় বিধান। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের জন্য বাঙ্গালীর কোমলমতি শিশুবিগের বাহ্য প্রথম হইতেই জাহিরা বাইতেছে, তাহার পর চাকরি জীবনে যে স্বচ্ছন্দ্য অর্জন করিয়া হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালীর অকর্মণ্যতা, একান্তই অবশ্যস্বাবী।

এখনকার দিনে অজীর্ণ বা ডিসপেন্সিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে পতকরা ৭৫ জনের বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু এই অজীর্ণরোগের

কারণ কি? বাঙ্গালী ভেলের অনেকটাই মৃত্তি-ভাবক শূন্য অবস্থায় মেসে-বোর্ডিংয়ে অবস্থিতি করে, স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধি সকল তাহা দিগকে কেহ শিখাইয়া দেয় না। অধিক জলপান বিষম-ভোজন (অন্ন ভোজন, বহু ভোজন বা অসময়ে ভোজন) মূল মুহাদিব বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ—এই সকল কারণে যে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়—এ সব কথা তাহাদিগকে কেহ বলিয়া দেয় না। বলিয়া দিলেও ঘটনাক্রমে সে সকল পীড়ন করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইয়া উঠে না। মাতাভগ্নী পরিত্যক্ত অন্নমতি শিশুগণ ফিক্স-কেমিস্ট্রীর ভবন সকল অবগত হইতে গিয়া যখন অবসর হইয়া পড়ে, তখন কলিকাতার মত স্থানে সহজলভ্য-চারের লোভ সম্বরণ অথবা সোডা-গেমনোড-সব-বতের পিপাসা পূর্ণ না করিয়া তাহার থাকিতে পারে না। ফলে অজীর্ণের প্রধান কারণ অধিক জলপান এইরূপ ভাবে ছাত্র জীবনেই অনেকের নিকট অভ্যস্ত হয় এবং কালে কর্তব্য জীবনেও অভ্যাস দোষে অনেকে সে দোষ পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহার পর অন্ন ভোজন—বহু ভোজন—ইহাও ছাত্রজীবনে অপরিহার্য। এখানে অন্ন ভোজন অর্থে খুরিা লইতে হইবে—বাঙ্গালী বালককে যে পরিমাণ শ্রম, স্বীকার পূর্বক বিভাজন করিতে হয়, মেসে-বোর্ডিংয়ে থাকিয়া সে পরিমাণ আহাৰ্য্যলাভ প্রাপ্ত হই তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটনা উঠে না। অন্ন, রাত্রি জাগরণ—সে তো ডিগ্রি লাভের কার্য্য নয় না করিলে উপায় নাই। ফলে নানা কারণে অজীর্ণের বীজ বাঙ্গালী



শিশুর প্রাথমিক জীবনেই বাহ্যিক অক্লান্তি  
হইতে পড়ে—কালে কর্ম্মের জীবনে তাহাই  
বঙ্গালীর আয়ুষ্কালের সর্বপ্রধান কারণ হইয়া  
উঠিতেছে। অনেক বঙ্গালীই অক্লান্তিপ্রবণ  
হইতেছে এই কারণে।

বহুকাল চিকিৎসা কার্যে ব্যাপৃত  
থাকিয়া আমরা যতদূর বুঝিগাছি, তাহাতে  
এই অক্লান্তি হইতেছে বঙ্গালী জাতীর  
আয়ুষ্কালের সর্বপ্রধান কারণ। আমরা  
ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইয়া কাজ নাই—  
এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু যেরূপ ভাবে  
তাহাদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা  
হয়, তাহার পরিবর্তন করা যে উচিত—  
একথা মুক্তকণ্ঠে বলিব। আমরা এগনকার  
দিনে ছেলেবা কেবল নির্দিষ্ট গ্রন্থগুলি  
আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেছে কিনা তাগাই  
দেখি—কিন্তু তাহাব ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য  
অক্ষয় থাকিতেছে কিনা তাহার চিন্তা তো  
মোটেই করিনা। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে  
ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা আছে—এ কথাটা  
এগনকার অনেক পিতামাতারই জ্ঞান নাই।  
বিশ্বাস্য সমুদ্রে অবস্থা সে ব্যায়ামের ব্যবস্থা  
অল্পবিস্তর প্রবর্তিত আছে, কিন্তু সে ব্যায়ামের  
কাল যে সময়ে নির্দিষ্ট—তাহা কখনই বঙ্গালী  
শিশুর পক্ষে উপযুক্ত নহে। বঙ্গালী বালক-  
দিগকে যে সকল ব্যায়াম করান হয়, উপযুক্ত  
খাত্তের অভাবে তাহাও বঙ্গালীশিশুর পক্ষে  
প্রকৃষ্ট নহে। সেকালে ছেলেদের ব্যায়ামের  
ব্যবস্থা ছিল—হেঁড়োডুড়, কপাটখেলা প্রভৃতি।  
একালের ব্যায়াম হইয়াছে, ব্যাটবল, ক্রীটবল  
প্রভৃতি। এ সকল ব্যায়ামের ব্যবস্থা  
ইংরাজ জাতির নিকট আমরা শিক্ষা

করিয়াছি। ইংরাজ সভাবতঃ মাংসাদী  
জাতি। মাংসাদী জাতির পক্ষে ঐরূপ  
ব্যায়াম যেরূপ ফলোৎপাদক হয়, শাক্য-  
ভোজী বঙ্গালী শিশুর পক্ষে তাহা কখনই  
উপযুক্ত নহে, কাজেই এই ধরণের ব্যায়াম  
চর্চায় অনেক স্থলে বঙ্গালীবালক বশবী  
হইলেও তাহা যে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার  
পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে তাহা স্পষ্টচর।

সেকালে বঙ্গালীশিশুর লেখাপড়ার সময়  
নির্দিষ্ট ছিল—প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে।  
বঙ্গালীর কর্ম্মকালও নির্দিষ্ট ছিল ঐ দুইটি  
সময়। দ্বিপ্রহবে সকলেই বিশ্রাম গ্রহণ  
উপভোগ করিতেন, এখন দেশ হইতে সে  
প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ফলে 'আহারান্তে  
ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইতে না হইতেই  
বঙ্গালী শিশুকে জ্যামিতি-বীজগণিতের তত্ত্ব  
অবেষণে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে হয়—  
বঙ্গালী কর্ম্মীর পক্ষেও ঐ ব্যবস্থা। বঙ্গালীর  
আয়ুষ্কালের ইহাও কারণ। তাহার পর  
ব্রহ্মচর্যের কথা। ব্রহ্মচর্যপালন বঙ্গালী বালক  
তো এখনকার দিনে করিতেই জানেনা,—  
সে ব্রহ্মচর্য শিক্ষাদানের স্পৃহাও কাহারও  
নাই। সেকালে বঙ্গালী বালকের অধ্যয়ন-  
কাল যতদিন পূর্ণ না হইত—ততদিন তাহা-  
দিগের ব্রহ্মচর্য রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে  
ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইত। সেকালের  
গুরুগৃহের অধ্যয়নের ব্যবস্থা ইহারই অঙ্গ  
নির্দিষ্ট ছিল। এখন সে গুরুও নাই, সে  
ছাত্রও নাই। ফলে ব্রহ্মচর্যহীনতাই যে  
এখনকার দিনে আমাদের আয়ুষ্কালের  
সর্বপ্রধান কারণ এবং কলিকাতার বঙ্গা  
বুঝি যে তাহারই ফলসমুদয়, তাহা প্রত্যেক  
অভিভাবকই চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের  
সমীক্ষিত অগ্রদ্রোহ। আমরা সমসাময়িক  
সমক্ষে সমীক্ষণ আলোচনা করিব।

## পদ্ম।

( কবিরাজ শ্রীহরিশ্রীসন্ন রায় কবিরত্ন )

**পদ্ম**—পদ্ম ত্রিবিধ, যেতপদ্ম, নীলপদ্ম রক্তপদ্ম। নীলপদ্ম এখন এতদেশে দৃষ্ট হয় না। পুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধে ক্ষু হইয়া মহামারী ভগবতীকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য এক লক্ষ নীলপদ্ম দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত একটা অপহৃত হওয়ার পূজায় বিরোপন্ন হয়, পবন ভক্ত রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সংকল্পিত পদ্মের সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য নিজের দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া পূজা সমাপনের বাসনা করিলে, মহামারী মহাশক্তি তক্তের বাসনা পূর্ণার্থে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাবণবধের বরদান করিয়াছিলেন। এই পুরাণোক্ত বর্ণিত বিধি নীলপদ্মের সংখ্যা অবগত হওয়া যায়। উহা না কি রামভক্ত হস্তমান কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল।

রক্তপদ্ম ও যেতপদ্ম এতদেশে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। রীতিমতেই যেতপদ্মের উৎপত্তি অধিক দৃষ্ট হয়।

পদ্মের মূল, মৃণাল, পত্র ও পুষ্প সমস্তই বিভিন্ন প্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে পদ্মের গুণ প্রকাশ করিতেছি—

**রক্তপিত্তরোগে পদ্ম**—পদ্ম বা মৃণালের বরদ, কিঞ্চিৎ ইন্ধুচিনির সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগীর রক্তবমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে মৃণালের কক কাষ্ঠও রক্তপিত্তে হিতকর।

**মূত্রক্লেশে পদ্ম**—মূত্রক্লেশ রোগীকে পদ্মের মৃণাল ও উৎপলের কাষ্ঠ সেবন করাইলে মূত্রক্লেশ আরোগ্য হয়।

**রক্তশার্শে পদ্মকেশর**—পদ্মের কেশর চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাখন ও ইন্ধুচিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শের রক্তরোধ হইয়া থাকে।

**জ্বরাতিসারে পদ্ম কেশর**—জ্বরাতিসার রোগে, পক্ষকেশর, উৎপল ও দাড়িমের খোসা—সমভাগে মইয়া চাউল খোঁচ জলের সহিত সেবন করিলে জ্বরাতিসার উপশান্ত হয়।

**রক্তবমনে পদ্মকেশর**—রক্তবমন হইলে পদ্মকেশর কিঞ্চিৎ টুকুচিনির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তবমন নিবৃত্ত হয়।

**মূত্রক্লেশে পদ্মকন্দ**—মূত্র রোধ হইলে পদ্মকন্দ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্ররোধপীড়ার উপশান্ত হয়। পদ্মকন্দ প্রথমতঃ তিল তৈলে ভাজিয়া লইবে, তৎপরে গোমূত্রে পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

**পদ্মবীজ**—যেত ও রক্তগ্রন্থের চাউল খোঁচ জলসহ পান করিলে বিবেচ উপকার দর্শে।

দাহসংযুক্ত জ্বরে পদ্মপত্রের শবন করিলে দাহ উপশান্ত হয়।

পদ্মের সিরাপ—অর্শের রক্তপ্রবাহ ও রক্তগ্রন্থের দ্বাবে বিবেচ উপকারী।

পদ্মের কোমল পত্রগুলি খেঁচলন ও আবলকী পেষণ করিয়া জরকালীর বিরোধী কপালে প্রলেপ দিলে বিবেচ দারি। বোধ হইয়া থাকে।

## ম্যালেরিয়ায় মুষ্টিযোগ ।

( কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ নেনগুপ্ত কবিরত্ন )

১। কিসমিস, গুলঞ্চ, বাসকছাল, চিরাতা, দাকহরিজা, অম্লক—প্রত্যেক জব্য ১/১০ জল ১/১০ সের শেষ ১/১০ এই কাথ সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয় ।

২। অনন্তমূল, বীষমধু, জাকীহরীভকী, পিপ্পল—প্রত্যেক জব্যের চূর্ণ সমানভাগে ১ তোলা লইয়া আমলকীর কাথে তিজাইয়া শুক করিবে। তৎপরে এক আনা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতে, বেলালে ও রাত্রে একটি করিয়া বটীকা সিউনী পাতার রস ও মধুসহ সেবন করিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইলে পরিষ্কার পাওয়া যায় ।

৩। সিউনী পাতা, বেলপাতা, গুলঞ্চ ক্ষেপাঁপড়া—ইহাদের স্বরস ১/১০ ছটাক পরিমাণ কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণসহ পান করিলে ম্যালেরিয়ার উপশম হয় ।

৪। মনসাপাতা অরিতে কলসাইয়া তাহার রস অর্দ্ধছটাক ৩৪ রতি পিপ্পল চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয় ।

গুলঞ্চ ও অনন্তমূল প্রত্যেক জব্য ১ তোলা, জল ১/১০ সের শেষ ১/১০ পোরা—ইহাতে চারি আনা পরিমাণ সোঁদালের আটা গুলিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে ৩ সপ্তাহের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয় ।

৬। রামনহাটী চূর্ণ করতঃ এক আনা প্রাতে ও এক আনা সন্ধ্যায়—২ তোলা পরিমাণ ক্ষেপাঁপড়ার রস ও মধুর সহিত সেবনে ম্যালেরিয়া নষ্ট হয় ।

৭। নিমপাতা, চিরাতা, গুলঞ্চ, সোঁদালের আটা—প্রত্যেক জব্য ১/১০ তোলা জল ১/১০ সের, শেষ ১/১০,—ইহা কয়েক দিন পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয় ।

৮। তুঙ্গীসীর পাতার রস ১ তোলা ও বেলপাতার রস ১ তোলা—কিঞ্চিৎ মধুসহ প্রত্যহ পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর উপশমিত হয় ।

৯। হিন্দু অর্দ্ধ রতি, পিপ্পলচূর্ণ ৩ রতি—২ তোলা গুলঞ্চের রসের সহিত প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে প্রবল কম্পবৃত্ত ম্যালেরিয়া জ্বর রতি নীচ বিধূত হয় ।

১০। রসসিন্দূর ১/১০ আনা, সোডা ১০ সওয়া রতি—একত্র গ্রহণকরতঃ নিসিকা পাতার রসে মর্দন করিয়া ৪টি বটি প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা প্রাতে ১টি মধ্যাহ্নে ১টি ও বিকালে ১টি জলসহ সেবন করিলে জ্বর ৩ দিনের মধ্যে ছাড়িয়া যায় ।

১১। কণকধূতরার মূল অর্দ্ধ রতি সন্ধ্যাকালে ছোট্টিয়া একছটাক জলে তিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে উক্ত ঔষধ না আঁকাইয়া মূলট তুলিয়া কেলিয়া দিয়া নির্মল জলটুকু পান করিয়াই সর্বপটেল মর্দন করতঃ অবগাহন করিবে। রানের পর মিহিরির সরবৎ খাইবে। জল ১/১০ সের ও মিহিরি ১/১০ তিজাইয়া প্রস্তুত করিবে। তৎপরে রালের কোল ও ভাত খাইবে। এই ঔষধ ১ দিন মাত্র সেব্য। কিন্তু সরবৎ ১ সপ্তাহ খাইবে। ইহা জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর প্রাতক কলমারক ।

## পল্লী-প্রসঙ্গ ।

জীর্ণ জটিল রোগে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা  
সেইরূপ ফলপ্রসূ এমন আর কোনো চিকিৎসা  
নহে। ম্যালেরিয়া জরে এলাপাপিক চিকিৎসা  
সত্বেও কুইনাইন-সাহায্যে যে চিকিৎসা করেন,  
তাতেও কিন্তু পুনঃ পুনঃ পালটাইয়া পড়িতে  
হয়। কিন্তু আয়ুর্বেদে নতুন যন্ত্রি পাচন ও  
বটিকা প্রভৃতির প্রয়োগে ম্যালেরিয়াক্রান্ত  
রোগীর চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে  
তাহাব যে আর পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা  
থাকে না ইহা প্রশংসনীয়। সুখের বিষয় এখন  
দেশের লোকের এ কথা বুঝিতেছেন এবং  
তাহার ফলে আয়ুর্বেদের প্রচার বৃদ্ধির  
জন্য স্থানে স্থানে আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয় এবং  
হাসপাতাল স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।  
ময়মনসিংহের চাকমিতির আমাদিগকে সংবাদ  
দিতেছেন—

অনেক সময় দেখা গিয়াছে, ডাক্তারি চিকিৎসার  
ম্যালেরিয়া জর হইতে বৃত্তিলাভ করা কঠিন, কিন্তু  
ভাল কবিরাজী চিকিৎসার উত্তম ফল পাওয়া যায়  
থাকে। টাঙ্গাইল উপবিভাগে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য  
রোগবাহ্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। টাঙ্গাইলের  
বহু অধিবাসী টাঙ্গাইলের একটি আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়  
স্থাপন কর্তৃক ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের নিকট আবেদন করিয়া  
ছিলেন। আমরা দেখিয়া ছায়া হইলাম, ডিঃ বোডের  
আজ্ঞাক্রমে গত ১৩ বে তারিখে এই বিষয়ে টাঙ্গাইলের  
সর্বাধিবাসীরা অতিশয়কর সহিত রিপোর্ট করিবার  
অনুরোধ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক  
কি পরিমাণ ব্যয় পড়িবার সম্ভাবনা, কি প্রকার শিক্ষক  
নিযুক্ত হওয়া আবশ্যিক, হাঙ্গামা কি পরিমাণ হওয়ার  
সম্ভাবনা এবং অন্যান্য জাতীয় সবকিছু বিশেষ বিবেচনা  
করিবেন।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ময়মনসিংহের  
অবস্থা যেমন ভয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও  
চাকমিতির ত্রিগুণিত এবং মসীতে উপলব্ধি  
হইয়া থাকে,—

নেত্রকোণা উপবিভাগের অন্তর্গত বহুগ্রামে ভীষণ  
জরের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোক ইতি-  
মধ্যেই জরে মারা গিয়াছে। বহু পরিবারে ও পুত্র  
করিবার বা পথারি দিবার লোক পর্যন্ত নাই  
ডিঃ বোর্ডকোনও কোনও স্থানে ডাক্তার পাঠাইয়াছেন  
বটে, কিন্তু তাহার সামান্য লোকের উপকার  
হইতেছে।

যতগুলি কারণে বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব  
হইয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালা দেশে রেল বিস্তৃতি  
তাহার একটি কারণ। রেলওয়ের সুবিধাব  
জন্য বাঙ্গালার অনেক নদী হাজিয়া মজিয়া  
গিয়াছে। অনেক স্থানে গর্ত পগার প্রভৃতির  
সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল নদী সর্পিণ  
হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের সংস্কার সাধন  
সম্বন্ধে সাপেক্ষ। কিন্তু গর্ত পগার গুলি  
বুজাইয়া দেওয়া বিশেষ ব্যয়ের ব্যাপার নহে।  
এই কার্যের ব্যবস্থা সরকার হইতে রেল  
কর্তৃপক্ষকে দিয়াই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা  
উচিত। সহযোগী চাকমিতির এ সম্বন্ধে  
এইরূপ প্রস্তাব করিতেছেন,—

রেল স্তম্ভসমূহকে সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া জর  
বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে এই কারণ আর এখন  
সম্পন্ন করিবার কোনও কারণ নাই। নেত্রকোণা  
ও কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অধিবাসীরা এই কার্য  
সাধার্মণ্য বিশেষরূপে প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন।  
ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হইয়া ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের নিকট

ক্রান্তি ও ঔষধ প্রার্থনা করিয়া এই রিপূর হস্ত হইতে হারীকপে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। বাহ্যাত হানীয় স্বাস্থ্যের অবহার পরিবর্তন ঘটে, তাহার চেষ্টা করাই বিশেষ আবশ্যক। রেল রাস্তা ও অন্যান্য উচ্চ রাস্তার মধ্যে ঘন ঘন গোল বেওয়ার ব্যবস্থা কুরিয়া, গর্ত পগার ইত্যাদি ভরিয়া ফেলিয়া রাস্তা নামিয়া বাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে ম্যালেরিয়ার হস্ত, হইতে পরি-  
ত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা আশা করি, জন-  
সাধারণে তৎপ্রতি মনোযোগ প্রদান করিবেন এবং  
বাহাতে ডি: বোর্ড ও গবর্ণমেন্টের উচ্চ কর্মচারীগণ এই  
প্রকারে হানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত সচেষ্ট হন তৎ-  
প্রতি তাঁহী দর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে।

জরের সংবাদ বাঙ্গালায় সকল জেলা  
হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ত্রিপুরা হিঠৈবী  
তে প্রকাশ,—

রোগের আতঙ্ক—রকঃখলের অনেক স্থান হইতেই  
নানাবিধ রোগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জর  
রোগ কোন কোন স্থলে মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে।  
প্রকাশ মুরারনগর। থানার অধীন একবাইরা গ্রামে  
১২০১৩০ জন লোক জর রোগে মৃত্যুমুখে পতিত  
হইয়াছে। একে অনাভাবে অনশনে বা অন্ধাঙ্গনে লোক  
দিন কাটাইজেছে, তার উপর যদি রোগের আক্রমণ হয়  
তবে অন্তর্বে অপরিপুষ্ট জীর্ণ দেহ সেই ব্যাধির সহিত  
কয়দিন সংগ্রাম করিতে পারে? অনশন এ সকলের  
মুখ্য কারণ হইতে পারে, কিন্তু উহাও যে গোণ কারণ  
সে বিষয় সন্দেহ নাই।

“ত্রিপুরা হিঠৈবী” শুধু হানীয় রোগ  
বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই সেখানকার  
হাসপাতালটিরও যে দুঃখবহুর পরিচয়  
দিয়াছেন তাহাও বড় মর্মভেদী। পাঠক  
তাঁহারই ভাষায়, সে সংবাদ অবগত হউন,  
জনীর হাসপাতালের কথা—শ্রুত: ডিক্তিসভাল  
কমিশনার সাহেব এবার যখন কুরিয়া পরিদর্শনে আগ-  
করিলেন, তখন ডির, হানীর হাসপাতাল পরিদর্শন  
কালে কতকগুলি অজাবশ্যকীয় যন্ত্র ও ঔষধ সবধে  
অসুসঙ্গ করিল। প্রকাশ, এই অসুসঙ্গানের ফলে

তিনি কোনরূপ সম্ভাষণ লাভ করিতে পারে নাই।  
তিনি যখন যে যন্ত্র বা ঔষধ দেখিতে চাহিয়াছেন  
তাঁহার উত্তরে না ব্যতীত ইহা নাকি স্তমিতে পান নাই।  
ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে। এ নিমিত্ত কাহার  
দোষ দ্বিরা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সহরের  
দাতব্য হাসপাতালে অধ্যাবশ্যকীয় ও মূল্যবান যন্ত্র  
ও ঔষধাদি রক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সহরে  
যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন,  
তাঁহার সর্পিগ্রন্থের যত্নাদি রক্ষিতে পারেন না, তাহা  
সম্ভবও নয়। কাজেই যন্ত্র ও ঔষধের অভাবে কঠিন  
ব্যাধিগুলি অচিকিৎসায় থাকিয়া গেলে উহা সহরের ও  
ও ছেলোবাসীর নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে।  
বাঁহারা ধনী তাহারা না হয় চিকিৎসায় নিমিত্ত দূরবর্তী  
স্থানে যাইতে পারেন, কিন্তু হরিঙ্গের উপায় কি? এ  
নিমিত্ত আমাদের মনে হয়, কেবল দান ও পাঁচড়ার  
ঔষধ বিতরণের স্থান না হইরা বাহাতে লোক  
দুঃসময়ে ও কঠিন রোগে সাহায্য পাইতে পারে হাস-  
পাতালে তেমন ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন এবং  
ঐ সকল ক্ষেত্রেই হাসপাতালের সার্থকতা।

এসময় আমাদের অপর একটি অভিযোগ আছে।  
হাসপাতালে সকল সময় রোগীমণিকে গ্রহণ করা হয়  
না। সংঘাতিক রূপে বহুত ব্যক্তি বিগকেও নির্দিষ্ট  
সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে প্রত্যাখ্যান করা হয়,  
ইহা আমাদের নিজের প্রেমের একটা লোকের সম্পর্কে  
বিশেষ ভাবে জানিতে পারিয়াছি। দুর্ঘটনা—হাসপাতা-  
লের আইন মানিয়া চলে না। ইহার কোন নির্দিষ্ট  
সময় নাই। এসময়ই কোন দুর্ঘটনার আহত কেহ  
যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয় নাই বলিয়া  
নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে তাহা অপেক্ষা পরি-  
তাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি তাহাই  
হয়, তবে ডাক্তারের বাসস্থান সরকার হইতে বিবায়  
ব্যবহা ই বা কি নিমিত্ত? এ সম্বন্ধ আমরা পূর্বেও  
একবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। জানিনা  
তাঁহার ইহার কোন প্রতিকার করিয়াছেন কি না?

আমাদের দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা  
উত্তরা গিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির  
কারণও ইহাই। এখনকার স্থল কলমে

বেঙ্গল ধরনে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার মধ্যে  
ত্রক্ষচর্চের বিষয় কিছুই নাই। এ অবস্থায়  
দেশে যদি ত্রক্ষচর্চা বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠার কথা  
জনা যায়, তাহা হইলে মনোমধ্যে স্বভাবতঃই  
আশায় সঞ্চার হইয়া থাকে। সুশিলাবাদের  
“প্রতিকার” সংবাদ দিতেছেন,—

ত্রক্ষচর্চা বিভাগের স্থাপন। কয়েক দিন হইল,  
ত্রক্ষচর্চা বিভাগের সংস্থাপন রক্ত বৈজ্ঞানিকধর্মের রায়  
বাহাদুরের সুরমা অট্টালিকায় একটি সভার অধিবেশন  
হইয়াছিল। এই সভার অগ্রাধিপের অধিষ্ঠার মাননীয়  
ঐযুক্ত আন্তোয় বরিক মহাপ্রভুর সভাপতিত্বে সভার  
কার্য সুন্দররূপে সমাধা হইয়াছিল। তিনি এই সভার  
উক্ত ত্রক্ষচর্চা বিভাগের স্থাপন রক্ত বরিক দণ্ড হাজার  
টাকা ও এক হাজার বিঘা জমি দান করিবেন বলিয়া  
প্রকাশ করিয়াছেন। ত্রক্ষচর্চা বিভাগের স্থাপন একটি  
মহৎ পুণ্যের কার্য। আমরা সভাপতি মহাপ্রভুর  
এইরূপ দানের প্রশংসা করি। ত্রক্ষচর্চা বিভাগের  
স্থাপিত হইলে তাহার দান চিরস্মরণীয় থাকিবে।

কলেরায় প্রাচুর্য্য এখনও বাঙ্গালার  
অনেক স্থানে চলিতেছে। “ঢাকা প্রকাশে”  
প্রকাশ,—

সরস্বতী করিবাধার অকলে ‘কলেরা’ রোগ  
বেধা দিয়াছে। তত্রতা ‘কনষ্টেবল ট্রেনীং সুলে’  
শিকানবীনদের মধ্যেও নাকি কয়েক জন এই রোগে  
লুপ্তাশ্রয় হইয়াছে। বাহাতে সাম্প্রতিক ব্যাধি আর  
বেদীহীন হুড়াইতে না পারে, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ  
অঙ্গীশে তাহার ব্যবস্থা করুন।

মেরিনীপুরের “নীহার” হইতেও সেখানে  
কলেরায় আক্রমণের সংবাদ পাওয়া  
বাইতেছে,—

ওলাউঠার প্রাচুর্য্য—পুরী রথবাড়ী কিরিবার  
সঙ্গে সঙ্গেই মেরিনীপুর সহরে ওলাউঠা হুড়াইয়া  
পড়িয়াছে এবং তাহাতে অনেক লোক মারা বাইতেছে।

“মেরিনীপুর হিঠেবিনী”তেও এই কলে-  
রায় সংবাদ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে,

“মেরিনীপুর হিঠেবিনী” সেখানে কলেরা  
বিচ্ছুরিত কারণেও সেখানকার পানীয় জলের  
দ্রব্যবহার কথাও উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

বাহা—এখনও কলেরা সহর ছাড়িলনা। মধ্যে  
মধ্যে ছুই চারিজন উত্তরোপে দেখত্যাগ করিতেছে।  
জরারি আবির্ভাব নহে। চারি দিকে মাছি ভন  
ভন করিতেছে। “সুদামায় জিনিষ পড়িতেছে। পুষ্করী-  
আদি অপরিষ্কৃত ও তাহাতে জন্তুত্যাগ। গরীব লোক  
জলের অভাবে তাহাই পান করে।

আসাম প্রদেশ তৌ ম্যালেরিয়া ও কালু-  
জরের আবাসভূমি। সেখানকার সাতগাও  
অঞ্চলের বর্ণনা করিয়া শিলচরের সহযোগী  
“সুরমা”তে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে এই অঞ্চলের শত শত  
লোক প্রতিবৎসর প্রাণত্যাগ করিতেছে—এবারের পর  
এবার ম্যালেরিয়ার উল্লাহ হইতেছে। সাতগাঁয়ের  
ম্যালেরিয়ার জরের কথা এখন প্রবাহবাক্যে পরিণত  
হইয়াছে। উহা হইতে আশ্রয় করা যায় না।  
এ অঞ্চলের লোক গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পলাইতেছে—  
পারত পক্ষে সাতগাঁও এর ছাড়া। মাড়িহিত চাহে না,  
—বাহার্য্য নিত্য বিরূপায়, তাহারাই গ্রামে থাকিয়া  
জরায়ালে আক্রান্ত হোগাইতেছে।

বাঙ্গালাদেশে বেঙ্গল আধিবাসীর  
পরিমাণ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার  
প্রত্যেক জেলায় সরকার হইতে বেজিকেল  
সুলস্থাপনার চেষ্টা করিয়া চিকিৎসকের সংখ্যা  
বৃদ্ধি করা যে একান্ত উচিত—লে বিষয়ে আর  
সন্দেহ নাই। আমরা এ কথা অনেকবারই  
বলিয়াছি। প্রত্যেক জেলায় আধিবাসী-  
বৃদ্ধির ইহার জন্য চৌকীল হুজুর কর্তব্য।  
আমরা ভবিষ্যৎ সুখী হইলাম। বরেনসিয়ার  
আধিবাসীসহ ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।  
সহযোগী চৌকীলদিগের আধিবাসীকে জানাই-  
তেছি।

• এই বগরে মেডিক্যাল স্কুল হাণ্ডন গথছে হানীর জন সাধারণের পক্ষে গবর্ণমেন্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমরা এ আবেদন পত্রের প্রতিশিপি প্রাপ্ত হইয়াছি, হানীভাবে উহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই আবেদনপত্রে ময়মনসিংহে মেডিকেল স্কুল হাণ্ডন গথছে যে সকল উক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অসত্য। উহাতে যে সকল বিবরণ নিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, এই হানে মেডিকেল স্কুল হাণ্ডন করা আশাশ্রয়। আমরা তরঙ্গা করি, কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আর কালগৌণ না করিয়া সদন স্কুল হাণ্ডনে গল্পবান হইবেন।

সহযোগী "হিন্দুস্থান"ও ময়মনসিংহে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন,—

ময়মনসিংহ বাঙ্গালা দেশের সর্বাঙ্গের বড় জেলা, সুতরাং সে হিসাবে দাবী যে খুব জোরাল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জেলাটিতে ৪৪,২০ জন লোক পিছু বা ১৩২ খানা গ্রাম পিছু মাত্র একটি করিয়া চিকিৎসক আছেন। আর, কোনো সভ্য দেশে এরূপ ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না।

## কাজের কথা ।

• **বাঙ্গালার স্বাস্থ্য**—বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা ভাবিলে শুধুঃখ হয় না, চক্ষু ফাটিয়া জল আসে। নীরোগ দেহে স্বাস্থ্যস্থ উপভোগ এখন অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীর ভাগ্যেই ঘটয়া থাকে। বাহার পল্লীগ্রামে বাস করেন, বায়ালেরিরার পড়নে তাঁহার ভো চিরবিশপাণ্ড। সহরে বাস করিয়াও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নাই, কারণ সহরবাসের ফলে পনের আনা বাঙ্গালীকে অজীর্ণ রোগ ভোগ করিতে হয়। ইহার উপরে সহরে বড়বায়ুর ফলে বঙ্গাগ্রন্থের সংখ্যাও শনৈঃশনৈঃ বেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে—তাহাই হইতেছে বাঙ্গালীর পক্ষে আশঙ্কাজনক কথা।

• **সেকালের বাঙ্গালী**—

• সেকালের বাঙ্গালীর যে কখনও কোন রোগ হইত না—অজীর্ণ, অজীর্ণ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত

হইয়া সেকালের বাঙ্গালী যে কখনও মরিত না—এমন কথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু একালের মত সেকালের বাঙ্গালী এত যে রোগে ভুগিত না এবং তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যস্থ অটুট থাকিত—ইহা সন্দেহ নাই। সেকালের বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যস্থ অটুট থাকিত বলিয়াই সেকালের বাঙ্গালী বেরূপ পরিশ্রম করিতে পারিত একালের বাঙ্গালীর নিকট সে ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালী এখন একপোরা পথ হাঁটিতেও কষ্ট বোধ করে। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যেদিন বাঙ্গালী খ্রীষ্টিজগদ্রাথ দেবের দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য বাঙ্গালার স্বরূপ পরী হইতে পুরী পর্যন্ত পদব্রজে হাঁটিতে কষ্ট বোধ করিতেন না। এখন দেশে বেরূপ নানা প্রকার বান বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পথপথটির অভাঙ্গ হইতেও বাঙ্গালীকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

উন্নতি না অবনতি।—কি  
 এই প্রশ্নবিশৃঙ্খল বাঙ্গালী জাতির উন্নতি কি  
 অবনতির পরিচায়ক, তাহা ভাবিবার কথা।  
 প্রশ্নবিশৃঙ্খতার ফলে একদিকে বাঙ্গালীর  
 শারীরিক অবনতি ঘটিতেছে, অপরদিকে  
 বাঙ্গালী-বহুলোকদিগের দেখাদেখি বাঙ্গালী-  
 দরিদ্রও নিজের অবস্থান বৃদ্ধি, জ্ঞানবিস্তার  
 হইতে হেতুসর মোড় পর্য্যন্ত ঘাটতে হইলেও  
 টামে চড়িয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছে।  
 দেশে দশ টাকা মণ চাউল, বাঙ্গালার অনেক  
 স্থানের লোক ছাঁবেলা পেট ভরিয়া খাইতে  
 পাইতেছে না, এ অবস্থার বাঙ্গালীর পক্ষে  
 রূপ অত্যাসের প্রশ্রয় পাওয়া উচিত কিনা—  
 তাহা কি বিবেচনার বিষয় নহে। বাঙ্গালী  
 দরিদ্রকে তো ইহারই ভয়।

মানসিক প্রশ্ন।—বান্দালী নারী-

রিক শ্রম করিতে আর সম্ভব নহে। কিন্তু  
মানসিক শ্রমটা বাঙ্গালীর মধ্যে বাড়িয়া  
গিয়াছে। বাস্তব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিনাভেব  
জন্ম এবং তাহার পর বিশ্বপণ্ডিত রূপে  
বাতির হইয়া গোলামি বজায় রাখিব। জন্ম  
এই মানসিক শ্রমটা বাঙ্গালীকে অতিরিক্ত  
করিতে ছয়। কামর জীবনে বাঁহারা সেরূপ  
মাথা বামাইতে অনস্বীকৃত, তাঁহাদের আর্থিক  
উন্নতিও সম্ভব। কাজেই বাঙ্গালীজাতি  
একদিকে যেরূপ শ্রমবিমুখতার ফলে  
স্বাযোগ্যতার বিপরীত হইতেছে, অপর দিকে  
সেইরূপ অতিরিক্ত মানসিক চিন্তায়  
অস্বাভাবিক হইয়া উৎপন্ন করিয়া  
ফুলিতেছে। শুধু বিশ্বপণ্ডিত হইলে চলিবে না,  
মানসের বড় বড় অভিধানে সমস্ত থাকিলেও  
চলিবে না, ইহার ফলে আমাদের অবস্থাটা  
কি দাঁড়াইতেছে, তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই  
কি চিন্তা করা উচিত নহে?

## সমানোচনা।

শিশুশালনা। ডাঃ ঐকান্তিকম্বে বহু  
এম, বি সম্পাদিত। মূল্য ১০ আনা। এখন-  
কার দিনে শিশুযত্নাধিকারের যুগে কার্তিক  
বাহুর মত বিদ্বৎ ও বহুদর্শী চিকিৎসক যে  
বহুল কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়াও এরূপ এই  
সম্পাদনে সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি  
স্বাস্থ্যকর বাস্তবিকই ধন্যবাদের পাত্র। ভারতে  
স্বাস্থ্যকর মিনটিটে গারিটি করিয়া শিশু মরে।  
আমরা হোমকল গিয়া বাস্তব, বহুতার কঠোর  
মেল কাপাইয়া তুলিতেছি, কিন্তু এইবাসী

কি করিয়া স্বাধোন্নতি হইবে, কি করিয়া  
শিশুস্বত্ব সংখ্যা দেশ হইতে লোপ পাইবে—  
সে কথাটা একবার চিন্তা করিতেছি কি ?  
দেশরক্ষা করিতে হইলে সকল চিন্তা অপেক্ষা  
আগে শিশুরক্ষার জন্ত বনোবোণী হইতে  
হইবে। আমাদের দেশে শিশু স্বত্ব-বাহণের  
সর্ব প্রধান দ্বারী আমরাই :— বাবরা একসঙ্গে  
ভুলিয়া গিয়াছি, কিরণ সময়ে উপযুক্ত  
ক্রীড়কবের দিলেন পুত্র ধরিশের ব্যবহার  
স্বাধাভাবিত ও দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করিত হইবে



পারে—সে চিন্তা করজন দেশবাসী করিয়া  
 “থকেন? তাহার পর সম্ভান লাভ হইল  
 তো—সে সম্ভান প্রকৃত কর্মীপুরুষ হইবে  
 কিনা, তাহা আমাদের বিচার করিবার  
 প্রয়োজনও নাই। স্থির, ধীর শাস্তভাবে  
 —বিশ্ববিদ্যালয়ের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া  
 সে ছেলে একজন বড় চাকুরে হউক  
 ইহাই এখনকার প্রত্যেক পিতামাতার  
 কামনা। একে আমাদের ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা  
 নাই—স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি সকল আমরা অব-  
 গত, তাহার ফলে চর্কল, কণ, অকর্ম্ম, শিশু  
 লাভ তো আমাদের নিত্য ঘটতেছে, তাহার  
 উপরে এটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগিকায়  
 চেলেদেব অর্ধেক পবমান্ব কমিয়া বাইতেছে,  
 ক—সে যে অধিকতর ভগ্নহাস্য হইয়া পড়িতেছে  
 এবং সেট ভগ্নহাস্য হইতে রক্ষা করিবার  
 জন্য তাহাদিগকে যে নানা কারণে আমরা  
 উপযুক্ত আহ্বান দিতে অসমর্থ—এ সকল  
 কথা আমরা করজন ভাবিয়া থাকি?  
 কার্তিক বাবু এ সকল কথা চিন্তা করিয়াছেন।  
 এ পুস্তক তাহারই ফলসত্ত্ব। কাজেই  
 পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। এ পুস্তক  
 পড়িলে বাঙ্গালী-পিতামাতার অনেক শিক্ষা  
 লাভ হইবে, আমরা সকলকেই এরূপ এক-  
 খানি অবগত প্রয়োজনীয় পুস্তক পড়িবার জন্য  
 অনুরোধ করিতেছি।

শরীর-তত্ত্ব। Physiology ৪র্থ সংস্করণ।

শ্রীবাল্লভলাল হর এল, এম, এল, সি  
 প্রণীত ও ৮২ নং শ্রাবণবার্ষিকী হইতে  
 শ্রীবাল্লভলাল হর কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য  
 ১ টাকা। মানবদেহের গঠন, পরিপ,  
 ক্রিয়াকলাপ ইহা নিখিত এবং ইহার কার্যই বা

ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হয়, এ সকল বিষয় অতি  
 প্রাঞ্জল ভাবে এ পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।  
 এ পুস্তকখানি চিকিৎসার প্রথম শিক্ষার্থি-  
 গণের বিশেষ উপকারে আসিবে। আমরা  
 এ পুস্তককে বহুল প্রচাৰ্য্য কামনা করি।

অস্তিতত্ত্ব। Osteology, ৩য় সংস্করণ।  
 ডাঃ শ্রীবাল্লভলাল হর এল, এম, এল, সি  
 প্রণীত। মূল্য ৮০ আনা। এ পুস্তকে  
 অস্থিতত্ত্বের বর্ণনা উত্তমরূপে বর্ণিত। বাহ্যিক  
 অস্থিরহস্ত অবগত হইতে চাহেন, তাহাদিগের  
 পক্ষে এ পুস্তক প্রয়োজনীয়। একদম ধরণের  
 পুস্তকের ভাষা স্বভাবতঃই দ্রুত হইবার কথা,  
 কিন্তু আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, এই  
 গ্রন্থের রচয়িতা সে পক্ষেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া  
 যথাসম্ভব সহজকথায় এইখানি প্রণয়ন প্রয়াস  
 পাইয়াছেন। তবে মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে  
 মনে হইল। মূল্য আর একটু কমাইয়া  
 দিলে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে।

তিব্বেনসিহা বা সহজ হাকিমী শিক্ষা।—  
 ১ম খণ্ড। হাকিম মসিহর রহমান কোরাশী  
 প্রণীত। ১১৪ ও ১১৫ মেছুয়া বাজার স্ট্রীট  
 হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য  
 ২ টাকা। এখানি হাকিমী চিকিৎসার  
 উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে সকল রোগের  
 পরিচয় লিখিয়া তাহার চিকিৎসা-প্রণালী  
 লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাহ্যিক হাকিমী  
 চিকিৎসা শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহাদের  
 পক্ষে ইহা উপকারে আসিবে।

চিকিৎসা।—ডাঃ এ, সি, মজুমদার  
 এল, এম, এল, সি প্রণীত। ৬৪ নং শিকদার  
 বাগান স্ট্রীট হইতে মজুমদার এণ্ড কোং  
 কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—১০ নং  
 কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা। এখানি হোমিও-  
 প্যাথিক গ্রন্থ। হোমিওপ্যাথি কি? প্রথমেই  
 তাহার বিবরণ দিয়া তাহার পর বাস্তবিক  
 বিধি, রোগীর পথ্যাপথ্য ও মেডিকার  
 মেডিকার পরিচয় দিয়া, তাহার পর রোগী  
 পরীক্ষা, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা-প্রণালীর  
 কথা ইহাতে বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার

“হোমিওপ্যাথি কি?”—বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, “আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের মূলস্থর এক।” বাস্তবিক তাহাই ঠিক। হোমিওপ্যাথির মতে বৈকল্য বরষা যাত্রার ঔষধ প্রয়োগে শুভফলের আশা করা যায়, আয়ুর্বেদবেত্তারাও বহুবল পূর্বে তাহাই করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এ গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায়,—এ গ্রন্থের গ্রন্থকার বায়ু-শিত্ত-কফ-নির্গর করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করার পক্ষপাতী। সেইজন্য তাঁহার প্রাকটিক বা চিকিৎসার বর্ণিত অংশ বিচক্ষণতার সহিত লিখিত হইয়াছে মনে হয়। গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণের উপকারে আসিবে।

যুক্তিকা। শ্রীকীর্তীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ১/০ আনা। ৪৫নং চিংপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। এ গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে জানা যায়, স্বপ্ন হৃৎকের মধ্যে কর্মক্ষেত্রের অবিশ্রাম কর্মস্রোতের মধ্যে সোমাস্ত পাইবার উপায় স্বরূপ অবসর মত ইহার কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে। এইজন্য ইহার নামকরণ হইয়াছে যুক্তিকা। ইহার কবিতাগুলি ‘মহোদধি’ কবিতাগুলিতে গ্রন্থকারের ভগবদ্ভক্তির পরিচয় প্রত্যক্ষ হইতে প্রকটিত। গ্রন্থকার কর্মক্ষেত্রের অবিশ্রাম কর্মস্রোতের মধ্যে

সোমাস্ত পাইবার স্তম্ভ যুক্তিকা লিখিয়াছেন বটে—কিন্তু ঐরূপ কর্মস্রোত পাঠকও এগ্রন্থ পাঠে যে সোমাস্ত পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছাপা, কাগজ ও বঁধান অতি সুন্দর।

প্রচারক। হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্র। ডাঃ এ. সি. বজ্রমহার সম্পাদিত। ১০ ৪র্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। বার্ষিক মূল্য ২।০। ১৩০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ১০ প্রচারোদ্দেশ্যে এই মাসিকপত্রের প্রকাশ। আলোচ্য সংখ্যায় যে কয়টি সন্দর্ভ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে বামাগণের সর্বনাশকারী পোড়া ও প্রতিকারের ব্যবস্থা ও “শিশুপালন” পাঠে সাধারণের উপকার হইবে। দ্রবরোগে “অর্জুন বৃক্ষের ছাগ—পবেষণামূলক সন্দর্ভ।” “রোগীবিবরণ” হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদিগের উপকারে আসিবে। সম্পাদকীয় মন্তব্য যদি বাস্তবিক হইয়া লিখিত হয়, তাহা হইলে তাহার পাঠকের উপকারের আশা বেশী করা যায়। “একনাটকের গুণ”—কবিতাকারে আমাদের ভাল লাগিল না। “চিকিৎসার চেয়ে রোগবিবরণ প্রেরণ”—এরূপ গ্রন্থক হোমিওপ্যাথিক ভাষে প্রকাশ করা পাঠকের ঐচ্ছাহানি ঘটবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

## কাশী আয়ুর্বেদ সম্মিলনী পরীক্ষার ফল।

( ১ম শ্রেণী )

বিজয় কান্ত সেন বি, এ,

( ২য় শ্রেণী )

প্রমীলা বালা দাসী। সরোজিনী দেবী।  
সরস্বতী দেবী। বিপিন বিহারী বিভা-  
বিনোদ। বতীন্দ্র প্রসাদ মিশ্র।

( ৩য় পরীক্ষা )

( ১ম বিভাগ )

জ্যোতীন্দ্র কাকা ব্যাকরণভীর্ষ। অধিকা  
চরণ কাব্যভীর্ষ। বনবিহারী সুখোপাধ্যায়।  
মধুনন্দন প্রসাদ মিশ্র। সীতারাম মিশ্র।

( ২য় বিভাগ )

যোগেন্দ্র সিংহ দে। বীরেন্দ্র চন্দ্র  
ভট্টাচার্য। শ্রীচন্দ্র শর্মা। জানকী বরত  
পাণ্ড। কেশব দাস চক্রবর্তী। কিশোরী  
শরণ দীক্ষিত। আশুদত্তপারিক। বৈদ্যবীরেন্দ্র  
সুখোপাধ্যায়।

আজ পরীক্ষা

১ম বিভাগ

কিশোরী শরণ দীক্ষিত। দেববর পাণ্ডে।  
সুখারি সিংহ বর্মণ। সপারীন্দ্র প্রসাদ পাণ্ডে।  
সীতারাম শর্মা। বুদ্ধিবরত পাণ্ডে।

# আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক :

৪র্থ বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৭—ভাদ্র।

১২শ সংখ্যা।

## কাজের কথা।

### কলিকাতার শিশু মৃত্যু।—

সকল দেশ অপেক্ষা কলিকাতার শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। ইহার সর্বপ্রধান কারণ কলিকাতার বিস্তৃত গবীত্ব পাওয়া স্বকৃতি। কলিকাতাবাসীগণ যে ডঙ্ক পাইয়া থাকেন, তাহা মফঃস্বল হইতে যোগাযোগে এখানে আমদানি হইয়া থাকে। সে অবস্থায় গবী—হুই কি অহুই, দুর্জল কি রুগ, উহার ডঙ্ক জুকা দিয়া দোঁচন করা কিনা—এ সকল বিষয় কাহারও দেখিবার প্রয়োজন হয় না, ডঙ্ক পাইলেই হইল। শুধু জল মিশাইলেই যে ডঙ্কের কুজিমাটা দোষ ঘটে তাহা নহে, উপরোক্ত কারণগুলি হইতেও ডঙ্ক বিকৃত হইয়া থাকে। ফলে কলিকাতা সহরে বিস্তৃত ডঙ্কের বখেট অন্ত্য এবং তাহারই ক্ষয় শিশুদিগের বহুভিন্ন রোগ এবং তাহার পরিণতি অকাল মৃত্যু। কলিকাতা সহরে এমনই করিয়া infant leaver বা বহুভিন্ন রোগে অসংখ্য শিশু কাল-কলিত হইতেছে।, যাহারা শিশুমৃত্যু

নিবারণের ক্ষমতা করিতেছেন, তাহার। সর্বাঙ্গে কলিকাতাবাসীগণ বাহাতে বিস্তৃত ডঙ্ক পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করুন— তবে কলিকাতার অকালমৃত্যুর কবল হইতে শিশুগণ রক্ষা পাইবে।

### দুঃখ সম্প্রদর্শনতর্কতা।—

সম্প্রদর্শনতর্কতায় অধিবাসীগণ বেকার সতর্ক, এমন আর কোনো দেশের অধিবাসীগণ নহেন। ভারতের অধিবাসীদিগের পক্ষে যে বিচার ক্ষমতার ব্যবস্থা অতীত যুগে ছিল, মহাকবি কালিদাস তাহারই কলে আনন্দময় ভূমণ্ডলব সম্রাট দালিপকে দিয়া গোচারণের চিত্র প্রদর্শনেও কুটিত হন নাই। কিন্তু ভারতবাসীর নিকট এখন সে বিচারশক্তি লোপ পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ডঙ্কের স্পৃহাও এখন অন্তর্য্যে ভারতবাসীর নাই বণিলেও চলে। যাহাদের সে স্পৃহা এখনো লোপ পায় নাই তাহার। বাছ-বিচারের

বাংলা রাশের না, ছদ্ম পাইলই হইল,—  
তা' যেমনই কেন চটক না! বিলাতেরও  
নাকি এই অবস্থা! বিলাতের "ম্যাকটোর  
গার্জেন" পথে প্রকাশ, বিলাতে অনেক  
স্থানেই ছদ্ম অবৈজ্ঞান্য থাকে এবং  
তাহারই ভক্ত সেখানে টাইকয়েড, বস্মা,  
গলনালীর কঁত প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।  
আমাদের দেশেও যে এট একট কাবলে  
ঐ সকল বোগের বাতলা ঘটতেছে না, তাহাই  
না কেমন করিয়া বলিব? এখন কলিকাতায়  
বস্মায় যত লোক মরে, আগে কি এত  
মরিত? টাইকয়েডও যো এখন যথেষ্ট  
বাড়িয়াছে। গলনালীর কঁত বা ডিপথিরিয়াও  
এখন শিশুদিগের একটা সংক্রামক ব্যাধি।  
আমাদের দেশের ছদ্ম বিক্রয় কলে তো  
আমরা এ সকল বোগ ভোগ করিতেছি,  
তা' ছাড়া যে বিলাতী কাগজে বিলাতী ভাষায়  
নিম্নোক্তঃ অতি ভীষণভাবে প্রচারিত  
হইতেছে, অনেক সময় সহস্রগুলক মনে  
করিয়া সেই "গোয়াপিন্‌মার্ক" পাউ ড্রগ"  
কেও আমরা সারবে অনুমত পুষ্ক পান-  
দ্রব্য উপভোগ করিতেছি! বিলাতে যে  
ছদ্ম সাধারণ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা  
অতিপান মার্কিনে কৃষীর শ্রমের দ্রব্য। তাহা  
"ব্লান ও পলা প্রস্তুত করিয়া কন্ট বাব-  
চাবেব পোয়া" বিক্রয়ের সময় বিক্রীত  
হয়। আমরা কিন্তু বিলাতী কন্ট দ্রব্য ব্যবহার  
সময়ে এ সকল কথা কিছুই ভাবিয়া দেখি  
না। ষিক আমাদের! আমাদের দেশে  
প্রতিদিনে চাষিকর্ম করিয়া শিশু শরীরে না  
তো মরিতে কোন দেশে?

পাঁউকটী।—পাঁউকটীর প্রচলন  
টাও এখন আমাদের দেশে যথেষ্ট। সুপ-  
করিয়া এবং জলখাবারের সময়ে গো-  
এই পাঁউকট অনেক পরিবারেই ব্যবহৃত হয়,  
এ' ছাড়া অনেক সংসারে নেশাজার্মেন  
হাভুডা কটীও পবিবর্তে পাঁউকটীর প্রচলন  
দেখিতে পাওয়া যায়। এট পাঁউকটী  
কিন্তু যেকোনো প্রস্তুত হয় তাহার তথ্য  
অবগত হইলে বক্তাক্ষই স্বেচ্ছা উপস্থিত  
হইবার কথা। পাঁউকটী প্রস্তুতের সময়  
হই পা দিয়া উত্তর উপাদান দ্রব্যকে প্রস্তুত  
ভাবে বিন্দন করিয়া লওয়া হয়, ইহার অস্তিত্ব  
পাঁউকটী প্রস্তুত হইতে পারে না। তাহার  
পর, প্রস্তুত বস্তুগুলি পাঁউকটী প্রস্তুত হয়—  
তাহা সেদিনই সমস্ত বিক্রয় হয় না, কাজেই  
তাহার পরদিনও সেই বাসিকটী বিক্রয় নী  
করিলে উত্তর ব্যবসায়ীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে  
হয়। পাঁউকটী প্রিয় পরিদদারগণ কিন্তু  
সে সকল বিষয় প্রাণিব্যবসায় অবসর পান না।  
কলিকাতায় এট পাঁউকটী প্রিয় ব্যক্তিগণ  
কিন্তু পবিত্র অমোঘপ্রস্তু। মনঃবলেও যে সকল  
স্থানে ইহার প্রচলন কলিকাতার ইন্ডাস্ট্রি, সে  
সকল স্থানের অধিবাসীগণও অমোঘের হাত  
চটতে অব্যাক্তি পান না। আমরা  
উদারগণস্বরূপ নদীর বেলায় মাগাঘাটের  
নাম উল্লেখ করিতে পারি। নদীর  
মাগাঘাট ইশেন ই, বি, বেলেব একটি  
বড় জংশন। এখানে এই উপলক্ষে অনেকগুলি  
লোক পাঁউকটীর ব্যবসায় পূর্ণোত্তম চালাইয়া  
থাকে। মাগাঘাট এবং তরিকটবর্তী স্থানের  
বাসিন্দাগণও এইজন্য দারুণ অজ্ঞান প্রবণ।

## শিশুশ্রমীর পাউকটী।—

অনেক আবার পাউকটী চটকান পাউকটীর  
আবিধান নিজেরা উপভোগ করিয়াই  
পরিচয় নহেন, তাঁহাদের প্রাপ্যপক্ষ  
নিয়ম সপান-সহিতগণকেও চটক প্রসাদ  
দিয়া আনন্দ কুড়াব করেন। সে আনন্দ  
কিন্তু শেষে যতটুকু বিক্রতির ফলে নিবানন্দে  
পতিত হয়। তখন অনেক সময় কার-  
মনায্যাকো ক্রিসমস্কুর শ্রবণ গ্রন্থ কখনও  
ফলপ্রসূ হয় না। দেশে জন্মের দুর্ভাগ্য,  
শ্রমের অসুখ আত্মা কদম্বা তৃপ্ত ব্যবহার  
করাইয়া শিশু মৃত্যু কাবণ করিয়া শুক্লি-  
ভেজি,—ইচ্ছা উপর পাউকটীর মত তাড়ি-  
মিশ্রিত দ্রব্য শিশুদিগের মুখে তুলিয়া দিতে  
গভীর হইয়া যে কি বিষম ফল উৎপন্ন  
করতেছি, তাহা এখনও বুঝতে পারিতেছি  
না—ইচ্ছাই হুগু।

আমাদের আত্মা।—আমাদের  
দেশে পাউকটীর তো ব্যবহার নাই,—যে  
স্থলে আমরা পাউকটীর ব্যবহার করিয়া থাকি,  
সে স্থলে বাকীলা দেশের সহজ মূল্য পাউ  
‘মুড়ি’ যে কত উপকারী তাহা বলিবার নয়।  
মুড়ির মত সহজসাধ্য পাউ অতি অল্পট  
আছে। আগে পত্নীগ্রামে এই মুড়ির প্রচলন  
থাকে ছিল। তখনকার দিনে সকল সংসাবেই  
মুড়িভাজার প্রথা প্রবর্তিত ছিল, অনেক  
সংসারে সকালে বিকালের জলখাবার ছিল  
সেই মুড়ি। এখনও সেই মুড়ির প্রচলন  
বাকীলার বর্ধমান-বাকুড়া-মালবহ-মেদিনীপুর  
প্রভৃতি জেলা হইতে গোপ পাওয়া যায় না। যে  
সব দেশে পাউকটীর প্রচলন কম, সে সব

দেশের লোকে এই জন্তই দক্ষিণ বাকীলার  
মত এত অজীবগ্রহণ নহে।

## মুড়ি ও বিস্কুট।

এখনকার  
দিনে অনেকে পাউকটীর মত বিস্কুটও যথেষ্ট  
পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইচ্ছা  
কলে আমাদের দেশের বিস্কুটনির্মাতাগণ  
অর্থগতির পস্থা বড় বেশী মূল্য কখন আর  
না করেন, বিলাতী বিস্কুট ব্যবসায়ীরা কিন্তু  
যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেছেন। অনেক  
সংসাবেই এখন দেখিবেন—আলমারির তাকে  
টিন ভরা বিস্কুট গৃহবাসীরা সমৃদ্ধি পোষণ  
প্রকাশ করিতেছে। এটা বিস্কুটগুলি যে  
কতদিন পূর্বে প্রস্তুত হয়, কত সাগর মহা-  
সাগর অতিক্রম করিয়া আমাদের দেশে  
আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং কতকাল পূর্বের  
প্রস্তুত সেই জন্ম সম্ভবকে আমরা উৎকৃষ্ট  
স্বাদের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি না—  
এটা কিন্তু আমাদের বিচার করিবার  
প্রয়োজনীয়তা নাই,—ক্ষমতাও নাই। দেখিতে  
চমৎকার,—স্বাদেই সুস্বাদু—মুখে দিলেই  
মিলাটয়া যায়—ইহাই তো সে জন্মের পক্ষে  
উৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র! সে জন্ম—কে—কি  
প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়াছে—কোন দেশ  
হইতে কিরূপভাবে কে আসিয়াছে এবং সেই  
দ্রব্য বহুকালাবধি পণ্যসিদ্ধ হওয়ার ফলে  
আমাদের স্বাস্থ্যক্ষার পক্ষে কতদূর হইতে পারে  
কি না—এ সকল বিষয় আমাদের চিন্তা করা  
উচিত নহে কি? আমাদের দেশে ‘মুড়ি’  
এই বিস্কুট জাপেক্ষা বহুল পরিমাণে উপকারী।  
যেস্থলে কোনো প্রকার ঝগড়া জীবন কখন  
সুস্থ, সেস্থলে এই মুড়ি ব্যবহার যথেষ্ট

হুগল পাওয়া গিয়াছে। হিকা নিবারণে  
মুড়ির জল অমোঘ ঔষধ। তবে আমরা  
বর্তমান সভ্যতার যুগে 'মুড়ি' খাইতে হজ্বা  
বোধ করি—কারণ দূরিত্র বিবেচনায় আমরা  
মৃণাল্পদ চইয়া পড়িব—‘এই যা’ কথা।

**খাদ্যে বিশ্ব।**—সকালে দোকান  
চইতে খাবার কিনিয়া খাওয়ার প্রথা কমট  
ছিল। সকালে এখনকার মত নানারূপ  
খাদ্যের ব্যবস্থাও ছিল না। মুড়ি-নানিকেল,  
আদা-ছোলা-ভিজা, গুড়-গাভীরা—ইহাই ছিল  
সকালের সাধারণ গুস্তের জলখাবার।  
বড় লোকেবা ইহা উপর সন্দেহ-বসগোম  
ব্যবহার করিতেন। ক্ষীণ-জানা-নাথন  
নবনী—হৃৎকাত এ দ্রব্যগুলি সকালে  
গরীবের খাইত, মহতেও খাইত। এ কালে  
সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা লবণাক্ত  
খাদ্যসম্ভাব্যেব অধিক পক্ষপাতী চইয়া  
পড়িয়াছি, কলিকাতার কচুরি-শিম্ভাড়াব  
দোকানগুলি তাহারই ফলে সমৃদ্ধি সম্পন্ন।  
যদি উৎকৃষ্ট দূতে সে সকল প্রস্তুত হয় এবং  
যেণের লোক তাহা পাইবার অজ্ঞ বেনী  
আগ্রহান্বিত হয় তাহা হইলে আমাদের  
বলিবার কিছুই নাই,—কিন্তু অনেকস্থলেই  
ঐ সকল দ্রব্য গলিগংকরণেব কিছুক্ষণ পরেই  
বুকে জলিতে থাকে, অন্নোপদ্রব উঠিয়া থাকে,  
সেক্ষণ অবস্থায় সে সকল খাদ্য পাকস্থলীতে  
পড়িয়া যে বিষবৎ ক্রিয়া উৎপন্ন করে তাহাতে  
তা আর সন্দেহ নাই। আমরা ই, বি, এস,  
রেলওয়ের হু—একটি ট্রেনের কথা জানি,—  
সে সকল স্থানের লবণাক্ত খাদ্য খাওয়ার  
পরই ঐরূপ অন্নোপদ্রব হইয়া থাকে। রাণাঘাট

ট্রেনের ‘গরম-শিম্ভাড়া’ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।  
আমরা এই প্রসঙ্গে রাণাঘাটের সবডিভিসজাল  
অফিসার মহাশয়কে এ সকল বহুস্ত ভেদ  
কবিবার কল অনুরোধ করিতেছি।

### কলিকাতার চপ-কাটিংগেট।

এখনকার দিবস কলিকাতার চপ-কাটিং-  
লেটেব দৌকানগুলি চইতেও আমাদের  
স্বাতন্ত্র্যের কন অন্তরায় ঘটতেছে না।  
অনেক স্থলে বেকপ মাস’ প্রভৃতির মিশ্রণে  
উহা প্রস্তুত করা হয়—তাহা আমাদের  
স্বাতন্ত্র্যের ত্রো সমস্ত নিম্নোৎপাদক বটেই,  
কখনও কখনও বিষ-কিমাণ্ড মিশ্রণে প্রকাশিত  
হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্বে—গত বৎসর  
চৈত্র মাসে হারিসনবোডের এফ রেটারেটে  
ব’ চপ-কাটিংলেটের দোকানে ছয়টি বাঙ্গালী  
চার আচার করিতে গিয়াছিল; আচার  
করিয়া যেসব বাঙ্গার প্রত্যাবর্তনের পরই  
ছয়জন পৌড়িত হয়। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার  
ব্যবস্থা আরম্ভ হয়, ফলে পাঁচটি ছাত্র  
চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিল, একটি  
কিন্তু উন্নাদগন্ত হইল। খাদ্যপরীক্ষক  
মহাশয় সংবাদ পাঠিয়া সেই রেটারেটে গিয়া  
পাঠ্য পরীক্ষা করিলেন এবং পচা খাবারের  
জন্মই যে অনিষ্টোৎপাদন হইয়াছে তাহাও  
প্রকাশ করিলেন। ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াও  
কি লোকের চৈতন্য হইবে না? এখনকার  
দিনে ঐরূপ চপ-কাটিংলেটের দোকানে আহার  
করার জাতি ধর্ম্মতো নষ্ট হইতেছেই, তা’  
ছাড়া পাহারার অপচয়ে আমাদের পরমায়  
হ্রাসেরও যে কারণ ঘটিতেছে—ইহাই কি  
সবচেয়ে বড় কথা।

### বান্ধালীর বাণিজ্য ব্যবস্থা ।

বান্ধালীকে যদি বাচিতে হয় তাহা হইলে বান্ধালীকে আবার সেকালের আদ্যবৈব ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আদ্য অধিমণ্ডলী ফলমূলারা ছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাদের পরমাণু লাভ যেরূপ ঘটত তাহা এখন আরব্যোপভ্রাতাদের কিঞ্চিদূর বলিয়া পরিগণিত। ফলতঃকণে বহুতের ক্রিয়া উত্তমরূপে সাধিত হয়, যেণা ও ক্ষুধা ক্ষুধা প্রথর হয়। জীবনে নূতন বক্ষকধিকা বদ্ধিত হইয়া থাকে। বান্ধালীদেশে সাময়িক ফলমূলেবও অভাব নাই, কিন্তু বান্ধালীর তাহা তক্ষণের আগ্রহ নাই—এই যা' কথা। তথেষ কথ্য গো বসিযাছি, কিন্তু বান্ধালীদেশের ধীরে ঘরে আবার গানী পালনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হউক, বান্ধালী আবার ভাবতচক্ষে পটিনী কথার মত 'আমার সন্তান যেন থাকে ভথে ভাতে' একুপ কামনা করিতে থাকুক— একুপ উপদেশ দিলে নীর ফলোপহারক

হইবে না। ঢাকরিজীবি-প্রবাসী-বান্ধালীব পক্ষে জীবনের গতিশ্রোতঃ ফিরাইয়া দিয়া আবার পটিনীবাণী হইতে না পারিলে সে ব্যবস্থা হইবে না, কিন্তু টাণী হুদ্বপব্যক্ত। তবে চণ-কাটোটেব মন্ড্যাস ভাগ করিয়া, বান্ধালীর চর্কিমিশ্রিত স্তুতে প্রস্তুত কচুবি-শিঙ্গাড়াব লালসা বিসর্জিত দিয়া জলধাবাবেব স্থলে ফলমূলকে স্থান দান করা বান্ধালী পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার নহে। বান্ধালী যদি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পাবে—তাহা হইলে বান্ধালীজাতি আবার বন্ধা পাইবে, নতুবা Imperial Gziter of India গ্রন্থে সবকাবী মৃত্যু তালিকায় বান্ধালীদেশের মৃত্যুর হিসাব প্রতিবৎসরই যুবকপনবদ্ধিত দেখা যাউতেছে—শাধা দারব বদ্ধিত দেখিতে হইবে—এং কালে সেই মৃত্যু সংখ্যা একুপ বৃদ্ধিপ্রাপ হইবে যে, সন্তা সন্তা বান্ধালী জাতিব অস্তিত্বও বৃদ্ধি দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে।

## শারীর বিজ্ঞা ।

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন স্বরস্বতী এম-এ,এল, এম, এস ]

( পূর্কপ্রকাশিত অংশের পর )

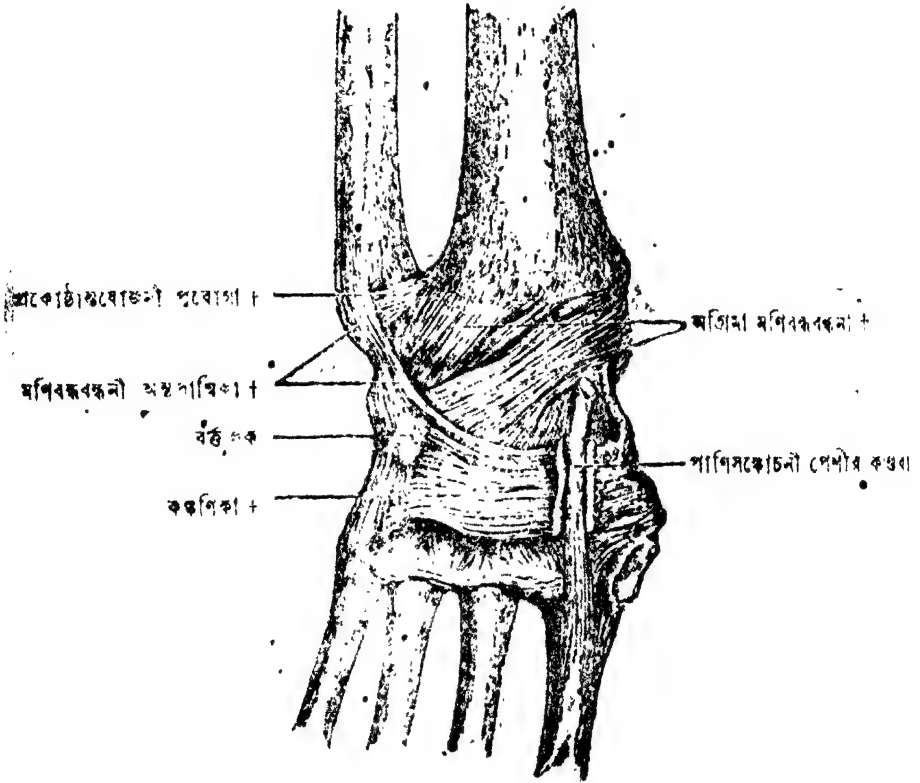


অনিবন্ধসন্ধি ।—ইহাতে বহিঃ-প্রকোষ্ঠাধির অধঃপ্রান্তস্থ থলেনুভার গর্ভবৃত্ত অংশের সহিত অর্দ্ধচক্রে ও নৌনিত নামক কূর্চ্চাধিধরের থলেকোর সন্ধি হইয়া থাকে। অস্তঃপ্রকোষ্ঠাধির অধঃপ্রান্ত সাক্ষাৎভাবে এই সন্ধিতে কূর্চ্চাধির সহিত সংহিত হয় না,

পরন্তু তৎসংসক্ত ত্রিকোণ তরুণাধি 'উপলক' নামক কূর্চ্চাধির সহিত সংহিত হইয়া থাকে। বহিঃপার্শ্বে, অস্তঃপার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থিত চারিটা মাণ্ডু এই সন্ধির বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করে।

[ ৪৪শ চিত্র—মণিবন্ধসন্ধি ( সম্মুখতল ) ]

প্রকোষ্ঠা স্থি দ্বয়



\* মূল শলাকা

[ + : উন্নত চিত্র সাহায্যবোধক ]

চেষ্ঠা—এই সন্ধি সম্মুখে, পশ্চাতে, অধঃ-পার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে খোঁজা থাকে। এই সকল চেষ্ঠার মিশ্রণে নানাদিগ্ন দিবর্ভনকপ চেষ্ঠা সম্পন্ন হয়। তন্ত্রে ভাঙ্গ-ভাঙ্গের সুবিধার্থ এই সন্ধির স্নায়ুগুলি শিথিল ও ত্তিত্বশূন্যক।

শ্লেষ্মাধরা কলা—এই সন্ধির মধ্যস্থ শ্লেষ্মাধরা কলা শিথিল এবং প্রচুর শ্লেষ্মক-সম্পন্ন।

করকর্কাত্তরীয়া সন্ধি—

কর্কাত্তিসমূহের পরস্পর সন্ধি 'প্রভর-সন্ধি' নামে অভিহিত। এই সন্ধিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—উর্দ্ধাশ্রয়ী অস্থিগুলির পরস্পর সন্ধি, অধঃশ্রয়ী অস্থিগুলির পরস্পর-সন্ধি এবং উর্দ্ধ ও অধঃশ্রয়ীর মধ্যে পরস্পর সন্ধি। সকলগুলিই অস্থিগুটি দ্বারা উৎপন্ন। নিম্নে ও উত্তর পার্শ্বে একশ ভাবে সন্ধি নে-



সংহিত কূর্চাস্থিগুলি একখানি অত্যন্ত বলবান্ প্রম হয়। তবে 'বর্তনক' নামক কূর্চাস্থিটো এই সন্ধির বহির্ভাগে ছইটো পৃথক্ মায়া দ্বারা আবদ্ধ থাকে। কূর্চাস্থিগুলির মধ্যে নানা শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট শ্লেষ্মাবরা কণা বর্তমান থাকে। কূর্চাস্থিগুলির চলন অতি সর পরিমাণে দেখা যায়।

**কব্জতলসন্ধি**—এই সন্ধি কোব-সন্ধি প্রধানতঃ কব্জতল নিৰ্ম্মাণকা মূলদেশকগুলির সহিত কূর্চাস্থিসমূহের ও অঙ্গুলিনলকগুলির সন্ধি। মূলশলাকাগুলি উর্দ্ধদিকে গর্হাণক, কূটক, মধ্যকূট ও ফণধর নামক চারিখানি কূর্চাস্থির সহিত, অধোদিকে অঙ্গুলি সমূহের পশ্চমনলকগুলির সহিত এবং সম্মুখে পবম্পব সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

উভাদের সন্ধির বিষয় অগ্রবর্ণন প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হইয়াছে। ছয়টা পশ্চাতে, আটটা সম্মুখে ও ছইটো মধ্যস্থলে—এইরূপে বিস্তৃত ঘোলাটো মায়া দ্বারা ইহাদেব সন্ধিবন্ধন হইয়া থাকে।

**কব্জাঙ্গুলি সন্ধি**—চৌদ্দখানি অঙ্গুলিনলকে চৌদ্দটা কোবসন্ধি হইয়া থাকে, যথা অঙ্গুলি দুইটা এবং মধ্যম অঙ্গুলি চতুর্দয়ের প্রত্যেকটিতে তিনটা করিয়া বারটা।

প্রত্যেক অঙ্গুলিসন্ধি বন্ধন কার্য সম্মুখে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত তিনটা মায়া দ্বারা নিম্পন্ন হইয়া থাকে। 'প্রদারণী' সংজ্ঞক পেশীসমূহের কণ্ডরাগুলির দ্বারা উভাদের পৃষ্ঠবন্ধন কার্য নিম্পন্ন হয় বলিয়া প্রয়োজনভাবে বহু পৃষ্ঠগা মায়া থাকে না।

[ ৪৫শ চিত্র—বঙফণসন্ধি ]



**চেষ্ঠা**—করাবুলিসব্ব সঙ্ঘোচ, প্রসার  
অন্তঃকর্ষণ ও বহিঃকর্ষণরূপ চেষ্ঠাবান্।  
অঙ্গুষ্ঠের অপসারণার্থ আছে অর্থাৎ অগ্র অঙ্গুলী-  
সমূহের উপর উঠার অগ্রভাগ যথোচ্চ ঘুরিতে  
পারে।

**অধঃশাখা সন্ধি**।

অধঃশাখার সন্ধি প্রায় উর্দ্ধশাখার প্রায়  
কেবল অবস্থান ভেদ বশতঃ কিঞ্চিৎ পার্থক্য  
দেখা যায়।

**বক্ষঃশাস্ত্রী**—শ্রেণিকলকের  
কর্ণাঙ্গ বেষ্টিত বক্ষঃশাস্ত্রী নামক কোটরে  
উর্দ্ধস্থির মুণ্ড সংহিত হইয়া এই উদ্বলসন্ধি  
নির্মাণ করে। এই স্থানের বৃহৎ শাণ্ডকোষের  
অভ্যন্তর ভাগ বাপিরা বৃহৎ স্নেহধরা কলা  
থাকে। এই মহান শাণ্ডকোষ বক্ষঃশাস্ত্রীর  
পরিধি হইতে উপিত হইয়া উর্দ্ধস্থির গ্রীবার  
চারিদিকে সঞ্চল থাকে। অধিকন্তু ইহা  
শ্রেণিকলকের অব্যবহৃত ভিনখণ্ড অস্থি  
হইতে ইলসও ষ্ট্রিট শাণ্ডকোষ দ্বারা পৃষ্ঠীকৃত  
হয়। তদ্ব্যতিরিক্ত 'বক্ষঃশাস্ত্রী' নামে একটি  
দৃঢ় শাণ্ডকোষ শাণ্ডকোষের ভিতরে, বক্ষঃশাস্ত্রী-  
স্থলের মধ্যম গভীর কোটর বেষ্টিতে ইহা  
হইয়া উর্দ্ধস্থির মুণ্ডস্থিত গঠে সঞ্চল থাকিয়া  
এই সন্ধিকে আরও দৃঢ় করিয়া থাকে।

**জাম্বুসন্ধি**—উর্দ্ধস্থি, জাম্বুসন্ধি ও  
জাম্বুসন্ধি দ্বারা নির্মিত এই সন্ধিটা নানা-  
প্রকারে বন্ধনযুক্ত হইলেও বিশেষ চেষ্ঠাবান্।  
তদ্ব্যতিরিক্ত জাম্বুসন্ধির সহিত উর্দ্ধস্থির ও  
জাম্বুসন্ধির প্রত্যেকসন্ধি এবং উর্দ্ধস্থির সন্ধি  
জাম্বুসন্ধির কোরসন্ধি হইয়া থাকে। অ-  
জাম্বুসন্ধি জাম্বুসন্ধির মধ্যে প্রবেশ করে না,  
ব্রহ্মসন্ধির পশ্চাতে পৃথকভাবে সংহিত হয়।

একটি পাতলা অথচ দৃঢ় শাণ্ডকোষ  
উর্দ্ধস্থি, জাম্বুসন্ধি ও জাম্বুসন্ধিকে বেধন করিয়া  
এই সন্ধিরক্ষণ কার্য প্রধানতঃ নিম্নলিখিত  
থাকে। অধিকন্তু এই শাণ্ডকোষ সমুখ,  
পশ্চাতে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত  
চারিটি শাণ্ডকোষ দ্বারা পৃষ্ঠীকৃত হয়। তদ্ব্যতিরিক্ত  
সমুখের শাণ্ডকোষ উর্দ্ধপ্রসারণী পেশীচতুষ্টয়ের  
সন্নিবিষ্ট কণ্ডার সহিত মিশিয়া এক হইয়া  
যায়, ইহারই মধ্যস্থলে তির্যকদিকে জাম্বু-  
কপালাস্থি দৃঢ়ভাবে সঞ্চল থাকে। এইজন্য  
কেহ কেহ জাম্বুসন্ধিকে কণ্ডারমধ্যস্থ বৃহৎ  
চণকাস্থি (Sesamoid bone) বলিয়া  
নির্দেশ করেন। জাম্বুসন্ধির অভ্যন্তরে অপর  
পাঁচটি শাণ্ড এবং বোজকরজ্জুসঞ্চল হইয়া  
অর্দ্ধচন্দ্রাকার তলপাণ্ডি আছে। এই তলপাণ্ডি  
হইবারিয়ার প্রান্তভাগ জাম্বুসন্ধির শিরঃস্থি  
দ্বিগুণ কণ্ডকের হইনিকে সঞ্চল।

[ ৪৬শ চিত্র—আনুমানিক ]

উর্দ্ধস্থি

উর্দ্ধস্থি পেশীচতুষ্টয়ের সীমিত্তি :

শ্লেষ্মা কলার উর্দ্ধ শাখা

জন্তুপাল বন্ধনী বাধ

আবস্থ

জন্তুর সমুখের ত্বকনিয়ন্ত্র

শ্লেষ্মা কলাপুট

উর্দ্ধস্থিকল

শ্লেষ্মা কলার বন্ধনী

দিকির সমুখস্থ মেদঃপিণ্ড

শ্লেষ্মা কলাপুট ( ত্বকনিয়ন্ত্র )

জন্তুবাধ

জন্তু বাধা পশ্চাৎস্থি

দিকির মেদঃপিণ্ড

শ্লেষ্মা কলার বন্ধনী

দিকির আগ্রন +

ই পশ্চিমা +

জন্তুপাণ্ডিক +

[ + এইরূপ চিহ্ন বায়ুবোধক ]

**চেচটা**—এই সন্ধি সঙ্কেট ও প্রসার—  
এই বিশিষ্ট চেচায়ুক্ত, তন্মধ্যে সঙ্কেট দ্বারা  
সন্ধি পশ্চাদ্দিকে সম্পূর্ণভাবে মুড়িয়া যায়  
এবং প্রসার দ্বারা সমুখদিকে দণ্ডবৎ স্তম্ভ মাত্র,  
অতিরিক্ত মুড়িয়া যায় না।

**শ্রেয়ধরা কলা**—জাম্বুসন্ধির শ্রেয়-  
ধরা কলা তিনটী; একটা 'সন্ধাস্তরীয়া মতটী'  
—এটার একটা শাখা উর্দ্ধে বিস্তৃত এবং ইহা  
জাম্বুসন্ধির মধ্যস্থ ও বিনালায়তন, অপর  
দুইটা শাখা সন্ধির বাহ্যদেশে সংস্কৃত।  
তন্মধ্যে সন্ধির বহিঃস্থিত একটা কলাগুটি  
জাম্বুকপাল ও ককের মধ্যে অবস্থিত। অপরটী  
জাম্বুকপালবন্ধনী প্রাণুজঙ্ঘর পশ্চাতে অবস্থিত  
ও ককরামুগা। মহাশী কলা হঠাৎ অতিরিক্ত  
শ্রেয় করণ হইয়া 'নিবামুগু' বা 'ক্রোড়শীর্ষ'  
নামক বাতব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই সন্ধির  
সমুদ্রে ও পশ্চাতে শ্রেয়ধরাকলাজঙ্ঘর দুইটা  
সমাপ্তিও আছে।

**জজ্ঞাস্তরীয়া সন্ধি**—জজ্ঞাস্ত্রি ও  
অজ্ঞাস্ত্রির সন্ধি উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য—এই  
তিন স্থানে হইয়া থাকে। উর্দ্ধে অজ্ঞাস্ত্রির  
উর্দ্ধ জজ্ঞাস্ত্রির উর্দ্ধ প্রান্তের বহিঃ-  
স্থিত সন্ধি পশ্চাদ্ভাগে সংস্থিত হয়।  
এই প্রান্তসন্ধি ও জাম্বুসন্ধির সম্পূর্ণ বহিঃস্থিত।  
—এই সন্ধির তুলনায় এই বৈসাদৃশ্য দেখা  
যায়। উর্দ্ধস্থিত সংযুক্ত দুইটা শাখা এই সন্ধিকে  
পশ্চাদ্ভাগে দুটরূপে বন্ধন করিয়া থাকে।  
এই সন্ধি অগ্রিমা, পশ্চিমা ও কোষাকাবা—  
এই তিনটা শাখাও উর্দ্ধ সন্ধির বন্ধন করেন।  
—এই সন্ধি জজ্ঞাস্ত্রির অধঃপ্রান্তের বহিঃ-  
স্থিত সন্ধি একোণাকার কোরে অজ্ঞাস্ত্রির  
—এই সন্ধি নিম্নাধঃ অধঃপ্রান্ত সংস্থিত হইয়া

কোরসন্ধি নির্ধারণ করে। অগ্রিমা, পশ্চিমা,  
বলরিকা, ও সন্ধাস্তরীয়া নামে চারিটা শাখা  
এই সন্ধিবন্ধন করিয়া থাকে। এইরূপে  
সংস্থিত জজ্ঞাস্ত্রি ও অজ্ঞাস্ত্রির অধঃপ্রান্ত-  
স্থলের সহিত 'কূর্চশির' নামক অস্থির সন্ধি  
হয়। এই সন্ধির বিষয় পরে বলা যাইবে।  
জজ্ঞাস্ত্রি ও অজ্ঞাস্ত্রির 'মধ্যানলকধর'  
'জজ্ঞাস্ত্রিমা' নামে দুট 'কলা' দ্বারা সুবদ্ধ।  
প্রকোষ্ঠাস্থিদের দ্বারা ইহাদেরও মধ্যানলক-  
ধরের পবম্পর সংস্পর্শ হয় না।

**গুস্তফসন্ধি বা পাদসন্ধি**—  
জজ্ঞাস্ত্রির অধঃপ্রান্তের সহিত কূর্চশির  
অস্থির পরকোষ সন্ধি হয়—এই দুট গুস্তফের  
মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে গুস্তফসন্ধি বলে।  
এই সন্ধি আশ্রয় করিয়া সমগ্র পদ সমুদ্রে  
পশ্চাদ্ভাগে, তির্যকদিকে ও কিঞ্চিৎ বাহিরদিকে  
বিস্তৃতি হইতে পারে। এইজন্ত ইহাকে  
পাদসন্ধিও বলা যায়। অগ্রিমা, পশ্চিমা,  
অধঃপার্শ্বিকা ও বহিঃপার্শ্বিকা নামে চারিটা  
শাখা জজ্ঞাস্ত্রি, অজ্ঞাস্ত্রি, কূর্চশির,  
নৌনিত, পার্শ্ব—এই কয়টা অস্থিতে সংস্কৃত  
পার্শ্বিকা এই সন্ধির বন্ধনকাণ্ড নিশ্চয় করে।

**পাদকূর্চাস্থির সন্ধি**—পাদ-  
কূর্চাস্থি সমুদ্রে মধ্যে কোনো কাহার সহিত  
সন্ধিযুক্ত ভাণ্ড পূর্বে বলা হইয়াছে। অনেক-  
গুলি শাখা এই সকল অস্থির বন্ধন করিয়া থাকে  
এবং এই সকল শাখা পরস্পর অল্পপ্রতি বলিয়া  
এইরূপ আয়ুজালবোঁত ও বৃহৎ পাদকূর্চাস্থি-  
সমুদ্রের কূর্চাস্থির মত একখানি অস্থি বলিয়া  
বোধ হয়। সেইজন্ত প্রাচীনরা কেহ কেহ  
প্রত্যেক পদে একখানি করিয়া 'পাদকূর্চাস্থি'  
অস্থি আছে বলিয়াছেন।

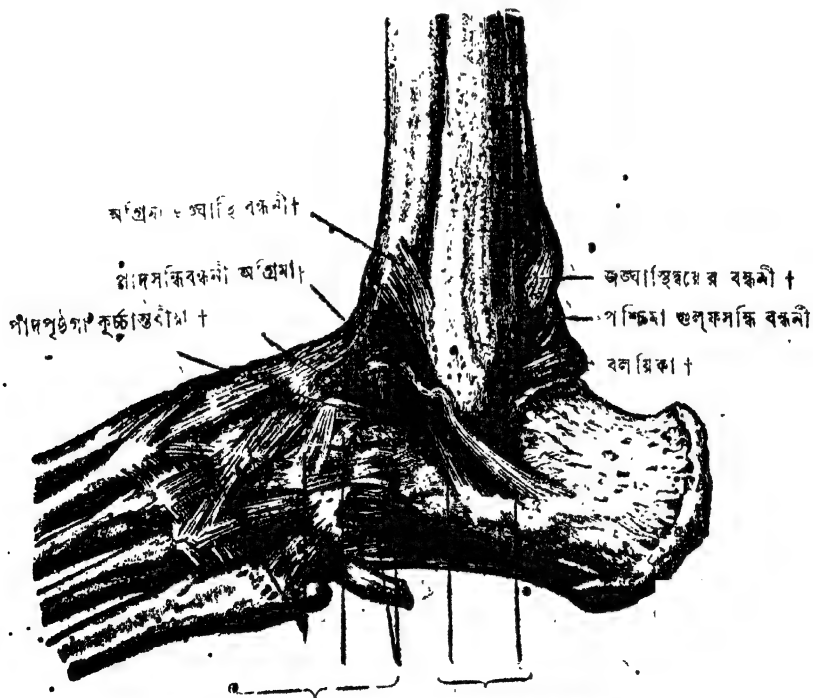
**পাদতল সন্ধি**—পাদতলের পশ্চাৎ অবস্থিত কৃচ্ছাসন্ধির বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। পাদতলের সম্মুখার্ধে পাদ-মূলশাফাগুলির সম্মুখে ও পশ্চাতে কোরসন্ধি হইয়া থাকে। ইহাদের সন্ধান তিন প্রকার—সম্মুখে পাদাঙ্গুলিসমূহের পশ্চিমমূলকগুলির সহিত; পশ্চাতে কোণকএয় ও কননাসন্ধি কৃচ্ছাসন্ধির সহিত এবং মূলদেশে পরস্পরের সহিত। তন্মধ্যে পাদাঙ্গুলির পশ্চিম মূলকের সহিত ঈর্ষক অঙ্গুলির সন্ধি বলা যায়। কৃচ্ছাসন্ধিগুলির সহিত সন্ধি পাদতলবন্ধ, পাদপৃষ্ঠবন্ধ

এবং সন্ধাস্তরীয়—এই তিন প্রকার স্নায়ু দ্বারা সম্বন্ধ হয়।

অঙ্গুলি বাণীত অস্ত্রাত্ত মূলশাফাগুলি মূলদেশে পরস্পর সংস্কৃত হইয়া থাকে। পূর্ববৎ ত্রিবিধ স্নায়ু দ্বারা সন্ধি বন্ধনকার্য সম্পন্ন হয়।

**পাদাঙ্গুলি সন্ধি**—করাঙ্গুলির ত্রয় পাদাঙ্গুলি সমূহের চৌদটি কোরসন্ধি আছে—অঙ্গুলি দুইটি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া বারটি। ইহাদের বন্ধনী স্নায়ু-গুলিও করাঙ্গুলিসন্ধির তায়।

[ ৪৭শ চিত্র—পাদ সন্ধি বা গুল্ফ সন্ধি ]



পাদপৃষ্ঠগা কৃচ্ছাসন্ধি + পাদসন্ধিবন্ধনী বাহ্য +

[ + এইরূপ চিত্র স্নায়ুবোধক ]

চেফা—পাদজ্বলি সকলের চেষ্ঠা বা চলহ অঙ্গমাত্র—সঙ্কোচন, প্রসারণ, অস্তঃকর্ষণ ও বহিঃকর্ষণ—এই চারি প্রকার চেষ্ঠাটী অঙ্গ-ভাবে বর্তমান । :

### শৈলী পরিচয় ।

পূর্বে নয়কাল বর্ণন প্রসঙ্গে যে অতিময় শরীরের দ্বিধা বলা হইয়াছে, উহা সর্বত্র পেশী দ্বারা আবৃত থাকে এবং পেশী সর্বত্র বিবিধ কলা ও ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে । অর্থাৎ শরীরের বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তর দিকে প্রথমতঃ ত্বক, তৎপরে মেম্ব্রেনা কলা, পবে মাংসধরা কলা, তৎপরে স্তবে স্তবে পেশী সূহ এবং তৎপরে অস্থি অবস্থিত । পেশী সূকের দ্বারা শরীরের সর্বপ্রকাব চেষ্ঠা সাধিত হইয়া থাকে ।

পেশী সকল মাংসকর । মাংস ও পেশীও কোন প্রভেদ নাই । চলিত কথায় পেশীগুলি ষণ্ড ষণ্ড করিলেই মাংস বলা হয় । পেশীও আকার প্রায় স্তূপমধ্য বস্তুব জায়, কচিৎ ছোট চাদরের জায় এবং কদম্বাদি স্থানে কোষের জায় । স্তম্ভে কথিত হইয়াছে যে পেশী সকল সন্ধি, অস্থি, স্নায়ু ও মাংস সমূহকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং স্থানভেদে আবদ্ধকৃত মত করিন, কোমল, স্থূল, সূক্ষ্ম, আয়ত, গোলা, হ্রদ, দীর্ঘ, স্থির, মুক্ত, সঞ্চল ও কর্কশ হয় । \*

রক্তবস্তুর আকারবিশিষ্ট পেশীসমূহের

\* তাম্র-বহল-পেলব-কলাপি-পুষ্ক-বৃক্ক-দীর্ঘ-স্থির-হ্রদ-রক্ত-কর্ণ-ভাবাঃ সন্ধ্যস্থি-স্নায়ু-বাস্তু-প্রচ্ছাদক-কলা-বিশা-বিশা-বভাবত-এব-ভবতি

হৃক্কত, শারীর দ্বাদ, ৪ অঃ ।

ভদ্র-দক্ষণ, দৃঢ় ও স্নায়ুময় প্রাপ্তভাগকে বস্তু + বলে । বিস্তৃত ও স্থূল, পেশী সূক্ষ্মের প্রচ্ছাদক আর্য্য চাদরের দ্বারা আয়ত প্রায়-ভাগগুলির কলা ও কণ্ডরা উভয়ের সংকট সাদৃশ্য আছে, একজ্ঞ উহাদিগকে ‘কলাকণ্ডরা’ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় । \*

শ্যাসাসমূহের পেশীগুলি প্রপঞ্চবস্তুর ঘন-ভাবে সন্নিহিত । উভয়ের মধ্যে কেবল পুষ্ক পাতলা কলার ব্যবধান আছে মাত্র । উক্ত প্রত্যেক পেশী পৃথকভাবেও কলাকণ্ডরা বৈষ্টি, আবার সবগুলি একত্র একটী কলা দ্বারা বৈষ্টিত ।

প্রধানতঃ পেশীসকলকে আশ্রয় করিয়া স্নায়ু, ধমনী ও স্রোতঃসমূহের শাখা প্রশাখা সমুদ্র মাংসাদির মধ্যে প্রসারিত হয় । স্তম্ভে কথিত হইয়াছে যে ‘পল্লবকথিত মৃণাল যেমন ভূমিতে চতুর্দিকে তন্তু বিস্তার করিয়া থাকে, স্নায়ু, ধমনী প্রভৃতিও মাংসের মধ্যে সেইরূপ শাখা প্রশাখাদ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে । §

পেশী সকলের সঙ্কোচ ও প্রসার বশতঃ অবয়ব সমূহের আকর্ষণ, প্রসারণ, উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার শারীরিক চেষ্ঠা সাধিত হইয়া থাকে । চেষ্ঠার বেগপ্রযুক্তি পেশীর মধ্যে প্রবিষ্ট চেষ্ঠাবহা নাকী সকলের

+ ইং—নাম Tendon ( টেণ্ডন ) ।

‡ ইং-নাম—Aponeurosis—( এপো-নিউরোসিস ) ।

§ বধ্য বিসমুণালারি বিবন্ধন্তে সমস্ততঃ !

কুমৌ পাক্যাকস্থানি তথা মাংসে স্নায়বঃ ।

\* হৃক্কত, শারীর দ্বাদ ৩৪ অঃ ।

দ্বারা ঘটে। শারীরিক বলও পেশীমূলক। পেশী সকল স্পষ্ট ও সুসংহত হইলেই লোককে বলবান বলা হয়।

চেষ্টাবহা ব্যতীত সংজ্ঞাবহা নাড়ীও পেশীর মধ্যে অবস্থিত কবে। এই সকল নাড়ী দ্বারা পেশী সমূহের সংস্কারপ্ৰসার ও শীত-স্নান সজ্জাতীয় জ্ঞান উপলব্ধ হয়।

ক্রিয়াবিশেষতঃ পেশীসকল 'স্বল্প' ও 'পৰৱৰ্ত্ত'—এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে স্বল্প পেশী সকলের ক্রিয়া আপনা হইতে হইয়া থাকে, পৰৱৰ্ত্তের ইচ্ছাব অপেক্ষা কবে না—যেমন হৃদয়, আশায় প্রভৃতি স্থানের পেশীগুলি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল। পরৱৰ্ত্ত পেশীসকল পুরুষের ইচ্ছাবশে চালিত হইয়া থাকে, যেমন কর চব্বাদি স্থানের পেশী। এই জন্ত ইচ্ছাদিগের অপব নাম—“ইচ্ছাধীন” পেশী।

ইচ্ছাধীন পেশী সমূহের উভয়প্রান্ত প্রধানতঃ স্বায়ুস্বর। উভারা উভয়দিকেই অস্থিতে সংবদ্ধ, কতিং একদিকে অস্থিতে ও অপরদিকে ত্বক্ অথবা একদিকে অস্থিতে ও অপর দিকে স্বায়ুতে সংবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে উর্দ্ধদিকের নিবন্ধন প্রায়ই স্থিরতর ও ‘প্রত্য’ নামে অভিহিত এবং নিম্নের নিবন্ধন অধিক ক্রিয়াশীল ও ‘নিবেশ’ নামে কথিত।

পেশীসকলের উপাদান—জলোকা শরীরের স্তায় সংস্কারপ্রদায়ী মাংসতন্তুগুলি এবং কল্প সংখ্যক স্বায়ুস্বর। শুষ্কীকৃত মাংস-তন্তু সমূহই পেশী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পরৱৰ্ত্ত পেশীসমূহের মাংস-তন্তুগুলি চণ্ডাদিকে রেখবদ্ধিত, দীর্ঘ এবং নাতিদ্রব সংঘাত বিশিষ্ট; আর স্বল্প পেশী

সমূহের মাংসতন্তুগুলি ত্রৈকুণ রেখাবিহীন, হ্রস্ব এবং ঘনসংঘাত বিশিষ্ট। স্বল্প পেশী সকলের উৎপত্তি বা নিবেশ অস্থিসাপেক্ষ নহে—উহারা প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থিত করে।

সিবিধমনীজালকনিঃসৃত বক্তের ‘লসীকা’ নামক স্বচ্ছ তরল ভাগের দ্বারা পেশী সকলের পোষণ হয়।

পাণীৰ প্রাপ্তিরোগ হইলে পেশী সকল প্রথমে শীঘ্রই সঙ্কুচিত ও কঠিন হইয়া যায়, এই কারণে যুদ্ধদেহে চতুর্পদাদি কঠিনতা ঘটে। ইহাকে ‘মৃতিকঠিত্ত’ (Rigor Mortis) বলে। ইচ্ছা অপগত হইলে পেশী সকল পটিতে আরম্ভ হয়।

পেশী সকলের মামকরণ নানাবিধ স্বরূপ ধরিয়া করা হয়। কখন স্থান ভেদে যেমন ‘গ্রীবাশৃঙ্গিকা’ পেশী, কখন উৎপত্তি-নিবেশ ভেদে—যেমন ‘উবঃকর্ণমূলিকা’ পেশী কখন কার্য ভেদে—যেমন ‘অস্বর্ত্তপ্রসারিনী’ পেশী, কখন আকৃতি ভেদে—যেমন ‘দ্বিশিরিকা’ পেশী, কখন বদৃচ্ছাক্রমে—যেমন ‘মজা’—ইত্যাদি।

আয়ুর্বেদকারগণের মতে পেশীর সংখ্যা পাঁচশত\*। আশ্চর্য্য চিকিৎসকগণের মধ্যে ও কেহ কেহ পেশীর সংখ্যা ৫০১ পাঁচশত

\*. Sappey recognises 501 muscles distributed as follows:—trunk, 190; head 63; arms, 98; legs 104; and alimentary canal 46. G. D. Thane finds 311 muscles on each side of the body:—head and front of neck, 82; Vertebral column and back of neck, 60; thorax, 42; abdomen, 14; arm 39; leg, 54, (Morris's Anatomy p. 317.)

এক বলিয়াছেন।। পেশীর সংখ্যা সম্বন্ধে  
এইরূপ কথঞ্চিৎ মতের ঐক্য পেশী সমষ্টি  
সম্বন্ধে মাত্র—ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের পেশী সংখ্যা  
সম্বন্ধে নহে। উদাহরণ যথা—মুণ্ডত বলিয়া-  
ছেন যে, শাখাসমূহ পেশীর সংখ্যা চারি শত,  
কিন্তু নবাব মতে শাখাসমূহের পেশীর সংখ্যা  
তুই শত মাত্র।।

এইরূপ মহতত্ত্ব গণনার পার্থক্য বশতঃ  
ঘটিয়া থাকে। যেমন প্রতীচ্যমতে অঙ্গুলি  
প্রসাধনী ও সঙ্কোচনী পেশীগুলি বহুশাখা  
বিশিষ্ট হইলেও সংখ্যায় তানেকগুলি বলিয়া ধরা  
হয় না, এক একটা মূল ধরিয়া এক একটা  
পেশী ধরা হয়। সম্ভবতঃ পাত্যামতে ইহাদের  
নিম্নে ও পৃথকভাবে ক্রিয়ানীতির ধারণা  
শাখাগুলির পৃথক গণনা করা হইয়াছে। এইরূপ  
পৃষ্ঠপ্রচ্ছদ পেশীকে প্রাত্যামতে ত্রৈলিকে স্বতন্ত্র  
পেশী বলিয়া গণনা করা হয়, কিন্তু প্রতীচ্য  
মতে উভয় দিকের অংশ একই বলিয়া একটা  
পেশী বলিয়া গণনা করা হয়। প্রাত্যামতেও  
সংখ্যামাত্র স্মরণ্যতানিতে পাওয়া যায়, পৃথক-  
ভাবে বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন্য এখানে বিশদ  
কর্তব্যে। এইরূপ প্রাত্যামতের সম্পূর্ণ অঙ্গ-  
সরগ এক্ষণে অসম্পূর্ণ।

লক্ষ পেশীলক্ষ্যনি ভবতি। রাসাঃ চারিণেন্তানি  
নাখাত, কোত্তে বটবটঃ, যৌবাঃ সমুদ্রাঃ চতুর্বিণ্ডবঃ।

(মুহুর্ত, শাখা-গণনাঃ অঃ।)

অতএব এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচ্য মতের  
অঙ্গসরগ না করিয়া প্রতীচ্যমতানুসারে পেশী  
সমূহের বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম।

## পেশী বর্ণনা।

প্রথমে মস্তক ও গ্রীবাব পেশী সমূহের  
বর্ণনা করা যাউক—১। ত্রয়োদশ মস্তক ও  
মুখমণ্ডলের পেশীগুলিকে বর্ণনা—কৌণ্ডার্য  
দশটী স্থানে বিভক্ত করা যায়। যথা, কণ্ঠাতি  
পটলে একটা, প্রতিকর্ণের চতুর্দিকে তিনটী,  
প্রতি কণ্ঠে তিনটী, প্রতি নেত্রগোলাকে  
চারটী, নাসাপার্শ্বের সাতটী, উর্দ্ধমুখ এক এক  
দিকে চারিটী, অধোমুখ এক এক দিকে  
তিনটী, হৃদয়ের মধ্যে এক এক দিকে তিনটী,  
শর ও হৃদয় মধ্যস্থলে এক একদিকে ত্রৈলী  
হৃদয়স্থে এক এক দিকে ত্রৈলী।

কহোটিপটলত্রিঃ পেশীর নাম  
শিশিরসংস্থনা। উহা লগাটী মুইতে আবদ্ধ  
কবিতা পশ্চাৎ কপাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং  
মধ্যে মূলকলা নির্ভৃত। শিশিরসংস্থনা পেশী  
লগাটীসঙ্কোচন ও মস্তক আচ্ছাদন—প্রধানতঃ  
এই ত্রৈলী কার্য করিয়া থাকে।



[ ৪৮শ চিত্রে—মস্তকের পেশীসমূহ ]  
( উপবিষ্ট অব )

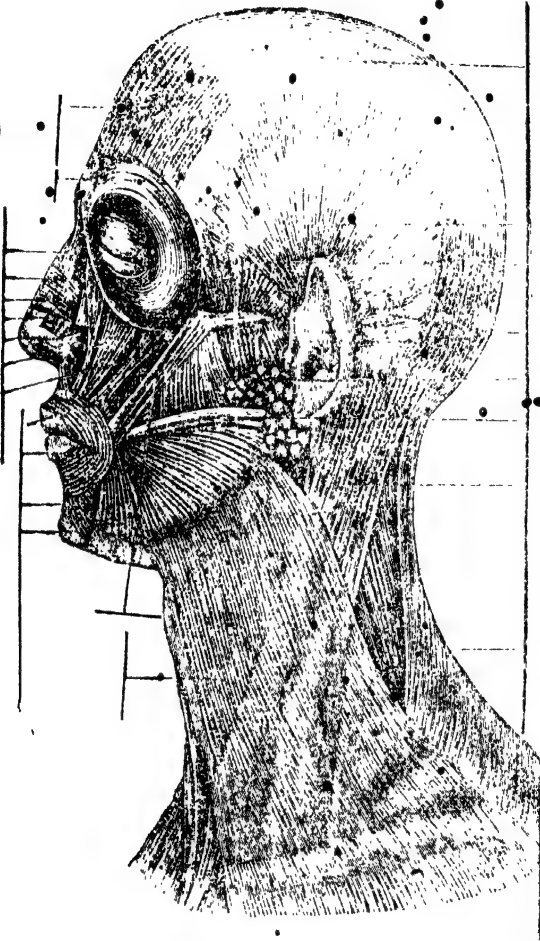
শিরঃশূল্য ( অগ্রিমার্শ )  
নেত্রনিম্নলিনী

ঐ সংনমনী  
নাসোক্তকক্ষী  
বাসীসেজুক  
নাসাবিশ্কারণী পৃষ্ঠী  
পারিস্কারণী পশ্চিম  
ঐ সম্বন্ধগণী লম্বী  
কণী কক্ষী পশ্চিম

কৃৎস্নমুগ্ধগণী  
কনরোক্তকক্ষণী  
অধরাবনমনী

কণীকক্ষণী কক্ষী

গলপার্শ্বকক্ষী



শিরঃশূল্যপেশীসমূহ  
কণীকক্ষণী

কণীকক্ষণী  
কণীকক্ষণী  
—শিরঃশূল্য (পশ্চিমার্শ)  
কণীকক্ষণী  
কণীকক্ষণী  
কণীকক্ষণী

কণীকক্ষণী

কণীকক্ষণী

## আয়ুর্বেদ—অনুশীলন।

( কবিবাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী )

যে শাস্ত্র আজ সমাজের জায় নিখুঁত হইয়াছে বোগ ও ঔষধ-সংক্রান্ত মানবের প্রকৃত বা সম্পূর্ণ আধিপত্য কল্পাইতে পারিতেছে না, তাহার সামাজ্য আভাসে কি হইবে? উক্ত সামাজ্য আভাসই বা কোথা হইতে আসিল, কেউবা তাহার সৃষ্টি-কর্তা, ঐ আভাস পরম্পরা হইতে কোন কোশলেই বা এই বিষয়াদিক শাস্ত্রের উদ্ভব হইল, আয়ুর্বেদ তবু জিজ্ঞাস্য মাত্রেই এই বহুতত্ত্ব জানিবার কোতুলল ভন্নিতে পাবে।

কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র কেন, যে কোন বিষয়ই কেন হউক না, মানবের সেই অকৃত্যব-ময় আধিনি অথবা হইতে বর্তমান অবস্থা চিত্রা কবিলে সকলের জন্ম বিস্ময় রসে প্রাবৃত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয় আজ, একটা পঞ্চদশবর্ষীয় শিশুও সর্বল বুদ্ধি বুদ্ধিতে পাবে, প্রথমাবস্থায় তাহা সূক্ষ্মভাৱে অজ্ঞাত ছিল। আজ তাহা নগণ্য আবিষ্কার ইতিহাসে প্রীত; তাহাতেও এক সময় মানব বুদ্ধি চমকিত হইয়াছিল, জয়নাগে গগন বিদীর্ণ হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে ঐ সকল এক দিনের এক মাসের বা এক বৎসরের সংগত নয়। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে, বহুশ্রমণ বহু জিহ্বা সহ পরীক্ষার বীজ-অনিব-জীবন ব্যয়িত হইয়াছে, কে তাহার টয়রা করিতে পারে? এক ব্যক্তি কোনো বিষয়ের আভাস বাত্ৰ পাঠলেন, সেট ব্যক্তি অপর

ব্যক্তিকে সেট বিষয়ের উপদেশ দিলেন, এইকণ উপদেশ-পূর্য্যপাতনে শাস্ত্র মত্রেই শিক্ষা বলিয়া দাঁসিতেছে। বেদের সময়ে, গুণাধিপ সময়ে এবং হিন্দু সময়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষণের কোন প্রভেদ ছিল না। বর্তমান সময়ে যাহারা আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন, অথবা শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাদিগের শিক্ষা প্রণালী কিরূপ, এবং প্রকৃত চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক তাহাদিগের কতদূর লক্ষ্য—তদ্বিষয় জানবা সংক্ষেপে—কিছু কিছু আলোচনা করিব।

এ বিষয়ের আলোচনায় কন কি? তাহা পাঠাঙ্গণ স্বয়ং বুঝিয়া লইবেন। শিক্ষা বলিলে কি বুঝায় এবং শিক্ষার জগৎ কি ইচ্ছা বলা কনাস্ত্রক? কেননা শিক্ষার স্রোতের পূর্ণা-গেতা সমগ্রিক মাত্রায় বুদ্ধি পাইয়াছে, স্বতরাং শিক্ষার প্রভাবও সাধারণে অবগত হইয়াছেন। পরন্তু শিক্ষার সহিত চিকিৎসার অনেক অংশ সাদৃশ্য বা সাম্য আছে ইহা হয়ত সাধারণে না জানিতে পারেন।

চিকিৎসার যেমন চিকিৎসক, ঔষধ এবং পরিচারক ও রোগী এই চারিটা পাদ বা স্তম্ভ নষ্ট হইয়া গিয়া, এই কারণেই চিকিৎসককে—  
**“চতুস্পাদ বা চতুস্তম্ভ  
 বলে।”** (১)

\* ভিকটোয়াগুপ্তাভা মেঘীপাদ চতুস্তম্ভ।  
 ভগবৎকারণ জ্যেষ্ঠ বিক্রমপুরশাস্ত্রী।  
 (চরক) (১)

শিক্ষারও তেমনি শিক্ষক, গ্রন্থ, অভি-  
ভাবক ও শিষ্য এই চারিটিকে পাদ বা অঙ্গ  
বলা যাইতে পারে। কেন না উহাদের  
কোনটির অভাবে চিকিৎসা চলিতে পারে  
না। এবং উহাদের স্বয়ংদোষের উপর  
চিকিৎসা বা শিক্ষার উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর  
করে। "চিকিৎসা পাদেব সত্যতঃ শিক্ষাপাদেব  
অন্যন্যিত্ব সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা যাইতে  
পারে।

"চিকিৎসা পাদঃ" ॥ (২)

"শিক্ষিত জনক"—অর্থ তত্ত্ব দৃষ্ট  
কর্মী, অগ্রকৃত্য, ক্রিপ্তত্ব, শুচি, শুব,  
চিকিৎসোগত সজ্জা ও উপকরণ যুক্ত  
পড়াংপরমতি, বুদ্ধিমান, উত্তমশীল, বিশারদ,  
সত্যধর্মপরায়ণ।

"উষধ"—প্রশস্ত দেশসমূহ প্রশস্ত  
দিনোদ্যত মাত্রোচিত, মনোহার গন্ধবর্ণ  
রসস্বিত, দোষহ, অপ্রাণিকব।

পরিচালক—যেহান অনিন্দ্য  
বলবান, রোগীরক্ষণতৎপর, বৈজ্ঞানিক  
প্রতিপালক, শ্রমশীল।

(২) তৎসংগিতসার্থো দৃষ্টকর্ম্মাংগকৃতী।

লব্ধত্বঃ শুচিশুরঃ সন্তোষকর ভেষজঃ।

প্রত্যুৎপন্নমতির্মান্ব ব্যবসায়ী শ্রিয়ধনঃ।

সত্যধর্ম্মপরো বশ বৈজ্ঞানিক প্রশস্ততঃ।

প্রশস্ত দেশসমূহ প্রশস্তেহি চৌদ্ধত্বঃ।

অন্নমাত্রং মহাবীজং গন্ধবর্ণ রসস্বিতং।

দোষহমপ্রাণিকরং যথিকং ন বিকারি বৎ।

সমীক্য কালোত্তমক ভেষজং জ্ঞাত গুণাবহনং।

সিদ্ধো হস্ততত্ত্ববলবান বৃত্তো ব্যরিত রক্ষণে

বৈজ্ঞানিক ক্রমশাঙ্কং পুণ্য পরিচর যতঃ।

আহুমান বহুবান সাধ্যো ব্যবসায়ী বসানি

আত্মিক বৈদ্যবাক্যো ব্যরিতঃ পার উচ্যতে।

রোগী—আহুমান, ক্রেশসতিষ্ণু, সর্ব  
দ্রব্য নির্লোভ, আত্মিক, বৈজ্ঞানিক প্রতি-  
পালনকারী।

শিক্ষাপাদঃ—

শিক্ষক—শাস্ত্রের স্বার্থ তত্ত্ব, দৃষ্ট-  
কর্ম্ম, অভিজ্ঞ, ক্রিপ্তকর্ম্ম, শুচি, শুব শিষ্টো-  
পয়ক উপকরণ সম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান  
উত্তমশীল, বিশারদ, সত্য ধর্ম্মপরায়ণ।

গ্রন্থ—লেখনীর প্রহৃত-সুসময় লিখিত  
শিষ্যের ধারণ যোগ্য মনোহারী রস কাব্যাদি-  
গুণ সম্বিত চরিত্র সংশোধক, সন্তোষদায়ক,  
অনপকারী।

অভিভাষক—যেহান অনিন্দ্য,  
বলবান ছাত্রশাসনপটু শিক্ষক।

শিষ্য—আহুমান, ক্রেশসতিষ্ণু, উপদেশ  
গ্রহণক্ষম, গ্রন্থায়করণ সম্পন্ন, নির্লোভ  
আত্মিক, শিক্ষাকোপদেশোচ্চবাসী।

রোগীর রোগ মোচন করিয়া সুস্থিলা  
স্বাস্থ্য স্থাপন বিতরণ করা যেমন চিকিৎসকের  
কার্য, শিষ্যের মনোমালিন্য দূর করিয়া প্রকৃত  
জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া দেওয়াও  
শিক্ষকের তেমনি কর্তব্য। "রোগ পরীক্ষার  
তত্ত্ব রোগীর বাহ বা অভ্যন্তর দেশ উন্নত  
করিয়া পরীক্ষা করা যেমন চিকিৎসকের  
কর্তব্য শিষ্যের অধ্যয়ন করণ ক্রম  
কুসংস্কারাদিতে আচ্ছন্ন তাহা পরীক্ষা করিবার  
তত্ত্ব তাহার পঠনের সহিত তাহার মানসিক  
বৃত্তিনিচয় নূতন ভাবে পরীক্ষা করাও শিক্ষ-  
কের তেমনি কর্তব্য। রোগীর প্রকৃত বয়স  
ইত্যাদির সহিত দেশকাল প্রভৃতির সামঞ্জস্য  
করিয়া মাত্রাতে ঔষধ প্রয়োগ করা যেমন  
চিকিৎসকের কর্তব্য, শিষ্যেরও মানসিক

প্রবৃত্তি, মনের গঠন ক্রিয়াকলাপ, কোন বৃত্তি প্রবল, কোন বৃত্তি অপ্রবল, যেথা কেমন, বুদ্ধি কেমন, মনের ভাবাশক্তি কোন দিকে কোন বিষয় শিক্ষার সমস্তা ফলোপকারক হইতে পারে, ইত্যাদি মনের স্বাভাবিক অবস্থা বা গতি, বহুসংখ্যক পদ্ধতি দিবার কথিয়া বেশ ভাল ইত্যাদি বিশেষণা পূর্ণক বৃথাচিহ্ন শিক্ষা পদান করণ শিক্ষকের কর্তব্য, নতুবা শিক্ষা সুসিক্ত বা শুকলপদ হইতে পারে না। কথ্য ভগ্ন জীব দেহ সংস্কার এবং সুসুখ জীবনের পুনর্জন্মরূপে উৎকর্ষ কার্য সাধন করেন বলিয়া চিকিৎসক যেমন জীবনদাতা পিতা, অজ্ঞান ভিষিক্ত বিমুক্ত বাক্য আত্মসংস্কার এবং আনন্দক বিস্তরণ করেন বলিয়া শিক্ষকও যেমন জ্ঞানদাতা পিতা। একটু আধটু তিক্ত প্রভৃতি ঔষধ বোগীর কটিক হইয়া না বলিয়া চিকিৎসককে সময় সময় কল্লনার আশ্রয় লইতে হয়, আপাত অপ্রতি-কব তর্জনী অটল বিষয় সকল অতিক্রম হয় বলিয়া শিক্ষককেও সময় সময় উপশ্রাস ও কপদ পুড়ক নানাবিধ কল্লনার আশ্রয় লইতে হয়। ফলতঃ চিকিৎসা যেমন চিকিৎসক, শিক্ষকও যেমন চিকিৎসক। এই কারণে প্রকৃত চিকিৎসক যেমন চিকিৎসক, প্রকৃত শিক্ষক তেমন চিকিৎসক। এইরূপ শিক্ষক চিকিৎসক বলিয়া শিক্ষাক্ষণে নীচনিপুণ কবি বলিষ্ঠাঙ্গন,—

“যেমন কল্লনার দুর্বাবোহ হইলেও কেহ যদি সোপান কথিয়া দেন, তবে তাহাতে

অবগাহন করা যাইতে পারে, তেমন ছাত্র হৃৎকোষ হইলেও কেহ যদি সোপান অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি কথিয়া দেন—তাঁহা হইলে তাহাতে প্রবেশ করা যাইতে পারে।” কিন্তু সুখের সোপান প্রভৃতি কথিয়া দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়াই ভার।

চিকিৎসার সুস্থিত শিক্ষার এইরূপ সাধারণ প্রদর্শন প্রকৃত পক্ষে সমীচীন। এইরূপ সাধারণ প্রশংসার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা চিকিৎসার্থী বা চিকিৎসার্থী উৎকর্ষাভিলাষী, তাঁহাদের যেমন চিকিৎসক, ঔষধ, চিকিৎসক ও বোগী এই চারিট বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক, এই চারিটর উৎকর্ষ বিধানের অন্তর্গত হওয়া উচিত, তেমন যাহারা শিক্ষার্থী বা শিক্ষার উন্নতিস্বার্থী, তাঁহাদেরও শিক্ষক, শিষ্য প্রভৃতি চারিটর অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। ইহাদিগের একটা দ্বারায় কখনও শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে না। যে কাণী পবম্পর বোধসাপেক্ষ, সে কাণীর প্রত্যেক অঙ্গেই সেই বোধ-বিচার করা বিশেষ। যে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা প্রসারে আমরা এই সকল কথা উত্থাপন করিলাম, বলিতে বড়ই দুঃখ হয়, সেই আত্মশুদ্ধির শিক্ষার সমস্ত অঙ্গেরই অভাব। সেই সকল অভাব মোচন না করিয়া যাহারা কেবল উন্নতি লইয়াই বাস্তব তাঁহাদিগের কথা লইয়া আলোচনা করা আমরা বাস্তবিকই প্রয়োজন মনে করি না।

## স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

(প্ৰাণরক্ষা)

[ ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার ]

## প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যা।

তৃণ, অন্ন, (ছাই বা তামাকের গুল) প্রভৃতি, বাসুকা, লৌহ, চর্শ্ব-লোম (tooth brush) প্রভৃতি নিত্য অব্যবহিত দ্রব্য দস্তধাবন পরিত্যাগ পূর্বে পূর্বোক্ত দ্রব্য-স্বিচ উপকরণে দস্তধাবন করিয়া মুখগহ্বর পবিত্র করিবে। তৎপরে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া শুচি হইবে। ঐদৃশ শুচি ব্যক্তিকে দেবতাগণ রক্ষা করিয়া থাকেন। পিতৃগণ শুচি ব্যক্তির অনুগত হন। রোগ-বীজরূপ ব্যাকসগণ শুচি ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। শৌচসূচি ব্যক্তি ঘান, দান, তপস্যা, ত্যাগ, মন্ত্র, জপ, ধর্ম এবং বিধিবোধিতক্রিয়া ও মঙ্গলাঙ্গন প্রভৃতির ফল কিছুমাত্র লাভ করে না। এ নিমিত্ত নিরন্তর নানাবিধ রোগ-শ্রোণাদির অধীন হইয়া থাকে।

উক্তরূপে শৌচক্রিয়া সম্পাদন পূর্বেক রাজিবাস পরিত্যাগ কর্তব্য। যে সকল ব্যক্তির প্রাতঃস্নান সক্ষম হয় না, তাঁহারা ই সংক্ষেপে-প্রাতঃস্নান করিবেন বলিয়া রাজিবাস তৎকালে পরিত্যাগ করিলেন। রাজি-বাস পরিত্যাগ, হস্তপাদ প্রক্ষালন, সন্তকে গন্ধদ্রব্য—অর্থাৎ তুলসীযুক্ত জল প্রক্ষেপ করতঃ অগ্রে গাজ মার্জনা দ্বারা আপাদ যতক মার্জন করাকে সংক্ষেপে প্রাতঃস্নান

কহে। এতদ্বারা শারীরিক বায়ুরেন্দ্রি-বিদূরিত হইয়া দেহ পবিত্র, হর্ব্বুক্ত এবং বিমল হইয়া দেহের স্বভাৱ বিদূরিত হয়। প্রত্যেক-বার স্নানত্যাগান্তে হস্তপদ প্রক্ষালনেও উক্ত প্রকার ফল হইয়া থাকে। অরোগ এবং সচিকু ব্যক্তি উক্তরূপে স্বর্গোদয়ের পূর্বে শৌচক্রিয়া সমাধা করিয়াই নতাদিতে সমস্ত এবং গৃহে হইলে অমস্ত প্রাতঃস্নান করিবে। প্রাতঃস্নান স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অমৃত তুল্য। প্রাতঃস্নানে দেহ রোগশূন্য পবিত্র ও সাত্তিকভাবাগম হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ হয়। প্রাতঃস্নান সত্ত্ব: পাপহর, সত্ত্ব: দুঃখবিনাশক, সুখপ্রদ। প্রাতঃস্নানাত্ম্যসীগণ প্রায়শ:ই মহামারী-জীবাণু বা 'ম্যালেরিয়ার জীবাণু' কর্তৃক আক্রান্ত হন না। অতএব প্রাতঃস্নান মহাপূর্বক অভ্যাস করা সকলের পক্ষেই নিত্য মঙ্গলজনক স্বর্গোদয়ের পূর্বেই প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হওয়া আবশ্যিক। প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনার উপকারিতা আধুনিক নব্যশিক্ষিতগণ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া দেশবাসী নিত্য নতুন রোগ-শোকের প্রাহর্ডাব দিন দিনই বাড়িয়া বাইতেছে। পূর্বোক্তরূপে প্রভুর্বে গোজাখান এবং শৌচ-সদাচার ও প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনা পরায়ণ ছিলেন বলিয়াই পূর্বকালের ব্যক্তিগণ সুস্থ, সবল, দীর্ঘায়ু ও নীরোগ এবং নিরন্তর

উৎসাহ সম্পন্ন থাকিতেন। উক্তরূপ সদাচার  
বিশ্বীনতাষ্ট বর্তমান কালের স্বাস্থ্যবিশ্বীনতাষ্ট  
অন্ততঃ কারণ। এ নিমিত্ত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু  
এবং ভাবী সুস্থশোষণাদিনকামী ব্যক্তি  
মাত্রেরই আর পুষ্টিশাস্ত্র অনাচার-তরঙ্গে  
অঙ্গ ভাসাইয়া না থাকিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-  
বিজ্ঞানের অঙ্গশীলনে তত্ত্ববান হওয়া এবং  
উদ্ভাবন অভ্যাস করা নিত্য কৰ্ত্তব্য।  
প্রাচ্য বিজ্ঞানের স্বয়ং বৈজ্ঞানিক কোন সহপা-  
শেষ প্রবণতাবোধে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্তগণ  
“ইহা কেন করিব; উহা কেন করিব?”  
ইত্যাদি “কেন” ইত্যাদি উদ্ভাবিতেন; এবং  
কথায় কথায় “চাইডোজেন, অক্সিজেন”  
বচন বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া  
দাবী করেন, সেট দাবীগুলি জুলিয়া শাস্ত্র  
বাক্যে বিশ্বাস ভক্তি স্থাপন পূর্বক যথাসাধ্য  
শাস্ত্রাদেশ প্রতিপালনের চেষ্টা করা কৰ্ত্তব্য।  
কারণ হুলস্থলনসম্পন্ন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান  
করিয়া কথায় কথায় “কেন”-এ সন্নিবিষ্টকরণ  
এতকাল পর্যন্ত করিয়া দেখা হইয়াছে,  
তাহাতে সে “কেন”-এর সমস্তই গাণ্ড না  
হওয়ার সম্ভাব্যতার অস্বীকার হয় নাই। সেট  
অনাচারে পরিচালিত হইয়া তাহার কুফল  
বহন বধেই উপভোগ করা হইল, যাচাব ফলে  
আজ পল্লী, নগর অশানভূমিতে পরিণত হইতে  
চলিয়াছে, এমন অসংখ্য এখন একবার  
“কেন”-এর প্রশ্ন চাঞ্চিয়া দিয়া অল্পকাল  
বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন এবং তদানিষ্ট অমুষ্ঠানে  
প্রতী থাকিয়া কিছুদিন স্বাস্থ্যচর্যা করিয়া  
দেখার চাক্ষুণ্যিক?

প্রাচ্যমানার্মি ব্যক্তি স্ব্যাকিরণোভাসিত  
পূর্বকককে অবলোকন পূর্বক করণর যথো

ভর্ত্তনৌ অঙ্গুলী প্রবেশ করাটয়া বক্ষনমজ্জিন  
জলে অবগাহনপূর্বক স্নান করিবে। প্রাচ্য  
নদী বা পুষ্করিণী, বাপী বা প্রভাবনে স্নান  
করাই প্রশস্ত। অনিকক্ষণ স্নান করিবে না।  
অন্যায়ীগণ স্বাস্থ্যন মানের সংক্রান্তিৎ দিন  
চাইতে নিত্য প্রাতঃস্নান অভ্যাস আবিস্ত করি-  
বেন। স্নানান্তর গঙ্গা স্তোত্রপাঠ ও প্রদান  
করিবে। প্রাতঃস্নান দ্বারা বস পূর্বক পুষ্টি  
কায় গায় মাংসনা ককিল রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া  
প্রচলিত হইবার সাধায়া লাভ করিবে। অনন্তর  
আবাস্য পরিচাল্য পূর্বক দৌত পরিষ্কৃত  
পারদান করতঃ গঙ্গাভূক্তিক অথবা তিলক  
দ্বারা বপাবিহিত নিয়মে তিলক দাবণ করিবে।  
তিলক দাবণ পরন পবিত্র কর্ত্তব্য। শিশু  
দ্বারা ব্যক্ত পদম বৈষ্ণব ব্রতপ। অনন্তর  
পিতৃতর্পণ করা পূর্বক অবস্র কৰ্ত্তব্য। প্রাতঃ  
পিতৃলোকের তৃপ্ত সম্পাদন হয়। পিতৃলোক  
পবিত্র হইলে তদ্বংশরাজ্য ব্যক্তিগণ স্বয়ং  
পুষ্টিযুক্ত রোহ দীর্ঘায়ু পাতিতে পাবেব।  
তিলক দাবণ ব্যতীত গোদান, তপস্তা, হোম,  
যাগাদি ও পিতৃতর্পণ কর্ত্তব্য নিবন্ধ হয়।  
উক্ত কর্ত্তব্য সমূহের পূর্বে উক্তপুণ্ড দারণ করিতে  
হইবে। মুক্তিকারিণ অস্তাব হইলে জগু দীর্ঘায়ু  
উক্তপুণ্ড কবিয়া সন্ধাবন্দনা বা দেবদারি  
অর্চনা কর্ত্তব্য। তিলক দারণে অমুষ্ঠ ব্যবহার  
পুষ্টিবৃদ্ধিকরী, যথ্যমা আয়ুর্ভিকরী, অনামিকা  
অর্থপ্রদা, প্রদেশিনী মুক্তিকারী হয়েন। যে  
ব্যক্তি গঙ্গাতীর সমুদ্রা মুক্তিকা দ্বারা তিলক  
দারণ করে, সে স্বয়ংস্বপদারী হইয়া যোগ  
অঙ্ককার নামের নিমিত্ত হয়। অর্থাৎ সর্গ  
প্রকার পাণ হইতে বিমুক্ত হয়। দীর্ঘায়ু  
উক্তপুণ্ড মুক্তিকা দ্বারা বা হোমজগু দ্বারা

ত্রিগুণ্ড, আর যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত চন্দন দ্বারা তিলক  
ধারণ করিবেন। স্বাক্ষণ উদ্বিপুণ্ড করিবেন,  
কজ্রিয় ত্রিগুণ্ড করিবেন, বৈষ্ণব চন্দ্রাকৃতি  
তিলক ধারণ করিবেন, শূদ্র বর্জলাকার  
তিলক করিবেন। তিলক ধারণে ভগবৎকির  
বুদ্ধি হয়।

তিলক ধারণাত্মক বস্তু স্বাস্থ্যমুখ্য পাতঃ  
সন্ধ্যা করিবেন। সন্ধ্যা বন্দনা এবং ভগবানে  
ভক্তি ও বিশ্বাস—সর্বরোগ আরোগ্যের মূল।  
সন্ধ্যাবন্দনা অশ্বৈ মধাকালের পূজা অর্চ-  
নাই নিমিত্ত দূরীচরণ কর্তব্য। তাহাতে  
পুলোপ্পানে ভ্রমণ ও স্তম্ভ প্রহণে বাস্তব  
উন্নতি হইয়া থাকে। অময়ব কেশ-প্রসাদন,  
আদর্শ ও মাহাত্ম্য জ্ঞানাদি দর্শন, তবল স্তম্ভের  
মধ্যে স্থায় প্রতিবিম্ব দর্শন, দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্য-  
কামী ব্যক্তিগণের নিত্যকর্ম জানিবেন।  
ইতালোকে মঙ্গল আটপকাব, যথা, ব্রাহ্মণ,  
গো, হস্তাশন বিবণা, রত, সূর্য্য, জল এবং  
বাজা। ইহাদিগকে এবং যতিধর্ম্মদিগকে  
দর্শন, স্পর্শন, এবং ভাবন দ্বারা পরিতুষ্ট  
করিলে ত্যাক্ষর দেহ মন পবিত্র হয়। বর্তমান  
সময়ে যতিধর্ম্মদিগের সংখ্যা নিত্যম্ভ বিরল,  
একজ্ঞ স্তম্ভাচার পরায়ণা বালবিধবাকে আমরা  
যতিধর্ম্মাবলম্বিনী মনে করিয়া লইতে পারি।  
বালবিধবাগণ সংসদে সদাচার পরায়ণা  
থাকিলে তাঁহাদিগকে দেবী বা যতি বলিতে  
আপত্তি নাই। বৈদ্যবাস্তব যে পরম পবিত্র  
ধর্ম্ম,—তাহা আমরা বিগত ১৩৬ সালের  
বৈশাখ সংখ্যা আয়ুর্বেদের ৩৫ পৃষ্ঠায়  
আলোচনা করিয়াছি।

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ গুরু ধারণ, দয়া, ক্ষমা,  
ধ্যান, সভ্যবাক্য কর্তন, হিংসা পরিত্যাগ,

নিষ্পাপ অন্তঃকরণ, পরদ্রব্য লোভ না করা  
প্রভৃতি মনুর দ্বাবে জীবন যাপনে কৃতসংকল্প  
হইয়া তত্তদাচার পরায়ণ হইতে পারিলেই  
স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল নিশ্চয়  
লাভ করা যায়। অর্থাৎ প্রভাতে উঠিয়াই  
সংসংকল্প সকল লইয়া সমস্ত দিনের জগ্ন  
প্রস্তুত হওয়া স্বাস্থ্যকর্ম্মের পক্ষে কর্তব্য।  
একজন স্বাস্থ্যরক্ষা করিলেই মানব ধর্ম্ম বর্ধিত  
হয়। ধর্ম্ম রক্ষা চাইলেই শরীর রক্ষা  
অনিবার্য্য। তাই শাস্ত্রে বলেন, “শরীরমাঞ্জ  
বলধর্ম্ম সাধনম্”। অর্থাৎ ধর্ম্ম রক্ষিত হওয়াই  
শরীর রক্ষার মূল।

আমাদের ছুটি পটী বক্ষা হয়। দ্রব্যের  
কণা গ্রহণ চাইলে যে মানসিক, স্নেহ বশতঃ  
পাইবার ইচ্ছা হয়, তাহাতে পাকশয়ের  
পাথের অভাব উপস্থিত হয় না। ইতাকে  
চক্ষুর ক্ষুধা বলে। আর প্রকৃত খাদ্যের  
প্রয়োজন বশতঃ যে ক্ষুধা হয় তাহাকেই প্রকৃত  
ক্ষুধা বলে। চক্ষুর ক্ষুধা আহার করিলে  
অজীর্ণ হয়, অতঃপর তাহা বন্ধ করিতে না।  
প্রাণঃশ্বাস ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সর্বকর্ম্ম সমাধা  
হইলে যদি কাহারো প্রকৃত ক্ষুধার উদ্রেক হয়  
তবে তিনি অল্প পরিমাণে ছোপা চিড়া ও ইক্ষু  
গুড় ভোজন করিবেন। বিদেশীয় “চা”  
বিস্কুট, পাউকটী প্রভৃতি দ্রব্য কদাচ  
আহার করিবেন না। তাহাতে অপকার  
ভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় উপকারের সম্ভাবনা নাই।  
তবে ক্ষুধার আধিক্য হলে অল্প মাত্রায় হালুয়া  
ব্যবহারও এই অন্নগতপ্রাণ কলির জীবের  
পক্ষে চলিতে পারে। কিন্তু প্রাতঃক্রিয়া ও  
সন্ধ্যাদিগের পর উদর শূণ্য থাকে কালে বাহার  
বতটুকু দক্ষ হয়—দেহ পরিমাণে দৈহিক ব্যায়াম

করা আবশ্যক। সে উদ্দেশ্যে কেহ বা “ডন” কেহ বা কুন্তি, কেহ বা কোদাগি দ্বারা মাটি কোদান, কুঠান দ্বারা লকড়ী প্রস্তুত প্রভৃতি গৃহস্থলীর সাহায্যকর পরিশ্রমও করিয়া লইতে পারেন। যে গুরিনাশ পরিশ্রমে যাত্রার শরীর কপকিং পরিশ্রাম ও বর্ষাক্রম হয় তাহাই তাহার পক্ষে পরিমিতশ্রম। পরিমিত পরিশ্রম সকলেই নিত্য প্রয়োজন। তথাবা দেহ লঘু বোধ হয়, বক্তৃতা সঞ্চালন সুচারু হয় এবং ক্ষুধা পরিবর্দ্ধিত এবং মন উৎসাহিত হয়। পক্ষান্তরে অপরিমিত পরিশ্রমে আবার এই সকল গুণের ব্যাঘাত ঘটয়া থাকে। পরিমিত পরিশ্রমের পরম্পরাগত পুষ্টি বিশ্রামান্ত প্রয়োজনমুহুর্তে অন্ন মাত্রায় লঘুপাক ও হিতকর বস্ত্র আহার করিয়া কার্যক্ষেত্র উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। যাহারা মাধ্যাত্নিক ক্রিয়ার পব ভিন্ন আচরণ করিতে অক্ষম বা অমনোহর তাহারা প্রাঃকালীন ভোজন করিলে অত্যন্ত কষ্ট প্রাপ্ত হইবে। প্রাঃকালীন ভোজনে “জ”র অপকৃষ্টতা বুঝিয়া উক্ত পবিত্রাগে চেষ্টার একপট্টক হইবেন। তৎপরিবর্তে সন্তোষিত ধারোক্ত গব্যতন্ত্র সেবন পরমোকারী। তাহাতে অগ্নি অন্ন-দিনের মধ্যেই স্বকর্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে ঈষৎ এক বলকের গব্যতন্ত্রও উপদেশ পণ্য। বুড়িভা বা ঈক্ষুভ প্রায় সকলেই সুবিধানক হইতে পারে। একমুষ্টি টাউল সহ এক গ্রাস মলও অনেক পান করিয়া থাকেন। ইহাও ক্ষুধাশীলিগের পক্ষে মন্দ নহে। ফলতঃ নিত্যই আবশ্যক হইলে প্রাঃকালের ভোজ্য অতি অন্ন মাত্রায় গ্রাহ্য হইতে পারে, নষ্টকর নহে।

উপযুক্ত সময়ে পরিমিত ম্নান, মৌনাবলম্বন অর্থাৎ অতি অন্ন বাক্য ব্যবহার, উপবাস, বৈবকার্য ও বেদাধ্যয়ন অর্থাৎ ধর্ম শাস্ত্রাদি পাঠ এই গুলিকে নিয়ম বলে। পূর্বোক্ত ভাবে সাধামত সংযম শিক্ষা করিয়া উক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সংযম প্রতিবেশ স্বকপ, আর নিয়ম—অগ্র্যেয় রূপ। নিয়মের প্রথম বাম অর্থাৎ চারি দণ্ড কালের মধ্যে উক্ত কর্মসম্পাদন করিয়া দ্বিতীয় বামের প্রস্ত প্রাপ্ত হইবে।

### দ্বিতীয় সামাজিকতা।

দ্বিতীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিহিত আছে। বেদাভ্যাস—ব্রাহ্মণগণের পক্ষে এক কালে তপস্তা ছিল। এখন আর সেকাল নাই। পূর্বকালে বেদ, বেদান্ত ও যুক্তি ভিন্ন শাস্ত্র—ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞা উপার্জন দ্বারা যে পরম গতিলাভ হয়, সে গতি ম্নান, তপস্তা, ব্রহ্ম, উপবাস, এবং ত্র্যাদি আচরণেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই সাধারণ লোক অবতার শব্দবাচ্য বলিয়াছেন,—

বিজ্ঞানিক ত্রুটিগতি প্রদায়।

বোধোক্তিকো যত্ববিযুক্তি হেতু।

যে শিক্ষাতে ব্রহ্মের দিকে গতি করে তাহাকেই বিজ্ঞা বলে—অর্থাৎ ব্রহ্ম আরাধনা করিবার তাহাই প্রকৃত। বিজ্ঞানদ্বারা অপর সবই অবিজ্ঞা। যে জ্ঞান লাভে ভবনশূন্য হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানদ্বারা। অতএব সে সকল মহাবাক্য যেরূপ পরিপূর্ণ হইয়া উক্তবর্ণিত ঠিক তদ্বিপরীত ভাব অবলম্বিত হইতেছে।



এইখানেই আমাদের কলিকাতা অর্জনের প্রাথমিক ভিত্তি সংস্থাপিত হইতেছে।, যতদিন না এই ভিত্তির সংশোধন হয়, ততদিন লক্ষ লক্ষ চেষ্টাতেও জনসাধারণের কোন প্রকার উপকার সাধিত হইবার প্রত্যাশা করা যাইতেই পাবে না। অধুনা, এত গভীর ও প্রকৃত তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি করতঃ দৈনন্দিন সামাজিক অধঃপতনে মগ্ন হইয়া অনেক স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা 'বালক' শিক্ষা এবং বালকবিকাশ বিদ্যক নান্যপ্রকার প্রস্তুত লিখন এবং উপদেশ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা কিন্তু উৎপূর্ণে অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষাব বাবস্থা বিষয়ে মনোযোগ দিতে অমরোধ্য করি। কারণ যতদিন ভাবনাসম্মানেব অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ প্রকৃত সংশিক্ষা প্রাপ্ত না হইতেছেন, ততদিন বালকশিক্ষা ও বালক-রক্ষার চেষ্টা কার্যকরী হইবে না। কোমল প্রকৃতি বালক বালিকাগণ দ্রিক কাঁচা মাটির মত, যে ছাঁচ তাহাদের স্বভাব স্পর্শ করিবে— তৎক্ষণাৎ তাহাবি ছাপ পড়িয়া রাইবে। একমুখ অভিভাবক এবং শিক্ষক যাহারা তাহাদের সম্মুখে আদর্শরূপে দণ্ডায়মান, তাহাদের চরিত্র নির্মল হওয়াই প্রথম ও প্রধান আবশ্যক। আদর্শ—অনাচারী, মিথ্যাবাদী, রিপূর্ণহত, সদ্যপায়ী প্রভৃতি অসদৃশ সম্পন্ন হইয়া তখনই সম্মানকে সদৃশ সম্পন্ন করিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যদিও কদাচিৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, কেহ তাহা নিতান্ত বিরল। কলকাতা আদর্শকে নীতিপরাণ, স্বদেশ-স্বাত্মরক্ষক, ভাষ্যমান প্রভৃতি সদৃশ-

শালী হইতেই হইবে। বালকবৃন্দ এক্ষণে কোমল প্রকৃতি বিদায় কাঁচা মাটির তুল্য, সুতরাং তাহারা আদর্শ-পরিচ্যাগে চরিত্রগঠন করিতে কদাচিৎ পারিবে না। তাহা অভ্যাস ও শিক্ষকগণ এক্ষণে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়া পাঠ্য গিগাহেন, সুতরাং তাহারা চেষ্টা এবং অভ্যাস দ্বারা স্ব স্ব স্বভাব অনুযায়ণেই জ্ঞানপূর্বক পরিবর্তন করিয়া আদর্শ সাজিতে পারিবেন। এইরূপে তাহারা আদর্শ না সাজিলে অল্প কোনো উপায়ে কোন প্রকার তীব্র শাসনে বালক-চরিত্র সংশোধন হইতে পারিবে না।

বালক যখন বর্ষপঞ্চদশ দ্বিতীয়ভাগ পড়ে, তখন তাহাকে পড়ান হয় যে, "স্মৃতি কথা কহা বড় দোষ," কিন্তু তাহাবা জানে যে, উহা পড়িয়া কণ্ঠস্থ করার দরকার কেবল পরীক্ষায় পাশ হইবার জন্য। আব কাছের বেলার মিথ্যা কথা বলাই আবশ্যক। কারণ অভিভাবক এবং শিক্ষকগণের নিকট কার্যতঃ সে ঐক্লপ আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াই অনুকরণ করিয়া থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞানসমূহে পারিতোষিক বিতরণের দিনে সর্বস্বার্থেব শেষ ভাগে "বালকগণের প্রতি উপদেশ" শীর্ষক একটা ধারা নির্ধারিত থাকে। এই ধারাকে আমরা ততটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি না। কেননা বালকগণ বৎসর বাপী বহু উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা দিয়াছে, আজ তাহারা পারিতোষিক বিতরণে উত্তীর্ণ হইয়া প্রদানের দ্বন্দ্ব, আজিকার কলিক উপদেশ তাহাদের কর্ণে আদৌ প্রবেশের অবসর পাওয়া স্বাভাবিক হয় না।

যেহেতু তাহারা পারিতোষিক-আনন্দে অহমন্ত আছে। তৎপরিবর্তে এই ধারার শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের প্রতি উপদেশ দিয়াব ব্যবস্থা থাকাই নিত্য দরকার। কাবণ তাহাদের এ সুযোগ আর বৎসবেব মধ্যে কোন দিনই বাটে না।

বালক বালিকাকে সঙ্গীত-বন্দন অভ্যাস করিয়া তুলিতে পণ্ডিত অভিভাবক ও শিক্ষক ইচ্ছা করেন, কিন্তু কিকণ আদর্শ তাহাদের সম্মুখীন থাকিলে যে তাহা কার্যে পরিণত হয় একথা অনেকটী চিন্তা করেন না। অভিভাবকগণ বালককে স্থলে পাঠাইয়া এবং গৃহশিক্ষায়িত্ব করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত, আর স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ পুস্তকে ছাপার লেখাগুলি কোনমতে কর্তৃত্ব বা গলাধঃকরণ কবাইয়া পথিকার পাশ কবাইতে পারিলেই দীর্ঘায় হইতে থাকাস, বস্তুতঃ বালক যে কিকণ কিস্তি শিক্ষার চরিত্রশঠন করিয়া সমাজে সম্মান হইল নাহর নিকি কাচারা কামপট নাহি। বালকগণও কেবল মুখেরে রেখের অথবা লেখ চুর করিয়া কিম্বা পুঁস্বাদেব বন্দোবস্ত করিয়া কোনমতে পাশ করিয়াই চেষ্টা কর্তে বক্তৃৎকিত। কাবণ যে কোনমতে পালের ডিগ্রিমানা শুদ্ধাইতে পারিলেই তিনি লোক-সমাজে “সবজাক”রূপে সম্মান হইতে পারিবেন। এ বিধান দ্বারাও শিক্ষাশা ও অভিভাবক এবং শিক্ষকগণকে সহ উপকার নিরাকরক ওড়াইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং বালকগণের শুদ্ধমান হইয়াই কার্যে পরিণত কবিতোচন। বক্তৃৎকিত জনসমাজও সর্ব-প্রকারে অধঃপতিত হইতেছে।

সেই নিমিত্ত আমাদের মনে হয়, এক্ষণে যদি সাবধকালের মত সূহ দেহ, বেজ-বীণা ও দীর্ঘায়, ঘোষা, ধর্মপরাধন ও প্রকৃত বিদ্যান লোক প্রকৃত করিয়া দেশের উন্নতি কবিত হই, তবে পরবর্তী বংশের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষিত গণবাক্তি নির-দিত্ব মতো প্রথমে শিক্ষার সাজিয়া পাঠা-শাস্ত্রের সহপাঠ্য গ্রন্থে সর্বপ্রকার সমাচরণ প্রাপ্ত করিতে হইবে। “নিজে কিছুই করিব না—কেবল সম্মানকৃত শিক্ষা দিব” এই অসাব্য প্রতিজ্ঞা করিয়া যাঁহে বা অসম্মান জান করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং আমা-নিগেব পুরুলোচিত প্রাণকোষাদি প্রথম যাম্যকৃত্য হইতে প্রাণকোষাদি প্রথম যাম্যকৃত্য হইতে প্রাণকোষাদি প্রথম উপদেশ শিক্ষক ও অভিভাবক এবং স্কুল-কলেজের “ইন্সপেক্টর” প্রভৃতি উচ্চ-কর্মচারীগণকে সম্মানে প্রতিপালন করিতে হইবে। নতুবা তত চাষিতা বক্তৃতা দিয়া বা বক্তৃৎকিত পদার্থ পুস্তক বিধিয়া অথবা বক্তৃৎকিত অর্থ চাষিতা কেবল মাসিক বেতন গ্রহণে পূর্ণ স্বার্থপর থাকিয়া সমাজ নৈতৃত্ব লাভ কবা চলিতেই পারিব না।

সমাজ গণমণ্ডল যখন কাণ্ডাকৃত্য, বক্তৃৎকিত জ্ঞান শিক্ষার ভার ভারতবাসীর কর্তৃত্ব হইয়া দিতে আশা করিয়াছেন, তখন এই ত সুদূর সুযোগ, এই সময়ে বহু পরীক্ষিত আর্গামেন্ট শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া বক্তৃৎকিত কাচারা আনিয়ার চেষ্টা বাহাণ্ডে হয়, তদ্বিময়ে চেষ্টা করা নৈতৃত্বের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তৎপূর্বে অভিভাবক এবং শিক্ষক সম্মানকে সেই সকল বিধানের আদর্শ হইতে হইবে—নতুবা সমাজ শিক্ষণ।

## পল্লীগ্রাম ও ম্যালেরিয়া।

আমরা ইতিপূর্বে পল্লীগ্রামের লিঙ্গা অল্প বিস্তার আলোচনা করিয়াছিলাম, আবার করিব। বাহারী সহরে বাস করেন,—সহরের কুপমণ্ডক হঠাৎ বাহারী সহর ভিন্ন আর কোনো স্থানের কোনও বসবাস রাখেন না, পল্লীগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিন্তু পরেই হইতেছে দেশের প্রাধান্য উপায়। সহরে কলের জল, বা বৈদ্যুতিক আলোকে আমাদের সুখ-সুবিধার পূর্বা পরিদ্রুত হইতে পাবে, কিন্তু আমাদের জীবন ধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় ধাতু-কলার-মুগ মসুরি—পল্লীর আদিল প্রান্তর ভিন্ন আর কোথাওতো উৎপন্ন হইবার উপায় নাই। সহরেব মত পল্লীপ্রদেশে মণিকাকর্ণেব স্থলভতা নাই, কিন্তু স্বর্ণ বস্তুত অলঙ্কার বিহীন-পল্লীগ্রামীর অঙ্গলতা চরিত্র-শ্রামল শল্ল সম্ভারে যে সৌন্দর্য লইয়া বিরাজ করিতেছে, সে রূপলাবণের সাধনা করিবার সৌভাগ্য লইয়া সকলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্তই বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে রক্ষা করা যে কত দূর প্রয়োজনীয় তাহা আমরা চিন্তা করিবার অবসর পাই না।

কিন্তু সে চিন্তা আর না করিলে নয়, নামাকারণে বাঙ্গালার পল্লী গুলি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। কতিবাস পণ্ডিতের ভিত্তির যুগুচরিতেছে, কানীয়াস বাসের ভিত্তি ধাপ ধুলের আবাস ভূমি ইহা, 'ভারতের' জন্মভূমি আর জন্মভূমি পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে নবদীপ এক দিন

সাহিত্য-দর্শন-স্মৃতি-পুরাণ, চিকিৎসা-জ্যোতিঃ-বেদগর্ভে সকল দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, রোগের আশ্রয় পিতৃপিতামহের ভিত্তির মায়া বিসর্জন দিয়া লেখনকার আর্জিক অধিবাসী আজ দেশত্যাগ করিয়াছে। বিজ্ঞানসাগরের প্রতিবাদীগণ, বস্তুম চক্রে গ্রামনিবাসীগণ, নবীনচক্রে দেশবাদীগণ এখন আর কেহ দেশের খবর রাখেন না, কারণ রোগের পীড়নে দেশে থাকিবার উপায় নাই। অয়দেবের কেলবিশ গ্রাম—যে গ্রামে ভক্তের গৃহে একদিন স্বর্গ ভগবান আসিয়া "দেহিপদপল্লবমুদারম্" বহন্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে গ্রাম আজ জন শূন্য। বোপদেবের ভিত্তি কেহ আর চাহিয়া দেখেনা। বিজ্ঞাপতি-গোবিন্দলাস-জ্ঞান দাঁসের জন্মভূমি যে কোথায় ছিল—সে চিন্তা করিবার আবশ্যকতাও এখনকার দিনে কেহ মনে করেন না।

কিন্তু কেমন হইল? কেমন করিয়া কাহার অভিসম্পাতে আজি সোণার বাজার অধিবাসীগণ দেশত্যাগী হইয়া পড়িল। সহরে আমাদের সুখ-সুবিধা বত প্রকারেই বর্দ্ধিত হইক না কেন, সহর হইতে কেহই কবি-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। স্মৃতির ব্যবস্থা, দর্শনের মীমাংসা, সাহিত্যের অনুশীলন—ইহাও আশ্রয় সহর হইতে কোমলকালে প্রাপ্ত হই নাই। সহরে অর্থ ব্যপেষ্ট আছে, সহর বাণিজ্যের বন্দর, বণিক সাজিয়া সহর হইতে অর্থ কুড়াইবার চেষ্টা কর, ব্যপেষ্ট

পাইবে, কিন্তু সাহিত্যের সাধনা, জাতির  
সিদ্ধান্ত, জ্যোতিষের আলোচনা করিবার স্থান  
সহর নচে, বাজার নিভৃত পল্লী ভিন্ন সে  
সকলের উর্ধ্বের ক্ষেত্র সহরে কোনও কালে  
প্রাপ্ত হয় নাই। আঁধার কেমন করিয়া  
কাহার অভিসম্পাতে আমাদের সে পল্লী  
জননী তাঁহার কৃতী সন্তানদিগকে প্রবাসী  
সাজাইয়া দাঙ্গা দৈত্য বেশ পরিগ্রহ করিলেন  
এবং আমরা চেষ্টা করিয়া আবার  
তাঁহার সেই হস্তী ফিরাইতে পারি কি  
না—এই সমস্তার সমাধান করাটী কিন্তু  
এখন আমাদের সর্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া  
পড়িয়াছে।

সহরে বাস করার ফলে পেট ভরাইবার  
জন্তু বিহারার পরের চিন্তায় দিবসের অধিকাংশ  
সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, ঘরেব  
খবর রাখিবার চিন্তা তাঁহাদের অনেকেরই  
নাই। অর্ণের সাধনার তাঁহারা সিক্তিলাভ  
করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন কোন দেশ  
হইতে দাঙ্গা উপর হুটী—কেমন করিয়া  
কিরূপ জেবে সে দাঙ্গাশাশি হইতে আমরা  
আমাদের প্রধান আহারীয় দ্রব্য চাইল পাও  
হইয়া থাকি এবং অধুনা দেশে দিন দিনই যে  
সেই চাইলের মূল্য অসম্বরণে বৃদ্ধি  
পাইতেছে এবং চেষ্টা করিয়া তাহার প্রতীকার  
করিতে পারি কিনা—এ সব চিন্তা করিবার  
অবসর তাঁহাদের আদৌ নাই। অবসরও  
নাই, প্রবৃত্তিও নাই, প্রবৃত্তি থাকিলে তো  
অবসর আসিবে।

এখন আমরা জাতি ধর্ম্ম শিক্ষাশেষের  
বিচার না রাখিয়া সকলেই গতানুগতিক  
জাবে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করিয়াছি বটে,

কিন্তু এমন একদিন ছিল, যে দিন আমরা  
দাসত্বকে ঘৃণা করিতাম, জাতি ধর্ম্ম রক্ষা  
করিয়া গ্রামাঞ্চিক বিধি উল্লঙ্ঘনের ভয়ে  
আতঙ্কিত হইতাম, জীবিকা নির্বাহের জন্ত  
সকল জাতি লোকে একাকার পস্থা অনু-  
সরণ করিতে শিহরিয়া উঠিতাম, শাস্ত্র মাত্র  
কবিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া স্ব স্ব জাতির কর্ম্ম  
পালনে গর্ব্ব অনুভব করিতাম। তখন দেশে  
অর্গল হুলস্থল ছিলনা, কিন্তু উদ্ভাবনের সংক্রান্তে  
জন্তু আমরা তখন তো দেশভাগী হই নাই।  
পল্লী প্রান্তরে মুক্ত বায়ু তখন আমাদের  
সকল জাতি সর্ব্বাঙ্গ শৌক্য কবিত, সহরের  
সহস্র বৈজ্ঞানিক বাজনাও তাঁহার সমযোগে  
নচে। স্বতঃস্ফূর্ত হুলা নদী-তড়াগেব কল-  
প্রলাপ আমাদের যে স্নিগ্ধতা উপাদান করিত,  
সহরে কলেব জলে সে স্নিগ্ধতার সম্ভাবনা  
কোথায়? পূর্ণিবার চন্দ্র সহরেও প্রকাশ হয়  
বটে, কিন্তু পল্লী ভিটার আঁধারায় বসিয়া সেই  
প্রাকৃতিক শোভা যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে,  
সে কখনই পূর্ণিবার চন্দ্র ভিরণে সে কত  
মাধুরী,—তাঁহা উপলব্ধি করিতে পারিবে  
না। সে কোকিলের কুহুরব, পাণিরার  
কলতান, ভ্রমবের মধু গুঞ্জন—পল্লীবাসী হিন্ন  
কাহার শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত লাভ করিতে  
পারিয়াছে? আমরা একদা পল্লীবাসীর সেই  
সকল প্রাকৃতিক সুখ উপভোগ করিতাম।  
হায়, কাহার অভিসম্পাতে আমাদের সে  
সকল নষ্ট হইল?

অনেকে বলিবেন, ম্যালেয়িয়ার জন্তু  
আমাদের সে সুখ-সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে।  
অনেকটা একথা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে।  
আমাদের দেশভাগী হইবার সুখ কারণ

আমাদের দাসত্বের সূত্র, —গোণ কারণ  
মালেরিয়া। মালেরিয়া বঙ্গদেশে ভাসিয়াছে  
১৮০৪ খৃঃাব্দে। মুর্শিদাবাদ ও কাশিম  
বাজারে এই বোগের প্রথম আবির্ভাব হয়,  
কিন্তু তখন ইহার সমাজ স্থচনা মাত্র।  
ঐ স্থচনার ২০ বৎসব পরে যশোহর, জেলার  
মহম্মদপুর অক্ষিপথের ফলে মালেরিয়া যে  
কি পদার্থ তাহা আমরা চিনিতে পারি। কিন্তু  
মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে ইহার প্রথম  
স্থচনা যে সময় হইয়াছিল ইংরাজী শিক্ষার স্থচ-  
নার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় হইতেই আমাদের  
মনে চাকরি করিবার সূত্র জাগিয়া উঠে।  
সেই জাগরণই হইল আমাদের সর্বনাশের  
কারণ। সেই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে  
য়েল-স্ট্রাসারের আবির্ভাব হইল, ইংরাজী  
শিক্ষার বিস্তার হইতে চলিল, দেশের লোকে  
অল্প বয়সে ইংরাজী শিখিয়া মোটা মোটা মাহি-  
দানার চাকরি পাইতে লাগিল। স্ত্রী-পুত্র  
লইয়া সেই সময় সর্ব প্রথম বিদেশবাদী হই-  
বার কামনা বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়া উঠিল।  
পল্লীজন্যের কৃতীসম্মানরণ পল্লীমাতার অঙ্গ  
পুত্র হইবার ইহাই সর্ব প্রথম কারণ। তাহার  
পর নুনাকারণে দেশে মালেরিয়ার বিজ  
শিকড় গাড়িয়া বসিল, কাজেই প্রবাসী  
বাঙ্গালী আর পল্লীভিত্তি চাহিয়া দেখিলনা,  
এমনই করিয়া বাঙ্গালার পল্লীগুলি হতভী  
হইল। কাজেই বলিতেছিলাম; ইংরাজী  
শিখিয়া গোলাবীর সূত্রই আমাদের পিতৃ  
পিতামহের ভিত্তিগুলি জনপুত্র হইবার মুখা  
কারণ। এক মালেরিয়ার ভয়ে পল্লী পরি-  
ভ্রাণের সূত্র আমাদের গোণ কারণ।  
বীকার করি—অনেকে দেশ ত্যাগ

করিয়াছেন ম্যালেরিয়ার ভয়ে। কিন্তু দেশে থাকিয়া সে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহারা কোনো চেষ্টা করিয়াছেন কি ? ষাঁহার পুটের দ্বারে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের দেশ ত্যাগের কারণ ম্যালেরিয়া নহে, কিন্তু ষাঁহার ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, পল্লীর প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা ছাড়িয়া সহরের অস্থায়ী পশু-দৌর গহবরে ষাঁহারা সপ করিয়া আবাস স্থান নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি পল্লীভিটার সক্ষা আলিয়া প্রতিবাসী দিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এবং মহামাত্র সরকার বাহাদুরের হস্তে সেই সংগৃহীত অর্থ প্রদানান্তর পল্লীর বন জঙ্গলভূমি কাটাইবার জন্য—পুষ্করিণী দীক্ষিকাগুলির পঙ্কোদ্ধারের জন্য—কদম্বপঙ্কিল-সরসীগুলির সংস্থার সাধনের জন্য নানোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতেন না ? ম্যালেরিয়া বলিয়া আতঙ্কিত হইলে চলিবে কেন ?—শত্রু শিবিরে, তাহাকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিলেই হইত হইলে হইত না।

ম্যালেয়রয়ার উৎপত্তির কারণ-অসুস্থস্থানে  
অবগত হুওরা যায়, যেদেশ নিম্ন, যে দেশের  
ভূমি অধিকাংশ সমর সিদ্ধ, যে দেশে পর্যঃ  
প্রণালীর সুব্যবস্থা নাই এবং যে স্থান জঙ্গল-  
বহুল,—ম্যালেয়রয়ার আক্রমণ সেই স্থানেই  
পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহাই যদি  
ম্যালেয়রয়ার কারণ হয়, তাহা হইলে আমাদের  
বঙ্গভূমিকে ম্যালেয়রয়ার হাত হইতে রক্ষা  
করা কি বিশেষ কঠিন ব্যাপার ?  
ম্যালেয়রয়ার তাড়নে আমরা বঙ্গদেশের  
লোকই যে আজি নূতন বিপদাশঙ্ক এবং

ইহা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশকে ইতিপূর্বে আক্রমণ কবে নাই—তাহা নহে, বাঙ্গালা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশেও এটী ভ্রমস্ত বাক্ষসী যে সকল স্থানকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে সকল দেশের অধিবাসীদিগের চেষ্টা ও যত্নে যত্নেই পলায়িত হইয়া বণে ভক্ষ্য দিয়া ম্যালেরিয়া বাক্ষসী সে সকল স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে। ১৮৮৮ সালে হাভানার এই ভ্রমস্ত দানবী মৃত্যু সদনে প্রেরণ করিয়াছিল ৩২৫ জনকে, ১৮৮৮ সালে ১০১, ১৮৯০ সালে ১৭০, ১৮৯২ সালে ২০৬ ও ১৯০০ সালে ৩৪৪ জনকে শমন-সদনে প্রেরণ করে, কিন্তু ১৯০১ সালের পর হাভানার প্রকৃতিপুঞ্জ ম্যালেরিয়া দমনের জন্য এরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিয়া তুলিল যে, ১৯০৩ সালে ঐ রোগে মৃত্যু সংখ্যা হটল মাত্র ১৬ জনের। স্টুটেনহামবন্দবেও ১৯০১ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৩১০, কিন্তু ঐ সময় হইতে চেষ্টা করিয়া ১৯০৫ সালে মৃত্যু সংখ্যা হটল মাত্র ২৩। ১৯০০ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১৬৩, কিন্তু ঐ বছর পর বৎসর হইতে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টার ফলে ১৯০৫ সালে মৃত্যু সংখ্যা ষাড়াটল মাত্র ৫৪। আনি ম্যালেরিয়ার উত্তীর্ণ এখানে সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়া প্রবন্ধে কলেরার বৃদ্ধি করিতে চাচ্চিনা, আমাব বক্তব্য ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার মত অন্যান্য প্রদেশকেও উত্তাপূর্বে আক্রমণ করিয়াছিল এবং সে সকল দেশের অধিবাসীগণ তাহা দেখিয়া বাঙ্গালার সম্বাদাদিগের মত রণে ভক্ষ্য দিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই, পরন্তু প্রকৃত চেষ্টায় ঐ ভ্রমস্ত ব্যাধিকে দেশ হইতে বিদূরিত

করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে বিকল্প কৃতকার্য হইয়াছিলেন তাহারই পরিচয় দিবার জন্য উপরে সংশ্লিষ্ট তালিকা প্রকাশ করিয়াছি।

অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের মত বচনব্যাপন নহেন, তাহার প্রকৃত কলের উপাসক, প্রকৃত উপাসকের সাধনা নিষ্ফল হইবার ন্যায় কয়েক তাহার কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন। আমি জানি,—আমাদের পক্ষ জননা ম্যালেরিয়ার আক্রমণ প্রতি বৎসর সংখ্যা অসংখ্য স্থান-সমৃদ্ধি-বিবেগ বাধা অসম বদনে অসুস্থ করিতেছেন, যে মৃত্যুর অপত্য—না মরিয়া বাচ্চি থাকিতেছে, তাহাদের পেট জোড়া মৌহা, পাখী জোড়া বক্ত ও কৃষি জোড়া অগ্রদূত তাহাদের বাহ্যদৈন্তের অন্তর ব্যাধি প্রদান করিতেছে,—বাহ্যদৈন্তের আর্থিক অবস্থা সমুন্নত, তাহার দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছেন, বাহ্যদৈন্তের গত্যন্তর নাই তাহার উপায় রহিত অবস্থায় ভিত্তির সজ্জা প্রদীপ আলিয়া নিজেদের আয় প্রদোপ নির্দান প্রাপ্ত করিয়া ফুলিতেছেন। আমাদের দেশে Ronald Ross অনুগ্রহণ করেন নাই, ডাক্তার গিলিও আমাদের দেশের নহেন, ডাঃ টীকেন এবং ক্রিষ্টোকারও আমাদের দেশে নাই, জার্মানীর মুখ্য অধ্যাপক কক (Kocu) ও আমাদের দেশের নহেন, অতঃপর তাহার আমাদের এই ম্যালেরিয়াক্রিষ্ট দেশের কথা চিন্তা করিয়া তাহাদের দেশের মত ম্যালেরিয়া দূর করিবার উপদেশ প্রদান না করিলেও আমাদের দেশেও তো কমবাসিগণের অভাব নাই।

বহু, রায় চুনোগাণ বহু বাহাদুর প্রমুখ বাঙ্গালার কুঠী সম্বানগণ বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য যদি চিন্তা করেন, তাহা হইলে আশ্চর্যের বশে হইতে কি ম্যালেরিয়া-মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইতে পারে না? বাঙ্গালার দেশের কথা চিন্তা করেন এমন মনবী আবও অনেক আছেন, • তাঁহারা ই বা এ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিতেছেন? আসল কথা, এরূপ একটা প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া চিন্তা শুধু কাগজে কলমে লিখিয়া নিশ্চিত থাকিলেই চিন্তা করিতেছেন? বহু-তার জোবে প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ করিলেও চলিবে না,—এই চিন্তার কলে পল্লীর কুঠী সম্বানগণ তাঁহারা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য চিরকালের মত পল্লীমার্য বিসর্জন দিয়া সহরপ্রবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুন্নয় করিয়া—বিনয় করিয়া—তাঁহারা ই পল্লীর আশা-ভরসা—সহায় সম্বল—এ সকল কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া বাহাতে তাঁহারা আপন-আপন পল্লীর উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হন—তাঁহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, বাহাদের অবস্থা আছে তাঁহারা অর্থ প্রদান করুন, বাহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা শক্তি প্রদান করুন, বাহাদের কর্তব্য বোধ আছে তাঁহারা দায়িত্ব গ্রহণ করুন,—এইরূপে বাঁহার বতটুকু শক্তি—বাঁহার বতটুকু ক্ষমতা—তিনি ততটুকু আপন পল্লী রক্ষার জন্য যদি ব্যয় করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে এই দুঃস্থ মনবীর সহিত যুদ্ধে অস্ত্রাঘ্র দেশের বড় আমরাও জয়ী হইব—তাঁহা অবিসম্বাদিত।

আমরা সহরে বাস করিতেছি, কিন্তু

সহরেও তো রোগের আশা কম নহে। পল্লীগামে ম্যালেরিয়া সব চেয়ে বড় ব্যাধি, কিন্তু সহরে সব চেয়ে বড় ব্যাধি হইতেছে বম্বা বা ক্ষয়রোগ। সহরেব বড় বায়ু, কলকারখানার ধোঁয়া এবং পাখাখাতের বিচারশূন্যতা—মোটামুটি এত করত কারণে আমরা সহরে থাকিয়া বম্বাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি। বম্বাগ্রস্ত হইবার আবও অনেক-লি কারণ আছে—কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়া সে সকল পরিচয় এখানে নাই প্রদান করিলাম। বাহা হউক মফঃস্বলের ম্যালেরিয়ার মত সহরেও বম্বারোগ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা ভিন্ন সহরে সকল প্রকার ব্যাধিই বারমাস, লাগিয়া আছে, টেনুস, রেঙ্গা, হাম, বসন্ত, কলেবা নিউমোনিয়া—কাহাকে ফেলিয়া কাহাব কথা বলিব? এক কথায় বাঙ্গালার সর্বপ্রধান সহর কলিকাতা তো এখন সকল রোগের ঠাকরভূমি। ইহার উপর কলিকাতার বাসাবাড়ীর কথা আর নাই তুলিলাম। ফলে কলিকাতার অবস্থা বেরূপ দাঁড়াইয়াছে—তাঁহাতে ইচ্ছা হউক অনিচ্ছা হউক—অনেককে আবার পল্লীভিটার ফিরিয়া বাইতেই হইবে। তাঁহাই যদি আর কিছুদিন পরে করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আর বাঙ্গালার পল্লীগুলি ধ্বংস করিয়া লাভ কি? এখন হইতে কারমনোবাকো পল্লী-সংস্কারে মনোযোগী হইয়া বাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আবার সেকালের মত সুখসমৃদ্ধিত কটাইতে পারে—তাঁহার জন্য চেষ্টা করা উচিত নহে কি? আমাদের অবস্থা ব্যবস্থা চাউলের মূল্য দশটাকা

একরূপ নির্দিষ্ট ভাবেট দাঁড়াইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ ঠটিপুর্বে তো বলিয়াছি— আমরা অনেকট চাউলের উৎপত্তি বিনয় অবগত নহি, বাজার বহিরাছে যখন যে সবট চটক কিনিয়া আনিতেছি, বন্ধন হইতেছে, আহার করিতেছি—হইনে আমাদের চাউলের সম্বন্ধে সম্বন্ধ। বাজারের অবস্থা স্বচ্ছল, তাঁহারা একপ সম্বন্ধ স্থানে কাঁড়ের নহেন, কিন্তু বাজারগকে যথেষ্ট পাব-প্রম কবিয়াও সংসারযাত্রা নির্বাহ কবিত্তে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এ সম্বন্ধ যে বিশেষ ভরসার কাঁড়তে তো কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যে পর্যন্ত বাজারী জাতি সেই অসীত যুগের অসমতা পূরণের পল্লী প্রান্তের আবার কৃষি কর্ষে মনঃসংযোগ না করিবে সে পর্যন্ত যে তাহাব পক্ষে এই ভরসার যত্নের ভোগ কবিত্তে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাজারী চাকরিট ককর আর বাজারি ককর, বাজারী যে এখন 'হাভার' দল হইয়াছে। বাজারীর অধিকাংশ জাতিই আগে চাকরি করিত্ত না বটে, কিন্তু এখন হাভারের চাষে যাত্রা হইত, মাঠে কদল হইত, ফেটে প্রকারী জমিত, পুষ্কবিলিতে, মৎস্তের অভাব ছিল না। তাহার ফলে তখন বাজারী এখনকার মত 'হাভার' দল হয় নাই। চাকরির স্পৃহাতেই বন, আর মালেরিয়ার ভাঙনেই বন, আর সব দিটাইবার জন্তই বন, বাজারী প্রভৃতি ছাড়া—সেকালের বৃষ্টিপূর্ণ পরিচাল্য করিয়া আপন কর্মদেবে স্বপাদ-মিলে ডুবির মরিতেছে। এক আঁচ বেপের-অংশ ভরসা, — বাজারীর এই জারুণ দুর্গতির দিনে বাজারী জাতিকে তাহার প্রম দেখাইয়া দিয়া,—

তাহাকে তাহার অনেক কালের অভ্যাস পরিচাল্য কবাইয়া পল্লী পরিচাল্যই যে তাহার আশ্রয় চরম দুর্গতির কারণ তাহাকে ইহা দেখাইয়া দিয়া—আবার তাহাকে স্বপক্ষে আনিয়া তাহার উদ্ধার সাধনে চেষ্টা করিবে না। দিনে এই কর্মে অগ্রসর হইবেন—আমরা তাহাকে কেউটা ধর্য্য দিব, বিষয়সংগ্রহ তাহার গুণগাণা গাহিবে, ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাহার নাম অবিনশ্বর ভাবে, কীর্তি হইবে। আর তাহারও সাহস থাকে, এস—না যত্না অসংখ্য তার নিজের পুত্র দেখাশোনা রক্ষা করিতে পারবে।

এইবার দেশ হইতে মালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন কি করিয়া হইতে পারে, সেট কথটা বলি। পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাঁতে হইলে আমাদিগকে মালেরিয়ার দূর করিবার জন্ত বকপরিষ্কার হইতে হইবে, পল্লীগ্রামে ফিরিয়া না যাঁতেও আমাদিগকে তাহার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে। বৎসরের শতকরা ৩০ জনেরও অধিক লোক মালেরিয়ার আক্রমণে মরিয়া থাকে। 'এক মৃত্যু! অগতঃ কোন দেশের লোক তো একপভাবে মরণের পথ পরিষ্কার কবে না।

আমরা পল্লী চাড়িয়াছি, কিন্তু বাহারা আমাদের ভিটার সন্ধ্যা আলিয়া এখনো পল্লীর অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, তৈত্রেয় কাটকাটা রৌদ্র, শ্রাবণের অবিরাম বারিধারা, পৌষের চাঁড়ভাঙ্গা শীত অন্নানবধনে সজ্জ করিয়া বাহারা দেশের জন্ত—জাতির জন্ত পল্লী হাতের প্রাণে পরিপ্রম করিয়া সর্বপ্রকারে শত্রু উপপাদনের প্রয়াস করিতেছে, নিরাকর অদভ্যাজিত বলিয়া উপেক্ষার চক্ষে আঁত বিকাশপূর্বক



তাহাদের নরণ তো চাহিয়া দেখিলে চনিবে  
না! তোমার আমার দেশ রক্ষা করি  
অপেক্ষা তাহা বা যে সত্য সত্য কার্যমো-  
বাক্যে দেশের সেবা করিতেছে—একটি  
এখন আর মর্মে মর্মে না বহির্ভূত চনিবে  
না, বৎসরে শতকরা যদি ৩০ জন রক্ষ  
দাখিলেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুপথে পতিত হয়,  
তাহা হইলে বাঙ্গালকে বাঁচাইবার আর  
উপায় থাকিবে না—ইহা সত্য। পল্লী  
প্রান্তরের রক্ষকুল নিবন্ধ হইতে মৃত্যু  
হউক, কিন্তু তাহা হইতেছে সমগ্র  
বাঙ্গালী জাতিকে একত্রিত  
করমা। তাহা বা কুশলে থাকিলে হবে  
বাঙ্গালীর সকল জাতি কুশলে থাকিবে,  
তাহা বা বক্ষা পাউনে তবে বাঙ্গাল দেশ রক্ষা  
পারিবে। বঙ্গের কৃষী পুষ্কগণ, শৌমবা  
জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাও আর না যাও,  
শৌমবা অগ্রণী হইয়া দুঃস্থ মালেকির  
হাত হইতে তাহাদিগকে বক্ষা করিয়াব চেষ্টা  
কব। তাহাদের আবাসস্থানের পার্শ্ব  
বন জঙ্গলগুলি কাটাঁইবার ব্যবস্থা করিয়া  
দাও, তাহাদের আবাস স্থানের পার্শ্ব  
নাড়া ভোবাগুলি বুজাইয়া দিবার বন্দোবস্ত  
কর; তাহাদের পানীয় জলের হ্রাসিত দূর  
করিবার জন্ত তাহাদের রক্তপ্রায় জলাশয়-  
গুলির সংস্কারসাধনের ব্যবস্থা কব,  
তাহাদের পানার্থ যে জলাশয়গুলি নির্দিষ্ট,  
সেগুলিতে পানি পড়াইয়া বাতাতে কেচ সে  
জলাশয়গুলি না করে, তাহারি ব্যবস্থা কর—  
দেখিবে। তাহাদের আবাসভূমি দিবার  
ব্যবস্থাকেও হইয়া উঠিবে—পল্লী গ্রাম  
সোভাগ্য অভ্যুত্থানের সাধিবহন করিয়া

আবার কিবিধা আসিবে, রূপার পৈঁচা-  
তাহাজে বাতলতাব শোভা সুকি করিয়া  
পল্লীগ্রামের কৃষাণীকুল আকুল হইয়া আবার  
রক্ষকের আনীত শস্ত আফ্রিনাগ্রদেশে  
বিস্তারপূর্বক রোদ্রে দিবার জন্ত বাগ্ৰশভাবা  
হইয়া উঠিবে।

উবে যে চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া  
—উঃ আমাদের কল্পনার চিত্র নহে—সত্য  
কথা বাঙ্গালীর পল্লীগুলিতে একদিন ঘরে  
একটি চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইত।  
রক্ষকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে ক্ষেত্রে শস্ত  
উৎপন্ন হইত, সেগুলি পরিপক হইলে কাটিয়া  
আছড়ান হইত, তাহার পুর শস্তমস্তার পৃথক  
পৃথক করিয়া লওয়াব পরে যখন সেগুলিকে  
গৃহে আনা হইত—তখন কৃষাণীই সে শস্ত-  
রক্ষার অধিকারিণী হইতেন। কৃষাণী সে  
গুলিকে রোদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইয়া কতকাংশ  
বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া তদ্বারা তৈল  
লবণ প্রভৃতি সাংসারিক দ্রব্য সকল ক্রয়  
করিতেন। ঐহমজিক হাণ্ড যখন এইরূপে  
গৃহজাত হইত—তখন সকল গৃহেই কি এক  
অভূত আনন্দপ্রসূতি প্রবাহিত হইত।  
এখনকার নবাব, এখনকার পৌষপার্বণ—  
সে তো বাঙ্গালীর পূর্বস্মৃতি রক্ষা কবিতোছে-  
মাত্র,—একটা শুভদিন দেখিয়া বাজার  
হইতে নূতন চাউল কিনিয়া আনিয়া এখন  
আমরা যেমন নবাবের আয়োজন করি,  
পৌষপার্বণের ঘটাপ এখন আমাদের  
সেইরূপ। কিন্তু সেকালে রক্ষ যখন সারা  
বর্ষের প্রম সুস্থল মনে করিয়া নূতন ধান-  
শির শুপে আফ্রিনাগ্রদেশ আলোকিত  
করিত—তখনই কৃষাণী সেই ধান্যে নবাবের

উৎসবের আয়োজন করিত। সে এক কি  
আয়োজন। পুরোচিত ডাকা হটত, মস্ত-  
পাঠ হইত, প্রতিবাদী আত্মীয়স্বজনবর্গকে  
নিমন্ত্রণ করা হইত, তবে সে নবান্নের ব্যবস্থা  
সিদ্ধ হইত। বাঙ্গালীর পোষপাকপণ্ড ছিল—  
ঐ নূতন ধাতু উপস্থানের পরে। এখন সে  
নবান্নের ঘটান নাই, পৌষ পার্বণের উৎসবও  
নান্ন মাত্র আছে।

যাক সে কথা। এখন চটতেছে বাঙ্গালী  
আবার সেই অতীত সুগ ফিরাইয়া আনিবার  
কথা, বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায়ের দ্বারা  
অক্ষুণ্ণ বাধিবাব কথা, বাঙ্গালার পল্লভূমি  
হইতে মালেশিয়া-বাঙ্গলাকে দূর কবিনাব  
কথা। পল্লীকাছাবী বিশেষভাবে প্রমাণিত  
হইয়াছে, ইংল্যান্ডে মালেশিয়া আক্রমণের  
সর্বপ্রধান কারণ। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে  
ডাঃ মানসনট একথা সর্বপ্রথম প্রকাশ  
করেন। ইহার পর ডাঃ রস ১৮২৭—২৯  
খৃঃ অব্দে স্পষ্ট দেখাইয়া দেন যে, কতকগুলি  
মশক নরশোণিত হইতে কৃষ্ণচক্রাকার প্রাপ্ত  
জীবাণু গুলি উদ্ভব করিয়া জীবাণু  
জন্য উৎসাহ করিতেছে। ইহার পর ডাঃ  
লো ও সামবিল প্রভৃতি টোনা প্রদেশে  
অবস্থিত করিয়া ইহার প্রকৃত প্রমাণ লোক  
সমাজে প্রকাশ করেন। মশকটা মশকট  
চটতেছে মালেশিয়ায় আক্রান্ত হইবার  
সর্বপ্রধান কারণ। যে সব দেশে মশক নাই  
সে সব দেশে মালেশিয়াও নাই। দেশ হইতে  
মালেশিয়া দূর করিতে হইলে দেশ হইতে  
আগে মশকবৃন্দ নির্মূল্যে বাদ্য, করিতে  
হইবে,—সমস্তোয়া 'নদী-সরিকুলি, পুরী  
কর্দম পরিপ্লত খাল বিল ডোবাগুলি, গৃহ-

পাখী গর্ভ ও নালগুলিট হইতেছে মশক  
বিস্তৃতির সর্বপ্রধান স্থান—সেগুলির সংস্কার  
সাধনের কথা পূর্বেই বলিয়াছি, তা' ছাড়া  
বাগানে পল্লীবাশীমাঝেই গ্রীষ্মের মিনে দাগায়  
গড়িয়া মুক্ত বায়ুতে আবাদ সুখ উপগন্ধি না  
করে—তাহার জন্য উপদেশ প্রদানপূর্বক  
তাঁহারা বাগানে মশারি ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া  
তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। বর্ষার  
সময় কতাবৃত্তিই গুলি দূষিত হয়, একত্র গরম  
জল পানীয়রূপে ব্যবহার করিবার জন্য  
তাহাদিগকে পরামর্শ দিতে হইবে—মশক  
উদ্ভবরূপে সর্বিদেহ মদন—খানি ধোণের  
উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক—এ কথা তাহাদিগকে  
স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে।—কৃষকদিগের  
পক্ষে আর স্বস্তি বায়ামের প্রয়োজন  
হয় না—কর্মসূত্রে তাঁহারা যে বায়াম কবে  
তাছাই বধেই, কিন্তু কৃষিজীবী বা অজ্ঞাত-  
শ্রমজীবী ভিন্ন বাঁহাব পল্লীগ্রামে বাস করেন  
তাঁহাদের পক্ষে যে পাতার কিছুকল ধরিয়া  
বায়াম করা একান্ত প্রয়োজন—একথা  
পল্লীবাশীর সকলকেই বুঝাইয়া দিতে হইবে।—  
কলে এট সকল ব্যবস্থা যদি পল্লীগ্রামে  
কেহ প্রবর্তনের চেষ্টা করিতে পারেন  
তাঁহা হইলে মালেশিয়া-রাকসী-দীর্ঘবাণ-  
কেলিয়া যে বাঙ্গাল দেশ হইতে টলিয়া  
যাইবে তাহাতে আর কিছুবার সন্দেহ  
নাই, কিন্তু ইহার প্রবর্তক হইবেন কে?—  
তাঁহাই তো চিন্তা! কে এমন কর্মবীর  
আছেন—যিনি সর্বকর্মভাগ করিয়া বাঙ্গালার  
পল্লীতে কল্যাণে পরিভ্রমণ পূর্বক এই  
মালেশিয়া-বাণের কথা পল্লীবাশী  
দিগকে বুঝিয়া দিবেন? বাঙ্গালীগণের

অবশ্য নিশ্চিত নাই, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা আমরা নিজেরা কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করিলে কর্ম-  
কল যে আরও তত্তদ হইবে, তাহা নিশ্চিত।  
সেইজন্য বলিতেছি,--কে না আমাদের প্রাণ বাঙ্গা-  
লার গৌরব! এস ভাই,--বাঙ্গালী জাতির  
এই দীর্ঘ দিনে বাঙ্গালী জাতিকে মাগে-  
রয়ার আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার  
জন্য বন্ধ পরিকল্পনা হইতে,--মুন্সীর বাঙ্গালী  
জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য। যে  
জাতির একজন বীর  
জিগ, শক্তি ছিল, বাঙ্গালীর একদিন  
আশানন্দের মত বীর, বৈজ্ঞান্য-বিশ্বনাথের  
মত গণ্যকমশাসী শোকেব অভাব ছিলনা,  
জানিব যেন একদিন অক্ষতবাস্তবো

বিজ্ঞানোপাচনার সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট  
সুপরিচিত হইয়াছিল,--যে জাতি দেশের  
জন্য--দেশের জয়--রাজ্যের আতির সাহায্যের  
জন্য--পক্ষান্তরে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য  
ব্রিটিশ-জার্মান যুদ্ধে যাইতেও পশ্চাৎপদ  
হই নাই,--এস ভাই বাঙ্গালার কৃতীসন্তান!  
সেই দেশকে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর,  
সেই বাঙ্গালীকে বাঁচাইতে চেষ্টা কর--  
সেই বাঙ্গালার পল্লীগামের মাগেরিয়া  
নিবারণের জন্য বন্ধপরিকর হইয়া পল্লীর  
পূর্বশ্রী ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা কর;--  
সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অমোঘ আশীর্বাদ দেব-  
নির্ঘাণের মত তোমার মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হইবে,  
--তুমিই বাঙ্গালীজাতির রক্ষা কারণ হইবে।

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

আয়ুর্বেদ কলেজ।--নিখিল ভারতবর্ষীয়  
আয়ুর্বেদ-সম্মিলন হইতে একটি আয়ুর্বেদ  
কলেজ প্রতিষ্ঠা হইবে। কথা উঠিয়াছে  
কলিকাতার অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান্যের  
সহিত উহা বিশাটয়া সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী  
একটি কলেজের ব্যবস্থা হউক। ভাণ কথ।

ডিক্টেট বোর্ডে আয়ুর্বেদের সাহায্য।--  
বিশোহর ডিক্টেটবোর্ড সেখানে "আয়ুর্বেদীয়  
দাঁতব্য-চিকিৎসার" প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবার  
নিশ্চয়, তাহা আমাদের ষাঠিগুহিডা নেন  
বিশা ডিক্টেটবোর্ড হইতে ২০  
সিপ দিয়া আমাদের আয়ুর্বেদ কলেজ  
জন ছাত্রকে পঠিত করাইছে। লক্ষ্যে  
নিকট, তাহা ডিক্টেটবোর্ড সেখানে

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিবেন  
বলিয়া অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান্য হইতে  
একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র চাহিয়াছেন।  
ভারতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-বিস্তারিত পন্থা  
সুগম হইতেছে বলিতে হইবে।

আয়ুর্বেদ সভা।--আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার  
উন্নতি বিধানের জন্য মহামহোপাধ্যায় কবি-  
রাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয় কলিকাতা মহা-  
নগরীতে একটি আয়ুর্বেদ সভার প্রতিষ্ঠা  
করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠাতার পুরস্কার গন-  
নের পর সভাটি ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়া-  
ছিল। কুমারটুলীর বর্তমান কবিরাজ মহাশয়-  
দিগেন্দ্রপ্রসন্ন চৌধুরী উহাকে ধ্বংসের পথ  
হইতে রক্ষা করা হয়। এখন সভার অবস্থা .

গণেই উন্নত, অনেক চিকিৎসকই যেচ্ছিলেন।  
 হাজার সভাপ্রার্থী ভুক্ত হইতেছেন। মহা-  
 মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন  
 সর্বস্বতী এম-এ, এল, এম, এস মহাশয় গত  
 বৎসর ৪৪তম ইহার সভাপতির পদ অধিকৃত  
 করিয়া তদ্বিক্রমসম্মত নামে সকল প্রার্থী  
 চিকিৎসাব আলোচনা বাহাতে সমাক্রান্ত  
 হইতে পারে, সভায় সেট নিয়ম প্রবর্তন  
 করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়ের এইরূপ  
 একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই সভাগণের অনুরাগ  
 বৃদ্ধি বিশেষ কারণে অধিক সংখ্যক ভোট  
 প্রাপ্তির ফলে এ বৎসরও উক্ত মহামহোপাধ্যায়  
 সভাপতির পদে বরিত হইয়াছেন। আমরা  
 এই প্রাচীণ ও প্রতীকাত্মক চিকিৎসক-শিষ্য-  
 মণির নিকট সভার উন্নতিকল্পে অনেক বিষ-  
 য়ের আশা করি।

‘আয়ুর্বেদ সভা’ কাগনিজাতক সমিতির  
 সভা—১৯২৭ সালে নিম্নলিখিত  
 ব্যক্তিগণ ইহার কাগনিজাতক সমিতির সভা  
 নিষ্পাদিত হইয়াছেন,—১। মহামহোপাধ্যায়  
 কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সর্বস্বতী এম-এ,  
 এল, এম, এস সভাপতি, ২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত  
 কালীভূষণ বসু কবিভূষণ, এম-এ, এম-বি,  
 সভা সভাপতি, ৩। শ্রীযুক্ত প্রমোদস  
 বাচস্পতি সভা সভাপতি, ৪। শ্রীযুক্ত বাচস্প  
 নারায়ণ সেন কবিভূষণ সভা সভাপতি, ৫। শ্রীযুক্ত  
 চন্দ্রমোহন মজুমদার কাব্যভীরব সভা সভাপতি,  
 ৬। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন, কবিভূষণ সভা এইরূপ  
 সভাপতি, ৭। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন কবিভূষণ  
 সভা সভাপতি ও প্রাধিকার, ৮। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ  
 বিদ্যেবর প্রসন্ন সেন কবিভূষণ, কবিভূষণ,

৯। শ্রীযুক্ত দ্বিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, সম্পাদক,  
 ১০। শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন কবিভূষণ,  
 সম্পাদক, ১১। শ্রীযুক্ত যতীনাথ গুপ্ত কবিভূষণ,  
 ১২। শ্রীযুক্ত অনুরোধ সেন, ১৩। শ্রীযুক্ত  
 বরেন্দ্রচন্দ্র সেন বি-এ, ১৪। শ্রীযুক্ত কালীভূষণ  
 দাস গুপ্ত কাব্যভীরব, ১৫। শ্রীযুক্ত কবিভূষণ  
 প্রসন্ন সেন, ১৬। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন  
 বাকবসু কবিভূষণ, ১৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত  
 সত্যচন্দ্র পরাশর দত্ত, ১৮। শ্রীযুক্ত  
 সত্যচন্দ্র সেন কবিভূষণ, ১৯। শ্রীযুক্ত  
 গোবিন্দ, ২০। বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগদানন্দ  
 চট্টোপাধ্যায়, ২১। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  
 হিসাব-পরীক্ষক, ২২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র  
 সেন হিসাব পরীক্ষক, ২৩। শ্রীযুক্ত  
 সত্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীযুক্ত  
 রজনীকান্ত দাস, ২৫। ডাক্তার শ্রীযুক্ত  
 অনিবার্য মণি বসু এম, বি, ভিষকবর।

অষ্টম আয়ুর্বেদ বিভাগের—“অষ্টম  
 আয়ুর্বেদ বিভাগের” এবার যে সকল ছাত্র  
 ভর্তি হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি বি,এ, এবং  
 আই, এ উপাধিযুক্ত। অনেকগুলি প্রবন্ধ  
 বিদ্যমান এই বিভাগের এবার প্রবেশাধি-  
 কার লইয়াছেন। কলেজ-কাউন্সিলের নুতন  
 নিয়মে এবার ৬ মাসের করিয়া বেতন গ্রহণের  
 ব্যবস্থা হইয়াছিল,—আমাদের কথা এই যে,  
 আমরা কই সে ব্যবস্থার সম্মত হইয়া ৬ মাসের  
 বেতন গ্রহণ করি এই কলেজে ভর্তি হইয়াছেন।  
 এই বিভাগের ৪৫ জন ছাত্র  
 পদার্থ বিদ্যা পদার্থ বিদ্যা  
 বায়োমিউট্রিক্স করিতেছেন, ইহা নিতাই  
 আর কথা।

# কলিকাতা "আয়ুবের কলেজ"

## বার্ষিক পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ৪র্থ হইতে ৫ম বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| ১। বিশ্বনাথ সেন গুপ্ত   | ৭। প্রহ্লাদ নাথ রায়   |
| ২। প্রমথ নাথ দত্ত গুপ্ত | ৮। যোগেন্দ্র সেন গুপ্ত |
| ৩। মজি, সি, বিক্রমসিংহ  | ৯। জ্ঞানচন্দ্র গুপ্ত   |
| ৪। বাজেন্দ্র চন্দ্র দাস | ১০। কিবদাস দাশ গুপ্ত   |
| ৫। হেম চন্দ্র চক্রবর্তী | ১১। গোব দাস অধিকারী    |
| ৬। যোগেন্দ্র সেন গুপ্ত  | ১২। ধনঞ্জয় সেন গুপ্ত  |
|                         | ১৩। মণীন্দ্র রায়গুপ্ত |

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ৩য় হইতে ৪র্থ বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| ১। রম্য কুমার সেন          | ৮। পরমানন্দ শর্মা                |
| ২। জিতেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত | ৯। লাল বিহারী টিকাদার            |
| ৩। জবিন                    | ১০। বি, এল, ডব্লিউ, বিমলা দৌট    |
| ৪। অমিত্রাচার্য            | ১১। গোপাল চন্দ্র গোপ             |
| ৫। রাজি হেন্ড দত্তদাস      | ১২। হই ছাত্রগণকে সাধারণভাবে উত্ত |
| ৬। অমিত্রা কুমার চৌধুরী    | করিয়া লওয়া হইল।                |

চিকিত ছাত্র ১ মাস পরে বিষয়ব  
নিম্নলিখিত পরীক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইলে ৫ম  
বর্ষে উন্নীত হইবে।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ২য় হইতে ৩য় বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| ১। শ্যামলা নাথ দাশগুপ্ত            | ৩। নীলকণ্ঠ দাস আইচ        |
| ২। নরেন্দ্র নাথ রায় চট্টোপাধ্যায় | ৪। প্রভাত কুমার চক্রবর্তী |
|                                    | ৫। টি, এন, সিং কুর        |

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১ম হইতে ২য় বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| ১। হুমেন্দ্র পাল             | ১৭। সুনীল আশ্রম সেন        |
| ২। হুমেন্দ্র সেন গুপ্ত       | ১৮। ধরণী ধর সেন            |
| ৩। হুমেন্দ্র সেন গুপ্ত       | ১৯। যতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত |
| ৪। হুমেন্দ্র সেন গুপ্ত       | ২০। মনোমোহন দাশগুপ্ত       |
| ৫। হুমেন্দ্র চক্রবর্তী       | ২১। নিরঞ্জন দাশগুপ্ত       |
| ৬। অতুলকুমার গোস্বামী        | ২২। সি, শঙ্কর আচার্য       |
| ৭। উপেন্দ্রকুমার রায়        | ২৩। পূর্ণ চন্দ্র পাল       |
| ৮। হুমেন্দ্র কিশোর রায়      | ২৪। গণনাথ শর্মা            |
| ৯। হুমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত    | ২৫। শ্রীচন্দ্র দাস         |
| ১০। হুমেন্দ্র মোহন           | ২৬। ভবেন্দ্র রায়গোষা      |
| ১১। হুমেন্দ্র কুমার দেব নাথ  | ২৭। মহাবলা শেঠী            |
| ১২। হুমেন্দ্র লাহিড়ী        | ২৮। বি, সি, রতন            |
| ১৩। হুমেন্দ্র পতি রায়       | ২৯। বিজয়শঙ্কর ঐতিহাসিক    |
| ১৪। হুমেন্দ্র কুমার কার্যকার |                            |
| ১৫। হুমেন্দ্র                |                            |

১ম হইল, বিজয়শঙ্কর ঐতিহাসিক  
২য় হইল, বিজয়শঙ্কর ঐতিহাসিক

## পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ৩ টোটকা।

( কবিরাজ শ্রীমদাশুভযশ সেনপুত্র )

বাসক যোগে। (১) সুস্বর ও ত্রি— বাস পী আপানিতে। (২) বহুভা  
সমান ভাগে মিশ্রিত। পাতা প্রাতে বাস পী আপানিতে। (৩) বহুভা  
মাত্রার কিছুদিন সেবন করিলে বক্তৃকৃত্য মিছরি পান করিতে দি-  
আরোগ্য হয়। (৪) গুলকমলেঃ মূলক পারাবল দিতে  
ফলে গুটী আনা শু গোলমরিচ ৩ টি, ত্রকত্র জল একে আনি চূর্ণ  
হাওয়া বাটিয়া ক্ষুণ্ণ শিন দিবস পাত্রে ৩০ সতিন সেহন করিলে বাসেব কষ্ট বিদূষিত  
বৈকালে সুবাসেব সেবন করিলে পাবক সেবনাব হয়। (৫) পুরাতন শুড় ও সর্বশ বৈদ্য  
শাস্তি হয়। (৬) মোতাগাব মট, চিঃ ফলে মিশ্রিত। সেবন করিলে বাসেব কষ্ট  
সুস্বর ও ভোগকস—সমান ভাগে গুটী মূত- নিবৃত্ত হয়।  
কুমারিও বসে মাড়া ২ বান মাত্রার কলেব  
সতিন সেহনে বাসক সেবনা নিবৃত্ত হয়।  
মুর্ছা বা টিষ্টবিহারা—আদ্য বস বাবা আনা শুভনে গুটী মধুব সহিত পিষিয়া  
নয় গাংগা-ব্রহ্মে মর্মে নিবৃত্ত হয়। (২) সেবনে পমেহ বোগ আরোগ্য হয়। (৩)  
নয়, ১ টি, বনঃশিলা ও ১৫ একত পেঘল কাটা চরিত্রীর বস ১ তোলা, বজ্রমূলের বস  
করিয়া জল দিলে মুর্ছা প্রশমিত হয়। (৩) ১ তোলা ও চিনি চাষি আনা একত্র বস্তক  
কাগজ টুকটের মত গাংগা করিয়া হাওয়া দিন সেহনে পমেহের আলা-বস্তক উপশম  
হয় নাশিকায় দিলে মুর্ছা শান্ত নষ্ট হয়। হয়। (৪) গুলক, আমলকী গোলকী কাটা  
(৫) বস্ত্রের বসেব নত প্রদান করিলে চরিত্রী টোলের এক একটী ১০ তোলা, জল  
মুর্ছা শুভ হয়। (৬) মরিচ পোড়াইয়া তাহা ১০ সেহ, শেষ ১০—এট কাখে মধু অক্ষেপ  
শ্রম নাকে দাগাইলে মুর্ছার অপনয়ন হয়। দিয়া পান করিলে পমেহ পীড়ার শাস্তি হয়।











